

Barcode - 4990010208484

Title - Masik Basumati (Year 39, vol. 1)

Subject - LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE

Author - Ghatak, Prantosh, ed.

Language - bengali

Pages - 1174

Publication Year - 1960

Creator - Fast DLI Downloader

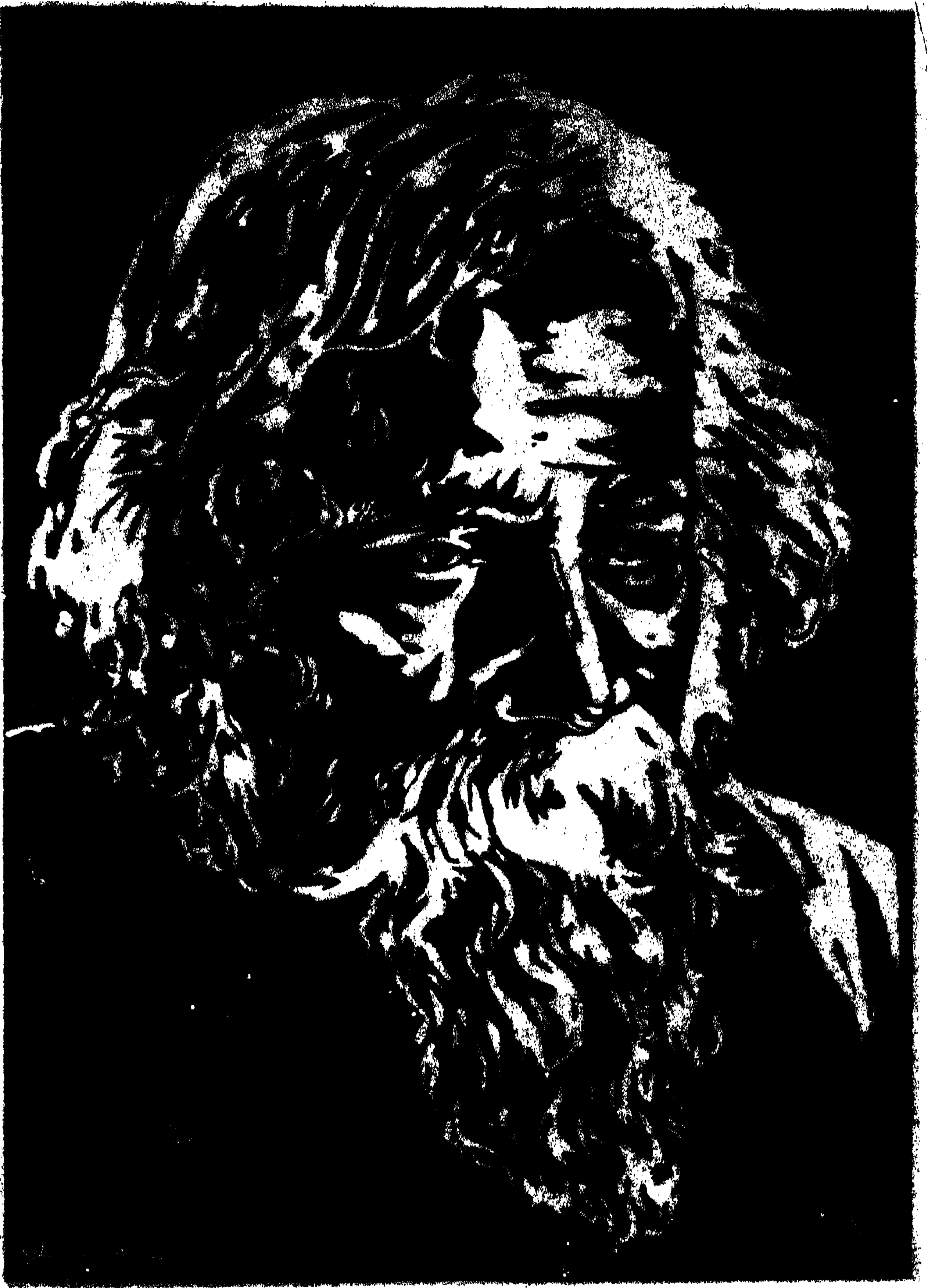
<https://github.com/cancerian0684/dli-downloader>

Barcode EAN.UCC-13



4990010208484

28



মাসিক বঙ্গবন্ধু
১১ কৈলাশ, ১৩০৭ ॥

(কাঠ খোদাই)

ভারত-রবি
—অক্ষয়কুমার পাহান খোদিত



11-2010

11-2010

11-2010

11-2010



মাসিক কুমুদী

৩৯শ বর্ষ—বৈশাখ ১৩৬৭]

। স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ।

[প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

মূর্তিপূজা

ছই-একটি ছাড়া সকল ধর্মেই ব্যক্তিবিশেষ বা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ব্যতীত বোধ হয় জগতের সকল ধর্মেই সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকে, আর সগুণ ঈশ্বর মানিলেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি উপাসনাদি ভাব আসিয়া থাকে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা যদিও সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু অত্যাশ্রম ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে, ইহারাও ঠিক সেইভাবে স্ব স্ব ধর্মের প্রবর্তকগণের পূজা করিয়া থাকে।... জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানব প্রতীক বা বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক আকৃতিবিশেষের সহায়তায় সূক্ষ্মকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্মের বাহ্য অঙ্গস্বরূপ ঘণ্টা, সঙ্গীত, শাস্ত্র, প্রতিমা, অনুষ্ঠান—এই সবগুলিই ঐ পর্যায়ভুক্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে কোন বস্তু মানুষকে সূক্ষ্মের সুল আকার দিবার সহায়তা করে, তাহাই সেইরা উপাসনা করা হয়।

জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম ও খৃষ্টধর্মের কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে কিছুমাত্র আপত্তি নাই; বরং তাঁহারা অবাধে প্রতিমার সদ্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল মুসলমান ও প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম এই সহায়তার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাহা হইলেও মুসলমানেরা তাঁহাদের সাধু ও ধর্মার্থ প্রাণোৎসর্গী ব্যক্তিগণের কবর একরূপ প্রতিমাস্থলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রটেস্ট্যান্টরা ধর্মে বাহ্য সহায়তার আবশ্যকতা উড়াইয়া দিতে গিয়া প্রতিদিন ক্রমশঃ উচ্চ আধ্যাত্মিকভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন।

খ্রীষ্টান মনে করেন, ঈশ্বর যে ঘুঘুর রূপ ধরিয়া আসিয়াছিলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু হিন্দুদের মতামুসারে তিনি যে গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, উহা সম্পূর্ণ ভ্রম ও কুসংস্কারাঙ্ক।

ইহুদীরা মনে করেন যে, ছুইদিকে ছুই দেবদূত-বসান সিন্দূকের আকৃতি একটি প্রতিমা নির্মাণ করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু নর বা নারীর আকারে যদি কোন প্রতিমা গঠিত হয়, তবে উহা ঘোরতর দোষাবহ। মুসলমানেরা মনে করেন যে, তাঁহাদের প্রার্থনার সময় যদি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া কাবা নামক কক্ষপ্রস্তরযুক্ত মন্দিরটির আকৃতি চিত্রা করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু চার্চের আকৃতি ভাবিলেই তাহা পৌত্তলিকতা। প্রতিমাপূজায় এইরূপ গৌড়ামি আসিবার আশঙ্কারূপ দোষ বিদ্যমান। তথাপি প্রতিমাপূজা প্রভৃতি সমুদয় ধর্মের চরমাবস্থায় আরোহণের জগৎ প্রয়োজনীয় সোপানাবলী বলিয়া বোধ হয়।

আপনাদের মধ্যে সকলেই ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছেন। উহা ভাবিবার চেষ্টা করুন দেখি। সর্বব্যাপী বলিতে কি বুঝায়, আপনাদের মধ্যে কয়জন ইহার কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারেন? যদি খুব চেষ্টা করেন, তবে হয়ত সমুদ্র বা আকাশ বা মরুভূমি বা একটা সুবৃহৎ হরিষর্গ প্রান্তরের ভাব মনে আনিতে পারেন। এই সমুদয়গুলিই জড় পদার্থ আর যতদিন না আপনারা সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মরূপে, আদর্শকে আদর্শরূপে ভাবিতে পারেন, ততদিন এই সকল জড়বস্তুর সহায়তা আপনাদিগকে লইতেই হইবে। ঐ জড়মূর্তিগুলি আমাদের মনের ভিতরে অথবা মনের বাহিরে থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা সকলেই পৌত্তলিক হইয়া জন্মিয়াছি, আর পৌত্তলিকতা অশ্রায় নহে, কারণ উহা মানবের প্রকৃতিগত। কে ইহা অতিক্রম করিতে পারে? কেবল সিন্ধু ও জীবনুক্ত পুরুষেরাই পারেন। অবশিষ্ট সকলেই পৌত্তলিক। যতদিন আপনারা বিভিন্ননামরূপবিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছেন, ততদিন আপনারা পৌত্তলিক। আমরা জগৎরূপ এই প্রকাণ্ড পুস্তকের অর্চনা করিতেছি। যাহার আপনাকে দেহ বলিয়া বোধ আছে, সে ত পৌত্তলিক হইয়াই জন্মিয়াছে। আমরা সকলেই আত্মা—নিরাকার আত্মস্বরূপ—অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ—আমরা কখনই জড় নহি। অতএব যে ব্যক্তি পৃথিবীর আত্মা, যে ব্যক্তি নিজেকে জড় না ভাবিয়া, দেহস্বরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি

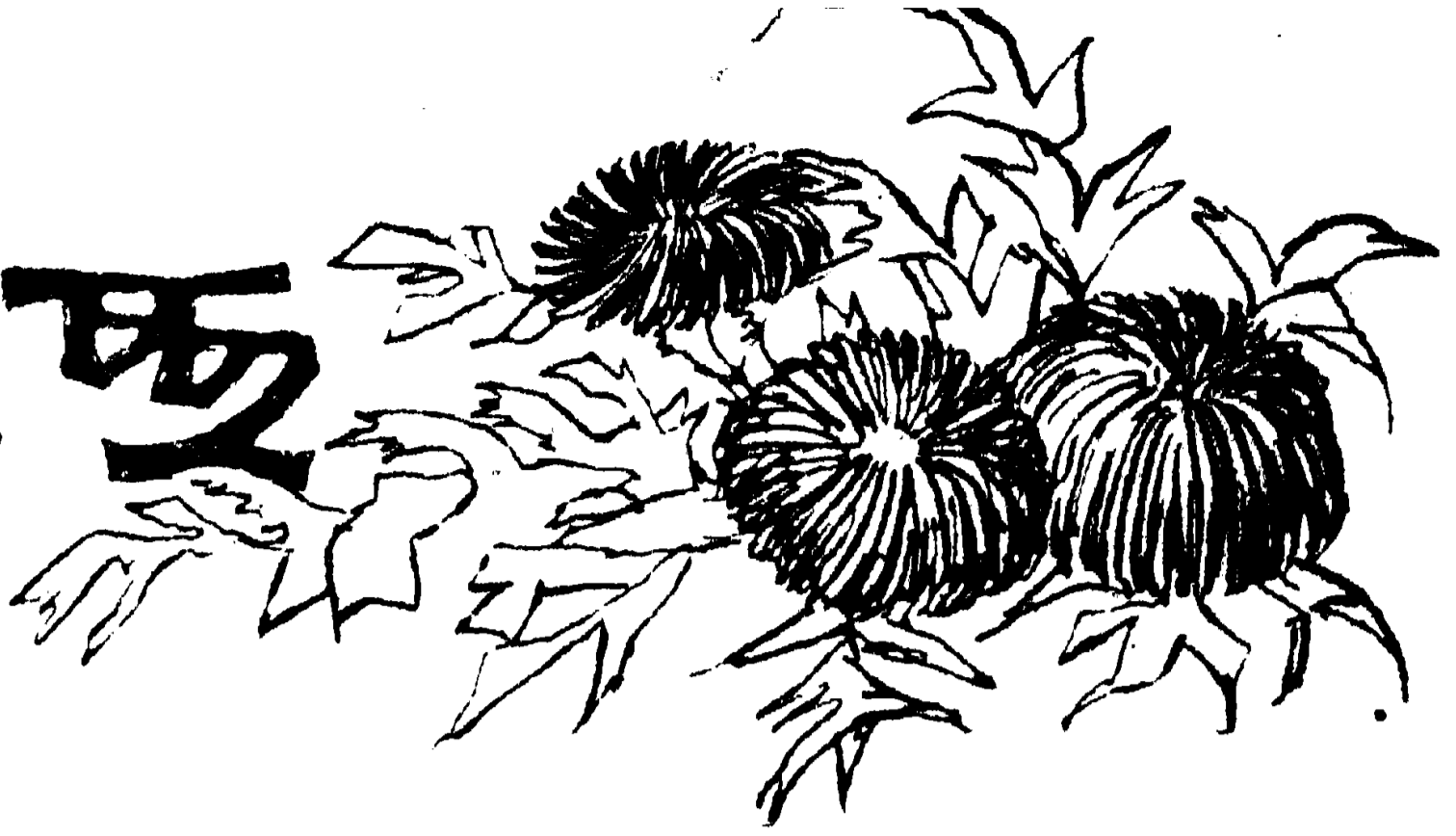
নিজ স্বরূপচিন্তায় অসমর্থ, সে পৌত্তলিক। তথাপি দেখুন, কেমন লোকে পরস্পরকে পরস্পর পৌত্তলিক বলিয়া বিবাদ করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ উপাস্তকে ঠিক মনে করে, কিন্তু অপরের উপাস্ত তাহাদের মতে ঠিক নয়।

সাধারণ মানবের ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে উপাসনা না করিলে চলে না। যদি সে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবানের পূজা না করে, তবে তাহাকে স্ত্রী, পুত্র, পিতা, বন্ধু, আচার্য বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ভগবানের স্থলাভিষিক্ত করিয়া পূজা করিতেই হইবে। পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের আবার ইহা অধিকর আবশ্যিক।... আমাদের ভগবানের ধারণা ও উপাসনা স্বভাবতঃই মানুষী। সত্য সত্যই “এই শরীর ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির।” সেইজন্মই আমরা দেখিতে পাই যে, যুগযুগান্তর ধরিয়া লোকে মানুষের উপাসনা করিয়া আসিতেছে।

মূর্তিপূজাও সত্য, সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপও সত্য, কেবল একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—চিত্তশুদ্ধি। যদি হৃদয় শুদ্ধ ও অকপট হয়, তবেই উপাসনা সত্য হয় ও আমাদেরকে চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়, আর এইসব বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালীই সত্য, কারণ সত্য না হইলে কেন সেগুলির সৃষ্টি হইল? জীবাশ্মের স্বাভাবিক প্রয়োজনে ঐগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার জগৎ সেগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে, সুতরাং তোমাদের উহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ফল নাই। যেদিন সেই প্রয়োজন আর থাকিবে না, সেদিন সেই প্রয়োজনের অভাবের সহিত সেগুলিরও লোপ পাইবে, আর যতদিন এই প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন তোমরা যতই উহাদের তীব্র সমালোচনা কর না কেন, যতই উহার বিরুদ্ধে প্রচার কর না কেন, ঐগুলি অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। তরবারি বন্দুকের সাহায্যে জগৎকে রক্তশ্রোতে ভাসাইয়া দিতে পার, কিন্তু যতদিন প্রতিমার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন প্রতিমা-পূজা থাকেই থাকিবে। এই বিভিন্ন অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও ধর্মের বিভিন্ন সোপান সকল অবশ্যই থাকিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

পত্রপুচ্ছ



গ্যেটের প্রেমপত্র : কবির দ্বিতীয় মানসী

গ্যেটের কৈশোরের প্রথম স্পর্শালু প্রেম বয়ঃসন্ধিকালে হতাশা এনেছিল। যাকে তিনি মানসী ভেবেছিলেন, সেই গ্রেচেন নামী মুহিলা কবিকে ভাই হিসাবে দেখেছিলেন। এই কথা শুনে কবি আহত হন। মানসিক অবসাদে শয্যাশায়ী হন। জীবন-মরণ সমস্তা দেখা দিয়েছিল কবির। দীর্ঘ রোগভোগের পর কবিকে আইন পাঠ করবার জ্ঞান লাইপজিগে পাঠান হয়। প্রবঞ্চিত কবির কাছে ফ্রাঙ্কফার্ট শহর শূন্য বলে মনে হয়েছিল। গৃহে পিতার কঠোর শাসনও কবির কাছে অসহ্য লাগছিল। অচিরেই তিনি লাইপজিগে চলে আসেন। সেখানে তিনি কাপ্তান হয়ে উঠেন। মেয়েদের মনোরঞ্জনের জ্ঞান যে কোন কাজ পেলে কবি অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠতেন। তাঁর হাবভাব দেখে না হেসে উপায় ছিল না। তাস খেলতেন। ব্যঙ্গাত্মক ছবি আঁকতেন। কোন উদ্দেশ্যও জীবনে ছিল না। এই সময় তিনি আহা হরতেন সনকফ পরিবারে। সনকফ পরিবারের গৃহিণী ফ্রাঙ্কফার্টের অধিবাসী ছিলেন। স্বাভাবিক প্রবণতা বশতঃ স্বদেশীয়দের তিনি আপ্যায়ন করতেন। এই পরিবারের মদের ব্যবসা ছিল। এই পরিবারের অনূঢ়া কন্যা কুমারী কেটহেন সনকফের সহিত কবির পরিচয় হয়। সামাজিক বংশ-মর্যাদা এই পরিবারের তেমন ছিল না। তবে গ্যেটে এই সামাজিক মর্যাদা মানতেন না। এই যুবতীকে দেখে গ্যেটে মুগ্ধ হন। কুমারী সনকফ তখন পূর্ণ বিকশিত। ইনি বেশী লেখাপড়া জানতেন না। তবে গ্যেটে বুঝেছিলেন সেই যোষার হৃদয় আছে। কোন কুর্গা বোধ এই যুবতীর মধ্যে ছিল না। এই জ্ঞান সেই যুবতীকে গ্যেটে আরও ভালবাসতেন। কবি একবার সহোদরকে লিখে জানালেন যে, বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁর ইতিহাসের নামকরণ সঙ্গীতের নয় জন অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামানুসারে করেছিলেন, তাই তিনিও বারটি কবিতা প্রেমসীর নামে লিখে প্রেমসীকে সমর্পণ করবেন। তারপর আকস্মিক ভাবে সহোদরকে গ্যেটে জানালেন, ইতিহাসের সঙ্গ সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর যেমন সম্পর্ক নাই সেইরূপ তার কবিতার সঙ্গ কেটহেন সনকফের কোন সম্পর্ক নাই। এখানে বলা যেতে পারে, এই প্রেমদার সঙ্গ গ্যেটে এক সঙ্গ অভিনয় করেছিলেন লেসিং রচিত একটি নাটকে। সে বাই হোক, কবি লাইপজিগে বরাহীন জীবন যাপন করেছিলেন। পানাহারের ফলে কবির হৃদয় শক্তি হ্রাস পায়। উচ্চমাত্রা জীবন যাপনের জ্ঞান লাইপজিগের জ্ঞান সমাজ

হতে কবি একবার বহিষ্কৃত হন। এই কেটহেন সনকফকে তিনি অভিপায়িত রমণী বলেছিলেন। জর্নৈক বন্ধুর কাছে জানান এই প্রেমসী রমণীকে স্বপ্নে দেখে জাহান্নামে নেমে গিয়েছিলেন। এই কুমারীর সম্পর্কের সহিত অবশেষে গ্যেটের শিথিলতা আসে। কবি সম্পূর্ণ অধিকারের দাবী জানান নি। সুতরাং কুমারী কেটহেনকেও পথ দেখতে হয়েছিল। উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হলে কবি বলেছিলেন ছাড়াছাড়ি হয়ে তিনি সুখী হয়েছেন এই জ্ঞান যে, বিচ্ছেদের পরও বন্ধু থাকবে। এই সময় কবি অসুস্থ হন। কবির মনে হত তিনি কয়রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রবঞ্চিত প্রেমিকের এটি কল্পনাবিলাস। অবশ্য অসুস্থ তাঁর হয়েছিল। এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। অনূঢ়িত পত্রের অন্তঃসঙ্গতি দেখে গ্যেটের মানসিক পটভূমি ধরা হুহু হবে না।

Fankfert Sept. 1768

প্রিয় কেটহেন সনকফ,

গ্যেটে জানে যে, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি জিনিষের প্রতি তোমার আকর্ষণ আছে, তাই তোমাকে এক জোড়া সুন্দর কাঁচি পাঠালাম। এর সঙ্গে এক জোড়া মজবুত চটি এবং ভাল চামড়ার দু'জোড়া পিঁপারও পাঠালাম। জিনিষগুলো ভাল এবং এর পেছনে বেশ মেহনত আছে কারণ এগুলো খৈর্য ধরে বানাতে হয়েছে, তবু মনে হয়, এগুলো হৃদয় তোমার হাতে বেশীক্ষণ থাকবে না, যেমন থেকেছিল নির্মিতার হাতে। আমি যা ভাবি তাই বলি—তাই আমাকে মন্দ বল না। আশা করি, আড়াই বছরের মধ্যে তুমি পিঁপার আর ছুরির আকার করবে না- অবশ্য এর তার তোমার ওপর রইল। ইষ্টারের ছুটির আগে অবশ্য তুমি এগুলো ভেঙে তচনহু করে দিতে পার—তা হলে তোমাকে এগুলো দেবার জ্ঞান আবার তৈরী থাকবে—আর এই তুচ্ছ জিনিষের মধ্যে আমাকেও তুমি মরণে আনতে পারবে, আমার দেবতা তোমাকে চিঠি লেখার ইচ্ছে বর্তমানে আদৌ রাখে না কারণ সে যে প্রতিজ্ঞা করেছে, মাসের প্রথম দিক ছাড়া তোমাকে সে আর লিখবে না। সে-প্রকৃত ইচ্ছে, আমি যেন তার প্রতি অঙ্গুগত হই। সেই হিসাবে আমিও দাবী করছি, তুমিও আমার প্রতি অঙ্গুগত হও। ইতি—

আমার প্রিয় বান্ধবী,

1 Nov. 1768

চিরকালের সঙ্গী। চিরকালের ঘৃণা! কৃত্রিম আলোতে তোমার মহত্ব উদ্ভাসিত। প্রবক্তিতের কাছে তোমার বর্ণনা নাই। তুমি হাসছ। যে আর্জি পেশ করে তাকে ভূঁসনা করছ। এই ক্রুর আনন্দ তোমার চিঠিতে। তবে প্রাম্য মেয়ে এ ছাড়া আর কী লিখবে। এত তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছ যে, তার অস্ত ধন্যবাদ জানাই। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি এই বলে যে ভবিষ্যতে পুণ্য তিথিতে আমাকে চিন্তা কর। এতে আমার কত সুখ, তোমার সঙ্গীতায় কত যে আনন্দ পাই! তোমার উচ্ছলরূপ, তোমার হাসি—তা বত তুচ্ছ হোক না কেন তা কত গুণসংকারী।

যে ছবিতে আমি বিক্ষুব্ধ করেছি, তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না, আমার লেখনী যে ছবি কাটছে তা আমি বেশ অনুমান করতে পারি, যখন বৃষ্টি অপরের সঙ্গে কী ঘটেছে তখন কোন ভবিষ্যৎ বক্তার প্রয়োজন হয় না এই ভেবে যে কী ঘটবে, এতেই আমি সন্তুষ্ট। যে বিদায় নেয় তার ভাগ্যে এই রকম হয়। এখনও বার পিছনে আছে এবং যে-সব প্রেমিক আসবে তারা প্রবক্তিত বিতাড়িত প্রেমিকের কবরের উপর নাচবে।

আমাদের নাট্যসম্বন্ধ পরিচিত কর্মাধক্ষ, পরিচালক প্রভৃতি কে কেমন আছে। তারা কেউ কী সেই অগ্রগামী অভিনেতার কথা ভাবে যে সব সময় ট্রাজেডিতে এবং কমেডিতে স্বাভাবিক ভাবে ঘৃণ্য প্রবক্তিত প্রেমিকের ভূমিকায় মনোহারী অভিনয় করছে, আমার সেই শূন্য স্থানে কাউকে মনোনয়ন করা হয়েছে কী? তবে মনে হয় সে স্থান পূর্ণোপরি ভাবে পূর্ণ হবে। তুমি হয়ত দশজন অভিনেতা আমার স্থানে পাবে।

আমার মা আমাকে একটা বইয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। যা আমি ভালবাসি তা আমি ভবিষ্যতে এবং বর্তমানে পছন্দ করব। আমাদের পাঠাগারের কথা আমি প্রায় স্মরণ করি। তুমি বিশ্বাস করতে পার, সে পাঠাগার আরও বেড়ে যাবে, যা আমি প্রতিজ্ঞা করি তা আমি সঙ্গে সঙ্গে পালন করি না, তবে প্রতিজ্ঞার চেয়েও আরও বেশী কিছু করে থাকি।

তুমি হয়ত ঠিকই ভেবেছ, লাইপজিগে যে পাপ করেছি তার আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি।

বর্তমানে গৃহের পরিবেশ আমার খুব খারাপ লাগছে। এর চেয়ে আমার কাছে লাইপজিগ প্রীতিপদ হত যদি এখন এইখানে আমার হয়ে কেউ থাকত। আমাকে যদি দোষ দাও, তা হলে তোমাকে ঠিকভাবে কাজ করতে হবে। কী কারণে আমার এত অসন্তোষ আর বিরোধ তা তুমি জান। নুস্কী মেয়েদের কাছে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। তোমার আত্মীয়স্বজনদের কাছে আমি সৌজন্য দেখালে তুমি বহু রুচ হয়ে ওঠ। তুমি আমার হৃদয় পেয়েছ, ভালবাসা পেয়েছ। আর বতই সহস্র শ্রদ্ধা হোক না কেন তার ভগ্নাংশ হবে না। অভিনয় করলেও তুমি জান তোমার বন্ধুর চিন্তদাহ বা আনন্দ বন্ধটি কী। এ দুটো হয়ত তোমার কাছে সমান। তবে মনে হয় এ-সব তুমি ভাব না। তোমার পক্ষে তুমি আমার বিদায়ের কথা বলতে চাও; কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক।

আমার এই চিঠি—এই চিঠিই বা কেন—সব চিঠি তোমার মা-খাবাকে তুমি দেখিও। তবে কারও আড়ালে যেন এ-পত্র দেখিও না। আমার কথামত তোমাকে আমি আন্তরিকতার সঙ্গে লিখি। তাই আমার ইচ্ছে এর ওপর চোখ বুলিয়ে কেউ যেন তার কণ্ঠ না করে। ইতি—

ফ্রান্সফার্ট। ৩০শে ডিসেম্বর ১৭৬৩

আমার প্রিয়তম বান্ধবী,

নব-বৎসরের বাণী আমি যে রোগমুক্ত হয়েছি তা তুমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছ। রোগমুক্তি আমিও স্বীকার করলাম। আমার প্রিয়তম মেঘ সরে গেছে। এ তোমাকে সাধনা দেবে ভবিষ্যতে, যখন শুনবে আমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমার ধাত খুব শক্ত। তবে এখন আমি ভাল আছি। অবস্থা আরও অবনতির দিকে নেমেছিল। যা আমার বর্তমান অবস্থার চেয়ে অবস্থা সঙ্কটজনক হয়েছিল। ভীষণ ব্যথায় আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। এখন ধারাপের মধ্যেও ভাল আছি। যখন অসুস্থ ছিলাম সে-সময় অনেক কিছু শিখেছি। সুস্থ থাকলে সে-সব হয়ত আর শেখা হত না। যাক যা হবার তা হয়েছে। আমি এখন ভাল আছি। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। এর আগে আমি তিন হপ্তা ঘরের বাইরে বার হই নি। ডাক্তার ছাড়া আমার কাছে আর কেউ আসে না। সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেও লোকটা শ্রদ্ধার পাত্র নয়। মানুষ কী বোকা। আমি যখন সুস্থ ছিলাম তখন আমার মেজাজ তিরিকে হয়ে উঠত—সমস্ত পৃথিবী আমাকে ত্যাগ করেছে এখন। আমি সঙ্গীততা ফিরে পেয়েছি কারণ অসুস্থ অবস্থায় আমার উৎকল ভাব দেখে আমার সংসারের লোকজন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস কেলত। আমার নিজীবভাব ধরা পড়লে কেউ আর তাদেরকে সাধনা দেবার ছিল না। কল্পনার খেয়ালে একটা নব-বর্ষের গান আমি রচনা করেছিলাম। সেটা তুমি সম্ভবতঃ পেয়ে থাকবে এবং তার পিছনে সময়ও নষ্ট করে থাকবে। সেগুলো আমি ছাপিয়েছি। আমি ভালোর দিকে যাবছি, গল্প লিখছি। মোট কথা আমি সন্তুষ্ট। ঈশ্বর কৃপা করুন। সব কিছু আমার কাছে যেন শুভ হয়। আমরা যদি কিছু নাও চেয়ে থাকি, তবু আমরা আশা করব এর চেয়ে জাগৃষ্টির বাণী আমরা পাব। আমি যদি এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাঁচি তা হলে আমি ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করব। তা হলে আমার ভাল হবে। প্রতিদিন স্বাস্থ্যেরও আমার উন্নতি হবে। আমার অভিযোগ কোথায় তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমার বুক বেশ সুস্থ আছে তবে পাকস্থলীতে কোন কিছু গণ্ডগোল আছে। আমি বুঝতে পারছি জীবনের সঙ্গে যথার্থভাবে আমি খাপ খাইয়ে নিতে পারব। অল্প কারও সঙ্গ ছাড়া সুস্থ হলে আমি বিদেশ ভ্রমণে যাব। তোমাব সব কিছু চিন্তা তখন আমার হবে। তারপর ব্যবস্থা করব কত তাড়াতাড়ি লাইপজিগ ভ্রমণে যাব। আমি ঠিক করেছি ক্রালে গিয়ে করাশীদের জীবন-যাত্রা দেখব, তাদের ভাষা শিখব। তা হলে তুমি বুঝতে পারছ কত সুভঙ্গ হয়ে উঠবে—তোমার সঙ্গে পুনরায় মিলনের আগে। একটা কথা শুধু চিন্তা হয়—মুর্খের মত কেন যে ভাবতাম ইষ্টায়ের পূর্বে আমার যেন বৃত্ত্য হয়—আমার এ-সব পরিকল্পনা থাকা

সঙ্গে। কবরখানায় কবরের পাথর রাখার জন্ত তা হলে প্রস্তাব করতাম যাতে করে সেটাজনের পবিত্র দিনে আমার কবর তুমি একবার দেখে আসতে। এ-বিষয়ে তুমি কী বল ?

তোমার মা বাবার কাছ থেকে যাতে স্নেহ পাই সে বিষয়ে বল। আমার জন্ত তোমার বন্ধুদের চুমু খেও এবং যারা আমার বিষয়ে উৎসাহী সেই সব বান্ধবীদের ধন্যবাদ জানিও। তা হলে সেই সব বান্ধবীদের আমি চিঠি লিখব। তোমাদের প্রতিবেদী বিষয়ে আমি দুঃখিত। আর দুই প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে এটা কী দুঃখের নয়, তারা হতভাগ্য। খুব বিড়ম্বনায় তারা পড়েছে। ঈশ্বর তাদের সাহায্য করুন বা না করুন এর জন্ত তারা কৃতজ্ঞ থাকবে। তুমি বেঁচে থাকবে দেখবার জন্ত এবং সম্ভবতঃ বলবে গোটে তুমি এ-কথা বল না ? নিশ্চিত মনে বলতে পারি, আজকাল বিয়ে একটা মজার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের একজনের বা অপরজনের নিজস্ব ইচ্ছে নাই, হে সন্ত ! পৃথিবীতে অবতরণ করে একটা অলৌকিক কিছু দেখাও।

পুনঃ—যারা এ থেকে সাহায্য পেতে না পারে তাদের জন্ত কাউকে এ পথ দেখিও না। প্রিয়তমা, বিদায়। সুখে দুঃখে আমি তোমারই।

ইতি গোটে।

আমার বন্ধু হর্নকে তুমি যে চিঠি * দিয়েছ, তা থেকে জানলাম তোমার আশা আর আনন্দের কথা। বর্তমানে আমার মনোভাব কী তা তুমি নিজেই বেশ বুঝতে পারছ। তবে তুমি এ কথা ঠিক বুঝতে পারবে না এই ভেবে যে কতখানি আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার বাগদস্তা স্বামী সত্যিই মহান। তার কাছে আমার পরিচয় দিও। তোমাকে বহুদিন যাবৎ লিখিনি বলে হয়ত তুমি ভেবেছ অবহেলা ভরে আমি তোমাকে লিখি নি। এর জন্ত তুমি আমাকে অপরাধী ভাবতে পার অবশ্য তুমি যদি আমার পত্রের জন্ত অধীর হয়ে থাক। এ আমি জানতাম, তাই আমি লিখি নি। তোমার এখন যা অবস্থা তাতে তোমার কাছে আমার চিঠি নগণ্য, এটাই অবশ্য আসল কথা। আমার অবস্থা সেই মাছের মত—যে মাছকে জল থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারি—না আর প্রতিজ্ঞা করব না, কারণ আমি 'যে তোমার প্রতি অনুরক্ত এ কথা তুমি ভাবতে পার না।

যারা গুণী তারা ভাবতে পারে না যে নারীর জন্ম পাথরে তৈরী, সে-ই প্রেমিক যে সহজে ভালবাসতে পারে, সহজে তুলে ধরে পারে। কিন্তু প্রেম বিষয়ে স্বার্থ ভাবে অল্প কিছু সে ভাবতে পারে না। উঃ! কী মর্মান্তিক যখন একজনের প্রেম নিঃশেষ হয়ে পড়ে। যে প্রেমিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না সে তত হতভাগ্য নয়; এ-দিক থেকে যে বিতাড়িত হয় সে-ই তত হতভাগ্য প্রেমিক। প্রথম জন তবু আশা রাখে, ভয় সে প্রোহ করে না; আর ইয়া—অপরজন বুঝেছে অন্তর থেকে মানসীকে সরিয়ে দিতে হবে, যে জ্যোতির্ময়ী হয়ে অন্ধবে উদ্ভাসিত হতে থাকে—এ ব্যথার বর্ণন' আর নাই।

আমার গানগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নি। ছাপা হলে

* পত্রে বাগদানের কথা ছিল।

তোমাকে তৎক্ষণাৎ এককপি পাঠিয়ে দেব, কারণ আমি জানি লাইপজিগের কোন অধিবাসীকে বিশ্বাস করা যায় না। আমার খাতিয়ে গরীব দুঃখীকে কিছু অর্থ বিলিও। তুমি আমার কথা যখন চিন্তা করবে তখন অন্তরমনে যেন তোমার সঙ্গে খেলা করে। এ-গান গুলো আমি যখন লিখেছিলাম তখন আমি অল্প ধরণের মানুষ ছিলাম। আমি পূর্বে কী ভাবে জীবন কাটাতাম তা জানলে তুমি উন্নত হতে।

তোমাকে লিখতে আমার এত ঘৃণা হয়। এ-চিঠির উত্তর যদি না পাই, তা হলে অক্টোবরের আগে তোমাকে আর পত্র দেব না। হে আমার প্রিয় বান্ধবী, এখনও যদি তুমি আমাকে তোমার প্রিয় বান্ধব বলে ডাক, কারণ তুমি আমাকে মাঝে মাঝে প্রিয়তম বন্ধু বলে ডেকেছ—তবু বলতে ইচ্ছে হচ্ছে প্রিয়তম বন্ধু বনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

টাটকা সিম পেলে কে আর বাসি সিম চায়। টাটকা কলেই সকলের রুচি। কিন্তু বাসি হবে বলে কেউ যদি ভয় করে তবে অনেকে জারক রসে ডুবিয়ে রাখে। উদ্বেগ কেউ যদি নিয়ে যেতে চায়। নিশ্চয়ই তোমার হাসি পায় এই ভেবে যে দল নির্বিশেষে গুণগ্রাহীরা বন্ধুদের ওপর মূনের ছিটে ছড়িয়েছে। তবে সেই সব অনুরাগীদের কথা ভেবে আমি হাসি। আমার সঙ্গে পত্র লেখা বন্ধ কর না। কারণ মাছের যে আচার বানিয়েছ তার মধ্যে আমি এখনও বেশ সরস আছি।

পাছে আমি ভুলে যাই সেইজন্য তোমার কাছে সামান্য জিনিষ পাঠিলাম। এটা তোমার হাতে বা তোমার প্রিয়তম বন্ধুর হাতে মানান-সই হবে। তোমার জন্ত যে-সব জিনিষ বানাতে যিরেছিলাম সে-গুলো এখন তৈরী-ই হয় নি। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি প্রাণখোলা মানুষ। তবে ছবি আঁকতে গেলে আমার গলা শুকিয়ে আসে। বসন্তে মেঘপালকেরা গাছে নানা প্রতিমূর্তি আঁকে। ফুলের সময়ে লোকে মালা গাঁখে। সব কিছু স্মৃতি মনে পড়লে বড় দুঃখিত হয়ে পড়ি। আমার চেয়ে তোমার জন্ত যদি কোনদিন কিছু কম করে থাকি তবে আমাকে ক্ষমা কর।

আমি তোমাকে বহুবার বলেছি, তোমাদের ওপর আমার সব কিছু নির্ভর করছে। সম্ভবতঃ এ-কথাটা তুমি ভাড়াভাড়া বুঝবে। খুব ভাড়াভাড়া এমন সংবাদ হয়ত শুনেবে, যা তুমি আশা কর নি। তোমার মা বাবাকে এবং তোমাদের পরিবারের অন্ত সকলকে যতখানি সম্ভব ততখানি শ্রদ্ধা জানাই। ইতি

26. 8. 69

আমার শরীর বিষয়ে তুমি উদ্বিগ্ন; এর জন্ত তোমাকে ধন্যবাদ। তবে তোমার সান্তনার জন্ত বলছি যে, এর আগে অনুরক্ততার কথা লিখেছিলাম, সে বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবার কারণ নাই। আমি নিজেকে বেশ উৎফুল্ল মনে করি। তবে পূর্বে যতটা উৎফুল্ল ছিলাম, এখন আর ততটা নাই। তুমি বুঝতে পারছ, কেবল অনুরক্ততার জন্তই তোমাকে লিখতে পারিনি। তবে আশা করছি যে, অল্প কোন কারণে আমার পক্ষে তোমাকে চিঠি দেওয়া সম্ভব হবেনা। ভাবতে অবাক লাগে কারণ আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে তোমাকে লেখেছিলাম। ভাবতে আরও অবাক লাগে এই ভেবে

যে, এক বছরের মধ্যে কত পার্থক্য আসে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাকে আবার যদি দেখতে হয় তবে তোমার আর খোঁজ নেব না। এরকম ঘটনা যদি তিন বছর আগেও ঘটত তা হলেও হয়ত এই রকম প্রতিজ্ঞা করতাম। প্রতিজ্ঞার আর দরকার নাই। এক সময় তোমার সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারতাম না। এমন কী তোমাকে এক পাতা লিখতে আর আমার উৎসাহ আসে না। আমি যে আর কিছুই ভাবতে পারি না—আর এটা যে তুমি মেনে নিতে পার না। আমি যদি বুঝি, তুমি সখী সব দিক থেকে তা হলে আমি সন্তুষ্ট হব। একথা কী বিশ্বাস কর, আমার মেজাজ খিঁচিয়ে গেছে। যদি লাইপজিগে থাকতাম তা হলে তোমার পাশে বসে থাকতাম, তা হলে তোমার পাশে মুখ কাঁচুমাঁচু করে বসে থাকতাম। তুমিও অতীতের কথা কিছু ভাবতে পার। কিন্তু থাক। যদি তোমার পাশে বসতে পারতাম, জীবনটা কত মধুর হত। ওঃ! গত আড়াই বছরের কথা আমি স্মরণে আনতে পারি। কেটহেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আমি বেশ ভালভাবে চলব। ইতি—

12.12.69

আমার প্রিয়বন্ধু,

গতরাত্রে এক স্বপ্ন স্মরণ করিয়ে দিল তুমি আমার কাছ থেকে একটা পত্রের উত্তর পাবে। অবশ্য একথাটা আমি সম্পূর্ণভাবে ভুলিনি। তবে তোমাকে যে চিন্তা করিনি—এমনও নয়; না, না আমার প্রিয় বান্ধবী। দিনগুলো বলে দেয়, তোমার কাছে আমার কত পাওনা। তবু তুমি বুঝতে এ এক কী তীব্র উদ্বেজন। যখন পুরোশো বন্ধুদের স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে পড়ে, যদিও সে বন্ধুকে সময় ধরে মুছে দিতে পারে না। আমাদের জীবনের বিকর্ষণ, নতুনের সঙ্গে পরিচয়—সংক্ষেপে অবস্থার পরিবর্তন আমাদের মনে ধুলো আর ধূঁয়ের সৃষ্টি করে তৈলচিত্রের ওপর; তা যেন ক্ষীণ অদৃশ্য টানাটানা রেখার মত—যদিও অল্পজনে সহজে এটা বুঝতে পারে না এই ভেবে যে কী ভাবে এটা হল।

আমি কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এতে সুখ নাই। বিজ্ঞানের অবসরে শক্তি বিষয়ে আমার ধারণা নমনীয়। ফলে অতীতের নানা স্মৃতি আমার মধ্যে আসে না। স্বপ্নে মনে হয় শুধু জন্মকে ফিরে পাই—সেই স্বপ্নে অতীতের সুখাবহ স্মৃতি আমি ফিরে পাই; আমার বোধগুলো সজীব হয়ে ওঠে। আগেই তোমাকে স্বপ্নের বিষয় বলেছি। এর জন্য তোমার কৃতজ্ঞ থাকি উচিত। আমি তোমাকে দেখলাম, তোমার পাশে আমি বসে আছি—যেন খুব বড়ো হয়ে গেছি। তোমাকে আমার এ-সব বলতে অবাক লাগছে। অর্থাৎ তোমাকেও বিবাহিত রূপে দেখলাম। এ কী হতে পারে? তোমার চিঠিটা নিয়ে দেখলাম কবে সে-চিঠিটা লেখা হয়েছিল। বিয়ে যদি তোমার হয়ে থাকে তবে তোমার জীবনের সুখ ও শান্তি যেন শুরু হয়।

যখন তোমাকে তোমার প্রিয় স্বামীর বাহুবন্ধনে দেখি, তখন কত না প্রীত হই। অপরে তোমার দর্শন করতে পারে। কিন্তু তুমি যে আমার বন্ধু। তোমার প্রশান্ত রূপের মধ্যে তোমার সেই মরৎ রূপ দেখলাম। সেখানে তুমি স্ব-মহিমায় আসীন। তোমার আভাসিত সুখ, তোমার স্বামীর সুখ-স্বপ্ন দেখে সত্যিই আমি প্রীত।

তোমার স্বামী তোমাকে ভালবেসে বর্ষা পুরস্কার পেয়েছে। তোমার স্বামীর কাছে আমার বন্ধুত্ব বেধ। তুমিও আমার বন্ধু হয়ে থেক। বন্ধুত্বের মধ্যে যে বোগসূত্র থাকে। স্বপ্নে যদি বিশ্বাসী হয়ে থাকি তা হলে আমরা পরস্পরকে আবার দেখব। তবে এ সাক্ষাৎ খুব শীঘ্র হবে বলে মনে হয় না। নিয়তিবু বিপক্ষে যুক্ত হলে এর পূর্ণতার বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে। আভাসে তোমাকে জানিয়েছিলাম আমার কী হবে। এবার তা খুলে বলছি। এ বসন্ত-বাটা আমি পালটাব আর তোমার কাছ থেকে আরও বহুদূরে চলে যাব। তা হলে স্বপ্ন ছাড়া লাইপজিগের কথা আর মনে আসবে না। যে সব বন্ধু আস বা যায় তাদের কথাও আর মনে পড়বে না। তবু মনে হয় না যে আমি মুক্ত হব। সময়, দৃষ্টি ও ধৈর্য্য বেশ ফল দিয়ে থাকে। অল্প জিনিষ দিয়ে এরকম ফল পাওয়া যায় না। তারপর অতীতের ক্লাস্তিকর স্মৃতি মুছে গেলে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু কর। তারপর বহুদিন পর দেখা হলে, আমাদের চাহনি ভিন্ন হলেও অন্তরের অমুরাগ সেই টিকই থাকবে। তারপর বিদায়! না তারপর 'তারপর' নয়। তিনমাসের মধ্যে তুমি আমার একখানা পত্র পাবে। তা থেকে আমার জীবনের লক্ষ্য পথ তুমি জানতে পারবে। বিদায়ের রাগিণীর কলি জানতে পারবে। যে-সব প্রলাপ বকেছি তাও বুঝতে পারবে। তোমার উত্তর না পেলেও হবে। তবে একটা মিনতি আমার আছে। কোন বন্ধু মারফৎ জানিও আমার কাছ থেকে তুমি কী কী পেয়েছ। এই আমার একটা কক্ষণ মিনতি। তুমি নারী। তোমাকে আর বন্ধু বলব না। কারণ আমার কাছে সব অর্থহীন। তোমার হাতের লেখা বা কণ্ঠস্বরে আমি আর আদৌ ইচ্ছুক নই। কারণ তাহলে স্বপ্নে হয়ত সেই সব বিতীর্ষিকা জাগাবে। আমার কাছ থেকে তুমি আর একটা পত্র পাবে। তাহলে আমার জীবনের ঋণ অনেকটা লাঘব হবে। আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি এই ভেবে যে, আমাদের সব সমস্যা হেঁদ পড়েছে।

যে বই তুমি চেয়েছ তা আমি পাঠিয়ে দেব। তুমি যে আমার কাছে বই চেয়েছ এর জন্য আমি আনন্দিত। যত উপহার দিয়েছি, তার মধ্যে এইটাই হবে আমার সেরা দান। এই দান তোমার মনে থাকবে আর আমিও তোমার মনে জাগরুক থাকব।

বিয়ের কবিতা তোমাকে আর পাঠাব না। অনেক কবিতা আমি লিখেছিলাম। সেই সব অসুভূতি খুব বেশী আর না হয় খুব কম হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আর তোমার আনন্দ-উৎসবে আমার মাঝে সুরেলা গানই বা তুমি আশা কর কী ভাবে। কিছুদিন থেকে মস্তিষ্কের উৎসাহে আমার কাছে কবিতা ও গান বেসুরো হয়ে পড়েছে—যে-সব কবিতা ছাপা হয়েছে তা থেকে তুমি বুঝতে পারবে। আরও যদি দেখ তবে দেখবে যে বাদবাকী যে-গুলো ছাপা হবে সে-গুলোও সেই রকম হবে। তোমার মাকে ভাইকে আমার কথা বল। তোমার ভাই নিশ্চয়ই এতদিনে সন্দীতজ হয়েছেন। শুধু স্বপ্নের কথা মনে পড়েছে—যার ফলে এত কথা বললাম। স্বপ্ন না দেখলে হয়ত এত আর কথা বলতাম না। ইতি—

অনুবাদক—শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

বঙ্গবাসী : কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশ ও কাল

শ্রীহারাধন দত্ত

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাস বেশী দিনের নহে।

গত উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাব বাংলায় যে চিত্তবিক্ষেপ ঘটাইয়াছিল, বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকা তার অনবদ্য প্রকাশ। জাতি চিন্তের ঐ যুগের মধ্যেই সাময়িক পত্র-পত্রিকার জন্মলাভ ঘটিত হয়। আর এই সাময়িক পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করেই বাংলার গণসাহিত্য গড়ে ওঠে। সাময়িকপত্র ও গণসাহিত্য মূলতঃ ইউরোপীয় শিক্ষার দান। উনিশ শতকের বাঙালী সৈন্য আর একবার নবজাগৃতির প্রত্যক্ষ দর্শক হয়েছিল। নবজাগৃতির বাণী মৃষ্টিময় শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে তা সম্পন্ন হয় না। নবজাগৃতি সার্থকতা লাভ করে তখনই যখন ইহা লোকায়ত হয় এবং সাধারণ লোকের জীবনে ও কর্মে ইহার ছাপ পরিস্ফুট হয়। এর জন্ম সাধারণ শিক্ষা প্রবর্তন এবং সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রচার একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বিগত শতাব্দীতে আমাদের দেশে সংবাদপত্র ও সাধারণ শিক্ষার কিছু কিছু প্রসার ঘটেছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হিকি সাহেব 'বেঙ্গল গেজেট' নামক যে পত্রিকা প্রকাশ করেন— আমাদের দেশে ইহাই প্রথম সংবাদপত্র—কিন্তু ইহা দেশীয় ভাষাতে মুদ্রিত ছিলনা। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হতে প্রকাশিত মার্শম্যানের 'দিক্‌শর্ন' এবং একই বৎসরে গঙ্গাকিশোর শিরোমণি সম্পাদিত 'বাঙ্গাল গেজেট' বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র। ইহার পরবর্তী কালে কত সংবাদপত্র আগাছার মত জন্মলাভ করেই মৃত্যু বরণ করেছে—কোন কোনটির জন্ম-ইতিহাসও আজ আমাদের বিস্মৃতির মধ্যেই রয়ে গেছে। তবু সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২৩), সংবাদ-কৌমুদী (১৮২৩), সংবাদ-প্রভাকর (১৮৩১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩), বিবিধার্থসংগ্রহ (১৮৫১), সোমপ্রকাশ (১৮৫৮), বঙ্গদর্শন (১৮৭২), সাধারণী (১৮৭৩), আর্ধদর্শন প্রভৃতি উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের মধ্যে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিতব্য। উনিশ শতকের চতুর্থ পাদে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী' সর্বাঙ্গীণ বিখ্যাত। এই সময় স্বদেশীয় মনীষিগণ মাসিক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও জাতির উন্নতি চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নব্যভারত, নবজীবন, জন্মভূমি, বঙ্গদর্শন, প্রচার, ভারতী, সাধনা প্রভৃতি মাসিকগুলি সে যুগের মনীষী ও চিন্তানায়কদের নব ভাবনায় জাতির আদর্শ ও মর্মবাণী প্রচারে ব্রতী হয়েছিল। গত যুগের বিচিন্তামুখী ভাবনা, চিন্তা, জ্ঞান, মনীষা ও জাতীয় আন্দোলনের বার্তাবাহী ছিল এই সমস্ত পত্র-পত্রিকা। ইতিমধ্যে কেহ কেহ ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকার কার্যক্রম ও প্রাণপ্রবাহকে সুনিপুণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেছেন এবং বিলুপ্তপ্রায় ইতিহাসকে আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের গোচরীভূত করেছেন। কিন্তু উনিশ শতকের অষ্টম দশক হতে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত একা 'বঙ্গবাসী' কোন জাতীয় ভাবধারা ও আন্দোলনকে চালন করেছিল—বাংলা গজের কোন শিল্পীসমাজ 'বঙ্গবাসী'র প্রভাব পেয়েছিল, তার সঠিক ইতিহাস আজ

পর্যন্ত কেহই নির্ণয় করেননি। কোন উৎসাহী বাণী-সেবকের দ্বারা এ কাজ অচিরে সম্পন্ন হলে বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের এক অনালোকিত প্রদেশ আলোকপ্রাপ্ত হবে। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বঙ্গবাসীর সংগে সুদীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। বঙ্গবাসী-সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের নাম অধুনা প্রায় বিস্মৃত। সমসাময়িক দেশ ও কালের পটভূমিকার এই কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে। এখানে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী আলোচনা কালে বঙ্গবাসীর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও অবদানের কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হবে।

বঙ্গবাসীর প্রথম প্রকাশকাল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর, বাংলা ২৬শে অগ্রহায়ণ ১২৮৮ সাল। "বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার। ইহা রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদপত্র। স্বল্পমূল্যের এই সুবৃহৎ পত্রিকা আগেজ্ঞে বঙ্গ তদীয় বন্ধু উপেন্দ্রনাথ সিংহরায়ের সহযোগে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম, এ, বি, এল।" ১ এই প্রসঙ্গে বঙ্গবাসীর জন্মলাভের পশ্চাৎ পটটি একটু দেখে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। বঙ্গবাসীর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বাংলার নবজাগৃতি বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান মানবতাবাদ, যুক্তি ও বিজ্ঞান জাতির সুপ্রচিন্তকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রামমোহনের প্রতিষ্ঠালাভের পর হতেই নবযুগের বার্তা ঘোষিত হয়। ১৮১৭ সনে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। এখানেই বাঙালী তাকণ্যের বৃহত্তর মুক্তিফলের নির্মাতা হিসাবে দেখা দেন ডিরোজিও। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ও ইংরেজী জ্ঞানজগৎ ও ভাবজগৎ তাদের চর্চার বিষয়বস্তু হয়ে যেনেদের মুক্তিপথ আলোকিত করতে চলল। ভারতের প্রথম ইংরেজী পণ্ডিত রামমোহন ইংরেজী বিচার-বুদ্ধির সংগে ভারতীয় নিষ্ঠার সংযোগ ঘটালেন। এলেন বিজ্ঞানগণ ইংরেজের প্রথম বিচারবোধের সংগে গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়কে সংগে নিয়ে। রামমোহন—বিজ্ঞানগণ-অক্ষয় চন্দ্র ও ডিরোজিও—প্রতিভার এই ত্রিদেশী দ্বারায় বাংলার নবজাগৃতি মুক্তিমান-প্রয়াসী হল। দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজ-জীবনের চরিত্র ও চেহারা এই সংগে নবযুগের অভিমুখী হয়েছিল। তা না হলে কয়েকজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিক তেজে চারিদিকে এমন বহুত্বসব হতো না। এমনই করেই জাতির চিন্তাধারা আত্ম-সচেতনতা, উগ্র ব্যক্তিব্যক্তিশ্রীতি, মধ্যযুগ-বিমুখতা এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে উঠল। গতযুগের আচার পালনে নির্ভীকতা ও অস্বস্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বাঙালী ব্যক্তিব আত্মমোক্ষের পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চলল। ব্যবহার ও ভাবের জগতে যুগপৎ বহন মুহুর্তের প্রবেশতা চিন্তা-জগতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করলো। সমাজের নানাপ্রকার কুসংস্কার ও অস্বস্তা উৎপাতনের ভিত্তি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নানা প্রকার বিমুখী কর্ম ও ভাবধারার মধ্যে অতিবাহিত হল। আর

(১) বাংলা সাময়িক পত্র—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই কাল বঙ্গসাহিত্যের দিক থেকে প্রভূতকাল মাত্র। বাংলা গল্প, সাময়িক পত্র, বাংলা অভিধান, বাংলা শব্দ সংকলন, বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি নবীন ও দুর্লভ কার্যের ব্রতেই জাতীয় শক্তি নিয়োজিত থাকে। নবযুগের বাণীকে লোকায়ত ও সার্থক করার জন্ত এইরূপ প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। এই সময়ে মাধ্যমিক, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হল। আর সাময়িক পত্র তথাকথিত আপামর জনসাধারণের কাছে নবযুগের বাণী পৌঁছে দেওয়ার কার্যে রত হল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের সাহিত্যরথীরা তখনও পরিপূর্ণ ভাবে অবতীর্ণ হননি। বিজ্ঞানাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন এই পর্বের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে। আর ঐ আলোক-উজ্জ্বলিত জীবনপথের শিল্পী ভগীরথ মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন আরও কয়েক বৎসর পরে (১৮২৪), বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ এ, দীনবন্ধু ও হেমচন্দ্রের জন্মও ঐ সালে, বিহারীলালের বছর দুই আগে অর্থাৎ ১৮৩৬ সালে, নবীনচন্দ্রের ১৮৫২ সালে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উপরি উল্লিখিত সাহিত্যিকদের মধ্যে বিজ্ঞানাগর ও তাঁর সমসাময়িক অক্ষয় কুমারের কিছু কিছু বই পত্র বার হয়। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র—উনিশ শতকের লক্ষ্যকীর্তি সাহিত্যিকদের রচনাবলীর প্রকাশ শতকের তৃতীয়পাদ হতেই শুরু হয়। আর ১৯ শতকের প্রথমার্ধে যেটুকু সাহিত্য বিকশিত হয়েছে তার অতি সামান্য অংশই সাহিত্যের পংক্তি ভোজে আহৃত হতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সালের পর মধুসূদন, প্যারীচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের আর্ষভাবের ফলে ১৯শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ নবযুগান্তরের সম্মুখীন হয়। এই শতকের প্রথমার্ধে তারই প্রসঙ্গটি ছিল। ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য প্রথমার্ধের সাহিত্যেই স্পষ্ট ছিল। সেজগুই পরবর্তীকালের সাহিত্যসমৃদ্ধির কারণ তার প্রথমার্ধের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও মানবজীবনে অসুস্থতায়। গত শতকের তৃতীয় পর্ব থেকে সাহিত্যের সর্বাঙ্গে জোয়ার এল বটে—কিন্তু যে রেনেসাঁসের কথা উল্লেখ করেছিলাম, তা এই শতকের তৃতীয় পর্ব থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হতে লাগলো। নবযুগের বাণী শতকের প্রথমার্ধেও নির্ধন্দ্র হতে পারেনি। নূতনকে প্রতিরোধ করার মত বাধা এসেছিল অনেক। নবযুগের পথিকদের কর্মে ও বক্তব্যে অনেক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। গোড়া থেকেই ভবানীচরণ, সূতজয় প্রভৃতি নায়কেরা পুরাতনপন্থী ছিলেন। সেজগুই নবযুগের বাণী শতকের প্রথমার্ধে নানা বাদ-বিতণ্ডার সম্মুখীন হয়ে শক্তিহীন হয়েছিল—শতকের তৃতীয়পাদে এই গৌড়ামিই আরও দানা বেঁধে উঠার সুযোগ অর্জন করলো বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। অতীত শাস্ত্র সত্যতা সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনকেই অনেকে রেনেসাঁসের অর্থ হিসাবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এটা ঠিক যুক্তিসহ নয়। রেনেসাঁসের মূল কথা হচ্ছে, হিউম্যানিজম বা মানবতন্ত্র। এই মানব তন্ত্রের মুখ্য উপজীব্য স্বয়ং মানুষ। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, দেবদেবী বা ঐ জাতীয় অতিমানসিক কল্পনা নয়। মানবতন্ত্রী দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতামুক্ত। মানুষ সব কিছুর রূপকাটা—বাস্তব নয়নারীকে নিয়েই মানবতন্ত্রের বস্তু ভাবনা চিন্তা। অথচ যুক্তিসহ বিচার করলে দেখা যাবে যে,

আমাদের দেশে যে রেনেসাঁস এসেছিল তা অসাধারণ হতে পারেনি বা সফলতা অর্জন করেনি—শেয়ার্দের এই অধ্যাত্মমুখী হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্ত। সিপাহীযুদ্ধের পর কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন এবং বিছুদিনের মধ্যেই নব ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন। ইহার পরবর্তীকাল হতেই ভারতবর্ষের নানাকেন্দ্রে বিশেষ করে বাংলাদেশে ধর্ম-আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মরা পুরাতন ও নব ব্রাহ্ম দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ঈশ্বরকে নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি শুরু করে। ইউরোপের মুক্ত বুদ্ধ উদার দৃষ্টি ক্রমশঃ জাতির আবেগ প্রবণতার কাছে পরাজয় স্বীকার করে। পুনরায় মধ্যযুগীয় চিন্তা ধর্মের আসন্ন অধিকার করতে থাকে। এমন কি ইহবাদ পুষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম চিন্তাও মধ্যযুগীয় চিন্তার দ্বারা খানিকটা আচ্ছন্ন হয়েছিল। আর বুদ্ধিবাদকে যুক্তিবাদকে অস্বীকার করে শুধু হৃদয়সর্বস্বতা ও অধ্যাত্মবাদের পথে ভারতকে আগ্রত করার যে পরিকল্পনা বিবেকানন্দের ছিল—কালের রূপান্তরশীল চেতনার সংগে তার কোন মিল ছিলনা বলেই তা ব্যর্থতার পর্যায়সিত হয়েছে। নূতনকালকে সৃষ্টি করার শক্তি ও ব্যবহারিক ঐশ্বর্য তার ছিল না! ১৮৩৭ সনে নবগোপাল, রাজনারায়ণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের প্রচেষ্টাতে হিন্দুমেলায় প্রবর্তন হল। এই সময় হতে মুসলমানদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ধর্ম-আন্দোলনের জয়যাত্রা শুরু হলো ওয়াহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে। শতকের তৃতীয় পাদে এমনি করেই রেনেসাঁসের জয়যাত্রা ব্যাহত হল। তাছাড়া রেনেসাঁসের বাণী কোন সাম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ইহা আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে চায়। অথচ ভারতীয় রেনেসাঁসে মুসলমানরা শতকের প্রথমার্ধে জাগরণের কোন প্রেরণাই অর্জন করেনি। তাছাড়া নবজাগরণকে লোকায়ত করার পক্ষে ভীষণ বাধা ঘটাল ইংরাজী শিক্ষা—যে ইংরাজী শিক্ষার স্পর্শে আমাদের পুনরুজ্জীবন হয়েছিল—লর্ড হার্ডিঞ্জের পর হতে সেই ইংরেজীই আমাদের নবজাগরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। কারণ হার্ডিঞ্জের সময় হতে—ইংরেজী শিখলেই চাকরী মিলবে এই ধারণা উচ্চতর বিচার ক্ষেত্রে বাংলা চর্চার ক্ষতি করলো। এমনি করেই রেনেসাঁসের বাণী যেমন একদিক হতে ব্যর্থ হল—অপর দিকে হিন্দুজাতীয়তাবাদের দ্বারা ই শাসিত হতে চলল উনবিংশ শতকের শেষ পাদের বাঙালী চিন্তা। সেজগুই উনিশ শতকের বাঙালী রেনেসাঁস সার্থকতার উৎস ইউরোপীয়তার প্রাণস্পর্শে ভারতীয় হিন্দু জীবন দর্শনের পুনর্মূল্যায়নে। বঙ্গবাসীর আবির্ভাব এই রক্ষণশীল হিন্দু আন্দোলনের মধ্যেই। হিন্দুর প্রাচীন চিন্তা ও ধ্যানধারণাই বঙ্গবাসীর প্রাণ। বঙ্গবাসী সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং ঐ হিন্দু মানসিকতার উত্তরাধিকার-সূত্রেই তিনি বঙ্গবাসীর সম্পাদক-পদে বৃত্ত হতে পেরেছিলেন।

বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষার হলকর্ষণ এবং রাম-মোহনের যে যুক্তিবাদী মন জাতির জীবন-বন্ধে অগ্ন্যাদান করেছিল—উনিশ শতকের শেষ পাদের পূর্বসূর্যই তা ধূসর হয়ে আসে। যুক্তি অপেক্ষা ভক্তি, বিশ্বাস, হৃদয়াবেগ ও অতীত ঐতিহ্যের প্রতি মোহ, নবজাগৃতির সাফল্যকে বিলম্বিত করে। কেশবচন্দ্রের নব ব্রাহ্ম আন্দোলনের কাল হতেই ঐ মানবমুখী যুক্তিবাদ অপেক্ষা জাতীয়

ঐতিহ্য, জাতীয় ধর্ম, জাতীয় কীর্তির কথাই বড় হুয়ে দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার ও ধর্মপ্রচারকে এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাধারণী ও নবজীবনে হিন্দুর অতীত কথা যুক্তি সহকারে বিচার ও প্রচারে সজ্ঞী হন। এই সাধারণীতেই কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারই কৃষ্ণচন্দ্রের সাহিত্য পথের গুরু। অক্ষয়চন্দ্র গত যুগের একজন বিখ্যাত গল্পশিল্পী ও চিন্তানায়ক ছিলেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় তাঁর মানসিক পরিপুষ্ট হয়েছিল। সাধারণী ও নবজীবনের মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত বাঙালীর মন নব্য হিন্দু তত্ত্ব আলোচনার দিকে ফিকতে চেয়েছিলেন। ২ নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় তিনি লেখেন—“নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন যে, ধর্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না!... নিয়মিতরূপে সাময়িক পত্রের বিষয়ের চর্চা করিয়া, আমরা আপনারাও বুঝিব এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে।” ৩। সাধারণীতে অক্ষয়চন্দ্রের রাজনীতিজড়িত সাহিত্যিক সঙ্গ মেটাবারও উদ্দেশ্য ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে এই সাধারণীতেই যোগদান করেন। সাধারণী অফিসেই বঙ্গবাসী-প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সংগে কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতনামা লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্রের হাতে খড়ি হয় এই সাধারণীতে। কৃষ্ণচন্দ্র সে সময় সাধারণীর সহ-সম্পাদক ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের রচনা-সৌন্দর্য সাধারণীর স্রীসংবন্ধনে সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে উঠেছিল। এঁরা দুজনেই সাধারণীর প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে অক্ষয়চন্দ্রের বখেট্ট সহায়তা করেছিলেন। এই সময় যোগেন্দ্রচন্দ্রের সংগে কৃষ্ণচন্দ্রের আচ্ছেদ্য সৌহার্দ হয়। কিন্তু সাধারণীতে যোগদানের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্রের মানসিক প্রস্তুতির পশ্চাদ ভূমিটি দেখে নেওয়ার দরকার। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দের শুরুতেই অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১১৫৭ সালে। নদীয়ার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রাম শিবনিবাসে তাঁর জন্ম। এই শিবনিবাস মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচেষ্টাতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশে অন্ততম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মহারাজ এখানে অনেকগুলি দেববিগ্রহ স্থাপন করে কুলীন ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করেন। মহারাজ সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেকগুলি সংস্কৃত টোলের প্রতিষ্ঠা করেন এখানে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর হাতে শিবনিবাসের ঐশ্বর্য ও পরিমা ক্রমশঃ হতশ্রী হতে থাকে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মনীতিতে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত সমাজব্যবস্থা জড় ও জঙ্গমে পরিণত হয়। আর এই সমাজই ক্রমে অচলায়তন হয়ে ব্যক্তির স্বাসংগ করিতে চলে। ঠিক অপর দিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা অজ্ঞাত অপরিচিত গতিপথ নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শনের প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও যুক্তিমতে জাতির চিন্তাভূমি আকর্ষণ করতে

চলেছিল। সেই নবযুগের বোধনকেন্দ্রগুলির মধ্যে কৃষ্ণনগর ছিল একটি। কৃষ্ণনগর রাজবংশের সংগে শিবনিবাসের রাজবংশের যোগাযোগ তখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাই নবযুগের বাণী এই সুদূর পল্লীভূমিতেও সহজেই প্রসারিত হতে পেরেছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে নব্যবাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার অন্ততমকেন্দ্রে পরিণত হল। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন। ইনি ডিরোজিয়ান ও ইংল-বেঙ্গলদের মধ্যে গুরুস্থানীয় ছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বীটন লাহেব জ্যৈষ্ঠিকার জন্য কলিকাতার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। সংগে সংগে কৃষ্ণনগর ও বারাসাত প্রভৃতি মধ্যবর্তী শহরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। ইতিপূর্বে ১৮৩৪ সালে আডাম সাহেবের শিকারিপুরে স্মিথসন, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাথগঞ্জ, চটগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১১টি বালিকা বিদ্যালয় ও ৪৫০টি বালিকার উল্লেখ দেখা যায়। তদানীন্তনকালে এই জ্যৈষ্ঠিকার প্রচলন নিয়ে কলিকাতার হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হোল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার জ্যৈষ্ঠিকার বৈধতা প্রমাণের জন্য গ্রন্থ রচনা করলেন। অপরদিকে নাটুকে রামনারায়ণ জ্যৈষ্ঠিকাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিক্রম লক্ষ করলেন। ঐশ্বরগুপ্ত লিখলেন—

বত ছুঁড়িগুলো তুড়ী মেরে, কেতাব হাতে নিজে ববে,
এ, বি, শিখে বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;
আর কিছুদিন থাকবে ভাই, পথেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

বাংলার নবজাগৃতির অর্ধশতাব্দী জুড়ে এই বিধা ও ধর্ম জাতির চিন্তা, ভাবনা ও কর্মে মুখর হয়ে আছে। সে যুগে মুক্তিও ঐ আশ্বাসই ছিল বড় আশ্বাস। ভেবে দেখার অবকাশ ছিল না। বাঙালীর প্রাণ নিছক চিন্তাবিলাস অপেক্ষা ভাবের উদ্ভাটনাতাই অতি সহজে ভূপ্তিলাভ করে এবং তত্ত্বের সত্য অপেক্ষা তত্ত্বের ভাবাবেগ তাকে বিচলিত করে। এইরূপে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে নবযুগের সেই মানবধর্মের কঠিন পরীক্ষা আরম্ভ হোল। দেশের ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায় যোরতর সংস্কারবাদী হয়ে উঠলেন। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অর্ধপথেই বিধাগ্রস্ত হল। সংবাদপত্রসেবী কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মের পূর্বমুহূর্তেই জাতীয়-জীবনের ঐ বিধা ঘন পিনাক হয়ে উঠেছিল। মাহুয ক্ষুদ্র নয়, এই বিধাও যেমন এসেছিল— তেমনই নবলক বিজ্ঞা তার মনুষ্যত্বকে পরিবর্তিত না করে অহঙ্কারকেই পুষ্ট করতে লাগল—আত্মপ্রসারের পরিবর্তে আত্মসঙ্কোচ ঘটাতে লাগল—গ্রহণ অপেক্ষা বর্জনই শ্রেয়তর হয়ে উঠল। পাপ, পুণ্য, তুচ্ছ, অতুচ্ছ, স্রীল, অস্রীল, ভব্য অভব্য প্রভৃতি সবকিছু এক নূতন বিবেকবুদ্ধি অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠল। ইহাও একপ্রকার মানসব্যাদি। বলাবাহুল্য এই Morality সংস্কার জাতীয় সংস্কৃতির বিরোধী। তথাপি সেযুগের প্রায় সকল মনোবী ও কবিতচিত্ত মাহুয এই সংস্কারের অগ্নাধিক বশীভূত হয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রও এই মানস ব্যাদি হতে যুক্ত ছিলেন না। সেকালের নবযুগের ঐ বাণীতে যেমন তাঁর দীক্ষা হয়েছিল—তেমনই সে-যুগের ধর্ম ও Morality নামক মানসব্যাদি হতেও তিনি মুক্ত হতে পারেননি।

২। “সাধারণী হিন্দুজাতির পক্ষপাতিনী—বাঙালীর পক্ষপাতিনী”—প্রথম সংখ্যা সাধারণী। ৩। সূচনা, নবজীবন, প্রথম সংখ্যা।

তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে বর্ধিত হয়েছিলেন। শৈশব হতেই সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি মোহ তাঁর সহজাত প্রকৃতির মধ্য হতেই আবির্ভূত হয়েছিল। সমসাময়িক যুগপ্রবৃত্তির একটি প্রবল ধারাও তাঁকে হিন্দুচিন্তার দিকে প্রবৃত্ত করে। কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম ও সাধনার যুগের ঐ দৈবসত্তার মধ্যে হিন্দুধর্মী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাই প্রবল। তৎসঙ্গে তিনি উনিশ শতকের বাংলাদেশের একজন আধুনিক মানুষ।

কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মকাল ও সেই যুগের দ্বিধাবিভক্ত ভাবধারার কথা সংক্ষেপে বলেছি। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার নাম ছিল রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা ছিলেন ফুলিয়া মেলের নৈকধ্য কুলীন ঋষামেশ্বর চক্রবর্তীর সন্তান। লেখাপড়াতে বাল্যকালেই কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে মেধা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শিবনিবাসেই সংস্কৃত বিজ্ঞান পারদর্শী পিতা রামচন্দ্রের কাছে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। পিতার দৃঢ় চরিত্র ও হিন্দুশাস্ত্র-জ্ঞান তাঁর কৈশোর জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল—সে প্রভাব থেকে তিনি কখনই মুক্ত হতে পারেননি। বয়ঃ পরিণত বয়সে ঐ পিতৃ-স্মৃতিই তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তৎসঙ্গে পিতা রামচন্দ্র তাঁকে তৎকালে প্রচলিত বিলাতি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেন নি। কৃষ্ণচন্দ্র সেজন্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষারই আলোক লাভ করেছিলেন। তাঁর কর্মজীবনে এই দুই শিক্ষার ভাগবতী শ্রোত প্রবাহিত হতে দেখা গেছে। তৎকালে প্রচলিত ফার্সি আর্ট বা এফ-এ পাশ করার পর কৃষ্ণচন্দ্র চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। এই কলেজে কৃষ্ণচন্দ্র তিন বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করেন। নিজের মধ্যে বন্দ্যার লক্ষণ প্রকাশ হতে দেখে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। বন্দ্যার লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু ইহা কখনও রীতিমত রোগে পরিণত হয়নি। লোকান্তরের ২৩ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সুদৃঢ় সবল ও সুস্থ ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'সাধারণী'তে সহ-সম্পাদকের পদে যোগদান করেন। সাধারণীর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের যোগাযোগের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া হতে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশ করেন। ইহা সে যুগের একখানি উৎকৃষ্ট পত্র। অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, প্রমুখ সাহিত্য-রচয়ীদের রচনা সাধারণীর পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করতো। ইংরাজী ১৮৮৬ সালের দিকে 'নববিভাকর' সাধারণীর সঙ্গে যুক্ত হয়। নববিভাকর সাধারণী ৪র্থ ভাগ ২১ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইবার পর তিরোহিত হয়। নববিভাকর-সাধারণী যুক্ত হবার বহু পূর্বেই কৃষ্ণচন্দ্র সাধারণী পরিত্যাগ করে বগ্রাম শিবনিবাসে চলে যান। সেখানে নূতন ইংরেজী শিক্ষার প্রচারে তিনি কার্য শুরু করেন। যথাস্থানে কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষাতন্ত্রী জীবন সম্বন্ধে আলোচিত হবে। যাহোক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পর হতে প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয়। এখন হতে সাহিত্য, সংবাদপত্র ও দেশসেবাই তাঁর ব্রত হ'ল। ইতিমধ্যে জাতীয় আন্দোলনের একটা প্রবল শ্রোত জন-সংগম মণ্ডিত করে তুলেছে। কৃষ্ণচন্দ্র জাতীয়-জীবনের এই সর্বগ্রামী ভাবধারাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু তৎকালের অতিমাত্রার বিদেশী ভাবাপন্ন দেশসেবীদেরও তিনি

স্বক্ষে দেখেননি। তৎসঙ্গে তদানীন্তন জাতীয় জীবনের ঐ বাণীকে তিনি জীবনে আর এক দিক দিয়ে চরিতার্থ করেছিলেন—কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্তী জীবন আলোচনাকালে তাহাও পরিস্ফুট হবে। এমন সময় 'বঙ্গবাসী' হতে আহ্বান এল। সংবাদপত্র সেবার আহ্বান। কৃষ্ণচন্দ্র সে আহ্বান উপেক্ষা করেননি। অতঃপর বঙ্গবাসীই কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম ও কীর্তি ক্ষেত্র হয়ে পড়ে; এখানে আমরা সে প্রসঙ্গেই প্রবেশ করবো।

উনিবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবাসী একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী কেবলমাত্র সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যোগেন্দ্র চন্দ্র বাংলা দৈনিক, সাত্ত্ব ইংরেজী দৈনিক 'টেলিগ্রাফ' হিন্দী বঙ্গবাসী প্রভৃতি আরও কয়েকখানি দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন এবং নানা সঙ্গ্রহ প্রকাশ করে সুলভ মূল্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর কোলকাতার টাপাতলা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়ে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী হতে বঙ্গবাসী প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্র বসু উপেন্দ্র চন্দ্র সিংহের প্রচেষ্টাতে এই সময় বাংলা দৈনিকের জন্ম হয়। দৈনিকের প্রতিষ্ঠার জন্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র একজন সুলেখক অথচ কর্মী লোকের অনুসন্ধান করছিলেন। সাধারণী কার্যালয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সংগে যোগেন্দ্র চন্দ্রের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই সময় যোগেন্দ্র চন্দ্র সর্ব কর্মশূন্য বিচক্ষণ ও সুলেখক কৃষ্ণচন্দ্রকে ডেকে আনেন। কৃষ্ণচন্দ্র দৈনিকের সম্পাদনা ভার গ্রহণ করলেন। পূর্ব সৌহার্দ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঙ্গবাসী প্রতিষ্ঠানের কার্য প্রসারের পরিপোষক হয়ে উঠল। কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনার গুণে দৈনিকের মান বাড়ল। হুঁএক বছর পরেই বঙ্গবাসীর অল্পতম সত্বাধিকারী উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ রায়েবর সহিত যোগেন্দ্র চন্দ্রের মনোমালিঙ্গ হয়। উপেন্দ্র চন্দ্র সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেন। কলে বঙ্গবাসী কার্যালয় হতে প্রকাশিত 'দৈনিক' ও 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক মণ্ডলীর মধ্যে একটু বদ-বদল ঘটে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের দিকে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'দৈনিক'র সম্পাদক পদ পরিত্যাগ করে বঙ্গবাসীর সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানাগর চরিতকার বিহারীলাল সরকার লিখছেন—“১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বঙ্গবাসীর প্রিটারী কার্যে নিযুক্ত হই। ১০. ১১খন প্রিটারী করি, তখন যোগেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ বঙ্গবাসীর সত্বাধিকারী। যোগেন্দ্রবাবু সম্পাদক বলিয়া গণ্য ছিলেন, উপেন্দ্রবাবু ম্যানেজারী করিতেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দৈনিকের সম্পাদক এবং বামদেব দত্ত বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। উপেন্দ্রবাবু সকল সম্পর্ক ছাড়িয়া দেন। নূতন বন্দ্যোপাধ্যায় হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ ম্যানেজারী ভার লইলেন। বামদেব দৈনিকের সম্পাদক এবং আমি সহকারী সম্পাদক হইলাম। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইবার অধিকারী নহেন, এখন এই নিয়ম হইল।” ৫ সূত্রবা দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেই বঙ্গবাসীর মূল সম্পাদক হ'ন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত

৪। ইনি নদীয়া জেলার শিবনিবাসের অধিবাসী ছিলেন।

৫। বঙ্গভাষার লেখক।

ছিলেন। ইংরেজী ১৮৯২ সনে সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করেন এবং ১৮৯৫ সনে ঐ পত্রিকার মূল সম্পাদক হন। বামদেবও বেশীদিন দৈনিকের সংগে যুক্ত ছিলেন না।* অল্পদিন অল্প হস্তে ভ্রষ্ট থেকে দৈনিক প্রায় ১৪ বৎসর ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের হস্তে ভ্রষ্ট হয়েছিল। তাঁর রচিত 'মদনমোহন' শিক্ষা ও উপদেশ, দৈনিকেই প্রকাশিত হয়। এই ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিজ্ঞানমহাশয় বঙ্গমতী ও বঙ্গবাসীর সংগে সুদীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন; রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় ক্ষেত্রমোহনের সমকক্ষ সে কালে ছলভ ছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 'সাহিত্য মঙ্গল' রচয়িতা ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক হিসাবে বঙ্গবাসীতে যোগদান করলেন। তিনি নিজেও পাঁচকড়ির সংগে 'বঙ্গবাসীর' সংস্রবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীর সম্পাদনা বিভাগে যোগদানের পূর্বে বঙ্গবাসী কাঞ্চালয় হতে প্রকাশিত তদানীন্তন দৈনিক ইংরেজী সংবাদপত্র টেলিগ্রাফের সম্পাদক ছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। এইসময় ১৮৯৬ সালের ২৩শে আগষ্ট সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর আবির্ভাব ঘটে। পাঁচকড়ি কংগ্রেস-বিরোধী বঙ্গবাসী বর্জন করে ১৮৯১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী হতে কংগ্রেস সমর্থনকারী বঙ্গমতীর সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত সময়েও কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গবাসীর সংগে সংস্রব ত্যাগ করেননি। এই সকল কথা পরে আলোচনা করা হবে। ঐতিহাসিক কুমুদনাথ মল্লিক কৃষ্ণচন্দ্র প্রসঙ্গে একস্থলে লিখেছেন—“বৌবনে ইনি মনীষী শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পাদিত সাধারণীীর সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন, পরে বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ পূর্বক তাঁহার স্বাভাবিক রচনা পারিপাট্যে উহার স্তম্ভবর্ধন করেন, তারপর দৈনিক চন্দ্রিকার সম্পাদকতা করিতে থাকেন।” ৭ এই শেষোক্ত দৈনিক চন্দ্রিকার সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্রবের কথা আমরা অল্প কোথাও জানিতে পারি নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সংবাদপত্র সেবার জীবন এইভাবে দূর লক্ষ্যে ধাবিত হ'ল। এবারে তাঁর কর্মকর্ত্তিগণের বিচার করে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের অধিকাংশই সংবাদপত্র-সেবায় অতিবাহিত হয়। আর বঙ্গবাসী সম্পাদনা তাঁর সংবাদপত্রসেবী জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাস্তবিকই কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনা গুণে বঙ্গবাসী এত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। ১৮৮৩ হতে ১৮৯৫ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল তিনি বঙ্গবাসীর মূল সম্পাদক ছিলেন। ইহার পূর্বে ও পরে তিনি বঙ্গবাসীর পরিচালনা বিভাগের অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন। ধীরে বঙ্গবাসীর সম্পাদনা করে ধ্যানি অর্জন করেছেন— তাঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, হরিনাথ ভট্টাচার্য, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মত কেহই সুদীর্ঘকাল বঙ্গবাসীর সংগে যুক্ত ছিলেন না। বঙ্গবাসীর উক্ত বঙ্গমতী

হিন্দু মনোভাবের আওতাতে। হিন্দুর ধর্ম-কর্ম আচার অনুষ্ঠান রক্ষাই বেন বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল। প্রথমে ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—“বঙ্গবাসী শীঘ্রই হিন্দুসমাজের মুখপত্র রূপে পরিণত হইল। ইহা এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, মফঃস্বলে সংবাদপত্র বলিতে বঙ্গবাসীকেই বুঝাইত।” ৮ সেকালের অতিরিক্ত ধর্মাস্তর গ্রহণ, অত্যধিক মাত্রায় বিজ্ঞাতীয় অনুকরণ এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম বিগর্হিত আচার অনুষ্ঠান রক্ষণীয় হিন্দুদিগের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। বঙ্গবাসীর লক্ষ্য হইল এই সমস্ত অনাচারের গতিবোধ করা। হিন্দুশাস্ত্র-বিদ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গবাসীর দ্বারা এইরূপ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করে যোগেন্দ্রচন্দ্র দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যে নিস্পৃহ জ্ঞানবাদ ও মানবতা এই শতকের অক্ষয় মন্ত, বিজ্ঞানগর প্রভৃতির মধ্যে জাগরিত হয়েছিল—বঙ্গবাসীর কর্ণধারগণের মধ্যে তা দেখা যায়নি। বঙ্গবাসীর সাধনা ও সেবা একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেই ধাবিত হতে লাগল। বাংলার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সেবার পরিবর্তে বঙ্গবাসী ঋণ হিন্দু-সম্প্রদায়ের সেবক হল। তাই উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে নবযুগের যে তরঙ্গ কলৌল বাঙালীর অর্গলক্ক মানন ধারে আঘাত করেছিল—শতকের শেষে তা বিভিন্ন স্রোতপথে প্রবাহিত হ'ল। নানা প্রকার ধর্ম-আন্দোলন এবং অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষবাস্পে যেনে-সাঁঝের স্বপ্ন বিকল হ'ল। শুক্লর সুরকুমার সেন এই কাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—“সংক্ষেপে বলিতে গেলে পিছাইয়া পড়িতে চাওয়া হিন্দুসমাজ ও আগাইয়া চলিতে চাওয়া ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শঘটিত দ্বন্দ্বই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় বছরে বাঙালীর ও ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।” ৯ কিন্তু আর এক দিক দিয়ে বাঙালী নবযুগের আদর্শবাদ থেকে বঞ্চিত হ'ল না। তা হিন্দুর জাতীয় জাগরণ ও পরিপার্শ্বে চেতনা। ইহারই ফলে বাংলার সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান অপরূপ কার্যকান্ড লাভ করল। এই পরিপার্শ্বে চেতনার দিক থেকেই নবযুগের বাণী কতকটা সার্থক হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণচন্দ্র সে যুগের ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির খাত-পানীর আকর্ষণ গ্রহণ করেও সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যকে অগ্রিহোজীর অগ্রিহকার মত রক্ষা করেছিলেন। এই কৃষ্ণচন্দ্র আন্তিক্যবাদে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বহু পূর্ববর্তী বিজ্ঞানগর খাঁটি সঙ্কত কলেজের ছাত্র হয়েও আন্তিক্যবাদে ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন। প্রত্যক্ষ প্রত্যয় ও ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞা ব্যতীত তিনি জীবনের কোন সত্যকেই বিশ্বাস করতেন না। কৃষ্ণচন্দ্র জ্ঞানতাপস হয়েও ছিলেন ধর্মপরায়ণ ভক্তহিন্দু। তিনি সেকালের নব্য হিন্দু নেতাদেরও একজন ছিলেন। শক্তিমান বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিসহ হিন্দুধর্মের আলোচনা শুরু করেছিলেন—পরে তিনি এই পথ হতে সরে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁর পাইক পেয়াদারা ক্ষান্ত হল না। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত অস্ত্র নিয়ে চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গবাসী ও নবজীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। বঙ্কিমের মনীষা, মহত্ব ও ঔদার্য বঙ্গবাসীর হিন্দু নেতাদের ছিল না। চিন্তা ও যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রই ছিল এঁদের প্রধান অস্ত্র। কৃষ্ণচন্দ্রের

৬। সাহিত্য সাধক চরিত মালা ৮২ সংখ্যক পৃষ্ঠিকা।

৭। নদীয়া কাহিনী, ২য় সর্ (১৩১১) পৃষ্ঠা—১৮৫

৮। সাহিত্য সাধক চরিত মালা—৩৮ সংখ্যক পৃষ্ঠিকা।

৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪।

মধ্যে জ্ঞান ও শ্রেয়, ধ্যান ও কর্মের একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখা গিয়েছিল—আর এ দৃশ্য সেকালের বাঙালী জীবনের আত্মার দৃশ্য। কৃষ্ণচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় সেকালের বাঙালী হিন্দু স্নায়ীদের প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও রচনাগুলিই তার প্রমাণ। এই কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মদক্ষতার গুণেই বঙ্গবাসী সেকালের বাঙালীর হৃদয় জয় করেছিল। “অষ্টম দশকে যুগোপযোগী পত্র-পত্রিকা কয়েকখানিই বাহির হইল। সঞ্জীবনী ও বঙ্গবাসী এই সময়ের দুই বিখ্যাত সাপ্তাহিক।” ১০ বঙ্গবাসীর প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছিল বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করা। যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরিচালনায় এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনা-গুণে বঙ্গবাসী বাঙালী মাত্রেই সেবার আন্তরিক ভাবে আত্মনিয়োগ করে। সেকালে বাংলার জনজীবনে ‘বঙ্গবাসীর’ প্রভাব সম্বন্ধে হরিনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন—“তাহাদের (বাঙালীর) অভাব অভিযোগ, তাহাদের অধিকার, তাহাদের সুখ-সুবিধা, তাহাদের দুঃখকষ্ট, তাহাদের হিতাহিত সকল বিষয়েই বঙ্গবাসী এমন নিরপেক্ষ নির্ভীক ও সরল ভাবে আলোচনা করিত যে, তাহাকে সকলেই একান্ত কল্যাণকামী বন্ধুর মতই আদরের পাত্র বলিয়া মনে করিত। কয়েক বৎসরের মধ্যেই বঙ্গবাসী এইভাবে সকলের শ্রদ্ধার, স্নেহের ও ভালবাসার ভিতর দিয়া দেশের একটা শক্তিকেন্দ্ররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতায় বসিয়া বঙ্গবাসী পরিচালনা করিতেন, কিন্তু সুদূর মফঃস্বলের প্রতি পল্লীর পর্ণকূটারে পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব পরিস্কৃত হইত। বঙ্গবাসীই ছিল বাঙালীর একমাত্র সংবাদপত্র। তখন কেহ আর সংবাদপত্র বলিত না। সংবাদপত্র বুঝাইতে হইলে বঙ্গবাসী বলিত।” ১১ অতি দুর্গম পল্লীগ্রামে—বেল ধরিতে হইলে দুইদিন গরুর গাড়ীতে বাইতে হয়—বহু দূরবর্তী পোষ্ট অফিস হইতে সম্পূর্ণ মাত্র একদিন ডাক আসে—এমন স্থানেও বঙ্গবাসীর গ্রাহক ছিল। বঙ্গবাসীর জনসেবা তার জনপ্রিয়তার অঙ্গতম কারণ। উনিশ শতকের অষ্টম দশকে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভীষণ প্রাণহীন দেখা দেয় ফলে প্রাবৃত অঞ্চলের জনসাধারণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সম্মুখীন হয়। বঙ্গবাসী এই সময়ে বিপর্যাস্ত জনসাধারণের সেবায় সহযোগের হস্ত প্রসারিত করে। ঐ সময় বর্ধমান ও বাঁকুড়া অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের জন্ত বঙ্গবাসী সরকার-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। লাথারা নামক স্থানে দামোদর নদের বাঁধ ভাঙা হেতু এক হানা বা হ্রদতুল্য জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। প্রতি বৎসরে দামোদরের বস্তার বেগে এই হানার পথে জল প্রবেশ করে বহু ক্রোশব্যাপী শত্রুক্ষেত্র ধ্বংস করে দিত। বঙ্গবাসী এই বস্তার প্রতিকারের জন্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধে অগ্নিবর্ষী লেখনীর দ্বারা জনসাধারণের স্খীতি অর্জনে সমর্থ হয়। এই আন্দোলন ও জনপ্রিয়তার পিছনে সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচেষ্টা মুখ্য ছিল। তিনি নিজে পয়ত্রয়ে ঐ সমস্ত বস্তাপ্রাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট জনসাধারণের দুর্দশার কথা বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন বর্ণনা করে চলেেন। এই সমস্ত কারণে বঙ্গবাসীর ইতিহাসে

কৃষ্ণচন্দ্রের নাম অরণীয় হয়ে থাকা উচিত। বঙ্গবাসী, কেবলমাত্র নীরস সংবাদের সমষ্টি ছিলনা। ইহার ভাষাও ছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। বঙ্গবাসীর এই জনপ্রিয়তার মূলে কৃষ্ণচন্দ্রের কথা অরণ করিতেই হবে। কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্তীকালে বঙ্গবাসীর জনপ্রিয়তা কমেছিল। সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—মাঝে বৎসর কয়েক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিভা-পরিচালিত হইয়া বঙ্গবাসী, হিন্দুপ্রজার, পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থের মুখপত্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর সে বিশিষ্টতা নাই। ১২ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের পতীর সৌহার্দ্য ছিল এবং কৃষ্ণচন্দ্র এখন বঙ্গবাসী সম্পাদক, ইন্দ্রনাথ তখন তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় এই ইন্দ্রনাথের হাতে সেকালের অনেক সাহিত্যিকেরই শিক্ষানবিশি হয়। পাঁচকড়িও ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। পাঁচকড়ি তাঁর সাহিত্যগুরু হিসাবে ইন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে কোনদিনই কুণ্ঠিত হননি। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের এ বিষয়ে লিখে গেছেন। ১৩ বঙ্গবাসী-হিতৈষী যোগেন্দ্রচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালে বাংলার জাতীয় জীবন নানাভাবে আন্দোলনের সম্মুখীন হয়। বঙ্গবাসী এই ভাব আন্দোলনের পথ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়নি। বরং যুগচিন্তের ঐ উচ্চাঙ্গ গতি-প্রকৃতিকে একটা স্থির পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনাকাল যুগের ঐ ঘনঘটার মধ্যেই অতিবাহিত হয়। তিনি বঙ্গবাসীকে বাঙালীর চিত্ত জাগরণের উৎসবে পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন। বঙ্গবাসী, শাণিত আয়ুধের জায় জাতির তামসিক চিত্ততলে আঘাত হানিতে থাকে। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের মধ্যভাগে শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে স্বাধীনতা উৎসুক্য জাগে। ইহা সেযুগের নব্য ইতিহাস চর্চার ফল। টডের রাজস্থান কাহিনী নিয়ে বঙ্গবাসী প্রমুখ কবি সাহিত্যিকগণ অসুট রাষ্ট্রীয় চেতনাকে জাগরিত করেন। যে সমস্ত ব্যক্তির চিত্তে এই চাক্ষু্য দেখা দিয়েছিল, রাজনারায়ণ তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। তিনি ব্যাকুল ছিলেন দেশের সর্বাঙ্গীণ জাগরণের জন্ত। তাই রাজনারায়ণ ও তাঁর স্ত্রীস্বর্গের আশালিঙ্গম আত্মনির্ভর কর্মপরায়ণতার পথ ধরে। তারই ফলে শতকের অষ্টম দশক হতে জাতীয় আন্দোলন আরও সক্রিয় আকার ধারণ করে। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের লেখনীগুণে বঙ্গবাসী এদেশের মানসিক চিত্ততলে জাতি বৈরের ভাবটি ব্যাপক করে তোলে। কৃষ্ণচন্দ্র লিখিত অনুবন্ধগুলি তখন থেকেই তন্দ্রচ্ছন্ন বাঙালীর মনে বহিষ্করণ ছড়িয়ে দিতে থাকে।

উনিশ শতকের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও সমাজ সংস্কারের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শতকের ৬ষ্ঠ ও ৭ম দশক থেকে রাষ্ট্রীয় চেতনা ও সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করে। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের নবজাগৃত রাষ্ট্রীয় চেতনার স্মৃষ্টি রূপকর্ষণের জন্ত ১৮৭৬ সনে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা গঠিত হয়। অষ্টম দশক হতে সভার কাজ ক্রমশঃ অন্তর্ভুক্তি হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ১৮৭২ খৃঃ হিন্দু সহবাস বিল আইন সভার

১০। বাংলার নব জাগরণের কথা—যোগেন্দ্রচন্দ্র বাগল, বসুমতী—পৌষ, ১৩৬৫।

১১। যোগেন্দ্র-কথা (১৩৩১)।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ—প্রবাহিনী ২০শে পৌষ ১৯২১।

১৩। প্রবাহিনী—২০শে বৈশাখ ১৩২২।

অনুমোদন লাভ করে। ইহার দ্বারা অল্পবয়স্ক বালিকাদের বিবাহ রহিত হয় এবং বিধবা বিবাহের প্রবর্তন হয়। ইহাতে সারা দেশে এক ব্যাপক আন্দোলন সুরু হয়। ইহা ছাড়া ইলবার্ট বিল, মিউনিসিপ্যাল বিল, এবং পরিশেষে জাশাজাল কনফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলনের উদ্ভব বাঙালীরা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিপুল সাড়া এনে দেয়। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় যুগের এই নবাগত ঘটনাগুলিকে মনযুগের তোরণদ্বারে পৌঁছে দেওয়ার কার্যে প্রতী হন। বিদেশী ঐতিহাসিকের লেখাতেও এই যুগ-চাকলোর আভাস মেলে। “During the year 1883 the native Press was much excited on various subjects, such as, the Ilbert Bill, the Local Self Govt. and Municipal Bill, and the imprisonment of the editor of the Bengali by the High Court for Contempt.” ১৪ এই সময় রাষ্ট্রতন্ত্র স্বরেন্দ্রনাথ কাব্যরুদ্র হন। বঙ্গবাসী, ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য চিন্তার সংগে সংগে রাষ্ট্রীয় চিন্তাতেও উৎসাহ প্রদর্শন করে। তৎকালীন কংগ্রেসকে বঙ্গবাসী সমর্থন করেনি বটে—কিন্তু জাতিবৈরের ভাবটি ঘনীভূত করে তোলার ব্যাপারে বঙ্গবাসীর কৃতিত্ব অসামান্য। বঙ্গবাসী প্রকাশকভাবে বিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুন্দর সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের অগ্নিবর্ষিলেখনী জাতিচিন্তে নূতন সাড়া এনে দেয়। তাঁর লিখিত অল্পবয়স্ক বঙ্গবাসীর পাঠকদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। তৎকালে বঙ্গবাসীর অধিকাংশ সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই লিখতেন। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন—“বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক হইবার সময় প্রত্যেক সংখ্যায় একটি বা দুইটি কখনো কখনো ততোধিক প্রবন্ধ, অল্পবন্ধ, কলিকাতা মকঃবল প্রভৃতি লিখিবার ভার আমার উপর পড়িল। কৃষ্ণবাবু তখন সম্পাদক। তবে অল্পবন্ধ তিনি অধিকাংশই লিখিতেন।” ১৫ বঙ্গবাসী সর্বাঙ্গ্রে সহবাস আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তোলে। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে নবযুগের বাণী তখনও মূর্ত হয়ে ওঠেনি। ধর্মসঙ্কার তখনও প্রবল। বঙ্গবাসী সহবাস আইনের বিরোধিতা করে রক্ষণশীলতারেই পরিচয় প্রদান করে। বঙ্গবাসীর এই আন্দোলনের পিছনে নবযুগের কোন মুক্ত আলোক ত ছিলই না, বরং গোঁড়ামির জন্ত সঙ্কীর্ণ অচলায়তন সৃষ্টি করে তোলে। বিভাসাগর—মধুসূদনের যুক্ত মানবতার কোন পরশই ছিল না এই আন্দোলনের পিছনে। তবু বঙ্গবাসীর এই আন্দোলন সাধারণ ধর্মভীত বাঙালীর হৃদয় জয় করে ফেললো। বঙ্গবাসী দূর পল্লীবঙ্গের মানুষের মধ্যে সহবাস আইনের বিরুদ্ধে নূতন মন তৈরীর জন্তে লেগে গেল। যোগেন্দ্রচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ বঙ্গবাসী-হিতৈষীগণ সহবাস আইনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এক প্রতিবাদসভা আহ্বান করেন। গড়ের মাঠের ঐ প্রতিবাদসভায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়ে ঐ আইনের প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদসভাকে কেহ কেহ ভারতের প্রথম বৃহৎ

জনসভা বলে অভিহিত করেন। সে যুগের ঐ সহবাস আইনকে কেন্দ্র করে দেশের সংবাদপত্র-জগতে তুফান আলোড়ন উঠেছিল। অনেকেই সহবাস বিলকে সমর্থন করেছিল। বালিকাসখী, সঙ্গীবনী, ওনিমন্ত্রাজ, সমর, প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সহবাস বিলের সমর্থন করে অসংখ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ ও ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশ করতে থাকে। অপর দিকে বঙ্গবাসী, দৈনিক, বঙ্গনিবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, হিন্দুরাজিকা, ঢাকাপ্রকাশ, টাইমস্, সুধাকর প্রভৃতি সংবাদপত্র সহবাস-আইনের ঘোর বিরোধিতা করে। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় সহবাস বিলের বিপক্ষে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, তা সেকালের মানুষকে সচকিত করে। সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বঙ্গবাসীর এই আন্দোলনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ইংরেজী ১৮৯১ সালের দিকে অমৃতসন্ধান পত্রিকার বিবিধ প্রসঙ্গে দেখিতে পাই “সম্মতির বয়স লইয়া হিন্দুসমাজে বড়ই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুই এই বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন। এমন গ্রাম নাই বা এমন নগর নাই যে, সেখান হইতে এই বিলের সম্বন্ধে আপত্তি উপস্থাপিত হইতেছে না। সকল হিন্দুই ধর্মহানি ভয়ে শঙ্কিত হইয়াছেন। গভর্নমেন্ট এসকল দেখিয়াও যে বিল পাশ করিতে অগ্রসর হইবেন, এইরূপ ত মনে হয় না। বিল পাশ হইলে যে কি অনিষ্ট সাধিত হইবে তাহা বলা যায় না। বাহা ইউক, এন্সবুকে বাহারা বিশেষ উত্তোঙ্গী হইয়া বিলের প্রতিবাদ জন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমাদের অন্তরের ধন্যবার প্রদান করিতেছি। বিশেষতঃ সহযোগী বঙ্গবাসী একত্র সর্বাঙ্গেকা ধন্যবাদ পাইবার পাত্র। গত দুইবারের বঙ্গবাসীর প্রতিবাদ সংগ্রহ বড়ই উচ্চ অঙ্গের।” ১৬ ১২১৭এর ৩০শে ফাল্গুনের অমৃতসন্ধানের সহবাস বিল সম্পর্কে প্রস্তুত আলোচনা দেখা যায়। উক্ত সংখ্যাতেও অমৃতসন্ধান বঙ্গবাসীর ভূয়সী প্রশংসা করে। অমৃতসন্ধান প্রকাশিত, আশঙ্কার কথা, কি দেখিলাম ও কি শিখিলাম, প্রভৃতি আলোচনার বঙ্গবাসীর সহবাস বিল সম্পর্কীয় আলোচনার ব্যাপক উল্লেখ আছে। বাস্তবিকই বঙ্গবাসী সেকালে সহবাস বিলের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন তুলে ধর্মভীত বাঙালীজনের চিত্ত জয় করেছিল। সেকালে বঙ্গবাসীর এই ধ্যান্তি প্রতিপত্তির পিছনে সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা, এবং তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীই যে প্রধান ছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। বঙ্গবাসী প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র এতদুই কৃষ্ণচন্দ্রের উপর স্নগভীর আস্থা রেখে চলাতেন। বিহারীলাল সরকার তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—“তখন কৃষ্ণবাবু বঙ্গবাসীর সম্পাদক ছিলেন বলিয়া যোগেনবাবু অনেকটা নিশ্চিত থাকিতেন।”

এই সময়ে ইলবার্ট বিল পাশ হয়ে সমগ্র জাতিকে প্রবল তরঙ্গ-বিক্ষোভের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিল। এই ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে জাতির রাষ্ট্রীয় চিত্ত জাগরণ আর একধাপ অগ্রসর হ'ল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ তারিখে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের বি-এল-গুপ্ত শাসনতন্ত্রের কিছু পরিবর্তনের জন্ত এক প্রস্তাব পেশ করেন। এই সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন Sir Augustus

১৪। Bengal under the Lieutenant Governors —vol. II—C. E. Buckland.

১৫। বঙ্গভাষার লেখক।

১৬। অমৃতসন্ধান। ১৪ই মাঘ ১৩১৭।

Rivers Tompson (1882-87). ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন খেতাবদেব বিরোধিতা উপেক্ষা করে সভ্যহতে উক্ত প্রস্তাবটি পাশ করে নেন এবং তদানীন্তন Law member শ্রী সি, সি, ইলবার্টের নামানুসারে বিলটি ইলবার্ট এ্যাক্ট নামে অভিহিত হয়। এই ইলবার্ট বিলে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, কোন কোন শ্রেণীর ভারতীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট বিচার-বিভাগে ইউরোপীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের সমান মর্যাদা ভোগ করবেন। এই প্রস্তাবে দেশের গোটা ইউরোপীয় সমাজ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এতদিন ইউরোপীয়েরা যে সব সুখস্ববিধা ভোগ করে আসছিল—সে সবের উপরে দেশীয় বিচারকদের হস্তক্ষেপ তারা কিছুতেই গ্রাহ্য করতে চাইল না। কেন না, নৈতিক গুণাবলীর দিক দিয়ে ভারতীয়েরা নাকি ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক হীন ছিল। যাদের মধ্যে জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, প্রতিমাপূজা প্রভৃতি প্রচলিত তারা বিজ্ঞাবুদ্ধিতে যতই উন্নত হোক তবু ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারক হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ভারতীয়দের মর্যাদার উপর এইভাবে যে আঘাত পড়ল তা বিচিত্র বল প্রসব করতে চলে। সমসাময়িক দেশীয় পত্র-পত্রিকা যারকত আন্দোলন শুরু হল। দেশীয় পত্রিকাগুলির অধিকাংশই ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জাতীয় আন্দোলনের ঘূর্ণিবর্তী সৃষ্টি করে ফুলল। অপরদিকে খেতাব সম্প্রদায় 'ইলবার্ট বিলের' বিরোধিতা করতে লাগল। তারা ইংল্যান্ড ও এদেশ হতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে লাগল এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য। বঙ্গবাসী, স্বদেশের পক্ষ অবলম্বন করে 'ইলবার্ট বিলের' সমর্থন করে জনগণচিহ্নে সঞ্চিত শতাব্দীর বহুকুণ্ড হতে অগ্নিচয়ন করে নীপশলাকা জালিয়ে দিল। এই আন্দোলনকে ডিঙি করে কৃষ্ণচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গবাসী' ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে জাতিবৈরের তাবটি প্রসারিত করে দেয়। কলে দেশী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে মনো-মালিন্য তীব্র আকার ধারণ করে। ইলবার্ট বিল কেন্দ্র করে যে জাতিবৈরিতার ঝড় সেসুগের মাহুকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত ঘটিয়েছিল—সে সবকে C. E. Buckland লিখেছেন—The storm of indignation which had broken out in the European Community smouldered during the year, while the report called for were under submission. All India was in alarm, on the lookout for any manifestation of the intentions of the Govt. "Nothing could be more lamentable it has been said than the animosities of race that were aroused, the prejudices, the bitterness and bad feeling between Europeans and natives that were excited." ১৭ এই সময় বঙ্গবাসী স্বদেশসেবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে। বঙ্গবাসী এই সময় কেবলমাত্র ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হ'য়নি, স্বদেশী নেতাদের অতিরিক্ত উচ্ছাসকেও তিরস্কৃত করেছিল। স্বাধীনতার জীবন উন্নাস ও রাষ্ট্রীয় চেতনার পাবক স্পর্শে, বঙ্গবাসী,

কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে অর্পণ শক্তি সঞ্চয় করে। কেবল বঙ্গবাসী নয়, সেকালের প্রায় সকল সংবাদপত্রই এই 'ইলবার্ট' আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। উনবিংশ শতকের বিখ্যাত কবি মনীষিগণ ইলবার্ট বিলকে অবলম্বন করে নানাপ্রকার ব্যঙ্গ-কবিতা ও রচনাদি প্রকাশ করতে থাকেন। বঙ্গবাসীর ইচ্ছনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যসেবিগণ এবিষয়ে বিশেষ অগ্রণী হয়েছিলেন। এখানে সেই রকম কয়েকটি কবিতাংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে।

হার কি হলো—কপাল পোড়া উমেদারের পেশা
পড়ল চাপা জুতার তলে—সাহেব বড় পোয়া।
অন্ন গেল বাঙালিরই, আর কি হোল তার।
এ পোড়া ছাই, "ইলবার্ট বিল" কেন হার হার।

—(হার কি হলো)

ছসিয়ার ইলবার্ট	দেখছে রিপন লাট
সাহেব বঙ্গবাসী সভা সংগঠিত হয়েছে।	
হু-পৌঁচ তে-পৌঁচ মিলে	লক্ষ টাকা দিছে তুলে
চামড়া কটা কতগুলো 'এম্ফিবিয়স' জুটেছে।	
হিপ-হিপ, হুরে	ছাট কোট বুট পরে
ভাদের বিচার করে এ জগতে কেটা ?	
আইরে কিরিজি ভাই	সবরতা ডাকে সবাই
সিদ্ধপারে দেখে আসি ইংরেজের সভা।	
পালে চুকে মিশে যাবে	আজ পিত্ত নাহি যব
সিংহদলে স্থান পাবো বেছে নেবে কেবা ?	
হয়ে হিপ,—হরে-হো	পিঙা বাজে ভৌঁ-ভৌঁ-ভৌঁ
এদেশী বুটন যোরা পোরাদের ব্যাটা ?	
	—(নেতার নেতার)

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 'ইলবার্ট বিল' উপলক্ষে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিতাটি রচনা করেন—নেতার, নেতার। ইলবার্ট বিলের প্রতিবাদে কলিকাতার দেশীয় নেতাগণ যে সভা করেন, জ্ঞানসন্ম প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকেরা এবং ইংলিস ম্যান প্রভৃতি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি তাতে কিণ্ড হয়ে বিবিধ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহাঙ্গিকে উপলক্ষ করেই হেমচন্দ্র এই কবিতাটি রচনা করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড টেম্পল কর্তৃক মিউনিসিপ্যাল আইন রচিত হলে হেমচন্দ্র আর একটি বহুশ্লোক কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটি হ'ল—'সাবাস হজুক আজব সহরে'। আজিও ভোট প্রদান কালে বাঙালীর এই কবিতাটির কথা মনে হয়। সমসাময়িক ঘটনার প্রতি এই প্রকার হজুকপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত সেকালের সাময়িক পত্রে বিস্তর ছড়িয়ে আছে। 'বঙ্গবাসী'র পৃষ্ঠায় ইলবার্ট বিল নিয়েও এইরূপ অজস্র ব্যঙ্গ-রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমসাময়িক এই সমস্ত কবিতা ইলবার্ট বিল আন্দোলনের ব্যাপকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাহিত্যিক কৌতুক

— কৌতুক চিত্রিত —

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

হাসিটা হঠাৎ ছনিয়া থেকে ছলভ হয়ে পড়েছে। লোকে
প্রাণখোলা হাসি হাসতে ক্রমেই ভুলে যাচ্ছে। হাসির গল্প
আর হাসির কথা আজ যেন লোকের কাছে বিলাসের বস্তু। আর
কি নিয়েই বা লোকে হাসবে? কোথায় সেই হাসির খোরাক?
সত্যতার গোলামীতে আর অর্থনৈতিক যুগকাঠে মানুষ তো সব
মেসিন হয়ে গেছে। দিলখোলা লোক যদিও দেখা যায়, বিপর্যস্ত
মন থেকে যদিও বা কিছু বল বেবোর—তা হয়ে যায় নিদারুণ
ব্যঙ্গ বা বিক্রম। রসনিষ্ঠার অনাবিল খোলা মনের কলধ্বনি
আজকের দিনে প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা কোথায়? তথাকথিত
'অপচয়' করার মত সময় বা অর্থ কই? সেকালের সে বৈঠকও
মেই, সে মজলিসি মানুষও নেই। ছিল একদিন বধন গানে,
কবিতায়, সাহিত্যে রসের স্বরূপা স্বরূপা, রসবেত্তা ধনী-সমাজ
কর্তৃক পুষ্ট হয়ে এই রসের পরিবেশন হতো। তখনও—

"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ

তবু রঙ্গ তারা....."

তখনও—

"ওকথা আর বলো না

আর বলো না

বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে

এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা

হাসবে লোকে

হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে।"

হাঙ্ক, হাসি নিয়ে আমি গবেষণা করতে নামিনি, প্রবন্ধ লিখতেও
সক্ষম নই। আমার নেশা সেকালের লোকদের জীবনী খাঁটা।
তাই তাঁদের মধ্যে কয়েকজন খনামধ্য সাহিত্যরসিক ধারা ছোট
ছোট গুটিকয়েক কথার স্তোত্র দিয়ে পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয়
দিয়েছেন—তারই কিছু আপনাদের সামনে পরিবেশন করছি—

সেকালের কলকাতার এক বিখ্যাত ধনীর বাড়ীর 'হল' ঘরে
কয়েকজন যুবক সাহেবী কারদার খানা খাচ্ছে। এমন সময়
নাটুকে রামনারায়ণ তর্করত্ন মশাই সে দিক দিয়ে বাড়ীর কর্তার
সঙ্গে দেখা করতে বাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই তারা বললে—

লোক, 'খানা' খাও, আমরা পাড়ার্গেয়ে মালু্য, 'খানার' মলত্যাগ
করি।

[রামনারায়ণ তর্করত্ন (১২২১—১২১২) নাট্যকার। ইনি
নাটুকে রামনারায়ণ নামে খ্যাত ছিলেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' 'বেমন
কম তেমনি কম' প্রভৃতি এর প্রসিদ্ধ নাটক।]

ঐ তর্করত্ন মশাই একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশাই-এর
বাড়ীতে এসেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেই চেঁচিয়ে
বললেন—'ওরে কে আছিস, তর্করত্ন মশাইকে চৌকী দে'।
তর্করত্ন মশাই কপালে হাত দিয়ে বললেন—'হা ভগবান,
আমি গরীব ভ্রাক্ষণ, চোরও নই, ঝটপাড়ও নই—আমাকেও
'চৌকী' (পাহারা) দেবে।

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২২৩—১৩১২) ভ্রাক্ষণসমাজের





সভাপতি ও প্রধান আচার্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতা এবং শাস্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা।]

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মিজপাখ্যক ও রসাত্মক কবিতা রচনার সিদ্ধান্ত ছিলেন। তাঁর জ্যাঠাতুত ভাই মহেশচন্দ্র রসাত্মক রচনার কিছু কমতি ছিলেন না। তাঁদের উভয়ের মধ্যে কবিতার লড়াই চলত। কোন কারণে মহেশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে কবিতার যুদ্ধ করবেন না। তাতে ঈশ্বর গুপ্ত বিজয় করে বলেন—“দাদা, ল্যাজ গুটলে কেন?”

তার প্রত্যুত্তরে মহেশচন্দ্র বললেন—

“ওরে ছুই ভাইয়ের ছুই থাকলে ল্যাজ—

থাকতো না সংসার।

এক তোমার ল্যাজে মজে গেছে

সোনার লজ্জা ছবিখার।”

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১২১৩—১২৬৫) ‘সংবাদ-প্রভাকর’, ‘সাধুরঞ্জন’, ‘সংবাদরত্নমালা’, ‘পার্বণ-পীড়ন’ প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।]

এটালির দেবনারায়ণ দেব ছেলের জন্মকালো পাকা দেখা। প্যারীচাঁদ মিত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেমা-পাওনার ফর্দ চলছে। প্যারীচাঁদ দফার দফার দেবনারায়ণ বাবুকে টাকা দিতে অস্বীকার করলে তিনি বলেন—প্যারীবাবু, আপনি তো বেশ লোক, প্রত্যেকবারেই আমাকে টাকা দিতে বলছেন। তাতে প্যারীবাবু সহাস্তে বললেন—বাপু, তুমি দেবে না তো কে দেবে?

তোমার আগে ‘দে’ শেষে ‘দে’ দুতরাং তুমিই দেবে। সকলেই হেসে উঠলেন।

[প্যারীচাঁদ মিত্র (১২২১—১২১০) সাহিত্যাকাশে টেকচাঁদ ঠাকুর নামে খ্যাত। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস তাঁরই রচনা।]

একদিন ভূদেববাবুর কোন বন্ধু ভূদেববাবুকে বললেন—কালিদাস মৈত্র বলেছেন—ভূদেব আমার ‘মানব-দেহতত্ত্ব’ কলম দিয়ে কেটেছে, আমি তার ‘প্রকৃতির বিজ্ঞান’ কোদাল দিয়ে কাটব। তাই শুনে ভূদেববাবু হেসে বলেন, যার বা অস্ত্র সে তাই দিয়ে কাটে।

এক সময় ভূদেববাবু কোন বালিকা বিজ্ঞানের পরিদর্শন করতে যান। নীচু ক্লাশের একটি মেয়েকে ডেকে তার নাম জিজ্ঞাসা করেন। মেয়েটি উত্তর দেয়—ব্রজবালা দাসী।

আবার জিজ্ঞাসা করেন—কি পড় মা?

এবার মেয়েটি কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিল—দ্বি তীর ভাগ।

সেই কথা শুনে তিনি বেশ গম্ভীরভাবে বললেন—“ব্রেশ, ব্রেশ।”

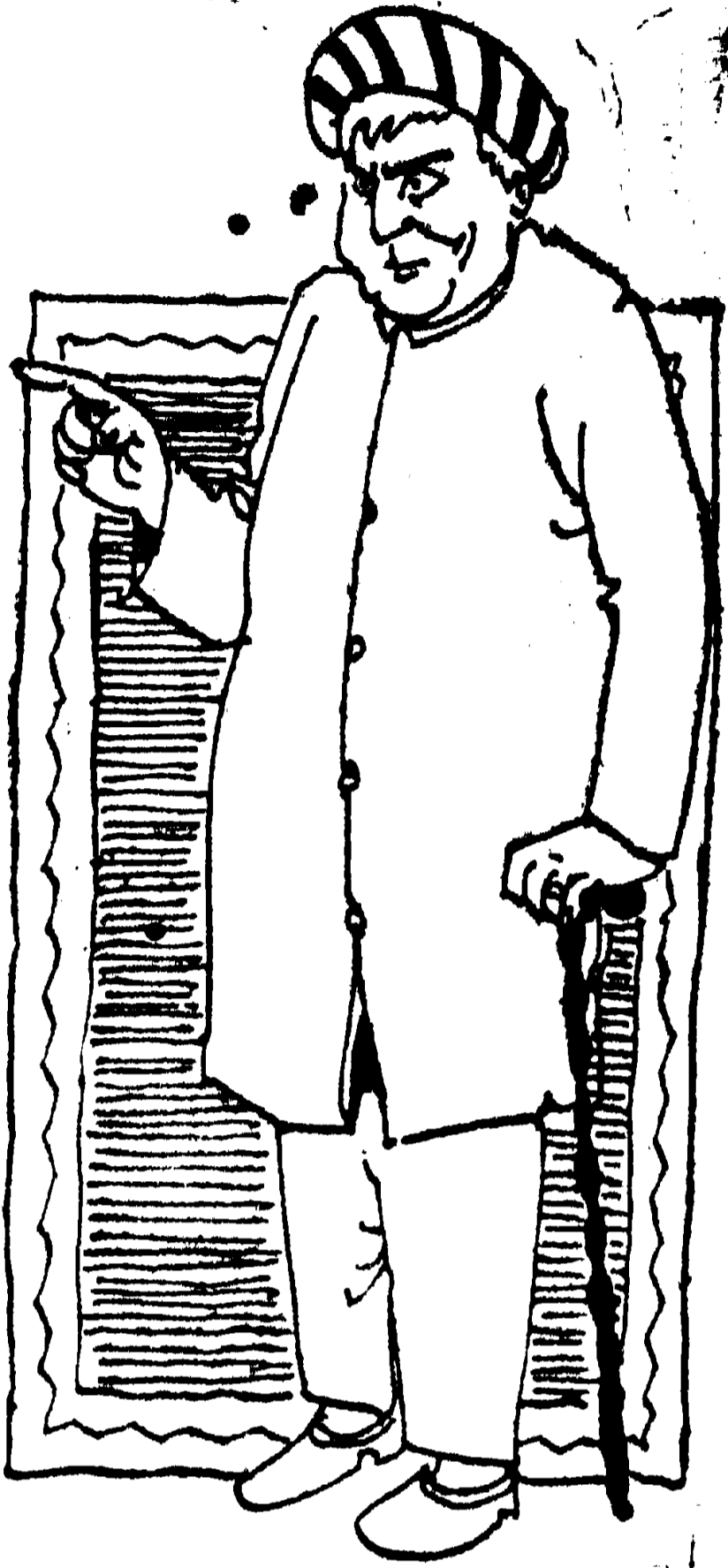
এখন হয়েছে কি, সেই মেয়েটির ডাক নাম বেজা ছিল। তার বাড়ীতে বলেছিল—কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে—ভাল নাম বলতে হয়। তাই মেয়েটির ধারণা হল—চলতি নাম বেজাকে ‘ব’-ফলা দিয়ে ভাল নাম ব্রজ হয়েছে—সেইজন্মে দ্বিতীয়তে ‘ব’ ফলা দিয়ে ভাল নাম করে দিলে। ভূদেববাবুও সেই রহস্য বুঝতে পেরে তিনিও ‘ব’-ফলা দিয়ে উত্তর দিলেন।

[ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৩৩-১৩০০) শিক্ষাব্রতী ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। হিন্দুধর্মের উন্নতি ও হিন্দুধর্মে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য তিনি নানা গ্রন্থ রচনা করেন। ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।]

বিজ্ঞানাগর মশাই যখন সামাজিক আচারগুলির সংস্কারে ব্যস্ত ছিলেন—সেই সময় তাঁর এক বন্ধু কালীকৃষ্ণ তাঁকে কিছু আমের আচার বহুস্তে তৈরী করে পাঠান। পরে উভয়ের দেখা হলে বিজ্ঞানাগর আমের আচারের খুব প্রশংসা করেন। তাই শুনে কালীকৃষ্ণ বলেন—তাহলে বিজ্ঞানাগর তুমিও স্বীকার কর, এদেশের সব আচার কু-আচার নয়, কেমন?”



—দামোদর মুন্সিংগ?



[ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর (১২২৭—১২৯৮) বাংলা সাহিত্যের গুরু, সমাজ-সংস্কারক ও পণ্ডিত। কালীকৃষ্ণ মিত্র বাহাদুর আশ্রমবাসী জনৈক বঙ্গী।]

কালীচন্দ্র রাঢ়ী বাসি-ব্যাংকপুর বঙ্গ-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত। তিনি এক সময়ে পাঠাগরের বই সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় বিজ্ঞানাগর মশাই-এর বাড়ীতে আসেন। বিজ্ঞানাগর মশাইকে তিনি আগে কখনও দেখেননি। সুতরাং তাঁকে তিনি চিনতেন না। বিজ্ঞানাগর মশাই-এর বাড়ীতে তাঁর ঘরে তখন অনেক লোক বসেছিলেন আর তিনি রোয়াকে বসে দাঁড়ি কামাচ্ছিলেন। ঘরের মধ্যে চৌকীর ওপর এক ভদ্রলোককে দেখে বিজ্ঞানাগর ভেবে তাঁর কাছে আবেদন জানালেন—তিনি বাইরে বিজ্ঞানাগরকে অঞ্জলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন। বিজ্ঞানাগর তা দেখে বললেন—আজকাল দেখছি, সবারই উঁচু দিকে নজর, নীচের দিকে দৃষ্টি পড়বে কেন?

তাতে কালীচন্দ্র কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দিলেন—
“ঈশ্বর সর্বব্যাপী হলেও আমরা তাঁর আশায় উঁচু দিকেই চাই।”

এই উত্তর শুনে বিজ্ঞানাগর মশাই খুব খুসী হলেন—আর তাঁর প্রার্থনাও মঞ্জুর করলেন।

[কালীচন্দ্র রাঢ়ী (১২৫৩—১৩২১) পণ্ডিত এবং ‘ভারতের ইতিহাস’ ও ‘নবদীপ-মহিমা’র গ্রন্থকার।]

একবার মধুসূদন ও দীনবন্ধু কৃষ্ণকর্ণের থেকে সঙ্গী পাঠ হবার

অন্ত ঘুম ভাঙে ঘাটে এসেছেন। খেরাঘাটের মাঝি নৌকোর ভেতর গভীর ঘুমে ঘর। দীনবন্ধু নৌকোর কাছে তীরে ঝাঁপিয়ে মাঝিকে ডাকতে লাগলেন—ও বাবা, মাঝি, একবার ওঠ, ওঠ আমাদের পার করে দিয়ে আবার ঘুমোও। দীনবন্ধুর বীর কণ্ঠ মাঝির কানে পেল না। তখন মধুসূদন বললেন—ওরকম করে ডাকলে কি মাঝি সাড়া দেবে? তখন তিনি সাহেবি ভঙ্গি বললেন—Oh, You, বলে গুরুগভীর ভাবে ডাকা যাত্র মাঝির ঘুম ভেঙ্গে পেল। সে ধড়মড় করে ওঠে তাঁদের নৌকোর তুললে।

“সেই ঘাটে খেরা দিল ভদ্রালু পাটুনি

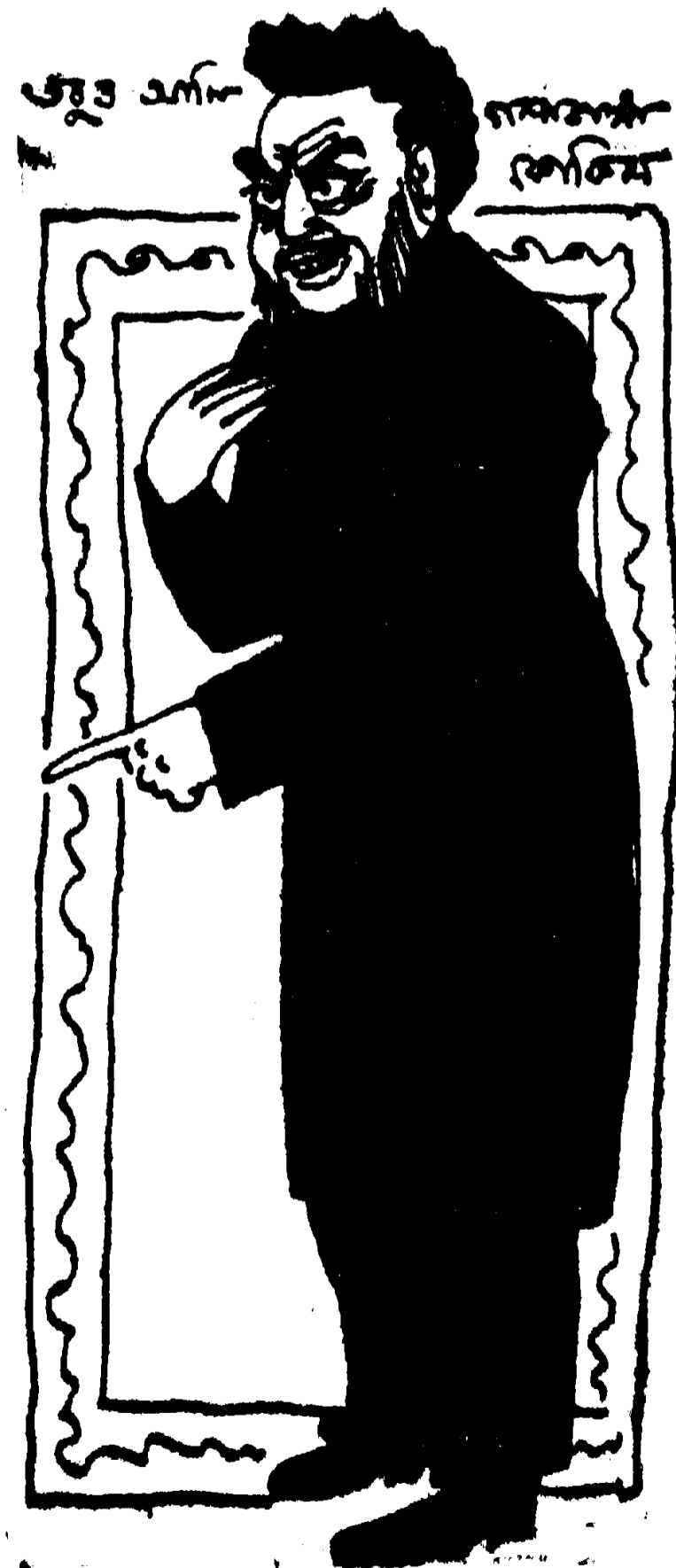
ঘরায় বাহিল নৌকা ‘মধু’ ঘর ভনি।”

[মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বিখ্যাত কবি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’র রচয়িতা। দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৮-১২৮০) নাট্যকার ‘নীলদর্পণ’ ‘সধবার একাদশী’ প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা]

কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গীত-শিক্ষক ও ‘গীতপুত্রধার’ রচয়িতা শমিষ্ঠা নাটকের শমিষ্ঠার অংশগ্রহণ করেছিলেন। দীনবন্ধুর সঙ্গে মাইকেল তাঁর পরিচয়ে বললেন—ইনি আমাদের লাইনে আছেন। দীনবন্ধু বিজ্ঞাসা করলেন—ইনি কি Lawyer?

মধুসূদন বললেন—না হে না, ইনি নাট্যশিল্পবিদ। আমাদেরই লাইন জে।

মহাবলী নাটকের মহড়া। পাইকপাড়ার রাজাদের উদ্দেশ্যে বাটিকার হলে সোকার বসে মহারাজা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্গী মধুসূদন।



মধুসূদন—বাংলা নাটকে অমিত্রাক্ষর হ্রস্ব প্রবর্তিত না হলে নাটকের প্রকৃত উন্নতির আশা নেই।

যতীন্দ্রমোহন—প্রবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। কারণ অমিত্রাক্ষর হ্রস্বের গাভীর্ষ ও পদবিন্যাস বাংলা ভাষার উপযোগী নয়।

মধুসূদন—আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত নহি—একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত।

যতীন্দ্রমোহন—কেন আপনার মনে নেই, ঈশ্বর গুপ্তের লেখা—

“কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি
ইচ্ছা হয় বত পাই পেট ভরে খাই।”

[মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১২৬৮—১৩১৪) বহু জনহিতকর, শিক্ষা, শিল্প, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ‘বিভাসনন্দন’, ‘বুঝলে কি মা’ ‘গীতমালা’ প্রভৃতি তাঁর লেখা]

মধুসূদন একদিন রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে কোন সামাজিক উৎসবে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে এসেছেন। সকলে খুঁটি চাদর পরে এসেছেন কেবল মধুসূদন এসেছেন কোট পাতলুন পরে। তাঁকে দেখে দিগম্বর মিত্র বললেন—মাইকেল, আজকে তুমি কাপড় পরে এসে না কেন ?

মধুসূদন হেসে বললেন—কাপড় পরে আসলে গাড়ু গামছার দরকার। এটা Ruling race এর পোষাক—এতে সে ভয় নেই।

[ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্র (১৮১৭—১৮৯৭) বিজ্ঞান-সাহী ছিলেন।]

চুঁচুড়ার সরকারী উকীল কবি দীননাথ ধরের সঙ্গে মাইকেলের গুরু-শিষ্য সম্পর্ক। তা হলেও চুঁচুড়ার মধ্যে বেশ রসিকতা চলত। তখন মাইকেল লালবাজারে থাকতেন, মাইকেল একদিন রহস্য করে বললেন—দেখ দীহু! লালবাজারে এসে লালপানি দাঁড়িয়ে সজত; আবার লালপানি খেলেই লালবাজারে গতি হয়। সৌরচক্র কি না। তুমি কিন্তু দেখতে পাই—কেবল সাদা জলই খাও। লালবাজারের লালপানিও খেলে না টলেও পড়লে না, বেশ খাড়া আছে।

মাইকেল ‘পদ্মাবতী’ নাটক লেখবার সময় বললেন—‘ও’ শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র, হুঁরে প্রতিধ্বনি হল তার ধ্বনি মাত্র। মাইকেলের পত্নী, তাঁকে সম্বোধন হলে ‘dear’ বলতেই তিনিও ‘dear’ বলে উত্তর দিতেন। তাই শুনে দীননাথ রহস্য করে বললেন—মি: দত্ত, আপনি দেখছি পরমাসতী মিসেস দত্তের প্রতিধ্বনি।

দীননাথ এক কবিতা লেখেন। মাইকেল পড়ে বললেন—এ ত poetry নয় এ বে pottery.

[দীননাথ ধর (১৮৩১—?) ‘কংস-বিনাশ’ ‘জিশুল’ ‘উবাচয়িত’ প্রভৃতির রচয়িতা]

মাত্রাজের এক হিমসিদ্ধ জলে স্নান করে মধুসূদনের মধুসূর কর্তৃক চিরদিনের জন্য ভয় ও বিকৃত হয়ে যায়। মাইকেল দেখতে কাল, তরুণ হলে গলাটা ভাঙা। কোন এক সুপুরুষ লোক মাইকেলের চেহারা আর গলায় আওয়াজ নিয়ে কটাক করে।

তাই শুনে মাইকেল হেসে বলেন—তবুও আমি গলাভাঙা কোকিল, সারা হাঁসের মত করি না ত প্যাক প্যাক প্যাক।

বহু রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র একবার নিজ কংশ-মর্ষাদার গর্ভ করায় মাইকেল রহস্য করে বলেন—কিন্তু বতই বল তুমি দাদা, knave, slave, বাবুনের মোট মাথায় করে তোমার বাপ-দাদারা বাঙলার আসে, আর আমি—‘দত্ত’ কারো ভৃত্য নয়।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—১৮৯১) বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, বহু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ‘শিল্পিক দর্শন’ ‘শিবাজীর চরিত্র’ প্রভৃতি অনেকগুলি বই-ও লেখেন।]

রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্ম হয়ে কানীতে গিয়ে পৈতে ফেলে আসেন—বাপ বার বার নিষেধ করেন, বাপের সঙ্গে তর্ক করে আলাদা বাড়ীতে গিয়ে থাকেন।

একদিন রামতনু বিজ্ঞানাগরকে বললেন—ওহে, আমাকে একটা রাঁধুনি বাবুন ঘোগাড় করে দিতে পার ?

বিজ্ঞানাগর বললেন—কেন হে, তোমার আবার বাবুনের দরকার কি ? বাবুঁচি খানসামা হলেও তো চলে।

রামতনু বললেন—হ্যাঁ, আমার কোন আপত্তি নেই বটে, কিন্তু বাড়ীর ভেতর যে বাবুন ছাড়া চলবে না।

বিজ্ঞানাগর হেসে বললেন—বাপের কথায় পৈতেগাছটা রাখতে পারলে না, এখন পরিবারের কথায় বাবুন খুঁজতে বেরিয়েছে ? রামতনু মাথা চুলকোতে লাগলেন।

[রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩—১৮৯৮) ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষার আদর্শে সমাজ-সংস্কারে উত্তোগী হন।]

এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে মহাসমারোহে আড়ম্বাছ। সভাপণ্ডিত চতুর্ভূজ ভট্টাচার্যের ও প্রধান নৈয়ায়িক জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ওপর নিমন্ত্রণের ভার। এক গরীব ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য উভয়কেই অমুরোধ করেন। চতুর্ভূজ বললেন—মশাই, আমার এ বিষয়ে কোন হাত নেই। আপনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে যান, তাকে ধরুন। একথা শুনে ব্রাহ্মণ আর থাকতে না পেরে বললেন—“চতুর্ভূজ ভূজো নাস্তি নিতুং কিং করিষ্যতি”—পণ্ডিত মশাই, চতুর্ভূজ হুঁয়ে আপনার যদি হাত না থাকে, তবে জগন্নাথের হাত থাকি কি সম্ভব ? বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হন।

[হুগলী-ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১১৩১-১২০৩) বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও অদ্বৈত মেধাশক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ‘বিবাদভঙ্গার্পণ’ প্রভৃতির রচয়িতা। চতুর্ভূজ ভট্টাচার্য হুগলীর বিখ্যাত পণ্ডিত]

বিজ্ঞানাগর মশাই-এর কাছে এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ দেখা করতে এসেন—সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই অপরিচিত ব্রাহ্মণকে কেউ প্রশ্ন করেন না দেখে, সেই ব্রাহ্মণ বড় অপমানিত বোধ করলেন আর অত্রাহ্মণদের লক্ষ্য করে বললেন—এই সকল অর্ধাচীনদের মনে রাখা উচিত যে, ব্রাহ্মণেরা বর্ণ-শ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ, এক সময় তাঁরা এদেশের কল্যাণ সাধন করেছেন, তাঁরা সকলেরই প্রণয়।

বিজ্ঞানাগর তাই শুনে হাতস্থে বললেন—পণ্ডিত মশাই,

কিছুক একদিন বরাহরূপ ধরেছিলেন বলেই কি ভোমপাড়ার হত শূকর আছে, তাদের ভক্তি বা প্রণাম করতে হবে ?

ভ্রাক্ষণের রাগ নিরসন হল।

সাহিত্যরসিক দামোদর মুখোজ্যে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কিত বেহাই। তাঁর বাড়ীতে উৎসব। আসর জমকালো। এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে আসতে দেখে বেহাই-এর সাদর আহ্বান—এস, এস বঙ্কিম চট্টো (অর্থাৎ বাঁকা চট্টকুতো)। বঙ্কিমও রসজ্ঞ, প্রত্যুত্তর দিতে ছাড়লেন না, বললেন—কোন দিকে ? দামোদর মুখোয় ? (অর্থাৎ দামোদরের মুখে)।

[দামোদর মুখোপাধ্যায় (১২৫১-১৩১৪) গ্রন্থকার ও 'প্রবাহ', 'অহুসকান', 'জ্ঞানানুভব' প্রভৃতি সাময়িকপত্রের সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৪৫-১৩০০) সাহিত্য-সম্রাট। 'বন্ধে মাস্তরম্' মন্ত্রশ্রী ঋষি।]

একবার কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নামে আদালতে অভিযোগ করে যে, সে তার জীব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে সেই মোকদ্দমা ওঠে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সাক্ষী আছে ? প্রথম ব্যক্তি বললে, হজুর আমার জীবই সাক্ষী, সেই দেখেছে। বঙ্কিম সহাস্তে বললেন—তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, তোমার জীবও পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করা অভ্যাস আছে নতুবা তিনি কি করে জানলেন যে, এই ব্যক্তিটি তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে ?

একবার প্রতাপ চাটুজ্যের গলির বাড়ীতে বঙ্কিম রোয়াকে বসে তেল মাখছেন। এমন সময় দীনবন্ধু মিত্রের এসে হাজির। দীনবন্ধুর হঠাৎ নজরে পড়ল বিতলের ঘরের জানালার বঙ্কিম-গৃহিণী দাঁড়িয়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ জানালার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দীনবন্ধু বললেন—ওহো, এখানে কি চাদের শোভা ! বঙ্কিম ওপরের দিকে একবার চেয়েই উত্তর দিলেন—আহা, বেন দিনের (দীনবন্ধুর) গালে হেগে দিয়েছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ছুল পাঠকালীন তাঁর সহাধ্যায়ীদের মাথার চাপড় বা চাটি মারতেন। তাঁরা একদিন শিক্ক মশাইয়ের কাছে নালিশ করলে, শিক্ক মশাই তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চাইলেন। কালী সিংহ কিছুমাত্র ভীত না হয়ে বরং গর্ব করে বললেন—আমি জাতে সিংহ। জাত্যভিমান কিছুতেই ত্যাগ করতে পারি না—তাই এরকম করে থাকি।

[কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১-১৮৭০) মহাত্মারতের অনুবাদক। এ ছাড়া তিনি 'হতোম প্যাটার নজা' ও আরও কতকগুলি বই লেখেন।]

একদিন কবি রসময় লাহা তাঁর সন্তপ্রকাশিত 'ছাইভয়' নামে গ্রন্থখানি কান্তকবি রজনীকান্তকে উপহার দেন। রজনীকান্তও তাঁর অমৃত নামে কবিতার বইখানি উপহার দিয়ে বলেন—'ছাইভয়' দিয়ে 'অমৃত' নিয়ে বান।

আর একদিন লাহা মশাই তাঁর রচিত 'আরাম' বইখানি রজনীকান্তকে তাঁর বোগশব্যার উপহার দিলে পরিচাস করে রজনীকান্ত বলেন—আমার এই ব্যারামে 'আরাম' দিলেন বেশ।

[কবি রসময় লাহা (১২৭৬-১৩৩৫) কবি করেকটি কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা। রজনীকান্ত সেন (১২৭২-১৩১৭) বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কান্তকবি নামে পরিচিত। ইনি একাধারে কবি ও গায়ক ছিলেন। 'বাণী', 'কল্যাণী' এর বিখ্যাত বই।]

এক সময় রজনীকান্ত তাঁর কোন বন্ধুর বিতায় বারের বিয়েতে গিয়েছিলেন। বর-কন্ডা সমেত ফেরার পথে নব-বধুর প্রবল অর্ষ হয়। বন্ধুটি তাঁর কাছে এসে বললেন—ধর ১০৩ হয়েছে। রজনীকান্ত হেসে বললেন—মাগেও এক সতীন। এখনও ১০৩।

কান্তকবি আইনজীবী ছিলেন। আদালতে উকীলদের মাঝে রসালপ চলছিল। রজনীকান্ত বললেন—একটা রাখাল ছটো গরু নিয়ে কাছে—একটি মোটা আর একটি রোগা। একজন উকীল সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে রাখালকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার ও গরুটা অত মোটা আর এ গরুটা এত রোগা কেন রে ? কেউ দিস না না কি ? রাখাল উকীলকে বললে—আজ্ঞে তা নয়, মোটা গরুটা উকীল আর রোগাটা মজ্জেল। রাগ করবেন না যেন।

তহবিল তহরুপের মামলা। প্রতিবাদী পক্ষের উকীল ইন্দ্রনাথ আদালতে দেখার ভুলে বাচীপক্ষ থেকে একখানি খাতা দাবিল করার আবেদন করলে পরদিন অপর পক্ষের উকীল মশাই ক্রোধভরে বহু খাতা নিয়ে আসেন। খাতার ভূপ দেখে ইন্দ্রনাথ হাকিমকে



বললেন—আমি একটু বিশ্ল্যাকরণী চেয়েছিলুম কিন্তু আমার সুপণ্ডিত বন্ধু একেবারে গোটা গল্পমানন এনে হাজির করেছেন। আদালতে হাসির বোল উঠল।

[ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৫৫-১৩১৭) আইনজীবী ও রস-সাহিত্যিক। 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামে বঙ্গবাসী পত্র 'পাঁচু ঠাকুর' 'কুদিরাম', 'ভারত উদ্ধার' প্রভৃতি লেখেন।]

হু'পয়সার কাগজ বঙ্গবাসীর যখন খুব প্রতিপত্তি তখন কোন ব্যাপারে 'বেঙ্গলী' সম্পাদক শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে আসেন। সে সময় ইন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ চলে গেলে ইন্দ্রনাথ যোগেনবাবুকে বললেন—আপনার হু'পয়সার কাগজের এমন প্রতিপত্তি হয়েছে যে, ইংরেজি কাগজের সম্পাদকরাও আপনার মতামত জানতে বাড়ী পর্যন্ত ছুটে আসেন। এর জন্য আপনার একটা 'কাল' পাথরের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হওয়া উচিত। যোগেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথের এই রসময় ইঙ্গিতে হাসলেন—অর্থাৎ কাল পাথরের উল্লেখে তাঁর দেহের বর্ণের প্রতি ইঙ্গিত দিল।

শান্তী মশাই রসিক লোক ছিলেন। তাঁর গৃহিণীও সুরসিকা। শান্তী মশায়ের লেখাপড়ার সময়ে কখনও কখনও গৃহিণী এসে সংসারের কথাবার্তা স্তব্ধ করতেন—তাতে শান্তী মশায়ের কাজের

ব্যাঘাতও ঘটত—তাই একদিন তিনি বাজা অভিনয়ের মত হাত নেড়ে বলেছিলেন—

"লিখিতে পড়িতে লিখিতে দিলে কই,

বিবাহি নিরবধি জানি না আর তোমা বই।"

শান্তী মশাই বেশ তোলাজ করে আহার করতে ভালবাসতেন—গৃহিণী কিন্তু বহুস্তে সুর্য্যনাথি বেঁধে তাঁকে খাওয়ার সুযোগ পেতেন না। তাই নিয়ে গৃহিণীর কাছে অসুযোগ করলে তিনি বাজা অভিনয়ের মত হাত নেড়ে বললেন—

"রাখিতে বাড়িতে লিখিতে দিলে কই,

বিবাহি নিরবধি জানি না আর আঁতুর বই।"

[মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্তী (১৮৫৩-১৯৩১) বিখ্যাত প্রকৃত্তান্তিক, ভাবাবিদ সুপণ্ডিত। হাজার বছর আগেকার বাংলাভাষার আবিষ্কারক।]

নবদ্বীপ রসিকতার দেশ। নবদ্বীপের কোন এক নৈরাসিক পণ্ডিত আহার করতে বসেছেন। তাঁর আঙ্গনী তাঁকে পরিবেশন করছেন। উভয়েই অস্তি বাল্যে বিবাহিত হওয়ার তাঁদের মধ্যে রসিকতা চলত। গৃহিণীর নাম সম্ভবতঃ পঞ্চাননা দেবী। আহায়ে বসলে পণ্ডিতের জলের প্রয়োজন হওয়ার তিনি ডাকলেন—পাঁচী, পাকি, প্রপাকি, পঞ্চাননি, বারি আনয়।

গৃহিণীও সুরসিকা। উত্তর দিলেন—আর্ষ, আর্ষা, ওটাচাৰ্ষ শিরোধাৰ্ষ, গজোদকং বা কুপোদকম্ (গঙ্গার জল না কুয়ার জল ?)।

তবু

অসীম সরকার

বস দেখি না আমি।

কতো দিন, কত মাস, পার হ'য়ে গেছে :

শুভ শ্রুত শরতের তারা-জলা-রাত ;

কতো রাত বাদলের মারলে মাতাল।—

মনের আঁধারে তবু, বললো না কোন দিন—

বপ্নের মশাল।

নতুন শিকরা এলো

লাজুক লাজুক সব মায়ের কোলে।

কারার পাট সেয়ে তাদেরও তো দেখলুম ;—

তেপান্তর পার হয়ে পথে পথে পোড় খেলো তারা :

ইন্দ্রাত-খজু দেহ, হাতে পায়ে শিরার শিকড়

চেটে খস্কালো বুঝি মেরেদের জামল শরীরে।—

ওরাও কি কোন দিন, পারবে না বপ্নসাধ

এনে বিতে কিরে ?

পুরানোরা হবে গেল।

এ পৃথিবী কীদলো না, দিন-রাত্রি এলো গেলো ঠিক ;

বনস্পতি রিক্তশাখা আকাশের পটে দিল এঁকে ;

জলন্ত আকাশে কেব কীদলো কল্প চিল ;

বর্ষার জটায়ু মেঘ বাতাসের যুগে এসোমেলো।

ওই সব বরাপাতা, ওরাও কি কোন দিন

বপ্ন দেখেছিলো ?

তবু তো ফাগুন আসে

আগনের মতো সব ফুলে।

সোনালি হরকে বোজ, আকাশ আশার চিঠি লেখে,

কাজল রাতের মারা তারার তারার শুধু কাঁপে,

এখানে অসাড় মাটি বার বার হয় দিশাহারা।—

কোন দিন পৃথিবীতে পথ খুঁজে পাবে না কি—

কারার বপ্নেরা ?

অন্যতঃ অস্বীয়
শ্রীমদ্রামায়ণ
অস্বীয় কৃষ্ণ শ্রীমদ্রামায়ণ

২২

সকলে তখন অদ্বৈতের কাছে গেল। তার নবদ্বীপের বাসায়।

‘নিমাই কী হয়েছে দেখবেন চলুন।’

‘কী হয়েছে?’ যেন কিছুই জানে না, বিশ্বরাবিষ্ট চোখে তাকাল অদ্বৈত।

‘সে নিমাই আর নেই।’

‘কোন নিমাই?’

‘পাণ্ডিত্যে জগৎজয় করে ধরাকে যে সন্ন্যাসী
করত। সেই উদ্বৈতের শিরোমণি। সেই গর্বে
পর্বতায়মান।’

‘এখন কী হয়েছে?’

‘কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছে। ধরেছে দীন-হীন
কাঙালের সাজ। অঙ্গে ধুলো, চোখে অবিরাম অশ্রু।’

‘হয়েছে? এসেছে?’ হৃদয় দিয়ে উঠল
অদ্বৈত। ‘আমার সঙ্কল্প সফল করেছে?’

কত ডেকেছে অদ্বৈত, কত হৃদয় দিয়েছে, কত
ভুলসী-গঙ্গাজলে ভজন করেছে একমনে। জীবকুল
মলিন হয়ে রয়েছে, কত জন এসে নাশিত করেছে
সকাতর। অদ্বৈত আশ্বাস দিয়েছে সকলকে, আর
বেশি দেয়ী নেই, আসবেন শ্রীহরি, পতিতকে উদ্ধার
করবেন, মলিনকে প্রদীপ্ত করবেন। শুককে ব্রবীভূত
করবেন। সকলের নয়নগোচর হবেন।

‘কোনো না কাল কী হয়েছিল?’ বলতে লাগল
অদ্বৈত, ‘কাল সন্ধ্যায় গীতা পড়ছিলাম। একটা
শ্লোকের অর্থ নানা বিচারেও প্রাজ্ঞ হচ্ছিলাম না।
সেই উপোস করে ছিলাম রাত্রে। তুমিই ছিলাম,

স্বপ্ন দেখলাম অপরূপ। কে যেন আমাকে ডাকছে।
বলছে, আচার্য, ওঠ, কেন উপোস করে আছ?
উঠে ভোজন কর। ভোজন করব কী, শ্লোকের যে
এখনো ব্যাখ্যা পাইনি। আগস্তক বললে, তার জন্তে
কী হয়েছে, আমি বলে দিচ্ছি অর্থ। উচ্চ কণ্ঠে শ্লোক
পড়ে অর্থ করে দিল আগস্তক। তুমি কে? কাল
জন্তে এত দিন অপেক্ষা করেছ, সাধন ভজন তন্দন
করেছ, আমি সেই। একবার দেখতে পাই না
তোমাকে? একবার কাছে এসে দাঁড়াও।’

‘দাঁড়াল?’

‘দাঁড়াল। দেখলাম আমাদের সেই বিশ্বরূপ’
অদ্বৈত আকুল উজ্জল চোখে তাকাল সকলের মুখের
দিকে।

‘ঠিক চিনতে পারলেন?’

‘বা, পারবনা চিনতে?’ বললে অদ্বৈত, ‘ওর দাবী
বিশ্বরূপ গীতা পড়তে আসত আমার কাছে। পড়তে
পড়তে বেলা বেড়ে যেত, বাড়ি ফেরার কথা মনে
থাকতনা। কত দিন ছোট শিশু বিশ্বরূপ ভাকতে
আসত দাদাকে। বলত, দাদা, তোমার খিদে
পায়না? মা রান্না শেষ করে বসে আছে। কী
সুন্দর দেখতে সেই শিশুকে, কী মধুর তার কথা!
হৃদয় হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত মার কাছে।
মন আপনা থেকেই শিশুর দিকে ছুটে যেত। নিজের
মনে বিচার করতাম, আমি কৃষ্ণের দাস, সর্বস্ব
আমার চিত্ত কেন ঐ শিশুতে আকৃষ্ট হবে, কেন ঐ
শিশু আমার চিন্তা জুড়ে বিরাজ করবে? কে ঐ
শিশু? ওই কি তবে আমার সেই আরাধনের ধন?’

‘কিছু বলল সেই স্বপ্নমুহুর্তি?’

‘বললে, নগরে-নগরে ঘরে-ঘরে এখন কৃষ্ণকীর্তন হবে। ভয় নেই, ত্রাণ পাবে জীবকুল।’

‘আর কী দেখলেন?’

‘ঐ কথা বলেই অস্তহিত হল।’ অর্ধেত আনন্দের লহর তুলে বললে, ‘এখন যখন তোমরা বলছ সেই বিশ্বস্তর ভক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠেছে, তখন কী না-জানি অঘটন ঘটে! অতুলন ঘটে। কী না-জানি মঙ্গলের বশ্চা নামে সংসারে।’

‘একবার যাবেন তাকে দেখতে?’ কে একজন কানের কাছে মুখ এনে জিগপেস করল।

‘না, সে যদি আমার জিনিস হয়, সত্যবস্ত্ত হয়, নিজেই সে উঠোগী হয়ে আসবে আমার কাছে।’ অর্ধেত হাসতে লাগল। ‘আমার সঙ্গে তার তো সেই রকমই কথা হয়ে আছে।’

ঠিক একদিন গৃহদ্বারে গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে নিমাই এসে হাজির।

এসে দেখল অর্ধেত জলসিঞ্চনে তুলসীর সেবা করছে।

‘আমি এসেছি।’

‘এসেছ?’ মহামন্ত সিংহের মত ছুঁকার দিয়ে উঠল অর্ধেত। বাছ আফালন করে হরি-হরি বলে নৃত্য করতে লাগল। পূজার্চন ভুলে গেল। তোমার যখন দর্শন পেয়েছি তখন আর আমার কিসের পূজা?

প্রহ্লাদ বলছে নৃসিংহকে, তোমার সাক্ষাৎকারের ফলে আমি আনন্দ-সমুদ্রে ডুবেছি, আমার ব্রহ্মানুভূতির গোপ্পদ দিয়ে কী হবে? সাক্ষাৎকরণানন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ, অল্প, যৎসামান্য। অমুভবের চেয়ে দর্শন বেশি সুখের। ব্রহ্মানন্দ সামান্য নয় কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমানন্দ অধিকতর। ‘কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিদ্ধ-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম।’ ব্রহ্মানন্দ ছোট গর্ত, কৃষ্ণনামানন্দ অমুনিধি।

অর্ধেতকে দেখে, তার ভাবভক্তির বশ্চা দেখে, নিমাই মাটিতে মুছিত হয়ে পড়ল।

‘এই যে, এই আমার প্রাণনাথ।’ অর্ধেত নিনিমেঘে দেখতে লাগল নিমাইকে। ‘কিন্তু ও কী? তুমি না কালো, তবে তোমার গৌরবরণ কেন? আর তুমি যে এখন আসবে, এ তো শাস্ত্রে বলেনি। তবে, তুমি তো শাস্ত্রের হয়েও শাস্ত্রের অতীত। তুমি যে যুগের হয়েও শাস্ত্রের।’

সন্দেহ কী, এই অর্ধেতের সাধন ধন।

অর্ধেত দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে পাণ্ড-অর্ঘ্য নিয়ে এল, গঙ্গাজল আর তুলসী-চন্দন। গঙ্গাজলে পা ধুইয়ে দিল নিমাইয়ের! তুলসীতে চন্দন মেখে নিমাইয়ের পায়ের উপর রাখতে লাগল। আর সনমস্কার বলতে লাগল:

‘নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥’

যিনি বেদজ্ঞদের পূজনীয়, যিনি গো ও ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি সর্বজগতের হিতকারী, যিনি গোপালক, সেই কৃষ্ণকে বারংবার নমস্কার।

গদাধর কাছেই ছিল, কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল। প্রায় সত্তর বছর বয়স অর্ধেতের, সে কিনা নবীন এক যুবকের পা পূজা করছে। ছি-ছি, লজ্জায় জিভ কাটল গদাধর। চোঁচিয়ে উঠল, ‘গোঁসাই, এ আপনি কী করছেন?’

কী করছি তো দেখতেই পাচ্ছ। গোঁসাই কথাটা কানেও নিল না।

‘নিমাই সামান্য বালক, আপনার কত ছোট, ওর পা-পূজা করে ওকে অপরাধী করছেন কেন?’ গদাধর আবার প্রতিবাদ করল। ‘কেন ওর অকল্যাণ করছেন?’

‘যিনি সর্বজীবের কল্যাণ করতে এসেছেন, তাঁর অকল্যাণ করে, এমন সাধ্য কোন্ মানুষের? আর বালক বলছ কাকে? কদিন পরেই জানতে পারবে এ বালক না আর কেউ! আর বালক হলেই বা কোথাকার বালক!’

গদাধর থমকে দাঁড়াল। এ বলে কী গোঁসাই? তবে নিমাইকে সত্যিই অবতীর্ণ ভগবান?

ভয় করতে লাগল গদাধরের। নিমাই শুধু পণ্ডিত ছিল, মানুষ ছিল, গদাধরের একলার ছিল। কিন্তু যদি সে এখন ভগবান বলে স্বীকৃত হয়, তা হলে সে তো সকলের হয়ে যাবে, আর পুছবেও না গদাধরকে। কী জানি কী অপরাধ সে করেছে এতদিন না জেনে, নিমাইকে সামান্য গোঁখে দেখে, তাকে শুধু সখা ভেবে। এক পা ছুঁ পা করে এখন ভয়ে-ভয়ে সরতে লাগল গদাধর।

নিমাইয়ের বাহুজ্ঞান ফিরে এল। চোখ চেয়ে দেখল অর্ধেত তাকে পূজা করছে। উলটে ছুঁতে তার পায়ের ধূলো নিল নিমাই। করুণবচনে বললে, ‘গোঁসাই, তুমি আমাকে কৃপা কর। আমি ভবসাগরে

পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, উদ্ধার করো আমাকে। আমার এই দেহ তোমাকে অর্পণ করলাম, তুমি আমার মাথার তোমার পা ছুখানি একটু রাখো। আমাকে পবিত্র করো। তুমি কৃপা করলেই তবে মুখে কৃষ্ণ নামের ফুরণ হবে। *তুমি কৃপা করলেই তবে নষ্ট হবে ভববন্ধ। তুমিই তো সমস্ত কিছুর প্রেরণা। সমস্ত কিছুর মূল। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।’

কী রকম খটকা লাগল অধৈতের। নিমাই যদি ভগবানই হবে তবে আমাকে, ক্ষুদ্র মানুষকে, প্রণাম করছে কেন? কেন তবে আমার কাছে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকছে? কেন প্রকট হচ্ছে না?

তার পরে এত দৈন্ত কেন নিমাইয়ের? কেন এত নিবেদ ও বিষাদ, কেন এত উদ্বেগাতি? যে ভগবান, সে কেন নিজেকে হীন বা নিকৃষ্ট মনে করবে? তার কেন এত শোক হবে? এত চিন্তা, এত অশ্রু, এত বৈকল্য? কেন সে নিজেকে আতির প্রহারে অবমাননা করবে? তবে কি নিমাই ভগবান নয়?

মনের সন্দেহ মনে চেপে রেখে অধৈত বললে, ‘আমি আর কী আশীর্বাদ করব? তুমি নিত্য কৃষ্ণ-কথা-কোঁতুকে থাকো। যা বলেছ, সকল বৈষ্ণবকে নিয়ে কীর্তন করো। কীর্তন-আটোপে সমস্ত পৃথিবী টলমল করে উঠুক।’

‘তাই, তাই করব।’ নিমাই ফিরে গেল নিজ গৃহে।

কলিকালে যুগধর্ম—নামের প্রচার।

তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥

দ্বাপরে ভগবান শ্যাম, কলিতে ভগবান গৌর। এঁরা দুই পৃথক অবতার নন, একই অবতারের দুটি ভাব বা দুটি আবির্ভাব। গৌরসুন্দর শ্যামসুন্দরেরই আরেক অভিব্যক্তি। বৃন্দাবনলীলা ও নবদ্বীপলীলা পৃথক লীলা নয়, একই লীলা-সমুদ্রের দুটি তরঙ্গ। পূর্বতরঙ্গ বৃন্দাবন, উত্তর তরঙ্গ নবদ্বীপ।

জীবকে ব্রজপ্রেম দেওয়াই নবদ্বীপ লীলার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ব্রজপ্রেম কী করে দেওয়া যায় রাধিকা ছাড়া? রাধিকাই তো ব্রজপ্রেমের মালিক। আর রাধিকা গৌরঙ্গী। তাই রাধিকার ভাব ও কান্তি ছাড়া ব্রজপ্রেম অসাধ্য। সেই ভাব আর কান্তিকে অঙ্গীকৃত করে নিয়েছে বলেই শ্রীকৃষ্ণ পীত বা গৌর হয়েছেন নবদ্বীপে।

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।

কলিবুগে ধর্ম—নামসকীর্তন সার ॥

অধৈত ফিরে গেল শান্তিপুর। ওখানে বসে পরীক্ষা করব নিমাইকে। নিমাই যদি সত্যি ভগবান হয়, যদি সত্যি তার প্রকাশ হয়ে থাকে, সে আমাকে দূরে কেলে রাখবে না, তার নিজের কাছে টেনে নেবে। ‘সত্যি যদি প্রভু হয়, মুঞি হও দাস। তবে যোরে বাঙ্কিয়া আনিব নিজ পাশ ॥’ আমাকে করবে না উপেক্ষা।

কেউ কেউ ভাবলে এ নিমাইয়ের বায়ুরোগ ছাড়া কিছু নয়। নইলে কেন এত কম্প, এত কাঁদা, ক্ষণে ক্ষণে কেনই বা সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি, কেনই বা নবনীতময়। শচী পাগলের মত হয়ে গিয়েছেন। এ কী হল নিমাইয়ের? শ্রীবাস এসে আশঙ্কিত করল শচীকে। এ বায়ুরোগ নয়, এ কৃষ্ণভক্তি। শরীরে কৃষ্ণ বিহার, কৃষ্ণফুরণ।

শরীর তবু সাধনা কই? যদি কৃষ্ণপ্রেমের চেঁড়য়ে নিমাই বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে?

না, শোক করি কেন? আমিও চোখ ভরে দেখি এই কৃষ্ণ-মাধুর্য।

যে মাধুরী, উর্ধ্ব আন নাহি বার সমান
পর ব্যোমে স্বরূপের গণে।

ধেঁহো সব অবতারী পরব্যোমে অধিকারী
এ মাধুর্য নাহি নারায়ণে ॥

অন্য স্বরূপের কথা দূরে থাক, যিনি সমস্ত অবতারের মূল, যিনি পরব্যোমধামের অধিপতি, সেই নারায়ণেও শ্রীকৃষ্ণের সমান মাধুর্য নেই। থাকলে লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য উপেক্ষা করে সমস্ত কামভোগ বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণ-মাধুর্য আশ্বাদনের আশায় তপস্যা করতে বসতনা।

দেখ, দেখ নিমাইকে।

কনক মানস যেন পুলকিত অঙ্গ

ক্ষণে-ক্ষণে অট-অট হাসে বহুরঙ্গ।

ক্ষণে হয় আনন্দ মুচ্ছিত প্রহরেক

বাহু হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ ব্যতিরেক ॥

বহিরঙ্গ লোক দেখলে নিমাই এড়িয়ে যায় আর ভক্ত দেখলেই নমস্কার করে, কারঙ্গ পায়ের কাছে বা লুটিয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে।

‘সবাই হায়-হায় করে ওঠে। কী কর কী কর বলে পিছিয়ে যায়। নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে কেলে, তার আন্তরিকতার বাধা দিতেও কুষ্ঠা আসে।’

কার কুন্দের সাজি করে দেয় নিমাই, কার বা
স্নানের কাপড়। স্নানের শেষে কার বা ভিজে কাপড়
নিরুড় দেয়।

কিন্তু এসবের কি অর্থ? নিজেকে তৃণাদপি কি
তুচ্ছ মনে করা?

‘জনেছি ভক্তের সেবা করলে কৃষ্ণকৃপা হয়, তাই
আমি সেবা করছি আপনাদের।’ বললে নিমাই,
‘আমাকে কৃষ্ণকৃপা থেকে বঞ্চিত করবেন কেন?’

কৃষ্ণের করয়ে সেবা ভক্তের স্বভাব।

ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব।

নিমাইয়ের বিনয়ে সকলে মুগ্ধ। অকৈতবে সকলে
তাকে আশীর্বাদ করতে লাগল: কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা
করুন। তোমার থেকে আমাদের সকলের ছুঃখ যাক।
যারা অঙ্গ, রক্ত, কঠিন, যারা নিন্দুক, বিমুখ, বিরুদ্ধ,
তারাও সকলে কৃষ্ণরসে মগ্ন হোক। তুমি যেমন
শাস্ত্রে সর্বসংসার জয় করেছ, তেমনি ভক্তিতে পাবণদের
সংহার কর। যারা অধ্যাপক আছে নবদ্বীপে তাদের
মুখেও কৃষ্ণনাম নেই। ‘এই নবদ্বীপে বাপ, যত
অধ্যাপক। কৃষ্ণভক্তি বাথানিতে সন্তে হয় বক।’
আর যারা বিষয়ী পাপাশ্রয়ী তারা তো আমাদের
পীড়ন আর অপমান করতেই ব্যস্ত।’

ভক্তের ছুঃখের কথা শুনে, পাপিষ্ঠদের অত্যাচারের
কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে নিমাই। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—
আমি সেই—আমিই সেই। দুর্জনদের বিনাশ করতে
আমি এসেছি। দূরে সরো অভক্তের দল।
অনুভবের দল।

আপন ভক্তের ছুঃখ শুনিঞা ঠাকুর।

পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাঢ়িল প্রচুর ॥

সংহারিব সব বলি করয়ে হুঙ্কার।

মুঞি সেই মুঞি সেই বোলে বারবার ॥

আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।

ক্ষণে বোলে ছিণ্ডে। ছিণ্ডে। পাষণ্ডীর মাথা ॥

দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে।

গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না ফুরে ॥

এ আবার আরেক প্রকাশ। আরেক কৃষ্ণফুটি।
কৃষ্ণোদ্দীপন।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার বিপুল বিরহভারে ভেঙে
পড়ে নিমাই। অশ্রুর স্রোতস্বিনীতে ঝাঁপ দেয়।

কোথায়, আমার নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? আমার
শিখিপুচ্ছভূষণ কোথায়? আমার মঙ্গুরসীরব

কোথায়? কোথায় সুরেন্দ্রনীলছাতি? কোথায়
রসরাসজাগুণী? কোথায় আমার প্রাণরক্ষার মহৌষধ?
আমার স্নহস্তম অমূল্যরত্ন কোথায়? সেই বিধিকে
ধিক যে আমাকে আমার এমন প্রিয়তমের থেকে
বিচ্যুত করল।

কাঁহা সে চুড়ার ঠান, শিখিপুচ্ছের উজান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।

পীতাম্বর ভড়িদ্যুতি মুক্তামালা বক পাঁতি
নবাসুদ জিনি শ্যামতনু ॥

সবত্রিই ঐ এক ধনি, কোথায়, কোথায়? কানাই
কানাই, কাঁহা নাই, কাঁহা নাই।

শ্রীধাস নিমাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল
কীর্তন করতে। তারা চার ভাই, সকলেই কীর্তনে
কীর্তিমান। সকলে আনন্দ করে উঠল। তারপরে
আসবে মুকুন্দ-মুরারি, সদাশিব আর গদাধর। আসবে
আরো অনেক কৃষ্ণপ্রণত—কৃষ্ণপ্রণীত। জয়-জয়কার
হবে।

কিন্তু কীর্তন কোথায়? কাঁদতে বসল নিমাই।
সে ক্রন্দন বৃষ্টি কীর্তনের চেয়েও মধুর।

‘জানো গয়া থেকে ফেরবার সময় কানাই-নাটশালা
নামে এক গ্রামে এসে উঠেছিলাম। সকালে দেখলাম
সেখানে একটি শিশু এসে উপস্থিত। আহা, কী
সুন্দর সে শিশু। তমাল-শ্যামল। কুন্তলে নবগুণ্ডা,
তার উপরে বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ। ছোট-ছোট মণি তাতে
ঝলমল করছে। মুক্ত কমলদলের মত চোখ, কানে
মকরকুণ্ডল। পরনের পীত ধটিটি কী মনোহর।
আর হাতে মোহন বাঁশি, পায়ে মধুর নূপুর। সে অতি
চঞ্চল শিশু হাসতে হাসতে আমার কাছে এল, এল
নাচতে-নাচতে, আর আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে
পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়েই মিলিয়ে গেল। কোথায়
গেল সেই শিশু, সেই আমার মধুর মধুর স্নেহাকার, সেই
আমার মানসনয়নোৎসব।’

কিমিহ বৃণ্মঃ কস্য ক্রমঃ কৃত্ব বৃতম আশয়া।
হা হা সখি কি করি উপায়। কাঁহা করোঁ কাঁহা বাঙ
কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাণ্ড, কৃষ্ণ বিহু প্রাণ মোর যায়।

নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মূর্ছাভঙ্গে হাসতে লাগল নিমাই। গৌরকলেবর
স্থির হল। আনন্দের সরোবরে ভাসতে লাগল
সন্তোষের শ্বেতপদ্ম।

এ আমরা কোথায় আছি? মতে না কৈকুঠে?

এ আমাদের কী অবস্থা? জাগ্রত না নিদ্রায়?
এ কি আমরা বিবাদ দেখছি না প্রসাদ দেখছি?
এ কি আমাদের সেই নিমাই, না কি এ শুকদেব না
প্রহ্লাদ? না কি এ যুগলায়িত রাধাকৃষ্ণ?

বলতে লাগল সবাই, 'আমাদের আজ বড় পুণ্য,
তোমার সঙ্গ পেয়েছি। আর আমাদের কী চাই।
তুমি সঙ্গে যার, তার বৈকুণ্ঠে কি করে। তিলকে
তোমার সঙ্গে ভক্তি ফল ধরে। পান্ডুদের বাক্যে
ব্যবহারে শরীর দৃষ্টি হয়ে আছে, তোমার প্রেমজলে
এবার শীতল হব।'

'কোথায় কৃষ্ণ?' বাড়ি করে এসে সঙ্গী
গদাধরকে আবার জিগ্গেস করল নিমাই। শিশুর
মত চাউনি, শিশুর মত প্রশ্ন।

'কোথায় আবার যাবেন?' বললে গদাধর,
'তোমার হৃদয়েই গুরে আছেন।'

'হৃদয়ে? সত্যি?' ছুই হাতের নখ দিয়ে বুক
চিন্নিতে লাগল নিমাই। রক্ত বরতে লাগল।

যাকে আমি ত্যাগ করব ভাবছি, সে আর জায়গা

না পেয়ে আমার হৃদয়ে এসে লুকিয়েছে? 'যারে
চাই ছাড়িতে, সেই গুণী আছে চিতে, কোন রীতে
না পারি ছাড়িতে।' যাকে ভোলবার জন্তে এত চেষ্টা
তার কিনা হৃদয়শয়ন?

ক্রমব্যস্ত হরে নিমাইয়ের ছুই হাত ধরে ফেলল
গদাধর। শিশুর মতই প্রবোধ দিল। 'ব্যস্ত হচ্ছ
কেন? শিশুগিরই আসবেন কৃষ্ণ।'

'আসবেন?'

'হ্যাঁ, হৃদয় থেকে উঠে আসবেন বাইরে।' বললে
গদাধর, 'তুমি দেখবে, সকলে দেখবে।'

আশস্ত হল নিমাই। নিরস্ত হল।

শচী কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললে, 'বাবা গদাধর, এমন শিশুর
বুদ্ধি আর কোথাও দেখিনি। আমি তো ভয়ে গুরু
সামনেও যেতে পারি না, বউয়েরও সেই দশা, তুমি
ছিলে বলেই ও আজ রক্ষা পেল। বল তুমি ওর সঙ্গ
ছেড়ে যাবেনা কোথাও, ওকে চোখে-চোখে রাখবে।'

'কৃষ্ণই ওকে চোখে-চোখে রাখবেন।'

[ক্রমশঃ।

সময়হারা

শ্রীবিভূতিভূষণ বাগ্‌চী

অনেক রাতের পর এল যে সকাল
মধুরা শীতের বোধ—
বল-মল মাঠ-বন দূর সবুজ র
নেমেছে অনেক বড় মনের উঠানে;
যুরে কিয়ে কোণে,
উর্নাত মন তবু খালি জাল বোনে!
অনেক সূর্যাস্ত শেষ সাগরের পারে—
আবার অরুণোদয় পূবের পাহাড়ে।
বহুলাস্ত দিন সন্ধ্যা ললিত আভার
আসে আর বার;
চিন্তলেখা ভেমনি মিলায়।
অনেকদিনের পর এল সেই বেলা
স্মৃতির পথের প্রান্তে দলিতে একেলা।
হরিৎ ঘাসের পরে রোদ ঝিঝি ঝিঝি করে,
পীতাত অচেল ফুল
রোদে ডুবে স্নান করে।
নীল পীতধারা মিঠে শীত বোধ রে,
সকালের আলো মনের 'বোরবোধ'।
নীল প্রবাহিণী প্রাণের গোপন পুষে,
নীল ডেউ বয় সারাটি হৃদয় জুড়ে।
সময় হারাই নীল ভীর্ণের ভীর্ণে।

নীলপাখি! কত ছপুয় বিকেল সারা
অগ্নিত ফুল ফুটলো টুটলো,
নিবলো কত বে তারা!
আকাশ বিহার এখনো তোমার অবিচ্ছিন্ন ধারা।
নীড়ের মায়ায় তোমার ও মন
কখনো হয়না হারা?
গেছে সে অনেক কাল—
রিক্ত সন্ধ্যা, উষার কনক জাল।
অনেক বাধা যে হলো লালফুল
আলো ছারা বোধুরে।
নীলপাখি মেলে দূরে
উদাসীন তুমি ভেসে ভেসে চল রাস্তা দিগম্বরে।
রোদ-সায়রে 'ল্যাঙ্ক-নীল' চোখ,
রোদ-সায়রে ওঠ তোমার কাঁপে;
রোদ-সায়রে স্নেহ অনাবিল ভাসে,
স্মৃতি রাখবু ঘোরে করে চারপাশে।
নীল পাখি!
হোলো কত না সকাল সারা;
কত রাতা-উষা মনের বাসানে কত ফুল মাতোয়ারা।
আমায় ভেবে কি তোমার ও মন
কখন হয়না হারা?

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

কালাপাহাড়কেও আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু হরিপদ বাবু ভালোরূপেই চিনতো। কলিকাতার হানীর কুস্তী ক্লাব-গুলিতে একজন পলোয়ান বলে তার নাম-ডাক ছিল। তবে আমাদের এই কালাপাহাড় কলিকাতার সেই কালাপাহাড় কি না, তাতে আমার সন্দেহ ছিল। দেওঘরে আমাদের অগণিত নতুন বন্ধুদের নিকট বিদায় নিয়ে মধুপুরে যাবার জন্তু ষ্টেশনের দিকে বাছি। এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন মধুপুর থানার অফিসার-ইনচার্জ এস, রায়। তিনি পরে বিহার গভর্নমেন্টের এ, আই, জির পদে উন্নীত হতে পেরেছিলেন। তিনি আমাদের তাঁর গৃহে অতিথি হবার জন্তে নিমন্ত্রণ করলেন। এ ছাড়া তিনি সর্বতোভাবে আমাদের এই কালাপাহাড়কে গ্রেপ্তার করতে আমাদের সাহায্য করবার জন্তে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্রী এস, রায় দেওঘর কোর্টে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন। এই জন্তু তাঁর আত্মহাতিশয্যে সক্ষ্য পর্যাঙ্ক অপেক্ষা করে আমরা তাঁর সঙ্গে রাত আটটার গাড়ীতে মধুপুর রওনা হয়ে গেলাম। আমরা গালগল্প করতে করতে মধুপুর থানার নিকট বড় রাস্তার উপর এসেছি; এমন সময় হরিপদ এক ব্যক্তির দিকে আঙুল নির্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলেন: অ-ওই তো কালাপাহাড়। আমরা সচকিত হয়ে চেয়ে দেখলাম: মসীবর্ণ, ছুলকায় ও দীর্ঘদেহী, কাপড় ও ফতুয়া পরা এক ব্যক্তি, আমাদের দেখা মাত্র সে পথের পাশ হতে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আমাদের দিকে নিক্ষেপ করতে বাচ্ছিল। কিন্তু এই সময় আমরা আরও জোরে চীৎকার করা মাত্র সে বিরাট বৃক্ষের সারির পিছনে ঝরিত গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এই সময় সেখানে দাণ্ডাবাবু নামে এক শক্তিমান হানীর বাজালী প্রৌচ ভ্রমলোক এসে উপস্থিত হলেন। এই মহা সাহসী ভ্রমলোকের সহিত রায় বাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। আমরা চার জনে মিলে কালাপাহাড়ের জন্তু এদিক ওদিক বহু খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কোথাও আর একটুখানির জন্তু তাকে আমরা দেখতে পেলাম না। প্রায় চার পাঁচ দিন তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্তু আমরা মধুপুরে ছিলাম। কিন্তু কোথাও তাকে আমরা আর দেখতে পাইনি। এর পর আর এখানে কালবিলম্ব না করে আমরা কলিকাতায় রওনা হয়ে গেলাম। কলিকাতায় পৌঁছে প্রায় সন্ধ্যার দিকে আমরা থানায় পৌঁছে দেখলাম যে, সেখানে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, দেওঘর ত্যাগ করার পূর্বে আমরা ইনস্পেক্টার সুনীল রায়কে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলাম—“খোকা এবেসটেড নো ক্যান্সেলেরটা”। এ ছাড়া মধুপুর থেকেও আমরা কলিকাতায় রওনা হলাম বলে একটা তার পাঠিয়েছিলাম। থানার চুক বিন্দিত হয়ে দেখলাম যে, সেখানে আমাদের অভিনন্দন জানাবার

জন্তু বহু নাগরিক অপেক্ষা করছেন। এঁদের মধ্যে কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়, নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, কক্সবোগী রায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গুলীও ছিলেন। এঁরা আমাদের বিশেষ স্নেহ করতেন এবং থানার সন্নিকটে বসবাস করতেন। এ ছাড়া শ্রীসজনীকান্ত দাস ও ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য এবং ভবতোষ ষটক টেলিকোনে আমাদের এ সবক্ষে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রাত্রে দিকে অস্তান্ত নাগরিকদের সহিত বহু রূপভাবিনীও বিভিন্ন স্থান হতে থানায় এসে খোকাকে গ্রেপ্তার করার জন্তে আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে গিয়েছিল। তাদের সকলেরই মুখে সেই একই কথা—এক নম্বরের পাবলিক এনিমি তাহলে এতো দিনে ধরা পড়লো। এদের কেউ কেউ আমাদের সাক্ষ্য-ভোঞ্জে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িতও করেছিল। কিন্তু এতো অভিনন্দন ও নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও সব ভুলে আবার আমাদের ধূনের তদন্তে আত্মনিয়োগ করতে হলো। এই সময় ডাইরী পাতাগুলি খেঁটে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, এখনোও তদন্তের ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটি কাজ বাকি। আমাদের অবর্তমানে ইনস্পেক্টার সুনীল বাবু কয়েকজন দরিদ্র বিধবা ও অল্পরূপ কয়েকটা ছুঃস্থ ভদ্র পরিবারকে খুঁজে বার করেছিলেন। খোকাবাবু এই সব দরিদ্র পরিবারগুলিকে মধ্যে মধ্যে নিঃস্বার্থ ভাবে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এঁদের কাউর কাউর কন্যার বিবাহে খোকাবাবু নগদ টাকা ও বহু অলঙ্কার ষৌতুক দিয়েছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই ঐ সকল গহনা চোরাই গহনা বলে সন্দেহ করে আটক করেছেন। এ ছাড়া খোকাবাবুর কৃপানাথ লেনের বাড়ীতে ও তার দেওঘরের ডেরা সন্ধান করে বহু অলঙ্কার পাওয়া গিয়েছে। এক্ষণে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সিঁদেল চুরির নথী-পত্র হতে ঐ সকল চুরির করিয়াদীদের খুঁজে বাহির করা এবং ঐ সকল চোরাই গহনার মালিকদের দ্বারা সেইগুলি সনাক্ত করানো। এই জন্তু আমাদের থানার জুনিয়ার অফিসারদের ফ্রমের কয়েকটি টেবিল একত্রিত করে তার উপর এই সকল গহনাগুলি পর পর সাজিয়ে রেখে আমরা একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলাম। সকাল-সন্ধ্যায় বহু মামলার করিয়াদীরা একে একে এইগুলি ভালো করে দেখে তাদের আপন আপন দ্রব্য বলে সনাক্ত করে গেলেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেয়ামতির দাগ সহ ওজন প্যাটার্ণ হতে তাঁরা এইরূপ সনাক্তি করণের কার্য্য সমাধা করতে পেরেছিলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রাকরারা এসে উহাদের কয়েকটি গহনা নিজেদের তৈরী বলে দাবী করে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, এক এক জনের কাজের এক এক রকম বৈশিষ্ট্য থাকে। সাধারণ মানুষের চক্ষে এই সকল সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরা না পড়লেও কারিগরদের হাতে তা অতি সহজেই ধরা পড়ে। এ ছাড়া এমন অনেক খিঁচখাঁচ এখানে ওখানে থাকে

বা থেকে ব্যবহারকারীরা সহজেই নিজের নিজের দ্রব্য সহজেই চিনে নিতে পারে। এ ছাড়া কয়েকটি গোল্ড ক্যাপড কাউন্টেন পেনের জন্ত আমরা দ্রব্য সনাক্তি করণেরও ব্যবস্থা করেছিলাম। চোরাই দুইটি ফাউন্টেন পেনের সহিত হবাহ অম্লরূপ সাত আটটি কলম বার হতে এনে সেগুলির সহিত একত্রে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে আমরা চোরাই কাউন্টেন পেনের মালিকদের তাদের আপন আপন কলম অতোগুলো অম্লরূপ কলমের মধ্য হতে বেছে নিতে বলি। আশ্চর্যের বিষয়, তারা তাদের নিজের বকম দুইটি অতোগুলো কলমের মধ্যে হতে অতি সহজেই বেছে নিতে পেরেছিল। এই ভাবে সনাক্ত করণের দ্বারা সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে আমরা কিরানকইটি সিঁদেল চুরির মামলাও খোঁকাবাবুর বিরুদ্ধে রুজু করে কোর্টে বিচারের জন্ত অভিযোগ পত্র বা চালান পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই কয়টি মামলা ছাড়া পাগলা হত্যা মামলা এবং শিউচরণ হত্যা মামলা সম্পর্কেও আমাদের তাকে কলিকাতার আনার প্রয়োজন হয়েছিল। এই জন্ত নিয়ম আদালত ও উচ্চ আদালতের মারফত বিহার হাইকোর্টের মাধ্যমে খোকাকে কলিকাতার আনার ব্যবস্থা করে আমি কলিকাতা প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আসামী কেষ্ঠার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত অমুমতি চাইলাম। চীফ-প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের অমুমতি ক্রমে জেলে আসামীর সঙ্গে দেখা করে বুঝলাম যে, সে এখোন ভিন্ন প্রকারের মামলা হয়ে গিয়েছে। জেল-হাজতে বসেই সে খোকার গ্রেপ্তারের বার্তা পেয়ে গিয়েছিল। আমার নিকট এই সময় সে পূর্বাপর সকল তথ্য প্রকাশ করে কুমারটুঙ্গী অঞ্চলের যে সড়ক গলিটার দেওয়ালের খাঁজে খোকার পরিত্যক্ত রক্তমাখা জুতা ও কুমাল খোকা গুজে রেখেছিল, সেই স্থানটি সে আমাকে এইবার দেখিয়ে দিতে রাজী হলো। আমি পরদিন তাকে কলিকাতা শহরের প্রধান হাকিমের অমুমতি ক্রমে পুলিশ-হেপাতিতে নিয়ে সেইখানে এলে সে খুশী মনেই সেইখানকার ভাড়া দেওয়ালের ভিতরকার একটি গহ্বর হতে খোকার রক্তমাখা জুতা দুইটি দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সম্মুখে বার করে দিয়েছিল। পাগলার দেহ হতে কাটা মুণ্ডটা গঙ্গার জলে ফেলে ফিরে আসবার সময় তার পায়ের এই জুতো দুটো রক্তে ভিজ়ে যায়। এইজন্য খোকা গুড়োটো ঐ দেওয়ালের গহ্বের মধ্যে গুজে রেখে শুধুপায়ে তার কুপানাথ লেনের বাড়ীতে ফিরে এসেছিল। বাইহোক, কেষ্ঠার এই শেষ বিবৃতি অমুমায়ী আমরা এই জুতা দুটি সরকারী রক্তপরীক্ষকের নিকট পরীক্ষার জন্ত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই সম্পর্কে রক্ত পরীক্ষকের মন্তব্যের সাক্ষিপত্র নিয়ে উক্ত করে দিলাম।

“জুতা দুইটির উপর রক্ত পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বহুদিনের ব্যবস্থানে উহাদের কণিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার, উহা মনুষ্য রক্ত কিনা তা সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়।”

এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, উপরোক্ত মন্তব্যে রক্ত-পরীক্ষক উহা যে মনুষ্য রক্ত নয়, তা'ও বলেননি। এই জন্ত পারিবেশিক প্রমাণের ক্ষেত্রে উহার মূল্য ছিল অসামান্য। তবে এই জুতা দুইটি যে খোকার তা সর্বাগ্রে আমাদের প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু মুঞ্চিল হলো এই যে, আমরা দেওঘরে খোকার পা' হতে তার জুতা জোড়াটি প্রহণ করতে সুলে গিয়েছিলাম। জা না হলে

উভয় জুতা তুলনা করে প্রমাণ করা যেতো যে, উভয় জুতা জোড়াটিই খোকার। রক্তমাখা জুতাটি কেটে ওদের তখতলার উপর হতে খোকার পায়ের ছাপ হয়তো সংগ্রহ করা যেতো। কিন্তু সুনীলবাবু এইভাবে জুতাটি নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে আদালত-কক্ষে জুরীদের সামনে খোকার পায়ের তার ঐ জুতা পরিবে তা পায়ের কিটু করিয়ে দিয়ে প্রমাণ করা বাবে ঐ দুটো খোকায়ই জুতো। এদিকে কেষ্ঠা আসামী বিধায় তাকে এ বিষয় সাক্ষীরূপে ডাকা বাবে না। নানাস্থিতিক বিবেচনা করে আমরা জুতো জোড়াটি খোকার দ্বিত্বতা মলিনা সুলকারীকে একবার দেখানো উচিত মনে করলাম। তাহাকে এই জুতা জোড়াটি দেখানোর পর সে এই সবকিছু একটি নূতন বিবৃতি দিয়েছিল। এই বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য বিধায় নিয়ে উক্ত করা হলো।

“কিছুকাল আগে নানা অপরাধ ও ধুনখারাপি করার জন্ত খোকার মনে একটু অমৃত্যপ এসেছিল। সে প্রায়ই অভিযোগ করে বলতো যে, তার আর কিছুই ভালো লাগছে না। এর পর একদিন সে আমাকে নিয়ে পুরীর জগন্নাথধামে কয়েকদিন কাটিয়ে আসবার জন্ত প্রস্তাব করেছিল। আমি এতে মত দিলে সে আমাকে নিয়ে পুরী শহরের সমুদ্রধারে বাসভাড়া করে কয়েকদিন বসবাস করে। এই সময় ঐ শহরের একটি জুতার দোকানে পায়ের মাপ দিয়ে সে ঐ জুতা জোড়াটি তৈরি করিয়ে নিয়েছিল। বহুদিন সে এই জুতা জোড়া পরে আমার বাড়ীতে এসেছে। এইজন্য এই জুতা জোড়াটি খোকার বলে আমি নিঃসন্দেহরূপে সনাক্ত করতে পারছি।”

মলিনার এই বিবৃতি অমুমায়ী সেইদিনই মলিনা প্রবৃত্ত ঠিকানা ও ঐ জুতাসহ আমরা একজন অফিসারকে পুরী শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের সেই অফিসারটি পুরীতে সেই দোকানদারকে খুঁজে বার করে তাকে ঐ জুতা জোড়াটি দেখানো মাত্র সে উহা তার নিজের তৈরী বলে সনাক্ত করেছিল। এছাড়া তার দোকানের অর্ডার-বই হতে তারিখ সহ প্রমাণ করতে পেরেছিল যে, খোকা ঐ দিনে তার পায়ের মাপ দিয়ে ঐ জুতা তৈরী করার জন্ত তাকে অর্ডার দিয়েছিল। এরপর যে বাড়ীটা খোকা সেখানে ভাড়া নিয়েছিল, তার বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে আমাদের অফিসার বুঝতে পেরেছিল যে, খোকা সত্য সত্যই ঐ সময় কয়দিন পুরীতে কাটিয়ে গিয়েছে।

এরপর আরও কয়েকদিন সাক্ষ্যপ্রমাণের জন্ত এখানে ওখানে ঘুরাঘুরি করার পর আমরা এই হত্যা মামলার ডাইরীর পাঠা খুলে আসামী কেষ্ঠা বাবুর পূর্বতন বিবৃতিটি পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে দেখলাম। এই বিবৃতিতে কেষ্ঠা বলেছিল যে, পাগলাকে ট্যান্ডিতে করে ধরে নিয়ে বাবার সময় সে গরাণহাটার মন্দিরের সামনে টেঁচিয়ে উঠে। এই সময় সত্য গোয়ালো ও হাক গোঁসাই নামক দুই ব্যক্তি তাদের দিকে ছুটে এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এ ছাড়া সে আরও বলেছিল যে, তারা বখন পাগলাকে নিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে এগিয়ে আসছিল, তখন গোঁরীরা নামে এক পুরাণো চোর চোরাই বালের আশায় তাদের সঙ্গ নিয়ে পরে খুলের ব্যাপার বুঝে সরে পড়ে। গোঁরীর এই অপরাধের জন্ত খোকা

কয়েকদিন বাজ শেওড়াগুলিতে গৌরীয়ার রক্তিতার বাড়ীতে এসে তাকে মারধর করে এসেছিল। এ ছাড়া কেউ এই কথাও বলেছিল যে, খোকা কাটা মুণ্ডটা জলে ফেলে উপরে উঠবার সময় তার সঙ্গে পিতার বন্ধু সন্ন্যাসী ঠাকুরের দেখা হয়েছিল। এই সময় তিনি একটি কুকুর সঙ্গে করে গজার বাটের সোপানে বলে হাওয়া খাচ্ছিলেন। খোকাকে কি একটা জল ফেলে দিতে দেখে তিনি সেই সময়ে খোকাকে কয়েকটি প্রহার করেছিলেন। খোকা তাঁর প্রহারের উত্তরে বলেছিল যে, সে সেখানে একটা মরা বেড়াল ফেলে দিয়েছে। এরপর কেউ বাবু আরও বলেছিল যে, জামা কাপড় ছাড়বার পর কুশানাথ লেনের বাড়ী থেকে বার হয়ে আসবার সময় তাদের বন্ধু দেবেন বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। এই সময় দেবেন বাবু খোকাদের বাটীর রোয়াকে বসে হাওয়া খাচ্ছিল।

আমরা এর পর এই কেউর বিবৃতি অস্বাভাবিক প্রতিটি সাক্ষীকে খুঁজে বার করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছিলাম যে, কেউ এই খুন সম্বন্ধে একটি বখাৰ্শ সত্য বিবৃতি আমাদের কাছে দিয়েছে। এর পর আমরা শেওড়াগুলিতে গিয়ে গৌরীয়ার স্ত্রীলোকের বাড়ীতে গৌরীয়ার খুঁজে বার করেছিলাম। সেখানকার মেয়েরা খোকাকে ভালো রূপেই চিনতো। তার সাক্ষ্য দিল যে, সত্য সত্যই খোকা সেখানে গিয়ে গৌরীয়ার মারধর করে গিয়েছে। এ ছাড়া গৌরীয়া নিজেও কেউর বিবৃতি অস্বাভাবিক একটি বিবৃতি দিয়েছিল। এই সম্বন্ধে গৌরীয়ারে আমি কয়েকটি প্রশ্নও করেছিলাম। সেই প্রশ্নোত্তরগুলি নিচে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—তুমি খোকা ও তার স্ত্রীলোকের সঙ্গে অতদূর গিয়েও পরে

সঙ্গে পড়েছিলে কেন? তুমি কি খুনে নও? তুমি কি জব্দ চূড়ি করো?

উঃ—আজ্ঞে না। আমি খুনিও নয় কিংবা চোরও নয়। আমি গলা পার হয়ে তাদের সঙ্গ নিয়েছিলাম চোরাই বাজের আশ্রয়। খুনখারাপীতে আমাদের বড়ো ভয়। এর কারণ, আমি জানতাম যে, এরা খুনের সঙ্গে দস্ত্যতাও করে। ওরা পাগলারক ট্যাপ করতে বাচ্ছে শুনে আমি ভয়ে সরে পড়েছিলাম।

প্রঃ—তোমার কি মনে আছে যে, কতো রাতে প্রহর সঙ্গে গজার ধারে তোমার দেখা হয়েছিল? কোন মাস বা তারিখ সেদিন ছিল, তা মনে করে বলতে চেষ্টা করো। ঐ সময়কার অস্ত কোনও এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি এই ঘটনার তারিখ ও সময় ও মাস বলবার চেষ্টা করো।

উঃ—ঘটনার মাস বা তারিখ আমার মনে নেই। তবে গলা পার হবার রাত্রে ঐ সময়টাতে পূর্ণো ঠাণ্ড উঠেছিল। এর আগের দিন হাওড়ার ঘাটে ওখানকার হবুনাথ গুণ্ডা ধরা পড়েছিল। ওখানকার খানার নখিত্র হতে তারিখটা আপনি জেনে নিতে পারেন।

গৌরীয়ার এই বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে আমি একটা বর্ষ-পঞ্জিকা আনিতে নিলাম। এই পঞ্জিকা হতে জানতে পারলাম যে, খুনের রাত্রি পূর্ণিমার রাত্রি ছিল। এই থেকে বুঝতে পারলাম যে, আমাদের কাছে গৌরীয়া সত্য কথাই বলেছে। এরপর এই পঞ্জিকাটি আমি বিচারের সময় আদালতে পেশ করার জন্তে উর্দাকে প্রদর্শনী-ক্রমের তালিকাভুক্ত করে নিলাম। এই পঞ্জিকা অস্বাভাবিক করে জজ ও জুরীরাও গৌরীয়ার এই বিবৃতি সত্য বলে মেনে নেবেন বুঝেই আমি পঞ্জিকাটি বিশেষরূপে সংরক্ষণ করি। [ক্রমশঃ]

রক্ত বৈশাখ

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

অসহ এ নূর্বের শ্রান্তিমন তির্যক প্রহার
চাবুকে আহত করে; গলে গলে বঁরে পড়ে অগ্নি-গ্নেসিয়ার,
বৈশাখ তোমার বুকে।

যদি এতো ছিল ভেজ

হে বৈশাখ তোমার বুকে, তবে কেন হে আশ্চর্য দিন
এই মৃত্যু-জীর্ণ রক্ত কলকাতার নানকীয় শব
বেধা জ্বর প্রেতাঙ্গা প্রহরে প্রহরে চালে বিব—
মুহুর্তে ভয় করো, লগ্ন তাই কিরণোৎসবে
এই কণে;

তাই অহর্নিশ

বিবাক্ত বাঙ্গুর কাল্লা ধরে ধরে কুমাশার মায়া
নিরন্ত যন্ত্রণা দেয়, অসহ এ বধন যন্ত্রণা
গর্ভে ধরি; মুক্তি দাও, মুক্ত করো হে দক্ষিণী হাওয়া
কলকাতার এই বুকে একটু আনো নীলাঙ্গনছায়া,
রক্ত আমি বৈশাখের শ্রান্তি-মন কিরণ-প্রহার।

(যদি এমনই চাবুকে আহত করবেই তবে
বলো নি কেন, তাহলে মনের অশুভ প্রদীপ
যে জলে আমাকে জ্বালানো কেবল তাকে মুহুর্তে
মুক্ত করেই নিতাম মুক্তি, সে তবে পুড়তে
ব্যস্ত থাকতো, তবে বৈশাখী কিরণোৎসবে
ব্যর্থ হতো না বাতনার এই বহি-দীপ।)

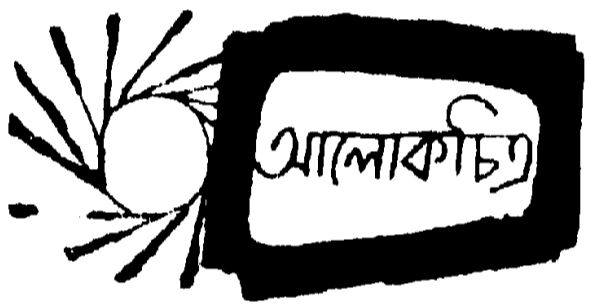
অসহ এই নূর্বের চেউ, নূর্বের চেউ
এখনো মেটেনি জুকা, হায় রে, বৈশাখ তোমার,
বিপ্রহরের এই কাল হতে আমাকে কেউ
মুক্তি দিবি কি আবাঢ়ে-আবলে, কই জ্বলে তোমার।



—পূর্ণানন্দ পাল



—নির্মলচন্দ্র দাস



—পূর্ববী ঘোষ



শ্রী
অ
ধ
র



—রাধা কান্ত রায়





राजधानी

—नीरोगी राज



খেলার সাথে

—বিভাস মিত্র



श्रीपञ्चशिखर

—विश्वेश्वरनाथ मठ, मंगलगढ़

চন্দ্রা তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মহাশেতা ভট্টাচার্য

সতেরো

১৯শে জুলাই, ১৮৫৭। বিটুরের আকাশ লাল করে আগুন উঠছে। নানাসাহেবের প্রাসাদে অতিথি হয়ে এসেছে মেজর সিকেনসনের বিজয়ী স্রিগেড।

সম্মিত অতিথিদের সাদর স্বর্ধনা জানাতে আজ কেউ নেই। নানাসাহেব পলাতক। সতীচোড়া ও বিবিধের হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় মায়ক নুদর্শন আজিমুন্না খানের অভ্যর্থনার হাসিতে স্নিত উজ্জ্বল মুখখানাও অল্পপস্থিত।

দাঁড়িয়ে আছে শুধু পরিত্যক্ত প্রাসাদ। দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সমাপ্তির নীরব সাক্ষী হয়ে।

বীরশ্রেমিক প্রথম বাজীরাত, স্মরণস্বরূপ মাধব রাও, কটকদয় রঘুনাথ রাও এবং তাঁদের অযোগ্য উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বাজীরাত পেশোয়ার স্মৃতি ও ঐতিহ্য আজ বিদেশী সৈন্যের হাতে বিপন্ন। বহু যুদ্ধ ও গৌরবের স্মৃতিবিজড়িত কারুকাঁথচিত্রিত কামানগুলি বহিরঙ্গনে অপেক্ষা করছে তাদের শেষ পরিণতির জন্য। দেওয়ালে সারি সারি চাল, কোনটি বা নাগারা ও চামরচিত্রিত, কোনটিতে বা সিক্কিয়ার পূর্ব ও নাগের চিহ্ন দেখা যায়, আগুনের আভায় তারা একবার ঝলকে উঠছে, আবার ম্লান হয়ে থাকে অঁধারে।

দূরে অলছে আজিমুন্নার প্রাসাদ। তার আলো এখানেও এসে পড়ছে। ঘরে ঘরে ধ্বংস ও লুণ্ঠনে ব্যস্ত ইংরাজ ও শিখ সিপাহীরা মশাল হাতে অগ্নিসংকার করছে আসবাবে—মূল্যবান চন্দনকাঠের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে—স্বাসরোধকারী ধোঁয়ার একটা সুবিশাল অজগর কুণ্ডলী খুলতে খুলতে এ-ঘর থেকে ও-ঘর তাদের অনুসরণ করছে। তবে সে অজগরের গর্জন শোনা যায় না। নিঃশব্দ তার গতি। উন্নাসের চীংকার ওঠে শুধু সৈন্যদের কণ্ঠ থেকে। সৈন্যরা জেনেছে নানাসাহেব এক অতুল ধনভাণ্ডার সঙ্গে নিয়ে গেছেন। তবু বা পড়ে আছে, তার পরিমাণও নগণ্য নয়। স্রিগেডিয়ার ও ক্যাপ্টেনদের মনে আছে, একদিন এই সব হলঘরে বসে তাঁদের কত উৎসবসজ্জা কেটেছে। সোনার আভরদান, গোলাপপাশ, ট্রে ও ফর্সার কথা তাঁদের মনে পড়ে। তাঁরা উন্নত হয়ে ধুঁজে বেড়ান ঘর থেকে ঘরে।

হলঘরগুলির দেওয়াল মোড়া বড় বড় আয়নার। মাথার ওপরে পাঁচশো ও হাজারবাতির ফটিকের দীপাধার ছলতে থাকে। অন্দের কুচি দেওয়া অতিরিক্ত মালা দোলে সাথে সাথে। তাতে আগুনের আভা পড়ে মণিমুক্তার বিজয় রচনা করে। আয়নার পিতলের

ক্রমকে মনে হয় সোনা। সৈন্যরা স্বর্ণভূষায় অস্থির হয়ে ছুটে বেড়ায়। মন না খেয়েই মস্ত তাদের গতি। পুরাব চেয়ে অনেক বড় নেশায় তারা উন্নত, অস্থির।

চন্দন ও মেহগনির সোফা ও কোঠের ভাঁজে ভাঁজে না জানি পলায়নকালে পুরবাসীরা কত কি রেখে গিয়েছে। রেশম ও কিংখাবের আন্তরণ সৈন্যরা তরোয়াল দিয়ে চিরে কেঁড়ে কলে। কখনো কিছু মেলে, কখনো মেলে না। রেশমের নরম তাকিয়াগুলি ফুটো করে দেখে তারা। তুলো আর পালক ঘরঘর উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সহসা উন্নাসে টেচিয়ে ওঠে একজন। পেয়েছে সে। সোকারি ভাঁজ থেকে পেয়েছে একটি রেশমের থলি। স্বর্ণমুক্তার লোভনীর নিক্কণ তাতে বেজে উঠছে। একহাতে থলি, ও অপরহাতে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে সে ছুটে ছুটে আসে। আর এক বৃদ্ধ শিখ, রক্তাঙ তার চোখ খলিত তার পদক্ষেপ, কৃপাণের খোঁচা দেয় সে থলিতে। বন্ বন্ করে ছড়িয়ে পড়ে মোহর। উপড় হয়ে তার ওপরে পড়ে অজরা।

নর্তকীরা আজ পেশোয়ার ও বাঘরার বিজয় রচনা করে নর পায়ের নূপুর বাজিয়ে অতিথিদের প্রলুব্ধ করছে না। তাই কি। তাদের পায়ের নূপুর যে সুর তুলতে পারেনি—সেই অপকৃপ বন্ধার আজ বার বার বেজে বেজে উঠছে। ফটিকের দীপাধারে গুলী করতে করতে চলেছে অকিসাররা। অতি নূন্দ নূন্দর কাজকরা সে ভিনিসীয় কাচের আধার, একটি গোলাপের মতো বার রক্তিম আভা, গোলাপের পাপড়ির মতো-ই বার কাচ পাতলা, গোলাপের বৃকের রঙ যেমন গাঢ় গোলাপী, এবং ধীরে ধীরে সে রঙ যেমন পাপড়ি থেকে পাতলা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে—এই দীপাধারের মধ্যের ঝাড়টি-ও তেমনই গোলাপী, এবং তার বাইরের দীপগুলির রঙ-ও তেমনই একটু একটু করে ক্রিকে হয়ে এসেছে। গুলীর আঘাতে এইসকল হুমূল্য দীপাধার বনবন করে ভেঙে পড়ছে। তার কাচে কাচে লেগে শব্দ উঠছে নূপুরের মোহ বিস্তার করে। আর হুমূল্য ইতালীর গালিচার ওপরে ছড়িয়ে পড়ে সে শব্দ ডুবে থাকে এক বোবাকান্নার নিঃশব্দে।

পানপাত্র রাখবার ফটিকের টেবিল তুলে আয়নাগুলির বৃকে আছাড় মারে কেউ। দেওয়াল আয়নায় ঢাকা। তাও এই লুণ্ঠনকারীদের প্রতিক্রিয়া প্রতিকলিত হয়ে বিজয় জাগায় বৃকি বা এরা সংখ্যায় অগণন।

আর এক কথা থেকে তাঁরকার ওঠে সমবেত কণ্ঠে। সে উল্লাসধ্বনি বেন ধামতে চায়না।

ইংরেজসৈন্যরা নানাসাহেবের বহুখ্যাত, বহুশ্রুত পানাগারের সন্ধান পেয়েছে।

পেশোয়াশাহীর দাবী অস্বীকৃত হবার পরে-ও নানাসাহেবের বিশ্বাস ছিল কোম্পানী সরকারকে তিনি রাজী করতে পারবেন। ফিরে পাবেন তাঁর বৃত্তি।

তাই, একদিন, কানপুরের ইংরেজ গ্যারিসনের অভ্যর্থনার জন্ত মহামূল্যবান পানীয় সংগ্রহ করে সাজিয়েছিলেন তাঁর পানাগার।

দেওয়ালের গায়ে সারি সারি আলমারী। তাতে কবাসী, ইতালীর ও বিলিতী মদের বোতল। ইতালী ও স্পেনের ড্রাকাকুলের ভূমধ্যসাগরের বাতাস ও বোদের প্রসাদে পুষ্ট আঙুরের গুচ্ছ, যা একদিন সেই দেশের মেয়েরা চয়ন করেছিলো কোমল হাতে। এবং একদিন সুরাট, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরে সেই ড্রাকাকুলের পেটিকাগুলি ইংরেজ ও ভারতীয়দের চাবুকের সামনে নামিয়েছিলো ভারতীয় কুলীরা—সেই সব পানীয় আজ টেনে টেনে বের করে ইংরেজরা। বাইরে আশুন বলছে। তার আগে ভেতরটাকে আলিয়ে নেয় তারা। বত বা পান করে, তত বা ফোয়ারার মতো ঘরে ছড়ায়।

ধোঁয়ার সে অঙ্গুরটা এ-ঘরেও ঢুকেছে। তার কুণ্ডলীর পাকে পাকে বিচরমান এই পানোদ্রবের নরকের প্রেতসেনানী বলে ভুল হয়। হুমূল্য পানোদ্রবগুলি দেওয়ালে আছড়ে ভাঙে কেউ।

আশুনটা আজিমুল্লার প্রাসাদ ছেড়ে এবার বাইরের বাগানে এসেছে। আশুন দেখে সতর্ক আর্জনাদ করে বাগানের শিকারখানার বন্দী চিতা ও হরিণ, বাঘ ও ময়ূর।

এক বিশালদেহ বারশিঙ্গা হরিণ, আশুন দেখে প্রাণভয়ে ছুটে আসে হসবের। দেওয়ালে দেওয়ালে, আয়নার আয়নার নিজের ছায়া দেখে সে বিভ্রান্ত হয়ে আর্জনাদ করে আছড়ে পড়ে আয়নার ওপর। তারই দেহের চাপে, শিঙ উপড়ে আসে গোড়া থেকে। রক্ত পড়ে তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

সৈন্যরা উল্লাসে চ্যাচাতে চ্যাচাতে তার চার পা ধরে তুলে বাইরের আশুনের মধ্যে ফেলে দিতে নিয়ে চলে। ভাঙা শিঙটা মাটিতে ঘসতে ঘসতে যায়। রক্ত পড়ে ছিটকে ছিটকে। আর হরিণের যে চোখের স্তম্ভিত কবিরের লেখনী এত মুখর, সেই চোখ তুমি অস্তিত্ব বিষয়ে অবাধ মানে, যে অরণ্যের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বর্ষর এ কোন্ নতুন জাতের পশু ?

দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, ইউক্যালিপটাস ও চন্দনের গাছ পুড়ে এবার এক অদ্ভুত গন্ধ ছড়াতে থাকে বাতাসে।

কোথায় আছে নানার সে অতুল ঐর্ষ্য ? সৈন্যরা এবার ঘর থেকে ঘরে, মহল থেকে মহলে ছড়িয়ে পড়ে। দেওয়াল থেকে বড় বড় গিল্টির ফ্রেমে বাঁধাই তৈলচিত্র ভেঙে পড়ে মাটিতে। আশুন আলাতে আলাতে চলে তারা।

থেকে থেকেই ওঠে বিজয়োল্লাস। পেয়েছে তারা। টাকা মোহর, নাচওয়ালীদের রূপার অলঙ্কার, সোনা ও রূপার বাসন।

বাইরের আন্তাবলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ওঠে আরবী বোড়াগুলি। একদিন অস্বপ্নীকার সকল স্তম্ভিত মিলিয়ে তাদের কেনা হয়েছিলো।

আজ তারা বোঝে, এই বন্ধ আন্তাবলে তাদের পুড়ে মরতে হবে। তাদের তীব্র আর্জনাদে আকাশ চিরে যায়।

এ এক মহা দীপাধিতা। এত উৎসব হয়েছে এ প্রাসাদে কিন্তু এমন মহাসমারোহে উৎসব কোন দিন হয় নি।

বড় বড় উট ও ঘোড়ারগাড়ী পাকী, মেনা ও তাজাম—বার গায়ে কত না নকশা কাটা, কত না সাজপোষাকে বাহার—সেগুলিতে আশুন লাগিয়ে মজা দেখে সৈন্যরা।

আজকের এ উৎসবে ইভান্সের-ও এক মহান ভূমিকা। উজ্জত তরবারি হাতে সে-ও এ ঘর থেকে ও ঘরে ছুটছে। লুঠ এবং মদ, দুই নেশা তাকেও মত্ত করেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, এই শেষ নয়। নিশ্চয় কোথাও না কোথাও আছে হীরে জহরৎ, বহুমূল্য অলঙ্কার। খুঁজতে খুঁজতে সে ঠিকই পেয়ে বাবে। কোথায় যে আছে, সে ঠিক ঠাহর করতে পারে না। ইভান্স শুধু খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে সে দলছাড়া হয়ে পড়ে। এবার সে ঢোকে অন্ধরের মহলে।

এ সব ঘর বুদ্ধি বিলাসকথা হবে। বড় বড় ডিভান, সুরমশূণ মেঝে—নর্তকীদের নাচের জন্ত বুদ্ধি এখানে গালিচা পাতা হয়নি। দেওয়ালে নগ্ননারীদের চিত্র। বিদেশী তৈলচিত্রের সে অসুন্দর দেখে ইভান্সের আজ আর কোন উত্তেজনা হয় না। স্বচ্ছন্দে সে তরোয়ালের ধোঁচায় নগ্নদেহ স্নানরত সুরমরীর স্ফীত বক্ষ ও অঙ্গের জাগানো জজ্বা চিরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন দেহ সুরমরীর আধখানা মাটিতে পড়ে যায়, আধখানা তবু চেয়ে থাকে অধরে হাসি ও কামনা মেখে।

ইভান্স এবার একজনকে ক্ষতবিক্ষত করতে করতে চলে। উদ্বেগ ব্যর্থ হয় না। ভেনাস ও গ্র্যাভোনিসের যুগ্মবিহারের ছবির পাশ থেকে এক খলি সোনার রামচাঁদী মোহর মিলে যায়। অতএব ভেনাসকে ছেড়ে দেয় ইভান্স। গ্র্যাভোনিসের আলিঙ্গন থেকে ভেনাস কামনারিভ্রুড়িত রাঙাচোখে চেয়ে থাকেন অপরাপর ভাগ্যহীনাদের দিকে।

সহসা চমকে থেকে যায় ইভান্স। ছায়ামূর্তির মতো কক্ষের গভীর থেকে এগিয়ে আসছে কে। এ কি কোন প্রেতিনী ? অথবা এই সব ছবিতে জাহ্নু পড়া ছিন্ন। প্রতিশোধ নেবার জন্ত প্রাণ পেয়ে উঠে আসছে কেউ ? ইভান্সের বুকের তলা থেকে অরক্যানেজে মাহুঘ হওয়া, ভূতপ্রেতের কুসংস্কারে জীত্ব একটা ছেলের অন্ধবিশ্বাসগুলো নাড়াচাড়া দিতে থাকে।

—সাহেব ! সাহেব !

খিগখিল করে নিঃশব্দে হাসছে এই রমণী। হাসতে হাসতে এসেছে ইভান্সের দিকে।

ইভান্স তবু চেয়ে আছে। রমণী ক্রমশঃ আরো কাছে আসে। ইভান্সের বুক হাত রেখে বলে—সাহেব !

—ওঃ !

আশঙ্ক হয়ে একটা মত্ত নিশ্বাস ফেলে ইভান্স। বলে—চম্পা !

—সাহেব !

—চম্পা ভূমি এখানে ?

চম্পা নিশ্চিন্ত আশ্বাসে হাসে। এমন করে হাসে, বেন এটা ধ্বংসোদ্ভূত প্রাসাদের কোন ঘর নয়—ইভান্স এই ধ্বংসের অস্তিত্ব

নাথক নয় এবং তাদের চারি পাশে এক অস্বাভাবিক, অদ্ভুত পরিবেশ নেই। সবই যেন যেন ছিল তেমনই আছে।

চম্পার কণ্ঠ থেকে এক নিশ্চিত্তার লাবণ্য করে পড়ে হাসিতে। সে বলে—বা, তুমি বলেছিলে না আসতে? তোমার কথামতোই ত এসেছি।

—চম্পা।

—কখন এসেছি। ঘনবন্ধ খুঁজে তোমরা যে কাণ্ড করছো, দেখে হাসতে হাসতে আমি একেবারে...

—কি বলতে চাও চম্পা?

—সাহেব!

চম্পা এবার বুকে লেপটে আসে। একদিকের অনাবৃত উন্নত বুকটা ইভান্সের জামায় ঘসে যায়। চম্পা বলে—সাহেব, নানা সাহেবের আসস ঐশ্বর্য তোমরা কেউ পাওনি। নানাও নিয়ে যেতে পারেনি। আমি তাই দেখছিলাম।

—চম্পা!

চম্পা আরো কাছে। আরো নিশ্চয় তার গলা। বাস বলে—সাহেব, হীরার টায়রা, মুক্তোর কণ্ঠ, পারার বালা, কঙ্কণ, আর হীরের আংটি, চূড়ি, হার, চন্দ্রটিকা, সে যে কত, তোমায় কি বলব। সারাদিন সেইগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিলাম।

—কোথায়, চম্পা?

ইভান্স চম্পার হাত চেপে ধরে। চম্পা হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে—আমার সঙ্গে এসো। আমি কি একলা সব নিয়ে যেতে পারি? ছোটো বড় বড় পেটি...

—চম্পা, তুমি কি করে জানলে?

—বা, আমি নাচতাম না এখানে? মনে নেই?

চম্পা ইভান্সের হাত ধরে চলতে শুরু করে। বলে—খুব চুপি চুপি এসো। আমি আর তুমি দুইজনে সবগুলো নিয়ে—কোথায় যাব সাহেব?

—চম্পা, তোমাকে আমি বিবি বানাব।

—জানি সাহেব... তাই ত তোমার সঙ্গে বসে আছি। এসো।

ইভান্স চম্পাকে অল্পসরণ করে। আঁধার। তবু চম্পার কোন কণ্ঠ হয় না। সে বলে—চল, আমার সঙ্গে চল।

ইভান্স নিশ্চিত্ত হয়ে নিজেকে ছেড়ে দেয় চম্পার হাতে। সে চলতে থাকে। তার চম্পা আছে, তার ভয় কি? ইভান্সের চম্পা আছে। ইভান্সের মনে আজ চম্পার জন্তে এক নতুন অল্পসরণ উঠলে উঠলে পড়ে।

অন্ধরমহল পেরিয়ে তারা এসে পড়েছে এক চত্বরে। সে চত্বরের পর আঁধারগলি ও বাবালা পেরিয়ে শুরু হয় রহস্যশালা।

চম্পাকে এখন আঁধার দিয়ে গড়া, আঁধারেরই কোন অশরীরিক মতো দেখাচ্ছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এই পরিবেশ। তবু ইভান্স ভয় পায় না। নিজের হাতটা পরম আঁখালে ছেড়ে রাখে চম্পার হাতের মুঠোয়। একবার শুধু চমকে ওঠে সে। মনে হয় পাশের বিশাল ঘরানা থেকে তাকে লক্ষ্য করছে কারা। নীরবে, শুধু চোখ তুলে।

তারপরে তুল ভাঙে। সেগুলি গজাঙ্গল রাখবার বড় বড় পিতল ও তামার ছালা।

এবার সিঁড়ি ধরে নামে চম্পা। আবার শুরু হয়েছে সর্দীর গলিগলি। দুই পাশে সারি সারি ঘর। বুকি বা চাকরদের থাকবার ঘর এগুলি। তার পরে আরো চত্বর, আবার বাবালা, ঘর ও সিঁড়ির পুনরাবৃত্তি।

পরিসর ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। চলতে চলতে দুই পাশের দেওয়ালে গা বেঁবে যায় ইভান্সের। চম্পা বলে—এই সব ঘর থেকে নিশ্বাস পাচ্ছ?

—চম্পা!

চম্পা হাসে। প্রেতের মতো নিশ্বাসে। বলে—এই সব ঘরে, এই পেয়ে, জল না পেয়ে গুমরে গুমরে মরেছে অনেকে। তাদের কথা হুনিয়ার কেউ জানে না। কঙ্কালগুলো আজও পড়ে আছে দেওয়ালের সঙ্গে শেকলে-বাঁধা। আজ সন্ধ্যাবেলা, আমি তাদের দীর্ঘনিশ্বাস পাচ্ছিলাম আমার গায়ে। তুমি পাচ্ছ না?

ইভান্সের গুম্ব করছে। সে বলে—আর কতদূর চম্পা?

চম্পা জবাব দেয় না সে-কথার। বলে—ওপরের দিকে চাও। আকাশ দেখতে পাচ্ছ?

ওপরে, অনেক ওপরে একটুকরো আকাশ দেখতে পাচ্ছে ইভান্স। তারায় ভরা আকাশ। চম্পা বলে—দেখে নাও। এবার আঁধার মাটির নিচে যাব। পাতালে যাব। পাতাল বোঝ?

—বুকি।

—যত হীরে-জহরৎ সব এখানে আছে। এসো।

ছোট ছোট সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে নামছে। ইভান্স যে কত সিঁড়ি নামে, আর কতবার যে দেওয়ালে মাথা ঠুঁকে যায়, তার হিসেব থাকে না। দেওয়ালের গা অমসৃণ, তার খাঁজে খাঁজে চটচটে ঠাণ্ডা কি লেগে আছে। চম্পা বলে—দাঁড়াও, দরজা খুলি।

শিকল টানবার শব্দ হয়। কাঠের পাল্লা টানে চম্পা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভ্যাপসা গন্ধ, একটা বন্ধবাতাস কিছুক্ষণের জন্ত ইভান্সের মাথাটা ঘুরিয়ে দেয়। ইভান্স নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে। ঈর্ষ টলে গিয়ে হাত থেকে তরোয়ালটা গড়িয়ে পড়ে যায়।

সেই ইম্পাতের শব্দ. পাথরের ওপর ঘসে ঘসে, ঠুঁকে ঠুঁকে, কত নিচে যে নেমে যাচ্ছ, গুণে ইভান্স চম্পার দিকে তাকায়। বলে—আরো নামতে হবে?

—আর কত, দশটা সিঁড়ি।

—তরোয়ালটা কোথায় গেল?

—ও কিছু নয়, ঘরের মাঝখানে পড়েছে বোধ হয়।

—তাতেই ও রকম শব্দ হলো, চম্পা?

—ঘরের মাঝখানে একটা কুয়ো আছে।

—সে কি?

—সেই কুয়োতে বোধ হয় পড়লো তরোয়ালটা।

—চম্পা, পা রাখতে পারছি না।

—বড় পিছল। আমার হাত ধর।

শেখের ধাপ কয়টা পা হড়কে নেমে আসে ইভান্স। তারপরই অকুঁট অর্জনাদ করে। পা তার ডুবে যায় নরম কাদায়। নরম চটচটে, আঁঠার মতো কাদা।

চম্পা বলে—ভয় পেও না। কাদা বেশী নেই। বেশী ডুববে না পা।

চম্পা সামনে দাঁড়িয়ে সরীসৃপের মতো নিখাস ফেলে। কিছুকণ কখা বলে না।

ইভান্সের চোখে এবার জাঁধারটা সরে এসেছে। চম্পাকে এবার দেখা যায়। ঘরটার চারিপাশেও দেখে ইভান্স। কই, কোথাও ত' কোন নিখাস চোখে পড়ে না? আর কত নিচে এসেছে তারা? জয়েক শো' কোজের বর্ধমানিও পৌঁছয় না এখানে? এত নিম্নতর কেন এই পরিবেশ? সত্যিই কি তারা পাতালে এসেছে? ঘরটোর রাজ্যে?

চম্পা ই বা কথা কয় না কেন? ইভান্স বলে—চম্পা, কোথায়? বল? দেবী হয়ে যাচ্ছে না?

চম্পা আবার হাসে। বলে—দেবী? আমাদের হাতে এখন জয়ন্ত সময় ইভান্স! সময় এখানে খেমে রয়েছে দেখছ না? বুঝতে পারছ না?

—চম্পা, এখন ছেনালী ক'রো না। বল, কোথায়?

—কি, কোথায়?

—সেই হীরে জহরৎ?

চম্পা জবাব কবে না। নিচু হয়ে কি যেন শোনে। তার পর দাঁড়িয়ে গভীর গলায় বলে—পায়ের নিচে জল টের পাছ?

হ্যাঁ। এবার মনে হচ্ছে কাদা ছাপিয়ে যেন জলের স্পর্শও পাচ্ছে ইভান্স। বলে—জল... হ্যাঁ জলই ত। বিহ্ব চম্পা...

চম্পা বলে—ইভান্স মনকে প্রস্তুত কর। জল এখন বাড়বে।

—তার মানে?

—তার মানে আমি আর তুমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সে ঘরটা মাটির অনেক নিচে। তার মানে গঙ্গার জল আসছে। জোয়ার এসেছে কি না। জায়গাটা মদীর খুব কাছে।

—তার মানে কি চম্পা?

—তার মানে তুমি আমি কোনদিনও এ ঘর ছেড়ে যাব না। এই ঘরটা ভরে যাবে গঙ্গার জলে।

—চম্পা শয়তানী!

—নাই বা মিলসো হীরে জহরৎ ইভান্স। আমি ত' তোমার কাছে আছি। আমাকে না তুমি ভালবাস?

—তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ চম্পা?

—নিশ্চয়। তুমি কি ভেবেছিলে নানাসাহেব এতই মুখ? বত হীরে জহরৎ আর গহনা—সব সে নিয়ে গেছে। তোমরা তার পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টগুলো নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছ।

—শয়তানী!

চম্পার গালে চড় মারে ইভান্স। সে শব্দটা ঘরটার ঘুরে ঘুরে ভুবে যায়। চম্পা বলে—মনকে প্রস্তুত কর ইভান্স। যে ভগবানকে বিশ্বাস কর, তার নাম নিতে চাও ত নাও। জল উঠছে।

ইভান্স মরিয়া হয়ে বন্ধুকের বাঁটটা দিয়ে মারতে চায় চম্পাকে। বন্ধুটা হাত ছিটকে জলে পড়ে যায়। পা তুলতে পারেন না ইভান্স। পা কাদায় ডুবে আছে। সে আঁর্ত এক জহর মতো ছটকটিয়ে ওঠে মিনতিতে।

—চম্পা, আমাকে বাঁচাও, আমি মরতে চাই না।

—কি না জহরৎ ইভান্স। দাঁড় করো চম্পা বলে। বলে

—এ ঘরে যখনই মেমেছি আমরা, তখনই পাজা পড়ে গিয়েছে ওপরে। এ ঘরে যারা নামে, তারা কি করে ইভান্স? না, তুমি আর কি হবে না।

—চম্পা, আমাকে বাঁচাও।

চম্পাকে জড়িয়ে ধরে ইভান্স। চম্পা বলে—বাঁচবে কেন ইভান্স? তুমি যে মরবে। এখনি মরবে। জল যে হাঁটু ছাপিয়ে এল। বুঝতে পারছ না তার মানে কি?

—চম্পা।

—চম্পাকে না তুমি ভগবানপুরে কীসী দিচ্ছে? চম্পা কি মরতে ভয় পেয়েছিল? অমনি করে মর ইভান্স।

—আমি মরতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই।

—তাই বললেই কি বাঁচা যায় ইভান্স? চম্পা বাঁচতে চেয়েছিল। আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম—তাতে কি হলো?

ইভান্স এবার ধস্তাধস্তি করে পাটা কাদা থেকে ছাড়তে চেষ্টা করে।

চম্পা বলে—কোন লাভ নেই। কুয়োতে পড়ে যাবে।

জল উঠে আসছে। জল উঠে আসছে কোমর ছাড়িয়ে বুকের দিকে—ইভান্স বলে—চম্পা, তুমি যা চাও তাই দেব, শুধু আমাকে বাঁচতে দাও, বাঁচতে দাও, চম্পা।

চম্পার কণ্ট এই জলের চেয়েও গভীর, আরো ঠাণ্ডা। সে বলে—আমি চম্পাকে চাই। আমি তার কাছে বাছি। কিন্তু ইভান্স, তুমি এমন কাপুরুষের মতো মরছ? আমার যে কষ্ট হচ্ছে ইভান্স! তুমি যে তোমার মরকেও ঠাই পাবে না।

—চম্পা।

—এমনি করে মরো।

চম্পা ইভান্সের হাঁটু জড়িয়ে ধরে। কাছে আসে। তারপর ইভান্সের শরীরটা নিয়ে সেও ভেঙে পড়ে মাটিতে।

জল ওঠে নিঃশব্দে। জল ওঠে পাক খেয়ে খেয়ে। জল ওঠে নাগিনীর প্রেমে ইভান্সকে পাকে পাকে জড়িয়ে।

উঠতে উঠতে জলে ভরে ফেলে ঘরটা। সিঁড়ি ছাপিয়ে দরজার দিকে চলে যায়।

তারপর আর কোন শব্দ থাকে না। শুধু থাকে জল—আর অস্তিম আলিঙ্গনে বন্ধ হুটি নর-নারী।

* * * * *

নভেম্বর—১৮৫৮। Queen's Proclamation পড়া হয় ভারতের শহরে শহরে—বিভিন্ন জনপদে। মহাশাস্তি পুনর্নাসিত হয়েছে এক মহাশাস্তানে। চতুর্দিকে শাসনের নীরবতা। সমস্ত উত্তরভারত দক্ষ, ধ্বংসীকৃত, শত শত মাইলব্যাপী একদিনের সমুদ্র বসতি আজ জনমানবশূন্য। পুরুষদের কীসী হয়েছে—নারীরা উন্মাদ ও শ্রাশানচারিণী—শিশুরা অনাথ এবং পথের শিয়ালকুকুরের মুখে তারা অসহায়।

মহারাজার ঘোষণাপত্র—কমা ও শাস্তির আধাসে প্রসারিত দক্ষিণভারতের বরাভর তাই পড়া হয় এক মহাশাস্তানে।

ইটাইশিয়া কোম্পানীর হাত থেকে স্বয়ং মহারাজা নিচ্ছেন

ইয়োবোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশের শাসনভার। তাই—

“এই সকল সীমানাকৃত দেশের প্রজাপুঞ্জকে আমরা—কিন্তু বিশ্ব হইতে বলিতেছি—আমাদের উত্তরাধিকারী এবং তাহাদের উত্তরাধিকারীদের প্রতি-ও তাহারা বিশ্ব থাকিবে এবং আমরা তাহাদের উক্ত দেশসমূহের শাসনভার দিবার যোগ্য বিবেচনা করিব—তাহাদের আদেশ মানিতে তাহারা বাধ্য থাকিবে।

...পূর্বপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধিকার স্বত্রে প্রাপ্ত জমির উপর ভারতের নেটিভরা কিরূপ আদালত ও আবেদন, তাহা আমরা জানি ও তাহাদের সে অহুত্বকে প্রত্যাখ্যান করি। আমরা তাহাদের সে বিষয়ে অধিকার বাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাদের আশ্বাস দিতেছি।

...কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ, তাহাদের স্বদেশবাসীকে মিথ্যা সংবাদে বিভ্রান্ত করিয়া উদ্বুদ্ধ বিক্রোহে প্রবৃত্ত করিয়া যে চূর্ণ ও অসামান্য আনিয়াছে—তাহার জন্ত আমরা দুঃখিত। সেই বিক্রোহ সময়ে-ই আমাদের ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইয়াছে। তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া ভুল করিয়াছে, তথাচ এখন তাহারা কর্তব্যের পথে কিরিয়্যা আসিতে ইচ্ছুক তাহাদের আমরা আমাদের দয়াপ্রদর্শন করিতে চাহি।

...আমাদের দয়া প্রদর্শিত হইবে সকল অপরাধীর প্রতি—শুধু তাহারা ব্রিটিশ প্রজাদের হত্যাকার্যে লিপ্ত ছিল বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, ও যাইবে—তাহাদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শিত হইবে না। তাহাদের প্রতি ক্রয় বিচার হইবে।

...যখন, ভাগ্যের আশীর্ষাদে আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা, যে ভারতে শান্তিপূর্ণ ভাবে শিল্প বৃদ্ধি হয়, জনসাধারণের উন্নতি ও মঙ্গলার্থে কার্য করা হয়, এবং আমাদের প্রজাদের উপকারার্থে সরকারী কাজকর্ম সৃষ্টভাবে চলে।

...তাহাদের সমৃদ্ধিতে আমাদের শক্তি—তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের নিরাপত্তা—এবং তাহাদের কৃতজ্ঞতার আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন আমাদের এবং আমাদের বাহারা শাসন কার্যে ভারপ্রাপ্ত তাহাদের, আমাদের প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলবিধানার্থে এই সকল কার্য করিতে শক্তি দেন।”

সব সমাপ্ত হলো। এক রক্তদ্রবের পর ভারতের ইতিহাসে নতুন করে ব্রিটিশ শাসনের এক নতুন ইতিহাসের গোড়াপত্তন হলো এই ঘোষণাপত্রে।

* * * * *

উত্তর ও মধ্যভারতের গাছ থেকে মৃতদেহ পচে পচে ধসে পড়লো। গলিত রক্তমাংসের সে সারে ভিজতে ভিজতে মাটি চিন্তা করলো—এবার সে কি ফসল দেবে। তাকে উর্বরা করার জন্ত এই নতুন সার থেকে সে কি নতুন কোনো ফসল দেবে? এবার কি গম, যব, আখ, ছোলা ও অড়হরের গাছগুলি বেশী সতেজ হবে? তার শীতগুলি যখন গভীর হবে, তখন কি ফসলের দানাগুলি বেশী পুষ্ট এবং রসালো হবে? এই গম পাকলে, সোনার সঙ্গে কি এবার রক্তিম আভার আভাস পাওয়া যাবে?

সহজে জমি পাবার ভরসা, এবং প্রাথমিক কৃষিকাজ শুরু করতে, প্রাথমিক কৃষিকর্মের সাহায্যের আশ্বাস—হালবলদ ও বীজ পাবার

আশ্বাস—তাতেও প্রথমে চাষী পাওয়া গেল না। অবশিষ্ট চাষীরা ভয়ে দূরদূরান্তে আত্মগোপন করেছিলো। চাষীর প্রাণ তার জমি ও ঘরের সঙ্গে বজ্রিশ নাড়ীতে বাঁধা—তবু তারা সাহস করে কিরে আসতে পারেনি।

তাই বলে হাজার লক্ষ বিঘা জমি অনাবাদী পড়ে থাকতে পারে না। এ যুগ উপনিবেশের লক্ষী বাঁধা চাষের ক্ষেত্রে। সেখান থেকেই চাষীর চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ, চুক্তিক ও অনাহার, জোতদার ও মহাজনের টাকা—এবং রাজকোষে রাজকর। তাই নতুন করে নয়ান্নান্নের নয়াবসতি স্থাপনের প্রয়োজন হলো।

নতুন নতুন মানুষের দিন শুরু হয়েছে। জমির মালিকানা গেল যারা এই যুদ্ধে ইংরাজের সহযোগিতা করেছে, বা নিরপেক্ষ থেকেছে, সেই সব নতুন তালুকদার জোতদার ও ঠাকুর সাহেবদের হাতে।

জাগচাষীদের তাইরাই দূর দূর জায়গা থেকে প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে এলো। কাণার গাঁথনিতে পাতা বা খড়ের চাল বসিয়ে ঘর বানাবার জন্ত সাহায্য করতেও ভরসা দিলো। গ্রামগুলির নাম পুরনো রইলো—তবে নতুন মানুষ এসে বসতি করলো সেখানে।

তার ১৮৫১ থেকে নতুন করে শুরু হলো সব। তাদের জানপ্রাণের ওপর ব্রিটিশের জীবনে-মরণে সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করে যারা এলো, তাইরাই হলো এই নতুন দিনের মানুষ।

পুরনো দিনের সব-কিছুই চলে গেল। সেই ঘর মন্থর চালের দিন—য দিনের ছলকি চাল বোঝা যেতো উট, হাতী, মোহ ও বলদের গাড়ীর চালে—তীর্থভ্রমণের খাতিয়র পদব্রজে পথ চলাতে—সে দিন চলে গেল।

শিল্পী কারিগর, পণ্ডিত, মৌলভী, সেই চাক ও কাড়কলার প্রকাশে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সব মানুষ—যারা ছিলো মনে-প্রাণে ভারতীয় জরি ও রেশমের কাজে যাদের পারদর্শিতা ছিলো, পাখর, কাঠ, তামা বা পিতলের জিনিষে যারা অপকল্প নকশা জারী করতে পারতো—চন্দ্রী ও বেনারসীতে যারা ভারতের শিল্পমানসের মর্মবাণী ফোটাতে পারত—রাজারাজড়াদের প্রসাদে রুজী রাজগারের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যে সব কলাবস্ত্র গায়ক স্বর তান দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারতো সেই সব মানুষ এবং সেই সব সময়সাপেক্ষ শিল্পকলার ওপর চোট পড়লো। তাদের কপালে পাশা উন্টে গেল। চোট পড়লো গ্রাম ও গ্রামীন সাংস্কৃতির ওপর। গ্রামের মানুষ গ্রামের কারিগরের তৈয়ারী কাপড় পরে খুশী থেকেছে—তাদের হাতে গড়া পুতুল ও দেবপ্রতিমা তাদের খেলা ও পূজার সাধ মিটিয়েছে। এখন সব জায়গায় জালের মতো সূক্ষ-সূক্ষ হয়ে, তাদের জীবনের সর্বত্র প্রবেশ করলো নতুন দিনের ব্যবসার প্রতিযোগিতা। চোটটা লাগলো মর্মস্থলে। আন্তে আন্তে তারা কাজ ও রুজী হারাতে শুরু করলে এবং পরিবর্তে কিছু না পেয়ে আরো আরো নিরন্ন ও বেকারের সংখ্যা বাড়তে শুরু করলো।

এ প্রক্রিয়া চললো ধীরে, অস্তি ধীরে—তবে বোঝা গেল এই ভাবে চললে শতবর্ষের মাধ্যম ভারতের গ্রামীন সংস্কৃতি নিঃশেষ হতে দেবী হবে না এবং ইতিহাসের প্রয়োজনে সেদিন যদি সত্যিই ব্রিটিশ চলে যায় এ মহা উপনিবেশ ছেড়ে, তাকে সকল দিকে নিজস্বতা বর্জিত করে অস্তঃসারশূন্য করেই দেখে যাবে।

এ সব মানুষ এই নতুন দিনে কোন কাজেই লাগলো না। কেন না, তারা যা যা জানতো, দেখা গেল সে জীবনবোধ—হুই জাতির রক্তাক্ত সংঘর্ষের সময় তাদের বাঁচতে পারেনি। তাদেরও কীসীতে ঝুলতে হয়েছে এবং আরো অবমাননার মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

বহু দিন, বহু মাস প্রায় বৎসরাধিক ধরে—উত্তর ও মধ্যভারতের পাছের ডালে ডালে মৃতদেহ ঝুলতে লাগলো। তবে তখন আর তাদের দেখে ভয় পাবার মতো মানুষ অবশিষ্ট ছিল না।

তার পরে বৃষ্টি এলো। প্রথমে ধূলো ও শুকনো পাতা উড়িয়ে বৈশাখী বৃষ্টি—তার পর এলো বর্ষা।

বর্ষার জল পেরে সেই সব গাছেই নতুন তেজ সঞ্চার হলো। তারা সতেজ ও সুপুষ্ট হয়ে উঠলো।

সাকাখানার ভগ্ন বাংলার উপাত্তে—চন্দন ও ম্যাকমোহনের প্রেমসিক্ত সে বনভূমিতে বঙ্গগোলাপ গাছগুলি সেই বর্ষণের পরের বসন্তে নতুন নতুন ফুলের গুচ্ছে ফেটে পড়লো। সে গোলাপগুলির বেগুলি লাল—তাদের রঙ সমস্ত ১৮৫৭-৫৮র সমগ্র রক্তপাতের চেয়ে অনেক বেশী লাল এবং দীর্ঘস্থায়ী—সে গোলাপগুলির বেগুলি শাদা তাদের শুভ্রতা, ১৮৫৭-৫৮র মৃতদেহগুলির হাড়ের চেয়ে অনেক বেশী শাদা। এবং সেই লাল ও শাদা ফুলের সুঞ্জরিত সুসমার অবদানও অনেক চিরন্তন। কেননা, সেই সব ফুল থেকে মধু পান করে উড়ে গিয়ে মৌমাছি ও ছোটপাখীর বাঁক নিজেদের সজিনীদের মধ্যে আর এক ভবিষ্যৎ পুরুষ সৃষ্টি করলো। সেই সব বিহঙ্গীর জঠরে যে সন্তান এলো, তারাও আবার 'আর এক মৌসুমে এমনি করেই এই সব ফুলের রক্তরাগ ও শুভ্রতা থেকে প্রাণসঞ্চার করে আর এক উত্তরপুরুষ সৃষ্টির কাজে সম্বদ্ধ ব্রতী হবে। এমনি করে এই সব ফুলগুলি ক্ষণস্থায়ী হয়েও চিরন্তন জীবনসৃষ্টির কাজে প্রকৃতিকে সাহায্য করলো।

* * * *

ভেরাপুরে সেতার নদীর তীরে, চন্দন ও চম্পার স্মৃতিসিক্ত সে বটগাছ, দীর্ঘদিন ধরে মৃতদেহগুলির পচমান গন্ধে অশুচি বোধ করে স্নিগ্ধ হতে রইলো।

তারপর, মৃত্যুর নিষ্ফল প্রয়াসের ওপর জীবনের জয় বে সত্য এই কথা পুনর্বীর মনে হলো তার হুইটি বর্ষার ঋতু শেষ হলো। তখন সে গভীর তৃষ্ণায় মাটির নিচে তার নতুন নতুন শিকড় চালিয়ে দিলো এবং সূর্যের দিকে অসীম আগ্রহে কিছু নতুন ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুর গন্ধ ছাড়িয়ে ওপর দিকে মাথা তুললো। এই ভাবে সে মাটির গভীর থেকে প্রাণরস এবং সূর্য থেকে উত্তাপ ও শক্তি আহরণ করতে চাইল। এবং এই ভাবে, উত্তাপ ও রস আহরণ করে সে গভীর বৃক্ষের সে বিভীষিকা বিমুक्त হতে চাইলো। সে এমন পরিপূর্ণ এবং জীবনপ্রেমী ভাবে বাঁচতে চাইলো, যাতে তার এই ভয়ঙ্কর নরকের দুঃখপূর্ণ কথা মনে না থাকে। সে ভুলতে চাইলো, হুইটি পরম্পর-বিষেবী জাতির পরম্পরকে না জানবার ও না বুঝবার জন্ত এই নির্বোধ সংঘর্ষের কথা—এবং সে বাঁচতে চাইলো সেই দিনের জন্ত, যখন এই নির্বোধ রক্তাক্ত অধ্যায়ের কথা গল্পকথা হয়ে যাবে এবং যুদ্ধ করে নয়, হত্যা করে নয়—পরম্পরকে জানবার বুঝবার ও ভালোবাসবার তাগিদে পৃথিবীর লবল মানুষ পরম্পরের অন্তদের আরো কাছাকাছি আসবে। হয়তো সেদিন সূর্য—তবু—বটগাছটা জানলো, যে তার শিকড়, ঝরি ও ডালপালা পাতার মধ্যে অপেক্ষা করবার ধৈর্য আছে।

গাছটা এই সব কথা ভাবতে বহু দিন ব্যস্ত থাকলো, তার মধ্যেই শীত পড়লো। উত্তরদেশ থেকে মৌসুমী পাখীরা উড়ে এসে তার ডালে বসে নিশ্চিন্তে নীড় বচনায় ও সজিনীর দেহের উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। শীতের টানে নদীতে জল শুকোলে—ওপারের বন থেকে হরিণ ও হরিণী এসে নিশ্চিন্তে তার গোড়া থেকে সতেজ ঘাস খেতে ব্যাপৃত হলো। বহুদূর ও একান্ত নিকট থেকে আরো পাখী এলো—কাঠবিড়ালীরা ত্রস্তভাবে বটফল আহরণ কবে শীতের সঙ্কটে ব্যস্ত হলো—গাছের গোড়ার গর্তে এবারও একজোড়া গোথরো সাপকে দেখা গেল, বোঝা গেল শীতকালটা তারা ঐ গর্তের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে ঘুনোবে।

এমনি করে চারিদিকে শুধু জীবন সৃজন এবং বাঁচবার কাজই চললো। মৃত্যুর গন্ধ সে পরিবেশ থেকে তখনই কেটে যাচ্ছে। জীর্ণ হয়ে থসে যাচ্ছে মৃত্যুর প্রভাব।

সমাপ্ত

মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)		ভারতবর্ষে	
বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ২৪	প্রতি সংখ্যা ১.২৫	
বাগ্মাসিক "	— ১২	বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ১.৭৫
প্রতি সংখ্যা "	— ২	পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)	
		বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ	— ২১
(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	— ১৫	বাগ্মাসিক " " "	— ১০.৫০
" বাগ্মাসিক সডাক	— ৭.৫০	বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	— ১.৭৫

মাসিক বসুমতী কিস্তুন ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● আপনারকে কিসতে আর পড়তে বসুন ●



বিদ্যাসিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]
নীলদরশন দাশগুপ্ত

নয়

পরের দিন ভোরবেলা চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল—কে যেন তীব্র কশাঘাত করল মনের উপরে। ঘুম ভেঙ্গে, কি যে হল—হু এক মিনিট কিছুই যেন বুঝতে পারলাম না। সহসা মনে পড়ল মালিন। মালিন মিথ্যাবাদিনী? মালিন অবিধাসিনী?

একবার পাশে চেয়ে দেখলাম মালিন চিৎ হয়ে চূপ করে শুয়ে আছে, চোখ দুটি খোলা, একদৃষ্টে চেয়ে আছে ছাদের দিকে নিজের ভাবে তন্নয়। চোখ ফিরিয়ে নিলাম—চাইতে ইচ্ছে করল না।

ক্রমে মন জুড়ে বসল ভায়লেটের কথাগুলি—আপনি আমাদের দেশের মেয়েচরিত্র কিছুই বোঝেন না, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অল্প প্রেমিক থাকে স্বাভাবিক—স্ত্রী যদি স্তম্ভরী হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। ভায়লেটকে কি ভগবান পাঠিয়েছেন আমার চোখ খুলে দেওয়ার জন্য? সত্যিই কি আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম?

যখন অসহ্য হল, তখন মনকে নানা দিক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। জীবনে মালিনের প্রেম নিবেদনের নানা মধুর রূপ বাবে বাবে কল্পনা করে মনকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। মালিনের নানা কথা একে একে মনে হতে লাগল। 'এইত সেই দিনও বলেছে—বিকো! বিকো! তুমিই যে আমার একান্ত আশ্রয়, তাই আমাকে ভুল বুঝ না। 'লু'র কথা মনে হল। গ্রেসের কথার আলোচনায় বলেছিল—আমি তা পারব না। তাহলে তোমারও যে মুখ পুড়বে, তা আমি কিছুতেই সহিতে পারব না। এইরকম টুকরো টুকরো অনেক কথা মনে হল। সবই অভিনয়? না—না। অভিনয় নয়—কেমন যেন অসম্ভব বলে মনে হল।

'লু'তে মালিনের আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল—জীবনে ভুল বোঝাবুঝি বলে একটা কুংসিত ব্যাধি আছে, জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। মনকে বোঝালাম তাই হয়েছে। একটা কিছু ভুল বোঝাবুঝিই হয়েছে—হয়ইত এরকম জীবনে। সময়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনের সেই নিদারুণ ব্যথা একটু শান্তও হল। কিন্তু আবার মনটা যেন হঠাৎ চমকে উঠল।

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। আর শুয়ে থাকা সম্ভব

হল না। মালিন আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে, পরিষ্কার মিথ্যা কথা যে—কেন?

তৈরী হয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে দেখি মালিন ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে আছে, আমার ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে নিয়ে। কোনও কথা বলার ইচ্ছে হল না। মালিনও চূপ করেই বসে রইল—সেই গম্ভীর বিষণ্ণ চোখ। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাকে আর একখানা টোষ্ট দেব? সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলাম, না।

ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে গেলাম সার্জারীতে। অল্প দিনের চেয়ে অনেক সকালেই রওয়ানা হলাম।

সার্জারীতে ঢুকতেই ভায়লেটের সঙ্গে দেখা হল। ভায়লেট যেন একটু অবাক হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে—এত সকালে ত সার্জারীতে কোনও দিন আসি না। ভায়লেটের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। সহজেই টের পেলাম—তার প্রতি কেমন যেন একটা বিরাগে মনটা উঠেছে ভরে। ও যেন একটা অভিলাষের মতন এসেছে আমার জীবনে। না এলেই যেন ভাল হত। কিন্তু কেন? যুক্তিসঙ্গত কারণ ত কিছু নাই। তবুও, ওর মুখের দিকে চাইতে ইচ্ছে করল না। ঈর্ষ মাথা হুলিয়ে তার গম্ভীরতার জবাব দিয়ে গম্ভীরভাবে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

কোনও রকমে রোগী দেখার পর্ক শেষ করলাম। এখন কি করি? ভায়লেট এখনি 'চা' নিয়ে ঘরে ঢুকবে—তার সঙ্গে চা খেতে খেতে কোন কথা বলার ইচ্ছে আমার আদৌ নাই অথচ এখনি বাড়ী ফিরে যেতেও চাইনা। ভাবছি, এমন সময়ে ভায়লেট 'চা' নিয়ে ঢুকল ঘরে। যেমন রোজই করে—চা তৈরী করে আমাকে দিয়ে নিজেও এক পেয়লা চা নিয়ে বসল।

একটু চূপ করে থেকে শুধাল, আপনার শরীরটা আজ ভাল নাই বুঝি?

গম্ভীর ভাবে বললাম, আমি ভালই আছি।

না—না। কিছুতেই ভায়লেটকে আমার মনের কথা টের পেতে দেওয়া হবে না। সহজ ভাবে একটা কিছু বলা দরকার।

বললাম তোমার সেই কথাটা—সেই ম্যানচেষ্টারে গিয়ে প্র্যাকটিক করার কথা—প্রায়ই ভাবি। শুধাল, মিসেস চাউডুরী রাজী হয়েছেন ?

বললাম, তাঁর অরাজী হওয়ার কি আছে ?

বলল, শুনে অত্যন্ত খুসী হলাম।

কথাটা কেমন বেন ভাল লাগল না। স্ত্রী স্বামীর উন্নতির পথ সমর্থন করবে—এইটাই ত স্বাভাবিক। তাতে বিশেষ করে খুসী হওয়ার কি আছে ?

তবে কি ভারলেট মালিনকে স্বাভাবিক মনে করে না ?

তীক্ষ্ণ ভাবে শুধালাম, কেন ? খুসী হওয়ার কি আছে ?

ভারলেট মাথা নীচু করে বলল, সব স্ত্রী ত সমান হয় না।

আবার। আবার স্নক হল ঐ ধরণের কথা। অসহ হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম, থাক। ও-সব আলোচনার এখন সময় নয়। আমি এখন যাই। বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলাম।

* * * *

সেই সময় ৫৭টা দিন, আমার মনের দিক দিয়ে যে কি ভাবে কেটেছিল, বলা ! বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন নাই, কল্পনা করে নিও। দুটো কি চারটে কথা ছাড়া বাড়ীতে মালিনের সঙ্গে আমার কথাবার্তা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। আমিও বলি না এবং মালিনও জিনিষটাকে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সহজ করার কোনও চেষ্টাই করে না। সেই গভীর বিষণ্ণ ধরণ। এক একবার মনে হয়েছিল—কথাটা মালিনের সঙ্গে পরিষ্কার করে নিলেই হয়, সোজা জিজ্ঞাসা করি না কেন, কেন সে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। সত্য যাই হোক, সহজ ভাবে তার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি আমার থাকে উচিত। কিন্তু মালিনের ধরণ-ধরণে সে প্রবৃত্তি হয় না—তারই ত উচিত এগিয়ে এসে আমার কাছে সত্য কথা বলে সব পরিষ্কার করে ফেলা। পারে না যে, তার কারণ কি—সত্যই অবৈধ প্রণয় ? বৃকের মধ্যে আবার অগ্নিশিখা জ্বলে।

এই সময় একদিন সুধাকে স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নটা আজও পরিষ্কার মনে আছে এবং তোমাকে বলি।

সেই বেন তোমাদের কলকাতার বাড়ী। আমি ত সে বয়সে খুব আড্ডাবাজ লোক ছিলাম—একদিন ক্লাবে তাস খেলে বাড়ী ফিরে আসতে আমার বেন অনেক রাত হয়ে গেল। বোধ হয় রাত প্রায় একটা বাজে। সেই তিন তলায় ত আমাদের শোবার ঘর ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি—সুধা ঘরের মেঝের এক কোণে আঁচল পেতে ঘুমুচ্ছে, ঘরে আমার খাবার ঢাকা। সুধাকে ডাকলাম, জবাব দিল না। কাছে গিয়ে আদর করে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম। জবাব নাই। ক্রমে আমারও বেন রাগ হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে গেল। কৈ, সুধা ত বিছানায় নাই ! বিছানার পাশে কেউ শুয়েছে বলেও মনে হল না। সুধাকে ডাকলাম, ঘরেও সুধা নাই। সমস্ত বাড়ী বেন খুঁজে বেড়ালাম—বাড়ীতেও সুধা নাই। তার পর বেন কত মাঠ কত পথ সুধাকে খুঁজে বেড়ালাম—সুধা নাই। তার পর বেন ডিউটিনের মাঠে মাঠে, সেই ডিউটিনের চার্কে, সুধাকে খুঁজে বেড়ালাম—সুধা নাই। সুধা !

সুধা ! ডেকে কোনও সাড়া পেলাম না। জীবনে সে বেন হারিয়ে গেল। বৃকের মধ্যে একটা অসহনীয় বেদনায় ভোরবেলা গট করে ঘুম গেল ভেঙ্গে।

মনটা কিছুক্ষণ ভরে রইল সুধাকে নিয়ে। ক্রমে মনে পড়ল বর্তমান জীবনের অশান্তির কথা। আজ যে জীবনে এই অশান্তি—এ কি অবহেলায় সুধাকে হারিয়ে ফেলার অভিলাষ ?

* * * *

তারপর দু'চার দিন সুধার কথা প্রায়ই মনে হতে লাগল। মনে হল—আজ মালিনকে নিয়ে এই অশান্তি এ বেন আমার জাঘা পাওনা। জীবনে সুধার ধার ত আমাকে শোধ করতেই হবে। কিন্তু তাতেই বা মনে সান্তনা পাই কই ?

যাই হোক, এই ডাবে ১০।১২ দিন কাটার পর একদিন মন বেশ স্নান্ত হয়ে আপনা থেকেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ওষুধ মন নিজেই নিল যোগাড় করে।

ভোর হতে না হতে ইদানীং যোজ্জই খুম ভেঙ্গে যায়—মনটা ভরে ওঠে একটা অশান্তিতে। কিন্তু সেদিন ঘুমটা ভালল না। ভালল না বললে ঠিক কথাটা বলা হবে না—ঘুমটা পাতলা হয়ে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রইলাম শুয়ে। তার মধ্যেই বেশ মমে আছে, মনটা ভরে উঠল একটা বেদনায়—মালিন মিথ্যা কথা বলল কেন ? তবে কি ?

কিন্তু আশ্চর্য ! সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মনের ভিতর থেকে বেন সাড়া পেলাম—মিথ্যা কথা বলেছে কে বলল ? মিথ্যা নাও হতে পারে। হয়ত মালিন বোলাগুকে দেখেনি। বোলাগু হয়ত বাড়ীতে ঢোকেনি। ঢুকবে ভেবেছিল কিন্তু হয়ত অসময়ে মালিনের সঙ্গে দেখা করাটা ঠিক হবে না মনে করে দরজার কাছ থেকেই গেল ফিরে। আমি যে সদর দরজা খুলে বেরুতে দেখেছিলাম—হয়ত আমার ভুল, আমি ত ফটকের কাছ থেকে দেখেছিলাম। তা আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল কেন ? সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে সাড়া উঠল—আমাকে হয়ত দেখেনি, আমি ত অন্ধকারে ফটকের কাছে ছিলাম। হয়ত তার গাড়ী অল্প ফটকের দিকে ছিল। সেই দিক দিয়েই ত ম্যানচেষ্টারে যাওয়ার একটা যোজ্জা রাস্তা আছে।

বুলা ! আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। সেদিন উঠলাম অনেক বেলা করে।

সকালবেলা তৈরী হয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে দেখি—মালিন আমার জন্ত বসে আছে। আমার দিকে চেয়ে মুহূ হেসে বলল, আজ অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমুলে।

মালিনের মুখের এই মুহূ হাসি বেন অনেক দিন দেখিনি। আমিও মুহূ হেসে মালিনের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, হ্যা। আজ সকালবেলা ঘুম বেন ছাড়ছিল না। তা তুমি কখন উঠেছ ?

বলল, আমার ভোর হতে না হতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আর কিছুতেই ঘুম হয় না।

* * * *

এর পর থেকে মালিনের প্রতি মনোভাব ক্রমেই সহজ হয়ে গেল। যত দিন যায় ততই সেদিন সন্ধ্যাবেলার ব্যাপারটা তুচ্ছ ও ছোট বলে মনে হতে লাগল। ক্রমে একটা লজ্জা এল ভাবতে, এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে মালিনকে আমি কি যা-তাই না ভেবেছি।

মাগিক কুম্ভভী—বৈশাখ



লক্ষ্মীবিলাস

তৈল

এম. এল. কুম্ভ স্ট্যান্ড কোং প্রাইভেট লি:
লক্ষীবিলাস হাট, কলিকাতা-৯

ক্রমে মনে হল মার্গিনকে সমস্ত ব্যাপারটা বলে কথাটা পরিষ্কার করে নিই। কিছু বলি বলি করেও বলা হয়ে উঠত না। বলতে গেলেই বাধত, একদিন কথাটা স্মরণ করলাম—জান লীনা, সার আর্থার একদিন এসেছিলেন।

একটু যেন অবাক হয়ে শুধাল, কবে?

বললাম, এই কয়েক দিন আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা।

শুধাল, কোথায়? তোমার সার্জারীতে?

এত সহজ ভাবে কথাটা জিজ্ঞাসা করল যে মার্গিন সেদিন রোলাণ্ডকে দেখেনি, সে বিষয় আমার মনে আর সন্দেহের লেশ মাত্র রইল না।

হেসে বললাম, না—এই বাড়ীতেই। আমি সার্জারী থেকে ফিরে আসতে দেখলাম, অল্প গোট দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

মার্গিন চূপ করে গম্ভীর হয়ে গেল, কোনও কথা বলল না।

একটু চূপ করে থেকে শুধালাম, তা এসে ওরকম করে চলে গেলেন কেন? দেখা না করে?

সংক্ষেপে উত্তর দিল, জানি না।

আর কিছু কথা হল না। বাই হোক, এদিক দিয়ে মনটা বখন সহজ হয়ে গেছে—এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে মন সঙ্কুচিত হল। মনে হল রোলাণ্ডকে নিয়ে আর কোনও কথা না বলাই ভাল।

আমার মনের গ্লানি আর নাই বটে, মার্গিনের দিক দিয়ে কিছু বিশেষ কিছু ভাবাস্তর হল না। কথাবার্তা অনেকটা সহজ হলেও সেই গম্ভীর বিষয় অগ্ৰমনস্থ ধরণ। ভাবলাম, বাই হোক, আমার ব্যবহারের একটা আঘাত ত পেয়েছে মনে। বড় কোমল প্রাণ মার্গিনের যে, সামলে উঠতে হয়ত একটু দেরী হবে।

ভায়লেটের প্রতি কিছু আমার মনোভাব ঠিক সহজ হল না। তার প্রতি একটা মানসিক বিরাগ রয়েই গেল। কেন? বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার ব্যাপারটা দেখে, তা নিয়ে এই যে ক'দিন একটা মানসিক আলোড়ন চলল, এর জন্য কি ভায়লেটকেই আমি মনে মনে দায়ী করেছিলাম? ঠিক বলতে পারি না। ফলে, ভায়লেটকে কথায়-বার্তায় সুবিধে গেলেই একটু খোঁচা দেওয়ার প্রবৃত্তি মনে জেগে উঠতে লাগল।

এই সময় একদিন মিঃ ও মিসেস প্যান আমার সার্জারী থেকে শেষ বিদায় নিয়ে গেল। আমার চিকিৎসায় মিঃ প্যান সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছে—আর চিকিৎসায় দরকার নাই। মিসেস প্যান কি কৃতজ্ঞ! মুখে মিষ্টি হাসি মাখিয়ে বাবে বাবে আমাকে মনের গম্ভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে যেন তার ক্লাস্তি নাই এবং তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব যে এতটুকুও ছিল না—একথা আমি জোর করে বলতে পারি। চীনে মুখে পিট পিট করে চেয়ে এবং মুহু মুহু হেসে মিঃ প্যানও বতটা সম্ভব তার প্রাণের অভিনন্দন জানিয়ে গেল এবং মিঃ প্যানের মুখের দিকে চেয়ে মনে হল—তার প্রাণের শান্তিতে আর যেন কোনও ভেজাল নাই। আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহা আনন্দে হাত ধরাধরি করে দুজনে আমার ঘর থেকে গেল বেরিয়ে।

সেদিন বোগী দেখার পরে 'চা' খেতে খেতে ভায়লেটকে বললাম, দেখ ভায়লেট! তোমারই ভুল।

মিসেস প্যানের অল্প প্রেমিক আছে, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

ঠোটের উপর একটু মুহু হাসি খেলে গেল—আমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

মুখে বলল, হবে।

একটু দৃঢ়ত্বেরে বললাম, তুমি যে ওর অল্প প্রেমিক দেখছ সেটা তোমারই দৃষ্টিভঙ্গির দোষ।

গম্ভীর ভাবে বলল, হতে পারে।

বললাম, হতে পারে না—নিশ্চয়ই। এই ক'দিন ধরে ওদের দুজনার মধ্যে যে ভালবাসা লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে অল্প লোকের দাঁড়াবার জায়গা নেই।

ভায়লেট একটু চূপ করে রইল। তারপর একটু যেন জোরের সঙ্গে বলল, ভালবাসা জিনিষটাই আমি মানি না।

মুহু হেসে শুধালাম, কি রকম?

বলল, ওটা একটা ক্ষণিকের ব্যাপার। কোনও একটা বিশিষ্ট আবহাওয়ার তৈরী হয় এবং সে আবহাওয়াটা চলে গেলেই সরে যায়। কতকটা season flower এর মত।

একটু চূপ করে থেকে বললাম, হাজার হলেও তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আর কতটুকুই বা বোঝ।

একটু দৃঢ়ত্বেরে বলল, আমি যা বুঝি খুব কম লোকই তা বোঝে। মুহু হেসে একটু অবজ্ঞার সুরে বললাম, এই ব্যসেই এত বুঝে ফেললে?

বলল, হ্যাঁ বোঝাবুঝি নির্ভর করে অভিজ্ঞতার উপরে। ব্যসের উপর নয়।

হেসে উঠলাম। বললাম, তোমার আবার কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা হতে পারে?

সোজা চাইল আমার দিকে। বলল, শুনবেন আমার জীবনের কথা? আমার বলতে কোনও আপত্তি নাই।

বললাম, বেশ ত বল।

বলল, অনেক দিন থেকে ভেবেছি—আপনাকে বলব। কারণ আপনার প্রতি আমার একটা কল্পনা আছে, আপনি আমাদের দেশের জীবন কিছুই চেনেন না। অঙ্কের মতন একটা আদর্শের স্রোতে ভেসে চলেছেন, বোধ হয় আপনাদের দেশেরই আদর্শ।

একটু রাগ হল। বললাম, তা আমাকে বাদ দিয়েই কথাগুলি বল না।

বলল, কেন আপনাকে বলছি, সেইটেই জানিয়ে রাখলাম। আমাদের জীবনে বাইরের দিকটার একটা চাকচিক্যের বাহার আছে বটে কিন্তু উল্টো দিকটা বেশীর ভাগই কুৎসিত। সেদিকটার ধরন আপনি কিছুই রাখেন না।

একটু তীক্ষ্ণ সুরে বললাম, প্রয়োজন কি আমার সে সব ধরনে? সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে একটু চূপ করে থেকে বলল, জানেন, আমি কুমারী নই বিবাহিতা।

অবাক হলাম। শুধালাম, তুমি বিবাহিতা—সে কি?

বলল, বিবাহ আমার হয়েছিল—ডিভোর্স হয়ে গেছে।

শুধালাম, কি রকম?

বলল, তখন আমার বয়স ১৮.১৯ বৎসর। একটি সুদর্শন

যুবকের প্রেমে পড়ে আমি তখন হাবুডুডু খাচ্ছি, সেই বেন জীবনের একমাত্র আলো, সে নইলে আমার জীবনের সবই অন্ধকার, এইরকম একটা মনোভাব। সে শুধু দেখতেই ভাল ছিল না, কি মিষ্টি মার্জিত ধরণ-ধারণ ছিল তার—মুগ্ধ অল্প অনেক যুবকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি—তার বেন তুচ্ছনা ছিল না। সেও আমাকে দারুণ ভালবেসেছিল সে যুগে, একথাও আমি জোর করে বলতে পারি—একদিন আমাকে না দেখতে পেলে পাগলের মত হয়ে উঠত।

একটু চুপ করল। শুধালাম, তারপর ?

বলল, তারপর তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হল—হাতে বেন স্বর্গ পেলাম। বছর খানেক বেশ শান্তিতেই কাটল। আমরা ছিলাম লণ্ডনের বেজওয়াটারের দিকটার একটা বোর্ডিং-হাউসে একটা ঘর নিয়ে। বেশ বড় বোর্ডিং-হাউস। একই কম্পাউন্ডে তিনখানা বাড়ী—বিভিন্ন লোকজন বিভিন্ন ঘরে থাকে। মাঝের বাড়ীখানার তিনতলার উপরে ছিল আমাদের ঘর।

শুধালাম, বোর্ডিং-হাউসে ছিলে কেন ? একটা ছোটখাট বাড়ী বা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে পারতে ?

বলল, প্রথমতঃ নিজের সংসার নিজে গুছিয়ে করা মস্ত বড় হাজারি, আমার ঠিক আসে না। আর তাতে খরচাও বেশী। সামান্ত মাইনের একটা অপিসে কাজ করত সে। বোর্ডিং-হাউসে আমাদের কোনও রকমে যেত চলে।

বাই হোক—বলে যেতে লাগল।

বছর খানেক পরেই তার বিকৃত রূপটি চোখে পড়তে শুরু হল। সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে আর বেরুতে চাইত না—নানা ছুতোয় বেশীর ভাগ একলাই বেরুত এবং রাত্রে ফিরে আসত দুর্দান্ত মাতাল হয়ে। তারপর শুরু হল—আমার উপর কি অত্যাচার !

বললাম, দুঃখের কথা।

বলল, ক্রমে সে অত্যাচার কি রূপ নিল আপনি তা ধারণাও করতে পারবেন না। কিছুদিনের মধ্যে এমন হল আমাকে একবার না মারলে সে বেন সুস্থ হয়ে ঘুমুতে পারত না।

বললাম, নিশ্চয়ই তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে দিতে রাগিয়ে ?

জোরের সঙ্গে বলল, মোটেই নয়। ও মাতাল অবস্থায় ফিরে এলে আমি চুপচাপই থাকতাম—ওর কোনও কথায় প্রতিবাদ করতাম না। কতকটা অবশ্য ভয়ে। কিন্তু একটা না একটা ছুতো করে সে আমাকে প্রহার দেবেই। ক্রমে চাবুক এল। ক্রমে (মাথা নীচু করে একটু চুপ করে থেকে) আমার কাপড় সরিয়ে চাবুক মেরে বেন তার তৃপ্তি হত।

বললাম, লোকটা পাগল নাকি ?

বলল, না—স্যাডিস্ট (Sadist)। পরে বুঝতে পেরেছিলাম। মাতাল অবস্থায়ই সেই প্রবৃত্তি উঠত জেগে।

একটু ভেবে বললাম, তা হবে। বাই হোক, ডিভোর্স হয়ে বেঁচে গেছ তা হলে ?

বলল, আরও কথা আছে—শুধুন। একদিন ঐ অবস্থায় সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেশলাই ফুরিয়ে গেছে দেখে একটা কুৎসিত ভাবার আমাকে গালাগালি করে চাবুক দেখিয়ে বলল—বা, যেখান থেকে প্যারিস একটা দেশলাই নিয়ে আয়।

তখন রাত প্রায় বায়োটো—দোকান পঙ্গর সব বন্ধ। কোথায় দেশলাই পাই ? বললাম—এত রাত্রে দেশলাই কোথায় পাবি ? বলল কি জানেন ?

শুধালাম, কি ?

বলল, যেখান থেকে প্যারিস নিয়ে আয়—না হয় রাস্তার লোক জুটিয়ে নে—ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম—ওর হাত থেকে ত খানিকক্ষণ রেহাই পাওয়া যাবে। তারপর—চুপ করে গেল।

শুধালাম, তারপর কি ?

বলল, আমাদের বোর্ডিং-হাউসে একটা যুবক থাকত। সে আইনের ছাত্র ছিল। নাম গ্রাডিং। আমরা ত আমাদের কম্পাউন্ডের মাঝের ব্লকে থাকতাম। সে থাকত পাশের একটা ব্লকে, রাস্তার ধারেই, তিনতলার উপরে। তার আমার উপর একটু দৃষ্টি ছিল, সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম—সেটা বুঝতে মেয়েদের মোটেই দেয়ী হয় না। কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমি তাকে কোনও দিক দিয়ে এতটুকু আস্থা দিই নাই। তুল বুঝবেন না—তার কারণ এ নয় যে, আমার মনটা তখন আমার স্বামীতেই ভরপুর। সে ভাবটা তখন আমার অনেকটা কেটে গেছে। তার কারণ—লোকটিকে আমার পছন্দ হয়নি, কেমন বেন অতিরিক্ত রোগা, আলগা ধরণের গড়ন, চলতে ফিরতে বেন ভেঙ্গে পড়ে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তায় চলে এলাম। উপরের দিকে চেয়ে দেখি—গ্রাডিংয়ের ঘরে জানলার আলো দেখা যাচ্ছে। কি খেয়াল হল আমার জানি না, সোজা চলে গেলাম গ্রাডিংয়ের ঘরে। দরজায় করাঘাত করলাম। গ্রাডিং জেগেই ছিল। দরজা খুলে—এত রাত্রে আমাকে দেখে বিশ্বাস-উৎকল্ল হয়ে বেন ভেঙ্গে পড়ল। আমার পিঠে হাত দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল ঘরে।

চুপ করে রইল। কৌতুহল হয়েছিল।

শুধালাম, তারপর ?

বলে যেতে লাগল গ্রাডিংকে অবশ্য একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—দেশলাই আছে কি না। কিন্তু দেশলাই নিয়ে তখনই ঘরে ফেরার আমার ইচ্ছে ছিল না—জানি খানিকটা দেয়ী করে ফিরলে মাতাল অবস্থায় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে—আজকের রাতটা অন্ততঃ যাব বেঁচে। তাই সোজা গিয়ে গ্রাডিংয়ের বিছানায় সটান শুয়ে পড়লাম—গ্রাডিং এল পাশে—ক্রকুকিত করে বললাম, এত সহজে—

বলল, তাইত বলি, একটা আদর্শের শ্রোতে ভেসে যাচ্ছেন—চোখ চেয়ে জীবনটা দেখেন না।

বাই হোক বলে যেতে লাগল, এইবার আমার কাহিনী শেষ করি। রাত প্রায় ৩ টার সময় চুপি চুপি পা কলে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। বা আশা করেছিলাম—ঘুমিয়েই পড়েছে। কিন্তু কি দৃশ্য। সমস্ত শরীর মন ঘূণায় বী-বী করে উঠল। ঘরে আলো জ্বলছে, উগুড় হয়ে খাটের এক প্রান্তে আছে শুয়ে—একটা হাত ও একটা পা খাট থেকে বেরিয়ে মাটি ছুঁয়ে আছে, হাতের পাশে সিগারেটটা আছে পড়ে। মুখটা কাত হয়ে আছে খাটের কিনারায় ধাঁ করা ; কাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। বাগ ও ঘূণারই সংমিশ্রণের একটা কুৎসিত প্রলেপে কি বিকৃত রূপ নিয়েছে—আমি সেদিকে বেশীক্ষণ চাইতে পারলাম না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! এই জানোয়ারটাকে

সুপুরুষ ভেবে একদিন ভালবেসেছিলাম।
যর থেকে বেরিয়ে গেলাম।
আর তার সঙ্গে দেখা করিনি।

একটু চূপ করে থেকে বলল, জানেন—সেই থেকে কোনও
ইংরেজের মুখের দিকে আমি সন্দেহে চাইতে পারি না—তখনই
কল্পনার ভেসে ওঠে তার উন্টো দিকের কুংসিত রূপ, ঐরকম
জানোয়ারের মতন হয়ে থাক। শুধু তাই নয়, জীবনে সুন্দর
কিছু দেখলে আমি যেন তা বিশ্বাস করি না কিছুতেই—যেন সুস্থ
হই না বর্তকণ না তার কুংসিত রূপটি দেখতে পাই! কেননা,
কুংসিত রূপ তার অন্তরালে আছেই।

একটু চূপ করে থেকে বললাম, ভায়লেট! তোমার জন্ত আমি
অত্যন্ত গুণিত—জীবনে ঐ রকম একটা আঘাতে তোমার মনটা
কেঁকে গেছে—একটা ব্যাধির মতন। কিন্তু তুমি ত বুদ্ধিমতী মেয়ে,
ভেবে দেখ তোমার জীবনের এই একটা ব্যাপার নিয়েই সমস্ত জীবনটা
বিচার করা উচিত।

একটু উত্তেজিত ভাবে বলল, আমি যে দেখেছি—আমাদের
দেশের কুংসিত উন্টো রূপ, আমি অনেক দেখেছি। আমি যে
বোড়িয়ে থাকতাম, আমাদের মতন অনেক আমি জীবী
সেখানে থেকে বাইরের দিক দিয়ে সুখে শান্তিতে ঘরকরা
করত। কিন্তু স্বামীরা আপিসে চলে গেলে, দুপুরবেলা সেই
সব জীবীর নানা রকমের বিকৃত রূপ ত আমার চোখে
এড়ায়নি?

খড়ির দিকে চাইলাম—এ কি! একটা বেজে গেছে। উঠে
দাঁড়িয়ে বললাম, সে সব শোনার ইচ্ছেও আমার নাই। ভাল-বন্দ
জীবনে ছুই আছে—সব দেশেই। তোমার একান্ত হৃৎগাণ্ড, তোমার
চোখে খালি মন্দ দিকটাই পড়েছে।

বাওয়ার সময় মনে হল—ভায়লেটের চোখে যেন একটা অবজার
হাসি কুটে উঠেছে।

[ক্রমশঃ]

সে কি তুমি ?

নচিকেতা ভরদ্বাজ

কে শাড়ী পালটালো। তার বড় চোখে কচি নীল'বুম
ঘন কালো স্নিগ্ধ কেশে—কপালের নিটোল কুমকুম
এখন লেপুটে গেছে! মনে হয় রাত্রির আকাশ
সেখানে সে নিবিবিলি! নীলাভ নরম ধোঁপা

দূর দিগন্তের

এখন এলিয়ে পড়ে চোখের মুখের ক্লাস্তি

মুছে নিল; গভীর টোটে

বৃহহাসি—ধাঁকা চাঁদ! চারিদিকে নির্জন বাতাস
নদীতে চেউয়ের ঘরে বুম-পাড়ানিয়া গান। কাঁপে
অবশের ডালে ডালে শিশির জড়ানো পাতা। বুম
নকড়ে হাড়িয়ে গেছে—মুছে গেছে পা'র বুমবুম।

এখন ডেকে না তাকে। সারাদিন রোজের উত্তাপে
বুরে বুরে বড় ক্লাস্ত। চেউ-জল-নদী-পাখী-অরণ্য-পর্বত, পৃথিবী।
এখন বুরে বুরে—ঝবে পড়ে শান্তির শিশির।
আমরাও বুমোব তবে—আমরা যারা দিনে শ্রমজীবী
এনপবে পথ চলি—হুই হাতে ঠেলে ঠেলে এই সব প্রত্যাহের ভিড়।

ভোরে সে বেরিয়ে আসবে অরণ্যের অন্ধকার থেকে
আকাশের সিঁড়ি বেয়ে—মেঘের প্রাসাদে ফুলে বেখে
রাত্রির ক্লাস্তির সজ্জা। নীল শাড়ী রেশমী শরীর
জড়াবে সলজ্জ হাতে, সোনালী জরির কাজ করা
আঁকাবাঁকা পাড় পড়বে পায়ের কাছে : দিনের গভীরে
কী সুন্দর দেখাবে যে—আলো কাঁপা আকাশ অঙ্গুরা।

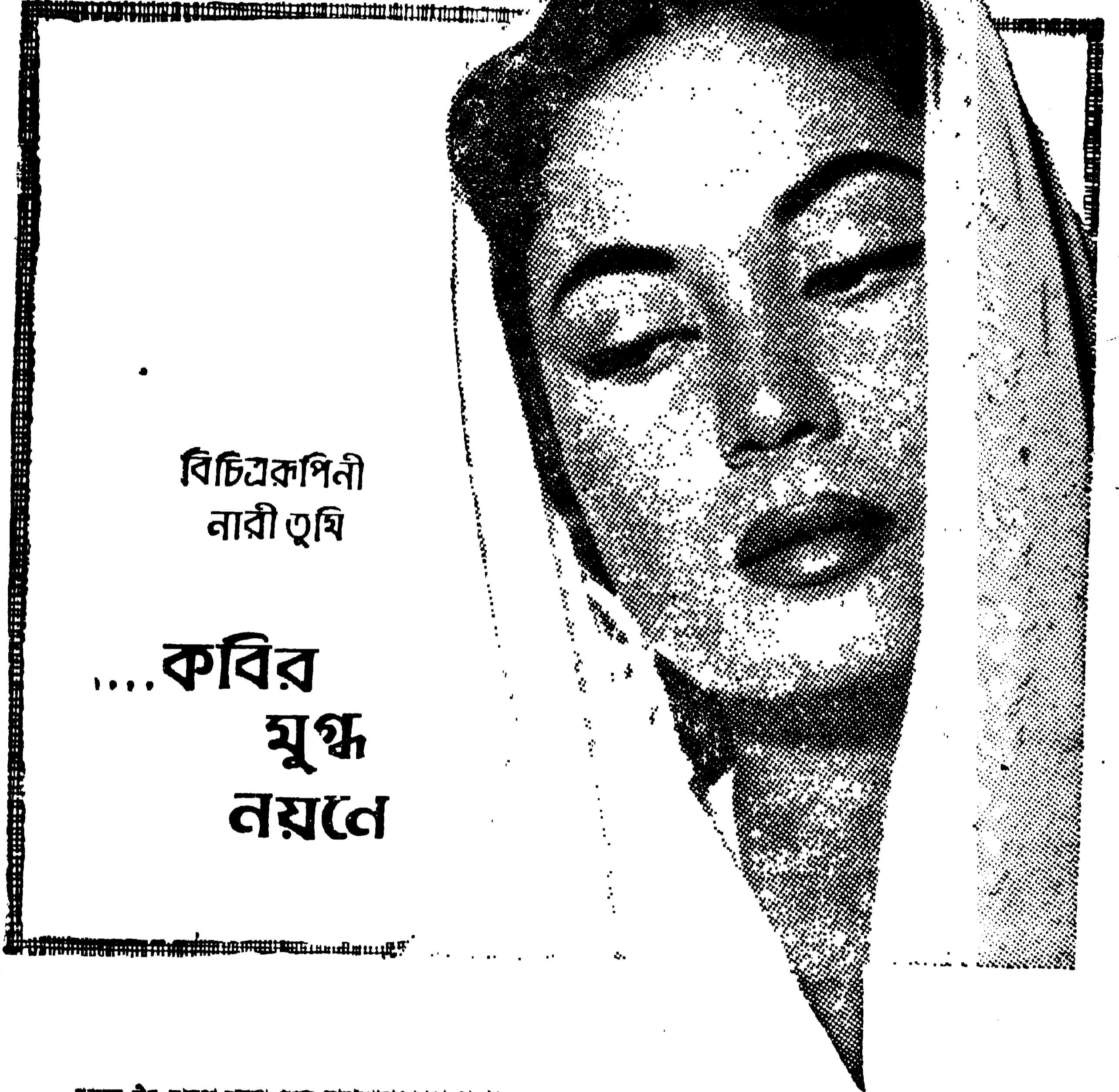
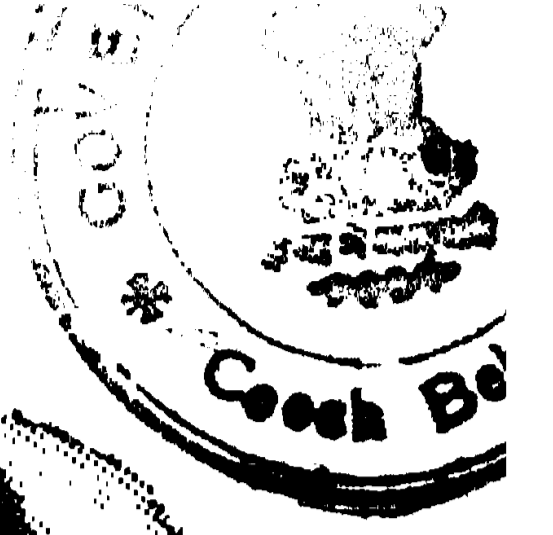
তার চোখে চেয়ে চেয়ে সারাদিন কাজ করে বাব
কঠিন শ্রমের শিল্পে নিজেকে ছড়িয়ে দেব। হয়তো কখন
ক্লাস্তি এলে, উজ্জ্বল আয়ত মুখে

আবার শান্তি কিরে পাব :

সোনালী নক্সাকাটা হাতে পিঠে কোমল গলায়
মেঘের ওপারে বুরে বুরে অরণ্যে এই মন
তখন প্রস্তুতি পাবে—ছোট ছোট কাজ করা নদীর আঁচলে।
সে কি তুমি—অথবা নক্সা-নদী পৃথিবীর পা'র
আবার প্রণাম রাধি—কাজ করি হেরকাস্তি হিরণ্য-প্রভার
নিজেকে নতুন করে চিনি আর বনুকর ভাসাই এ জলে ॥

মাসিক বসুমতী—বৈশাখ

মীনা কুমারী কামাল আমরোহীর 'পাকিমা' ছবিতে



বিচিত্রকপিনী
নারী তুঘি

...কবির
যুগ্ম
নয়নে

পরতের নীল আকাশে হালুকা মেঘের আনাগোনার মাঝে, হাজার
তারার ভীড়ে, এক ফালি চাঁদের এক ঝলক হাসির মতোই মিষ্টি মেঘের
মিষ্টি হাসি.....চাঁদের আলো হারিয়ে গেছে ঐ মেঘেরই রাসা রূপের
মাঝে.....রূপ, রূপ বে নারীর সব!

আর সে কথা চিত্রতারকা মীনা কুমারী ভাল করেই জানেন। জানেন
কলেই মীনা কুমারী বলেন, "অসংখ্য চিত্র তারকাদের মতো আমিও সুবাসভরা
লাগ্ন ব্যবহার করি। এর ফলের মতো নরম কেনার পরশ আমার
ছককে মুখী আর মোলায়েম করে।"

আপনার রূপও এমনটিই হবে—নিরমিত লাগ্ন ব্যবহার করুন!



চিত্র-তারকার
সৌন্দর্য্য
সাবান বিশুদ্ধ
শুভ্র লাগ্ন

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

L75. 43-X52 B0

কবি কর্ণপুর-বিরচিত আনন্দ-রসাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৫। বলরামের শ্রীমুখের বিশ্বস ও আনন্দ-হাস্য তখন চীৎকার দিয়ে বলছে—“দেখুন, দেখুন, আপনারা সকলেই দেখুন, অঙ্গন-স্নিগ্ধকে দেখুন, ঐ দেখা দিয়েছে আমার ভাইয়ার মণিময় অলঙ্কার; ভূজঙ্গটার পাতের কামড়টাতে লেগে রয়েছে বিবের ফুলিঙ্গ। তাদের সমস্ত চাকচিক্যই হার মানল গো হার মানল! হাঁ, বিক্রম বটে ভাইয়ার হাত দুখানার। ঐ দেখুন, যতই তাড়া খাচ্ছে সাপ, ততই শিথিল হয়ে যাচ্ছে তার ফণার চাপ। উকীলের পাশের কৌকড়ানো ভাঙা ভাঙা চুলগুলোও দেখা দিয়েছে। পীতবসন!..বনমালা! ওরে আমার শোভার ঘরের আলাল-দুলাল মূর্ত্তি যে। কোমর বেঁধে নেচে উঠেছেন...কালিয়ার ফণার চূড়ো...পদাঘাতের মুদ্রায়। ঐ দেখুন, পরিকরদেব সুখদর্শনের কুখা মিটিয়ে কৃষ্ণ আমার এসেছে, ফণার মণির তেজ শুচিয়ে কৃষ্ণ আমার নাচছে। নৃত্যোৎসবে বেড়ে উঠছে ওর অঙ্গের জ্যোতিঃ। কী প্রভা! ভয় পেয়েছে, ঐ যাঃ, নিবে গেল ফণার মণির আলোগুলো। কী আনন্দ, কী আনন্দ! আপনারা দেখুন, আমার তত্ত্বকথা বুঝুন, পরমানন্দের উদয় হয়েছে। এবার বিশ্বস্ত হোন বৈকল্য, এক-কল্যাণ নিরাময় হোন।”

শ্রীবলরামের এই অদ্ভুত হান্তরস-মিশ্র বাণীতে খণ্ডিত হয়ে গেল গোপ-পরিজনদের শোক। শ্রীতিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তাঁদের নয়ন। একদিকে যেমন তাঁরা দেখতে পেলেন তাঁদের নয়নানন্দ-বন্দ শ্রীকৃষ্ণকে, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা দেখতে পেলেন সেই ভয়ানককে, সেই অহীম্মকে। মনের মধ্যে তাঁদের যুগপৎ বিচিত্র রেখাপাত করতে লাগল...প্রবর্তমান আনন্দ ও ভয়।

২৬। তটস্থ হলেও এ যেন এক অতটস্থদের ছবি। অতি-যত্নতার মর্ম্মরিত হয়ে উঠল শ্রীকৃষ্ণের মতি। তাঁর ককণ-রসময় কটাক্ষের দেহে ভর করল কৃপা। কটাক্ষ-কৃপায় কৃতার্থ হয়ে গেলেন সকলে। নর, কিন্নর, সুর, সিদ্ধাদি সকলেই তাঁর নৃত্যভঙ্গি দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে উঠলেন সম্মানিত সাধুবাদে। মান বেড়ে গেল শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যশিল্পের। আনন্দ ভক্তদের উদ্ধারকর্ত্তা তখন হির করলেন ফণীর ফণার উপরেই তিনি নাচ দেখাবেন।

ততঃপর যেই তিনি নৃত্য-সহচর করে নিয়েছেন নিজের মনটিকে, অমনি অকস্মাৎ জ্ঞানোদয় হল দেবতাদের। মুহূর্ত্তে তাঁরা রচনা করে ফেললেন গর্ভব বিজ্ঞাধর অঙ্গরাদের এক রসিকগোষ্ঠী। নৃত্য-সাহায্য সম্পাদনার মধুর মধুর ধ্বনিত হয়ে উঠল মৃদঙ্গ, মৃদঙ্গ ও পণয়ের স্তব।

২৭। কিন্তু শ্রীভগবানের অনন্ত রহস্য বোঝা দায়। নিখিল কলার যিনি সৌভাগ্যবান, তিনি তখন কর্ণপ মার্গরীতি অবলম্বন করে আরম্ভ করে দিলেন দাক্ষিণাত্য প্রবন্ধ-বন্ধ। গর্ভবেরাও তাল দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ‘গুহ’ ‘লঘু’ ‘প্লুত’ ‘ক্রত’ ‘ক্রতর্ধ’ ও

‘বিরামে’র রমণীয়তার মাধুর্য দেখিয়ে এবং ‘সশব্দ’ ও ‘নিঃশব্দ’দি ভেদবিচারের চাতুর্য দেখিয়ে আনন্দোদ্ভূত হয়ে উঠলেন বরিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ তালধারীরা। চঞ্চল করপুটে তাল-মহিমা উদ্ঘাটন করলেন গর্ভবেরা।

“থৈয়া তথ তথ থৈয়া থৈ থৈ থৈয়া তথ থৈয়া”...

উচ্চৈঃস্বরে তালের পাঠ দিতে দিতে আনন্দের কুর্জিতে বাস্ত আরম্ভ করে দিলেন গর্ভবেরা। যখন উদ্ঘাটিত হল তালপাঠের শব্দগুলি, তখন মনে হল তথায় যেন পঠিত হচ্ছে চণ্ডবৃত্ত মঞ্জরীাদি—লক্ষণ গজ-পদ্মময়ী কাব্য (বিক্রম)। আর সেই তাল-পাঠের তথা-শব্দের ছন্দে তথা-নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। ফণীর এক ফণা থেকে ফণাভরে ছুটে চলল সেই নাচ।

এ নৃত্য-গীত তাঁর নিজের কল্পনা। শৈবী কৃষ্ণ নাচছেন। সে গতিরাগের অক্ষরূপ কি কখনও গাওয়া চলে গান, না বাজানো যায় বীণা, না তোলা যায় বোল? গর্ভবেরাও কি পারলেন? না।

ফণিপতির এক মাথা থেকে আর এক মাথায় একলা নেচে নেচে চললেন কৃষ্ণ। চন্দ্র-মুখে সমীরিত হোলো আক্লপ্ত শব্দমালা। পশ্চিম তাণ্ডবেশ নাচলেন, চরণকমলের আঘাত-ভঙ্গির প্রত্যেকটি আঘাতে শীর্ণ করে মুইয়ে দিলেন অহিরাজ কালিয়ার উন্নমস্ত ফণা...একটির পর একটি।

“জাং জাং জাং দৃমি দৃমি খোজ খোজ খোজ”

মুখ থেকে উত্তাল ছুটে চলেছে বোল আর পাঠের অক্ষরূপ বেগে কণিকায় নিদ্রয় আঘাতে হেনে চলেছে শ্রীকৃষ্ণের উদার শ্রীচরণের পদ। যিনি রজ ভঙ্গ রঙ্গী; মরি তার বালাই নিয়ে মরি।

২৮। শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় এই নৃত্যগতিবিশেষটির অক্ষরূপ করতে না পেরে লজ্জায় লীন হয়ে গেলেন ফাতর্গর্ভ গর্ভবগণ, অঙ্গরগণ। যত্ন করেও যখন সিদ্ধি লাভ হল না তখন তাঁরা বিপুল উৎকর্ষায় এবং বিপুল হর্ষে স্বতন্ত্র আরম্ভ করে দিলেন নৃত্য-গীত।

২৯। দিব্যালোকে তুলুল হয়ে উঠল হুল্লুতির হুঙ্কার, গভীর হয়ে উঠল ভেবীর ঘন ভাঙ্গার। আপনা হতেই স্তবন-মুগ্ধ হয়ে উঠলেন মুনিগণ, এবং বৃষ্টির মত অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল নন্দন-বনের ফুলদল। দিব্যালোকবাসীদের ও ঘোষবাসীদের যেমন বহু ভাবে বেড়ে যেতে লাগল প্রেমোদের পর প্রেমোদ, দেবদ্রোহীদেরও তেমনি বহু ভাবে বেড়ে যেতে লাগল উদ্বেগের পর উদ্বেগ। আর শ্রীবনমালীর তখন সে কী অপরূপ তাণ্ডব-চণ্ডিমা! নিদ্রয় পদাঘাতে খেদধির হয়ে যাচ্ছে সর্পরাজের প্রত্যেকটি ফণা, আর প্রত্যেক ফণা থেকে উছমিত হচ্ছে রক্তধারা, বঁকে ভেঙে যাচ্ছে চক্ষু, অতিশীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ফণার বিশালতা। সে কী আকুলতা, সে কী মিরমাণতা

সর্পরাজের! স্বদয় ভেঙ্গে গেল তাঁর মহিষীদের। পতির অবস্থা দেখে হৃদ থেকে তাঁরা বেরিয়ে এলেন সন্তানদের বৃকে নিয়ে। চাহনিত্তে ভগ্ন কাতরতা, গভীর মমতা। তাঁদের মন বলে উঠল—

“ভগবানের অমুগ্ধ হাড়া এখন আর স্বামীর নিরাসক নেই সৃতির।”

বিপুল ভাবনা তাঁদের ভাবিত করে তুলে। ভগবানের ভাবী অমুকম্পাই হল একমাত্র এই ভাবনার বিষয়। অমুকম্পা লাভই হয়ে দাঁড়াল তাঁদের অভিকাজকা। স্বদয়ক্ষেত্রেই যখন চমতে থাকে ছুনিবার শোক, তখন তার পক্ষে লজ্জা ত্যাগ স্বাভাবিক। অসংহিত লজ্জায় তাঁরা উপস্থিত হলেন ভগবানের সমীপে এবং স্তব করলেন শোক-কাতর কলমধুরতায়।

৩০। হে দেব, হে 'দেবঘটা-মুকুট মহামারকত, আপনার জয় হোক। আপনার পবে পরতত্ত্ব কিছু-নেই, আপনিই পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম এবং শিতিকঠের কাঠ আপনিই রত্নায়মান গুণত্বাকর। রত্নাকর-তনয়ার করলালিত আপনার পদকমলমধু মা-স স্মৃখে আশ্বাদন করতে করতে সুর্যোগী পরমহংসেরা পুরুষার্ধ-সার্ধযুখ্য মোক্ষকেও স্মৃখে পরিহারযোগ্য করে তোলেন...ক্ষীর ও নীরের সম্বন্ধে যেমন করে হংসেরা।

৩১। হে দেব, আপনার চরণে নতি স্বীকার করেছেন বেদ। আমাদের নিবেদনে কর্ণপাত করুন, আপনি সচ্চিদানন্দমনমূর্ত্তি, আপনি নিত্য নবীন, আপনার বিগ্রহ মাজেই সংস্রত হয় বিশ্বদানব। বাসুদেব-সম্বর্ষণ-প্রত্যক্ষ-অনিরুদ্ধ-নারায়ণ প্রমুখ নববাহের আপনি আত্মা। হে পরমপুরুষ, অপহার করুন রোষ।

৩২। অভিনব-প্রাণদাতা আপনিই বাসুদেব, নিখিল তাপ সম্বর্ষণ আপনিই সম্বর্ষণ; অখিল ঘোষবাসীদের প্রেমের পরা-ধন-মূর্ত্তি আপনিই প্রত্যক্ষ; আত্মমায়ায় যোগমায়ায় বিরুদ্ধ হলেও আপনিই অনিরুদ্ধ, এবং যেহেতু আপনি অখিল দেবআত্মা, সেই হেতু ব্রহ্মবাসীদের আপনি আত্মা। প্রসন্ন হোন, অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছেন কপিরাজ।

৩৩। আপনার যে চরণকমলের বন্দনা করেন সুরাসুরকিঙ্কর, নরঋষি এবং দেবর্ষিরা, যে চরণকমল থেকে রমণীয়তার সংযোজন হয় আত্মারামদের অন্তরে এবং হৃত হয় আধি...সেই সমাধিচূড়ভ চরণকমল আজ সকৌতুকে এবং অনায়াসে নৃত্যচ্ছলে বিচরণ করছে সর্পরাজের প্রতি কণায়। যিনি সেই চরণকমলের স্মৃখবন্ধন করছেন, সেই কপিপতির, স্বীকার করতেই হবে, এখনও নিঃসন্দেহে অবশিষ্ট রয়েছে কিছু স্মৃকৃতি, কিছু পরমভাগ্য।

৩৪। হে ত্রিগুণাতীত, ভবতাপহারী হলেও আপনিই স্বয়ং নিখিলের মনঃশোধনে সত্ত্বগুণের সাহায্যে প্রতিপালন করছেন এই ত্রিগুণকৃত প্রপঞ্চটিকে কপিবচ্চু চূর্ণের অমুকরণকারী রজোগুণের সাহায্যে স্রজন করছেন; নিবিড়নিখিলীনিগঞ্জী তমোগুণের সাহায্যে সংহার করছেন। হে মহাজ্ঞ, এক্ষেত্রে গরুড়াসন কমলাসন ও বৃহাসন...সেগুলি নাম মাত্র।

৩৫। গুণের তারতম্যেই জীবের তারতম্য হয়। হে নিখিলপ্রিয়, কোনো জীব, নিজের গুণের গুণ দোষ ত্যাগ করতে পারে না। ক্রোধোৎপন্ন তামসিকতার জন্ম হয়েছে কপিপতির, সেইজন্ম ধলতার প্রভাবে সেখানে সৌজন্ম পরিণত হয়েছে আকাঞ্চকুস্মে,

জনকল্যাণ হয়েছে কদর্ষিত, তাঁর পক্ষে সম্ভব ময় আপনার এই মারাটুকু কাটিয়ে ওঠা। বিবরবাসীদের মধ্যে এই রীতিই প্রচলিত।

৩৬। সেই হেতু বলছি, ইনি তো কোনো অপরাধ করেননি। আপনি অপার করুণ-রসের মণি, আপনার অমুকম্পা থাকলে উপেক্ষার যোগ্য কি কেউ হতে পারে? আপনি সমদর্শী, সর্ব পন্থাই আপনার কাছে সমান ও প্রচুর মঙ্গলময়। এই পায়ের জীবের প্রতি আন্তরিক কৃপা করুন, এর জীবন হরণ করা আপনার যোগ্য নয়।

৩৭। আপনি ভগবান। শিব ব্রহ্মা লক্ষ্মীদেবীরাও আপনার ভাগবত্তার জ্ঞানবিচার করতে পারেন না...স্বদয়ের সমস্ত অবধান শক্তির সমস্ত প্রয়োগ করেও পারেন না।

তামস প্রকৃতির অধিকারী চিরস্থায়ী চুই গর্কের মহিমায় পৃষ্টবুদ্ধি সেই কপিপতি কেমন করে বিচার করবেন আপনাকে? এ-ও কি সম্ভব?

৩৮। কপিরাজ মহাবলশালী, তবুও অভিভূত হয়ে পড়েছেন, সহ করতে পারছেন না আপনার হেলানুতোর গতিরাগ, টনটন করছেন বেদনার, স্বদয়ের মর্ম্মস্থলে ব্রাণংপতির মত খাস মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে তাঁর। অশিষ্ট হলেও উনি মহাপ্রাণ, হে দেব, বাতে উনি প্রাণে বাঁচেন, তার ব্যবস্থা আপনি করুন।

৩৯। ক্ষমা করুন ঈশ্বর অপরাধ। আমাদের বৈধব্য বেন না হয়। আমাদের দান করুন আমাদের স্বামীকে।

অহি-মহিলাদের এই অতিকাতর নিবেদন, অমুগ্ধ-ভিক্ষা ও হিতমধুর আলাপে বিচলিত হয়ে উঠলেন ভগবান। অমুগ্ধ প্রদর্শনের অভিজ্ঞাযে তিনি শিথিল করলেন তাঁর কৃত্রিম নিগ্রহ। বিগলিত হয়ে গেল রোষ, দয়ার উদ্ভেক হল। মনে আগল উদ্ধারের বাসনা। একটু হেসে মধুর চেয়েও মধুর বাক্যে বললেন—

৪০। ভয় করবেন না, মা ভৈঃ, প্রচুর হলেও, আমার এই অনির্কচনীয় ক্রোধ, আপনাদের বাণীতে শান্ত হয়েছে—মহানন্দ যেমন শান্ত হয় সলিলে। অতএব শুনুন—এই পরগ গোচরীভূত হবেন না সূত্যর। আমার এই ক্রীড়াহৃদ পরিত্যাগ করে আশা করি ইনি কিয়ে যাবেন, যেখান থেকে ইনি এসেছিলেন সেখানে, এবং আমার চরণচিহ্নের চাক শোভা চিঃসঙ্গিনী হয়ে থাকবে এর উত্তমাজে। সেটি দেখলে গরুড়ও একে দেবেন নিষ্কৃতি। জীভগবানের মুখনিঃসৃত এই পরমাখাস-বাণীতে অভয় পেলেন সর্পরাজ। একটি প্রচণ্ড লৌহভার বেন নেমে গেল। হঠাৎ অতি লঘু হয়ে গেল তাঁর হৃদয়। ভয়ে ভয়ে ভক্তিতে গর্কহীন শ্রদ্ধায় তিনি বললেন—

৪১। হে ভগবন্, ঐশ্বর্ষ-গরিমায় পৃথিবীতে আপনি আবির্ভূত হয়েছেন—সাধুদের জীবুদ্ধি ও অসাধুদের অভিভবের জন্ম, এবং ভাবী-ভক্তজনের মঙ্গল উৎপাদনের জন্ম। আচন্দ্র-সূর্য নিখিল জ্যোতিকমণ্ডলীর মনোবিনোদন, পরম অন্তরের দূরীকরণ ও প্রকাশ-সমূহের ক্ষুদ্র উদ্বেগ—আপনার কাম্য।

৪২। হে দৈবতোত্তম, দুর্দৈববশতঃ এখানে আপনার চরণকমলে নীতিবিগর্হিত কাজ করে ফেলেছি আমি। হে মকরবৃন্দ কুণ্ডল সেটিকে ক্ষমা করুন।

হে দরামন্দির, এই হৃদয়ের জল আপনারই ক্রীড়াযোগ্য। দূষণ করেছিলেম। আপনি দণ্ড দিয়েছেন, আমার সেই একই সময়ে এসেছে আপনার অমুকম্পা অমুগ্ধে। এ দয়া আপনি হাড়া আর

কে করে? কোণভরে আপনি নৃত্য করলেন, আর আমার প্রত্যেক কণায় চিরদিনের চিহ্ন রয়ে গেল সর্বমঙ্গলাসুন্দ লক্ষী-লালিত চরণ আপনার কমলের, অতএব হে বলাহুজ, হে রম্যরমণ, আমার নিবেদন, আপনার আজ্ঞা পেলেই আমি "রমণক"—দীপে বাজা করি।

এই বলে কনিপতি একখানি দিব্যাস্বর, শ্রেষ্ঠ মণিবাশির মধ্যে গণনীয় ও হিতবরূপ কৌন্তভমণি এবং একটি যুক্তাহার উপহার দিলেন শ্রীকৃষ্ণ চরণে, প্রণামান্তে সপরিষ্কার নিলেন বিদায়।

৪৩। কালিয়নাগ বিদায় নিতেই তৎক্ষণাৎ অমৃতবৎ অতি মধুর ও স্বাদুস্বাদু হয়ে গেল হৃদের জলবাশি।

ব্রজরাজকুমারের তখন কী অপরিণীম শোভা! বলয়োল্লসকের ও দিব্যাস্বরখানির জ্যোতিতে তখন লজ্জা পাচ্ছে বিহ্বল-বলয়। কুলে উত্তীর্ণ হয়েই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর পিতাকে, ... ভয়, কৌতুক, বিস্ময় ও আনন্দের যেন একটি সমুদ্র। দেখতে পেলেন মাতাকে। বস্ত্রা বহে গেল যেন আনন্দের। দেখতে পেলেন মাননীয় ঘোষকদের সমুদায়ের। নিকটে এসে সকলকে তিনি প্রণাম করলেন। প্রণামে প্রকাশ পেল অকপট পরমাদর।

পিতা নন্দ, মাতা যশোদা, তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। তাঁকে আলিঙ্গন দিলেন ব্রজের পুত্রদ্বীপা এবং পরম কুতূহলী হলী। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর প্রত্যেকটি সখাকে আলিঙ্গন করতে করতে এগিয়ে চলতে লাগলেন, তখন ঐ ষাঃ; সৃষ্টি হয়ে গেল আর একটি আমোদের জগৎ!

শ্রীকৃষ্ণ চলেন, আর তাঁর পানে মধুর-মধুর চাহনি হানেন পরমামুরাগিণী বধূরা ও কস্তারা, সে চাহনিত্তে যেন লেখা রয়েছে ষায় বত অমুরাগ তার তত ভাগ্যি। তাঁদের পানেও নয়ন হেনে চলেন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ চলেন আর তাঁর চিরতুষ্ট চিরবশ ধেমুগণ যেন ঐ একই ধারায় তাঁকে পান করতে থাকে—অক্ষয়জল নয়নপুট দিয়ে; যেন জ্ঞান করতে থাকে প্রফুল্ল নাসিকা উত্তোলন করে; যেন দ্রুত লেহন করতে থাকে রস—বিজয়শালী রসনা দিয়ে, এবং যেন গদগদ মধুর হাওয়ারবে সপ্রণয় প্রশ্ন করতে থাকে, সব কুশল ত?

৪৪। প্রত্যেক সখাটিকে নিয়ে আলিঙ্গনের আমোদপূর্ণ যখন শেষ হয়ে এল, তখন আমোদ-মত্ত বন্ধুদের আনন্দে আমোদিত ও ক্লান্ত হয়ে বিপ্রায় নিলেন শ্রীভগবান ব্রজবাস-রমণ। ব্রজরাজ শ্রীনন্দও তখন লক্ষ্য করলেন জরাজীর্ণ বাসস্থানির মতই অন্তর্গত-পথের পথিক হয়েছেন বাসরমণি। তাই, আজ আর বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিত হবে না... মনে মনে এই বিচার করে দেশকালোচিত জ্ঞায় তিনি নির্দেশ দিলেন—

আপনারা সকলেই দেখছেন... এগিয়ে আসছেন শরীরী। কল্প রীতির মতই তিনি বিষমবর্ণনা। তিনি ভ্রমোবহলা এবং উগ্রা। অতএব এই স্থানেই আমাদের পক্ষে বাস্তব্য করা বিধেয়। হৃদের তটভাগ এখন জ্বলনীয় হয়ে উঠেছে; বৎস শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণে খণ্ডিত হয়ে গেছে তার গরলানলমালা। হৃদের কুল এখন অধুকুল। এইখানেই বামিনী বাপন তাহলে স্থির করা হোলো।

ব্রজরাজের বাণীতে আনন্দিত হলেন সকলেই। বিশেষতঃ আনন্দিত হলেন অমুরাগিণীরা, মুন্ডা রমণীরা, এবং কস্তারা।

কারণ, মেঘেন্দ্রবর্ণ একটি সুন্দর-কান্তি কমণীয় কিশোরের বস্ত্রতম অভিলষনীয়তম দর্শন তো মিলবে, সুলভেই তো মিলবে, বাধা তো আর কেউ দিতে আসছে না। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও তো নির্বাণিত হবে একটি ঐ মন-শিরশিরে কুটকুটে উৎকর্ষ। ভাই হবে।

৪৫। শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যস্থলে রেখে তাঁকে ঘিরে বসলেন ব্রজরাজাদি সকলে। তার পরে বসলেন ব্রজবাণী। তার পরে সখীরা, মাতার নিকটস্থ কুমারীরা, শাণ্ডীর নিকটস্থ বধূরা। মণ্ডলের বাইরে বসলেন অপরাপর গোপেরা; গোপেদের বাইরে ধর্মুকাচারী রক্ষীগণ; রক্ষীদের বাইরে ধেমুগণ। ধেমুদের নিকটে রইলেন মহাবীর নবীন অস্ত্রধারীগণ।

৪৬। মণ্ডলীবাহু বচনা করে তাঁদের মধ্যে চলতে লাগল কালিয় মর্দন নিয়ে নানান খুঁটিনাটি কথা। ঘটনার বিচিত্রতা, বৈচিত্র্যের চাক্তা, চাক্তার গরিমায় নানান বিচিত্র কথা। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল অর্ধেক রাত, স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে নেমে এলেন নিদ্রাদেবী। কিন্তু দৈবের এমনি খেলা! সেই রসময় সময়ে যখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে অমুরাগের ইসারায় নিমেষ হারাচ্ছে বধুদের ও কুমারীদের নয়ন; যখন তাঁরা নির্বাধে অমুভব করছেন চাক্তা ও মানসিক সন্তোষ; চন্দ্রাবলী প্রভৃতি মুখ্যা সখীদের নয়নে যখন সীমা ছাড়িয়ে চলেছে নিভৃত উৎসব; তখন হৃজনের মধ্যে প্রেমের পূর্বাঙ্কুর জেগে উঠেছিল বলেই হোক অথবা আকস্মিক গুণভোগ বশত:ই হোক, বাধাকৃষ্ণের উত্তরেরই নয়নে এল দর্শনের লালসা, এবং লালসার সমরূপ সমুৎকর্ষ। কঠ তুলে কথা কইতে চাইল যেন আনন্দের নিবিড়তা। অকস্মাৎ হৃজনেরি মুখ হৃজনেরি দিকে ফিরল। অকস্মাৎ প্রকাশ পেল... চাতুর্যিক এক অক্ষিকমল-খেলা। সে খেলায়,—

বাধার দিঠি এগিয়ে আসে, আর কৃষ্ণের হুলে গুঠে দৃষ্টিপাত। খঞ্জন-পুচ্ছের আঘাত লেগে ও কি তবে কেঁপে উঠল পদ্মফুলের রাশ?

কৃষ্ণের দিঠি এগিয়ে আসে আর বাধার কটাক্ষ ঝিমিয়ে যায়। পদ্মফুলের আঘাত লেগে ও কি তবে ভেঙ্গে গেল রতিপতির নীলকমলী শব?

৪৭। মুর্ছা যায় যেন মূর্ত্তিমান একখানি মুহূর্ত্ত, মনের চোখে আঁধার নামিয়ে আনে অমুরাগ-ফুলের পবাগ। অমুভব করেন কৃষ্ণ, অমুভব করেন বাধা। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীদের স্বদয়েও অমুমান বলে গুঠে—বৃষভানুন্দিনীতে নতুন ভালবাসা দেখাছ কৃষ্ণের।

এমন সময়, কেউ কেউ তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, দু-একজন বা তখনও জেগে জেগে কৃষ্ণের কথাই কইছেন... হঠাৎ সমুখিত হল এক অগুণতীৎকার... সর্বনাশ হয়েছে সর্বনাশ।

৪৮। শোনা মাত্রই বিরাট বিহ্বলতায় নিজা হুলে শয্যা ত্যাগ করে উৎকর্ষ হয়ে লাকিয়ে উঠল ধেমুর দল। কি হয়েছে, কি হয়েছে প্রশ্ন করলেন আতঙ্কিত গোপ-প্রধানেরা। হঁ হঁ করতে করতে নিজা ছেড়ে লাকিয়ে উঠলেন নিজাধেরা। ভয়ে বিহ্বল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কুলবধূরা, কুলকস্তারা। এবং শ্রীব্রজপুরপুরন্দরনন্দনও তখন সপ্রণয় পাণ্ডীর্ষে সকলের প্রতি আখ্যাস বিতরণ করতে করতে বলে উঠলেন—



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিক্সে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটা কত সুখী, কত সন্তুষ্ট। কারণ ওর স্নেহময়ী মা ওকে নিয়মিত অষ্টারমিক্স খাওয়ান। অষ্টারমিক্স বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত খাদ্য। এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিক্স তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিক্স পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সব রকম তথ্যসম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়—“অষ্টারমিক্স”, P. O. Box No. 2257, কোলকাতা-১।

...মায়ের দুধেরই মতন

কার্যকর শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। দুই দেহগঠনের জন্য চার পাঁচ মাস বয়স থেকেই দুধের সঙ্গে কার্যকর খাওয়ানও প্রয়োজন। কার্যকর পুষ্টিকর শযাজাত খাদ্য-রাশী করতে হয়না—ওধু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চামচে করে খাওয়ান।



ভয় করবেন না, ভয় করবেন না। কিন্তু মা তৈজঃ তনুতেই মন থেকে তো আর এক মুহূর্তে মুছে কেলে দেওয়া যায় না হৃদয়িত্তা ? একদল তাই বলে উঠলেন—তবে কি তীর-পথ ধরে আবার কিরে আসছে কালিয় ?

আর একদল বললেন—নিশ্চয়ই তাই। অপমান বা সয়েছে তাতে তো প্রচণ্ড ক্রোধ হবারই কথা।

আর একদল বলে উঠলেন—না হে না, বুনো হাতীর দল বোধ হর কেনে কুটে আসছে। গণ্ড-শৈল বেয়ে মদযারা ঝরছে। গন্ধ পাচ্ছ না ?

৪১। তর্ক-বিতর্ক মধ্যপথে অকস্মাৎ ঘোষণা হল, দাবানল। দাবানল...নিবারণের উপায় নেই; নিজে যে বিনষ্ট হয়ে নিবে সাবে এমন লক্ষণও নেই।

উদ্বোধনার নিদাক্ষণ তার সম্ভ্রস্ত হয়ে উঠলেন ব্রজেশ্বর। সহসা তাঁর স্মৃতিপথে সমুদিত হল মহর্ষি গর্গের বাণী। অতএব কালবিলম্ব না করে কালিয়-মর্দন শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বললেন—রক্ষা কর বৎস, রক্ষা কর। একেবারে ব্রজভূমিকে দহন করতে করতে এগিয়ে আসছে আরণ্য মহাবহ্নি। নির্বাণের কোনো উপায় নেই। তুমি ছাড়া আর উপশম হবে না। এর ধ্বংসই আনবে কল্যাণ।

৫০। জনক, জননী, পরিজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই ব্যাকুল হয়ে চেয়ে রইলেন শ্রীকৃষ্ণের মুখের পানে। শ্রীমুখ থেকে শুধু বেবোল, ভয় করবেন না।

মা তৈজঃ বাণীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ। অস্ত্র বনে কলে উঠতে পারে দাবানল, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে কেমন করে সম্ভব হয় দাবানল ? সবই সম্ভব, যদি স্বয়ং প্রভাবিনী হন সর্ব-চমৎকারকারিনী লীলাশক্তি। তাই শ্রীমাতব এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন,—দাবানল। শুকনো গাছগুলোর সারা গায়ে আগুন লেগেছে। চট চট করে বিকট আওয়াজও হচ্ছে, কিন্তু গাছগুলো মরছে না, তাদের পাতাগুলো কেবল পুড়ছে; ছাই হয়ে বাচ্ছে চারদিকের ঘাস। ব্রহ্ম হয়ে উঠছে শুষ্ক রক্ত প্রভৃতি যুগকুল। তারা দৌড়ছে আর দেখছে...দূর থেকে দেখছে...দাবানলের শিখা লেহন করছে আকাশ।

৫১। দাবানল মর্দন করে শ্রীমাতব স্বগত চিন্তা করতে লাগলেন—ধূম-ধ্বজের মহাধূম আকাশ ছুঁয়েছে, নাথিয়ে আনছে

পাখীদের। বন্ধুরা ব্যথা পাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি ? করুণ...তরুশ্রেণীর এই পত্রহীন দশা। ভয়ে কান খাড়া করে খেজুর দল; ওদের আর্তধ্বনি বিদীর্ণ করছে কর্ণ। চতুর্দিকে রেখা, পক্ষিশ্রেণী অন্ধ হয়ে উড়ছে। ভীতিক্রমিত হরিণযুগ। কি করি ? মেঘ থেকে যে বৃষ্টি নামবে বা নদী থেকে জল তুটে আগুন নেবানো হবে এমন সম্ভাবনা নেই; দেশ কাল বিবে অবসর নেই আমাদের; অতএব...চিন্তা করতে করতে শ্রীভগ্ন অস্ত্র থেকে প্রাতুর্ভূতা হলেন এক অনির্করচনীয়া ঐশ্বরী শক্তি পলক ফেলতে না ফেলতে অগ্নিশিখাগুলিকে কেশগুচ্ছের মত করে পান্ন করে ফেললেন দাবানল।

৫২। দরিদ্রদের মনোরথের মত ভ্রম্মাতে না জ্ঞা প্রণষ্ট হয়ে গেল বন-বহ্নি, হতভাগ্যদের বৈতবোধের মত লাগতে না লাগতেই বিগলিত হয়ে গেল বন-বহ্নি। সে চি হল না বৈতব বহ্নির মত। অদৃশ্য হয়ে গেল স্বপ্নদৃষ্টের মত, মত, ষাটকরের মুখের ভাবার মত। লজ্জাজনক হয়ে উঠল সক বলাবলি করতে লাগলেন সকলে—কি আশ্চর্য, আমরা সত্যিই প্রেমন্ত হয়ে গিয়েছিলাম ? বন্ধুছিলাম...দাব দাবানল ?

৫৩। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এল। প্রস্থান ব বিভা-বদনীয়া বিভাবরী। ব্রহ্মপুত্রপুরন্দর শ্রীমন্নরাজের আর ধরে না। প্রেমার উদয়ের মত ব্রহ্মপুরকে প্রেমোদিত করতে, ব্রহ্মবাসীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। আর সাথে এলেন, যিনি তাঁর স্বজনকল্যাণ, যিনি তাঁর স্বকুলভূষণ, লীলার যিনি আধান, বহু শোভার যিনি নিধান, যিনি আ সার, যিনি সর্ব-সৌভাগ্যের মূল।

৫৪। ব্রজরাজ চলে গিয়েছিলেন ব্রজনগরী থেকে ; সারারাত ব্রজনগরীর দশা হয়েছিল প্রোবিতভর্তৃকার মত ব্যথার ব্রজরাজ যেই ফিরে এলেন, অমনি তিনিও ফিরে গেলেন তাঁর রা ক্তপরাগ। [ক্রম

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলাবিস্তারে

কালিয়দমনো নাম

নবমঃ স্তবকঃ

অভিযান

শ্রীতমোনাশ মুখোপাধ্যায়

আঁধারের পানে মোরা অভিযান করিয়াছি আলো নিয়ে,
আমুক বড়া প্রলয় তুফান ভয়াল জুকুটি নিয়ে।
ভরিব না মোরা দলে পিবে বাব বাধা-বিপত্তি সব,
আলোকের গান গাহিয়া চলিব এক হয়ে মোরা সব।
আঁধার রাজ্যে আলিব প্রদীপ কাঁপিয়ে সন্তয়ে কালো,
আলোর পরশে পালাবে সকল জঞ্জাল গ্লানি কালো।

হাল ছুনি আলয়া

আন্তোব মুখোপাধ্যায়

৭

শুধুর দোকানে ম্যানেজারের অভ্যর্থনা কি বকম হতে পারে
ধীরাপদ সেটা আঁচ করেই এসেছিল। পর পর ছ দিনের
সঞ্চিত রাগ তাঁর। ভিতর ভিতরে বেশ বৈধব্যচূত বলেই বাইরে
কিছুটা শান্ত দেখালো তাঁকে। ইন্সুল পালানো ছেলেকে আঁতোর
মধ্যে পেয়ে কড়া মাষ্টার খানিকক্ষণ নির্বিকার থেকে যে-ভাবে ছাত্রের
শকাটুকু উপভোগ করেন, অনেকটা তেমনি নির্বিকার। কিন্তু অপরাধী
ছাত্রের ভাব ভঙ্গীতে উঃ-ঐ ঠিকতোর আভাস পেলে কতক্ষণ আর বৈধব্য
থাকে? কর্মচারীদের এখানে বধেছ আনাগোনার নজির নেই,
খেচ্ছাচারিতার তুল্য অপরাধ সেটা।

ছ দিন বাদে এসেও বাবু একবার মুখ কাঁচু-মাঁচু করে সামনে এসে
দাঁড়াল না। প্রথম দিন না বলে কয়ে, ডিউটি কখন না জেনে চলে
বাওরাটাই বেশ একটা অপরাধ। গতকাল খোঁজ নিয়ে জেনেছেন,
ছপুয়ের দিকে একবার চুঁ দিয়ে চলে গেছে। তারপর আজকের এই
বেলা পাঁচটার হাজিরা। এখানে একসঙ্গে এতগুলো অপরাধের বিচার
এর আগে আর তাঁকে কখনো করতেও হয়নি বোধহয়। তার ওপর
কাউকে একটুও কথা না বলে চুপ চাপ ওই বেঞ্চিতে বসে থাকা।

তবু ম্যানেজারই ত্রুঙ্ক নয়, ধীরাপদের মনে হল তার আচরণে
কর্মচারীরাও বিস্মিত। রমেন হালদারের সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপে ওর
প্রতি নিবুঁদ্ধিতার অভিযোগ, কাছে এসে উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয়
বলে চাপা অস্বস্তি।

খদের বেশি ছিল না। আর একটু হালকা হতেই মুল-বপু
ম্যানেজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।—এই যে বাবু, আপনি এসে গেছেন
দেখছি। কাজ করবেন তা হলে?

এর পরেও উঠে না দাঁড়ানোটা ধীরাপদের ইচ্ছাকৃত নয়। মজার
আভাস পেলে মজা দেখাটা বহু কালের অভ্যাস। ঘুরে বসে নিরীহ
চোখ ছোটো তাঁর ব্যঙ্গ-ভঙ্গু ভারী মুখখানির ওপর স্থাপন করল শুধু।

খন মেঘের সঙ্গে বর্বানো ঠাণ্ডা হাওয়া বোগ হলে বা হয়।
ম্যানেজার ফেটে পড়লেন। কাঁচা-পাকা বাঁকড়া-চুল মাথাটা শূন্ডের
ওপর সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে ভাল চুকতে লাগল। গোল চোখ
ছোটো ডাবডেবিরে উঠল। এটা কোনো মাতুল সম্পর্কিত বিশ্বাসের
আয়না নয়, বেঞ্চিতে বসে দেখার জন্তে থিয়েটারের ট্রেজও নয়, এখানে
নিরম কাহন বলে কিছু কথা আছে, এখানে যদি বলে একটা
জিনিস আছে, এখানে ডিউটি বলে একটা কামেলা আছে, ওর

মত লোক দিয়ে এখানে কাজ চলবে না সেটা আজ তিনি স্পষ্ট
জানিয়ে দেবেন, বেঞ্চিতে বসে হাওয়া খেতে হলে গড়ের মাঠ এর
থেকে ভালো জায়গা—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আরো চলত হয়ত কিছুক্ষণ। কিন্তু ধীরাপদ এক কাণ্ড করে
বসল। এখানে ওর ছোর সবচেয়ে অস্বস্তিত বোঝের পতকালের
আশাস বা চাকরির কথাই প্রতিজ্ঞা কিনা নিজেও জানে না।
প্রথম পশনার পর দম নেবার জন্ত ম্যানেজার একটু খামতাই
হাত দিয়ে বেঞ্চির খালি জায়গাটা দেখিয়ে নিরবেস আপায়ন
জানালো, বসুন—।

ম্যানেজারের গোল চোখ ছোটো ওর মুখের ওপর থমকালো।
সেই চোখে কালোর থেকে শাদার অংশ বেশি। ওদিকে কর্মচারীদেরও
এক-একটা চকিত চাউনি।

সত্যিই জল্পলোক বসবেন আশা করে বসতে বলেনি ধীরাপদ।
যে জন্তে বলেছে তা সকস। বেশ ঠাণ্ডা অঞ্চ স্পষ্ট করেই বলল,
আমার কাজের জন্ত আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি এখানে বসে
নাটক দেখব, কি হাওয়া খাব, কি আর কিছু করব তার দায়ও
বোধহয় আপনার বাড়ি পড়বে না।

বলার ধরনে উদ্ভা না, বিজ্ঞপ না, বরং হালকা শ্রীতির সুরই
ছিল। তবু নির্বাক প্রতিজ্ঞাটুকু উপভোগ্য। ম্যানেজারের চুঁই
চোখের শাদা অংশ আরো একটু বিস্তারিত, কার ওপর কাঁপিয়ে
পড়েছিলেন সেই বিজ্ঞম আর সেই বিশ্লেষণ।

হঁস কিরতে স্বরিত প্রস্থান। একেবারে ডিসপেনসি কক্ষের
ওধারে। ব্যাপারটা ঠিকমত ভেবে দেখার জন্ত আড়াল দরকার
বোধহয়। খানিক বাদে কাজে বেরিয়ে এলেন যখন তখনো
গোটা মুখে আহত পাণ্ডীর। কর্মনিয়ন্ত্রণের স্বর ও সুর থমথমে
মুহ। কাজ চলছে। লোক আসছে, বাচ্ছে। তা সবেও
পরিবেশ আর জমজমাট নয় তেমন। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও একটা
নীলবতা খিতিরে আছে, যার দরুন খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে
না কেউ।

ধীরাপদও না। জল্পলোককে আনৌ অপদহ করার ইচ্ছে
ছিল না। লোকটি কাজ জানেন, নিজের কাজ ছাড়া অন্য সকলের
কাজ আদায় করাও কাজ তাঁর। দরদ দিয়ে দায়িত্ব পালন করেন
বলেই বেলাজ বিগড়েছিল। অবশ্য মেলাজ এমনতেই একটু
চড়া। কিন্তু তাঁর দিক থেকে বিচার করতে গেলে ধীরাপদ

অপরাধ ঘোষণাচারিতার পরীয়েই পড়ে বই কি। অথচ ওটুকু না বলে উপায়ও ছিল না, আশ্রয়কার তাগিদে বলা।

ম্যানেজার আপাতত এখানকার কত্রীটির আগমনের প্রতীকার আছেন বোধ হয়। সে আসার আগে বীরাপদ আজকের মত চাকরি-পর্ষ শেষ করে সরে পড়বে কিনা ভাবছে। সেদিন রাতে লাবণ্য সরকার তাঁর হাতে ওকে সঁপে দিয়েছিল সে কথা মনে হতে আবারও না বোকাপড়ার এগিয়ে আসেন ভুললোক।

আবারও এলেন বটে, তবে বোকাপড়া করতে নয়। দুখতার ওকনো আর বিষত। জানালেন, বড় সাহেব টেলিকোনে একুনি একবার ওকে বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন।

বড় সাহেব মানে হিমাংশু মিত্র। দোকানশুদ্ধ কর্তারীর কাছে এ-ধরনের আহ্বান অভিনব বিষয়। একটু আগেই ম্যানেজারের সঙ্গে যে বচন-বিনিময় হয়ে গেছে, তেমন চতুর হলে বীরাপদর এরপর সুখে নিস্পৃহ গাভীর্ষের পালিশ চড়িয়ে উঠে আসার কথা। তার বদলে ও নিজের হকচকিয়ে গেল।

একটা নীরব প্রহসনের মধ্যে নীরবে গাভ্রোখান।

বড় সাহেব ডাকলে ট্যান্ডিতে ছোট্টার রীতি জানে না, বীরাপদ ট্রামে উঠল। এই ডাকের পিছনে চাকরির তাগিদ বোধহয়। অমিতাভ ঘোষ বলে থাকতে পারে। বলবে বলেছিল। বীরাপদর হাসি পাচ্ছে। ভাত নাকি পেট খোঁজে না, ওর বেলায় তাই খুঁজছে বেন।

মান্কে নিচেই ছিল। এক গাল হেসে জোড়-হাত কপালে ঠেকিয়ে আনত হল। বাবু ভালো আছেন? চলুন, ওপরে চলুন, বড়সাহেব ঘরেই আছেন—আপনি এলে সটান নিরে বেতে বলেছেন।

বীরাপদ সিঁড়ির দিকে এগোলো। মান্কে সবিনয়ে অঙ্গুগামী। আপ্যায়নের বিনিময়ে একটা কুশল প্রেরণ করা উচিত, বীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, তুমি ভালো তো?

বিগলিত। হিচরণের 'আশীর্বাদে' ভালই বাবু। গলার ঘর নামল একটু। আপনি চল বেতে কেয়ার-টেক বাবু সেদিন আর আমাকে নিয়ে ষাঁটাবাঁটি করেনি, হোষ তো আসলে তেনারই আপনি এ-বাড়িতে থাকতে পারেন বলে তেনাকে সেদিন ঘাবড়ে দিতে বাসনা করে ছিলেন, তাই না বাবু? খুব জ্বক—

হি-হি শব্দে চাপা হাসি। বড়সাহেবের সামনে উপস্থিত হতে চলেছে মনে মনে সেই প্রস্তুতির একটু অবকাশও পেলনা বীরাপদ। বাসনা করা তনে হেসে কেলল। মান্কের এই কুর্তিও খুব স্বতোৎসাহিত মনে হল না। ও স্বার্থ কি 'বাসনা করেছে' এই স্বর প্রযোগেও মান্কের সেটুকুই উপলব্ধির চেষ্টা হয়ত।

ওপরে উঠে আজ আর বায়ে নয়, ডাইনের অন্দর মহলে এনে হাজির করা হল তাকে। একটা বড় ঘরের দোর গোড়ায় বিনয়-নম্র সূত্ৰিতে কেয়ার-টেক বাবু দাঁড়িয়ে। প্রথম তৎপর আহ্বান তারই। আগুন, সাহেব ভিতরে আছেন।

সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে এলো। অন্দর মহলের বসবার ঘর এটি। সেই ঘরের ভিতর দিয়ে আরো গোটা কতক ঘরের আভাস। একরে দানী সোকা সেটি, ডেক-চেয়ার, পুরু পদীর সাময়িক বিজ্ঞান শব্দা, কেয়ালে বড় বড় অহেল পেশি হবি।

হিমাংশু মিত্র ইজিচেয়ারে পা ছেড়ে দিয়ে খবরের দেখছিলেন। কাগজ সরালেন। বোসো।

ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর থেকে পাইপটা নিরে চাপলেন। কেয়ার-টেক বাবু জাড়াডাড়ি এগিয়ে এসে অগ্নিবোপ করে দিল। পাইপ ধরতে একবার তিনি তার তাকালেন শুধু। সেটুকুই নির্দেশ কিছু, সঙ্গে সঙ্গে কেয়া বাবুর প্রস্থান।

বীরাপদর অস্থি এক ধরনের, এইটুকু থেকে মনোভা: নিতে আর এ-রকম আত্মগত্যা রপ্ত হতে কতদিন লাগে?

ভূমি কাজের জন্ত খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ তনলাম...

অমিতাভ ঘোষ নয়, চাবি তাহলে চাকরি ঘুরিয়ে বীরাপদ নিরুত্তর। নীরবতা নিরাপদ।

কাজের জন্তে চিন্তা নেই—হিমাংশু মিত্র অত্যাৎসাহের রাশ ট মত করে বললেন, একবার কাজে লাগলে কাজের শেষ ে আমাদের মেডিক্যাল হোম, ক্যাট্টরী—সব দেখেছ?

বাড় নাড়ল, দেখেছে।

হিমাংশু মিত্র ভাবলেন একটু। ওর যোগ্যতার দিকটাই ৭ করার চেষ্টা সম্ভবত। এতদিন কি করেছে না করেছে আবারও প্রের হই একটা। কবিরাজি ওষুধ আর বইয়ের বিজ্ঞপন লিখে তনে হেসে মন্তব্য করলেন, ওই বিত্তে এখানেও কাজে লাগতে পা তবে তার জন্ত কিছু অভিজ্ঞতা আর কিছু পড়াশুনা দরকার।

এটা সেটা হুঁচর কথা আরো। কথা উপলক্ষ মাত্র। মো চশমার ওধার থেকে ঈবৎ কোঁড়ুক প্রচ্ছন্ন একটা বাচাইয়ের দৃ সরাসরি বীরাপদর সুখের ওপর পড়ে আছে সেই থেকে। শে জানালেন, মাসের এই বাকি যারো চৌদ্দদিন মেডিক্যাল হোমে বসতে হবে ওকে। সেখানে কিভাবে কাজ চলছে না চলছে স বুকে নেওয়া—ব্যবসা আর অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান হইই। এই ব্যাপা মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার লাবণ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা নির্দেশ। ওদিকটা মোটাশুটি জানা হয়ে গেলে আগামী মাসে গোড়া থেকে তাকে ক্যাট্টরীতে আনা হবে বলে আশ্বাস দিলেন আসল কাজ সেখানেই, তবু ব্যবসায়ের পোটা পরিস্থিতি চোখে ওপর থাকা দরকার।

লেবার নিরে মাথা ঘামিয়েছ কখনো? আই মিন, পার্টি-টার্টি করেছ?

বেন প্রের নয় কিছু, হঠাৎ মনে এলো। বীরাপদ মাথা নাড়ল, করেনি।

তাহলে কি আর করলে, কাজ না থাকলে ওটাই তো কাজ। পাইপ চাপা সুখে হাসির আভাস।—সব ক্যাট্টরীতেই কিছু না কিছু লেবার প্রবলেম লেগে থাকে...বাই দি বাই, প্রেসের সঙ্গে বোগীবোগ আছে?

কতবার বাড় নাড়বে বীরাপদ? প্রেসের কথায় প্রথমেই গুণ্ডার সুখখানা উকিছুঁকি দিল। নতুন পুরনো বইয়ের দোকানের দে-বাবুর প্রয়োজনে গুণ্ডাই বখেট সুকসি, কিন্তু এখানে তাঁর উদ্বোধও একেবারে নির্বোধের মত হবে। জবাব দিল, বোগীবোগ করে নিতে পারি।

কি করে? সঙ্গে সঙ্গে প্রের।

—কোম্পানীর নামের জোরে আর বিজ্ঞাপনের জোরে।
কদিকের ষিধা, তাছাড়া গোড়ার দিকে অমিতব্যয় যদি
একটু সাহায্য করেন, তিনি প্রেস-রিলেশান মেনটেন করতেন
তনেছি...।

ধীরাপদর মনে হল, জন্মাবের প্রথম অংশটুকু বুৎসই হয়েছিল,
শেষের কথায় দৃষ্টির স্পষ্ট পরিবর্তন।—তার সঙ্গে ভোমার পরিচয়
হয়েছে ?

কাল কাট্টরীতে আলাপ হয়েছিল—

সে প্রেস-রিলেশান মেনটেন করত কে বলল ভোমাকে ?

এবারে ? এবারে কোণঠাসা। ধীরাপদ মনে মনে নিজেকে
রক্তক-পালিত জীব বলে গালাগাল করে নিল প্রথমে। ভুল্ললোকের
এমন সুগভীর অভিব্যক্তির মুখোমুখি বসে কিছু বানিয়ে বলাও শক্ত।
জবাব দিল, চাকদি গল্প করেছিলেন...।

চাকদি কি গল্প করেছিলেন সেটা যেন ওর মুখে লেখা, আর
হিমাংগ মিজ নীরবে, কয়েক মুহূর্ত তাই পাঠ করলেন। ধীরাপদর
কাঁড়া কাটল কি একটা কাঁড়া তৈরি হয়ে থাকল বোঝা গেল না।
পাইপটা হাতে নিয়ে হাসলেন তিনি। লঘু কৌতুকে জিজ্ঞাসা
করলেন, তাহলে তার সাহায্য পাবে আশা করছ ?

অর্থাৎ, অমিত্য যৌব যদি সত্যি সাহায্য করে ওকে সেটা বর্ধার্ব
হাতবশ বলতে হবে। ধীরাপদর মুখ সেলাই এবারে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সাক্ষাত-পর্ব শেষ। হাতের পাইপ
দাঁতে গেল আবার।—আচ্ছা, এ-সব পরে ভাবা যাবে, এ-মাসটা

মেডিক্যাল হৌমি অ্যাটেও করে। কোনো অপ্রবিধে হলে বা কিছু
বলার থাকলে আমাকে জানিও, কাম ট্লেইট—ওড বাই।

লঘু পদক্ষেপে সামনের ঘরের ভিতর দিয়ে অল্প ঘরে ঢুকে
গেলেন। সেদিকে চেয়ে ধীরাপদ বোকার মত ঝাঁড়িয়ে রইল
খানিক। তাঁর শেষের এই আন্তরিকতার কোনো ইজিতের আভাস
নেই, তবু কথাগুলি বিজ্ঞাপের মত লাগল ধীরাপদর কানে।

মেডিক্যাল হৌম।

আজ আর সেখানে না কিরলেও চলত। কারো কাছে জবাবদিহিও
করতে হত না। তবু বাইরে এসে আবার সেখানেই কোর ভাঙ্গি
অনুভব করছিল ধীরাপদ। খোদ বড় সাহেবের পরোয়ানা জাহির
করার জন্তে নয়। কিন্তু এই পরোয়ানার জোর ছিলই একটু।
কাল আবার ম্যানেজার আর কর্মচারীদের নাকের ভস্মার সন্দের মত
বসে থাকার চেয়ে আজই সিনে দাঁড়ানো ভালো। হিমাংগ বিলা
লাবণ্য সরকারের সঙ্গেই আলোচনা করতে বলেছেন।

রোগীর ভিড় এড়ানোর জন্তে বেশ খানিকক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি
করে কাটিয়ে একটু রাত করেই দোকানে এসে ঢুকল। দোকানের
ভিড় কিছুটা হালকা তখন, বেঞ্চিতে রোগীর সংখ্যাও নামমান।
ম্যানেজার এক-নজরে বসটুকু দেখা সম্ভব দেখলেন, তার পর কাজে
মন দিলেন। কর্মচারীরা কাজের কাকে কিরে কিরে তাকালো।
রমেন হালদার তার সামনের খাঙ্কের ফুলে ধী করে চেয়ে রইল তার
দিকে। প্রত্যাশার দৈন্ত তেমন কিছু নেই বলে এদের এই দৃষ্টির
সামনে ধীরাপদর অস্বস্তি।

দেবযানী জুড়েও একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক








দেবযানী

ফেস্ পাউডার
ট্যালকাম্ পাউডার
স্নো, কুমকুম
হেয়ার অয়েল
নেল্ গলিশ

ডি, জে, প্রোডাক্ট্‌স্ * কলিকাতা-১




রোগী ভাবতে এসে লাভণ্য সরকারও দেখল।

সেই দেখা থেকে বীরাপদর অনুমান, ম্যানেজার তাঁর কাছে বতরু নিবেদন করার করেছেন।

শেষ রোগীটি বিদায় হবার পর আলোচনার ক্ষেত্রে বীরাপদকে একপাশে হল না, তারই ডাক পড়ল। বেয়ারা এসে মেমসাহেবের তলব জানালো। বীরাপদর নিজে থেকে সামনে এসে দাঁড়ানোর সঙ্কোচ গেল।

নিজের চেয়ারে লাভণ্য সরকার গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। একটু অবসর। একতরফের ধকলের পর এটুকু শ্রান্তি স্বাভাবিক। টেবিলের ওপর ট্রেসকোপটা সাপের মত কুণ্ডলী পাকানো। একবারে সেই মোটা ব্যাগটা।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে লাভণ্যর শিথিল হুঁটু ওর মুখের উপর আটকালো। শিথিল বটে, আবার গভীরও। মুখ দেখে তার আঙ্গকের ব্যবহারের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা, লক্ষণ দেখে রোগ বোঝার চেষ্টার মত।

কি ব্যাপার বলুন তো, ম্যানেজারকে নাকি কি সব বলেছেন স্তম্ভাম...

সামনে দুটো খালি চেয়ার, অর্ধচ বসতে বলেনি। আগের দিনও বলেনি। ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা না-ও হতে পারে, অধস্তনদের এখানে এসে বসারটা রীতি নয় হয়ত। কিন্তু আজ বীরাপদর চেয়ার দুটোর এই শূন্যতার বিক্রম বরদাস্ত হল না। একটা চেয়ার টেনে বসল, আর একটা চেয়ারের কাঁধে একখানা বাছ-ছড়িয়ে দিল। তারপর হাসিমুখে জবাব দিল, ম্যানেজারবাবু হয়ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু আমি তাঁকে একটুও অসম্মান করতে চাইনি, আমার কাজের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে না এই শুধু বলেছি।

লাভণ্য সরকার তার বসারটা লক্ষ্য করেছে, অল্প চেয়ারে হাত ছড়ানো লক্ষ্য করেছে, আর জবাবের অক্লান্ত ভঙ্গীও লক্ষ্য করেছে। এরই সামনে সেদিন ফ্যাক্টরীর কন্টোল রুমে অমিতাভ ঘোষের ব্যঙ্গ বিক্রমে নিজের বিড়ম্বিত পরিস্থিতিটাও এরই মধ্যে ভোলেনি বোধহয়।

আপনার কাজের দায়িত্ব কে নেবেন তাহলে?

তাত্তো জানি না। বীরাপদকে বেন জব্দ করা হয়েছে, মুখে চোখে সেই রকমই সরল ব্যঞ্জনা। আপনিই নিন না?

প্রতিক্রিয়া বাই হোক, ওজন না বোঝা পর্যন্ত কর্তৃস্থানীয় মহিলাটির সংস্বের ওপর দখল আছে। হিমাংগু মিত্র টেলিকোনে ওকে বাড়িতে দেখা করতে বাসছেন ম্যানেজার সেই ধরনও জানিয়েছেন। কিন্তু প্রথমেই সে প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা করলে পাছে মর্বাদা দেওয়া হয় তাই ম্যানেজারের অভিযোগটাই প্রথম উত্থাপন করেছিল।

মিঃ মিত্র আপনাকে ডেকেছিলেন কেন?

প্রশ্নটা চাপা আনন্দের কারণ। জবাব দিল, এখানে কিভাবে কাজ চলছে সব দেখে রাখতে বললেন, আর আপনার সঙ্গেও আলোচনা করতে বললেন—

কি আলোচনা?

কি দেখব, কি ভাবে কাজ শুরু করব সেই সম্বন্ধে, মাসের এই থাকি ক'টা দিন মাত্র সময় দিয়েছেন।

তারপর কী?

তারপর অল্প কাজ দেবেন বোধহয়।

হেয়ালীর মধ্যে পড়ে লাভণ্য সরকারের মুখে বিরক্তির কু-স্পষ্ট হয়ে উঠল এবারের। বলল, কি জানি, কি ব্যাপার আদি বুঝতে পারছি না।

সেটুকুই কাম্য ছিল বীরাপদর। নিজের সহজতার পরিচুট। মহিলার বিরক্তির জবাবে নিরীহ কুণ্ডা প্রকাশেও নেই, বুঝতে না পারার অপরাধ বেন ওরই। তারপর শ একটা প্রস্তাব করল, টেলিকোনে মিঃ মিত্রর সঙ্গে একবারে বলে নেবেন?

কথা এরপর বড়সাহেবের সঙ্গে বলবে কি করে? ভালই জানে। সে-কথা যে ওর দিক থেকে খুব হবে না সে-সম্বন্ধেও প্রায় নিশ্চয়। কিন্তু প্রস্তাবনার অপ্রতিক্রিয়া বসোস্তীর্ণ। কি করবে না করবে সেটা এখ কারো মুখে শুনে অভ্যস্ত নয়, কয়েক মুহূর্তের নিম্পলক গাভীরে লাভণ্য সরকার সেটুকুই ওকে ভালো করে বুঝিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা টেনে নিয়ে তার মধ্যে ট্রেসকোপ কাকে আবারও তাকালো।

সকলের চোখের ওপর দিয়ে সকলের আগেই বীরাপদ মে ছেড়ে বাইরে চলে এলো। কুটপাখ বেঁবে লাভণ্য সরকারের গাড়ি দাঁড়িয়ে, কোম্পানীর সেই ছোট স্পেশাল ওয়্যগন। বী পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। এভাবে বেরিয়ে আসাটা ঠিক হয়ত, কিন্তু বসে থেকেই বা করত কি। লাভণ্য সরকার ছ আর যারা আছে সেখানে, এই নাটকের পর তাদের অল্প খানিকটা রিলিক দরকার। কাল আবার আসতে হবে চিন্তাও অলক্ষ্য অস্বস্তির মত। এসে করবে কি...

কালকের কথা কাল।

আঙ্গকের সমস্ত ব্যাপারটা রসিয়ে রোমহ্রন করার ম্যানেজারের মুখ বন্ধ করা, হিমাংগু মিত্রর ডেকে পাঠানো, ল সরকারের কর্তৃত্বের মুখোমুখি দাঁড়ানো। পরে বাই হোক, অস্তিত্ব সকলকে ভাবিয়ে আসতে পেরেছে—এই ক'টা দিনের অকমে জবাব দিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু স্নায়ুজ প্রগলভতা হবার সঙ্গে সঙ্গে তুষ্টির বদলে একটা অস্বাভাব্য উঁকিঝুঁকি কি কোথায়। মনে হচ্ছে, আগাগোড়াই ছেলোমাহুবি করে এ আসলে মনের অগোচরের একটা স্তম্ভ বাসনার আঁচ লেগেই সেই আঁচে পুরুষকারের ওপর প্রলোভনের রং ধরেছিল তাই নিজেকে এভাবে জাহির করার তাগিদ। নইলে বা ওকে অবহেলা দেখাতে গেছে, আর কার সঙ্গেই বা বেবারিবি।

আগে পথ চলতে প্রায় প্রতিটি লোকের মুখের রেখা ওর চে পড়ত। সেই রেখা ধরে প্রবৃত্তি-বৈচিত্র্যর অনেক চিহ্নবিহীন নব আঁকত। এঁকে নিরাসক্ত ত্রুটির মত দেখত চেয়ে চেয়ে। চাক্রা সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এই দেখার আনন্দে ছেদ পড়েছে আজ নতুন সূচনার চতুর্পাথে এসে সকলকে ছেড়ে বীরাপদর নিচ দিকেই চোখ গেল।

বীরাপদ ধমকালো একটু।

—আজও একটু স্বপ্ন উঠছে আবার! খারোমিটার দাগিয়েছিলেন বুঝি? আমি একটা ভালো প্রেসক্রিপশন দিতে পারি, কলো করবেন? খারোমিটারটা রাত্তার কলে দিন, তারপর যেমন খুশি সেই ভাবে চলুন, বা খুশি তাই খান, অন্তর্ধ বলে একটা কথা আছে তাই ভুলে যান। বিধাস হচ্ছে না? আচ্ছা বা বললাম করে দেখুন, খারাপ কিছু হলে দায়িত্ব আমার। ডাঃ লাবণ্য সরকার রোগী সত্বকে নিশ্চিত এবং নিশ্চিত।

—ওষুধটা নিয়মমত খাননি? কেন? ঠেলে উঠে আসতে চায়! আসেই যদি সে ভাবনা তো আমার, আপনি খাবেন না কেন? দেখি হাত। সাড়া নেই কিছুক্ষণ, হাত দেখার পরে বোধহয় বুক দেখার নীরবতা। ওষুধ তো দেব, কিন্তু দিয়ে লাভ কি, গোলাপ জল আর লিমনস্কোয়াশ মিশিয়ে তো আর ওষুধ দিতে পারি না। বেল টিপে বেয়ারা তলব, একটা ইনজেকশন এনে দেওয়ার নির্দেশ।—ওষুধ বদলে দিচ্ছি, আর একটা ইনজেকশন দেব, কিছু লাগবে না, ভয় নেই। এই ওষুধটা ঠেকে দিনে তিনবার নিয়ম করে খাওয়াবেন, রোগিণীর স্বামী প্রতি গভীর নির্দেশ, আর হুঁবেলা খাবার আগে এই টনিক হুঁচামচ করে—কিঁদেও হবে, ওজনও বাড়বে। এবারে অনিয়ম হলে ভয়ানক রাগ করব কিন্তু, দিনের পর দিন এভাবে ভুগলে আমার বদনাম না? রোগিণীর কারণে ডাঃ লাবণ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির অভিযোগ।

—ঘুম হয় না? ভালই তো, অনেক সময় পাচ্ছেন দিকি। আমি তো নিজের জন্তে ঘুম না হওয়ার ওষুধ খুঁজছি। অনিদ্রা প্রসঙ্গে লঘু বিশ্লেষণ।—ঘুম না হওয়ার জন্তে ততো ক্ষতি হয় না, যত হয় ঘুম হল না সেই চিন্তা থেকে। সময় প্রায়, ঘুম হচ্ছে না কেন, খুব ভাবেন বুঝি? আপনার আবার ভাবনা চিন্তা কি! পেট কেমন? কিঁদে? পিঠের সেই ক্রনিক ব্যথাটা একেবারে গেছে তাহলে? বা ভাবিয়েছিলেন...আচ্ছা, ঘুমের ওষুধও দিচ্ছি, কিন্তু আপনি চেষ্টা না করলে শুধু ওষুধে কিছু হবে না। রোগ সকালে উঠে খোলা বাতাসে বেশ খানিকক্ষণ হাঁটতে হবে। মনোযোগী রোগীর প্রতি ডাঃ লাবণ্য সরকারের সুস্থ-বাতাসে প্রাতঃসময়ের উপযোগিতা বিশ্লেষণ।

—আপনি দিনকতক এখন ঘুমোন দেখি বেশ করে, সব অবসাদ কেটে যাবে, আপনার শরীর ঘুম চাইছে। প্রেসার দেখেছিলেন শিগগীর? আচ্ছা আমি দেখে দিচ্ছি, ওই বেড এ যান। প্রেসার তো লো, কত বয়েস? তাহলে তো খুবই লো। তা' বলে ভাববেন না যেন, এই একটা রোগই সব রোগী পছন্দ করেন। ওষুধ বাই দিই আসল চিকিৎসা খাওয়া আর ঘুমোনো। ওষুধ আর ইনজেকশনের উল্লেখসহ ডাঃ লাবণ্য সরকারের রসনা-উসকানো খাত-তালিকা বিস্তার।

—কি খবর? যেতে হবে...একুণি বাব কি করে, কাল সকালে বাব'খন...তাহলে তো মুশকিল, আচ্ছা রাত ন'টার পর বাব। কিন্তু এরই মধ্যে এত হটকট করার মত কি হল, এই তো কাল দেখে এলাম। ব্লাড-প্রেসার বেড়েছে মনে হচ্ছে? কার মনে হচ্ছে, আপনার না আপনার স্ত্রীর? ডাক্তার না দেখলে উনি রুহু হবেন না যখন কব, কিন্তু ওই ব্যাটার অভিব্য আপনার

স্ত্রীর মাথা থেকে না তাড়ালে রোগ হাড়বে না। ওটাই ঠেকে পেয়ে বসেছে—সিসটলিক দশ-বিশ উঠতে বসতে কয়ে বাক্যে, ওটা মোটাওটা মানসিক একেবারে। আপনার বা আপনার স্ত্রীর মত অত ব্যাধি লেখাপড়া জানে না তারা ব্লাড-প্রেসারও জানে না। রক্তচাপ প্রসঙ্গে ডাঃ লাবণ্য সরকারের মন্তব্য।

ক্যান কাউন্টারের ওধারে ডাক্তারের চেয়ার পাটিননের ঠিক পিছনটিতে বীরাপদর টেবিল-চেয়ার। কান পাতেলে ডাক্তারের প্রতিটি কথা কানে আসে। বীরাপদ কান পেতে শোনে। শুধু তাই নয়, এই একজনকে চিকিৎসা-পর্ব শোনার প্রতীকার বসে থাকে রোজই। বিকেল ছ'টার পরের হুঁতিন ঘটা কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরও পায় না। যে লাবণ্য সরকার কর্মচারীদের কাছে এমন, সে-ই যে আবার নিজের পেশার ক্ষেত্রে কেমন—নিজের কানে না ওনলে বীরাপদ তাবতেও পারত না। এমন চিকিৎসকের পদার হবে না তো কার হবে! আর বে-ক'টি চিকিৎসক আসেন তাঁরা শুধু চিকিৎসাই করেন। তাঁদের ওষুধের মতই নীরস তাঁরা। কিন্তু ডক্টরিং ইজ অ্যানু আর্ট...চিকিৎসা চিকিৎসা-কলাও বটে। পেশার ক্ষেত্রে সেই কলা লাবণ্য সরকার ভালোমত রক্ত করেছে। অবশ্য এর পিছনে প্রকৃতিগত আত্মকল্যা আছে কিছু। আছে বখন তার কলও আছেই। প্রকৃতির বশ নয় কোন্ মাহুদ? তার ওষুধে রোগ না হাড়লে কথায় হাড়, কথায় না হাড়লে হাসিহু হাড়। হাড়ুক না হাড়ুক এই চিকিৎসা-কলাকুশলিনীর হাতে রোগী হতে সাধ যায়।

ওইখানে বসে বসে আর একটা আবিষ্কার করেছে বীরাপদ... বার বার অল্প সল্প রোগের প্রতি রোগীর বেশ একটু মনোভা আছে। শোক লালন করতে দেখেছে, এখানে এসে রোগ লালন করা দেখল। নিজের অভিব্য সত্বকে সদয় মর্ষাদা-লাভে বঞ্চিত মনে হলে জর-গোছের ছোটখাট একটা রোগ সংগ্রহ করে দেখো, মর্ষাদা পানো। তুমি যে ঘটা করে বিরাজ করছ সেই তুমি উপলব্ধি করানোর দোদর পায়ব।

লাবণ্য সরকার সেদিক থেকে অন্তরক দোদর। প্রত্যেককে সে বিভিন্ন ভাবে মর্ষাদা দিতে জানে, প্রত্যেকের জন্ত বিভিন্নভাবে উতলা হতে জানে। সাধারণ চিকিৎসাক্ষেত্রে এ-বে কয় জানা নয় সেটা বীরাপদ এরই মধ্যে উপলব্ধি করেছে।

এই হুঁতিন ঘটা বাদ দিলে সারাক্ষণের ক্লাস্তি। কাজ নেই বললেই চলে। অল্প সময় বাপনে অনভ্যস্ত নয় সে। কিন্তু হুকে-বাঁধা কর্মচকলতার মধ্যে এমন নিষ্ক্রিয় আলস্তের বোঝা আর কখনো টানেনি। না চলে চোখ, না মন। সেকেও গুণে মিনিট গুণে ঘটা পার করার মত। এখন বা-ও করছে প্রথম হুঁতিন তাও জোটেনি। কাউন্টারে দাঁড়ানো হাড়া আর কি করা কেতে পারে সে-সত্বকে যিনি হৃদিস দিতে পারতেন, তিনি বিরুখ। পুরো সাত ঘণ্টার মধ্যে ম্যানোমটার সাত বারও ওর দিকে তাকিয়েছেন কি না সন্দেহ। হৃপূরের নিরিবিলিতে সেই মনেন হালদাই শুধু কাছে এসেছিল, কিন্তু বিশ্বরে নিজেই কাটো-কাটো, সে আর ওকে কাজের হৃদিস কি দেবে।

দাদা আপনি যে সাংঘাতিক লোক দেখি, এমনতে কিছুটা বোঝা যায় না।

কেন, কি হল আবার...। প্রহর কৌতুকে পরিহিতিকে বুকে নেওয়ার চেষ্টা বীরপদর।

কি হল! রমেন হালদারের বিশ্ব উপছে ওঠার দাখিল, ম্যানেজার কুপোকাত, টেলিফোনে বড়-সাহেবের তলব, তারপর চেয়ার থেকে কাল আপনি বেরিয়ে যাবার পর মিস সরকারেরও দেখি পিসিমা-পিসিমা মুখ! বলুন না দাদা, শুনব বলে সেই কাল থেকে হাঁসকাঁস করছি আমি—

ওর কৌতুহল জ্বিইয়ে রেখেই বীরপদ কাজের কথা আসতে চেষ্টা করেছিল।—এখানকার সব কাজ-কর্ম বুঝিয়ে দেবার জন্য পাছে তোরাকে চেয়ে বসি সেই রাগে অমন মুখ করে ছিলেন বোধহয়।

হেলোটর বড় বড় দুই চোখ ওর মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে শেষে খেঁচেছিল।—হ্যাঁ, আপনি ঠাটা করছেন। সলজ্জ হাসি, কিন্তু এখানে কাজ-কর্ম বোঝার কি আছে আবার।

বলো তো দেখি কি আছে?

কাড়িয়ে কাড়িয়ে ওবুধ বেচা ছাড়া আর কিছু নেই। নিজের দোকান হলে দেখিয়ে দিতাম কত বকম প্র্যান করা যায়।

নিজের দোকান বলেই ভাবো না।

এই দোকানকে! এও ঠাটা কিনা বুকে নিতে চেষ্টা করল।

—হ্যাঁ, এর দশ ভাগের এক ভাগের কথাই ভাবতে পারিনে...। তারপরেই সমস্ত মুখে আলগা উত্তেজনা একপ্রহর, বড় আলো যেমন ছোট আলো ঢেকে দেয়, তেমনি একটা বড় আগ্রহের ছটার রমেনের ছোট কৌতুহল চাপা পড়ে গিয়েছিল।—একটা দোকান করবেন দাদা? আজ থেকে ভাবলে একদিন না একদিন ঠিক হবে, আশুন না আমাতে আপনাতে ভাবি—

ওর নিজস্ব একটা দোকানের আকাঙ্ক্ষার কথা বীরপদ আগেই শুনেছিল। মাত্র এই কটা দিনের পরিচয়ে তাকেই সেই আকাঙ্ক্ষার অংশীদার করে নেবার চেষ্টা দেখে হাসি চেপেছে।

ভাবা যাবে, কিন্তু এখন আপাতত—

এখনই কে বলছে, এখন টাকাই বা কোথায়। কিন্তু এখন থেকে একটা প্র্যান তো মাথার ধাকা দরকার। ওর প্র্যানে তাকেই যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনার কারণও ব্যক্ত করেছে। আপনাতে আমাতে ভাবলে দোকান হবেই একদিন, আপনাকে প্রথম দিন দেখেই আমার অন্তরকম মনে হয়েছে, আপনি ঠিক এখানকার সকলের স্বত্ব ইচ্ছে—জানে চাকরি-সর্বস্ব ধরনের নন।

প্রশংসার জাল ছাড়িয়ে বীরপদর নিজের সমস্ত পৌছনোর অবকাশ মেলেনি। ম্যানেজারের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে রমেন মুখের আশার আলো এক ফুরে নিবিয়ে দিয়ে গোমড়া মুখে কাউন্টারের ওপরে গিয়ে কাড়িয়েছে। যেন অপ্রিয় লোকটার সঙ্গে অপ্রিয় নিষ্পত্তির অভিনয়ই ছিল কিছু একটা, ম্যানেজার এসে পড়ার বাধা পড়েছে।

হ্যাঁ-হোক কিছু কাজের হদিস শেষে লাবণ্য সরকারই দিয়েছে বীরপদকে। দিন দুই একটা লোককে এমন গো-বেচারীর মত, বসে থাকতে দেখে নিজেই আবার ডেকেছিল। ডেলি সেলস্ রিপোর্ট ঠাতি করতে বলেছে, পুরনো রিপোর্ট দেখে এক-একটা সিজন বিশেষ বিশেষ করেকটা ওবুধের গড়-পরতা চাহিয়ার ওঠা-নামার চার্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। এ-ছাড়া, ঠক্ না রাখার কলে

বে-সব প্রেসকুপশান বোজ কেবত যাচ্ছে এখান থেকে, ব খসড়া তৈরি করতে পরামর্শ দিয়েছে—এ-রকম খসড়া থাকলে ঠক্ সব্বকে ভাবার অনেক সুবিধে হয় নাকি।

আগের দিনের মত সেদিন আর আত্মাভিমানী শ্রুপ্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেয়নি বীরপদ। পথ চলতে চা মিকে তাকিয়ে সেই ভূপ্তির মোহে বিস্তৃত্যর দাহ দেখেছি। লাবণ্য বসতে বলেনি, সে-ও চেয়ার টেনে বসেনি আ বৃত। কাড়িয়ে কাড়িয়ে শুনেছে, হাঁই তুলে সাত হটা চক্ষুসজ্জা কিছুটা কাটল ভেবে মনে মনে একটু কুতূহল করেছে, আর কিরে এসে নির্দেশ মতই কাজে মন দি করেছে।

কিন্তু কাজ করলে এই বা কতকণের কাজ। হু'বট না। বীরপদ এই সঙ্গে আরও একটা কাজ আবিষ্কার ওবুধের সিটারেচার পড়া, কোন্ কোন্ অনুধে কোন্ ওবু সেই কিরিত্তি। স্মৃতিচাের অধিকা কবিবুজের কবিবুত বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তফাৎ নেই খুব। স্মৃতিটুকুই তফাত লাগে পড়তে, এই দেহবৃত্তি যেন অগণিত রোগ-তৈরীর বিশেষ। এত রোগ থাকতে মাছুব আবার নিরে কেমন করে!

কিন্তু তবু হাঁই ওঠে। পাঁচটার পর থেকেই বড়ির সিব চোখ ছোট, হু'টা বাস্ততে বাকি কত। ফুটপাথ বেঁধে ওয়ারণটা এসে কাড়ালেই টের পায় এখন। নড়ে চড়ে ঠিকঠা বসে। যেন এতকণের শ্রান্ত প্রতীক্ষার পর ওরই দিনের কা লাবণ্য সরকার চেয়ারে ঢুকে পড়লে এক-একদিন উঠে এসে প্রতীক্ষারত যোগীর ভিড় দেখে যায়। ভিড় যত বেশি ততো ব্যাধ দেখতে এসে অপরিণত মন বড় প্রোগ্রাম দেখলে খুশি হয়।

সেদিন বীরপদর দিনের কাজেও অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যের দেখা গেল একটু।

সবে বিকেল চারটে তখন। ম্যানেজার এসেছেন। কাই কর্মতৎপরতার আভাস জাগেনি তখনো। বিমুনি কাটানোর বীরপদ বাইরে মরজার কাছে এসে কাড়িয়েছিল। চুপচাপ দেখছিল আর ভাবছিল একটু চা খেয়ে আসবে কিনা।

কোথা থেকে ভূইকোঁড়ের মত এসে ফুটপাথ বেঁধে কা কোম্পানীর সেই ট্রেশান-ওয়ারণন, লাবণ্য সরকার যার এব আরোহিনী। ডাইভার দরজা খুলে দিতে একটা কাইলসহ হাতে সেই নামল। বীরপদকে দেখল একবার, তার স্তম্ভ গাভীর্থে পাশ কাটিয়ে দোকানে প্রবেশ করল।

গাড়িটা চলে গেল।

অন্যয়ে এই কত্রীটির আবির্ভাবে দোকানের আর সকলে অব কিনা বীরপদর জানা নেই। এ-সময়ে সে এই প্রথম দেখল তাত ম্যানেজারের কাছে গিয়ে কি বলল, অনুমান করা গেল না। স সঙ্গে ম্যানেজার এবং আর সকলেরও মুখে চকিত ভাবান্তর একা লাবণ্য সরকার করেকটা ওবুধ চেয়ে নিয়ে ব্যাগে পুরল, তার ভিতরে ঢুকে গেল। ম্যানেজার কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এ নিজে হাতে চেয়ার আর বেঞ্চিগুলি ঠিক করে রাখলেন। এ

দৈনিক বঙ্গবন্ধু—বৈশাখ ১৩৬৪



দিনে
দিনে
দিনে
দি...



রেক্সোনা সাবানে 'নাওল' মাল
এবং টি মিলে মনোহর মলমল মণালো হয়,
যাতে ত্বক আরও স্নায়িত, আরও
মুক্তির, আরও লাবণ্যময়ী হয়। সুশাস
ভনা লেছোনা'র পূর্ণ সাবান্দিত
আপনার ক সঙ্কর আর সঙ্কর বাখে।
সৌন্দর্য সাধনার সমদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন।

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

RP164-X3220

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লি: অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লি: তৈরী

ইজিতে বেয়ারা আর একপ্রহ্ন কাড়ামোছা করে দিয়ে গেল সেগুলো।

এই প্রহ্নর ব্যক্ততার মধ্যে ছবির মত দাঁড়িয়ে থাকটা বিস্ময়। ধীরাপদ এগিয়ে এসে দেখে তার টেবিল চেয়ার লাভণ্য সরকারের ধবলে। গভীরমুখে ফাইল খাটছে, জায়গায় জায়গায় কাগজের নিশানা আঁটছে। এই ফাইলটাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। অল্প আর্টেজিং কিজিসিয়ান এসে যেতে পারেন ভেবেই হয়ত ওখানে বসেছে।

ধীরাপদ সরে এলো।

দশ মিনিটের মধ্যে ফুটপাথ ঘেঁষে আর একখানা গাড়ি এসে থামল।

হিমাংক মিত্রর সেই গাঢ়-লাল গাড়ি।

বাজনার মত হন' বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ দোকানটার বেন নিঃশ্বাস বন্ধ। ব্যাগ আর ফাইল হাতে লাভণ্য সরকার বেরিয়ে এলো। হাসি হাসি মুখ, লঘু চরণে তৎপর ছন্দ। ড্রাইভার সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিতে হিমাংক মিত্রর পাশে উঠে বসল সে।

রীতি নীতি ভুলে ধীরাপদ সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ির দিকে এগোলো। লাভণ্য সরকারের পাশ থেকে দোকানের দিকে ঝুঁকে বড় সাহেব ইশারায় ওকেই ডাকছেন।

ইজিতে ড্রাইভারের পাশটা দেখিয়ে দিলেন। অর্থাৎ, ওঠো।

কোথায় চলেছে, কি ব্যাপার, ধীরাপদ ভাবতেও পারছে না। ওকে সঙ্গে মেওয়াটা পূর্বকল্পিত নয় নিশ্চয়, কিন্তু চলল কোথায়? পিছনের কথা-বার্তা থেকে মনে হল, ব্যবসায় সংক্রান্ত কোনো কাজেই চলেছে। একটা ওষুধ নিয়ে আলোচনা, কাগজ-পত্র কি কেউ আছে না আছে সেই কথা দু-চারটে। ধীরাপদ কিছুই বোধগম্য হল না।

বুঝতে চেষ্টাও করল না। প্রথমে সহজ হলে বসতেই সময় লেগেছে, তারপর চকিত চাকদির কথা মনে পড়েছে তার। চাকদির সেদিনের সেই প্রহ্নও কৌতুক। ধীরাপদর ঘুরে বসে দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু নিরুপায়। ড্রাইভারের সামনের ছোট আয়নার ওপর চোখ পড়ল, পাইপ মুখে বড় সাহেব গাড়ির কোণে গা এলিয়ে বসে আছেন। লাভণ্যর পরিপুষ্ট কঠম্বর কান পেতে শোনার মত, ধীরাপদ রোজ শোনে। কিন্তু এখন শোনার মত কিছু বলছে না, টুকরো টুকরো কথা আর সংক্ষিপ্ত জবাব দুই একটা। কিন্তু সেও কি একটু বেশি পরিপুষ্ট লাগছে কানে, একটু বেশি মিষ্টি লাগছে।

—ধীরাপদ কাজকর্ম দেখছে ভালো করে?

হঠাৎ বড় সাহেবের হালকা প্রশ্ন। সেই থেকে সামনের দিকে চেয়ে মূর্তির মত বসে আছে দেখেও হতে পারে। প্রশ্ন ওকে নয়, প্রশ্ন পার্শ্ববর্তিনীকে, তবু এরপর সেই একভাবে বসে থাকা চলে না।

ধীরাপদ বিনয়-নম্র হাসি হাসি মুখ করে বাড় ফেরাল। এ-রকম প্রশ্ন পরিবর্তন লাভণ্য সরকারও আশা করেনি, কিন্তু প্রশ্নর প্রশ্নের জবাব না দিলেও চলে। ধীরাপদর মুখের ওপর স্তম্ভোৎসাহ স্থাপন করল একবার তারপর। বড় সাহেবের দিকে চেয়ে হাসল একটু। ওইটুকু থেকে বড়টুকু বোঝা যায়।

ধীরাপদর ভিতরে ভিতরে আঁচড় পড়ল একটা। হাসির আঁচড়। বড় সাহেব পাঠিয়েছেন বলেই সে বেন তারও অস্বাভাবিক শিকানবিশ।

বেধানে আগমন' সেটা একটা অফিস বাড়ি এবং ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তিনিও একজন পদস্থ ব্যক্তিই হবেন। কোন্ অফিসে এলো বা কার কাছে এলো ধীরাপদর অজ্ঞাত। ভুললোক পরিচিত বোঝা গেল, সাদর আপ্যায়নে বসতে বললেন সকলকে। হিমাংক মিত্র নতুন করে পাইপ ধরাতে ধরাতে মুহূ হেসে ভুললোককে সতর্ক করলেন, আমার মেডিক্যাল অফিসার আজ আপনার সঙ্গে ঝগড়া করার জগ্গে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

ঝগড়ার জ্বাসে অফিসারটিকে বেশ প্রশ্ন মনে হল ধীরাপদর। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, চকচকে চেহারা। ঝগড়া যে করবে তার দিকে ফিরে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনাদের কোনো খবর পাননি বুঝি এখনো?

বেশ, সে খবরও রাখেন না! লাভণ্য সরকারের কঠম্বরে অহিত বিষয়, তিন মাস ধরে অপেক্ষা করে করে না এসে পারা গেল না, স্লাম্পল পাঠিয়েছি তারও দু'মাস আগে—এভাবে আর কতকাল বসে থাকব?

ধীরাপদ রমণীমুখের স্তম্ভ, কারুকার্য দেখছে চেয়ে চেয়ে। হিমাংক মিত্রর নিজের কিছু যেন বক্তব্য নেই, যোগাযোগ ঘটিয়ে খালাস। আলোচনা থেকে এখানে আসার উদ্দেশ্য বোঝা গেছে। কোম্পানীর একটা নতুন ওষুধের সরকারী অনুমোদন মিলছে না, সরকারী পরীক্ষার রিপোর্টও কিছু আসছে না। ভুললোকের মারকত ধরিত এবং অস্বাভাবিক নিষ্পত্তির সুপারিশ। অফিসারটি বিলম্বের কারণ জানালেন, ব্লাড প্রেসারের ওষুধ বাজারে হামেশা এত বেঝুচ্ছে যে সতর্ক বাচাইয়ের পর মতামত প্রকাশে দেরি না হয়ে উপায় নেই।

জবাবে লাভণ্য সরকার হাতের ফাইল খুলেছে, মোটা ব্যাগ থেকে কতগুলি চালু ওষুধের স্লাম্পল বার করে সেগুলির উপকরণ তালিকার সঙ্গে নিজেদের ওষুধের উপকরণের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখিয়েছে, ফাইল থেকে একে একে নিজেদের ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার আশাতীত সাফল্যের রিপোর্টগুলো দাখিল করেছে। প্রথম গিনিপিগের ওপর প্রয়োগের ফলাফল তারপর বেড়ালের ওপর, তারপর বাদরের ওপর, সব শেষে মানুষের ওপর।—জেনারাল বিহেভিয়ার, প্রেসার কাউন্ট, ড্রাগ এফিক্যাসি, বায়লজিক্যাল অ্যাসপেক্ট, সেরেব্রম নারিশমেন্ট, ব্লাড-অ্যাসিমিলেশান, সেনসরি সেন্টার, মেন্টাল আরমিসটিস—

ধীরাপদর কানের পরদায় দুর্বোধ্য শব্দতরঙ্গের ঠাসাঠাসি ভিড়। কিন্তু ধীরাপদ শুনেছে না কিছুই, হাঁ করে দেখছে শুধু। ভাবে, ভুলীতে, কঠম্বরে, বিলম্বের আগ্রহে, বাছুর মুহূ চাকল্যে, আঙুলের স্তম্ভের সংকেতে, লাভণ্য সরকারের ভেহজ বক্তব্যটুকু এক পশলা দুর্বোধ্য কাব্যের মত লাগল ধীরাপদর। ধীর কাছে আবেদন, তিনি কে বা কতটা পায়ের জানে না, কিন্তু এই সপ্রতিভ মাধুর্যের বক্তার ধীরাপদ নিজে ঘায়ের হয়েছিল। ধীরাপদর হাতে ক্ষমতা থাকলে এই লাভণ্য-দর্শন আর কলজটির বিনিময়ে ব্লাডপ্রেসারের ওষুধ ছেড়ে বিঘের ওপর অমৃতের পরোয়ানা লিখে দিতেও বাধ্যত না হয়ত।

বড় সাহেবের মুখে হালকা গাভীর, নীরবে-পাইপ টানছিলেন তিনি। উপসংহারে জানালেন, নিজে তিনি ক্রমিক ব্লাড-প্রেসারের রোগী, নির্বিঘ্ন নিজে ওপর এই ওষুধ বাচাই করেছেন এবং কল পেয়েছেন।

অফিসার ভক্তলোকটি আশ্বাস দিলেন, সরকারী বিবেচনার ফলাফল বাতিলে শিগগীরই বেবোর সে-সকল আন্তরিক চেষ্টা তিনি করবেন এবার। হিমাংশু মিত্র ধীরাপদকে বললেন ভক্তলোককে ভালো করে চিনে রাখতে, এই ব্যাপারে অন্তঃপর যোগাযোগ রক্ষা এবং তাগিদ দিয়ে কাজ আদায় করার দায়িত্ব তার।

বাইরে এসে ইশারায় তিনি একটা চলতি ট্যান্ডি আহ্বান করলেন। ওদের ট্যান্ডিতে বেতে বলে নিজে লাল গাড়ির দিকে দিকে এগোলেন। তিনি অস্ত্র বাবন।

ট্যান্ডি সামনে এসে দাঁড়াতে লাভণ্য উঠে বসল। ধীরাপদর হুই এক মুহূর্তের দ্বিগা, সামনে ড্রাইভারের সঙ্গে বসবেন না শিহনে মহিলার পাশে। নিজে উঠে বসার পর লাভণ্যবই ডাকা উচিত ছিল। কিন্তু ডাকবেন না জানা কথা। এক সঙ্গে এক গাড়িতে গেলেও সজিনী নয়, পদমর্দাদার সচেতন গাভীরে সে নীরব এবং নির্বিকার।

দরজা খুলে ধীরাপদ পাশে বসল।

লাভণ্য সরকার বাড়ি ফিরিয়ে অলস চোখে শুধু তাকালো একবার। তারপর সামান্য সবে বসল। সামনেই বসবে ভেবেছিল বোধহয়। নির্দেশ নিয়ে ড্রাইভার গাড়ি ছুটিয়েছে। ধীরাপদর এই কদিনের বিনত সংসার মুখটা আজ আবার আলগা হয়ে গেল কেন জানি। পুরুষকারের নামে সেই অদৃষ্ট বিরোধের প্রতিক্রিয়া শুরু হল ভিতরে ভিতরে। আরো একটু সবে বসলে ওর স্মৃতিতে হত, ওখানে জায়গা আছে। এও এক ধরনের অবজ্ঞাই ধীরাপদ এ-ধারের দরজার সঙ্গে মিশে আছে। খানিক আগে এই মেয়ে স্মৃতির জাল বিছিয়ে বসেছিল কে বলবে। নীরব তুণ অনেক বাণ, পণ্যের তাগিদে তাইই গোটা কতক অকাতরে খরচ করে এসেছে। অমিতাভ ঘোষের বেলায়ও তাই করেছিল বোধহয়... চাকরির ইজিতটা বিরূপত-প্রসূ প্রেরণার মত কাজ করছে এখন। ওই হুজনের প্রতি তার বেন বর্ত্য আছে কিছু, আর সেই বর্ত্য-বোধেই যেন ভিতরটা উসুধ করছে ধীরাপদর।

মাঝামাঝি পথে এসে লাভণ্য সরকার ব্যাগ সংগ্রহ ফাইলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মৃদু-গম্ভীর নির্দেশ দিল, এটা আপনার কাছে রাখুন, সাবধানে রাখবেন—সামনের সপ্তাহে এসে একবার তাগিদ দিয়ে যাবেন।

ফাইলটা হাতে নিয়ে ধীরাপদ তক্ষুনি নিজের সম্বন্ধে বিধাচিত সূক্ষ্ম জ্ঞাপন করল, আমি কি আপনার মত অমন করে বলতে পারব...।

লাভণ্য সরকারের ঠাণ্ডা চোখ দুটো ওর মুখের ওপর এসে থমকালো। নিরীহ পশ্চাৎ অপসরণের চেষ্টা ধীরাপদর, মানে, আমার পক্ষে এ-সব টেকনিকাল ব্যাপার আপনার মত করে বোঝানো শক্ত—

আপনাকে কিছু বোঝাতে হবে না, কঠোর ঈর্ষ রূঢ়, আপনি শুধু ফাইল নিয়ে গিয়ে মনে করিয়ে দিয়ে আসবেন, আর কি হল না হল খবর নেবেন।

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, দায়িত্ব লব্ধবশের ফলে প্রায় সিদ্ধিও যেন। মনে মনে হাসছিল, কিন্তু আর এক কথা মনে হতেই হাসি উবে গেল, পুরুষকারের তুলির গুরুতেই হোটেল খেল একদফা। পকেটে চার ছ' আনাও আছে কি না সন্দেহ, ট্যান্ডির মিটার উঠবে দেড় টাকা ছ' টাকা। গাড়ি থেকে নেমে পুরুষের বদলে রমণীর মত মবে দাঁড়াতে হবে। পকেটে টাকা থাকলে পুরুষের মতই ভাড়াটা দিয়ে দিত সে। এ-রকম পরিস্থিতিতে টাকা না থাকার মানসিক বিড়ম্বনা কম নয়। টাকা থাকবে কোথা থেকে, টিউশন ছেড়েছে, নতুন-পুননো বইয়ের দোকানের দে-বাবু আর অধিকা কবিবাহের কাছ থেকেও পা টাকা দিয়ে আছে। সোনা-বউদি কুকার কেনার জন্যে যে-কটা টাকা কেবত দিয়েছিল তাই ভাড়িয়ে চলছে। কিন্তু বলসীর ভোলা জল পড়িয়ে খেলে কদিন আর, ধীরাপদর পুরুষের উত্তরে বিমর্ষ ছায়া পড়ল একটু।

না ভাবলেও চলত। চক্ষুলাজ্ঞা এড়ানোর হাতা ওপরঅলাই ভেবে রেখেছিলেন।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মাঝ বয়সী মেদবহুল পোলাকার এক বাবু ভক্তলোক যমেন হালদারের সঙ্গে আলাপে মগ্ন। ট্যান্ডি ধামার শব্দে তিনি ফিরে তাকালেন, তারপর চাছা-ছোলা কবলা মুখখানা হাসির বসে ভিজিয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন। কোঁচানো কাঁচি মুক্তি, গিলে-পাঞ্জাবীর নিচে ধপধপে জালি গেল, পায়ে চেবনাই ছোটানো

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



এটি প্যাকেট
২৪ টি
ব্রেড আকারের

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সঞ্চয় রক্ষা করিতে

- কলে প্রস্তুত
- ফ্রীমে সেকা
- হেসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আর্য বেকারী অ্যান্ড কনফেকশনারী

কলিকাতা - ২৯

হলদে মিউজিক, হাতে মোড়ার বড়ি সোণার ব্যাগ, বুক থেকে গলা পর্যন্ত মিনেকরা মোনার বোতাম, মাথার চুলে কলপ-ঠকানো শাকার কোড়ক। শৌখিনতার মতল বিজ্ঞাপনটি সামনে এসে বাঁড়ানোর পর বীরাপদর গাড়ি থেকে নামার কথা মনে পড়ল।

অনেককথা যা কি? ভুললোকের উদ্দেশ্যে লাভ্য সরকার। মুখে ভারত হাতির আভাস একটু।

এই কিছুকথা, কখন আবার তোমার সময় হবে না হবে, তাবলার হয়ে গিয়ে বাই—এখনই যাবে তো?

লাভ্য সরকার বড়ি রেখল, সাহুন—আবার ছুঁটার মধ্যে কিভাবে হবে।

ভুললোক পদব্যাঙ্কে উঠে গেলেন, ট্যাঙ্কি বেরিয়ে গেল, বীরাপদ বোকার মত দাঁড়িয়েই রইল। ফিরে দেখে, রমেন তার দিকে চেয়ে দিকি হাসছে। হাসি গিলে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছেন দাদা?

ভুললোক কে?

সর্ব্বেশ্বর বাবু—

বীরাপদর প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল কার সর্ব্বেশ্বর। সামলে নিল, এমনতেই ছেলের সমস্ত মুখে বাচালতা উঁকি ঝঁকি দিলে। আর প্রশ্ন হল না দেখে রমেন নিজে থেকেই বলল, মিস্ সরকারের নিকট আত্মীয়, একেবারে নিজের ভগ্নিপতি—বেশ ভালো সম্পর্ক, না দাদা?

বীরাপদ দোকানের দিকে পা বাড়াবার উত্তোগই করল শুধু, এগোলো না। শোনার লোভ বোল আনা, এই ভগ্নিপতিই তাহলে লাভ্য সরকারের ভাস্করী পড়ার পরচ যুগিয়েছেন, আর তার বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছেন। প্রত্যাশা সফল হবে কি না জিজ্ঞাসা করতে ভ্র-ভঙ্গি করে চাকুদি ওকে নীচেট বলেছিলেন, রমেন হালদার উপছে ওঠা হাসিটুকুর ওপর চট করে সহানুভূতির প্রলেপ চড়িয়ে জানালো, ভুললোকের একটি ছেলে আর একটি মেয়ের অস্থখ, ডবল—চিন্তা মিস সরকারের সাড়ে চারটেয় বাবার কথা ছিল, দেরি দেখে ফায়ারীতে টেলিফোন করেছিলেন, সেখানে না পেয়ে এখানে এসেছেন। সর্ব্বেশ্বরবাবুর প্রশংসাও করল রমেন, খুব অমারিক ভুললোক আর, ওকে বেশ স্নেহ করেন। অনেকদিনের আলাপ রমেনের সঙ্গে, মাসের মধ্যে দুই একদিন অন্তত দোকানে আসতে হয় তাঁকে না এসে করবেন কি, ছেলেমেয়েগুলো বড় ভোগে যে। একটি ছুঁটা নয়, পাঁচটা না ছুঁটা—মাসির হাতের শুধু না পড়া পর্যন্ত একটাও এমনতে সেরে উঠবে না। মাসি ছদ্ম প্রাণ সব—হৃদয়ের শিশুরা মা হারালে বা হয় আর কি। কিন্তু মাসি জো আর সব সময়ে এখানে বসে থাকেন না, যখন অপেক্ষা করতে হয় ওর সঙ্গেই ভুললোক গল্পদল করেন।

আর একটু দাঁড়ালে ভুললোকের গল্পসল্পেরও কিছু নয়না শোনা যেত হয়ত। কিন্তু ফাজিল ছেলের দরদ মাখানো মুখে ছুঁটা মি টাণুটপূর। অস্থস্থ ছেলেমেয়ের বাপের মুখখানা মনে পড়তে বীরাপদর নিজেরই হাসি পাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দোকানে ফেরে পড়ে অব্যাহতি।

কিন্তু বীরাপদ সেদিন সত্যিই অবাক হয়েছিল।

অকিন সক্রান্ত অক্ষয়ী কোনো কাছে না আটকালে লাভ্য

সরকারের দোকানের চেঁচাবে আসতে ছুঁটার ছুঁদখ বিজিটের বেধি দেরি হয় না।

সেদিন রাতে সাতটা হয়েছিল।

বাইরে তখন বসার জায়গার অভাবে অনেক বোকা দাঁড়িয়ে। তাদের বেধতে গিয়ে বীরাপদর নিজের নিভৃত প্রতীকটিই আগে চোখে পড়ে গিয়েছিল। নিজের উদ্দেশ্যেই লম্বু জুকুটি সেও কি বোকা হয়ে গেল নাকি।

এই থেকে বীরাপদ মনে মনে স্থান কাবারের প্রতীকার ছিল। ঘাসটা শেষ হলে তাকে ফায়ারীতে টেমে মেবার কথা। রাস কাবারের পরেও ছুরিন কাবার। বীরাপদ তাবছিল, হিমাংক স্নিহব সঙ্গে একবার দেখা করে প্রতিজ্ঞাটি তাঁকে মনে করিয়ে দেবে কি না। কিন্তু বীরাপদ তাবলই শুধু, স্বভাবত সঙ্কোচে গিয়ে উঠতে পারল না। বাক আর দুটো দিন।

তার আগেই শনিবার উপস্থিত। সকলের মুখেই একটুখানি প্রশংসার আমেজ দেখা গেল সেদিন। বীরাপদ জানতে পারল, মাসের প্রথম শনিবারে মেডিক্যাল হোমের কর্মচারীদের মাইনে হয়। আর সেই শনিবার। ছুঁটা আড়াইটের মধ্যে লাভ্য সরকার টাকা নিয়ে আসবে—সেই মাইনে দিয়ে থাকে।

ধববটা শুনে একমাত্র বীরাপদই খুশি হল না, উন্টে তাকে বিঘর্ষ দেখা গেল একটু। মনে মনে আশা করতে লাগল, তার সম্বন্ধে হিমাংক মিত্র ভুলে গিয়ে থাকলেই ভালো হয়, তার মাইনেটা না হলেই ভালো হয়। এখানকার মাইনেটা কি-রকম রমেনের মুখে শুনেছে। ভাগ্য মাসে তারও সামান্যই প্রাপ্য হবে হয়ত। কিন্তু বীরাপদর আপত্তি সেই কারণে নয়, তার আপত্তি আর সকলের মত মুখ বুজে ওই সামান্য ক'টি টাকা লাভ্য সরকারের হাত থেকে নিতে হবে ভেবে। মনে মনে অন্তত যার সঙ্গে একটু আর্থটু পার্সা দিয়েছে সেই বেন তাহলে বাস্তব ফাড়াকটা ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার সুযোগ পাবে। সেটাই অব্যাহতি। অস্থগৃহীত মলে নাম লেখাতে আপত্তি। নইলে টাকার দরকার খুব, গোটা মাস টাকা না পেলে নতুন-পুরানো বইয়ের দোকানের দে-বাবুর কাছেই গিয়ে হয়ত ধরনা দিতে হবে আবার।

প্রত্যাশিত সময়ে লাভ্য সরকার এলো। ভিতর দিয়ে চেঁচাবে ঢোকায় আগে বীরাপদর দিকে বেন বিশেষ মনোযোগেই তাকালো একবার। সেই দৃষ্টি সহানুভূতির কি অস্থবন্দ্য কি আর কিছুই সঠিক বোঝা গেল না। বীরাপদ মনে মনে আশাবিহীন, হয়ত তার ভবিলে ওর মাইনেটা নেই বলেই এভাবে দেখে গেল।

প্রথমে ম্যানেজার চুকলেন মাইনে নিতে। তাঁর বেকতে সময় লাগল একটু। সকলের মাইনে-পত্র ঠিক আছে কি না দেখছিলেন বোধহয়। কিন্তু বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে চোখ পড়তে বীরাপদই উড়কে গেল। দুই চোখ-ভরা নির্বাক বিশ্বর তাঁর। বীরাপদ ভেবে পার না, এই দিনে কারো মাইনে না হওয়াটা এমনই অবাক ব্যাপার কিছু নাকি।

একে একে সকলের মাইনে হতে সময় মল লাগল না। সব ব্যাচের সব কর্মচারী হাজির। দরওয়ান, বেয়াগা, সুইপার পর্যন্ত। কিন্তু শুধু ম্যানেজার নয়, কর্মচারীদেরও অনেকের বিজ্ঞান দুটির

যা এসে পড়ল ধীরাপদর মুখের ওপর। হাছুরটাকে বেন আবার হতুন করে দেখছে তারা।

সকলের ঘিটে বেতে লাভণ্য সরকার নিজেই উঠে এসে ছইংডোর টেলে ডাকল, এবারে আপনি আসুন একটু।

এ আবার কি কর্তব্য! কর্তব্য কর্তব্য নয় কর্তব্যের কর্তব্য নয়। ধীরাপদ উঠে এলো।

লাভণ্য সরকার নিজের চেয়ারে কিরে গিরে ওকে বলল, বহন— ধীরাপদ স্বপ্ন দেখছে না মিনে হুথুরে কল্পনার ডানা মেলে ঘিরেছে। নিজে উঠে ডেকে আনা, তার ওপর প্রায় ঘিটি করে হুতে বস।

বসল।

লাভণ্য সরকার ছই হাত টেবিলের ওপর রেখে সামনের দিকে ঘূঁকল একটু, মুখে সজোচ-তাজানো হাসির আভাস। দেখুন, এখানকার কাণ্ডই আলাদা, আপনি কি পোর্টএ এসেছেন, কি ব্যাপার, কেউ কিছু বলেনি, আপনিও কিছু বলেন নি—আজ পে-সর্টারএ দেখলাম...মিঃ মিজর সঙ্গেও অবশ্য তারপর কথা হয়েছে।

এরই মধ্যে ফাস্তানের গা-জুড়ানো বাতাস দিচ্ছে কোথায়। ছুর, এটা শীতকাল। ধীরাপদ অপেক্ষা করছে আর নিজের মুখের ওপর সহজতার রেখা বুনতে চেষ্টা করছে।

সই করার জন্ত লাভণ্য সরকার অ্যাকুইট্যান্স রোল বাড়িয়ে

দিল তার দিকে; একটা আলাদা শিট-এ ধীরাপদর একার নাম। নাম আর পছন্দীতা। কিন্তু দেখাওসো বেন চোখের সামনে স্থির হবে বসছে না কিছুতে।

সোসো ধীরাপদ সোসো, এতবড় কোম্পানীর জেরারাজ সুখারতাইকার তুমি, এমন জ্যাবানাকা খেয়ে বসে থেকে রা— মাসে ছ'প' টাকা মাইনে হিসেবে বোল দিনে তিনশ কুড়ি টাকা প্রোপ্যা তোমার, বুকের দাপাদাপি খামণ্ড। চোখ তাকালেই দেখতে পাবে, কান পাতলেই শুনেতে পাবে যে। এখানে নয়, এই মুহূর্তে নয়, এর সামনে নয়, সব বাইরে—বাইরে গিরে বিস্বয়ের দুর্নীতে বিশেষহারা হলো, আকাজকার উন্নাসে হাবুতুব খেও, মাতার দিরে সিদ্ধ পাব হলো। এখানে শুধু ওই টাকার অঙ্কের পাশে, ওই রেভিনিউ ট্যান্সটার ওপর বেণ সহজ লাভ মুখে স্পষ্ট করে একটা নামের স্বাক্ষর বসিয়ে দাও।

কলমটা টেবিলেই ফেলে এসেছে। লাভণ্য নিজের কলম এগিরে দিল, আর টাকার খাম। স্বাক্ষরান্তে কলম আর অ্যাকুইট্যান্স রোল কেবল নিরে আলাপের সুরে জিজ্ঞাসা করল, এর আগে আপনি কোথায় ছিলেন?

অভিজ্ঞতা অজ্ঞতার বোগ্যতা প্রসঙ্গে অধিকা কবিরাজের আধড়া আর দে-বাবু নতুন পুরানো বই-এর দোকানের নাম করবে? ধীরাপদ সত্যি জবাব দিল, আগে কোথাও ছিলাম না, কাজ-কর্ম বলতে গেলে এই প্রথম—

প্রলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লণ্ডন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত ফলিত ও গণিত সত্তার সজাপতি এবং কাশীর বারাগসী পণ্ডিত মহাসত্তার হারী সজাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠি বিচার ও প্রস্তুত এবং অন্তঃকণ্ড ও ছুই প্রহাদির প্রতিকারকরে শাস্তি-বন্তারনাদি, তান্ত্রিক জিনাদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে মনীষীস্বল্প ঠাহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও কাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাহারা মুক্ত তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাজী ত্রিপুরা স্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রী মনমথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর শ্রী মনমথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি. কে. রায়, বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রী প্রসন্নদেব রায়কন্ত, কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব মিঃ এস. এম. দাস, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ফজল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে. রুচপল।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য কবচ—

স্বাস্থ্য কবচ—ধারণে স্বাস্থ্যসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (ভন্ত্রোক্ত)। সাধারণ—৭১১/০, শক্তিশালী বৃহৎ—২২১১/০, মহাশক্তিশালী ও সম্বর ফলদায়ক—১২২১১/০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্যের কৃপা লাভের জন্ত প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসারীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য)। সন্ন্যাসভী কবচ—অরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সফল ২১১/০, বৃহৎ—৩৮১১/০। মোহিনী (বশীকরণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১১০, বৃহৎ—৩৪১/০, মহাশক্তিশালী ৩৮৭১১/০। বঙ্গলাসুখী কবচ—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিহ মনিবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলার জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ২/০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪১/০, মহাশক্তিশালী—১৮৪১। (আমাদের এই কবচ ধারণে তাওরাল সন্ন্যাসী জরী হইয়াছেন)।

(হাগিতাক ১২০৭ ধঃ) অল ইণ্ডিয়া এন্টোলজিক্যাল এণ্ড এন্টোনমিক্যাল সোসাইটি (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ব), ধর্মতলা স্ট্রিট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশ পথ ওয়েলেসলী স্ট্রিট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০৩৫।

সম্বর—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা। ড্রাক অফিস ১০৫, গ্রে স্ট্রিট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৬৮৫। সম্বর প্রান্তে ৯টা হইতে ১১টা।

কিছু না করেও এমন পদ-পর্যায় লাভের বহুভাষী লাভ্য সরকার ওর মুখ থেকেই আবিষ্কার করে নিতে চেষ্টা করল হুই এক মুহূর্ত। কৌতূহল আভাবিক, অস্ত্রিকের রোজগার এখন বাই হোক, নিজে সে টারফ টাকার এসেছিল—তাও অমিতাভ ঘোষের খাতিরে। এতদিনে হুই টাকার ঝাড়িয়েছে। মালিকদের বাদ দিলে তার সমান মাইনে আর কারো ছিল না।

এ-রকম পদ-পৌরবে অর্জিত হবার মত কোনো প্রতিজ্ঞা আগে তো চোখে পড়েই নি, আজও পড়ল না।—আপনি সোমবার থেকে ক্যান্টিনে আসুন, এখানে মাঝে সাজে সজোর দিকে এসে দেখানো করে গেটেই হবে—মিঃ মিত্রই সব বলে দেবেন আপনাকে, সোমবার ক্যান্টিনে আসতে বলেছেন।

বীরপদ বাইরে এসে ঝাঁড়তে বহুভাষীর একটা কড় নিঃশ্বাস বেন মুক্তি পেয়ে বাঁচল। দোকানে আর এক মুহূর্তও ভালো লাগছিল না। এমন কি বিকেলে লাভ্য সরকারের পেসেন্ট-দেখার বৈচিত্র্য মন ভোবানোর আগ্রহও নেই আজ। সে চলে যাবার সজে সজেই বেরিয়ে পড়েছে। বড়িতে সবে চারটে তখন।

বুক-পকেটে টাকার খামটা পকেট ছাড়িয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে। স্পর্শটা জামার ভিতর দিয়ে বুকের চামড়ার লাগছে। মাসে ছ'শ... ষোল দিনে তিনশ কুড়ি। আশ্চর্য! খুলে দেখবে একবার? একবারও তো দেখল না। থাক, ঠিকই আছে। উৎসেগ গেছে, উত্তেজনা গেছে, সেটুকুই শাস্তি। বড় বড় পা কলে সেই শাস্তিটুকু উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে বীরপদ। জীবন বুঝি এক-একটা বস্তুর মধ্যে আটকে থাকে এক-একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। যত ঘোবো আর যতই মাথা খোঁড়ো—ওরই মধ্যে। বীরপদ মাথা না খুঁড়ুক, তাই বুঝিল। হঠাৎই বস্তুরদল হয়ে গেল। এই বস্তুর বড়ই বোধহয়।

চাকরির ওখানে যাবে কি না ভাবছে। যাওয়া উচিত, কিন্তু আজ অন্তত যেতে মন সবে না। এই বস্তুরদল সহজ হোক আর একটু, চাকরি মনে মনে ভবেতে পারেন প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই আনন্দে আটখানা হয়ে ছুটে এসেছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে আশার দারিত্র্য আবিষ্কার করবেন হত। সুলতান কুঠির দিকেই পা টানছে, অনেকগুলো দিন একটা মানসিক বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। সোনারউদি ঠাটা করেছিল, সাত মণ তেল পুড়েছে, রাধা শেষ পর্যন্ত নাচবে কি না। বীরপদ হাসছে আপন মনে, এমন নাচ সেও করনা করেনি। নোটভরা খামটা বড় বেশি মাথা উঁচিয়ে আছে মনে হচ্ছে এখন। তুলে নিয়ে ছ' ভাঁজ করে আবার পকেটে কলেই ধমকে ঝাঁড়াল। মনের তারে ঠিক সময়ে ঠিক সুরটি এভাবে বেজে ওঠে কি করে। এতদিন তো মনে পড়েনি।

...হাসিমুখে সোনারউদি রণুর কাণ্ডর কথা গল্প করেছিল একদিন। ষাট টাকা মাইনের ৩৭ কি একটা চাকরিতে চুকেছিল একবার। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই সোনারউদিকে ভালো একখানা গরদের শাড়ি কিনে দেবে ঠিক করেছিল। সোনারউদির একখানা গরদের শাড়ির সখ ছিল জানত। কিন্তু দশদিন কাজ করার পরই অসুখে পড়ে চাকরি শেষ। অসুখ হল চাকরি গেল সেটা কিছু না, শাড়ি কেনা হল না সেই দুঃখে রণু মনমরা। শেষে সোনারউদির ধমক খেয়ে ঠাণ্ডা,

সোনারউদি বলেছিল, গরদের শাড়ি পরে মেয়েগুলো চিতাব উঠবে তাই শাড়িটা একুনি দরকার।

একটা অসুখ তাগিদে বীরপদ মার্কেটের পথে পা চালিয়ে দিল। কিন্তু আবারও ধীরেতে হল। নিজের চোখ হুটোকেই বিখাস করে উঠতে পারছে না। না ঠিকই দেখছে। ধীরপদ হুই চোখে পলক পড়ে না।

ফুটপাথ বেঁবে আধুনিক কারবার খোলা রেস্তুরা একটা। খোলা বলতে ক্যান্টিন অথবা পরদার বালাই নেই। অব্যাহতী অভিজাত নারী-পুরুষের ভিড় বেশি। বাইরে দরবার দিকের টেবিলে একটি ঘেরে ছুটি ছেলে। ট্রাউজারের ওপর শার্ট কোলানো ছেলে হুটোকে পাড়ার অনেক বকে বসে বস্তুর পর বস্টা জটলা করতে দেখেছে বীরপদ। মেয়েটি রমণী পশ্চিমের মেয়ে কুয়ু—বাপের জ্যোতিষী মতে হাতে বার বিভাছান বড় শুভ। রমণী পশ্চিমের চোদ বহুরের সেই প্রায়-বোবা ভোঁতা মেয়েটার এরই মধ্যে এতখানি বিভালাভ। অবশ্য চোদ বহুর হয়ত সতেরু ঠেকেছে এখন, আর খতুরাজের বিচারে ও-বয়েসটা ফেলনা নয় একটুও। তবু, সোনারউদির জন্ম ঘর খালি করার তাগিদে বীরপদ প্রায় মরিয়া হয়ে বে-মেয়েটাকে অ'কাশ বাতাস মেঘ জল গাছ পালা আর মজাপুরের জাওলা-প্রসঙ্গে অকাতরে পাঠান করেছে সেই কুয়ুর এরই মধ্যে এমন উন্নতি চমক-প্রদ। এই হ'বহুর আড়াই বছর বীরপদ কি অন্ধ হয়ে বসেছিল?

ছেলে হুটোর একজনকে রমণী পশ্চিমের কোণ-ঘরের বারান্দায়ও এক আধদিন দেখেছে মনে পড়ল। এদের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় খুব সম্ভব। ফুটপাথে একটা লোককে হা করে ঝাড়িয়ে পড়তে দেখে সেই প্রথম তাগিয়েছিল। তারপর চট করে মুখ নামিয়ে-নিরে না দেখার ভান করেছে। পরক্ষণে ওদের ছোট টেবিলে নিঃশব্দ আলোড়ন, দ্বিতীয় ছেলেটারও মুখ নিচু। আর কুয়ু? আচমকা আলোর ঘায়ে ভীত-ভ্রস্ত শশকের বিড়ম্বনা।

বীরপদ এগিয়ে গেল। নিজের স্বভাবটার ওপরেই বিরক্ত, দিলে ওদের আনন্দটুকু পণ্ড করে।...সুলতান কুঠির বাসিন্দাদের চোখে এই কলকাতা অনেক দূর বলে জানত। ভাবছে, প্রকৃতি নিরপেক্ষ কর্মকুশলিনী বটে, ওরা যতই তুচ্ছ ককক আর অবহেলা ককক, তার কাজে ধুঁত নেই।

দূর থেকে কদমতলার শূণ্য বেকি দেখে বীরপদ মনে মনে খুশি একটু। হাতের বস্তুরি নিয়ে কারো দৃষ্টি বিজ্ঞেধনে হোঁচট খেতে খেতে ঘরে পৌঁছুতে হবে না। শকুনি ভটচাষ আর একাদশী শিকারীর অন্তরঙ্গতার চিড় খেল মাকি, সন্ধ্যা না হতেই বেকি কাঁকা কেন!

উঠোন পেরিয়ে আসার আগেই কচি-গলার তীক্ষ্ণ আর্তমাদ কানে আসতে বীরপদ হকচকিয়ে গেল। গণ্ডার ন'বহুরের মেয়ে উমাগাণীর গলা, মেয়েটাকে বেন মেয়েই কেলেছে কেউ। ঘরে ঢোকা হল না, পাশের দরজায় এসে ঝাঁড়াল।

ভিতরের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত।

মেয়ের এক হাত ধরে গণ্ডা টানটানি করে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে আর শুকনো মুখে শাসাচ্ছে, ভালো হবে না—খবদার—ছাড়ো বলছি। মেয়ের অপর হাতটি সোনারউদির করায়ত, অন্ধ হাতের ভাড়া-পাখার ডাঁট মেয়ের হাতে-পায়ে-পায়ের মাখায় কটাকট পড়ছে

তো পড়ছেই। মেয়েটার সর্বাঙ্গ দাগরা-দাগরা হয়ে গেল বোধহয়। আঁত ভাবু তিতে কানে ভালা লাগার উপক্রম, আর করব না মাপো, আর কক্কো-চাইব না, তোমার ছুটি পারে পড়ি, আর মেবো না, মবে গেলাম—

সামীর শাসনীতে ক্রমেকপ নেই, অকুট গর্জনে মেয়ে পিটেছে সোনাবউদি—আর চাইবি কি করে, যমের বাড়িই তো পাঠাবো তোকে আজ—

হাতের কাগজের বাস্কাটা দরজার পাশের ছোট আলমারীটার মাথার বেখে গায়ের জোরেই ধীরাপদ উমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সোনাবউদির হাত থেকে পাখাটা এক ঝটকায় টেনে নিয়ে দরজা দিয়ে ছুড়ে বারান্দার ফেলে দিল। এইটুকু মেয়ের ওপর এমন অমানুষিক মার দেখে রাগ হয়ে গেছে তারও।

সোনাবউদি দাঁতে করে নিজের চোঁট কামড়ে ধরে তাকালো তার দিকে, হাঁপাচ্ছে রীতিমত। গুদাও নির্বাক করেক মুহূর্ত, তার আহত পুরুষচিত্ত তৃতীয় ব্যক্তির ওপরেই ফুরু হয়ে উঠল বুদ্ধি। গভীর মুখে বলে উঠল, এর মধ্যে তোমাকে কে আসতে বলেছে—

আমার বদলে পুলিশ আসা উচিত ছিল। ঠাস করে মুখের ওপর কথা ক'টা বলে উমাকে হুহাতে আসতো করে ভুলে নিয়ে ধীরাপদ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

মেয়েটার হেঁচকি ধামতে আধঘণ্টা। অনেক তোয়াজের পর আর অনেকগুলো লোভনীয় প্রতিশ্রুতির পর উমারানীর মুখে কথা ফুটল। ধীরাপদ অবাক, এত বড় মারটা কেন খেল মেয়েটা এখনো ভালো করে জানে না। ছুপুরে মা-বাবাকে কি নিয়ে একটু ঝগড়ার মত হয়েছিল। বিকেল পর্যন্ত সে কি আর কারো মনে থাকে, উমারানীরও মনে ছিল না। বাবার কাছে রিবন চেয়ে বসেছিল, বাবা ওকে রিবন এনে দেবে কথা দিয়েছিল। সেই রিবন চেয়ে বসতে বাবা ঠাস করে ওর গালে এক চড়—মা তখন উলুনে পাখা দিয়ে বাতাস করছিল, উঠে এসে সপাসপ ওকে পিটেতে আরম্ভ করে দিল। ধীক-কা না এসে গেলে মা যে ওকে আজ মেয়েই ফেলত সে-সময়কে উমারানীর একটুও সন্দেহ নেই।

রাগটা আসলে কার ওপর ওই মার দেখেই ধীরাপদ অমুমান করেছে। তবু কমা করা শক্ত। ছেলেমেয়েগুলোকে একটুও ভালবাসে না সোনাবউদি, ভালবাসলে এত নির্দয় হতে পারত না। কিন্তু গুদার ওপর আজ আবার এমন চণ্ডাল রাগের হেতুটা কী..!

উমার তাগিদে একটা গল্প শুরু করতে হয়েছিল, দরজার কাছে

সোনাবউদিকে দেখে খেমে গেল। তার হাতে ওই বিকেলের আলা সেই প্যাকেটটা। দরজার ওয়ার থেকে মেয়েকে একবার দেখে নিয়ে ভিতরে এসে পড়াল। নরম হুপ করে বলল একে তো পুলিশের ভর, তার ওপর আবার এটা ঘরে ফেলে এসেছিলেন। ছুই চোখে নীরবে ব্যঙ্গ ছড়ালো একটু, দেখে-টেখে বাধুন, আমি খুলিওনি—কি থেকে আবার কি ফ্যানাদে পড়ব কে জানে।

শাড়ি ছাড়া ওতে যে আর কিছু থাকে সম্ভব নয় শৌখিন প্যাকেটের ছাপেই সেটুকু স্পষ্ট। প্লেব গায়ের না মাথলেও ধীরাপদ অবাক একটু, ও কার জন্তে শাড়ি এনে তার ঘরে ফেলে এসেছে বলে সোনাবউদির ধারণা! অবশ্য তারই জন্ত যে তাই বা ভাববে কি করে।

কি ভাবে শাড়িটা এনে হাতে দেবে বা কি বলবে, এই পরিস্থিতিতে পড়ে সেই সমস্তটা গেল। খুব শাদাসিখে ভাবে ধীরাপদ বলল, আমি ওটা ফেলে আসিনি।...আপনি ইচ্ছে করলে ফেলে দিতে পারেন।

সোনাবউদির মুখে পরিবর্তনের রেখা পড়তে লাগল। হঠাৎই খতমত খেয়ে গেল কেমন, তারপর নিজের অমোচরেই কাগজের বাস্কা ওপরকার কিতের বাঁধন খুলে শাড়িটা হাতে তুলে নিল।

বাস্কারের সব থেকে সেরা গরদের শাড়িই এনেছিল ধীরাপদ।

ছু'চোখে তারা নিবিড় বিশ্বয় সোনাবউদির। শাড়ি থেকে সেই বিহ্বল দৃষ্টি ধীরাপদের মুখের ওপর ওপর ফিরে এলো আবার। ধীরাপদও হঠাৎ স্থান কাল ভুলেছে, কোলের কাছে ছোট মেয়েটা হাঁ করে চেয়ে আছে, খেয়াল নেই। বিচারকের শেষ রায় শোনার মত তারও ছুই চোখে নিস্পলক প্রতীক্ষা।

সোনাবউদি দেখছে। দেখছে না, শুধু চেয়ে আছে। চেয়ে চেয়ে কোন্ এক স্মৃতি-দূতের পাঠের শব্দ শুনেছে বেন। পরক্ষণে সর্বাঙ্গ-জোড়া একটা চকিত শিহরণের আভাস দেখল বুদ্ধি ধীরাপদ—গরদের শাড়ি-ঘরা ছুই হাতে, বাহতে, মুখের রেখার রেখার, চোখের পাতায়..।

কাগজের বাস্কা আর গরদের শাড়ি হাতে সোনাবউদি ক্রমেক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গল্পের মাঝখানে অনেকক্ষণ মুখ বুখে বসেছিল উমারানী। মা চলে যেতে নিশ্চিত। তাগিদ দিল, ধীককা বলা—

গল্পে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টায় ধীরাপদ বাদ-ছুই গলা ধাক্কা দিয়ে নিল।

[ক্রমশঃ]

কাঠি ও কথা

সৈয়দ হোসেন হালিম

একটু বাকর মুখ—মাজা পরিপাটি,
কতো ছোট একটি সে দেশলাই কাঠি।
তবু-ও কখনো সে যে ঘর করে আলো,
কখনো বাকরে তার ঘর আলালো।

আমাদেরো ছোট কথা কাঠির মতন,
কখনো জুড়ার বুক—আলার কখন।



বিজ্ঞানভিক্ষু

চাঁর

"With mournful wait from dusk to dawn
He gibbered at the taunting stars—
A hermit soul gone raving mad,
And beating at its bars." —Lew Sarelt

হবিবুল্লাহ জন্ম হয়েছিল একত্রিশ বছর আগে লক্ষ্মীর এক বিস্তালা পরিবারে।

'ট্রাডিশন' অনুযায়ী খানবংশের পুরুষদের চতুর্বিবাহ অথবা চতুর্বিবাহ বিবাহ চলে আসছিল বহুকাল ধরে। সরকারী আইনের অনুশাসনে কিংবা অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে সে ধারা বদল করবার কোনো কারণও ঘটেনি তখনও পর্যন্ত, হবিবুল্লাহ বাল্যকালটা তাই কেটেছে বহু মাতৃবেদর মধ্যে! মাতৃবিয়োগ হয় তার জ্ঞান হবার আগেই। এত বড়ো পরিবারে একজন নারী কম কি, বেশী হল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ কারো ছিল না—এমন কি হবিবুল্লাহ পিতারও না। খান-পরিবারে সবই ছিল প্রায় মাপ করা প্রত্যেকের জন্য—দুধ-দই, অশন-বসন খরচ-পত্র মায় স্নেহ-ভালবাসা পর্যন্ত। হবিবুল্লাহ পিতা এই পরিবারে এমন কিছু হঠাকর্ষ স্থানীয়ও ছিলেন না। কাজেই শিশু হবিবুল্লাহ জন্ম কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকারও কথা নয়।

তার হাতেখড়ি হোলো লক্ষ্মীর কোনো এক মাদ্রাসায়। প্রধান মৌলভি এখনও জীবিত আছেন—কিন্তু বাসক হবিবুল্লাহ কথা তাঁর শ্রবণেই ছিল না। তিন পুরুষ ধরে খানবংশের ছেলেদের প্রায় সকলকেই তিনি পাব করে দিয়ে এসেছেন হাইস্কুলের দরজার কাছে। তির্যাস্তর বছরের ক্ষীরমাণ শ্রমশক্তিতে গাঁথা আছে কেবল অতিরিক্ত মেধাবী ছেলেদের কথা অথবা অতিমাত্রায় হরত ছেলেদের কথা।

বহু পরিচয় দেবার পর মৌলভি সাহেবের আবছা মনে পড়ল, ছাত্রবহু বছর আগের এক নিতান্ত সাধারণ, গোবেচারি, অ্যাভারেজ ছাত্রের কথা। তাঁর মনে পড়ল, হবিবুল্লাহ খুব শান্ত-শিষ্ট ছিল, সম্ভবতঃ একটু বেশী মাত্রায়ই লাজুক। পড়াশুনা করত এক বকমের।

এর পরের অংকে হবিবুল্লাহ হাইস্কুলে প্রবেশ।

প্রথম কয়েক বছরের কাহিনী সম্পর্কে—স্কুলের পুরানো নথি

নাড়াচাড়া করে জানা যায়, কোনো বিষয়েই ছিল না হবিবুল্লাহ বিশেষ আগ্রহ বা ব্যাপ্তি। শতকরা পঞ্চাশের ঘরে নব্বই শেরে এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে উঠে যেতো। কেবল খেলাপুলায়ই সে হয়ে উঠেছিল অদ্বিতীয়। উচ্চতায় খাটো হলেও, স্কুলের কুটবলের অথবা হকির 'বি' টীমে তাকে নিয়ে টানাটানি চলতো।

হঠাৎ একদিন ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা। ঘুড়ী ওড়াতে গিয়ে একদিন হবিবুল্লাহ কোনো একতলা বাড়ীর ছাদ থেকে নীচে পড়ে গেল। পায়ের হাড় ভেঙে যায় বেশ গুরুতর ভাবেই। এই দুর্ঘটনার পর হবিবুল্লাহ খেলোয়াড় হবার সাধ চিরকালের মতো সাংগ হয়ে গেল। এই দুর্ঘটনার পর থেকেই তার জীবনের সহজ গতিটা সহসা মোড় ঘুরে গেল।

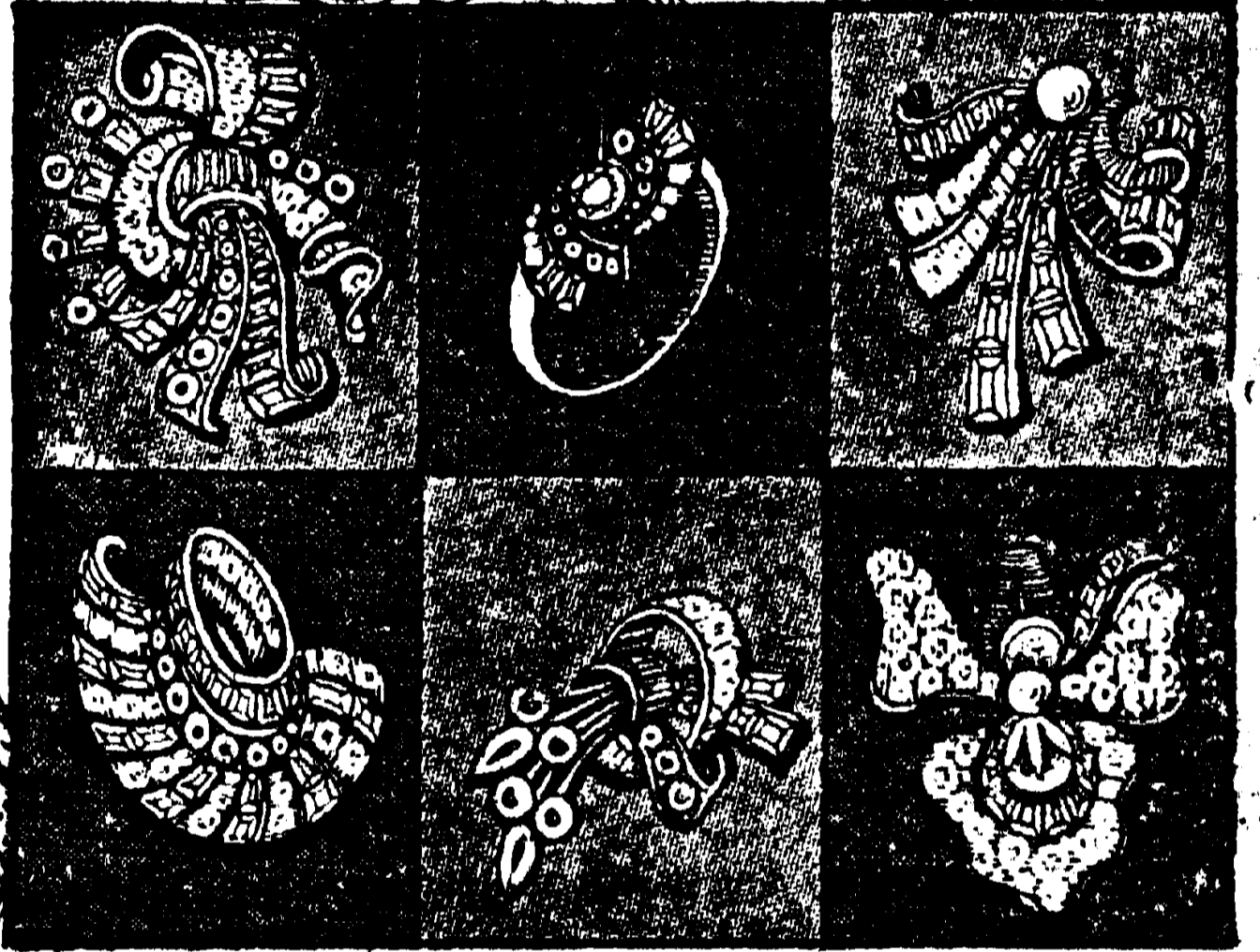
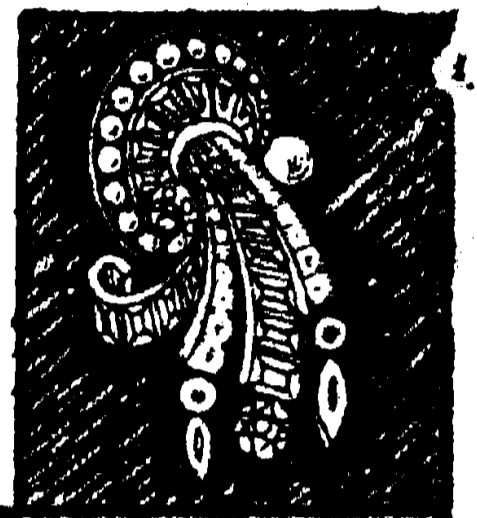
দুর্ঘটনাটা না ঘটলে সহজ সরল পথে, জনসমুদ্রের তরংগে তরংগে ভেসে হবিবুল্লাহ পরিণতি হয়ত হত অ্যাভারেজ ছেলেদের মতোই ছাপোষা কেরাণী, স্কুলমাষ্টারী কিংবা ডাক্তারী ওকালতির পেশায়। বরাত্তে থাকলে হয়ত ভালো বকমের একটা সরকারী চাকরীও জুটে যেত। না হয় স্কুলের সীমানা অতিক্রম করে লেগে পড়ত খান কোম্পানীর ঔষধের ব্যবসারে। কিন্তু কালের প্রেকোপে বহুদিন বাদে ভাঙা পা জোড়া লাগলেও, জীবনের বাঁকা গতিটা তার হল না সোজা।

এগারো বছরের ছেলে বছর খানেক স্কুল কামাই করে ক্লাসে ফিরে এল লাঠিতে ভর দিয়ে। দেখা গেল, এক বছর আগের লাজুক ছেলেই কী করে হয়ে উঠেছে দল্লভমতো গোঁয়ার-গোবিন্দ। সতীর্থদের সংগে বিনা কারণে ঝগড়া করে কেবলমাত্র গায়ের জোর দেখাবার জন্তই। পুরানো বন্ধুদের সংগে বাক্যালাপ বন্ধ। পড়ার ছুটি হলে একলা লাঠিতে ভর করে বাড়ী ফেরে ঘুরপথে চেনা লোকালয় বধাসম্ভব এড়িয়ে। দেখা যেতো, ছুটির দিনে নির্জন পথের ধারে গাছতলায় বসে চুপ করে একমনে কী ভাবছে। মাঝে মাঝে বনে বাগাড়ে, গোমতীর ধারে ধারে উদ্বেগবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় ছেলেটা। হেমন্তের সন্ধ্যায় চক্রবাকের দল পাড়ি মারে এক দেশ থেকে আর এক দেশে—পসু হবিবুল্লাহ একদৃষ্টে তাদের অনুসরণ করে।

হয়তো বা সেদিনের কৈশোরের স্বপ্নের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল হৃদয় মহাকর্ষকে অয় করার কঠিন লক্ষ্য।



আদর্শ মাধুর্য



গিনি জাল্ড জুয়েলারী স্ক্রশালিষ্ট

এম.বি. সরকার
এও সন্স
 ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৩৭/সি ১৩৭ সি/২, মধ্যবাজার ট্রাষ্ট কলিকাতা-১২ গ্রাম-দিল্লিয়াট্টে
 ব্রাঞ্চ-বালি গং-০০১/সি রাসবিহারী এডিনিউ কলিকাতা-১৯ ফোন-৪৬-৪৫৬৬
 মোকামের পুরাতন টিলাবা ১২৪, ১২৪/১, মধ্যবাজার ট্রাষ্ট, কলিকাতা-১২
 কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
 ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ

হবিবুল্লাদের স্কুলে তখন খেলাধুলা পরিচালনা আর প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান পড়ানোর ভার ছিল একজন শিক্ষকেরই ওপরে। হরিকিশণ গুপ্ত সার্বভৌম স্কুলশিক্ষক হয়েও বিজ্ঞান-অঙ্গতের প্রায় সমস্ত বড়ো বড়ো আবিষ্কারেরই সন্ধান রাখতেন। কলেজ-জীবনে গুপ্ত ছিলেন একজন মেহা ছেলে কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলনে মাতামাতি করার জন্য তাঁর পড়াশুনার মাঝে মাঝে পড়ে বড়ো বড়ো ছেদ। অল্প চাকরীর আশা থাকলেও হরিকিশণ গুপ্তের আনন্দবান গুঁকে টেনে নিয়ে এল শিক্ষকতার কাজে।

পল্লু হবিবুল্লার ওপরে গুপ্তসাহেবের কেমন একটা মারা পড়ে গিয়েছিল। ভালো খেলোয়াড় হবার বখন আশা বইলই না ছেলের, তখন বহু নিয়ে তাকে করে তুলতে চাইলেন বিজ্ঞানসাধক। স্কুল ও কলেজের লাইব্রেরী থেকে সহজ পপুলার সায়েন্সের বই এনে তুলে দিতেন হবিবুল্লার হাতে। ছুটির দিনে প্রায়ই গুরু-শিষ্যের অনাবিল আলোচনার বেলা বেত পড়িয়ে। সন্ধ্যার বনামান অন্ধকারে লাঠি ঠুকে হবিবুল্লা বলে কিরত আবিষ্কারের নেশার স্বপ্নাত্তর হয়ে।

এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটল হবিবুল্লার ছাত্রজীবনে। কোনো রকমে পাশ করতে পারলে যে ছেলের খুশীর অস্ত থাকত না, সেই ছেলেই হবে উঠল ক্লাসের মধ্যে মেহা—কোন মন্তব্যে! হরিকিশণ গুপ্ত বলেছেন যে, হবিবুল্লার মতো স্বরশক্তি তিনি আর কোনো ছাত্রের মধ্যে দেখেননি। যে বিষয়টা তার মনে ধরত সে বিষয় তাকে হুঁকার শিখতে হয়নি।

এ সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে—হবিবুল্লা একটা প্রায়োবোনের সাউণ্ডবক্স নিজের হাতে তৈরী করে। সে সাউণ্ডবক্স আজও সংরক্ষিত আছে স্কুলের মিউজিয়ামে। আর আছে টোন সূতা ও ছাপলের চামড়া দিয়ে তৈরী হবিবুল্লার টেলিফোন—যার সাহায্যে কয়েক শত গজ ব্যবধানেও কথোপকথন করা চলত। হবিবুল্লার বাড়ীতে বেতারযন্ত্র বিকল হলে অনেক সময়েই সেটা দোকানে পাঠাবার প্রয়োজন হত না—হবিবুল্লাই তা মেহামত করে দিত। আর ছোটো আন্নার সেলাই-এর কল আটকে গেলেও হবিবুল্লার ডাক পড়ত সেটাকে আবার চালু করার জন্য।

গুপ্তসাহেবের এক জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে বহু করে তৈরী করে দিয়েছিল একটা 'কুস্ত্যাল রেডিও-সেট'। গুপ্তসাহেব সেটা এখনও বহু করে রক্ষা করে এসেছেন—অতিথি অভ্যাগতদের মুগ্ধ করেছে সেই ছোট রেডিওসেটের গঠন আর কারুকার্য।

ছাত্রজীবন এমনি ভাবে এগিয়ে চলল হবিবুল্লার—নাম হয়তো থাকত লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতার উজ্জ্বল হয়ে। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার আগের বছরেই স্কুল হয়ে গেল উনিশশো বিদ্যালয়ের আগষ্ট আন্দোলন। গুপ্তসাহেবকে গ্রেপ্তার করা হল কোন রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা দেবার অপরাধে। দেশ স্বত্বকে এর আগে হবিবুল্লার কোনো চেতনা ছিল না—বদিও খানবংশের অনেকেই ছিলেন কংগ্রেসের আন্দোলনে জড়িয়ে। একমাত্র বহু ও সঙ্গী হরিকিশণ গুপ্তের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে অন্ধ আক্রোশে হবিবুল্লা বাঁপিয়ে পড়ল আন্দোলনের মাঝখানে।

এর পরে কাহিনীতে ছেদ পড়েছে প্রায় দু' বছরের। সমাজতন্ত্রী

গোয়েন্দা পুলিশের দপ্তর থেকে জানা যায় কেবল দু-একটা কথা। হবিবুল্লাকে এ সময়ে দেখা গেছে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। কখনও পনড্রজে সে চলে গেছে নাগপুর থেকে বোম্বাই, কখনো বিনা টিকিটের ধাত্রী হয়ে বেলে ঘুরেছে নানা জায়গায়। কী করে যে তার দিন চলত সরকারী নথি থেকে তা জানবার উপায় নেই। হবিবুল্লার বিকল্পে বৃটিশ সরকারের অভিযোগও তেমন জোরালো ছিল না, তাই কড়া পাহারাও বসানো হয় নি তার প্রত্যেক গতিবিধির ওপরে খবরদারী করার জন্য।

কয়েক মাস ছদ্মনাম নিয়ে হবিবুল্লা নাকি হরীকেশের কোন বোগাধমে হঠযোগ শিক্ষা করেছিল। অমৃতসরের পথে পথে এক বাজীকরের দলের সংগে বাহুর খেলা দেখাতেও লোকে নাকি তাকে দেখেছে। কখনো বা তার সন্ধান পাওয়া গেছে চটগ্রামে লক্ষ্যবন্দে আড্ডায়। পুলিশের মতে—এগুলো বেসরকারী রিপোর্ট। আজ এগুলোর সত্যতা নিরূপণের কোনো উপায়ই নেই। জেলে মাঝে মাঝে হরিকিশণ গুপ্তের কাছে হবিবুল্লার চিঠি আসত ভারতের বিভিন্ন জায়গার ডাকঘরের ছাপ নিয়ে।

গুরু-শিষ্যের পরে বখন মিলনও হয়েছিল তার, এ অজাতবাসের কোন সংগম বিবরণী হরিকিশণ গুপ্তের কাছে হবিবুল্লা ব্যক্ত করেনি।

হবিবুল্লা ধরা পড়ল মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতাকে শেষ দেখা দেখতে এসে। পিতার সাংঘাতিক অসুখের সংবাদ হবিবুল্লা জেনেছিল সন্তোষুক্ত গুপ্তসাহেবের চিঠির মাধ্যমে। মাত্রাজে কোন সওদাগরী গুদামে সে তখন চাকরী করছে।

পিতার মৃত্যুর পর বছরখানেক হবিবুল্লার কেটে গেছে সরকারের নজরবন্দী হয়ে। গ্রেপ্তার হল সে উনিশশো পূর্বতানিশ সনের গোড়ার দিকে। ভারত ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ওয়াকিবখাল মহলে তখন জরুরী-করনা চলছে ভারতে ইংরেজরাজত্বের তবিষ্যৎ সম্পর্কে। এই কারণেই দু-তিন বছর পরে ধরা-পড়া আগষ্ট আন্দোলনের অপরাধীদের বিচার সম্পর্কে সরকার একটু নরমে-নরমে চলবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই রেল-লাইন ধ্বংস করার অপরাধে উনিশ বছরের যুবক হবিবুল্লার জেল শেষ পর্যন্ত হল না—কিন্তু মাত্রাজ নজরবন্দী থাকার হকুমটা চেষ্টা করেও রদ করানো গেল না।

হবিবুল্লার পিতার মৃত্যুতে খান-পরিবারে বিশেষ আলোড়ন হবার কথা নয়। উনিশ বছরের তরুণ কিছুটা অসহায় বোধ করলেও, হয়তো এ ঘটনায় একটা বন্ধন মুক্তির আশ্বাসও পেয়ে গিয়েছিল। এদিকে একাধিক খান-পরিবারে তখন বিভেদের সূত্রপাত হয়েছিল রাজনীতি নিয়ে। বনেদী পরিবারে অল্প ভেদটা এমন কিছু নূতন নয়—সরিকে সরিকে জমিজমা, বিবর-সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বেধেই থাকে বড়কর্তাদের অন্তর্ধান হলেই। এবারের বিরোধটা কিন্তু বেশ ঘোরালো হয়েই ঠাড়ালো কংগ্রেস-লীগ দলাদলির পটভূমিকায়। কংগ্রেসের সংগে খান-পরিবারের একটা বড়ো অংশ জড়িয়ে দিল প্রত্যেক কি পরোক্ষ ভাবে। কিন্তু কালের ধরে তার মধ্যেও ধরল বড়ো রকমের ফাটল। হবিবুল্লার এক বৈমাত্রেয় বড় ভাই আর ভিন চাচা তাঁদের পরিবারবর্ন নিয়ে আলাদা হয়ে বেড়িয়ে চলে গেলেন।

অন্তরীণ অবস্থা থেকে স্কুল হবিবুল্লাহর বই পড়ার নেশা। ওপ্তসাহেবের সাহচর্যে ওর মনে অকুরিত হয়েছিল বিজ্ঞান-সাধনার বীজ সেই কিশোর বয়সেই। কিন্তু অন্তরীণ অবস্থার বহির্ভগতটা যেমন হল সীমাবদ্ধ, অন্তর্ভগতে জ্ঞানের নেশা তেমনি ব্যাপ্ত হল—বহুমুখী হয়ে। পিতার মৃত্যুর পর হবিবুল্লাহ হাতে আসতে লাগল কিছু কাঁচা পরমা। তা থেকে সে বই আনাতে স্কুল করল ডাক-ভেলিভারীতে। সে ডাকের মধ্যে বিজ্ঞান-ইতিহাস, প্রাণিতত্ত্ব, দর্শন-ধর্মশাস্ত্র আর আরবী-ফার্সি-উর্দু, ইংরেজি সংস্কৃতির মূল গ্রন্থগুলো তো থাকতই—উপরন্তু থাকত তন্ত্রশাস্ত্র, কোকশাস্ত্র, হঠযোগ, ডাকিনী শাস্ত্র, হস্তবেধা বিচার ও সামুদ্রিক বিজ্ঞানের বই। ছোটো সম্পূর্ণ বিপরীত জ্ঞানের ধারা কী করে একই মগজে পরম নির্বিবাদে আশ্রয় গ্রহণ করত—হবিবুল্লাহর মনঃসমীক্ষণে এটাই হয়ে পাড়িয়েছে প্রধান সমস্যা।

এই নজরবন্দী অবস্থার মধ্যেই প্রবেশিকা পরীক্ষার পাশ করে গিয়েছিল হবিবুল্লাহ প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে। পরীক্ষা পাশ নেহাত একটা করার দরকার, সেইজন্মই পরীক্ষায় বসল। নামকরা ছাত্র হবার পূর্বা এর মধ্যে কোথায় সে হারিয়ে এসেছিল।

সুখি পাবার পর সে আবার হোঁচট খেয়ে পড়ল জীবনের আবর্তে।

খান-পরিবারের আয়ের মূল ভিত্তি ছিল কতকগুলো ঔষধের কারখানার ওপরে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী ঔষধ প্রস্তুত করা। আর ভারতের বিভিন্ন সহরে বিদেশী ঔষধের আমদানী ও কেনাবেচার কাজে খান-পরিবারের বেকার ছেলেরের কাজে লাগানো হত। ধীরে ধীরে মাল্গণ্য হয়ে উঠতেন ডাক্তারী-ওকালতী বা চাকরীতে, তাঁরা অবশ্য থাকতেন ও কারখানাগুলো বেড়ে চলেছিল পরিবার বৃদ্ধির সংগে তাল রেখে। এখন যুদ্ধের বাজারে কারবারটা ফীতকায় হয়ে উঠল—কয়েক লক্ষ টাকার বাৎসরিক আয় রাতারাতি কয়েক কোটিতে ঝাঁড়াল। এ ছাড়া যুদ্ধের পরেই পশ্চিম দেশের দ্বার খুলে গেল ভারতীয় ব্যবসাদারদের জন্য।

খান কোম্পানীর ব্যবসায়ের ধারা ছিলেন কর্ণধার তাঁদের অনেককে বেতে হল বিদেশে—কারবার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা দেখতে। দিল্লীর কারখানায় এই ভাবে একজন ম্যানেজারের ঘাটতি পড়ে গেল। যত্নপাতি কলকারখানা সম্বন্ধে হবিবুল্লাহর বিশেষ জ্ঞানের কথা কারো অজানা ছিল না। তার ওপরে অন্তরীণ অবস্থায় হবিবুল্লাহ "মর্যাদাও বেড়ে গিয়েছিল খান-পরিবারে—যদিও কর্তব্যাক্ষিরা তার বাউতুলে ভাবটার সমর্থন করতেন না। শেষ পর্যন্ত ঘাটতি পূরণ করার জন্য হবিবুল্লাহকেই ধরে আনা হল, তার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা স্থগিত রেখে। কর্তারা আশা করেছিলেন যে ইণ্ডিয়ান স্টীমরোলারের নিষ্পেষণে ওর বেয়াড়া ভাবটা ওধরে যাবে।

সবচেয়ে বিশ্বাসের কথা, এ ব্যবস্থায় হবিবুল্লাহ তরফ থেকে কোনও ওজর আপত্তি তো উঠলই না, উপরন্তু পাকা ব্যবসাদারের মতোই সে কাজ শিখতে বসে গেল—বিজ্ঞানসাধনার আশায় অলাঞ্জলি দিয়ে।

এই পনের ক'বছরে ব্যবসায়ের হবিবুল্লাহর অসাধারণ সাফল্য আর

একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। তিন বছর আগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অর্থনীতির ছাত্র উত্তর-ভারতে ঔষধের ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ শীর্ষক এক থিসিস দাখিল করে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রীর জন্য। ১৯৪৬ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত খান কোম্পানীর ঔষধের কারবার কী ভাবে পরিবর্তিত হয় তার একটা অর্থ-তীক ব্যাখ্যা নিয়ে সে থিসিসের একটা প্রধান অধ্যায়। তা থেকে একটা অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে হবিবুল্লাহর জীবনীতে।

রাজনীতি, সমাজনীতি, লোকচরিত্র, ইতিহাস, অর্থনীতি ও সাংখ্যের মহাপণ্ডিতরা মিলে যদি কোনও ব্যবসায় পরিচালনা করতেন, তাহলে সে ব্যবসায়ের যে রকমের বিপ্লব আশা করা যায়—খান কোম্পানীর ঔষধের ব্যবসায়ের পরিচালনাতেও সে রকম অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা যায় উনিশ শ হেচল্লিশ সাল থেকে উনিশশো উনপঞ্চাশ সাল পর্যন্ত। এ সময়কার বাজারদায়ের অপ্রত্যাশিত উত্থান-পতনের মধ্যে ঔষধের ক্রয়, বিক্রয় ও প্রস্তুতি এমন নিতুল ভাবে চালানো হয়েছিল যে সত্যি সোটা বিশ্ব উৎপাদন করে। আরো বিশ্বাসের কথা—কোনো বিশেষজ্ঞকে খান কোম্পানী এ সময়ে নিয়োগ করেন কি। একজন অনভিজ্ঞ তরুণ ম্যানেজারই দিল্লী কেন্দ্রে ব্যবসায় পরিচালনা করেন এই চার বছর ধরে। হয়তো বলা বেতে পারে যে কল্পনাভীত সৌভাগ্যের কলেই নূতন ম্যানেজারের নীতি ও আদর্শ সর্বতোভাবে কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু চার বছর একাদিক্রমে একমাত্র আদর্শের ওপরে নির্ভর করে প্রতিপদে এই আশাতীত সাফল্যলাভ হয়েছিল—এ কথাটা বিশ্বাস করাও শক্ত।

এই অধ্যায়ের উপসংহার—“এখানে স্রষ্টব্য যে আজকের বাজারের পরিস্থিতিতে খান কোম্পানীর ১৯৪৬-৪৯এর প্রাণী কার্যকরী হত না উপরন্তু খুব সম্ভবতঃ কোম্পানীকে মোটা রকমের লোকসান দিতে হত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ১৯৫০ সাল থেকেই খান কোম্পানীর ব্যবসায়ের নীতি আবার ফিরে যায় গতানুগতিক পথে। সর্বশেষে বলতে হয়, ভারতের বাণিজ্যের ইতিহাসে এরকম অত্যন্তাশ্চর্য ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না।”

এই চার বছরেই হবিবুল্লাহ হয়ে উঠল প্রায় তিরিশী লক্ষ টাকার মালিক। এর মধ্যে বেডিও ইলেক্ট্রনিকসএর একটা বিরাট কারখানা আর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাও পত্তন হয় তার উত্তাপে।

কিন্তু এতো কর্মব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ যেন নির্বাণিত হয়ে গেল ব্যবসা সম্বন্ধে তার উৎসাহ। লাভ-লোকসানের এত বড়ো নাটকটা যখন জমে 'রাইম্যান্স'এ উঠেছে, হবিবুল্লাহ নিরুৎসাহ হবার কোনো সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়তো বা অতিবাস্তব দৈনন্দিন কেনা-বেচার কোলাহলে তার কল্পনাবিজ্যাসী মনটা হাকিয়ে উঠেছিল। ব্যবসাকে সে হয়তো গ্রহণ করেছিল একটা চিন্তাধর্মিক গণিতের খেলা হিসাবেই। যখন উপলব্ধি করল যে অল্প আয়াস সমস্তার সমাধান মিলে যাচ্ছে তখনই সে সম্বন্ধে তার উৎসাহ গেলো নিবে।

কারবারের মধ্যে ভূবে থাকলেও হবিবুল্লাহ পড়ার নেশা এতোটুকুও বমেনি। খান কোম্পানীর ম্যানেজারের ঘরের সব দেওয়ালগুলো ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বইয়ের আলমারীতে। সেখানে থাকে থাকে জমা তো ছিলই 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট' ও 'মার্কেট

বিসার্চ'-এর নানা রকমের কেতাবে—আর তার সংগে মিশে থাকত পদার্থবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মোটা মোটা ভল্যুম ; এগুলো ছিল সব হবিবুল্লার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ছোটো-বড়ো অবসরটুকু ভরিয়ে তোলার জন্ত।

ইতিমধ্যে হবিবুল্লা 'কবেসপেণ্ডেন্স' কোর্সের মাধ্যমে 'ডি'গ্রামা' বোর্ডিং করছে চারটে বিষয়ে—'ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' গণিতশাস্ত্র, 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট' আর 'রেডিও ইলেক্টনিক্স' এ। ১৯৪১ সালের লন্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সে, প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে।

মাসুকের সংগে কিছু তার ব্যবহারটা ছিল একেবারেই খাপছাড়া। সামান্য আলাপ ছাড়া কারো সংগেই ছিল না তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। তরুণ ম্যানেজারকে সকলেই করত ভয়—কিন্তু জনপ্রিয়তা হবিবুল্লার একেবারেই ছিল না। প্রথমেই সে খান কোম্পানীর ছু-চারজন বহুবর্ষের পুরানো কর্মচারীকে সামান্য অপরাধে বরখাস্ত করে বসল। অথচ কখনো কখনো নিয়তন কর্মচারী, মজুরদের দাবী সে মিটিয়ে দিত অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দেশের দৃশ্যপট ইতিমধ্যে গিয়েছে বদলে—ভারতবাসীর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পাওয়া গেছে মর্মান্তিক বিভেদের মধ্য দিয়ে। লন্ডনে খানবংশের ফাটলধরা একান্তরতী পরিবার এবার ভেঙে পড়ল ঐতিহাসিক তরুণের ধাক্কায়। পরিবারের একটা অংশ আশ্রয় নিল পাকিস্তানে। খান কোম্পানীর ব্যবসায় ছু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল; 'খান ব্রাদার্স', 'পাকিস্তান ইন্ফরপোরটেড' এর জন্মও এর মধ্য থেকেই।

হঠাৎ এফদিন হবিবুল্লা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে ইস্তাফা দিয়ে বসল।

নিজের গড়া 'ইলেক্ট্রনিক্স' আর 'ইঞ্জিনিয়ারিং' কারখানাগুলোর পরিচালনার ভারও সে ছেড়ে দিল একটি 'ট্রাস্ট' এর ওপরে। ব্যাংক থেকে কিছু টাকা তুলে বেরিয়ে পড়ল হবিবুল্লা জগতটাকে চিনবার বিভিন্ন অভিযানে।

প্রথম বছরটা কাটলো ইউরোপ ও আমেরিকায় 'টুরিস্ট' বৃত্তিতে। তার গতিবিধির কোনো বাঁধাধরা নিয়মও ছিল না, কখনও বা পদার্থবিজ্ঞানের কংগ্রেসে তাকে দেখা গেছে মর্শফ-বেলে, আবার কখনও ভববৃক্ষের মত ঘুরে বেড়িয়েছে সে ভ্রাম্যমান 'জিপসি'দের দলের সংগে। হবিবুল্লাকে দেখা গেছে প্যারীতে বিস্তারিত 'আর্টিষ্ট-ইন্সটিটিউট'দের আড্ডায়, লণ্ডনের ব্যবসায়ী সম্মেলনে, লোহামজুরদের সমাবেশে, পেভিলিয়ানিয়া, 'রিভাইভা' মিটিং এ 'নিউইয়র্ক' নিয়ন্ত্রিত স্পিরিচুয়ালিষ্ট সংগীতের আসরে, শিকাগোর নাইটক্লাবে, স্তানফোর্ডে সায়েন্স ফিকসন কংগ্রেসে, লণ্ডনে 'ইন্টারনেশনাল সোসাইটি'র বাৎসরিক অধিবেশনে, জার্মানিতে ম্যান প্রাংক ইনস্টিটিউটে।

জগতের তথাকথিত উন্নততর দেশগুলোর সংগে এই ভাবে পরিচয় সমাধা করে হবিবুল্লা রওনা হল অপেক্ষাকৃত দুর্গম পথে। এবার তার যাত্রা সাহারা মরু অতিক্রম করে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবধি। তারপরে পশ্চিমতীর ঘেঁষে সমগ্র মহাদেশটার অর্ধেকটা পরিভ্রমণ করে নাইজেরিয়ার উপকূল থেকে সে উঠল দক্ষিণ আমেরিকাগামী এক মালবাহী জাহাজে—আট মাসের এ দীর্ঘ পর্বটন

যে নিবিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল সে কথা বলা যায় না। নাইজেরি থেকে তার আসে যে হবিবুল্লার জীবন-সংশয় হলদে করে। সে সময় খবর পেয়ে তার এক আত্মীয় কেপটাউন থেকে এসে তার সেবা করে। ট্যাংগানিকা অতিক্রম করবার সময় বহুসংখ্যক অক্রমণে হবিবুল্লা জখম হয়ে পড়ে। প্রায় তিন সপ্তাহ তাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয় একজন বাণ্টু সরদারের অতিথি হয়ে।

দক্ষিণ আমেরিকাতেও তার সফর সমাধা হতে লাগল আরো কয়েক মাস। এবারে কিন্তু সে দেশভ্রমণের সহজতর উপায় বেছে নিয়েছিল হাওয়ারী জাহাজের যাত্রী হয়ে। হয়তো দুর্বল রোগজীর্ণ শরীরে পদব্রজে ভ্রমণ আর ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠছিল না। সম্পূর্ণ জানা গেলে এ ভ্রমণের বিবরণী থেকে একটা চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনা করা যেত। কিন্তু একমাত্র হরিকিষণ গুপ্তর কাছে লেখা ছু'-একখানা আকস্মিক পত্র ছাড়া আর সমস্ত স্মৃতিই বিলুপ্ত হয়েছে। তা ছাড়া গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে ধীরে ধীরে শৈথিল্য এসে যাচ্ছিল। হরিকিষণ গুপ্তর তখন আসেসবলীর মেম্বর-মন্ত্রী হবার সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রাক্তন ছাত্রের খবরাখবর নেবার সময়ই হত না তাঁর দৈনন্দিন কর্মতালিকার মধ্যে।

এই উদ্বেগবিহীন ভ্রমণের কোনো তাৎপর্য যোঝাও শক্ত। মনে হয় সারা হুনিয়াতে হবিবুল্লা তুলত কিছু একটা খুঁজে বেড়াত। স্থূলজীবনে গোমতীর নির্জন তটে, অজ্ঞাতবাসে ভারতের কোণে কোণে, কারবারের হিসাব নিকাশের মধ্যে আর বাইরের জগতের দুর্গম গিরিকান্ডারে যেন কোন হুরাকাঙ্কার সাধনায় তার এই নিবর্ধক অবেশণ।

মাসুকের সংগে সাধারণ ব্যবহারে ওর দানা বেঁধে গিয়েছিল একটা কাষদাত্তর জুতা। পাচজনের মনে হবিবুল্লা জাগিয়ে তুলত ঈর্ষা, সহকর্মীদের কাছে কাজ আদায় করবার ভংগীতে ছিল কঠোর স্বার্থপরতা। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রকাশ পেত তার অবহেলামিশ্রিত অবজ্ঞা। কাজেই হবিবুল্লাকে যে সকলে এড়িয়ে চলত, এটা এমন কিছু বিশ্বাসের কথা নয়। বিশ্বাসের কথা হচ্ছে এই যে, অশিক্ষিত, দরিদ্র সমাজের নীচর তলার মাসুকের জন্ত মাঝে মাঝে দেখা যেত তার প্রাণভরা দরদ।

ওর পরিচিত এক ট্যাংগাওয়ালা একবার চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। তার হয়ে আদালতে লড়াই করার জন্ত হবিবুল্লা নিয়োগ করেছিল লন্ডনের সব সেরা উকীলকে। খান পরিবারের এক পুরাতন ভৃত্যের ক্ষয়রোগ ধরল; হবিবুল্লা নিজের খরচায় তাকে পাঠিয়েছিল সুইৎসারল্যান্ডে চিকিৎসার জন্ত। দরকার হলে কোল, ভীল, সাঁওতাল, আদিবাসীদের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিত পরম আনন্দে। অথচ ভদ্রলোকের আড্ডায়, নাচ-গান-সংস্কৃতির আসবে। সাহিত্য সম্মেলনে বা রাজনীতি সভায় এক মুহূর্ত থাকতেও তার অসহ্য লাগত।

এই পটভূমিকায় হবিবুল্লার জীবনে প্রথম নারী-সংস্পর্শ। রৌশনআরা—আলিগড়ের সোসাইটি-গাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কন্যা। প্রবীণ ছাত্রদের 'হাটখব' আর নবীনদের মানসী। রেস্তোরাঁর টেনিসে, সিনেমায়, জলসায় নাম শোনা যায়—রৌশনআরা। কোন খেয়ালে হবিবুল্লা একদিন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্বৃত্ত ক্লাশে ভর্তি হয়ে গেল।

সতীর্ঘদের আশ্রয় করে দিয়ে রৌশন .কিন্তু বেছে নিল হবিবুল্লাকেই। ওই সিনেমা-পাটিতে, মানুষের সমাবেশে কিছু দিনের মতো হবিবুল্লাকে দেখা যেতে লাগল। কানাকানি মূক হল—এবার হৃর্ভেত হুর্গে কাটল ধরেছে।

কিন্তু মাত্র কয়েক মাসই এই বিলম্বিত বসন্ত ফুল ফোটা। লঘুচিত্ত প্রজ্ঞাপতির সংগে ঐরাবতের সখ্যতা সম্ভব হলেও, সে মিতালিতে প্রয়োজন মেটে না কোন পক্ষেই। লক্ষ্যেরই এক তরুণ ডাক্তার সুযোগ বুঝে একদিন রৌশনকে কেড়ে নিয়ে গেল হতবুদ্ধি হবিবুল্লার সামনে থেকেই। হরিকিষণ গুপ্তর কাছে হবিবুল্লার চিঠিতে জানা গেছে ওর সেদিনের প্রতিক্রিয়া—মর্মস্পর্শী ভাবার।

প্রকৃতি আর জড়কে জয় করার জন্ত যটা করে আজ চলছে আয়োজন। দেখা যাচ্ছে সব চেয়ে হৃস্তর বাধা এই অভিবানে মানব হৃদয়—'বায়োলজি'র অমোঘ বিধান। জীবনে আজ আমার হল দ্বিতীয় পদাঙ্কর। ছেলেবেলার একদিন খেলোয়াড় হবার সাধনা ছিল—কিন্তু সে আশার পূরণ হল না দৈব দুর্বিপাকে। তখন ভাবতাম যে, এর চেয়ে অসহনীয় হুঃখ আর কিছুই নেই জগতে। আজ পেলাম তার চেয়ে বড়ো আঘাত।

বুজি দিয়ে মনকে বোঝাচ্ছি যে রৌশনের মত অপরিত বুদ্ধি, অসারমস্তিক সংগিনীর প্রয়োজন সত্যই এমন কিছু ছিল না আমার জগতে। বুজি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি—তার সংগে আমার মিলনটা কোনো দীর্ঘকৃতি 'নরওয়েজিয়ান' জোয়ানের সংগে 'বৃশমান' নারীর মিলনের চেয়ে বিসদৃশ হয়। কিন্তু হৃদয়ের কাঁকটা ভরাবার জন্ত আজ কোনো উপকরণেরই সন্ধান পাচ্ছি না।

হবিবুল্লার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রৌশনআরা বলেছে, হবিবুল্লার মধ্যে কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা থেকে গিয়েছিল—ইঞ্জিনবিহীন জাহাজের খোলটার মতো। ব্যবহারে ছিল তার একটা দুর্বোধ্য আড়ষ্টতা। একটা প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠ রতাও তার মধ্যে দেখেছি। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার হুঃখ এই যে, ওই বিরাট প্রতিভা জগতের কোনো কাজেই লাগল না।

সত্য কথা বলতে কি, আমার সে কোনদিনই চায়নি—মানুষ যেমন করে মানুষকে চায়। আমার মধ্যে সে যেন কিসের সন্ধান করত।

এই বিপর্যয়ের পর হবিবুল্লার সখের কলেজ-জীবনেও পড়ল যবনিকা। আঘাত পেয়ে হবিবুল্লা সাধনার আশায় ভুবে গেল আবার তার বই-এর তাড়ার মধ্যে। এমনি ভাবে কেটে গেল কিছুদিন। মাস ছয়েক বাদে সে উপস্থিত হল গুপ্ত সাহেবের দরবারে।

গুপ্তসাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন—ছেলেটা বদলিয়ে গিয়েছে। তার চোখে উর্দূপনার আলো, বর্ধনবে আত্মবিধ্বাসের দৃঢ়তা। গুপ্তসাহেবের কাছে সে বললো, মাষ্টার সাহেব এবার একটা ল্যাভরেটরী গড়ে তুলব বলে স্থির করেছি। এমন ল্যাভরেটরী ভারতে কেউ কখনো দেখেনি।

হরিকিষণ গুপ্ত খুব উৎসাহের সংগে সে প্রস্তাবের সমর্থন করলেন। ভাবলেন, ছেলেটার প্রতিভা ও অর্ধবল যদি সত্যই কিছু কাজে লাগে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে গুপ্তসাহেবের সংগে চলল ল্যাভরেটরী সখকে জল্পনা-কল্পনা। গুপ্ত-শিষ্যের মধ্যে আবার কিরে এক কনিকের জন্ত সেই পুরানো দিন—মাবিকারের স্বপ্নে বিহ্বল। তারপর হবিবুল্লা চলে এল দিল্লীতে।

এ সময়ে একজন আশ্রিত ভাইপো জুটে গেল ওর সংগে। পাঞ্জাবে দাংগার সময়ে সলিমুদ্দিনের চোখের সামনে কিন্তু শিখের দল ওদের পরিবারের সমস্ত পুরুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সলিম ও তার আত্মা এক হিন্দু পরিবারের মধ্যে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু ওর মা এ নিদারুণ অভিজ্ঞতার ফলে একেবারেই বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে গেলেন। জীবমৃত অবস্থার তিনি বছর কয়েক বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হবিবুল্লা কিশোর সলিমকে পরম আদরে কাছে টেনে নিয়ে এল। দিল্লীতে কলেজে তাকে ভর্তি করে দিয়ে অতি বড়ে সলিমের পড়াপনার সাহায্য করতে লাগল।

সলিমও ছারার মত অল্পসরণ করে হবিবুল্লার পোষমানী কুকুরের মতো—নানা রকমের কাইফরমাস খেটে দেয়, সাহায্য করে যথাসম্ভব ল্যাভরেটরী সাজানোর কাজে। হবিবুল্লার স্নেহবৃত্তুক হৃদয়ও পেল একটা অবলম্বন। নিজের জীবনের নিয়মতান্ত্রিক কলেজ শিক্ষার যে অসম্পূর্ণ সাধ তার কতকাংশ পূরণ করে নিতে লাগল সলিমের মাধ্যমে।

পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে সলিম যখন বি. এস সি পাশ করে, হবিবুল্লার তখন গৃহনির্মাণ পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এবার



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
'শঙ্খ ও গন্ধ'

মার্ক গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

-রিটেল ডিপো-

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২১১৫

সলিমকে সংগে নিয়ে আবার বিদেশে বেরিয়ে পড়ল হবিবুল্লাহ ল্যাভরেটরীর সাজসরঞ্জাম যত্নপাতির সন্ধানে। তার পর আসতে লাগল বিদেশ থেকে বড় বড় প্যাকিং বাস ক্রেট প্রায় বছর ধানেক ধরে। ধীরে ধীরে হবিবুল্লাহ ল্যাভরেটরী গুরে উঠতে লাগল। এ সময়ে ওরা ছিল নিজেদের মধ্যেই সমাহিত। বহির্জগতের কারুরই প্রবেশ ছিল না গুড়া-ভাইপোর মধ্যকার অন্ধর্জগতে— এমন কি গুপ্তসাহেবেরও নয়।

গুপ্তসাহেবের সংগে শেষ দেখা হয় হবিবুল্লাহ এগারো মাস আগে। ওদের গৃহপ্রবেশের উৎসবে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কয়েক ঘণ্টার জন্য জরুরী কাজ কেসে বেখে। হবিবুল্লাহকে তিনি দেখেছিলেন দারুণ অসুস্থ। সে রাত্রে বিদায় নেবার সময় হবিবুল্লাহ শেষ কথাটা তাঁর মনে আছে। মাষ্টারসাহেব, মনে হচ্ছে একটা বিরাট কিছু সন্ধানে পেয়েছি। আমার পরিকল্পনা সম্ভব হলে ভারতে বিজ্ঞান-সাধনার রূপ বোধ হয় বদলে দেওয়া যাবে। আজ তো আর সময় হল না—একদিন আপনার অবসর হলে সবই বলব।

বলা বাহুল্য, সে সুযোগ আর আসেনি।

এর পরে পড়েছে কাহিনীতে ছেদ। এ সময়ের মধ্যে ল্যাভরেটরীতে হবিবুল্লাহ আর সলিম কী নিয়ে যে সমাহিত থাকত, আজ আর তা জানার কোনো উপায় নেই। চাকরবাকরের সাক্ষ্য জানা গেছে যে, প্রায়ই গভীর রাত্রি অবধি ছুজনে পবেষণাগারে পড়ে থাকত, কখনো বা আহা-নিদ্রাও পরিত্যাগ করে।

টিমারপুরের অগ্নিকাণ্ড বাড়ীতে শিশুপুত্র নিয়ে যে ভক্তমহিলা বাস করতেন, তাঁর সবকিছু বিশেষ কিছু জানা যায়নি। মিসেস আহমদ বলে তিনি ওখানে পরিচিত ছিলেন। ইতিবৃত্তে বতটুকু জানা গেছে, ছুঁটনার বছরখানেক আগে দু'মাসের শিশুপুত্র নিয়ে ঐ বাড়ীর তিনতলার বড়ো 'ফ্ল্যাট'টা তিনি ভাড়া নেন। হবিবুল্লাহ মাঝে মাঝে আসত তাঁর সংগে আলাপ করবার জন্য। নীচের তলার কয়েক জন দোকানদারের সংগে তার সামাজ্য আলাপ ছিল; আর ওর ছোটো মোটর গাড়ীটাও ওই অঞ্চলে পরিচিত ছিল।

মিসেস আহমদের সংগে বিশেষ পরিচয় ওই বাড়ীর বাসিন্দাদের কারোই ছিল না। মাসে মাসে উচ্চহারে নিয়মিত বাড়ী ভাড়া পেয়ে বাড়ীওয়ালার সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন। দামী কারনিচারের বহর দেখে সকলে অসুস্থান করে নিতেন যে, ভক্তমহিলার অর্থের অভাব ছিল না। ওই ফ্ল্যাটে ওদের সংগে ছিল একজন পরিচারিকা—অগ্নিকাণ্ডের কয়েক দিন আগে থাকতে সে-ও নিরুদ্দেশ হয়েছিল। মিসেস আহমদের সংগে হবিবুল্লাহ যে কী সম্পর্ক, তদন্ত করেও তা জানা সম্ভব হয়নি। কোন ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে হয়তো বা ছুজনের মধ্যে কোন অর্থে সম্পর্ক ছিল।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অগ্নিকাণ্ডের সময় মিসেস আহমদ ও তাঁর শিশুপুত্রের তিনতলার অবস্থিতির কথাটা কারো জানা ছিল না।

সবচেয়ে হতাশার কথা, হবিবুল্লাহ পূর্ব ইতিহাস অনেক সময়ে সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হলেও জীবনের শেষ অধ্যায়টা তার মনে গেছে রহস্যমালে আবৃত। এ জীবনের বেশীর ভাগ উপকরণই সংগ্রহ করা গেছে হরিকিষণ গুপ্তের সহযোগিতায়।

হবিবুল্লাহ মনের যে অংশ ছিল গুপ্তসাহেবের নাগালের বাইরে, সে অংশটা রইল হয়তো বা চিরকালের মতো বিস্মৃতির অতলসায়রে ডুবিয়ে।

দীর্ঘ পঁচিশ পৃষ্ঠার রিপোর্ট এখানে খেমে গেছে। শেষে একটা ছোটো প্যারাগ্রাফে যোগ করা হয়েছে,

এ বিচিত্র ঘটনাবলী জীবনকাহিনীর মধ্যে অ্যাণ্ডি প্রাণ্ডি আবিষ্কারের মূল প্রেরণা কোথায় যে সমাহিত হয়ে আছে, আপাত ভূঁইতে তা ধরা যায় না। পজু হয়ে পড়ার পর হতাশাস কিশোরের মনে কি জেগে উঠেছিল মহাকর্ষ বিজয়ের সংকল্প? না, রৌশন আয়ার নির্মম প্রত্যাখ্যানের পর একটা অসম্মত প্রতিক্রিয়া নিয়েছিল হবিবুল্লাহ—সাধারণ মানুষকে ছাড়িয়ে ওঠবার? ভবিষ্যতের শুভম এ সবকিছু আলোকসম্পাত করবে কি?

শংকরের চোখে আজ ঘুম নেই।

দীর্ঘ ব্যারাকটা নিস্তক। দূরে আওয়াজ শোনা গেল কুকুরের পালের। কখনো বা নীরবতা ভেঙে যায় দু'পাখে লরী বা মোটরের বন্বনায়। দু'পাশে ট্রেনের বাঁশীর আওয়াজ শোনা যায় থেকে থেকে। সম্ভবতঃ কোনও যাত্রীবাহী ট্রেনকে আটক করে রাখা হয়েছে ডিসট্যান্ট সিগনালের লালচক্ষু দেখিয়ে।

কেমন মানুষ ছিল হবিবুল্লাহ?

তার ভাড়া যতটুকু মতোই এ অদ্ভুত কাহিনীর মধ্যে কোথায় মনে গেছে একটা অসম্মতা, একটা প্রচ্ছন্ন অপূর্ণতা!

হবিবুল্লাহ কোন রূপটা সত্য? কল্পনাবিলাসী হবিবুল্লাহ? ব্যবসায়ী হবিবুল্লাহ? না ভবনুয়ে হবিবুল্লাহ? কিসের সন্ধানে কেটেছিল তার নিফল জীবন? অ্যাণ্ডি প্রাণ্ডি?

এ জীবনকাহিনীতে কোথায় কেন থেকে গেছে এক বিরাট অসংগতি। তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করেও সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না কেন?

চোখ বন্ধ করে শংকর মানস পটে ফোটাতে চেষ্টা করে হবিবুল্লাহ প্রতিকৃতি। একটা আবছায়া অস্বস্তির বোঝার রাস্তা মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে হবিবুল্লাহকে আর আলাদা করা যাচ্ছে না!

ঘরের বাতিটাকে স্নাইচ টিপে নিবিয়ে কেসে শংকর যায়।

[ক্রমশঃ]

ভলভেয়ার—জীবন ও দর্শন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

উপমহ্য

অন্তায় ধ্বংস হোক

শ্রোণের ক'টা দিন দার্শনিক চিন্তার জাল বনে, বিষাদবিধুর নিঃসঙ্গতায় কাটিয়ে দেবেন, এই হয়তো ভেবেছিলেন ভলভেয়ার। পরিবেশও ছিল অসুস্থ। তাঁর দার্শনিক যত্ববাদ মেনে নিয়েছিল অভিজাত-সমাজ। ধর্মবাক্যকরাও তাঁর ওপর বিরূপ হননি, বিশ্বাসের পথে যে অনেক কাঁটা এই ভেবে অসুস্থপার হাসি হেসেছিলেন। কেউ কেউ ভলভেয়ারকে ধর্মীয় কোনো সম্মানে ভূষিত করার কথাও ভাবছিলেন। কিন্তু তা আর হ'ল না। আচমকা এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উগ্রভেদে জলে উঠলেন ভলভেয়ার, ওড়ালেন রাজক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা। সেই পতাকায় রক্তাকরে লেখা হ'ল অন্তায় ধ্বংস হোক। কিন্তু কি সেই ঘটনা?

Ferney থেকে একটু দূরেই ফ্রান্সের সপ্তম সহর Toulouse। Toulouse তে তখন চলেছে ক্যাথলিক রাজক-সম্প্রদায়ের নির্বাধ রাজত্ব। প্রোটেষ্ট্যান্টদের উপর আরোপ হয়েছে অসংখ্য বাধা-নিষেধ। তাদের কেউ সহরে উকীল, ডাক্তার সুদী, পুস্তক-বিক্রেতা বা ছাত্র হতে পারেনা। এমন কি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রোটেষ্ট্যান্ট চাকর বা কেরানী রাখাও নিষেধ। ১৭৪৮ সালেও প্রোটেষ্ট্যান্ট ধাত্রীকে নিযুক্ত করার জন্য এক ক্যাথলিক রক্ষীকে ৩০০০ ফ্রাঁ অধিমানা দিতে হ'য়েছিল।

এ সব কিছুই জানতেন না ভলভেয়ার। জানলেন যখন Toulouse থেকে সহরের প্রোটেষ্ট্যান্ট বাসিন্দা Jean Calas এর অত্যাচারিত ও সর্বস্বান্ত আত্মীয়-স্বজন এসে আশ্রয় চাইল তাঁর কাছে। Calas এর এক মেয়ে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছিল। পরে একমাত্র ছেলে করল আত্মহত্যা। সহরের আইনামুসারে আত্মহত্যাকারীর নগ্ন মৃতদেহ রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় কাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। শোকার্ত পিতা চেয়েছিলেন মৃতদেহকে এই মর্যাদিক পরিণতি থেকে রক্ষা করতে। তাই মৃত্যুটা আত্মবিক্রম প্রমাণ করার চেষ্টা ক'রেছিলেন তিনি। কিন্তু কল হ'ল বিপরীত। ক্যাথলিকরা যট্টের দিল ব্যাপারটা মোটেই আত্মহত্যা নয়। ছেলের ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণে বাধা দেবার জন্যে বড়বড় ক'রে হত্যা করা হয়েছে তাকে। Calas মৃত হ'ল এবং শেষ পর্বত অমায়িক নির্ধাতনের ফলে তার মৃত্যু হ'ল। তারপর চ'লল অবশিষ্ট আত্মীয়স্বজনের উপর অত্যাচার। সহর ছেড়ে প্রাণতরে পালিয়ে তারা আশ্রয় নিল ভলভেয়ারের কাছে। এটা ১৭৬১ সালের ঘটনা।

১৭৬২ সালে Toulouse সহরে মারা গেল Elizabeth Sirvens নামে প্রোটেষ্ট্যান্ট মেয়ে। আবার ওজব ঘটলো যে ক্যাথলিক হবে এ প্রায় ঠিকই ক'রে ফেলেছিল এলিজাবেথ।

ক'রেছে। আবার একবার সহরের প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ওপর ব'য়ে গেল একটা অত্যাচারের তাণ্ডব। কেউ একবার ভেবেও দেখলে না যে সদাসমুদ্র মুষ্টিমের জনকয়েক প্রোটেষ্ট্যান্টের পক্ষে এমন কিছু করা করনার অতীত। ১৭৬৫ সালে বোল বছরের প্রোটেষ্ট্যান্ট কিশোর La Barre কে কেন্দ্র ক'রে প্রকাশিত হ'ল এই সাম্প্রদায়িকতার নব রূপ। ক্রম ভেঙ্গে ফেলার অপরাধে মৃত হ'ল এই কিশোর। পাশবিক অত্যাচারের পেয়ে আদার করা হ'ল তার স্বীকৃতি। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠল সারা সহরের ক্যাথলিক সম্প্রদায় নরহত্যার আনন্দে। অশ্রুর আঘাতে এই কিশোরের মস্তক ছিন্ন ক'রে, মৃতদেহ নিয়ে কোলা হ'ল অলম্ব অরিকুণ্ডে। আর সেই লেলিহান অগ্নিশিখা ঘিরে উল্লাসে মেতে উঠলো এক উন্নত জনতা। কিশোর বুকে একটি বই অড়িয়ে ধ'রে মৃত্যুকে বরণ করেছিল। বইও পুড়ল আগুনে। সেই বইয়ের নাম Philosophic Dictionary—লেখক ভলভেয়ার।

মহুয্যেব এই অপমানে তীব্র ক্রোধে জলে উঠলেন মানবধরনী ভলভেয়ার। রাজক-শাসনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে অত্যাচারের নিরসনকল্পে শুরু হ'ল তাঁর সংগ্রাম। d'Alembert ও চার্চ ও রাষ্ট্রের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে লিখেছিলেন—এর পর সবকিছু কোঁতুকের চক্ষে দেখা হবে আমার কাজ। উত্তরে ভলভেয়ার এইবার লিখলেন এ কোঁতুকের সময় নয়, হত্যার সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসি-ভাঙ্গা চলনা...। ডেকাসের মামলাকে কেন্দ্র ক'রে উদ্বীণ হ'য়েছিলেন জোলা আর আনাতোল ফ্রাসু। হয়তো তাঁদের এই প্রেরণায় উৎস ছিল ভলভেয়ারের জীবন; একদিন ফ্রান্সের মাটিতে ভলভেয়ারই দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে অত্যাচারের সঙ্গে আপোষ সম্ভব নয়। দর্শনের শাস্ত পরিবেশ ছেড়ে বৃদ্ধ ভলভেয়ার বার হলেন কর্মের আহ্বানে, নব-জীবনের শুদ্ধি-মন্ত্র তবল অরির ভেঙ্গে নির্গত হ'ল তাঁর লেখনীর মুখে। এই মন্ত্র হ'ল অত্যাচার ধ্বংস কর। এই মহান বক্তে সকলকে ডাক দিলেন তিনি। Diderot, d'Alembert সকলকে, বললেন সকলে হাত মিলিয়ে ধ্বংস কর মুষ্টিমেয়ের এই অন্ধ উন্নত অত্যাচার ও অত্যাচারকে; বাতে আগামী দিনের বংশধরেরা স্বাধীন জীবন ও স্বাধীন ও চিন্তার আবহাওয়ার নিখাস নিয়ে বাঁচতে পারে। এই আঘাতের প্রচণ্ডতার ভেঙ্গে পড়লো করানী রাজক-শাসনের প্রভাব প্রাচীর, কেঁপে উঠলো রাজতন্ত্রের ভিত্তি।

প্রতিপক্ষও নিশ্চূপ হয়ে বসেছিল না। রূপোর খালার সম্মানের স্বর্ষুকুট সাজিয়ে পাঠানো হল ভলভেয়ারের কাছে। সুন্দরী বিলাসিনী মাদাম পাম্পাছরের কথিক সান্ধ্য পাবার জন্যে পাগল তখন প্যারিসের অভিজাত-সমাজ। সেই মাদাম পাম্পাছর পাঠালেন চার্চের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব; প্রস্তাবে সম্মত হলো চার্চ।

জনগণের অন্তরে ধীরে আসন পাতি, ইন্টেলেক্টের রাজ্যে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট, সেই ভলতেয়ার প্রলুব্ধ হবেন জনবতক মুক বাজকের প্রভু করায়। প্রত্যুত্তরে ভলতেয়ার প্রকাশিত করলেন তাঁর *Treatise on Toleration* লিখলেন—*তিনি*—কি আশ্চর্য যে ধারা আজ বলছেন আমি যা করছি তাই কর, অজ্ঞাধার ঈশ্বর তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন; তাঁরাই আবার পরের দিন বলছেন—আমি যা করছি তাই কর, নতুবা আমি তোমায় হত্যা করবো। তারপর তুললেন তিনি সেই মৌলিক প্রশ্ন—স্বাধীনতার প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার, অতএব কি অধিকার আছে একজনের অঙ্কে তার মতে চলতে বাধ্য করার? মত শেষ করে উচ্চারণ করলেন পথের নির্দেশ মানুষ যতক্ষণ না পরম্পরের দার্শনিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মতবৈধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ততক্ষণ পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির কোনো আশা নেই। ধর্মতত্ত্বের উচ্ছেদ সাধন না হলে পাওয়া যাবে না সামাজিক স্বাস্থ্য—কারণ গৌড়ামিই হচ্ছে ধর্মীয় শাসনের মূলমন্ত্র।

ক্রমে ভলতেয়ারের কলম থেকে জায়গার দুর্দান্ত গর্জনে অক্ষরগুলি উদ্দাম ভলপ্রোতের মতো উৎসারিত হল একের পর এক পুস্তিকা, ইতিহাস, চিঠি, ব্যঙ্গ-বিক্রপ, প্রবন্ধোত্তর, উপদেশ, উপাখ্যান, কাব্য, কাহিনী একাধারে সমালোচনা ও সাহিত্য। নিজের নামে এবং শতাধিক ছদ্মনামে লিখিত হল এই অসংখ্য অগ্নিগোলক—সাহিত্যিক যুদ্ধে শত্রুর বাহকে লক্ষ্য করে এমন মারণাস্ত্রের আতসবাজী আগে কখনও দেখা যায়নি, পরেও গিয়েছে কি না সন্দেহ। জীবন-দর্শনের এমন বহু অখণ্ড প্রশ্নবস্ত্র ভাষ্য সাহিত্যের ইতিহাসেও দুর্লভ। দার্শনিকমূলক বিনয়ে গলে গিয়ে ভলতেয়ার অবশ্য বললেন হ্যাঁ, সত্যিই আমার চিন্তাধারা ভারী সহজ আর সরল। পার্বত্য নিকরিনী আর কি, জল যার গভীর নয় বলেই কাচের মতো স্বচ্ছ। সেই স্বচ্ছ জলে মানুষের প্রচণ্ড মুক্তির তৃকা নিশ্চয়ই মিটছিল, তা না হলে তখনকার দিনে এক একটা পুস্তিকা ৩০০,০০০ কপি বিক্রী হওয়া সম্ভব হতনা। আজকের দিনেও শুধু এই বিপুল সংখ্যার কথা ভাবলেই আশ্চর্য লাগে। ভলতেয়ার জানতেন যে, বড় বই পড়বার বৈধ সাধারণ মানুষের নেই। তাই সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস বর্ণাঙ্গনে পাঠালেন তাঁর এই ক্ষুদ্র কিন্তু সুসজ্জিত লক্ষ লক্ষ সৈন্তের দল। পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সৃষ্টির শেষ কাজটি পর্যন্ত করলেন সত্তর বছরের বৃদ্ধ নিজের হাতে। ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে আছে এই বিপুল স্বল্পনীশক্তির, এই অলৌকিক উদ্দীপনার স্বর্ণবাক্য।

উচ্চ চিন্তার পর্দারে উপনীত হয়ে ভলতেয়ার প্রচণ্ড বিক্রমে বাইবেলের সমালোচনা করলেন। অবশ্য স্পিনোজা, ইয়াজ...Deists এবং Bayle এর *Critical Dictionary* থেকে প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু নিজস্ব ভঙ্গীতে বসসিক্ত করে বা পরিবেশন করলেন তার রূপ ভিন্ন, আত্মদণ্ড নুতন। এই সিরিজের একটি পুস্তিকার নাম "The questions of Zapata," জাপাটার বড় সাধ বাজক হবার। কিন্তু মনে তার সন্দেহও অনেক। তার একটা প্রশ্ন হ'ল ইহুদীদের আজ আমরা ধরে ধরে পুড়িয়ে মারছি। তা হ'লে কি করে আমি প্রমাণ করবো যে তারা হাজার বছর আগে এই ইহুদীরাই ছিল ঈশ্বরের একমাত্র

আপনার জন? এই প্রশ্নের মধ্যে হয়তো নিজের মনের একটু উদ্ভাও মিলিয়ে দিয়েছিলেন ভলতেয়ার। অর্ধের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক এই দার্শনিক বিক্রপ ছিলেন জাতব্যবসায়ী ইহুদীদের প্রতি। সেই মানসিক বিকোভের আভাস আছে জাপাটার প্রশ্নের মধ্যে।

এই রকম অসংখ্য প্রশ্ন তুলে ভলতেয়ারের জাপাটা উজ্জ্বলিত করলে বাইবেলের মহিমাকে। শেষে উত্তর না পেয়ে বিরক্ত জাপাটা অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে ঈশ্বরের মহিমা প্রচারে বসে হ'ল। সে বললে, ঈশ্বর এক, তিনি সকলেরই পিতা, তিনি পাপীকে শাস্তি দেন, পুণ্যাত্মকে পুরস্কৃত করেন এবং অজ্ঞায় কমা করবার ক্ষমতা তাঁরই। এই ভাবে সে মিথ্যার জঞ্জাল সরিয়ে আবিষ্কার করলে সত্যের দ্যুতিমান হীদক এবং প্রমাণ করলে যে প্রকৃত ধর্ম আর আচরিত গৌড়ামি এক নয়। সে সকলকে সং হবার শিক্ষা দিলে। স্নেহ, সহানুভূতি বিনয় ও প্রেম রূপায়িত হ'ল তার অভ্যাসে এবং আচরণে। ১৬৩১ সালে এই লোককেই Valladolid এ পুড়িয়ে মারা হ'ল।

ভলতেয়ার দেখাতে চাইলেন কেমন করে ভারত, গ্রীস ও ইজিপ্টের অতি পুরাতন ধর্মীয় আচার-আচরণ খৃষ্টীয় ধর্ম অল্পপ্রবেশ করেছে এবং এ-ও বললেন যে, এই পুরাতনের পুনরাবৃত্তিই সেকালের মানুষের কাছে খৃষ্টধর্মের সাকল্যের অন্ততম কারণ। তাঁর ধর্মনিবন্ধে লিখলেন, অত্যাচার ও অনাচারে লিপ্ত থেকেও দীর্ঘ ১৭০০ বৎসর খৃষ্টধর্ম বখন বেঁচে আছে তখন তার অপার মহিমা স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রকৃত ধর্মের সঙ্গে যে পুরোহিতদের বিন্দুমাত্র যোগ নেই এইটাই নানাভাবে প্রমাণ করতে চাইলেন ভলতেয়ার। শুধু গৌড়ামি আর আচার-আচরণের কচকচি নিয়ে মেতে আছে এই মূর্খের দল। সাধারণ মানুষ কোনোদিন মাথা ঘামায়নি এই সব ঢুচ্ছ হান্তকর মতামত নিয়ে—সৃষ্টি করেনি ভয়াবহ পরিস্থিতি, ডেকে আনেনি অসংখ্য আত্মকলহ—বরঞ্চ সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের বিনিময়ে আরামে জীবন কাটাচ্ছে এই পুরোহিতের দল এবং ক্রমাধারে এরাই চাইছে আরও ভারাম, কামনা করছে আরও বেশি ক্রীতদাস। সাধারণ মানুষকে এরাই প্রবৃত্ত করছে আত্মকলহে—বাক্তে নিজেদের প্রভু অব্যাহত থাকে। গৌড়ামির শিক্ষা দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মনকে আকর্ষণ করা ওদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য বাজক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে মানুষের মনে আতঙ্ক অব্যাহত রাখা। অর্থাৎ 'পৃথিবীর ছুট ব্যক্তিই ছিল পৃথিবীর প্রথম পুরোহিত এবং তার সঙ্গে যার প্রথম সাক্ষাৎ সেই ছিল পৃথিবীর প্রথম মূর্খ।' এই পুরাতন প্রবাদই উত্থাপিত করাসী জনগণের মনে নূতন করে গেঁথে দিতে চাইলেন ভলতেয়ার।

এর পর একটা প্রশ্ন থেকে যায়—তাহলে কি ভলতেয়ার নিজেই ছিলেন খোঁড়া নাস্তিক? জীবনের অনেক পথ সন্দেহের দোলায় দুলাতে দুলাতে চলেছেন ভলতেয়ার, তাতে সন্দেহ নেই। এক সময়ে নাস্তিক্যবাদকে প্রবল আক্রমণ করেছিলেন তিনি। কলে *Encyclopedists*র বিক্রপ হয়েছিল তাঁর প্রতি, বলেছিল, 'ভলতেয়ার একজন গোঁড়া ঈশ্বরবিদ্বানী।' কিন্তু ঠিক বলেনি তারা। কারণ তার পরেই ভলতেয়ার অধুবক্ত হয়েছিলেন স্পিনোজার *pautheism* এর প্রতি। Diderot কে লিখলেন অক্ষ হয়ে জন্মাবার ক্ষোভে Saunderson ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। 'আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। হয়তো তুল আমায়ই।

লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে



আ। লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম।
আর স্নানেরপর শরীরটা কত বর করে লাগে।
ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্যকারী
ফেনা সব ধুলো ময়লা সোণবীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।
আজ থেকে পরিবারের সবলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।



কিন্তু তবুও যিনি ষ্টিব বহুসভা অঙ্কে একাধিক অগ্ৰাণ শক্তি দিয়েছেন তাঁর অসীম করুণাকে অস্বীকার করতে পারিনা; অস্বীকার করতে পারিনা—যখন দৃশ্য-স্বপ্নের প্রতিটি বস্তু মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মের অস্তিত্ব দেখি। অচিন্ত্যনীয় নিপুণতার অধিকারী একজন স্রষ্টা নিশ্চয়ই আছেন। তিনি কে বা কেন তিনি এই সৃষ্টিকে রূপ দিয়েছেন তা জানিনা, কিন্তু জানিনা বলেই তিনি নেই, এমন কথাও মানতে পারিনা। সব মানুষই সেই অজ্ঞাত শক্তির অংশ।

মন্ত্রের মারাজাল বা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করবার লোক তা বলে ছিলেন না ভলভেরার। ছোট একটা কোডুক-কাহিনীতে তিনি বলেছেন তাঁর মনের কথা। কাহিনীটা হুই সন্ন্যাসিনীর সংলাপ: একজন বলছেন, 'বিধাতা যে আমার প্রতি প্রেমের ভার অনেক প্রমাণ আছে। এইতো আমার পোষা পাখীটার মারাত্মক অসুখ করেছিল। দশ বার প্রার্থনা করবার পরই সেবে গেল তার অসুখ।'

কাছেই ছিলেন এক প্রাজ্ঞ দার্শনিক। তিনি বললেন, 'আমিও জানি যে প্রার্থনার মতো সুলভ আর কিছু নেই—বিশেষত: তরুণীর কণ্ঠে শুধু ল্যাটিনে যখন তা উচ্চারিত হয়, কিন্তু বিধাতার সব কিছু ছেড়ে শুধু আপনার ওই সুলভ পাখীকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন, আমি মানতে পারি না। আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে বিধাতার আরও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ থাকে স্বাভাবিক।'

অপর সন্ন্যাসিনী তখন চোখ কুঁচকে বললেন, 'আপনি গোটা কতক শোনা কথা বলছেন যেন... অস্ত্র কেউ শুনে আপনাকে নাস্তিক ভাবে।'

দার্শনিক উত্তর দিলেন, 'মোটাই আমি নাস্তিক নই। আমি সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী সেই বিরাট শক্তিতে বিশ্বাস করি, যে শক্তি অসংখ্যকাল যোগে বেঁধে দিয়েছেন বিশ্বনিয়ন্ত্রণের নিয়ম, যে নিয়মের অস্তিত্ব প্রতীক হচ্ছে পূর্ব। কিন্তু আমি এমন কোনো বিশেষ বিধাতার বিশ্বাস করি না, যে বিধাতা আপনার পোষা পাখীটার সুবিধা হবে বলে তাঁরই সৃষ্টি নিয়মকে পরিবর্তিত করবেন।'

অর্থাৎ ভলভেরার মতে—বিধাতা বল বাই বল, সত্যিকারের প্রার্থনা বিশ্ব-নিয়মের ব্যতিক্রম চাইবে না, বরঞ্চ এই নিয়মকেই ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা বলে স্বীকার করে নেবে। "Free will" সবক্ষেত্র বড় বড় উক্তি শুনে হেসে উড়িয়ে দিতেন ভলভেরার। আবার আশ্চর্য অমরত্ব বা অমরত্ববাদেও তিনি বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। সোজা বলেছেন, পৃথিবীতে এত জীব থাকতে মানুষই কেন এই আশ্চর্য অমরত্ব দাবী করেছে? সম্ভবত: ওটা মানুষের অদম্য আশ্চর্যমির কল। আমার মনে হয়, মরুর কথা বলতে পারলে সমস্বরে ঘোষণা করতো যে তারও আশ্চর্য আছে এবং সেই আশ্চর্য আসন হচ্ছে তার মনোহর পুঙ্খের অস্তরে। মনের এই অবস্থার মর্যালিটির সংরক্ষণে অমরত্ববাদের প্রয়োজন, এ কথাও তিনি মানতেন না। হেসে বলতেন, প্রাচীন মর্যালিটির বালাই ছিল না কিন্তু তাতে তাদের ঈশ্বরের প্রিয় হতে আটকায়নি।

আরও পরে অবশ্য তাঁর এই মত বদল হয়েছিল। Dayle-এর প্রস্তাব—'নাস্তিকদের নিজস্ব সমাজ থাকতে পারে কি না'—এর উত্তরে ভলভেরার বললেন, পারে, যদি নাস্তিক হয় দার্শনিক। কিন্তু যেহেতু দার্শনিক কোটিতে মাত্র গুটিকতক, অতএব সাধারণ মানুষের পাপের ও পণের পরস্কার দেবার জন্য একজন ঈশ্বর প্রয়োজন। আদর্শ

গ্রাম গড়তে হলে তাঁর অধিবাসীদের একটা ধর্ম থাকা কথা। এই সব ভেবে ভলভেরার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রাজের সুরে বলতেন, আমি চাই যে আমার উকীল, দর্জি এবং স্ত্রী ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে; তাহলেই আমার ঠকবার বা অপস্রুত হবার আর ভাবনা থাকে না। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি না-ও থাকে, তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে।

সন্দেহের শূন্যতা থেকে ধীরে ধীরে বিশ্বাসের শক্তি মাটিতে পা রেখেছিলেন ভলভেরার। Holbach-কে লক্ষ্য করে তাঁর অভিধানে 'ঈশ্বর' নিবন্ধে লিখলেন তুমি স্বীকার করেও যে ঈশ্বর-বিশ্বাস অসম্ভব কিছু মানুষকে অগ্ৰাণ থেকে বিরত করেছে। তাই যদি হয় তো আমি ওইটুকুতেই সন্তুষ্ট। ঈশ্বরে বিশ্বাস যদি দশটা হত্যা, দশটা অত্যাচার নিবারণের কারণ হয় তা হ'লেই আমি সারা পৃথিবীর লোককে এই বিশ্বাসের প্রতি অল্পরক্ত হ'তে বলবো। তুমি অবশ্য এ-ও বলেছো যে, ধর্ম পৃথিবীতে অসংখ্য দুর্দশার বাহন হয়েছে; আমি বলবো ধর্ম নয় কুসংস্কার, যা আজও আমাদের আচ্ছন্ন করে আছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির পথে এই কুসংস্কারই প্রধান বাধা। মাতৃবন্ধ বিদীর্ণকারী এই দানবকে ধ্বংস করতেই হবে; যারা এর দমনে উত্তোঙ্গী তারা মানবজাতির পরম বন্ধু। ধর্মের বন্ধে মরণকামড় বসিয়েছে এই কুসংস্কারপী সর্প; একে মারতেই হবে কিন্তু সাবধানে—যাতে মাতৃ-অঙ্গে আঘাত না লাগে।

ধর্ম ও কুসংস্কারের এই পার্থক্যই ভলভেরার ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যীশুর চরণে কৈদেছেন ভলভেরার। যীশুর প্রতি তাঁর বহু প্রশংসা অনেক সাধু-সন্তেরও ঈর্ষার দস্ত। বার বার তিনি কল্পনা করেছেন সাধু-সন্তদের মধ্যে বসে কান্না ম্যানবপুত্র যীশু, কান্না ম্যানবপুত্রের নামে অসংখ্য পাপের কথা স্মরণ করে। হয়তো মানুষের চরণে ভলভেরারও আড়ালে বসে কেলেছিলেন অনেক চোখের জল। তারপর শেষে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ঈশ্বরকে। এই পরমদর্শন রূপায়িত হয়েছে তাঁর Theist নিবন্ধে।

Theist সেই মানুষ যে সর্বশ্রেষ্ঠ এক মহান পুঙ্খের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, যিনি মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান, যিনি বিশ্ব-চরাচরের স্রষ্টা... যিনি নিষ্ঠুর না হয়ে পাপের শাস্তিবিধান করেন, এবং মঙ্গলময়রূপে পুণ্যকে করেন পুণ্ডিত—এই বিশ্বাস বৃকে নিয়েই Theist বিশ্বের অধিবাসী। অজ্ঞাত বিভিন্ন মতাবলম্বী, যারা পরম্পরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত, তাদের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। তার ধর্মই পৃথিবীর সবচেয়ে পুণ্ডিত এবং সর্বব্যাপী ধর্ম, কারণ ঈশ্বরের এই সহজ পুঙ্খই পৃথিবীর বৃকে মানুষের প্রথম আরাধনা। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি পরম্পরের ভাষা বোঝেনা কিন্তু Theist এর ভাষা সকলেই বুঝবে। দক্ষিণ থেকে উত্তরমেক সর্বত্র তার সমধর্মী আছে, সব সাধু-সন্তই তার আপনজন। সে বিশ্বাস করে যে ধর্ম মানে গোটা কতক অবাধ্য দার্শনিক মতামত নয়, বা অসার লোকসেখানে আচার-আচরণ নয়, ভারই ধর্মের দেহ, পুঙ্খই তার প্রাণ। তার কাছে মঙ্গল বর্মই পুঙ্খ, ঈশ্বরে বিশ্বাসই তার মন্ত্র। এক ধর্ম তাকে টেচিয়ে বলে, সাবধান! মন্ত্রায় তীর্থযাত্রা যেন বাদ না যায়। অগ্নি ধর্ম বলে, নোতরদামের গির্জায় না গেলে পাপ হবে। হু পঙ্কের কথা শুনেই সে হাসে। কিন্তু আর্ডের সেবা এবং নির্ধাতিককে আশ্রয়দানে বিরত রাখনা।

ভলতেয়ার ও রুশো

শেষ বয়সে অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে একটু দূরে গিয়ে পড়েছিলেন ভলতেয়ার। রাজনীতির ক্ষেত্রেও অনাচার ও দুর্নীতি কম ছিল না। সবই জানতেন বুদ্ধ মনীষী। তবুও বলতেন, রাজনীতি আমার জ্ঞানে নয়। আমি আমার জীবনে মানুষকে একটু বুদ্ধিমান করবার, তাকে আত্মমর্দাদার প্রতিষ্ঠিত করবার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। কিন্তু একেবারে মানুষের এই একান্ত প্রয়োজনীয় জীবনধারা থেকে দূরে যে থাকতে পারতেন তা নয়। শ্রোতের ধারায় বধনই ধরা পড়তেন তখনই বিরক্ত হয়ে বলতেন, বুদ্ধ কামরায় বসে যারা রাজ্যশাসন করে তাদের কথা ভাবলেই কেমন ক্লান্তিবোধ হয়; ••ভাবতে অবাক লাগে যে যারা বাঙালীতে নিজের স্ত্রীকে আয়ত্তে রাখতে পারে না, তারাই কি না পরমানন্দে নিয়ন্ত্রণ করছে সারা পৃথিবীর ভাগ্য। অর্থাৎ ভলতেয়ারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে বা সত্য তার ওপর তো আর পাটির ছাপ নেই, অতএব রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকাই শ্রেয়ঃ। এই পলায়নী মনোবৃত্তির পেছনে খুব সন্দেহ ছিল তাঁর অর্ধ-সম্পদের প্রতি অপার্থায় মোহ। ধনীর সংরক্ষণশীলতা আর নিরন্তর বিপ্লবাকাজকা—এ দুই একই বাসনার এপিঠ আর ওপিঠ। একজন বা আছে আঁকড়ে রাখতে চায় একান্ত করে, অল্পজন বা নেই তাই পেতে চায় চ'হাত ভ'রে। প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন ভলতেয়ার। বুদ্ধ বয়সে তাই দারিদ্র্যকে ছিল ভীষণ ভয়। তাঁর অভিধানে তাই বিষয়-সম্পত্তির ব্যাখ্যায় লিখলেন, বিষয়-সম্পত্তি মানুষের শক্তিকে বিগণ করে। বার জমিদারী আছে সে ভালোভাবে নিজের বংশকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করতে পারে।

রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি নিয়েও এই বয়সে আর মাথা ঘামাতে প্রস্তুত ছিলেন না ভলতেয়ার। প্রজাতন্ত্র তিনি পছন্দ করতেন কিন্তু এর ক্রটিগুলোকে তুচ্ছ করে নয়। বলতেন যে, ব্যবস্থাটার মধ্যেই অস্বাভাবিক বিঘ্ন আছে, বা থেকে পরে গৃহযুদ্ধ না হোক, জাতীয় ঐক্য কুণ্ডল হ'তে বাধ্য। ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধা আছে, ধনতন্ত্রের পা বেখানে পড়েনি, এমন একটা দেশে এই ব্যবস্থা চলতে পারে। আর চলতে পারে সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে। অর্থনীতির অনিবার্য নিয়মে আসে শ্রেণীভেদ আর ক্রমোন্নতির-প্রতিযোগিতা; তখন এই ব্যবস্থার আদর্শ ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। অভিধানে "বদেশ" শব্দকে লিখতে গিয়ে নিজেই এই নিয়ে তর্কের অবতারণা করেছেন ভলতেয়ার। প্রশ্ন তুলেছেন,—কোনটা ভালো, রাজতন্ত্র না প্রজাতন্ত্র? উত্তরে বলেছেন, চার হাজার বছর ধরে এই একই প্রশ্ন বার বার শোনা গেছে। ধনীদেয় কাছে উত্তর চাও—তারাও যুঁকবে আভিজাত্যের দিকে। সাধারণ লোক চাইবে গণতন্ত্র। শুধু রাজারাই বলবে রাজতন্ত্র ভালো। অথচ আশ্চর্য এই যে, প্রায় সারা পৃথিবীতেই রাজতন্ত্রের অবাধ আধিপত্য চলে আসছে। কেন জানতে চাও? বিড়ালের গলার যে ইঁদুরটা ঘণ্টা বাঁধতে চেয়েছিল তার কাছে এর উত্তর পাবে। এমন একটা মতের সমালোচনা হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকেই প্রশংসা করতে চাইলেন যে, রাজতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। উত্তরে তিনি হেসে বললেন, মার্কাস অরেলিয়ানের মতো সন্ন্যাসী হলে অবশ্য বলবার কিছুই নেই। অত্যাচার, সাধারণ মানুষের কাছে

জীবনে অনেক দেশ ঘুরে মানুষের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন ভলতেয়ার। ফলে জাতীয়তাবাদ, দেশভক্তি এই সব ধুমোতে বিশেষ ভক্তি তাঁর ছিল না। সারা ইউরোপের আপনজন ভলতেয়ার তাই ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলও আর প্রাশিয়ার যুদ্ধ চলার সময়েও ইংরাজের সাহিত্য আর প্রাশিয়ার রাজাকে প্রাণ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু যুদ্ধ? যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা তাঁর প্রকাশ পেত প্রতিটি কাজে আর কথায়। অভিধানেও 'যুদ্ধ' শব্দকে তিনি বলেছেন, যুদ্ধের মতো পাপ আর নেই; অথচ প্রত্যেক আক্রমণকারীই চেষ্টা করে তার এই অস্ত্রকে জায়ের রঙে রঙীন করে সবার সামনে তুলে ধরবার। আইনে নরহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হত্যাকারীও শাস্তি পায় অবশ্য যদি না সে বেশ ঢাক ঢোল বাজিয়ে অসংখ্য হত্যার ব্যবস্থা করতে পারে।

তা হ'লে কি বিপ্লবকেই এই সব অসঙ্গতির হাত থেকে মুক্তির পথ বলে ভাবতেন ভলতেয়ার? মোটেই না। এই বিরুদ্ধতার প্রথম কারণ তাঁর সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রতি অবিশ্বাস। তাঁর ধারণা ছিল যে, সাধারণ মানুষ সংস্কারের দাস, আর সেইজন্মেই রাজনীতিকদের স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র। দ্বিতীয়ত, ভলতেয়ার বিশ্বাস করতেন যে সমাজের কাঠামোর মধ্যেই অসাম্যের বীজ নিহিত আছে; বহু দিন মানুষ মানুষ থাকবে এবং জীবনে তার থাকবে সংগ্রাম, তত দিন এই অসাম্য দূর করা যাবে না। এই চিন্তাই পরিণত রূপ লাভ করেছে তাঁর অভিধানের "সাম্য" শব্দে। সেখানে তিনি লিখেছেন, যারা বলে সব মানুষই সমান তারা খাঁটি সত্যই বলে—যদি তাদের বস্তবের অর্থ এই হয় যে সব মানুষেরই স্বাধীনতার, সম্পত্তির মালিকানায় এবং আইনের নিরাপত্তায় সমান অধিকার আছে। কিন্তু এই সাম্যবাদই পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজপ্রাণ্য আবার স্বপ্নের মতো সূদূরও। অধিকারের পত্তীতে বতকরণ আবদ্ধ, ততকরণ সহজপ্রাণ্য কিন্তু সম্পদ আর ক্রমতার কেন্দ্রে প্রকৃত টান পড়লেই এ হ'লে ওঠে স্বপ্নের মতো সূদূর। অভিধানেও অস্বস্তিও এই চিন্তারই জের টেনে তিনি বলেছেন, সব মানুষের পক্ষে সমান বলবান হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু সকলের সমান স্বাধীনতাভোগে বাধা নেই। ইংলও এই স্বাধীনতা অর্জন করেছে...এই স্বাধীনতার অর্থ মানুষ একমাত্র আইনের অধীন হবে। ভলতেয়ারের এই সব কথায় ধ্বনিত হয়েছে বিপ্লব সম্বন্ধে নরমপন্থীদের ধারণা। এই চিন্তারই সূত্র ধরে মিরাবৌ,

ডাঃ বঙ্গুর

মেমোরি কার্ডিয়েল

নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

ডাঃ বঙ্গুর ল্যাবরেটরী লিঃ

কলিকাতা-৯

টুরগো ইত্যাদি চেয়েছিলেন শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। কিন্তু নির্ধাতিত মানুষের দল ধরেনি এই নরম নীতির পথ। স্বাধীনতার চেয়ে সাম্যের দাবী বড় হয়েছিল উগ্রপন্থীদের কাছে। সাম্য চাই, তাতে স্বাধীনতা যায় থাক। সাধারণ মানুষের এই আকাঙ্ক্ষার অন্তিমালে নির্ধাতনের বেদনা, নিরস্ত্রের হাহাকাঙ্কটুকু চিনতে ভুল হয়নি রুশোর। তাদেরই একজন তিনি; শ্রেণীবিভেদের বাধায় অনেক গৌচট খেতে হয়েছে তাঁকে জীবনে। তাই তাঁর কঠোর ধ্বনিত হ'ল সাধারণ মানুষের দাবী, তাঁর পক্ষে এক নতুন রূপ পেল এই সাম্যের, সব সমান করার প্রেরণা। এই প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল মারাত, রোবস্পিয়ের ও আরও অনেকে। এঁদের হাতে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হল, কিন্তু বিপ্লবের অন্তিম বলি হল স্বাধীনতা।

সমসাময়িক শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোর রাতারাতি স্বর্গরাজ্য সম্ভব, এ কথা বিশ্বাস করতেন না ভলতেয়ার। বাস্তব ও কল্পনার পার্থক্য ভুলতে পারেননি তিনি, তাই বলতেন, কালের গতিতেই সমাজের রূপ বদলায়, কল্পনার রঙে নয়। অতীতকে দরজা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে সে জানালায় এসে উঁকি মারবেই মারবে। এই অবস্থায় সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, কি করে এবং কতটুকু সমসাময়িক হৃদয় ও অনাচার দূর করা সম্ভব। এর জন্তে প্রয়োজন দীর্ঘ অপেক্ষা, একান্ত সাধনা। ইতিমধ্যে কালের অনিবার্য নিয়মে যতটুকু আসে, তাতেই খুশী হতে হয়। ঠিক এমনি খুশী হ'য়েছিলেন ভলতেয়ার Turgot ক্রমতায় আসীন হ'তে।

এইবার আসবে সোনার দিন, সংস্কারের রথ এইবার হবে গতিশীল। জুরীর বিচার প্রবর্তিত হবে, ধর্মীয় প্রশাসনের দাবী বন্ধ হবে, দরিদ্রেরা মুক্তি পাবে করভার থেকে। এই আশঙ্কের উত্তেজনার ভলতেয়ার লিখলেন তাঁর বিখ্যাত পত্র :-

সবকিছুর মধ্যেই সুনতে পাচ্ছি বিপ্লবের পদধ্বনি—সে বিপ্লব অল্প ভবিষ্যতে আসবেই কিন্তু যা দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়তো হবেনা। ফরাসীরা সব কিছুই একটু দেবীতে করে, তবে শেষ পর্যন্ত যে করে তাতে সন্দেহ নেই। এক থেকে অল্পে ছড়িয়ে পড়ছে এক বিজ্ঞানবাহিতা, বিস্ফোরণের আর বিলম্ব নেই, এলো বলে সেই বিপ্লবের পরম লগ্ন। আজকের তরুণরা সত্যিই সৌভাগ্যবান; তারা অভূতপূর্ব সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে।

খানসহ ভলতেয়ার কিছু দেখতে পাননি কি ঘটছে তাঁর চার পাশে। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে তাঁর কল্পিত বিস্ফোরণের মাঝে জন্মাবে ফ্রান্সের জনগণের নতুন স্বরূপ-দেহতা। রুশো তখন প্যারিস আর জেনিভা থেকে লিখে চলেছিলেন তাঁর ভাবাত্মক রোমান্স আর বিপ্লবাত্মক রচনা—একের পর এক। এই রুশোরই জন্ম নতুন শাসন পদ্ধতি হচ্ছিল জনগণের অন্তরে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে, ফ্রান্সের জনগণ তাদের অন্তরের পূজা হু' ভাগ করে তেলে দিয়েছিল দুই মনীষীর উদ্দেশে—ভলতেয়ার আর রুশো, দুই বিপরীত প্রতিভার পারে। নীটশে ভলতেয়ারের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করেই তীক্ষ্ণ বিজ্ঞান, দীপ্ত অগ্নির মহিমা, তপ্ত যুক্তি আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলো আলিয়ে আসবে যে নবীন দার্শনিক, তারই স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু রুশো? আদর্শবাদী, ভাবরসে টলমল, কল্পনার আকাশে রঙীন পাখা মেলে উড়ে যায় মন, জনগণের আশ্রয় আশ্রয়, যে বলে যে চিন্তার একটা মুক্তি আছে যা বুদ্ধি

দিয়ে কখনোই বোঝা যায় না। একই দেশের মাটিতে অল্প সময়ের ব্যবধানে ভলতেয়ার আর রুশোর আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসের এক আশ্চর্য বিস্ময়।

বিস্মিত হয়েই দেখতে হয়, এই দুই প্রতিভাকে কেন্দ্র করে সেই পুরাতন বুদ্ধি আর বোধির সংগ্রাম। যুক্তির পূজারী ভলতেয়ার বার বার বলেছেন—লেখা এবং কথা দিয়ে মানুষকে অগ্রগতি এবং উন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়া সম্ভব। কথার মূলকল্পিত কিন্তু বিশ্বাস ছিল না রুশোর, যুক্তির ধার দিয়েও যান নি তিনি। কাজ, শুধু কাজ চাই রুশোর, তাতে যদি বিপ্লব আসে আনুক, মানুষের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের স্পৃহাই বিপ্লবের আঘাতে উৎপাটিত, পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত, ছিন্নমূল জনগণকে আবার বোধ দেবে একেবারে বন্ধনে। আইন বিদূরিত হলেই মানুষের জীবনে আসবে সাম্য ও সুবিচারের সুদিন। এইসব চিন্তা রূপায়িত হল তাঁর Discourse on the origin of inequality গ্রন্থে। সভ্যতা, কলা, বিজ্ঞান সবকিছু তুচ্ছ করে আদিম অরণ্য-জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরে যাবার ডাক দিলেন রুশো। এই বই এক খণ্ড পাঠালে ভলতেয়ারের কাছে। উত্তরে ভলতেয়ার লিখলেন, মনুষ্যজাতির বিলম্ব আপনাদের নতুন রচনা পেয়েছি এবং প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি... আজ পর্যন্ত আপনার মতো এমন চমৎকার ভাবে আমাদের পক্ষে পরিণত করার চেষ্টা আর কেউ করেনি, আপনার বই পড়লেই চতুষ্পদ হবার সাধ যায়। আমি কিছু বাট বছর আগে ওই অভ্যাসটা ত্যাগ করেছি, তাই এখন আবার নতুন করে আরম্ভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। রুশোর Social contract প্রকাশিত হবার পর তিনি M. Borduকে লিখলেন এইবার রুশোর সঙ্গে দার্শনিকের ততটুকু মিল প্রত্যক্ষ হচ্ছে, যতটুকু মিল আছে মানুষের সঙ্গে বাণবের। কিন্তু এই ভলতেয়ারই সুইশ শাসনকর্তারা Social contract বই পুড়িয়ে দিতে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রুশোকে লিখলেন, আমি আপনার একটা কথাও মানতে রাজী নই কিন্তু তবুও আমৃত্যু আপনার কথা বলবার অধিকারকে আমি সমর্থন করবো। তারপর যখন অসংখ্য শত্রুর তাড়নায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন রুশো, ভলতেয়ার তখন বিনা বিধায় তাঁকে পাঠালেন আতিথ্যের আমন্ত্রণ। এই দুই মনীষীর মিলন প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য কিন্তু ইতিহাসের হয়নি।

সভ্যতার সৌধকে ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না ভলতেয়ার। অরণ্য জীবন থেকে সভ্যতার আলোর এসে লাভ হয়নি, এ কথা শুধু ছেলেমানুষেই বলতে পারে। রুশোকেও তিনি এই কথাই জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পশুর হিংস্রতা যে মানুষের স্বভাবে আছে এ কথা অস্বীকার করার নয়। সমাজ ও সভ্যতা এই পশুর পলায় নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খল পরিবেশে, ফলে পার্থক্য প্রবৃত্তি ধ্বংস হয়েছে, এবং সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের মনীষা উৎকর্ষের এবং জীবনানন্দ উপভোগের সুযোগ পেয়েছে। চলিত সমাজ ব্যবস্থার ধারণা কিছু নেই এমন নয়, অনেক ধারণা আছে। যে ব্যবস্থার যারা খাটে তারাই কম নয়, আর অল্পদল খাটেনা বলে কম দিতেও চায়না—সেখানে হটেনটটদের শাসন-ব্যবস্থা চলছে, তাতে সন্দেহ নেই। তবুও

অসংখ্য ছনীতির মধ্যেও কুলে পারিনা প্যারিসের নিজস্ব মহিমা। The world as it goes নিবন্ধে আছে তাঁর এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি। কষ্ট দেবতা দূত গাঠালেন খোঁজ আনতে যে এক সহর ধ্বংসের যোগ্য কি না। দূত সহরে গিয়ে ছনীতি আর অনাচারের অবিশ্রান্ত স্রোত দেখে চমকে উঠলো। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে সহর আর তার সাধারণ মানুষকে ভালো লেগে গেল দূতের। মানুষগুলো একটু বিলাসের ভুক্ত বটে কিন্তু অল্পদিকে বেশ নম্র, সহাস্ত আর পরোপকারী। এমন সহর ধ্বংস করার চিন্তা পছন্দ হল না তার। অথচ দেবতাকে মতামত দিতে হবে। দূত তখন একটা মতলব আঁটলে। সহরের শ্রেষ্ঠ ভাস্করকে দিয়ে অতি সুন্দর মূর্তি গড়ালে। মূর্তিটা তৈরী হল মাটি থেকে মার্বেল পাথর, হীরার থেকে কাচ এবং সোনার থেকে লোহা—অর্থাৎ সবকিছু মূল্যবান ও সস্তা শ্রেষ্ঠ তুচ্ছের সংমিশ্রণে। সেই মূর্তি নিয়ে দূত দাঁড়ান দেবতার সামনে। বিবস্ত্রিতে জু কুঁচকে তাকালেন দেবতা। দূত সবিনয়ই নিবেদন করলে শুধু হীরার আর সোনার দিয়ে তৈরী নয় বলেই কি এমন সুন্দর মূর্তিটা ভেঙ্গে ফেলা উচিত হবে? দেবরোষ থেকে রক্ষা পেল সহর। অর্থাৎ পৃথিবী যেমন চলছে চলুক, কালের প্রকোপেই আসবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। মানুষের স্বভাব বদল মা হলে তার পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার বদল সম্ভব নয়। এমন কোনো ব্যবস্থা ধ্বংস হলেও মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাই আবার তাকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

তাই যদি হয়, মানুষ আর পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থা এরই পাশচক্র ঘুরে মবাই কি শেষ, কোনো সংস্কারই কি তাহলে আসবে না? ভুলভেগারের মতো উদ্বাপনছীরা বলেছেন যে, ধীর-স্থির ভাবে শিক্ষার আলোর মানুষের মনের অন্ধকার দূর করাই এই পাশচক্র ছেদনের একমাত্র উপায়। ক্রশো এবং সংস্কারপছীরা কিন্তু এই পাশচক্রের প্রতীক সবকিছু প্রতিষ্ঠান আর প্রথা উদ্দীপ্ত প্রেরণার আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পক্ষপাতী। তারপর অস্ত্রের নির্দেশে গড়ে উঠবে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শবল্ল নতুন জীবনব্যবস্থা।

মানুষের জীবন এত সহজ নয় সামান্য নয় যে, এক কথায় তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হয়তো দুই মতের মধ্যপথে সত্যের সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। অস্ত্রের উদ্দীপ্ত প্রেরণার পুরাতন ধ্বংস হয় হোক, কিন্তু নতনের প্রতিষ্ঠায় চাই বুদ্ধির ভাবের দীপ্তি। ক্রশোর উগ্রপন্থাতেও নিহিত ছিল এই সত্যের বীজ, প্রতিক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি। অতীতই অস্ত্রের উদ্দীপ্ত প্রেরণার, করনাজরী ভাবাদর্শের উৎস। তাই বিপ্লবের কোলাহল শুরু হলে অস্ত্রের অতিপ্রাকৃতের স্বপ্নে বিভোর হয়, ফিরে যেতে চায় ফেল-আশা শতাব্দির সুখ ও শান্তির আশ্রয়ে। তাই ক্রশোর পরেই শোলা বায় কাণ্টের আবির্ভাবের পদধ্বনি।

শেষের ফসল

এদিকে সভ্যতার কোলাহল থেকে দূরে "হাস্তমুখ দার্শনিকের" দিন কাটে Fermi তে বাগানের পরিচর্যা। কলমেয় মুখে অনেক ফসল ফলিয়েছেন তাঁর দীর্ঘ জীবনে, এয়ার বাগানের গাছে গাছে ফুল ফোটারোর পালা। দীর্ঘ জীবনের একান্ত বাসনা ছিল

পূর্ণ হয়েছে, আশাতীতরূপে সকল হয়েছে সে আশা। এইবার অস্ত্রগামী সূর্যের কি সুন্দর প্রশান্ত রূপ, পশ্চিম দিগন্ত ঘিরে কি কোমল-করণ রক্তিমভার রূপায়ণ। মানবদয়দী দার্শনিকের হৃদয়ে কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সমস্ত বিলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত তিনি। দান—তাঁর অসংখ্য দানের কথা লেখা আছে ইতিহাসে, হয়তো আরও কত লেখা নেই। আর্ত, পীড়িত মানুষের জন্য অব্যাহত তাঁর দ্বার—সাহায্য ও সাহায্য আশায় লোক আসারও বিরাম নেই। দরিদ্র বিপথগামী কত মানুষকে অস্ত্রায়ের পথ থেকে ফিরিয়েছেন, অর্থ ও উপদেশ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুস্থ সুন্দর জীবনে। আর্ত মানুষের প্রয়োজন এই বিদায়বেলার কলম ধরতেও কুণ্ঠিত হননি। অস্ত্রায় করে কত মানুষ পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চেয়েছে। সন্তোহে তুলে ধরে তাদের বলেছেন, আমার ক্ষমা তো তোমাদের জন্য আছেই। মানুষের কাজ শুধু ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। এর পরেও বলেছেন, মানুষের যেটুকু উপকার করেছি, সেই আমার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। আমার আক্রমণ কালে আমি শয়তানের মতো সংগ্রাম করি; কার্যকর কাছে ঘাথা নীচ করা আমার স্বভাব নয়; কিন্তু শয়তান না হলেও প্রকৃতপক্ষে ভালো শয়তান আমি, হাসির মধ্যে সব কাজের পরিসমাপ্তিই আমার কাম্য।

১৭৭০ সালে ভুলভেগারের বন্ধু ও অসুখাগীরা টানা তুলে বৃহৎ দার্শনিকের একটা আবক্ষ প্রতিমূর্তি নির্মাণে উত্তোগী হ'ল। হাজার

নীরা

তাল ও খেজুরের সুমিষ্ট রস

প্রতি বোতল—১২ নঃ পঃ।

খেজুর সিরাপ

২ পাউণ্ড বোতল

প্রতি বোতল—১-৫০ নঃ পঃ

সর্বত্র পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তালগুড় শিল্পী

সমবায় মহাসংঘ লিঃ

৪, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা—২৬

ফোন :—৪৬-১৯২৪।

✱ কমিশনে এজেন্সি দেওয়া হয়।

হাজার লোক এগিয়ে এল তাঁরা দেবার আগ্রহে। ধনীদেব এমন কি খুঁজে ফেডরিককেও বলা হ'ল যৎসামান্য দেবার জন্ত। এক কঙ্কালের প্রস্তরমূর্তির প্রতি আগ্রহ প্রদর্শনের জন্ত ভলতেয়ার বস্তুবাদ জানালেন ফেডরিককে। উত্তোক্তাদের মূহু ভৎসনা জানিয়ে বললেন, আমার মুখই নেই তো মূর্তি গড়বে কি। চোখ তিন ইঞ্চি গর্তে ঢুক গেছে, গালের চামড়া ক্লটিং কাগজে পরিণত হয়েছে; যে কটা দাঁত ছিল তাও আর নেই। এর উত্তরে d' Alembert বলেছিলেন, প্রতিভার একটা বিশেষ প্রতিমূর্তি আছে যা অল্প একজন প্রতিভা ঠিকই চিনে নিতে পারবে।

তিরিশ বছর বয়সে বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত দার্শনিকের মনে তখনও অগলি একটি আকাঙ্ক্ষার গোপন মূহু আলো। প্যারিস দেখতে হবে, মরতে হবে প্যারিসের মাটিতে। ডাক্তাররা একবাক্যে নিবেদন করলেন—তীর ভগ্নস্বাস্থ্যে সঙ্কট হবে না এই দীর্ঘ পথযাত্রা। কিন্তু কাকুর কথার কান দেবার মাহুয নয় ভলতেয়ার। দীর্ঘ জীবন উপভোগ ক'রেছেন তিনি, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন কঠোর পরিশ্রমে—এর পর নিজের খুশীমতো মরবার, মোহিনী প্যারিসের কোলে মাথা রেখে মরবার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে। কোন ক্ষুদ্র অতীতে নির্বাসিত হয়েছেন, ছেড়ে এসেছেন প্যারিস। এবার ফিরে চললেন সেই নগরীর বুকে। মাইলের পর মাইল পায় হ'য়ে, ক্রান্তের পথ, ঘাট, মাঠ দিয়ে একদিন সত্যিই তাঁর গাড়ী এসে পৌঁড়াল, রাজধানীর দরজার। দীর্ঘ পথক্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন ভলতেয়ার তখনই ছুটলেন বাল্যবন্ধু d' Argental-এর সঙ্গে, দেখা করতে, মরতে মরতেও তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারছি বন্ধু! পরের দিন তিনশো দর্শনার্থী এল তাঁর বাড়ীতে। বৃদ্ধ দার্শনিকের এই রাজসম্মান দেখে সম্রাট বোড়শ লুই কেটে পড়লেন স্তম্ভিত। কিন্তু দর্শনার্থীর স্রোতে তাঁটা পড়ল না। এলেন নাটিকে সঙ্গে নিয়ে বেঞ্জামিন ফ্রান্সলিন। ফ্র্যাডলিনের অহুরোধে ভলতেয়ার সেই তরুণের মাথার হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, ঈশ্বরের ও স্বাধীনতার পূজারী হও।

মৃত্যুর ক্ষীণ পদধ্বনি শুনে পাচ্ছিলেন ভলতেয়ার। সেই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় প্রথা পালনে আপত্তি ছিল না তাঁর। পর পর দু'জন পুরোহিতও এলেন, কিন্তু তাঁদের আত্মসম্মতি, আচার-ব্যবহার পছন্দ হ'ল না বৃদ্ধ দার্শনিকের। শেষে বিরক্ত হয়ে লিখলেন, মিজের শেষ স্বীকৃতি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসা, শত্রুর প্রতি ক্ষমা এবং কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা অন্তরে নিয়ে আমি মৃত্যুক বরণ করছি। সেই করে, তারিখ দিয়ে হাতে তুলে দিলেন লেক্টেচারীর; তারিখটা হচ্ছে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৭৭৮ সাল।

দীর্ঘ পত্রের মতো কাঁপছে জরাজীর্ণ দেহ, মৃত্যুর নীতল স্রোত ধীরে, অতি ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে শিরা-উপশিরায়। তবুও সব অগ্রাহ করে ভলতেয়ার সাক্ষাৎ দিলেন ফরাসী আকাদেমীর সভ্যনা

সভায়। বাড়ী থেকে আকাদেমী বাত্রাকালে লক্ষ লক্ষ লোক পথের হুপাশে দাঁড়িয়ে এই ফরাসী মনীষীর জয়ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুললো আকাশ-বাতাস। গুণমুগ্ধ ভক্তের দল গাড়ীর হুপাশে কাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে নিল ক্যাথারিনের দেওয়া বহুমূল্য অজাবরণের টুকরো টুকরো অংশ—ভলতেয়ারের স্মৃতিচিহ্ন রেখে দেবে তাদের ঘরে। জীবনীকার লিখেছেন শতাব্দীর ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব জয়যাত্রা। কোনো বিখ্যাত সেনানী অত্যন্ত কঠিন যুদ্ধে চমকপ্রদ জয়লাভ করে সহ্য প্রবেশের পথে, এমন অকৃত্রিম, অক্ষুরক্ত সযর্থনা আশা করতে পারতেন না। আকাদেমীতে তারুণ্যের তেজে জলে উঠে বড়ুতা দিলেন ভলতেয়ার। ফরাসী অভিজ্ঞান সংস্কারের প্রস্তাব করলেন এবং নিজে প্রথম বর্ণ 'A' সংক্রান্ত সব কাজ নিতে চাইলেন।

পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ছে সূর্য, দিগন্তে ছড়িয়ে আছে শেষ রঙের আভা। সেই স্নান আলোর রেখা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে, চিকিৎসকদের নিবেদন অগ্রাহ করে ভলতেয়ার গেলেন থিয়েটারে, তাঁর শেষ নাটক Irineer অভিনয় দেখতে। নাটক নিকট হোক, কিন্তু তিরিশী বছর বয়সে অভিনয়যোগ্য একটা নাটক লেখাই বিশ্বকর আর তার চেয়ে বৃষ্টি বিশ্বকর তিরিশী বছর বয়সে মুম্বু' নাট্যকারের অভিনয়ে উপস্থিতি। দর্শকরা সেদিন অভিনয় দেখল না, আনন্দে উল্লসিত হয়ে নাট্যকারকে জানালো অন্তরের মুখর অভিনন্দন।

যাত্রা বাড়ী ফিরে মৃত্যুর সুখোমুখি পৌঁড়ালেন ভলতেয়ার। আশাতীত অভূতপূর্ব জীবনীশক্তি নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু তার জাগরণও বৃষ্টি শূন্য হয়ে এল, চৈতন্য আচ্ছন্ন করে ছড়িয়ে পড়ছে নিদ্রার নেপা। এইবার যেতে হবে। তবু, তবু শেষ চেষ্টা করবেন অদম্য অপরাধিত ভলতেয়ার। কিন্তু মৃত্যুর কাছে ভলতেয়ারকেও হার মানতে হল। ৩০শে মে ১৭৭৮ সালে শেষ হল একটা শতাব্দীর।

খৃষ্টীয় মতে সমাধি দেওয়ার বাধার সম্ভাবনা ছিল সত্বরে। বন্ধুদের তৎপরতায় মৃতদেহ সহরের বাইরে এক শান্ত পবিত্র পরিবেশে সমাধি করা হল, প্রয়োজনীয় আচারানুষ্ঠানেরও ক্রটি হল না। ইতিহাসের চাকা কিছ্র ঘোরে। ১৭১১ সালে বিপ্লবের পুরস্কার জাতীয় পরিষদ তাই সম্রাট বোড়শ লুইকে বাধ্য করেছিল ভলতেয়ারের দেহাবশেষ সম্মানে জাতীয় কবরশালার Pantheon এ ফিরিয়ে আনতে। এক লক্ষ লোক যোগ দিয়েছিল সেই শোভাযাত্রায়, ছয় লক্ষ লোক পথের হুপাশে দাঁড়িয়ে দেখেছিল এই জয়যাত্রা। দেহাবশেষবাহী শকটে লেখা ছিল ইনি মাহুযের মনে জাগিয়েছিলেন নূতন উদ্দীপনা, আমাদের দিয়েছিলেন স্বাধীনতার প্রেরণা। তাঁর কবরে লেখা হল মাত্র তিনটি কথা—“এই ভলতেয়ারের শেষশয্যা।”

সমাপ্ত

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

আধুনিক বঙ্গদেশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

প্রকাশিত গ্রন্থাদি

কলকাতা সহরে দ্রুতগতিতে ব্যাক, বীমা কোম্পানী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপিত হল। এর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার জগৎ ব্যাপক আন্দোলন হতে লাগলো। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রগতিশীল অথবা পশ্চিমীর্ষে জনগণের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ বইল না। ইংরেজ মিশনারীরা অথবা সরকারী লোকেরা অথবা তাদের পশ্চিমীর্ষে বন্ধুরা শুধু নয়, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈষ্ণবনাথ মুখোপাধ্যায়-এর মত বন্ধুশীল নেতৃত্বক এবং পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভূবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়ও শিক্ষাবিস্তারে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে তৃতীয়দশ পর্যন্ত শুধু ইংরাজী শিক্ষার অগ্রগতি হয়নি, সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার পক্ষেও নূতন উৎসাহ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল।

উক্তনখানেক ইংরাজী সংবাদপত্র ছাড়াও ফারসী ভাষায় একটি সাপ্তাহিক পত্র ছিল, হরিহর দত্ত নামে একজন হিন্দু সেটি সম্পাদনা করতেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ হতো। যথা—সংবাদ-প্রভাকর, সমাচারদর্পণ, বঙ্গদূত, সমাচার-চন্দ্রিকা, স্বদেশকৌমুদী, সংবাদ-তিমিরনাশক। শেষে ক্রম পত্রগুলোর অধিকাংশ গৌড়া মতবাদ প্রকাশ করতো, তবে এর মধ্যে প্রগতিশীল সমাচারদর্পণের প্রভাব ছিল অত্যধিক। পাঁচ বছরে প্রগতিশীল ও গৌড়া পত্রিকাগুলোর মোট প্রচারসংখ্যায় তুলনামূলক ওঠানামা বিশ্লেষণ করলে আরও আগ্রহ-উদ্দীপক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

কোষগ্রন্থ ও অভিধান সম্পর্কে বলা যায়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জগৎ রাধাকান্ত দেব ১৮২২—১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শঙ্করচন্দ্র নামে সংস্কৃত কোষগ্রন্থ রচনা করেন। (দীনেশচন্দ্র সরকার—দ্বি পাক্ত পীঠস, জে এ এস বি লেটার্স, ভূম্ব ১৪, ১৯৪৮) কলকাতার নিকট খড়দহে প্রাণকৃষ্ণনাথ স্থাপনা হয়। রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত কোষগ্রন্থের মত তারানাথ বাচস্পতি (১৮১২—১৮৮৫) বাচস্পত্য-অভিধান নামে সংস্কৃত কোষগ্রন্থ সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাচস্পত্য অভিধানও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়। সমাচারচন্দ্রিকা প্রেস বিজ্ঞাপন দেয় যে তারা শুধু ব্রাহ্মণ কলোজিটরদের সহায়তায় শ্রীমদ্ভগবৎগীতা ছাপছেন। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৬, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৮) বিভিন্ন প্রকাশক কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, আনন্দলাহরী, মজু ও বাজবন্ধ্যের আইন-সংহিতা, উত্তরাধিকার সম্পর্ক-স্বায়ত্ত্বাগ ও মিতাকরা আইনের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উপক্রমণিকা সমানভাবে লোকপ্রিয় হল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তার কয়েকটি তালিকা প্রকাশিত হল, তা থেকে পড়পড়তা পাঠকের জ্ঞানার্জনের আগ্রহের নমুনা পাওয়া যায়।

শ্রীরামপুর (মিশনারী) প্রেস, ১৮২২—

সংস্কৃত :

রামায়ণ ইংরাজী অমরকোষ (সংস্কৃত অভিধান) ইংরাজী অমরকোষ, যুক্তবোধ ব্যাকরণ, সাংখ্যসার।

বাংলা :

কেবি সাহেব কৃত ব্যাকরণ, বাংলা অভিধান, ইংরাজী-বাংলা চলিত ভাষা, বক্রিশ সিংহাসন ও হিতোপদেশ, রাজাবলী (ইতিহাস), দিগ্দর্শন, গোলান্দার (ভূগোল) ইংরেজী সমেত কানারী ব্যাকরণ, পাঞ্জাবী ব্যাকরণ, তেলগু ব্যাকরণ, বর্মী ব্যাকরণ গুরুদক্ষিণা (গল্পের বই), বিশ্বমঙ্গল (সংস্কৃতে লিখিত বাংলা অমরকোষ সমেত, কর্মলোচন (সংস্কৃত বাংলা অমরকোষ সমেত)।

তিমিরনাথ প্রেস—

চণ্ডী—বাংলা ভাষায় লিখিত। (মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত দেবী দুর্গা কর্তৃক মহিষাসুরবধ কাহিনী)

হরচন্দ্র রায়ের প্রেস—

চৌরপকাশিকা (কবিতাকারে লিখিত প্রেম কাহিনী), হিতোপদেশ, শৃঙ্গারতিলক সংস্কৃতে লিখিত বাংলা অমরকোষ সহ, মোহমুগুর (শঙ্করাচার্য লিখিত সংস্কৃত ধর্মভোক্তা) অমরকোষ সমেত, দায়ভাগ অমরকোষ সহ।

মি: পিরাসের প্রেস—

নীলগাহ সংক্রান্ত আইন, মনোরঞ্জন ইতিহাস (নাগরী হরকে), বীড়ার ফর তুলস—কাশীর মি: এডাম লিখিত (নাগরীতে), মর্যাল টেলস—কাশীর মি: এডাম লিখিত (নাগরীতে), এ্যালকাবটে—ইয়াট লিখিত গোলাধার (ভূগোল ?)—তারিখীচরণ মিত্র (নাগরী ও টমা কারেখী হরকে), ব্যাকরণ—কীয়েট লিখিত।

পীতাম্বর সেনের প্রেস—

ব্যবহার্য (আইন বই), মলময়রত্নী, বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, চাঁপকা, মহিমা (ধর্মীয় স্তব), কর্মবিপাক (নভেল ?), নিত্যকর্ম, বেতাল (গল্প) চন্দ্রবংশ (ইতিহাস), পঞ্জিকা।

বারাণসী আচার্যের প্রেস—

কালীর সহস্রনাম, বিষ্ণুর সহস্রনাম, রাধার সহস্রনাম, হরমত-চরিত—কাকচরিত, চক্রবর্তী স্পন্দনের ফলাফল (জ্যোতিষ গ্রন্থ), ভাগবতী গীতা। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭২, ৭৩, ৭৬, ৮২, ৮৩, ১৭)

এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত বই ছাপা হয়েছিল তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ঊনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে বাংলা দেশে চিন্তার জগতে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল এবং এই সকল বইয়ের অধিকাংশ প্রাচীন ঐতিহ্য অথবা প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে।

বহুল পরিমাণে বাংলার প্রগতিশীল নেতাদের সৃষ্টি নয়। দীর্ঘকাল কু-শাসন ও নিরাপত্তাহীনতার পর শান্তি স্থাপিত হওয়ার ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন পথ খুলে গেল। ছাপাখানার সম্প্রসারণ হওয়ার তা গোড়া ও প্রগতিশীলদের নিজেদের পৃথক পৃথক মত প্রকাশ করতে সহায়ক হল। এবং সর্বোপরি মিশনারীরা অথবা বন্ধুভাবাপন্ন ইউরোপীয়গণ সরকারী ও বেসরকারী নেতাদের প্রচেষ্টার বালক-বালিকাদের স্কুল অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় যে পরিবর্তন ঘটলো তা সমাজ ও ধর্মসংস্কারকদের ধারণাকেও ছাড়িয়ে গেল। দেখা গেল, জমি খুব উর্বর কিন্তু সে জমি তৈরী করেছে রাজনৈতিক নিরাপত্তা এবং মধ্যবিত্তের অভ্যুত্থান। এই মধ্যবিত্ত কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়নি।

রাজনৈতিক অশান্তি ও সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ

সহর ও পল্লীতে

চতুর্থ অধ্যায়ে ঊনবিংশ শতকে বাংলার পরিবর্তনের যে কল উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি হল সহর ও পল্লীর মধ্যে স্বার্থের উত্তরোত্তর ব্যবধান এবং গ্রামের প্রধান ও উৎসাহী নেতাদের গ্রাম ত্যাগ করে সহর অভিমুখে প্রস্থান। দেশের সর্বত্র তখন সহর কেন্দ্র গণ্ডিতে উঠছে। পুঁজি ও স্থানান্তরে যেতে লাগলো, এবং অভিজাত ভূস্বামীদের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল না। স্থিরীকৃত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলধন ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দিকে ধাবিত হল। বিভিন্ন জাতি থেকে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল দৃষ্টিসম্পন্ন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে তখন। ব্যবসায় বাণিজ্য তখন ছিল ইংরেজদের হাতে অথবা ভারতীয়দের হাতে থাকলেও তা ছিল ব্রিটিশ-কর্তৃকৃত হস্ত-স্থায়ীতলে, এই ব্রিটিশ শক্তির তখন একমাত্র স্বার্থ ছিল ভারতে ব্রিটিশ উত্তোগের উপযুক্ত পথ তৈরী করা। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজে তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং এই ভাবে কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্র সঙ্কচিত হওয়ার ক্রমশঃ চকল হয়ে উঠলো।

এই সময়ে ভারতের নানা স্থানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা দেখা গেল, যেটা সাধারণত উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া পীড়নমূলক আর্থিক উন্নয়নের বিরুদ্ধে এখানে সেখানে ছোটখাট ও স্থানীয় বিদ্রোহ দেখা গেল। সমস্ত ভূমির কৃষকদের মধ্যে পাহাড় জঙ্গলের উপজাতিদের মধ্যে এটা ঘটেছিল, তন্মধ্যে ১৭৬০—১৭৬৪ ও পুনরায় ১৭৭৬ ও ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অন্যতম। ১৭৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে চূষাড বিদ্রোহ ঘটে। (হিন্দী অফ বেঙ্গল, বিহার এণ্ড উড়িষ্যা আগার ব্রিটিশ কাল—এস এস এম ও-ম্যালি, ১৯২৫, পৃ: ২১০, ২৯৮)

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ছোটনাগপুরের সুতা উপজাতির দর্পনারায়ণ শোহী নামে একজন রাজা কর্তৃক শাসিত হত। তিনি দিল্লীর মোগল সম্রাটকে ছয় হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন। কিন্তু ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যখন রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হল তখন দর্পনারায়ণের দেয় রাজস্ব প্রথমে ১৪১০০/০ করা হল ও পরে ১৫৬৪১ টাকা করা হল। রাজাকেও প্রজাদের কব বাড়াতে হল, ফলে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘটে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। ১৯৯৬—১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে আরও বিদ্রোহ হয় এবং ছোটনাগপুরকে

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ট্যাম্প ও আবগারী আইনের অধীনে আনা হয়। কর আরও বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৮১২, ১৮১৯—১৮২০, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আরও বিদ্রোহ ঘটে। শেষ বার বিদ্রোহ ঘটে ১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দে।

তৎকালীন বাঙ্গালা প্রদেশের পশ্চিমে সুরগুজার অল্পকাল ঘটনা ঘটে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নীলকর হাজারী ঘটে; ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। তারপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করে, বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল, দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ যিনি কার্যত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতের খেলার পুতুল হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ঊনবিংশ শতকের আগাগোড়া মাঝে মাঝে খেমে জনপ্রিয় হাজারী ও আন্দোলন হলেও উচ্চ ও নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ এই সকল বিদ্রোহের সঙ্গে কখনও এক হয়নি। শেষোক্ত শ্রেণী শুধু দুবেই থাকেনি, সমসাময়িক সংবাদপত্র পাঠ করলে দেখা যায়, তারা এই সকল বিদ্রোহে বিরক্ত হয়েছে, কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তারা এর মধ্যে শান্তি ও অগ্রগতি ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ দেখতে পেয়েছিল। দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য কে নিয়ন্ত্রিত করছিল সে প্রশ্ন অপেক্ষা এই দুটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

কয়েক জন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন যাদের ব্যাপক দূরদৃষ্টি অথবা গভীর সহায়কৃতি ছিল, তাঁরাই দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের দাবীদাওয়া ও অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের উত্তোগী হয়েছিলেন ও তাদের অচ্যুত জনমত সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের নীল চাব সংক্রান্ত নীলদর্পণ নাটক প্রকাশ করে যেভাবেও লড়াই-এর বিচার ও দণ্ড হয়েছিল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শশিধর বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ শুরু করেন। তিনি ভারতে প্রথম শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন, এই কার্যে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অন্যান্য অনেকে তাঁকে সাহায্য করেন। স্নান-সমাজের প্রচারক রামকুমার বিজ্ঞানবন্ধু আসামের চা-বাগানে প্রবেশ করেন এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে আসামে দাস ব্যবসায় নামে একটি বই রচনা করেন।

এই রকম কয়েকটি ঘটনা আছে যেগুলি কখনও গণ-আন্দোলনের পর্যায়ে উঠেনি, এই রকম হুলস্থল দৃষ্টান্তগুলিকে বাদ দিলে আমরা দেখতে পাই, মোটের ওপর বাঙ্গালার শিক্ষিত ও সম্ভবে নাগরিকদের রাজনৈতিক স্বার্থ নিজেদের সবিশেষ শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণেই সচেষ্ট ছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয় ও ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এইগুলি বিশেষ করে অভিজাত ভূস্বামীদের স্বার্থের প্রতিফল ছিল; এর বিপরীত হিসাবে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নবজাগৃত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হিসাবে। (এনেশন ইন মেকিং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯২৫, ডব্লিউইউনিভার্সিটি প্রেস, কলিকাতা, পৃ: ৪০-৪১) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল সন্ন্যাসীদের মধ্যে অচ্যুত ব্রিটিশ প্রজার মত সমান ব্যবহার লাগ

ছাড়া আর কিছু নয় এবং তার সঙ্গে ভারতে কোন রকমের পার্লামেন্টারী সরকার প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া ভূমি সংস্কার, শিক্ষা ও অশ্রান্ত দাবীও ছিল। শিক্ষিত লোকেরা যে সব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল সেটাই ছিল বড় প্রস্ন। কৃষক ও কুটীরশিল্পীরা দেশের তিন-চতুর্থাংশ হলেও তাদের প্রস্ন ততখানি গুরুত্ব পায়নি। এ ছাড়াও, উপরোক্ত সংস্কারগুলিতে শিক্ষামূলক প্রচারকার্যের সুযোগ ছিল, কিন্তু কোনরকম প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যের সুযোগ ছিল না।

এই ভাবে ক্রমশঃ সহর ও গ্রামের ব্যবধান ঘটলো ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের শাসকশক্তির সঙ্গে ধীরে ধীরে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে উঠলো, কলে প্রামাণ্যের জনগণের মধ্যে ইতস্তত যে নিফল বিদ্রোহ ঘটেছে তা নতুন শাসকদের নিরাপত্তার পক্ষে গুরুতর বিপদ হয়ে ওঠেনি।

আগেই আমরা দেখিয়েছি, ধর্ম, সমাজ সংস্কার অথবা সাধারণভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে স্পষ্টভাবে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। কারুর কাছে সম্পূর্ণ বিলিতি ধরনের পাশ্চাত্য পদ্ধতি পছন্দ হত, কেউ বা প্রাচীন পদ্ধতির অহুসরণের পক্ষপাতী ছিল। এটা পাশ্চাত্যবাদ গ্রহণ অথবা ভারতীয়বাদ গ্রহণের ব্যাপার ছিল, অবশ্য যদি এটাকে ভারতীয়বাদ বলা যায়। এই আপোষহীন সজবর্ষের সমাধানের প্রথম যে চেষ্টা হয়েছিল তা ছিল সকল মতের সার গ্রহণের প্রচেষ্টা। এই নতুন ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে হিন্দুসমাজে যে নতুন মূল্যায়ণ

হল তাতে হিন্দুসমাজের প্রচলিত বিধি-বিধান বিশেষ কোন সম্মানলাভ করলো না। আত্মরক্ষার মনোভাব নিয়ে কোন লোক নিজেকে তার প্রভাববিস্তার করে প্রকৃত স্বতন্ত্রমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের পর্যায়েরে উঠতে পারে না। যন বধন হীনমস্ততার কবলবৃত্ত হর তখনই সংস্কৃতির প্রকৃত স্বতন্ত্রমূলক অধ্যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়।

ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারকরণ ছাড়া বাংলার হিন্দু সমাজ নিজস্ব আভ্যন্তরীণ রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ভবানীচরণ অথবা বাণ্যাকান্ত দেবের মত হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল নেতারা হিন্দু সংস্কৃতির সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার শিক্ষিত লোকদের সারনে সহজে তুলে ধরেছিলেন। উনবিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থাংশে ব্রাহ্ম সমাজের পশ্চিমোন্মেষণ মনোভাবের বিরুদ্ধে এক নতুন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রভাবশালী লেখকগণ এবং শশধর ভট্টচাঁদমণির মত বক্তাগণ স্বতঃপ্রসূত হয়ে হিন্দুধর্মের সারভঙ্গ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। জনপ্রিয় নাট্যকারগণ ব্রাহ্ম সমাজের বাড়াবাড়িকে উপহাস করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও সংগ্রামশীল জাতীয় পুনরুজ্জীবনের বীজ বপন করলেন।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সারা ভারতে রাজনৈতিক সফর শুরু করেন এবং তাঁর অগ্নিবর্ষী বাগ্মিতা ও সংগঠন শক্তির দ্বারা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যকার ব্যাপক অসন্তোষকে এক নতুন ও সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ রূপ দিতে সক্ষম হলেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই নতুন কার্যে সুরেন্দ্রনাথ যুবকদের সম্মুখে যে সংগঠন আদর্শ

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ..



খাওয়ার সারাংশ সম্পূর্ণ শরীরের প্রয়োজনে নিয়োগ করলেই অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়। ডায়া-পেপসিন ব্যবহার করলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন, কারণ ডায়া-পেপসিন খাওয়া হজমের সাহায্য করে।

দুবেলা খাবার সময় নিরমিত ছোট এক চামচ খাবেন। ডায়া-পেপসিন কখনো অভ্যাসে ধাঁড়ায় না।

ডায়াপেপসিন

ইউনিয়ন ড্রাগ কলিকাতা



উপস্থাপিত করলেন তা পশ্চিমী সূত্র থেকে নেওয়া বেমন ম্যাডিনী, গ্যারিবন্দী, অথবা আইরিশ ও রুশ বিপ্লবীদের আদর্শ। (মেমরিজ অফ মাই লাইফ এণ্ড টাইমস, বিপিন চন্দ্র পাল, ১১৩২, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৬—২৬১ ও পৃ: ৪২১-৪৪৩ এবং এ নেশন ইন বেকিং—স্বয়ংক্রমিক বন্দোপাধ্যায়, পৃ: ৪০)।

দৃষ্টান্তরূপ বলা যায়, সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য এখন প্রথম গোপন সমিতি গঠিত হয় তখন এই সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে তরবারি দিয়ে নিজের বুক চিরে রক্ত বের করে তা দিয়ে সমস্তপদের প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করতে হত। (মেমরিজ অফ মাই লাইফ এণ্ড টাইমস, ১ম খণ্ড, বিপিন পাল, ১১৩২, পৃ: ২৪৮)। বঙ্কিমচন্দ্রও অল্পরূপ এক বিপ্লবী-সঙ্ঘের প্রস্তাব করেছিলেন বারা দেশের মুক্তি অর্জনে জীবন উৎসর্গ করবে। বিংশ শতকের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান সমূহের আবির্ভাব হল এবং হুর্গা ও কালী নবজাগৃত ভারতের মাতৃদেবী হলেন এবং ধারা রাজনৈতিক বিপ্লবের পথে পদক্ষেপ করলেন ভগবৎসীতা তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস হল। বঙ্কিমের পূর্বে ভূদেব তাঁর স্বল্প-পরিচিত পুষ্পাঞ্জলি পুস্তকে এই ধরনের একটি পরিকল্পনার বীজ বপন করেছিলেন।

একটা গোটা শতাব্দী ধরে প্রগতিশীল নেতামণ অপেক্ষা রক্ষণশীল নেতারা ছাপাখানার ব্যবহার করার অন্ততঃ একটি সুফল হয়েছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার লিখিত ভারতের সর্বোত্তম প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। ছাপাখানার পূর্ববর্তী সময়ে এইরূপ অবস্থা ছিল বলা যায় না। কারণ তখন সেই একই ঐতিহ্য ও সাহিত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের একচেটিয়া ছিল বলা যায়।

ছাপাখানা এবং পূর্ব ও পশ্চিমী চিন্তাধারার অবাধ প্রচলন এখন পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, এইভাবে নতুন অগ্রগতির পথ প্রস্তুত হল। জাতীয়তাবাদের যে নতুন চেতনা ও আন্দোলন সেটা সর্ব সংস্কৃতির সার গ্রহণের আদর্শের দিকে না ঝুঁকে ভারতীয় সভ্যতার অতীত গৌরবের দিকে বেশী করে আকৃষ্ট হল। শেষোক্ত মত ও পথ ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধের পক্ষে সহায়ক হয়নি।

রামকৃষ্ণ আন্দোলন এবং উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়ায় মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে এই নতুন প্রয়োজনের পূর্ণতা অজান্তেই সম্ভব হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাংলার জাতীয় জীবনে যে সব পরিবর্তন ঘটেছিল তার পিছনে এক ধর্মীয় ঐতিহ্যের কন্ডারা ছিল, এই কন্ডারা গ্রামের চারণকবি ও সাধুসত্ত্বারা গ্রামের সরল ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিরকাল বাঁচিয়ে রেখেছিল। এটা বাংলা সম্পর্কেই 'গুণু সত্য নয়, ভারত সম্পর্কেও বটে, এবং একদিক থেকে এর মধ্যে ভারতের মূল সাংস্কৃতিক ঐক্য নিহিত আছে। বাউল ও সহকিরাদের মতবাদ মরেনি; ভক্তিমূলক গান এবং বাত্রার মধ্য দিয়ে সেই ধর্মীয় সংস্কৃতির শ্রোত দেশে কীভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। বেশি শিক্ষিত লোক ধারা—সহরের সমৃদ্ধির জন্য গ্রাম

জীবনবাত্রার সজ্বর্ষের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়লো। ধুব সূত্র গ্রামগুলিতেও অর্ধনৈতিক জীবন ইংরাজী শাসন ও বাণিজ্যের ধারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল; কিন্তু উত্তরোত্তর দারিদ্র্য সঙ্গেও একটি ধর্মীয় ও ভক্তিমূলক সংস্কৃতি দেশে অকিঞ্চম বয়ে চলছিল।

রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের লোক। তাঁর সহজ-সরল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, মাতৃরূপে ঈশ্বরের প্রতি বলস্ব ভক্তিজ্ঞাপক গান সাধারণ গ্রামবাসীর হৃদয় জয় করেছিল। (কালী দি মাদার, ১১০০-সিষ্টার নিবেদিতা।) তাঁর অভিজ্ঞতাই তাঁর আধ্যাত্মিক অকৃত্রিমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু এই গানগুলি সহরের শিক্ষিত, সংস্কৃত সম্প্রদায়ের কাছে আদৌ আমল পায়নি; কারণ তাতে পৌত্তলিকতার গন্ধ ছিল, সংস্কারকগণ এই পৌত্তলিকতাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা করছিল। শিক্ষিত বাঙালী একটি যুক্তিসঙ্গত, পৌত্তলিকতাবর্জিত ও মানবতাপূর্ণ মতবাদ গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হতে চেয়েছিল, যদিও প্রত্যেক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বিবর্তিত সেই মতবাদ বঞ্চিত সমৃদ্ধ ছিল না।

কিন্তু গ্রাম-ভারতের প্রায় অশিক্ষিত মানুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬—১৮৮৬) যখন সহর থেকে শিক্ষিত যুবকদের প্রতি তাঁর খাঁচা, ব্যক্তিগত ধর্মীয় উপলব্ধি ব্যক্ত করতে লাগলেন, তখনই এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল। রামকৃষ্ণের পুঁথিগত বিজ্ঞা ছিল না, তাঁর গ্রামের পাশের রাস্তা দিয়ে সাধুসত্ত্বারা দক্ষিণ-ভারতে তীর্থ করতে যেতেন, প্রথম জীবনে তিনি তাদের সম্পর্কে এসেছিলেন; বোল বছর বয়স থেকে দক্ষিণেখরের কালীমন্দিরে তিনি বাস করেন। দেশীয় থিয়েটারে হিন্দুধর্মের পবিত্র কাহিনী এবং রামপ্রসাদ অথবা বৈকব-সত্ত্বদের সঙ্গীত তাঁকে প্রাচীন সভ্যতার চিরন্তন মহত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছিল।

কঠোর এবং গভীর বীরত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত সাধনার সিদ্ধিলাভ করেন। রামকৃষ্ণ অদম্য তীর্থবাত্রিরূপে এই পথ দিয়ে চলেছেন। বড়ই বিশ্বাসের বিয়র যে, সিদ্ধিলাভের পর তিনি আরও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের দিকে দৃষ্টপাত করেন। এখানেও পূর্বসূরীদের মত শেষ পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটে। তখন এই বীর তীর্থবাত্রী উপলব্ধি করেন যে, সকল মত নদীর জায় প্রবাহিত হয়ে শেষে এক সমুদ্রে পতিত হয়। তিনি ঘোষণা করেন যে, বস্তু মত তত পথ। এই উক্তির ধারা তিনি হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত এক প্রাচীন সত্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন—বস্তু মানুষ তত ধর্ম। কারণ দুটি মানুষের আধ্যাত্মিক জুখা এক রকম হতে পারে না। এক ধর্ম অপর ধর্মের চেয়ে ভাল বা ধারাপ হতে পারে না। প্রয়োজন হচ্ছে মানুষ যে বিশ্বাসে পুষ্ট হচ্ছে তা আঁকড়ে ধরে অগ্রসর হবে এবং যেখানে এক মতবাদের সঙ্গে অপর মতবাদের কোন পার্থক্য নেই, সেখানে পৌঁছতে না পারা পর্যন্ত থামবে না। আসল কথা হচ্ছে, উপলব্ধির সীর্ষস্থলে পৌঁছবার চেষ্টা না করে এবং অন্য ধর্মের বিশ্বাসের অধিকারকে অধীকার না করে সতীর্ণ গভী বাধা-নিষেধ ছেড়ে অসীম সমুদ্রে গিয়ে পড়তে হবে। অহমিকা থেকেই এর উৎপত্তি, কারণ এই অহমিকাই

সহরের প্রসার, ধর্মীয় বীজবিরে ভারতের পথে পরিচালিত করে।

নব হিন্দুত্ববাদ

এখানে হিন্দুধর্মে এমন কিছু আছে যা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় না। আবার হিন্দুধর্মেও এমন এক অজ্ঞাত মূল্যবান ভাবধারা আছে সম্ভবতঃ পশ্চিমে যার উপলব্ধি ও স্বীকৃতি বঙ্গসামাজ্যই হয়েছে, ভারতসত্ত্ব ভাবে ভারতীয়রা জীবনের এই আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে এবং যা নব অভ্যুদয়ের পথ দেখাতে পারে।

হিন্দুধর্মের এই পুনরুজ্জীবনের মধ্যে ভারতের জাতীয়তামূলক মনোভাব সম্পূর্ণ ভারতসত্ত্ব ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, হিন্দুধর্মের এই পুনরুজ্জীবন গর্ব করবার জিনিষ। বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৯০২) ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন ও পশ্চিমে কয়েকটি বেদান্ত সোসাইটি গড়ে তোলেন। হর্দ্বর্ষ নাইটের মত তিনি তাঁর আচার্যদেবের জীবনের অমুভূত দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রাচ্যদেশের মূল্যবোধ ঘোষণা করলেন; কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা না করে তিনি পশ্চিমের যা কিছু তা গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। পশ্চিমের বিজ্ঞান, মানবতাবাদ, সামাজিক বন্ধন থেকে নারী ও শ্রমিকের যুক্তি সব কিছু তিনি গ্রহণ করতে বললেন। বিবেকানন্দের ভাষায় ভারত এক ক্ষয়িষ্ণু দুর্গন্ধময় শবের মত হয়েছিল। অতীতকে ভস্মীভূত করতে হবে; সেই ভস্ম থেকে নবভারত জন্মলাভ করতে পারে, সেই নবভারত প্রাচীন গৌরবের উত্তরাধিকারী হবে ও আধুনিক বিশ্বের পক্ষে তা তাৎপর্যপূর্ণ হবে। তাঁর আচার্যের কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন জীব ও শিব এক, ব্যক্তি-আত্মা ও বিশ্ব-আত্মা এক; তাঁর কাছে ঈশ্বর নর-নারায়ণের রূপ ধরে দেখা দিয়েছিলেন, উৎসাহিত ও অবহেলিতদের মাঝে তাঁর আসন ছিল পাতা।

বিবেকানন্দের সহযোগী হয়েছিলেন একজন সাহসী সৈনিক, নাম মার্গারেট নোবল, একজন আইরিশ রমণী। বিবেকানন্দ এঁর নাম দিয়েছিলেন নিবেদিতা। একথা স্মরণীয় নয় যে, তিনি একদল তরুণ বাঙ্গালীর সঙ্গে নানাক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছিলেন ও তাদের কার্যকলাপে নানাভাবে অল্পপ্রেরণা দিয়েছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, শিল্পী নন্দলাল বসু, সাহিত্যের 'ইতিহাস লেখক কীশোরচন্দ্র সেন, রাজনৈতিক নেতা অরবিন্দ ঘোষ ও অজ্ঞাত অনেকে কোন না কোন সময়ে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পর্কে এসেছিলেন ও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নিবেদিতা প্রচুর লিখেছিলেন। তিনি 'তাঁর গুরু—স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলি শুধু সম্পাদনাই করেননি, হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ভ্রমণ ও শিক্ষা বিষয়ে বই লিখেছিলেন, কলকাতার বালিকাদের জন্যে একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন, তিনি যে এলাকায় থাকতেন তথায় মহামারী দেখা দিলে মিউনিসিপ্যাল কাজ শুরু করেন, তাঁর একটি উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত জনসাধারণকে ঘুম থেকে জাগানো এবং তাঁর নিজের দিক থেকে, কুহেলির আবেগ উদ্বোধন করে ঐতিহাসিক অতিরঞ্জনযুক্ত

হিন্দু সজ্জতার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা এবং ভারতের উত্তাল জাতীয় জীবনে এবং পশ্চাত্য জগতের কাছে তাকে প্রেরণার উৎসর্গে উপস্থাপিত করা। কারণ পরিবর্তন ও কর্মবান্ধকে একমাত্র সর্বাধিক মূল্যবান বলে অতিরিক্ত যে নির্ভরতা পশ্চিমীদের মধ্যে আছে তাকে শোধনের জন্যে উপলব্ধি সজ্জাত ধ্যানগভীর প্রশান্তির প্রয়োজনীয়তা পশ্চিমীদের আছে।

ভারত ও পশ্চাত্য জগৎ তাদের নিজ নিজ পৌত্তলিকতার বাঁধা পড়েছিল; বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার উদ্দেশ্য ছিল উভয়ের কাছে আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রত্যক্ষ চেতনা নিয়ে আসা, তা হলে উভয়ে নিগূঢ় থেকে মুক্ত হয়ে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারবে।

হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকে বাংলা দেশে উনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দেখলে ভুল করা হবে। আসল কথা, ব্রাহ্ম সমাজ তখনও সক্রিয় শক্তিরূপে ছিল; হিন্দু সমাজের মধ্যে সংস্কারমূলক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, উহা কোন বিশেষ ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানগরের চৌধুরী কথা বলা যায়, তিনি বিধবা বিবাহের জন্ত ও ব্রাহ্মণদের কৌলীভ প্রথার বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন। সমগ্র সহরে সমাজে, কুজ সহরে ও গ্রামে কসবাসকারী শিক্ষিত লোকের মধ্যে কোন না কোন ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক সমিতি ছিল, শিক্ষা অথবা সমাজ উন্নয়ন, ধর্মীয় চিন্তা ও কার্যকলাপ সব ক্ষেত্রে।

সমগ্র দেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো। কোন না কোন সময়ে এই সব আন্দোলন জনপ্রিয় হয়েছিল। তবু একটি অপরিচিত সঙ্গে পরস্পর প্রতিযোগিতা করেনি। কার্যসূচী পৃথক ছিল, কখনও কখনও সমান্তরাল ভাবে চলছিল। কেবল জনগণের তৎকালীন মনোভাব একটিকে অপরিচিত অপেক্ষা সাময়িক ভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল। কোন শক্তিশালী বক্তা কর্তৃক কোন এক মুহূর্তে সৃষ্ট কোন চিন্তার বলকামিতে অথবা অজ্ঞারের জন্ত অন্তর্নিহিত যে সংস্কারের দাবী সাধারণত স্বীকৃত হত তা দিয়ে এই মনোভাব সৃষ্টি হত। কিন্তু বধন ব্রাহ্ম সমাজ অথবা রামকৃষ্ণ মিশনের মত কোন বিশেষ সংস্থা অথবা সন্ন্যাসবাদী রাজনৈতিক সংস্থা-সমূহ সৃষ্টি হত, তখন তারা তাদের ঠিকে থাকার জন্ত সেই মনোভাবের ওপর নির্ভর করতো যে মনোভাব তারা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল অথবা সংগঠন করেছিল।

এই বিশেষ আলোকে উনবিংশ শতকের বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকে বিচার করে দেখতে হবে। এগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনগণ ক্রমশ নানা প্রকার নতুন জীবনধারা ও চিন্তাধারার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লো। তারা সকলে পৃথক ভাবে, এমন কি তাদের মিলিত প্রভাবে দিয়ে জনগণের মননশীল ও নৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছিল, বতদিন না জনগণ দেশব্যাপী সম্ভব আন্দোলন করতে প্রস্তুত হল। [ক্রমশঃ]

গোপন প্রেম

সাধন চৌধুরী

মুখ নীচু করে সূর্যস্বামী মাটিতে ডাকিয়া কর,
তবু সাথে যোগ্য শাস্ত প্রেম সুলিবার কড় নর।

রক্ত কিরণে গগন প্রাবিয়া সূর্য মারিলে উঁকি,
মুখ তুলে কর, 'সূর্যের ভয়ে ফুটেছি সূর্যস্বামী।'



মানুষ কি করে বড় হল!

শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ

আজ-কাল চারিদিকে তোমরা নানা রকমের সভ্য মানুষকে দেখতে পাচ্ছ। পৃথিবীর মাটির ওপরে ঘর-বাড়ী তৈরী করে, চাষ-বাগ করবে, স্কুলের স্কুলের জিনিষ সৃষ্টি করে আজ মানুষ তার সজ্জতার বিকাশ ঘটতে চলেছে। কিন্তু এই সব ব্যাপার হুঁ-একদিনে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে। একটু একটু করে উন্নতি করতে করতে আজ মানুষ উন্নতির শীর্ষ স্থানে আরোহণ করতে চলেছে। কি-ভাবে একটু একটু করে উন্নতির পথে এগিয়ে এল সেই কথা শোনা এবার। লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর এই মাটির বুকে যে সব জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছিল সে সকল জঙ্গলে এক জাতীয় বনমানুষ বাস করত। এরা জঙ্গলের গাছে ডালে ডালে এমন করে বেড়াত যে মনে হত সমস্ত বনে জঙ্গলে কে যেন তাদের জঙ্গ গাছের সঙ্গে গাছের সেতু বেঁধে দিয়েছে। এখন হ'য়েছে কি, গাছের ফল-মূল পেড়ে খেতে বা ডাল-পালা ভেঙ্গে অনেক সময়ে মিজের আসা-বাওয়ার পথ পরিষ্কারের জঙ্গ তারা হাতের ব্যবহার শুরু করেছিল। অনেক সময়ে এমন হ'ত যে, ফল ইত্যাদি গাছ হতে পাড়তে গিয়ে মাটিতে পড়ে যেত। পড়ে যাওয়া ফল মাটি হতে তোলবার জঙ্গ তাদের বাধ্য হয়ে মাটিতে নামতে হ'ত। এই ভাবে ঐ জাতীয় বনমানুষ মাটিতে নামতে শিখল। এই ভাবে মাটিতে নামতে শেখা ও হাতের ব্যবহার করা এরা শুরু করল। মাটিতে নামতে শিখে তাদের নেশা বেড়ে গেল। তখন আর তাদের ফল-মূল খেয়ে তৃপ্তি হলনা। তারা অন্তর্ভুক্ত পশু-পাখীদের মতো তাদের মাংস খেতে শুরু করল। ফলে আগের চেয়ে বেশী করে তাদের নীচে নামতে হল। গাছের ডাল-পালা ভেঙ্গে লাঠি তৈরী করে গর্ত খুঁড়ে পোক-মাকড় খেতে শুরু করল। এই ভাবে তাদের যেমন খাবার জিনিষের তালিকা বেড়ে গেল, তেমনি আবার হাতের কাজও বেড়ে যেতে লাগল। (সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের হাত, পা, বা অন্তর্ভুক্ত অবয়ব আমরা সাধারণতঃ কাজে লাগাই শুধু সুখার নিবৃত্তির জঙ্গ)। হাতের কাজ যখন বেড়ে

গেল তখন পায়ের ওপর ভর দিয়ে হাতের চলেতে হল। কেননা, একসঙ্গে হুঁহাতে আর হুঁপায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চললে নিজের খুসীমত খাবার জিনিষ খাওয়া যাবেনা। এই কারণেই বোধ হয় ভগবান তাদের সাহায্য করলেন যাতে তাদের হাতের ওপর ভর দেওয়া কমে যায়।

এখন তোমরা যদি বল—এদের দেখতে ঠিক কি রকম ছিল এবং এদের আবির্ভাব কোথা হ'তে হল, তাহলে একটু বে-কারদার পড়তে হবে। কেননা, এদের নমুনা আজ-কাল পাওয়া যায়না। তবে খুঁজে পেতে তাদের হাড়গোড় থেকে এটাই প্রমাণ পাওয়া বাবে যে, বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন বানর-মানুষ (Ape-Man) হচ্ছে বানর থেকে মানুষের রূপান্তরের মাঝখানের 'হারানো-সৃজ' বা (missing link)।

গরিলা, শিম্পানী, ওরাং, পিকা প্রভৃতি অনেকটা বাইরে থেকে দেখতে এক রকমের লম্বাগুলি এই 'বানর-মানুষ' পর্যায়সূত্র। প্রাণিতত্ত্ববিদরা এই দলটাকে Simaldie (সিমাইদাই) নামে অভিহিত করেন এবং এই সিমাইদাই দলটাকে প্রাইমেট (Primate) জাতিভুক্ত বলে গণ্য করেন। এই বানর-মানুষের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল শিম্পানী। কেন না, এদের মাথার গুলি, হাড়-গোড় ও দাঁতের সংখ্যা এবং হাত-পায়ের গঠন প্রভৃতিতে মানুষের সঙ্গে এক গভীরভাবে সাদৃশ্য আছে যে, প্রাণিতত্ত্ববিদরা এদের মানুষের সবচেয়ে নিকট-আত্মীয় বলে অভিনন্দন জানান। শুধু যে গঠন অনেকটা মানুষের মত তা নয়। আচার-ব্যবহার স্বভাব-চরিত্র অনেকটা মানুষের মত। কেন না, মানুষের মতনই এরা অনেকটা সোজাভাবে পায়ের উপর ভর দিয়ে হাঁটে। হাতের গঠন মানুষেরই মত, পায়ের চেয়ে ছোট। এই হাত এরা কাজে লাগায় ফল, মূল ইত্যাদি গাছ হ'তে পেড়ে খাবার জঙ্গ। মানুষের মত এরাও দল বেঁধে থাকে। মানুষেরই মত স্বামি-স্ত্রীরূপে স্মৃষ্টি ঘর-করা করা কিংবা কোনও আনন্দ-উৎসবে যোগদান করা এদের স্বভাবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েদের রক্ষা করার জঙ্গ 'বাসা' প্রস্তুত মানুষেরই মত এরা করে। তবে এদের 'বাসা' প্রস্তুত হয় গাছের ওপরে। মানুষের মত হুণ, সুরকি, সিসেট দিয়ে নয়। স্ত্রী-শিম্পানী যাত্রিবেলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাছের ওপরে 'বাসা'র থাকে এবং পুরুষ-শিম্পানী গাছের তলার বসে সারা রাত ধরে চৌকি দেয় আর গভীর রাতে মাঝে মাঝে চৌকিদারের মত এক রকম বিকট চীৎকার করে সবাইকে সজাগ করে দেয়।

শিম্পানীর সঙ্গে মানুষের গভীর সাদৃশ্য থাকলেও প্রভেদও আছে যথেষ্ট। সেটা কিন্তু মনে রাখ।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই বানর-মানুষকে 'পিথেক্যান্থপাস' (Pithecanthropas) বলা হয়। এর পর বৈজ্ঞানিকেরা আরও অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যখন হাঁটতো তখন তাঁরা কুঁজো হয়ে হাঁটতো। হাঁটবার সময়ে পা বেঁকে যেত ও হাত ছুটো বুলতে থাকত। ছুবোরা নামে এক নৃতত্ত্ববিদ এদের নতুন নাম দিলেন 'পিথেক্যান্থপাস ইরেকটাস' অর্থাৎ যে পিথেক্যান্থপাস সোজা হ'য়ে হাঁটে। পরে এরা যখন একটু উন্নত ধরনের হয়ে উঠল তখন বৈজ্ঞানিকেরা এদের নাম দিলেন 'সিনান্থপাস'। আরও বেশ কিছুদিন পরে অনেক অনুসন্ধানের পর পাহাড়ের ওপর মধ্য হতে হাড়-গোড়ের সন্ধান পেয়ে এরা এই

সিদ্ধান্তে আসেন যে, সিনানথ্রুপাস ওহার থাকত ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। পূর্ব সম্ভব পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র তারা জন্তু-জানোয়ারের মতের তাদের মাংস খাবার জন্তু ব্যবহার করত। এর পর এরা মনবৎ হয়ে বাস করতে শিখে নিজেদের কিছুটা উন্নত করে তুলল। বৈজ্ঞানিকের জানবার আগ্রহ কিন্তু এতেও মিটল না। আরও কিছু নতুন তত্ত্ব জানবার আগ্রহে তাঁরা মাটির তলার হাড়-গোড়ের দিকানে রত হলেন। হাড়-গোড় সংগ্রহের পর পরীক্ষা করে তাঁরা জানতে পারলেন যে, উত্তরযুগে যে সব মানুষ জন্মিছিল তারা কেহই পূর্বপুরুষের মত হবহ দেখতে ছিল না। এক একটা যুগে এক এক রকম দেখতে হচ্ছিল। তাঁরা করলেন কি. বিভিন্ন যুগের মানুষকে বিভিন্ন নামে ভূষিত করলেন। সিনানথ্রুপাসের পর হাউডেলবের্গ, তারপর এরিস ডর্ক, তারপর নিয়ানডারথ্যাল আরও পরে ফ্রোম্যাগনন প্রকৃতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের মানুষের আবির্ভাব হতে লাগল। সবত্ব তোমরা যেমন পর পর তাড়াতাড়ি নামগুলি পড়ে গেলে সে একম তাড়াতাড়ি এদের আবির্ভাব ঘটেনি। অন্ততঃ হাজার হাজার বছর পরে পরে এদের আবির্ভাব ঘটেছে।

এই ভাবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের মানুষের আবির্ভাব হতে লাগল। এই ভাবে ক্রমশঃ এল অসভ্য আদিম অধিবাসীরা। বুনো হাভাব বানের মধ্যে গভীরভাবে দেখা যায়। তারপর প্রকৃতির ফলাফলে উন্নতশ্রেণীর মানুষের আবির্ভাব হতে লাগল। (বদিও বাধার ধূলি, হাড়-গোড়-এর সংখ্যা এবং আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে এক যুগের মানুষের সঙ্গে আর এক যুগের মানুষের বিশেষ কোনও সামঞ্জস্য ছিলনা। তাহলেও এই ভাবে মানুষ উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে।) এই ভাবে মানুষ ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলতে লাগতে অবশেষে এল বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা। একদিকে যেমন বৈদিক দিগে সুস্থ ও সবলরূপে বেঁচে থাকবার জন্তু মানুষের অস্বাস্থ্য পরিশ্রমের ফলে আবিষ্কৃত হল নানারকম যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র, পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইত্যাদি—অপর দিকে তেমনই সভ্যতার বিকট রূপ দেখা দিল ধ্বংসাত্মক কনিক-রে এটম বোমের মধ্য দিগে। কিন্তু যেটা সুন্দর, যেটা শান্ত, তার বিনাশ নাই। Great and good do not die. তাই আবার আমরা সব রকম বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের প্রকৃত সাধনায় লিপ্ত হব। আবিষ্কৃত জ্ঞানাদি কাজে লাগার মানুষের হিতার্থে মানুষের বিনাশের মধ্য দিগে নয়। তবেই হবে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা—হবে বৈজ্ঞানিকের পরম সার্থকতা। আর তাতেই আসবে প্রকৃত আনন্দভূষণ।

লেখা ও লিখনকলা

শ্রীনির্মলেন্দু সেন

পৃথিবীতে বহু লোককেই অনেক কিছু লিখতে হয় অক্ষরের মালা সাজিয়ে, কিন্তু সেই লেখা কয়েকটি বিশেষ গুণবৃত্ত হলে বলা হয় 'সাহিত্য'। ধীরে শুধুই লেখেন না সাহিত্যস্রষ্টা করেন, তাঁদেরই বলা 'লেখক'।

যে কোনো ভাষার সাহিত্যকারদেরই অর্থাৎ লেখকদেরই হ'ত্যাগে কেলা যায়—একদল প্রতিভাশালী এবং আর একদল নিপুণ লেখক। একদল লেখেন রামায়ণ জাতীয় লেখা, আর একদল লেখেন

ভট্টিকাব্য। তবু, একটি ব্যাপারে এ দু'রকম লেখকদের মধ্যেই মিল আছে : থাকতেই হয়। সব লেখককেই লেখার 'কলা' (Art) শিখতেই হয়। Virginia Woolf লিখেছেন, he (the writer) has to be taught his art... is that strange? Nobody thinks it strange if you say that a painter has to be taught his art or a musician or an architect. Equally a writer has to be taught. For, the art of writing is at best as difficult as the other arts (A Leaving Tower).

প্রতিভাবান হলেই বা কিছু বলার থাকলেই কোনো লেখক Samuel Daniel এর ভাষায়—"Worthy the reading and the world's delight" কিছু রচনা করতে পারেন না, বরং অবসর, মনের নির্ভর প্রশান্তি এবং লেখার পরিবেশ—এগুলো ভো চাই-ই, তা ছাড়াও দরকার হৃদয়ের গভীর তল থেকে নিজেস্ব প্রকাশের জন্তু ঠেলা এবং প্রধানতঃ লেখার আর্ট জানা থাকা। হৃটি লোক একই ঘটনার প্রত্যক্ষ-সাক্ষী হলেও একজন যে ঘটনার ভিত্তিতে লিখতে পারেন এমন গল্প বা লেখককে বিখ্যাত করবে, অজ্ঞান কি করে ঐ গল্প লেখা হলো, তা ভেবেই অবাক হবেন।

বিষয়-বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তসীমা গত পঁচিশ বছরে অনেকখানিই বেড়েছে হঠাৎ। কিন্তু তবুও এ সময়টি বাংলার 'সাহিত্য সমারোহের যুগ' না বলে 'লেখক-বংশ-প্রার্থীদের যুগ' বলাই বুদ্ধিসঙ্গত হবে। কারণ, একমাত্র কথাসাহিত্য ছাড়া গুণ ও উপবৃত্ততার দিক দিগে আমাদের সাহিত্যের অস্তিত্ব দিক (জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, ইতিহাস, সংস্কৃতি, গবেষণা ইত্যাদি) পূর্ব উৎকর্ষিত করেছে, তা বলা যায় না (পরিমল গোস্বামী)। নানা বিষয়ের ওপর নানা দিক থেকে ও মান অনুযায়ী বহু বই ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় লেখা হয়েছে, সে তুলনায় বাংলা ভাষায় বই বৈচিত্র্য, নগণ্য। বাংলা সাহিত্যের এই অবস্থার অন্ততম কারণ, আমার মনে হয়, বাঙালী লিখিয়েদের লিখন-কলা-বিভা সখকে উদাসীনতা এবং অজ্ঞতা। তাঁরা সত্য মূল্য নাহি দিয়া সাহিত্যের খ্যাতি চুরি করিতে চান। কবিতা, চৈনিক ও সাম্প্রতিক কালের মার্শিয় লিখিয়েদের লেখা পড়লেই দেখা যায়, লিখনকলায় তাঁরা কত পটু। সোভিয়েট দেশে নৃতত্ত্ব, পরমাণু-বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পকে সাধারণ লোকের কাছে বোধগম্য করে তোলা হচ্ছে লেখার কৌশলে। আজকের মার্শিয় মূলুকে পরিবার-পরিকল্পনা, ভাষাব্যা, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ে সাহিত্য রচনার কথা সবারই জানা। স্বীকার করি, উপবৃত্ত পাঠকের অভাব সাহিত্যের প্রগতির পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা। বাংলা দেশের সমস্তাও অনেকাংশে তাই। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে, লেখকরাই পাঠক তৈরী করেন এবং করতে পারেন। তার জন্তে লেখকের অকুষ্ঠ অধ্যবসায় ও নিজেস্ব লক্ষ্যের প্রতি অসামান্য নির্ভর দরকার। রবি ঠাকুরের বাণী লেখকের প্রতি ভালো ভাবেই বাটে।

ওরে তুই বায়ে বায়ে আলবি বাতি

হয়ত বাতি জলবে না।

ভাবলে ভাবনা করা চলবে না।

লেখক হ'তে হ'লে শুধু তার লেখা-বিষয়-ভাষা, ভদ্রি ব্যাকরণ জানা থাকলেই চলবে না, জগত ও জীবনের বিভিন্ন দিকের পরিচয়

ও ব্যক্তিসত্ত উপলব্ধিও এক্ষেত্রে প্রধান কথা হয় না। লেখকের পরিবেশ তাঁকে গড়ে তুললেও লেখার কারিকুরি তাঁকে শিখতেই হবে। কোনো বিষয়ে ভালোভাবে, পুরোপুরি না জেনেও সে সবকিছু লেখা সম্ভব, কিন্তু লিখতে না জানলে বহুদূর পৌঁছানোর পক্ষেও লেখা সম্ভব নয়। লেখকের শিক্ষা অত্যন্ত শিল্পীর মতো বাধ্যবাধক নয় নিশ্চয়ই, তবু লেখার আর্ট শিক্ষা তাঁর পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন।

প্রতিটি মানুষ অল্প সময় থেকে আলাদা, তাঁর দেহ ও মনের গঠনের মত জীবনায়নেও। জগতের অযুত কোটি বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজ শক্তি অনুযায়ী দেখা জানা বোঝা বিষয়গুলোকে লেখক একটি বিশেষ রূপ ও কাঠামোর মধ্যে ফেলে একটি বিশেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যান। তাঁর চোখে অল্প সময় থেকে আলাদা রকমভাবে সেই পরিণতি ফুটে ওঠে। সব কথাই লেখককে বলতে হয়না, যেমন তেমন করে বললেও তা লেখা হয়না অর্থাৎ তা সাহিত্যের পর্যায়ের ওঠে না। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে কোনো বিষয়কে মনোপ্রাণী করে তোলার জন্য দরকার লিখনকলার জ্ঞান।

লিখন-কলা বিস্তার কোনো সাধারণ সহজ সূত্র (definition) দেওয়া এককথার অসম্ভব, A. E. Hadsman এর ভাবার একটু অক্ষয় বল করে বলি-.if I were obliged not to define art of writing but to name the class of things to which it belongs, I should call it a secretion—এই কথাটিরই প্রতিফলন গনি আর একজন ইংরেজ লেখকের ভাবার—Art lies in concealing art, কি বলতে হয়না, সেটা লেখাই হচ্ছে লিখন-কলার প্রধান কথা।

কি কঠোর সাধনার দরকার মনের উজ্জ্বল ও আবেগকে গোপন করার শিক্ষার জন্য? কী ভীষণ কঠিন সত্যকে প্রকাশ করা? কী সে শক্তি যার বলে একজন লোকের অক্ষরের আঁচড় বা কুলির আঁচড় (ছবি আঁকিয়েতো লেখকই) যুগ যুগ ধরে মানুষের মনকে জাগায় এবং মানুষের মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হয়? তা বিশেষ রূপে ভজিত কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা। লিখন-কলা জানা লেখক এমন করে লুক্কায়িত করে আমাদের সেই বিষয়টিতে আগ্রহ জন্মাবেই, তাঁর বলার ধারাবাহিকতা ও যুক্তি আমাদের মুগ্ধ করে, তাঁর মাঝে মাঝে অল্প প্রসঙ্গে বাওয়া আমাদের মনে আনে ছুটির স্বাধীন আর ভেবে দেখার অবসর, তাঁর কখনো কখনো ব্যাকরণ ও অল্প নিয়ম না মানা নিজস্ব শৈলী (style) আমাদের দেয় সহজ তৃপ্তি। আর, তাঁর শেষ কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে হয় আর কিছু দেখানার নেই—সে কথাটির কোনো প্রতিবাদ করাই যায় না।

লিখন-কলাবিদ্যা is acquired by exercise and study এবং সেটি যার অধিগত ভাবা যে তাঁর কাছে কোনো বাধাই নয় Goldsmith তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আবার, মধুসূদন লিখেছেন : শব্দগুলোকে খুঁজতে হয় না, তারা যেন শ্রোতে ভেসে আসে। আমার প্রেরণার শ্রোত বলতে পারি। ভাবনা কিংবা চিত্র-শব্দগুলোকে আকর্ষণ করে আনে, সে শব্দগুলো আমি জানতাম বলে আর মনে হয় না।

কোনো একটা বিষয়ের শেষ কথা বললেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা বলা সম্ভব নয় কারুর পক্ষেই।

তবু যেটুকু বলা যায় সেইটুকুকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ করে বলাতেই লিখন-শিল্পের প্রকাশ। লেখকের অধীত বিজ্ঞা, তথ্য ও অনুসন্ধিৎসা, আদর্শ-বোধ ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যেই লেখকেরা মনোমত ঘটনা, পরিবেশ পরিমণ্ডল ও সীমা ছিঁব করে নেন। সেই ছিঁব করে নেওয়ার মধ্যেই তাঁর যুক্তিবোধ ও কল্পনার প্রসারতা ফুটে উঠে। কিন্তু তাঁর এগুলো সুশৃঙ্খল ভাবে ব্যবহার এবং ক্রমাধর এমনই হওয়া চাই যাতে তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে। সমস্ত মালমসলাকে বখাখ্য ভাবে পরিচালনা করাই লেখকের দায়িত্ব, সেটা করার শিক্ষাই কোনো লোকের পক্ষে লেখক হবার প্রথম সিঁড়ি।

এ কথা না বললেও চলে যে, প্রথম সিঁড়ি সব লেখকের পক্ষেই এক নয়, এক রকম নয়। লেখক হতে হলে প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথে পরীক্ষা নিরীক্ষা, সফলতা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তাঁকে এই প্রথম সিঁড়িতে উঠতে হয়—না উঠা ছাড়া উপায় নেই। অথচ এই সিঁড়ির পথ, অর্থাৎ লিখন-কলা বিস্তার পথ অল্প যে কোনো কলা-বিস্তার পথের চেয়ে কম কঠিন ও কম রূক্ষ নয়।

মহাকবি গ্যোটে'র বাল্যকাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

কবির বাল্যকাল গৃহশিক্ষক ও পিতার তত্ত্বাবধানে কেটেছিল। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন নিয়ম তাঁকে পালন করতে হত না। সববয়সীদের সঙ্গে তিনি মেশবার সুযোগ পাননি। পিতার ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় থাকার জন্য বালকজনোচিত স্বভাব তার মধ্য থেকে সহজে দূর হয়নি। তাছাড়া তার মধ্যে মাঝে মাঝে এক উৎকট ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাব দেখা দিত।

গ্যোটে'র পিতা ছিলেন গ্রাজুয়েট। গ্যোটে'র জীবনে তাঁর পিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, স্থায়ী জীবিকা তাঁর ছিল না। তাই নিজেই তিনি ছেলের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ইনি লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন এবং গিমন বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রাজুয়েট হন। ইনি স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে নিয়োগের চেষ্টা করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তার পর অবশ্য রাজকীয় সভাসদ হন। কিছুদিন পর এ পদ হতেও তিনি বঞ্চিত হন।

ইনি ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী ব্যক্তি। বিশ্বমন সম্ভবতঃ গ্যোটে'র পিতার কাছ থেকে পান। গৃহে কতকগুলো রোমান শিল্পীদের আঁকা নিসর্গমূলক ছবি ছিল। গ্যোটে'কে এই সব ছবি দেখিয়ে তার অর্থ ও তাৎপর্য তিনি বুঝিয়ে দিতেন। কবির পিতা ইটালী ভ্রমণ করেছিলেন। ইটালী দেশের কতকগুলো মার্বেল পাথরের সফর ছিল তাঁর। এগুলো ছেলেকে দেখাতেন। গ্যোটে'র মা স্থানীয় কাছ থেকে ইটালী সঙ্গীতের তালিম নিতেন। তাছাড়া তিনি ইটালী ভাষায় নিরমিতভাবে রোজনাযচা লিখতেন। বাল্যকালে গ্যোটে' একটা ইটালী সঙ্গীতের কলি Solitario Bosco Om Brosa কণ্ঠস্থ করেছিলেন। গ্যোটে'র পিতার কাছে ছিল ল্যাটিন চিরায়ত সাহিত্যের একটা গুলাদাঙ্গী সংস্করণ। এর বলে গ্যোটে' অতি বাল্য অবস্থায় কবি ট্যাসোর প্রতি ভক্ত হয়ে উঠেন। স্থাপত্য

বিষয়েও গ্যেটের পিতার গভীর জ্ঞান ছিল। তা ছাড়া পাঠাগারে ছিল বিশ্বকোষ ও অভিধান। এই দুই জাতীয় গ্রন্থ লনের দিকে গ্যেটের পিতার আকর্ষণ ছিল বেশী, সময় পেলে ইনি আরম্ভ করতেন কাহিনী পড়তে, মাতৃভাষার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক কর্ষণ ছিল। তাছাড়া বিদেশী ভাষার প্রতি গ্যেটের পিতার যোগ ছিল। ইনি পত্নী এবং কন্যাকে ইটালী ভাষা ও সঙ্গীত শাভেন।

আত্মজীবনীতে গ্যেটে স্বীকার করেছেন, তাঁর বুদ্ধি ও প্রবণতাকে কাশ করবার জন্য তাঁর বাবা সুরোগ দিতেন। চিত্তাঙ্কন বিষয়ে বর অল্পরূপে তাঁর পিতার কাছ থেকে পাওয়া। তদানীন্তন জাতি চিত্রশিল্পীদের ইনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সব শিল্পীদের কা কয়েকখানা ছবিও ছিল। তেলকে তিনি বলতেন, বিগত জীবনের চেয়ে জীবিত শিল্পীকে বেশী সম্মান দিতে। পুত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর মনে একটা প্রকল্প গর্ভ ছিল। গ্যেটে বাল্যকালে একটা বন্ধু লিখে পিতার কাছ থেকে উপহার পান। বংশের উচ্ছল বহুরে তোলবার জন্য গ্যেটের পিতার আগ্রহ ছিল অত্যধিক। ল্যাকালে ওভিদের একখানা কাব্যগ্রন্থ গ্যেটের হাতে আসে। ত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গ্যেটে কাব্যগ্রন্থখানি পড়ে শেষ করেন। রায়ত গ্রীক সাহিত্যের সম্পর্কেও কবি আসেন। সম্পর্কের এক পক্ষে হোমারের রচনার সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দেন। হোমারের বই বই-এর মধ্যে একটা ছবি ছিল। এই ছবি দেখে কবি অভিভূত হয়ে পড়েন। এই পিসের পত্নী অর্থাৎ পিসীমা গ্যেটকে ভার্জিল পড়বার উপদেশ দেন। ছোট থেকেই গ্রীক ও রোমান মহাকাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তবে তাঁর পিতার ধারণা ছিল, মিত্রাকর ছাড়া মন্ত্র হলে অর্থাৎ অমিত্রাকর হলে কাব্য লেখা যায় না। জার্মানীর হনগণের কবি ক্লোপটোক Hession নামক একখানি কাব্য অমিত্রাকর হলে লেখেন। জার্মান সাহিত্যে ঐটি প্রতিনিধিত্ব করত। যেহেতু ঐটি অমিত্রাকর হলে রচিত, সেহেতু গ্যেটের পিতা তাঁর গৃহ-পাঠাগারে এই বইটির স্থান দেন নি।

গ্যেটের পিতার অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, অমিত্রাকর হলে কাব্য লেখা যায় না। উপরন্তু অমিত্রাকর হলে হলেই নয়, বাইবেলের কাহিনীকে কবি ক্লোপটোক ভাবের বোঝনা দিয়ে কাব্যখানি এত প্রাণবন্ত করেন যে সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে কাব্যখানি সমাদৃত হয়। স্বামীর পাঠাগারে এ কাব্যগ্রন্থখানি না থাকায় গ্যেটের মা এই কাব্যগ্রন্থটি ভট্টনৈক বন্ধুর মারফত এনে কাব্যরস আবাদন করেন। কবি লুকিয়ে বোন কর্ণেলিয়ার সঙ্গে বইটি পড়তেন। এ-কাব্য শরতান প্রসঙ্গ ছিল। সন্ধ্যার আবছায়াতে গ্যেটকে পড়াচ্ছিলেন, বোনকেও শোনাচ্ছিলেন। গ্যেটের পিতা কৌতুক করছিলেন। বইখানি এত প্রাণবন্ত ছিল যে শরতান প্রসঙ্গ শোনবার সময় বোন কর্ণেলিয়া ভয়ে আর্জনাৎ করেন। কৌতুকরত নাপিতের হাত থেকে ক্ষুর পড়ে গেল। কারণ নির্ণয় করে তিনি জানলেন, অমিত্রাকর হলে রচিত গ্রন্থটি তাঁর গৃহে বসে অনিষ্ট সাধনের মূল। সুতরাং কাব্যগ্রন্থটি সরিয়ে ফেললেন বাড়ী থেকে।

কয়েকটা বংশের ধারা পান তিনি। গ্যেটের প্রপিতামহের

আহরণ করেন যে বার মাত্র তাঁকে ভুলবভাব বলা হত। নদীর প্রতি অল্পরূপে তাঁর মন হর কৈশোরের সন্ধিক্ষণে। জীবনের সারাংশে এক মারীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ লাগে। পুত্র পিতার প্রতি অল্পরূপে ও সামান্য বস্তব মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আহরণ করবার কল্পনা পান তিনি এক প্রপিতামহীর কাছ থেকে।

গ্যেটে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন সে অঞ্চল উত্তর ও দক্ষিণ-জার্মানীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ঐটি ছিল জার্মান সার্বভৌম সাম্রাজ্যের মুক্তনগর। তা ছাড়া এই নগরে জার্মান যুবরাজদের অভিব্যক্তি হত। আর নগরের টাউন হলে বহু সন্ন্যাসীর রাজ্যভিত্তিকের চিত্র অঙ্কিত থাকত। এ-সব ছবি কবি অর্থাৎ-বিশ্বয়ে দেখতেন। মুক্তনগরের শাসনভার ধারা চালাতেন তাঁরা ভাবতেন যে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব অভিজাতদের চেয়ে জাতি পদমর্যাদার কম নয়। কবিদের গৃহ ছিল যেখানে সেখানে বহুকাল পূর্বে ছিল হরিণের আশ্রয়। সুতরাং সে-অঞ্চল হরিণের আশ্রয় বলে পরিচিত হলেও সেখানে হরিণের সাড়া-শব্দ পাওয়া যেত না। কবিদের গৃহটা ছিল পুরানো। সংস্কারের অভাবে বাড়ীর ভিতরটা ছিল গুমোট ও অন্ধকার। বাড়ীর মধ্যে একটা বিছানার স্তরে কবির ভর লাগত। বাড়ীর গুমোট ভাব দেখে কবি রীতিমত ভয় পেতেন। পিতার কঠোর শাসনের ভয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে পেতেন না। পিতার শাসন ও মনের ভর দূর করে দিতেন তাঁর মা নানারকম পুরস্কার দিয়ে। তাঁর মা বলতেন, যে যত ভয় দূর করবে তাকে তত তিনি পুরস্কার দেবেন।

পিতার শাসন ছিল কঠোর। এই নির্মম শাসনের বেড়াঙ্কাল পেরিয়ে গ্যেটে মার কাছ এলে যতটা পারতেন ততটা মেহ ও ভালবাসা আদায় করে নিতেন। ছোটবেলায় জানালার ভিতর দিয়ে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য কবি সহ করতে পারতেন না। অর্থাৎসঙ্গীতী সূর্য্য দেখে কবির মন চুখে ভারাক্রান্ত হত। কবি নির্জনপ্রিয় ছিলেন। এই নির্জনপ্রিয়তা হওয়ার কলে তাঁর মধ্যে চিত্তা করায় প্রবণতা দেখা যেত। এইজন্য চিত্তাশীলতার ভাব তাঁর মধ্যে বেশ পরিষ্কৃত হয়েছিল। অবসর সময়ে কবির সময় কাটত ঠাকুরমার সঙ্গে। একটা প্রশস্ত ঘরে তাঁর ঠাকুরমা থাকতেন। ঠাকুরমার কাছে গিয়ে খেলা করতেন, এই বৃদ্ধা ঠাকুরমা পুতুলখেলার মাংক নাভী-নাভনীদেব একদিন পুতুলদের মুক অভিনয় দেখান। গ্যেটের জীবনে নাট্যরচনার দিক হতে এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গ্যেটের মনে এর ছাপ সুস্পষ্ট ভাবে পড়ে। এই থেকে নাট্যকার হওয়ার বাসনা তাঁর মনে অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। নদীর তীরে ভ্রমণে যেতেন। বাসু নির্দেশক ধাতুর মোহন গৃহচূড়ায় দেখে তিনি আনন্দ পেতেন। নৌকার জলবিহার সব চেয়ে তাঁকে বেশী আনন্দ দিত। মদের দোকান ছিল নদীর ধারে। নদীতে বিরাট পণ্যবাহী জাহাজ নোঙর করত। এ-সব তিনি মূগ্ধ হয়ে দেখতেন। নদীতীরে তাঁর ভর লাগত কশাইখানার দোকান দেখে। কশাইখানা দেখে অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠতেন তিনি আকাশচুম্বী মিনার দেখে তাঁর খুব আনন্দ হত। শহরে স্থাপত্যশিল্পের পুরানো বহু নিদর্শন ছিল। এ-গুলো তিনি দেখতেন। শহরের প্রাচীর-বেষ্টিত লম্বা দেওয়াল তিনি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতেন।

লেখাপড়ার তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাবা ও শিক্ষক বা পাঠ দিতেন তা তিনি শেষ করে ছাড়িয়ে দিতেন। তবে ব্যাকরণ পড়বার সময় তাঁর খুব অসোয়াস্তি লাগত, কারণ ব্যাকরণের মিসরমন্তব্যে তাঁর কাছে খুব খেচ্ছাচারী বলে মনে হত, তাঁর মনে হত, ব্যাকরণ খেরালখুশি মত ভাষার কঠোরোধ করে। ব্যাকরণের ব্যতিক্রমগুলো ব্যাকরণের নিয়মকে বেশী পরিমাণে ঘাবল করে। মেধাবী ছাত্র হয়েও ব্যাকরণ-বিভীকির জন্ত তাঁকে হুর্ভোগ সহ করতে হত। বিভাগয়ে যখন কিছুদিনের জন্ত ছিলেন তখন পণ্ডিতেরা ব্যাকরণের জন্ত কাঁড় করিয়ে রাখত তাঁকে। রচনা-রীতির দিক হতে তিনি ছিলেন সরস্বতীর বরপুত্র। ছোটবেলাতেই কবিতার ছন্দ ও সুর তাঁর আয়ত্তে আসে। তাঁর পিতা তাঁর মা ও বোনকে ইটালী ভাষার তালিম দিলেন। সেই সময় গ্যোটে'র মনে হয়েছিল ইটালী ভাষা ল্যাটিন ভাষার সংস্করণ।

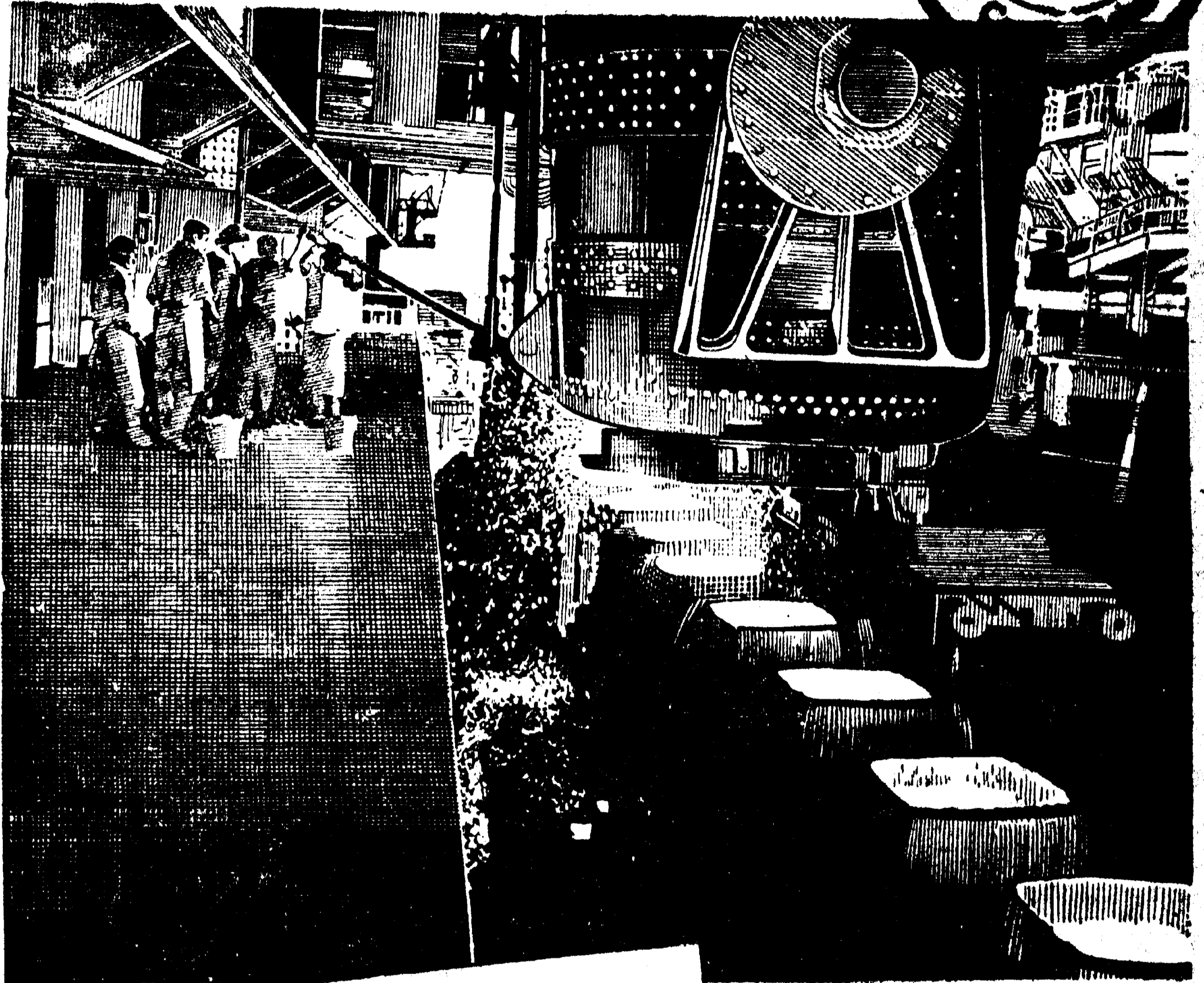
জার্মান কবিতাও গ্যোটে'র ভাল লাগত। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখেন, সমবয়সী বন্ধু কবিদের সঙ্গে লড়াই হত। অবশ্য এরা সকলেই ক্ষুদ্র কবি। ক্ষুদ্র কবিরা সকলেই আপনাতর রচনাকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করত। অধিকাংশ ক্ষুদ্র কবি অপরকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে এনে বেমালুম নিজের নামে চালিয়ে দিত। গ্যোটে খুব অনুধায় পড়তেন। কারণ, কবিতা যে তিনি নিজে লিখতেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর মৌলিক কবিতা অপরের চেয়ে ভাল হত। ছোটবেলায় কবির একবার হাম হয়। এর ফলে লেখা-পড়া বন্ধ থাকে কিছু দিনের জন্ত। অনুধে চোখের পাতা তুলতে পারতেন না, সর্ব অঙ্গে ব্যথা থাকতে কাতরোক্তি করতেন, আর হামের গুটা এত হয়েছিল যে তিলার্দ্র ধারণের স্থান ছিল না, সে সময় ঢাকার প্রচলন হয়েছিল। ঢাকা অবস্থ তখন সকলে নিত না। কবিকে বলা হত মুখ খুঁটে তিনি বেন যা না করেন। আর এই কাজ থেকে তিনি যাতে বিরত হন তার জন্ত তাকে উপহার দেওয়ার লোভ দেখানো হত। তখন লোকের ধারণা ছিল, ঢাকা হলে রোগীর দেহে বেশী ঢাকা দিলে রোগের উপশম হয়। বেশী ঢাকা দেওয়ার ফলে রোগের উপসর্গ আরও তাঁর বাড়ল। অবশ্য অনেক রোগভোগের পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। হামের গুটা মুখে একটা মুখোসের মত আবরণ তৈরী করেছিল। মুখোস সরিয়ে দিলে যেমন সাধারণ মুখ দেখা যায় তেমন হামের দাগ সরে গেলে তাঁর মুখমণ্ডল স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাঁর আকৃতির পরিবর্তন সামান্য হয়, তাই এক মাসি গ্যোটে'কে দেখে বলেছিলেন যে গ্যোটে' হচ্ছেন কৃত্রিম ভাইপো। গ্যোটে' বুঝতে পেরেছিলেন যে রোগভোগের জন্ত তিনি আগেকার চেয়ে অসুন্দর হয়ে উঠেছিলেন। এই হাম ও পানি-কসন্তের প্রকোপে তাঁর এক ছোট ভাই মারা যায়। অনুধ হয়েছিলেন বলে লেখাপড়া কিছুদিন বন্ধ থাকে। কবির পিতা ভাবলেন যে, ছেলে পিছিয়ে পড়েছে। তাই তিনি দ্বিগুণ পাঠের তালিম দেওয়া শুরু করলেন। ছেলের মানসিক ও শারীরিক অক্ষমতার কথা ভাবেননি। গ্যোটে'ও হাঁকিয়ে উঠতেন। পিতার কঠোরতা দেখে মধ্যে মধ্যে ঠাকুরমা ও মাতামহের কাছে পালিয়ে যেতেন।

এই মাতামহের বর্ণনা গ্যোটে' আত্মজীবনীতে দিয়েছেন। সারা বছর তিনি বাগান পরিচর্যা করতেন। হাতে দস্তানা পরে বাগানে কাজ করতেন গাউন পরিধান করে। ডেলভেটের তাঁজ করা টুপি তিনি মাথায় পরতেন, ইনি খুব কম কথা বলতেন, ঘোড়ার চড়ে তিনি টাউন হলে যেতেন, কিংবে এসে আহায়ে'র পর ঘুমাতেন, দাতকে গ্যোটে' কোনদিন বৃদ্ধ হতে দেখেননি। এই দাতুর পাঠাগারে ভ্রমণ-কাহিনী, মহাদেশ আবিষ্কিয়া বিষয়ে সমুদ্রযাত্রার কাহিনী ছিল। এসব কাহিনী পড়ে তিনি উদ্দীপ্ত হতেন। বই পড়া নেলা গ্যোটে'র এত প্রবল ছিল যে তুলোট কাগজের ওপর ছবিওয়াল পুস্তক কিনতেন। বইগুলো টেকসই নয়, তবু আগ্রহ সহকারে এই সব বই পড়তেন। অনেকে বলেন যে, ছবিওয়াল এই বই আর ঠাকুরমার মুক পুতুল অভিনয় গ্যোটে'কে অমর কাব্য কাউট রচনায় উদ্দীপ্ত করেছিল। সম্ভা নামের বইগুলোতে সাধারণতঃ পরীদের কাহিনী থাকত। গ্যোটে'র দাতুর বাড়ীতে ছিল নানা রকমের গাছ ও লতাপাতা। বাড়ীটার আকার ছিল দুর্গপ্রাকারের মতন, তুঁতে, গোলাপ প্রভৃতি নানা ধরণের গাছ ছিল। দাতুর বাগান পরিচর্যা করবার সখ ছিল। অকসি লোক যেমন কাজ করে, সেই রকম নিয়মিত ভাবে তিনি বাগান পরিচর্যা করতেন। বাগানের লতাপাতা ও গাছগাছড়া বিষয়ে প্রত্যাহ রোজনামচা লিখতেন। এই দাতু একবার স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তাঁর চাকুরীর উন্নতি হবে, সে-স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়, সেই থেকে দাতু স্বপ্নে বিশ্বাস করতেন। গ্যোটে' আত্মজীবনীতে লিখেছেন, এই দাতুর মধ্যে তিনি একটা আত্মতৃপ্ত ভাব দেখেছিলেন।

উৎসব পালনের জন্ত তাঁদের গৃহে বছ চীনায়াটির বাসন আনা হয়েছিল। এক নির্জন দুপুরে-কৌতুকবশে বাড়ীর লোকের অজ্ঞানতে এই সব বাসনপত্র রাস্তায় ফেলে ভেঙে তছনছ করেছিলেন। ভাঙার আওয়াজ শুনে উল্লসিত হয়েই এই কাজ করেছিলেন। প্রায়ই তিনি শহরের টাউন হলে গিয়ে জার্মান সম্রাটদের আঁকা ছবি বিচিত্র দেওয়ালে গভীর মনোযোগ সহকারে দেখতেন। সেখানে একটা সোনার বাঁড়ের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, এটাও তিনি পুখাছুপুখরুপে দেখতেন। অতীত রাজবংশের ছবি দেখে ইতিহাসপাঠের দিকে তাঁর প্রবণতা দেখা দিল। গ্যোটে'র ঠাকুরমা মারা গেলে, তাঁর বাবা বসন্তবাটার সংস্কার করেন। গ্যোটে'র বয়স যখন চার, তখন তাঁর বাবা বসন্তবাটার সংস্কার করেন। সংস্কার করবার সময়ও তাঁর বাবা হয়ত জন্ত কোথায় পাঠাতেন না। কিন্তু একদিন প্রাকৃতিক হুর্ভোগে ঘরের চাল সরে যায়। আলোর প্রবেশ হল বাড়ীতে আরও; আগে এত আলো ঘরে আসত না। এটি গ্যোটে' লক্ষ্য করলেন। এই সময় তাঁরা তাঁর বাপের বন্ধুদের বাড়ীতে গঠন। গ্যোটে'র পড়ার পাছে ক্ষতি হয় এই ভেবে গ্যোটে'কে বিভাগয়ে ভর্ত্তি করা হয়। কারণ গ্যোটে'র বাবা জানতেন, বাড়ী সংস্কার কার্যে মন দিলে ছেলেকে পড়াতে পারবেন না। নিজের তত্বাবধানে গৃহ সংস্কার তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর শুরু করবার বাসনা ছিল গ্যোটে'র পিতার বহুদিন আগে থেকে।

[ক্রমশঃ]

মাসিক বঙ্গমতীর প্রচার ও প্রসার বাঙলা দেশের বিস্তার।।



নির্ধারিত সময়ের আগেই

গত ২৫শে এপ্রিল মেশিন শপ বিভাগে প্রথম ওপেন হার্ব ফার্নেসটির নির্মাণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুগাঁপুর ইস্পাত কারখানায় নির্ধারিত সময়ের আগেই ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয়েছে।

যেখানে ছিল একদিন গভীর অরণ্য সেখানে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এক বিরাট ইস্পাত কারখানা। দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী এই কারখানাটি সম্পূর্ণ করার জন্য ইংরেজ ও ভারতীয় কারিগরেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এখানে দিন রাত কাজ করে চলেছেন।

ইস্কন

ইন্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কমস্ট্রাক্শন্স কোং লিঃ

দি ওয়েলফ্যার স্ট্রব ওয়েন এন্ডসিয়ার্টিং কর্পোরেশন লিঃ
ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্ডসিয়ার্টিং কোম্পানি লিমিটেড
বেড হাইটসন্স অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ সাইবিস-ভার্কস্ লিঃ
দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ ব্রিটিশ টমসন্স-হস্টন্স কোম্পানি লিঃ
দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকট্রিক
কোম্পানি লিমিটেড মেট্রোপলিট্যান-ভাইকাস ইলেকট্রিক্যাল
এন্ডপোর্ট কোম্পানি লিঃ স্মার্ট উইলিংহাম এন্ডল অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ
স্ট্রীভল্যান্ড ব্রিজ অ্যান্ড এন্ডসিয়ার্টিং কোম্পানি লিঃ ডব্লিউএন সন্স
(ব্রিজ অ্যান্ড এন্ডসিয়ার্টিং) লিঃ জোসেফ পার্কস অ্যান্ড সন্স লিঃ
ইস্কন কেবল গ্রুপ (সিমেন্ট এডিসন সোয়ান লিঃ এবং গিরেশি
জেনারেল কেবল ওয়ার্কস্ লিঃ)

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবার জন্য

সঙ্কটের বিহ্বলতায়

জুলফিকার

বিশ্বায়িত্বের সম্মুখে আজ কয়েকটি বিহ্বলকারী প্রশ্ন জেগেছে—‘এ আমরা কোথায় চলেছি? মানব-সভ্যতার পরিগতি কি, ক্লাস্ত-কাতর মানুষ কি শান্তি ফিরে পাবে না?’

একটা দারুণ অস্থিরতা, একটা গভীর অসোয়াস্তি পৃথিবীর দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করেছে। চারিদিকে যেন আতঙ্কের বিবর্ণ প্রোভাওয়া—

আজকের সঙ্কট শুধু রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক বিরাট দৈত্যের মত সে আবির্ভূত হয়েছে। মানব-সভ্যতাকে সে গ্রাস করতে উত্তত।

বর্তমান যুগটা হচ্ছে কৃত্রিমতার যুগ, সব জিনিষই যেন বাঁধা-ধরা হাঁচে কেলা, একজন লোক এ সময়ে বেশ একটা সরস উক্তি করেছেন, ‘It is an age of canned food, canned music and canned thought.’ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রায় সকল দেশেই স্বাধীন চিন্তার সঙ্কোচ এবং রাষ্ট্রবিরোধী মতবাদের কঠোরোধ করা হচ্ছে। একজন যুগান্তকারী শিল্পী বা সাহিত্যিক, একজন বিরাট দার্শনিক অথবা একজন মহামানবের অভ্যুত্থান এ যুগে সত্যি অপ্রত্যাশিত। আজ-কাল প্রতিভাবান ব্যক্তির সম্মুখে মাত্র চারিটি পথ উন্মুক্ত—হয়, সে একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হতে পারে, না হয়, একজন শিল্পপতি অথবা মস্ত বড় একজন বৈজ্ঞানিক আর না হয়, একজন চর্যাক্ত চোর, জুরাচোর বা নরহাতী মনুষ্য। এ কথা বলেছেন হুয়ং বাচুটাও হাসেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে তাকে চলতে হয় আজীবন ভৃত্যের মত, না হয়, অভ্যাচারীর দস্ত ও দাপট নিয়ে। হাসেনের কথায়, ‘A man who now wishes to influence human affairs finds it difficult except as a slave or a tyrant.’ সমকালীন বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তিনি উপমা দিয়েছেন আরব্য উপন্যাসের দৈত্য বা জিন্দের। রাজনৈতিক নেতার হাতে কমতার ঐক্যজালিক অকুর্বা; তারই প্রভাবে বৈজ্ঞানিক জিন্ অকুত অকুত কার্য সম্পাদন করে চলেছে। এই সব মিরাক্যাল ঘটনাতে সে আপনাদের অন্তরের প্রেরণার নয়। আজাদাসের মত সে প্রকৃত হুকুমই তামিল করে চলেছে মাত্র।

যে বৈজ্ঞানিক (হয়) আপনিক বোমা আবিষ্কার করেছেন (যে মারণাস্ত্রের বিধ্বংসী শক্তি হিরোসিমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, হাজার হাজার নর-নারীর দেহ ছিন্নভিন্ন করল, আরও কয়েক হাজারকে পত্ন, বিকল, অস্ত্রশস্ত্র করে গেল) লক্ষ নরহত্যার পাপের বিবম গুরুভার কি তাঁদের অন্তরকে আতঙ্কিত, রিভীকিগ্রস্ত করে তুলেছে না?

জান আমাদের ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কিন্তু সেই তুলনার কমে আসছে অল্পভুক্তি, আবেগের প্রখরতা। মানুষের জীবনের যেন কোন মূল্যই নেই আজ, যদিও অস্ত্রাস্ত্র সব ক্রমের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানকার মত ব্যাপক নরহত্যা পূর্বে আর কখনও হয়নি পৃথিবীর বুকে, বর্ষের চেঙ্গিস খাঁ বা হনু এ্যাটিলার আমলেও নয়।

বিগত মহামুহুরে রক্তক্ষয় থেকে উঠেও মানুষ এখনও যুদ্ধ ও হত্যার কথা বিদ্রুত হতে পারছে না। যে সক্রিয় অল্পভুক্তি সং জীবন বাপনের প্রেরণা বোগায়, ভায় ও কল্যাণবোধ উদীপ্ত করে, মানুষের ছন্দে তা আজ মৃত। মানসিক ও আত্মিক পরিপূর্ণির দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধু বৈবরিক সমৃদ্ধির জন্য মানুষ তার সৃজনীশক্তি নিয়োজিত করেছে। শীলবস্তা ও আধ্যাত্মিকতার (cultural and spiritual) মান উন্নত না করে কেবলমাত্র লৌকিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কার্যে সে ব্রতী। একজন কিছুতুকিমাকার লোক যার দেহের একদিক অতিমাত্রায় পুষ্ট, অত্রদিক অস্বাভাবিক রূপে কীর্ণ, সে যেমন আমাদের বিক্রপ ও জুগুপ্সার উদ্রেক করে, বর্তমান সভ্যতার রূপটাও সেইরূপ অশোভনীর খাপছাড়া এবং সত্যদর্শী ব্যক্তিদের মনে ঘৃণা ও অল্পকম্পার ভাব জাগিয়ে তোলে।

অধিকাংশ রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো মনুষ্যাত্মক পরিপূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী। আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) গুলির মধ্যে সব চেয়ে জোরালো হচ্ছে নিজেকে প্রসারিত করার ইচ্ছা—আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা। এ যুগের প্রলয়-মেঘের ঘনঘটা চারিদিকে যে কালো ছায়া ফেলেছে তারই অল্পষ্টতার মানুষ আজ তার আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। চতুর্দিক হ’তে লংশয়, শকা, দুর্ভাগ্য, ছলনা, ঘেঘ তাকে বিহ্বল হয়ে তুলেছে। বন্দী মানবাত্মার আকৃতি বুধাই হৃদয়পঞ্জরে ডানা ঝাপটে মরছে।

অবাধ স্বাধীনতা বিশ্বখলা আনতে পারে সত্য, একনায়কত্বের অভ্যুদয়ও ঘটতে পারে কিন্তু মানবাত্মার প্রসার ও উর্ধ্বগতি রোধ করলে কিবা মানুষের প্রতিভাকে শুধু রাষ্ট্রের সংকীর্ণ স্বার্থে নিয়োজিত করলে শুধু যে জাতীয় জীবনের প্রকর্ষবস্তা বাহত হবে তা নয়, সমগ্র মানব জাতির পক্ষে তা চরম অকল্যাণকর।

বর্তমান যুগে মানুষের বিচারবুদ্ধি কোন দৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নেই। অসত্য ও অত্যাচারের প্রবল প্রোতকে প্রতিহত করতে মানুষ অশক্ত। তার বুদ্ধি অল্পষ্ট, বিধাশ্রুত; সার্থক সৃষ্টি-কার্যে মন তার বক্ষ্যা। জেসে চলেছে সে সঙ্কটের মেপধ্য পানে।

অন্ধের মত মানুষ তার হারিয়ে যাওয়া শান্তিকে খুঁজে কিরছে। অশান্তির দাবদাহে সে দগ্ধ। জীবনের সহজ ছন্দ সে তুলে গেছে, মন তার বিভিন্ন complex-এ ভুগছে। মার্শিয়ন যুলুকের বড় বড় সহরে অসংখ্য সাইকো থেরাপীর ক্লিনিক খোলা হচ্ছে। বিকৃত-মস্তিষ্কের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আত্মহত্যার হার উর্ধ্বগামী।

হুইটি বিবদমান শক্তির মাঝে পড়ে পৃথিবী আজ ওষ্ঠাগত-প্রাণ। হুই দৈত্য—রূপ আর ইয়াতি সুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাল টুকছে আর যোবসন্দেহাকুল নেত্রে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করছে, (সম্প্রতি ওদের মারমুষ্টির উগ্রতা অনেক কমে এসেছে। তবে ওদের মধ্যে আপোষ যদি কিছু হয়, তবে তা কত দিন টিকবে, সেটা বলা কঠিন।)

জেদি, অনমনীয় আমেরিকা গণতন্ত্রের মুকুট হিসাবে চূর্বল ও হুঃহ রাষ্ট্রগুলিকে প্রচুর আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছে; সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে (Collective security of nations) দৃঢ় করে তোলার অহিলায় এই সব দেশগুলির উপর আপন কর্তৃত্ব বিস্তারে সে সচেষ্ট।

এই সব দেশের লোকেরা আমেরিকাকে দেখছে ডিমোক্রাসীর চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নয়, বিরাট এক মহাজনের সূক্ষিকার। মহাজনকে খোলাখোলা সম্মতি করে কিন্তু তাকে সত্যি ভাঙ্গরাসে প্রহা করে

কর জন? প্রচা দূরে থাক, অনেক সময় আমরা তাকে অভিশাপ দিই। আমেরিকান লেখক Andre Visson এর কিছুদিন আগে একখানা বই বেরিয়েছে 'As Others See Us' তাতে তিনি ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছেন, ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার অল্পমত যে সমস্ত দেশ মার্কিন সাহায্য পাচ্ছে তাদের অধিবাসীদের মনোভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। এরা আমেরিকাকে মোটেই শ্রীতির চক্ষে দেখে না। বাহিরে আত্মগত্যের ভাণ দেখালেও ইয়াঙ্কিদের মনে মনে ঈর্ষা করে আড়ালে বিক্রম করে। একদিকে মার্কিন দেশ (U. S. A.) যেমন ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার তার আধিপত্য বিস্তার করতে উৎসুক, অতীতে সোভিয়েট রাশিয়া (U. S. S. R.) বিরাট চীনকে আপনার দলে টেনে এনে, ইউরোপের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ও এশিয়ার অসংখ্য দারিদ্র্য-পীড়িত অল্পমত জাতিদের মনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে তার রাজনৈতিক সমর্থনের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে তুলেছে। সোভিয়েট গুপ্ত পুলিশের (MUD) অমানুষিক কার্যকলাপের কাহিনী এ্যাংলো আমেরিকান কাগজগুলিতে ফলাও করে ছাপা হওয়া সত্ত্বেও আজ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক রুশ-নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। কিন্তু কম্যুনিজম-নির্দেশিত জনগণের মুক্তির সন্ধান দিতে গিয়ে নতুন দাসত্বের শৃঙ্খলে তাদের আবদ্ধ করেছে। কতকগুলি বাঁধা নীতির মায়াজালে তাদের মনকে আটপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে : It has created a new serfdom by enslaving the human minds.

যদিও আদর্শের দিক দিয়ে রুশ ও মার্কিন বিরুদ্ধবাদী তবু তাদের মূলগত ঐক্যের অভাব নাই। কথটা বোঝাতে গিয়ে একজন লেখক বলেছেন, Americans are merely Russians with clean finger nails and pressed pants. জীবন সত্বে হু'জনেরই দৃষ্টিভঙ্গী এক—বস্তুতাত্ত্বিক। হু'জনেই বস্তুতাত্ত্বিক আঁকড়ে ধরে আছে। শিল্পকলায়, সাহিত্যে, মর্শনে বা ধর্মবিষয়ক চিন্তার ওদের কারোই বিশ্বয়কর কোন অবদান নেই।

রুশ-মার্কিন যুদ্ধে সম্প্রতি অনেকটা ভাঁটা পড়েছে বটে কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা এখনও সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি। ঠাণ্ডা হানুসু হু যে শেষকালে ধুনোধুনি লড়াইয়ে পরিণত হবে না, কে বলতে পারে? কে জানে চীন-ভারত সীমান্ত-সমস্যা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছাতে পারে যাতে সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধদেবতার মত্ত পদাঘাতে কম্পিত হয়ে উঠবে?

এই যে এত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মিশন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে, ওদের আপোষ আলোচনা, শান্তিবৈঠকগুলো যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত প্রায়ই ব্যর্থতার পর্যাবসিত হচ্ছে।

এই নিফল দৌত্য বা বৈঠকগুলি রাষ্ট্রনেতাদের আন্তরিকতার অভাবকে স্পষ্ট করে তুলেছে। অধিকাংশ নেতাদের কার্য বাক্যের অল্পমরণ করে না। কপটতা ও চাতুর্যের দ্বারা কোন মহৎ কার্যে সাকল্যের আশা করা বুধা। মহৎ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হলে অল্পমরণ মহৎ ধর্মপন্থাই প্রয়োজন। কর্মপন্থা ও লক্ষ্যের মধ্যে নৈতিক বৈষম্য দূর করতে না পারলে সিদ্ধি সূদূর-পরাহত। ওদের উপর শান্তির প্রতিষ্ঠার আশা তাই নিফল হাসনা। এ্যাটম

যুক্তি দাঁড় করানো হচ্ছে, 'শত্রু যদি জানে যে আমার হাতে তীর মারাত্মক অস্ত্র আছে, নিশ্চয়ই তাহলে আমাকে সে আক্রমণ করতে সাহসী হবে না; আর যদি আক্রমণ না হই তবে আমার দেশের শান্তিও বিঘ্নিত হবে না।' ধাঙ্গা যুক্তি, বিবে বিকল্প বিগরী।

দেখা যাচ্ছে, অনাক্রমণ চুক্তি (Non-aggression Pact) যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, অর্থনৈতিক অবরোধের (Economic blockade) অবসান ঘটতে আন্তর্জাতিক সাহায্য পরিকল্পনা ব্যর্থ। রাজনৈতিক কর্তব্যে জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতার বড় বড় বুলি আওড়ে এনে আপন দেশে স্বাধীন মতবাদের স্বাস্রোধ করছেন। 'শান্তি চাই, শান্তি চাই', বলে ধারা গলা ফাটাচ্ছেন, তাঁরাই আবার উপনিবেশ সাম্প্রদায়িক বিরোধের উদ্বানী দিচ্ছেন, অল্পমরণে গুপ্তচর পাঠিয়ে সাবোটাজ (Sabotage) ঘটানো কিংবা হরণত ভবিষ্য যুদ্ধের অস্ত্র আণবিক অল্পমরণ সংগ্রহে তৎপর।

পদার্থ বা শক্তির ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত অবস্থাকে বাস্তবিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও, মানুষ ও তার মনের ক্রিয়া দ্বারা যে সব অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো আয়ত্তে আনবার কোন কৌশল (mechanical contrivance) কোন দিনই আবিষ্কার হতে পারে না; কেননা, মানুষের মনগুলো সব এক ছাঁচে তৈরী নয়, এ ছাড়া কখন যে তাদের কাজ কি ভাবে হবে সেটাও ঠিক আগে থেকে অল্পমরণ করা যায় না (unpredictable)। নিছক যুক্তি দিয়ে মনকে জানা যায় না। অল্পমরণকে বুঝতে হলে অল্পমরণের পূন্যতা ও গভীরতা একান্ত প্রয়োজন। আজ যদি কোন রাষ্ট্রনেতা তাঁর দেশের কোন লৌকিক ব্যাপারে (human affair) সাকল্য অল্পমরণ করতে চান, তবে তাঁর চাই দেশতাইদের প্রতি অল্পমরণ দরদ, নৈতিক আত্মগত্য এবং সর্বোপরি প্রশস্ত কল্পনা।

মানুষের মনে অসন্তোষ, হিংসা, শাঠ্য বা অহরণ শান্তির প্রতিকূল অবস্থা গড়ে তুলছে, গুপ্ত কঠোর সমাজ-ব্যবস্থা বা আইন প্রণয়ন দ্বারা সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়া বুধতা। গুপ্ত সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার নববিজ্ঞানের প্রবর্তনে মানব-কল্যাণের প্রত্যাশা করা বুধা। এদিয়ে জগৎকে বিশ্বশান্তির পথে এগিয়ে নেওয়া চলে না। সামাজিক অল্পমরণগুলো অনেকটা চশমা, নকল দাঁত বা ক্রাচের (crutch) মত বুদ্ধ পঙ্গু সমাজকে চালু রেখেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক চাপ কিংবা ভবিষ্যতের উজ্জল প্রতিশ্রুতি, মানুষের মনকে কখনও কখনও তার স্বাভাবিক পথ থেকে টেনে এনে একটা নির্দিষ্ট কক্ষে চলতে বাধ্য বা প্রণোদিত করে। জার্মানীর হিটলারী আমলে বা হয়েছিল বা গত চল্লিশ বছর ধরে রুশ দেশে বা হচ্ছে।

মানুষের মনকে রাষ্ট্রের অল্পমরণিত পথে চালিত করতে গিয়ে যে দেশকে তাঁরা একটা ভারী বিপদের মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, এ ধারণাটা রাষ্ট্রনেতাদের কমতামহমত্ততা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের মনের পুঞ্জিত গ্রানি অল্পমরণে অল্পমরণ একদিন না একদিন তাকে বাকানো ইম্পাতের পাতের মত ছিটকে বার করে নিয়ে

বিপ্লবের প্রচণ্ড ভূকান বয়ে বাবে; অনেক প্রাণ হারাবে, অনেক সম্পদ নষ্ট হবে।

শিত যেমন কলের খেলনা পেয়ে তাকে ইচ্ছে মত মাড়াচাড়া করতে গিয়ে বিকল করে দেয়, রাজনৈতিক নেতারা দেশবাসীর মন নিয়ে সেই রকম খেলা করতে গিয়ে (mishandle) তাদের মানসিক অবস্থাকে সঞ্জীন, জটিল করে তুলেছেন। এর ফলে ক্রমেই জগতে যা কিছু ভাল ও স্থায় তার অবসান ঘটতে বসেছে। Prof. Collingwood তাই দৃষ্টি করে বলেছেন, 'Not only would any failure to control human affairs result in more and more wide-spread destruction, as natural science added triumph to triumph, but the consequence would tend more and more to destruction of whatever was good and reasonable in the civilised world.'

সমাজের পরিপূষ্টি ও তার স্বৈর্য্য নির্ভর করছে মানুষের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর, রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রচেষ্টার উপর নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ও সমাজের মৌলিক জ্ঞান ও দায়িত্বগুলির সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং ঐগুলির সমাধানের জন্য তার সক্রিয় সহায়ত্ব আবেদন। সুন্দর ও সুস্থ সমাজ কখনও ছুটোছুটি কুটিল লোকদের নিয়ে গঠিত হতে পারে না, যদি যে সমাজে দুর্ভিক্ষের আধিপত্য, সেখানে শান্তির আশা অসম্ভব। সমাজকে সুন্দর করে তুলতে হলে আমাদের প্রত্যেককে সং জীবন যাপনে প্রয়াসী হতে হবে। হতে হবে শীলবান, দক্ষিণ, কমান্ডার, বন্ধু-সহায় ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন। এর জন্য প্রয়োজন শ্রম, সেবা সং দৃষ্টিভঙ্গীর নৈতিক ভিত্তিতে সর্বতোমুখী উন্নয়ন ব্যবস্থা। এইটি হচ্ছে কর্মবোধের গোড়ার কথা।

রক্ত, রক্ত পৃথিবী আশ্রয় শান্তির জন্য ব্যাকুল। সে আরোগ্য চায়, চায় হিংসা-লোভ-প্রবঞ্চনা-সন্দেহ-শঙ্কাক্রিষ্ট বিবাক্ত আবহাওয়ার অপসারণ। এই বীভৎস পরিবেশ কাটিয়ে উঠতে হলে মানুষকে বর্ধমান হতে হবে। ভগ্নানী ও আত্মসন্ত্রস্ততার প্রভাবমুক্ত হতে হবে। সুস্থ আত্মার গুণগুলিকে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। কখনো কখনো ধর্মপ্রচারকের মত শোনাচ্ছে হরত কিং ধর্মের ব্যতিক্রম বা নৈতিক অবনতি যে সমাজে দারুণ বিশ্বাস আনে এবং রাষ্ট্র-সংকতি নষ্ট করে দেয়। এটা শুধু মহাজারতের কথা নয়, হাল আমলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডাউন, দার্শনিক প্রোফেসর কলিং উড, ঐতিহাসিক প্রোফেসর টরেনসী প্রমুখ পণ্ডিতেরাও এ মতের পোষকতা করেন।

ধর্মীয় ও লৌকিক ব্যাপার যে সম্পূর্ণ পৃথক নয়, এ কথাটি উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। শান্তির রাজ্য ফিরিয়ে আনতে পারে বিশ্ববৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান কুলিয়ে বিভিন্ন জাতির একাত্মীকরণ, কিন্তু এর জন্য অপরিহার্য চিন্তাবোধ, স্বাধীনতা, ঈর্ষা-হেতু অবসান। মানব-মনের এই পরিপূষ্টি বা সঞ্জীবন আদৌ সম্ভব নয়, যদি রাষ্ট্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ গড়ে না ওঠে।

পৃথিবীতে আর মানুষের প্রয়োজন—তার ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন

ভেঙে-পড়া পৃথিবীকে খাড়া রাখতে পারেন। can hold, like strong nails, the crumbling components of the world together. পৃথিবীর চরম ভাগ্য নির্ণীত হচ্ছে মানুষের আত্মিক পরিসীমার মধ্যে।

মানব-সভ্যতার ধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির কালকে তাদের ভাব ও লক্ষণ অনুযায়ী মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

(ক) ত্রাঙ্কণযুগ বা ধর্মতান্ত্রিক যুগ (Age of Ethics or Theocracy)

(খ) ক্রান্তযুগ বা রাজতন্ত্রের যুগ (Age of Militarism or Monarchy)

(গ) বৈজ্ঞ বা ধনতান্ত্রিক যুগ (Age of Capitalism)

(ঘ) শূন্য বা শ্রমিকযুগ বা সাম্যতন্ত্রের যুগ (Age of Communism)

এই কালবিভাগ হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের অনুরূপ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই যুগবিভাগ হয়ত অবাস্তব বা ঐতিহাসিক-ভিত্তিহীন বলে মনে হতে পারে। কেন না, একই সময় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধাঁচের রাষ্ট্র বা সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। উপরোক্ত ক্রম স্মিতিক রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পৃথিবীর ঘটনাবলীর সাধারণ গতি, প্রকৃতি ও উদ্ভুততা (tendency) সামগ্রিক বা অখণ্ড দৃষ্টিতে বিচার করলে সভ্যতার কালকে উপরোক্তরূপে চিহ্নিত করলে তা অর্থোক্তিক বলে মনে হবে না।

প্রাচীন কালে রাষ্ট্রের ক্ষমতা মুখ্যতঃ পুরোহিত বা রাজক-সম্প্রদায়ের হস্তে সঞ্চিত ছিল। এ যুগে ধর্ম বা দার্শনিক জ্ঞানের প্রাধান্য ছিল। ধর্মই প্রথমে বর্ধন ও বাধাবর মানুষকে শ্রদ্ধা ও আত্মগত্যের নীতি শিক্ষা দিয়েছিল। এই সময় সামাজিক জীবনে দার্শনিক চিন্তার প্রতিকলন হয়েছিল ও সংস্কৃতির মান অনেক উচ্চে ছিল। ধর্ম-যুগে মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হয় নাই, কারণ শান্তিকে লোকে তখন বাইরে খোঁজেনি, ভগবদ্ভক্তির মধ্যে তারা শান্তির উৎস খুঁজে পেয়েছিল। রাজকীয় স্বৈচ্ছাচার ও ধর্মীয় গোড়ামী অনেক রাষ্ট্রের অধঃপতন ঘটিয়েছে হরত কিং এই কাল মানুষের মনকে ঈর্ষাবিশুখী হতে দেয়নি।

রাজ্য পতন ও রাজ্য বিভাগের সাথে এল ক্ষত্রিয়যুগ; সত্রাট ও সেনাপতির শাসন। রাজ্য রক্ষা ও দূর প্রদেশের বিজ্ঞান দমনের নিমিত্ত সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রসজ্জার ধার কর্তৃক, তিনিই হলেন রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। সাহস ও শৌর্ভের বলে লোক তখন উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হয়েছে। এ যুগে অশ্বশীলন হয়েছে বীর্যবস্তার, ক্রান্তগণের, ডিসিপ্লিনের, সিড্যালরীর। সামাজিক জীবনে দেখা গেল কর্মতৎপরতা, নির্ভীকতা, ভারপন্নতা। বিক্রম ও উদারতার সমাদর করতে শিখল লোকে। দেশের ও সমাজের জন্য স্বার্থত্যাগে মানুষ তখন কুণ্ডিত হত না, আর্ন্ত ও বিপ্লবের জন্য লোকে আত্মবলি দিয়েছে। এটা হচ্ছে মহাকাব্য ও বীরগাথা রচনার যুগ। সত্রাট ও রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা, সক্রিয়, দায়িত্বের জড়ত্ব প্রসার ঘটবে এ যুগে।

পর্বর্তী কালে বাণিজ্য ও শিল্পের (industry) বিস্তৃতির লে সূচনা হল বৈজ্ঞানিক যুগের। কমতা টলে গেল বণিকগোষ্ঠী, পল্লপতি বা ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে, রাজস্বের স্থান নিল মানসত। যুগে মানুষের কাম্য হল ধন বা ঋদ্ধি। প্রথম দিকে সাহিত্য শিল্পকলার উন্নতি অব্যাহত থাকলেও মানুষের মনের জটিলতা ও ঋক্তির আধিক্য এক সংবেদনশীলতা হ্রাস পাওয়ার, পর্বর্তী যুগে কাব্য ও আর্টের গতি মন্দীভূত হয়ে এল। কিউবিজম, কন্ট্রারিইজম, ডাডাইজম, সুরবিয়ালিজম, স্যুপ্রিম্যাটিজম প্রভৃতি বিভিন্ন ও অদ্ভুত মতবাদের সৃষ্টি হল।

প্রথম দুইটি কালকে কোন নির্দিষ্ট সন-তারিখ দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তৃতীয় বা বৈজ্ঞানিক যুগের কাল নির্দেশ করা যেতে পারে বাস্পীয় শক্তির আবিষ্কারের পর থেকে—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে। দেশ-বিদেশে আমদানী-রপ্তানী যখন হস্তগত হয়ে উঠল এবং কারখানার বহুচালিত শিল্প উৎপাদন শুরু হল। এর একশ বছর পর যখন বিদ্যুৎ আবিষ্কার হল তখন যুগের সূত্র আরও দ্রুত এগিয়ে চলল। বিজ্ঞানের উন্নতি রাজ চরম পর্যায়ের উঠেছে। চন্দ্রলোকে বাবার পথ আজ মানুষকে গ চিনিরে দিবেছে, আণবিক শক্তিকে কার্যে নিয়োগ করতে শিখিয়েছে। কিন্তু এই যুগের অভিশাপ লেগেছে ধনিক ও ঋনিক-সমাজের উপরে। তাদের আধিপত্য ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে, তাদের সৌভাগ্যসূচী অস্তমিতপ্রায়।

পৃথিবী আজ বৈজ্ঞানিক যুগের সন্ধিক্ষেত্রে উপনীত। চারিদিকে সূর্য ও শোভিত জনগণের মিছিল চলেছে। লাক্ষিত, উৎসাহিত, আধিকারবঞ্চিত মানব-সমাজই যুগের প্রতীক। ধনতান্ত্রিক যুগে শ্রমিক সমাজই তার কাল হল। শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান দাবী মেটাতে সে আজ নাহেহাল, ধনিক ও ঋনিকগোষ্ঠীর পক্ষে যুগের অভ্যুত্থান বোধ করা সম্ভব নয়। শূন্যযুগের আগমনী-ভেরী দিকে দিকে বেজে উঠেছে। বিবর্তনের দ্বারা অমুদারী এই শূন্যযুগই মানব-সভ্যতার শেষ যুগ। এই যুগে যান্ত্রিক কৌশল আরও উন্নততর হবে, মানুষের জীবনযাত্রা বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা অধিকতর mechanical হয়ে উঠবে। নাস্তিকতা আরও চরমে উঠবে। মানুষের চিন্তা কল্পনা আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে। কর্মব্যস্ততা তার নিভৃত চিন্তার অন্তরায় হয়ে উঠবে। কলে দর্শন, কাব্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে মৌলিকতার অভাব দেখা দেবে। মনের ও আত্মার চাহিদা মেটানোর পক্ষে এ যুগের অবদান অতি নগণ্য। ব্যক্তিবিশালী এ যুগের পরিবেশে জনচিত্তের ব্যবহারের পরিচয় দিতে গিয়ে আলডুস হাজ্জলী বলেছেন, "As they do not know how to travel upwards and as they are unwilling even if they do know, to fulfil the ethical psychological and physiological conditions of self-transcendence they turn naturally to the descending road, the road that leads down from personality to the darkness of sub-human emotionalism and panic animality."

শূন্যযুগ ক্রমেই পৃথিবীকে একটা মহাপ্রলয়ের পামে টেনে নিয়ে যাবে।

আমাদের পথে প্রধাবিত এই বিশ্বের গতি রূপ করে তাকে

যেতে হবে ব্রাহ্মণ্যযুগে (back to the age of ethics) এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হলে বিভ্রান্ত জনচিত্ত যে নৈতিক চেতনার অভাবে আজ শুধু প্রতিহিংসার কথাই ভাবছে, তাকে সাব্যস্ত অবস্থার আনন্দে হবে ও তার মাঝে কল্যাণ ও মৈত্রীবোধের সঞ্চার করতে হবে। পৃথিবীতে আজ ধীরে ব্রাহ্মণ বা শ্রেষ্ঠ, Savants ধীরে বিজ্ঞান, জ্ঞানে, চরিত্রবলে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ স্তরের, ধীরে বুদ্ধিসত্ত্ব, ধীরে ভাবনা সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত নিঃস্বার্থ ও স্বাধীন (free from the corrupting influence of the vested interests as also from the vagaries of the collective ego).

(পৃথিবীতে এখনও এইরূপ শুভবুদ্ধি ও শুভপ্রচার মনীষীর অভাব ঘটে নাই) তাঁরা যদি পৃথিবী পরিচালনার ভার নিজ হাতে তুলে নেন তবেই এই আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই সব মনীষীদের সমবেত চিন্তা একটা বিরাট ভবিষ্য সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিকল্পনা দিতে পারে ((formula for One-world Government) হাতে অর্ধনৈতিক সাম্য ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার স্বপ্নের চিত্র-অবসান ঘটে।

এই আদর্শকে রূপায়িত করে তুলতে বাধা দেবেন তাঁরা, ধীরে কমতার আগনে আসীন, দেশের ভাগ্য নিয়ে ধীরে ধীরে খেলছেন—সেই সব কমতা ত্যাগে অনিচ্ছুক রাষ্ট্রনেতারা ও তাঁদের সঙ্গে স্বার্থজড়িত দুর্নীতিপরায়ণ সঙ্গীর দল। এঁরা বহুবিধ কূট-কৌশল অবলম্বন করে আক্রোণ বাধা দেবেন, হাতে এই নবোদ্ভাবিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বানচাল হয়ে যার। অবিশিষ্ট এ-ও বলি অসম্ভব নয় যে, জনগণের উদ্বেলিত ঘৃণা ও অসন্তোষ, তাদের সীমা সাজ করে অচিরেই আসন্ন থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করবে। তবে কমতার ভারকেন্দ্র এই মনীষীদের দিকে অপসারিত হবে কিনা এবং কিভাবে তা সম্ভব হবে, এর উত্তর একমাত্র ভবিষ্যই দিতে সক্ষম।

বিশ্বের বিপদমুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিকল্প সমাধান হতে পারে এক যুগাবতার মহামানবের আবির্ভাব, ধীরে অভ্যুত্থানের প্রতীকার অন্ধ কাতর মুকপ্রাণী উদ্ভূত হয়ে আছে। বিধাতার ইচ্ছা—এঁরই মাধ্যমে জগতে শান্তি পাঠাবেন। ঈশ্বর প্রেরিত এই বিরাট প্রতিভাবান মানুষ, যিনি এই বিশ্বের জ্ঞানকর্তার ভূমিকায় অবতরণ করবেন, আমাদের এই হতমান, দরিদ্র, অন্ধতৈর্যবশীলী প্রাচীন মহাদেশেই জন্ম নেবেন তার পূর্ববর্তী যুগাবতারদের (Messiah) মত! প্রাচী ও প্রতীচীর বহু মনীষী এই একই ভবিষ্যবাণী করে গেছেন।

এ সম্পর্কে কবিগুরুর অশীতিতম জন্মদিনের বাণী বিশেষ ভাবে স্মরণীয়—

জীবনের প্রারম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম যুবোপের সম্পদ—অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিজ্ঞানকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কূটারের মধ্যে। অপেক্ষা করে থাকি সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আগবে মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এবে শোনাবে এই পূর্বনির্ধারিত থেকেই...মহাপ্রলয়ের পামে বৈরাগ্যের মেঘরক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হতে আরম্ভ

অক্ষয় ও প্রাণ



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরমা দে

আমি চাই না সংসার সংসাজতে। আশা হরণ-পূরণের সংসারের সার আর কি আছে? আকাঙ্ক্ষাই তো বাড়ছে। এখানকার বিয়েতে কাঁকেই বা আপন কোরব? সবই তো বরণশীল। তাই 'গেকিয়া বসনে অঙ্গ আবরি করজ করে ধরি' দেশে দেশে বেড়াব। এই ভাল। চতুর্দশমের শেষ আশ্রম বতীই ভাল। হোক সে কঠিন সাধন-ভজন, হোক তা নিবিচ্ছিন্ন সমাধি। দরজায় দরজায় কোঁপিন পরে সন্ন্যাস নিয়ে নরদেবতার করুণা বাচাও ভাল। এতে হৃদয় গলে, ভগবান গলে গিয়ে হৃদয়-আসনে এসে বসবেন। সংসারের মায়ায় জড়িয়ে অভিনয় করাতে কোন লাভ নেই। যুগে যুগে মহাপুরুষ সাধক, বীরা এসেছেন, তাঁরা ঐ মনোভাব নিয়ে সংসারকে উপেক্ষা করে ব্রত নিয়েছেন ভগবান পাওয়ার জন্য কঠিন সাধনার।

আত্মার উন্নতি হয়েছে তাঁদের। কিন্তু জগৎ-সংসারের মজল কি হল? সকলেই তো সংসারে থেকে ঐ রসে ডুবতে জানল না? কে জানাল তুমি অমৃতের পুত্র? এমনি করে চললে সুখ-দুখে গড়া সংসারে থেকেও অমৃতরসে হবে রসিকজন। জীবন হবে সহজ। প্রকৃতির মিত্য হওয়ার লীলাধেলার তোমার প্রাণের অমৃতরসের হবে বিস্তার। তবু তাঁরাও পরমপুরুষ বীরা আত্মদর্শনের জন্যে অধ্যাত্মসাধনার হলেন পাগল ও আত্মহারা। কিন্তু এঁদেরই মত অধ্যাত্মসাধনার পাগল হয়ে এলেন এক নির্লিপ্ত, আত্মভোলা—আর সহজিয়া সন্ন্যাসী, বার সংসার ত্যাগ হল না সন্ন্যাসের কঠোরতাকে মিলে, কোঁপিন পরে আর হাতে দণ্ডী ধরে পথে পথে বেড়াতে। বরঞ্চ এসে বসলেন একটা মন্দিরে। দেখলেন, প্রণাম করলেন মাহুঘেরই এক মূর্ত্তী দেবীকে—বিনি ভাষা না। তিনিই বললেন,

তখন আমাকে রসে বশে রাখিস মা। আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিসনে। প্রকৃতি যদি মিত্য সহজভাবে হয়ে উঠতে পারে তো সংসারে থেকে মাহুঘ কেন হবে শক্ত। এ ভাব নিয়েই বললেন তিনি ঐ কথা। আবার জানালেন মাকে, রস বেন বিরস না হয়, সে রসও আবার বশে থাকে। রসের প্রতি মতি থাকার প্রার্থনা। মনে মনে গভীর বিশ্বাসের সুরও উঠেছে বেজে। তিনি চাইলেন, মাহুঘের আরাধ্যা এই দেবী হোক সকলের কাছে বিশ্বাসের মূর্ত্তি। তাই নিজে প্রার্থনা করে করে এই মূর্ত্তিকে সজীব করতে গিয়ে তাঁকে 'মূর্ত্তী আধারে চিন্নরী রূপ দিয়ে' প্রথমে নিজের মনে বিশ্বাস করলেন মানবের এই কত দিনের মুক দেবীকে। দেখালেন বিশ্বাসে মনের মাঝে জড়ও পায় প্রাণ। ব্যস, পাগলের সাধন হল শেষ। এবার চেয়ে দেখলেন এই সংসারে জটিল হয়ে থাকা মাহুঘের চেহারা। তখন ভাবলেন, বাসনা তো মাহুঘেরই বাসনা। মন্দ বলে বাসনাকে ত্যাগ করে কি হবে? তাই দেখলেন, মাহুঘের মনে যে বাসনা আছে তা উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেই বাধা। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পথ নয় সোজা। তবু তাকে চলবে না ছাড়া। সহজভাবে, রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে যেমন সুন্দর করে হবে তুলতে, মনের কষ্টপাথরে ফেলে দেখতে হবে সে খাঁটি সোনা না চকচকে পাথর শুধু। পাথর হলই জটিল। এখানে চাই সংযম, ব্রত, ত্যাগ খাদকে ফেলে দেওয়ার জন্তে। তখনই তিনি মাহুঘের পাদপদ্মে দৃষ্টি রেখে নামলেন এক নতুন পথে। সংসারীদের মাঝে সাজলেন এক সহজ সংসারী। তাই আবার মাহুঘের কাছে জানালেন প্রার্থনা, ঐজন্তে তুলে দে মা লোকচকুর সামনে আমার বন্ধন সংযম শৃঙ্খল আবার শাসন দণ্ড। চাই না আমি বাঁধভাঙা বস্তা, হতাশনের রক্ত। চাইলেন আমাদের সামাজিকতা।

তখন বারা শাস্ত্র জানেন তারা সাধকের কথার অর্থ বুঝলেন না। বুঝলেন না সাধকের শ্রামা মাহুঘের পূজা—কালীসাধকের পূজা। কেবল মা মা বলে পাগল হচ্ছেন, নাচছেন আর কীদছেন। ফুল মাহুঘের চরণপদ্মে দিতে গিয়ে দিচ্ছেন নিজের মাথার। তখন তারা শাস্ত্রবচন, পূজাপদ্ধতি আঙড়ালেন। পাগল তুললেন না। পাগল দেখছি শাস্ত্রপাঠ, আত্মপের শ্রেষ্ঠ সবই দেবে ধ্বংস করে। যে দেবী ভবতারিণী হলো চন্দ্রীকপিণী তিনিও রুষ্ঠ হবেন, রসাতলে যাবে সব। কি হবে তাহলে? তখন পাগল বললেন, চাই না আমি শাস্ত্রের কচকচি, চাই প্রাণের রস। অর্থাৎ শাস্ত্রের অভিমানের হোক অবসান—এত বড় কথা সহজেই জোর গলায় বললেন বেন।

তখন বারা দেবীর রক্তমূর্ত্তিকে করেছিল ভয়, এই বকম জোরের কথা শুনে নিজের মজল-অমজলের কথাও ভাবছিল, তখন আবার সাধক বলেছিলেন মাকে, আমি তোমার হাত ধরব না, তুই আমার হাত ধর। তাহ'লে তো পড়ে বাওয়ার ভয় থাকবে না। বারা ভয় করেছিল, মনে তাদের 'অহং' ছিল, তারা শুনল এই সহজ কথা। প্রাণে পেলেন অভয়বাণীকে। চিরদিনের মুক-দেবীর কাছে এমন জোরের কথা বলেও কি না দেবীর মুখের ভাষার অভয়বাণী পেয়েছেন সেই পাগলও। শুনল সকলে, পাগল হলো ঐশ্বরিক ক্ষমতার শক্তিশালী তখন তিনি। একথা মুখে মুখে বটে গেছে। কিন্তু, তিনি ঈশ্বর হলে কি করে চলবে? আবার এও কি সম্ভব? এসব বাধা কত লোকের মনে এসে

দ। তবু যে দেখে সেই চেয়ে নয়, বিশ্বাসের উজ্জলতা পাগলের ধ-চোখে ফুটে উঠেছে। তাতেই সকলেই হইয় মুগ্ধ।

তবু শাস্ত্রজ্ঞ যারা তাদের যেন বিশ্বাস হ'তে চাইল না। পণ্ডিত যারা শাস্ত্রকথা তখন জানাতে চায়। একদিন তাদেরই একজনের ধর্মগীতার ব্যাখ্যা শুনে হেসে বললেন, 'ও আর স্তনতে হবে না। গীতা ত্যাগ করলেই গীতা জানা হল।' তখন মুখে কেউ কিছু বললেও মনে মনে ভাবছে, নিরক্ষরটা বলে কি? একটা কথাই বলে কিনা গীতার মূল কথা। আবার এ-কথাও বললেন, 'দি মুখ দিয়ে কারও না বেরায়, আধো-আধো ভাষায় বললেই হবে।' যারা নিরক্ষর, যারা এতদিন তাঁর নামও শোনেনি তারা ন যেন শিক্ষা পেল। মুগ্ধ হল।

মুগ্ধ তো হতেই হবে। নিজের নিরক্ষর হয়ে অত বড় কথা লেছেন তিনি সকলের জন্তে। গীতা পড়া সহজ করে দিয়েছেন। আর তাঁর বিশ্বাসঘন জামামায়ের কাছে চেয়ে নিয়েছেন দুর্বল, অশিক্ষিত লোকের জন্তে নিজের জীবনে তাদেরই সামাজিকতা।

তাই যেদিন কালীমন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির প্রতিষ্ঠা, দিন শ্রীকৃষ্ণের একখানা পা গেল ভেঙে। সঙ্গে সঙ্গে রাণী রামণির ভাবনা হল কত। এল নানা বিধান। ঠিক হল, নব ট্রাই হবে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু, সাধক আর পারলেন না থাকতে। গনি জোর বিশ্বাসে বললেন, আমি সেবে দেব। বাস যেমন বলা, এমন কাজ। একেবারে বেমালুম করে সারিয়ে দিলেন। বড় স্ত্রীও নাকি হার মেনে যায়। সকলেই দেখে অবাক! তবু জ্ঞা পা তো থাকল, এ ভাবনা রাসমণির মনে বেশ কষ্টই দিল। 'ধক তখন বললেন, রাসমণির জামাইয়ের যদি একখানা পা ভেঙে তাহলে কি নতুন জামাই আনতেন? এমন কথা তো কেউ বলেনি? শুনে সকলে চুপ। রাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস কেলে ধককে করলেন প্রণাম। মনে মনে মুক্তি হল বুঝলেন।

তা তো হবেই। তিনি তো নেমেছেন আমাদের সমাজে। ত বিচার আর তর্ক নিয়ে জটিল হয়ে চলেছি, নিজেরে সহজবোধকে কেলেছি হারিয়ে। তিনি তাই দিলেন অতি সহজেই পণ্ডিত করে।

আবার এই বোধ দিয়ে বখনই মনে করি 'ব্রহ্ম অমুচ্ছিত' তখনই সহজেই যেন বুদ্ধি ব্রহ্মের স্বরূপকে। দূবে সয়ে যায় তখন বুগাঙ্কের ব্যাখ্যা। যেমন ব্রহ্ম নিরাকার, বিশাল বিরাট, ব্যাক্যাতীত বা অবর্ণনীয়। আমাদেরই নিত্য ব্যবহারিক কথায় কি সুলভ ভাবে জানান হল ব্রহ্ম সকলের এঁটোর বাইরে। এ বিশ্বের বা কিছু, তিনি তাই।

আর এমন সহজ সমাধান দিয়েছেন বলেই সংসারীকে মুক্তিপথের কত কথা শুনিয়েছেন। সংসারে মুখে করা কথা দিয়ে এমন করে বলেছেন যে স্তনলে যেমন বুঝতে কিছু কষ্ট হয় তা, তেমনি বিশ্বাসও আসে বৈজ্ঞানিকের মতই।

তিনি বলেছেন, হরো না বাদরের বাচ্ছা, হরো বেড়ালের বাচ্ছা। সংসারে নিজের নিজের কর না, ছুট না কুকুরের বাচ্ছার মত কুকুর-মার পিছন পিছন। বেড়াল যেমন তার মার কাছে নিজেকে সঁপে দেয় আর বেড়ালও তার বাচ্ছাকে মুখে করে নিয়ে বেড়ায়,

যাবেন। এ কথায় ভগবানে বিশ্বাস যেমন আসে তেমনি সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাসও কেলা যায়। আবার বলেছেন, বড়ের এঁটা পাতা হয়ে থেকে। কথটা স্তনতে হরতো লাগে খাপ বিস্ত, সব তাতে থেকেও, কোন বন্ধন নেই কিছুতেই, এমন ভাবের কথা ঐ বাণীতেই তো রয়েছে। ভগবান ধর্মের নানা ছাঁচে বখন পড়ে গেছেন তখন সব বিচার আর তর্ক ভাসিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, যত মত তত পথ। ভগবানের কৃপার রূপান্তর নেই, শুধু থেকে যায় মতবাদ। সত্যই তাই। ইসলাম, খৃষ্ট হিন্দু বে ধর্মই হোক না কেন, বিশ্বাস হলেই তাঁর কৃপা সব ধর্মিকের কাছেই যাবে। তবে ধর্মমত আলাদা, তাই কৃপাও আসে এক একজনের কাছে ব্যুপথে।

শুধু চাই বিশ্বাস। এই জগেই তিনি বলেছেন, আমি জেনেছি, আমি পেরেছি আমি দেখাতে পারি। নিজের বিশ্বাসঘন বলেই তো বলছেন ঐ কথা। তাইতো কি সুলভ, কি প্রাণবন্ত অচক কত জোরের কথা। শুধু তাই নয়, নিজের রসে বসে আছেন বলেই সংসারীর কাছে পরম বঙ্গরূপে দেখালেন ভক্তির শিল্পের পথ বিশ্বাসে উজ্জল হয়। বনে গিয়ে কোঁপিন পরে নির্জনে থেকে সংসারকে 'বিশালাকীর দ' বলে উড়িয়ে দিতে হবে না। বরক, সকলের মধ্যে থেকেও সব কাজে মন দিয়েও সংসারে 'নষ্টা স্ত্রীর মত' পোপনে উপপতির দিকে মনটা রাখবার কথা দিলেন বলে। তাই তো বলতে ইচ্ছে হয়, তিনি নিজের দিলেন পরম বোগী হয়ে চিনির রসে ডুব। চিনি হল বশ, তিনি হচেন চিনির বশ। শুধু তাই নয়, আমাদেরও চাইলেন চিনিতে ডোবাতে। তাইতো নামে তাঁর এখনও পাই ভয়ুত। তাই তাঁর আবির্ভাবের দিনে এমন সহজ মানব-প্রেমিককে করি শত-কোটি প্রণাম। ইনি আমাদের চিরদিনের মদনী, কবি আর শিল্পী দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। যিনি ঐশ্বরিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। 'জয় হোক'! আমরা তাঁর দেওয়া সহজবোধের রসে আর বেশে থাকি যেন চিরদিন।

আত্মাহুতি

শ্রীমতী সীমা গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রুগনের সকাল। ভীষণ কুরাসার চারদিক প্রায় অন্ধকার।

শীতও আজ ধুব তীব্র। কোন এক মধ্যবিত্ত পল্লীর একটি ঘরে শুয়ে আছে একটি মেয়ে। বয়স আন্দাজে আট নয় বৎসর হবে। মেয়েটির নাম মার্গারেট। মার্গারেটের মা একটি কলের লোকালে কাজ করেন। ভোরবেলার যান আর সেই রাত ময়টার আসেন। কাজে বাবার আগে মার্গারেটের জন্ম কিছু কল ও কটি রেখে যান। মার্গারেট ঘুম থেকে উঠে খাবার খেয়ে গৃহস্থালীর কাজে মন দেয়। এই ভাবেই চলে তাদের মা-মেয়ের দিন। কিন্তু মাদুয়ের সব দিন সমান যায় না। একদিন মার্গারেটের মা বাড়ী কিরলেন গারে প্রচণ্ড অর নিয়ে। অরের জাঁচে মুখখানি লাল ও ধসুধসু করছে। এই ভাবে চার পাঁচ দিন কেটে গেল কিন্তু অরের কোন উপশম হবার লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে সংসারও প্রায় অচল। বাই হোক, মার্গারেট তার মায়ের নির্দেশ মত যে ক'টি টাকা কলের লোকালে পাওনা ছিল টাকা ক'টি নিয়ে এল। ভাতারও ডেকে

টাকার। তার অর্ধেক টাকাও মার্গারেটের কাছে নেই। অর্ধেক টাকা জোগাড় করতে না পারলে তার মাকে হরত বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিতে হবে। না, সে আর ভাবতে পারে না। অল্পমনা হয়ে রাত্তার এসে দাঁড়ায় ও এক সময় নিজের অজান্তেই পথ চলতে শুরু করে। কিছুদূর হাঁটবার পর হঠাৎ তার নজর পড়ে পথচারী এক জল্লোকের পকেটের দিকে। একটি ফুটপুট মনিব্যাগ কোটের পকেট থেকে উঁকি মারছে। টাকার চিন্তা মার্গারেটকে এতই অস্থির করে তুলেছিল যে সে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হয়ে মনিব্যাগটি তুলে নিয়ে বাড়ীমুখো ছুটতে লাগল। পিছনে জনতার সোরগোল, কিন্তু মার্গারেট সব উপেক্ষা করে ব্যাগটি বুকে চেপে ধরে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, এমন সময় একটা গাড়ীর ধাক্কায় ছিটকে পড়ল। তারপর যখন জ্ঞান ফিরল তখন মার্গারেট দেখল, সে একটি অচেনা পরিবেশে গুয়ে রয়েছে। গুরুতর জখমের জন্ত হাত-পা বেড়ের সঙ্গে বাঁধা। মাথায়ও পটি বাঁধা। ক্রমে তার মার শীর্ণ হস্তশাক্তির মুখখানি মনে পড়ল, সাথে সাথে টাকার কথাও। হঠাৎ সে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করে কি একটা কথা বলতে গেল। কিন্তু হায়! তার শেষ কথাটিও সে পৃথিবীকে জানিয়ে যেতে পারল না। অব্যক্ত গোঙানির মতো সে লুটিয়ে পড়ল। যে ঘুম আর কোন দিনই ভাঙল না।

বিষন্ন বসন্ত

নমিতা রায়

সুখানটা তারী সুরুর—আকাশে বাতাসে বসন্তের চরম হাঁহামাতি 'কিন্তু এমন সুরুর সকালও আনন্দ দিতে পারে না লীনাকে। কেমন যেন একটা বোঝা বহুধার ছটফট করতে থাকে; কাল রাত্তিরের স্মৃতিটা বুকের কাছে খচখচ করে বিঁধতে থাকে। শুধু লীনা নিজের বিষন্ন ভাবটা চাকতে চেষ্টা করে, কারণ ও জানে, এবার একের পর এক জেয়ার পড়তে হবে। প্রতিদিনের কটিন ওর মুখ। একুশি আসবে নাস' তার সকালের ডিউটি দিতে, তারপরে মা' পুজোর শেষে ঠাকুরের ফুল নিয়ে, তারপর আসবেন বাবা বাইরে বের হবার আগে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু লীনার মনে হয়, আজ যদি কেউ না আসে তা হলে খুব ভাল হয়, কেউ আসবার আগেই কিন্তু কোনটা বেজে উঠলো। বিছানার পাশে টেবিলের ওপর থেকে বিনিতারটা তুলে নিতে কষ্ট হয় না, আধ-বসা অবস্থায় কানে ফুলে ধরে ওটা।

ওদিক থেকে প্রশ্ন আসে, কে লীনা?

হ্যাঁ।

কি ব্যাপার বলতো, কাল রাত্তির থেকে অপেক্ষা করছি কিন্তু একটা খবর দিলে না কেন? কালকের উৎসব কেমন হলো?

বিচ্ছিন্ন, একদম বাজে।

বাজে কেন? আশ্চর্য্য হয়ে বললো তীর্থঙ্কর।

কেন ভাল হবে, কেন আমার ভালো লাগবে বলতে পার? ওরা এলো, হৈ-হৈ করলো, তারপর ওদের হাসি ওদের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল, ওরা দমকা হাওয়ার মতো এলো আবার মিলিয়ে গেল

কিন্তু তাতে আমার কি? আমি কি ওদের মতো হাসতে পারি প্রাণ খুলে, না ঘুরে বেড়াতে পারি? শেষের দিকে লীনার গলা ধরে এলো আর কথা বলতে পারলো না।

লীনাকে আবেগের সুরে ডাকলো তীর্থঙ্কর, আমি কামনা করছি, আগামী বছর তোমার জন্মদিন সার্থক হয়ে উঠবে, হুঃখ করো না।

তীর্থ কণ্ঠে লীনা বললো, না হবে না, আমি আগামী বছর আর উৎসব করতে দেব না। আমি আর ভালো হবো না।

শান্ত কণ্ঠে তীর্থঙ্কর বললো, তুমি বড় অধৈর্য্য হয়ে উঠেছ, মনে বিশ্বাস রাখো, নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠবে।

কিন্তু আমি আর পারছি না তীর্থঙ্কর, বিশ্বাস কর, এই ক'বছরে সুরে থেকে থেকে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি।

কিন্তু আমি বিশ্বাস রাখি লীনা, একদিন তুমি আমি দুজনেই সুস্থ হয়ে উঠবো।

তোমার অসুখ সামান্য কয়েক মাসের কিন্তু আমার অসুখ বে আরো অনেক দীর্ঘ, হতাশ কণ্ঠে উত্তর দিলো লীনা।

বুঝি লীনা, তবু আমার অমুরোধ তুমি বিশ্বাস হারিও না, আজ তোমার মন বিক্লিপ্ত, তাই আমার কথা হয় তো তোমার ভাল লাগছে না তবু—

না না, তোমার কথা আমার অশান্ত মনে অনেকখানি শান্তি আনে, তোমার কথা বুঝি, তোমার কথা মনে চলতে চেষ্টা করি কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথায় কি যে হয়ে যায় সব সূত্র হারিয়ে ফেলি। আমার চিন্তা ভাবনা সব এলোমেলো হয়ে যায়। কালকের উৎসবে আমি তো সুখীই হতে চেয়েছিলাম, আমি তো হেসে উঠলাম, কিন্তু যখন ওরা সকলে চলে গেল তখন একলা ধরে আমার চোখের সামনে আমার অন্ধকার ভবিষ্যৎ এতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে নিমেষে আমার সব আনন্দ সব হাসি মিলিয়ে গেল একটা অব্যক্ত বোঝা ব্যথায়— আমি ছটফট করতে লাগলাম, তারপর একটা ছুনি'বার কারায় তেড়ে পড়লাম।

এবার ওরা উত্তরে উত্তরের কাছে বিদায় চেয়ে কোন ছেড়ে দেয়।

উদাস দৃষ্টি মেলে আকাশ পানে চেয়ে থাকে লীনা, অতীতের অনেক কথাই অল্প মনে পড়ছে। হুবহু আর চঞ্চল মেয়ে লীনা কিন্তু কলেজে ওর পরিচয় ছিলো ভাল গান আর আবৃত্তির জন্মে। ধনী ব্যাণ্ডিটার শিতার একমাত্র মেয়ে ও, লীনার বাবা সকল দিক থেকে মেয়েকে কুতী করে তোলবার জন্তে চেষ্টা করেছেন, আর লীনাও বাবার প্রচেষ্টার অমর্যাদা করেনি। সকল দিক থেকে সার্থকই হয়ে উঠলো। কিন্তু কোথায় কি যে হয়ে গেল, হঠাৎ লীনার জীবনে এলো এক বিপর্যয়—একটা অপারেশন ফেলিওর হওয়ার দিনে দিনে লীনার হু পানে প্যারালিসিস হয়ে যায়। প্রথমে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ছিলো কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ার অবশেষে গুকে বাড়িতে এনে রাখা হয় এবং নাস' ও ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয়। লীনা জানে, তার বাবা মা চেষ্টার ক্রটি করছেন না, তাঁদের সম্পর্কে ওর কোন অভিযোগই নেই কিন্তু ডাক্তারে কি খুব আশ্বাস দেয়? বোধ হয় দেয় না। লীনার তো তাই ধারণা হবে, বাবা মাকে মুখ ফুটো'কিছু বলে না, বললে ওরা হুঃখ পাবেন, তাঁরা তো চেষ্টা করেন কি করলে ও সুখী হয়, যেমন কালকের উৎসবটা। কিন্তু ধুসী কি ও হতে পেরেছে? বরং অনেক দিন পড়ে ওর মন তরানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আর তীর্থকর তার অভিশপ্ত জীবনে পরম আশান, তার লোবাগা লীনার জীবনে এক তীব্র আনন্দহুত্ব। খেলোয়াড় তীর্থকর মিত্রের সঙ্গে লীনার অন্তরের যোগাযোগ এক আশ্চর্য্য ভাবে চিত্ত হয়েছে 'হু' জনের ভাগ্য, এক কৈশে এসে মিলেছে আর ইখানেই তাদের ভালোবাসার বাত্রাপথের আরম্ভ।

মাস কয়েক আগে সকালবেলায় কাগজ পড়তে গিয়ে লীনার ষি প্রথম পাতার আটকে গিয়েছিলো, এ কি অদ্ভুত খবর! বাঙালো আজও মনে আছে তার—বিখ্যাত খেলোয়াড় তীর্থকর র পায়ে আঘাত লেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ডাক্তার আশঙ্কা রছেন তাঁর পায়ে প্যারালিসিস হয়ে যেতে পারে। লীনার মটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তীর্থকর মিত্রের ছবিও গুলে দেখেছিলো কিন্তু তখন ও অত খেয়াল কেরেনি কিন্তু ধম যেন সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার ছবি তার প্রতিটি খেলার টনাটি ঘটনা। কাগজেই খার পেল তীর্থকর বাড়িতে কিরে গেছে, পায়ের অবস্থা পূর্বের মতো।

একদিন কি খেয়াল হলো লীনার—কোন করলো তীর্থকরের ভিত্তে, কোনটা ধরছিলো তীর্থকরই। এই প্রথম আগাপের ত্রুণা ঠ, তারপর দিনে দিনে অনিষ্ঠতা বেড়ে উঠেছে।

লীনা আবার 'চোখ তুললো আকাশের দিকে, কি করণ পৃথিবীর

ছবি। আজকের বসন্ত তার কাছে শুধু যৌবনভরা, যেন যেন আওন ভালার বাপি হয়ে আসে না।

আরো কেটে গেছে অনেক দিন—সেদিন আকাশে চলেছে মেঘে মেঘে বর্ষার আয়োজন, লীনার চুসে ছুসে বাতাসের লুকোছবি খেলা লীনার খুব ভাল লাগছিলো, তারপর আরম্ভ হলো বর্ষণ। কিন্তু বর্ষার এই ঘনঘোর মাতামাতির মধ্যে একলা থাকতে ইচ্ছে করে না, কাছে পেতে ইচ্ছে করে কাউকে—জীবন্তীও তো সেই ইচ্ছেই ব্যক্ত করেছিলেন—“এ সখি, হামারি ছুধের নাহি ওর। এ ভরা বাবর মাহ তার মন্থমন্দির যোর।”

মনে পড়ছিলো তীর্থকরের কথা—একটা কোন করলে কেমন হয়? অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত কোনই করলো লীনা। তীর্থকরকে ও বললো, কেমন হুন্দর বর্ষা নেমেছে, এখন কি মনে হচ্ছে বলতো?

তীর্থকর উত্তর দিলো, নিরেক রামগিরি ওহার আবহ বিয়হী বক বলে মনে হচ্ছে আর তোমাকে অলকাপুরীর অধিবাসিনী, বক্ষিরা, তোমার আবাসস্থানই তোমার কাছে চিরসৌন্দর্যের প্রত্যেক আমার ইউট্রোপিয়া, সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান।

হাললো লীনা তীর্থকরের উচ্চাস প্রকাশে—বসন্ত ঠিক বলেই হবে বিয়র। তারপর কথাটাকে ঘুরিয়ে গিয়ে বললো আচ্ছা, এমন দিনে কি করতে ইচ্ছে করে বলতো?

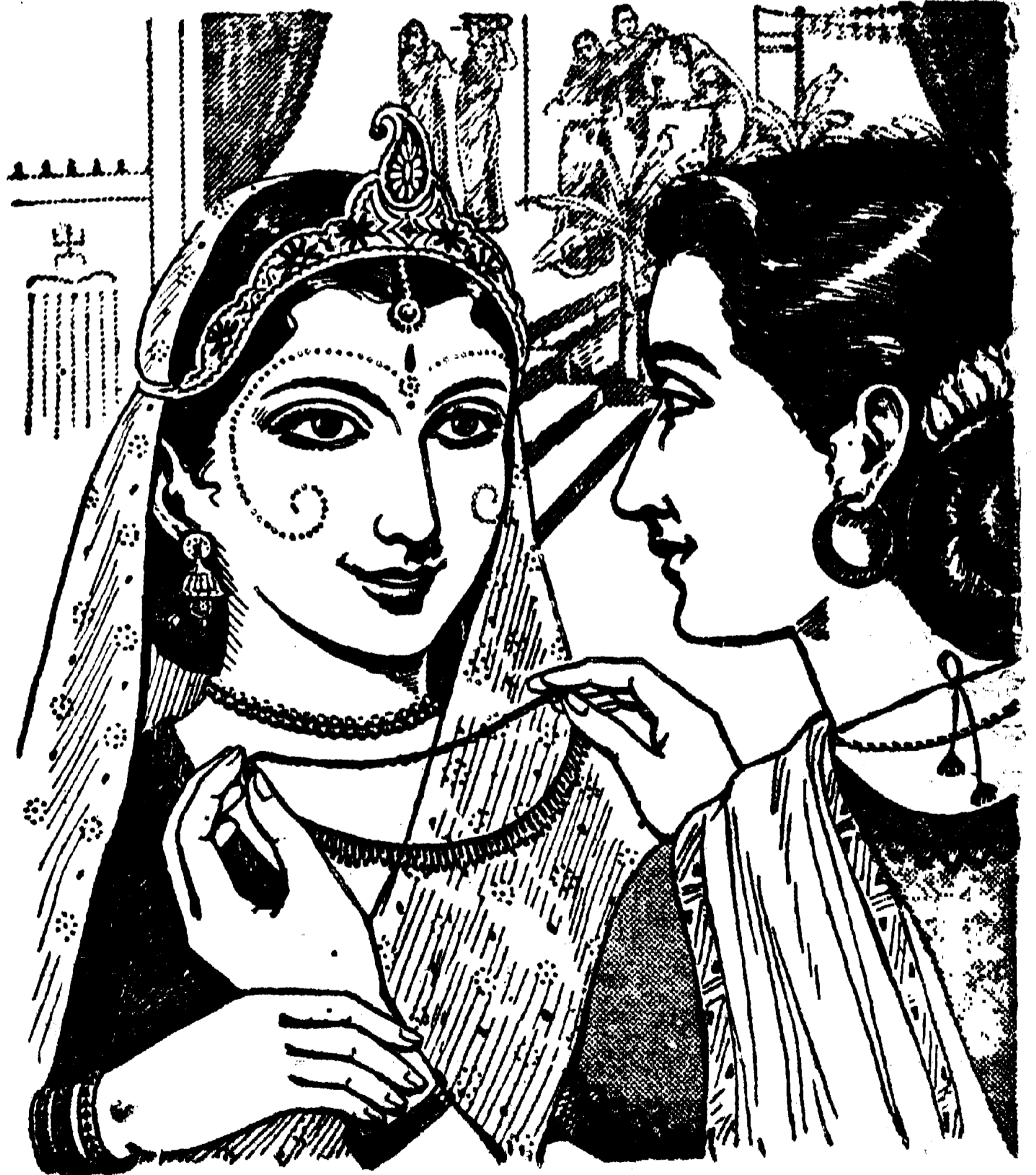
মনের কথা

‘এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?’
‘আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স
দেয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই,
মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌঁছেছে
ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও
স্বাভাবিক আমরা সবাই খুসী হয়েছি।’

মুখার্জী জুয়েলার্স

পূর্ণি মনোর পয়সা নির্মাতা ও রত্ন-ভরসী
বহুভাষার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



‘এমন দিনে তারে বলা ধীর এমন ধন ধীর বরিবার।’ ধীর এই ভাষ সমারোহে শিল্প পাহাড়ে বনে লাবণ্যের ইচ্ছে করেছিলো অমিতের হাত ধরে বলে মিতা, জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার। লীনা—উ’।

একটা কবিতা শোনাবে?

কি কবিতা শুনবে বলে?

তোমার বা ভাল লাগে।

লীনা শোনাল ভ্রষ্ট লগ্ন। যখন তার কবিতা শেষ হলো তখন মনে হলো আকাশের কোণে কোণে সঞ্চিত অনেক অশ্রু কণা ধরে ধরে পড়ছে।

অনেককণা দুজনেই চূপ করে রইলো, তারপর প্রথম কথা বললো তীর্থঙ্কর—এমন কবিতা কেন শোনালে লীনা?

লীনা হাসলো, হাসিটা বড় করুণ কিন্তু তীর্থঙ্কর দেখতে পেলো না। আমার লগ্ন ভ্রষ্ট হয়ে গেছে তীর্থঙ্কর।

কিন্তু আজ আমি তোমাকে খুশী দেখবো আশা করেছিলাম।

আমি তো খুশী হতেই চাই, তাই তো তোমার বার বার ডাকি কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমার সুখ দেয় না।

সেদিনের কথা এইখানেই শেষ হয়।

ক’দিন বাবে লীনা স্মরণ একটি স্বপ্ন দেখলো ও আর তীর্থঙ্কর বেড়াতে গেছে অনেক দূরে উল্লুঙ্গ পৃথিবীর বৃক, সেখানে উচ্ছ্বসিত লীনা কবিতা শোনাল সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে—‘আমি চকল হে আমি সুরুরের পিয়ারী’ আর তীর্থঙ্কর জীবনে প্রথম কবিতা শোনাল লীনাকে—‘ওমু অকারণ পুলকে কণিকের গান গাবে আজি প্রাণ’ আজ ওরা দুজন বেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। এই স্বপ্নের কথা লীনা জানালো তীর্থঙ্করকে কিন্তু তারপরেই লীনার কণ্ঠে সেই হতাশা ফুটে উঠলো ও বললো, জান তীর্থঙ্কর, তারপরে তুমি হারিয়ে গেলে অন্ধকারে আর আমি একা তোমায় খুঁজে ফিরতে লাগলাম, আমি জানি একদিন তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে তখন আমার কাছ থেকে তুমি দূরে সরে যাবে।

বুধা তব পেও না লীনা, আশ্বাস দিলো তীর্থঙ্কর—জীবনে এমন কিছুই ঘটতে পারে না যা তোমার আমার মাঝখানে ব্যবধান ঘটনা করতে পারে।

কিছুকণ কথা বলে কোন ছেড়ে দিলো লীনা।

ক’দিন থেকেই লীনা একটা কথা চিন্তা করছে, কাগজে দেখেছে তীর্থঙ্কর মিত্রের অবস্থা উন্নতির পথে কিন্তু লীনা জানে, ও আর ভালো হবে না। আচ্ছা, তীর্থঙ্কর সুস্থ হয়ে গিয়ে যদি লীনাকে ভুলে যেতে চায় তখন ও কি করবে, সহ্য করতে পারবে? কিন্তু উপায় কি? তীর্থঙ্করই বা কি করবে লীনাকে নিয়ে? লীনা আর পারে না ভাবতে, সব বেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, অসংখ্য চিন্তার জট ওর মাথার তেতর দাপাদাপি করতে থাকে। হ’ হাতে মাথা চেপে রক্তার মতো পড়ে থাকে বিছানায়। নাস’ আসে, ডাক্তার আসে কিন্তু কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে চূপচাপ বিছানায় পড়েছিল লীনা। ডাক্তার এসে ওর অসুস্থতি নিয়ে আলো জ্বালার, তারপরে প্রসন্ন করে, আচ্ছা লীনা বেবি, আপনি কি কোন রকম অনুভূতাবোধ করছেন?

নিম্পূহ গলার লীনা উত্তর দেয়, না।

তবে মানসিক কিছু?

না।

তা-ও না, তবে?

ডাক্তারকে ধামিয়ে দিয়ে লীনা হঠাৎ প্রশ্ন করে, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি তো তীর্থঙ্কর মিত্রের কেসটা দেখছেন। তাঁর সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

তিনি অনেকখানি Improve করেছেন। তারপরে সামলে নিয়ে বলেন, আপনি অংশ হতাশ হবেন না।

হাসলো লীনা। বুধা আশ্বাস দেবেন না, I know Dr. it is now out of control.

মাথা নীচু করেন ডাক্তার।

লীনা ডাকে, ডাক্তারবাবু!

বলুন।

আপনি আমাকে একটু বিষ দিতে পারেন?

ডাক্তার চমকে ওঠে, এ কি বলছেন আপনি?

আপনার কোন ভয় নেই, কেউ জানতেও পারবে না, শুধু আমার এ জীবনের শেষ হয়ে যাবে।

দেখুন লীনা বেবি, আপনি বড় অধৈর্য হয়ে পড়েছেন কিন্তু আপনি আপনার বাবা-মার কথা চিন্তা করুন—তীর্থঙ্কর বাবু—

চূপ করুন, তীর্থঙ্কর বাবা দেয় ও। জানি আপনার সাহস নেই। আরো দু’দিন পরে লীনা কোন করলো তীর্থঙ্করকে।

তীর্থঙ্কর আশ্বাস দিয়ে বললো কি ব্যাপার লীনা, আজ ক’দিন তোমার ফোনে ডেকে ডেকে হয়রণ হয়ে গেলাম। শরীর ভাল আছে তো?

আছে।

তবে?

একটা পরিকল্পনা করছিলাম।

কি এমন পরিকল্পনা, বার জন্মে তিন দিন সময় লেগে গেল?

পরও আমার জন্মদিন মনে আছে? এবার কিছু নতুনও করতে চাই।

বেমন—

অনেক দিন থেকে তুমি আমার ফটো চাইছো, এবার আমি আমার ফটো তোমায় দেব আর তুমি, একটু ধামলো লীনা।

আর আমি কি?

তুমি দেবে ফুল, শুধু সাদা ফুল।

তার পরে ক’টা দিন কেটে গেছে, তীর্থঙ্কর অধীর প্রতীক্ষায় ছটফট করছে। কী হলো লীনার, ওর কথামতো ফুল পাঠিয়েছিলো কিন্তু লীনা কথা রাখেনি, ফটো দেখনি।

ডাক্তার ঘরে ঢুকতেই তীর্থঙ্কর প্রশ্ন করলো, আজ ক’দিন আসেননি কেন?

একটা দুর্ঘটনার বিব্রত ছিলাম।

দুর্ঘটনা!

হ্যাঁ, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, লীনা বোস আশ্বস্তা করেছেন। ডাক্তারের কাণ্ডে বেননা।

কি বললেন। লীনা ঘাবা পেছে? প্রায় চীৎকার করে ওঠে ও, তারপর আপস মনে বলে, মা না, তা হতে পারে না। আমি ওকে

যেতে দেব না, বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর সিঁড়ির দিকে ছুটে যায়। ওর মা বাধা দিতে গেলে, তাকে বারণ করেন। এচও উত্তেজনার নীচে নেমে আসে তীর্থঙ্কর। কিন্তু তার পরেই কেমন বেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তীর্থঙ্কর। ওর মা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেন। কোথায় বাবি খোকা, ও যে আজ দুদিন চলে গেছে।

আমায় বলনি কেন মা ?

এ হুঃখ আমার রাখবার আরগা নেই রে, মেয়েটা চলে গেল কিন্তু বাবার আগে কত বড় দান করে গেল ও জানতেও পারলো না, আমি তোকে কিরে পেলাম কিন্তু কান্নায় মার গলা বুকে এলো।

মা আমার পা বড় কাঁপছে, আমি আর পারছি না দাঁড়াতে।

দোহাই খোকা, ধৈর্য্য ধর, ভেঙে পড়িস না, আতঙ্কিত গলার বলেন তিনি।

এমন সময় পেছন থেকে ডাকে ডাক্তার।

তীর্থঙ্কর বাবু, এগুলো লীনা দেবী আপনাকে দিয়ে গেছেন। ফটাটা তুলে ধরে চোখের ওপর তীর্থঙ্কর। কি স্নান কর ছুট মীতরা হাসি, তারপরেই চিঠিটা খুলে পড়তে থাকে।

তার লীনার প্রথম এবং শেষ চিঠি—প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে বেন লীনার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায়।

তীর্থঙ্কর, পারলাম না, হেরে গেলাম জীবনের কাছে। আমার জন্তে হুঃখ করে না, আজ হয়তো আমার বিরহ তোমার কাছে অসহ মনে হবে কিন্তু এছাড়া আর উপায় ছিলো না। আমি জানি, আমার খেমে থাকা গতিহীন জীবন তোমার জীবনে শুধু বিড়ম্বনাই বাড়াতো, তার চেয়ে এই ভালো হলো। আমাদের ভালবাসার স্মৃতি অথবা বিস্মৃতি মধুর হয়ে থাক চিরকাল তোমার কাছে। আমার মৃত্যু আত্মহত্যা হলেও মহান। কারণ এতে আমার প্রেম বাঁচবে কিন্তু দিনে দিনে তিলে তিলে যে মৃত্যু আসতো তাকে তোমরা স্বাভাবিক বললেও সেই হতো আমার অপমৃত্যু আর প্রেমও পেতো না তার মূল্য।

চিঠি পড়া শেষ করে তীর্থঙ্কর আকাশের দিকে চাইলো। চারিদিকে কি বিরাট শূন্যতা! পৃথিবীতে আবার এসেছে বসন্ত, কিন্তু কি বিষণ্ণ তার রূপ!

কাছে থাকা

কুমারী মধুছন্দা দাশগুপ্তা

এক কাছে আছ তবু দূরে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক
আকাশের ওই ছুঁটি তারা কত কাছে জলে সারা রাত।
তবু ওরা একজন অপরের পরশের লাগি হয় উন্মাদ,
মনের ভেতরে আছ তাই চোখে না থাকাই স্বাভাবিক।
গোলাপের কুঁড়ি ছুঁটি কত কাছে কাছে ফুটে রয়েছে,
তবু হোঁওয়া পেয়েছে কি? ভ্রমের পথ চেয়ে রয়েছে।
অনেক কাছেই আছ তাই দেখা না হওয়াই স্বাভাবিক,
পাহাড়ের বুক থেকে ঝাঁপ দিয়ে চলে যাওয়া নদীটাও
পাহাড়েরই কাছে আছে, তবু দেখা নাহি হয় ছুঁঅনার
তুমিও নাই বা এলে আমার অনেক কাছে,

প্রতিশ্রুতি

শ্রীমতী যুধিকা ঘোষ

প্রসন্ন প্রত্যয়ের প্রতিশ্রুতি
সোনালী নূর্ধের রশ্মিরাগে
বসন্ত বাতাসের শিহরণে,
আকাশের অনন্ত নীলিমায়
মঞ্জরিত সহকার-সৌন্দর্যে,
পুষ্পিত নিকুঞ্জের লাবণ্য-বিলাসে
অসিত প্রাণের স্পন্দনে,
অযুত মানবের মৌন মিছিলে।

এ ধরণী কী বক্ষ্যা ?

অভেদ দিন-রাত্রি নির্বিশেষ আলো-আঁধার,
হেথা শুধু কামনার সমাধি, চেতনার অবলুপ্তি,
পদে পদে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় সংঘাত আর।
কোথা পুষ্পাসব, ফেনিল ঘোঁবন সুরাসার ?
নিখিলের বক্ষে শুনি বীণার বন্ধার,
সুরে সুরে গানে গানে অপূর্ব ঐক্যতান।
রূপাতীত আনন্দের অশ্রুচয়ন চাক্র বিবেদন।

সুদূর দিগন্তে জাগে ঐ প্রাণ,
মৃত্যু নাই ঘোঁবন-মস্ত্রিত কলতান।
নিত্য নূতন জনম অভূদয়,
আলোয় আলোয় জ্যোতির্ময়।

প্রথম বৃষ্টি

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তা

আমার এই পুঁথির রাজ্যে
নতুন বৃষ্টির সৌজন্দ্রে
সৌন্দা মাটির সুরাস আসছে ভেসে
পুঁথির গন্ধ ছাপিয়ে
বৃষ্টি গেল খেমে
কিন্তু সৌন্দা গন্ধ রইল মনে
ধূপের রেশটুকুর মত।

সবুজ ঘাসের রঙে
এই বৃষ্টির বিন্দুর মত
আমিও বাব মিশে মাটিতে
তবুও সেদিন আমার ভাললাগাটুকু
পুরোনো গানের কলির মত
হঠাৎ আসবে কাতর মনে
এই সৌন্দামাটির
গন্ধের সঙ্গে
এই পুঁথির দেশের—

চিত্রায়ী

রঙ্গা সেনগুপ্ত

আজ সন্ধ্যার এক বছর পরে,
এসে রসলায় সেই জানালার ধারে ।
জানককে বিদ্যে পরিণি বাসন্তী রঙের শাড়ী
দিয়েছি চুল এলো করে ।।
সে দিনের মতো শুধু আজ
হাস্তে রয়েছে সঞ্চয়িতা—
খুলে ছিলাম ক্যায়েলিয়া কবিতা
একটা বর্ণও পড়িনি কিন্তু,
শুধু বইটা খুলে রেখেছিলাম,
আর আকাশের অনেক চূরে ঘনটাকে উড়িয়ে দিলাম ।

—ভাবলাম সেদিনের কথা,
আজকের মত সেদিনও ছিল গোখুলির নীরবতা ।
হঠাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করে তুমি এলে,
তুমি আমার ঘুখের পানে চাইলে,
তারপর একটু হেসে ভেঙ্গে দিলে আমার ধোঁপা
বললে, চুই মেয়ে, এখন থেকে ডাকবো
তোমায় বঙ্গা,
এলো চলে, বাসন্তী রঙের শাড়ীতে তুমি যে অনঙ্গা ।

চাল-ডাল-নুনের কবিতা

সোনালী দত্ত

দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ভিক্ষুক-দম্পতি গাছটার ছায়ে বসে লিখেছে,
মৃত্যুর লক্ষ বেড়ালাল ছিঁড়ে জীবনের সুর সাধা লিখেছে ।
অর্গের মদিরামস্ত চিন্তে স্বপ্নের মায়-নীড় বাঁধেছে ;
সারাদিনে সঞ্চিত অশ্রু-সিক্ত ভিক্ষার চালগুলো বাঁধেছে ।
মৃত্যুঞ্জরী সুরে জীবনের মহাপান গাইছে ।
দূর নীল-সাগরে স্বপ্নের পরীরা বাইছে ;
কল্প-মানসের ছন্দিত তরনী ।
মঞ্জুল মেখলা মাহুকের ধরণী
দেখা বার ভিখারীর চুল্লির বিন্দু আঙুলে,
সৌরভ সাড়া দেয় মধু-ঝরা ফলদের কাণ্ডনে ।
চলে চকস লাগে তরনী ভেসে ধর ধর খিরে অলা তারাদের দেশে
পথ্য মর্ত্যের ধূলি ।
ভিখারী-মিথনের স্বপ্নে হলি,
শুনল মর্ত্য অমরণ মন্ত্র শিখছে ।
চুল্লির আলোকেতে ভিক্ষুক-দম্পতি লিখেছে—
চাল-ডাল-নুনের কবিতা
তরণীর বাণীর ছবি তা ।
চকিত চাউনিতে ভিক্ষুক-প্রেরণী হাসছে,
দূর নীল সাগরে আশা তার ডাসছে ;
পাল হাল গুনের ছবি তা ।
চাল-ডাল-নুনের কবিতা ।

ময়ূন

রাণু রায়

ছ'টি ময়ূন নিয়ে আমি এলাম পৃথিবীতে
ধীরে ধীরে বড় হলাম মাতের কোলেতে ।
বুঝতে এখন পারছি আমি ময়ূন বলে কাছে
সকল জীবের মনের ডাব ময়ূনে গুঠে ডেবে ।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ময়ূন আছে হার
খুঁজে খুঁজে ময়ূনের মত ময়ূন হেলা দার ।
এক ময়ূনে দেখি যে হার হিংস্র অবহার
আর ময়ূনে দেখি যে গো সাধু ব্যাধার ।
কেমন করে বুঝবো বলে অস্তর সবার
যুধিষ্ঠির কি বুঝেছিলেন দ্রৌপদীর আচার ?
কুক জেরা করে দেখান আত্মকলের ব্যাপার ।
ময়ূন দিয়েই পৃথিবীকে দেখতে শিখলাম
ময়ূন হতেই সকল জীব চিনতে শিখলাম ।

খালপার হতে গ্রামের সীমানা

মঞ্জুলিকা দাশ

তুমি যদি কোন এক বিকেলবেলায় শহরের বাসে চড়ে বসো,
দেখবে,—দেখবে তুমি, শহর ফুরোলে পথে গ্রাম ফুরোবে না ।
মস্ত আকাশ-ছোঁওয়া দিগন্তের দেশে মাঠ, অরণ্য সবুজ,
খাল, বিল, নদী, দীঘি, দীঘির সোপান বেয়ে কত শত কালো
কালি-দীঘির সোপান—

অভিমानी মেয়ের মতন এলোমেলো ঝোপঝাড় বড়ই অবুঝ ।
তুমি যদি কোন দিন ছপূরবেলায় শহরের বাসে চড়ে বসো,
একটুকু রোসো,—শহর ফুরোলে গ্রামে পথ ফুরোবে না,—
দেখবে নিঃস্বপ্ন মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদ,—সবুজ ধানের গান,
মাটিতে আকাশ ছোঁয়া মুক্তির নব অভিধান ।

তুমি যদি কোন দিন সন্ধ্যাবেলা শহরের বাসে চড়ে বসো,
পতীর রাজির বৃকে মুখ ঢেকে চুপি চুপি চোরের মতন
গ্রামের কুটিরে এলে, শহরের কোলাহলে রাজিচর মন
নির্ধাৎ বিষন্ন হবে,—

কী নীরব, অসহ শান্ত পাড়াপ্রতিবেশ,—
ছবিতে ভাসবে শুধু হঠাৎ হারিয়ে বাওয়া ছাড়া নো স্বদেশ ।

তুমি যদি কোন দিন ছপূরে, বিকেলে শহরের বাসে চড়ে বসো,
ইটিগাঘাটের দিকে বাও চলে কিম্বা হাসনাবাদ,
চলন্ত বাসের থেকে অকুরনো পথে শুধু ঝরাবে অসহ—
এক শান্ত অবসাদ

যত পথ চলো এঁকেবেঁকে, ফুরোলে পথে গ্রাম ফুরোবে না,
সবুজের তল তবু হাতড়িয়ে পাওয়া বার,—শুধু এ—
পথের বিশ! পাওয়া বড় তার—

অলপ আলোকে হতে অসহ ব্যাধার দেশে ভ্রমিত পথার ।



বিষ্কট  লডোস

এখানে



দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী

সুস্বাদু স্বাদে এমনটী আর হয়নি

কোলে বিষ্কট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-১০



বিবাহ-সাধনা

শচীন্দ্র মজুমদার

“সেই গোপন রাগের
রক্ত বেনো মোর মর্মে লাগে,
আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের আগায় লাগে।”

—রবীন্দ্রনাথ

মুখবন্ধ

—চীন কবি কমলানন্দ গুপ্তের গানে আছে—

“দিলেন দারা পুত্র

দিলেন সেই সে দয়াময়

ভালবাসার শিখরি বলে বর্ণপরিচয়।

(তুই কি) বর্ণমালা শেষ না করে

ডিঙিয়ে যাবি ভ্রাস্ত রে ॥”

বিবাহিত জীবন সেই ভালবাসার বর্ণপরিচয় শেখবার একমাত্র ক্ষেত্র। কিন্তু তার স্বরূপটি জানবার যে প্রয়োজন আছে, আধুনিক কালের বিবাহিতেরা তা অমুভব করেন বলে আমার মনে হয় না। তাই আমি বিবাহের স্বরূপ ও তার পূর্ণ অভিব্যক্তির কথাটি বলতে চেয়েছি।

বিবাহ সম্বন্ধে পড়বার মতো পাশ্চাত্য সব বই পড়ে আমার অসংখ্য বার মনে হয়েছে যে, সে সকল চিন্তাকে সার্বভিত্তিক বলে ধরে নেওয়া খুব বড় একটা ভ্রান্তি। বাঙালীর বিবাহ সাধনার সঙ্গে তাদের একটুও সুরসঙ্গতি নেই। আমাদের বিবাহ সাধনা ঐতিহ্যে সংস্কারে আদর্শে ও অভিব্যক্তিতে একান্ত বিশিষ্ট ও বিচিত্র।

আমাদের দেশে একটি প্রকৃষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত মনস্তত্ত্ব থাকলেও ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে আমরা সেটা পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব গ্রহণ করেছি। তার ফলে আমরা মনে করি যে মানুষ সম্পূর্ণ হয়েই জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষার ও অল্প কিছু উপায়ে দ্বারা তার সামান্য একটু মানসিক উৎকর্ষ সাধন করা গেলেও জীবনে তার আর কোন পরিবর্তন হয় না। আমাদের মনস্তত্ত্বের মতে মানুষ অসম্পূর্ণ হয়েই জন্মায়। নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করবার জন্য প্রকৃতি তাকে কিছু দূর পর্যন্ত নির্মাণ করে ত্যাগ করে। তার সকল শক্তি স্তম্ভ অবস্থায় থাকে এবং আত্মসাধনার দ্বারা সে সেই নিহিত শক্তিগুলিকে ফুটিয়ে তুলে নিজের অপরিমিত উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম। বলা বাহুল্য, এই আত্মসাধনার একটি বহু-পরীক্ষিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আমাদের দেশে অক্ষয় হয়ে আছে। যদিও ইওরোপীয়

মনোবিজ্ঞানীরা আজ নিজেদের ডুলটা বুঝতে আরম্ভ করেছেন, তবু সে ডুলের দারুণ প্রভাব ইওরোপের মতো আমাদের দেশের ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই গভীর হয়ে আছে।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীদের বিপুল প্রচারণের ফলে আমরাও এখন বিশ্বাস করি যে সকল দেশের ও জাতির নারীপ্রকৃতি হুবহু এক। তার ফলে আমাদের বিবাহিত জীবনে নানা বিদেশী বিপর্যয় জানের গভীর প্রভাব এসে পড়েছে। তার ফলে যে ভালো হয় নি এবং ভালো হবারও নয়, সে কথা বুঝতে বেশী ভাববার দরকার হয় না। চীনা, বাঙালী ও ইংরেজ মেয়ে মূর্তিতে অত্যন্ত ভিন্ন হলেও প্রকৃতিতে যে এক হয়, এমন কথা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে তাদের দৈহিক গঠনে, শারীরক্রিয়ায় এবং বিশেষ করে মানসিক প্রকাশে গভীর বিভিন্নতা বর্তমান। বিগত শতাব্দীর বিখ্যাত পর্যটক ও নারীস্বাধীনতা আন্দোলনের আদিগুরু মেসী উল্ষ্টোনক্রাফট, তাঁর পরে ম্যালিনোফি প্রভৃতি নারীপ্রকৃতির অত্যন্ত বিভিন্নতার কথা বলে গেলেও, অধিকাংশ ইওরোপীয় মনোবিজ্ঞানীরা তা গ্রাহ্য করেন নি। বর্তমান বস্তুযুগের প্রয়োজনে মানুষকে এক-নিরিখের করে তোলার একটা গভীর চেষ্টা আছে। তাই এই বিজ্ঞানীরা একটি মাপকাঠি দিয়েই বিশ্বের নারীপ্রকৃতিকে মাপতে চেয়েছেন। এঁদের প্রচারণের ফসলটা অস্বস্তি: আমাদের পক্ষে শুভ হয় নি। কোনো ভ্রান্ত ধারণার কখনো শুভফল হয় না। বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে অসংখ্য পাশ্চাত্য সস্তা অসার বই এবং তাদের সস্তা বাংলা নকল বাঙালীর অপরিমেয় ক্ষতি করেছে। আমরা নিজেদের বিশিষ্ট বিবাহ সাধনা ত্যাগ করে ইওরোপীয় যে ধরণটা সার্বভিত্তিক বলে নিতে চেয়েছি তা অপকৃষ্ট হওয়া ছাড়া আমাদের নারীপ্রকৃতির সহিত কোনই সামঞ্জস্য রক্ষা করে না।

আমার জীবনে আমি তিন ধরণের বাঙালী-দম্পতি দেখেছি। (১) মিশ্রিত-দম্পতি অর্থাৎ বাঙালী-খামীর ইংরেজ বা অল্প ইওরোপীয় দম্পতি। (২) বাঙালী সাহেব ও বাঙালী-মেমসাহেব-দম্পতি। (৩) খাঁটি সাদামাটা বাঙালী-দম্পতি।

আমার একটি পরমাত্মীয় ইংরেজ নারী বিয়ে করে আজ চল্লিশ বৎসরেরও ওপর ইংলণ্ডে বাস করছেন। সেখানেই তাঁর নিজের বাড়ী। আমার মার প্রাণে তিনি একদা বলেছিলেন, ‘দেখো দিদি, ওদেশে বাস করি বলে এক রকমে চলে যায়, না হলে তেলে-জলে মিশ খায় না।’ কথাটা গভীর অমুভবের ও অত্যন্ত সত্য। আমি অল্প যে মিশ্রিত-দম্পতি দেখেছি তাঁদের বিয়েরও ওই কথা বলা চলে। আমার জানা কয়েকজন ভারতীয় ইওরোপীয় পেশীরা শেষ পর্যন্ত

স্বামীদের ত্যাগ করে, স্বদেশে ফিরে গিয়েছেন। কারণ, তাঁদের বিবাহ নিয়মীমা ছাড়িয়ে, অসুস্থ হয়ে মন ও আত্মার পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় নি। আমার আত্মীয়টি এখন সুস্থ হয়েছেন। বাঙালীর ঐতিহ্য ও সংস্কার তাঁর আত্মাকে স্ত্রীর আত্মা থেকে বিযুক্ত করে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করেছে। মিশ্র বিবাহে এমন আধ্যাত্মিক আলোড়ন ঘটা খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

আমার এক উৎকট বাঙালী-মেমসাহেব বাক্বী আমাকে বলেছিলেন, 'আমাদের বিবাহিত জীবনে কি যেন একটা নেই। সব থেকেও সেটা যেনো সারশূন্য, স্বাদহীন। বাঙালী দাম্পত্য-জীবনের আচার দেখি, লোভ হয়, কিন্তু সেটা গ্রহণ করতে আমার বিলিতি শিকার সংস্কারে বাধে।' আর একটি বাঙালী ক্রিস্টান বাক্বীর মুখে আমি ঠিক ঐরূপ কথাই শুনেছি। হঠাৎ একদিন তাঁকে সী খিতে সিঁচুর ও মণিবন্ধে লৌহবলয় পরতে দেখে আমি প্রশ্ন করেছিলুম, 'এ কেন?' তিনি বলেছিলেন, 'দেখুন আমি হিন্দু-ক্রিস্টান। আমার মাক-বয়সে হিন্দু আমাকে বেশী করে টানছে। তিনি যেমন গির্জায় যেতেন, কলকাতায় গেলেও তেমনি কালীঘাটের মন্দিরে পূজা দিতে ভুলতেন না।'

আমি নিজে ইংলু কলেজে ইংরেজ শিক্ষক ও অধ্যাপকদের এক পরর্তীকালে ইওরোপীয় বন্ধুদের কাছে সব বিষয়ে পাঠ নিয়েছি। যৌবনে আমি ইংরিজি ভাবনাকে পরমার্থ বলে জানতুম। আমার বিবাহিত জীবনেও গোড়ার দিকে তার গভীর প্রভাব হয়েছিলো। কিন্তু পদে পদে আমি যা খেয়েছি। পরে বুঝেছি যে কোন অনাস্থ আচার ও আচরণ পালন করে নিজের প্রকৃতি ও সত্তা বদল করে নেওয়া অসম্ভব কথা। কেবল ধর্মাচরণেই সত্তার আমূল পরিবর্তন হয়। হাজার হাজার বাঙালী ইংরিজিয়ানা পালন করে গেছেন কিন্তু একজনকেও আমি ইংরেজ হয়ে যেতে দেখিনি। বাঙালীর ইউরোপীয় পত্নীদেরও সত্তার একটুও বদল হয়নি। কিন্তু গভীর ধর্মাচরণের দ্বারা ইংরেজকথা মার্গারেট নোবল্ নিবেদিতা হয়েছিলেন। ইংরেজ পুরুষ নিক্সন্ নিয়ত কৃষ্ণভাবনার দ্বারা সত্তার পরিবর্তনে সর্বতোভাবে যে কৃষ্ণ-প্রয় হয়েছেন, তা আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

জীবনে "ভালোবাসা" বস্তুটা অত্যন্ত গুরুতর। এক শতাব্দী পূর্বে ইউরোপে "Love" শব্দটার যে অর্থ ছিলো, এখন তা নেই। যৌনবিজ্ঞানীদের কৃপায় Love দেহজ ভালোবাসার পরিচায়ক হয়ে অচ্যুত সঙ্গীর্ণ হয়ে গেছে। আমরাও সেই সঙ্গীর্ণ বস্তুটাকেই গ্রহণ করেছি। প্রাচীন গ্রীকদের শব্দ ছিলো: Eros, Phile ও Agape। আমাদের শব্দ: কাম প্রেম মুদিতা করুণা ভক্তি। Eros কাম। Phile প্রেম। Agape করুণা।

ইওরোপীয়েরা ভক্তি কথাটা জানেনা ও বুঝতেও পারেনা। Ecstasy ভক্তিবাচক শব্দ নয়। কারণ, ভক্তি সুরময় বোধপ্রবাহ এবং শান্তিময় বোধপ্রবাহ, বা অপরা ভক্তি এর পরা ভক্তি বলে জাত। বিখ্যাত জার্মান যৌনবিজ্ঞানী Iwan Bloch ঠিকবদের ভক্তিকে "Religio-Sexual Phenomenon" বলে ব্যাখ্যা করে গেছেন, বা সর্বৈব জুল।

আমাদের বিবাহ সাধনার চারটি মূল তত্ত্ব আছে যা আজও ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানীদের জ্ঞানের অতীত। আমরা জানি যে কিশোরী মেয়েদের ঐতিহ্য স্বতঃস্ফূর্ত বস্তু সেটি তার সত্তার (Essence)

মূল উপকরণ। বিবাহ এই ঐতিহ্য উদ্ভবপরিণাম (Evolution) সাধন করে। ঐতিহ্য অসুস্থ ইংরাজি শব্দ নেই বলেই জানি। আমরা জানি যে কিশোর-কিশোরী ভাব বিবাহের প্রাণবস্তু। আমরা জানি যে সাধনার দ্বারা পতি-পত্নী দ্বৈতরূপ থেকে অদ্বৈত অবস্থায় উপনীত হতে পারে। আমরা জানি যে, সাধনার দ্বারা সত্তানসৃষ্টি নিবারণিত হয়ে যৌনশক্তি উচ্চতম বিবাহ সাধনে নিয়োজিত হতে পারে।

ইওরোপীয়েরা বাঙালীর এ সাধনা বোঝেনা। ইংরেজ আমাদের অবজ্ঞা করে বুঝতে চায়নি। জার্মানরা ভারতীয় দর্শনকে প্রকৃত সমাদর দিয়েছে, কিন্তু এ প্রেম সাধনা বুঝতে পারেনি। আমার কয়েকটি অসুস্থ ইওরোপীয় বাক্বী আছেন (ইংরেজ নয়)। তাঁরা চিন্তাশীল সাধনাপরায়ণ। আমি তাঁদের বোগতত্ত্ব শিখিয়েছি। এই তত্ত্বটিও তাঁদের আমি বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু তাঁরা চোটা করেও তাঁদের মনের গড়নের বাধার বুঝতে পারেননি।

ইওরোপীয় মেয়েদের এই প্রশংসা আমি করবো যে তাঁরা যা বোঝেন না, যা তাঁদের প্রকৃতিসঙ্গত নয়, তা তাঁরা গ্রহণ করেন না। আমাদের শিক্ষিত পুরুষ ও মেয়েদের সবুকে এমন কথা বলতে পারলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হতুম। আমরা অন্ধ হয়ে অপরের আচার দেখ-মনের স্বাভাবিক ও প্রগতিসাধক বলে গ্রহণ করি। পুরুষ যেমন চার মেয়েরা তাই হয়। আজ ইউরোপে নারী ছিন্নমস্তা। ছিন্নমস্তা প্রাচীন হিন্দুভাবনার কথা। যে নারী নিজের দেহ ও মনের নারীত্বের উপাদান মিলেই গ্রাস করে তাকেই ছিন্নমস্তা বলে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা—যথা হ্যাডেলক এলিস, ডক্টর বাক্স ও ডক্টর সার্জেণ্ট এই ছিন্নমস্তার নাম দিয়েছেন Woman approximated to the male—the new or third sex. আমাদের এ শতাব্দীর প্রারম্ভে হ্যাডেলক এলিস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, In our century the sexes tend to approximate to each other, অর্থাৎ নারী নিজের নারীত্ব গ্রাস করে পুরুষতাবাপন্ন ও পুরুষ পৌরুষ বিসর্জন করে নারীতাবাপন্ন হয়ে যাবে। কথাটা আজ পরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় পুরুষ এই ছিন্নমস্তাকে চেয়েছে। আমাদের বুঝেও ঠিক তাই চাইছেন বলে আমাদের দেশেও ছিন্নমস্তার উদয় হয়েছে। আগামী কালে ধূমাবতী হওয়া কি ইউরোপীয় নারীর ভাগ্যলেখা? তা হলে আমাদের অসুস্থপ্রিয়তার কারণে আমাদের দেশে ধূমাবতীর উদয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন হিন্দুধর্মণার ধূমাবতী সেই নারী যে পুরুষকেও গ্রাস করে। অর্ধপক রাজশাস্ত্রীয় ও অর্ধনৈতিক তত্ত্বের কল্যাণে সকল জ্ঞানধর্ম বিসর্জন দিয়ে পৃথিবী আজ একাকার হতে চলেছে। কিন্তু কারো কখনো পরধর্ম নয়না।

একটি মাত্র মূল বিষয়ে হিন্দু ও ইউরোপীয় চিন্তার ঐক্য দেখি। প্রেম ও ধর্ম যে নারীর জীবনের প্রধান দুটি রাজপথ তা স্বীকৃত মহাসত্য। ধর্ম অর্থে এখানে উজ্জ্বল-পূজন নয়। তার অর্থ প্রেম সতীত্ব ও সেবা। এই ধর্মের গুণেই নারী মহাশক্তি। আমাদের যৌবনকাল পর্যন্ত "পতিদেবতা" কথাটার প্রচলন ছিলো। এখন সেটা উঠে গেছে, থাকলে হাতকর হোত। কিন্তু কেবল আমাদের দেশেই পতিদেবতার প্রতিষ্ঠা ছিলো না। Paston letter-এ দেখি যে একদা অভিজাত ইংরেজ রমণী পতিকে "Right Reverent

and worshipful husband" বলে সাধন করতে। নিজেকে বলতো, "your Servant and Bedeswoman." সমসাময়িক ফ্রান্স দেশেও ঠিক তাই ছিলো। আমি আমাদের পাঁচটি নারী-বংশক্রম দেখলুম। একটির এখন শৈশবাবস্থা। তার মধ্যে প্রথম তিনটি বংশক্রম পতিকে দেবতা জ্ঞান করে গেছেন। কিন্তু আমি সংসারে তাঁদের প্রভুত্বই দেখেছি, পীড়িত দাসীর হীনতা দেখিনি। তাঁরা যেচ্ছায় দাসী হতেন, অর্থাৎ অকুষ্ঠ সেবাপরায়ণতা তাঁদের ছিলো। কথাটা মনে রাখবার যোগ্য যে, আমাদের বিবাহ সাধনার পত্নী স্বামীর জীবনমন্ত্রদাতা, পত্নীই প্রেমভক্ত। পতি তার জন্মসত্তার ও পুরুষসত্তার কারণে দেবতা হয় না, পত্নীই স্বামীকে দেবতা ও পুত্রকে নরোত্তম করে তোলার সাধনা করে। আমার স্বধীজনাখের মাতাঠাকুরাণীর কথা জানতে অত্যন্ত আগ্রহ হয়। অস্ত্রমালবর্তিনী ষোষণাবিহীন মহীয়সী এই নারী পতিকে ঋষি ও পুত্রকে পুরুষোত্তম করে গড়েছিলেন। এমন উদাহরণ মানবেতিহাসে আর নেই। রামকৃষ্ণসেবের দেবমানবত্ব লাভের সহায় হয়েছিলেন তাঁর পত্নী সারদা দেবী। বাঙালী হিন্দুনারীর পত্নীই সাধনার পরাকাষ্ঠা এ। এমন মহান আদর্শ আর কোন নারীসমাজে নেই।

আমাদের বিবাহ-সাধনাটি প্রধানতঃ বৈকবীর। তার সাধন-পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত সংগোপন হলেও এখনো বর্তমান। আমাদের পূর্বাচার্যেরা সেটাকে অষ্টাঙ্গ যোগের সহিত মিলিত করে একটি নূতন বিচিত্র যোগাজ রচনা করে গেছেন। অজ্ঞান করি যে, প্রায় হাজার বছর ধরে এ দেশে তার ব্যবহার হয়েছে। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব এই গোপন সাধনাকে আরো গোপন করে দিলেও বিনষ্ট করতে পারেনি। ধারা 'বিবর্তনবিলাস' এবং চণ্ডীমাসের 'রাগাঙ্ঘ্রিকা পদ' বোঝবার সামর্থ্য রাখেন তাঁরা জানেন যে অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন ভিন্ন এই উচ্চতম বিবাহ সাধনা হয় না। সকল দুঃখসাধ্য বিষয়ের মধ্যে যোগ সর্বপ্রথম। এই বঙ্গীয় রসযোগ যোগের চেয়েও দুঃখসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নয়। এই বইটিতে আমি রসযোগের আভাস মাত্র দিয়েছি, প্রশ্নালীটি বলে দেওয়া উচিত নয় বলে বলিনি। তাকে খুঁজে নিতে হয়, যেমন সারাজীবনের চেষ্টায় আমি খুঁজে নিয়েছি। যে সব সাধনা আমি করেছি তা আমারই খুঁজে নেওয়া। শুধু কোঁতুল মেটাতে গেলে সে সব জানা যায় না, তীব্রসংবেগের প্রয়োজন হয়। তারপর আশ্চর্য ঘটনা উপলব্ধি করা যায়, নিজের ঘরে বসে গুরু পাওয়া যায়। এইটি আমার জীবনের প্রকৃষ্টতম অভিজ্ঞতা। আমার বহুবিধ সাধনার গুরুরা যেন নিজের গরজে আমার বাড়ী এসেছেন। পহলবাণী থেকে যোগসাধনা, সর্ববিষয়ে আমি এমন কথা বলতে পারি। রসযোগ প্রত্যেকটি নর-নারীর অল্পভবে বর্তমান, কেবল তাকে চিনে, ফুটিয়ে তুলে ধরে রাখতে হয়। একমাত্র ইওরোপীয়, বিবেকানন্দশিষ্যা নিবেদিতা সম্ভবত এ তত্ত্বের কথাটি জানতেন। বঙ্গনারীর বিষয়ে তাঁর লেখার ইঙ্গিত থেকে সেই অনুমানই হয়। ইওরোপীয় মনীষীদের মধ্যে তিনজনকে দেখি যারা এই উচ্চতম নারীত্ব—ও বিবাহ সাধনার অনুমান করেছেন। তাঁদের নাম হ্যাভেলক এলিস, এডওয়ার্ড কার্পেন্টর ও জেমস হিটন।

ইওরোপীয় মনস্তত্ত্বে দেখি যে, জীবনের পটপরিবর্তনের কালে বৌদ্ধশক্তির বিনাশের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ইওরোপীয় রমণী অপরিণীত দুঃখ ভোগ করে। এ পরিবর্তন নারীসমাজেই বিধিলিপি।

হিন্দুনারী কিন্তু প্রৌঢ় বয়স থেকেই বৌদ্ধশক্তিকে দমন করতে বা বিসর্জন দিতে ব্যগ্র হয়। এটি হিন্দু-ঐতিহ্য। এই অত্যন্ত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে ইওরোপীয় প্রৌঢ়ার যে সমস্ত তা একেবারেই বাঙালী প্রৌঢ়ার সমস্তা হয়না। আমাদের সাধনার যেচ্ছায় এই পটপরিবর্তন ঘটাবার পদ্ধতি আছে। আমি হুজন যোগিনীকে জানি। একজন সাতাশ বৎসর ও অল্পজন চব্বিশ বৎসর বয়সে সাধনার দ্বারা ঋতু বন্ধ করেছিলেন। তাঁদের প্রৌঢ় বয়সে পটপরিবর্তন অনিত্ত বিলুপ্ত কোম আলোড়ন হয়নি। এ সাধনার দ্বারা ডিম্বকোষের শক্তি (Ovarian hormonal energy) উজ্জ্বল পথে প্রবাহিত করে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে নিযুক্ত করা যায়। আমাদের দেশের এ যোগসাধনা বিচিত্র।

সুপ্রজননবিভা ও ইউজেনিক্সের হালে ইওরোপে উৎপত্তি। আমাদের দেশে সেটি সুপ্রাচীন। মজু তার যে আটখাট বেঁবে দিয়ে গেছেন তার সত্য এখনো কুর হয় নি। বৈজ্ঞানিক চিন্তা তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। মানবকণ অবনতিশীল। সুপ্রজননবিভার প্রয়োগ ভিন্ন তার উদ্ধার নেই।

বিবাহ সুখ ও শান্তিকামী। দুঃখকে দূর করবার এবং সুখ ও শক্তিসন্ধানের আমাদের সর্বজন এবং সর্বকালমাত্র পদ্ধতি আছে। হাজার হাজার বছরের ক্রমাগত ব্যবহারে তা উজ্জ্বলই হয়ে আছে, মলিন হয় নি। সেটি কিন্তু কঠিন সাধনা, তপস্বী। ইওরোপীয় মনস্তত্ত্বে তেমন কিছুই নেই। না থাকার কারণ ইওরোপীয় মন বিজ্ঞানকেই মানে, যা বস্তুগত। সে এখনো ভালো করে এই আন্তর ইন্দ্রিয়টির সন্ধান করেনি। বিবাহ একান্ত ভাবে মনোরই সাধনা।

এই বইটিতে আমি এমন কিছু ইওরোপীয় জ্ঞানও গ্রহণ করেছি যা সার্বভৌম। কিন্তু ইওরোপীয় বিজ্ঞান আমাদের কিছু গোপন সাধনাকে আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং এই বইতে দুই দেশের জ্ঞানের সমন্বয় পাওয়া যাবে। ঋষিকল্প জ্ঞানী হ্যাভেলক এলিসের কাছ থেকে আমি সব চেয়ে বেশি নিয়েছি। তবুও এই বইটিকে প্রাথমিক বলেই ধরতে হবে। এতে আমি এমন একটি কথাও লিখিনি যা আমার পর্ববেক্ষণ বা অনুভবের বাহিরে। যা আমি জানি না তা পরম সত্য হলেও কখনো ব্যবহার করি না। আমাদের চল্লিশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে আমরা প্রত্যেকটি তত্ত্ব বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি যে তা অজ্ঞাত সত্য। ভ্রান্তিদর্শন সকল সাধনার অন্তরায়, তা আমরা এড়িয়েছি। বা চিরন্তন সত্য তাকে নিজে উপলব্ধি করলে তা নূতন করে সত্য বলে অনুমোদিত হয়। কাল ও কালমানস বদলায়, কিন্তু সত্য চিরদিনই অপরিবর্তনীয় ও অমলিন। যাকে "খিওরী" বলে তেমন কিছুই এই বইটিতে নেই।

বার বার পরীক্ষার দ্বারা পাঠক-পাঠিকারাও এই বই-এর সকল কথার সত্য নিরূপণ করতে পারবেন।

বিবাহের স্বরূপ

একটি নারী ও একজন পুরুষের সমগ্র জীবন স্থায়ী মিলন বন্ধন ধর্ম বা রাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদিত হয়, তাকে আমরা বিবাহ বলি। বিবাহ মানব-সমাজের অতিশয় প্রাচীন রীতি।

মানুষের মনে বিবাহের সংস্কারটি দৃঢ়াঙ্গত। তৎস্বয়ং

অর্থাৎ তার দৈনিক উৎকর্ষের বিশিষ্ট একটি পর্যায়ে এই সংস্কারটি আগ্রহ হই এবং ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে গুঠ। তারূণ্য শুধু যৌনচেতনার প্রতীক নয়। তারূণ্যের আগমনে বালক-বালিকার মনে অহংজ্ঞানের উদয় হয় এবং তারা আগামী কালেরও উপলক্ষি করে ও তাতে আগ্রহ হয় চলে। যৌনতা, অহংজ্ঞান এবং আগামী কালের ভয়ভব তারূণ্যের বৈশিষ্ট্য। এই বয়সে পুরুষের যৌনচেতনার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ হয়, বা নারীর হয় না। তীব্র যৌনপ্রেরণা পুরুষের নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকাশ। সে চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশটিও বিভিন্ন। তার তিনটি পরীক্ষামূলক রূপ: প্রাথমিক রূপ আত্মবিস্তারিত, পরে পরবর্তিত, আর তৃতীয় আকার। এ অবস্থার চরম উদ্দেশ্য—একটি প্রকৃত ও স্থায়ী জীবন-সঙ্গিনীর অন্বেষণ। স্বভাবসুলভ এই পরীক্ষামূলক বৃত্তিটিকে পুরুষ আত্মজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। আমাদের সকল ক্রিয়া একটি চরম ও পূর্ণ অবস্থাকে লক্ষ্য করে সাধিত হয়। পুরুষের কামচেতনাটি সেই চরম ও পূর্ণ অবস্থাটির অন্বেষণ করে। যাকে খোঁজে তার নাম পত্নী; যে অবস্থাটিকে খোঁজে সেটি বিবাহের আত্মজীবনস্থায়ী অবস্থা।

নারী কিন্তু পরীক্ষামূলক অমুরূপ কোন স্বাভাবিক অবস্থার অধীন নয়। প্রেম ও সন্তোষ তার জীবনের মূল দুটি পথ। তারূণ্যের উন্মেষে সে সোজানুজি প্রীতির ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে। জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কটি নিবিড়। সোজানুজি চরম অবস্থায় উপনীত হওয়া তার প্রকৃতিগত সংস্কার। স্বভাবগুণে পুরুষ জীবনের সব কিছুতে

তর্ক বিচার অর্থাৎ বুদ্ধির আশ্রয় নেয়, নারীর আশ্রয় প্রীতি। প্রীতির ক্ষেত্রে খুঁজে পেতে পুরুষের বিলম্ব হয়, সকলে খুঁজে পায়ও না। কিন্তু নারী শরৎ সোজানুজি সেই ক্ষেত্রে গিয়ে গিয়ে পৌঁছায়। বিবাহ বন্ধনের দ্বারা সেই প্রীতি-সজাগ নারী একটি পুরুষের ঘর আলো করলো, সেই মুহূর্তে সেই ঘরে একটি নূতন বৈশিষ্ট্য, নবজীবনের একটি ধারার উৎস স্থাপিত হলো। তাকে দিয়েই নূতন সংসার, নূতন জীবনযাত্রা, নূতন একটি বংশক্রম, কক্ষের নবীভূত উদ্দীপনা, নবতম আনন্দের সম্ভাবনা এলো। প্রীতি নারীর সহজ গুণ, আনন্দের উপলক্ষি তার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। নারী একদিকে প্রকৃতির অন্তরঙ্গ মিতা, অন্য দিকে জীবনকে পরমার্থের সহিত যুক্ত করে দেবার সহায়। এই দুটি প্রান্তের মধ্যবর্তী পরিসরে তার বিচরণ। সে জীবনকে বহন করে, জীবনে উজাগ সঞ্চারিত করে, জীবনশিল্পী হয়ে এই দুটি প্রান্তের মধ্যবর্তী ঘন করে রাখে। জীবনশিল্পী হওয়া নারীর সহজভাগ্য, পুরুষের তা হতে হলে প্রকৃত সাধনা করতে হয়।

মূলতঃ, প্রথম সোপানে বিবাহ যৌবনরসের তীব্র প্রেরণার সূচন অবস্থা। বিবাহের প্রকৃত পূর্ণতা ঘটে সোপানে সোপানে, সারাজীবন ধরে। এই আদিম সংস্কারের কারণে যে যৌনমিলন তা সত্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে পৃথিবী থেকে লোপ পায়নি। সংস্কার এই যৌন মিলনের পর্যায়ে মানুষ ও ইতর প্রাণী এক, সমান ভাবে প্রকৃতি-শাসিত। কিন্তু মানুষ সে অবস্থায় খুশি হয়ে থাকতে পারেনি।

হিম্যানী

বিউটি পাউডার

ক্রপের জৌলুস বা ডাম

স্বচ্ছ আবরণের মত মুখশীর্ষকে আবহাওয়ার রক্ষতা ও ময়লায় হাত থেকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ফ্লোর 'শেড'-এ পাওয়া যায়



হিম্যানী প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-২

নিজের উৎকর্ষ সাধন করবার জন্ত সে সমাজ গঠন করেছে, বেছা-প্রণোদিত হয়ে সমাজের বন্ধনকেও স্বীকার করে নিয়েছে। শুধু দেশে মিলে কাজ করবার জন্ত নয়, ব্যাপক ভাবে মঙ্গলচরণ করবার এবং সেই মঙ্গলের অংশভাগী হওয়াও তার লক্ষ্য। তাই যৌবন-সমাজমোচিত বিবাহকে সে মন খুলে মেনে নিতে পারেনি। কারণ, তার পরিধিতে স্বার্থের বেড়া দিয়ে ঘেরা, তার আয়তনটি সঙ্কীর্ণ, তাতে সারাজীবনের নির্ভরতার অভাব। অর্থাৎ সে পথটার সে পাঁচলও ভুলে রাখেনি, যার ধূল সেট পথে যেতে পারে। সমাজকে জানতে গিয়ে সে ধর্মকে ভোলেনি। বিবাহের ভেতর দিয়ে সে যেমন সমাজের মঙ্গল-কামনা করেছে, তেমনি বিবাহিত জীবনকে মহাত্মত বলে জেনে নিজের হিত সাধনের জন্ত ধর্মকে, পরমার্থকে বিবাহের মাঝখানে ঠাকুর বলে স্থাপন করেছে। অর্থাৎ, আমার বলবার কথা এই যে, মানুষের হাতে পড়ে প্রাকৃতিক কামমূলক বিবাহ সংস্কৃতির স্ত্রীর দ্বারা সঞ্চিত হয়েছে। মানুষ প্রকৃতিকে সংস্কৃতি দিয়ে জয় করেছে। আমাদের বিবাহ তাই সংস্কৃতিমূলক।

সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি? সংস্কৃতির বিবিধ সজ্জা আছে। নৃবিভাগত অর্থে সংস্কৃতি ইচ্ছাপূরণ, কামনাকে রূপায়িত করা, আদর্শের পশ্চাদ্ধাবন করা। আদর্শবাদীকে অর্বাচীনেরা পাগল বলে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদর্শ মানুষের অন্তরের জ্যোতির্ময় সত্য, যাকে লাভ করতে সে সতত ব্যগ্র। তাই আবহমান কাল মানুষ নিছক কাম-মিলনে পরিতৃপ্ত না হতে পেরে, সেই প্রবল শক্তিটাকে একটি আদর্শে সমাহিত করে সমাজের এবং নিজের আত্মার উৎকর্ষ ও বিকাশের কাজে নিযুক্ত করেছে। বুদ্ধিমান মানুষ মানেই জানে যে, পর-রতির সবকিছু ক্ষণস্থায়ী, তার জীবনকে পুষ্ট করার কোনই শক্তি নেই। তাই আমাদের চিরস্থায়ী মিলনের কামনা। নিছক বৌনমিলনের কলে প্রকৃতি সন্তান দেয়, যা তার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষ কিন্তু শুধু সন্তান লাভ করেই খুশি হয়ে ইতর প্রাণীর মতো তাকে অন্ধ অদৃষ্টের হাতে ফেলে দেয় না। সন্তানের জন্ত সে এমন একটি পরিবেশ, এমন একটি আবহ সৃষ্টি করতে রত থাকে, যাতে সে সন্তান তার বংশের ও সমাজের পূর্বগামীদের চেয়ে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। এটি সংস্কৃতিগত প্রয়াস, যা আমাদের বিবাহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের স্বভাব স্তম্ভের পানে চেয়ে থাকা, স্তম্ভকে লাভ করবার জন্ত আকুল হওয়া।

বিবাহের সঙ্গে যে সংস্কৃতি যুক্ত সেটি মানুষের বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। কল্পা বিবাহবোগা হলোই আমরা তাকে যার তার হাতে ভুলে দিইনে। সেই অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে বাচাই করে নিয়ে তাকে বোগ্য পাত্রের হাতে সম্প্রদান করি। বাচাই করার এই ক্ষেত্রটিতে সংস্কৃতিই একমাত্র মাপকাঠি। যে পরিবারে যেমন সংস্কৃতি সংস্কারের ধারা, সেই পরিবার সেই মানদণ্ড অনুসারে পাত্রের অনুসন্ধান করে। সুতরাং আমাদের চরনের পরিসরটি ছোট, রক্তের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি দিয়ে বেষ্টিত। অজ্ঞাত-কুলসীলকে আমরা যে সন্দেহের চোখে দেখি, তার কারণ, তার সংস্কৃতি ও সংস্কারের পটভূমিকার সহিত আমরা পরিচিত নই। রক্তের বেড়া তাই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণোচিত ও শূদ্রকে শূদ্রোচিত সংস্কারের গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ করে রাখে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জন্মগত কিছু নয়, সেটি সম্পূর্ণভাবে সংস্কার ও সংস্কৃতি সঞ্চীর অবস্থা, যা কোন শক্তিই বিনষ্ট করতে পারে না।

রাজা জমিদার বৈবাহিক সঞ্চয় দিয়ে বৈষয়িক শক্তি বর্ধনের উপায় খোঁজে। ধার্মিক যে জন সে ধর্মবন্ধন চায়। এ সমকক্ষতার অন্বেষণ তাই সমান-সমান ঘরের উচ্চ ও নীচকুলের সমকক্ষতা স্থাপন করবার প্রয়াসশূন্য। এ বিভেদ সংস্কৃতিগত।

বিবাহ সংস্কারে আমরা জন্মের কুশলতাকে খুব বড়ো একটা মানদণ্ড বলে জানি। এই কুশলতার চুটি রূপ—একটি সুপ্রজনন, অল্পটি সুসংস্কার। মানবপরিবার সন্তানকেত্রী; সন্তানের গুরুত্বের সীমা নেই। চাষী যেমন ভালো বীজ সংগ্রহ করে, সমস্তে জমির পাট করে উৎকৃষ্ট ফসলের কামনা করে; গৃহপালিত পশুর উৎকৃষ্ট শাবকের জন্ত যেমন উৎকৃষ্ট পিতৃবীজের বিষয়ে আমরা সতর্ক হই, মানুষের বেলাতেও সেই সতর্কতা তেমনি একই ধরনের। সন্তানের অদৃষ্টটি ভবিষ্যতে নয়, অতীতে বাধা। অতীত কালের পূর্বপুরুষ হতে সে তার নিজের জীবনের উপাদান সংগ্রহ করে। সে উপাদান দেহগত ও সংস্কৃতিগত দুই-ই। তাই কল্পার বিবাহকালে আমরা এমন বংশের পাত্র অন্বেষণ করি যে বংশ কয়েকটি অধোগমনশীল বোগ হতে বংশপরম্পরায় মুক্ত। ভাবী সন্তানের স্বাস্থ্যের ও জীবনের দৃঢ় বৃদ্ধির জন্ত এ অনুসন্ধান। কিন্তু এইটুকুই অর্থাৎ সন্তানের দেহটুকুই যথেষ্ট নয়তো? সন্তানের সম্যক উৎকর্ষের জন্ত তখন অল্প একটি উপাদানের গভীর প্রয়োজন হয়, সেটি সুসংস্কারের বংশানুক্রমিক আবহ। এ কথা নিগূঢ় সত্য যে, সন্তান পৈতৃক নানা মনোবৃত্তি লাভ করে থাকে। সেই অনুসারে তার সত্তা বা জীবনধারা লৈশবকালেই গড়ে ওঠে। সন্তানকে দেহ ও মন দিয়ে জীবনের পথে অনেকটা অগ্রসর করে স্থাপন করা এ চরনের উদ্দেশ্য। প্রগতি স্বার্থে গতিময়, অগ্রগমনশীল। তাই এ চরনের ইচ্ছা রক্ষণশীলতার পরিচায়ক নয়, প্রগতিই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং পরিচিত ঘর ছাড়া স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পাত্র পাওয়া দুঃস্বপ্ন। তাই বিবাহ গৌত্র বা পাণ্ডি ঘরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ থাকে। কিন্তু এখন ভাত্তেও বহুকালের সঞ্চিত নানা কলুষ জমে উঠেছে। বিবাহকে সৃষ্টি করতে গেলে গৌত্রকে এখন সাক্ষাৎ পরিচয়ের আরো সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ করতে হয়।

প্রাচীন কালের মনুষ্যুত্তি থেকে এবং আধুনিক কালের বৈবাহিক মনু হ্যাডেলসক এলিসের বিবাহে বর্জনীয় বংশের তালিকার উল্লেখ করা যেতে পারে। মনুষ্যুত্তির ব্যাখ্যায় স্বামী দস্তানন্দ সরস্বতী বলছেন যে, গবাদি পশু ও ধনধান্যযুক্ত হলেও নিম্নলিখিত বোগের দ্বারা কলুষিত বংশের পাত্র ও পাত্রী বর্জনীয়। যথা—ভগন্দর, রাজবন্দা, আমাশয়, মৃগীরোগ, শ্বেতকৃষ্ঠ ও গলিতকৃষ্ঠ। হ্যাডেলসক এলিসের মতে উন্মাদ বোগ, জড়প্রকৃতি, দুর্বলচিত্ততা, মৃগীরোগ, স্নায়ুবিকার ও হস্তারোগে কৃষ্ট বংশ বর্জনীয়।

এ বিষয়ে মনুর অত্যাশ্চর্য্য দূরদর্শিতার কথাটা বলতে হয়। মনু বোমশ পাত্র ও পাত্রীকে পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হ্যাডেলসক এলিস ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশের অনেক কারাগারে অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বোমশ নয়নারীদের বৌন পাপের প্রবণতা থাকে। বোমশ নারী বৌনপাপী হওয়া ছাড়া প্রায়ই জ্বরহত্যা অথবা সন্তানহত্যার পাতক হয়।

পুরুষের পরীক্ষামূলক বৌনতার কথা আমি উল্লেখ করেছি। যেখানে পুরুষ সুসংস্কার ও সুশিক্ষার দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে গেলে

না সে অবস্থায় বৌনচেতনার এই সঙ্কীর্ণতা তার বৌনবৃত্তির বিকৃতি ঘটাবার এবং বৌনরোগের সম্ভাবনা বিলম্বভাবে থাকে। বর্তমান কালে বৌনরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। এই বিকৃতি ও রোগ বিবাহের গোপন কিন্তু পরম শত্রু। অনুভূত অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের এ রোগ হওয়া সম্ভবপর নয়।

মহু সংস্কৃতিগত বাধার কথা বললে, যে কুল উত্তমক্রিয়াহীন যে কুলে উত্তমপুরুষ এবং বিদ্বান নেই, সে কুল বর্জনীয়। এখনকার প্রবল অর্থনৈতিক যুগে ধন বিবাহের একটি বড়ো মাপকাঠি; কিন্তু সেটি একান্ত বাহ্যিক বস্তু। পাত্র বা পাত্রীর দৈহিক, নৈতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উত্তমতার সঙ্গে তার বিলম্বিত কোন রোগ নেই। কাজেই মহু বাক্য সুপ্রাচীন হলেও আজও তার মূল্য অব্যাহত আছে।

বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া খুব কঠিন কথা। সে সুখ অল্পকালে নির্মাণ করা যায় না, সেটি সারা জীবনের সাধনা-সাপেক্ষ। সুখ সদা পলায়নপর বস্তু। কেবল ব্রত নয়, সুখকে মহাব্রত বলে গ্রহণ না করলে তাকে ধরে রাখা অসম্ভব কথা। এ বিষয়ে মানব-প্রকৃতির কি বলবার আছে তা দেখা যাক। দেহের গঠন অমুসায়ে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; পিকনিক (Pyknic), লেপ্টোসম (Leptosome) এবং হাইপোপ্লাস্টিক (Hypoplastic)।

পিকনিকের গোলাকার মুখ, মোটা হাড়, পেশল দেহ, রোগ-প্রবণতা খুব কম। পিকনিক স্বভাবে শান্ত, সংসার গঠনে ও শৃঙ্খলার অমুরাগী। লেপ্টোসমের ডিম্বাকৃতি মুখ, আয়তন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, পাতলা অস্থি। লেপ্টোসম রোগপ্রবণ, ভাবপ্রবণ, বহিমুখ, শিল্পমনা ও চঞ্চলপ্রকৃতি। পিকনিকের মধ্যে স্নান্য হওয়া, লেপ্টোসমের দেহসৌন্দর্যে অধিকার আছে।

তৃতীয় শ্রেণী, হাইপোপ্লাস্টিকের খুচালো মুখ, দীর্ঘ শরীর, কাঁটার মতো পাতলা অস্থি, দেহ প্রায় মেদশূন্য কঙ্কালসার, তার আভ্যন্তরিক দেহবস্তুগুলির অবস্থা বৃদ্ধি-উৎকর্ষহীন, শিথিলভাৱে। এ শ্রেণীর মেয়ে ও পুরুষ অভিশপ্ত। তারা স্বল্পায়ু, তাদের ক্ষয় ও উন্নাদরোগের সম্ভাবনা অত্যধিক। খেলাধুলা ও রতিক্রিয়া তাদের সাক্ষাৎ ঘম।

হিন্দুর ভাষায় পিকনিক মেয়ে মাতুরূপা এবং লেপ্টোসম মেয়ে নটীরূপা। বিবাহে নটীরূপা ত্যাগ্য। এ বিষয়ে প্রাচীন তথা ত্যাগ করে আধুনিক কালের প্রখ্যাত ছ'জন বৈজ্ঞানিকের সাক্ষাৎ নেওয়া যেতে পারে। দৈহিক শ্রেণীবিভাগটির আবিষ্কারক বিখ্যাত জার্মান মনীষী, আর্নেস্ট ক্রেটস্‌মার (Ernest Kretschmer)। তিনি বহুসংখ্যক পরিচিত দম্পতির পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে শতকরা দশটি সুখী-দম্পতি পিকনিক-জাতীয় এবং চারটি লেপ্টোসম-জাতীয়। শতকরা ছিয়ানীটি দম্পতি জীবনে সুখসামঞ্জস্যের সন্ধান পায় না। ছাভেলক এলিসের মতে শতকরা পঁচাত্তি মাত্র দম্পতি সুখী-দম্পতি করতে সমর্থ হয়।

আধুনিক রাশিয়ার বিখ্যাত মনীষী, অধ্যাপক ব্লন্স্কি (Blonsky) মানসিক গঠন অমুসায়ে মেয়েদের দু'টি ভাগ করেছেন। একটি মনান্দ্রিক (Monandric) অর্থাৎ পলি-অ্যানড্রিক (Polyandric)। মনান্দ্রিক মেয়ে একামুগা, নিঃস্বভাবা, সুখ ও শৃঙ্খলাহীন। এমন কথা বিবাহিত জীবনের অলঙ্কার-অন্য। পলি-অ্যানড্রিক মেয়েরা বচিবর্ধী ও একাধিক পুরুষ

ডায়বেটিস রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান

প্রশ্নাবের সঙ্গে চিনি বের হলে তাকে বলা হয় ডায়বেটিস মেলিটাস এবং চিনি ছাড়া বারবার প্রশ্ন হলে তাকে বলা হয় ডায়বেটিস ইনসিপিডাস। যে সব রোগী এই রোগে ভুগে থাকেন, তাঁদের পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যন্ত বেড়ে যায়, সমস্ত শরীরে বেদনাযোধ করেন, শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কাজে আগ্রহের অভাব বোধ হয়। দিন দিন ওজন হ্রাস পেতে থাকে, চুলকানি হয়, চর্মরোগে ভুগে থাকেন, যকৃতের কাজ মন্দ হয়, মূত্রাশয় দুর্বল এবং পাকাশরীর ক্রোমিয়াম (প্যানক্রীজ) দোষযুক্ত হয়। এই রোগকে অবহেলা করার ফলে বাত, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতা, অনিদ্রা, কার্বাইকল, দৈহিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস, দৈহিক অবসন্নতা, অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ এবং সাধারণ দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। যারা এই রোগে ভুগছেন, তাঁহাদিগকে বিনাখরচায় ডাক্তারের পরামর্শ লওয়ার জন্য আমাদের নিকট লিখিত অনুরোধ করছি—যার ফলে তাঁরা ইনজেকশন না দিয়ে, উপোষ না করে বা খাওয়া নিয়ন্ত্রণ না করেও এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং সবসময় যৌবন ও শক্তিশালী বোধ করবেন এবং দৈহিক কার্যকলাপে আগ্রহ বেড়ে যাবে। খুব বিলম্ব না হওয়ার আগেই লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (B.M.)

পোস্ট বক্স নং ৫৮৭,

৬-এ, কানাই শীল ষ্ট্রীট, (কলুটোলা)

কলিকাতা

আসক্ত, গৃহস্থালীর তারা কেন্দ্র হয় না। তাদের বিষয়ে এইটুকু বলাই যথেষ্ট। সৌভাগ্যক্রমেই সংসারে মনোনির্ভর নারীর সংখ্যাটাই বেশী।

এখনকার কালে ঘটকেরা যেমন পাত্রের বাড়ী, গাড়ী ও পরমর্বাদার সন্ধান দেয়, আমাদের যৌবনকাল পর্যন্ত তারা পাঞ্জপাত্রীদের বংশের বিত্তহতা ও সংস্কৃতিগত ক্রিমার সন্ধান নখনদর্পণে রাখতো। বংশের বিত্তহতা খুঁজে পাওয়া যে কতো কঠিন সে বিষয়ে হুঁচি উদাহরণ দেওয়া যাক।

কুড়ি বছর হোল বাসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান অধ্যাপক, বেঞ্জ (Benz) সাহেব বিপুল অল্পসন্ধানের দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে বিত্তহত বংশে সন্তানের সংখ্যা অল্প এবং কলুবিত বংশে অপরিমিত হয়ে থাকে। বেঞ্জের মতে একটি বিত্তহত দম্পতি হতে পঞ্চাশ বছরে মাত্র বোলটি সন্ততি জন্মায়। অল্প পক্ষে, কলুবিত দম্পতি হতে পঞ্চাশ বছরে ১৬০০ সন্ততি জন্মগ্রহণ করে থাকে। এই কারণে পৃথিবীতে আজ জন্মের আধিক্য এবং নানা রোগ ও পাপহুঁট মানুষ দিবে সংসার পূর্ণ।

আমার নিজের একটি শৌখিন ও সম্পূর্ণ ভাবে অবৈজ্ঞানিক অল্পসন্ধানের কথা বলি। তিরিশ বছর পূর্বে আমার এ অল্পসন্ধানের আরম্ভ এবং আজও সে বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ করা শেষ হয়নি। কলকাতার একটি সুপরিচিত বনেদী পরিবারের মানুষদের মধ্যে আমি এ অল্পসন্ধানের আরম্ভ করেছিলুম। এই পরিবারে একটি দম্পতি থেকে প্রায় তিরিশ বছরে আদি-দম্পতির জীবনকালেই— ১১৬ জন সন্ততি জন্মায়। আমার অল্পসন্ধানের সময়ে তার মধ্যে কেবল ৫৬ জন জীবিত ছিল। যেখানে জন্ম অপরিমিত, সেখানে মৃত্যুর হারও অধিক হয়ে থাকে। সেই ৫৬ জন মেয়েপুরুষের মধ্যে কেবল ২২ জন দেহ ও মন দিয়ে স্বভাবী (normal) নিরিখের। বাকি ব্যক্তিগুলি নানা দোষে হুঁট। পাগল, বন্দারোগী, জড়প্রকৃতি, হুঁসলচিত্ত, অপরিণতবুদ্ধি, অপরিণত দেহ মানুষ দিয়ে সে কশাটি শাখা-প্রশাখায় ভরা। সেই বংশটির একজন পাগল ও কয়েকজন জড়বুদ্ধির বিবাহও হয়েছিলো এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও এখন যথেষ্ট। সে পরিবারটির মূল ও শাখার চতুর্থ বংশক্রমে সেই পুরাতন কলুবের প্রবাহ ও প্রভাব আমি আজও দেখে যাচ্ছি। শাখাগুলির শিরায় শিরায় এখন জড়বুদ্ধি, বন্দা, উন্মাদ রোগ, বিস্তার হয়ে চলেছে। মূল পরিবারটি একদা বংশগৌরবে বিশিষ্ট এবং অপরিমিত ধনী ছিলো, কিন্তু কোন সংস্কৃতিগত গুণ তাতে ছিলো না। এখন ধনের পরিবর্তে দারিদ্র্য এবং আধারের অপচয়ের কারণে পরিবারটির কোন সংস্কৃতিও আহৃত হয়নি। এমন কলুব কেবলমাত্র বিবাহের পথ দিয়েই ক্রমাগত হুঁড়াতে থাকে, আর কোনই উপায়ে হুঁড়ায় না।

মেয়েদের বিবাহের বয়সের নিরিখ নানা দেশে নানা ধরণের। দেশ, জাতি, জলবায়ু, পুষ্টি, সামাজিক শ্রেণী প্রভৃতি এই বিভিন্ন নিরিখ নিয়ন্ত্রণ করে। সেটি বাহ্যিক। মূলতঃ সকল দেশের বিবাহের কালের একটি ঐক্য আছে। মেয়েদের মনে প্রীতির জাগরণ ও উৎকর্ষ যৌবনোদগম ও যৌবনের উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক কারণে মেয়েদের যৌবনোদগমের কালের যতই স্থিতিশীলতা থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সকল দেশে প্রীতির উৎসের কালটি বিবাহের কাল নির্ণয় করে এসেছে।

গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই অন্তর্নিহিত সত্যটি পাওয়া যায়। মনুষ্য ব্যবহার দুটি নিরিখ দেখা যায়। প্রথমটি তারণ্যের পূর্বেই গৌরীদান। দয়ানন্দ সর্গস্বতী শাস্ত্রব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ ব্যবহারটির নিশ্চয় করে বলেছেন যে, সেই প্রাচীনকালেও বহু ঋতুমতী হবার পর চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ঋতুচক্র সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হলে বিবাহযোগ্য বলে বিবেচিত হতো। তার অর্থ, তখন ১৬।১৭ বৎসরটা বিবাহের বয়স ছিল। দেহের নিরিখে এ দৃষ্টিভঙ্গীটি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক। দেহের এ পুষ্টিতে প্রীতির পুষ্টি ও বিস্তার নিহিত। আমাদের দেশে কিছুকাল আগে পর্যন্ত তারণ্য ও বিবাহ দুগুণে ঘটনা ছিলো। বর্তমানকালে এ রীতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। তারণ্য ও বিবাহের মাঝে কালব্যবধান এখন বেশ বেড়ে চলেছে। বাঙালী মেয়েদের ঋতু আরম্ভের ঠিক বয়স আজও আমাদের জানা নেই। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে জুবর্ট (Joubert) নামক একজন ইংরাজ ডাক্তার লিখে রেখে গেছেন যে, কলকাতাবাসী মধ্যশ্রেণীর বাঙালী মেয়েদের প্রথম ঋতুর বয়স ১২'৬ বৎসর। গড়পড়তা ১২।১৩ বছর বয়সটাকে আমাদের মেয়েদের প্রথম ঋতুর বয়স বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য বিষয়শূন্য হলে ঋতুর হ্রাসের সম্যক প্রতিষ্ঠা হতে প্রায় হুঁ বছর লাগে এবং অল্পপূরণ হতে ঋতুর প্রথম প্রকাশের কাল থেকে প্রায় পাঁচ বছর লাগে। স্বাভাবিক অবস্থায় মেয়েদের দেহ পরিপক হয় প্রায় কুড়ি বছর বয়সে। ওই বয়সে মনেরও পরিপকতা হতে আরম্ভ হয়।

বিবাহ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ অবস্থা। সে দায়িত্ব স্বীকার করতে গেলে শুধু দৈহিক উৎকর্ষটাই যথেষ্ট নয়, মানসিক উৎকর্ষও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। মানসিক উৎকর্ষ হতে বিলম্ব হলে, দৈহিক উৎকর্ষের সহিত তার বিশেষ কোনো যোগ নেই। আনুমানিক ১১।২০ বছর বয়সে ছেলেদের মানসিক উৎকর্ষ আরম্ভ হয়। তৎসঙ্গী হ্যাভেলক এলিস এবং বাকুল সাহেবদের মতে ২২'২ বৎসর বয়সে মানসিক পরিণতির প্রথম সোপান আসে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দেহ ও মনের অকালপকতা হয়। সে কারণে তাদের মানসিক উৎকর্ষের কালারম্ভ ১৮।১৯ এবং মানসিক পরিণতির প্রথম সোপান একুশ বৎসর বয়সে ধার্য করা যেতে পারে। ফলে, কুড়ি থেকে একুশ বছর বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলে মনে হবে। বিবাহের বয়সের বহিঃরাজ এই, এখন তার অন্তরঙ্গ রূপটাও দেখা প্রয়োজন।

পুরুষ ও নারীর দেহের বিকাশ ও উৎকর্ষের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই যৌবন বিভাগটির অনেক গুরুত্ব। প্রায় চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষ উৎকর্ষলাভ করে চলে। কিন্তু বছর কুড়ি বয়সে পূর্ণ যৌবনের প্রথম সোপানটিতে পা দিলে স্বাস্থ্যবতী নারীর উৎকর্ষ রুদ্ধ হয়। এটি বাহ্যিক দৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধিক্ষণটির পরবর্তীকালে নারীদেহের ভিতরে ভিতরে উৎকর্ষ ঘটতে থাকে। কারণ তাকে প্রকৃতির উদ্দেশ্য পূরণ অর্থাৎ সন্তান ধারণ করার জন্য সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রস্তুত হতে হয়। সৃষ্টির ভার একমাত্র সেই বহন করে। সুতরাং পুরুষ বাইরে থেকে উৎকর্ষ লাভ করে এবং নারীর উৎকর্ষ সম্পূর্ণভাবে আন্তরিক ব্যাপার। বিবাহের জন্য দৈহিক উপাদানের এই উৎকর্ষ ও পূর্ণতা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় গুরুতর উপাদানটির নাম প্রীতি। প্রীতি স্বীকৃতি; তা থেকেই আনন্দ, ভালোবাসা ও সত্যিকার উৎসাহ হয়। নারীদেহের

উদ্বাস্যেই সব মেয়ে তাদের স্বভাবধর্ম প্রীতিতে গিয়ে পড়ে। মনুষ্যমাত্রেরই একটি প্রাকৃতিক মূল শক্তি আছে, তার নাম সত্ত্বশক্তি। এ শক্তি জীবনের একমাত্র সাথ বস্তু। সেটির খানিকটা প্রাকৃতিক, খানিকটা নির্মিত। প্রাকৃতিক ভাগটা হৃদয় পূর্বসংস্কার দিয়ে গড়া। নির্মিত ভাগটা শৈশবকালে অধিকতর ভাবে মাতৃ সহবাসে গড়ে ওঠে। বাপ ও পরিবারের তাতে দান থাকলেও সেটা সামান্য। মা ভালো বা মন্দ হলে এই সত্ত্বটুকু ভালো বা মন্দ হয়। মাতৃসঙ্গ বসত দিন ঘন থাকে তত দিন সত্ত্বের বৃদ্ধি। কিন্তু শিশুটি বেই বাইরের সমাজে যেতে আরম্ভ করে সে বৃদ্ধি নিকট হয়। আমাদের প্রাচীন একটা বাক্য আছে যে মানুষের আয়তন তার বুদ্ধাসুষ্ঠির মতো। তার মানে তার এই শিশুসুলভ স্বল্প সত্ত্বশক্তি।

শিশু সমাজে বিচরণ করতে আরম্ভ করলেই তার মনের ওপর বাহিরের ছাপ পড়তে আরম্ভ করে। ইচ্ছাগ থেকে কলেজ, কলেজ থেকে সংসার, তার বিচরণের পরিধি ও মাত্রাটা যেমন বাড়ে, সেই বাহ্যিক ছাপটাও তেমনি পুরু হতে থাকে। তার সত্ত্বকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পুরু ব্যাহ্যিক ছাপটার নাম ব্যক্তিত্ব বা পার্সোনালিটি। আমি দ্বিতীয় ইংরাজী শব্দটাই ব্যবহার করবো, কারণ প্রথম শব্দটা আমাদের জোর করে বানানো, ঠিক ও সুধকর নয়। পার্সোনালিটি শব্দটার মূল অর্থ মুখোস। সত্যই সেটা মুখোস ছাড়া আর কিছুই নয়। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে আমরা এখন পার্সোনালিটিকে খুব বড়ো দাম দিয়ে থাকি। কিন্তু পার্সোনালিটি ভারি ঠুনকো জিনিষ। সঙ্কটকালে একটা টুসকিও সে সহিতে পারে না, তৎক্ষণাৎ মুখোসের মতই ধসে পড়ে। সুতরাং, আমাদের এই সঙ্কটবহুল জীবনে আমরা বার বার সত্ত্ব গিয়ে পড়ি। সত্ত্ব মন্দ হলে গুলিয়ে বাই, সেটি ভালো হলে সঙ্কটে উত্তীর্ণ হই। আমরা যাকে বিপদের হরি বলি সেটি এই শুদ্ধসত্ত্ব!

আমরা সমাজে থেকে যে আচার আচরণ গ্রহণ করি বা লেখাপড়া শিখি, তাতে এই পার্সোনালিটি বা মুখোস নির্মিত হয়। চেতনা সাধনা ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন লেখাপড়ার পদ্ধতি নেই বা সত্ত্ব শক্তি নির্মাণ করে দেবার ক্ষমতা রাখে। নিজের না গড়ে নিলে সত্ত্ব বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ লাভ করে না। বা আমরা চেতনার যুক্ত হয়ে শিখি সেটুকু সত্ত্বকে পুষ্ট করে। বস্তুত পক্ষে, পার্সোনালিটি রুদ্ধকর বিকৃতি। কিন্তু একটি প্রকৃত পার্সোনালিটি আছে, সেটি শুদ্ধসত্ত্ব সাধনার উপজাত জিনিষ। তার কখনো বিনষ্ট হতে না। কিন্তু কেবল মহাপুরুষেরা সেটি লাভ করেন, সাধারণ মানুষ করতে পারে না।

বলেছি যে, পুরুষের পথ বিতর্ক বিচারো, প্রীতি ও সত্ত্ববৃদ্ধি মেয়েদের মূল জীবনপথ। মেয়েদের সত্ত্ব ভালো বা মন্দ বাই হোক না কেন, প্রীতি তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেটি অপরিহার্যরূপে বেড়ে চলে। কুড়ি বছর বয়সের পরের নারী দেহের আভ্যন্তরিক উৎকর্ষের মতো প্রীতির উৎকর্ষও সম্যক ভাবে আভ্যন্তরিক। বিবাহের ক্ষেত্রে স্মৃতি' পেয়ে এই প্রীতি-বীজ ক্রমশ আনন্দ ভালোবাসা ও ভক্তির ফুল ফোটার, ফল দেয়। নারীর প্রীতি-বিবাহে একটি প্রকৃত উপায়।

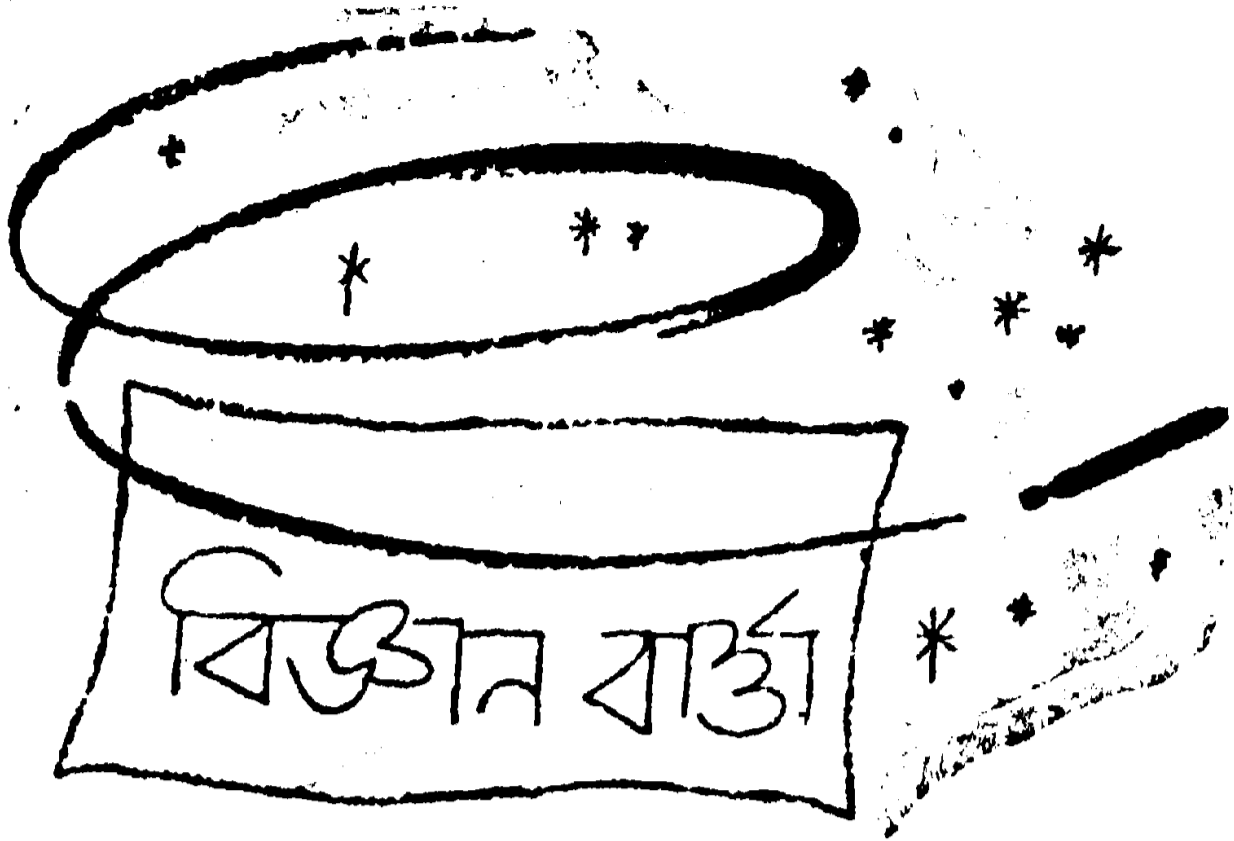
বর্তমান কালের আবহাওয়ার প্রভাবে মেয়েরাও পুরুষের মতো নিজের পার্সোনালিটি গড়ে তুলতে তৎপর। তার নানা উপায়। তার ফলে মেয়েদের দেহ মেয়েলি নিরিখ থেকে সরে চলেছে। তাদের যৌবন আহত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রীতির হ্লাদিনী শক্তি সাংঘাতিক ভাবে ক্ষুণ্ণ। এ ঘোর পরিবর্তন একটু পূর্ববেক্ষণ করলেই বেশ বোঝা যায়। এই হ্লাদিনী শক্তিটুকুই বিবাহের মূল ভিত্তি। প্রকৃতি প্রতিঘাতপরায়ণ, নির্মম। তার দরবারে আপিল বলে কোনো জিনিষ নেই। তার পথ থেকে বিচ্যুত হলে, বিকৃত হলে তার আদেশ হয় মৃত্যু না হয় উর্বরতা।

পার্সোনালিটি লাভ করতে গেলেই মেয়েদের স্বধর্মবিচ্যুত হতে হয়। তার ফলে প্রীতির স্থানে কাঠিন্দ আসে। প্রীতি ভালোবাসা সংসারের শ্রেষ্ঠতম শক্তি। সে ছুটি আভ্যন্তরিক ভাবে নারীশক্তি। সে শক্তি হারিয়ে গেলে সংসারে ঘৃণা, বিরোধ, নিষ্ঠুরতা, হিংসা ছাড়া আর কিছুই থাকে না; প্রীতির আধার না হলে বিবাহ কখনোই পূর্ণ নয়।

বিবাহের উদ্দেশ্য

বিবাহের উদ্দেশ্য কি? আমাদের দেশের প্রাচীন মত বলে, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্ঘ্য।।' সন্তানের জন্মদান করা এবং বতদিন না সে-সন্তান আত্মনির্ভর হয় ততদিন তাকে লালন করা বিবাহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এই স্তরে মানুষ সকল স্তম্ভপায়ী জীব এবং অধিকাংশ পক্ষীর সঙ্গে সমান। এটিকে মানুষের জীবন্তর বলা যায়। কাম আদিম, মানুষের সঙ্গে তার জন্ম। আদিম কালে কামের উদ্গতিগত সূক্ষ্মতর প্রকাশের অর্থাৎ প্রেমের কোন উপলব্ধি ছিলো না। নিজের উর্দ্ধ গমনের প্রয়োজনে মানুষ বহুকাল পরে প্রেম ও নীতির সৃষ্টি করেছে। আদিম কালে যেমন ছিলো, আজও তেমনি অনেক মানুষ বিবাহের জৈব উদ্দেশ্যটিকে মুখ্য বলে জানে। কাম মানুষের উচ্চতম এবং সূক্ষ্মতম ভাবের ও ক্রিয়ার উৎস। কামের উর্দ্ধ পরিণামের (উর্দ্ধ পরিণাম বা পরিবর্তন—Evolution) অবস্থাতেই মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করে এবং সেই শক্তির কারণেই চাক্ষুশ সাহিত্য ধর্ম প্রভৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে। ভালোবাসা মহিমময় কামশিল্প। সে আনন্দ কেবল একটি আত্মব উপভোগ নয়, সেটি মানুষকে আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছে দিয়ে তার আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে। "আধ্যাত্মিক" অর্থে আমি ধার্মিক কিছু বলছি, আমাদের সূক্ষ্মতম অহুভূতিরই ইঙ্গিত করছি। এ উর্দ্ধ পরিণামের কথা আমরা যথাস্থানে বিচার করবো।

কেবল দৈহিক মিলন বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য, দেহ, মন, আত্মা এই ত্রয়ীর নিবিড় সম্যক মিলন, দুটি বিকৃত যৌবন ব্যক্তিকে একাত্ম করা। দৈহিক মিলন তার ভিত্তি্বরূপ, কেননা রতিমিলনের মতো এমন প্রগাঢ় সত্ত্ব মানুষের আর নেই। যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উৎকর্ষ লাভ করেছে তার রতিমিলন শুধু দেহের মিলন নয়, আর একটি আত্মাতে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া। পাঠক-পাঠিকাকে এ কথা বেশ স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের কোনো ক্ষেত্রে আমরা বস্তুগত পথ ছাড়া আধ্যাত্মিক সোপানে উঠতে পারি না। বিবাহের দুটি স্তর। একটি জীবন্তর, সেটি প্রকৃতির রাজ্য। অপরটি মামবস্তর, সেটি সত্ত্বতির রূপে রূপায়িত। [ক্রমশঃ।



যুক্তির মুখে আফ্রিকা

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপনিবেশ দখলের লড়াই থেকেই প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর্ব বখন শেষ হোল, তখন দেখা গেল ইতিহাসের গতি সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে যায়নি। সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করার লড়াই-এর পরিণাম হোল ছনিয়ার এক যষ্ঠাংশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু তবু শিক্ষা হোলনা সাম্রাজ্যবাদীদের। উঠে-পড়ে লাগল তারা নতুন সমাজতন্ত্রকে নাবালক অবস্থায় গলাটিপে মারবধি জন্ত। তারা ফ্যাসিষ্ট কালসাপকে পুস্তে লাগল দুধ কলা দিয়ে। কিন্তু সেই কালসাপ ছোবল মারল আগে তাদেরই। কালসাপকেই আবার লড়াই না বেধে আর উপায় কি? দুটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে লড়াই দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরমপন্থী ফ্যাসিষ্ট জোট এমন সময় ঝাঁপিয়ে পড়ল সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আর তাদের সঙ্গে হাত মেলানো সম্ভব ছিল না। তবে যুদ্ধের আগাগোড়া তারা যে নীতি অনুসরণ করেছিল, তার মূল কথা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে দাবিয়ে নিজেদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সেই সঙ্গে 'যাক শত্রু পরে পরে' এই প্রবানবাক্য মেনে জার্মানী ও সোভিয়েতকে যতদিন পারা যায় লড়িয়ে রেখে, সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী ও সাম্রাজ্যবাদের শত্রু সমাজতন্ত্র এই দুই পাখীরই এক টিলে ডানা ভেঙ্গে দেওয়া।

২৪.৪	উস্মা
১২.৭	মিসো
১৫.২	টিন
৪৭.৭	জার্মানি
৬২.৮	সোশাল
৯৬.৬	হীরা
১২.৪	অ্যাঙ্গলো
৩২.৬	ফ্রান্স

বিশ্বের খনিজ ধাতু উৎপাদনে আফ্রিকার শতকরা অংশ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হোল। জয় হল ইঙ্গ-মার্কিন ক্রম মিত্রপক্ষের। কিন্তু সাম্রাজ্যের জন্ত যে যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়েছিল, তার পরিণাম এবারেও হোল ঠিক উল্টো। সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে বোল আনা বার হয়ে গেল পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি। তারপর ক্রমে ক্রমে এশিয়া মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের যে উপনিবেশগুলি বাকি ছিল, সেগুলিও গেল হাত-ছাড়া হয়ে,—বোল আনা না হলেও, আট-দশ আনা তো বটেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন হোল কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের নাগপাশ তারা এখনো ছিঁড়তে পারেনি।

সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসন থেকে এশিয়া আজ মুক্ত। বাকি আছে আফ্রিকা। আফ্রিকাই আজ ফরাসী, ব্রিটিশ, জার্মান ইতালীয় এবং অজ্ঞাত সাম্রাজ্যবাদীদের আশা-ভরসা। তাই মরীয়া হয়ে তারা লড়াইে কাক্রি জাতিগুলির যুক্তি-আন্দোলনের বিরুদ্ধে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ অ্যালাজিরিয়ার হিংস্র যুদ্ধ চালাচ্ছে ৫ বছর ধরে। খেতাজ-প্রভৃৎকে আইনে মর্যাদা দিয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকার কুলীন ও বর্ণসংক্রম উপনিবেশভোগীরা কালো কাক্রিদের সাজা রক্তে জমি লাগ করে ফেলেছে। হীনজাতির মানুষকে হত্যা করা সেখানে পাপ নয়, পুণ্য, খেতাজ জাতিগুলির কৌলীক অক্ষুণ্ণ রাখবার, নীলরক্ত নির্ভেজাল রাখবার মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ঊনবিংশ শতকে ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী উঠতি বয়সে কালো মহাদেশে বেশ বড় একটি চাংড়া হাতিয়ে নিয়েছিল, কোথাও ছিল, কোথাও বলে, কোথাও বা কৌশলে। প্রথম মহাযুদ্ধ বখন শেষ হোল, তখন আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশের আয়তন ছিল ৭৬৬৬০০০ বর্গ কিলোমিটার। এই জনবিরল কিন্তু রত্নগর্ভা এলাকার বাস করত ২ কোটি ৮০ লক্ষ কাক্রি এবং তাদের ১ লক্ষ খেতাজ প্রভৃৎ।

ফরাসী-কবলিত পশ্চিম ও বিষুববৈধিক আফ্রিকার উত্তরাংশকে আফ্রিকানরা বলত 'মাগ্রেব'। মাগ্রেবকে ফরাসীরা তিন টুকরো করে যে তিনটি প্রশাসনিক এলাকা খাড়া করে, সেগুলিই আজ অ্যালাজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও মরক্কো। সমগ্র ঔপনিবেশিক অঞ্চলটি বিভক্ত হয় এই ভাবে:—মরিতানিয়া, সেনেগাল, সুদান, হস্ত-ভলতা, গিনি, গজদন্ত উপকূল, দাহোমে, নাইগার, গার্ব, মধ্য কংগো, উরাজি—শারি ও চাদ।

তারপর কালো আফ্রিকার ভূগর্ভে নিহিত যথের ধনের লোভে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পিছনে পিছনে এগিয়ে এল ব্রিটিশ, বেলজিয়ান, পর্তুগীজ ও স্পেনীয় উপনিবেশলিপ্সু। ব্রিটিশরা বুয়োর-যুদ্ধ করে আদিবাসীদের সবংশে বিনাশ করে জেকে বমল দক্ষিণ-আফ্রিকার, মিশরে, সুদানে এবং অজ্ঞাত অঞ্চলে। বেলজিয়ানরা দখল করল কংগোর কিছুটা এবং ফরাসী উরুন্দি; পর্তুগীজরা হাতিয়ে নিল আংগোলা, মোজাম্বিক ইত্যাদি। স্পেনীয়দের ভাগে পড়ল মরক্কোর খানিকটা। এই ভাবে আফ্রিকার গোটা তিরিশেক দেশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণত হোল, যাদের সম্মিলিত অঞ্চলের আয়তন হচ্ছে প্রভু-দেশগুলির মোট এলাকার ১৪ গুণ।

ধনতান্ত্রিক ছনিয়ার হীরক-সম্পদের শতকরা ১১ভাগ নিহিত রয়েছে আফ্রিকার ভূগর্ভে, স্বর্ণসম্পদের রয়েছে শতকরা ৫১ ভাগ, ক্রোমিয়ামের ৪০ ভাগ, তামার ২৭ ভাগ। সাহ্যারার উত্তর অঞ্চলের

বুকে বইছে খনিজ তৈলের কলুধারা। সারা দুনিয়ার উপর কোর্পেটর হুই-ভূতীয়ংশ এবং বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম উপর হয় বেলজিয়ান কংগোয়, যার শতকরা ১০ ভাগ চালান যায় আমেরিকায়। সেনেগ্যাল ও গ্যাণ্ডিয়ায় অর্থনীতি নির্ভর করে চীনাবাণ্য রপ্তানী করার ওপর। গজরস্তু উপকূলের অর্থনীতি কোকো গাছের ক্ষীণ বৃদ্ধে দোহুল্যমান, উগাণ্ডার অর্থনীতির মেরুদণ্ড হচ্ছে তুলা এবং কফি। ষানার প্রধানমন্ত্রী নক্রুমা সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর দেশের সব চেয়ে জরুরী অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে একটি মাত্র রপ্তানীর সামগ্রী অর্থাৎ কোকোর উপর জাতীয় অর্থনীতির নির্ভরশীলতা। ব্রিটিশ নাইজিরিয়া এক প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি ছিল। আরবী অভিযানে সেই 'সংঘে' সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে। বোড়শ শতকে ঠিক ভারতের মতই ব্রিটিশ বণিকরা সেখানে হানা দেয়। বণিকদের পিছনে পিছনে এল সবুট সঙ্গীনধারী মৈনিক। বণিকের মানদণ্ড সেখানেও রাজদণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আজ নাইজিরিয়ার খনিজ সম্পদের শতকরা ৭০ ভাগ ব্রিটেনে চালান যায়।

আফ্রিকার জ্যাক্ত মানুষ কেনা-বেচা আজও বন্ধ হয়নি। সেটা কোথাও চলে প্রত্যক্ষে, কোথাও পরোক্ষে। আদমসুমারীর হিসেব মত নাইজিরিয়ার লোক-সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি হলেও, আসল সংখ্যা আরো কিছু বেশি; কারণ লোকে 'পোল্ট্যান্ড' থেকে রেহাই পাবার জন্তে ছেলেপিলের সংখ্যা গোপন করার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নাইজিরিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকে দলে দলে লোক ধরে পশ্চিম গোলার্ধে চালান দিয়েছে। আজ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে যে নিগ্রোদের নির্যাতনের খবর আমরা পাই, তাদের পূর্ব-পুরুষদের অধিকাংশই এসেছিল পশ্চিম-আফ্রিকা থেকে, যেমন দক্ষিণ-আফ্রিকা ও সিংহল-প্রবাসী ভারতীয় কৃষ্টিমজুরদের পূর্ব-পুরুষদের চালান দেওয়া হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে। তারাও আজ কালা-আদমি হিসাবে কাফ্রিদের মতই দক্ষিণ-আফ্রিকায় পদদলিত। পর্তুগীজ উপনিবেশ আংগোলা ও মোজাম্বিকে ফরাসী চাদে, বেলজিয়ান কয়লা-উরুন্ধিতে সাম্রাজ্যবাদীরা কাফ্রিদের জোর করে কুঠি ও খনিতে, সড়ক নির্মাণে কাজ করতে বাধ্য করে। স্পেনীয় ও পর্তুগীজ কর্তারা অন্যান্য দেশের উপনিবেশের কলকারখানায়, খনিতে ও আবাস কুলি বেচে দেয় এবং শিশু বিক্রয় ব্যবস্থা পর্যন্ত আজও চালু আছে। যে সব ক্ষেত্রে উপনিবেশ-ভোগীদের আবাদ বা কলকারখানা করার পরসানা থাকে, সেক্ষেত্রে তারা কুলি জোগাবার ঠিকা নিয়ে পরসনা কাষায়।

পর্তুগীজ মালিকরা মোজাম্বিক থেকে প্রতি বছর লক্ষাধিক মজুর চালান দেয় বোডেসিয়া ও বেলজিয়ান কংগোতে এবং সেই ঠিকা থেকে কমিশন কামায়।

আফ্রিকার মানুষের রক্ত নিংড়ে নেবার আর একটি মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে, 'কনসেশন' বা বিশেষ সুবিধা। যেমন ধরুন বেলজিয়ান কংগোর সমস্ত জমি বেলজিয়ান রাজকূটের হস্তায়ার এনে

(যাধীন কংগোর জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না) এই খনিজ কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সাহারা মরুভূমিকে সাম্রাজ্যবাদীরা ভাগাভাগি করে নিজে তৈলের সন্ধানে লেগে পড়েছে। ইন্দোনেশিয়া, ইরাক ও কুবায়েতের মতই একচেটে ধনকুবেরের দল কংগো, নাইজিরিয়া, অ্যালজিরিয়া ও বোডেসিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করার বিশেষ অধিকার আদায় করে নিয়েছে। বেলজিয়ান কংগোর মাকিং ইউরেনিয়াম কোম্পানীগুলি স্থানীয় আইনের আওতায় পড়ে না। পুলিশ, বরকন্দাজ, আদালত ও জেলখানা—সবই তাদের নিজেদের। অ্যালজিরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের অহ্যাচার শেষ হয়নি। অ্যালজিরিয়ার তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ তারা মার্কিন স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর হাতে তুলে দিয়েছে। লাভের বখরা সমান সমান এবং অ্যালজিরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা যে টাকা লাভ করছে, তাই দিয়ে তারা চালিয়ে বাচ্ছে অ্যালজিরিয়ার মানুষের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক সংগ্রাম। নাইজিরিয়া থেকে ব্রিটিশ কোম্পানীর একরকম বিনা পরসায় দেশের শতকরা ৭০ ভাগ খনিজ সম্পদ স্বদেশে নিয়ে যায়। নাইজিরীয় শ্রমিকের মজুরী ব্রিটিশ শ্রমিকের মজুরীর ১০ ভাগের একভাগ এবং একজন ব্রিটিশ শ্রমিক এক সপ্তাহে যা কামায়, সত্বসবে একজন নাইজিরীয় শ্রমিক তার অর্ধেকও কামাতে পারে না। ফরাসী অ্যালজিরিয়ার সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানীগুলি ১১০০ থেকে ১১৪০ সালের মধ্যে যে ২০০০ কোটি ফ্রাংক মূলধন বিনিয়োগ করে, তার অধিকাংশই এসেছিল অ্যালজিরিয়ার মানুষকে শোষণ করে।

এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করার বিরুদ্ধে প্রথম আওয়াজ শোনা যায় সানইয়াং সেনের জিনীতির (সান্-মিন্চু-আই) মধ্যে। সেই জিনীতি বৃদ্ধ বোধনা করেছিল বৈদেশিক কোম্পানীগুলির বিশেষ সুবিধা ভোগের বিরুদ্ধে। সানইয়াং সেনের সেই আদর্শ আজ পরাধীন দুনিয়ারক সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলতে সাহায্য করেছে। সেই আদর্শ বহন করে চীনের মানুষ যেমন চীনা জনগণের মুক্তিবাহিনী গঠন

৩১.৩	সেনেগাল
৪৪.৩	আংগোলা
৬১.৬	ভ্রামন
২৭.৪	বোডেসিয়া
৬০.৬	ডালা
২৬.৪	চিন
৩৮.৪	কয়লা
১০.৮	আফ্রিকা

ব্রিটেনে খনিজ দ্রব্য আমদানীতে আফ্রিকার শতকরা অংশ

২৭	২৩শ
২৬	ববার
৬২	কামলা
৭৬	খানসিদ্দিক
২০	দেশলাহ
৬২	পাট
৮৬	চা

স্বাধীন ভারতের শিল্পে বিদেশী মূলধনের শতকরা অংশ

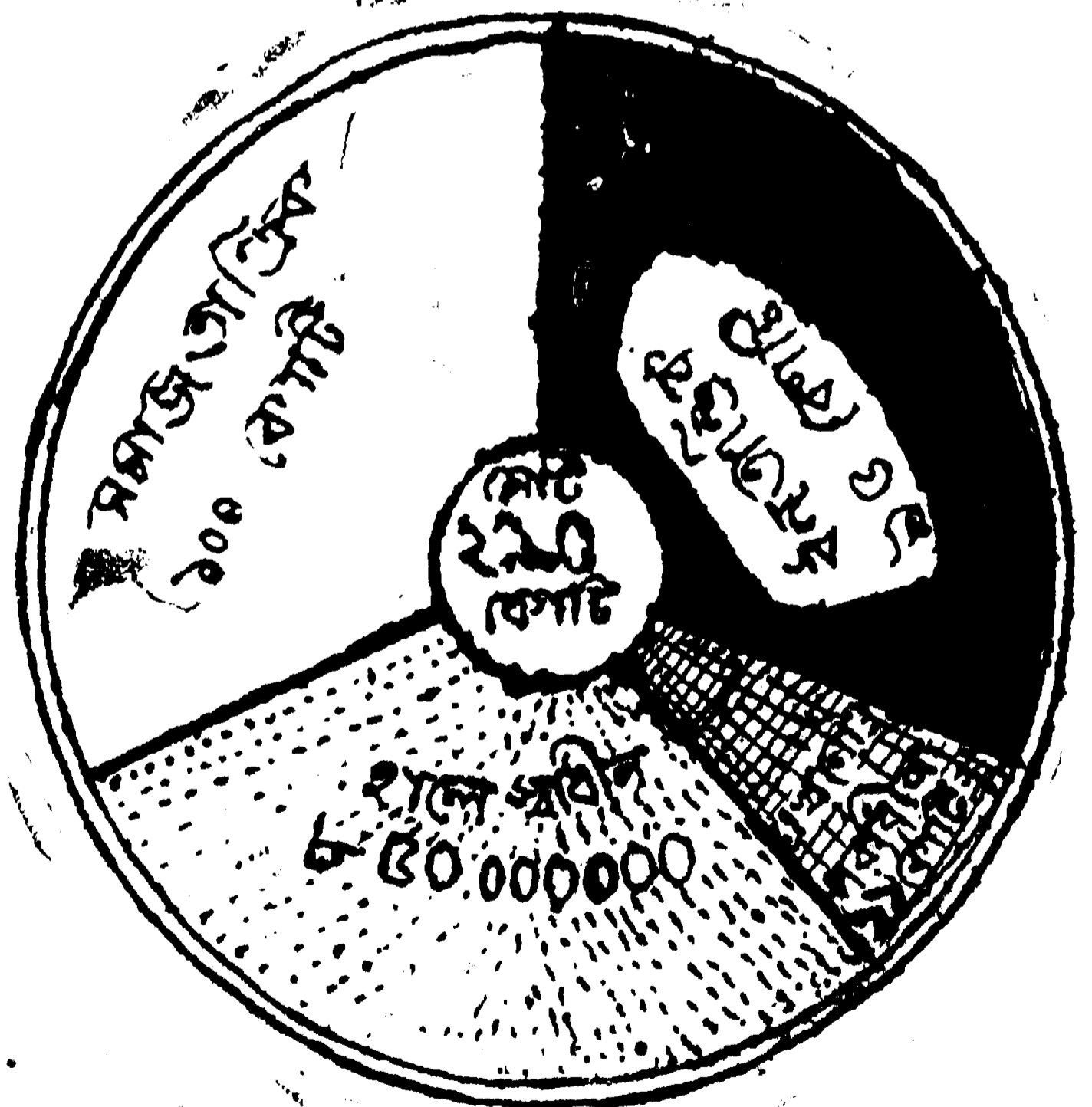
করে ৩০ বৎসর গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল, ঠিক তেমনই আজ অ্যান্টিভিয়ার নিপীড়িত মানুষ গঠন করেছে জাতীয় মুক্তি-বাহিনী— যে বাহিনী গত ৫ বছর ধরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গেরিলা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রাচীন রোমের উপনিবেশভোগীরা বিজিত অঞ্চলে দাস বেনা-বেগা করে ও ভেট নিয়ে সঙ্কট থাকত। প্রাথমিক ধনসঞ্চয় ও অশিক্ষিত—ধনতন্ত্রের যুগে উপনিবেশবাদীরা হোল আর এক কাঠি সবেশ। তারা দাস-ব্যবসা বজায় রাখল, কুলি চালান দেবার ঠিকা নিল এবং জলের দরে কাঁচামাল কিনে আগুনের দরে তৈরি মাল বেচতে লাগল। সাম্রাজ্যবাদী যুগে উপনিবেশবাদীরা তাদের পূর্বপুরুষদের ঘৃণ্য ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে তার ওপর সবাই একজোট হয়ে খাড়া করেছে এমন এক সর্বগ্রাসী ঐতিহ্য উপনিবেশবাদ বা গোটা ধনতান্ত্রিক ছুনিয়ার মেহনতী জনতাকে সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্যে পরিণত করেছে। কিন্তু কালো মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। ভিয়েতনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়, বালু সংশ্লেশন, সমাজতান্ত্রিক ছুনিয়ার দুর্বার অগ্রগতি এবং এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীনতা-বিজয়ী দেশগুলির সাফল্য আফ্রিকার জনগণকে সংঘবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা দান করেছে। স্বাধীন স্বাধীনতা লাভ আফ্রিকার ঘটনা-প্রবাহকে দিয়েছে নির্দিষ্ট রাস্তার ইঙ্গিত। ১৯৫৭ সালে আফ্রিকার ৪টি প্রধান রাজনৈতিক পার্টি গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক আফ্রিকা পার্টি বা আর, ডি, এ, 'আফ্রিকান কনভেনশন', 'আফ্রিকান সমাজতন্ত্রী আন্দোলন' এবং আফ্রিকান স্বাধীনতা পার্টি। এ ছাড়া সারা আফ্রিকার প্রমিকশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করেছে সারা আফ্রিকা প্রমিকসংঘ। তু গল সরকার বেকারদার পড়ে পের পর্বন্ত অ্যান্টিভিয়ার বাদে অল্প উপনিবেশগুলিকে ফরাসী কমিউনিটির মধ্যে স্বাধীন হবার সুযোগ দিতে চান এবং এই বলে সকলকে শাসন যে, কোন দেশ যদি ফরাসী কমিউনিটির মধ্যে না থাকে, তাহলে ফ্রান্স আর কোন দিক দিয়েই জাতি সাজায়া করতে না। একমাত্র গিনি ছাড়া আর কোন

দেশের জাতীয় নেতারা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পাননি। সেকৌ তুরের নেতৃত্বে গিনির জাতীয় নেতৃত্ব সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন এবং তিনি হাল সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে গিনি-সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি পাকা করে এসেছেন। ওদিকে সম্মিলিত জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্যামেরুন ও টোগোল্যান্ড আজ স্বাধীন। সেনেগাল, সুলদান, দাহোমি, হবুতে-ভোলতা, নাইজার, গজদন্ত উপকূল ও বিয়ুবৈরথিক আফ্রিকার পরিস্থিতি অন্তরকম বলে এই সব দেশের জাতীয় নেতারা ফরাসী কমিউনিটির মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করতে রাজী হয়েছেন। অর্থাৎ এই দেশগুলি নাটোর বেড়াফালে যেরা ইউরাক্রিকা পরিকল্পনার মধ্যেই থাকবে—যে ইউরাক্রিকা মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রণের মতে ২০।২৫ বছরের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে নিয়ামক সংগ্রামের কেন্দ্র হবে। আফ্রিকাকে তাঁরা নাটোর অঙ্গাগারে পরিণত করতে চান। সেই দিক থেকে দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্রিটিশ সামরিক বাঁটিগুলি এক মরক্কো, লীবিয়া, ইরিত্রিয়া ও অস্ত্র জায়গায় মার্কিন বাঁটিগুলি অত্যন্ত জরুরী।

১৯৬০ সালে স্বাধীনতালভ করবে পৃথিবীর বৃহত্তম উপনিবেশ নাইজিয়ারা (লোকসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি) এবং ইতালীয় সোমালিল্যান্ড। পরাধীন আফ্রিকার মানচিত্রে আজ রেখারিত হয়েছে ১০টি স্বাধীন দেশ, যেগুলির মোট লোকসংখ্যা হচ্ছে ৭ কোটিরও বেশি অর্থাৎ আফ্রিকার লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ।

ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ শিখর সাম্রাজ্যবাদের দিও মণ্ডলে আজ গোধুলির কালো ছায়া নেমে এসেছে। —তরুণ চট্টোপাধ্যায়



সারা ছুনিয়ার ২১০ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১১ কোটি লোক এখনো সাম্রাজ্যবাদের অধীনে আছে। ১০০ কোটি সমাজতন্ত্র রচনা করছে এবং ৮৫ কোটি লোক হালে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।



একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় বসান যায়

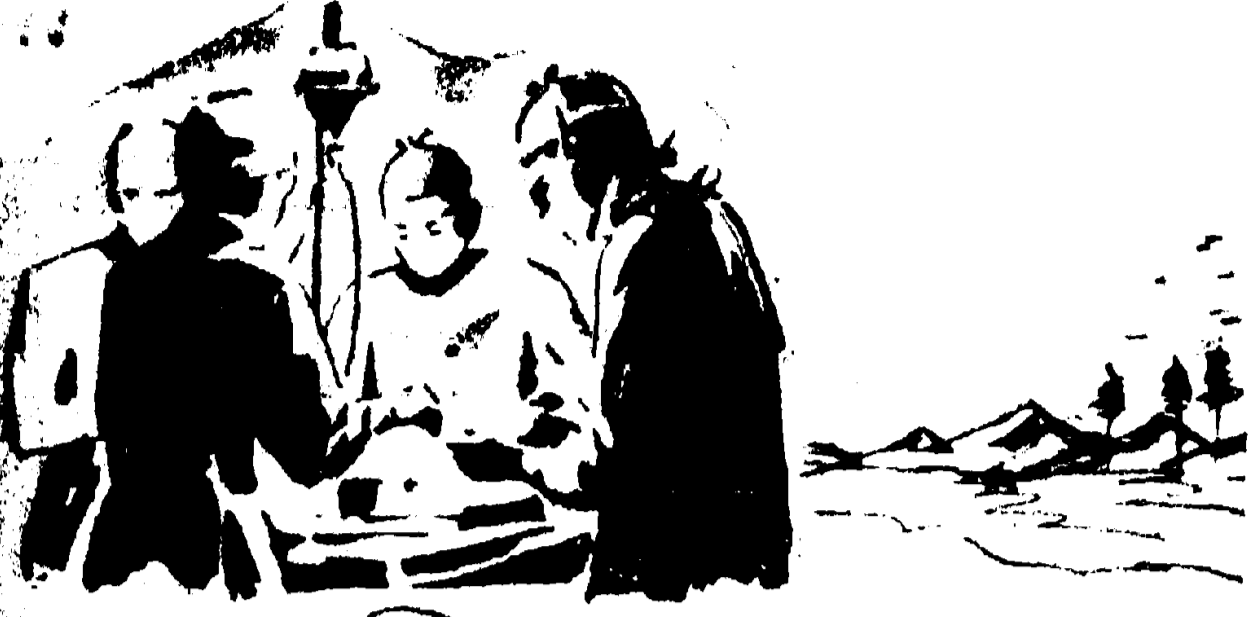
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা



ঠাকুরমাও পছন্দঃ ঠাকুরমা কি আজকের লোক-
তার এতদিনের অভিজ্ঞতা। তিনিও খুশী হয়েছেন
লক্ষীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি
ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে রঙীন।
লক্ষী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড়
কাচা যায় এবং লক্ষী এটাও দেখেছে যে খুঁড়ি, সাট,
বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য রকম
সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য-
করী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটি কণাকে বার করে
দেয়, কাপড় আছড়ানোর দয়কার হয়না। আপনার
পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট
সাবান ব্যবহার করুন না কেন?



সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে



প্রদীপ ও পতঙ্গ

(শ্রীশশিশেখর বেনকেয় হিন্দী গল্প 'বর্ক' ওর বিজলী'র
ছায়া অবলম্বনে)

তেজেশ্বরলাল মজুমদার

সারা পৃথিবীটা যেন কেঁপে উঠলো কণিকের জঙ্ক। চাকর
স্বপ্নভরা চোখের পেলব-মন্ত্রণ পাপড়ি ছুটোকে ভিজিয়ে
দিলেন রাজিন্দরনাথ। বহুদিনের নৈকট্য থেকে উদ্ধৃত আবেগটুকু
এতদিন বৃষ্টি এই সুরোগটিরই প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়েছিল।

কিন্তু পরক্ষণেই আবেগ যখন কিছুটা শিথিল হয়ে এলো, তখন
লজ্জার অবনতা চাকর মত রাজিন্দরনাথও চোখ তুলে তাকাতে
পারলেন না। নিজের আটশ বছরের জীবনে এত নিকট-সান্নিধ্য
কোনও দিনই কোনও মেয়ের কাছ থেকে পেতে পারেননি তিনি।
তাই এই একটু আগে বা আদায় করে নিলেন তিনি চাকর কাছ
থেকে, তা তাঁর জীবনের প্রথম অমুভূতি—স্বপ্নময়, মোহময়,
কামময়। জ্বপিশেখর দুক-দুক স্পন্দনেও যেন এই অমুভূতির
আলোড়ন জেগে উঠেছে।

অথও শুদ্ধতায় কেটে গেল কয়টি মুহূর্ত। তারপর প্রথম নড়ে
উঠলো চাকরই, ক্রিপ্রহাতে অবিকল্প চুলের খোঁপা বেঁধে নিয়ে
অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলো সে হাই-হিলে ঠকঠক
আওয়াজ তুলে, অমুকম্পা-মেশানো দৃষ্টিতে বেরিয়ে যেতে যেতে
একবারটি তাকালোও সে ডাক্তার রাজিন্দরনাথের দিকে।

এ দৃষ্টির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হলো না ডাক্তার রাজিন্দরনাথের।
অপরোধী মত চাকর চল-বাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন
তিনি। চাকর যেন এক জটিল সমস্যা তাঁর কাছে। আপত্তি সে
করেনি, উৎসাহও সে দেরনি—সব মিলিয়ে যেন বিরাট এক
নির্দিকারতা চাকর মধ্যে। তার চেহারায় অমুভূতির সামান্যতম
আভাস তিনি যেমনি পাননি, তেমনি দেখেননি তিরস্কারের ক্ষীণতম
ইঙ্গিতও। বৃকভরা সংখ্যে একটি দিন কেটে গেল ডাক্তার
রাজিন্দরনাথের।

ঘটনাটা কাশ্মীরের এক সামরিক হাসপাতালের। শ্রীমগর থেকে
হাইল তিরিশেক দূরের ত্রাস গাঁও সামরিক কারণে গুরুত্ব পেয়েছে মাস
কয়েক ধরে। পাকিস্তানী হানাদাররা ওপারের গুরিয়াস গাঁও পর্যন্ত
নিজেদের করায়ত্তে এনে পূজপালের মত এগিয়ে আসছে ত্রাস গাঁও হয়ে
শ্রীমগরের দিকে। ভারতীয় সেনার হাউনি নির্মিত হয়েছে ত্রাসের
উঁচুনীচু পাহাড়ী সাহুলেমে আব অনতিদূরের নাম-না-জানা এক
গ্রামে তৈরী হয়েছে আহত সৈন্যদের চিকিৎসা করার জন্য সামরিক
হাসপাতাল।

ডাক্তার রাজিন্দরনাথ এই হাসপাতালের মুখ্য সার্জন। আটশ
বছরের বলিষ্ঠ যুবক, চেহারায় ফুটে রয়েছে মেধা আর আড়িআড়োর
মুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। বয়সে যুবক হলেও অপারেশন থিয়েটারে
সার্জারির যন্ত্রপাতি নিয়ে যখন তিনি আহত সৈন্যের পাশে এসে
দাঁড়ান, তখন কে তাঁকে অবজ্ঞা করবে কামবরসী ডাক্তার বলে?
কে অস্বীকার করবে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যতাকে?

নাস' থেকে কম্পাউণ্ডার পর্যন্ত সবাই ভয়ে হিমসিম খেয়ে যায়
ডাক্তার রাজিন্দরনাথের সামনে এসে। নাসের হাতের ট্রে থেকে
সার্জারির যন্ত্রপাতিগুলোকে এক এক করে তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
পরীক্ষা করেন রাজিন্দরনাথ। কখনও কখনও খেঁকিয়ে ওঠেন,
হোয়াট ইজ জাট। কে ষ্টারলাইজ করেছে একে?

অপরোধী মত জবাব দেয় নাস', আজে, আমি স্তর।

তুমি! রাশভারী হয়ে বলেন রাজিন্দরনাথ, রোগীকে মারবার
ইচ্ছা নেই তো তোমার? যাও, নো এ্যাণ্ড ষ্টারলাইজ ইট এগেন।

কাজে এতটুকু খুঁত থাকতে দেন না রাজিন্দরনাথ। তাই
জটিলতম অন্তর্চিকিৎসায়ও আজ পর্যন্ত অসফল হননি তিনি।
রোগী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাজিন্দরনাথের হাতে এলে সামরিক
মহলে বলাবলি হয়, বাহু জানে ডাক্তার রাজিন্দরনাথ। ওকে দেখলেই
রোগ পালার আপনা থেকে, ভাঙ্গা শরীরে জোড়া লাগে।

চাকর এই হাসপাতালের ম্যাট্রিন। আর ম্যাট্রিন হিসাবে ডাক্তার
রাজিন্দরনাথের কাছে সব চেয়ে বেশী কাজ পড়ে তারই। সৌন্দর্য,
বুদ্ধি আর প্রতিভার এক আশ্চর্য সমন্বয় চাকর মধ্যে। অকারণে সে
হাসে না, নিশ্চয়োজনে সে কথা বলে না—গাভীর্য যেন চার দিক
থেকে ছেয়ে আছে এই যুবতী ম্যাট্রিনটিকে। তবে এই গাভীর্য
আঘাতের মেঘের মত ধমধমে নয়, শীতের বৌজের মতই কলমলো।

এই ম্যাট্রিন চাকরকে বড় ভাল লাগে ডাক্তার রাজিন্দরনাথের।
আর লাগে রোগশয্যায় শায়িত যন্ত্রণাকাতর সৈন্যদেরও। সারা হৃদয়
জুড়ে যেন মমতা ভরে আছে চাকর। মায়ের মতই সবাইর শিয়রে
এসে বসে সে, কপালে হাত বুলিয়ে দেয়, সুখ-দুঃখের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করে।

*** বা ভেবেছিল রাজিন্দরনাথ তা কিন্তু হলো না পরদিন
থেকে। প্রতিদিনের মত সেদিনও নির্দিষ্ট সময়ে কাজে এলো
ম্যাট্রিন চাকর। সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে কাজের কথা নিয়ে আলোচনাও
করে গেল। চেহারা কিংবা কথাবার্তায় বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পেল না
কোনও ভাবান্তর। শুধু লক্ষ্য করলো ডাক্তার রাজিন্দরনাথ, কাজের
শেষে প্রতিদিনের মত সেদিন আর কনসালটিং রুমে গর জুড়তে
এলো না চাকর।

সপ্তাহে একটি দিন ছুটি থাকে হাসপাতালের কর্মচারীদের।
সেদিন শ্রীনগরে গিয়ে সিনেমা দেখে, নৌকা বিহার করে অথবা বাজার
করে কাটার কর্মচারীরা। মুখ্য সার্জন রাজিন্দরনাথের এই সপ্তাহান্তর
ছুটিরও কোনও নির্দিষ্ট দিন থাকে না, যেদিন হাসপাতালে কোনও
সার্জারির কেস থাকে না, শুধু সেদিনই ছুটি পেতে পারেন তিনি।

ভাগ্যক্রমে এবার একই দিনে ছুটি পেল চাকর আর রাজিন্দরনাথ।
ছুটির সকালে লনের বেতের চেয়ারে বসে এ মাসের মেডিক্যাল
জার্নালের পাতা নাড়াচাড়া করছিলেন রাজিন্দরনাথ, কিন্তু কিছুতেই
যেন মন সংযোগ করতে পারছিলেন না তিনি।

মনে পড়ে গেল, চাকর কথা। আজ ভোরে ঘুম ভাঙতেই
অর্ধস্বপ্নে অবস্থার আবিষ্কার তিনি চাকর। আজ একটি ছুটির

দিনে চাককে নিয়ে জীনগরের কোনও হুদের ধারে বসে থাকা অথবা অন্ততঃ পকে এক শো সিনেমাও কি দেখা যায় না? সেদিনের পর থেকে চাককে আর একান্তে পান নি, অথচ এখনও তাঁর কত কথা রয়ে গেছে চাককে বলবার মত।

রাজিন্দরনাথের মনের আকাশে নিমেষেই যেন রং ধরিয়ে দেয় চাকর কল্পনা। গায়ত্রোপান করে উঠে পড়েন তিনি। আলনাতে বসিয়ে রাখা স্ক্যানেলের সৌখিন স্মৃট পরে নিয়ে এক সময় বেরিয়েও পড়েন চাকর উদ্দেশ্যে।

তাঁর অস্বাভাবিক মনোভাব হ্রাস হইল। ষ্ট্রাক লাইব্রেরীর এক কোণে নিবিষ্ট মনে বই পড়ছিল চাক। পায়ের শব্দ পেতেই সমস্ত মন দাঁড়িয়ে উঠলো সে, মুহূর্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, শুভ মর্নিং ডক্টর?

শুভ মর্নিং চাক—বললেন রাজিন্দরনাথ, কি পড়ছ এত মন দিয়ে?

বই-এর মলাটের দিকে এক বারটি চেয়ে নিয়ে বললে চাক, 'মানবতার বিজয়না'—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা একজন ইউরোপীয়ান নাসের আত্মকথা।

তোমার ভালো লাগছে কি এই বই? এই বইতে তো আবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সারা দুনিয়া জুড়ে একটি রাষ্ট্র তৈরী করো, ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা নিশ্চিহ্ন করে দাও। অন্ধ স্বদেশপ্রেমকে ক্রমাহীন অপরাধ বলে গণ্য করো।

আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ডক্টর,—নিজেকে বধাসম্ভব সংঘত করে নিয়ে বললে চাক—আমার দেশকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি আর ভালোবাসি বলেই মন্ত্রাজ্ঞা আত্মীয়ে-পরিজন সবাইকে ছেড়ে দেশের প্রয়োজনে কাশ্মীরের এই রণক্ষেত্রে আসতে আমি আপত্তি করি নি। তবু আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, এই বইতে দেশভক্তি সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে আমি তাকে মানি, শ্রদ্ধা করি। এই বইয়ের বিনিময়ে লেখিকা তিনি যে মানসিক অবস্থা থেকে দেশপ্রেম সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন—তা খাঁর বুঝেছেন, এই বই তাঁদের ভালো লাগবেই। কাশ্মীরের এই রণক্ষেত্রে এসে আজ পর্যন্ত যে ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা থেকে আমিও যুদ্ধের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন মন-প্রাণ দিয়েই কামনা করি। মানুষ মানুষকে

হত্যা করবে—এ যে কত বড় ক্রুরতা—কত বড় নীচতা—তা কি আপনি বোঝেন না ডক্টর?

মুহূর্তাধিনী চাকও যে অনর্গল এত কথা বলতে পারে তা কোনও দিনই ভাবতে পারেন নি রাজিন্দরনাথ। প্রত্যুত্তরে তাই কথা বোগালো না তাঁর মুখে।

কয়েক মুহূর্তের অথচ নীরবতার পর ধমধমে ভাবকে হাঙা করে দিতে আবার কথা বলল চাকই, মুহূর্তেই বললে সে, আপনার ছুটির সকালটাকেই আমি আজ মাটি করে দিলাম ডক্টর, তাই না?

না, না, তেমন কিছু নয় চাক, আজ

একটু বেশী হয়ে গেছে এই বা—প্রাণ খুলে হাসলেন রাজিন্দরনাথ, তোমারও তো আজকে ছুটি চাক?

হ্যাঁ।

তাহলে চলো না ছুজনে মিলে জীনগর ঘুরে আসি। বোটিং না হয় সিনেমা একটা কিছু দিয়ে বেশ সময় কাটানো যাবে ওখানে।

রাজিন্দরনাথের প্রস্তাব যেন অনভিপ্রেত ছিল চাকর মত। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে সে, যদি আমি না বাই, তাহলে কোনও কতি হবে কি?

সে তোমার ইচ্ছা—বললেন রাজিন্দরনাথ।

একটু ম্লান স্মি। আমি তা হলে যাবো না ডক্টর—এর মধ্যে নিজেকে যেন আয়ত্তে নিয়ে এসেছে চাক।

রাজিন্দরনাথ আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না। হনু হনু করে বেরিয়ে এলেন তিনি লাইব্রেরীর দরজা পেরিয়ে।

এর পরের বার ছুটি এলো দীর্ঘ দশ দিন বাদে। পঞ্চাশের মত এগিয়ে আসা হানাদারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে জীবন পণ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিন্দুস্থানের বীর সৈনিকেরা। আহত সৈন্যের ভিড়ে হাসপাতাল তাই ভরে উঠেছে আর হাসপাতালের নিয়মাহুগ জীবনেও এসেছে বিরট ব্যতিক্রম। ডাক্তার রাজিন্দরনাথ অপারেশন থিয়েটারে ঢোকেন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, আর তাঁর বেরিয়ে আসতে আসতে সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিম আকাশে। কর্মবহুল দিন কাটছে রাজিন্দরনাথের, আর তাই ম্যাট্রন চাকর পাশাপাশি খেবেও এতদিন কেন জানি চাকর কথা ভাবতে পারেন নি তিনি।

কিন্তু আজ অবসর পেতে না পেতেই দশ দিনের না ডাক্তার ভাবনারা যেন বজ্রাত্তোরের মত কলকলিয়ে উঠলো রাজিন্দরনাথের স্বপ্নময়নদীতে, নিজেকে হঠাৎ কেন জানি বড় অসহায়, বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো তাঁর। অকারণে ভাবতে লাগলেন তিনি, কোন বাতু দিয়ে ভগবান গড়েছেন ওই চাককে, স্বপ্ন ব'লে কি কিছু নেই ওর?

আগের দিন সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল রাজিন্দরনাথের। ভোগরা বেজিমেটের এক আহত সিপাহীর অপারেশন শেষ করে থিয়েটারের টেবিলে ক্লাস্তির নিঃশ্বাস টানছিলেন তিনি, এমনি সময় হাই-হিলে ঠক ঠক আওয়াজ তুলে চাক এসে বললো, কনগ্রাচুলেশন ডক্টর!

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ডাক্তারগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে প্রকমর

বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত **বাকলা** ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ডাক্তার গণ্ডা রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিডারের ব্যথা, মুখে টকভাব, চেতুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দ্যগ্নি, বুকজ্বালা, আহায়ে অরুচি, স্বপ্নানিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও স্বাস্থ্যকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ। ৩২ ডোলার প্রতি কেঁটা ৩ টাক, একসে ৩ কেঁটা—৮-১১ আনা। ডাঃ, মাঃ ও পাইকারীদের পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-স্বর্নশাক্ত (পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

থ্যাংক ইউ ম্যাট্রিন ! কেমন আছে রোগী ?

খুব ভালো, বললে চাক, চলুন কোয়ার্টারে ফেরা বাক ।

কোয়ার্টার ! হঠাৎ কেন জানি উদাস হয়ে পড়লেন রাজিন্দরনাথ, বললেন, কি হবে কোয়ার্টারে কিরে, বেশ তো রয়েছি এখানে ।

বিস্তরের সুরে বললে চাক, ডোন্ট বি সো সিলি ডক্টর, শরীর ঝাঁটিয়ে তো সব কিছু । আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি আপনার । চলুন, খাবেন চলুন ।

এর পরে আর প্রতিবাদ করেননি রাজিন্দরনাথ । হাসপাতালের স্তারাক পেরিয়ে কঁকর-বিছানো সড়ক হয়ে হুজনে এগিয়ে এলেন তাঁরা কোয়ার্টারের দিকে । পথ চলতে চলতে বললেন রাজিন্দরনাথ, আজ আমি যেন অস্থির হয়ে উঠেছি ম্যাট্রিন ! সেই আহত ডোগরা সিপাহীকে দেখবার পর থেকে আমার কেন জানি বার বার মনে হচ্ছে ছেড়ে ছুড়ে দিই এই সার্জনের কাজ । এতদিন তো জীবন দিলাম মানুষকে, এবার জীবন ছিনিয়ে নিতে কতি কি ?

আপনি কি বলছেন ডক্টর ! প্রতিবাদের সুরে বললে চাক ।

ঠিকই বলছি ম্যাট্রিন ! এবার আর সার্জারির যন্ত্রপাতি নয়, রাইফেল তুলে নেবো নিজের হাতে । মানুষের বিরুদ্ধে যে মানুষ এত নির্ভয় হতে পারে তাদের মাথা গুঁড়ো গুঁড়ো না করে দিলে শান্তি নেই আমার । অন্ধকারে যেন জোনাকী মত দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছিলো রাজিন্দরনাথের এক জোড়া চোখ । কথার মোড় কিরিয়ে দিতে শান্ত-প্রশান্ত কণ্ঠে বললে চাক, শেষ পর্যন্ত সেদিনের সেই 'মানবতার বিড়ম্বনা' বইটিতে ফিরে এলেন তো আপনি ?

নিমেষে যেন মনের সবটুকু উফুতা হারিয়ে ফেললেন রাজিন্দরনাথ । সেদিনের সেই লাইব্রেরীর কথা মনে পড়তেই বিড়ম্বার ভয়ে উঠলো তাঁর মন । কোনও রকমে চাকর পাশ কাটিয়ে ফিরে এসেছিলেন তিনি নিজের কোয়ার্টারে ।

ক্লাস্তিবিহীন দীর্ঘ দশটি দিনের পরে আজ আবার ছুটি পেয়েছেন রাজিন্দরনাথ । কিন্তু আজ কেন জানি না, বিছানা ছেড়ে উঠতেও মন চাইছে না তাঁর । স্তরে স্তরে ভাবছিলেন তিনি চাকর কথা, আর ভাবছিলেন, কোন্‌ খাতু দিয়ে ভগবান গড়েছেন ওই চাককে, হৃদয় বলে কি কিছু নেই ওর ?

এমনি সময় মূহু আর্জনাৎ করে খুলে গেল ভেজানো দরজাটা । জোখ তুলতেই দেখতে পেলেন রাজিন্দরনাথ, দরজার চৌকাঠে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে স্থিত হাসি মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চাক । বললে, কি ব্যাপার, আজকের ছুটির দিনে ঘুমিয়েই কাটাবেন নাকি ?

না, ছুটি কেলেঙ্গাই করিয়ে নেব ভাবছি—বললেন রাজিন্দরনাথ । কেন ?

কি হবে ছুটি নিরে ? হাসপাতালের কাজে থাকলে তবু বা হোক করে সময় গড়িয়ে যার ।

আমি ভাবছিলাম, আমরা হুজনে শ্রীনগরে গিয়ে আজ সিনেমা দেখ আসতাম । একটা ভালো কিম্ব এসেছে, 'ওয়ার এ্যাণ্ড পিস'—স্থির শান্ত কণ্ঠে বললে চাক ।

কি বলছ তুমি চাক ?

ঠিকই বলছি । আপত্তি না থাকে তো চলুন, বারোটার বাসে এখান থেকে শ্রীনগর যাওয়া বাবে ।

রাজিন্দরনাথের মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্ন দেখছেন তিনি । যেন শুধু বিবর্ণ লতার লতার আবার সবুজের সমারোহ জেগে উঠেছে । বললেন তিনি, বারোটার বাস তো ? আমি তৈরী হয়ে নেব তার মধ্যে, তুমিই এখানে এসো চাক !

শ্রোতের মত সময় গড়িয়ে গেল । মনে হচ্ছিল রাজিন্দরনাথের, যেন হাওয়ার হাওয়ার ভেসে বেড়াচ্ছেন তিনি, যেন কোন্‌ এক সীমাহীন রহস্যের ছায়াপথ ধরে এগিয়ে চলছেন তিনি আশ্চর্য্য স্তম্ভের এক অভীষ্টের দিকে । সামনের প্রকাণ্ড পর্দায় ছায়াছবিরা স্তম্ভ-স্থম্ভের অভিনয় করে বাচ্ছিক—কিন্তু সেদিকে ভ্রক্ষেপ রয়েছে কি তাঁর ? চাকর নরম হাতখানাকে আলতো ভাবে নিজের কোলে তুলে নিয়ে খেলা করছিলেন তিনি আজুলের সাথে । আশ্চর্য্য, বিন্দুমাত্র আপত্তি করছে না চাক অথবা সরিয়েও নিতে চাইছে না নিজের হাতখানাকে ।

রাজিন্দরনাথ সস্থির কিরে পেলেন হলের সব করুটি আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠতেই । দর্শকেরা সবাই উঠে পড়েছে নিজেদের আসন ছেড়ে । শান্ত স্তম্ভ পরিবেশ নিমিষেই যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়েছে বহু কণ্ঠের মিলিত আওয়াজে ।

চাক বললে, চলুন, বেরোনো যাক ।

কিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে এলেন রাজিন্দরনাথ চাকর সাথে সাথে ।

লেক্‌ ডিউ রোডের এক বিলেতী হোটেলে ডিনার খেলেন ওঁরা হুজনে । ছাপকিন্‌ নিয়ে মুখ মুছে নিয়ে ক্যামিলী ক্রমের দিকে এগিয়ে এলো চাক । রাজিন্দরনাথ স্থির দৃষ্টিতে দেখছিলেন চাককে, দেখছিলেন চাকর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী আর পায়ের গোড়ালীর কাছে শাড়ীর প্রান্তটুকুর অব্যাহা দোল খাওয়া পর্যন্ত । চকিতে এক উদ্দাম আলোড়ন যেন বয়ে গেল তাঁর ধমনীতে ধমনীতে, যেন আগ্নেয়গিরির জ্বালাময়ী অগ্ন্যুৎপাতের মত হৃদয়ের অঙ্গস্র কামনা উৎক্লিষ্ট হয়ে এলো লাভাশ্রোত হয়ে ।

নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না রাজিন্দরনাথ । ক্যামিলী ক্রমের ভেজানো দরজা খুলে, ভিতরে এসে দাঁড়ালেন তিনি চাকর সামনে । উদ্গস্তের মত চাককে সজোরে টেনে এনে ডাকলেন তিনি, চাক, চাক !

চাক ! কে আপনার চাক ? আমি তো ম্যাট্রিন, ডক্টর ! এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে যুগায় আর অবজ্ঞার বললে চাক ।

রাজিন্দরনাথ যেন কি বলতে বাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই কিপ্র পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে ।

শ্রীনগর থেকে ট্রাস পর্যন্ত আবার একই বাসে এলো ওরা হুজনে । কিন্তু কথা বললো না কেউই । যেন চেনে না ওরা একে অঙ্কে—অপরিচিত, অত্যন্ত অপরিচিত ওরা পদম্পর পরম্পরের কাছে !

পরদিন অপারেশন কেস ছিল হাসপাতালে । ফ্রন্ট থেকে এক গুলীবিদ্ধ সৈনিককে নিয়ে আসা হয়েছে এ্যাথুলেল করে চাপিয়ে । চকিতে কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলো সমগ্র অপারেশন থিয়েটার । ডাক্তার রাজিন্দরনাথ এলেন, এলো ম্যাট্রিন চাকও ।

কিন্তু কি হয়েছে আজ রাজিন্দরনাথের ? বিচুড়তাই যেন আর

কাজে মন লাগাতে পারছেন না তিনি। অসহায়ের মত হতাশায় ভরে আছে তাঁর চোখ দুটি—উদ্ভ্রান্ত, অস্থির—কাল সারা রাত তিনি ঘুমিয়েছেন কি না কে জানে।

অপারেশন হলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু রোগী আর বাঁচলো না। হাসপাতাল-জীবনে সার্জন রাজিন্দরনাথের আজ প্রথম ব্যর্থতা—অথচ তেমন অটলও তো ছিল না এই কেসটি। সামান্য একটা ব্লেট বিকল হয়েছিল রোগীর ডান দিকের জাহাজে। আর একটু চেষ্টা করলে কি আর এই রোগীকে বাঁচানো যেত না ?

হাসপাতাল থেকে কোয়ার্টারে ফিরে এসে সটান শুয়ে পড়লেন রাজিন্দরনাথ। ব্যর্থতার আজ যেন ভিত্তি কাঠের মত ঘোঁরাটে হয়ে উঠেছে তার মনের অজস্র আশা-আকাঙ্ক্ষা। কানের সামনে বার বার তাঁর বেজে উঠতে লাগলো শুধু একটি ঘণা আর অবজ্ঞা ভরা কঠবর, চাক ! কে আপনার চাক ? আমি তো ম্যাট্রিন, ডক্টর !

আটশ বছরের জীবনে আজ পর্যন্ত কোনও ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে নি রাজিন্দরনাথের। শুধু এইবার, এই প্রথম বার অদৃষ্ট তাঁকে পরিহাস করলো। তাঁর ভালোবাসাকে ঘণা আর অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করলো চাক—ম্যাট্রিন চাক !

কখন সন্ধ্যা হয়ে এলো, কখন আলো জ্বললো, আবার নিবেও গেল, কখনই বা মধ্য রাত্রি ঘনিয়ে এলো—কিছুই টের পেলেন না রাজিন্দরনাথ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু তিনি ভেবেই চলছিলেন অজস্র হিজিবিজি।

কেন চাক তাঁকে ফিরিয়ে দিল ? চাককে কি তিনি ভালোবাসা দিতে পারতেন না ? পারতেন না কি দিতে নারী-জীবনের বা কিছু কামা, তার সবটুকুই ? তবে কি চাক তাঁকে অবিশ্বাস করেছে ? বুকের মাঝে বিরাট এক শূন্যতা হঠাৎ যেন অনুভব করলেন রাজিন্দরনাথ। তাঁর মনে হলো, চাককে বাদ দিয়ে তাঁর জীবন অর্থহীন, অসম্পূর্ণ। ভালোবাসাকেই যদি ভুলে যেতে হলো, তাহলে কি লাভ বেঁচে থেকে ?

কাঠকোঁকরা পাখীর মত হঠাৎ ঠকঠক আওয়াজ হলো দরজার বুকে। ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটি। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন রাজিন্দরনাথ। কিন্তু এ কি ! স্বপ্ন তো দেখছেন না তিনি ? নিজের চোখেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রাজিন্দরনাথের। বিশ্বের সবটুকু কাব্যময় সৌন্দর্য যেন এই মুহূর্তটিতে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে তাঁর শয়নগৃহের উন্মুক্ত দরজায়। টেবিল-ল্যাম্পের যে ক্ষীণ রশ্মিটুকু দরজার সীমানা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল, তাতে তিনি স্পষ্ট চিনতে পারলেন চাককে।

নিমেষেই সমস্ত গ্রানি আর বস্ত্রশাকে ভুলে গিয়ে উদ্দাম চকল হয়ে উঠলেন রাজিন্দরনাথ। দুহাতে চাককে জড়িয়ে ধরে

বললেন, চাক, চাক, তুমি এসেছ প্রিয়তমে ! আমি জানতাম তুমি আসবে।

অনেক হয়েছে ডক্টর ! প্রথমে দরজা বন্ধ করুন আর আলো নিবিয়ে দিন—নির্বিচার কণ্ঠে বললে চাক।

সেতারের তার যেন ছিঁড়ে গেল। শরবিদ্ধ পত্তর মত হুয়ে ছিটকে এলেন রাজিন্দরনাথ। ডক্টর ! এখনও তাহলে ডক্টরই রয়ে গেছেন তিনি চাকের কাছে। নিজেকে বখাসভব সামলে নিয়ে বললেন তিনি, আমাকে কি তুমি পত্ত ভেবেছ চাক ?

পুরুষের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি পত্তেই নামাস্তর ডক্টর ! আর এর জন্তই আপনার কাছে আমি এসেছি। বাসনার তৃপ্তি হলোই আমার জন্ত আপনার আর আকর্ষণ থাকবে না। তখন আপনি আবার মনুষ্য কিরে পাবেন। নিন, আর দেয়ী নয়, বা কববার হয় করুন শীগ্গির।

রাজিন্দরনাথ তাকালেন চাকের দিকে। সেই স্নিগ্ধ প্রশান্তির স্মৃতি মাখানো অপূর্ণ স্মৃতির একজোড়া চোখ। প্রণয়ের উন্মাদনা তাতে যেমনি নেই, তেমনি নেই অভিসারিকার উন্মাদ উত্তেজনাও। তুচ্ছতার শাস্ত প্রদীপের মতই যেন অচকল সে চোখের দৃষ্টি।

শাস্ত সংযত কণ্ঠে বললে চাক, ডক্টর, মায়ের ভালোবাসাকে অস্বীকার করে, নববধূর প্রণয়কে অবহেলা করে হিন্দুস্থানের শত শত বীর ছেলে এসে পৌঁছেছে কাশ্মীর ফ্রন্টে। তাদের জীবন আজ আপনার হাতে। আজকের মত যদি আপনার অপারেশন অসফল হতে থাকে, তাহলে কে সাহসনা দেবে এই মায়ের দলকে ? কে মুছিয়ে দেবে এই নববধূদের চোখের জল ? আমার ছুল বুঝবেন না ডক্টর, আমারও স্বপ্ন আছে। কিন্তু আজ কখন সর্বনাশের ঝড় বয়ে চলেছে সারা দেশের বুকের উপর দিয়ে, তখন কর্তব্যবিমুখ হয়ে প্রেম নিয়ে ময় হওয়া কি পত্ততারই নামাস্তর নয় ? ডক্টর, আজ সন্ধ্যা থেকে খুনী আক্রমণ আরম্ভ করেছে পাকিস্তানী হানাদাররা। কাল বহু আহতকে জীবন দান করতে হবে আমাদের। এমনি সময় আপনার ভেঙ্গে পড়লে চলবে কি ? আমার এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ পেলে যদি আপনার ভাঙ্গা মনে জোড়া লাগে, তবে তাই নিন। কিন্তু 'দোহাই আপনার, আপনি যেন ভেঙ্গে পড়বেন না।

ক্ষিপ্র হাতে ব্লাউজের বোতাম একে একে ধুলতে আরম্ভ করলো চাক। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না রাজিন্দরনাথ। চাকের হাত দুখানাকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে এনে, শিশুর মত কেঁদে কেঁদে বললেন তিনি, 'আমায় কমা করো চাক, কমা করো।

ডঃ কমর্ডিক বঙ্গমতী

টার্কোমোডা	নানাল
অন্ন, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায়	ব্যথা ও বেদনায়
ডঃ বঙ্গমতী ল্যাবরেটরী লিঃ - কলিকাতা ৯	

বিপ্লবের সঙ্ঘাত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊর্ধ্ব ভাবগতিক যুগান্তরের দাদাদের পছন্দ হচ্ছিল না,—এক তাঁরা শরৎ চ্যাটার্জীকে নেতা খাড়া করার চেষ্টায় তোয়াজ সুরক করেছিলেন। বোধহয় রংপুরে, এক যুব-সম্মিলনীতে শরৎবাবুকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল,—এবং “স্বাধীনতার” তাঁর সমগ্র ভাবগ ছাপা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ বাবুর এক বক্তৃতার সারাংশমাত্র ছাপা হয়েছিল। সুভাষ বাবু হঠাৎ এক ধমক দিয়ে দিলেন,— তিনি কংগ্রেস ছেড়ে ছাত্র ও যুব আন্দোলন নিয়ে থাকবেন। দাদাদের পিঠে চমকে গিয়েছিল। তাঁর “ঘরের অবস্থার” এও আর একটা দিক।

স্বাধীনতা যখন লিখছে, বাইরে নেতার সর্বসর্বা ক্ষমতা স্বীকৃত হলেও, ঘরের মধ্যে নেতার উচিত দলের কাজে মাথা নত করা,—ঠিক তখনই কুমিল্লার যুবসম্মেলনে প্রতুল গাঙ্গুলী বক্তৃতা দিচ্ছেন, নেতার আদেশ সেনাপতির আদেশের মতন সর্বদা ও সর্বথা পালনীয়। এদের সকলেরই টার্গেট তখন সুভাষ বাবু। তিনি পেকেছেন এমন করে অনেক পোড় খেয়ে।

১৯২৮:২৯ সাল সময়টা ছিল এমন, যখন বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থাটা হয়েছিল যেন একটা প্যাণ্ডিমোনিয়াম—যেন ইংরেজীতে বাকে বলে melting pot—অদৃষ্ট পরস্পরবিরোধী এবং স্ববিরোধী আদর্শ, কর্মপন্থা, সংগঠন প্রচেষ্টার এলোপাতাড়ি হুড়-হালুয়া। ইংরেজ '৩০ সালে যে আর এক কিস্তি স্বরাজ্যদেবে, তার আগে একটা লড়াই দরকার, বাস্তবে সে স্বরাজ্যটা নেহাৎ ইংরেজের ধূসীকৃত বাচ্ছতা হই না হয়,—কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের লক্ষ্য সেই দিকে—এক মহাস্থায় নেতৃত্বে তাঁরা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস আদায়ের চেষ্টায় তৎপর হইবে এক লড়াইয়ের প্ল্যান আঁটছেন। সাধারণ কংগ্রেসীরা আছেন তাঁদের পিছনে। এই হল মূল কংগ্রেসী আন্দোলন।

বিপ্লবী-দাদারা কংগ্রেসের ভিতর দিয়েই স্বাধীনতার দাবীর চেষ্টায় ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের বিরোধিতা করছেন,—বাংলায় তার বাস্তব রূপায়ণ হয়েছে সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে সুভাষ বাবুকে খাড়া করা, কিন্তু গান্ধীভক্তির কম্পিটিশনে হেরে গেলে বেহেতু কংগ্রেসের মধ্যেও অবস্থা কাহিল হবে,—অতএব গান্ধীভক্তি বাঁচিয়েই তাঁরা স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে কর্মীদের সচেতন করতে চাইছেন। তার

সংগঠন ক্যাপচার করা—ছাত্রসংস্থা—সুভাষ হা থেকে মিউনিসিপ্যালিটি-জেলাবোর্ড-ইউনিয়নবোর্ড পর্যন্ত। এ নিয়ে সর্বত্র এমন দলাদলি সুরক হয়েছিল যে, একটা নতুন রাজনৈতিক শব্দ পড়িয়েছিল,— ক্যাপচারিজম। আনন্দবাজার পত্রিকার সুভাষ বাবুকে বলা হত খোকা-ভগবাম,—শরৎ বাবুকে বলা হত কটকী বোঁকা। দাদাদের কাছে সুভাষ বাবুর জনপ্রিয়তা এমন মার খাচ্ছিল যে, কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে সুভাষ বাবু প্রার্থী হলেন দেখে সেনগুপ্ত যখন সবে পাড়ালেন, তখন সুভাষ বাবুকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হলেন বি, কে, বসু।

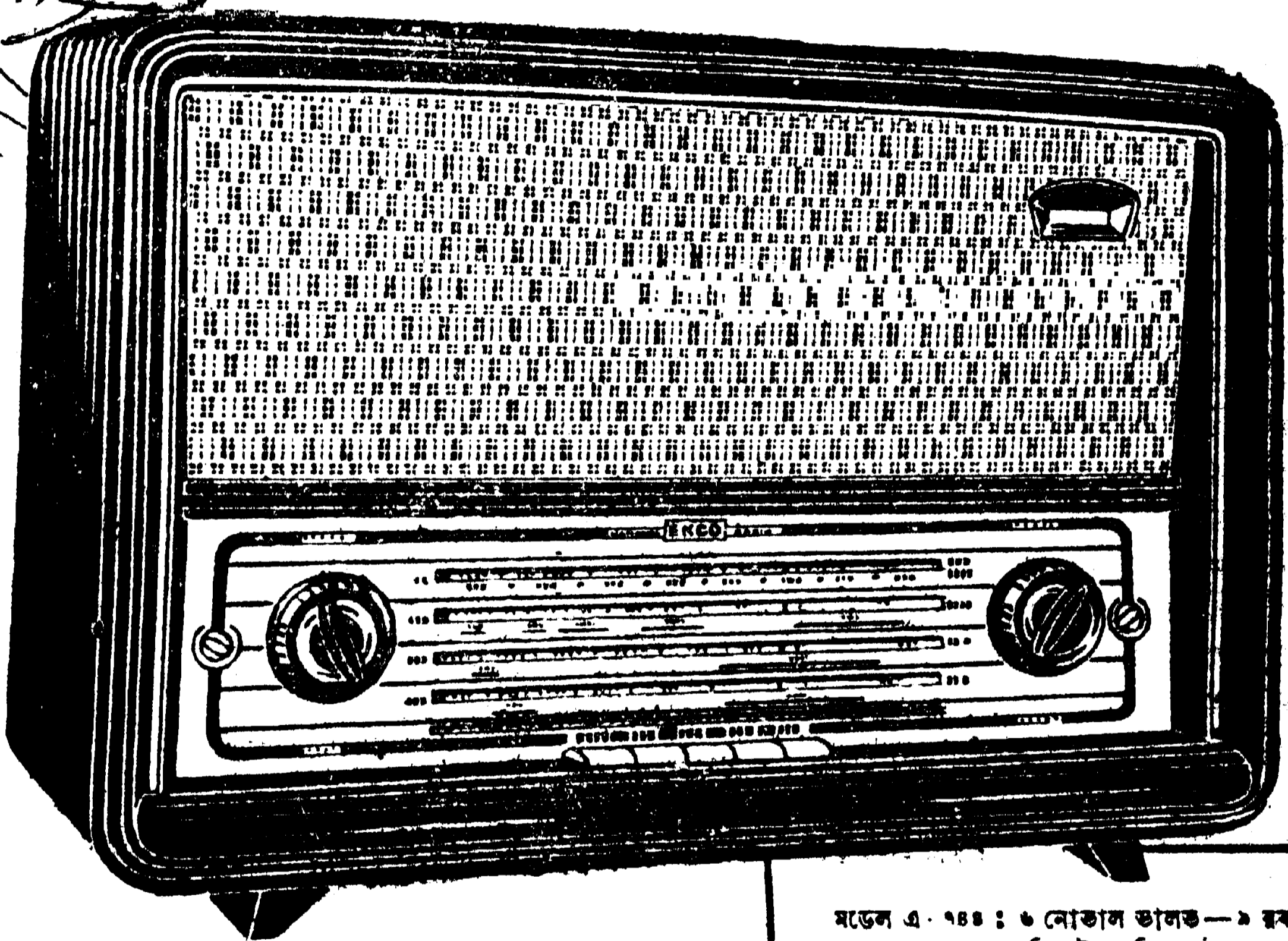
'২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের দুই বৃহৎ বিপ্লবীদের অ্যামেলগামেশন একটা বেলেঙ্কারীতে পর্যবসিত হওয়ার পর অমূল্য দল গিয়েছিল সেনগুপ্তের শিবিরে,—সন্তোষ মিত্রের দল এবং অমূল্যদা, অমর বসু প্রভৃতিও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সেনগুপ্তের অর্ধের অনটন ছিল,—সে অনটন ঘোচাতে এগিয়ে এসেছিলেন জে, সি, গুপ্ত। পরে তাঁর অর্ধমূল্যই Advance কাগজ বেরিয়েছিল।

বিপ্লবের খোঁজ নেই,—শুধু স্বাধীনতার নামে ইলেকশন আর ক্যাপচারের দলাদলিতে হাঁপিয়ে গিয়ে বিপ্লবী তরুণেরা ক্রমে দড়ি ছেঁড়ার উপক্রম করছিলেন। বছরের পর বছর দাদাদের হুকুমে বস্ত বাজে লোকের জন্তে ভোট সাধা, এই ব্যস্তে কি আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলুম? এই ছিল তাদের মনোভাব। দাদারা কিছু করতে না, সুতরাং আমাদের নিজেদেরই কিছু করতে হবে, এই মনোভাব থেকে তারা আবার বোমা-রিভলভার সংগ্রহের দিকে ঝুঁকছে। কংগ্রেসে যে হাজার হাজার ছেলে ভলান্টিয়ার হয়েছিল, কোন না কোন বিপ্লবী-দাদা তাদের অনেককেই ঠুকরে দেখেছেন—তারা স্বাধীনতা, বিপ্লব এবং মিলিটারী প্যারেডের শাইনে ভাবতে সুরক করেছে; কোন কোন বিপ্লবীদল জেলা-কংগ্রেস হখল করে, তাইই মধ্য দিয়ে কংগ্রেস ভলান্টিয়ার সংগঠন করে, বাছা বাছা ছেলের নিয়ে নতুন এক একটা বিপ্লবীদল গড়ে তুলেছে—যেমন বি, ভি বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দল; চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা এই ভাবে দলকে সুসংগঠিত করে বাছা বাছা ছেলের revolver practice-এর ব্যবস্থাও করেছিল; দুর্ভাগ্যের জীবন চ্যাটার্জির তরুণ চেলারাও কিছু করার জন্তে ছুটকট করছিল—দাদারা তাদের ঠাণ্ডা করেছিলেন একটা অকাজে বিলম্বিতার দ্বারা; আদালতপূর্ব প্রথম উঠে যাওয়ার



অনবদ্য শিল্প-কৌশল...
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য...

ন্যাশনাল একো-র নতুন মডেল এ-৭৪৪



সঙ্গীত রসিকেরা চাশনাল-একোর চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হ'য়ে পারবেন না। এর অনিন্দ্য গড়ন, কলাকৌশল ও চক্চকে চেহারা যেমন নয়নাভিরাম, তেমনি প্রতিমধুর ও সুস্পষ্ট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সত্যি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি চাশনাল-একো ডিলারকে সাজিয়ে শোনাতে বনুন—কোন থরচ নেই।

আমাদের অনুমোদিত চাশনাল-একো ডিলারের
কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : ৬ নোতাল ভালত—১ রকম কাজ, মনোরম কেবিনেট সম্বিষ্ট ৪-ব্যাণ্ড ব্লক এসি রেডিও—সারা পৃথিবীর স্টেশন ধরা যায়। পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন; ম্যাজিক আই; গ্রামোফোন ও একফ্রী স্পীকারের সঙ্গ বোনা-যোগ ব্যবস্থা; টেপ, রেকর্ডারের সঙ্গ বিশেষ বন্দোবস্ত। এক বছরের গ্যারান্টি।

৪১৫, নীট

হানীর ট্যাঙ্ক বস্ত্র



ন্যাশনাল একো রেডিওই সেবা—এগুলি



কেন্দ্রাল রেডিও অ্যান্ড অ্যান্ডারসেন্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকতা • বোম্বাই • গাটনা • মাদ্রাস • বাঙ্গালোর • দিল্লী • লেক্ষনাবাদ



IWT. GRA 122

পর রসিক দাস কলকাতায় এসে একটা কিছু করার জন্তে হটকট করছিলেন। তিনি ছিলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে সঙ্গিষ্ট।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (সিনিয়র ভূপেন্দ্রনাথ) তখন ইউরোপ থেকে দেশে ফিরেছেন এবং সোসিয়ালিজম-কমিউনিজমের কথা বলতে শুরু করেছেন। সুতরাং একদিকে যেমন কমিউনিষ্টরা তাঁকে খাতির করে, আর একদিকে যুগান্তর দলের (বাঁটা সরস্বতী গ্রেস) তিনি চকুশূল। কারণ ভূপেন্দ্রনাথ যুগান্তরের আদি নেতাদের অন্যতম এবং তাঁর সম্মান প্রায় সার্বজনীন। তিনি কমিউনিজম প্রচার করলে দলের অনেক ছেলে "বিপথগামী" হতে পারে। সুতরাং তাঁর প্রভাব থেকে ছেলেদের মুক্ত রাখতে হলে তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাও চাই, আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার কিছু পরিভূক্তির ব্যবস্থাও দরকার।

কিন্তু জেলা কংগ্রেস-কমিটিও তো হাতে থাকে চাই—না হলে বি. পি. সি. সি-তে সেনগুপ্তের সঙ্গে লড়াইয়ে হারতে হবে বে! অনেক দাদাই নিজ নিজ জেলা-কংগ্রেসের নেতা,—কিন্তু ২৪ পরগণা জেলা-কংগ্রেস বেহাত হয়ে আছে গোড়া থেকেই। আগে প্রেসিডেন্ট ছিলেন মজিবর রহমান এবং তাঁর সঙ্গে খাদি প্রতিষ্ঠানের ক্রীতদাস দাশগুপ্ত এবং কয়েকজন ননকোপারেটর উকীল। তারপর নেতৃত্ব গেছে একদিকে প্রফুল্ল ব্যানার্জি, দ্বন্দ্বয়ভূষণ চক্রবর্তী প্রভৃতি এবং আর একদিকে বিপিন সাহুসীর হাতে। বিপিনদার বাড়ী হালিসহর, বারাকপুর সাবডিভিসনে তাঁর বাঁটা, সাধারণ কংগ্রেসী এবং প্রফুল্ল বাবুরা তাঁকে খাতির করেন। বিশেষত বারাকপুর সাবডিভিসনে একদিকে ভাটপাড়া, আর একদিকে আলমবাজার প্রমিক আলোলনের বাঁটা এবং তাঁর কর্মীদের মধ্যেও বিপিনদার চেলা আছে।

কিন্তু হরিদা (চক্রবর্তী) যুগান্তরের বিপ্লবী নেতা এবং ২৪ পরগণার লোক হলেও ২৪ পরগণা কংগ্রেসে তাঁর প্রতিষ্ঠা নেই। কথাটা ভাল মনে রাখ। ২৪ পরগণা কংগ্রেসটাও 'ক্যাপচার' করা দরকার। আমি বারাকপুর সাবডিভিসনে কাজ করেছি এবং বিপিনদার চেলা সেবার লীডারদেরও কাউকে কাউকে কংগ্রেসে ভিড়িয়েছি। দক্ষিণে সাতকড়ি ব্যানার্জি (সাতুদা) আছেন। সুতরাং হরিদা আমাকে এবং সাতুদাকে নিয়ে পরামর্শ আঁটলেন, ২৪ পরগণা কংগ্রেসের দিকে একটু বিশেষভাবে নজর দেওয়ার জন্তে। সাতুদার বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ খেলুম—কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে আলাপও হল। আমি আবার আলমবাজার ভাটপাড়া বাতায়ত শুরু করলুম।

কিন্তু আমরা তখন কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকেছি এতখানি যে, এই সব বাজে কর্মে উৎসাহ পাই না। তখন সন্তোষকুমারী গুপ্তা হয়েছেন একজন সেবার লীডার,—ভাটপাড়ার কালী ভট্টাচার্য, আলমবাজারের ধীরেন চ্যাটার্জি প্রভৃতি সন্তোষকুমারীকে নিয়ে সেবার মিটিংয়ে লোকচার দেওয়ান। তিনিও বিপিনদার একজন ভক্ত। শুধু একজন বিপ্লবী-দাদাকে অন্তরঙ্গভাবে দাদা বলেই ইসারার নিজে একজন প্রফুল্ল বিপ্লবী বলে চালিয়ে দেওয়া তখন ব্যাপক ভাবে চালু হয়ে গেছে।

একদিন জীবন বললে, বাইরে থেকে একটা চিঠি আসবে, এক সাহেবী নামে, এবং ঠিকানাটা হবে এরন, যাতে I B তার ধারের

না বেঁধেতে পারে, এমন একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আমি আলমবাজারে গিয়ে ধীরেন চ্যাটার্জিকে বললুম। ঠিক হল, যে কোন এক সাহেবী নামে আলমবাজার জুট মিলের ঠিকানায় চিঠি আসবে, পোষ্ট মাঠার নজর রাখবেন, এবং চিঠিটা নিয়ে ধীরেন বাবুকে দেবেন। এই ভাবে একটা চিঠি এসেছিল, তারপরে আর দরকার হয়নি। এম এন রায় তখন ভারতে এসেছেন, এবং গা-ঢাকা দিয়ে আছেন—কানপুর বলশেভিক বড়বস্ত্র মামলার ১নং আসামী।

কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভা হয়েছিল এবং বোধ হয় দেশপাণ্ডের নেতৃত্বে বসে থেকে কমিউনিষ্ট কর্মীর একটা বড় দল এসেছিল। তারা সভাটা দখল করে "আন্তর্জাতিক" সঙ্গীত গেয়ে রীতিমত নাটকীয়ভাবে কমিটি ক্যাপচার করেছিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের হেড কোয়ার্টার নিয়ে গিয়েছিল বসেতে।

ঠিক মনে নেই,—বোধ হয় এই সময়েই সোমেন ঠাকুরের "কমিউনিজম"—বাংলা ভাষায় কমিউনিজম সম্বন্ধে প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিল। বইটার অনেক জায়গায় "কমিউনিষ্ট" কথাটা ছাপার ভুলে হয়েছিল "কর্মনিষ্ট"। কমিউনিষ্ট শব্দটা তখনও সাধারণ লোকের কাছে অপরিচিত। কিশোর বই এদেশে আসা ছিল নিবিছ।

হাইকোর্টের জজ এ. চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর লাইব্রেরীটা নিলামে বিক্রী করেছিল ম্যাকজি লায়াল। বিরাট বইয়ের পাহাড় এসেছিল নিলামে। উত্তরপাড়ার রমেন ভট্টাচার্য নিলামে চাকরী করতেন, এবং তিনি বইগুলো বাছাই করে "লট" করেছিলেন। তার মধ্যে একখানা বই ছিল কমিউনিজম ইন ইণ্ডিয়া,—এবং মলাটের ওপর ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল Issued (by the Director of Intelligence) to the officers of the department only and the officers are responsible for the safe custody of the book. রমেন বাবু বইখানা সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি জানতেন, আমি স্বদেশী হাজারী করে "জেল খেটেছি"—উত্তরপাড়ার অমরদার কাছে যাতয়াত আছে। তিনি আমাকে বললেন, একখানা ভাল বই রেখেছি আপনার জন্তে—কমিউনিজম ইন ইণ্ডিয়া—হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধানোর সরকারী বড়বস্ত্র। বইটা দেখে আমার তো চকু স্থির। দরকারী বই বলে আমি বইটা নিয়ে এলুম। রমেন বাবু তখনও কমিউনিজম কথাটা শোনেনি কিন্তু কমিউনিজমটা জানেন।

১৯২০ সালের "স্বরাজের" পর গোয়েন্দা বিভাগের এই একটা পৃথক শাখা খোলা হয়েছিল। '২৩ সাল পর্যন্ত প্রথম Triennial (৩ বছরের) রিপোর্ট বেওয়ার। তারপর '২৬ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় (৩ বছরের) রিপোর্ট এই বইটা। এর সঙ্গে প্রথম ৩ বছরের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টও সন্নিবিষ্ট ছিল,—এবং তৃতীয় একটা অংশ ছিল Who is who in Communism in India. বইটা নিয়ে দিনকয়েক মেতে থাকলুম, অনেক গুপ্ত কথা জানতে পারলুম, বার কিছু কিছু '২৪ সালের কানপুর বলশেভিক বড়বস্ত্রের মামলা সম্পর্কে আগে বলেছি। কমিউনিজমের ওপর বৃটিশ সরকার অসীম গুরুত্ব দিয়েছে—সুতরাং আমার পক্ষে সেটা হল একটা সার্টিফিকেট।

যুগান্তর পার্টির মধ্যে থেকেও জীবন কমিউনিজমের দিকেই চলছিল, এবং তার সঙ্গে আধারাও। নিজের প্রয়োজন মত চলাকোর

জন্মে কিছু অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন, অর্থের অভাব চূড়ান্ত, সুতরাং আমরা ঠিক করেছিলুম, আমরা অর্থের সংস্থানের জন্মে খাটবো এবং জীবনকে কাজ করার জন্মে "ক্রী" করে দোব। ম্যাকেলি লায়াল কোম্পানির একটা চমৎকার ব্যবস্থা ছিল, উপর থেকে বড় সাহেব কিছু মোটা টাকা নিয়ে রিটারার করে, "ছোট সাহেব" "বড় সাহেব" হয়, এই ছোট সাহেব কোম্পানির পার্টনার। নীচে থেকে একজন কর্মচারী সাহেব "ছোট সাহেব" হয়ে জুনিয়ার পার্টনার হয়। আমরা পরামর্শ করে ঠিক করেছিলুম, আমরাও ঐ ভাবে প্রথমে জীবনকে "ক্রী" করে দোব, তারপর সাধনা যখন দোকান চালাতে পারবে, আমি কিছু মাসিক ভাতা নিয়ে রিটারার করে "ক্রী" হয়ে কাজে নামবো, তারপরে উঠবে প্রভাস, এবং সাধনা রিটারার করবে। প্রায়টা অবশ্য রীতিমত কার্যকরী হবার আগেই ভেঙে গিয়েছিল। ঢাকী স্তম্ভ বিসর্জন হয়ে গিয়েছিল।

দোকানটাকে আবার ভাল করে পড়ে তোলবার জন্মে খোক কিছু টাকা দরকার। অমরদাকে বললুম। তিনি ভে, সি, গুপ্তের কাছ থেকে ১০০০।১২০০ টাকা ঋণের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি মনে করেছিলুম, হ্যাণ্ডনোটের মতন কিছু লিখে দিতে হবে, কিন্তু দেখা গেল এক বিরাট দলিল তৈরী হয়েছে—দোকান মর্টগেজ এবং আর্ট-পার্শ্ব বন্ধন। সেই করে দিলুম, কিন্তু মনটা খিচকু গেল। যাদের জ্ঞানের মাপ টাকায়, সেই রকম একজন বড় লোকের মুঠোর বাঁধা পড়লুম—পড়ে পড়ে হস্তক্ষেপ করবে, নিজের প্রায় অল্পসাবে কিছুই হয়তো করতে পারবো না। হয়তো অবস্থা ঠাড়াবে, "খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, আপদ করলো এঁড়ে গরু কিনে।"

সে রকম লক্ষণও দেখা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দলিল সেই করে দিলুম, কিন্তু টাকা পেলুম না। ২০০ মাত্র টাকা দিয়ে গুপ্ত সাহেব বললেন, এক সঙ্গে বেশী টাকা নিলে নষ্ট করে ফেলবেন—দরকার মত কিছু কিছু করে নেবেন। ঋণড়া না করে "কিল খেয়ে কিল চুরি" করে ঐ টাকাই নিয়ে এলুম। ভাবলুম, কি করে পাঞ্জা খেয়ে গুপ্ত দুটো ঘাড়ের খাটুনির জোরে দোকানটা খাড়া করেছি, তা যদি জানতেন গুপ্ত সাহেব!—এই ভাবে ১২০০ টাকা ঋণ পেতে মাস ছয়েক লেগে গেল।

বাই হোক, উঠে পড়ে খাটতে লাগলুম সকলে মিলে। সাইন বোর্ডের নীচে লিখে দিলুম Secondhand Everything, গরু-চোরের মতন গিয়ে ঠাড়াই, কিছু কিছু করে টাকা আনি, আর নিজেমে সব রকমের জিনিস কিনে ঘর বোঝাই করি। ফার্নিচার, কিউরিং, সতরঞ্চি কার্পেট পরদা, ছবি-আয়না, ইলেকট্রিক গুডস, ফটো গুডস, টাইপরাইটার, সেলাইকল, হারমোনিয়ম, দূরবীন কিছুই বাদ রইলো না। বই তো আছেই। Upholsterd Brite, Sofa, Couch এর কাজও হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত রেডিও সেট তৈরীর ব্যবস্থা পর্যন্ত হল। ২ জন ছুতোর ও ২ জন পালিস-মিস্ত্রীও হল।

শান্তিপুত্রের জিতেন প্রামাণিক (?) ছিলেন ইলেকট্রিক এবং রেডিওর একজন expert mechanic, এবং তাঁর All Bengal Licenseও ছিল রেডিওর। তিনি তখন বেকার ছিলেন, এবং এক ঘেসে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা হল, তিনি দোকানে থাকবেন এক থাকবেন,—আমি পুরোনো রেডিও সেট কিনে দোব,

দরকার মতন নতুন পার্টস কিনে দোব.—তাঁর নির্দেশ মত কাজই বাস্তব প্রভৃতি মিস্ত্রী তৈরী করে দেবে,—তিনি যদি সেট তৈরী করতে পারেন, তাহলে বিক্রী হলে আমি লাভের অংশ পাব,—বস্ত দিন না হয়, তত দিন তাঁর খরচ আমি চালিয়ে যাব। তিনি এক নতুন বাস্তব তৈরী করিয়ে নিয়ে নতুন এক রেডিও সেট তৈরীতে মন দিলেন।

আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে পারবেন না, কিন্তু একদিন সত্যি "পালে বাঘ পড়িল।" একদিন বাইরে থেকে এসে দেখি, দোকানের তৈরী নতুন রেডিও বাজছে, ওরা ভিড় করে বসে শুনছে। তখন নতুন বাস সিগ্নিফিকেন্ট বাসের মাসিক টিকিট চালিয়েছে—আমরা দুখানা মাসিক টিকিট রেখেছি—একখানা থাকে দোকানে, একখানা আমার কাছে—আমি সারাদিন বাইরে ঘুরি, যাবে যাবে দোকানে এসে দেখে-শুনে নির্দেশ দিয়ে বাই। এসব কথা অবাস্তব মনে করে অধীর হবেন না—শীঘ্রই বুঝতে পারবেন, এ কথাগুলো কত প্রয়োজনীয়।

বাই হোক, ওদিকে ৩১শে ডিসেম্বর এসিয়ে আসছে, তার মধ্যে ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস না দেয়, তাহলে মহাস্বাভি নিজেই ইন্ডিপেন্ডেন্সওয়াল হয়ে যাবেন। একটা লক্ষ্যই আশা করে জনগণ তৈরী হচ্ছে। সুতরাং লর্ড আর্কইন আগে প্রমিকনেতাদের প্রেরণার করে মীরট মামলার পত্তন করে, প্রমিকনে বেকারদা করে নিয়ে উত্তরলোকদের সন্তুষ্ট করার জন্মে মিস্ত্রীতে এক ঘোষণা করলেন, ভারতে বৈধ শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির অস্তিত্বে তাঁর ডোমিনিয়নের পর্যায়ে উন্নীত করাই বুটেনের নীতি। মহাস্বাভি লড়াই এড়ারর কঁাক খুঁজছিলেন,—সুতরাং তিনি তাঁর দলকে নিয়ে আর্কইনের ঘোষণাটাকেই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বলে ধরে নিয়ে এক বিবৃতি [বিখ্যাত (?) দিল্লী ম্যানিফেস্টো] প্রচার করে তাতে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস-এর স্বীকৃতি জন্মে সরকারের মত সহযোগিতার প্রস্তাব করলেন। তাতে জওহরলালও সেই দিয়েছিলেন সারা দেশের মধ্যে তাতে একটা অসন্তোষও প্রকাশ হয়ে পড়লো কিছু মহাস্বাভি আর্কইনের সঙ্গে দেখা করার জন্মে হটকট কল লাগলেন।

লোকের মনের অবস্থা যেমনই হোক, একটা লড়াই যে হয়ে এবং তার জন্মে মহাস্বাভি নেতৃত্বও প্রয়োজন, এই জেবে তখন মহাস্বাভিকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব করলে। কি নিরপেক্ষ প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি কি শেষে সত্যি ইন্ডিপেন্ডেন্সওয়াল হয়ে খরচ পড়তে রাজী হতে পারেন? তাহাড়া জহরলালের মতির্গা তো ভাল নয়। তাঁকে মতিলাল ও মহাস্বাভি হৃদিক থেকে ঠে ধরে চালাচ্ছিলেন,—অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিল্লী ম্যানিফেস্টোতে স করাতে হয়েছিল,—তাঁর বাড় মটকানোর কাজটা পাকাপাকি ভর কিনিস করাও দরকার। তাই তিনি বললেন, আমি নয়, জহরলাল লাহোর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট কর।

ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং সোসিয়ালিজমের কথা বলে জহরলাল জনপ্রিয়তা বেড়েছিল,—কাজেই সকলে সন্তুষ্ট মনে তাঁকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে খুসীই হল। মহাস্বাভি তখন সফরে বেয়ালে এক ইউ. পিতে সফর করলেন ব্যাপক ভাবে, আর সকলকে এক বেড়াতে লাগলেন, জহরলালের দিকে ভোট দিও। লোকের ম করলে মহাস্বাভি বলে এসে গেছেন। কিন্তু মহাস্বাভি প্রায় রী

এক চিলে হুই পাখী মারা। একদিকে খাঁটি ইণ্ডিপেন্ডেন্সওয়ালার বেকারদা করার জন্তে তিনি জহরলালকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করবেন,—আর একদিকে সরকারকে একটু ভয় দেখানোও হবে—কংগ্রেসের রাশ আর বৃষ্টি তাঁর হাতে রইলো না, চিরপরিচিত রফাপত্নী বেণের হাতে কংগ্রেসের রাশ না থাকাতার ইংরেজ নিশ্চয়ই স্বত্তিবোধ করবে না।

বস্তুত, এই অবস্থার আকর্ষণ মহাত্মার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন,—দেখা হলে আগে থেকেই একটা রফার বন্দোবস্ত হতে পারবে। কিন্তু বিখ্যাতপুস্তক বাদ সাধলেন, আকর্ষণের ফ্রেনের কামরার নীচে এক বোমা ফাটলো। কাজেই সাক্ষাৎকার হল না। মহাত্মা বোমার নিন্দা করলেন—কংগ্রেসের দিনও এসে পড়লো।

ইতিমধ্যে ব্যবস্থা পরিবর্তনের মধ্যেও দর্শকদের গ্যালারী থেকে এক বোমা পড়লো, এবং গুপ্ত সি গ্রেপ্তার হল—রাজগুরু এবং গুপ্তদেব নামক আর দুজন যুবকও ধরা পড়লো। গুপ্ত সি বললেন,—আমি বোমা ফেলেছি কাউকে মারার জন্তে নয়, শুধু সরকারী মীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্তে। বাই হোক, কেউ না মরলেও বিচারে গুপ্ত সিরের কীসির হুকুম হল, এবং সারাদেশের প্রতিবাদ অগ্রাহ করে তাকে কীসি দেওয়াও হল।

লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব পাশ হয়েছে বলে এবং জহরলালের নেতৃত্বেই তা হয়েছে বলে কংগ্রেসের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং জহরলালের মহিমার ঢাকা-নির্নাদ সেই থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

কিন্তু লাহোর কংগ্রেসের প্রকৃত চিত্র ঢাকা দিয়েই সেটা করা হয়। লাহোরে মহাত্মাজি ইণ্ডিপেন্ডেন্স প্রস্তাব নিয়ে রচনা করেন, এবং তার মুখবন্ধে বড়লাটের সুখ্যাতি এবং হিংসাত্মক কাজের নিন্দা জুড়ে দেওয়া হয়। খাঁটি স্বাধীনতাকামীরা এই ছুটো অহেতুক এবং অবাস্তব কথা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করলে মহাত্মাজি চ্যালেঞ্জ করে বলেন,—আমার প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির স্বত্বাধীন প্রস্তাব। এ প্রস্তাবের কোন সশোধন চলবে না। হয় প্রস্তাব বখাখখ ভাবে গ্রহণ করতে হবে,—না হয় সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে either accept it in toto or reject it in toto যদি বর্জন করা হয়, তাহলে ওয়ার্কিং কমিটি পদত্যাগ করবে, এবং তোমাদের নতুন ওয়ার্কিং কমিটি তৈরী করে কংগ্রেস চালাতে হবে। (অর্থাৎ অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাতে হবে)।

"নিরপেক্ষ" প্রেসিডেন্ট জহরলাল চূপ করেই থাকলেন। আর সকলেও চূপ করেই থাকলো—কেউ কংগ্রেস চালাবার দায়িত্ব নিতে ভরসা পেলো না। শোনা যায়, বিঠলভাই কাবেরভাই প্যাটেল স্তম্ভাব বাবুকে বলেছিলেন, তুমি যদি দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো—এস চেষ্টা করে দেখা বাক। স্তম্ভাব বাবু পিছিয়ে গেলেন—বললেন, তাহলে বাংলাদেশে সেনগুপ্ত ও মহাত্মার দলের কাছে আমার পরাজিত হতে হবে। স্তম্ভাব বাবু মানে যে আমাদের বিপ্লবী দাদারামও,—সে কথা কি বলে দিতে হবে?

লাহোরের স্বাধীনতার প্রস্তাব ও সেটা পাশ হওয়ার ইতিহাস এই। খাঁটি স্বাধীনতা বোঝাতে ব্যবহৃত হত ইণ্ডিপেন্ডেন্স শব্দটার পরিবর্তে হিন্দী ভাষায় হল পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ঠিকই রইলো,—শুধু বোঝা গেল,—প্রত্যদিনকার স্বাধীনতাটা ছিল অসম্পূর্ণ,—এখন সেটা

হল পূর্ণ। আজকের ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপও তাই ডোমিনিয়নের ওপর রিপাবলিকের গুণনা।

বাই হোক, পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জন্তে সংগ্রামের প্রকৃতির কথাও রইলো—অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির ওপর তার দেওয়া হল, তাঁরা অহিংস আইন অমান্তের কর্মসূচী, খাজনা বন্ধ সমেত, রচনা করবেন,—এবং তাঁরা রক্ষণ বলবেন তখন সংগ্রাম আরম্ভ করা হবে। এই ভাবে ঠেংখতার কূটকৌশলের জোরে মহাত্মাজি দৃঢ় হস্তে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মস্ত তুরঙ্গের ঝাঁটি চেপে ধরলেন এবং সরকারকে বৃষ্টিয়ে দিলেন, কংগ্রেসের রাশ এখনো আমার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মুহুর্ৎ-পড়া মনকে চালা করার জন্তে গান্ধী-কংগ্রেসের প্রচার হিসেবে '৩০ সালের ২৬শে জাভুয়ারী সারা দেশে "স্বাধীনতার শপথ" (Independence Judge) গ্রহণের ব্যবস্থা হল। সম্পূর্ণ হলো, একটা সংগ্রামের আশায় লোকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো।

এদিকে সেনগুপ্তের দলের কাগজ Advance প্রকাশের তোড়জোড় চলছিল। হঠাৎ একদিন জে, সি, গুপ্ত দোকানে এসে বললেন, আজ আমাদের meeting-এ final decision হয়ে গেল,—অমুক দিন কাগজ বেরোবে—আপনাকে সমস্ত furniture দিয়ে অফিস সাজিয়ে দিতে হবে। তাঁর সঙ্গে গিয়ে ৩-৪ মত্বর হেয়ার স্ট্রীটের বিরাট বাড়ীটা দেখে এলুম—কোন ঘরে কি হবে কি কি চাই সব গুনলুম—মাত্র হস্তা দুইয়ের মধ্যে সব চাই।

প্রায় অসম্ভব কথা। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব ভাবার বালাই না যেনে অবিলম্বে কোমর বেঁধে লেগে গেলুম। দোকানে বা কিছু দরকারী মাল ছিল, রেডি করে ফেললুম এবং চালান করলুম। সবগুলো নিলেমে ঘুরে মাল সংগ্রহ করি,—রোজ ছ তিন গাড়ী করে মাল যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিল করি,—গুপ্ত সাহেব কিছু টাকা বাকি রেখে টাকা দেন। হিসেব দেখা হবে পরে।

গুপ্ত সাহেবদের বসবার ঘর সাজিয়ে দেওয়া হল মেহরি কার্ণিচার দিয়ে—প্রকাণ্ড রাউণ্ড টেবিল, চেয়ার, সোফা প্রভৃতি দিয়ে; ঘরে ঘরে ছোট বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, স্ল্যাট রাইটিং টেবিল, টাইপরাইটিং টেবিল এবং ডজন ডজন চেয়ার, রেকর্ডর্যাক, হোয়াটনট; ব্লক রাখার জন্তে একটা বিরাট চেই অফ ড্রয়ার, করিডরে ছুখানা ১২ ফুট লম্বা আর্চড বেঞ্চ, কতকগুলো আলমারী; মাপমতন নতুন ক্যান কাউন্টারও তৈরী করে দেওয়া হল; তা ছাড়া ছোটো গ্রাসকেস আলমারীভরা বই—তার মধ্যে আছে একটা সেট নাইন্থ এডিসনের এনসাইক্লোপিডিয়া বৃতানিকা,—একগাদা ইণ্ডিয়ান ইয়ারবুক, একগাদা ট্রেটসম্যান ইয়ার বুক, ৫০ বছরের চেম্বার অফ কমার্সের রিপোর্ট ৫০ ভল্যুম প্রভৃতি। সর্বসাকুল্যে বিল হয়েছিল মাত্র ১৮০০ টাকার। অর্থাৎ আমার নিলেমের ব্যবসার সবটুকু কেয়ামতী খরচ করে যদি আমি নিজের কাগজ করতুম, তাহলে যেমনটি হতে পারতো।

কিন্তু ৫০ বার ঘুরে ঘুরে আদার হল ১৫০০ টাকা,—তার পর "হিসেবটা একবার দেখতে হবে" বলে চললো দিনের পর দিন ঘোরানো। মনে করেছিলুম, গুপ্ত সাহেব সম্ভট হয়ে তানিক করবেন,—তা চুলোর বাক, অসকোচে দিনের পর দিন ঘোরাতে একটু বাধে না, দেখে জীবনে বেগা হয়ে গেল। তারও ওপর দশক আছে—আমাকে বাইরে বসতে বলে গুপ্ত সাহেব স্বর্গার পর স্বর্গী

সভার মিত্রকে নিয়ে আপ্যায়ন এবং পলিটিক্স করেন,—বলেন, সভার মিত্রের মতন লোকের সঙ্গে আশ্রয় হওয়াটা তাঁর সৌভাগ্য।

তখন দোকানে আমরা ১১জন লোক খাটি—বাড়ীর ভিতরের উঠানটাও নেওয়া হয়েছিল ৩০ টাকা ভাড়ায়। এই অবস্থায় কাজ এবং টাকা একসঙ্গে বন্ধ। গুপ্ত সাহেবের ভাবখানা,—ব্যবসাটা তাঁর,—আমি কর্ণচারী,—দোকানের খরচটা আমার। মেজাজ তিরিক্কে হয়েছে,—গুপ্ত সাহেবের কিছু না করতে পেয়ে যবে এসে সকলকে বকাবকি করি। ওদিকে কংগ্রেস এবং তার সঙ্গে দাদাদের ওপরও মনটা বিধিয়ে উঠেছে। বড়লোক সম্বন্ধে নতুন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মনটাকে কমিউনিজমের দিকে আরো জোরে টানছে।

একদিন প্রভাসকে খুব বকাবকি করলুম,—সে রাগ করে বাড়ী চলে গেল। সারদার ধৈর্যের বাঁধও ভাঙলো—সে বললে, আমারও আর এ বকমারির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না। রাগ, হুঃখ, অপমান মনটাকে নিষ্পেষিত করছিল,—এখন অভিমানে চোখে জল এল। গুপ্ত সাহেবকে এক চিঠি লিখলুম একুশ পৃষ্ঠা—সকলকে বিদায় দিলুম,—দোকানে তাল দিলে চিঠি ও চাবি গুপ্ত সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একখানা কাপড় ও কয়েকখানা বই হাতে করে নিয়ে এসে উঠলুম কলেজ স্কোয়ারে আশ্রয়লাইব্রেরীতে।

কত কষ্টে গড়া ব্যবসা এমনি করে বিসর্জন দিলুম,—“বেনোজল এসে ঘরো জল বার করে নিয়ে গেল।” সারদা আমার মুখ চেয়ে যেমন মুখ বুজে খেটেছিল, এখনও তেমনি মুখ বুজে এই বিসর্জন পর্ব দেখলো—একটি কথা বললো না। মুক্তিও পেলুম এক সঙ্গে হুজনেই। পরে অমরদাকে বলে কর্পোরেশনে এক ফুলমাঠারী জুটিয়ে নিয়ে সারদা সরে গেল। আমি হুবেলা মুড়ি খাই এবং আশ্রয়লাইব্রেরীর কাউন্টারের ওপর শুই। আর হুপুরবেলা ফরোয়ার্ড অফিসে উপেনদার কাছে গিয়ে আড্ডা মারি। আবার নতুন করে কিছু রোজগারের চিন্তা চলছে। লিখে খাওয়ার কথা ভাবছি।

শান্তিপুরে গিয়ে প্রভাসের কাছে সব বললুম,—তুমি গিয়ে গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে দেখা কর,—সাজানো দোকান,—কিন্তু গুপ্ত সাহেব তো ও ব্যবসা চালাতে পারবেন না,—তুমি গেলে হয়ত তোমার একটা ব্যবস্থা হতে পারবে। সে এসেছিল এবং তাকে দিয়ে গুপ্ত সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন,—কিন্তু আমি তখন মুক্তির আনন্দ ভোগ করছি—একুশ পাতা চিঠির পর, আবার!

দাদাদের কংগ্রেসী বিপ্লব প্রচেষ্টার বিশ্লেষণ করতে করতে একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখলুম। আনন্দবাজার অফিসে সুরেশ মজুমদারের কাছে আবার যাতায়াত শুরু করেছিলুম,—তাকে কবিতাটা দেখালুম। তিনি চক্ষু ছানাবড়া করে মাখন সেনকে ডেকে সেটা পড়তে দিলেন। তিনি পড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, এ আমি ছাপবো। বলে তিনি অমূল্য সেনকে ডেকে তাঁর হাতে সেটা দিলেন। সুরেশ মজুমদার বললেন, দোহাই তোমাদের, ও ছাপলে আনন্দবাজার অফিসে হামলা হবে। অমূল্য সেন ঝড়ে বললেন, বেশ, আনন্দবাজারে নয়, আমি অন্য কাগজে ছাপবো। আমি বললুম, নামটা দেবেন না বেন!

তখন মির্জাপুর স্ট্রীটে এক কাঠগোলায় অমূল্যসেনের ক্ষিত্রীশ বন্দোপাধ্যায় থাকতেন, এবং সেখান থেকে “হিন্দু” নামক এক

সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরতো। দেখা গেল, কয়েক দিন পরে সেই কাগজে কবিতাটা বেরিয়েছে—নাম দেওয়া হয়েছে **শ্রীশ্রীদাস!** কবিতাটা এই : (সবটা মনে নেই)

আমরা নন্দলালের দাদা
আমরা খোড়া পিটে পড়ি পাখা
আর বাক্যের জোরে সাদা করি কালো
বত কালো কবি সাদা
আমরা ধনী চরণ চাটি
আর গরীবকে মারি চাটি
আর লীডারে লীডারে বিবাদ এখিলে
আমরাই ভাড়া খাটি।

আর ডাকাত কি ধুনে নয়
ওসব শুধু ইতিহাসে কর
এখন খোসারুদী আর স্বদেশীর নামে
মনটা বা কি হয়!
আমরা ঐক্য মহিমা গাই—
সেটা নির্জলা তাঁওতাই—
কারণ সতীনের দলে সহিতে পারি না
ধনীর করুণা চাই।

আমরা জেলার জেলায় ঘুরি
সদা দলাদলি করে কিরি
আর সত্তেরোটা দলে এক একটা ছেলে
টেনে ছেঁড়াছিঁড়ি করি
আমরা ছোট ছেলের চরমই
আর বড়দের বড় ডরাই—
আমাদের সুরে সুর না মেলালে
আর টিকটিকি নাম ছড়াই—

কিন্তু যদি দিতে পারে গুঁতো
আমরা ছেড়ে ছলা-কলা-ছুতো
নাকে খং দিয়ে শিরে ভুলে নিই
তার ছেঁড়া চিট ছুতো—
আমরা নিজেরা বাজাই নিজের তোল
খাই কিঙে যদি, বলি পটোল
হাতে লয়ে কিরি তৈলতাও
মুখে স্বাধীনতা-বোল।

হ্যাঁগা মুটে মজুর কি চাখা—
এদের স্বদেশীতে কেন আসা!

এদের যে ব্যাটা আকারা দেয়
সে ব্যাটা করনাশা

দেখ ওদের ধর্মঘটে
ওসু বড়লোকগুলো চটে—

আমরা মৌলারেম করি ভেল দিয়ে, তাই
ভারত উদ্ধারে পটে—

বাবা মুটে-বহুরের মার
সে বে মারা ছনিয়ার বার !
হি হি জয়লোকের ভয়বরাজে
ঠাই দিতে আছে তার ?

বত স্বদেশীতে মরা ছেলে
ভায়া ছিল আমাদেরই দলে
তথু দিনকর আগে কুসঙ্গে মিলে
বিশ্বোরে প্রাণটা নিলে
নৈলে আমাদেরই মত মুখে
বসে' ভারতমাতার বৃকে
উঠিতে বসিতে মরণ বরণ
করিত যে মুখে মুখে ।

কিছু এক একটা বেই খসে
আমরা কাগজেতে কাঁদি কসে
লোকে চার গুণ দাম দেয়, আমাদের
পকেট ভরিয়া আসে ।

আহা এমনটা যদি হ'ত
মাসে এক আঘটা অন্তত
মোদের পরের মটরে ডেপুটা লীডারী
এঁত দিনে বুচে বেত ।

বত মিছিলের পুরোতাগে
বেতাম আমরাই সব আগে
ডায়াস, চেয়ার, কাউন্সিল হল
সকলই পেতাম বাগে ।

ভায়া মোদের বসানে ঘানি
তোমরা চোখে ঠুলি পরে টানি'
আরো কিছু দিন তৈল জোগাও
আমরা বরাজ আনি ।

বৃকের মাঝে ভিলে তিলে সজিত বহু দিনের পুত্রীভূত বি-
বাসের এ বেন বিফোরণ—চিত্তার ঝিখা সঙ্কোচের বাঁধ বেন ভেঙ্গে
গেল ।

এই সময়ে একদিন ট্রামে উপেনদার সঙ্গে দেখা অফিসের
পথে। কথা কইতে কইতে যাচ্ছি,—হঠাৎ ট্রামে উঠলেন অরুণ
ভহ। উপেনদার সঙ্গে তাঁর চাপা হুট্ট হাসির বিনিময় হল।

তিনি উপেনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ হস্তার "স্বাধীনতা"
পড়ছেন ?

উপেনদা—না, কেন বল দেখি—

অরুণ বাবু—একটা আর্টিকেল আছে—ভাল—

উপেনদা—হ্যা—কে বেন বলছিল বটে—তা দেখব এখন

অরুণ বাবু—আর একটা জবাবও লিখবেন (বুচকি হাসি)

উপেনদাও বুচকি হেসে বাড় নেড়ে জানালেন, লিখবেন। তার
পরে অরুণ বাবু নেমে গেলেন এবং উপেনদা আমাকে বললেন,—কিছু
বুঝলি ?

আমি—না, কি ব্যাপার ?

উপেনদা—ওরা আমার লেখা চায়, আমি লিখি না—এই জবাব
উপলক্ষে একটা লেখা পাবার মতলব ।

আমি—তা বেশ তো! আপনিও একটা ভেজাল চালিয়ে
দিন না ।

উপেনদা—তুই লিখবি ?

আমি—আপনি বললেই লিখতে পারি ।

তাই-ই ঠিক হল। আমি "স্বাধীনতাটা" সংগ্রহ করে প্রথমটা
পড়লুম—"শতকরা নিরানব্বই জন"। পড়ে একেবারে কেপে গেলুম
—লেখকের নাম হুর্গাপ্রসাদ। কাঁচা লেখা, অপরিণত আইডিয়া
এবং যারা সোশিয়ালিজম-কমিউনিজম বা জনগণের বিপ্লবের কথা
বলে, তাদের অতি অভয় ভাষায় গালিগালাজ ।

জবাব লিখলুম—"নিরানব্বইয়ের ধাক্কা।" লেখাটা বেশ বড়
হয়ে গেল বলে তিন অংশে ভাগ করে দিলুম। প্রথম অংশে থাকলো
গালাগালের জবাবে পাণ্টা গালাগাল; দ্বিতীয় অংশে তথাকথিত
জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের আদর্শ ও কর্মপন্থার বিশ্লেষণ; আর তৃতীয়
অংশে গণবিপ্লবের আদর্শ, কর্মপন্থা ও বৌদ্ধিকতা ।

গেলুম লেখা নিয়ে উপেনদার কাছে ফরোয়ার্ড অফিসে। তিনি
পড়ে "আত্মশক্তি"র সম্পাদক শচীন সেনগুপ্তকে (বর্তমান নাট্যকার)
ডেকে পাঠিয়ে লেখাটা দিয়ে বললেন, ঘরে নিয়ে গিয়ে পড়। তিনি
লেখাটা পড়ে কিরে এসে বললেন,—এ তো আমার ছাপতে হবে!
কার লেখা ?

উপেনদা আমাকে দেখিয়ে দিলেন—নামটাও বলে দিলেন।
আমি বললুম, নামটা ছাপবেন না। তার পর দেখা গেল নামমুহুর
লেখা ছাপা হয়েছে। আমার বিজ্রোহ প্রকাশ হয়ে পড়লো, একটা
হেঁ হেঁ পড়ে গেল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অরুণ বাবু আমার ওপর
হাড়ে চটা। উপেনদা বললেন,—কিসের "চাক চাক গুড় গুড়"?
একেবারে কাঁটছিঁড় হয়ে যাওয়াই ভাল।

শচীন সেনগুপ্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ আমার সেই প্রথম।
যখনোবস্ত হয়ে গেল, হস্তার হস্তার লিখবো এবং দশ টাকা করে পাব।
উপেনদা ধুসী হয়ে বললেন, কেমন হল ? [ক্রমশঃ ।

এ সময়ে প্রচুদপট

এই সংখ্যার প্রচুদপটে অরুণের শিবমহলের আত্মতরীণ
আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্রশিল্পী
সুধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ।

যোগাযোগ

রমেন দীর্ঘকাল পরে বিলেত থেকে ফিরে এলো। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রী নিয়ে। একে সুদর্শন সুপুরুষ, তার বিরাট চাকুরে আর সবচেয়ে বড় কথা অবিবাহিত। পরশাওয়াল লোকদের বিবাহযোগ্য। মেয়েদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল। এমন ছেলেকে হাতহাড়া করতে আছে? রীনা, শ্রামা, কেতকী অর্থাৎ যারা বিয়ের আগে রমেনকে চিনতো তারা পালা করে রমেনের সঙ্গে পার্টি, পিকনিক আর সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করল।

এইরকম একটি পার্টিতে কমলার সঙ্গে রমেনের প্রথম দেখা। পার্টি ছিল শ্রামার বাড়ীতে। কমলার এমন পার্টিতে থাকার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই ছিলনা। কমলার বাবা নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তরের শিক্ষক। শ্রামারা যেদিন পার্টির কথা আলোচনা করছিল কমলা কলেজের কমনরুমে সেই একই জায়গায় ছিল তাই চক্ষুজ্জ্বাল খাতিরে কমলাকে ডাকা।

কমলা পার্টিতে আলাদা একটা কোনে বসেছিল সাদাসিধে জামাকাপড় পরে। চারিদিকে দামী সাড়ী, সেট—ইংরিজী বুকনি আর বেশির ভাগই রমেনকে ঘিরে। রমেন একটা কিছু চাইতেই চার জন দৌড়ে যাচ্ছে এইরকম একটা ব্যাপার! হঠাৎ ঘটল একটা অঘটন। কমলা চা খাচ্ছিল।

হঠাৎ তার হাত থেকে পড়ে পেয়াল। প্লেট দুটোই চৌচির। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কমলা নীচু হয়ে ভাঙ্গা কাঁচ তুলতে যাচ্ছিল—শ্রামার মা বাধা দিয়ে বললেন “থাক বেয়ারাই তুলবে। দামী সেটে চা খাওয়া অভ্যাস নেই তো!” কমলার মুখ লজ্জায় অপমানে কালো হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে—বিশেষ কেউ লক্ষ্য করার আগেই। কমলা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। ওর চলে যাওয়াটা কেউ লক্ষ্য করলনা কারণ ওরা তখন রমেনকে নিয়ে ব্যস্ত।

পরদিন সকালে। কমলাদের বাড়ীর দরজা খটখট করে নড়ে উঠল। দরজা খুলে কমলা অবাক।

সুদর্শন রমেন দাঁড়িয়ে আছে—পরনে ধুতী, পাঞ্জাবী

চাদর। রমেন নমস্কার করে বলল—“আপনার কাছে কমা চাইতে এসেছি। শ্রামার কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিলাম। কাল পার্টিতে সবই আমি লক্ষ্য করেছিলাম কিন্তু আপনাকে কিছু বলার আগেই আপনি চলে গেলেন। আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে।”

কমলা বলল—“না আমারই যাওয়া উচিত হয়নি। ওরা এত বড়লোক—” “হ্যাঁ, বড়লোক, কিন্তু অমাহুষ—” রমেন বাধা দিয়ে বলল। কমলা রমেনকে ভেতরে নিয়ে এলো। বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তারপরে ভিতরে গেল চা আনতে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো চা আর জলখাবার নিয়ে। রমেন বলল—“এ কি, এর মধ্যে এত খাবার? আপনি কি জাহ্নু জানেন?” কমলা লজ্জিত হয়ে বলল “না না, কাল বাড়ীতে পুলিপিঠে আর গজা বানিয়েছিলাম।” রমেন এক কামড় খেয়ে—“আহা কি অপূর্ব পিঠে! প্রায় ছয় বছর বিলেতে, এই পিঠের স্বপ্ন দেখেছি। আরও কত রান্না খেতে ইচ্ছে করে—চচ্চড়ি, শুকতো, ডালনা! এখানে থাকি হোটেলের আর মিশি ষাঁদের সঙ্গে তাঁরা খান বিজিতী খানা। আচ্ছা, এত ভাল পিঠে বানালেন কি করে?” কমলা—“কেন? নারকেল কুরে, ময়দায় পুর দিয়ে, ডালডায় ভেজে—” রমেন—“ডালডায় এত ভাল রান্না হয়?”

কমলা “হ্যাঁ, আমাদের বাড়ীর সব রান্নাই সেইজন্মে ‘ডালডায়’ হয়। আজ খেয়েই যাননা এখানে। চচ্চড়ি, শুকতো, ডালনা—যা যা আপনি খেতে চান সবই রান্না আজ।” কমলার বাবাও সায় দিলেন—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা এসেছ যখন খেয়েই যাও।” রমেন উৎসাহভরে বলল “নিশ্চয়ই, আমি নিজে বলতে পারছিলাম না যা পিঠে খাওয়ালেন আজকে না খেয়ে আমি উঠি?”

খাওয়া দাওয়ার পরে রমেন আরও অবাক হোল। কমলা শুধু রান্না বাসায় পারদর্শীই নয় ও খুব ভাল গায়িকাও বটে, ছবিও আঁকতে পারে। কমলার গান শুনতে শুনতে আনন্দে রমেনের চোখ বুজে গেলো.....



মার্গসঙ্গীত কেন জনপ্রিয় হচ্ছে না ?

আজ-কাল মার্গসঙ্গীতের পুনরুজ্জীবনের জন্য কিছুটা চেষ্টা চলছে বটে কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সেই চেষ্টা আশাশ্রমভাবে সফল হচ্ছে না। এর কারণ বোধ হয় এই যে, সেই সব চেষ্টা কৃত্রিম উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। রেডিওতে প্রপদ, ধামার ও খেরালের প্রোগ্রাম কিছুটা বাড়ানো বা বৎসরে একটা-আধটা সঙ্গীত-সম্মিলনীর অধিবেশনের মধ্যেই এই প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি। মার্গ-সঙ্গীতকে জনসাধারণের কাছে পরিচিত এবং আকর্ষণীয় করবার পক্ষে এই চেষ্টা অতি অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং বার্ষ হতে বাধ্য।

সঙ্গীত চাকরকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইরূপ একটি চাকরকলা যদি জীবন্ত না থাকে তাহলে তার চর্চারই বা সার্থকতা কী? শব্দেহের সৌন্দর্যচর্চারই মত তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। মার্গসঙ্গীতের এই শব্দেহ মোগল আমলের মাটি খুঁড়ে বের করে গোটাকতক মুষ্টিমের শিল্পী মাথায় নিয়ে বেড়াচ্ছে, সাধারণ লোক শিউরে উঠছে কিছুকাল। কেন এমন হচ্ছে? সাধারণ লোকের কান ও সৌন্দর্যবোধ, বা অবশ্য অভ্যাস ও শিক্ষাসাপেক্ষ, মার্গসঙ্গীতকে গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষিত নয় এ কথা স্বীকার করতে পারি আংশিকভাবে, পুরোপুরি নয়। আমরা দেখেছি, একজন শ্রোতা বেহাগ রাগের একটি প্রপদ আরম্ভ হতেই সরে পড়লেন, কিন্তু সেই রাগেরই সেতার বাজনা মুগ্ধ হয়েই শুনেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে তিনি জবাব দিলেন, বাজনাটা বেশ লাগে, বিশেষ করে প্রথম দিকের ওই আরগাটা (অর্থাৎ বেহাগের গা-সা মীড়টুকু) অথচ কঠসঙ্গীতের ঠিক এই মীড়, গমকই প্রভৃতি তাঁর বিভীষিকার উল্লেখ করে। দৃষ্টান্তরূপ একজনের কথা উল্লেখ করলাম কিন্তু এইটাই সাধারণ অবস্থা। এর কারণ অসুস্থকান করা মোটেই কঠিন নয়। প্রধান কারণগুলির মধ্যে গায়কের কঠস্বর, আয়বিক ভঙ্গিমা, গায়ন প্রণালী ও গানের বাণী। স্বল্পসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই কারণগুলি অসুপস্থিত।

কঠস্বরের প্রায় গায়নের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রথম। কঠস্বরের মাধুর্য কঠসঙ্গীতকে রমণীয় করে তোলাবার সর্বপ্রধান উপাদান, এ কথা কেউই অস্বীকার করবেন না হয়ত, কিন্তু আমার মনে হয়, এ সবচেয়ে কিছু তুল ধারণাও আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, কোন মানুষেরই,—বিশেষ করে স্বরসাধকের—কঠস্বর স্বভাবতঃ এমন কর্কশ নয়, কারণ হ'তে পারে না যে তা শ্রোতার বিভীষিকা উপাদান করতে পারে, কারণ মনুষ্যকঠস্বরে একমাত্র কোন অস্বাভাবিক এবং অসাধারণ যান্ত্রিক বিকৃতি ছাড়া কখনই স্বাভাবিক চীৎকার, অথবা হেঁচকা প্রভৃতি অস্বাভাবিক স্বর নির্গত হ'তে

পারে না। আমরা এখানে কর্কশ স্বরের কথা বলছি, বেগুর স্বরের কথা বলছি না। পক্ষান্তরে, মধুর স্বরও স্বাভাবিকভাবে অতিকটু হ'য়ে পড়ে। উচ্চ কঠসঙ্গীতে এই অতিকটু সাধারণ বস্তু। উচ্চ সঙ্গীতশিল্পী এটার ওপর গুরুত্ব দেন না। দৃষ্টান্তরূপ কেউ তারাগ্রামে পঞ্চমে বা ষৈবতে গলা তুলতে গেলেন শরীরের সমস্ত পেশীগুলি আকৃঞ্চন ও সঙ্কোচন করে, বার ফলে ওই অতিকটু-নির্গত স্বর সাধারণ লোকের কানে কর্কশ শোনাতে বাধ্য, অথচ ওই স্বরপ্রয়োগটুকু তিনি নিছক বাহাহুরীর বা উপপন্থিকতার খাতিরেই করলেন, না করলেই ভালো করতেন। যুরোপীয় কঠসঙ্গীতসাধকের মধ্যে কিন্তু এই মুঠ, বোধটুকু দেখতে পাওয়া যায়, তাঁদের সঙ্গে আমাদের বাহাহুর সঙ্গীতসাধকের এই পার্থক্য রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

মোটের উপর স্বাচ্ছন্দ্য (এবং তার সঙ্গে দরদ) কর্কশ কঠস্বরকেও শ্রবণীয় করে তোলে আবার ওইগুলির অভাবে মধুর কঠস্বরও চিত্তাকর্ষণ করতে পারে না। কারো নাম না করে, সাধারণ ভাবে বলতে পারি যে বর্তমানে ভারতবর্ষে এমন অনেক প্রথম শ্রেণীর সুগায়ক রয়েছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানদত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী নন। অথচ তাঁদের সঙ্গীত আমাদের মুগ্ধ করে—কেন? শারীরিক ভঙ্গিমা এই কঠস্বর প্রয়োগের সহিত স্বাভাবিক ভাবেই সম্পর্কিত। মার্গসঙ্গীতশিল্পীর এই সাধারণ ক্রটি, যাকে বলা হয় মুদ্রাদোষ, সাধারণের নিকট স্বভাবতই অত্যন্ত বিভীষিকা ও বিরক্তির কারণ। সঙ্গীত মুখ্যতঃ শ্রবণীয় ললিত কলা হলেও অংশত শ্রেণীবিশেষ বটে। সঙ্গীতশ্রুতি করতে হয় শুধু শিল্পীর কঠনিঃসৃত শব্দতরঙ্গের দ্বারা নয়, শিল্পীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে, তবেই শিল্পশ্রুতির সার্থকতা আসে, আর যদি শিল্পী তৎপরিবর্তে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বৃদ্ধ-সংহারই করতে রইলেন তখনই সেই সঙ্গীতে সার্থক কলাশ্রুতি কখনই হলো না, তা সে উচ্চসঙ্গীতের অভিধানের দিক দিয়ে যতটাই বিস্তৃত হোক। এই "মুদ্রাদোষ" কতটা অনিবার্য—তবে বেশীর ভাগটাই কু-অভ্যাসজাত, সুতরাং নিবার্য। সুর, লয় এবং উপপন্থির দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিতে হয় বলে মার্গসঙ্গীতসাধককে নিজের অজান্তসারেই একটু-আধটু শারীরিক সঞ্চালন করতে হয় কিন্তু সেটুকু কখনই চক্ষুপীড়াদায়ক হতে পারে না, কিন্তু কু-অভ্যাসজাত মুদ্রাদোষগুলো সত্যিই বিরক্তিকর। আমরা এমন গায়ক দেখেছি যে, প্রতিবার সোম আসবার সময় আসনের মাঝখানে চক্ষু মুগ্ধিত করে সটান পাড়িয়ে উঠেন, সাপাট ভাল দেবার সময় এমন ভাবে হুঁড়ুসেন যে পাশে

উপবিষ্ট একজন শ্রোতার চশমা ঘুরে হিটকে পড়লো, এমনি বহু দেখেছি। এই সব বুদ্ধাদোষ শুধু শ্রোতারই ভয়োস্কেক ও হাস্যোস্কেক করে না, পরন্তু সঙ্গীতের ললিত পরিবেশটুকু নষ্ট করে। অথচ একটু চেষ্টা করলেই এই দোষগুলো বর্জন করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।
—শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য।

আমার কথা (৬৪)

শ্রীসমরেশ চৌধুরী

অল্প বয়সে পিতৃহীন—অভিভাবকদের আপত্তি—জীবনারম্ভে অর্থ-সংস্থানের প্রচেষ্টা—তবুও সঙ্গীতচর্চা করেছেন আপন মনে যিনি—নাম, বংশ:, খ্যাতি ও অর্থ-সামগ্র্য অভিজ্ঞ হন নি যে শিল্পী—আজ তিনি স্বর্গীয়বে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অবিকৃত গায়কী পরিবেশকরূপে জনসমাজে। বেদনাধারক অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক শিল্পী জীবনী সেদিন বসে শুনেছি শ্রবণ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীসমরেশ চৌধুরীর মুখ থেকে তখনই হয়ে—

“আমার শিল্পীজীবন একান্তই নিজের কাছে নিভূতে স্বরধীর ইতিহাস—বাহিরে ইহার কি কদর জানি না। যেটুকু এগিয়েছি তার হিসাব নিজের কাছে মূল্যবান। অস্ত্রের কাছে এর মূল্যমান কতটুকু বলতে পারি না। নয় দশ বৎসরের কথা মনে আসে। বাবা স্বর্গীয় বাবু কেদারনাথ চৌধুরী বাহাহর তখন ময়মনসিংহে জেলা ও সেসনস্ জজ। সঙ্গীতও চিত্রকলায় প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ আমার শিশুমনকে ললিতকলার অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে। খেলাধুলা ও পড়াশোনার সাথে গানও ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। বাড়ীতে বাবার এশ্রাজ্জ, হারমোনোমিয়াম ও সংগৃহীত সঙ্গীত-বিষয়ক বইগুলির উপর ছিল আমার হৃনিবার আকর্ষণ। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহে হোতো আধ্যাত্মিক ও দেহতত্ত্বের গান, শ্রামা-সঙ্গীত, পল্লীগীতি ও রবীন্দ্রনাথের গান। সেগুলির সুর ও কথা এখনও কিছু কিছু মনে পড়ে। সুরটি ও মার্জিত-সম্পন্ন গানের সঙ্গে সখ্যতা হয় তখন থেকে। কচি বয়সে শুনে শুনে সুর ও ছন্দে সঠিক অনুকরণ করতে পারতাম—এ কথা বড়দের কাছে জেনেছি।

চতুর্থ শ্রেণীতে যখন পড়ি, তখন ছোড়দিকে রবীন্দ্রনাথের গান শেখাতেন একজন শিক্ষক। প্রথমে গান ছিল ‘অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ-মধুর হাওয়া।’ আমিও ছোড়দির সঙ্গে বিধিবদ্ধভাবে সঙ্গীত সুর করি তাঁর কাছে। তিনি আমাকেই বেশী উৎসাহ দিতেন আর বলতেন, গানে এর অন্তর্গত অধিকার। মকঃবলের সঙ্গীতশিক্ষক—কিন্তু গুরুদেবের গানের গায়কী তাঁর কণ্ঠে ছিল অবিকৃত। পরে শান্তিনিকেতনে তাঁর কাছে শেখা গানগুলির হুবহু গায়কী শুনে আশ্চর্য হয়েছি। হুবহুই অনেক গান তুলে নিলাম তাঁর শিক্ষার। সেই সময়ে ৮বছরীকান্ত ঘোষ-দত্তদ্বারের ‘সরল হারমোনিয়াম শিক্ষা’ থেকে স্বরলিপি পদ্ধতি, ছোট ছোট তাল, গং ইত্যাদি শিখি। ‘সঙ্গীত-প্রকাশিকা’ প্রভৃতি থেকে স্বরলিপি দেখে গান তোলায় মধ্যে এক অনির্বচনীয় আনন্দপ্রসাদ লাভ করেছি প্রথম। এর পর বাড়ীর এশ্রাজ্জটিতে হাত দেবার অধিকার হল। ৩৭ মাস পরে ছোড়দির গানের সঙ্গে এশ্রাজ্জ বাজাতাম। বাড়ীর বাহিরে মেলামেলা বা খেলাধুলার সুযোগ ছিল না—অল্পবয়সে সময়—তাই

অল্পসময়েই আমি বেশী এগিয়ে যাই। হুবহু বৎসরের মধ্যে ছোড়দির বিবাহ হয় আর গান শেখার ব্যবস্থা বন্ধ হল। এখন থেকে বাবার শরীর খুব খারাপ হয়—তৎক্ষণ সফলেই চিহ্নিত হয়ে পড়েন। ১৯২৭ সালে বাবা চিরকালের মতন আমাদের থেকে চলে গেলেন সাধনোচিত ধামে—পড়ে রইল বিরাট বিবাদের ছায়া—সাংসারিক বন্ধন শিথিল হল ক্রমশঃ—আমার পানের চর্চাও বন্ধ রইল। কিন্তু অন্তরের তাগিদে বই থেকে গান, গং ও বাগ-বাগিনী তোলায় কাজ সবার অলক্ষ্যে ফের শুরু করি।

আরও হুবহুই কাটল বিনা সঙ্গীতশিক্ষক। এক আত্মীয় ভ্রাতার অব্যবহৃত বেহালাটি চেয়ে নিই—উপেক্ষনাথ রায়চৌধুরীর লেখা বেহালা শেখার বই কিনে গং বাজাতে থাকি—প্রচুর সুরবোধ ও স্বরলিপি জানা থাকায় গান ও গংগুলি এতে তোলায় বেশি দিন লাগেনি। বেহালায় সুরের বিশেষ আবেদন থাকায় আত্মীয় স্বজনদের (আমার গান শেখায় আমল না দিলেও) উহা বাজানার তারিক করেন খুব। অনেক অল্পবয়সে বেহালা বাজিয়েছি, সেই সময় সমাজে সঙ্গীতের আদর বিশেষ ছিল না—এতে লোক নষ্ট হয়ে যায়—এইরূপ ধারণার জন্ত গুরুজনেরা পড়ুয়া আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু মনের অনন্য বাসনার নিজেকে গানবাজনা থেকে তখন নিবৃত্ত করতে পারি নাই।

১৯২৯ সালে (দশম শ্রেণীর ছাত্র) আমার বাগসঙ্গীত শেখার সুযোগ আসে প্রখ্যাত ওস্তাদী হোসেনের সুযোগ্য শিষ্য ওস্তাদ মহম্মদ হোসেনকে আমার সঙ্গীত-গুরু হিসাবে পেয়ে। আই-এর

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা খুবই আত্মবিক, কেমনা সবাই জানেন ডোয়ার্কিনের ১৮-৭৫ সাল থেকে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন বস্তুর প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার জন্ত লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এম্প্ল্যান্ড ইস্ট, কলিকাতা-১

সেকেও ইয়ার পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে শিখি তাঁর কাছে। পড়াশোনার মাঝে দিনে-রাতে ৬৭ খণ্ড অভ্যাস করে খেয়াল পদ্ধতির অনেক রাগরাগিণী আয়ত্ত করি, তিন বৎসরে তাঁর কাছে ও আসরে পূর্ণাঙ্গ পরিবেশন করার উপযুক্ত হই। তাঁহার স্নেহ ভালবাসা ও বন্ধুত্বলতা কোন দিন তুলব না এবং অল্পকালের মধ্যে তাঁর কঠোর খেয়ালের দীপ্ত, আলাপ ও তানের স্বরলিপি করতুম বলে তিনি খুব বিস্মিত হতেন। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর বখন ওস্তাদজীর কাছ থেকে দূরে আসি—তখন গীতপুস্তকার, সঙ্গীত-মঞ্জরী, সঙ্গীত-চন্দ্রিকা, প্রাচীন রূপদমালা, রাগবিজ্ঞান, ক্রমিক পুস্তকমালিকা ইত্যাদি গ্রন্থগুলি আমাকে পরিচর করিয়েছে অক্ষরহীন রাগরাগিণী ও গীতের সঙ্গে। তখন নানা আসরে খেয়াল গান পরিবেশন করতাম—কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের নিকট রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতাম। রাগসঙ্গীতে ময় থাকে সবেও কবিগুরুর গানের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মনে বাসা বেঁধেছিল। ওস্তাদজীর নিপুণ শিক্ষার গুণে কঠোর স্বাভাবিক স্বর রাগসঙ্গীতের কঠোর চাপে লালিত্য হারাতে পারিনি। কবিগুরুর গানের উপযুক্ত কঠোর তাই ব্যাখ্যাত পারিনি কখনও।

আই, এ, পাশ করার পর আমার জন্ম চিত্তাধিত হয়ে উঠলেন আমার মাতামহ। উপার্জনের প্রতি বড়দাদার আগ্রহ ছিল না। সংসারের আর নেই অর্থাৎ ব্যয় প্রচুর—কলে জীবনযাত্রার উপর অভাবের চাপ আসতে লাগলো। ছুই তাই আশায়রূপ উপার্জনকর্ম হলে পারিবারিক ধারা বজায় থাকবে—মা ও দাদামশাই তাই ভরসা করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতের দিকে আমার অদম্য আকর্ষণ তাঁদের বিচলিত করে তোলে। ঠিক হল প্রাজুয়েট হয়ে আমার 'আইনজীবীর' রাস্তা ধরতে হবে। জীবনে বড় সফল সমস্তা এই প্রথম দেখা দিল। আমি হব 'সঙ্গীতজ্ঞ' আর অভিভাবকেরা চান 'আইনজ্ঞ সমরেশ'কে—মনে ঝিগা এল। মনঃস্থির করলাম—তাঁই ১৯৩৩ সালে চুপি চুপি শান্তিনিকেতনে এসে 'খাঁড় ইয়ারে' ভর্তি-হলাম। গুরুজনেরা খুবই কষ্ট হলেন—বোলপুর ছেড়ে আসার আবেশ দিলেন। বি, এ, পাশের পর 'ল' পড়ব কথা দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করি। শান্তিনিকেতনে গানের দলে যোগ দিলাম। তখন 'সঙ্গীত ভবন' হয় নি। প্রধানতঃ শ্রীমদেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গানের তালিম নিতাম। তাঁর স্বত্ব ও নিষ্ঠা তুলবার নয়। উৎসব অনুষ্ঠানের জন্ম প্রস্তুতি, নাটকের মহড়া, গুরুদেবের কঠিনিঃসৃত গান তোলা ও নৃত্যনাট্যাদিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেলাম। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রাণতন্ত্র জানবার—গুরুদেবের স্নেহলাভ—কবিগুরুর স্মরণার্থ—তাঁর ছুটিভদি বৃক্সে নেওয়ার হুল'ভ সুযোগ—'নবীন', 'শাপমোচন', 'তাসের দেশ', 'চন্দ্রালিকা' ইত্যাদির ভারতবাসী পরিবেশনার অংশগ্রহণ—এনে দিল আমার মনে এক নব-উদ্বোধ। সে বৎসর শান্তিনিকেতনে বেন গানের বজা এসেছিল। শিশুর কাকলী, বাল্যের প্রবৃত্তি, কৈশোরের স্বপ্ন—বেন বৌবনের প্রথম পদক্ষেপ মূর্ত্ত হল এই শান্তিনিকেতনে—শ্রদ্ধের দীপ্ততার স্নেহে ও জগৎকবির বাৎসল্যে। নিজেকে ধস্ত মনে করি বায়ে বায়ে।

এই সময়ে অভিভাবকদের পত্র পাই—সংসারের ভার চাপিয়ে আমার মতি-গতি শোধরাবার জন্ম খ্যাতনামা পরিব্রাজকের একটি কন্ডাকে বিবাহ করার জন্ম। বিব্রোহ কুখা

মনে করে তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করি। শান্তিনিকেতনে ফিরে এতে নিবিড় ভাবে গিণ্ড / হলাম সঙ্গীতরাজ্যে। ক্রমাগত গান আহরণ করতে থাকি গুরুদেব, শ্রীমদেন্দ্রনাথ, ছুটিভদি, শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদারের নিকট। কেন্দ্র বদলে ময়মনসিংহ থেকে বি, এ পরীক্ষা দিয়ে ১৯৩৬ সালে প্রাজুয়েট হই। কলিকাতায় এম এ, ও ল তে ভর্তি হলাম। কিছুদিন গানের চর্চা বন্ধ থাকলেও কলিকাতায় 'আন্তঃ-কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়' যোগ দিই। বাংলা গানে প্রথম, খেয়ালে দ্বিতীয়, বাউলে তৃতীয় ও ভজনে চতুর্থ স্থান পাই। খ্যাতনামা শ্রীমদেন্দ্রনাথ মিশ্র সেবার একজন প্রতিযোগী ছিলেন। ১৯৩৬ সালেই কলিকাতা বেতারে শিল্পী হিসেবে যোগ দিই। এখন থেকেই গুরুদেবের গানের আবিষ্কৃত গায়কী পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। তাঁর গানের 'টক' কে আজ অবধি নষ্ট করিনি, এ আমার গর্বের বস্ত্র। তাঁর গানের টককে কিছুটা পরিবর্তন করা হত—রেকর্ড বিক্রয় বাড়ানোর জন্ম। আমি প্রতিবাদস্বরূপ রেকর্ডে গান দেওয়া বন্ধ করেছি। তাতে আমার ক্ষতি হয়েছে অনেক—কিন্তু মানসিক তৃপ্তি পেয়েছি ঢের বেশী। এই সময় কলিকাতায় শ্রী অনাদিকুমার দস্তিদার ও শ্রদ্ধেয়া শ্রীমুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছ থেকে বহু রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখি। জীবনব্যাপী এঁদের সাধনার কথা কাহারও অবিদিত নেই। ১৯৩৭ সাল থেকে 'সংসারের ভার' নিতে হল। পিতৃহৃত্ত অর্ধের কোন সাহায্য অভিভাবকদের কাছ থেকে না নিয়ে জীবনযাত্রা চলল। পড়া ছেড়ে দিয়ে উপার্জনে নামতে হল—গানশেখানোর মাধ্যমে। তখন কলিকাতায় শান্তিনিকেতনের ও ঠাকুরবাড়ীর সংস্রবে বহু সঙ্গীতানুষ্ঠান হত—তাতে যোগ দিতে হয়েছে। সমাদরও পেয়েছি প্রচুর। রবীন্দ্র—সঙ্গীত বিকৃতরূপ নিয়েছে বলে ১৯৪০ সালে 'বিচিত্রা—ভবন এ' গীতালী নামে উহা ঠিকমত শেখানোর জন্ম একটি সঙ্গীতালয় খোলা হয়। ইহার উদ্বোধন করেন গুরুদেব স্বয়ং—আর আমাকে দায়িত্ব দেন গান শেখানোর। তিনি শান্তিনিকেতনে পুনরায় আমাকে লওয়ার কথা বলেন কিন্তু দ্বীীর অনস্বৃতার জন্ম যেতে পারিনি। আমার খুব দুঃখ হয়েছিল তাঁর জন্ম। যুত্ব্যর পূর্বে কলিকাতায় রোগশয্যায় আমি কবিগুরুকে গান শোনাতেই নিয়মিতভাবে। আমার শিল্পীজীবন তাঁহার এই আন্তরিক স্নেহ আমার নিভৃত্ত অন্তরে মস্তবড় সম্পদ হয়ে আছে।

১৯৪২ সালে শান্তিনিকেতনের 'সঙ্গীত ভবন' এ অধ্যাপনার কাজ করেছি। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার এক বৎসর পরে ফিরে আসি কলিকাতায়। শিল্পীজীবনে উপার্জনের ক্ষেত্রে আদর্শগত বাধা পেয়েছি অপরিমিত—রবীন্দ্র সঙ্গীতের রূপ অবিষ্কৃত রাখার উদ্দেশ্যে। আজও আমার এই লক্ষ্য। গুরুদেবের গান যে ভাবে চিনেছি, জেনেছি ও শুনেছি—সেভাবে গান গাওয়া, শেখা ও প্রচারের সাধনার আমার প্রথমজীবন কেটেছে। আজ জীবন-অপরাত্তে দাঁড়িয়ে সমস্ত হিসাব মিলিয়ে দেখি যে জানতঃ আমি আদর্শ থেকে চ্যুত হইনি।

সঙ্গীতের অনাত্ত দিকে আমি ধনী হয়েছি শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী, মহম্মদ জমীক্বীন খাঁর শিষ্য আত চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতরত্ন শ্রীমদেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খাঁর নিকট।

শ্রীচৌধুরী শেখ করেন এই কথা করটিতে। সঙ্গীতরাজ্যে ও শিল্পীদের মধ্যে কিছুকাল যাবৎ রাজনীতি (Politics) আমদান বেন ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না।

আমেরিকার আমার খুব খাতির করেছিল। মিঃ আর মিসেস মিলেও আপনার লোকের মত করেছিলেন। মিসেস মিলে জন্মেছিলেন মাত্রায়ে তাই ভারতীয়ের ওপর তাঁর একটা মার ছিল।

খনগোপালের সঙ্গে প্রথমে দেখা হয়নি, পরে এসে বললে— আগে জানলে আপনার সঙ্গে সময়মত দেখা করতুম।

মিসেস মিলে আসবার সময় একটা ছোট ডিনার দিয়েছিলেন। তাতে উইল ডুরান্টের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথা বিশেষ হয়নি, ভীষণ গিরিয়াস লোক।

ইনস্টিটিউট অব সোসিয়োলজির ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোক বললেন—দেখ, বাঙলা আমি জানিনা, সংস্কৃত কিছু কিছু পড়েছি। বলে এমন কতগুলো সংস্কৃত নাটকের নাম করলেন যার অধিকাংশই আমি পড়িনি। ভদ্রলোক ছটা ভাষা জানতেন, তার মধ্যে তিনটে বেশ ভাল জানতেন, লিখতে পড়তে পারতেন। বাকীগুলো পড়তে পারতেন ঠিকই কিন্তু ভাল করে লিখতে পারতেন না—Can not express myself well।

হারভার্ডের সংস্কৃত প্রফেসর জ্যাকসনের সঙ্গেও চেনা হয়েছিল। তিনি সরাসরি আমার প্রশ্ন করে বসলেন—তোমাদের বইটি দু'হাজার বছরের পুরোনো বলছে কিন্তু বাঙলা ভাষাত—

কথাটা চাপা দিতে তাড়াতাড়ি বললুম—ওটা পাবলিসিটি ছাও আউট। আসলে ওরিজিনাল গল্পটাও রামায়ণ থেকে নেওয়া। তারপর একথা সেকথা বলে কেটে পড়লুম।

আমাদের নাটকের অখ্যাতি বিশেষ কেউ করেনি এক নিউইয়র্ক টাইমস। ওরা বলেছিল—A mediaeval story with a slow tempo, নিউইয়র্ক মান খুব ভাল গিখেছিল।

মসেরা আমার ইংরেজীতে অনুবাদ করে করতে বলেছিল। তাতে আমি বললুম—সবই ঠিক বলা, কিন্তু ওদের অ্যাকসেন্ট যে খারাপ হবে।

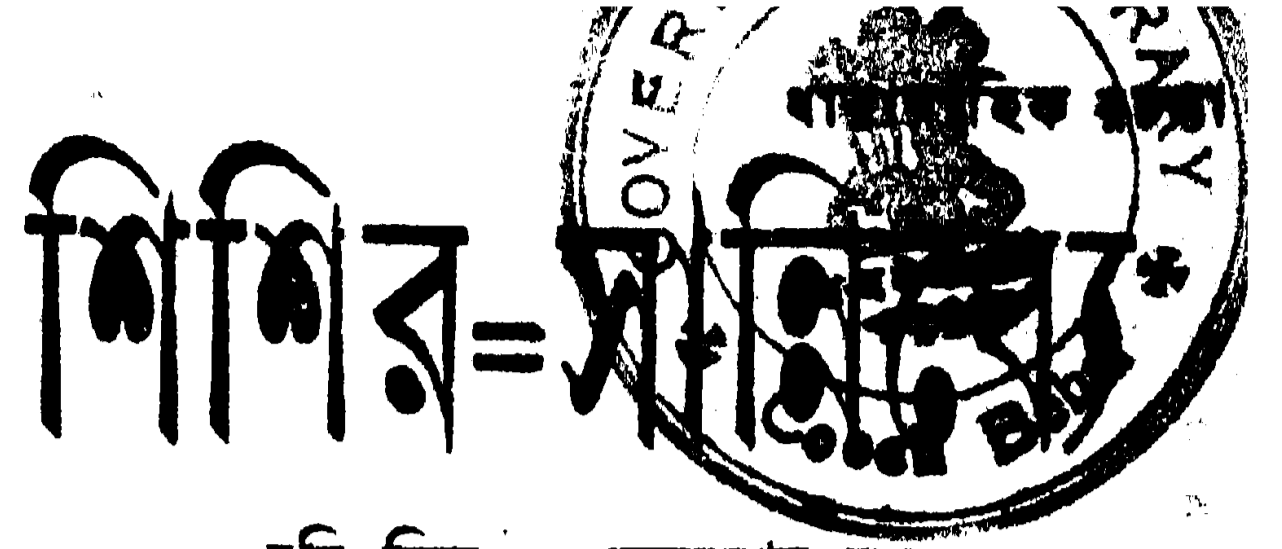
তার উত্তরে বললে—Worse the accent the better, ওরাই বলেছিল—ক্রকলিন, নিউ জার্সিতে যত ভারতীয় আছে সব পাগড়ী বেঁধে ঠেঙে তুলে দেব। ঠেঙে হাতী তুলতেও চেয়েছিল।

ওদের আসল মতলব ছিল—তোমরা যে জংলী সেইটাই সকলকে প্রমাণ করে দেব।

আমি রাজী হইনি, বলেছিলুম—বাঙলার নাটক করতে এনেছ, বাঙলাতেই করব।

১৭ই নভেম্বর এলেন মালিনীর প্রথম রিহার্স্যাল দিতে। কথা হচ্ছিল—অভিনয় করানোর জন্তে কিছু অল্প বয়েসী মেয়ে দরকার আর তাদের কিছু শিক্ষা থাকে দরকার। শুনে বললেন—অল্প বয়েসী মেয়ে শু আমাদেরও ছিল। এখানে চল্লিশ বছরে বড়ের গোলা লাগিয়ে কি আর বয়েস বেঁধে রাখতে পারে?

আবার বললেন—বেশী শিক্ষিত মেয়ের ত দরকার নেই, শুধু বর্ণ-পরিচয় থাকলেই হবে। তবে উচ্চারণটা ভাল করে করতে জানা চাই, তাহলেই চলবে। বইএর শিক্ষাত শিক্ষা নয়, সারা জীবনের শিক্ষাই হচ্ছে আসল শিক্ষা। একজন প্রাজুয়েটের চেয়ে লেখাপড়া না জানা একজন দেখবে, কার্যক্ষেত্রে বুদ্ধিমান। কাজত



রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

দেয় বুকটাই। বড় বড় অনেকে সব জানি বলে মাথা দোলায়, কিন্তু অন্তরে তারা কিছুই বোঝে না।

বিজ্ঞানসাগর মশায়ের কথা তুললেন এবার—বিজ্ঞানসাগর মশায়ের তুলনা হয় না। ওঃ, কম বই পেয়েছেন তিনি! ন বছরের বালককে বাড়িশুদ্ধ লোকের রান্না করতে হয়েছে; অথচ তার ভেতর নিজের অন্তরের তাগিদে কিছু করতে পেরেছেন।

জীবনে সাধনা হচ্ছে কিছু করতে পাগ। হ্যাঁ, সত্যিই তুমি কাজের কাজ বরেন্দ্র একথাটা কেউ কোনদিন বলে না কাউকে। সবাই শুধু নিতেই চায়। বিজ্ঞানসাগর মশায়ের কাছে মাসোহারা পেলেই সবাই শান্ত। তাছাড়া আর কিছু তারা কেউ জানত না।

পাছে সব টাকা খরচ হয়ে যায়, তাই বাইরে যাঁর আগে একজনের কাছে চৌদ্দশ টাকা রেখে কয়েকজনের নাম বল তাদের মাসিক আশী টাকা করে মাসোহারা দিতে বলে যান। ফিরে এসে শুনলেন যাদের প্রাপ্য তারা কেউ টাকাটা পায়নি। যার কাছে (টাকা) রেখে গিয়েছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করতে, সে বললে—না, টাকাটা দেওয়া হয়নি, তাড়াতাড়িই দিয়ে দেব।

তারপর আর কোনদিন তাকে বিজ্ঞানসাগর মশায় তাগাদা দেননি। উনি একবার ছুবার কি বড় জোর তিনবারের বেশী তাগাদা দিতেন না বা করতেন না।

এবার মালিনী নাটকটা ধরলেন, বললেন—মালিনীর প্রথম অংশটা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন, অথচ কোথাও তার বিষয়ে কিছু লেখেননি পর্যন্ত।

এই সময়ে শ্রামলী চক্রবর্তী এসে ঠকে প্রশ্নাম করলেন। তারপর কি কথা বলতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। উনি পরিচয় জানতে চাওয়ায় ঠকে পরিচয় দেওয়া হল, শুনে বললেন—শ্রামলী কি দুর্গেশ নন্দিনীতে অভিনয় করেছিল? ও'ত সতীশ দাশগুপ্তের বই। লোকটা বোধ হয় কিছু করতে পারত কিন্তু নিজেকে নষ্ট করলে।

আকস্মিক ভাবেই বললেন—সীতা মঞ্চস্থ করতে আমার নকলই হাজার টাকা খরচ হয়েছিল আর উঠেছিল কত জানো? মাত্র পঁচাত্তর হাজার টাকা। সে অনেক কিছু ব্যাপার! প্রত্যেকের সবচেয়ে বেশী গ্রেড একশ টাকা, তারপর তার চেয়ে কম, এমনি করে মাইনে ধরা হয়েছিল বা দেওয়া হ'ত। শেষ পর্যন্ত গোল বাধালে একশ টাকার হোঁমরা-চোমরারা। তারা বললে—অল্পের একশ টাকা হলে আমাদের আরো বেশী হওয়া দরকার।

ওয়ান সাহেব বলতেন—তোমাদের সবচেয়ে বড় দোষ তোমাদের আভিলাষ।

আবার মালিনী ধরলেন, বললেন—মালিনীর প্রথমেই কাঙ্ক্ষণ যে কথাগুলো বলছেন, বলার মধ্যে দিচ্চ বোঝাতে হবে—ভবিষ্যতের কথা। মহাক্ষণ কথাটা খুব দরকারী। সেটা ঠিক করে প্রকাশ করতে হবে। চোখ দুটোকে বড় করতে হবে।

মালিনী অভিনয় করার পারমিশান সবক্কে বললেন—মালিনী আর ঘরে-বাইরে আমার পারমিশান নেওরা ছিল ৪৩এ। ভাবলুম কর্তা গত হলেন, কে আবার কি বলবে। তা চার বছরের মধ্যে করার কথা ছিল, করতে পারিনি। তারপর চাইলেই পারমিশান দিয়েছে। রেডিওতে ঘরে-বাইরে সুনাম—বলবার মত নয়।

এবার কাণ্ডপের ভূমিকায় এক একজনকে ডেকে পড়াতে লাগলেন। দেবদাকেও পড়ানো হ'ল, (মানে বিনয়দা জোর করে পড়ালেন)। দেবদা খুব হাত-মাথা নেড়ে পড়ছিল, বললেন—দেবু তুমি হাতটাকে নেড়োনা। ষাড়টাকেই বা ওরকম করছ কেন? তোমার হুঁটাকা তেরো আনা বাদ রেখে দাও।

তারপর মালিনী আর রাণীর ভূমিকায় রিহাসার্শাল দিতে শ্রামলী চক্রবর্তী আর করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকলেন, বললেন তোমাদের দুজনকে সুন্দর মানাবে। একজন মালিনী আর একজন রাণী।

করুণা বৌদি যুহু আপত্তি তুললেন—আমার গলা ভাল নয়, গলার জোর নেই।

হেসে বললেন—তোমার গলা বেশ ভাল : তোমার গলার যে কত জোর তা তুমি নিজেরই জানোনা।

হুজুরকার ভূমিকা পড়ানো শুরু হ'ল, কিছুটা পড়িয়ে বললেন—তোমার বাপের দৈন্ত বলতেই রাণী চটে গেছেন, তাই রাগ করে পরের কথাগুলো বলে নিলেন। তারপরেই আবার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করছেন। রাজা এসে যেই বলছেন—নির্ধাসন, অমনি চটে গেছেন রাণী, পরের কথাগুলো (তাই) ব্যঙ্গ করেই বলছেন।

সুশ্রিয়র ভূমিকা করা অনেক কঠিন। কেমকরের চরিত্রে একটা কাটিন্য আছে, সেটা সহজেই ফোটে কিন্তু সুশ্রিয়র বোকা বোকা ভাবটা দেখানো অত সহজ নয়।

মালিনীর ভালবাসা কিন্তু মোটেই Personalized নয়, idealized.

রবীন্দ্রনাথের মন সত্যি মারাত্মক। অবশ্য মালিনীতে অতটা নয়, কিন্তু তপস্বী, বিসর্জন কি রাজারাগীতে মন করা রীতিমত শক্ত। তপস্বীতে একজনকে লেখাতেই একমাস লেগে গেল।

কে একজন বললেন—মহাজাতি সদনের হলে acoustics ভাল নয়। অভিনেতাদের ছোট দেখার।

তুনে বললেন—তাই নাকি? আমি ত মেট্রোপলিটান গ্র্যাণ্ড অপেরায় ওপরে বসে অভিনয় দেখেছি, অভিনেতাদের একেবারে পুতুলের মত দেখার কিন্তু সবকিছু পরিষ্কার শোনা যায়। আমাদের এখানে ফাট এম্পায়ার হলও খুব ভাল, তখনকার acousticsও খুব ভাল—ডোমের নীচে হ'লত। ঠেকটা এখন কেমন আছে জানিনা তবে আগে কিন্তু খুবই ভাল ছিল। এখন কি যেন নাম হয়েছে? বলা হ'ল—রসি।

মালিনীতে ভ্রাক্ষণ সবক্কে যে সব উক্তি আছে, সে সবক্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন—আগে আমাদের ভ্রাক্ষণদের খাতির ছিল বেশী। ভ্রাক্ষণদের নেমস্তন্ন খাওয়া হলে তবে আমরা খেতে যেতে পারত। বাড়ির কর্তা এসে বলতেন—ভ্রাক্ষণদের জায়গা হয়েছে।

আমার বিয়েতে শহীদ সুরাবর্দিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলুম, আমাকাপড় পরিয়ে একেবারে খান দিলু বানিয়ে দিয়েছিলুম।

একবার এক বছর বিস্মৃতে ভ্রাক্ষণদের ডাকতে এগেছে, আমরা বললুম—আমাদের মধ্যে ভ্রাক্ষণ-ভ্রাক্ষণ নেই। আমরা সবাই ৭নং কলেজ স্কোয়ারের দল।

১৮ই নভেম্বর এলেন নাটোৎসবের নাটক রিহাসার্শাল দিতে। ইতিমধ্যে ঠিক হয়েছে নাটোৎসবে মাইকেল, বোড়শী আর বিজয়া হবে। পুরোণো স্মৃতির তাগিদে ঠর ইচ্ছে ছিল আলমগীর করবার, আর অনেক দিন আগে শেষ অভিনীত নাটকের পুনরভিনয় দেখার লোভে আমরা চেয়েছিলাম দিগ্বিজয়ী নাটক অভিনয় করতে। (এককালে যে নাটক যথেষ্ট সুনাম পেয়েছে, আমাদের মধ্যে বয়স্করা যে নাটকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অথচ আমাদের জ্ঞানতঃ যে নাটক অভিনীত হয়নি তার অভিনয় দেখার লোভ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বৈ কি!) কিন্তু হুঁপঙ্কের কারো ইচ্ছাই পূর্ণ হলো না। বলা হ'ল মাইকেল, বোড়শী, বিজয়া, এই হবে নাটোৎসবের নাটক।

এদিন এসে তাই ঐ নাটকগুলি সবক্কেই আলোচনা করলেন। প্রথমে বললেন—বিজয়া নাটকে আর আছে কি? বেশ একটা মিষ্টি গল্প, তাতে Human element প্রচুর। নাটকটাকে ভাল করে ফোটারোর সঙ্গে একটা সিন লেখাতে চেয়েছিলুম, বিজয়া কেন সই করল। ও যে দয়ালকে বলছে—আমি যে নিজের হাতে সই করে দিয়েছি।

তাতে দয়াল বলছেন—নলিনী আমায় সব কথা বলেছে। তোমার হাতে সই করেছে, মন সই করেনি।

ওখানে বিলাসের আকটিং-এরও ছোপ থাকত। বিলাসকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলুম—বাবার কি ইচ্ছে তা আমি জানি না। আমি কিন্তু তোমার সম্পত্তি চাইনা। আমি তোমাকে ভালবাসি তাই তোমাকেই চাই। আমাদের আচার-ব্যবহার এক রকম, আমরা ছোট থেকে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, পরস্পরকে আমরা চিনি কাজেই পরস্পরকে পেয়ে আমরা সুখীই হ'ব।

তারপরেই বিজয়া সই করে দিলে।

এ দৃষ্টটা পরৎনাকে অনেকবার লিখতে বলেছি কিন্তু উনি বললেন—Not a line more, কিছুতেই লেখাতে পারলুম না। সব মানুষেরই idiosyncrasy থাকে ত, ঠরও ছিল। লেখা এক লাইনও উনি কাটতে দিলেন না। ঐ কাটা নিয়েই ত পল্লীসমাজে গোলমাল বাধল, উনি তখন বললেন—আমি অত আয়গার বাই।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিবে আসতে হ'ল, বললেন—তারা ওয় বৌদে করতে পারে, সন্দেহ করতে জানেনা।

পঙ্কজদা নাটোৎসবের সুরভেনিরের অন্ততম সম্পাদক হয়েছেন, তাতে নাটকগুলি সবক্কে একটা প্রবন্ধ লিখবেন ঠিক করেছেন, সেই প্রসঙ্গেই বোড়শীর কথা তুললেন। বললেন—বোড়শী সবক্কে অনেক কথা বলতে পারি, তবে এখানে নয়, বাড়ীতে বসে। এখানে আমার মাথার ঠিক থাকে না। বোড়শী নাটক আর সেনা পাওনা উপজ্ঞাসে বিশেষ মিল নেই। জীবানন্দ ঐ যে বলছে না—আমি চাই, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ঘর বাড়ি সব কিছু চাই। জানি মরণ বন্ধন আসবে, তাকে ঠেকাতে পারব না, কিন্তু স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের সামনে নিজের বাড়িকে মরতে চাই।—এই কথাগুলো উপজ্ঞাসে ছিল না।

কিন্তু তার পরেই বলছে—কাকি দিয়ে পেয়ে পেয়ে আমার লোভ বেড়ে গেছে। কিন্তু আর কাকি দিয়ে পেতে চাইনে।

আবার আছে—জমি আর জমিদারের নয়, জমি এখন কৃষকের।

একেবারে ব্যক্তিগত জিনিষ সাধারণ হয়ে দাঁড়াল।

এবার বললেন মাইকেলের কথা—মাইকেলে ছটি সিনে মাইকেলের জীবনের এক একটি বাক কোটানো হয়েছে। মাইকেল লিখেছেন ত মোটে পাঁচ বছর—না, বোধ হয় তারও কম হবে; কিন্তু কি দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন। নাটক ঠেকে লিখতে দিলে না তাই। বিলেত থেকে ফিরে বোধ হয় লিখেছিলেন—না, না বিলাত বাবার আগেই লেখেন, মাস্তাজ থেকে ফিরে।

তারপর বিলেত গেলেন ব্যারিষ্টারি পড়তে, কেন না তখন মাথায় এসেছে টাকা রোজগার করতে হবে। ঠেকে কিন্তু বিপদে ফেললে গুরুদাস—বার হাতে বিয়ের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন আর কি! ঠর পরিবারকে মাসে মাসে আড়াইশো টাকা করে দেবার কথা, কিন্তু এক পরসাত দিলেন। তারা বিপদে পড়ে টাকা ধার করে মধুর কাছে চলে গেল। সেখানে তিনি তখন না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন, ছেলে-পুলেরা বেতে বেশী অন্তর্বিধের পড়লেন। নানা বিখ্যাত লোকের সঙ্গে মিশছেন, অঞ্চ ল্যাণ্ড লেডি বলছে, ভাড়া না দিলে বার করে দেবে।

বিভাসাগর মশায় ঠর জন্মে কিন্তু অনেক করেছেন। প্রচুর ধার করে পাঠিয়েছিলেন, ঠর জন্মে বাড়ি ভাড়া করে সাজিয়ে রেখেছিলেন : উনি না ঠর বিভাসাগর মহাশয় একটু ক্ষুণ্ণ হন। তারপর সমরমত ধারশোধ না করতে মন ধারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তুল তাঁরই হয়েছিল। স্কিয়া স্ট্রীটে যে মাইকেল থাকতে পারেন না, এটা তাঁর বোকা উচিত ছিল।

বিভাসাগর মশায়ের জীবন নিয়ে, বিশেষকরে শেষ-জীবন নিয়ে, খুব ভাল একটা নাটক লেখা যায়। কেন উনি পরিবারের সকলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন; কেন মা দেশে থাকলেও বীরসিংহে গেলেন না; ভায়েরা কেন ছাপার অক্ষরে তাঁকে গালাগাল দিলেন তা জানা যায় না। সেইজন্মেই বোধহয় উনি বলেছিলেন—ও লোকটা আমার গাল দিচ্ছে কেন? আমিত কখনো ওর উপকার করিনি!

বিভাসাগর মশায়ই প্রথম দেখালেন যে, লিখেও সংসার চাসানো যায়। প্রতি বছর হাজার হাজার টাকা রোজগার করা সহজ কথা নয়। অঞ্চ উনি তাই করেছেন।

১১

মাইকেল সব্বদে শিশিরকুমার অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর মতে, শুধু কবি হিসাবেই নয়, নাট্যকার হিসাবেও মাইকেল খুবই বড় ছিলেন। নানা কারণে তাঁর নাটক লেখার বাধা না পড়লে, তিনি বাঙলা নাট্যসাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারতেন। কর্মের দিক থেকে তাঁর নাটক একেবারে প্রথম শ্রেণীর।

এতদিন পরে মাইকেলের নাটক পড়বার কথা হ'ল। ২০শে নভেম্বর মাইকেলের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা পড়তে এসেন। প্রথম কথা বললেন—মাইকেলের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা—১৮৫৮ সালে

লেখা। ভাবটা সেদিনকার দিনের পক্ষে মোটেই ধারাপ নয়, একটু আধটু বদলে দিলে একেবারে আধুনিক ধরণের হয়ে যাবে।

শর্মিষ্ঠার সংস্কৃতের প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়। কিন্তু নাটকের গঠন সংস্থান খুব সুন্দর। অঞ্চ এই লোকটিকে নাটক লিখতে দেওয়া হ'ল না। কৃষ্ণকুমারী অভিনয় করা হ'ল না বলেই উনি আর নাটক লিখলেন না। এতদিন পরেও বাঙলা নাটক কৃষ্ণকুমারী থেকে একপাও এগোয়নি। ইচ্ছে করে ওটা পড়বার আগে টডের রাজস্থানের কাহিনীটি পড়ে শোনাই। ওতে সব্বিছুই ভাল এক তপস্বিনী নামটা ছাড়া। ওটা প্রায়োরেস বা অ্যাবেস গোছেব কোন একটা চরিত্র বহন করে লেখা। ওটার কোন একটা নাম দিলেই বোধ হয় পারতেন।

নাটক পড়তে শুরু করে বললেন—শর্মিষ্ঠার শুরুতে এই যে লম্বা বড়তা আছে, এটা সব্বদে নাট্যকার ওয়াকিবহাল তাই পরিক্রমণ লেখা। পরের প্রকৃতি বর্ণনা একেবারে সংস্কৃত থেকে নেওয়া।

দ্বিতীয় দৃশ্যে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সখীর কথাগুলো একটু বেশী দীর্ঘ। দেবদাসীর সঙ্গে পূর্ণিকার কথাও এত বেশী বলবার কোন দরকার নেই, কিন্তু দর্শকরা পাছে বুঝতে না পারে তাই হয়ত বলা হয়েছে। এই অংশটা হ'ল যাত্রার প্যাচ। যাত্রার ধরণের সঙ্গে নাটকটির যনিষ্ঠ যোগ আছে।

আবার কিছুটা পড়ে বললেন—এইখানে নাটকটি কতখানি এগিয়ে গেল। তাইত বলছি এর গঠন নৈপুণ্য চমৎকার। শুক্রাচার্য যে মেয়ের মনোভাব জানবার জন্মে পূর্ণিকাকে বলেছিলেন আর সে তা জেনে জানাচ্ছে—এই কথাটুকু জানার সঙ্গে সঙ্গে নাটক অনেকখানি এগিয়ে গেল।

পরের দৃশ্যটা পড়ে বললেন—জামি হলে শেষের স্বপ্নতোক্তিটা দিতুম না। রাজার মনের ভাবটা এই দৃশ্যে চমৎকার কুটেছে। বিদূষকের বলার কথা হ'ল—একটি নারীকে তোমার দরকার, তা যে কোন নারীই হোক না কেন!

পরের দৃশ্যটা পড়ে বললেন—এখানে দ্বিতীয় মুখ দিয়ে কথাগুলো বলানোর অর্থ অনেকখানি টাইম ল্যাগ দেখানো। মানে পরবর্তী অঙ্কের আগেই যথাস্থির পাঁচটি ছেলে হবে। সাপ দিলে তাদেরই একজন বাপের জরা নেবে ও।

এই সময় চাঁ এলো, পড়া বন্ধ করলেন। দেবদাস পিসীমা এসেছিলেন, তিনি তাঁর ভগ্নীপতির পরিচয় দিলেন। শুনে বললেন—পুকলিয়ার শশধর গাঙ্গুলী ত! হ্যা, তাকে খুব চিনতুম। কতদিন তার বাড়িতে গিয়ে থেকে এসেছি। সে ও কোলকাতার এলেই আমার কাছে থাকত। একবার একটা কেসের ব্যাপারে ওর বাড়িতে গিয়ে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। শশধরের বিপদে ছিল অসুস্থ।

অন্ত কথাই গেলেন—জামার বই আমার ভাল লাগেনা, ওত বড় Pravant details থাকে।

চন্দ্রশঙ্ক চাঁপক্য করবার কথা হচ্ছে নারকোল ডায়াল। জামি ওদের বলেছি without সেলুকাস—ওরা তাতেই রাজী হয়েছে। বাইরে একদল সীতা করতে ধরেছিল, বলেছিল—সত্যেশো টাকা দেব, না হয় একশো টাকা বেশীই দেব। কিন্তু চোখের জন্মে রাজী হলুম না। কার কণ্ঠস্বর বলে দুটে এসে সিঁড়ি দিয়ে মাঝে

পারি না বলে তিনটে কোটে একটা করলুম, কিন্তু তাও হাঁচট খেতে খেতে রয়ে গেলুম। তাই শেষ পর্যন্ত বন্ধ করতে হলো।

চন্দ্রগুপ্তে ছায়া কে করবে একজন জানতে চাওয়ার বললেন—
ছায়া ত গীতা করবে বলেছে। ও সাতটায় যাবে।

কে একজন বললেন—এর ত পাট আছে, শেষ হতে দেয়ী হবে বোধ হয়।

বললেন ওর পাট এখনই শেষ হোক না কেন, যাবে যখন বলেছে, তখন ঠিক সময়েই যাবে। ও ত আজ পর্যন্ত আমাকে বিট্টে করেনি, একবার শুধু ডুল করেছিল। গীতা বেশ ভেবে চিন্তে বুকে পাট করে, কাজেই পারবে।

আজকালকার দিনে দুটি মেয়ে মোটামুটি বেশ ভালই অভিনয় করে। একটি হ'ল গীতা, অন্যটি—

কে একজন ফস করে বলে বললেন—কেতকী।

একটু অবাক হয়ে বললেন—কেতকী? সে কে?

ভুললোক বললেন—প্রভার মেয়ে ছুটু।

বললেন—ছুটু? না তার অভিনয় দেখিনি। আমি বলছি মমিতার কথা। ওর মধ্যে বেশ সজাবনা ছিল, হয়ত বন্দোবস্ত করা হেত, কিন্তু আজকাল ওর নিজেরই কেমন কাকি দেবার কোঁক এসেছে।

নরেশ আজকাল কাত্যায়ন করে তাতে নাকি প্রাণ থাকে না। আচ্ছা, এতকাল যবে করছে, এখনও প্রাণ থাকেনা; এটা কি রকম করে হয়? এক বলতে পার প্রথম থেকেই প্রাণ ছিল না, কিন্তু তাহলেও অস্তায় করা হয়। কাত্যায়ন ও খুবই ভাল করত।

ইনষ্টিটিউটের হল সম্বন্ধে বললেন—ওখানে মাইক দিতে হবে, ময়ত লোহলায় যারা বসবে তাদের ওপর অস্তায় করা হবে। হলটার accoustics খুবই খারাপ, ছাদটার জন্মে কথাগুলো ভাল করে শোনা যায়না। তাছাড়া মোটা মোটা ধামগুলোর জন্মে দেখারও অনুবিধে হয়। কিন্তু ওটাও ইচ্ছে করে করা। পনেরো ইঞ্চি করে দেওয়াল করারও দরকার ছিলনা, আর অত মোটা ধামেরই বা কি দরকার ছিল? যাতে থিয়েটার না করা যায় সেই জন্মেই ওভাবে তৈরী করা। যেভাবে হলটা তৈরী তাতে মিটিং হতে পারে, অভিনয় নয়। হ্যা তবে অভিনয় আমরা করেছি। ওরলে সাহেব বলেছিলেন—ওখানে যে ড্রামা হবে তা আমি জানতুমই না।

ড্যাগহোসি ইনষ্টিটিউটে অভিনয় করেছিলুম ১৯১৩ সালে—

ওর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের যুগের বন্ধু কান্তিবাবু এসেছিলেন এদিন, তিনি বাধা দিয়ে বললেন—না ওটা ১৯১৪ সালে।

বললেন—কান্তি, তুমি বলছ ওটা ১৯১৪ সালে। ওর একটা প্রোগ্রাম আমার কাছে আছে দেখব এখন। ইনষ্টিটিউটে রজাবতী করবার কথা হ'ল; তা আমরা এখানে না করে ওখানে করলুম। কতকগুলো ফিরিজী মেয়ে এসেছিল। বিনা প্রচারেই এত লোক হোয়েছিল যে, টিকিট দিতে পারা যায়নি। ওখানকার প্রোগ্রামেই প্রথম বেরোর Directed by Sisir Kumar Bhadury.

২২শে নভেম্বর এসে ইনষ্টিটিউটের এক মাতব্বরের নাম করে বললেন—অনুক বলছিল, আলমগীর করতে বিকী হবে। কিন্তু

সত্যি বলতে কি আলমগীর করতে আর ভাল লাগে না, হ্যা, আমি ওকে বলেছি যে, অত যদি যৌক থাকত অন্ত এক সময় কোরো।

চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়ের দিন যনিয়ে এসেছিলো, সেই প্রসঙ্গেই বললেন—চন্দ্রগুপ্তে ছায়া করবে গীতা, এইরকম কথা হয়েছে। ছায়ার একটা দৃশ্য সবচেয়ে দরকারী। মানে শেষ দৃশ্যে গলায় মালা পরাতে গেলে যে হলেন বলবে—আমার নয় রাজাকে দাও।—সেটার কোন অর্থই হয় না, কারণ তার আগের দৃশ্যটা বছর কুড়ি করা হয়নি।

মগধ রাজদূত বিবাহের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে, মন্ত্রী বলছেন, আমাদের রাজবস্তার আর কোনোদিকে মন নেই, কুনো হয়ে গেছেন, যাবেন কিনা সন্দেহ।

তারপরেই এলেন ছায়া, শুনে বললেন—ভাল কথা। নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলুম, কিন্তু যেতে পারব কি না সন্দেহ। রাজদূত চলে যেতেই মনে হ'ল—এ দুর্বলতা জয় করতে হবে। তাই ডেকে বললেন মন্ত্রীকে—রাজভাণ্ডার থেকে বড়ভার নিয়ে গিয়ে জেষ্ঠ আভরণ তৈরী করাও, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।

এবার কোন নাটকে কে কি ভূমিকা করবে তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হ'ল। মাইকেলে এক বিশেষ ভূমিকান্তিনেতার নাম করে বললেন—ওত করত পাটটা কিন্তু সে যখন আমাদের দল থাকতেই অল্প দলে চলে গেল, অভিনয় করল, তখন তাকেত আর ডেকে আনতে পারি না। তবে কে যদি নিজে আসতে চায় ত না বলব না। আমার বা বরেন্স ত্যাগে পুরোধো কথা মনে করে রাগ করতে পারি না সেটা অস্তায় করা।

বলতে বলতে যার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল তিনি এসে হাজির। তাঁকে দেখে বললেন—আরে এসো এসো, তোমার কথাই হচ্ছিল। তারপর বিভিন্ন নাটকে তাঁর কি কি ভূমিকা থাকবে বুঝিয়ে দিলাম। এবার জানতে চাইলেন, যোড়শীতে এককড়ি কে করবে? এক সৌখীন অভিনেতার নাম করতে বললেন, হ্যা, হ্যা, ওকে দিয়ে বলাব।

মাইকেলে দেবকী কে করবে সে প্রশ্ন তুললেন এবার। একজনের নাম করতে বললেন—হ্যা ও পারবে, কিন্তু ওকে ত মানাবেনা। বড় রোগা, তাছাড়া বয়েসের ছাপ পড়ে গেছে। তবে আমি যদি মাইকেল করতে পারিত ও-ও দেবকী করতে পারে। গান ও ভালই গাইবে।

যেয়েটি সম্বন্ধে আরও বললেন—ওর মধ্যে একটা দৃঢ়তা আছে। ও যখন প্রথমে এসেছিল, তখন দেখতেও ভালছিল। স্বামীর কাছে গিয়ে থাকলে সুরেই থাকত কিন্তু গোলমালের জন্মে যায়নি। মেয়েটা ভাল; পরসা করতে চাইলে করতে পারত, কিন্তু সে ইচ্ছে ওর হয়নি। ওর বড় মেয়েও বেশ ভাল, তবে ছোট মেয়েটাকে সামলাতে পারলে না। এই লাইনের এই সবচেয়ে বড় দোষ।

আবার চন্দ্রগুপ্তে আন্দ্রেয়ীর ভূমিকা সম্বন্ধে ওর পরিচিত ছুটি মেয়ের, মেয়েদের কথা তুলে জানতে চাইলেন, ওদের মধ্যে কে বড় রে? আন্দ্রেয়ীর গলাটা শোনা চাইত, তবেত বলব কার কর্তব্য? মানে গলায় মিল চোখের ডাঘ বড় হলেও বদলাবে না ত।

কেউ বখন করত, তখন বলেছি—ওকে গাইতে দাও। তা বলত—ও গাইতে জানেনা যে বড়না।

অল্প কথা তুললেন—আজকাল কি আর কেউ রামায়ণ মহাভারত পড়েনা? আমার কিছু সেদিন পর্যন্ত শ্রায় পুরো রামায়ণ মুখস্থ ছিল। মুরারির ত ছোটবেলায় পড়তে শেখার আগেই রামায়ণ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল; যে কোন একটা ভাষা সন্ধিয়ে দিলেই গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেত। রামায়ণ বড় ভাল বই। অল্পদ রায়বাবের মত অমন অপূর্ব বর্ণনা বড় একটা দেখা যায় না।

এলেনটেরীর শেষ অভিনয় বখন হয়, তখন তাঁর বয়স ৭০ বছর। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, কি বই করবেন? বললেন—রামায়ো জুলিয়েট।

জালোটালো ডিম করে করানো ত'ল, কিন্তু তবু বয়েসের গলিরেখা ফুটে উঠেছিল। কিন্তু কি সুন্দর হাত আর কি অপূর্ব গতিছন্দ।

প্রভা ছিল সত্যিকারের ভাল অভিনেত্রী, কিন্তু দেশের কাছে কি সম্মান পেয়েছিল? অল্প চরিত্রের কথা ছেড়ে দাও—বুধবারে আমাদের একটা হাসির বই হয়েছিল, তাতে ও করেছিল একটি গৈয়ো মেয়ের পাট। সে কোলকাতায় নতুন এসেছে, স্বামীর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। একগলা শোমটা, তার মধ্যে থেকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, অনভ্যস্ত পা থেকে চটি খুলে খুলে পড়ছে, থেকে থেকে পেছিয়ে পড়ছে, আবার স্বামী ধমকাতাই ছুটতে

ছুটতে কাছে বাছে।—একেবারে পুরোপুরি গৈয়ো মেয়ে। অল্পটুরে যাওয়া ছাড়া ও কখনো গ্রামই দেখেনি।

বার্ণপুর থেকে লোকেরা এসেছিল। ওদের ওখানে কে একজন আমার নাম করে গিয়েছিল। আমিত ওদের আগেই বলে দিয়েছিলাম—মধ্যস্থ বেখে কোন কাজ করব না। ওরা বলছিল ডিসেম্বরের শেষে যেতে। তা বললুম—এই চারদিনের পর আবার পারবনা।

তাতে বললে—পরে কবে পারবেন?


বললুম—বলতে পারিনা। ভবিতব্য জানে।

ওরা বললে—মেজর জেনারেল চৌধুরী আপনার কথা বলছিলেন।

মেজর জেনারেল চৌধুরী খুবই বড় করেছিলেন আর তাঁর স্ত্রী সত্যি গৃহকন্যা। ছশো টাকা মাইনের অফিসারের বোঁরা মুখে রক্ত মেখে, বীদযুটে জুতো আর গা-খোলা ব্লাউজ পরে আসত আর একশো টাকা মাইনের অফিসারের বোঁ একেবারে খাঁটি মধ্যবিত্ত বাঙালী বোঁ-বাড়িতে জুতো পরেন না, এক বাগানে বেড়ানোর সময় চটি পরেন। সকালে সাড়ে পাঁচটার উঠে কুকুরকে নিয়ে বেড়িয়ে এসে, চাম কয়েক পুজো সেরে, রান্নাঘরে ঢুকলেন।

আমি জেনারেল চৌধুরীকে বললুম—আপনার খুব সৌভাগ্য মশায়!

জেনারেল চৌধুরী হচ্ছেন সেকলে ছাঁদে আই, এম, এস—বুকের সময় সুরাবায়াতে আটকে গিয়েছিলেন। ওঁর কাছেই অষ্টলিয়ার



নিয়মিত কুমারেশ সেবনে লিভার মুস্থ থাকে, অস্বীর্ণ, অক্ষুধা, পে.ফাঁপা প্রভৃতি রোগে ভুঁতে হয় না, খিটখিটে মেজাজ, সহজে ক্লান্তি প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয় না।

কুমারেশ

ও, আর, সি, এল, লিঃ
কুমারেশ হাউস
দালিখা, হাওড়া

আর বৃষ্টির খুব নিশ্চয়। বলেছিলেন—এরকম বার্ষিক আর কাউন্সিল দেখিনি, নিজের বাঁচাতেই ব্যস্ত। সুরাবারা থেকে এক জাহাজে গাদাগাদি করে কলোথো এসেছিলেন। বললেন—কলোথো এসেই হাঁক ছেড়ে বাঁচা গেল! সেখানেই প্রথম চান করা, দাড়ী কামানো ইত্যাদি সারলাম। ওদের গালাগাল দিয়ে সব চেয়ে আনন্দ পেয়েছি।

এবার নিজের কথা বললেন—এই নাটকগুলো শেষ করেই চোখ কাটা। অস্ত্র কোন কাজ আর নেই। তবে নাস'রা বড় জিনিষপত্র চায়—সিগারেট দাও, চকোলেট দাও। কিন্তু খাটেও ওরা খুব।

বলা হ'ল—সে সব নাস' আজকাল আর নেই।

বললে—ওঃ আজকাল তারা নেই বুঝি?

তার আগের কথার জের টেনে কে একজন বললেন—আর্মির লোকদের ঠকানো খুব শক্ত, বায় না বলতেই হয়। হেসে বললেন—আর্মির লোকদের ঠকানো বায় বলছ? তবে একটা গল্প বল শোন। তখন আমি মদনে। সেখান থেকে কিসের সব ক্যানভাস সাপ্লাই দিয়েছে, তা মাপে ছোট হয়েছে। সে এক ছুঁদে সাহেব মেজর এসে হাজির—গোলমাল হয়েছে, সব ফেরত নিতে হবে।

সবাই ভেবে অস্থির, কি করবে ঠিক করতে পারছে না। স'ম্মলে বুড়ো মদন নিজে। বললে—নিশ্চয়, ছোট হলে ফেরত দেব বৈকি। কিন্তু তুমি নিজে যে কোন একটা বাস্তব থেকে বায় করে দেখ মাপ ঠিক আছে কিনা।

সাহেব তখনি বেঁটেবুঁটে বায় করে তিনটে বাস্তব খুললে, দেখা গেল মাপ ঠিক আছে। বায়, গোলমাল মিটে গেল।

সাহেব চলে যেতে অন্তরা বললে—বাবা, খুব বরাত ভাল। আরাদের ভয়ে বুক টিপটিপ করছিল।

২৪শে নভেম্বর মালিনীর রিহাস্ট্রালে এসে প্রথমেই বললেন—দেখ একটা দল খোলা ত দরকার। মিনিমাম ধরচ দিয়ে সহরে সহরে অভিনয় করে বেড়াবে, তাতে অন্ততঃ নাটক সংক্ষেপে ইন্টারেস্ট বাড়বে। এরকম দু-তিনটে গুপ একসঙ্গে বের করা দরকার।

মালিনীর কথা তুললেন—মালিনী খুব ভাল বই, চরিত্রগুলোর ডেভেলপমেন্ট খুব ভাল। রবীন্দ্রনাথ সত্যিকায়ের বড় নাট্যকার হতে পারতেন কিন্তু থিয়েটারের সঙ্গে ত মিশলেন না—না, না, তাহলে কথাটা ভুল বলা হয়, মিলতে উনি চেষ্টা করেছিলেন পারেন নি।

প্রথম অবস্থার পারেননি, কারণ তখন বারা থিয়েটারে ছিল, তারা ঠেকে আমল দেখনি আর তাছাড়া ওঁর মত লোকের পক্ষে তাদের সঙ্গে মেশাও কষ্টকর ছিল। দ্বিতীয় অবস্থার ওঁর ভাবকরা মিশতে দেখনি। বা উনি করেছেন, তাই খুব ভাল, খুব ভাল, করেছে সবাই। আর শেষের দিকে উনি ত বিশ্বর হয়ে গেলেন।

ওঁর তপতীও খুব ভাল বই।

বিনয়না বললেন—তপতীর শেষটা মোটেই লজিকাল নয়।

বললেন—বইএর শেষটা লজিকাল নয় বলছ কেন বিনয়? রাণী আর কি করতে পারতেন? তার পক্ষে আর ধরে কি

বাওয়া সম্ভবপর ছিল না, তাছাড়া অভিনয় করলে খুব ভাল জমে যায়।

এবার একজনকে পড়তে ডাকলেন—দেখি পড়। হ্যাঁ, গলা ভাল, কিন্তু উচ্চারণে দোষ আছে। আচ্ছা ওখানে একটা অনাবশ্যক W দিলে কেন। ওই হাঁক ডাওয়েলকে আমরা W বলি। ওতে কি লাভ হয়?

রিহাস্ট্রাল মুগ্ধ করবেন, বললেন—শ্রামণী এখনো এলো না কেন?

বিনয়নাই বোধ হয় বললেন—তারা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

বললেন—না, না ওকে সরাসরি আসতে বোলো। তারা নানা কাজের লোক, তার পক্ষে নিয়ম মেনে আসা কষ্টকর। তা আজ এলো না কেন?

কে বললে—W. B. P. C. C.র মিটিং আছে।

বললেন—সেটা আবার কি?

তারপর বুঝিয়ে দিতে বললেন—প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি। হ্যাঁ তার মিটিং এ যেতে পারে।

সকলে মিলে ওঁকে মালিনী নাটকটা পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলেন।

বললেন—পড়ে শোনাব! তবেছিলুম আজ কীকি দেখো। আচ্ছা পড়া বাক।

কিন্তু পড়া আরম্ভ করার আগেই ওঁরা এসে পড়লেন, বেশ একটু নিশ্চিতভাবে বললেন—এসে গেছে, তবে মুগ্ধ হোক রিহাস্ট্রাল। প্রস্পট করবে কে? সবাইকে কিন্ত ভাল করে মুগ্ধ করতে হবে। প্রস্পটের থাকবে, বইও থাকবে কিন্ত প্রস্পট করা হবেনা। নিতান্ত বধন একেবারে তুলে যাবে তখন ধরিয়ে দেবে।

মুগ্ধির কে করবে? এটাই সবচেয়ে কঠিন পার্ট। কেমনকরের পার্টে ত অধর ব্যাকিং আছে, একটু করতে পারলেই চলে যায়। কিন্ত মুগ্ধির এই বে বোকা পার্ট, এই ভ্যাসিলেটিং মাইণ্ড—ওটা ফোটনো বেশ কঠিন।

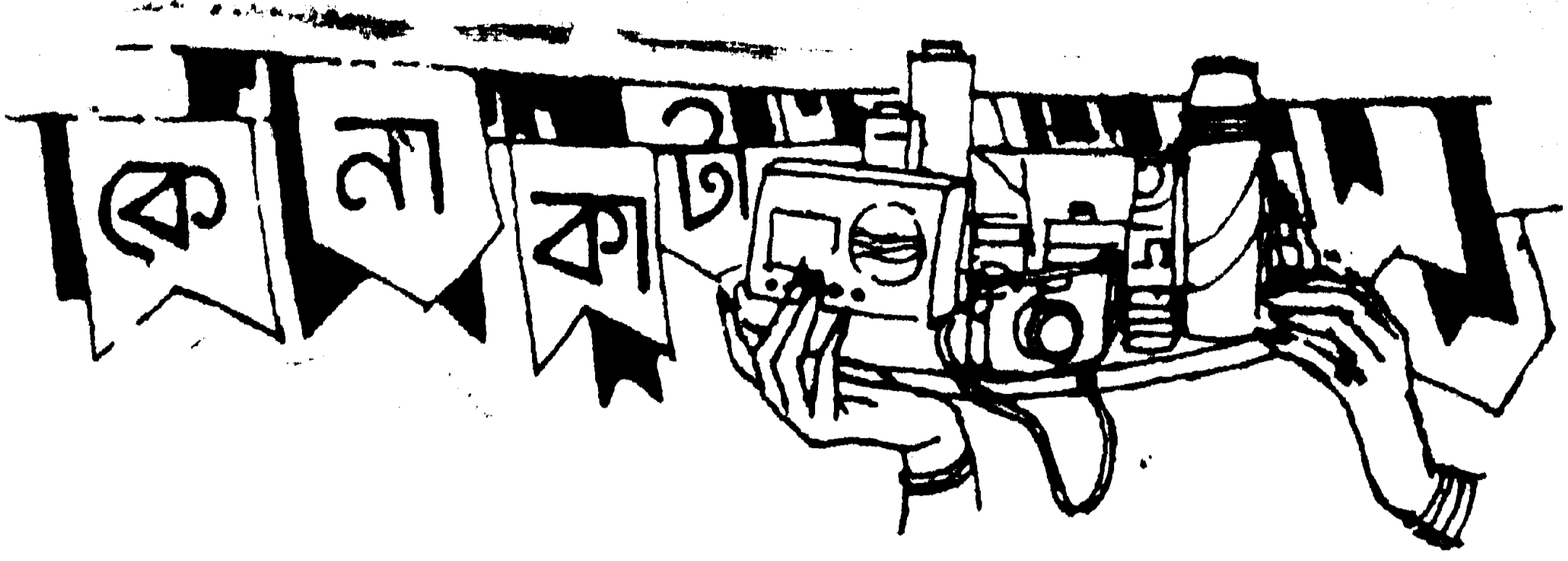
কে ওঁকে লেখার কথা বলার বললেন—দেখ, লেখা কিছুটা দরকার। কি ভাবে অভিনয় করতে হয়, সে সংক্ষেপে কিছু লেখা দরকার। কিন্ত তার চেয়েও বড় দরকার—কতকগুলো নাটকের নাটকীয় চরিত্রগুলোকে অ্যানালাইজ করা। চরিত্রের ইন্টার-প্রিটেশন কেমন হবে, তা নিয়ে মতবৈধ থাকতে পারে, একটার বেশী ইন্টারপ্রিটেশন থাকতে পারে, তা নইলে ক'চিনিউয়ার্স অভিনয় করতে করতে টেল হয়ে যেত, রাতের পর রাত একটা চরিত্র কোটাতে পারত না।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের সবচেয়ে বড় দোষ ডাইরেস্ট নয়, তবে মানুষটি নিজেও ত ডাইরেস্ট কথা বলতেন না, ওঁদের ধারাই হল ইনডাইরেস্ট কথা বলা।

ওঁকে আমাদের থিয়েটারে এনেছিলুম, কিন্ত নাটক আর দেখা হয়নি। বললেন—আমি এখন বাইরে বাছি, কিয় এসে তোমাদের নাটক দেখব।

তা উনি বধন কিয় এসেন, অভিনয় আর তখন হচ্ছে না।

[কবিতা]



চশমার ব্যবহার

এ বৃগ্ণে চশমার ব্যবহার সব দেশেই খুব বেশিরকম চালু। প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই এমনটি হয়ে পড়িয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

ভিটামিনের অভাব ও অপর নানা কারণে চোখ খারাপ হতে পারে। আর চোখ খারাপ হলেই আমরা চিকিৎসায় কল না পেলে চশমার প্রয়োজন দেখা দেয়। দৃষ্টি সহায়ক এ মূল্যবান জিনিসটি আবিষ্কৃত হয়েছে অবশ্য উন্নয়নশীল শতকে। কিন্তু তখনকার অবস্থায় এ ব্যবহার ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ বা নামমাত্র। পরিবর্তিত অবস্থায় ক্রমে এইটি ব্যাপকতা লাভ করে চলে এবং তা বিশেষভাবে সহরাজলেই।

চশমা সত্যি না হলেই কি নয়, এমন প্রসঙ্গ কেউ কেউ তুলে থাকেন বা তুলতে পারেন। কিন্তু প্রসঙ্গটি বোধ করি নগর-সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে অর্ধহীন হয়ে পড়ছে। পল্লী-অঞ্চলের ঐতিহাসিক স্মৃতি পরিবেশ ছেড়ে মানুষ এখন সহরযুগী। ভেতালময় সহরগুলিতে চোখ ভালো থাকতে পারে এমন ব্যবস্থা কৈ? তাই দেখা যায়, অল্প সকল দেশের জায় এদেশেও চশমার ব্যবহার আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

চোখ খারাপ হলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে চশমা নিতে হবে, এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। কারণ চক্ষু হলো অমূল্য ধন—দৃষ্টি না থাকলে জীবনই একরূপ বুধা। চোখের দোষ কত কারণেই হতে পারে। সিনেমা, টেলিভিশন—এসবও লোকের চোখ খারাপ করছে কম নয় নিশ্চয়ই। অপ্রতীক্ষিত কারণ থেকেই চোখের দোষ হয় অবশ্য বেশি। অথচ এ কারণটি এখনকার সমাজ থেকে নির্মূল করার সহজ উপায় নেই।

আজকাল দেখা যাচ্ছে—যে কোন বয়সের লোকই চশমা ব্যবহার করছে। বৃদ্ধ বা বয়স্ক লোকের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, জীবন পথে সবে যে পা বাড়ালো, এমন কত ছেলেমেয়ে ও ছাত্র-ছাত্রীর চোখে দেখা যায় চশমা। ব্যাপার কি? চোখের দোষ ধরা পড়েছে ঐটুকু বয়সেই, তাই এই বিজ্ঞানসম্মত প্রতিকার ব্যবস্থা। হাসপাতালগুলির চোখের বিভাগে, বিভিন্ন চক্ষু-চিকিৎসা-কেন্দ্রে ও চশমার দোকানগুলিতে লোকের আসা-যাওয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চশমার প্রয়োজন ও ব্যবহার কি পরিমাণ বাড়ছে, এই থেকে বেশ অনুমান করা যায়।

কিছুকাল আগে অবধি একটি চলতি ধারণা ছিল—চল্লিশ বছর বয়স বধর হয়ে যায়, সে সময়ই প্রথম চোখের দোষ দেখা দিতে

পারে। চক্ষুর এ দৃষ্টিহীনতার বয়সকেই বাংলার চালশা বা চালশে বলা হয়। এ সময় অনেককেই (স্ত্রী পুরুষ) চশমা নিতে হয় যেমন আগে ছিল, তেমনই এখনও। কিন্তু এখন যেটা বেশিভাবে লক্ষ্য পড়ে, সে হলো—চালশে ধরবার পূর্বেই চশমা ব্যবহারের ব্যাপকতা। চোখের দোষে মাথাব্যথা করছে, চোখ লাল হয়ে গেলো, হস্তগা হলো, আলোর দিকে তাকানো যাচ্ছে না, চোখ হয় কট টেরা হয়ে পড়লো, পড়াগুলো ও কাজকর্ম চোখের কারণে আটকাচ্ছে—এসব অভিযোগ আজকাল অহরহ শুনে পাওয়া যায়। ব্যবস্থাপত্র অনুসারে সঠিক চশমা ব্যবহারে অভিযোগের প্রতিকারও হয়ে চলেছে, এও নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, পশ্চিমী দেশগুলোতেও চশমার ব্যবহার এখন অতিমাত্রায় বেড়ে চলেছে। বুটেনে ১৯৫০ সালে বহু সংখ্যক চোখের রোগী ছিল, দশ বছর বাদে এখন তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায়। দাবী করা হচ্ছে—এই দশ বছর সময় মধ্যে চশমাধারী বৃটিশ নর-নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে অস্বতঃ তিনগুণ। মেয়েদের চোখেও চশমা দেখতে পাওয়া যায় একপে কম নয়, আর সে সর্কর। রৌদ্রতাপ থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে পঙ্গল-এর (চশমা বিশেষ) ব্যবহারও আজকাল সব য়ায়গায়ই বেশ চালু। বিশ্বব্যয় একপে চশমার ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছে হ্রদয়। চশমার লেন্স, ফ্রেম এসকল বেহু কর প্রকাণ্ড শিল্প গড়ে উঠেছে। আজ চশমার কাচ তৈরীর ব্যবস্থাও হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে।

বিনা প্রয়োজনে সখ করে চশমা ব্যবহার করতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। কারণ, এতে ভালো চোখও খারাপ হয়ে পড়া বিচিত্র নয় এবং তেমনটি অনেকক্ষেত্রে হয়েও থাকে। অবশ্য সৌখিন চশমা পরা তরুণ-তরুণী কিছু সংখ্যায় সব দেশেই রয়েছে, এদেশেও। এই শ্রেণীর চশমাগুলি হয়ত 'পাওয়ার'-শুভ; কিন্তু এ থেকেও 'পাওয়ার'-সম্বন্ধিত চশমার প্রয়োজন হয়তো দেখা দিল—সত্যি এমন অবস্থা পড়িয়ে গেলো, যখন চশমা ছাড়া গত্যন্তর নেই। মোটের ওপর, চশমা নেবার প্রয়োজন বুলেই চক্ষু-চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। চোখ ভালো রকম পরীক্ষা না হওয়া অবধি চশমা নেওয়া-না-নেওয়া প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাওয়া কিছুতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

ফলের রসের উপযোগিতা

খাতপ্রাণ বা ভিটামিনের অভাব থেকেই শরীরে অপ্রতী দেখা দেয় এবং অপ্রতী ক্রমে অবতি ও ব্যাধিকে ডেকে নিয়ে আসে। শাক-সবজী ও ফলের রসের থেকে প্রচুর পরিমাণ

ভিটামিন—বার জন্ম চিকিৎসকগণ শরীরের পুষ্টিসাধনে ফলের রস খাওয়ার কথা এতটা জোর দিয়ে বলেন।

ফলের রসের গুণ ও উপযোগিতা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। রোগ বার এ খেতে পারছে বা খায়, তাদের স্বাস্থ্য-শ্রী দেখতে পাওয়া যাবেই। সাধারণ ঘরেও অসুখ-বিসুখ থেকে রোগী যখন সেরে উঠল, অন্ততঃ সে সময় বললাভের জন্তে তাকে ভালো খাবার-দাবারের সঙ্গে ফলের রসের ব্যবস্থাও দেওয়া হয়ে থাকে। এতে যে দ্রুত সুস্থল পরিচালিত হয়, এ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না।

ফলের রসের সত্যি এতটা গুণ দেখা যায় কেন? এর ভেতর প্রচুর পরিমিত খাদ্যপ্রাণ তো আছেই, পরন্তু এইটি সহজপাচ্য। জ্বর ও দুর্বল মানুষ এ খেয়ে হজম করতে পারে অনায়াসে। দৈনিক দুর্বলতা দূরীকরণ ও মানসিক প্রশান্তি কিরিয়ে আনতে রোগ একটু করে ফলের রস খেতে পারলে যত্ন মতো কাজ করবে, এইটি সাধারণ দাবী। মোটের ওপর রান্না করা খাবারের চেয়ে এ অনেক ভালো বলে মেনে নিতেই হবে।

ভালো বলেই যে একদিনে অনেকটা ফলের রস খেলে বেশি ফল পাওয়া যাবে, তা আদৌ নয়। বরং মাত্রাসুপাতিক না খেলে অর্থাৎ যে পেটে যেমনটি সহ্য হবে, সে বুঝে না খেলে ভালো না হয়ে খারাপ ফল হবার আশঙ্কাই বেশি। তাতেই দাঁড়াচ্ছে—শক্তি-সঞ্চায়ক ও রক্তবর্ধক এই ফলের রসটি খেতেও পূর্বাঙ্কু চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অসুচিত নয়। অনেক সময় ডাক্তাররা টাটকা ফলের রস অমনি সোজাসুজি খেতে ব্যবস্থাপত্র দেন না—জলের সঙ্গে মিশিয়ে সেই রসটাই খেতে বলেন। শিশুদের মুখে কমলালেবুর রস দিতেও এমনি রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়।

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের জন্ত সুস্থ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যের যে দাবী করা হয়, সে নানা কারণে কার্যকরী হয়ে ওঠে না। আজকের সমাজে ভেজালহীন টাটকা খাদ্য খুঁজে পাওয়াই কঠিন বলা যায়। এই অবস্থার কারো দেহের পুষ্টিই বলতে গেলে ঠিকভাবে হওয়া সম্ভবপর নয়। কাঁচা সজীর জায় নিজ হাতে তৈরী ফলের রসের একটু ব্যবস্থা করতে পারলে আশু সুস্থল দর্শাবে। শিশুদের ফলের রস দৈনিক পুষ্টি ও মানসিক বিকাশের জন্ত একরূপ অপরিহার্য বলা যায়।

প্রশ্ন যেটি বড়, সে হ'ল—ক'টি পরিবারের পক্ষে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র বা স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ অনুসরণ করা সম্ভব? ফলের রস ভালো হলেও আজকের দিনে কয়জনের ভাগ্যে এইটি জুটছে? কিন্তু এও ঠিক কথা—জুটছে না বলেই জিনিসটার উপযোগিতা বা দাম কমে গেলো না। স্বীকার করতেই হবে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দক্ষতা একই সঙ্গে আহরণ করতে হলে কাঁচা শাক-সজীর পাশাপাশি রেখে ফলের রস খাওয়া উত্তম ব্যবস্থা।

চুলের যত্ন কেন চাই?

আমরা যে রূপ ও শ্রী দাবী করি, চুল বাদ দিয়ে তা হয় না। চুলের সৌন্দর্য্যে মানুষের সৌন্দর্য্য বাড়ে, এ নিয়ে বিতর্ক নিশ্চয়ই

নিপ্রয়োজন। নারীদের বেলায় কথাটি বোধ হয় আরও জোর দিয়ে বলা চলে। সুলভ বিস্তৃত চুল থাকা তাদের একটি মস্ত সম্পদ বলেই গণ্য।

কিন্তু একটি কথা পরিষ্কার—পর্যাপ্ত বয়স না নিলে চুলের সৌন্দর্য্যও ম্লান হতে বাধ্য। যেখানে চুল নষ্ট হয়ে গেলো, খুঁজলে দেখা যাবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যত্নের অভাব এর জন্ত দায়ী। চুলের গোড়াগুলি মজবুত ও সতেজ রাখার দিকে নজর না থাকলে মাথার ক্রমেই চুল কমে যেতে পারে, অকালপকতা দেখা দিতে পারে, টাক পড়তে পারে—এসব আরও বস্তু কি।

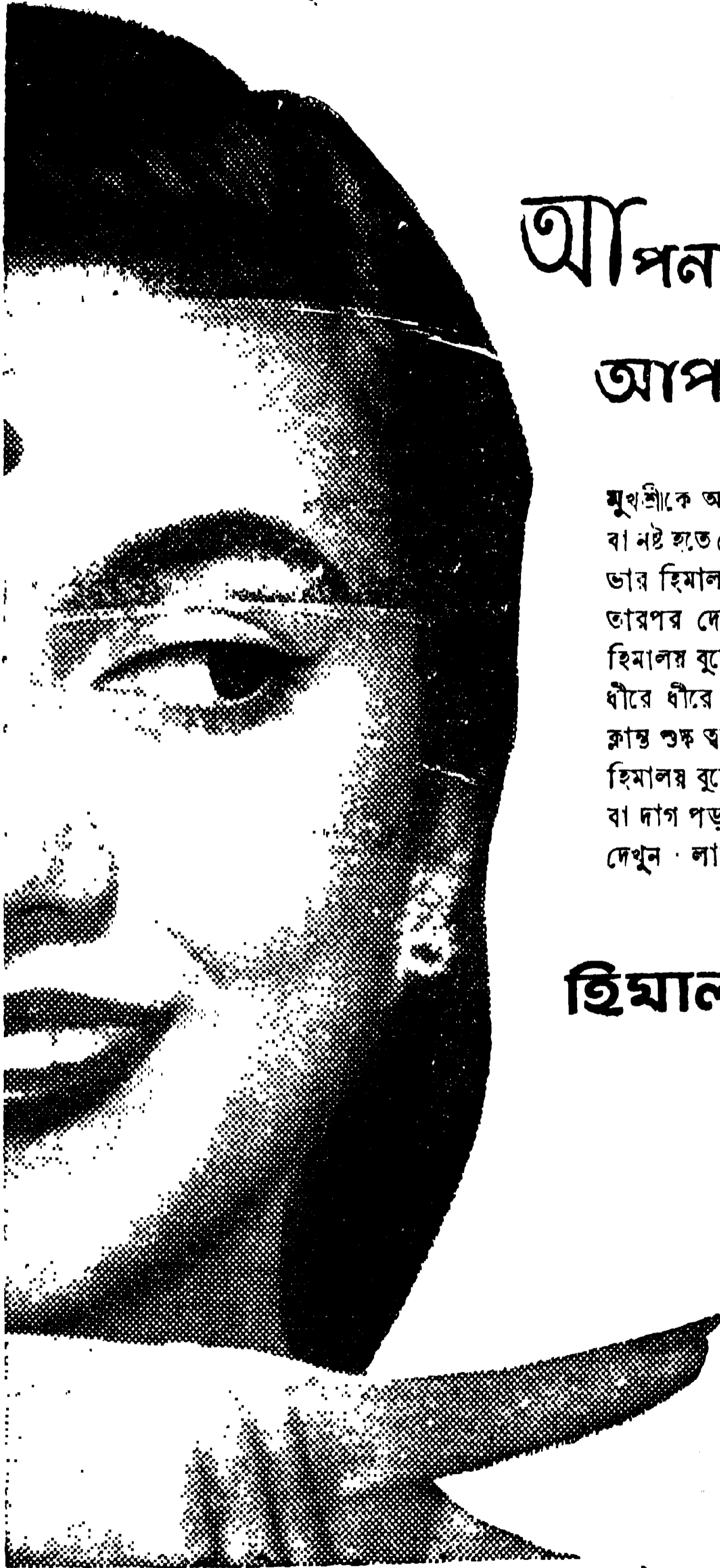
আবার, প্রতিদিন যদি নিয়মিত চুলের যত্ন নেওয়া হয়, তা হলে সাধারণ অবস্থায় এর সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর। মনে রাখা দরকার, চুলের মূলদেশে যে স্বাভাবিক তৈলাক্তভাব থাকে, তা শুকিয়ে গেলেই বিপদ। এমনটি হ'লে যদি যায়, সে ক্ষেত্রে চুলের সৌন্দর্য্যও বিদায় নিলো বুঝে নিতে হবে।

চুলের ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের কয়েকটি সূত্র বা নিয়ম মেনে না চললে নয়। যেমন, দিনে অন্ততঃ বার দুই ভালো করে চুল আঁচড়ানো, চুল বেঁধে শোওয়া (মেয়েদের বেলায়), সপ্তাহ কি পক্ষকাল পরপর মাথাঘসা বা চুল শ্যাম্পু করে নেওয়া, চুলের গোড়ায় ভালভাবে ভাল তেল মালিশ করা—এ সব চাই। দেখতে হবে চুলের মূলদেশে যেন কিছুতেই ধুলো, ময়লা বা খুসকী জমতে না পারে। কোন রকমে একটু তেল মেখে স্নানটা সেয়ে ফেললেই কাজ হবে, এমনটি আশা করাও চলে।

মাথা ঘসা বা শ্যাম্পু করার যে কথা এইমাত্র বলা হ'ল, তা কিন্তু খুব ঘন ঘন করা ঠিক নয়। কারণ, এতে চুলের গোড়াকার তৈলাক্ত জিনিসটি নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে আর সত্যি একটা দাঁড়িয়ে গেলে চুল সতেজ থাকতে পারে না। দিনে কয়েকবার করে চিফনী দিয়ে চুল আঁচড়ানো খুবই ভালো জিনিস। এতে চুলের গোড়ায়, গোড়ায় রক্ত চলাচলের সুযোগ বাড়ে—যেখান থেকে চুলগুলি সতেজ থাকবার রস পায়।

বাপ-মায়ের উভয়ের চুলই যদি ভালো থাকে, সন্তানের চুলও ভালো হওয়ার সম্ভাবনা। অপরিষ্কার মা-বাবার চুল খারাপ থাকলে ছেলে-মেয়ের চুলও তেমনি হওয়া বিচিত্র নয়। টাক পড়ার ব্যাপারটা কিন্তু সব সময় এই সূত্রে নিয়ন্ত্রিত হয় না। বিশেষ করে টাক পড়ে সাধারণতঃ পুরুষদের মাথাঘ, মেয়েদের নয়। চুলের অকালপকতা কোন কোন ক্ষেত্রে মাতা-পিতার কারণেই হতে পারে বা হয়ে থাকে।

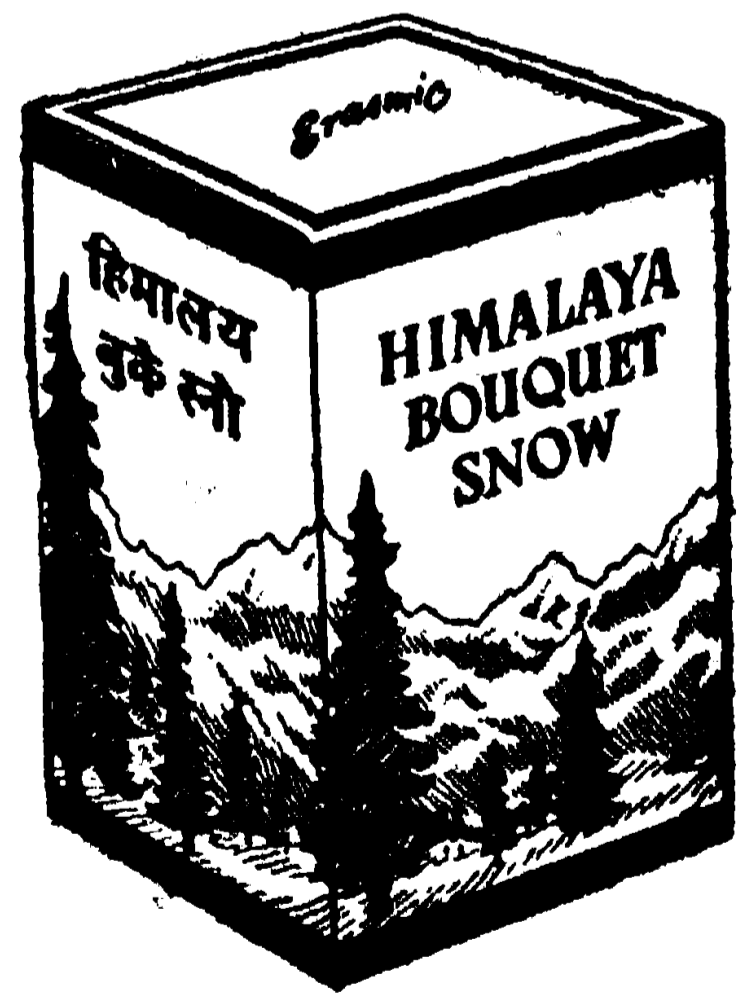
সৌন্দর্য্যের জন্ত ছাড়াও চুল হলো সাধারণ স্বাস্থ্যের একটি 'ব্যারোমিটার' বা নিরূপণ বস্তুবিশেষ। স্বাস্থ্য খারাপ হলে, রক্তের জোর কমে গেলে, চুলের ওপরও এর প্রতিফলনা না হয়ে পারে না। এ থেকেই দাঁড়িয়ে যায়, চুলের যত্নের সাথে সাথে সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকেও নজর না রাখলে নয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো থাকলো বলে চুল ভালো থাকবে, এই আশা রাখলেই লুপ্ত হবে না। চুলের যত্ন নেওয়ার দাবীটা যেন কোন অবস্থাতেই উপেক্ষিত না হয়, সেদিকে সব সময় হ'সিয়ার থাকতে হবে।

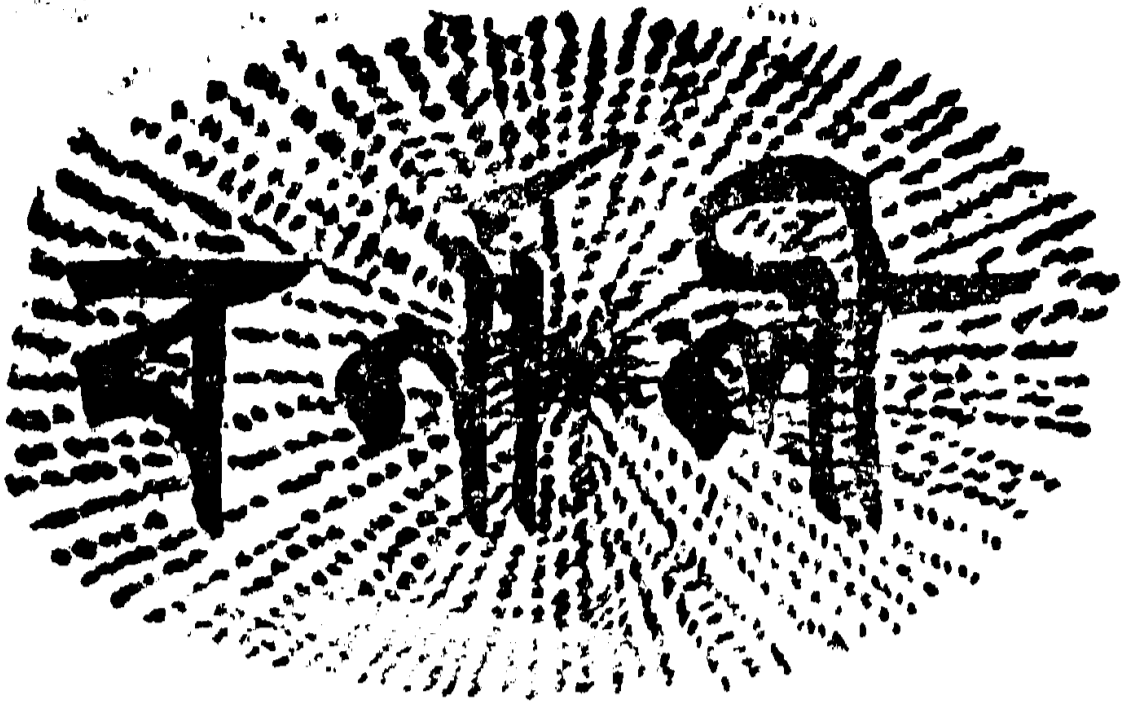


আপনার রূপ লাভন্য আপনারই হাতে!

মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধুলোর কালো
বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাভন্যতা রক্ষার
ভার হিমালয় বুক স্নো ওপরই ছেড়ে দিন—
তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু ধানি
হিমালয় বুক স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কাস্তি
ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে!
ক্রান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে!
হিমালয় বুক স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ
বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারায়
দেখুন লাভন্যতা এনে ধরেছে...

হিমালয় বুক স্নো!





[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

ভাসাচোরা মুখে সুদর্শনকে অভ্যর্থনা করতে করতে মঞ্জুর মনে পড়ে গেল রক্তের কথাটা। সত্যি তো, রক্ত তো বলাইলেন, দেখো ভাসার ঠিক আসবে।

ঘরের মাঝখানে ঝাঁড়িয়ে ছিল সুদর্শন। মঞ্জুর দিকে আরো হু পা এগিয়ে এলো সে। বতীন বাবুর চিঠি পড়ে মৌরীর মৃত্যু খবরের সত্যতা সন্দেহ সন্দেহ জাগা মাত্র সেই যে সে ছিঁর সংকল্প করেছিল একদিন এখানে আসবে সে, ব্যাপার কি জানতে—তার সেই সংকল্পের সঙ্গে আরো একটা হৃদমণীয় কিছুব টান দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে আজ তাকে একেবারে বেন টেনে এনে এখানে হাজির করে দিয়েছিল। বাড়ীটা অচেনা নয় সুদর্শনের। এক তলার বাবুর ঘর থেকে মৌরীর চিলে কোঠা পর্যন্ত সব চেনা তার। নীচে কাউকে দেখতে না পেয়ে সবাসরি উপরের বসবার ঘরে চলে এসেছিল সে। কিন্তু বাড়ীটাতে ঢোকার পর থেকে ভেতরে বেন একটা হলুদুলু কাণ্ডকারখানা চলছিল তার। যদি সংবাহটা সত্য হয়। যদি ওকে দেখে মৌরীর বুঝা পিসিমা চিংকার করে কেঁদে ওঠেন। বৌদি চোখে জাঁচল চাপা দেন। কত কষ্ট মঞ্জু বেদনার কথা বলতে না পারে। শোক রুহমান পিতার আর্ত আক্ষেপ আছড়ে পড়তে থাকে তার কাছে। একটা পরিবারকে অনর্থক কাঁদিয়ে বাওয়ার জন্ত এসে উপস্থিত হলো না তো সে ?

কিংবা—কিংবা যদি একেবারে মৌরীর সঙ্গেই সব প্রথম সাক্ষাৎ হুখোহুখি দেখা হয়ে যায় তার ? নিতান্তই যে একটা ছেলেমানবি দাপাদাপি শব্দ বৃক্কের মধ্যে চলছিল, মঞ্জুর কথা শুনে সব গপ্তগোল লাভ হয়ে গেল এক তার ঠোঁটের চিবুকের যে অননুভবনীয় অভিভাবত ভাবটা এতকণ অনমনস্ক হয়েছিল, কের পুরো ওজনে প্রথিত হলো তারা। মঞ্জু ঠিক ঘটটা বিস্তৃত হয় ঠিক ভতটাই আগ্রহাবিত, আরে বসুন বসুন। কি ভাগ্য আমাদের। অভ্যর্থনার জবাবে হু পা এগিয়ে এসে ঝাঁড়িয়ে একটু হাসল সে। বসল ভাগ্য ?

আনন্দ বেদনা হু দিকেই যায় এমনি একটা সুরে ও ভজিতে মঞ্জু বললো—সঃ, ভাগ্য নয় একেবারে অভাবিত ভাগ্য যে।

—কায় ?

দেখা গেল জবাবের জন্ত মঞ্জুকেও ঠেকে যেতে হলো। হয়তো ঠেকতে হতো না, যদি এর ভেতর বড়রা জড়িত না থাকতেন। ছোট পিসি, ছোট পিসেমশাই-এর সঙ্গে হয়তো সুদর্শনের দেখা হয়েছে।

কিন্তু সত্যি সত্যি মঞ্জু বেদনা মঞ্জুর হৃদয় জিলে মঞ্জুর মনোভাব

ঘটনাটারই আরো বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন সুদর্শনের কাছে—এই অবস্থার ঝট করে কিছু করে বসা সমুচিত হবে না।

জবাবের জন্ত অপেক্ষাও করলো না সুদর্শন। বসতে বসতে ধীর কণ্ঠে বলল—তা আপনারা সব ভালো ?

এ প্রশ্নেরই বা কি জবাব দেবে মঞ্জু ? তাই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে ঝটপট বলে উঠল সে—আপনি বসুন। আমি বাড়ীর ভেতর ধর দিয়ে আসছি।

বেরিয়ে এসে মঞ্জুর মনে হলো গাছের পাতাটুকু পর্যন্ত না নড়া গ্রীষ্মের শুক সন্ধ্যার মতো ওদের বাড়ীটা বেন নিশ্চল রূপ ধরে আছে। যে যেখানে আছে ছিঁর হয়ে আছে। হাত পাটুকুও বেন কেউ নাড়াচাড়া করছে না।

পর্দার কাঁক দিয়ে বারান্দার চোখ পেতে বসেছিল অমিতা। মঞ্জুকে দেখামাত্র তার হাত ধরে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে এলো তাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে চাপাকণ্ঠে বললো, বাবু বলে গেল, জামাইবাবু এসেছেন ?

হেসে ফেলল মঞ্জু—আর জামাইবাবু ! তা তুমি এমন ঘরে বসে হাঁপাচ্ছ কেন ?

—সত্যি নাকি বলোই না।

—তুমি চলো দেখবে।

—ওরে বাবা ! অমিতা আরো ক'পা ভেতরে ঢুকে গেল। ভাগ্যিস আমি সামনে পড়ে বাইনি।

—কি হতো তুমি পড়লে ?

—কেঁদেই ফেলতাম ভয়ে।

কপালে করাঘাত হানল মঞ্জু—একেবারে পারকেটে—ঐটুকু হলেই তো হয়ে যেত। ভয়লোকের অহংকৃত প্রথিত ঠোঁট দেখতাম বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে কি না।

অর্ধেক ব্যাকুলকণ্ঠে অমিতা বলল—কি করবে এখন তুমি তাই বলনা ?

চিবুকে হাত বুলাতে লাগল মঞ্জু—তাই তো ভাবছি। বাবা অফিসে চলে গেছে ?

—না। মাত্র বেরুচ্ছিলেন। বাবুর মুখে শুনে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

—দাদা ?

—ঐ যে। হাত দিয়ে ঘরের কোণ দেখিয়ে দিল অমিতা।

মঞ্জু দেখল অফিসের জামা কাপড় পরা অবস্থার ছাদের ঘরের কোণে ককণ মুখ করে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে।

জন্ত কোন কারণে দাদাকে এইভাবে অফিসের জামা কাপড় পরে চোরের মতো ঘরের কোণে বসে থাকতে দেখলে মঞ্জু হেসে লুটোপুটি খেত—এখনও ঠেলে হাসি হাসছিল কিন্তু হাসল না মঞ্জু। মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। অমিতা উগ্রীব চোখে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

মাথা তুলল মঞ্জু—ঠিক আছে।

—কি ঠিক করলে গো ?

—ভয়লোকটিকে নিয়ে গিয়ে সোজা ভয়মহিলাটির ঘরে পৌঁছে দেবে। তারপর যা হয়—

শব্দ না করে ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল অমিতা। সেই বেশে হবে—চমৎকার হবে। মুখটা আছাদে করে তুলে বলল, শির অর্ধেকরাত মিলে সোজা-পড়া করে—নিশ্চয় করে। আরো

তো বগই হাতে পাবো—না গো? নিরুপায় হয়েই তো আমরা
অমন মিথ্যে কথা বলেছি এঁরা? এই অবস্থায় সবাই তাই করতে
না? আমাদের দোষ কি—এঁরা? ওঃ, কি মজা! মুখে একমুঠো
কাপড় চাপা দিয়ে অমিতা হাসির শব্দ ধামালো।

অমিতার ঘর থেকে মঞ্জুদের ঘরের ব্যবধান বিশ গজের বেশী নয়।
এই পথটুকু আসতে আসতেই আশ্চর্য্য ভাবে তৈরী করে ফেলল মঞ্জু
নিজেকে। একটা মর্শ্বাতিক দুঃসংবাদের খবর শুনে ছুটে আসবার
মতো এসে মৌরীর টেবিলের ছু কোণ ঘরে ঝাঁড়িয়ে রক্ত নিঃখাসে বলে
উঠল—একটা সাংঘাতিক দুঃসংবাদ শুনে এলাম রে দিদি!

মঞ্জু খাতা আনতে গিয়ে আর ফিরে এলো না দেখে মৌরী ওর
নিজের কাজে মন দিয়েছিল। টেবিলে মাথায় এক করে বসে যেন
কি লিখছিল সে—উৎকর্ষার সঙ্গে মুখ ভুলল—কি হয়েছে?

চঞ্চল গলায় বলে উঠল মঞ্জু—সুদর্শনবাবু তার বোনের কাছে
বেড়াতে গিয়েছিলেন তো। সেখানে কোন এক পাহাড়ী পথে নাকি
তার গাড়ী একেবারে হাজার ফিট নীচে পড়ে—

মৌরীর মুখের লাল কণাগুলো যেন পলকে সাদা কণায় পরিণত
হয়ে গেল। ঠোঁটটা কেঁপে উঠছিল বলেই কিনা কে জানে—হাতের
কলমটা ঠোঁটে চেপে ধরল সে।

গাড়ী আর মানুষটার গুঁড়িয়ে যাওয়ার কথাটা বলে উঠতে পারল
না বলেই যেন সেখানটার থেকে গিয়ে মঞ্জু বলল—কিন্তু সব চাইতে
আশ্চর্য্য কথা হলো, বারা ঘটনাটা দেখেছে তারা নাকি জোর দিয়ে
বলছে, লোকটি ইচ্ছে করে খাদের দিকে গাড়ী চালিয়ে দিয়েছিল।

নইলে ও-পথে ছুঁটনা ঘটে না কখনোই। তার মানে তো আশ্চর্য্য
—এঁরা? কী সাংঘাতিক কথা মা গো! হু চোখ বন্ধ করল মঞ্জু।

এবার হেসে ফেলল মৌরী। তোর লাইব্রেরীর কাজ দেখতে
চাওয়ার জন্য এমন গল্প তৈরী করে আনলি।

—গল্প তৈরী করে আনলাম? কি যে বলিস। এমন গল্প
মাথায় আসে নাকি কার। টেবিলের ধরা হাত ছেড়ে দিয়ে বলল—
বাই ঘটনাটা শুনি গিয়ে। আমি না শুনেই ছুটে এসেছি।

—আচ্ছা, এর মানেটা কি হচ্ছে মঞ্জু?

—কোনটার? মারা যাওয়ার মানে জিজ্ঞাসা করছিস না
ছুঁটনার মানে জিজ্ঞাসা করছিস? হু চোখ বিক্ষারিত করে আনতে
চাইল মঞ্জু।

চুপ করে গেল মৌরী।

আর ওকে চুপ করে বসিয়ে রেখে এসে প্রবেশ করলো সে কসবার
ঘরে।

টেবিলের উপর রক্ষিত ত্রিকোণ-কাটা কাচের কাগজ-চাপাটার
ভেতর দিয়ে যে সূঁচাছুটাটা নানা বর্ণে এসে টেবিল-ঢাকনাটার উপর
পড়ে রামধনু সৃষ্টি করেছিল, তারই দিকে তাকিয়ে বসেছিল সুদর্শন।
তার চিন্তাধারাটা এখন একেবারেই অন্য ধারায় বইতে শুরু করেছিল।
এতদিন তার সমস্ত মন একমুখী হয়েছিল। সংবাদটার সত্য-মিথ্যা
বাচাইএর প্রতি। ওরা হু' পুরুষের লক্ষ্মীবাসী। আশ্চর্য্যক বোগাযোগ
যতই থাক, বাহ্যিক বোগাযোগটা এসেছিল বাংলার সঙ্গে কীপ হস্তে
কীপতর হয়ে। স্বজন-বন্ধু বারা আছেন, তাঁরাও এতই উচ্চ মহলের

ক্যালকেমিকোর
ক্যাস্টরল
মনোরম গন্ধযুক্ত ক্যাস্টর অয়েল
ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্যমে সহায়তা করে

বড় শিশি কার্টন হাড়া ও ছোট শিশি (পূর্বের ৫ আউন্স) কার্টন সমেত
পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২২

CAS 1A/58-59

বে, মৌরীয়া সে-সব সমাজে অপরিচিত তো বটেই, অপমানেরও বটে। কানে কানে রাজা তৈরী করে ঠিক খবরটা যবে এসে পৌঁছবে তাই না ছিল তার সম্ভাবনা—না ছিল সুদর্শনের তত অপেক্ষার বৈধ্য। কিন্তু এখন চিন্তায় উজানটান আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল তার। মৌরীর এই অস্বীকৃতির পেছনে যে অসম্মান ছিল, যে অসম্মানের কাঁটাটা সংবাদটার বখার্বতা সবুজে সন্দেহ জাগা মাত্র তার মুখ কটিন করে তুলেছিল, এতকণে সে কাঁটাটা কেব বিধতে শুরু করেছিল তাকে। সে জানে এখন বাড়ীর ভেতর কি ঘটবে। মৌরীকে নিয়ে নব উত্তমে আবার উঠে পড়ে লাগবে সবাই। কিন্তু তার ভেদের কাছে তার মানতে হবে সবাইকে। লজ্জার সংকোচে কেউ আর তার কাছে আসবে না। শেষ পর্যন্ত যে আসবে সে হলো মঞ্জু। বসে কথা খুঁজবে সে, কিংবা বিব্রত অপ্রতিভ মুখে বাড়ীর মুখপাত্র হয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ও পক্ষের আক্ষেপের কারণ থাকতে পারে—লজ্জা পাবার কিছু নেই—না কিছু নেই তাদের লজ্জা পাওয়ার। সব লজ্জা, সব অসম্মান তার। বসে থাকতে পারলো না বলেই সোকা ছেড়ে উঠে পড়েছিল সুদর্শন। মঞ্জু এসে প্রবেশ করলো যবে। আর ওকে দেখেই হাত জোড় করে একটা নমস্কার জানাল সুদর্শন। বললো—আপনার জন্তই অপেক্ষা করছিলাম। কিছু না বলে বাড়ীতে ঢুকলেও না বলে তো চলে যাওয়া যায় না। আচ্ছা আসি তবে।

—বাঃ সে কি! আপনি আশ্রয় আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—আশ্রয়ই না আমার সঙ্গে। তারপর সুদর্শনকে নীরব দেখে বললো—কি হলো? আসবেন না?

দুই পাঞ্জাবীর পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে শরীর টান করল সুদর্শন। বলল—চলুন।

কি ভেবে মঞ্জু কি করেছিল তা জানে মঞ্জু। কিন্তু এতে করে একটা বড় কাজ হয়েছিল এই যে, মৌরীর দুর্বলতাটাকে মঞ্জু একেবারে উপর তলার টেনে তুলে রেখে গিয়েছিল। টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নতনেত্রে নিশ্চলভাবে বসেছিল মৌরী। ঘরের ভেতর কারা ঢোকবার শব্দ পেয়ে মঞ্জু ভেবে মুখ তুলল সে। আর চোখ তুলতেই একেবারে ঘরের ভেতর এসে পাঁড়ানো সুদর্শনের দৃষ্টির সঙ্গে চোখ মিলে গেল তার। চমকে উঠে পাঁড়ালো মৌরী। শরীরের ধাক্কায় চেয়ার গেল পড়ে। হাতের কলম পড়ল ছিটকে। কাঁধের আঁচল পড়ল খশে।

সুদর্শন ওর লুটিয়ে পড়া আঁচলটার দিকে একবার তাকালো বটে—কিন্তু সেটা তুলে দিতে গেল না।

এগিয়ে এসে চেয়ারটা তুলল। কলমটা তুলে নিয়ে নিবটা চোট খেয়েছে কিনা দেখল, পরীক্ষা করে তারপর সেটার মুখ বন্ধ করে রেখে দিল টেবিলের উপর। তারপর চেয়ারের পিঠে হাত রেখে মৌরীর দিকে একটা বিশেষ মনোযোগের দৃষ্টি কেলো বলল—মনে হচ্ছে ভূত দেখেছেন আপনি। কিন্তু ভূত তো আপনার দেখবার কথা নয়। সে তো দেখবো আমি।

নিজেকে সামলাতে আর কতক্ষণ লাগে। সুদর্শনের কলম ধাক্কা, চেয়ার তোলায় মনোই আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠল মৌরী।

আর ওধু বে আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠল সে তাই নয়—বেন আরাম বোধ করতে লাগল। জবাব দিল সে—ভূত আমিও দেখতে পারি।

—কি করে? আমি যারা গেছি এমন সংবাদ তো আমি আপনাকে দেইনি?

—এইমাত্র মঞ্জু আমাকে সেই রকমেরই একটা খবর দিয়ে গিয়েছিল।

—তাই বলুন! বুদ্ধিমতী মেয়ে মঞ্জু। জানে জ্যান্ত এসেছি শুনলে দরজা সেঁটে দেবেন। ভূতকে তো আর দরজা বন্ধ করে—আটকানো যায় না—তাই দরজা খোলা পেয়েছি। তা আপনার আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। জোর করে বিয়ে করবো বলে আসিনি—আর তা সম্ভবও নয়। একটু চূপ করে থেকে বলল—তা যর পর্যন্ত যখন এসে পৌঁছোনাই গেল তখন গৃহকর্তার অনুমতি পাই তো একটু বসে বসি।

নিজেকে আরো কিছুটা সহজ করে নিল মৌরী—এখানে আপনাকে বসাতে পারি তেমন কেন ব্যবস্থা নেই। চলুন বসবার ঘরে।

—তার মানে, আপনি রেহাই পেলেন। সবার মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে চূপচাপ চলে আসবেন আর নয়তো নিতান্ত ভয়তায় দ্বারে চূপচাপ বসে থাকবেন—বা আমার প্রতি সেই দায়টাও আপনি পালন করতে অপরাগ হবেন। কিন্তু আমার দরকার আপনাকে। আপনার উপর আমার একটা নালিশ আছে। দেখা যখন হয়েই গেল, তখন সেটা জানিয়ে যাই। তার বুদ্ধিম তোটে ভাঁজ কেলল সুদর্শন—চেয়ারের কাঠ যত শক্তই হোক অপমানের কাঁটা হয়ে তা কখনই গায় বিধবে না। স্বচ্ছন্দে বসা যাবে। চেয়ারটা ওর দিকে পেছন ফেরানো ছিল। সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বসল সে। পাঁড়িয়ে থাকা মৌরীকে বসতে বলতে গিয়েও গেল খেমে। তারপর এতকণে সিগারেটের টিন আর দেয়াশলাই বের করল সে। একটা সিগারেট ছু আঙ্গুলে টেনে বের করে হাতের টিনটা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল—কাউকে ভালো লাগা না লাগার উপর কোন কথা চলে না। আর বিয়ে ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই জীবনের এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, একদিন আগে কেন, পাত্র অপাত্র হলে বিয়ের পিঁড়ি থেকেও কনে উঠ আসতে পারেন। আপনার বিরুদ্ধে আমার একমাত্র অভিযোগ, আপনি আমাকেই তো পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে পারতেন। তাতে আমার মানটা বা হোক বখার্বিত রক্ষা পেত—আপনার অভিভাবকদেরও এমন অহেতুক মিথ্যার ভেতর চুকতে হতো না। আপনার সংকল্পের কথা, কেন আপনি সেই রাতেই আমার জানিয়ে দিলেন না—তেমন সময় বখেট্ট পাওয়া গিয়েছিল।

সে রাতের সংকল্প যে এটা নয় সে কথাটা বলতে গিয়েও খেমে গেল মৌরী। তবে সুদর্শনের ওকে সেই অকস্মৎ বুক টেনে নেওয়া, ওর ঠোটে ঠোঁট স্পর্শ করা—ও গ্রহণ করেছিল এ কথাই বলা হয়ে যায় না। স্তম্ভিত চকল শব্দ করতে লাগল মৌরীর। কিন্তু সুদর্শন এমন ভাবে প্রতীক্ষা করে রইল জবাবের জন্য যে, চূপ করে থাকা সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়েই জবাব দিতে হলো ওকে। দৃষ্টিটা দেয়ালের দিকে রেখে বললো—না, এ সংকল্প আমার সৈনিকের নয়।

বিষ্মিত সুদর্শনের সিগারেট-ধরা মুখের হাত নেমে এলো नीচে।
বিমূঢ় কাঠে জিজ্ঞাসা করল সে—তবে ?

—সে অস্ত কারণ।

—অস্ত কারণ ! শুনি কারণটা ?

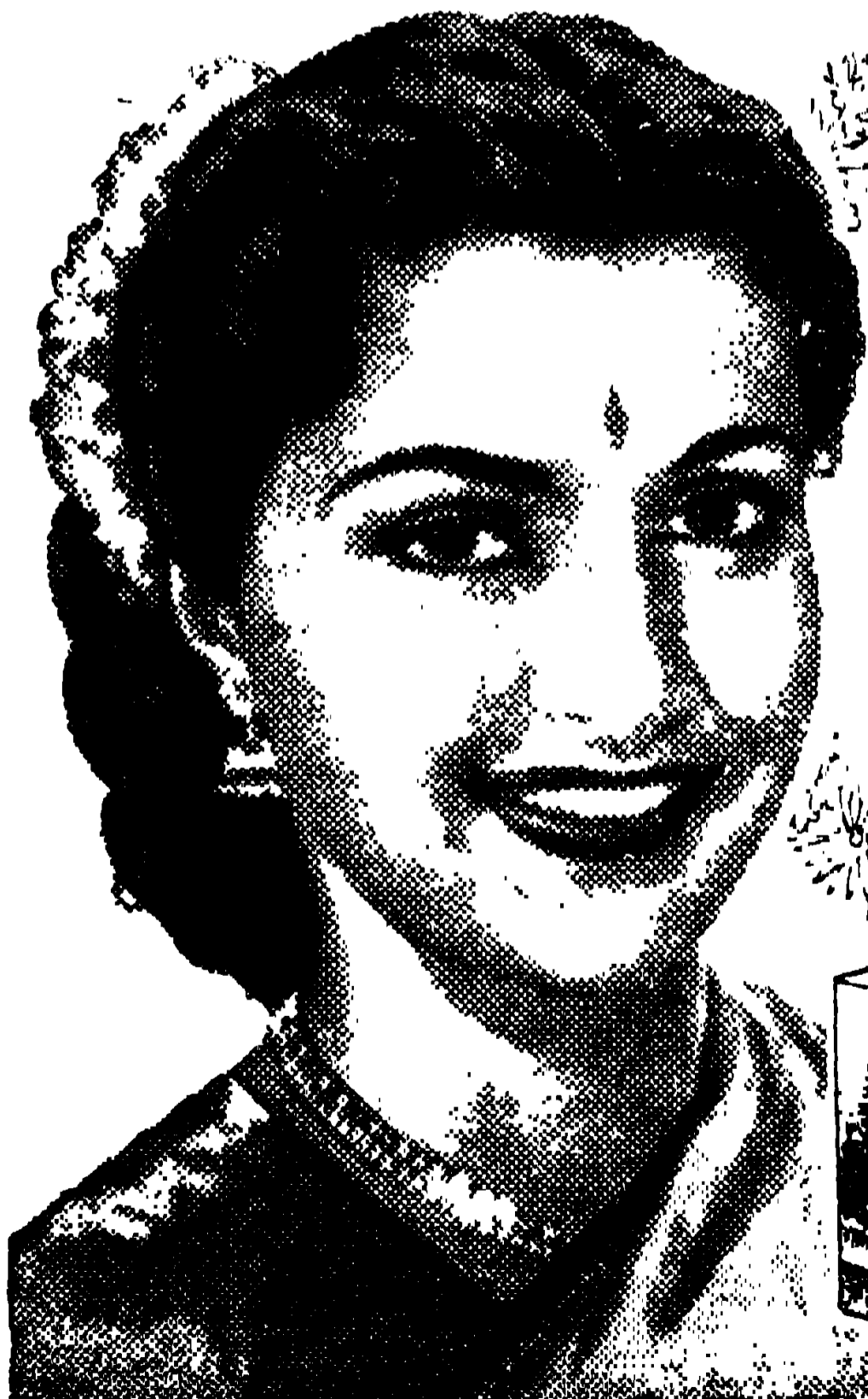
শিশিমার সঙ্গে ঐ দিনের কথোপকথন মনে পড়ে গেল মৌরীর—
না একে মনে পড়ে বাওয়া বলে না। ও বেন ছোটপিসিকে আর
নিজেকে স্পষ্ট দেখতে লাগল—ক্রুদ্ধা পিসি ঠোটে বিষ ঢেলে বলছেন,
ছাত্র আর ডাক্তারদের সঙ্গে নার্সদের কি সম্পর্ক, তারা তাদের নিজে
কি করে না করে আমি তার কতটুকুই বা শুনেছি। দুদিন বাদে
সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করলেই তুমি জানতে পারবে সব। বৌদি
তিব্বার করে উঠেছিল—‘ছোট পিসি’ বলে। ওর মুখ কুকড়ে
উঠেছিল বাসীফুলের মতো। চিবুকের কাঁপুনি খামাতে সমস্ত মুখটা
কঠিন করে তুলতে হয়েছিল ওর। ও শুধু বলেছিল—সুযোগ পেলে
সে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে। হঠাৎ বেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল মৌরী।
ওর ইচ্ছে হলো সুদর্শনকে আশ্চর্য্য করে ও চেয়ারে গিয়ে বসে
সুদর্শনের মুখোমুখি হয়ে। সামনের চুলগুলো পেছনে ঠেলে সোজা
তার মুখের দিকে তাকায়—যেমন তাকানো এর পূর্বে আর কোনদিনও
সে সুদর্শনের দিকে তাকায়নি। তার পর জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু ঐ
যেমন হঠাৎ দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি হঠাৎ নিবে গেল।
ওর ধারা সম্ভব হবে না—সম্ভব হবে না এই কারণে নয় যে, ও
লজ্জাবোধ করছে। বত কথাই মনে উঠুক, ওর ধারণা কখনই বলে
উঠতে পারবে না ও এত কথা।

মৌরীর চকল ভাব আর সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে বাওয়া লক্ষ্য
করলো সুদর্শন। বললো—কিছু বিধা করবেন না, বলুন। আমিই

যখন নায়ক, শান্তিটাও যখন পুরো আমার উপরই এসে পড়েছে,
তখন আমার কারণ জানতে চাওয়ার অধিকারও আছে—

বিধা বেড়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত শুধু এইটুকুই বললো মৌরী,
আপনি মঞ্জুর কাছ থেকে শুনে নেবেন। কিছু না বলেও বেন বলার
বড় ওর মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেছে এমনি ভাবে আঁচল তুলে মুখ
মুছল সে। এতক্ষণ অস্তত এ স্বাক্ষর্য্যবোধটা সুদর্শনের ছিল যে, কেন
কি হয়েছে সে জানে। এবার সেটুকুও গেল। তবু যে কারণে মৌরী
সংকোচবোধ করছিল, এটা সে রাতের সংকল্প নয় বলতে, ঠিক সেই
কারণেই সুদর্শনের চোখে, মুখে, ঠোটে বেন একটা আবেগ এসে
থমকে দাঁড়ালো। ওকে আলিজানের, ওকে তার মুখচুবনের
অধিকার মৌরী দিয়েছিল। সে গ্রহণ করেছিল ওর অসংবন্ধকে।
কথাটা মনে হতে মৌরীর হৃৎপিণ্ডটা যেমন চকলতা প্রকাশ
করেছিল—সুদর্শনের হৃৎপিণ্ডটাও তেমনি চকল হয়ে উঠল।
কিন্তু দুর্নিবারকেও মানুষের রোধ করার শক্তি ধরতে হয়। সব
আনন্দ কেবল কাপিয়ে পড়েই আহরণ করা যায় না—অপেক্ষা করতে
জানতে হয়—সাধনা—হা সাধনা করতে হয়।

প্রথমে দরজায় উঁকি দিয়ে মঞ্জু বেন একটু দেখে নিল ব্যাপার-
সেপারটা কি। তার পর চা জলখাবারের ট্রে হাতে টিপে টিপে পা
ফেলে এসে চুকল ঘরে। হাতের ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে
রাখতে বললো—এমন টিপে টিপে পা ফেলে এলাম বলে কিন্তু
আপনারা আবার কিছু ভাববেন না। হাতের চা জলের জন্ত এ
সাবধানতা। বলে হাসিমুখে খাবার ডিস তুলে ধরল সুদর্শনের দিকে।
ওবার এসে আগে চা তার পর মিষ্টি খেয়েছিলেন, দেখলাম বউনিটা
ভালো হয়নি। এবার তাই আগে মিষ্টি তার পর চা—
নিন ধরুন ! [ক্রমশঃ।



আনন্দ উৎসবে ক.হোড়ের

প্রসারিত সামগ্রী



ক.হোড় ২৩ কাং • কলিকাতা-১০



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

তেত্রিশ

জুগুয়াথ আর পূজা নৌকো নিয়ে বয়্যারখোলা চলে গেছে। ছুতোর ধরে কাজকর্মগুলো সারবে, আলকাতরা দেবে। আর চারজনে এরা সাইতলায়। পাড়ায় এসে পা দিতেই একটা কলরব উঠল। অন্নদাসী চেঁচাচ্ছে। তার পরে কি কথায় রাধেষ্ঠাম ঠাণ্ডা করে দিল একেবারে। চূপচাপ আছে। দ্বী-পুরুষে এত নিঃসাদে আর কখনো ঘর করেনি।

চালাঘরে পড়ে ক্যাপা-মহেশ ক্রমে ক্রমে গাঁজা খায়, আর ভেবে ভেবে কদ' বলে। শশী গোয়ালী কাগজে অক্ষর কাঁদতে জানে। ভাতে সুবিধা হল, লিখে রাখে ফদ'গুলো। মহেশ এক চিলতে কাগজ এখন দিয়েছে চাকরবালার কাছ থেকে। ফদ'র মধ্যে পূজোর উপকরণ আছে; আর বসদ-সামগ্রী আছে জললে থাকবার। হাটবাজারে যা মিলবে না, যেমন কুস্তকার-সজ্জা—কাঁক মতন এক দিন বরাপোতার গিরে কেনে। কলা, শসা, নারকেল, বাতাসা—জগারা এসে পড়লে তারপরে ব্যবস্থা হবে। এ সমস্ত সেই একদিনে কুমিরমারি হাটে হয়ে বাবার কথা, কিন্তু নৌকোর অনুবিধার জন্ত অনেক বস্তু বাকি রয়ে গেল। ধীরে-সুস্থে এখন সব জোগাড় হচ্ছে। চাল অনেক লাগবে—খোরাকির চাল ও পূজোর নৈবেদ্য। বয়্যারখোলার তৈলক্ষ মোড়লকে ধরে নিখরচায় চালটার জোগাড় হয় যদি। চাল ওরা নিয়ে আসবে। মুগ, তেল, কাল মোটামুটি একটা হিসাব করে সেদিন নিয়ে এসেছে। আর ডাল। ডাল এই সব অঞ্চলে বড় বাড়াবাড়ি রকমের বিলাসিতা। শুধু কিছু ডাল সঙ্গে নেওয়া ভাল। জলের মাছের কথা তো—হয়তো জালে উঠল না কোন দিন। কিংবা মাছ খেয়ে অক্ষতি হয়ে একদিন মুখ বদলাবার শখ হল। ডাল ঘুঁটে নেবে সেদিন।

কুস্তকার-সজ্জা অর্থাৎ মেটে জিনিষ কতগুলো রে বাবা! ঝাঁকা ভরতি হয়ে যায়। সাতটা ঘট, সাতটা পিঙ্গিম, সাতটা জলের ভাঁড়, একটা কুঁচি। তা ছাড়া ঘর-ব্যক্তারি হাঁড়ি-কলসি মালসা-সরা কিছু আছে। রাত করে মাল নিয়ে আসতে হল, নয়তো লোকেব নজরে পড়ে যায়। ছিটে-গরান কেটে চেঁচে-ছুলে লাঠি বানানো হল এগারখানা। এই লাঠির মাথার নিশান টাঙানো হবে। দুই গজ লাল শালু কুমিরমারি থেকে সেদিন এসেছে এই নিশান ও পিঙ্গিমের

শলতের জন্ত। কাপড় কেটে এগার খণ্ড নিশান বানিয়ে রাখ, আর টুকরোগুলো নিয়ে শলতে পাকাও। বনে নেমে পূজোর পণ্ডির পাশে নিশান তুলতে হয়।

এই সমস্ত হচ্ছে। অত্যন্ত গোপনে, কেউ না টের পায়। তাড়া খেয়ে সাইতলা ছেড়ে পালাচ্ছে অপমানের কথা বটেই। তা ছাড়া চৌধুরিগঞ্জের শত্রুয়া খবর পেয়ে দারোগা নিয়ে এসে জগাকে আটক করে ফেলতে পারে। দরকার কি জানান দিয়ে? চলে আসুক বয়্যারখোলা থেকে নৌকো এদিকে সমস্ত ঠিকঠাক রইল। আশা-সুখে নতুন জায়গায় যাচ্ছে, ভাল দিনক্ষণ অবশ্য চাই। কিন্তু সে পঞ্জির শুভদিন নয়। অস্তরীক্ষের পানে নিরিখ করে দেখে সুদূর বাদাবনের দিকে তাকিয়ে ক্যাপা মহেশই বলে দেবেন। সময় ধরে নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়বে। পীর-দেবতাদের তুষ্ট না করে গুণীন-বাউলে সঙ্গে না নিয়ে হট করে বাদায় নেমে কুড়ুলের কোপ দেওয়া যায় বটে গাছের গোড়ায়, গাছও পড়ে। পরিণাম কিন্তু শুভ হয় না। বাঘ-কুমিরে নাও যদি খায়, টিকে থাকতে পারবে না সে জায়গায়। বনবিবি, দক্ষিণবায়, গাজি, কালু, রণগাজি, ছাওয়ালপীর এঁরা কুপিত হয়ে থাকেন; ওদিকে দানো, ঝটো, দুধেংগাও সব কারদায় পেয়ে যায়। ছ-পক্ষ মিলে তাড়িয়ে তুলবে—প্রাণে রক্ষা পাবে'নিতান্ত পিতৃপুরুষের পুণ্যবল থাকে যদি। দেখতে পাচ্ছ না, আশা-সুখে ঘর তুলে সাইতলা থেকে কেমন সরে যেতে হচ্ছে। গোড়ায় কোন রীতকর্ম করনি, তার পরিণাম।

তিনদিনের দিন জগা-পচা এসে পড়ল। ঘরিতে কাজ হয়েছে। কাজটা হয়েছেও খাসা। আলকাতরা মেখে নৌকো চকচক করছে। নতুন ছই। খোদ মালিক এসেও যদি এখন এই নৌকোর চলাচল করে, নিজের বস্তু বলে চিনতে পারবে না।

পৌছেছে ঠিক দুপুরে। ভেবেচিন্তে নৌকো ও পারের পাশখালিতে নিয়ে গিলেলতার কোণের ভিতর চুকিয়ে দিল। মাছবের নজরে না পড়ে। তাতে নানান ঝামেলা। নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করবে, মুখ ব্যথা হবে জবাব দিতে দিতে। কোথা থেকে আনলে নৌকো, তাড়া কত? রঙনা হচ্ছে কবে? কোন মতলবে চলেছ, থাকবে কতদিন বনে গিয়ে? চটপট জবাব বানাতে হবে—মিথ্যে বানিয়ে বানিয়ে কাঁহাতক পারা যায়?

কিন্তু নৌকো লুকিয়ে রেখেট বা কাজ হল কই? চাউর হতে বাকি নেই কিছু। সাজের মুখে গগন এসে পাড়ার মুখটার দাঁড়াল। উচ্চকণ্ঠে কাকে বেন বগছে, জগন্নাথ ফিরেছে শুনতে পেলাম। যবে আছে? ডেকে দাও একবারটি। আমার নাম করে বল।

ভাকতে হল না। কানে দিবে জগা নিজেই বেরিয়ে এল। ভূমিকা না করে গগন বলে, ঠিকঠাক হয়ে গেল?

জগন্নাথ শ্রীকান্ত বলে, কিসের ঠিকঠাক বড়দা?

বসন্ত তুলে পাকাপাকি চলে যাবার।

কে বলল?

সন্দেহটা পচার উপর। চাকরবার সে বড় অসুগত। চলে যাবার কথা সে হরতো বলেছে।

কিন্তু গগন বলে, বলে দিতে হয় না কারো। বাদা জায়গা—শহরবাজার নয় যে মানুষ কিলবিল করছে ঘরের মানুষ উঠানের মানুষটাকে জানে না। এ জায়গায় মানুষ লাগে না, গাছগাছালি বলে দিতে পারে। ঝোপের মধ্যে নৌকো চুকিয়ে রেখে এলে—মানুষে না দেখল তো পাখপাখালি দেখছে, তাইতো সকলের দেখা হয়ে যায়। সামাল করে দিতে এসেছি জগা। মহেশ তোমাদের ঘাড়ে লেগেছে, ক্ষেপিয়ে তুলছে। কোন অজস্রি জঙ্গলে নিয়ে তুলবে ঠিকঠাকানা নেই। ওর ঐ কাজ। কতবার কতজনাকে নিয়ে গেছে—হর ঘড়ুই অনেক জানে, তার কাছে শুনে দেখো। কাউকে বাধে নিয়েছে, জিনপরীতে উড়িয়ে নিয়ে কাউকে সাগরে নিয়ে ফেলেছে। পাগল হয়ে কেউ আবার ফিরে আসে—ঐ শশী গোরালার হয়েছে যেমন।

জগা বলে, জেনে ফেলেছে তো খুলেই বলি বড়দা। চৌধুরীদের পেরায়ের লোক তুমি এখন। শালা আর বোনাই মিলে বড় করছ, জেলে পুরবে আমার, কঁাসি দেবে। জঙ্গলের বাঘ তোমাদের চেয়ে ভয়ের হল কিসে?

খুব হাসতে লাগল জগা। গগনের আঁঠেপিঠে যেন ঐ হাসির বেত মারছে। হতভম্বের মতো সে জগার দিকে চেয়ে থাকে। বলল, সেই কথাই তোকে বলতে এলাম। মেজ শালা বিস্তর প্যাঁচ খেলেছে। কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। তোকে তাড়াল, আমাকেই কবে আবার বোঁচকাবিড়ে বাঁধতে হয়।

কিন্তু তাড়া খেয়ে চলে যাচ্ছে, এমন কথা জগন্নাথ কিছুতে মেনে নিতে পারে না। ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করে বলে, আমার নতুন দেখছ না বড়দা। নেড়ি-কুকুরের মতন লেজ গুটিয়ে পালাবার লোক কি আমি? কিন্তু পাড়ার মধ্যে বোকা-শাকা আছে কতকগুলো—ঘরসংসারে জড়িয়ে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে। বেরিদার হয়ে তোমরা তো শুনলাম বাদার চিরকলে নিয়ম বাস্তব করে দিচ্ছ। বেরিতে জাল ফেললে নাকি সরকারি আইন মতে কোমরে দড়ি বেঁধে আলায় চালান করবে। তখন আর উপায় থাকবে না মাহ-মারাদের। সেইজন্মে তাবছি একটা জায়গা করে নেওয়া যার যদি আগেরতানে গিয়ে।

গগনের কথা হাহাকারের মতো শোনায় : আমার বাদার মধ্যে তো তুই এনে বসালি। একা কলে সত্যি সত্যি চললি তবে?

—তখন কি চলে যাবে কেউ

ভেবেছিল? থাকতেই তো দিচ্ছ না, থাকা যাবে কেমন করে? —হাসল। বলে, তুমিও যাবে বড়দা। ভাবনা কিসের? দুটো দিন আগে আর পিছে। জায়গা করে রাখিগে, গিয়ে যাতে উঠতে পার। সে জায়গায় কিন্তু বেরিদার কেউ নয়। যাবে তো আর দশজনের মতন মাটি-কাটা মাহ-মারা হয়ে থাকতে হবে। পারবে তো? মানে মেজাজটা এখন উঁচুতে উঠে গেছে কিনা।

গগন একেবারে বেকবুল যার : আমি কেন যেতে যাব? কাঁধে তোর মতন ঘুরনপেত্ৰী চেপে বসে নেই তো কোন একটা জায়গায় যে সৌরাস্তিতে থাকতে দেয় না।

নিজের ইচ্ছে না যাও তো তাড়িয়ে তুলবে। তোমার পরিবারের ভাই। চেপে বাছ কি জন্তে? তোমার কথাটাই ঘুরিয়ে বলছি—এ জায়গা শহরবাজার নয়, জানতে কিছু বাকি থাকে না। মানুষে না বললে গাছগাছালি বলে দেয়। নগেনশশী নতুন বেরি লিখে পড়ে নিচ্ছে। কুটুখ মানুষ বলে একেবারে না তাড়িয়ে গোমস্তা করেও রাখতে পারে। ঘাড় হেঁট করে রাতদিন তখন খাতা লেখার কাজ, ঘাড় তুলে তাকাতে দেবে না।

গগন উত্তেজিত হয়ে বলে, শোন তবে। তেমন কিছু কববার আগে আমিই তাড়াছি। বুদ্ধীধরকে পাঠিয়েছি ফুলতলার। পরন্ত দিন দলিল রেজেষ্ট্রী হবার কথা। কিন্তু আজ রাতে কিবা কাল সকালবেলা দেখতে পাবি হস্তদণ্ড হয়ে এসে পড়েছে। কুলো বাজিরে বাদা অঞ্চলের সীমানা পার করে দিয়ে এসে আবার আমরা সেই আগেকার মতন থাকব।

Amico's
GREEN LINIMENT


আপনি নিশ্চয় দৈহিক ব্যথার যন্ত্রণা পান- কোথায়?
কোমরে, হাঁটুতে, কিবা কোন সন্ধিস্থানে?
তনে খুসী হবেন—
পারীক্ষক, বুক বা পিঠের পীড়নার,
ঘাড়ের ইত্যাদি ব্যবহার্য ব্যথার

এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেন্ট
(সবুজ মালিশ)
ব্যস্তবিকই নির্ভরযোগ্য।

মূল্য : বড় শিশি—২.৭৫ মঃ পঃ
ছোট শিশি—১.৭৫ মঃ পঃ
"মাসুল" বস্তুর

ব্যবহারের জন্য নির্দেশ—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
১০ নং বনুটোলা স্ট্রিট, কলিকাতা-১



জগন্নাথের হাত জড়িয়ে ধরে। বলে, বাসনে তুই। সেই কথাটা বলতে এলাম। ওরাই এখন চলে যাবে, তাদের বাবার কোন দায় পড়েছে। নৌকো যেখান থেকে এনেছিস, কেবল দিয়ে আয়।

বলতে বলতে জগন্নাথকে টেনে নিয়ে চলল খালের দিকে। বলে, কাঁড়িয়ে কাঁড়িয়ে হয় না, অনেক কথা। নিরিবিলি একটা জায়গায় বসিয়ে চল।

শেষ পর্যন্ত গগনই নগেনশশীকে তাড়াচ্ছে, এ খবরটা নতুন। এমন খুবকর মানুষটা কোন কারদায় তাড়াচ্ছে, তারিয়ে তারিয়ে শোনার মতোই ব্যাপার বটে।

খালের ধারে বাঁধের আড়ালে বসল এসে হু-জনে। জোয়ারের জল অল্প একটু দূরে ছলছল করছে। নগেনশশীর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে চাকরবালার সঙ্গে, দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেশে পাঠাবে। অম্বুকুল চৌধুরি নগেনের নামে নতুন ঘেরির বন্দোবস্ত দিচ্ছে, খবরটা টোনি' চক্কোত্তি মুখে করে নিয়ে এলেন। কিন্তু লেখাপড়া বন্ধই করে আনুক, গগন দাস কি জন্মে দখল ছাড়তে বাবে? চক্কোত্তি বুদ্ধি দেয়, কখনো না, চেপে বসে থাক তুই দাস মশার। মামলা লড়ে তবে উচ্ছেদ করতে হবে বাহাদুরের। সে এখন পাঁচ-সাত-দশ বছরের খাড়া। কত রকম স্বভাবস্বির কথা উঠবে। করালীর চর-ওঠা তুইয়ে কার মালিকানা—চৌধুরির না ভারত-সরকারের? বাবতীয় দলিলপত্রের হাকিমের রায়ে হয়তো বা চোতা-কাগজের শামিল হয়ে যাবে। মামলায় হেরে অকস ছেড়ে পালাতে তখন দিশা পাবে না?

টোনি' মানুষ—মামলা গড়ে পিটে বানানো পেশা হল চক্কোত্তির। কোমর বেঁধে তারপর কোন এক পক্ষের হয়ে লেগে যাবেন। ভাল রকমের একটা জুড়ে দিতে পারলে কিছু দিনের মতো নতুন রোজগারের পথ হল। ঠিক এই সময়টা আর এক পন্থা এসে গেল গগনের মনে। মামলার কোর্শল বাতলে দিচ্ছেন চক্কোত্তি, কিন্তু আরও এক ভাল উপায় আছে নির্মোলে নগেনশশীকে অকস-ছাড়া করবার। চাকরবালার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। যে লোভে ঘুরঘুর করছে বিস্তর দিন ধরে, সেই দেশে-ঘরে থাকবার সময়ও। যার জন্মে ওদের পিছন ধরে বাঁদা-অকস অবধি চলে এসেছে। টোনি' হওয়া সবে চক্কোত্তি মশায় জাত্যাংশে ব্রাহ্মণ। অস্ত্রের বুদ্ধীধরকে ফুলতলায় পাঠিয়ে চক্কোত্তিকেও বলেকয়ে ধরে রেখেছে এখানে। অং-বাং দুটো বিয়ের মন্তর উনিই পড়ে দেবেন। বাঁদা-রাজ্যের বিয়েখাওয়ার এমন খাঁটি ব্রাহ্মণ ক'টা ক্ষেত্রে মেলে? গদাধরের মতন অনেক লোক পৈতে ঝুলিয়ে হঠাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। ভাগ্যবশে এত বড় বোগাযোগ। বুধবারটা ভাল দিন আছে—পাঁজির অভাবে স্মৃতি থেকে চক্কোত্তি বিধান দিয়েছেন। দলিল রেজিস্ট্রির কথা ছিল, তার বদলে নগেনশশী বর হয়ে বিয়ে করতে বসবে। চুক্তি থাকবে বউ নিজের বিদায় হয়ে যাবে বিয়ের তিন দিনের মধ্যে। সেই করে নেওয়া হবে চক্কোত্তির সুকাবেলা। তবে বিয়ে।

অজ্ঞাপাত্ত শুনে জগন্নাথ গুম হয়ে যায়। অপরকে বলে, তখনই তোমার বোন? সে রাজি হয়েছে?

গগন অবহেলার ভাবে বলে, বটা করে কে বলতে গেছে। কিন্তু আপত্তি কি আছে? আমি বড় ভাই, ভাল বুঝেই তো বিয়ে দিচ্ছি। মামার খুবখবড়ির ভাল অবস্থা—তাতেই কষ্ট পাবে না কখনো।

জগা বলে, বোনটি তোমার সোজা নয় তো। ষটপূজার দিন সেই যে তোমার আলায় এসে পড়লাম বড়দা। চাকরবালার ভেবেছে খোঁড়া-নগনা। বাছেতাই করে উঠল। যা করার ধার—মোব বলি-দেওয়া মেলতুকের ধার কোথায় লাগে তার কাছে।

গগন বলে, ও কিছু নয়। দুটো হাড়ি-মালসাও তো এক কাঁকার রাখলে ঠনঠন করে। এত বাড়িতে এক সঙ্গে সব রয়েছে, বগড়া-কাটি হবে না—বলি, বোবা তো কেউ নয়। বগড়া বিয়ের আগে হাচ্ছ, বিয়ের পরেও হবে। কিন্তু সেজন্য কোন কাজটা আটকে থাকে কার সংসারে?

একটু চুপ করে থেকে নিজের কাছেই বেন কৈকিরং দিচ্ছে : বলবি যে দোজবরে বর—কিন্তু সে বিয়ে শুধু তো নামেই হয়েছিল। বউ বর করল না। বিয়ের পরে এসেছিল, তারপরে একদিনের ভরেও খুবখবড়ি আর আনা গেল না। নানান কেলেকারি শোনা যায়। সে বউ আসবে না কোনদিন, এলেও ঠাই পাবে না। বরের একটু পায়ে টান বলবি তো তাই? থাকল তো বয়েই গেল। খেটে খেতে হয় না, এমন সুসপনার যে দাওয়া থেকে উঠানে পা না দিলেও দিব্যি রাজার হালে কেটে যায়। তবে? মায়ের পেটের বোনকে আমি কি ধারাপ ধরে দিচ্ছি?

জগন্নাথ বলে ওঠে, বলছ কাকে? যেখানে খুশি দাওগে। যার পাঁঠা সে লেজে কাটবে, অস্ত্র কি যায় আসে!

গগন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলল। বলে, দেখ, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। যার কপালে যেমন লেখা থাকে, মানুষের কিছু করবার নেই। নগনাটা কি আজকের থেকে লেগেছে। আমি টালবাহানা কবে আসছি। পান্তরের খোঁজখবর করছিলাম, আসছিল হু-একটা। সেই সময়টা বর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হল। বউ পরের ঘরের ঘরে, তার কথা ধরি নে। কিন্তু নিজের বোন হয়ে চাকর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে তুলল। হাচ্ছও তেমনি। আমি কি করব—জন্মে পড়ে আছি, জন্মে বরপাত্তর কোথায়? যে আছে, তার হাতেই তুলে দেব। আইবুড় নাম তো খণ্ডাক।

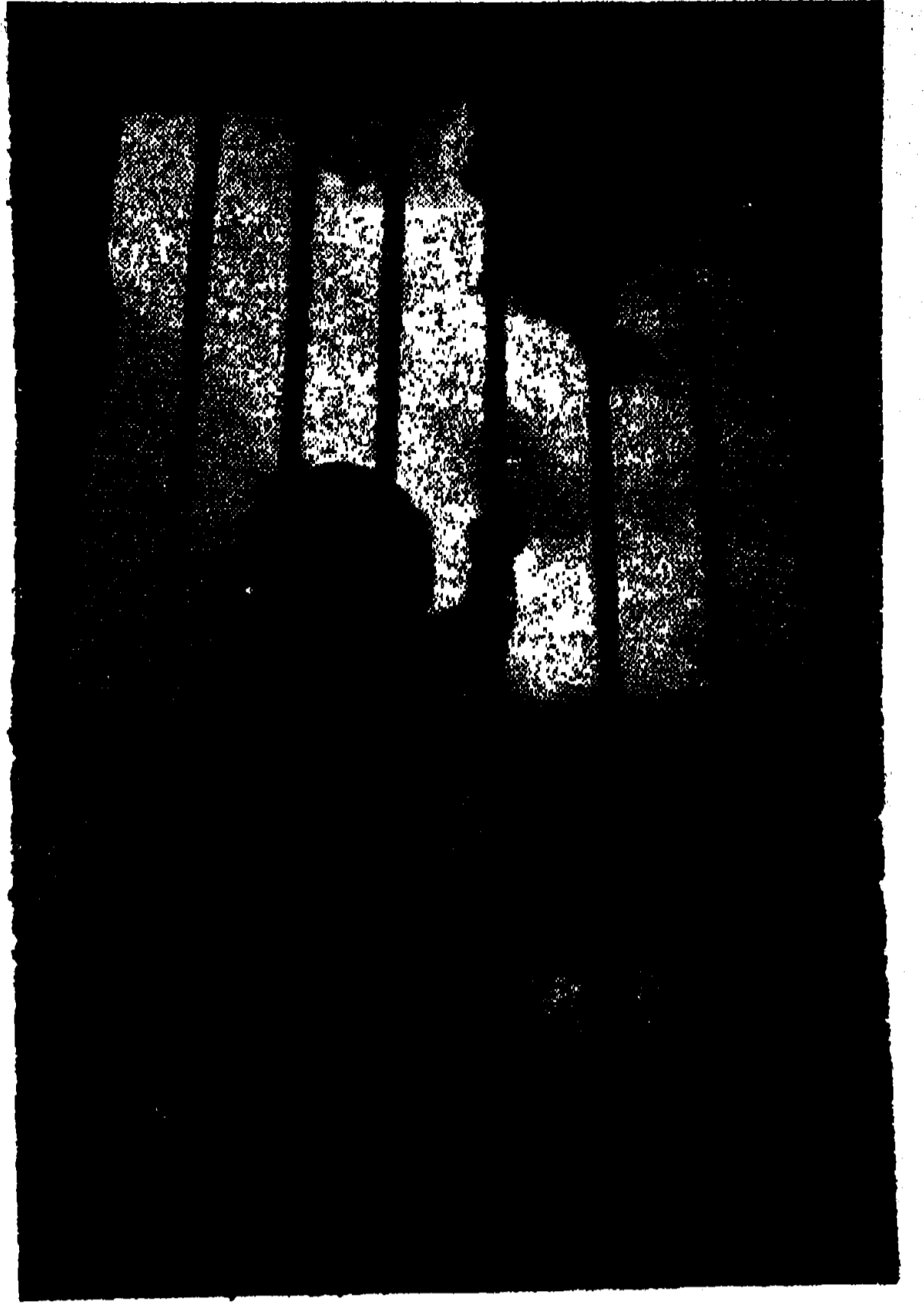
ধরকণ্ঠে বলে, দোষটা শুধু নগনার দেখলেই হবে না। বোন বলে ছাড়ব না—বাঁদার পা দিয়ে ও-ই তো সকলের আগে গুণ্ডগোল পাকাল। তার সঙ্গে ভাড়াভাড়া ওরই কারণ। মেরেলোক আরও একজন তো এসেছে। চোখে দেখতে পাস তাকে কখনো? গলা শুনতে পাস? তা ভালই হল, জোড়া আপদ এদিনে এক সঙ্গে বিদের হচ্ছে। ঘরে-বাইরে সোয়াস্তিতে থাকা বাবে।

অককার হয়েছে। আলাঘরে হারিকেন-লঠন খেলে দিয়ে গেছে। গগন উঠে পড়ল। মাহের ডিঙি কোয়ার সময় হল কুমিরমারি থেকে। অনেক কাজ। নগেনশশী নেই। একলাই আজ সমস্ত করবে। মাহের দাম হিসাবপত্র করে নেবে, খাতা লিখবে। জগার হল ডিঙির কাজ ছেড়েছে। কাজ তা বলে আটকে নেই। চৌধুরির আলা থেকে অনিচ্ছ নৌকো বাওয়ার পাকা লোক দিয়েছে। বুধীধর আছে—এই ভরকের নতুন মাতব্বর। তা ছাড়া কথা আছে, মরকার বতন চৌধুরীমহলের নৌকোতে মাহ বয়ে দিলে আসবে কুমিরমারি। পাকা লোক নগেনশশী, সেই করেছে গম্বু।



আলম্ব

—দিয়াত্ত বায়চৌধুরী



কারাগার

—ফকর (মেদিনীপুর)



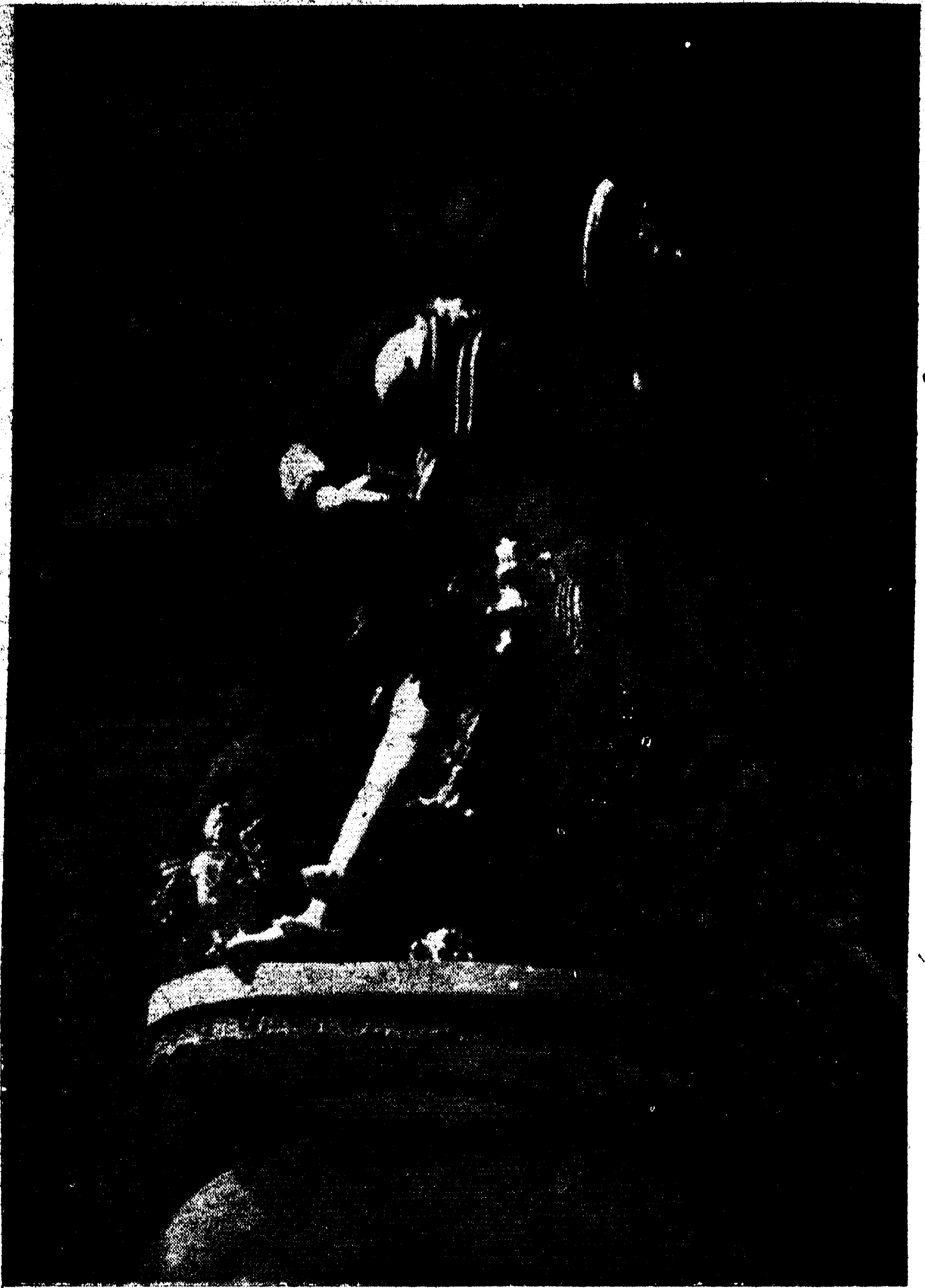
পুষ্টি

—নবদ্বীপ বুকোপাঠ্য

জীবন-যুদ্ধ

—শঙ্করসেবক মিত্র





প্রসাধন (বেলুড়, দক্ষিণভারত)

—কমল বন্দ্যোপাধ্যায়



ଅଜିମା

—ବାଉଁଶର ମିନିଆ



—দীপালী চৌধুরী

মন্দিরশিল্প (বংশধাটা)

—জানচাঁদ বর্মা



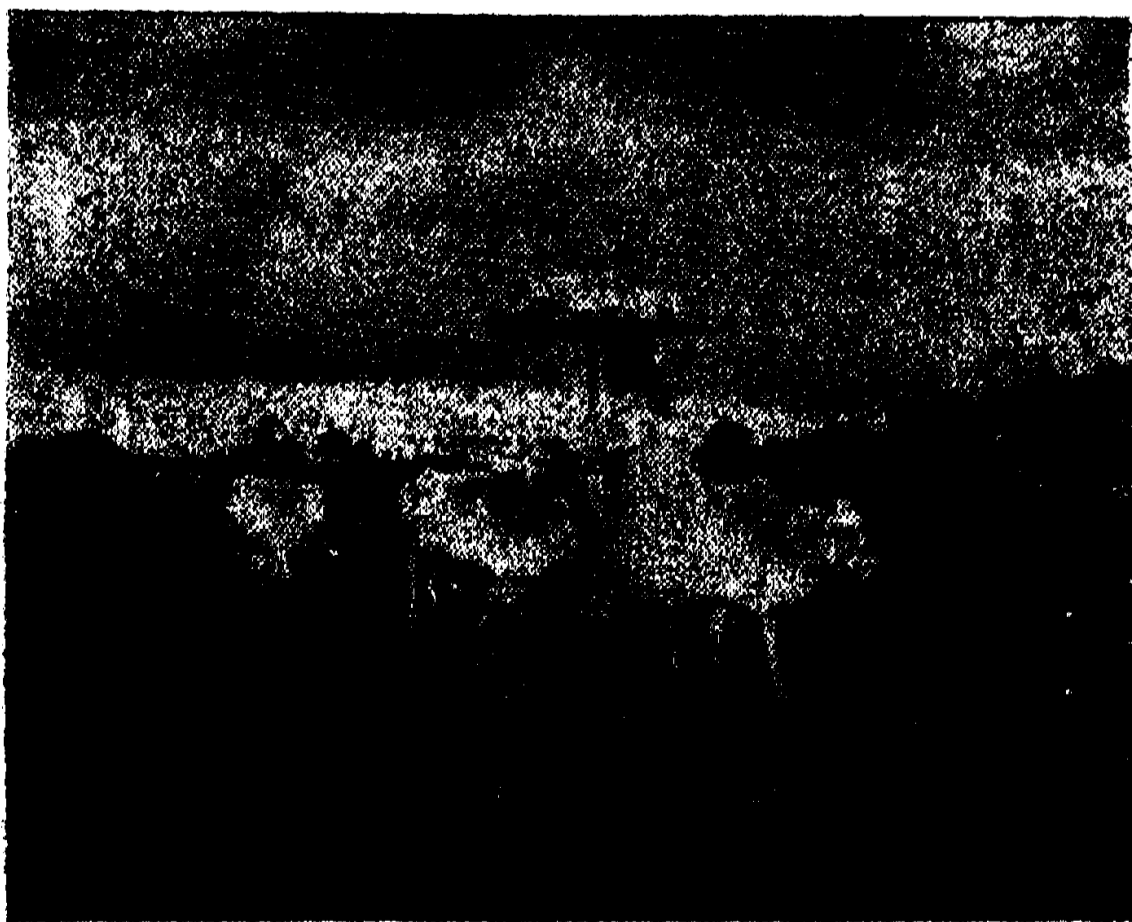
অপত্যস্নেহ

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না ।]

—মিস এম. বসু

চাষী ভাই

—বিবেকু গোখামী



ডোবার ধারে গিয়ে একবার গগন খুব কিবিয়ে দেখে। অগম্য আঁচে তখনো—নিশি-পাওয়া লোকের মতন খাল কিনারে ছিটে-জলের ভিতর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চৌত্রিশ

গগন বা ভেবেছে, মিথ্যা নয়। খানিকটা পরেই নগেনশরী বুদ্ধির সঙ্গে এসে পড়ল। তখন গা বুছে গগন ডোবার ঘাটে বসে। নগেনকে দেখল। বীদরকে কলা দেখাতে হয়, সেই কলা হল চাকুবালা। একা একা গগন খুব হাসছে।

আর হাসছে চাকুবালা যান্নাঘরে বিনি-বউয়ের সঙ্গে। বলে, দেখ বউদি কিসে কি হয়ে যায়। এত বড় শরতান মানুষ, কিন্তু দাদার বুদ্ধির সঙ্গে পেয়ে উঠল না। দলিল করে সর্বশ্রুতিতে বাচ্ছিল—দাদা এমনি চিরকুট লিখে পাঠাল, ছেড়েছুড়ে ছুটে এসে পড়ল।

বিনোদিনী বলে, কি লিখেছে জান না ঠাকুরঝি? তোমার যে বিয়ে।

হাসি আরও বেড়ে যায় চাকুর: ওমা, তাই নাকি? কার সঙ্গে বিয়ে গো, বনের মধ্যে বর পেলে কোথা?

বিনোদিনী হেসে বলে, ভিজে বেয়ালটি—কিছু জানেন না। বর এই দুখানা মাস্তব—এত কথাবার্তা হচ্ছে, উনি যেন কানে তুলে দিয়ে থাকেন। কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশুদিন বিয়ে মেজদার সঙ্গে। সেইজন্মে তো তাকে আনতে পাঠিয়েছিল।

এই? চাকু কৃত্রিম হতাশার সুরে বলে, এ সবক তু কত বছর ধরে চলছে। বিয়ের তদ্বিরে বর আমাদের পিছন ধরে অজ্ঞানি জন্মে এসে উঠল। এদিনে চাড় হল তোমাদের?

বিনোদিনী বলে, ফুল না ফুটলে কি জোর করে হয় ভাই? মাহুয়ের হাত কিছু নেই, যা করবার বিধাতাপুরুষ করেন। যোগাযোগটা কী রকম! চক্কোত্তি মশায় এসে পড়লেন—ভাল ব্রাহ্মণ, নৈকযা-কুলীন। মস্তার পড়বার জন্ম বলে কয়ে রাখা হল তাঁকে।

চাকু বলে, শুধু বলাকওয়ার হয়নি। টোনিমাছুষ—মোটো দক্ষিণা কবুল করতে হয়েছে। বরকেও ছেড়ে কথা কইবে না, মোটা দালালি আদায় করবে তার কাছ থেকে।

নগেনশরী ইতিমধ্যে জামা খুলে হাত-পা ধুয়ে গামছা দিয়ে পরিপাটি করে বুছে চক্কোত্তির কাছে বসেছে। নিচুগলার কথাবার্তা হচ্ছে। চক্কোত্তি খবরাখবর নিচ্ছেন ফুলতলার। নগেনও শুনেছে এদিককার খবরাখবর। তড়িৎ এই বিয়ের আয়োজনের বিবরণ। গগনের মতলব বা আছে এর পিছনে। গগন না থাকায় হু-জনে খোলাখুলি কথাবার্তার জুত হয়েছে।

বিনি-বউয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে চাকুবালা ডোবার ঘাটে গেল গগন বেখানে গা বুছে। জলে নামবার উপায় নেই, বিষম কামা। নোনারাজ্যের সর্বত্র এমনি। কাদা লেপটে গিয়ে আঠার মতো এঁটে থাকে; কলসি কলসি জল ঢেলেও ছাড়ান যায় না। ঘাটের উপরে সেজন্ত মাটা বানিয়ে নিয়েছে। জলের ভিতরে শক্ত হুটো খুঁটি পোতা, আড় বেঁধেছে ঐ খুঁটির সঙ্গে, লম্বালম্বি কতকগুলো কাঠ কেলে নিয়েছে। ঐ মালার উপরে বসে ষটিতে করে গারে জল ঢালছে। চাকু এল খান দুই খালা হাতে করে। খালা খুঁজ

এসেছে। সেটা উপলক্ষ, গগন বুঝতে পারছে। খুব খুঁজে এইবারে চাকু।

গগন কিছুমাত্র আয়ল না দিয়ে বুকের উপর লোহাতির আঁব টেনে এনে বলে, বাক, এসে গেছে ভবে মেজদার। বর-বর পেয়ে এবারে তো দেশে চললি। পুরানো কুটুখিতে ঝালিয়ে নতুন কুটুখি।

চাকু বলে, তোমার মেছো সম্পত্তিটা রক্ষে হল দাদা। যদি অবশ্য তোমার নতুন কুটুখ সত্যি সত্যি চলে যায় দেশে যাবে।

গগন জাঁক করে বলে, বন কেটে জন্মানোরায় তাকিয়ে সম্পত্তি বানানো। হেঁ-হেঁ, এ সম্পত্তি নিয়ে কেউ জিরোতে পারবে না। চক্কোত্তি মশায়কে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখিল।

তারপরে একেবারে আলাদা সুরে বলে, তোকে নিয়ে কত উদ্বেগে যে দিন কেটেছে! সেয়ানা বোন চোখের উপর সুরসুর করছে, বাদাবনে উপায়ও কিছু করা যায় না—

চাকু বলে, উদ্বেগের কথা আমার বল নি কেন দাদা? আমি উপায় করতাম।

কি উপায় করতিস? বর ধরে আনবি, কিন্তু জন্মে রাহু কোথা? হাটবার দেখে তাহলে কুমিরমারি বেতে হত। কিছা সেই ফুলতলা অবধি।

রসিকতা করে গগন খুব এক চোট হেসে নেবে, কিন্তু চাকুবালায় মুখে চেয়ে শুভিত হল। চাকু বলে, কোথাও যেতে হত না দাদা। এইখানে করালী গাঙে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। বোনের দার মোচন হয়ে যেত তোমার।



গগন আহত কর্তে বলে, শুভকর্মের আগে তুই জল কাঁপ দেবার কথা বললি চাকর ?

জল অনেক ঠাণ্ডা দাদা। রাতে ঘুমিয়ে থাকতাম—সেই সময় হাত-পা ধরে গাড়ে ছুঁড়ে দাও নি কেন ? দায় চুকে বেত।

গগন চটে গিয়ে বলে, এখন এই বলছিস, কিন্তু নগেনকে তুই-ই তো নিয়ে এলি বিয়ের লোভ দেখিয়ে। দাদার মত ছাড়া হবে না—দাদার কাছে মত নিতে এসেছিস তোরা। তা ভেবেচিন্তে দিচ্ছি আমি মত। চক্কোত্তি মশায়কে ঐ জন্তু ধরে রেখেছি। এখন আবার উটে-পাটা বললে হবে কেন ?

কেন বলেছি সে-ও তো জান দাদা। নিজের পরজ বুধে আজকে তুমি অবুর হচ্ছ। তুমি খবরবাদ দাও না, একলা দুটো মেয়েমাছুর আসতে পারতি নে জঙ্গলদায়ে। কী করা যায়—কামিয়ে বলতে হল একটা কিছু। নয়তো খোঁড়া পা টানতে টানতে মাহুঘটা এদুর অবধি আসতে যাবে কোন দ্বারখোঁ? কিন্তু পৌঁছবার পর থেকেই তো দূর-দূর করছি। তিতো কথাবার্তা কিন্নরাত। রাগ করে, দেশ-ভূঁয়ে চলে যাবে—তা একেবারে জোঁকের মতন লেপটে রয়েছে।

গগন বলে, লেপটে থেকে পাঁচ কবে কবে এবারে সবসুদ্ধ ধরে টান দিয়েছে। আমার এত বছরের নোনা জল খাওয়া বরবাদ করে দেয়।

হঠাৎ সে চাকর দিকে খিঁচিয়ে ওঠে : তোদের জন্তুই তো। হাতে-পাটে মানবের সব সময় টাকাপয়সা থাকে না। চিঠি লিখেছিলি, আরও না হয় পাঁচ-দশখানা লিখতিস। হট করে এসে পড়বার কোন দায় হল ? সব গণ্ডগোলের মূলে তোরা ? বলি, নগনটা এসে না জুটলে এসব কিছুই তো হত না। উটে আবার টকটক কথা বলিস আমার উপরে।

হু-খানা খালা ধুতে আর কত সময় লাগে ! হয়ে গেছে। খালা হাতে নিয়ে অঙ্ককার উঠানে চাকরখালা ম্যাচ-ম্যাচ করে চলল। বাদারাজ্যে কত রকম সাপখোপের কথা শোনা যায়। একটা সাপ কণা তুলে এসে ছোঁবল দিলেও তো পারে।

তিরকুট পেয়েই নগেনশশী আ-তুউ ডাকা কুকুরের মতন ছুটে এসেছে, বুধের তর্ক কিন্তু ঝুলজানা। গগন পা ধুয়ে এসে ঝড়তেই কঙ্কার দিয়ে ওঠে : কী কাণ্ড ! বুধবারটা ছাড়া বিন ধুঁজে গেলে না ? কাজটায় বাধা পড়ে গেল।

নিজের বিয়ের ব্যাপারে বাইরে নিরাপত্তা ভাব দেখাতে হয়। সন্ধ্যাই বলে থাকে এমনি। হাসি চেপে নিয়ে গগন বলে, শুভকর্মটা অনেক দিন ধরে বুলছে। সেইজন্তে ভাবলাম—

কথা শেষ হতে না দিয়ে নগেন বলে, এদিন বলেছে তো আরও না হয় ছু-দশ দিন বলত। লোক পাঠিয়ে প্রেস্তার করে দিয়ে আসা—বিয়ের তারিখ ঐ বুধবারের পর আর বেন আসবে না।

গগন বলে, তারিখ কতই আসছে যাচ্ছে। কিন্তু বাদার মধ্যে পুরুত মেলে কোথা ? ভাগ্যিভোগায় চক্কোত্তি মশায়কে পাওয়া যাচ্ছে। বাঁচি ভ্রামণ—হোটেলওয়ালা গদাধরের মতো ভেজাল বাবুন নন।

চক্কোত্তি মশায় বরাপোতার থাকবেন এখন। দরকারে ধর দিলে কি আসতেন না ? নাঃ, কাজটা ঠিক হল না আমাইবাবু। পালা দলিল হয়ে বাছিল। বড়লোকের ব্যাপার তো—কোন কোটনা কী মন্ত্রণা দেয়, মন ধুয়ে না যায় অমুকুল বাবুর।

দলিল না-ই বা হল। এদিন বিনি-দলিলে চাঙ্গিরে এসেছি, হঠাৎ দলিলের কোন পরজ পড়ল ? আসল দায়িক কে, তারই জো সাকিন নেই।

নগেনশশী জাঁক করে বলে, দলিল হবে না মানে ? ইরাকি ? ঠিকঠাক করে এসছি অমুকুল বাবুর সঙ্গে। এ বুধবারে হল না তো আসছে বুধবারে। ক্যাম্পের উপর লেখাপড়া হয়ে আছে, খালি এখন সই মেয়ে হাকিমের সামনে তুলে ধরা। কেন যে লোকে অমুকুল বাবুর নিন্দে করে—আমি তো কই খারাপ দেখলাম না। তিনি আরও ঠাটা করে বললেন, বিয়ে করতে বাচ্ছ, মিষ্টিমিঠাই নিয়ে আসবে। নয়তো কাজের তুলু বাটরে দেব।

কী সব উটোপাটা কথা ! গগন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিয়ে হয়ে গেলেই বাগা থেকে বিদায় হবে—এমনি কথা কতদিন হয়েছে। শতমুখে বাদার নিন্দে করত নগেনশশী : শাপ-গুয়োর থাকতে পারে এখানে, মাহুঘের বসবাসের জায়গা নয়। মায়ের পেটের বোনটা ছাড়ল না কিছুতে—সেইজন্তে আসা। পালাতে পারলে বেঁচে যাই যে বাবা। বিনি-বউ আর এক রকম বলে : আসতে চাচ্ছিল না মেজদাদা। যে-ই বলেছি, আমার একেবারে তাড়িয়ে তুলল। তখন চারি বলে, যাবে না কি রকম ? নাকে-নড়ি দিয়ে নিয়ে যাব। চারির চক্কোত্তি পড়ে মেজদাদা এল, আমার কথায় নয়। চারিকে বিয়ে করার লোভে। কিন্তু বিয়ের পরেও এখন তো নড়ে বসবার মতলব দেখা যাচ্ছে না সেই নগেনশশীর।

গগন বলে, এ কি রকম কথা। রীতবর্ম আছে তো একটা। দলিল হোক না হোক সে আমি বুঝব। তার জন্তু কিয় বুধবার অবধি এখানে ধী করে থাকতে হবে না। বিয়ের পরদিনই বউ নিয়ে জোড়ে বাড়ি চলে যাও।

নগেনশশী বলে যেখানে থাকব সেই তো বাড়ি। বউ নিয়ে ভিন্ন জায়গায় যেতে বল, তার জন্তুও আটকাবে না। এখান থেকে গিয়ে ঐ চৌধুরিগঞ্জের আলায় পাঁচ-সাত দিন জোড়ে থেকে আসতে পারি। অমুকুল চৌধুরির সঙ্গে দহরম-মহরম হয়ে গেছে। আমার গুল বুঝেছেন। নতুন-যেটির একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে তার পরে চৌধুরিগঞ্জের ভারও আমার নিতে হবে। অনিচ্ছকে দিয়ে হয় না, ফুলতলা থেকে এসেও সুবিধা করতে পারে না। ভালই হবে, কি বল আমাইবাবু ? একছত্র হয়ে বসা যাবে। অঞ্চল জুড়ে চেপে বসে তখন দেখা যাবে কত শক্তি ধরে পাড়ার ঐ হাথেরগুলো। ভিটে-ছাড়া করে তাড়াব।

গগন ব্যাকুল হয়ে বলে, না গো, দেশে কিরে যাবে তোমরা। কথাও তো তাই। চারি পাগল হয়ে উঠেছে দেশে-ঘরে বাবার জন্তে। বিয়ে দিচ্ছি সেই কারণে।

কিন্তু নগেনশশী কিছুমাত্র আমল না দিয়ে চক্কোত্তির সঙ্গে পুনশ্চ কথাবার্তার মগ্ন হল। কেমন ভাবে কি রকম সর্ভে চৌধুরিগঞ্জের কাজটা নেওয়া যায়, কাজ নেবার পরে কোনখানে বাঁচি করা যাবে—সাইভলার না চৌধুরিগঞ্জে, তারই সব জরুরি শলাপরামর্শ।

বেশ মজা ! বিয়ে করবে চাকরখালাকে—এবং বিয়ের পরে নতুন ঘেঁষি ও চৌধুরিগঞ্জ উভয় জলকরের কর্তা হয়ে বাদারাজ্যে আধিপত্য করে বেড়াবে। ধান ছাড়াতে গিয়ে চাল বেধে আসে—উপায় কি এই বিপদে ? [ক্রমশঃ]

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পূর্ব]

সাধনা বসু

বোঝাইয়ে কিরে গিয়ে আমি বোগ দিলুম ভয়ঙ্ক ফিঙ্গাস
লিমিটেডে। এই প্রতিষ্ঠানটি তখন 'উর্ধ্বী' ছবিখানির
নির্মাণকার্যে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। উর্ধ্বী ছবিতে এঁরা
আমার নাম ভূমিকার অভিনয়ের জন্তে নির্বাচন করলেন। স্মৃতি
গুরু হল, ছবির নির্মাণকার্য এগিয়ে চলতে লাগল বথারীতি, আর একথা
মিথ্যে নয় যে উর্ধ্বী চিত্রটিতে আমার মানিয়েছিলও সবদিক দিয়েই।
উর্ধ্বীতে অভিনয় করে আমি সব দিক দিয়েই বেন পরিপূর্ণা, কোথাও
বেন এতটুকু কঁক নেই। পূর্ণতার সমারোহ। কিন্তু এইখানেই
ঠঠাং ছন্দপতন। পরম রমণীয় সুললিত বর্ণবাহ্য-সমৃদ্ধ একটি
কবিতার পঠন কানে বেন সুখা ঢালছে, হাঁসং ছন্দপতন কানে লাগল
ভীষণ, এও ঠিক তাই, কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল, আমি ভীষণ অসুস্থ
হয়ে পড়লুম, রীতিমত শয্যা নিতে হল আমাকে, বেশ কিছুকালের জন্তে
স্বাভাবিক স্বাস্থ্য আমি হারিয়ে ফেললুম, আর এই শয্যার আশ্রয়
নিতে হয়েছিল বেশ কয়েকটি মাস, বাইরের কলকোলাহল শব্দযুগ্ম
জগতের সঙ্গে এই ক' মাস আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না বাইরের
রূপ রস বর্ণ গন্ধের স্তূপসৌরভ ক' মাস বেন আমার জন্তে ছিল না,
স্বাভাবিক জগত থেকে এই অসুস্থতা বেন কয়েক মাসের জন্তে
আমার একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিলে। আমার তিলে তিলে গড়া
একেকটি স্বপ্ন হাওয়ার মিলিয়ে গেল, রূপ তা পেল না, আমার সাধের
চিত্তা অসুস্থে বিনষ্ট হল, আমার কল্পনার প্রাসাদকে এই অসুস্থতারূপী
বড়ের দমকা বেগ বেন ধূলিসাৎ করে দিল, সেই প্রাসাদের চূড়া বেন
লুটিয়ে পড়ল প্রকাশ্য পথে। অসুস্থতা যখন আমার মধ্যে জাঁকিয়ে
আপন অধিকার কার্যে করল তখন উপায়ান্তর না দেখে আমিই
প্রয়োজকদের আর আমার জন্তে সময় নষ্ট করে ক্ষতির সম্মুখীন হতে
নিবেদ জানালুম। আমার জন্তে সময় নষ্ট করে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া
মানে সেই অন্তর্ভর্তী সময়টুকু প্রত্যেকটি কলাকুশলীকে মাসে মাসে
পারিশ্রমিক দিয়ে বাওয়া অথচ তার বিনিময়ে ঐ সময় কোন কাজও
তঁারা পাচ্ছেন না, আমি জ্ঞারে বতক্ষণ না যাচ্ছি ততক্ষণ স্মৃতি বন্ধ
অতএব কাজ হচ্ছে না অথচ তঁরা প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য
পারিশ্রমিক বথারীতি দিয়ে যাচ্ছেন, তার উপর কলাকুশলীর সংখ্যা
তঁাদের প্রতিষ্ঠানে ছিল বিরাট। আমার সাহসে কতদিন লাগবে
তা আমার একেবারেই অজানা। এ ক্ষেত্রে তঁাদের কাজ বন্ধ করিয়ে
যাখা আমার ভাল মনে হল না, এই সব ভেবে আমি নিজেই তঁাদের
এ অভিশ্রম জানালুম। এঁদের কাছে আমি আরও নানা দিক দিয়ে
কৃতজ্ঞ, এঁদের সহায়তা এবং আন্তরিকতা কোনদিন ভোলবার নয়,
আমার স্মৃতিতে এঁদের কথা চিরদিন বেঁচে থাকবে। যে সকল
প্রয়োজকদের সঙ্গে পরম আরাধ্যে কাজ করা যায় এঁরা সেই শ্রেণীর
অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সে বিষয় বিস্তারিত বলাই বাহুল্য, আমার বা বা
চাহিদা ছিল অমানবদনে পরম আনন্দে বিনা বাক্যব্যয়ে এঁরা তা
য়েনে দিয়েছেন। এমন কি আমার ইচ্ছার আমার নিজস্ব শিল্পনির্দেশক
কীভাবেও চৌধুরীকে এঁরা তঁাদের ছবির শিল্প নির্দেশনার তার
স্বর্ণ করতেন বিধাবোধ করেনি। মঞ্চসজ্জা এবং সাজসজ্জার দিকে
স্মৃতিতেই যখনও চৌধুরীর প্রয়োজন অনুভূত হয়, তার কারণ



যথপট

একে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলায় জন্তে এর নৃত্যশৈলীর উপযোগী
মঞ্চসজ্জা এবং সাজসজ্জাও বর্ধেই বিশেষত্বপূর্ণ হওয়ার দরকার ছিল
তার উপর আমি নিজেও চেয়েছিলুম যে আমার পরিচ্ছদাদিতেও বেন
বর্ধেই পরিমাণে একটা নিজস্বতার স্পর্শ চিহ্ন পাওয়া যায়।
আজ আমার জীবনের একটি বিশেষ দিকের স্মরণার্থে
করছি, পাঠক-সাধারণের কাছে আমার জীবনের একটি দিকের
প্রতিকৃতি আজ সম্পূর্ণভাবে উন্মোচন করব। মাসুকের জীবন স্মরণ
এবং হুঃখের একটি সমগ্র সুখ হুঃখের অভিনয় সংমিশ্রণে মাসুকের
জীবনে পূর্ণতার স্পর্শ পড়ে সুখ আর হুঃখ উভয়েই উভয়ের উপর
প্রভাব ফেলে আর উভয়েই মাসুকের জীবনে অপরিহার্য। সুখ
বাদ দিয়ে হুঃখের চিন্তা বা হুঃখকে বাদ দিয়ে সুখের চিন্তা অকল্পনীয়।
ভাগ্যদেবতার আশীর্বাদে জীবনে সুখের যে স্পর্শ পেয়েছি তার
তুলনা নেই, না চাইতেই কত সুখ যে আমার ঘিরে ধরেছে তা হয়
তো মাজ পর্বত আমার নিজেরই জানা নেই। সুখও পেয়েছি
যেমনই, হুঃখ বেদনাও তেমনই পেয়েছি তাঁরই কাছ থেকে। সুখসম্পন্ন
তিনি আমার জরিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাতে পরিপূর্ণতার লক্ষণ ছিল
না, জীবনের একটি বিশেষ বৃত্তি হয়তো পূর্ণতা পেয়েছিল কিন্তু
সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, তাতে জীবন পূর্ণতা পারি
তাইতো তিনি আমার হুঃখ দিলেন, দিলেন বেদনা, দিলেন আত্মকেন্দ্র
কষ্টকমাল্য—আমাকেই পূর্ণ করে তোলায় জন্তে যে হুঃখ আমার
জন্মে চিরকালের জন্তে অমলিন স্বাক্ষর রেখে গেছে সেই স্বাক্ষরগুলোই
আজ খালি চোখের সামনে—জেসে উঠছে। সেই হুঃখের দিকটাই আর
তুলে ধরছি—আমার জীবনের স্বর্ণযুগ বলতে যে সময়টা বোঝায় অর্থাৎ
যখন আমি স্মৃতির সাধনার বিজোর (অবশ্য আমার স্মৃতিতে তার
কতখানি আছে তা আমার বিচার নয়, সে বিচার করবেন পাঠক
ও রসবোধীর দল) যখন নতুন নতুন স্মৃতির কল্পনার আরাধ্যে
আচ্ছন্ন করে কেলেছে, যখন স্মৃতির চিন্তা ছাড়া জগতের অস্তিত্ব
সম্প্র চিন্তা আমার মন থেকে নির্বাসিত—সেই সময়ের কথা বলছি।
যখন হিমালয় থেকে কঙ্কাকুমারিকা পর্বত পূণ্য ভারতভূমির প্রায়
প্রধান স্থানগুলিতে দর্শকসরবারে ভারতভূমি হিসেবে আমার নৃত্যকর্ম
নিবেদন করে চলেছি দেশপুত্র ও দেশবতার সাদর আহ্বানে এবং
প্রশংসার নিবেদক যখন ধড় মনে করছি তখন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক
পরিস্থিতি সাংঘাতিক। সুখো বহুরের পেশারের বহুই তখন শিবিল

হয়ে এসেছে। বনিক ইংরেজ বুকেছে আর উপার নেই, এবং জালগটোতে হবে, যামমোহন থেকে যে জাগরণের সাধনার পরিচর পাওয়া গেছে তারই অল্পর আজ মহীকহে পরিণত হয়েছে, ভারত-আজ্ঞার কঠ আর যোধ করে রাখা চলবে না, অতএব বাবার আগে শেষ কামড় দিয়ে ইংরেজ তখন দেখাতে আরম্ভ করেছে যে নানাদিকে আমাদের পটুখের কথা তোমরা নানাভাবে উল্লেখ কর, এবার দেখে নাও নির্ধাতনের দিক দিয়েও পৃথিবীর অনেক জাতকে আমরা টেকা মেয়ে যেতে পারি। আর সেই নির্ধাতনের বলি হল ভারতের যুক্তিকামী সন্তানেরা, সারা ভারত তখন যুক্তির সংগ্রামে আত্মমগ্ন, হিমালয় থেকে বঙ্গাকুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্রই এক কথা, ভারত ছাড়, যুক্তি চাই, ভারতের অস্তরে অস্তরে তখন স্বাধীনতার ক্ষুধা। পরাধীনতার জালায় তখন বিধিরে উঠেছে সারা ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের বরণ্য নেতৃবৃন্দ তখন প্রায় সকলেই কারাগারে। সেই সময় তাঁরা অনেকেই কেন, প্রায় সকলেই বলা যায়—সৌহার্যর অস্তরালে। কখনও কখনও লোহার দরজার বাইরে তাঁরা বেরিয়ে আসতেন যেতেন বটে তবে তা অতি অল্প সময়ের জন্যে, অল্পকালের ব্যবধানেই আবার ফিরে যেতে হোত জেলে, তাই আমার Neo Classical Ballet বা গড়ে উঠেছিল আমাদের ঐতিহাসিক পটভূমির উপর ভিত্তি করে এবং যুগের সঙ্গে তাল রেখে সেই নৃত্য নিবেদন তাঁদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজন ছাড়া অনেককেই দেখাবার সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে পারিনি, আমার জীবনে এ কোভ চিরকালের। আমি অস্তর থেকে বলছি দেশের শৃঙ্খল মোচনে ধারা নিজেদের ব্যক্তিগত সুখস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ত্যাগের হৃদয় সাধনায় সমাহিত, শতসহস্র

নির্ধাতন ধারা হাসিমুখে বরণ করছেন সেই সার্বিকজন্মা নেতৃবৃন্দকে যদি দেশের মেয়ে হিসেবে দেশীয় নৃত্যকলার একটি বিশেষ উদ্ভাবিত দিক দেখাতে পারতুম তা হলে আমার সুখের সীমা থাকত না।

সে সময়ে সুযোগই হল, প্রেরণাই হল, খ্যাতিই হল, বিধাতা আমার কোন বিছুরই অভাব রাখেননি, অথচ দেখুন এই একটি দিককে কেন্দ্র করে আমার মনে যে হতাশা, যে বেদনা, যে কোভ জন্ম নিল—তারা চিরকালের জন্যেই আমার মনে বেঁচে থাকবে। আমার পূর্ণ জীবনে এ যেন একটা বিশেষ কীক হয়ে গেল। আর এই কীক—বলতে পারেন আমি কোন মন্ত্রবলে ভরিয়ে তুলব।

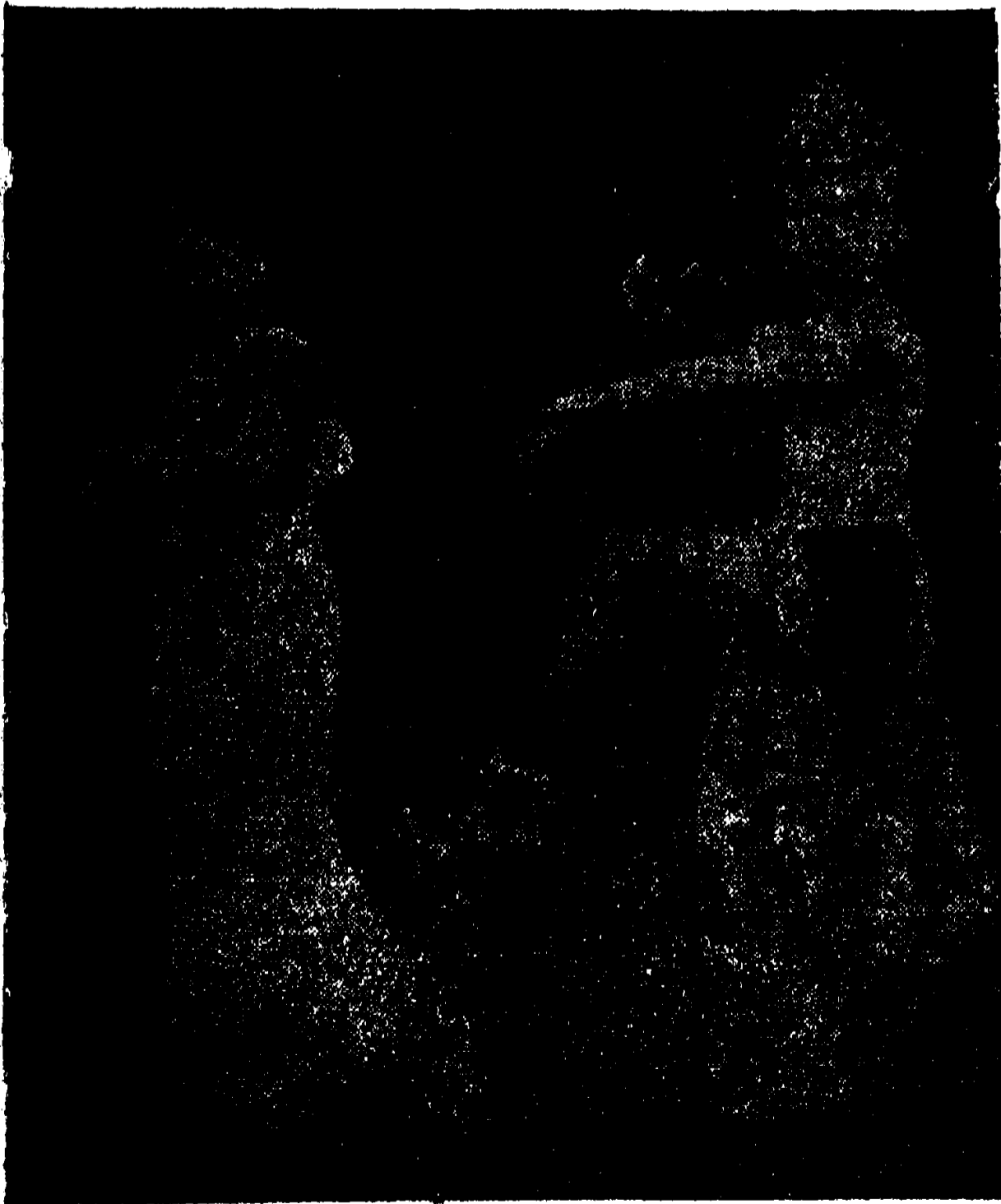
[ক্রমশঃ]

অনুবাদ : কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষুধিত পাষণ

সরস্বতীর বরণ্য রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভায় বাংলাদেশের ছোট গল্প যে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তার তুলনা নেই। এ দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতির ঋণের শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে বাংলা দেশের ছোট গল্প একটি বিশেষ রূপ পেয়েছে। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এক নব ধারাপাতের সৃষ্টি হয়েছে। গীতাঞ্জলিকে নিয়ে বাঙালী যতখানি গর্ববোধ করতে পারে গল্পগুচ্ছে নিঃসেও বাঙালী ঠিক ততখানিই গর্ববোধ করতে পারে। যে অবিস্মরণীয় ছোটগল্পগুলিকে একত্রে সংকলিত করে গল্পগুচ্ছের সৃষ্টি ক্ষুধিত পাষণ তাদের মধ্যে অন্ততম। ক্ষুধিত পাষণ শুধুমাত্র বাংলাদেশের গৌরব বর্ধনই করেনা বিশ্বের ছোটগল্প সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করার অধিকার বা শক্তি রাখে। বিশ্বসাহিত্যের যে ক'টি ছোট গল্প অমর ও অজর্ন করার দাবী রাখে ক্ষুধিত পাষণ তাদেরও অন্ততম। মাত্র কয়েক পাতার একটি ছোট গল্প। চরিত্রসংখ্যা মুষ্টিমেয়। কিন্তু অপূর্ব বহনায়স সমন্বিত ও ভাবসমৃদ্ধ এই গল্পটি পড়ার সময় সব কিছু মন থেকে মুছে যায়, গল্পটির মধ্যে থেকেও তখন সব কিছু মিলিয়ে যায় সব কিছুকে ছাপিয়ে ফেলে বারংবার রবীন্দ্রনাথকেই সেখানে সর্বতোভাবে মনে পড়ে। মনে পড়ে এই অনবস্ত সৃষ্টির বিশ্বপূজ্য শ্রষ্টাকে।

ক্ষুধিত পাষণ বর্তমানে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। ছায়াচিত্রের উপযোগী নাট্যরূপ দিয়েছেন মনমথ রায়। ছায়াচিত্রের অন্তে স্বভাবতই কাহিনীকে কিছুটা সম্প্রসারিত করতে হয়েছে। কিন্তু সুখের বিষয়, এই কাহিনী সম্প্রসারণে মনমথ রায় বর্ণেই নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের মত ক্ষুধিত পাষণের কাহিনী সম্প্রসারণ নিছক ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়নি। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের চিত্রগঠনে রবীন্দ্রনাথের মূল সুর ব্যাহত হয়েছে, তাল কেটে গেছে, ঘটেছে ছন্দপতন। ক্ষুধিত পাষণ সে পরীক্ষায় সর্গোরবে উত্তীর্ণ। ছবিটির গল্পাংশ সর্বজনবিদিত, তাই সে সম্পর্কে নতুন আলোকপাতের কিছু নেই। ছবিটির মূল সম্পদ পরিচালকের ট্রিটমেন্ট এবং ক্যামেরার কাজ। চিত্রকর যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তার তুলনা নেই। চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে কয়েকটি কল্পনা এবং কয়েকটি কোণ নির্ধাচন যেমনই বিস্ময়কর তেমনই অভিনব। মঞ্চভূমির এবং অঞ্চালনার চিত্রগ্রহণ যেভাবে নেওয়া হয়েছে তা এককথার অনবস্ত, বিশেষ করে মঞ্চভূমির বা বিস্তীর্ণ প্রান্তর সমূহের চিত্রগ্রহণ যেভাবে গৃহীত হয়েছে সেইভাবে



মদনমথর ব্যালোতে শিব-পার্বতীর ভূমিকায়

মায়ব বেনর ও সাধনা বসু

চিত্রগ্রহণ ইত্যপূর্বে অল্প কোন বাঙলা ছবিতে দেখা গেছে কি না আমাদের জানা নেই। চিত্রকরকে অভিনয় জানাই। সুবিত পাণ্ডা তপন সিংহের একটি অক্ষয় চলচ্চিত্র সৃষ্টি। তাঁর অসামান্য দক্ষতার সম্যক প্রকাশ ঘটেছে এই ছবিখানিতে। তাঁর পরিচালিত এই ছবিটি আমরা অল্পে দৃঢ় আশা পোষণ করি; অগতের চলচ্চিত্রের দরবারে যথেষ্ট মর্যাদার বিভূষিত হয়ে বাঙলা ছবির মানোন্নয়নে এবং গৌরববৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। আলী আকবরের সুরবোজনা তাঁর সুনাম সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন করিমরুপী বাধামোহন ভট্টাচার্য। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর বিশ্বকর অভিনয় সুখের ভাষা কেড়ে নেয়। যে বীর, ছিন্ন, সংবত, গান্ধীর্ষপূর্ণ এবং ব্যক্তিত্ববান অভিনয়—তিনি প্রদর্শন করলেন তা তাঁর বিশ্বকর অভিনয়-প্রতিভাই পরিচয় দেয়। তাঁর উচ্চ উচ্চারণ অপূর্ব এবং বিস্ময়কর। বাধামোহন ভট্টাচার্যের পরেই উল্লেখ করব মামুদশাহরুপী দিলীপ রায়ের নাম। বাদশাহ-সুলত ব্যক্তিত্ব এবং গান্ধীর্ষ তিনি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁরও উচ্চারণ আড়ম্বরমুক্ত এবং ভ্রান্তিহীন। ছবি বিশ্বাস, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী এবং অক্ষয়ী মুখোপাধ্যায়ও যথোচিত অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

মেঘে ঢাকা তারা ও বাইশে শ্রাবণ

বর্তমানে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে যে সকল বাঙলা ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের মধ্যে মেঘে ঢাকা তারা এবং বাইশে শ্রাবণের উল্লেখ বিশেষ ভাবে করণীয়। দুখানিই হৃদয়ধর্মী এবং বলিষ্ঠ বাস্তব আবেদনমূলক ছবি। মেঘে ঢাকা তারার কাহিনীকার সাহিত্যসেবী শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু, তাঁর "চেনামুখ" রচনাটিকে অবলম্বন করেই মেঘে ঢাকা তারার চিত্ররূপ গঠিত হয়েছে। আজকের দিনের অগতের আকাশে বাতাসে চতুর্দিকে যে সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—ছবি দুটির কাহিনীও সেই সুরেই গাঁথা। আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি পরিবেশিত হয়েছে মেঘে ঢাকা তারার। মধ্যবিত্ত সমাজে এখন বেঁচে থাকাটাই একটি বড় সমস্যা, জীবন ধারণের চেষ্টাটাই যেন একটা অপরাধ, মধ্যবিত্তদের যেন সৃষ্টিই হয়েছে বিরাম বিশ্রামহীন সংগ্রামে লিপ্ত থাকার জন্মে, মূলতঃ এই কথাগুলির উপর ভিত্তি করেই চেনামুখের গল্পাংশ রচিত। ছবিটাই বোনকে কেন্দ্র করে ছবির কাহিনী রূপ পেয়েছে, এবং এই ভাই বোনের মধ্যে দিয়ে যে ভাবে লেখক আপন বক্তব্যকে রূপ দিয়েছেন তা হৃদয়বান, অল্পভূতসম্পন্ন এবং দরদী দর্শকমাজকেই অভিভূত করার যোগ্যতা রাখে। তবে এই সুন্দর ছবিখানির সমস্ত মাদুর নষ্ট হয়ে গেছে শব্দগ্রহণের জন্মে, ছবির শব্দগ্রহণ এত পীড়াদায়ক হয়েছে যে সে বিষয়ে আর বলার কিছু নেই, ছবিটির সমস্ত সৌন্দর্যকে হত্যা করেছে এই ব্যর্থ শব্দ গ্রহণ। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন কৃষ্ণী চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত। পরিচালনা করেছেন শক্তিমান পরিচালক ঋষিক ষটক।

অভিনয়ে দর্শক সাধারণকে স্তম্ভিত হতবাক করে দিয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। অস্তিত্বশূন্য অবতীর্ণ হয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য, নিয়রন রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বিজু ভাওয়াল দেবী সিন্ধোয়ী, সীতা দে, অম্বিকারাম ও সীতা ষটক প্রভৃতি।

বাইশে শ্রাবণ ছবিটি নিয়মিতভাবে কেন্দ্র করে। তাদের সুখ সুখ বেদনা আশা আশঙ্কাই এই ছবির প্রধান উপজীব্য। তাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করার ক্ষেত্রে পরিচালক যথেষ্ট পরিমাণে সফলতা অর্জন করেছেন। ছবিটির কাহিনীর আবেদন হৃদয় স্পর্শ করে। বুধা আড়ম্বরের ভায়ে ছবিটি অর্জনিত নয়, অথবা চাকচিক্যে একে বিভূষিত করার চেষ্টা করা হয়নি, কোন কিছুই অর্থহীন বাহুল্য ছবিটিতে আরোপিত হয়নি, অথচ ছবিটি যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন, বক্তব্য সমন্বিত সর্বোপরি বৈশিষ্ট্যবান। সেইখানেই পরিচালকের কৃতিত্ব সহজ সরল ভাবে বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে কৃষ্ণীমতীর অস্পষ্টতার, এবং হৃদয়গাত্যের আশ্রয় নেওয়া হয়নি—সেই জন্মেই ছবিখানি সুন্দর হয়ে উঠেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুপাল সেন। সুর দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শিল্প সঞ্চায়ী নির্দেশাদি দিয়েছেন বংশী চন্দ্রগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকার রূপ দিয়েছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার, উমানাথ ভট্টাচার্য, হরিমোহন বসু, শ্রীতি মজুমদার, অজিত চট্টোপাধ্যায়, হেমাজিনী দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

রক্তপট প্রসঙ্গে

বর্ষায়ান সাহিত্যশ্রী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কাঞ্চনমূল্য' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রের রূপে দেখা বাবে। তারতের কৃষ্ণী আলোকচিত্রশিল্পী রাহানন্দ সেনগুপ্ত এবং প্রখ্যাত লোকনৃত্য শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী ছবিটির আলোকচিত্র এবং সুরবোজনার ভার যথাক্রমে গ্রহণ করেছেন। ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার, ভাস্কর-অক্ষয়, জীমান গৌতম, বাসবী নন্দী এবং রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি শিল্পীগণকে বিভিন্ন ভূমিকার দেখা বাবে।.....বাঙলার অল্পতম শ্রেষ্ঠ কথাসিল্পী সুরবোজ বোবের অপূর্ব কাহিনী 'তন বরনারী'র চিত্রায়ণ সম্ভবপর হচ্ছে অক্ষয় করের পরিচালনার। উত্তমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, ভুলসী চক্রবর্তী, সুনন্দা দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বনানী চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখ শিল্পীরা এতে অভিনয় করছেন।.....কুমারেশ বোবের 'বিনোদিনী বোডিং হাউস' গল্পটিকে ছায়াচিত্রে দর্শকসাধারণ দেখতে পাবেন "শেখ পর্যন্ত" শিরোনামায়। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরবোজিত এই ছবিটিতে বিভিন্ন ভূমিকার অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, জীবন বসু, গঙ্গাধর বসু, ভুলসী চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, অম্বতা গুপ্তা, সীতা দে, সুলতা চৌধুরী প্রভৃতি।.....'কানামাছি' ছবিটি পরিচালনা করছেন ভবেন দাস। সুরবোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রখ্যাত সুরকার নটিকেশ্বর বোস। রূপায়ণে আছেন পাহাড়ী সাত্তাল, অক্ষয়কুমার, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় রায়, ভুলসী চক্রবর্তী, জীমান তিলক, পদ্মা দেবী, সুনন্দা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী বোব, প্রভৃতি।.....'পাথের' নামক ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রভাত চক্রবর্তী। এই ছবিটির মাধ্যমে রূপালী পর্দার বৃক্কে কেশব শিল্পীর অভিনয় দেখতে পাওয়ার বাবে তাদের মধ্যে নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, প্রশান্তকুমার, অক্ষয়কুমার, অক্ষয় রায়, ভুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, প্রণতি বোব, তপতী বোব, রেণুকা রায়, অপর্ণা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

জার্মান শিল্পীদের চিত্রসমাবেশ

অশোক ভট্টাচার্য

স্বীত ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার বাহুবরের প্রদর্শনীকক্ষে ললিতকলা একাডেমি ও একাডেমি অব ফাইন আর্টসের উদ্যোগে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রাকৃতিক চিত্রকলা প্রদর্শনী হয়ে গেছে। গত কয়েক বছরের পূর্ব-জার্মানির এই বিভাগের বাছাই করা কাজ এগুলি, এবং এ কথা বললে অস্বাভাবিক করা হবে না যে, শিল্পীদের প্রদর্শিত নয়নাগুলি কেবলমাত্র উচ্চমানের পরিচায়কই নয়, সেগুলি জার্মান জাতির প্রাকৃতিক আর্টের যে গৌরবময় ঐতিহ্য—বা ভূমির-প্রমুখ শিল্পীর রচনার দ্বারা বিশ্বশিল্পের অগ্রদূত—স্বারও বলিষ্ঠ উত্তরসাধক। সেই সঙ্গে একটি নতুন দিকসংস্কারকে যে ব্যাপক প্রকার পূর্ব-জার্মানিতে ইদানীং ঘটেছে তারও বৈশিষ্ট্যকর অভিব্যক্তি হিসাবে বিশিষ্ট। অথচ রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রভাবে কোনো রচনাই আড়ষ্ট বা চিত্তার দিক থেকে দেউলিয়া নয়। অবশ্য এদের রচনায় কোথাও অহেতুক আঙ্গিকগত জটিলতা দৃষ্ট হয় না এবং প্র্যাবল্টিগাট্ট আর্টের অবয়বগত অথবা আলোছায়া বিষয়ক নৈর্ঘাতিক অস্বীকরণও লক্ষ্য করা যায় না। তাই বলে শিল্পীদের স্বকল্পশক্তি যে কোনো নিপড়ে বাঁধা পড়েছে তাও নয়। তাঁরা আয়োজন মতো রচনার ভাবকে মূর্ত করবার উদ্দেশ্যে দৈহিক অবয়বের সড়কচর্চন ও সম্প্রসারণ প্রতিয়েছেন এবং রং-এর ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণে সজ্ঞা স্বাধীনতা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা সূহ শালীনতা সর্বত্র বিদ্যুত এবং কার্যকর অস্বীকরণগত নিষ্ঠা সর্বত্র প্রতীয়মান। এ কথা বুঝতে অস্বীকরণ হয় না যে, শিল্পীরা এক নতুন মূল্যবোধ অর্জন করেছেন এবং এক বৃহত্তর সমাজের সম্মুখে সেই মূল্যবোধকে ফুলে ধরতে চেয়েছেন। দ্বিধাব্যাপী মানসিক অস্থিরতার মধ্যেও তাঁরা যে অসাধারণ স্বাভাবিকবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা অস্বীকার্য।

এই প্রদর্শনী ভাল লেগেছে আরও এই দেখে যে, সংখ্যাগত অধিক্য এখানে গুণগত উৎকর্ষকে কোথাও লুপ্ত করেনি। অধিকাংশ ছবিই বিশিষ্ট এবং কিছু ছবি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দক্ষতা ও রসবোধের



মুখপাতানি গান—গ্যাব্রিয়েল মেয়ার ডেনেইটস

পরিচায়ক। সিগফ্রিড হুমানের রচিত 'উইকাটে উইটার ল্যাওস্কেপ' (১২৮) এই ধরনের একটি ছবি। অতিসাধারণ বিষয়বস্তুও যে বহুসংস্কারক ও আলোছায়া বিস্তারে কতদূর রসময় হয়ে উঠতে পারে এ ছবি না দেখলে তা উপলব্ধি করা যায় না। হেলেনা সিগালার 'ভাগেলিয়নস' (১৩৪), প্রেসিং চিল্ড্রেন (১৩৫) এবং গাল এট দি বিচ, (১৩৭) ও উল্লেখযোগ্য রচিত উইকাটে।

অপর একটি মহৎ চিত্র হলো হানস-খিও রিটার এর লিথোগ্রাফি গাল উইথ স্ট্রাওয়ার (১০৭)। যে সূত্র রসামুগ্ধতা-এ ছবিতে সঞ্চারিত তা কোনো শ্রেষ্ঠ তৈলচিত্রের পক্ষেও গৌরবজনক। অত্যন্ত লিথোগ্রাফির মধ্যে আর্নোমোর-এর 'চাইল্ড উইথ বাটারলাইস' (৭১) ও রুডল্ফ বায়গেভারের 'অন সান ডে' (৭) বিশেষ ভাল লাগে। অটো জাংজল-এর প্যাটেল ছবি (১৭ ও ১৮) ভেরা কোপেৎসের রচিত স্ক্রিন প্রিন্ট 'টু বাইডাস' (৫৬) ও টনি মাউ-এর 'রিডিং গাল' (৭১) লক্ষণীয়। ওয়ার্ণার ফ্রেমকে ও ম্যাক্স স্ক্রিউমারের পুস্তক-চিত্রায়ণগুলিও [খুবই উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত ছবির মধ্যে অনেকগুলিই বিভিন্ন কারণে ভাল লেগেছে। কোনো ছবিই প্রদর্শনীর অযোগ্য মনে হয়নি। হানসিড হুমানের আঁকা আইনষ্টাইন প্রমুখের প্রতিকৃতিগুলিও স্মরণ।

সব দিক থেকেই এ বছরের একটি তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে শিল্পবসিকদের কাছে জার্মানশিল্পীদের এই প্রদর্শনী স্মরিত হবে। বিশেষত এটি হলো সেই ধরনের প্রদর্শনী বা শিল্পীদের পক্ষেও শিক্ষাপ্রদ।

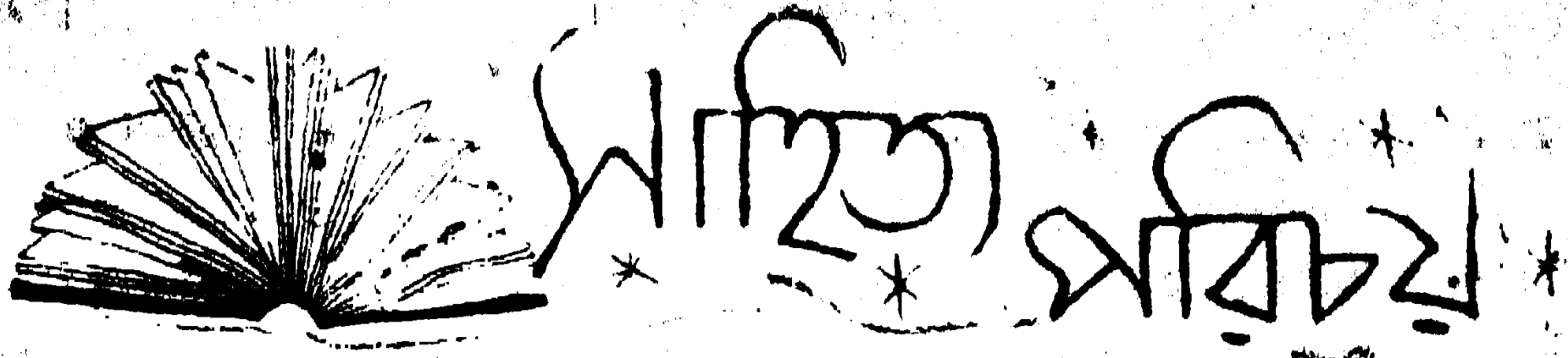
কফি হাউসের প্রদর্শনী

কফি হাউসের ধীরাজ চৌধুরীর একক প্রদর্শনীটি ইদানীং শিল্প-বসিকদের অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পী গভর্ণমেট আর্ট কলেজের চতুর্থ বাৎসরিক শ্রেণীর ছাত্র। ইতিপূর্বে তাঁর একাধিক প্রদর্শনী কলকাতার বাইরে অনুষ্ঠিত হলেও কলকাতার এই তাঁর প্রথম একক আয়োজন।

শিল্পীর স্থান নির্বাচনের প্রশংসা করি। চিত্রকে জনজীবনের কাছাকাছি এনে দাঁড় করানোর সরাসরি প্রচেষ্টা কলকাতায় চলতে না হলেও কফি হাউসে এই আয়োজনের বিশেষ তাৎপর্য আছে। কলেজ স্ট্রীটই যে কলকাতার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের তথা বুদ্ধিজীবীর প্রাণকেন্দ্র, তাতে সন্দেহ নেই এবং কফিখানায় যে তাঁদের অনেকেই পদার্পণ ঘটে তাও কারোই অজানা নয়। সুতরাং ধীরাজ বাবুর আয়োজন সেদিক থেকে নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দেবে।

শিল্পীর কাজে বলিষ্ঠতা লক্ষিত হয়। বিশেষত তিনি নিছক মুখস্থ ছাত্রসুলভ রঙের মধ্যেই যে নিজেকে নিবদ্ধ রাখেননি, তাও স্পষ্ট। তাঁর কয়েকটি চিত্র, যেমন জলরঙে ইন দি মিড্ডল অব ওয়ার্ক স্ট্রীটলাইক ও এ মফঃসর রেট রেট এবং তেলরঙে টি মেকার ও হিল-টল শিল্পীর দক্ষতার পরিচায়ক। তেমনি অপরপক্ষে জলরঙের ছবি প্র এ উইগো ও আউটডোর রেট রেট (২) ছাত্রসুলভ স্বল্পতার প্রতিকৃতি। এ ধরনের ছবি যে কোনো প্রদর্শনীর পক্ষেই অস্বপ্নমুখ।

শিল্পীর রচনায় একটা বিপদের সম্ভাবনা দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের আঙ্গিকের ব্যবহার দেখে ভয় হয়, অক্ষয়-শিল্পী হঠাৎ বিকল হতে না পড়েন। ছাত্রসুলভ রসময় হ-একটি পদ্ধতিতেই বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করা হয়ে সব প্রান্তে সীমিত।



১৩৬৬ সালের উল্লেখযোগ্য বই

* কবিতা *

অচিরা ৪'০০	প্রভাতমোহন বন্দ্যো: শান্তি লাইব্রেরী
এল ভোরাদো ২'০০	বিমলচন্দ্র সিংহ অভিজিৎ প্রকাশনী
কটি কবিতা ও একলব্য ২'০০	মঙ্গলাচরণ চট্টো: জ্ঞানদাল বুক এন্ডেজী
কিংসক বহি ২'০০	শ্রমখনাথ বিনী এ প
জানানো ২'০০	অজিত দত্ত এম সি সরকার
জুপিটার ২'০০	বাণী রায় মিত্রালয়
ভেপান্তর ২'০০	আনন্দ বাগচী আর্ট ইউনিয়ন
নিঃসঙ্গ মেঘ ২'০০	অচ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় এম সি সরকার
শ্রমণী পঞ্চক ৩'৫০	সুশীল রায় নতুন প্রকাশক
শ্রম প্রত্যয় ১'৫০	নবনীতা দেব এম সি সরকার
সুখের মেলা ১'৫০	মণীন্দ্র রায় পুস্তক
শতদল ২'০০	নবগোপাল সিংহ রামধনু
সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা ৩'০০	হরপ্রসাদ মিত্র সুরভি প্রকাশনী
হরিণ চিতা চিল ৩'০০	শ্রেয়স্ক মিত্র ত্রিবেণী

* সাহিত্য ও সংস্কৃতি *

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ ৭'০০	সুশীলকুমার গুপ্ত এ মুখার্জি
কবিতার কথা ৫'০০	বিমলকৃষ্ণ সরকার সুরপ্রকাশ প্রা: লি:
কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র ৫'০০	যোগেশচন্দ্র বাগল শ্রীগুরু
দুই কবি ৪'৭৫	সুধাংশুমোহন বন্দ্যো: রীডার্স কন'র
ধিঞ্জলল : কবি ও নাট্যকার ১২'০০	রথীন্দ্রনাথ রায় সুরপ্রকাশ প্রা: লি:
নাটকের কথা ৪'০০	অজিতকুমার ঘোষ এ
প্রাচীর কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন ৭'০০	কেন্দ্র গুপ্ত গ্রন্থনিলয়
বাংলা গল্পের ক্রমবিকাশ ৬'০০	শ্যামলকুমার চট্টো: শতাব্দী গ্রন্থভবন
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২'২৫	ভোলানাথ ঘোষ এস ব্যানার্জি
বাংলা সাহিত্যের একদিক ৪'০০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত শ্রীগুরু
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১২'৫০	সুকুমার সেন ইষ্টার্স পাবলিশার্স
বাংলার কবি ৪'০০	শ্রমখনাথ বিনী শ্রীগুরু
মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার ৩'৫০	সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এ মুখার্জি
মধুসূদনের কবি মানস ২'৫০	শিশির দাস বুকল্যাণ্ড
স্ববিত্তার্থে ৪'০০	বিনায়ক সাত্তাল বেঙ্গল পাবলিশার্স
রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেম ৩'০০	মল্লিকা গঙ্গোপাধ্যায় নাভানা

রবীন্দ্রসঙ্গীত কবি সমাজ ৬'০০	অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় এ মুখার্জি
রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধান ৩'৫০	শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
রবীন্দ্র সাহিত্যে সমালোচনার ধারা ৭'০০	আদিত্য ওহদেয়ার এভারেস্ট বুক হাউস
রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪'০০	মাখনলাল রায়চৌধুরী শ্রীগুরু
শব্দতত্ত্ব ১৫'০০	রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী প্রবর্তক পাবলিশার্স
সমালোচনার কথা ৫'০০	অসিতকুমার বন্দ্যো: সুরপ্রকাশ প্রা: লি:
সাহিত্যে ছোটগল্প ৮'০০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ডি এম
সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ ৮'০০	জীবেন্দ্র সিংহরায় ক্যালকটা পাবলিশার্স
সাহিত্যের সত্য ২'০০	তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধিয়া
সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩'৫০	হেমেন্দ্রকুমার রায় আই এ পি

* জীবনালেখ্য ও মনীষী প্রসঙ্গ *

আমেরিকার শিশিরচন্দ্র ৫'০০	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বুক এণ্ড বুক
কবি তরু দত্ত ২'৫০	রাজকুমার মুখো: এশিয়া পাবলিশিং
কবি মোহিতলাল ৫'৫০	হরনাথ পাল এস ক্যানারি
ক্রিকেটের রাজকুমার ২'৫০	খেলোয়াড় আই এ পি
খুঁট ২'৫০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী
যে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ৫'৫০	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় আই এ পি
জর্জ বার্নার্ড শ ৮'৫০	ভবানী মুখো: বেঙ্গল পাবলিশার্স
দেশবন্ধু স্মৃতি ১০'০০	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শ্রীগুরু
বরপীঠ ৫'০০	যোগেশচন্দ্র বাগল এ মুখার্জি
বিভূতিভূষণ ৫'০০	চিত্তরঞ্জন ঘোষ বিশ্ব শতাব্দী
বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প ৩'০০	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বুকল্যাণ্ড
ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র ২'৫০	যোগেন্দ্রনাথ সরকার মিত্রালয়
ভগিনী নিবেদিতা ৭'৫০	প্রত্নাজিকা মুক্তিপ্রাণা উষোখন
ভারত পশ্চিক রামমোহন ৩'০০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী
মহবি দেবেন্দ্রনাথ ৪'৫০	মণি বাগচী জিজ্ঞাসা
রবীন্দ্র-জীবনকথা ৬'০০	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতী
শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য ২'২৫	সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: শিশির পাবলিশিং
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ৮'০০	স্বামী সারদেশানন্দ মডেল পাবলিশিং
সোনার আলপনা ৮'০০	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এভারেস্ট

* স্মৃতিকথা *

আমাদের শান্তিনিকেতন ৫'০০	স্বধীঃজন দাস বিশ্বভারতী
কবির সঙ্গ দক্ষিণাত্যে ২'০০	নির্মলকুমারী মহলানবিশ ডি এম
কাকোরী বড়বনের স্মৃতি ৩'০০	শ্রমখনাথ গুপ্ত শান্তি লাইব্রেরী

জীবনের বরাণাতা ৪'০০ সরলাদেবী চৌধুরাণী সাহিত্য সন্মত
শেখ বৈঠক ৩'৫০ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ডি এম
হে অতীত কথা কও ৪'০০ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীশঙ্কর

*** ভ্রমণ ও অভিযান ***

এই ভারতের পুণ্য তীর্থে ৬'০০ দেবল এ সুখার্জি
কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে ২'৫০ বিশ্বদেব বিশ্বাস প্রজ্ঞা প্রকাশনী
কান্দীর পরিক্রমা ২'০০ নলিনীকিশোর গুহ এ সুখার্জি
কৈলাস মানসের পথে ৩'৫০ অতুলচন্দ্র সাহিড়ী ডি এম
ভোতার পেরিয়ে ৪'৫০ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এম সি সরকার
তারাপীঠের একতারা ৩'৭৫ চিত্তরঞ্জন দেব প্রজ্ঞা প্রকাশনী
কুহিন মের অকলে ৩'০০ যশুধারা গুপ্ত রঞ্জন পাবলিশিং
হুস্তর মর ৩'০০ দয়বেশ লিপিকা
পশ্চিম দিগন্তে ৫'০০ ধীরেন্দ্রলাল ধর ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
ভারত তীর্থ ২'০০ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য বিচিত্রা
কুর্গের অভ্যন্তরে ৩'০০ জ্যোৎস্নাময় চৌধুরী স্বস্তিকা পাব্লিকেশন
জগনের পাড়ার পাড়ায় ৩'০০ হিমালীশ গোস্বামী আই এ পি

*** রম্যরচনা ***

ইটকুটু ৩'৫০ লীলা মজুমদার ত্রিবেণী
চেনাঘুণ ৪'০০ সৌরীন সেন আর্ট গ্যাং লেটার্স
ভাঙারের হুনিয়া ৬'০০ পশুপতি ভট্টাচার্য মিত্রালয়
দেখা অদেখা ৩'০০ পার্থ চট্টোপাধ্যায় এশিয়া পাব্লিশিং
ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর বৈঠক ২'৫০ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী শান্তি লাইব্রেরী
যদি গদি পাই ২'০০ কুমারেশ ঘোষ রঞ্জন পাব্লিশিং
যান্ত্রিক ২'০০ অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বেনসনস
রক্তব্যঙ্গ ৩'৭৫ রূপদর্শী ডি এম
লাবণ্যের এনাটমি ৩'০০ শিবতোষ মুখোপাধ্যায় আই এ পি
সারিধা ৪'০০ চিন্তামণি কর ত্রিবেণী
স্বপ্নতোক্তি ৩'২৫ প্রশান্ত চৌধুরী আই এ পি

*** ধর্মগ্রন্থ ***

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩'৫০ রাজমোহন নাথ প্রবর্তক
কথার কথা (৩য় ভাগ) ২'৫০ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শ্রীশঙ্কর
ভাব রত্নাকর ২'৫০ স্বামী হরানন্দ গিরি ঐ
মন ও মায়ূষ ৭'৫০ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
গাধু দর্শন ও সংপ্রসঙ্গ ৫'০০ গোপীনাথ কবিরাজ প্রাচী পাব্লিকেশন

*** সঙ্গীত ও নৃত্য ***

প্রাচীন নৃত্য ও নাট্য ৩'০০ শান্তিদেব ঘোষ আই এ পি
তবলা বিজ্ঞান ও বাণী
(২য় ভাগ) ২'২৫ রবীন্দ্রকুমার বসু ডি এম
ভারতীয় বাস্তবতা ও বঙ্গসাধক ৩'৫০ জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ঐ

*** দর্শন ***

চাৰ্বাক দর্শন ৫'০০ দক্ষিণায়নন শাস্ত্রী পুরোগামী প্রকাশনী
দর্শন প্রসঙ্গ ৮'০০ ইন্দুভূষণ মজুমদার আন্ততোধ বুক ষ্টল

*** প্রাচীন সাহিত্য ***

অনুভূতের উপাখ্যান ৩'৫০ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রজ্ঞা প্রকাশনী
আলেখ্য দর্শন ২'৫০ হুম্মিল রায় রঞ্জন পাব্লিশিং

*** ইতিহাস ***

উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল ৩'০০ ভোলা চট্টোপাধ্যায় আই এ পি
ওম মনিপত্রে হুম ৩'০০ ধর্গেন দে সরকার অভিজিৎ
প্রাচীন মিশর ৫'৫০ শচীন্দ্রনাথ চট্টো: এম সি সরকার
রুশ দেশের ইতিহাস ১২'৫০ স্ববি দাস ক্যালকাটা পাব্লিশার্স

*** নানা নিবন্ধ ***

আজ ও আগামীকাল ২'৫০ সুব্রতেশ ঘোষ শান্তি লাইব্রেরী
উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে
বিদ্রোহের চিত্র ৩'০০ সুকুমার মিত্র এভারেস্ট
কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে ২'২৫ মীহার চক্রবর্তী বেঙ্গল পাব্লিশার্স
কৃষি ও সমস্যা ৩'৫০ নিরঞ্জন হালদার রেনেসাঁস পাব্লিশার্স
প্রহাগার বিজ্ঞান ১০'০০ সুবোধ মুখোপাধ্যায় ডি এম
চিত্রদর্শন ২৫'০০ কানাই সামন্ত বিজ্ঞানদর
নাটক লেখার মূলমন্ত্র ৫'০০ সাধনকুমার ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা
পশ্চিম দিগন্ত ২'০০ নির্মল চট্টোপাধ্যায় কল্যাণ প্রকাশনী
বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান ৫'৫০ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
মনোবিজ্ঞান ১০'০০ ইন্দুভূষণ মজুমদার আন্ততোধ বুক ষ্টল
মনোবিজ্ঞা ও দৈনন্দিন জীবন ২'৫০ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন জিজ্ঞাসা
মানব বিকাশের ধারা ১২'০০ প্রফুল্ল চক্রবর্তী বিজ্ঞানদর
মাহুকের ঠিকানা ৫'০০ অমল দাশগুপ্ত নতুন সাহিত্য
শিক্ষা বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব ৫'০০ অক্ষয় ঘোষ এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজ
শিল্পদর্শনের ভূমিকা ২'০০ শুভেন্দু ঘোষ চিত্রালোক
স্থাপত্যশিল্পের ভূমিকা ৪'০০ মনোমোহন গঙ্গো: পুরোগামী প্রকাশনী
স্বাধীনতার পথে প্রাচ্য জগৎ ২'৫০ অনিলা দাশগুপ্ত বিজ্ঞানদর

*** অনুবাদ ***

করণা করো না
(ষ্ট্রাইক আইগ) ৬'০০ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নব ভারতী
জানি টু দি সেণ্টার অব দি আর্থ
(জুলে ভান') ২'০০ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় অত্যাধর
ক্রৈলার আইল্যাণ্ড
(ডিভেনসন) ২'০০ মণীন্দ্র দত্ত তুলি-কনম
থেরেসা (এমিল জোলা) ৫'০০ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল রীডার্স কন'র
হুশ্চিন্তাহীন নবীন জীবন
(ডেল কানে'গি) ৫'৫০ হিমালীশ গোস্বামী প্রজ্ঞা প্রকাশনী
ধীর প্রবাহিনী ডন
(শলোথড) ১'০০ অবন্তী সান্তাল সান্তাল বুক এজেন্সী
নবম তরঙ্গ
(ইলিয়া এরেনবুর্গ) ৬'০০ সত্য গুপ্ত ঐ
নিশা শওকত ওসমান ও
(পাবেল লুকনিৎস্কী) ৭'৫০ পার্থকুমার রায় স্যাডিকাল
নিবেদিতা (লিজেল রেম') ৭'৫০ নারায়ণী দেবী উমাচল প্রকাশনী
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ (সংকলন)
(১ম ভাগ, ১ম খণ্ড) ৭'০০ এম সি সরকার
প্রতিপত্তি ও বঙ্গলাভ
(ডেল কানে'গি) ৪'৫০ হিমালীশ গোস্বামী প্রজ্ঞা প্রকাশনী

শ্রীমতী আর্ডের (তরু দত্ত) পৃষ্ঠীক্ষনাথ মুখোঃ মিত্র ও ঘোষ
সেই পুরাতন কথা (ইতিহাস
গনচারণ) (১ম খণ্ড) ৩'৫০ অশোক গুহ পপুলার লাইব্রেরী
* সংকলন *

অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন ৪'০০ অভূদয়
উনবিংশ শতাব্দীর শ্রীকুমার বন্দ্যোঃ ও
গীতি-কবিতা সংকলন : ২'০০ অরুণকুমার মুখোঃ মণ্ডান বুক এজেন্সী
প্রেমের গল্প ৪'০০ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত
প্রেমের গল্প ৪'০০ অনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
প্রেমের গল্প ৪'০০ তারামঙ্গল বন্দ্যোঃ ঐ
প্রেমের গল্প ৪'০০ শৈলজানন্দ মুখোঃ ঐ
প্রেমের গল্প ৪'০০ প্রতিভা বসু গ্রন্থম্
রমেশ বস্নাবলী ১'০০ রমেশচন্দ্র দত্ত সাহিত্য সংসদ
রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধ সংকলন ৫'০০ নিখিল সেন সম্পাদিত
সবস গল্প ৮'৫০ এভারেট বুক হাউস
সিদ্ধুর স্বাদ ৭'০০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সংকলিত নতুন সাহিত্য
প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত
স্মৃতি প্রকাশনী
অনির্বাচিত গল্প ৪'০০ ভগদীশ গুপ্ত আই এ পি
অনির্বাচিত গল্প ৫'০০ সজনীকান্ত দাস গ্রন্থম্
ভাষার বছরের অবন্তী সান্যাল
প্রেমের কবিতা ৮'০০ সম্পাদিত নতুন সাহিত্য
হাসির গল্প ৫'০০ অসমগ্র মুখোঃ ক্যালকাটা পাব্লিশার্স

* নাটক *

অজার ৩'২৫ উৎপল দত্ত পপুলার লাইব্রেরী
অসমাপ্ত ১'০০ বিমল বাব রাইটার্স কন'র
এক মুঠো আকাশ ২'০০ ধনঞ্জয় বৈবাগী গ্রন্থম্
কালাহাসির পালা ২'৫০ বিধায়ক ভট্টাচার্য
ভাতীয় সাহিত্য পরিষদ
গোত্রান্তর ২'৫০ বিজন ভট্টাচার্য ঐ
চোরাবালি ২'০০ কিরণ মৈত্র সিটি বুক এজেন্সী
জল ২'৫০ উমানাথ ভট্টাচার্য কথকতা
টোপ ও টোপের ২'০০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোঃ এম সি সরকার
ডাকবাংলো (মনোজ বসু) ২'২৫ দেবনারায়ণ গুপ্ত বেঙ্গল পাব্লিশার্স
দিশারী ২'০০ সলিল সেন ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
মকুর তারা ৩'২৫ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত গ্রন্থম্
ককিদের পাখর ও নাট্যগুচ্ছ ২'৫০ ময়ূখ বাব অটোপ্রিণ্ট এণ্ড পাব্লিশিটি
বারো ভূতে ১'৫০ নারায়ণ গঙ্গোঃ ভাতীয় সাহিত্য পরিষদ
নিখিলিপি ২'০০ গজেন্দ্রকুমার মিত্র মিত্র ও ঘোষ
রজনীগন্ধা ২'২৫ ধনঞ্জয় বৈবাগী আই এ পি
শ্ৰীট বেগার ২'২৫ ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ডি এম

* গল্পগ্রন্থ *

অনুসন্ধান ৩'০০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোঃ বিভূতি প্রকাশন
অনুসন্ধান ৩'০০ সুধীরঙ্গন মুখোপাধ্যায় ত্রিবেণী
চমৎকারী ইত্যাদি গল্প ৩'০০ পরশুরাম এম সি সরকার
চিরঞ্জিবি ৩'০০ সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ নাটকানা

দেওয়াল-লিপি ২'৫০
নগরঙ্গী ৩'০০
নায়ক-নারিকা ২'৫০
নীলাঞ্জন ছায়া ৩'০০
পঞ্চীমহল ৪'০০
পত্রলেখার বাবা ৪'০০
পূর্বতনী ২'৫০
প্রথম পুরুষ ৩'০০
প্রেমই ধ্বংসকারী ২'৫০
ফাশন ৩'০০
বাঘের চোখ ২'৫০
ভালবাসার ইতিকথা ২'৫০
মন মানে না ৩'৭৫
মনের মানুষ ৩'০০
যুক্তবন্ধ ৩'০০
মুখোমুখি ২'৫০
রূপতরঙ্গিমা ২'৫০
রূপমতী ২'৫০
রূপসীর মন ৩'০০
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫'০০
সায়ন্তনী ৩'০০
সুধাময় ৩'০০
স্বাহ স্বাহ পদে পদে ২'৭৫

সমবেশ বসু
প্রবোধকুমার সান্যাল বেঙ্গল পাব্লিশার্স
বিমল দত্ত বিমল পাব্লিশিং
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিবেণী
আশাপূর্ণা দেবী ত্রিবেণী
সতীনাথ ভাট্টাচাঁ বেঙ্গল পাব্লিশার্স
নরেন্দ্রনাথ মিত্র সয়ন্তনী প্রকাশন
বিমল মিত্র ইষ্টলাইট বুক হাউস
প্রেমেন্দ্র মিত্র নিউ ফ্রন্টি
ভাঙ্কর আই এ পি
লীলা মজুমদার গ্রন্থম্
শিবরাম চক্রবর্তী গ্রন্থম্
গৌরাকিশোর ঘোষ ত্রিবেণী
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
রমাপদ চৌধুরী বেঙ্গল পাব্লিশার্স
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোঃ পুস্তক প্রকাশক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র ক্যালকাটা
পাব্লিশার্স
নারায়ণ গঙ্গোঃ বসু সাহিত্য সংসদ
প্রফুল্ল বাব এভারেট বুক হাউস
চাকচাক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থম্
সুবোধ ঘোষ কারেট বুক শপ
বিমল কর এভারেট
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ত্রিবেণী

* উপন্যাস *

অগ্নিসাক্ষী ৩'৫০
অগ্রীধর ৪'৫০
অজানিতার চিঠি ৩'০০
অনিকেতা ৫'০০
অনুবর্ষ ৫'৫০
অজ্ঞ কোন খানে ৫'৫০
অবরোধন ২'৫০
অভিষেক ৫'৭৫
অগ্নি অন্ধনে ৩'০০
অশনি সঙ্কেত ৪'৫০
আকাশ লিপি ৪'০০
আধি বিহঙ্গ ৩'০০
আমি বড় হব ৩'৫০
উত্তর মৌসুম ৩'০০
উপকর্ষ ৪'০০
এই পৃথিবী পাহনিবাস ৫'০০
এই প্রেম ৪'০০
একান্ত আপন ৪'০০
একটুকু আশা ৩'০০
প্রবোধকুমার সান্যাল ত্রিবেণী
বনফুল ডি এম
বিধায়ক ভট্টাচার্য গ্রন্থম্
মিহির আচার্য ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
নিকপমা দেবী মিত্র ও ঘোষ
সৌরীন সেন রাইটার্স সিগ্নিফিকেন্ট
কগাদ গুপ্ত কথা সাহিত্য মন্দির
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় আই এ পি
সুবোধকুমার চক্রবর্তী মাসিক প্রেস
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোঃ বিভূতি প্রকাশন
গজেন্দ্রকুমার মিত্র ত্রিবেণী
উত্তম পুরুষ তুলি-কলম
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ডি এম
অগ্নি মিত্র ইণ্ডিয়ানা
প্রবোধকুমার অধিকারী এভারেট
বুক হাউস
রমাপদ চৌধুরী ডি এম
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ডি এম
স্বভাব বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিবেণী
স্বাধীনতা ভট্টাচার্য কল্পনা প্রকাশনী

কনক দীপ ৩'০০
 কতালয় ২'৫০
 খোয়াই ৩'০০
 পাঞ্চর্য ৩'৫০
 গ্রন্থসারথি ৬'০০
 শ্রীস্বরাস ২'৭৫
 কলকয়ল ৩'০০
 কলকয়ল ৭'০০
 কলপ্রপাত ২'৭৫
 ভাগনের নিঃশাস ২'৫০
 ভয়ক রোধিবে কে ৬'০০
 তিন গ্রন্থ ৪'০০
 ভীরভূমি ৪'৫০
 ছই পৃথিবীর মাঝের দেশ ৬'৫০
 নাগিনী যুদ্ধা ৩'৫০
 নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ২'৫০
 নির্বাস ৩'৫০
 নীলাঞ্জনের খাতা ৪'০০
 নোনা জল মিঠে মাটি ৮'৫০
 পদ্মপাতায় জল ২'০০
 পরমলগনে ৪'৫০
 পলিমাটি নোনা জল ২'২৫
 পূর্বের আকাশ ২'৫০
 প্রথম প্রণয় ৩'০০
 প্রাক্তন ৪'৫০
 পিয়াললতা ২'৫০
 কবিতা ৪'০০
 বসন্ত সজিনী ২'৫০
 বিকালের রঙ ২'৫০
 বিদ্যুৎ ২'৫০
 বেলাব গী মহানদী ৩'৫০
 মধুরাই ২'৫০
 মনামী ৪'০০
 মাহুৎ গড়ার কাহিনী ৫'৫০
 মুখের রেখা ৫'০০
 মেঘে ঢাকা ভাষা ৪'৫০
 রাজপুতানী ৩'৫০
 রাজমহল ২'৭৫
 রাজা ও মালিনী ৩'০০
 রাণীবো ৪'০০
 রাণীর বাজার ৩'০০
 রিকশার গান ৫'০০
 রূপচাঁদ পক্ষী ৩'০০
 লালদীঘির উপকথা ৩'০০
 কলসম্বা ৫'০০

আশাপূর্ণা দেবী রাইটার্স সিণ্ডিকেট
 উদ্যোগী সরস্বতী আধুনিক
 সাহিত্য ভবন
 বিমল কর মিত্র ও যোষ
 সত্যপ্রিয় যোষ আই এ পি
 সুশীলকুমার যোষ শতাব্দী গ্রন্থ ভবন
 জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ত্রিবেণী
 সুবোধ যোষ বিশ্বাস পাব্লিশিং
 সুশীল যোষ জ্ঞানদাল পাব্লিশিং
 নরেন্দ্রনাথ মিত্র আই এ পি
 প্রেমেন্দ্র মিত্র গ্রন্থম্
 দিলীপকুমার রায় গ্রন্থম্
 সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নিও লিট
 শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিবেণী
 বিশ্ব বন্দ্যো: বেঙ্গল পাব্লিশিং
 অমরেন্দ্র যোষ বিজ্ঞানদয়
 রমেশচন্দ্র সেন শতাব্দী গ্রন্থ ভবন
 অমিয়ভূষণ মজুমদার নিও লিট
 বুদ্ধদেব বসু বেঙ্গল পাব্লিশিং
 প্রফুল্ল রায় গুরুদাস
 শংকর নিউ এজ
 আনন্দকিশোর মুন্সী বর্তিক
 যজ্ঞেশ্বর রায় কারেন্ট বুক শপ
 অমিনাশ সাগা ভারতী লাইব্রেরী
 বিক্রমাদিত্য ত্রিবেণী
 বরেন বসু সাধারণ পাব্লিশিং
 সঞ্জয় ভট্টাচার্য নবভারতী
 দীপক চৌধুরী নাজানা
 শচীন্দ্রনাথ মিত্র পুস্তক
 আনন্দ বাগচী বিহার সাহিত্য ভবন
 নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিপিকা
 বিনয় চৌধুরী এম সি সরকার
 ধনঞ্জয় বৈরাগী গ্রন্থম্
 মারায়ণ সাত্তাল বেঙ্গল পাব্লিশিং
 মনোজ বসু বেঙ্গল পাব্লিশিং
 সত্যোদয়কুমার যোষ ত্রিবেণী
 শক্তিপদ রাজগুরু সাহিত্য জগৎ
 বিমল মিত্র ডি এম
 নীলিমা দাশগুপ্ত
 এস ব্যানার্জি এণ্ড কোং
 বারীন্দ্রনাথ দাশ বেঙ্গল পাব্লিশিং
 প্রাণতোষ ঘটক ডি এম
 সমরেশ বসু বিশ্ব শতাব্দী
 বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আই এ পি
 পঙ্কজর ভট্টাচার্য পুরোগামী প্রকাশনী
 অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ানা
 সরোজকুমার রায়চৌধুরী ত্রিবেণী

সমুদ্র স্রব ৪'০০
 সপ্তমিরা ৩'০০
 সাগরনগর ৩'৫০
 সাত পাকে বাঁধা ৪'৫০
 সামান্য কতি ২'০০
 সাজা ৩'০০
 সিন্দু বারোয়ী ৩'০০
 স্মরণচিহ্ন ৫'০০
 অধিতীয় ঘনাদা ২'৭৫
 আজব টাকা ৫'০০
 আমাদের নেত্রক ২'৫০
 এক যে ছিল রাজা ৩'৫০
 গোয়েন্দা ভূত ও মানুষ ২'০০
 গ্রীক পুরাণের গল্প ৪'০০
 চাইবুড়োর পুঁথি ৩'০০
 চাঁদের দেশে ১'২৫
 চুলচেরা শোধবোধ ২'০০
 ছবিতে মহাভারত ১'৭৫
 ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন ২'৫০
 ডাইনীরা ১'৫০
 পথ চলি আনন্দে ২'০০
 পাতালপুরীর কাহিনী ৩'০০
 বাবুমাঝার গল্প ১'২৫
 বহোদীঘির রায় বাড়ি ২'৫০
 বীরসিংহের সিংহশিঙ ২'৫০
 বেলায় রাজার দেশে ১'০০
 ভূতের পাঁচালী ২'৫০
 মনের মত বই ২'২৫
 মরমসিংহ গীতিকার গল্প ১'৬০
 মাঝির হেলে ২'৫০
 মৌমাছির ছোটদের
 শ্রেষ্ঠ গল্প ২'০০
 বাহুপুরী ৩'২৫
 রাজা নয় রাণী নয় ১'৬০
 কল দেশের উপকথা ২'২৫
 লাল নীল দেশলাই ৩'০০
 শুধু হাসির গল্প (সংকলন) ৫'০০
 শ্রামলা দীঘির
 ইশান কোণে ২'৫০
 শপনবুড়োর
 কৌতুক কাহিনী ৩'০০
 হাওয়ার ৩'০০

প্রতিভা বহু নাজানা
 শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আই এ পি
 কুমারেশ যোষ বেঙ্গল পাব্লিশিং
 আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মিত্র ও যোষ
 অমল্য চক্রবর্তী দিলারী
 বুদ্ধদেব বসু গ্রন্থম্
 দিব্যেন্দু পালিত আভেনির
 সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ডি এম
 * ছোটদের সাহিত্য *
 প্রেমেন্দ্র মিত্র আই এ পি
 শ্রামাপদ আচার্য কল্লোল প্রকাশনী
 নিখিল সেন শিশুসাহিত্য সংঘ
 অমিয়কুমার চক্রবর্তী ও
 শ্রামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত অভ্যুদয়
 হেমেন্দ্র রায় আই এ পি
 নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অভ্যুদয়
 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আই এ পি
 কার্তিক বন্দ্যো: বেঙ্গল পাব্লিশিং
 শিবরাম চক্রবর্তী আই এ পি
 পূর্ণেন্দ্র চক্রবর্তী সাহিত্য সংসদ
 মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও
 প্রভাত বসু সংকলিত ঐ
 অমলেন্দু ভট্টাচার্য এ পি
 মহাশেতা ভট্টাচার্য পুস্তক
 খগেন্দ্রনাথ মিত্র বিজ্ঞানদয়
 সুকুমার দে সরকার অভ্যুদয়
 ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ঐ
 নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
 ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
 শৈল চক্রবর্তী অভ্যুদয়
 জানেন্দ্রনাথ চৌধুরী শান্তি লাইব্রেরী
 ধীরেন্দ্রলাল ধর ক্যালকাটা পাব্লিশিং
 বামিনীকান্ত সিং শান্তি লাইব্রেরী
 বানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আই এ পি
 মৌমাছি অভ্যুদয়
 যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
 ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
 আশাপূর্ণা দেবী এ পি
 অক্ষয় যোষ ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
 লীলা মজুমদার আর্ট ইউনিয়ন
 বিশ্বনাথ দে আই এ পি
 শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য সংসদ
 শপনবুড়ো
 শপনবুড়ো
 বিজ্ঞানদয়
 আই এ পি

শীর্ষ-সম্মেলনের ভরাডুবা—

শীর্ষ সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে না, এই আশঙ্কা বোধহয় প্রায় সকলেই করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ইউ—২-র ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া সূচনাতেই শীর্ষ-সম্মেলনের ভরাডুবা হইবে, ইহা বোধহয় কেহই কল্পনাও করিতে পারেন নাই। মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ইউ—২কে ভূপাতিত করার পঞ্চম দিবসে মঃ ক্রুশেভ যখন সর্বপ্রথম ঐ ঘটনাটির কথা সুরীম সোভিয়েটে ঘোষণা করেন তখন তিনি অবশ্য বলিয়াছিলেন যে, 'এইরূপ ঘটনার ফলে বিশ্বযুদ্ধ বাধিতে পারে। এইরূপ ঘটনাকে শীর্ষ-সম্মেলনের প্রস্তুতি বলিয়া গণ্য করা যায় না।' মঃ ক্রুশেভ সর্বপ্রথম সোভিয়েট জনগণকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই উক্তি হইতে সস্তিবাচনেই শীর্ষ-সম্মেলনের বিসর্জন হইবে, ইহা অস্বাভাবিক করা সম্ভব ছিল না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের শাস্তি প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই, রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ একথাও তাঁহার বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকামী শক্তিসমূহ শীর্ষ-সম্মেলনের বিস্মৃতির চেষ্টা করিতেছে। এই গোয়েন্দা বিমানটিকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্ত প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পাঠাইয়াছেন, মঃ ক্রুশেভ তাহা বিখ্যাস করিতে চাহেন নাই। তবু শীর্ষ-সম্মেলন আরম্ভ হইতে পারিল না কেন?

শীর্ষ সম্মেলন সত্যই আরম্ভ হইয়াছিল কি না, তাহাও একটা তর্কের বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। শীর্ষ-সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার সম্পর্কে যে সংবাদ আমরা পাইয়াছি তাহাতে প্রকাশ, নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে বেলা ১১টার সময় (ভারতীয় সময় বৈকাল সাড়ে তিনটায়) উদ্ভেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ প্রেসিডেন্ট জগল এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের উপস্থিতিতেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইতে সম্মত না হওয়ার সম্মেলনের উদ্বোধন এক ঘটনার জন্ত স্থগিত রাখা হয়। সম্মেলনের সূচনাতেই মঃ ক্রুশেভ বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার উপর গুপ্তচর বিমান প্রেরণ বন্ধ না করিলে শীর্ষ-সম্মেলন ছয় হইতে আট মাস স্থগিত রাখিতে হইবে। জুন মাসে রাশিয়া পরিদর্শনের জন্ত প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল তাহাও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিন ঘণ্টা চলার পর সম্মেলন অনির্দিষ্ট কালের জন্ত স্থলভূবা থাকে। মঃ ক্রুশেভ অস্তিত্ব রাষ্ট্রপ্রধানদের সহিত কর্মসূচন না করিয়াই সম্মেলন ত্যাগ করেন। সূত্রানুযায়ী শীর্ষ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল একথা বলিতে বাধা নাই। কিন্তু মঃ ক্রুশেভ মনে করেন যে, শীর্ষ-সম্মেলন আরম্ভ হইবে না। ঐদিন প্রথম যে অধিবেশন হয় তাহাতে বহু উপদেষ্টা প্রতিনিধিদল এবং বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত ছিলেন। মঃ ক্রুশেভের মতে শীর্ষ-সম্মেলন অসম্পূর্ণ হইতে পারে কিনা তাহাই নির্ধারণের জন্ত উহা প্রাথমিক সম্মেলন ছাড়া আর কিছুই নয়। শীর্ষ সম্মেলন সত্যই আরম্ভ হইয়াছিল কি না, এই প্রশ্নের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। সম্মেলন যদি আরম্ভ না হইয়া থাকে তবে কেন আরম্ভ হয় নাই, আর যদি সম্মেলন আরম্ভ হইয়াও থাকে তবে সূচনাতেই উহার



শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ভরাডুবা হইল কেন, ইহা-ই-সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শীর্ষ-সম্মেলনের ভরাডুবা হওয়ার পরিণতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে, ইহা-ও বিশেষ ভাবে বিবেচনায় বিষয়।

১৭ই মে (১৯৬০) রাতে পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রনায়কত্ব যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভের মনোভাবকেই সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্ত দায়ী করা হইয়াছে। কিন্তু মঃ ক্রুশেভ যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার কারণ কি? তিন বৎসর ধরিয়া যে শীর্ষ-সম্মেলনের জন্ত মঃ ক্রুশেভ আশ্রয় চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন সেই শীর্ষ-সম্মেলন হওয়ার সুযোগ যখন উপস্থিত হইল তখন তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনি উহাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন কেন, তাহা সত্যই ভাবিয়া দেখার বিষয়। মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ইউ—২-র ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া মঃ ক্রুশেভ শীর্ষ-সম্মেলন বাতিল করিয়া দিলেন, এইরূপ মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন যে, মার্কিন গুপ্তচর বিমানকে ভূপাতিত করিবার অনেক পূর্বেই মঃ ক্রুশেভের মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। বাহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহারা গত এপ্রিল মাস (১৯৬০) বাকুতে প্রথম মঃ ক্রুশেভের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ঐ বক্তৃতায় তিনি ১৯৫৮ সালের নবেম্বর মাসের চরমপত্রের নীতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মঃ ক্রুশেভ তাঁহার উপস্থিত শীর্ষ-সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াও উহা ব্যর্থ করিয়া দিলেন কেন, অনেকের কাছে তাহা দুর্বোধ্য মনে হইলেও বিশ্বাসের বিষয় হয় না। তাঁহার নিজের আকাঙ্ক্ষিত শীর্ষ-সম্মেলন তিনি নিজেই কোন ব্যর্থ করিয়া দিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে রাশিয়া মার্কিন-গোয়েন্দা বিমানকে ভূপাতিত করার পরবর্তী ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বস্তুতঃ মার্কিন গোয়েন্দা বিমান সম্পর্কে মার্কিন-প্রেসিডেন্ট এবং এডমিনিস্ট্রেশন যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাদ দিয়া সূচনাতেই শীর্ষ-সম্মেলনের ভরাডুবা হওয়ার কারণের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।

মার্কিন গোয়েন্দা বিমান প্রসঙ্গে—

পৃথিবীর ইতিহাসে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুপ্তচর বৃত্তিট যে সর্বমুখ্য নয়, ইহা আমরা যেমন জানি তেমনি রাশিয়াও জানে

প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজের স্বার্থে অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ তথ্যাদি, বিশেষ করিয়া সামরিক তথ্যাদি জানিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া থাকে। রাশিয়া যে ইহার ব্যতিক্রম তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। গুপ্তচর-বৃত্তিটাকে আমরা সকলেই যুগার চক্ষে দেখি এ কথা সত্য হইলেও নিজের জীবনকে বিপন্নাপন্ন করিয়া বাহারা নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থে অন্য রাষ্ট্রের গোপন তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য গোরেন্কাগিরি করে নিজের রাষ্ট্রে তাহার দেশপ্রেমিক বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। অন্য রাষ্ট্রে গুপ্তচরের কাজ করিতে বাইয়া ধরাপড়ার দৃষ্টান্ত শুধু মার্কিন ইউ-২ বিমানই প্রথম, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। সাধারণতঃ কোন রাষ্ট্রেই অন্যদেশে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য ধরা পড়িলে সেই গুপ্তচরের কার্যাবলীকে প্রকাশে সমর্থন করে না। কিন্তু ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়িত্ব অস্বীকার করেন নাই, বরং সমর্থনই করিয়াছেন, যদিও প্রথমে উহার গুপ্তচর বৃত্তির কথা অস্বীকার করিবার চেষ্টাই করা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত মার্কিন সরকার চাপে পড়িয়া উহার গোয়েন্দাগিরির কথা স্বীকারই শুধু করেন নাই এই ধরনের গোয়েন্দাগিরির সমর্থন করিয়া যুক্তি ও প্রদর্শন করিয়াছেন। এই যুক্তি সম্পর্ক আলোচনা করিবার পূর্বে ভূপাতিত মার্কিন ইউ-২ বিমান সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্তব্য যে ক্রমাতিব্যক্তি দৃষ্ট হয় ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মার্কিন ইউ-২ বিমানখানি রাশিয়ায় ভূপাতিত করা হয় যে দিবসে অর্থাৎ ১লা মে তারিখে। কিন্তু চারি দিন পর্যন্ত রাশিয়া সম্পর্কে নীরব ছিল। পঞ্চম দিবসে রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ সোভিয়েটে মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করার কথা প্রকাশ করেন। যে দেশের গোয়েন্দা বিমান সে দেশকে না জানাইয়া টিকীর ভাবে সোভিয়েটে উগা প্রকাশ করার আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরির কোন বিধান থাকিলে তাহা লঙ্ঘন করা হইয়াছে হইবে, সে সম্পর্কে আমাদের পক্ষে কোন কথা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু হা লঙ্ঘ্য করার বিষয় যে, যে-বিমান গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হইল তাহার পাইলট জীবিত আছে কি না সোভিয়েটে মঃ ক্রুশেভের ৫ই মে তারিখের বিবৃতিতে সে সম্বন্ধে কোন কথা নাই। এই নীরবতা যে রুশ প্রধান মন্ত্রীর একটা কূটনৈতিক চাল এ কথা স্বীকার করা যায় না। এই এক চালেই যে তিনি বাস্তবিক বিবৃতিতে ইগা মনে করিলে খুব বেশী ভুল বলা হইবে না। মঃ ক্রুশেভের ঘোষণার পর হোরাইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারী জেমস গার্সি যে ইস্তাহার প্রচার করেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্টের নির্দেশে এ সম্পর্কে সকল দিক হইতে তদন্ত করা হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিবৃতি বা ইস্তাহার বেরণ হওয়া উচিত না হইতে ভিন্ন রূপ হয় নাই। কিন্তু ঐ ৫ই মে তারিখে প্রদত্ত মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস অফিসারের বিবৃতিটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই বিবৃতিতে রাশিয়ার ভূপাতিত বিমানখানিকে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য-সন্ধানী নিয়ন্ত্র ইউ-২ বিমান বলিয়া স্বীকার একটা চেষ্টা দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ-সংস্থা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে ৩রা মে তারিখে জানান যে, ১লা মে হইতে উক্ত বিমানখানির কোন সন্ধান পাওয়া বাইতেছে না। উহার খাঁটি ছিল তুবকের আভ্যন্তর, উহার চালক ছিল একজন অনামরিক ব্যক্তি এবং উহাকে একটি উক্ত

পরীক্ষাগার বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ইহা খুব সম্ভব যে, অজ্ঞান সন্নবরাহকারী একটি বিকল হইয়া বাওয়ার ফলে বিমান চালক অচেতন হইয়া পড়েন। ইহার পর স্বয়ংক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা সাহায্যে উহা বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয় এবং ঘটনাচক্রে আকস্মিক ভাবে সোভিয়েটের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করে। মঃ ক্রুশেভ তাহার প্রথম বক্তৃতায় ভূপাতিত বিমানখানি সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ চাপিয়া বাওয়ার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এবং জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা বোধ হয় এই ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন যে, বিমান চালক জীবিত নাই এবং বিমানখানি এমন ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে যে উহার যন্ত্রপাতির কোন অস্তিত্ব নাই এবং থাকিলেও ঐগুলিকে চিনিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। এইরূপ ধারণাই যে এই ধরনের বিবৃতির মূল তাহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। ইহার পর ৭ই মে তারিখে সোভিয়েটে মঃ ক্রুশেভের বক্তৃতাতেই হইল প্রথম আকস্মিক বক্তৃতা।

গত ৬ই মে (১৯৬০) সোভিয়েটের যুক্ত অধিবেশনে মার্সাল প্রেসকো-ঘোষণা করেন যে, একটি রকেট চালিত ক্রেশপাণ্ডের প্রথম আঘাতেই সোভিয়েটের আকাশ-সীমা লঙ্ঘনকারী মার্কিন বিমান ভূপাতিত হয়। ইহার পরদিন অর্থাৎ ৭ই মে তারিখে মঃ ক্রুশেভ সোভিয়েটে চাকলায়কর তথ্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, গত ১লা মে রাশিয়ার আকাশে গুলী করিয়া যে মার্কিন বিমান ভূপাতিত করা হয় তাহার চালক ফালিস পাওয়ার্স জীবিত এবং সোভিয়েটের হাতে ক'নী। ধরা না দিয়া আত্মহত্যা করিবার যে নির্দেশ তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল সে নির্দেশ প্রতিপালন না করিয়া সে প্যারিস হটেবোগে নামিয়া পড়ে। আত্মহত্যা করিবার জন্য তাহার সঙ্গে প'ব দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সে ব্যবহার করে নাই। সে যদি ইজেক্টর সীট (ejector seat) ব্যবহার করিত তাহা হইলে সমগ্র বিমান খানিই বিক্ষারিত ও বিধ্বস্ত হইয়া বাইত। কিন্তু সে তাহাও করে নাই। মঃ ক্রুশেভ পাইলটের স্বীকারভুক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, বিমানখানি ভূপাতিত হইতে পাকিস্তানের পেশোয়ারে যায়। সেখানে বিমান চালক তিন দিন টিকিল এবং ঐস্থান হইতে কাভাকস্থানের উপর দিয়া বাইরা ভারতভূমি গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূপাতিত হয়। মারমানক ও আর্কেঞ্জেল হইয়া নয়ওয়ের বৃন্দে নামক স্থানে বিমানটির অবতরণ করার কথা ছিল। পাইলট ইজেক্টর যন্ত্র সাহায্যে অবতরণ না করিয়া প্যারাপুর্টে অবতরণ করার প্রমাণিত হয় যে, তাহার অজ্ঞানের অস্তর ঘটে নাই। পাইলটের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলেন যে, সরকারী ভাবে তাহার কাজ ছিল আবহাওয়ার সংবাদ সংগ্রহ, কিন্তু গুপ্তচরের কাজ করাই ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিমানখানিকে রাশিয়ার সাড়ে বার শত মাইল অভ্যন্তরে ভূপাতিত করা হয়। উহার পূর্বে পাইলট বহু সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের কটো গ্রহণ করিয়াছিল। বিমানের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েটে ক্রেশপাণ্ড ও রাস্তার প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা। মঃ ক্রুশেভ আরও বলেন যে, বিমানখানি যন্ত্রপাতি সমন্বিত অত্যন্ত খাঁটি একটি পর্যাবেকক বিমান। এই বিমানের ধ্বংসোপশেষ সাংবাদিকদিগকেও দেখানো হইয়াছে।

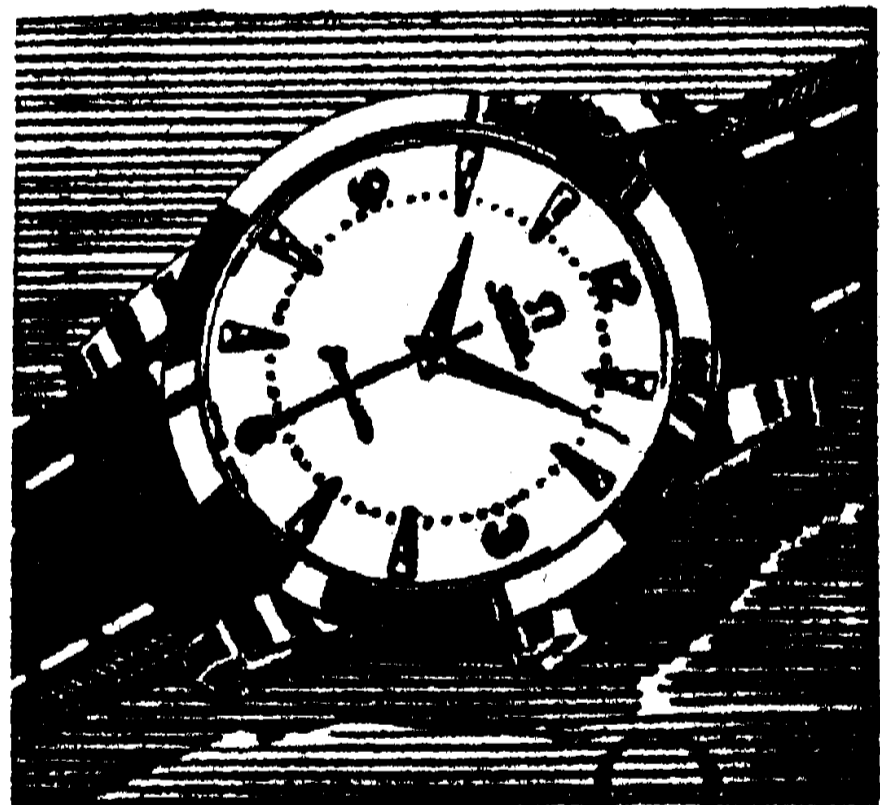
মঃ ক্রুশেভের দ্বিতীয় বক্তৃতা সমগ্র বিশ্বে শুধু চাকলাই কর্তি

করে নাই, মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রকেও বেশ বেকারদার কেলিয়াছিল। রাশিয়ার ভূপাতিত মার্কিং বিমানটি যে নিরীহ আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী বিমান নয় সে-সম্পর্কে মঃ ক্রুশেভের উপস্থাপিত অস্বাভাবিক তথ্যাদি মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও আর স্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। ১ই মে তারিখেই মার্কিং পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যে তদন্তের আদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, লৌহ বনিকার অন্তরালে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকার একখানি বিমান 'সম্ভবতঃ' সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর উড়িয়া গিয়াছিল। উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই বিবৃতির সহিত ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষ যতটা সংশ্লিষ্ট তাহাতে দেখা যায়, মঃ ক্রুশেভের বর্ণনা অস্বাভাবিক আকাশপথে এইরূপ ভ্রমণের জন্য কোন ক্ষমতা উহাকে দেওয়া হয় নাই। এই বিবৃতি হইতে দেখা যায়, ভূপাতিত বিমানখানি যে লৌহবনিকার অন্তরালে তথ্য সংগ্রহের জন্য গিয়াছিল তাহা স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ তথ্য সংগ্রহের কোন ক্ষমতা বা নির্দেশ ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষ দেন নাই। মঃ ক্রুশেভ সুপ্রীম সোভিয়েট বন্দী পাইলটের স্বীকার উক্তি উদ্ধৃত করার পর ১১ ঘণ্টা আলোচনার পর মার্কিং পররাষ্ট্র দপ্তর এই বিবৃতি দিয়াছেন। অল্পদেবে গোপনে তথ্য সংগ্রহের কার্যকলাপ কোন গবর্নমেন্টের পক্ষে স্বীকার করা যেমন এই প্রথম তেমনি ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা না পাইয়া বিমানখানি রাশিয়ার উড়িয়া গিয়াছিল একথাও বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন। তবে কেন এই ধরণের বিবৃতি দেওয়া হইল? প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের শাস্তি প্রচেষ্টা ব্যাহত করিবার জন্য স্থানীয় মার্কিং সামরিক নেতৃত্বক ওয়াশিংটন হইতে কোনরূপ নির্দেশ ছাড়াই খোলাখুলি ভাবে রাশিয়ার আকাশে গুপ্তচর বৃত্তিতে রত হইবার জন্য ঐ বিমান প্রেরণ করিয়াছিলেন, বিশ্বাসীর মনে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি করাই কি উহার উদ্দেশ্য ছিল? কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং হাটারের বিবৃতি হইতে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

গত ১ই মে (১৯৬০) মার্কিং পররাষ্ট্র সচিব মিঃ হাটার বলেন যে, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েটের বিভিন্ন সীমান্তে আকাশ হইতে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ কার্য চালাইতেছে এবং সময় সময় সোভিয়েট এলাকার ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার উপর এইরূপ গোয়েন্দাগিরির সমর্থনে মিঃ হাটার যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা খুবই অদ্ভুত। তিনি বলিয়াছেন যে, আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য যে-কোন উপায়ে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নির্দেশে নিরস্ত্র অসামরিক বিমান সমূহ আকাশ পরিক্রমা করিয়া থাকে। এই সব অসামরিক বিমান সমূহের কোন নির্দিষ্ট কার্যের জন্য প্রেসিডেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। মিঃ হাটার গোয়েন্দাগিরির সমর্থনেই শুধু যুক্তি দেন নাই তিনি এই অভিযতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনার ফলে শীর্ষ-সম্মেলনের ক্ষতি হওয়া দূরের কথা বরং আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বসম্মত ও কার্যকরী বন্ধা-ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে উহা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস বলিয়া বিশ্বাসীর নিকট প্রতিষ্ঠিত হইবে। অস্বাভাবিক সামরিক গোপন তথ্যাদি জানিবার চেষ্টা সকল রাষ্ট্রই

করিয়া থাকে। কিন্তু উহার সমর্থনে প্রকৃত এইরূপ যুক্তি ইতিপূর্বে কোন গবর্নমেন্ট দিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অতঃপর ১১ই মে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারও সোভিয়েট রাশিয়ার উপর গোয়েন্দাগিরির সমর্থনে অল্পরূপ যুক্তিই দিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন, মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র পাল হারবারের পুনরাবৃত্তি চার না বলিয়াই সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর আকাশ হইতে পর্যবেক্ষণ কার্য চালান হইয়াছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের গোপনতা এবং সেই গোপনতা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকেই তিনি উদ্ভেদনার প্রধান কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আকস্মিক আক্রমণজনিত বিপদের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে শীর্ষসম্মেলনে মঃ ক্রুশেভকে তাঁহার 'উন্মুক্ত আকাশ' প্রস্তাব গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করিবেন বলিয়া সাংবাদিকদিগকে জানান। সোভিয়েট রাশিয়ার আকাশে মার্কিং বিমানের গোয়েন্দাগিরির সমর্থনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ হাটার যে যুক্তি দিয়াছেন সোভিয়েট রাশিয়ার দিক হইতেও কি এরূপ যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে না? অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যুক্তরাষ্ট্রের যেমন আছে তেমনি আশঙ্কা আছে রাশিয়ারও। বরং অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা রাশিয়ারই বেশী। কারণ রাশিয়ার চারিদিকেই মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী স্থাপিত হইয়াছে। মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য বলিতে পারে যে, আক্রান্ত না হইলে আমেরিকা কাহাকেও আক্রমণ করিবে না, অতর্কিতে আক্রমণ তো দূরের কথা। কিন্তু একথা তো সোভিয়েট



OMEGA

Automatic SEAMASTER
Steel Case Rs. 520/-

ROY COUSIN & CO

JEWELLERS & WATCHMAKERS

4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA

OMEGA, TISSOT & COVENTRY WATCHES

রাশিয়াও বলিতে পারে। রাশিয়ার গোপনতা 'লৌহবনিকার অস্ত্রাণ' এই প্রবাদাক্যে পরিণত হইয়াছে। কথাটার মধ্যে সত্য একেবারেই নাই, একথা হয়ত বলা যায় না। রুশ বিপ্লবের পর হইতে এ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি পশ্চিমী শক্তিবর্গের আচরণ ইহার জন্ত বড় কম দায়ী নয়। তাহাড়া প্রত্যেক দেশেই সাময়িক তথ্যাদি অতি গোপনে রক্ষা করা হইয়া থাকে। দেশের লোককেও সে সত্বে জানিতে দেওয়া হয় না। এমিক দিয়া রাশিয়া নূতন কিছু করিয়াছে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের 'উন্মুক্ত আকাশের' প্রস্তাব রাশিয়া গ্রহণ করে নাই। তাই বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জোর করিয়া রাশিয়ার আকাশ উন্মুক্ত করিতে পারে না। অপর দেশের গোয়েন্দা বিমান যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উড়িয়া সোয়েন্দাগিরি করে তবে আমেরিকা তাহা সহ করিবে কি? সোয়েন্দাগিরি যে সব সময়ই প্রয়োজনামূলক, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শীর্ষ-সম্মেলনের মাত্র ১৬ দিন পূর্বে রাশিয়ার আকাশে সোয়েন্দা বিমান প্রেরণ করা হইল কেন? ধরা পড়িবে না, এই আশাতেই কি? দৈবাৎ ধরা পড়িলে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা প্রবল বিক্ষোভ ঘটতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্যরূপ একথাটা ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু শীর্ষ-সম্মেলনের পূর্নাতেই বিক্ষোভ ঘটিল এবং শীর্ষ সম্মেলনের ভাঙাডুবি হইল।

শীর্ষ-সম্মেলন না হওয়ার দায়িত্ব—

পরমাণু যুদ্ধাশঙ্কার ঘোর চর্যোগের মধ্যে পৃথিবীর চারিটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রধানগণ প্যারীতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন আন্তর্জাতিক বিরোধগুলির আপোষ মীমাংসার জন্ত পথের সন্ধান করিতে। এই সম্মেলনেই সকল বিরোধের অবসান হইবে, এতখানি চর্যাশা কেহই করেন নাই। কিন্তু সকলেই আশা করিয়াছিলেন আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার সূচনা হইবে প্যারীর শীর্ষ সম্মেলনে এবং তাৎপর্য আরও অনেক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া আন্তর্জাতিক আকাশকে পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহ আশঙ্কার ঘোর ঘনঘটা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে। তাহাদের আশা মিথ্যার ছলনা—মরুভূমির মরীচিকার মতই মর্গান্তিক বিভ্রান্তি ছিল ইহা মনে করিবার কোন কারণ ছিল না। শুধু প্যারীতে শীর্ষ সম্মেলন হইল না কেন, না হওয়ার জন্ত দায়িত্ব কাহার এবং উহার প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে, এই সকল জটিল প্রশ্ন বিশ্বাসীর মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। অথচ, দৃষ্টান্ত: অনেকের কাছেই সহজ বলিয়া মনে হইয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ গত ১৭ই মে (১৯৬০) প্যারীতে যে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে কঠোর ভাবের না হইলেও ব্যর্থতার দায়িত্ব মঃ ক্রুশেভের কাছেই চাপানো হইয়াছে। পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলিও মঃ ক্রুশেভের উপরেই সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়াছেন।

'ডেইলী হেরাল্ডের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধকে মঃ ক্রুশেভের নিকট খোলা চিঠি বলিয়াই অভিহিত করিতে পারা যায়। উহাতে বলা হইয়াছে, "রাশিয়ার সঙ্গে কাজ করা যায়, এই বিশ্বাস নষ্ট করিয়া দিয়া আপনি বিরোধীকরণ ও শাস্তির স্বার্থের কতি

করিয়াছেন। আপনি সকল প্রকার অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টির জন্ত একদিন বিশেষ বুধা আশা জাগাইয়া ছিলেন।" বিলাতের 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "ইউ—২ বিমানই বর্তমান সঙ্কটের মূল কারণ, একথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। আমেরিকার গুপ্তচর বৃত্তির জন্ত ক্রুশ হইয়া তিনি (মঃ ক্রুশেভ) এ কাজ করিয়াছেন তাহা ঠিক নয়। ক্রুশেভ সম্মেলন ডাকিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই সম্মেলন ডাকিয়া দিয়াছেন।" মঃ ক্রুশেভ কেন সম্মেলন ডাকিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের সহজত্তর কিন্তু কেহই দেন নাই। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, মঃ ক্রুশেভকেই শীর্ষ সম্মেলন না হওয়ার অব্যবহিত কারণ বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি দাবী করিয়াছিলেন যে, শীর্ষ সম্মেলন সম্ভব করিতে হইলে প্রয়োজনামূলক গুপ্তচরবৃত্তির নিন্দা করিতে হইবে, উহা বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে এবং সাম্প্রতিক ঘটনার জন্ত বাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী, তাহা দিগকে শাস্তি দিতে হইবে। এই দাবী পূরণ করা হইলে তিনি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করিতে রাজী ছিলেন। বস্তুতঃ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি কোন আন্টিমেটাম (চরমপত্র) দেন নাই। কয়েকটি সার্ভে তিনি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করিতে প্রস্তুত। বিমান পর্যবেক্ষণ বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি সত্বে তিনি বলেন যে, মিঃ আইসেনহাওয়ার বতদিন প্রেসিডেন্টপদে আগীন থাকিবেন, ততদিনের জন্ত এই প্রতিশ্রুতি চাওয়া হইয়াছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার প্রেস সেক্রেটারী মিঃ হ্যাগার্টির মারফত এক বিবৃতিতে বলেন যে, "ক্রুশেভকে আমি জানাইয়া দিয়াছি যে, সাম্প্রতিক ঘটনার পর রাশিয়ার আকাশে আমেরিকার গুপ্তচরবৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহা আর আরম্ভ করা হইবে না।" এই বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন যে, "কোন অবস্থাতেই আমেরিকা ক্রুশেভের চরমপত্র স্বীকার করিবে না, এ কথাটি আমি ক্রুশেভকে জানাইয়া দিয়াছি।" প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মঃ ক্রুশেভকে সম্মেলন বানচাল করার জন্ত দায়ী করিয়া উক্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "ইহার পরেও তিনি সাম্প্রতিক ঘটনাটির কথা উল্লেখ করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শীর্ষ সম্মেলন বানচাল করিয়া দিতে তিনি বন্ধপরিকর রহিয়াছেন।"

শীর্ষ-সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্ত তিনিই দায়ী, মঃ ক্রুশেভ একথা অস্বীকার করিয়া লিখিত বিবৃতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরেই ব্যর্থতার দায়িত্ব চাপাইয়াছেন। ব্যর্থতার দায়িত্ব রাশিয়ার, না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, তাহা অবশ্যই বিশেষ ভাবে আলোচনার বিষয়। গুপ্তচরবৃত্তির সমস্র ধরা পড়িলে বিস্তৃতবোধ করাই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিত, নীরব থাকাই উচিত, না গুপ্তচরবৃত্তি প্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষণা করা উচিত, এই প্রশ্নের উত্তর পাঠক-পাঠিকাগণ নিজেরা ভাবিয়া দেখিবেন। মার্কিন গুপ্তচর বিমান রাশিয়ার ভূপাতিত হওয়ার প্রে: আইসেনহাওয়ার ঘোটেই বিস্তৃতবোধ করেন নাই বরং উহা প্রয়োজনীয় বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। গত ১১ই মে তারিখের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ ঘাষণা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, এইরূপ গুপ্তচরবৃত্তি চলিতেই থাকিবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচর-বৃত্তি যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে উহা রাশিয়ার সার্বভৌমত্বের উপর চ্যালেঞ্জ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। কাজেই রাশিয়ার আকাশ

মার্কিন গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনাকে মঃ ক্রুশেভ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। উপেক্ষা করিলে রাশিয়ার আকাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচরবৃত্তির অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হয় এবং উহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ অধিকার দাবীর নিকট রাশিয়ার আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই হয় না। কোন দেশের রাষ্ট্রনায়কই রাজ্যের সীমা লঙ্ঘিত হওয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। গুপ্তচরবৃত্তি দ্বারা রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করিবার অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে, একথা মঃ ক্রুশেভ স্বীকার করিতে পারেন নাই। ইহাই যদি শীর্ষ সম্মেলন বানচাল হওয়ার জন্ত দায়ী হয়, তাহা হইলে মঃ ক্রুশেভ নিশ্চয়ই দায়ী।

মার্কিন গুপ্তচর বিমান ভূপাতিত করার পরও মঃ ক্রুশেভ চাহেন নাই যে, শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হউক। প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সাধারণ নির্দেশেই যে এইরূপ গোয়েন্দাগিরি চলিতেছে মঃ ক্রুশেভ তাহা জানেন না বা বুঝিতে পারেন নাই, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবু উক্ত বিমান রাশিয়ার আকাশে উড়িবার জন্ত প্রেঃ আইসেন হাওয়ার দায়ী, একথা তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। এই বিশ্বাস করিতে না চাওয়াটা সম্পূর্ণ কূটনৈতিক ব্যাপার। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার যদি এই কূটনৈতিক অবস্থাসের সুযোগ গ্রহণ করিতেন এবং ১৬ই মে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি এক সপ্তাহ পূর্বে বলিতেন তাহা হইলে শীর্ষ সম্মেলনের ভরাডুবি হইত না। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক চালে ফুল, না বেছাকৃত, তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। রাশিয়ার মার্কিন গুপ্তচর বিমান ভূপাতিত করার পর লণ্ডন হইতে প্রেরিত ১ই মে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ বিমান বাহিনীর বিমানও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপের কয়টি দেশগুলির উপর পর্যবেক্ষণকার্যে রত রহিয়াছে। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত বিবরণে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ উন্নত ধরনের 'ডি'-বোম্বার্ড বিমান ও ক্যানবেরা বিমান এই পর্যবেক্ষণ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। অবশ্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ করা হইয়াছে। ডেইলী মেগের সংবাদে বলা হইয়াছে, রুশবিমান বুটম, কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উড়িতে দেখা গিয়াছে। গুপ্তচর বৃত্তিতে নিযুক্ত বিমানগুলি দেখা, এমন কি উহাদের মধ্যে সংঘর্ষের কথাও সব পক্ষই গোপন রাখিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রাশিয়ারও কম নয়, একথা বলিলে ভুল হইবে না। রাশিয়ার চারিদিকে বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনীর বেইনী গড়িয়া তুলিয়াছে। ১লা মে তারিখের ঘটনার পর রাশিরা পাকিস্তান, জাপান ও নরওয়েকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। সংঘত ভাষায় হইলেও এই দেশগুলিও আমেরিকার নিকট প্রতিবাদ জানাইতে ক্রটি করে নাই। মার্কিন সরকারও এই আশঙ্কা দিয়াছেন যে, মঃ ক্রুশেভ যে সকল মিত্রশক্তিকে ভয় দেখাইয়াছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের পাশে ঠাঁড়াইবে। রাশিয়ার চারিদিকে আমেরিকার যে সকল মিত্র রাষ্ট্র আছে তাহাদের প্রতি রাশিয়ার হুমকী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা ঐ দেশগুলিতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে

তাহা বলা অবশ্য সম্ভব নয়। কিন্তু এই দেশগুলিকে কতক পরিমাণে neutralise করিবার এই সুযোগ রাশিয়া গ্রহণ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

শীর্ষ সম্মেলন না হওয়ার প্রতি ক্রিয়া—

শীর্ষ সম্মেলন না হওয়ার প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে, এখনই সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে এটুকু বলিতে পারা যায়, ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলেও হয় হইতে আট মাসের মধ্যে উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার আশঙ্কা দেখা দিবে না। মঃ ক্রুশেভ হয় হইতে আট মাস শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত রাখিবার কথা বলিয়াছেন। হয় হইতে আট মাস পরে শীর্ষ সম্মেলন সত্যই হইবে কি না, এখনই তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। গত ২০শে মে (১৯৬০) কমন্সভায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান বলিয়াছেন, "প্যারীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা যে একটি গুরুতর ব্যাপার সে সবকিছু কোন সন্দেহ নাই। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী আরও কঠোর হইতে পারে বলিয়া আমাদের পক্ষে অবশ্যই প্রস্তুত হইতে হইবে। আমাদের পক্ষে হস্ত নুতন ভীতি ও নুতন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।" নুতন ভীতি ও বিপদ রাশিয়ার দিক হইতে আসিবে বলিয়াই তিনি যে আশঙ্কা করেন তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। ঐদিনই অর্থাৎ ২০শে মে তারিখে পূর্ব-বার্জিনে রক্ততা প্রসঙ্গে মঃ ক্রুশেভ হয় হইতে আট মাসের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন হইবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, শান্তিচুক্তির জন্ত পূর্ব-জার্মানিকে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনি বলেন, হয় হইতে আট পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে হইবে। এই বক্তৃতার মঃ ক্রুশেভ সহায়স্থান নীতিতে আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন এক ভাবী শীর্ষ সম্মেলন বাধা প্রাপ্ত হয় এমন কিছু না করিবার জন্ত আবেদন জানাইয়াছেন। আবার শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার আশা উক্তর পক্ষই সত্যই পোষণ করেন কি না, আলামী কয়েক মাসের মধ্যেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

কৃত্রিম মানবসহ কৃত্রিম উপগ্রহ—

প্যারীতে শীর্ষ সম্মেলনের জন্ত নির্ধারিত তারিখের প্রাক্কালে, ১৫ই মে তারিখে রাশিয়া পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিয়াছে। উহার একটি কক্ষে মহাকাশযাত্রী কৃত্রিম মানুষ রহিয়াছে। মহাকাশযাত্রীর মাহুবকে যে সকল আহার মধ্যে কাটাইতে হইবে তাহার প্রত্যেকটিই কৃত্রিম উপায়ে ঐ কক্ষে সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৫ই মে তারিখে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি কেন আকাশে প্রেরণ করা হইল, সে কথা তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়, কিন্তু মহাকাশে মাহুবেয় যাত্রার দিন যে আর দুর্বর্তী নয়, এই ব্যাপারে তাহাই বুঝা যাইতেছে। মহাকাশে মাহুব প্রেরণের জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও একটি পরিকল্পনা আছে। ইহার জন্ত সাত জন লোককে শিক্ষা দান করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই ভার্জিনিয়াস্থিত হেডকোয়ার্টার্স ল্যাংগেস্টে আছে। তাহারা না কি এইরূপ জরুরী-কল্পনা করিতেছেন, কৃত্রিম মাহুব নয়, একজন প্রকৃত মাহুবকেই রাশিরা কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে পুরিয়া মহাশূভে প্রেরণ করিয়াছে। নিজেদের স্বার্থতার সংবাদ গোপন রাখার জন্ত বিদ্যা

লোকটি নিরাপদে কিরাইয়া আনার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সংবাদটি চাপিয়া বাইতেছে।

কমনওয়েলথ সম্মেলন—

গত ৩রা মে (১৯৬০) লণ্ডনে বৃটিশ কমনওয়েলথের প্রধান মন্ত্রীদের যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল, গত ১৩ই মে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার উৎকট বর্ণবৈষম্য নীতি যে এই সম্মেলনের উপর গভীর ছায়াপাত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্মেলনে দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় নাই, আলোচনা হইয়াছে যদ্বারাভাবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি কমনওয়েলথ সম্মেলনে আলোচনা হওয়ার রীতি নাই, এই অজুহাতে খেতকার প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি সম্পর্কে সম্মেলনে আলোচনা হইতে দেন নাই, ইহা মনে করিলে ভুল-হইবে না। বর্ণবৈষম্য যদি নিছক প্রত্যেক রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপার হয় তাহা হইলে মানবিক অধিকারের ঘোষণা করার নেকামী করা সম্মিলিত আতিপুঞ্জের উচিত হয় নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকা দেশটা কাক্রীদের। যেতানরা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। যেতানরা কাক্রীদেরকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়া বলিতেছে, উহা তাহাদের ঘরোয়া ব্যাপার। কমনওয়েলথের খেতকার প্রধানমন্ত্রীর সেই অজুহাত মানিয়া লইয়াছেন এবং অখেতকার প্রধানমন্ত্রীর তাহাতে লায় দিয়াছেন।

কমনওয়েলথ সম্মেলনের শেষে যে বৃহৎ ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে বর্ণবৈষম্য নীতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণবৈষম্য নীতি সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয় নাই। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এরিক সো সম্মেলনে উপস্থিত থাকার অন্তিম প্রধানমন্ত্রীগণ দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্যক্তিগত পরিস্থিতি সম্পর্কে যদ্বারাভাবে তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল ঘরোয়া আলোচনার সময় মিঃ সো দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের নীতি সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন এবং প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। অন্তিম মন্ত্রীগণ দক্ষিণ-আফ্রিকার সন্যস্ত সম্পর্কে তাহাদের অতিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কমনওয়েলথ সম্মেলন উপলক্ষে দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি প্রসঙ্গে মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টেকু আবদুল রহমানই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ সোর স-দল উক্তি সহ করিতে না পারিয়া তিনি আলোচনা বৈঠক ত্যাগ করেন। অন্তিম অ-খেতকার মন্ত্রী তাঁহার ভায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মালয়ের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, দেশে প্রত্যাভর্তনের পর একীকৃত-আফ্রিকা দেশগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কমনওয়েলথের সমস্ত অ-খেতকার প্রধান মন্ত্রী যদি মালয়ের প্রধানমন্ত্রীর মত দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারেন তবে বর্ণবৈষম্যের প্রতিকার হওয়া কঠিন হইবে না।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়—

গত ২১শে মে হইতে তিন দিন ধরিয়া চিলিতে যে ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, জলপ্রাবন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে চিলিরই শুধু ব্যাপক ক্ষতি হয় নাই, উহার ফলে ২০টি প্রবল জলোচ্ছ্বাস প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া এক গুরুতর প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ বৃহৎ প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা বর্তমান যুগে বোধ হয় আর হয় নাই। উত্তর তরঙ্গমালা চিলি হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া পশ্চিম উপকূলের জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, ফরমোসা ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে আছড়াইয়া পড়িতেছে। জাপানের পূর্ব উপকূলস্থ সেগাই বন্দর এলাকার আট শত লোক নিহত এবং ২০ হাজার লোক আশ্রয়হীন হইয়াছে। দক্ষিণ চিলিতে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার নয় শত জন নিহত, ১৫ হাজার আহত এবং হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

গত ২৫শে মে বুয়েনস আয়র্স হইতে ৮১৩ মাইল দূরে সান মার্টিন জ লস আগোজ অঞ্চলে একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে গলিত ধাতু ও তন্দ্রে আর্জেন্টিনার সান কার্লস জ বারিলোচের চারিদিকে সমগ্র অঞ্চলটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। চিলিতে ষোল্ল সাড়ে তিন হাজার লোকের মৃত্যু হয়।

—২৬শে মে ১৯৬০।

একটি আশ্চর্য কণ্ঠ

(শিশির ভাঙ্গুড়ী)

শ্রীকরণাময় বসু

একটি আশ্চর্য কণ্ঠ সারা দিন মধুকরী সুর ফিরি করে
 কাঁপি তার বন্ধ করি সন্ধ্যাবেলা ফিরে পেল ঘরে :
 সেই সুর শ্রবণের কুঞ্জডালে ফুল হয়ে ফুটে থাকে
 রাস্তা রাতে শেষের প্রহরে ।
 চান তার কথাগুলি
 কানে কানে বলে গেছে পদ্মকলি-ভোরে ।
 একটি আশ্চর্য শিল্পী
 রূপমূর্তি ব্যঞ্জনার বিচিত্র বিভাসে
 এঁতে যেহে প্রকৃতির লক্ষ স্মারকস্বরূপ

অসৌকিক অক্ষুট আভাসে ;
 রজমক মনে হত নব রূপলোক,
 মহাজীবনের রূপদক তব জয় হোক ।
 একটি বিদ্রোহী আত্মা
 হেলার কবেছে বন্দী সৃষ্টিভঙ্গে নির্ভুর সময় ;
 জীবনের শিল্পমূর্তি মৃত্যুঞ্জরী,
 এই তার উদ্ভূত প্রত্যয় ।
 অক্ষয়দী আত্ম-অভিমান
 অক্ষয় কীর্তির পোষে কোন পোষে হাজার হাজার ।

জ র জ ন

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

[প্রবীণ সাহিত্যতত্ত্বী ও জীবন-চরিতকার]

দেখলেই বোঝা যায়, যৌবনে এ মানুষটি ছিলেন বহুই চিন্তাশীল, ততই কর্ম-তৎপর ও তেজস্বী। চোখে-মুখে তাঁর সে দৃঢ়তার ছাপ এখন অবধি বেশ স্পষ্ট। বার্ষিক্য ও জড়তা স্বাভাবিক নিয়মে দেহ-কাঠামোকে জুড়ে বসলেও মনের দিক থেকে আজও তিনি অনেকখানি সবল। প্রথিতযশা সাহিত্যতত্ত্বী ও জীবন-চরিতকার শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর জীবনধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য বৃষ্টি এইখানেই।

ময়মনসিংহ জেলার ছয়াজানী গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে গিরিজাশঙ্করের জন্ম হয় ১৮৮৫ সালে। জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সঙ্কল্প ও প্রতিশ্রুতি ছেলেবেলাতেই তাঁর ভেতর লক্ষ্য করা যায়। নিয়মিত পড়াশুনো করে এক্টাস পাশ করেন তিনি ১৯০৪ সালে ছয়াজানীর সম্মিহিত গ্রাম্য হাইস্কুল থেকে। এরপর বখারীতি কলেজে পড়াশুনো চলে তাঁর এবং সে কলকাতায়। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি এফ-এ ও বি-এ (দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১১ সালে অর্থনীতি-সমাজবিজ্ঞান-রাজনীতিতে এম-এ পাশ করলেন তিনি। এম-এর সাথে সাথে আইনশাস্ত্র ('ল') অধ্যয়নও তাঁর শেষ হয়ে যায়।

গিরিজাশঙ্করের সকল জীবনের ওপর বাংলার দুইজন মনীষীর প্রভাব রয়েছে খুব বেশি রকম—একজন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অপরজন ডক্টর ব্রজেননাথ শীল। ছাত্রাবস্থাতেই (কলেজ-জীবন) তিনি এঁদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। সমাজ ও জাতির বহু প্রশ্ন নিয়ে বহু সময় এঁদের সাথে নিবিড় আলোচনা হয়েছে তাঁর। সে সব পুরণো দিনের গৌরবময় স্মৃতিকথা শ্রীরায়চৌধুরীর মুখে শুনে পাওয়া যায় আজও।

একজন সুবক্তা ও সার্থক সাংবাদিক হিসাবেও এ মানুষটি কম মর্যাদার দাবী রাখেন না। ১৯১২ সালে অর্থাৎ কলেজী শিক্ষা সমাপ্তির এক বছর পরই 'দেবালয়' মাসিকপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রেরও তিনি ছিলেন বলতে গেলে প্রাণস্বরূপ। তাঁর বহু সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ পায় এই পত্রিকায় সেকালে—যেগুলি পরে গ্রন্থাকারে 'বাংলার রূপ' নাম নিয়ে বের হয়। নারায়ণের সম্পাদনা ব্যাপারে ১৯১৬-১৭ সাল থেকে ১৯২১-২২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন চিত্তরঞ্জনের অনিষ্ঠ সহযোগী।

বাংলার মননশীলতার ক্ষেত্রে গিরিজাশঙ্করের একটি বিশিষ্ট অবদান রয়েছে, অস্বীকার করা যায় না। নারায়ণ, দেবালয় ছাড়াও নব্যভারত, বীরভূমি, উদ্বোধন, ভারতবর্ষ, জয়ন্তী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় এভাবে তাঁর বহু সূচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর প্রণীত 'বাংলার রূপ' গ্রন্থখানি পড়ে সেদিনে সুভাষচন্দ্র (নেতাজী)

বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'ভরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে তাই তিনি দাবী রেখেছিলেন—প্রত্যেক বাঙালী যুবকের এ অবশ্য পঠিতব্য। তাঁর অপরূপ বিশিষ্ট রচনা (জীবনী-সাহিত্য) 'হামী বিবেকানন্দ' ও 'বাংলার উনবিংশ শতাব্দী', 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশীয়গণ', 'রাজা রামমোহন রায়' সুধী সমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে শ্রীচৈতন্য প্রসঙ্গে তিনি কয়েকবারই বক্তৃতা করেছেন। ঐ বক্তৃতাগুলি গ্রন্থিত করেই 'বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য' ও 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পার্শ্বগণ'—এ দুটি মূল্যবান সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। দু'খানি বই-ই উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্য-তালিকায় স্থান পেয়েছে।

প্রায় ৫০ বছর ধরে শ্রীগিরিজাশঙ্কর সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন—লেখনী তাঁর আজও কিছু একেবারে শুরু হয়নি। স্মরণে তাঁর রচিত 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ', 'কয়েকটি মহাপুরুষের জীবনকথা'—এ সকল অমূল্য গ্রন্থ একপে বহুই রয়েছে। বলতে কি, তিনি শুধু একজন প্রখ্যাত জীবন-চরিতকারই ননেন, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-রাজনীতি সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের একজন নিপুণ সমালোচক। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাট্টা, সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—এঁরা ছিলেন বরাবর তাঁর বিশেষ ভণ্ডারী।

গিরিজাশঙ্কর রাজনীতি বা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে কখনও প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেননি বটে কিন্তু একটা সতেজ বিপ্লববর্ষী মন সব সময়ই তাঁর ভেতর সজাগ ছিল বা আছে। যবোরা



শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

আলাপ-আলোচনাতে একটুতেই এইটি স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারা যায়। দেশের বর্তমান অবস্থা-ব্যবহার বিক্রমে তিনি নিতান্ত প্রতিবাদমুখর। তাঁর দৃঢ় ধারণা—মাতৃমহের সত্যিকার কল্যাণ যদি চাওয়া হয়, খেতে-পরতে সবাই কেন পাবে না, এ প্রশ্নের উত্তর যদি পেতে হয় ঠিক ঠিক—তা হলে বিপ্লবকে এড়িয়ে কিছুতেই চলবে না।

শ্রীবিজয় সিং নাহার

[বিশিষ্ট দেশসেবী ও বিধানসভা-সদস্য]

তখনও ইনি স্কুলের ছাত্র কিংবা সবে উত্তোগ করছেন কলেজে পা বাড়ানোর। দেশসেবার জন্তে ক্রমেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁর মন। জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন থাকতে দিলে না একে সাধারণ জীবন-ধারা নিয়ে। সেদিনের এই চঞ্চল ও সাহসী তরুণই সার্থক কর্মী ও নেতা শ্রীবিজয় সিং নাহার।

মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ নাহার পরিবারে বিজয় সিং জন্মগ্রহণ করেন ১১০৬ সালে। এই নাহাররা (জৈন) বাংলা দেশে আসেন—সে প্রায় দুই শতাব্দিক বছর আগের কথা! তারপর ক্রমে বাঙালী সংস্কৃতির সাথে তাঁদের আত্মার সংযোগ স্থাপিত হয়, তাঁরা বোল আনা বাঙালীই হয়ে পড়েন। বিজয় সিং-এর শিক্ষা পূরণ চাঁদ নাহার ছিলেন একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ পুরুষ। তিনি একাধারে ছিলেন আইনজ্ঞ, সাহিত্যভ্রতা, বিষয়বৎসল, প্রত্নতাত্ত্বিক, গবেষক ও শিক্ষামুহুরাগী। পূরণ চাঁদের আদর্শ ও গুণাবলীর প্রভাব স্বলিক নাহারের ওপর অভাবতঃই পড়ে।

বিজয় সিং-এর ছাত্র-জীবন যখন শুরু হতে থাকে, সে সময় থেকেই তিনি কলকাতায়। পিতার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে ও অনুশাসনাধীনে তাঁর পড়াশুনো চলতে থাকে। স্কুলের পড়াশুনো



শ্রীবিজয় সিং নাহার

তাঁর সবটাই সম্পন্ন হয় বঙ্গবাজার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন-এ। ১১২৩ সালে তিনি এখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ১১২৭ সালে সেন্টজের্জিয়ার্স কলেজ থেকে তিনি বখারীতি বি-এ পাশ করেন। এম-এ ও ল' ক্লাশের তিনি যখন ছাত্র, গান্ধীজীর আইন-অমন্ত্র-আন্দোলনের ঢেউ তখন আসছে। দেশের কাজে অমনি বাঁপিয়ে পড়েন তেজস্বী যুবক শ্রীনাহার।

মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ছাত্র থাকাকালীনই বিজয় সিং-এর রাজনৈতিক দীক্ষা হয়ে যায়। তাঁর প্রকৃত দীক্ষাগুরু বলতে গেলে ঐ স্কুলেরই সেদিনকার প্রবীণতম শিক্ষক গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। একজন নির্ঘাতিত রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন তিনি (গিরীন্দ্রনাথ)—বিপ্লবী নায়ক বিপিনবিহারী গান্ধীজীর আত্মোত্তী-সমিতির সাথে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আপন শিক্ষকের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রীনাহারও ঐ গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার একজন সদস্য হন, বিপিনবিহারীর নিবিড় সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়ে যান তিনি সেই থেকেই। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, বন্ধিৎ লড়া, গুলী ছোঁড়া—এসবে পারদর্শী হয়ে নিতে হয় অস্ত্রাভ্যাসের সাথে তাঁকেও।

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্ম-জীবনের প্রারম্ভ থেকেই বিজয় সিং কংগ্রেসের (বর্তমানে শাসক দল) সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। কংগ্রেসে প্রতিনিধি তিনি সর্বপ্রথম নির্বাচিত হন ১১২৮ সালে। ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন ছাত্র-আন্দোলনে তাঁর ছিল বরাবরই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। ১১১৭ সালে কলকাতায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হয়, সে সময় মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে তিনি পড়তেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে তখন দূরে থাকা অসম্ভব হলো—বয়স কম থাকলেও স্বচ্ছাসবকের দায়িত্ব নিয়ে সেই কংগ্রেসে তিনি কাজ করেন। আগষ্ট-আন্দোলনের (১১৪২) সময় প্রাদেশিক কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে তিনিও যুক্ত হন। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি ১১৫০ সালে। বর্তমানে তিনি প্রদেশ-কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ।

বাংলা ও ভারতের বড় বড় নেতাদের সাথে শ্রী নাহারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আসবার বহু কারণ ঘটেছে। সে দিনে নাহারদের ইণ্ডিয়ান মিরার স্ট্রিটস্থ বাড়িটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র। অনেক সময় অনেক জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে এই বাড়িতে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে গোপন আলোচনা ও পরামর্শ হয়েছে—আজ সে সকল অবিষ্টি ইতিহাসের সামগ্রী। শ্রীনেহরু (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) ও মৌলানা আজাদ বহুবার এখানে এসেছেন বহু জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদে। আত্মগোপনকারী বিপ্লবী কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয়ও ছিল এই নাহার-ভবন। জাতির সেবার উৎসর্গীকৃত নাহারদের কুমার সিং হলটিও বিজয় সিং-এর ধুরতাত কুমার সিং-এর স্মৃতিভূক্তিত রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও জাতীয় আন্দোলন বিবহক কর্মকাণ্ডের একটি প্রধান কেন্দ্র।

শ্রীবিজয় সিং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমানে একজন কর্মধার। গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে তিনি চৌরঙ্গী নির্বাচন-কেন্দ্র থেকে রাজ্য বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১১৪৬ সালে তিনি কংগ্রেস ডিকিটেই তৎকালীন প্রাদেশিক

পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সেটি ছিল কলকাতা নির্বাচনকেন্দ্র থেকে। পরোক্ষ নির্বাচনে তিনি রাজ্যের অন্ততম এম্. এল. সি (কংগ্রেস) হয়েছিলেন ১৯৫২ সালেও। কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিলার নির্বাচিত হন তিনি প্রথম ১৯৩৩ সালে ডালতলা ওয়ার্ড থেকে। আপন বোগ্যতাবলে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ঐ আসনটি তিনি অধিকার করেন। বর্তমানে তিনি কলকাতা পৌরসভার একজন নির্বাচিত অন্তরায়মান। রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে গোড়া থেকেই দেশগোঁড়ব সুভাষচন্দ্রের (নেতাজী) সঙ্গে শ্রীনাথের ঘনিষ্ঠ বোগাযোগ ঘটে। পৌরসভাতেও এই জাতীয় মহানায়কের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি বহুদিন।

রাজনৈতিক সংস্থা (কংগ্রেস) ছাড়াও বহু সমাজসেবা-প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সঙ্গে বিজয় সিং বরাবর নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের তিনি একজন সদস্য। খেলাধুলা (ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি) বরাবরই তাঁর একটি বিশেষ 'হবি'। হেলিসিফিতে যে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়, ভারতীয় বকিং টিমের ব্যবস্থাপক হয়ে তিনি তাতে বোগদান করেছিলেন। শ্রী নাথার একজন দক্ষ ও নিরলস কর্মী—দেশ ও জাতির সেবাই তাঁর সর্বসময়ের লক্ষ্য।

শ্রী আশুতোষ লাহিড়ী

ভারত মাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করতে অগ্রসর হওয়ার অগ্নিযুগের যে সব বিপ্লবীরা ইংরাজ সরকারের অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করেছেন, শ্রী আশুতোষ লাহিড়ী তাঁদের মধ্যে একজন।

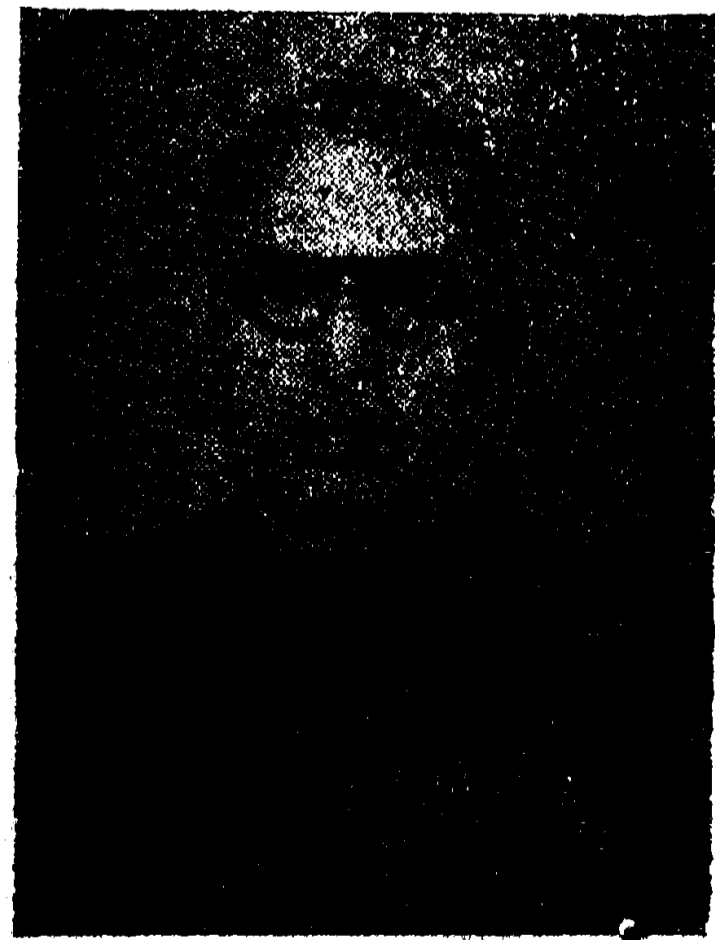
পাবনা জেলার অন্তর্গত গাড়ুলহ গ্রামে এক অভিজাত ও নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারে ১৮৯২ সালের ৩০শে জুন শ্রী আশুতোষ লাহিড়ী জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশব হইতে তিনি ঐশ্বরাম্বরাসী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি রাজসাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ২০ টাকা বৃত্তিপান। ১৯১৪ সালে তিনি কলিকাতা হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম, এ, পড়বার সময় তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপের দক্ষণ গ্রেপ্তার হওয়ার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।

আশুতোষ যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়িতেন তখন-ই নিজ দেহের রক্ত দ্বারা মা কালীর সন্মুখে নিজের নাম দস্তখত করে দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে বি, এ, পড়তে কলিকাতায় এসে তিনি বিপ্লববাদী ঘূর্ণ্যাবর্তে পড়েন। এই সময়ে যে সব বিপ্লবী নেতার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ইনি নানবেঙ্গ রায় নামে খ্যাত) অন্ততম। ১৯১৫ সালের মে মাসে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। এক স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সন্মুখে কুফনগরে বিচারার্থে আনীত হলেন। কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট এই মামলা পরিচালনা করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই মামলার আসামী পক্ষ সমর্থন করে কলিকাতা থেকে জে. এম. রায় প্রমুখ হইজন বিখ্যাত কারিগরকে

কুফনগরে পাঠালেন। এতৎসঙ্গেও ১৯১৫ সনের আগষ্ট মাসে এঁরা দশ বৎসর বীপান্তর বাসে দণ্ডিত হলেন।

আন্দামানে বন্দীদের যে সব কাজ করতে হয়, নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়ে আঁশ বার করা তার অন্ততম। আশুতোষ এই কাজ করতে অস্বীকার করেন। জেল কর্তৃপক্ষ শাস্তি স্বরূপ ডাঙাবেড়ী Cross Fetter (দুই পায়ের গোড়ালীর ওপর দু'টা কড়া লাগিয়ে তার মধ্যে প্রায় তিন ফুট লম্বা একটা লোহার রড লাগানো থাকে) পরিহিত অবস্থায় দেওয়ালের সঙ্গে উচ্চ স্থানে হাতে হাতকড়ি দিয়ে আটকিয়ে দাঁড়ান অবস্থায় প্রত্যেকদিন আট ঘণ্টা করে রেখে দিতো। তারপর একে একে খাদ্য হ্রাস (Penal Diet), উন্টাপিঠি—হাতকড়ি (Behind Hand Cuff), দাঁড়ানো হাতকড়ি (Standing Handcuff), খাড়াবেড়ী (Barfetter) ইত্যাদি জেলের সর্বপ্রকারের দণ্ড দেওয়ার পরও যখন নারিকেলের ছোবড়া থেকে আঁশ বার করার কাজে স্বীকৃত করা গেল না তখন বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। নির্বিকারচিত্তে আশুতোষ ১৫টি বেত্রাঘাত গ্রহণ করলেন। এই বেত্রাঘাতে নিতম্বস্থানে আঘাত ইচ্ছা গভীর গর্ভ হয়ে গেল এবং এক মাসের ওপর কষ্ট ভোগ করে মৃত্যু হলেন।

এতেও কোন ফল হ'ল না দেখে কারা-কর্তৃপক্ষ ডাঙাবেড়ী সহ এক বৎসর কঠোর নির্জনবাসের আদেশ দিলেন। এই নির্জনবাসে সাধারণতঃ কয়েদীর মস্তিষ্কবিকৃতি হয়। আশুতোষ এই দণ্ডও নির্বিকারে বহন করলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর এইদব অত্যাচারের কাহিনী বাংলায় পৌঁছিল। তাঁর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে প্রস্তাব করে তদন্তের দাবী করলেন। এর ফলে বন্দীদের হাঙ্কা কাজ দেওয়া হ'ল। এই সময় জেলের প্রেস-বিভাগে কাজ করতে গিয়ে আশুতোষ বীর সাভারকর ও তাঁহার ভাই গণেশ সাভারকর, ভাই পরমানন্দ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহায্য লাভ করেন। এই সময়ে দেশে নির্বাসিত বন্দীগণের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, ফলে বন্দীগণকে আলিপুর জেলে ফিরিয়ে আনা হ'ল। অসহযোগ



শ্রী আশুতোষ লাহিড়ী

আন্দোলনে তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ইত্যাদি বাঙ্গালার নেতাগণও আলিপুর জেলে রাজবন্দী রূপে আনীত হয়েছেন। ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে আন্তত্যাগ মুক্তিলাভ করেন।

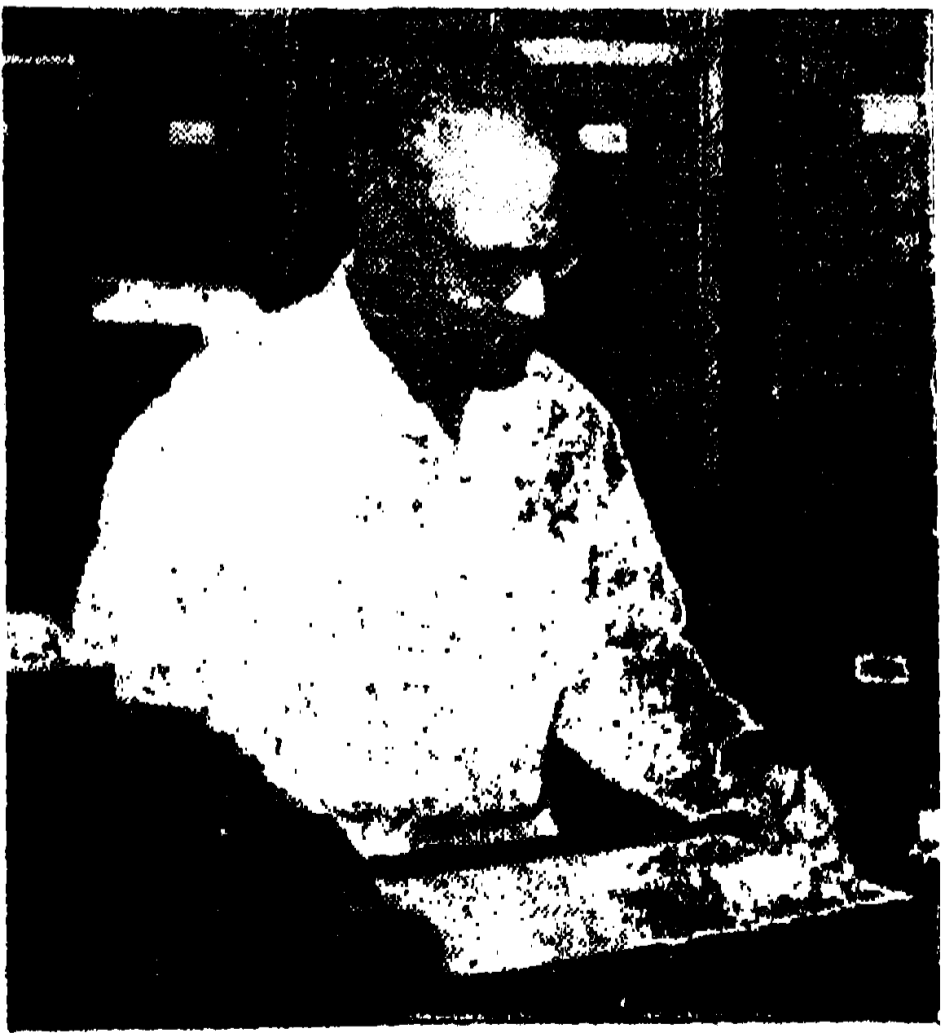
এর পরও ১৯৩২ সালে সন্দেহক্রমে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৭ সালে মুক্তিলাভ করেন। কারাযুক্তির পর আন্তত্যাগ হিন্দুমহাসভার বোঙ্গা দেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও সন্দেহক্রমে দিল্লীতে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৮ সালে তিন মাস এবং ১৯৫০ সালে চার মাস কারাবরণ করেন। প্রতিবারই প্রমাণাভাবে তাঁকে মুক্তি দিতে সরকার বাধ্য হন।

ইহার কিছুদিন পরই তিনি কলিকাতা থেকে বাংলা ভাষার এবং দিল্লী থেকে হিন্দী ভাষার 'কেশরী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। হিন্দুমহাসভার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করিয়া তিনি তাঁর কর্মকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে এক নতুন পথের সন্ধান দিতে প্রবৃত্তীল হয়েছেন। আন্তত্যাগের সম্পর্কে দিল্লীতে গান্ধীজী একবার বলেছিলেন—“শ্রীআন্তত্যাগ লাহিড়ীর রাজনৈতিক মত ও আদর্শের সহিত একমত না হলেও, তাঁকে আমি একজন সত্যজ্ঞি বলেই মনে করি।”

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর

[কলিকাতা ষ্টক-এক্সচেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা]

মাণ্ড্য বরাবর সঞ্চয়প্রয়াসী। সঞ্চিত অর্থ সে আবার বিনিয়োগ করে আয়বৃদ্ধির জন্ত। কিন্তু অর্থলগ্নীর বিশেষ ক্ষেত্র হল ষ্টক-এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার-বাজার। ইহা বর্তমান যুগের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। ব্যবসায়ের মূলধন প্রয়োজন—আবার এই মূলধনই দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শেয়ার-বাজারের মাধ্যমে বহুজনের সঞ্চিত অর্থ একত্রীভূত হয়ে (Stock) মূলধন গঠন করে। সরকারী ও মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটি (Securities) হল ক্রেতার কাছে ঋণবদ্ধ আর



শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর

ষ্টক-শেয়ার হল ক্রেতার নিজস্ব সম্পদ। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির বন্ধকের পরিবর্তে অর্থসংগ্রহ করাই হল 'ভিবেকার'।

শেয়ার হয় অভিনায়ী ও প্রেক্ষারঙ্গ। প্রথমটির ক্রেতারা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভার ভোটার, উহার হিসাব অল্পমোদন, উহার পরিচালক নির্বাচন ও ডিভিডেণ্ড ঘোষণার অধিকারী। আর শেয়ারটির ক্রেতারা কয়েক বৎসরের ডিভিডেণ্ড অনাদায়ী হলে ভোটারদের যোগ্য বলে বিবেচিত হন। কিন্তু একটি বিশেষ সুবিধার অধিকারী হলেন তাঁহারা—সেটি হল নির্দিষ্ট বেটে ডিভিডেণ্ড পাওয়া আর প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে উহার Assets-র অধিকারী। ষ্টক ও শেয়ারে সাধারণ মধ্যবিত্তদের দাদনের সংখ্যা বেশী। এই সমস্ত ব্যাপারে 'ষ্টক-এক্সচেঞ্জ' মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

হাজারের উপর সদস্য সম্বিত এশিয়ার বৃহত্তম কলিকাতা-ষ্টক-এক্সচেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুরের নিকট ইহার দৈনন্দিন কার্যকলাপ জানিতে চাহিলে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

ডাঃ ব্রাজেন্দ্রলাল সুর ও শ্রীমতী সত্যবালা সুরের পুত্র অতুলকৃষ্ণ ১৯০৪ সালের ৫ই আগষ্ট কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ২৪পরগণার গোপালপুর গ্রামে। দাদামহাশয় ছিলেন চন্দননগর নিবাসী ঐসিদ্ধেশ্বর নিয়োগী। অতুলকৃষ্ণ ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর (১১) সহ ১৯২১ সালে জামবাজার বিভাগাগর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে আই-এ, ও বি-এ, পাশ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ইতিহাসে ও ১৯২৮ সালে এ্যানথ্রপলজীতে (Anthropology) প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম-এ পাশ করেন। ১৯২৮ সালে তদানীন্তন ডিরেক্টর জেনারেল (প্রকৃতত্ত্ব বিভাগ) তার জন মার্শালের নির্দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক ডক্টর ডি. আর. ভাগ্যরকর শ্রী সুরকে Indus Valley Culture এর উপর গবেষণা করার জন্ত আহ্বান জানান। এই গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ব্রাহ্মাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-আবিষ্কৃত মহেন্দ্রজাদোড়া ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের সহিত পরবর্তী সংস্কৃতির যোগাযোগ, আর খিসিস্ ছিল Pre-Aryan Elements in Indian Culture. "ক্যালকাটা রিভিউ" ও ডক্টর নরেন্দ্র লাহা সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টারলী"তে উহার কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে Archeological Surveyতে তিনি উচ্চপদ পান কিন্তু ডক্টর রাধাকৃষ্ণ ও ডক্টর শ্রীমতী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় উক্ত পদ গ্রহণে আপত্তি জানান। ফলে শ্রী সুর ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে তিনি খিসিস্ দাখিল না করিয়া উহার সহিত সঙ্গব ছিন্ন করেন। তাঁহার গবেষণালব্ধ বিবরণ হইতে আমরা কিছু সভ্যতার বহু জিনিষ জানিতে পারি ও ডক্টর ভাগ্যরকরের Outstanding works উহা প্রকৃত সাহায্য করে।

১৯৩২ সালে তিনি অর্থবিষয়ক সাংবাদিকতা আরম্ভ করেন। গুয়ার্ডা পরিকল্পনার রূপদাতা ক্যাপ্টেন গোটাল প্রতিষ্ঠিত Bread & Freedom ও Commercial India মাসিক পত্রিকাখন্ডের সহকারী সম্পাদক হিসাবে শ্রী সুর বোঙ্গাদান করেন। চারি বৎসর তিনি Commercial Gazette (সাপ্তাহিক)র

বৃন্দ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৬এর অক্টোবরে তিনি কলিকাতা টেক এন্ড চেম্বারের আর্থিক উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া এখনও উহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৪৬ সালে পরলোকগত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের আহ্বানে তিনি 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার বাণিজ্য পৃষ্ঠা সম্পাদনা ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লিখিবার ভার গ্রহণ করেন। ইহার স্বপদান ও ইহার Economic Supplement প্রবর্তন সারা ভারতে উচ্চপ্রশংসিত হয়।

১৯২৯ সালে Prof. J. M. Keynes (পরে লর্ড কীনস্)-র উত্তাপে শ্রীশ্রব লগুন ইকনমিকস্ সোসাইটির সদস্য (F. R. E. S.) নির্বাচিত হন। ইহার পর তাঁহাকে লগুন রয়্যাল ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটির ফেলো হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সাল হইতে তিনি ব্যুরো অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ষ্ট্যাটিস্টিকসের সদস্য রহিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে তৎকর্তৃক প্রকাশিত 'What Price the Ottawa Agreement' সরকারী ও বেসরকারী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বোম্বাইস্থ ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতি উহার গুজরাটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে বম্বাদাস মেটা উহার হিন্দী সংস্করণ বাহির করেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনসভায় উক্ত অটোয়া চুক্তির বিরুদ্ধে বেসরকারী সদস্যদের প্রতিবাদ উত্তোলনে শ্রীশ্রবের পুস্তক প্রভূত সাহায্য করে। এছাড়া তাঁহার লেখা চল্লিশটি পুস্তক রহিয়াছে—তন্মধ্যে Savings & Investments in India, India's natural Resources, Contracts & Regulation Acts, Principle of Business Finance, টাকার বাজার প্রভৃতি সর্বজনসমাদৃত। ১৯৫৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমন্ত্রণে তিনি Indian Institute of Social Welfare & Business Managementএ Applied Economics ও Business financeএর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। উক্ত

বৎসর হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের Applied Economicsএ অধ্যাপক ও পরীক্ষক রহিয়াছেন।

অতুলকৃষ্ণ ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন। সর্টহাণ্ডের তিনটি খারার (শিট্‌ম্যান, গ্রে ও ব্লন-ডুগ্লাইয়ান) টিচার্স-ডিপ্লোমাপ্রাপ্তীতা শ্রীশ্রব লগুন চেম্বার অব কমার্সের পরীক্ষায় (একমিনিটে ১৪০ শব্দ লেখন) উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এছাড়া তিনি বাংলা ও ইংরাজী সর্টহাণ্ড সমভাবে লিখিতে সক্ষম।

প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি প্রধান এ. আর. পি উপদেষ্টা হিসাবে কলিকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জিলার কয়েক সহস্র লোককে শিক্ষিত করিয়া তোলেন। এছাড়া সেন্ট্রাল এগ্লুজেন্সি ব্রিগেডের অ-চিফিংসক সদস্য হিসাবে তিনি কাউন্সিল, হোম-নাসিং, হাইজিন ও স্যানিটেশনের 'Lay-Lecturer' এবং এইগুলির উপদেষ্টা-ডিপ্লোমা পান। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় তিনি প্রাথমিক সাহায্য সম্বন্ধে দুইটি পুস্তকের লেখক। বরফাউটের সহিত তিনি বহুদিন সংযুক্ত ছিলেন, ভারতে 'ভারোত্তোলন' এর তিনি অন্ততম প্রবর্তক এবং ৪ Stone classএ তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী বিমলা শ্রব হলেন একজন সুগৃহিণী।

'টেক-এন্ড চেম্বার ইয়ার বুক' শ্রীশ্রবের সম্পাদনার বেশ-বিহীন সমাদৃত হইয়াছে। শ্রীশ্রব বলেন যে, ভারতের আর্থিক উন্নয়ন করিতে হইলে অবহেলিত জনতার দিকে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হইবে। কাং অবহেলিত গ্রামেরই বাসিন্দা তাহারা। বার বৎসর পূর্বে তাঁহা লেখা ধারাবাহিক ছাব্বিশটি প্রবন্ধ (Rural Planning) দ্বারা 'গ্রামীন আর্থিক পরিকল্পনা' আজ কেন্দ্রীয় সরকারের প্র্যানিং কমিশনে গ্রাম-স্বকীয় কার্যধারার সঙ্গে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। বর্তমান জনসাধারণ অর্থনৈতিক বিষয়ে খুবই আগ্রহবান হয়েছেন—ই আনন্দের কথা।

শ্রমিক

[বিখ্যাত রাশিয়ান কবি Vasily Kazin এর Brick-layer

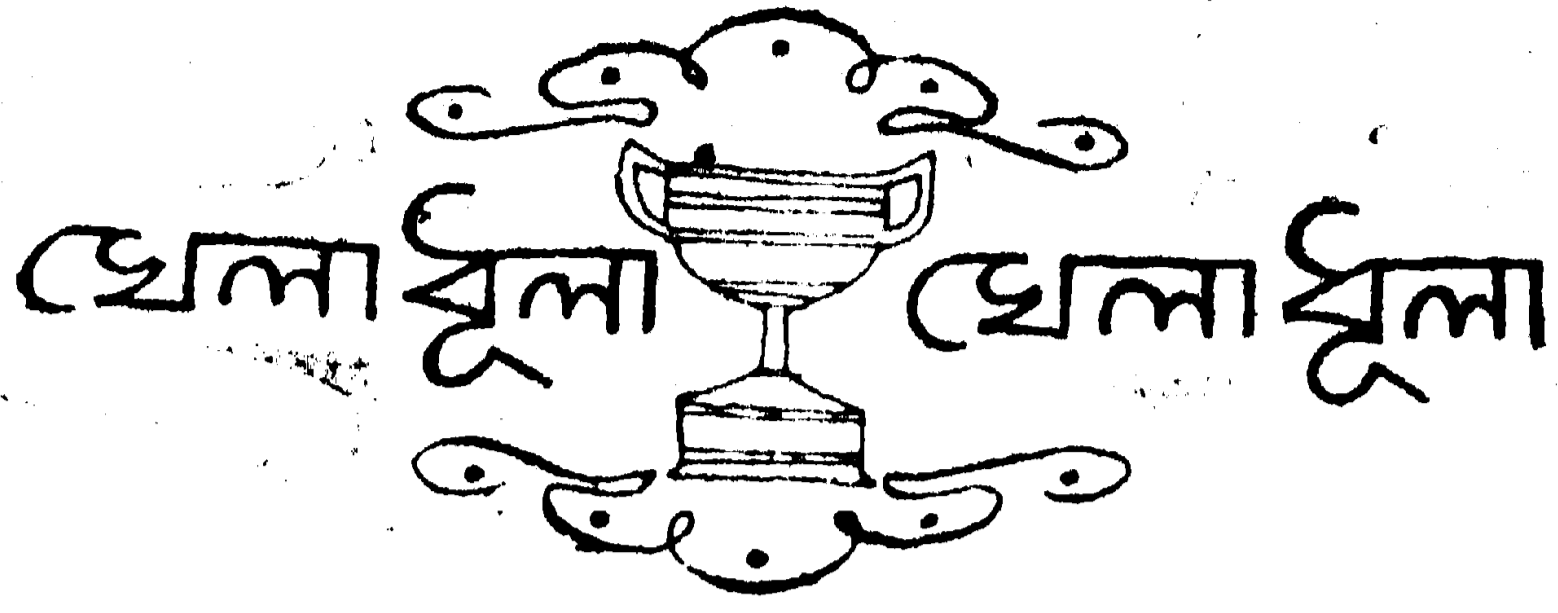
নামক কবিতাটির অনুবাদ]

সন্ধ্যায় হাঁটি গৃহের পানেতে আমি,
সঙ্গে চলেছে শ্রমের ক্লাস্তি সাথী
অঁধারে আমার লোহিত বহির্বাস
লাল টকটকে ইটের গাইছে গীতি।

গাইছে সে লাল-ইটের বোঝার গান,
যত বোঝা বেয়ে ওপরে উঠেছি আমি,
ওপরে উঠেছি, অনেক ওপরে ছাদে,
সেই ছাদে, বাকি আকাশ বল'বে তুমি।

মদের আমেজে চোখেতে লালের আভা,
বাভাসেতে ছিল কুয়াশার আমেজ মাথা,
উবাকে দেখেছি শ্রমিকের মত যেন
লাল ইটখানা তুলতে ওপরে একা।

অনুবাদক—মল্লিনাথ



রোম অলিম্পিক ও ভারত

এবার রোমে সপ্তদশ অলিম্পিকের আসর বসবে। চার-দিকেই একটা সাজ সাজ রব শড়ে গেছে। ভারতও বসে নেই। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সংখ্যা নির্ধারণে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। মনোনীত দলে ৬৫ জন ক্রীড়াবিদ ও ৬১ জন কর্মকর্তা থাকবেন। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্রীড়া-সংস্থা মনোনীত প্রতিনিধিদের খরচ বহন করতে রাজী থাকলে আরও বার জন প্রতিযোগী ও তিন জন কর্মকর্তার রোম যাত্রা মঞ্জুর করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এখেলেটিক দল গঠন সম্পর্কে ভারতীয় এমেচার এখেলেটিক ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ এক নির্দিষ্ট মান স্থির করেন। ধারা এই নির্দিষ্ট মানে পৌছাইয়াছেন তাঁহাদেরই চূড়ান্ত ভাবে মনোনীত করা হয়েছে। নিম্নে চূড়ান্তরূপে মনোনীত প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ও বে দল গঠিত হয়েছে তার নাম প্রদত্ত হলো :—

এখেলেটিক দল—নয় জন পুরুষ ও তিন জন মহিলা এবং তিন জন কর্মকর্তা (একজন কোচ এবং পুরুষ ও মহিলা দলের দু'জন ম্যানেজার)।

পুরুষ—টি আর বোম্বি-দিল্লী (১০০ মিটার), মিলখা সিং-সার্ভিসেস (অধিনায়ক) (২০০ ও ৪০০ মিটার), অগমোহন সিং-পাঞ্জাব (১০০ মিটার হার্ডল), গুরুবচন সিং-দিল্লী (উচ্চ লক্ষন), বি ডি সত্যনারায়ণ-মাদ্রাজ (দীর্ঘ লক্ষন), ভীরা সিং-সার্ভিসেস (দীর্ঘ লক্ষন)।

মহিলা—শীলু মিন্টী-বোম্বাই (১০০ মিটার), ট্রেসি ডি সুরজা-বোম্বাই (২০০ মিটার), এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট—রাজস্থান (বর্ষা নিক্ষেপ)।

৫০ ও ২০ কিলোমিটার জমণে জোরা সিং ও অজিত সিং দিল্লীতে বিগত জাতীয় ক্রীড়াঙ্গণেই নির্দিষ্ট যোগ্যতা লাভ করেছেন। গাল চাঁদ ও ম্যারাথনে যোগ্যতা লাভ করেছেন। তবে দেবানুনে চূড়ান্ত নির্বাচনী ট্রায়ালের পর এই বিষয়ের প্রতিনিধি দলের নাম ঘোষণা করা হবে।

এখেলেটিকসে ভারতের মহিলাদের মান খুবই নিম্ন। এখেলেটিক ফেডারেশনের সম্পাদক বলেছেন যে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ফেডারেশনের অনুরোধ ক্রমেই ভারতীয় মহিলা দল পাঠান হচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন যে, মহিলা এথেলিটদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য রোমে দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা হয়। নির্বাচনী ট্রায়ালে কিন্তু ভারতীয় মহিলা এথেলিটারা বেশ সাক্ষ্য অর্জন করেছেন। দুটি বিভাগে মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড় ও বর্ষা নিক্ষেপে এশীয় রেকর্ড অতিক্রম হয়। টিকিল ডি'সুরজা ২৫'৩ সেক: ২০০ মিটার দৌড়ান। ইহা এশীয় রেকর্ড অপেক্ষা ০'৫ সেক: কম। এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট

১৫৫ ফুট ৫ ১/২ ইঞ্চি দূরত্বে বর্ষা নিক্ষেপ করেন। ইহা এশীয় রেকর্ড অপেক্ষা (১৫৫ ফুট) ৪ ১/২ ইঞ্চি বেশী। সেদিক থেকে মহিলাদের উপর একেবারে নিকরংসাহ হবার কোন কারণ নেই।

পুরুষ এথেলিটদের মধ্যে ভারতের আশা ভরসা মিলখা সিং। সকলেই তাঁর ফলাফলের জন্য অধীর প্রীতকায় বসে আছেন। এবার নির্বাচনী ট্রায়ালে মাদ্রাজের সত্যনারায়ণ দীর্ঘ লক্ষনে সকলকে বিস্মিত করেন এবং নিজ জাতীয় রেকর্ড (২৩ ফুট ৫ ১/২ ইঞ্চি) অতিক্রম করেন। ভারতের কোন এথেলিট দীর্ঘ লক্ষনে এ পর্যন্ত এত বেশী লাক্যতে পাবেন নি। রাম মেহের বিনি ১১৫৬ সালের অলিম্পিক গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এই দিন ২৩ ফুট ৬ ইঞ্চি লাক্যিয়ে চতুর্থ স্থান লাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রাম মেহের ইতিপূর্বে ২৪ ফুট ১১ ইঞ্চি লাক্যিয়ে এক সময় রেকর্ড করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সত্যনারায়ণ সেই রেকর্ড স্থান করে দেন। আরও উল্লেখ করার বিষয় যে মেলবোর্ণ অলিম্পিকের বিজ্ঞতা ২৫ ফুট ৮ ১/২ ইঞ্চি লাক্যিয়েছিলেন এবং বর্ষস্থানাধিকারী ২৩ ১১ ফুট ১ ইঞ্চি অতিক্রম করেন। সেই দিক থেকে সত্যনারায়ণের সাক্ষ্য সম্পর্কেও সকলেই আশাবাদী।

ফুটবল দল—১১ জন খেলোয়াড় এবং দু'জন কর্মকর্তা (একজন কোচ ও একজন ম্যানেজার)।

ভারতীয় ফুটবল দল এখনও চূড়ান্তভাবে গঠন করা হয়নি। দার্জিলিং-এ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিম্নলিখিত ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ বার্ষিক সভার শক্তিশালী দল গঠনের উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কোলকাতা, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ ও দিল্লীতে তিন সপ্তাহ স্থায়ী চারটা শিক্ষাশিবিরের ব্যবস্থা করা হবে। এই শিবিরগুলো ৭ই জুন থেকে ২৮শে জুন পর্যন্ত চালু থাকবে এবং তারপরে ২৮ জন খেলোয়াড় নির্বাচন করা হবে—যাদের ভেতর থেকে চূড়ান্তভাবে অলিম্পিক দল গঠন করা হবে। ফেডারেশনের এই প্রচেষ্টাকে অনেকে হয়তো সাধুবাদ জানাবেন; কিন্তু চারটা শিবিরের জন্য বেশ কয়েক হাজার টাকা এভাবে অপচয়ের পশ্চাতে কি যুক্তি থাকতে পারে তা উপলব্ধি করা বাচ্ছে না। কারণ ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে সেরা খেলোয়াড় নিয়েই ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছিল এবং এই দল চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের পূর্বেই একটা শিক্ষাশিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে প্রত্যেকটি প্রদেশ থেকেই সেরা খেলোয়াড়রা যোগদান করেছিলেন। তাঁদের অনুশীলনী দেখার পরেই চূড়ান্তভাবে দল নির্বাচিত করা হয়। পুনরায় এই ভাবে শিক্ষাশিবির স্থাপনের প্রচেষ্টা অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এতে কোনও নতুন উদ্বেগ সিদ্ধ হবে না। যে সকল খেলোয়াড় ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে দু'টি খেলার জন্য প্রেরণ করেছিলেন—তাদের বাদ দেওয়ার

কোনও প্রসঙ্গ আসে না। এঁদের তেতর থেকেই চূড়ান্তভাবে অলিম্পিক দল গঠন করতে হবে। তা হ'লে এই অপব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা কি? এতে খেলোয়াড়দের কিছু উপকার হ'বে-না কি নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্যগণের বিনা পরসায় প্রমোদ ভ্রমণ এবং খরচ-খরচা বাবদ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলেই এ শিক্ষাশিবিরের আয়োজন?

হকি দল—কুড়ি জন খেলোয়াড় ও তিনজন কর্মকর্তা (ম্যানেজার, কোচ ও ব্যায়াম শিক্ষক)।

হকিতে ভারত আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে। অস্ত্রাত দেশ বর্তমানে বেশ উন্নত হলেও ভারতের হকির মান নিম্নগামী, সেই বিষয়ে ভিন্নত হবার উপায় নেই। ভারতের সাকল্য সম্পর্কে সকলেই উদগ্রীব। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ বেশ আঁকড়মক করেই ট্রায়াল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এবার ট্রায়ালের শেষ পর্ব শুরু হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্তভাবে দল এখনও গঠিত হয় নি। চূড়ান্ত দল গঠন হবার পূর্বে একটা খবর প্রকাশ হয়েছে যে কোচ শ্রীহাবুল মুখার্জীও নির্বাচক কমিটির সদস্য শ্রী কে ডি সিং (বাবু) বর্তমানে যে শিক্ষা-শিবির চলছে তাতে উপস্থিত হন নি। এতে সকলেই উৎকর্ষা বোধ করেছেন। মনে হচ্ছে এর পেছনে যেন কোথায় কি জানি একটা কিছু রয়ে গেছে। বাহা হউক, আশা করা যায় নির্বাচকমণ্ডলী দল গঠনে রাজনীতির উর্ধ্বে থাকবেন এবং ভারতীয় দলটি ঠিকভাবে গঠিত হবে। সকলেই ভারতের সাকল্যের জন্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছেন।

কুস্তিগীর দল—ছয়জন প্রতিযোগী এবং দু'জন কর্মকর্তা (ম্যানেজার ও কোচ)।

ভারতীয় কুস্তিগীর দল গঠনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বোম্বাইতে একটা ট্রায়াল অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। আর একটা ট্রায়ালের পর চূড়ান্তভাবে দল গঠন করা হবে। ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের কর্মসচিব শ্রী দেওয়ান প্রতাপচাঁদ প্রথম ট্রায়ালের পর বলেছেন যে হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরের কয়েক জন কুস্তিগীর প্রকৃত অপেশাদার নয়—এই অভিযোগে বোম্বাই রাজ্য অপেশাদার কুস্তি এসোসিয়েশন এই সকল প্রতিযোগীকে প্রথম ট্রায়ালে অংশ গ্রহণ করতে দেননি। অভিযোগটি সত্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে ভালভাবে তদন্ত হওয়া দরকার। আশা করা যায়, ফেডারেশন এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হয়ে ভারতীয় দল গঠন করবেন।

রাইফেল শ্যুটিং দল—প্রতিযোগী বিকানীর মহারাজা।

নিখিল ভারত রাইফেল শ্যুটিং প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর ভারতের প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হয়। কিন্তু ভারতের খ্যাতনামা শ্যুটার শ্রীমতী সবিতা চ্যাটার্জী সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিখিল ভারত রাইফেল শ্যুটিং প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ক্রটি-বিচ্যুতির এক দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কয়েক জন রাইফেল শ্যুটার ক্রীড়াক্ষেত্রের এই অঞ্চলের রাজনীতি, ছলনা ও কাপট্য আমদানী করে ফেলেন। বিগত নিখিল ভারত রাইফেল শ্যুটিং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা এমন ভাবে করা হয়েছিল—যাতে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সকল প্রতিযোগী শ্যুটারবৃন্দ শ্রেষ্ঠ আসন না পান। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে, এই নির্ধারণ প্রীয়ে কোন বিবেচনার এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা

হয়েছিল—তাহা বোঝা গেল না। এমন কি, প্রতিযোগীদের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও দেওয়া হয়নি। আসন্ন অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণের পূর্বে এই বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত হওয়া দরকার বলে মনে হয়।

ক্রিমডাটিক দল—প্রতিযোগী শামলাল ও অনন্তলাল।

মুষ্টিবোদ্ধা দল—প্রতিযোগী স্যামি ঘাটাউ।

সাঁতার দল—প্রতিযোগী রামদেও সিং এবং কুমারী সফ্যা চন্দ্র (তবু ভাল, বাঙ্গালা থেকে একজন নির্বাচিত হয়েছেন)।

ভারোত্তোলন দল—প্রতিযোগী ঈশ্বর রাও ও মনোজ দাস এবং একজন ম্যানেজার।

সর্বসাধারণ মনোনয়ন

ব্যক্তিগত ব্যয় বহনের সর্ভে অলিম্পিকে যোগদানের জন্ত নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধিদের সাময়িক ভাবে মনোনীত করা হয়েছে। রাইফেল-শ্যুটার কেশব সেন, উদাচিহ্নভাই, হেমচাঁদ, পি এস চিহ্না ও ম্যানেজার সরদার জয়া সিং। একজন মুষ্টিবোদ্ধা ও একজন ম্যানেজার, একজন সাঁতার ও একজন ম্যানেজার এবং চারজন ভারোত্তোলনকারী।

পশ্চিম জার্মানী সফরে ভারতীয় এথলীট দল

জুন মাসে ভারতীয় এথলীট দল পশ্চিম জার্মানী সফরে বাচ্ছে। তাঁরা একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন বলে ঠিক হয়েছে। এগার জন প্রতিযোগী নিয়ে ভারতীয় দলটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ জন রোম অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। অলিম্পিকের পূর্বে এই সফরের গুরুত্ব কম নয়। ভারতীয় প্রতিযোগীরা সাকল্য অর্জন করুন, এটাই সকলে আশা করেন। নিম্নে মনোনীত ভারতীয় এথলীটদের নাম প্রদত্ত হলো :—

মিলখা সিং, জগমোহন, জোরা সিং, অজিত সিং, লালচাঁদ, মাধন সিং, দলজিৎ সিং, প্যান সিং, মহিন্দর সিং, গুরুবচন সিং, বিদ্যা সিং ও কমাণ্ডার পেরিরা (ম্যানেজার)।

লীগের ভিত্তিতে অলিম্পিক ফুটবল খেলা

অলিম্পিকের মূল ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বোলটি দল চারটি বিভাগে প্রাথমিকভাবে অংশ গ্রহণ করবে। লীগের ভিত্তিতে এবং গুপ বিজয়ীরা প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করবে। তৃতীয় স্থান নির্ধারক সেমিফাইনালে বিজিত দুই দলকে পরস্পরে খেলতে হবে। নিম্নে খেলার তালিকা দেওয়া হলো :—

প্রথম গুপ—মগোলাভিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব

দ্বিতীয় গুপ—ইতালী, যুটেন, ব্রাজিল ও কয়মোসা।

তৃতীয় গুপ—পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, আর্জেন্টিনা ও টিউনিসিয়া।

চতুর্থ গুপ—ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, স্পেন ও ভারত।

ফুটবলে বদলী খেলোয়াড় প্রেরণের সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি দার্জিলিং-এ অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ বার্ষিক সভায় ভারতীয় ফুটবলে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে প্রতিযোগিতামূলক খেলার আহত খেলোয়াড়ের বদলে নতুন খেলোয়াড় গ্রহণ করার যে আনুষ্ঠানিক নিয়ম আছে, উহা ভারতে শীঘ্রই চালু করা হবে। উক্ত নিয়মানুযায়ী গোলরক্ষক আহত হলে খেলার যে কোন সময় তাঁর পরিবর্তে নতুন গোলরক্ষক দলভুক্ত করা যেতে পারে; কিন্তু গোলরক্ষক ছাড়া অন্য কোন খেলোয়াড় যদি আহত হন, তাঁর পরিবর্তে কেবলমাত্র প্রথমার্ধে নতুন খেলোয়াড় খেলান যেতে পারে। তবে খেলোয়াড় যদি গুরুতরভাবে আহত হন এবং রেকারী যদি মনে করেন যে তাঁর পক্ষে আর খেলা সম্ভবপর নয়, সেই ক্ষেত্রে নতুন খেলোয়াড় খেলান চলবে।

আই এক এর লীগ সাব-কমিটি এই সম্পর্কে আলোচনার পর স্থির করে যে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে নির্দেশ আসলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আই এক এর গভর্নিং বডির নিকট বিষয়টি প্রেরণ করা হবে।

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে সকলে সাধুবাদ জানাবেন বলে মনে হয়। কারণ আকস্মিক দুর্ঘটনার আর কোন দলকে অনুবিধায় পড়তে হবে না।

পরলোকে কুস্তিগীর গামা

সম্প্রতি বিশ্বের ভূতপূর্ব চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগীর গামা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। চিকিৎসার জন্য লাহোরের হাসপাতালে আনার সময় গামা লাহোরের নিকটে নদীর ধারে একটা ভরকুটীতে বাস করতেন। শেষ জীবনে গামা অর্ধাভাবে কষ্ট পান।

ভারত বিভাগের ফলে শেষ জীবনে গামা পাকিস্তানে বসবাস করলেও এককালে তাঁর খ্যাতি শুধু ভারতে নয় ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তখনকার দিনে তিনি একমাত্র ভারতীয় কুস্তিগীর যার পক্ষে বিশ্ববিজয়ী আখ্যা লাভ সম্ভবপর হয়েছিল। পরিণত বয়সে মৃত্যু হলেও শেষ জীবন তাঁর বেরুপ অর্ধকষ্টের মধ্যে কাটাতে হয় তা খুবই দুঃখের বিষয়! আশা করা যায়, সকলেই তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাবেন।

কলিকাতা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্টের প্রশংসনীয় উদ্যম

রবীন্দ্র সরোবরে (চাকুরিয়া লেক) কলিকাতা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্টের ট্রেডিয়াম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার ক্রীড়াক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় রচনা হয়েছে। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল গুপ্ত ট্রেডিয়াম নির্মাণের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কলিকাতার এখনও পর্যন্ত কোন বৃহৎ ট্রেডিয়াম কাজে রূপান্তরিত হয়নি। কিন্তু তার পরিবর্তে দক্ষিণ কলিকাতার আঞ্চলিক ক্রীড়াস্টানগুলো এখানে অস্থগীত হতে পারবে। তবে এই ট্রেডিয়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্থানীয় তরুণ ও কিশোর-কিশোরী খেলোয়াড়দের বৈজ্ঞানিক প্রথার শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা। ট্রেডিয়াম সম্পর্কে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানিয়েছেন :—

(১) ৭ একর জমি জুড়ে এই ট্রেডিয়াম। এই স্থানের মধ্যে ৪-৫ একর জমিতে স্পোর্টস ও খেলার মাঠ, ২-৫ একর জমিতে প্যাভেলিয়ন, দর্শকদের প্যালারী ও রাস্তা।

(২) ট্রেডিয়ামের মধ্যস্থলে অলিম্পিকের মাপের (১১৫-৭৫ গজ) ফুটবল ও হকি মাঠ থাকবে।

(৩) দৌড়ের জন্য ৩৫ ফুট চওড়া ৪০০ মিটারের সিঁচার ট্রাক থাকবে।

(৪) সাইক্লিং-এর জন্য (২৫ ফুট চওড়া ও ৪৫২ মিটার দীর্ঘ) ঘাঁবের ট্রাক থাকবে।

(৫) উচ্চ লম্ফন, দীর্ঘ লম্ফন, পোল ভন্ট, ডিসকাস নিক্ষেপ ও সটপাটের ব্যবস্থা থাকবে।

(৬) ৮০ × ৪৬ ফুট আয়তন বিশিষ্ট ট্রেডিয়ামে একটি বহুতা ধিয়েটার নির্মিত হয়েছে। এই কক্ষে ৬৪৪ জন দর্শক বা শ্রোতা বসতে পারবেন। একতলা ও দোতালার বারাগার বর্ধাক্রমে ১২৫ ও ২৭৫ জন দর্শক বসার ব্যবস্থা আছে।

(৭) দর্শকদের জন্য ৫টি ব্লক থাকবে। এর মধ্যে ২টি ব্লকের নির্মাণ কাজ হয়ে গেছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ব্লকের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। এর পর পূর্ব দিকের ব্লক নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

(৮) প্যাভেলিয়ন বিল্ডিংয়ে দোতালার ক্রীড়া-সমালোচকদের জন্য বিশেষ আসন নির্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে কলিকাতা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্টের অবদানকে নিশ্চয়ই সকলে স্বাগত জানাবেন। তাঁদের উদ্দেশ্য সকল হউক, এটাই সকলে চান।

ক্রীড়াক্ষেত্রে বর্তমানে 'রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেসে' পরিণত

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবরে কলিকাতা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট নির্মিত ট্রেডিয়ামের উদ্বোধন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতার ক্রীড়াক্ষেত্রে সম্পর্কে যে কটাক্ষ করেছেন সেটা নিয়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, কলিকাতার ক্রীড়াক্ষেত্রে বর্তমানে "রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেসে" পরিণত হয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ডাঃ রায় ক্রীড়াক্ষেত্রে সকল দুর্নীতির কথা জানেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেন এর প্রতীকার হয়নি, এটাই সকলের প্রশ্ন। ক্রীড়াক্ষেত্রে এই দুর্বলতার জন্য সরকারের কি কোন দায়িত্ব নেই?

মোহনবাগানের তৃতীয় বার বাইটন কাপ লাভ

ক্রীড়াঙ্গণতে বহু ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দল মোহনবাগান ১৯৬০ সালের বাইটন কাপ লাভ করে তাদের গৌরবময় ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। বাইটন কাপের কাইডালে তারা বোম্বাই হইতে আগত ভারতীয় নৌ-বাহিনীকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। এই সাফল্য তাদের এ প্রথম নয়। এর পূর্বে ১৯৫২ ও ১৯৫৮ সালে তারা বাইটন কাপ লাভ করেছিল। ১৯৫৬ সালে তারা কাইডালে উঠে সার্ভিসেস দলের নিকট পরাজয় বরণ করে। এবার মোহনবাগান অপরাধিত ভাবে হকি মরত্তম শেষ করেছে। তারা লীগের "রাপাস-আপ" হর। এবারকার সাফল্যের জন্য দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ই অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।

বৈশাখ, ১৩৬৭ (এপ্রিল-মে, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল): 'ভারত উত্তর সীমান্তের উপর আপন দাবী কোনক্রমেই ছাড়াবে না'—পাটনার জনসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর দৃষ্ট বোষণা।

২রা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল): মধ্যশিক্ষা পর্বে (পশ্চিমবঙ্গ) বর্ধাণ গণতান্ত্রিক সংস্থায় পরিণত করার দাবী—মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের প্রস্তাব।

৩রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল): পৌহাটির জনসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী—ভারতের উত্তর সীমান্তের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৪ঠা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল): স্বতন্ত্র পার্টি নেতা শ্রী সি, রাজাপোপালাচারীকে জনসভায় আক্রমণের চেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাজে জটনক সশস্ত্র যুবক গ্রেপ্তার।

৫ই বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল): প্রতিরক্ষা অডিট রিপোর্ট সম্পর্কে লোকসভায় তুয়ুল হটগোল—সীকার ও শ্রীকিরোজ গান্ধীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা।

৬ই বৈশাখ (১৯শে এপ্রিল): সীমান্ত বৈঠক উদ্দেশ্যে চীনের প্রধান মন্ত্রী মি: চৌ-এন-লাই-এর নয়াদিল্লী উপস্থিতি।

দিল্লীতে প্রায় ৬০ জন হিন্দু মহাসভা কর্মী গ্রেপ্তার—চৌ-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের জের।

৭ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল): চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা লইয়া নয়াদিল্লীতে প্রত্যাশিত নেহরু-চৌ বৈঠক আরম্ভ।

৮ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল): দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে সীমান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে নেহরু-চৌ চার ঘণ্টাব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

উপরাষ্ট্রপতি ডা: রাধাকৃষ্ণ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি পণ্ডিত গৌবিন্দবল্লভ পন্থের সহিত চীনা প্রধান মন্ত্রীর (চৌ) পৃথক বৈঠক।

৯ই বৈশাখ (২২শে এপ্রিল): সমগ্র দেশে (ভারত) একটি ঋজুগণ গঠনই খাতসমস্যা সমাধানের উপায়—সাংবাদিকদের নিকট পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের বোষণা।

তৃতীয় দিনে চীন-ভারত সীমানা বিরোধ প্রশ্নে দিল্লীতে নেহরু-চৌ তিন ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক।

১০ বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল): সীমান্ত প্রশ্নে নয়াদিল্লীতে চীন-ভারত প্রধান মন্ত্রীদের দীর্ঘতম আলোচনার অনুষ্ঠান।

১১ই বৈশাখ (২৪শে এপ্রিল): দিল্লীতে নেহরু-চৌ আলোচনার পঞ্চম দিনেও সীমান্ত বিরোধ সীমাংসার সাধারণ পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা।

করোয়ার্ড ব্লক, আর এসু পি ও বলশেভিক পার্টির উত্তোগে বারাসতে পশ্চিমবঙ্গ খাত-সম্মেলনের অনুষ্ঠান—রাজ্যব্যাপী খাত-আন্দোলন পরিচালনার জন্ত খাতসকট প্রতিরোধ কমিটি গঠন।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত পুনর্বাসন ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের সদলবলে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিতি।

১২ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল): সীমান্ত বিরোধ প্রশ্নে পাঁচ দিনব্যাপী নেহরু-চৌ বৈঠক ব্যর্থতার পর্যাবসিত।

১৩ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল): 'সীমান্ত বিরোধ প্রশ্নে আমরা পরস্পরের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে পারি নাই'—চীন-ভারত প্রধান মন্ত্রীদের সর্বশেষ সম্পর্কে লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

দেশ-বিদেশ

মণিপুরে তিন দিনের জন্ত কারকিউ জারী—সত্যপ্রহীদের (রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন দাবীকারী) উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ।

১৪ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল): খনামঞ্চক রস-সাহিত্যিক শ্রীরাজশেখর বসুর ('পরশুরাম') কলিকাতার বাসভবনে জীবনদীপ নিরীক্ষণ।

১৫ই বৈশাখ (২৮শে এপ্রিল): প্রতিরক্ষা অডিট রিপোর্ট প্রশ্নে তারি বর্ধাণ বিধি পালন করেন নাই—লোকসভায় বিবৃতি প্রশ্নে কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব শ্রী ডি. কে. কৃষ্ণমেননের মন্তব্য।

১৬ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল): ভারতীয় অফিসে চীনা সৈন্যের আক্রমণ প্রশ্নে লোকসভায় প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতিতে চীনের প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ-এর উদ্বা—শিকিং ফিরিবার পথে দমদম বিমানঘাঁটিতে সাংবাদিকদের নিকট মন্তব্য।

১৭ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল): বোম্বাই রাজ্যের বিভাজনান্তে মধ্যরাজ্যে নূতন মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের আভ্যুদয়।

১৮ই বৈশাখ (১লা মে): নূতন মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ সম্পন্ন—মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীওরাই বিচয়ন ও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ডা: জীবরাজ মেহতা।

১৯শে বৈশাখ (২রা মে) নাগপুরে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—পৃথক বিদ্রোহ রাজ্য গঠন আন্দোলন সম্পর্কে অব্যাহত হাজামার জের।

২০শে বৈশাখ (৩রা মে): দক্ষিণ-পশ্চিম কলিকাতা লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কমুনিষ্টপ্রার্থী শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্তের ১৩ সহস্রাধিক ভোটে জয়লাভ—কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্তের পরাজয় বরণ এবং পি এস পি প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত।

২১শে বৈশাখ (৪ঠা মে): জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান এবং দেশের প্রতি জনগণের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ—বোম্বাই-এ নাগরিক সতর্কতার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রপতি ডা: রাজেন্দ্র প্রসাদের দাবী।

২২শে বৈশাখ (৫ই মে): 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ'—প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধি দলের দাবীর উত্তরে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের উক্তি।

২৩শে বৈশাখ (৬ই মে): প্রবর্তিত সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস্-এর প্রতিবাদে প্রবোধ মল্লিক দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের বিরাট সমাবেশ এবং মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের বাসভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

২৪শে বৈশাখ (৭ই মে): উত্তর ভারতের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে

বিরোধী দলের সহিত আসাম সম্রাজ্ঞ পুন্ড্রেশ্বর সংঘর্ষ—৮জন নাগা নিহত ও অপর কয়েকজন আহত হওয়ার সংবাদ।

২৫শে বৈশাখ (৮ই মে): কলিকাতা সহ ভারতের সর্বত্র সাড়ম্বরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত।

২৬শে বৈশাখ (৯ই মে): পার্লিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের প্রতি অনুরোধ—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী সদস্যদের অভিযোগ।

২৭শে বৈশাখ (১০ই মে): পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা কেন্দ্র হইতে রাজ্য বিধান পরিষদের নয়টি আসনের নির্বাচন সম্পন্ন—কংগ্রেসের ৬টি, কমুনিষ্ট পার্টির ১টি, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ১টি এবং অন্যান্য বিরোধী দল সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর ১টি আসন অধিকার।

২৮শে বৈশাখ (১১ই মে): 'মুঠু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডকারণ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্ভাট প্রেরণ উচিত হইবে না'—পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার সর্বসম্মত (সরকারী ও বিরোধী সদস্যবৃন্দ) অভিমত।

২৯শে বৈশাখ (১২ই মে): প্রধান মন্ত্রিত্বের (নেহরু-চৌ) বৈঠকে ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা না হওয়ায় হুঃখ প্রকাশ—কমুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের কলিকাতা বৈঠকের প্রস্তাব।

৩০শে বৈশাখ (১৩ই মে): হায়দ্রাবাদে ভারতীয় রেল-ট্রেন মার্টার ও সহকারী ট্রেন মার্টার সমিতির বৈঠকের সিদ্ধান্ত—দাবীদারদের পুরণ না হইলে ২৪শে আগষ্ট হইতে রেল ধর্মঘট।

৩১শে বৈশাখ (১৪ই মে): জীবিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক কলিকাতা শৌর্যসভার মেয়র পদে ইস্তফা।

বহির্দেশীয়—

১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল): থাই-বিমানবাহিনীর অধিনায়ক সমেত ১৮জন নিহত—থাইপের (ফরমোসা) নিকট বিমান দুর্ঘটনার জের।

৩রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল): এশীয় ও আফ্রিকার জনগণ সামরিক চুক্তি ও আণবিক যুদ্ধের বিরোধী—গিনিতে আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলনের ঘোষণা।

৪ঠা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল): লণ্ডনে একই দিনে দুইটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল—আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের দাবী ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যমূলক নির্ধ্যাতনের প্রতিবাদ।

৬ই বৈশাখ (১৯শে এপ্রিল): সিউল সহ দক্ষিণ কোরিয়ার ৫টি সহরে সামরিক আইন জারী—প্রেসিডেন্ট রী'র বাসভবনের সম্মুখে পুলিশের গুলীতে অসংখ্য ছাত্র হতাহত।

১০ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল): সিংহলের গভর্নর জেনারেল ডায় অলিভার গুণতিলক কর্তৃক সিংহল পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ২০শে জুলাই নূতন নির্বাচন অস্থিষ্ঠানের আদেশ জারী।

১২ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল): ইরাণে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে প্রায় তিন হাজার নর-মারী ও শিশুর প্রাণহানি—দক্ষিণাঞ্চলের লার ও গায়াস সহর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

১৩ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল): জনতার চাপে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সিংহ্যান রী'র পদত্যাগ।

১৫ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল): কাটমাণ্ডু-এ নেপালের প্রধান মন্ত্রী বি. পি. কৈশোরার সহিত চীনা প্রধান মন্ত্রী মি: চৌ এর বৈঠক।

১৫ই বৈশাখ (২৮শে এপ্রিল): আকারা ও ইন্ডাগুলে অবরোধ

অবস্থা ঘোষণা—তুরস্ক সরকার কর্তৃক উত্তর স্থানে সামরিক আইন জারী।

১৭ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল): সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের মার্কিন জাহাজ বর্জন অভিযান শুরু—নিউইয়র্কে আরব প্রজাতন্ত্রের 'ক্রিপ্টোপেট্রা' জাহাজ বর্জনের পাল্টা কার্য্য ব্যবস্থা।

১৯শে বৈশাখ (২রা মে): ১২ বৎসর আইনের লড়াই-এর পর ক্যালিফোর্নিয়ার সানকুয়েটিন কারাগারে প্যাস চেবারে নারীহরণের দায়ে কয়েদী-লেখক ক্যারিল চেসম্যানের মুক্ত্যবরণ।

২০শে বৈশাখ (৩রা মে): বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: হারল্ড ম্যাকমিলান কর্তৃক লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের উদ্বোধন—ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী জীনেহরু প্রমুখের বোগদান।

২১শে বৈশাখ (৪ঠা মে): আগামী চার বৎসরে এক কোটি ৭০ লক্ষ ম্যাট্রিক টন মার্কিন খাদ্যপত্র ভারতকে প্রদানের ব্যবস্থা—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার (আমেরিকা) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত।

সীমান্ত নেতা খান আব্দুল গফুর খানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাক ট্রাইবুনালের পরোয়ানা জারী—উচ্ছেদমূলক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ দায়ের।

২২শে বৈশাখ (৫ই মে): ১লা মে (মে দিবস) সোভিয়েট আকাশ হইতে রকেটের সাহায্যে পাইলট সমেত মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করার চাকল্যকর সংবাদ—মুশ্রীম সোভিয়েটে রুশ প্রধানমন্ত্রী ম: ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

২৪শে বৈশাখ (৭ই মে): স্বাস্থ্যের কারণে মার্শাল ভরোশিলভের প্রেসিডেন্ট পদ হইতে অবসর গ্রহণ—ম: লিওনিদ ব্রেজনেভ তাঁহার স্থলে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত।

২৫শে বৈশাখ (৮ই মে): প্যারিসে প্রেসিডেন্ট চার্লস ড গলের সহিত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জীনেহরুর বৈঠক—শীর্ষ সম্মেলন, জাৰ্গণ প্রস্ন, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ পর্যালোচনা।

২৭শে বৈশাখ (১০ই মে): 'মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের ব্যবহারের জন্ত বাঁটি দেওয়া হইলে প্রতিশোধাত্মক কার্য্য-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে'—পাকিস্তান, তুরস্ক ও নরওয়েকে লক্ষ্য করিয়া সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সতর্কবাণী।

২৮শে বৈশাখ (১১ই মে): 'স্বাধীন বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষার জন্তই রুশিয়ার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি চালাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে'—ওয়ারশিণ্টনে সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ঘোষণা।

২৯শে বৈশাখ (১২ই মে): রুশিয়ার ভূপাতিত মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের পাইলট ফ্রান্সিস পাওয়ার্স কর্তৃক গুলুচর বৃত্তির অভিযোগ স্বীকার—মস্কোর পাওয়ার্সের বধোচিত বিচারের উদ্যোগ আরোহণ।

আমেরিকা কর্তৃক সোভিয়েট অভিযোগ অস্বীকার—গোয়েন্দা বিমান প্রসঙ্গে রুশ সরকারের নিকট মার্কিন নোট প্রেরণ।

৩০শে বৈশাখ (১৩ই মে): দশ দিবসব্যাপী কমনওয়েলথ সম্মেলনের (লণ্ডন) সমাপ্তি—প্রধান মন্ত্রীদের বৌধ ইচ্ছাহারে শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব উদ্ভেজন্য হ্রাস ও নিরস্ত্রীকরণের পথ খুলসম হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ।

৩১শে বৈশাখ (১৪ই মে): প্রাচ্য-প্রতীচ্য শীর্ষ সম্মেলনে (১৩ই মে) বোগদানের জন্ত রুশ প্রধানমন্ত্রী ম: নিকিভা ক্রুশ্চেভের প্যারিস উপস্থিতি।

বেকার-সমস্যা

“বর্তমান বেকার-সমস্যার লম্বাধারের জন্য এক দিকে সরকারী কর্তারা সমবায় ভিত্তিতে ছোট ছোট শিল্প গড়িবার জন্য বাঙ্গালী যুবকদের উদ্বোধনী হইতে বলিতেছেন, অন্য দিকে আবার তাহাদের উদ্বোধনের দক্ষা-রক্ষা করিতেও ছাড়িতেছেন না। কল্যাণীতে শিক্ষিত যুবকদের নানা বিষয়ে ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা গভর্ণমেন্ট করিয়াছেন। কল্যাণী হইতে শিক্ষালভের পর কয়েকজন যুবক সমবায় ভিত্তিতে একটি বাগিচা, ড্রাম ইত্যাদি তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। সরকার হইতে ইহাদের অর্থ সাহায্য করিবার কথা; কিন্তু এক বৎসরের উপর হইতে চলিল, সরকারী সাহায্য আর ইহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। এই ধরনের ঘটনা একটি নয়—আরও আছে বলিয়াই জানা যায়। সরকারী অর্থ সাহায্যের অভাবে এই ধরনের প্রচেষ্টা অকুরেই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে সরকারী দীর্ঘস্থায়িতার অবশান হইতেছে না।”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

চোর-পুলিশ

“রেলের বৈদ্যুতিক তার এবং ডাক বিভাগের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার চুরির কথা প্রায়ই শুনা যায়। কিন্তু গত রবিবার শেষ রাত্রে মানকুণ্ড ও ভদ্রেশ্বরের মাঝামাঝি স্থানে বৈদ্যুতিক রেলপথের তার চুরির ফলে যে বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর! এই স্থানে তার চুরির ফলে দিল্লী এক্সপ্রেস ও দেয়াহুন এক্সপ্রেসের হাওড়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হয়। একজন হাওড়া আগমনকারী পাঁচখানা স্বেচারবন ট্রেন বাতিল করিয়া দিতে হয়। অবশেষে তিন ঘণ্টা কালব্যাপী চেষ্টার পর নতুন বৈদ্যুতিক তার বসানো হয় এবং নিয়মিতভাবে ট্রেন চলাচল আরম্ভ হয়। এই ঘটনা হইতে রেলের বৈদ্যুতিক তার চুরি সম্বন্ধে রেল কর্তৃপক্ষের অধিকতর সতর্ক হওয়া কর্তব্য। সত্য বটে যে, রেলের সকল স্থানে দিবারাত্র তারের পাহারা বসানো সম্ভবপর নহে। কিন্তু সাধারণের ধারণা যে এক বিশেষ শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীর দল এইরূপ অনাচারের নায়ক এবং তাহাদের সহিত রেল নিয়োজিত ব্যক্তি ও পুলিশের যোগসাজশ রহিয়াছে। বাহারা তার বিক্রয়ের ব্যবসা চালায় দুষ্কৃতকারীদের সহিত তাহাদেরও যোগাযোগ রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যায়। রেল কর্তৃপক্ষ এই ধরনের চুরি বন্ধ করিবার জন্য যদি একটি নির্ভরযোগ্য বিশেষ ধরনের গোয়েন্দা দল গঠন করেন এবং এই ব্যাপারে সন্দেহজনক ব্যক্তিগণকে যদি বিনা বিচারে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সুকল হইতে পারে বলিয়া মনে করি। মোটের উপর, ব্যাপারটি একেবারেই উপেক্ষার যোগ্য নহে। কারণ এই শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীদের কার্য-কলাপের ফলে বাস্তবসাধারণের জীবনও বিপর হইতে পারে।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

টেলিফোন বিভ্রাট

“কলিকাতার টেলিফোনের জনৈক মুখপাত্র এখানে সর্বাঙ্গীর্ণ চড়া মাস্তুল ধার্য করার অল্পকালে যুক্তি দিয়াছেন যে,—বোম্বাই-এ লাইন প্রতি কলের সংখ্যা বেশী; সেজন্য পড়তা ধরচ কম পড়ে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আর কলিকাতার লাইন প্রতি কলের সংখ্যা কম, প্রতি বয়ে প্রত্যহ গড়ে সাতটি কল করা হয়। সেজন্য বোম্বাই-এর তুলনায় এখানে টেলিফোন চালু রাখিবার ধরচ বেশী পড়ে। এই কারণেই কর্তৃপক্ষ নাকি কলিকাতার সর্বাঙ্গীর্ণ চড়া মাস্তুল ধার্য করিয়াছেন। এই যুক্তিটি সত্য হইলে মাদ্রাজে লাইন প্রতি কলের সংখ্যা নিশ্চয়ই বোম্বাই অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়ার কথা। নতুবা সেখানে আরও কম মাস্তুল ধার্য হইত না। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ তুলনামূলক অবস্থা আমাদের জানা নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি ইহা জোপাফ করিতে পারিবেন। তবে সে তালিকা না দেখিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, মাদ্রাজে কলের সংখ্যা কোন ক্রমেই বেশী হইতে পারে না, বরঞ্চ অনেক কম। অতএব তাঁহার যুক্তিটি সম্পূর্ণই উদ্ভট কল্পনার আভির্ভাব। ব্যবসাবুদ্ধির দিক দিরাও ইহা অসম্ভব। টেলিফোনের জন্য কর্তৃপক্ষ মাসিক ১৪৮ হিসাবে বে ডাড়া আদায় করিতেন তাহাতেই রক্ষণাবেক্ষণের মাসুলি ধরচ উত্তম হইয়া থাকে। মাসে অনধিক নব্বইটি কল হইলে ডাড়ার মধ্যে বেশ কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। নতুবা সে সব ক্ষেত্রে মাসিক ডাড়া হইতে দুই টাকা রিভেট দেওয়ার পরেও প্রচুর মুনাফা হইত না। কলিকাতা টেলিফোনের একজন মুখপাত্র এরকম উদ্ভট যুক্তি দ্বারা নিজেকে হাত্তাপদ না করিলেই সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন।” —যুগান্তর।

অন্ধ বিদ্বেষ

“শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বর্তমানে মার্কিন মুলুক সফর করিতেছেন। একবার কংগ্রেসী সভানেত্রী হইবার পর তাঁহার মুখ খুলিয়া গিয়াছে। সহজে তিনি চূপ করিয়া থাকিতে পারেন না। আর মুখ খুলিলেই বেকাস বলিয়া ফেলেন। মার্কিন দেশে ভারতীয় ছাত্রদের এক সভায় তিনি বলিয়াছেন, চীন যে সময়ের মধ্যে উন্নতি করিয়াছে তাহার বিগুণ সময়ও যদি ভারত উন্নতি করিতে পারে তাহা হইলেও ভারতবাসী সন্তুষ্ট থাকিবে। কিন্তু তাহাও না করিতে পারিলে ভারতবাসী নাকি চীনের প্রতি ঝুঁকিবে (ইন্দিরা গান্ধীর ভাষায় অবশ্য চীনের একনায়কত্বের প্রতি ঝুঁকিবে।) খাস আমেরিকায় বসিয়া চীনের বিপুল অগ্রগতির স্বীকৃতি ভালো, কিন্তু প্রকারান্তরে ভারতের যে তুলনামূলক শোচনীয় চিত্র তাঁহার বক্তৃতা উদঘাটিত হইল সে জন্য তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই বরং একই সঙ্গে চীনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন। ক্রমে ইহাই পরিস্ফুট হইতেছে যে, চীনের অগ্রগতি প্রভাব হইতে ভারতের মালুমকে দূরে রাখার জন্যই যে কোনো উপলক্ষ্যে যে কোনো কংগ্রেস-নেতা আজকাল তাঁহাদের মনোবো কেন্দ্রীভূত করিতেছেন। সম্প্রতি পণ্ডিত পট্ট ও কংগ্রেস সভাপতি জীয়েজিৎ বক্তৃতাভঙ্গী হইতেও তাহা অস্বপ্নমান করা যায়। আ পণ্ডিত নেত্রক স্বয়ং কখনওয়েসলথ সম্মেলনে বসিয়া বলিলেন চীন, সমগ্র

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিরোধের মধ্যে তাঁহার বক্তব্য সীমায়িত রাখিলে তবু ক্রমবিকাশের ক্রোধের কারণটা বোঝা যাইত।”

—স্বাধীনতা।

ঘড়ি তৈরি

“ঘড়ি তৈরির বড় কারখানার কথা খুব শোনা যাইতেছে, ১৫ টাকার নাকি টেবিল ঘড়ি পাওয়া যাইবে। এই একটি জিনিষ কুটীরে খুব ভাল তৈরি হইতে পারে সুইজারল্যান্ড তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে। দিল্লী সরকারের শিল্প ও শ্রম ডিরেক্টর ঘড়ি তৈরিকে কুটীরশিল্প পর্যায়ে কেলিয়াছেন এবং বাহারা উহার জন্ম টাকা ও সুযোগ চায় তাহাদের দরখাস্ত আহ্বান করিয়াছেন। মে মাসের মধ্যেই বোধ হয় টাকা দেওয়া শুরু হইয়া যাইবে। দেয়াল ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি এবং হাত ঘড়ি তিনটিই তাহারা তৈরি করিবে। এই তিনটি এবং সেই সঙ্গে ইলেকট্রিক মিটার নির্মাণে বাঙ্গালী তরুণেরা প্রচুর দক্ষতা দেখাইতে পারিবে, ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে তাহা হইবার নহে। এখানে মন্ত্রীরা দুইটি জিনিষে শুধু বিশ্বাস করেন—বৃহৎ শিল্প এবং চৌর-সম্ভার। সংশ্লিষ্ট ঠাহাদের আস্থা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের মারকং ছাড়া টাকা দিবে না, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার টাকা চাহিবে না। বাঙ্গালী তরুণের সুযোগ মিলিয়াও যিলাবে না।”

—যুগবাণী (কলিকাতা)

ভাগ্যের পরিহাস

“ব্যয়ের পরিমাণ দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। পুনর্কাসনের জন্ম ১১৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে কিন্তু অর্জনের নিষ্ঠুর পরিহাসে পার্টিশানের কালিমা এখনও মুছিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গালী আজ হারখার হইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালী স্বাধীনতার স্বাদ এখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই, পারিয়াছে কেবল বেদনা ও অন্ধার। বাহারা দিল্লীর মসনদে আছেন তাহারা আজ কোথায় থাকিতেন যদি এই অভিশপ্তের দল পার্টিশানের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিত? মানুষের বেদনাকে লইয়া এইভাবে উপহাস আর কতকাল চলিবে? যে অসন্তোষের আগুন বিকি বিকি করিয়া জ্বলিতেছে তাহার পরিব্যাপ্তি ঘটিলে বক্তৃতার সাহায্যে তাহাকে ঠেকানো কি সম্ভব হইবে? হে ভাগ্যবিধাতার দল! সতর্ক হও, লোকসভায় ঝট মেজরিটির উদ্ভাস্ততার বাস্তবকে উপেক্ষা করিও না, স্মরণ কর লোহমানব সর্দার বলভতাই প্যাটেলের সেই সতর্কবাণী, “It will be folly to ignore realities; facts take their revenge if they are not faced squarely and well.”

—সমাধান (হুগলী)

অসহনীয় পরিস্থিতি

“আবার সেই চিরন্তন সমস্যা—বা মানুষের মূল ও প্রধান সমস্যা। এই মূল সমস্যা মাথা চাড়া দিয়াই আছে—আলোচনা ও সমালোচনা কথিক বা সাময়িক ভাবে হইলেও সমস্যা বেখানে দেখানোই

আছে—সমাধানের পথ হুয়ের দিগন্তে, যার স্পর্শ অস্বস্ত হইয়াই, কবে হইবে কেহ জানে না—বলিতেও পারে না। বাহাদের বলিবার কথা বা বাহাদের কাছে জনসাধারণ এ সবকে কিছু জানিবার প্রত্যাশা করে সেই কর্তৃপক্ষও প্রকৃতপক্ষে নীরব। চাউলের দর আবার বাড়িতেছে—খুব যে একটা কমিয়াছিল তাহা নয়, তবে বাহা হিতাবস্থায় ছিল তাহা আবার ধীরে ধীরে আকাশচুম্বী হইবার পথ ধরিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। মিলভালা বা আড়ভার বলিতেছে যে বেহেতু আমদানী কম সেইহেতু দর বাড়িতেছে, আমরা দেখিতেছি যে বহু অবস্থাপন্ন জাতিদের দেশের আপামর মানুষের প্রতি উদাসীন থাকিয়া আরও দর বা লাভের প্রত্যাশার ধান আটকাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা এবারের বর্ষে বিলম্ব দেখিয়া আরও উৎকল হইতেছেন। এই ধরণের দেশ বা দেশের মানুষের সবক্ষে উদাসীন, বিস্তার প্রতি অভিলোভ যে কতদিন তাহাদের খেলা দেখাইতে থাকিবে কে জানে? কর্তৃপক্ষ নীরব অথচ বেশীর ভাগ মানুষের জন্ম তাহাদের সরব হওয়া প্রয়োজন ছিল বা আছে। গ্রামাঞ্চলে চাউলের অভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে—অচিরেই হয়ত প্রকটতর হইয়া উঠিবে। অথচ গ্রামাঞ্চলে মজিকারেড রেশনিং-এর বন্ধোবন্ধের এখনও অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। উপদেশ বক্তৃতা বাণী ও এ সবকে বহু জাতকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু সাধারণ মানুষ তার মর্ম উপলব্ধিতে অক্ষম। সহস্রাঞ্চলে অন্ন-আরী নির-মধ্যবিত্তের হৃদশাও অসীম।”

—বীরভূমবার্তা।

চাই সেচ

“অনাবুষ্টির কলে পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র হাহাকার শুরু হয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিনই দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এর প্রতিকার প্রার্থনা করছেন। কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সুরচিকিৎসক হলেও অনাবুষ্টির কি চিকিৎসা তিনি করবেন? বৃষ্টি আনবার ক্ষমতা তো তাঁর নেই? তবে একেবারেই কি নেই? তেরো বৎসর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। সহস্র কোটি টাকা ব্যয়ে বড় বড় সেচ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত দেশের সর্বত্র জলাসেচের ব্যবস্থা হল না। বাবা ভৈরবের কৃপা, কিংবা বক্রণ দেবের পূজা নয়, অনাবুষ্টির একমাত্র ঔষধ সেচ।”

—জনমত (জলপাইগুড়ি)

ব্যর্থ শীর্ষ-বৈঠক

“শান্তিসম্মেলন যে ব্যর্থ হইবে, এ আভাস আমরা পূর্বেই দিয়াছিলাম, কারণ, সন্ধিবার মধ্যে ছুত থাকিলে তাহা দিয়া ছুত ছাড়ান যায় না। একটা বিরটি ধ্বংসযজ্ঞ হইবেই। বামা চাপা দিয়া হুনিয়ার অন্তরের রাজত্বকে আর কতদিন সুরের রাজত্ব বলিয়া চালান যাইবে? জুরাচুরি, চুরি, বামাবাজি দিয়া এতদিন গণতন্ত্রের নামে খেছাতন্ত্র চলিয়াছে। একটা বিরটি ধ্বংসযজ্ঞের পর পৃথিবী মুক্তিমান করিবে, মানুষে মানুষে নূতন সম্পর্কের সৃষ্টি হইবে। এ সম্পর্কে এ-দেশের মনীষীদের ভবিষ্যৎবাণীর কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ১৯৬১ ও ১৯৬২ সাল যে পৃথিবীর পক্ষে অভ্যস্ত মারাত্মক, ভারতের পক্ষেও, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি।

শান্তিসম্মেলনের ব্যর্থতা, নূতন করিয়া উগ্র মাহুকের সুর—সেই অন্ধকার-ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত দিতেছে।”

—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

উদ্বাস্তদের নিয়ে ছিনিমিনি

“আর প্রত্যাহারই বধন করা হইল তবে আরও দুই দিন আগে করা হইল না কেন? তাহা হইলে হয়ত অসহায় সরল বিশ্বাসী একটি উদ্বাস্তর জীবন শেষ হইত না। একটি উদ্বাস্তর জীবন বধন নিশ্চিতরূপে শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন দাবী না মিটিতেই অনশন প্রত্যাহার করা হইল কেন? ইহা কি অনশনকারী উদ্বাস্তদের দাবীর প্রতি আন্তরিকতার নিদর্শন? কমিউনিষ্ট পার্টি সভায় অনশন প্রত্যাহার দ্বারা প্রথম অনশনকারী উদ্বাস্তদের অনশন ভঙ্গ করিতে বাধ্য করা হয় নাই কি? কমিউনিষ্ট পার্টির সভায় যে আইন অমান্য আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, সম্মিলিত উদ্বাস্ত সমিতির প্রোগ্রামও কি তাহাই ছিল? সম্মিলিত উদ্বাস্ত সমিতির বত সত্য হইয়াছে তথায় কোথাও তো আইন অমান্যের কথা পূর্বে ঘোষণা করা হয় নাই? বাহারা প্রথম সত্যগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তো কোথাও আইন অমান্যের কথা বলেন নাই? বরঞ্চ তাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অগ্রসর হইবার কথাই বার বার ঘোষণা করিয়াছেন। তাহা হইলে হঠাৎ উদ্বাস্তদের উপর কমিউনিষ্ট পার্টির আইন অমান্যের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে কেন? তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্বাস্ত আন্দোলন উদ্বাস্তদের দাবী আদায়ের জন্ত নহে, তাঁহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই আন্দোলন সুরু করা হইয়াছিল? সেই জন্তই অর্ধপথে অনশন প্রত্যাহার করিয়া আইন অমান্যের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে? ত্রিপুরায় আবার একটা অস্বাভাবিকতা সৃষ্টির প্রয়োজনে উদ্বাস্তদের দলে টানার জন্তই কি উদ্বাস্ত আন্দোলনের প্রয়োজন হইয়াছিল? কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছার জন্তই কি উদ্বাস্তদের ক্রীড়নক করা হইয়াছে? কমিউনিষ্ট পার্টির নিকট ত্রিপুরায় শান্তিকামী জনসাধারণ এই প্রশ্নগুলির জবাব দাবী করিতেছে। জানি না, তাঁহারা আদৌ জবাব দিবেন কি না, বহুবার বহু প্রশ্ন করা হইয়াছে, একটিরও জবাব তাঁহারা দেন নাই।”

—পদবাহু (আগরতলা)।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সার্থকতা

“গান, কবিতা, আবৃত্তি, অভিনয় কোনটাই অবাঞ্ছনীয় নয়। জানি, অক্ষয়জ্যৈষ্ঠ তাঁহার গান, প্রাণবন্ত তাঁহার কবিতা, আর বৈচিত্রময় তাঁহার অভিনয়,—সুরে সুরে তিনি বাহুযন্ত্র মাখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। গল্পে গল্পে গল্পে উপভাসে প্রবন্ধে সন্দর্ভে সরস্বতীর ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি বলিব, শুধু আত্মগোষ্ঠানিক আবেষ্টনীর মধ্যে আর তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিলে চলিবে না, জনতাকে তাঁহার শিক্ষার শিক্ষিত এবং কর্তব্যপ্রণয়তার অমুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। পুষ্পিত ভাষার শিরনৈপুণ্য সাহিত্যের ঘোর ঘনঘটা বিকীর্ণ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে মাহুকের মধ্যে মিলাইতে পারা যায় না। এ সবকে কবির নিজের কথাই সামান্য কিছু

(হানাতাবে) উদ্ভূত করিয়া দিলার—“তাঁরা অবতীর্ণ হয়েছে মাহুকের মাহুকের সঙ্গে মেলাবার উদ্দেশ্যে। সাধারণতঃ সে মিলন নিকটের ও প্রত্যাহার। সাহিত্য এসেছে মাহুকের মনকে সকল কালের সকল দেশের মনের সুখোন্মুখি করবার কাজে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী কমিটির সম্মুখে এই এক বিরাট কর্তব্যক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। মাহুকের দরদী এই মাহুটিকে মাহুকের মাঝখানে টানিয়া আনিতে পারার মধ্যেই রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সার্থকতা।”

—পদ্মাবাসী (কালনা)।

বকু দেশ-সেবক

“দেশের সেবক সাজিয়া দেশবাসীদের মঙ্গল করিবার চেষ্টা করিয়া সরলপ্রাণ ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মাইয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছে ও করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর একান্ত সচিব (সেক্রেটারী) জীনির্খল বনু ও স্বাধীন ভারতের স্বনামধন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মহারাজ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের লিখিত পরম ধার্মিকের সেবকের মধ্যে সে বকু দেখিয়া চমকিত ও চমৎকৃত হইবেন। মহারাজ দশরথের আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র যেমন হিন্দু জন্ত বকের পরম ধার্মিক দেখিয়া তুল করিয়াছিলেন, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা-প্রিয়সী স্বরাজ্য দলের স্বর্গত মোতীলাল নেহরুর আদরের একমাত্র পুত্র কত আন্তরিক স্বার্থপর বাহ্যিক স্বার্থত্যাগী দেশসেবকরূপী বকুকে ধার্মিক জানে যে সব ভুল করিয়া তুলকে বজায় রাখার জিদ ধরিয়া মোঙ্গের শাস্ত্রে বর্ণিত এজিদ্দ রাজার মত নিম্ননীর হইতে চলিয়াছেন ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী হইয়াও যে শপথ ভুলিয়া তুল স্বপথে চলায় ভারতকে যে অবস্থায় আনিয়াছেন তাহাতে ইংরাজ দুই শত বৎসরে যে দুর্গতি দিতে পারে নাই, আজ ভারতবাসী পথে কোলাপাত হইতে কুকুরের সঙ্গে ভাত কুড়াইয়া খাইতেছে। বহু বকুরূপী সেবক এর জন্ত দায়ী। সেবকবেশী বকুগুলি থাকিতে দেশের মঙ্গল নাই।”

—জলীপুর সংবাদ।

খাঁড়-সমস্যা

“নিত্য প্রয়োজনীয় জব্যাদির মূল্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় জনসাধারণ এমনিতেই পিষ্ট, তহুপরি জীবনধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় জব্যাদি মহাধর্ম ও দুঃস্বাপ্য হওয়ার জনসাধারণের হৃদশা একেবারে চরমে পৌঁছিয়াছে। এই অবস্থায় বর্বার প্রারম্ভেই চাউলের বাজারের অনিশ্চিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমরা স্বভাবতঃই উদ্বেগ বোধ করিতেছি। বহুনিমিত্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর হইতেই আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সরকার ব্যর্থ হইতেছেন। ইহার পেছনে কোন হুঁচকুর গোপন হাত ক্রিয়ামূলক রহিয়াছে বলিয়া প্রায়ই খবর পাওয়া যায়। এই সন্দেহ যে অন্ততঃ আংশিক পরিমাণেও সত্য, গত কয়েক সপ্তাহে চাউলের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে যুগশক্তিতে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। এই ধরনের বক্তব্যের সহিত যে শুধু সরকারী কর্মচারীর একাংশই জড়িত, তাহা নহে। সন্তুদার

এক ব্যবসায়ীদের একটি অংশও অধিক লাভের আশায় এই অপকর্মে সহায়তা করিয়া থাকে। ফলে অনেক সময় স্বাভাবিক অবস্থায়, যখন চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কোন সঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না, তখনও চাউলের মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া যায়। পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যখন কিস্কিং বিলম্বে সক্রিয় হইয়া উঠেন, তখন মূল্য বৃদ্ধি কিছুটা বোধ হইলেও পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় আর কিয়দূর আসে না। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর হইতে গভ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ভাবে জনসাধারণের মুখের অন্ন লইয়া কোন কোন দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী এবং মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা এই ছিনিমিনি খেলিতেছেন।

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

খ্যালমায়িক পাঠ্যপরিবর্তন

“সম্প্রতি দেখা বাইতেছে, বিভিন্ন হাই ও জুনিয়ার হাই স্কুলের নির্ধারিত পুস্তকতালিকা Book List বহির্ভূত পাঠ্যপুস্তক জোর পূর্বক পড়ানো হইতেছে। ফলে যে সব ছাত্ররা পুস্তক-তালিকা অনুযায়ী বই কিনিয়াছিল তাহাদের আবার নতুন করিয়া আর একদফা বই কিনিতে হইতেছে। ইহার ফলে দরিদ্র অভিভাবকরা অহেতুক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন। কাহার স্বার্থে এই পরিবর্তন করা হইয়াছে ও দরিদ্র অভিভাবকদের এইভাবে অহেতুক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্ত দায়ী কে, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্ত আমরা দুর্নীতি দমন বিভাগকে অহরোধ করিতেছি। নিম্নে দুইটি উদাহরণ প্রকাশিত হইল। প্রয়োজন হইলে আরও তথ্য সরবরাহ করা হইবে। বড়শাল জুনিয়ার হাই স্কুলে বর্ষ শ্রেণীর জন্ত সংকৃত পাঠ্যপুস্তক শ্রীমধব দাস সাংখ্যাতীর্থ প্রণীত সংকৃত-পরিচয় পুস্তক-তালিকায় (Book List) নির্ধারিত করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ প্রণীত সংকৃত-পরিচয় বইটি পড়ানো হইতেছে। ফলে ছাত্রদের দুই দফা বই কিনিতে হইয়াছে। জয়কৃষ্ণপুর পাণ্ডুড়িয়ার জুনিয়ার হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর জন্ত শ্রীবাদবচস্র চক্রবর্তী প্রণীত প্রবেশিকা জ্যামিতি পুস্তক-তালিকায় (Book List) নির্দেশিত হয় কিন্তু বিদ্যালয়ে শ্রীকে পি, বসু প্রণীত আধুনিক জ্যামিতি পড়ানো হইতেছে! ফলে অভিভাবকরা দুই দফা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।”

—বীরভূম (রামপুরহাট)।

শোক-সংবাদ

রাজশেখর বসু

বাঙালার সুপ্রবীণ রসসাহিত্যিক প্রত্নসম্পাদ আচার্য, রাজশেখর বসু মহাশয় গত ১৪ই বৈশাখ ৮১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ১২৮৬ সালের ৪ঠা চৈত্র তাঁর জন্ম। এম-এ পাশ করার পর তিনি আইনের পাঠ নিতে থাকেন। জীবনের প্রথমার্ধে

বিজ্ঞানসাধনাকে ইনি জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ করে রাসায়নিক হিসেবে বেঙ্গল কেমিক্যাল বোর্ড দেন ও পরে ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। পরবর্তীকালে ইনি ঐ প্রতিষ্ঠানের অল্পতম পরিচালকের আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯২২ সালে সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটির মাধ্যমে সাহিত্যের দরবারে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। তদবধি তাঁর সারবান লেখনা অক্লান্ত গতিতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহুবিধ উল্লেখযোগ্য ফসল ফলিয়েছে। “পরশুরাম” ছদ্মনামে স্রাটায়ার ও হিউমারের সংমিশ্রণে বাঙালার রসসাহিত্যে তিনি যে বৈশিষ্ট্য আরোপ করে গেলেন তার তুলনা নেই। কেবলমাত্র রসসাহিত্যিক হিসেবেই নয়, রাসায়নিক, ভাষাবিশেষজ্ঞ, প্রবন্ধকার, শাস্ত্রবিদ ও অহুবাদক হিসেবেও তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। বাঙলা ভাষাচর্চায়ও তাঁর অবদান অতুলনীয়। ১৯৩৫ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির ইনি সদস্য ছিলেন। ‘স্মৃতিকা’ রাজশেখর বসুর এক অক্ষয় সৃষ্টি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭ সালে এঁকে ডি. লিট উপাধিতে এবং ভারত সরকার ‘পদ্মভূষণ’ সম্মানে বিভূষিত করেন। ১৯৫৫ ও ৫৮ সালে ইনি যথাক্রমে রবীন্দ্র পুরস্কার ও আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানকালে রসসাহিত্যিকদের মধ্যে ইনিই সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। এঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে গড্ডলিকা, কঙ্কণী, হুমুমানের স্বপ্ন, গল্পকল্প, ধুলুরীমায়া, কৃষ্ণকলি, নীলতারা, আনন্দীবাই, চমৎকুমারী, লঘুগুরু বিচিন্তা (প্রবন্ধ), কুটীরশিল্প (শিল্পগ্রন্থ) রাসায়ণ ও মহাভারতের অহুবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্যাতীর্থ

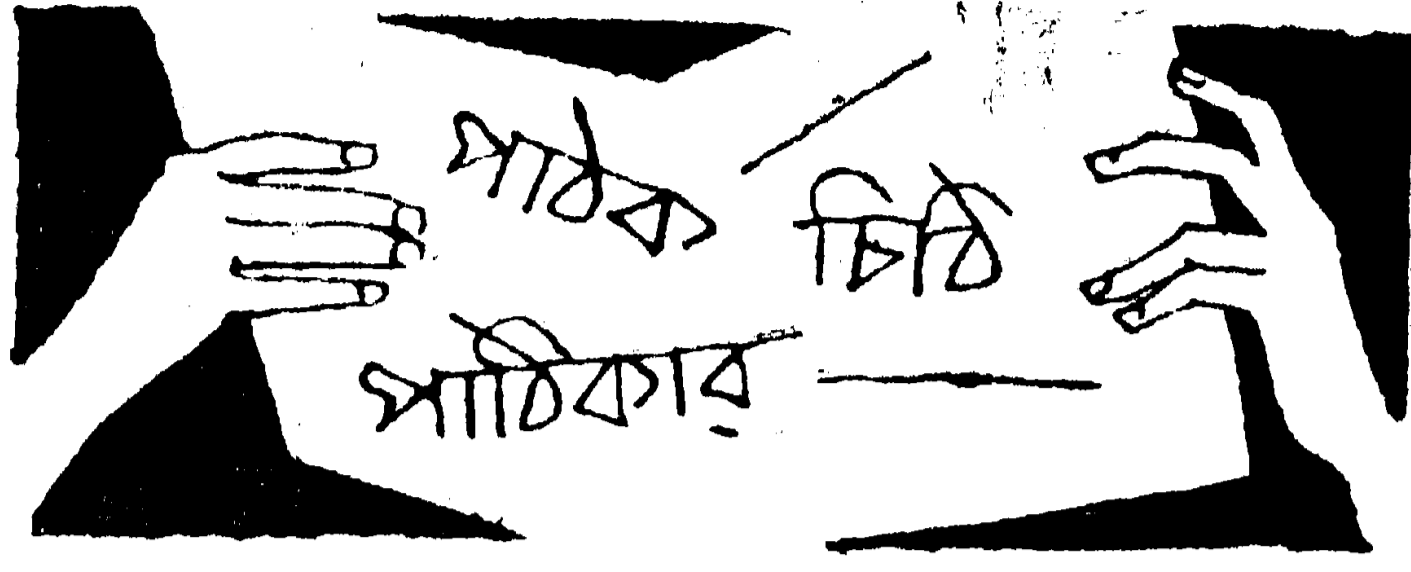
ভারতবর্ষে সুরধীবর মহামহোপাধ্যায় আচার্য যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্যাতীর্থ গত ২২এ বৈশাখ ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নির্ভাবান শিক্ষাব্রতীরূপে এঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এঁর জীবনব্যাপী নীরব জ্ঞানসাধনা দেশ ও জাতিকে বহুভাবে উপকৃত করেছে। প্রাচ্যবাগী-মন্দির এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার ইনি সভাপতি ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে সম্মানাত্মক ডি লিট উপাধিতে বিভূষিত করেন (১৯৫৭)। অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূল্যবান গ্রন্থ এঁর লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে। যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু ভারতবর্ষ থেকে একজন সর্বজনপ্রিয় জ্ঞানসাধকের অভাব ঘটাল।

পান্নালাল বোস

প্রখ্যাত বঙ্গশিল্পী পান্নালাল বোস গত ৭ই বৈশাখ ৪১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ভারতবর্ষে সুরসাধক আলাউদ্দীন খাঁর কাছে ইনি শিক্কালাভ করেন ও পরবর্তী জীবনে বঙ্গশিল্পী হিসেবে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন, বাস্তবত্রে এঁর দক্ষতা বর্ধেই সমাদর লাভ করে এবং সেই কারণে সারা দেশে ইনি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ইতি আকাশবাণীর বাস্তবত্রে সুররচয়িতা ও পরিচালক ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

মাসিকতা ১৯৬৬ নং বিশিষ্টকারী পান্দুলী ষ্ট্রিট, “বঙ্গবন্ধু রোটারী ক্লাব” শ্রীমতীকন্যা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



—সবিনয় নিবেদন—

[পাঠক-পাঠিকা গ্রাহক-গ্রাহিকা অনুগ্রাহক-অনুগ্রাহিকাদের পক্ষ থেকে সম্মানে তাঁদের প্রিয়তমা পত্রিকা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত যাবতীয় লেখা ও রেখার সমালোচনা আহ্বান করা হচ্ছে। 'পাঠক-পাঠিকার চিঠি' বিভাগটি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই বিভাগে প্রশ্ন ও উত্তর মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। যে কোন পার্থিব বিষয়ের অবতারণায় যে কেউ আলোচনা ও আলোকপাত করতে পারেন। বর্তমান সংখ্যা থেকে এই বিভাগে মূল্যবান আলোচনার জন্য কথঞ্চিৎ সম্মান-দক্ষিণা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়েছে। আশা করি পাঠকগোষ্ঠীর নিকট থেকে পূর্বের স্থায় সহযোগিতা মাসিক বসুমতী লাভ করবে।

—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী]

পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, মাসিক বসুমতীর গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "সূর্য সেন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনন্তসাধারণ বিপ্লবী বীরত্বের অরণীয় আলেখ্য বিবৃত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে 'হ'-একটি তথ্যগত ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমতঃ, সপ্তম প্যারাগ্রাফে সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন যে ছয়জন বিপ্লবী সহকর্মীকে বেছে "বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতি" করে কাজ চালাবার ভাব দিয়েছিলেন লিখিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উপেন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে। অতঃপর, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও আত্মসম্মতিক শ্রেষ্ঠ বিপ্লবাসক্ত ঘটনাবলীর বর্ণনায় উপেন্দ্র বাবুর নামোল্লেখ নেই। আমি যতদূর জানতাম ও স্মরণে আছে এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার প্রথম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সুদীর্ঘ রায়ে অথবা অস্ত্র বিবরণীতে উপেন্দ্র ভট্টাচার্য এ সকল মুখ্য ঘটনাবলীর অন্যতম নায়ক বা "সেনাপতি"রূপে দেখছি না। অবশ্য, এটা সত্য যে, নেতৃত্বের "মাষ্টার-দা"র (সূর্য সেনের) ২১টি তালিকার উপেন্দ্র বাবুর নাম ছিল এবং মোকদ্দমার সময় 'উপেন্দ্র' নাম শুনেছি ও শেয়েছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৩০ ইং ১৮ই এপ্রিল রাতে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরদিন 'চট্টগ্রাম আদালত, পুলিশ অফিস ইত্যাদির ওপর ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন' থাকে। ভারতে ব্রিটিশ আগমনের পর এই প্রথম

ও শেষবারের জন্ম চাটগাঁয়ের ওপর ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা সাময়িক ভাবে দেখা যায়।" এই তথ্য সঠিক নহে। ১৯শে এপ্রিল ও তারপর চট্টগ্রামে স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম। সহরে তখন এই বর্ণিত জাতীয় পতাকা দেখা যায়নি। ১৮ই এপ্রিল রাত্রির দুর্ভব ঘটনাবলীর পরই রাতারাতি বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের বাহিরে কুজ-বুহুং দলে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এটা সত্য যে, ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ শৈলশিখরে বিপ্লবী যোদ্ধার দল এবং ব্রিটিশ বাহিনীর মধ্যে কঠোর সংগ্রামের পর 'মাষ্টারদা' ও শ্রীলোকনাথ বলের নেতৃত্বে সাংঘাতিক আহত টেগরা (পরক্ষণেই ব্রিটিশ গুলীতে নিহত হরি বল, লোকনাথ বলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) প্রমুখ মৃত্যুপথযাত্রী তরুণ বিপ্লবীরা অল্পকালের জন্ম ত্রিবর্ণ পতাকা একটি আমলকী গাছের উপর উড়ান করেছিলেন। এবং ইহাই পরাধীন ভারতে রক্তাক্ত বিপ্লবী সৈনিকের হস্তে প্রথম স্বাধীনতার ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন। দ্বিতীয়বার এই পতাকা উঠেছিল নেতাজীর আই-এন-এ বাহিনীর হাতে ইন্ফিলের সমরভঙ্গনে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও তৎসংক্রান্ত অভূতপূর্ব বিপ্লবী উত্থানের পর প্রায় তিন-চার দিন চট্টগ্রাম সহরে ব্রিটিশ শাসন ও সাধারণ জীবনযাত্রা প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অফিস-আদালত একরকম সব বন্ধ, সরকারী মহলে ঘোরতর চাকল্য, রেললাইন ও টেলিগ্রাফ-টেলিফোন সংযোগও প্রায় সম্যক বিচ্ছিন্ন, বিশেষতঃ সরকারী বে-সরকারী ইউরোপীয়ান সকলেই প্রবল ভীতি ও জ্বাসের মধ্যে ১৯শে এপ্রিল থেকে ৩ দিন কর্ণফুলী নদীর মোহনার অদূরে সমুদ্রে একখানি জাহাজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। চতুর্থ দিন অর্থাৎ ২২শে এপ্রিল (রেললাইন ঠিক হওয়ার পর) শিলাং থেকে কর্ণেল ডালাস স্মিথের নেতৃত্বে ইষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম আগমন করেন। এঁরাই শহরের অনতিদূরে জালালাবাদ পার্বত্য অঞ্চলে বিপ্লবী দলের সহিত সৈদিন সারা বিকাল, সন্ধ্যা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে সহরে প্রত্যাবর্তন করেন। তৃতীয়তঃ, গত ফাল্গুন সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে পাঠক-পাঠিকার চিঠির পৃষ্ঠায় শ্রীচিন্তরঞ্জন সেন উক্ত প্রবন্ধ লেখকের বর্ণিত পলাতক সূর্য সেনের সংবাদ বা প্রেক্ষারের জন্ম ব্রিটিশ সরকার ঘোষিত "দশ হাজার" টাকা পুরস্কারের কথা শুধু করে লিখেছেন তা "পনয় হাজার" ছিল। বস্তুতঃ, শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য সঠিক তথ্যই দিয়েছেন। প্রথমে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল বাবং সূর্য সেনের পাত্তা না পেয়ে দুঃস্বপ্ন ব্রিটিশ সরকার তা বাড়িয়ে পনের দশ হাজার টাকা ঘোষণা করেন। (আমি ১৯৩০-৩৪ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিপ্লবমূলক ঘটনাবলী এবং সকল স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ও স্পেশাল বিচারসমূহের তথ্য একমাত্র সংবাদদাতা ছিলাম।) —শ্রীশচীন দত্ত (সাংঘাতিক), কটক।

আধুনিক বঙ্গদেশ

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, আমি গত ১৯৪২ সাল হতে আপনার জনপ্রিয় 'মাসিক বসুমতী'র নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক—১৩৬৫ সাল পর্যন্ত কার্যোপলক্ষে বাইরে থাকাকালীন আমার নির্দিষ্ট হকারের নিকট হতেই কাগজ ও বসুমতী নিয়মিত পেয়েছি ও নিয়েছি। বর্তমানে সে সুবিধা না থাকায় ১৩৬৭ সাল বৈশাখ সংখ্যা হতে মাসিক বসুমতী আমার বাড়ীর নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিচ্ছি। ১৩৬৬ পর্ব সংখ্যায় মাননীয় অধ্যাপক মহাশয় "আধুনিক বঙ্গদেশ" নামক প্রবন্ধে 'পরম্পর নির্ভরশীলতা' অংশে এক জায়গায় বৈরাগ্যভঙ্গার মেলা বীরভূম জেলায় বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু বীরভূম জেলায় প্রায় সমস্তই আমার ঘোরা আছে, সেখানে 'বৈরাগ্যভঙ্গার মেলা' লে কোন মেলা আছে আমার জানা নেই। তবে বর্তমান জেলায় আমার বাড়ী হতে মাত্র ২ মাইল তফাতে দখিয়া গ্রামে গোপালদাস ঠাকুরের পুত্রপীঠস্থানে মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথি হতে ১৭ দিন খুবই জাঁকজমক সহকারে মেলা হয় এবং এই মেলাই বৈরাগ্যভঙ্গার মেলা নামেই প্রসিদ্ধ। এই মেলা A K Rly (আহমদপুর-কাটোয়া) এর মধ্যে মধ্যবর্তী ঠেশনে "রামজীবনপুর" হতেও ২।৩ মাইল মধ্যে। এই মেলাতেই অধ্যাপক মহাশয়ের লিখিত মত দরজা জানালা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়—বহু দূর দেশ হতে বহু রকমের বহু জিনিবের বহু দোকানদার গানের পসরা নিয়ে আসেন। তন্মধ্যে পিতল কাঁসা পাখর ও লোহার জিনিষ ও মাছুর ইত্যাদির দোকানও প্রচুর আসে। মেলায় সিনেমা, ধ্বংসের, সার্কাস ইত্যাদির বিপুল আয়োজন হয়। আপনার জিকার এ তথ্যটা প্রকাশ করিলে বাঞ্চিত হব। বাক্য আপনার ধর্ম্ম্য সময়ের উপর হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হওয়ার ভ্রুটি নেবেন না। আমি যে যে বিষয় উল্লেখ করলাম সে সব বিষয়ে একটু অবহিত হলে বিশেষ বাঞ্চিত হবো।—হরিহর নাগ। নারেন্দ্রা, বর্ধমান।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আমি আপনাদের বহুল-প্রচারিত 'মাসিক বসুমতী'র গ্রাহিকা হইতে চাই, নিয়মাদিসহ বাৎসরিক মূল্য ইত্যাদি পত্রপাঠ জানাইবেন। কার পরিমাণ জানিলেই টাকা পাঠাইয়া দিব।—শ্রীমায়ালতা গালিত, শ্রীনগর, কান্দীর।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে আপনাদের মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই। দয়া করিয়া সমস্ত নিয়মাবলী জানাইয়া দিখিত করিবেন।—শ্রীমতী শ্রামলী দাস, গোপালপুর।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত ছয় মাসের টাকা ৭।।০ টাকা পাঠাইলাম।—জ্যোৎস্না গাজুলী, গৌরকপুর।

নতুন বৎসরের জন্ম বাৎসরিক টাকা বাবদ ১৫৮ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী বিভাবতী চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী রমা রায়, বোম্বাই।

I am too much interested to be a regular subscriber of your Masik Basumati from the month of Baisakh, 1367 B.S. Herewith I am remitting Rs. 7.50 towards my advance subscription. I shall be obliged if you kindly enlist me as your regular subscriber.—Mrs. Pratima Mukherjee, Dhanbad (Behar).

আগামী বৎসরের বার্ষিক টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী রেণুকা সুখাঙ্গী, এলাহাবাদ।

বাংলা ১৩৬৭ সালের (বৈশাখ হইতে চৈত্র) এক বৎসরের টাকা ১৫৮ টাকা পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত সময়ে পত্রিকা পাঠাইয়া বাঞ্চিত করিবেন।—নীলিমা বসু, কলিকাতা।

I am sending herewith Rs. 15/- being annual subscription for the year 1367 B.S. Kindly send the magazine regularly from Baisakh.—Anima Chakravorty, Cachar, Assam.

Remitting Rs. 7.50 being half yearly subscription of Monthly Basumati from Baisakh to Aswin 1367 B.S.—Bina Dey, Burdwan.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টাকা ১৫৮ টাকা পাঠাইলাম।—গৌরী সেন, কটক।

Herewith remitting Rs. 15/- as the subscription of Monthly Basumati for another one year.—Secretary, Rabindra Sangha, Singhbhum.

Remitted Rs. 7.50. Please enlist me as a subscriber of your Monthly Basumati from Baisakh 1367 B.S.—Sujata Sircar, Dum Dum Airport, Calcutta.

আমি আপনার মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই। বৈশাখ ১৩৬৭ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত ৬ মাসের অগ্রিম ৭.৫০ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী মিনতি বিশ্বাস, ধানবাদ।

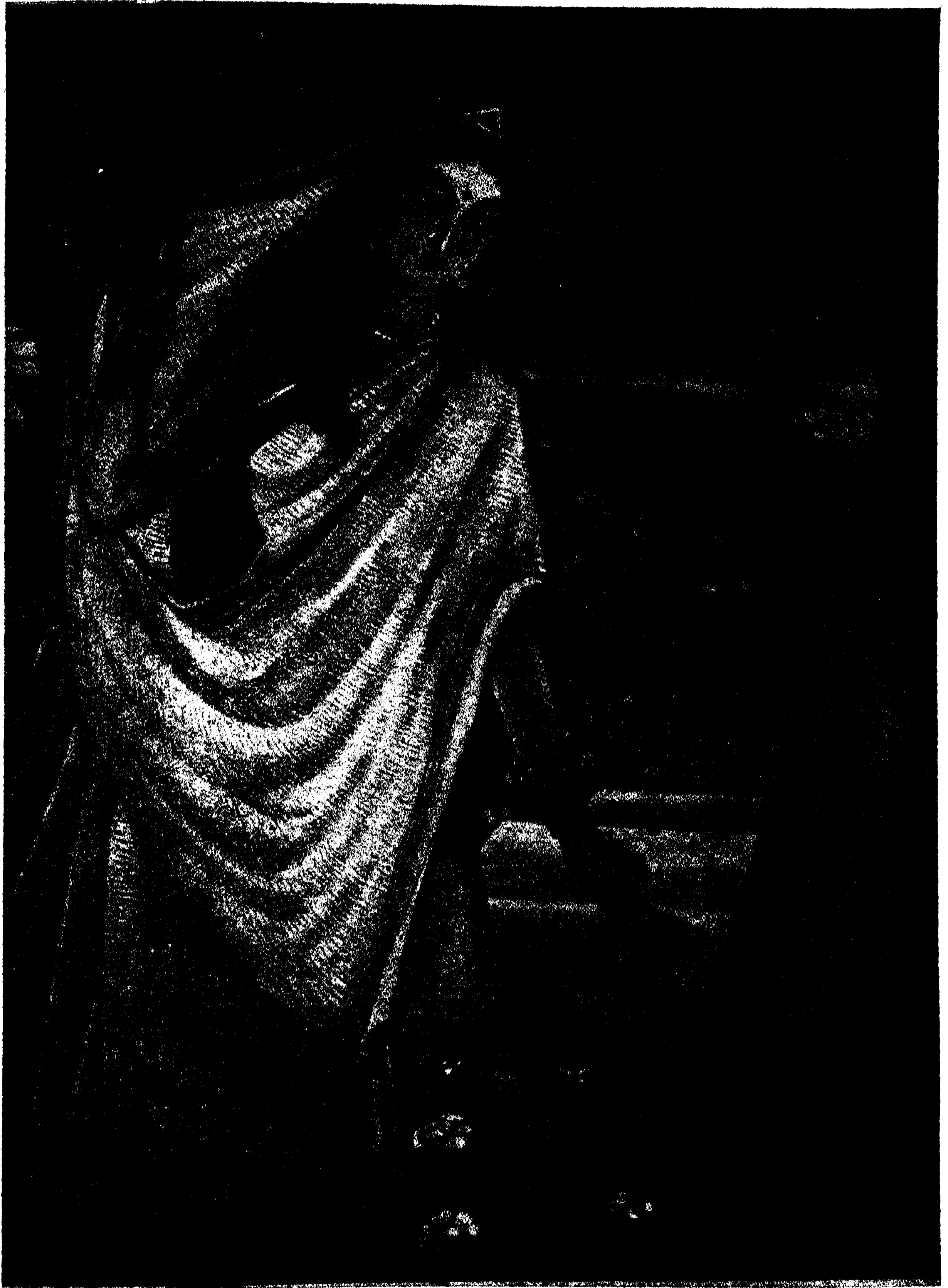
মাসিক বসুমতীর জন্ম ১৩৬৭ সালের বার্ষিক টাকা ১৫৮ টাকা পাঠাইলাম। বসুমতী নিয়মিত পাঠাইয়া বাঞ্চিত করিবেন।—Sri Lata Ghose, Bombay.

১৩৬৭ সনের মাসিক বসুমতীর টাকা ১৫৮ টাকা পাঠাইলাম।—Ashamukul Roy, Calcutta.

১৩৬৭ সালের বাৎসরিক গ্রাহকমূল্য ১৫৮ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী অমিতা রায়, বর্ধমান।

১৩৬৭ সনের বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টাকা ১৫৮ টাকা পাঠাইলাম।—অধিমা রায়, হাজারিবাগ।

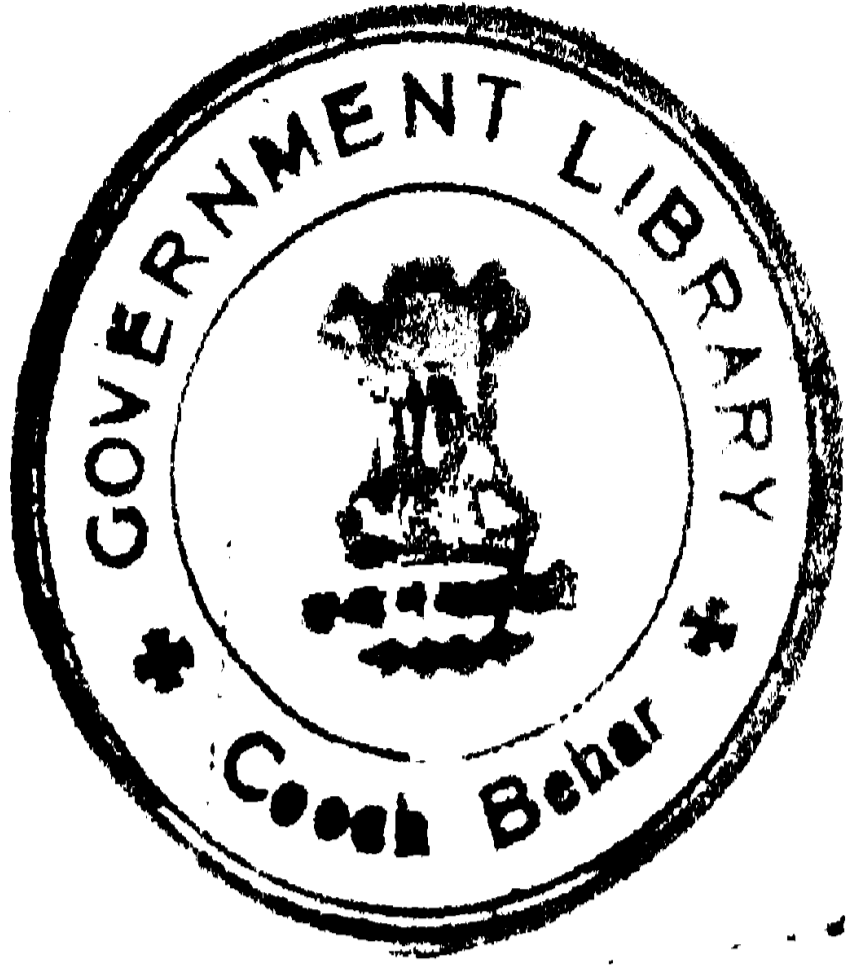
মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক টাকা ৭.৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে আশ্বিন ১৩৬৭ পর্যন্ত নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইলে বাঞ্চিত হইব।—Sm. Madhabika Chatterjee, Puri.



মাসিক বসুমতী
॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ ॥

(জলরঙ)

গ্রাম-যমুনায়
—নৌহাররঞ্জন সেনগুপ্ত অঙ্কিত



সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



মাসিক ফুলতী

৩৯শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥

[প্রথম ৬৩, ২য় সংখ্যা

হিন্দু

যে 'হিন্দু'নামের পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথাস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার এখন কিন্তু আর সার্থকতা নাই; কারণ এই শব্দের অর্থ এই—যাহারা সিদ্ধুদের পারে বাস করিত। প্রাচীন পারসীকদিগের উচ্চারণ-বৈকল্যে এই সিদ্ধু শব্দ 'হিন্দু'রূপে পরিণত হইয়াছে; তাহার সিদ্ধুদের পরপারনিবাসী সকল লোককেই হিন্দু বলিতেন। এইরূপে 'হিন্দু' শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে; মুসলমান শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

বর্তমান কালে সিদ্ধুদের এই তীরবর্তী সকলে আর প্রাচীন কালের মত এক ধর্ম মানেন না। সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটি হিন্দুমাত্র বুঝায় না, উহাতে মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, জৈন এবং ভারতের অপরাপর অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে। অতএব আমি 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে আমরা কোন

শব্দ ব্যবহার করিব? আমরা 'বৈদিক' (অর্থাৎ যাহারা বেদমতানুবর্তী) শব্দ ব্যবহার করিতে পারি, অথবা 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়।... আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেকেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক। কোন কোন স্থলে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে সকল স্থলেও উক্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির ক্রমসন্নিবেশ অধিকাংশ স্থলে বেদানুযায়ী নহে—তন্ত্র বা পুরাণানুযায়ী। অতএব বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের অনুবর্তী এই অর্থে আমাদের 'বৈদিক' নামে অভিহিত করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা যে সকলে বৈদান্তিক, ইহা নিশ্চিত। হিন্দুনামে যাহারা পরিচিত, তাহাদিগকে 'বৈদান্তিক' আখ্যা দিলে ভাল হয়।

হিন্দুগণ কেবলমাত্র মত বা শাস্ত্রবিচার লইয়া থাকিতে চান না। যদি অতীন্দ্রিয় সত্তা কিছু থাকে,

তিনি তাহাকে সাক্ষ্য করিতে চান। জড়ের সহিত সহকরহিত আত্মা যদি থাকেন, যদি দয়াময় সর্বব্যাপী পরমাত্মা থাকেন, তিনি তাঁহার সাক্ষ্যকার লাভ করিতে চান। কারণ তাঁহাকে দর্শন না করিলে কখনও সন্দেহ দূর হয় না।

হিন্দুরা অপরোক্ষানুভব-ধর্মকেই প্রধান ও চরম লক্ষ্যরূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন। মানবকে ঈশ্বরোপলব্ধি দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং দেব-বিগ্রহই হউক, দেবালয়ই হউক বা ধর্ম-শাস্ত্রই হউক, এই সমুদয় তাঁহার ধর্মজীবনের বাল্যাস্ত্র সহকারী মাত্র; এ সকল তাহার চরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নহে।

সেই অতি প্রাচীন কালে ভারতে একজন অতি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়, জগতে এইরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। এই মহাপুরুষ সেই প্রাচীন কালেই এই সত্য উপলব্ধি ও প্রচার করেন—“একং সন্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি।”—বাস্তবিক, জগতে একমাত্র বস্তু আছেন, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানাভাবে বর্ণনা করেন। একরূপ চিরস্বরগীয় বাণী আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই, একরূপ মহান সত্য আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আর এই সত্যই আমাদের হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই তত্ত্ব—“একং সন্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি”—ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইয়া আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে ওতপ্রোত ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—যেন সর্বাংশে আমাদের জীবনের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে।

তুমি হয়ত দ্বৈতবাদী, আমি হয়ত অদ্বৈতবাদী।
তোমার হয়ত বিশ্বাস—তুমি ভগবানের নিত্যদাস,

আবার আর একজন হয়ত বলিতে পারে, আমি ভগবানের সহিত অভিন্ন, কিন্তু উভয়েই ষাট হিন্দু। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেই মহাবাক্য পাঠ কর, তাহা হইলেই ইহা কিরূপে হয় বুঝিবে—
“একং সন্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি।”—একমাত্র সত্তাই আছেন, বিপ্রাঃ অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

এই একটিমাত্র বিষয়ে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত যে, আমরা সকলেই আমাদের শাস্ত্র—বেদে বিশ্বাসী। এইটি বোধ হয় নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি বেদের সর্বোচ্চ প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার অধিকার নাই।

হিন্দুদের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব দেখিতে পাইবে—তাঁহা আধ্যাত্মিকতা। অগ্র কোন ধর্মে, পৃথিবীর অপর কোন ধর্মপুস্তকসমূহে ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে এত অধিক শক্তিক্ষয় করিয়াছে দেখিতে পাইবে না। তাঁহারা একরূপভাবে আত্মার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন পার্থিব সংস্পর্শই ইহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আত্মা অপার্থিব বস্তু এবং এই অর্থে উহাতে কখনও মানবীয়ভাব আরোপ করা যায় না। সেই একত্বের ধারণা—সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধি সর্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে।

হিন্দুরা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধার্মিক জাতি হইয়াও বাস্তবিকই ভগবন্নিন্দা বা ধর্মনিন্দা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। তাহাদের মতে ভগবান বা ধর্মসম্বন্ধে যে কোন ভাবে আলোচনা করা হউক না, তাহাতেই পবিত্রতা ও কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে আর তাহারা অবতার বা শাস্ত্র বা ধর্ম ধ্বংসিতার প্রতি কোনপ্রকার কৃত্রিম শ্রদ্ধা বা ভক্তি দেখায় না।

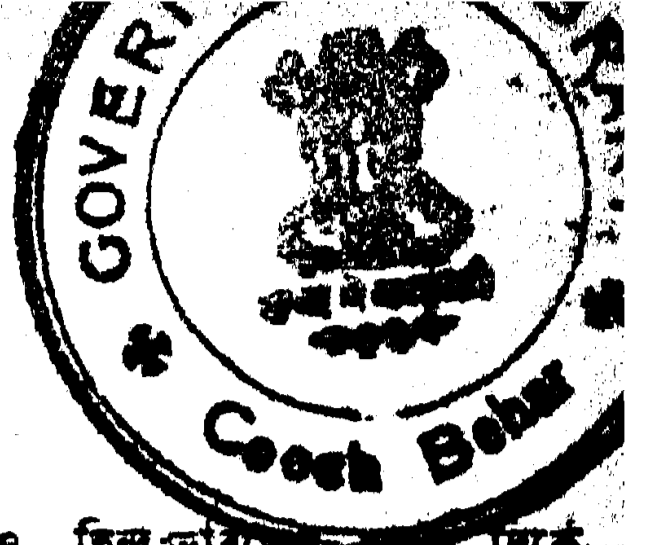
—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নূতন ভারত বাহির হউক। বাহির হউক লাজল ধরিয়া, চাবার কুটির ভেদ করিয়া, জেলে মালা মুচী মেথরের বুপড়ির মধ্য হইতে। বাহির হউক মুদির লোকান হইতে, তুনাওয়ারা উলুনের পার্শ্ব হইতে। বাহির হউক কারখানা হইতে, হাট হইতে, বাজার হইতে। বাহির হউক বোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত হইতে। ইহারা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সহিয়াছে, নীরবে সহিয়াছে— তাহাতে লাভ করিয়াছে অপূর্ব সচ্ছন্দতা।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

নারীর বিবাহকাল

শ্রীবেণনাথ ভট্টাচার্য



প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম ভাগে ভারতের অরণ্যচারী ও গৃহবাসী বাসাবর আদিমানবেরা ছিল খাজ-সংগ্রাহক। আরণ্যক পরিবেষ্টনে উদরপূর্তির হুল প্রয়োজনে মৃগয়াবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। সূর্যোদয়ের সংগে সংগে পুরুষেরা শিকার অশেষণে বহির্গত হ'য়ে দিনান্তে তাদের অস্থায়ী বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করত। নারী ও শিশুরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাদের আগমন প্রতীক্ষার থাকত। তারপর মৃগয়ালক মাংসে কুখার নিবৃত্তি হ'লে গণনৃত্যে ও সমবেত সংগীতে তাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হ'ত। বিবাহ ও পরিবার তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি স্বর্ক তাদের মনে কোন ধারণাই জন্মায়নি। তারা গণবিবাহে দলবদ্ধভাবে বাস ক'রত। মিথন-বিহারে তাদের কোন রকম শালীনতা বা সত্বকবোধ ছিল না। দৈহিক প্রয়োজনেই যৌন-সংসর্গকে তারা স্বীকার ক'রে নিষেছিল ব'লে ইচ্ছামত সহচর বা সহচরী পরিবর্তনে তাদের কোন রকম কৃথা দেখা যেত না। তারপর একদা কৃষিকর্মের আবিষ্কারে তাদের জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হ'ল। পরবর্তী কালের মানুষেরা খাজাশেষণের বাসাবর বৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে স্থিতিশীল জীবনে প্রতিলিপিত হ'ল ও খাজ উৎপাদনে মন দিল। উৎপাদন বৃত্তির সংগে সংগে তাদের মনে জাগল সঞ্চয়-সংগ্রহ, প্রাচুর্য সৃষ্টি ক'রল ভোগের বাসনা, আর সেই বাসনা থেকেই সৃষ্টি হ'ল পরিবার। কৃষি প্রধান সমাজে পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হ'ল। উদ্বৃত্ত খাজের বিনিময়ে ভোগের বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করা সহজ হওয়ার মানুষ প্রথমেই নারীকে সংগ্রহ ক'রল। এই নারীই তার স্বর্কপে পরিচিত হ'ল। অবশ্য আদিমযুগেও নারীক্রয় অপ্রচলিত ছিল না। খৃতা নারী তখন দলীয় সম্পত্তিরূপে গণ্য হ'লেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বন্দীকারী এক বা একাধিক পুত্র বিনিময়ে ভিন্ন আবাসে ঐ নারীর সংগে একক সহবাসের অধিকার পেত। তবে এই প্রথা তখন ছিল ব্যতিক্রম, পরে নিয়মে পরিণত হ'ল। মানুষ তত্ত্বমাত্র তার স্ত্রীর অধিকারী হ'ল না, তার সম্ভানদেরও অধিকারী হ'ল। মৃগয়া-জীবনে শিক্ত ছিল অপ্রয়োজনীয় বোঝা, কুখার্ত শিক্তকে কষ্টার্জিত আহাৰের অংশ দিতে হ'ত। এখন যৌবনের সহকর্মী ও বার্কিকোর আশ্রয়রূপে সম্ভান সম্পদে পরিণত হ'ল। এই সম্পদের সৃষ্টিকারিণী হওয়ার মানুষ দৈহিক ও বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থে নারীকে স্ত্রীর অধিকার দিল, স্বচ্ছায় তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রল। কালে নর-নারীর এই মিলনই বিবাহরূপে অমুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ ক'রেছিল।

দৈহিক লাভসার চরিতার্থতা ও সম্ভানলাভের বাসনা এই বিবিধ উদ্দেশ্যে নিয়েই প্রথম যখন নারীকে স্ত্রীরূপে পরিবারভুক্ত করা হ'ল, তখন সে নিশ্চয়ই নাবালিকা ছিল না। বরং যৌন সম্পর্ক স্থাপন ও সম্ভান ধারণের উপযোগী দৈহিক পরিণতি সে লাভ ক'রেছিল। মনে রাখতে হবে, নারীর দাসত্ব-বন্ধন একদিনের সৃষ্টি নয়। দৈহিক পরাক্রম, সম্পত্তি-মিলন ও সম্ভানলাভের প্রয়োজনে নারী ক্রমে

পুরুষের সম্পত্তিরূপে পরিণত হ'লেও, হিন্দু ভারতের অধিকাংশ অংশে সাধারণ ভাবে নারীর স্বাভাবিকতা ছিল, তার স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হ'ত।

স্বর্কের যুগে তরুণীরা সাধারণতঃ ঋতুমতী হবার পরেই উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'ত। ঘোষা, বিশ্বারা, অপালা, প্রজ্ঞা-কামায়নী, বমী, লোপামুদ্রা, জরিতা, গোপারনা, পৌলমী প্রভৃতি অবিবাহিতা তরুণীর পিতৃগৃহে বাস ও উচ্চ শিক্ষালাভ, উৎসব-অমুষ্ঠানে প্রণয়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ মানসে প্রণয়কলাশীলা যুবতী তরুণীদের বিচিত্র আভরণ-সজ্জা, প্রেমিকার চিত্ত-বিজয়ে প্রেমিকের উপায়ন প্রদান, যৌবনবতী প্রণয়ীর সংগে যুবক প্রণয়ীর পূর্বরাগ, প্রেমিকার নিভৃত সংস্রবের আকুলতার নিশাগমে সমস্ত গৃহবাসীকে মন্ত্রবলে নিমিত্ত করার উত্তোগ-আয়োজন, কষ্টকে তার স্বচ্ছা-সম্মতিতেই পিতৃগৃহ থেকে হরণ—এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ থেকে বৈদিক যুগে প্রাপ্তযৌবনা অবিবাহিতা তরুণীদের অবস্থিতি প্রমাণিত হয়।

বৈদিক-বিবাহের বিস্তারিত আচার-অমুষ্ঠান ও মন্ত্রগুলিও প্রাপ্তবয়স্ক যুবক-যুবতীর বিবাহ স্বর্ক্রে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। বিবাহ-অমুষ্ঠানের প্রারম্ভেই নববধূ পতিকে বরণ করে—

বরণাশ্বঃ, বৃশে স্বাহিত্ত বৃশে চিত্তঃ বৃশে মনঃ।

বৃশে সৌম্যসং হারিঃ আশ্বানঃ স্বাহিত্তা বৃশে।

ওগো বরণীর্, আমার চিত্তে তোমার চিত্তকে আমি বরণ করি। আমার প্রীতি, আমার আশ্বার অর্থ্য সাজিয়ে আমি তোমার প্রীতি ও আশ্বাকে বরণ করি।

সন্তপদী পরিক্রমায় পতি পত্নীকে সথারূপে আহ্বান জানায়—
আমাদের যুক্ত-জীবন সুগভীর প্রণয়ে, নিত্য সহবাসে পরমানন্দে অতিবাহিত হোক। পরম্পরের কল্যাণ কামনা ক'রে আমরা একত্রে বিস্ত, বৈভব ও ঐশ্বর্য উপভোগ করি। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের চিন্তা-ভাবনা সংযুক্ত হোক।

অগ্নজ দেখা বাদ—

প্রাণৈশ্চে প্রাণান্ সম্প্রদাম্যাহিভিরস্বীনি

মাংসৈসমাংসানি বচা বচম্।

আমাদের প্রাণ, আমাদের শক্তি, আমাদের তত্ত্ব পরম্পরের স্পর্শে একাত্ম হয়ে উঠুক।

আবার যুক্ত-প্রার্থনা কালে উভয়ে বলে—

সং নৌ ভগাসো অগ্নত সং চিত্তানি সমুভ্রতা।

বধা সংমনসৌ ভূষা সথারাবিব সচাবহে ॥

আজ থেকে আমাদের হৃজনের ভাগ্য, হৃজনের চিত্ত, হৃজনের ব্রত পরম্পর সংযুক্ত হয়ে চলুক। গভীর অমুরাগে আমাদের হৃটি হিরা পরম্পর প্রীতিযুক্ত হোক।

এই সমস্ত মন্ত্রে স্বামি-স্ত্রীর বিবাহ মিলনের মধ্যে যে ঐক্যাত্ম্যভূক্তি, যে অভ্যেদোপলব্ধি যে 'সহবর্চারণী সংযোগ্য' মনোবৃত্তি পরিস্কৃত হ'য়েছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিবাহকালে বর-বধূ হৃজনেরই বরস এমন ছিল যে তারা পরম্পরের আশা-আকাঙ্ক্ষা অগ্রত্ব করে পরম্পরকে সথারূপে গ্রহণ করতে পারত। অপরিণতবয়স্ক

স্বামীনারীরা এ রকম বিবাহসম্বন্ধ উচ্চারণের কোনই সার্থকতা থাকতে পারে না।

পরের একটি ছন্দে আরও স্পষ্টভাবে বলা হ'য়েছে—

তাবেহি সংভবাব সহরেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বৈগটেব।

এস, আমরা সৃষ্টি করি। ছন্দনের রোত-হিলনে আমরা কেন পুত্রসন্তান লাভে সমর্থ হই।

সুতরাং সপ্ত-পদ গমন করে যখন বিবাহ সম্পূর্ণ করা হ'ত, তখন পতি-পত্নী ছন্দনেই সন্তানের পিতামাতা হবার দৈহিক ও মানসিক উপযুক্ততা অর্জন করেছিল।

আবার ঋগ্বেদে বিবাহ শেষে পতিগৃহে বাজার প্রাক্‌শালে বধূকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী বধা৯সৌ

বশিনী ঙং বিদধমা বদাসি।

এবং— সম্রাজ্ঞী হুতরে ভব, সম্রাজ্ঞী হুশ্রাং ভব

ননান্ধরি সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিরেবেষু।

পতিগৃহে গিয়ে গৃহস্থামিনী হও। সেখানে সকলের বশবর্তিনী হয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালিত কর। গুণাধিতা তুমি, নিজগুণে স্বত্তর শাতাড়ীর পাশে সম্রাজ্ঞীর মত শোভমানা হও। তুমি স্নেহমীলা দেবর নন্দ তোমাকে কেন সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা দান করে।

বিবাহের পরেই পতিগৃহে গিয়ে বধূকে সংসারের ফর্দী হয়ে যজ্ঞকার্য পরিচালনা ও আত্মীয়-পরিজনের প্রতি বধাবোগ্য কর্তব্য পালন করিতে হ'ত। সুতরাং বিবাহের পূর্বেই তার পরিপূর্ণ সাংসারিক জ্ঞান, লাভ করার প্রয়োজন ছিল। নাবালিকার পক্ষে এই শিক্ষা লাভ করা ঘোটেই সম্ভব ছিল না। সেই কারণেই বৈদিক যুগে অপরিণীতা ভ্রুকণীরা বিবাহের পূর্বেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করে পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করত এবং শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে সাগর-সলিলে অবলুপ্ত নদীধারার মত উপযুক্ত শিক্ষিত পতির সংগে বিবাহিত জীবনে মিলিত হ'ত। বাক, বন্ধু ও অধৰ্ব বেদে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

পতিগৃহে প্রবেশ কালে নববধূকে শুভাশিস জানান হ'ত—

অষ্ট পুত্রা ভব ঙং—সুভগা চ পতিব্রতা।

তুমি অষ্টতনয়ের মাতা হও, তুমি পতিব্রতা ও সৌভাগ্যশালিনী হও।

তারপর কালরাত্রির অবসানে বিবাহের চতুর্থ রাত্রে বৌন-মিলন রূপে বধু স্বামীর কাছে কামনা জানাত—বীমান ও গুণধাম তুমি। তপস্চর্যার তোমার জন্ম, তপঃশক্তিতে তুমি প্রদীপ্ত। তুমি আমার সন্তান ও সম্পদে পূর্ণ কর। পুত্রকাম তুমি, আমাদের অপত্যের মধ্যে তোমার পূনর্জন্ম হোক।

স্বামী উত্তর দিত—তুমি তোমার দেহে সন্তানদের উপস্থিতি কামনা করছ। তুমি যুবতী, পুত্রকামা তুমি—আমার প্রেম-মধুর আগ্রহ গ্রহণ কর। প্রজাবতী তুমি, আমাদের সন্তানের মধ্যে তোমারও পূনর্জন্ম হোক।

বিবাহ-অনুষ্ঠানের পরেই পতি এখানে যুবতী পত্নীকে পুত্রার্থে রমণে আহ্বান জানাচ্ছে। যুবতী পত্নীর মনেও বীর্ঘবান স্বামীর উরসে গর্তবতী হবার সুস্পষ্ট কামনা রয়েছে।

সুতরাং বৈদিকযুগে বিবাহ যে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর মধ্যেই সংঘটিত হ'ত এবং যেহেতু নির্বাচনই যে প্রাণান্ত লাভ করত সে বিবাহ

অনুমাত্র সন্দেহ নেই। তখন বিবাহের পূর্বে পিতা অথবা জাতীয় সম্মতি গ্রহণকে বাধ্যতামূলক এবং আবশ্যিক বলে গণ্য করা হ'ত না। মিলনোৎসুক ছুটি তরুণ-তরুণীর ছন্দর বিনিময়ের পরেই আত্মতাত্ত্বিক ভাবে গুরুজনদের আবির্ভাব ঘটত এবং বিবাহের মাধ্যমে তাঁরা উভয়কে মিলিত করে দিতেন।

ঋগ্বেদোক্তর সংহিতার যুগেও যজ্ঞশালা নারীর বিবাহই প্রচলিত ছিল। এ যুগেও বিবাহকালে চিত্ত-বিনিময় রূপে পতি পত্নীকে সম্বোধন করে বলে—

যদেত্তৎ ছন্দয়ং ভব, তদন্ত ছন্দয়ং মম।

যদিদং ছন্দয়ং মম, তদন্ত ছন্দয়ং ভব।

এ ছাড়া কাঠক সংহিতার অগ্নিভুক্তিতে, অধৰ্ব বেদের মাজহোর মন্ত্র এবং কক্তার পিতৃকুলের আশীর্বাণী ও নববধুর কর্তব্য-নির্দেশ, সাময়িক ব্রাহ্মণের প্রস্থি-বন্ধন মন্ত্রে, ব্যাস-সংহিতার পতি ও পত্নীর ধর্ম নির্দেশে, বাজসনেয়ী সংহিতার বরবধুর যুগল-প্রার্থনায় যে সমস্ত উক্তি রয়েছে, সেগুলি প্রাপ্তবয়স্ক নারীর বিবাহেরই স্পষ্ট ইংগিত বহন করে।

গৃহস্থভুক্তিতে কক্তার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে পরস্পর-বিবোধী নির্দেশ দৃষ্ট-হয়। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শূদ্রশ্রেণীতে বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রেই চতুর্থী কর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বৌন-মিলনের নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। এ ছাড়া হিরণ্যকেশীর গৃহস্থ ও পারশ্বর গৃহস্থে উল্লিখিত বিবাহ অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলিতেও প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর মিলন সম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালের গৃহ ও ধর্মশূদ্রগুলিতে 'নগ্নিকা' বা অপ্রাপ্তবয়স্ক কক্তার বিবাহকে সমর্থন এবং ঋতুমতী ও উদগতস্ননা কক্তার বিবাহকে অননুমোদন করা হ'য়েছে। বিবাহের পূর্বেই যে কক্তা পিতৃগৃহে রজশালা হয়, সেই কক্তাকে 'বৃষলী' বলা হয় এবং তার পিতাকে ব্রহ্মহত্যার পাশে অভিযুক্ত করা হ'য়েছে। অজ্ঞান বশতঃ কোন পুরুষ এই কক্তার পানিগ্রহণ করলে, সেই 'বৃষলীপতির' সংগে একত্র ভোজন এবং সন্তানধারণ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হ'য়েছে। নারী প্রথম বয়সে সুরগণ, সোম, গন্ধর্বা এবং অগ্নি কর্তৃক ভুক্ত হ'য়ে পরে মানব কর্তৃক ভুক্ত হ'য়ে থাকে। অগ্নি রজঃকালে, চন্দ্র সোম নির্গমনে ও গন্ধর্বাগণ স্তন্যোদগমে কক্তাকে উপভোগ করে থাকেন। সুতরাং এই সমস্ত শারীরিক পরিবর্তন হবার আগেই কক্তার বিবাহ প্রদান বিধেয়। দৃশ্যমোমা কক্তা পুত্রধাতিনী, উদগতস্ননা কক্তা কুলম্মী ও দৃশ্যমোমা কক্তা পিতৃধাতিনী হয়। যিনি কক্তাদানের পূণ্য বল অতিলাভ করেন, তাঁর সোমাদি কর্তৃক অতুল কক্তাকেই সম্প্রদান করা উচিত। অগ্নধা দাতা কলভোগী হন না, প্রতিগ্রহকারীও অধঃপতিত হয়ে থাকে।

ঋতুমতী কক্তার বিবাহ সম্বন্ধে ধর্মশূদ্রগুলির স্থানে স্থানে এরূপ কঠোর মনোভাব ব্যক্ত হ'লেও অতুল গান্ধর্ব-বিবাহের প্রচলন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বর্ণনা রয়েছে। বলা হ'য়েছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এই বিবাহ-রীতির যথেষ্ট অমুরাগী ছিল। আবার জ্বীলক্ষণ বর্ণনার আপাদমস্তক নারীদেহের যে সমস্ত শুভাওত লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক কক্তার দেহে সে সমস্ত লক্ষণ কখনই পরিস্ফুট হতে পারে না। জংঘা, নিতম্ব, জখন, বক্ষ, স্তন, স্তন্যপ্রভাগ, কক্ষ প্রভৃতি স্ত্রীদেহের পরম সৌপনারী ও লক্ষ্যস্বামী পরীক্ষাকারীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিচক্ষণ

ব্যক্তির প্রথমেই নারীদেহের লক্ষণসমূহ পরীক্ষা করে সুলক্ষণ কল্পকে বিবাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৌধায়নের মতামতানুসারে যদি কোন যুবতীকে বলপূর্বক হরণ করে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা বিবাহ না করা হয়, তবে সেই যুবতীকে অনুচা কল্পরূপে গণ্য করা চলে এবং অপব ব্যক্তির সংগে তার পুনরায় শাস্ত্রসম্মত বিবাহ দেওয়াও চলে। কোন প্রাপ্তবয়স্ক কল্পকে যদি তার অভিভাবক উপযুক্ত সময়ে বিবাহ দিতে অক্ষম হয়, তবে সেই কল্প তিন বছর অল্পখায় তিন মাস অপেক্ষার পর স্বাধীনভাবে স্বীয় পতি নির্বাচন করে নিতে পারে। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এই নির্দেশকে সাধারণভাবে সমর্থন করা হয়েছে। বিপরীতধর্মী এই সমস্ত নির্দেশ থেকে মনে হয়, সূত্র ও উপনিষদের যুগের প্রথম ভাগে যৌবনবতী কল্পার বিবাহ-রীতিই প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে বাল্যবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বিবাহরূপে সমর্থন করা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে ঋতুমতী যুবতী কল্পার বিবাহকেও অস্বীকার করা হয়নি।

বিবাহকালে কল্পার বয়সক্রম সম্বন্ধে মহাভারত ও রামায়ণের সাক্ষ্যপ্রমাণাদি প্রাপ্তবৌবনা কল্পার বিবাহকেই বিশেষভাবে সমর্থন করে। দ্রৌণদী, কুল্ভী, সুভদ্রা, উত্তরা, শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি কল্পির ও শূদ্রমণী ও ব্রাহ্মণকল্পা দেবধানীর বিবাহ এই অভিমতের বখেট অনুকূল। তাছাড়া বিবাহ-অনুষ্ঠানের অংশরূপে পুণ্যতন রীতিগুলির বিশ্বস্ত অনুসরণও এই অভিমতকে সমর্থন করে। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে যে, বিবাহকালে রাম ও সীতার বয়স ছিল যথাক্রমে তের ও ছয়; কিন্তু অল্প বয়স বর্ণনা থেকে মনে হয়, বিবাহকালে সীতা পূর্ণযুবতী ছিলেন। পতিগৃহে আগমনের পরে বিবাহোপযোগী মংগলাচরণ সমাপ্ত হলে সীতা নির্জনে স্বামি-সহবাস লাভ করে পরমশুখে ও স্নেহচিত্তে ভোগশুখ অনুভব করেছিলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বর ও বধুর বয়স যথাক্রমে ত্রিশ ও দশ অথবা একুশ ও সাতরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অবশ্য এই নির্দেশ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, সাধারণ নিয়মানুসারে তৎকালীন সমাজে যুবতী নারীর বিবাহ-বিধিই প্রচলিত ছিল। এর সমর্থনে রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করা চলে। রামায়ণের বালকাণ্ডে নৃপতি কুশনাভের যৌবনবতী চাক-সর্বাঙ্গী এক শত অবিবাহিতা কল্পার উল্লেখ দেখা যায়। অপরিণীতা তরুণীদের সন্ধ্যাসন্ধ্যাগমে ক্রীড়ার্থ লতাকুলে গমন ও অরণ্য-বিহারে প্রবল আসক্তির কথাও রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে। অধোধ্যাকাণ্ড থেকে জানা যায় যে, প্রত্যহ প্রভাতে কুমারীকুল সাধনী সীমন্তিনী সহ নৃপতি দশবধের মংগলার্থ স্পর্শনীয়া খেয়, পানীয়, গংগোদক, দর্পণ, পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ নিয়ে উপস্থিত থাকত। তপস্শ্রাবত ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যকে দর্শন ও তাঁর মুখনিঃসৃত বেদমন্ত্র শ্রবণ কালে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কল্পা ঋষির অভিশাপে সহসা গর্ভবতী হন। সুর্যবোনা ও অশেষ গুণশালিনী এই কল্পাকে পরে পুলস্ত্য পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষি কুশধ্বজের কুমারী কল্পা বেদবতীর যৌবনাচ্য রূপে উন্নত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁকে পত্নীরূপে কামনা করেছিল।

উত্তরকাণ্ডে দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রমণীর এক চৈত্রদিনে ইন্দ্রাক্ষর অনুভবিত ও কামাসক্ত

কনিষ্ঠ-পুত্র দণ্ড পুরোহিত গুক্রাচার্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কল্পা অল্পময় রূপলাবণ্যময়ী অরজাকে দেখে মুগ্ধ হ'লেন। কল্পার অসম্মতি সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য দণ্ড সবলে অরজাকে হরণ করে রাজধানীতে গিয়ে গিয়েছিলেন। দুয়ন্ত-শকুন্তলা, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতি বহুল প্রচারিত উপাখ্যানগুলি ছাড়াও মহাভারতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিচিত্র প্রেমোপাখ্যানগুলি যৌবনশালিনী নারীর বিবাহকেই প্রত্যক্ষ সমর্থন করে। কট ও দেবধানী, রুক ও প্রমদরা, তপতী ও সুরবণ, অমল ও ভাস্করী, উতখ্যা ও চান্দ্রেরী, চ্যবন ও শুব্রতা, অগ্নি ও স্বাহা প্রভৃতি উপাখ্যানে যুবক-যুবতীর বিচিত্র প্রণয়তত্ত্বের চমৎকার মনোবিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। মহীপাল শান্তনুর সহিত বিবাহের পূর্বেই মৎস্তগন্ধা সত্যবতী মহর্ষি পরাশরের সহযোগে কুকর্ষেপায়ন নামে এক পুত্রের জননী হয়েছিলেন। কুমারী অবহার কুল্ভীও সূর্যের ঔরসে কর্ণকে জন্ম দিয়েছিলেন। কাশিরীঅনুহিতা কুমারী অম্বা সৌভপতি শাশুরাজের প্রণয়সক্তা ছিলেন এবং মনে মনে তাঁকে পতিত্ব বরণ করেছিলেন। সুভদ্রাহরণে অর্জুনকে প্ররোচিত করার সময় স্বয়ং ক্রীকক বলেছিলেন—দানবরূপ কল্পাগ্রহণ করা অপেক্ষা ধর্মীমুসারে কল্পাহরণ মহাবীর কল্পিরের পক্ষে অধিক প্রশংসনীয়। যৌবনপ্রাপ্তা সাবিত্রীকে রাজা অশ্বপতি স্বীয় পতি নির্বাচনের জন্য রাজবিগণের আশ্রমে প্রেরণ করেছিলেন এবং কল্পার মনোনয়নকেও অমর্দনা করেননি। রামায়ণে কল্পার স্বয়ংবরকে অনুমোদন করা হয়নি—পিতাকেই অনুচা কল্পা সম্প্রদানের শ্রেষ্ঠ অধিকারিরূপে গণ্য করা হয়েছে। প্রণয়াজিলাবী বায়ুকে প্রত্যাখ্যান করে কুশনাভকল্পারা বলেছিলেন—

মা তুং স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।

অবমল্ল স্বধর্মেণ স্বয়ংবরমুপাশ্রয়ে।

গুক্রাচার্যের কল্পা অরজাও দণ্ডকে বলেছিলেন—আমি পিতার বশবর্তিনী। যদি আমাকে কামনা কর, পিতার নিকট প্রার্থনা জানাও।

কিন্তু মহাভারতে স্বয়ংবরই কল্পিরকল্পাগণের শ্রেষ্ঠ বিবাহবিধিরূপে গণ্য করা হয়েছে। স্বয়ংবরসভার প্রাপ্তবৌবনা কল্পার মনোনীত প্রার্থীর হস্তেই তাকে সম্প্রদান করা হয়েছে। পূর্বরাগ জনিত গাঙ্ঘর্ষ বিবাহও তৎকালীন সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। শকুন্তলা ও দুয়ন্তের মিলন গাঙ্ঘর্ষ বিবাহের একটি চমৎকার উদাহরণ।

বৌদ্ধযুগেও প্রাপ্তবৌবনা নারী স্বয়ংবরা হত। সমাজে গাঙ্ঘর্ষ বিবাহও অপ্রচলিত ছিল না। অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে যুবক-যুবতী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলে সমাজ সেই বিবাহকে স্বীকার করে নিয়ে বখেট উদারতা দেখাত। স্বয়ংবর বিবাহে কল্পার নির্বাচনকেই চরম বলে গণ্য করা হত। মনোনীত পাত্রের কোন ক্রটি থাকলেও সে মনোনয়নের কোন পরিবর্তন করা হত না। রাজকুলেই গাঙ্ঘর্ষ-বিবাহ বিশেষভাবে আদৃত হত। এবিষয়ে বৌদ্ধসাহিত্যে বহু কাহিনী রয়েছে। সে যুগে বিবাহের পরেই পতিগৃহে স্বাত্রার সময়ে নববধূকে সংসারধর্ম সম্বন্ধে যে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া হত, সেগুলি সাবালিকা বধুর পক্ষেই পালন করা সম্ভব ছিল। অনুচা কল্পার বিবাহের কোন বয়স নির্ধারিত না

খাঁকিগেও, বোল বৎসর বয়সে কস্তারি বিবাহদান সবচে বই দুটো দেখা যায়। শাক্য কেমকের কস্তা সুন্দরী অভিরূপনন্দা, রাজগৃহবাসিনী চিত্তা, শাক্যরাজবংশীয়া নন্দা, সাগলরাজবংশীয়া কেশা ও ব্রাহ্মণকস্তা ভদ্রা কপিলানী, শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠিকস্তা উৎপলবরা, অঙ্গরাজ্যের ভদ্রির নগরবাসিনী শ্রেষ্ঠিহুহিতা বিশাখা বৈশালীর ব্রাহ্মণকস্তা রোহিণী প্রভৃতি বোদ্ধনারী বিবাহের পূর্বেই বোবনে উপনীতা হয়েছিলেন। পানিপ্রার্থী প্রেমিকের অভাব না থাকলেও সন্ন্যাসবংশীয়া রূপবতী অল্পময়া সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণীর ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্বিসারের পুরোহিতকস্তা সোমাও বয়োপ্রাপ্তা হয়ে বৃদ্ধর গৃহী শিষ্যা হন। জাতক কাহিনী থেকে জানা যায় যে, বিদেশাগত এক ব্রাহ্মণকুমার বারানসীতে গুরুগৃহে অধ্যয়নকালে একটি তরুণীর প্রেমাসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করেছিল। প্রচলিত রীতি অনুসারে একটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে গুরু তাঁর শ্রেষ্ঠতম শিষ্যের হস্তে বোবনবতী কস্তাকে সম্প্রদান করেছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে বিবাহযোগ্য গুরুকস্তাকে বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যের হস্তেও সম্প্রদান করা হত।

পুত্রগ্রহণে কস্তার বিবাহের বয়স নিয়মগামী করার যে আশ্রয় পরিলক্ষিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতেও তার বিধিত অনুসরণ দেখা গিয়েছে। মহুর মতামুসারে ত্রিংশ ও চতুর্বিংশ বৎসর বয়সে যুবকদের বধাক্রমে দ্বাদশ ও অষ্টমবর্ষীয়া কস্তাকেই পত্নীত্বে বরণ করা শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু সংগে সংগে তিনি একথাও বলেছেন যে, নিষ্ঠুরের হস্তে সম্প্রদান অপেক্ষা বিবাহযোগ্য কস্তাকে আত্মীয় কুমারীরূপে পিতৃগৃহে স্থান দেওয়াও শ্রেয়ঃ। এর থেকে মনে হয় যে সমসাময়িক যুগে বাল্যবিবাহ ক্রমশঃ প্রচলিত হতে থাকলেও রাজস্বলা কস্তার বিবাহও অপ্রচলিত বা অননুমোদনীয় ছিল না। প্রত্যক্ষ পাণে লিপ্ত হতে না হলেও কোন পিতাই বিবাহযোগ্য কস্তাকে গৃহে রাখা কামনা করতেন না। কলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে কস্তাদের পতি-সন্ধানের স্বাধীনতা দেওয়া সবচে প্রায় সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রকারই একমত পোষণ করেছেন। অবশ্য পতি-নির্বাচনের পূর্বে কস্তাকে তিন মাস থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যোগ্য পতি মনোনয়ন নাথাকার পক্ষে কখনই সম্ভব হতে পারে না। পরবর্তীকালে রচিত বাজবল্যস্মৃতিতে কস্তা ঋতুমতী হবার আগেই তাকে পাত্রস্থ করার কঠোর বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাজবল্যের এই নির্দেশ পরবর্তীকালে অনুসরণীণ রীতির পূর্বাভাস মাত্র, সমসাময়িক যুগের অনুসৃত পদ্ধতি নয়। কারণ বাজবল্য স্মৃতির পরে রচিত নারদ স্মৃতির রাজস্বলা নারীর বিবাহকে অননুমোদন করা হয়েছে। মোট কথা, ধর্মশাস্ত্রের যুগে নারীকায় বিবাহদানের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছে এবং নারীর দৈহিক গুণিতা দৃষ্টিভঙ্গের প্রতি একটা নৈতিক উৎস্রক্য থেকেই সম্ভবতঃ এই নিয়মের প্রবর্তন হয়েছে।

Kane প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতামুসারে স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত বাল্যবিবাহ বিবরণ নির্দেশগুলি প্রধানতঃ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হত, অপর তিন বর্ণের ক্ষেত্রে নয়। এই মতের

সমর্থনে সমসাময়িক সংস্কৃত নাটকগুলির উল্লেখ করা চলে। এই নাটকগুলিতে নারীকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোবনবতী নারীরূপে চিত্রিত হয়েছে এবং কোনখানেই তাদের জিয়াকলাপ ও বাচনভঙ্গীতে অবিবাহিতা বালিকাসুলভ মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হয়নি। নাট্যকার ভাস রচিত অভিমারক, প্রতিক্ষায়োগকনারায়ণ ও স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকদ্বয়ে বিবাহের পূর্বেই আকট্যবোবনা নারীকায়ের প্রণয়লীলা বর্ণিত হয়েছে। কালকাচার্য বিবচিত্ত কালকাচার্য-কথা নামক কাহিনীতে কালকাচার্যের অবিবাহিতা যুবতী ভগিনী সরস্বতীর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া সমসাময়িক তামিল সাহিত্যের বর্ণনামূলক দশটি গ্রাম্য-গাথার অন্তর্গত কবি রজন কল্পনার বিবচিত্ত পি টনম্লাই ও কবি কপিলরের কুরিনচিন্নাটু প্রেমোপাখ্যান ছুটিতে এবং অষ্ট গীতি-কবিতামালায় গিরি ও মরুদেশ, শাখল প্রান্তর ও আরণ্যস্থলী এবং সযুজ-সৈকতে মান-অভিমান, বিচ্ছেদ-বিলাপ ও বিরহ-মিলনের বিচিত্র বর্ণনায় কুমার-কুমারীর প্রেমরংগই প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনারও উল্লেখ করা চলে। জুনাগড় শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মহাক্ত্রপ রজন্যামন বহু স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হয়ে রাজকুমারীদের মনোনয়ন লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে রচিত সংসারপ্রকাশ নামক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর তিন বর্ণের নারীরা ঋতুমতী হলেও তাঁদের বিবাহে কোন বাধার সৃষ্টি করা হত না, বরং সেই বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বিবাহের মর্যাদা দেওয়া হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে বাল্য-বিবাহ সবচে কঠোর বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে সেই সমস্ত বিধি-নিষেধ বিশ্বস্ততার সংগে পালন করা হত না।

নারীর বিবাহযোগ্য বয়স নিয়মগামী করে তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা নারীজাতিতে আত্মগত্যের সুকঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। পুরুষপ্রধান সমাজে এক শ্রেণীর প্রভুত্বলিপ্সা গ্রাস করতে চেয়েছিল অপর শ্রেণীর আত্মিক স্বাধীনতা। কঠোর বিধিনিষেধের পেয়ণ-ফল নারীর আত্মোৎসর্গ আদায় করা হলেও, সে আত্মনিবেদনে বাধ্যতা ছিল, ছিল না স্বেচ্ছা-সম্মতি। নারীর বৈহিক পবিত্রতা রক্ষার নামে মহু বাজবল্য-প্রমুখ নৈতিক শাস্ত্রকারেরা নারীদের অভিধাকে সংস্কৃতিতে করে নতুন বিধান দিলেন—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহঁতি।' ফলে নারী তার স্বাতন্ত্র্য হারান, হারান শিক্ষার সুযোগ। বলা হল, সংসারে স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র পতি, পরম আশ্রয়। পতির পদসেবা এবং সন্তানের জন্মদান ও পালনই তার সত্যধর্ম ও গৃহকর্ম। অবশ্য বাল্য-বিবাহ রীতি প্রবর্তনের কলে প্রাক-গুপ্তযুগে নারীজাতির অধোগতির সূচনা হয়েছিল মাত্র, চরম পরিণতি লাভ করেনি।

মহু, বাজবল্য রচিত আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে বিবাহ-বিধি সবচে যে সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে সেগুলির সুলভত কোন পরিবর্তন না ঘটলেও সাধারণ্যে কুমারী-কস্তার বিবাহের বয়স নিয়মগামী করার একটা বর্ধমান প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছিল। কতকগুলি গ্রন্থে বাধ্যতামূলক ভাবে কস্তা ঋতুমতী হবার আগেই তাকে পাত্রস্থ করার জন্তে অভিভাবককে আদেশ দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণের মতামুসারে পাত্রের বয়স পাত্রীর বয়সের তিন গুণ হওয়া উচিত। কিন্তু স্মৃতিগ্রন্থকালে অগিরস বলেছেন, বর-বধু

স্বক ক'রেছিল, আলোচ্য যুগে তার গতি আরও স্বাধীন হয়ে উঠল। নতুন শাস্ত্রকারেরা মনু, বাজবল্য ও পরাশর রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিকে সনাতন বৈদিক সাহিত্যের মর্যাদা দিয়ে জনমনকে প্রভাবিত করতে চাইলেন। ফলে সাধারণ্যে বাল্য-বিবাহ আরও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হ'ল। বালিকাবধুও বিনা প্রতিবাদে পতির একাধিপত্য স্বীকার করে নেওয়ার তার অঙ্গুগতা শিষ্যের পরিণত হল। স্বাধীন শিক্ষা-দীক্ষা লাভের সামান্ততম সুযোগটুকুও তার রইল না। মেধাতিথির সাক্ষ্য এবং সমসাময়িক শব্দকোষ প্রভৃতিতে ব্রহ্মবাদিনী নারীর অস্তিত্ব সন্দেহে অভিপ্রায়-সূচক অল্পলেখ শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর পশ্চাদ্গামিতাই স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত করে। কাব্যমীমাংসা, উপনিষদভবপ্রপঞ্চকথা ও পরবর্তীকালে রচিত স্মৃতিযুক্তাবলীতে শাস্ত্র-অভিজ্ঞা বলানিপুণা নারীদের অবস্থিতি সন্দেহে ইংস্তুতঃ উল্লেখ থাকলেও, তা' স্মৃতিমের নারী সন্দেহেই প্রযোজ্য। সাধারণ নারীর শিক্ষা জীবনের চিত্র তা থেকে পরিস্ফুট হয় না।

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, হিন্দু-জাতির প্রথম যুগে প্রাপ্তবয়স্ক তরুণীর বিবাহই সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। তৎকালীন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর সমাজ-জীবনে মানুষের জীবন-নীতি ঐহিক ভোগ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার দ্বারা প্রভাবিত হ'ত না। জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল—ত্যাগ, অনাসক্তি, আত্ম-বিলোপন ও আধ্যাত্মিক কর্ণা। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল, নর-নারীর একাত্ম-মিলনের দ্বারাই পরিবার, সমাজ ও প্রকৃতি বিদ্যুত। পুরুষ ও নারী একে অপরের সম্পূরক, একের মধ্যে উভয়ের সম্পূর্ণতা সম্ভব নয়। ফলে, সে যুগের নর-নারী তথা পতি-পত্নীর ছিল অভেদ-মিলন। দাম্পত্য-জীবনে এই অভেদোপলক্ষিত্ব ফলে স্ত্রী কেবলমাত্র স্বামীর সুরত-সহচরী ছিল না, সে ছিল একাধারে স্বামীর সখী ও সহধর্মিণী। উভয়ের পারস্পরিক সহায়ভূতি, সহায়তা, সেবা, ত্যাগ ও মিলিত প্রচেষ্টার পরম সুখদ পরিবারের সৃষ্টি হত। নারীর স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হওয়ার সে-ও পুরুষের মত শিক্ষা-দীক্ষা লাভের অধিকারিণী ছিল। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা তাকেও গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশের জন্যে প্রস্তুত হ'তে হ'ত। বয়সোচিত দূরদর্শিতা অর্জনের ফলে পতি-নির্বাচনে তার স্বাধীন মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হত। পরিবারে পত্নীই ছিল নিয়ামিকা, পরিচালিকা ও সুখশান্তি-বিধায়িনী। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সংগে সংগে স্বচ্ছন্দ সমাজ-জীবনে অটলতার সৃষ্টি হল। অর্ধ নৈতিক স্থিতি ও সমৃদ্ধির দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার বিলাস-বৈভব ও সন্তোগের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল। পুরুষের মনে নারীকে ভোগ ও বিলাসের উপকরণে পরিণত করার একটা স্বার্থ-ভ্রষ্ট প্রবৃত্তি দেখা দিল, দেখা দিল নারীর ওপর একাধিপত্য বিস্তারের উগ্র আকাঙ্ক্ষা। রাজনৈতিক ও অর্ধ নৈতিক স্বার্থে এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনে অসবর্ণ বিবাহও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করল।

এই সমস্ত কারণেই তদানীন্তন সমাজ-জীবনে যে সংকোচের সৃষ্টি হ'ল, তাকে সংবৃত্ত করবার জন্যে মনু-পরাশর-বাজবল্য প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকার বিবাহাদি সংস্কারকে কাঠার বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়মিত করতে চাইলেন। ব্রাহ্ম-দৈব-আর্ধ-প্রাজাপত্য এই চতুর্বিধ বিবাহ ধর্ম-বিবাহরূপে গৃহীত হ'ল, আর আশুর গার্হস্থ্য রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকে অশাস্ত্রীয় অন্তত বিবাহরূপে বর্ণনের

নির্দেশ দেওয়া হ'ল। হিন্দু-নারীর দৈহিক সৌন্দর্য রক্ষার জন্যে তাঁরা াল্য বিবাহকে অঙ্গুমোদন করে পরোক্ষে স্বাধীন শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে নারীকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ক'রলেন। নারীকে পত্নীকে শেখান হ'ল, স্বামী ছাড়া স্ত্রীর কোন পৃথক সত্তা নেই। সে স্বামীর সখী নয়, সহধর্মিণী নয়, বশংবদা দাসীমাত্র। পুরুষ-প্রধান সমাজে তার নারী-জীবনের আদর্শ নির্দিষ্ট হ'ল একাধি পতিপ্রাপ্ততা, পতির সংসারে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা। স্বামীর প্রতি এই একান্ত নির্ভরতা থেকেই ক্রমশঃ স্ত্রীর মনে ধারণা জন্মাল যে স্বামিসহবাসেই তার সাংসারিক স্থিতি। ধর্ম-বিবাহের দ্বারা পতি-পত্নী যে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, পরলোকেও তা অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই বিশ্বাসের ফলেই বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিনিয়োগ অবস্থাকে শাস্ত্রকর্তারা অন্তত, অশাস্ত্রীয় বলে অভিহিত ক'রলেন। সৃষ্টি হ'ল সতীদাহ প্রথা—মৃত-পতির চিতায় পতিব্রতা নারীর আত্মহত্যা। প্রথমে এই নৃশংস প্রথা রাজসভাকূলে সীমাবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু ক্রমশঃ সতীত্বের পরাকাষ্ঠারূপে সাধারণ্যেও এর ব্যাপক অঙ্গুসরণ দেখা দিয়েছিল।

মনে রাখতে হবে, মনু-পরাশর রচিত স্মৃতিশাস্ত্রে বাল্য-বিবাহের যে বিধান দেওয়া হ'য়েছে তা' অবিমিশ্র অন্তত নয়। পরিবারই সমাজের ভিত্তি। সেই পারিবারিক জীবনে সুশৃংখলা ও শান্তি সংরক্ষণ করতে হলে নারীর বাল্য-বিবাহ একদিক দিয়ে যথেষ্ট সুবিধানক। কারণ, স্বাধীন শিক্ষার শিক্ষিতা যুবতী কন্যাকে বিবাহের ফলে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে মতবিরোধ জনিত যে বিশৃংখলা ঘটবার সম্ভাবনা থাকে, বাল্য-বিবাহের ফলে তা বহুলাংশে দূরীভূত হতে পারে। আর্ধ-বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হল ধর্মাস্ত্রাণ ও অন্তে শুদ্ধ সংবৃত্ত অধ্যাত্ম জীবন প্রাপ্তি। শাস্ত্রকারেরা তাই ব্যবস্থা করেছিলেন, পুরুষ বিধিবদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা বিস্তারিত শিক্ষা লাভ করে কোন অরজা কন্যাকে স্ত্রী তথা শিষ্যরূপে গ্রহণ করবে। পরে নিজের আদর্শে বোধোপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে তাকে সহধর্মিণী হবার যোগ্য করে নেবে। এই পরিবর্তনায় মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সত্য, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, নারীর বিবাহ-বয়স নিয়গামী হওয়ার পুরুষেরও বিবাহ-বয়স আপনা হতেই নিয়গামী হয়ে পড়ল। পরিপূর্ণ শিক্ষালাভের কাল হ্রস্বতা প্রাপ্ত হওয়ার পুরুষের সুনিয়মিত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এল। পতিগৃহে বালিকা-বধু উপযুক্ত শিক্ষার নামে মুকঠিন বিধি-নিষেধের ভারে নিপীড়িত হতে লাগল। সর্ধীর্ণ নিরানন্দ পারিবারিক জীবনে তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব, তার স্বাধীন সত্তা অবলুপ্ত হয়ে গেল—ফল হয়ে গেল তার জীবনের সুস্থ বিকাশ। নারীজীবনের পরবর্তীকালের ইতিহাস তাই হীনমন্ত্রতা ও পরনির্ভরতার ইতিহাস, দাসত্বের ইতিহাস, উৎপীড়নের ইতিহাস।

এই প্রবন্ধ রচনায় নীচের বইগুলি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

- (১) Sanskrit Literature—Macdonell
- (২) The History & Culture of the Indian People. Vol. I, II, III & IV—Majumdar & Pusalker.
- (৩) Sexual life in Ancient India—Meyer.
- (৪) Social Life in Ancient India—Chakladar
- (৫) Position of Women in Ancient India—Altekar.

সাধন—প্রাণায়াম

স্বামী শিবানন্দ

সাধন শব্দে ভগবান লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ করবার উপায় বুঝায়। ভক্তিপথের পথিকই হউন বা জ্ঞানপথের পথিকই হউন, সাধন সকলেরই প্রয়োজন। সাধন ব্যতীত কেহই ইষ্টলাভ করতে সক্ষম হন না। ভক্তিপথের পথিক, তাঁদের কেবল বৈতন্যম অবলম্বন, তাঁরা বিশ্বাস করেন ভগবান বিভিন্ন মূর্তিতে গোলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠলোকাদিতে বাস করেন, আর তাঁদের লক্ষ্য দেহান্তে ভগবৎরূপায় নিজ নিজ ইষ্টলোকে গমন, তাঁদেরও সাধন অবশ্যই করতে হয়। তাঁদের অবশ্যই পূজা অর্চনা রূপধ্যান, ভগবৎকথা পাঠ, ভগবৎপ্রসঙ্গ ইত্যাদি সমস্তই করতে হয়। তাঁরা একটু সাধনে অগ্রসর হলেই নির্জীবনবাসপ্রিয় হন এবং অনেক সময় ইন্দ্রিয়াদি বোধ করে আপনাপন ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হন। তাঁরা কেবল একেবারে ভগবানে লয়প্রাপ্ত হতে চান না, সেব্য-সেবক-ভাব বজায় রাখতে চান। কিন্তু তাঁরা তাঁর ধ্যানে আনন্দ, তাঁর নামভঙ্গে আনন্দ, তাঁর নামগানে আনন্দ, অপর ভক্তের সহিত সংপ্রসঙ্গে আনন্দ ও সর্বভূতে ভগবান বিরাজ করছেন দর্শন করে সর্বভূতের সেবায় আনন্দ উপভোগ করেন। ইহাতে বেশ বোঝা যায় যে, সাধনের পূর্বে ভগবান বিশেষ বিশেষ রূপে বিশেষ বিশেষ লোকে বাস করেন। এবং সে সমস্ত এজগৎ ছাড়া—এ ধারণা তাঁদের ক্রমশঃ পরিমার্জিত হয়ে গেছে এই মনুষ্য-হৃদয়ই যে তাঁর আবাসস্থান ও উহাই যে বাস্তবিক স্বর্গ, গোলোক, শিবলোক ইত্যাদি, ইহা উপলব্ধি হয়। সাধন দ্বারা চিন্তের শুদ্ধাবস্থা লাভ হলে ভাগবান সাধক হৃদয়েই ভগবানকে দর্শন করেন এবং তখনই বৈতন্যবাদী ও অর্ধৈতন্যবাদী অশরিকবুদ্ধি-প্রসূত সব বাদানুবাদ মিটে যায় এবং শান্তিলাভ হয়।

জ্ঞানপথের পথিক, যিনি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বা 'নেতি নেতি' বলে থাকেন, এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম) এই উপলব্ধি দ্বারা উদ্ভূত, তিনি গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস, ইহলোকে বা পরলোকে জ্ঞানরূপ কর্মফলভোগেচ্ছা না রাখা এবং শম দম তিতিক্ষা উপরতি প্রভৃতি সাধন করেন। উপরি-উক্ত ভগবানের আবাসস্থান স্বর্গাদিতে গমন এবং সুখভোগ ইত্যাদি জ্ঞানীর অভিপ্রেত নয়। তাঁর মতে ঐ'সকলও অনিত্য এবং মনোরাজ্যের অন্তর্গত। জ্ঞানী চান মনেরও বাহিরে যেতে, 'অবাস্ত্বমনসগোচরম্' (বাক্য-মনের অতীত) অবস্থা লাভ করতে। তিনি 'কীশে পুণ্যে মর্ত্যালোকঃ বিশান্তি' (পুণ্য ক্ষয় হ'লে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন)—এ অবস্থা চান না। তিনি জানেন 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্নোতি ব ইহ নানেন পশ্চাত' অর্থাৎ এই জন্মে এই শরীরে যিনি জীব ও ব্রহ্মের একত্ব দর্শন না করেন তিনি বার বার জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন। এই জীবমুক্ত পুরুষ আবার সাত্ত্বিকে সর্বভূতে দর্শন করে তাঁদের সেবাতেও রত হন। তাঁর দ্বারা জগতে মহা মহা কল্যাণকর কার্যও সাধিত হয়।

এখন বোঝা গেল, যিনি যে পথেই ভগবান লাভের জন্ত যান না কেন, সাধন সকলেরই প্রয়োজন। শাস্ত্রেও নানাবিধ উপায় কথিত আছে। প্রাণায়াম এই উপায় সকলের মধ্যে অঙ্গতম। আমি ভগবান লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত যে প্রাণায়ামরূপ সাধন তাহাই বলিব। বর্তমান সময়ে অনেকে শারীরিক সুস্থতা লাভের জন্ত এবং অজ্ঞান কার্য সিদ্ধ করিবার জন্তও প্রাণায়াম অভ্যাস করেন এবং তনিত্তে পাই নাকি এরূপ উপদেষ্টা বা শিক্ষকও আছে। আমার মতে ঐরূপ শুধু প্রাণায়াম মহা অনিষ্টজনক এবং অনেকে 'অদ্বৈতেন ব নীহমানাঃ বধ্যস্তাঃ' (অরূপ বরূপ অন্ধ দ্বারা পরিহাসিত হইবে সেরূপ)

হবে প্রত্যাশিত হয়েছেন এবং কেহ কেহ অকালে কালপ্রাপ্তে পরিত্রস্ত হয়েছেন।

প্রাণায়াম শব্দ বুঝা অতি সহজ—এত সহজ যে, বুঝাইয়া দিলে সকলেই বুঝিবেন, আমরা প্রত্যহ সকলেই অজ্ঞাতসারে প্রাণায়াম করিয়া থাকি আর ইহা অভ্যাস করণও অতি সহজ। যখন তুমি কোন অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ গল্পের পুস্তক পাঠ কর, বা আশ্চর্য-সম্বন্ধ কোন নূতন দেশের ইতিহাস অধ্যয়নে নিযুক্ত হও, অথবা নির্বিচলিত গণিতশাস্ত্রের কোন চক্র সমস্তা সমাধানে নিযুক্ত থাক, তখন তুমি এমনি মেতে যাও যে, গল্পটা শেষ না হলে বা গণিত-সমস্তাটার জীয়াসা না হলে তোমার কোনমতে সেগুলি ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না। এই সময় যদি তুমি তোমার খাসের প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য করে দেখ, তুমি দেখবে খাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক বেশ অনেক কম গেছে, উহা খুব আস্তে আস্তে চলছে, যেন হৃদয়ের ভিতর খাস-প্রশ্বাস অনেকটা বন্ধ হয়েছে। হৃৎখন্ডক ঘটনা পাঠ করলে করতে কেঁপে যায়, হৃৎখেতে হৃদয়টা যেন ভারি হয়ে উঠে আর আনন্দখন্ডক ঘটনার হৃদয়টা যেন ফীত হয়ে উঠে। এই উভয় অবস্থাতেই খাস-প্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হয়। যদি অধিক হৃৎখন্ডক ব্যাধির পড়, তখন হৃদয়ত বখন হৃদয়ের ভার অক্ষপাতে অনেকটা লঘু করে দাঁড় বা অক্ষপাত আনন্দের উদ্ভেক হলে হান্ত বা আনন্দাশ্রু-মোচন দ্বারা উহা বন্ধ করে দাও। কিন্তু এইটি বিশেষ করে নজর করো যে, উভয় ব্যাপারেই খাস-প্রশ্বাস (যাহা প্রাণবায়ুর কার্য) অনেকটা রুদ্ধভাবে থাকে। এই সকল উপাহরণ থেকে বেশ বুঝা গেল যে, কোন এক বিশেষ বিষয়ে মন সংযত হলে খাস-প্রশ্বাসের কার্য ততদূরত্বই রুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হয় বা প্রাণায়াম আপনা চাইতেই হয়। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার,—যখন ঐরূপ নির্বিচলিত পাঠের সময় বা গণিত-সমস্তা সমাধানের সময় খাস-প্রশ্বাসে ধীরে ধীরে বইছে কিম্বা লক্ষ্য করতে যাবে, তখন সেই পাঠ বা অক্ষর দিকে মন থাকবে না, খাসের দিকে মন আসবে, এবং দেখবে উহা আরার ক্রমশঃ সহজভাবে ধারণ করবে। কিন্তু তুমি বেশ বুঝতে পারবে যে, খাস রুদ্ধভাবে বইছিল, এখন সহজভাবে ধারণ করল। প্রায়শঃই সিদ্ধান্তের সহিত এই তত্ত্বটির আলোচনা করলে এই কথা বার বার মনে কোন একটা ভাবে একেবারে মগ্ন হলে প্রাণবায়ু আপনা হতে কতকটা রুদ্ধভাবে ধারণ করে; আর তাই বুদ্ধি, প্রাণনিয়োগ গৌণ। এইরূপে প্রাণায়াম আমরা নিত্যই অজ্ঞাতসারে করে থাকি।

এখন দেখতে হবে, সাধনপথের প্রাণায়াম কি? এ-ও কি ঐরূপ স্বাভাবিক, না কৃত্রিম কোনরকম কিছু করতে হয় এবং সাধন নিজেও স্বাভাবিক কি?

ইহার উত্তর এই—সাধন স্বাভাবিক এবং বহু প্রকার সাধনের উপায় শাস্ত্রে উক্ত আছে তৎসমূহই স্বাভাবিক। যখন কৃৎপিপাসা শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম, তাহাদের নিয়ন্ত্রণের উপায়ও যাহা বা করে থাকে, নানাবিধ বস্তু, কিছু স্বাভাবিক।

পত্রগুচ্ছ



গ্যেটের প্রেমপত্র : কবির তৃতীয় মানসী

প্ৰতি বৈশাখ সংখ্যায় কেটেছেন সনককের নিকট কবিগুরু গ্যেটের পত্রাবলী পড়েছেন, প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে লাইপজিগে কবির এই প্রেম ব্যর্থ হয়। অমুহু কবি ক্রাককাটে মা এবং বোনের সেবা ও বন্ধে মুহু হল। তারপর তিনি ষ্ট্রাসবার্গে পুনরায় আইন পড়তে যান। সেই সময় একদা তিনি সেসিনহিমে ভ্রমণে যান। এই সেসিনহিমে কবির জীবনকে এক নারী সুবভিত্ত করেছিল। এই মহীয়সী রমণীর নাম ফ্রেডারিকা। কবি কর্তৃক লিখিত বহু পত্রাবলী ফ্রেডারিকার সহোদরা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। ফলে খুব অল্প পত্র আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে। ফ্রেডারিকার প্রতি কবির প্রেম দীপাবিত্তরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সত্যিই তিনি এই রমণীকে ভালবেসেছিলেন। ফ্রেডারিকাও কবিকে ভালবেসেছিলেন। গ্যেটে বলেছিলেন, পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর নারী আছে। এক শ্রেণীর নারীদের ঘরে রাখা যায়; আর এক শ্রেণীর নারীদের মুক্ত আকাশের নীচে ছাড়া কল্পনা করা যায় না—ফ্রেডারিকা হলেন সেই মুক্ত আকাশের নীচের নারী; এই শ্রেণীর নারী চলার ঠিকরণে পৃথিবীর ফুলের পেলবতাকে হার মানায়। ফ্রেডারিকার মুখের বউ উজ্জল নীল আকাশের মত বলে কবির মনে হত; বাইরের, রূপ, বস এই সব নারী ঘরে এনে জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করে; জীবনের দুঃখ ও বিপদকে মেঘেরা সহজেই কাটিয়ে উঠে এই কারণে যে তাঁরা নিপুণ নারী—এই ছিল গ্যেটের মত। তবু গ্যেটের জীবনসঙ্গিনী এই রমণী হতে পারেন নি সত্ত্বতঃ এই যে marriage is not the bond of the souls. এই মহীয়সী রমণী আজীবন কুমারী ছিলেন। বিবাহের প্রস্তাব শুনে বলতেন, যে স্বপ্ন তিনি গ্যেটকে দিয়েছেন তা আর কাউকে তিনি সমর্পণ করতে পারবেন না। গ্যেটে যখন তাঁর আত্মজীবনী লিখছিলেন তখনও ফ্রেডারিকা জীবিত ছিলেন; ফ্রেডারিকার কথা কবির মনে প্রায় জাগত। এই ফ্রেডারিকাকে তিনি হেলানা চরিত্রে রূপ দিয়ে অমর করে বেখেছেন কাউট নাটকে। কাউট নাটকে মার্গারেট চরিত্রটি হল গ্রেচেনের রূপ—যে গ্রেচেনকে তিনি বয়ঃসন্ধিকালে প্রথমে ভালবেসেছিলেন। ফ্রেডারিকাকে লিখিত একখানি পত্রের অমুবাদ নীচে তুলে ধরা হল।

আমার নতুন বান্ধবী,

তোমাকে এই নামে ডাকতে আমি আর দ্বিধা করি না। আমি যদি তোমার চোখের সামান্য ভাবা বুকে থাকি তবে প্রথম দৃষ্টিতে

তোমার চোখের ভাবা দেখে বন্ধুত্বের আশা করতে পারি—আর আমাদের হৃদয়ের তরফ থেকে প্রতিজ্ঞা করতে পারি। তোমার হাবেভাবে বতটা বুঝতে পেরেছি তা থেকে আমি কী ভাবতে পারি মা যে তার বিনিময়ে তুমি আমার প্রতি একটু বেশী প্রবণতা দেখাবে। তোমাকে আমার জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে, সত্ত্বতঃ সেটা খুব বড় বেশী কথা না। আর কোন বিশেষ বিষয়ে তোমাকে কেম লিখছি, এবং লেখার হেতু কী তার উদ্দেশ্য অবশ্য অল্প। হৃদয় ভিতরের চকলতার জন্ত আমি এই কথা লিখছি আর সানকে জানাচ্ছি যে আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার কাছে উপস্থিত হব। এ-জন্ত একটা সাদা কাগজ আমাকে সাহায্য জোগাবে। আর আমার মনে হয় তোমার শান্তির জন্ত কর্মমুখর শহরে একটি পক্ষিরাজ বোড়া হাজির হবে—অবশ্য তা সম্ভব হবে যদি তুমি তোমার বন্ধুর বিচ্ছেদের কথা ভাব।

আমি যখন বিদায় নেই তখন সে-বিদায় কত কষ্টকর হয়েছিল তা তুমি বুঝতে পার। ওয়েল্যাণ্ড বাড়ী কিংবার জন্ত কত উদগ্রীব হয়েছিল। আমাদের অবস্থা বুঝতে পারলে সে-বুড়ো হৃদয় থেকে যেত। সে ফেরবার জন্ত উদগ্রীব—আমার ফেরবার মন নাই এমন অবস্থায় আমাদের কথাবার্তা খুব শ্রীতিপ্রদ বলে মনে হত না। কম পথ ঘুরে আমি আসবার চেষ্টা করেছিলাম। তার ফলে বিস্তৃত জলার ধারে আমি পথ হারিয়ে কেলেছিলাম। রাত নেমে এল। বৃষ্টি ছাড়া জন্ত কোন হুঁশোপের অভাব হয়নি।

...বা হোক অনেক ঘুরে বাড়ী পৌঁছালাম। তবে তোমাকে দেখবার বাসনায় আমি আবার সাহায্য কিংবে পেয়েছিলাম। আবার দেখার মধ্যে বেশ একটা হার্দ্যভাব আছে। আমাদের ভাব-উদ্ভাসিত হৃদয় যদি সামান্য কিছুতে বিপর্যস্ত হয় তবে তার সরাসরি উপশম হবে এই বলে। প্রিয় মন, শান্ত হও। বাসের তুমি ভালবাস তাদের কাছ থেকে তোমার আর বিচ্ছেদ হবে না—শান্ত হও প্রিয় মন। তারপর হৃদয় তার ওপর আমরা প্রলেপ বুলাব।

...তোমাদের গ্রাম্য পরিবেশ থেকে কিংবে এসে শহরের এই কোলাহল আমার ধারণ লাগছে।

সত্যিই কুমারী। এ-শহর আমার কাছে ধারণ লাগছে। মনে হয় সময় একদিন সব কিছু ম্লান করে দেবে। যে আনন্দ, সুখ আমরা উপভোগ করছি তখন হৃদয় দয়ালু বান্ধবীর সঙ্গীত

আমার মনে থাকবে না। তবু এ কী ভুলে যেতে পারি? সুতরাং চিন্তনাহ এখন কয়ই। তোমাকে প্রায়ই আমি লিখব—ইতি।

ইটালী ভ্রমণ-অঙ্কে গ্যোটে যখন ভাইমারে এসে পৌছান তখন গ্যোটের জীবনে আর এক নারীর আবির্ভাব হয়। এই রমণীর নাম ক্রিস্টিয়ান ভুলপিয়ারস। এই রমণী বেরটশ নামক ভ্রমণলোকের অধীনে নকল ফুস ভুলে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কথিত আছে যে গ্যোটে একবার এই রমণীর রূপের প্রশংসাও করেছিলেন। তাঁর ভাই একটি পদের জন্য দরখাস্ত করে বোনকে বলেছিলেন ক্রিস্টিয়ান ভুলপিয়ারস রাষ্ট্রমন্ত্রী গ্যোটের হাতে যেন দরখাস্তটি দিয়ে দেন। গ্যোটে এই রমণীর রূপ দেখে অভিভূত হন। অনতিবিলম্বে তিনি ক্রিস্টিয়ান ভুলপিয়ারসকে বাড়ীর কর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন। এখানে বলা যেতে পারে, তাঁর ভাই উত্তরকালে Rinaldo Rinaldini নামক উপভাষ্য লিখে প্রখ্যাত হন। ইটালী-ভ্রমণ অঙ্কে গ্যোটের চারিত্রিক প্রকৃতি বেশ উন্নত পর্যায়ে উঠেছিল। তাঁর এই জীবনান্বর্ষের সঙ্গে কেউ সমান তালে চলতে পারছিল না—এই ছিল গ্যোটের মত। শ্রীমতী স্ত্রীয়েনের সঙ্গে গ্যোটের বিরোধ চলছিল। শ্রীমতী স্ত্রীয়েন গ্যোটের মধ্যে ইন্দ্রিয়ধর্মিতা ও প্যাগান প্রেমিকের অভিব্যক্তিকে মেনে নিতে পারেন নি। গ্যোটে বোঝাতে চাইতেন ইন্দ্রিয়ধর্মিতার মধ্যে সুস্থি রয়েছে এবং এইটাই হল মর্ম। শ্রীমতী স্ত্রীয়েন এতে ভূপ্ত হননি। যতাত্মিত পড়ল যখন স্ত্রীয়েনের শিশু পুত্র ফ্রিৎজ এসে জননীকে বলেন গ্যোটের উজ্জানগৃহে এক রমণীকে সে দেখেছে। শ্রীমতী স্ত্রীয়েন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং পরিশেষে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। গ্যোটে ক্রিস্টিয়ান ভুলপিয়ারসকে প্রথমে পরিচারিকার পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে বিবাহিত পত্নী বলে দাবী জানান। বিবাহ পৃষ্টধর্মমতে হয়নি। এর জন্য পত্নীর মর্যাদা অনেকে নিতে চাইতেন না। অভিভাষ্য সমাজ এ-বিবাহ অস্বীকার করেন নি। অবশ্য গ্যোটের জননী এই বিবাহকে মেনে নেন। বিবাহের পর গ্যোটের পুত্রসম্ভান জন্মায়। ছেলেকে ও পত্নীকে তিনি ভালবাসতেন। বিবাহের বছরদিন পরে তিনি পৃষ্টধর্মমতে বিবাহকে পবিত্র করেছিলেন। গ্যোটের জীবন কবি-পত্নী বাচান একবার। এই ঘটনার পরেই তিনি বিবাহ পবিত্রকরণ করেছিলেন। কবির জীবনের অভিব্যক্তি হল Roman Elegies। কাব্যের প্রেমসী কবিপত্নী। সেন্সটি ১.৪৪ পূণ্যক সৃষ্টি।

যদি ভালবাসার ধনকে প্রকৃত ভালবাসা যায় তবে তাকে ছেড়ে এলেও কিছু হয় না। সময় চলেছে। তার স্থানে কোন কিছু স্থলাভিষিক্ত করা যায় না। ছেলেকে রেহ দিও। মজপান বেসী করে কেলেছি। তবে আর কারও প্রতি আমার দৃষ্টি নাই। ছেলের কথা ভাবছি, তার সঙ্গে তোমার কথা ভাবছি, তাড়াতাড়ি কিবে আসব। ইতি—

স্ত্রীয়েনের কাছে এসে পড়েছি, তবুও মনের অভাব। 'ননীর মত কোমল শয্যা' পাতা আছে, সুতরাং তোমার চিন্তা নাই, বাড়ীর

মতনই বিছানা। আমার চেয়ে অনেক সুন্দর লোক থাকতে আমাকে গ্রহণ করলে কেন? এতে অসুখ আসে। আমাকে তুমি ভালবেস। আমাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে, তোমাকে অধীর ভাবে ভালবাসি। এর চেয়ে অন্য কিছুতে আমি সন্তোষ পাই না। মা তোমাকে বধু হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন, তোমার ওপর তাঁর ধারণা ভাল। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিও অন্ততঃ সন্তানের জন্য। তোমাকে ছাড়া আর কারও প্রতি আমার দৃষ্টি নাই। ইতি—

সেরা মন আর তোমাকে পাঠাতে পারছি না। আমাকে ভালবাসতে ভুল না। বাড়ী বকরকে তকতকে যেন থাকে। মাহুর, মিটি আর রান্নাবরের কথা মনে পড়ছে। তোমাকে স্বপ্ন দেখি।... শ্রীমতী স্ত্রীয়েনের কাছে ছেলেকে পাঠিয়ে দিও।

আবহাওয়া খুব খারাপ। কুয়াশার আক্রান্ত মনে গেছে। আবহাওয়া সুন্দর। রাত্রি আরও রমণীয়। অগ্নিকাণ্ডের কলে পথ ঘাট মন্দিরের চূড়া সব দৃষ্টি হয়ে গেছে। ইতি—

Carlsbad—19. 7. 95.

এখানকার আবহাওয়া ভাল নয়। কয়েকটা চকিত মধুর নারীদের চাহনি দেখা যায়, তবে ভয় নাই। আমার বিশ্বস্ত বন্ধকে তুলিনি; তাকে আমি ভালবাসব। ছেলের প্রতি আর তোমার প্রতি আমার মন পড়ে আছে। গৃহের দিকে মন টানে। আমার জীবন যে তোমার মধ্যে পূর্ণ হয়ে আছে। ইতি—

Illmenan—29. 8. 95.

কাজের চাপে আটকা পড়ে গেছি। ক্রত কিরতে পারব না। তাই আমার সঙ্গে ছেলেকে আরও কিছুদিন থাকতে হবে। সে কত শান্ত হয়েছে জান। ছেলে আমার সকলের সঙ্গে কথা বলে। সব কিছু দেখে। সকলে তাকে চেনে। মধু দিয়ে তৈরী কেক তোমার কাছে সে পাঠাচ্ছে। এ-গুলো খেতে সে বেশ ভালবাসে। তার কত কষ্ট হয় এ-গুলো পাঠাতে। কিছু মোজা পাঠিয়ে দিও। এখানকার আবহাওয়া খুব খারাপ। তাড়াতাড়ি সব জিজ্ঞাসা কর। ইতি—

তোমার জন্য মসলিনের পোষাক বানাতে দেব। তার পর ফ্রাঙ্কফোর্টে মার কাছে যাব। এ-কথা কাউকে বল না। তোমার কাছে কিবে গেলে আশঙ্ক হব। খরচের জন্য ভেব না। ইতি—

তোমার বিবরে মাদাম দি স্ত্রীয়েনের কাছে লোকে যা বলেছে তার জন্য দুঃখ কর না। পৃথিবীর এই নিয়ম। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া করলেই হল। ইতি—

1810

ছেলে তোমার কাছে গ্রীষ্মে ছুটি কাটাতে আসছে। তার গ্রীষ্মাবকাশকে আমি মান করতে চাই না। তবে পড়াশোনা ছুটিতে সে দূর থেকে করলেই পারত। অবকাশ কাটাবার অনেক দিন তার জীবনে পড়ে আছে। সব জিনিষ না বলে থাকা যায় না তাই বললাম। ইতি—

অনুবাদক :—শ্রীমাদাস সেনগুপ্ত।

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥



ডাক্তার শ্রী অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক]

প্রথমতঃ নিজেকে করে রেখেছেন শিক্ষাধীন—যিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের চিকিৎসা পদ্ধতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। বিনা প্রয়োজনে বিনা স্বীকার্য চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ করেন বিনি—আর নিজদেশের বয়স্ক অভিজ্ঞ অথবা সমসাময়িক স্বব্যবসায়ীদের সহকে শ্রদ্ধা সহিত কথা বলেন যিনি—সেই সবল, আড়ম্বরবিহীন ও দৃঢ় চিকিৎসক শ্রী অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে জানিতে পারি।

১৯১৩ সালের ২৫শে আগষ্ট পিতার কর্মস্থল শিলং সহরে অর্ধেন্দুকুমার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডঃ সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থাকায় অর্ধেন্দুকুমার ভারতের বহু স্থানে গমন করেন। মা চিন্ময়ী দেবী ছিলেন শান্তিপুত্রের তনয়া। পৈতৃক নিবাস নদীয়া জিলার মুড়াগাছা গ্রাম। ঠাকুরদাদা ডঃ গোকুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অর্ধসংগ্রহ করিয়া নিজ জিলার কয়েকটি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠা করেন। বড়দাদা শ্রী সুধাংশুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আয়কর কমিশনার পদ হইতে সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন। অর্ধেন্দুকুমার ১৯৩১ সালে বগুড়া জিলা বিভাগ হইতে প্রবেশিকা ও ১৯৩৩ সালে কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে আই এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় জাশানা মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হন। তথা হইতে ১৯৩১ সালে এল. এম. এক পাশ করিয়া দেড় বৎসরের মধ্যে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ হইতে চক্ষু-চিকিৎসায় ডিপ্লোমা পান। কলিকাতায় কিরিয়া তিনি নিজ কলেজে (বর্তমানে চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল) ১৯৪০ সালে জুনিয়ার ডিজিটিং সার্জেন্ট নিযুক্ত হন। তিনি বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক পরলোকগত এস. কে. গাঙ্গুলীর অধীনে কার্য করিয়া প্রভূত উপকৃত হন। আট বৎসর পরে তিনি ইংল্যান্ডের সুবক্স আইইনফারমারীতে যোগদান করেন—কিন্তু তথায় নূতন কিছু শিখিবার না থাকায় যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিয়া অধ্যাপক রেমণ্ড এম্ব্রী মীকের অধীনে নিউইয়র্ক চক্ষু-চিকিৎসালয়ে কাজ করিতে থাকেন। সেই সঙ্গে অধ্যাপক ওয়ানডেল হিউজের নিকট Plastic Surgery on Eye এবং জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক কাট্রোভিওর তত্ত্বাবধানে Keratoplasty (অক্ষিগোলকের স্বচ্ছাবরণ বসান) শিক্ষা করেন। এ ছাড়া পৃথিবীর সর্বোত্তম মেয়ো হাসপাতাল ও আমেরিকার প্রখ্যাত চিকিৎসালয়গুলির চক্ষু বিভাগের কাজ লক্ষ্য করেন। ১৯৪৯ সালে ভারতে কিরিয়া কলিকাতা জাশানা মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন। ডাঃ গাঙ্গুলী ১৯৫১ সালে প্রথম Keratoplasty অপারেশন করেন। শোনা যায়, কলিকাতায় কর্ণেল কেয়ওয়ানি ও মাদ্রাজে কর্ণেল রাইট এইরূপ পরীক্ষাকার্য করেন কিন্তু নথীভুক্ত

ফসাল পাওয়া যায় নাই। ১৯৫৩ সালে তিনি সুইজারল্যান্ডে বিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক অধ্যাপক ফ্রান্সিস্ চেষ্টের নিকট বিশেষ ভাবে Method of Corneagrafting, Detachment of Vetina ইত্যাদির সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া ভিয়েনা, ফ্রান্স (ডাঃ যোজানে), ইটালী ও বাসিলোনাহ চক্ষু-চিকিৎসালয় সমূহ পরিদর্শন করেন। শেষোক্ত স্থানে ডাঃ বরাকর (Barakar) প্রতিষ্ঠিত (সরকারী সাহায্য বিনা) ক্লিনিকের কার্যকলাপে তিনি মুগ্ধ হন। ডাঃ বরাকর একটি শুল্ক শাস্ত্রের আবিষ্কারক।

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি পুনরায় সুইজারল্যান্ডে অধ্যাপক চেষ্টের নিকট সর্বাধুনিক চক্ষু-চিকিৎসার প্রয়োগ পদ্ধতি শিখিয়া আসেন। বর্তমান বৎসরের শেষে অথবা আগামী বৎসর তিনি জার্মানী কলোন্ এ অক্ষিগোলকে Photo-Quagglation প্রক্রিয়া শিখিবার জগ্ন বাইতে মনস্থ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন চক্ষু-পীড়িতকে অধ্যাপক মীক অথবা অধ্যাপক চেষ্টের নিকট পাঠাইয়াছেন—যিবে এসে সুস্থদেহী তাঁহারা জানিয়েছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা এই দুইজন প্রখ্যাত চিকিৎসকদের উদ্দেশে—বিশেষতঃ তাঁদের সেবা, যত্ন, আদর ও জাতিভেদাত্মক শূন্যতার।

মাড়োয়ারী সেবা সমিতির আহ্বানে ডাঃ গাঙ্গুলী বড়বাজারের ঘানীরাম বুনো চক্ষু-গামপাতালে পরিদর্শক-চিকিৎসক হিসাবে যোগদান করিয়া উহাকে 'সুসজ্জিত' করেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তিনি তথায় পর পর দুইটি Corneagrafting করেন। একটিতে বাঙ্গালী এক বৃদ্ধের চক্ষুগোলকের তেজী আবরণ, সৌরাস্ট্রের এক কিশোরীর অকেজো আবরণের পরিবর্তে বসান হয়। এই দুইটি ঘটনায় তিনি সাক্ষ্যলাভ করেছেন বলে জানা যায়।

১৯৩৬ সালে গোবরডাকার স্বর্গগত সতীশ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী অর্পণা দেবীকে অর্ধেন্দুকুমার বিবাহ করেন। নানারূপ খেলাধুলার অমুরাগী তিনি এবং আমেরিকায় 'স্কি' (ski) আদৃত



ডাঃ অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

করেন। এছাড়া কটোপ্রাকীতে তিনি পায়দশী এবং Fundus অর্থাৎ চক্ষু। ত্রিভবের ছবি তোলায় আগ্রহী।

দারিদ্র্য, দুখের অভাব, সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতির জন্ম কখনো, সহরে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিপাত, মেয়েদের সাংসারিক কাজে অবহেলার জন্ম কোনরূপ কারিক পড়িগ্রম না হওয়া, গ্রামে হাড়ফের চক্ষুচিকিৎসা ও গ্রামে চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ না থাকার—বাজালাদেশে চক্ষুরোগ বিস্তার করেছে বলে তাঁহার ধারণা।

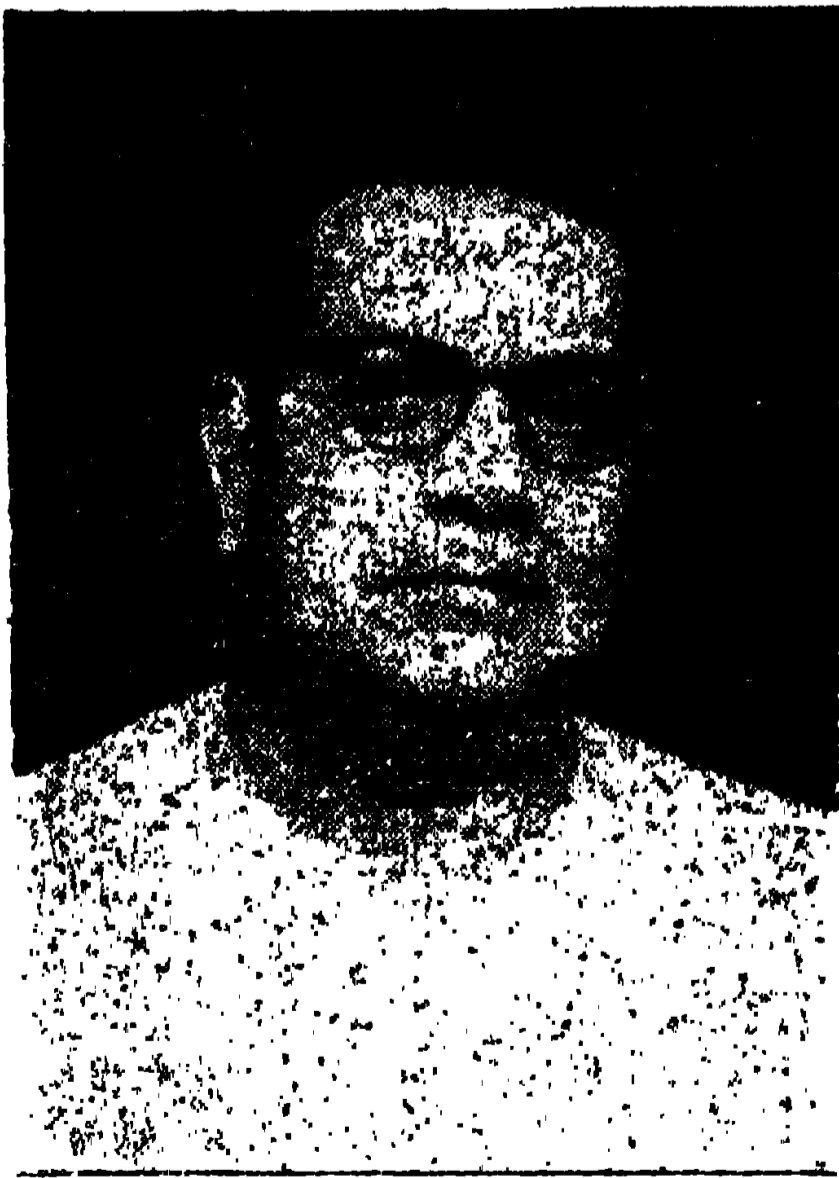
বর্ত্তই উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক হইন না কেন, সর্বাধুনিক চিকিৎসা সখ্যকীর পুস্তকাদি ও পদ্ধতি সখ্যে ওয়াকিবহাল না হলে— চিকিৎসকেরা অনেক পিছিয়ে পড়েন। এই জন্ম আমেরিকার প্রতি পাঁচ বৎসরে গ্রামের চিকিৎসকেরা সহরের হাসপাতাল অথবা ক্লিনিকে যুক্ত হয়ে Refresher Course সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। সেইরূপ ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু করা যায় কি না, তাহা সরকার বিবেচনা করিতে পারেন—ইহা ডাক্তার গাঙ্গুলী অহুত্তব করেন।

শ্রীশ্রুবোধচন্দ্র মৈত্র

[প্রবীণ বৈমানিক ও বিমান-কারিগরী শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ]

জ্ঞাত অনুবিধা সখ্যে এফক প্রচেষ্টা ও হর্নিবার আকাঙ্ক্ষার সখ্যেভূমুক একটি প্রতিষ্ঠানকে যে সুরক্ষণপ্রস্থ করা যায়, তাহা দমদমে অবস্থিত ভারতের আদি ও অধিতীর বিমান কারিগরী শিক্ষালয়ের কার্যধারা অহুসরণে উপলব্ধি হয়। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হল ওকত্বপূর্ণ ও সময়সাপেক্ষ—সেজন্ম ছাত্রসংখ্যা নির্দিষ্ট মাত্র ৩০।৩৫ জনকে লওয়া হয় প্রতি বৎসর—কিন্তু সারা দেশ থেকে আসে বহু আবেদন। ইহার স্থাপয়িতা হলেন প্রবীণ বৈমানিক ও বিমান-শিল্প-ইঞ্জিনিয়ার শ্রীশ্রুবোধচন্দ্র মৈত্র।

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের প্রথম ভারতীয় সুরপারিনটেন্ডেন্ট শান্তিপুত্রের ৮জগদীশচন্দ্র মৈত্র ও শ্রীমতী ননীবালা



শ্রীশ্রুবোধচন্দ্র মৈত্র

দেবীর প্রথম পুত্র শ্রুবোধচন্দ্র ১১১১ সালের ১ই এপ্রিল কলিকাতার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১১২৭ সালে সেট জ্যোশেক বিদ্যালয় হইতে সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করিয়া C. E. S. C.তে শিক্ষানবিশী হন এবং গৃহে শিল্পবিষয়ক পুস্তকাদি পড়িতে থাকেন। ইহার পর ক্রেক মোটরকার কোম্পানীতে লেড বৎসর থাকিয়া ১১১৩ সালে লণ্ডনস্থ সিটীসিন্ড হইতে 'অটোমোবাইল' সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। উক্ত বৎসরে তিনি করাচী এরো-ক্লাবে গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারী পড়িতে যান। পর বৎসর বেঙ্গল ক্লাইং ক্লাবে আসিয়া ১১৩৩ সালে বেঙ্গল সরকারের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া 'এ' ও 'সি' লাইসেন্স পান। কয়েক মাস পরে তিনি ইংল্যান্ডের রিভীং Phillips & Powis Aircraft Ltdএ যোগদান করিয়া হাঙ্কা বিমান তৈরীরী সখ্যে শিক্ষা নেন। সেখান হইতে তিনি বৃটিশ সরকারের 'এ' ও 'সি' লাইসেন্স গ্রহণ করেন। তখন শ্রুবোধচন্দ্র Armstrong Ltdএ আসিয়া 'হইটলী' (বৃহৎ বখার) সখ্যে জ্ঞানলাভ করেন ও যাত্রা কন্ডেক্টরী শিল্পকলেজে পড়িতে থাকেন।

১১৩৫ সালে 'বি' ও 'ডি' লাইসেন্স লইয়া তিনি উক্ত কোম্পানীর সাউদাম্পটন শাখার 'ফাইনাল ইনস্পেক্টর' হিসাবে ১১৩৬ সালে Ensign বিমান নির্মাণের তত্ত্বাবধান করেন। সেই সময় তিনি Design & Construction বিষয়ে 'বি' লাইসেন্স লইয়া তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। পরে De-Harilland এ 'ফাইনাল ইনস্পেক্টর' হন ও 'এসবাস্ট্রাস' নামে কাঠের বিমান নির্মাণের ভারপ্রাপ্ত থাকেন। ১১৩৮ সালে ছয় মাসের ছুটিতে ভারতে আসিয়া বেঙ্গল ক্লাইং ক্লাব ও এরার সার্ভের চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কার্য করেন; এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার পরলোকগত ডি. আর. ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রথম কন্যা শ্রীমতী মায়া দেবীকে বিবাহ করিয়া তিনি ইংল্যান্ডে নিজ কর্মস্থলে 'করিয়া যান। ১১৩৯ সালের মধ্যভাগে শ্রীমৈত্র সিংহলের এরো-ক্লাবে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যোগদান করেন। তথাকার বেসামরিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থাকে তিনি উন্নত করিয়া তোলেন। ১১৪২ সালে তিনি সহকারী বিমান পরিদর্শকরূপে দিল্লী ও পরে করাচীর ভারপ্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে বাজালোর হিন্দুস্থান কারখানায় প্রধান সরকারী পরিদর্শক হিসাবে Harlow ও Hawk বিমান নির্মাণের তত্ত্বাবধান করেন। পরে দমদমে A. I. D. হিসাবে ভার গ্রহণ করেন। এ কয়টি স্থানে তিনি বৃটিশ পরিচালকদের পরিবর্তে আসেন। সরকারী কার্য ভাল না লাগায় ১১৪৫ সালে পদত্যাগ করিয়া তিনি 'মৈত্র কোম্পানী' গঠন করিয়া বিমান-কারিগরী শিক্ষার জন্ম প্রচেষ্টার ক্ষুদ্র কোর্সি-এর ব্যবস্থা করেন। ১১৪৬ সালে 'এয়ারওয়েজ'তে প্রধান ইঞ্জিনিয়াররূপে উহাকে সংগঠন করেন ও ১১৫৮ সালে কলিকাতা-বাজালোর বিমানপথ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে বিমান পরিবহন প্রসারের সঙ্গে প্রয়োজন বিমান-কারিগর, বিমান-ইঞ্জিনিয়ার, বিমান নির্মাণকারী, বিমান পরিকল্পনাকারী—বিমান পরিদর্শক। তাই অতিজ বৈমানিক ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমৈত্র চাকুরী ত্যাগ করিয়া ১১৫৮ সালের কেকরয়ারী মাসে ভারতে প্রথম বেসরকারী Air Technical

Training Institute খোলেন দশদশে। ক্রমশঃ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে উহার উদ্দেশ্য—কয়েক বৎসরে সেখান থেকে বেবিয়েছে কিছু ইঞ্জিনীয়ার—পেয়েছে বেসরকারী ও সরকারী সমর্থন কিছুটা। কিন্তু একক প্রচেষ্টার এই বিরাট কর্মশালাকে ভারতের অভ্যন্তর পৌরষের বস্ত করে তুলতে হলে প্রয়োজন অকুঠ সমর্থন ও সহযোগিতা সর্বত্রের। শ্রীমতঃ নিঃস্বার্থভাবে নিজের অভিজ্ঞতা ও সামান্য পুঁজি অর্পণ করেছেন ইহার পিছনে—যার বৎসরের কিশোর হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান কিন্তু আমার মনে হল যে উহার পূর্ণ বোঝান আনতে হলে চাই সারা দেশের পূর্ণ আন্তরিকতা। নিভুতে যে কর্মের সাধনা শুরু হয়েছিল আজ লোকসমক্ষে তাহা প্রকটিত হয়ে উঠুক ইহাই কাম্য।

১১৩৭ সালে শ্রীমতঃ পাইলট নির্বাচিত হন। তিনি লণ্ডন এরোনটিক্যাল সোসাইটির এসোসিয়েটেড ফেলো, লণ্ডন ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ার ইনঃ স সদস্য, এবং ভারতে এরোনটিক্যাল সোসাইটির পূর্ণ সদস্য, উহার কার্যকরী সমিতির (ছয় বৎসর) ভূতপূর্ব সদস্য, ভারতীয় কারিগরী শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষের সভার অভ্যন্তর সদস্য ও লাইসেন্স পরীক্ষা বোর্ডের ভূতপূর্ব পরীক্ষক ছিলেন বা আছেন। লণ্ডনস্থ এয়ো-ক্লাব শ্রীমতঃকে International Aviators সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

এই শিক্ষাসরে বিমান সংক্রান্ত পঠিত বিষয় বাতীত অটোমোবাইল, ডিজেন্স, ট্রাক্টর, রেডিও সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ারী প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষাদান প্রবর্তিত করা হইয়াছে।

শ্রীমতঃের দুই তনয়া বিবাহিতা—তন্মধ্যে কনিষ্ঠা পরিণয়ন্বয়ে ধারদ্ধা হয়েছেন উদীয়মান মক ও চিত্রাভিনেতা বিমান বিখ্যাজি স্টোপাধ্যায়ের সহিত।

বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সুবোধিত হইলেন মনে-প্রাণে গায়ত্রী। স্বদেশে রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারে তাঁর গভীর আস্থা আর আধ্যাত্মিক রূপময় ভারতের প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতি। তাই তিনি প্রায়শঃ যান ঠাকুর পরমহংসদেবের আশীর্বাদপূত পীঠস্থানে—যার তাঁর নিজস্ব ঘরে শোভিত রয়েছে একটি ছদ্মপ্যা ছবি—‘ঠাকুর দেহরক্ষা করেছেন শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত্ত অবস্থায়।’

শ্রীইন্ডিজিৎ গুপ্ত

[বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও লোকসভার সদস্য]

স্বাভাবিক অবস্থায় একে হইত আমরা দেখতে পেতাম একজন বাহু আই-সি-এস রূপে কিংবা একজন নামকরা পেশাদার ব্যারিষ্টার। যোগাঃতা সংঘে ও আন্দোলনপ্রতিষ্ঠার এ নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে রাজনীতিবিদের কটকিট ভূমিকা বরণ করে নেওয়া নিশ্চয়ই এক অসাধারণ পদক্ষেপ। অন্ততঃ এটুকু অসকোচে বলা যায়, প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও লোকসভার সদস্য শ্রীইন্ডিজিৎ গুপ্ত আপন পারিবারিক ধারায় একটি মস্ত ছেদ বা ব্যতিক্রম।

২৪ পরমণা জেলার পরিচা প্রায়ের বিশিষ্ট গুপ্ত-পরিবারে এই মাহুঘটির জন্ম হয় ১১১১ সালে। তাঁর পূজ্যপাদ পিতামহ ছিলেন স্বনামধন্য বিহারীলাল গুপ্ত। প্রায় এক শতাব্দী আগে সুরেশচন্দ্রনাথ বানার্জী, যমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল—এই ত্রয়ীকলেক থেকে

আই-সি-এস হয়ে আসেন একযোগে। ইন্ডিজিৎের পিতা ব্যারিষ্টার শ্রীমতীশচন্দ্র গুপ্তও একজন কৃতী পুরুষ। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় সেক্রেটারী পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন দীর্ঘকাল। ওমিকৈ তাঁর পুত্রনীর যাতায়াৎ ও তিন মায়াও ছিলেন আই-সি-এস। তাঁর স্যোভ্রাজ্যতা শ্রীমতঃ গুপ্তও একজন আই-সি-এস এবং সরকারী ব্যারিষ্টার পদে অধিষ্ঠিত।

ইন্ডিজিৎ বধন ছাত্র, সামনে স্বভাবতঃই লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল বড় হবার। পারিবারিক ধারাকে অকুর রাখতে তিনিও পিছনা হবেন না, এ প্রতিশ্রুতি তাঁর মনে ছিল। ছুল-জীবনে তিনি অধ্যয়ন করেন দিমলায় সেট এডওয়ার্ড স্কুলে আর দিল্লীর সেট স্কুলে কলেজে চলে তাঁর কলেজীয় পড়াশুনো। ছাত্রাবস্থায় প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইতিহাসে অন্যাসহ ১১৩৭ সালে তিনি বি-এ পাশ করেন—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়টিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন সে ব্যয়ে তিনিই।

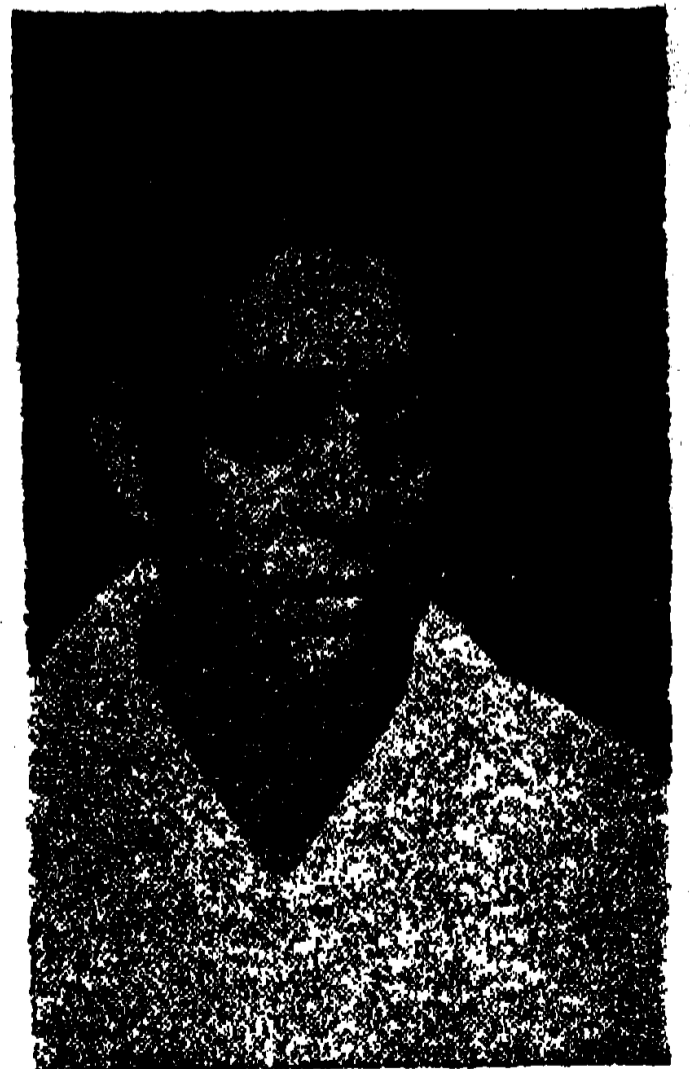
এর পরই ভবিষ্যৎ জীবন সংগঠনের জন্ত এবং উচ্চ শিক্ষালাভের তাপিন্দে শ্রীগুপ্ত চলে যান ইংল্যাণ্ডে। আই-সি-এস হবার লক্ষ্য বাস্তব সুহৃৎও তাঁর ছিল কিন্তু সেব অবধি মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই হইত সে পথে তিনি পা বাড়ালেন না। কেমব্রিজের ট্রাইপস পরীক্ষায় কৃতিত্ব সহকারে পাশ করে তিনি স্বদেশমুখী হন।

কিন্তু ইত্যবসরে ইন্ডিজিৎের ভেতর এক নতুন মাহুঘের জন্ম হয়ে যায়, তাঁর চোখে দেখা দেয় নতুন দৃষ্টি। ইংল্যাণ্ডে বাওয়ার আগে অবধি পারিবারিক প্রভাবই ছিল তাঁর ওপর বেশি—রাজনৈতিক আলোচনা কিংবা ক্রিয়াকলাপ থেকে তিনি থাকতেন অনেক দূরে। কিন্তু বিলেতে থাকা অবস্থায় তাঁর চিন্তাধারার আদুস পরিবর্তন ঘটে—আই-সি-এস হতে বেয়েও আই-সি-এস হওয়া এই জন্তে হল না।

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ছাত্রমহল সে সময় রাজনৈতিক চর্চা ও আলোচনার খুব বেশি রকম মস্ত। সাম্রাজ্যবাদ ও ক্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন আনাতে তাঁরা ক্রমেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে এর ভেতর তাঁদের যোগাযোগ ঘটে—তা র তে র সূক্তি-

সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার ব্যাপারে পরম্পর নিবিড় আলোচনা হয়। এই অল্পকাল পরিবেশেই জীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ইন্ডিজিৎের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়—কমিউনিষ্ট পার্টি ও মতবাদের দিকে তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। নতুন পথে স্বদেশসেবার সফল নিরে তিনি কিরে আসেন ভারতে ১১৪০ সালে।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি তখন বে-আইনী—নেতা ও কর্মীদের অনেকেই তখন



শ্রীইন্ডিজিৎ গুপ্ত

কাঠামানে। বাবা বাইবে থাকতে পারেন, আত্মসোপন
কন্যায় পুসিদের চকু এড়িয়ে পণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে
পারেন তাঁরা। পার্টীর একজন বিদগ্ধ কর্মী হিসাবে
ইন্ডিয়ান আত্মসোপন করেই নির্ধারিত কাজ করে চলেন সেদিনে।
বহুকষ্টে পণ পার্টীর সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি বেশে ট্রেড ইউনিয়ন
সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই ক্ষেত্রেই তিনি বিশেষ
লক্ষণ ও প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন, এ নিশ্চয়। আত্ম
জিহ্বা বক্রী প্রাথমিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে সম্পাদক,
বিবিধ ভারত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অধ্যক্ষ সম্পাদক ও বিবিধ
ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রসমূহের কাছাকাছি কমিটির সম্প্রদায় অধিষ্ঠিত।
প্রথম আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি পণতান্ত্রিক ভাষায়, সোভিয়েট
ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় দেশ সফর
করেছেন, ভাষান্তর প্রথম আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সে
সকল দেশে।

বহু বয়সে পণতান্ত্রিক বাস, কমনিস্ট পার্টীর সঙ্গে আত্ম ইন্ডিয়ান
ও পণতান্ত্রিক হলে গেছেন—বাক্তিগত বসন্তে একশে তাঁর আশা
সত্য নেই। বিভিন্ন পণ-আন্দোলনে তিনি সেই থেকেই সক্রিয়
ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন। সাধারণ শোষিত মানুষের সেবার
নিজেকে বিশেষ দিতেই আজ তাঁর প্রাণের ব্যাকুল আগ্রহ।
দক্ষিণ কলকাতা দক্ষিণ-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে
বিশু সোটারিকো তিনি জয়লাভ করেছেন—দেশকর্মী ও নেতা
হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা যে কতখানি, এই থেকেই স্পষ্ট বুঝতে
পাওয়া যায়।

শ্রীত্রিদিবকুমার চৌধুরী

[রাজনৈতিক নেতা ও লোকসভার সদস্য]

মিঃ চৌধুরী, সনাতন, চিরকুমার, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নেতা
ও লোকসভার সদস্য শ্রীত্রিদিবকুমার চৌধুরীর আসন আজ
শ্রীমতসভার সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ, তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে থাকে
শ্রীমতসভা সমালোচনা ও দৃঢ় মনোভাব।
শ্রীমতসভা সমালোচনা চৌধুরীর চারি পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে বিতীর্ণ



শ্রীত্রিদিবকুমার চৌধুরী

পুত্র ত্রিদিবকুমার শিটার কর্মকর্তা ঢাকা শহরে ১৯১১ সালের
ডিসেম্বর মাসে জন্মান। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মা ৩তমখানা
বেড়ীকে হারান কিন্তু বিয়াতা ৩তমখানা বেড়ীর মেহ-ভালবাসি আজও
তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন। বয়স ৪৯ পাঁচখানা জিলায়
চাউনোহর হরিপুর। এই স্থানের চৌধুরী বংশোদ্ভূত হলেন ৩তমখানা
আওতাধীন চৌধুরী, ব্যাডিয়ায় এ. এম, চৌধুরী, ব্যাডিয়ায় জে,
চৌধুরী, শ্রীমতসভার চৌধুরী প্রভৃতি বাংলার কৃতী সন্তানগণ।
পল্লীগোবিন্দ বাবু ছিলেন পল্লীগোবিন্দ কন্যারী—২তমখানা বাংলার
বহুবারে তাঁহাকে বাইতে হয়। কিন্তু শ্রীমতসভার জিলায় বিভিন্ন
কার্যের প্রথম চাকুরীকালে থাকার ভিত্তি তিনি বহুবারে পণ
হারা বাসিন্দা হন। ত্রিদিবকুমার হারান M. E. বিভাগের
পরিচয় ভাষাকার কন্যার কলিকাতায় ছুলে হইতে হন এবং ১৯২৮
সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৩০ সালে হারান কলেজ
হইতে আই. এ. পাশ করেন।

কন্যার ছুলে পড়াই সময় তাঁহার এক জাতি-জাতীর মাথানে
তিনি বিপ্লবী-আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন এবং তের বৎসর বয়সে
অনুষ্ঠান সমিতির সক্রিয় হন। সেই সময় তিনি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ
দত্ত, শচীন সান্যাল, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রভৃতি-পাড়লী, শ্রীমতসভার
যৌব প্রভৃতি বিপ্লবী নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। কলে
গোয়েন্দা পুলিশ তাঁহার উপর খুব লক্ষ্য রাখে এবং ইন্টারমিডিয়েট
পরীক্ষার পর তিনি লোকচক্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে বাধ্য হন। কিন্তু
১৯৩১ সালে ওরায়েট বলে দৃঢ় হইয়া হিজলী বিশ্ববিদ্যালয় তিনি
অবস্থান করেন এবং তখা হইতে ১৯৩৩ সালে বি. এ পাশ করেন।
ইহার পর রাজপুতানার মেট্রোপলিট্যান বন্দী হইয়া ১৯৩৬ সালে
ইকনমিক্স এম. এ পাশ করেন। জেলে সেই সময় সরকার পক্ষ
রাজবন্দীদের প্রচুর সামান্য সবজীর পত্র-পত্রিকা পাড়তে অথবা
উচ্চতর বিজ্ঞানিক উৎসাহ দিতেন—বদি তাঁহাদের মনোভাব
পরিবর্তিত হয়। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত
কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময় তিনি যুবনেতা সুরভাচন্দ্র বসুর
সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। ইহার পূর্বে সুরভাচন্দ্রের
শ্রীমতসভা জিলা পরিভ্রমণের সময় ত্রিদিবকুমার সঙ্গী হিসাবে অবস্থান
করেন। জঙ্গীপুর ষ্টেশনে সুরভাচন্দ্র নির্দিষ্ট ট্রেন ধরিতে পারিলেন না
বলিয়া কিশোর ত্রিদিবকুমার চক্র গাড়ীতে উঠিয়া বিপদভাগ্যক
শিকল টানিয়া গাড়ীর গতিরোধ করেন। ইউরোপীয় গার্ড
সুরভাচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া ত্রিদিবকুমারকে কিছু বলেন নাই।
১৯৩৭ সালে রাজবন্দী মুক্ত আন্দোলনের কলে অস্ত্রের সহিত
শ্রীচৌধুরীও মুক্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ২৩য় আইনসভায় কংগ্রেস
পার্লিমেটারী দলের অফিস সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। উক্ত
দলের নেতা ছিলেন ৩৭তমখানা বসু, সহ-নেতা ৩তমখানা গোখারী,
সম্পাদক ৩কিরণশঙ্কর বসু ও চীফ হইপ জীন্স, সি, গুপ্ত। এই সব
দিকপালদের সহিত কাজ করিয়া পরিবর্তন আইন-কাহন ও কার্যকলাপ
তিনি ভালভাবে আয়ত্ত করেন। এদিকে তিনি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী
দলের নিয়মিত সদস্য হিসাবে জাতীয় কার্যে লিপ্ত হন। কিন্তু
ত্রিপুরী কংগ্রেস ও পরে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনধরে তিনি
সমাজতন্ত্রীদের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ১৯৪০ সালে প্রভু
দী বোম্বে ৩ চাউনোহর প্রভৃতি সক্রিয় R. S. P. (বিপ্লবী

সমাজতন্ত্রী দল) গঠন করেন। হলওয়েল বৃত্তিভিত্তক অপসারণ আন্দোলনের পূর্বে অত্যন্ত প্রবীণ বিপ্লবী-নেতাদের সহিত ১৯৪০ সালে শ্রীচৌধুরী পুনরায় যুক্ত হইয়া হিজলী জেলে থাকেন ও ডিসেম্বর মাসে ঢাকা জেলে বাটরা ১৯৪৫ সালের প্রথমভাগে কমনওয়েলথেলে বন্দী হন। ১৯৪৬ সালের মে মাসে তিনি জেলখানা হইতে ছাড়া পান। এক বৎসর তিনি দলীয় সংগঠন লইয়া ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু কমতা হস্তান্তরের পর R. S. P. জাতীয় কংগ্রেস হইতে (১৯৪৭ সালে) বাহির হইয়া আসেন। বর্তমানে ইহা উত্তর ও দক্ষিণভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে বহুমতীপুর কেন্দ্র হইতে সমাজতন্ত্রী দলের প্রার্থী হিসাবে তিনি কংগ্রেসপ্রার্থীসহ কয়েকজনকে পরাজিত করিয়া লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পুনরায় ১৯৫৭ সালে উক্ত কেন্দ্র হইতে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৯৪৮ সালে উত্তর নীহারবন্দন রায় ও শ্রীচৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনার "ক্রান্তি" মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া শ্রীচৌধুরী সংবাদপত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

ত্রিদিবকুমারের রাজনৈতিক জীবনে ৫২ জন বেচ্ছাসেবক সহ ১৯৫৫ সালের ১-ই জুলাই পর্তুগীজ-অধিকৃত গোয়ার ভারতীয় পতাকা লইয়া প্রবেশ এবং অত্যাচার ও নির্যাতনের মধ্যে উনিশ মাস তথাকার পুলিশ ও সামরিক জেলে জীবন বাপন—এক উচ্ছল অধ্যায়রূপে পরিগণিত হয়। ইহার পিছনে আছে এক ভয়ঙ্কর ক্ষুদ্র ঘটনা। ১৯৫৫ সালের মে মাসে পুণায় R. S. P.র দলীয় সভা হয়। শ্রীচৌধুরী তথায় লোকসভার সদস্য শ্রীখাদিলকরের গৃহে ছিলেন। কতকগুলি গোয়ানিবাসী যুবক তাঁহাদের সহিত পরামর্শের জন্য আসে। ত্রিদিবকুমার তাঁহাদের বলেন যে, আইনসভার সদস্যরা যদি বেচ্ছাসেবক সহ গোয়ার অত্যাচার করেন তবে কাজের সুবিধা হইবে। হঠাৎ তাহারা শ্রীচৌধুরীকে প্রথম দলের ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার জানায়। চিরবিপ্লবী ত্রিদিবকুমার চার সপ্তাহের সময় চাহেন। দিল্লীর কাজ শেষে তিনি বাংলায় আসেন। গোয়া যাওয়ার কয়েক দিন পূর্বে অরে আক্রান্ত হন। সেই অবস্থায় পুণা হয়ে তিনি গোয়ার প্রবেশ করেন। স্থানীয় পুলিশ একটি ক্ষুদ্র ঘরে তাঁহাদের একত্রে তেত্রিশ জনকে বাধে। অসহ্য কষ্টভোগ—সপ্তাহে

একদিন রান—আহার্য অধািত—ভয়পরি পুলিশের অত্যাচার ও আটাই। ছয় মাস পরে সামরিক জেলখানার বন্দী হন। কিন্তু এখানে কষ্টের কিছুটা লাঘব হয় ও অত্যাচার কম ছিল। এই সময় তিনি পর্তুগীজ ভাষা শেখেন। মহামাভ পোপের হস্তক্ষেপের ফলে অত্যাচারের সাথে শ্রীচৌধুরী ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তথা হইতে মুক্ত হন।

উনিশ মাস গোয়া জেলে থাকার সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, পর্তুগীজরা খুব ভয়ঙ্কর স্পেশাল পুলিশ ছাড়া ১৭৮৩ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত প্রতি দশ বৎসরে তথায় একটি করে বিপ্লব হয়েছে। সর্বপ্রথম হয়েছিল "ধর্মবাহকদের বিদ্রোহ" ও সর্বশেষ হয় "রাশেদে"। তথাকার হিন্দু সারস্বত ব্রাহ্মণরা অবস্থাপন্ন বাসিন্দা—তারা চার পর্তুগীজ শাসন—নিজেকে ধার্যে। বহু শিক্ষিত পর্তুগীজ প্রধান মন্ত্রী সালাজারের শাসনে সম্বলিত নয়। গোয়াবাসীর সংখ্যা হল ছয় লক্ষ। শতকরা ৪০ জন খৃষ্টধর্মাবলম্বী। তাঁহার গোয়া-অভিযানের কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তৎলিখিত পুস্তকে 'সালাজারের জেলে উনিশ মাস।' সারা ভারতে শ্রীচৌধুরীর মুক্তির জন্য প্রচুর আন্দোলন হয়। বাংলা দেশের প্রতিটি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র তাঁহার মুক্তির দাবী ঘোষণা করে। কলিকাতা পৌরসভার সর্বসম্মতিক্রমে 'পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীটের নাম ত্রিদিব চৌধুরী স্ট্রীট'এ পরিবর্তিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বহু নির্দলীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার মুক্তি দাবীর আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীচৌধুরীর পূর্বে শ্রীদেশপাণ্ডে এম-পি গোয়ার প্রবেশ করেন—তিনি প্রস্তুত হন—কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

শ্রীচৌধুরী বলেন, 'আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাবার খুবই উচ্চাশ ছিল—আমার জন্য প্রচুর বই কিনেছেন—আমি যখনই বাহা চেয়েছি তাই দিয়েছেন—কিন্তু তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারিনি। বহু বিপ্লব-আন্দোলনে আমি নিজেকে যুক্ত করার, তাঁর চাকুরীক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু কোন দিন তাঁর কাছ থেকে উঠেছি কোন অসুযোগ, অভিসযোগ বা হত্যাশা। আর আমার বিমাতা আমার প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানে পক্ষে।'

অন্তরে ব্যথা

মাধবী সেনগুপ্ত

অপরাধ কেটে গেলে হবো হবো সন্ধ্যার আলো
সন্ধ্যার যে আবেশটুকু ভরে তোলে বিকেলের মন,
সেই মন কেঁপে ওঠে বিকেলের ব্যাকুল বাতাসে
বৃহৎ ছোঁয়া, জ্বালাপন, ক্রমে প্রেম পাঠের হ'ল।

বুদ্ধ হয়ে দেখি মন, মন দেখি মুক্তার মত
পড়ছিল কোন দূর সাগরের অতল তলায়,
এক বিন্দু ছোঁয়া পেয়ে, গর্ভ নয় ধুলেছে কপাট
পড়শীড়া তাকে নিয়ে তাই আজ গুণনরত।

ব্যাকুল বাতাস আজ কণে কণে আনে শিহরণ
আবাত্তে আবাত্তে জাগে কাজ-শেষ ভেঙে পড়া জেটি,
চলে বাব বহু ঘুরে বেখানে মাছুব নেই কোন
অকুরাণ প্রেম বেথা ভরে থাকে নোদের মতল।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

পঁয়ত্রিশ

বলাই-পচার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর নতুন-আলার বুদ্ধীধর
সিঁয়ে জুটেছে। গুঠাবসা আগেও ছিল, সে হল আর দশটা
মাছ-মারার মতন। এবারে চাকরি দিয়েছে নগেনশী—মাস মাস নগদ
তঙ্কার মাইনে। নতুন ঘেরির বেলদার। বেলদার বুদ্ধীধর। এরার-
বন্ধুদের মাঝে বুদ্ধীধর চাকরীর কথা তুলে জাঁক করে। সকলের
থেকে স্বতন্ত্র—তুচ্ছ মাছ-মারা আর নয়, চাকুরে মানুষ।

বেলদারের প্রধান কাজ দিবারাত্রি ভেড়ি পাহারা দিয়ে বেড়ানো।
যোগ হল কিনা ঠাইর করে দেখা। গাঙ-খালের নোনা জল ঝিরঝিরিয়ে
ঘেরির ভিতর আসে, সেই ছিদ্রপথের নাম হল যোগ। ঘেরির
তলদেশে স্তম্ভ একটি ছিদ্র—সেই পথে জল এসে চুকছে, খুব নজর না
করলে বোঝা বাবে না। কিন্তু অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়ে পড়ে এই
ব্যাপারটা। সূঁচ হয়ে চুকে ফাল হয়ে বেরুনো—বাদাবনে এই সামান্য
যোগের ব্যাপারে সেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। জল চুইয়ে এসে মাটি
ধুয়ে আস্তে আস্তে পথ বড় হয়ে ওঠে। তার পরে কোটালের সম্বর
প্রচণ্ড স্রোত সেই পথে মাথা চুকিয়ে বাঁধ ভেঙে ফেলে চারিদিক
একাকার করে দেয়। দীর্ঘ দিনের তৈরি করা মাছ বেরিয়ে চলে
যায়, মালিকের মাথার ঘা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় থাকে না।
আবার তখন নতুন করে ভেড়ি বেঁধে নতুন ডিম ও চারামাছের
মরস্তম অবধি বসে থাক চূপচাপ হাত-পা কোলে করে। এতদিন
যা-কিছু করেছিলে সমস্ত বরবাদ। বেলদার তাই সতর্ক চোখে
যোগ পাহারা দিয়ে বেড়ায়। তিলেক সন্ধ্যা ঘটলে সেই দুই
জায়গাটুকু খুঁড়ে নতুন মাটি শক্ত করে চাপান দেবে। ভেড়ির
কোনখানে যদি দৈবাৎ ভেঙে গেল, লোকজন জুটিয়ে এনে ঘরিতে
সেটা মেরামত করে ফেলবে। তার আগে বাঁশের পাটা পুঁতে ঘিরে
দেবে ছেঁড়া জায়গাটা। কিছু পরিমাণ বাইরের জল আসে
আসুক, কিন্তু ভেড়ির খোলের একটি কুচো-চিংড়ি বেরিয়ে যেতে না
পারে।

বেলদারের কাজ অতএব সামান্য নয়। কঠিন দায়িত্ব। এর
উপরে কাইকরমাস আছে তো হরবধত। আলার রান্নার জন্ত কাঠ
কেটে আন বন থেকে। কাঠ চেলা করে দাও। কলসি ভরে মিঠা
জল নিয়ে এস—নৌকোর গুবিধা হল না তো কাঁধে বয়ে আন।

পথ কতই বা—জু-চার ক্রোশ বই তো নয়। বেলদারের কাজের
কোন লেখাজোখা নেই। যেমন এই বিয়ের পাত্র নগেনশীকে ধর
দিয়ে আনতে হল ফুলতলা অবধি ছুটে গিয়ে।

তাই নিয়ে বুদ্ধীধর জাঁক করছিল বলাইয়ের সঙ্গে : হার বেখানে
আটকায়, অমনি বুদ্ধীধর। চারখানা হাত আমার, আর চারটে চোখ।
এই কোদাল ধরে ভেড়ির মাটি কাটছি এই আবার শিলনোড়া নিয়ে
বাল বাটতে রান্নাঘরে বসে গেলাম। রটন্তীপুঞ্জোর পাঁঠা কিনে
এনেছি বড়দলের হাতে গিয়ে, আবার এই দেখ ফুলতলা গিয়ে বরও
এনে হাজির করে দিয়ে খালাস। তোমাদের কী-ই বা কাজ ছিল—
কুমিরমারি মাছের ডিঙি পৌঁছে দিয়ে চললাম। যেতে জা-ও
তিনজনে মিলে।

বুদ্ধীধর নাম খুব জাঁকালো, কিন্তু মানুষটা হাবাগবা। বাঁটিয়ে
বাঁটিয়ে তার কাছ থেকে লোকে মজার কথা শোনে।

বাদাবনে বিয়ে—কী কাণ্ড হচ্ছে বল তো বুদ্ধীধর। মানষেলা থেকে
তকাংটা তব্ব কি রইল? দুটো-পাঁচটা বা মেয়েমানুষ আছে—হয়
তারা বিয়েখাওয়া চুকিয়ে এসেছে, না হয় তো আর ঐ পথে
বাবে না।

কিন্তু হচ্ছে তো এবারে। না হয়ে আর রক্ষে নেই। কনে
মজুত, চক্কোত্তি পুরুতমশায় মজুত। বরকে আমি হাজির করে
ছিলাম। ফুলতলা থেকে ঐ সঙ্গে বিয়ের বাজারও সেরে এসেছি
বড় বড়েল বর—হিসেবপত্তর করে নিজে পাঁড়িয়ে থেকে কেনাকাটা
করল, একটা পরমা বাতে এদিকওদিক না হয়। চৌপর পছন্দ
করে মাথার বসিয়ে মাপ দেখে নিল। সমস্ত হয়ে গেছে,
বাকি এখন শুধু মস্তোর পড়ে কনের পিঁড়ি সাতটা পাক ঘুরিয়ে
নেওয়া।

জগন্নাথ গুনছিল বলাই আর বুদ্ধীধরের কথাবার্তা। এবারে
কাছে চলে এসে বলে, কনে বা দজ্জাল, পিঁড়ি থেকে লাক
দিয়ে পড়বে না তো সাতপাকের সময়? খোঁড়া-বর ছুটে গিয়ে
কনে জাপটে ধরবে, সে কমতা নেই।

বুদ্ধীধর বলে, বর না পারুক—অত বড় চৌধুরি-আলার সবুজ
নেমস্তর—বাহা বাহা মরদ জোরানরা থাকবে। তারা গিয়ে
ধরবে।

বলাই বলে, মেম্বর আমাদের হবে না?

হাত ঘুরিয়ে বুড়ীও বলে, সব সব। বরমশায় বলে দিয়েছে সাইতলা আর চৌধুরিগঞ্জ মিলে কতই বা রাখুব। কেউ বাদ থাকবে না।

জগা হেসে বলে, ঢালাও হকুম। বাপের বাপ, বেলামাল হয়ে পড়েছে স্মৃতিতে। মজা টের পাবে। ঐ মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করা আর জাত-গোথরো ঘর করা একই কথা। যেমন শরতান নগনাটা, তেমনি তার উচিত শাস্তি। এর চেয়ে অল্প কিছুতে শাস্তি হত না। যেখিন বলাই, বিয়ের বেন কোনরকম বাগড়া না পড়ে। নিখিলে বেন হয়ে যায়।

হেসে হেসে চলে গেল জগরাথ। দিনটা কাটল। সন্ধ্যার সিকে শশী ঘোষকে ডেকে নিয়ে খালের ধারে গেল, জঙ্গলের পাশে। বলাইও আছে।

শশীকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি তো ডাকাত?

শশী ঘাড় নেড়ে না না করে ওঠে: না জগা, হিংস্রটে লোকে বদনাম রটার। দেখতে পাবে, থাকব তো বরাবর একসঙ্গে। গুরু-চুরির মামলায় মিথোমিথি জড়িয়ে ফাটকে পুরেছিল একবার।

জগরাথ গভীর হয়ে বলে, একজন খুন-ডাকাত দরকার আমার। বনে গুচ্চর ভালমানুষ নিয়ে কি হবে? তবে তো তোমার দ্বিহ্নে হয় না। দেখি কাকে পাওয়া যায়।

শশী ভাড়াভাড়ি বলে, ফাটকে একবার খানি ঘুরিয়ে এলে আর তো ভালমানুষ থাকবার জো নেই। খুন যদি হয়ে থাকে ইচ্ছে করে তো করিনি। কাজে-কারবারে আপনি খুন হয়ে গেছে।

তেমনি কাজ আবার একটা করতে হবে। আজকেই।

জিত কটে শশী: পাপের ফল কক্ষণে ভাল হয় না জগরাথ। ধারাপ পথে যেও না। কাঁচা বয়স বলে মনে ধরবে না আজ, কিন্তু আমার দ্বিহ্নে দেখ। আমার পরিণাম দেখ। টাকাকড়ি বা-হোক কিছু করেছিলাম আজকে একেবারে চনচন। পরের ভাত্তে থাকি। ছেলে নেই, বউ নেই, নির্বংশ মানুষ। রোগপীড়ের পড়ে থাকলে এক বিহুক জল এগিয়ে দেবার মানুষ নেই। নিড়ানি নিয়ে ক্ষেতে বসে বেলাত বাস বাহলে তবে তার এক মুঠো ভাত দিত।

জগা বলে, খুন করতে হবে না। মালপত্তর লুঠেরও দরকার নেই। একটা মানুষ চুরি করতে হবে শুধু। অল্পবস্তুর মারধোর দিয়ে জঙ্গলে দিয়ে আসবে।

বলাই অবাক হয়ে যায়। মতলব সমস্ত একলা জগার, বলাই কিছু জানে না। তাকে বলেনি। প্রশ্ন করে, কোন মানুষ—কোথার সে? নগনা খোঁড়া।

বলাই আন্দাজ করেছিল তাই। শশী বলে, খোঁড়ামানুষের উপর আক্রোশ কেন গো?

জগা বলে, ও খোঁড়া একজন বাড়ী। পুরো ছুই ঠ্যাংওয়ালাদের কান কেটে দেয়। বড়দাকে উৎখাত করে নিজে মালিক হবে। সর্বনাশ ঠেকাবার জন্ত বোনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বড়দা ভাব জমাচ্ছে। কিন্তু ভবী ভোলে না—পাশাপাশি ছুই ঘেরিয় মাতকর হয়ে আরও জাঁকিয়ে বসবে। সর্বনাশ বা হবার হবে যাবে থেকে মারা পড়বে মেয়েটা।

বলাইয়েরও খুব রাগ নগেনশশীর উপর। বলে, জঙ্গলে বওয়াবরির কি দরকার জগা? ও-লোকের উপর মারা কিসের? পারে তো শশী-দা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে বস্তায় পুরে মাকপাটে ছেড়ে দিয়ে আনুক। আলাতন করতে আর বাতে না করে আসে।

শশী ঘোষের স্মৃতি লাগছে। অনেক দিন পরে মজার কাজ একখানা এসে পড়ল বটে। হাত নিশপিশ করে তার। একপাল হেসে বলে, একই তো কথা ঠাডাল বলাই ভাই। জঙ্গলে ছেড়ে এলেও কেয়ার ভয় নেই। বাঘে ধরবে। এক দিক দিয়ে বরক ভালই—আমাদের উপর নরহত্যার পাপ অর্শাবে না। বাঘে খেলে আমরা কি করতে পারি?

বলাই ঘাড় নেড়ে বলে, ওকথা মনেও টাই দিও না শশী-দা। খোঁড়া নগনার মাথা-ভরা শরতানির বিব। হাড়-মাস বিবে তিতো। বাঘ যদি আসে, এক কামড় দিয়ে খু-খু করে কেলে দিয়ে যাবে। গিলতে পারবে না।

জগা বলে, শোন শশী-দা বড়দার উপরে বউ অত্যাচার হচ্ছে। বাদাবন এটা। সমাজ নেই যে পকারেতে মাতকররা মিলে একটা ফয়শালা করে দেবে। সরকারি উপরওয়ালার কথা যদি বল, তিন জোরার মেরে উঠে তবে খানা। খানার গাছতলার তোমার বসিয়ে রাখল। দারোগাবাবুকে একটা ধর পৌছে দেবে, তার জন্তেও শালার সিপাহি হাত পেতে আছে। পুরো বাস কাঁচি সিগারেট—বিড়ি কিম্বা সস্তার মাসিক-সিগারেটে হবে না। তবে বোক, বা-কিছু করতে হবে নিজেদেরই। বরসকালে নিজের হুনাকার জন্তে তো বিস্তর করেছে—বুড়ো বয়সে পরের জন্ত কিছু কর, পুণ্য হবে। আমরা সাথে সঙ্গে আছি। বুদ্ধি বাতলে দাও, হাতে-নাতে আমরাই সব করব।

শশী ঘোষ কিছু চিন্তিত হল।

বিয়েটা কবে?

বুধবারে।

বা করবার, আজকেই তবে করে ফেলতে হবে। একটা রাত্তির হাতে রাখতে হয়। যদি ঘর কোন গতিকে পরলা বুধে বাগড়া পড়ে গেল।

চূপচাপ আরও একটুখানি ভেবে নেয় শশী। বলে, মজেল শোর কোনখানে? ভাল করে দেখা আছে জায়গাটা?

বাঁধের উপরে উঠে এল তিনজনে। নতুন আবার কাছাকাছি এল। শশী বলে, আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না। এমনি বল, আমি আন্দাজ করে নেব।

বলাই বলে, পূবের পাশে খোলা জায়গা—ঐখানটা আমরা আজ্ঞা জমাতাম। বড়দা আর নগনা ওখানে শোর। ক'দিন আবার চকোত্তি মশার জুটেছে ওদের সঙ্গে। মেয়েলোক হু-জন কাষরার ভিতর থাকে।

শশী প্রশিধান করে বলে, সেটা ভাল। ছুরোরে শিকল তুলে দিলে বেরিয়ে আসতে পারবে না। মেয়েমানুষে বউ চোঁচার।

আবার বলে, তিন জনের বেশি তো নয় বাইরে—ঠিক জান? বাইরের অল্প কেউ এসে থাকে না—ব্যাপারি-মহাজন মাঝিমাঝিরা কেউ?

বলাই নিখাস ফেলে বলে, থাকতাম তো কতজনে আমরা।

কিন্তু খাঁড়া নগ্ননা মানবের বেঁধে সইতে পারে না। একে একে সব ভাঙিয়েছে। মজা বুঝুক এই বায়ে। গুণভিত্তিই ঐ তিন জন। গুর মধ্যে টোনি চক্কাতি বা মাহুব, সেদিনের নগ্নর-কীর্তনে টের পাওয়া গেছে। হাঁক শুনেই আগাপাশলা কাঁধা চাপা দিয়ে মজার মতন পড়বে।

জগা বলে, বড়কাও তাই। পরস-হরে ভয় চুকছে মনে। প্রাণের বজ্র মায়া।

শশী ঘোষ বলে, তোমাদের নগ্নেশশীও ঠিক অমনিধারা হবে। এদিক ওদিক চরে বেড়িয়েছি তো এক কালে—অনেক রকম মাহুব দেখা আছে। যে মাহুব বত শরতান সে তত ভীতু। জঙ্গল অবধি যেতে হবে না, হাত-পা বেঁধে পাঁচপারে কলে দিয়ে এসে আর পার হরে আসবে না। দেশ-ঘরের পাশে হাঁটবে।

অনেক রাত্রি। কী ভয়ানক অন্ধকার। জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে এদিকে সেদিকে। বেরুল তারা। আগে শশী ঘোষ, পিছনে বলাই আর জগরাধ। মহেশ ঠাকুর এসব কিছু জানেন না, অব্যবাহিত যুগেছেন। পচাকেও খুলে বলেনি। একটা কিছু হবে এই মাত্র সে বুঝেছে, জগা নিজে থেকে না বললে সাহস হয় না কিছু জিজ্ঞাসা করবার। নৌকো এপারে আঘাটার এনে চূপচাপ আছে বসে সে প্রতীকার।

পাকা লোক শশী। দেহ একটু কুঁকো হরে পড়েছে, কিন্তু রাত্রিবেলা কাজের মুখে এখন সে দেবদাকর মতন খাঁড়া। চোখের মনি ছটো অলছে। বিড়ালের চোখ যেমন অল, বাঘের চোখ যেমন। নতুন-আলার কাছাকাছি এসে সে থমকে দাঁড়ায়। কিসকিসিয়ে বলে, দেখ এস। আজকেও তিন জন, না বাইরের কেউ গুর উপরে এসে জুটেছে। নগ্নেন কোন পাশে সেটাও দেখে এস ঠাহর করে।

জগা বলে, বলাই চলে যাক টিপিটিপি। এসব ব্যাপার পাঁচ কান না হয়। আমরা এই তিন জন। আর পচা জানবে একটু পরে। বা বলাই, আমরা এইখানে রইলাম। রাধেটাকে ডেকে নিলে হত না ঘোষ মশায়? হবে তিন জনে?

শশী ঘোষ অবহেলার ভাবে বলে, তিনই তো অনেক। কাজ দেখনি আমার হাতের। পচার মতন তোমাদেরও নৌকোর বসিয়ে দেখে একলা চলে যেতাম। কিন্তু আনকোরা নতুন জায়গা, খাঁতখাঁত বুকে নেবার একটা দিনও তো কুরসং দিলে না। তার উপর বয়সও খানিকটা হরে গেছে। ডান-হাতে বাঁ-হাতে সেজন্ত তোমাদের ছটিকে নিয়ে বাছি।

বলাই সাঁ করে চলে গেছে আলা-ঘরের কানাচের দিকে। হারার মতন একটা মাহুব বাঁধ ধরে এদিকে আসছে। মাছ-মারাদের কেববার অনেক ঘেরি। ঘেরির কাছাকাছি এই গুল্মটে জাল কেলতেও কেউ আসবে না। কে তবে মাহুবটা? শশী আগে দেখেছে; দেখতে পেয়ে জগার হাত ধরে টানে। একটু খানি সরে দিয়ে হুজনে সৈয়োবনের আড়ালে দাঁড়াল। হাঁটনা দেখেই জগা আন্দাজ করেছে। জন্ত কেউ নয়, বুদ্ধীধর। কাছাকাছি হল মাহুবটা—বুদ্ধীধরই বটে। বেরিয়ে এসে জগা বলে, বিয়ের কাজে তোর বজ্র খাটনি। হরে গেল সব জোগাফজর?

বুদ্ধীধর বলে, পনের আনা তো ফুলতলা থেকে এসে গেছে। চক্কাতি মশায় দেখেওনে বা ছটো-একটা এখন বলছেন, চৌধুরিপুত্রের গুরা কুমিরমারি থেকে কেনাকাটা করে এনে দেবে।

কিক করে হেসে বলে, বরের বাড়ি তো চৌধুরিপুত্র হরে গেল। সাঁইতলা কনের বাড়ি। চৌধুরি-আলা থেকে সেজেজেজে জোল-কাঁদি বাড়িয়ে বরবাড়ী-পুকত সঙ্গে করে বিয়ে করতে আসবে। বরপাতার সেইখানে পিয়ে উঠেছে।

জগরাধ ভক্তিত হরে বলে, নগ্ননা এখানে নেই ২

এই তো রেখে এলার চৌধুরি-আলায়। যেজবাবু আর চক্কাতি মশায় হু-জনকে। কম হাদামা! আমাদের সালতি নেই, হেঁটে যাবে কেমন করে—চৌধুরিপুত্র পিয়ে সেখানকার সালতি নিয়ে আসতে হল। কিয়ে আসছি, অনিরুদ্ধ আটকে কেলল। কুঁচুবাড়ির লোক হলাম আমি। না খাইয়ে কিছুতে ছাড়ল না।

আলা-ভরা হরে জগা বলে, এইটুকু হাঁটতে পারে না, সালতি নিয়ে আসতে হয়—পা তো একখানা খোঁড়া ছিল, আর একখানা খোঁড়া করে দিয়েছে নাকি রে কেউ?

এক গাল হেসে বুদ্ধীধর বলে, বিয়ের বর হয়েছে যে। তোমরাও হবে একদিন জগা। বরপাতার পায়ে হাঁটলে লোকে কি বলবে? চক্কাতি মশায়ও সেই ব্যবস্থা দিল: হেঁটে বাওয়া চলবে না। হেঁটে খেয়ে পড়লে চিত্তির। বিয়ের ভণ্ডুল পড়ে যাবে। এই দুটো দিন সামাল-সামাল—মজোর ক'টা পড়া হরে গেলে তার পরে আর চিন্তা নেই।

আলায় হুকে গেল বুদ্ধীধর। বর ও পুকতের নিধিয়ে পৌছানোর ধবর দেবে। এবং পগ্নন একলা আছে বলে বুদ্ধীধরও থাকবে হয়তো আলায়। কিন্তু বলাই যে ফেরেনা—কোনখানে ছুব দিয়ে আছে বুদ্ধীধরকে দেখতে পেয়ে।

শশী বলে, বলাই এসে নতুন কি বলবে? সবই তো জানা হরে গেল।

কিয়ে চলল হু-জনে। জগরাধ গুম হরে আছে। তারপর বলে ওঠে, আছা, ঠিক আছে—

কি বলছ?

মেয়েটাই চুরি হবে। ঐ চাকুবালা। কনে না পেলে বিয়ে করবে কাকে?

এক হুহুত খেমে বলে, মেয়েটা আরও বিচ্ছু। নগ্ননা খোঁড়াকে হু চক্কে দেখতে পারত মা। এখন ভাবছে, হু-হুটো ঘেরি নগ্ননার হাতে এসে গেলে মুলুকের মালিক হরে মাতকরি করে বেড়াবে। সেই লোভে চূপ করে গেছে। নইলে রণচণ্ডী একবার হুকার ছাড়লে বড়নার তাগত হত এই কাজে এগোবার?

শশী ঘোষের দোমনা ভাব: কাজটা বড় গঞ্জগোলার হরে খাঁড়াকে জগরাধ। বেটাছেলে চুরি আর মেয়েছেলে চুরি একরকম কথা নয়। সোমত মেয়ে ঐ রকম ভাবে জঙ্গলে ছেড়ে আসা যাবে না।

জঙ্গলে না হয়, মানবেলার নিয়ে ছাড়ব। ফুলতলার, না হয় সেই মাতলা শহর অবধি পিয়ে।

শশী বলে, মানবেলা তো বেশি ভয়ের জায়গা জঙ্গলের চেয়ে।

সর জন্তু-আনোরারের খাবা তবু হয়তো এড়ানো যায়, কিন্তু না সোমস্ত মেয়ে মানবেলার মাহুব হাবলা দিয়ে পড়বে।

জগা বিবস্ত কঠে বলে, জান না যোব মশায়, সেই জন্তে খা বলছ। মেয়েই তো হাবলা দিয়ে বেড়ায় বস্ত পুরুষের উপর। তোমার নিয়ে গিয়ে কিছু পরসা কড়ি হাতে ভাঁজে দেব। রেলগাড়ি তারপরে যে চুলোর ইচ্ছে চলে যাক।

শশী ভেবে নেয় একটু : সিঁদকাঠি চাই তবে একটা। কামরার দিবে আছে। ভিত্তরে চুকতে হবে তো? চুকে পড়ে ছুয়োর দেব। দেয়াল খুঁড়ে পথ করে দাও, তার পরে তোমাদের ক-কিছু দেখতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি নেড়ে বলে, উঁহ, খোঁড়াখুঁড়ির কাজও পারবে তোমরা। পোস্ত হাত ছাড়া হয় না, আওরাজ করে কেলবে। সিঁদকাঠি জোগাড় করে দাও, আমি সব করব। আমার নিজের ফটা ভাল জিনিষ ছিল, পরসা নখরের পোলাদে গড়ানো। রোগার ভয়ে পুকুরের জলে কেল দিলাম। সে কি আজকের খা? দারোগার অভ্যাচায়েই তো দেশভূঁই ছেড়ে জঙ্গলে আসতে পার।

বলাই এসে পিছন ধরল। আলার উন্টো দিকে পর্গার দর হরে জল ভেঙে এসে বাঁধে উঠেছে। জগা বলে, সিঁদকাঠির দর করা যার বলাই? মুশকিল হল, ওদের কামরার দেয়াল খুঁটে করতে হবে।

বলাই বলে, সিঁদকাঠি না-ই হল, খন্টার গর্তে হয়ে যাবে। গাটির দেয়াল। হবে না যোব মশায়?

কাঁচা-বাঁদার বন কাটতে চলেছে। ঘরও বাঁধবে সেখানে। খন্টা আছে, হেঁসো-দা আছে, কুড়াল আছে। তা ছাড়া শিকার ও মাহুরকার জন্ত আছে লেজা কোচ ছোরা। আর ঠারেঠোরে শশী যোব ভরসা দিয়েছে, দেশি বন্দুকও মিলতে পারে একটা; বন্দুক সরে সামলে রাখা আছে কোথায়। অস্ত্রের ভরা বাচ্ছে তবে তো, নৌকোর খোলে রয়েছে সব।

বলাই বলে, সিঁদ কেন কাটতে যাবে যোবমশায়? জানলা আছে কামরার কানাতে। জানলার কাঠের পরাদে, ধারালো কিছু দিয়ে পরাদে কাটা যাবে। তুমি একবার নৌকোর চল দিকি, বা দরকার নিজে বেছেওছে নিয়ে এস।

ভাই উচিত বটে। ওস্তাদ মাহুব শশী যোব অনেকদিন বাদে কাজে মায়ছে। পুরানো সাকরের কেউ নেই, একলা হাতে সমস্ত করতে হবে। স্বচক্ষে দেখে নেওয়া ভাল। কিন্তু জগা যাবে না নৌকোর। তার বাবার কি প্রয়োজন? এখন তার অস্ত কাজ। এই যে কথা হল কিছু টাকাপরসা দিতে হবে চাকবালার হাতে—সেই ব্যবহার বাচ্ছে। সেদিন কুমিরমারি থেকে ফিরে এসে কেওড়াতলার পোপন ভাঙারে আমার সব খুঁতে রেখেছে। মাটি খুঁড়ে বের করে আনবে কিছু এখন।

বলে, চলে যাও তবে তোমরা। আমি একটা কাজ সেয়ে আসছি। দেবি হবে একটু। দেয়াল খোঁড়া জানলা কাটা—এ কাজগুলো করতে লাগ, আমি তার মধ্যে এসে পড়ব। আমার বাদ দিয়ে যদি না করতে চাও, নৌকোর বসে থেকে ভা হল।

তোমার কোন করে লাগবে? করব তো আমিই। তবু কলাই থাকলে হবে, হাতের কাছে এটা-ওটা এগিয়ে দেবে। মুখ মেয়ে মাল নৌকোর এনে কেলবার সময়টা তোমাদের লাগবে। জোরান-বুবার কাজ। তার মধ্যে চলে এসো।

শশী আর বলাই নৌকোর চলল। শেষ এইবারে চাকবালার হলকলা। বাবাবন থেকে জন্মের মতন বিদায়। ফুলতলার ঘাটে সেই দেখা। কোন লগের প্রথম দেখা গো—সাপে-নেউলে সেয়ে গেল একেবারে। সর্বশশী মেয়ে জগাকে দেশান্তরী করে ছাড়ল। বন কেটে মাটি তুলে ঘেরি বানানো এমন সাধের জারগা ছেড়ে বয়ারখোলায় বাজার দলে চলে বেতে হল তাকে। শোধ এত দিনে। জগারা না-ই বা থাকল, কিন্তু তাদের নতুন-ঘেরিতে চাকবালারও নগেনশশীর সঙ্গে জাঁকিয়ে সংসারধর্ম করবে না। এই ভাবনার বড় আশ্রয় পাচ্ছে।

হন-হন করে জগা চলেছে। ক্ষিধে পেয়েছে বস্ত। পা টলছে ক্ষিধের। সাজবেলার ওরা সবাই খেয়ে নিল, জগা খায় নি। খেতে ইচ্ছে হল না কিছুতে। আসন্ন শুভকর্মে একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া অবধি ক্ষিধে-তেটা উপে গিয়েছিল। এখন সেই ব্যাণারের খানিকটা বন্দোবস্ত হয়ে বাওয়ার ক্ষিধে চাড় দিয়ে উঠল। অনেক হাজারী তো এইবারে—নৌকো নিয়ে কি ভাবে কত পথ বেতে হবে, ঠিকঠিকানা নেই। খালি পেটে বোটে বাওয়া যাবে না।

ভাতে জল ঢেলে পান্ডা করা আছে। কাঁপ সরিয়ে ঘরে চুকে কলাইয়ের খালার পান্ডা নিল ঢেলে, আর খানিকটা গুড়। খেতে খেতে শান্ত হয়ে এখন ভাবছে, কাজটা ভাল হচ্ছে কিনা। সোমস্ত মেয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে কোন জারগার? টাকা-পরসা কি পরিমাণ দেওয়া হবে তাকে? যেমন রাগি মেয়ে, পরসা যদি ছুঁড়ে মারে তার গায়ের উপর? কাঁপিয়ে পড়ে গাঙের জলে? সকল বন্দোবস্ত শেষ, কাজে লেগে গেছে হু-হুটো মাহুব, হয়তো বা সিঁদ খোঁড়া হয়ে গেল এককণে। এখন জগা এমনি সমস্ত আবার ভাবছে।

মেঘে ধমধম করছে আকাশ। বাতাস বন্ধ, গাছের পাতাটাও নড়ে না। মহেশ ঠাকুর বিভোর হয়ে ঘুরছেন মাহুবের উপর। টেমি জালিয়ে রেখেই ঘুম, নিভোবার কথা মনে নেই। পাজাটা আজ বড় বেশি মাত্রায় টেনেছেন। কেবোসিন ফুরিয়ে দপদপ করে উঠে টেমি নিভে গেল। চুলোর বাকপে—রাছ বেছে খেতে হবে না, আলোর কি দরকার? ভালই বরক। আলো দেখে পান্ডার কেউ হয়তো চুকে পড়ল। রাখেস্তায় হয়তো—ক্যাপা মহেশের কন্ডের প্রসাদ পাবার লোভে। এসেই বকর-বকর জুড়ে দেবে, মুশকিল তখন সামাল দিয়ে বেরনো। ওরা এককণে কাজ অনেক ছুর এগিয়ে ফেলেছে। পাকা লোক শশী যোব—বয়সে বুড়ো বলে কি হবে, জোরান বুবারের হার মানিয়ে দেয়। বাইরের কাজকর্ম সেয়ে কামরার চুকতে পারছে না হয়তো তারা, জগরাখের পথ ভাঁকাছে। জগা পোপাসে মিলছে, পান্ডা কটা শেষ করে লহমার মধ্যে বেরিয়ে পড়বে।

চমকে যার। মাহুব যেন বাইরে। খুঁটখাট আওরাজ। কাঁপ একটু কাঁক করল। দেখবে কি, বিবম অন্ধকার। এমন অন্ধকার

কিন্তু হারার মতো মানুষ একজন, সেটা বোঝা যাচ্ছে। বলাই চলে এল নাকি ঘেরি দেখে? গুগোল ঘটল কোনরকম? হয়তো বা ঘরে কেলেছে শব্দী খোবকে, খবর নিয়ে বলাই ছুটেছে।

কাঁপ সরিয়ে ঘরে চোকে মানুষটি—কী আশ্চর্য, কাঁপগুলিতে চুড়ি খাচ্ছে ঝিনঝিন করে। ভাতপুস্ত হাত ধেমে যায় জগার—নিজের ঘরে নিঃসাড় হয়ে একেবারে চোর হয়ে যাইল।

ঘরে এসে চাকরী বলা, আলো আলনি কেন?
বিরক্তস্বরে জগা বলেছিল নিবে গেছে, তেল নেই।

ও—

এ কি, চেপে বসে পড়ল চাকরী বলা সামনে। বসে প্রশ্ন করে,
খাওয়া বন্ধ করলে কেন?

হয়ে গেছে খাওয়া।

তাহলে উঠে পড়।

সে বখন হয় উঠব। কিন্তু ঘরকুটি আঁধারে এদর এসে তুমি একেবারে পুরুষমানুষের ঘরে উঠে পড়লে, কেমন মেরেছেলে তুমি?

বোক তবু কেমন! চাকরী বলা খিল খিল করে হেসে উঠল। এমন হাসি হাসতে পারে সে তো জানা ছিল না। হাসি এমন মিষ্টি লাগে অন্ধকারে।

হাসির রেশ মিলিয়ে গেলে আবার বলল, গরজে পড়ে আসতে হল। নৌকো নিয়ে এসেছ, কি শলাপারাম্প হচ্ছে তোমাদের তুমি?

জগা চোক গিলে বলে, না তো। নৌকো আবার কোথায় দেখলে?

চকচকে বকবকে নৌকো, ওপারের গোলবনে চুকিয়ে রেখেছিলে। খবর জানতে কিছু বাকি নেই।

জগরীখ ভক্তিত হয়ে যায়। গোপনতা সবেও নৌকো লোকের নজরে পড়েছে, স্ত্রীলোক চাকরী বলা অবধি জানাজানি হয়ে গেছে।

চাকরী বলা বলে, রাত ছপূরে এখন নৌকা এপারে নিয়ে এল। বড় গাও পাড়ি ঘিরে দূর-দেখে কোথায় বাবে। আমি সমস্ত জানি।

ধমধমে আকাশ। আসন্ন ভাঁটার অদূরে খালের জলও ধমধমে হয়ে আছে। কী সর্বনাশ! এই রাত্রে চুপিসাড়ে পচা নৌকো বেয়ে এপারে নিয়ে এল, সেটা পর্বস্ত জেনে বসে আছে। হাত গুপতে পারে নাকি মেয়েটা? কিবা ডাকিনী-হাকিনী কেউ ঝালপারের বাগাবন থেকে চাকরী বলার মূর্তি ধরে এল?

চাক বলে, আমি জানি সাঁইতলা ছেড়ে চলে যাচ্ছ তোমরা আজ রাত্রে। মহেশ ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছেন। চিরকালের মতো যাচ্ছ, আর আসবে না। কেন বাবে, তাই জিজ্ঞাসা করি। নিজের হাতে কুড়ুল মেরে গাছ কেটেছ, কোদাল মেরে ভেড়ি বেঁধেছ—গোছগোছ করে সমস্ত পনের হাতে তুলে দেবে, সেই জন্তাই কি অত খেটেছিলে?

সর্বরক্ষে রে বাবা! পচা কাঁস করেছে মেয়েটার কাছে, নিঃস্বপ্নে এবারে বোঝা গেল। পচা ছাড়া কেউ নয়। চাকরী বলাকে তোয়াজ করে সে এখনো। কোন এক নূরের জায়গায় বাওয়া হবে, ভাঁটার মুখে নৌকো এনে এপারে রাখবে—এই অবধি জানে শুধু পচা, ভিতরের ব্যাপার কিছু জানে না। আসে না জাগিয়াস।

জগাও এবারে খানিক জো পেয়ে যায়। কোঁস করে নিখাস ছেড়ে বলে, আমি তো একটা একজন নই। বত এই মাহ-মারা দেখ, কত স্মৃতিতে সবাই মিলে খাটাখাটনি করল। কিন্তু খাকবার মতন যাইল কি এ জায়গা? মানবেলা থেকে তোমরা এক দল এসে পড়লে সুখের গন্ধ পেয়ে। পিছন পিছন চৌধুরিদের নায়েব-ম্যানেজার এল। আদালতের পেয়াদা এল। টোনি চকোত্তি এসে আড্ডা পাড়ল মাথা-ভরা শরতানি বুদ্ধি নিয়ে। পাকা রাস্তা হচ্ছে, গাড়ি মোটর আসতে লাগবে। গাড়ি চড়ে কত কত দরের মানুষ এসে পড়বে। দু' বছর পরে আর কেউ ছাতা ছাড়া বেরবে না এ-জায়গায়, জুতো ছাড়া হাঁটবে না। রন্ধকর বাপু, আমাদের পোবাবে না। আমরা চললাম—দেখি পিরখিমের মুড়ো আর কত দূরে।

চাকরী বলা সহসা কাতর হয়ে বলে, আমিও থাকব না। আবার নিয়ে যাও এখান থেকে। তুমি একটা মানুষ তবু একটু মাথা খাড়া করে চলতে। তুমিও শেষ করে দিয়ে যাচ্ছ, তবে আর কোন ভরসায় থাকা এখানে?

জগা অবাক হয়ে বলে, সে কি গো! উড়ে এসে জুড়ে বসলে—আমাদের খেদিয়ে দিয়ে তোমাদেরই তো দিনকাল। কিন্তু বা মানুষ নগেনশশী, বড়দাকে অবধি রেহাই দেবে না। খেদাবে—ছুটো দিন আগে আর পরে।

চাকরী বলা বলে, দাদা বুঝেছে সেটা। বিয়েখাওয়া সেই আপদ-বিদায় হবে বলেই তো। আমিও সংসারের ভারবোঝা এখন। দাদা ভেবেছিল, এক টিলে দুই পাখি নিকেশ করবে। কিন্তু খোঁড়া মানুষ অনেক বেশি সেয়ানা—গাছের খাবে তলারও কুড়োবে সেই মানুষ। বুঝেছে দাদা এখন। বুঝেসমঝে হাত কামড়াচ্ছে। পিছোবার আর উপায় নেই—

কষ্ট অকল্প হয়ে আসে। বলে, ভেবেচিন্তে তোমার কাছে চলে এসেছি। তুমি উপায় করে দাও। দাদা দেশ ছেড়ে এল। নগেনের আলাতন সইতে না পেয়ে ছলেছুতোয় শেষটা আমরাও বাঁচাবনে পাড়ি দিলাম। সে পিছন ধরে এল। তারপরে দেখতে পাচ্ছ তো সব। সহোদর বড় ভাই মাথার উপরে থেকেও নেই—দাদা আর বউ দু-জনেই আজ শত্রুর হয়ে পাড়িয়েছে।

চাকরী বলার কথাবার্তার জগা অবাক। মনে মনে কষ্টও হচ্ছে। কারদার পেয়ে তবু একটা লাগসই জবাব না দিয়ে পারে না: তুমিই তো সকলের মাথার চড়ে বেড়াও। কার যাড়ে ক'টা মাথা যে তোমার মাথার উপরে থাকতে যাবে?

ব্যঙ্গবিঙ্গপ চাকরী বলা কানে নেয় না। বলে, বত খুশি গালি-গালাজ কর, আমি ছাড়ব না। তক্তে তক্তে থাকব, নৌকো ছাড়বার সময় জোর করে উঠে পড়ব। এই যে রাত ছপূরে ম্যাচম্যাচ করে এসে তোমার ঘরে উঠে পড়লাম, কাঁপ চেপে ঘরে পারলে ঠেকিয়ে রাখতে?

জগা বলে, যাব তো আমরা অজদি জ্বললে। আমাদের নৌকোর তুমি কোথা বাবে?

মানবেলার মধ্যে নিয়ে যে জায়গায় হোক আমার ছেড়ে দিও। যেমন করে পারি আমাদের গাঁয়ে গিয়ে উঠব। এমনি ভাত না জ্বাটে, দশ ছম্বারে ভাড়া ভেসে বাসন মেজে খাব। সে অনেক ভাল

এখানে এসে পড়ে করেশখানার আটকে গেছি। তুমিই এক উদ্ধার করতে পার। তোমার সঙ্গে যাব।

বেন আলাদা এক মানুষ—এত দিনের দেখা চাকরবালার থেকে একেবারে ভিন্ন। ভিতরে কোন মন্তলব আছে কিনা কে জানে? পাঁচ ফেলার কোঁশল? সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে জগা সাক জবাব দিল, নৌকোর বাইরের কাউকে নেওয়া যাবে না। মানবেলার দিকে বাচ্ছইনে মোটে, যাব উটে'মুখো।

তবে কি হবে?

হেঁটে চলে যাও, সাঁতার কেটে যাও। রাতবিরেত মান না, গাভ-খালই বা মানবে কিসের তরে? সাপে কাটুক, কুমিরে নিক—আমি কিছু জানিনে।

তড়াক করে জগা উঠে পড়ল। বেরিয়ে যাবে। ভ্যানর-ভানর করে সময় বাচ্ছে, আর অকারণে দেয়াল খুঁড়ে মরছে শশী-বলাই ওদিকে। গিয়ে তাদের সরিয়ে আনবে।

কিছু কাঁপের ছয়োর আগলে বসে চাকরবালার। বলে, যাও কেমন করে দেখি। বেখানে যাবে, আমি পিছন পিছন চলব।

বিষম মুশকিল, কাঁঠালের আঠার মতন লেপটে রইল। জগা কঠিন হয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে: আমি লোক খারাপ। বদনাম শোন নি আমার?

খুন করবে? তাই কর তুমি। জ্যাঙ্ক আমার খোঁড়া নগনার হাতে ফেলে কিছুতে এখান থেকে যেতে দিচ্ছি নে।

সেই অন্ধকারে চাকরবালার জগরুখের পা এঁটে ধরেছে। পায়ের উপর মাথা খোঁড়ে: বিহুনি বাঁধেনি কেন কে জানে, গোছায় গেরো দিয়ে খুঁটি করে বেখেছিল। গেরো খুলে আলুল চুল ছড়িয়ে পড়েছে হুই পায়ের। পা খাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়বে জগা, কিন্তু বড় জোরে ধরেছে যে। বলিষ্ঠ পুরুষ—কিন্তু চম্চলে একটা মেয়ের সঙ্গে পেয়ে ওঠে না। কথার ও কলহে যেমন পারে নি কখনো তার সঙ্গে। ডাকাতি করে মুখ বেঁধে আনতে বাচ্ছল, সেই এখন হামলা দিয়ে পড়েছে তার ঘরে তার পায়ের উপর।

কতক্ষণ রইল এমনি। তারপর জগরুখ বলে, চল তোমার আলার বেধে আসি।

সে কঠে কি ছিল, বিকল্পি না করে চাকরবালার আগে আগে উঠানে নামল। উঠানের আঁধার গাঢ় নয়, নজর চলে একরকম। কাপসা আঁধারে, মরি মরি, কী অপরূপ দেখায় চাকরবালাকে!

জগা বলে, চল, পাড়িয়ে থেক না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আজকে বাচ্ছল কোথাও। কাল রাতে—ঠিক এমনি সময়।

চাকরবালার কথা বিশ্বাস করেছে। চলল নতুন-আলার। জগরুখ তার পাশে। মাটির নিচের ভাগার থেকে টাকাপয়সার তোলায় আজ কোন দরকার নেই। শশী আর বলাইকে এখন ফিরিয়ে আনতে যাবে চুপিসাড়ে। চাকরবালার টের না পারে। সিঁক কাটা শেষ করে কেলেছে হয়তো বা এতক্ষণ। কামরার চুকেই গর্ত দেখে চাকরবালার চেঁচামেচি করবে। কাদের কাজ, বুঝতে না পারে বেন কোন ক্রমে। কোন দিন না টের পারে।

হঠাৎ ধমকে পাড়িয়ে চাকরবালার বলে, তোমরা বেখানে বাচ্ছ সেইখানে যাব আমি চল। মানবেলার একা একা থেকে কি হবে?

জগরুখ বলে, আমিও ভাবছি তাই। মানবেলার উটে দিকে বাত্রা আমাদের। নৌকো ঘুরিয়ে অতদূর নিয়ে যেতে হালানো অনেক। কাজে দেবি পড়ে যাবে, অস্ত্রেরা বাচ্ছ, তারা সবাই রাগারাগি করবে।

দূর কঠে চাকরবালার বলে, তাই কথা রইল কিন্তু। আর কোথাও আমি বাচ্ছ নে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব।

জগা প্রীত হয়ে বলে, কেশোডাডার চরে এবারের নতুন বসন্ত। ভাল হবে। সুরুর করে তুমি ঘরের ডোরা নিকাও, ফুল-বৈভি দিয়ে লক্ষ্মীগুজো কর, গোরাল তুলে গরুর সেবা কর।

একটুখানি হেসে বলে, কিন্তু একটা মুশকিল চাকরবালার, বাঘ এসে পড়ে তোমার গরু মুখে করে নিয়ে যাবে। নিকানো ডোয়ার মাটি নোনা লেগে খুবখুব করে পড়বে। তোমার গুজোআচ্চার বাছুনপুকত মিলবে না।

হেসে উঠে চঞ্চল সুরে চাকরবালার তেমনি জবাব দেয়, পুকত না হলেও লক্ষ্মীগুজো হয়, বউ-মেয়েরা করে। ঘরের ডোরা আমি রোজ লেপাণোছা করব। বাঘও কি আর থাকতে দেবে তোমার? বন কেটে ফেলে কোন মূলুকে তাড়িয়ে তুলবে।

ঘাড় নেড়ে জগা বলে, উঁহ। বন রেখে দেব, বাঘ থাকবে। মানুষ পড়শির চেয়ে বাঘ পড়শি ভাল। বাঘেরা পাহারা দেবে—আবার কোনদিন খোঁড়া-নগনা, গোপাল ভরখাল, প্রমথ ম্যানেজার, আদালতের চাপরাশি আর অহুকুল চৌধুরির চুকে পড়তে না পারে।

[ক্রমশঃ]

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা বেন এক দুর্ভাগ্য বোঝা বহনের সামিল হয়ে পাড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বিচার না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বাধিকীতে, নহতো কারও কোন কৃতকার্যতার, আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র

'মাসিক বসুমতী' এই উপহারের জন্য সুদৃঢ় আবেগের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালস। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে খুশী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এক একজন করে। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যে-কোন জাতঘোর জন্য লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।

অন্তিম অক্ষয় শ্রীমতীমহাশয় অক্ষয়কান্ত মিত্র

২৩

‘কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।’ বাহে বিবজ্জালা
কিন্তু অন্তরে আনন্দস্রোত। তপ্ত ইক্ষুচর্বণের মত।
মুখ জলে যাচ্ছে তবু ‘না যায় ত্যজন’। ‘সেই প্রেমা
যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে, বিষামৃতে একত্র
মিলন।’

প্রৌঢ় সাপের চেয়ে শিশু সাপের বিষ বেশি।
তার কটুতা অর্থাৎ তীব্রতাও বেশি। আর এই
কটুতার জগ্রে সর্পশাবকের গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু
কৃষ্ণপ্রেমের জ্বালা সেই নবকালকূটের গর্বেকেও
নির্বাসনে পাঠিয়েছে। অশ্রুদিকে সুধারও অহঙ্কার
কম নয়। আমার মতন কার এমন মধুরিমা এই
তার অহঙ্কার। কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ সেই অহঙ্কারেরও
সঙ্কোচ ঘটিয়েছে। কৃষ্ণপ্রেম একাধারে বক্র ও মধুর।

নিমাই নাচছে আর আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে
মাটিতে। শচী বলছে, ‘বাছার আমার হাড়গোড়
ভেঙে গেল। তোমরা আর কীর্তন কোরো না।
কাস্ত দাও এবার।’

কে কার কথা শোনে। নিমাই আবার উঠেছে।
না, হাড়গোড় ভাঙেনি। আবার নাচছে নিমাই।
আবার হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ বলে, নামগান
করছে। তখন শচী নিমাইয়ের সঙ্গী-ভক্তদের বললে,
‘ওগো তোমরা নিমাইকে ঘিরে থাকো, যদি ঢলে
পড়ে ধরে ফেলো। তার কোমল অঙ্গ যেন মাটিতে
না পড়ে।’

কিন্তু বারণ করছ কাকে? দেখ কাকে বলে
কৃষ্ণপ্রেম।

শচী নিমাইকে বললে, ‘তুমি যেখানে বা পাও

তা আমাকে দাও। শুনছি তুমি কৃষ্ণপ্রেম এনেছ
তবে তা আমাকে দিচ্ছ না কেন?’

নিমাই বললে, ‘মা, তোমার অপরাধ আছে।’

‘কী অপরাধ?’

‘বৈষ্ণব-অপরাধ।’

অদ্বৈতের প্রতি অপ্রসন্ন ছিল শচী। বড় ছেলে
বিশ্বরূপ অদ্বৈতের কাছে যাতায়াত করত, বলত
ঈশ্বরকথা। যখন সন্ন্যাসী হয়ে বিশ্বরূপ ঘর ছাড়লে,
শচী মনে করল অদ্বৈতই এর হেতু। মন বেঁকে রইল
অদ্বৈতের উপর। তারপর নিমাই যখন আশ্বাস দিল
যে সংসারে থাকবে তখন শচী ভুলে গেল অদ্বৈতকে।
কিন্তু এখন, গয়া থেকে আসবার পর, এ সব কী হচ্ছে?
নিমাই ঘন ঘন যাচ্ছে অদ্বৈতের কাছে। এমন কি
লক্ষ্মীপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে অদ্বৈতের ঘরে রাত
কাটাচ্ছে। নিমাই না আবার সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়।
অদ্বৈত না আবার বৈরাগ্যের মন্ত্র দেয় কানে কানে।
শচীর সমস্ত চিন্ত অদ্বৈতের উপর বিমুখ হয়ে রইল।

আর তার এই বৈমুখ্য এই অপ্রসন্নতাই বৈষ্ণব-
অপরাধ।

কোনো বৈষ্ণবকে প্রহার করলে, নিন্দা করলে, ঘেঁষ
করলে, অভিনন্দন না করলে, অর্থাৎ অনাদর করলে,
বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলে বা বৈষ্ণব দর্শনে
আনন্দ না দেখালে বৈষ্ণবাপরাধ হয়।

শচী বৈষ্ণবপ্রধান অদ্বৈতের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ
করেছে। সুতরাং সে অপরাধী।

‘সবে এই অপরাধ আর কিছু নাই।

ইহার লাগিয়া প্রেম না দেন গোসাঞি ॥’

শান্তি দিল নিমাই। বা বলেও পক্ষপাতিয়

করল না। এ তো দণ্ড নয়, প্রসাদ। অর্ঘ্যের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিল শচী। সে ক্ষমায় অপরাধ ধুয়ে গেল। তারপরে মাকে নিমাই কৃষ্ণপ্রেম দিলে।

‘যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।

সে দণ্ড প্রসাদ অণ্ড লোক পাবে কতি?’

ভক্ত অঙ্গরীষের কাছে অপরাধ করে দুর্বাসারও দণ্ড হয়েছে, বিষ্ণুচক্রের তেজ তাকে দক্ষ করেছে। ছুটতে ছুটতে অঙ্গরীষ বৈকুণ্ঠে এসে শ্রীহরির শরণ নিয়েছে, হে অচ্যুত, হে বিশ্বভাবন, আমাকে রক্ষা করুন। শ্রীহরি বললে, আমার করার কিছু সাধ্য নেই। আমি অস্বতন্ত্র, আমি ভক্তপরাধীন। ভক্তরা আমার হৃদয় গ্রাস করে রেখেছে। তাদের মত প্রিয় আর আমার কেউ নেই। আমি তাদের কথাই শুনি, তাদের কথায়ই উঠি-সি।

তবে আমার উপায়? দুর্বাসা চোখে অন্ধকার দেখল।

তুমি গিয়ে অঙ্গরীষের কাছে ক্ষমা চাও। তা হলেই তুমি শাস্তি পাবে। চক্র আর পিছু নেবে না। ফিরে যাবে।

ব্রাহ্মণ দুর্বাসা ক্ষত্রিয় রাজার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। প্রশান্ত হল বিষ্ণুচক্র।

মুকুন্দ দত্ত সম্পর্কে ও সেই দণ্ড-প্রসাদ।

এক সঙ্গে পড়ত নিমাইয়ের সঙ্গে। ব্যাকরণের কাকির লড়াই হত ছু জনে। অস্তুরঙ্গ সঙ্গী মুকুন্দ আর গানে সুধাকর্ষণ।

সেই মুকুন্দের প্রতি নিমাই বিরূপ। আর সকলকে ডেকে কৃপা করছে, প্রেম দিচ্ছে কিন্তু মুকুন্দকে ডাকছে না। নামও করছে না মুকুন্দের।

কী যেন অপরাধ করেছি। সরাসরি নিমাইকে জিজ্ঞেস করতেও বাহস হয় না। শুধু অন্তরে বসে কাঁদে। ম্লানমুখে ঘুরে বেড়ায়।

শ্রীবাস এসে নিমাইকে ধরল, ‘তুমি সকলকে ডাকছ মুকুন্দকে ডাকছ না কেন? তোমার কাছে ও কী অপরাধ করেছে? ও তোমার বন্ধু। ওর গানে প্রসুর পর্যন্ত দ্রবীড়িত। তুমি কেন ওর প্রতি উদাসীন? ওকে দেখা পর্যন্ত দিচ্ছ না।’

‘বোলো না, ওর কথা বোলো না।’ নিমাই বললে বিরক্ত স্বরে, ‘ওর ভক্তিস্থানে অপরাধ।’

‘ভক্তিস্থানে?’

‘হাঁ, ও যখন যেখানে যায় তখন সেখানের মত কথা বলে। যখন জ্ঞানমার্গীদের কাছে যায় তখন

যোগবাশিষ্ঠ পড়ে, আবার যখন ভক্তের কাছে যায় তখন ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করে।’ নিমাই বললে, ‘ভক্তিস্থানে তাই ও অপরাধী। ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ। এতেকে উহার হইল দরশনে বাধ।’

ঘরের বাইরে থেকে শুনল সব মুকুন্দ। ঠিক করল এ অপরাধী দেহ আর রাখবে না। কাঁদতে কাঁদতে শ্রীবাসকে বললে, ‘প্রভুকে জিগগেস করো আর কোনোদিন তাঁর দর্শন পাব কি না’—

নিমাই বললে, ‘পাবে। কোটি জন্ম পরে পাবে।’

‘পাব? পাব? আমার অপরাধ ক্ষয় হয়ে যাবে?’ নিশ্চয় প্রাপ্তির কথা জেনে মহানন্দে নাচতে লাগল মুকুন্দ।

মুকুন্দের কাণ্ড দেখে নিমাই হাসতে লাগল। বললে, ‘শিপিগির আমার কাছে নিয়ে এস মুকুন্দকে। ওর আর অপরাধ নেই।’

মুকুন্দ কাছে এসে দাঁড়াতেই নিমাই বললে, ‘মুকুন্দ, প্রসাদ নাও।’

‘প্রভু বোলে মুকুন্দ, যুচিল অপরাধ।

আইস আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ ॥’

মুকুন্দ নিমাইয়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল।

নিমাই বললে, ‘ওঠ। আর তোমার ভিলাধ অপরাধ নেই। তুমি আমার বাক্য অব্যর্থ জেনে আনন্দ করছ তাতেই তোমার শরীরে ভক্তি এসে গিয়েছে।’

‘ভক্তিময় তোমার শরীর—মোর দাস

তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস ॥’

অনুতাপ করতে লাগল মুকুন্দ। ‘এই ছার মুখে আমি ভক্তি মানলাম না, আমার মত হীনমতি আর কে আছে? কীট হই না মানিলুঁ মুঞি হেন ভক্তি। আর তোমা দেখিবারে আছে মোর শক্তি? দুর্ষোধনও বিধরূপ দেখল কিন্তু ভক্তিশূন্য বলে কিছুই দেখল না। পেল না আনন্দলেশ। ‘না পাইল মুখ—ভক্তিশূন্যের কারণে।’ বেদ-মহাভারত বহু শাস্ত্র লিখেও ব্যাসের শাস্তি হল না। শাস্তি হল ভক্তির বিস্তারে। ‘নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তার। তবে মনে হুঃখ গেল তারিল সংসার।’ আর আমি কিনা সেই ভক্তি মানলাম না, তবু তুমি—তুমি আমাকে কৃপা করলে।’

গত চরিত্রের জন্মে অনুতাপ করতে লাগল মুকুন্দ। নিমাই বললে, ‘না, তোমার কণ্ঠধরেই তো প্রেমভক্তি

ঢেলে দিয়েছি। তোমার সর্বদেহে এখন প্রিয়করী ভক্তি এসেছে। তুমি ঠিকই বলেছ, যদি ভক্তি না থাকে আমাকে দেখেও কিছু হয় না, ভক্তি ছাড়া সমস্ত কর্ম অর্থহীন। কিন্তু তোমার আর ভয় নেই। তুমি ভক্তি-বিশ্বাসের গান হয়ে উঠেছ। যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার। তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার। 'যথা গাও তুমি তথা আমি অবতারি।'

মুকুন্দকে বরদান করল নিমাই আর সকলে জয়ধ্বনি, হরিশ্বনি করে উঠল।

মুকুন্দের স্তুতি বর শুনে যেই জন।

সেহো মুকুন্দের সঙ্গে হইব গায়ন ॥

গদাধরও কাঁদছে। নিমাইয়ের নিত্যসঙ্গী গদাধর। যত গৃহকাজ সব গদাধর করে দেয়। নিমাইয়ের বিছানা করে, পান সাজে, পাখা করে, পায়ের নিচে শুয়ে থাকে যদি কিছু আদেশ হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে ছু চক্ষে দেখতে পারে না। তার সকল কাজ বুঝি হরণ করেছে গদাধর।

গদাধরেরও গোপন সাধ একদিন কৃষ্ণপ্রেম চেয়ে নেয় নিমাইয়ের কাছে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সাহস পায় না। নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকাতেও কেমন তার ভয় করে।

একদিন রাতে হুজনে শুয়েছে কীর্তনান্তে। নিমাইয়ের পায়ের নিচে গদাধর।

হঠাৎ গদাধর নিমাইয়ের ছু পা বুকের মধ্যে ঝড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

'এ কি, কাঁদ কেন?' নিমাই চঞ্চল হয়ে উঠল।

গদাধর সন্তয়ে বললে, 'আমার কৃষ্ণপ্রেম কই?'

'তোমারও চাই না কি ও বস্তু?'

'সকলে প্রসাদ পেয়ে উদ্ধার হয়ে গেল, আর আমি তোমার সঙ্গী, তোমার সেবক, শুধু আমিই বঞ্চিত হয়ে থাকব? এ কেমন কথা?'

সহাস্তে নিমাই বললে, 'আচ্ছা, তুমিও পাবে।'

'পাব?'

'হ্যাঁ, দেখো, কাল ভোরে যখন তুমি গঙ্গাস্নান করবে দেখবে তোমাতে কৃষ্ণপ্রেম আবির্ভূত হয়েছে।'

'সত্যি?'

বাকি রাত গদাধর আর ঘুমুল না। পারল না ঘুমতে। পূর্বের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণে ফোটে তার আনন্দের স্বপ্ন।

ভোর হতেই ছুটল গঙ্গার দিকে। ডুবের পর ডুব দিতে লাগল। কই কোথায় কৃষ্ণপ্রেম!

স্নান সেরে পারে উঠতেই এ কী আবেশ এল সর্বান্তে! এ কী আনন্দ! এ কী অশ্রু! পা কেন স্থির রাখতে পারছি না মাটিতে? কেন টলে-টলে পড়ছি?

ভক্তগণ নিয়ে বসে আছে নিমাই, দেখল অবশ শরীরে টলমল করতে-করতে গদাধর এগিয়ে আসছে। কাঁদছে অঝোরে, চোখ লাল হয়েছে কাঁদতে-কাঁদতে। গলবস্ত্র হয়ে নিমাইয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

'গদাধর, কী খবর?' নিমাই তাকে তুলল হাতে ধরে।

গদাধর বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল।

'কী, পেলে?' স্মিতহাস্তে জিগপেস করল গৌরহরি।

গদাধরের মুখে কথা নেই, শুধু অশ্রু ঝরছে অবিশ্রাম।

শুভ্রাধর ব্রহ্মচারী নিমাইয়ের প্রতিবেলী। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে ভিক্ষে করে বেড়ায় এবং তারই বলে অনেক তীর্থ ঘুরতে পেরেছে। তপস্শ্রাও অনেক করেছে শোনা যায়। একদিন তার মনে হল, প্রেমই পরম পদার্থ আর প্রেম না পেলে কী পেলাম জীবনে। আর, প্রেম আমি পাব না তো পাবে কে? কে অত তীর্থ পর্যটন করেছে, কে করেছে এত ব্রত এত কষ্ট, এত কাঠিন্দ।

প্রেমভিক্ষা চাইল শুভ্রাধর। তার ভিক্ষার পিছনে দস্ত ছিল। বললে, 'ধারকা মথুরা বেড়িয়েছি, করেছি অনেক তপঃক্লেশ, স্মৃতরাং আমিই প্রেমভক্তি পাবার উপযুক্ত। দাও আমার প্রাপ্যধন।'

নিমাই বললে, 'ধারকা মথুরায় কি শেয়াল কুকুর ছিল না?'

মুহূর্তে শুভ্রাধর বুঝতে পারল তার অপরাধ। আর তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। লোকদেখানো কান্না নয়, কৃষ্ণবিহ্বলের আতি।

অনুগতের আতি নিমাই সহিতে পারল না। প্রেম-প্রসাদ দিয়ে দিল ব্রাহ্মণকে। তখন শরীরে পুলককম্প শুরু হল, নয়নে বইতে লাগল অশ্রুর ভরাস্রোত।

করণায় অবতীর্ণ গৌরহরি! অস্ত্র ধারণ করেনি, কারু প্রাণসংহার করেনি, হরিনাম কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে সকলের চিত্ত শুদ্ধ করে দিল। অশ্রু নাশ করল না,

অশুরকে নাশ করল। পাপীকে শাস্তি দিল না, তার
পাপ হরণ করে তাকে ভক্ত করে তুলল।

রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অশুরেরে করিল সংহার।

এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে করে না মারিল
চিত্ত শুদ্ধি করিল সভার।

আর যে এত করুণা দিচ্ছে সে কৃষ্ণ ছাড়া আর
কে? কৃষ্ণাদম্ব: কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভগতি?
কৃষ্ণ ছাড়া এমন আর কে আছে যে লতাকে পর্যন্ত
প্রেম দেয়? প্রেমে বৃক্ষ-লতাও কাঁদে, সর্বাস্ত্রে পুলক
শিহর ধরে থাকে। মধুকরণ করে।

সেই কৃষ্ণমাধুরী আশ্বাদনের উপায় কী? উপায়
প্রেম। 'প্রৌঢ় নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম। কৃষ্ণের
মাধুরী আশ্বাদনের কারণ' যার যতটুকু প্রেম তার
ততটুকু আশ্বাদন। 'আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব-স্ব-প্রেম অনুরূপ ভক্ত আশ্বাদয়' একমাত্র
রাধিকাতেই ভাবের অবধি, প্রেমের পূর্ণতম সর্বোত্তম
প্রকাশ। তাই এক মাত্র শ্রীমতীরই পূর্ণতম সর্বোত্তম
আশ্বাদন।

প্রেম পেয়ে গুরাশ্বর নাচতে লাগল; তার কাঁধে
ভিক্ষার বুলি, তা নামিয়ে রাখল না। কার সাধ্য সেই
নাচ দেখে না হাসে। নিমাই উঠে তার ভিক্ষার বুলিতে
হাত ঢুকিয়ে দিল। দেখল তাতে কিছু চাল পড়ে
আছে। সেই চাল এক মুঠো কুড়িয়ে নিয়ে খেতে
লাগল নিমাই।

'করো কী, করো কী! শুধু শুধু কাঁচা চাল কি
কেউ খায়?'

নিমাই বললে, 'বেশ, ঘরে গিয়ে রান্না করে কৃষ্ণের
নৈবেদ্য কর। মধ্যাহ্নে আমি খাব।'

গুরাশ্বর ফাঁপরে পড়ল। পরামর্শ নিল ভক্তদের।
ভাত আর গর্ভখোড় রান্না করল। গঙ্গাস্নান করে
এসে কৃষ্ণে নিবেদন করে খেল তাই নিমাই।

শ্রীবাসের আভিনায় নিত্য কীর্তন হচ্ছে রাত্রিতে।
শত শত ভক্ত নিয়ে নৃত্য করছে গৌরহরি। কখনো
বাজাচ্ছে মৃদঙ্গ, কখনো বাজাচ্ছে করতাল। কখনো
বা হরিবোণ বলছে, কখনো বা হরি হরয়ে নমঃ
কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। কখনো বা হুই বাছ তুলে
দিচ্ছে উর্ধ্ব। হরিবোলের আর হরি নেই, শুধু
বলছে বোল-বোল। উত্তাল হয়েছে ভক্তির সুখা-
সাগর।

'আপনি করিব ভক্ত্যভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে।
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়।'

নদীয়ার রাজপথে দিনে কীর্তন তো হচ্ছেই,
রাত্রে আবার দরজা এঁটে, শ্রীবাসের বাড়ির ভিতরের
উঠানে। এমন কথা কেউ কখনো শোনেনি,
দেখেনি শহরে-গ্রামে। ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইতর-ভদ্র সকলে
মিলে একসঙ্গে হৈ হৈ রৈ রৈ করে নাচবে আর
চৈচাবে। শুধু খোল করতাল বাজাচ্ছে না, পায়ে
ঘুঙুর বেঁধে নিয়েছে। কী কৈলেকার! নগরবাসীদের
কারু ঘুমুবার জো নেই, রাত্রির শান্তি চলে গিয়েছে
দেশ ছেড়ে। এর বিহিত কী!

নগরের সঙ্কীর্ণ বহিমুখদের জগে, যদি প্রচারে
কেউ অন্তর্মুখ হয়ে ওঠে। যদি পাষণ্ডীরা জাগে,
যদি ফেরে তাদের মতিগতি। তাদের আর কাজ
কী। তাদের কাজই হচ্ছে বিক্রম করা, বিরুদ্ধতা
করা, তিরস্কারে অপদম্ব করা। করুক, তবু কেউ
যদি আকৃষ্ট হয়, কারু চোখে-কানে যদি অপূর্বের
স্পর্শ লাগে।

কিন্তু শ্রীবাস-আভিনায় সঙ্কীর্ণ অন্তর্মুখদের
জগে, যারা অন্তরঙ্গ ভক্ত তাদের আশ্বাদনের জগে।
প্রাচীরের দরজা বন্ধ করে নেওয়া হয়েছে যাতে
বহিমুখেরা, বিরুদ্ধবাদীরা না উৎপাত করতে পারে।
ঠাট্টা-বিক্রমে না ব্যাহত করতে পারে তদয়তা।
তারা তো সন্তোষের দলে নয় তারা ভুলের দলে।
সুতরাং এ কথা বলতে পারো না তাদেরকে বঞ্চিত
করা হচ্ছে। বলতে পারো কীর্তনের পবিত্রতাকে
নিবিল্ব করা হচ্ছে।

'কবাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে।

পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে।'

বহিমুখের দল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নানা
জটলা করে। এগুলোর এ কী বাই হল। এত
নাচন-কুঁদন তো কোথাও দেখিনি। তার উপর দরজা
বন্ধ কেন? ভিতরে কীর্তনের নামে কী হচ্ছে কে
জানে।

নানা রকম কুংসা রটতে লাগল শত্রুরা। ভগবানকে
ডাকবার জগে এত ঘটা-হটার কী দরকার। তিনি হৃদয়ে
আছেন তাঁকে মনে মনে ডাকলেই তো চলে যায়।
ওরকম চৈচালে তিনিই তো সর্বাগ্রে রুষ্ট হবেন।

তিনি রুষ্ট হলে দেশে দেশে বৃষ্টি হবে না, শস্য হবে না, সকলে না খেয়ে মারা যাব। ওঠো, একত্র হও, প্রতিকারের পথ দেখ।

এ সমস্তই নিমাইয়ের কাণ্ড। নিমাই পণ্ডিত আগে চালো ছিল, গয়া থেকে ফিরে এসে শুরু করেছে গাঙ্গলামি। এ নবদ্বীপ, এখানে তোমার ঐ নব্য মত লবে না। রাজা মুসলমান, এ কথা শুনলে, রক্ষে রাখবে না, ধরে নিয়ে তো যাবেই, শহর-গ্রাম লুণ্ঠরাজ্য হবে।

অনাচারে নষ্ট হল হিন্দু ধর্ম। চলো যাই কাজীর দরবারে গিয়ে নালিশ করি। রাজা লুটপাট করবে কেন? শরণাপন্ন বিপন্ন প্রজাদের রক্ষে করবে। ধরে নিয়ে যাবে নিমাইকে আর যার ঐ অঙ্গন সেই শ্রীবাসকে।

এত হাজার দরকার কী! আমরা নিজেরাই দরজা ভাঙি চলো। মারপিট করে ঘায়েল করি পাগলগুলোকে। শ্রীবাসের ঘর-দোর ভেঙে ফেলে ভাসিয়ে দিই পশায়।

খোলো, দরজা খোলো।

দরজায় ঘন ঘন করাঘাত করে পাখণ্ডীরা। ভিতরে অস্তমুখের দল তা গ্রাহও করে না। উদ্দাম কীর্তন করে। তাদের শব্দে ঢাকা পড়ে বাইরের কোলাহল।

দ্বাররক্ষী গঙ্গাদাস। তার দৃঢ়তা অটুট-অটল। কারু সাধ্য নেই সামান্যতম ছিদ্র করে দরজায়।

প্রতিহত হয়ে ফিরে যায় বিমুখেরা। ষড়যন্ত্র করে। কী করে জব্দ করা যায় শ্রীবাসকে।

কীর্তন শুনি বাহিরে তারা জলি পুড়ি মরে।

শ্রীবাসেরে ছুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে।

যুক্তি রাখো। সোজামুজি কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করো। কাজী যদি কিছু প্রতিকার না করে তখন দেখা যাবে কুটকৌশল।

দল বেঁধে সবাই হাজির হল কাজীর কাছে।

আজি কী?

নিমাই পণ্ডিত দল খাড়া করে হিন্দুধর্মের নিপাত করছে। খোল-কর্তাল বাজিয়ে নিশি দিসি বেসুরো চিৎকার বরছে। লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে। জনসাধারণের শাস্তিভঙ্গ করছে। কাউকে ঘুমুতে দিচ্ছে না।

চৈচিয়ে বলছে কী? কি বলে চৈচাচ্ছে?

হরি-হরি বলে। এ ভাবের তাণ্ডব ভজন হিন্দুধর্মে বিধেয় নয়। দেশের ঘোর অকল্যাণ হচ্ছে তাতে। সারা দেশে দেখা দেবে হুভিক্ষ, দেখা দেবে মহামারী। ঈশ্বরের রোষে উচ্ছিন্নে যাব সকলে।

আরো নালিশ আছে। বললে দলের আর আর কেউ।

দিনে কীর্তন রাস্তায়, রাত্রে কীর্তন রুদ্ধঘরে। দরজা যখন বন্ধ তখন ভিতরে নিশ্চয়ই পাপের প্রস্রবণ। মদ-মাংস তো আছেই, আছে হয়তো বা প্রাসঙ্গিক আমঙ্গ। আমাদের কি কেউ রাজা নেই? আমরা কি অবিধির দেশে আছি?

কাজী বললে, যাও, শায়েস্তা করছি। কীর্তন বন্ধ করে দিচ্ছি অচিরে।

অভিযোক্তারা ফিরল খুশি হয়ে। রাষ্ট্র করে দিল পৌড়ের বাদশা হোসেন সা নিমাই আর তার পার্শ্বদেবের ধরবার জন্তু সৈন্ত-পাঠাচ্ছে।

বৈষ্ণবদের কেউ-কেউ ঘাবড়ে বললে, 'ঘরে বসে একাকী কীর্তন করাই ভালো। শয়ে-শয়ে লোক জুটিয়ে লোকের বিরক্তি ঘটিয়ে কীর্তন করার দরকার কি।'

কেউ-কেউ বললে, 'আমাদের কী দায়! ধরতে আসে শ্রীবাসকে বেঁধে নিয়ে যাবে। ওই তো নাচিয়েছে আমাদের।'

কিন্তু বেশির ভাগ বৈষ্ণবই নির্ভয়। আমাদের প্রভু আছেন, আমাদের ভয় কী। 'যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র—সেই সত্য হয়। সে প্রভু থাকিতে কোন অধমেরে ভয়?'

আর নিমাই? নিমাইয়ের কী ভাব? এ কী, গঙ্গাতীরে একা-একা বেড়াচ্ছে কী! রাজার সৈন্ত যে ধরতে আসছে।

আমুক। চলে যাব রাজার কাছে। এ তো ভাগ্যের কথা। রাজা সম্মান করলে সকলে সম্মান করবে।

পালাও। সময় থাকতে দেশ ছাড়ো।

সমস্ত দেশই তো রাজার। পালিয়ে যাব কোথায়?

'এত ভয় শুনিঞাও ভয় নাহি পায়।

রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায়॥'

[ক্রমশঃ]

বঙ্গবাসী : কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশ ও কাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীহারাধন দত্ত

১৮৮৫ সাল। এই বৎসরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হ'ল। বঙ্গবাসী এই কংগ্রেসের আদৌ পক্ষপাতী ছিল না। একালের কংগ্রেসীরা অধিকাংশই বিদেশীতাবাগিন ছিলেন—সাহেবিয়ানা ও উৎকট অহুকরণ এঁদের মধ্যে প্রবল আকারে দেখা দেয়—ইংরেজের কাছে আবেদন নিবেদনের দ্বারা সামাজিক কিছু সুখ-সুবিধা আদায় করাই এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের 'বঙ্গবাসী' এই কংগ্রেসের কার্যাবলীকে ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপে বিরোধিতা করতে লাগল। বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠার কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন উল্ল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসীতে, ধারাবাহিক প্রকাশিত 'পক্ষানন্দ' দেশ ও সমাজের নিপুণ চিত্র আঁকতে লাগলেন। সমকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতি বঙ্গবাসীর দৃষ্টি এড়াল না। ব্যক্তিগত জীবনের অসঙ্গতি থেকে সমসাময়িক সমাজজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সমালোচনা ও পীচুঠাকুরের রূপকাত্মক রচনাগুলিতে প্রকাশ পেতে লাগল। এছাড়া যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 'বঙ্গবাসী' হিতৈষিগণও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। এই বিরোধিতার অকৃতম কারণ বঙ্গবাসী হিতৈষিগণের অধিকাংশই সংরক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। অতিরিক্ত 'বিজাতীয় মনোভাব ও অহুকরণকে তারা অসঙ্গতি বলেই মনে করতেন। সেকালে এইরূপ আন্দোলনের কিছুটা প্রয়োজন ছিল না এমন নয়। চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির এই অসঙ্গতি সেকালের বিখ্যাত বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যেও নানাপ্রকার মতবৈষম্যের কারণ হয়েছিল। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত একস্থলে লিখেছেন—রাজনারায়ণ বসু "সেকাল ও একাল" বইতে বাঙালীর অহুকরণপ্রিয়তার নিন্দা করেছিলেন। তারই সমালোচনার বন্ধিম লিখেছিলেন, 'অহুকরণ' প্রবন্ধটি (১২৮১)। এতে তিনি অহুকরণকে প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করেছিলেন।

অবনত জাতিকে উন্নততর সভ্যতার অহুকরণ করতেই হয়। তা না হলে উন্নতির সম্ভাবনা নেই। বাঙালী পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় হীন, অতএব অহুকরণই সেই যুগের স্বাভাবিক ও আলাপ্রদ লক্ষণ। বন্ধিমচন্দ্র তাঁর মতবাদ রচনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছিলেন। ১৮ হিন্দুধর্মের সমর্থক এই বন্ধিমের সংগে বঙ্গবাসীর হিন্দুনেতাদের পার্থক্য ছিল আমূল। বন্ধিমচন্দ্র যে ধর্মচর্চা করেছিলেন—সে ধর্মের মূল লক্ষ্য ছিল মাহুয। বঙ্গবাসীর ধর্মচর্চার লক্ষ্য নিছকই ধর্ম। বঙ্গবাসীর অকৃতম নায়ক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধনার কথা বলতে গিয়ে ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—উনবিংশ শতকের শেষপাশ্চাত্য ভারতে রাজনৈতিক ও বাংলার সামাজিক জীবনে যে অসঙ্গতি অসামঞ্জস্যের প্রচুর সমাবেশ হইয়াছিল, পক্ষানন্দের কোন দৃষ্টি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বাদ দেয় নাই। ইংরেজ শাসনের বিচার বিজ্ঞাট ও অসাধুতা—

সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড ও ইকবাট বিলের বিরুদ্ধে তুলুল আন্দোলন, দেশহিতৈষিতার বাছাড়ধর ও অহুকরণশূন্যতা, সামাজিক দুর্নীতি ও ইংরেজী সভ্যতার অহুকরণ, ব্রাহ্মধর্মের শূন্যত আদর্শবাদ ও কেশব সেনের সর্কধর্ম সম্বন্ধের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, বিধবা বিবাহ ও নারী-প্রগতির প্রভাবে সমাজধর্মের বিপর্যয়—এ সমস্ত বিষয়ই পক্ষানন্দের পরিহাস প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইয়াছিল। যেখানেই মেকী ও ভগানী সাধু উদ্ভক্তের সুখোপ পরিয়া ও আত্মপ্রসাদক্ষীত হইয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আত্মগত্যে রাজকর দাবী করিয়াছে, সেখানেই পক্ষানন্দ তীক্ষ্ণ বিজ্ঞপাত্রে তাহার হৃদয়বেশ ভেদ করিয়া তাহার কৃত্রিম গৌরবক্ষীতির বৃন্দবৃন্দ নিকাশন করিয়া, তাহাকে পদমর্দনার উচ্চ রাজসিংহাসন হইতে উপহাস্ততার ধূলিশস্যার পাতিত করিয়াছেন। ১৯ এইগুলিই সমগ্র বঙ্গবাসীর উদ্ভক্ত আদর্শের কেন্দ্রেও প্রবোজ্য হতে পারে।

কৃষ্ণচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গবাসীর এই ছিল অবপদ। সে বা হাক, বঙ্গবাসী কংগ্রেসের সমর্থন না করলেও এবং সেযুগের অতিরিক্ত বিজাতীয়তা ও অহুকরণকে মনে-প্রাণে সমর্থন করতে না পারলেও বঙ্গবাসী তদানীন্তন শাসননীতির নির্ভীক সমালোচনা করতে ক্ষান্ত হয়নি। বঙ্গবাসী এই সময় উগ্র স্বাদেশিকদের সমর্থন করে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'নায়ক' সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন—এই বেঙ্গালিজমের কথাটা এখন মুখে মুখে শুনিতে পাই, ইহার মূলতত্ত্ব বঙ্গবাসীই প্রথমে প্রকাশ করেন। আমাদের ধর্ম আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ—অনন্ত অজ্ঞাত কাল হইতে, কবি মুনির সময় হইতে যে ভাবের ধারা, আচারনিষ্ঠার ধারা এদেশে প্রবাহিত হইতেছে তাহা আমাদের পৈতামহ সামগ্রী। একথা ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীকে প্রথমে বঙ্গবাসীই শিখাইয়াছিলেন। সে শিক্ষার মূলে আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি সমাজতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, আজ সেই মনীষিবর্গের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র চাঁলয়া গেলেন। ২০ তৎসঙ্গেও কৃষ্ণচন্দ্রের ঐ জাতীয়তাবাদ—হিন্দুজাতীয়তাবাদ ঐতিহ্যক্রীতির ধারা খণ্ডিত। রাজনীতি ও জাতীয় আন্দোলনেও কৃষ্ণচন্দ্রের বঙ্গবাসী নিম্নোহ হতে পারে নি। সেখানেও সেই অতীত মোহ—যুক্ত অপেক্ষা ভক্তি—বিচার অপেক্ষা বিশ্বাসই বড় ছিল। যুক্তি ও বিচারের প্রবণতা নিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখাই ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই আসল বেনেসাস যুগের দৃষ্টিভঙ্গী—বাধীন মাহুযের দৃষ্টিভঙ্গী। তদানীন্তন জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গবাসীর মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

১৯। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(সমালোচনা সাহিত্য)।

২০। নায়ক—২য় কাল্পন—১৩১৭।

১৮। বন্ধিমমনীষা—সমকালীন (আখ্যায়িক ১৩৬৬)।

বঙ্গবাসী বহু পূর্বেই শাসক ও শাসিতের মধ্যে জাতিবৈরের ভাবটি প্রসারিত করার চেষ্টা করে আসছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গবাসী এই ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর হোল। প্রকাশ্যে সরকার-বিরোধী নানা প্রকার রচনা বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতে লাগল। ১২১৭-১৮ সালের দিকে ইংরেজী ১৮৯১ সালে বঙ্গবাসীতে এইরূপ অসংখ্য সরকারবিরোধী রচনা মুদ্রিত হ'ল। কৃষ্ণচন্দ্র-লিখিত কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ ইংরেজ শাসকদের নজরে আসে। ইহার ফলে বঙ্গবাসী রাজস্বের কবলে পড়ে। এই সময় স্ত্রী চার্লস ইলিয়ট বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন। ভারত গভর্নমেন্টের অনুমতি গ্রহণ করে ইলিয়ট বঙ্গবাসীর বিরুদ্ধে রাজস্বোচ্চের অভিযোগ দায়ের করিতে হুকুম দেন। ফলে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক, কার্যাধ্যক্ষ ও প্রিটার-প্রকাশকের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। বঙ্গবাসীই রাজস্বের অভিযুক্ত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম অভিযুক্ত সম্পাদক। প্রবীণ সর্বাঙ্গপত্রসেবী ও সাহিত্যিক জীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এক স্থলে লিখেছেন—

The first attempt to prosecute a newspaper on a charge of sedition was the case instituted against the Bangabasi, (Calcutta) in 1891, when the officiating standing Counsel applied for warrants against the Proprietor, the Editor, the Manager and the Printer and the Publisher of the paper under section 124A and 500 of the Indian Penal Code. The Jury brought in a divided verdict and the Chief-Justice ordered the case to remain as remanet at the next session Court-Board. In the mean time the accused were prevailed upon to tender an apology and the case was withdrawn. ২১

বঙ্গবাসীর উপর এই রাজস্বের সেকালের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনার পরিণত হয়েছিল। তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নয়—একবারে হাইকোর্টের দায়রায় জুরি সমন্বিত জজের এজলাসে রাজস্বোচ্চের বিচার হত। চীফ জাস্টিস স্ত্রী পেথারন বিচারে বসেছিলেন। রাজস্বোচ্চ কি গুরুতর অপরাধ তা বোঝাবার জন্য বিচারপতি আইনের বে ব্যাখ্যা করেছিলেন এখনও তা নজীর হয়ে আছে। আসামীদের পক্ষে তখনকার শ্রেষ্ঠ বৈতাঙ্গ ব্যারিষ্টার সনামধ্যাত জ্যাকসন সাহেব বে বড়তা দান করেন তাও উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। কৃষ্ণচন্দ্রের 'বঙ্গবাসী' এই ঘটনার পর অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের স্তায় অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বঙ্গবাসীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের ফলে কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ চারিজন কর্ণধারের কারাবাস হয়। এই কারাবাসের অভিজ্ঞতা সরস ব্যঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে বোগেন্দ্রচন্দ্র লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। প্রকাশিত কোন্ কোন্ নিবন্ধের জন্য বঙ্গবাসী রাজস্বের অভিযুক্ত হয়েছিল উক্ত কাহিনীতে তারও উল্লেখ আছে।

বোগেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন—আমাকে অর্থাৎ বোগেন্দ্রচন্দ্র কনকে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী বলিয়া, জীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক বলিয়া, জীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যাধ্যক্ষ বলিয়া এবং জীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্রকে প্রিটার ও প্রকাশক বলিয়া, এবং ইংরেজ রাজ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২৪ক ধারা অনুসারে এবং উক্ত আইনের ৫০০ ধারা অনুসারে আমাদের চারিজনের উপর অভিযোগ আনয়ন করেন। এই অভিযোগের ২য় বড়ই গুরুতর। অর্থাৎ বঙ্গবাসীর লেখার দ্বারা গভর্নমেন্টের প্রতি লোকের অভ্যক্তি উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এক কথায় রাজস্বোচ্চ নূতন হইতেছে। এই অপরাধের দণ্ড বাবজী২ন স্বীকার্য বাস পর্যন্ত হইতে পারে।

১৫ই চৈত্রের বঙ্গবাসীতে, 'আমাদের অবস্থা', ৩রা জ্যৈষ্ঠের বঙ্গবাসীতে, 'ইংরেজ রাজস্বের প্রকটমূর্তি', 'অসভ্য হিন্দুর প্রথম ও প্রধান ধারণা', ২৪শে জ্যৈষ্ঠের বঙ্গবাসীতে 'পরিণাম কি' 'অসভ্যের পক্ষে 'অকপট নীতিই ভাল' এই পাঁচ প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত হয়।

সে বাহাই হউক, ২৩শে জ্যৈষ্ঠের শুক্রবারে গভর্নমেন্টের ট্যাঙ্কিং কাউন্সিল মির্ড সাহেব, ব্যারিষ্টার ডন সাহেব এবং পুলিশ আদালতের সহকারী উকিল কাউই সাহেব এই তিনজন একত্রে মিলিত হইয়া বেলা ১১টার সময় আমাদের নামে পুলিশ আদালতের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রের মিঃ জাওলী সাহেবের নিকট উক্তরূপ অভিযোগ আনয়ন করেন। অমনি আমাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইল। ২২ বোগেন্দ্রচন্দ্রের এই ধারাবাহিক রচনা অনুভূমিতে আধিন (১২১৮) হতে ফাল্গুন (১২১৮) পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনার কৃষ্ণচন্দ্রের বে চিত্র অঙ্কিত আছে তা কচি ও শুচিবাহুগুস্ত রক্ষণশীল হিন্দুস্বাক্ষরের চরিত্র। কৃষ্ণচন্দ্রের কালে বঙ্গবাসীর কত সংখ্যা মুদ্রিত হত বোগেন্দ্রচন্দ্রের এই রচনা হতে তা জানা যায়। জেল-নায়েব ও কৃষ্ণচন্দ্রের কথোপকথনের মধ্যে দেখা যায় যে, কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বঙ্গবাসী ২০ হাজার করে ছাপা হত এবং তার ১৪ হাজার কাগজ মকঃফলে যেত। এক স্থলের কথোপকথন এইরূপ—

জেলনায়েব—আপনাদের প্রতি সপ্তাহেই কি বিশ হাজার করিয়া বঙ্গবাসী ছাপিতে হয় ?

কৃষ্ণ বাবু—কখনও কম কখনও বেশী। যেবার ভারতবর্ষীয় পৌত্র এলবার্ট ডিক্টর কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেবার প্রায় ২৫ হাজার বঙ্গবাসী ছাপিতে হইয়াছিল। সহবাস সম্মতি বিপরক আইনের বন্ধন আন্দোলন হয়, তখন প্রতি সপ্তাহেই ২৩২৪ হাজার করিয়া বঙ্গবাসী ছাপা হইত। সাধারণত ১১২০২১ হাজার, কখনও বা ১৮ হাজার বঙ্গবাসী প্রতি সপ্তাহে ছাপা হইয়া থাকে।

—আমাদের হাজত

এ সবকিছু সরকারী অভিযোগপত্রে দেখা যায়—The Bengali weekly Journal Bangabasi is reported to have a circulation of about 30,000 copies and is printed in Bengali.

বঙ্গবাসীর মামলার বে সমস্ত আইনজ্ঞ বঙ্গবাসীকে সমর্থন

করেছিল তাদের মধ্যে ব্যারিষ্টার সি: হিল, সি: লালমোহন ঘোষ, এটর্নি জীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র, এটর্নি জীযুক্ত কালিনাথ মিত্র এবং উকিল জীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবাসীর প্রতি ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপের কারণ তাদের অভিযোগপত্রেই দেখা যায় for sedition and defamation by having published certain articles in the issue of that paper of the 20th March, 16th May and 6th June, in which certain statements are made against the Government and there by attempting to excite popular feeling and discontent and disaffection towards the Government among the people বঙ্গবাসী ক্রমা প্রার্থনা দ্বারা এই রাজ অভিযোগ হতে মুক্তিলাভ করে। The State prosecution of Bangabasi Newspaper, The Queen Empress versus Jogendra Chandra Bose and others এই মামলা সেকালের বাংলা দেশের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই মামলার পূর্ণ বিবরণ তৎকালেই একটি গ্রন্থে ২৩ সংকলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের ১৬৫—২৩৩ পৃষ্ঠায় উক্ত মামলার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে। কৃষ্ণচন্দ্র, বোগেশচন্দ্র প্রভৃতি রাজসমীপে ক্রমা প্রার্থনামূলক যে আবেদন জানিয়েছিলেন তাহা 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও 'নেটিভ প্রেস এসোসিয়েশনে'র দ্বারা সমর্থিত হয়। ১৮৯১ সালের ১ই সেপ্টেম্বর বেঙ্গল গভর্নমেন্টের চীফ সেক্রেটারী স্যার জন এডগার কে সি, আই-ই, সি, এস, আই ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারীর কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তার খানিকটা উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে—

In continuation of my letter No 33757 dated 28th of August last I am directed to forward copy of petition to the Lieutenant Governor of Bengal from J. C. Bose. K. C. Banerjee, B. Banerjee and A. Ray respectively Proprietor, Editor, Manager and Printer of the Bengali Newspaper Bangabasi, in which they express their deep and heartfelt sorrow for having allowed the articles which were the subject of the recent Prosecution, to appear in the column of the Bangabasi, and throw themselves unreservedly on the mercy of the Lieutenant Governor, In a separate communication they undertake to publish this petition in the Bangabasi Newspaper when required by the Government.

I am also directed to forward a copy of a letter from the President of a newly formed native Press

Association, in which the members, who are the Proprietor and Editors of merely all important native Newspapers published in Bengal, express their regret at the use of the language of the articles, but support the Prayer of the Petitioners which is also supported by the British Indian Association in a letter, copy of which is also submitted in which they express their strong condemnation of the language and the tone of the incriminated articles. ২৪ এই সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন বাবু রাজকুমার সর্বাধিকারী। আর নেটিভ প্রেস এসোসিয়েশনের অন্ততম সভ্য ছিলেন বঙ্গবাসী সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তৎকালের বিখ্যাত বিখ্যাত পত্রপত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকগণকে নিয়ে এই নেটিভ প্রেস এসোসিয়েশন গঠিত হয়। হিন্দু পেট্রি, রট, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান ক্রিস্চিয়ান হেরাল্ড, ইউনিটি এ্যান্ড মিনিষ্টার, তোপ, জ্ঞানানাল পেপার, ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, বঙ্গবাসী, দৈনিক সঞ্জীবনী, সামা, সোমপ্রকাশ, সর্বদা-প্রভাকর, হিতবাদী, সফচর, বেঙ্গলবাস, ভারতমিত্র, হিন্দী বঙ্গবাসী, বিশেষ করে এই সমস্ত পত্রপত্রিকাগুলির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীগণকে নিয়ে নেটিভ প্রেস এসোসিয়েশন তৈরী হয়। বঙ্গবাসীর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আবেদন ও তৎসহ ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ও নেটিভ প্রেস এসোসিয়েশনের আবেদন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মঞ্জুর হয় এবং হাইকোর্ট হতে এই মামলা কুলে নেওয়ার আদেশ দেয়। C. E. Buckland ও Prosecution of the Bangabasi সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থের ১১৬-১১৯ পৃষ্ঠায় মধ্যে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন, তিনি এট প্রসঙ্গে লিখেছেন—The Proprietor, Editor, Manager and Publisher of the Bangabasi then presented a petition to the Lieutenant Governor in which they expressed contrition for having allowed the articles which formed the subject of the prosecution to appear in that paper, promised henceforth to conduct it in a spirit of loyalty to Her Majesty the Queen Empress and the Government of India and throw themselves unreservedly on the mercy of the Lieutenant Governor. Representation were also made by the British Indian Association and by the native Press Association a body which was formed after the proceedings against the Bangabasi had been instituted. with the object, among others, of improving the tone of the native Press and preserving moderation in discussions of all public questions. ২৫ সময়সময়িক অন্তত সর্বদা ও তথ্য

২৩। Celebrated Trials in India (1902) vol I Compiled by J. Ghosal

প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গবাসী সে যাত্রা কমা প্রার্থীর বাগাই রাজস্বের হতে নিকৃতি লাভ করে।

বঙ্গবাসী, রাজস্বের হতে মুক্তি লাভ করল। এর পরেও কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গবাসী আরও ৩ বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত চলছিল। ১৮১৫ সালের দিকে পাঠকড়ি বন্দোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর সম্পাদক হয়ে এলেন এবং ব্রজরাজ বন্দোপাধ্যায় ম্যানেজারীর পদ ত্যাগ করিলে কৃষ্ণচন্দ্র ম্যানেজারীর ভার গ্রহণ করেন। বিংশ শতকের প্রত্যয়লগ্ন পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বভার পালন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বঙ্গবাসী সম্পাদনা কালে এদেশে যে সমস্ত ভাবতরঙ্গ ও আন্দোলনের অগ্নিবাহী বাঙালীর চিত্ত শিথাকে উজ্জ্বলতর করেছিল এবং বঙ্গবাসী কোন মুক্তিযুদ্ধে ঐ ভাবতরঙ্গের সম্মুখীন হয়েছিল তা স্বতন্ত্র সম্ভব এখানকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে। মনমুগের চিন্তার সংগে বঙ্গবাসীর ধ্যান-ধারণার অনেক পার্থক্য ছিল। সেকালের ভিন্নমুখী চিন্তাধারার জন্মই বাংলার নবচেতনা খানিকটা হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। বঙ্গবাসীর ধর্ম আন্দোলন পশ্চাত্মুখী ঐতিহ্য-ক্রীতির নবধাতায়ন-পথ উন্মুক্ত করে দেয়। গোড়ামির পোষকতায় শশধর তর্কচূড়ামণির শিখাধ্বজদের ইংরেজী বিজ্ঞা মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐরূপ পরিকল্পিত সৃষ্টির জন্তও শক্তির প্রয়োজন। বঙ্গবাসী, যদি পুরাতন ধর্মঐতিহ্যে দেশকে জাগরিত করার কিছুমাত্র প্রেরণা সুগিয়ে থাকে—সেই সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র অবশ্য স্মরণীয়।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মজীবনের আরও দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। ১৮১০ সালে বঙ্গবাসী কার্যালয়ের হতে হিন্দী বঙ্গবাসী প্রকাশিত হয়। এই 'হিন্দী বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যোগেন্দ্রচন্দ্রের নামই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কেহ কেহ এই 'হিন্দী বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। ডক্টর সুরধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের হিন্দী বঙ্গবাসী (১৮১০) বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তুলুল আন্দোলন পড়ে গেল। সরস্বতীর পূর্বে বঙ্গবাসীর মত জনপ্রিয় আর কোন পত্রিকা হয়নি। এর বৃহদায়তন, অল্পমূল্য, চমৎকার ছাপাছবি ও বিষয়বস্তু, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে উপহার বিতরণ, বঙ্গবাসীকে হিন্দীর পাঠক-পাঠিকার এত প্রিয় করে তুললে যে হিন্দীতে 'বঙ্গবাসী' শব্দ সংবাদপত্রের সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেল। উঠে গেল হিন্দীর একাধিক পত্রিকা, যে কয়েকটি খাড়া রইল তাদেরও রাজা গেল ভেঙ্গে (কমর টুটগই)। এর একমাত্র দোষ ছিল বাংলাভাষীরা ভাষা। সে ভাষা-দোষও বিদূষিত হল বালমুকুন্দ গুপ্তের কল্যাণে। তিনি হিন্দী বঙ্গবাসীর সম্পাদনাভার গ্রহণ করলেন। হিন্দী লেখক অমৃতলাল চক্রবর্তী, বালমুকুন্দ গুপ্ত, প্রেত্নদয়াল পাণ্ডে,

হিন্দীতে ত্রয়ী নামে পরিচিত। এই ত্রয়ীর পরিচালনার 'বঙ্গবাসী' উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করল। ২৬ ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় ২য় সম্পাদিত 'হিন্দী কি পত্র পত্রিকা' গ্রন্থ হতে পাদটীকার খানিকটা উদ্ধৃত করেছেন—উপরের উদ্ধৃত বাংলা অংশটুকু ঐ হিন্দী উদ্ধৃতির হুবহু অনুবাদ মাত্র। উক্ত হিন্দী গ্রন্থখানিই তাঁর তথ্যের একমাত্র অবলম্বন।

সে বা হোক, ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের ঐ অংশটুকু পাঠ করলে কৃষ্ণচন্দ্র সহজে সন্দেহের অবসান হয় না। বালমুকুন্দ গুপ্ত সম্পাদক হয়ে আসার পূর্বে হিন্দী বঙ্গবাসীর সম্পাদক কে ছিলেন—ডক্টর চট্টোপাধ্যায় তা উল্লেখ করেননি। বরং তাঁর লেখা পাঠ করতে গেলে এই ধারণাই দৃঢ়মূল হয় যে, কৃষ্ণচন্দ্রই 'হিন্দী বঙ্গবাসী'র সম্পাদক ও প্রকাশক। এ সহজে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর এক ব্যক্তিগত পত্রে আমার সন্দেহ নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন 'কাগজের মালিকানা (স্বামিত্ব) কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর, সম্পাদনা ত বলিনি।' ২৭ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা যায় তা হতে প্রতীয়মান হয়, যোগেন্দ্রচন্দ্রই সমগ্র বঙ্গবাসী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী, কৃষ্ণচন্দ্র সম্পাদক হিসাবেই খ্যাত। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর, 'বিয়োগব্যাখ্যা' শীর্ষক যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল, তার এক স্থলে দেখা যায়— 'বঙ্গবাসীর সম্পাদনার সঙ্গে তাঁহার স্বত্বাধিকার ঘটিয়াছিল। শেষে সে স্বত্বাধিকার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।' ২৮ এখন দেখা দরকার—১৮১০ সালে কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গবাসীর অল্পতম মালিক ছিলেন কিনা। কৃষ্ণচন্দ্রকে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী বলবার পূর্বে এই বিষয়টি যুক্তি সহকারে দেখা প্রয়োজন। সম্প্রতি সুরসাহিত্যিক 'বনমুকুন্দ' ডক্টর সুরধাকর চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে একটি বিবৃতিতে বলেছেন—'কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বাহির করেন 'হিন্দী বঙ্গবাসী' পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল।' ২৯ কৃষ্ণচন্দ্র যে হিন্দী বঙ্গবাসীর সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি হিন্দী বঙ্গবাসীর সম্পাদক বা মালিক ছিলেন কি না— তা আরও যুক্তি সহকারে বিচারের অপেক্ষা রাখে। [ক্রমশঃ।

২৬। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান। পৃ: ২৮-২৯

২৭। বর্তমান লেখককে লিখিত ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৪৪৫৯ তারিখের পত্র।

২৮। বঙ্গবাসী, ৬ই ফাল্গুন—১৩১৭।

২৯। হেলার লক্ষা কবিতা জয়—যুগান্তর, ১৫ই চৈত্র ১২৬৫।

... এ মাসের প্রচুদপট ...

এ মাসের প্রচুদে মুক্তিলাভ নিমিত্ত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিশ্রুতির আঙ্গোিকচিত্র প্রকাশ করা হইল। মুক্তিটি নির্বাণ করিয়াছেন ক্রীমহেন্দ্র পাল এবং

শিলালিপি

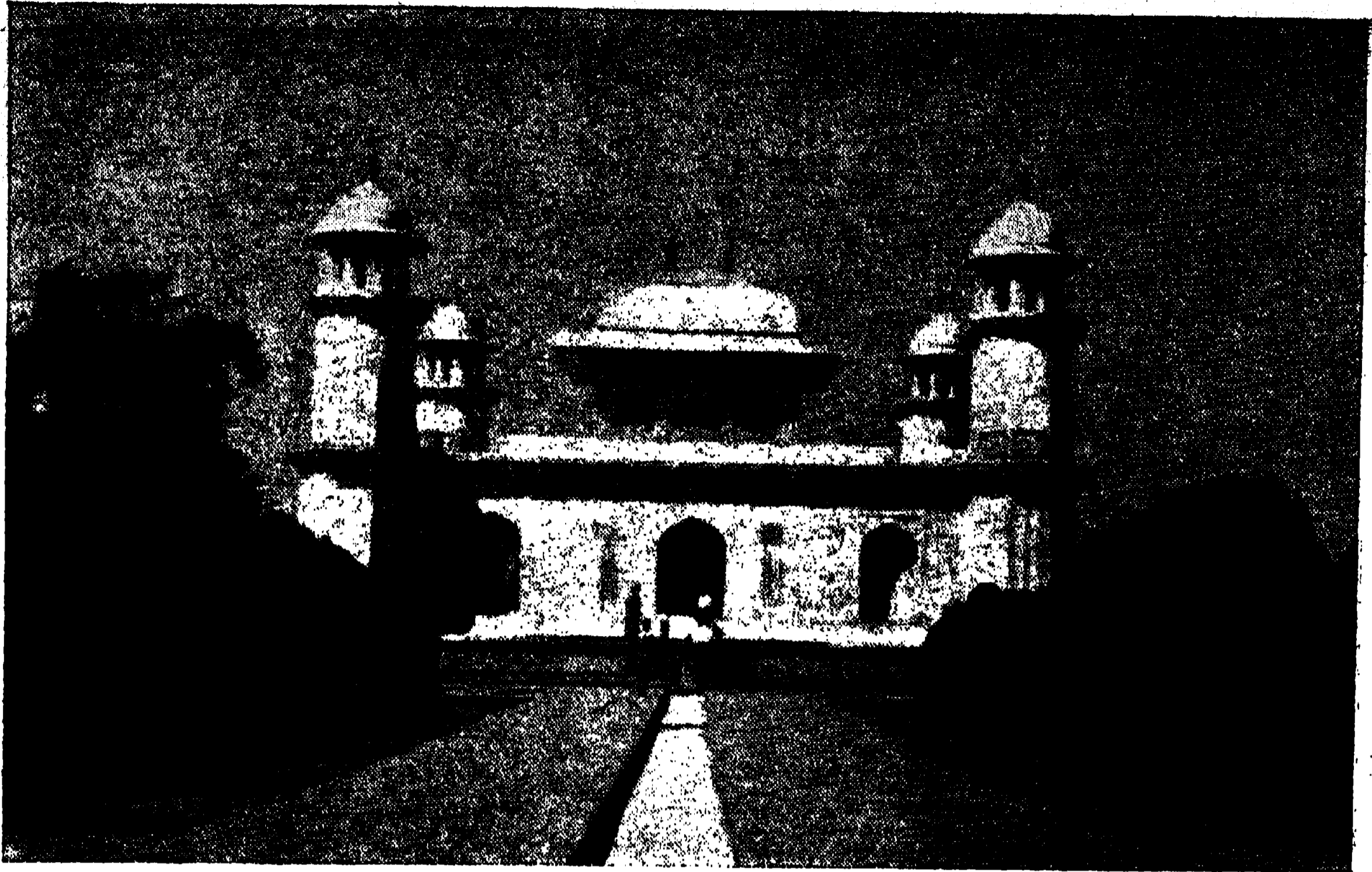
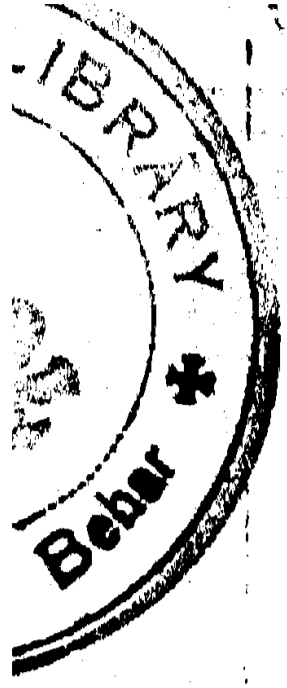


—দিলীপ চাকলাদার



পথ বেঁধে দিল



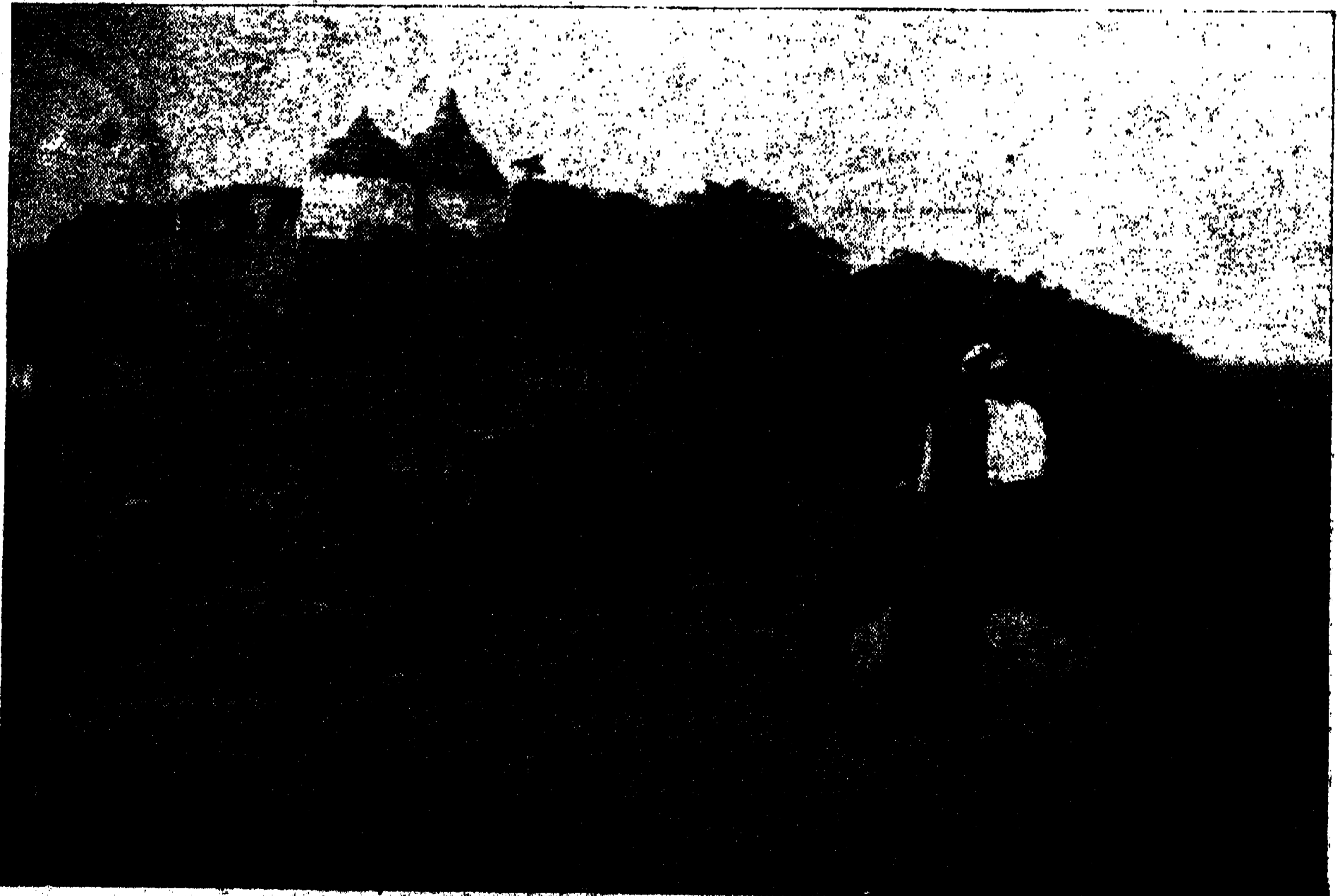


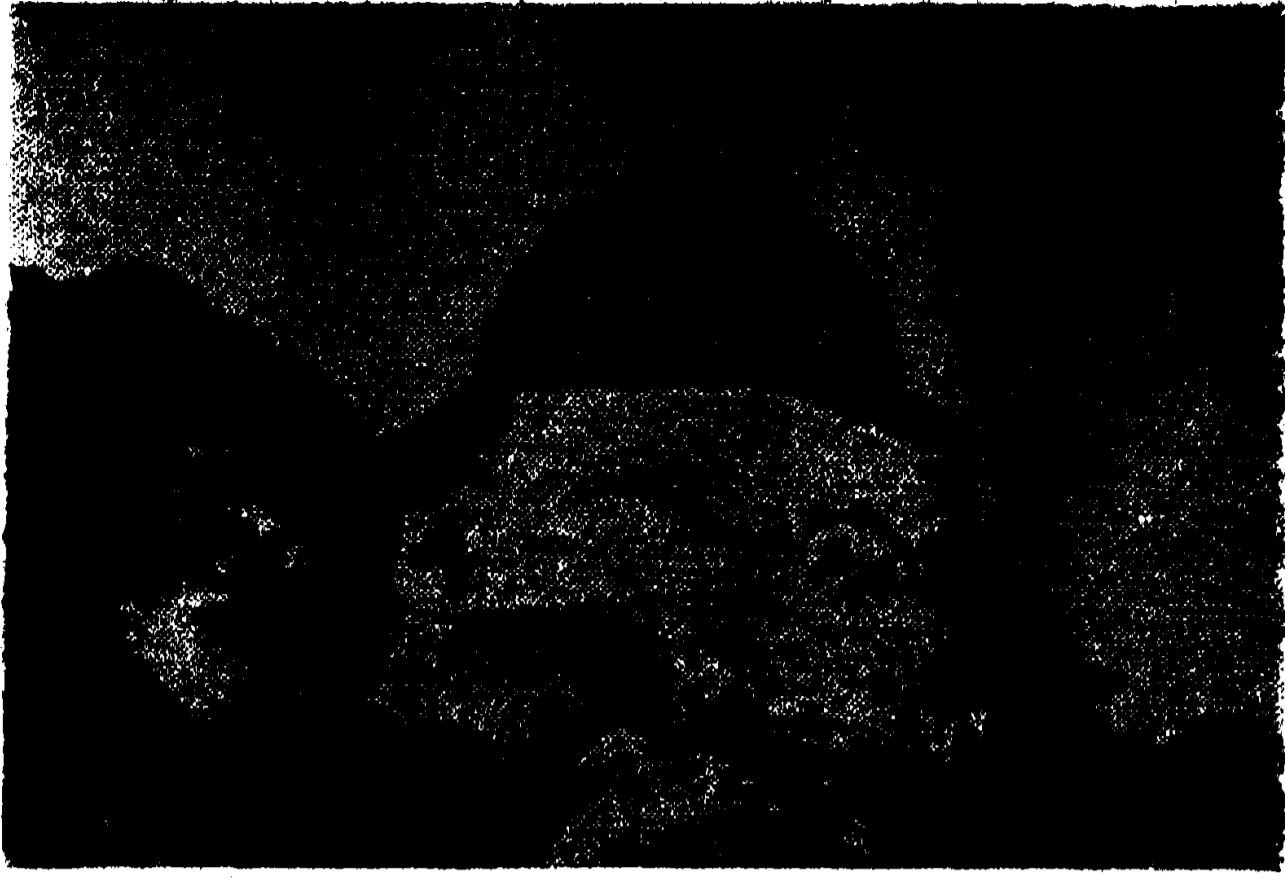
সবার চেনা ভূমি

—শিবদাস হাজরা

খণ্ডগিরি দর্শন

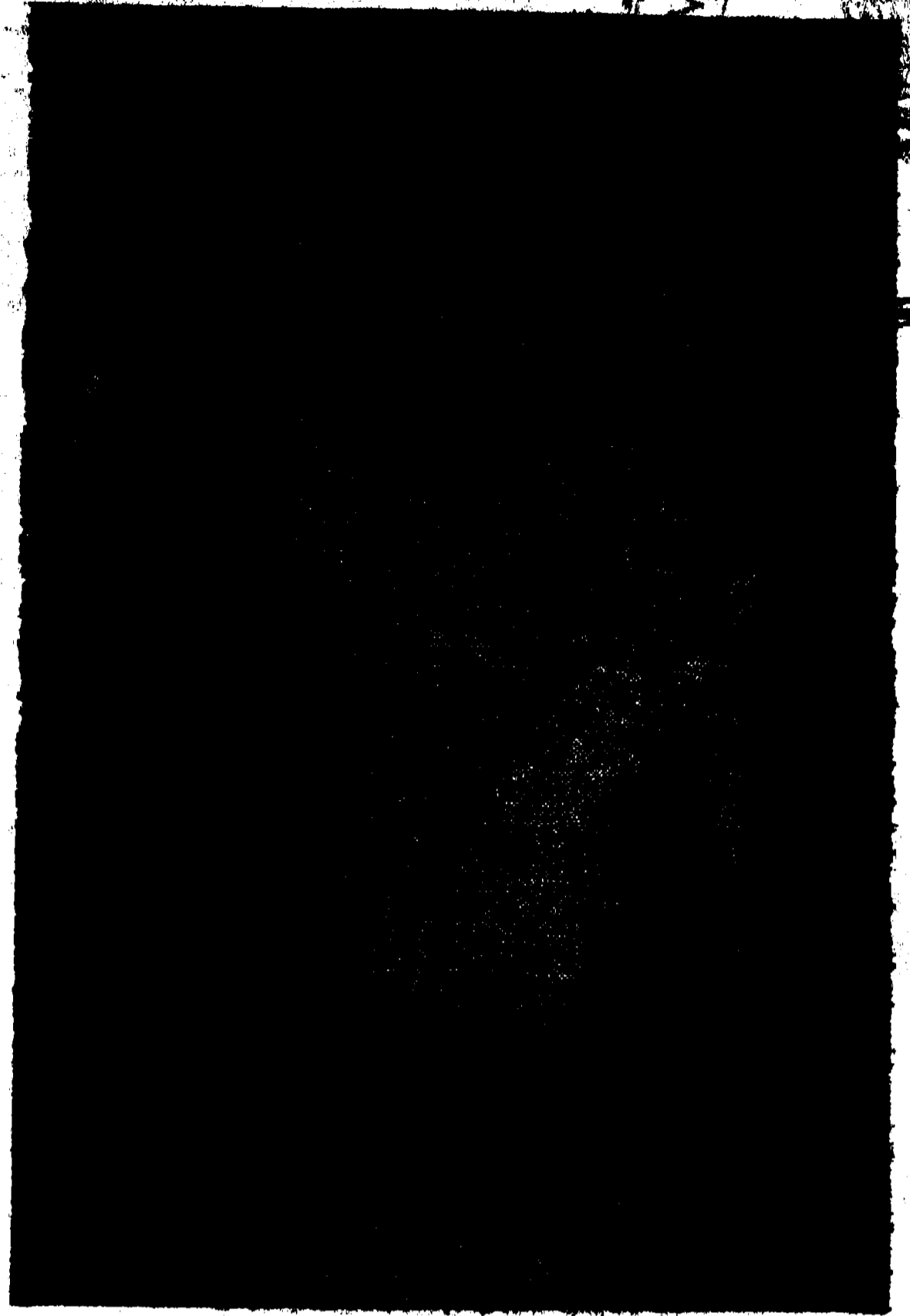
—রঞ্জিত বসু





কামাক্ষ্যা-মন্দির

—ডি. সি. বণিক



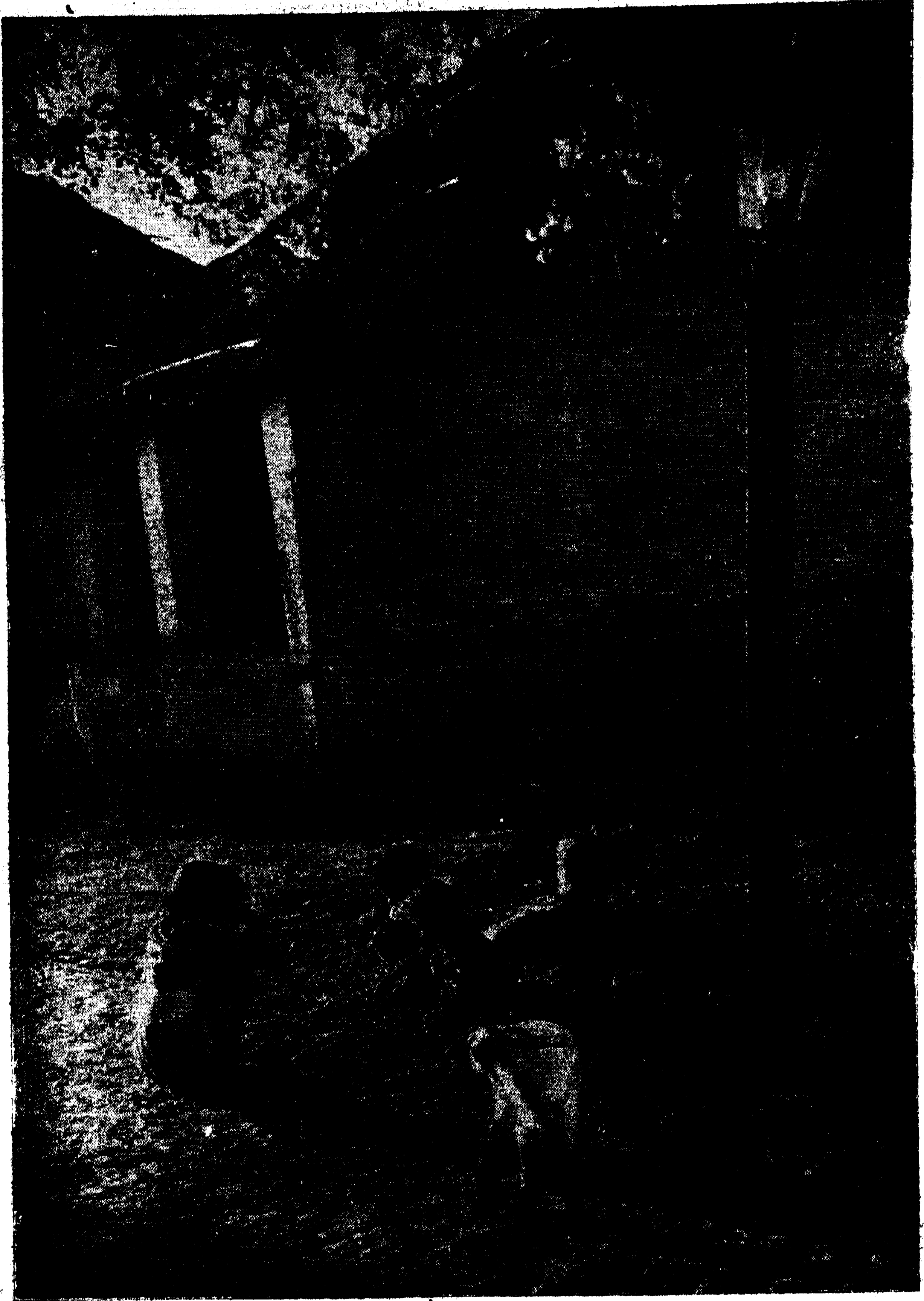
নববধূ

—হুশীল মিত্র

আলু-কাবলিওলা

—নিবাহিরতন ৩৩





পথের শেষে

—সাতভোর দিন

অনুরূপা দেবী স্মরণে

ঐনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সন ১৩৫০ এর ঞ্চাবিশ মাস।

হুজিঙ্কের হাছাকায়ে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত, টাকা দিয়েও খাত মেলে না। ঘরের টাকা বের করে কালো-বাজারীদের পেছনে চোরের মত কুরে পাঁচ টাকার জিনিষ পঞ্চাশ টাকার কিনতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। ক্যান দাও, একটু ক্যান দাও,—বলে মর্মান্তিক চীৎকারে কেঁদে বেড়াচ্ছে অগণিত নরনারী মহানগরীর পথে পথে।

এমনি দিনে পূর্বকালের জর্নৈক জমিদারের একমাত্র কস্তার বিবাহ। মহাভারতের অমুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রাসাদোপম বাড়ী ভাড়া করে রচিত হয়েছে বিবাহ-মণ্ডপ—বিবাহের ব্যয় বরাদ্দ চল্লিশ হাজার টাকা।

দান সামগ্রী ষোড়শাদি দিয়ে বিবাহ মণ্ডপ এমনভাবে সাজানো হয়েছিল বেন কোন প্রদর্শনীতে টল খোলা হয়েছে। হীরে জহরতের অলংকার থেকে শুরু করে পিতল কাঁসার বাসন কোনটারই প্রাচুর্য কম নেই।

এই উৎসবে যোগদান করবার জন্ত এলেন বাংলার সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী। গাড়ী থেকে নেমে যখন তিনি বিবাহ-মণ্ডপে প্রবেশ করলেন, তখন বিশ্বয় আর চেপে রাখতে পারলেন না। সংগীটিকে বললেন : এ যে দেখছি, রাজকস্তা আর অর্ধেক রাজস্ব।

অনুরূপা দেবীর মন প্রশ্ন এমন বেদনায় ভরে উঠলো যে, তিনি ভাল করে কিছুই খেলেন না কিংবা প্রশ্ন-খুলে কারো সাথে আলাপ করতে পারলেন না।

ফিরবার পথে সংগীটিকে বললেন : এই হুজিঙ্কে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে এগিয়ে চলেছে তিলে তিলে মৃত্যুর কুরাল প্রাসে, সেই সময়ে এমন বিলাসিতা, ঐশ্বর্যের এত আড়ম্বর সত্যি আমার মনকে বড় পীড়িত করে তুলেছে। অবশ্য জমিদার বাবুর একই মেয়ে এবং দেবার সামর্থ্যও তাঁর আছে, কাজেই তিনি তো দেবেনই। এর সংগে একটা দরিদ্র ভোজনের আইটেম থাকলে এ উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হতো। বুঝলে বাবা, জমিদারদের এ বিলাসিতার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কবিগুরু 'হুজিঙ্কা দেশ' কবিতাটি একবার মনে করে দেখো, আমার মনে হয়, এর অভিশাপ একদিন সত্য হবে।

অভিশাপ সত্যি লেগেছে। কবিগুরু ভবিষ্যদ্বাণী আজ অন্ধরে অন্ধরে কলেছে—

‘বিধাতার রক্ত ঘোষে

হুজিঙ্কের ঘারে বসে

ভাগ করে খেতে হবে সাথে অরণ্যান।’

অনুরূপা দেবী যদিও সম্পন্ন এবং বনেদী ঘরের মেয়ে ছিলেন কিন্তু সমাজের অবজ্ঞাত নিপীড়িত জনগণের প্রতি তাঁহার অসামান্য সহানুভূতির পরিচয় আমরা আরো একবার পেরেছিলাম।

এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে একটি সাহিত্য সভায় যোগ দেবার জন্ত অনুরূপা দেবী আমাদের সাক্ষাৎপূর্বে গিয়েছিলেন। ষ্ট্রীন থেকে

নেমে আট মাইল পথ বেতে হতো পাকীতে। পাকী থেকে নেমেই আমাদের কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বললাম : আপনাকে খুব রান্ড দেখাচ্ছে।

: হ্যাঁ একটু রান্ডই হয়েছি বাবা, তবে পথ ঞ্চমে ততটা নয়, যতটা তোমাদের এই পাকীবাহকদের কথা ভেবে।

আমরা উৎসুক হুজিঙ্কে তাকালুম তাঁর দিকে। অনুরূপা দেবী বললেন ; দেখো, না খেয়ে খেয়ে এই বাগ্‌দীভলোর কি হাল হয়েছে। আমাকে নিয়ে আসতে বেন এদের কত কষ্ট হল। অথচ বাগ্‌দীরাই ছিল এক দিন বাংলার রক্ষক। বাংলার শাসন কর্তাদের বাগ্‌দী লেঠল বিদেশের জয়ের বস্ত ছিল। বাগ্‌দী ভাঙাতের নামে সমস্ত দেশ একদিন ধর ধর করে কাঁপতো। আজ পঞ্চাশের মধ্যভাগে তাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে, ভাবলে বড় কষ্ট হয়।

আমার একটি কবিতা পড়ে অনুরূপা দেবী বললেন : সত্যিকারের হুজিঙ্কের রূপ তুমি দেখেছো নরেশ, তাই লিখতে পেরেছো এমন কবিতা। কত লোক মরেছে অনাহারে আর কত লোক লাখ লাখ টাকা করেছে কালো বাজারীতে। একটু ক্যানের জন্ত কত লোক বে আসতো তাঁর ইয়ত্তা নেই। পরাধীন দেশে বাস করে, এমনি বিড়াল কুকুরের মতই মরতে হবে আমাদের—তবু ইংরেজের মতে এটা হুজিঙ্ক নয়।

আমি বললাম : ইংরেজই তো এই হুজিঙ্ক সৃষ্টি করেছে, কাজেই স্বীকার করায়—না করায় কিই বা এসে যায়।

এবার বললেন সাহিত্য সম্রাজ্ঞী : অথচ মজা দেখো, এই যে লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেরে মরছে, কটে লের লোকানের সামনে দিনরাত্রি বাপন করেও হয়তো কিছুই পাচ্ছে না। মিষ্ট্রির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে অথচ একটি দোকান লুটের সবাধও তো শোনা বাচ্ছে না। এমন নিষ্ক্রিয় ভাবে কোন দেশের লোক মরেছে শুনেছ ? আরে বাবা মরতে যখন হবেই তবে একটা মরণ কামড় দেবো না কেন?—বলতে তাঁর স্বর উত্তেজনায় ভরে উঠলো।

খানিক নীরব থেকে বললেন : তোমরা সাহিত্য-সভা কর আর বাই কর, এই সব অজ্ঞ, অসহায় পরোবাসীদের নিরক্ষরতা দূর করবার ব্যবস্থা কর, এদের প্রশ্নে জাগিয়ে তোল সং সাহসের আলোক। নৈশ বিভালয় করে দেশের অজ্ঞ, চাষাভূষো মজুর শ্রেণীর ভেতর নিরক্ষরতা দূরী করণের অভিযান চালাও। অজ্ঞানে দাও আলো, মৃত জনে দাও প্রশ্ন।

আমরা মাতৃসমা এই মহীয়সী মহিলার আদেশ শিরোধার্য করে কাজে অগ্রসর হয়েছিলাম কিন্তু দেশ-বিভাগের কলে কর্মীদের মধ্যে কে কোথায় ছিটকে পড়লো। নিজেরাই হলাম সর্বহারী উদ্বাস্ত।

আজ এতদিন পরে সাহিত্যসম্রাজ্ঞীর কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে সাহিত্য-ই শুধু তাঁর সাধনার বস্ত ছিল না, সমাজের নির্বাচিত অবহেলিত অসহায় নরনারীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রচেষ্টাও ছিল তাঁর সাধনার প্রধান অঙ্গ। তাই বাংলা সাহিত্য হারিয়েছে সম্রাজ্ঞী আর দরিদ্র অসহায় নরনারী হারিয়েছে তাদের দরদী জননী।

কবিতার কথা

আইভান তুর্গেনিভ

খুসীতে উজ্জল মধুর
আনন্দময় দিন ও বছর—
বসন্তে এক পশলা বৃষ্টির মত
হায়, কবেই হয়েছে গত।

পুরানো গান

রাত একটার পর তিনি পড়ার ঘরে চুকলেন। চাকর এসেছিলো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিতে, তাকে চলে যেতে বললেন, দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে চিম্নীর কাছে একটি চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তার মনে হচ্ছিলো জীবনে কখনো এর আগে মানসিক বা শারীরিক এত ক্লান্তি তিনি বোধ করেন নি। সারা সন্ধ্যা তার কেটেছে নিশ্চিত, সুসভ্য, মধুর স্বভাবের নরনারীর সঙ্গে। যেরকমের অধিকাংশই ছিলেন সুন্দরী, ছেলের প্রায় সবাই ছিলেন প্রতিভাবান বা বিদ্বান। কথাবার্তা তিনিই প্রায় চালাচ্ছিলেন, সকলেই খুসী হয়েছিলো। তবু তার মনে হলো, তিনি ক্লাস্ত—প্রাচীন যুগের রোমানরা যাকে বলতো জীবনের গ্রানি, জীবনের প্রতি যুগা তার মনকে এর আগে কখনও এত বিধিরে তুসতে পারেনি। যদি তার বয়স অল্প হতো, তাহলে তিনি হয়ত দুঃখে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন, তাঁর অন্তর তখন তিক্ততার ভরে গিয়েছিলো, তাঁকে বেন চারদিক থেকে দুঃখ ও ক্ষোভ ঘিরে ধরছিলো। এই তিক্ততা, এই ঘৃণার হাত থেকে কি করে তিনি মুক্তি পাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। যুগ তার আজ আগবে এমন আশা আর ছিলো না।

অগস তিক্ত চিন্তায় তার মন ভরে গেলো। সকল বয়সের মানুষের কথা তিনি ভেবে দেখছিলেন। সম্প্রতি তিনি বাহার বছর অতিক্রম করেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি মানব-চরিত্রে অহঙ্কার, অসারতা ও নিরর্থকতা ছাড়া কিছু দেখতে পেলেন না। সর্বত্র সর্বকালে সেই অর্থহীন ব্যস্ততা, শক্তির অপব্যয়, আত্মপ্রত্যারণার লুকোচুরি খেলা কোনোরকমে ভুলে থাকার চেষ্টা। তারপর অকস্মাৎ একদিন বার্কিকা এসে দেখা দেয়, সব কিছুর অন্তরালে থাকে যুক্ত্য-ভর তারপর! তারপর সব কিছুর ঘটে অবসান। তবু ভালো যদি এই হয় শেষের ইতিহাস। কিন্তু শেষ হওয়ার আগে দেখা দেয় দুর্বলতা ও যন্ত্রণা, ইম্পাতে মরচে পড়ার মত। জীবন-সমুদ্র তার কাছে কবিবর্ণিত চঞ্চল ঢেউ-এর রূপ নিয়ে দেখা দেয় নি। তার শান্ত ও স্বচ্ছরূপই তার চোখে ধরা পড়েছে। তিনি বেন মোচার মত ছোট একটি নৌকোর বসে আছেন ও সমুদ্রের অন্ততল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে দানবরূপী দুঃখ জীবনকে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে আছে যোগ, দুর্ভাগ্য, মস্ততা, দারিদ্র, অন্ধকারে। তিনি আরো পত্নীভাবে চেয়ে দেখলেন—সব দুঃখ-কষ্টকে ছাড়িয়ে উঁচুতে উঁচুতে চেষ্টা করছে এক

দানব—ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার যুগ্য চেহারা। আর এক মুহূর্ত, এবারে নৌকো দিলো বুঝি ডুবিয়ে। না, আবার তলিয়ে যাচ্ছে, ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর তো ওকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় একদিন আসবে এখন নৌকোটা উন্টে দিতে ওর দেবী হবে না।

তিনি মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে দাঁড়ালেন। সারা ঘরে ছ'বার পাঘচারি করলেন। টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ারে হাতড়াতে লাগলেন কাগজপত্র ও পুরানো চিঠির তাড়া, অধিকাংশ চিঠিই মেয়েদের লেখা। কি যে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তা তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট ছিলো না। শুধু যন্ত্রণাদায়ক এই চিন্তাগুলোর হাত থেকে মুক্তি চাইছিলেন তিনি। এদিক ওদিক কতকগুলো চিঠি দেখে তিনি শুধু কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন, চিম্নির আগুনের দিকে চাইলেন, একপাশে বেধে দিলেন, এসব অসার আবর্জনাগুলো পুড়িয়ে দেবেন এই কথাই হয়ত তাঁর মনে উদয় হয়েছিলো। এগুলোর মধ্যে ছিলো একটি শুকনো ফুল, এক বিবর্ণ ফিতে দিয়ে বাঁধা। এক ড্রয়ার থেকে অল্প ড্রয়ার হাতড়াতে লাগলেন, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখতে পেলেন একটা সেকলে ধরণের আটকানো বাস। তার ঢাকনিটা আস্তে আস্তে খুললেন। হলদে হয়ে যাওয়া তুলোর নীচে দেখতে পেলেন গার্নেট পাথরে তৈরী ছোট একটি ক্রস।

নির্বাক-বিশ্বয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন ক্রসটির দিকে, মুহূর্ত আর্তনাদ করে উঠলেন। আনন্দ বিবাদের ঢেউ খেলে গেলো তাঁর চেহারায়। মনে হলো তিনি বেন বছদিন হারিয়ে যাওয়া এক প্রিয়জনকে দেখা পেয়েছেন, যাকে তিনি ভালোবাসতেন বহু বহু দিন পূর্বে। সে বেন আগেকার রূপ নিয়ে দেখা দিলো—তবু অনেক বছরের ছাপ রয়েছে তার চেহারায়।

তিনি উঠে আবার আগুনের কাছে গিয়ে সেই চেয়ারটিতে বসলেন, আবার হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন। আজ কেন, কেন আজই? তিনি বেন নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন। বহু দিন আগেকার স্মৃতি তার মনে ভেঙ্গে উঠলো।

যা তার মনে হলো তা হচ্ছে এই—কিন্তু প্রথমে তার নাম ও পৈতৃক নাম জানা দরকার—নামিচ্ছি পাতলোভিচ। তার পদবী ছিলো সানিন। যা তার মনে এলো—

১

১৮৪০ সালের গ্রীষ্মকাল। সানিনের সবে বাইশ বছর পূর্ণ হয়েছে। ইটালী থেকে রাশিয়াতে ফিরে যাওয়ার পথে মাইন নদীর তীরে ক্রাককোট শহরে এসে উঠেছিলো সে। তার ধন-সম্পত্তি সামান্তই ছিলো, মুক্ত ও স্বাধীন ছিলো সে, নিকট-আত্মীয় তার প্রায় কেউ ছিলো না। একজন ছুঁ সঙ্গের আত্মীয়ের যত্নে কয়েক

হাজার ক্রমের মাসিক হয়ে সে ঠিক করলো, সরকারী চাকরিতে চাকরী আগে বিশেষ বেয়িরে আসবে। চাকরী তাকে করতেই হবে, যদি সে বাঁচার মতো বাঁচতে চায়। সে তার ইচ্ছা পূর্ণ করলো এত হিসেব করে যে বেদিন ফ্রান্স কোর্ট পৌঁছালো তার কাছে অবশিষ্ট রইলো আর মাত্র পিটার্সবুর্গ কিনে বাঁচার ভাড়া। ১৮৪০ সালে ইউরোপে কোথাও রেলগাড়ী ছিলো না বললেই হয়।

সবাই দেশ ভ্রমণ করতে বোটার গাড়ীতে। সানিনও গাড়ীতে একটি সিট ভাড়া করলো কিন্তু রাত দশটার আগে গাড়ী ছাড়বে না অর্থাৎ তাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ভাগ্যক্রমে দিন ভালো করেছিলো। তখনকার প্রসিদ্ধ শেতরাজহংসী হোটেলে দুপুরবেলা খেয়ে নিয়ে সানিন শহর দেখতে বেরলো। ডানেকারের আবিষ্কান্দে দেখতে গেলো, বেশী ভালো লাগলো না, প্যোটের বাড়ী দেখতে গেলো। প্যোটের লেখাপত্রের মধ্যে একমাত্র 'ভেটারের চুখ' বলে বই-এর ফরাসী অনুবাদটি তার পড়া ছিলো। মাইন নদীর ধার দিয়ে হাঁটছিলো সে, সব মার্জিত রুচি অমণকারীদের মতই তার মুখে ছিলো বিরক্তির ছায়া, অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা প্রায় হুঁটার সময় ক্লান্ত শরীর ও ধূলিলিপ্ত জুতো নিয়ে ফ্রান্স কোর্টের এক নগণ্য পাড়ার তদধিক নগণ্য গলিতে এসে হাজির হলো সে। এই গলিটি পরে তার স্মৃতিতে অমর হয়েছিলো। এই গলিরই একটি বাড়ীর সামনে সাইনবোর্ড যোগা করছিলো—অিয়োভানি রচসলি—ইটালীয়ান খাবার বিক্রেতা। সানিন এক গ্রাস লেমোনোড খাবে বলে চুকলো। সামনের ঘরটিতে একটি ছোট কাউন্টারের পেছনে বসে-করা তাকের উপরে কেমিষ্টের দোকানের মত হলদে লেবেল লাগানো। সামান্য কতকগুলো বোতল ছিলো আর কতকগুলো কাচের জারে ছিলো রান্না, চকোলেট ও লজেন্স। ঘরেতে কোনো লোক ছিলো না। জানলার পাশে বেতের চেয়ারে একটা ধোঁরাটে বসে-এর বেড়াল বসে পিট-পিট করে চাইছিলো। মেঝেতে একটা উল্টানো খোদাই করা কাঠের শেলাইয়ের বাজ থেকে গড়িয়ে পড়েছিলো একটা লাল উলের বল। তাতে সারাজের রোদ পড়তে চুপী মত চকচক করছিলো বলটি। পাশের ঘর থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ আসছিলো। সানিন দরজার উপরে ঘণ্টাটি বাজিয়ে খেমে বাঁচার অপেক্ষা করছিলো। বলতে বাচ্ছিলো, কেউ আছে? সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে গেলো। সানিন বা দেখলো তাতে তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো।

২

একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে, অনাবৃত কাঁধের উপর তার কালো চুলের গুচ্ছ ছিলো, হাত বাড়িয়ে দৌড়ে এসে সামনের ঘরে চুকলো। সানিনকে দেখতে পেয়ে তার কাছে এসে তার হাত ধরে টেনে খাসরোধ করা কণ্ঠে বললো শীগ প্রিয় বাঁচাও ওকে। সানিন এতো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো যে নড়তে পারছিলো না। জীবনে এর আগে কখনও সে এত রূপ কাকর দেখে নি। মেয়েটি কিনে চাইলো ও আবার বললো, আশ্রয়, দয়া করে আশ্রয়, তার কণ্ঠধরে, আর চাহনিত্তে তার গালের উপরে রাখা হাতটিতে এত দুশ্চিন্তা,

মাথানো ছিলো যে সানিন আর এক মুহূর্ত না জেবে খোলা দরজার ভেতরে দৌড়ে গিয়ে চুকলো।

যে ঘরে ওরা গেলো সেখানে একটা পুরানো সোকার উপরে শুয়েছিলো একটা বছর চৌদ্দ বছরের ছেলে, অনেকটা মেয়েটির মত দেখতে, সম্ভবতঃ মেয়েটির ভাই। তার মুখটা দেখাচ্ছিলো মৃতের মত ক্যাঁকশে, হলদে আভাযুক্ত সাদা-মোম বা পুরানো মর্মর পাথরের মত। চোখ বন্ধ ছিলো, ভুরু উপর তার ঘন কালোচুলের ছায়া পড়েছিলো। তার স্থির ভুরুগুলো বেন দেখাচ্ছিলো পাথরে খোদাই করা। নীলচে ঠোঁটের কাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো তার দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। মনে হচ্ছিলো তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। একটি হাত মেঝেতে ঝলছিলো, অন্যটি মাথার উপরে কেসে রাখা ছিলো। ছেলোট পুরো পোষাক পরেছিলো—কোটের সব বোতাম লাগানো ছিলো আর গলায় ছিলো আঁট করে বাঁধা একটি টাই।

মেয়েটি জোরে কঁঁদ উঠে ওর কাছে গেলো। সে চিৎকার করছিলো—সে মারা গেছে, সে মারা গেছে। মিনিটখানেক আগে মাত্র সে ওখানে বসে আমার সঙ্গে কথা বলছিলো। হঠাৎ পড়ে গেলো আর নড়তেও পারলো না। হায় ভগবান! আশ্রয় কি আর ওর জন্ত কিছুই করতে পারি না? মা-ও বেয়িরে গেছেন। এবারে মেয়েটি ইটালীয়ান ভাষায় বললো—পাণ্টালেগন, পাণ্টালেগন, ডাক্তার কোথায়? তুমি কি ডাক্তার আনতে পেরো?

ভালাগলায় উত্তর এলো দরজার দিক থেকে, আমি নিজে বাইনি, সিনোরিনা—লুইসাকে পাঠিয়েছি। কালো বোতাম লাগানো বেগুনি বসে-এর ফ্রান্স কোর্ট, খুব চওড়া সাদা গলাবন্ধ, ছোট দুইদুই ব্রীচেস ও নীলবসে-এর পশমের মোজা পরে এক বৃদ্ধ বেকানো পা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরে এলো। তার ছোট মুখটি কালো ধূসর বসে-এর চুলের ঝোপে প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। উচ্চকণ্ঠে চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া করে কাঁধের উপরেও পড়েছিলো। মাথার উপরে এই একরাশ চুলের বোকা থাকার দরুণ তাকে দেখাচ্ছিলো একটা ঝুঁটিওলা মোরগের মত। তার চেহারার একটি ভীক নাক ও একজোড়া হলদে গোল চোখই ছিলো চোখে পড়ার মত, সেজন্ত সাদৃশ্যটি আরো কাছাকাছি হয়েছিলো।

কাঁস বেওয়া কিস্তিতে বাঁধা বৃট জুতো পরা, মোটা বেতো পা দুটো নাড়তে নাড়তে বুড়ো বললো, ইটালীয়ানে, আমি তো দৌড়তে পারি না, লুইসা অনেক ভাড়াভাড়ি বাবে। আমি একটু জল এনেছি।

তার সঙ্গ হাড় বের করা আজুলগুলো দিয়ে একটা জলের বোতলের গলা ধরেছিলো।

কিন্তু ডাক্তার আসার আগেই যে এমিল হয়ে বাবে। মেয়েটি সানিনের দিকে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো, আপনি কি ওর জন্ত কিছু করতে পারেন না?

মেয়েটি পাণ্টালেগন বলে বাক্যে ডাকছিলো, সেই বুড়ো বললো ওর মাথার রক্ত চড়েছে, রক্ত ঝরিয়ে দিতে হবে।

যদিও সানিন ডাক্তারীয় কিছুই জানতো না তবু এইটে জানতো চৌদ্দ বছরের ছেলের রক্তচাপ বৃদ্ধির কলে কখনো এরকম হয় না

সানিন পাণ্টালেওনকে বললো : সে মুঁহা গেছে, আর কিছু হয় নি। একটা ত্রাশ দাও তো।

বুড়ো মুখ তুলে বললো, কি জিনিষ?

সানিন প্রথমে জাৰ্গাণ পরে ফরাসীতে বললো—ত্রাশ ত্রাশ নিজের কোটটি ত্রাশ দিয়ে ঝাড়ার অভিনয় করে বললো, ত্রাশ।

এতক্ষণে বুড়ো বুঝতে পারলো সানিন কি বলছে। ত্রাশ, স্পাজেটে? নিশ্চয়ই আছে।

নিশ্চয় এসো। তার কোটটা খুলে ফেলে ত্রাশ দিয়ে শরীরটা ঘষতে হবে।

আচ্ছা—ওর মাথার জল ঢাললে হয় না?

না পরে হবে। তাড়াতাড়ি ত্রাশগুলো নিয়ে এসো। পাণ্টালেওন বোতলটা মেঝেতে রেখে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে ও নিয়ে এলো একটা চুল আঁচড়ানোর ত্রাশ ও আরেকটা কাপড় ঝাড়ার ত্রাশ, জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে ও কি জন্তু এত হৈ চৈ হচ্ছে জানার উৎসুক্য পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বুড়ো, মেয়েটি ও সানিনের দিকে চাইতে চাইতে একটি ছোট কাঁকড়া কাঁকড়া কাঁকড়ানো লোমগুলো কুকুর চুকলো বুড়োর পেছন পেছন।

সানিন তাড়াতাড়ি করে শোয়ানো ছেলেটির কোটটি খুললো, কলার ঢিলে করে দিলো, সার্টির হাতা গুটিয়ে দিলো, তারপর নিজের গায়ে বত শক্তি আছে, তা'দিয়ে ছেলেটির বুক ও হাত ঘষতে লাগলো ত্রাশ দিয়ে।

পাণ্টালেওন চুল আঁচড়ানোর ত্রাশ দিয়ে সে রকম জোরেই ছেলেটির প্যাণ্ট ও বুটের ওপর ঘষতে লাগলো। মেয়েটি হাঁটু পেড়ে সোফার পাশে বসে নিজের মাথাটি হুঁহাতে ধরে অনিমেব ময়নে তার ভাই-এর দিকে চেয়ে রইলো। সানিন ত্রাশ ঢালাতে ঢালাতে আড়চোখে মেয়েটিকে দেখছিলো। হে ভগবান, কি সুন্দর দেখতে মেয়েটিকে।

৩

মেয়েটির সুন্দর উঁচু নাকটি ছিলো একটু লম্বাটে, তার টোঁটের ওপরে অস্পষ্ট সফ গৌণের রেখা দেখা যাচ্ছিলো কিন্তু তার অনিন্দ্য গায়ের রং ছিলো মন্থণ ও নির্মল—বার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে হস্তি-দন্তের বা ঈবৎ হলদে এষাবের। পালাজো পিটিতে এলোরির জুড়িধের মত ছিলো তার চকচকে চেউখেলানো চুলগুলো। বিশেষ করে তার ঘন ধূসর রংএর চোখ, চোখের তারা চার পাশে বেঁটন করে ছিলো একটি কালো রেখা—ছিলো অপূর্ব সুন্দর বিজয়িনীর চোখ। এমন কি এখনও বে ভয়ে ও হুঃখে কাতর হয়েছে তাদের চাহনি তবু কি সুন্দরই দেখাচ্ছিলো। সানিন বে দেশ সজ বেড়িয়ে এসেছে সেই গৌরবময় দেশে তার মন চলে গেলো। কিন্তু ইটালিতেও কই এত রূপ কোথাও তার নজরে পড়েনি। মেয়েটি খেমে খেমে অনিয়মিত নিশ্বাস নিচ্ছিলো, যেন অপেক্ষা করছিলো তার প্রত্যেক নিশ্বাসে তার ভাই এবার শ্বাস নিতে আরম্ভ করবে।

সানিন ঘবে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার চোখ মেয়েটিকে ছাড়াও অন্য আরেক দিকে পড়ছিলো। পাণ্টালেওনের বহুত চেহারা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। বুড়ো পরিশ্রম করে হাঁপাচ্ছিলো, প্রত্যেকবার

ঘবার সঙ্গে লাকাচ্ছিলো ও ককণ ঘরে কাতরাচ্ছিলো। একটি বহু পাছের শেকড়গুলোর ওপরের মাটি জলে ধুয়ে গেলে বে রকম দেখায় সে রকম দেখাচ্ছিলো তার ঘামে ভেজা চুলের গোছা। তার চুলগুলো একবার মাথার এপাশে পড়ছিলো, একবার ওপাশে।

সানিন বলতে যাচ্ছিলো, তার জুতোগুলো, অস্ত্রত: খুলে নাও। কুকুরটি নিঃসন্দেহ এতগুলো অল্পত ঘটনার সমাবেশ দেখে সামনের পা ছুঁটোর ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে ডাকছিলো।

বুড়ো ফিস-ফিস করে বললো, টাটাগিয়া, চূপ। কিন্তু তখনই মেয়েটির চেহারা পরিবর্তন হলো। তার ভুক জোড়া ওপরে উঠে গেলো, চোখগুলো যেন আরো বড় হয়ে গেলো, তার মুখে পড়লো আনন্দের ছাপ।

সানিন চেয়ে দেখলো ছেলেটির গালে লাল আভা ফিরে আসছিলো চোখের পাতা পড়ছিলো। নাকটা কেঁপে উঠছিলো। তার ঠাতে ঠাত লাগানো ছিলো কিন্তু তার ভেতর দিয়ে সে শ্বাস নিলো ও নিশ্বাস ফেললো। এমিল, মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো—আমার এমিলিও।

কালো বড় বড় চোখগুলো আন্তে আন্তে খুলে গেলো, শূন্য দৃষ্টিতে অল্প একটু হাসি দেখা দিলো একটু পর। তার ফ্যাকাশে ঠোঁটেতেও হাসি নেমে এলো। তার খুলানো হাতটিও এবারে বুকের ওপর টেনে নিলো।

মেয়েটি আবার এমিলিও বলে ডেকে উঠে কাঁড়ালো। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিলো সে হয় ত একুনি কারায় ভেজে পড়বে কিংবা হাসিতে কেটে পড়বে।

দরজার ওপাশ থেকে এবার আওয়াজ এলো—এমিল, এমিল, কি হয়েছে? ছিমছাম পোষাক-পরা, রূপোলী চুল ও জামবর্ণ গায়ের রং একজন ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি ধেঁটে ঘরে এসে ঢুকলেন। তার পেছনে আসছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, তার পেছনে দেখা গেলো বাড়ীর ঝিকে।

মেয়েটি দৌড়ে গেলো তাদের কাছে। ভদ্রমহিলাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো—মা, সে বেঁচে আছে, সে প্রাণে বেঁচে আছে, মা।

কিন্তু হয়েছিলো কি? ভদ্রমহিলা আবার বললেন। আমি এসে দেখি হঠাৎ ডাক্তারবাবুকে নিয়ে লুইসা ঢুকছে।

মেয়েটি কি কি ঘটেছে তার মাকে বলতে লাগলো। ডাক্তার রুগীর দিকে গেলেন, রুগীর জ্ঞান ফিরে আসছিলো, মুহূ হাসছিলো সে। এত হৈ-টৈ ও শঙ্কার কারণ নিজেই মনে করে সে যেন লজ্জিত বোধ করছিলো।

সানিন ও পাণ্টালেওনকে ডাক্তার বললেন, দেখছি, আপনারা শুকে ত্রাশ দিয়ে ঘষাছিলেন। খুব ভালো করেছেন, ভালো, আচ্ছা, দেখি, ওর জন্তু আর কি করা বার।

তিনি রুগীর নাড়ী দেখছিলেন। হঁ। দেখি তোমার ভিত্ত। ভদ্রমহিলা ছেলেটির ওপর চিন্তাধিত ভাবে ঝুঁকে পড়লেন। সে তখন আরো বেশী হাসছিলো, ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে লজ্জার লাল হয়ে গেলো।

সানিনের মনে হলো ওর জন্তু হয়ত সবাই সঙ্কোচ বোধ করছে। সে দোকান ঘরে আবার ফিরে এলো। কিন্তু দরজা

খুলে বাস্তার পা দেওয়ার আগেই মেয়েটি এসে তাকে বেতে বাধা দিলো।

স্বিতযুখে তার দিকে চেয়ে মেয়েটি বললো—চলে যাচ্ছেন, আপনাকে আটকে রাখতে চাইনে, কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে সত্যবেলা আবার আসবেন। আমরা আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, আপনি না থাকলে আমার ভাই হয়ত মারা যেতো। আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমার মা চান, আপনার সবছোও আমরা জানতে চাই, আমাদের সঙ্গে আপনাকেও আনন্দে যোগ দিতে হবে।

সানিন খেয় খেয়ে কোনো বকমে বললো, কিন্তু আমি যে আজ রাত্রেই বার্লিন চলে যাচ্ছি।

মেয়েটি জোবের সঙ্গে প্রতিবাদ করলো। বাওয়ার আগে অনেক সময় হবে আপনার। এক ঘণ্টার ভেতর ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে এক পেয়লা চকোলেট খাবেন কথা দিন। আমাকে এখন ওর কাছে কিরে বেতে হবে। আসবেন আপনি, না।

সানিন আর কি করতে পারে? বললো—আচ্ছা, আসবো। অসামান্য সুল্লরী মেয়েটি তার হাতে একটু চাপ দিয়ে চলে গেলো। সানিনও রাত্তায় বেরিয়ে পড়লো।

৪

সানিন দেড় ঘণ্টা পর বখন খাবার বিক্রেতার বাড়ীতে ফিরে এলো, ঠিক পরিবারেরই একজনের মত আদর পেলো সে। যে সোকার এমিলকে মালিশ করা হয়েছিলো তার উপরেই বসেছিলো সে। ডাক্তার তার জন্ম ওবুধ লিখে গেছেন ও বলে গেছেন মানসিক চাকলা খেন তার কখনও না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে। কারণ কঙ্গীর স্নায়ু দুর্বল, স্নায়বোগও তার সহজেই হতে পারে। আগেও তার অনেকবার ফিট হয়েচে, কিন্তু এত দীর্ঘস্থায়ী ও জীষণ বকমের দুর্ভা এর আগে কখনও হয়নি। অবশ্য ডাক্তার বলে গেছেন এখন আর ভয়ের কারণ নেই। এমিল কঙ্গীদের মতই একটি টিল ড্রেসিং গাউন পরে ছিলো। তার মা তার গলায় নীলরং এর পশমের 'স্কার্ফ' জড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে দেখাছিলো খুব খুসী, যেন উৎসবে যেতে গেছে—সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়াই ছিলো উৎসবের। সোকার পাশে, একটা পরিষ্কার টেবিলরূপ দিয়ে ঢাকা গোল টেবিলের ওপরে ছিলো সুগন্ধ চকোলেট তিনটি একটা প্রফাও বড় ককিপট, নির্যাপের বোতল, বিস্কুট ও কটি। এমনকি ফুল পর্যন্ত। একজোড়া পুরানো ধরণের রূপোর মোমবাতিদানে অলছিলো ছটি সফ মোমবাতি। সোকার একপাশে উঁচুপিঠ ও হাতলওলা একটা অতি আরামদায়ক চেয়ারে সানিনকে বসানো হলো। বাড়ীর সবাই বাবের সঙ্গে সানিনের সেদিন আগেই দেখা হয়েচে, উপস্থিত ছিলো, ছোট কুকুর টাটালিয়া ও বেড়ালটি সমেত। সবাইকে মনে হচ্ছিলো অত্যন্ত আনন্দিত, কুকুরটি আনন্দে হাঁচছিলো, কেবলমাত্র বেড়ালটিরই কোনো পরিবর্তন দেখা বাচ্ছিলো না, পিট পিট করে চাইছিলো ও ঘরঘর করে আওয়াজ করছিলো। সানিনকে বলতে হলো তার নামধাম ও কি করে সে। বখন মেয়েরা জনলেন ও রাশিয়ান ওরা একটু হকচকিরে গেলেনও আশ্চর্য হওয়ার জায় দেখালেন। হুজুমেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, সে আধাণ খুব

ভালো জানে কিন্তু যদি ইচ্ছে করে তবে ফরাসীতে কথা বলতে পারে কারণ তারা ফরাসীও খুব ভালো জানেন ও বুঝতে পারেন। এই সুযোগে সানিন ফরাসীতে কথাবার্তা চালালো। সানিন? সানিন! তারা কখনও জানতেন না কোনে রাশিয়ান নামের এত সহজ উচ্চারণ হতে পারে। তার ক্রিস্টিয়ান নাম দিমিত্রিও ভারী সুন্দর। বয়স্ক মহিলাটি বললেন বৌবনে তিনি দেমেত্রিও ও পলিবিক্ত বলে একখানি গীতিনাটা শুনেছিলেন, কিন্তু দিমিত্রি নামটি দেমেত্রিও নামের থেকে অনেক বেশী সুন্দর। এসব কথাবার্তা বলতে বলতেই সানিন একঘণ্টা কাটিয়ে দিলো। আর মেয়েবাও তাদের নিজস্বের জীবনের সব কিছু ওকে খুলে বললেন। মা অর্থাৎ রূপোগীচুল সেই ভদ্রমহিলাই প্রায় একচেটির কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। সানিন জানতে পারলো তার নাম হচ্ছে লেওনোরা রসেলী, তিনি তার স্বামী জিয়োভানি বাটিষ্টা রসেলীর মৃত্যুর পর আর বিয়ে করেন নি। তার স্বামী মাইন নদীর তীরে এই ফ্রান্সকোর্ট সহরে পশ্চিম বছর আগে খাবার বিক্রেতা হিসাবে আসেন। জিয়োভানি বাটিষ্টার দেশ ছিলো ভিসেনজাতে; যদিও রাগী ও বোকা স্বভাবের ছিলেন তবু খুব ভালো ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন ঘোর সাধারণতন্ত্রী। এই কথা বলে দেওয়ালে টাঙ্গানো সোকার উপরে তার তৈলচিত্রটির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন। মেডেম রসেলী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন চিত্রকরও একজন সাধারণতন্ত্রী—সেই ছবিটিতে তার স্বামীর সঙ্গে সাদৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। ছবিটা দেখে মনে হয় যেন ভয়াবহ চেহারার এক দস্যু, রিনাল্ডো রিনাল্ডির মত। মেডেম রসেলীর নিজের দেশ ছিলো প্রাচীন ও সুন্দর পার্মা সহরে এই সহরে অমর চিত্রকর করেজিয়ার আঁকা ফ্রেস্কো আছে একটা সুন্দর গধুলাওলা চার্চে। অবশ্য দীর্ঘদিন জাৰ্মানীতে বাস করার ফলে তিনি পুরো টিউটন হয়ে গেছেন। হৃৎধিতভাবে মাথা নেড়ে তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন তার ছেলে ও মেয়েকে বললেন, এরা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। মেয়েটির নাম জেন্মা, ছেলেটির নাম এমিল, ওরা খুব ভালো ও বাধ্য বিশেষ করে এমিল। মেয়েটি বলে উঠলো আমি বুদ্ধি বাধ্য নই? ওর মা উত্তর দিলেন—তুমিও একজন সাধারণতন্ত্রী। তার স্বামী জীবিতকালে ব্যবসা বেরকম ভালো চলছিলো সেবকম ভালো অবশ্য এখন চলে না, তার স্বামী ছিলেন সত্যিকারের গুণী, খাবার তৈরীর হাত ছিলো তার চমৎকার। এখানে পাটালেওন কঠোর ভাবে বলল, অতি উঁচুদরের গুণী। সবশেষে ভদ্রমহিলা বললেন—ভগবানকে ধন্যবাদ, নালিশ জানাবার মত কিছু তার নেই।

৫

জেন্মা গুনছিলো ও তার মার কাঁধে মাঝে মাঝে হাত রাখছিলো, হাসছিলো দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলো, আঙ্গুল নেড়ে মাঝে মাঝে মার কথার প্রতিবাদ করছিলো ও সানিনের দিকে দেখছিলো একটু পর পর। খানিকক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে সে দু'হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো ও চিবুকের নীচে গলায় চুমু খেলো। তার মার হৃৎস্পৃড়ি লাগাতে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। সানিনর সঙ্গে পাটালেওনেরও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। জানা গেলো সে একটা অপেরাতে মাঝারি গভীর গলায় গান গাইতো কিন্তু বহুদিন পূর্বেই বন্দক ছেড়ে দিয়ে

রসেলী পরিবারের সঙ্গে আছে—এখানে তার স্থান ছিলো ভৃত্য ও পরিবারের বন্ধুর মাঝামাঝি। যদিও সে জার্মানিতে অনেকদিন আছে তবু সে জার্মান খুব খারাপ বলতো, তখু শিখেছিলো কতকগুলো শিশু করার পালাপাল তারও উচ্চারণ ঠিক হতো না। সে সব জার্মানকেই বলতো অতি পাণ্ডী। অতি চমৎকার ইটালীয়ান বলতো সে কারণ তার দেশ ছিলো সিজিগালিয়াতে যেখানে এখনও শুনতে পাওয়া যায় রোমানদের যুগের টাসকেনির ভাষা।

এমিলিও খুব খুশী হয়েছিলো, সত্য বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে বা মুহূ হুহু এককম একটা ভাব তার মনকে পূর্ণ করেছিলো, স্পষ্ট বোকা বাচ্ছিলো সে হচ্ছে বাড়ীর সকলের আচুরে। সলজ্জভাবে সে সানিনকে ধন্যবাদ জানালো, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই সে মিষ্টি ও সিন্ধাপ খাচ্ছিলো। সানিনকে ছ'কাপ চমৎকার চকোলেট খেতে হলো ও অপর্ধ্যাপ্ত বিস্কুটের সঙ্গতি করতে হলো। বেই সে একটা শেব করছিলো অমনি জেন্মা আর একটা এগিয়ে দিচ্ছিলো, সানিন না বলতে পারছিলো না। তার মনে হলো সে বেন বাড়ীতে বসে আছে। সময় অবিশ্রান্তরকম দ্রুততালে চলে বাচ্ছিলো। ওদের কতকিছু বে ওকে বলতে হলো। রাশিয়া সবছে, রাশিয়ার জলবায়ু, রাশিয়ার সমাজ, রাশিয়ার কৃষক এবং বিশেষ করে কসাকদের সবছে, তার পর, ১৮১২ সালের যুদ্ধ, পিটার দি গ্রেট, জেমলিন রাশিয়ার গান, পির্জার ঘটনা। ছ'জন মহিলাই রাশিয়া এক সীমাহীন ও সুন্দর বিস্তৃত দেশ এ ছাড়া আর কিছু জানতেন না। মেডেম রসেলী—তাকে লোকে সাধারণতঃ ফ্রাউ লেনোর বলে ডাকতো—সানিনকে অস্বাক করে দিলেন জিজ্ঞেস করে—বিগত শতাব্দীতে পিটার্সবুর্গে যে বিখ্যাত বরফের বাড়ীটি তৈরী হয়েছিলো সেটা কি এখনও আছে। তার স্বামীর একটি বই 'শিল্পকলায় সৌন্দর্য্য'তে একটি প্রবন্ধ তিনি সম্প্রতি পড়েছেন তাতে এর এক অতি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। সানিন যখন আশ্চর্য্য স্বরে বললো—আপনি কি ভাবেন রাশিয়াতে গ্রীষ্মকাল হয় না? তখন ফ্রাউ লেনোর স্বীকার করলেন তিনি রাশিয়াকে চির তুষারের দেশ বলে চিন্তাকাল মনে করে এসেছেন। সেখানে সবাই সারা বছর কারকোট পরে, সব পুরুষ সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সবাই খুব অতিথিপরিারণ আর কৃষকরা খুব শান্ত প্রকৃতির। সানিন বখাসাধ্য খাঁটি ধবর দিতে চেষ্টা করলো মা ও মেয়েকে। যখন রাশিয়ান গানের কথা উঠলো, শুধন তাকে একটি রাশিয়ান গান গাইতে বলা হলো। তখন তার মস্তক পড়লো, ঘরের এক কোণে একটা ছোট পিয়ানো আছে, তার সাদা চাবিগুলো কালো আর কালোগুলো সাদা। বেশী জোরাজুরি করার আগেই সে গাইতে লাগলো পিয়ানো বাজিয়ে ডান হাতের ছুটো আঙ্গুল ও বাঁ হাতের তিনটে আঙ্গুল দিয়ে (বৃদ্ধা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা দিয়ে)। উঁচু দরাজ গলার গাইলো প্রথমে সে 'লাল সারাকান' ও তার পর 'বাঁধানো পথের ওপর দিয়ে।' মেয়েরা তার স্বরের ও গানের প্রশংসা করলেন, তার চেয়ে বেশী প্রশংসা করলেন অতি কোমল ও হৃদয়ঙ্গর রাশিয়ান ভাষার, কথাগুলোর অর্থ জানতে চাইলেন। সানিন তাদের ইচ্ছে পূর্ণ করলো, কিন্তু 'লাল সারাকান' ও তার চেয়ে বেশী 'বাঁধানো পথের উপর দিয়ে' এর কথাগুলো এতই গামাত্ত কবিত্বপূর্ণ ছিলো যে তার মনে হলো রাশিয়ান কবিতার অতি সুবিচার হয়নি। তাই সে প্রথমে আবৃত্তি, পরে অল্পবাদ

ও শেষে গাইলো পুশকিনের গ্রিকোকৃত স্বরলিপি 'বর্গীর আনন্দে'র চিরস্মরণীয় মুহূর্তটি। এবারে মহিলারা গানটি উপভোগ করলেন সত্যি সত্যিই—ফ্রাউ লেনোর আবিষ্কারই করে যেমন রাশিয়ান ও ইটালীয়ান ভাষার মধ্যে অতি নিকট সাদৃশ্য। পুশকিন (তিনি এই নামটি উচ্চারণ করলেন পুসকিন) ও গ্রিকা এই দু'টো নাম তার অতি পরিচিত বলে বোধ হলো। এবারে সানিনকে ও অল্পবাদ করতে হলো মেয়েদের গাইবার জন্ত ও তারাও আর কথা না বাড়িয়ে রাজি হয়ে গেলেন। ফ্রাউ লেনোর পিয়ানো বাজালেন ও তিনি ও জেন্মা কয়েকটি গান গাইলেন, মা এককালে খুব সুন্দর নীচু পর্দার গাইতেন মনে হলো ও মেয়েটির গলা যদিও খুব জোরালো ছিলো না তবু বেশ মিষ্টি লাগলো সানিনের।

৬

কিন্তু সানিনের যত না জেন্মার কণ্ঠস্বর ভালো লাগলো, তার চেয়ে তের বেশী ভালো লাগলো জেন্মাকে। ওদের একটু পেছনে একপাশে বসেছিলো সানিন, নিজের মনে বলছিলো কোনো পাম গাছ এমনকি তখনকার দিনের নামী কবি বেনে দিকতত্ত লিখিত কবিতাতেও মেয়েটির লালিত্যময় তবী চেহারার তুলনা মেলে না। যখন সে গানের কোনো বঙ্গল জায়গা গাইতে গাইতে ছাদের দিকে চাইছিলো তার মনে হচ্ছিলো স্বর্গ পর্য্যন্ত এই দৃষ্টিতে বিচলিতে বোধ না করে পারে না। বৃড়ো পাটালেওন দরজার পাশায় ঠেসান দিয়ে বসেছিলো। তার চিবুক ও যুগের প্রায় সবটাই চওড়া গলা বন্ধে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো, গানের সময়দ্বারের মত গভীর হয়ে শুনছিলো, এমনকি সে পর্য্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলো যখন সে মেয়েটির সুন্দর যুগের দিকে চেয়ে দেখছিলো যদিও নিশ্চয়ই সে এই দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত ছিলো, ফ্রাউ লেনোর যখন গান শেষ করলেন বললেন এমিলের কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর, খাঁটি রূপোর, কিন্তু এখন তার বয়ঃসন্ধিতে স্বর পরিবর্তন হচ্ছে (সত্যিই সে ডাক্তার গলার কথা বলছিলো) ও তার গান গাওয়া বারণ। কিন্তু অতিথির সম্মানার্থে পাটালেওন অতীতের কথা স্মরণ করে যদি এখন গান গায় তো কেমন হয়? তখনই পাটালেওনের মুখে জেখা দিলো অসন্তোষের ছায়া, সে তুচ্ছ কৌটুকালো, চুলের ভেতর আঙ্গুল চালানো, বললো সে অনেকদিন এসব ছেড়ে দিয়েছে যদিও তরুণ বয়সে সে বেশ নাম করেছিলো, তা ছাড়া সে হচ্ছে সেই মহৎ যুগের লোক যখন সত্যিকারের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিস্তারিত ছিলো, এই যুগের চেঁচামেচির সঙ্গে যার তুলনাই চলে না, সে হচ্ছে সে যুগের লোক যখন সত্যিকারের গানের চর্চা ছিলো। মডেনাতে একবার তাকে, ভারিসির পাটালেওন সিন্নাটোলাকে ফুলের মালা উপহার দেওয়া হয়েছিলো যে সময় থিয়েটার থেকে খেত ডাক পাখী ছাড়া হয়েছিলো। টারবুগির রাজকুমার সেও একজন রাশিয়ান, তার খুব বড় বন্ধু ছিলো, সে তাকে অনেকবার সারাহু ভোজনের সময় রাশিয়াতে যেতে নেমস্তন্ন করেছে বলেছে সোনার পাহাড় দেবে তাকে, পাহাড়। কিন্তু ইটালীকে ছেড়ে যেতে হবে, দাঁতের দেশকে ছেড়ে যেতে হবে, এ চিন্তাটা তার অসহ ছিলো। পরে অবশ্য অনেক হুর্দটনা ঘটছে, সে বখেট সাবধানী ছিলো না। বৃড়ো এই বলে আর বলতে পারলো না। চোখের পাতা নীচে নামিয়ে দিলো, দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো জোরে জোরে। আবার সে প্রাচীন যুগের গানের কথা

বলতে লাগলো, উঁচু দরাজ কঠোর অধিকারী পার্শ্বীর কথা বার প্রতি তার ছিলো অপরিণীত শ্রদ্ধা।

সে বলে উঠলো এই একটি লোক ছিলো বটে। মহামানব পার্শ্বী কখনও আজকালকার বাজে উঁচু গলার গাইয়েদের মত নিকৃষ্ট গান গায়নি। বুড়ো তার শিবিলায় বৃষ্টি নিয়ে আমার হাতের ঘূষি নিয়ে বললো কি অভিনেতা ছিলো সে। একটা আগ্নেয়গিরি, একটা আগ্নেয়গিরি ছিলো সে, সে ছিলো ভিনুবিয়াস। ওখেলোতে আমার তার সঙ্গে গাইবার সুখ ও সম্মান হয়েছিলো, মহাশয় রসিনির লেখা গীতি নাট্য ওখেলো। পার্শ্বী গাইছিলো ওখেলোর গান, আমি ইরানোর, বখন সে এই কথাগুলোয় এলো এই বলে পাণ্টালেওন নাটকীয় ভঙ্গীতে তাজা ও কাঁপা কিন্তু তবু মর্মস্পর্শী গলার গাইতে লাগলো।

‘বদি ভাগ্যে থাকে তবে তাই হোক
ভীত হইনি আমি।’

সমস্ত বাড়ী কাঁপতে লাগলো। কিন্তু আমি হির রইলাম ও তার পরে গাইলাম

‘বদি ভাগ্যে থাকে তবে তাই হোক—
তর করি না।’

হঠাৎ সে বাধ বা বিছাড়ের মত কেটে পড়লো

—‘ঘুর—কি আমার প্রতিহিংসা’—

কিবা বখন সে বিখ্যাত ছোট গানটি ‘বিবাহ রহস্য পূর্বরাগ’ গাইছিলো, বখন সে এই কথাগুলি গাইছিলো ‘ষোড়া ছুটে যাচ্ছে’ তখন বদি তোমরা শুনতে, মহামানব পার্শ্বীকে অবিশ্রান্ত একটানা অমুসরণ গাইতে—কি অমুত সুল্লর, কি চমৎকার, কি বিস্ময়কর—সে—ভীষণ উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক প্রশংসা করে গান গেয়ে গেলো তার কিন্তু ন’টা কি দশটা পদ পাওয়ার পর সে গলা পরিষ্কার করে হাত নেড়ে একপাশ হয়ে বসলো ও ঘূষেরে বললো, কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দাও? জেন্মা তকুনি হাততালি দিয়ে, চেয়ার ছেড়ে লাকিয়ে উঠে দৌড়ে গেলো ‘সাবাস, সাবাস’ বলতে বলতে। সম্মুখে অনেক দিন আগেই অবসরপ্রাপ্ত ইরানোর কাঁধে হাত চাপড়াতে লাগলো হু’ হাতে। কেবল এমিল নিষ্ঠুরের মত হাসছিলো। কিন্তু অনেক দিন আগেই যে লা কঁটে লিখে গেছেন : এই বয়স করণা করতে জানে না।

সানিন এই বৃদ্ধ গায়ককে সাহসনা দিতে চেষ্টা করলো। ইটালীয়ান ভাবার কথা বলতে আরম্ভ করলো (ভ্রমণকালে সে একটু আধটু শিখেছিলো) বলতে লাগলো—দাত্তের দেশ বেখানে আছে সত্যিকারের গান এই পদটি ও ‘সব আশা পরিত্যাগ করে’ এই কথাটি—ইটালীয় কবিতার জ্ঞান এই নবীন দেশভ্রমণকারীর এইটুকুই ছিলো। কিন্তু পাণ্টালেওন তার উৎসাহে উৎসাহ পেলো না। চিবুকটি আরো বেশী গলাবন্ধে চুকিয়ে দিয়ে করণ নরনে চেয়ে থাকতে আরো বেশী পাখীর মত দেখাচ্ছিলো, দেখাচ্ছিলো একটা রাগী পাখী একটা পাড়কাক বা চিল। এবারে এমিল আছরে হেলের মত লজ্জার আরম্ভরূখে বললো তার বোনের দিকে চেয়ে—বদি সে অতিথিকে ধূসী করতে চায় তবে সে মাল্ৎসের হাত-কৌতুকগুলো বদি পড়ে তাহলে খুব ভালো হয়, সে ওগুলো এত ভালো পড়ে। জেন্মা হেসে

তার ভাইএর হাত চাপড়ালো, বললো, ‘তুমি হচ্ছে একটা ভাঁড়।’ বদিও তখনই সে তার ঘরে গিয়ে একটি ছোট বই নিয়ে এলো, আলোর পাশে টেবিলে বসলো, সকলের দিকে তর্কনী উঁচু করে চাইলো বেন বলতে চাইলো : ‘দয়া করে সবাই চূপ করো।’ এটা হচ্ছে একটা ইটালীয়ান কার্যনা। সে পড়তে শুরু করলো।

৭

মাল্ৎস ছিলেন একজন লেখক। ফ্রান্সিসকোর্টে ১৮শ শতকের ৩০ দশকে বাস করতেন। স্থানীয় উপভাষার, স্থানীয় লোকদের নিয়ে কৌতুকপূর্ণ মজার নক্সা লিখতেন। সেগুলো হরত খুব উঁচু দরের ছিলো না কিন্তু বেশ বরফেরে ও হাসির ছিলো। দেখা গেলো জেন্মা সত্যিই খুব ভালো পড়তে পারে, পেশাদার অভিনেত্রীর মত। সে প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুললো চমৎকার ভাবে, ইটালীয়ান যন্ত্রের সঙ্গে সে যে অমুকরণ করার ক্ষমতাটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলো তা কাজে লাগালো নিখুঁত ভাবে। বখন আধপাগলী কুৎসিত বুড়ী কিংবা হাঁকা মেয়েরের কথার আসতো, সে তার মিষ্টি স্বর ও সুল্লর চেহারাকে বিকৃত করে, হাস্যকর করে, চোখ উপরে তুলে নাক কুঁচকে, আটকে আটকে আড়ষ্ট হয়ে কথা বলে, তারঘরে গান গেয়ে তাদের নকল করতো। বখন পড়তো সে নিজে কখনো হাসতো না। কিন্তু বখন তার সব প্রোভারাই (বলতে গেলে সবাই এক পাণ্টালেওন ছাড়া, কারণ বখনই সেই পাজী জায়াপটার কথা উঠেছে তখনই সে আসর ছেড়ে উঠে গেছে) অটহাস্তে তার পড়ার বাধা দিতো, তখন সে বইটা হাঁটুর ওপরে কেলে দিয়ে, চেয়ারে হেলান দিয়ে, বসে হাসতে থাকতো। তার কালো চুলগুলো ছোট ছোট আঁটির মত পাকিয়ে পাকিয়ে তার গলা ও কল্পমান ঘাড়ের উপর নাচতো। বখন হাসির হরোড় খেয়ে যেতে, সে আবার বইটি নিয়ে বধাবধ ঘূষের ভাব করে পড়ীর ভাবে পড়ে যেতো। সানিন জেন্মাকে দেখে, জেন্মার প্রশংসার সব তুলে গেলো তার বিস্ময় বোধ হলো কি করে এই অপূর্ব সুল্লর চেহারা এত হাস্যকর ও মাঝে মাঝে এত সাধারণ চেহারা এত সহজে নিতে পারে। যেখানে তরুণী মেয়েদের কথা ছিলো তথাকথিত তরী কিশোরীদের জেন্মা সেখানে অতটা ভালো করতে পারছিলো না। আর একেবারেই পারছিলো না প্রশংসাদৃগুগুলো। সে নিজেও তা বুঝতে পারছিলো ও সেসময় এই দৃগুগুলো একটু ব্যঙ্গের ছায়া নিয়ে পড়ে বাচ্ছিলো, বেন মনে হচ্ছিলো এই সব গড়ীর প্রতিজ্ঞাগুলো ও বড় বড় কথাগুলো সে বিশ্বাস করছিলো না, উপরন্তু লেখকও এ সব দৃশ্য খুব অন্নই লিখেছিলেন।

কি করে যে সারা সন্ধ্যা কেটে বাচ্ছিলো সানিন লক্ষ্যই করে নি। বড়িতে বখন দশটা বাজলো তখন তার যাত্রার কথা মনে পড়লো। বেন কোনো কিছু কামড়েছে এরকম ভাবে সে লাকিয়ে উঠলো।

ফ্রাউ লেনোর জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ?

আমাকে আজ বার্লিন যেতে হবে—পাড়ীতে গিটের জন্ত আগেই অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।

পাড়ী কখন ছাড়বে ?

সাড়ে দশটার

জেন্মা বললো—তাহলে আপনার দেহী হয়ে গেছে। থেকে বান না, আমি আরো পড়ব।

ফ্রাউ লেনোর জানতে চাইলেন—তাদের সব টাকা দেওয়া হয়েছে না কেবলমাত্র ডিপোজিট ?

সানিন জোবের সঙ্গে কাতর ভাবে বললো—সব। জেন্মা তার চোখ ছোট ছোট করে সানিনের দিকে চেয়ে হেসে ফেললো। তার মা বকলেন তাকে।

জেন্মা এক মিহিমিহি এতগুলো টাকা নষ্ট করলেন আর তুমি হাসতে !

জেন্মা বললো—কুহ পয়সা নেই। এতে তিনি সর্বস্বত্ব হবেন না আমরা তাকে সাহায্য দিতে চেষ্টা করবো। আরো একটু লেমোনেড নিন।

সানিন এক গ্রাস লেমোনেড পান করলো ও জেন্মা মাল্ংস পড়তে লাগলো। সব কিছুই আগের মত ফুর্টিতে চললো।

যড়িত্ত বারোটা বাজলো। সানিন বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালে জেন্মা বললো, ফ্রাঙ্কফোর্টে আপনাকে আরো কয়েকদিন থাকতে হবে। আপনাকে এতো তাড়াহড়ো করতে হবে না। অল্প কোনো সহরে আপনার এত ভালো লাগবে না। সে খেমে আবার বললো—সত্যি আর কোথাও নয়।

সানিন উত্তর দিলো না। সে জানতো ভালো লাগুক বা না লাগুক তার শূন্য পকেটই তাকে ফ্রাঙ্কফোর্টে আটকে রাখবে। তার বন্ধুর কাছে বার চেষ্টা লিখে উত্তর আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

ফ্রাউ লেনোর বললেন, হ্যাঁ, থেকে বান। জেন্মার ভাবী স্বামী হের কাল রুয়বারের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ফ্রাঙ্কফোর্টের বড় রাস্তা সাইলে সহরের সবচেয়ে বড় কাপড় চোপড়, পোষাক পরিচ্ছদ ও সিকের দোকান। সে হচ্ছে তার কর্তা। সে কিন্তু খুব খুশী হবে আপনার সঙ্গে পরিচয় করে। ভগবান জানেন কেন এই খবরটি সানিনকে খুশী

করতে পারলো না। তার মনে বিদ্রোহের মত খেলে গেছে। ভাগ্যবান পুরুষ। জেন্মার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো সে বেন তার চোখে বিক্রমের হাসি দেখতে পেলো। সে বিদায় নিলো এবারে।

কাল পর্যন্ত ? কাল আসছেন তো, না ? ফ্রাউ লেনোর জিজ্ঞেস করলেন।

জেন্মা প্রম্বোধক হয়ে নয়, সোজানুজি বললো, আচ্ছা, কাল দেখা হবে। বেন এর অল্পখা হতে পারে না।

সানিনও উত্তর দিলো হ্যাঁ, কাল।

এমিল, পাটালেওন ও টাটালিয়া বলে কুকুটি মোড় পর্যন্ত দিয়ে গেলো। পাটালেওন জেন্মার ওইগুলো পড়ার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ না করে থাকতে পারলো না।

তার লজ্জা বোধ করা উচিত। মুখ ভেঁচানো আর চেঁচানো সব ভাঁড়ামি। মেয়োপ বা ক্লিটেমেনেট্টা অভিনয় করা উচিত তার—বা সত্যিই মহৎ ও করুণ, তার জায়গায় অতি বাজে জার্মানের অক্ষরকণ করে আনন্দ পায় সে। আঙ্গুসগুলো ছড়িয়ে চিবুক বের করে ভাঙ্গা গলায় বললো, আমি পর্যন্ত করতে পারি এসব মের্তস, কের্তস, শ্বের্তস।

টাটালিয়া এই অদ্ভুত শব্দগুলো শুনে ডেকে উঠলো ও এমিল জোরে জোরে হাসতে লাগলো। বুড়ো হঠাৎ ঘুরে ফিরে গেলো সানিন 'শ্বেত রাজহংসী'তে ফিরে এলো (সে তার জিনিষগুলো ওখানে ফেলে গিয়েছিলো)। সে পরিষ্কার কিছু ভাবতে পারছিলো না। তার কানে বাজছিলো জার্মান-করাসী-ইটালীয়ানে সব আলোচনা।

হোটেলের একটা সত্তা ঘরে শুয়ে সে নিজেকে বললো 'ভাবীস্বামী।' কিন্তু কি রপসী। আচ্ছা, আমি কেন ঘরে গেলাম ?

বাই হোক, পরদিন সে তার বালিনের বন্ধুকে একখানা চিঠি লিখে দিলো। [ক্রমশঃ]

অনুবাদিকা—আশা দাস

এসো মৃত্যু এসো

(সেক্সপীরের Come away Come away Death

কবিতার অনুবাদ)

এসো মৃত্যু এসো তুমি
আমারে করো আলিঙ্গন
তোমার কঠিন হাতে
ধরাশিত হোক তবে বিদায়ের ক্ষণ।

আমার এ সমাধি শুভে দিয়ে নাকো ফুল
ব্যথাহত নয়নের জল নাহি চাই,
শুভ চাহরে ঢাকা এ জীর্ণদেহে
গেয়ে বেতে দাও শুধু জীবনের ফুল।

খোলা এই আকাশের তলে মৃত্তির আবাদ,
জীবনের স্বপ্ন শেষে
এই শুধু মোর মনসাধ।

অনুবাদ : সত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাষ্য

মিখাইল শোলোকভ

যুদ্ধের বা শুকোতে না শুকোতেই আবার ডন নদীর হুকুল
ছাপিয়ে প্রথম বসন্তের আভাস ফুটে উঠলো বীরে বীরে। মার্চ
মাস এর শেষদিকেই আজন্ত সাগরের গরম বাতাস উঠলো, বাতাসের
সঙ্গে উড়ে আসছে নদীর বালিকণা। বরফে ঢাকা পাহাড়ী নদী-
নালা, পথ-ঘাট সব একাকার হয়ে গেছে—যেন বক্রকে রূপের
পাতে মোড়া বিরাট এক প্রান্তর। গরমে বরফ গলতে আরম্ভ
করেছে, স্রোত ছুটছে। বাতাসের পথ প্রায় বন্ধ।

বছরের এই বিলম্বী সময়টোতেই আমার সেবার একটা বিশেষ
কাজে বুকানোভস্কার জেলা শহরে যেতে হলো। খুব বেশীদূরের পথ
নয় মাত্র বাট কিলোমিটার। কিন্তু এই বাট কিলোমিটার পথ পার
হওয়া বিশেষ করে এইসময় ভয়ানক কষ্টসাধ্য। আমার এক
বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সূর্য উঠবার আগেই আমরা রওনা হলাম।
তাগড়া তাগড়া ছোটো ছোটো বোড়াও রীতিমত কাহিল হয়ে পড়লো
আমাদের গাড়ীখানা টানতে টানতে। গাড়ীর ঢাকা কেবল বসে
বাঁকে বালি আর নরম বরফে ঢাকা রাস্তার। ঘটাখানেকের
মধ্যেই দেখা গেলো বোড়া ছোটোর মুখ দিয়ে সাদা সাদা গাঁজলা
উঠছে ক্লাস্তিতে। লাগামের চামড়া দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে মাটিতে
পড়ছে গাঁজলা। ডোরের নির্ভল বাতাস বোড়ার ঘাম আর চামড়ার
জ্যাপসা গন্ধ ভারী হয়ে উঠলো।

আমাদের গন্তব্যস্থান পর্যন্ত বোড়াগুলো আর কোন মতেই
যেতে পারবে না বুঝতে পেয়ে আমরা গাড়ী ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে
শুরু করলাম। ভারী বুট কেবল বসে বাঁকে কাদায়। পা টেনে
তুলতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। পাশেই পড়ে আছে রূপের পাতে
মোড়া রাস্তা। কিন্তু সে পথ সাক্ষাৎ বন্ধ। ছোটো একটা
নদী ইলাকা, মাত্র তিরিশ কিলোমিটার, পার হতেই আমাদের প্রায়
ছ'ঘণ্টা সময় চলে গেল।

মকোভস্কাগ্রামের এই কীর্ণ মদী গরমকালে শুকনোই থাকে
কিন্তু এখন এর রূপ ভয়াবহ। দু কাপায় সমান হয়ে বইছে।
মাঝে মাঝে জাসিরে দিচ্ছে দু তীরকে। বাসগুলো সব কাদায়
লেপ্টে আছে। একখানা চ্যাপ্টা মত ফুটো নৌকার আমাদের
নদীটা পার হতে হবে। নৌকাটার আবার একসঙ্গে তিনজনের
বেশী লোক পার হওয়া বাবে না। বাধ্য হয়ে আমরা বোড়া ছোটোকে
কেরং পাঠালাম। শুনলাম শীত কাল থেকেই একখানা পুরাণো
ঝরঝরে জীপগাড়ী ওপারে বোধ ধামারে পড়ে আছে। আমরা
সেটা নিয়ে যেতে পারবো। নৌকার মাঝিটার সঙ্গে ছুচারটে কথা
কথাম্বর করে সেই ভাঙা নৌকার উঠে বসলাম। বন্ধুটি নদীর ধারে
আমাদের মালপত্রের পাহারায় বইলো। নৌকার ফুটো দিয়ে
হরদম জল চুকছে আমরা সেই জল তুলে কেলতে কেলতে অগ্রসর
হলাম। কোনরকমে জল কেটে কেটে নৌকাখানা এপারে এসে
জিড়লো ঘণ্টা খানেক পর। মাঝি ধামার থেকে জীপখানা

নিয়ে এলো। নৌকার পাঁড়খানা হাতে তুলতে তুলতে আমার
বললো : ফুটো দিয়ে জল চুকে নৌকাখানা যদি না ডুবে যায়
তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হলেও আপনার বন্ধুকে নিয়ে ফিরতে ঘণ্টা
তুয়েক হবে।

এপারের গ্রামখানা নদীর ধার থেকে বেশ কিছুটা দূরে।
সমস্তটাই জলমগ্ন কোন প্রান্তর যেন। শরৎকাল কিংবা প্রথম
বসন্তকালের মতই তার অবস্থা। ঘাস লতা পাতার পচা গন্ধ
বাতাসটা পর্বস্ত ভারী হয়ে উঠেছে।

জলের ধারে একটা কফির বেড়া। সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা
হওয়ার আমি সেই বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে পাড়লাম। কিন্তু
জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়েই মনটা আমার হতাশায় ভরে
উঠলো। সিগারেটের প্যাকেটটা জলে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।
রাস্তা পার হওয়ার সময় আমার গায়ে জলের ঢেউ লেগেছে তখনও
তার দাগ জমা প্যাটে প্যাটে। সে সময় সিগারেটের কথাটা
খোঁজলে হয়তো ওগুলো বাঁচাতে পারতাম কিন্তু নৌকার হাল
নিয়ে আমি রীতিমত হিমসিম খাছি—অন্ত কোন দিকে মন দেবার
মত অবস্থা ছিল না। বত তাড়াতাড়ি পার হওয়া যায় সেই
চিন্তাতেই বাস্তব কোন সময় জল উঠে নৌকাটা উঠে যেতে
পারে। এখন কিন্তু নিজের অসাবধানতার জন্যে নিজের উপরই
ভয়ানক বিরক্তি এলো। তেজা প্যাকেটটাই পকেট থেকে টেনে
বের করলাম। ধরেনী রংএর সিগারেটগুলো একটা একটা করে
মেনে দিলাম বেড়ার গায়ে।

বেলা প্রায় দুপুর হতে চললো। সূর্যের তেজ মে মাসের মতই
প্রখর। তাবলাম, সিগারেটগুলো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে বাবে নিশ্চয়।
গরম লাগছে খুব। এই মিলিটারী ভারী পোষাক আর
জ্যাকেটগুলোতে আরও অবস্থি লাগছে। মনে হলো আজই বুঝি
এ বছরের সবচেয়ে গরম দিন। এই নির্জন স্থানে এভাবে পাঁড়িয়ে
থাকতে বেশ ভালো লাগছে আমার। পুরানো ওসাক সৈন্যবাহিনী
পিছনে পড়ে আছে। আমি পাঁড় টেনে ক্লাস্ত হয়ে বিগ্রাম করছি
এখানে। ভিজে বাওয়া চুলগুলো শুকোচ্ছে হাওয়ার। উনাসভাবে
চেরে আছি কিক নীল আকাশের বৃকে ভেসে বাওয়া হালকা মেঘের
টুকরোগুলোর নিকে।

হঠাৎ নজরে পড়লো গ্রামের শেষ প্রান্তের একটা কুঁড়ে থেকে
একজন লোক বের হয়ে রাস্তার নামলো। মনে হলো লোকটার
পিছনে বছর পাঁচ ছয়কের একটা শিশু আছে। অস্ত কিছু বোঝা গেল
না এত দূর থেকে। ওরা ক্লাস্তভাবে পার ঘাটার দিকে যেতে যেতে
জীপগাড়ীটার কাছ থেকে আমার দিকেই এগোতে আরম্ভ করলো।
দেখলাম লোকটা অস্বাভাবিক লম্বা হওয়ার কলে সামনের দিকে বুক
চলে। সোজা আমার কাছে এসে ঘড়ঘড়ে পলার সন্ধান জানালো
—স্বাগতম বন্ধু।

—সাগতম্। আমি ওর প্রসারিত শির ওঠা শক্ত হাতটা ধরে বাঁকি দিলাম। সন্দের বাচ্চাটাকে নীচু হয়ে আদেশ দিল— কাকাকে নমস্কার কর। দেখছো না ও ঠিক তোমার বাপের মতই একজন ডাইভার। তোমাকে আমি চালাই আর ও চালায় ওই দেখ ওই ছোট গাড়ীখানা।

মেঘমুক্ত নীল আকাশের মত বিশাল একজোড়া চোখ মেলে শিশুটি সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলো। ছোট একখানা লাল নরম হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমিও খুব বন্ধু করে ওর হাতটি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে একটু বাঁকি দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম! তারপর তোমার কি রকম ঠাণ্ডা লাগছে হে বুড়ো কত্তা? আজকের মত এত গরমেও তোমার হাত এরকম ঠাণ্ডা কেন বলতো?

শিশুটি আমার প্রশ্নে তার শিশুসুলভ সবল বিশ্বাসে আমার কোলের কাছে এগিয়ে এসে তার ঈর্ষ হৃদয়ে ক্র কুঁচকে অবাধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর বললো— কাকা, আমি তো বুড়ো নই—ছেলেমানুষ। আমার হাতে ঠাণ্ডা লাগেনি মোটেই। আমি এতক্ষণ বরফের গোলা পাকাচ্ছিলাম বলেই এত ঠাণ্ডা লাগছে হাতটা।

শিঠ থেকে একটা আধখালি বস্তা নামিয়ে লোকটি আমার পাশে চেপে বসলো। বললে—বুঝলেন দোস্ত, আমার এই বাচ্চা সজীতি একটি ছোটখাট বস্তাট বসতে পারেন। ও নিজে তো ক্লাস্ত হইবেই আর সেই সঙ্গে আমাকেও ক্লাস্ত করে ছাড়বে। যদি একটু লম্বা লম্বা পা কেলে তাড়াতাড়ি চলবার চেষ্টা করবো অমনি ছোঁড়াটা একেবারে আন্তে আন্তে চলতে আরম্ভ করে দেবে। তখন ওর তালে ভাল বেওয়া ছাড়া আর কি উপায় থাকে বলুন? যেখানে আমি এক পদক্ষেপে যেতে পারি ওর জেই শুধু সেইটুকু যেতেই দশ ধারো পদক্ষেপ লাগে। এই ভাবে সেইঃগয়ে পড়া ছোড়া আর কাছিমের মত চলতে হয় আমাদের দুজনকে। এর পরেও ওকে সামলাবার জেই পিছন দিকে ছোটো চোখ থাকে দরকার। পিছন কিরছেন কি অমনি হয় কোন নালায় ধারে বসে তার নিরে খেলা আরম্ভ করবে যা হয় বরফ কুড়িয়ে বাতাসার মত চুষতে থাকবে। ওর মত ছেলেকে সঙ্গে করে কারোও কোথাও বাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে পদত্বজে তো কখনই না। কিছুক্ষণের জেই লোকটা খামলো। তারপর আমার প্রশ্ন করলো আপনার কি ধবর বলুন দোস্ত, আপনার অধিনায়কের জেই অপেক্ষা করছেন বুঝি?

আমি যে মোটেই ডাইভার নই লেকথা ওকে এখন বলতে ইচ্ছা হলো না। তাই বললাম—দেখতেই তো পাচ্ছেন।

: উনি কি অস্ত্র রাস্তা দিয়ে আসছেন।

: তাই হয়তো হবে।

: নৌকোটা কতক্ষণে এপারে কিরবে বলতে পারেন?

: ঘণ্টা দুয়েক হবে।

: ওহো—তা হলে তো অনেক দেরী আছে। তবে এখন বেশ খানিকটা জিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আমারও এমন বিশেষ কোন ভাড়া নেই। রাস্তার নেমে দূর থেকে আপনাকে দেখে ভাবলাম হয়তো আমাদেরই মত কোন ডাইভার এখানে বসে বসে বোদ পোয়াকে। বাই একসঙ্গে বসে একটু ধূমপান করে আসি। বুঝলেন,

একা একা ধূমপান করতে আমার মোটেই ভালো লাগে না। কোন আনন্দ পাই না। একলা কিছু করতে। তবে বৃত্ত্যর আনন্দটা একা ছাড়া আর কে ভোগ করবে? তা, আপনি তো দেখছি বেশ ভালোই আছেন। ধূমপান করছেন? আহা-হা! সব যে একেবারে ভিজে অবজবে হয়ে গেছে। ইস। ডাক্তারদের ছোড়া আর ভিজে সিগারেট সমান একেজো। আচ্ছা তাই, দেখি আমার এই ছোঁড়া জামাটার পকেটগুলো খুঁজে যদি কিছু পাওয়া যায়।

লোকটা ওর মোটা খাঁকী প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা সিগের জীর্ণ তামাক রাখা থলে বের করলো। দেখলাম থলেটার এক কোণে এমতরভারী করে লেখা রয়েছে, একজন প্রিয় সৈনিককে লেবোঁরয়াক্তা মাধ্যমিক বিজ্ঞালয়ের এক ছাত্রের শ্রীতি উপহার। আমরা তারপর নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগলাম। আমি ভাবছিলাম ওকে জিজ্ঞাসা করবো যে এই দুর্গর পথে ওই বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে কেন বেরিয়েছে? কিন্তু তার আগেই ও আমার প্রশ্ন করে বসলো। —আপনি কি এই যুদ্ধের প্রথম থেকেই কাজ করছেন?

: প্রায় গোড়ার থেকেই বলতে পারেন

: সীমান্তে?

: হ্যা। সীমান্তে।

: আমি কিন্তু এখানে ভয়ানক কষ্ট পেয়েছি।

লোকটি ওর কালে কালো বিশাল হাত দুখানাকে হাঁটুর ওপর রেখে কাঁধটা নামিয়ে ক্লাস্ত ভাবে বসলো। আমি একবার আড়চোখে ওর দিকে চেয়েই চমকে উঠলাম। আচ্ছ, আপনি কি কখনও এমন কোন চোখ দেখেছেন যে চোখ দেখে মনে হবে কেউ বেন চোখ দুটোর ওপর একমুঠা ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে? দাক্ষণ উৎকর্ষা আর নৈরাতে হয়ে আছে ছোটো চোখ। জীবনে এই প্রথম আমি ওই রকম এক জোড়া চোখ দেখলাম।

বেড়ার থেকে একটা শুকনো ডাল ভেঙে নিয়ে ও কিছুক্ষণ নেটা দিয়ে মাটিতে হিজিবিজি কাটতে লাগলো। একসময় হঠাৎ বলে উঠলো, বুঝলেন দোস্ত, অনেকদিন আমি রাস্তা একদম ধূমোতে পারতাম না। অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে কেবল ভাবতাম, এ জীবন দিয়ে দিয়ে আর কি হবে? কেন এভাবে আমি পছু হয়ে গেলাম? আমার নাড়ি কুড়ি পর্যন্ত কেন এ ভাবে টেনে ছিঁড়ে দিল। আমার এসব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি কোন সময়েই পেতামনা। না রাস্তার অন্ধকারে না সূর্যের উজল আলোর। পরমুহুর্তেই ও আশ্চর্য হয়ে হয়ে ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে বললো—বাও বাচ্চু, জলের ধারে গিয়ে খেলা করগে। কিন্তু ধবরদার পা ভিজিও না—মসে থাকে বেন।

যে সময় আমরা চূপচাপ তামাক টানছিলাম তখনই আমি বেশ খুঁটিয়ে ভালোভাবে ওদের বাপবেটাকে লক্ষ্য করেছি। একটা ব্যাপার আমার খুবই আশ্চর্য্য লেগেছে। দেখলাম ছেলেটির গায়ের পোষাকগুলো খুবই সাধারণ তবু বেশ দামী কাপড়ে মজবুত ভাবে তৈরী। ছোট ছোট ছোঁড়া কাটা ব্যাগগুলো সেলাই মনে হলো সে সব ব্যাগের মায়ের স্নেহ পরশ লেগে রয়েছে। কিন্তু বাপটির অবস্থা একেবারে উল্টো। ওর গায়ের তুলোভরা জামাটার ব্যাগের ব্যাগের পোড়াগুলো মোটা মোটা তালিমারা, খাঁকি প্যাণ্টের ছোঁড়াগুলো সব এলেমেলোভাবে সেলাই করা সবটারই কেমন যেন পুরনাসী

৮। লোকটার পায়ের মুছের জুতোজোড়া অবশ্য ঠিক নোতুনই বলা চলে কিন্তু মোজাজোড়া একেবারে শতহির, ওগুলোর ওপর কোনদিন কোন জীলোকের ছোয়া লেগেছে বলে বলে আমার মনে হয় না। ভাবলাম, লোকটা হয় বিপত্নীক না হয় ওদের স্বামিনীর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন একটা গুণগোল ঘটেছে—তা নাহলে কিছুতেই এমন অবস্থা হতে পারে না।

লোকটা মাঝখানে একবার উঠে গিয়ে জলের ধারে ছেলেটিকে দেখে এলো। তারপর একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলো। আমি ওর প্রতিটি কথার স্বীকৃতি মনোযোগ দেবার সাধ্যমত চেষ্টা করলাম।

বুঝলেন দোস্ত, আমার জীবনের আরম্ভটা খুবই সাধারণ। ১১০০ খ্রীস্টাব্দে ডেরোনেজ প্রদেশে আমার জন্ম হয়। সিভিল ওয়ারের সময় আমি লাল কোয়েব কিংকর্তৃত্ব বিভাগে কাজ করতাম। রাইশ সালের হুজিরের সময় আমি কুবানদেয় হয়ে হাঁড়ের মত লড়ছি। আর সে সময় ও ভাবে লড়াই না করলে আজ আর আমার বেঁচে থাকতে হতো না। কিন্তু সেই সর্বনাশ হুজিরে আমার দেশের বাড়ীর সকলে মানে আমার মা, বাবা, বোন সবাই না থেকে শুকিয়ে মরলো। পৃথিবীতে আমার আপনার জন্ম বলতে আর কেউ রইল না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমি একা পড়ে রইলাম। আর বছর ধানেক পরে কুবান থেকে কিয়ে দেশের বড়বাড়ী বিক্রী করে ডেরোনেজ চলে গেলাম। সেখানে প্রথমে কিছুদিন ছুতোর মিল্লীর কাজ করলাম। তারপর একটা কারখানায় মিল্লির কাজ শিখতে আরম্ভ করলাম। কিছুদিন পর শিশুসদনের একটি অনাথা মেয়েকে বিয়ে করলাম। মেয়েটি সত্যিই খুব ভালো। আমার কি ভাবে সুখী করবে সেই চিন্তাতেই সব সময় ব্যস্ত থাকতো। মেয়েটি এত চটপটে যে আমার সঙ্গে তার কোন তুলনা-ই চলে না। মনে হয়, ছোট থেকে ছুঃ-কষ্টের মধ্যে মাছুষ হয়ে ওর মনটাকে ওইভাবে গড়ে তুলেছে। পাশ থেকে দেখে মেয়েটির সৌন্দর্য ঠিক বোকা যেতোনা বলেই আমি কোন দিনই ওকে পাশ থেকে দেখিনি। সময় পেলেই আমি ওর গোটা সুখধানার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম। আমার মতে ওর মত সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না—আজ্ঞে নেই।

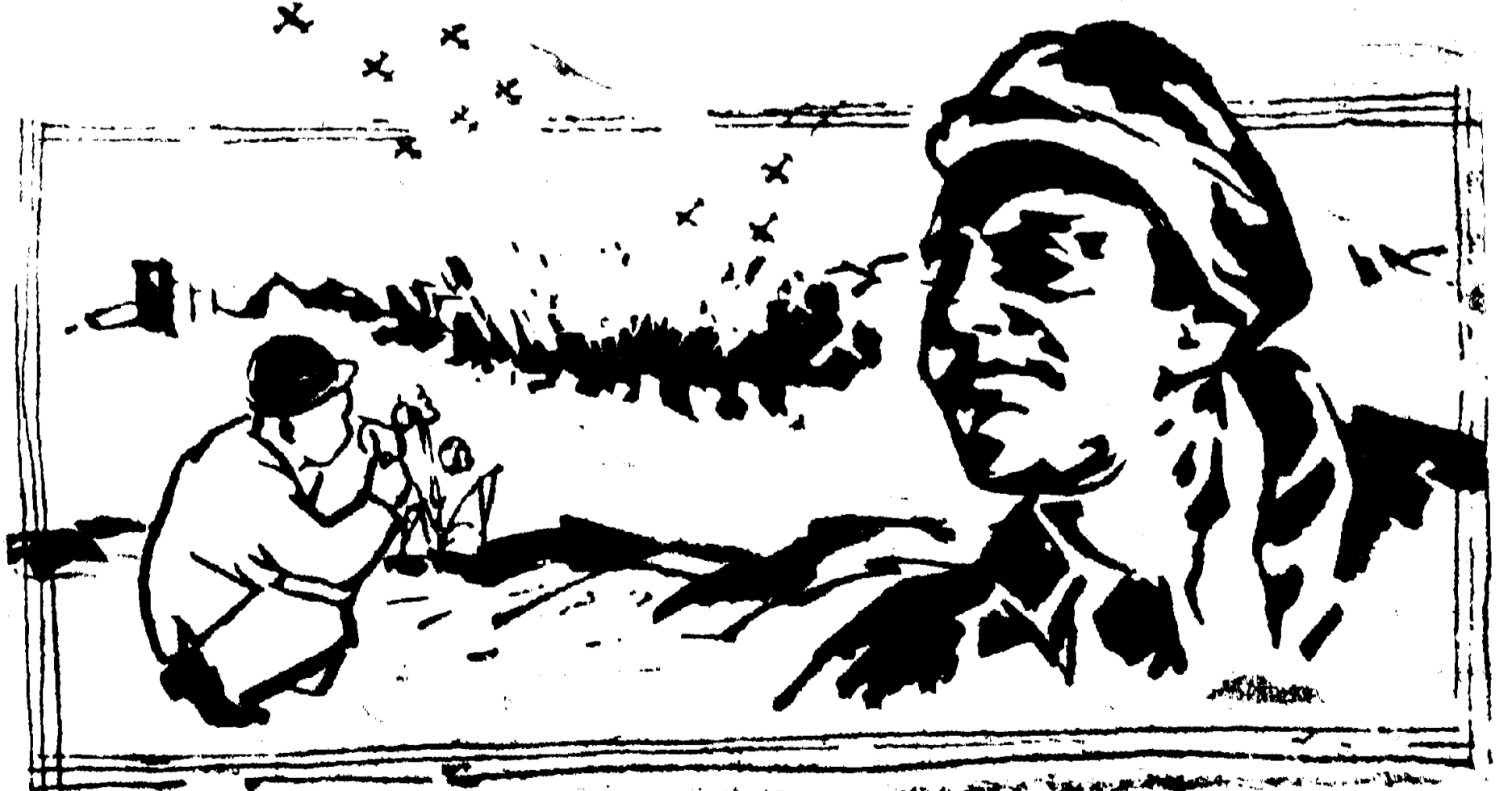
মাঝে মাঝে কাজ থেকে বাড়ী ফিরে আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, মেজাজটাও ক্লান্ত হয়ে থাকতো। কিন্তু আমার স্ত্রী কোন দিনই আমার ওপর কোন রকম ক্লান্ত ব্যবহার করেনি। সব সময় শান্তি মধুর ব্যবহারে আমার সমস্ত ক্লান্তি-দূর করে দিত। আমাকে সুস্থ করে তুলতে ও প্রাণপণ চেষ্টা করতো। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্যানক লঙ্কিত হয়ে পড়তাম। তার পর এক সময়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলতাম—প্রিয়তমা ইরিগা, সমস্ত দিন কারখানায় হাড়ভাঙা খাটুনিতে

সত্যিই উদ্যানক অর্থাৎ ইরিগা পড়েছিলেন। ও অনেকটা সহজ হতে উঠতো তার পর। কারখানায় কাজে কি রকম সাংঘাতিক পরিপ্রয় হয় জানেন তো? ওই পরিপ্রয়ের পর বাড়ী ফিরে যাওয়ার সেবা বস্ত্র বা স্নেহপত্র না পাওয়া যায় তাহলে মনের কি অবস্থা হয় বুঝতেই পারছেন?

বেতন পাওয়ার দিন মাঝে মাঝে ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে পুরো পানিশালার গিয়ে মদ খেতার প্রচুর। চলতে গেলে পা টলতো পাশের সড়ক বাস্তা ধরে একলা চলতাম। বড় বাস্তা ধরে চলতে ভা লাগতো। কখনও বা কাপড় জামার ঠিক থাকতো না। সব ধরে জড়িয়ে বৃকে হেঁটে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতাম। তখন অবশ্য আমায় কোন রকম চীৎকার গালাগাল বা শব্দ করার পর্বত কমতা থাকতে না। ইরিগা আমার এই রকম অবস্থা দেখে হেসে কেলেতো। একসময় তাব দেখাতো যে আমি মদ খেলে এ রকম মাতলামী করে কোর অভ্যাস করিনি। আমার পা থেকে জুতো বুলে দেবার সময় বীর বীরে বলতো—এস্তি, আজকের রাতটা তুমি বহু ওপানের খর গিয়ে শৌণ্ড, তা না হলে ঘুমের ঘোরে হরতো বিছানা থেকে পড়ে যাবে।

আমি খবের বস্তার মত বর্ণনা করে মাটিতে পড়তাম আর মনে হতো আমার চোখের সামনে সব কিছু সীতার কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পর বহন আমার একটু তজ্রা আসতো তখনই আমি বুঝে পায়তাম, ইরিগার স্নেহ-কোমল স্পর্শ আমার মাথায়, আর ওনার পেতার ওর সাহনাবানী। আমি জানতাম, আমার এই অবস্থা জন্মে মেয়েটা বড় আঘাত পেয়েছে।

সকালেই ও আমাকে বস্টা ছই আগে বিছানা থেকে উঠিয়ে দিবে বাইরে একটু ঘুরে আসার জন্টে। ও জানতো, মদ খাওয়ার পর আমি কিছুই মুখে দিইনা। আমার জন্টে লসা কিংবা জন্ট কোন ফল আর এক গ্লাস জন্টকা নিয়ে আসতো আগের দিনের অবসাদ দূর করতে। এই নাও এস্তি, ও রকম আর কোরো না প্রিয়তম। একজন যদি এতখানি বিশ্বাস করতে পারে তাহলে সে বিশ্বাস কি করে ভাঙা যায়? আমি নিঃশব্দে তদকার গ্লাস শেষ করতাম আর মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতাম ওকে। তার পর ওকে টেনে নিয়ে একটু আদর করে চলে যেতাম শান্ত মেঘশাবকের মত নিজের কাজে। ভেবে দেখুন দোস্ত, ও যদি আমার মাতাল হতে দেখে গালাগাল



করতো কিংবা চেঁচামেচি করতো তাহলে তো আমি হালক করে বলতে পারি যোগই আমি মাতাল হয়ে বাজী কিরতাম ঠিক। আমি ওরকম অনেক লোককে জানি, তাদের দ্বীরা অত্যন্ত ঘোরাফুর। ও আমার জানা আছে অনেক দেখেছি।

তারপর বেশ তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরে ছেলেমেয়ে আসতে আরম্ভ করলো। প্রথমে একটি ছেলে তারপর দুটি মেয়ে। আর সে সময় থেকেই আমি বন্ধুবান্ধবদের দল ছাড়লাম। সমস্ত টাকা পরসী দ্বীরা হাতে তুলে দিতাম। তখন থেকেই আমরা সত্যিকারের সুখী সংসারী হলাম। মদ খাওয়ার সময়ই পেতাম না। সমস্ত দিনের পর বড় জোর এক গ্রাস বীয়ার হয় তো খেতাম কোন কোন দিন। এই ভাবেই আমাদের জীবন বেশ চলছিল। ২১ সালে মোটরের কাজ শিখবার খেয়াল হলো। আমি মোটর চালানো শিখতে লাগলাম—আর একটা লরীতে কাজ করতে আরম্ভ করলাম। এ কাজটা বখন আমি শিখে ফেললাম তখন আর কারখানার কাজে কিরে যেতে মন চাইল না। আমি এইটাকেই আমার জীবিকা হিসাবে বেছে নিলাম। দশটা বছর যে আমাদের কোন দিক দিয়ে কি ভাবে পার হয়ে গেল, টেরও পেলাম না। যেন একটা বিয়াট সুখস্বপ্ন। কিন্তু ফেলে-আসা সেই দশটা বছরে আমি কি পেরেছি? যে কোন চল্লিশ বছর পার হয়ে যাওয়া প্রৌঢ়কে প্রশ্ন করলে দেখা যাবে এ প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর তাঁরা দিতে পারবেন না। কারণ কেউ কোনদিন চমার কালের হিসাব রাখতে চায় না। অতীত যেন সকলের কাজেই পিছনে পড়ে থাকে একটা আবছা সবুজ প্রান্তর। আজ সকালেই ওই সবুজ প্রান্তরটুকু পার হয়ে এসেছি তাড়াতাড়ি। আসবার সময় ভালোভাবে দেখে আসা হয়নি মাঠটা। অথচ এতদূর থেকে আর বুঝতে পারা যাচ্ছে না, মাঠটা ঠিকমত লাভল দেওয়া হয়েছে কিনা। দূরে ওটা কি গাছ!

ওই দশটা বছর আমি দিন-রাত যন্ত্রের মত কাজ করেছি। যোগ্যতার কয়ছি ভালই। সাধারণের অপেক্ষা আমাদের অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল। ছেলেমেয়েরা ছিল আমাদের দুজনের আনন্দের উৎস। লেখাপড়াতেও ওরা ভালো। বড়টি তো অঙ্কশাস্ত্রে রীতিমত সুনাম পেলে। এমন কি, মস্তুর কাগজে পর্বস্ত ওর প্রশংসা ছাপা হলো। আমার ছেলের এতখানি বুদ্ধি কি করে হলো সে কথাটা আমিই আপনাকে বলতে পারবো না দোস্ত! তবে একথা সত্যি যে, অ্যানাটলির এই অসাধারণ বুদ্ধি এবং প্রতিভার জন্মে আমি ভয়ানক গর্ব অনুভব করতাম। দশ বছরের মধ্যে আমরা কিছু জমিয়ে বৃদ্ধের আগেই নিজের মনের মত ছোট একটা ঘর তৈরী করলাম। ইরিগা একজোড়া ছাগল কিনলো। এর বেশী আমাদের মত লোকের আর কি চাই বলুন? ছেলেদের জন্মে দুধের ব্যবস্থা হয়েছে, আমাদের মাথা ওঁজবার মত একখানা ঘর হয়েছে, খাওয়া-পরাই একটা মোটামুটি যন্দোবস্তও আছে। তবে বাজীখানা ঠিক আমার পছন্দমত জায়গায় হয়নি। ওরা আমার একটা এরোপ্লেনের কারখানার পাশে বাজী করার জায়গা দিল। এই জমিটা যদি অন্ত কোনখানে আমি পেতাম তা হলে হয়তো আমার জীবনের গতি অন্য রকম হতো বন্ধু!

এর পর এলো সর্বনাশা যুদ্ধ। একদিন কাগজপত্র নিয়ে হাজির

হওয়ার ডাক এলো আমীরও। খবর পেলাম পরদিনই আমার ঠেশনে তৈরী থাকতে হবে। আমার স্ত্রী ইরিগা, অ্যানাটলি আর মেয়ে দুটো নাসতেজা ওলিউফা ওরা চার জনেই হতভম্ব হয়ে গেল এই মর্মান্তিক সংবাদে। বাজাগুলো অবস্ত এটাকে একটা খেলা বলেই ধরে নিল। অ্যানাটলি প্রথমে চমকে উঠলো একবার তারপরেই কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ছেলেটার বয়স তখন হয়তো গোটা সত্তেরো হবে। সামান্য বুদ্ধিসূচি হয়েছে তো। কিন্তু আমার প্রাণের ইরিগা—বিবাহিত জীবনের সত্তেরোটা বছরের একটা দিনও আমরা পরস্পরকে ছেড়ে দূরে থাকিনি। যাত্রা আমার বুকখানা চোখের জলে ধুইয়ে দিল। পরদিন সকাল পর্বস্ত একই ভাবে কাটলো। তারপর এলো আমার বাজার সময়। আমি ইরিগার দিকে ভালো ভাবে তাকাতে পারলাম না। কারার পমকে ঠোট দুখানা তখনও ফুল রয়েছে। মাথার অবিভক্ত চুলগুলো শালের কাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বুখে-চোখে। নিদ্দ্রাপ ঘোলাটে চোখে চেয়ে আছে, বুদ্ধি ওর মনটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অকিসার সকলকে গাড়ীতে ওঠার আদেশ দিলেন কিন্তু ইরিগা হঠাৎ আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মরম হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। ওর সারা দেহ ধরধর করে কাঁপছে বিয়াট এক বড়ের দোস্তায়। ছেলেমেয়েরা ওর কাছে এসে কথা বলতে চেষ্টা করলো, আমিও সাহসনা দিতে পেলাম কিন্তু আমার গলা দিয়ে স্বর বের হলো না। একটা কথাও বলতে পারলাম না ওকে। অত্যন্ত মেয়েরা দেখলাম নিজের স্বামিপুত্রদের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা কইছে কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে জড়িয়ে আছে নিশ্চয় ভাবে যেন শাখার সঙ্গে একটি পাতা লেগে রয়েছে। পাতার মতই কাঁপছে, একটি কথাও বলতে পারছে না। একটু শান্ত হও সস্ত্রীটি, যাওয়ার সময় হু—একটা কথা বলে আমায় সাহসনা দাও প্রিয়তমা ইরিগা আমার!

ইরিগা কথা বললো। প্রতিটি শব্দের ওপর অজস্র চোখের জল টেলে অনেক কষ্টে আমার প্রিয়তমা ইরিগা কথা বললো—প্রিয়—প্রিয়তম আমার আমরা—আমরা হয়তো ইহজীবনে আর কোনদিন পরস্পরকে দেখতে পাবো না।

আমার মন যে সময় ওর সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যথায় কাঁদছে সেই মুহূর্তে ইরিগা আমায় ওই কথা শোনালো। ওর বোঝা উচ্চ ওকে ছেড়ে যেতে আমারও হৃদয় ফেটে যাচ্ছে। আমি কোন উৎসবে আনন্দ করতে বাচ্ছি না নিশ্চয়ই। ইরিগার হাতের বাঁধন খুলে ওকে সরিয়ে দিলাম আমার কাছ থেকে। আমার কাছে তখন ইরিগাকে ও ভাবে ঠেলে সরিয়ে দেওয়াটা কিছুই নয়। কারণ আমার মনটা সে সময় গৌরার বাঁড়ের মতই ছুঁকুঁকু হয়ে উঠেছিল। আমার থাকার সে বেচারী তিন চার পা পিছিয়ে গেছিল কিন্তু পর মুহূর্তেই ও আবার আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি বেশ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলাম—এই কি তোমার বিদায় সস্তাবণ? তুমি তাহলে এখনিই আমার সৃত্যু কামনা করছো? কিন্তু আমি ওকে সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম, কারণ বুঝতে পারলাম ওর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

সহসা লোকটা ভেঙে পড়লো। নিশ্চরতার মধ্যেই অহুতব করলাম ওর গলা থেকে একটা বড়বড় শব্দ উঠলো। ওর এই আবেগ হয়তো আমাকেও সংক্রামিত করে ফেলেছে। আমি একবার

ওর দিকে চাইলাম আড়চোখে কিন্তু ওর ওই প্রাণহীন সাদা চোখের কোলে এক কোঁটাও জল দেখতে পেলাম না। মাথাটা নামিয়ে বসে আছে ও। লম্বা লম্বা হাত দুখানা বলে আছে দুপাশে, মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে একটু; খুঁতনীটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে দুটু সংবদ্ধ ঠোঁট দুখানাও। আমি ওকে বেশ শান্ত ভাবে সাহসনা দেবার চেষ্টা করলাম—দেখো, এসব কথা চিন্তা করে আর মন খারাপ করো না। আমার কথা ওর কানে ঢুকলো বলে তো মনে হোলো না। সমস্ত আবেগকে বেড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ বড়বড় গলায় বলে উঠলো: আমার জীবনের শেষ দিনে শেষ সুহৃৎও ইরিণাকে ওই ভাবে ঠেলে দিয়েছিলাম বলে নিজেকে কমা করতে পারবো না।

আবার কয়েকটা সুহৃৎ নিস্তক হয়ে রইলো। একটা সিগারেট তৈরী করার চেষ্টা করলো খবরের কাগজের একটা কোণ ছিঁড়ে নিয়ে কিন্তু তামাকটা ছড়িয়ে পেল ওর আশে পাশে। বাই হোক শেষ পর্যন্ত কোন রকমে তামাক আর কাগজে জড়িয়ে বাঁকাচোরা ভাবে পাকিয়ে বিরক্ত ভাবে কয়েকটা টান দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার আরম্ভ করলো—

ইরিণার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ওর দুখানা ধরে বিদায়-চুম্বন দিলাম। ঠোটগুলো বেন ঠাণ্ডা বরফ। বাচ্চাদের বিদায় জানিয়ে চলন্ত গাড়ীতে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। ট্রেন চলছে খুব আস্তে আস্তে। আমি গাড়ী থেকে আবার বাইরে তাকালাম। দেখলাম, আমার অনাথ ছেলেরা তাদের ছোট ছোট হাতগুলো হাওয়ার দোলাচ্ছে—মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। আর আমার প্রাণের ইরিণা ওর হাতখানাকে জোর করে বুকের সঙ্গে আটকে রেখেছে। ঠোটগুলো চকখড়ির মত সাদা। কি বেন বলছে ফিস্-ফিস্ করে, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে গাড়ীখানার দিকে। সামনের দিকে মুয়ে পড়েছে প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করার পর। আর ঠিক এই ভাবেই ইরিণার ছবিখানা আমার বাকী জীবনে বেঁচে আছে। হাত দুখানা বুকের ওপর সংবদ্ধ, ঠোটগুলো চকখড়ির সাদা, বড় বড় চোখ দুটো জলভারে টলটল করছে; এই মূর্তিতেই সে আমার স্বপ্নের মধ্যে জেগে থাকে। কিন্তু আমি ওকে সেদিন এমন হিংস্রভাবে কেন ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলাম আমার কাছ থেকে? এখনও কথাটা মনে হতেই ভাবি, আমি সে সময় বোকার মত নিজের হৃৎপিণ্ডটাকে ধারালো ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে নষ্ট করে ফেলেছি।

আমাদের সকলকে প্রথমে ইউক্রেনের বেলাইয়া সেরকভ-এ নিয়ে এলো। এর পরের সুন্দর বিবরণ আশা করি আর আপনাকে দিতে হবে না। কারণ আপনি স্বচক্ষে সবই দেখেছেন—সবই জানেন। বাড়ী থেকে গাদা গাদা চিঠিপত্র আসে কিন্তু নিজের মনকে বেশী কথা লিখবার অধিকার নেই। সামান্য ছ'-একটা মামুলী কুশল সংবাদ আদান-প্রদান আর যুদ্ধের সুখবর ছাড়া আর কিছুই লেখা চলবে না। হয়তো কোথাও আমাদের পরাজিত হয়ে পিছু হঠে আসতে হচ্ছে কিন্তু চিঠিতে সে কথা চলবে না, লিখতে হবে আমরা সুসংবদ্ধ হওয়ার জন্যে, আরও বিপুল সৈন্য সমাবেশের জগ্জেই কিছুটা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। এছাড়া আর কি-ই বা লেখার থাকে আমাদের? সেই ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে আর চিঠিপত্র লেখার মত অবস্থা কারও

থাকে না। আমি অবশ্য আর সবার মত কোনদিনই সেই একটা ছুঃখের কাঁছনী গাইনি। প্রত্যেক দিন অকারণ চোখের জলে নাও জলে ভিজিয়ে স্ত্রী-পুত্রদের চিঠি দেওয়া আমি মোটেই পছন্দ করত না। উঃ! কি দুর্বিহ্ব জীবন! আমার যুক্ত্য সমাসর! এ! আবোল-তাবোল লেখার কোন মানে হয় না। এই সব পরতো দল জোর করে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সহায়ত্ব আদায় করা চায় কিন্তু হতভাগীরা একবারও চিন্তা করে না যে আমরা আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের কি রকম অসহায় অবস্থায় ছুঃখের বোকা মাথার চাপি ফেলে এসেছি। দেশের সমস্ত দায়িত্ব তাদেরই হাতে। ওই বিয় দায়িত্বের বোঝাতেই কি ওরা চাপা পড়ে যাবে না? কতটুকু ওর কমতা যে এত বড় গুরুভার ওরা বইবে? আর এই অবস্থায় ষ আমাদের কাছ থেকে এই ধরনের চিঠি ওরা পায় তাহলে ওদের। পরিণতি হবে সে কথা যদি না আমরা চিন্তা করি তবে কে করবে স্ত্রী-পুত্রদের কাছে এ ধরনের চিঠি গেলেই তারা দিশাহারা হয়ে পড়বে ওদের সমস্ত কাজকর্ম পণ্ড হয়ে যাবে। এই জগ্জেই কি মানুষ হ মাটিতে অন্ন নিয়েছি? সৈনিকের বৃত্তি নিয়েছি? না, সব কি সহ করে সমস্ত ভার বহন করার জগ্জেই মানুষ হয়ে জন্মেছি- সৈনিকের বৃত্তি নিয়েছি। অবশ্য যদি আমাদের মধ্যে কারও ভিত্ত পুরুষের প্রকৃতির পরিবর্তে নারীপ্রকৃতির প্রভাব বেশী থাকে তাহলে তার সৈনিকের পোষাক খুলে ফেলে ফ্রিল দেওয়া ষাগরা পরা উচিত শিখন থেকে মেয়েছেলের মত খানিকটা দেখাবে। তারপর যশে কাজকর্ম নিয়ে থাকতে পারবে, দুখ দোয়াতে পারবে বেশ, কার ওদের দিয়ে যুদ্ধের কোন কাজই হবে না, ঘর গৃহস্থালীতেই ভাসে মানাবে।

আমার কিন্তু এক বছরের মধ্যে দুবার আহত হতে হলো প্রথম বারে বাঁ হাতে সামান্য আঘাত দ্বিতীয় বারে পায়ে লাগলো জার্মান সৈন্য চারিদিক থেকে আমার লরীখানা ঘিরে ফেললো। অবশ্য প্রথম দিকটায় বরাবর আমার ভাগ্যটা ভালোই চলছিল বলা চলে কিন্তু এই প্রথম আমি দুর্ভাগ্যের সামনাসামনি পাঁড়ালাম বিয়াল্লিশের মে মাসে আমি লোকোভেভিতে বন্দী হলাম। একটা বিজ্রী রকম ওলোট-পালট হয়ে গেল। জার্মানরা আমাদের বাহিনী ওপর প্রবল আক্রমণ চালাচ্ছে সমানে। আমাদের একটা ছোট কামান উঠিয়ে আনতে ভুল হয়ে গেছে দেখে আমার লরীখানা গুলী-গোলা বোঝাই করে চললাম কামানটা উঠিয়ে আনতে আমাদের একটু তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে এখান থেকে, কার শত্রুরা ক্রমশ: 'অগ্রসর হচ্ছে এই দিকে। বাঁদিক থেকে [ট্যাঙ্ক-এ আওয়ার শোনা যাচ্ছে। ডাইনে সামনে সমানে গুলী চলছে কাজেই আমাদের অবস্থাটা যে মোটেই আশাশ্রয় নয়, সেটুকু বুঝবার কমতা তখনও ছিল।

আমাদের কমান্ডার আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন—শোকোলভ তুমি সোজা যেতে পারবে?

—আমার অন্তঃস্বামী বধন মৃত্যুমুখে তখন কি আমি বসে বসে বুড়ো আঙ্গুল নিয়ে খেলা করতে পারি? আপনি কি বলতে চাইছেন কমান্ডার? আমিও সোজানুজি প্রশ্ন করলাম। তারপর বললাম—দরকার হলে আমি নিশ্চয়ই গাড়ী নিয়ে সোজা যেতে পারবো। তখন কমান্ডার হকুম দিলেন—সব ভেঙে দিয়ে এগিয়ে চল।

আমি সত্যিই এগিয়ে চললাম। জীবনে এভাবে আর কোন
কিন আমি গাড়ী চালাইনি। আমি যে কোনা-খোঁড়া বসে নিয়ে
রাছি না, সে খেলাস আমার কাছে কি মজাতে বা বোবাই করা
আছে, যেগুলো কি তাই যে নিরাপন্ন হান্নে পৌঁছে দেবো বুঝতে
পারছি না। চারিদিকে শত্রুসত্তার হাতাহাতি বৃদ্ধ করছে,
পোলাওনীর আঙন ঘেঁষার পথ-বাট সব আছন্ন। আমি নির্ধিক্ত
ফিল্মার বিকে প্রায় হ' কিলোমিটার হাঁটা এগিয়ে পেশার।
কারখানার কারখানাটা আছে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কি দেখলাম
মাঝি? তাৎসার, যদি আমারের পনাতিকবাহিনী হাতার হুকিক
থেকেই খিচু হটে আসে, তাহলে তো শত্রুর মোলাওনো সব ওদের
পিঠের ওপরেই পড়বে। কারখানাটার কাছে পৌঁছতে আর হান্ন এক
কিলোমিটার হাঁটা বাকী। আমি তাড়াতাড়ি করলাম কিন্তু বোত,
শত্রুবাহুলে পৌঁছতে পারলাম না। আমার লরীর সামনেই একটা
বিকোরণ হলো। মনে হলো, পোলাটা বুকি বা আমার মাথাতেই
পড়ছে। তারপর আর আমার কোন জ্ঞান ছিল না। কিভাবে
আমি বেঁচে গেলাম খালের মধ্যে কতকগনই বা পড়েছিলাম, সে-সব
আমি কিছুই জানি না। তারপর একসময় চোখ খুললাম, উঠতে
গেলাম কিন্তু পারলাম না। মাথাটা অস্বাভাবিক রকম ভারী, মনে
হোলো অরে গোটা গা বেন পুড়ে আছে। সব কিছু অন্ধকার।
আমার বাঁ কাঁধটার কেউ বেন ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে কুরে কুরে
দিচ্ছে। সমস্ত শরীরে অসহ বেদনা। অনেককগ থেকেই পেটটার
ধুব মোচড় দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বহুকাটে উঠে বসলাম আমি। কিন্তু
বর্তমানে আমি কোথায় কি অবস্থায় আছি, কিছুই বোধগম্য হলো না
আমার। বুঝলাম, আমার সৃষ্টিশক্তি একদম লোপ পেয়েছে।
আমি বুকি তর পেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম—তর পেয়ে শুয়ে পড়লে পরে
আর হয়তো একেবারেই উঠতে পারবো না ভেবে জোর করে উঠে
দাঁড়লাম। কিন্তু প্রবল বড়ে গাছগুলো যেমন টলে, আমিও ঠিক
সেই ভাবে টলছি তখন।

যখন আমার সন্নিহিত করে এলো, তখন একবার চারিদিকে ভালো
করে তাকালাম। মনে হলো, আমার হৃৎপিণ্ডটাকে কেউ বুকি
দাঁড়াই দিয়ে চেপে ধরেছে। আমার গাড়ীতে যেসব গোলা ছিল
সগুলো কি আমার চারপাশে ছড়িয়ে গেছে। লরীখানা হয়তো
টুকরো টুকরো হয়ে চাকা ওপর দিকে করে উল্টে পড়ে আছে
কাছাকাছি কোথাও। আর লড়াই ১০০-আমার পিছনেই লড়াই
লাছে। হ্যাঁ, ঠিক আমারই পিছনে।

যখন বুঝলাম যে আমি ক্যাসিন্ডদের হাতে বন্দী হয়েছি তখন
আমার একটুও লজ্জা বা হুঁশে হলো না। কারণ, এই তো আমাদের
হুঁশের রীতি।

না, না মোস্ত, আপনি বা তাবছেন, ব্যাপারটা ততখানি সোজা
নয়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সৈনিক যে শত্রুর হাতে বন্দী
হতে পারে, একথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। আর
আমাদের এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাদের তো কোনমতেই এর
হত্যাসত্য বোঝানো যাবে না?

আবার একটা ট্যাঙ্কের আওয়াজ শুনে আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে
পড়লাম। চারটে মারাত্মকগোছের জার্মান ট্যাঙ্ক আমার পাশ দিয়ে
ছুটে যেদিয়ে গেল, আমি বেদিক থেকে এসেছি সেই দিক দিয়ে।

আমার যে সময়ের অবস্থাটা আশা করি উপলব্ধি করতে পারছেন।
তারপরই দেখলাম, একবাঁক ট্রাকটার গুলী চালাতে চালাতে পার
হলো। শিহনে একটা জাহাজমান বহনশালা তার শিহনে একটা
হোঁটমত পনাতিক বাহিনী। আমি আড়চোখে ওদের প্রত্যেকটি
শক্তিবিধি লক্ষ্য করছি—তারপর কি মনে হলো, আঙে আঙে মাথাটা
আবার একটু তুললাম আর এই দুর্বলতাই আমার কাল তোলো।
ওরা সব পার হয়ে গেছে ভেবেই মাথাটা যেমন উঠিয়েছি, অমনি
যেখি, হ'জন বেশিনখানচামক আমার কাছ থেকে হারি শতখানেক
কদম হুবে ঘাট' করে আসছে। আমাকে দেখেই ওরা কোন কথা
না বলে হাতা ছেড়ে সোজা আমার বিকে এগিয়ে এলো। বুঝলাম,
ইহলীলা এখুনি শেষ হবে। মরতেই বখন হবে তখন আর মেহাৎ
ভরে ভরে কেন মরি, উঠে বসাই যাক। বসতে গিয়ে সোজা ঠাড়িয়ে
গেলাম। ওদের মধ্যে একজন আমার সামনে এসে কাঁধ থেকে বন্দুক
তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু, কি আশ্চর্য! সেই চরম
মুহূর্ত, যার তরে মাদুমমাত্রই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় সেই ওরাবহ
বুক্যর মুখোমুখি ঠাড়িয়ে একটুও ভয় হলো না আমার! এমন কি
হৃৎপিণ্ডের কোন তারতম্যও বুঝতে পারলাম না আমি। আমি
শত্রুগণের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম—এখুনি ওর হাতের বন্দুকটা
গর্জে উঠবে। কিন্তু গুলীটা আমার কোথায় লাগবে? মাথায় না
ঠিক বুকের মাঝখানে? অবশ্য ওটা এমন কোন বিশেষ ভাবনা
নয়। আমার শরীরের যে কোন জায়গা ফুটো করে দিতে পারে।

লোকটির বয়স কিন্তু অল্প আর স্বাস্থ্যটাও বেশ চমৎকার।
চুলগুলো সব কালো কুচকুচে কিন্তু ঠোঁট তুটো বড় বেশী পাতলা
আর চোখের দৃষ্টিতে এত বেশী বর্ধরতা ফুটে উঠেছে যে শরতানটা
কেন আমার গুলী করতে এত চিন্তা করছে বুঝতে পারছি না।
ওর লক্ষ্য সবক্কে ও যে স্থির, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।
আমিও স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম অস্ত্র
একজন, হয়তো দলের করপোরাল হবে—সামনের সৈন্যটিকে ঠেলে
সরিয়ে দিয়ে আমার সামনে এলো। নিজেকেই ভাবায় কি সব
চেষ্টামেচি করলো কিছুকগ, তারপর হঠাৎ আমার ডান কাঁধটা টিপে
পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলো। বললে—ওহো! তারপর
অস্ত্রাচলগামী সূর্য যেখানে এসে কয়েক মুহূর্ত ধমকে ঠাড়িয়েছে
সেই দিকে আজুল দেখিয়ে চীৎকার করে উঠলো :—যা রে ছুঁচো, দূর
হয়ে যা এখান থেকে। যা আমাদের রাইফেল কাজ করবে।
বুঝলাম এই মোটা লোকটি একটা আন্ত শরতান।

ওদের মধ্যে একজনের নজর পড়লো আমার শক্ত বৃট-জাড়ার
ওপর। বলে উঠলো : ওরে হতভাগ', ওটা খুলে দে। আমি
মাটিতে বসে জুতোটা পায়ের থেকে খুলে লোকটির হাতে তুলে
দিলাম। বলতে গেলে একরকম আমার হাত থেকে ছিনিয়েই নিল
ওটা। তারপর পায়ের পাঁটটা খুলে ওর দিকে তাকালাম কিন্তু
লোকটা চীৎকার করে আমাকে ধমকে উঠলো, হাতের বন্দুকটা
আবার আমার মাথা লক্ষ্য করে তুললো। ওর অস্ত্রাচল সাধীরা
হাসিতে কেটে পড়লো। তারপরই ওরা আবার চলতে আরম্ভ
করলো। শুধু প্রথমকার লোকটা হাতায় নামবার আগে আমার
দিকে কেবল কিয়ে কিয়ে তাকাছিল। তার চাউনিতে কুখার্ত
নেকড়ের হিংস্রতা চক-চক করছে।

অনেকে হয়তো ভাবতে পারে যে আমি বৃষ্টি ওই লোকটার জুতোর পরিবর্তে আমার জুতা জোড়াটা ওকে দিলাম। কিন্তু ওসবের কোন বালাই নেই দোস্ত। তারপর সেই প্রচণ্ড গরমে আমি খালি পায়ে পথ চলতে লাগলাম, পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে উপায়হীন বন্ধী আমি। পথ হাঁটার মত দৈহিক অবস্থা সে সময় আমার আদৌ ছিল না, বঁটার খুব জোর হয়তো এক কিলোমিটার পথ চলতে পারি। হাতালদের মত আমার শরীরের অবস্থা। সোজাভাবে চলবার হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই পারছি না। কে যেন পিছন থেকে আমার হাতের এক প্রান্ত থেকে অল্প প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ হাঁটতেই দেখলাম আমাদের দলের আরও অনেকে বন্ধী হয়ে চলেছে—আমিও ওদের সঙ্গে ধরলাম। জন দশেক জার্মান সৈন্য ছুটে এসে আচমকা আমার মাথার বন্ধকের কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো। আর সেই আঘাত সহ করতে না পেয়ে যদি মাটিতে পড়ে বাই—তাহলে পতটা আমাকে মাটির সঙ্গে বেঁতলে দেবে নির্ণয়, কাজেই দলের একজন আমার সাহায্য করলো। আমাকে ওদের মাঝখানে নিয়ে এলো, কিছুক্ষণ তো আমাকে টেনেই নিয়ে চললো ওরা। আমি একটু ধাতস্থ হলে একজন আমার কানে কানে বললো ভগবানের মোহাই, তুমি যেন কিছুতেই মাটিতে পড়ে যেও না। যতক্ষণ তোমার শক্তি থাকবে আশ্রয় চেষ্টা করো সোজা থাকতে। পড়ে গেলেই ওরা কিন্তু একেবারে শেষ করে দেবে। আমার সর্বশেষ শক্তি দিয়ে কোন রকমে নিজেকে খাড়া রেখে এগিয়ে চললাম ওদের সঙ্গে।

দুর্ভাগ্য বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানরা আমাদের ওপর আরও কড়া পাহারা বসালো। আরও বিশ জন সৈন্য আনিতে নিল লরীতে। আমাদের আরও জোরে টেনে নিয়ে চললো। আমাদের মধ্যে যে সব হতভাগ্য আহত সৈনিক নিজেদের কোনমতেই আর সোজা রাখতে পারলো না, বর্ষর জার্মান-সৈন্যরা তাদের কুকুরের মত শুসী করে মারলো। দু একজন হয়তো মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেই জনহীন প্রান্তরে তাদের আলোয় পলাতকদের শুসী করতে জার্মানদের একটুও কষ্ট হলো না। মাঝ-রাতে আমরা ভয়ভৃত এক গায়ে এসে পৌঁছলাম। ওরা আমাদের একটা গির্জার ধ্বংসস্থলের কাছে নিয়ে এলো। সেই পাথরের মেঝেতে এক গাছা খড় বা শুকনো ঘাসেই আমরা বাত্রিটা কাটলাম। আমাদের মধ্যে কারও গায়ে সামান্য আবরণ ছাড়া একটা লম্বা কোটও নেই যে সেগুলো বিছিয়ে শোয়া যাবে। অনেকের গায়ে একটা পাতলা সার্ট ছাড়া অল্প কোন আবরণও নেই। ওরা হয়তো এন, সি, ও, দলের লোক। ওদের সমস্ত পোষাক খুলে নেওয়া হয়েছে বলেই ওরা নিজেদের দল অথবা ব্যাকের পরিচয় দিতে পারছে না। আর একদল মিল্লী বাবা বিনা পোষাকেই কাজ করার অবস্থাতে বন্ধী হয়েছে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ওরা প্রায় উলঙ্গ অবস্থাতেই আছে বলা চলে।

রাত্রে আবার ঘুমঘণ্ডারে বৃষ্টি এলো। আমরা অসহায় জানোয়ারের মত গোটা বাতটা ভিজলাম। আমাদের আশ্রয়স্থলের ছাতের খানিকটা কামানের গোলা কিংবা বোমার আঘাতে ভেঙ্গে গেছে, বাকী অংশটুকুও গোলন্দাজদের কুপায় জরাজীর্ণ। কাজেই আমাদের বলা বা দাঁড়বার মত শুকনো জায়গা কোথাও নেই।

সমস্ত রাত্রি আমাদের গির্জাতে কাটাতে হলো অন্ধকার ঘোঁর একপাল ভেড়ার মত।

রাতের অন্ধকারে কে যেন আমার হাতটা ধরে কিস্কিন্ ক প্রায় করলো—বন্ধু, তুমি কি আহত? আমিও পান্টা প্রায় করলো এ প্রায় কেন দোস্ত?

: আমি একজন ডাক্তার, অন্ধকার হলে তোমার আমি সাহায্য করতে পারবো।

আমি ওকে বললাম, আমার বাঁ কীণের ভিতরটা কেমন কড়ম করছে। বীভূতিমত ফুলে উঠছে জাহপাটা; আর সবানে অঙ্গ বহুনা হচ্ছে। সব শুনে লোকটা আমার জামা খুলে কেনতে বললো ওর কথা মত জামা খুললাম, তারপর ও আমার কতটা জ্বালা জ্বালা দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। আমার বহুনা আরও বেতে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে কোনমতে বললাম—তুমি মোটে ডাক্তার নও—গোবত্তি। বেখানে আমার অসহ ব্যথা সেখানে অমন ভাবে চাপ দিচ্ছ কেন শয়তান?

আমার কথায় কর্ণপাত না করে ও যেমন পরীক্ষা করছিল তেমনি করতে লাগল। একসময় একটু রাগত ধরে বললো তোমার কাজ যুধ বন্ধ করে থাক। বেশী কথা বললে তোমার ব্যথা আরও বাড়বে। ওর কথা শেষ হতে না হতেই হাতটা এমন মোচড় দিল যে আমি চোখে সর্ধে ফুল দেখতে লাগলাম জ্ঞান লোপ পেল।

আমার জ্ঞান কিরে এলে আমি ওকে প্রশ্ন করলাম: শয়তান ক্যাসিন্ত, তুমি কি করছিলে কি? মারের চোটে আমার যে হাতটা ভেঙে গেছে সেই ভাঙা হাতটাই অমন ভাবে টেনে দিলে তুমি আমার কথায় ডাক্তার মুখে একটা শব্দ করে বললো—তোমার পরীক্ষা করার সময় আমার মনে হলো যে বহুনা সহ করতে না পেয়ে তুমি হয়তো আমার আঘাত করে বসতে পারো। কিন্তু তুমি বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক। বাই হোক তোমার হাত ভাঙেনি, জোড় হেড়ে গেছিল কিন্তু আমি আবার ঠিক বসিয়ে দিয়েছি। এখন একটু আরাম লাগছে? সত্যি কথা বলতে কি আমার বহুনা অনেক কমে গেছে। আমি ডাক্তারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম। ও ততক্ষণে আবার অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক সৈনিকের কাছে গিয়ে শান্ত গমায় প্রশ্ন করতে করতে এগিয়ে চলেছে: বন্ধীদের মধ্যে কে আহত আছে? আমি সাহায্য করতে পারি। লোকটা একজন সত্যিকারের চিকিৎসক। এই সূচীভেদ অন্ধকারেও ও তার ব্রতপালন করে চলেছে নিঃশব্দে।

ভয়ানক রাত্রিটা যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। আমাদের যখন ওরা গির্জার মধ্যে ঢোকাচ্ছিল তখন একজন জমাদার জানিয়ে দিয়েছিল যে আমাদের বসতে পর্যন্ত দেওয়া হবে না। এই দুর্ভাগ্যের মধ্যেই একজন খৃষ্টানের আবার পায়খানার বেগ দেখা দিল। বেচারি অনেকক্ষণ সামলাবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেললো। বললো: আমি এই পবিত্র গির্জা কোনমতেই অপবিত্র করতে পারবো না। আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। এ কাজ এখানে কেমন করে করি বলা? সে আমি কিছুতেই পারবো না। আমাদের ভেতরেও নানা জাত নানা মতের লোক আছে। কেউ কেউ ওর এই কাজ দেখে হাসিতে কেটে পড়লো, কেউ গালাগাল

মিল আবার কেউ ওকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলো। আমাদের কথা অগ্রাহ্য করে লোকটা উঠে দাঁড়ালো কিন্তু বল হলো অত্যন্ত মর্মান্তিক। বন্ধ দরজার বাব বাব বাজা দিয়ে বাইরে বাবার অনুভূতি প্রার্থনা করতে লাগলো পাহারাওয়ালাদের কাছে। আর তার প্রার্থনার জবাব আসতেও বেঙ্গী দেবী হলো না। দরজার কীক দিয়ে এক কীক গুলী চুকলো। খুঁটানটি তো মারা গেলই সেই সঙ্গে আমাদের আরও তিন জন শেব হলো আর একজন এমন গুরুতর আহত হলো যে, যে বেচারীও সকাল হবার আগেই শেব হবার পেল।

যুদ্ধক্ষেত্রলোকে একটা কোণে টেনে নিয়ে ধিয়ে চূপচাপ করে বসে চিন্তা করতে লাগলাম, আরম্ভটা খুব সুবিধার নয় বোটেই। তারপর এই ভয়াবহ পরিস্থিতিটাকে একটু সহজ করে দেবার আশায় আমরা কিসকিসিয়ে পদক্ষেপের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলাম, আমরা কে কোথায় থেকে কি ভাবে বন্দী হলাম।

আমার ঠিক পাশেই ছোটো কঠোর সুনলাম। একজন বলছে : কাল আমাদের এখান থেকে অল্প কোথাও নিয়ে বাবার আগে ওরা যদি আমাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে কে কমিউনিষ্ট, কে ইহুদী আর কে খাতিসবরাহ বিভাগের কর্মচারী বাহুতে আরম্ভ করে তাহলে আর তোমার পল্টন কমাণ্ডার বলে লুকিয়ে থাকে চলবে না। কোনমতেই ওরা রেহাই দেবে না। তোমার পোষাক পরিচ্ছদ না থাকলে ওরা পদমর্বাদার কথা বুঝতে পারবে না মনে কর? সে তুমি কিছুতেই মুছে কেলতে পারবে না হে। তোমার জন্মে আমি দুর্ভাগ ভোগ করতে যাবো কেন? প্রথমেই আমি তোমায় ধরিয়ে দেবো। তুমি যে একজন কমিউনিষ্ট লোকখা আমি জানি। আমাকে তোমাদের পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্ম তুমি অনেক চেষ্টা করেছিলে। সে সব কথা আমার বেশ মনে আছে। এখন তার জবাবদিহি কর। লোকটা আমার বাঁ পাশে বসে আছে। ওর ওপাশ থেকে আর একটি তরুণের কঠোর সুনলাম : আমার বরাবর সন্দেহ ছিল অত্যন্ত বাজে প্রকৃতির লোক ক্রিমেনেভ। বিশেষ ভাবে যখন তুমি অশিক্ষিতের অজুহাত দেখিয়ে আমাদের পার্টিতে যোগ দিতে অসম্মত হলে তখন আমি সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু, তুমি যে এত বড় বিশ্বাসঘাতক সে কথা বলনা করতে পারিনি। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তুমি স্কুলে গিয়েছিলে কিনা বলতো?

অপরজন অত্যন্ত ধীরে ধীরে উত্তর দিল : ই্যা গিয়েছিলাম। তাতে কি হয়েছে?

কিছুক্ষণ আবার চূপচাপ কাটলো। তারপর আবার সেই পল্টন কমাণ্ডার আন্তে আন্তে বললো : কমরেড ক্রিমেনেভ আমার ধরিয়ে দিও না। অপরজনের যুহ হাসির শব্দ শোনা গেল। এখানে তোমার কোন কমরেড নেই। তাদের সকলকেই লাইনের ওপারে ফেলে এসেছ। আমি তোমার কমরেড নই। আমার সঙ্গে ওসব নিয়ে আর তর্ক করতে এসো না। যে কোন উপায়ে আমি তোমায় ধরিয়ে দেবই। আমার নিজের প্রাণটাকে তো আগে বাঁচাতে হবে।

ওদের কথাবার্তা বন্ধ হলো। আমার শরীর এই জঘন্যতার গুরুতর করে কেঁপে উঠলো। আমি ভাবলাম, না না, শরতান, আমি

তোকে তোমার কমাণ্ডারের সঙ্গে কিছুতেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেবোনা। তুমি আর কোনদিন নিজের পায়ে হেঁটে এই চার্চের বাইরে যেতে পারবি না। ওরা তোমার পা ছুটো ধরে টেনে বাইরে ফেলে দেবে। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠছিল। বেখলাম একজন বেশ মোটা-মোটা লোক হাতটা মাথার নীচে দিয়ে গুয়ে আছে আর ঠিক তার পাশেই একজন বুক পায়ে কেবল একটি সাঁট দিয়ে হাঁটু ছুটোকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে ব্যাকপাশে বুখে। ভাবলাম, ওই বাজাটা তো জানোয়ারটাকে ঠিক কাছের আনতে পারবে না কিছুতেই। আমাকেই হাত লাগাতে হবে দেখছি।

আমি বুকটাকে ছুঁয়ে কিসকিসিয়ে প্রশ্ন করলাম : তুমিই কি পল্টন কমাণ্ডার? বুখে কোন জবাব না দিয়ে ও মাথা সোঁক জ্বাল, হ্যাঁ সেই। আবার আমি পাশে গুয়ে থাকা লোকটাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম ও তোমায় ধরিয়ে দিতে চায়? এবারেও সে মাথা নাড়লো শুধু। বললাম ঠিক আছে, তুমি ওর পা ছুটোকে চেপে ধর বেন লাখি ছুঁড়তে না পারে—এবটু তাড়াতাড়ি কর। তারপর আমি লোকটার ওপর কীপিয়ে পড়ে গলাটা টিপে ধরলাম। লোকটা চীৎকারে করারও সময় পেল না। কয়েকটা যুহুর্ন্ত আমার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে চেপে রাখলাম। তারপর একসময় ওর জিভ বের হয়ে এলো।

তারপরই আমার ভয়ানক বিলী লাগলো। হাত ছুটোকে ভালো ভাবে ধুয়ে কেলতে ইচ্ছা হোলো। থাকে এই তাবে হত্যা করলাম সে বেল কোন মানুষ নয়। একটা বিশ্বাস সাপ। আমার জীবনে এই প্রথম আমি মানুষকে হত্যা করলাম। তাও আবার নিজেদেরই একজনকে। আমাদের নিজের লোক? কিন্তু কোনরকম ভাবেই ক্ষমা পাবার যোগ্যতা তার ছিল না। শত্রুর অপেক্ষাও ভয়ানক। সে বিশ্বাসঘাতক। আমি সেখান থেকে উঠে পল্টন কমাণ্ডারকে বললাম—চল, এখান থেকে আমরা অল্প কোথাও বাই; চার্চটা বেশ বড়।

শরতান ক্রিমেনেভের ধারণা অনুযায়ী পরদিন সকালে আমাদের চার্চের বাইরে নিয়ে এসে লাইনে দাঁড় করলো। পাহারাওয়ালারা আমাদের চারদিকে গোল করে ঘিরে বন্দুক উঠিয়ে দাঁড়াল। আমাদের মধ্যে কোন বিপজ্জনক ব্যক্তি আছে কিনা খুঁজতে লাগলো তিনজন এস, এস, অফিসার। ওরা একে একে সকলকেই প্রশ্ন করতে লাগলো আমাদের মধ্যে কে অফিসার, কে কমিউনিষ্ট, কে খাতিসবরাহকারী কিন্তু কেউ কোন কথা স্বীকার করলো না। এমন কোন শরতানও এগিয়ে এলো না যে সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। আমাদের দলের মধ্যে অর্ধেকের ওপর কমিউনিষ্ট। বাকী লোকের মধ্যে প্রচুর অফিসার আছেন, খাতিসবরাহকারীও আছেন। আমাদের মোট দু'শ জন বন্দীদের মধ্যে ওরা মাত্র চারজনকে সন্দেহ করে বের করলো। একজন ইহুদী আর তিনজন রাশিয়ান। রাশিয়ানদের বিপদের কারণ হলো ওদের মাথার কালো কৌচকানো চুল। এস, এসগুলো ওদের কাছে এসে প্রশ্ন করলো—ইহুদী? উত্তরে ওরা কি বললো সে কথা শোনার বৈধ ওদের রইল না। গর্জন করে উঠলো—লাইন থেকে বাইরে এসো। ব্যদ, এই য খট।

ওই চারজনকে গুলী করে আমাদের নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হলো। বার সাহায্যে আমি সেই শরতান বিশ্বাসঘাতকটাকে হত্যা

কয়েকদিন সেই দু'কটি আশ্রয়স্থলের সমস্ত সমর থেকে বীর্ষী পোজনান পর্বত আশ্রয়স্থল হাতে হাতে পালিয়ে গেল। পোজনানে এসে আমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

আমি বন্দী হওয়ার পর থেকেই পালানোর কথা চিন্তা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সুযোগ পাইনি। পোজনান পর্বত আশ্রয়স্থল সমস্ত রাত্তায় ওরা আমাদের যে সব ক্যাম্প রেখেছিল সেখান থেকে পালানোর তেমন কোন উপায় ছিলনা। কিন্তু পোজনান ক্যাম্প এসে মনে হলো একদিন আমি যা চাইছিলাম এবার হয়তো সেই সুযোগটা পাওয়া যাবে। সে মাসের শেষের দিকে একদিন ওরা ক্যাম্পের পাশেই একটা ছোটখাট জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল দু'ত বন্দীদের কবর খুঁড়বার জন্যে। আমাদের মধ্যে অনেকেই সে সময় আশ্রয়স্থলে মরে গেল। পোজনানের মাটি কাটতে কাটতে আমি একসময় চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। আমাদের পাহারাওয়ালাদের হুকুম খেলতে বসেছে আর একজন রোজ বসে বসে বিমোহে। আমি হাতের কোমলটা কেসে দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা কোমলের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। তারপর উদীয়মান সূর্য লক্ষ্য করে সোজা দৌড়তে আরম্ভ করলাম।

পাহারাওয়ালারা প্রথমটার আমার দেখতে পারিনি বোধ হয়। আমার মত একজন দুর্বল লোক সে সময় একদিনে চল্লিশ কিলোমিটারে মাঝা দৌড়ে পার হয়েছিল। সে কথা জানতেই পারিনি, সেদিন অবশ্য রাত্তায় কোন অঘটন ঘটলো না। কিন্তু চতুর্থ দিনে আমি যখন সেই অভিশপ্ত ক্যাম্প থেকে বহুদূরে চলে এসেছি তখনই ওরা আবার আমার ধরে ফেললো। আমার ধরবার জন্ত ওরা ব্লাড হাউণ্ড ছেড়ে দিয়েছিল। একটা জইক্কেলের মধ্যে ওরা আমার ধরলো।

ভোরবেলাতেই আমি একটা কাঁকা মাঠে এসে পড়লাম। দিনের আলোর এই মাঠটা পার হতে আমার বেশ ভয় হলো। বন থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার হয়ে জমিটা। কাজেই সমস্ত দিনটা জইক্কেলের মধ্যে শুয়ে কাটিয়ে সেওয়াই স্থির করলাম। দু' থেকে কুকুরের চীংকার আর মোটর সাইকেলের শব্দ শুনে আমার প্রাণ ভরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠলো। জই-কল তুলে তুলে আমার পকেটগুলো ভর্তি করতে লাগলাম। কুকুরের চীংকার বত এগিয়ে আসতে লাগলো আমার জংগলও বৃষ্টি একেবারে খেমে বাওয়ার উপক্রম হলো। আমি চিং হয়ে শুয়ে হাত দিয়ে কোন রকমে দু' ডকে রাখার চেষ্টা করলাম। কুকুরগুলো যাতে না আমার দু'খটার চামড়াকে পারে। ওরা এসে গেল। আমার জামা-কাপড়গুলো ছিঁড়ে কুটি কুটি করতে কুকুরগুলোর এক দু'হুঁটও লাগলো না। যা নিয়ে পৃথিবীতে জগেছি তাই ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। সের খেয়াল-খুঁসীমত ওরা আমার নিয়ে জমিতে টানাটানি করলো। শেষে একটা বিরাট কুকুর তার খাবাটা আমার বুকে বসিয়ে লা লক্ষ্য করে এগিয়ে এলো কিন্তু ঠিক সোজা হুঁজি কামড়াকে ঠিকলো না।

মোটর সাইকেলে হুকুম জারীপটন্ত এসে আমার বীতিমত বিধোর করলো। তারপর আবার কুকুর লেলিয়ে দিল। আমার গায়ের মাংস খাবলা খাবলা করে তুলে নেওয়ার পর ওরা আমার বাঁদ ক্যাম্প নিয়ে এলো। উল্লস অবস্থায় হুকুম দেবে নির্জন

হাস করতে হলো আমার পালানোর অপরাধে। তবু আমি বেঁচে ছিলাম। বাঁচবার জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করলাম।

গোষ্ঠ, আমার সেই বন্দীজীবনের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার কথা মনে হলেও কষ্ট হয়। তবু আপনাকে সব কথাই আমি বলছি। জার্মানিতে যে বীভৎস অত্যাচার আমাদের ওপর করা হয়েছে, ওই সব ক্যাম্পে আমার আপনজনদের অত্যাচার করে মেং ফেলছে, সে কথা বন্ধনই মনে পড়ে তখনই গলা বন্ধ হয়ে আসে; নিঃশব্দ নিশ্চৈ কষ্ট হয়।

বন্দী অবস্থায় ওরা সমানে দু'বছর ধরে আমাদের পতপালের মত চরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আমার মনে হয়, অর্ধেক জার্মানী ক্যাম্পে আমরা ঘুরেছি। আমি স্ত্রীস্বামির সিলিকেট কারখানার কাজ করছি। স্ত্রী-এর কথলাখনিতে কয়লা কাটতে হয়েছে। ব্যাডেরিয়ার জমিতে কোমল নিয়ে কেমেছি, থার্মিনডোন-এ বকলি হয়েছি। কে জানে জার্মানীর আর কোথাকার মাটি কেটেছি। সব জায়গার নিজস্ব দৃশ্য আছে বটে কিন্তু আমাদের গুলী করে কোথাও আর আমাদের ওপর অত্যাচার করার দৃশ্য সব জায়গায় একই। কোন প্রভেদ মেই। শরতদিনগুলো আমাদের এমনভাবে প্রহার করতো যে কোন মানুষ জানোয়ারকেও সে ভাবে প্রহার করতে পারে না। বাঁজা, লাখি, রবাবের লাঠি, বড় বড় লোহার চাঙা, এসব ওদের অত্যাচারের অস্ত্র। সাইকেলের দু'বো আঁচলীর কথা তো বাসট দিলাম।

বেহেতু তুমি একজন রাশিয়ান, বেহেতু এখনও পৃথিবীর আলো-বাতাস তুমি পান্ন, বেহেতু তুমি ওদের বন্দী হয়ে কাজ করছো, সেই হেতুই ওরা তোমার ওপর নির্মম অত্যাচার অবাধে চালিয়ে বাছে। ওরা তোমার বিকৃত ভাবে দেখবার জন্তই ওরা তোমার মায়ের তোমার চলাকেবা এমন কি বৃষ্টি পর্বত বিকৃত করে দিয়ে তোমার প্রাণটুকুকে বের করে দেওয়ার জন্ত তোমার মায়ের। আমার মনে হয়, গোটা জার্মানিতে আমাদের সকলকে ঠেলে দেওয়ার মত চুল্লী নেই।

আমরা যেখানেই গেছি সেখানেই বাঁওয়ারাওয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত জব্ব। কোথাও আবার শুধু পরমজল দিয়েই সেরেছে, কোথাও আবার ভাও জোটেনি। এসব কথা না বললেও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। যুদ্ধের আগে আমার ওজন ছিল ছিয়ানী কিলোগ্রাম কিন্তু সে বছর শরৎকালে দেখা গেল পঞ্চাশ কিলোগ্রামও হলো না। কেবল, হাড় আর চামড়া। আর সেইগুলো বয়ে নিয়ে বেড়াবার মত বেটুকু শক্তির দরকার সেটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই অবস্থাতেই কিন্তু আমাদের বিনা প্রতিবাদে সমানে কাজ করতে হয়েছে আর সে এমন কাজ যে, গাড়ীটানা খোঁড়াতেও বোধ হয় অতখানি খাটতে পারে না।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকেই এক শ' বিয়ার্লিশ জন সোভিয়েত বুদ্ধবন্দীকে ওরা কাটারিনের কাছাকাছি ক্যাম্প থেকে ডেনডেনের ১৪ বি নম্বর ক্যাম্পে পাঠালো। সে সময় ওই ক্যাম্পটার আশ্রয়স্থল হাজার হাজার লোক ছিল। ওখানে আমাদের সকলকে একটা পাথরের খালে হাত দিয়ে পাথর কাটতে আর সেই পাথর ভাঙা করতে হতো। প্রত্যেকের জন্ত চার কিউবিক মিটার কাজ বাঁধা। ভেবে দেখুন, বাঁধা কোন রকমে প্রাণটুকুকে টিকিয়ে রেখেছে তাদের

পক্ষে এতখানি পাখর কাটা মানে কি অস্বাভাবিক ব্যাপার। লোকগুলোকে ইচ্ছাকৃত ভাবে মেরে ফেলা ছাড়া আর কি? আর নতি সত্যি হলোও তাই। আমাদের দলের একশ' বিদ্যালয় জমের মধ্যে ছ' মাস পরে দেখা গেল মাত্র সাতার জন জীবিত আছে। কি করে হলো বলুন তো দোস্ত। বুঝতে পারছেন কি ভাবে হত্যাকাণ্ড চলতো অর্থাৎ। আমরা কচিং আমাদের মৃত বন্ধুদের কবর দেবার সময় পেতাম। ওই সময় ক্যাম্পে একটা গুজব শোনা গেল। জার্মানরা স্তালিনগ্রাদ দখল করে সাইবেরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এইভাবে একটার পর একটা আঘাতে আমরা এত ভেঙে পড়েছিলাম যে মাটি থেকে ওপরে চোখ তুলতে পারতাম না। এই জার্মানীর মাটিতেই হয়তো আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেক দিন ওদের পাহারাওয়ালারাগুলো প্রচুর মন খেয়ে নিজেদের ভাবার বিকট চীৎকার করে গাম পাইতো, সব সময় হৈ-হুলা করে বেড়াতে।

একদিন সন্ধ্যায় কাজ থেকে কুঁড়েতে গিয়ে এসে দেখি, বৃত্তিতে আমাদের কখনগুলো সব ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। সমস্ত দিন খুলনায়ে বৃষ্টি হয়েছে। ঠাণ্ডার আমরা রীতিমত কাঁপছি। দাঁতের কাঁপুনি কিছুতেই বন্ধ হতে চাইছে না। কোথাও এতটুকু শুকনো বা গরম আরগা সেই বেখামে একটু দাঁড়াতে পারা যায়। তার ওপর ক্রিমের আলায় শরীরের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। অথচ সন্ধ্যায় আমাদের কোন দিন খাবার দেওয়া হয় না।

আমি কখনটা খাটিরায় ছড়িয়ে দিতে দিতেই বললাম: ওরা আমাদের দিয়ে দৈনিক চার কিউবিক মিটার করে মাটি পাখর কাটাচ্ছে কিন্তু এক কিউবিক মিটারই আমাদের পক্ষে কবর দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এ ছাড়া অল্প কোন কথা আমি বলিনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন অল্প কুকুরের মত ক্যাম্প-কমাণ্ডারের কাছে আমার মানে লাগিয়ে এলো। আমাদের ক্যাম্প-কমাণ্ডার জার্মান—নাম ফুলার। লোকটা বিশেষ লম্বা নয় কিন্তু বেশ মোটা। মাথায় শনের মত এক গোছা সাদা সাদা চুল। মাথায় চুল, চোখের পাতা, এমন কি চোখটা পর্যন্ত ক্যাকাশে। চোখটা আবার পিটপিট করে। আমার

আপনার মতই অনর্গল রাশিয়ান ভাষায় কথা বলে যেতে পারে। এমন কি ওর কথার মধ্যে আমাদের ভুল্পা অঙ্কলের চীনটাও শোনা যায়। লোকটা যেন ওই সব অঙ্কলের কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে কিম্বা বড় হয়েছে। দিব্যি দিতে লোকটা ওস্তাদ। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম হতভাগাটা এ বিজ্ঞা কোথা থেকে শিখলো? লোকটা থাকতো আমাদের কুঁড়েগুলোর সামনে। ডান হাতটা পিছন দিকে দিয়ে একগালা এস, এস, অকিসার সঙ্গে নিয়ে আমাদের সামনে ঘুরতো। হাতে থাকতো চামড়ার দস্তানা। আঙ্গুলগুলো ঠিক বাথার জন্তে চামড়ার নীচে আবার শীস দেওয়া। ও বখন ঘুরতো তখন সবাই ওর ওপর নজর রাখতো। সব সময়েই বলতো—তোমরা ইনস্পুয়েঞ্জার টিকা নাও। ওর কথামত বোজাই টিকা দেওয়া চলতো। আমাদের ক্যাম্পে মোট চারটি ব্লক।

প্রথম দিন ১নং ব্লকে টিকা দেওয়া হতো, তার পরদিন দ্বিতীয় নম্বর ব্লক, তারপর তৃতীয় এইভাবে একের পর এক চলতো। লোকটা মহা শয়তান। একদিনও কামাই দেওয়া চলতো না। কিন্তু একটা জিনিষ কিছুতেই গর্দভটার মাথায় চুকতো না। ওর পরিক্রমা আরম্ভ করার আগে আমাদের সামনে কাড়িয়ে প্রথমেই একচোট গালাগাল দিয়ে মিত। যা ওর মনে আসতো তাই বলে অভিশাপ দিত আর তাতে আমরা একটু শান্তি পেতাম। বুঝতেই পারছেন, ওই অবস্থায় শত্রুপক্ষের মুখে মাতৃভাষা শোনা মানেই খামিকটা প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়া। আর ওই কথাটাই ও যদি বুঝতে পারতো যে ওর এই অভিশাপ আর গালাগালি শুনে আমরা আনন্দ পাই, তাহলে আর কিছুতেই শয়তানটা কলভাষা ব্যবহার করত না। ওদের জার্মান ভাষাতেই টেঁচতো। আমাদের মধ্যে একজন যে বরাবর মস্তো থেকেই আমার সঙ্গে আছে, সেই ওর কমাণ্ডারের গালাগালে ক্ষেপে উঠতো। ও বখন গালাগালি করতো আমার সঙ্গীট বলতো—ওর কথা শুনে আমি চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকি, আমি যেন মস্তোতেই আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এক গ্লাস বীয়ার পান করার জন্তে উৎসুক হয়ে উঠেছি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

অনুবাদক—অলক সিংহ-চৌধুরী

সেই সূর্যের দেশে

Oh | The days are gone, when beauty bright
My heart's chain wove. (Tomas Moore)

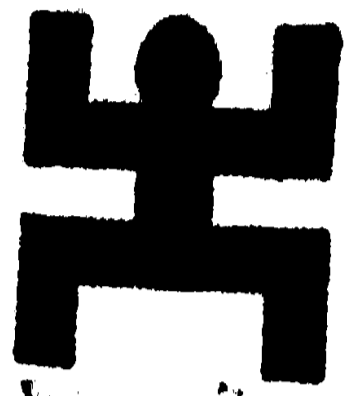
হায়রেছে সে রূপকথার দিন পোড়ামাটির পুতুলে—
হঠাৎ কখন চমকে উঠে মন, স্মৃতি খুঁড়লে পাইনা কোন হীরে :
সেদিন ছিলো অবনীন্দ্রনাথ, দিনের এবং রাতের উপকূলে
পট-পটে সে ছবি লিখতো, গালগরে, হাজার লোকের ভীড়ে।
এখন শুধু শব্দসাধনা, লক্ষ কাঁট সমস্ত শরীরে।

হে প্রিয় মোর বাঙলা দেশ, রবি ঠাকুর, রবীন্দ্র-সঙ্গীত—
অরণ্যের নির্বাসনে বৃকে অগছে বৌবনের লোকদৃগ-আলো
কালিন্দীর গহীন জলে কেঁপে উঠেছে দুঃখের প্রত্যুত :
“আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে,” সে আনন্দ সকালও
শূন্য বালুচরের সন্ধ্যায়, হার, নটে গাছটি মুড়ালো।

আমার প্রিয় বাঙলা দেশ, রবি ঠাকুর, রবীন্দ্র-সঙ্গীত—
ব্যঙ্গ করে গুরুর আকাশ, গুলির মোড়ে ব্যর্থ বিলাপ-গীত।
হায়রেছে সে রূপকথার দিন পোড়ামাটির পুতুলে—
হঠাৎ কখন চমকে উঠে মন, গোলাপকাঁটার বেঁধা মন, কীদছে

দুলে-দুলে।

অনুবাদ : অবিনাশ রায়।



लेखनीबिलाप

तेल

ए.ए. क्यू काउंटर प्रिंटेड लि.
नवीनवाट घाट, बकिवाडा-२



শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চিক আমি, জগৎ জুড়ে আমার ঘর আছে। বহু ঘরের
চেয়ে পথই আমার আপন, তাই জীবনের একমাত্র
আকাঙ্ক্ষাকে সত্যে পরিণত করলাম ১৯১৮ সালে।

সামান্য আসবাব নিয়ে আমি হলাম স্বপ্নের অভিযাত্রী। বিশেষ
কিছু প্রমাণ-পত্র না নিয়ে খেয়ালের বশে বেরিয়ে পড়েছিলাম বলে
নানান বাধা এসে ভীড় জমাল, কিন্তু বাধা যেমন এসেছিল, প্রবল
ইচ্ছার কাছে সে সব কোন দিকে চলে গেল। ছাড়পত্র জোগাড়
করতে বেশী দেরী হয়নি। বুকলাম ইচ্ছা থাকলে উপায় সত্যিই হয়।

আর একটা কথা বলা দরকার, নইলে বলার কোন সার্থকতা
হয় না। বঙ্গ শিশু বিজ্ঞান্যের (বালী) ৫ম শ্রেণীতে ভূগোল মাস্টার
মশাইয়ের কাছে ভূপর্ধ্যটক রামনাথ বিশ্বাসের দুঃসাহসিক ভ্রমণের
গল্প শুনি। আফ্রিকার গহন অরণ্যে এই বাঙ্গালী পর্যটক যেভাবে
পর্যটন করেন, তাই থেকে আমি প্রেরণা পাই।

আলোচ্য প্রবন্ধে পর্যটক বিশ্বাসের ভ্রমণের কিছু আলোচনা
করতে বসিনি, নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কাহিনীতে
যে সব উল্লেখ করে গেছেন সেটুকু যে কত উপকারে এসেছে বা বলার
শেষ নাই।

একটি পরমা না নিয়ে সাইকেল যোগে তিনি সারা বিশ্ব টহল
দিয়ে অজানাকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন,—তাই প্রতিটি
ভারতীয়ের কাছে তিনি নমস্কার।

তাঁর নির্দেশিত কয়েকটি কথা আমি সর্বদা স্মরণ করে চলতাম।
প্রতি স্থলে, সংস্কার, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট আমার বক্তব্য
পেশ করতাম। পারতপক্ষে বতরুকু সাহায্য তাঁরা করতেন, তাতেই
আমি এগিয়ে যেতাম। কারণ আমিও ছিলাম কপর্দকশূন্য পর্যটক।

যাত্রা শুরু করেছিলাম শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে।
মুখের শহরতলী পার হয়ে নিম্ন পল্লী-বাংলার শ্রামিকদের ছায়াধন
পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চললাম।

বর্ষা ধুয়ে মুছে সাক করে গেছে, শবৎ দিয়ে গেছে সবুজ
শস্তরাশি; হৈমন্তিক আমেজ-স্পর্শ লেগে সেগুলি গেরুয়া রং-এ রাস্তা
হয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। আগমনীর সুর আর বাজছিল না, নবায়ের
নেমন্তর পাঠিয়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে। ক্রমে পৌঁছলাম শিল্প-
সঙ্গীর কর্ণশালার, ক'বছর আগে দিনের আলোতেই খেয়াল ডেকে
উঠত, আর আজ ষ্টল প্রোজেক্টের চিমনীকে কেন্দ্র করে মুখরিত হয়ে
উঠেছে পরীপ্রকৃতি।

কলকার দেশ তার পাশেই—সত্যতা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য হাজার
হাজার মনুষ্য হিরণ্যত মরণ-গহ্বরে নাবছে—আর উঠছে।

তারপর বাংলা-মায়ের শ্রামল সৌন্দর্যের দিকে শেষ চাউনি মেলে
বিহারে চুকলাম। গোবিন্দপুর থেকে রাস্তাগুলির দূরত্ব লিখে নিয়ে
দক্ষিণ বিহারের পার্বত্য অঞ্চলে পাড়ি জমলাম।

ধানবাদ, ঝরিয়া তারপর পুকুরিয়া পার হয়ে যে রাস্তাগুলি
আমাকে চলতে হয়েছে এবং চলতে গিয়ে যে যে বাধার সম্মুখীন হতে
হয়েছিল, তার কয়েকটি বিবরণ আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখ করব।
তার আগে দূরত্বটা একটু জানান দরকার—নইলে বলার কোন অর্থ
হয় না। কোলকাতা থেকে দিল্লী জি. টি. রোড ধরে দূরত্ব ৮৮৫
মাইল। গোবিন্দপুর থেকে ঝরিয়া সিন্দী পুকুরিয়া বাঁচি ও
হাজারীবাগ হয়ে পুনরায় জি. টি. রোডে আসতে দু'শ' মাইল আরও
বেশী হাঁটতে হয়েছিল। বাঁচি থেকে রামগড় পৌঁছানোর সময় প্রথম
বাধার সম্মুখীন হলাম। জংগলে ভর্তি পাহাড়ের পাঁচিলঘেরা এক
ফালি পীচের রাস্তা, দুটি জেলার সদরকে এক করেছে। বাঁচি আর
হাজারীবাগ যেখানটার মিলেছে সেখানটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪১১
ফুট উঁচু এবং ক্রমশঃ উঁচু হয়েই এগিয়েছে।

এ পথে নবখানকের মুখে পড়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়। বহু
রাজনীতিক শ্রীঅতুল ঘোষ মশাই এ কথা বলে বার বার লাবধান
করে দিয়েছিলেন। বতটা সম্ভব সতর্ক হয়েই চলতাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও
বিপদ একদিন এসেই। রাস্তার পাশে একটা বাছুরের ঠাঁ নিয়ে
ছুটো নেকড়ে দিবি চিঝুছিল। হাত পকাশেক ব্যবধান তাদের
থেকে। ভয়ে বুক দুক দুক করে কেঁপে উঠল। ব্যাগগুলো একটা
গাছের ডালে ঝোলালাম—হাতের লাঠিটা আঁট করে ধরে পাহাড়ের
নীচের দিকে নামতে চেষ্টা করলাম—নীচে সাঁওতালদের বস্তি দিবি
লক্ষ্য করা যায়—তখনও তারা (নেকড়েরা) আমার লক্ষ্য করে নাই।
যখন লক্ষ্য করল তখন আমার অবস্থা একেবারে কাহিল হয়ে
এসেছে। ছুঁটো নেকড়ের সঙ্গে লাঠি নিয়ে পেরে উঠা কখনও
সম্ভব নয়, তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে গড়-গড় করে গড়িয়ে গিয়ে
একটা গাছের গোড়ায় আটকে গেলাম। বিকট চিৎকার শুরু
করেছি তখন, হাত পা ছিঁড়ে রক্তারক্তি হয়েছে। চিৎকার শুনে
ছুটে এল বস্তির লোকেরা, দৈবক্রমে বাঁচিগামী একটি লরীও
ততক্ষণে এসে পৌঁছেছে। উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম।

এর পর কানপুর পর্যন্ত আর কোন বিপদের মুখে পড়িনি,
কিন্তু কানপুরের বাবলাবনে জনকয়েক ছবুস্তের হাতে পড়লাম,
টর্চ নিয়ে রাস্তা আগলে দাঁড়াল—কেরীওলা ঠাউরে ব্যাগগুলো
তখনই করে যখন কিছু পেল না, পকেট হাতড়াতে শুরু করলো।
এক টাকা লাড়ে ন' আমা তাও কেড়ে নিল তারা। অগত্যা কানপুরে

উপবাসে কাটল সে রাতটা। সকালে সেলাম মতিমহল সিনামায়, ম্যানেজার ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার পরিচিত, হঠাৎ আমার এ ভাবে দেখে তিনি প্রথমে বিস্মিত হলেন—পরে বতহর সাহায্য করা ব্যর্থ করলেন তিনি। এদেশের উপযোগী কিছু শীতবস্ত্র তিনি দিয়েছিলেন। আমি যে দিন কানপুরে পৌঁছাই, এলাহাবাদ থেকে অনুভবাজার পত্রিকা খবর ছাপল "কানপুর ভারতের সব থেকে বেশী ঠাণ্ডা নগর" (৩।১২।৫৮)।

কাজেই তখন শীতবস্ত্রের যে কি প্রয়োজন হবে পড়েছিল তা বলাই বাহুলা। তাছাড়া কিছু অর্থসাহায্য দিয়ে তিনি এগিয়ে দিলেন দিল্লীর দিকে।

কানপুর থেকে ৫৪ মাইল দূরে সৌন্দর্যাময়ী লাখনৌ। উত্তর-প্রদেশের প্যারিস লাখনৌ শহর দেখে মনে আবার উৎসাহের বজ্রা বইল। ফিরে এলাম আবার কানপুরের দিকে। কানপুর থেকে ১৪ মাইল দূরে এসে একটা গ্রামে জি. টি. বোর্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেলাম করোজ।

ইতিহাসের এক অমর অধ্যায় নিয়ে করোজ আজও বেঁচে আছে। পৃথিবীজ-সংস্কৃত্য পালনা করে শেষ হয়ে গেছে,—কিন্তু করোজে এসে ইতিহাসের সেই দুটি মুখ মনে পড়ে গেল।

কেঙ্গার উপর এখন কপির চাব হচ্ছে—মার সেই সুড়ঙ্গ রাস্তা দিয়ে হু হু করে মোটর ট্রাকের লাল ধূলা উড়ান দেখে সেদিনকার কথাগুলি মনে পড়ছে; ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে কত বীর বোড়া ছুটিয়ে লাল ধূলা উড়িয়ে মুগ্ধিত করত, কত সৈনিকের কূচকাওয়াজ শ্রবিত হত, আজ কেবল বাহুড় চামচিকা ছাড়া কিছুই নাই।

করোজের পরে এলাম ডুনগাঁওতে, এখান থেকে আগ্রা মথুরা রোড ধরে বহুনা-ব্রীজ পার হয়ে আগ্রায় এসে পৌঁছলাম। বহু প্রত্যাশিত তাজমহলের সৌন্দর্য্য চোখ মেলে দেখে খেয় মেটলাম। তাজমহলের মিনারগুলি তখন কাটা হচ্ছিল—তারই গোটা হু'এক টুকরো ব্যাগের মধ্যে কুড়িয়ে নিলাম—তারপর ফতেপুর সিক্রী সেকেন্দ্রা, ইন্-মদ উল্লা দেখে সেলাম মথুরা, বৃন্দাবন ও কোম্পী, ওখান থেকে আবার দিল্লী অভিমুখে রওনা হলাম। ২৬শে জাহ্নবারী প্রায় তিনটের সময় রাজধানী দিল্লীতে পৌঁছলাম। হু মাস পঁচিশ দিন অপ্রান্তভাবে হাঁটতে হাঁটতে প্রজাতন্ত্র দিবসের বৈকালীন মেলা দেখবার সৌভাগ্য হল। তা'ছাড়া পার্লামেন্ট ঘরের ভিতরও হুকবার সৌভাগ্য হয়েছিল—অতদিন পার্লামেন্ট দেখতে হ'লে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়—কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবসে ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত পার্লামেন্ট অব্যাহত-ধার। রাজধানীতে পৌঁছে আবার বিপদের সম্মুখীন হলাম। সারা শহরের আনটো কানাচে জরে গেছে নানান প্রদেশের লোকে, কোথাও তিল ধারণের আয়না নাই। কালীবাড়ীতে পত্রপাঠ জবাব, বিড়লা মন্দিরেও তখৈব চ। কাজেই কুটপাত, কিন্তু বিধি বাম। বর্ধণ শুরু হল—জাহ্নবারীর ঠাণ্ডা এ দিকের যে কি ভীষণ তা তুলুজোসী ছাড়া বোঝান কঠিন—তার উপর ঠাণ্ডা হাওয়া আর সুবলধারে বৃষ্টি। কট্রের কাহিনী লিখে জানাতে পারছি না। বহু সাধ্য সাধনার পর বিড়লা মন্দিরে চাতালে কোন রকমে একটু স্থান হল। রাত কাটলাম। পরের দিন করোয়েশনে গিয়ে মেঘের জীবন্তী অক্ষয় আসক আলির সঙ্গে দেখা করলাম এক তিনি সব দিক দিয়ে আমার সাহায্য করলেন।

তারই সৌভাগ্যে দিল্লীতে প্রায় ১৫ দিন কাটলাম। কপীর হানগুলি দেখে, খুলে পাঠপালে আমার ভ্রমণ কাহিনী তনিক্তে আবার কোলকাতায় ফিরে এলাম।

কোলকাতায় পৌঁছানোর আগেই তুমলাম, চ্যানেল সীতারক ঈমিহির সেন পর্যটকদের জন্ত একটা সংস্থা খুলবেন ঝল ঠিক করেছেন। বোগাবোগ করলাম পর্যটক সংস্থার সঙ্গে। তখন সংস্থার নামকরণ হয়েছে "সংঘম অভিবাত্রী" "সংঘম" খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঈসেন আমার জন্ত একটা চাকরীও ঠিক করে দিলেন।

আবার হু'মাস কোলকাতার কলরবে মিলিয়ে সেলাম ১৭ নভেম্বর এলো। শীতের হাওয়া ক্রমশঃ বইতে শুরু করলো। আবার কে যেন ভাক মিল সুদূরের পানে। ১৩ই নভেম্বর ১৯৫৯ সালে আবার পাড়ি জমালাম—উত্তরবঙ্গের দিকে। এবারে বাত্মা শুরু করলাম বালী বিবেকানন্দ ব্রীজ থেকে। প্রথম দিনেই এক লোমহর্ষক ছুঁটিনা দেখে ভয় পেল, কিন্তু অভিবাত্রীদের ভয়ে পেছনো উচিত নয়, এগিয়েই ছিলাম।

ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে N. H. W 34 এর উপর পৌঁছালেই একজন মারওয়ার্ডী উকা পবিত্রে পাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। মনে হল এই বুরি কোথায় কোন বিপদ বাধিরে বসে। হনুত তাই, হু'পালে লাল ধূলা উড়িয়ে একটা কংক্রীটের ব্রীজের উপর বারলো এক বাত্মা। সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল দাবী পাড়ীটা। ভাইভারকে পাশে বসিয়ে পাড়ীর মালিক নিজেই পাড়ী চালাচ্ছিলেন। কাজেই ঈয়ারীং-এর সঙ্গে বাত্মা লেগে সুখটা বিকৃতি হয়ে গেছে। সর্বোচ্চ যত্নের দ্বারা বইতে লাগল। এরই মধ্যে একটা ছেলে কেমন করে ছুঁটিনা থেকে রক্ষা পেল সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। পাড়ীটা যখন ব্রীজটার কাছে এলোমেলো ভাবে ভীষণগতিতে এসে বাত্মা মারল ঠিক সেই মুহূর্তে ব্রীজটার উপর উঠে এক লাক মারলো, পড়লো একটা এঁদের পুকুরে, কাঁটার ভর্তি ছিল পুকুরটা। রক্তারক্তি হয়ে উঠে এলো কিন্তু মরণের হাত থেকে বাঁচল। মারওয়ার্ডী ভয়লোক জীবন ফিরে পেলেন কি না সন্দেহ। ইতিমধ্যে পাড়ীর ভীড় জমে গেল। পাড়ীর মালিককে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল পাঠান হল। জানি না জয়লোক বেঁচে আছে কি না! এই ঘটনাটি কিন্তু আমার চিরদিন মনে থাকবে—কারণ বৃত্ত্যবৃত্তের মত আমাকেও বাঁওয়া করেছিল, একটুই জন্ত আমি বেঁচে গিয়েছিলাম।

কাঁকা বাত্মা পেয়ে লম্বী ট্রাক বা প্রাইভেট মোটর পাড়ীগুলি যে বিপৃথল ভাবে ছোটো তা দেখে মনে হয় ছুঁটিনা জরা ইছা করে থেকে আনে।

N. H. W. 34 ধরে বতই এগিয়েছি, প্রত্যেক দিন অন্তত হু' চারটে ছুঁটিনা নজরে পড়েছে। হয় পাছের সঙ্গে বাত্মা লাগিয়েছে না হয় ওতার ঠেক করতে গিয়ে পরস্পর বাত্মা খেয়ে ছুঁড়ে পড়েছে। তা ছাড়া গরু, বাছুর কুকুর ছাপল প্রতিদিন মোটর পাড়ীর চাকার পিট হয়ে ম্যাট হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখেছি অসংখ্য সাপ ও ভেঁকড় চাকার পিবে পিচের সঙ্গে এঁটে গেছে।

ভুরাসের চা-বাগান দিয়ে চলতে চলতে বাত্মার ধারে যে সুন্দরী পাছগুলি দেখা যায়, ঐ পাছের ভালে পাক খেয়ে কাল মত সাপগুলি পাছের সঙ্গে মিলিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে ঐ পাছের ভাল থেকে

হাতার উপর লাকিরে পড়ে এক ঐতলিই লরীর চাকার পিঠ হয়ে যায়।

এবারের ভ্রমণে আরও কিছু দেখতে পেয়েছিলাম। তা না বলে থাকতে পারছি না, গত বছরের বত্ৰা সফরে কিছু উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও যা দেখেছি সে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। বানের তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু প্রায় নাচনের তখনও শেষ হয় নাই। বানজেলের কোন চিহ্নই ছিল না। বড় বড় গাছগুলো নেড়া হয়ে গাঢ় হয়ে মড়ার মত সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে পড়ে গেল বন্ধিমের আনন্দমঠের কথা। সর্বপ্রাণী বন্ধার কলে আনন্দমঠের চেহারাটা আবার ফুটে উঠেছে বাংলার গ্রামে গ্রামে। মারী আর মহামারী তার পিঠে পিঠে এসেছে। এ সাজান কথা নয় চোখের দেখা, যা দেখেছি একটুখামি বলে এ প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ টানবো।

সেদিন আমি কুসনগর থেকে মাইল ১৫ দূরে বাদকুলা গ্রামে রাত কাটাই। গ্রামবাসীদের কাছে আমার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাকে তাদের গ্রামের ক্লাবঘরে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দেন, প্রচুর উপাদানের ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা আমাকে আপ্যায়ন করলে, ক্লাবঘরের বাইরে একটা চাপা কান্না তখনতে পেয়ে টর্কটা ঝেলে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম : মুসুবু সন্তানের শিয়রে এক হতভাগ্য সম্পতি। শেষ সফলটুকুও বানের জলে ভেসে গেছে তাদের, এই হল ছেলোটিকে নিয়ে ক্লাবঘরের রকে আশ্রয় পেড়েছে। ক'দিনই পর পর ভিজে ছেলোটির অবস্থা ক্রমশঃ ধারাপের দিকে চলেছে, বতদূর সম্ভব তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে সর্বস্বহারা বাপ-মা। শেষ রক্ষা করতে হয়তো পারবে না—সেই দুশ্চিন্তায় তারা ভেঙে পড়েছে। সাধনা দেবার ভাবা পেলাম না আমি তাদের দেখে।

পাশের একটা ভাঙ্গা হুলঘরে কতকগুলি হতভাগা সর্বস্বহারা কুকুর-কুঙলী পাকিয়ে পড়ে আছে। কে কার খোঁজ রাখে। এরা অধিকাংশ উদ্ভাস্ত, এদের থাকবার যে কলোনী তৈরী করা হয়েছিল, বানের দাপটে সেগুলির চিহ্ন বড় একটা নাই বললেই চলে। কড়ের মুখে আর বানের শ্রোতে কোথায় ভেসে গেছে, বার কোন চিহ্নই নাই। যেগুলি তখনও নিশ্চিহ্ন হয় নাই, সেগুলি শূন্যের কুঁড়ের পরিণত। পাক পচে হুর্গন্ধে বাতাসকেও বিবাক্ত করে তুলেছে। মাহুবকে বিব খাইয়ে মরতে বলতে পারা যায় কিন্তু ওখানে মাহুবকে বাস করতে বলা যায় না।

মাহুকের এই হুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে একদল হুর্ভুক্ত এই কঁাকে বেশ কিছু লুঠে নিচ্ছে। চাকরীর প্রলোভন দেখিয়ে এমন কি কুমারী মেয়েদেরও সর্বনাশ করছে। এ কথা চাকদার মোড়ে একজন সর্বস্বহারার সঙ্গে আলোচনা করতে করতে জানতে পারলাম। জল্পসোক আরও বললেন, শিয়ালদহ ষ্টেশনে বড় কারবার আছে বলে একজন জল্পসোক তাঁকে প্রলোভিত করেন। তাঁর ভগিনীকে সেলুম্যানের কাজ দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। দক্ষিণ লোককে এই ভাবে প্রলোভিত করা খুব অসম্ভব নয়—কাজেই নারকীয় পরিণাম হল এই ঘটনার। হু'দিন ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করার পর আর পাত্তা পাওয়া গেল না। শেষ সর্বাঙ্গ বললেন : নিবিষ্ট গতিতে নারকীয় কর্তে লিঙ্গ তার জগিনী। হুঃখে, দায়িত্ব্য ও প্রকৃতির পীড়নে আজ

আমরা কোথায় নেমেছি—হাতার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। ক্রমে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ পার হয়ে পৌছালাম ধুলিয়ান ঘাটে। জলদী ও পাগলাচণ্ডী ইতিমধ্যে পার হয়েছি—এসব নদী পার হতে কোন বাধা নাই, কারণ ওগুলির উপর ত্রীজ আছে। কিন্তু ধুলিয়ানে বার মাইল পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গা বা পদ্মা। ধুলিয়ানে লড়ে চড়ে বসলাম, ঘটা আড়াইয়েক পরে খেজুরীয়া ঘাটে পৌছালাম। করাচী ত্রীজ এখানে হবার কথা হচ্ছে—জনলাহ। তা হাড়া মতগেল লাইন বসাবার তোড়জোড় হচ্ছে, তাহলে অভ্যন্তর জেলার সঙ্গে মালদহ জেলার বোগাবোগের জন্ত এ হাতার বিশেষ প্রয়োজন। তা হাড়া এখানের ত্রীজটির সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করা। গঙ্গার উপরের শ্রোত ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে গেছে। মোকামার ত্রীজ হবার পর আরও শ্রোত কমে আসছে। এদিকে বঙ্গোপসাগরের নোনাগুল চুকে ক্রমশঃ চড়া পড়ে যাচ্ছে, কাজেই করাচী বীধ অবিলম্বে প্রয়োজন—এটির জন্ত এ এলাকার লোকে ব্যাকুল ভাবে চেয়ে আছে। এ অঞ্চলে হাড়া ঘাট বে কি প্রয়োজন দেখলেই বোঝা যায়। রেশম, আম এ জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, এ কথা না বললে মালদহ জেলার কিছুই বলা হয় না। চার দিকে আমবাগান মালদহ জেলার অমূল্য সম্পদ তা হাড়া গুটি পোকের চাব এ জেলার উল্লেখযোগ্য শিল্প। এ চাব করার সুন্দর কৌশল দেখলাম গৌড়ের এক কার্ণে। ছুঁত গাছের পাত্তা খেয়ে এই পোকগুলি বেশ বড় হয়। বার বত বেশী ছুঁত ক্ষেত আছে সে তত বেশী রেশম প্রস্তুত করতে পারে এবং এ নিয়ে আরও গবেষণা চলছে।

গৌড় ও পাণ্ডুর ধ্বংসাবশেষ দেখলেই সে পুরানো স্মৃতিগুলি আমাদের মাহুখ পটে ভেসে ওঠে। সরকারী ব্যবহার এগুলি সুন্দর রাখা হয়েছে।

এর পর দিনাজপুর জেলা পার হয়ে পড়লাম ডুরাসে। এ সব অঞ্চল আগে ভূটানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। পরে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে ভূটানের এক চুক্তি বলে বৃটিশ সরকার এ অঞ্চলের শাসন ভার গ্রহণ করে এবং প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ভূটান সরকারকে দিতে স্বীকৃত হয়। স্বাধীনতা পাবার পর ভারত সরকার আরও চার লাখ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এ অঞ্চলে কয়েকটি পাহাড়ী নদী আছে, সেগুলির দাপটে উত্তরবঙ্গ কেঁপে উঠে। অল্প সময় এর উপর দিয়ে মাটি কেলো কাঁচা পুল তৈরী করে অনাহাসে মোটর ট্রাকে চলাচল করে। বর্ষাকালে হু'কুল ছাপিয়ে যায়, টানের চোটে গাছপালা বাড়ী ঘর কোথায় যে যায় তার পাত্তা থাকে না। পাহাড়ী নদীগুলির কি ভীষণ টান তা তেরবা, তিত্তায় চান করে দেখেছি। বর্ষার মৃষ্টি করণা করা কঠিন।

ডুরাস, তরাই ভারতের মধ্যে ভারতের জঙ্গল এ জঙ্গলে বাঘ, গণ্ডার, হাতী ও অজগর মুড়াহুত্তের মত ঘোরাকেরা করে, কত শিকারীদের বে ঘায়েল করে তার ইয়তা নাই।

এখনও বহু হুর্ভটনা অনবরত ঘটে। এক ডুরাসবাসীর কাছে জনলাহ বে সে কমলালেবুর সিঙ্গিনের সময় পাগলা হাতীর কবলে পড়েছিল তার কাছে শোনা গল্প থেকে একটু উদ্বুদ্ধ করে যদি শোনাই তা হলে বুঝতে পারা যায় এদের আক্রমণ কি ভীষণ। এদের হাত থেকে পরিজ্ঞাপ পেতে হলে গাছে চড়া হাড়া উপায় নাই। কিন্তু যেমন তেরম গাছে উঠে পরিজ্ঞাপ পাওয়া

যায় না; গাছের ভাঁড়ি যদি শক্ত ও মোটা হয় ভাল-পালা যদি ওদের নাগালের বাইরে থাকে, হাতীর আক্রমণ থেকে তবেই যেহাট পাওয়া যায়। তা ছাড়া ওরা ভীষণ একত্রে, শত্রুকে ঘারেল করবার জন্য ওরা সপ্তাহকাল অপেক্ষা করে। এবং ওদের ভরণ থাকে যে গাছের উপরে শক্ত আছে। এর ব্যতিক্রম হলে হাতীর পালার পড়ে ক্বিরে আসার সৌভাগ্য কদাচ দেখা গেছে বলে মনে হয় না। হস্তী সবক্কে ডুমারস'বাসী আরও বলে চললেন যে এদের যৌন সংগম আজ পর্যন্ত কেহ দেখেছে বলে তিনি বলতে পারেন না, যৌর অমাবস্তার রাত্রে গভীর জঙ্গলে এদের যৌন সংগম হয়। কেও অপেক্ষা করলে হস্তিনী তা বুঝতে পারে। পুরুষ হস্তী শত্রুর সন্ধান করে হয় তাকে বিতাড়িত করে না হয় বধ করে পুনরায় তাদের কাজে লিপ্ত হয়। যদি সন্ধান করতে না পারে তাহলে দ্বী-হস্তী উন্মাদিনী হয়ে সারা জঙ্গলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। লজ্জাশীলা হস্তিনী তখন দিক-বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। ঐ অঞ্চলের গণ্ডার আমি নিজে চোখে দেখেছি। সোনাপুর হাটে এক হোমিওপ্যাথী ডাক্তার বাবু থাকেন। দিনের বেলায় ঔষধ দেন রাত্রে ছাত্র পড়ান, তাছাড়া পুস্তক শিকারী তিনি। চামর চি পাহাড়ের নীচে এক গভীর জঙ্গলে গণ্ডার দেখালেন।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে গেলাম ডুমারস'র ভয়ংকর জঙ্গলে। যে কোন সময় মরণের জন্য তৈরী থাকতে হয়েছিল কিন্তু তাহলেও আশ্চর্যকর জন্ত ছিল ছুটো খারালো ছোরা। একটা মোটা শাল গাছে দুজনে উঠে পড়ে হাতের টর্চ দুটো খুব জোরে নাড়া দিলাম, বিছাতের মত ছুটে এল একটা পাহাড়ের মত জীব। এসেই ঢৌ মারলো একটা গাছে, তারপর শরীরের বত শক্তি ছিল আহির করে সারা জমিটাকে তোলাপাড় করলো। বস্টাখানেক চেঁচীর পর ক্লান্ত হয়ে ক্বিরে গেল। শুনলাম ওরা শিকার করতে না পারলে তাড়াতাড়ি পালায়। হাতীর মত একরোখা নয়। প্রায় বটা ছুরেক পরে আমরা ফের নেমে সম্ভরণে ক্বিরে এলাম। গণ্ডারের মূর্ত্তি চাক্ষুব টর্চের আলোর দেখে আশ মিটলো। আরও গভীর জংলা পাহাড়ী পথ ধরে চলেছি কিন্তু কোন হিংস্র জন্তর সাক্ষাৎ পাই নাই।

যোগী হপা সোয়াল পাড়ার যৌর জঙ্গল দ্বিরে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত আমার চলতে হয়েছে। মাঝে মাঝে জংলা পাহাড়ীদের ভাড়া খেয়েছি,—কিন্তু বস্ত্র জন্তর দাঁতখঁচানি সহ করতে হয় নেই। দৃঢ় মনোবল প্রচুর সাহস নিয়ে এগিয়েছি, কোথায়ও অবধা খাবড়ে বাইনি। ভয় যেখানেই লেগেছে তার কিনারা করেছি—দেখেছি সত্যিই কিছু ভয়ের আছে কিনা। ঐসব যুক্তির কিছুই চলল না এখন গৌহাটি থেকে শিলা বাছিলাম। শিলা শহর গৌহাটি থেকে ৩৩ মাইল দূরে, সন্ন্যস্তল থেকে ৪১০৮ ফুট উঁচুতে। পাক খেতে খেতে কেবলই উপর দ্বিরে উঠে গেছে রাস্তাটা। এ রাস্তাটি একমুখো, কারণ প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটতো এ রাস্তার, তাই শিলা আর গৌহাটি শহরকে যোগাযোগ করতে কর্তাদের দিন রাত পরিশ্রম করতে হয়। শিলা থেকে বাস ট্রাক আইভেট পাড়া এক সঙ্গে পকাশ বাটটা ছাড়া হয়। জ্বাকার সঙ্গে সঙ্গে সবার বাতলে টেলিকোন করে নংপোতে,

অল্পকপ গৌহাটি থেকে টেলিকোন করে জানার নংপো পুলিশকে; গাড়ীগুলি পরস্পর সন্মুখীন হলে তবে ছাড়া হয়। দিনে হ'বার, রাত্রে হ'বার এ ভাবে ছাড়া হয়। গাড়ীগুলি চলে যাবার পর পাহাড়ঘেরা জংলা রাস্তার নিজেকে যে কি অসহায় অবস্থার পড়তে হয়েছে তা জানাবার ভাবা আমার নাই। তবুও প্রথম দিনের ঘটনাকে বস্তদূর মনে পড়ছে তা বলে বাই।

গৌহাটি থেকে সকাল সাতটায় বাত্রা করলাম শিলা উক্কেতে, গৌহাটি থেকে মাইল আঠেক দূরে এগিয়ে যাবার পর পড়ে একটা গেট। রাস্তাটা দু'ভাগ হয়েছে এখানে, বাঁদিকে নংগাঁ হয়ে ডিক্রপড় দিকে গেছে। আর এক দিকে গেছে শিলা—জোয়াই চেরাপুছি হয়ে একবারে মনিপুর। গৌহাটি থেকে নংপো প্রায় ৩৩ মাইল। মাঝে পড়ে জোড়াবাত "কুট কন্ট্রোল সেক্টর" কয়েক মাইল জুড়ে আছে কমলা লেবুর বাগান, লেবু তুলে এই ঘরে জমা রাখা হয় এক বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হয়। আরও কিছু দূরে পড়ে "অনটু প্রোজবক্ট" এখানে এসে অনটু নদীতে নান সেরে একটা দোকানে কিছু খাবার খেয়ে নংপোর দিকে এগিয়ে গেলাম। নংপো শৌহাতে বখন ৭ মাইল বাকী তখন সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যা হবার পরই অন্ধকার এত ঘনিয়ে এল যে রাস্তার উপর কিছু দেখা যায় না, একসেল টর্চটার রাস্তা দেখতে দেখতে ক্রমশঃ এগুছি। রাস্তার বাঁ পাশে উঁচু পাহাড়, ডান পাশে গভীর খাদ; মাঝে-মাঝে বর্ণীর স্বরকর শব্দ। ভাল তো লাগছিল, সেই সঙ্গে ভয়ে সর্বস্ব ভয়ংকর কাঁপছিল। বখন "হাড় গিলে কংখল" গুলো বিকট আওয়াজ করে উঠছে; সর্বস্ব ঘামে নেয়ে বাছি উত্তেজনার; এই বুরি লাগিয়ে পড়ল হালুঘ করে। পর মুহূর্ত্তে আবার চিত্তার গতি অন্তদিকে ঘুরে বাছে। আবার কিছুকপ ডাকছে আবার ভয়ে সারা শরীরটা ঠক ঠক করে কাঁপছে।

অন্ধকারে সর্বস্ব পাহাড়ের কোণ বেঁবেই চলবার চেষ্টা করছিলাম। রাস্তার উপর কাঁকর হুড়ান আছে পাছে গাড়ীর চাকা পিছলে পড়ে যায় বলে কিন্তু মানুষের পা এতবেশী পিছলার, আমিও একবার পিছলে পড়লাম বড়াস করে। যদি বাঁদিকে খাদের দিকে গড়িয়ে পড়তাম তাহলে হয়তো আমার কোন হমিশ কেউ কোনদিন বার করতে পারত না। কিন্তু আপেই আমি বলেছি রাস্তার ডান দিকে চলছিলাম। জোরে আহড়ে পড়লাম কাঁকরের উপরে, কাঁধের উপর প্রায় ১৬ পাউণ্ডের বোকা, তার উপর নিজের একটা ওজন আছে; কাজেই আর একবার সর্বস্ব হস্তারক্তি হয়ে গেল। খিদের নাড়ী ভুড়ি চুঁই চুঁই করছে, বিক্রার হয়ে গেল জীবনের উপর। এসময় জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ী রাস্তার সকলের অজান্তে কেঁদে কেঁদলাম, এর আগে বখন আরও বড় বড় সমস্তার পড়েছিলাম কিন্তু চোখে কোনদিন জল পড়ে নাই, রাত তখন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে ভয় আরও বাড়ছে, অপরিচিত জায়গা তা ছাড়া পাহাড় আর জঙ্গলের সঙ্গে পরিচয় কতটুকু? কিই বা জানা আছে এ অঞ্চলের সম্পর্কে। কোলকাতার মত কলরব সুখরিত সহরের সঙ্গে কল্যকাল থেকে যাদের পরিচয়, নিবুম পল্লী অঞ্চলে যাদের বনবাস বলে মনে হয়; তাদের কাছে এ অরণ্য কত দুর্গম তা বোধ হয় লিখে জানাতে হবে না। এততে এততে কেমন বেশ একটা উন্মাদনা এসে সারা শরীরটা মাড়া দিল। চারের

লাকটা থেকে কতকটা চা টেলে খেলার, সিগারেট ধরানোর একটা, এর পর মা ঠৈঃ বলে এগিয়ে গেলাম। ভয় পেলাম না আর।

এর নটার সময় নংপোতে পৌঁছলাম। পাহাড়ের উপর নংপো জায়গাটি একটি চটির মত। এখানে খানা আছে। সংযুক্ত খাসিয়া-জয়ন্তীরা পাহাড়ের খানা নংপো। এর পর শিলং যেতে আর রাত না হলেও কষ্ট বোধেই হয়েছিল। কারণ তার আগের দিনেই শরীরের উপর দিয়ে বে অত্যাচার হয়েছে এবং হাঁটুকান্টু ছড়ে বে ভীষণ ব্যথা হয়েছিল সেইজন্য আরও কষ্ট হচ্ছিল তার পরদিন নয়। বাংলোর এক খাসিয়া বস্তিতে ডেরা গাড়লাম। খাসিয়াদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেল। এদের পুরুষেরা অধিকাংশ থাকির হাকপ্যাট আর কালো কতুয়া পরে, মাথার কালো কেজের মত টুপি একটা জাঁটে, কতকটা নেপালীর মত কিছু লম্বা টিকি এদের মাথায় নাই। এ রকম পোষাক গারো, লুসাই, খাসিয়া জয়ন্তীরা, মণিপুরী ও নাগাদের মধ্যে চলন আছে। বারা লেখাপড়া শিখেছে তাদের সাধারণতঃ কোর্ট প্যান্ট পরতে দেখেছি। মেয়েদের পরিচ্ছদ তাজ্জব ধরণের। আমি বে কয়টি জায়গার নাম আগে উল্লেখ করছি ওদের কথাই বলছি। কালোর উপর লাল ডোর কাটা ব্লাউজ পরে আর কোমরে একটা মোটা রকমের লম্বা উড়নার মতন জড়িয়ে বার, বারা একটু শিক্ষিতা তারা ঐ ওড়না একটু দামী গোছের ব্যবহার করে আর তার সঙ্গে পেট কাটা ব্লাউজ ও বডিস ব্যবহার করে। এদের হাতে মাঝে মাঝে ভ্যানিটি ব্যাগ দেখা যায়।

মিশনারীদের দৌলতে এরা বেশীর ভাগ খৃষ্টান হয়েছে, লেখাপড়াও এরা বেশ শিখেছে, খাসিয়া জয়ন্তীরা পাহাড়ের অধিবাসীদের পল্লীতে এ সবকিছু জানতে পেরেছি তারই ঐ বিবরণ লিখে গেলাম। কারণ হু'এক দিনের মধ্যে সবকিছু জানা সম্ভব নয়। এ দেশের অধিবাসীরা সাধারণতঃ ধর্মান্তরিত ও বলবান এদের সকলের হাতে বঁটির মত—অদ্ভুত ধারাল একটা অস্ত্র থাকে, তাই দিয়ে এরা কাঠ কাটে, হিংস্র বস্ত্র জড়র কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে। আক্রমণকারীকে হু'খানি করে ছাড়ে। এরা বলে বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে জবাই করা হয়। এদের সমাজ বড় অদ্ভুত রকমের। মেয়েরা সম্পত্তির অংশ পায়। পাহাড়ে কাঠ কাটা আর রান্না করা ছাড়া পুরুষদের আর কোন কাজ নাই। মেয়েরা ফুলে বার অকিসে বার চায়ের দোকানে কাজ করে। এদের কাজ তারা সবাই করে। এদের ভারী সুন্দর গালগুলো, ফুলো ফুলো আপেলের মত রং। খাসিয়া সুন্দরীরা নিজের ইচ্ছামুসারে সব কিছু করে, তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় পুরুষেরা অবধা হাত লাগায় না। পরদেশীর সঙ্গে ওরা অবাধ মিলেমিশে। এ মেলা মেলাটা ওদের ইচ্ছামুসারে হয়। এরা অত্যন্ত গরীব তাই অবাধ স্বাধীনতাটা এদের। পাঁচ বছর বয়স থেকে বাগ মা এদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ছেড়ে দেয়। পাহাড়ে উঠে কাঠ-কেটে বোকা বহে পেট চালায়। কাজেই এদের উপরওয়াল কেউ নাই। শিলং-এর এক অকিসের সামনে এক খাসিয়া যুবতী এক হিন্দুস্থানী চানাহুরওয়ালাকে বলেছে, 'হু'খানা বে মজা লুটে পা' বুঝতে পারা যায় উৎসাহ তার।

ব্যক্তি স্বাস্থ্য সবকিছু শিলং পৌঁছে ৭ দিন ঘুরে এদের সবকিছু খুঁটিনাটি জানতে চেষ্টা করি। শিলং সহরের বর্ণনা আমি করব না শিলং পৌঁছাতে বে কত কষ্ট হয়েছিল তারই কিছু বাতলে দিলাম। শিলং থেকে বাসে করে বারা নামে, বাসের ভিতর থেকে তারা বমি করতে করতে আসে। এর কারণ পাহাড়ের পাক খাওয়া রাস্তার গাড়ী চড়া অভ্যাস না থাকায় এরকম হয়। সেই জন্ত আগে থেকে অনেকে ঘুখে লজ্জেল নেয় শুনেছি। আমার জামায় ও বাগে এরকম হু'ভিন দিন বার বমি লেগেছে। নয়। বাংলো থেকে শিলং-এ যেতে একদিন গোটা সময় লেগেছিল নয়। বাংলোর পর রাস্তাটা আবার পাক খেতে খেতে উঠেছে। বস্তি এ রাস্তার উপর আর দেখা গেল না রাস্তায় খাবার দাবার বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি চা আর লাঠি বিস্কুট খেতে খেতে চলেছি। এগুলি একটা বস্তির দোকান থেকে পাওয়া গিয়েছিল খাবার বলতে এই বোঝায় এ ছাড়া বে খাবার পাওয়া যায় সেগুলি খাবার বলে মানা যায় না সেহু ছোলাকে নানা রকম মশলা মিশিয়ে রান্না করে তার উপর ধনে গাছের পাতা ছড়িয়ে এগুলি বাসী করে রাখে অল্প মাছি ওতে ভন্ ভন্ করছে দেখা যায় খিদের চোটে তখন আর সে বিচার করবার ঐশ্বর্য ওদের থাকে না। চার পরসায় দেয় অনেকটা। তার সঙ্গে এক রকম রুটি তৈরী করে ওরা চাটনীর সঙ্গে ওগুলো খায় ওদের নাকি খুব ভাল লাগে। ময়দার তালটাকে জলে নেয় পরে জিলপীর মত প্যাচ দিয়ে তেলে ভেজে নেয়, এরা এদের ভাবায় রুটি বলে। চা তৈরির ধরণও তাজ্জব রকমের। এক গেলাস ফুটন্ত জলে, কয়েক চামচে চিনি দেয় পরে মুনও দেয় একটু তারপর একটুখানি চা পাতার রস দেয় দুধও একটু দেয়, এই চায়ের গেলাস একটু ঠাণ্ডা করে খেতে ভালবাসে কিন্তু বরফ পড়ার সময় গরম গরমই খায়।

শিলং-এ পৌঁছাবার তখনও ঘণ্টাখানেক বাকী, খিদের চোটে ঐ উপদেশে থাক আমাকে খেতে হয়েছিল—নইলে এক পা'ও চলার শক্তি আমার ছিল না। ২৫ মাইল ঘূর্ণিপাক খাওয়া রাস্তা ধরে উঠে যদি খাওয়া না হয়—তবে বে কি অবস্থা হয় এ আমি বেশ ভাল করে বুঝেছি।

এ রাস্তায় চলতে চলতে যখনই পিপাসা পেয়েছে, তখন বরণায় জল খেতে বাধ্য হয়েছি। বরণায় পাশে লেখা আছে "জলপান নিষিদ্ধ" পাহাড়ের ময়লা জল সর্বদা বেহুছে একটু জল হাতে নিয়ে যদি ধরা যায় ময়লায় ভর্জি হয়ে যায় হাতটা।

তারপর ঐ ঠাণ্ডায় বরণায় জলে স্নান করতে হয়েছে। কিন্তু বলতে কি এক দিনের জন্ত কোন রকম শরীর খারাপ হয়নি। পা'টা রক্তারক্ত হয়ে যা হয়ে যায় ফলে রাস্তা হাঁটতে গিয়ে মাঝে মাঝে দারুণ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তাতে পথ চলা বন্ধ হয় নাই। শিলং-এ পৌঁছে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সবকিছু নানান প্রশ্ন করেন, এবং তাঁর বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের গল্প শোনাবার জন্ত আমায় বলেন, তারপর শ্রীমতী চালিয়া এই অভিবানের জন্ত উৎসাহিত করেন। তাছাড়া তিনি আমার পাখের বাবদ কিছু অর্থ সাহায্যও করেন সন্ধ্যায় কিং এলাম "প্রকাশ হোটেল" এখানেই উঠেছিলাম। রাত

দিন পরে বোয়ালের রাস্তা ধরলাম কিন্তু বোয়াই বাওয়া হয়ে উঠল না। সেলাম মনিপুরের দিকে। সোজা মনিপুর বাওয়ার কোন পাঁকা রাস্তা নাই, সেই নওগাঁও ঘুরে লামডিং হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ রাস্তায় চলা নিবিড়। গাড়ী চলায় আরম্ভ পুলিশ গার্ড দিয়ে। নাগাহিলের ভিতর দিয়ে গাড়ী চলে। যে কোন সুহৃৎ দলবদ্ধ ভাবে এসে নাগারা আক্রমণ করে, লুণ্ঠন করে এবং শেষে মেরে পাহাড়ের খাদে ফেলে দেয়। ও রাস্তায় যেতে চাইলেও পুলিশ ওদিকে যেতে দেয় না। সেইজন্য নেকা আর নাগাহিলের ব্যাপার কিছু জানতে পারলাম না। কিন্তু জয়ন্তিয়া ও খাসিয়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া মনিপুরে যাবার কাঁচা রাস্তা আছে। এ রাস্তা ধরে মাঝে মাঝে দু'একটা জীপ গাড়ী যাতায়াত করে, তবে পথ বড় দুর্গম চারিদিকে গভীর জঙ্গল, মানে কষ্টের আবার পুনরাবৃত্তি হল, তবে দুর্গম হলেও রাস্তাটা ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে গেছে। পাহাড় থেকে নামতে কোন কষ্ট হয় না, মাঝে মাঝে লোক বসতি যথেষ্ট আছে।

খাসিয়া পাহাড়ের এ অঞ্চলটা দক্ষিণ দিক। মনের দিক থেকে এরা একেবারে চার পাঁচ শতক পিছে পড়ে আছে। সামাজিক আদব কার্যদা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

এক রাতের ঘটনা উল্লেখ করা বোধ হয় আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে আমার ভ্রমণ কাহিনী। অবিদ্বান্ত বলে মনে হবে কিন্তু লেখকের কল্পিত কাহিনী বলে যদি কেহ ধারণা করেন তবে তিনি খুব ভুল করবেন। কেক্রগারীর শেষ সপ্তাহে মনিপুরের কাছে পৌঁছেছিলাম শিলং থেকে শ' আড়াই মাইল দূরত্ব ইম্ফলের। ইম্ফলে পৌঁছানোর দুদিন আগে বোয়ার বনে আলোচ্য ঘটনাটি ঘটে।

মনিপুরীদের অতিথি হলাম। গ্রামসেবক আমার আশ্রয় দিল। আমার আসার খবর দিল সারা মহল্লায়। হুলুভি বেজে উঠল, বাজল মাদল। লোকনৃত্যের মহড়া চলল কিছুক্ষণ। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের অভিনয় হল। কেঁদো সেছ মদ খাইয়ে ছটা দুই ধরে আনন্দের বজ্রা বহে গেল বোয়ার বনে। পরেরদিন সকালে এ রহস্যের তথ্য আবিষ্কার করলাম। অতিথি পরিচর্যার রীতি এদের এই রকম কুমারী মেয়ের ভাগ্যে যদি একশটি অতিথি বরণ করবার সৌভাগ্য ঘটে তবে তিনি সতী পুণ্যবতী।

এর পর উল্লেখ করবার মত কোন ঘটনা আর বিশেষ কিছু ঘটে নাই। মায়ুলী ঘটনা জুড়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই মা।

ইম্ফল দেখে গৌহাটের দিকে রওনা হলাম। আগেই বলেছি এ রাস্তা ধরে হাঁটা একেবারে অসম্ভব। ট্রাক ধরে লামডিং এলাম ওখান থেকে নওগাঁ হয়ে আবার ফিরে এলাম গৌহাটতে তারপর

ঐশ ধরে বুড়ী এলাম। মিটার সেক লাইনে কি ভীষণ ভীত হয়। দেখে তাড়াতাড়ি লাগল। কামরাগুলি আগেই বন্ধ করে দেয় ভিতরের লোকেরা। হিন্দুহানী বোয়ানেরা লাঠি চালিয়ে লোকের মাথা কাটিয়ে রক্তপাত করে। পুলিশ কিন্তু মোটামুটি দর্শকের ভূমিকার নামে, কারণ এ ঘটনা নিত্য।

আবার আলিপুর দোয়ার হয়ে চামরটি পাহাড় হয়ে সিকিমের দিকে এতলায়।

তিস্তাব্রীজ পার হয়ে সেবক পাহাড়ে পৌঁছলাম, সে দিন ছিল দোলের দিন—কাজেই পাহাড়ী রাস্তা ধরে চলছিলাম নীচে থাকলে রংএ ভাসিয়ে দিত। জামা কাপড় ও কাগজ পর বাঁচাতে গিয়ে সেদিন আমার অবস্থা শোচনীয় হল। ৪২ মাইল রাস্তা আমাকে একদিনে পার হতে হয়েছিল। তিস্তার ২নং ব্রীজে এসে তখনলাম কালিম্পং দশ মাইল দূরত্ব। মাঝে কোন জায়গা নাই যে সেখানে একদিন রাত কাটাই। তিস্তা ব্রীজ বেখান থেকে গাংটক, কালিম্পং—আর অত্রদিকে দার্জিলিং-এর রাস্তা বের হয়েছে—এ জায়গাটা সমুদ্রতল থেকে ১৩শ ফুট উঁচু—আর দশ মাইল ব্যবধানে কালিম্পং প্রায় ৫ হাজার ফুট উঁচু—কাজেই সহজে বোকাবার দশ মাইল রাস্তা ঘূর্ণিপাক খাওয়া পাহাড়ের রাস্তা ধরে উপরে উঠতে হয়েছে। সারা দিন উপবাসে কেটেছে। পরমা তখন সব ফুরিয়ে গিয়েছিল—পাহাড়ে কার কাছে সাহায্য পাব? কোন উপায় না দেখে এগুতে গিয়ে কালিম্পং-এর প্রবেশ পথে অর্টোডক্স হয়ে পড়লাম—বখন জান কিয়ল দেখলাম কালিম্পং টেলিফোন মেসের বিছানায় শুয়ে আছি।

কালিম্পং থেকে আবার কিছু সাহায্য পেলাম এক গাংটকের দিকে এতলায়। মাঝে পড়ে রংপো চেক পোর্ট। জোর পরীক্ষা হচ্ছে—কেন না চীনা গুপ্তচরেরা হামেশাই এ-দিকে যে-আইনী ভাবে ভারতে প্রবেশ করে। নংপো থেকে আবার পাহাড়ী রাস্তা ধরে ঘুরে ঘুরে গাংটকে গিয়েছিলাম আর বিশেষ কোন অনুবিধা হয় নাই। গাংটকে রেশিডেন্সিতে উঠে পলোটিক্যাল অফিসার আমায় বিঃ পত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ তিনিও আমার অভিযানকে সমর্থন করেন।

অবশেষে গাংটকে আমার অভিযান শেষ করলাম। প্রায় সাত হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে কোলকাতার ফিরে এলাম।

কিয়লাম বানবাহনযোগে। কারণ আমার উদ্দেশ্য হেঁটে বাওয়া—ফিরে আসা নয়। আগামী নভেম্বরে দক্ষিণ-ভারত রওনা হব। আশা করছি আবার আপনাদের আমার কাহিনী শোনাব।

ডঃ কার্তিক বসুর

টার্কোপ্রোড

* অল্প, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় *

নানালা

* ব্যথা ও বেদনায় *

ডঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা ৯



বিবাহ-সাধনা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশ্রী মজুমদার

হিন্দু বিবাহ

বাঙালীর অর্থাৎ হিন্দু বিবাহ পৃথিবীর সকল বিবাহ পদ্ধতি থেকে ভিন্ন আদর্শের। রবীন্দ্রনাথ তার যে ব্যাখ্যা করেছেন তা প্রত্যেক বাঙালীর জন্য ও মনে রাখা কর্তব্য। হিন্দু সমাজের গঠন আমাদের বিবাহের ভিত্তি। সমাজের মঙ্গলে ব্যক্তির মঙ্গলও নিহিত। সুতরাং হিন্দু বিবাহের আদর্শে ব্যক্তিগত রুচি বা অভিপ্রায়ের কোন স্থান নেই। সে আদর্শ ঐ দুটি জিনিসকেই ভয়ের চকুতে দেখে। দুটি ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার ফলে যে গাঙ্ঘর্ষ বিবাহ, মনু তাকে যেমন কামজ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বলেছেন যে সে বিবাহে কামনার মশালই পথ দেখায়; তাতে ব্যক্তিগত তৃপ্তির অন্বেষণ ছাড়া সামাজিক মঙ্গল সাধনের কোনো শক্তি নেই। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরাও প্রেমযুক্ত বিবাহের বিষয়ে অত্যন্ত সন্নিহান। তাঁদের মতে এ ধরনের বিবাহের স্বভাব—বিবাহিতদের ব্যক্তিগত কামনা ছাড়া আর সব কিছুকে বহিষ্কার করা। নির্বাচন বিবাহের ধর্ম—বাহিরকেও বিবাহিত-জীবনের সীমাবদ্ধ করা। গাঙ্ঘর্ষ বিবাহের রতিপ্রকৃতিও নির্ভরযোগ্য ভাবে স্থায়ী হয় না।

ব্রাহ্ম বিবাহের কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমাদের শাস্ত্রমতে এই বিবাহ পদ্ধতিটি শ্রেষ্ঠ। এ বিবাহে এমন পাত্রকে কন্ডাদান করা হয় যে কন্ডাকে যাচঞা করেনি। সমাজই এ বিবাহের কর্তা, তাতে পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোনো স্থান নেই। ইওরোপের সকল রাজবংশে এইরূপই একটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো। ইংলণ্ডের রাজবংশ ১৭৭৫ সালের Royal Marriage Act দ্বারা সুরক্ষিত, দায় জন্ত স্বৈচ্ছাবিবাহের কারণে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডকে রাজসিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছিলো।

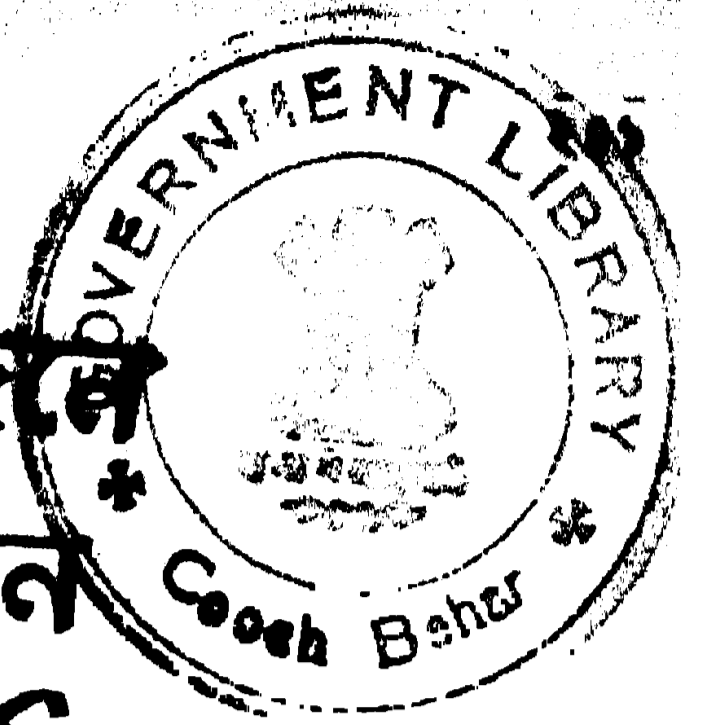
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিবাহ অদৃষ্ট নির্ভর ব্যাপার, দুটি মানুষ তাতে অন্ধকার সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কল সম্পূর্ণরূপে বিধাতাপুরুষের হাতে। তাই মনীষীরা তার আট-বাট বাঁধতে গিয়ে কামনার সঙ্গে বৃদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মানুষের এমন একটা বয়স আছে যখন তার বোন প্রেরণা স্তম্ভিত হয়ে উঠে। যদি সমাজের মতে বিবাহকে নির্ধারিত করতে হয়, তাহলে সেই প্রেরণাটির নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। হিন্দুর বাল্যবিবাহ সেই কারণে। আমরা আধুনিক কালের মনস্তত্ত্ব দিয়ে এই প্রাচীন প্রথাটির বেশ একটি অর্থ নির্ণয় করতে পারি। সোড়াত্তেই বলা হয়েছে যে পুরুষের তারুণ্যগত

বোনচেতনার তিনটি বিশিষ্ট রূপ ও পর্যায় আছে। উদয়ের প্রথম অবস্থায় সেটি আশ্রয়িত। উৎকর্ষের প্রথম অবস্থায় সেটি পররতি। দ্বিতীয় অবস্থাটি ব্যক্তির পক্ষে যেমন বিপজ্জনক, সমাজ ও পরিবারের পক্ষেও তেমনি গভীর ভাবে অমঙ্গলকর। প্রাচীনেরা তাই এই অস্থির উৎকর্ষশীল কামচেতনাকে বিবাহের স্থায়ী গভীর তেজের বাঁধতে চেয়েছিলেন। আরো চেয়েছিলেন যে এই প্রচণ্ড আবেগ ভ্রাম্য ক্রোড়েই উৎকর্ষ লাভ করুক। তাতে সমাজের এই মঙ্গল নিহিত ছিলো যে এই নিচত্বরণের দ্বারা বোন রোগ এবং গনিকাবৃত্তি উৎসাহ পেতো না। সেকালের সামাজিক অবস্থার নিরিখে যে প্রাচীনেরা তুল করেছিলেন, এখন আমরা এমন কথা বলতে পারি না।

বিবাহের উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম নির্ভরযোগ্য কিছু নয়। হিন্দুরা এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, বিবাহকে শুভ ফলদায়ক করতে গেলে বিবাহের পূর্বাচ্ছেই তার জন্য অমুশীলন করার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সেই জন্য খুব কম বয়স থেকে আমাদের মেয়েদের কাছে শ্লোকে গাধার, ব্রতপূজার, নানা অমুষ্ঠানে স্বামীর আদর্শটি তুলে ধরা হয়েছে। যথাকালে মেয়েরা যখন স্বামী লাভ করে, তখন স্বামী কোনো ব্যক্তি নয়, সে একটি প্রকৃষ্ট তত্ত্ববিশেষ বা অমুরক্তির মতো, স্বদেশকে ভালোবাসার মতো, মেয়েদেরই অন্তরে সৃষ্ট হয়ে পুষ্ট হয়ে আত্মার অঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের বাংলাদেশে তাই শিবপূজা, হিন্দুস্থানী মেয়েদের তুলসীদাসের নির্দেশে পার্বতী-পূজা। আমাদের দেশে তাই সতী, অর্থাৎ আদর্শ পত্নীর সমাদর আছে, যে পত্নী গার্হস্থ্য ধর্মের প্রতীক। এই উপায়ে বোন আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে বিবাহিত প্রেমের অমুশীলন করবার চেষ্টা আমাদের দেশে যুগ-যুগান্তর ধরে হয়েছে। পত্নীর কাছে পতি একটি আদর্শ মাত্র। এ অবস্থায় সে কারো কাছে পার্থক্য বলে বাধ্য হয়ে আশ্রয়দান করেনি, বরং স্বৈচ্ছায় একটি আদর্শের সেবার নিজেকে নিযুক্ত করেছে। স্বামী যদি জলদ্রবান হয় তাহলে প্রেমের এ শিখা তার জীবনকেও আলোকিত করে। "সহধর্মিনী" কথাটি আমাদের নিজস্ব। কোনো দেশের বিবাহের বর্ণনার অমুশীলন একটি শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। শব্দটির ইচ্ছিতেই জীবন্তর অতিক্রম করে মানবস্তরের সাধনার কথা আছে।

রবীন্দ্রনাথ আরো মন্তব্য করেছেন: নারীর দুটি রূপ। একটি রূপে সে মাতা, অন্য রূপে প্রিয়। আধ্যাত্মিক প্রয়াস মাতার ধর্ম। কেবল সন্তানের জন্মদান করেই সে কাজ হয় না।

মাসিক বসন্তী—ফেব্রু, ১৩৬৭



দিনে
দিনে
দিনে
দি...



রেক্সোনা সাবানে 'কাডল' বলে
একটি বিশেষ ধরণের তেল মেশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও
সুন্দর, আরও লাভনাময়ী হয়...! সুশাস
ডবা রেক্সোনার পরশ সারাদিন
আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে।
সৌন্দর্য সাধনার সর্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন।



রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাভনাময়ী করে।

২৫২৬৫৫৫৫

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লি: অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লি: প্রাই

তাকে নরোত্তম করার জন্য মাতার অস্বাস্থ্য ফেটে যাতে সন্তান শুধু মানব-সংখ্যাটারই বৃদ্ধি না করে। অজ্ঞানের সঙ্গে, আবেষ্টনের সঙ্গে অবিয়াম ও অনিবার্য যুদ্ধে এবং তার সাংসারিক জীবনে জয়ী হয়। প্রিয়তার রূপে নারীর কাজ, সকল উচ্চাশায়, সকল সঙ্কল্পে তার পতিক্রে অমুপ্রাপিত করা। আত্মার যে বল দিয়ে নারী এই কবচটি সম্পাদন করে, তাকে হিন্দুরা শক্তি বলেছেন, নারী তাই শক্তিরূপা। সে শক্তির পরিচয় দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী "চ্যার্ম" Charm শব্দটির ব্যবহার করেছেন। আমি সেটিকে হ্লাদিনীশক্তি বলবো। কবিগুরুর এ উক্তিটি মনে রাখবার মতো যে "গৃহের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেই নারী মুক্ত হয় না। তার মুক্তি তখনই সম্ভব যখন তার শক্তি, তার আনন্দ সংসারের মুক্ত ক্ষেত্রে ক্রিয়ামূল হয়ে ওঠে।"

নূতন আকাশ

বিবাহের নামে সকল যুবক-যুবতী মধুর স্বপ্ন দেখে, মনে মনে স্বপ্ন রচনা করে। কিন্তু বিবাহ কঠিন মাটির জিনিস, তার শিকড় মাটিতে, সেটি স্বর্গের কিছু নয়। সেঙ্গপীরের একটি বাক্য উদ্ধৃতি করার আমি সোভ সধরণ করতে পারছি না, Maids are May when they are maids, But the sky changes when they are wives. এর চেয়ে পরম সত্য কথা আর নেই।

বিবাহের অমুঠান সমাপ্ত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নবম্পত্তির বোম, প্রজনন সম্বন্ধীয়, আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলির নূতন ও বিশিষ্ট রূপ হতে আরম্ভ করে। প্রথমে যে সকল উদ্বেগ নিয়ে বিবাহ হয় সে সব কোথায় হারিয়ে যায়। কারণ, উদ্বেগের মনে অনেক নূতন ভাবের উদয় হয়, নূতন একটি শক্তি তাদের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। সব চেয়ে বড়ো কথা, ভালোবাসা যতোই প্রগাঢ় বা স্থায়ী হোক না কেন, তার রক্তির অংশটুকু আর মুখ্য না থেকে একটি গৌণ স্থান অধিকার করে। তার স্থানে একটি নূতন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জেগে ওঠে, দুজনের ভাগ্য যে একান্ত ভাবে এক, দম্পতির সেই উপলব্ধিটি হয়। পতিপত্নীর গভীর ঐক্যের চেতনা বিবাহের অব্যবহিত পরের অমোঘ বল। প্রাকৃতিক সংস্কারগুলি দম্পতির আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে লীন হয়ে গিয়ে তাদের একান্ত করে একটি বিচিত্র জীবনে উন্নীত করে দেয়। কথাগুলি আমার নয়, সুবিখ্যাত মনীষী হার্মানু কেসরলিঙের। সকল অভিজ্ঞ দম্পতি আত্মপর্যবেক্ষণের দ্বারা কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে।

আমাদের বিবাহে কল্পা সম্প্রদানের সময়ে বরকে কয়েক বার "প্রতিগৃহ্মিণী" কথাটা বলতে হয়। প্রীতিসজাগ কল্পাটিও নীরবে গ্রহণ করে। গ্রহণ করা মানে, জীবনের সকল দায়িত্বকে স্বীকার করে নেওয়া। এ স্বীকৃতির অর্থ, জীবনের নানা দুঃখ-বেদনাকে মেনে নেওয়া। যে নারী বা পুরুষ বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভেই দুঃখ-বেদনাকে স্বীকার করে নেয়, সে তৎক্ষণাৎ জীবনের সকল অভিব্যক্তির কেন্দ্রস্থলটি অধিকার করে। তখন দুঃখ আর তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। নিজের প্রকৃতি দিয়ে বিবাহ সহজ নয়, দুঃখের অবস্থা নয়। দুঃখকে নির্মাণ করে নিতে হয়। এইখানেই দম্পতির কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষা সকলে উত্তীর্ণ হতে পারে না,

তাই অধিকাংশ বিবাহ ব্যর্থ হয়। কোন মেয়ে বা পুরুষ বিবাহিত জীবনের বৃহত্তর সকল সম্ভাবনাকে মনে রেখে বিয়ে করতে বসে না, অজানা অবস্থাতেই শুধু মিলনের উৎসাহ নিয়েই বিবাহ করে। তাই যখন কোন বড় ওঠে তখন আর তারা কুল খুঁজে পায় না। বিবাহিত জীবনের সকল সমস্ত প্রত্যেক দম্পতির ব্যক্তিগত সমস্তা, কোন সাধারণ বাধাধরা উপায়ের দ্বারা সে সকলের সমাধান ঘটানো অসম্ভব কথা। একমাত্র ভালোবাসার সামঞ্জস্য দিয়ে সে সমস্তার নিরসন হয়। ভালোবাসা মানে পরস্পরে মজে যাওয়া। কিন্তু মনে রাখতে হয় যে মজে যাওয়ার ক্ষেত্রটি বিরাট বিস্তৃত। মেহের সম্যক মিলন থেকে আরম্ভ করে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুরসজ্জিত পর্যন্ত তার বিস্তার।

বিবাহে সফল হবার জন্য, সুখ অর্জন করবার জন্য পতি-পত্নী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব নয়। বিবাহে নারীর দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর। বিবাহের ক্ষণে তারই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত যে সকল বিষয়বিপদকে অতিক্রম করে জীবনকে আমি ঐক্যের, সামঞ্জস্যের, ভালোবাসার আশ্রয় করে ফুলবো। নিজের প্রেমশক্তি ও শুদ্ধস্বের পথটি ধরে থাকলেই এ সাধনা সহজ হয়। এই প্রতিজ্ঞাই মেয়েদের হ্লাদিনী শক্তির উৎস। যে সকল দাম্পত্য দৃষ্টান্ত আজও আমাদের অমুপ্রাপিত করে, তাতে একটি মুখ্য কথাই আছে—হাসিমুখে আনন্দ দিয়ে অদৃষ্টের ক্রুরতাকে বরণ করা। যে সকল বরণ্যা নারীর আজও আমরা মহিমা ঘোষণা করি তাঁরা সকলেই হাসিমুখে অদৃষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তীর কথা কোন বাঙালী মেয়ে না জানে? তাঁদের কাহিনীতে ভোগ ঐশ্বর্যের কথা নেই। দুঃখের মাঝেই তাঁরা দীপ্ত। এ বিপুল মহিমার আমি পুরুষকে খুঁজে পাই না। সীতার কাছে তাঁর জীবন ও তাঁর নিষ্ঠুর অদৃষ্ট বা দাবী করেছিলো তা তিনি পূর্ণ করেছিলেন। বিরাট মহিমা তাঁর সেই জন্মই। এ শক্তি কেবল নারীতে নিহিত। আমাদের অনেক ঘরে আজও যে সীতার মতো বরণীয়ারা বিরাজ করছেন তা আমার দ্রব বিশ্বাস। তাঁরা হৃদয়ভোষণার অপেক্ষা রাখেন না বলে আমরা তাঁদের পরিচয় পাইনে।

জীবন একাধারে মহাযজ্ঞ ও ষোগাভূমিলন। আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেলো। বিবেকানন্দ একবার একটি মহিলাকে বলেছিলেন, "মা, আপনার যোগে অধিকার হয়েছে, আপনি দীক্ষাগ্রহণ করুন।"

মহিলাটি হেসে উত্তর দিলেন, "ঠাকুর, উদয়-অস্ত এই সংসার-যজ্ঞই আমার ষোগাভূমিলন, আমার অস্ত্র যোগ নেই।" বিবেকানন্দ সে কথা সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন।

বিবাহের মতো জীবনের আর কোন ক্ষেত্রে এমন প্রেমকামী শক্তিকামী মহাবল্ল সম্পন্ন করবার অবসর নেই। সেই জন্মই আমাদের সংসার করাকে গার্হস্থ্য বলে। আর কোন দেশে এমন একটি কথা নেই বলেই মনে হয়।

ভাবুক কেসরলিঙ বলেছেন যে, দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত না হলে দাম্পত্যসুখের কোন সংজ্ঞা নেই। দুঃখকে জয় করাই সুখকে আকার দেয়, সেটিকে পরিমার্জিত করে। একান্ত হতে গেলে দুঃখের এক সঙ্গে দুঃখভোগ করা ছাড়া অন্য পথ নেই। উৎসবে আত্মার

মিলন হয় না। নিরন্তরে, পতি-পত্নীর সাংসারিক ক্রিয়ার উচিত অংশগুলি বধাবধ বটন করে নেওয়া সম্প্রত্যক্ষকে হারী করবার উপায়। নিরন্তরে বিবাহ যেখানে তৃপ্তির অবস্থার এসে পড়ে জীবন তাতে একটা গতানুগতিক ক্রমকে বাঁধা পড়ে যায়। এ অবস্থাটা উৎকর্ষশীল পতি ও পত্নী, উভয়ের পক্ষেই সুখকর নয়। ভালো করে গভীরভাবে বুঝতে গেলে এই কথাটাই পাওয়া যায় যে বিবাহ মূলতঃ যৌনমিলন নয়। বিবাহের সন্তানার্থী জৈব সীমাটি উত্তীর্ণ হবার পর সম্প্রতির প্রকৃত মানবজীবনের আরম্ভ। আত্মার উপলক্ষি তার চরম উদ্দেশ্য। বিবাহ এই স্তরেই সার্থকতা লাভ করে, নিরন্তরে নয়। বন্ধা নারীর জীবনও সেই কারণে ব্যর্থ না হয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

জীবন যেমন বিবাহও তেমনই একটি অচর অবস্থা নয়। সেটি গতিময় ও পরিবর্তনধর্মী। নদী যেমন আকারে হারী কিন্তু তার অন্তরে সঙ্গ-নৃতন বলরালির প্রবাহ, বিবাহিত জীবনও তাই, তার অন্তরে সঙ্গ-নৃতনের রাজ্য। যে সম্প্রতির জীবন ঘটনাচক্রে একটি অচর অবস্থায় এসে পড়ে তাদের বিবাহ ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু যারা এই পরিবর্তনশীলতার রূপটি বোঝে, তার প্রত্যেকটি সমস্তার উপলক্ষি করে, তারা তার সমাধানও খুঁজে পাবে। অচরতা যেখানে বস্তুগত, সেখানে অনন্ত ষাট-প্রতিঘাত। এই জটিল মনটিতে বিবাহিত জীবনে সংস্কৃতির ক্রিয়ার অবসর আসে; সেই ক্রিয়া ভিন্ন আত্মোপলক্ষি নেই, সমস্তার বিধানও হয় না। বিবাহ পতিপত্নীর বিচ্ছেদবিহীন সম্বন্ধ। পত্নীর কর্তব্য এইখানে। নারী সংসারের সাম্রাজ্যী। আজ যতাই তার অধিকার এবং দাবী নিয়ে আন্দোলন হোক না কেন, তার প্রভাব ও প্রভুত্ব যে কোনদিন ক্ষুণ্ণ নয় তা আমি চারটি বংশক্রমের নারীদের দেখে একটু জোর করে বলতে পারি। এ আন্দোলন বিরোধ জীবন্তরে আবদ্ধ, মানবস্তরে তা প্রবেশ করতে পারে না। মেয়েরা গায়ের জোরে অপরকে শাসন করে না, শাসন করে তাদের মাদুর্ভাগ্য ও জ্বালামিনীশক্তি, তাদের সঙ্কটময় মন্ত্রপারুষ্টি, তাদের মাদুর্ভাগ্যের অমুক্তবশতির দ্বারা অপরকে সহজে বুকে মেবার ক্ষমতা দিয়ে। মেয়েদের এ শক্তির তুলনা নেই। বিবাহ নারীর একান্ত নিজস্ব ধর্ম ও আর্টি। বিবাহ তার জীবন্ত, তার প্রাণের প্রয়োজন। আমার এ কথা গভীরতম উপলক্ষি যে স্বামীকে যে সংস্কৃতির সোপানে সোপানে আরোহণ করতে অনুপ্রাণিত করে তার নাম প্রিয়া। যে স্বামীর জীবনে মানবধর্মের বীজ বপন করে সেটিকে প্রাণবন্ত করে, তার নাম সহধর্মিণী। কিন্তু জীবন বড়ো দ্রুতগতি; তার ক্রমিক বিকাশ অত্যন্ত মন্থর। এই মন্থর গঠনশীল কালে একটু সচেতন ক্রিয়ার প্রয়োজন। সে ক্রিয়া পরম আত্মা, পরম্পরের প্রতি প্রচণ্ড সন্ত্রমের দৃষ্টি, পরম্পরকে গুরু বলে মেনে নেওয়া। বর্তমানা শ্রীতিকে প্রচণ্ড বলে। এ সবই শ্রীতি নিয়ে খেলা। বিবাহ যোগাঙ্গুশীলন। দীর্ঘকাল, নিরন্তর এবং সমাদরের দ্বারা সেবা না করলে কোন সাধনার দৃঢ়ত্বিক হওয়া সম্ভব নয়। দৃঢ়ত্বিক না হলে কোন সাধনা হয় না। সেই উপায়ে বিবাহ সাধনাতেও দৃঢ়ত্বিক হতে হয়। স্বামী যেমন সর্বাংশে পূর্ণ হয় না, স্ত্রীও তেমনই সর্বাংশে পূর্ণ নয়। পরম্পরের অভাব বধন পরম্পরে পূর্ণ করে তোলে তখনই বিবাহের মিলন সত্য, সার্থক, পরমানন্দের—জীবনব্যাপী প্রার্থনার সিদ্ধি।

পতি-পত্নী

বিবাহ অদৃষ্টশাসিত বিধি। তার অস্ত মেয়েদের বা প্রভৃতি তার অর্ধেক রূপ। কটি অদৃষ্টপূর্ণ অজ্ঞাত আর একটি আধাধানার সহযোগে সেটি পূর্ণ হয়। এই অস্ত আধাধানাটি স্বামী। কস্তার পানিগ্রহণ করার অস্ত যে যুবকটি ছাদনাতলার এসে পড়ায় তার হুটি রূপ। তখন পর্যন্ত তার মৌলিক রূপটি ব্যক্তির; অস্ত সন্তাবিত রূপটিতে সে স্বামী। একই মাদুর্ভাগ্যের হুটি বিভিন্ন সত্তা। পানিগ্রহণের মুহূর্ত থেকে তার স্বামিসত্তাটির আরম্ভ। সেই স্তর থেকে কস্তাটিরও ব্যক্তিসত্তা অতিক্রম করে পত্নীরূপের আধাধা। যে প্রাকৃতিক উপকরণটি হুজনের সমানভাবে থাকে সেটি যৌনতা, বা তাদের প্রথম মিলনের ভিত্তি। স্বামিদের ও পত্নীদের বাকি বহুস্তর অংশটির ধানিকটা ঐতিহ্যগত ও ধানিকটা সংস্কৃতিগত। সংস্কৃতিগত যেটি তা বিবাহোত্তর কালে সারা জীবনের প্রয়াসে পরম্পরের সাহচর্য ও সহায় দিয়ে গড়ে নিতে হয়। অস্ত কোন পর্ব নেই। বিবাহের অনুষ্ঠানের রূপটি পর্যন্ত হুজনেরই অপরিণত অবস্থা। বয়-বধু হুজনেই নৃতনের পথে সমান অনভিজ্ঞ নবীন স্বামী। বিবাহোত্তর কালটি জীবনব্যাপী, একান্ত নিচ্ছত, তাতেই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সকলতা বা বিকলতা তাতেই নিহিত। হুটি অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতী তাতে পরম্পরের সাধী ও সহায়। ভ্রান্তা-পড়া কেবল তাদেরই হাতে। সে কালটি পূর্ণ করে বাপন না করলে বিবাহকে জানা ও আয়ত্ত করা অসম্ভব কথা। জীবন, বিশেষ করে বিবাহ একটি শ্রেষ্ঠ চাকরলা। আমাদের শাস্ত্রমতে হাত শিল্পেশ্রিয়। বই পড়ে যেমন কোন শিল্প শেখা যায় না, হাতে-কলমে নিরন্তর সাধনার খতে হয়, বিবাহও তেমনই হাতে-কলমে নিরন্তর সাধনার দ্বারা স্বপ্নীয়। বিবাহের রস ও রহস্য বিচিন্ন, সাধনা না করলে তাদের : : করা সম্ভব হয় না।

যুবকটি একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের দ্বারা লাগিত। তার পুরুষালি ঐতিহ্য বলে, সংসার তার রাজ্য; সেখানে সে প্রভু, সিংহাসনাধিকারী রাজা। সংসারকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখা, তার উন্নতিসাধন করা, পত্নী ও সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করা তার পুরুষধর্মের অস্ত। মেয়েটির মেয়েলি ঐতিহ্য বলে পত্নীরূপে স্বামীর সংসারে তার বিশিষ্ট একটি স্থান থাকলেও সেটি সৌন্দর্য, প্রভুত্বের নয়। তার প্রভুত্বের যেটুকু অধিকার সেটুকু সন্তান ও দাসদাসীর ওপর, স্বামীর ওপর নয়। কিন্তু স্বামী মাদুর্ভাগ্যই একটু আনাড়ি জীব। সে অর্ধোপার্জন করে, সংসারের ভার বহন, কিন্তু গৃহস্থালী পাতা ও তাতে শৃঙ্খলা স্থাপন করা তার কাজ নয়। সেটি সম্পূর্ণ ভাবে পত্নীর দায়িত্ব। তাই সংসারের বিরাট কর্তব্যে মেয়েরাই রাষ্ট্রী। এমন স্বামী ভূপৃষ্ঠে বিয়ল দার ব্যক্তিসত্তা ও স্বামিসত্তা সমান ভাবে পূর্ণ ও শক্তিমান। বাহিরের কর্তব্যে যে পুরুষ কৃতী, গৃহস্থালীতেও তার অমূর্ত্য কৃতিত্ব লাভ করা সম্ভব হয় না। বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হবার অস্ত তার সকল শক্তি নিযুক্ত। প্রত্যেক পুরুষের তাই একটি অপরিণত রূপ আছে, সেটি তার স্বামিরূপ।

বিবাহের দ্বার দিয়ে ইওরোপীয় কস্তা কেবল মাত্র স্বামীর ঘরে যায়। আমাদের মেয়েরা খস্তরগৃহের অস্তরুত হয়। এ হুটির বিস্তার অনেক এবং আমাদের মেয়েদের পরিবেষ্টনও তাই ভিন্নতর।

খণ্ডবালয়ে খণ্ডর-শাওড়ী দেবর-নন্দ স্বামির ব্যক্তিসত্তাটির বিস্তৃত রূপ। স্বামীর মাধ্যমে সেই রূপটির সহিত বধুর সোজানুজি কোন সম্পর্ক নেই। বধুর ওপর তাদেরও বী তার স্বামীর মাধ্যমে, সোজানুজি কোন দাবী করার হেতু বা অবকাশ নেই। ইওরোপীয় বধুর তার অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু, কারণ স্বামীর বিস্তৃত ব্যক্তিসত্তার সহিত তার সামাজিক ছাড়া দাবিগতক কোন আদান প্রদান নেই। সোজানুজি দিয়ে সে সামাজিক সনাক্ত রক্ষা করা চলে। আমাদের মেয়েদের স্বামীর এই বিস্তৃত ব্যক্তিসত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সনাক্ত স্থাপন করতে ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়, যা তাদের প্রীতির ওপর নির্ভর করে। মেয়েদের মধ্যেও ব্যক্তিগত ও পত্নীত্বের বিভেদ থাকলেও সে বিভেদটি পুরুষের দুটি ভিন্ন সত্তার মতো উচ্চারিত নয়। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল থেকে ভারী পত্নীদের শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষালয় হয়েছে। বাঙালী গৃহস্থালী অগণিত শতাব্দী ধরে বিরাট একটা গৃহ-বিদ্যালয়ের কাজ করে আসছে।

ঐতিহ্য ও সংসারের গুণে নববধু সংসারের বেস্তটাকেই চেনে এবং সেই বেস্তটিতে গিয়ে পড়ে। এই আসল অভিজ্ঞ শিক্ষা-নিকেতনেই তার সংসারের কল্যাকৌশল শিক্ষা হয়। যার করার যত্নের জন্য। আমাদের দেশে আজও যে ঐখাটি প্রচলিত, কয়েক শতাব্দী পূর্বকার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেও তাই ছিলো। সেটি ছিলো ও দুটি দেশে নারী-শিক্ষালয় গড়ে ওঠার পূর্বকাল। সে দুটি দেশের সম্রাজ্য যবের মেয়েরা তখন অল্প সম্রাজ্য যবে বাস করে জীবনযাত্রার কল্যাকৌশল শিক্ষা করতো। এই শিক্ষার পর আমাদের মেয়েদের সংসারকে জয় করা লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সে বিজয় সেবা আনন্দ ও ভালোবাসা দিয়ে, আর কোন উপায় নেই। সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও সার্থক সফল হতে গেলে আর অল্প কোন পথ নেই।

যে বধু নিজের ব্যক্তিত্বের দাবী আঁকড়ে ধরে থাকে, সে সংসার বিফল হয়। ব্যক্তিত্বটি যে কি বস্তু তা আমি আগেই বলেছি। বাঙালীর সংসার পতিপত্নীর গুহসম্বন্ধকে দাবী করে ব্যক্তিত্বকে ঠাঁই দেয় না। গভীরভাবে দেখতে গেলে পতিপত্নীর গুহসম্বন্ধেই সনাক্ত, দুটি ব্যক্তিত্বে কখনো জোড়া লাগে না। পত্নীসত্তার দায়িত্বটি বিরাট। সীতার পত্নীত্বের যে দায়িত্ব ছিলো, বহু সহস্র বৎসর অতীত হয়ে গেলেও আমাদের মেয়েদের অনুরূপ দায়িত্বের এখনো অবসান হয়নি। সীতাম দায় ছিলো, স্নেহে মাতা, সেবার ভগিনী, ক্ষমায় ধরিজী, শস্যায় শৃঙ্গারনিপুণা ইত্যাদি হবার। এখনকার মেয়েদেরও সেই সকল দায় পূর্ণরূপে বর্তমান আছে। পত্নীসত্তার সব কোন ঘোষণা নেই। সেটি নিজের প্রেরণায় নীরবে আপন মাধুর্য দিয়ে নিজের সাত্ত্বীয় বিস্তার করে চলে। এই উপায়েই সেই অনভিজ্ঞ অক্লান্তকর্মী নববধুটি পরিণত বয়সে তার সংসারের কর্ণধার হয়ে ওঠে। বাঙালীর ঘরে ঘরে এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্বামী এমন সংসারের সুবিধাটুকু সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে বটে, কিন্তু সে নিজে সে সুখ-সুবিধার একটি কণাও সৃষ্টি করতে পারে না। পত্নীত্ব বিশ্বয়কর শক্তি। সেটি দিয়ে মেয়েরা পুরুষদের অসহায় করে রেখেছে। সেজন্য পুরুষ কোনদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি, বরং বিচিরি একটি সুখ ও নিরাপত্তা অনুভব করে ছেলোমানুষের মতো নারীনির্ভর হয়ে থাকে। ক্রমাগত মাতা, পত্নী, কন্যা, পুত্রবধু তার ইহজীবনের বিরাট বিস্তৃত বটছায়া। গৃহস্থালীতে পত্নীই সব, স্বামীর স্থানটি ক্রমশ

গৌণ হয়ে ওঠে। আমাদের সংসার একান্ত ভাবে নারীর ভালোবাসার শাসনাধীন।

বিবাহের অনুষ্ঠানের ক্ষণটির পর দম্পতির জীবন দ্রুতগতিতে বদলায়, পূর্বকার কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শের অস্তিত্ব থাকেনা। সে পরিবর্তনের সব চেয়ে লক্ষ্য করবার মতো ঘটনা—বিবাহের পূর্বকাল পর্যন্ত বর ও বধুর “আমি” জ্ঞান থাকে, যা তাদের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়। কিন্তু অচিরে দাম্পত্যের নিত্যসহবাস নবপ্রভাতের মতো একটি নূতন যুগ্ম-সত্তার উদয় হয়, সেটি “আমরা” জ্ঞান। এই “আমরা”-র পরম অনুভবটি উত্তরের দেহের কোষে কোষে, ভাবময় জীবনে ও আত্মায় ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এ ছাড়াও যুগ্ম-সত্তার গভীরতর আর একটি অনুভব আছে, সেটির কথা বখাছানে বলবো! যে সংসারে “আমরা”-র সম্যক উপলব্ধি জীবনের পথ আলোকিত করে, সে-পথ যতোই বন্ধুর হোক না কেনো, কখনো বিষম হয় না। মেয়েরা শুধু নিজের পত্নীসত্তাটুকু গড়ে নেয় না, সেই সঙ্গে স্বামীর পতিসত্তাটিও গঠন করে তোলে। কোন পুরুষই নিজের পতিসত্তাটি গড়ে তুলতে সক্ষম হয় না, তার জন্য পরশমণিটির প্রয়োজন আছেই। দাম্পত্যজীবনে দুটি বস্তু কোনই স্থান নেই, একটি স্বামী বা পত্নীর অহমিকা। অহমি, আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর হওয়া। থাকলে বিবাহ দু দিনও টেকে না।

নিজের দৃষ্টিতে আত্মবিশ্বাস দিয়ে, প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটায় আত্মত্যাগের, স্বার্থবলির ডাকে সাড়া দিয়ে পতি-পত্নী তাদের সংসারকে সুন্দর করে তুলতে পারে। আর কোন উপায়ে তা হয় না। সংসার অনুক্ষণ এই স্বার্থবলির দাবী করে চলেছে। সেইটাই সংসারের দৃঢ়তম ভিত্তি। নারী যেমন প্রকৃতির পরম সুন্দর, তেমনি আত্মার উৎকর্ষ ও প্রকাশের সহিতও সে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমি মেয়েদের দুটি সত্তার উল্লেখ করেছি। তাদের আর একটি মহিমময় সত্তা আছে। এ বিপুল সন্তাবনা প্রত্যেকটি নারীর মধ্যে নিহিত। হিন্দুধর্মের ধর্মোৎসর্গ নিত্য-নৈমিত্তিক। সেটি আনুষ্ঠানিকই হোক অথবা ঘাই তার মূল্য হোক বা না হোক, এ কথাটা ঐতিহাসিক সত্য যে মেয়েরা ধর্মের জ্ঞানশাল ও প্রতিপোষক। তাদের আত্মা উর্দ্ধলোকে কোন শক্তির সহিত, বা উর্দ্ধলোকস্থিত কোন আদর্শের সহিত যুক্ত। এই যোগস্থাপনায় নারী কল্যাণময়ী, কল্যাণঞ্জী তার। একমাত্র এই কল্যাণমূর্তিতে তার জয়ঞ্জী রূপের—পরমতম রূপবিকাশের সন্তাবনা। আমাদের এ গতানুগতিক নানা অভাব পীড়ার সংসার থেকেই সেই কল্যাণী রূপের অভ্যুদয় হয়। মেয়েরা নিজের নারীসত্তা অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের রূপ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে পত্নীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ঘরে ঘরে নারী আছে, প্রকৃত পত্নীও আছে অনেক ঘরে। কিন্তু কল্যাণী বিরল। কল্যাণী গুহসম্বন্ধ উর্দ্ধলোকের সহিত যুক্ত হয়ে সংসারব্রত পূর্ণ না হলে কল্যাণীর উদয় হয় না।

যারা ভাবীকালের স্বামী তাদের এ কথাটা মনে রাখতে বলা যেতে পারে যে স্বামী হলেই গুণনিধি হয় না। ঘরে নেওরা যেতে পারে যে, বিবাহের ফলে বহুটি কন্যার চেয়ে মানসিকতায় শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু কন্যাটিও যে কর্মবুদ্ধিতে বহুটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এ কথাও তেমনি সত্য। আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা করে জীবনোপায়ের জন্য উপযুক্ত হতে হয়। কিন্তু দুটি বিশিষ্ট ও গুরুতর পেশার জন্য

কোন শিক্ষা কীর্তি রীতি নেই। এক পলিটিক্‌স্‌ অন্যটি স্বামিণী। যে কোন ব্যক্তি পলিটিশিয়ন বা স্বামী হতে পারে; বহুতপক্ষে হয়-ও। মেয়েরা কার্যক্ষেত্রে হাতে-কলমে বরং কিছু পত্নীধর্ম—Wifecraft শেখে, কিন্তু পুরুষ বিবাহিত হয়েও, সংসারের আঘাতে পড়েও স্বামিধর্ম বা Husbandcraft শেখার বালাই রাখে না। সহজ একটা অপটুতার কারণে পুরুষ সে কলাটা শিখতেও পারে না। যে স্বামীর স্ত্রীবন্দী বুদ্ধি যে নিজের অপটুতাকে স্বীকার করে তার সংসারকে পত্নীর হাতে ভুল করে।

সুপত্নী সংসারকে রক্ষা করে। কিন্তু যে কল্যাণী সে স্বামীর ভাবময় ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল অভাব পূর্ণ করে দেয়। সে ধর্মহীনকে ধর্মের পথে রাখে। মানবভাগ্য বা ঐশ্বরীয়, তার সঙ্গে সে স্বামীকে, পুত্রকে, কন্যাকে যুক্ত করে। সন্তোষ, ভালোবাসা, শান্তি কল্যাণীর সংসার পালনের উপকরণ। এই প্রভাব তার নিজের সংসারটিকে ছাপিয়ে বাহিরেও ছড়িয়ে যায়। এই প্রেমসর্বস্বভাবা কল্যাণরূপ মাতৃরূপের চরমতম বিকাশ। সে যেমন নিজের পুত্রকন্যার মাতা, তেমনি স্বামী আত্মীয়-পরিজন এবং তার সমাজমণ্ডলীরও মাতৃরূপ। সেই কল্যাণীরূপে নারীর জীবন্তরের চরম উদ্গতি কোন কোন ইউরোপীয় লেখক বলেন যে, স্বামিপত্নীকে গঠন করার ছাঁচ। জীবন্তরে সে কথা অবশ্য সত্য। যেমন করে সে শেখার পত্নী সেই রকম শেখে। কিন্তু মানবস্তরে পত্নীই স্বামীকে জীবনমন্ত্র দিয়ে উন্নীত করে দেয়। পরমর্ষ সর্বদা ভয়াবহ। পরমর্ষাচরণে কল্যাণজীর উদয় নেই, তাতে পত্নীঘেরও বিলুপ্তি ঘটে। নিজের প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সুসঙ্গত না হলে ধর্ম, ধর্ম হয় না, বুদ্ধি প্রকৃত বুদ্ধি হয় না।

কর্তব্য ও সহবাস বিবাহিত জীবনের অতিশয় গুরুতর কথা। নবজীবন আরম্ভ হলেই নববধূকে দুটি বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। নারী বা পুরুষের এমন কোন কর্মক্ষেত্র নেই যাতে স্বাদিহীন গতাভুগতিক ত্রুটি না থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থালীতে ক্রটিনে বাধা কিছু কর্ম আছে। যা না হলে সংসার চল না। এ কর্তব্যের দায় কেনো, তার উপলব্ধি থাকলে সে কাজ কটু হয় না। স্বামী যদি কেবল কর্তব্যজ্ঞানের দ্বারা চালিত হয়ে প্তীর ভরণপোষণ করে, প্তীর সেবাও যদি অল্পরূপে একটা গুরু কর্তব্যজ্ঞানের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহলে সে দম্পতির বিবাহ বালির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে জানতে হবে। বিবাহের প্রকৃতি থেকে যে কর্তব্যজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাতে বাধ্যতাজনিত কোন পীড়ার বোধ নেই। সে কর্তব্য আনন্দেরই অঙ্গ। কোন মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বাধ্যতামূলক কর্তব্য করতে পারে না এবং কর্তব্যের বিষয়ে সদাসর্বদা সচেতন হয়ে থাকতেও পারে না। যে দম্পতি বিবাহে আনন্দ আবাদন করে সেই আনন্দই তাদের সকল কর্তব্যের উৎস হয়। সে কর্তব্য দায়ের কুণ্ডা নেই বরং সেটি আনন্দের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত।

অনেকে পতি-পত্নীর রতি-প্রয়োজন পূর্ণ করাকেও দাম্পত্য কর্তব্যের তালিকাভুক্ত করে। যে দম্পতির রতিজীবন কর্তব্যজ্ঞানের দ্বারা শাসিত হয় তাদের বিবাহ বিফল হয়ে গেছে বলে মানতে হবে। এ প্রয়োজনটিকে কোন হিসাব-নিকাশ বা ক্রটিনের দ্বারা বাধ্য করা অত্যন্ত জঘন্য ও বিভ্রমনার কথা। সেটি সম্পূর্ণ দাবী-দাওয়াশূন্য প্রাণপ্রাচুর্যের কারণে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া। প্রতিদিনের পরিবেশ এ ক্রিয়াটির প্রয়োজন বা অপপ্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত করে।

“সহবাস” শব্দটিতে রতির ইঙ্গিত কেন, তার কারণ আমরা জানা নেই। সহবাসের সঙ্গে রতির কোন সংশয় নেই। পতি-পত্নীর—স্বামি-স্ত্রী ও সন্তান এ ত্রয়ের একত্র বাসকেই সহবাস বলে জানা উচিত। একসঙ্গে বাস করা এবং পরস্পরের জীবনের অংশভাগী হওয়াই প্রকৃত সহবাস। বর্ষা ও বসন্ত প্রত্যেক দম্পতির জীবনের অবিচ্ছেদ্য হুঁটি স্বভূত, একসঙ্গে তাদের সম্মুখীন হওয়াই সহবাস। অভিজ্ঞ দম্পতিদ্বারা জানে যে স্ত্রীর চেয়ে দুঃখের মিলন ঐক্যই গাঢ়তর, গভীরতর। দুঃখ হতেই গতাভুগতিকতার ভেতর দিয়েই জীবনের অমিলন উদ্ভব। দুঃখ জীবনছন্দের অঙ্গ। দুঃখের বেদনার অগ্নিসেবন না করলে দম্পতি একান্ত হয় না। ইংরাজি একটা সর্বনামে বাস্তু আমাদের মন ও মস্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে Familiarity breeds contempt—নিকট পরিচয় থেকে ঘৃণার উৎপত্তি হয়। এমন সর্বৈব মিথ্যা কথা আর নেই। এ কথাটা সত্য হলে ভগতে বন্ধুত্ব, দাম্পত্য, মাঝুবে মাঝুবে আত্মীয়তার বোগ সস্তব হোত না। সত্য কথা এই যে, পরিচয়ে আকর্ষণ ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, পরস্পরের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার উদয় হয়। নিত্যমিলনের বর্ধমানা শ্রীতিকে আমরা শ্রদ্ধা বলি।

ঘনিষ্ঠতা মানে পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে জানা। দাম্পত্য ঘনিষ্ঠতার অর্ধ, পরস্পরের দেহকে, মনকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া, পরস্পরের ভাবময় জীবনে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া। বিবাহ সর্বদাই প্রেমের ভিত্তির ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চক্কর সন্ধান। স্বটিক মণি জ্বালানুস্মের সংস্পর্শে এলে তার রঙ উপরভুক্ত হয়। পরস্পরীও তেমনি পরস্পরের উপরগে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। একথণ্ড কাঠকে যদি চিনির রসে বার বার ডুবিয়ে নেওয়া যায়, তাতে রসের নানা পরত পড়ে। শেষ পর্যন্ত কাঠখণ্ডটিকে আর দেখা যায় না, তার রসাক্ত রূপটিকেই দেখা যায়। এই রাসায়নিক রূপান্তরকে কেমাসন বলে। তেমনি প্রেমিক-প্রেমিকার দেহমনের ওপরও নিত্যনব রূপের কেমাসন পড়ে, বার কারণে মাঝুবে প্রেমাস্পদের গুণের অতিরঞ্জন করে, যে গুণ তার নেই তাতে সে গুণটিও দেখে। প্রতিরূপে তাকে নূতন করে দেখে, রূপের আর ইয়ত্তা খুঁজে পায় না। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে কেমাসনের গুণে, প্রেমাস্পদের মুখের কোন রেখা, চুল্লীর কোন ভঙ্গী, বর্ধন্যের কোন ধরণ, পলাতক একটি অলঙ্কার বা অঙ্কন নূতন আকর্ষণ নূতন উদ্ভাপ, নূতন মাধুর্য বিকীরণ করে। বিবাহিত জীবনকে স্থায়ী করবার, মধুর করবার জন্ত অঙ্কন উদ্ভাপের প্রয়োজন। সহবাস এ সকলের অহীন উৎস। সহবাস না থাকলে দম্পতি নব নব রূপে প্রতীকমান হয় না। পরস্পরের আত্মার প্রাণের হিঙ্গাল তেলে না।

বিবাহে যেমন দুটি জীবন এক হয়, তেমনি দুটি দেহও এক হয়ে যায়। সহবাসের চেয়েও যদি বড়ো কিছু থাকে সেটি একত্র শয়ন। এ বিষয়ে আমি নানা স্থানের নানা মত দেখেছি। কিন্তু এ কথা খুবই সত্য যে, একত্রে নিত্রা বাওয়ার মতো পতিপত্নীর ঐক্যের আর উচ্চতর কোন প্রকাশ নেই। যে দম্পতি একত্র শয়নের মাধুর্য জানে না তাদের মিলন সূত্র, তাদের বিবাহ সার্থক হয়নি। এ কথাটি পর্ববেকপদ্যপেক্ষ যে, নিত্রাকালে দুজনের বাস-প্রবাস সমন্বয় হয়। একজনের ঘুমের শান্ত বাস-প্রবাসের ছন্দে অল্পের ঘুম আসে। এই প্রাণবায়ুর ঐক্য থেকে দম্পতির জীবনীশক্তিরও

হৃদয়মিলন হয়। সহবাসটুকুই দাম্পত্য জীবনের সার কথা, তাতে কোন ক্রিয়ার কথা ওঠে না। একত্র শয়নের মতো একান্ত হবার আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। এই এমন একটি ঘনিষ্ঠ অবস্থা ভালোবাসা বা রতি বার কোন আঙ্গিক নয়।

বিবাহের দুস্তর সাগরটিতে অনেকগুলি দৃষ্টির অগোচর নিমজ্জিত মৈনাক পর্বত আছে বার সংঘাতে বিবাহ-স্তরনীটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর্থিক অভাব ভয়াবহ মৈনাক। ধর্মমতের বিরোধ, সঙ্কারও ক্রটিগত গভীর মতভেদ, শ্রেণীগত পার্থক্য খুব বড়ো বড়ো মৈনাক। জাতিবৈষম্য বিবাহকে সম্পূর্ণ হতে দেয় না। আমার মতে শান্তি ও নির্জনতাপ্রিয় স্বামীর পত্নী যদি উৎসাহী সঙ্গীতসাধিকা বা বেহালাবাদিকা হয়, তাহলে বিবাহ নিশ্চয়ই ভেঙে যায়। কথাটা আমি ঠিক পরিহাস করে বলছিলাম। বিবাহের আরো একটি বড়ো শত্রু আছে, আমাদের সমাজে বার হালে উদয় হয়েছে। ইংরেজীয় সমাজের কথায় বাগটীও রাসেল, হাইনরিখ কিস, কেনেথওয়ার্কর প্রভৃতি জ্ঞানবুদ্ধেরা এই বিষয় শত্রুটির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অবাধ মেলামেশা পুরুষের যেমন মেয়েদেরও ভেদনি বিবাহের ভিত্তিটাকে শিথিল করে। ধর্ম ও নীতি এখন কোন দেশেই সকল নয়, তাই সে হুটি আর মানুষের রক্ষাকবচ হয় না। ধর্ম ও নীতির কথাটা প্রখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী কেনেথওয়ার্করের, সেটা মনে রাখা মন্দ হবে না।

এ সমস্তটা আধুনিক হলো কথাটা আমাদের দেশে বেশ পুরাতন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে 'কামসূত্র' রচয়িতা এখনকার মনোবিজ্ঞানীদের আদিগুরু বাৎসর্যন লিখেছিলেন যে, 'পরপুরুষে গোষ্ঠীশীলানু' মেয়েরা গৃহধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়। বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ ও মনোবিজ্ঞানী হাইনরিখ কিস বলেছেন যে পরপুরুষে ও পরস্ত্রীকে গোষ্ঠীশীল মেয়ে ও পুরুষের গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবন সদাসর্বদা বিপদাকীর্ণ। অভিধানকার রাজশেখর বসু গোষ্ঠীর অর্থ দিয়েছেন, আড্ডা, Club গোষ্ঠীশীলদের ধোঁচেতনা সত্তত উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। সে উত্তেজনা দাম্পত্য ও সমাজের মঙ্গলকর হয় না।

কিন্তু বিবাহের পরমতম শত্রু প্রত্যেক স্বামী ও স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সদাসর্বদা আছে। তাকে ভালো করে চিনিয়ে দিই। মানুষ স্বাস্থ্যেরই পাঁচটি কর্মসূত্র এবং পাঁচটি জ্ঞানসূত্র। যে ইন্দ্রিয়টির ডবল কাজ, অর্থাৎ কর্মসূত্র ও জ্ঞানসূত্রের কাজ করতে হয় তার নাম জিভ। কর্মসূত্ররূপে জিভ কথা কয় এবং জ্ঞানসূত্ররূপে সে রসনা রস গ্রহণ করে। জিভের মতো আর কোন ইন্দ্রিয় সদাসর্বদা অসংঘত উৎকট কাজ করে না। বাগিন্দ্রিয় হিসেবে সে কটু ও নিষ্ঠুর ভাষণের দ্বারা সর্বনাশ ঘটায়। রসনা হিসেবে লোকের দ্বারাও সর্বনাশ করে, অবশেষে মৃত্যু আনে। দাম্পত্যজীবনে এই ভয়ানক ইন্দ্রিয়টি পতিপত্নীর বসে না থাকলে বিবাহ নরক হয়ে যায়। সুখেরা লোভী স্ত্রীর মতো কটুভাষী লোভী বাচাল স্বামীও ভয়ানক লোক। বাচালতা মিথ্যাভাষণের পরমতম সহায়। আমাদের দেশে কথায় আছে "সে কহে বিস্তর মিথ্যা যে, কহে বিস্তর।"

আধুনিক কালে উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদি দাম্পত্যজীবনের একটি বড়ো শত্রু। আমি উপন্যাস ও গল্প লিখি, কাজেই এ কথাটা

বেশ জোর করে বলতে পারছি। সংঘর্ষণের চিত্র না থাকলে উপন্যাস গল্প, নাটক পাঠকের মনোরঞ্জন করে না; তাই সংঘর্ষণ লেখকদের একটি বহুপ্রচলিত করণ ও কৌশল। এই ধাঁধার পক্ষে উপন্যাসকে জীবনের প্রকৃত আলোচ্য মনে করে পাঠক-পাঠিকা সংঘর্ষণকেই দাম্পত্যজীবনে অবশ্যজ্ঞাবী বলে শুধু মনে করে না, অভ্যাসবশে সংঘর্ষণকে মননও করে; সামঞ্জস্য ও শান্তিকে খোঁজে না। ডাক দিলেই সংঘর্ষণ তখন আসে। এ কথা ভাল করে মনে রাখা মন্দ হবে না।

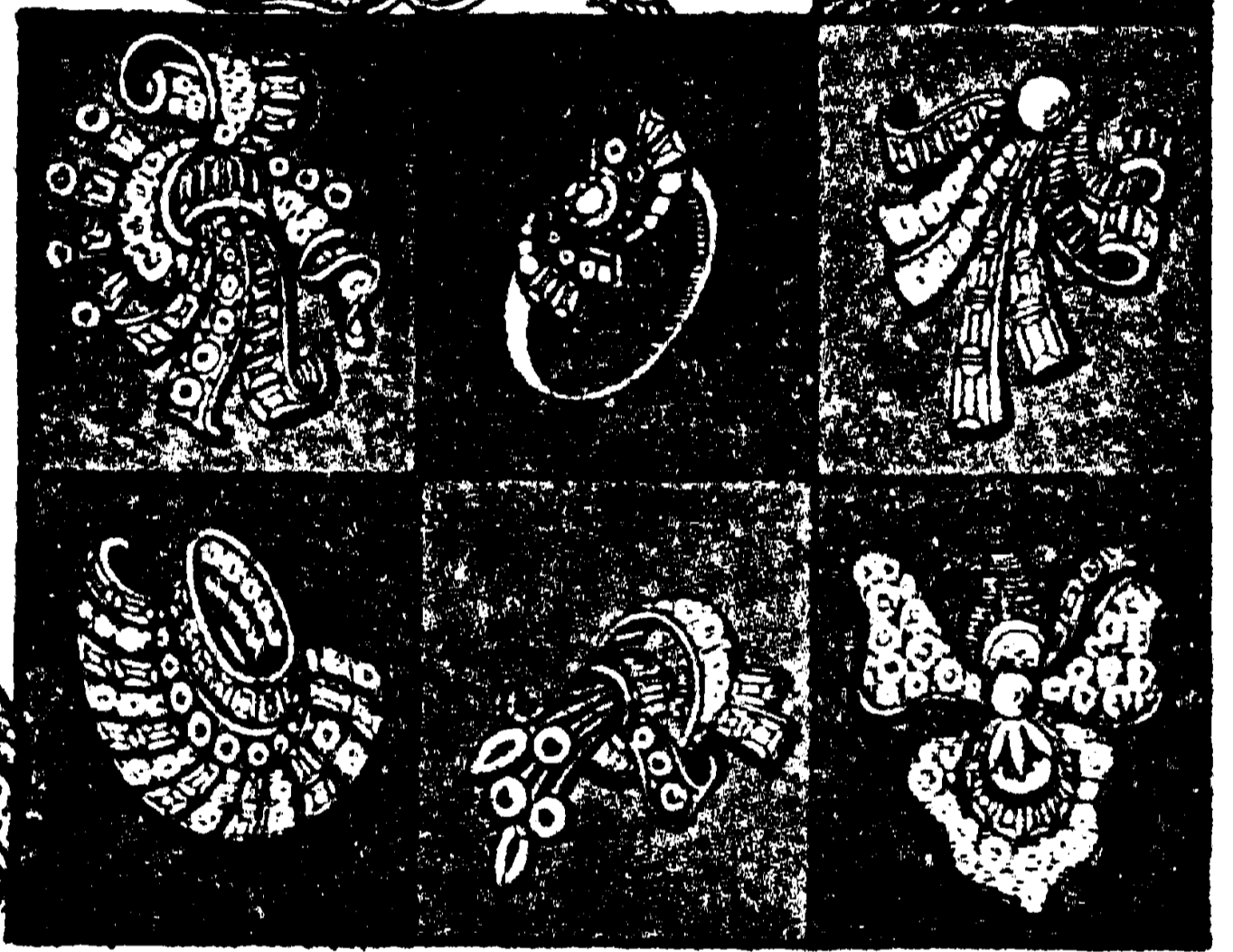
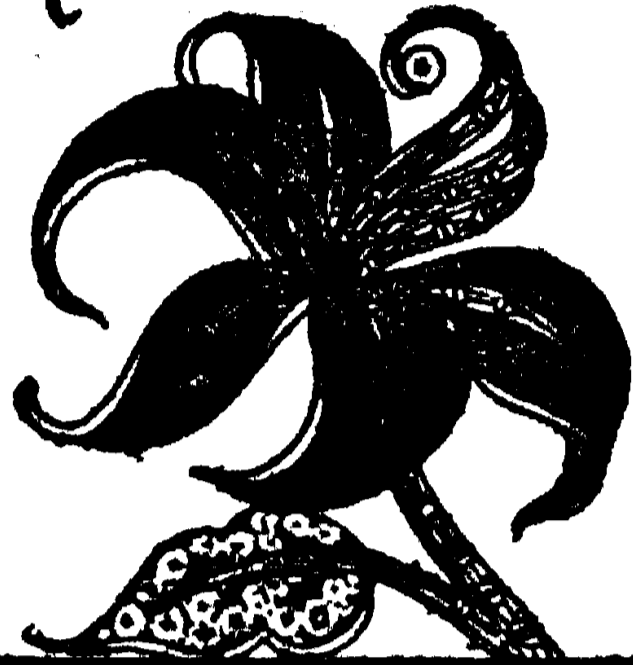
বারা কল্পলোকে বিচরণ করে, অর্থাৎ চিত্রকর কবি ও লেখক জাতীয় স্বামীদের শৃঙ্গারের দাবী বেশী। অল্পপক্ষে দার্শনিক বিজ্ঞানী ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার উকিল ব্যবসায়ী জাতীয় স্বামীদের সে দাবী সহজ নিরিখেও কম হওয়া সম্ভব।

বিবাহিত-জীবন জীবনের শ্রেষ্ঠতম মহিমময় অংশ। মানুষের যা শ্রেষ্ঠ ঐর্ষ্য—বোঁবন—তার সমগ্র শক্তি দিয়ে সে এই জীবনটির পূজা করে। সেটিকে অক্ষুণ্ণ সুন্দর পরমোৎকর্ষের অবস্থা করে রাখতে গেলে বধুকে তার নিজের অন্তরাত্মকে যত গোপন বাণীটির দিকে নিরন্তর কান পেতে থাকতে হয়। সে ঐশ-বাণীটি সকলেরই বুকের ভেতর আছে। কিন্তু উৎকট কোলাহল, অসংখ্য অর্বাচীনের নানা আফালনের এ যুগে সাধনা না করলে বাণীটি তনতে পাওয়া সম্ভব হয় না। বিবাহ নিভৃত সাধনার বস্ত্র, হাটের জিনিস নয়। কোন দেশে, কোন কালে হাটের মাঝে কারো বিবাহ সার্থক হয় নি। ব্যুধিষ্টির অভিশাপে অভিশপ্ত কুকুর ও নিলজ্জ ছাগল ছাড়া কীটপতঙ্গেরও বিবাহ নিভৃত সাধনা। পত্নীর ভার খুবই গুরুতর। সে সৃষ্টির কেন্দ্র অধিকার করে আছে, নিজে সে শ্রষ্টা। তার একটি পরমতম কাজ আছে বলে আমি মনে করি। সেটি ভালো হওয়া। কিন্তু ভালো হবার মতো এমন কঠিন তপস্যা পৃথিবীতে আর নেই।

মানুষ মাত্রেই জীবনে পরম আগ্রহ। স্বাস্থ্য, ধন, নিরাপত্তা, চিন্তা, অমুরাগ, হিংসা, ঘেব, নৈরাশ, অভিমান, অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি-নানা বস্ত্র জীবন থেকেই উৎপিত হয়। এ সকলের অধিকাংশই জীবনবিরুদ্ধ। মানুষ সেই বিরুদ্ধ-চিন্তার দ্বারা অভিভূত হয়ে থাকে। ভালো হ'তে গেলে সকল বিরুদ্ধ ভাব মন থেকে উৎপাটিত করে তার স্থানে সৌন্দর্য, ভালোবাসা, দাম্পত্য ও স্থায়বিচারকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই অবস্থাতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাই ভালো হওয়া। সকল অবস্থায় হাসিমুখে প্রসন্ন অন্তরে ছোট ছোট কাঁধে ভালোর বিষয় গুরুতর বহন করাই কল্যাণী, প্রকৃত গৃহলক্ষীর বিধিলিপি। হিন্দু জীবনযাত্রার একটি বিশিষ্ট ধরণ। এই হিন্দুই বাঙালীর মেয়ের ধ্যান-ধারণাকে আলাদা করে রেখেছে, বার কারণে পৃথিবীর কোন দাম্পত্য সমস্তা তার নিজের সমস্তা নয়। এ পরম সত্যটির উপলক্ষি করেছিলেন বিবেকানন্দের শিষ্য মার্গারেট নোবল, বাংলা দেশ আজও বাকি ভগিনী নিবেদিতা নামে স্মরণ রেখেছে। তিনি হিন্দুনারীর পত্নীত্বের গুণগান করে গেছেন। তার ভালোবাসাকে "love strong as death" বলে জগতে প্রচার করে গেছেন। পৃথিবীর আর কোন নারী জাতির বিষয়ে অতুলন কিছু পড়ার আজও আমার সৌভাগ্য হয়নি।



আদ্যে মাদুর্য



গিনি জাল্ড জুয়েলারী স্কেনশালিস্ট

এম.বি. সরকার
এও সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/২ চন্দ্রজাগর স্ট্রীট কলিকতা-১২ গ্রাম-সিলিয়ার্স
ব্রাঞ্চ-বালি গঞ্জ-২০০/৫/পি রাসবিহারী এডিনিউ কলিকতা-১২ ফোন-৪৬-৪৪৬৬
মোরুমের পুরাতন টিলাবা ২২৪, ২২৪/১, অক্ষয়জাগর স্ট্রীট, কলিকতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮৭

B.B.



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

মালিনকে ভায়লেটের জীবনের কাহিনী বললাম—সেই দিন
রাত্রেই ডিনার খাওয়ার পরে। মালিন চুপ করে শুনল।
আমার কথা শেষ হলে বলল—মেয়েটির জন্ত আমি দুঃখিত। কিন্তু—
শুধালাম, কি ?

বলল, তোমাকে এত বিস্তারিত করে জীবনের কাহিনী বলার
কি প্রয়োজন হল তার ?

হেসে বললাম, আমি যে ওকে একটু খোঁচা দিয়েছিলাম।
বলেছিলাম—জীবনে ওর দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত।

গভীর ভাবে শুধাল, কেন ?

মিসেস প্যানের কথাও বিস্তারিত বলতে হল। ইদানিং
মালিনকে আর কিছু বলিনি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, ওর সঙ্গে এসব কথাবার্তা না
বলাই ভাল।

বললাম, যা বলেছ। আমারও আর ইচ্ছে নেই। ওর বিকৃত
মনোভাবের ছোঁয়া মনে না লাগানই ভাল।

সেই রকম গভীর ভাবেই বলল, শুধু তাই নয়। ওর লীলা
তধু খেয়ালেই চলে না—তার একটা সুনির্দিষ্ট গতি আছে দেখছি।

দু-তিন দিন পরে একদিন বিকেলে মিঃ ও মিসেস লালকাকা
এলেন আমাদের বাড়ীতে। মালিন টেলিফোনে 'চা' এ আসতে
বলেছিল। তার কারণ—মিসেস লালকাকাই টেলিফোন করে
একদিন আসতে চেয়েছিলেন। সেদিন বৃথকার ছিল, তাই বিকেলটা
আর সার্জারীতে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। মিঃ ও মিসেস
লালকাকা এলেন। মিসেস লালকাকা মালিনকে জড়িয়ে ধরে
চমো খেলেন—মালিনকে দেখে যেন অত্যন্ত খুসী। তারপর
মালিনের মুখের দিকে একটু যেন অবাক হয়ে চেয়ে বললেন
মালিন। এ কী চেহারা হয়েছে তোমার ?

আমি অভ্যর্থনার জন্ত পাশেই পাড়িয়েছিলাম।

আমার দিকে চেয়ে শুধালেন, মালিন কি অসুস্থ ? কৈ কিছু
খবর পাইনি ত ?

বললাম, না ভালই ত আছে।

মালিনও সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি ভালই আছি।

কথা বলতে বলতে আমরা বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম।
মিসেস লালকাকা যেন কথাটা ছাড়লেন না। আমাদেরই বললেন
দেখছেন না—কি চেহারা হয়ে গেছে! চোখের কোলে কাজী
ভেঙ্গে দিয়েছে। অমন মুখ—কেমন যেন শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে।

মিঃ লালকাকা বললেন, সত্যি, মিসেস চৌধুরীর চেহারা খারাপ
দেখছি ?

বললাম, আমি ত রোজই দেখি, তাই হয়ত ঠিক বুঝতে
পারি না—হয়ত আপনাদের কথাই ঠিক।

মালিন মিসেস লালকাকাকে বলল, কেন মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছে।
আমি ভালই আছি—ও আমার ঠিক হয়ে যাবে।

মালিনের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই ত,
মালিনের চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। বড় বড় সেই বিয়ল
চোখ দুটির নীচে যেন ঘন কালি জমা হয়েছে। মুখখানি রোগাও
দেখাচ্ছে অনেক। তাই ত! এতদিন কি ভাল করে চেয়ে
দেখিনি ?

মিসেস লালকাকা আমার দিকে চেয়ে মুহূর্তে হেসে বললেন,
আপনার চেহারাও ত বিশেষ ভাল দেখাচ্ছে না। ব্যাপার কি ?

হেসে বললাম, কিছুই না। বোধ হয় স্বামিনীকে চেহারা খারাপ
করার পান্না দিচ্ছি। সব দিকেই ত মালিনের কাছে আমার হার।
তাই এদিকেও যাচ্ছি হেরে।

সবাই হেসে উঠল। কথা অল্প দিকে গেল ঘুরে। একথা
—ওকথা—সেকথা—পাঁচ কথায় জলযোগের সঙ্গে খানিকক্ষণ
সময় গেল কেটে। মিঃ লালকাকা অবশ্য 'চা' খাননি। হইছি
খেয়েছিলেন।

ওরা বিদায় হয়ে যাওয়ার পর খাওয়া লাগা সেবে রাত্রে বিছানায়
শুয়ে মালিনের শরীরের কথা ভেবে মালিনের প্রতি একটা
সহানুভূতিতে মনটা উঠল ভরে।

কাছে টেনে নিয়ে শুধালাম, লীলা! সত্যিই কি তুমি শরীর কিছু
খারাপ বোধ কর ?

মুখখানি এলিয়ে পড়ল আমার বুকের মধ্যে। একটা

দীর্ঘদিনের কষ্টে কল, শুধু দুকটার মধ্যে মানে মানে কেমন যেন করে—

মনে পড়ে গেল সেই ভক্তির হাসপাতালে মালিনের রিউম্যাটিক কিবানের কথা। তার দরুণ হার্টটি কি দরুণ জখম হয়েছিল—সবই শুধু আমার জন্য। একটা অভূতপূর্ব মরমে মনটা হুলে উঠল।

মুখে বললাম, কালই আমি তোমাকে ভাল করে পরীক্ষা করব। হিঃ হিঃ, এতদিন যেখিনি কেন?

আমার কপালে ও চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল বিকে। ছুঁতে ভেঁব না। বতদিন তোমার বুকে ঠাই ততদিন আমার বুকে কোনও আঘাত লাগবে না।

বুলা। মনটা মহলা শুধু হালকা নয়, এত উৎফুল্ল হয়ে উঠল—জীবনে কোনদিন এমন হয়েছিল কিম্বা জানিমা। মনে হল—আমাদের দুজনার বুকের মধ্যে কোনও বিরোধের স্থান নাই-ই, কোনও বিরোধ হতে পারেনা। তা বেল অসম্ভব।

কিন্তু Providence is nothing if not Coquettish বুলা। মনে আছে ত লগনে প্রথম এসে চন্দ্রমাখের অল্পপ্রেরণার বিখ্যাত উপত্যকিক টমাস হার্ডির খামকয়েক উপভাস পড়েছিলাম। এম পড়ে বিশেষ অভিভূত হয়েছিলাম। তারই, কোন উপভাসে মনে মাই, ঐ কথাটি পড়েছিলাম। কথাটা যে কি মিহাক্ষণ সত্য—পরের দিনই টের পেলাম।

পরের দিন সকাল থেকেই শরীরটা বিশেষ ভাল লাগছিল না—

কেমন যেন লম্বা শরীর এলিয়ে পড়ছে এইরকম একটা ভাব। বাই হোক, পাঁচ মালিন কিছু ভাবে, তাই মালিনকে কিছু না বলে বখারীতি সাক্ষারীর কাজ এলাম সেবে এবং হুপুরবেলা বসবার ঘরে বিজ্ঞান করতে করতে একটু বেল ঘুমিয়েও পড়লাম। সন্ধ্যাবেলা সাক্ষারীতে বাঙার সময় শরীরটা বেল আরও ভারী মনে হতে লাগল—বেল শুবে পড়তে চায়। হুপুরবেলা ঘোমনটা বোব হয় ঠিক হয়নি। নিজের নাকী পরীক্ষা করলাম—কিছুই না, বেশ স্বাভাবিক। একবার ভাবলাম—গাড়ী নিয়ে সাক্ষারীতে বাই, তারপর ভাবলাম—না বেশ ক্রতপদে হেঁটে সাক্ষারীতে গেলেই এ ভাবটা বাবে কেটে। তাই পেলাম।

কিন্তু সাক্ষারীতে গিয়ে আধ বটা খামেকের মধ্যে সহজেই বুঝতে পারলাম—প্রবল মর এল, লম্বা হাত-পা বেল ভেঙ্গে নিয়ে আসলে, মাথার মতলা একটু একটু করে ক্রমেই প্রথম হতে লাগলো।

ভারলেটকে ডেকে ডালাস, আর কতগুলি যোগী আছে? বলল, আর পাঁচটি।

টেবিলের 'পরে মাথাটা কাত করে বেখে বললাম, আজ আমি যোগী দেখতে পারবনা, আমার মর এসেছে।

ভারলেট তৎক্ষণাৎ আমার কপালে একবার হাত বিয়ে খামোমিটারে মর পরীক্ষা করল—১০২ এর উপরে।

বলল, আপনি চলুন—আমার শোবার ঘরে একটু শুবে পড়বেন।

কিন্তু তখন আমার মন মালিনের কাছে বাঙার মত আকুল

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ...

খাদ্যের সারাংশ সম্পূর্ণ শরীরের প্রয়োজনে নিয়োগ করলেই অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়। ডায়াল-পেপসিন ব্যবহার করলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন, কারণ ডায়াল-পেপসিন খাদ্য হজমের সাহায্য করে।



ডায়ালপেপসিন

হুকেলা খাবার সময় নিয়মিত ছোট এক চামচ খাবেন।
ডায়াল-পেপসিন কখনো অভ্যাসে দাঁড়ায় না।

ইউনিয়ন ড্রাগ • কলিকাতা

NA/UD-BN/

হবে উঠেছে—মালিনের মধ্যেই চাইছে বিশ্রাম। আর কোথাও না।

বললাম, না না। আমি বাড়ী চলে যাচ্ছি।

ভায়লেট বলল, কিন্তু এ অবস্থায় হেঁটে যাবেন কি করে? গাড়ী আনেননি। সেলে ত ট্যান্ডী পাওয়ার ব্যয় না। টেলিফোন করে ম্যানচেষ্টার থেকে ট্যান্ডী আনতে অন্ততঃ হু বটা লাগবে। তাই বলছিলাম—ততক্ষণ শুয়ে থাকুন—আমি টেলিফোনে ট্যান্ডীর ব্যবস্থা করি।

বললাম, না—না। মাইলখানেক ত রাস্তা। কোনরকমে হেঁটে চলে যাব।

এই বলে উঠলাম। কিন্তু মাথাটা বে ফেটে যাচ্ছে। আবার বললাম।

বললাম, এক কাজ কর ভায়লেট! আমাকে ত্রাণীর সঙ্গে এসপ্রিন মিশিয়ে একটা ডোজ করে দাও ত?

ভায়লেট ক্ষতপদে ঘর থেকে চলে গেল এবং একটু পরে ওষুধ নিয়ে ফিরে এসে আমাকে দিল।

বলল, আমি রোগীদের বিদায় করে দিয়ে এসেছি। ওষুধটা খেয়ে ক্রমে একটু সুস্থ মনে হল। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি এইবার বাই।

বাইরে প্রচণ্ড শীত। ভায়লেট তাড়াতাড়ি আমার ওভারকোট নিয়ে এসে পরিষ্কার করে, গলা পর্যন্ত ফুলে দিল বন্ধ করে। টুপীটা মাথায় চেপে পরিষ্কার দিল।

বলল, একটু পীড়ান—এক সেকেন্ড।

প্রায় লৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই এল ফিরে, গায়ে ওভারকোট এবং মাথায় একটা টুপী পরে নিয়েছে, হাতে একটা মোটা উলের স্কার্ফ।

চলতে চলতে শুধালাম, একি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বলল, আপনাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব।

বললাম, কেন? কি দরকার?

চুপচুপে বলল, আপনাকে এ অবস্থায় একলা যেতে দেব না, এটা ঠিক।

বেশী কথা বলার শক্তি তখন ছিল না। তাই আর বিশেষ প্রতিবাদ করলাম না। কিন্তু তারপর বাইরে দুর্ভাগ্য ঠাণ্ডায় বেরিয়েই মনে হল—ভাগ্যিস ভায়লেট আছে নইলে আমি সত্যিই একটা রাস্তা যেতাম কি করে। নিজের দেহের উপর যে কোনও জোরই নাই, কোনও আস্থা নাই যেন, যে কোনও সুস্থর্তে ভেঙে পড়তে পারে। ভায়লেটের কাঁধে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম।

রাস্তা যেন আর ফুরায় না—কতক্ষণে মালিনের কাছে যাব। তখন বোধ হয় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি—ভাগ্যিস বরফ পড়তে শুরু হয়নি। রাস্তাও পরিষ্কার ছিল—বাইরে ছিল ঠান্ডার আলো। তাই কোনও রকমে ভায়লেটকে ভর করে শরীরটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া যেন সম্ভব হল। মাথা বে ফেটে যাচ্ছে তার তার কোথায় যাবি?

শেষ পর্যন্ত বিকোলীনার কটকের কাছে এসে যেন হাঁক ছেড়ে দাঁড়ালাম। ভায়লেটের কাঁধের ভর তখনও ছাড়িনি। চুকলাম কটকের মধ্যে। হাঁক ছাড়বার অন্ত সুস্থর্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম কি?

কেন আমি না, চোখ পড়ল অন্ধ কটকের দিকে। একটা ভীষণ তড়িৎশিখার চমকে উঠল প্রাণ। কি দেখলাম তখন? ঠান্ডার আলোতে দেখলাম কটকের পাশে একটা স্প্রুস (Spruce) গাছ-তলার ছায়া দাঁড়িয়ে আছে।

একজন—সেই যোগাও, সেই গলা পর্যন্ত ওভারকোট ঢাকা, মুখটা ঢাকা মাথায় টুপীতে, দাঁড়িয়ে আছে গাছের ছায়ায়—তাই পরিকার তাকে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু আর একজনকে পরিকার দেখতে পেলাম মালিন! শুধু তাই নয় বলা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম মালিন তার গলা জড়িয়ে তাকে চুমো খেল এবং সে অন্ধ কটক দিয়ে ক্ষত পদে গেল বেরিয়ে।

আমি কি সেইখানেই পড়ে যাচ্ছিলাম, মাথাটা কি ঘুরে গিয়েছিল, সহসা অনুভব করলাম ভায়লেট আমাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে টেনে ধরে রেখেছে।

চাপাগলার বলল, চলুন। চলুন। আশ্বা কিবে বাই। এ পাপ পুরীতে এ অবস্থায় গেলে আপনি বাঁচবেন না। এই বলে আমাকে প্রায় টেনে কটকের বাইরে নিয়ে গেল।

শুধাল, পারবেন না?

শুধু বললাম, হ্যাঁ পারব। চল ফিরে।

ভায়লেট আমাকে সেই ভাবেই প্রায় টেনে নিয়ে চলল। তার আলের কোমল স্পর্শে তখনকার মত যেন একটা আশ্রয়ও পেলাম।

সমস্ত রাত ধরে প্রায় বেহাশ হয়ে রইলাম। কোনও রকমে সার্জারীতে ফিরে এসে ভায়লেট আমাকে সব্বত তার বিধানার তইয়ে দিয়েছিল, সেইটুকু মনে আছে এবং তারপর আর সে ব্যস্তের কথা বিশেষ কিছু মনে নাই। তবে ভায়লেট, আমি শুয়ে পড়ার পরে খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসে, একটা কি ওষুধ লাগিয়ে আমার মাথা টিপে দিচ্ছিল সেটুকুও যেন মনে পড়ে।

তবে, সমস্ত রাত ধরে যোরে নানা রকম ভীষণ ভীষণ স্বপ্ন দেখেছিলাম—তার কিছু কিছু আজও মনে আছে, বস্তুকুঁ বা মনে আছে বলি।

—একটা যেন ভয়ঙ্কর কালো সাপ আমাকে তাড়া করেছে, আমি যেন ছুটছি, চারিদিকে ভয়ঙ্কর, কিছুতেই যেন তার হাত থেকে নিস্তার নাই। হঠাৎ যেন আমি পড়ে গেলাম, একটা উঁচু জায়গা থেকে নীচু জায়গায়। ভীষণ যেন লাগলো। কোন রকমে মাথা ফুলে সাপটা কতদূরে দেখবার অন্ত চাইতেই দেখি, সাপ নয়, সুধা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, আমার অবস্থা দেখে হাসছে। ভীষণ যেন রাগ হল।

বললাম, তুমি হাসছ? তোমার লজ্জা করে না।

যেন কাছে এল, হাসতে হাসতেই আমার হাত ধরে আমাকে তুলতে তুলতে বলল, চল এইবার বাড়ী চল। তারপর কি যেন কি সব হল ঠিক মনে নাই।

আবার যেন দেখলাম আমি ও সুধা চলেছি, কিন্তু এবার ভয়ঙ্কর নয় বাগান, কি সুন্দর বাগান, চারিদিকে ফুল ফুটে আছে। ছোট-বড় নানান গাছ পরিপাটী করে সাজান।

চলতে চলতে শুধালাম, বাড়ী কতদূর? আমি আর হাঁটতে পারছি না। পাশে চেয়ে দেখলাম—কই সুধা কই? এ ত মালিন চলছে আমার সঙ্গে, সেই বিবরণ-গভীর ধষণ।

বলল, আর বেশী বুঝে নয়। আমার হাত ধরে চল। আমি মার্লিনের হাত ধরলাম। অরের ঘোরেই মনে হল—কত দারুণ, কত মহাশক্তি মার্লিনের হাতখানিতে রাখান। সত্যিই আমি যেন উল্লসিত পারছিলাম না, শরীর যেন জেঁকে আসছে। মার্লিনের হাত ধরে যেন বাঁচলাম।

ক্রমে ক্রমাৎ এমন জায়গায়, সেখান থেকে পায়ের উল্লসিত ভাবি যেন জেঁকে অনেক দীর্ঘতে চল গিয়েছে। বুঝে একটা বিরাট নদীর ধারে যেন দেখা গেল আমার বাঁদীর। নদীটা এত বড় যে নদীর উপরেব দিকের জল বায়ে বায়ে ফুলে যেন আকাশ ছুঁয়ে আসছে। দীর্ঘ কিয়ে চেয়ে যেন মাথা বুঝে গেল—অনেক দীর্ঘ। কি করে সাঁকব?

মার্লিন যেন বলল, লোক দিতে হবে। তবে যেন চমকে উঠলাম।

বললাম, পারব না। পারব না। মার্লিন যেন বলল, উপায় মাই। এই বলে আমার দ্বিতীয় কথাই অপেক্ষা না করে আমার হাত ধরে টেনে লাকিয়ে পড়ল। লোক দিয়েরই মার্লিনের সঙ্গে আমার হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। পড়ে বাছি, পড়ে বাছি—চীৎকার করে ডাকলাম লীনা! আমাকে ধর ধর। কোনও দিকে সাড়া পদ নাই—শূন্য শূন্য। আমি খালি পড়েই বাছি।

চমকে বোধ হয় ঘুরে ঘোরটা গেল কেটে। তখন কত রাত জানি না—সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে। কাতর হয়ে চাইলাম, জল, একটু খাবার জল। আমার পাশেই চেয়ারে বসেছিল—কে? ভারসেট না মার্লিন? জল নিয়ে এসে সবচেয়ে আমাকে খাইয়ে দিল। একটু পরেই অরের ঘোরে আমার ঘুমিয়ে পড়লাম।

আবার এলো নানা রকমের স্বপ্ন। বিস্তারিত ঠিক মনে নাই। তবে বোধ হয় আগের মতন তত ভীষণ নয়। রাত্রের শেষের দিকের একটা স্বপ্ন কতকটা মনে আছে—সেটাও খারাপ স্বপ্ন। সেইটে বলি।

আমি ও মার্লিন যেন পিকনিক করতে গিয়েছি, সহর ছাড়িয়ে অনেক বুঝে, মার্লিন নদীর ধারে অনেক বুঝে। আমি বসে আছি, মার্লিন আমার পাশে আসের উপর গুয়ে পড়েছে—পাঁচুটি ভিড়িয়ে রেখেছে জলের স্রোতে। হঠাৎ কাল মতন কি যেন একটা জলে ভেসে এল—মাছুব না কুমীর? না সাপ?—কালো তার ছোটো চোখ খালি জলের উপর ভাগছে। হঠাৎ মার্লিনের পা ছুটি ধরে মার্লিনকে টেনে নিয়ে গেল জলের মধ্যে। চীৎকার করে উঠলাম—লীনা! লীনা! জলে লাকিয়ে পড়তে গেলাম—শরীর যেন বড় ছুঁকল। পা ছুটি যেন একবারে অরণ হয়ে গেছে—নাড়াতে পারছি না ওঃ, বুকের মধ্যে কি অশঙ্ক বসে। খালি চীৎকার করছি—লীনা! লীনা! লীনা!

এই যে আমি তোমার পাশেই রয়েছি। চমকে ঘুম জেঁকে গেল। জানালা দিয়ে তোমার আভাস এসে পড়েছে ঘরে। পরিষ্কার দেখতে পেলাম—মার্লিন দুখখানি দীর্ঘ করে আমার গালের উপর গালখানি বেধে খাটের পাশে চেয়ারে আছে বসে।

কাতরভাবে বললাম, লীনা! লীনা! তুমি আছ?

আমার কানের কাছে দুখ দিয়ে আঁকর করে বলল, তোমাকে জেঁকে কোথায় যাব? তোমার পাশেই যে আমার ঠাই।

হুঃখের ঘোরটা কেটে বুকটা যেন ঠাণ্ডা হল। তোমার আলোর দিকে চেয়ে মনের মধ্যে কেমন যেন সব সোজাভাল হয়ে গেল। শুধলাম, আমি কোথায়?

মার্লিন আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তোমার মার্লিনীতে। কাল রাতে যে তোমার ভীষণ স্বপ্ন এসেছিল—তাই বাকী কিং যেতে পারনি।

একটু চুপ করে থেকে শুধলাম, ভারসেট কোথায়?

বলল, তোমার বসবার ঘরে কিম্বায় করছে।

আমি কাল রাতে এসেই তাকে এ ঘরে কিম্বায় করতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

শুধলাম, তুমি কি করে খবর পেলে?

বলল, তুমি কিং না বেখে—টেলিফোন করেছিলাম।

বাক—তুমি আর এখন এত বেশী কথা বল না। এখনও তোমার শরীরে বেশ অসুস্থ আছে।

চুপ করে বইলাম। বুঝতে দেয়ী হল না—মার্লিন সমস্ত রাত আমার পাশে চেয়ারে বসে আমাকে সেবা করেছে। অরের ঘোরে ছুঁকল মনে এই কথাটা ভাবতেই কেন জানি না নিজেকে যেন আর সাময়তে পারলাম না। চোখ ছাপিয়ে জল এল। [ক্রমশঃ]

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



প্রতি পউন্ডে
২৪ টি
বড় আকারের

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সর্বত্র রক্ষা করিতে

- কলে প্রস্তুত
- স্ট্রমে সেকা
- মেসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্সল্টেশনারী

কলিকতা - ২৯



বিজ্ঞানভিত্তিক

পাঁচ

বহি-বিহংগ

"পর্বত চাহিল হ'তে

বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ"

—রবীন্দ্রনাথ

পরদিন সকালে সামনের বাগানে দেখা সুমিত্রার সংগে।
প্রাথমিক চা-এর পর্ব শেষ করে সামনের 'কম্পাউণ্ড'টা
প্রদক্ষিণ করে এলো শংকর—বাকী ঘুমের আমেজটা কাটিয়ে ফেলার
জন্ত। দেখা গেল, কোণের বেঞ্চের ওপরে বসে আছে সুমিত্রা।
চিন্তার গভীরতার কপালে পড়েছে তার কুঞ্জনরেখা। সন্ত-ঘুমভাঙা
অবস্থায় বেগীটাকে ভালো করে সংবৃত্ত করবার অবকাশ হয় নি—
আয়ত চোখে তার স্বপ্নাতুর দৃষ্টি।

শংকর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না।

কোনো সন্মোহন না করেই শংকর এসে স্তম্ভপূর্ণ বসে সুমিত্রার
পাশে। পকেট থেকে একটা নয়া পয়সা বের করে বলে, এই নাও,
তোমার ভাবনার মঞ্জুরী।

যুহুর্তে শিথিল ভাবনাগুলোকে সংহত করে নেয় সুমিত্রা।

এই যে স্বপ্নচারি, জেগে আছি না ঘুমিয়ে ?

ঘুমিয়ে থাকলে মন্দ ছিল না, এই ভোরের আলোয় তোমার
স্বপ্নসম্ভবা মূর্তিটা স্বপ্ন বলেই চালিয়ে দেওয়া যেত। তোমার কোলে
মাথা বেধে আবার শুয়ে পড়তাম।

জেগে আছি বলেই তো লোকজ্ঞার ভয় আছে, তোমার পায়ের
চটির ভয় আছে—অগত্যা স্থির হয়ে একটা ভয় দূরত্ব বেখেই
বসতে হল।

হাতের তালু ছড়িয়ে এক বিষৎ দূরত্বের মাপ করে দেখায়
শংকর।

সুমিত্রা এবারে অপ্রতিভ হয়—কিন্তু সেটা এক পলকের জন্তই।
হেসে বলে, বেশ, তোমার অবচেতন মনের স্বরূপটা জানা গেল—
এবার থেকে সাবধান হয়ে চলতে হবে বখাসম্ভব।

সুমিত্রাকে অন্ততঃ পলকের জন্ত অপ্রতিভ করতে পেরেছে, তাই
শংকরের আশ্বাসাদেশের সীমা নেই। অন্তর দিয়ে সে বলে—

এই দেখ, ভয় পাইয়ে কিলায় ত। তবে জানোই তো—চেতন
মনটার বেজার কড়া পাহারা আছে—অমন ছ-একটা জেলভাঙা
'ইম্পালস্'কে পাকড়াও করবার জন্ত।

ততক্ষণে সুমিত্রা পায়ের তলার মাটি পেয়েছে, এবার আবার
কথার শাপ দিয়ে নেয়।

শংকর বায়ের বে চেতন মনের বালাই আছে—সে খবরটা
আমার কাছে নতুন। অবচেতন, অর্ধচেতন আর অচেতন মনের
সমষ্টিতেই ভয়ে আছে তোমার মগজ। সেখানে চেতনার স্থানটা
কোথায় আমার হিসাব করে বৃষ্টিয়ে দাও তো।

শংকর মনে মনে হার মানে—কিন্তু কথায় তা প্রকাশ করে না—
এক ভালো মনস্তাত্ত্বিকের পাল্লায় পড়েছি। হাঁচি-কাশির
মতো নিতান্ত সাধারণ উপসর্গগুলোকেই বিশ্লেষণ করতে শুরু করে
দেবে—এর মধ্যে নিরুদ্ভ 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' কতটা আছে।

সুমিত্রা বলে, তোমার কথাবার্তাগুলো এখনও বিপজ্জনক, সেই
জেলপালানো অবচেতন ইম্পালস্ এর কাছ বেঁসে চলেছে। চলো
আমার সংগে, এককাপ কফি খাইয়ে বাকী ঘুমটা তাড়িয়ে দিচ্ছি।

শংকর বলে, বখালাভ। অন্ততঃ তোমাকে অপ্রতিভ করে
বিনা পয়সায় এক কাপ কফি তো মিলে গেল।

দীর্ঘ বারান্দার শেষ প্রান্তে সুমিত্রার ঘর। শংকর দেখে,
বাসস্থানের ব্যবস্থা সকলেরই এক রকমের, কিন্তু সুমিত্রার
ঘরের আবহাওয়ার রয়েছে একটা সৌন্দর্য। টিপয়টার ওপর পড়েছে
একটা ফিকে সবুজ রঙের ঢাকা, চেয়ারে রয়েছে হাতে-তৈরী কুশন,
জানলার পড়েছে পর্দা রঙ মিলিয়ে আর ফুলদানীতে রয়েছে একগুচ্ছ
সীজন্-স্নাওয়ার। হাওয়াতে কোন প্রসাধন সামগ্রীর অশরীরী মুহু
সুবাস।

কফি ঢালতে ঢালতে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, হবিবুল্লাহ সবচে
রিপোর্টটা পড়বার সময় হয়েছে তোমার ?

নিরাশার পূরে শংকর বলে, পড়লার তো কিন্তু কই, সমস্ত
সমাধানের লুজ তো কিছু মিলল না ?

সবচেয়ে নিরাশার কথা—তোমার এমন চমৎকার রিপোর্টে কোনো

শ্রীমতী কুমারী কামল কান্তার 'পাকিমা' গ্রন্থ



বিচিৎরকপিনী
নারী তুমি

...কবির
যুগ
নয়নে

শ্রীমতী কামল কান্তার হালকা মেঘের আনাপোনার মাঝে, হাজার
তারার ভীড়ে, এক কালি চাঁদের এক বলক হাসির মতোই বিষ্টি মেঘের
সিঁটি হাসি.....চাঁদের আলো হারিয়ে গেছে ঐ মেঘেরই হালকা রূপের
মাঝে.....রূপ, রূপ যে নারীর সব!
আর সে কথা চিত্রতারকা শ্রীমতী কামল কান্তারই জানেন। জানেন
কলেই শ্রীমতী কামল কান্তার বলেন, "অসংখ্য চিত্র তারকাদের মতো আমিও হুবাসতারা
লাগ্ন ব্যবহার করি। এর কুলের মতো নয়র কেনার পরশ আমার
চককে হুঁই আর মোলায়েম করে।"
আপনার রূপও এমনটাই হবে—নির্ভরিত লাগ্ন ব্যবহার করুন!



চিত্র-তারকার
সৌন্দর্য্য
সাবান বিশুদ্ধ
সুত্র লাগ্ন

অভিযানি সেই, বঙ্গদেশের মানুষটার কেবল দেখা যায় একটা কাঠামো।

সুমিত্রা হান হেসে বলে, উপকরণ কোথায় শংকর, আন্ত মানুষটাকে গড়ে তোলার? আমার মালমশলা বা কিছু সবই পেয়েছি পুলিশের রিপোর্ট থেকে, আর চিকিৎসা ও গুণ কাছ থেকে।

শংকর সাধনা দেয়, তা সফল করতে হবে অসামান্য সাধন করেছ। কিন্তু কী জানো সুমিত্রা, আমার মনটা হচ্ছে ক্যামেরার মতো, নূতন কোনো জিনিস সেখানে সাদা তোলে তখনই—বখন তা কোকাসে ধরা পড়ে। হবিবুল্লাহ হবিটা হয়ে গেছে ধোঁয়াটে—একটা অংশ কোকাসে আঁকতে গেলে অপর অংশগুলো যায় অস্পষ্ট হয়ে। আচ্ছা, সুমিত্রা, হবিবুল্লাহ অল্পসে গড়া কোনো লোকের দেখা তুমি কোনো ভিন কি পেয়েছে? তোমার জানা মনোবিজ্ঞানে কি এরকম চরিত্রের মজীর মেলে?

সুমিত্রা মীরবে কিছুক্ষণ কক্ষের পেয়ালার চামচে খোঁরাতে থাকে। তার পর বলে—

না। এই কারণেই কাল আমি তোমার বলেছিলাম যে হবিবুল্লাহকে সাধারণ জেবো না। অবশ্য তার চরিত্রের এক একটা বিক নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মূল উপাদানগুলোর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নেই।

হয় না কেন, তার প্রতিভার আকস্মিক বিকাশের কথাও দেশ-বিদেশে অনেক বড়ো বড়ো লোকের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা কি দেখা যায় না? উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করা যায় তোমাদের আইনটাইনের কথা। পঙ্কু হবার আঘাতে হয়তো বা হবিবুল্লাহ মনের দরজা খুলে গিয়েছিল।

এ ছাড়া তার অহেতুক কাঠিন্দ, সৃষ্টিছাড়া নিলিপ্ততা, ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি, গুরুভক্তি, দস্ত, প্রেম—আলাদা ভাবে দেখলে এর মধ্যে কোনোটাই অসম্ভব নয়। এ ধরনের কোনো না কোনো মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে একত্র করলে সমষ্টিটা হয়ে দাঁড়ায় একেবারেই খাপ-ছাড়া।

হঠাৎ একজনকে দেখে মনে হয় লোকটা সূত্রী। বিশ্লেষণ করে দেখলে সে সৌন্দর্য কোনো অবয়বের মধ্যেই পাওয়া যাবে না। সব কিছুর সমষ্টি কিন্তু আশ্চর্য ভাবে মানিয়ে যায়। তেমন আবার অনেক সময়ে চোখে পড়ে সুন্দর মুখ-চোখ-নাক-কান, স্তূঠাম হাত-পা, কিন্তু সবটা মিলিয়ে মনে হয় কী কুল্লী মানুষটা!

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ছুই আর ছুই যোগ করলে প্রায় চার মেলে না উত্তরে। পাওয়া যায় শূন্য আর অসীমের মধ্যে যে কোনো সংখ্যা। আমাদের কোনো ধরোরিই সবক্ষেত্রে খাটে না—সব মানুষকে বুঝতে হলে চাই তোমাদের ধরোরি অক রিলেটিভিটির মতোই কোনো শক্ত বনিয়াদ।

শংকর পেয়ালার চুমুক দিতে দিতে সুমিত্রার কথাগুলো ভাবে। সত্যই তো, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে হবিবুল্লাহ সৃষ্টিছাড়া, উদ্ভাদ। কিন্তু হবিবুল্লাহ চোখ নিয়ে জগতের মানুষগুলোকে দেখায় কেমন? মানুষের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মানসগুণ আছে কি?

হঠাৎ সে প্রশ্ন করে সুমিত্রা, একটা কাজ করতে পারে। আমার জন্ম? তোমার বা পসার প্রতিপত্তি সরকারী মহলে—তাই ভয়সা করে অহবোধটা করছি।

সুমিত্রা ভিজানরনেত্রের ওর দিকে চায়।

দেখ, আজ বিকালে ব্যবস্থা হয়েছে হবিবুল্লাহ ল্যাবরেটরী সকলকে দেখাবার। ওদের দল গিয়ে সেখানে ছুটলে অবস্থাটা অনেকটা হবে একপাল বুদ্ধুকু গরুর সবজীর বাগানে প্রবেশ করার মতো। সব কিছুই লগুভগু করে কেলেবে।

চলো না, আমরা দুজনে সকালেই ও কাজটা মেয়ে আমি।

সুমিত্রা আপত্তি তোলে—কিন্তু প্রফেসর কুকখামী কি রাজী হবেন? তাছাড়া ছাড়পত্রও তো চাই একখানা—আজ সকালের মধ্যে তা সম্ভব হবে কী করে?

শংকর মুখ অন্ধকার করে বলে, তোমার মতো জাবিকুবি নিরীহ শংকর রয়েছে ওপরে। কাজের বেলা সুন্দর মুখ বড়ো বড়ো চোখ সবই অন্ধকার হয়ে দাঁড়ায়। আচ্ছা থাক, ধরকার নেই।

পেঁটার হস্ত মুখ করে শংকর বলে থাকে।

সুমিত্রা হেসে কেলে। রাগ করতে হবে না তোমার। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাক কিছু করতে পারা যায় কিনা। কোনো প্রতিক্রমিত্তি কিন্তু দিতে পারব না।

শংকর বলে, পদ্ম-ঝাঁধি আচ্ছা দিলে কি না হয়?

সুমিত্রার এবার রাগ করবার পালা—বতো বাজে কথা। কেন যে তোমায় প্রশ্রয় দিই জেবে পাই না।

সুমিত্রা চলে যায় কুকখামীকে ফোন করতে। পরম নিশ্চিত্তে পেয়ালার কক্ষটুকু শেষ করে শংকর সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলী সমস্ত সোজা উঠে সিলিং-এর কাছে এসে মিলিয়ে যায়। এমনি করেই মানুষ মিলিয়ে যায় মৃত্যুর পর। জড় পদার্থ—পঞ্চতন্ত্রে মিলে যায় প্রাণী—‘কার্বন ডাইঅক্সাইড’ বাষ্প আর নাইট্রোজেনের অণুর সমষ্টিতে। মাটিতে পড়ে থাকে ‘ক্যালসিয়াম কার্বনেট,’ ক্যালসিয়াম ফস্ফেট বিভিন্ন ধরনের লবণ আর যৎসামান্য ধাতুর সমন্বয়। বৃষ্টির জলে, নদীর শ্রোতে ঝোঁত হয়ে বেরিয়ে যায় মহাসাগরের দিকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বছর ধরে সে সব অণু-পরমাণুর সমষ্টি।

অন্তরিকে চলেছে প্রাণসৃষ্টির সমারোহ ধরণীরই আর এক অবজাত কোণে। সূর্যালোকের শক্তিতে আকাশ-বাতাস সাগর আর ক্রিতির থেকে সংগৃহীত হচ্ছে মালমশলা—কার্বন ডাইঅক্সাইড অণু আর বাষ্প, কার্বন-অক্সিজেন-নাইট্রোজেন-সালফার-ফস্ফোরাস আর ধাতু মিলিয়ে তৈরী হচ্ছে কাঠামো, উদ্ভিদকোষ থেকে প্রাণিকোষ, প্রোটিন-নিউক্লিয়ারিক অ্যাসিড থেকে বীজাণু-ভাইরাস, অ্যামিবা থেকে কুকুর-বেড়াল-মানুষ। এ প্রক্রিয়ার আদি নেই, অন্তও নেই। এইজন্মেই বোধ হয় বলা হয়েছে—আত্মা অবিনশ্বর।

এ ঘরের মধ্যে যে অণুগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে কোনোটা কি হান পেয়েছিল হবিবুল্লাহ নখর দেখে?

এ হেন দার্শনিক চিন্তাপ্রোভে বাধা পড়ে সুমিত্রার পুনঃ প্রবেশ। কী খাওয়াবে বলো? ব্যবস্থা মঞ্জুর হয়েছে। এখন একখানা গাড়ীর যোগাড় করতে পারলেই বেরিয়ে পড়া যেতে পারে।

শংকর উল্লসিত হয়ে বলে, দেখলে তো। তোমরা ‘সাইকলজিষ্ট’ বলে নিজেদের পরিচয় দাও—অথচ কলিত মনোবিজ্ঞানের প্রথম সৃষ্টচারই ধর রাখো না। সুন্দর মুখের উপরোধে কী না সম্ভব?

সুমিত্রা জ্বকুক্তিত করে, কেন আরো বাজে কথার সময় নষ্ট

কর। আদ্য বর্টার মধ্যে যদি দেখি ছবি তৈরী হওনি, তা হলে কৃষ্ণবাহীকে বলে পাশ বাতিল করিয়ে দেব।

শংকর হাসতে থাকে।

ও

আদ্য বর্টা নয়, ঠিক বিশ মিনিটের মধ্যেই শংকরকে বেরিয়ে পড়তে হল ঘন ঘন ইলেকট্রিক হর্ণ-এর অস্থির তাগিদায়। দেখে সুরমিত্রা বলে আছে একটা ছোটো মিলিটারি ট্রাক-এর চালকের আসনে। অল্পমানে বুকে নিল—যে পদ্ম-ঝাঁধির মিনতিতে কেবল কৃষ্ণবাহীই অভিভূত হন না, কোনো তরুণ মিলিটারি অফিসারও তাড়াতাড়ি 'ট্রাক'এর বোগাড় করে দিলে গঙ্গ হলে বান।

এরই মধ্যে কোন কীকে প্রসাধন সেবে নিরেছে সুরমিত্রা। অবিন্যত কেন্দ্রীয় শান্তবেগী সংবদ্ধ, কপালে উঠেছে একটা ছোটো টিপ, আর কিকে নীল রং-এর সাদী বরতরু করেছে উজ্জ্বল।

সুরমিত্রাকে আর একটু আলোচনা প্রলোভন সংবরণ করে নিতে হল তুচ্চীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে। নিব্বকর্মে জিজ্ঞাসা করলে, এ আপদটা ছুটলো কোথা থেকে?

সুরমিত্রা বলে, বা বে, নিকিউরটির ব্যবহার কখাটা এর মধ্যেই ফুলে গেল?

সুরমিত্রার সাহচর্যে সকালবেলাটা মিরিবিষিতে কাটাধার আশায় ছিল শংকর। ঘনটা তার লয়ে বার। হয়তো বা ওকে কিছুটা আশ্বাস দেবার জন্যই নিকিউরটির ড্রাজলোক আশ্রয় নিলেন ট্রাকএর পেছন দিকে।

সকালের কীচা রৌদ্রে ঝলমল করছে দিল্লীর রাজপথ। রাস্তার জনতার ভীড় তখনও সুরু হয়নি। ফুলের ইউনিক্স-পর্যবেক্ষণে মনে পড়ে নিজের কুসঙ্গীবনের কথা—সেদিন আর এদিনে কতখানি ব্যবধান।

তাদের ফুলে বাস ছিল না, ছিল না ইউনিক্সের বালাই। মকঃবলের ছোটো ফুল—মাত্র তিন টাকা কী দিলে লক্ষ্য শ্রেণী অবধি পড়া যেত। গ্রাম থেকে ফুলে বাবার পথে পড়ত বিরাট এক নালা। বাঁপের সাঁকোর ওপর দিয়ে সে নালা পার হতে কী ভয়টাই না করত। বর্ষাকালে ধানক্ষেত আর নালা সবই জলে একাকার হয়ে যেত, ফুলে বাবার একমাত্র উপায় ছিল হারাণ মঞ্জুলের নৌকা। মাত্র এক মাইল পথ অতিক্রম করতে লাগত প্রায় একটি বর্টা—হেমন্তে আবার ধানের ক্ষেত পঙ্কিয়ে উঠত, সবুজ চারার ভরে যেত দিগন্ত—সেও আর এক বকরের বড়া। সন্ধ্যাবেলা মাটির প্রদীপ বলে উঠত ঘরে। দুটি মাত্র ছিল পেতলের লঠন, তার একটি থাকত বারান্দার আর একটা পড়ার ঘরে। সন্ধ্যাবেলা মাছেরে বলে সে ছোটো বোন বিলুর সংস্পর্শে পড়াভনা করত। বিলুটা কেমন আছে এখন? বড় ঘরের গিরি তার ফুরসৎ নেই ডাই-এর খবর নেওয়া।

বাবা এসে বসন্তেন তাকিয়ার ভয় দিলে, হাতে ফুলে মিতেন গড়গড়ায় নল। সাতদিনের ছোটোপাটিতে শংকরের স্নান দেখে তখন ঘুমে লুটির পড়তে চাইত। বাবা মাঝে মাঝে আবেশ করতেন চোখ মুখ ভাল করে ধুয়ে আসবার জন্য। শাসন ছিল কড়া,

শংকর আর বিলুকে নিয়মিত একটা বর্টা পড়াশোনা করতে হলে, তারপর ছুটি।

সময় হলে বাবা পড়ার ঘর থেকে চলে যেতেন আকের মর্টার পুর্নিম চৌরুরীর বাড়ী লাভা খেলতে। ওরা ডাই-বোসে কোমোরকনে আহালাদি সমাপ্ত করে ঠাকুরমার ঘরে গিয়ে জুটত গল্প শুনতে। লালকমল নীলকমলের গল্প, মহাত্মারতের গল্প। পঙ্কিমিত্রার গল্প। তখন কিছু এত রাজ্যের ঘুম কোথায় পালিয়ে যেত। মা এসে ওদের শাসন করে গল্পের আসর উঠিয়ে দিতেন। বাবা ছিলেন ফুলের হেডমাস্টার। হেডমাস্টারের ফেসকে স্নানের শীর্ষস্থানে থাকতেই হবে, না হলে বিধবৎসটাই উঃচে বাবে।

সুরমিত্রা পাড়ী থামালো—সামনে রয়েছে লালবাতির নিবেদান। চিত্তাহর শংকরের নিকে তার চোখ পড়ে। হাতব্যাগ ফুলে একটা মর্টা পরমা বেধ করে বলে এই ঘর, কেনও নাওঁতোমার ডাকমার মজুরী। উভয়ের সম্মিলিত উচ্চহাস্তে হাতের হু-একজন পঞ্চিক সজ্বিত হয়ে উঠে।

শংকর বলে, হঠাৎ ছেলেবেলার কিরে গিরেছিলাম, সুরমিত্রা। কী ভাবছিলাম জামো? তখনকার দিনের কতদিন বাবা জীবন অসহ বলে হোতো। এক দিকে ছিল বাবার কড়া শাসন, অন্যদিকে পরীক্ষার ভয়। এই দুই ভয়ের মারখানে কীক প্রায় মিলতই না। প্রায় ভয়ে সেদিন কামনা করে গেছি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠবার জন্য—ভাবতাম বড়ো হওয়ার কী সুবিধা। পকেটে থাকবে অচল পরমা, পুঁকিত চানাহুর, ফুলদীমানা কিনে খাওয়ার ভয়। বোজ সন্ধ্যা সাতটার সময় পড়াভনার বসতে হবে না আর ব্যাকরণের স্নান থেকেও চিরকালের মত রেহাই পাওয়া বাবে।

আজ আবার মনে হচ্ছে ছেলেবেলার নির্বর্তাট মিললো যদি আর একবার কিরে পাওয়া যেত। হবিবুল্লার সমস্তার জট হাকানোর জয়ে সেদিনের ব্যাকরণের স্নানও জেরঃ বলে মনে হয়। বাবা-মায়ের শাসনের কড়া ব্যবহার মধ্যেও কতখানি স্নেহপ্রবণতার প্রত্যয় আর আশ্রয় থাকত সেটা বুঝছি তাঁদের হাবিয়ে।

ওই বে ছেলে-মেয়েদের দল ফুলের পথে চলেছে—ওদের কঠিনভয় সমস্তাও কতো সহজ, কতো সরল। আজ যদি আমরা মহাবিকর্ষের মূল আবিষ্কার করি ওদের মনোজগতে তার জন্ম কোনও আন্দোজনই উঠবে না। যদি নিঃফল হয় আমাদের চেষ্টা, তার জন্মও ওদের মনে জাগবে না কোনও ক্ষতিবোধ।

আচ্ছা সুরমিত্রা, বলতে পারো, মাঝে মাঝে অতীত কেনার জন্য এই ইচ্ছাগুলো আসে কোথা থেকে?

সুরমিত্রা বলে, এরকম ইচ্ছাগুলো আমাদের শিশুমনেরই অভিব্যক্তি শংকর। বয়সে প্রবীণ হলেও মনের একটা অংশ শেষ দিন পর্যন্ত রয়ে বার কীচা, জেবে দেখ না কেন, তা নাহ'লে জীবন হুর্বিহ হলে উঠত। নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম বে ফুলে সেটা তো আসছে অন্তর্নিহিত শিঙেচেনার থেকে। জুটবল খেলার মাঠে প্রবীণ লক্ষ্যকদের বে উন্নততা সেটাও শিশুমনের বিকাশ—বয়সের পাকা হলের আশ্রয় ভেদ করে অমতর্ক হুহুর্তে বেরিয়ে পড়ে। আবার হুর্ বা দাগীর সময়ে যে পৈশাচিক উজ্জান দেখা বার সেটার পেছনে রয়েছে শিশুর বারিধীর নিষ্ঠ বড়া।

কিন্তু মফুন কিছু সত্ত্ব করবার আগ্রহটা জোগাচ্ছে মনের এই কাঁচা অংশটুকু। প্রবীণতর অংশের অ্যাডভেঞ্চার দাক্ষণ আপত্তি—বেচাল আগ্রহগুলো অবদমিত করে রাখে নৈমন্দিক অভ্যাসের শাসনে। সত্যি করে বল তো, ভূমি যে আজ এ প্রজেক্টে এগিয়ে এসেছে এর মধ্যে একটা ছেলেমানুষী খেয়ালের আভাস পাও কি না?

শংকর স্বীকার করে, কতকটা তাই বৈ কি—অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু আরেকটা কারণও আছে। মনের মধ্যে এ বোধটা জন্মাল যে অ্যাণ্টিগ্রাভিটি একটা চ্যালেঞ্জ—পৌরুষকে লক্ষ্য করে। ইউরোপে এই একশো বছর আগেও যেমন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান এলে পশ্চাদপদ হবার উপায় ছিল না। সে আহ্বানে যে সাড়া না দিত, তার বদনাম রটে বেত জনসমাজে চিরকালের মতো। এমন কি, তার সন্তান সন্ততিদেরও রেহাই দিত না সমাজ। সে সংস্কারের হুমিটা হয়ে গেছে আজকের দিনেও মিতান্ত্র অসহায় শংকর মায়েরের মনে। দ্বন্দ্বযুদ্ধের বৃত্তান্তটাও খাটো হয়ে বেত এই কল্পিত আত্মসম্মান-বোধের কাছে। তাই পরাজয়ের বেশ জোরালো সত্যবলা থাকা সত্ত্বেও আহ্বান উপেক্ষা করতে আমারও আত্মসম্মানে বেধে গেল।

সুমিত্রা বলে, জামি না এ কথাটা ভূমি ভেবে দেখেছ কি না, শংকর, যে এই তথাকথিত আত্মসম্মান-বোধটাও মানুষের ছেলেমানুষী। নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথাই বলি—

ছেলেবেলার বাড়ীতে ছিলাম আমরা তিন বোন আর এক ভাই। অব্যবিত্ত আদ্যপ্রপত্তিশীল মহারাষ্ট্র-পরিবারে ছেলের স্বাধীনতা মেয়ের তুলনায় অগাধ। এমন দিন যায়নি, বেদিন কোনো না কোনো কারণে এ অবিচারের বিরুদ্ধে অন্তরাত্মা বিদ্রোহ না করেছে। ফুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবার সময় বাড়ীতে নিজের কিছুটা প্রতিষ্ঠা অবশ্য সম্ভব হলো, কিন্তু সেটা নেহাতই পরীকার কলাকলার কল্যাণে।

বিধি-নিবেধের বেড়া থেকে আংশিক মুক্তি বখম মিলল, শংকর মিলার—এ অবিচারের শোধ তুলতে হবে। বয়ের কলেজে কী মাতামাতিই না করেছি নারীর অধিকার নিয়ে। কলেজের মেয়েদের সুখপাত্র হয়ে উঠতে বিশেষ দেরী হয় নি। মেয়েদের সমর্থনের আওতার, শিক্ষক সমাজের প্রেরণে আর পুরুষ সতীর্থদের স্ততিবাদে অহমিকাবোধটা হয়ে উঠল রীতিমতো পুষ্ট। কেউ কেউ বলতেন—এ মেয়ে সরোজিনী নাইডু না হয়ে ছাড়বে না।

অহঙ্কারের পুঞ্জি বখন বেশ ফীতকার হয়ে উঠেছে, বীরাগনা হলে আমার জয়জয়কার চারদিকে—এমনি সময়ে ঘটে গেল একটা ছোটোখাটো বিপর্যয়।

একজন সহপাঠী ছেলের কী করে নজরে পড়ে গেলাম। সহসা কোঁখে পড়ল, ছেলেটি ছায়ার মতো আমার অঙ্গসরণ করে যায়। কলেজের ছুটি হবার পর একই বাসে দেখা হয়ে যায় রোজ। সিনেমা দেখতে গেলেও দেখি, অদূরেই ছেলেটি বসে আছে। অথচ প্রকৃত্তে আমাদের মধ্যে হু'-একটির বেশী কথাবার্তা হয় নি।

একদিন ছুটির পর কয়েকজন সহপাঠিনীর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলেছি—দেখি ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে অল্পপত হুমানের মতো—আমারই একখানা বই হাতে করে। কাছে আসতেই বইখানা সে এগিয়ে দিয়ে বললে—রাশে কলে এসেছিলেন।

অতি সাধারণ কথা—অতি সামান্য ঘটনা। তবু একটা বক্তব্য দিলে ঘটনার এইখানেই হয়তো পরিসমাপ্তি হত। কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ল বাক্যবীর্গের মধ্যে চাপা হালির উজ্জলতা। আমার আর সহ হোলো না।

সকলের সামনে ছেলেটিকে অপমানের পর অপমান করে গেলার। কী সব কথা বলেছিলাম—আজ স্মরণে নেই, তবে মনে আছে—শেষে পায়ের চটি ধুলে তাকে শাসিয়েছিলাম।

লঘুপাশে একটা চরম শাস্তির ব্যবস্থা ছেলেটি প্রত্যাশা করে মি। প্রথমে তার মুখ লাল হয়ে উঠল—তারপর বিবর্ণ হয়ে গেল। পরের দিন থেকে তাকে আর কলেজে দেখিনি। কিছুদিন পরে তুললাম সে কোথায় সামান্য চাকরী নিয়ে জনসম্মুখে মিলিয়ে গেছে। আরো জানলাম—ছেলেটি পড়াশুনার ভালো ছিল—দরিদ্র পরিবারের অনেক বয়স গড়ে উঠেছিল পরীকার তার তথ্য সাফল্যের মুখ চেয়ে।

বীরাগনা সুমিত্রার সেদিন থেকে কয় বছর হল। হঠাৎ বেত বড়ো হয়ে উঠলাম।

শংকর একটা মস্তব্য করবার লোভ সামলাতে পারে না।

আজকের সুমিত্রা দেশপাশে যদি করপ্রাপ্তা বীরাগনা হন, তবে সেদিনকার সেই পূর্ণশশী বীরাগনার রূপটা অঙ্ক কষে বার করবার চেষ্টা করছি। উত্তরটা প্রায় অসীমের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। এখনো ত দেখি হাতের চটিটা বেশ উত্ততই আছে।

সুমিত্রা বলে, বা রে, আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে ত? তোমার তথাকথিত সচেতন মনের পাহারায় যে ঘটা দেখছি তাতে নিরাপত্তা সব্বন্ধে তো আর নিশ্চিত হওয়া চলে না।

একটু হেসে আবার বোগ করে। তবে কারণে অকারণে বা কতক বসিয়ে দিতে ইচ্ছা যে করে না এমন কথাও বলা যায় না।

শংকর উত্তর দিতে বাচ্ছিল, সুমিত্রা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, বাক, তর্ক বাড়িও না। এই দেখ এসে গেছি আমরা।

দিল্লীর জনবিরল উপকণ্ঠ। এখানে ওখানে গৃহনির্মাণের পর্ব চলেছে—রাজধানী সম্প্রসারণের চিহ্ন। সাধারণ রাজপথ থেকে একটা লাল কাঁকরের রাস্তা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে নির্মায়মান সৌধের দেওয়ালের শ্রেণীর মধ্যে। ইট-বওয়া লরীর চাকার পীড়নে সে লাল-পথ ক্ষতবিক্ষত। সেই পথের ওপরে সাধা 'গেট'।

ফটক থেকে বাড়ী পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত রাস্তার পাশে ফুলের 'টব' সাজানো। রাস্তার দুধারে আর মাঝখানে প্রশস্ত সবুজ লন চোখ জুড়িয়ে দেয়। চারদিকে শ্রেণীবদ্ধ ইম্পাতের গোল বেড়ার মধ্যে সব্বন্ধে লালিত চারাগাছ—অশোক, দেবদারু, গোম্বোমোহর। দুবে দুবে বিস্তৃত বড়ো বড়ো 'প্লট'এ মরশুমী ফুলের বিচিত্র রঙের সমারোহ। অগ্রসর সর্বগ্রাসী মক্ষর বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই—অর্থবল, লোকবল, বুদ্ধি আর বিজ্ঞানের সাহায্যে।

রক্ষী ভদ্রলোক এগিয়ে বান সরকারের প্রতিনিধির সন্ধানে—ফটক থেকে বেশ কিছু দূরে অতি-আধুনিক বাড়ীটা ছবির মতো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় উড়ন্ত বিশালকার এক লাল পাখীর কথা। মারের গাড়ীবারান্দা থেকে 'রিইনকোর্সড কংক্রিট'এর দুখানা লম্বা ডিকোণ চাতাল ক্রমোচ্চ হয়ে ছপাশে শেষ হয়েছে ত্রিভুজের দুই

কোণে। ছুই পাখার মাঝখানে গাড়ীবারান্দার ঠিক ওপরেই দেখা যায় বিরাট একটা খেত গম্বুজ। গম্বুজের ডুবান-ওজতা সমগ্র বাড়ীটার লাল রং যেন আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছে। শংকর হবিবুল্লাহর ক্রটির প্রশংসা না করে পারে না।

শুভিত্রার চোখও তার প্রশংসা দৃষ্টির অঙ্গস্বরূপ করে। বলে— বাড়ীটার নাম দিয়েছিল কী হবিবুল্লাহ আন্দাজ কয়্যো তো? কারারবার্ড! বেলজিয়াম থেকে আর্কিটেক্ট এসেছিলেন এটাকে গড়ে তুলতে।

শংকর ভাবে—কারারবার্ড! হয়তো কল্পিত বহুবিক্রম ছিল হবিবুল্লাহর প্রেরণার মূলে। বহিষ্কৃতই শেষে সমর্পিত হল তার প্রেরণা আর কল্পনা।

শুভিত্রাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, তত্ত্বলোকের 'অ্যাট্টর্নিস'রও বাস্তবিক ছিল না কি?

শুভিত্রা বলে, হ্যাঁ। হবিবুল্লাহ সত্যিই একটা বিদ্বান। কোথা থেকে বিরাট একটা দূরবীণ সংগ্রহ করে এনেছিল। কুকর্মামী বলেন, যে এতো বড়ো 'টেলিস্কোপ' নাকি গোটা ভারতে নেই। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

শংকর হেসে বলে, এলিমেন্টারি ওয়াটসন। গম্বুজটা দেখেই বুঝলাম ওটা অ্যাট্টর্নিসকাল অবজারভেটরী না হয়ে যায় না।

বকী তত্ত্বলোক কিরে এসেছেন চাবির ভাড়া নিয়ে। দেবী করার জন্ত মার্জন। চাইলেন—বললেন, যে বাড়ীর প্রধান বকী

বাইরে কোথাও গেছেন তাই এই দেবী। এখন ত কারো আসার কথা ছিল না।

গাড়ীবারান্দা থেকে ওঠা যায় এক বিরাট 'হল' ঘরে, সে-ঘরের ছপাশে দেওয়াল বেঁসে উঠে গেছে সোপানশ্রেণী একটা চাতাল পর্যন্ত। ঘরের মাঝখানে গোল করে সাজানো পিতলের 'টব'এ 'পাম', 'অরিকেরিয়া,' 'ক্যাকটাস' আর পাভাবাহারের চারা। দু-কোণে দু-খানা কালো মার্বেল পাথরের গোল টেবল আর পূর্ব গদীজোড়া আরাম কেদারা। জানালা ও 'বাইলাইট' ঘরে এমনভাবে সাজানো যে আলোর প্রৌচুর্ষ আছে সর্বত্র কিন্তু আতিশয্য কোথাও নেই। ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলে ইউরোপের বড়ো কোনো হোটেলের 'লবী'র কথা মনে পড়ে যায়।

শুভিত্রা বলে—এই হলঘরের একদিকে হচ্ছে দু-খানা বহু-জুড়ে লাইব্রেরী আর একদিকে ল্যাবরেটরী তিনখানা ঘর জুড়ে। ওপরের তলাটাতেও রয়েছে ল্যাবরেটরী—দুন্দ বহুপাতির ঘর। ঘোড়ালার এক কোণে ছিল হবিবুল্লাহর নিজের শোবার ঘর—আর ঠিক তার বিপরীত কোণে থাকত সলিম। বাগ্নাঘর, ভাইনিং রুম, চাকরবাকরদের ঘর সবই পেছনের উইংটার। এই হলঘরের ছাদের ওপরেই অবজারভেটরি। নীচের তলায় আছে কারখানা আর ভারী বহুপাতি।

শংকর জিজ্ঞাসা করে—চাকর-বাকর ছিল না হবিবুল্লাহর? শুভিত্রা বলে, হ্যাঁ, তারা সম্ভবতঃ এখনও এ বাড়ীতেই আছে।

হিমালী

বিউটি পাউডার

রুপের জৌলুস বাড়ায়

বহু আবরণের বহু মৃৎশীকে আবহাওয়ার রুদ্ধতা ও ময়লায় হাত থেকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ফুল 'শেড'-এ পাওয়া যায়



হিমালী প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-২

সামগ্রী আর তাদের দুই ছেলেমেয়ে। রান্নাঘরের কাজ ছাড়া এরা শুধু লাইব্রেরী আর শোবার ঘরের তদারক করত। কখনো বা ল্যাবরেটরীর যন্ত্রগুলো পরিষ্কার করতে মালিকের তাগিদায়। অল্প সময়ে এদের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল যন্ত্রপাতির ঘরে না প্রবেশ করার জ্ঞ। নূতন যন্ত্রপাতি এলে খান কোম্পানীর কারখানা থেকে লোক আসত সেটা বধাছানে সন্নিবেশ করার জ্ঞ।

হলধর অতিক্রম করে বেবিমে পড়া যায় একটা লম্বা বারান্দার। সে বারান্দার ঠিক মাঝখান থেকে সুর পোহনের উইংটা। বারান্দার এক প্রান্তে সিঁড়ির সারি—একদিকে তা নেমে চ'ল গেছে ভূগর্ভস্থ একটানা গলিতে। গলিটা সমান্তরালভাবে মাটির নীচে সমস্ত বাড়ীটা অতিক্রম করে ক্রমশঃ উঠে গেছে রান্নাঘর 'লেভেল'এ। এই প্রবেশপথটা বন্ধ 'কোলাপসিবল' দরজা দিয়ে। গলির দুপাশেই কামরার সারি।

দরজার তামা খুলে ওরা প্রবেশ করল প্রথম কামরাটাকে। আলো আলতেই দেখা গেল—বিশ বড় আকারের একটা বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র। এগার শত অক্ষয়িত্রের একটা 'পাওয়ার প্ল্যান্ট'। একাংশ ঘরটার এক পাশে রয়েছে ট্রান্সফরমার'এর সারি। চারদিকের দেওয়ালে ঘড়ির মতো নানা রকমের মিটার, বড়ো বড়ো মাষ্টার সুইচ ডিষ্ট্রিবিউশন বোর্ড আর ভারবাহী মোটা মোটা পাইপ। পাওয়ার প্ল্যান্টটা খুবই আধুনিক—স্বনিয়ন্ত্রিত কন্ট্রোলের ব্যবস্থা তা আছেই, তা ছাড়া রয়েছে দু' থেকে সেটাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা—একটা সার্ভো-মেকানিজম। মিটারগুলো পরীক্ষা করে শংকর রায় দিলে, সুরমিত্রা, হবিবুল্লা এ পাওয়ার প্ল্যান্টটা বেশী ব্যবহার করেনি হয়তো অতিরিক্ত শক্তির ব্যবহার হলেই এটাকে চালু করা হত।

পাশের ঘরে রয়েছে একটা বড়ো আকারের এয়ার কন্ডিশনার—সমস্ত বাড়ীটার আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবার জ্ঞ। আর আছে একটা পাম্প, ওপরে জল তোলার জ্ঞ। এ ছাড়া একটা বড়ো এয়ার কম্প্রেসর শংকরের নজরে পড়ল বাতাসকে টেনে নিয়ে কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট জায়গায় তা বইয়ে দেবার জ্ঞ।

সুড়গপথের অপর দিকটার প্রথম ঘরে প্রবেশ করেই শংকর ধমকে দাঁড়ায়। এ ঘরটা একটা বড়ো রকমের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা বললেও চলে। নূতন মডেলের জার্মান লেদমেশিন কতগুলো ছাঁদা করবার ড্রিল, যন্ত্রচালিত করাত, ধাতু গলাবার একটা বৈজ্ঞানিক চূর্ণী। ওয়েল্ডিং-এর যন্ত্রপাতি। ইলেক্ট্রোপ্রেসিং-এর বড়ো কাচের চৌবাচ্চা। দেওয়াল জুড়ে ইম্পাতের আলমারীর থাকে থাকে সাজানো ছোটোখাটো যন্ত্র, বড়ো যন্ত্রগুলোর নানা রকমের উপকরণ, বাড়তি অংশ, নাটবোল্ট, স্ক্রু পেরেকের বাস্তু নানা রকমের খুঁটিনাটির অপরিাপ্ত সমাবেশ।

ঘরের মাঝখানে এক বড়ো ওয়ার্ক বেঞ্চ। তার ওপরে একটা ইম্পাতের ফ্রেম-এর অসমাপ্ত কাঠামো অ্যালুমিনিয়ামের দেওয়াল তাকে লাগান হচ্ছিল। সমস্তটা দেখলে মনে পড়ে যায় স্পিনেট পিরানোর কথা। শংকর সুরমিত্রার দিকে সঙ্গ্রহ দৃষ্টিতে তাকায়।

সুরমিত্রা বলে, ওটা যে কী তৈরী হচ্ছিল, এখনও পর্যন্ত বোঝা যায়নি। কবে পুরো ফ্রেমটা একটা নমুনা পাওয়া গেছে। সেটা

এ ঘরেই কোথাও আছে একটা ডরারের মধ্যে সম্ভবতঃ ওপাশের ওই ডরারটার।

শংকরের নজরে পড়ে এক কোণে একটা চালু ডেক নমুনা তৈরী করবার জ্ঞ—তার নীচে থাকে থাকে দেওয়ালের সারি। ওপরের 'ডরার' খুলে সুরমিত্রা টেনে বের করে একটা কেরো প্রিন্ট' ওপরে শিরোনামা "৪৪নং ফ্রেম"। সন্ধ্যায় আছে 'প্লান' 'এলিভেশন' 'সাইডভিউ' 'এণ্ড' ইত্যাদি। শংকর নজরটা মিলিয়ে দেখে ফ্রেমটার সংকে। একটা ফুটকল বের করে মাপ করে দেখে ফ্রেমটার। তার পর আপন মনেই বিড়বিড় করে বলে, ওপরের অংশটা তৈরী হয়নি এখনও—ফ্রেমটা কিন্তু কিসের? আবার একবার চিন্তিত দৃষ্টিতে সুরমিত্রার দিকে তাকায়।

সুরমিত্রা ওর চিন্তাক্রান্ত মুখ দেখে হেসে ফেলে।

তুমিই যদি না বলতে পার আমি কি করে বলব বল? আশ্চর্যের কথা—সমস্ত বাড়ীটা খানাতল্লাসী করেও এরকম দু-চারখানা নমুনা ছাড়া আর কিছুই উদ্ধার করা যায় নি। হয়তো বা সলিমের সংকে সংকে আর সবই উধাও হয়ে গেছে।

শংকর মাথার চুলের মধ্যে অস্থিরভাবে তুলি চালনা করে, নমুনা দেখে মনে হচ্ছে যে কোথাও দেখেছি এমন একটা যন্ত্র। সুরমিত্রা কিন্তু ঠিক আসছে না সুরমিত্রা!

কর্মশালায় পাশে হচ্ছে হবিবুল্লা'র ভাণ্ডার 'টোরকম'। শংকর অবাক হয়ে যায় তার সঞ্চয় দেখে। নানা রকমের বৈজ্ঞানিক তার, রেডিওর 'ভ্যাক', ট্রান্সিস্টর', 'রীলে', রকমারি সুইচ-এর সমষ্টিতে করেকটা বড়ো বড়ো কাচের আলমারী ভর্তি।

মস্তব্য করে, এতো জিনিষপত্র দিয়ে হবিবুল্লা করত কী? এসব দিয়ে দেখছি একটা বড়ো রকমের ইলেক্ট্রনিক্স-এর কারখানা গড়ে তোলা যায়। আর এই ডলার পারমিট, বৈদেশিক এক্সচেঞ্জ, আমদানীর কড়া কন্ট্রোলের মধ্যে হবিবুল্লা এতগুলো উপকরণ আনালোই বা কেমন করে?

সুরমিত্রা বলে, আমরা যতোদূর জেনেছি এর মধ্যে বেশীর ভাগ উপকরণই এসেছিল, এতো কড়াকড়ি ব্যবস্থা প্রবর্তন হবার আগেই। এ সবকিছু হয়তো বা হবিবুল্লা'র একটা নিতুল আশ্রয়স্থল ছিল, তাই আমদানী নিয়ন্ত্রণের আগেই মালপত্র সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করেছিল।

ভূগর্ভস্থ অংশটুকু শেষ করে ওরা উঠে এল আবার একতলার ওদের পথে প্রথমেই পড়লো গ্রন্থাগার। দুখানা বিরাট ঘরে কাচ আর ইম্পাতের আলমারীর সমারোহ। রাশি রাশি বই সারি সারি সাজানো থাকে থাকে। বইএর সংখ্যা দেখে শংকর বিস্মিত হল।

সুরমিত্রা বলে, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। গ্রন্থাগারে বইএর সংখ্যা কতো, জানো? সাত হাজারেরও বেশী!

অবশ্য অনেক ধনী লোকের হয়তো এর চেয়েও বড়ো লাইব্রেরী আছে। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে বই সংগ্রহে হবিবুল্লা'র কৃতি। আমার প্রধান কাজ হচ্ছে প্রজেক্টে আপত্ততঃ বইগুলোর একটা বর্ণানুক্রমিক, আর বিবরণক্রমিক তালিকা তৈরী করা। এ ছাড়া ল্যাবরেটরীরও একটা ইনভেন্টরী নেওয়া হচ্ছে জোমাদে'র জ্ঞ।

ততক্ষণে শংকর আলমারী খুলে বইগুলো নাড়াচাড়া শুরু করে

দিয়েছে। প্রথমেই হাতে উঠল তুলনারের ইংরেজি অনুবাদ। মধ্যে মধ্যে প্যারাগ্রাফের পর প্যারাগ্রাফে লাল-নীল পেন্সিলের দাগ। মাঝের পাঠগুলো বহুবারের অসুস্থিস্পর্শে মলিন।

পরের বইখানা হচ্ছে পরমাণবিক রি-অ্যাঙ্করের ডিক্রাইন্স সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের রিপোর্ট। সে বইটার মধ্যেও রয়েছে ব্যবহারের চিহ্ন—লাল-নীল পেন্সিলের দাগ আর ফুৎনে অকরে পেন্সিলে লেখা ফুটনোট কোনে কোনা পাতায়।

তারপর রয়েছে গ্রে'র অ্যানাটমি, রোসিন্দুসিয়ান মেটাকিঞ্জি, আইনষ্টাইন প্রভৃতির প্রিন্সিপাল অফ থিওরিটিস বাহাই ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, বার্নার্ড শ'র গ্রন্থাকলী গ্রেটোর রিপাবলিক। এর পরের থাকেও একই অবস্থা। অ্যাক্টিকিঞ্জি কোকশান্ত ভেনারের সাইবারনেটিক্স, অ্যাব্যোপক্সাস, দি সিক্রেট অফ লাইফ, ব্রেন কিংডমজি, রবীন্দ্ররচনাবলী, পাটিংটনের ইনরগ্যানিক কেমিস্ট্রি, আর অঙ্কবায়ুগের ডাকিনী শাস্ত্র।

অন্য একটা আলমারীতেও অবস্থাটা প্রায় একই রকমের। গ্রীক ডাক্তার, ব্লাক-ম্যাডিক, কোয়াটার্ন মেকানিক্স সচিত্র মারশ-উচাটন বন্ধকরণ—বেসেস অফ ম্যান, ইন্ড্রজাল বিজ্ঞান, হাডলক এলিসের বোন সাইকলজি—আটটি খণ্ডে সম্পূর্ণ—ইত্যাদি।

যেন প্রচণ্ড বজা বয়ে গেছে লাইব্রেরীটার ওপর দিয়ে। বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনিয়ারিং মিশেছে মহাভারতের সংগে; 'পরলোক-কিবাত' মিলে গেছে জিওকিঞ্জি'এর সংগে; হঠযোগসাধনা-এর 'ত্রাণ্ডউইচ' তৈরী হয়েছে 'ইনকরমেশন থিরোরি' আর 'মিনাক্সলজি'র মধ্যে। কেবলদীপের কাব্যের চচ্চড়ি তৈরী হয়েছে, 'অ্যাবনর্মাল সাইকলজি' 'হস্তবেদ্য বিচার' 'ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস' আর 'ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিকস'এর সংগে।

হুটো ঘরেই বই সাজানোর প্রণালীতে অভাবনীয় অসঙ্গততা। যে কথানা বই শংকর খুলে দেখল, সবতাত্তেই রয়েছে অল্পবিশ্বর ব্যবহারের চিহ্ন—লাল-নীল পেন্সিলের দাগ আর ফুটনোট। অল্পকণের পর্ষবেকপেই শংকর হিসাব করে কেবল যে অন্ততঃ বারোটি বিভিন্ন ভাষায় বই গ্রন্থাগারে রয়েছে।

শংকরের বিমূঢ় ভাবে ইচ্ছন যোগায় স্মিত্রা। দেখলে তো। হয়তো এই বইগুলোর মধ্যেই কোনো না কোনো জায়গায় লুকানো রয়েছে 'অ্যাক্টিভিটি'র প্রেরণা। কেবল সেটাকে সন্ধান করে বার করতে হবে—এই আর কি?

শংকর বলে, তার চেয়ে বল না কেন এক বিধা আগাহার মধ্যে একটা হারানো আলপিন খুঁজে বের করতে! বোধ হয়, সে কাজটা আরো সহজ।

হলঘরের বিপরীত দিকটার ল্যাবরেটরীর নুহ। প্রথম ঘরটা রসায়নাগার। অ্যাসিড ও নানা রকম রাসায়নিক 'রিএজেন্ট-এর' বোতল সাজানো আছে থাকে থাকে, ভরে ভরে, কোনো কোনো বোতল ভর্তি, আবার কতকগুলো অল্পবিশ্বর খালি। দেয়ালের সংগে লাগানো বিরাট একটা পোস্টিলেনের 'সিক' তার পাশে জল পরিষ্করণ করবার একটা ম্যানেট্রি 'টিল'। টেবলের ওপরে সাজানো 'টেট্রাটিউব' 'বীকার' 'স্লাক'এর সারি। কোণ বরাবর মেঝে থেকে উঠেছে কাচের একটা 'ডিক্রিশেন্স কলাম' এক কোণে 'হীটার'-এর

ওপর বসানো একটা বড়ো 'স্লাক' একটা কালো তরল পদার্থ ওপরে ভাসছে একটা বাদামী রঙের সর। ঘূরে একটা ছোট্টো টেবল একটা 'অ্যানালিটিক্যাল' ব্যালাল আর একটা 'স্পিঞ্জি ব্যালাল'। পাশে বর্নামেল-এর 'বারশেন' গ্যাসের ছোটো বড়ো বড়ো আধার।

রসায়নাগারের পাশের ছোটো ঘর নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী। প্রথম ঘরটাতে বিরাটাকার কতকগুলো বস। মাস স্পেকট্রোমিটার, ইলেক্ট্রন, ডিক্রাকশন ক্যামেরা, এক্সরে-ডিক্রাকশনের বস। সুপারসনিকস জেনারেটর, শব্দশক্তিতে শব্দতরঙ্গ তৈরী করবার অস্ত্র। একটা বড়ো ভ্রাম্যমান হাই ড্রাকুরাম ইউনিট। মাঝারী সাইজের একটা স্লাইট্রন বিভিন্ন মাশের হুন্দ রেডিওতরঙ্গ সৃষ্টি করবার অস্ত্র। একটা ভ্যান ডি গ্রাক জেনারেটর, উইলসন স্লাইড চেম্বার, আরন কিঙ্ক মাইক্রোস্কোপ যাতে অণু পর্ষত দেখা যায়। একটা 'মাইক্রোটোম'।

পাশের ঘরে 'অপটিক্স'এর নানা রকমের বস, একধারে সাজানো বিভিন্ন রকমের রীলে আর সার্কিট, মোটর ব্যাটারীর সারি; পাঁচ-ছটা অসিলোস্কোপ বেওরালে হু ঘরেই খড়ির সারির মতো নানা রকমের মিটারের সমাবেশ আর ডিন-কেন্দ তড়িৎ প্রবাহের বড়ো বড়ো মার্টার সুইচ।

নীচের তাল শেব করে উঠে যায় ওপরের তালতে। প্রথম ঘরটার প্রবেশ করেই শংকর অভিভূত হয়ে যায়।

সমস্ত ঘর জুড়ে নানা রকমের কম্পিউটার!

এক পাশে একটা বিরাট ডিজিটাল কম্পিউটার আর বিপরীত দিকে রয়েছে অ্যানালগ কম্পিউটার। চারদিকে ছড়ানো নানা রকমের সহকারী ইউনিট।

স্মিত্রা বলে, সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ! কী শংকর, ভূত দেখলে না কি?

শংকর বলে, স্বর্ণ সন্কে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রের যে ধারণা হবিবুজ্জা দেখছি সেটা সম্ভব করেছিল দিল্লীরই এক অজ্ঞাত কোণে।

জানো স্মিত্রা, মোটা ভারতবর্ষে এমন বস আর একটাও নেই। এম, আই, চিত্তে বড়ো কম্পিউটারের কথাটা তোমার মনে আছে? পশিতের যে সমস্ত সমাধান করতে রীতিমতো মেধাবী ছাত্রের বহু ঘুরে বাবে—এই মেনিনে উত্তর পাওয়া বাবে সে সমস্তার কয়েক মিনিটে। অবশু সমস্তাটা মেনিনের নিজের ভাষায় অনুবাদ করে দিতে কিছুটা সময় বাবে আরো। মনে আছে স্মিত্রা, তন নিউম্যানের সেদিনকার বক্তৃতা তিনি বলেছিলেন—এ বাস্তব বোধ হয় একটা আশ্চর্য্য আছে।

শংকরের প্রশংসাবিহ্বল ধূর্তিতে বড়ো সন্ত্রম বস্ত্রটার প্রতি।

বস্ত্রগুলোর পরীক্ষার সে তদয় হয়ে যায়, মাকে মাকে তার হুখ থেকে শোনা যায় প্রায় অসুট অভিব্যক্তি কী চমৎকার। গ্যাও!

মাকে মাকে আগ্রহের আতিশয্যে স্মিত্রাকে ডাকে, স্মিত্রা, দেখে বাও এটাকে হবিবুজ্জা নিজের হাতেই গড়ে তুলেছে আই, বি, এম-এর ক্যাটাগরে কিঙ্ক এ রকম ডিকারেসিয়াল অ্যানালাইজার এর উদ্ভেধ পর্ষত নেই! ওই যে বড়ো অ্যালুমিনিয়ামের আলমারীর মতো অংশটুকু দেখছ, ওটাও হবিবুজ্জার তৈরী। বলতে গেলে, পুরো অ্যানালগ কম্পিউটারটাও সে গড়ে তুলেছিল।

সুমিত্রা, এখন মনে পড়েছে কোথায় দেখেছি নীচের ডালার ফ্রেমটা। ওটা এই কম্পিউটারগুলোরই অংশ একটা অতিরিক্ত মেমোরী ব্যাংক মেশিনটার স্মরণশক্তি বাড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা। এই মাত্র ক'মাস আগে একটা সাময়িক পত্রে ওই নক্সাটা দেখেছিলাম।

একটা ক্ষুণ্ণ ভাইজার বোগাড় করে দেবাজের সামনের প্যানেলটা খুলে ফেল শংকর। হঠাৎ বলে ওঠে দেখ কী চমৎকার হাতের কাজ ছিল ডাললোকের। এখানে আটশটো তার একসঙ্গে হবিবুজ্জার কী করে সন্নিবেশ করেছে এতো স্বল্প পরিসর জায়গায়? কতকগুলো গেছে ফেলারএর দিকে আর কতকগুলো মেমোরী ব্যাংকের দিকে। অথচ প্রতি তারেরই স্বতন্ত্রতা বজায় রয়েছে। কী অদ্ভুত বিজ্ঞান সুমিত্রা।

এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে এ সমস্ত জটিল যন্ত্র যে এমন নির্ভুলভাবে গড়ে তুলতে পারে তার পক্ষে হয়তো অ্যাটিউট্রাভিটি মেশিন তৈরী করাও অসম্ভব নয়।

সুমিত্রা কিছুক্ষণ চেষ্টা করে শংকরের উৎসাহে বোগান দিতে। কিন্তু মাইলের পর মাইল লম্বা লাল নীল তারের জটিল সমাবেশ আর হাজার হাজার জ্যালুস্ত ট্রানজিষ্টার এর অরণ্যের মধ্যে তার অস্বাভাবিক শক্তি পথ হারিয়ে যায়।

শংকরের সময়ের জ্ঞান লোপ পেয়েছে এত বড়ো চমকপ্রদ খেলনা পেয়ে। এক একবার তার একটু খটকা লাগে। সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করে।

ভাবছি, ডাললোক এতো পরমা বোগাড় করলেন কী করে? এই যন্ত্রের যন্ত্রপাতির নামই হবে কমপক্ষে চল্লিশ লক্ষ টাকা। আর অল্প যন্ত্রের সব যন্ত্রের হিসাব করলে আর এক কোটিটাকার মত হবে দাঁড়ায়।

সুমিত্রা হাই চেপে বলে, তার চেয়েও বেশী, শংকর। একেসর কুকর্মী সেদিন একটা মোটামুটি হিসেব করছিলেন। এ বাড়ী আর ল্যাবরেটরী তৈরী করতে আর এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা লেগেছিল। কিন্তু ইনকমট্যাক্স বাদ দিয়ে হবিবুজ্জার বাৎসরিক আর ছিল কতো, আন্দাজ করো দেখি? চল্লিশ লক্ষ টাকা।

শংকরের চক্ষু বিস্ফারিত হয়—চল্লিশ লক্ষ টাকা!

মনে মনে একবার হিসেব করে নেয় ক'শো শংকর রাখকে এ টাকার পোবা যায়। তারপর আবার সে মগ্ন হয়ে যায় কম্পিউটারের মধ্যে।

অসাম হৈর্ষ নিয়ে সুমিত্রা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর বলেই ফলে, আজ আর থাক, শংকর। তোমার না হয় 'কম্পিউটার' পেয়ে কুধা-তুকা ঘুচে গেছে, কিন্তু তার জন্ম এই যক্ষী ডাললোককে উপোস করিয়ে মারবে? আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কত বেলা হল তোমার খেয়াল আছে?

শংকর অপ্রতিভ হয়ে যায়, তাই তো মাপ করো আমার এ বাস্তব মতো। বেলা গড়িয়ে ছুপুরে পৌঁছেছে আমার স্মরণেই ছিল না। চলো, এবার ভাড়াভাড়ি অল্প খরগুলো শেষ করে ফেলা যাক।

অল্প খরগুলোর রয়েছে নানা রকমের স্মরণ যন্ত্রপাতি, মাপজোপ করার জন্ম। 'ট্যাকোমিটার' 'ইন্টারকমিটার' 'বোলোমিটার' 'ম্যাগনেটোমিটার' 'টরশান্ ব্যালান্স' ইত্যাদি। শংকরের দৃষ্টি থেকে যায় একটা 'প্রাতিমিটার' মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপ করার যন্ত্র, দেখে। পরম কৌতূহলে সেটাকে যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে। তার পর অল্প সব নানা রকমের যন্ত্রপাতির ওপরে চোখ বুজিয়ে দীর্ঘকাল ত্যাগ করে।

এখন সব ভালো করে দেখাই হোলো না, সুমিত্রা। বিকালে না হয় ওদের সংগে আর একবার আসা বাবে।

সবশেষে লোহার সিঁড়ি দিয়ে ওরা উঠে যায় হলঘরের ওপরের অবজারভেটরিতে।

বিরিট দুর্বীণটা অন্ধকার ঘরে মকের ওপরে তেরছা ভাবে দাঁড় করানো—একটা ঐতিহাসিক দানবের মতো। আবহা আলোর কালো ছায়া তার বিস্মৃত—গৌলাকার ছাদের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত জুড়ে। ঘরের মধ্যে একটা দুঃসহ নীরবতা। হাটুকের অবর্তমানে মাকড়সার দল পরম নিশ্চিন্তে জাল বুনে তুলেছে। মান আলোর হঠাৎ সে জাল চিক্চিক করে ওঠে। মনে পড়ে যায় কেমন করে ভাঙ্গনহলের কুর্গর্ভে কবরখানার কঠিন নীরবতা।

একটা পতীর সমবেদনা সহসা শংকরের মনের ভিত্তিতে সাজা দিয়ে ওঠে।

বহিবিহংগ।

সর্বপ্রাণী হতাশনের লেলিহান শিখার মধ্যে সহসা রূপ নেয় 'কারারবার্ড'। দিগন্তপারের ঘুরের দাবানলের আকাশ-রাঙানো আভার মধ্যে অন্তর্হিত হয় সে রূপ চোখের নিম্নে। আবার অল্প কোথাও তখন অরণ্যপাতের প্রলয় ভাঙবে বেতে উঠেছে বহিবিহংগ-কিনিয়। টিমারপূরের অগ্নি-উৎসবে হবিবুজ্জাকে ভেঁকে নিলো বহিবিহংগ নিয়তির রূপে।

নিয়তি আছে কি?

হবিবুজ্জার অকাল মৃত্যু কি মহাকর্ষের অমোঘ বিধানকে উপেক্ষা করার চরম শাস্তি?

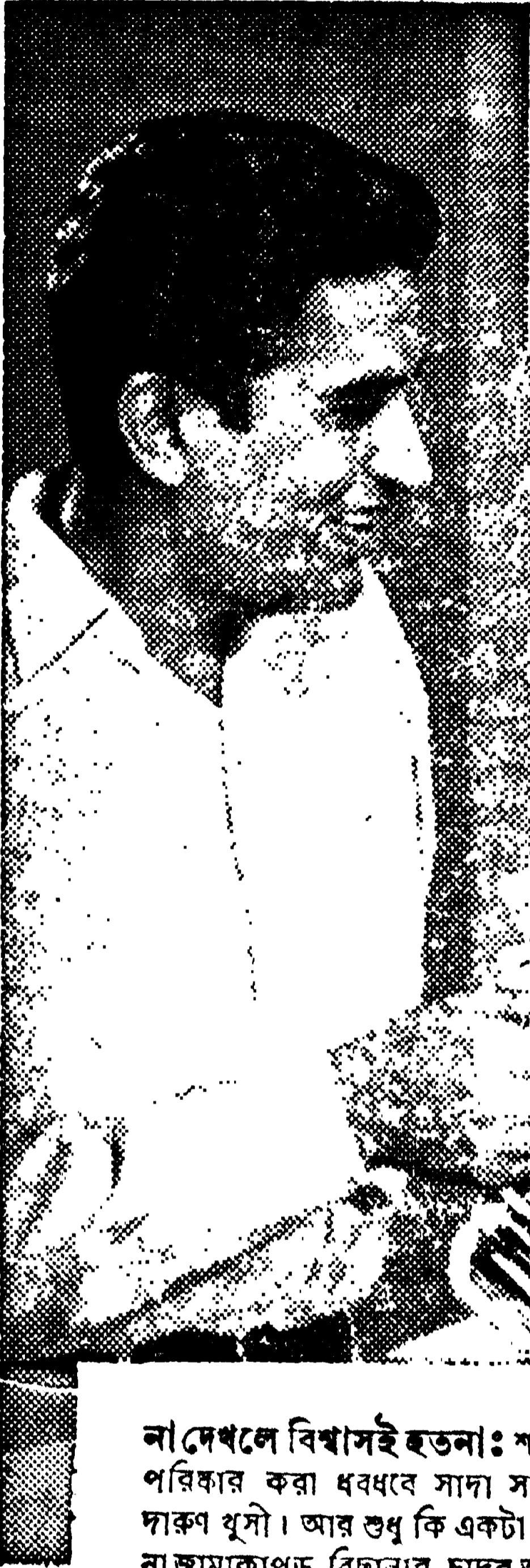
কে জানে?

শংকর ভারী পলার বলে, এবার ফিরে চলো সুমিত্রা।

বাগান পেরিয়ে গাড়ীতে উঠবার সময়ে একবার পেছনে ফিরে চায় শংকর। হঠাৎ প্রান্তর জনহীন বলে মনে হয়। সেই বিরিট প্রান্তরের মাঝখানে উন্মুখ ডানা মেলে দিচ্ছে—বহিবিহংগ। তার মাথার ঝুঁটি থেকে ঠিকবে পড়ে শতশূরের ছালা। ঘুরের সত্ত নিম্নীয়মান সৌখের ভিত্তলোকে মনে হয়—বেন বহু শতাব্দীর কোন বিশ্বৃত সত্যতার ধ্বংসাবশেষ।

[ক্রমশঃ]

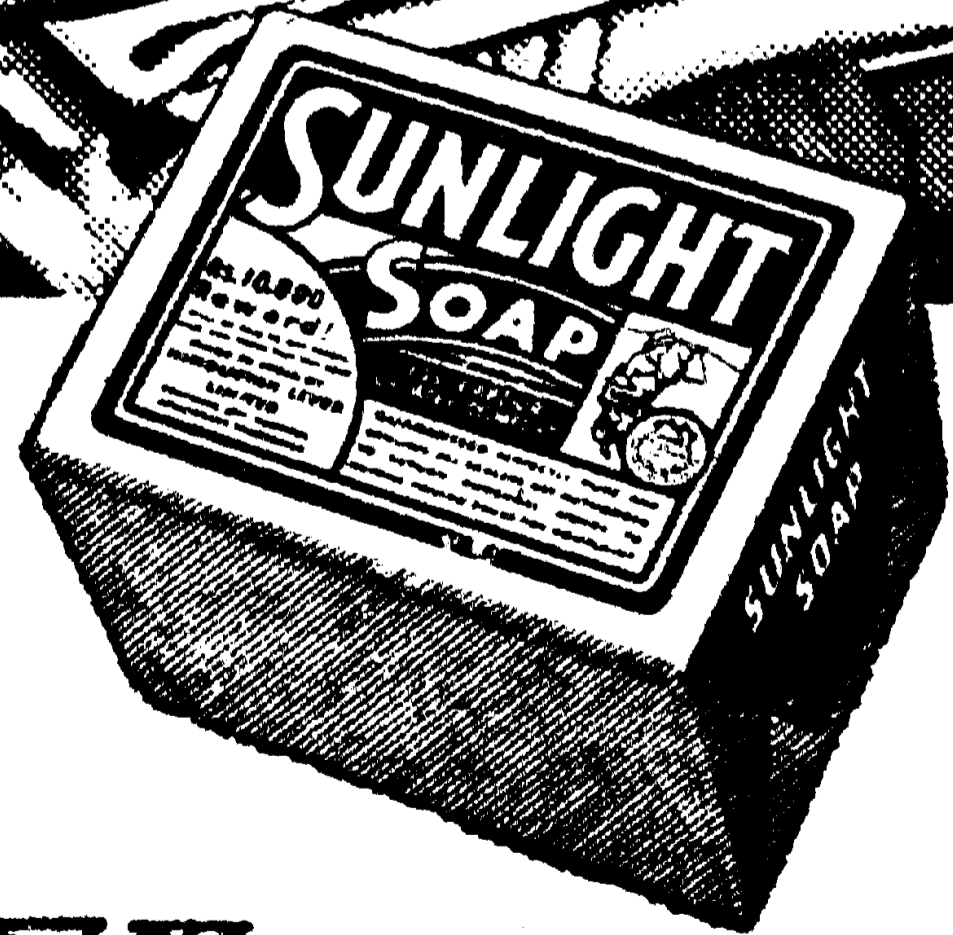
[মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য]



একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শব্বর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সাটটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সাট দেখুন বা জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তুপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্যকরী ও অফুরন্ত ফেনা কাপড়কে পরিপাটি করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক ফুটিও ময়লা থাকতে পারে না। আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন বা কেন... আজই!



সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জল করে

অজ্ঞান ও প্রাক্ষণ



বৌদ্ধ অষ্টাঙ্গমার্গ

আশা রায়

সাধারণত ধর্ম এই বাক্যের সংজ্ঞা ঐশ্বরভিত্তিক। বুদ্ধ ঐশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণই নীতিভিত্তিক—মহত্তর জীবন লাভে দৈনন্দিন অভ্যাস-যোগ, বাহ্যিক আচরণের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নহে, যেহেতু ভগবদালোচনার প্রয়োজন হয় নাই।

তাঁহার নির্দেশিত পথ সর্বসাধারণেরই সুগম্য—তিনি কোনও গুরু তত্ত্ব কতিপয়ের অধিকারভুক্ত করিয়া যান নাই। পরবর্তীকালে তাঁর মতবাদ বৌদ্ধধর্ম নামে আখ্যাত হইলেও তাঁহার জীবিত কালে ইহা পৃথক একটি ধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম নামে অভিহিত ছিল না। বৌদ্ধসম্রাট অশোকের গিরিলিপি ও শিলালেখ সমূহের নীতিবচনে কোথাও বৌদ্ধধর্ম বলিয়া উল্লেখ নাই।

বুদ্ধের আবির্ভাব কালে (খৃঃ পূঃ ৫৬৩) ধর্মচর্চার সাধারণত দুই আতিশয়ের প্রাবল্য ছিল—ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ কর্তৃক যাগ-যজ্ঞ, পূজা, বলি ইত্যাদি সাড়ম্বর বাহ্যিক অনুষ্ঠান, অপর দিকে জীবগণ ইন্দ্রিয়নিচর দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া পাপকর্মে লিপ্ত হয়, একারণ ইন্দ্রিয় ধমনার্শে কঠোর আত্মনিগ্রহ ও কৃচ্ছসাধন।

জীবন-দার্শনিক বুদ্ধ মানবকে একান্ত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মসমীক্ষণ আত্মসংযম ও আত্মশক্তির উদ্বোধনে বিমুক্তিলাভে প্রেরণা দিয়াছিলেন। প্রাক্‌বুদ্ধ ভারতীয় মোক্ষ শাস্ত্রের (মোক্ষশাস্ত্র উপনিষদের যুগ খৃঃ পূঃ ১১০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৫৫০) লক্ষ্য ছিল অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ, এবং ইহার মধ্যার্থ সীমাবদ্ধ ছিল পশুতন্দের মধ্যে, ইন্দ্রিয়গ্রাম চালিত লৌকিক জীবনে জনসাধারণের ভ্রম পথ নির্দেশের প্রয়াস উহাতে সামান্ত মাত্র। বুদ্ধ সেই ইতিভুক্ত ধর্ম প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানদৃষ্টিতে বাস্তব ও ব্যবহারিক রূপদান করিয়া এক সুক্তিপূর্ণ বিজ্ঞানসরভ প্রণালী সাধারণের বোধগম্য ভাষায়

ব্যক্ত করিলেন। দুঃখার্হ মানবকে সুক্তির উপায় ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি ধর্মগুরু পরমেশ্বর বা ত্রাণকর্তা বলিয়া নিজেকে কখনও দাবী করেন নাই—“তুম্‌ হে হি কিচ্চ আত্মপুং অকথাভাবো তথাগতো” তথাগত পথ প্রদর্শক মাত্র, পথ অতিক্রমের প্রচেষ্টা তোমাদেরই করিতে হইবে—ইহাই তিনি বলিয়াছেন।

মানব রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ সমূহ হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে ইহার অনুসন্ধানে এক আঘাত পূর্ণিমা বজ্রনীতে কপিলবাস্তুর রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শাক্যরাজপুত্র তিখারী-ব্রত ধারণ করিলেন। দেশে দেশে পর্যটন, বহু প্রশিদ্ধ আচার্যের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন, কঠোর কৃচ্ছসাধন ও বিভিন্ন যোগ সাধনা অভ্যাস করিলেন কিঞ্চিৎ প্রকৃত সত্যের সন্ধান মিলিল না। এইরূপে দীর্ঘ ছয় বৎসর অতিক্রম হইতে চলিল কিঞ্চিৎ সর্বব্যর্থতার মনোরথ পূর্ণ হইল না। অবশেষে নিরঞ্জনাতে এক অশ্বখবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই আসনে তপশ্চর্য্য আমার শরীর ধ্বংস ও বিলীন হইয়া গেলেও সত্যলাভ না হইলে উপান করিব না। তিনি নিম্নলিখিত নেত্রে ধ্যানের গভীর হইতে গভীরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ধীরে ধীরে সুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল। মানবের সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যুর রহস্য প্রতিভাত হইল এবং তিনি সুমহান সর্বাতিক্রমী বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া সমুদ্র হইলেন।

বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি চিন্তা করিলেন যে, সুগভীর জ্ঞান ও নিগূঢ় সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা কাহার নিকট ব্যক্ত করিবেন? একরূপ চিন্তা করিতে তাঁর পূর্বতন পঞ্চ শিষ্যের স্মৃতি উদ্ভিত হইল—যাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। তিনি অপর এক আঘাত পূর্ণিমায় বারাণসীর যুগকাননে (সারণাথ) উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“যে যে ভিক্ষুবে অস্তা পরমিতেন ন সেবিতক্সা...মজ্জিম পটীপদা নিক্কানার সংবত্ততি”—হে ভিক্ষুগণ! দুইটি আতিশয় অর্থাৎ ভোগ ও আত্মনিগ্রহ এই উভয়কে বর্জন করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিলে নির্কামের পথ জানা যায়।

তিনি বলিলেন, চারিটি মূল সত্যের অজ্ঞতার জন্ত আমরা সংসার-দুঃখচক্রে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হইয়া জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শ্রিয়-বিচ্ছেদ, অপ্রিয়-সংযোগ, ঐশ্বিত্য অলাভ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতেছি—সেই চারিটি সত্য চতুর্দর্শ্য সত্য—যথা জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের হেতু আছে, দুঃখের নিরোধ আছে এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিলেন—“হৃক্খ নিরোধ গামিনী পটীপদা অরিসসচ্চং, অবমেব অরিসো অট্টজিকো মগগো, সেযাধীদং সন্মা দিট্ঠি সন্মা সংকম্মো, সন্মা বাচা, সন্মা মস্সন্ডা, সন্মা আজীব, সন্মা বাবামো, সন্মা সত্তি, সন্মা সমাধি।” দুঃখ নিরোধগামী মার্গরূপ আর্ধ্য সত্য এই ইহা আর্ধ্য অষ্টাঙ্গ মার্গ যথাসম্যক স্মৃতি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। জন্ম মৃত্যুর আবর্তন ও দুঃখনিরোধকারী এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনে দুঃখ-সুক্তি ও নির্কাম লাভ হয়, শিখাগণ। ইহাই আজ তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি।

বুদ্ধবাণীর মূলকথা—স্মৃতি, সমাধি প্রজ্ঞা। অষ্টাঙ্গ সুক্তিমাণের ভিত্তি বিতাপ। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা

শীল-স্বকী, সম্যক প্রাচীনা, সম্যক সমাধি, সম্যক স্মৃতি সমাধি স্বকী, সম্যক দৃষ্টি সম্যক সংকল্প প্রজ্ঞা-স্বকী, বহুত বুদ্ধের শিক্ষা জ্ঞানও ধ্যানমূলক। আর্ধ্য অষ্টাঙ্গ মার্গ ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হইলেও প্রত্যেকটির সহিত অপারগুলির অনঙ্গী স্বকী, এ কারণ একে অন্তের পরিপোষক।

বুদ্ধ বলিয়াছেন, হৃৎকের হেতু তিনটি অকুশল—লোভ, ঘেব মোহ এবং এই তিন অকুশল সত্ত্বত তৃকা বা বাসনা জন্ম-জন্মান্তরের হেতু তথা হৃৎকের মূল।

সম্যক দৃষ্টি (প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টি)

মোহ বা অবিজ্ঞানিত দৃষ্টিধারা জীবন ও জগৎপ্রবাহকে বিচার করিয়া মানব কুসংস্কার আপাত সুখকর ভোগলিপ্সা, ধর্মবোধে অধর্ষাচরণ, পবের অহিত সাধনে ধনলাভ ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। জ্ঞানদৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিলে তিনটি বিঘ্ন প্রতীয়মান হইবে— হৃৎক, অনিত্য অনাস্থ। এ জগতে হৃৎকেরই আধিক্য, যথা জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, ঈপ্সিত অলাভ, প্রিয়-বিচ্ছেদ প্রভৃতি নানাবিধ হৃৎক। কোনও সুখই স্থায়ী নহে বরং পরিণামে হৃৎক উৎপাদন করে। সুতরাং সেই সুখ-বাসনার পশ্চাদ্ধাবন নিবর্ধক ও বিড়ম্বনামাত্র।

এ জগতের সব কিছুই অনিত্য, জীবন বৌবন ধন-মান প্রিয়জন প্রিয়বস্তু সকলই কালপ্রবাহে বিনষ্টশীল। এই প্রত্যয় দৃঢ় হইলে লোভ ঘেব ও মোহের বিনাশ হয়। অনাস্থ শব্দের অর্থ আস্থার অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টিপ্রবাহের সকল কিছুই যখন বিনাশশীল তখন একই সত্তা বা আস্থা জন্ম-জন্মান্তরে অপরিবর্তিত থাকিবে, এই ধারণা অস্বাভাবিক। (ব্রাহ্মণ্যধর্মের কর্মবাদ, পুনর্জন্ম মোক্ষ প্রভৃতির সহিত বৌদ্ধমতের বিশেষ পার্থক্য নাই কিন্তু হিন্দু দর্শনের বড় দর্শনের কাল পূ: পূ: ৪৫০ হইতে খৃ: পূ: ২০০) সহিত বৌদ্ধদর্শনের (খৃ: পূ: ৪৮৩ হইতে খৃষ্টোত্তর ১৭৫) প্রভেদ বধাক্রমে আস্থার অস্তিত্ব ও অনাস্থাদে। ঋকবেদে (বৈদিকযুগ খৃ: পূ: ১৫০০ হইতে খৃ: পূ: ৫০০) জন্মান্তরবাদ ও জাতিভেদের উল্লেখ নাই (মাক্সমুলার যুইব) সম্ভবত: বেদোত্তরকালে আর্ধ্যা অনাধ্যদের জন্মান্তরবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, সুসভ্য আর্ধ্যারা তথাকথিত অসভ্য অনাধ্যদের ধারণা সমর্থন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করা সমীচীন কিনা। মহেনজোদেহো, চানহুদেহো ও হারাঙ্গার ভূমিবক্ষে প্রাক-আর্ধ্য সিদ্ধ সভ্যতার (খৃ: পূ: ৩০০০-১৫০০) যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কানিংহাম, বন্সোপাধায়, মার্শাল মজুমদার, হুইলার, কুক দ্বামী, পিগট, নাগ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই অনাধ্যগণ প্রকৃতপক্ষে আর্ধ্যগণ হইতে অনেক উন্নততর সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ-জন্মের হাজার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খৃ: পূ: ১৫০০ শতকে আর্ধ্যগণ একেশে আসেন। সিদ্ধ উপত্যকার এই অনাধ্যগণ আর্ধ্যদের বহু পূর্বে উত্তর-পশ্চিম এশিয়া হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। দৈহিক শক্তিতে হীনতর হইলেও তাহাদের জীবনযাত্রার মান আর্ধ্যগণ অপেক্ষা উচ্চতর ছিল। এই পূর্বোক্ত Dravidian-Sumerian-দের ভারতের আদিম অধিবাসীদের সমপর্যায়ে কেহিয়া আর্ধ্যগণ নিজেদের স্বাভাবিক বজার স্থাপিতে ইতদার্থে অনাধ্য এই আখ্যা প্রদান করিলেন।

অনাধ্যদের Animism and totemism—ঐতিহাসিক, মানবের অর্থাৎ ইতর প্রাণী বা কোনও পদার্থ হইতে জন্মবিবর্তন জন্মান্তরবাদ আর্ধ্যারা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বর্তমানকালের প্রখ্যাত শ্রীতা-বেদান্ত-ভাষ্যকার ডক্টর বেলভালকরের মত।

সম্যক সংকল্প (উত্তম সংকল্প)

মূল অর্থে ইহা চিত্তশক্তির দৃঢ় অভিনিবেশ। ইহার তিনটি বিভাগ (১) নৈকাম্য সংকল্প—ভোগস্বর্থ অনিত্য ও পরিণামে হৃৎক সৃষ্টি করে এই চিন্তা সদা জাগ্রত রাখিলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদিজনিত তৃকা অন্তত জ্ঞানে বিদূরিত হয় এবং চারি ধাতু সম্বিত মেহ—(ব্রাহ্মণ্যধর্মের জীবদেহ পঞ্চভূত সম্বিত কিন্তু বৌদ্ধমতে ইহা চারি ধাতু (element) যথা পৃথিবী (Solid) অপ (fluid) তেজ (heat) বায়ু (Vibration, wind) সম্বিত এই চারি ধাতুকে পৃথক করিলে মেহের স্বকীয় কোনও অস্তিত্ব থাকে না—এই প্রত্যয়ে অন্তত তৃকার মূলোচ্ছেদ হয়। (২) অব্যাপাদ সংকল্প অর্থাৎ অহিত চিন্তা বর্জন ও সর্বত্রীবে মৈত্রী ভাবনার দৃঢ় উদ্ভব। (৩) অবিহিংসা সংকল্প সর্বপ্রকার হিংসা বিরতি ও করুণাচিত্ত উৎপাদন চেষ্টা।

সম্যক বাক্য (সত্য বা অবিরুদ্ধ বাক্য)

ইহা চতুর্বিধ বাচনিক পাপের পরিহার—যথা (১) প্রবক্তনা চিন্তে আত্মহেতু বা পরহেতু জানিয়া তনিয়া মিথ্যা না বলা, সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিশ্বাস ও অ-বিষমবাদী হওয়া। মিথ্যা ভাষণ লোভচিত্তজাত। (২) পিত্তন অর্থাৎ অপর যে কোন দুই ব্যক্তির ভিতর পরস্পরের প্রতি প্রিয়তাশূন্য করে (মন ভাঙ্গান) এইরূপ বাক্য হইতে বিরত থাকা। পিত্তন বাক্য ঘেব, চিত্তজনিত অকুশল কর্তব্য। (৩) পক্ষ্য বাক্য পরিহার—যে বাক্য নিজেকে ও অপরকে পক্ষ্য ব্যবহারে নিযুক্ত করে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্যস্বকর নির্দোষ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ। পক্ষ্য বাক্যও ঘেবচিত্তজাত। (৪) সম্প্রলাপ বাক্য হইতে বিরতি—শূন্যগর্ভ, অসং, বিরূপাশ্রুক, অসার বাক্য পরিহার করিয়া ধর্মবোধী, বিনয়বাদী, কালবাদী, অর্থযুক্ত পরিমিত বাক্য বলা। সম্প্রলাপ বাক্য মোহচিত্তজাত।

সম্যক কর্ম (সং বা কুশল কর্ম)

এই কারিক সংম ও কুশল কর্মের অস্বীকরণের উদ্দেশ্যেই শীল পালনের নির্দেশ প্রাদিহিংসা হইতে বিরত থাকিয়া সর্বকৃতে হিতাত্মকম্পী হওয়া, (১) বেচ্ছার দেওয়া হয় নাই একপ বস্ত্র গ্রহণ বা অপহরণ না করা, (২) কামসম্বোগে মিথ্যাচারী না হওয়া—এ বিবিধ কারিক পাপ পরিহার করিয়া মুকর্ম দ্বারা কার-পবিত্রতা অর্জনই সম্যক কর্ম।

সম্যক জীবিকা (সংজীবিকা)

অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে নৈতিক জীবনযাপন সম্ভব হয় না। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন ধর্মী ও বাস্তববাদী, তিনি কেবল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদেরই শিক্ষা দেন নাই, আপাতের সকলে হৃৎকহৃত হইক,

• শীল পালন সম্বন্ধে এই পত্রিকায় পূর্বতন এক সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি।

বাসনাবিহীন বুদ্ধের ইহাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। যেহেতু অষ্টাদশ মার্গের নির্দেশ সম্যাসী গৃহস্থ সকলের জ্ঞানই। কার্যিক বাচনিক মানসিক অকুশল বাহাতে উৎপন্ন না হয় এইরূপ জীবিকাভ্যন্তরেই তিনি উপদেশ দিয়াছেন। লোভ, হিংসা, পদপীড়ন, কপটতা, মিথ্যা, ব্যক্তিতার ইত্যাদি যে যে জীবিকার সজাত হইতে পারে, তাহাই তিনি নিবেদন করিয়াছেন। যথা—সংস্র, মাংস, মত্ত, বিব, শব্দ, নর ও নারীসংস্র ব্যবহার।

সম্যক প্রচেষ্টা (দৃঢ় উৎসর্গ)

ইহা চতুর্বিধ (১) অমুৎপন্ন অকুশল উৎপন্ন হইতে না পারে তৎসংক্রান্ত বলবতী চেষ্টা, (২) উৎপন্ন অকুশলের বিনাশ ও পুনঃ উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ কার্যিক বাচনিক মানসিক ব্যবহার হইতে বিরতির উদ্দেশ্যে দৃঢ় উত্তেজনা ও স্থির প্রতিজ্ঞা, (৩) অমুৎপন্ন কুশলের উৎপাদনের জ্ঞান চিত্তকে সর্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ করা, (৪) উৎপন্ন কুশলের স্থিতি ও বৃদ্ধির জ্ঞান অভিনিবেশ। বীর্ষাবান ব্যক্তিই ধর্মলাভ করে, পরিপূর্ণ অভিমুখিতা ও অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাই তাহার বন্ধু।

সম্যক স্মৃতি (স্মৃতি সাধনা)

সম্যক স্মৃতি অষ্টাদশ মার্গের একটি উচ্চতর সাধনা। ইহা ধ্যানমূলক। সুলভেহ ও সূক্ষ্মমনের বর্ধারূপ সংজ্ঞা ও অমুভূতির বিবর্তন সম্বন্ধে সর্বদা স্মৃতিমান থাকাই স্মৃতি অমুভূত। ইহার চারিটি বিভাগ—যথা (১) কায়ে কার্যাদর্শন—কুংসিত কেশ লোম নখ দন্ত অস্থি মাংস অস্ত্র মজ্জার সমন্বয়ে এই দেহ এবং এই দেহের পরিপত্তি জ্ঞানদৃষ্টিতে পুনঃপুনঃ পর্যবেক্ষণ করিলে দুঃখ, অনাস্ব, অমিত্যবোধে আশ্র-সংস্রার ও আশক্তিসমূহের ক্রমে নিরসন হয়। (২) বেদনায় বেদনাদর্শন পালি বোধ সাহিত্যে সুখ দুঃখ উপেক্ষা শীতোষ্ণ সমস্ত দৈহিক ও মানসিক অমুভূতিই বেদনা। কি কারণে কোন বেদনা বা অমুভূতির উদয় হইল এবং উদয় হইয়া কোন মনস্কামের সৃষ্টি করিল বা কোন বিরতির কারণ হইল, তাহা স্মৃতি দ্বারা অবলম্বন করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা পুণ্যাপুণ্যরূপে অমুভাবন করা। অমুভূতিই দেহের সহিত জগতের যোগসূত্র। উদয় স্থিতি ও বিলয়শীল অমুভূতি সমূহের অমুভাবনে ক্রমে অনাস্ববোধ প্রতিভাত হইবে তাহার অমুভূতি হইতেছে, কে অমুভব করিতেছে? (৩) চিত্তে চিন্তাদর্শন—কার্য ও অমুভূতির সমন্বয়েই চিত্তের উৎপত্তি। কায়ে ও অমুভূতির বিভিন্নতার বিভিন্ন চিত্তের উৎপত্তি অহরহ হইতেছে। কোন সময়ে কোন চিত্ত উৎপন্ন হইতেছে, যে চিত্ত উৎপন্ন হইল তাহা সংস্রাগ চিত্ত না স-স্বৈচিত্র্য না স-মোহচিত্ত অথবা যোগ-স্বৈ-মোহাতিক্রান্ত চিত্ত বীর্ষ্যসহকারে স্মৃতি দ্বারা অবলম্বন ও প্রজ্ঞাচক্ষে দর্শন করিলে দুঃখ অনাস্ব, অনিত্য বোধে নিত্য সুখ আশ্রসংস্রা ক্রমে পরিত্যক্ত হয়, চিত্ত নির্বুদ্ধিতা হইয়া যায়। (৪) ধর্মে ধর্মাদর্শন—ধর্ম এই শব্দের মৌলিক অর্থ হইল যে বিষয়ের যে স্বভাব। তুষারের ধর্ম শৈত্য, অগ্নির ধর্ম উত্তাপ। বীর্ষ্যধিষ্ঠান ও প্রজ্ঞা দ্বারা স্বীয় কার্য-চিত্ত-স্বভাবের পুণ্যাপুণ্যভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে ধর্মের স্বলক্ষণ, অনিত্যাদি সাধারণ লক্ষণ ও অনাস্বাদি শূন্যতা লক্ষণ দৃষ্টে দেহমনের অভিব বোধ ক্রমশঃ লুপ্ত হয়।

সম্যক সমাধি (পরিপূর্ণ একাগ্রতা)

সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক প্রচেষ্টা সম্যক জীবিকা, সম্যক স্মৃতি এই সপ্ত অঙ্গসম্বিত চিত্তের পরিপূর্ণ একাগ্রতাই সম্যক সমাধি। যদিও সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক স্মৃতিতেই উচ্চতর অবস্থা কিন্তু চিত্তের অবিকল্প সৈর্ষ্য ও প্রশান্তি আসে যোগে অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্বিতায়। ধ্যানের গভীরতার আসে সমাধি বা কৈবল্য, যে অবস্থায় চিত্ত নির্বৃত্ত নীপশিখার ভার উদ্ভল ও অচঞ্চল হইয়া অবস্থান করে। ধ্যানলোকের চারিটি অবস্থা বুদ্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন—(প্রথম) কার্যিক, বাচনিক, চৈতন্যিক নির্বৃত্ততা, সৈর্ষ্য প্রশান্তিই ধ্যানযোগের প্রথম ভূমি। ভোগ কুলা অকুশলাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিচার বিবেক শ্রীতি সুখ ও একাগ্রতা সম্প্রসৃত হইয়া বিহার করাই এই প্রথম সমাধিভূমি লাভ। (দ্বিতীয়) আধ্যাত্মিক সম্প্রসার চিত্তে সমাধিভাত শ্রীতি সুখের ক্রমবর্ধনে দ্বিতীয় ভূমি লাভ। (তৃতীয়) শ্রীতি বিরাম উপেক্ষা একাগ্রতার সহিত শুল্কশীল হইয়া বিহার করিলে যে কার্যিক সুখবোধ ও প্রজ্ঞার উদয়ে হয় তাহা তৃতীয় ভূমি। (চতুর্থ) ক্রমে কার্যিক ও মানসিক সুখ-সুখবোধ সর্বথা রহিত হইয়া যে নিরবচ্ছিন্ন নির্বিকল্প শান্তি ও শান্ত দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় তাহাই চতুর্থ ধ্যানভূমি অর্থাৎ নির্বৃত্ত। নির্বৃত্ত উপলব্ধির বিষয় ইহা অনির্বচনীয় অকল্পনীয়।

বুদ্ধনির্দিষ্ট ধ্যানের বিষয়বস্তুগুলি অতীব সুস্থি ও বিজ্ঞানসম্মত। অজ্ঞাত ধর্মসম্প্রদায়ে ধ্যানের বিষয়বস্তু ঈশ্বর এবং লক্ষ্য হইল তাহার সহিত সাযুজ্য সালোক্যলাভে আত্মাত্মিক সুখ। এখানে উদ্বৃত্ত করা বাইতে পারে যে নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিল যুনি কে উদ্ভেদ করিয়া গীতার জীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—‘সিদ্ধানাং কপিলো যুনিঃ ১০।২৬ অর্থাৎ সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল যুনি।

ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধ যেমন নীরব ছিলেন, নির্বৃত্ত সম্বন্ধেও সেইরূপ তিনি ইঙ্গিত মাত্র করিয়া তাহার ব্যাখ্যা বা আলোচনার কণ্ঠ ছিলেন। ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় এরূপ নীরবতা অজ্ঞাত ও পবিত্রিত হয়, উপনিষদে আছে ‘ন তত্র চকুর্গচ্ছতি ন বাপ্ পচ্ছতি নো মনো’ ইত্যাদি অর্থাৎ সেখানে চকু যায় না বাক্য যায় না মনও যায় না তাহা বিদিত অবিদিত সকল বস্তু হইতে পৃথক—তাহা অবাঙ্গমনসগোচরম্। হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই দর্শনের চরম লক্ষ্য যথাক্রমে ব্রহ্ম ও নির্বৃত্ত, উভয়েই অনির্বচনীয় অকল্পনীয় এ সম্বন্ধে বলিতে শূন্যতা বা ন-প্রার্থক (নেতি নেতি) বর্ণনা আসিয়া পড়ে অর্থাৎ ন-দুঃখ ন-সুখ ন-জর ন-মর ন-জন্ম ন-জাত ন-অস্ত ন-অনন্ত অচ্যুত অমৃত। ব্রহ্মোপলব্ধি ও নির্বৃত্ত, সাধন মার্গের চরম লক্ষ্য শৌছিলে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধির বিষয়, সে উপলব্ধি ভাবাতীত।

যোক বা নির্বৃত্ত লাভই মানবের চরম কাম্য চরম লক্ষ্য। তাই ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বুদ্ধ পঞ্চ শিব্যকে বলিয়াছিলেন, ‘অপাঙ্কতা ভেস অমতসুস দার, যে সোভাবতো। পমুক্কত্ত সত্তা’ আদি তোমাদের জ্ঞান অমৃতের দ্বারা খুলিয়া দিলাম, হে অমরমান। তোমরা প্রজ্ঞার দ্বারা খুলিয়া প্রাপ্যপাত্রখানি পূর্ণ করিয়া লও।

বুদ্ধের উপদেশাবলী পর্যালোচনার আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে জাতি-ধর্ম-ধর্ম-নির্বিশেষে বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন যে কোনও কালের যে কোনও ব্যক্তিরই ইহা অমুভবনসাধ্য এক এই মার্গ সম্পর্কই

মানসিক তৃষ্ণা ও পূর্ণ পরিণতি লাভের অনিবার্য, বুদ্ধিপূর্ণ, বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী, ইহার সার্বজনীনতা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। যাহুব এই মার্গ অবলম্বনে নিজের বুদ্ধি নিজেই অর্জন করিতে পারে। বাগ, বঙ্গ, বলি বৈষ্ণবপা বা কাহারও সাহায্য বা নির্ভরতার প্রয়োজন নাই ইহাই তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন 'হথা অত্যাহি অন্তনো মাখো কো হি নাখো পরোসিয়া? অন্তনা হি সুমন্তেন নাখং লভতি হুরজ' নিজেই নিজের নাখ (জ্ঞানকর্মা) তদ্বিত্ত্ব অণ কে জ্ঞান করিতে পারে? সুদান্ত ব্যক্তি আপনার মথ্যেই হুরজ আশ্রয় লাভ করে। 'অন্তনা চোদবস্তানং পটিমাসে অন্তমন্তনা সো অন্তত্তো সতিমা সুখং বিহাসীসি' নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, নিজেই নিজেকে পরীক্ষা কর, যিনি আত্মগুণ (আত্মহ) ও স্মৃতিমান তিনি সুখে বিহার করেন।

গণমানসে আত্মশক্তির এরূপ শ্রেষ্ঠ আসন এরূপ প্রেরণা কেহ দেন নাই—তাই ভগবান বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তন দিবস আবার পূর্ণিমা বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক পথযাত্রায় অস্তরশক্তি উদ্বোধনের স্বর্ণীয় দিবস।

দিন যায় রাত্রি আসে, এক ঋতু অস্তে অস্ত ঋতু—বর্ষ শেষে নববর্ষ চুরুর হুরজ্য হুরজ হুরম কালচক্র ভগৎ ও জীবনপ্রবাহ চালিত

করে। কাল গতিশীল চক্র তার গতিবেগ। কাল সমূহ জীব কালচক্রের প্রচণ্ড নিস্পেদন হইতে পরিভ্রাণ কিভাবে পাইবে? কোরি শক্তিমান হইতে শক্তিমান কালোত্তর কালবিজয়ী কালাতীত? বহুই কাল বিজয়ী কালাতীত সর্বশক্তিমান ইহাই ভগবান বুদ্ধ প্রবর্তিত বর্ষ চক্রের আহ্বান। চক্রের বহুধর্ম সমতা, চক্রের ব্যাস পরিধি ও ব্যাসার্ধ সর্বদৃষ্টিভঙ্গীতেই সু-সম।

ধর্মচক্র তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্বী-পুরুষ নির্কিশেবে যোগা করিতেছে সর্বকালের সকল মানবের বুদ্ধিলাভের উন্নয়ন অধিকার—এ স্বর্ণীয় দিন ভারতবাসীর ঐতিহ্যের অক্ষীভূৎ হইয়া আছে।

একদা বুদ্ধবাণীর আদর্শে মৈত্রীর আহ্বানে ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়া বে কল্যাণপ্রসূ নৈতিক ধর্ম সমগ্র এসিয়া এক সুদূর মিশর গ্রীস প্রভৃতি দেশকে অনুরোধিত করিয়াছিল, সেই ঐতিহ্য স্বরূপে আজ স্বাধীন ভারত বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মচক্রের প্রতীক ধর্মবিজয়ী বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের রাষ্ট্রচক্রকে জাতীয় পতাকার কেন্দ্রস্থলে স্থান দিয়াছে।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের পূণ্যতিথি অতীতের ও বর্তমানের কল্যাণদায়ী মহিমার মহিমাবিত, তাই বর্ষে বর্ষে আবার পূর্ণিমার পবিত্রদিনে অর্বাৎ গুরু পূর্ণিমার ভারতীয় হিন্দুগণ উক্তিচিত্তে আপন আপন ধর্মোপদেশী গুরুকে পূজা-নৈবেদ্যে শ্রদ্ধা জানায়।

মনের কথা

"এমন সুন্দর গহনা কোথায় পড়ালে?"
"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কচ্ছিন্দান, সততা ও দারিদ্র্যবোধে আমরা সবাই খুশী হয়েছি।"

মুখার্জী জুয়েলার্স

১০ দিন সময়ের গহনা নির্মাণ ও রত্ন-অলঙ্কার
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪১১০



স্বীকারোক্তি

শ্রীপদ্মা কুণ্ড

তোমাকে দেখার পর,
প্রতিজ্ঞা করেছিলুম,
আর কারো প্রেমে পড়বো না।
কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আজ
মুলতুবি রাখতে হল,
এক সৈনিকের প্রেমে পড়েছি।
রাগ করো না।
প্রেমে পড়েছি আমি
তুমু একজনেরই।
তোমার বা সৈনিকের নয়।
সে হল, আমার কল্পনার গড়া
এক অনন্ত পুরুষ।
সেই আমার অপূর্ব সৃষ্টির,
অপূর্ণমাণু
প্রত্যক্ষ করি বার মধ্যে
তারই প্রেমে পড়ি আমি।
—আমার প্রেমবারি
তুমু তোমাকে আর সৈনিককেই
সিদ্ধ করবে না—
কেননা
আমি কল্পনা-বিলাসী।

সাধীহারা

শ্রীমতী মধু চক্রবর্তী

সে একা—
তাকে দেখি প্রত্যহ শূন্য স্থিত্তিতে
দীপ জ্বলে দিতে নিরালা রাতে।
কুরাশায় যখন সমস্ত সম্পদ
সে আসে ; শিশিরের সাথে
ছটি মুক্তাবিন্দু করে পড়ে আঁধি হ'তে
তারই উদ্দেশে—
বে সাধী চলে গেছে নিরুদ্দেশে।
শীতের পর এলো বসন্ত
কিন্তু বে সাধী চলে গেছে অনেক দূরে
সে তো আর কিরবে না
ক্লাস্ত হাতে তুমু প্রদীপ জ্বলে দেবে
সে একা একা।
আরও অল্প মুক্তাবিন্দু করে পড়বে
সিদ্ধ হবে স্মৃতির বেদীভঙ্গ,
আর মিট-মিট করে জ্বলবে সারাষ্টমাত
সমব্যথা তার-দয়।

মৃত-সঞ্জীবন

গীতা ঘোষ

পাখীদের কথা বলা শেষ হয় না কো,
কী বে কথা বলে তারা গান গেয়ে গেয়ে।
কী বে ছবি আঁকে তারা মেঘের কিনারে,
বুঝি নাই তুমি আমি, চিনি নাই তারা।
পাখীদের ডানা আর পালকের ড্রাণে,
তাদের উজ্জ্বল চোখে-ছোট ছোট প্রাণে।
কখন যে ধরা দেয় আকাশের নীল,
হেসে ওঠে রোদ আলো দুঃসাহসী ডাকে
খোঁজ তার রাখে নাই মাহুকের মন।
তবু যদি কোন দিন শালিকের ডাকে,
চিলের কান্নায় সুরে বলাকার উদাত্ত আহ্বানে।
কাজের কাঁসিতে বাঁধা আমাদের মন
সাজা দেয়, ভেঙ্গে ফেলে জানালার সংকীর্ণ বন্ধন।
উড়ে চলে যেতে চায় ওপারের বোদে কলোমল
কচি কচি ঘাসে ঢাকা সবুজ প্রান্তরে—
যেতে দিও। ঘাসের পাতার নাচ
কড়িয়ে ডানায় ডানায় মনটা বিছিয়ে
একবার নেচে নিও। রোদের পরাগ মেখে
চেতনার নয়ন পালকে, হসে বেও বাবুই চড়াই।
সূর্যের সোনালী তাপ পান করে, খাব নিও জীবনের।
তারপর, চুহাতে ছড়িয়ে দিও শান্ত ক্লাস্ত জনে
প্রাণের উজ্জ্বল মন্ত্র,—মৃত-সঞ্জীবন।

কেরাণী

কুমারী শিখারাণী সিংহ রায়

পৃথিবী বৃহৎ হৃদয়।
বারো ঘণ্টার দিনে
চারশো আশি মিনিট ঢাকা জীবন কক্ষিনে
মোহন রানো আত্মগ-বাক অমিত সৃষ্টির।

কীটসু, সংজ্ঞান, রবিঠাকুর বায়রণ
মৃত আমার জীবিকার কাছে
কাঠের 'ক্রাচে' ভব দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
সফেন সমুদ্রে ভাসমান আমার জীবন।

জীবান্ন হয়েছে জীবনের সকল প্রকিট।
তাই চেয়ে আছি জীবনের অন্তহীন অস্তিত্বে
বরষ বাগানে
গোলাপের গুণে
বে হেমন্ত ভ্রাসমাহুর হিয়ে।
আমি আজ বস্তু ;
লেজার, ট্রায়াল ব্যালান্স, ব্যালান্সশীট।

মেঘ

[Shelly'র Cloud কবিতার ভাব অবলম্বনে]

কুমারী অপর্ণা সরকার

নীল আকাশের মাঝ দিয়ে যাও কে গো তুমি গুপ্ত মেঘে ?
 ময় সমাজ সেজে চলেছ কোথায়। বাও পরিচয় দিয়ে।
 জন্ম দিয়েছে জল মাটি ঘোরে, মানুষ করেনি কেহ,
 আকাশই আমারে নিল কোলে তুলে দিল বুকভরা মেহ।
 এখন চলেছি বারিদল লয়ে বাঁচাইতে ফুলদলে
 দিতে মোর ছায়া রৌত্রকিরণে বারা পড়িয়াছে চলে।
 আমার সৃষ্ট সূক্তার ভায় শিশির কণার জল
 বাঁচাবে তাদের, জাপাবে সার বত আছে কুঁড়িমল।
 অসাধ্য মোর ছেন কাজ নেই এই পৃথিবীর পরে
 সবুজ মাঠকে করে দিই সালা শুভ্র শিলায় ভরে।
 বৃষ্টিরূপেতে পুনরায় আসি মুছে দিই সব ক্রন্দ
 অসুখেরারে করি উর্ধ্বরে ঘেটে কৃষকের খেদ।
 আমি নেই জেবে বায়ু ও কিরণ রচে মোর সৃষ্টিভক্ত
 আমি হেসে উঠি মুছে দিই সৃষ্টি করে দিই হতভক্ত।
 অন্নাদ্যধারী আমি নই কতু আমি যে চির অমর
 কণে কণে শুধু রূপ বদলাই আমি এক বাহুকর।

সালিমা সুলতান বেগম

শিবানী ঘোষ

জ্ঞানীনা হতে দেখা যায় সুলেমান পর্বতমালা। কিশোরী
 সালিমা সুলতান ছিন্ন দৃষ্টিতে ভাকিয়ে থাকে সেদিক পানে।
 ঐ বোবা পর্বতগুলো কি যে বলতে চায়। অনেক গোপন রহস্য,
 অনেক না-বলা কথা জমে আছে ওদের বুক। কিন্তু কি
 সেই কথা? জানবার জন্তে আকুলিবিগুলি কয়েই ওঠে সালিমার
 অন্তর।
 প্রতিদিনের মত সেদিনও সালিমা জানালার পাশে ঠাঁড়িয়ে
 থাকে অনেকক্ষণ। কিন্তু বোবা পাহাড়ের ভাষা কিছু না বুঝতে
 পেয়ে সে ব্যথা-ভরা হৃদয়ে ছুটে যায় তার মাসীমা গুলবদনের কাছে।
 গুলবদন বেগম তখন লিখে চলেছেন 'হমায়ুন-নামা'। পিতৃ
 বাবর বাদশা নিজের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন নিজেই
 কিন্তু জ্ঞাতা হমায়ুন বাদশার সে সুবোগ সুবিধে কোনদিনই এল না।
 হতবাক্য পুনরাবৃত্তি করতে করতেই কেটে গেল তাঁর জীবন।
 তাই তাঁরই অসমাপ্ত কাজ শেষ করে চলেছেন গুলবদন বেগম।
 সালিমা সুলতান কাছে গিয়ে ঠাঁড়াতেই গুলবদন বেগম
 বলেন—কি রে সালিমা ?
 সালিমা বলে—আচ্ছা মাসীমা তুমি কি এত লিখতে ?
 গুলবদন বেগম বলেন—লিখছি তোমার মামা হমায়ুন বাদশার
 কাহিনী।
 সালিমা বলে—তাঁর কাহিনী লিখে লাভ কি মাসীমা ?
 গুলবদন হেসে বলেন—ওরে বোকা মেয়ে এখন তাঁর কাহিনী
 লিখে না রাখলে এসেদের ভাবীকালের অধিবাসীরা যখন তাদের

বাদশার কাহিনী সংগ্রহ করতে বসবে তখন তাঁরা হমায়ুন
 বাদশার সঠিক স্মৃতি কি করে পাবে বল ?
 সালিমা বলে—তোমার এই ইতিহাস লেখা কাজ কিন্তু আমার
 একটুও ভাল লাগে না মাসীমা।
 গুলবদন বেগম মুহূ হেসে বলেন—কি কয়বো বল তোমার মাসীমা
 তো আমি কবি নই যে বসে বসে কবিতা লিখবো।
 সালিমা সুলতান বলে—ইসু তুমি বুঝি কবিতা লিখতে পার
 না। আচ্ছা মাসীমা—
 —উ ?
 —ঐ যে বোবা সুলেমান পর্বতমালা তাদের ভাষা তুমি বুঝতে
 পারো ? মানে ওদের সুখ দুঃখ হৃদয়ের বিচিত্র অহুত্ব—
 তার কথা মাসীমানেই গুলবদন বেগম খিলখিল করে হেসে
 উঠে বলেন—নায়ে তোমার মাসীমা অত বড় কবি নয় যে বোবা
 পাহাড়ের ভাষা শুনেতে পারে।
 সালিমা সুলতান বলে—কিন্তু মাসীমা আগে তুমিও তো কবিতা
 লিখতে। দাঁও না আমার খাতার একটা লিখে।
 —কই দেখি তোমার খাতা।
 সালিমা এগিয়ে দিল তার কাব্য-লিপিকা। গুলবদন বেগম
 তার কয়েক পৃষ্ঠা উন্টে কবিতাগুলো দেখে একটা মাথা পাতায় লিখে
 দিলেন—
 হয় পরি কি আউ বা আসাক খুঁ ইয়ার নিস্ত।
 তু ইয়াকিন্ মিদন্ কি হেচ অজ উমর বার-খুব-দার-নিস্ত।
 কবিতার লাইন ছাটি বার বার পড়ে সালিমা বলে—কিন্তু এর কি
 মানে মাসীমা ?
 গুলবদন বেগম পুনরায় 'হমায়ুন-নামা' লিখতে লিখতে অব্যব
 দেন—মানে ভালবাসা নেই, জীবনের কোন দাম নেই।
 কথাটা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস কেলে সালিমা সুলতান। এ অসুখে
 ভালবাসা নেই। এ জীবনের কোন দাম নেই? মনটা তার
 মুহূর্তেই হয়ে ওঠে ব্যথাতুর।
 এমন সময় দেখানে এসে ঠাঁড়াল হমায়ুনের বিষয়া পত্নী
 হামিরাবাহু বেগম।
 গুলবদন তাঁকে দেখে লেখা থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন—কিছু বলবে
 বৌদি ?
 হামিরাবাহু বলেন—আমাদের হিন্দুস্থানে বাওরার দিন কালকেই
 ছিন্ন হয়েছে। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।
 গুলবদন বিস্মিত হয়ে বলেন—কালকেই বাওরা হবে ?
 —ঠ্যা আর তো বিলম্ব করা ঠিক নয়। পুত্র আকবর এক
 কংসর হল হিন্দুস্থানের সম্রাট হয়েছে। সে চৌক কংসরের অর্বাচীন
 বালক। অবশ্য বৈরাগ্য খাঁ আছেন তার অভিভাবক হিসেবে।
 তবু আমরা না গেলে পুত্র আকবর দেখে মনে বল পাবে
 কেমন করে ?
 গুলবদন বেগম বলেন—আমার সব কিছুই প্রস্তুত আছে বৌদি,
 তুমি অস্তিত্ব ব্যয়না ঠিক করে ফেলো।
 তখন সালিমা সুলতান নিচু গলায় বলে—মাসীমা, আমি
 তোমাদের সাথে যাব।
 —কোথায় যে ?

—হিন্দুস্থানে।

গুলবদন বেগম বলেন—কিন্তু তোর মা বাবা এতে মত দেবেন কেন?

সালিমা বলে—তাদের অমুমতি আমি ঠিক আদায় করে নিতে পারবো।

গুলবদন বেগম তখন হামিদাবাদকে ভেঙে বলেন—কিন্তু বোদি, সালিমা আমাদের সাথে হিন্দুস্থানে যেতে চায়।

হামিদাবাদ বলে—তা ওর মা বাবা যদি মত দেয় তা হলে যেতে আপত্তি কি?

সালিমা সুলতান তখনি ছুটে-বার তার পিতা মির্জা মুকদ্দিন মহম্মদ এবং তার মাতা গুলবদন বেগমের কাছে।

সালিমা সুলতান সরাসরি পিতার কাছে গিয়ে জানায় তার আবেদন। মির্জা মুকদ্দিন মেয়ের কথায় তখনি দিলেন তাঁর অমুমতি। কিন্তু আপত্তি জানালেন গুলবদন বেগম। তিনি বললেন উপস্থিত হিন্দুস্থানের অবস্থা মোটেই শান্তিপূর্ণ নয় কাজেই সেখানে এখন যাওয়া কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

মির্জা মুকদ্দিন বললেন—না এখন হিন্দুস্থানের অবস্থা আর ধারণা বলা চলে না। বর্তমান পাঠান-রাজ শের খাঁ জীবিত ছিলেন ততদিন এ কথা বলা চলতো।

গুলবদন বলেন—এখনও তো শের খাঁর ডাভুপত্র মহম্মদ আমিল শাহ রয়েছেন। তাঁর সেনাপতি হিমুই বা কম কিসের?

—ও একটা হিমুই কিছু হবে না। বলেই মির্জা মুকদ্দিন ডাক দিলেন—সালিমা।

—বাবা?

—কুমি তোমার মাসীমাদের সাথে হিন্দুস্থানে অনায়াসেই যেতে যেতে পার। আমি সম্পূর্ণ মত দিলাম।

সালিমা সুলতান প্রস্তুত হয়ে নিলেন হিন্দুস্থানে যাওয়ার জন্য। পরদিনই সুর হুল বাজা।

হিন্দুস্থানে জলদ্বর সহরে যেদিন হামিদাবাদ, গুলবদন বেগম এবং সালিমা সুলতান এসে পৌঁছলেন সেদিন বৈরাম খাঁ নিজে এসে স্বাগত জানিয়ে তাঁদের নিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদে।

সেখানে তাঁদের দেখা হল চৌদ্দ বৎসরের ভারত-সম্রাট আকবরের সাথে। তাকে করলেন আশীর্বাদ। গুলবদন বেগমও অত্যন্ত খুশী হলেন আকবরকে দেখে। তিনিও ডাভুপত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনা জানালেন ঈশ্বরের নিকট।

এদিকে মুন্সিল হল সালিমা সুলতানের। যদিও আকবর বয়সে তার চেয়ে চার বৎসরের ছোট তবু সালিমার মনে হল ঐ কিশোরীর কাছে যদি নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া যায় তবে যেন ধন হই জীবনটা।

কিন্তু সালিমার এ বাসনা তখনকার মত রয়ে গেল অপ্রকাশিত। এদিকে প্রৌঢ় বৈরাম খাঁ যুক্ত হয়ে গেলেন সালিমা সুলতানের দ্বন্দ্ব দেখে। তিনি প্রার্থনা করে করলেন ঐ কিশোরীর পাণি।

এতে মত দেন সকলেই। কারণ বৈরাম খাঁর সাথে সালিমার বিবাহ হওয়া মানে আলি-সুক্র বেগ এবং তৈমুর কশের রক্ত একত্রিত হওয়া। এ তো অত্যন্ত সুসংবাদ। এতে অমত করার আছে কি?

এ সংবাদ শীঘ্রই প্রচারিত হয়ে গেল সর্বত্র। বৈরাম খাঁর সাথে সালিমার বিবাহ-বার্তা শুনে সকলেই কাবুল, সমরখন্দ থেকে ছুটে এলেন জলদ্বরে।

এদিকে সালিমা সুলতানের অন্তর তখন ভোলপাড় হচ্ছে। ঐ বিগত যৌবন বৈরাম খাঁ হবে তার স্বামী? ইস এ কথা ভাবতেও যেন তার কেমন লাগে। কিশোর আকবর সেখানে রয়েছে তার হৃদয় জুড়ে সেখানে আসবে বৃদ্ধ বৈরাম খাঁ? সালিমার মনে পড়ে গুলবদন মাসীমার কবিতার পদ দুটি 'ভালবাসা নেই, জীবনের কোন দাম নেই।'

এর পর একদিন খুব ঘটা করে বিবাহ হল বৈরাম খাঁ এবং সালিমা সুলতানের।

বৈরাম খাঁ অত্যন্ত শ্রীত হলেন সালিমাকে পেয়ে। কিন্তু তাঁর সে স্বথ স্থায়ী হল না খুব বেশীদিন। আকবর একদিন তাঁকে পদচ্যুত করে নিজেই গ্রহণ করলেন দেশের শাসন ভার। তখন বৈরাম খাঁ স্থির করলেন তিনি যাত্রা করবেন মক্কার।

সাধী হিসেবে বৈরাম খাঁ সালিমাকে বললেন মক্কার বাবার জন্যে। কিন্তু সালিমা রাজী হয় না। অন্তরের এক ভিন্ন আকর্ষণ তাকে ধরে রাখে সেখানেই।

অগত্যা মক্কার পথে একাকী যাত্রা করেন বৈরাম খাঁ। কিন্তু মক্কার যাওয়া তাঁর ভাগ্যে আর হয়ে উঠলো না। পথিমধ্যে তিনি নিহত হলেন এক আকবানের ছুরিকাঘাতে।

এ সংবাদ এসে পৌঁছলো সালিমা সুলতানের কাছে। কিন্তু এমন মর্মান্তিক ঘটনাতে সে বিচলিত হয় না বিন্দুমাত্র। বরং মনটা তার তুলে ওঠে এক অজানা আনন্দে।

বৈরাম খাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে গুলবদন বেগম ছুটে আসেন সালিমাকে সাহুনা দিতে। কিন্তু তাকে দেখে অবাক হয়ে বান গুলবদন বেগম। এক স্বামীর মৃত্যু সংবাদ কি এতটুকু স্পর্শ করেনি মেয়েটির হৃদয়?

গুলবদন বেগম তার কাছে এগিয়ে এসে বলেন—তোয় কি হয়েছে বলতো সালিমা?

সালিমা সুলতান বলে—কি আবার হবে মাসীমা!

গুলবদন বেগম বলেন—উঁহ আমার কাছে কিছু গোপন করিসনে সালিমা। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ যাকে বিচলিত করতে পারেনি তার মন নিশ্চয়ই অন্য কেউ অধিকার করে আছে। বল সালিমা কে সে?

তাঁর কথায় ফুঁপিয়ে ওঠে সালিমা সুলতান। সে গুলবদনের বুকে মাথা রেখে বলে—মাসীমা আমি পাপিনী আমাকে তোমরা শাস্তি দাও।

গুলবদন বেগম সালিমার মাথায় হাত রেখে বলেন—না না সালিমা তুই পাপিনী নস। বৈরাম খাঁর সাথে তোয় বিবাহ জোর করে দেওয়া হয়েছিল। এ কথা আমি তখনই বুঝেছিলাম। কাজেই তাকে যদি তুই না ভালবেসে থাকিস তবে সে-পাপ তোয় নয়, যারা জোর করে তোয় বিয়ে দিয়েছিল এ অপরাধ তাদের। তা বল সালিমা কে তোয় মন হরণ করে রেখেছে? যদি সম্ভব হয় আমি তার সাথে তোয় পুনরায় বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।

সালিমা গুলবদন বেগমের বুকে মাথা রেখে বলে—মাসীমা বে

আমার মন হরণ করে রেখেছে সে বর্তমান ভারতের সম্রাট আকবর।

তার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গুলবদন বলেন—বলিস কি সালিমা, সেই কিশোর বালক করেছে তোর মন চুরি ?

হ'বার হুঁপিয়ে উঠে সালিমা বলে—হ্যাঁ মাসীমা !

এমন সময় সম্রাট আকবর এসে পিড়ান সেই কক্ষের ধারে। বৈরাম খাঁর দৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত চুঃখিত হয়েছেন এবং তাঁর বিধবা পত্নী সালিমার বাতে কোনরূপ অবজ্ঞা না হয় তার ব্যবস্থা করতে তিনি ছুটে এসেছেন নিজেরই।

এসেই গুলবদনকে দেখে আকবর বলেন—সালিমা, সালিমার জন্তে আমি এলাম এখানে। তাঁর জন্তে আমি মোটা মাসোহারার ব্যবস্থা করেছি এবং তিনি এই প্রাসাদে বাতে রাজস্বাধী মত থাকতে পান তার সব সুব্যবস্থা আমি করে দেবো।

গুলবদন বেগম বলেন—মাসোহারা বা রাজস্বাধীর মত থাকতে পাওয়ার কোনটাই চায় না সালিমা। সে চায় তার চেয়েও মূল্যবান জিনিষ এক একমাত্র তুরিই তাকে সে জিনিষ দিতে পার।

আকবর বলেন—কি সেই জিনিষ সালিমা ? যদি আমার সাধ্যাতীত না হয় তা হ'লে আমি তাঁকে তাও দেবো। কারণ বৈরাম খাঁ ছিলেন আমার অভিভাবক এবং বিশ্বস্ত কর্মচারী। তাঁরই জন্তে আমি আমি হ'তে পেরেছি ভারতের সম্রাট। কাজেই তাঁর স্ত্রীর কথা অবহেলা আমি কখনই করবো না।

গুলবদন বলেন—আকবর, সালিমা চায় তোমাকে।

—আমাকে ? বিস্মিত হ'য়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে পিড়িয়ে থাকেন আকবর। তারপর সালিমার মুখের পানে তাকিয়ে বলেন—বেশ তাই হবে। এতে আমার কোন আপত্তি নেই।

আকবরের কথা শুনে আনন্দের জোরার বয়ে যায় সালিমার অন্তরে। সে গুলবদনের বৃক মাথা গুঁজে লুকোবার চেষ্টা করে নিজের লজ্জা।

গুলবদন তাকে স্নেহে বৃক জড়িয়ে ধরে তার মাথার বোলাতে থাকেন তাঁর সুকোমল হাত।

চেনা

মাধবী ভট্টাচার্য

পূর্বে সাত ঘোড়ার যথেষ্ট বেদিন ছুটিয়েছিলে,
চাঁদ-মা বুদ্ধিকে চবকা কাটার বেদিন ছুটিয়েছিলে—
সেদিন তোমাকে সঠিক চিনেছি আমার বিধাতা বলেই,
সেদিন তোমাকে সালাম করেছি ভক্তিরসেতে গলেই।
আজকে তোমার সূর্যের রথ জানের পংকে পড়ে
পিড়িয়ে গিয়েছে হৃদয় মতো হাজার বছর ধরে।
চাঁদ-মা বুদ্ধির চবকা হারালো খানা-খোন্দল মাখে,
আধখানা চাঁদ প্রদীপ আলালো পূর্ব-অস্ত সঁাখে।
আজ তুমি আর নরকো আমার অধিনয়র খাতা
সারা দুনিয়ার দেখেছি তোমার কাঁকির আসল পাতা।

বর্তমান পারিবারিক জীবনে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য- নন্দিতা দাশগুপ্তা

আদিম মানব বর্ধন অরণ্যচাষী ছিলো তখন উগ্র আত্মকেন্দ্রিকতাই তাকে একক জীবন বাপন করতে বাধ্য করেছিলো। বার্ষিক আত্মকেন্দ্রিক মাহুব তখন নিজের প্রাচ্যবাহ প্রয়োজনকেই বড় করে দেখে দরকার মতো শিশুসন্তানদেরও আহার্য তালিকাকৃত করে ফেলতো। সত্যতার পথে কয়েক পা হাঁটার পরে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটলো। কোনও বকরে বাঁচতে চাওয়া একা বাঁচতে চাওয়ার প্রচেষ্টার মাঝে সে আর নতুন বৃক্ষ পেলে না। ক্রমশঃ সন্নীর জন্ম বৃদ্ধ করল, প্রেম, ভালোবাসার স্বার্থত্যাগের নতুন মন্ত্রে সাধীকে অভিযুক্ত করে নিলো। দুটি একটি সন্তানের আগমনের সাথে সাথে পারিবারিক চেতনা আরও বিকৃত হয়ে দারিদ্র্যবোধকে সংজ্ঞাকে আরও ব্যাপক করল।

মানব সত্যতার ইতিহাস উন্টালে দেখা যাবে যে আদিম মানব-মানবীর বৃষ্ণ ও সম্মিলিত পথ বতই সত্যতার পথে অগ্রসর হয়েছে ততই তার দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়েছে কৃষ্ণ হতে বৃহৎ ; দারিদ্র্য হতে বহুতে ; ব্যক্তি হতে সমষ্টির পরিধিতে।

বর্তমান জীবনের যে রূপ আমরা প্রতিদায়িত লেখছি তাতে এই প্রায়ই মনে জাগে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সীমা কত দূর আর কখনই বা সমষ্টির জন্ম ব্যক্তির বিলোপ প্রয়োজন সে সামঞ্জস্যবোধ আমাদের আদৌ আছে কিনা। ব্যক্তির সংজ্ঞা কি, তা বোঝবার পূর্বেই এখনকার ছেলেমেয়েরা ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গানে সুখরিত হয়ে ওঠে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মতবিরোধ ঘটলেই স্ত্রী সহক হতে ওঠেন পাছে কোনও সুযোগে স্বামী-দেহতাটি তাঁর স্বাধীনতার হস্তারক হয়ে পড়েন। আবার ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দিতে গেলে তারাও ব্যক্তিস্বাধীনতার খড়গ উঁচিয়ে অভিভাবকদের ত্যাগ করে। বহু আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে সংসারিকতার পাট তো উঠেই গেছে ; কারণ যেখানে বহু মতের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। বর্তমান যুগের মাহুব সর্বদাই সম্বন্ধিত, পাছে সাংসারিক-জীবনের আদান-প্রদানের মাঝে কোথাও আত্মবিলুপ্তি ঘটে, আত্মস্বাতন্ত্র্যের হানি হয়, আত্মস্বার্থ ক্ষয় হয়।

সাংসারিক-জীবনের পরিক্রমা আজ কেবল আত্মপরিক্রমাতাই পর্যাবসিত হয়ে গেছে। নিহত আত্মব্রহ্মা করতে করতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কত অহুদার হয়ে যাচ্ছে সে বিবরণেও সচেতনতার অভাব ঘটেছে। সমষ্টির মঙ্গলেই ব্যক্তির মঙ্গল নিহিত, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। একটি লাঠিতে বৃহৎ জয় হয় না, একখানি ইটের সাহায্যে অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা ব্যর্থতাই পর্যাবসিত হবে।

বিকল্পবাদীরা এই কথাই হয়তো বলবেন যে, পৃথিবীতে এসে সুখ ও স্বাধীনতার আহার যদি প্রাণভরে না ভোগ করা যায়, চিরজীবন যদি পরের জন্ম সব আকাঙ্ক্ষাকে অপূর্ণ রেখে এই পৃথিবী হ'তে বিদায় নিতে হয় তবে পৃথিবীতে আসার সার্থকতা কি ? কিন্তু যে ব্যক্তি জন্ম হতেই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন এবং কারও জন্ম বিশ্বমাত্র স্বার্থত্যাগে অত্যন্ত নন তিনিও কি বাসনা পরিপূর্ণতার চরম পরিভূক্তি হৃদয়ে নিয়ে এ জগৎ থেকে বিদায় নিতে পেরেছেন ? বর্তমান কল-কলহপূর্ণ জীবনযাত্রা দেখলে মনে হয়, পূর্বে যে সহজ

আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত ছিলো, তার বিনিময়ে সে কৃষ্ণকে অতিক্রম করে বৃহত্তর সংগঠন করতে পেরেছিলো কিন্তু এখনকার সংসারযাত্রা দোকানদারীর কৃষ্ণতার রূপ নিয়েছে। এখন প্রথমেই মনে হয় সেনসেনের মাঝে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না—যদি বিনিময় লাভসূচক হয় তবেই আমরা কিছু বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত, নচেৎ নয়।

স্বর্ধবৃত্তি মানুষের মনে চিরকালই ছিলো এক থাকবে। সিংহাসনের লোভে আরম্ভের ভ্রাতৃত্ব। ও পিতৃত্ব। করেছিলেন। সে আজকের কথা নয় কিন্তু সেই হত্যার আয়োজনের মাঝেও তাঁর কিবক হয়তো সমাপ্ত ছিল, তাই দিল্লীর বাদশাহ হয়েও তাঁকে হলের আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। কিন্তু এখনকার দিনে জাগত বিবেকের ভাঙনাও মূল্য হতে বসেছে। স্বর্ধ পিতামাতা বা অক্ষয় ভ্রাতাকে প্রতিপালনের দায় সহজেই বেড়ে ফেলা যায়, হলের আয়োজন হয় না।

অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘণ্টাছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। যে উপার্জনে একজন লোকেরই ভ্রাতৃত্ব চলে না, সেখানে গলগ্রহ প্রতিপালনের প্রস্তুতি ওঠে না। চল্লিশ বৎসর আগেও ভ্রাতৃত্বের বাঁচার যে সূত্র ছিলো ইতিমধ্যে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মধ্যবিত্তের জীবনের আদর্শ ছিলো মোটামুটি পরিষ্কার জামাকাপড় পরে সংকুচিত জীবন বাপন করা। এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বহু অপরিহার্য বিলাস সামগ্রী। ছেলে বা মেয়েকে শিক্ষিত করলেই চমকে না, তাদের উপযুক্ত পোশাক, সাইকেল ও ঘড়িও সরবরাহ করতে হবে। বিদ্যালয়গণের জগদ্বিস সাত্বয়ে প্রতিপালন করলেও তাঁর মতম প্যানপোন্টের নীচে বসে লেখাপড়া করা তাদের আদর্শ

নয়। কাজেই দুঃস্থ তাইপো বা ভারের হান হওয়া চিহ্নিত অতীত।

যদি কোনও সংসারে গহগ্রহ বা বৃহ পিতামাতা বেশ সন্তানের সঙ্গে হান পেয়ে থাকেন, তবে লোকে বিশ্বাসের সঙ্গে বলে থাকেন—এককম ছেলে-বোঁ আজকাল দেখা যায় না। ধীরে ধীরে পেয়েছেন তাঁরাও মনে মনে নিজের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেন। কারণ দাবীর দিন কুবিয়তে এটাই সর্বতোভাবে মনে নেওয়ার দিন এসেছে।

ভ্যাগের আদর্শকে বিসর্জন দেওয়ার কসেই বিশ্বাসের বুলি কানে অর্ধহীন প্রলাপ বলে মনে হয়। যে স্তম্ভ অর্ধ মা-বাপের হৃৎখে কাঁদে না, সে স্তম্ভে বিশ্বাসের ধারণা অস্বাভাব্য চেষ্টা বুঝা। তাই আজ বিশ্বজনীন ভালোবাসার কাঁকা বুলি প্রাদেশিকতার গহগ্রহের তলায় ভুবে যাচ্ছে। প্রদেশের মাঝেও বিভিন্ন ভেলাভেদ গড়ে ফুলে তাকে আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করবার অস্বাভাব্য প্রচেষ্টা চলেছে। তার পরেও আছে দলীয় ও উপদলীয় স্বর্ধবৃত্তি। এই ভাবে বতই দেশটাকে টুকরো টুকরো করে লোককে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা চলছে, ততই মানুষ স্বাভাব্য অঙ্গানে মুখরিত হয়ে উঠে আরও স্বাভাব্য দাবী করে বসছে। কলে বর্তমান জীবনে মানুষ একেবারে অসহায় ও একা। স্বর্ধের গুহার নির্ধারিত মানুষ তাই নিজের স্তম্ভ বেদনার অস্বীকার পায়না—তার অক্ষয় বৃহ্মিরে দিতে হবির মা-বাপের কাঁপা কাঁপা হাত এগিয়ে আসবে না। অবশ্য স্তম্ভকে আমরা একেবারেই প্রাণিত দিই না, কাজেই আমাদের পরবর্তী বংশধরের মধ্যে অক্ষয় অস্তিত্ব আদর্শে থাকবে কিনা, সেও এক বিতর্কের বিষয়। ব্যথা-বেদনার অর্ধহীন প্রলাপ তাদের অক্ষয়বৃত্তিহীন স্তম্ভে কোনও আলোকন আনাবে না বলেই মনে হয়।

বাস্তবতা

শ্রীপদ্মা গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশের গায়ে,
এক দোরাত কালি বেন গিয়েছে ছড়িয়ে।
কিন্তু তার বুক থেকে নামলো যে জল,
ঠাণ্ডা টলটল।
সর্বাস অসাড় করা সেই অক্ষয়বৃত্তি,
উর্ধ্ব মুখে করে পান
তাপনিত ত্বিত প্রকৃতি,
সহসা সঘন মোর গুরু গর্ভসে
ঘেরে আসে কিন্তু বড়
মদমত্ত উচ্চত চরণে।
সে বেন কি প্রলয়ের ইজিত করাল,
ক্রকৃটি জয়াল।
তার তাণ্ডব মৃত্যু পদক্ষেপে,
পৃষ্টি ওঠে কেঁপে,
ছিন্নভিন্ন পৃথিবী বেদনার মুক,
কোন অপরাধে তার
নেচে ওঠে সর্পিলা শান্তির চাবুক।

আকুলি বিকুলি গাহুলো
মার মমতার,
অসহায় ভ্রাতৃত্ব মাটিতে লুটোর।
ফুলের কাছসগুলো,
ছড়িয়ে ছিটিয়ে কোথা ভেসে গেল।
তধু ক্যাপা বড় মত্ত আক্রোশে
দাপাদাপি করে করে বিস্তারিত আকাশে,
স্বাভ হলে অবশেষে,
বিস্মৃত চিত্ত তার শান্ত হয়ে আসে।
আবার হাসে নূর্য, হাসে দিন
আলো ঝলমল।
জেগে ওঠে ব্যস্ত জীবনের
কর্মকোলাহল।
গুণ, বড়ে ভাঙা বাসা পানে চেয়ে,
ভাঙা ডালে বসে থাকে,
ছোট একটা পানী,
নিঃস্ব, একাকী।

বিহুট  লডেন্স

একাত্তি



চুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী

সুস্বাদু স্বাদে এগুনটী আর হয়নি

কাল বিহুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড • কলিকাতা-১০



কান্নার পর

শরিতোষ মুখোপাধ্যায়

বসন্তে যেমন ঝরঝর ঝরঝর পাতা ঝরা, শীতের রাতে যেমন টুপটাপ টুপটাপ শিশিরের কান্না, আজ তেমনি শরতরাণীর হাসি-কুরিষে-বাওয়া পাহাড়-কোলা চোখের অবিরল অশ্রু।

শরতরাণীর আঙিনায় শাদা শিউলির নৈবেদ্য সাজিয়ে কুমকুম-রাজা নূরকে কেউ হেসে অভিনন্দন জানালো না, সোনার রবি ঢেউ-জাপা ধানের মাথার সোনার আঙুর বিছিয়ে দিল না : আজ শুধু কান্না, দুঃখের দিনের কান্না ; কোলের মাণিককে শ্রুশানে নিয়ে যাওয়ার দিনে ঘায়ের বৃকের কান্না।

ন'দিন দশ রাত শুধু কান্না। সমুদ্রের ওপার থেকে ধেয়ে আসা হাওয়ারা বৃকের দীর্ঘনিশ্বাস। এই কান্না এই বৃকের দীর্ঘনিশ্বাসের বৃষ্টি শেষ নেই, শেষ নেই, শেষ নেই।

পৃথিবীর শিঙমহলে কথা-হাসি-নাচ-গানের হাট জেতে গেছে, জীবনের শ্রোত কান্নার শ্রোতের ঘূর্ণিতে একটি বিন্দুতে ধূরপাক থাকে ; নেই আনন্দ, নেই আশা, নেই আলো। আর—

আর বৃষ্টি জেতে বার কুমুমকুমারের বিয়ের উৎসব।

রান্নীমা বিরলে বসে কাঁদেন, বৃকের ওপর দিবে দু কাঁধে যুলিয়ে রাখা জ্বর-পাড় ওড়নাটা ভিজে সপসপ করে, সোনার পালংকে চোখের জল সোনালী চুমকি কোটার। আজকে ছলল কুমুমকুমারের বিয়ের দিন বৃষ্টি আকাশের কান্নায় লগ্ন হারিয়ে গেল।

প্রাসাদের চিলেকোঠায় উঠে রাজা করুণ চোখে আকাশ দেখেন, ছুঃখ-ভরা অশ্রুমতী পৃথিবীকে দেখে তাঁর বৃকের পাজরের ভাঁজ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস ঝোড়ো হাওয়ার মিলিয়ে যায় দিগন্তে। ব্যথা আর ব্যথা—বৃষ্টি এই নিয়েই পৃথিবী।

তবে ? কুমুমকুমারের বিয়ের লগ্ন বয়ে বাবে ?

রান্নীমা বলেন অশ্রুচাপা কণ্ঠে : কী উপায় মহারাজ ? এই প্রলয়ের দিনে কে-ই বা আসতে পারবে আমার বাহাকে আশীর্বাদ করতে ?

বৃষ্টি আমি সব। দিগন্তগরের রাজার মেয়ে—ত্রিভুবনের

অপ্সরা ; আমি কথা দিয়েছি রাজাকে। বৌতপূর্ণিবার দিনে যদি বিয়ে না হয়—

না হয়—উঃ, ভাবতে পারছি না রান্নী।

রান্নীমা কঁকিয়ে ওঠেন।

আমামী বৌতপূর্ণিবার দিনে যদি কুমুমকুমারের সঙ্গে বিগনগরের রাজকুমারী কুলকুমারীর বিয়ে না হয় তো—

কী ?

ত্রিভুবনের অপ্সরা বাবার অপবাধের বলি হবে, কুলকুমারী অনুঢ়া থেকে বাবে পৃথিবীতে। আর তার বিয়ে হবে না কোন দিন।

দিগনগরের রাজাও হাড়বার পাত্র নন। পরাক্রান্ত শক্তি তাঁর। দেবরাজকে হু আঙুলের ভুড়িতে উঁড়িয়ে দিতে পারেন নাকি। এই দুর্দান্ত তেজ আর শক্তিই তো এই বিগনের গোড়া।

ইন্দ্র দূত পাঠিয়েছিলেন।

দিগনগরের রাজা তাঁকে আপ্যায়িত করে রাজসভার বসিয়েছিলেন। দেশের জানী-গনীরা তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিলেন, আর রাজা জিজ্ঞেস করেছিলেন : কোন আর্জি আছে ?

: আজ্ঞে মহারাজ ! দূত মাথা নোয়ালেন। এই নিন দেবরাজের চিঠি। সভাসভা উৎসুক হয়ে উঠলেন। দেবরাজ চিঠি নিয়েছেন মর্ত্যের একজন রাজার কাছে ? সুহৃতে পৃথিবীতে রাষ্ট্র হয়ে গেল : চিঠি—চিঠি, দেবরাজের চিঠি।

কী চিঠি ?

'মহামহিম মহারাজ, আপনার শক্তির কথা আমি অবগত আছি। আপনার কন্যা কুলকুমারীর খ্যাতির কথাও অমরলোককে হুত্ব করেছে। আমি তাঁর পাণিগ্রাহী। আপনার কন্যাকে মর্ত্যের নবকথাম হতে অমরবতীর তীর্থে উত্তীর্ণ করে দিতে আশা করি আপনার বিধা বা সংকোচ হবে না। শুভেচ্ছা রইল। ইতি—'

সভা হল নিস্তরু। এমনভর চিঠি পৃথিবীতে কোন রাজা কবে পেয়েছে ? কেউ কেউ পরামর্শ দিল ; মহারাজ এতো আপনার পৌরুষের কথা।

: হুঁ—মহারাজ বিস্মিত হয়ে মাথা নত করে থাকেন।

: জানি। সুরলোক সবচেয়ে আপনার ধারণা ভাল নয়, ওতে আপনার শ্রদ্ধাও নেই। কিন্তু কি জানেন মহারাজ ! আভিকাল থেকে মহাকবিরা সুরলোকেই বন্দনা গেয়ে এসেছেন।

তবুও উত্তর নেই। হুঁ-হ্যাঁ করে রাজা সত্যর কাজ হুলতবী রেখে রাজপুরীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

দিগনগরের পাশের রাজ্য সিংহপুরীর রাজা কুমুমকুমারের বাবা ত্রিদিব সিংহকে তলব করা হল। হুই রাজ্যের হুই বড়। এঁর বিপদে উনি এসে পাশে দাঁড়ান, তাঁর সম্পদে এঁর ভাগ আছে। ছোটবেলাকার বড়ুবে এতটা গভীর, এতটা স্থায়ী হতে পারে, খাস সুরলোকেও বৃষ্টি তার নজির মেলে না।

ত্রিদিব সিংহ দেবরাজের অল্পগৃহীত। কিন্তু তাই বলে ত্রিদিব সিংহের মুখের সত্য কথাটি কখনো বিকৃত হতে পারেনি।

তিনি বললেন : দেখ হিমালয়নিবাসী, তোমার মত আর্জিও সুরলোকেই সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার বিরোধী। আমাদের পৃথিবীর মেয়ে আমাদের পৃথিবীতেই থাকবে। পৃথিবীটা তো কম সুন্দর নয়। বেশ, তাই হবে। হোক না দেবরাজ ইন্দ্র, তবু প্রতি মানুষেরই

আছে মনের ইচ্ছা, আশ্রয়, আশ্রয়ভেদনা। ইচ্ছার দৃষ্টে পাঠিয়ে দেওয়া হল, 'না' করে চিঠি লেখা হল দেবরাজের ঠিকানায়।

দেবরাজ লিখলেন : ভেবে দেখুন আয়েক বার।

মিগনগরের রাজা লিখলেন : ত্রিকুবনের মাসিক, আপনাকে বলতে বিধা নেই—আমি খুব ভাল করেই ভেবেছি। আমার মেরেকে আমি এই স্তম্ভের পৃথিবীর এই ভয়া সৌন্দর্য থেকে হুঁসে সরতে পারি না। লেজত আমি হুঃখিত।

ইচ্ছা বেগে গেলেন। বুদ্ধের ছবকী দিয়ে কড়া চিঠি লিখলেন : পৃথিবীর সীমান্তে আমি দেবসেনা পাঠিয়েছি। দেখব আপনার দৌড় কতটা।

তবুও বাবড়ালেন না হিমালয়নির্ভর। ত্রিদিব সিংহ ঠাণ্ডা কালেন ইচ্ছাকে। আপনি একজনর ওপর ক্রোধ করে পৃথিবীকে রসাতলে দেবেন না। এটা আর বাই হোক, জানী লোকের কাজ নয়।

দেবরাজ বললেন : কিন্তু দেখুন, ও রাজার এতটা স্পর্ধা হল কেন করে যে ত্রিকুবনের রাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ?

: সে ঠিকই দেবরাজ। এটা অস্তায় হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আপনি ও ভাবে গুকে শাস্তি দিতে যাবেন না। আপনার মত সর্বশক্তিমানী পৃথিবীর রাজার সঙ্গে কী বুদ্ধ করবে গুনি ? তার চেয়ে অস্ত উপায় ভাবুন তো ?

ইচ্ছা ভাবলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি ভাবলেন। এই মেরেটার একটা পথ করতেই হবে। অনেক দিন পর তিনি ত্রিদিব সিংহের কাছে চিঠি পাঠালেন : যত্ববাদ ! আপনার মত একজন বুদ্ধমান বড় পেয়েছি বলেই আজ এত বড় একটা সমস্তার সমাধান সম্ভব হল। আপনার হেলে কুম্ভকুমারের সঙ্গে কুম্ভকুমারীর বিয়ের প্রস্তাব করুন। আমার বিচ্ছেদ মহাদেব পাড়িয়ে হিমালয়-নির্ভরকে অস্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু মহাদেবকে আমি রাজি করিয়েছি, তিনি আমার মত দিয়েছেন। আমার কথা হল, আসছে বৌদ্ধপূর্ণিমার দিনে ওদের বিয়ে না হলে কুম্ভকুমারী অনুচর থেকে যাবে। আমার অবশ্য কুম্ভকুমারীর অস্ত অস্ত ব্যবস্থা করার মতলব ছিল। মহাদেবের অস্তই অনেকটা সহজ হতে হয়েছে আমাকে। কুম্ভকুমারীর পরিচয় আমার খুবই জানা আছে। তাই কুম্ভকুমারের কাছেই গুকে দেওয়া উচিত। ত্রিদিব সিংহ জীবনে এর চেয়ে বৃষ্টি আর আশ্চর্য হন নি। তাঁর বড় বিপদ ঘূচল, অথচ ত্রিকুবনের অস্তরাও তাঁর ঘরে এস। কী সৌভাগ্য !

এই সৌভাগ্যের দিন ফুরিয়ে যায় বৃষ্টি। কোথায় রাজি কোথায় দিন—শরতে বর্ষা নেমেছে। সব একাকার। এখন উপায় ?

ত্রিদিব সিংহ উপায় খুঁজে না পেয়ে বিশেষহারা হলেন।

রাণী ভয়ে কেঁপে ওঠেন, মাথার খুলি ভেদ করে চিন্তার ধোঁয়াগুলো উড়ে যায় আকাশে-বাতাসে। অনেক ভেবে বললেন : কেন এমন বৃষ্টি নামল, এই শরতকালের এ বৃষ্টি বন্ধ করা যায় না ?

রাজা কাঠ হাসি হেসে বলেন : রাণি, পৃথিবীর একজন রাজা একটা সাধারণ মানুষ বৈ ত নয়। নিশ্চয়ই কোন দেবতার কোন মতলব আছে।

হাছাকার ওঠে বাড়ীতে। আকাশছোঁয়া রাজপ্রাসাদের

ইট-কাঠ-কড়ি-ধরা—গোয়া পাখিগুলো—মাছ, সব বৃষ্টি বেঁচে ওঠে। নিরুপায়, নিরুপায়। বাতবিরেতে ভয়র্ষ পোঁচার কাঁপা যেন।

বৌদ্ধপূর্ণিমার আগের দিন। মিগনগরের রাজা এসে ভিক্সে নৌকোর করে এ রাজবাড়ির দরজায় এসে টোকা দিলেন কাক-তোরে। বাড়ীটা সরগরম হয়ে উঠল। হুই বড় মিলেছে। হুই রাজা এক হয়েছে। এবার নিশ্চয়ই একটা বিহিত হবে।

হিমালয়নির্ভর বললেন : কেন অস্ত ভাবছ বড় ! আমরা হুই রাজা। এ বৃষ্টি তো দেবতারের হুকুম। আমরা হুকুমের বুবব।

: চলো।

: আমাদের বতটুকু শক্তি আছে ততটুকুই আত্মা চালব এর পেছনে। রাজপ্রাসাদে এবং কাছাকাছি সরকারদের কাছে বস্ত ইম্পাত আছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যোগাড় করতে যলো। তোমার ছাদে সামিয়ানা খাটাও। হুঁহাজার লোকের উৎসব ওখানেই হতে পারবে।

অসম্ভব কাজ ! রাজারা বললেন : তবু সম্ভব করতে হবে। একটা মেরের জীবন ওভাবে নষ্ট করা চলবে না। দেবতারের চকান্ত বার্থ করতেই হবে।

কুম্ভকুমারকে পাঠানো হল মিগনগরে। আর কুম্ভকুমারীকে এনে রাখা হল সিংহপুরীতে। মিগনগরের রাজপ্রাসাদ ছোট, বর্ষা ওখানেই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। ও বাড়ীতে এতবড় একটা উৎসব হতে পারে না।

এদিকে সামিয়ানা খাটানো আর আর সব যোগাড়স্বয়ং সব চলতে লাগল প্রকৃতির ঝামেঝামানীপনাকে উপহাস করে।

রাণীমা তবুও ভাবেন। এতবড় অসম্ভব কাজ কী করে করা সম্ভব করবে ? তাছাড়া যদি দেবতারেরই কোন বড়বড় থেকে থাকে তো এত সব পরিষ্কারের মানে কি ? তাঁর চোখের পাতা তুকের না। চোখ ছুটো আকাশের মেঘের মতই কোলা।

ছিলকোঠার জানলার পাড়িয়ে তিনি বৃকের নিঃশ্বাস পাঠাতে থাকেন দেবতার দরবারে—তোমরা প্রসন্ন হও ঠাকুর।

কেউ প্রসন্ন হয় না। বর্ষা বে-কে সেই পড়তে লাগল। কমকম বিম্বিম বিম্বিমবির বর্ষা।

রাজপ্রাসাদের পাঁচিলটা পেরিয়ে এ সময় তাঁর নজর পৌঁছে গেল। একটা মেরে—অপরূপ স্তম্ভরী—কুম্ভকুমারের মতই বয়সে হবে—একবার এদিকে আসছে, হুঁসে আবার ওদিকে যাচ্ছে। আভকের আকাশটার মতই ওর চোখে কাঁপা। মেরেটা কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কাঁদে আর ধর ধর করে কাঁপতে কাঁপতে তাকায় ছিল কোঠার দিকে।

রাণীমার বৃকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। ঐ হুঃখিনী মেরেটার অস্ত এই বুদ্ধের বৃষ্টি তাঁর পাগল হয়ে যাওয়ার কথা।

রাণীমা হুকুম করলেন খারীকে : বাও, একুণ নিয়ে এস গুকে আমার কাছে। আমি জানতে চাই ও কেন কাঁদছে।

খারী ছুটে গেল হুকুম ডালিম করতে। কিন্তু মেরেকে কি জানা যায় ? কী তার শক্তি অস্তটুকু শরীরে। একবড় জোরাল মে খারীটা সেও হুঃখি কয়ে কয়ে গুল।

: কী রে, কী বললাম তোকে ?

: ও আসবে না মায়জী। বলে কি, আমি যাবো না ওই বাড়িতে।

: সে কী। ঘরে নিয়ে আস।

: ধরলে কি হবে মায়জী। আমি পারছি না।

রাণীমা ওর হাত ধরে আকৃতি করে বললেন : ভাখ, এই বুড়িতে ভিজছে। কী বেন হুঃখ ওর, ওকে নিয়ে আস আমার কাছে। ওকে কোলে করে নিয়ে আস। যা।

হারী জোর করে কাঁধে চাপিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে এল চিলে কোঠার।

রাণীমা ওর চোখের জল মুছিয়ে কোলে তুলে নিলেন। মেঘমালা ওর নাম। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কারার ওর বিরতি নেই। বলে, আমাকে খেতে দাও। এ বাড়িতে আমার আনলে কেন? রাণীমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে বলেন : কেন কাঁদছ মা ?

তা ও বলবে না।

অনেক সাধ্যসাধনার পর বললে : আমার ভাইটার কাল বিয়ে কি না তাই কাঁদছি।

রাণী ধমকে ওঠেন। হেসে বলেন : ভালই ত! বিয়েতে কত আনন্দ। তা তোমার চোখের জল যে পড়ছেই ?

হ্যাঁ, ওর চোখের জল পড়তে থাকবে। ও খামাবে না ওর কারা। ওর ভাইটার বিয়ে যদি না মূলতবী রাখা হয় তো ওর কারাও খামবে না।

: তুমি বুড়িতে ভিজছিলে যে, পাগলী মেয়ে ?

: এমনি। কারার মতই শোনাল কথাটা।

: তোমাদের বাড়ী কোথায় ? একলাটি বেরিয়েছ এই জলে ?

মেয়েটির মুখে বিছাৎ খেলে গেল। তবু গোপন করল না ও কিছু। বলল : আমার বাবা মেঘবুড়ির রাজা। আমি চলে এসেছি, বাবাই আমাকে আসতে বলেছে।

রাণীমার গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। মেঘবুড়ির রাজা ? বক্রণের কত্তা মেঘমালা এমনি করে কাঁদছে পথে পথে ? কেন ?

কেন আবার কি ?

মেঘমালার হুঃখ তো কম নয়। তার ভাইটা বাবো বছর আগে মাঘীপূর্ণিমার দিনে পৃথিবীর ঘরে এসেছে। সেই ভাইটার গাল বৌদ্বপূর্ণিমার দিনে বিয়ে। হোক না বৌদ্বপূর্ণিমা। তবু তার ভাইয়ের জীবনটা একটা রাক্ষসী গিলতে চলেছে। সে হবে র বউ। বউ তো নয়। ত্রিভুবন জানে খুব ভাল মেয়ে—কিন্তু ও ভালোর আড়ালে ও রাক্ষসী। মায়াবিনী। হায় হায়।

মেঘমালার কারা আরো ছেয়ে এল হুঁচোখ। আর রাণীমা ? কীমার বুকটা ধকধক করে উঠতে পড়তে লাগল। তাঁর ছেলেটা বৌপূর্ণিমার দিনে তাঁর ঘরে এসেছিল বাবো বছর আগে, কাল বৌপূর্ণিমার দিনে তার বিয়ে। ফুলকুমারী ত্রিভুবনের অঙ্গরা, র সুরুর মেহের আড়ালে—

ভয়ে হুঁচোখের পাতা উল্টে তিনি চীৎকার করে উঠলেন।

এল রাজপ্রাসাদে। রাজা ছুটে এলেন।

ফুরো রাণী। তুমি এতটা দুর্বল হয়ে পড়ো না। সব ঠাকুরের চক্রান্ত। মেয়েটা একটা মায়াবিনী। ফুলকুমারীর জীবনটা নষ্ট করতে চায়।

এই বলে কারুর কোন কথাই অপেক্ষা না করেই হারীকে দিয়ে মেয়েটাকে বিদায় করে দিলেন কটকের বাইরে। মেয়েটা সেই যে কাঁদছিল, তার চোখের ধারা আর খামে মি। যাবার সময় যন্ত্রণার ছটকট করে মেঘমালা বলে গেল : আমি কাঁদব। আমার ভাইটা মরতে চলেছে, আমি কাঁদব।

রাণী মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। ডাক্তার-বডি তাকিয়ে ভাক মুহু করা হল।

বৌদ্বপূর্ণিমা।

তেমনি বমবম কিমকিম রিমকিমকিম বৃষ্টি। তেমনি বৌদ্বপূর্ণিমা আকাশে বাতাসে।

কুমুমকুমার আর ফুলকুমারীর বিয়ে হয়ে গেল। অতিথি-সংজন খুব বেশী এল না। নেহাৎ গরীবানা মতে দুই রাজার দুই যুকের নিধির বিয়ের উৎসব শেষ হল। শেষ হল কারাকারি পালা : বিয়েটা তো শেষ হয়ে গেছে। আর—

আর কি ?

আকাশের কারা খেমেছে। শরতরাণীর মুখে হাসি ফুটেছে। উপায় না দেখে যেমন চিরজুঃখী ভাবে—আর কাঁদি কেন, অনেকটা বেন সেই বকম। নিরুপায় হয়ে বেন হাসল শরতরাণী।

তারপর দিন যায়, মাস যায়। ত্রিভুবনের অঙ্গরা হাসি গানে মুগ্ধ হয়ে ওঠে। তবু—

মেঘমালার কথাগুলি বেন কানের পর্দায় বেজে ওঠে সব সময়। মন কিছুতেই মানে না। আর দু বছর বাদে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল।

রাজা ত্রিদিব সিংহ এতটা অপদস্থ জীবনে আর হননি। কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। একটা ঘটনা ঘটছে আর তিনি ধী করে তাকিয়ে থাকেন, ভাবেন কি ঘটল, কেন ঘটল ? কিছুই কিনারা পান না।

কুমুমকুমারের আর একটি ফুটফুটে বোন হয়েছিল। ত্রিদিব সিংহের ঘরে এই একমাত্র মেয়ে। কি সুরুর, কি টুকটুকে তার মুখখানা। দেখতে ত্রিভুবনের অঙ্গরাকে হার মানার। বড় হলে এ মেয়ে—

হায় ঠাকুর, বড় তুমি হতে দিলে কই ?

রাণীমা বলেন, তুমি ঠাকুরকে দোষ দিও না রাজা। সেই মেয়েটি, সেই মেঘমালার কথা তুলতে পারিনি আমি। তোমার ঘরেই আছে সব খাওয়ার রাক্ষসী। সে তোমার ছেলের বউ।

রাজা ভয়ে পিছে সরে যান। সেদিন আর সত্যের খাওয়ার শক্তি থাকে না তাঁর। জীবনীশক্তি কে বেন নিড়ে চূবে খায়। কি ব্যাপার ?

অম্মের ছ'দিনের দিন দুপুরবেলা ঘরে ঢুকে রাণী দেখেন কচি মেয়েটার মাথার খুলিটা পড়ে আছে মেঘের। রাজা ভাকেন ঠাকুরকে। রাণী বলেন, সঙ্কোনাশা তুমি ঘরে পুবেছ। জান না।

এমনি করে সব যায়। জীবনের ধুকধুকানীটুকু খেমে আসে।

সেই যে সিং দরোজায় পাহারা দেবে। দাসদাসী,

চাকর-বাকরদের মাথায় খুলি, কোমরের হাড়, পায়ের পোড়ালি হুকিয়ে থাকে ঘরে ঘরে। সারা রাজবাড়ীটা একটা ভুতের মত থমথমে হয়ে মুখ গোমড়া করে চোখে বিষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিমোর, ভিজে বেবালের মত।

ত্রিদিব সিংহের অত বড় দেহটা ভাবনায় এতটুকু হয়ে গেছে চূপসে। কুসুমকুমার গুঁকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, চোখের কোলে কালি জমেছে। অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে সে পায়নি ফুলকুমারীকে, কোথায় বেন অব্যক্ত হয়ে যায়। ভয়ে এতটুকু হয়ে যায় কুসুমকুমার। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মায়ের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকে মায়ের বুকে লেগে।

বাড়ীতে চারটি প্রাণী বেঁচে। রাজা, রাণী, কুসুমকুমার আর ত্রিভুবনের অঙ্গরা ফুলকুমারী। আর আছে একটা থমথমে বিভীষিকা।

হিমালয়নির্করকে ডাকিয়ে পরামর্শ ভিক্ষা করেন ত্রিদিব সিংহ। দ্বিপদগরের রাজা বলেন : বন্ধু, তুমি অশ্রমেণ বন্ধ কর। না জানি শত-সহস্র বছর ঘরে তোমার বংশে কি পাপ জমা আছে।

ত্রিদিব সিংহ আরো বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

এমনি সময় একদিন হুপুর রাত্রে তিনি কারা গুনতে পেলেন। শিকারীর বন্দুকের মুখে ভয়াবহ হরিণীর মত কারা। তিনি কান পাড়লেন। আঁা, এ যে কুসুমকুমারের ঘর থেকে আসছে এ কারার শব্দ। তিনি উঠে বসলেন। গুনতে পেলেন মারামারি ধ্বংসাত্মক শব্দ। রাণীকে ডাকলেন। চটপট উঠে পড়লেন। তলোয়ারের খাপটা কোমরে গুঁজে ভাতে বন্দুকটা নিয়ে তিনি নিজেই গেলেন ছুটে, আর রাণী ভয়ে হুগুগে রাগে কেঁদে ফেললেন। রাজা ছুটে গিয়ে ডাঙলেন কুসুমকুমারের ঘরের দরজা। খুলে দেখলেন—

রাণীমা অস্থির হয়ে শুয়ে পড়লেন। মাথায় বিষ ঘরে এল। আর রাজা হুহুত খামলেন। কুসুমকুমারের বুকে চেপে বসেছে রাঙ্গসীটা। কুসুমকুমার পা দিয়ে ওকে লাথি মারছে। উঠতে চেষ্টা করছে, পারছে না। রাজা সব বুঝলেন এবার। আর এক হুহুত দেবী করলে ছেলেকে বাঁচানো যাবে না। তিনি ছুটে গিয়ে কাঁপিয়ে পড়লেন ফুলকুমারীর ওপর। গুলী ছুঁড়লেন তার মাথায়। তারপর খাপ থেকে বকবকে তলোয়ার খুলে ওর হুগুটা আলাদা করে ফেললেন স্তম্ভর দেহ থেকে।

কুসুমকুমার উঠে এসে ভয়ে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরল। রাজা সাধনা দিয়ে নিজের ঘরে পালংকে শুইয়ে দিলেন। বিষের পর ছেলেটার জীবন কাঁকরা হয়ে গেছে। মারাই তো বেত।

রাণীমা কাঁপিয়ে উঠে বললেন : কতবার বলেছি, মেঘমালায় কথা তো শোননি। আমার ছেলেটাকে তুমি এমন বিপদে ফেলেছ, এমনি করে ও শেষ হতে চলেছিল।

রাজা মাথা নীচু করে থাকেন।

সেই রাত্রেই আবার ঘটল একটা আশ্চর্য ঘটনা। আলো নিবিয়ে বাড়িটা যখন ঘুমের বোগাড় করছিল, ঠিক সেই সময় রাজার ঘরটা হঠাৎ আলোর আলো হয়ে উঠল। বক বক করে হুঁচোখ বাঁধিয়ে এক পুরুষ এসে দাঁড়ালেন রাজার পাশে। রাজা উঠে বসলেন। প্রথমে অস্বাভাবিক হলো ও তার পেলেও শেষকালে বললেন : বহন। দেবরাজ ইন্দ্র।

: আজ থেকে আপনি সুখী।

: কিন্তু দেবরাজ, এতটা খেলা খেললেন আপনি ?

দেবরাজ হেসে বললেন : দরকার ছিল বন্ধু। ফুলকুমারীকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম কেন জানেন না ? আমি বলেছি, ফুলকুমারীকে আমি চিনি। পৃথিবীতে ও অনাজ্ঞ বাড়াক তা আমি চাইনি ; সুরলোকের নিয়ম নির্বাহাটে ওকে কার্যনা করব, এই ছিল মতলব। আজ মহাদেবকে সব আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। মেঘমালায় রাজা বন্ধনের কথা মেঘমালাকে তো আমিই পাঠিয়েছিলাম, তুমি মনিলে না কিছু।

রাজা বললেন : দেবরাজ, আপনি সেদিনই কেন আমাকে শান্তি দিলেন না ?

: না, না। আপনার বিশ্বাস ছিল যে ফুলকুমারীর ওপর। ভাল করে বোঝাবার জন্যই—

রাণীমা কেঁদে উঠে বললেন : দেবরাজ, আমার বুকের বাঁচাটা খেয়েছে ওই রাঙ্গসী। কত ঘ্যানঘ্যারণার পর ও এসেছিল আমার ঘরে।—বলে রাণী লুটিয়ে পড়লেন। কাঁদতে লাগলেন।

ইন্দ্র হেসে উঠলেন। বললেন : সব আমার জানা আছে। সে কে ? সেই যে মেঘটাকে ওই ত্রিভুবনের অঙ্গরা চূবে খেয়েছে ? সে ওই—

: কে, কে মহারাজ ?—রাজা আর রাণী আকৃতি জানিয়ে ওঁর পারে পড়লেন। সেই অপরূপ রূপসী মেঘটাকে—যে নাকি বন্ধ হলে অঙ্গরাকে হার মানাত—তার কথাটি জানবার জন্য।

দেবরাজ শান্ত স্তম্ভর হেসে বললেন : সে ওই মেঘমালা।

: মেঘমালা ? চমকে উঠলেন রাজা-রাণী। দুজনে দুজনের চোখের মণি দেখেন। এ দেখেন ওঁরটা, ও দেখেন এঁরটা। কাঁকর মুখে কথা নেই।

: ভয় নেই, তাকে ফিরে পাবেন। আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম এই জন্তে যে, ঐ ঘটনার হৃৎ চেতনা আসতে পারে আপনাদের। ফুলকুমারীর এ-হেন ব্যবস্থা করার জন্যই আমি তা করেছিলাম। আজই তা সফল হল।

ওঁরা দেবরাজের পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন।

তিনি আবার বললেন : ওরা দুজন পৃথিবীর পাপের বোঝা ছুঁ করবে।

রাজা-রাণীর চোখের কোলে জল টলমলিয়ে উঠল। ওঁরা হাঁসি।

আর তার পবের বছর মাঘীপূর্ণিমার দিনে রাজার ঘরে আরেকটি মেয়ে এল। কুসুমকুমারের বোন। তার নাম রাধা হল মেঘমালা।

শিলাইদহের কুঠিবাড়ি

বিজনকুমার ঘোষ

শিলাইদহের কথা মনে হলেই আমার সর্বাঙ্গে কুঠিবাড়ির কথা মনে হয়। বহিঃ শিলাইদহ বলতে শুধু মাত্র কুঠিবাড়িকেই বোঝায় না, বোঝায় আরো অনেক কিছু, যেমন বিরাহিমপুর পরগণার সদর, এর কাছাকাছি বাড়ি, পথঘাট, ডাকঘর, বানফেডের ওপর নীল আকাশ, পদ্মাসরীর বাতাস—সবু, শিলাইদহ বলতে চোখের ওপর

কুঠিবাড়ির হবিই ভাসতে থাকে। কেননা, এক কুঠিবাড়ির ভিতরেই সমস্ত শিলাইদহ পোরা রয়েছে। তাই শিলাইদহ দেখতে আর কোথাও যেতে হয় না। এ ছাড়া আরো অনেক কিছু মনে হয়। একদিন এই বাড়িতেই বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য মনীষীর জন্ম-স্মরণ শোনা যেত। এই ভো সেনদিনের কথা, চুগুরবেলার কুঠিবাড়ির ভেতলার নির্জন ঘরখানা ভরে পদশব্দ উঠত তখন তখন সেই আশ্চর্য মনীষীর। জ্যোৎস্না রাতে দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত বারান্দার দোলান ইজিচেয়ারে এসে বসতেন। ঝড় উঠলে চলে যেতেন উৎসবের ছাদে। পদ্মা তখন এক লক্ষ্মীছাড়া মেয়ের রূপ ধরেছে। পাঁচচারী করতেন তিনি গুন গুন করে। মাতালের মত ঠাণ্ডা বাতাস এসে তার চুল-বাড়ির জ্বল তোলপাড় করত। খুব ভোরে, পাখিদেরও তখন ঘুম ভাঙেনি, তিনি বেয়িনে পড়তেন কুঠিবাড়ির সম্মুখে শিববনের ভিতর। সবুজ ধানক্ষেত ফুঁড়ে আগুনের মত পূর্ব উঠত। অথবা এক সময় সব কিছু ছেড়ে মাসের পর মাস পদ্মার ঢেউএ ঢেউএ ভেসে যেতেন। আর কিছু মনে থাকত না তখন। শুধু বাতাসে কাউ পাটার শব্দের মত একটানা অচিন রাগিনী গুমরে উঠত তাঁর মনে।

শিলাইদহ কিন্তু খুবই ছোট জায়গা। লম্বায় আধ মাইলের কিছু বেশী হবে বোধ হয়। কুঠিবাড়ি থেকে মহর্ষি চেম্বার-টেল ভিসপেনসারী হয়ে কাছারি ও ডাকঘর পর্যন্ত রাস্তাটাই হল শিলাইদহ। শিলাইদহ বলে কোন বিশেষ গ্রাম নেই। রাস্তার এপাশে ওপাশে আরো অনেক গ্রাম আছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও প্রচুর লোকসংখ্যা। কিন্তু শিলাইদহ বলতে বোঝায় কুঠিবাড়ি, ডাকঘর, কাছারি, আর কয়েকটি মাত্র সরকারী কোয়ার্টার।

বর্তমান কুঠিবাড়ি কিন্তু খুব বেশী পুরোনো নয়। আগে এখানে কুঠিরাল সাহেবদের আড্ডানা ছিল। কুঠিবাড়ির চার পাশে তখন প্রচুর নীলের চাষ হত। কুঠিরাল শেলী সাহেব এখানেই তার কুঠি বানিয়েছিলেন। পরে তাঁর নামানুসারেই জায়গাটার নাম হয় শিলাইদহ। আমাদের ছেলেবেলার শেলী সাহেবের কবর দেখতে যেতুম পদ্মার পারে। এখন তার চিহ্নও নেই। বহু দিন আগেই অত্যাচারী সাহেবের কবর পদ্মার অভল গছেরে পৌঁছে গেছে।

শিলাইদহ জমিদারী রাগী ভবানীর হাত থেকে প্রিন্স হারকানাথ ঠাকুরের হাতে আসে বাংলা ১২০৭ সালে। সাহেবদের কুঠি তখন সাময়িক ভাবে সদর কাছাড়িতে পরিণত হয়। কিন্তু বর্তমান বাড়িটি তৈরী হয় আরো অনেক পরে রবীন্দ্রনাথের আমলে। প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি নিয়ে কুঠিবাড়ি অবস্থিত। চারপাশে পাঁখি-ডাকা আম-জামের গহীন বন। উত্তরে ধীর প্রবাহিনী পদ্মা। রঙীন পালের নৌকো নিয়ে গোরালদের পথে চুটে চলেছে। আর বাকী তিন দিকেই, বহু দূর চোখ যায় সীমাহীন সবুজ সবুজ আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কুঠিবাড়ির গেটের দু'পাশে বিশাল শিত গাছ আর বাবলা গাছের সারি। আগে এখানে সামান্য একটু জঙ্গল ছিল। বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ একদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এই জঙ্গলে বাঘ শিকারে এসেছিলেন। কুঠিবাড়ির উত্তরে ও পশ্চিমে ছোটো বড় বড় পুকুর আছে। বাঁধাঘো ঘাটের পাশে আকাশছোঁয়া বকুল গাছ। একদম সাহেবের আবার মাহু ধরার সখ ছিল। মাঝে মাঝে হুঁইল কেঁল ফলতেন। সারা দিন মাহেরা ধরঘট করে থাকলেও

পাশে বসে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ দিতেন। কুঠিবাড়ির পূর্ব ও উত্তর দিক ঘিরে রয়েছে বিশাল বাগান। আম-জাম থেকে আরম্ভ করে বাংলা দেশে ছেন ফলের গাছ নেই বা কুঠিবাড়িতে নেই। সেই সঙ্গে শাল-সেতুন আর্জুন-কাউ-এর ফুলের সমাবেশ। সারাদিন পদ্মা থেকে উড়ে আসা বাতাস আছড়ে পড়তে শিববনে, কাউ-এর পাটার আর কি বকম বেন কুঠিবাড়ি ঘিরে উত্থাস করা পুর উঠত সারারাত। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলে তিন হাজার ঘরখানা তাঁর জন্মে নির্মিত হত। কেন না, সারা পৃথিবী তার অসম্ভব রূপসম্ভার নিয়ে এই ঘরের জানালায় ঝাঁকে পড়ত। আকাশ-বাতাস, পদ্মানদী আর শিববনের মর্মর ধ্বনি তাকে নিমেষের ভিতর ভাববাহ্যে নিয়ে যেত।

শিলাইদহে আমি শেষ বার যাই ১৯৫২ সালে। তখন পর্বত কুঠিবাড়ির অবস্থা ভালই ছিল। বহু দিন পর দরজা-জানালার রং করা হয়েছে, কুঠিবাড়িতে নতুন চুগকাম পড়েছে, যে সব জায়গা ভেঙ্গে গিয়েছিল অথবা আছড়র খসে পড়েছিল, তা সারানো হয়েছে। কিন্তু ওই বছরেই পাকিস্তান গভর্নমেন্ট এক নতুন আইন বলে পূর্ববঙ্গের সমস্তেরাটি বড় হিন্দু জমিদারী মঞ্চল করে নেন। তার ভিতর শিলাইদহ এষ্টেট একটি। তখন জমিদারীর সঙ্গে কুঠিবাড়িও চলে যায় সরকারের হাতে। কিন্তু জমিদার যিরিয়ে নেন এই বুদ্ধি বলে যে ওটি নিজস্ব বাসভবন মারে, জমিদারীর অন্তর্গত নয়। সুতরাং সরকার তা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। জমিদার তখন কুঠিবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্থানীয় এমন একজন লোকের হাতে দেন যে তার ছিল কাঠের ব্যবসা, সুতরাং সে এক মাসের ভিতরেই কুঠিবাড়ির সৌন্দর্যের আঁকর বিশাল শিববন নির্মূল করে এ ব্যাপারের তার বোগ্যতা প্রমাণ করে। এখানেই সে কাছ থাকেনি। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত চেম্বার-টেল-কাউ-সোকা-কৌচ ইত্যাদি সমস্ত আসবাবপত্র নীলামে বিক্রী করে। এমন কি একবার শেষ বর্ণাঙ্কনের আশায় কুঠিবাড়ি ভেঙ্গে কেঁলবার চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে প্রায়ের হিন্দু-মুসলমানের সখিৎ কিছুটা কিয়ে আসায় সে বিকলমনোরথ হয়। বাক, এর কলে একটা উপকার হয় যে কুঠিবাড়ি তখন পাক ভারত উপ মহাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্লামেন্টে নবাব সিং চৌহানের প্রোঞ্জর উত্তরে জহরলাল বলেন, এ ব্যাপারে ভারত একক ভাবে কিছু করতে অক্ষম, পাকিস্তানের সহযোগিতা করতে পারে মাত্র। এর কিছুদিন পর ঢাকাই ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার কুঠিবাড়ি পরিদর্শনে আসেন। পূর্বপাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী আতাউর রহমান বিশেষ আইন বলে কুঠিবাড়ির ভার পুনরায় সরকারের হাতে তুলে দেন এবং চম্বিশ ঘণ্টার জন্মে দু'জন পুলিশ পাহারা বসান তিনি আরো খোঁষণা করেন যে কুঠিবাড়ি রবীন্দ্র মিউজিয়মে পরিণত করা হবে। এর জন্মে যে সমস্ত আসবাবপত্র বিক্রী হয়ে গিয়েছিল তা পুলিশের সাহায্যে ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি নিজেও এ ব্যাপারেও ক'বার শিলাইদহে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের অনেক মানুষ সমাজের মত এই ইচ্ছাটিও হাওয়ার হারিয়ে যায়। কেননা, আর্চবিতে মিলিটারী শাসনের আবির্ভাবে তাঁর মন্ত্রিসভার পতন হয়; সেই থেকে একই অবস্থা চলছে। কুঠিবাড়ি বেন জনমানবহীন দীপ, সত্য অঙ্গকতর বাইরে। পঁচিশ বৈশাখে দিকে দিকে এক বে

কলকর্তা-আনন্দ-উজ্জ্বল, কুঠি-বাড়ি নিভর। সারা দিন সারা রাত
জুঁ জুঁ পোকাকার শব্দ, পাখিদের গুঞ্জন আর হাওয়ার মর্মর ধ্বনি।
সারের মাঝে দরজা-জানালায় বুককাটা খট-খট শব্দ।

পৃথিবীর প্রথম নাট্যকার

শ্রীবারীজনাথ চক্রবর্তী

পৃথিবীর প্রথম নাটক গ্রীসের একেজল সহরে খৃষ্টপূর্ব ৪১০ অব্দে
অভিনীত হয়। নাট্যকারের নাম এইছাইলাস। খৃষ্টপূর্ব ৫২৫
অব্দে নাট্যকারের জন্ম হয়। তাঁর লিখিত নক্সাইখানা নাটকের
মধ্যে সাত সাতখানি পাওয়া গেছে। কিন্তু নাটক ক'খানিতে যে
অপূর্ণ শিল্পচাতুর্য দেখা গেছে তা কালের গতিকে অস্বীকার করে
আজও অমান। প্রথম অভিনীত নাটকখানির নাম হচ্ছে 'অহুগুগণ'
বা (Suppliants)।

গ্রীসে তখন বাৎসরিক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।
এইছাইলাস বহু বার প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখন
নাট্যকারদের নাটক লিখেই মুক্তি ছিল না, একাধারে পরিচালক,
সঙ্গীত-শিল্পক, মঞ্চসজ্জাকর প্রভৃতি হতে হত। অভিনয়ের শেষে
নাট্যকারকে দর্শকদের সামনে এসে তাদের অভিবাদন করার ছিল
রীতি। সে সময় জনসাধারণ সাধুবার দিয়ে অথবা পচা তরকারি
ছুঁড়ে নিজের মতামত ঘোষণা করতেন। এই সময়ে নাটকে
কোন মৃৎসজ্জা ছিল না। পেছনে একটি এককটা পরদা টাঙানো
থাকতো। কথা বলবার নিয়ম ছিল দুজনায়। কোন ভূতীয় ব্যক্তি
উপস্থিত থাকলে তাকে চুপ করে থাকতে হতো।

এইছাইলাস খৃষ্টপূর্ব ৪৫৬ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

পুরস্কার

শ্রীবিকাশ ভানু

বিশ্বাস করো, ছোট ছেলে হ'লে কি হবে, ঠিক বেন হীরের
টুকরো। আপন মনে গান করে, আর খুশীর ভাবে কবিতা
লেখো। হ্যা, এতটুকু বাচ্চা তা কি, ও কবিতাও লিখতে পারে, আর
এতো সুন্দর গান গায় সে—যে শুনেলে সকাই অস্বাক হ'য়ে যায়।

সেদিন বেন কি দিন ছিল, বাবার হঠাৎ কানে গেল কে বেন
খুব দ্রুত পলায় গান গাইছে, ওর শুনেতে না বজড ইচ্ছে হ'ল।
তা ছাড়া, রাজারাজড়ার ব্যাপার তো, ইচ্ছে হ'লে তো আর ইচ্ছে
তপে রাখা যায় না, তাই হুকুম হ'ল তাকে ওর কাছে ডেকে
আনার।

এসেই গানের কথা শুনে তো ওর কর্মী টুকটুকে মুখখানা
একেবারে রাঙা সোহুজি হ'য়ে উঠলো। বেচারি একেবারে বেন
হাতির সঙ্গে মিলে যেতে লাগলো। কিন্তু বাবার হুকুম, ওকে ওর
কাছে গান গাইতেই হবে।

কি আর করে, গান শেষ পর্যন্ত একটা ধরলে, 'নরনে তোমারে
পাইলে দেখিতে, রয়েছ নরনে নরনে, জন্ম তোমারে পায় না জানিতে
স্বপ্নে রয়েছ সোপনে।' আঃ, কি সুন্দর ভাষা, আর গানের
গলাটাও কি অপূর্ণ, ঠিক বেন সত ডেকে আনা তাজা মৌচাক। যু
বেন টুকটুকু করে ওর মুখ দিয়ে ধরছে।

বাবা ওর নিজের লেখা গান নিজের বেঁটা ছুর শুনে ওকে বুকে
জড়িয়ে ধরলেন, ওর বাঁধ' মুখে চুপু খেলেন অনেকগুলো। লজ্জার
ও আরো জড়সড় হ'য়ে পড়লো। বাবা মৌড়ে ঘরে গিয়ে একটা
চেক এনে পাঁচশ' টাকা লিখে দিয়ে বললেন, 'আগের দিনে নবাব-
বাদশারা কবিকে পুরস্কার দিতেন, কিন্তু এখন তো আর ওরা নেই,
তাই কবির আদর কে করবে? তোমাকে আমি এই পুরস্কার
দিলাম, কেমন?'

বাবার হাতের পুরস্কার নিয়ে ছোট্ট খোকার সে কি আনন্দ।
বাড়ীর কাকে যে ডেকে ও এই কথা জানাবে তা ভেবেই পার না,
চাকর-বাকররাই বেন ওর আপন, তাদের ঘরে গিয়েই ও ওর
পুরস্কারের কথা বলে বেড়ায়। তারাও ওকে কোলে ক'রে খেই-খেই
নাচে। বেচারি গায়ক কবি হাঁপিয়ে ওঠে ওদের আদরেতে।
চাকররাও কি কম ভালোবাসে নাকি ওকে। বিধেস হয় না, না?
হ্যা-হ্যা ওকে সবাই ভালোবাসে, মায় পৃথিবীর সকাই। উনি যে
যদি ঠাকুর।

শুবরে পোকাকার জন্মকথা

(একটি গারো রূপকথা)

অনিলকুমার সমাজদার

সূর্যের প্রথম প্রভাতে দেবতা উপদেবতা আর মানুষ পরস্পরে
করতো নানা কাজে সাহায্য। দেবতারাইও নানা কাজে
পোকা-মাকড়দের কাছে সাহায্য চাইতো। একবার বামনদের দেবতা
যর তৈরী করবার জন্ত জোনাকী পোকা আর শুবরে পোকাকার সাহায্য
চাইলো। সে সময় জোনাকী পোকা বেথতে ছিলো সবচেয়ে কুৎসিত।
তার শরীরে এমন আলোর রোশনাই ছিলো না। শুবরে পোকা
কিন্তু ছিলো খুবই সুন্দর। প্রজাপতির চাইতেও বেশী সুন্দর ছিলো
তার পাখা।

বামনদের দেবতার যর তৈরী হতে সজ্যা হয়ে গেলো। বামনদের
দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে শুবরে আর জোনাকী পোকাকে বেশ করে বাইরে
দিলেন। পেট ঠেসে খেয়ে বাড়ী ফিরবার সময় বেশী রাত হয়ে গেলো।
সে রাতটা ছিলো খুবই অন্ধকার, খুবই দুর্ভোগপূর্ণ। যোর আঁধারে
পৃথিবীটা তলিয়ে গিয়েছিলো।

বামনদের দেবতা বিদায় দেবার সময় ওদের বললেন, বাবার সময়
ওরা বেন আলো নিয়ে বাড়ী যায়। জোনাকী পোকা বাড়ীর ভিতর
থেকে একটা আলো নিয়ে পথে নামলো। আর শুবরে পোকা
পর্ষিত ভাবে বামনদের দেবতাকে বললো—আমার বাতির দরকার
হবে না প্রভু, আমার গারে যে আলো আছে তাতেই পথ দেখে
চলতে পারবো।

হু'জনেই পথে চলছে। খানিক দূর এসে জোনাকী পোকা তার
বাড়ীর দিকের রাস্তায় চললো আর শুবরে পোকা আপন পথে। কিছু
দূর গিয়ে শুবরে পোকা বুঝতে পারলো তার গারের রোশনাই কখেট
নয়... অন্ধকারে পথ চলতে তার বেশ কষ্ট হতে লাগলো। পথের
পাশেই ছিলো সোবরের ছুঁপ। সে গিয়ে হঠাৎ পড়লো সেই
সোবরের মাঝে, ভোরবেলার আলোতে সে যখন বেরিয়ে এলো তখন
তার গারের দর সন্ধ্যাই পেছে চুই হয়ে। তার বাড়ীর লোকেরাও

তাকে চিনতে না পেয়ে বাড়ী থেকে দিলো ভাড়িয়ে—চিরদিনের দতো।

সেই দিন থেকে জোনাকী পোকা অন্ধকার রাত্তিরে আলো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—আর শুবরে পোকা আলো দেখলে সেখানে এসে ভীড় জমায়।

মহাকবি গ্যোটে'র বালাকাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

বিজ্ঞানর গ্যোটে'র ভাল লাগে নি। বিজ্ঞানরে ছরস্ত ছেলের সংস্পর্শে এসে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। গ্যোটে ছোটবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বাড়ীর নির্মল পরিবেশ বিজ্ঞানরে থাকে না। শ্বেহ ও ভালবাসার স্থান বিজ্ঞানর নয়। ছরস্ত ছেলের বিপক্ষে আত্মরক্ষা করতে ভাল ও নিরীহ ছেলেরা পারে না। গৃহসংস্কার শেষ হলে নিজেদের বসতবাটাতে আবার তাঁরা কিরে আসেন। গ্যোটে'র বাবার বাঁধাধরা কোন জীবিকা ছিল না। হাতে তাঁর প্রচুর সময় ছিল। সব সময়টা তিনি ছেলের পিছনে ব্যয় করতেন। ছেলের জন্ত নিজেই তিনি পাঠ্যতালিকা ঠিক করেছিলেন। ভাষা শিক্ষার ওপর তিনি কতখানি জোর দিয়েছিলেন তা গ্যোটে'র পাঠ্যতালিকা থেকে বোঝা যায়। জার্মান মাতৃভাষা গ্যোটে'কে শিক্ষা করতে হত। তারপর ইউরোপীয় ভাষার আদিজননী গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার অধ্যয়ন চলত। অভিজ্ঞাত মহলে তখন কন্নাসী ভাষার কন্নর ছিল। সুতরাং অভিজ্ঞাত মহলে পরিচিত হবার জন্ত কন্নাসী ভাষারও তালিম গ্যোটে'কে নিতে হত। প্রারম্ভিক শিক্ষার্থীরা যে-হায়ে পাঠ নিত তার চেয়ে গ্যোটে'কে বেশী পাঠ নিতে হত। ভাষা শিক্ষার পর শুরু হত দেহচর্চা। মেহের বিকাশ যাতে মানসিক পুষ্টির সহায়তা করে সে-জন্ত দেহচর্চা করতে হত। অভিজ্ঞাত সমাজে যাতে মিশতে পারেন সে-জন্ত তাঁকে নাচের তালিম নিতে হত। অসিবু ছর নিয়মিত অধ্যয়ন চলত। তারপর শুরু হত তাঁর সঙ্গীতচর্চা। অঙ্কনবিজ্ঞার পাঠ বহুস্তে তাঁর পিতা দিতেন। জ্যামিতিও তাঁকে পাঠ করতে হত সে-সময়, অঙ্কনবিজ্ঞার সব খুঁটিনাটি তাঁর পিতা বুঝিয়ে দিতেন, ছেলে যাতে ভাব ও ভাষাকে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারে তার জন্ত তিনি বিভিন্ন ভাষার অম্ববাদ পুত্রকে করতে দিতেন। পরবর্তী জীবনে প্রথিতযশা লেখক হয়েও গ্যোটে' অম্ববাদ করেছেন। তাঁর পিতা শুধু ক্রতিলিখন নিয়েই কান্ত হতেন না। কোন ঘটনা, নগরের উল্লেখযোগ্য কোন অম্বষ্ঠান বা পুরাতন কাহিনী— বা গ্যোটে' শুনেছেন বা দেখেছেন তা বর্ণনা করতে দিতেন গ্যোটে'কে। কবিতা, প্রসঙ্গ, নীতি কাহিনী বা দৈনন্দিন সংলাপের বিবরণও গ্যোটে'কে লিখতে দিতেন। এ-সব কিছু গ্যোটে'র পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফ্রান্সকার্টে কিছু সংখ্যক ইহুদী ছিল। এঁরা জার্মান ভাষার কথা বললেও মাতৃভাষা ভোলে নি। পবিজ্ঞ বাইবেল হিব্রু ভাষায় লিখিত। কবি পিতাকে জানালেন, তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা করবেন। জটনক পণ্ডিত ব্যক্তির সিকট তিনি

হিব্রু ভাষায় তালিম নিলেন। ইংরেজী ভাষাও তিনি এ-সময়ে শিক্ষা করেন।

বহু ভাষাভাষী এক পরিবারের কাহিনী গ্যোটে' তাঁর সহোদরকে বলেছিলেন। গল্পটি এইরূপ—এক ভাই বোনকে জার্মান ভাষায় চিঠি লিখত। দ্বিতীয় ভাই ধর্মতত্ত্ব পাঠ করত। সুতরাং ল্যাটিন ভাষায় পরিবারবর্গের কাছে সে চিঠি লিখত। আর দু'ভাই হামবার্গ ও মার্সেলিসে থাকত। তারা কেরণী। এক ভাই লিখত কন্নাসী ভাষায় চিঠি। আর ছোট ভাই লিখত আর এক নতুন হিব্রু ভাষা। সে ভাষা হচ্ছে ইহুদী-জার্মান ভাষা। এ-কাহিনী শুনে কবির মা ও বাবা বেশ উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।

গ্যোটে'র জীবনে আর একটা ঘটনার প্রভাব না বললে নয়। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে লিসবনে একবার প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়, অনেক ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়েছিল। সাগরের ঢেউ-এ নোঙর করা অনেক জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। প্রকৃতির বিধ্বংসী ক্ষমতা দেখে তিনি অভিভূত হন। জনসাধারণের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। প্রাকৃতিক দুর্ভোগের ভয়াবহ রূপ তাঁর মনে এক ছাপ রেখেছিল। তিনি ঘরে একটা বেদী নির্মাণ করেন। নানাবকম জিনিষ সংগ্রহ করে বেদীর ওপর রাখতেন। আর বেদীতে একটু ডিসের ওপর দাঁছ পদার্থ রাখতেন। তারপর আতঙ্গী কাচে সূর্যের কিরণকে আহরণ করে আগুন জ্বালাতেন। ধূপ ও ধূনোর মত সুন্দর গন্ধ বার হত তা থেকে। এরকম কাজ করে ভগবানের আন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করতেন নৈবেদ্য দেখে। তিনি ভাবতেন এইভাবে ভগবানকে শান্ত করা যায়। নিয়মিতভাবে তিনি চার্চে যেতেন। তবে ধর্মীয় প্রভাব তখনও তাঁর জীবনে পড়েনি। ধর্মকে ভাবতেন : শুধু নীতি। ঈশ্বর কল্পনাময় ও পিতার মত শ্বেহময়, এ কথা তিনি ভাবতে পারতেন না। ভগবানের ক্রুদ্ধ রূপ তিনি পুনরায় প্রাকৃতিক দুর্ভোগের মধ্যে পরধ করেন। সেই সময় তাঁর পিতার গৃহ-পাঠাগারের বহু বই নষ্ট হয়। বাড়ীরও কিছু ক্ষতি হয়। প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মমত তাঁর কাছে নীরস বলে মনে হয়েছিল। অনেকে বলেন, বাইবেলের সূর্যের সঙ্গে তাঁর জীবন-সঙ্গীতের সুর মেলেনি, কারণ তিনি বলতেন, সস্ত হবার জন্ত তিনি জন্মাননি, তবে পৃথিবী যে সুন্দর ভগবানের রাজত্ব তা সৃষ্টিরহস্ত দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

১৭৫৯ খৃঃ গ্যোটে'র মাতামহ ও পিতার মধ্যে মনোমালিঙ্গ হয়। এই সময় কন্নাসীরা ফ্রান্সকার্ট শহর দখল করে—দুই পরিবারের মধ্যে শান্তি তাই ব্যাহত হয়। এই সময় প্রেশিয়ান রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। গ্যোটে'র মাতামহ প্রথম ফ্রান্সিসের আভিবেকের সময় কাজ পরিচালনা করেছিলেন। এই প্রথম ফ্রান্সিস সাম্রাজ্যী মারিয়া থেরেসার স্বামী ছিলেন। গ্যোটে'র দাঁছ সাম্রাজ্যীয় সমর্থক ছিলেন। গ্যোটে'র পিতাকে রাজকীয় সভাসদ করেন সপ্তম চার্লস। ইনি ক্রীষ্টীয়ানদের হাতে নিগৃহীত হন। তা ছাড়া প্রেশিয়ান সুবরাজের চরিত্র তাঁকে রুদ্ধ করেছিল। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে অম্ববাদ দেখা দিল। গ্যোটে' পিতার পক্ষ সমর্থন করেন। ছুটির দিনে আহার করতেন তাঁর মাতামহের গৃহে। তা ছাড়া বাতায়নও তাঁর ছিল। রাজা ফ্রেডারিকের ধ্যান-ধারণা ও স্বাধীন মনোভাব শিশুমনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পরিণত বয়সে ইটালীতে এই সম্রাটের বৃত্ত্য সংবাদ শুনে তিনি বলেছিলেন : এই বকম মহৎ লোক বখন মৃত্যুর কোলে শাঙ্খলাভ করে তখন কী আশ্রয় নীরবে থাকতে পারি? সেই শিশুকাল থেকে জনমতের প্রতি তাঁর একটা তাচ্ছিল্য ভাব জন্মে। কারণ নাগরিকদের শৈথিল্যের জন্য সে নগর করাসীরা সহজেই অধিকার করে। এ-থেকে আরও বোঝা যায় যে বীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে তিনি জানতেন। এই সময় থেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তবে বীরপূজার মনোভাব তিনি বাল্যকাল হতে দেখিয়েছিলেন একথা অনেক সমালোচক বলেন। তবে একথা ঠিক—ছোটবেলা থেকে তিনি ঠিক করেছিলেন তিনি মহৎ হবেন। মহৎ রাজাকে সাধারণ লোক বুঝতে পারেনি। তাই তিনি ভেবেছিলেন তিনি মহৎ হলে সাধারণ লোকও তাঁকে বুঝতে পারবেন। তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধবল হয়েছিল—জনগণ উচ্চ গ্রামের কিছু বুঝতে পারে না। গোটেও পরিণত বয়সে বলেছিলেন এই কারণে জনতার বিরাট অংশের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনে যোগসূত্র রাখতে পারেন নি। এই কারণে তাকে অনেকে এই বলে অভিহিত করেছিলেন যে ভাইমার সভার তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি; তিনি মানববিরোধী।

জামাই ও স্বস্তরের মধ্যে তিক্ততা আরও সৃষ্টি হল বখন ঠিক হল বিজয়ী করাসী কাহিনীর অধাক গোটে-পরিবারের গৃহে অবস্থান করবে। করাসী রাজশক্তির বিরোধী গোটেের বাবা তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তাছাড়া কিছুদিন পূর্বে বহু অর্থ ব্যয় করে গৃহসংস্কার করেছিলেন। এই প্রতিবাদে অত্যন্ত ফল কিছু হয় নি। কাউন্ট খেরনে নামক জর্টনক করাসী সচিব এ-গৃহে বসবাস শুরু করলেন। ইনি ছিলেন সুভদ্র ও কলারসিক।

গৃহস্বামীর শাস্তি বাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার প্রতি এই সময়সচিবের প্রথর দৃষ্টি ছিল। তিনি কলারসিক ছিলেন। কবিদের গৃহে বহু অয়েল পেণ্টিং ছবি ছিল। সে-ছবিগুলো জীবিত জাৰ্মান শিল্পীদের আঁকা। কাউন্ট খেরনে গৃহস্বামীর গুণগ্রাহিতা স্বীকার করবার জন্য আরও অনেক কলারসিকদের আহ্বান করতেন। কাউন্ট খেরনে শিল্পীদের ডেকে আরও ছবি আঁকবার বরাত মিলেন সেই গৃহতেই। গোটেের বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। গোটেে কিছু মহা উৎসাহে ছবি আঁকা দেখতে লাগলেন। আর শিল্পীদের সঙ্গে মহা উৎসাহে আলাপ জমিয়ে ফেললেন। ভবিষ্যৎ জীবনে অন্ধ-প্রতিভার সুরণ আরও তাই ব্যাপক হয়েছিল। সেই সময়সচিবের কাছে রাজকীয় কাজের জন্য বহু লোক আসত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী

বার্তা নিয়ে। করাসীদের সম্পর্কে এসে করাসী বৃষ্টি ও সন্তুষ্টির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। ল্যাটিন ভাষা জানতেন। তাই অন্তরাসে করাসী সৈন্তদের সঙ্গে মিশে করাসী ভাষা আয়ত্ত করেন। করাসী ভাষা গোটেের বা শিখা করতেন। উদ্বেগ ছিল গৃহস্বামী ও অভিবির মধ্যে যাতে বোঝাপড়া হয়। কিন্তু গৃহস্বামী গোটেের পিতা অনমনীয় ছিলেন এ-সব ব্যাপারে। বিদেশী শাসনের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র প্রত্যাশীল ছিলেন না। এই সময় নাটকের প্রতি গোটেের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। শহরে করাসীরা নাটক মঞ্চ করত, গোটেে ছিলেন জেলাশাসকের নাতি। তাই তাঁর ঘর অবাধিত ছিল।

করাসীরা সমীহ ভাব দেখাত জেলাশাসকের নাতিকে। গোটেের দাছ নিয়মিত ভাবে টিকিট দিতেন। গোটেেও অভিনয় দেখতেন মহা উৎসাহে। তবে তাঁর বাবা নাটক দেখা পছন্দ করতেন না। তবে পাঠান্ত্যস তাঁর ঠিক চলত। জ্যামিতি পাঠ করে তিনি কিছু উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়েছিলেন। কাঠের বাঁক দিয়ে তিনি ছোট ছোট বাড়ীর মডেল নির্মাণ করতেন। সবচেয়ে উপভোগ্য হল বখন তিনি কৃত্রিম বর্ষ তৈরী করতে শিখলেন। এই বর্ষ পরে সব বন্ধুবান্ধব খেলা শুরু করত। সমাপ্তি হত এক ভীষণ যুদ্ধ-মহড়ার মধ্যে। বর্ষ পরে সকলে ঝাছ সমরনায়কদের মত যুদ্ধ দেখি মনোভাব দেখাত। গোটেে হতেন এক দলের পাণ্ডা। অল্প দলেও পাণ্ডা থাকত। পদস্পর্শ প্রতিযোগিতার কলে প্রথমে হত বচসা। বচসা রূপান্তরিত হত কলহে। তারপর তা রূপান্তরিত হত যুদ্ধ-মহড়ার। কিল, চড়, লাথি ও বৃঁসি সরান ভাবে চলত বিভিন্ন দলের মধ্যে। অনেক সময় দু-একজন আহত না হওয়া পর্যন্ত এ মহড়া চলত। এ শেষ হত শেষে শান্তির সর্ভে। তারপর তিনি অত্যন্ত গালগল্প বলে ও বন্ধুদের ধাইয়ে বন্ধুদের সন্তুষ্ট করতেন। ক্রুদ্ধ হলে আদিম মানুষের মত গোটেে হিংস্র হয়ে উঠতেন। অভিনয় দেখতে গিয়ে তাঁর এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়। গ্রীষ্মকমে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অবাধ মেলামেশা করে। অভিনেত্রীরা শালীনতা বজায় রাখতেন না; কারণ শিথিল অঙ্গবাস খসে পড়ত। বাইরে থেকে মককে দেখে তাঁর ভাল লেগেছিল। মকের নেপথ্যে এই দৃশ্য দেখে অবাক হতেন। নট ও নটীরা গ্রীষ্মকমে পোষাক পরিবর্তনকালে কারও উপস্থিতি গ্রাহ্য করত না। তাদের যে লজ্জা কম এ কথাও কবি বুঝতে পেরেছিলেন। অবশ্য মকের লোকদের কাছে এগুলো যে স্বাভাবিক তা তার মনে হয়েছিল। [ক্রমশঃ।

চড়ক-মেলায়

শ্রীশুশীলকুমার মণ্ডল

ময়নামতি পরমা গায়ে চড়কডালার বার

পালা দিয়ে পরমা নিয়ে পাঁপড় কিলে খায়।

ময়নামতি এদিক-ওদিক ঘুরছে চারিদিক
চানাচুর আর বাদাম ভাজা কোনটি খাবে ঠিক।
ময়নামতির বেই না সবে ফুচকি চোখে পড়ে—
ফুচকি হাসি অধরে তার আপনি খেলা করে।

আমড়া লেবু আর বে আমের আচার খয়ে খয়ে,
ময়নামতির রসনা দিয়ে ঠিক বেন জল করে।
হরেক বকম হাজার জিনিস দেখে মেলায় দিনে
ময়নামতির লোভ হল তাই রাখবে ওসব কিনে।

মাহিতিক কৌতুক

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

(২)

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে ভারতচন্দ্র 'বিভাগসূত্র' উপাখ্যান রচনা করেন। রাজসভায় ভারতচন্দ্র উপাখ্যানটি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখাইলে তিনি উহা সাদরে গ্রহণ করে এক স্থানে কাৎ করে রাখলেন। তাই দেখে ভারতচন্দ্র বললেন—কাৎ করে রাখবেন না, মহারাজা, কাৎ করে রাখবেন না, সব রস করে যাবে।

মহারাজা তাড়াতাড়ি পুঁথিখানি শুইয়ে রেখে হাসতে লাগলেন।

[ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১১১১-১১৬৭ বঙ্গ) লুকবি।
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১১১৬—১১৮১ বঙ্গ নবদ্বীপাধিপতি
বিভাগসাহী ও রসজ্ঞ]

বাঙলা দেশের পল্লীগামগুলিতে যখন প্রথম বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করবার নিয়ম হয়, তখন নরীল বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল না। ইন্সপেক্টর ছিলেন বিভাগসাগর মশাই। তাঁকেই শিক্ষকদের পরীক্ষা করে বিদ্যালয়ে নিয়োগ করতে হত। টোলের অনেক ভট্টাচার্য পরীক্ষা দিতে বিভাগসাগর মশাই-এর কাছে উপস্থিত হন।

একদিন এক টুলো ভট্টাচার্যের পরীক্ষা লওয়া হচ্ছে। বিভাগসাগর মশাই নীতিবোধের একটা জায়গা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন,— 'আমাদের আজীব, আরাম ও কার্যসৌকর্যার্থে যে সকল বস্তু আবশ্যিক' এইটুকুর মধ্যে আজীব 'আর' 'আরাম' শব্দের মানে কি ?

ভট্টাচার্য বললেন—জীবনম্ পৰ্ব্বতম্ আজীবম্ আর আরামঃ স্ত্রী উপবনম্ অর্থাৎ আরাম শব্দে উপবন বোঝায়। তার উদাহরণ হচ্ছে 'হা হা রামো হতো হস্তঃ'।

উত্তর শুনে বিভাগসাগর মশাই হাসি সংবরণ করতে পারলেন না। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন অভিপ্রায় শব্দের অর্থ কি ? বাংলার উত্তর দেবে সংস্কৃত নয়। ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন,—এই তোমার অভিপ্রায়, আমার অভিপ্রায়, তাহার অভিপ্রায়।

বিভাগসাগর মশাই বললেন শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলতে হলে কিয়কম করে বলা উচিত ?

পণ্ডিত বললেন—যেমন আমি ছুলের পণ্ডিত হব, এই অভিপ্রায়ে আপনার কাছে পরীক্ষা দিতে এসেছি।

তারপর আর একটা জায়গা পড়তে দেওয়া হল। তিনি

পড়তে লাগলেন,—কটিক পড়ছি নামক এক সম্রাট লোক, সন্ন্যাসী শকটাবোহণে বিয়ে না (বিয়েনা - ভিয়েনা) হইতে ক্রমো গমন করিতেছিলেন।

পড়ার ব্যতিক্রম দেখে বিভাগসাগর জিজ্ঞাসা করলেন,—কি পড়লেন ? বিয়ে না হতে ক্রমো গমন করিতেছিলেন ?

তিনি বললেন—আজ্ঞে, হ্যাঁ, তা বই কি, বিয়ে না হতে অর্থাৎ তখনও তার বিয়ে হয়নি।

বিভাগসাগর মশাই বললেন—এর আগে যে সন্ন্যাসী শব্দ আছে, বিয়ে না হলে সন্ন্যাসী কি রকম করে হয় ?

পণ্ডিত অনেকক্ষণ ভেবে উত্তর দিলেন—সাহেবদের ওরূপ হয়।

অফিসের কাজের ছুটির পর মধুসূদন প্রায়ই পাইকপাড়া রাজবাড়ীতে যেতেন। একদিন অপরাহ্নে কিছু লিখতে লিখতে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আমার সন্ন্যাসী-আহ্নিকের সময় হল, আমার সন্ন্যাসী-আহ্নিকের ব্যবস্থা করুন।

রাজারা ভাবলেন, এ আবার কি ? খুঁটানের আবার সন্ন্যাসী-আহ্নিক কি ? জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি ?

মাইকেল হাসিমুখে বললেন—গেলাসরূপ কোথায় হু' আউল পেগরূপ গজাজলে আচমন কার্ণ সমাধানে আহ্নিককৃত্য অহুঁতান করতে হবে।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মধুর হান্তে মধুসূদনের অপরূপ সন্ন্যাসী-আহ্নিকের ব্যবস্থা করলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের মহারাজা সতীশচন্দ্র মধুসূদনের পরম বন্ধু। একদিন হু'জনে বেরিয়ে যখন প্রাসাদে প্রবেশ করছিলেন, এমন সময় পঞ্চাৎবর্তী মধুসূদন হেসে বললেন—I see Krishna Chandra followed by Bharat Chandra.

মহারাজা বললেন—একদিন ভারতচন্দ্র বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রধান আসন গ্রহণ করেছিলেন, এখন আপনি সে আসন কেড়ে নিয়েছেন।

মধুসূদন তাই শুনে হাসতে হাসতে বললেন—ভারতচন্দ্রকে আপনারা ভিন্ন শ' টাকার গীতি দিয়েছিলেন, আমাকে কি দেবেন ?

মহারাজ তখন দুঃখের সঙ্গে বললেন—আমার যদি কৃষ্ণচন্দ্রের মত সম্পত্তি থাকতো, আপনাকে ত্রিশ হাজার টাকার জমিদারী দিতুম।

কোন এক সময়ে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে এক ত্রাণ-পশ্চিমগণের মহতী সভা হয়। ঐ সময়ে বহু সোনার ও রূপোর হুকো বার করা হয়। মাইকেলের জন্তও একটা সোনার হুকো এল। মাইকেল পশ্চিমদের রহস্য করে বললেন—ঠাকুর মশায়েরা, এ দাসের হুকোটি মারবেন না, আমার জাত গেলে আর জাত পাব না।

পুলিশ-আদালতে কাঁধকালে কোন কোন সময় মধুসূদন চোগা-চাপকান পরতেন। একবার শালের পাগড়ী ও চোগা-চাপকান পরে শালের রুমাল হাতে নিয়ে বেরোবার উদ্ভোগ করছেন—এমন সময় দীননাথ ধর এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখেই হাসতে হাসতে বললেন—Dinoo, do I look like the Maharaja of Burdwan.

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই হেমেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে 'কিছু কিছু বুকি' নামে এক প্রহসনের অভিনয় হয়। মধুসূদন অভিনয় দেখতে আসেন। অভিনয় শেষে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার করে বললেন—'মৃত্তিকে যে বাবা, মৃত্তিকে।' অর্থাৎ এই অভিনয় আগেকার সব অভিনয়কে মাটি করে দিল।

একদিন ঈশানপাড়ার দীনবন্ধু গেছেম বন্ধির বাড়ী। প্রায়ই বেতেম। বৈঠকখানার দেখেন বন্ধি বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে বেশ বৈঠক ঘণিয়েছেন। দীনবন্ধুর আগমনে সকলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কেবল বন্ধি অতর্কিতা করলেন না।

প্রায়ই সময় হল তখনও বন্ধি তাঁর সঙ্গে কথা বললেন না। ব্যাপার কি। কি হল। দীনবন্ধু বন্ধির পড়বার ঘরে গিয়ে এক টুকরো কাগজে একটা ছবি এঁকে তার তলায় একটা কবিতা লিখে দিলেন।

ছবি দেখে সকলেই হাসাহাসি করতে লাগলেন—কেবল বন্ধি বাবে। বন্ধি বললেন এ ছবি তাঁরই।

তিনিও তখন পড়ার ঘরে চুকে একটা কাগজে কি লিখলেন—তারপর গঁদ দিয়ে দীনবন্ধুর অজান্তে তাঁর পিঠে সেটা সঁটে দিলেন। তাই দেখে সকলেই হাসতে লাগলেন।

দীনবন্ধু তখন অপ্রতিভ না হয়ে বলতে লাগলেন—তোমরা কেউ আমার বলে নাও না না, আমার পিঠে কি আছে। হাতীর কপাল মক, তাই তার পিঠের কোথায় মশাটা মাছিটা বসেছে—তা সে দেখতে পায় না।

বন্ধি বললেন—দেখতে পায় না বলেই তো তাকে আমরা হতীমূর্খ বলি।

একবার বন্ধিচন্দ্র সন্ত্রাসক ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন। একজন কৌকড়ানো চুল ও কাল রঙের যতক লজি ট্রেনে তাঁর কামরার দিকে ঘুরে ফিরে তাঁর স্ত্রীর দিকে দেখাচ্ছিল।

এবার বন্ধি সেই বুক তাঁর কামরার দিকে এসেছে—বন্ধি

তাঁর স্ত্রীকে তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—দেখেছ, ঠিক যেন চিড়িভনের টেতা।

তাই তখন বুকটি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে—আপনার কাছে তো বন্ধের বিবি আছে, ভুলপ করে নিন না।

তাঁর উপস্থিত জবাবে বন্ধি খুসী হয়ে তাকে ডেকে কিছুক্ষণ বসলাপ করলেন।

আর একবার সন্ত্রাসক ট্রেনে করে যাচ্ছেন। সেবারেও একটা বুক ট্রেনে ঘুরে ফিরে তাঁর স্ত্রীর দিকে দেখছিল।

বার বার ওরূপ হওয়ারে বন্ধি তাকে গাড়ীর ভেতর ডেকে তাঁর কাছে বসালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি কর ?

—চাকরি করি।

—কত টাকা মাইনে পাও ?

—মাত্র ত্রিশ টাকা।

—বেশ, তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে দেখবার জন্ত ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছ—আমি ঘোমটা খুলে দিচ্ছি ভাল করে দেখ। আর শোন—আমি ডেপুটিসিরি করি—তাতে পাই আটশ টাকা—নাম আমার বন্ধি চাটুজো, বই লিখি তাতে বেশ হয়, সর্বসাকুল্যে আমার আয় হাজার বেড় হুই। সে সবই এঁর স্ত্রীর দিকেও এঁর মন পাই নে, আর তুমি বাপু ত্রিশ টাকার কেবাণী—একবার চোঁটা করে দেখ—মন পাও কি না।

বুকটি লজ্জার মাথা হেঁট করে চলে গেল।

মানা লোকে বলত বন্ধিচন্দ্র দেমাকী। অক্ষয় সরকারও তাকে দেমাকী বলে চিটিকারী হিতেন। তাই তখন একদিন বন্ধি বললেন, এক গুলির আঁড়ার আমার বইয়ের সমালোচনা হচ্ছিল। তাদেব ধারণা, বন্ধিচন্দ্র নিশ্চয়ই গুলি খায়—তা না হলে এমন রসিকতা কি তাঁর কলম থেকে বেরোয় ?

অক্ষয়চন্দ্র বললেন তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলা। তাই না হেসেই বললেন—আমি গুলিখোর হই আর বাই হই—কিন্তু আপনারই দেমাকে দেশের মাটি কম্পমান।

বন্ধি নবীন সেনকে বললেন—কথাটা ঠিক। বহরমপুরে বসলি হয়ে গেছি—সেখানে অকিসের কাজের পর বাড়ীতে এসে লেখাপড়ার সুযোগ পেতুম না। বাড়ীতে সব সময় দর্শকদের আলাপ অহির। যে আসে সে হুকো নিয়ে বসে লেখার দফাটি মাটি করে দেয়। কাজেই বাড়ীর দরজার এক নোটিশ টাঙিয়ে দিলুম কেউ আমার সাক্ষাৎ পাবে না।

তাঁর পরদিন থেকে সমস্ত বহরমপুরে আমার দেমাকী নাম রটে গেল। কেউ আর বাড়ীতে আসত না।

[অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১২৫৩-১৩২৪ বঙ্গ) সুপ্রসিদ্ধ লেখক, সম্পাদক ও সমালোচক। নবীনচন্দ্র সেন (১২৫৩-১৩১৬ বঙ্গ) সুকবি। বহু কাব্যের রচয়িতা।]

অক্ষয় সরকার সাধারণী নামে এক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তাই বন্ধি অক্ষয়-গৃহিণীর নাম দেন 'অসাধারণী'।

একদিন অক্ষয় সরকার আর হাইকোর্টের জজ দ্বারকা বিদ্য

চুঁচুড়ার গজার নৌকা ভ্রমণ করতে করতে ওপারে নৈহাটির ঘাটের কাছে এসে পড়েছেন। তখন নদীর মাঝ থেকে একটা ছপ, ছপ আওয়াজ শোনা গেল। সম্ভবতঃ অল্প কোন নৌকায় শক্ত জিনিষের ওপর লোহার ঠোকাঠুকি হচ্ছিল। অনেকেই এদিক ওদিক চেয়ে ভাবছিল এই ছপ, ছপ, আওয়াজ কোথেকে আসে।

ঘরকানাথ গজীর হয়ে বললেন—এ শব্দটা কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারলেন না—এপারে কাঁঠালপাড়া, নদীর ধার দিয়ে চার ডেপুটি এক সঙ্গে গট মট করে চলছে তারই আওয়াজ।

[বঙ্কিমচন্দ্রেরা চার ভাই-ই ডেপুটি ছিলেন।]

বঙ্কিমের বেড়াই দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'শান্তি' উপন্যাস প্রকাশ হলে বঙ্কিমচন্দ্র উপহার পেয়ে লেখেন—

'প্রিয়তমেষু,

'শান্তি' প্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম, পরলোকেও ভরসা করি দামোদর তাহাতে বঞ্চিত করিবেন না। ইতি তাং ২২শে আশ্বিন।'

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আবার দামোদর বঙ্কিমের কয়েকটি উপন্যাসের উপসংহার লেখেন—উপসংহারগুলি যেমন সুবিধের হয় নি। তাই তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন—'আপনি আমার উপন্যাসের উপসংহার লিখে আমাকে সাহায্য করেছেন।'

দ্বিজেন্দ্রলাল একবার বন্ধুবান্ধবদের বিরাট ভোজ দেন। ভোজটা হয় তাঁর খত্তরবাড়ীতে। এই উপলক্ষে তিনি যে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছিলেন তা এই—

'বাহ্যর কুবেদের ভার সম্পত্তি, বৃহস্পত্তির ভার বুদ্ধি, বসের ভার প্রতাপ। এ হেন আপনি আপনার কুবেদের মঙ্গল কানন ছাড়িয়া, আপনার পদ্মলালময়না জামিনী সম্ভিষ্যাহারে, আপনার বর্ণশকটে অধিষ্ঠিত হইয়া এই ধীন অকিকিংকর অধমদের গৃহে, শনিবার মেঘাঙ্কর অপরাহ্নে আসিয়া যদি ঐচরণের পবিত্র ধূলি ঝাড়েন—তবে আমাদের চৌকপুকর উদ্ধার হয়। ইতি শ্রীশুরবালা দেবী। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মজুমদার।'

নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে অনেকেই হাতকর উত্তর দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে দুখানি পত্রের উল্লেখ করছি—

একখানি প্রসিদ্ধ শিকারী ও ব্যারিষ্টার কুমুদ চৌধুরী মশায়ের—

'ডানা কাটা পরী

গাঁজাগুলি আবকরী,

হোমা-পেড়ী ধবড়রি

ত্রয়ে নমস্কারি।

এত কহে পারে ধরি

শ্রীকুমুদ চৌধুরী।'

দ্বিতীয়টি প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—

'ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পত্তি, বমঃ প্রতাপ চ

নাহিক মে।

ন চ নন্দন কানন, স্বর্ণ-সুবাহন, পদ্মবিনিন্দিত

পদ্মবৃগ মে।

আছে সত্যি পদ-রজ রক্তি,—তাও পবিত্র কি জানিত নে।

চৌক পুকর তব ত্রাপ পায় যদি, অংগ ঝাড়িব তব ভবনে।

কিত্ত—

মেঘাঙ্কর শনি অপরাহ্নে যদি গুরু বাধা ঘটে মে।

কিবা বস্তপি সহসা চুপি চুপি প্রেরিত না এই পরধামে।'

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১২৭০—১৩২০ বঙ্গ) কবি ও নাট্যকার। আবগারী বিভাগের উচ্চ পদস্থ এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ইনি ডি, এল, রায় নামে বিখ্যাত। শুরবালা দেবী—(১৮৭৩—১৯০৩)। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী এবং ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বন্ধু। দ্বিজেন্দ্রনাথ মজুমদার—বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পুত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতৃক। ইনিও হোমিওপ্যাথ। কুমুদ চৌধুরী—(? —১৩০০) শিকারী ও ব্যবহারকারী এবং ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অন্ততম জামাতা। বীরবল প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৪৬—১৩৩২ বঙ্গ) কবি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র]

পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় তখন বঙ্গবাসীর সম্পাদক। দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন ছাটকোট পরে পাঁচকড়ি বাবুর বাড়ীতে এসে হাজির। ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ঘরে ঢুকেই একবার পাঁচকড়ি বাবু ও একবার ইন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার এখানে আসতে ভয় করে। তুমি 'বঙ্গবাসী'র এডিটর। গৌড়াদের সর্দার।

ইন্দ্রনাথ অমনি মাথা নেড়ে বললেন—উঁহ, পাতিদের সর্দার। কমলা শিলেটে জন্মায়, সেই কমলার চাব বাউলার মাটিতে কবলে গৌড়ার পরিণত হয়। পাঁচু এদেশেরই, সুতরাং 'পাতি'—বড় জোর প্রমাণ করে 'কাপুড়ী' বলতে পার।

দ্বিজেন্দ্রলাল অমনি হাসতে হাসতে বললেন—আপনার মাম ইন্দ্রনাথ বন্দো, কেমন—কারণ এমন উপহাস রসিকতা এক ইন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর নেই।

ইন্দ্রনাথও হেসে বললেন—তোমারও চিনেছি—তুমি দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্গবাসীতে 'Reformed Hindoos, বিলেত বেড়া ক'তাই—

কেমন—

বসিকে বসিকে পরিচয় হয়ে গেল।

[পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় (১২৭৪—১৩৪০) সাংবাদিক ও প্রেঙ্কার]

একদিন দ্বিজেন্দ্রলাল 'রিফর্ম পার্কের' ভেতর দিয়ে আসছেন—এমন সময় দেখলেন এক পাদরী মহা চিংকারে বক্তৃতা দিচ্ছেন—চারদিকে তাঁর লোক ঘিরে আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য যেমন দাঁড়িয়েছেন—অমনি পাদরী গজীর হয়ে বললেন—And you, the Devil is staring you in the face (পরতান তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে)।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল আরও গজীর হয়ে উত্তর দিলেন "Yes, you are (হ্যাঁ, সে তুমিই)।

মুখের মত জবাব শুনে লোকদের মধ্যে হাসির ঝুয়া পড়ে গেল।

আমার পিতৃদেব অমূল্যচরণ বিজ্ঞানরণ মহাশয়ের জীবিতকালে আমাদের বাড়ীতে বহু সম্মানিত সাহিত্যিকদের সন্মান-সন্ধ্যার সমাগম

হত। নানারূপ আলোচনা হত তার মধ্যে মাঝে মাঝে বসলাপও হত। পিতৃদেবের মুখে শোনা কয়েকটি গল্প এখানে দিচ্ছি—

বাদশাহের ইচ্ছে হল বাগানবাড়ীতে বেড়াতে যাবেন। নিজের ছেলে আর বীরবল উজীরকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। সেখানে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করবার পর ভারবোধ হওয়ায় বাদশাহ আপনার অঙ্গবস্ত্র বীরবলের হাতে দিলেন। বীরবল বস্ত্রখানি নিজের কাঁধে রাখলেন। কিছুক্ষণ পরে বাদশাহের ছেলেও নিজের গাত্রবস্ত্র বীরবলের কাঁধে দিলেন। পরে বীরবলের দিকে নজর পড়ায় বাদশাহ তাঁর কাঁধে অনেকগুলি বস্ত্র দেখে রহস্য করে বললেন—কৈওজী বীরবল, বড়ী অচ্ছী হয়।

বীরবল—ক্যা বাদশাহ, নমদার।

বাদশাহ—দেখতে ঠৈ কি তুমানে এক গধেকা বোর লিয়া।

বীরবল—বাদশাহ নমদার, আপ জো কহতে ঠৈ, য়ে গধেকা বোর লিয়া, বহ সচ্চী বাত, লেকিন এক গধেকা নহী—দো গধেকা।

অনেক বড়লোকের বাড়ীতে পূজোর সময় অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিনায় হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ধর্মীর গৃহে গিয়ে বার্ষিক নিয়ে আসেন। ষাঁরা প্রতি বছর বার্ষিক পেতেন, তাঁদের নাম খাতায় লেখা থাকত। যদি কেউ ২১০ বছর বার্ষিক না নিতে আসতেন, তাঁদের নাম কেটে দেওয়া হত।

এক ব্রাহ্মণের কিছু বার্ষিক ছিল। তিনি কোন কারণে দু' বছর বার্ষিক নিতে আসতে পারেননি। তাঁর বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। পরের বছর ব্রাহ্মণ এসে শুনলেন, তাঁর নাম কাটা গেছে। এই সর্বনেশে কথা শুনে ব্রাহ্মণ তো বাবুর কাছে অনেক কাকূতি-মিনতি করলেন।

বাবু দেওয়ানজীর ওপর আদেশ দিলেন, ব্রাহ্মণের নাম খাতায় লিখে নিতে। দেওয়ানজী খাতা এনে লেখার অস্ত্র ভটাচার্জির নাম জিজ্ঞাসা করলেন—

ব্রাহ্মণ বললেন—লেখ, আমার নাম গরু ভটাচার্জ।

নাম শুনে লেখক তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ব্রাহ্মণ আবার বললেন—লেখ না হে, সত্যি সত্যিই আমার নাম গরু ভটাচার্জ।

পরে বাবু এসে স্বয়ং এ রকম মাহের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন—মশাই, আমি বড় বিপদে পড়ে দু' বছর বার্ষিকী নিতে আসতে পারি নি। এই সামান্য দোষে আমার নাম কাটা যায়। যদি কেয় কোন বিপদে পড়ে না আসতে পারি, তা হলে কেবল হিন্দু হয়ে কে এবার আমার নাম (গরু) কাটতে পারে।

কোন এক বিজ্ঞানসাহী রাজার কাছে অনেক বড় বড় পণ্ডিত এসে নতুন কবিতা শুনিয়ে পুরস্কার নিয়ে যেতেন।

একদিন গজগতি বিজ্ঞানিগ প্রভুর মত এক পণ্ডিত রাজসভায় এসে হাজির। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করার বললেন, নতুন কবিতা আছে।

তৎক্ষণাৎ রাজ আদেশে তাঁকে সমাদর করে আসনে বসান হল।

বিশ্রামের পর রাজা তাঁকে বললেন—এবার আপনার কবিতা পড়ুন।

ব্রাহ্মণ গম্ভীর হয়ে বললেন—

'হৃদয় শিবতি বিজ্ঞানঃ'।

সভাপণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন—তাদপর ?

ব্রাহ্মণ বললেন, আজ্ঞে এই পর্বত।

এই শুনে সভাপণ্ডিত বললেন, কবিতার চারি চরণ থাকার নিয়ম। এতে তা কই ?

ব্রাহ্মণ—কেন মশাই, বেড়ালের কি চারি চরণ নেই ? সভাহ সকলে হেসে উঠলেন।

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন—কবি ঠাকুর, কবিতার যে একটা রস থাকে। তাতে কেমন মাধুর্য থাকে, তা আপনার কবিতায় কই ?

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—স কি মশাই, ছুধের কি রস নেই, খাঁটি ছুধে কি মাধুর্য কম ?

আবার হাসি

তখন রাজা স্বয়ং জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা কবিতা মাজেরই একটা বিশেষ অর্থ থাকে—তা আপনার কবিতায় তা কই ?

অমনি ব্রাহ্মণ কৃতাজলিপুটে বললেন—ধর্মবতার, বিশেষ অর্থ থাকা দূরের কথা, আমার কিছুই অর্থ নেই।

[অমূল্যচরণ বিজ্ঞানিগ (১৮৭৭-১৯৪০) বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক]

দস্তি দামাল হাওয়া

বুদ্ধদেব গুহ

দস্তি দামাল হাওয়া

ঘরে হুকেই ক্যালেক্টারটা উল্টো মুখে ক'রলো।

হ-হ-গলার বলল :

'তোল সময়ের মেনা

কৃপণের কড়ি গোপা।'

দস্তি দামাল হাওয়া

তারপরে কী ধরল ?

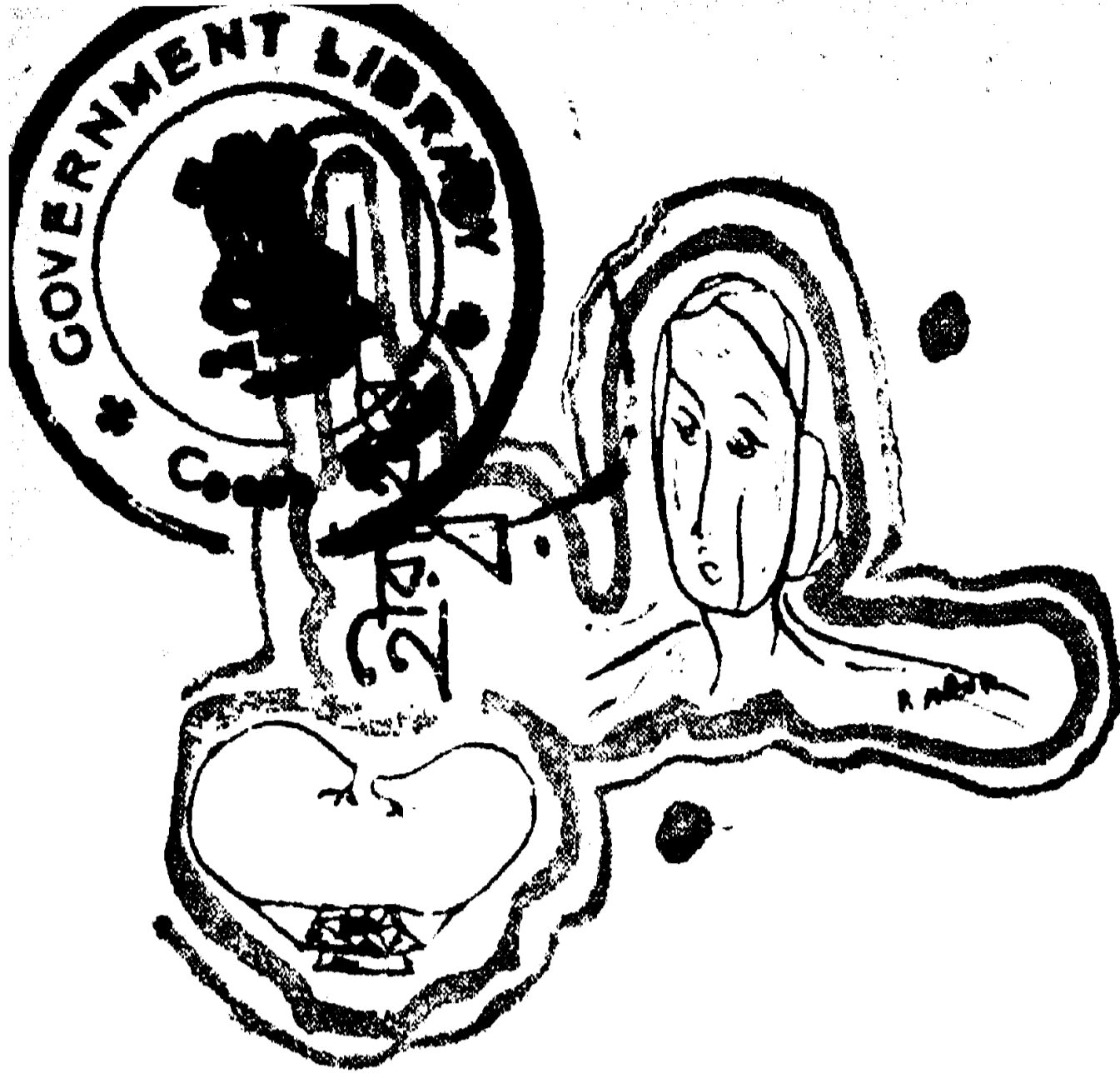
আমার মনের মতন করে

তোমার মুখের চাবিধারে

চুলগুলো সব এলোমেলো সে করল ?

আমার গুহিরে রাখা সমস্ত করমুলা

ভয়ঙ্কর উলটায়িত জোড় উলটায়িত ॥



(ডিটেক্টিভ গল্প)

পুষ্পদল ভট্টাচার্য্য

অনেক দিন পরে মণিকা এসেছিল কুকপুয়ের রাজবাড়ীতে বেড়াতে। রাজা বসন্ত রায়ের স্ত্রী মণিকার মাসতুতো দিদি অনীতা বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করতিল।

মণিকা রাজবাড়ীর মস্তবড় 'কার' থেকে নামতেই সে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

মণি, খুব সময়ে এসেছিল তুই, নিজেই না এলে মামবাই কাল তোকে আসবার জন্ত 'তার' করতাম।

দিদির হাত ছাড়িয়ে তাঁকে প্রশ্নাম করতে করতে মণিকা বলল, শুনলাম তোমাদের ড্রাইভারের কাছে। সেই বিখ্যাত হীরার হারটি নাকি চুরি গিয়েছে ?

তুই বিখ্যাতই নয় ভাই, সেই হীরটা একজন সাধুর দান। এ বংশের কল্যাণ নির্ভর করছে ঐ হীরার উপর। প্রবাদ আছে, ঐ হীরা হারালে এ বংশের অকল্যাণ হয়। অনীতা কেঁদে ফেলে।

তুই বা কবে হোক হীরটা খুঁজে দে ভাই ! সে বার দাদামশায়ের ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ হারিয়ে গেলে পুলিশও বা পারেনি তুই তাই করেছিলি। তাঁদের ঠাকুর উদ্ধার করে দিয়েছিলি তুই। এবার আমার দায় উদ্ধার কর ভাই।

আবে করছ কি অমু ? ও বেচারী সবে ট্রেন থেকে নামল। একটু বিজ্ঞান তো করতে দাও মণিকে। পেছন থেকে বললেন রাজাবাহাদুর বসন্ত রায়।

অপ্রস্তুত অনীতা বোনকে সঙ্গে করে তার জন্ত নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেল। সে রাতে আর তারা চুরির সম্বন্ধে কোন আলোচনা করার সুযোগ পেল না।

বিখ্যাত মেম্ব-ডিটেক্টিভ মণিকার পরিচয় বোধ হয় সকলেই জানেন। সেই যে খ্যাতনামা পোয়েন্দা পুলিশ-ইন্সপেক্টার হরেনবাবুর ভাগিনী, যে একবার একটা রহস্যময় খুনের তদারকে আমাকে সাহায্য করে প্রকৃত অপরাধীকে ধরিয়ে দিয়েছিল ? মনে পড়েছে ? হ্যাঁ, সেই মণিকার কথাই বলছি। সেই ঘটনার পর থেকেই তো আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ী কোন চুরি কি ছুর্টনা ঘটলে পুলিশে খবর দেওয়ার আগেই তারা মণিকাকে ডেকে পাঠায়।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য মণিকা চুরির খবর পেয়ে আসেনি। সে এসেছিলি দিদির বাড়ী বেড়াতে। কিন্তু টেকীকে বর্ণে গিয়েও ধানই ভালতে হয় তো ?

পরদিন সকালে চা খাবার পর মণিকা বলল, যে ঘর থেকে হার চুরি হয়েছে সে ঘরটা একবার দেখব।

অনীতারা তাকে তাদের শোবার ঘরে নিয়ে এল। এই ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালে একটা বেশ মজবুত লোহার দরজার তালা ঝুলছিল। সেই তালা খুলে অনীতা ডাকল, এস।

ভেতরে গিয়ে মণিকা দেখল, ঘরটি একটি মাঝারী সাইজের ষ্ট্রং রুম। ঘরের দুয়ার ঐ একটি মাত্র। ঘরে আলো আর বাতাস আসবার জন্ত খুব উঁচুতে বাইরের দিকের দেওয়ালে প্রায় ছাদের কাছাকাছি দুটি ফাইলাইট আছে। দুটিই দামী পুঙ্ কাচ আর তারের জালি দিয়ে ঢাকা। তার উপর দুটো ফাইলাইটই এত ছোট যে একটি চার পাঁচ বছরের বোপা ছেলে ছাড়া কেউই সেই কীক দিয়ে ঘরের ভেতর আসতে পারবে না। সব চেয়ে বড় কথা, রাণী অনীতা কিংবা রাজাবাহাদুর এ ঘরে না থাকলে ফাইলাইট দুটি কখনও খোলা হয় না।

অনীতা বলল, এ ঘরের ভেতর শিলিংক্যান আর বিজলী বাতি লাগাবার পর এদিকে প্রায় বছর ধানেক ফাইলাইট দুটিকে একবারও খোলা হয়নি।

কাপড় ছাড়বার সময়ে এই বন্ধ ঘরে কষ্ট হয় না পরমে ?

মণিকার প্রশ্নের উত্তর দিলেন রাজাবাহাদুর। আমরা এ ঘরে আসবার সময়ে শোবার ঘরের বাইরের দিকের দরজাগুলি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিই। তাই এ ঘরে ঢোকবার একমাত্র দরজাটা খোলাই থাকে সে সময়ে। ঐ দরজাটা দিয়েই মুক্ত বাতাস চলাকেরা করে এ ঘরে।

মণিকা মারের এই দরজার সামনে এসে ঝাঁড়তেই দেখল, এর ঠিক উন্টোদিকে শোবার ঘরের দক্ষিণের দেওয়ালে বেশ বড় একটা জানালা। ঐ জানালার দরজা বন্ধ থাকলেও কাচের ভেতর দিয়ে শোবার ঘর আর এই ছোট ঘরটারও খানিকটা বেশ দেখা যায় বাইরের বাগান থেকে। জানালার দরজা খোলা থাকলে ঘরের লোকের কথাও বাইরে থেকে শোনা যায়।

মণিকার প্রশ্নের উত্তরে অনীতা বলল, সে রাতে একটা জাপসা গরম পড়েছিল। তাই ঐ বড় জানালাটি খোলাই ছিল। কিন্তু ঐখান দিয়ে চোর আসা সম্ভব ছিল না। কেন না, আমি আর মানদাদি' ষ্ট্রংরুম থেকে বেরিয়েই এ ঘরের দরজার তালা দিয়েছিলাম।

চাবী কার কাছে থাকে ?

আমার কাছে। তুই ঘর পরিষ্কার করার সময়ে মানদাদি' চাবী নেয়। অনীতা উত্তর দেয়।

মানদাদি' কি একাই ঐ ঘরে যেত ?

সব সময়ে নয়। কখন-কখন আমি কাছে ব্যস্ত থাকলে সে একাই আসত।

যে রাতে হার চুরি হয়, সে রাতে মানদাদি' এ ঘরে একলা ছিল ?

না, আমার কাপড় ছাড়ার সাহায্য করেই সে বাইরে চলে গিয়েছিল আমার জন্ত এক গেলাস জল আনতে। তবে আমি যখন দরজার তালা দিই তখন মানদাদি' শোবার ঘরে ছিল।

এ ঘরের ছুল্লিকোট চাবীটা কার কাছে থাকে ?

আমার কাছে। রাজাবাহাদুর বললেন, কিন্তু সে চাবী আমি বহুদিন ব্যবহার করিনি। আমার কাশবাল্মে যেমন বেখেছিলাম তেমনিই পেয়েছি পুলিশ এককোরাবীর সময়ে।

দৈনিককণ কি ভেবে মণিকা আবার প্রশ্ন করল, হারটা সাধারণতঃ কোথায় রাখা হয়? অত দাবী জিনিব বখন, তার রাখবার ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই উপযোগী?

রাজাবাহাদুর ঘরের এক কোণে একটা লোহার আলমারী দেখালেন। আলমারীটির অনেকগুলি দরজা নানা কোণে খুলতে হয়। সবগুলি দরজা খুলে তিনি একটা মজবুত লোহার বাক্স দেখালেন। এরই ভেতর হীরার হার ও অজ্ঞাত সব দামী অলঙ্কার রাখা হয়। সব জিনিব রাখবার পর আলমারী বন্ধ করে দরকার মত সেটাকে ইলেকট্রিকাই করার ব্যবস্থাও আছে। তবে আজ পর্যন্ত কখনও রাজাবাহাদুর আলমারীটাকে ইলেকট্রিকাই করেননি।

যা দেখছি তাতে—আশ্চর্য্য হয়ে মণিকা কি বেন বলতে বাচ্ছিল। বাধা দিল অনীতা। সে রাতে কিন্তু আমি হীরার হার বা অস্ত কোন গহনাই লোহার আলমারীতে তুলিনি। আগেই বলেছি, সে রাতে একটা ভ্যাপসা গরম পড়েছিল। তার উপর এঁর জাতির মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে সারাটা দিন তাদের বাড়ী হৈঠে করে কাটিয়ে বড় রান্ধ হয়ে পড়েছিলাম। তাই রাতে বাড়ী গিয়ে সব গহনা খুলে বাক্সে ভরে সেটা কাপড়ের আলমারীতেই রেখে দিয়েছিলাম। মানদাদি' অবত বললেছিল, কাজটা ভাল হচ্ছে না দাবী-দিদি। তুমি বাচ্ছটা লোহার আলমারীতেই তুলে রাখ।

আমি বললাম ঘরের চাবি তো থাকবে আমার কাছে। আর আমরা থাকব শোবার ঘরে। কাজেই আজ রাতে আর কেউ কিছু করতে পারবে না।

পরদিন কখন হার চুরির কথা জানতে পারিলে?

মণিকার প্রশ্নের উত্তরে অনীতা বা বললুম্ভা সন্দেহে এই—আগের রাতের গরমে ও নিমন্ত্রণ-বাড়ীর খাওয়া-দাওয়ার সোলামালে অনীতার শরীর ধরাপ হয়ে পড়ে। পরদিন সে তাই বেশ বেলাতেই বিড়ানা ছেড়ে ওঠে। তারপর সংসারের প্রয়োজনীয় কাজের তার পিসীমাকে বুঝিয়ে দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ে। আহা রে অনিচ্ছা থাকায় সকালে অনীতা কিছুই খায়নি। দুপুরে পিসীমা আর মানদার আগ্রহাতিশয্যে সে এক গ্রাস খোলার সববৎ খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে।

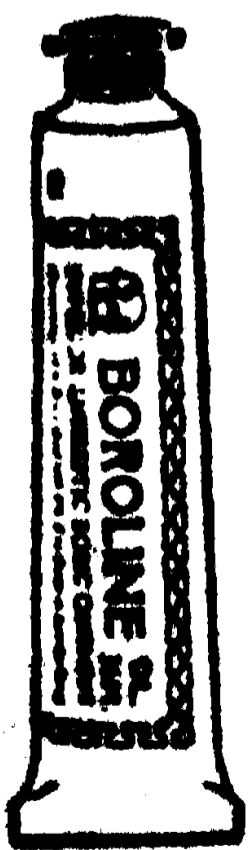
রাজাবাহাদুর কি কাজে সহরে গিয়েছিলেন। তাইয়ের বউয়ের শরীর ধরাপের খবর পেয়ে মানদা ছুটা নিয়ে দুপুরে বাড়ী গেল। তাই পিসীমা অনীতার দেখা-শোনার উদ্দেশ্যে শোবার ঘরে এসে বসলেন।

পিসীমার খুব বেশী পান-দোস্তা খাওয়ার অভ্যাস। সব সময়ই তাঁর সঙ্গে একটা পানের বাটা থাকে। সেদিনও পিসীমা গল্প করতে করতে পান সেজে খাচ্ছিলেন। তিনি হঠাৎ বললেন, একটা পান খাও বউমা, তাহলে তোমার পা-বমি ভাব কমে যাবে।

রাজামশায় পান খাওয়া পছন্দ করেন না। তাই অনীতা অল্পদিন পিসীমা বললেও কখনও পান খায় না। কিন্তু সেদিন একে

গ্রীষ্ম দিনে-ও স্নিগ্ধ সজীবতা

গ্রীষ্মের খরতাপে ক্রোধান্ড আবহাওয়ার আপনি বখন বিজ্রত তখন আপনার একান্ত প্রয়োজন বোরোলিনের মতো মিষ্টি আর স্নিগ্ধ ক্রেমক্রীম। ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলিন স্বকের গভীরের সমস্ত মালিগ্ধ দূর করে আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে আপনার স্বক-কে স্নিগ্ধ ও সজীব করে তুলবে।



বোরোলিন

পরম প্রসাধন

প্রস্তুতকারক :

জি. ডি. কার্গাসিউটিক্যাল্‌স্‌ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩



তো রাজাবাহাদুর বাড়ী ছিলেন না, তার উপর শরীরটাও বেশ খারাপ বোধ হচ্ছিল, তাই অনীতা সাগ্রহেই পিসীমার কথামত একটা পান খেল। প্রথমে ঘোলের সরবৎ তারপর পান খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর অনেক হালকা বোধ হওয়ার অনীতা ঘুমিয়ে পড়ে।

রাজাবাহাদুর হেসে বললেন, সে কি ঘুম। সন্ধ্যা পাঁচটার বাড়ী কিরে দেখি তখনও ঘুমোচ্ছে। অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না। ভয় হল শরীরের কষ্টে অজ্ঞান হয়ে বায়নি তো? মানদাকে ডেকে মুখে মাথায় ভিজে তোয়ালে বুলাতে বললাম। তারপর নাকের কাছে স্বেলিংসপন্টের শিশি ধরতে ধড়মড় করে উঠে বসল।

অনীতা বলল, সত্যিই অতক্ষণ ধরে অমন গভীর ঘুম আমি কখনও ঘুমিনি। বাই হোক, ঘুম থেকে উঠে শরীর বেশ স্নহ বোধ হল। চা খাওয়া শেষ হতেই মানদা বলল, রাণীদিদি, কাল রাতে গহনার বাস সিন্দুক তোলানি আজ এইবেলা তুলে কেস। নইলে তুলে যাবে। আজ গায়ে শুনে এলাম বিরাটপুরের জমীদারবাড়ীতে একটা মস্ত বড় চুরি হয়ে গিয়েছে।

রাজা মশায়ও বললেন, হ্যাঁ সহরেও শুনলাম বটে বিখ্যাত অলঙ্কার চোর সিহু এ অঞ্চলের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বাড়ী চুরি করেছে। কিন্তু পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারছে না। অবশ্য আমার এই ঠিকমে চুকে চুরি করার সাধ্য চোবের বাবারও হবে না। তবু সাবধানের মার নেই। গহনাগুলো সব ভাল করে আলমারীতে তুলে সেটা ইলেকট্রিক ফাই করে দিও।

ওদের ছুজনের কথা শুনে আমার ভয় হল। তাড়াতাড়ি ও ঘরের দরজা খুলে গহনাগুলো লোহার আলমারীতে সাজিয়ে তুলে রাখতে গিয়ে মাথার বাজ ভেঙ্গে পড়ল। আর সব গহনাই আছে শুধু সেই বিখ্যাত হীরার পেণ্ডেট দেওয়া হারটাই নেই। ভাবলাম হয়তো কাপড়ের আলমারীর ভেতর দিকে কোথাও সরিয়ে রেখে ফুলে গিয়েছি। কিন্তু আমাতে আর মানদাদি'তে সমস্ত আলমারী ঘরের প্রত্যেকটি কোণ খুঁজেও সেটা পেলাম না। অনীতা একটু খেয়ে চোখের জল মুছে আবার বলতে লাগল।

জানিস তো হারটা এ যশের উন্নতির মূলে। তাই খবর পেয়ে তোর জামাইবাবু এসে খুব রাগারাগি করতে লাগলেন। উনি নিজেও সব জায়গা ভাল করে খুঁজে দেখলেন। তারপর পুলিশে খবর দিলেন।

পুলিশ প্রথমে সিহু চোরকে সন্দেহ করলেও পরে সব দেখে শুনে বলল, সিহু যদি আসত তাহলে একটা মাত্র হার নিয়ে দ্রুত হত না সে। গোটা বাস, সব অলঙ্কার স্নহই সরাত সে। যেমন অল্প জায়গা থেকে সরিয়েছে। এ নিশ্চয় বাড়ীর খুব জানাশোনা কোন লোকের কাজ। খুব সস্তব এ বাড়ীর কোন চাকর-বাকরই সরিয়েছে হারটা।

বাড়ীর সকলের অবানবন্দী নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশ মানদাদি'কে গ্রেপ্তার করেছে। মানদা কি রাণী অনীতার মামার বাড়ীর স্বি। সে অনীতা আর মণিকার ছেলেবেলায় তাদের মাহু্য করেছিল। রাণী অনীতা খুববাড়ী এসে একলা থাকতে হবে বলে দিদিমার কাছ থেকে মানদাকে চেয়ে এনেছিলেন। এই প্রায়েই মামার বাড়ী থাকে, তাই মামদাও একদিকে তার রেহপাত্রী অনীতা অত্যধিক

ছোট ভাইটিকে কাছে পাবে এই আশায় সহ্য ছেড়ে আসতে আপত্তি করেনি। অনীতাদের অনেক পুরানো বিখ্যাত বি সে। তাই অনীতা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তার মানদাদি' চোর।

সেই কথাই সে বলল মণিকাকে, মানদাদি' যে হার চুরি করেছে একথা নিজের চোখে না দেখলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না মণি। তুই তো জানিস দিদিমার সমস্ত গহনার্গাটি টাকাকড়ি মানদাই রাখা ঢাকা করতো। কখনও একটা পরসাত তার হাত থেকে হারায় নি।

মণিকা একটু দুঃখিত সুরে বলল, বলা যায় না দিদি। কথার বলে মাহু্যের মন না মতিভ্রম। যে মাহু্য লক্ষ টাকার দিকে চেয়েও দেখে না সেই আবার অনেক সময়ে সামান্য একটা হার কি কানের ছল চুরি করে ধরা পড়ে। কিন্তু মানদাদি'কে কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করে ধরল পুলিশ?

অনীতা বলল, এক তো মানদাদি' হাড়া আর কোন চাকর কখনও ঠিকমে চুকে না। একমাত্র সেই জানত যে শোবার সময়ে আমি বরাবর আমার আঁচল থেকে চাবী খুলে মাথার আলমারীর নীচে রেখে শুই। কোন চাবীটা ঐ ঘরের দরজার, কোনটাই বা কোন আলমারীর এসবও জানত মানদাদি'। আগের রাতে যে আমি গহনার বাস লোহার আলমারীতে রাখিনি তাও মানদাদি'র জানা ছিল।

পিসীমাও সাক্ষ্য দিলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর তিনি নিজের ঘরে কিরে বাবার সময়ে দেখেন মানদা আমার ঘরের দরজায় বসে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাড়ী যাওনি মানদা?

মানদা উত্তর দিল, গিয়েছিলাম পিসীমা। দেখলাম বউ ভাল আছে। তাই ফিরে এলাম।

মানদার তাই মদ খায়। একবার চুরি করে জেলেও গিয়েছিল। তাই এ বাড়ীর সকলে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। চাকরেরা খবর দিল আগের রাতে ও পরদিন দুপুরে মানদার ভাইকে বাগানে আর শোবার ঘরের কাছে বড় জানলাটার বাইরে উঁকবুঁকি দিয়ে ঘুরতে দেখেছে। চাকররা জিজ্ঞাসা করার সে বলে, দিদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বড় দরকার আছে।

আগের রাতে অনীতার সঙ্গে মানদাও বিয়েবাড়ী গিয়েছিল তাই ভাইয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। পরদিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবার পথই মানদা ছুটি নিয়ে বাড়ী যায়। কিন্তু খটা কয়েক পরেই ফিরে আসে। পুলিশের লোক খোঁজ নিয়ে জানতে পারে মানদার সঙ্গে দেখা করেই তার ভাই বাড়ী ছেড়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছে। মানদাও সেদিন বাড়ী গিয়ে তার ভাজকে বাপের বাড়ী পারিয়ে দিয়েছে। এই সব কারণে পুলিশের দৃঢ় ধারণা, মানদা হার চুরি করে তার ভাইকে দিয়েছে। ভাই বোংহর বোংহাই কিংবা পুণায় গিয়েছে। হার বিক্রী করতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। ভাই হার বিক্রী করে খবর দিলেই মানদাও চলে যাবে তার কাছে।

পিসীমা একখার সার দিয়ে বললেন যে, আগের দিন যখন মানদার সঙ্গে তার ঝগড়া হয় তখন সে রাগ করে বলেছিল, এত অপমান সরে আর এ বাড়ীতে থাকব না আমি। রাণীদিদিকে বলে ক'লকাতার মণিদিদির কাছে চলে যাব।

মণিকা প্রশ্ন করল মানদারি'র সঙ্গে কি পিসীমার বনত না ?

অনীতা বলল, শুধু মানদারি'র কেন, এ বাড়ীর বি-চাকর কারুর সঙ্গেই পিসীমার বনত না। রাগী মেজাজের মানুষ তিনি। কোন কাজ করতে একটু দেয়ী হলেই চাকরবাকরকে বড় গালমন্দ করতেন।

একটু হেসে বলল অনীতা, আমিও পিসীমার খোঁটার হাত থেকে রেহাই পাইনি। এই দেখ না, কথায় কথায় বলেছিলাম, কি কুকণেই না পিসীমার দেওয়া পান খেয়েছিলাম। পাশের ঘর থেকে হার চুরি হয়ে গেল তবু জানতে পারলাম না। তাইভেই তিনি বেগে উঠে বা নর তাই বলে গাল দিলেন আমার। বললেন, আমি নাকি সন্দেহ করছি যে তিনি পানের সঙ্গে আমাকে কিছু খাইয়ে অজ্ঞান করে আমার হার চুরি করেছেন।

কত করে পারে ধরে বোঝালাম আমি যুগাকরেও ও ধরণের কোন কথা বলিনি কিন্তু তিনি রাগায়াগি কান্নাকাটি করে কাল রাত্রেই চলে গেলেন। ফুর্দ কঠে শেবের কথাগুলি বলে অনীতা চোখ মুছল।

বধাবীতি বাড়ীর বি-চাকরদের জেরা করার পর মণিকা রাজাবাহারকে বলল, আমি জেলে মানদারি'র সঙ্গে দেখা করতে চাই। ব্যবস্থা করে দিন।

রাজাবাহারের কোন করে পুলিশের অনুমতি আনিবে দিলে বাড়ীর গাড়ীতে একাই গেল মণিকা মানদারি'র সঙ্গে দেখা করতে।

কয়েক ঘণ্টা পরে খালি গাড়ী নিয়ে মোকার কিরে এসে জানাল, সড়্যার ট্রেনে মণিকা ক'লকাতার চলে গিয়েছে। বলেছে বিবি, জামাইবাবুকে বেলো, ভাল রাত্রে কিয়ব। বিবেক দরকারে ক'লকাতার যাচ্ছি।

পরদিন রাত্রে ত মণিকা কিরল ঠিকই কিছু দিদি, জামাইবাবুর সাগ্রহে প্রশ্নের উত্তরে বলল, সায়াদিন বোঝাবুরি করে আজ আমি বড় লাজ, কাল সকালে সব কথা বলব। সকলকে আরও বিস্মিত করে সে জানাল তার এখানের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। সেত পরদিন বিকালেই সে ক'লকাতার কিরে বাবে একটা তটিল মাথলার জামাইবাবুকে সাহায্য করতে।

সে কি ? মানদারি'কে জেলে কলে বেখেই চলে যাবি ?

অনীতার প্রশ্নে মণিকা উত্তর দেয়—হার ভাগ্যে বা আছে তাই তো হবে। আমি তো আর কারো ভাগ্য পান্টাতে পারি মা ?

আর আমাদের হীরটা ? রাজাবাহারের সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, সেটা পাওয়া বাবে তো ?

ভেমনি রত্নভরে মণিকা উত্তর দিল আপনাদের ভাগ্যে থাকে তো চোর নিজেই এসে হীরার হার কিরিয়ে দেবে। না থাকে তো পাবেন না কিরে।

মাক্রণ কৌতুহলে অনীতা রাত্রে ঘুমতে পারল না। অতদিনের চেয়ে সকালেই চায়ের টেবিলে বসে রাজাবাহারের মণিকা'কে ডাকতে পাঠালেন। মণিকা আসবার আগেই অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা টাকী এসে দাঁড়াল বাড়ীর সম্মুখে। তারপরেই পিসীমা পাগলের মত ছুটে এনে রাজাবাহারের পা জড়িয়ে ধরলেন। বাবা বসন্ত, আমার সুরোধকে বীচাও। সে কিছুই জানে না সব দোষ আমার।

কি হয়েছে পিসীমা, সুরোধকে কি হয়েছে ?

অনীতা আর রাজাবাহারের দুজনেই ব্যস্ত হয়ে পিসীমাকে তুলতে তুলতে ভিজ্ঞাসা করলেন।

হার চুরির দোষে পুলিশ সুরোধকে আরেষ্ট করেছে।

সে কি ? সুরোধ কি করে হার চুরি করবে ?

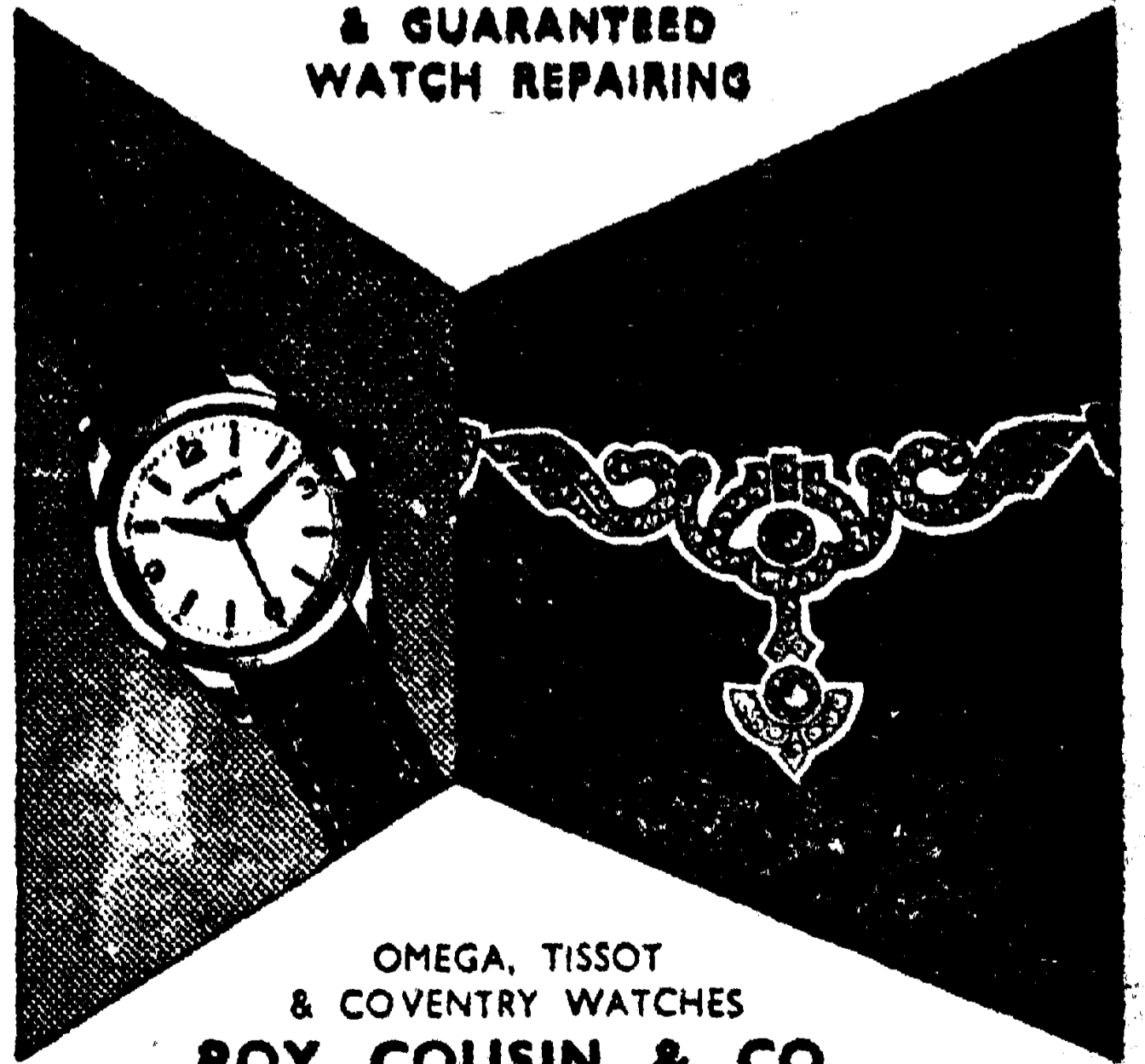
আমার দোষ বাবা ! বউমাকে পানের সঙ্গে একটা অজ্ঞান হবার ওষুধ খাইয়ে আমিই আলমারী থেকে হার বার করে নিই। তারপর কলিকাতার গিয়ে সুরোধকে হার দিয়ে বলেছিলাম, এ হারছড়া আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। এতদিন বসন্তর কাছে রাখা ছিল। তুই এ হার বিক্রী করে তোর ব্যবসায়ের স্বপ্ন শোধ করে দে। পিসীমা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

মণিকা ঘরে এল। পিসীমাকে কীদতে দেখে বলল, আপনি যদি পুলিশে সব দোষ স্বীকার করে মানদাকে খালাস করে আনেন আর তার কাছে ক্ষমা চান তাহলে আমি জামাইবাবুকে বলে আপনার ছেলের নামে মামলা তুলে নেব।

রাজাবাহারের ব্যস্ত হয়ে বললেন, কেস তো তুলে নিতেই হবে যদি, ঘরের কলঙ্ক কখনও বাইরে যেতে দিতে নেই। কিন্তু পিসীমা, এরপর থেকে আপনার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রইল না। হিঃ হিঃ। লোভের বশে হার চুরি তো করলেনই, আবার মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে অজ্ঞান করে একটা নির্দোষ বুড়ো মেয়েমানুষকে জেলে পাঠালেন ?

মণিকার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে নিরুপায় পিসীমা তার মর্গ মেয়ে মিলে। সায়াদিন ছুটোছুটি করে মানদাকে জেল থেকে মুক্ত করে, সুরোধের আর পিসীমার বিচ্ছেদে সব মামলা তুলে মিলে মণিকা ও

JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

রাজাবাহাদুর বখন বাড়ী ফিরলেন তখন কলিকাতার শেষ ট্রেন চলে গিয়েছে। অগত্যা মণিকাকে সে রাত্রে দিদির কাছেই থাকতে হল।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর অনীতা জিজ্ঞাসা করল, তুই কি করে বুঝি যে পিসীমাই চুরি করেছেন? মণিকা উত্তর দিল, প্রথম থেকেই আমার পিসীমাকেই সন্দেহ হয়েছিল। তবে তিনি নিজে যে চুরি করেছেন তা ভাবিনি। যে চুরি করেছে পিসীমা তাকে জানেন আর তার কাছ থেকে মোটা টাকা পাবার আশা করেন এই কথাই ভেবেছিলাম। আমার সন্দেহ ছিল যে মানদার ভাই-ই চুরি করেছে পিসীমার সাহায্যে। মানদার সঙ্গে তার ভাইয়ের ও যেমন বনত না, তেমনি পিসীমাও মানদাকে শত্রু ভাবেন। মানদা না থাকলে তিনিই এ বাড়ীতে রাণীর রক্ষয়িত্রী হয়ে থাকতে পারতেন। তাছাড়া রাণীকে কিছু বললে মানদাদি' সইতে পারত না, তাঁকে স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিত। এই সব কারণে ইদানীং পিসীমা মানদাদি'কে এবাড়ী থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছিলেন।

সেদিন জেলে গিয়ে মানদাদি'র কাছে শুনলাম হার চুরির দিন দুপুরে সে বাড়ী গিয়ে দেখে তার ভাজের অস্থলের খবর পেয়ে বউয়ের ভাই আর মা এসেছে। পাশের গ্রামেই তাঁদের বাড়ী। তাই মানদা ভাজের সঙ্গে তার ভাজকে বাপের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করেই ফিরে আসে। কারণ রাজবাড়ীতে রাণী দিদির অস্থখ। কখন কি দরকার হয় তাঁর বলা যায় না।

বাড়ীর সব ব্যবস্থা করতে মানদার ঘণ্টা দুইয়ের বেশী লাগেনি। সে বখন বাড়ী ফিরে-রাণীদিদির ঘরের বারান্দার পৌঁচেছে তখন দেখল পিসীমা সম্বর্ণণ ঘরের দরজা খুলে এদিক ওদিক চেয়ে দ্রুত নিজের ঘরের দিকে চললেন।

তাঁকে ওভাবে যেতে দেখে মানদার গুর হল হয়তো রাণীদিদির দরীর বেশী ধারণ হলে। সে পেছন থেকে ডাকল, পিসীমা, পিসীমা, রাণীদিদি কেমন আছে এখন?

মানদার ডাক শুনে পিসীমা কেমন যেন খতমত খেয়ে কি একটা জিম্বি কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে ফেললেন। তাঁর মুখ তখন তরে সাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তখনই সাইলে নিয়ে বললেন, ও কুই মানদা?

আমি ভাবলাম ঠিক দুপুরে কেউ কোথাও নেই, হঠাৎ ডাকে কে? এ বাড়ীর আবার তুতুড়ে বদনাম আছে তো?

মানদাদি' অবাক হয়ে গেল। কই, এত বছর সে রয়েছে কখনও তো কারুর কাছে এ বাড়ীর তুতুড়ে বদনাম সে শোনেনি। কিন্তু সে কথার উল্লেখ না করে সে আবার অনীতার কথাই জিজ্ঞাসা করল। পিসীমা জানালেন সে এখন ভালই আছে আর সুমোছে।

মানদাদি'ও ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, অনীতা ঘুমে আচ্ছন্ন। সে তখন দরজার কাছেই মাহু পেতে গুরে পড়ে। কি জানি কখন অনীতার ঘুম ভেঙ্গে কিছু দরকার পড়ে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা পর্বান্তে অনীতার ঘুম ভাঙেনি। শেষে রাজাবাহাদুরের আদেশে জোর করেই মানদাদি' তার ঘুম ভাঙায়।

মানদাদি' পুলিশকে পিসীমার এ আচরণের কথা জানায়নি শুধু। তিনি রাজা বাহাদুরের আত্মীয় আর মানদাদি' একজন সাধারণ বি

মাত্র। তার কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। বরং তাঁর আত্মীয়ের নামে দোষ দেওয়ার রাজাবাহাদুর চটে যাবেন।

মানদাদি'র কাছে সব কথা শুনে মণিকা কলিকাতার চলে যায়। সেখানে বড় বড় জুয়েলাসের দোকানে সে খোঁজ করে হুই একদিনের মধ্যে কোন বড়ঘরের বউ কোন দামী অলঙ্কার বিক্রী করেছেন কি না?

কিন্তু পিসীমা তো হারটা বিক্রী না করে নিজের কাছে রাখতে পারতেন? অনীতা বলল।

তা পারতেন। কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল টাকার দরকার বলেই পিসীমা চুরি করেছিলেন। মানদাদি'র কাছেই শুনেছিলাম পিসীমার ছেলে সুবোধ বাবুর ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল নয়, তাই তিনি রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে টাকা চেয়েছিলেন। রাজাবাহাদুর বলেন এখন খাজনা জমা দেবার সময়। এখন টাকা দিতে পারব না, পরে দেব।

পিসীমা বলেন, বউয়ের গহনা থেকে কিছু বাঁধা রেখে টাকা দাও। বড় দরকার সুবোধের। এ বিপদটা কেটে গেলেই সে তোমার ঋণ শোধ করে দেবে।

রাজামশায় বলেন তার চেয়ে সুবোধ ক'লকাতারই কোন ব্যক্তি থেকে ব্যবসায় বাঁধা রেখে টাকা নিক।

পিসীমা এ কথায় খুব রাগ করেন। শেষে তাঁর রাগ গিয়ে পড়ে অনীতার উপর। তাঁর ধারণা হয় রাণী গহনা দিতে অস্বীকার করতেই তিনি টাকা পেলেম না।

একটু চুপচাপ গেল। তারপর মণিকা আবার বলল, কয়েকটা জরিফ জুয়েলাসের দোকানে খোঁজ করেও হারের কোন সন্ধান পেলাম না। তখন মামাবাবুর পরামর্শ মতম ওখানকার সবচেয়ে বড় মণিকার ও জুয়েলাস' মিষ্টার ওরাইয়ের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলাম গতকাল বা আজ কেউ তাঁর কাছে কোন হীরা বা হীরার হার বাঁধা দিয়েছে কি না? হীরটার আর হারের বর্ণনা দিতে তিনি সেটা বের করে দেখালেন। কিন্তু কে দিয়েছে তা বলতে ইতস্তত করতে লাগলেন। কারণ বড়ঘরের গোপন কথা বলার তাঁর অধিকার নেই।

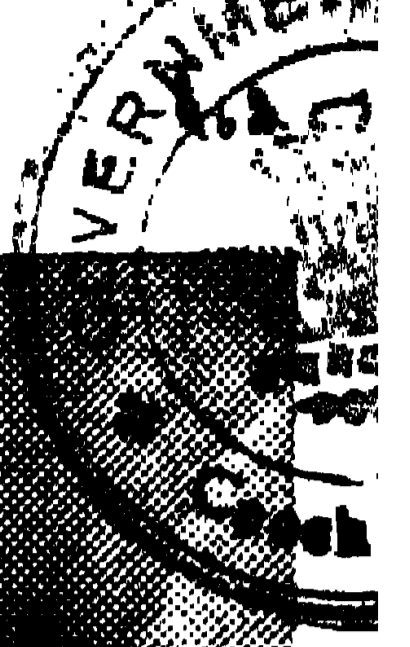
তারপর বখন মামাবাবু কাছে শুনলেন যে হারটা জোবাই হার, তখন বললেন সুবোধ বাবুই সেটা বাঁধা দিয়ে টাকা ধার নিয়েছেন। হারটি মণিকি তাঁর মায়ের।

মণিকা খামতে রাজাবাহাদুর বললেন, কিন্তু আমাকে মা জানিয়ে সুবোধকে অ্যারেট করার ভাল হয়নি। খবরটা জানাজানি হলে তার ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে।

মণিকা উত্তর দিল, খবর জানাজানি হবে না। সুবোধ বাবু যে অ্যারেট হয়েছিলেন, সে খবর মামাবাবু আর তাঁর সহকারী ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু সুবোধ বাবুকে অ্যারেট না করলে পিসীমাকে দিয়ে কিছুতেই স্বীকারোক্তি করান যেত না। বলে নির্দোষী মানদা জেল খাটত।

অনেকক্ষণ সকলে চুপ করে রইল। তারপর মণিকা নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, কাল জোরের পাড়ীতেই আমি ক'লকাতায় ফিরব। মানদাদি' আবার সঙ্গে যাবে।

মাসিক বসুমতীর প্রচার ও প্রসার বাওলা দেশের বিষয়!!



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটি কত সুখী, কত সমৃদ্ধ। কারণ ওর স্নেহময়ী মা ওকে নিরমিত অষ্টারমিল্ক খাওয়ান। অষ্টারমিল্ক বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত খাদ্য। এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিল্ক তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সব রকম তথ্যসম্বলিত। ডাক বরতের জগু ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়—“অষ্টারমিল্ক”, P. O. Box No. 2257, কোলকাতা-১।

...মায়ের দুধেরই মতন

কারের শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। দুই দেহগঠনের জগু চার পাঁচ মাস বয়স থেকেই দুধের সঙ্গে কারের খাওয়ানও প্রয়োজন। কারের পুষ্টিকর শস্যজাত খাদ্য-রাসা করতে হয়না—তুধু দুধ আর তিনির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চামচে করে খাওয়ান।



হাল হুঁসি আলয়া

আন্তোষ মুখোপাধ্যায়

প্রতিবেশী বলল, তুমি জাহান্নমে যাও।

দোষ তো করিনি, এ কথা কেন?

প্রতিবেশীর চোখ গরম, তোমার নেই কেন।

আবার এক দিন।

প্রতিবেশী বলল, সেলাম সেলাম, অনেক সেলাম।

সেলাম কেন ভাই?

প্রতিবেশীর চোখ নরম, তোমার যে অনেক আছে...তাই।

এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিবেশীত্বের এদিকটা দেখে বীরাপদ কাঁপরে পড়ে গেল। ওর জীবনে যেন হঠাৎই জোরালো স্বকন্ঠের সৌভাগ্যের আলো জ্বলে উঠেছে একটা। সেই আলোর সুলতান কুঠির বাসিন্দাদের চোখে ধাঁধা লেগেছে প্রথম। তারপর মড়েমড়ে সন্ধ্যা হয়ে একে একে কাছে এগিয়ে এসেছে তারা। আলো আর তাপের বিচিত্র মহিমা।

সুলতান কুঠিতে মাসে ছ'শ টাকা অনেক টাকা।

এই নতুন শ্রীতি-বিভূষণের মধ্যে পড়ে মনে মনে বীরাপদ সোনাবউদিকেই দারী করেছে সব কিছুব জন্ত। ওর সৌভাগ্যের কথা ঢাক পিটিয়ে বলে না বেড়ালেও তার কাছ থেকেই খবরটা ছড়িয়েছে।

সোনাবউদি পরদিনই এসেছিল। পরদিন দুপুরে।

অনেকদিন বাদে এই এক ছুটির দুপুরে বীরাপদ ঘরেই ছিল। মেডিক্যাল হোম রবিবারেও খোলা, কিন্তু ক্যান্টরী বন্ধ। সোমবারে তার ওপর ক্যান্টরীতে হাজিরার নির্দেশ। বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে এলোমেলো পাঁচ কথা ভাবছিল। একটা বড় কাজ সারা হওয়ার আশ্রিতি আর ভূপ্তি।

আধ-ভেজানো দরজা ঠেলে সোনাবউদি উপস্থিত। এক-মুখ পানে টসটসে টোট, হাতেও পানের খিলি গোটাকতক। সোনাবউদি কান বেশি খায় না, খায় যখন অমনি একগাদা খায়। দিকি লহজ, প্রসন্ন মূর্তি, যেন রোজই গল্পগুজব করতে এ-ঘরে এসে থাকে।

আসব, না বৃষ্টিছেন?

আসবেও জানে, বৃষ্টিছে না তাও জানে। বীরাপদ আগেই বড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল। জবাব দেওয়ার দরকার হয়নি, অভ্যর্থনার হাসিটুকু জবাবের থেকে বেশি।

দেখে নিয়ে ঘরের দরজা ছুটা টান করে খুলে দিয়েছে। ওপাশের বন্ধ জানালা ছুটার দিকে চোখ পড়তে তুফ কুচকে তাও ঠেলে খুলে দিয়ে এসেছে। তারপর হেসে কলে কুতকর্মের কৈকিরত দিয়েছে, এরপর ধীরে ধীরে খুলি ভাবুক—

সকাল থেকেই সোনাবউদিকে অনেকবার আশা করেছিল বীরাপদ। সুলময়েই এসেছে।—আপনার এখনো ভাবাজাবির গুয়টা আছে নাকি?

থাকবে না কেন? ছদ্মকোপে প্রায় চোখ রাঙিয়েছে সোনাবউদি, এরই মধ্যে এমন কি বুড়ী হয়ে গেলাম, জিজ্ঞেস করে আসুন ওই বিটলে গণৎকারকে—

কৌতুকটুকু ভিইয়ে রাখার জন্তে বীরাপদ ভাড়াভাড়া নিরীহ মুখে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। সে কথা নয়, আমি ভেবেছিলাম সেই এক অত সাজ করেই একসঙ্গে সকলকে ঘায়ের করে ফেলেছেন।

অসহায় ক্র-ভঙ্গি সোনাবউদির। দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে বসে পড়েছেন। দীর্ঘ-নিঃশ্বাসও ফেলেছেন।—যতই করি শিব-সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না। হাসি চাপার চেষ্টা, খবর বলুন শুনি—

কাল এই সোনাবউদি ও-ভাবে মেয়ে ঠেড়িয়েছে ভাবাও শক্ত। খবর শুনেই আসবে এবং এসেছে তা যেন জানাই ছিল বীরাপদের। খবর তো আপনার...

আমার? আমার আবার কী?

আনন্দ করে পান খাচ্ছেন...

ও, আয়েশ করে বার দুই-তিন পান চিবিয়ে মেনেই নিয়েছেন, কাল অমন একখানা ভালো গরম পেলাম, আনন্দ হল। ভাই খেলায়। আপনিও খান ছুটা...

ছুটা পান ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, বাকি দুটা নিজের মুখে পুরেছে। পান হস্তগত করে বীরাপদ বলেছে, আমি কেন, আমার তো আনন্দের কিছু হয়নি।

সোনাবউদির কৌতুকভরা দুই চোখ ওর মুখের ওপর খেমে ছিল খামিক, বাড়তি পানে মিচের টোট সিক্ত।—আপনারও হয়েছে, আয়নার দেখে আসুন।

খবর শুনেছে তারপর। কোথায় চাকরি, কি চাকরি, কেমন চাকরি। অসহিষ্ণু আগ্রহ, অত বুকিনা, কত মাইনে হল?

টাকা-পয়সার ব্যাপারে সোনাবউদির এ-ধরনের শাধা-সাপটা

কৌতূহল বা হিসেব-মিকেশ ধীরাপদ বহুদিন দেখে আসছে। এখন আর খারাপ তো লাগেই না বরং ভালো লাগে। খারাপ লাগতে গিয়ে অনেকবার যা খেয়েছে। রণুব অল্পে সেই পোট-হার বিক্রি করা, বা অনটনের সময়েও মাসের বরাদ্দ থেকে ওর দেওয়া বাড়তি টাকা মরিয়ে রেখে কুকার কেনার জন্য একসঙ্গে দেড়-বছরের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ধীরাপদ জীবনে ভুলবে না বোধ হয়। আসক্তি আর নিঃসঙ্গতার এমন গায়ে গায়ে মিতালি আর দেখেনি।

হ'শ টাকা। মাসে? সোনাবউদির পান চিবুনো খেয়ে গিয়েছিল, বিস্ফারিত চোখে সংখ্য আর বিশ্বর।—চাল মিছন না তো?

ধীরাপদ হেসে ফেলেছিল। সোনাবউদিও। আনন্দ করে না।

সোনাবউদির মুখ থেকে গুণ্ডা শুনেছে।

গুণ্ডা বিকেলে এসেছিল। উল্লোক কথাও বেশি বলতে পারে না, উচ্ছাসও তেমন প্রকাশ করতে পারে না। তবু সুখের স্তনে বসে সন্তব অন্তরঙ্গ আনন্দ জ্ঞাপন করেছে। আপনজনের ভালো স্তনে কত ভালো লাগে তাও বলেছে। বিনিময়ে ধীরাপদও আপনজনের মতই তারও চাকরির খোঁজখবর করেছে, উন্নতির কতটা কি হল না হল জিজ্ঞাসা করেছে।

একেবারে মরমের কথা গুণ্ডার। আশার উৎসে নাজা পড়েছে। হবে হয়ত একটা কিছু, হওয়া উচিত, চেষ্টা-চরিত্র চলছে। কিন্তু না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই, ধর-পাকড়ের জোর তো নেই বরং উন্টে মন্দ করার লোক আছে। লোকের ভালো ক'জন দেখতে পারে, সাব-এডিটরদের অনুবাদের বহর তো দেখছে বছরের পর বছর ধরে, গুণ্ডা চেষ্টা করলেও অত ভুল করতে পারবে না। মালিকদের বিচার বিবেচনা থাকলে অনেক আগেই হয়ে যেত। রমণী পণ্ডিত অংশ বলেছেন, সময়টা ভালো এখন, একটু আধটু ভালো নয়—যাতে হাত দেবে তাই সোনা হওয়ার কথা...। একটা অসহিষ্ণু খেদে উদ্দীপনা মান হতেও দেখেছে ধীরাপদ—যে এমন দজ্জাল মেহেমানুষ থাকলে বরাত ভালো হলেও কত আর হবে—তিন পা এগোলে হ'পা পেছন টানবে। নিরুপায় ক্ষোভে গুণ্ডার কঁসা মুখ জাল।—নিজের চোখেই তো দেখলে কাল, নির্বোধের মত গৌ ধরে লাভের মুখে ছাই জেলে ছাড়ল—কড়কড়ে আড়াই শ' টাকা লোকসান, তার ওপর শুধু দুই মেয়েটাকে ঠেঙিয়ে আধমরা করল, রাগের মাথায় তোমাকেও কি না কি বলে ফেললাম...

রাগের মাথায় ওকে কি বলা হয়েছে না হয়েছে ধীরাপদ মনেও নেই। কিন্তু চিন্তাহের কারণ স্তনে হতভম্ব। আড়াই শ' টাকা লোকসান কেন?

সেটা আর বলেনি বুঝি? বলবে কেন, আর কেউ আড়াই টাকা লোকসান করলে ঢাক পিটিয়ে বলত। ঢৌক গিলে গুণ্ডা গৃহিণীর হঠকারিতা কঁাস করে দিয়েছে। তার অকিসের এক উল্লোক নিয়মিত রেস খেলে, অনেক সময় অনেক খবর দেয়, গুণ্ডা কানও দেয় না কোনদিন, ঘোড়দৌড়ের মাঠও আজ পর্যন্ত ভালো করে দেখেছে কি না সন্দেহ। সেদিন সেই উল্লোক অব্যর্থ খবর পেয়ে গেছল একটা, হুঁরে হুঁরে চার কবার মত নির্ভুল খবর—একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের শুধু দিয়েছিল খবরটা। গুণ্ডা তাও কান দিত না হয়ত, কিন্তু রমণীপণ্ডিত বলেছিলেন ঘনস্থানে রাহ তুঙ্গী এখন,

চন্দ্র-স্বপ্ন গিলে বসিও অনন্তব নয়। তাই অনেক বুঝিয়ে শ্রুতিকে সোনাবউদির কাছ থেকে গুণ্ডা মাত্র পঞ্চাশটি টাকা চেয়েছিল। টাকা দেওয়া হুঁরে থাক একেবারে বুকে পা দিয়ে কাণীর নাচ নেচেছে। ওদিকে সেই ছোড়া ঠিক প্রথম এসেছে। শুধু প্রথম? টাকার আশ্রিত মুখে নিয়ে প্রথম—এক টাকার পাঁচ টাকা, পঞ্চাশ টাকার আড়াই শ' হত।

কৌম করে বড় নিঃখাস ফেলেছে গুণ্ডা। সন্তর্পণে ধীরাপদও। বাবার আগে গুণ্ডা ওর আশাতীত খুশির খবরে আবারও আনন্দ জ্ঞাপন করে গেছে।

গুণ্ডার কাছ থেকে রমণী পণ্ডিত শুনেছেন।

কালো মুখে উদ্দীপনার জলুস বার করে সকালেই হস্তদত্ত হয়ে একেবারে ঘরে এসে হাজির। শকুনি ভট্টচার আর একাদশী শিকদারের টিপনীর পরোয়া করেননি, ধীরাপদর হ'শ টাকার জোরে তাঁরও জোর বেড়ে গেছে।—কি মশাই, সকলের আগে কোথায় আমি খবরটা পাব, না আমাকেই কঁাকি। বলেছিলাম কিনা আপনার অনেক হবে, আমার কথা, মিলিয়ে নেবেন একদিন—বলেছিলাম কিনা বলুন?

না বললেও অস্বীকার করা শক্ত, তবে রমণী পণ্ডিত বলেছিলেন ঠিকই। সোনাবউদির ব্রতভঙ্গের নেমস্তুরে বাদ পড়ার চুখে রাতে কদম-তলার বেঞ্চেতে বসে আর পাঁচ কথার সঙ্গে এই কথাও বলেছিলেন। বাজার করে দিচ্ছে ও নেমস্তুর এড়িয়েছিল সেই

ফোন ৬৪-৬২৩১

পি, পি, তাত্য

জুয়েলার

১২৫-বি. বহুবাজার স্ট্রীট. কলিকাতা-১২

আমকে বলেছিলেন। উভাসিত মুখে আজ জোর করেই ওর ডান হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়েছেন, অর্থাৎ দেখবেনই তিনি হাত। দেখেছেন আর পক্ষ মুখে ভেঙে পড়েছেন তারপর। ভাগ্যের বিড়িতে ধরে থা পড়ল, এখনো অনেক, অনেক বাকী।—একাদশ বৃহস্পতি কুশাই, একাদশ বৃহস্পতি। ওরু তাই? জ্বল কড়া, সব চড়া দৌর বীরে হাত ডবা। উজ্জ্বলের ডোড়ে বীরপদ সরে বসতে চেষ্টা করেছেন।

—হাত তো হবে আজ দেখলেন তিনি, এই ক্রমে যে আনবে তাঁর ডানাই ছিল। হাত না দেখেই তো বলেছিলেন যে কথা। তুলসী দেখলেই তিনি বুঝতে পারেন কার পিছনে বন্দী বুরছে, কপাল দেখেই বসন্ত লিতে পারেন কার কপালে ভাগ্য নাচছে। দেখে ওর ভাবটা থেকে নিজের হুঁতুয়া এসেছে এসে ভিত্তিত হয়েছেন আর নাহুলসে একটা আবেদন ব্যক্ত করেছেন। গত এক মাসে মতুল পুরসো বইয়ের দোকানের দালিক দে-বাবু বীরপদর খোঁজে হুঁতুল মিল মিলে এই হুলতান কুঠিতে এসেছিলেন, পশ্চিমের সঙ্গে তখন তাঁর আলাপ হয়েছে। আর একটা ওখু কিনতে গিয়ে পাকেচক্র একটু আখটু আলাপ পরিচয় হয়েছে কবিরাজী দোকানের অধিকা কবিরাজের সঙ্গেও। এখন এই হুঁতুলের কাছে তাঁর হয়ে একটু সুপারিশ করতে হবে, বীরপদ যে কাজ করত সে কাজ উনি বহুস্বামী করতে পারবেন। বিজ্ঞাপন লেখা ছাড়াও দে-বাবুর লজ্জা ভালো ভালো বইও লিখে দিতে পারবেন তিনি, তাঁর জ্যোতিষীর বইয়ের কদর কম হবে না। ঘরের অচল অবস্থা প্রায়, এটুকু সাহায্য বীরপদকে করতেই হবে, এই সুরোগটুকু পেলে হয়ত একদিন ঘর ভাড়া নিয়ে জ্যোতিষীর দপ্তরও খুলে বসতে পারবেন তিনি।

মেডিক্যাল হোমের রমেন হালদাবের স্বপ্ন ওসুধের দোকান করবে, পশ্চিমের স্বপ্ন জ্যোতিষীর দোকান। বীরপদ রমণী পশ্চিমকেও সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে হাঁপ কলে বেঁচেছে।

সকালে কদম তলার হাঁকোর আগরে তাঁর কাছ থেকে শকুনি ভট্টচার, আর একাদশী শিকদারও এই ভাগ্যোদয়ের সমাচার শুনবেন জানা কথাই।

সেদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙতে বীরপদর মনে হয়েছিল কল-পাড়ে শকুনি ভট্টচারের উষা-কাশির ঠন ঠনে শকুনি যেন আগের থেকে ভিত্তিত। আর অনেক বেশি কষ্টক্লিষ্ট। অনেককণ বিহানায় এপাশ ওপাশ করে শেষে বীরপদ বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

কদমতলার বেড়ির সামনে হাঁকো হাতে একাদশী শিকদার দাঁড়িয়ে। বসতে পারছিলেন না বলে দাঁড়িয়ে। জানালা বন্ধ দেখে কাগজওয়াল বন্ধ দরজার গায়ে কাগজ কলে গেছে। কাউকে কিছু না বলে শিকদার মশাই দোরগোড়া থেকে কাগজ নিয়েও বেতে পারছেন না, আবার চোখের সামনে কাগজ পড়ে আছে দেখে শান্তি মত বসতেও পারছেন না। বীরপদ বাইরে আসতে সতৃষ্ণ চোখ জোড়া কাগজের ওপর থেকে ওর দিকে ঘুরেছে। উদগ্রীব প্রতীকা, প্রতীকার বাতনা।

—বেঁচে থাকে বাবা, দিনে দিনে জীবুছি হোক। বা হাতে হাঁকো, শিরা বার-করা শীর্ণ ডান হাত বাড়িয়ে বীরপদর হাত থেকে কাগজ নিয়েছেন। ব্যগ্র চোখ হাঁটো কাগজের ওপর থেকে ছিঁড়ে এসে ওর দিকে তুলেছেন।—রমণীর মুখে স্তম্ভিত বাবা, বড় আনন্দ

হয়েছে শুনে—বার ভিতরে কি আছে একি তার বাইরে থেকে বোকা বার, কত মনর কত অবসেসাই না করেছি—

আশীর্ষনে নয়, আনন্দ হয়েছ শুনেও নয়, শেষের কথাটার বীরপদ অবশি বোধ করেছে। বেড়িতে বসেও একাদশী শিকদার কাগজ পড়া একটু স্থগিত রেখেছেন। বন্দীরেখার হিতবিধি মুখখানা ওর দিকে তুলে ধরেছেন, তা তুরি বাবা নিজের ওখেই কারো ক্রটি ধরো না জামি, এখন তো বড় লোক, বড় আশা-ভরসা। মুখে হঠাৎই বেন আশা উঁকি-কুকি দিয়ে উঠেছিল একটু, আগ্রহে কদার ঘর রেখেছিল।—তুরি তো বাবা নিজেই আর একখারা কাগজ হাথতে পারো এখন, বালা কাগজ,—পারো না?

কামজ। অকুট বিখর বীরপদর।

একখারা কাগজ পড়ে ঠিক হব হয় না, আরো তো বড় কাগজ আছে—ভাড়াটা এক কাগজে সব খবর থাকেও না বোধহয়। থাকে?

বড় খবর সবই মোটামুটি থাকে। বীরপদ না ভেবেই বলেছিল।

মন:পূত হয়নি।—ওরু সব তো থাকে না, কোন্ খবরটা কার কাছে বড় তার কি ঠিক আছে।

সত্যি কথা। জবাব নেই।

ইত্যবসরে গজাললের বাটি হাতে শকুনি ভট্টচার উপস্থিত। বীরপদকে দেখে অবাক হলো আগে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। উপবীত স্পর্শ করে একখানি শীর্ণ হাত তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে অকুটবরে আশীর্বাদ করেছেন। বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত মিশিয়ে আশীর্বাদটুকু দীর্ঘতর করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হাঁপের-ঠেলার ক্যাশফেশে কাশির দমকে পেয়ে উঠেননি, কাশতে কাশতে বেড়িতে বসে পড়েছেন।

শিকদার মশাই কাগজে ডুবেছেন। সোনারউদির মত বীরপদও হুঁতুলের পারের খুলো নিয়ে কেলবে কিনা ভাবছিল। অতটা পেয়ে ওঠেনি। ভট্টচার মশাইয়ের কাশির বাতনা দেখে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল, ভুললোক এরই মধ্যে এত কাহিল হয়েছেন লক্ষ্য করেনি।—আপনার কাশিটা কি আগের থেকে বেড়েছে নাকি?

আর বাবা কাশি... কাশির দমকে আটকে গিয়ে হাত তুলে আকাশ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এবারে গেলেই হয়। চোখে জল এসে গিয়েছিল। সেটা দমবন্ধ কাশির বাতনায়ও হতে পারে, আবার মাটির টান টিলে হয়ে আসছে বলেও হতে পারে। সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে খেদপ্রকাশ করেছেন, সব ক্ষেত্রেই মনে হয় হয়ে গেল, এবারে আরো বেশি—একটু আখটু খাঁটি চ্যবনপ্রাস পেলে হয়ত কমত, অগ্নিমূলের বাজারে খেয়ে-পরে প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত, ওখু জুটবে কোথা থেকে।

পাছে এরপর রমণী পশ্চিম এসে হাজির হন সেই ভরে বীরপদ ভাড়াভাড়ি সরে এসেছে। এই হুঁই বৃদ্ধের লজ্জা বীরপদ মমতা বোধ করেছিল কিনা জানে না। মাহুবেব এই অসহায় দিকটাও পীড়ার কারণ হতে পারে।

রমণী পশ্চিমকে এড়ানো সম্ভব হয়নি। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর প্রবৃত্ত দলিলে সই করার মধ্যে তর্কাত নেই খুব।

দিয়ে হাতির হয়েছে যে বাবুর কাছে আর অধিকা কবিরাজের কাছে।

প্রথম দর্শনে আসে উঠতে দিয়েও আসে উঠতে পারেননি নতুন-খুনো বই এর দোকানের দে-বাবু। গোল গোল চোখ দুটো বীরাপন্নর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিচরণ করেছে এককথা।—দিন কয়েকে যেন হচ্ছে বেন মখারের।

দিন কতটা বকলেছে তা রমণী পণ্ডিতই বলে দিয়েছেন। বেই করার বৌকে রাখে হ'খ টাকা আটপ হাজারে ঠাঁড়িয়েছে। দিন আরো কত বকলেছে তারও একটা মিশ্রিত ছবি এঁকে দিয়েছেন দে-বাবুর চোখের সামনে—হ'চার হাজার টাকা হামেশাই ভান-পকেট বাঁ-পকেট করতে হবে। এই দিন খকলের ভক্ত-বোগওগি যে অনেক আশেই তিনি ছুকে দিয়েছিলেন দে-কথাও জানাতে জ্ঞানেন মি।

রমণী পণ্ডিতের উদ্ভেদ সকল। তাঁর অজ্ঞাত গধনার ফল চোখের সামনে দেখেও দে-বাবু অবিধাস করেন কি করে। বীরাপন্নর না হয়ে আর কেউ হলেও কথা ছিল। টাকার জোরে আর কাজের ভাসিমে বস্তাই চোখ হাতাম, তলায় তলায় প্রভাও করতেন একটু। ভালো কাজ করত, বিনিময়ে ঠকালেও বুকে-ভনেই ঠকত—এক এক সময় মনে হত সেই বেন উন্টে অধুকা-দেখিয়ে গেল তাঁকে। অমন মাথাওয়াল নিবিহার কাজের লোক দে-বাবু বেশি দেখেননি। প্রস্তাবমাত্রে কাজ হল। রমণী পণ্ডিতকে কাজ দেখেন তিনি, আর, কৃত-ভাবিহ্যত চোখের সামনে নাচে এমন একখানা সহজ-সরল জ্যোতিষীর বই লিখতে পারলে ছাপতেও আপত্তি নেই তাঁর। তবে

পুরনো বন্ধুকে একেবারে জেঁলা চলেবে না বীরাপন্নর, বকোর বলা একটু সাহায্য করতে হবে।

দে-বাবু এখন আর বলিব নন, বন্ধু। হাসি চেপে বীরাপন্নর প্রতিজ্ঞা দিয়েছে।

অধিকা কবিরাজের দোকানেও সেই একই প্রহসন আর একই উপহাসহার। বীরাপন্নর দেখিয়ে ভাবিয়ে দিলে রমণী পণ্ডিতকে কাজ দিতে আপত্তি নেই তাঁরও। বেখার থেকে বেতবার আগে তি ভেবে বীরাপন্নর চ্যবনপ্রাস কিনেছে এক কোঁচো। নিজের দরকার ভনে অধিকা কবিরাজ তিতর থেকে খাটি জিনিস বার করে দিয়েছেন মাকি, আর লাভ ছেড়ে বার দিয়েছেন।

কিরতি পথে যানের ভিড়ে রমণী পণ্ডিত উজ্জাস প্রকাশের স্বযোগ পাননি। বান থেকে মেখে তাঁর বুনিয় অবতরবিকার দুখেই বীরাপন্নর চ্যবনপ্রাসের কোঁচোটা এগিয়ে দিয়েছে।—ভট্টচার মশাইকে দিয়ে দেবেন, ডব্বলোক বড় বই পাচ্ছেন। কিনেছি বলবেন না।

হাতের অধিকারেও পণ্ডিতের বিশ্বর উপলভি করা গেছে। উজ্জাস এবার মহাহুভবতার খাতে গড়াতে দেখে বীরাপন্নর বাবা দিয়েছে, বিজ্ঞাপন লিখতে হলে একটা ডিকশিনারি বোগাড় করে ভালো ভালো বিশেষণ মুখস্থ করুন—

রমণী পণ্ডিত হেসেছেন, জ্যোতিষীর ডিকশিনারি হাতড়ে অলঙ্কার খুঁজতে হয় না মশাই, আপনি নিশ্চিত থাকুন। তা বলে আপনার সবচেয়ে বা বলেছি একটুও বাড়ানো নয়, ও নিশ্চিত কসবে দেখবেন।

ক্যালকেমিকোর
ক্যাস্টরল
 মনোরম গন্ধযুক্ত ক্যাস্টর অয়েল
 ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্যমে সহায়তা করে
 বড় শিশি কার্টন ছাড়া ও ছোট শিশি (পূর্বের ৫ আউন্স) কার্টন সমেত
 পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
 বঙ্গবাজার-২৩

আর পশুপদ কবচে বা বলেছেন ?

বেথারা প্রায় শুনে রমণীপণ্ডিত খতমত খেয়ে গেছেন। কোন্ জবাবে ভূট হবে গলার ঘরে স্পষ্ট নয় তেমন।—উঁহও ডালই, তবে এক একজনের ভালো এক একরকম। আপনার ভালোর সঙ্গে তাঁর ভালোর তুলনা হবে কেমন করে। তাঁর ট্যাগার্ট লক্ষ্যবাহী তাঁরও ভালো, বেশ ভালো—

ওই ভালোটা আর একটু কম কাঁপালে ভালো হয়, তত্বেলোক বিগড়ে কেতে পারেন।

তত্বেলোক বিগড়োন আর মা বিগড়োন, পণ্ডিত একটু বিগড়েছেন। পারে-চলা পথ ধরে মজাপুরুষের কাছাকাছি পর্যন্ত গম হয়ে থেকে বলেছেন, শুধু ভালোর খবরটাই বুঝি আপনাকে সাতখানা করে শুনিয়েছেন উনি, খারাপও তো কম বলিনি, সে-কথা বলেছেন ?

বীরপদর প্রথম মনে হয়েছে খারাপের ইজিতটা সোনাবউদিকে নিয়ে।...গম্বন নয়। ওয়ই কাছে সে-রকম ইজিত করবেন রমণী পণ্ডিত অন্তটাই নির্বোধ মন। সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে বীরপদ খুব শান্তমুখে আবার বলেছে, অস্তের খারাপ ভালোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিকটাও একটু দেখা দরকার বোধহয়...আপনার মেয়েটা এখনো ছেলেমানুষ একেবারে, একটু নজর রাখবেন।

রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে গেছেন। সুলতান কুঠির অন্ধকার আড়িনায় কালো মুখের ধমকানি ভালো করে দেখা না গেলেও অনুমান করা গেছে। আর একটি কথাও বলেন নি, একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি। কলে বীরপদর ধারণা, তত্বেলোক সব জেনেই চোখ বুজে ছিলেন আর চোখ বুজে আছেন। মেয়ের চাল-চলন যে আরো কারো চোখে পড়েছে, চূপ করে থেকে সেই ধাক্কাই সামলেছেন শুধু।

নিজের ঘরে ঢুকে বীরপদর মনে হয়েছে, না বললেই হত। রেষ্টারায় বাদেই সঙ্গে দেখেছিল মেয়েটাকে তাদের একজন তো আত্মীয়ই বটে। ছেলেমানুষদের নির্দোষ আনন্দ নিজের চোখের দোবে হলে লেগেছে কি না কে জানে। মন বলেছে তা নয়, তবু সফোট।

অফিসের জঙ্গে তৈরি হয়ে বেশ সকাল সকালই বেরুতে হয় বোজ। হোটেলের 'কিউ'তে আটকালে খাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি। কিন্তু বেরুবার মুখে বাধা, রমণীপণ্ডিতের দশ বছরের ছেলেটি হস্তদস্ত হয়ে এসে শেখানো বুলির মত বলে গেল, বাবা আপনাকে দয়া করে একুনি একবারটি আমাদের ঘরে আসতে বলেছেন—

ভালো করে শোনার আগেই বার্তাবহ অদৃশ্য।

পায়ে পায়ে কোণা-ঘরের প্রথম ঘরটিতে ঢুকেই বীরপদ হতভম্ব। দরজার কাছে কালো পাথরের মূর্তির মত রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে, অন্ধের জানালার মুখ গুঁজে কুয়ু কান্নার ভেঙে পড়ছে, পাথের ঘরের দরজার নিচ দিয়ে রমণী পণ্ডিতের রমণীটির পা দেখা যাচ্ছে।

বীরপদ নির্বাক।

এই, এদিকে আর।

খারাপের কর্তার আদেশে মুখে আঁচল গুঁজে মেয়েটাকে জানালা থেকে সরে আসতে হয়েছে। শাসন আর নির্বাসন বস্তুটা হবার

বীরপদর হ'ল ছিল না যেম। তারই হুই পারের ওপর মুখ গুঁজে মেয়েটা কুলে কুলে কাঁদছে। রমণী পণ্ডিতের হুই চোখে শাসনের তৃপ্তি এবং প্রতীকা। যেন বীরপদর কাছেই মেয়ের সমস্ত অপরাধ, সে কমা না করা পর্যন্ত কমা নেই।

হাত বাড়িয়ে বীরপদ কুয়ুকে তুলতে চেষ্টা করেছে, মেয়েটা গুর পা দুটো আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে।

ওঠো—।

ক'বরে কাজ হয়েছে। কুয়ু উঠেছে।

যাও, তিতরে যাও।

এই আদেশও পালন না করে পারেনি। চলে গেছে।

যাগে বিড়ফায় আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে বীরপদ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। হনহনিরে সুলতান কুঠিও পেয়িয়ে এসেছে। হোটেলের পথে না গিয়ে ক্যাটরীর বাস ধরেছে। সারা পথ অল্পশোচনা আর অশান্তি। মেয়েটার ওই অত কান্নার কীকে কীকেও বা চোখে পড়ছিল সেটা কী? কুয়ু কাঁদছিল, কিন্তু আর কিছু যেন ব্যঙ্গ করছিল ওকে।

নীতির মুঠোর যৌবন ধরে কোনদিন ?

সুলতান কুঠির বাইরে ছ'শ টাকা মাইনেটাই সবথেকে বড় ব্যাপার নয়, মর্ষাদার দিকটা আরো বড়। সব শুনে চাকদি শাদাসিধে মস্তব্য বয়েছেন, মাইনে আরো কিছু বেশি হবে ভেবেছিলেন তিনি, কিন্তু মাইনের জঙ্গে ভাবনা নেই, মাইনে অনেক বাড়বে—দায়িত্বটাই আসল, সেটা যেন ও ভালোমত দেখে শুনে বুঝে নিয়ে চলতে পারে।

বীরপদ অবাক হয়েছিল, চাকদির স্বার্থের উৎসটা আজও ঠিকমত ধরা গেল না।

মর্ষাদার আসন লাভ করা আর সেই মর্ষাদার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে কিছু তফাত আছে। সেই তফাতটুকু খোচানো তেমন সহজ হচ্ছিল না বীরপদর।

ধুতি-পাঞ্জাবী পরে অফিস করবে না আর পাঁচজনের মত কোটপ্যাট চড়াবে, সেটাই এক সমস্যা ছিল। এ নিয়ে কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। শেষে ধুতি-পাঞ্জাবীই বহাল রেখেছে। মুখে কেউ কিছু না বললেও গোড়ায় গোড়ায় সেটা লক্ষণীয় হয়েছে। অবশ্য এই ধুতি-পাঞ্জাবী আগের ধুতি-পাঞ্জাবী নয়। সোনাবউদি মুখটিপে ঠাট্টাও করেছিল, যবলে-মাজলে চেহারাখানা খুব মন্দ নয়তো দেখি...।

ছোট সাহেবের ঘরের পাশেই আলাদা ছোট ঘর তার। ঘরের তিতরে হাল-ফ্যাশানের অফিস-সরঞ্জাম, বাইরে নেম-প্লেট, দোরগোড়ার টুলে শাদা টুকোটার ওপর কোম্পানীর লাল ছাপ-মারি বেরা।

প্রথম দিন স্বঃ বড় সাহেব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন তাকে। বলা বাহুল্য, বীরপদ শুধু শুনেছে, বোঝেনি। ছোট সাহেবের নির্দেশ মতই কাজ করতে হবে তাকে। সাধারণ প্রচার-চাকরিক্য বাড়ানো, বিজ্ঞাপন দেখা, খবরের কাগজ সরকারী দপ্তর আর ডাগ হাউসগুলোর সঙ্গে বোগাযোগ রাখা, বর্ষচারীদের

হোমের বিধি-ব্যবস্থা তদারক করা—এক কথায় ছোট সাহেবের পরেই কোম্পানীর ব্যবস্থার তদারকানের ভার তার।

তারটা বীরাপদর কুকের ওপর অনেকদিন পর্যন্ত গুরুভারের মত চেপে বসেছিল।

এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের কর্তব্যের সিংহাসন মিত্র, প্রোডাকশানের অমিতাভ ঘোষ। কেউ কারো থেকে কম নয়। তবু মাইনে বা প্রাণান্ত বিচার করতে গেলে ক্যাস্ট্রীর প্রধান ব্যক্তি অমিতাভ ঘোষ। তার মাইনে চোক্ষ' টাকা, দাপট ক্যাস্ট্রীর জোড়া। সেই দাপটের কাছে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান আর প্রোডাকশানের সীমাবদ্ধি অবলুপ্ত। কলে চিক কেমিষ্টের মেজাজের আওতায় কোনো কর্মচারীই নিরাপন্ন বোধ করে না খুব। বীরাপদ তবু এই একজনের অধীনে কাজ গেলে সব থেকে খুশি হত, নিশ্চিত হত।

কিন্তু কাজের দিক থেকে তার সঙ্গে সামান্যতম বোঙ্গের সম্ভাবনাও দেখল না।

অর্গানাইজেশান টীকের সচেতন পাঠার্থী সিংহাসন মিত্র ওকে সঙ্গে করে সমস্ত বিভাগগুলো ঘুরে দেখিয়েছে, অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তারপর একে একে কাইল চিনিয়েছে। প্রচারের কাইল, বিজ্ঞাপনের কাইল, খবরের কাগজের মন্তব্য সংগ্রহের কাইল, সরকারী দপ্তর আর ড্রাগ হাউসের কাইল, কর্মচারীদের কাইল, মেডিক্যাল হোমের কাইল। এত স্রুত ভালো, যে বীরাপদর চোখের সামনে সবই ঘয়ামোছা। কিন্তু ছোট সাহেবের ধারণা, সুপারভাইজারকে সব দেখানো হয়ে গেছে। সরাসরি কাজ চালান করেছে তারপর। এটা করুন, ওটা দেখুন, সেখানে যান, এই কামেলা মেটান, ওই রিপোর্ট দিন—

বীরাপদর হিমসিম অবস্থা। এক ফটার কাজ তিন ঘণ্টার হয়ে ওঠে না, এক বাণীর তিন বার করে জিজ্ঞাসা করে আসতে হয়। ছোট সাহেব অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু গোপনও থাকে না খুব। নিজে ব্যস্ত থাকলে লাভ্য সরকারকে দেখিয়ে দেয়, ওঁর কাছে যান, বুঝিয়ে দেবেন—

সে ঘরে না থাকলে লাভ্য নিজেই তাকে, কি আটকালো আবার, আশ্রন বলে দিচ্ছি—

বলে দেয়, বুঝিয়েও দেয়। আর বীরাপদর মনে হয় তলার তলার হাসেও। নিজে সে কোনো কাজের কাই করমাশ করে না, ঘরে ডেকেও পাঠায় না। তেমন দরকার পড়লে লাভ্য নিজেই উঠে আসে, আলোচনার ছলে বক্তব্য জানিয়ে যায়।

তবু বীরাপদর মনে মনে ধারণা, এখানকার বত সব নীরস কামেলার কাজগুলো ছোট সাহেবের নির্দেশে ওর থাকে এসে চাপলেও তার পিছনে এই রমণীটির হাত আছে। ধারণাটা একেবারে অহেতুক নয়। মেডিক্যাল হোমের রমেন হালদারের মুখে লাভ্য সরকারের কর্তৃত্বের কথা শোনা ছিল। এখানে এই কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতার কর্মচারীদের হাবভাবেও তার পরোক কর্তৃত্ব-প্রসঙ্গে এক-ধরনের বিজ্ঞপাত্তক বিশ্বাসের আভাস দেখা গেছে।

পুঙ্খ রূপারনিক বলেই হয়ত জীবিকার মূল-বাহুবে নারীর প্রভাব তেমন জীবিতর চোখে দেখে না।

—ছোট সাহেবের সঙ্গে কথা বলার আগে আপনি সার নিস

সরকারকে একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়, তিনি মাঝি হলে আটকাবে মী।

কিনা নোটাসে দিন কতক কামাই করার কামেলার পক্ষে আবেদন জানাতে এসে একজন কর্মচারী নবাগত কুফিকটিকে সাহায্যের হাতাও দেখিয়ে দিবেছিল। বীরাপদ বলেছিল, ছোট সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করবে। জবাবে ওই উক্তি।

নতুন বয়লার চালানো নিয়ে অমিতাভ ঘোষের সেই টিগনীও বীরাপদ ভোলেনি।—তুমি বললে এখানে সব হবে, এতদ্রিখিং ইজ, পসিবল।

কিন্তু বাস্তব: তার প্রতি লাভ্য সরকারের ব্যবহারে কর্তৃত্বের সামান্য আভাসও দেখা যায়নি এ-পর্যন্ত। বয় নিস্পৃহ মৌলের জীবিতভাবেই লক্ষ্য করেছে একটু। বীরাপদর বিশ্বাস, সেটা তবু সমান মাইনের এই অপ্রত্যাশিত উঁচু আসনে ওকে এসে বসানো হয়েছে বলেই মনে হয়। তবু ছোট সাহেবের ওপর আধিপত্যের বলেই তার কর্মতার ওজন এখনো অনেক বেশি। কিন্তু ওর বেলায় সেই ওজনটুকুও যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন, তার সত্বত অন্ত কারণ।

কারণটা তুম্ব।

গত তিন সপ্তাহের মধ্যে চাকরি বার তিনেক ডকে টেলিকোমি ডেকেছেন। বীরাপদর টেবিলে টেলিকোন আসেনি শুধোনা। এ ঘরে হুজুমের টেবিলে দুটো টেলিকোন। ডাকটা প্রত্যেকবার লাভ্যর টেবিল থেকেই এসেছে। বাইরের বল এসে ক্যাস্ট্রীর অপারেটরই হয়ত ছোট সাহেবকে বিরক্ত না করে এই টেবিল কামেকশান দিয়ে দেয়। চাকরির টেলিকোনের বলেই বীরাপদর সুপারিশের জোরটা লাভ্য সরকার আঁচ করতে পেরেছিল বোধহয়। অন্তত সেই রকমই মনে হয় বীরাপদর।

তাছাড়া মেজাজ পত্র ভালো থাকলে যখন তখন নিজের টেবিল থেকে টেলিকোন করে অমিতাভ ঘোষও। কখনো বলে, ক্রী থাকলে চলে আসুন, কখনো বা টেলিকোনেই গল্প জুড়ে দেয়। বীরাপদর ঘরেও এসে বসে থাকে মন্তে। বীরাপদর টেবিলে তার প্রিয় সিগারেট মজুত থাকে এক টিম, সেই লোভেও আসে। লাভ্যর চোখে সুপারভাইজারের পদমর্দকার সঙ্গে এই মর্দনাটুকুও যোগ হয়েছে। মুখ ফুটে একদিন জিজ্ঞাসাও

ডাঃ বসু

মেমোরি কার্ডিয়েল

নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

প্রথম প্রস্তুতকারক:

ডাঃ বসু ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯

কই কেলেছিল, মিঃ ঘোষের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় কই কালের। ছ'মাসেরও নয় শুনে মনে মনে অবাক হয়েছে।

তাকে নিয়েও যে ব্যঙ্গ-বিক্রম চলে টেলিফোনে, টের পাশ কিনা কে জানে। এইমত মত একদিন টেলিফোন হয়ে মাজেহাল অবস্থা বীরাপদর। ওদিক থেকে চীক কেমিষ্টের হাঙ্কা প্রশ্ন, আপনার সামনে যে মহিলাটি বসে তার মুখখানা ভার-ভার কিনা দেখুন তো—

লাবণ্য সরকার মাথা নিচু করে লিখছিল কিছু বীরাপদ একটা চকিত দুই নিক্ষেপ করে জবাব দিল, ঠিক বুঝি না। কেন?

পলাটা ভার-ভার লাগল, ডালো করে লক্ষ্য করে দেখুন। লবু তাগিদ।

...বেশা শক্ত। মা তাকিয়েও বীরাপদ টের পেল, বলল বেবে লাবণ্য সরকার মুখ তুলেছে।

এদিকের লোকটা বিব্রত যৌব কয়েক জুহাম করেই বেশ অমিতাভ ঘোষের ভারী আনন্দ।—শক্ত আবার কি। কি রক্তের শাড়ি পরেছে, শাদা না রঙিন?

টেলিফোন রাখতে পারলে বাঁচে বীরাপদ। সিরে বলছি, কি কথা আছে বলুন।

কি-কু কথা নেই, বেজায় কুতি, আপনি মশাই কোনো কাজের নন, দিন ওকেই দিন দেখি—

বীরাপদ প্রমাদ গুণেছে। আপনি থেকেই সমুখবর্তিনীর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেছে একবার। লাবণ্য সরকার তার দিকেই চেয়েছিল।

—এখন নয়, পরে করবেন। ওদিকের হাসির ওপরেই বস করে টেলিফোন নামিয়ে বেবে ভাড়াভাড়ি উঠে এসেছে, ভরসা করে সামনের দিকে তাকাত্তেও পারেনি আর। লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পারিনি।

চাকরির সুপারিশ আর অমিতাভ ঘোষের হস্ততার জোর বত বড়ই হোক, কাজ পাবার পর বীরাপদ কাজের জোরের ওপরেই নির্ভর করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনভ্যস্ত মনটাকে দিব্যাত্র কাইলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেও সেই জোরটা তেমন পেরে উঠছিল না। যার ইজিত্তেই কাজ আনুক, বীরাপদ মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে, মন হুঁদিয়ে করতে চেষ্টা করেছে। এখানে আসার পর একবার মেডিক্যাল হোমে হাজিরা দেবারও ফুরসত মেলেনি।

কিন্তু এত করেও বীরাপদর নিজেরই এক একসময় মনে হত, সোনার পাঁড়ে কাক বসানো হয়েছে। মাসে ছ'শ টাকা মাইনে দেবার মত এখানে কি তার করার আছে বা কি সে করতে পারে, নিজের থেকে ঠাণ্ড পেরে উঠত না।

এই অস্থিটা দিনে দিনে বাড়ছিল।

কোম্পানীর কাজে না হোক, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিমাংগু মিত্রর ব্যক্তিগত কাজে কিছুটা বোধ্যতা দেখাবার সুযোগ ঘটল একদিন।

বড়-সাহেবের তলবে সেদিন সকালে তাঁর বাড়ি আসতে হয়েছিল। সামনে কোম্পানীর ছোট প্রেশন-ওয়ার্ডন পাড়িয়ে। কলম থাকে আশা করেছিল ভিতরে ঢুকে তাকেও দেখল। অন্ধর-মহলের দিকের সেই বসার ঘরের পদ-খাঁটা বিজ্ঞান-শস্যার হিমাংগু

মিত্র অর্ধ-শয়ান। বাহুতে কেটি বেঁধে কানে ট্রেখস্কোপ লাগিয়ে লাবণ্য সরকার পঞ্জীর মুখে তাঁর ব্লাড-প্রেশার দেখ'ছ।

হিমাংগু বাবু ইশাতায় বসতে বললেন ওকে। লাবণ্যর ছ' চোখ যন্ত্রের কাগজলোর ওপর। তাঁর পাশেই একটা চেয়ারে থুঁকে বসে আছে, পাশ্প করে পায়া তুলছে, ছেড়ে দিচ্ছে।

হঠাৎই বীরাপদ অস্থিবোধ করতে লাগল বেমন। এই বাড়ির এই ঘরে, এক প্রবল পুরুষের এত কাছে ওইভাবে থুঁকে বসাতুকুর মধ্যে, এমন কি রক্ত-চাপ পরীক্ষার ওই নির্বিষ্টতার মধ্যেও কিছু বেশ আছে, বা দেখলে ছ' চোখে আকাঙ্ক্ষার তাপ লাগে। হৃদপিণ্ড অশান্ত হয়। স্নায়ুতে স্নায়ুতে কানাকানি হতে থাকে।

পরীক্ষা করলে সেই মুহূর্তে বীরাপদরও রক্তচাপ খুব কম হত না হরত।

প্রেশার দেখা শেষ করে লাবণ্য ওর দিকে একবার তাকালো শুধু। চেমে কি চেমে না। হিমাংগুবাবু উঠে বসে জামার পোটামো হাতটা টেমে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কত?

লাবণ্য বীরেন্দ্রে বস্ত্র পোটামো, দামাভ হেসে মাথা মাড়ল। অর্থাৎ, ঠিক আছে। ব্লাড-প্রেশার নিয়ে মেডিক্যাল হোমের পেসেন্টদের সঙ্গে তার অনেক হাঙ্কা মতব্য গুমেছে বীরাপদ। বেখামে বেমন দরকার।

হিমাংগুবাবু বীরাপদর দিকে চেয়ে হাসলেন।—ও আবার আমাকে প্রেশার সব সময় বলে না, বললেও কমিয়ে বলে হরত, যদি নার্ভাস হয়ে পড়ি।

ভিতর থেকে সহজ হওয়ার তাগিদ, বীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, আপনার শরীর অস্থি না কি?

থুঁকে সামনের সেন্টার টেবিল থেকে পাইপটা হাতে নিলেন হিমাংগুবাবু। বললেন, অস্থি হতে কতকণ, পাছে অস্থি হয়ে পড়ি সেই ভয়ে সপ্তাহে তিন দিন প্রেশার চেক করাটা ওরা দরকার মনে করে। মুহু হেসে লাবণ্যর ডাক্তারী গাভীবটুকু লক্ষ্য করলেন। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন।—বে জন্তে তোমাকে ডেকেছিলাম, তোমার লেখা-টেখায় বেশ হাত আছে শুনলাম?

বীরাপদ অবাক। বাড়িতে ডেকে পাঠানোর ফলে অনেক এলোমেলো সম্ভাবনার কথা ভেবেছে, এ প্রশ্ন বলনা করেনি।

বাই শুনে থাকুন, চাকরির কাছ থেকে শুনেছেন। বীরাপদ হরত কিরে জিজ্ঞাসাই করে বসত কোথা থেকে শুনেছেন। হিমাংগুবাবুর পয়ের কথা থেকে তাঁর বক্তব্য বোঝা গেল। ইংরেজি-বাংলা দুটো খবরের কাগজ শিল্প-বাণিজ্যের ওপর বিশেষ সংখ্যা বার করছে, এ দেশের ভেবজ-শিল্প প্রসঙ্গে লেখার জন্ত তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এসেছে। সামনের টেবিলের টাইপ-করা কাগজ কটা এগিয়ে দিলেন তার দিকে—রচনার জন্ত এই তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন, আরো কিছু তথ্য লাবণ্য এবং সিতাংগু তাকে দেবে। সব নিয়ে বেশ ভেবে চিন্তে লিখতে হবে কিছু, বাংলাটা লেখা হয়ে গেলে ইংরেজি কাগজের জন্ত কাউকে দিয়ে সেটা অস্থি করিয়ে নিলেই হবে।

আলোচনা শেষ। লাবণ্যকে নির্দেশ দিলেন, তাকে নার্সিং হোমে ছেড়ে ডাইটার বেশ বীরাপদকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

নোতালার সিঁড়ির কাছে পাড়িয়ে কেয়ার-টেক বাবু বিনয়-নয়

বন্ধে নিজের চকচকে টাক-মাথার হাত বোলাছিল। চকিত তৎপরতার এগিয়ে এসে লাবণ্যর উদ্দেশে নিবেদন করল, অকিন-
ঘরে ছোট-সাহেব একবার দেখা করে যেতে বলেছেন।

লাবণ্যর মুখ দেখে মনে হল, ছোট-সাহেব বাড়ি আছে তাই জানত না। কিছু একটা জিজ্ঞাসা করার মুখেও যেমে গেল।

আপনি পাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি আসছি—।

ওদিকের হল-ঘরে চুকে গেল। নামতে গিয়ে সিঁড়িটাই কাঁকা কাঁকা লাগছে মনে হতে বীরপদর হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু নিচে সিঁড়ির ওধারে সর্বিনয়ে মানকে পাড়িয়ে। আসার সময় আর্থানা বঁকে ভক্তি আপন করেছিল, এখনও তাই করল। এই কদিনের আনাগোনার বড় সাহেবের শুনজরের লোক ঠাউরেছে, তাই ভক্তিপ্রসাদও বেড়ে গেছে। কিসকিস করে আরজি পেশ করল, কাছখানার চাপরাশির কাজের কথাটা একটু বলে কয়ে দেবেন বাবু? সেই যে পঞ্চম দিন আপনার সঙ্গে কথা হল—

মনে আছে। কিন্তু বলে কয়ে দেওয়াটা সম্ভব কিনা সেটা মানুষকে বলা না বলা সমান।

বাঁধানো উঠানে কোম্পানীর টেশান ওয়াগনের পাশে হিমাঙ্ক-
বাবু লাল গাড়ি পাড়িয়ে। বেরবেন হয়ত। বীরপদ বাইরেই চূপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। সপ্তাহে তিন দিন লাবণ্যর এখানে ব্লাড-প্রেসার চেক করতে আসার খবরটা জানত না। ..চাকরি জানে?

মনের ওপর এই অশোভন আঁচড়টাই কেলতে চায়নি। আপনি পড়ল। বিরক্তিতে তুফ কোঁচকালো, চাকরির চর ময় ও, হবেও

না কোনকালে। কিন্তু চাকরি উপলক্ষ মাত্র, অভ্যন্তরের নিষ্কৃতে আকাঙ্ক্ষার জাল বুনছে কেউ। ভ্রুকুটি করে সরাসরি তার মুখের ওপর এক বলক আলো কেলো তাকালো বীরপদ। রক্তচাপ-পরীক্ষারত নারীতনু-রহস্তটি তখনো রেখার-রেখার সংসোপনে লালন করছে সেই অসোচনের ব্যক্তিত্ব। এই সামান্য প্রতীকার অসহিষ্ণুতাও সেই কারণে। মনে মনে বীরপদ হিসেব করে কেলল একটা, নিষ্কৃতাচারীর এই সোপন উন্নয়ন অনেক দিনের।

মিজেকে দেখো, নিজের বশে থাকো। বীরপদ মুহু বোধ করল অনেকটা, নিজের বশে এলো। দশ মিনিট অপেক্ষা করছে, এবারে দুইটা অপেক্ষা করতেও আপত্তি নেই।

লাবণ্য সরকার নয়, হিমাঙ্ক মিত্র বেরিয়ে এলেন।

ড্রাইভার অভ্যন্ত তৎপরতার লাল পাড়ির দরজা খুলে পাঁড়াল।

তোমরা বাওনি এখনো? টেশান ওয়াগনের দিকে তাকালেম একবার, লাবণ্য কোথায়?

সিতাংগবাবু ডেকেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন...

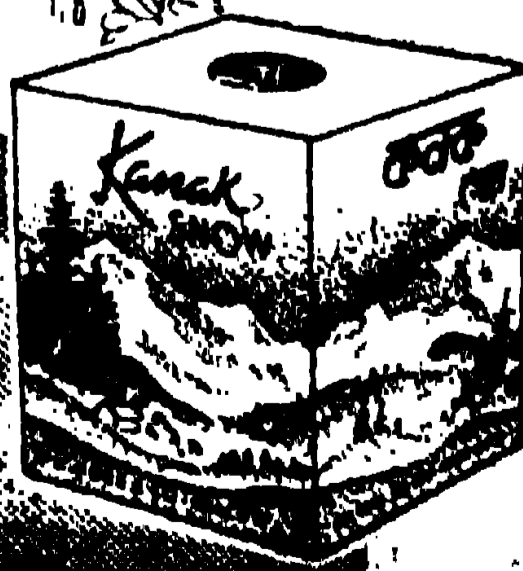
ঈশ্বর বিষয়ে হিমাঙ্কবাবু বাড়িটার দিকে ঘুরে তাকালেন একবার, ছেলে বাড়িতেই আছে তিনিও জানতেন না বোধহয়। ভুলসোকের প্রেসার পাড়ীর্বে এই প্রথম সম্ভবত বিরক্তির ছাড়া লক্ষ্য করল বীরপদ। নিজের পাড়ির দিকে এগোলেন তিনি, উঠতে গিয়েও ঘুরে পাঁড়ালেন।

হুই এক মুহুর্তের নীরব দৃষ্টি বিনিময়। তুমি থাকো কোন দিকে?



আনন্দ ডিঙ্গবে
ক, হাডের

প্রসাধন সামগ্রী



ক, হাড ২৩ কাং • কলিকাতা-১০

বলল।

এসো—

গাড়িতে উঠে বসলেন। বিব্রতমুখে ধীরাপদও। ডাইভার সশব্দে দরজা বন্ধ করল। গাড়িটা দু'পাঁচ হাত ব্যাক করিয়ে স্টেশান ওয়াকানের পাশ কাটাতে হবে।

নিচের দরজার ওপর পাশাপাশি ধমকে দাঁড়িয়ে গেল সিতান্ত আর লাবণ্য সরকার। হকচকিয়ে গেছে দু'জনেই। হিমাংশুবাবু নিলিগুপ্তমুখে তাদের দিকে একবার ফিরে তাকালেন শুধু।

গাড়ি বেরিয়ে গেল।

বড় রাস্তার পড়তে তিনি জানালেন, ওকে চৌরঙ্গীর কাছাকাছি ছেড়ে দেবেন, সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে সে বেন বাড়ি চলে যায়। এভাবে বধন বা ট্যাক্সিভাড়া লাগে মাসকাবারে বিল করে দেয় বেন, সকলেই তাই করে।

ধীরাপদর কেমন মনে হল, ওই দুটিকে একটু জব্দ করার জন্মেই বড়সাহেব এই ব্যাপারটা করলেন। পাইপ টানছেন, বিরক্তির ছায়াটা গেছে। আগের মতই সুশ্রী গান্ধীর্ষ।

এক সময় বললেন, তোমার ওই আর্টিকুল লেখা নিয়ে অমিতের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারো, দুই একটা ইন্টারেস্টিং অ্যানিকডোট হয়ত সেও বলতে পারবে, আগে তার এসবে খুব উৎসাহ ছিল, এখন অবস্থা—

কথাটা শেষ না করে সর্কোতুকে ওর দিকে চেয়ে পাইপ টানলেন বার দুই, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এখানকার কাজে ওর সাহায্য পাবে আশা করেছিলে, পাছ ?

এই একজনের প্রসঙ্গে ওজন না করে কোনো কথা বলা নিরাপদ নয়, আগের বাবের সাক্ষাতে সেটুকু উপলব্ধি করতে হয়েছিল। কাজের হৃদিস না পেয়ে এ পর্যন্ত ধীরাপদ অনেক দিনই অমিতান্ত ঘোবের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সব সময়ই আর পাঁচটা বাজে কথায় কাজের কথা ডুবে গেছে। বেশি বলতে গেলে সে বিরক্তিতে ধমকে উঠেছে, এখানে কাজ কেউ চায় না, ডোন্ট বনার— বা করতে বলে করে যান।

কিন্তু বড়সাহেবকে সেটা বলা যায় না। কুণ্ঠিত জবাব দিল, তাঁর সঙ্গে সে-রকম কথাবার্তা কিছু হয়নি এখনো।

হয়নি কেন, যুধ থেকে পাইপ নামালেন, কনস্ট্রাক্টিভ কিছু যদি করতে চাও, হি ক্যান্ হের ইউ এ লট—করানো শক্ত অবস্থা, ব্যট ওন্লি হি ক্যান—

প্রশংসারটুকু অকৃত্রিম। ধীরাপদর ভালো লাগল। একটু খেমে তিনি আবার বললেন, সেও তোমাকে পছন্দ করে শুনলাম, বি ইন টাচ, হি রিকোর্ডার্স কম্প্যানী...

খানিকক্ষণের নীরবতার ধীরাপদর উৎকর্ষা গেল, জটিলতার সূচনা নয় কিছু। তাঁদের প্রসঙ্গে আর কিছুই বললেন না, চূপচাপ পাইপ টানতে লাগলেন। কিন্তু পাইপ টানার কঁাকে কঁাকে এক একবার দেখছেন ওকে, কিছু ভাবছেনও হয়ত। চোখোচোখি হতে বুকেই বসলেন একটু, পাইপ হাতে নিলেন।—অনেক কাল আগে কোথায় বেন দেখেছি তোমাকে, জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম... দেখেছি ?

হঠাৎ জাপরে পড়ে গেল ধীরাপদ। একরকম একটা প্রশ্নের জন্ম

একটুও প্রস্তুত ছিল না। জবাব দিয়ে উঠতে পারল না, বিব্রতমুখে মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ, দেখেছেন বটে।

কোথায় ? ইং উৎসুক।

চারদিক খুলেবাড়িতে।

জবাবটা নিজেই কানেই বড় বেশি স্পষ্ট ঠেকল ধীরাপদর। মোটা ফ্রেম-জাঁটা গোটো মুখে বিস্ময় আর বিড়ম্বনার ব্যঞ্জনা। হাসি মুখে ভুঙ্ক কুঁচকে সরাসরি চেয়েই রইলেন ওর দিকে। স্মরণের প্রয়াস। স্মরণ হল বোধহয়। চারদিক খুলেবাড়িতে প্রতিদ্বন্দ্বী তরুণ প্রেমিকের আনা-গোনা নিয়ে দু'জনের মধ্যে তখন হাসাহাসিও হত কিনা কে জানে। হিমাংশুবাবু সামনের দিকে ঘুরে বসে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন, শেষে পাইপ কঁাতে চেপে বললেন, তাহলে ধরে নেওয়া যাক আগে আর দেখিনি।

অর্থাৎ এ নিয়ে খাঁটাঘুঁটি না করাই নিরাপদ ছিল। যতই বিব্রতভাব দেখোক, মনে মনে খুশি ধীরাপদও। ব্যাপারটা মন্দ ঠিকাল না। ধরে যা-ই নিন, আর যত বড় সাহেবই হোন, ওর সামনে আঠের বছর আগের অব্যাহতি আর একেবারে বিস্মৃত হতে পারবেন বলে মনে হয় না। সেদিক থেকে ধীরাপদ অনেকটাই দূরত্ব লক্ষ্যন করে বসেছে।

নেমে যাওয়ার সময়ও তাঁর মুখের হাসির আভাসটুকু একেবারে মিলায়নি।

অকস্মে সেদিন লাবণ্য সরকারকে বেশ একটু গম্ভীরই দেখাছিল। সকালে বড় সাহেবের বাড়িতে ওভাবে বিব্রত হওয়ার অপরাধটা বেন ধীরাপদরই। সমস্ত দিন চূপচাপ থেকে বিকেলের দিকে নিজেই ঘরে এলো। হাতে দু'তিন শিট টাইপ-করা কাগজ।

ধীরাপদ সকালের পাওয়া রচনা-সংক্রান্ত তথ্যগুলি মনোবোগ দিয়ে পড়ছিল আর ভাবছিল কি-ভাবে কি লেখা যায়। লাবণ্য সরকার সামনের চেয়ারে না বসে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। কাগজকটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এগুলো আপনার কাজে লাগবে কি না দেখুন।

আপনি দিচ্ছেন বধন, কাজে লাগবে জেনেই দিচ্ছেন। সহজ যিনয়ে ক্রটি নেই ধীরাপদর, বসুন—

লাবণ্য বসল না, দুই এক পলক চেয়ে থেকে বলল, সকালে এগুলোই ঠিকঠাক করে আনতে গিয়ে দেবি হয়েছিল, আপনি চলে গেলেন কেন ?

ভালো না গিয়ে করি কি, কিন্তু এরই জন্মে দেবি নাকি। বর্ধনবের সহজ বিস্ময়, এই ব্যাপারে আটকে ছিলেন কি করে জানব, জানলে এড়ানো বেত—

বুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, আর্টিকুল লিখব আমি, এই ব্যাপারের জন্মে হলে তোমার বদলে আমাকেই ভাকা উচিত ছিল ছোটসাহেবটির, অথচ আমিই রইলুম বাইরে দাঁড়িয়ে—

এটুকুও উপলব্ধি না করার কথা নয় লাবণ্য সরকারের। আগে সামান্য কর্মচারী ভাবত বধন তখন বে-চোখে তাকাতো, দুট্টটা প্রায় তেমনি। নিলিগুপ্ত চোখে বৃষ্টতার বহর দেখেছে বেন। নিস্পৃহ শুভার্ধিনীর মত ঠাণ্ডা পরামর্শ দিল, ভালো করে লিখুন, ভালো হলে আপনারও ভালো।

বিজ্ঞপ গারে না মেখে ধীরাপদ কিরে আঞ্জহ প্রকাশ করল, ভালোর আশা দেখিনে, বসুন না...

নিম্পৃহতার কাটল দেখা গেল একটু, টিগ্ননী কাটল, বসলে ভালো হবে আশা করেন ?

ধীরাপদ হেসে ফেলল, খুব করি।

আসবেন তাহলে এক সময়, দেখব... কাজ আছে।

শিখিল চরণে দরজার দিকে এগোলো। এই মূর্তিতে সহকর্মিনীর থেকেও আর কিছুই জোরটুকুই বেন অনেক বেশি। নারীর প্রাধান্য বেশি। সেটুকুই দেখিয়ে গেল। যেতে যেতেও ওর অল্পসঙ্কানরত চোখ দুটোকে সেই প্রাধান্য বুঝিয়ে দিচ্ছে বেন। চেয়ে থাকো, আমার জোরটা কোথায় চেয়ে চেয়ে দেখো।

ধীরাপদ চেয়ে ছিল, দেখছিল।

সকালে ছেলে লাভণ্য সরকারকে আটকে রেখেছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে হিমাংগু মিত্রের মুখের চকিত্ত বিরক্তি ধীরাপদের দৃষ্টি এড়ায়নি। গাড়ি ছাড়ার মুখে দোরগোড়ায় এসে লাভণ্যও সেটুকু অমুভব করেছে হয়ত। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যে এমন হবে ধীরাপদ কল্পনা করেনি।

ভাবছে। মহিলা হঠাৎ ওর ওপর এত বিজ্ঞপ কেন। ও কি করল ?

বতটা সম্ভব ভালো করেই খবরের কাগজের রচনা সরবরাহ করল ধীরাপদ। শুধু বাংলা নয়, ইংরেজিটাও সেই করে দিল। হিমাংগুবাবু এতটা আশা করেননি। ফলে এরপর এ ধরনের ব্যাপার মাঝেমাঝে ধীরাপদের ঘাড়ে এসে চাপতে লাগল। এক-আধটা ভাষণ লিখে দেওয়া, ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সভা-সমিতিতে বিবৃতি পাঠানো। সেই প্রথমদিন ছাড়া সামন'সামনি আর প্রশংসা করেননি হিমাংগুবাবু। ধরেই নিচ্ছেন ভালো হবে।

চাকরি সেদিন প্রশংসার ছলে একটু ব্যঙ্গই করলেন বেন। একথা সে কথার পর বললেন, তোমাদের বড়-সাহেব তো খুব খুশি দেখি তোমার ওপর, পাঁচ জায়গায় লিখেটিখে তাঁর খ্যাতি বাড়ানো...

ধানিক আগেও আজকাল আর বেশি আসে-টাসে না বলে বক্রোক্তি শুনেতে হয়েছে। অমুযোগের মুখে খেমে গিয়ে টিগ্ননী কেটেছেন চাকরি, অন্ত সময়ই বা পাবে কি করে, কোম্পানীর কাজ, বড়-সাহেবের কাজ—ছোট-সাহেব আর মেম-ডাক্তারের কাজও কিছু কিছু জুটছে নাকি ?

ধীরাপদ পান্টা ঠাটা করেছিল, এখনো জোটেনি, তবে জোটাতে চেষ্টা করছে বটে। লিখে বড়-সাহেবের খ্যাতি বাড়ানোর প্রসঙ্গে হাসিমুখেই কিরে অমুযোগ করল, ঝামেলাটি তো তুমি বাধিয়েছ—আমি লিখতে পারি এ কথা তাঁকে কে বলেছে ?

আমিই বলেছি, চাকরির নিরীহ স্বীকার-উক্তি, তোমার সুবিধে-টুবিধে যদি হয়। তা ঝামেলা কিসের, বেশ তো সুনজরে এসে গেছ।

ধীরাপদ স্পষ্ট করেই বলে ফেলল, সুনজরে আসাটা তুমি তেমন সুনজরে দেখছ বলে তো মনে হয় না।

কলে পড়ে হেসে ফেললেন চাকরি, তা কি করব, একধার থেকে তুমি যদি এখন বক্তৃতা আর ভাষণ লেখো বসে বসে—এই সঙ্গে সেক্রেটারীর হাইনেটাও তাহলে তোমাকে দিতে বলা।

একটু খেমে ধীরাপদ বলল, এ-সব লেখা-টেখা আর আবার ঘাবা হবে না তাই বরং জানিয়ে দেব।

এ কথা বলবে নাকি তাঁকে ? চাকরির গলার শঙ্কার রেশ।

ধীরাপদ ঘাড় নাড়ল, বলবে। জানালো, লিখতে তো আর সত্যিই পাবে না, রীতিমত পরিশ্রম হয়, আর কাজেরও কতি।

চাকরি বিরত বোধ করছেন বোঝা গেল। বিজ্ঞপ প্রত্যাহারের চেষ্টা।—গোয়ারতুমি করে কাজ নেই, পরিশ্রম গোড়ার গোড়ারই করতেই হয়। কিছু বলতে হলে অমিতের সঙ্গে কথা করে নিও; সেই বলছিল...

অর্থাৎ আগের ওই অভিযোগ চাকরির নয়, অমিতাভ ঘোষের। ধীরাপদ ধাক্কা খেল একটু, কিছুদিন বাবত অমিতাভ ঘোষ ওর করে আর আড্ডা দিতে আসছে না বা টেলিকোনে ডাকছে না মনে পড়ল। অথচ মনে মনে ধীরাপদ বাহোক করে তাকে ধরে বেঁচে কাজের আলোচনার বসবে স্থির করেছিল। সেদিন মোটরে হিমাংগু বাবুর কথা ভোলেনি, এই কোম্পানীতে কাজ কিছু করার ইচ্ছে থাকলে সাহায্য একমাত্র সেই করতে পারে। ধীরাপদ বিশ্বাস করেছে, আর সাহায্যটা বেরন করে হোক আদায় করে নেবে ভেবেছে। কিন্তু এর মধ্যে তেমন অবকাশ পেরে ওঠেনি।

চাকরির বাড়ি থেকে বেরবার মুখে ছোট বোণাবোণ একটা। কলটা সুবাহিত মনে হল ধীরাপদের।

বাইরের ঘরের বইএর আলমারির পাশে ছোট টেবিলটার কাছে পার্বতী দাঁড়িয়ে। তার কানে টেলিফোন। কথা বলছে না, চূপচাপ কথা শুনেছে।

এক নজরে মুখের ঋজু গাভীটুকু লক্ষ্য করেই ধীরাপদ অসুস্থান করেছে তার কথা।

পায়ের শব্দে পার্বতী কিরে তাকালো। রিসিভারে একটা হাত চাপা দিয়ে মুহূ অথচ স্পষ্ট অসুস্থোষ করল, একটু দাঁড়াবেন। রিসিভার মুখের কাছে এনে শুধু বলল, ছেড়ে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রাখল রিসিভারটা।

ধীরাপদের মনে হল, অপর প্রান্তে যে আছে, এভাবে বিচ্ছিন্ন হবার ক্ষেত্রে তার প্রস্তুত থাকার কথা নয়। একেবারে গভাকারের সমাপ্তি। সামনাসামনি তার সঙ্গে এই প্রথম কথা বলল পার্বতী। টেলিফোন রেখে নীরবে একবার চোখ তুলে তাকালো শুধু, তারপর ভিতরে চুকে গেল।



ক্যালকট উপাটিক্যাল কোং প্রাইভেট) লিঃ
ফোন-৩৫-১১১৭, প্রত্নস্বাস: ডা: কার্জিক স্ট্র, ক্যু. স্ম-বি।
প্রত্ন-কলকটক: ৩৫ নং জামশেদপুর স্ট্র, কলকটক ৩।

হুঁ-বশ লোকের মধ্যেই কিরে এলো। হাতে ক্যামেরা।

অমিতাভ ঘোষের সেই ক্যামেরা।

এটা দিবে দেবেন—

কাকে দিতে হবে বলল না, জানাই আছে বেন। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে বীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, অমিতা বাবু বাড়িতেই আছেন এখন ?

বাড়ি নাড়ল। তারপর বৃহৎলার জালালো, কাল অকস্মে দিলেও হবে।

কাল নয়, অকস্মেও নয়, চাকরদের বাড়ি থেকে বীরাপদ সরাসরি হিমালয় মিত্রের বাড়িতে উপস্থিত। আসার উপলক্ষ বোগানোর ক্ষেত্রে পার্বত্যের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য তুলে থেকে থেকে ওই মেয়েটার কথাই ভেবেছে। ওকে দেখলেই আকাশের একরাশ মেঘের কথা মনে হয় বীরাপদের। বে-মেঘ ভ্রাসের কারণ সেই মেঘ নয়, বে-মেঘ আশ্বাস বোগায় সেই মেঘ। আর ভেবেছে, ক্যামেরাটা নিয়ে গিয়ে বার বার এ ভাবে কলেই বা আসে কেন অমিতাভ ঘোষ।

মান্নকে জানালো, ভাগ্নেবাবু ধানিক আগে গাড়ি নিয়ে বেরুলেন, বোম্বের খেতেটেতে গেছেন, এক্সনি কিরবেন মনে হয়, কারণ তাঁর ঘর খোলা।

অর্থাৎ শিগগীর কেয়ার সন্ধাননা না থাকলে ঘর তালি-বন্ধ থাকত। বীরাপদ বলল, তাঁর ঘরেই তাহলে বসি একটু—

অমিতাভ ঘোষ নিচে থাকে জানত না। সিঁড়ির ডান দিকের বন্ধ হল শেরিয়ে অমিতাভ ঘোষের ঘর। দরজা হুটো ভেজানো ছিল, মান্নকে খুলে দিল।

আগোছালো ঘর। কোণের টেবিলে এক পাঁজা বিলিভি ডিটেকটিভ বই। টেবিলের পিছনের তাকে কতগুলো বিজ্ঞানের বই আর একটা কোটা অ্যালবাম। বীরাপদ চেয়ার টেনে বসল।

সাল্লনের অবিস্তৃত শব্দ আর একখানা অ্যালবাম। ঘরটা ওকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখে মান্নকে দোষ-কালনের চেষ্টা করল ভাড়াভাড়া। বলল, ভাগ্নেবাবুর ঘর বারোমাসই এমনি থাকে— মেজাজ ভালো না থাকলে যে পরিষ্কার করতে আসবে তাকেই খুঁটিয়ে ভাড়াবেন।

হাত বাড়িয়ে বিছানা থেকে অ্যালবামটা তুলে নিল বীরাপদ। কিন্তু খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করতে হল আবার। না, মান্নকে লক্ষ্য করেনি, ভাগ্নেবাবুর মেজাজের কথা সবে শেষ করেছে।

চাকর্য পোপন করে বীরাপদ বলল, তোমার কাজ থাকে তো বাও না, আমি বসছি।

তার দিকে চেয়ে মান্নকে বুকে মিল পন্ন জন্বে না। বলল,

ভী বাই, কেয়ার-টেক বাবু সন্ধ্যা নিজে ভেঙে হাতের কাছে খাবারটি না দেখলে আবার তো আমাকেই ধরে চটকাবেন। দরকার হলে ওই বেল টিপবেন—

সব ঘরেই বৈদ্যুতিক বোগ-ব্যবস্থা লক্ষ্য করেছে বীরাপদ। মান্নকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালবাম খুলে বসল। পর পর লাভণ্য সরকারের ছবি কতগুলো। লাভণ্যর এ-সৃষ্টি বীরাপদ দেখেনি। হাসি-খুশি-আনন্দ ভরা ছবি, এই লাভণ্য পদস্থ কর্মচারী নয়, বচন-কুশলিনী ডাক্তারও নয়। এই লাভণ্য একটি মেয়ে শুধু, ভর-ভরতি মেয়ে।

আবারও খামতে হল এক জায়গায়। চকিতে দরজার দিকে তাকালো একবার।

...লাভণ্যর ছবি শেষ হয়েছে।

এবারে পার্বত্যের ছবি। গোটা অ্যালবামের চার ভাগের তিন ভাগই তাই।

কানের কাছটা পরম ঠেকছে বীরাপদের। আর দেখা উচিত নয় ভাবছে, অথচ পাতা না উন্টেও পারছে না। দেখার অননুভূত আকর্ষণ একটা, অজান্তে ভাগিন। নানা ছাঁদে বন্ধিনী বীর গভীর একখানি পার্বত্য বোবন। কোনো কোনো ছবিতে রোদ-দাগানো মেঘের মত গাভীর কাটলে ইবং হাসির আভাস, প্রায়ের আভাস, কোনটিতে বোবনের নির্বিকার প্রসারিত দাক্ষিণ্য শুধু। বেশির ভাগ ছবির পরিচ্ছদ-স্নেহতা চোখে বেঁধার মত, আবার পোপন সৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখার মতও। শেষের ক'টাতে সবুজ বেলার আঁট কষ্টউন্ন পরা—কোনোটায় ঘান সেয়ে উঠে আসছে, কোনোটায় ঘানে নামছে।

অ্যালবাম বখানানে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বীরাপদ। অধ্যক্ষ অবাচ্ছন্দ্য একটা, অথচ অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। বুকের কাছটা ধকধক করছে, কান ছাঁটো পরম ঠেকছে আরো, ঠোট ওকনো, খরখরে জিব।

অনুরে পূর্না-ক করে একটা শব্দ হতে বীরাপদ নিজেই চমকে উঠলো। বেল সে-ই টিপেছে। দরজার বোতাম টিপে মান্নকেকে ডেকেছে। মান্নকে আসার আগে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা হুটো ভেজিয়ে দিল।

আর বসব না, বাই এখন...এলে বোলো, ক্যামেরাটা রেখে গেলাম।

মান্নকেকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে বীরাপদ চোবের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে একেবারে বন্ধ রাস্তায় এসে থামল।

[ক্রমশঃ]

শেষ সাধ

গৌবিন্দপ্রসাদ বন্দু

বন্ধ যদি ভালোই চোখে, ভালো ;
তবু হাসুখ, গান গাইব, তোমার বাসুভ ভালো ।
স্থণা করবে, চন্দ্রম স্থণা করো,
হাসুবে আশ্বাস, হাসুো কটিনভর—
অন্তকারে তোমার পথে বরষো তবু আলো ।

বড়ের হাতে না দিলে ঘাব খুলে,—
বাইরে একা দাঁড়িয়ে রব সকল দুঃখ তুলে ।
নাই বা পেলাম তোমার ভালোবাসা,
কলছে বুকে একটি শুধু আশা ;
শবাধারাটি আপন হাতে সানিয়ে দিও তুলে ।

আধুনিক বঙ্গদেশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

পরবর্তী ঘটনাবলী

উনবিংশ শতক শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার নানাতাবে দেখা দিতে লাগল, সেই সময় রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও ভয়ঙ্কর নিম্নাঙ্গ শোনা গেল এবং তাতে স্বেচ্ছাপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সবই স্থাপিত হয়ে গেছে। এগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের জন্ত সমান ব্যবহার অর্জন অথবা বড় জোর ভারতে কোনপ্রকার পার্লামেন্টারী সরকার স্থাপন। দরিদ্র কৃষকগুলোর পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্যও দাবী করা হয়। কিন্তু কার্যপদ্ধতি ছিল ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্ত তথ্য করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে প্রতিনিধিদল প্রেরণ অথবা ভারতের জনসাধারণকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে শিক্ষাদান করা। কিন্তু এই আন্দোলনও কমবেশী নরমপন্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৭০ অথবা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় অথবা রুশ বিপ্লবী দলের আদর্শে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সকল যুবসংস্থা গঠন করেছিলেন তাদের কোন কর্মপন্থা ছিল না, যদিও দেশপ্রেমের আবেগের ব্যাপারে তারা উপরোক্ত রাজনৈতিক সংস্থাকুলিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে যুবকদের মধ্যে এক নতুন ধরনের সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল, যার উদ্দেশ্য হল সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ভারতে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ করার জন্ত বড়বন্দু করা। বাংলার প্রথম সংগঠনের সঙ্গে ষাঁদের নাম জড়িত ছিল তাঁরা হচ্ছেন পি মিত্র, বতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও অন্যান্য অনেকে।

ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রে একই ধরনের ঘটনা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং বাংলার বিপ্লব আন্দোলন প্রথম অবস্থায় মহারাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, বাহুগোপলে মুখার্জি, ১৩৬৩।) দুই প্রদেশের চরমপন্থীরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করেন এবং তাঁরা যুক্তভাবে প্রতিষ্ঠান থেকে 'মধ্যপন্থী' অথবা উদারনৈতিকদের কর্তৃত্ব দূর করতে সক্ষম হলেন। বাংলা দেশ ২টি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত হয়েছিল এবং বাংলা দেশের ঐক্যে এই ভাঙ্গন ধরায় ১১০৫-৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে ব্যাপক আকারে জাতীয় আন্দোলন সূচিত হল। এর পূর্বে উপজাতি অথবা কৃষকদের অসংখ্য বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ তা কখনও ঐক্যবদ্ধভাবে হয়নি অথবা এমন খাতে প্রবাহিত হয়নি যাতে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সূক্তি দেখা দিতে পারে। বঙ্গবিভাগ-বিরোধী অথবা স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার এক নতুন উদীপনা দেখা দিয়েছিল; কিন্তু প্রকৃত রাজনৈতিক আন্দোলন বঙ্গহারী হলেও তা থেকে স্থায়ী সাংস্কৃতিক উন্নয়ন দেখা দিয়েছিল।

ভাষা

উনবিংশ শতকের শুরুতে বাংলার প্রকাশিত বই-এর ভাষা কথ্যভাষা অপেক্ষা পৃথক ও অত্যন্ত সঙ্কট পূর্ণ ছিল।

প্যারীচাঁদ মিত্র অথবা কালীপ্রসন্ন সিংহ ও দীনবন্ধু মিত্র সহজ ভাষার বিদ্রূপাত্মক রচনা অথবা বিদ্রূপাত্মক নাটক লিখে সময় সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন।

জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে আর একটি চমৎকার ঘটনা বাংলাদেশে শুরু হল। রাজনারায়ণ বসু (১৮৭১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৭৪) অথবা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯২) ভায় নেতারা ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় বোপাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে হিন্দী ব্যবহারের প্রস্তাব করলেন। (স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা, সজনীকান্ত দাস, ১১৪১, পৃ: ৫-৬)। স্বদেশী আন্দোলনের পর এই দিকে আরও এক বাস্তব চেষ্টা শুরু হল। শিক্ক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটি নিজস্ব পত্রিকা ডন ম্যাগাজিনে হিন্দী অথবা দেবনাগরী হরকে বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র এই সময় একলিপি বিস্তার পন্থায় স্থাপন করলেন এবং ১১০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে পরিবর্তনের নিজস্ব পত্রিকা দেবনাগরী প্রকাশ হতে থাকল। এই দু'টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা লোকে একেবারে বিস্মৃত হয়েছে, কারণ সেগুলি তাদের সময়ের বহু পূর্বেই জগন্মুক্ত করেছিল।

জাতীয় পুনরুজ্জীবনের বাহনরূপে সাহিত্যের প্রতি বাংলার আগ্রহের ফলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপিত হল। শীঘ্রই চতুর্দিকে এর কার্যকলাপ প্রসারিত হল। বাংলা হস্তলিখিত পুঁথিপত্র সংগৃহীত হল, ঐতিহাসিক স্থান ও স্থানীয় প্রাদেশিক ভাষার সমীক্ষা শুরু হল। প্রাচীন গ্রন্থাদি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হল, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পরিত্রা সৃষ্টি হল, সাহিত্যিকদের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে লাগল, কবি বতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েই এর বেশির ভাগ কাজ হতে লাগল। সুতরাং মোটের ওপর বলা যায়, দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঠিক পূর্বেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন উৎসাহ দেখা গেল।

শ্রাক্ষসমাজ তার কার্যকলাপের শীর্ষস্থানে আরোহণ করে আসামে উপজাতিদের কল্যাণ ও চাবাগিটার শ্রমিকদের (আসাম) অবস্থার উন্নতির কাজে লেগে গেল। কিন্তু তার প্রধান কার্যকলাপ ছিল নারীজাতির উন্নতি এবং শিক্ষাপ্রচার অথবা সমাজ সংস্কার। রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানও শিক্ষা ও কল্যাণজনক কাজ, যেমন, বস্তা অথবা হুতিকের পর সেবার্খ, চিকিৎসা সাহায্য প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ নিতে লাগলেন।

পরে যে ক'জন বৈপ্লবিক কার্যকলাপে বোপা দিয়েছিলেন তাঁরা এইরূপ বেছামূলক সেবার দ্বারা দেশের উত্তরোত্তর আর্থিক অভাব অনটনের সঙ্গে প্রাথমিক বোপাযোগ করেছিলেন। একথা সত্য যে, স্বদেশী যুগের কয়েকজন বিপ্লবী নেতা হৃদয়ভঙ্গ করেছিলেন সামাজিক অত্যাচারের প্রতিকার ভাসা-ভাসা রকমে হতে পারে না। সুতরাং তাঁরা মনে করলেন, লোকের ধর্মীয় মনোভাব পুনরায় জাগ্রত করার মধ্যে এটা নিহিত আছে। এই চিন্তাধারার প্রকৃত সূত্রীত্ব হচ্ছেন অরবিন্দ ঘোষ। স্বদেশী বৈপ্লবিক কার্যকলাপ আত্ম কর্তব্য হল

অথবা হত্যা দেখা দিল, যেমন স্বভাবত হয়ে থাকে, তখন বহু লোক গভীরতর সার্থকতা লাভের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন অথবা অহুরূপ সজ্জের দিকে আকৃষ্ট হল।

জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুদের ধর্মীয় ঐতিহ্য কার্ণকিরূপ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল তা দেখাবার জন্য এখানে শ্রীঅরবিন্দের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল। অরবিন্দ লিখেছেন :

"পর্যায়ী জাতির পক্ষে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করাই প্রধানতম কর্তব্য, তা যে কোন উপায়ে ও যে কোন আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে হোক না কেন। এবং এই কর্তব্যের কাছে অন্য সব রকম কারণ বাতিল হয়ে যাবে। জাতীয় মুক্তির কাজ এক বিরাট ও পবিত্র যজ্ঞ, এতে বরকট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা ও অন্যান্য প্রত্যেকটি ছোটবড় কাজ বড় অথবা সামান্য অংশ। আত্মত্যাগ থেকে আমরা স্বাধীনতার ফল চাই এবং দেশমাতৃকাকে আমরা তা উৎসর্গ করবো। যজ্ঞের লেলিহান অগ্নিশিখায় আমরা আমাদের বা কিছু আছে সব উৎসর্গ করবো এবং আমাদের রক্ত ও জীবন এবং প্রিয়জনদের সুখ দিয়ে তার জুকা মেটাবো। দেবী দেশমাতৃকা বিকলাঙ্গ অসম্পূর্ণ বলিতে ভুট্ট নহেন, যার দানের মধ্যে কুঠা আছে সে কখনও দেবতার কাছ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। প্রত্যেক বিরাট যজ্ঞেই রাক্ষস আছে, যারা যজ্ঞ ব্যর্থ করে দিতে চেষ্টা করে, চারিদিকে ময়লা ছিটতে চায়, শঠতা অথবা হিংসার দ্বারা হোমায়ি নিবিয়ে দিতে চায়। শান্তিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্রহ্মতন্ত্র দ্বারা এরূপ উপদ্রবকারীদের সম্বন্ধীয় হওয়ার প্রচেষ্টাই নিষ্ফল প্রতিবোধ; প্রাচীনকালে যখন রাক্ষসরা ভয়ংকর ও বহুপরিকর হয়ে এগিয়ে আসতো, তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিরাও কত্রিয়দের ধনুর্বাণের সাহায্য না নিয়ে সেই হোমের আগুন জালিয়ে রাখতে পারেন নি। আমরাগকে নেপথ্যে হলেও, কত্রিয়ের তীরধনু ব্যবহারের উপযোগী করে রাখতে হবে। রাজনীতি কত্রিয়দের পেশা এবং ক্ষাত্রশক্তি পিছনে না থাকলে সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রাম নিষ্ফল।

কোন ধর্ম সত্য আর কোন ধর্ম মিথ্যা, বৈদান্তিক মতবাদ তার ধার ধারে না। তবে যা সুনিশ্চিতরূপে ও কমবেশী স্রুতগতিতে যৌক্তিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি ও অন্তরের দিব্যানুভূতির দিকে নিয়ে যাবে তা বৈদান্তিক ধর্মের বিবেচ্য। আমাদের মনোভাব হবে রাজনৈতিক বেদান্তধর্ম। (দি ডকটিন অফ প্যাসিভ রিজিস্ট্যান্স, শ্রীঅরবিন্দ, ১৯৪৮, পৃ: ৭৭-৭৯)।"

এই মনোভাব ধর্মীয় অথবা ধর্মনিরপেক্ষ যে রূপই হোক না কেন, সাময়িক পরাজয় সত্ত্বেও রাজনৈতিক কার্যকলাপে ধীরে ধীরে লোকের আগ্রহ বেড়েছে। এর ফলে সামাজিক সংস্কারের দিকে লোকের আগ্রহ কমে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জীবনধারার এটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামাজিক সমস্যাগুলির মূলেও দেখা গেল রাজনৈতিক পরাধীনতা। এই যুক্তি দেখান হয় যে ভারতবর্ষ পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে না পেলে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর হবে না। এই ভাবে কালক্রমে লোকের আগ্রহের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন দেখা গেল, পরবর্তীকালের সীমিত লক্ষ্যের পথে না গিয়ে সেই সময়কার বা লক্ষ্য তা সাধনের জন্য ধর্মীয় আবেগকে নতুন দেশাত্মবোধের ফলে কাজে লাগানো সম্ভব হল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর থেকে রাজনৈতিক ঘটনাবলী

গান্ধীপন্থী আন্দোলনের গোড়ার দিকে ভারতে ডিটক অফ কনটের আগমন উপলক্ষে যে বয়কট আন্দোলন করা হয়, কলিকাতা সহর তাতে অভূতপূর্বরূপে সাড়া দেয়। অসহযোগ আন্দোলন অন্যান্য জায়গায় হওয়ার প্রথমে তা বাংলাদেশে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দিত হয়নি। বাংলাদেশ তখন আর্থিক বয়কট এবং নিয়মতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। ভারত সরকারের ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের রাউলট আইন রচিত হয় বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যে। যখন গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগিতার কার্যনুষ্ঠা দেশের নিকট ঘোষণা করা হল তখন বাংলা দেশ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। কার্যনুষ্ঠাটি অত্যন্ত নেতিবাচক ও নৈতিক উদ্বেগপ্রবণ বলে প্রতিভাত হল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবী দলগুলি সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের যে চেষ্টা করেছিল তারপর এই কার্যনুষ্ঠা অনেকের নিকট যথেষ্ট বীরত্বপূর্ণ বলে মনে হল না।

বাংলা দেশকে বহুপ অভূত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল, সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা দেশের মুসলমান সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। শুধু তাই নয়, বঙ্গবিভাগের পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। (ইশিয়া ডিভাইডেড—রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ১৯৪৬) এবং তারপর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মিটো-মর্লি শাসন সংস্কারের সময় পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হয়। ভারতে জাগ্রত জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি করাই এইগুলির লক্ষ্য।

প্যান-ইসলামীয় মনোভাব বৃদ্ধির ফলে বাংলা দেশের বিপিনচন্দ্র পালের মত রাজনৈতিক নেতারা খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে যুক্ত করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বিপিন পালের মতে কয়েকজন মুসলমান নেতা প্যান-ইসলামইজম মতবাদ বিস্তারের জন্য খিলাফত আন্দোলনকে ব্যবহার করতেন এবং ইহা ভারতে জাতীয়তাবাদের জীবন্বিত্তে অন্তরায় হতে বাধ্য।

প্রথমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলা দেশ অর্থাৎ তার রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী শেষ পর্যন্ত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে বাঁপিয়ে পড়লো। নতুন নতুন নেতার আবির্ভাব হল, কিছু সংখ্যক বিপ্লবী কর্মী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পারলেন যে গান্ধীপন্থী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের অসন্তোষকে রূপ দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। এ পর্বন্ত তাদের কার্যকলাপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই বিধাগ্রস্ত মনোভাবের ফলে গান্ধী প্রবর্তিত আন্দোলন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের মত বাংলার জনকে উজ্জীবিত করতে পারেনি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সাহিত্যে ও চাকরকার যেমন সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনে তা দেখা যায়নি। মেদিনীপুর জেলায় সরকার চৌকিদারী প্রথার ফলে ইউনিয়নবোর্ড প্রথা চালু করার প্রস্তাব করলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে সজ্জবদ্ধ আন্দোলন হয়। মেদিনীপুর আপত্তি করেছিল।

কারণ প্রথম ব্যবহার অবস্থার কোন উন্নতি হবে না, অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ়ভাবে চেপে বসবে। এই বর্ধন আন্দোলন জয়লাভ করে এবং জেলায় সত্যাপ্রহ সংস্থার ভিত্তি স্থাপন করে, এক্ষেত্রে এই জেলাটি এখনও বিখ্যাত হয়ে আছে। দ্বিতীয় আন্দোলন হয় ভারকেশ্বরে। পশ্চিমবঙ্গের এটি তীর্থস্থান, সেখানে মন্দির ও উহার সম্পত্তি নিকটবর্তী এক মঠের মোহন্তের অধীন ছিল। সংস্থাটি জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার জন্য এই আন্দোলন হয়।

পরবর্তীকালে ১৯২০ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজসাহী জেলার বুকুংসার, বশোহরের বন্দবিলায়, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে, বরিশালের পটুয়াখালিতে প্রথম স্থানীয় কব ধার্যের বিরুদ্ধে অথবা মেদিনীপুরের জায় ইউনিয়নবোর্ড প্রথা চালু করার বিরুদ্ধে অথবা কয়েকটি বছরদিনের নাগরিক অধিকার পুনঃ প্রবর্তনের জন্য স্থানীয় ভাবে সত্যাপ্রহ হয়। সুতরাং বলা যায়, এই গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলোতে বাংলাদেশ এক ধরনের কূচকাওয়াজ ও অহিংস অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন কর্মীর আবির্ভাবের ফলে উপরোক্ত কয়েকটি আন্দোলন ঘটেছিল। যদিও এর কয়েকটি আন্দোলনে কিছু লোক এসেছিল বিপ্লবী দলগুলি থেকে, সর্দার বড়বঙ্গমূলক কার্যকলাপ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসাধারণকে নিয়ে বোধভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে।

বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রতি পুরাতন ভালবাসা এবং নির্ভীক ও প্রকাশ্য বুদ্ধ তখনও চলতে থাকলেও গান্ধীপন্থী সংগ্রাম ক্রমশ জনপ্রিয়

হয়ে উঠলো। বাংলার অধিকাংশ বিপ্লবী কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে আপোস করলেও এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখায় অধিক আসন দখল করলেও তাদের দল বধাবধ রইল এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিয়মিত কার্যসূচীর বাইরে বড়বঙ্গমূলক কাজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ইতিমধ্যে নতুন এক দল অহিংস রাজনৈতিক কর্মী হুগলী, বর্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের সূদ্র গ্রামে গিয়ে গান্ধী-পরিকল্পিত গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, তবে কংগ্রেস কমিটিসমূহের সংগঠন কাজ অপরের হাতে রইল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরকম বিভিন্ন প্রবণতার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরবর্তী ঘটনাবলীর পটভূমিকা তৈরী করা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যে শক্তি খোলাখুলি বামপন্থী অথবা শুধু কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী, এখানে আমরা তার বিচার করতে পারি, পরবর্তীকালে শেখোক্ত মনোভাবের প্রকাশ দেখা গিয়েছে।

বাই হোক, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন তখন এপ্রিল মাসের প্রথম কয়েক সপ্তাহে বাংলার সরকারী কংগ্রেস হেডকোয়ার্টার থেকে বর্ধেট সাজা পাওয়া যায়নি। মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমান জেলা থেকে উৎসাহজনক সাজা পাওয়া গেল, গত দশ বছর এগুলি গান্ধীবাদী গঠনকার্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস শীঘ্র অমূরূপ কাজ আরম্ভ করলো এবং ২৪পরগণা জেলা ও মেদিনীপুরের কয়েকটি অংশে অমূরূপ কাজ শুরু হলো। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে হুইদনের

সেবার্গিন জুয়োও একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

দেবযানী

ফেস্ পাউডার
ট্যালকাম্ পাউডার
স্নো, স্কুমস্কুম
হেয়ার অয়েল
মেল্ পলিশ

ডি, জে, প্রোডাক্টস্ • কলিকাতা-১

কার্যপদ্ধতি ও কর্মকৌশলের মধ্যে পার্থক্য ছিল, এটা সহজেই বোঝা গেল এবং কর্মীরা নিজেরাও স্পষ্টভাবে তা স্বীকার করলো।

শীঘ্র সরকারী নির্বাচন আরম্ভ হল এবং নির্বাচনে পাইকারীভাবে শান্তি দেওয়া হতে লাগল। বিপ্লবী দল হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হল। চট্টগ্রামে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সরকারী অস্ত্রাগার আক্রান্ত হল এবং সহর ও নিকটবর্তী অঞ্চল এক সপ্তাহ অথবা আরো কিছু বেশী সময় বিপ্লবীদের অধীনে রইল। সরকারও হিংস্রভাবে পাঁচটা আঘাত করলেন, কিন্তু হানাদার বিপ্লবীদের বীরত্ব বাংলার সব জায়গা থেকে সহাহুড়ুতিশ্রুতক সাড়া পেল। একমাত্র স্বদেশী যুগেই এইরকম দেখা গিয়েছিল।

সাহিত্য ও চাক্কলা

রাজনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র থেকে যদি আমরা বেরিয়ে আসি তাহলে চাক্কলা ও সাহিত্যের জগতেও আমরা সমান্তরাল ভাবে উন্নয়ন লক্ষ্য করতে পারবো। স্বদেশী যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে বাংলার নতুন চাক্কলার দ্বারা জাপান ও চীনের চাক্কলা থেকে কিছু অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। কিন্তু এতকাল পর্যন্ত বিশ্বস্ত ভারতের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যে চাক্কলা বলবৎ রয়েছে সেই সম্পর্কে এখন এক নতুন আগ্রহ দেখা গেল।

এমন কি, স্বদেশীযুগেও লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত সম্পর্কে আগ্রহ একটি ক্রীণ নদীপ্রোতের মত বয়ে চলেছিল। পশ্চিমবঙ্গ রংপুর, রাজসাহী, বীরভূম, মালদহ ও বাংলার অন্যান্য জেলার গ্রাম্য উপভাষা অনুশীলন করেন, উহার ফল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অথবা উহার রংপুর শাখার পত্রিকার প্রকাশিত হয়। লোকে কেমন ভাবে কথাবার্তা বলে, বসবাস করে, কি ভাবে দেবদেবীর আরাধনা করে সে সম্পর্কে লোকের মধ্যে ক্রমশ আগ্রহ দেখা যেতে লাগল। কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র একদল ভাবপ্রবণ পণ্ডিত, শিল্পী ও ঐতিহাসিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং জনগণও এই ব্যাপারে ক্রমশ আগ্রহশীল হয়ে উঠলো।

বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে এমন চরিত্র আবিষ্কার করা হল যাদের এ পর্যন্ত সাহিত্যের দরবারে প্রবেশাধিকার ছিল না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লুপ্তকথিত পতিতাদের জীবন সম্পর্কে কাহিনী লিখলেন, তাঁর এই সময়ের একখানি বহু বিতর্কমূলক উপন্যাসে একজন পতিতাকে নারিকারূপে চিত্রিত করলেন। তাঁর প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো অবশ্য পশ্চিম বাংলার নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে নেওয়া। সমাজের শঠতা ও তার আনুষ্ঠানিক নৈতিকতার তুরা আদর্শবাদ অর্থাৎ সমাজের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যের ফলে, প্রেম ও জীবনের প্রতি যাদের মমতা ছিল তাদের জীবন কি ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল তার রমণী কাহিনী তিনি সূটিয়ে তুলেছেন।

বিশ দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার সক্রিয় ভাবে যোগদানের পর এই দিকে নতুন কতকগুলি সম্পর্ক পরিবর্তন দেখা গেল। স্বদেশী যুগে অথবা তার কিছু পরে সাহিত্যের ভাষায়ও সমান্তরাল ভাবে কিছু পরিবর্তন দেখা গেল। কথা ভাষা থেকে এত কাল এটা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। ঊনবিংশ শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে প্রেমাত্মক সাহিত্য ও নাটকে কথা ভাষা অথবা কথিত ভাষার লিখিত ভাষাকে সহজ করে লিখবার যৌক্তিক প্রকট হয়ে উঠল এবং এটাই একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে

পাঁড়াল। স্বদেশীর পর প্রথমবার চৌধুরী ব্যাপকক্ষেত্রে নতুন করে পরীক্ষা শুরু করলেন। মোটের ওপর সাহিত্যের ভাষাই নিম্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে থাকল। ১৯২১ ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের গণ-রাজনৈতিক আন্দোলনের পর ক্রমশ কথা ভাষার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের লক্ষণীয় বিষয় হয়ে পড়ল।

সম্প্রতি পল্লীজীবন থেকে উৎপাত হয়ে বস্তিতে বাসা বেঁধে যাদের জীবন হয়ে উঠল একটানা দুঃখকষ্ট এবং বিরোধ-ব্যথার ভরপুর, করলাধনির সেই বাসিন্দাদের জীবন থেকে নতুন বিষয় নিয়ে কাহিনী লেখা হল। পাঁড়িমারি ও ধর্মীর গৌড়ামিত্ত মরনারীদের জীবনের কাহিনী অনুসন্ধানের দৃষ্টি নিয়ে উদ্ঘাটন করা হতে লাগল। (এ্যান একার অফ গ্রীণ গ্র্যাস—বৃহস্পতি বঙ্গ ১৯৪৮) এভাবে গড়পড়তা বাঙ্গালী পাঠক এমন এক শ্রেণীর লোকের জীবন সম্পর্কে পরিচিত হয়ে উঠলো, নিষ্ঠুর আর্থিক ও সামাজিক প্রথা যাদের জীবনে শোচনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। এটা যেম প্রায় তাদের নিজেদের জীবন কাহিনী, সুতরাং তা তাদের মনে সহাহুড়ুতির সাড়া জাগাতে সক্ষম হলো।

মোটের ওপর এভাবে ভাষা ও সাহিত্য জীবনের দাবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবুদ্ধি হল, পূর্বে এরকম ছিল না। অতীতের দিকে কিয়ে তাকালে আমরা দেখতে পাই, সাহিত্য কয়েকজননের একচেটিয়া জিনিষ ছিল। সংস্কৃতি ছিল বটে কিন্তু সেই সংস্কৃতির বাহন ছিল যুখে যুখে, পেশাদার চারণ-কবি, গল্প-কথক ও নটেরা পুস্তকাক্রমে তা পরিবেশন করে আসছিল। কিন্তু ছাপাখানা বোপাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করে তোলায় সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পূর্বকার যে ব্যবধান ছিল তা ক্রমশ ভেঙে যেতে লাগল। সাহিত্য শুধু মানুষকে নৈতিক পর্যায়ে পথই দেখিয়ে দেবে না, অনুভূতিসম্পন্ন শিল্পীদের মনে যে ভাবে প্রতিফলিত হয় সেভাবেই সাহিত্য জীবনচিত্র হয়ে পাঁড়াল। এই চিত্রশিল্পীর মন সহাহুড়ুতি আর আদর্শে আলোকিত হল। জীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে লোকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগল সাহিত্যে সেই একই ধরনের বস্তুর প্রতিফলন হল।

একই সময়ে সাহিত্যে ও অন্যান্য চাক্কলার একটি বিদ্রোহ, ধ্বংসাত্মক প্রবণতা দেখা যেতে লাগলো। বহু, দুঃস্বভাব রচনার পরিবর্তে অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং বিভিন্ন ধরনের পরস্পরবিরোধী আলোচ্য দেখা দিল। বাংলার বিগত হৃৎকম্প সম্পর্কে শুধু নয়, বর্তমান সময় সম্পর্কেও এটা সমানরূপে সত্য। টি এস এলিয়ট অথবা আরও সাম্প্রতিককালের অডেন, স্পেন্ডার ও জয়েসের অনুরাগী পাঠক বাংলা দেশে মেলে; এর আগের সময়ে টলটল, ডর্টমন্ডকি, ইবসেন, মোপাসাঁ ও হ্যুট হামস্বনের সমানর ছিল। অতীতের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এটা প্রতিবাদ শুধু নয়, সাধারণ মানুষের উদ্দীপনার উচ্ছ্বাস এবং তার প্রযুক্তির আবেগও বটে।

অধিকতর সন্তোষজনক কিছু গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তা বোধ অপেক্ষাও অতীত দ্বারা থেকে বিভিন্ন হবার আকাঙ্ক্ষা ভীতভর হল। এর ফলে বারা সমাজজীবনকে অতীতের আবর্জনারূপ করতে চাইলেন এবং আবিষ্কার করলেন যে, এই আবর্জনারূপ এত বেশী যে শেষ পর্যন্ত তাদের নৈরাশ্র ও নিফল বিদ্রোহ ব্যর্থতার

পর্বেদিত হইবে, সাহিত্য ক্ষেত্রেও আন্দোলনে তাদের সেই মনোভাব স্থান পেল।

উপরোক্ত মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাংলা দেশ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কলাবিভাগে ক্লাসিক্যাল-এর দিকে প্রতিকূল আন্দোলন দেখতে পাই। ভারতনাট্যম্ অথবা কথাকলি, কাজরী অথবা মনিপুরী বাস প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল নৃত্য সম্পর্কেও লোকের নতুন আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে মনে হয়। বামিনী রায় অথবা নন্দলাল বসুর মত শিল্পীরা দ্বি-মাত্রিক পট চিত্রশিল্পকে এক নতুন মর্যাদা দিয়েছেন। ক্রপন, খেরাল প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত আগের চেয়ে অনেক বেশী সমাদৃত হয়েছে। বোধ হয় ছাপাখানা এবং শেখোক্ত ক্ষেত্রে বেডিও ও এমপ্লিফায়ারের প্রবর্তনের কলে অধিক সংখ্যক শ্রোতার বোগদান সম্ভব হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এমন একটা অধ্যায় গিয়েছে যখন ভারতীয় সন্যতাকে মসীলিপ্ত করে ধীরে ধীরে পান তাঁদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে লোকে অতীতের একটা মনোরম চিত্র তুলে ধরেছে। অতীতের দিকে এই প্রত্যাবর্তন কেবল আত্মরক্ষার উপায় ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। পশ্চিমের উৎকর্ষতার যে মূল্যবোধ আড়ম্বরের সঙ্গে ভারতকে দেখান হয়েছিল তারই তিস্তিতে গঠিত হয়েছিল এই আত্মরক্ষার চেষ্টা। যাতে করে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতার বক্ষকগণ অন্তরে অন্তরে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী হলের নিষ্ঠা আত্মসমর্পণ করেছিল।

পুরাতন কৃষ্টি অথবা লোক-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের তৎকালীন পুরুষজীবনের ভিত্তিঃ চাকরকার কাঠামোরূপে এগুলোর অন্তর্নিহিত গুণাবলীঃ প্রতি একটা প্রকৃত আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পুরাতন টেকনিক অথবা নৃত্য, নাটক অথবা চিত্রকলায় অধিকতর মনন কাঠামোর মাধ্যমে প্রদর্শিত মানুষের সাধারণ আনন্দ, হৃৎ, ভয়, ভালবাসা প্রত্যেক করা যায়। যাতে করে চাকরকার

হৃৎ কাঠামো—ক্লাসিক্যাল ও সাধারণ জীবনের আবেগগুলোর প্রকাশের মাধ্যমরূপে তাদের বোগ্য আসন লাভ করেছে।

সাধারণ মন্তব্য

এই সকল বিরোধও কখনও কখনও সাহিত্য ও চাকরকার এবং সামাজিক অথবা রাজনৈতিক জীবন সমান্তরাল অগ্রগতির কলে মানুষের জীবন এক নতুন মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়েছে, অতীতের আচার অনুষ্ঠান, অথবা সাম্প্রতিক কালের শোষণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার চাপে পড়ে এই মর্যাদা মানুষকে কোনদিন দেওয়া হয়নি। মানুষের মনে আজ যথেষ্ট পরিমাণে ধর্মনিরপেক্ষ আগ্রহের উদয় হয়েছে এবং যে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে এক সময়ে লোকে একটা অতীতের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতো এখন সেগুলো জন-সংগঠনের এবং প্রেমোদ অনুষ্ঠানের বাহন হয়ে উঠেছে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে ইতিপূর্বে তাদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু আজ তাদের জন্তে দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। চাকরকার উদ্বেগ আজ প্রোথিত লাভ করেছে, আগে সেখানে ছিল ধর্মীয় অতীতের বাধার একচ্ছত্র প্রোথিত। সার্বজনীন পূজা নামে সে সামাজিক ধর্মীয় উৎসবগুলো আধুনিককালে নতুন রূপ পেয়েছে সেই সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তি বিশেষভাবে প্রোথিত। বহুবিধ বন্ধনের শৃঙ্খল থেকে জীবন আজ মুক্তিলাভ করেছে, একথা সুস্পষ্ট। স্বাধীনতা আজ প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছেছে। মজা, পুরুষের তুলনায় নারীর জীবনের ক্ষেত্রে একথা আজ বিশেষ ভাবে প্রোথিত এবং যেহেতু সেই বন্ধন আজও বাংলার জীবনধারাকে অংশত জর্জরিত করেছে। সেই কারণেই রাজনীতিতে, সামাজিক চিন্তাধারায় এবং চাকরকার মননভাবে গড়ে তোলার মনোভাবের পরিবর্তে একটা বিদ্রোহের ভাব প্রোথিত লাভ করেছে। তথাপি আজ দেখা যায়, এখানে জীবন তার মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক পুণ্যে থেকে গৃহীত কাঠামো ও নতুন সৃষ্টির দ্বারা নতুন প্রকাশের জন্ত সংগ্রাম করছে এবং ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আজ এরকম কতগুলো প্রবণতাও পুণ্যায়িত হয়ে উঠেছে।

সমাপ্ত

অশ্রমতী

জগন্নাথ ঘোষ

নিত্যতাই নন্দ হল যে মেয়েটি ইচ্ছার আওতায়,
সর্বদা অধিক তার মৃতিমতী বিবাদ বৌবন।
দর্পণে দেখেছে মুখ। স্বপ্নের কুহকে ভরা মন
এঁকেছে অপূর্ব ছবি প্রতীকার মারাজাল বনে।

অঁকারে অধৃত হল। পেল না সে প্রণয়ের দান।
অক্ষর লাভণ্যে মাখা কুমারীর মুক্ত মীল চোখে
নিটোল মুক্তার বিন্দু। নিত্যবহা বকনার শোকে
অশ্রমতী রূপ নিল। জলকড়া হবে তার সাধ।

অধোমুখী আকাজকার পদপাতা ছিঁড়েছে গোপনে।
অধরে বিধিত রেখা। শুনেছে সে-প্রেমিকের নাম।
প্রতিধ্বনি স্থংপিণ্ডে। রক্তে তার করে অবিহাম
করণ কারার কলি। কোন্ ব্যথা বাজে তার মনে।
সে জানে না ইচ্ছা তার। প্রেমিকের নিতৃত অধর
পেল না সে এক সূঁঠা। প্রেম তার হল না অধর।

শিশির-সান্নিধ্যে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

অভিনয়ের সময় কথা বলবার কৌশল শেখালেন—কথা বখন বলবে তখন ঠোট বা গলা থেকে নয়, বলবে বুক থেকে। আর বখন আরো গভীর কথা বলতে চাও তখন বলবে পেট থেকে। আমি ত ঠোট থেকে কথাই বলতে পারি না।

চারণার কথাগুলো—‘নর্দমার পচা-পাঁক’ কি ‘বন্ধ জলার ওপর ঘোঁরা উঠছে’ ওগুলো পেট থেকে বললে খুব ভাল শোনায়। এদিক থেকে অভূত ক্রমতা ছিল দানী বাবুর।

দেখ, আমি বখন এই সব নাম বলি, তখন ধরে রাখবে গিরিশ বাবু অলগয়েজ একসেজাইড। ঠর সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না। অমৃতলাল বোসের কাছে শুনেছি যৌবনে কষ্ট ছিল নাকি অতুলনীয়। তারপর এক সময়ে কি জন্মে জানি না উনি নাকি গলা দিয়ে দেন।

আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি। আমার মনে হয় অপরিমিত মত্ত পানের ফলে ঠর গলা নষ্ট হয়ে যায়। ঠর মদ খাওয়া কি সাধারণ খাওয়া।

একবার ছোটবেলায়—তখন আমার কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থল—গিরিশ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম, সঙ্গে ছিলেন একজন বয়স্ক লোক। আমাদের সামনেই গেলান এসো, চেহারা দেখে তখন মনে হয়েছিল বৃষ্টি লাইমেড খাচ্ছেন, এখন বৃষ্টি। সঙ্গে জুতোকে জিগ্যেস করতে তিনি ইমডাইরেটলি বললেন—মদ-টন হবে। তিনি বলেছিলেন—স্বাস্থি, এখন বৃষ্টি ওটা স্বাস্থি নয় হইকি।

তা এই রকম এক ঘণ্টার তিনবার খেলেন, মানে ঘোঁট পরিমাণ সাড়ে আট আউল হবেই। এক ঘণ্টার সাড়ে আট আউল, তাহলে সাড়ানির পরিমাণটা ভাবো একবার। অমৃতলাল বোসের লেখার চার ছিলিম গাঁজা, হু’বোতল হইকি আর এক ডজন বিয়ার খাবার কথা আছে।

গিরিশ বাবুর উচ্চারণ মোটামুটি ভালই ছিল। হু’একটা উচ্চারণের জুল এখনো মনে আছে। একটা হ’ল দুই—মুদ্রী উনি কিছুতেই বলতে পারতেন না, বলতেন দুই। আর একটা হ’ল—কুহক। ওটাতে আমারই গোলমাল হয় কুহকীর কুহকে পড়ে গেছি আর কি।

উচ্চারণ ভাল করতেন অমৃত মিত্র আর অর্ধেন্দু বাবু। অর্ধেন্দু বাবুর ত কোন দোষই ছিল না।

থিয়েটারের সঙ্গে পানদোষ অস্বাস্থ্যভাবে জড়িত; অমন যে হেনরী আরভিন, যিনি আয়রণ ডিসিপ্রিন মেনটেন করতেন, তিনি পর্বত প্রচুর মত্তপান করতেন। শোনা যায়, একবার এমন অবস্থা বেঁটাকতে পারতেন না, অভিনয় কিছু ঠিকই করতেন। অভিনয়ের পরে কার্টেন কলে ঠিকমত বেতে পারবেন কিনা সবাই ভাবছে, কিন্তু ঠিকমত গেলেন, একই ভাবে হাঁটু মুড়ে বাউ করলেন।

একবার হু’বার করে পাঁচবার গেলেন। শেখবার ক্রমে আলতেই হু’পাশ থেকে হু’জন ধরে ফেসলে, কারণ আর চলবার অবস্থা ছিল না।

আরভিনের চেহারা ভাল ছিল না, পলা ছিল শ্রিল; কিন্তু তার মধ্যে থেকেই পার্সনালিটি কেমন প্রোজেক্ট করতেন।

ভগবান সব বড় অভিনেতাকেই বড় বড় চোখ দিয়েছেন, কেবল আমাকেই বঞ্চিত করেছেন। তবে তা নিয়ে দুঃখ করলে চলবে না, বা আছে তাকেই ফোটাতে হবে।

আলো সবক্কে বললেন—আলো সাধারণ আলোই ভাল। স্পট লিটে এক জনের মুখে আলো পড়ে বটে অভিনয়ের মুখে অন্ধকার হয় আর তাহলে তার মুখের রি-অ্যাকশনটা বোঝা যায় না। তার চেয়ে ওয়াইড স্ট্রাডলাইট ব্যবহার করা অনেক ভাল।

ডিমারের কথা বলার বললেন—ডিমার ত আমারও ছিল। ডিমার করতে আর কত খরচ পড়ে? একশো সাতাশী, দুশো সাতাশী, তিনশো সাতাশী টাকার মত হবে। তবে পরেটের ডিমারের চেয়ে জলের মধ্যে দিয়ে ডিমার ইউজ করার ফল অনেক ভাল হয়।

২৫শে এলেন সাধারণ রিহার্স্যাল দিতে। প্রথমেই বললেন, মালিনী নাটক আমাদের ভালই হবে, তবে অনেক দিন রিহার্স্যাল দিতে হবে। মেয়েদের পাট ছুটায় খুব সুন্দর মানাবে তামলী আর কল্পাকে। ছেলের নির্যেই ভাবনা। সে রকম ভাল ছেলে কই? রবীন্দ্রনাথের লেখাতে ছোট ছোট চরিত্রগুলোও বেশ কঠিন। সুপ্রিয় চরিত্র কে করবে? কেমনভাবে চরিত্র ত লেখক নিজেই জোর দিয়ে গেছেন।

সীতান্তে আমার লাভ হল না। অর্ধ ঘণ্টার পর মাস ৫৭ ৭২ টাকা টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। এমন অল্প কোনো বইয়েও দেখিনি। লাভ না হবার কারণ লোকে প্রচুর ঠিকিয়েছিল। তাছাড়া মিলম্যান্ডেজমেন্ট আর চুরিও ছিল।

আবার বলব—ঐ যে মনোমোহন ছিল, গলবিহীন কোট পরত, সীতার সিনের জন্মে পুরোনো কাঠ আমাকে এসে দিলেন, চাইলেন দশ হাজার টাকা। আমি দিয়ে দিলুম। তখন কি জানি, মনোমোহন থিয়েটারের পুরোনো সিনগুলো আমার বেচে দিয়েছেন।

আমি বখন মনোমোহন থিয়েটার থেকে চলে আসছি তখন মনোমোহন বাবু বললেন—ওগুলো তোমার ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল।

আমি বললুম—সে কি? ওগুলো ত আমি কিনেছি।

উনি বললেন—কিনলে কি রকম? কাঠগুলো দেখো ত?

দেখি, সত্যি সত্যি সব পুরোন কাঠ, মানে পুরোনো সিন কেটে করে দেওয়া।

মনোমোহন থিয়েটার থেকে আমাকে উঠিয়ে দেবার জন্মে কত রকম চেষ্টা হ’ল। কর্পোরেশন থেকে বাড়িটা কনভয়ে করা হ’ল। অত বছর ধরে অত লোক যেখানে বসে থিয়েটার দেখেছে, সেটার মধ্যে অনেক রকম দোষ দেখানো হ’ল। দাশ সাহেব থাকতে অবশ্য পারেনি, কিন্তু যা চেজ করতে বললে, তা কনভয়েমেনশানেরও বেশী। হরিপ্রিয় আমাকে বললে—ও বাড়ি লোক বাগিয়ে ভাঙা যায় নাকি? শায়ল দিয়ে ভাঙতে পারে কিনা চাখো ত। তুমি কেস কর, আমরা তোমার হয়ে সাক্ষী দেব।

শাপুড়ীর শিক্ষা

ভাই বকুলকুল,

বউ কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করেছ। কথাটার সোজাসুজি উত্তর আমি দেবো না। একটা ঘটনা লিখছি তার থেকেই বিচার করো বউ ভাল না মন্দ।

তপুতো কি কাণ্ড করে বিয়ে করলো তা স্তনেইছো। কাউকে জানানো নেই কিছু না, হঠাৎ সাদাসিধে বিয়ে করে বসলো আমার উপর রাগ করে। আমার কত সাধ ছিল ব্যকপাইপ বাজিয়ে তপু ঘোড়ায় চড়ে বৌ আনবে। উনিতো আমার জুড়িগাড়ী চেপে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাতে কি এমন মহাভারত অন্তর হয়েছিল শুনি? ছেলে বেঁকে বসলো ও ভাবে বিয়ে সে করবে না—আমরা নাকি সেকলে। সেকলে বৈকি! আটার বছর বয়সে কি একেলে থাকবো নাকি?

যাই হোক, বউ দেখে আমি সেকলে মাহুব, কি রকম ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। দেখলুম বউ আমার ওপর এক বিধে ঢ্যাঙা (আজকাল ঢ্যাঙা হওয়া নাকি স্কন্ধের লক্ষণ), ময়লা রঙ (এটাও আজকাল চলে), একটু রোগাটে—যাকে আধুনিকারা 'সিলিন' না কি বলে ইংরিজিতে—তাই। গলার স্বর অবশি বলতে বাধ্য হচ্ছি, বেশ মিষ্টি। গানটানগুলো বাপমা খুব চর্চা করিয়েছে মিস্তরই।

উনি অসুখ থেকে তখন সবে সেরে উঠছিলেন। খাওয়া নিয়ে সারাক্ষণ খিটমিট করেন। সব খাবার দাবারই ওঁর পানলে লাগে! আমি একবারে ভিত্তো বিরক্ত হয়ে ঝালের ঝোল রেঁধেছিলুম—আজ হান খাবেন নন্নতো এমার থেকে রান্না করাই ছেড়ে দেবো।

বউমা প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল আর আমি ওর খাবার থালাটা ধরে বিলুয় বিছানার পাশের টেবিলে।

উনি ঝোল মুখে দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছি, ছি, কি লজ্জা বলতো ভাই বকুলকুল নতুন বউমার সামনে। উনি আরও কাটা ঘায়ে মূনের ছিটে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'পরত্রিশ বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও রুগীর পথ্য রাঁধতে শিখলে না?'

আমি চোখের জল ফেললুম। পাশের ঘরে গিয়ে বউমাকে বললুম—'কি রকম খিটখিটে মাহুবটি দেখেছো তো? পারবেতো ঘর করতে মা? বউমা হাসল। তারপর কাচু মাচু মুখ করে বললো। 'একটা কথা বলবো?'

'বলো'

'কাল আমি রাঁধবো বাবার তরকারী?'

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম—

'বলো কি বউমা, রান্নাবান্না জানো কিছু?'

'হঁ, আমার মাতো অনেক রকম রান্না আমায় শিখিয়েছেন।'

পরদিন আমি গেলুম কালীঘাটে পূজো দিতে আর বউমা কোমর বেঁধে রাঁধতে বসলো। তপুকে লিষ্ট্রি করে দিল বাঁজার থেকে কি সব আনতে। বাড়ি ফিরে দেখি এলাহি কাণ্ড, রান্না ঘরের ভোলই পালটে গেছে—সব সাজানো গুছানো। উম্মনের পাশে একটা নতুন কেরোসিন ঠৌড়। এর মধ্যেই পাঁচখানা তরকারী সাজা, উম্মনে ভাত হুটছে। তরকারীর রং দেখে জিজ্ঞেস করলুম—'বাঃ এমন রং বার করলে কি করে বউমা?' বউমা কিছুটা না বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। বুকলুম মার কাছে শেখা গুপ্ত মস্তুর আছে বলবে না।

ওঁকে প্রথমে ঝোল ভাত দেওয়া হ'ল কি বলেন দেখার জন্ত। প্রথম ট্রাসেই মুখে হাসি হুটলো—'বাঃ আজ

রান্নাটা যেন অল্প রকম লাগছে।' বউমা একে একে পাঁচটা তরকারী ধরে দিল। উনি চেঁছে-পুঁছে সব খেয়ে আরামের ঢেকুর তুলে বললেন 'এত খেয়ে ফেললাম—একটু জোয়ানের আরক দাওতো গো।'

বউমা বাধা দিল—'না না ও সব খাওয়ার দরকার নেই। আমার বাবাতো আপনার চাইতেও বড়, কিন্তু বাবাকে ও সব খেতে হয় না। আমার মা বাবার সব রান্নাই একটু হালকা করে 'ডালুডা' বনস্পতিতে রাঁধেন। আমাদের বাড়ীর সব রান্নাই 'ডালুডা'য় হয়।

'কি বললে বাছা?' আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—'ডালুডা' বনস্পতি? তা' আমাদের লুচি-টুচিতো বনস্পতিতে ভাজি আজকাল। ডিমের আঁমলেটও ওতেই হয়। আর কি বলে—মুজির হালুয়াও।'

'শুধু জল খাবার কেন মা, আজকালতো অনেক বাড়িতেই সব কিছু 'ডালুডা'য় রান্না হয়। আজ যে পাঁচটা তরকারীই 'ডালুডা'য় রেঁধেছি, তাতে কি স্বাদ খারাপ হয়েছে?'

উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন।

'না, না, বরং খুব ভাল হয়েছে। বউমার কাছে থেকে 'ডালুডা'র তাকবাগ-গুলো জেনে নাওতো গো।'

বউমার গুপ্ত মস্তুরটি জেনে নিয়ে খাসা রান্না করছি আজকাল উনি সেরে উঠেছেন। খেতেও পারছেন প্রচুর। বউমা যে শুধু স্বস্তুরকে বশ করেছে তাই নয়, চিরকলে খুঁৎ কাড়া শাপুড়ীও বশ মেনেছে। কি বল ভাই, বউমন্দ না ভাল?

হ্যাঁ, আর মাথা খাও ভাই বকুলকুল, তোমার ঐ খিটখিটে বউডেকে আমার বউমার 'ডালুডা' বনস্পতিতে রাঁধা রান্না খাইয়ে দেখ একবার—হাতে নাতে ফল পাবে।

তোমার বকুলকুল সই

কিন্তু তার আগেই আমাকে বাড়ি ছাড়তে হল; আর আমি ছাড়া মাত্র কনভেনশন উইথড্রন হ'ল।

মহেন্দ্র বাবু আমার গ্যারান্টির ছিলেন, ওঁর সঙ্গে এগ্রিমেন্ট লেখা ছিল, উনি বললেই আমি বাড়ি ছেড়ে দেব।

আমার সঙ্গে মনোমোহন পাণ্ডের বন্ধন গোলমাল আছে, তখন মনোমোহন বাবু হঠাৎ ওঁর ছেলের গিয়ে কি বোঝালেন, তারিও আমার সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে দিতে বললেন। আমিও ছেড়ে দিলুম।

থিয়েটারটা কিন্তু ইমপ্লেমেন্ট ট্রাষ্ট ভাঙত না। পার্গার না বমপাস—ওদের চিক আর্কিটেক্ট—আমায় বললেন—ও বাড়ি আমরা ভাঙতে চাই না। আমাকে ইকুইভ্যালেন্ট জায়গা দাও, আমি বাড়ীটাকে আইল্যান্ডের মত বেখে হু'পাশ দিয়ে রাস্তা বার করে নিয়ে যাব।

তাড়াতাড়ি মনোমোহন বাবুকে খবরটা দিতে গেলুম, ভেবেছিলুম খবরটা পেয়ে খুব খুসী হবেন। তা নয়, বললেন—না তারা, ও বাড়িতে আমার লক (luck) গেছে, ও বাড়ি ভেঙেই কেলুক।

আমাদের এখন অনেক নাট্যকার দরকার। নাটক লিখুক না, অন্ততঃ খান তিনক বই নিয়ে আমরা অভিনয় করতে পারি। আমি কিন্তু ৫০ রাস্তির বেশী কোন নাটক করতে দেব না।

২৭শে এলেন অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে, আগের দিন পড়ার চশমাটা ভাঙে গেছে, বললেন—এখন কি করে পড়ব বলত ?

একজন চশমাটা তাড়াতাড়ি সারাতে নিয়ে গেল। তখন বললেন—চুপচাপ বসে থেকে কি করব ? তার চেয়ে হু-একটা কবিতা আবৃত্তি করি। তোমরা শোনো, যদি কোথাও আটকার বা জুল করি ত আঙুল তুলে দেখিও।

এর পর মিনিট পনেরো কুড়ি একটানা আবৃত্তি করে গেলেন, হু' তিনটে কবিতা বললেন, একবারও আঙুল তুলতে হ'ল না। আবৃত্তি শেষ করে বললেন—তাহলে শিশির ভাঙড়ি এখনো মরেনি।

হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—চশমাটা এখনও নিয়ে এলো না।

সেবুদা সাধনা দিলে—ব্যস্ত হবেন না, পাকা লোক গেছে, পারিয়েই নিয়ে আসবে। তাছাড়া সারাতেও ত সময় লাগবে।

থিয়েটারে কে প্রস্পট করবে, সে সবকে কথা বলতে গিয়ে বললেন, তাখো কম বয়সে অনেক কিছু করেছি, যা এখন ভাবলে, বুকি অভয় করেছিলুম। প্রথম প্রথম প্রস্পটারদের কি কম কষ্ট দিয়েছি। বলতে বলতে কথা তুলে গেছি, ভাবলুম কি আমি শিশির ভাঙড়ি, আমি আর নিজেকে তৈরী করে বলতে পারব না। বলতুমও, লোকের তা ভালও লাগত, হাততালি দিত। কিন্তু হতভাগ্য প্রস্পটারের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো। এ পাতা ও পাতা সে পাতা খুঁজে শেষ পর্যন্ত হতশ হয়ে পড়িয়ে থাকত। আমার বলার পর ধরিয়ে দিতে কি কষ্ট তাকে পেতে হ'ত বল দেখি ?

উনি কথাও শেষ করেছেন আর চশমাও সারিয়ে নিয়ে কিরে এল। খুসী মনে চশমাটা হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে বললেন—এই সব সংস্কৃতি-টংস্কৃতির প্রচলন কবে বন্ধ হবে বলতে পার ? এই যে সত্য গিয়ে হু-চার কথা বলা এতে কার লাভ হবে ?

শর্মিষ্ঠা পড়তে শুরু করলেন। একটা দৃশ্য পড়ে বললেন—এই দৃশ্যটার কোন প্রয়োজন নেই, একেই বোধ হয় বলে বিহ্বলক। লোকেরা বলেছে হাতধর দিতে হবে, তাই হাতধর দিতে চেষ্টা

করেছেন। বইটা আমার কেটে পড়াই উচিত ছিল। এতে যেসব অবান্তর কথা আছে, কেইকুমারীতে সেসব কিছুই নেই। এ বইটার ওপর সংস্কৃতের প্রভাব প্রচুর। জায়গার জায়গার আবার সেক্সপীয়ারের ছাপও আছে।

শর্মিষ্ঠাতে উনি তবু ভরে ভরে বিশ্বনাথের অল্পশাসন মেনেছেন, কিন্তু কেইকুমারীতে একেবারে সব কনভেনশন লোপ করেছেন। কেইকুমারীর মত নাটক বাঙলার কমই আছে, এমন কি তার থেকে নাটক আর এগোয়নি।

আবার একটা দৃশ্য পড়ে বললেন—এই যে হু'জনে হু'জনকে দেখতে পাচ্ছে না, এটা মিড সামারনাইটস ড্রিমের মত।

মাইকেল অনেকগুলো ভাষা জানতেন। ইংরেজী ছাড়া ল্যাটিন, গ্রীক, ফ্রেন্স, ইটালিয়ান আর সংস্কৃত—এই ছ'টা হ'ল স্তম্ভাং টার্গারের মন্তাহুধারী উনি কালচার্ড। উইলিয়াম টার্গার বলেছেন—যে ছ'টা ভাষা জানে না, সে কালচার্ড নয়।

ঈশ্বর সিং আর প্রতাপ সিং-এর ছবি কোথাও আছে ? নাচবার বুকি বেরিয়েছিল, জাতীয় নাট্যশালা করলে সেখানে ওদের ছোটো বড় ছবি টাঙিয়ে রাখা উচিত, বেলগেছেতে ওরা না করলে বাঙলা নাটক কোথায় থাকত ?

মাইকেলের গান হ'ল গির্জা বাবুর আদর্শ, অবশ্য উনি অনেক ভাল লিখেছেন।

১লা ডিসেম্বর মালিনীর বিহার্তাল দিতে এসে প্রথমেই বললেন, —ত্রাঙ্গণগুলো বেশ ভাল লোক চাই—পাঁচ জন কথা বলার আছে, চার জনে করা বেতে পারে, দেবদত্তর মোটে হু'-তিনটে কথা আছে। চাকরদের কথাগুলো একটু বাঁকা ধরনের। সোমচার্ঘ খুব হৃৎকুড় করে কথা বলে এবং একটু বেশী ইমোশানাল।

সুপ্রিয়র চরিত্রটা খুব শক্ত, ওটা করার জন্তে ভাল লোক চাই। একজন এসেছিল বাড়িতে, কাতিক এনেছিল, গলাটা বঁটু ভাল; যবে ত ঠিক বোঝা যায় না, এখানে আসতে বলেছিলুম কিন্তু এলো না কেন বুঝতে পারছি না।

এর পর কিছুকণ বিহার্তাল হ'ল। আমাদের আঙ্গুহাতিশব্দে রাজার ভূমিকা নিতে রাজী হয়েছিলেন। কান্তপ, মালিনী, রাজা আর রাণীর ভূমিকারই বিহার্তাল হ'ল। একসময়ে চা এল, চা খেতে খেতে গল্প জুড়লেন—পুলিশ আজকাল বেখানে-সেখানে ঢোকে, কলেজের কর্তা নিজেবাই ডেকে আনেন। অথচ এমিক দিয়ে সাহেবরা অনেক ভাল ছিলেন।

এণ্ড ফ্রেজার আসছেন কটিপ কলেজে—উনি নিজের ত স্বচরম্যান। তা খুব জোর অ্যাবেজমেন্ট হয়েছে। এণ্ড ফ্রেজারকে মারবার চেষ্টা হয়েছিল, আবার মারতে গিয়েছিল কটিশেই হলে জীবনলাল।

বাইরে চারদিকে পুলিশ দেবার পর এক অত্যাংসাহী পুলিশ-কর্মচারী কোরাডাক্সলের ভেতর, সিঁড়ির আশেপাশে লোক পাক করতে শুরু করলেন, ওরান সাহেব তখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলেন, পুলিশ বেখে এসে বললেন—Who has allowed you to come in ?

অকিসারাটি আমতা আমতা করতে আরম্ভ করলেন। ওরান সাহেব তখন বললেন—You get out of my compound,

গেটের ধারে পাঁড়াতে বললেন—No, out of my compound. He is my guest, I know how to receive him.

জেমস সাহেবও ঐরকম ছিলেন। ইডেন হিন্দু হোটেল সার্চ করতে দিলেন না, আর তার ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে চাকরী ছাড়তে হ'ল। প্রথমে বললেন—দেবো না। তার পর রাত্তিরবেলা নিজে পাঁড়িরে থাকলেন, বললেন—আমার ছেলেরের তোমরা অনুবিধের কেলবে, তা চলবে না।

কিছুই অবশ্য পাওয়া গেল না। একটি ছেলে একটা ডালা তোরঙ্গ চাষি বন্ধ করে একগাছা বাঁটা রেখে দিয়েছিল। তারপর বলছে, চাষি পাওয়া বাজে না, তালা ভাঙুন। একটা লোহার কি দিয়ে টানতেই খুলে গেল—দেখে বাঁটা।

জেমস সাহেবের ওপর সেই থেকে গভর্ণমেন্ট চটে গেল, তারপর বিপদে কেলতে চেষ্টা করতে লাগল। উনি শেষ পর্যন্ত চাকরী ছেড়ে দিলেন।

যখন তখন পুলিশ বেখানে সেখানে এসে তাজির হয়। একদিন দেখি প্রেসিডেন্সী কলেজ ঘিরে পাঁড়িরেছে, সঙ্গে টেগার্ট নিজে। আমার অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে একটু দরকার ছিল। গিয়ে বলতে মিলি হেসে টেগার্ট বললে—You can not go through this road to day. Go by the side door.

বেকার ল্যাবরেটরীর পাশের দরজা দিয়ে চুকে প্রের করলুম— কি ব্যাপার ?

জহলোক বললেন—কে জানে।

সাহেবদের মধ্যে উলটো ধরণের লোকও ছিল।

ভাখো, প্রথম যখন অভিনয় করতে আরম্ভ করি তখন আমার সময় খুব ভাল ছিল। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত আমার কোন বই-ই কেস করেনি। প্রথম কেস করল স্বীকৃতনাথের তপতী।

একটু খেমে হঠাৎ প্রের করলেন—আজ্ঞা, আমার পরিচয় লোকে নিল না কেন ?

বিনয়লা বললেন—ওর নারক মুসলমান।

বাখা দিয়ে বললেন—ওর নারক ত মুসলমান নয়, হিন্দু। আমাদের সমাজ তাকে মুসলমান করে দিল।

বিনয়লা বললেন—রায়টের ঠিক পরেই এ কাহিনী মেনে নিতে দেশের লোক প্রস্তুত ছিল না।

একটু সময় ভাবলেন, তার পর বললেন—রায়টের পরে বলেই গোলমাল হ'ল বলছ। কিছুকণ চুপ করে থেকে প্রের করলেন—আজ্ঞা, তখত এ-তাউস ত প্রোডাকশান হিসেবে বেশ ভাল হয়েছিল; অভিনয়ও কিছু খারাপ হয়নি, তবে ১১০ টাকার বেশী বিক্রী হল না কেন ?

এ প্রেরের কোন উত্তর কেউ দিতে পারলেন না। চুপচাপ বলে রইলাম সবাই, এক সময়ে আবার রিহার্স্যাল শুরু হল—এবার জাহাঙ্গীরের বললেন।

রিহার্স্যাল শেষ হয়ে গেল, শুরু হ'ল গল্প। নিজের পাবলিক থিয়েটারে প্রথম নাবার সময়কার কথা বললেন—আমি যখন প্রথম থিয়েটারে আসি, থিয়েটারের তখন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা !

তখনকার দিনে দেখেছি যারা আসরে রিহার্স্যাল বিচ্ছেদ আর হাঙ্ক হাঙ্ক খেঁড়িয়ে আসছেন সঙ্গে বিহারের বোতল হাতে,

থিয়েটারে গিয়ে আবার বললেন রিহার্স্যাল। গিরিশ বাবুর রিহার্স্যালের সময়েও হইকি সোভা বসানো থাকত। জিনিষটা কিন্তু বড় দৃষ্টিকটু লাগত, নয় কি ? সবাই ত আর গিরিশ বাবু নয় ! উনিও বলতেন—আমি যদ খেসে মাতাল, ট্রেজে নাওনে গিরিশ বাবু, তু বেটা কে রে ? তবু বলব ওঁরা প্রিসিডেন্ট ভাম রাখেননি।

থিয়েটারে এসে ভালই করেছিলেন বলায়, বললেন—এসে আর কি করলুম। কিন্তু তবু বলব, এই একটা জিনিষই কিছুটা করতে পারি আমি। এ কাজে নেবে আমার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। তখন পড়াতে হত কম, বাকী সময়টা আমি কেনা-বেচা, বন্ধক ইত্যাদির দালালী করে অনেক রোজগার করতুম। থিয়েটারে নাবার সেগুলো সব বন্ধ হল ত।

২রা ডিসেম্বর রিহার্স্যালই হল, অবশ্য তারই কাকে কাকে ছু-চার কথা বললেন। প্রথমে আগের হস্তায় কুকনগর গিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গে বললেন—কেটনগরে গিয়ে খুব একচোট বলে নিয়েছি। সংস্কৃতি নিয়ে এই ধরণের ছেলেমানুষী আমার ভাল লাগে না। আমি বোধ হয় বেশীই বকি; আর বকব না। এই সব সংস্কৃতির ব্যাপারে আমি থাকবই না।

কেটনগরে গিয়ে অধির সাত্তালের সঙ্গে ছু-একবার ছিলুম। ও কিঞ্চ ইয়ার কমপ্লিট করে আর পবীকা দিলে না। বাবা দীননাথ সাত্তাল অনেক পরস্কা রেখে গিয়েছিলেন তাই, তা নাহলে কষ্ট পেতে হত।

গুরুদাস বাবু আর বিনয় বাবু বেঁচে থাকলে আমার পক্ষে থিয়েটারে নাবা কষ্টকর হত। সিণ্ডিকেটের মেথার হলেও আমি থিয়েটারে নাবতে পারতুম না। গুরুদাস বাবু বলেছিলেন—থিয়েটারই তোমার রিবেল ভোকেশন, কিন্তু আমাদের দেশে থিয়েটারের সামাজিক মূল্য জান ত ?

থিয়েটারের একজন লিবারেল মাইগ্রেণ্ড প্যাট্রিন দরকার হিন্দু হিন্দুমানের মত। বগড়া করছে, কিন্তু কখনও টাকা দেওয়া বন্ধ করছে না। বিলেতে সরকার দেয়; ওহু ডিক ২৮০০০ পাউণ্ড পার; আগে পেত ৩৫০০০ পাউণ্ড। স্ৰাডলার ওয়েলস পার লক্ষাধিক পাউণ্ড। ওদেশে অপেরার খুব দাম দেয়। ইউরোপ ত অপেরার জন্তে পাগল। অপেরার সিঁচার বা অভিনেতাদের মাইনে অনেক বেশী।

মেট্রোপলিটান (গ্র্যাণ্ড অপেরা) এর পুরোনো বাড়িটা কি বরলেছে। সে বাড়িটা মোটেই কিছু ভাল ছিল না।

আগেকার দিনের অভিনেতারা আমাদের সময়ের অভিনেতাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিলেন। আমরা বতই হৈ-ঠে করি না কেন, এক প্রোডাকশানে কিছু উন্নতি করা হাড়া ইণ্ডিভিডুয়াল আর্টিষ্টিক জিলিয়াল পুরোনোদের কাছেই লাগি না আমরা। অর্বেলু বাবুর কথাই ধর। ঐ যে পেটুক বাবুন গজপতি বিভাদিসঙ্গ করলেন, দেখলে একেবারে পিলে চমকে যার। একটা কমপ্লিট ক্যারেক্টারাইজেশন।

গিরিশ বাবুর ত কথাই নেই। কিন্তু উনি বড় কীকি দিতেন। ছত্রপতি শিবাজীর চতুর্থ দিনে দেখলেন, লোকজন বিশেষ হয়নি, অবশি—চল মন্ত্রী, মন্ত্রীর প্রয়োজন বোসে বেদিয়ে গেলেন। আমি

কিন্তু কখনও অমন করিনি, ২৪ টাকা বেতন বিক্রী সেদিনও সব কথা বলেছি, ৪৮ টাকা বিক্রীতেও প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।

গিরিশ বাবুর 'পাণ্ডবগৌরব' মোটেই ভাল বই নয়। আমি অবাক হয়ে ভাবি—ঐ হাত দিয়ে ঐ জিনিষ বেবোল কি করে! ফরমানী লেখা অবশ্য সেকসপীয়ারও লিখেছেন, কিন্তু তবু কেমন ভাল লাগে না।

গিরিশ বাবুর সঙ্গে দ্বিজু বাবুর সঙ্গাব ছিল না, দ্বিজু বাবুর বইএতে কখনও নাহেননি। দ্বিজু বাবুও ঠর লেখাকে ভাল বলতেন না। একবার মহেন্দ্র মিত্র গোলমাল মেটানোর জন্তে দ্বিজু বাবুর কাছে গিরিশ বাবুকে নিয়ে যেতে চাইলেন। গিরিশ বাবু বললেন—তুমি বলছ বখন, বাক মনিব, চল দেখা করে আসি, কিন্তু লাভ কিছু হাব না।

দ্বিজু বাবু তখন সুরধামে থাকতেন। পুরোনো সুরধাম দেখেছ ত? সাজানো বাগান, বারান্দা ইত্যাদি ছিল। বাগানে মহেন্দ্র বাবু আর গিরিশ বাবু বসলেন; দ্বিজু বাবু তখন ভেতরে। সেখানে তখন গুজব-সম্রাট ছিল—সে ছিল আবার দ্বিজু বাবুর খুব ভক্ত—তার কাছ থেকেই শোনা, কি ছ-একটা কথার পর মহেন্দ্র বাবু বললেন, চলুন, এবার বাওয়া বাক।

অপরেশ বাবুর কর্ণাজুর্ন লেখার মতলবটা ত আমার সামনেই খাড়া হয়। ঠরা বললেন—পানী থিয়েটার মহাভারত করে এত পরসসা করলে আর আমরা কিছু করতে পারি না?

অপরেশ বাবু বললেন—আমার কর্ণাজুর্ন লেখা হচ্ছে?

তার আগে স্বীকৃত বাবু কর্ণ লিখবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সেটা কিন্তু চাপা পড়ে গেল। আমাকে দেখতে যেতে বলেছিলেন, লেখি একেবারে হুবহু পানী মহাভারতের মত। স্বীকৃত বাবু একেবারে গহবের বেভাবে বস্ত্রহরণ করেছিল সেই ভাবে। রক্ত দেখাতে হলে ব্লাডারে লালরক্তের জল পুয়ে কারদা করে রক্তপড়া লেখাত। তিলুয়া ভীম করত, সে দুঃশাসনের যুদ্ধে বসে আমার ভেতরে রাখা ব্লাডারের লাল রক্তের জল খেত।

অভিনয় দেখার পর আমার বখন জিগ্যেস করলেন, কেমন দেখলে? তখন কি বলি! নরেন বোসের বৈঠকখানার কথা নরেন বোস বললে—বাজে।

আমার ওপর কিন্তু খুব চটেছিল।

সীতার আমার লোকসান হবার কথা নয়, শুধু চুরিই নয় ঠকানোও হয়েছিল আমাকে। আজ দুশো টাকার কাঠ এল, কাল তিনশো টাকার কাঠ—এমনি কত নিলে। অথচ মাসের পর মাস পাঁচটার টিকিট ফুল।

আলিবাবাতেও খুব বিক্রী হয়েছিল, পাঁচ রাতে একুশশো, বাইশশো, তেইশশো টাকা পর্যন্ত। আমি কিন্তু নাভিনি।

আজকালকার দিনে মহৎ নাট্য সৃষ্টি আর হচ্ছে কোথা? তিনশো, চারশো কি পাঁচশো রাত্তির চললেই কি মহৎ নাটক হয়? লোকের মনে তেমন নাড়া দেয় কৈ? লোকে তার ডায়ালগ বলে কোথা? রাত্তির তার গান গাওয়া হয় কৈ? রঘুবীর ত মোটে ছ' নাইট হয়েছিল আর তার পরেই আমি ছেড়ে দিলুম। কিন্তু ঐ দুদিনেই প্রাণে ছড়িয়ে গেল। তার কারণ গুপ্তহত্যা।

থিয়েটারের আগে ককতায় আমিও ত বলেছি—স্বাধীনতা

আগা দরকার, তা সে অহিংস উপায়েই হোক আর সহিংস উপায়েই হোক।

তাতে পুলিশের হীরালাল মুখ্যে বললে—দাদু, আমাদের চাকরী কি আর আপনি রাখবেন না?

আমি বললুম—বেশ ত, আমার না হয় ধবেই নিয়ে যাবে। ছ' মাস আটকে রাখলে আমার বিক্রী বেড়ে যাবে।

একবার আমার অফালাল সাবাভাই বধে যেতে বলেছিল, বলেছিল—বাওয়া-আসা, খাকা-খাওয়ার খরচ দেব আর বিক্রী বা হবে তুমি নেবে।

তাতে আমি বললুম—ডিসেম্বর হল আমার বিক্রী সিজন। সীতা ভাল চলছে তা বন্ধ করে বাব, কিন্তু কত টাকা লাভ হবে? হাজার তিরিশ টাকা! কিন্তু তাতে ত চিরকাল চলবে না।

দিল্লী, বধে, মাদ্রাজ—এই সব জায়গায় একবার বাওয়া দরকার। মালিনী নিয়ে বাওয়া যায়; কিন্তু শুধু মালিনী নয়, তিন-চারখানা বই—মানে একটা রেপোর্টারি থিয়েটারের মত আর কি? ওদের দেখানো—ভাল থিয়েটার কাঁকে বলে। আর তার জন্তে একটা ভাল লোক দরকার, যে এসব বন্দোবস্ত করবে।

সবাইকে বলেছিলুম—স্বাধীন হোক দেশ, তাহলে থিয়েটারের উন্নতি একটা হবে। দেশ স্বাধীন হ'ল কিন্তু থিয়েটারের উন্নতি কৈ? কেমন যেন সব ভাল-গোল পাকিয়ে গেল। সরকারের ত এখন থিয়েটারের উন্নতির জন্তে চেষ্টা করা দরকার। তা সরকার করছেও, কিন্তু তাতে কি কাজ হচ্ছে?

গলা ভাল রাখার সব চেয়ে ভাল উপায় হ'ল মিছরীর পানী খাওয়া। অনেকে ভয়েস পিল খায়, কিন্তু তাতে লাভ কি? গলা ঠাণ্ডা রাখার দরকার নয়, ঠাণ্ডা রাখা দরকার পেট। আগে অভিনয় করতে গিয়ে প্রায়ই গলা শুকিয়ে যেত। একজন বন্ধু বললে অত চা খাস কেন? মিছরীর পানী খেয়ে দেখ, অনেক ভাল থাকবি।

সেই থেকে মিছরীর পানী খাই। খেয়ে ত ভালই থাকি। মাইকেলে বত জায়গায় মদ খাওয়ার কথা আছে, মিছরীর পানী আর চায়ের লিকার মিশিয়ে খাই।

৩রা ডিসেম্বরে এসে একজনকে দেখানোর সময় বললেন আজ, কথা বলতে গিয়ে একটা জায়গায় ঝাঁক দাও কেন? জার্ক দেয় কারা জান? বাবের দম কম। জার্ক স্পীচ যে সুর করে তার আর মাদ করব কেন?

আমরা অনেক অজুরোধ করার বললেন—অর্গ্যান্ট সোনারের স্ট্রিকর্ডা রাধিকানলই জার্ক স্পীচেরও স্ট্রিকর্ডা। ওর থেকে নিল ডুমেন, আর এখন ত সব দিকে ছড়িয়ে গেছে।

পুরোনো স্মৃতিচারণ করলেন—আমরা বখন ইন্সটিটিউটে চাপকা করি, তখন সেলুকাসের পোবাক দেখে প্রেসিডেন্সী কলেজের এক প্রফেসর বললেন এটা কি ননসেন্স হয়েছে?

বিনয় বাবুও বাদ দিতে বললেন, সেই থেকে আমরা বাদ দিয়েই করি।

ইনস্টিটিউটে আমরা খুব ভাল চালিয়েছিলুম, তার গুরুদান বত দিন বেঁচেছিলেন, না না বিনয় বাবু বত দিন বেঁচেছিলেন। তারপরেও আমি ছিলুম, কিন্তু সে সবেক কোম খবর পায়ে না, কাগজপত্র সব নষ্ট করে দিয়েছে। আমায় বলছিল যে, ১৯৪৩

পর আর কোন কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমি বললাম, সে ত বাবেই না।

আচ্ছা, ঠাকুরবাড়ির আর কি আছে এখন? একটা বাড়ি থেকে এমন চার-পাঁচ জন বড়লোক বেরোন অবশ্যই পর্বেই কিন্তু তাতে ত আর এখন কিছু লাভ হবে না। রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞাননাথ ছাড়া অবন বাবুও মস্ত বড়লোক ছিলেন। আর্টিস্ট, লেখক, এমন কি অভিনেতা হিসেবেও তিনি বড় ছিলেন।

ইনস্টিটিউটে ষ্টেজের করা বইই চিরকাল করা হয়েছে; এমন কি আমাদের সময়েও। আমি আর অঘোর জোর করে কুক্কোত্র ড্রামাটাইজ করে করালুম। নরেনকে ছুঁচা করতে দেওয়া হ'ল। ও বললে তুমি হিরো আর আমার হ'সিন? (আমি অভিমত্যা করছিলুম।)

কিন্তু পাট্টা পড়ে শেষ পর্বস্ত রাজি হ'ল। ওতে ছুঁচাসাকে কর্ণের বাবা করা হয়েছিল ত।

ডি, এল, রায়েব সীতা করার একটা ইতিহাস আছে। বইটা ইনস্টিটিউটে করার কথা বলি। যাদের নিজের হাতে শিখিয়েছিলুম, তারাই আপত্তি করলে, বললে—ওতে কিছু নেই। ভাস' খারাপ।

আমরা ঠিক করলুম, বইটা করা হবে। পাট্টা সিলেকশনের বিন, আমরা চার পাঁচ জন বড় এসে বসলুম, কিন্তু বাবা করবে তারের কোন পাতা নেই। কিছু পরে ছোট ছোট পাট্টার ছ'চার জন ছেলে এল; অজ্ঞের কথায় বললে—এই আসছে। কাজ আছে। এসেছে ত, বোধ হয় নাচে বলে আছে।

আধ ঘণ্টা বলে চলে এলুম। সবই বুকেছিলুম, ভেবেছিলুম আর কোনদিন চুকব না, কিন্তু সেই চুকতে হ'ল।


এই এলেন কুকুমারী নাটক পড়তে। প্রথমেই নেশা করার কথা তুললেন—নেশা করলে কিছু লাভ হয় না। স্লাম্পনে লোকে বলে নেশা হয় না, কিন্তু বেশী স্লাম্পনে খেলে নেশা হয় বৈ কি! ওয়াইনের নিয়ম হ'ল, খেলে একটা rosy langarousness (glamorousness বলতে যাচ্ছিলুম, malapropism হয়ে যাচ্ছিল আর কি?) হয় আর স্পিরিটস খেলে হয় joyousness। অবশ্য পরে একটু রিঅ্যাকশন হয়। নেশা করলে গলা ভাল হয়, এ কথা অনেকে বলে; কিন্তু পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি, মিছরীর পানা ছাড়া আর কিছুতেই সুবিধে হয় না।

আমি সব কিছু খেয়েছি। একদিন গাঁজা খেয়েছিলুম। সেদিন ইনস্টিটিউটে বুদ্ধদেব; গলাটা খুব ভাল নয়, গুরুদেবের আদেশে গাঁজা খেয়েছিলুম। মধ্যম বাবু ইনডাইবেইলি বললেন—গাঁজা খেলে গলা ভাল হত।

অম্বলা চক্রবর্তী তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, সে বললে—ভাবনা নেই, আমার ওখানে চল।

মেথানে গিয়ে হাত-বন্ধে লেজে দিল, কিন্তু একটান দিতেই হুড়হুড় করে বমি করে ফেললুম, মাথা ঘুরতে লাগল। বললুম—আমি এখন পোবো।

বুদ্ধদেব খিয়েটার করার আগেই বুক, বনে গেলুম। অবশ্য গলার কিছুই উরতি হ'ল না।



নিয়মিত কুমারেশ সেবনে লিভার
সুস্থ থাকে, অজীর্ণ, অক্ষুধা, পেটকাঁপা
প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না, খিটখিটে
মেজাজ, সহজে ক্রান্তি প্রভৃতি উপসর্গও
দেখা দেয় না।

কুমারেশ

ও, আর, সি, এল, লিঃ
কুমারেশ হাউস
কালিখা, হাওড়া

আর একবার এক বন্ধু বললে—সবাই খায়, একটু অ্যাণ্ডি খা।

তা খেলুম, কিন্তু খেতে না খেতেই গলা বসে গেল। আর একবার মেদিনীপুরে থিয়েটার করতে গেছি, একজন আমার চেয়ে অনেক বড় বয়েসে। বললেন—ওপন এরায় বুঝ না ভায়া, একটু বাঙলা খাও। (জঙ্গ সাহেবের হাতায় পাল টাঙিয়ে হচ্ছিল)।

আমারও নো প্রেজুডিস খেয়ে নিলুম, কিন্তু কিছু লাভ হোলো না, গলা বসে গেল।

যারা ভাবে মদ খেয়ে ভাল অভিনয় করা যায়, তারা বোকা। মদ খেলে অনভ্যন্ত লোকের অনুবিধেই হয়। যারা অল্প নিরমিত খেতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে ২।৩ আউন্স খেলে বরং অনুবিধেই হয়। অনেকে নিরমিত খান বলে অনেক বয়েস পর্যন্ত খেলে কিছু অনুবিধে হয় না।

আমার এক মামা আছেন, তিনি বে পরিমাণ আর্সেনিক খান, তা ভয়াবহ! অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত সিধে হয়ে হাঁটতেন। মাকে অল্প অনুখে শয্যাশায়ী হয়ে শরীর একটু খারাপ হয়েছে। আমার লিখেছিলেন—তোমার হার্টের অনুখ বলেছ, প্রেসার বেশী কিনা জানি না, কিন্তু প্রেসার কম থাকলে আর্সেনিক খুব ভাল ওষুধ হ'ত।

হাঙ্গলী মেম্বারলিনের কথা লিখেছেন, ওটা হ'ল সিদ্ধি। সিদ্ধি খেলে একটু boisterousness হয়; হাসি পায়, খিদে বাড়ে।

আফিং খেয়ে সাধারণতঃ তিম লাগে কিন্তু শরৎদাকে কখনো বিষোত্তে দেখিনি। ঠিক আফিং খাওয়া সাধারণ লোকের মত ত ছিল না। উনি বড় এক চেলা আফিং র হুইভিতে তিজিরে দিতেন, হুইভির রং কালো হয়ে যেত। গ্রাসে দাগ দেওয়া থাকত। সাবাদিনে বেল অন্নকথানি খেতেন। শেষ ঠিক বে আটকে পিয়েছিল সে ত ঐজতেই।

একবার ঠিক সঙ্গে দেখা করতে গেছি, অনেকক্ষণ পরে উনি এসেন, এসে বললেন—কতক্ষণ এসে বসে আছ?

বললুম—ঘণ্টা আড়াই হবে।

বললেন—কি সর্বনাশ করেছি নিজের। তুমি আসবে বলে কাল রাতে এতখানি পেটোলিরাম খেয়েছিলুম। আজ সকাল থেকে বসে বসে কিছুই হ'ল না।

দেখলুম, মুখ দিগে গন্ধ বেরোচ্ছে। বললুম—এখনও ত আবার খেয়ে এসেছেন।

বললেন—কি অসহ্য হয়েছে এখন বুঝ ত?

বললুম—এখনও সে কালো জিনিষটা খান ত?

তাতে বললেন—হ্যাঁ।

কুকুমারী পড়তে শুরু করি। তার আগে চিঠিওসো পড়া দরকার।

একটা চিঠি পড়ে বললেন—কেশব গাঙ্গুলীকে এটা যা বলেছেন তা মনের কথা নয়, একটু তোয়াজ করা মাত্র। কুকুমারীর আগে বিজিয়া লিখেছিলেন, বইটা নিশ্চয় ভাল ছিল।

বাঙলা দেশের নাটক কুকুমারী থেকে এক পাও এগোয়নি বরং পেছিয়েছে। কুকুমারী নাটকের বে বাঁধন দেখা যায়, পরের (সব) নাটকের মধ্যে তার চেয়ে আলপাই দেখা যায়। ঐতিহাসিক নাটকের কেয়োরও কথা বার বে, ইতিহাসকে এক অমিষ্ট ভাবে অনুসরণ

করেও এত ফুলের নাটক আর হয়নি। সাধারণত টভের অ্যানালিস অব রাজস্থান পড়ে কাহিনীটি তাঁর সবচেয়ে ড্রামাটিক বলে মনে হ'ল। আর হু'চার দিনেই তার সিনপসিস তৈরী করে ফেললেন। কিন্তু বইটা আর অভিনয় হ'ল না, ছোট রাজা মারা গেলেন আর সেই অভূহাতে অভিনয় করা বন্ধ হয়ে গেল, মাইকেলও রাগ করে নাটক লেখা বন্ধ করলেন।

আবার একটা চিঠি পড়ে বললেন—চিঠিটার এই অংশ থেকে জানা যায়, টভের ছিল বোধ হয় কপূর্ববতী, সেই চরিত্রই নাটকে হয়েছে বিলাসবতী।

নাটকের প্রথমটা পড়ে বললেন—রাজার একটি অবিজ্ঞা আছে, তার কাছে যাবেন, এখন মন্ত্রীর কথা তাঁর ভাল লাগবে কেন? ধনদাস হ'ল রাজার পিশে, সেই জন্তেই এইভাবে কথা বলেছেন।

মাইকেলের মত পড়াশোনা ক'জনের ছিল? সত্যিকারের পণ্ডিত লোক ছিলেন, গিরিশ বাবুর পড়াশোনাও খুব কম ছিল না। ঠিক মৃত্যুর পর স্ত্রীর গুরুদাস বে বড়ুয়া দিচ্ছেলেন, সেটা পড়লে ঠিক পড়াশোনার পরিমাণ জানতে পারবে। স্ত্রীর গুরুদাস আর গিরিশচন্দ্র ছিলেন হেয়ার স্কুলে সহপাঠী এক সনে, চার বছর পড়েছেন হু'জনে। গুরুদাস বড় ছিলেন। উনিও ঠিক পঞ্চাশ বছর বয়েসে বিটায়ার করেন। ষ্টেটসম্যান উনি বিটায়ার করার পর একটা এডিটোরিয়াল লেখে। লাজ-কালও কত লোকেই বিটায়ার করছে, কই কারো জন্তেও এডিটোরিয়াল লেখে না?

লোকে না পড়েই বলে, গিরিশচন্দ্রের লেখা ভাল নয়। অথচ মাইকেলকে বার দিলে বাঙলাদেশের প্রাধান্য মাত্যকার গিরিশচন্দ্র। এক পণ্ডিত ব্যক্তি আমার বোকাছিলেন—গিরিশচন্দ্রের লেখার কিছু নেই। তাকে প্রমাণ করলুম পড়েছ? তা আমতা-আমতা করতে লাগল।

হঠাৎ যা হোক একটা কিছু বলে দিলে অনেক সময় কাজ দেয়। আত বাবুর ঐ স্বভাব ছিল, খুব জোর ডিসকাসান হচ্ছে, হঠাৎ বলে বললেন—আর্টিকেল টোরোপ্ট লেকশন সি অল্পসারে এ চলে না।

কেউ যদি খুঁজে বের করলেন, আর্টিকেল টোরোপ্ট লেকশন সি-ই নেই, ত বললেন—তাই মাকি। তাহলে তুল বলেছিলুম।

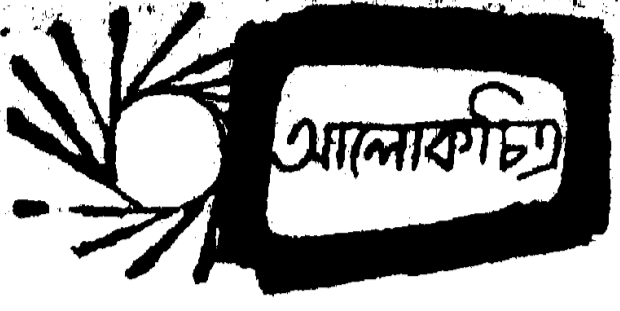
ততক্ষণে কিন্তু কাজ হয়ে গেছে।

আত বাবুর দৃষ্টিশক্তি কিন্তু খুব বেশী ছিল, তবে ইচ্ছে করে তুল করতেন। আত বাবুর কর্মশক্তি যদি স্ত্রীর গুরুদাসের চরিত্রবলেই সঙ্গে মিশতে পারত, তাহলে দেশের কত কাজই না করতে পারত।

৬ইও বেশীর ভাগ সময়েই বিহার্স্যাল হল, তারই কাকে কাকে বললেন—ইনস্টিটিউটের বাড়ি তৈরী হবার পেছনে একটা ইতিহাস আছে, তখন ছালিঙে সাহেব ছোটলাট, তিনি একবার ইনস্টিটিউটের কাংশনে এসেছিলেন। বিমর বাবু তাতে আমাকে ব্যাকস দিতে বললেন। বলে দিলেন বোলো, আমাদের একটা নিজস্ব বাড়ি যদি করে দেন ত খুব ভাল হয়।

সেইটাই শুধিবে আমার নিজের ভাবায় বললুম। তারপরই বাড়ি তৈরী হল।

বাড়িটা ত আমার দুঃখ দেবার জন্তেই ঐভাবে তৈরী করেছে। গুরুদাস সাহেব বললেন—এখানে বে থিয়েটার হবে তাই আমি জানতুম না।



ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও
ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।

একটি স্মৃতি

—বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়



পদ্ম-পলাশ



—তপন কুমার বর্মন

পারের যাত্রী



কাজিন্দারের গায়ে



—কাজিন্দারের গায়ে



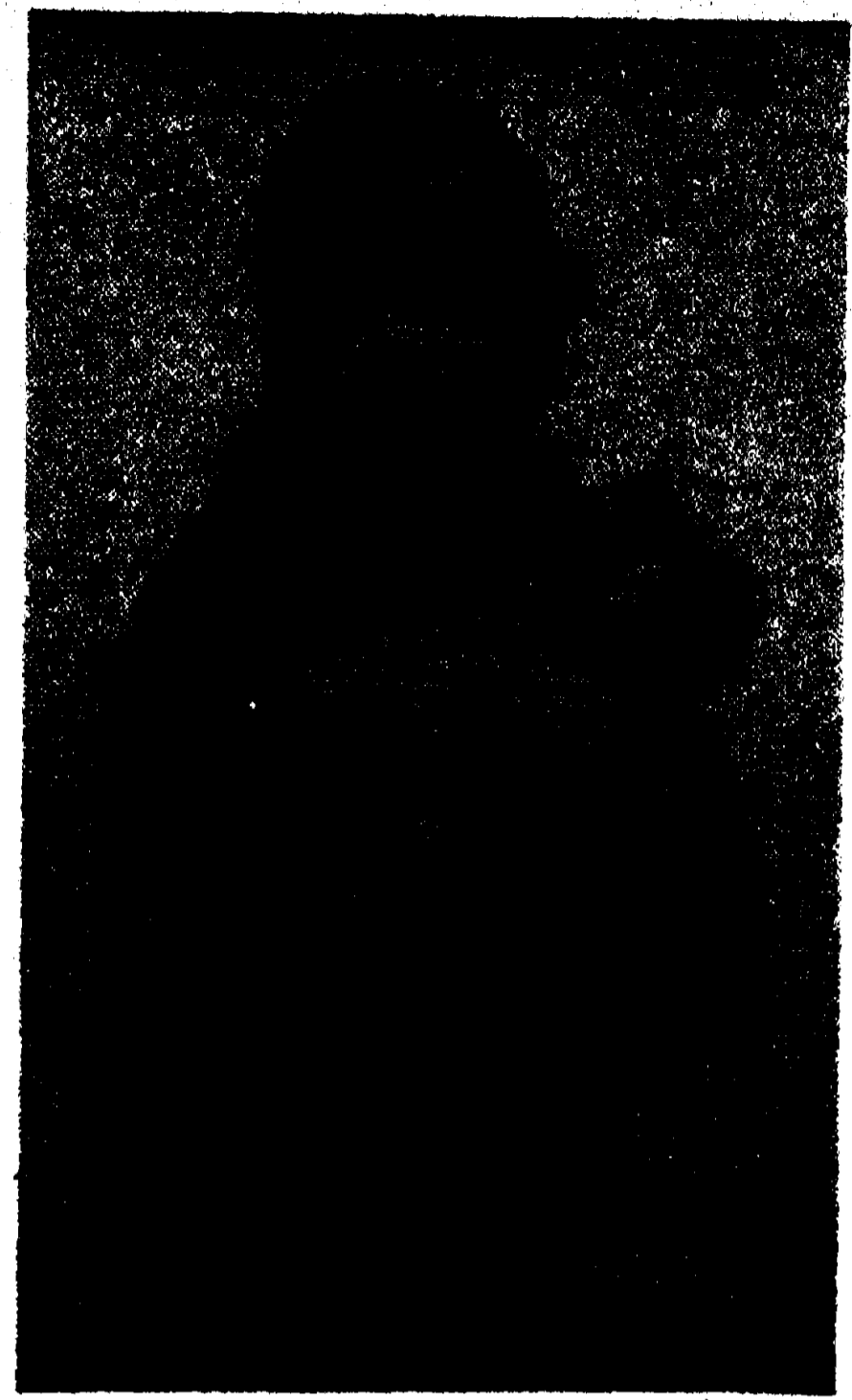
— বসেশাহ পাল (শিল্পী)

জীবন সংগ্রাম



তৃষিতা
ছই বোন

—বসিৎ বস
—চিৎ নন্দী



মেহময়ী —ঐনতী বিজলী মুখোপাধ্যায়



ভবিষ্যৎ

—অনিল কর্ণকার



তা ভাঙেও আমাদের খামাতে পারেনি, ওখানেই থিয়েটার করেছি।

বয়স ধরে মাহুকের তিম্বাদ—প্রথম কৈশোর-বৌবনের সন্ধিক্ষেপে, দ্বিতীয়বার ৪০-৪২ বছরে আর তৃতীয়বার ৬০-৬২ বছরে। তবে শেষ বয়েসের বয়স আমার ধরে না বিশেষ।

৭ই-৩ ৬ তারিখের পুনরাবৃত্তি ঘটল। রিহাস্যালের কীকে কীকে হু-চারটে কথা বললেন। বললেন—দেবপ্রসাদ বাবু একবার ইউনিভার্সিটিতে থিয়েটার করা বন্ধ করে দিয়ে নিয়ম করলেন। সেই পুত্র ধরে ইউনিভার্সিটিতে প্রোপোজাল দিলেন যে, সেখানেও থিয়েটার বন্ধ করে দিতে হবে। শুঁকে একমাত্র সাপোর্ট করলেন হেরশ মৈত্র। তিনি বললেন—A boy has confessed to me that he did not know what he was going into when he joined in a dramatic performance and he was ruined.

আমাদের মধ্যে একজন বললেন—In any case he would have been ruined. শুঁদের কথাই জবাব দিলেন শ্রাব বহুনাথ: বললেন—যদি থিয়েটার করে তারাও কেউ ধারণা ছেলে নয়। আজ বাবা, মাণ্ডার প্রাজুয়েট কাল তারা প্রাজুয়েট, তারপর এম, এ, তারপর এম, এ, বি, এল। (কান্তি আর নরেশ ঠিক তাই করেছিল।) তাছাড়া সমস্ত কাজের বেলায় ওরাই এগিয়ে আসে। ২৪ ঘণ্টার নোটিশে ১২০ জন ভলাটিয়ার পেয়েছিলে কাদের কাছ থেকে?

বাকী সকলেই শ্রাব বহুনাথকে সমর্থন করলেন, কাজেই প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে নাটোৎসবের নানা কাজের চাপ আমাদের ওপর এসে পিয়েছিল, কাজেই শুঁর কথা শোনার আর অবকাশ হয়নি। একদিন কেবল বাড়ি থেকে নিয়ে আসবার সময় কিছু কথা বলেছিলেন। কথাগুলো বোধ হয় বলেন ১৪ই ডিসেম্বর।

বললেন—মহ আমি বোজ খাইনি, বছরে ৩০০ দিন খেয়েছি এমন বছরও খুব কম আছে। সন্ধ্যাবেলা ফুরুরুং আর পেঁতুম কই। কোন কোন দিন রিহাস্যাল দিতে দিতে রাত এগারোটা বেজে যেতো, তখন আর খাওয়া হত না।

তখন আমার গাড়ী ছিল; মাঝে মাঝে থিয়েটারের পর সোজা আসানসোল চলে যেতুম। ওখানকার রেলের রেস্তোঁরার বড় ভাল ককি করত।

অনিন্দ্রা আমার অনেক কালের যোগ। থিয়েটারে থাকতে ভোর রাতে পাইচারী করে বেড়াতুম। এক ভঙ্গলোক ডেকে বলেছিলেন, মশার, অমন করে সারা রাত হাঁটেন কেন?

চোখ কাটাযো মঙ্গল বঠে গেলে—৩০শে জামুয়ারীর পর। মঙ্গল আমার চিরকালের বৈরী। শনি আর মঙ্গল এক ঘরে থেকে শুধু খেয়োখেয়ি করেই গেল। খনার বলেনও আছে—

বলল সবলে ঘর, বঙ্গমত পুত্রি।

কে দেয় অনলে হাত, কে ধরবে কপী ॥

আমার এক আত্মীয় আমার বলেছিলেন—তোমার সবই হবে: মাস, মশার, অর্ধ, কিন্তু কিছুই রাখতে পারবে না।

ইতিমধ্যে ১১ই থেকে ১৪ই ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটিতে শুঁর অভিনয় দেখতে অসম্ভব জনসমাগম ঘটল। বহু দূরদূরান্ত থেকে লোক এসে উপস্থিত, তাদের একমাত্র প্রার্থনা—একখানা টিকিট।

অনেক দিন পরে সাধারণের পক্ষে সহজপন্থা জারিয়ার অভিনয় করছেন বলেও বটে, আবার হয়ত এই তাঁকে দেখবার শেষ সুযোগ এভাবেও লোক একেবারে ভেঙে পড়ল। হু-চার জন স্পটাপটী বলেও ছিল—বয়েস ত হয়েছে, কবে আছেন নেই; দেখেও নিই এইবেলা।

দর্শক-আগমন দেখে উনি নিঃসন্দেহে ধুসী হলেন, কিন্তু সত্তর বছর বয়সে ঐ প্রচণ্ড জনসমাবেশের সামনে পর পর চারি রাতি অভিনয় করবার খকল তাঁর ভাড়া শরীরে গইল না। একেইত একটানা প্রায় মাসখানেক রিহাস্যালেরই তাঁর কেহে-মনে রীতিমত ছাপ পড়েছিল, তার ওপর বোকার ওপর শাকের জাঁড়ির মত অভিনয়।

এক একদিন অভিনয় শেষ হ'ত আর দেখতার অসহ্য ক্লান্তিতে দেহ-মন তাঁর জ্বরে উঠেছে। প্রায় কোন কথা বলবার মত অবস্থা হই তাঁর থাকত না। ধরাধরি করে গাড়ীতে তুলে দেওয়া হ'ত, উনি চলে যেতেন আর আমরা কিরে আসতাম পরিত্যক্ত মত থেকে, জিনিষপত্র কুড়িয়ে এনে শুঁহিয়ে রাখার ব্যবস্থা করত।

১৪ই ডিসেম্বর শুঁকে বখন গাড়ীতে তুলে দেওয়া হ'ল, তখন বললেন—শরীর আর বইছে না। এখন ক'দিন বি্রাম করব।

শুঁর শারীরিক অবস্থা বুঝে আসেই আমরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম, কাজেই বললাম—নিশ্চয়, নিশ্চয়। অন্তত: মাসখানেক বি্রাম নিন আপনি।

একটুখানি করণ হাসলেন—মাসখানেক। অত দিন কি পারব, আছা বেশি।

শুঁর গাড়ী সামনের পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল আর ক্লান্ত অবসর পায়ে আমরা বাকী কাজ সারতে গেলাম, কানের মধ্যে তখনও মাইকেল অভিনয়ের বেশ ভেসে বেড়াচ্ছে—মরণাপন্ন মাইকেল মনোমোহন বোবকে নিজের সমাধির ওপর কি সেখা হবে তাই বলছেন—

গাড়াও পথিকবর, জন্ম বহি তব

বলে, তিষ্ঠ কথকাল, এ সমাধিভূলে।

তখনও বুঝতে পারিনি মাইকেলের পঞ্চবর্তী তিরোধান দিবসে শিশিৎকুমার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলতে হবে।

[আগামী কথ্যার সন্ধ্যায়।]

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বঙ্গমতীর উল্লেখ করবেন]

বিপ্লবের সঙ্ঘাতে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিমধ্যে আরো কতকগুলো ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল বা হয়নি। বেঙ্গল শাসনালয় ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছিল—এবং এখানে ডায়েরির বি. কে. লাহিড়ী এবং ম্যানেজার ভূপেন চন্দ্রের নামে তহবিল তহরুর মামলা হয়ে তাঁদের ৮ বছর করে জে. হয়েছিল। বি. কে. লাহিড়ী ছিলেন ব্যোমকেশ ক্রবর্তীর ছাত্র, এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ছিলেন ঐ ব্যাঙ্কের হার্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর প্রেসিডেন্ট। তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এবং সেই পাগল অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

তাঁরা ছিলেন বঙ্গলক্ষী কটন মিলেরও কর্তৃপক্ষ। সেখানেও নানাবিধ চুরি-চুরীতি ধরা পড়েছিল, এবং মামলাও হয়েছিল। বেশ ভট্টাচার্য ছিলেন সেক্রেটারী—তাঁকেও মামলার জড়বার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বেকসুর খালাস হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন যুগান্তর দলের লোক।

এদিকে ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্তের বেঙ্গল ইনসিওরেন্স অ্যান্ড স্যাল প্রিন্সিপাল ভাল চলছিল না। ডাক্তার দাশগুপ্তেরও যুগান্তর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল—তাঁর ভাই সুখর বাবু ছিলেন দলের লোক। সেই সূত্রে বন্দোবস্ত করে ঐ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ হলেন অমর ঘোষ, মনোরঞ্জনদা (গুপ্ত), সিদ্ধা (চক্রবর্তী) এবং কোম্পানীর সেক্রেটারী এক প্রফুল্ল বাবু।

'২৭-২৮ সালে মনোরঞ্জনদা' মন্ত্রাজের জেলে রাজবন্দী থাকার লে সর্বকারী বেসরকারী অনেক হোমরা-চামরাদেব সঙ্গে তাঁর লাগপ পরিচর হয়েছিল,—অনেক বন্দী কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গেও লাগপ হয়েছিল। সেই সূত্রে বোধহয় ৩০ সালের গোড়ার দিকেই তিনি মন্ত্রাজে গিয়েছিলেন ঐ বেঙ্গল ইনসিওরেন্সের ত্রাণ খুলতে।

আমি তখন আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে থাকি। তাঁরা সুভাষ কুমার বাগীচীর সঙ্গে আঁকুপাকু করেন,—আমি সমালোচনা করি। কথা আগেই বলেছি। মন্ত্রাজ বাওয়ার আগে মনোরঞ্জনদা' পর ছুটো রাত আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে গোপনে এসে আমার কাছে রহিলেন এবং সারা রাত ধরে নানা আলোচনা চলছিল। আমি সুভাষ বাবুর সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনা করি—এটা অল্প উপেক্ষা লেও তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন না, কারণ তিনি আমাকে বাসভেন,—নিজের লোক মনে করতেন।

সেই সময়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আপনারা কি

এখন বলতে পারেন, সুভাষ বাবু আপনারদের লোক? তিনি বললেন, তা এক রকম বলতে পারি। আমি বলেছিলুম, সুভাষ বাবুকে "একরকম" নিজেদের লোক বলতে যদি আট বছর লাগে, তা হলে স্বরাজ হবে কত বছরে?—একটা কল অফ প্রিভ অফ। বাই হোক, মনোরঞ্জনদা' মন্ত্রাজ থেকে কলকাতায় কিরে এসেছিলেন ডালহাউসী স্কোয়ারে টেগার্টকে হত্যার চেষ্টার আগে। তার আগেই আমি "নিরেনকুইয়ের ধাক্কা" লিখে দাদাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত বিদ্রোহ করেছি।

এর কিছুদিন পরে ডায়ের ভূপেন দত্ত একদিন বললেন,—ওহে, তোমার "নিরেনকুইয়ের ধাক্কা" লেখাটা অনেক ছেলে খুঁজছে—কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি ওটা একটা ছোট পুস্তিকার আকারে ছেপে বার করে দাও না।—আমি শুনে বললুম, বেশ কথা, কিন্তু যদি ওদের "শতকরা নিরেনকুই জন" লেখাটার সঙ্গে ওটা পাশাপাশি ছাপি,—ছেলেরা দুটো আইডিয়ায় বিচার করে দেখতে পারবে,—তাহলে কেমন হয়? তিনি বললেন, খুব ভাল, তাই কর।

আমি তাই করলুম—"স্বাধীনতা" এবং "নবশক্তি" ("আত্মশক্তি" তখন "নবশক্তি" হয়েছিল) হইতে উদ্ভূত বলে, এবং প্রভাসচন্দ্র মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত বলে, "নিরেনকুই বনাম এক" নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করলুম। ছ কর্মীর বই, ছ আনা দাম—মোট কাগজের কভার। পাইকারী হারে ছ টাকায় ২৫ খানা বিক্রীর বন্দোবস্ত করে টাকা তুলে ফেললুম। তখন জিনিবপত্রের দাম ছাপার খরচ, সবই ছিল সম্ভা। ১৭"×১২" সাইজের ১৬ পৃষ্ঠার কাগজ "নবশক্তি"র দাম ছিল চার পয়সা। বাংলা ছাপার দর ছিল ৮:১০ টাকা কমা। হোটলে পেটভরা মাছের বোল-ভাত খাওয়া হত ছ' পয়সায়।—২০০০ বই-এর অর্ধেক বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, বাকিটা পুলিশের খপ্পরে গিয়েছিল,—যখন একবার পুলিশ সমগ্র আত্মশক্তি লাইব্রেরীটা তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

পুস্তিকার "প্রকাশকের নিবেদনে" লিখলুম,—বাকলার গত ২৫ বছরের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমাদের আদর্শ এবং কর্মক্ষেত্র ২৫ বছরে শত-সহস্র বাধাবিধ কাটিয়ে আশাতীত ভাবে অগ্রসর হয়েছে। ... আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রথম যুগে... প্রথম বিপ্লবী-দলে কাজ ছিল 'টেরিফর্ম'। তখন দেশের লোকে ধাক্কা করতে

পারতো না যে, ভারতবাসী ইংরেজের সঙ্গে বোমা বন্দুক নিয়ে লড়াইতে পারে,—বা মারতে এবং মরতে পারে। কুদিরাম-কানাইলাল দেশের লোকের এ ধারণা বদলে দিয়েছিল।

“দ্বিতীয় যুগ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়টা। এই সময়ে বিপ্লবীদের দৃষ্টি বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল। জার্মান বড়বন্দু ধরা পড়ার সঙ্গে সে যুগ শেষ হয়।

“তৃতীয় যুগ ১৯২০ সালের পর। বর্তমানে (১৯২১।৩০) এ যুগ শেষ হচ্ছে।

“ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় রাজ্যীয় পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষতঃ রুশ-বিপ্লব সারা পৃথিবীর নিপীড়িত জনসাধারণের মনে একটা আশার বাণী বয়ে এনেছে। আমাদের দেশেও সে বাণী এসে পৌঁছেছে, জনসাধারণের শত্রুদের অবিরাম মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও।

“ভারতের কঠোর নির্ধাতনে নিপেষিত ভারত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজ্যমন্ত্রে উৎসাহ হয়ে উঠলো। কিন্তু মহাত্মার অহিংসা নীতি নিয়ে একটু গোল বাধলো।

বিপ্লবীরা অহিংসার বিশ্বাস করে না, আর অহিংসা-নীতির প্রতিবাদ করতে গেলে মামুষের মনটা স্বভাবতই, মনেরই অজান্তে, একটু টেররিজমের ছিকে ঝোঁকে।

“স্বতন্ত্র ব্যাপার দাড়ালো এই যে, মহাত্মার কর্মপদ্ধতির সুযোগ নিয়ে বতটা কাজ করা সম্ভব, তাও হল না, আর বিপ্লবীরা উগ্রতর গণবিপ্লবের আদর্শও মেনে নিতে পারলেন না। কলে জাতীয়তার আদর্শমূলক স্বাধীনতাবাদ, এবং ধনসামান্যমূলক গণবিপ্লববাদ, এই দুই আদর্শের বিরোধ বাধলো।

“এ বিরোধ বেড়েই চলেবে—একে চাপা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। স্বতন্ত্র এ বিরোধটাকে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। এই পুস্তিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য এই।”

এখন ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ Veteran বিপ্লবীদের idea ও আন্তর্জাতিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ “স্বাধীনতার” “শতকরা নিরানব্বই জন” নামক প্রবন্ধ থেকে শুধুন :

“রক্তটা বতদিন সবল সতেজ থাকে, ততদিন বৃষ্টি সহজ বৃষ্টিতে ; আর রক্ত যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে, তখন সব জিনিসই দেখতে থাকি হিসেবের এঁখো গলির আঁধারপথে, কারণ মুক্তদৃষ্টির আলো তখন চোখ থেকে নিবে গেছে। বয়স যখন উঠতিযুগে তখন বৃষ্টি, স্বাধীনতা পাবার পথ, যে পথ দিয়ে ওটাকে হারিয়েছিলাম সেই পথ :—

“কিন্তু বয়সের ধরে রক্ত যখন ঠাণ্ডা হয়ে এল, অমনি বৃষ্টির জড়তা এসে দেখা দিল। প্রথম বয়সে কেউ ভাবে না স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশের শতকরা নিরানব্বই জনকে টেনে না আনলে স্বাধীনতা লাভের আর উপায় নাই :—

“হৃদয় স্পর্শ।—এইটাই মুক্তিপ্রার্থী জাতির কাছে সব চেয়ে বড় কথা—শতকরা নিরানব্বই জন নয়। আঘাত করব, আঘাত খাব,—মরব,—আবার আঘাত করব—প্রথমবারের চেয়ে এবারের শক্তি ও সাক্ষ্য বিস্তার হবে,—তার পরের বার চতুর্গুণ হবে,—এমনি করে পুরুষের পর পুরুষও চলতে পারে, এমনি করে নিরানব্বইজন আদর্শও আসতে পারে,—না আদর্শও কতি নাই :—

“এককালে মোহ ছিল শিকারিভার, এককালে মোহ ছিল সমাজ সংস্কার, দুদিন আগে মোহ জুটেছিল তাঁত-চরকা আর হিন্দু-মোসলেম মিলন সাধন আর আজ মোহ জুটেছে শ্রেণীসংঘর্ষ।—শ্রমিক আর চাকরী বন্দ শতকরা নিরানব্বই জন, তখন তাদের পাওয়ার পথ দেখতে হবে। তাদের পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় তাদের ঘরোয়া স্বার্থ দেখা,—তাদের ঘরোয়া স্বার্থ দেখতে গেলেই তাদের স্বার্থের বিরোধী বারা, অর্থাৎ মহাজন আর ভূমিদার, তাদের সাথে বন্দ লাগাতে হবে। অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতালাভের প্রথম সোপান শ্রেণীতে শ্রেণীতে বন্দ লাগানো।—

“এই শ্রেণীসংঘর্ষ আজ জগতের অনেক জাতের ভিতর চলছে, দু একটা দেশে তাতে এক রকমের সাক্ষ্যও এনে দিয়েছে। মুক্তি করেছে নামে—চিন্তার জড়তা এই নামের নৃত্য ধরে পুঁথি-পোড়ো বৈপ্লবিকের মাথায় চুকেছে। পুঁথি-পোড়োর গোড়াতেই ভুল হয়ে যায় যে, এদেশে অপর একটা দেশ আমাদের বাড়ি চেপে আছে, বা অপর দেশে নেই :—

“তবে কি কৃষক শ্রমিকসংঘের প্রয়োজন নেই? আছে বই কি! কৃষকসংঘের চেয়ে বরং শ্রমিকসংঘের প্রয়োজন বেশী করে আছে—শ্রমিকের পরোয়া নেই, আজ এখানে বারো আনা মাইনের চাকরী গেলে গতর খাটিয়ে কাল আর এক জায়গার হানাপানি জুটবে নেবে। একটা গুলট-পালটের সময় এই রকম বেপরোয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রভৃতি করিয়ে স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে অনেকটা জোর দেওয়া চলতে পারবে। তাই শ্রমিকসংঘের বিশেষ প্রয়োজনই আছে, এবং কৃষকসংঘেরও কিছু কিছু আছে। কি রকম? বথা আশ্রয় দিতে—

“কিন্তু তাই বলে স্পর্ধিত চিন্তার সাহস বাকের আছে, প্রতি মুহূর্তে মরণ বরণ করতে বারা প্রস্তুত, তাদের এর ভিতর টেনে এনে বিভ্রান্ত কোরো না। জাতির ও স্বাধীনতার শত্রুতা কোরো না।—

“বুলির আর অস্ত্র নেই! শতকরা নিরানব্বইয়ের অস্ত্র যে স্বরাজ হল না, সে স্বরাজ দিয়ে কি হবে :—বারো দেশের স্বাধীনতা আনবে তারাই অপরের অস্ত্র স্বাধীনতার ক্ষেত্র, ভোসের ক্ষেত্র খুলে দিয়ে বাবে, একখাটি আজ শ্রেণীসংঘর্ষের পাণ্ডারের কাছে ঠাটার কথা হয়েছে। এই যে বুর্জোয়া ভাষাভালিষ্টের বল, এরা আবার অপরের সুখ-সুবিধা করে দেবে? এই প্রশ্ন বারা ভোসে হয় তাদের ইতিহাসের জ্ঞান অভ্যস্ত অগভীর, অথবা তারা বুর্জোয়া ভাষাভালিষ্ট বলে বাদের ঠাটা করে, তাদের প্রতি উর্ধ্বপরাধ—নিজেরা নেতৃত্বকামী। কবাসী বিপ্লবের ইতিহাসে দেখি, ক্রমবিকাশীল বৈপ্লবিক আদর্শের সাধনার বিপ্লবের পরে বিপ্লব হয়েছে, কৃষিরাওও মাত্র সাত মাস পবেই কেরেনস্কির গভর্নমেন্টের পতন হয়েছে।—বিপ্লব একবার স্তব্ধ হলে বিপ্লবের পরে বিপ্লব এসে নূতন নূতন স্বৈচ্ছাচারীকে ধ্বংসে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে বাবে।”

“হুর্নীপ্রসাদ”—এই হুর্দ নামে ওরা প্রবন্ধটা লিখেছিলেন, যেন এক জুনিয়ার এক সিনিয়রকে লক্ষ্য করে লিখে—বক্তাঃ লক্ষ্য ছিলেন ওঁদের ভূপেন বন্দ, যিনি বুর্জোয়া ভাষাভালিষ্ট কথাটা বলতেন এবং লিখতেন। হুর্দই যদি জবাটা লিখলেন, বের

এক সিনিয়র এক জুনিয়রকে লক্ষ্য করে লিখেছে। তার কিছু নমুনা এখানে উদ্ধৃত করলাম :

"নিরেনকর ইয়ের খাড়া"—বড় কঠিন খাড়া।... "স্বাধীনতার" পৃষ্ঠপোষকেরা যেদিন থেকে শতকরা একেদের সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, এবং সাবজালানের মহৎ চেষ্টা আরম্ভ করেছেন, সেদিন থেকে... তাঁদের চিরকালে জনসাধারণ বাহাচাপা পড়েছে, আর তার ওপর উঠেছে শতকরা একেদের দল—লক্ষ্যমস্ত ধনী, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী এবং উচ্চশ্রেণীর সুবোধ বালকেরা।

শ্রীমান লিখেছেন,— "আমাদের দেশে বয়সে ভাঁটা পড়ে একটু ভাড়াভাড়া, আর রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এলে লোকে সহজবুদ্ধিতে না বুকে সব জিনিসই হিসেবের এঁধোপলির জাঁগার পথে দেখতে থাকে। শ্রীমানকে বলি, খোকা... হিসেববোধটা শুধু ব্যক্তির বয়স বাড়ার সঙ্গে নয়,—স্বার্থের বয়স বাড়ার সঙ্গেও পাকতে থাকে।... এই হিসেববোধ বাদে বেশী, সৈন্তদলের মধ্যে তারা হয় অফিসার—সমাজের মধ্যে তারাই হয় মাথা, রাষ্ট্রীয় জগতেও তারাই হয় শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতা।... স্বদেশী হাজার হাজার, হিসেববোধ বাদে কম, তারা হয় রানী, আর বাদে বেশী, তারা হয় রাজবন্দী।... হিসেববোধকে গাল দিতে হলেও গাড়ে তিনপৃষ্ঠাব্যাপী হিসেব লিখতে হয়। আর রসগোল্লা ভক্ষণের চেয়ে যে ইংরেজ রাজত্ব ভক্ষণের জন্তে একটু বেশী হিসেববোধ দরকার, এটাও আমাদের সত্যি বলেই সন্দেহ হয়।..."

"তারপর বয়সের কথা।... পুরোনো, পচা সমাজব্যবস্থার শেকলে যে কেবল বুড়োরাই বাঁধা, তাও নয়,—ছোঁড়ারাও হাজারে হাজারে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে,—আবার, সেই পচা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে অনেক বুড়ো জন্-মন-ধন উৎসর্গ করেছেন। অধিকাংশ "স্বাধীনতা" সেবায়ই Sweet home এ এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর নিবন্ধন রাজত্ব চলছে,—আবার, "স্বাধীনতার" ব্যবসা বাঁধা করেন না, তাঁদের মধ্যেও হাজার হাজার এমন লোক রয়েছেন, বাঁধা মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ আধুনিক।..."

"তারপর সহজ বুদ্ধির কথা। সহজবুদ্ধির আদর্শ হচ্ছে পণ্ডা।... মাহুরের বুদ্ধিটা বিচার-বিতর্ক একেবারে বাদ দিয়ে চলতে পারেনা। সে চেষ্টা করতে গেলে আইডিয়াগুলো হয় অসম্পূর্ণ, কথাগুলো হয় অসংলগ্ন, আর কাজগুলো অকাজ হয়েই পঁড়ায়। জ্ঞানভাজনদের টুকরো-টুকরো শেখানো বুলির খিচুড়ীই তখন একমাত্র সম্বল হয়। সব কাজেই আক্কেল দরকার, আর স্বাধীনতা অর্জনটাই বে-আক্কেল দরে কাজ, একথা মনে করা তখনই সম্ভব হয়।..."

"শ্রীমানের আকাঙ্ক্ষা, ভুলসোকেরা পালা করে করে আঘাত করতে বাসেন, আর মরবেন। কৃষক ও শ্রমিকেরা এরই মধ্যে,—অর্থাৎ তাঁদের আগেই সে কাজ শুরু করে দিয়েছে।... শ্রীমান তাদের সংঘ গড়ার অহুমতি দিয়েও উদারতা দেখিয়েছেন—সেটা তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে ধ্বংস করার জন্তে আর আশ্রয় দেওয়ার জন্তে। Secret Society করে ২৫ জন করে দাঁড়ান দিলে এক একটি সোনার টাককে ১৫ বছর ধরে ভাঁওতা মেরে মেরে সস্তা করে তুলতে হবে... তাতে ওয়ারেন্ট বেরবেই। কিন্তু ওয়ারেন্টকে ভয় করলে ত... কাঙ্ক্ষাই পা টাকা দেওয়ার

জারগাও দরকার। পুত্ররা স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে এসব দুর্ভব স্পর্ধা চাইই চাই।

"শ্রীমানের অসংলগ্ন শুঁড়ুনির একটু বিশ্লেষণ করা গেল।... কৃষক-শ্রমিক সংঘ বা শ্রেণী সংঘর্ষ সবচেয়ে শ্রীমানের আইডিয়াটা বেজার অস্পষ্ট।..."

"মানব জীবনের তার কেন্দ্র অল্পবন্দ। এই অল্পবন্দের সাহায্যে উপরই অল্প সর্বাধিক সুখশান্তি এবং উন্নতি নির্ভর করে... আমাদের দেশে উৎপাদনের অর্ধ কাঁচা মাল উৎপাদন, বটনের অর্ধ শতকরা নিরেনকর ই জনের অর্জাধার... এ সব সমস্ত অল্পদেশেও আছে,—কিন্তু সে সব দেশের সঙ্গে আমাদের একটা তফাৎ আছে। সে সব দেশে দল হচ্ছে দুটো, এবং দুটো দলই বেশী—একদল লুণ্ঠনকারী, আর এক দল লুণ্ঠিত কিন্তু আমাদের দেশে তিনটি দল। একদল লুণ্ঠনকারী, একদল লুণ্ঠিত, দেশের শতকরা নিরেনকর ই জন,—আর তৃতীয় একটি দল আছে, বাবা বয়ের বয়ের পিসী আর কনের বয়ের মাসী—দেশের "শতকরা একজনের" দল।

"দেশের কাঁচা মাল বিদেশে পাঠানো, বিদেশী শিল্পজাত পণ্য দেশে আমদানী করা, এই সব উপায়ে বিদেশীদের লুণ্ঠনে সাহায্য করে, লুণ্ঠনের একটা ছোট বখরা হিসাবে এঁরা বেশ ছু পয়সা পেয়ে থাকেন। এঁদের স্বার্থ বিদেশীদের স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো।..."

"এই শতকরা একেদের নিয়ন্ত্রণের লোকেরা নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্তে এ দেশে প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন।... চাকরী-বাকরী এবং শিক্ষা সংস্কারই ছিল সে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধুরো।... আন্দোলনের ফলে, এবং সরকারের উপেক্ষার ফলেও বটে,—এঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা এখন চাকরী-বাকরীর পত্তী ছেড়ে শাসন ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার চেষ্টায় গিয়ে পঁড়ালো... তখনও আন্দোলনটার প্রধান অঙ্গ হইলো দরখাস্তই, আর বিদেশী সৈঁহার সঙ্গে ভাগ বাঁটোরার বকাই হইলো তার মূল মন্ত্র।

"কিন্তু ঐ শতকরা একেদের নিয়ন্ত্রণেরই একদল মুংক এই ভাগ বাঁটোরারার মোহ কাটিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলে, আর তাদের নজর পড়লো দেশের সর্বাধিক স্বার্থের বিরোধী উক্তত দণ্ড বিদেশীদের ওপর। মুষ্টিমেয় হলেও তাদের শিয়ার শিয়ার তাল্লা রক্ত টপগিয়ে ফুটে উঠলো, আর উন্নত আবেগে তারা স্বাধীনতার বেদীর সামনে উচ্চার মস্তন কাঁপিয়ে পড়ে' সে রক্তের অর্গল মুক্ত করে দিলে।

"ভাগ বাঁটোরার পন্থীর দল হাতের কাছে কতকগুলো Raw material for victory দেখে তাদের বললে বাঁধবা, সরকারকে বললে, দেখচো ত? বেশী চালাকী করো না ভাড়াভাড়া বকা কর। সরকার বললে পঁড়ো, এক ডোজ ওবুধ দিই, কতবড় যোগ, বোকা বাবে। বলে' একটু নাড়ী টাড়ী দেখে মটে-চেমসকোর্ড-রৌলট মিকশায় এক ডোজ দিতেই যোগীর বাত করে এল। ভাগ বাঁটোরার পন্থীর বড় দল "আশার অর্ধেক কল" পেয়ে সরকারীদের কলা দেখিয়ে বড় বড় চাকরীর মহড়া দিতে ছুটলেন।

"সরকারও তাঁদের দিকে কলা দেখিয়ে মুচকে হাসলেন। হুঁ সিক থেকে কলা দেখে তারা বললেন, বটে? পঁড়ো। বেশ শুধ

লোককে তোমাদের বিরুদ্ধে কেনিয়ে তোমাদের শাসন শোষণ অচল করে তুলবে; দেখি আমরা Non co-operation করলে তোমাদের পেটে-পকেটে হাত পড়ে কি না।

“স্বাধীনতা কামীর দল নিজের শক্তির দীনতার কুরমানে সুরোগের প্রতীকার কিছুদিন ইতস্তত করে অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতির মধ্যে একটা সুরোগের ক্ষীণ আশা নিয়ে আস্তে আস্তে ভারত মধ্যে একটু কাজের ক্ষেত্র করে নিলে।

“প্রথম বছরটা একটু চকচকে ভাবে কাটলো, কিন্তু দ্বিতীয় বছরেই তার বরুণ বেরিয়ে পড়লো। স্বাধীনতাকামীরা আর একবার নিজের মধ্যে কিরে এল। তাদের জাবসতিক দেখে সরকার Regulation আর ordinance দিয়ে তাদের কর্ম ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলে।...-..

“৪১ বছর নিরুপায় গবেষণার পর জেল থেকে বন্দন কর্মীরা বেরিয়ে এল, তখন ঐ “শতকরা একদের” নিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকারীরা তাদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করলে। এক দল কর্মী তাতেই গলে গিয়ে পুরানো মোহে তাঁদের আঁকড়ে ধরলেন। আর এক দল দূরে সরে গিয়ে তাঁদের নমস্কার করে বললে,—তোমাদের স্বার্থ বন্দন শতকরা নিরেনকুইয়ের বিরোধী এবং বিরোধীদের সঙ্গে এক, তখন তোমাদের চিরকাল বিশ্বাস করা অসম্ভব। আজ তোমরা যা বলছ, তার সবলারি—“দল-জানা-হু-জানা ভাগ, আমরা জানি কি।” যেদিন ওরা বলবে, “আজ হতে ভাগ হল সমানে সমান”—সেই দিনই তোমাদের মানস্তম্বন হবে।—

দেশটাকে স্বাধীন করতে পারলে তোমরা এক একজন যে বাকি শতকরা নিরেনকুই জনের হুঃখ দূর করে যুচিয়ে দেবে, আজ পর্যন্ত তার বিলুমাত্র সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হওয়ার কোন অবসরই তো তোমরা দাঁড়ানি।—হুতরাং তোমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন নিয়ে তোমরাই থাক,—শতকরা নিরেনকুই জনের স্বাধীনতা আনবার ভারটা তাদের হাতেই ছেড়ে দাও।—

“এই হচ্ছে বর্তমান শ্রেণী সংঘর্ষের—আন্দোলনের মূল কথা। চাকরীর আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি যেমন স্বাধীনতার আন্দোলন;—স্বাধীনতার আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি এই শ্রেণী সংঘর্ষ। এক গাল দেওয়া ছাড়া তোমরা যে আর কিছু করতে পার না, এটা আজ-কাল আর শতকরা নিরেনকুই জনের বুকে বাকি নেই।

চাষা-মজুরদের চার সকলেই। মহাস্ত্রীর দল চান সরকারের সঙ্গে যকার উদ্দেশ্যে নিজের মত-প্রাধাত দেখাবার জন্ত।—স্বাধীনতার অবতারও তাদের চান—এই জন্ত যে, তাঁরা এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ পরাকার সাধন করবেন।—তখন তারা আশ্রয় দেবে,—আর যোগতিক দেখে বন্দন Signal দেবেন, তখন তারা ধর্মঘট করবে।—কিন্তু কি মহাস্ত্রীর দল, আর কি স্বাধীনতার অবতারগণ,—প্রজাতন্ত্র আইনের সংশোধনের কথা উঠলে প্রজাতন্ত্রের পিছনে তাঁদের দুর্ভর্য পর্বা বা প্রেমের বুলি নিয়ে না দাঁড়িয়ে অধিকারদের পিছনেই ঠৈলতাও নিয়ে হাজির থাকেন। তখন এই শ্রেণী-সংঘর্ষের দল কৃষক-শ্রমিক সংঘই তাদের বল-ভরসা জোগায়। কারণ তারা কৃষক-শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে, কৃষক

শ্রমিকদের স্বাধীনতাই প্রতিষ্ঠা করতে চায়,—যারা দেশের শতকরা নিরেনকুই জন, আর তাদের স্বাধীনতাই প্রকৃত পক্ষে দেশের স্বাধীনতা।

“বৈজ্ঞানিক কলকারখানা সাজ সজ্জায় প্রভৃতির সৃষ্টি ও ব্যবহার তাদের হাত দিয়ে হয়,—তারা কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর লোক। বেগুলো অপরে তাদেরই বিরুদ্ধে এতদিন ব্যবহার করে এসেছে। যেদিন তারা নিজের শক্তি সঙ্ঘে সচেতন হবে সেগুলোকে নিজের অর্পকে ব্যবহার করতে ইচ্ছা করবে, সেদিন-..শ্রীমানদের শ্রেণীর নেতৃত্বের বড়বড় ব্যর্থ হবে।

“কৃষক শ্রমিক সংঘ, বা তাদের তোমরা শ্রেণী সংঘর্ষের দল বা শতকরা নিরেনকুইয়ের দল বল,—তাদের war cry হচ্ছে, Down with Imperialism—Down with Capitalism নয়। Imperialism কে ঠেলাতে গেলে যদি Capitalism এর গায়ে হাত লাগে,—তার কারণ ও হুটো এক বস্তুরই হুপিঠ।

“শ্রেণী সংঘর্ষের আস্তে তোমরা বিপ্লবটাকে হেঁটে হেঁটে বিদ্রোহ বানাতেই চাও, আর Dominion Status টাকে বাগাড়ম্বরে ঢেকে স্বাধীনতা বলেই চালাতে চাও,—যদি প্রকৃত স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে এদেশে কিছু থাকে, বা কখনো ছটে, তাহলে তার সঙ্গে শ্রেণী বিরোধও থাকবেই।

“প্রতি বহুতে মরণ বরণ করতে যারা প্রস্তুত, তাদের বিদ্রোহ না করতে শ্রীমান উপদেশ দিয়েছেন। তারা-কারা তারা? নায় কটা বলে দিতে পারো? কৃষক শ্রমিক সংঘ সম্ভবত তাদের নাম কেটে দেবে। প্রতি বহুতে মরণ বরণ করতে যারা প্রস্তুত, তাদের চেয়ে, প্রতি বহুতে মরণে যারা বাধা চাচ্ছে, তাদের ওপরই তাদের ভরসা বেশী।

“শত প্রকারের হুঃখ, অভাব, অত্যাচারে জর্জরিত ভিন্নশ্রেণীকৃত কৃষকের অন্ধ, বিদ্রোহী আত্মার ক্রন্দ আক্রোশের ফলিত কখনো কখনো এক আঘটা জমিদার দারোগাকে ভয়ভূত করে থাকে,—কিন্তু সে শক্তিতুক্রও অভাবে মরিয়া হয়ে খাজনা বন্ধ করে কিছুদিন পড়ে থাকে। একে আজকালকার হুনিয়া আর প্রজা বিদ্রোহ বলে না। আজকালকার প্রজাবিদ্রোহের প্রথম আয়োজন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত কৃষক সংঘ। সংঘবদ্ধ কৃষক প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, একদিকে জমিদার মহাজনের সঙ্গে সমবেত “কাজিয়ার”—আর একদিকে আইন-কানুন পরিবর্তনের চেষ্টার সরকারের সঙ্গে সমবেত “কাজিয়ার”—এই বকম “কাজিয়ার” ততদিন চলে, যতদিন না সহরে সহরে সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রমিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সহরে শ্রমিক এবং গ্রামে কৃষক একসঙ্গে বিদ্রোহী হলে, তখন আর সে বিদ্রোহ “কাজিয়ার” মাত্র থাকে না। তখন তার শক্তিতে সর্ববিধ শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের তিষ্ঠিই ধ্বংস পড়ে।

শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবের মনোভাব, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এক সংঘপতি পড়ে না। উঠলে যে শ্রীমানদের কেবলেকির গভর্নমেন্টের পক্ষ হবেনা, এই কথাটা যারা বোঝে, তারা শ্রমিক আন্দোলনকেই চালা করে তুলতে থাকবে..”

কথা হচ্ছে, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের বড় দল বৃগান্তর পার্টির জাতিত আধর্ষ ১১০৫ সালেও বা, ১১৩০ সালেও সালেও তাই—

ভুল্লোকের এক কথা। তাদেরই দলের মধ্যে থেকেও তাদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ পারিপার্শ্বিক ও বিশ্ব-পরিষ্কৃতির প্রভাবে নতুন পথে চলতে শুরু করেছিল,—আমি তাদেরই একজন,—এবং পার্টি ও নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে আমার মন ও মূখের আগল একসাথে একেবারে খুলে গিয়েছিল। মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের জ্ঞান যে আমার তখনও খুব বেশীদূর এগোয়নি, একথা বলা বাহুল্য। বস্তুত টেলিন প্রণীত লেনিনিজম বইটার প্রথম ভল্যুমেই ইংরাজী সংস্করণটা এসেছে প্রচার হওয়ার আগে পর্যন্ত কোনো কমিউনিষ্ট কর্মীরও জ্ঞান আমার চেয়ে খুব বেশী এগোয়নি। কিন্তু একদিকে তাদের কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন, আর একদিকে কংগ্রেস, গান্ধী ও বিপ্লবী দাদাদের মতিগতি লক্ষ্য ও বিচার করতে করতে আমার বিপ্লবের সন্ধানী মন শুধু যে ঐ দিকেই ঝুঁকিয়েছিল, তাই নয়,—সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, এখানে ম্যাটসিনি গ্যারিবন্ডী বা সান-ইয়াট-সেনের বিপ্লবের আদর্শ কার্যকরী হতে পারেনা। এখুণের বিপ্লবে একদিকে থাকবে ইম্পিরিয়ালিষ্টদের সঙ্গে দেশী ক্যাপিটালিষ্টদের, আর একদিকে সংঘবদ্ধ চাষা-মজুর—বিপ্লবের প্রকৃতিটা হবে দেশী-বিশেষীর সংগ্রাম নয়, পরন্তু শোষক শোষিতের সংগ্রাম। আধুনিক শিল্প ও বান-বাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশী-বিশেষী ধনিক-মালিকেরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার-রূপে ব্যবহার করবে,—সুতরাং সে হাতিয়ার ছিনিয়ে নিতে না পারলে বিপ্লব সফল হতে পারেনা,—আর শুধু বিপ্লবী শ্রমিকই সেটা ছিনিয়ে নিতে পারে, এবং সারা দেশের শোষিত বিদ্রোহী কৃষকের সমর্থন ও সাহায্যে বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। এই বিশ্লেষণের জন্মেই আমার পুস্তিকা তখন তরুণদের মনে একটা সাক্ষাৎ জাগিয়েছিল।

এখন আবার কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাই কীরে আসা যাক। লাহোর কংগ্রেসে একটা বামপন্থী প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছিল, একটা প্যারাল্যাল গভর্নমেন্ট গঠনের জন্য শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের সংগঠিত করার ব্যবস্থা হোক। সে প্রস্তাব অবশ্য ভোটে পরাজিতই হয়েছিল।

জাহ্নবীর পোড়াতাড়িই মহাত্মাজী এক আমেরিকান পত্রিকার এক বিবৃতি দিয়ে বললেন,—“লাহোরের স্বাধীনতার প্রস্তাবে কারো ভয় করার কিছু নেই।” ২৩শে জাহ্নবীর স্বাধীনতা দিবস পালনের ব্যবস্থা হল। তার আগেই সুরভাব বাবুকে গ্রেপ্তার করা হল, এবং ২১ সালের শেষ দিকে এক প্রোশেশনের নেতৃত্ব করার ক্ষমতাকে তাঁর নামে মামলা করা হল, যে প্রোশেশনে একটা গান গাওয়া হয়েছিল,—“শক্তিমত্তে বীকিত মোরা অভয়া চরণে নয় শির,—ভয়না বস্ত করিতে করতে হুস্ত আমরা ভক্ত বীর” ইত্যাদি। মামলার সুরভাব বাবুর বোধহয় ১ মাস জেল হয়েছিল।

৩০শে জাহ্নবীর ইং ইণ্ডিয়াতে মহাত্মাজী ১১ দফা দাবীর এক বিবৃতি প্রকাশ করলেন। আগে বলা হয়েছিল, অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে আইন অমান্য করা হবে। কিন্তু কর্মসূচী কিছুই ঠিক করা হয়নি এবং প্রথমেই বলে দেওয়া হল, কোন সত্যপ্রহী পুসিসের পায়ে হাত দিলে আইন অমান্য বন্ধ করে

দেওয়া হবে। অর্থাৎ ইচ্ছিতে সরকারকে বলে দেওয়া হয়েছিল,—স্বাক্ষর রাজী হলেই বারদৌলীর পুনরুজ্জীবন করা হবে।

কিন্তু আইন অমান্য করার আগেই ঐ ১১ দফা সর্ভ দিয়ে বলা হল, এই সব দাবী মেনে নিলে আইন অমান্য শুরু করা হবেনা। মহাত্মার কর্মসূচীর কোন হদিস না পেয়ে সবরমতীতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁর তখনও কোন পরিষ্কার কর্মসূচী ছিল না। তিনি বলেছিলেন, ভোয়ের কুয়াসার মধ্যে ক্ষুণ্ণগামী মোটরের সামনের পথ যেমন ক্রমশঃ দেখা যায়, তেমনি ভাবে আমাদের কর্মসূচী ক্রমশঃ আপনি দেখা দেবে। সত্যপ্রহীদের কপালে বেন একটা সার্চলাইট বাঁধা থাকে,—সেইটাই কর্মসূচীর পরবর্তী ধাপ দেখিয়ে দেয়।

কেতুয়ারীতে তিনি লিখলেন, “আমি প্রথমে সবরমতীর আশ্রমবাসীদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করবো, তারা আশ্রমের আদর্শ ও শৃঙ্খলার অভ্যস্ত।” তারপর তিনি স্থির করলেন প্রথমে লবণ আইন অমান্য করা হবে, এবং মার্চ মাসে তাঁর ৭৮ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে সবরমতী আশ্রম থেকে পদ্মবাত্রা শুরু করলেন, ৬ই এপ্রিল তারিখে ডাণ্ডীতে বেআইনী ভাবে ছুন তৈরী করবেন বলে।

ছুনের ট্যাক্স তুলে দেওয়ার দাবীই ছিল ঐ ১১ দফার প্রথম দাবী। অস্ত্রাঙ্গ দাবীও এমন; যাতে সবগুলো মিলিয়ে সব রকম লোককে ঠাণ্ডা করা যায়, সকলেই বলে বাহবা।

ছুনের ট্যাক্স রদ করা, মস্তবর্জম আইন করা, খাজনা কমানোর দাবীতে গরীব, সাধারণ লোক ও চাষারা সন্তুষ্ট হল, উপকূল বানিজ্যে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বিলাতী কাপড় আমদানী বন্ধ, টাকার বিনিময় হার কমানোর দাবীতে বড়লোকেরা সন্তুষ্ট হল, গোয়েন্দা বিভাগ ও অস্ত্র আইন তুলে দেওয়া এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে তরুণ স্বাধীনতাবাদীর দল সন্তুষ্ট হল,—সিভিলিয়ানদের মাইনে কমানোর দাবীতে সকলেই সন্তুষ্ট হল।

এই রকম অসুতঃদাবীর অসম্ভাব্যতার দিকে বেন কারো মজুরই পড়লো না। এসব সর্ভ মানার অর্থ যে ইংরেজের বাড়ী চলে বাও, এটাই সকলের আন্দোলনের কারণ। এমন দাবী ইংরেজ মানতে পারে না, সুতরাং স্বাধীনতার সংগ্রামই জোরদার হবে, এও হয়ত কিছু লোক ভাবছিল। আর এরই তলার মহাত্মা আগে থেকেই স্বাক্ষর আলোচনার একটা ভিত্তি পেড়ে কেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি সরকারকে বলে দিলেন, এগুলোর একটা সম্ভাবজনক মীমাংসার ব্যবস্থা হলে “the Congress will heartily participate in any conference, where there is a perfect freedom of expression and demand”।

“দাবী”র সম্ভাবজনক মীমাংসার ব্যবস্থা হবে এবং “demand” এর freedom থাকবে—এ হলেই কংগ্রেস প্রেমানন্দে সম্মেলনে যাবে। অর্থাৎ higher politics এর দোহাই দিয়ে কে-কোন রকমের স্বাক্ষর জন্মে একটা রাউণ্ড বা অথডির টেবিল বৈঠক।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সব কার্যকরী লক্ষ্য করছিলুম এবং বখন মহাত্মাজী লবণ আইন ভঙ্গের জন্য একটা বিরাট প্রচার ব্যবস্থারূপে

ভাণ্ডীতে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন—যখন সারা দেশ আকুল আগ্রহে প্রত্যাহ সকালে সংবাদপত্রের পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে, কবে মহাত্মা কোথায় পৌঁছালেন,—কে কে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল, তখন “নবশক্তিতে” আমি এক প্রবন্ধ লিখলুম “ঐতীওতা।”

লিখলুম, friendly game শুরু হল—আপোষের ব্যবস্থা হবে এবং তার জন্তে দূতীরূপে আসবে মালব্য-ভিন্নার মতন নেতা, যারা মজারোটের মধ্যে একট্রিমিষ্ট এবং একট্রিমিষ্টদের মধ্যে মজারোট। হয়েছিলও ঠিক তাই এবং দূতীরূপে এসেছিলেন অরাকর ও সাঈফ। তার বিবরণ পরে বলছি।

১ই এপ্রিল মহাত্মাজী এক নির্দেশ দিলেন, গ্রামে গ্রামে বেআইনী হুন তৈরী করতে হবে, মসজিদ এবং বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চালাতে হবে, সর্বত্র চরকা চালাতে হবে, বিলাতী কাপড় পোড়াতে হবে, অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে, হিন্দু-মুসলমান মিলন করতে হবে, স্কুল-কলেজ ছাড়তে হবে, সরকারী চাকরী ছাড়তে হবে।—১৯২১ সালের অস্পৃশ্যতার আন্দোলনের বোটকা পক্ষ।

একটা লড়াইয়ের জন্তে লোকে উদগ্র আগ্রহে অধীর হয়েছিল,—এখন এই পচা কর্মপুঁচী নিয়েই তারা কাজে নেমে পড়লো। সরকারও তৈরী হয়েই ছিল—লাঠি, গুলি, রেল প্রভৃতি সর্ববিধ নির্ধাতনের বস্তার তারা অহিংস আন্দোলনকে ডুবিয়ে দিলে।

ঠিক এই সময়েই চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা অজ্ঞানতার লুণ্ঠন করে চট্টগ্রামে স্বাধীন ভারতের এক নতুন ডিক্লেইনের পতাকা উড়িয়ে দিলে। এ হল এপ্রিলের শেষে। এবং এ হল যেন একটা সিগ্‌ন্যাল, সর্বত্র বিপ্লবীরা চঞ্চল হয়ে উঠলো।

চট্টগ্রামের ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার পুলিশ প্রথমেই হানা দিলে সন্তোষ মিত্রের অজ্ঞানতার, জক্রুর দস্ত লেনে, এবং সেখান থেকে তাদের কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। “স্বাধীনতার” তখন উঠে বাওয়ার অবস্থা হয়েছিল, সে অবস্থার “উড়ো খই সৌবিন্দ্য নমঃ” বলে ওঁরা “বঙ্গ চট্টগ্রাম” শীর্ষক এক প্রকাশ্য অগ্রিবর্ষী প্রবন্ধ লিখে কাগজ ফুলে দিলেন।

এদিকে পেশোয়ারে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল। কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রবল পক্ষবিধোক্ত দমন করার জন্ত সরকার সাঁজোয়া পাড়ী পাঠায়, এবং বিক্ষুব্ধ জনগণ তার একখানা পাড়ী আক্রমণ করে, পাড়ীর লোকজনদের বার করে দিয়ে পাড়ীটাকে পুড়িয়ে দেয়। ফলে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে বহু লোক হতাহত করা হয়। এই সময়ে ১৮ বছর রয়েল পাড়োয়ালী রাইফেল এর বিত্তীয় ব্যাটালিয়নের হুই প্ল্যাটুন সৈন্যকে জনতার ওপর গুলি চালাবার আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই পাড়োয়ালী সৈন্যেরা সে আদেশ অমান্য করে, এবং মুসলমান জনতার সঙ্গে ভিড়ে যায়। ফলে ২৫শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা মে পর্যন্ত পেশোয়ারে সরকারী শাসনের চিহ্ন যাত্রাও লুপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ও এরোপ্লেনের সাহায্যে সহর পুনরুদ্ধার করা হয়। সমগ্র ব্যাপারটা সবচেয়ে অসুস্থতানের সকল দাবী অগ্রাহ্য করে সরকার ঐ পাড়োয়ালী সৈন্যদের সামরিক আদালতে বিচার করে ১৭ জনকে কারাবন্দী দেয়—৩ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর এবং একজনের বাবজীবন।

অহিংসা ও সন্তোষের অবতার এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা মহাত্মাজী কিন্তু ঐ পাড়োয়ালী সৈন্যদের এই বলে নিষ্পন্ন করেন যে:

কোন সৈন্য যদি গুলি চালাবার আদেশ অমান্য করে, তাহলে তার পশপ জন্মের পাতক হয়।

“যুদ্ধের” শেষে আক্রাইনের সঙ্গে যে “সন্ধি” হয়, তাতেও ঐ পাড়োয়ালী সৈন্যদের হুজির কথা ছিল না।

আর ঐপটতি সীতারামাইয়ার লিখিত কংগ্রেসের ইতিহাসেও ঐ একতরফ ঘটনার উল্লেখ নেই।

বাই হোক, ঐ ঘটনার পরে ঐই মে সরকার বাহাদুর মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করলেন। কারণ হল,—“যদিও মহাত্মা গান্ধী ঐ সব হিসাবস্বক কার্যকলাপের নিষ্পন্ন করেন, তবু তাঁর শিষ্যদের ঐ সব কাজের প্রতিবাদে তাঁর আগরাজ্য ক্রমশঃ ক্রীণ হয়ে আসছে—এক বোকা বাচ্ছ যে, তিনি এদের কার্যনা করতে পারছেন না।”

বাই হোক, মহাত্মার গ্রেপ্তারের আবার বখাশান্ত্র একটা প্রবল বিধোক্ত সারাদেশকে উদ্বেলিত করে তুললো। শোলাপুরে তার এক নতুন রূপ দেখা গেল। বোম্বাই প্রদেশের ঐ সহরটার ১৪০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৫০০০০ই হল বঙ্গশিষ্য অধিক। মহাত্মার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সহরটার সমগ্র অধিক সাধারণ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সহরটা দখল করে নিজেদের শাসন কার্যের করে ফেললো। এক হপ্তা ঐই অবস্থা চলার পর ১২ই মে সরকার মার্শাল ল’ জারী করে সৈন্যদের সাহায্যে সহর পুনরুদ্ধার করে, এবং তার পরে বখাশান্ত্র নির্ধাতনের চূড়ান্ত করে।

তার পর জুন মাসে সরকার কংগ্রেস এবং তার সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে বেআইনী ঘোষণা করে।

মার্চ মাসে মহাত্মাজী বড়লাট আক্রাইনের কাছে পত্র লিখেছিলেন আমি যে আন্দোলন করতে যাচ্ছি, তাতে অহিংসার শক্তি প্রযুক্ত হবে সরকারী এবং বেসরকারী উভয়বিধ হিসাবস্বক কাজের বিরুদ্ধে।

১৪ই জুলাই সরকারী মুখপাত্র ব্যবস্থা পরিষদে হিসাব হিসেব,—“১লা এপ্রিল থেকে আজ পর্যন্ত ২১ বার জনতার ওপর গুলি চালানো হয়েছে, এবং তাতে ১০৩ জন নিহত ও ৪২০ জন আহত হয়েছে।”

পরে ৩১ সালের মে মাসে মহাত্মাজী এক প্রবন্ধ লেখেন, “অহিংসা অক্ষুণ্ণ বেধে আমি চূড়ান্ত ব্যর্থতা বরণ করবোও প্রস্তুত, কিন্তু অনিশ্চিত সাক্ষ্যের লোভে অহিংসা নীতি থেকে চুল পরিহারণ বিচ্যুত হতেও রাজী নই।”

আমি পার্টি ও হাদাফের প্রভাব মুক্ত বিপ্লবীর চোখে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐ সব অসুস্থ ঘটনা ও বাকচাতুরী লক্ষ্য করে যাচ্ছি, আর অবাক হয়ে ভাবছি,—বিপ্লব কোথায়, কতদূরে? কংগ্রেস ও গান্ধী বেঁচে থাকতে কি তার কোন আশা আছে! যনকে প্রবেশ দিই, কৃষক-অধিকদের নিজেদের সংগঠন, নিজেদের বৈপ্লবিক আদর্শ যদি কোনদিন কংগ্রেস ও গান্ধীর প্রভাব কাটিয়ে গলে উঠতে পারে।

কলত গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পর্কে আমার যেন চোখ ধুলে গেছে, আমি সকলের থেকে এর পৃথক দৃষ্টিতে তাকে দেখি, আর তার বিপ্লববিরোধী ধনিকর্মা আপোষপন্থী রূপ দেখে শিউরে উঠি। তারই বলে অসুস্থ হ “ঐতীওতা” নামক বইয়ের।

নাট্য গান বাসনা

বাকালী গীতি-কবিতার রবীন্দ্রনাথ

কবি তাঁর সেই—“নানা বর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্থ বাশিখানি” হাতে নিয়ে, তাতে এক এক বকরের মূর সাধনা করে কোন এক অসীম অনন্ত গীতিরাজ্যের চতুঃসীমা পরিক্রমা করে বেড়িয়েছেন। নানা রসে রঙে ভরা এই বিশাল বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি জগতের অতুল ঐশ্বর্য উপভোগের যে অনির্বচনীয় আনন্দ তা থেকে হলো কবির গান, এবং বিশ্ব সৌন্দর্য্যভূত্বের যে রসাতল চার সমগ্র কবিমনটিকে গীতি-সুখর করে ফুলেছিল তা দিনের পর দিন গানের আকাশে মধুর সুদের সংযোজনায় কবিতার রূপ নিয়ে বাইরের জগতে একটির পর একটি বেরিয়ে আসে। তাই বলি যে গান গাইবার জন্তে কবিকে কখনো প্রস্তুত হয়ে আসার জাঁকিয়ে বসতে হয়নি পেশাদারী গায়কগোষ্ঠীর মত। কারণ সমস্ত গানই যে কবির অন্তরের গান, মহান সৌন্দর্য্যোপলব্ধির গান, রূপ জগতের গান, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে বলেই আমরা দেখতে পাই তাঁর প্রতিটি ছোট বড় গীতি-কবিতার গান ও কবিতার কি চমৎকার সংমিশ্রণ, সুদের সকল লক্ষণই এখানে সুপরিষ্কৃত ভাবে হয়ে গেছে। কবিতার দিক দিয়ে তার ভাষা ও ছন্দও যেমন আবার গানের দিক দিয়ে মুর ও ছবির সঙ্গতিও লক্ষ্য করার বিষয়। দেখে মনে হয় ঠিক যেন চূড়ামণি যোগ ঘটেছে।

কিন্তু সব থেকে বড় জিনিষ যেটি অর্থাৎ তাঁর গীতি-কবিতার বা নাকি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে মুর ও ছবির সুষ্ট মিলনের কলেই কবিতাগুলি এক অদ্ভুত রসমাহুর্ষ্য লাভ করেছে। রসই হল গীতি-কবিতার প্রাণ এবং যেখানে রসের মাহুর্ষ্য নেই সেখানে সে কবিতার প্রাণ নেই বলেই বুঝতে হবে। সুতরাং এ রসের সুষ্ট ভবনই হতে পারে যখন মুর ও ছবি অতিমাত্রায় উৎকর্ষতা লাভ করবে। অতএব এ দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতাগুলির সঙ্গে আর অন্য কারো তুলনা করা চলে না। সব কিছুই সমাবেশ একই সঙ্গে এখানে এমনভাবে ঘটেছে যার ফলে এগুলি যে সত্য সত্যই অতুলনীয় তাও নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কবির গীতি-কবিতাগুলি যে শুধুমাত্র চিত্রময়ী তা নয় বরং মনে হয় যেন সবগুলি একত্রে একটি চিত্র-প্রদর্শনী বিশেষ। কবিতা পড়ে গানের মুরও যেমন প্রাণে লাগে তেমনি আবার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর স্বরংসম্পূর্ণ ছবিও চোখের সামনে ফুটে উঠে, যেটি নাকি কবিতা পাঠের পর সমগ্র পাঠকের মনের রপিকোঠার টাঁড়ানো থেকে বার অনেকদিন পর্যন্ত। এই নানক কবিতাটির ক’টি ছত্র উদাহরণস্বরূপ দেখলেই এখানে

তা বুঝতে পারি, যার মধ্যে কবি কি চমৎকারভাবেই না মুর ও ছবির এক অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে রেখেছেন, বলা,—

“তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা।

ওই যে মূর্খ নীহারিকা

যারা ক’রে আছে ভিড়

আকাশের নীড়

ওই যারা দিনরাত্রি

আলো হতে চলিয়াছে আঁধারের বাজী

এহ তারা রবি,

তুমি কি তাদের মতো সত্য নও ?

হার ছবি, তুমি শুধু ছবি।”

এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতা সম্পর্কে অন্ততম বক্তব্য বিষয় হলো এই যে এগুলি কবির অতিময় গভীর অন্তর জগতে সৃষ্ট হয়ে গভীরতম ভাবাভূত্বের মধ্যে দিয়ে পরিপুষ্টতা লাভ করেছে এবং সেই সঙ্গে ব্যথিত কবি-জন্মের ব্যথার দ্রাবক রসে রস-সিক্ত, আগ্রস্ত, অতিব্যক্ত। যেমন কবি পেয়েছেন—

“তাই মোর গান

কুসুম-অঞ্জলি-অর্ঘদান

প্রাণ-স্বাহারী।

তাহারি আবশ্যে কিরে কিরে

এ পূজার কোনো ফুল নাও বাদ ভাসে চিরদিন,

বিশ্বস্তির তলে হয় লীন,

তবে তার লাগি, কহ

কার সাথে আবার কলহ ?”

এখানে কবির গহন অন্তর-নিচয়ের গভীরতম প্রবেশ হতে যে করুণ মুর ধ্বনিত হয়েছে তা আমাদের জন্মকে স্রবীভূত না করে পাবে না, সমস্ত মনটাকে যেন একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এর মধ্যে এমন একটি স্পন্দন হয়ে গেছে যার ফলে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারি যে কবির জন্মটি অনিবার্য ভাবেই স্পন্দমান হয়ে উঠে; গানের মধ্য দিয়ে কবি-জন্মের এক অদ্ভুত আকৃতি পটে লেখা ছবির মত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। যে এর মধ্য উপলব্ধি করতে পেয়েছে সেই কেবল বলতে পারে যে এটি নিছক কোন ভাবের কবিতা নয়, ‘কুসুম-অঞ্জলি অর্ঘদানের’ করুণ রসাতল গীতিকা নয়, কল্পনাপ্রসারী মনের তুলিকার আঁকা একখানি ছবি নয়, পরন্তু ব্যথিত কবি-জন্মের গাওয়া গানের হৃদে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির বুকে বিশেষ থাকতে চায় এই গানের মুর চিরন্তন কালের জড়। এক তা যদি হয় তবেই এ গান গাওয়া কবির সার্থক।

এবারে আরো একটু বলা প্রয়োজন যে, বহীশ্রনাথের গীতি-কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক ভাবের দিক থেকে এত উন্নত বা অবতীর্ণ সর্বজনসম্মত ভাবে প্রেত্বের পরিচয় বহন করে চলেছে। যেমন আমাদের বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রতিটি পদাবলী গান সু-বহান আধ্যাত্মিক ভাবে ও বসে সর্বকালের ভক্ত অভিযুক্ত ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের এক অনন্তকালের সম্পদ হয়ে রয়েছে, কবির প্রেত্ব গীতি-কবিতাগুলিও ঠিক তেমনি। গীতি-কবিতার মূল বিষয়বস্তুই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তবতা এবং এর প্রেত্বের দাবীও এইখানেই। কবি তাঁর গানের ভেতর দিয়ে যে ধরণের আধ্যাত্মিক ভাবের বিভিন্ন প্রকাশ-রূপ দেখিয়েছেন তা শান্ত মস্তিষ্কে বিচার করে দেখলে সত্যতাই বুঝতে পারি যে তিনি এক অনাদি, অনন্ত সত্যের সন্ধানই আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। সেই একক মহাসত্যের ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য ও গভীর আধ্যাত্মিক রসোপলব্ধির জন্য তিনি আমাদের মূল চেতনাকে বিশেষ ভাবে উদ্ভুদ্ধ করে কল্পনাকে রীতিমত সক্রিয় করে তুলেছেন। সুতরাং তাঁর ঐ সমস্ত গানের মধ্য দিয়ে যে সকল ছবি আমাদের এই হৃৎকল মনশ্চকুর সামনে তাসিয়ে এনেছেন তা সেই চিরন্তন সৌন্দর্যের এক মর্মবাহিনীই বহন করে নিয়ে চলেছে অথবা বাস্তবিক বৈচিত্র্যবিহীন চলার পথে। বাস্তব জগতের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে সুদূর পিয়ারী কল্পনার আতিশয্যে কবি যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন তা সেই ইন্দ্রিয়াতীত এক একটি নতুন জগৎ ও জীবনেরই আলেখ্য বিশেষ, এই জগৎই আমরা দেখি যে, তাঁর গীতি-কবিতাগুলি অধিকাংশই 'রোমান্টিসিজম' ও 'মিষ্ট্রিসিজমের' ওপর নির্ভরশীল এক এদের মূল সুর ও mystic হয়ে পড়েছে। অনেকে হয়ত মনে করে থাকেন যে কবি নিজেকে একটা জটিল আবিষ্কারের মধ্যে রাখার জন্য বোধ হয় mysticism-র অবতারণা করেছেন এবং এর মূল কারণ আর অন্য কিছুই নয়, ইয়োরোপের রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের প্রভাবে কবি একেবারে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন এবং এই দুঃসহ বিদেশী প্রভাব থেকে তিনি নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারেন নি। এই রকম ভাবান্তর বা অমূলক ধারণার বিপক্ষে আমি কেবল এটুকুই বলতে ইচ্ছা করি যে কবি কোনোকালেও নিজেকে জটিলতার জালে আবদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে mysticism-র পথ অবলম্বন করেন নি, বরং ভাবজগতের অল্পকৃতি বস্তুই পূর্ণ হতে পূর্ণতর হয়ে চলেছে ততই সহজ ভাবের transformation ঘটেছে এবং এই gradual transformation-র মধ্য দিয়ে কবিমানস আপনা থেকেই mystic হয়ে গেছে, একজন কবিকে দাবী করা সূচতার পরিচয় দায়। আর বিদেশী প্রভাব সবচেয়ে বলা বারি যে কবির প্রথম জীবনের দিকে হয়ত এ প্রভাব কিছুটা ছিল কিন্তু ক্রমেই তা কাটিয়ে উঠে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি ভাবের অবতারণা করেছেন, বা সকল প্রভাব হতে মুক্ত। তবে এ কথা ঠিক যে, আমাদের আধুনিক বাস্তবিক গীতিকাব্যের যুগের ওপর কবিপ্রভাব যে যথেষ্ট পড়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ না থাকারই কথা এবং অনেকেই তাঁর গীতি-কবিতার ভাব ও ধারা অনুসরণ করে কাব্য রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা করেছেন, কিন্তু অস্বতকার্যজনিত হতাশাই তাঁদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে বলেই মনে হয়। অবশ্য আর এক প্রকার আধুনিক কবি আছেন দীর্ঘা মহাসানি স্বীকৃতপ্রভাবমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ আধুনিক বাস্তবিক

নীতিই অনুসরণ করতে ব্যস্ত অর্থাৎ রোমান্টিসিজম ও মিষ্ট্রিসিজম-কে একেবারে হুয়ে মরিখে নিয়ে রিসেলিজমের ওপর গীতিকাব্যের প্রেত্ব ভিত্তি স্থাপন করাই এ দলের মূল উদ্দেশ্য ও একান্ত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। তবে এঁরা পাইকারী হানে মোটেই যে কৃতকার্য হতে পারেন নি তা নিশ্চিত, আর যদি কেউ কেউ কোনোগতিকে সক্ষমতা অর্জন করে থাকেন তবে তা কংসামাতাই; জানি না, এ বিষয়ে কিয়ৎ সমালোচকেরা একমত কি না। অবশ্য এ কথাও বলতে হয় যে আজ বাস্তবিক জীবনে যে চরম হৃৎদশার বহুভূত উপস্থিত হয়েছে তাতে আর কল্পনাবিলাসী মনের যে কোনো সুদূর প্রসার থাকতে পারে না তা হয়ত কতকটা সত্য বলেই মনি, এক বাস্তববাদী হাত। যে আর অন্য কিছুই সত্য বলে মনে হতে পারে না তাও স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, আধুনিক কবির উর্ধ্বর মানস জগতে কঠিন বাস্তববাদী ছাড়া আর কিছুই প্রবেশ করতে পারে না, বেহেতু বেখানো কল্পনামস্তির সত্যিকারের কোনোপ্রাণ প্রেরণা নেই সেখানে ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনো একটি পূর্ণর কাল্পনিক জগতকে বাস্তবরূপ দেওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। তাই ইন্দ্রিয়প্রাচ জগতের বাহিরে পূর্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করার ক্ষমতা এই সমস্ত কবির নেই বলেই তাঁরা বাস্তববাদকেই অগত্যা চরম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, রোমান্টিসিজম ও মিষ্ট্রিসিজম-কে এড়িয়ে গিয়ে এবং এঁরা বোঝার কেউই born-poet নয়, সকলেই made-poet-র পরিবারস্থ। তাই বাস্তববাদের নামে যে সব গীতি-কবিতা রচিত হচ্ছে তা কেবল

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আছে মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা খুবই আত্ম-বিক, কেমনা সবাই জানেন ডোয়ার্কিনের ১৮-৭৫ সাল থেকে দীর্ঘ-দিনের অভিজ্ঞতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে। কোন্ যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভাগিকার অন্তর্লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ পো-বক :—৮/২, এলগ্যান্ডেন্ট ইস্ট, কলিকাতা-১

অন্যস্ফট হইতেই চলছে বলে অনেক বিজ্ঞানের ধারণাও মিথ্যা নয়। কবিতা ও গানের মধ্যে দিয়ে চিরন্তন সৌন্দর্যের সাধনা যেমন কবিতার রবীন্দ্রনাথ করে গেছেন তেমন কবিতার কমতা বর্তমান বাঙ্গালী গীতিকাব্যে কোথাও পাই না, বরং এখানে আছে শুধু বিভিন্ন বকমের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার আভাষ ও ইঙ্গিত; ধীর কালে আধুনিক গীতিকাব্য ও কবিদের অক্ষমতার পরিচয়ই যাবে। সুতরাং সব শেষে আশা করি এটুকু নিষ্কর সংসাহসের সঙ্গে সন্তোষে পারি যে কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী গীতিকাব্যের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। —দেবব্রত ভট্টাচার্য।

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

এন ৮২৮৭৩—সত্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রাগপ্রধান হুঁখানি বাংলা গান—“পথ চেয়ে রাখিকা রয়েছে” (হুঁরী) ও “কেন জানি না বাছো”।

এন ৮২৮৭৪—শ্রীমতী বাসবী নন্দীর মায়ারী কণ্ঠে আবেদনশীল হুঁখানি আধুনিক গান—“এ শুধু তোমার আমারে লয়ে” ও “তোমার স্বপ্ন নিয়ে রাত্রি এলো।”

এন ৮২৮৭৫—“ঐ ঠমকী ঠমকী চালে” ও “আমি কি খুঁজিলাম”—দরদ-মাখানো পল্লীসংগীত, গেয়েছেন সনৎ সিংহ।

এন ৮২৮৭৬—বৈশিষ্ট্যময় হুঁখানি আধুনিক গান—“ঐ আকাশে পূর্ণ চাঁদ” ও “নতুন নতুন রঙ”—কণ্ঠবৈশিষ্ট্যে অগূর্ণ করে ফুলেছেন শ্রীমতী ইলা বসু।

এন ৮২৮৭৭—হইতে এন ৮২৮৭২—তিনখানি রেকর্ডে হয় খণ্ডে সম্পূর্ণ গীতিনাট্য “সত্যি বেহলা”—পল্লী বাংলার জম্বল্য সম্পদ।

কলঙ্গিয়া

জীই ২৪১১৪—শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুকণ্ঠের আধুনিক গান—“তোমার দীপের আলোতে নয়” ও “এই সুরঝরা খেলাতে।”

জীই ২৪১১৫—নবাগতা শিল্পী লক্ষ্মীশঙ্করের “মায়ারী রাতি” ও “এ মধু নিশীথে”—গান হুঁখানি তাঁর প্রথম রেকর্ড। পণ্ডিত বশিষ্ঠকরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এই শিল্পী সেতারবন্ধারের মতই কণ্ঠ-বন্ধারে সবাইকে মুগ্ধ করবেন।

জীই ২৪১১৬—“অচেনা বনের অচেনা ফুল” ও “নূপুর দিয়ে বাঁধলে চরণ”—আধুনিক গান হুঁখানি পরিবেশন করেছেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

জীই ২৪১১৭—গীতলী হুবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে হুঁখানি কীর্তন গান—“আজু রঙে হোরী” ও “বাঁশী বাজান জান না।”

জীই ২৪১১৮—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে “সাগর থেকে কেয়া”—কাব্যকীর্তির অনবদ্য সংগীত রূপ।

জীই ৩০৪৪১—“হাত বাড়ালেই বন্ধু” বাণীচন্দ্রের হুঁখানি জনপ্রিয় গান—“শরীরখানা গড়ো” ও “শহরে সবই বিকার”—গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

জীই ৩০৪৪০ এবং জীই ৩০৪৪১ রেকর্ড হুঁখানিতে “ইন্দ্রধনু” বাণী চন্দ্রের জনপ্রিয় গানগুলি গেয়েছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সীতলী সখ্যা মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা (৬৫)

শ্রীমুনীলকুমার রায়

রবীন্দ্র-সঙ্গীত যে বৈঠকখানার বিলাস-ব্যঙ্গন নয়—নিষ্ঠা ও সাধনার সাথে ঐকান্তিক প্রদীপ্য দিয়া শিক্ষা করিতে হয়—ইহা শিল্পী শ্রীমুনীলকুমার রায়ের কণ্ঠে শুধুদেব রচিত গান শুনিলে উপলব্ধি করা যায়। পরিচয়ের পর জেনেছি তাঁর শিল্পী-জীবনী—
চুই ভাই ও পাঁচ ভগিনীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান আমার ১৯২০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মীরট সহরে জন্ম। পিতা পরলোকগত ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় তথাকার উচ্চতম বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। স্বগ্রাম বরিশাল জিলার কুলকাঠি। আমার আট বৎসর বয়সের সময় তিনি নিজ পেশা ছাড়িয়া কলিকাতায় আসেন ও জীবনবীমা ব্যবসারে লিপ্ত হইয়া বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। তাঁহার সম্পাদনার Insurance & Finance Review ও ফ্লাইউ ফ্লিট নামে দুইটি ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। তাঁহার ডোভার লেনের গৃহে সাহিত্যসভা ও সাংবাদিকদের আসর বসিত এবং ব্যবসায়ী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁহার মুহুর্ত।

আমি ১৯৩৬ সালে জগৎকু ইনস্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও ১৯৪১ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্ররূপে বি.এস.সি পাশ করিয়া কিছুকাল জীবনবীমার কার্য করি। পরে আমার পিসেমহাশয় কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বর্তমানে ধানবাদ মাইনিং কলেজের ডপ্টর শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পরামর্শে ও প্রচেষ্টায় একটি কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি। ১৯৪৪ সাল হইতে আমি রবারশিল্পে স্বায়ত্তভাবে লিপ্ত হই ও বর্তমানে একটি প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানে যুক্ত রহিয়াছি।

আমাদের পারিবারিক পরিবেশে সঙ্গীত সমাদৃত ছিল। আমার মধ্যেও সঙ্গীতের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে উঠে। আমার কনিষ্ঠা ভগিনী যখন গৃহে শিককের নিকট গান শিখিত তখন অন্তরাল হইতে নিবিষ্টমনে শুনিয়া সেগুলি আয়ত্ত করিতাম। প্রামোক্ষোন রেকর্ড ও রেডিও সঙ্গীতের সহায়তা নিতাম অনেক সময়। ১৯৩৮-৩৯ সালে কলিকাতায় একটি বিশিষ্ট সংস্থার উদ্যোগে কবিগুরু “নটীর পূজা” অভিনীত হয়। ইহার সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন শ্রীসমরেশ চৌধুরী। এই নৃত্রে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় এবং নিয়মিতভাবে তাঁহার নিকট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করি। ১৯৪৩ সালে তাঁহার সহযোগিতায় “সীততারতী” নামে একটি সঙ্গীত বিভাগের আয়ত্ত করি। ১৯৪৫-৪৬ সালে এক বৎসরের জন্ত “সীতবিতান” এ শিক্ষকতা করি। ১৯৪৭ সালে শ্রীশ্রী গুরুচাঁদুরতা ও আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষারতন ‘দক্ষিণী’ প্রতিষ্ঠা করি। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সচিব ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বর্তমানে নিজগৃহে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদান করি। শ্রীশ্রী সমরেশ চৌধুরী ব্যতীত বিশ্বভারতী সঙ্গীত-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মহাশয়ের নিকট কিছুদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা করি। তাঁহার গায়কী আয়ত্ত করিতে গিয়া বুঝিতে পারি

যে ইহার ভিত্তি হইল ভারতীয় মার্গসঙ্গীত। অখচ বর্ষাবধি তাহাে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করিতে হইলে মার্গসঙ্গীতে অধিকার থাকি প্রয়োজন। তজ্জন আমি শ্রীঅমিয়নাথ সায়্যাল, শ্রীসুধেন্দু গোস্বামী ও শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট মার্গসঙ্গীত অঙ্গীকৃত করি।

১৯৩১ সালে এক বছর তাগিদে আমি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে 'অভিসন্' দিই এবং কেন্দ্রের শ্রীসুরেন্দ্রলাল দাস ও শ্রীসুপেন্দ্রনাথ মজুমদারের উৎসাহে আমি নিয়মিত ভাবে বেতার-কেন্দ্রে হইতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করিতে থাকি। ১৯৪১ সালে কবিগুরু তিরোধানের পর শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীশৈলজীবরঞ্জন মজুমদার কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট 'সুধেন্দু শান্তি পারাবার' গানটির স্বরলিপি প্রেরণ করেন এবং উক্ত বৎসরের ১১ই আগষ্ট আমি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে হইতে উহা পরিবেশন করি। পর বৎসর শৈলজীবাবুর পরিচালনার আমার গীত প্রথম রেকর্ড হল 'একলা বসে হেথা তোমার ছবি' ও 'উদাসী হাওয়ার পথে পথে'। ১৯৪৬ সালে বাহির হয় 'প্রাণেশ্বর পবনে' ও 'সুখখানি কর মলিন বিশ্ব'। কলিকাতা ও কলিকাতায় বাহিরে অনেক উল্লেখযোগ্য অঙ্গুষ্ঠানে আমি অংশ গ্রহণ করেছি। এই সম্পর্কে আজ বিশেষ ভাবে মনে আসে সন্তলোকান্তরিত আচার্য্য ক্ষিত্তিমোহন সেন মহাশয়ের আমার প্রতি অসীম স্নেহের কথা। কলিকাতায় ও চুঁচুড়ায় শ্রীসুবোধ রায়ের গৃহে তাঁহার স্খ্যাতিত 'কথকতা' সভায় আমি সঙ্গীত পরিবেশন করেছি। মীরা, কবীর, দাঙ্গ ও অজ্ঞাত সন্তবাণী যখন তিনি শ্রোতাদের স্নাইতেন তখন তৎভাব ও ভাবনায়ুক্ত তাঁহার নির্কাচিত অঙ্গরূপ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিবার ভার আমার উপর স্তম্ব হইত।

১৯৪৫ সালে স্বর্গত হেমশঙ্কর রায়ের কন্যা ও পরলোকগত দেশনেতা কিরণশঙ্কর রায়ের ভ্রাতৃপুত্রী শ্রীমতী ইন্দুনিভাকে আমি বিবাহ করি। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ার সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পড়ে আমার উপরে। অনেকে আমাকে ইতিপূর্বে প্রেরণ করিয়াছেন যে সঙ্গীতকে কেন একান্ত ভাবে আমার জীবিকার একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করি নাই। তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে,



শ্রীসুনীলকুমার রায়

বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতকে আমার জীবনের আনন্দলোকের প্রধান উপায় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ব্যবহারিক জগতে সেই সঙ্গীতকে একমাত্র বৃত্তি করিলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জনসমূহের চাহিদার সঙ্গে আমাকে কেবলই আপোষ করিতে হইবে। ইহাতে সঙ্গীতের আদর্শচ্যুতি ঘটিতে পারে। কিন্তু আমার অন্তরের চিরতৃষ্ণা আমাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধনার অঙ্গুগামী করে রাখে।

শেষে শ্রীয়ার বলেন, সৃষ্ট ভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করিতে হইলে বাণী ও স্বরের বিত্ত্বতা, বিশিষ্ট ভাবময় ভঙ্গী ও অদ্ভুত বিহীন উচ্চারণ প্রয়োজন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আধুনিক গানের সুর-স্পর্শ একবারেই অচল। বিশেষতঃ বিদেশী সুরের অঙ্গুসরণে ও অঙ্গুরণনে কম্পন (Tremolo) অতিশয় অবাঞ্ছনীয়।

কলমের কালিমা

চিত্তরঞ্জন পাল

আকাশ লোপাট হোক সঙ্গীত শুধারে থাক, তবু
এ জীবন ধন হবে মুছে যাবে দুঃখশোক, প্রভু
প্রসন্ন নয়ন তুলে বারেক বচন-সুধা যদি
কখনও করান পান। তা না হলে সাধনার নদী
হারায় বিশির্ষ ধারা অঙ্গুহীন হতাশার পারে।

হয়তালী দিবসেও হাজিরা দেবার অধিকারে
ঘেটুকু সম্মান তাতে শিরোধার্য্য প্রভুপদধূলি।
কর্ষের বহর বাড়ে। নিয়মিত দাসত্বের তুলি
দিনান্তের শেষ আলো মুছে নেয়; অকরণ হাত
হানা দেয় প্রতিদিন—রবিবাসে ঘটে অপঘাত।

মাসান্তিক মাইনে তবু প্রয়োজনে তুচ্ছতার কেন ;
অভাবের বন্ধু রুচে জীবনের চলে লেনলেন ।
বাণিজ্যিক বেড়াডালে উন্নতি তো আসেয়ার সিঁড়ি—
সবৎসরে কুশলুধি ; কানে-গোঁড়া অর্ধনন্দ বিড়ি ।

মাসিক বসুমতীর এজেন্ট-তালিকা

ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে

বর্তমানে মাসিক বসুমতীর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচার বাঙলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের পত্রিকার এজেন্ট-তালিকা লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কলিকাতার বাহিরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মাসিক বসুমতী প্রাপ্তির সুবিধার জন্য আমরা বর্তমান সংখ্যা হইতে আমাদের এজেন্ট-তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করিব। মাসিক বসুমতীর সহায়ক পাঠক-পাঠিকা এজেন্টদের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

॥ বাঙলা দেশ ॥

	হাওড়া ●	বর্ধমান ●
ক: কলিকাতা (বৃহত্তর) ●	মে: কৃষ্ণ বুক ষ্টল — বুরিগ্রাম	শ্রী অমরকৃষ্ণ দত্ত — চিত্রকন
শ্রী অক্ষয় চট্টাচার্য — টালিগঞ্জ	মে: জ্ঞানের সাধী — কেরা মিত্র লেন	শ্রী এ. এস, চ্যাটার্জী — কুলচী
শ্রী কটিকচন্দ্র পাল — টালিগঞ্জ	শ্রী জি, ব্যানার্জী — অবুত পাইন লেন	শ্রী কৃষ্ণনাথ দাস — কাইহাট
শ্রী এ. বি, দাস — লেক রোড মার্কেট	শ্রী বি, ভট্টাচার্য — সারকুলার রোড	শ্রী কৃষ্ণস্বামী সরকার — খাজীপুর
শ্রী অক্ষয় সি — বালিগঞ্জ	শ্রী বি, সি, শেঠ — রামসোপাল বৃত্তির লেন	শ্রী এস, প্যাণ্ডে — বর্ধমান
শ্রী অক্ষয় মাইতি — গড়িয়াহাট	শ্রী বি, সি, পাল — জি. টি. রোড	শ্রী তারাপদ বার — বরবদি
শ্রী অক্ষয় রায় — বালিগঞ্জ	শ্রী এ, এন, বসিক — নিকপু	শ্রী তপনজ্যোতি চ্যাটার্জী — গীতারামপুর
মে: দামোদর লাইব্রেরী — বেহালা		শ্রী সুরেন্দ্রকুমার দে — বাণীপু
শ্রী নির্মলচন্দ্র মোদক — টালিগঞ্জ	হুগলী ●	শ্রী বি, কে, আইচ — বর্ধমান
শ্রী রাধাকান্ত সি — বালিগঞ্জ	শ্রী অমূল্যচরণ বড়া — শেওড়াহুলি	শ্রী পকামন মোদক — ফালনা
শ্রী সুরকুমার ব্যানার্জী — বালিগঞ্জ	শ্রী মদনমোহন গাঙ্গুলী — মগরা ও ত্রিবেণী	শ্রী এইচ, সি, বোব — বার্নপুর ও আসানসোল
শ্রী শম্ভুচন্দ্র দত্ত — চেতলা	শ্রী গঙ্গাধর দে — গীতারামপুর	শ্রী সুরেন্দ্রসোপাল সেন — পলসি
শ্রী সুরভাচন্দ্র উকিল — বালিগঞ্জ	শ্রী বিধনাথ ভট্টাচার্য — ভক্তেশ্বর ও বৈভবাটী	শ্রী সুরেশকুমার বারচৌধুরী — কাছুরিয়া
শ্রী শম্ভুনাথ দত্ত — আলিপুর	শ্রী লজিতমোহন দত্ত — হুগলীঘাট	
শ্রী মাখনলাল নাথ — টালিগঞ্জ	শ্রী গোবিন্দচন্দ্র কুমার — সিকু	নলীয়া ●
শ্রী বীণকৃষ্ণ সুর — টালিগঞ্জ	শ্রী মণিকৃষ্ণ সিংহ — আরামবাগ	শ্রী গোপালচন্দ্র সেন — শান্তিপুর
	শ্রী বৈভনাথ মুখার্জী — নবগ্রাম, কোননগর	শ্রী হরিচরণ প্রামাণিক — নবদ্বীপ
পূ: কলিকাতা (বৃহত্তর) ●	শ্রী বি, ভূষণ চ্যাটার্জী — হরিপাল	শ্রী এ, বি, মুখার্জী — বনগাঁ
শ্রী ভগবৎ বারিক — বেলিয়াঘাটা	শ্রী সুরারীমোহন মুখার্জী — কোরগর	শ্রী এস, কে, চৌধুরী — রাণাঘাট
শ্রী বিমল সরকার — বেলিয়াঘাটা	শ্রী পি, মুখার্জী — গীতারামপুর	শ্রী এন, এন, বোব — রাণাঘাট
শ্রী লক্ষীকান্ত ব্যানার্জী — বেলিয়াঘাটা	শ্রী পি. চন্দ্র — বাণী	শ্রী বি, কে, সাহা — আড়বাটা
	শ্রী সুরেশ চক্রবর্তী — গীতারামপুর	মে: চাকদহ বুক ভিণ্ডো — চাকদহ
	শ্রী বি, সি, ভগ্যপাত্র — উত্তরপাড়া	শ্রী বি, চন্দ্র দাস — রাণাঘাট
	ডি, পি, ব্যানার্জী — চন্দননগর	
	হাওড়া ●	মেদিনীপুর ●
শ্রী কানীনাথ সাহা — আমতা		শ্রী পকামন চৌধুরী — বাকগ্রাম
শ্রী অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জী — বেগুড়	মুর্শিদাবাদ ●	মে: মিত্র নিউজ এজেন্সী — কলাইকুণ্ড
শ্রী এস, বি, সি — কুলেশ্বর	শ্রী অক্ষয়কুমার হালদার — বেলভাঙ্গা	শ্রী জে, এন, আচার্য — মহিষাল
শ্রী রামপং সি — ডেঙ্গাইল	শ্রী বিধনাথ দাস — গুলিয়ান	শ্রী আই, বি, বোব — চক্রকোলা রোড
শ্রী রামহরি নাথ — সাতরাগাছি	শ্রী কীর্ত্তীচন্দ্র ওস্ত	শ্রী হরিশঙ্কর পাইন — বাটাল
শ্রী পি, কে, সিংহ — বেলিয়াঘাটা	শ্রী হরিপদ সাহা — জিয়াগঞ্জ	শ্রী মতী কনকলতা দেবী — বঙ্গপু
শ্রী পি, জি, বোব — অন্নদায়ণ সরকার লেন	মে: বোব লাইব্রেরী — বরবপুর ও বাগড়া	শ্রী প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী — মেদিনীপুর
শ্রী এস, দাস — পঞ্চাননতলা রোড		
শ্রী মাতাঙ্গিনী পাণ্ডে — চিত্তামণি দে রোড	মালদহ ●	প: দিনাজপুর ●
শ্রী কটিকচন্দ্র দাস — নরসিং দত্ত রোড	শ্রী এস, এন, চক্রবর্তী — হরিপুর	শ্রী এ, কে, চ্যাটার্জী — বাসুদেবাট
	শ্রী সুরেশকুমার শেঠ — মালদা কোর্ট	



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মুলেখা দাশগুপ্তা

মঞ্জুর এই সকৌতুক সহাস্তভঙ্গির খাবার ডিম বাড়িয়ে ধরা প্রথমবারের বউনি বদল করে নেবার পরিহাস-তরলতার, মনটা পাঁড়লা হয়ে বড় স্বচ্ছন্দ্যবোধ ক'লে সুদর্শন—মানে এই অস্বস্তিজনক অবস্থার মধ্যেও বতটুকু স্বচ্ছন্দ্যবোধ করা যায়। নইলে যদিও মৌরীর মুখে আপন অভিযোগের উত্তর শুনে প্রথম থাকায় স্বপ্নটা তার ভেতরে ভেতরে বখেট উত্তালতা প্রকাশ করে ফেলেছিল, কিন্তু সেটা নিতান্তই কথকালের জন্ত মাত্র। তার পরমুহূর্তেই একটা নির্দাক্ষ অস্বচ্ছন্দ্যের আবর্ত বেন তার ভেতর থেকে পাক খেয়ে উপরে উঠে এসেছিল—মঞ্জুর কাছে শুনেতে হবে? কেন? এ কথার অর্থ কি? মৌরী নিশ্চয়ই তার বলবার কথা শুনে নিতে বলছে না মঞ্জুর কাছ থেকে। তবে? তবে কি তার বোঝার ভেতর মারাত্মক ভুল রয়ে গেছে? কেবল মৌরীর আপত্তি আর মৌরীর অনমনীয় জেদের ব্যাপার নয় এটা? তার এই আসা দিয়ে সে বাড়ীর লোকদের অপ্রস্তুত করে তুলেছে।

তা কারণটা সবক্কে সে বখন একেবারেই অজ্ঞ বনে গেছে, তখন তার মনে এটা ওটা সেটা ওঠা সম্ভব এবং তারই ভেতর বখন এই বাড়ীর দিককার প্রসঙ্গটা মনে উঠেছিল তখন সত্যি সুদর্শনের মনে অসৌহারিক অজ্ঞ ছিল না। কিন্তু মঞ্জুর হান্তোচ্ছল মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হলো সে। না, তার বোঝায় কোন ভুল ঘটেনি। কারণ বাই হোক, বজ্র পণ্ডের পুরোহিত একা মৌরীই। সব সঙ্কোচ, অস্বস্তি-অশান্তি তখনই অস্তিত্ব করে গেল সুদর্শনের মন থেকে। মৌরীর কাছে তার অহংকার আড়ম্বিত হতে পারে। তাকে জয় করে নিয়ে বাবার জন্ত সে বারংবার আসতে পারে। প্রিয়কে জয় করা চলে, এমন কি—হাঁ, হরণ করা পর্যন্ত চলে। মঞ্জুর পরিহাসের জবাবে সুদর্শনও একটু পরিহাস-তরলকণ্ঠেই জবাব দিল—সাহসটা গভীর বড় মার খেয়ে গেছে। আর বাবের কোন কিছুই আর এবার নয়।

কথাটার অস্তিত্বিত ইজিতটা এতই স্পষ্ট যে কতকণ হেসে নিল মঞ্জু। তারপর হাসি খামিয়ে বেন সুদর্শনের কথার সম্মতি জানাচ্ছে সে, এমনি ভাবে মাথাটা ডান দিকে অল্প একটু কাত করল।

সুদর্শন মঞ্জুর হাতের মিষ্টির ডিমটা দেখিয়ে বলল—এই খাওয়ারটাওরাও এবার বাদ।

এবার আপত্তি জানালো মঞ্জু—দুঃ, তা হয় না।।

—তবে শুধ এক কণ ককি দিন।

—ককি।

ককি উচ্চারণটির সঙ্গে মঞ্জুর কণ্ঠের বিধাশ্রিত লখাটানটা শুনে খেয়াল হলো সুদর্শনের, ককির আয়োজন এবাড়ীতে না থাকাই সম্ভব। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে—আচ্ছা, চা দিন। কিন্তু আর কিছু নয়।

মঞ্জু চায়ের কাপ সুদর্শনের হাতে দিল না। হাতের খাবায়ের ডিমটা ট্রে'র উপর নামিয়ে ট্রেটা নিজের দিকে একটু টেনে নিল সুদর্শনের কাছ থেকে। তারপর একেবারে ছেলেমানুষের মতো মাথাটা এ কাতে সে কাতে দোলাতে দোলাতে বলল—না। চা আপনি ভালোবাসেন না সে কারণ তো আছেই। তা ছাড়াও বউনি বদল করবো বখন ছির করেছি তো করেছিই। তারপর মাথা দোলান বজ্র করে মুখে চোখে স্বরবিজ্ঞানে বহুশ্রম বিধ প্রকৃতির হৃজের চাল-চলন পদ্ধতির প্রতি না বোঝার হতাশা ফুটিয়ে তুলে বললো—কোন অঘটন যে কখন কিসের জন্ত ঘটে, কে জানে। কেউ দোষ চাপান সময়ের যাড়ে। বলেন, দিনটা নিশ্চয়ই শুভ ছিল না। কেউ চাপান মাহুষের যাড়ে। বলেন, বাজ্রাকালে বেন কার মুখ দেখেছিলো। কেউ চাপান থাকে। বলেন, বাজ্রাকালে নির্বিচারে বা-তা সব খেলে আর দেখলে অস্বাস্থ্য হবেই। তাই আমি ছির করেছি এবার সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবো এবং এই অস্তিত্ব পরিপত্তির জন্ত এবার ওবারের সমস্ত—সমস্তকিছু বিনা বিচারে, শ্রেক বাদ দেব। তারপর চায়ের ট্রেটার হৃদিকের হাতল ধরে সেটা তুলে নেবার মতো করে ধরে ঠাড়ালো—বেন এমুনি সেটা নিয়ে সে রওনা হবে। কিন্তু একেবারে না তুলে বলল, কী বিতিকিচ্ছি কাণ্ড এ্যা—একজন বিশিষ্ট ভক্তজনের আসার সংবাদ শুনে বাড়ীর আপামর ভক্তজন সব ছুটে গিয়ে কেউ শোবার ঘরে, কেউ ঠাকুরঘরে, কেউ ছাদে। কেউ আলমারীর আড়ালে ঢুকছেন।

মঞ্জুর কথা শেষ হবার আগেই তার বড় বড় বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল সুদর্শন। ঠাক্ত দিয়ে টোটে'র পাশটা চেপে ধরে দেয়ালে পিঠ দিয়ে ঠাড়িয়ে থাকা মৌরীও তার মুখটা আরো কিছুটা ঘুরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

বড় বড় ব্যক্তিমের ছোট্টাছুটি করে ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়বার পেছনে যে লজ্জা ছিল সব বেন ধুয়ে মুছে গেল। মঞ্জু ট্রেটা দু হাতে তুলে নিয়ে বাঁওয়ার জন্ত পা বাড়ালো—ককি করতে কতকণ লাগবে। এই তো সোজা চলে বাবো বাবার কাছে। বলবো, শীগগির—শীগগির টাকা বের করো। আকুল ব্যাকুল চোখে আমার দিকে তাকাতো তাকাতো চকল হাতে ব্যাগ খুলে টাকা বের করে দেবেন বাবা। এক দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে ধরবো একটা ট্যান্ডি। চলে বাবো মার্কেটে। ধুমধাম হাতে বাছাই করে কিনব এই ছুজনার মতো একটা ডেপ্ট ককি-সেট। তারপর কের সোজা কোয়ালিটি। বাসু—পরম দিক ককিতে পট ভর্তি করে ট্রে-কক কোলে চাপিয়ে নিয়ে ছুটবো বাসামুখে। কতকণ আর লাগবে? বড় জোর এক ঘণ্টা? আপনাদের তো মনে হবে আমি বুঝি গেলাম আর এলাম। আপনারা কতকণ কথা—না, কথা বলে লাভ নেই। ও কথা বলতেও জানে না—বোঝেও বজ্র কম। তার চাইতে আপনি বরং—চোখের ইশারার টেবিলের উপর পড়ে থাকা সক্রিয়তাটা দেখালো মঞ্জু—ঐ সক্রিয়তাবানা নিয়ে বন্দন। আমি দেখেছি সাধারণতঃ ভক্ত্যরদের ভেতর বেশ একটা সাহিত্যিক মন থাকে। ঘরের একটা

কাণের দিকে চোখ রেখে চোখ হুঁটো পিট-পিট করতে করতে একটু ভাবলো মঞ্জু। তারপর সুরদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলল—

অনন্দের সমুদ্রে মন্থনে

গভীর বহুস্ত হতে তুমি এলে আমার জীবনে।

উষ্ণিহাহ অতলের অস্পষ্টতাবানি

আপনার চারিদিকে টানি—

আঃ, একেবারে লাগসই! দেখুন তো, বোধ হয় সানাইতে—

প্রথমতঃ মঞ্জুর কথার বাধা দিয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয়ত মঞ্জুর থাকারটাই চাচ্ছিল বলে চুপ করেই ছিল মৌরী। কিন্তু আর পারলো না। বাইরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এসে তাকালো মঞ্জুর দিকে। একটু ক্লান্ত একটু কষ্টকরে বলে উঠল সে—উঃ মঞ্জু!

হাতের ট্রেভ ভারটা ফের টেবিলের কোণের উপর রেখে সুরদর্শনকে সম্বোধন করলো মঞ্জু—ঐ দেখুন, বললাম না—কখনও বোধে না। কি করে বুঝবে? কেবল কবিতা। কবিতা পড়লে কি জ্ঞান-বুদ্ধির ওজন বাড়ে?

ছাদে বেওনাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়, সীমানা-হীন।

তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা—স্বপন সব হবে বিলীন।

তার চেয়ে এস বসি হুজনাতে, জানালা পাশে,

ও ধায়ের ছোট গলিটারে দেখি—

বাস হলো তো? পড়ো কবিতা। বললাম, চার্চিলের 'ওয়ার স্পীচেস' পড়। পড়লিনে। পড়লে বুঝতিন কথার শক্তি কাকে বলে। একটানা একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঞ্জু। যদি আমাদের রাজস্ববর্গের শুধু মাত্র এই একটা শক্তিও থাকত! পত্রিকাগুলোর বুক ভর্তি থাকে কেবল তাঁদের মুখ-ভর্তি কথায়। কিন্তু হা, ঈশ্বর! গতি নেই, বেগ নেই, স্পন্দন নেই—স্পর্শ নেই—এগুলো কি কথা। শুধু পারিভাসিক শব্দের মৃত সারি। প্রাণ যাদের ভেতর নেই—কথাও তাদের প্রাণ পায় না। পড়ি আর আমার কাগজ পায় মৃত কথার সাজই মৃত মামুষুগুলোর কথা ভেবে। হঠাৎ সুরদর্শনের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত শিশুর মতো চোখ-মুখ কুঁচকে মুচকে ছোলে যেসে ফেলল মঞ্জু। বলল—কথাটা হলো কি জানেন, গাছের পাতায় যদি জমা জল থাকে তবে যেমন নাড়া পড়লো তো টপ টপ করে পড়িয়ে পড়ল—তা গায়, মাথায় মাটিতে যেখানেই হোক। মনের মধ্যকার জমা কথারও সেই এক অবস্থা। ছোঁয়া পড়ল কি বাস—সমস্ত শরীর একদিকে হেলিয়ে দিয়ে 'বাস' শব্দটি উচ্চারণ করলো সে। তারপর ট্রেটা একটানে তুলে নিয়ে বৃকের কাছে ধরে, মৌরীর মুখটা তেড়েছা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে টোটে-মুখে হাসি নিয়ে বেহিরে গেল বর ছেড়ে।

ঘরঠাসা রুদ্ধ নিশ্চল ভাবটাকে উজ্জীবিত করে তুলবার জন্ত বেন কিছুক্ষণ ওলট-পালট হাওয়া বইয়ে তারপর হাওয়া ভাড়িত মেঘখণ্ডের মতোই বর ছেড়ে চল গেল মঞ্জু।

কিন্তু মঞ্জুর চল বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কলরব শান্ত হয়ে গিয়ে পূর্ব নিশ্চলতাটা ফের এসে চেপে বসল ওদের মাথখানে। আর এই হঠাৎ নীরবতা বস্ত্র বেশী নিখর করে তুলল ঘরের আবহাওয়ারকে। কিন্তু নিরুপায় তো সুরদর্শনও। সেই কি বেশী কথা বলে? ওর বক্তাবটীও তো যোল করা কাগজের মতো। মেলে ধরলেও কোঁকটা

থাকে গুটানোর দিকে। আর মেলে রাখতে হলে রাখতে হয় চাপ। তার জানা কারণটা গেছে বৈঠক হয়ে, অজ্ঞ কারণটা এখনও জানা হয়নি, ভেতরে একটা ভাবনার চাপ তার ছিল। সেই চাপ তার চিবুকের দৃঢ়তাকে কিছুটা চিলে করেও রেখেছিল কিন্তু ঐ কথা নিয়ে মৌরীকে কিছু এক্সুনি ফের জিজ্ঞাসা করতে মোটেই ইচ্ছে বসল না তার। মঞ্জু থাকতে যে সিগারেটটা খরচেছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে। ছাইদানের খোঁজে টেবিলের দিকে তাকালো সে। কিন্তু ঘরটা মৌরী-মঞ্জুরের। ছাইদান এখানে থাকার কথা নয়, ছিলও না। জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও খেয়ে গেল, কে জানে কোথায় গিয়ে পড়বে। বাধ্য হয়েই মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে নিবালো সেটাকে। ঘরটা সুরদর্শনের অপরিচিত নয়। এই ছু বোনের বিছানা—টেবিল চেয়ার বই-পস্তর, আলনার শাড়ী কাপড় জামা—সবই সে সেই রাতে মঞ্জু অশ্রুত হয়ে পড়লে তাকে দেখতে এসে দেখেছে। টেবিলের উপর কাইলে বেঁধানো স্তূপীকৃত পত্রিকার কাটিং। সেদিনও ছিল। আজ আছে। সেগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দেখল সুরদর্শন। ইংরেজী বাংলা সাপ্তাহিক বৈনিক বাদ নেই। এই কাগজের কাটিংগুলোর মাঠিক নিঃসন্দেহে মঞ্জু। টেবিলের ওপর থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয়তাবানাই তুলে নিতে নিতে দেয়ালে পিঠ রেখে ঝাঁড়িয়ে থাকা মৌরীকে অকুরোধের সুরে বললো—

আপনার এ ভাবে ঝাঁড়িয়ে থাকারটা আমার পক্ষে খুবই যে অস্বাভাবিক কারণ হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন?

বসল মৌরী।

কিন্তু তার পর? সুরদর্শন যে মাঝে মাঝে হু-একটা কথা বলতে না লাগল আর—মৌরী তার জবাব না দিল তা নয়। কিন্তু আসলে মৌরী বসে বসে কখনো শাড়ীর আঁচল কোলের ওপর ফেলে ভাঁজ করতে আর ভাজতে লাগল। কখনো নিজের পায়ের বুড়া আঙ্গুলের কিটোলের লাল রংটার দিকে তাকালো। তিন চার দিন আগে পরিবে দিবেছিল আলতা। মাঝে মাঝে উঠে গেছে। বিড়ী দেখাচ্ছে। শাড়ীটা বুড়া আঙ্গুল দিয়ে টেনে পা ঢাকল। সুরদর্শনের লুটানো কোচা, বক্রককে পাম্পসুর উপর গিয়ে চোখ পড়তে লাগল তার মাঝে মাঝে। আর সুরদর্শন উলটে পালটে চলল সক্রিয়তার পাতা। সে বইটাকে নয়, বইটার অধিকাংশীকেই বেন বইটার ভেতর দিয়ে

ধবল ও

বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল চর্মরোগ, সৌন্দর্য ও চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন। সময়—সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

ফোন নং ৪৬-১৩৫৮

দেখছিল। কইটির একটি পাভাও যে পড়া শুধু তাই নয়—প্রতিটি পাভা যে বহু বার পড়া তার চিহ্ন বিস্তারিত প্রতি হস্তে হস্তে। হাতের আঙ্গুলের ধূসর দাগ পাভার পাভার—পাভার পাভার খাত-বস্তুর নিকশিত কণার হস্তে ছিটে। কোথায় ছিটে পাভার মাঝখানে চেপ্টে আছে কপালের করা কুমকুম। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় দিনের বেশীর ভাগ সময়ই তার কাঁটে হয় মালিকের হাতে নয় কোলে। কইটির মধ্যে যেন মৌরীর কোলের উদ্ভাপ, হাতের স্পর্শ, চুলের গন্ধ মাঝানো রয়েছে। এই যে মঞ্জু বললো, ভেতরে প্রাণ থাকলে তবে কথা প্রাণ পায়। যদিও মঞ্জু যে অর্ধে কথাটা বলেছে তা একেবারেই ভিন্ন—তবু অল্প অর্ধে স্তম্ভনের মনে হলো মৌরীর প্রাণের উদ্ভাপে যেন কবিতাগুলো সব প্রাণ পেয়ে উঠে এসে ঘরের মধ্যে ঘুরছে, ঠাঁড়চ্ছে, বসছে। এই যেমন মৌরী বসে আছে ঠিক তেমনি ভাবে এসে বসছে। এই একটু আগে যেমন দেয়ালে পিঠ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল মৌরী, ঠিক তেমনি ভাবে দেয়ালে পিঠ রেখে নির্নির্মেষ হুঁতুতে বাহিরের দিকে তাকাচ্ছে। ছায়াছবির নামতালিকার পঙ্ক্তিশুলোকে যেমন অনেক সময় শ্রোতে ভাসমান বস্তুর মতো ভেসে ভেসে পর্দার পায়ে মিশে যেতে দেখা যায়, ঠিক যেন তেমনি করে স্তম্ভনের মনে ধরা পাভা থেকে কবিতার পঙ্ক্তিশুলো উঠে এসে ভাসতে ভাসতে মিশিয়ে যেতে লাগল মৌরীর মধ্যে।

স্তম্ভন চল গেলে ঘরের মাঝখানে ঠিক পাখার নীচে চেয়ার টেনে ক্লাস্ত শরীর এলিয়ে বসে কিছুক্ষণ হাঁওয়া খেল মঞ্জু। তারপর উঠে বসে বলল—উঃ, এক একটা দিন কি—হালানামাটাই বার। বাক্যে হালানামার কথা বলছিলেন, আনন্দেরও তো হালানামা আছে। তা বিলাস তো তোরা—খুঁড়ি, আমাদের স্তম্ভন বাবুকে ককি খাইয়ে। তারপর গলার স্বরটাকে একটু নীচু করে এনে কৌতুক চোখে জিজ্ঞাসা করল—ডাক্তার কবিতা পড়েছিলেন?

—ডাক্তার কবিতা পড়েছিলেন। দেখ মঞ্জু, বাক্য বলে প্রসঙ্গ—বাচাল, দিনকে দিন তুই তাই হয়ে উঠছিস। আমি সাবধান করে দিছি কিন্তু তাকে।

—ডাক্তার তাই বললেন?

—না। ডাক্তার বললেন তোরা মাখার ভালো রকম চিকিৎসার স্বরকার।

—তোরা মাখার চিকিৎসার কথা কিছু বলেন নি?

—না।

—তবেই ঠিক আছে। বাড়ীতে ডাক্তার এলেই আমার দেখাতে অবুধ খেতে ইচ্ছে করে। আর ঘরের ডাক্তার হলে তো কথাই নেই। করা বাবে মাখার চিকিৎসা। কিন্তু ডাক্তার আজ সন্ধ্যার কখন আসছেন?

—কেন, সন্ধ্যার আবার আসতে বাবেন কেন?

—কেন আসতে বাবেন?

—হ্যাঁ, কেন আসতে বাবেন।

—আজ সকালে এসেছিলেন কেন?

—বোকা বলে।

—বোকা বলে?

—হ্যাঁ, বোকা বলে।

—এই সময়ের ভেতর তাঁকে তুই তবে বুদ্ধিমান বানিয়ে ছেড়েছিস বল?

—বোকাকে কি আর বুদ্ধিমান বানান যায়?

—তাই যদি না বাবে, তবে বলছিস কেন সন্ধ্যার আসতে বাবেন কেন? আসবেন ঐ তোরা কথার বোকা বলে।

—না মঞ্জু, আমি সত্যি তোকে বলছি। সব কিছুই একটা সীমা আছে—

চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল মঞ্জু। বললো—না ভুলে, সীমা বলে কোথাও কিছু নেই—আকাশ-বাতাস জল-মাটি আলো গ্রহ-নক্ষত্র কোথাও না। পৃথিবীর প্রকৃতিতে সীমা বলে কোন শব্দ নেই, মানুষের প্রকৃতিতেও না। বেকনো তো হলো না। যুমোই বাপু একটু। বিছানার ভয়ে পড়ে পাশ বালিশ জড়িয়ে মড়িয়ে ধরে চোখ বুজল সে। বসে রইল মৌরী।

সকালের যে রোদটা পূর্বের জানালা দিয়ে একতরফ শিকর ছায়া বৃকে নিয়ে মেঝের ওপর পড়ে ছিল, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দক্ষিণের দরজা দিয়ে এসে সে রোদটা এবার ঘরে ঢুকেছে। স্তম্ভনের ছুতোয় তলায় পেয়া সিগারেটটার পাশ কাটিয়ে তেরছা ভাবে চল গেছে টেবিলের তলা পর্যন্ত। সেখানে মিনি বেড়াটা অনবরত স্তম্ভনের ককিকাপটা শুকছে। যেন তার উঠতে পারছে না হুধ না আর কিছু। চলে বাচ্ছে—কেন ঘুরে আসছে।

অমিতা ঝুপ করে একবার চুকেই মৌরীকে জানের তাড়া দিয়ে অমনি বেরিয়ে গেল। বলতে বলতে গেল, কি অসময়ে শুয়েছ। গুঠো না মঞ্জু। খেয়েছ বলে কি হয়েছে। আমাদের সঙ্গে খাবে তো চাঁট।

মৌরী উঠে জানের ঘর থেকে তেলের শিশি নিয়ে এলো। জান হাতে শিশি নিয়ে বা হাতে চুলের গোড়ার তরল তেল দিতে দিতে লাগল পায়েচাষী করতে। গন্ধতেলের স্তম্ভকে সুবাসিত হয়ে উঠল ঘরের হাঁওয়া।

কিন্তু মঞ্জু শুয়ে থাকবে কতক্ষণ? চোখ-মুখ কচল উঠে বসল বিছানার উপর। বললো, বৌদিটা ঠিক বলেছে। সত্যি ভীষণ খিদে পেয়েছে তো? কেক পোর্টের প্লেটটাতে তো তরললোক একবারের বেশী হবার হাত ছোঁয়াননি—প্রচুর হয়ে গেছে—

মৌরী মঞ্জুর একটা কথাও শুনেছে বলে মনে হলো না। শোনেওনি। মঞ্জুকে উঠতে দেখে সে পায়ের ধাঁটা আর হাতের তেল দেওয়া বন্ধ করে বলল—দেখ মঞ্জু, আমি কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি তোকে—বাড়ীর কেউ যেন—

তোকে কিছু না বলতে আসেন। খাটের বুলানো পা মেঝেতে নামিয়ে উঠে ঠাঁড়ালো মঞ্জু। বলতে হবে না। তাঁরা কেউ কিছু বলতে আসবেন না তোকে। তোরা জান-বাওয়া বখন বাকী আছে, তখন ঘর ছেড়ে অবতাই একবার বেরতে হবে তোকে আর বাবার ঘর বখন অকস্মে বাওয়া হয়নি, বাড়ীতে রয়েছেন তখন উত্তরণকে সাফল্য ঘটছেই—দেখনি, দুখের ভাবসাব সবার জমাট। শুধু মুখ নয় চেহারাটাও সবাই বোকা করে রেখেছেন। অর্থাৎ—তাঁরা কিছুই মধ্যে নেই। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছিলাম কি—না থাক। বলতে পিয়েও খেসে গেল মঞ্জু। ঐ বৌদি যা বলেছেন, দিন স্তম্ভন বাবু নিয়ে বোকা-পড়া করে—না গো? আমরা তো তাই চাই—এঁয়া? আমরা কি করতে পারি—না? আমরা আর এর মধ্যে নেই হ্যাঁ? হ্যাঁ, তাই ঠিক। আমরা এর মধ্যে নেই—একেবারেই না। যেন মৌরীকে নয় নিজেকেই মঞ্জু জোর দিয়ে বোকালা কথাটা। অর্থাৎ ও নিজেও আর কথা বলবে না এবিষয়ে মৌরীর সঙ্গে একটা—একটিও না।

[আগামী বারের সমাপ্ত]

শান্তি কল্যাণী - ১৯৪৬, ১৯৪৭

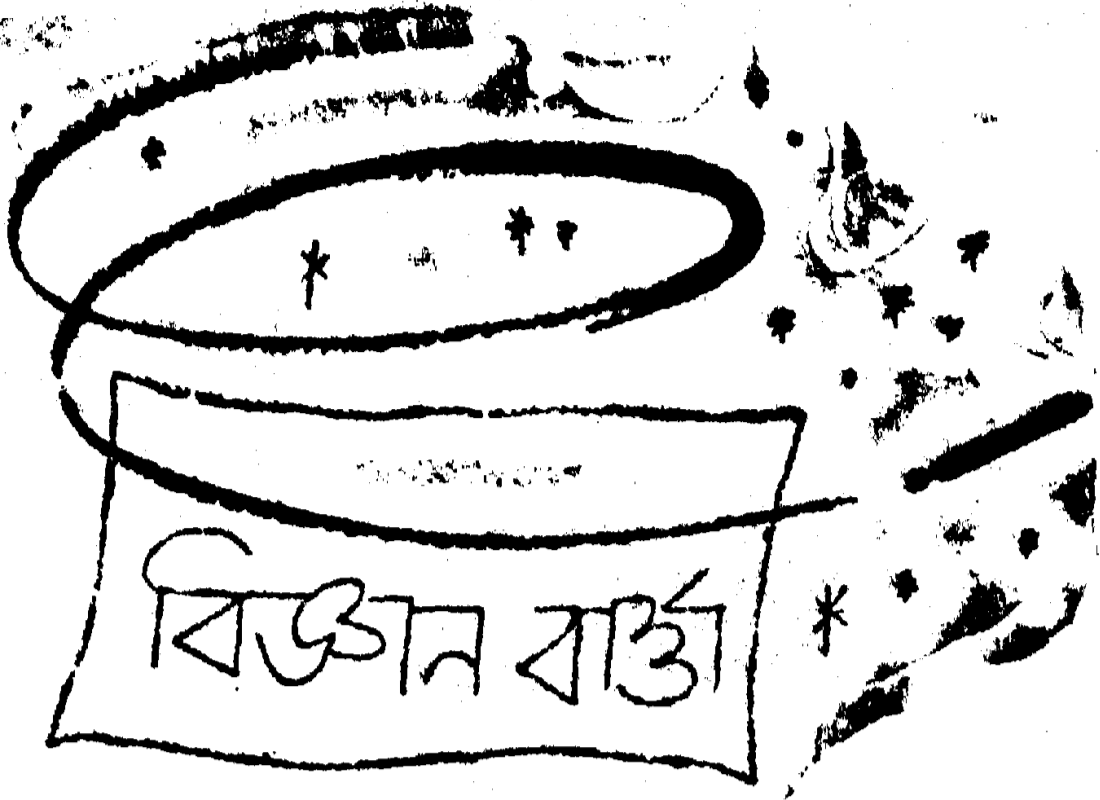


লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে!

আঃ! লাইফবয়ে গ্রাম করে কি আরাম! আর গ্রামের পর শরীরটা কত স্বাস্থ্যে রাখে!
খরে বাইরে ধুলা ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্যকারী ফেনা সব ধুলো
ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও বাতাস বদলা করে। আর থেকে স্বাস্থ্যের
পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে গ্রাম করুন!

L. 16-X12 BQ

বিশুদ্ধ নিখরাত



ভারতে পরিবার পরিকল্পনা

১৯৫১ সালের লোক-গণনা তখনও হয়ে যায় নি। ভারতবাসীর মনে এ প্রসঙ্গটি সবে উঠছে—কুমির অহুপাতে ভারতে লোকসংখ্যা সত্যি অনেক বেশি কি না।

লোক-গণনার বিবরণ যখন বের হ'ল, দেখা গেলো ভারতের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে ৩৫০,০০০,০০০। এই হিসাবের ভেতর স্বভাবতই পাকিস্তানকে ধরা হয় নি। আলোচ্য বিবরণে এও প্রকাশ পায় যে, বছরে ভারতে শতকরা ১.৫ হারে লোক বেড়ে চলেছে। ভারত-সরকার তখনই এই সমস্যা ব্যাপারে কিছু করবেন বলে-সচেষ্ট হন।

পরিকল্পনা কমিশন পরিবার পরিকল্পনা (জন্ম নিয়ন্ত্রণ) কর্মসূচীর জন্তে প্রারম্ভে বরাদ্দ করেন প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা। ভারতের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই এই বরাদ্দটি করা হয়।

সূচনার ছ'টি কেন্দ্রে একই সঙ্গে পরীক্ষা চালানো হয়—একটি নয়াবিল্লার মধ্যবিত্ত (সহরবাসী) মহল্লায়, অপরটি মহীশূর রাজ্যের রামনগরমে। একটি ছোট মধ্যবিত্ত মহল্লা এই রামনগরমে—যেখানে সাধারণ ভারতীয় জীবনযাত্রা চালু, যার আওতার রয়েছে ১৫টি পল্লী। বিশেষ কারণে প্রভাবিত কাজের জন্ত অঙ্গটি বেছে নিওয়া হয়।

জনসংখ্যার পর্যালোচনা বিষয় পরীক্ষা সমাধা করা হয় প্রথম দফাতেই। বাইরের লোক দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বাস্তব বাণী এখানে ব্যস্ত না হয়, সেভাবেই এগিয়ে বাওয়া হতে থাকে। মক্কেলার কাউন্সেল-এর সাহায্যে ১৯৬৬ সালেই রামনগরমে অবশ্য একটি সাহায্যকেন্দ্র খোলা হয়। ডাক্তার ও ধাত্রীদের সাথে পল্লীবাসী বাস্তব পরিচিত হারে, এই কার্য ব্যবহার মূলে ছিল সেই লক্ষ্য।

রামনগরমে একগুণে গেলেই বহু জিনিস চোখে পড়বে—পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতিও সহজেই লক্ষ্য করে আসা যায়। পল্লীর সংস্কারাজ্ঞার নিয়ন্ত্রণ স্ত্রী-পুরুষদের সহযোগিতা পেতে কী কষ্ট বা অসুবিধা, তাও জানবার সুযোগ পাওয়া যায় সেখানে।

তিনটি পল্লীর মোড়লদের এক লক্ষ্য ভেঙে জিজ্ঞেস করা হয়—স্বাধীনতার আগেকার পশ বছরের তিনটি বড় ঘটনা তাঁদের মতে কি? উত্তর করেন তাঁরা সমন্বয়ে—প্রথমে স্বাধিকেন্দ্র স্থাপিত হল, আমাদের কেয়েরা বাঁচল, ছেলেমেয়েরা বড় হতে থাকল। এর পরই বাবল লড়াই—আমাদের কল বিক্রী হয়ে চললো ডালকম, আঁরবা

বৈদ্য শৌখী করলার। এল নাতি—কলনের বিক্রী দাঁড়ি বৈদ্য দাঁড়ি। একদে সরকার তাঁরাই বাঁচতেও সাহায্য করবেন না, বরতেও কেবল না।

লোকসংখ্যা কি হারে কতটা বেড়েছে মোড়লরা সে পরিমাপ্যাম সম্পর্কে ভয়াকিবহাল নয়। তবে তাঁদের মুখে এ অভিযোগ শোনা যায়—‘আমাদের সকলের ঘরই লোকে জড়ি, ছেলে মেয়েরা আর ঘরছে না, বুড়োর দলও দীর্ঘস্থ হয়ে চলেছে’—

পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা প্রথমে যেয়ে পল্লীবাসীদের সাথে তাঁর জমিয়ে গেল। কাছটি স্বভাবত: খুব সহজ ছিল না—স্ত্রী পুরুষ সকল কর্মীকেই কাজে এমোয়ার নানা কিকির খুঁজে পেতে নিতে হয়। পল্লীর নারীদের সাথে মারী কর্মীরা কাজ করে চলেন, পুরুষকর্মীরা পুরুষদের সাথে। ছ' বছরের ভেতর ছেলে ছোক, এমনটি যে স্বামী স্ত্রীরা চান না, তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয় এক ‘বিদ্য পদ্ধতি’ নিধিয়ে দেওয়া হয় তাদের। এই পদ্ধতির মূল কথা হলো—নারীর স্বজন কোয়ের মাসিক উর্ধ্বতর সময় ছির করে এই সময়ের জন্ত স্বামী-স্ত্রীর পৃথকভাবে অবস্থান।

১৯১টি সম্পত্তির ভেতর ৭১২টি কেন্দ্রেই স্বামী ও স্ত্রী বৌভাভে পরিবার পরিকল্পনার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও শতকরা পাঁচটি কেন্দ্রে স্বামীরা এর জন্তে ব্যাকুলতা দেখান একটু বেশি রকম।

প্রারম্ভিক কর্মসূচীর লক্ষ্যই ছিল পরিবার পরিকল্পনার জন্ত গণ চাহিদা সত্যি আছে কিনা এবং সেই সাথে ‘বিদ্য পদ্ধতি’ কতটা চালু করা সম্ভব সেইটি যাচাই করা। এই পদ্ধতিটি বেছে নেওয়া হয় এই জন্তে যে, এতে টাকা পরমা খরচের প্রয়োজন নেই, স্বামী বোধ জুর হওয়ার কারণ নেই, কলা কৌশলের প্রয়োজন নেই, পরম্ব হিন্দুদের সামাজিক ধাঁচের সাথে এর বেশ মিল রয়েছে একটা। এ অহুসরণ করা খুবই সহজ, যে দিনগুলিতে গর্ভ সকারের অতিমাত্র সন্ধাননা থাকে, সে সময় সহবাস বর্জন করতে পারলেই নিরাপদ।

দিল্লীর শিকিত ও অগ্রসর পরিবারগুলির ভেতর এ কর্মসূচী নিয়ে কাজ করতে ততটা অসুবিধা হয় না। কিন্তু রামনগরমে এই পদ্ধতি চালু করতেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। সেখানে সকলের ঘবে তারিখ চিহ্নিতকরণের জন্তে ক্যালেন্ডারই খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্যালেন্ডার যদি বা সংগ্রহ করা গেলো, নিয়ন্ত্রণ পল্লীবাসীর পক্ষে এর ব্যবহার স্বভাবত:ই কঠিন বোধ হয়। কোন পরের দিন, কল কাটার দিন, বুড়ির দিন—এ সব মনে রেখে বেশিরভাগ লোক পরীক্ষা চালাতে থাকেন। কিন্তু কর্মসূচীতে সবলতার দাবী যেখানে রাখা হবে, সেখানে তারিখ ঠিক রাখাটাই সবচেয়ে বড় কথা।

আমেরিকার ডাঃ আড্রাহাম ষ্টোন পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। ভারতীয় পরিবারে কি ভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্তে ভারত সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনেন এখানে নিয়ন্ত্রণ ও অনগ্রসর পল্লী অঞ্চলে বিদ্য পদ্ধতি চালু ব্যাপারে তিনি মাথা থেকে একটা উপায় বের করেন। নারীরা বাস্তব প্রত্যেক দিন একটি করে গুটি এবং বিভিন্ন মাসের জন্তে বিভিন্ন রঙের গুটি মালার আকারে সাজিয়ে রাখবার অভ্যাস করেন, সেইভাবে প্রচার করা হয়। সহবাস ঠিক কোন্ সময়টিতে বর্জন করতে হবে, হিসাবে সে-কি মোটামুটি নিলে হার।

গোড়ার দিকে এই ভারতীয় গুটি-মালা ব্যবহারেও অনেক নারী অবশ্য আপত্তি জানাতে থাকেন। সারা বিশ্বের লোক জ্ঞান কি

করছেন, এ ছাড়াও, এটি কামা নয় বলেই তাঁদের বিক থেকে এমনি আপত্তি ওঠে। শেষ পর্যন্ত এই অন্তর্বিদ্য বহুল পরিমাণে দৃষ্টিভূত হয়, 'বিভিন্ন পদ্ধতি' ক্রমে সম্বাদিত হয়ে চলে কাশিক এলাকায়। দীর্ঘ কালীন সংস্কারের বাধাকে অতিক্রম করার প্রয়াসটি এর ভেতর কম বড় হয়ে দেখা দেয় না। মালা ব্যবহারে কম কম স্ত্রি, এখন অনেক স্থলে পরিষ্কারকারীদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা এসেও ছুটে।

সাময়িকভাবে সরকারী পরিবার পরিষ্কারের কর্মসূচী নিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা চালানো হয় মাত্র। জন্মনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে অকস্মে এর পথ বহু পরিষ্কারা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। শুধু 'বিভিন্ন পদ্ধতি'ই নয়, আরও নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু করার প্রয়োজন রয়েছে এখন। জন্ম-নিয়ন্ত্রক সমাজবাদী ব্যবহারও আজকাল বহুল পরিমাণে চলতি। পরিবার পরিষ্কারা প্রসঙ্গে নীতিমত শিকশকক্রমও সরকার স্থাপন করেছেন এর ভেতর বেশের বিভিন্ন ব্যবসায়। বীরে বীরে কাজ এগিয়ে চলেছে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে বিশুদ্ধতা সম্পর্কেই। কিন্তু শুধু এ ঠিক, পরিষ্কারাটির গুরুত্ব জনসাধারণ বহু বেশি উপলব্ধি করবেন, তত ক্রম দেখতে পাওয়া যাবে এর সুফল।

কতকগুলি পরিবারের সমষ্টিই সমাজ বা দেশ সুতরাং সমাজ তথা দেশের অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের সাথে পরিবার পরিষ্কারের সম্পর্ক খুব নিবিড়। মানুষের আর্থিক সম্বল বহু বাড়ছে, পরিবার পরিষ্কার বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসটিও স্বভাবতই দেখা দিচ্ছে বড় হয়ে। সীমাবদ্ধ আয়ের ভেতর সংসার চালানো আজকাল কী কঠিন, কারো অজানা নয়। এই থেকে সহসা রেহাই পাওয়ার আশা করাও এই সমাজ-ব্যবস্থার বৃথা। পরিবার পরিষ্কারের গুরুত্ব এসব নানা কারণেই আজ পূর্বের তুলনার সমধিক। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য

সরকারগুলো উপায়হীন হয়েই এ পরিষ্কারাঙ্কে রূপান্তর করতে প্রয়াস নিয়ে চলেছেন, এ বলবার মিশ্রণই অপেক্ষা থাকে না।

প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিষ্কারনাকাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিষ্কারা ব্যাপারে সরকারী উদ্ভম লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীতে 'কেন্দ্রীয় পরিবার পরিষ্কারা বোর্ড' নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে—পশ্চিমবঙ্গ সহ প্রায় সব বঙ্গটি রাষ্ট্রই গড়ে তোলা হয়েছে এর শাখা। এর ওপর রাজ্য সরকারের একটি পরিষ্কার পরিষ্কারা দপ্তরও রয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। পশ্চিমবঙ্গের কথা বিশেষ ভাবে বলা যায়—এখানে কম হীনশ্রমীভাবিত এক আরও বহু চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরিষ্কার পরিষ্কারা সরকারী ব্যবস্থা রাখা আছে। ক্রমে এই কর্মসূচী আরও সম্বলসংক্রান্ত তত্ত্ব-বাহ্য সরকার দাবী রাখছেন।

ভারতে পরিবার পরিষ্কারা আন্দোলন বহু নূন কর্মসূচী-সংক্রান্ত সৌচ্য ক্রমেই জোরদার হচ্ছে অস্বীকার করে চলে না। প্রথম পরিষ্কারনাকালে এই খাতে ব্যয় ছিল ৩৫ লক্ষ টাকা কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিষ্কারায় এই অর্থের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হয়। দ্বিতীয় পরিষ্কারায় কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করেছেন ৪কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগণ ১৭ লক্ষ টাকা। প্রথম পরিষ্কারনাকালে পঞ্জী অকস্মে ২১টি পরিবার পরিষ্কারা ক্লিনিক খোলা হয় আর সহরগুলো খোলা হয় ১২৬টি ক্লিনিক। দ্বিতীয় পরিষ্কারনাকালে মধ্যেই সহরগুলো ৫০০টি ও পঞ্জী অকস্মে ২০০০টি ক্লিনিক খোলায় কথা। এক একটি ক্লিনিকে সহরগুলো ৫০ হাজার ও পঞ্জী অকস্মে প্রায় ৬০ হাজার লোক উপকৃত হবেন বলে দাবী রাখা হয়েছে। তৃতীয় পরিষ্কারনাকালে পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতে আরও অসংখ্য পরিবার পরিষ্কারাবেঙ্গ খোলা হবে, এ নিশ্চয়।

রাজমিস্ত্রী

[সোভিয়েট কবি ভেসলি কাজিনের (Vasily Kazin) 'Brick-layer' কবিতার অনুবাদ]

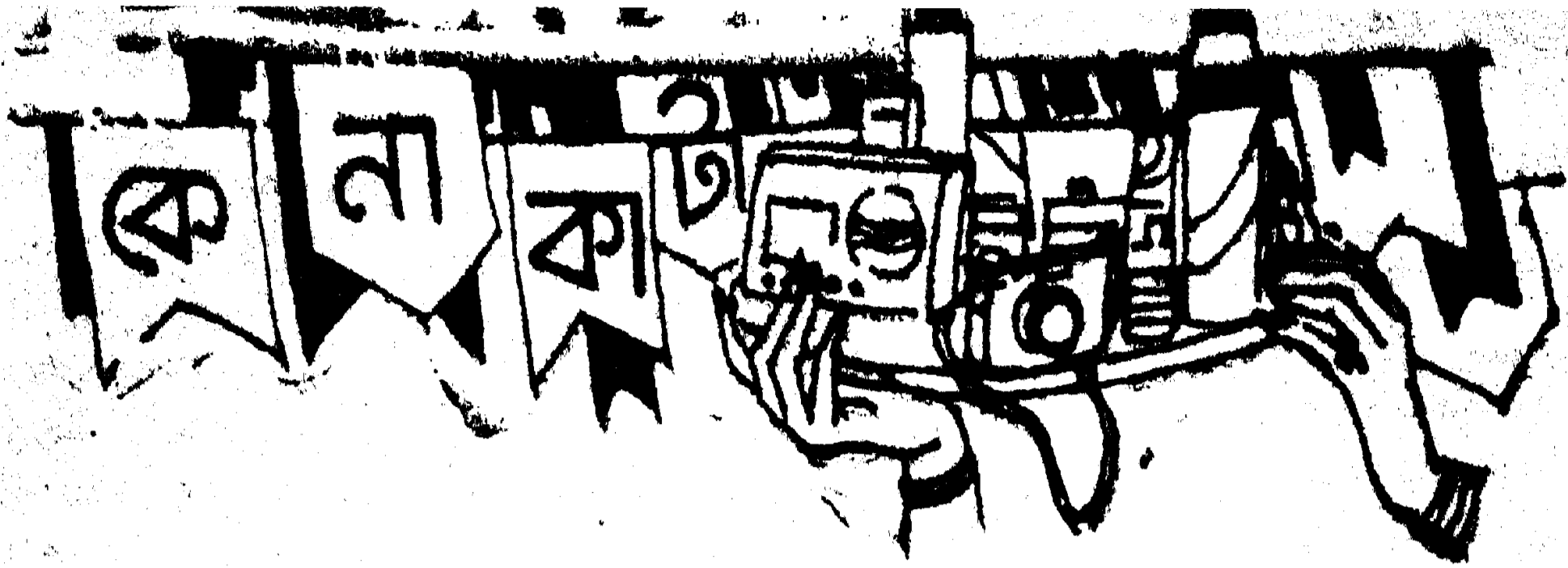
কী এক প্রচ্ছন্ন ক্লাস্তি মেখে নির্জন শরীরে
প্রান্ত পায়ে বাড়ী ফিরি সমাহিত সন্ধ্যায়,
প্রেশাবিত অঙ্ককারে সন্ধ্যায় সবুজ জমে
যেন এই উজ্জ্বল বিকলের আলো করে ;
আব ঐ সোনালী ব্যাপ্তির কোন বলিষ্ঠ লাল গান ।
এ গান আমার রক্তিম বোঝা সম্পর্কিত,
বাকে নিয়ে এলাম—
এই উঁচু—অনেক উঁচু হাদ অবধি,—
(বা-কে তারা আকাশ বলে জানে ।)
আমার গভীর চোখ যদি অলস
হত বাতাসে এখন কুয়াশার ভিড় ;
আর এই আলোকিত অস্মান ভোর
কোন এক কর্মরত শ্রমিকের মত,
ঐ ঘানিঘোঁস আকাশে বেখেছে,
একটি বৃদ্ধাঙ্গীর্ণ লাল টট ।

অনুবাদক : আশিস ঘোষ-রায় ।

নীরব কেন ?

শ্রী অরুণা ঘোষ

সুখর কবি নীরব কেন একটু কিছু বলা,
ভারত-সেনার সেনাপতি মাদল বাজারে চলে ।
অগ্নিবীণার বন্ধারেতে আবার জাগাও দেশ,
জাগো দুর্বার, পরো হে তোমার মহাবীর বংশ ।
যাত্রীরা যদি পিছিয়ে পড়ে তুমি করো হ'সিয়ার,
ভাগ্যের ভালে করিয়া আঘাত ধরো ধরো হাতিয়ার ।
"উষার ছয়ায় হানি আঘাত,
তুমি যে আনিবে রাত্তি প্রভাত"
স্মৃতির ছয়ায় দাঁড়াও আবার ঘূর্ণাও ভিমির রাত ।
বিশুদ্ধি-সাপরে কে দিল ভাসিয়ে তোমার লেখনীখানি,
নাহি জানি হার কে দিবে তোমার আবার কিয়ং আনি
স্বপ্নের স্মৃতি কীদে আজ তোমায়ে স্মরিয়া কবি,
কোন বেদনার নীরব হয়েছো ক্লান্তিতে চেয়েছো সবই ।
রাত্তি জবা ফুল আপনি ফুটিয়া নীরবে বরিয়া যায়,
অজলি দাগ, হামাল হুমাল লগন বহিয়া যায় ।
কণ্ঠ আজিকে নীরব কেন মধু-সঙ্গীতহারা,
তুত ছয়দিনে বাজাও আবার হারানো সে একজায়া ।



কাজে বিরাম ও বিশ্রাম

কৃত্রিমভাবে বাঁচবার ওাপিটেই কাজ বেমন না করলে নয়, তেমনি কাজের ঠাঁকে ঠাঁকে বিরাম-বিশ্রামও কিছুটা চাই। প্রকৃতির কাজ করে মেলে শরীর ও মন উভয়ের ওপরই এর প্রতিফলনা হইতে পারে না। চলতি একটি ইংরেজী প্রবন্ধের মন্তব্যটা বেশে মিলে—খেলাধুলো খান দিয়ে মিলের পর মিল যদি কেবল কাজ দিয়ে থাকে হয়, পরিপাটিতে চিত্তশক্তি ও কল্পকমতার কথা বেশে উক্ত।

সাধারণ অবস্থায় মানুষ কাজ করতেই চায়, জীবিকার্জন করতে চায় প্রম দিয়ে। অসল জীবন ক'জনার কাম্য, পরনির্ভরশীল হওয়ার ভেতর সত্যি সৌন্দর্য কোথায়? বেকার থাকলে অমনি খাওয়া-পরা ছুটবে না, বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও কুড়িয়ে যায়, এ আশঙ্কা বেশির ভাগ লোকের সামনেই রয়েছে। সেজন্মেই চারদিকেই দেখা যায় কাজ—কাজ, কত বিচিত্র ধরণের, সঠিক বলা অসম্ভব। কাজ করে করে মানুষ বেশে ক্রমেই একটা যন্ত্রে পরিণত হয়ে পড়ছে।

শরীর-বিক্রানী বা চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরা এইখানেই আপত্তি জুলছেন বড়রকম। তাঁদের বরাবর এই দাবী—কাজ বেমন মানুষকে করতে হবে, প্রয়োজনীয় বিরাম ও বিশ্রামের ব্যবস্থাও চাই তাঁর। পাশাপাশি এ ছুটো না হয়ে চললে সহসা স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে পারে, মনের কুর্ভোগ ও ষাভাবিক নিয়মে আসতে পারে না। অপিস-আদালতে বিশেষ ভাবে শিল্প-সংস্থা বা কারখানা সমূহে কর্মীদের ছুটির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই কারণেই।

অবশি বাঁধাবরা কাজ থেকে সাময়িক বিরতি খুঁজে নিলেও কাজ হয়ে চলবেই কোন না কোন। বিরাম-বিশ্রামের অবস্থাটাও একটা কাজই বটে; তবে শরীর ও মনকে এ অবসন্ন করবার জন্মে নয় পরন্ত অবসন্ন দেহ ও মনে নতুন সামর্থ্য ও কুর্ভোগানই এর লক্ষ্য। তা ছাড়া, একই ধরণের কাজ দীর্ঘ সময় ধরে না করে, কাজের রূপান্তর শরীর ও মন দু'-এর পক্ষেই ভালো। একঘেয়ে জীবনের ভেতর আনন্দ থাকে না, অথচ এই আনন্দই আসল জীবন—প্রাণ খুলে হাসতে না পারলে সবই বৃথা।

বেশে বৃহতে পারা যায়, খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ—জীবনে এ সকল মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়। বরং বলা চলে, দেহ ও মনের দিক থেকে দীর্ঘ দিন সবল ও সক্রিয় থাকার জন্মে এগুলি অপরিহার্য ভাবে চাই। দৈনন্দিন কাজের চাপে শরীরে যে গ্রানি ও ক্লান্তি আসে, মনও যার পরিপাটিতে পীড়িত ও কুর্ভোগান হয়ে পড়ে, তা দূর করতেই হবে। কাজেই বিরাম ও বিশ্রামের জরুরী প্রেরণ এসেছে সেই থেকেই। আহার, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটাতেই যে আবশ্যিক বিরাম বিশ্রাম সম্পূর্ণ হয়ে মেলে, সব সময় এমনটি হয় না। শরীর ও মন উভয়ের

অবসন্নতা কাটাতে ঠাঁকে ঠাঁকে কোর হা কোর বসবর আবার উপভোগ প্রয়োজন।

জন্ম তখায়, যে-ভাবেই হোক সেই-কর্তারই আশ্রয়তীর্থ হা-ওলিকে বিশ্রাম কিত্তে হবে, কিত্তিতে হস্তিককে বতকুব মন্তব্য রাখতে হবে ঠাঁকা। পাচ কুবের হাতেরে অবসন্নতার অসন্নতা লাভব হয় বটে, কিত্তি তারও বেশি কিছু চাই। বিরাম বিশ্রামকালে মিসেই খেলাধুলো বা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে মিলে উপকার কম হওয়ার কথা নয়। সহজ ধরণের বই পড়া, গল্প-ওজন করা, গান-বাঁজনা বা উৎসব-আনন্দে থাকা, অভিনয়াদি দেখা, আপন মনে বেড়ানো, শরীর ও মনকে চালা করে তুলতে এ সকলের মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। কাজ করতে কখনই অনিচ্ছাভাব আসবে, তখনই বৃহতে হবে বিরাম ও বিশ্রাম আবশ্যিক। বিরাম বিশ্রাম ব্যক্তিককে কোন হস্তি কাজ করে বেতে পারে না দীর্ঘদিন ঠিক ভাবে।

আজকাল সকল দেশেই কাজ বেফেছে প্রচুর, কর্মীর সংখ্যাও বাড়ছে সেই অনুপাতেই, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বলা কারখানা গড়ে উঠেছে বহু রকমের। প্রমিকদের চাকরির ব্যাপারে আইন কানুন তৈরী হয়েছে সর্বত্র—যার ভেতর বিরাম বিশ্রাম বা ছুটির প্রেরণটিও বিশেষ ভাবে সংযোজিত আছে। সপ্তাহে কত কটার বেশি কাজ করা চলবে না, ব্যতিক কতো দিন ছুটি পাওনা হবে, এ সকলই এক্ষণে নিয়মাবীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কলে মালিক বে সরকারকে এনিকটাধ নজর দিতে হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক বেশি। দৈনন্দিন কাজের পর কর্মীরা কি ভাবে শরীর ও মনকে সবল রাখতে পারে বে, সে প্রেরণে আজ উপেক্ষা করা চলছে না। এ ব্যাপারে কশিরা অবশি বহু দূর এগিয়ে যাবার দাবী বেখেছে। সেখানকার সমাজতন্ত্রী সরকার বিরাম ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছেন বেশিরকম—প্রমিকদের কাজের বটা কশিরে দেবার নীতিও ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও প্রমিক কল্যাণের এনিকটার পর্যাপ্ত নজর দেওয়া হবে—এ দাবী নিশ্চয়ই রাখা যায়।

খাওয়ার সময়ের রকমকম

শরীর সুস্থ ও সক্রিয় রাখবার জন্মে সুবম আহার বেমন চাই, তেমনি চাই প্রতিদিন ঠিক সময়টিতে খাওয়া। অসববে খেলে খাওয়ার কুণ্ডি হয় না, হজমেরও ব্যাঘাত বটে, এ পরীক্ষিত ব্যাপার। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি অবশি—কিধে পাওয়ারামা জন্মে হবে, আহার তরূপেই খেতে নেই কখনই। অধিক হাতিতে খাওয়াও মিলেব করে বেওয়া আছে।

কিন্তু আঙ্গুরের কথা যদি বিলেও আঙ্গুরের বিলে সকলের খাওয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ে হতে পারে না। সন্ধ্যা ও শিল্পকলে কর্তৃত্ব নত-আঙ্গুরের খাওয়ার সময়ের বকমকর হয়েই। চাকরিহীন কখন বেতে হবে, থাকতেই হবে বা কতকাল, খাওয়ার সময় নির্ধারণে এসব কিসে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না রাখলে হয়। তাই কোথা যাব, আঙ্গুর কখন যে কে খাচ্ছে, কোথায় কোন সময় খেতে হচ্ছে, টিকানা নেই। হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদিতে জায়ে পড়ে, তিন-চারটে প্রায় খাওয়া হয়েছে। বাড়ি-ঘরের চাহিদাও একই সিলেই সব কারবার হতে পারবে না।

ভারতের অবস্থারই খাওয়ার সময়ের এখন বকমকর হতে পড়েছে, সহজেই বুঝা যায়। অঙ্গুরের সাধারণ কর্তৃত্বকে যে সময়ে সিলেই প্রথম আহার গ্রহণ করতে হয়, বড় বাবু বা অকিসারদের সে সময় সে গ্রহণ ওঠে না। সাধারণতঃ সকাল দশটার ভেতর পেট ভরে খেতে তৈরী হয়ে সেবার জতে কেয়ামি বহলেই দুটাছুটি পড়ে যায়। কিন্তু অকিসার ও সাহেব শ্রেণীর লোকদের জতে হুগুংকো খাওয়ার সময় নির্ধারিত আছে—বধন সত্যি ভালরকম কিসে পার ও খেয়ে বেশ আহার বোধ হয়।

সহরাকলের খাওয়ার সময়ের সাথে আবার পল্লী-অঞ্চলের খাওয়ার সময়ের বকমকর আছে। পুরুর গ্রাম এলাকার বড়ি ঘরে খাওয়া অবস্থি হয় না, তবু মোটামুটি একটা নিয়ম অনুসরণ করা হয়। সেখানে সিলেই প্রথম খাওয়ারই সাধারণতঃ বিলবে হয়, হুগুং পার হয়ে বলা চলে। কিন্তু অপরদিকে রাত্রির আহার অনেকেরই সহরাকলের মতো এতটা বিলবে হয় না। সহরে যেখানে সিলে-রাতে ছ'বার বা একবার ভাত খাওয়া হয়, পল্লী-অঞ্চলে তিনবার ভাত খাওয়ার রীতিও চলতি আছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সেখানে কখন কখন চারবার পর্যন্ত খেয়ে নেয়। সহর এলাকার রাত্রিতে অনেক পরিবারেই কটি চলে, কিন্তু পল্লীতে রাত্রির আহার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাত। সকাল ও বিকাল সাধারণতঃ জলখাবারের সময় হিসাবে নির্ধারিত আর সেটি একরূপ সব জায়গায়—কি পল্লী, কি সহরে।

খাওয়ার সময়ের বকমকর শুধু এই দেশেই নয়, সব দেশেই লক্ষ্য করা যায়। বিলেতের কথাই ধরা যাক—সেখানে খাওয়ার সময় ও ধরণ ক্রমেই পান্টিয়ে থাকে, সে অবস্থারই হোক কি পরিবর্তিত কটিবোধের জতেই হোক। পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে অতীত সিলেই খাওয়ার সময়ের সাথে বর্তমান সময়ের অনেক গড়ামিল হয়ে গেছে। সিলেই আসল খাওয়া যে-টি, বিশেষভাবে সেইটি আঙ্গুরের সময়ে হয় না।

সকাল ও একালের খাওয়ার সময়ের বকমকর কতটা হয়েছে, দুটো সায়নে বেখে দেখা যেতে পারে। যেমন, দুম থেকে ওঠার পর বলতে গেলে সিলেই প্রথম খাওয়া যেটি অর্থাৎ প্রাতঃরাশ, অনেক আগে এইটি গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল সকাল ১১টা নাগাদ। ক্রমে এই সময়-সূচী ১১টা থেকে ১০টা, ১০টা থেকে ৯টার সরিয়ে আনা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি এইভাবেই চলতে থাকে, তার পর আহার পরিবর্তন দেখা দেয়। একদে প্রাতঃরাশের সময়টি মেয়ে এসে থাকিয়েছে সকাল সাড়ে সাড়টা ও ৯টার মাঝামাঝি।

বিলেত শব্দকেও বিলেতে মধ্যস্থি জোয়েব সময় এখনকার চেয়ে

জির করেছিল। সিলেই এই প্রথম আহারটি হতে হতে বেলে পড়ে যেতো সে বেলেও। প্রাতঃরাশের (শুক করা) পর মধ্যস্থি জোজ (লাজ) এক কিলে হলে খাওয়ার 'পকে খাওয়া', একরকম প্যারেন বিশেষকর হল। তার পর থেকে 'লাজের সময় এঞ্জির সিলেই আঙ্গুর হয়, একদে যেমন নির্ধারিত আছে' বোলা ১৫টি। বৈধ আহারের ও মেয়েই এখন একটা সময় টিক করা আর—বেশিরভাগ পরিবারেই বা অনুসরণ করা হয়। জ-কবি ইত্যাদি খাওয়ার অবস্থি বীথাকর সময় নেই; তবে সকাল-বিকাল জ খাওয়ার যেভাবে আঙ্গুরের সব কারবারেই প্রায় চলতি বলা চলে।

উৎস-অস্থি বা মেয়েই ব্যক্তিতে খাওয়া-খাওয়া সাধারণতঃ টিক সময়ে হয় না। সহরাকলে যদিও বা সিলেই কিছুটা বকর খাওয়ার, পাতালীয়ে এর ভেতর বালাই নেই। সেখানে মেয়েই ব্যক্তিতে হুগুংবের খাওয়া হতে হতে বোলা খেব হয়ে খাওয়াটিও বিচিত্র হয়। শিঙ ও বৌদ্বিদের খাওয়ার সময়ের সাথে প্রাতঃ-রাতঃ দুই ব্যক্তির খাওয়ার সময়ের বকমকর স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সব সময়েই এমনি বিচিত্র ব্যবস্থা চলে এসেছে—অবস্থারই সকল সাহুংবের জতে একই ধরণের খাওয়ার সময় নির্ধারণ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। কাজেই সময় মতো খাওয়ার সাহুং পালনের কিসে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রত্যেকের নিজেকে। বলতে কি, শরীর রক্ষার জতেই এইটি অত্যাবশ্যক, এর অভাব হলেই বিপত্তির আশঙ্কা।



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
'শঙ্খ ও গদা'

মার্কী গেম্বী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—ব্রিটেন ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২১১৫

কবি কণ্ঠশূন্য-বিমলচিত্ত আনন্দ-বন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রী প্রবোধেশ্বরনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় স্তম্ভ

১। কিম বার। আর প্রতিদিন গৌপ স্বভাবের ফলে
অসংখ্য পুত্রীকৃত হয়ে উঠতে থাকে এক অসংখ্য বিকার। সেই বিকার
কারণ হয়ে পীড়ার মূল-কলকাকারিনী কামচিভার। পুত্রকন্যা হয়ে
কলম উঠায়। যিনি কন্যার অধিকাংশ, তাঁর অল্প মন্ত্রের সম্ভাবনার
উপায়ওনি ভাবতে হবে বান উঠায়, তারপরে ভাবতে কলম
প্রতিশ্রুতের কথা, ভারতে ভারতে যনের যথেষ্ট চড়ে বসে মনস্বামনার
কল। পূর্বভাগের স্মরণ লেগেছে শ্রীকৃষ্ণের মনে, এ কথা বুঝতে
গেলেও তাঁদের পক্ষে হুবহুগাহ বলে মনে হয় সেই মন ও সমুদ্রে
ডুবে গেলে বুদ্ধিবলে গাহন করা যাবে না, নিতেই হবে মনস্বামনার
সাহায্য, এই কথাটি জেনেও কেমন যেন বিশ্বাস হয় না সে কথায়।
কিন্তু হারিয়েও তাঁরা ঢাকতে চেষ্টা করেন নিজের নিজের সুখী
অভিপ্রায়। কিন্তু ঢাকলে কি হবে, সহচরীদের সঙ্গে বসলেই
বাকিব্যয় হয়ে ওঠে তাঁদের উৎকণ্ঠা।

২। সেদিন চন্দ্রাবলী...গাঢ় বস্ত্র লেগেছিল তাঁর মনে...বসে
ছিলেন সখী পদ্মার সঙ্গে নিভৃত, পদ্মা ও অতি সুন্দরী তাঁরও পঞ্চজয়ী
সুখ। উষ্মে অধীরা হয়ে চন্দ্রাবলী তাঁকে বললেন—বলি, গৌরি,
অকৃত্যর এত গৌরব করে আর তো পারা যায় না। নন্দিনীর
মিন্দা তো কোন ছায়, খলনের কূট কথায় এখন আর কান পোড়ে
না, বিবেক আলার সঙ্গে মরি। তোদের ঐ ভ্রাম, একেবারে টুকটুকে
রাঙা করে দিয়েছে আমার এই হলদে ছদ্ম।

৩। পদ্মা তাঁকে বললেন—বলি ও আমার কমল আঁখি
সখী, এই আমি বলে রাখছি, বুঝতাম রাজার তিনি নন্দিনী হতে
পারেন, নবীন প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রথম থেকেই থাকতেও
পারে তাঁর ভালবাসা, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সঙ্গ পাননি তিনি
কৃষ্ণের, কল মনেই অহুবাগের। নিশ্চিত থাকো সই, এমন
যোগাযোগ ঘটাব যাতে করে দেখবে, শীঘ্রই তিনি তোমারি হয়েছেন,
নিজেই এসেছেন তোমার কাছে দৌড়ে।

৪। কিন্তু আমি দেখছি, ব্রহ্মরাজের পুত্রটির প্রেমভাব বড়
মঙ্গলময়। নিজের আলোর নিজেই উজ্জ্বল সেই প্রেম। হৃদের
ভীরে তাঁর উপর তাঁর ভালবাসা একস্বাতন্ত্র্যের বই ত আর নয়।

তখনকার মত আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিলেন পদ্মাদেবী এবং
চেষ্টার রইলেন মিলন ঘটাবার। এই হেন কণ্ঠই তাঁর মনের মত
ছিল : এবং এই হেন কণ্ঠই ছিল তাঁর প্রবীণতা।

৫। এদিকে, সেদিন বিজনে বসেছিলেন রাধিকা।
উৎকণ্ঠাভারাদিকা, অবশ্য, তাঁর কাছে বসেছিলেন তাঁর ললিতাদি
সখীরা ধীরে তাঁর অতি বিস্তৃত সৌহার্দ্যের অধিকারিনী। সইদের
কিন্তু এইদিনের মতো...সহচরীদের সঙ্গে বসলেই

ময়র অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হলেন "ভাব" মূল্যে কণ্ঠকে
কণ্ঠকে যেন তিনি এসেন। হাতে বকুল ফুলের একগাছি মালা,
করে সই...বকুল মালা।" বললেন—

৬। অতি বুঝতাম নন্দিনী, আশ্চর্য্য, এই গোকুলে, ব্রহ্মরাজ
এক কুলসমরার হয়েছেন, এক এমটি যেন তিলকরাশী...কিন্তু
পঞ্চকুণ্ডের সমস্ত সৌভাগ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যই কি আপনার উপরেই
তলল।

৭। তখনই বুঝেছি...তখন দেখলুম মূর্তিমান একটি উৎসবের
মত—একটি চাহনি—যেন অক্লান্ত দিতেই রসবতীর হৃদয়খানি টানল,
জেনে কেলল, গৌরীদের মিছে তর্ক, দোহন করল রস। ব্রহ্মরাজ
কুমারের হৃদয়খানিও আশ্চর্য্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোভী বন্দর্পের
কুপায়। তাঁদের খালার মত হয়ে গেল আপনার সুখ, আর
চকোবের মত কে যেন পান করতে চাইল সেই সুখের জ্যোৎস্না।

৮। আজ আমি সই জানতে পেয়েছি, তাঁর অহুবাগের
কটোরাটি সন্দেহাতীত ভাবে আপনি। আমার দুঃখ দূর হয়ে গেছে,
বৈচেছি কিবে পেয়েছি আমার মানসিক সবসত্তা।

৯। রাধিকা বললেন—তোমার তো বড় সাহস বেড়ে গেছে
ভ্রামা। এসব কি প্রলাপ বকছিল?

কোন ললনাটি যে কালিরদিপুর অহুবাগের পাত্রী। গোকুলের
কুলবালাদের সেটি অহুমান করবার ক্ষমতা আছে। শুধু জেনে
রাধিন সই, কুমুদিনী ছাড়াও চাঁদ ওঠেন আকাশে, কিন্তু চাঁদ
ছাড়া কুটতে পারে না কুমুদিনী।

১০। অগতের মেরেদের তিনি যে অহুবাগের পাত্রী তা আমি
জানি, কিন্তু তাঁর যে কেউ অহুবাগের পাত্রী নেই, সে বিবয়েও আমি
নিঃসন্দেহ। ভ্রামা বললেন—সন্দেহ করবেন না আমার কথায়,
তাঁর চেয়ে বরং নিজের মেহের প্রতি বড় নিন, নিজের সৌভাগ্যকে
ধন্যবাদ দিন। আর মনস্বির করে ভাবতে থাকুন...তিনি আমারি,
তিনি আমারি।

১১। ললিতা প্রমত্ত করলেন—এ আশ্বাসটি বাচনিক, না
বর্ধাধ?

উত্তর দিলেন ভ্রামা—ললিতা দেবী, প্রমত্ত করুন আমার সহচরী
বকুলমালাকে।

১২। ললিতা তখন বললেন—বলি, ও সই বকুলমালিকে
কেবল আশ্বাসের অহুরোধে পড়েই যেন বলবার বা সেটি বলে কেল না।

তখন বকুলমালা বললেন—এই বকুলমালাটিই নিশ্চিত দূর করে
দেবে আপনারদের সন্দেহ। তাহলে ও বেটুকু কানে এসেছে বা
কানে কানে কিয়ৎকি তা বলছি শুধু। পরম পুণ্ডরীক গৌরুর্ভন
পূর্ণিমার মতো...সহচরীদের সঙ্গে বসলেই

হুলাল। ঠিকঠিক পাঠ্যই চক্রে, -অপরাধী কিংবদন্তি সহচরের
 মর্দনা মর্দনা মৃত বনে চলেছে সহচরের মর্দনা মর্দনা। তাদের
 বনের সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ নির্ভর অর্থাৎ গভীর। কবিশে বাতাস
 কাননে, কুল গাছে বীণা, কুল কুটেছে অর্থাৎ, বীণা
 বীণা, কুল কুলছেন, কুল কুড়িয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ বললে কুল
 গন্ধ, মিঠে গন্ধ। আর বলবি কি সেই, আশ্চর্য, সেই বকুলের
 গন্ধে শুধিবে শুধিবে যোহন মালা গাঁথছেন তিনি। হঠাৎ
 আমার এই ভাবে দেখা। দেখেই কেমন বেন ভয় হল,
 কুলে নিজেই লুকিয়ে ফেললুম। কিন্তু বৈধা যদি কেমন
 ।? চেয়ে রইলুম। দেখি, তাঁর কাছে বসে বসেছেন
 হুলাল। আর আনন্দের দেখার শুক পাখীটিও। বিদ্বকের
 তার উপর বসে আছে। বিদ্বক কপটে থাকেন বৃহত্তানুনিবিনীর
 ম অকুমাণের কথা, বন পর্বতের সময়ে, অগ্নির উৎসবে,
 লির মননের দ্বারা যেমন ভাবে বার বার তিন বার দেবী
 খেছেন শ্রীকৃষ্ণকে। শুনে শুনে গভীর হয়ে যেতে লাগলেন
 হুলাল। লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকক্ষণ দেখলুম। কেমন বেন
 গন্ধে বসে লাগল তাঁর মন। আমাকে কিন্তু কেউ দেখতে
 পানি।

১৩। তাঁরপর কুসুমাসব, হঠাৎ বেন কঠে ফুলের মধু চলে
 স্তাব করে বললেন,-

বরুণ। নিজের হাতে করে এই যে বকুলমালাটি গাঁথছেন,
 দেখেন বেন সেটি আবার ছোট হয়ে না যায়। তাঁকে উপহার
 দওয়া চলে এমন মনোহারী করে গাঁথুন। কেন গলার হার হয়।

একটি হালি খেলে গেল শ্রীকৃষ্ণ টোটে। বললেন-বরুণ।
 কমন করে তা হয়, আকাশখানকে কেমন করে সাজাই কলো
 ...আকাশ কুসুমের মালা দিয়ে।

নিজের বচন ব্যর্থ হবে, অসম্ভব। তাই কী বেন বলতে গেলেন
 কুসুমাসব, কিন্তু বাচ্চাচর্য নিজের বুদ্ধির অধীন থাক। সখেও
 কণকালের জন্ম তিনি চিত্রলিখিতের মত শুরু হয়ে গেলেন।

১৪। আর ঠিক সেই সময়টিতে সেখানে অকাল বজ্রের মত
 উপস্থিত হয়ে গেলেন...পদ্মা। নতুন করে তীব্রতর হয়ে উঠল
 আমার উৎকর্ষ। কাছেই ছিলুম। শুনে পেলাম কুসুমাসবের
 বাণী।

১৫। তিনি বললেন-বলি, কে আপনি? চাতুর্যের বলসানিতে
 দেখাচ্ছে বেন মণি-মণি। বিজ্ঞ বিপিন, এখানে চরতে এসেছেন
 কোন্ প্রয়োজনে? বসিকশেখর...ব্রতমচরিত-আমার বরুণ
 বসেছেন এখানে। তাঁর সামনে সজ্জা নেই, ভয় নেই, বড় যে
 চরণ নাচিয়ে চলছেন। বচনও শেব হল, আর পছন্দাতের সামনেই
 পদ্মাও আরম্ভ করে দিলেন সাত কাহন শুরু। কত হলই না সে
 জানে। শেষে জানালেন-

১৬। দেবী চন্দ্রাবলীর নিত্য আয়োজিনী সহচরীদের আমি
 সখী। আমার নাম পদ্মা। গুণবতী গৌরী তিনি গৌরীপূজা
 করবেন। তাই আমাকে পাঠিয়েছেন ফুল তুলতে। কিন্তু তিনি
 যেমনটি চান তেমন ফুল, পূজার ফুল...অন্ত কোথাও খেলো না।
 আপনার এই কাননেই কোটে, তাই বকুল ফুল তুলতে এখানে আমার
 প্রবেশই আন।

১৭। কুসুমাসব বললেন-তিনি যে আমাকে বিদ্বা গৌরী,
 সে কথা কাননেই জানে। তাঁর গৌরীপূজার বিদ্বাতি। কিন্তু
 সেখানটা ছুটই হন অর্থাৎ পৌঁছবে। তিনি নিজে এসে মা কেন?

পদ্মা।-আপনি দেখছি বড় সাহসী। তবু ভাল প্রায়ই
 ফুলেছেন। কিন্তু কি জানেন, দুই তটে পাড়িয়ে যে দুহুর্ভে হঠাৎ
 তাঁর চোখে পড়েছে কুককুজ, সেই দুহুর্ভে থেকে এখনও পর্বত ব্যাধার
 ভয় ভয় করছে তাঁর মন। বিয়ের বাধাই বোধ হয় তাঁর কারণ।

১৮। কুসুমাসব।-বন থেকে সবসেই বাধার শাস্তি হয়।
 যদি হয় তবেই হবে।

পদ্মা।-আমাকে বুঝি, বন থেকে গিয়ে দেবীর কীবাণীকেই।
 কুসুমাসব। অতি মূল্য পেটি।

পদ্মা। তুমি উৎকর্ষার কাছে কিছুই হলুত হয়।
 কুসুমাসব। তবুই বাবে কখন মনের মধ্যে আসে উৎকর্ষার
 ভাব। কিন্তু উৎকর্ষার ভাবনি দিয়ে কেমন করে বকুল ফুল
 থেকে মনোহারী কাছটি হবে?

পদ্মা। ও কাছটি তাঁর হয়েই গেছে, যেহেতু মনের স্বপ্ন হয়ে
 গেছে এক মনোহারণের কৃপার। তবু কেন যে এই উৎকর্ষার ভাব...
 এইটাই বিভিন্ন।

কুসুমাসব। তাহলে, অকুসুমাসব কখন মনোহারকে।

পদ্মা। সম্প্রতি একপাছি বকুলমাল্যের লক্ষ্যে কিংহি। তাই
 গিয়েই মজিত করতে হবে গৌরীকঠ।

১৯। কৃষ্ণ বললেন-বরুণ। সন্দেহাতীত ভাবে ইনি চকুয়া।
 এই বকুল-মালাখানি দিয়ে গৌরী পূজাও করতে চান, আবার
 গাঁথবার পরিভ্রম থেকেও বিক্রাম পেতে চান।

২০। কুসুমাসব। বলি, ও সাহসিনি, প্রিয়বস্ত্রটির নিজের
 গলার দোলাবার জন্ম গাঁথা হয়েছে এই মালা। অত মহিলা সেটির
 অবিকারিনী হন কেমন করে? আর শাখা ফুল ফুটে রয়েছে অনেক,
 সেগুলি তুলে নিয়ে বান।

পদ্মা। সাহস দেখালুম আবার কোথায়? আমাকে ঠকাচ্ছেনই
 বা কেন আপনি...এই ভাবে? কুমার যদি খুশী হয়ে দিতে চান
 নিজেই দেবেন।

২১। কৃষ্ণ। বরুণ, ইনি ঠিকই বলছেন। ঠকে আমার
 নিজেরই বেওয়া উচিত এই ফুলগুলি। এতে ওর সখীরও সন্তোষ
 হবে, গৌরীপূজার ব্যাবহাও হবে।

বাক্যালাপ শেষ হল। পদ্মার মনখানিও বেন নিঃশ্বাস কেলে
 হাঁচল। বেওয়া ফুল বেওয়া হল। এক রাশ বকুল ফুল নিয়ে
 তিনি চলে গেলেন।

২২। এবার দেবী আমার বলতেই হবে আপনার তপস্তার
 জোর আছে। তা না হলে এমনটি হয়?

কুসুমাসব বললেন-বরুণ, হতেও তো পারে, এই এঁর মত
 কেউ, অর্থাৎ বৃহত্তানুনিবিনীর নব্য সখীদের মধ্যে কেউ, অথবা...
 আপনার স্বপ্নের অস্তিতাপটিকে উজ্জ্বলিতে উজ্জ্বলিতে এখানে
 উপস্থিত হয়ে যাবেন। তখন বান বাঁধবে এই মালার। শুনেই ভয়
 ভয়ে গেল আমার। বেন কিছুই তিনি এই অভিনয় করতে
 করতে, বরা ফুল কুড়িয়ে তোলার হল করে, আত্মিকীয় মতন
 উপস্থিত হয়ে গেলুম সেখানে। বেন অবহার আমাকে দেখবে

কবি কণ্ঠ-বিমলিত

আনন্দ-বন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রী প্রবোধকুমার ঠাকুর

কথার স্তম্ভক

১। কিম বাব। আর প্রতিদিন গৌণ বৃত্তীকর করায় ফলে পুরীকৃত হয়ে উঠতে থাকে এক অদ্ভুত বিকার। সেই বিকার ফলস্বরূপ হয়ে পীড়ার রূপ-রূপকারিণী কামটিভার। পুরুষেরা হয়ে ফলে উঠায়। যিনি ফলস্বরে অবিভাধ, তাঁর অঙ্গ সজ্জর সস্তাবনার উপায়ওনি ভাবতে করে বাব তাঁর। তারপরে ভাবতে বলেন প্রতিশ্রুতকর কথা, ভারতে ভারতে মনের মধ্যে চড়ে বসে মনস্বামনার মন। পূর্বস্বপ্নের স্পর্শ লেগেছে শ্রীকৃষ্ণের মনে, এ কথা বুঝতে গেলেও তাঁকের পক্ষে ছুরবগাহ বলে মনে হয় সেই মন ও সমুদ্রে ডুবতে গেলে বুঝিবলে গাহন করা যাবে না, নিতেই হবে মনস্বিজের সাহায্য, এই কথাটি জেনেও কেমন যেন বিশ্বাস হয় না সে কথায়। কিম্বাস হারিয়েও তাঁরা চাকতে চেষ্টা করেন নিজের নিজের সুখী অভিপ্রায়। কিন্তু চাকলে কি হবে, সহচরীদের সঙ্গে বসলেই কথিবর হয়ে ওঠে তাঁদের উৎকর্ষ।

২। সেদিন চন্দ্রাবলী...গাঢ় বড় লেগেছিল তাঁর মনে...বলে ছিলেন সখী পদ্মার সঙ্গে নিভৃত্তে, পদ্মা ও অতি সুন্দরী তাঁরও পদ্মজরী ধূম। উৎসে অধীরা হয়ে চন্দ্রাবলী তাঁকে বললেন—বলি, গৌরি, জ্ঞাতার এত গৌরব করে আর তো পারা যায় না। ননদিনীর মন্দা তো কোন ছার, খলেদের কুট কথায় এখন আর কান পোড়ে। যিবের আলার সঙ্গে মরি। তোদের ঐ ভাম, একেবারে টুকটুকে ভা করে দিয়েছে আমার এই হলদে জ্বর।

৩। পদ্মা তাঁকে বললেন—বলি ও আমার কমল জাঁখি রী, এই আমি বলে রাখছি, বুভাছ রাজার তিনি নন্দিনী হতে যেন, নবীন প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রথম থেকেই থাকতেও যে তাঁর ভালবাসা, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সঙ্গ পাননি তিনি কর, কল করেনি অমুরাগের। নিশ্চিত থাকো সই, এমন সাবোঙ্গ ঘটাব যাতে করে দেখবে, ঈর্ষাই তিনি তোমারি হয়েছেন, জই এসেছেন তোমার কাছে দোড়ে।

৪। কিন্তু আমি দেখছি, ব্রজরাজের পুত্রটির প্রেমভাব বড় দমর। নিজের আলোর নিজেই উজ্জ্বল সেই প্রেম। ফুদের ভীরে তাঁর উপর তাঁর ভালবাসা একরাত্রের বই ত আর নয়।

তখনকার মত আশাস দিয়ে বিদায় নিলেন পদ্মাদেবী এবং চৌর রইলেন মিলন ঘটাবার। এই হেন কর্ণই তাঁর মনের মত ছিল; এবং এই হেন কর্ণই ছিল তাঁর প্রবীণতা।

৫। এদিকে, সেদিন বিজনে বসেছিলেন রাধিকা। উৎকর্ষাভারাদিকা, অবত, তাঁর কাছে বসেছিলেন তাঁর ললিতাদি সখীরা ধারা তার অতি বিকৃত সৌহার্দ্যের অধিকারিণী। সইদের নিজস্ব সইছিলেন অশ্রু-অশ্রুদের কথা, আর জামহিসের। এত

সময় অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হলেন "ভামা" বলে কথিত হয়ে আসতে যেন তিনি এসেন। হাতে বকুল ফুলের একগাছি বাসা, মনে সই... "বকুল বাসা।" বললেন—

৬। আমি বুভাছনন্দিনী, আশ্চর্য্য, এই গোকুলে, ব্রজের কুলে এক কুলসলন হয়েছেন, এক এনটি যেন তিলকরাষ্ট্র...কিন্তু পক্কুতের সমস্ত সৌভাগ্যের সমস্ত ঐর্ষ্যই কি আপনার উপরেই চলল।

৭। তখনই বুঝি...বখন দেখলুম মৃতিমান একটি উৎসবের মত—একটি চাহনি—যেন অল্প দিচ্ছেই রসবতীর হৃদয়খানি টানল, ভেঙ্গে ফেলল, গৌপীদের মিছে তর্ক, দোহন করল রস। ব্রজরাজ কুমারের হৃদয়খানিও আশ্চর্য্য উদ্ভত হয়ে উঠল লোভী কন্দর্পের কুপার। তাঁদের খালার মত হয়ে গেল আপনার সুখ, আর চকোবের মত কে যেন পান করতে চাইল সেই সুখের জ্যোৎস্না।

৮। আজ আমি সই জানতে পেরেছি, তাঁর অমুরাগের কটোরাটি সন্দেহাতীত ভাবে আপনি। আমার হৃৎ পূর হয়ে গেছে, বেঁচেছি কিরে পেয়েছি আমার মানসিক সবসতা।

৯। রাধিকা বললেন—তোর তো বড় সাহস বেড়ে গেছে ভামা। এসব কি প্রলাপ বকছিল?

কোন ললনাটি যে কালিরবিপুর অমুরাগের পাত্রী। গোকুলের কুলবালাদের সেটি অমুমান করবার ক্রমতা আছে। শুধু জেনে রাখিল সই...কুমুদিনী ছাড়াও চাঁদ ওঠেন আকাশে, কিন্তু চাঁদ ছাড়া কুটতে পারে না কুমুদিনী।

১০। জগতের মেয়েদের তিনি যে অমুরাগের পাত্রী তা আমি জানি, কিন্তু তাঁর যে কেউ অমুরাগের পাত্রী নেই, সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। ভামা বললেন—সন্দেহ করবেন না আমার কথায়, তার চেয়ে বরং নিজের দেহের প্রতি বড় নিম, নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন। আর মনস্থির করে ভাবতে থাকুন...তিনি আমারি, তিনি আমারি।

১১। ললিতা প্রশ্ন করলেন—এ আশাসটি বাচনিক, না বর্ধা?

উত্তর দিলেন ভামা—ললিতা দেবী, প্রশ্ন করুন আমার সহচরী বকুলমালাকে।

১২। ললিতা তখন বললেন—বলি, ও সই বকুলমালাকে কেবল আমাদের অমুরাগে পড়েই যেন বলবার বা সেটি বলে ফেল না।

তখন বকুলমালা বললেন—এই বকুলমালাটিই নিশ্চিত দূর করে দেবে আপনার সন্দেহ। তাহলে ও বেটুকু কানে এসেছে বা কানে কানে কিয়ৎকি তা বলছি শুধু। পরম সুখমর্দন সৌভর্জন পরম্পরে, একদিন বেড়াছি একসময় আমার কাছে পড়লেন

শ্রীমদ্রসাল। ঐতিহ্যিক গাভীরা চলেছে, অল্পসী কিংকর সহচরের দল, মরণা মনীর মত বয়ে চলেছে সহচরের মর্দন মসিকতা। তাদের মনো মনের সঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ মির্জার অখণ্ড গভীর। মসিকতা বাতাস বইছে কামিনে, বকুল গাছের বীণা, কুল ফুটেছে অজস্র, বীণার পর বীণা, কুল ফুলছেন, কুল কুড়িয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ বললে কুল ঘন গন্ধ, মিঠে গন্ধ। আর বলবি কি সেই, আশ্চর্য, সেই বকুলের কুল দিয়ে শুধিয়ে শুধিয়ে মোহন মালা গাঁথছেন তিনি। হঠাৎ তাঁকে আমার এই ভাবে দেখা। দেখেই কেমন বেন ভর হল, লজাকুজে নিজেকে লুকিয়ে কেমনলুম। কিন্তু বৈধা যদি কেমন করে? চেয়ে বইলুম। দেখি, তাঁর কাছে বসে রয়েছেন "কুম্ভাসব"। আর আমাদের দেবীর গুণ পাখীটিও। বিদ্বৎকর হাতের উপর বসে আছে। বিদ্বৎকর কপ্তে বাঞ্ছন বুঝাতুনন্দিনীর মনীর অল্পসঙ্গের কথা, বন সঙ্গের সঙ্গের, জগদ্বিনের উৎসবে, কালির মননের যাত্রা কেমন ভাবে-বার বার তিন বার দেবী দেখেছেন শ্রীকৃষ্ণকে। শুনে শুনে গভীর হয়ে যেতে লাগলেন নন্দ্রসাল। লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকক্ষণ দেখলুম। কেমন বেন শূণ হয়ে যেতে লাগল তাঁর রূপ। আমাকে কিন্তু কেউ দেখতে পাননি।

১৩। তাঁরপর কুম্ভাসব, হঠাৎ বেন কণ্ঠে কুলের মধু চলে প্রস্তাব করে বসলেন,—

বরত! নিজের হাতে করে এই যে বকুলমালাটি গাঁথছেন, দেখবেন বেন সেটি আবার ছোট হয়ে না যায়। তাঁকে উপহার দেওয়া চলে এমন মনোহারী করে গাঁথুন। বেন গলার হার হয়।

একদিন হাসি খেলে গেল শ্রীকৃষ্ণ টোটে। বললেন—বরত! কেমন করে তা হয়, আকাশখানকে কেমন করে সাজাই যলো...আকাশ কুম্ভের মালা দিয়ে।

নিজের বচন ব্যর্থ হবে, অসম্ভব! তাই কী বেন বলতে গেলেন কুম্ভাসব, কিন্তু বাক্চাতুর্য্য নিজের বুদ্ধির অধীন থাক। সখেও ক্ষণকালের জন্য তিনি চিত্রলিখিতের মত ভুঙ্ক হয়ে গেলেন।

১৪। আর ঠিক সেই সময়টিতে সেখানে অকাল বজ্রের মত উপস্থিত হয়ে গেলেন...পদ্মা। নতুন করে তীব্রতর হয়ে উঠল আমার উৎকর্ষ। কাছেই ছিলুম। শুনে পেলাম কুম্ভাসবের বাণী।

১৫। তিনি বললেন—বলি, কে আপনি? চাতুর্যের বলসানিতে দেখাচ্ছে বেন মণি-মণি। বিজন বিপিন, এখানে চরতে এসেছেন কোন্ প্রয়োজনে? বসিকশেখর...বস্তুমচরিত—আমার বরত রয়েছেন এখানে। তাঁর সামনে সজ্জা নেই, গুণ নেই, বড় বে চরণ নাচিয়ে চলছেন। বচনও শেষ হল, আর পদ্মনাভের সামনেই পদ্মাও আরম্ভ করে মিলেন সাত কাহন স্তব। কত হলই না সে জানে। শেষে জানালেন—

১৬। দেবী চন্দ্রাবলীর নিত্য আশোদিনী সহচরীদের আমি সাথী। আবার নাম পদ্মা। গুণবতী গৌরী তিনি গৌরীপূজা করবেন। তাই আমাকে পাঠিয়েছেন কুল তুলতে। কিন্তু তিনি যেমনটি চান তেমন কুল, পূজার কুল...অজ্ঞ কোথাও মেলে না। আপনার এই কাননেই কোটে, তাই বকুল কুল তুলতে এখানে আমার প্রবেশই আনা।

১৭। কুম্ভাসব বললেন—তিনি যে আশিষ্য দিচ্ছে গৌরী, সে কথা মর্কসেই জানে। তাঁর গৌরীপূজার বিখ্যাত। কিন্তু লেবলসী তুট হল প্রচার পৌঁছে। তিনি মিজি এসেন না কেন?

পদ্মা।—আপনি দেখছি বড় সাহসী। তবু ভাল প্রায়ই ভুলেছেন। কিন্তু কি জানেন, হুঁসের তটে পাড়িয়ে যে হুঁসে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়েছে কুক্কুজর, সেই হুঁসে থেকে এখনও পর্বত বাধার তম্ব তম্ব করছে তাঁর স্বপ্ন। বিবেক বাধাই বোধ হয় তাঁর কারণ।

১৮। কুম্ভাসব।—মন থেকে মর্কসেই বাধার শাস্তি হয়। যদি হয় তবেই হবে।

পদ্মা।—আমরাও বুঝছি, মন থেকে মর্কসেই দেবীর কাণ্ডকেই। কুম্ভাসব। অতি কুল তুলে।

পদ্মা। তুমি উৎকর্ষের কাছে কিছুই তুলতে চর।

কুম্ভাসব। শুধি বাধে বধনি মনের মধ্যে আসে উৎকর্ষের ভাব। কিন্তু উৎকর্ষের ভাবধনি দিয়ে কেমন করে বকুল মন থেকে মর্কসের কাজটি হবে?

পদ্মা। ও কাজটি তাঁর হয়েই গেছে, বেহেতু মনের স্বপ্ন হয়ে গেছে এক মনোহারকের কপায়। তবু কেন যে এই উৎকর্ষের ভাব... এইটিই বিচিত্র।

কুম্ভাসব। তাহলে, অল্পসঙ্গের মনোহারকে।

পদ্মা। সম্প্রতি একসাহি বকুলমাল্যের সন্ধানে কিম্বি। তাই দিয়েই মজিত করতে চবে গৌরীকর্ষ।

১৯। কুম্ভ বললেন—বরত! সন্দেহাতীত ভাবে ইনি চকুয়া। এই বকুল-মালাখানি দিয়ে গৌরী পূজাও করতে চান, আবার গাঁথবার পরিশ্রম থেকেও বিশ্রাম পেতে চান।

২০। কুম্ভাসব। বলি, ও সাহসিনি, প্রিয়বস্তুরটির নিজের গলার দোলাবার জন্তে গাঁথা হয়েছে এই মালা। অল্প মহিলা সেটির অধিকাংশী হন কেমন করে? আর পাখা কুল ফুটে রয়েছে অনেক, সেগুলি তুলে নিয়ে যান।

পদ্মা। সাহস দেখালুম আবার কোথায়? আমাকে ঠকানেনই বা কেন আপনি...এই ভাবে? কুম্ভার যদি খুসী হয়ে দিতে চান নিজেই দেবেন।

২১। কুম্ভ। বরত, ইনি ঠিকই বলছেন। ঠকে আমার নিজেরই দেওয়া উচিত এই কুলগুলি। এতে তাঁর সখীরও সন্তোষ হবে, গৌরীপূজনের ব্যবস্থাও হবে।

বাক্যালাপ শেষ হল। পদ্মার মনখানিও বেন নিঃশ্বাস কেলে বাঁচল। দেওয়া কুল নেওয়া হল। এক রাশ বকুল কুল নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

২২। এবার দেবী আমার বলতেই হবে আপনার তপস্তার জোর আছে। তা না হলে এমনটি হয়?

কুম্ভাসব বললেন—বরত, হতেও তো পারে, এই এঁরি মত কেউ, অর্থাৎ বুঝাতুনন্দিনীর নব্য সখীদের মধ্যে কেউ, অধুনা... আপনার স্বপ্নের অগ্নিতাপটিকে উজ্জ্বলোতে উজ্জ্বলোতে এখানে উপস্থিত হয়ে যাবেন। তখন দাম বাঁকবে এই মালার। শুনেই ভর ভেঙ্গে গেল আমার। বেন কিছুই তিনিনি এই অভিনয় করতে করতে, করা কুল কুড়িয়ে তোলার হল করে, আভ্যিকীর মতম উপস্থিত হয়ে গেলুম সেখানে। বেন অবস্থার আমাকে বধতে

পরে সেই কুসুমাসব বলে উঠেছেন, তুমি কে? অমনি হাতের
জকটি বলে উঠলেন, আরে আরে এ যে দেখছি রাখার সেই
জামার সখী...বকুলমালা! কুল তুলতে, বকুলমালা গাঁথবে বলে।

কুসুমাসব বললেন—মালায় এর কিসের প্রয়োজন? বকুলের
কুল পেলেই তো মন গলে বার পোকুলের কুলবালাদের সজোচও
থোচে।

২৩। শুক বললেন—ইনি বকুলমালা। বকুলমালা রচনা
করে নিজের গুণ জামাসবী জামাকে ইনি দেবেন। তিনি আবার
দেবেন আমার দেবী জীরাধাকে। এই হল তার মর্বাদী।

২৪। কুকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কুসুমাসব তখন হাসতে হাসতে
বললেন—বরত, আমার উক্তিগুলি বেন এক একটি কল্পমতিকা,
কলোদ্ভবী বনে হচ্ছে।

শুকও বলে উঠলেন—ব্রাহ্মণ-বাণী অসৌখ, শুকে ডেকে হাতে
কুলে বিন বকুলমালা, উনিই পৌছিয়ে দেবেন ওটিকে তার কাছে।
একখানি হারের মত চলকে উঠল কুসুমাসবের দত্তপাণ্ডিত্য কিম্বাকী,
বা বলা উচিত তাই বললেন,—

হাতপটু আমার এই বরত কটুটির কথায় উমি কেম ডাকলেই
আসতে বাবেই? জানেনই তো পোকুলের কুলবালায় সজোই
পরবিনী। অতএব, হে জির বিহঙ্গমের, আপনিই নিজের দেবীর
পক্ষপাতিক ককন। পাখা নাড়তে নাড়তেই, গুণ কাছে স্বয়ং
উপসর্পণ করুন। 'বকুলমালা' অমলা, স্বভাব-কল-কোমলা।
আশা করি আপনার কথায় কৃপা হয়ে তিনি নিরে যাবেন বকুল-
মালাটিকে।

২৫। বিহঙ্গরাজ শুক তখন আমার কাছে এসে বললেন—
বকুলমালা, আমার তুমি চেনো, তবে মিছে বেন চরন করছ
বকুল-কুল? বরতরাজকুমারের কাছে এস। তাঁর হাতের গাঁথা
মালা আমি তোমাকে দেওয়াবো। কুল কুড়িয়ে এতটা পরিশ্রম করে
লাভ কি?

আমি বললুম, হে শুকবংশাবতঃ। কথায় বলে...সংসর্গজাঃ।
কুল দোষগুণঃ সত্যিই তাই। বিনি পীতবাস পরে প্রেমের ভণিতা
করে বেড়ান, বিনি মধু-রস খেয়ে মস্ত হন, তার মত সঙ্গী না হলে
কি আর এমন বৃদ্ধি হয়? বলি, কোথায় আপনি বেখেছেন,
কুলকুমারীরা বৃকে হুলিয়েছেন পরপুরুষের দেওয়া মালা?

২৬। শুক বললেন—আ-হা-হা, পরমপুরুষ ইনি মিস্তরই
পরপুরুষ মম।

আমি বললুম—বিনি পুরুষ, তাঁকে পরমপুরুষ বলছেন কেম?

শুক বললেন—এ কেনে কি সন্ধির অহুসন্ধান করা চলে?
একেবারেই চলে না। বাচালতার লতা বিভায়ে কাজ মেই। কর
ধারণ করুন। এই পদটি অতি হুলভ।

কথায় চাতুর্থে জীতক বেন আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে কর্ম
করতে এসেছ, সেটিকে দয়া করে বেল, অর্থাৎ বাচালতা না করে
মালাটি হাতে কুলে নাও। সত্যিই কথায় চাতুর্থেই বেন আমাকে
ভয়ে করে নিলেন শুক। তারপরে মা, আর কি আমার মা বলা
চলে? মকরবন্ধুর কুণ্ডলের দিকে আমাকে এগিয়ে আসতেই হল।

২৭। কুসুমাসব এক শুক...হুজমেই বিজয়া, হুজমেই জির
রহৎ। শুক এক আমি...আমাদের হুজমের মনেও তখন অতি
মিস্তর্য। বেন সকলের মতোই উপস্থিত বিয়হ বটেছে বিয়োবেব,
বেন বৃষ্টি হয়ে গেছে উপসর্গ অহুসন্ধানের এক সাহিত্য।

কুসুমাসব বললেন—দেখ শুক, বকুলের মালাখানি আমকে
কুব কুব করছে গড়ে। বকুল করকমলের লক্ষ্যও এটি
হুজাপ্য। অতএব আমাদের কর্তব্য বকুলমালাকে দিয়ে
এই বকুলমালাখানি পৌছিয়ে দেওয়া...চিরাহুজাগিনী তোমার
দেবীর কাছে। তাতে 'সকলও হবে বকুল শিল্পকৌশল। এই
মালাখানিকে তখন আদর করে উঠিয়ে নিলেন নাগোদয়, একটু
বেন কেঁপে উঠল করকমল; একটু কেমন 'বেন মেহুর হয়ে
গেল উদীর্ণ ঘর্ম জলের কণিকায়; চাঁদমুখে একটু বেন উখলে
উঠল মুচকি হাসির অমৃত। মনের ভাব গোপন করে মুখ
ফেরালেন আমার মুখে। হ্যাঁ করিতকর্মা বটে তিনি, আমার এই
হাতখানিতে পরশ দিয়ে সমর্পণ করলেন বকুলমালা, মালাখানি
হাতের পাতায় ধরে রইলুম, বেন ধরে রইলুম পুরভিতম মূর্তিমান
একখানি হুজয়। বহু হয়ে গেলুম। তারপরে আমি ছুটে আসি
আমার দেবীর কাছে, সব কথা বলে তাঁকে দিই মালা। তিনি...এই
আমার দেবীটি...সেই মালা নিয়ে যেয়ে এসেছেন আপনার কাছে।

বকুলমালায় বিবৃতির ইতি হতে না হতেই জীতামাদেবী বকুল-
মালাখানি হুলিয়ে দিলেন জীরাধিকার বৃষ্টি...মালায় স্পর্শ।

[ক্রমশঃ]

একাকিনী

শ্রীমতী রায়

আর কত দিন আছে বাকি তোমার কাছে বাওয়া।

কেমন করে আঁধার রাতে চলবে তরী বাওয়া?

একলা আমি আছি বলে

আজ কেহ নাই আমার পাশে,

কীপছি ত্রাসে আসছে যবে বিঘম ঝোড়ো হাওয়া

কেমন করে চলবে বল একলা তরী বাওয়া?

নিরুৎসব রাতের তারা

তাকাই আমি সজিহারা,

বিকল মানি বাজা গুণো হরনি তোমার পাওয়া

আঁধার রাতে কেমন করে চলবে তরী বাওয়া?

নতুনের অভিযান...



দিকে দিকে আজ নতুনের অভিযান—নবীন
শিশুর আঙ্গুপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সংকেত,
সাড়া জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা
দিয়ে, কর্ম দিয়ে জাতিকে তারা নতুন করে গড়বেই.....মহৎ
কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শান্তিময়,
ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে।
বৈচিত্র আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।
কালের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান
জাতিও আজ তাই জেগেছে, পেয়েছে সে নতুনের আশ্বাস.....

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যজব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে
পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে
চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই
প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও ...সশোক সেবায় হিন্দুস্থান লিডার্স

PR 2-X52 DG



শ্রীমৌপালচন্দ্র নিরোগী

তুরস্কে সামরিক শাসন—

গত ২৩শে-২৭শে মে (১৯৬০) মহারাষ্ট্রে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক তুরস্কে শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করার ঘটনাটি আকস্মিক বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সকল সামরিক অভ্যুত্থানেই আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়, যদিও তাহার প্রস্তুতি পূর্ক হইতে চলিতে থাকে। তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান আকস্মিক হইলেও একেবারেই অপ্ৰত্যাশিত একথা বোধ হয় স্বীকার করা যায় না। এই সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্কবর্তী কিকিমধিক এক মাসের ঘটনাবলীর কথা বিবেচনা করিলে ঘটনাটি একেবারেই আকস্মিক একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ গত এপ্রিল মাসের (১৯৬০) প্রথমদিকে যে ঘটনার সূত্রপাত হয় এবং পরে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে যে ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া ছাত্র-বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তাহারই পরিণতিতে সেনাবাহিনী তুরস্কে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে, একথা মনে করিলে ভুল হইবে না। সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেল কামাল গুবুসেল বাঘাট্টি বংসরের পুরুকেশ বৃদ্ধ। তুরস্কে সামরিক বাহিনীতে তিনি সর্কাপেক্ষা জনপ্রিয় বলিয়া কথিত। তুরস্কে জাতীয় পরিষদে বিরোধীদের নেতা ইসমেৎ ইনোমুকে জাতীয় পরিষদ হইতে বহিষ্কৃত করা এবং উহার বারটি অধিবেশনে তাঁহার বোগদান নিষিদ্ধ করার পর বে-হাকামা সৃষ্টি হয় তাহার অব্যবহিত পর জেনারেল গুবুসেলকে দুই মাসের জন্য ছুটি দেওয়া হয়। ঐ সময় তিনি তুরস্কে ফুলসৈন্তের কমান্ডার ছিলেন। দুটি গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি তরুণ সামরিক কর্মচারীদেরকে রাজনীতি হইতে দূরে থাকিবার অহুরোধ জানাইয়াছিলেন। তিন সপ্তাহ পরে তাঁহারই নেতৃত্বে তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিল। তুরস্কে সামরিক শাসনের যেটুকু সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি তিন মাস ধরিয়া সামরিক এই অভ্যুত্থানের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সুতরাং এই সামরিক অভ্যুত্থানের আয়োজন যে পূর্ক হইতেই চলিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সামরিক বিভাগ কেন এই অভ্যুত্থানের জন্য আয়োজন করিতেছিল, বলীয় বিরোধের কলে তুরস্কে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কাই উহার কারণ কি না, তুরস্কে বিমানঘাটি হইতে প্রেরিত সাক্ষিণ

গোরেনা বিমান রাশিয়া কর্তৃক ভূপাতিত করার ঘটনার সহিত হার কোন সম্পর্ক আছে কি না, এ সকল প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তুরস্কে এই সামরিক অভ্যুত্থান রিপাবলিকান পার্টির অহুরুলে হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নও উপেক্ষার বিষয় নয়। বরং ঘটনা-পরম্পরায় এই প্রশ্ন মনে জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রশ্নে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রিপাবলিকান দলের নেতা ইসমেৎ ইনোমু গ্রীসের বৃদ্ধ কামাল আতাভুর্কের বিশ্বস্ত সাথীই শুধু ছিলেন না, তিনি তুরস্কে সেনাবাহিনীর জেনারেল-ও ছিলেন এবং প্রেসিডেন্টও নির্কাচিত হইয়াছিলেন। তবে মেগেরিস পূর্কমেটের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর বহু অফিসারের মনে যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই।

গত এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে রিপাবলিকান দলের নেতা মিঃ ইসমেৎ ইনোমু বখন পার্টি কংগ্রেসে বোগদান করিতে বাইতেছিলেন, সেই সময় প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেগেরিসের নির্দেশে সৈন্যদল তাঁহাকে ঐ অহুরুঠানে বোগদান করিতে দেয় নাই। এই ঘটনার প্রতিবাদে কয়েক জন সামরিক কর্মচারী পদত্যাগ করেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রিপাবলিকান দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটিকে কতকগুলি ক্ষমতা দিবার জন্য তুর্কী জাতীয় পরিষদ একটি বিল উপাশিত হয়। এই বিলের আলোচনার সময় মিঃ ইনোমুর বক্তৃতা নাকি সরকারের কাছে খুব আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহাকে পরিষদ হইতে বহিষ্কৃত করা হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে, জাতীয় পরিষদের বারটি অধিবেশনে তিনি বোগদান করিতে পারিবেন না। আবার বার জন সদস্যকে টেবিল চাপড়াইবার এবং আপত্তিকর ধ্বনি করিবার অভিযোগে পরিষদ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। ছাত্রবিক্ষোভ দেখা দেয় উক্ত ঘটনার বিরুদ্ধে। ২১শে এপ্রিল ইস্তাম্বুলে এবং আঙ্কারায় সামরিক আইনজারী করা হয়। সামরিক আইনজারী করার অর্থ সামরিক বাহিনীর হাতেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব চলিয়া যাওয়া। ছাত্রবিক্ষোভ দমনের জন্য রাইফেল ও মেশিনগান ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১লা মে তারিখে আঙ্কারা সহরে কারফিউ জারী করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় এক মাসের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২রা মে তারিখে ইস্তাম্বুলে আটলাণ্টিক যন্ত্রণা পরিষদের বৈঠক আরম্ভ হইলে দুই সহস্রাধিক লোকের এক জনতা স্বাধীনতার দাবী জানাইয়া সভাকক্ষের বাহিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। গত ১৮ই মে তুরস্কে প্রধান মন্ত্রী শীজই সাধারণ নির্কাচন হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। মেগেরিস-সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক বিভাগের গভীর অসন্তোষের একটি দৃষ্টান্ত বিশেষ তাহা যেখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পশ্চিম জগৎহরলাল নেহরু কমন্ওয়েলথ সম্মেলন হইতে প্রত্যাগর্তনের পথে তুরস্কে গিয়াছিলেন। ২১শে মে পশ্চিম নেহরু বখন আঙ্কারায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের অহুরুঠান করিতেছিলেন সেই সময় সেনাপতি ও অফিসারগণের পরিচালনার আশ্রি ক্যাডেটরা তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। সেনাবাহিনীর ইহাই প্রথম বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং উহা যে তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত স্বরূপ ছিল, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থান এবং ক্ষমতা দখল বিনা রক্তপাতেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং ক্ষমতা দখল করিতে সময়ও সামান্যই লাগিয়াছিল। সৈন্যবাহিনী তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী মিঃ আদনান মেণ্ডেরিস এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আর যে সকল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে আছেন জাতীয় পরিষদের সভাপতি, দেশরক্ষা মন্ত্রী, চীফ অব জেনারেল ষ্টাক, অর্থমন্ত্রী এবং হলসৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক। শাসন-পরিচালনার জন্ত জেনারেল কামাল গুরসেলের সভাপতিত্বে জাতীয় ঐক্য কমিটি (National Unity Committee) গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি জাতীয় পরিষদ ডাকিয়া দিয়াছেন এবং রাজনৈতিক সভাসমিতির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ক্ষমতা দখলের পর সামরিক শাসন প্রচলিত করিবার জন্ত যে সকল আয়োজন করা প্রয়োজন তাহার কিছুই বাকী রাখা হয় নাই। জেনারেল কামাল গুরসেল ২৭শে মে রাত্রে এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমি এক-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করিব না। প্রত্যহ অবস্থার অবনতি ঘটিলেই বলিয়া আমি আমার দেশের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছি।" তিনি শীঘ্রই নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। নাটো ও সেন্টোর প্রতিও আছুপতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা বোধ হয় নিশ্চয়তায় যে, তুরস্ক উত্তর আটলান্টিক চুক্তি পরিষদ এবং বাগদাদ চুক্তির সদস্য। ইরাক বাগদাদ চুক্তির বাহিরে চলিয়া যাওয়ার এই চুক্তির নুতন নামকরণ হইয়াছে 'সেন্ট লিট্রিট অরগ্যানাইজেশন', সংক্ষেপে 'সেন্টো'। সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর সামরিক শাসক সাধারণতঃ যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন তাহার সমস্তই দেওয়া হইয়াছে, এমন কি, শীঘ্র সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত। এই ধরনের প্রতিশ্রুতি কোন সময়েই রক্ষিত হয় না। কাজেই নির্বাচন হবে অনুষ্ঠিত হইবে কিংবা আদৌ হইবে কি না তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশেষ করিয়া মিঃ মেণ্ডেরিসের ডিমোক্রেটিক দলটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হইলেও বিশ্বাসের বিষয় হইবে না। সেনাবাহিনী একবার ক্ষমতা দখল করিলে আর সে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে চাহে এরূপ কৃষ্টি বিরল। তুরস্কের এই সামরিক অভ্যুত্থান মিঃ ইনোমুয়ু রিপাবলিকান পার্টির অনুকূলে হইয়াছে, এইরূপ মনে হওয়াও স্বাভাবিক। রিপাবলিকান দলকে ক্ষমতার আসীন করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা হইবে কি না, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেল কামাল গুরসেল প্রধান মন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ২৮শে মে (১৯৩০) রাত্রে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে, মিঃ মেণ্ডেরিসকে সম্ভবতঃ নুতন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আটক থাকিতে হইবে। তিনি ইহাও জানান যে, আইন-বিশেষজ্ঞগণ নুতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতেছেন। হয় সপ্তাহের মধ্যে এই আঙ্গণেব হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

সেনাবাহিনী কর্তৃক তুরস্কের শাসনভার গ্রহণের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়া উঠা বাইতেছে না। নাটো ও সেন্টোর প্রতি মেণ্ডেরিস সরকারের আছুপত্যের কোন অভাব ছিল না। তুরস্কের বিমান-ব্যাটী হইতে মার্কিন-গোয়েন্দা বিমান রাশিয়ার আকাশে

গোয়েন্দাগিরির জন্ত গিয়াছিল। রাশিয়ার ইয়কোস্কেও মেণ্ডেরিস সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট কোন প্রতিবাদ জানায় নাই। ব্রহ্মদেশে সামরিকভাবে যেরূপ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার সহিত তুরস্কে সামরিক শাসন-প্রতিষ্ঠার কোন তুলনাই চলিতে পারে না। ইরাকের সামরিক অভ্যুত্থান এবং তুরস্কের সামরিক অভ্যুত্থান পরস্পর বিপরীত ধর্মী। সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্বে তুরস্ক বৈদেশিক পশ্চিমী-শক্তি-বর্গের নির্ভরযোগ্য ব্যাটী ছিল সামরিক অভ্যুত্থানের পরেও সেইরূপ নির্ভরযোগ্য ব্যাটীই রহিয়াছে। পাকিস্তানে এবং সুদানে সামরিক শাসন-প্রতিষ্ঠা বৈদেশিক যুক্ত তুরস্কে সামরিক শাসন-প্রতিষ্ঠা সেই পর্যায়ভুক্ত বলিয়াই মনে হয়। মার্কিন কোরিয়ার ডাঃ সীংম্যান রীর পতন এবং তুরস্কে মিঃ মেণ্ডেরিসের পতন একই পর্যায়ভুক্ত কি না তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। মিঃ ইনোমু এবং তাঁহার রিপাবলিকান দল ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তুরস্ক শাসন করিয়াছেন। তাঁহার শাসনও কম পীড়ন-মূলক ছিল না। বস্তুতঃ পীড়নমূলক ছিল বলিয়াই ১৯৫০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নবগঠিত ডেমোক্রেটিক দল রিপাবলিকান দলকে বিপুলভাবে পরাজিত করিয়া ক্ষমতা দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেই হইতে এই দলটিই এতদিন পর্যন্ত ক্ষমতার আসনে আসীন ছিল। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৭ সালের নির্বাচনেও এই দলটিই জয়লাভ করে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই দলটির বিরুদ্ধে রিপাবলিকান পার্টিতে দমন করিবার অভিযোগ শোনা বাইতেছিল। মেণ্ডেরিস সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র বিরোধী বহু কার্যকলাপের অভিযোগও উঠিয়াছে। সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গণতন্ত্র রক্ষা পাইল, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই।

বিলাতের 'দি পিপল' পত্রিকার গত ৫ই জুন (১৯৬০) তারিখের সংখ্যায় জর্নিক ডাব্যকার তুরস্কে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও বিবেচনার যোগ্য। উক্ত ডাব্যকার বলেন যে, মেণ্ডেরিস সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধর্মারিত হইতে থাকিলেও মার্কিন গোয়েন্দাবিমান সংক্রান্ত ঘটনার পূর্বপর্যন্ত সৈন্যবাহিনী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করে নাই। এই ঘটনার পর তুরস্ক সরকার পুনরায় মার্কিন গোয়েন্দাবিমান কর্তৃক তুরস্কের ব্যাটী ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করায় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই আশঙ্কা সৃষ্টি হয় যে, সমগ্র সামরিক বাহিনীই হরত আমেরিকার প্রভাবাধীনে চলিয়া বাইবে। উক্ত ডাব্যকার ইহা-ই মনে করেন যে, সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পশ্চাতে মার্কিন ইউ—২ গোয়েন্দা বিমান সংক্রান্ত প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সতর্কবাণী নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার এই ডাব্যকার সহিত একমত হওয়া কঠিন বলিয়াই আমরা মনে করি। সিয়াটো জোটে পাকিস্তানের এবং সেন্টো ও সিয়াটো জোটের সহিত নাটোর সংযোগ রক্ষাকারী হিসাবে তুরস্কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানে ইতিপূর্বে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। এখন তুরস্কেও সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইল। ইহাতে মার্কিন প্রভাব আরও অধিক হইল বলিয়াই আমরা মনে করি।

জাপানে তীব্র বিক্ষোভ—

জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত মশ বৎসরের নিরাপত্তা চুক্তি লইয়া জাপানে খেঁগতীর বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পরিণতি কি হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। এই বিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্যে মার্কিন বাঁটি সম্পর্কে রাশিয়া জাপানকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জাপানীদের আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এই বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান সরকারের প্রাক্কালে ইহা-ও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯শে জুন তারিখে তিনি জাপানে পৌঁছিবেন। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তাঁহার জাপান সফর শেষ হইয়া যাইবে। উল্লিখিত নূতন নিরাপত্তা চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জাপানের বাঁটি ব্যবহার করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং এই চুক্তি হইয়াছে যে, এই দুই দেশের কোনও একটি দেশ আক্রান্ত হইলেই উভয় দেশ মিলিত ভাবে যুদ্ধ করিবে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ প্রবল হইয়া উঠিলেও জাপানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ কিশি মোটেই বিচলিত হন নাই। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার জাপানে পৌঁছিবার পূর্বেই এই চুক্তি বাহাতে আইনসিদ্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। জাপানের সোশালিষ্ট পার্টি এইরূপ চুক্তির বিরোধী। ইহার উপর মার্কিন পৌরোহিত্য বিমান সম্পর্কে জাপানের প্রতি রাশিয়ার সতর্কবাণী যদি জাপানীদের মনে হিবোসিমা ও নাগাসিকির ভীতি জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহা হইলে বিশ্বের বিষয় হইবে না। সোশালিষ্ট পার্টি পাল্লীমেন্ট বরকট করা সত্ত্বেও মিঃ কিশি তাঁহার লিবারেল পার্টির ভোটারের জোরে জাপান পাল্লীমেন্টের নিয়ন্ত্রণে এই চুক্তি অনুমোদন করাইয়া লইয়াছেন। জাপান পাল্লীমেন্টের উচ্চ পরিষদ এই চুক্তি অনুমোদন করুক আর নাই করুক তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। নিয়ন্ত্রণ উহা অনুমোদন করায় প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের জাপানে পৌঁছিবার পূর্বেই ১৮ই জুন (১৯৬০) তারিখে উহা আইনসিদ্ধ হইয়া যাইবে।

জাপান মার্কিন নিরাপত্তাচুক্তির বিরুদ্ধে গত ২৩ মে টেবিত্তে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সহিত পুলিশের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সোশালিষ্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাপান ফ্রিড ইউনিয়ন ফেডারেশনের উত্তেজিত জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির বিরুদ্ধে জনপরিষদ (People's Council) গঠিত হইয়াছে। জাপান-মার্কিন চুক্তি বাতিল করিবার, পাল্লীমেন্ট ভাঙিয়া দিবার এবং মিঃ কিশির পদত্যাগ দাবী করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান সফর বাতিল করিবার দাবীও করা হইয়াছে। কিন্তু জাপান প্রধানমন্ত্রী মিঃ কিশি এই সকল দাবী সম্পর্কে অনমনীয় দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি পদত্যাগও করিবেন না, পাল্লীমেন্টও ভাঙিয়া দিবেন না। জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি অনুমোদন করাইতে এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার সঙ্কল্প অচল ও অটল। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান পরিদর্শন সংক্রান্ত চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার জন্ত প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারী মিঃ জেমস হাগার্ট গত ১০ই জুন টোকিও বিমান বাঁটিতে পৌঁছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত জাপানস্থিত

মার্কিন রাষ্ট্রসূত মিঃ ওপলাস ম্যাকআর্থারও বিমানবাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় তিন হাজার বিক্ষোভকারী ছাত্র বিমানবন্দরের রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেয়। কলে মিঃ হাগার্ট ও মিঃ ম্যাকআর্থারকে একঘণ্টারও বেশী সময় বিমানবন্দরে বন্দী বৃত্ত অপেক্ষা করিতে হয়। একটি মার্কিন হেলিকপ্টার তাঁহাঙ্গিকে টোকিও বিমানবন্দর হইতে উদ্ধার করিয়া মার্কিন দূতাবাস হইতে এক মাইল দূরবর্তী এক সেনাবাহিকে নাইয়া দেয়। সেখান হইতে মোটরযোগে তাঁহারা গন্তব্যস্থলে উপনীত হন। মিঃ হাগার্ট এক সাংবাদিক বৈঠকে টোকিও বিমানবন্দরে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, বিক্ষোভকারীগণ তাঁহার মোটর পাড়ী ভাঙিয়া কেলিবার এবং উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহার ধারণা এই বিক্ষোভ প্রদর্শন একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের কার্য। জাপান সরকার এতদুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

মিঃ হাগার্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার জাপান ভ্রমণ সম্পর্কে অবিচলিত আছেন বলিয়া হোয়াইট হাউস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। জাপান প্রধান মন্ত্রী মিঃ কিশিও প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের এই সফর স্থগিত রাখার বিরোধী। তিনি নাকি মার্কিন সরকারকে জানাইয়াছেন যে এই সফর স্থগিত রাখিলে তিনি পদত্যাগ করিবেন। নিরাপত্তা চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনটা তিনি কমিউনিস্টদের কারসাজি বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিশি সরকার এবং বিরোধী পক্ষ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের অভ্যর্থনার উত্তর যে আয়োজন করিতেছেন তাহাতে অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠিবার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে পক্ষাঘাত হাজার হাজার বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবে। কিশি সরকার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সতর্কতার উত্তর হয় লক্ষ লোক টোকিওতে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহার পরিণামে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের চোখের সামনেই সংঘর্ষ সৃষ্টি হইতে পারে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নিরাপত্তার জন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। বিমানবাঁটি হইতে এগার মাইল পথে প্রতি ছয় ফুট অন্তর এক জন করিয়া পুলিশ পাহারা দিবে। ইহার জন্ত আয়োজন হইবে প্রায় সত্তর হাজার পুলিশ। এই পুলিশ পাহারার মধ্য দিয়া বুলেট প্রফ সিতান পাড়ীতে প্রেসিডেন্ট গমন করিবেন।

জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে তাহা কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যের ফল—ইহা মনে করিলে গুরুতর ভুল করা হইবে। ১৬ই মে শীর্ষদলন নূতনভাবেই ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার পর ২০শে মে তারিখে জাপান পাল্লীমেন্টের নিয়ন্ত্রণে জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি অনুমোদিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই একই দিনে রাশিয়া জাপান সরকারের নিকট দুইখানি কড়া প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেন। জাপানে যে মার্কিন ইউ-২ বিমানবাঁটি আছে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকী দেওয়া হইয়াছে প্রথম প্রতিবাদ লিপিতে। জাপানে দুইখানি ইউ-২ মার্কিন বিমানের উপস্থিতি, নূতন জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি এবং জাপান সাগরে একখানি সোভিয়েট জাহাজের উত্থানে জাপানী বিমানের আনাগোনার বিরুদ্ধে সোভিয়েট সরকার

তীর প্রতিবার জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে গত ৩০শে মে সোভিয়েট প্রতিনিধি মন্ত্রী মার্শাল মেলিনোভস্কী যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, সোভিয়েট রকেট বাহিনীর সেনাপতিকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কোন বিমান যদি বিশেষের কোন বাঁটি হইতে আসিয়া রাশিয়ার আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করে তবে সে-বাঁটি নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে। সে বাঁটিটি কোন্ দেশে অবস্থিত তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি অল্প ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহা হুমকী নয়, ইহা সতর্কবাণী। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, শুধু রাশিয়ার আকাশ সীমা নয়, বরং কোন সোভালিট দেশের আকাশ-সীমা লঙ্ঘিত হইলেও বাঁটি ধ্বংস করিবার নির্দেশ কার্যকরী হইবে। রাশিয়ার প্রতিবাদ লিপি এবং উল্লিখিত সতর্কবাণীতে আপানের অনশাধারণ উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয়। উহা কাঁকা আওয়াজ হইতে পারে, কিন্তু উপেক্ষার বিষয় নয়। বিশেষতঃ আপানে যে সকল মার্কিন বাঁটি আছে সেগুলির উপর আপ সরকারের কোন বর্জ্ব নেই। এই সকল বাঁটিতে কি হইতেছে তাহাও জানিবার অধিকার আপ সরকারের নাই, একথাও অগণ রাখা আবশ্যিক।

নিরাপত্তা পরিষদ ও মার্কিন গোয়েন্দা বিমান—

রাশিয়ার ইউ—২ মার্কিন গোয়েন্দা বিমান সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপের নিন্দা করিয়া নিরাপত্তা পরিষদ যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল গত ২৬শে মে (১৯৬০) তাহা অগ্রাহ হইয়া গিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের ১১টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র দুইটি সদস্য রাষ্ট্র—রাশিয়া ও পোল্যান্ড প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। টিউনিশিয়া ও সিংহল ভোটদানে বিরত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, আঙ্জেলিকা, ইকুয়াডর, ইটালী এবং কুরোমিটাং চীন অর্থাৎ কয়েকটা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ হওয়া অপ্রত্যাশিত ছিল ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কান্ট্রীর আক্রান্ত হওয়া স্বীকার করেন নাই, একথা আমরা ভাল করিয়াই জানি। গুরাতেরালার আবেদনও অগ্রাহ হইয়াছিল। কিন্তু কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ নিরাপত্তা পরিষদে উত্তর কোরিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, সংখ্যাধিক্যের ভেট প্রস্তাবটি গৃহীত হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিতে পারিত। প্রস্তাবটি সংখ্যাধিক্যের ভেটো পাইল না কেন, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নয়। কিন্তু রাশিয়ার নিন্দা প্রস্তাবটি অগ্রাহ হওয়ার তাৎপর্য কি, উহা অগ্রাহ হওয়ার কি প্রমাণিত হইতেছে তাহাই প্রধান বিবেচনার বিষয়। প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় যে, লবীতে মার্কিন প্রতিনিধিগণ স্পষ্টভাবেই একথা জানান যে, সমস্ত দেশকে পরস্পরের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করা হইতে বিরত থাকিবার জরুরি সাধারণ ভাবেও যদি কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহাতে আপত্তি জানাইবে। ইহার পর নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাই ভিরোধিত হইয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ হেনরী কেবট লজ রাশিয়ার অভিযোগগুলির যে উত্তর

নিরাপত্তা পরিষদে দিয়াছেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মিঃ লজ বলেন যে, এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট নিরস্ত্র এবং একজন মাত্র লোক সম্বিষ্ট বিমানের রাশিয়ার আকাশে বিচরণকে আক্রমণ করা যায় না। প্রেসিডেন্ট হুইটসেনহাওয়ারের 'উন্মুক্ত আকাশ' পরিকল্পনা রাশিয়া অগ্রাহ করায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। যদি স্বীকার করা যায় যে, একটি নিরস্ত্র বিমানের রাশিয়ার উপর গোয়েন্দাগিরি আক্রমণাত্মক কার্য না হয়, তাহা হইলেও একদেশ বর্জ্ব আর এক দেশের উপর গোয়েন্দাগিরি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্ততঃ প্রকারে নিষেধীয় কি না। নিরাপত্তা পরিষদ রাশিয়ার প্রস্তাবটি অগ্রাহ করিয়া কি রাশিয়ার উপর মার্কিন বিমানের গোয়েন্দাগিরিই সমর্থন করেন নাই? এই প্রস্তাবটি অগ্রাহ হওয়ার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এইরূপ গোয়েন্দাগিরিকেই কি স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই? রাশিয়ার প্রস্তাবটি অগ্রাহ হওয়ার অল্প বেশের আকাশে গোয়েন্দা বিমান প্রেরণ করিয়া ঐ দেশের সামরিক গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার অধিকার আর এক দেশের আছে, ইহা-ই কি স্বীকার করা হয় নাই? প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাহারা ভোট দিয়াছেন তাহারা নিজ নিজ রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারের দিক হইতে উহার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বিবেচনা করেন নাই, ইহা-ই কি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে? পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ মনসুর কাদের মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "Activities of this kind increase risk and we certainly will not be a party to military intelligence being gathered" অর্থাৎ এই ধরনের কার্যকলাপ বিপদ বৃদ্ধি করে এবং সামরিক সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা অংশীদার হইতে পারি না। বৃটেনও মিঃ গেইটফেল বলিয়াছেন যে, বৃটেনের সম্পর্ক ছাড়া বৃটেনের বাঁটি হইতে গোয়েন্দা বিমান উড়িবে না, এই মর্মে সরকারের আশ্বাস দেওয়া প্রয়োজন এবং এইরূপ সম্মতি দেওয়া সরকারের উচিত হইবে না। বৃটেন রাশিয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে বটে, কিন্তু বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানও গোয়েন্দা বিমানের কার্যকলাপ দ্বারা যে জাতীয় সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করা হয় তাহা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই বিশ্বের শান্তিকামীদের বলিষ্ঠ দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া শীর্ষসম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। শান্তির বিরোধী শক্তি লুচনাতেই উহা বানচাল করিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই। কি শান্তিকামীদের শক্তি এখনও হর্বল হইয়া পড়ে নাই। তা শীর্ষসম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়াছে ভাবী শীর্ষ সম্মেলনে দাবী। নিরাপত্তা পরিষদ রাশিয়ার মার্কিন ইউ—২ গোয়েন্দা বিমান সংক্রান্ত নিন্দা প্রস্তাবটি অগ্রাহ করিয়াছে বটে, ভাবী শীর্ষ সম্মেলনে দাবীকে অগ্রাহ করিতে পারে নাই। কিন্তু মিঃ ম্যাকমিলান মনে করেন যে, বর্তমান বিশ্বে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জগুপ্তর বৃদ্ধি বজায় না রাশিয়া উপায় নাই।

ভাবী শীর্ষ সম্মেলন—

শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হওয়া এবং নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া মার্কিন ইউ—২ গোয়েন্দা বিমান সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে রাশিয়ার আনী মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের কার্যকলাপের নিন্দা প্রস্তাব অগ্রাহ হওয়ার প

বিষ পরিষ্কৃতি অবিকৃত উত্তর হওয়ার যে আশঙ্কা দেখা গিয়াছিল তাহা নিরোধের জন্য ভাবী শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব যে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ হওয়ার পরই যথা সম্ভব শীর্ষ পুনরায় আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য বৃহৎ চতুঃশক্তিকে আহ্বান করিয়া একটি প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদ গৃহীত হইয়াছে। শীর্ষ সম্মেলন বার্ষিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার শীর্ষ-সম্মেলন হইবে, একথা শোনা বাইতেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আর একটি শীর্ষ-সম্মেলনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয়লী করিবে কে, ইহা যে একটা প্রধান সমস্যা একথা অস্বীকার করা যায় না। নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত এই প্রস্তাবটি দ্বিতীয়লী কর আরম্ভ করিয়াছে, ইহা মনে করিলে বোধ হয় তুল হইবে না। সিংহল, আর্জেন্টিনা, টিউনিশিয়া এবং ইকোরাডর এই চারিটি রাষ্ট্র মিলিত ভাবে এই প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করে। এই চারিটি রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত। উদ্যোগে আর্জেন্টিনা এবং ইকোরাডর রাশিয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল এবং সিংহল ও টিউনিশিয়া ভোট দানে বিরত ছিল। প্রস্তাবটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া উভয়েরই গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে। রাশিয়া পোয়েন্কা বিমানের প্রসঙ্গ এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া। এই চেষ্টা ২-৬ ভোটে অগ্রাহ হইয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আকাশে অনধিকার প্রসঙ্গ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিরোধিতা করিয়াছিল, ইহা উল্লেখযোগ্য।

আপোষ-রকা হিসাবে প্রস্তাবটি সংশোধন করা হইয়াছিল। তথাপি সংশোধিত প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণের সময় রাশিয়া ও পোল্যান্ড অসুপস্থিত ছিল। কিন্তু রাশিয়া উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে ভোটেও প্রকাশ করে নাই। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই প্রস্তাব সমর্থন করে। প্যারীতে মঃ ক্রুশেভ বলিয়াছিলেন যে শীর্ষ-সম্মেলন হয় হইতে আট মাস স্থগিত রহিল। শীর্ষ-সম্মেলন বার্ষিক হওয়ার পর প্যারী হইতে পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রদ্বয়ের রাষ্ট্রনাগরকগণ যে ইচ্ছাহার প্রচার করেন তাহাতেও তাহারা এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক সমস্ত বিরোধ হমকী বা শক্তি দ্বারা নয়, আলাপ-আলোচনার শান্তিপূর্ণ পথে সমাধান করা বাইতে পারে। ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে এইরূপ আলোচনার জন্য গ্রহণ করিতেও এই ইচ্ছাহারে আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু দাবার কবে শীর্ষ-সম্মেলন আরম্ভ হইবে, আগামী ৬ হইতে ৮ মাসের মধ্যে শীর্ষ-সম্মেলন আরম্ভ হইবে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়।

ওয়াশিংটনে সিরাতো বৈঠকের উদ্বোধন প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ নিয়ন বলিয়াছেন, অধুনা ভবিষ্যতে কোন শীর্ষ-সম্মেলন হইবে বলিয়া আমেরিকা মনে করে না। তবে শান্তি স্থাপনের পক্ষে সহায়ক হইবে এইরূপ কোন বৈঠকই হইবে না, ইহাও তিনি মনে করেন না। বৃটিশ কবল সভার পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বিতর্কের উপসংহারে মিঃ সেগুইন লয়েডও এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ভবিষ্যতে শীর্ষ-সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তিনি ইহাও মনে করেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য শীর্ষ-সম্মেলনই একমাত্র পথ নয়।

তাহার মতে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পন্থা, পররাষ্ট্র মন্ত্রিসম্মেলন, সন্দ্বিগ্নিত আভিযুক্ত ও নিরাপত্তা পরিষদে সম্মেলন স্থাপন দ্বারা শান্তির জন্য আলোচনা চালানো বাইতে পারে। গত ২৮শে মে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ পররাষ্ট্র নীতি সঙ্ক্রান্ত এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, প্যারীতে শীর্ষ-সম্মেলন বাসচাল হওয়া সম্বন্ধে রাশিয়া ছয় মাসের মধ্যে আর একটি শীর্ষ-সম্মেলন হওয়ার পথ সুগম করিয়াছে। তিনি অল্প ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে শীর্ষ-সম্মেলনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না হইলেও প্রতীক্ষা করিয়া থাকার মত যথেষ্ট বৈধা রাশিয়ার আছে। মঃ ক্রুশেভ এই বক্তৃতায় ইহাও ঘোষণা করেন যে, বৃহৎ চতুঃশক্তির পরবর্তী শীর্ষ-সম্মেলনে কমানিষ্ট চীন, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়াসহ অন্যান্য রাষ্ট্রকে বোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত। ভাবী শীর্ষ-সম্মেলনে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি এশীয় রাষ্ট্রের বোগদানের প্রস্তাব পশ্চিমী শক্তিবর্গ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহার কোন ইঙ্গিত এখনও পাওয়া যায় নাই। শীর্ষ-সম্মেলন বার্ষিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক আবহাওয়া আঞ্চলিক যুদ্ধের আশঙ্কার ঘোরালো হইয়া উঠে নাই, ঠাণ্ডাযুদ্ধের তীব্রতার মধ্যেও কিছু সংঘাত ভাব দেখা যায়। কিন্তু শীর্ষ-সম্মেলনের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে একটা আশাশূন্য মনোভাব দেখা গিয়াছিল তাহার অস্তিত্ব আজ আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, অবস্থা মন্দের ভাল।

ইহা উল্লেখযোগ্য শীর্ষ-সম্মেলনের প্রাক্কালেও মার্কিন দেশরক্ষা মন্ত্রী পৃথিবীর সর্বত্র মার্কিন সামরিক বাহিনীকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। রাশিয়ার আকাশে মার্কিন-পোয়েন্কা বিমান প্রেরণ ইহারও পূর্বের ঘটনা। শীর্ষ-সম্মেলন বার্ষিক হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে মহাসাগরের ফিলিপাইন, ফরমোশা ও থাইল্যান্ড এলাকায় বিরাট নৌ ও বিমান মহড়ার অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়াছে। এই পরিকল্পনা নাকি ছয় মাস পূর্বেই করা হইয়াছিল। রাশিয়ার দেশরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল ম্যালিনোভস্কী গত ৩০শে মে (১৯৬০) ঘোষণা করিয়াছেন যে, "সোভিয়েট রকেট বাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে এই মর্মে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কোন বিদেশী বিমান যে কোন বিদেশী বাহিনী হইতে উড়িয়া আসিয়া রাশিয়ার আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করুক না কেন, সেই বাহিনী ধ্বংস করিতে হইবে। সেই বাহিনী কোন দেশে অবস্থিত তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই।" তিনি অল্প একথাও জানাইয়াছেন যে, "This is not a threat, but a warning." অর্থাৎ ইহা হমকী নয়, সতর্কীকরণ। এইরূপ সতর্ক করিয়া দেওয়ার পর যদি কোন দেশের বাহিনী হইতে মার্কিন পোয়েন্কা-বিমান উড়িয়া আসিয়া রাশিয়ার আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করে তবে সে দেশের বাহিনী সম্পর্কে রাশিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে, এই কথা ভাবিয়া যে সকল দেশে মার্কিন বিমান-বাহিনী আছে সেই সকল দেশে নিশ্চিত থাকিবে, ইহা মনে করা কঠিন। যে মার্কিন বিমানখানি পূর্ব-আর্জেন্টিনাতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা লইয়া রাশিয়া খুব সোরগোল সৃষ্টি করে নাই, শুধু মাহুলি প্রতিবাদ জানান হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে সে-কথাও উল্লেখযোগ্য।

আগামী ছয় হইতে আট মাসের মধ্যে আবার শীর্ষ-সম্মেলন

হইবে, এতখানি আশা করার কোন লক্ষণ দেখা বাইতেছে না। তবে মঃ ক্রুশেভ হইতে আট মাস শীর্ষ-সম্মেলন স্থগিত রাখার কথা কেন বলিয়াছেন, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকই মনে জাগিতে পারে। আগামী নবেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হইবে। এই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারই যে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবেন না সে-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে এই নির্বাচনের প্রচারকার্যে ডেমোক্রাটিক পার্টি রিপাবলিকান পার্টির পররাষ্ট্র নীতির ব্যর্থতা বিশেষ ভাবেই মার্কিন জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরিবেন, এইরূপ আশা করা হয়ত একেবারে অসম্ভব নয়। কারণ, ডেমোক্রাটিক দলের একটি প্রগতিশীল অংশ মার্কিন ইউ-২ গোল্ডেনা বিমান সক্রান্ত নীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। মঃ ক্রুশেভ হইতে উহার উপরেই অনেকখানি ভরসা স্থাপন করিয়াছেন, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। যে-সকল দেশে মার্কিন বিমান-বাঁটি আছে যে সকল দেশের জনমতও যে বিক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। মার্কিন জনসাধারণ এই বিষয়টিও বিবেচনা না করিয়া পারিবেন না। ডেমোক্রাটিক দলের মনোনীত প্রার্থী যদি আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাহা হইলেই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটবে, ইহা আশা করা কঠিন। তবে পরমাণু-বুদ্ধকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঘরাবিত করিয়া তুলিবে না, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

রাশিয়ার নূতন নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব—

শীর্ষ-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর গত ৭ই জুন (১১৬০) জেনেভার পুনরায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। এই দিন রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যালেরিচান জোরিল সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য একটি নূতন প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। যদি শীর্ষ-সম্মেলন হইত তাহা হইলে মঃ ক্রুশেভ নিরস্ত্রীকরণের এই প্রস্তাবটিই হইত সম্মেলনে উপস্থাপন করিতেন। শীর্ষ-সম্মেলন পণ্ড হওয়ার পর গত ২রা জুন সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ গ্রোমিকো ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ফ্রান্স এবং নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের হাতে পৃথক পৃথক ভাবে এই নূতন পরিকল্পনার বিবরণ অর্পণ করেন। অক্টোবর ৩রা জুন মঃ ক্রুশেভ সমস্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট সাধারণ ও সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বিবৃতি প্রেরণ করেন। এই বিবৃতির সঙ্গে রাশিয়ার নূতন প্রস্তাবটির বিবরণও প্রেরণ করা হয়। ঐ দিনই তিনি ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে রাশিয়ার নূতন পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। 'টাসের' প্রেরিত সূত্রে প্রকাশ যে, ১৯৫৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর মঃ ক্রুশেভ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সম্মিলিত আতিপুঞ্জ যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন তাহা হাজার পঞ্চসহস্রিত রাশিয়ার নূতন পরিকল্পনাটি তাহারই বিস্তৃত ভাষা রাশিয়ার নূতন প্রস্তাব তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। উহাতে আর্থিক আনুসঙ্গিক সর্বত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা,

অপর রাষ্ট্রের এলাকা হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ এক বৈশেষিক বাঁটি সমূহের বিলুপ্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। দশটি রাষ্ট্র লইয়া গঠিত পূর্ব-পশ্চিম নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন রাশিয়ার পরিকল্পনা উপস্থাপন করিবার সময় মঃ জোরিল প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের 'উদ্ধৃত আকাশ' পরিকল্পনা অগ্রাহ করিয়া বলেন যে, ইহা আন্তর্জাতিক গুপ্তচরবৃত্তি হাড়া আর কিছুই নহে। মার্কিন ইউ-২ গোল্ডেনা বিমানের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আকাশ হইতে এই ধরনের চিত্রগ্রহণ একমাত্র আক্রমণকারীরই কাজে আসে। কোন কোন রাষ্ট্র বিদেশে যে সকল বাঁটি স্থাপন করিয়াছে সেগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ঐগুলির প্রত্যেকটি নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে। তিনি বলেন, বাহ্যিক উদ্বেগ অসামুখিক আক্রমণের আক্রমণ করিবার হুমকিসহি বাহ্যিকের আছে তাহারাই গুপ্ত ইহাতে আপত্তি করিতে পারে। পরমাণু অস্ত্র প্রেরণের সমস্ত বান ধ্বংস করিতে হইবে এক ঐগুলি প্রেরণের নূতন বানাদি অর্থাৎ কেপনাভ্র, পাইলট শূন্য বিমান, পরমাণু-অস্ত্র বহনের উপযোগী সামরিক বিমান, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন ইত্যাদি নির্মাণ করা বন্ধ করিতে হইবে। অন্তর্জাত্যে যে সকল বিদেশী সৈন্য আছে তাহা নিজরাজ্যে কিয়দূর নিতে হইবে এবং বিদেশে যে সকল সামরিক বাঁটি আছে তাহাও ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই প্রথম স্তর। দ্বিতীয় পর্যায়ে পরমাণু অস্ত্র, বায়বীয়িক অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র এবং নরহত্যার অন্যান্য অস্ত্রাদি নিষিদ্ধ করিতে হইবে, ঐ সকল মজুত অস্ত্র ধ্বংস করিতে হইবে এবং ঐগুলি নির্মাণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। তৃতীয় পর্যায়ে সমস্ত রাষ্ট্রের সমস্ত বাহিনীর বিলোপের কাজ সম্পূর্ণ করিতে হইবে এবং অল্পসংখ্যক পুলিশ বাহিনী থাকিবে। সমস্ত কারখানার সামরিক উৎপাদন বন্ধ করিতে হইবে এবং প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র এবং উহাদের ডিপো ধ্বংস করিতে হইবে। এই পর্যায়ে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী হিসাবে কাজ করিবার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করিবেন। রাশিয়ার এই নূতন পরিকল্পনার ভাগ্যে কি ঘটবে সে সম্পর্কে কোন অহুমান করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। নিরস্ত্রীকরণ সমস্তার যদি সমাধান হয়, অন্যান্য সমস্তার সমাধান কঠিন হইবে না। ১৪ই জুন, ১৯৬০।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন !
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

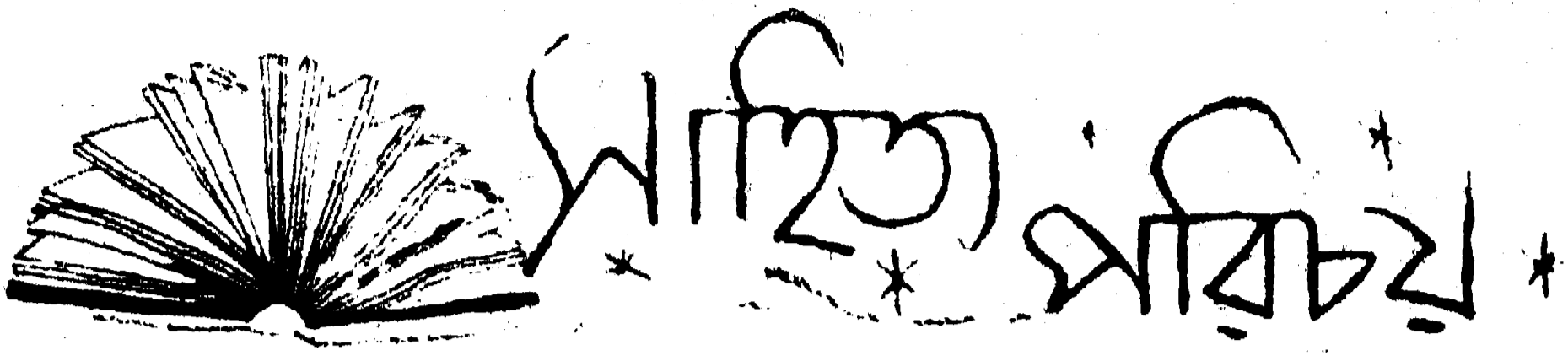
বাকলা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অল্পশূল, পিত্তশূল, অল্পপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, চোখের ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অনুরক্তি, অল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে মারা হত্যাশ হয়েছেন, তাঁরাও আশ্চর্যজনক সেবন করলে নরজীবন লাভ করলেন। নিঃসন্দেহে মূল্য ফেরৎ। ৩২ ডোজার প্রতি কৌটী ৩০ টাকায়, একডোজ ৩ কৌটী - ৮-।। আশা : ডঃ. মাঃ ও পাইকারীর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস- বাল্লিগঞ্জ (পূর্ব পাকিস্তান) গ্রাফ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী স্ট্রাট, কলিকতা-৭



উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নব জাগরণ

উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গলার সর্বাঙ্গিক গৌরবময় যুগ, বহু বৎসরের দাসত্বের দৈর্ঘ্যে বাঙ্গলার আতিমানস বধন প্রায় পশু, অশিকা আর কুসংস্কারের ঘন তমিষায় আচ্ছন্ন জাতির অস্তরাত্মা, বধন আকুল চিন্তে সন্ধান করছে সুক্তিপথ ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই ঘটেছিল উনিশ শতকের বাঙ্গলার নব যুগ-জাগরণ। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠতম মনীষার একত্র সমাবেশে সাধিত হয়েছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন, শিক্ষার, সমাজের, ধর্মের সাহিত্যে ও রাজনীতিতে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নব জাগরণ সেই যুগ বিপ্লবেরই ইতিহাস। আলোচ্য গ্রন্থের প্রামাণ্যতা প্রকৃত শ্রমের সহিত এই ইতিহাসকে পাঠকের সামনে ফুলে ধরেছেন। বাঙ্গলার মৃতপ্রায় ঐতিহ্য কি করে সামগ্রিক ও প্রাথমিক হলে উঠেছিল তার একটি একান্ত পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থে বা সম্পূর্ণ তথ্যানিষ্ঠ ও কালানুক্রমিক। অলৌকিক কল্পনার আশ্রয় নেন নি লেখক কোথাও এবং সেজন্যই পুস্তকখানি উনিশ শতকের বাঙ্গলার নব যুগ জাগরণের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। পুস্তকটি মুদ্রিত প্রচ্ছদে সজ্জিত ও এর অগ্রাগ্র আঙ্গিকও প্রশংসনীয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নব জাগরণ, ডক্টর সুশীলকুমার দত্ত, এম-এসসি, এম-এ, ডি-ফিল, প্রকাশক—শ্রী অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় এ. সুখার্জী অ্যান্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড। ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৭ টাকা মাত্র।

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস

বর্তমান পৃথিবীর অগ্রতম প্রধান রাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত দুনিয়া আজ এই বৃহত্তম গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের রীতি নীতি রাজনৈতিক বৃত্তিসমূহের সঙ্গে পরিচিত হতে উৎসুক, সেই উৎসুক্য অনেকাংশেই মিটেবে আলোচ্য গ্রন্থটি। প্রায় হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই বিপুল কলেবর পুস্তকে রুশ জাতির একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তার শৈশবাবস্থা থেকেই, সোভিয়েত রাষ্ট্রের ইতিহাসে রুশ জাতিই যে সর্বাঙ্গিক ও রূপপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী একথা অনস্বীকার্য আর সেজন্যই সোভিয়েত দেশের ইতিহাস প্রধানতঃ রুশ জাতিরই ইতিহাস। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে অক্ষুর বেধে সুপ্রচুর ধর্ম ও নিষ্ঠার সহিত এই ইতিহাস রচনা করেছেন লেখক, শৈশবচরিত্র রাজতন্ত্রের উত্থান ও পতন বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আনন্দিক অবস্থা থেকে তার আধুনিকতম রূপ গ্রহণ সবই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধনের পর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পটভূমিকার ঘটেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যার বার; সেনিনের রীতি পরিবর্তিত হয়েছিল তার মানসপুত্রের হাতে আবার তারও অনেক বদল ঘটেছে বর্তমানে, এই সমস্ত

বদল-লব কাহিনী ঐতিহাসিক তথ্যানিষ্ঠার সহিত উপস্থাপিত করা হয়েছে আলোচ্য পুস্তকে। মোট কথা, সোভিয়েত দেশের রাষ্ট্র ও সমাজনীতির অতীত ও বর্তমান রূপের একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে আলোচ্য বইটি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দাবী করতে পারে; এরূপ একটি মূল্যবান রচনা উপহার দেওয়ার জন্য গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্থ। নয়াটি ছবি সন্নিবেশিত করা হয়েছে বইটিতে, যা এর ঐতিহাসিক আকর্ষণ বাড়াই। আমরা আলোচ্য পুস্তকটির সাফল্য কামনা করি। "সোভিয়েত দেশের ইতিহাস"—খবি দাস। ক্যালকাটা পাবলিশার্স ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বাবো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা (বোর্ড বাধাই), পনেরো টাকা রেকসিনে বাধাই।

গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য

যে কোন জাতির মূল সংস্কৃতির উদ্ভব তার লোকসংস্কৃতি থেকেই, গণমানসের বর্ষাধিকরণটি পরিচুচিত হয় তাই গ্রামীন নৃত্য, নাট্যে সঙ্গীতে ও সাহিত্যেই; শান্তিদেব ঘোষ বহুদিন যাবৎ গ্রামীন নৃত্য-নাট্য, ও সঙ্গীত সম্বন্ধে অল্পসন্ধান করে চলেছেন, আলোচ্য গ্রন্থে গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা যে সম্পূর্ণ তথ্যানিষ্ঠ ও প্রামাণ্য একথা বহুক্ষেপেই বলা চলে। পশ্চিম বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, ত্রিপুরা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি সকল প্রদেশের লোকনৃত্য ও নাট্যের অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন তিনি এই স্বল্প পরিসর প্রস্তুতিতে। নৃত্য ও নাট্যসাহী বিদগ্ধ পাঠক তার রসাস্বাদনে তৃপ্ত হবেন এ আশা আমরা বহুক্ষেপেই করতে পারি। নানাভিরাগ প্রচ্ছদটি এঁকেছেন বিখ্যাত প্রচ্ছদকার অজিত গুপ্ত; অপরাপর আঙ্গিকও প্রশংসনীয়। লোকনৃত্যের কয়েকটি ছবিও বইটির শোভা বর্ধন করেছে। গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য—শান্তিদেব ঘোষ, প্রকাশক—জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি: ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ দাম—তিন টাকা মাত্র।

সজনীকান্ত দাসের স্বনির্বাচিত গল্প

প্রধানতঃ সাংবাদিক হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন একজন সজনীকান্ত দাস, বর্তমান সাহিত্যরথীদের মধ্যে এমন জনের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। শনিবারের চিঠির নির্মম নিতীক সমালোচনার সন্মুখীন হতে হয়নি বীকে কোনদিনও; কঠোর সমালোচক ছিলেন সেনিন সজনীকান্ত কিন্তু সেই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়, আসলে তিনি আত্মসাহিত্যিক, গল্প কবিতা ব্যঙ্গরচনা প্রভৃতি প্রভৃতি সাহিত্যের নানা পথে বিচরণ করেছেন তিনি সর্বত্র সাক্ষীস্বরূপে,

জান মধ্যে গল্পের লক্ষ্যই সর্বাধিক। বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকাদি থেকে মোট চব্বিশটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে আঙ্গোচ্য সংকলনটিতে; সজনীকান্তের লেখার মেজাজ সখাছে একটি পত্রিকার ধারণা করা যায় রচনাগুলি থেকে, মানসিক আবেগে প্রতিটি কাহিনী সজ্জ, ভাবানুভূতি সম্পূর্ণ আধুনিক না হলেও রসোপভোগে তা কোন বাধার সৃষ্টি না করে বরাহ সহায়কই হয়ে উঠেছে। সাধারণত ভবে সংকলনটি যে সুখপাঠ্য, একথা অনস্বীকার্য। আমরা সংকলনটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ শ্রীশোভন, ছাপা ও বঁধাই ভাল। প্রকাশক—প্রকাশচন্দ্র সাহা, গ্রন্থ, ২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—পাঁচ টাকা।

পরাশর

প্রেমের মিত্র সাহিত্য-জগতের এক বিশ্বকর নাম, সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই যে কলম ফলায় তাঁর সজ্জ লেখনী, এই সত্যেরই স্বাক্ষর বহন করে এনেছে তাঁর নবতম গল্পগ্রন্থটি। এই গল্পগুলির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নতুন, বস্তুতঃ এগুলি রহস্য-গল্পেরই পর্যায়ভুক্ত, শক্তিশালী সাহিত্যিকের কলমে রহস্য কাহিনী বা ডিটেক্টিভ গল্প যে কতটা রসোত্তীর্ণ হতে পারে, তার পরিচয় আমরা এর আগেও পেরেছি। প্রেমের মিত্র সাহিত্য-জগতের লিখিত ব্যোমকেশের গল্পগুলির মাধ্যমে। প্রেমের মিত্রের সৃষ্ট 'পরাশর' চরিত্রটি একমাত্র তার সঙ্গেই তুলনীয়। কাহিনী বিভাগে ভাবাসম্পদে গল্পগুলি যে কেবল সুখপাঠ্য তাই নয়, সাহিত্যসংগে পরিপূর্ণ। সাহিত্যের অঙ্গনে ডিটেক্টিভ বা রহস্য কাহিনীর যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় আজও, শক্তিশালী লেখকের কৃশল লেখনী তা অনেকাংশে দূর করবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদটি শোভন, অপরাধের আঙ্গিকও প্রশংসনীয়। 'পরাশর'—প্রেমের মিত্র। প্রকাশক—জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান অ্যান্ডোমিউনিসিটি পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

কালিদাসের কাব্যে ফুল

সহাকবি কালিদাসের নাম কালের অনতিক্রম্য প্রতীককেও করেছে পরাভূত, আজও বিন্দু রসিক জনের চিত্তে বহন হেঁপে ওঠে সৌন্দর্যের রসাত্মকতা তখন তা প্রকাশিত হয় কালিদাসের অমর কাব্য রসাবাদনে, গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে অপূর্ণ সৌন্দর্যমণ্ডিত কাব্য রোমকগুলি, কণ্ঠে, একান্ত অন্তরঙ্গভাৱ। কালিদাসের কাব্যে ফুল ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, পুষ্প-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রতি কাব্যেই, কবির মানসী নাট্যকাগণ কবর, বকুল, কেতকীর মালা জড়ান কুলে, রক্ত অশোক প্রতীকার থাকে সুন্দরীর চরণ স্পর্শে, ফুলবকের কর্ণিকা কোলে তরী ভাৱা শিখরিনন্দনের কর্ণকুলে, কৃত্রিম অলঙ্কারকে লজ্জা দেয় কোটা ফুলের অঙ্গলিন পরিমা। বিভিন্ন কাব্যের বিভিন্ন থেকে কবির এই পুষ্পাঙ্কনামূলক রোমকগুলি চয়ন করেছেন লেখক বর্জবান প্রহ্লাদ, শুধু যে চয়ন করেছেন তাই নয়, সুন্দর বঙ্গী অঙ্কন করেছেন সেগুলির। সঙ্গীতের পাঠকের পক্ষেও ব্যস্ত এই রসকল্পে প্রবেশাধিকার থাকে সেরকমই। লেখকের ভাৱা সুন্দর কাব্যগদ্যী, ফুলের রাজ্যে ফুলের মতই সুন্দর বিচরণ তাঁর, আমরা আশা করি কাব্যস্বামী পাঠক আঙ্গোচ্য

প্রতি সমালোচকের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। বইটির অঙ্গলঙ্কার সুন্দর। কালিদাসের কাব্যে ফুল—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক—জানকীনাথ বসু, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ, ১ নম্বর বোম সেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪৯ মাত্র।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজকের পাঠক চেনেন না, স্বীকৃতিস্বার্থে সহকালীন এই সাহিত্য-সাধকের রচনা আজ বিস্মৃতির কোলে লুপ্তপ্রায়, তাঁর সেই রচনা সজ্জের পুনরুদ্ধারের কার্যে সজ্জী হওয়ার জন্য আঙ্গোচ্য সংকলনখানির প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদ। সাহিত্যিক সাংবাদিক চারুচন্দ্রের রচনা তাঁর সহকালীন সাহিত্যের বীণা পথে পথচারণ করেনি, বস্তুত তিনি ছিলেন সামনে চলার মতল, আধুনিক সংস্কার-বর্জিত মুক্ত মনের পরিচয় বেলে তাঁর রচনার প্রতি পদে, সমসাময়িক সাহিত্যসমালোচকের হাতে তাই ফলের পুষ্পমালায় পরিবর্তে অধ্যাত্তির কষ্টক-মুকুটই ছুটেছিল তাঁর জীবন সৈনিক, আজ আমরা আধুনিক পাঠকরা অনেক বেশী বস্তুবাদী রচনার সাথে পরিচিত, তাই মনে হয় চারুচন্দ্রের সাহিত্য বিচারের আঙ্গই প্রকৃষ্ট দিন। আঙ্গোচ্য সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে মোট কুড়িটি গল্প, বিভিন্ন সুরের বিভিন্ন মেজাজের এই গল্পগুলি কেন একই সাজিতে চরিত্র নানা রঙের ফুল, রূপ রস গন্ধে ভরে জেলে যসিকচিত। "চুড়িওয়াল", "একটি বেহেদির পাতা", "শেখ" প্রভৃতি গল্পগুলি সত্যই অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, বিশেষতঃ "চুড়িওয়াল" গল্পটির ভিতর বাঙালীর একান্ত স্ববোরা যে রূপটি মুটে উঠেছে তা সত্যই অতুলনীয়, হিন্দু ধর্মের বাগবৈধব্যের নিদারুণ অভিশাপ অতি সুন্দর ভাবে আঁকা হয়েছে; বৃহৎ দরিদ্র চুড়িওয়ালার কষ্টপ্রতির হেহপাত্তীর প্রতি অপরিণীত ভাববাসার যেমনাও সখাচর্য করা তোলে পাঠকের চিত্ত। আমরা এই সুন্দর সংকলন প্রচারণা করে প্রচার কামনা করি। বইটির প্রচ্ছদ শোভন, অপরাধের আঙ্গিকও ভাল। প্রকাশক—প্রকাশচন্দ্র সাহা, গ্রন্থ, ২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৫৯ টাকা মাত্র।

প্রতিভা বসুর প্রেমের গল্প

বিষ্টি সুরে মিত্র প্রেমের গল্প বলেন প্রতিভা বসু। আঙ্গোচ্য প্রহ্লাদ এই বকম কয়েকটি গল্পই সংকলিত হয়েছে। মোট আটটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে, যার প্রত্যেকটিই কোন না কোন পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। প্রতিভা বসু প্রধানতঃ সুবয়স্কী শিল্পী, তাঁর প্রেমের গল্পে প্রেমই প্রধান, কোন বকম যতবাদ প্রহ্লাদের বিস্মৃতির প্রহ্লাদ নেই বলেই সহজ সরস স্বচ্ছ পতিভে বলা গল্পগুলি সজ্জ ও সুখপাঠ্য। সরস মধুর গল্পগুলি আমাদের মনকে ধুঁপী করে তোলে, অশাপবিন্দু সত্ব কিশোরীর কাজল-কালো চোখে বহন প্রহ্লাদ প্রেমের আলো বলে ওঠে তার ছোঁয়া বেন আমরাও উপভোগ করি মনে-প্রাণে। 'সুমিত্রার অপসৃভূতে' সংস্কার কেমন করে প্রেমের গলা টিপে ধরে তাই বর্ণিত হয়েছে অতি করুণ একটি বিরাসাত্ত কাহিনীর মাধ্যমে। নিপুণ হাতে লেখিকা এঁকেছেন প্রেমের নানা রঙ ছবিগুলি। কোথাও সেগেছে আনন্দের চক্কার, কোথাও বা বিরাসাত্ত অঙ্গলিন তরুতা; গল্পগুলি পড়ার পর মনে ভবে ওঠে আঙ্গোচ্য

ও বেদনার আর সেই আনন্দ-বেদনাতেই নিহিত রয়েছে এগুলির সার্থক পরিচয়। ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি ভাল। 'প্রেমের গল্প'—প্রতিভা বসু। প্রকাশক—প্রকাশচন্দ্র সাহা, গ্রন্থক, ২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪/- মাত্র।

জলপ্রপাত

জনপ্রিয় কথামিশ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সস্ত প্রকাশিত উপন্যাস 'জলপ্রপাত'; মানুষের মনের সমস্ত অলিগলির উপরেই লেখকের সতর্ক দৃষ্টি; কিছুই বেন তাঁর সন্ধানী নজর এড়িয়ে যায় না, অতি নিপুণ ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন তিনি মানব-মনের নানা বৈচিত্র্যকে এই গ্রন্থে। সেই ইটরভাল ত্রিভুজ, দুটি পুরুষ ও একটি নারী, অস্তর্ভূমিতে প্রতিনিয়ত বিকৃত মানুষগুলির জগতের সঙ্গে যে সংগ্রাম চলছিল অবিরাম, তারই উপসংহার ঘটলো এক জলপ্রপাতের ধারে কোন একদিন আকস্মিক ভাবে; নারীকো জীলেকার এই পরিণতি কাহিনীটিকে বিস্ময়গঞ্জ করে তুলেছে আর ছড়িয়ে দিয়েছে এক স্নিগ্ধ মাধুর্য বা গোষ্ঠুলির স্নানায়মান আভার মতোই আকর্ষণীয়। আলোচ্য পুস্তকটি বঙ্গীয় লেখকের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে বলেই আমাদের ধারণা। প্রখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী অজিত গুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদটি অতি মনোরম। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। 'জলপ্রপাত'—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, 'ক্রীড়িতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য দু' টাকা পঁচাত্তর নয় পয়সা মাত্র।

বাইশে আবেগ

রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ মহলে বাদ্যের প্রবেশাধিকার ছিল লেখিকা তাঁদের অন্ততম। তিনি কবিকে দেখেছেন অতি নিকট থেকে, তারই পরিচয় আঁকা হয়ে গিয়েছে বর্তমান গ্রন্থে, যদিও রবীন্দ্রনাথের শেষ খ্যাতি এই বর্ণিত বিষয়। কবির যোগেশব্যার দিনগুলির কল্পনামধুর এক ইতিহাস আলোচ্য পুস্তকটি। শেষের দিনগুলি এই অগ্নিবর্ণনা মহাপুরুষের কেমন করে কেটেছিলো সহজ সহজ ভাবায় তাই লিপিবদ্ধ করেছেন লেখিকা। রবীন্দ্রনাথের মত মানুষকেও যে ভোগ করতে হয়েছিল অপরিমিত যোগ্যতানা দিনের পর দিন, তার কাহিনী বেদনার বিধুর করে তোলে অন্তরকে, আবার বখন 'দেখি, শারীরিক বস্ত্র' কাতর করলেও আচ্ছন্ন করতে পারেনি তাঁকে, যোগেশব্যারই বয়ে চলেছে প্রসন্ন সংসতার প্রাণোচ্ছলতা তখন বিশ্বর জাগে মনে, প্রণাম জানাই এই দ্বিতীয় মহামানবকে সহস্রবার। গ্রন্থটির ছন্দে ছন্দে মানব রবীন্দ্রনাথের তাঁর এই কালজয়ী রূপটিই গভীর ভাবে ফুটে উঠেছে। অনাড়ম্বর মুকুটসম্পন্ন প্রচ্ছদে গ্রন্থটি শোভিত, অঙ্গসজ্জাও যথাযথ। বাইশে আবেগ—নির্মলকুমারী মহলানবিশ। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, ভ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৫/- টাকা মাত্র।

রজনীগন্ধা

মুকুটসম এই নাটকটি ধনঞ্জয় বৈরাগীর অধুনাতম রচনা, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে কয়েকজন সাহিত্যিক মনোবোগী হয়ে উঠেছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী তাঁদেরই অন্ততম; বাংলা নাটককে অসম্পূর্ণতা দূর করে তোলায় সাধনার তিনি মন; এ পটভূমি

কয়েকটি উৎকৃষ্ট নাটক তিনি রচনা করেছেন, সমুদ্র হয়েছে বাংলার নাট্য-সাহিত্য আর জনপ্রিয়তার চিহ্নিত হয়েছেন নাট্যকার। আলোচ্য এই নাটকখানিও যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে এ আশা আমরা বহুদূরই করতে পারি। রজনীগন্ধার চরিত্র মাত্র চারটি একটি নারী ও তিনটি পুরুষ, তিন অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকটির পতিবেগ কোথাও শিথিল হয়ে পড়েনি, বহুদূর সহজ এর ডায়লগ চরিত্রগুলির মুখে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে। কোথাও ক্লাস্তিকর একঘেয়েমির ছাপ পড়েনি আর সেজন্তই সামগ্রিক ভাবে নাটকটি সুপাঠ্য হয়ে উঠেছে শিল্প-সুখম প্রচ্ছদ এঁকেছেন অজিত গুপ্ত। অপরাপর আঙ্গিক প্রশংসনীয়। আমরা নাটকটির বহুল প্রচার কামনা করি। রজনীগন্ধা—ধনঞ্জয় বৈরাগী। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য—২'২৫ নঃ পঃ মাত্র।

উত্তর বসন্তে

বর্তমান বাঙালার সার্থকনামা সাহিত্যপ্রচেষ্টাদের মধ্যে আন্ততঃ্য মুখোপাধ্যায় অন্ততম। বাঙালী সাহিত্যের জীবিত্বের ক্ষেত্রে ইনি নানাভাবে সহায়তা করে আসছেন। বর্তমানে তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি উত্তর বসন্তে। গল্পগুলি যেমনই বৈশিষ্ট্যবান, তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রতিটি গল্পে লেখকের সৃজনশীলতার স্বাক্ষর বিস্তারিত। সর্বোপরি লেখক জীবনশিল্পী—জীবনকে ইনি নানা কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার ফলে জীবনের এক অপূর্ব অর্থ এর কাছে ধরা পড়ে গেছে— তাঁর গল্পগুলি আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করছে। প্রতিটি গল্পে লেখক আপন রসপিপাসুর মনের সমস্ত অমুদ্রিত উজাড় করে দিয়ে গল্পগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। প্রকাশক—কল্পনা প্রকাশনী ১১, ভ্রামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

গোত্রাস্তর

নাট্যকার শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের নাম তাঁর ময়াল নাটক নবায়ের সঙ্গে এমনই গুণপ্রসূত ভাবে জড়িত যে তাঁর নতুন কোন পরিচয় নিস্প্রয়োজন। গোত্রাস্তর তাঁরই নতুন প্রকাশিত নাটক এবং মঞ্চাভিনয়ে সাকল্যের গৌরব সে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিখণ্ডিত বাংলার রক্তপ্রোতে ভেসে-আগা একটি রক্ত পরিবারের কাহিনী নিয়ে এই নাটক পড়ে উঠেছে। তারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মালিকের নৃশংসতার চাকায় পিষ্ট চিরকালের সেই অমর শ্রমিকের দল। তথাকথিত ভ্রলোক হয়ে থেকে নিরুপায় ভাবে সমাজের উচ্চলোকের জীবনের মায় না খেয়ে এই শ্রমিকদের সঙ্গে সংস্বারের ব্যবধানটুকু বুটয়ে কেলে নিজের জোরে দাঁড়ানোর আদর্শ তুলে ধরেছেন নাট্যকার, দিয়েছেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান। প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গীয় ভাবায় রচিত ডায়লগগুলি নাটকটিতে নতুনত্ব এসেছে। ভূমিকায় নাট্যকারের বহু মূল্যবান বক্তব্য স্থান লাভ করেছে। তবে নাটকটির পরিণতি একাধারে আকস্মিক ও অনিশ্চিত। জীবনের যে জয়পানের কথা বলেছেন নাট্যকার, ঘটনার মাধ্যমে তাকে আরও একটু প্রকাশিত করে বলা হলে বেন ভালো হ'ত— দৃষ্টি পেলোর পটক ও কর্ণক। বাংলা সাহিত্যে নাট্যকারের

অভাববোধ করেন সকলেই, এ নিয়ে আলোচনাও হয় বিস্তার। তবু উন্নতি বস্তুর হওয়াই তা যথেষ্ট নয়, সর্বদাই অল্পতর আমরা করছি যে আরও উন্নতি হওয়া উচিত, আরও সমৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার জীবন ভট্টাচার্য এই পথের পথিক—ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বাংলা নাটক নিয়ে কালচার করে চলেছেন, তাঁর এই প্রচেষ্টা অবশ্যই অভিনন্দনীয়। প্রকাশক—জাতীয় সাহিত্য পরিষদ—১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। দাম—হু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

একটি অক্ষর, ছুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ

সাহিত্যের আসরে নীলকণ্ঠ অপরিচিত নন, আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর প্রথম গল্প সংগ্রহ, এতে মোট এগারটি গল্প সংকলিত হয়েছে, সাধারণতঃ হাঙ্গা রম্য-রচনা পাবনর্শী হিসাবেই তাঁকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত, সেই নীলকণ্ঠ যে একজন সুদক্ষ গল্পিক তারই স্বাক্ষর বহন করে এনেছে তাঁর এই নবতম রচনা।—গল্পগুলির আজিক নিখুঁত বললেও অকৃত্য করা হয় না, গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লেখক অতি সতর্কতার সঙ্গে কল্পম চালিয়েছেন যার ফলে গল্পগুলি কোথাও এতটুকু বোরিং হয়ে ওঠেনি, আপন আপন সীমাকে করেনি ছাড়া। বস্তুত এই পরিমিত জ্ঞানই ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় বা অনেক সময়ই থাকে অল্পপস্থিত, বর্তমান লেখক সে সবকিছু সম্পূর্ণ সচেতন আর সেজন্তই তাঁর গল্পগুলির পক্ষে প্রকৃত গল্প হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। বইটির প্রচ্ছদ কৃতিসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল।— একটি অক্ষর ছুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ নীলকণ্ঠ, প্রকাশক—কল্পনা প্রকাশনী, ১১ শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩/- মাত্র।

বেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল

আলোচ্য পুস্তকটি একটি কাহিনী প্রধান কাব্য; একটি ছেলে ও একটি মেয়ের চিরন্তন ভালবাসাবাসির খেলাকে মধুর সাবলীল ছন্দে গেঁথেছেন লেখিকা। নবাগত লেখিকা ছদ্মনামের আড়ালে আশ্রয়-প্রকাশ করেছেন, তাঁর ভাষা সহজ ও সরল হালকা একখানি কাব্যগ্রন্থ হিসেবে বইটি সাধারণের মনে ধরবে বলেই আমরা আশা করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই কাহিনী কাব্য কিছুদিন পূর্বে 'মাসিক বহুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা বইটির সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ কৃতিসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। বেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল—বিবি, প্রকাশক—শ্রীমুদ্রার সরকার, এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাট্টোজ্যে ষ্ট্রীট-কলিকাতা-১২। দাম—২'৫০ নঃ পঃ।

গাঙ্কব

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উপন্যাস, সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত লেখকের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি আছে তার পরিচয় মেলে তাঁর এই রচনার, লেখকের ভাষা সহজ ও সাবলীল, কোন বড় সমস্যার অবতারণা না করে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসটি পাঠকের খুশী করবে বলেই মনে হয়। সাধারণ মানুষের জীবনে অটলতা কম, আমাদের চারপাশে যে মানুষ তাদেরই এক অন্তরঙ্গ পরিচয়

দিয়েছেন লেখক সহজ ভাবে, কলে একটি কাহিনী দানা বেঁধে উঠেছে স্বাভাবিক রীতিতেই, আমরা বইটির সাফল্য কামনা করি। বইটির আজিক সবকিছুও অল্পবোধ করার কিছু নাই। গাঙ্কব—সত্যপ্রিয় বোব। প্রকাশক—ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাইভেট লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ মূল্য—৩'৫০ নঃ পঃ মাত্র।

জলতরঙ্গ

সাহিত্যিক সাংবাদিক সুনীল বোবের সত্ত প্রকাশিত উপন্যাস 'জলতরঙ্গ,' একটি সাধারণ মেয়ে জীবনের নানা স্বাভাবিক প্রতিঘাত ব্যথা বেদনাকে অতিক্রম করে কেমন করে বাঁচবার অবলম্বন খুঁজে পেল কুশলী কলে লেখক তা বিবৃত করেছেন। প্রথম বোবনের নিদারুণ আশাজন্মের মর্মান্তিক বেদনার নাটিকা কাজলের ফটেছিল কৃতিবিকার, সর্বনাশা অভিমানে ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছিল সে, প্রথম মাতৃদেহ সূচনার ঘটলো তার অবসান, উচ্ছ্বল অশান্ত জীবনে নেমে এল সার্থকতার মোহন পরশ, কাজল বেঁচে উঠল নতুন জীবনে আপন মহিমায়, সব অতীত মুছে ফেলে উঠে এল অগ্নিতপ্তা চিরন্তনী জননী। সুনীল অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন লেখক গভীর জীবনবোধের অধিকারী আর তারই পরিচয়ে প্রোচ্ছল তাঁর এই নবতম সৃষ্টি যে সাহিত্য রসিক পাঠক সমাজে আদৃত হবে, এ আশা করা অসঙ্গত নয়, আমরা আলোচ্য গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। শোভন প্রচ্ছদ ও অপরাপর আজিক বইটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। জলতরঙ্গ—সুনীল বোব, প্রকাশক—জ্ঞানদাল পাবলিশার্স, ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—৭/- মাত্র।

মধুচক্র

বহুদিন হতেই মধ্যবিত্ত বাঙালী মেস-জীবনে অভ্যস্ত, সাহিত্যেও ঘটেছে তার প্রতিকলন স্বাভাবিক রীতিতেই। শরৎচন্দ্রের অমর উপন্যাস চরিত্রহীনের নাট্যিকরূপে দেখা দিয়ে মেসের বি সাবিত্রী চমক লাগিয়েছিল একদিন পাঠক-মানসে, প্রতিভাশা লেখক শ্রীমরোজকুমার রায়চৌধুরীর সত্ত-প্রকাশিত উপন্যাস 'মধুচক্র' এই অতি পরিচিত বিষয়বস্তু অবলম্বনেই লিখিত। সাধারণ একটি মেস, তাতে বাস করেন সাধারণ কয়েকটি মানুষ, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সরসোচ্ছল ভাষায় বর্ণনা করেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থে। সামান্য সামান্য ঘটনাগুলি লেখকের স্নিগ্ধ সজ্জন লেখনীর মাধ্যমে যেন প্রাণ পেয়েছে; সর্বাপেক্ষা বা বিষয়কর তা হল, বইটি সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীভূমিকা বর্জিত, প্রেম বা ভাবাবেগের বিন্দুমাত্র অবতারণা না করেও যে কোন বিষয়বস্তুকে এতটা আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, একথা আলোচ্য পুস্তকটি পাঠ না করলে বিশ্বাস করা সম্ভবই কঠিন। গ্রন্থকারকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই; একটি স্তপাঠ্য মনোরম রচনা তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, আমরা আশা করি সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের প্রতিষ্ঠা ও বশ তাঁর এই নবতম রচনার মাধ্যমে আরও বর্ধিত হবে। অঙ্গসজ্জা যথাযথ, 'মধুচক্র'—শ্রীমরোজকুমার রায়চৌধুরী। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮'১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১। দাম হু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

শব্দীর প্রতীক্ষা

আইতি বাহা

সেই মেয়েটি বাসটপেজে এসে দাঁড়ালো। বাঁ হাতে বুকের কাছে ক'খানা বই খাতা আর ডান হাতে কাঁধে ঝোলানো জ্যানিটি ব্যাগটা চেপে ধরে।

আরও চকল চোখ দুটি কাঁকে বেন খুঁজে ফিরলো। একবার বাঁ হাতে কালো কিতের বাঁধা ছোট হাতখড়িটার দিকে তাকালো। কালো সফ্র জমরকুক ড্র হুটি একবার বেন কুঁচকে উঠলো। দাঁত দিয়ে বাঁ দিকের নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরে একটুকুণ কি ভেবে নিয়ে চলতে শুরু করলো।

হু পাও যেতে হোল না, পেছন থেকে একখানা বলিষ্ঠ হাত মেয়েটির কাঁধে এসে পড়লো। মেয়েটি চমকে ফিরে তাকালো। সুরক্ষা রক্ষিত হুটি ঠোঁটে খেলে গেল মিষ্টি হাসির ঝিলিক। আঙুলে আঙুলে হুড়িয়ে পড়লো তা সারা মুখে।

খন আর কালো চুলগুলো পেছনে ওটানো, কয়েক পোছা এসে পড়ছে প্রশান্ত কপালের ওপর। চোখ দুটিতে প্রশ্নের বুদ্ধির দীপ্তি। সব মিলিয়ে বেশ লাগে দেখতে ছেলেটিকেও।

প্রায় প্রতিদিনই ওদের এমনি সময় এখানে দেখা হয়। তারপর হুজনে কোথায় বেন যায়। কোনদিন দেখি মেয়েটি অপেক্ষা করছে, আবার কোনদিন দেখি ছেলেটি গুণে চলছে প্রতীক্ষার প্রহর। বহুদূর থেকে ছুটে এসে খেমে পড়া বাসগুলোর দিকে তাকাচ্ছে সতৃষ্ণ নয়নে।

ওরা হয়তো কেউই জানে না, আমি একজন নীরব দর্শক ও সাক্ষী ওদের এই বাতায় ও সাক্ষাতের।

আঙুলে আঙুলে আমাকেও বেন পেয়ে বসলো এক অদ্ভুত নেশার। বাসটপেজের ঠিক উণ্টোদিকে আমার বাড়ী। সামনের কুল বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে কাটে আমার প্রতিদিনের বিকাল ও সন্ধ্যার সামান্য অবসরটুকু। বৈশ্বিক জীবনের একঘেরেমির থেকে এই সময়টুকু আমি চুরি করি। তাই মনে মনে কোথাও আমার হারিয়ে যেতে থাকে না মানা। হুছে বায় বাতায়, তুলে বাই নিজের অস্তিত্ব। পাশের টিপসটার ওপর চায়ের পেরালা খুম উকীরূপ করে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে হতাশ হয়ে হয় নীরব। আনমনে থাকিরে থাকি বাইরের দিকে, কি যে দেখি তা আমি নিজেই জানি না।

সামনের বাসটপেজে অনেক লোকের গুঠানামা, আনাগোনা দেখতে দেখতেই একদিন চোখে পড়লো ওদের। প্রথম বৈশ্বিক ওদের লক্ষ্য করি সেদিন দেখেছিলাম অপূর্ব এক ছন্দ। বেন হুটি নদীর উজ্জল ধারা। হুদিক থেকে এসে মেলে।

হুজনে পাশাপাশি চলতে শুরু করে সামনের চকড়া রাস্তাটা করে। জানতে ইচ্ছে হয়, কোথায় বায় ওরা এমনি করে। আমার এলোমেলো হুটি সজাগ হয়ে ওঠে ওদের একজনকে দেখতে পেলেই। ওদের জন্ত আমিও এখন প্রতীক্ষা করি, ওদের থেকে সামান্য দূরে বসে নিজের মনে বুনে চলি করনার জাল।

সেদিন বহুদূর অস্থল তনে, আরামের বিক্রামটুকু ত্যাগ করে দাঁড়ালাম এসে বাসটপেজে। আমার বাস আনতে এগিয়ে গেলাম।

—দাঁড়ান, মেয়েহলে আগে দাঁড়ানো দিন—

সরে দাঁড়ালাম বাস কজারের পতীর কর্তে। বাসে উঠতে গিয়ে ধমকে গেলাম। সেই মেয়েটি। বই আর ব্যাগ হাতে।

আমার আর বাসে ওঠা হোল না। শুকে এক কাহ্নে দেখে কিছুকণ দাঁড়িয়ে দেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না। দূর থেকে বা দেখি কাহ্নে এসে দেখলাম এ তার চেহেরেও সুন্দর।

সারা একখানা মাজাজী শাড়ী আর গায়ে সাদা স্কাউট। দীর্ঘ রুক্ষ বেশী কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে আরো নীচে। দীর্ঘল সুন্দর চোখ দুটির ওপর এসে পড়ছে একসোছা রুক্ষ চুল। ডর বেন সরিয়ে দেবার কোন আগ্রহই নেই।

মেয়েটির সঙ্গে আমিও অপেক্ষা করতে লাগলাম ছেলেটির জন্ত। ও এল একটু পরেই। আজ ও পরেছে হুটি আর টিলে-পাজাবী। পাজাবীর গলার কাহ্নের হুটি বোতাম খোলা; জানি না সেটা ইচ্ছাকৃত কি না। কিন্তু এতেই বেন ওর পৌরব সৌন্দর্যটুকু বেশী করে ফুটে উঠছে। প্রশান্ত বন্ধের সামান্য উদ্ভূত অংশটুকু পরিচয় দিচ্ছে ওর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের।

চমক ভাঙলো আমার ওদের একটা পার্কের মধ্যে হুতে দেখে। আমিও কখন চল এলেছি ওদের সঙ্গে খেরালই করিনি। একবার মনে হোল কিরে বাই এবার। কিন্তু পারলাম না। কিসের নেশা বেন জোর করে টেনে নিয়ে চললো আমাকে ওদের পিছনে।

মস্তবড় পার্কটার একটা নির্জন অন্ধকার জায়গা দেখে বসলো হু জনে। ঠিক পাশাপাশি নয়, একটু দূরে হুখোহুখি।

আমিও বসলাম সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পিছন দিকে। সেখান থেকে স্পষ্ট জনতে গেলাম মেয়েটির গলা।

—এমনি করে আমাকে আসতে বলে তোমার কি লাভ হয় বলতো ?

মেয়েটির একটি মরম হাত তুলে নিল নিজের হাতের বুঠার ছেলেটি, তারপর খেমে খেমে বললো—তা কি তুমি আজও বোঝনি শব্দীর? এতদিনে বুঝলাম মেয়েটির নাম শব্দীর। তারি মিষ্টি নাম।

হুই অঞ্চল হুট গলার শব্দীর উত্তর দিল—কি তুমি বুঝতে বল শব্দীর? এমনি করে দিনের পর দিন সকলের চোখ এড়িয়ে, সকলকে কাঁকি দিয়ে, হু' বটীর জন্ত একটু দেখা করা, হুটো কথা বলা; কি প্রয়োজন এর বলতে পার? কি শূখ পাও তুমি এতে?

মনে মনে ভাবলাম সকলের চোখই কি এড়াতে পার তোমরা?

—এ ভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে সত্যি কি তোমার ভাল লাগে না শব্দীর? এ ছাড়া কি চাও তুমি আমাকে বল।

—কি চাই? তুমি জান না শব্দীর, কত বিনিময় রজনী কাটে আমার দুঃসহ একাকীঘের বাতনায়। কি পতীর এক অতাব বোধ দিন-রাত আমাকে করে করে খায়। যে অতাব চোখে দেখা যায় না অঞ্চল বুকে বোঝা যায়। কাঁটার মত বিঁধে থাকে মনে, কুশের অধুরের মত ক্ষুদ্র, হুটির অগোচর তবু তীক্ষ্ণতম। বই নিয়ে বসলে বইয়ের পাঠ্যের ভেসে ওঠে তোমার হুখ। সব আমার এলোমেলো হুয়ে 'যায়। কিছু ভাল লাগে না আমার শব্দীর? ইচ্ছে করে অনেক দূরে কোথাও চল বাই।

—কিন্তু তুমি তো জান শব্দীর, তোমাকে নিয়ে কোথাও চলি গিয়ে দর বীকতে আমি পারবো না। দেখ, বায় কোন উপকার

করতে আমি পাবো না; তার কোন কতিও করব না।

আমি বুঝলাম না কার্কে স্ত্রুত কতি বলছে। এই অন্ধকারে কসেও আমার মনে হোল, স্ত্রুতর এ ধরণের কথার শব্দীর শব্দর হুঁধানা বোধ হয় লাল হয়ে উঠলো। অনেককণ ও দুই হাঁটুর মতো হুঁধু ওঁজে চূপ করে বসে রইলো। কোন কথা বললো না।

কিছুকণ চূপ করে থেকে স্ত্রুত শব্দীর কাঁধের ওপর একটা আলতো হাত ছুঁইয়ে খুব আন্তে প্রের করলো—কি হোল শব্দী? কথা বলবে না?

এতকণে শব্দী হুঁধু তুললো। অস্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে ঘেরিয়ে এল একটি দীর্ঘবাস। কার্কা-ভেজা ভারী গলায় বললো—কি বলবো বল? অনেক রাত হোল, চল এবার কিয়ি।

—রাগ কোর না লক্ষীটি। আবার দেখা কোর। বল আসবে?

শব্দী উঠে পাড়ালো। চলতে চলতে বেন অতি কষ্টে বললো—আসবো...।

আমার মনে হোল এই তিনটি অক্ষর উচ্চারণ করতে শব্দীর বেন অনেক পরিশ্রম হোল।

ওরা চল গেল। কিন্তু উঠতে পারলাম না আমি। অনেক কথা আর কল্পনা উঁকি দিতে লাগলো মনের এদিক-ওদিক থেকে। ওদের ঠিক বুকে উঠতে পারলাম না। সব কথা জানবার জন্ত মনটা হয়ে রইলো উৎসুক।

ওদের একজনকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি এসে পাড়ালাম, বাসগুপেজে। সঙ্গে গিরে বললাম পার্কের নির্জন কোণে। ওদের হুঁট এড়িয়ে।

আজ বেন মেয়েটিকে বড় বেশী বিমর্ষ মনে হোল। একটু পরেই তনতে পেলাম মেয়েটির কথা। বেন পাতালের গভীরতম তলদেশ থেকে উঠে এল এ গলায় স্বর।

—আজ তোমাকে একটা কথা বলবো স্ত্রুত! জানি হয়তো তনে তুমি আঘাত পাবে। কিন্তু আমি নিরুপায়, আমাকে বলতেই হবে।

হুঁধটা কিয়িবে নিল শব্দী। বুকে জলের ধারের আলোটার চাঁর দিকে ঘুরে মরা কালো পোকটার কাছ পাঠিয়ে দিল ওর স্ত্রুতর চোখে উদাস হুঁট।

আকরানী বিকেল পেরিয়ে তখন নেমেছে ধূসর সন্ধ্যা। ঐ দিকে চেয়ে থেকেই বললো—দেখ এমনি করে তোমার সঙ্গে দেখা করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

—শব্দী!

স্বপ্নতীর আর্দ্রনাদের মত শোনালো স্ত্রুতর গলা।

—আমাকে কমা কর স্ত্রুত। এমনি করে বেশি দিন চলতে পারে না তা তো তোমাকে আগেই বলেছি। আমার মনের চাহিদা আন্তে আন্তে বেড়ে চলেছে। এটা হয়তো হু জনের পক্ষেই কতিকর। এমনি করে বেশি দিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব স্ত্রুত।

—শব্দী, তুমি শুধু নিজের দিকটাই ভাবছো। কখনো কি ভেবেছো আমার কি হবে? কেমন করে কাটবে আমার সমস্ত জীবন? তুমি হয়তো বলবে—কেম বিয়ে করবো, সংসার হবে, মৃত্যু-কেন্দ্র-বিধি-পথে মিল করবো। কিন্তু তুমি তো জান না

শব্দী, আমার সুখ, শান্তি আনন্দ সব তুমি কেড়ে নিয়েছ। আমি কোন দিন আর সুখী হতে পারবো না।

—কেড়ে নেব কেন? বল তুমি কিসে সুখী হবে? আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় নিশ্চয় সুখী করবো তোমাকে।

—তা আর সম্ভব নয় শব্দী!

—কেন? কেন সম্ভব নয়?

—আমি তোমাকে একান্ত ভাবে চাই শব্দী! তোমাকে পেলে আমি সুখী হই। কিন্তু তা আর হবার নয়। আমাদের মিলনে তোমার বাবা মা হুঁধু পাবেন। জানতে, তোমার বা আমার কারো বাড়ীরই মত নেই আমাদের মিলনে? তাই আমাদের মিলনে কেউ ভাল চোখে দেখবে না। আমাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ অক্ষ কোরবে না কোনদিন। তারপর আমাদের ভালবাসার সাক্ষী হয়ে যে আসবে, সেই কি আমাদের কথা কোরবে কোনদিন? বল শব্দী, এতে কি তুমি সুখী হবে? শুধু হুঁধনের জন্ত হুঁধনের বাস সে তো মরারই নামান্তর।

—আমার সম্পূর্ণ তুমি পেলে না, মনে করে কোনদিনই আমার তুমি প্রেরণ করতে পারবে না তা আমি জানি; কিন্তু তাই বলে আত্মীয়-স্বজনের দোহাই পেতে না। দোষ দিও না অস্তের—

শব্দী! আমাকে কি ভাব তুমি? আজ্ঞা আজ তোমার কি হয়েছে বলতো? এখন দেখছি আজ না আসলেই তুমি ভাল করতে।

শব্দী কিন্তু স্ত্রুতর কোন কথা শুনেছে বলে মনে হোল না। ও হুঁধু নীচু করে বলে বেতে লাগলো—আমাকে প্রেরণ করলে তুমি ঠকতে না স্ত্রুত। তোমাকে আপন করে পেলে তোমার হুঁট হাত আমি ভরিয়ে দিতাম আমার ভালবাসায়। রূপ ছিল দেখে, তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে বেতে তাই আটকালো না। কত দিনই বা? কিয়তে হোল কুমারীর বেশে। চুকলাম কলেজে। সমস্ত রূপ রঙ রস আমার সামনে থেকে হুঁধু গেল। আগে মা বাবা বলতেন—মেয়ে বড় হচ্ছে বিয়ে দিতে হবে। তারপর সুর পাণ্টে বলতে শুরু করলেন এখন এর কি হবে। নিঃশব্দে মেনে নিলাম সবই। কিন্তু সমস্ত সংসারের ওপর মন বেন আমার আন্তে আন্তে বিবিয়ে উঠতে লাগলো। এখন সময় সামনে এসে পাড়ালে তুমি। হারিয়ে কেললাম নিজেকে। সহ্যহুঁধুতির প্রদেশ পড়লো মনে। অর করলে বুঝি আমার। রাতের অন্ধকারে দেখলাম তোমার ছায়া; ঘিরে আছে আমার সমস্ত সত্তা। ডর পেলাম। পালিয়ে বেড়ালাম। পালিয়ে বেড়ালাম তোমার কাছ থেকে। কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না। তোমার ভাবগভীর কথাগুলো সহজ হাসির ঝোয়ারে ডাসিয়ে নিয়ে যেতাম বলে, তুমি একদিন বললে—কেবল উচ্ছল তুমি, কোন গভীরতা নেই। সেদিন কোন জবাব দিতে পারিনি। আজ আমার গভীরতার তল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তোমার গভীরতার তল খুঁজতে গিরে আমি ঠেকে গেছি স্ত্রুত! তোমার মত স্বপ্নীর প্রেম আমার নয়। আমি মাহুধ। আমার মতে কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষা সব আছে। তাই হয়তো তোমার মত নিশ্চয় থাকতে পারি না।...

স্ত্রুত কথা বললো না। হুঁধু নীচু করে ঠেসে ঠেসে বাসের

ভগ্না হিঁড়ছিলো। ওর সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল গভীর এক দীর্ঘশ্বাস। শবরীর বুকে আজ কোন দিকে লক্ষ্য নেই। ও বেন আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

একদিন তোমাকে বলেছিলাম সুরত! আমি বড় দুর্বল। আমার কাছ থেকে তুমি কখনও সরে থেক না। তাহলে তোমাকে হয়তো হারিয়ে ফেলবো। তোমাকে আমার ভুলতে দিও না : আপনার করে রেখ, তোমারই থাকবো চিরদিন। তা তুমি পারলে না সুরত।

—তোমার সব কথাই জবাব দেব আর একদিন শুধু এস শবরী।

আবার আমার আসতে হোল। চেয়ে চেয়ে দেখলাম শবরীর অপরূপ রূপ। শুধু বেশ বেন ওর দেহের সঙ্গে মিশে গেছে। এতদিনে আমার মনে হোল ওকে সাদা ছাড়া কখনও কিছু পরতে দেখিনি। অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে বসে রইলো। কাণ্ডন-শেষের শিশুসদৃশ্য বিশেষে এগিয়ে বেতে লাগলো রাত্রির অতল অন্ধকারে। নির্জন হয়ে এল চারিদিক।

হুই হাতের তলার তুলে ধরলো সুরত শবরীর সুন্দর মুখখানা। চেয়ে রইলো অপলকে।...একটু সময় এর মৃত্যু।...ঠোৎ বেন বড় ব্যস্ত হয়ে উঠে পাড়ালো সুরত।...শবরী শুক, ভাবাক।

—আমাকে কমা কর শবরী। ভুল করতে বাচ্ছিলাম। তোমাকে আপনার করে ধরে রাখবার মনের জোর এখন আমার নেই। এখন তোমার কোন ক্ষতি করবার অধিকারও আমার নেই।...।

তুমি চলে যাও শবরী। তোমাকে ভুলতে আমি কোনদিন পারবো না। কিন্তু অমুরোধ রইলো আমাকে তুমি ভুলে যেও।

অসহ বেদনার কুঞ্চিত হোল শবরীর ঠোঁটের প্রান্ত। পাতলা ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠলো, কি বেন বললো। কিছুই শোনা গেল না। আগতপ্রায় চোখের জল গোপন করতে বুকে ঠাঁত দিয়ে সজোরে চেপে ধরলো নীচের ঠোঁটটা। মুখটা ঘুরিয়ে নিল অন্ধদিকে। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো। রাস্তার ভীড়ে বিশেষ গেল ওর দেহটা।

* * * * *

একটা 'ডবল ডেকার' বাসের সামনে অনেক ভীড় দেখে পাড়িয়ে পড়লাম। কিসের বেন গোলমাল চারদিকে। ভীড় সরিয়ে এগিয়ে গেলাম। ভ্যানিটি ব্যাগটা একদিকে হিটকে পড়েছে...সাদা শাড়ীখানা আর সাদা নেই...বইগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিকে ওদিকে। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম মা। কিভাবে গিয়ে চোখে পড়লো এক পাশে পাড়িয়ে থাকা সুরতের বিহ্বল মূর্তি। ও বেন এখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। হয়তো সাহস নেই, এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিল শবরী ওর পরিচিত কেউ বলে। একবার মনে হোল সুরতের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। সাহস না দিই ওকে। কিন্তু কি পরিচয় দেব নিজের? ও তো জানে না 'আমি ওদের অনেক পরিচয় জানি।

অপরিচয় বেদনা মনটাকে পজু করে দিল কিছুক্ষণের জন্যে। শবরী শুধু চলে গেল না; কেড়ে নিয়ে গেল আমার সন্ধ্যার সামান্য অবসরের সুন্দর মুহূর্তগুলি।

বের্গামোর দুর্গদ্বারে

আলভাতর কোয়াসিমদো

ক্রান্ত মোরগের চিংকার ভেসে আসে
দূর-দূরান্তর হতে প্রাচীরের পাশ দিয়ে
বরফাচ্ছন্ন দুর্গশিখর নিশ্চিন্ত।

ছন্দময় জীবনের সেই ধ্বনি
কানে এসে বেজেছিল
হাওয়ার হাওয়ার শুনেছ তার
ক্রন্দন, আর ধোঁয়াটে আলোর পারে
স্বমতাজা পাখীদের কলগান।

নিজের সঙ্গে কথা বলে তুমি আজ
বীতরাগ, নীরব তোমার বাণী তাই আজ
ঘোরে করে পূর্বের চাকায়।

ধরা পড়েছে ত্রিমাণ হরিণশাবক
ঘুর ভেজেছে সারসের, নয়া ছনিয়ার প্রতীক
নীচব নিম্পন্দ সারস।

স্নেহের রাতের চাঁদ তুবে বার
পৃথিবীর আদিম চাঁদ;
অপ্রস্তুতি মারা দিয়ে ঘেরা
নীচে জাগে সনাতন পৃথিবী।

তোমার পরিক্রমার নেই শেষ
স্তোরণের শিখর হতে
সাইপ্রাস বাউবনের পথ আগলে
বিরামহীন তোমার পথ চলা।

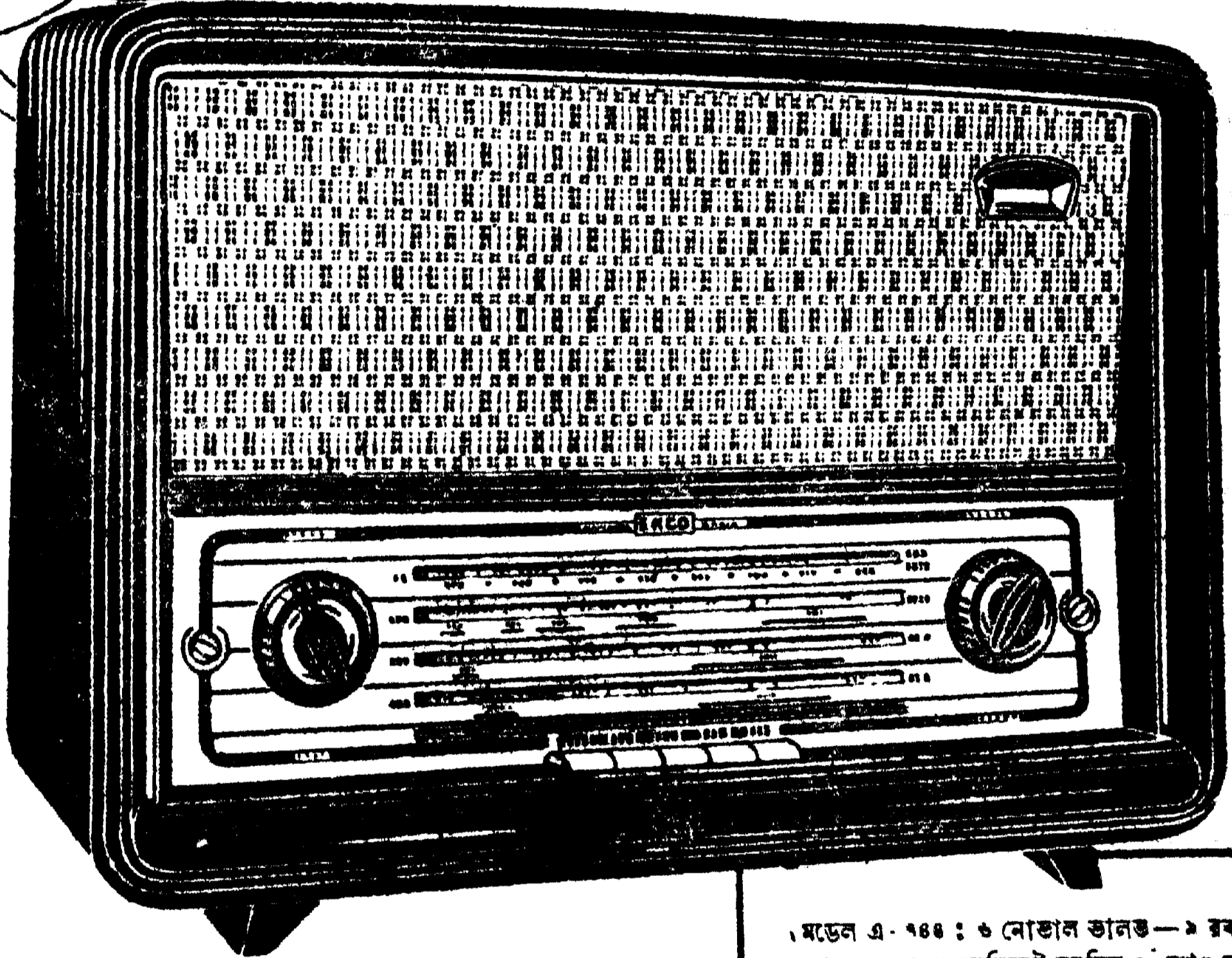
সবুজের আশ্রয়ে ঢাকা পড়ে আছে
জীবনের অনল জ্বালা—
আর সেই গতমান শোক?
সে তো জানেনেই অংশিকা
জিন্ন জঙ্গিয়া।

অনুবাদক—অমলোক্তমাধ ঘটক



অনবদ্য শিল্প-কৌশল...
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য...

ন্যাশনাল একো-র নতুন মডেল এ-৭৪৪



সঙ্গীত রসিকেরা ন্যাশনাল-একোর চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হয়ে পারবেন না। এর অনিন্দ্য গড়ন, কলাকৌশল ও চক্চকে চেহারা যেমন নয়নাভিরাম, তেমনি ক্ষতিমধুর ও সুস্পষ্ট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সত্যি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারকে বাজিয়ে শোনাতে বসুন—কোন খরচ নেই।

আমাদের অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো ডিলারের
কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : ৬ নোডাল ভালভ—২ বকম কাজ, মনোরম কেবিনেট সমন্বিত ৪-ব্যাণ্ড ব্লক এসি রেডিও—সারা পৃথিবীর স্টেশন ধরা যায়। পিচানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন; ম্যাজিক আই; গ্রামোফোন ও একস্ট্রা স্পীকারের জুড়ি বোপা-যোগ ব্যবস্থা; টেপ রেকর্ডারের জুড়ি বিশেষ বন্দোবস্ত। এক বছরের গ্যারান্টি।

৪১৫৭ নীট

স্থানীয় টায়ার বস্ত্র



ন্যাশনাল একো রেডিওই সেবা—এগুলি



কেন্দ্রীয় রেডিও অ্যান্ড অ্যান্টারেন্সেস প্রাইভেট লি:

কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • মাদ্রাস • বাদাকোর • দিল্লী • সেকেন্দরাবাদ



JWT, GRA 122



স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

কিছু উর্ধ্বশীর্ষ চিত্রগ্রহণও কোনদিন শেষ হল না। রূপালী পর্দার বৃক্ক দর্শক সাধারণ উর্ধ্বশীর্ষ চিত্ররূপ কোনদিন দেখতে পেলেন না, উর্ধ্বশীর্ষ চিত্রায়ণ চিরকালের মতই অসমাপ্ত রয়ে গেল, উর্ধ্বশীর্ষকে কেন্দ্র করে চিত্র-নির্মািতাদের বস্তু কিছু বহন না তা কল্পনাই রয়ে গেল, তা হল না কোনদিন বাস্তবে পরিণত। চিত্র-নির্মািতাদের সঙ্গে স্পর্শই বলাচি, আমার একটু ভুল বোকাবুঝি হয়েছিল যার ফলে উক্তর দিকেই এক ভিত্ত মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। অস্ত্র এর মধ্যে কে ঠিক আর কে বেঠিক, কে নির্দোষী আর কে দোষী, কার জায় আর কার অজায় আমি তার বিচার করতে চাই না, তা হাড়া সে বিচারের ভারও আমার উপর স্তম্ভ নয়, সে বিচারের আমি বিচারিকা নই।

অস্ত্র প্রসঙ্গে করা বাক। তখনকার দিনে এ কথা অনেকেরই এখনও স্পর্শই মনে থাকে উচিত যে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় অধিকার আরও অনেক বিধিনিষেধের বেড়াডালে আটকানো ছিল। ইচ্ছামত হাতে অর্ধ থাকলেই ছবি তোলায় উপায় ছিল না। তার বিধিনিষেধগুলি সম্ভাবজনক ভাবে অতিক্রম করতে পারলে তবেই ছবি প্রযোজনায় অধিকার পাওয়া যেত। কিন্তু তখন 'ও, জি, এল' ছিল না, 'ও, জি, এল' কথাটির সঙ্গে অনেকেরই অপরিচয় থাকতে পারে তাঁদের হয়তো জানা নেই এই কথাটির অর্থ বা ফিল্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়; ও, জি, এল কথাটির অর্থ ওপেন জেনারেল লাইসেন্স, এই লাইসেন্স না হলে ফিল্ম পাওয়া যেত না, অর্ধের বিনিময়েই ফিল্ম মিলত না। এই লাইসেন্সটিই ছিল ফিল্ম পাবার অধিকারপত্র। স্মৃত্যং এইখানেই একটি জিনিষ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে ইচ্ছে বা অর্ধ থাকলেই ছবি তোলা তখন সম্ভবপর ছিল না। তদানীন্তন ভারত সরকার কেবলমাত্র ষ্টুডিও স্বাধিকারীদের এই লাইসেন্স দিয়ে থাকতেন, দেখা যাচ্ছে ষ্টুডিও মালিকবাই কেবল এই লাইসেন্স পাবার অধিকারী ছিলেন তাও পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম; খুব বে একটা প্রচুর পরিমাণের পেতেন তাও তো নয়। ষ্টুডিও মালিক বীরা মন সেই সব প্রযোজকদের পক্ষে কিছের কোনটা সম্ভব করা সত্যি

সেদিন ছিল এক ছুসোব্য বাপার, সে এক অত্যন্ত আরাধনীয় প্রচেষ্টা। সে খুব দুঃস্থ প্রয়াস।

আমার প্রযোজকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি চালানুম আলোচনা-আলোচনা, ছবি তুলব বললেই তো তোলা যার না। অর্ধবলই সেখানে সমস্তার একমাত্র পরিপূরক নয়। ঐ তো পরিষ্কৃতি তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় ছিন্ন-করা গেল যে আমি মেরিট লাইসেন্স-এর জন্তে আবেদন করব, মেরিট লাইসেন্স পাবার জন্তে আমি যে চেষ্টা করব এবং সেই চেষ্টা যদি কলবতী হয় তা হলে আমার পরবর্তী কার্যচর্চা কি হবে, কি করব, আমি সেই লাইসেন্স নিয়ে সেই লাইসেন্সকে আমি কি ভাবে কাজে লাগাব—এ সব প্রশ্নও তখন একে একে মনের মধ্যে আগতে লাগল। আমি তাঁদের আশ্বাস দিলুম যে আমার চেষ্টা যদি সফল হয় তা হলে আমি নিশ্চয়ই তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেই কাজ করব। আমরা একসঙ্গে ছবির প্রযোজনায় কেন্দ্রে অবতীর্ণ হব, প্রধান কথা যে তাঁদের আমি হত্যাশ করব না কোন দিক দিয়েই। কারণ তাঁদের নিরাশ করা আমার কোন দিক দিয়েই অভিপ্রের্ত নয় তবে যদি সত্যি আমি ঐ কোটা পাই তাহলে আমি ছিন্ন করে নিলুম যে সেই কোটার আমি দুঃভাবেরে আগস্ত থাকব, তার প্রতি কোন কারণে কোন দিক দিয়ে যেন আমার অনাসক্তি প্রকাশ না হয়, ছিন্ন করলুম তার কোন বিধান কোন আইনকাহুনের কোনদিক দিয়ে অমর্ষাণা করব না, সফল করলুম যে এই অভাবনীয় সুযোগকে পরিপূর্ণ মর্ষাণা দিয়েই কাজে লাগাব। মনে মনে পপথ করলুম যে এই লাইসেন্স কিছুতেই অস্ত্রকে পরসার লোভে বিক্রী করব না, কোন প্রলোভনেই পা দেব না সমস্ত প্রলোভনকে আমি যেন হেলায় জয় করতে পারি, জ্ঞানের পথে থাকব, আইন মেনে চলব। অভাবনীয় এই সুযোগকে সম্পথে কাজে লাগাব।

তাগ্য সুপ্রসঙ্গ। আমার সমস্ত বহন রূপ নিল বাস্তবে। আমার সমস্ত স্বপ্ন সকলতার মুখ দেখল, আমার প্রাণপণ প্রচেষ্টা পূর্ববিনিত হল সার্থকতায়। যে আবেদন করেছিলুম তা গৃহীত হল। আমার আবেদন মঞ্জুর করলেন ভারত সরকার। একটা পরীক্ষা যেন শেষ হল কিছু ভাতেই অনিশ্চয়তার অবসান হল না, তখন উদ্বিগ্নতা আরও বেড়ে গেল সামনে আরও বিরাট পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আরও প্রচুর শক্তি নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। ভারত সরকার আমার দুখানি স্ক্রিপ্টই মঞ্জুর করলেন। এ যথেষ্ট সৌভাগ্যেরই নামান্তর বলে আমি মনে করি। আমার প্রথম স্ক্রিপ্ট 'রিদম্ অক ডি স্ট্রি'—মহিষাসুর বধকে কেন্দ্র করে রচিত, অর্থাৎ এই স্ক্রিপ্ট গঠিত হয়েছিল পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে, হুটের দমনের কাহিনী, দেবীশক্তির কাছে দৈত্যশক্তির পরাজয়ের ইতিবৃত্ত, মহাচণ্ডিকার অস্ত্রে মহিষাসুরের বিনষ্টের ইতিকথা। আমাদের দেশে এই কাহিনী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পরিচিত, ছেলেবেলা থেকেই এ দেশের ছেলেমেয়েরা এই গল্প শুনে আসেন, গল্পে কথকতার পুরাণব্যাখ্যায় এই কাহিনী বৃদের পর বৃগ ধরে লোকের মুখে মুখে নব নব রূপে ব্যাখ্যাত হয়ে আসে। এই গল্প কখনও পুরানো হয় না,—এ কাহিনী চিরনতুন, এ কাহিনীর সজীবতাকে কালের ধ্বংসমর্ষী বাহুবৃগলে কখনও পারে না স্পর্শ করতে। বাঙালীর পরম আনন্দের পরম আশার পরম আকাঙ্ক্ষার মহাপূজার মধ্যেও তো এই কাহিনী মিশে আছে। এ বিষয়েও আশা করি এ দেশে কেউ অধিপিত মন যে বর্তমান মর্ষীসূয়েই এই মহাবুত

অস্বস্তি হইয়াছিল মহিষাসুরের সঙ্গে মহীশূর শক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাট :লাভ ও প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষণীয়।

অজ্ঞাতকে বেত্র করেও আমার কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল, একটি পূর্ণ ঐক্য বিবরণ চিত্র করার জন্তে আমি খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। অজ্ঞাতকে অবলম্বন করে বৌদ্ধগণ পরিবেশন করাই ছিল আমার মূল অভিপ্রায়। এই প্রসঙ্গে আমার অজ্ঞানের গভীরতম প্রহ্লা উভাড়া করে দিয়ে স্বীকার করি যে এর প্রেরণা আমি পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে। তাঁর অনবদ্য কাব্যসৃষ্টি 'অতিসারের' কাহিনী থেকে। অতিসার রবীন্দ্রনাথের একটি বহন-প্রচারিত কবিতা। শিক্ষিত সমাজে এর সম্বন্ধে অধিক ব্যাখ্যা নিম্নয়োজন।

অধিক বলা বাহুল্য মাত্র যে, আমি শুধু লাইসেন্সই পাইনি সেই সঙ্গে কোডাকও পেয়েছিলাম সেদিন বহু জনের স্নেহে আমি ধাতা পরিপূর্ণা, আমার দর্শক সাধারণের অকুণ্ঠ সহায়ত্বভিত্তিতে আমার শিল্পীজীবন কানার কানার ভরে উঠেছে, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অল্প প্রান্তের মধ্যে আমি যেখানে গেছি জনতা আমায় সাদরে গ্রহণ করে আমার প্রতি তাঁদের অকুঞ্জিত কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন হয় তো সেই জন্তেই কোটা এবং কোডাক এই দুটি জিনিষই পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। [ক্রমশঃ]

অনুবাদ : কল্যাণীক বন্দ্যোপাধ্যায়

এতারাষ্টের চিত্রায়ণ

বিশ্বের যেন শেব নেই, সীমা নেই, অস্ত নেই। পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপরে পুণ্ড্রভূত তুহানের ভূপ। তুহতার অপূর্ণ সমারোহ। দিক থেকে দিগন্তেরে শুধু যেন বরফের মিছিল। চোখের সামনে রাশি রাশি তুহারকণা। পৃথিবী যে কত সীচে তা যেন কল্পনার আশা যায় না; যেন হয় পৃথিবীর ঠাণ্ডা উপরের পাঁচিলটা ছুঁয়ে ফেলছি। একে ঘিরে মানুষের কৌতূহলের অস্ত নেই অথচ এর সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের পরিবিণ্ড খুব বেশী নয়। কল্পনার মধ্যে দিয়ে এই গিরিশৃঙ্গ নানাঙ্গনের সামনে নিজেকে নানাঙ্গনে মেলে ধরেছে। পুরাণের নানা আখ্যানেরে আশ্রয় একে পেয়েছি, এর দর্শন মিলেছে অসংখ্য কবির কাব্যে।

এতারাষ্টকে মানুষও চাইল সূর্যের মধ্যে আনতে। পৃথিবীর মধ্যে থেকেও কেন সে মানুষের আওতার বাইরে থাকবে? কেন সে চিরকাল মানুষের কাছে অপরাধের থেকে যাবে? মানবশক্তির প্রচেষ্টা নানা ভাবে রূপ নিতে থাকে, কত মানুষ এগিয়ে এল, কত দল এল, কত অভিবাত্রী-সভ্য এল, কেউই হল না সকলকাম, কেউ কিরে এল ব্যর্থতার চিহ্ন লগাটে লেপন করে, কেউ বা আর কোনও দিনই কিরে এল না, পাহাড়ের বুকে তারা যে কেমন করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত তার হৃদয় খুঁজে বার করতে পারিল না কেউ।

কত কাল ধরে এই প্রচেষ্টা চলতে থাকে, এত বাধা এত বিপত্তি, এত বিপর্ষয় মানুষের অসম্ম্য আকাঙ্ক্ষাকে কিন্তু টলাতে পারিল না। অবশেষে ১১৫০ সালের জুন মাসে সারা পৃথিবী একদিন স্তম্ভ আনন্দোদ্ভূত বিশ্বেরে স্তম্ভল, এতারাষ্ট আর মানুষের নাগালের বাইরে নেই, স্তম্ভল এত আশ্চর্য্যাপের, দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার, বুন-বুগব্যাঙ্গী প্রকৃতির কল কলেছে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিবরের বৃকের উপর পা দিয়ে মানুষ মাথা তুলে গাঁড়িতে পেয়েছে।

তেনজিং, হিলারী, হার্ট-এর নাম এই উপলক্ষে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি, যোজিত হল তাদের নাম, ইতিহাসের পাতায় অমরত্বের দাবী তাদের স্বীকৃত হল। এই তিনজনকে নিয়ে সারা জগতে আলোড়ন উঠল, ঠিক এই প্রসঙ্গেই আজ মনে পড়ছে আর একজনের কথা—এই উপলক্ষে তাঁর নামও চিরকাল অমর হয়ে থাকবে, এ ব্যাপারে তাঁর অবদানও কম নয়—তিনি চিত্রকর টম ট্রোবার্ট। হার্ট, হিলারী, তেনজিং বিবৃতি দিতে লাগলেন কেমন করে এই অসম্ভব সম্ভব হ'ল, এই অসাধাসাধনের ইতিহাস, চির-অজ্ঞানির বৃকের উপর লুকিয়ে রয়েছে, কোন্ সাত রাজার ধন মানিক তার চমকপ্রদ বিবরণ পৃথিবীর মানুষ স্তম্ভতে পেল ভাষণে, বিবৃতিতে, লিপিবদ্ধ দেখল কাগজে-কলমে, কিন্তু চোখের সামনের ছবি জিনিষটিকে যে ভাবে জীবন্ত করে তুলতে পারে বিবৃতি বা বক্তার ভাষণ তেমনটি কখনো পারে না—মানুষের সেই কৌতূহল মেটালেন ট্রোবার্ট। সমগ্র হিমশীর্ষকে জগতের পুণ্ড্র জগতের নারী, জগতের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, জগতের বালক-বালিকা চোখের



সমগ্র হিমশীর্ষে ছবির মানচিত্র সন্নিবেশিত বহু

আলোকচিত্র—হেনসেন দ্বারা

সামনে পুখারপুখারুপে দেখতে পেল ট্রোবার্টের কল্যাণে। এঁরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে উত্তোলন করে এলেন পতাকা, ট্রোবার্ট সমগ্র অভিযানটিকে ধরে রাখলেন তাঁর ক্যামেরায়।

১৯৫১ সালের কথা। প্রখ্যাত পর্বতারোহী এডব্লিউ শিপটন ডিটেনে কিয়ে এসে জানালেন যে এভারেস্টে বাওয়ার একটি সহজ পথ খুঁজে পাওয়া গেছে, দক্ষিণ দিক ধরে যাত্রা শুরু করলে স্বপ্ন সঙ্গ হতে পারে। শিপটনের প্রস্তাব লুকে নেওয়া হল, ঠিক হল ১৯৫৩ সালে যাত্রা শুরু হবে। কার্ণাট্রিয়ান ক্লিমসও চূপ করে বসে থাকার পাত্র নন, অভিযানটির চিত্রায়ণের ভার নিলেন তাঁরা, সব জোই হল, চিত্রকর কে হবেন, এই ছুঁছুঁ অধ্যায়টিকে চিত্রে রূপ দেবেন কোন শক্তিধর, জীবনমরণকে পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করে নিশ্চিত হত্যার দিকে দ্বিধাহীন চিন্তে এগিয়ে যেতে পারেন কোন্ অসমসাহসী? নির্বাচিত হলেন টম ট্রোবার্ট। সেদিন তাঁর বয়স চল্লিশ। ডালিংটনে এঁর জন্ম। বাবাও ছিলেন একজন বিশিষ্ট পর্বতারোহী। ট্রোবার্টের মনে পড়ে তাঁর বখন আট বছর বয়স তাঁর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে একবার পাহাড়ে টেনে তোলা হয়েছিল, জীবনে সেই তাঁর প্রথম পর্বতারোহণ। পরবর্তীকালে অল্প বয়সে তিনি পর্বতারোহণে অংশ নিয়েছেন (মধ্য-আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়) হিমালয়ের চলচ্চিত্রও তিনি গ্রহণ করেছেন ১৯৪৬ সালে।

যাত্রার দিন এগিয়ে আসছে। ট্রোবার্ট অস্থির হয়ে পড়লেন। শুরুতর অস্থির। হাসপাতালের আশ্রয় নিতে হল তাঁকে, বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা সঙ্গী প্রকাশ করলেন। রোগীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তাই তাঁরা পোষণ করলেন। অনেক সেবা-সুস্বাস্থ্য পরিচর্যার পর অভিযাত্রীদের মিবুক চিকিৎসক সর্ভ হঠাৎ হৃৎকম্পক একটি সংবাদ প্রচার করলেন। ট্রোবার্টের সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ নেই, তিনি সেয়ে উঠছেন এবং নির্ধারিত দিনেই তিনি অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। হাতে বেন বর্গ পেল সবাই।

অস্থির অবস্থাতেও ট্রোবার্ট নানাভাবে চিন্তা করেছেন এই কাণ্ডে, তাঁর ওয়ার্ডে এই সম্পর্কে লোকের আনাগোণার বিরতি ছিল না। সবচেয়ে সময়ে বড় বড় জরুরী অধিবেশনও বসিয়েছেন তিনি, মানসিক অভিযন্ত্রণ প্রকাশ করেছেন, একাধিক নির্দেশাদি দিয়েছেন। হুট ক্যামেরাও সঙ্গে নেবার জন্তে ঠিক করা হল।

যাত্রা শুরু হল।

দিনে এবং হাতে নানাভাবে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়, এই তাপমাত্রার কমপরিবর্তন অনেকখানি অস্থির করে তোলে যাত্রীদের, কখন কোথায় কি ভাবে তাপমাত্রা দেখা দেন, এই চিন্তাতেই যাত্রীদের অস্থির-চিত্ত। অভিযানের পূর্বে ক্যামেরাগুলিকে কার্ণাট্রিয়ান একটি কোন্ চেম্বারে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছিল। তাপমাত্রার সঙ্গে ভাল বেধে ওজনের প্রঙ্গ দেখা দেয় হাঁকা খানে বিশেষ ধরনের ত্রিপায়া তৈরী করানো হল, বরফের চাই অনেক সময়ে এই কাজে লাগত। ওজন এক সময়ে বিরাট সমস্তার রূপ নিল, এঁদের সমস্ত মালপত্রের সমষ্টিগত ওজন ছিল তিরিশ পাউণ্ড। পরে এমন অবস্থা পাড়াল যে কেবলমাত্র সাড়ে চার পাউণ্ড ওজনের সিনি ক্যামেরা বহন করা এঁদের পক্ষে প্রাণান্তকর অধ্যায়ে পরিণত হল। ট্রোবার্ট কেবলমাত্র একটি জায়গায় ক্যামেরার হাতল ধোরান নি, একেবারে চূড়ান্ত পর্বটির। চূড়ান্ত

পর্বতারোহণের সাক্ষ্য দেবে একমাত্র হিমালয়ের তোলা ভেনজি-এর ছবিচিত্রটি।

ছবি তোলায় সময়ে ট্রোবার্টকে হুহাতে মোটা মোটা দস্তানা পরতে হোত ক্যামেরার ধাতব অংশগুলি আঠপুঠে মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হোত। না হলে যে কোন সময়ে বরফের আক্রমণে তাদের বিনষ্টের সম্ভাবনা ছিল।

এর পর রঙের প্রঙ্গ। পাহাড়ে রঙ সম্বন্ধে সমস্তার অভাব নেই। রঙের প্রত্যেক পরিধানে ঘন নীল রঙ ব্যবহার করতেন। জটনক সাংবাদিককে ট্রোবার্ট বলেছেন—when filming in the snow, your exposures have to be considerably reduced. পর্বতে চিত্রায়ণ সম্পর্কে ট্রোবার্টের এই অভিমত বিশেষ মূল্যই বহন করে।

কুড়ি দিনের অভিযানে ছবি তোলায় কাজ পোড়ার দিকে সম্ভাবনাক ভাবেই এগিয়ে চলছিল। আঠারো থেকে কুড়ি হাজার ফুটের মধ্যে বখন তাঁরা সেই সময় গভীর বিপদের তাঁরা সম্মুখীন পথসন্ধান, বাতাস, ওজন সব দিক দিয়েই তাঁরা তখন রীতিমত অশক্তি বোধ করছিলেন, পরে বত উঠতে তাঁরা উঠছেন চিত্রায়ণ তত সমস্তার বিষয়ে পরিণত হয়েছে, শেষে এমন পাড়াল যে সারা দিনে মাত্র একশো ফুটের বেশী ছবি তোলা যেত না।

সবচেয়ে মুশকিলে ট্রোবার্টকে পড়তে হয়েছিল একবার চিত্রায়ণের সময়ে হঠাৎ কি কারণে বেন চোখের কালো চশমা তিনি খুলে কেলেছিলেন। ব্যস এক কথায় বাক বলে "বরফাচ্" শুধু শাবা। ট্রোবার্টের প্রায় অন্ধ হবার উপক্রম, সমগ্র ইন্দ্রিয়ের এক অদ্ভুত অক্ষুণ্ণিত সে কর্তের ভীষণতার ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। তাবলেন হয়তো এওই নাম হুত্যা, বেশ খানিকক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে কিয়ে এলেন ট্রোবার্ট।

ভেনজি হিমালয় হাট-এর প্রাঙ্গণায় পৃথিবী পকরুখ। এ ব্যাপারে ট্রোবার্ট, তোমার অবদানও সমউঃস্ব্য। আপন জীবনকে তুমিও হুত্যা হুখে এগিয়ে নিয়ে সঙ্গর সাধনে অগ্রসর হয়েছ, বীর ট্রোবার্ট, তোমার সাহসের, তোমার নির্ভীকতার, তোমার কুশলতার তুলনা নেই। ভারতবর্ষ তোমাকে তার শ্রীতির অর্থ নিবেদন করছে।

জিনা লোলোত্রিজিটার প্রসঙ্গে

বিধসত্যতার অস্তিত্ব জগত্বে বোধ। সেদিন যোমের সৌর্ধ, বীর, বীর প্রায় সারা জগতকে তার হুত্বতলে উপনীত করেছিল। হু হাজার বছর আগে যোমের প্রভাব সারা ইন্দোচীনেকে সেদিন মজুত রূপ দিয়েছিল, মজুত পথের সন্ধান দিয়েছিল, দিয়েছিল মজুত জীবন। সেই যোম ইতালির রাজধানী। যোম, নেপলস, ভিনিস, ক্রোরেল প্রভৃতিকে নিয়ে ইতালি। সেই ইতালির মেয়ে জিনা লোলোত্রিজিটা। বিশ শতাব্দীর মেয়ে। পৃথিবীর মধ্যে অভিনেত্রী হিসেবে বিরাট জনপ্রিয়তার অধিকারিনী। যোমের সৌন্দর্যের একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

যোম থেকে পকাশ রাইল দূরে জিনার জন্ম। ১৯২৮ সালের ৪ঠা জুলাই এই মেয়েটি পৃথিবীর আলোক প্রথম প্রত্যক্ষ করল।

মেয়ে তো নয় বেন একটি বিদ্বান্ধিত্তি, বেন একটি অরিষ্টুসিক, বেন একটি বুদ্ধিশিখা। সৌন্দর্যসেইখানেই সার্থক, যেখানে রূপসার্থি

মধ্যে সমান পরিমাণে মিশে থাকে ব্যক্তিত্ব—জিনার সৌন্দর্য সেই দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় সম্পূর্ণ সার্থক। জিনার মধ্যে শুধু রূপের পরিমাই দেখতে পাবেন না, দেখবেন তার মধ্যে মিশে আছে এক অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। যেন চুল, বড় বড় টানা টানা জোঁথ প্রণালী গাভীরে ভরা অবয়ব, জিনাকে করে তুলেছে অপূরণ সুন্দরী।

হেমের রাজ্য নিয়ে হেঁটে চলেছে জিনা। পথরোধ করল একজন। এক অপরিচিত। স্পষ্ট ভাষায় বিনা ভূমিকার জিনাকে বললে—হাবির জগতে তোমার আসতেই হবে, ক্যামেরা তোমার সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে, বল তুমি আসবে। কে এই অপরিচিত? এক সুপরিচিত প্রবোধক। ছায়াছবির জগতে জিনার আকর্ষণের এই প্রথম ইতিহাস। "লাভ অফ এ ব্লাউন" ছবিটি জিনার নাম ছড়িয়ে দিল দিক থেকে দিগন্তেরে। সলোমন হ্যাণ্ড সেবা, নেভার সো কিউ, লেডি এল, গো নেকেড ইন দি ওয়াশ' প্রকৃতি ছবিগুলি জিনার অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেছে।

খুঁজল কোথায় জানেন, খুঁজল তার সঙ্গে কথা বলার। ইংরিজী সে জানে না বললেই চলে, অতি সামান্য অধিকার তার ইংরিজী ভাষায়—বড় জোর—হাও ডু ইউ ডু, কিংবা ওভ বাই অবধি—বাস, তার বেশী নয়। অভিনয় করতে জিনা কেন ভালবাসে—এই প্রশ্ন তার সামনে তুলে ধরলেন জনৈক সাংবাদিক—জিনার উত্তর এল করানী ভাষায়—অভিনয়ের মধ্যেই আমি জীবনের আনন্দকে খুঁজে পাই, আমি ভ্রমণ করতে ভালবাসি, ভালবাসি মানুষের সঙ্গে মিশতে, আমার এই ছুটি প্রধান বাসনা পূর্ণ হয়েছে এ জগতে যোগ দিয়ে। সাংবাদিকের পরবর্তী প্রশ্ন—তুমি আর কি করতে চাও?—জিনার উত্তর—ধুব তাড়াতাড়ি অবসর নিতে চাই—আর চাই এমন একটি বাড়িতে থাকি যেখানে থেকে পাহাড় আর সমুদ্র দুই-ই আমি একসঙ্গে দেখতে পাই।

কিন্তু অভিনেত্রী হবার সখ জিনার ছিল না, সখ ছিল শিল্পী হবার, রোমে থেকে কিছুদিন সে ছবি আঁকা শিকাগো ক্রবল তারপর হঠাৎ এক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে সে মিস্ রোমে পরিণত হল ১৯৪৬ সালে। রেজি স্কেরার, ব্রাসেতি, ক্রিস্টীয়ান জ্যাক, ভাসারোতি প্রমুখ বিখ্যাত পরিচালকের অধীনে কাজ করার সৌভাগ্য জিনার হয়েছে! জিনার মনে এখন যে ইচ্ছাটি সব চেয়ে প্রবল সেটি হল স্ত্রী লরেল অলিভিয়াবের সঙ্গে অভিনয় করার।

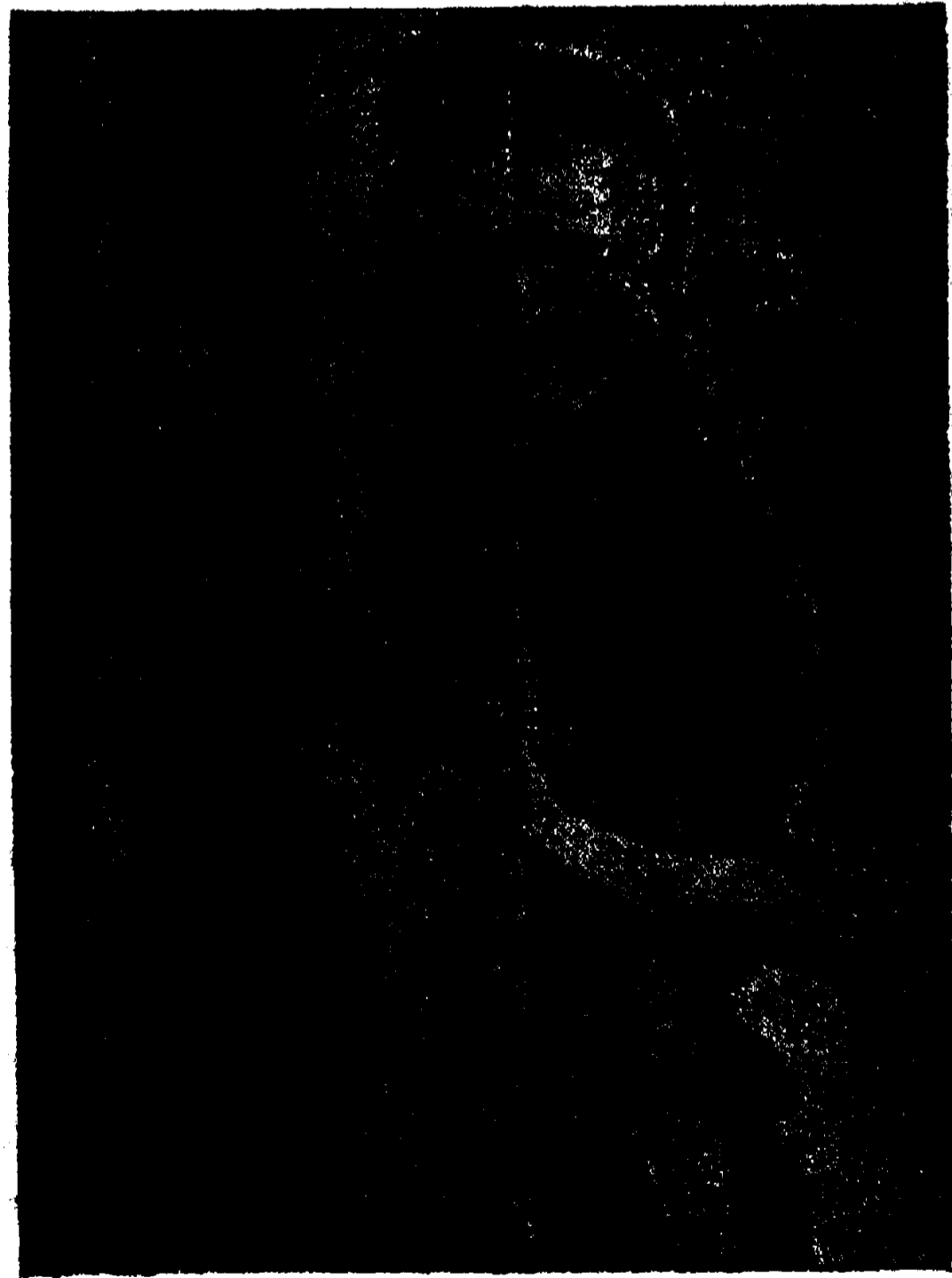
ইতালির মেয়ে জিনা, বিয়ে করল বৃগোল্লাভের ছেলেকে—পেশার চিকিৎসক, নাম—মিলকো স্কিক। বেশ আনুভবে ভুললোক; হাশপরিহাসপ্রিয়, তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ কিতাবে গড়ে তোলা যায় সেই স্বপ্নে এখন মিলকো ও জিনা দুজনেই বিভোর।

মিকি মুশিকের গল্প

মিকি মাউসকে চেনেন না, মিকি হাউসের কথা শোনেননি, মিকি মাউসের ছবি দেখেননি ছায়াছবির জগতে এমন দর্শক কিয়ল। সেই বললেই চলে। কোন একটি বিশেষ দেশের ভৌগোলিক সীমার মিকি আজ আবহ নয়। সারা পৃথিবীতে আজ তার সমান গতিবিধি যিবের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তার অপ্রতিহত অবয়ব, রঙ্গপাণ্ডার প্রতিটি মাস্কের কাছে প্রতিটি শিল্পের কাছে

তার করনাতীত সমান সমাদর। মিকি মাউসের কথা আজ নতুন করে কিছু বলার নেই তবে তার উৎপত্তির ইতিহাসও কখনও পুরোনো হবার নয়। সেই ইতিবৃত্তে নতুনদের স্পর্শ কখনও ঘুহবে না, সে কাহিনী বিশ্বের ভরা, অভিনবের ভরপুর।

এই বিশ্বের প্রষ্ঠা ওয়ান্ট ডিসনী, আর বিশ্বের সৃষ্টি আজ থেকে বক্রিম বছর আগে। ১৯২৮ সালের গ্রীষ্মের সময়ে ডিসনী নিউ ইয়র্কে এলেন তাঁর অসওয়াল্ড কার্টুনের জন্মে একটা পাকা এক উন্নততর ব্যবস্থা করতে। নিরাশ হলেন ডিসনী, স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে—হলেন ব্যক্তিত। কপিরাইট তাঁর ছিল না, তাই অসওয়াল্ডকে হারালেন তিনি, ট্রেণে কিয়ছেন ডিসনী। কিয় আসছেন লস অ্যাঞ্জেলেসে। তখনকার দিনে নিউ ইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার ট্রেণে পৌঁছতে চার দিন সময় লাগত। ভাববাক্য, চিন্তা করবার, করনার বখেট অবকাশ মিলত। কিছুদিন ছাকটসফ্যান হিসেবে শিকানবীশি করেছেন ডিসনী। সেই সময় একবার ইয়ুরের এক জনতার দৃষ্ট তাঁকে আঁকতে হয়। চকিতে মনে পড়ে যায় সেই কথা, দেখতে দেখতে সেই গণেশ বাহনের চিন্তা তাঁর সমস্ত মস্তিষ্কে অধিকার বিস্তার করল, সেই চিন্তার তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন সফল করলেন এই মুহুর্তেই অবলম্বন করে নির্মিত হয়ে তাঁর ভবিষ্যতের জীবনযাত্রার চলার পথ। একটি নাম চাই। শ্রী লিলিয়ানকে ছিলেন নামকরণের ভার। নিজেও একটি টিক করলেন—মটিমার, মাউসের আভ্যাকরণের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখাই ছিল ডিসনীর অভিপ্রায়। কিন্তু মটিমার নামে বাদ লাগলেন লিলিয়ান। শ্রীর কাছে এগিয়ে ডিসনী কি যেন বলতে চান আরও একটি



হাসপাতাল-এর একটি ভূমিকার করলা মুখোপাধ্যায় আলোকচিত্র—হেমেন মিত্র

নাম তাঁর মনে এসেছে তবু হয় লিলিয়ান যদি এটিও বাতিল করে
 দেব তবু বলে কেলে—আচ্ছা মিকি নামটা কি রকম হয়—অপূর্ব
 জোধ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লিলিয়ানের। পরিতৃপ্তির চিহ্ন তখন
 লিলিয়ানের সারা অবয়বে, ডিসনীরও। মিকি মাউসের জন্ম হল।

মিকি মাউসকে নিয়ে প্রথম যে ছবি ডিসনী তুললেন তার
 নাম দিলেন—প্রিন্স ক্রেজি। দশজন কর্মীকে নিয়ে ও ডিসনী এই
 রকম আরও তিনখানি ছবি তুললেন। বাড়ী বাধা পড়ল ডিসনীর
 বিকিয়ে গেল তাঁর লৌহমান। ১৯২১ সাল পর্যন্ত ডিসনীর পক্ষে
 আর একটি লৌহমান অধিকারভুক্ত করা সম্ভবপর হয়নি।
 পবিত্রেশকদের কাছে বিক্রী করতে গেলেন ডিসনী তাঁর ছবি।
 ডিসনীর ভাগ্যগন্ধী তখনও বন্ধু-প্রিয় হাসিটি নিক্ষেপ করেন নি
 ডিসনীর প্রতি। মিকি মাউস যে এতদিন সারা জগতকে টলিয়ে
 দেবে এ চিন্তা করতে পারেন নি সেদিনকার চিত্রব্যবসায়ীর দল।
 হারানোছবিতে তখন শঙ্করস্বয়ং আবির্ভাব ঘটেছে। সাধারণো
 ডিসনীর প্রথম যে ছবিটি প্রদর্শিত হল তার নাম ট্রিম্বোট উইলি,
 চিত্রব্যবসায়ীরা সর্বত্র গ্রহণ করতে চাইলেন—ডিসনী অব্যব দিলেন
 —আমার ছবিকেই বেচতে চাই আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে, আমার
 কল্পনাকে আমার চিন্তাধারাকে নয়। মিকি মাউসের গোড়ার
 দিকের এই ইতিহাস আর এই বাধার মধ্যে দিয়েই এইভাবে সেদিন
 চলতে হয়েছে ডিসনীকে।

ডিসনীর প্রথম চারখানি ছবির নির্মাণ করার খরচ পড়েছিল
 এককোথানি ছবিতে ছ' হাজার ডলার করে। তাঁর শেষ পূর্ণ দৈর্ঘ্য
 কার্টুনটির তৈরী করার খরচ হয়েছে সাড়ে তিন মিলিয়ান ডলার।

মিকি মাউসের কণ্ঠকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক অপূর্ব
 কাহিনী। নিখুঁৎ গলাটি আনবার ক্ষেত্রে ডিসনীর চেষ্টার অন্ত নেই।
 অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অসংখ্য শিল্পীরা আসছেন, পরীক্ষা
 দিচ্ছেন কিন্তু কোনটিই মনোহর হয় না ডিসনীর, তিনি যেমন গলাটি
 দিচ্ছেন সেই গলা আর কারোর মধ্যে তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘরে
 প্রায়ই বসে থাকে ডিসনীর ভাই রয় ডিসনী। তিনিই বলে
 উঠলেন—অল্প লোকের গলার প্রয়োজন কি তুমি নিজেই গলা দাও
 না, বিচ্যন্তরস্বয়ং খেল গেল ঘরের মধ্যে ডিসনী তাবলেন সত্যিই তো
 প্রস্তাবটি তো গ্রহণযোগ্য। তখান। সেই থেকে ডিসনী নিজেই
 গলা দিতে থাকেন। হাজার হাজার অসুস্থগী মিকি মাউসের আছে
 সারা বিশ্ব জুড়ে। “মিকি মাউস স্যামেরিকা” বিশ্বের যে কোন
 প্রান্ত থেকে এই ঠিকানার চিঠি দিলে তা ঠিক বখান্ধানে গিয়ে
 পৌঁছবে। শৈশবে এবং বাল্যকালে মিকি মাউস নিয়ে খেলা
 খেলা করতেন, মিকি মাউস প্লেটে যারা সাপার খেতেন তাঁদের
 অনেকের মধ্যে ছুটি নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
 ছুটি বোন পীরা। হুবোনেই বিশ্বব্যক্তিত্বের অধিকারিনী রাণী
 এলিজাবেথ এক যুবরাজী মার্গারেট। ব্যবসায়িক হিসেবে এ জগতে
 ডিসনীর আগমন। হঠাৎ কোন পুণ্য প্রজ্ঞাতে ব্যবসাদারের
 খোলস থেকে শিল্পী সত্তার প্রকাশ ঘটল ডিসনী নিজেও বাৎসরিক তা
 বুঝতে পারেন নি। আঙ্কের পৃথিবীর নরনারী প্রয়োজনবোধ করেনা
 ব্যবসায়ের ডিসনীর খবর রাখতে কিন্তু শিল্পী ডিসনীর সম্বন্ধে তাদের
 কৌতূহলের শেষ নেই। ভবিষ্যতের নরনারীর মুখে মুখে শিল্পী
 ডিসনীই বেঁচে থাকবেন। অনিত্য পৃথিবীর বুক থেকে ডিসনী একদিন
 বিস্ময় বেধেন ঠিকই কিন্তু থেকে বাবে তাঁর মিকি মাউস জেতে

হাবে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি, থেকে বাবে তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠ, যেগুলি
 তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভার অতুল্য নিদর্শন।

ক্ষুধা ও ইন্দ্রধনু

বর্তমানে যে ক'খানি বাঙলা ছবি শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে
 প্রদর্শিত হচ্ছে তার মধ্যে নতুন মুক্তি লাভ করেছে দুখানি ছবি—
 ক্ষুধা ও ইন্দ্রধনু।

ক্ষুধার গল্পাংশের সঙ্গে অপরিচয় রচয়িতাদের নেই, দীর্ঘকাল
 বঙ্গমঞ্চে এই নাটকটি যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।
 নাটকটির রচয়িতা বিহারক ওটাচার্ভ। ছবিতে পুর দিরেছেন
 নটিকেতা খোব। পঞ্চবিভিন্ন পরিচালনার বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ
 হয়েছেন বসন্ত চৌধুরী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়,
 অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারক ওটাচার্ভ, তরুণকুমার, সন্তোষ সিংহ,
 গোপাল মজুমদার, তুলসী চক্রবর্তী, ডাঃ হরেন, শ্রীমান দীপক, সান্ত্বিতী
 চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই
 ছবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে এর একটি বিশেষ চরিত্রে
 দেখা দিরেছেন বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীমৎশচন্দ্র মিত্র।

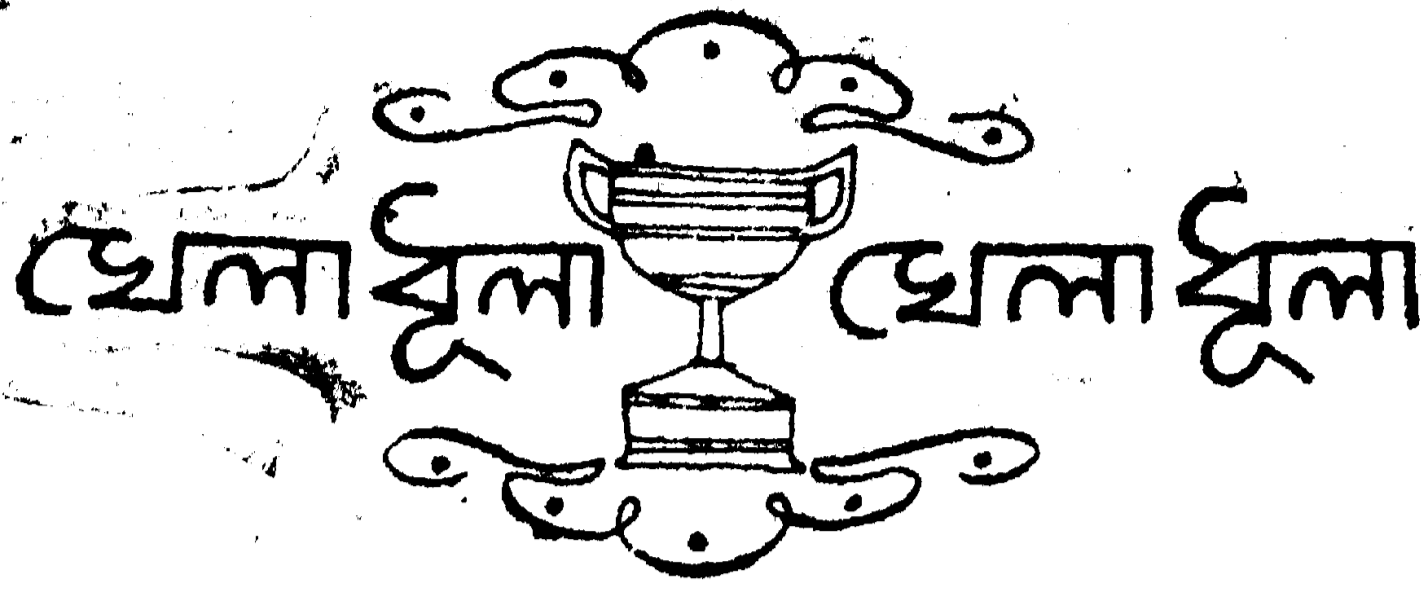
ইন্দ্রধনুর ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন দীপক বসু।
 এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। বিভিন্ন
 ভূমিকায় রূপ দিরেছেন পাহাড়ী সাজাল, অসিতবরণ, জীবেন বসু,
 অমর মল্লিক, জহর দাস, ডাঃ হরেন, চন্দ্রা দেবী, অরুণতী
 মুখোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, সীতা সিংহ প্রভৃতি। সঙ্গীতংশ
 পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদ-বিচিত্রা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনী অবলম্বন করে পাঁচ হাজার কুট
 দীর্ঘ একটি প্রামাণ্য চিত্রনির্মাণে শ্রীমত্যজিত দাস বর্তমানে ব্যস্ত।
 এর সুরসৃষ্টির দায়িত্ব জীবায় নিজেই গ্রহণ করেছেন। ছবিটিতে রবীন্দ্র
 সঙ্গীতও শোনা যাবে।

বাঙলার শক্তিময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী বক্রপা বন্দ্যোপাধ্যায়
 বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার স্যামোসিয়েশান কর্তৃক
 সর্ধিতা হয়েছেন। এই উপলক্ষে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত অভিনেতা
 জীবলরাজ সাহনী তাঁর বক্তৃতায় শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিপূর্ণ
 শ্রীতি নিবেদন করে তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে একটি উপভোগ্য আলোচনা
 করেন। মালারাম ছবি ‘উদ্ভা’র প্রদর্শনার পকাশ রজনী পূর্ণ হওয়ার
 চিত্রনির্মাণীদের দল দরিত্রনারায়ণের সেবা করে দিনটি উদযাপিত
 করেন। সৌন্দর্যময়ী ইতালির অভিনেত্রী সোফিয়া লোয়েনের প্রায়
 ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টালিংস অলংকারাদি অপহৃত হয়েছে। তাঁর
 প্রযোজক স্বামীর সঙ্গে লণ্ডন বিমানঘাটিতে তিনি যখন দেখা করতে
 যান তখন এই কাণ্ড ঘটে। আটাল বছর বয়সী সোফিয়াকে বৃত্যবতঃই
 এই ঘটনা বিশেষভাবে বিচলিত করে তুলেছে।

উনিশ বছর দাম্পত্য জীবন ধাপন করার পর তার লয়েল
 অলিভিয়ার (৫২) ও ডিভিয়ান লিয় (৪৭) বিবাহবন্ধন ছিন্ন
 হয়েছে। শোনা যাচ্ছে যে তার লয়েল বর্তমানে অভিনেত্রী ওয়ান
 প্রোরাইট (৩২) এর পাবিপ্রার্থী আর সেই জন্মেই মাকি এই
 বিচ্ছেদ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ডিভিয়ান তারতবর্ষের দার্জিলিং-এ
 জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সন্ন্যাস বাল্যকাল কলকাতার অভিবাহিত



কলিকাতার ফুটবল ইতিহাসে নতুন নজীর সৃষ্টি

কত বিচিত্র এই কলিকাতার ফুটবল মাঠ। এখানে কত ঘটনাই যে ঘটে তার ইয়ত্তা নেই। এবার কিন্তু ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন নজীর সৃষ্টি হয়েছে। মোহনবাগান ও মহম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলায় রেকর্ডীয় ক্রটিপূর্ণ পরিচালনাকে কেন্দ্র করে মহম্মেডান ক্লাবের সভ্য ও সমর্থক মহলে যে বিকোচ ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল তার চরম প্রকাশ পায় মহম্মেডান ও উয়াদীর খেলায়। এইদিন ক্যালকাটা মাঠে মহম্মেডান ক্লাবের সভ্য ও সমর্থকরা একযোগে খেলাটিকে সম্পূর্ণ "বয়কট" করেন। তাঁদের কিছু সংখ্যক সভ্য ও সমর্থক ক্যালকাটা মাঠের বিভিন্ন প্রবেশপথে "সত্যাগ্রহ" শুরু করেন। পুলিশ বাহিনী এসে হটাটয়া দিলে তাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবে খেলাটিকে বন্ধ করেন। সভ্যদের ভক্ত নির্দিষ্ট আসনগুলি সম্পূর্ণ ভাবে শূন্য থাকে। কিন্তু দৈনিক টিকিটের আসনগুলিতে সামান্য কিছু দর্শক উপস্থিত থাকলেও তার ভেতর কোন মহম্মেডান ক্লাবের সমর্থক ছিল কিনা বলা শক্ত। "সত্যাগ্রহ" এরূপ সুসংগঠিত ভাবে সাফল্য লাভ করে যে পুলিশ বাহিনীকে শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ই সময় অতিবাহিত করতে হয়। কলিকাতার দীর্ঘ ফুটবল ইতিহাসে সভ্য ও সমর্থকদের খেলা বন্ধনের এরূপ ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটে নাই। মহম্মেডান ক্লাবের সভ্য ও সমর্থকরা মাঠে তাঁদের এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। দেখা যাক এই পরিস্থিতির শেষ কোথায়।

কলিকাতার "বদলী খেলোয়াড়" প্রথা প্রবর্তন

শনিবার ১১ই জুন কলিকাতার ফুটবল ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন থেকে আই, এক, এ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় 'বদলী খেলোয়াড়' প্রথা প্রবর্তন হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কেবল আন্তর্জাতিক খেলায় এই নিয়মটি প্রযোজ্য আছে। তবে সম্প্রতি নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন এই নিয়মটি ভারতে চালু করার সিদ্ধান্ত করে।

প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী খেলার সময় প্রতিযোগী ক্লাবের পোলরক্ক আহত হয়ে রেকর্ডীয় অস্থায়ীভাবে সাপেক্ষ যে কোন সময়ে নতুন পোলরক্ক তাঁর স্থানে খেলতে পারবেন। ইহা ব্যতীত প্রতিযোগী কোন ক্লাবের অপর কোন খেলোয়াড় যদি আহত হন— তাঁর পরিবর্তে কেবলমাত্র প্রথমার্ধেই নতুন খেলোয়াড় বোগদান করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ার্ধে কোন "বদলী খেলোয়াড়" লওয়া চলবে না।

আবার কলিকাতার ট্রেডিয়াম প্রসঙ্গ

গত কয়েক বছর ধরে ফুটবল মনোরম শুরু হলেই কলিকাতার ফুটবল ট্রেডিয়াম প্রসঙ্গটা বেশ মাথাপাতা হিনে উঠে। ট্রেডিয়াম

প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক জল খোলা হয়েছে। প্রতিবারই আলাপ-আলোচনার অন্ত থাকে না। সব রেখে-ত্তনে মনে হয় যে কলিকাতার ফুটবল ট্রেডিয়াম প্রসঙ্গের উপর যখনিকাপাত হ'ল। কিন্তু আরও পর্যাপ্ত এই বিষয়টি যে তিমিরে সেই তিমিরে থেকে গেছে। এবার অবশ্য ট্রেডিয়াম প্রসঙ্গ সম্পর্কে একটা সুখবরোচক খবর প্রকাশ পেয়েছে। কলিকাতার ময়দানে ফুটবল ট্রেডিয়াম নির্মাণ সম্পর্কে পরামর্শ ও নকশা রচনা করার জন্যই ইতালিয়ান স্থপতি সিনর আনিবেন ভিটোলজি কলিকাতার এগে হাজির হয়েছিলেন। তিনি ট্রেডিয়ামের অন্ত নির্দিষ্ট "এলেনবরো কোস" পরিমার্জন করেন এবং প্রস্তাবিত ট্রেডিয়ামের নকশা ও উহা কিংসের অধিকরণে নিশ্চিত হবে তা নিয়ে সুখামন্ত্রী ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। অবশ্য এই আলোচনা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে হয়।

প্রস্তাবিত ট্রেডিয়ামে বাট হাজার দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে এইরূপ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। তবে এই ব্যবস্থা সম্প্রদায়ণ করে নব্বই হাজার দর্শকের সংকুলনও বাস্তব হয় তাহলে ব্যবস্থা হতে পারে। গাড়ী রাখার জায়গা, দর্শকদের তাড়াতাড়ি আসা-বাওয়ার ব্যবস্থা ও আরও কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও আলোচনা চলে।

জানা গিয়েছে যে, ডাঃ রায়ের মনে আরও একটা ট্রেডিয়ামের পরিকল্পনা আছে। ক্যালকাটা মাঠ অথবা মোহনবাগান—ইটবেঙ্গল মাঠে ত্রিশ-পঁয়ত্ৰিশ হাজার দর্শক সঙ্কুলান হতে পারে এইরূপ একটা নকশা তিনি আই, এক, এর সম্পাদককে পেশ করতে বলেছেন।

ইতালিয়ান স্থপতি সিনর আনিবেন ভিটোলজি সঙ্গী কলিকাতার এসেছিলেন। এই নকশা রচনা নিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে প্রকাশ। ভিটোলজি আবার কলিকাতার আসবেন। খবরটা বেশ গালাগতি। দেখা যাক, আর কতদিন কলিকাতার ক্রীড়ামোদীদের ট্রেডিয়ামের অন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

ইংলও প্রথম টেস্টে জয়ী

ইংলও ও দক্ষিণ আফ্রিকা ক্লাবের প্রথম টেস্ট খেলাটি সম্প্রতি এজবাস্টন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই খেলার ইংলও ১০০ রানে জয়ী হয়। খেলার শেষের দিকটা বেশ জমে উঠেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলও ক্লাবের টুয়ান, ট্যাথাম ও ইলিংওয়ার্থ প্রথমসরীর ভাবে বোলিং করেন।

রান সংখ্যা

ইংলও—১ম ইনিংস ২১২ (তুকা ৭৩ ৫০, শিখ ৫৪, ডেব্রটার ৪২; এ্যাডকক ৬২ রানে ৬ উইঃ)।

দক্ষিণ আফ্রিকা—১ম ইনিংস ১৮৬ (ডয়েট ৫৮, ওমোল ৫২; টুয়ান ৫৮ রানে ৪ উইঃ, ইলিংওয়ার্থ ১৫ রানে ৩ উইঃ; ট্যাথাম ৩১ রানে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস ২০০ (ওয়ার্ডার ৩৭, সুরা রাও ৩২, শিখ ২৮, ডেব্রটার ২৬, টুয়ান ২৫; টেকিঙ ৩২ রাণে ৪ উই:)।

দক্ষিণ আফ্রিকা—২য় ইনিংস ২০১ (ম্যাকলীন ৬৮, ওয়েট মট আউট ৫৬; টুয়ান ৫৮ রাণে ৩ উই:, ট্যাথাম ৪১ রাণে ৩ উই: ও ইনিংওয়ার্থ ৫৭ রাণে ৩ উই:)।

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল গঠিত

রোমে সপ্তদশ অলিম্পিক বিশ্ব বিজয়ী হকি দলের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রীড়া-জগতে যে জল্পনা-কল্পনা চলছিল তার অবসান হয়েছে। ভারতীয় দলটি চূড়ান্তভাবে গঠিত হয়েছে। তবে ২১জন খেলোয়াড় মনোনয়ন করা হয়। শিকা শিবিরে বোগদানের পর একজন খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়ার কথা ছিল। কারণ ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ২০জন হকি খেলোয়াড় অনুমোদন করে। কিন্তু বাজালার খ্যাতনামা খেলোয়াড় কেশব দত্ত ব্যক্তিগত কারণে রোম অলিম্পিকে যেতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন, ফলে একজন খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়ার সমস্তা থেকে কেডারেশন কর্তৃপক্ষরা বেঁচে গেছেন। বাজালার এল ক্লাডিয়াস ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন। এর পূর্বে তিনি লণ্ডন, হেলসিংকি ও মেলবোর্ন অলিম্পিকেও ভারতীয় হকি দলের প্রতিনিধিত্ব করার জৌর্য অর্জন করেছেন।

সুত অলিম্পিকের সেমি-ফাইনালে উন্নীত চারটি দলকে (ভারত, সুস্বারাজ্য, জার্মানী ও পাকিস্তান) এবারকার অলিম্পিকে চারটি গুপে রাখা হবে। মোট ১৩টি দল এই প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ করবে। চারটি গুপের খেলা লীগ প্রথার হবে। এই প্রথের বিজয়ী চারটি দল সেমি-ফাইনালে নক-আউট প্রথার খেলবে। এইবারকার প্রতিযোগিতার ভারত, ইটালী, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, হাঙ্গারি, জাপান, কেনিয়া, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, সুস্বারাজ্য, জার্মানী ও পাকিস্তান। অংশ গ্রহণ করবে।

ভারতীয় দলের সঙ্গে একজন ম্যানেজার ও একজন কোচ হাড়া এবার একজন শরীর শিকার উপদেষ্টা পাঠানর ব্যবস্থা হয়েছে। তৃতীয় কর্তৃকর্তা-শরীর শিকার উপদেষ্টা নির্বাচন করে ভারতীয় হকি কেডারেশন এবার নতুনদের পরিচয় দিয়েছেন। অর্থ ব্যয় করে এরপ একজন কর্তৃকর্তা পাঠানর কেন প্রয়োজন হ'লো—তা কেডারেশনের কর্তৃকর্তারাই বলতে পারেন। নিম্নে ভারতীয় হকি দলের মনোনীত খেলোয়াড়ের নাম প্রদত্ত হ'লো :—

গোল—লক্ষণ (সার্ডিসেস) ও দেশমুখ (মহীশূর)

বাক—পৃথিবী সিং (পাঞ্জাব)। রমনলাল শর্মা (উত্তর প্রদেশ)। শান্তারাম (সার্ডিসেস) ও বালকিবেশ (বেলজিয়)।

হাক-বাক—এল ক্লাডিয়াস (বাজালা)—অধিনায়ক, এ্যাণ্টিক (বেলজিয়), চরজিং সিং (পাঞ্জাব), শাবত (মহারাষ্ট্র) ও মহীন্দার সিং (বেলজিয়)।

করওয়ার্ড—উদয় সিং (পাঞ্জাব), বশবত সিং (সার্ডিসেস), পাতিস (মহারাষ্ট্র), ভোল, (সার্ডিসেস), বোগীন্দার সিং (বেলজিয়)

পিটার (সার্ডিসেস), আরম্যান (বেলজিয়), অরোরা (বেলজিয়) ও ম্যান ক্রেভাস (বোখাই)।

ট্যাণ্ডবাই—গোল—এস, মেডিস (বোখাই)। বাক—আলেকজান্ডার (মহারাষ্ট্র)। হাক-বাক—দেশমুখ (সার্ডিসেস) করওয়ার্ড—হরিপাল (সার্ডিসেস) ও নাগরাজ (মহীশূর)।

ম্যানেজার—শ্রী বি. এল. গুপ্ত।

কোচ—শ্রীকিবেশলাল।

শরীর শিকার উপদেষ্টা—কমাণ্ডার বি. এস. শিখি।

ডেভিস কাপ হইতে ভারতের বিদায় গ্রহণ

ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চল কাইভালে ফিলিপাইন ৫-০ খেলার ভারতকে পরাজিত করেছে। এই জয়লাভের ফলে ফিলিপাইন আন্তঃ আঞ্চলিক কাইভালে ইউরোপীয় অঞ্চলের বিজয়ীর সঙ্গে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ফিলিপাইন ভারতের কাছে দু'টি সিঙ্গেলস এবং একটা ডাবলসে জয়ী হয়ে ৩-০ খেলার অগ্রগামী হয়। এই ভাবে জয়-পরাজয়ের নিশ্চিতি পূর্বেই হয়ে যাওয়ার অবশিষ্ট দুটি সিঙ্গেলসের খেলার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। চূড়োপূর্ণ আবহাওয়া ও স্কট্রির জন্ত রমানাথ কৃষ্ণাণ (ভারত) বনাম জুবান জোল (ফিলিপাইন) এবং নরেশকুমার (ভারত) বনাম এম্পনের (ফিলিপাইন) সিঙ্গেলসের খেলা হওয়া সম্ভবপর হয়নি। ভারতীয় দল অবশিষ্ট দুটি সিঙ্গেলসে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়ার ফিলিপাইন ৫-০ খেলার জয়লাভ করে।

এশীর চ্যাম্পিয়ন রমানাথ কৃষ্ণাণের কাছে এম্পনের এইবারকার অপ্রত্যাশিত জয়লাভে বিশ্ব টেনিস মহলে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। ধর্মান্তি এম্পনকে যেখানে মনে হয় না যে তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। কৃষ্ণাণের জায় চৌধুর খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে তাঁর সাক্ষ্য সত্যিই কৃতিত্বের পরিচায়ক। এইদিন খেলা দেখার জন্ত প্রায় দু'মহল্ল দর্শক সমাবেশ হয়। কিন্তু দর্শকরা এম্পনের পক্ষ অহলসন করার কৃষ্ণাণ খুবই উত্সাহ ও বিচলিত হয়ে পড়েন। দর্শকদের চীৎকারে তিনি বিরক্ত বোধ করেন। অমেক সময় তিনি ইচ্ছা করেই পয়েন্ট দিয়েছেন। ১০ মিনিট খেলার মধ্যে কৃষ্ণাণ খুব কম সময়ই খাতাবিক ভাবে খেলতে পেরেছেন। কৃষ্ণাণের জায় খেলোয়াড়ের পক্ষে দর্শকদের আচরণে উত্সাহ বোধ করা সমীচীন হয়েছে বলে মনে হয় না। নিম্নে ক্লাকল প্রদত্ত হ'ল :—

সিঙ্গেলস—ফেলিসিস যো এম্পন (ফিলিপাইন) ৬-৩, ৮-৩ ও ৬-১ সেটে রমানাথ কৃষ্ণাণকে (ভারত) পরাজিত করেন।

য়েমেত্তো ডেরো (ফিলিপাইন) ৬-০, ৬-১ ও ৬-১ সেটে নরেশকুমারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডাবলস—এডুয়ার্দো ডুজো ও জুবান জোল (ফিলিপাইন) ৬-২, ৬-২ ও ৬-২ সেটে রমানাথ কৃষ্ণাণ ও নরেশকুমারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের ক্রীড়ামূলী

আন্তর্জাতিক ফুটবল এসোসিয়েশন-এর অলিম্পিক কমিটি রোমে সপ্তদশ অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গণে ফুটবল প্রতিযোগিতার চূর্ষ গুপের

যে ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রস্তুত করেছেন তাতে ভারতকে প্রথম খেলায় পশ্চিমবঙ্গী হাজারীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এই খেলা হবে ২৩শে আগস্ট অ্যাঙ্কুইলার। সেমি-ফাইনাল খেলাগুলি এই ও ৬ই সেপ্টেম্বর নেপলস ও রোমে অস্ট্রেলিয়ার আয়োজন করা হয়েছে। ১০ই সেপ্টেম্বর রোমে ফাইনাল খেলা হবে। ১ই সেপ্টেম্বর রোমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাবিকারী নির্ণয়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। নিম্নে চতুর্থ পূর্ণের ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রস্তুত হ'ল :—

- ভারত : হাজারী—২৩শে আগস্ট (অ্যাঙ্কুইলার)।
- ভারত : ফ্রান্স—২১শে আগস্ট (প্রেসেটোতে)।
- ভারত : পেরু—১লা সেপ্টেম্বর (পেনসকারার)।

টমাস কাপে ভারতীয় দলের খেলা

এশীয় ব্যাডমিন্টন কনফেডারেশনের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে টমাস কাপের এশীয় অঞ্চলের বিভিন্ন খেলা একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে গৃহীত হলেও আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন কনফেডারেশন সে সিডনিতে নাচক করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন কনফেডারেশনের কর্মসূচি এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ জারী করার এশীয় কনফেডারেশনের কর্মসূচি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী টমাস কাপ প্রতিযোগিতার এশীয় অঞ্চলের খেলাগুলি বিভিন্ন অঞ্চলেই অনুষ্ঠিত হবে।

ভারত, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, হংকং, সিংহল ও মালদেব টমাস কাপের এশীয় অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বর্তমান কর্মসূচী অনুযায়ী ভারত ও থাইল্যান্ডের খেলা ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হবে এবং এই খেলা ব্যাঙ্ককে হবে বলে ঠিক হয়েছে। এই খেলার বিজয়ী দলের ইচ্ছানুসারে কোন এক অঞ্চলে সেমি-ফাইনালে মালদেবের সঙ্গে তাদের খেলতে হবে। এই খেলা নভেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

পাকিস্তান ও সিংহলের খেলা পাকিস্তানে হবে বলে ঠিক হয়েছে। এই খেলা ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করণ হবে। এই খেলার বিজয়ী দল পরবর্তী রাউন্ডে হংকং-এর সঙ্গে খেলবে। এই খেলাও নভেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভারত সফর

আগামী ১৬ই নভেম্বর থেকে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের তিন মাসব্যাপী ভারত সফর শুরু হবে। সফরকারী দল পাঁচটি টেস্ট খেলাসহ ভারতে মোট ১৪টি খেলার বোপদান করবে। পূণ্যায় সম্মিলিত

বিভক্তিদানের দলের সঙ্গে তাদের প্রথম খেলা হবে। তবে পাকিস্তান দলের যে সফরসূচী প্রস্তুত হয়েছে তাগা জুলাই মাসে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরবর্তী কার্যকরী সমিতির সভায় চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবে বলে ঠিক হয়েছে। নিম্নে ভারত ও পাকিস্তানের পাঁচটি টেস্ট খেলার সম্ভাব্য তারিখ ও স্থানের তালিকা প্রস্তুত হল :—

- প্রথম টেস্ট—২রা, ৩রা, ৪ঠা, ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর (বোম্বাই)।
- দ্বিতীয় টেস্ট—১৬ই, ১৭ই, ১৮ই, ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর (কানপুর)।
- তৃতীয় টেস্ট—৩০শে, ৩১শে, ১লা, ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৬১ সাল (কলকাতা)।
- চতুর্থ টেস্ট—১৬ই, ১৪ই, ১৫ই, ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী (মাদ্রাস)।
- পঞ্চম টেস্ট—৮ই, ১ই, ১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী (দিল্লী)।
- ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ সাল পাকিস্তান দল স্বদেশ অভিমুখে রওনা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

পূর্ব-আফ্রিকা সফরে গুজরাট ক্রিকেট দল

গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পূর্ব-আফ্রিকার উজ্জ্বল সফরে একটি ক্রিকেট দল পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ৩রা আগস্ট থেকে আরম্ভ হয়ে ৩০শে সেপ্টেম্বর সফর শেষ হবে। গুজরাট দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের মধ্যে ১২ জন ভারতের পক্ষে টেস্ট খ্যাতি পেয়েছেন। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ এই সফরের জন্য মনোনীত হয়েছেন :—সাগা অমরনাথ (অধিনায়ক), বেণু প্যাটেল, পলি উদ্রীপড়, আর. বি. ফেরী, এন. এল. জয়সিঙ্গা, আর. জি. মাদকারনি, এ. জি. মিলখা সিং, দীপক সোধন, এক এম. ইন্ডিয়ায়, লবি কনট্রাস্টার, এন. ত্রিবেদী, আর. বি. দেশাই, আর. দিভেতা, জেনকু ওয়াধিয়া, সুধাকর প্যাটেল, অক্ষয় নারেক, জি. দেশাই ও সুব্রহ্মনাথ।

ভরপ ও উদীরমান খেলোয়াড়রা এই সফরে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাবেন। এই সফরের অনুমোদন দেওয়ার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাতে হয়।

৩রা কিছুদিন পূর্বে 'ভারতীয় টারলেটস' দলকে পাকিস্তান সফরের যে অনুমোদন দিয়েছিলেন তাতে কল বেশ ভালভাবেই হয়েছে বলে ম'ন হয়। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ সাক্ষ্যের সঙ্গে পাকিস্তান সফর করে এসেছেন। গুজরাট ক্রিকেট দলের সফর শুভ হউক, এটাই সকলে আশা করেন।

সমুদ্র সন্দর্শনে

[Moore-এর A thought of sea-র অনুসরণ]

নীলাবুর 'পরে ওঠে জ্যোৎস্নায় হাসি
 ঘুরে ঘুরে উমির বুক ওঠে ভাসি।
 উছলিত কেশরাশি-বারিধির বুক
 নিম্নে হারায় সব স্তম্ভিতল সুরে।

মানব মানসে খেলে সুখ আর দুখ
 কালের প্রবাহ (ধারা) বহে প্রকৃতির বুক
 নিম্নে হারায় পুনঃ সে প্রবাহধারা
 কালের করাল স্পর্শে হয় সর্বধারা

দেশ- বিদেশ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ (মে-জুন, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক চাকুরিয়া সেকের ধারে নব নির্মিত ট্রেডিংয়ের (কলিকাতা ইমপ্লিমেন্ট ট্রাস্ট পরিকল্পিত) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে): 'নাগরিক প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষে ইফ ল ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের কাঁচনে গ্যাস ও লাঠি চালনা—কতিপয় নারী সহ করেকজন আহত।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে): পশ্চিমবঙ্গ বিধান পথিক্বে পুনর্কাসন সচিব জি প্রফুল্লচন্দ্র সেনের ঘোষণা—সুষ্ঠু পুনর্কাসন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত হওকারণো উদ্বাস্ত প্রেরণ বন্ধ থাকিবে।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৮ই মে): কলিকাতা কর্পোরেশনের অচলাবস্থা অবসানকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত—বিবদমান হুঁটি দলের মধ্যে আপোষ-নীচাংসা না ঘটিলে কর্পোরেশন বাতিল করা হইবে।

৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে): উড়িষ্যার চরবেতিয়ার পুনর্কাসনপ্রাপ্ত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের চরম দুরবস্থা—অবস্থার পর্যালোচনা ও প্রতীকারের দাবীতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত উদ্বাস্ত প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকার।

৬ই জ্যৈষ্ঠ (২০শে মে): প্রায় ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতে ৪টি বন্দরের (টিউটকোরিং, মাজালোর, পরদীপ ও পোরবন্দর) পর্যাপ্ত উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত অল্পমত বন্দর উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২১শে মে): বনগী মহকুমায় প্রচণ্ড দুর্বিপাত্যা—তিন শত পরিবার নিরাশ্রয়: তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে): পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃকল্পেজালিতে বাণালী নিরোগ বাধাতামূলক করার দাবী—কর্ক-সন্ধান সপ্তাহের উদ্যে ধন উপলক্ষে রাজ্য সুবোধ মন্ত্রক কোয়ারে (কলিকাতা) অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রস্তাব।

শিল্পীতে মহাধাণা প্রতাপ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় খরাষ্ট সচিব পণ্ডিত গাবিন্দবরত পণ্ডের দাবী—উত্তর সীমান্তের (ভারত-চীন) পরিস্থিতিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ না থাকিলেই নয়।

৯ই জ্যৈষ্ঠ (২৩শে মে): কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচন সভা আইনভ: অসিদ্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্য-ব্যবস্থা বিধিসম্মত হইয়াছে বলিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের হার।

প্রখ্যাত মল্লবীর পায়ার (৮০) লাক্ষের হানপাতালে পরলোকগমন।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে): পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যেবীর কুসম্পত্তি সংগ্রহে বাধা-নিষেধ আরোপের ব্যবস্থা—রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অভিজ্ঞদের খসড়া অনুমোদন।

১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে): পাজাবে হুই শতাব্দিক আকালী নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার—'পাজাবী সুবা' দাবীর পরিণতিতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সরকার কর্তৃক সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন।

কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ ও উহার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ—'দাবী দিবস' উপলক্ষে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বিরাট সভা ও মিছিল।

১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৬শে মে): উপক্রমত অকলে গুণ্ডারী দমনের জন্য নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগ—রাইটার্স বিজিএ পুলিশের ডি, আই, জি, ও এ, আই, জি, সন্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে): কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনের জন্য রাজ্যপাল কর্তৃক অভিজ্ঞাল জারী—কমিশনারের উপর মেয়র নির্বাচনের জন্য সভা আহ্বানের ক্ষমতা অর্পণ।

আসামের সর্বত্র প্রবল ভূমিকম্প—৪০ সেকেণ্ডব্যাপী কম্পন অনুভূত।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে): পশ্চিমবঙ্গের সাপ্তাহিকবর্তী অকলে প্রবল বড়ের ধ্বংসলীলা—ভারতগুহারবার, কাকদীপ, ক্যানিং হলদিয়া প্রভৃতি অকল বিপর্যস্ত।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে): কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতি ও অযোগ্যতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা—সিঙ্গাগার অধিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সভাপতি জিডি, জি, দেশপাণ্ডের ভাষণ।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩০শে মে): মাকড়সির স্বাধীনতা ও সার্কর্ভৌমত্ব রক্ষায় সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তত হইউন—সিঙ্গাগার সর্বদনা সভায় জাতির প্রতি বাষ্ট্রপতি ডাঃ রাঞ্জনপ্রসাদের আহ্বান।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে): ক্যানিং কেন্দ্রের বিধান সভা উপনির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী (শ্রীমতা সাকিলা খাতুন) বিপুল ভোটারিকো জয়লাভ—ক্যানিং প্রার্থীসহ অপর পাঁচ জন প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয় বরণ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ (১লা জুন): কালীঘাট স্ট্রীকের উপর মালগাড়ীর সহিত বজবজ লোক্যাল ট্রেনের সংঘর্ষ—হুই ব্যক্তি নিহত।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন): পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্ত সংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ এবং পুনর্কাসন ব্যবস্থা এ হাং ১১৫ কোটি টাকার অধিক ব্যয়—কলিকাতার রোটারি ক্লাবে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্ত পুনর্কাসন উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে তথ্য প্রকাশ।

২০শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন): কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীকেশবচন্দ্র বহু ও ডাঃ ইসমাইল ইব্রাহিম ১১৬০ সালের জন্য বখাক্ষমে কর্পোরেশন (কলিকাতা) মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত—কর্পোরেশনের দেক মাসব্যাপী অচলাবস্থার অবসান।

১৯৬২ সাল হাংতে পুনরায় আত্মরানী মাসে পশ্চিমবঙ্গ বাধ্যমিক বিভাগসমূহের সেন্সস আরম্ভ—মধ্য শিক্কা পর্বতে (কলিকাতা) অনুষ্ঠিত সন্মেলনের সিদ্ধান্ত।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন) : কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র মৌলিক পরিবর্তনের দাবী অগ্রাহ—পূণ্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের প্রারম্ভেই ওয়ার্কিং কমিটি ও সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ।

২২শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন) : কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্বাচনের প্রস্তাব—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে (পূণ্য) ৭৮-১৪৮ ভোটে অগ্রাহ।

সোভিয়েট ইউনিয়নে মার্কিন ইউ-২ বিমান (গোয়েন্দা কার্যে নিপু সামরিক বিমান) প্রেরণ আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী—পূণ্য এ. আই. সি. সি. বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী জীনেহর ঘোষণা।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন) : সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের প্রায়াকলে আংশিক বৈশ্বিক যুদ্ধের ব্যবস্থা—রাজ্য মন্ত্রিসভার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

চীন-ভারত সীমান্ত বিবাদে প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের একদল অফিসারের শিকিৎসা যাত্রা।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন) দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতির পূরণ ও মূল্যবৃদ্ধি রোধের ব্যবস্থা—আমেরিকা সরকারে দিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রি জি. এম. কে. পাতিঙ্গ কর্তৃক নূহন ভারত-মার্কিন চুক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ (৮ই জুন) : ষাটি পাঞ্জাবী ভাষাভাষী রাজ্য গঠনের জন্য গণ-প্রচার আন্দোলন চালানো সম্পর্কে কনুনিট পার্টির পাঞ্জাব রাজ্য পরিষদ সম্মেলনের (জলদ্বর) সিদ্ধান্ত।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (৯ই জুন) নাগা পাহাড় অঞ্চলে বেলপথ বরাবর আগাম সরকারের প্রয়োজনে সৈন্য মোতায়েন—বিদ্রোহী নাগাদের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ বৃদ্ধির জের।

সরকারী কর্মচারী (পশ্চিমবঙ্গ) নেতাদের সামগেয় করার প্রতিবাদে কলিকাতা ও মহাবঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের বিক্ষোভ।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন) : কংগ্রেসী কার্জনিকদের প্রতিদ্বন্দিতার কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়—কলকাতায় (কলিকাতা) ট্যাঙ্কিং কমিটির নির্বাচনী সভার চাকলা।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ (১১ই জুন) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য দপ্তর হারী দপ্তরে পরিবর্তন—রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১২ই জুন) : দিল্লীতে বিক্ষোভকারী আফগানী কর্মচারী ('পাঞ্জাবী সুখা' দাবীর মর্ষক) সহিত পুলিশের সংঘর্ষ—একজন আফগানী নিহত ও উভয়পক্ষে হতীশত জন আহত।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন) : জুলাই মাসে তৈনিভাগে (উত্তর প্রদেশ) শিথিলবানী ছয় লক্ষ উষাককে প্রেরণকরমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত—কলকাতায় উষাক প্রেরণ আশাতকঃ স্থগিত।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন) : অর্ধ-পূর্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত উষাক শিথিল বন্ধ করা চলিবে না—রাষ্ট্রপতির বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় পূর্বাধীন সচিব জি.মহেশ্বরীস্ব প্রচারিত সহিত বৈঠককালে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক জ্ঞ অতিরিক্ত আশঙ্ক।

বহির্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) : সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক সামরিক সহিত মহাপুত্র বর্ষিক মাসবকালী কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ।

২লা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে) : প্যারিসে বহু প্রতীক্ষিত প্রাচ্য-প্রতীক্ষ

দীর্ঘ সম্মেলন আওতা—সম্মেলনের নুচনাতেই সোভিয়েট আক্রমণ মার্কিন গোয়েন্দা বিমান প্রেরণ প্রসঙ্গ লইয়া তুহুল উত্তেজনা সৃষ্টি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের প্রতি কশিরা লক্ষ্যে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার—দীর্ঘ সম্মেলনে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে) : পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ সম্মেলন নুচনাতেই ব্যর্থতার পর্ববসিত।

৬ই জ্যৈষ্ঠ (২০শে মে) : লিফিং-এ ত্রিশ লক্ষাধিক চীনার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ ও দীর্ঘ সম্মেলনে রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের জুমিকা সমর্থন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২১শে মে) : পূর্ব জার্মানিতে একখানি মার্কিন সামরিক বিমান আটক—বৈমানিক সহ নয় জন আয়োদিক জিজ্ঞাসাবাদকল্পে রুশ দপ্তরে প্রেরণ।

জাপানে কিশি মন্ত্রিসভা চরমতম সঙ্কটের সম্মুখীন—জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানীদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে) : রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আমেরিকার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা বিমান প্রেরণ প্রসঙ্গে কশিরা বিক্ষোভ প্রস্তাব পেশ।

১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৬শে মে) : রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আমেরিকার বিরুদ্ধে সোভিয়েট নিন্দা প্রস্তাব অগ্রাহ।

অপরাজিত ধবলগিরি শৃঙ্গ বিজয়—মুইস অভিযাত্রীদের অসামান্য কৃতিত্ব।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে) : তুয়েক সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পাকিস্তান কর্তা গ্রহণ—প্রেসিডেন্ট প্রধান মন্ত্রী ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রেরণ।

চীনা অভিবাত্রী দলের এভারেস্ট বিজয়—চূর্ণজন্ম উত্তর পর্বত দিয়া তিনজন পর্বতারোহীর সর্বোচ্চ শিখরে আয়োক।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে) : বনামগত রুশ সাহিত্যিক বোয়িশ প্যাট্রিয়নাকের (৭০) মর্ষো-এ জীবনদীপ নির্বাণ।

১১শে জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন) : রুশ পররাষ্ট্র সচিব জীয়ে প্রোমিকো কর্তৃক আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও ভারত সমেত নয়টি রাষ্ট্রের নিকট সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে কশিয়ার নূতন পরিকল্পনা পেশ।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন) : নেপালের সীমান্ত বরাবর চীনা সৈন্য বাহিনীর বিপুল সমাবেশ—পশ্চিম তিব্বতে রকেট ও সীজেরা পাকী আমদানীর সংবাদ।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন) : সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক রুশ প্রতি পূর্ব-পশ্চিম নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে তিন পর্যায় বিশিষ্ট নূতন নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা উপস্থাপিত।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন) : টোকিও বিমানঘাঁটিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের প্রেস সেক্রেটারী মিঃ জেনসু হায়াটি ও জাপানীয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ওগাসা ম্যাকআর্থীরের বন্ধিত্ব—বিস্ময় জাপান-হাজিরের কল হইতে হেলিকপ্টারযোগে উদ্ধার।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন) : কশিরা ও রুশ গোত্রিত্বক নাগরিকদের জর্ডন প্রবেশে বাধা—কনুনিট অধিবেশন বন্ধের জন্য জর্ডন সরকারের কার্য-ব্যবস্থা।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন) : দক্ষিণ আফ্রিকার হুতি-সরকারীতন্ত্র শিহনে ঐক্যবদ্ধ হউন—আফ্রিকা-আবাবার দাবীস আফ্রিকার একতন্ত্র প্রতি ইপিওপিরায় সরাট হাইলে সেনাধীস আধার।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুনর্বাসন প্রহসন

“পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন-সচিব প্রফুল্লচন্দ্রের কথা অধিক না বলাই ভাল। প্রথমেই যদি তিনি মেহেরচাঁদের মহলব বুঝিয়া বাঙ্গালীর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়া কাজ করিতেন, তবে চল্লিশটি মাত্র পরিবারের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করিয়া এক হাজার পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাইবার সাহস মেহেরচাঁদের হইত না। তাঁহার চোঁতোতেই মেহেরচাঁদকে উল্টা গাধার দিল্লিতে পাঠানো হইত। তিনি জাহা করেন নাই। কেন করেন নাই, সে কৈকিরং তাঁহাকে আগামী নির্বাচনে নির্বাচকদিগকে দিতে হইবে। মেহেরচাঁদ বাহা বলিয়াছেন এবং বিধান বাবু বাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, উভয়ের অসামঞ্জস্য যে কোন লোক সহজে দেখিতে পাইবেন। এক্ষেত্রে বিখ্যাতকে ? মেহেরচাঁদের কার্যকালে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা অপব্যয়িত হইয়াছে কিনা স্থির করিবার জন্য নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন। কংগ্রেসের নূতন সভাপতি রেড্ডি মহাশয় যে তদন্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা মেহেরচাঁদকে দিয়া আরম্ভ করিলেই ভাল হয় না? মেহেরচাঁদ আত্মরক্ষার জন্য মরণ কামড় দিতেছেন। এখন দেখা যাউক, কি হয়। এদিকে মেহেরচাঁদের বহিষ্কার একরূপ নিশ্চিত বুঝিয়া চাকরীতে ফালনেমীর লঙ্কাতাপের ব্যাপার ঘটতেছে। কেহ বলিতেছেন— দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারপ্রান্তে প্রধান সেক্রেটারী সীসতোন্দ্রনাথ রায়কে দেওয়া হউক। তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের চাকুরীয়া ছিলেন—নুতরাং ‘সর্বজ্ঞ’। ইন্সপেক্টর সেন যদি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইতে পারেন, তবে সত্যেন্দ্রনাথ দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা রূপায়ণ করিতে পারিবেন। কেন? বাহারা বহু দিন চাকরী করিয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুকাল ধ্যস্ত তাহা করিতে পারিবেন না কি?”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

কলিকাতা কর্পোরেশন

“কাউন্সিলার-অন্ডারম্যান, এবং সেই কমিটিগুলি—বাহারা নামেই ট্যাংগি, আসলে শয়ান বা ঘুমন্ত—মিলিয়া যে বারোয়ারী মণ্ডপ খাড়া করিয়াছে সেখানে বলি দিবার জন্য নাগরিক স্বার্থ ছাড়া নিরীহতর কোন জীব আজ অবধি বুঝিয়া পাওয়া যায় নাই। জোড়া মেঘের নির্বাচন পৌরসভার আর একটি অপকর্ম কীর্তি এবং মাত্র সেদিনের ঘটনা। পুরানো কাস্তুরি ষাঁটিতে চাই না। আজ সরকারী রূপে একটা জট অন্ততঃ খুলিয়াছে, এবং পৌর নির্বাচনের প্রকৌশল তালিকা তৈয়ার করার ভার রাজ্য সরকার বহুতে গ্রহণ করার কথাও প্রাবলিভেছেন। এই অবসরে নাগরিকেরাও বিচার

করিয়া দেখিতে পারেন, পৌরসমস্তা সম্পর্কিত স্থপকিলের সত্যকার আসান কী। টোটকা কোনও মুষ্টিযোগ নয়, সাময়িক একটা সুরাহাও নয়, একটা চিবছারী করশালার উপায় বুঝিবার সময় আসিয়াছে। নানা মহলে গুঞ্জন চলিতেছে—“অতঃ কিম?” কোন্ রাজনৈতিক দল পৌরসভার প্রভুত্ব করিবে, কোন্ মান্যবর মেয়রের মুকুট পরিবেন এ সবেয় সমাধান রহিয়া-সহিয়া করা সম্ভব, কিন্তু সময় ও শ্রোতের মত জল-কল বা প্রাবনের সমস্তা ত কাহারও মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করে না, একটা আশু মীমাংসার দাবী ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। কাউন্সিলাররা যতদিন মেয়াদ ততদিন টেবিল চাপড়াইয়া আসর মাত করিতে থাকুন, ততদিনে একটা স্তম্ভ জনমত দানা বাধিয়া আপনা-আপনি একটা উপায় স্থির করিয়া লইবে। তাঁহারা প্রের করিবে, কলিকাতার বড় বড় নলকূপ খননের পুরোনো কীর্তীর উপর চাপা দেওয়া খামাটা সযিতে আর কত বাকী? বিশ্ব-বাহ্য সংস্থার প্রতিনিধিদল যে মেট্রোপলিটান ওয়াটার বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাকে রূপদানের দিনটিই বা কতদূর? টালার ওই আকাশ-চাটা চৌবাচ্চা আজও খাড়া আছে বটে, কিন্তু শূন্যের সৌধে যেমন বসবাস করে চলে না, ওই চৌবাচ্চাটার দিকে চাহিয়া থাকিলেও ত তেমনিই ভূখা মিটিবে না। পয়ঃপ্রণালীগুলি আজও আকর্ষ বুঝিয়া আছে, বাড়ী তৈয়ারীর মঞ্জুরী ইত্যাদি সম্পর্কিত অনেক অনাচার এবং পাকিলিতি আর্জনার মত জমা হইয়া রহিয়াছে।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

আমাদের লেখাপড়া

“বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অবাধ অধিকার দানই কি এজন্য দারী? বলা বাহুল্য, তা নয়। অসুচ মানসিকতা-সম্পন্ন শিক্ষাদাতাদের দায়িত্বও কম নয়! বাহারা নিজেরা বিভ্রান্ত-বৈদগ্ধ্যের তুলশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, বহু বিচিত্র ভাবসম্পদের মধ্য দিয়া বাহাদের মন মানসিকতার প্রকাশ হইয়াছে, এমন শিক্ষকরা যদি আজ আমাদের দেশে স্থলভ না হইতেন, তা হইলে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের এই স্থ্যতিই তাঁহাদের শিষ্যদের কীর্তির মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইত। শিক্ষকরা কেউ রাজনৈতিক ভাগ্যবেশিতার, কেউ স্থূলপাঠ্য পুস্তকের মন্ত শিকারে ব্যাপৃত কেউ বা অস্ত্র ভাবে কড়ি কামানো লইয়া ব্যস্ত। সন্ন্যাসী মূর্খের সঙ্গে ছাত্র-জীবনের পথ অনেকই সংশ্লিষ্ট। আর তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভা ও মনশ্চিত্তা সম্পদের সংখ্যাও হুত্মাপ্য। কাজেই তাঁহাদের ছাত্রদের অসুপ্রাণিত করিতে পারেন না। নুতরাং বাহাই করিয়া শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র কলেজে নিজেই হইবে না, বাহাই করিয়া গুণী শিক্ষকও নিতে হইবে। তাঃ দেশরূপ ঠিকই বলিয়াছেন যে, নূতন যুগের চ্যালেঞ্জকে পুরানো প্রথার জীর্ণ অস্ত্র নিয়া আমরা কখনো পারিব না। আমাদের পাঠ্য-তালিকা আবুল বদলাইতে হইবে। পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা আবুল বদলাইতে হইবে এবং এজন্য শিক্ষা দান ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব হইতে বকেয়া মাহুযদেরও দৃঢ় হাতে বিহার দিতে হইবে। যুগের বিধর, আমাদের কর্তৃত্বের ছনিয়ার বৌবনের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ। জরাজীর্ণ উপরওয়ালার আর সকলেরই ক্রটি ও অসম্মতি দেখেন, কিন্তু নিজেদের দিকে তাকাইতে ভুলিয়া যান। আসল গলনের মূলীকৃত কার্যই তাঁহারা এবং বাহাতা আমাদের শিক্ষা-বীকার পুঁজি

নিরা তাঁহারা এ সুস্বের উচ্চ শিক্ষা পরিচালনা করিতে আসিয়াছেন বলিয়াই শিক্ষা ও শিক্ষার্থী, কাহারো হিতই তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং আর সব দিকগুলির মতো এই দিকটির কথাও যদি অকপট আত্মসমালোচনার মনোভাব নিয়া বাচাইয়া দেখা হয়, তবেই হয়ত কিছু কাজ হইবে।”

—যুগান্তর।

কলিকাতার দুঃখ

“সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হইয়াছে—কলিকাতার কর্মসংস্থান কিছুটা বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধি দেখা দিচ্ছে পুষ্করিচর্যা ও দোকান ব্যবসার ক্ষেত্রেই মাত্র। কাজের বাজারে বিপুল সংখ্যক কিশোরীও যোগ দিয়াছে—ইহাদের অর্ধেক দোকান, হোটেল ও রেস্তোরাঁর। তাহা ছাড়া নারীদের মধ্যে বেকারীর অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পর সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হইল, বে-অলস সংখ্যক মানুষের কোন প্রকারে একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে সেই সকল উপার্জনকারীদের শতকরা ৮৭ জনই এক শত টাকার কম আয় করেন (ষ্ট্রেটসময়ানে প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে)। ইহাদের গড় মাসিক আয় মাত্র ৭৩ টাকা। মহানগরীর উপার্জনকারীদের শতকরা মাত্র ২৩ জনের আয় এক শত টাকার উপর। এত অল্প আয়ে মানুষের পরিবার প্রতিপালন একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে বিশ্বের অভ্যন্তরম শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতার মানুষকে জীবন বাপন করিতে হয়। শ্রমণ রাখা প্রয়োজন যে, কলিকাতার এই অর্থনৈতিক চিত্রটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষার রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে, বিরোধী দলের মুখপাত্রদের বক্তব্য নহে। ইহার পরেও কি কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস-নেতারা বলিবেন যে, তাঁহাদের শাসনে দেশের মানুষের জীবনযাত্রা ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে? কলিকাতার ভার সহরে যেখানে কর্মসংস্থানের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে সেখানে মানুষের জীবনের এই দশা! কংগ্রেসী শাসনে দেশের জনজীবনের ইহাই দুর্গতিময় পরিণতি!”

—স্বাধীনতা।

বিধান পরিষদ নির্বাচন

“বিধান পরিষদ নির্বাচনে এবার কংগ্রেস একটিও প্রাক্কুরেট এক শিকক আসন অধিকার করিতে পারে নাই, সব কটিতেই কয়ুনিষ্টপ্রার্থীদের জয় হইয়াছে। বিশেষীরা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয়তাবাদের পুণ্যভূমি বাঙ্গলাদেশ এখন আন্তর্জাতিকতাবাদের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে, হুয়ারে শত্রু আসিয়া হানা দিলে এবং দেশের মাটি লুণ্ঠন করিলেও আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী তাদেরই সমর্থন করে। তবে এটুকু বলা যায় যে, বেবড়ী মারা মাত্র ১২৮ ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। তার কারণ নির্বাচনের আগে হঠাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগ্ৰস্ত এবং বীরভূম ও বর্ধমান জেলার তাঁর ভোট বাঞ্ছা কেলিবার আরোহনের কংগ্রেসের সাংগঠনিক ব্যর্থতা। কলিকাতা কেন্দ্রে শতকরা ৭০টি ভোট প্রাপ্ত হইয়া নাই, অর্থাৎ এখানে কংগ্রেস কয়ুনিষ্ট ছাড়া

প্রার্থনোপ্য অল্প প্রার্থী ছিলেন না বলিয়া প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভোটাভাড়া ভোটই যেন নাই। ভোট না দেওয়া বিক্ষোভ প্রকাশের একটি উপায় বটে, কিন্তু তাহাতে উদ্বেগ সিদ্ধ হয় না। তার চেয়ে ভাল উপায় এঁদের পক্ষে অগ্রণী হইয়া উপযুক্ত প্রার্থী পাড় করানো। ক্যানিং উপনির্বাচনের জয়ে কংগ্রেস পক্ষ খুব নৃত্য করিতেছেন। কংগ্রেসের নীতি বা কর্মপদ্ধতি সেখানে অক্ষয় হইয়াছে, জিতিয়াছে সাম্প্রদায়িকতাবাদ।”

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

শ্রেষ্ঠতম সমস্যা

“ভারতের ভিতরে ও বাহিরে নিত্য নূতন যে কত সমস্যা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, তাহা কে না দেখিতেছেন? একটার পর একটার সমাধান করিতে না করিতেই অভাবনীয় নূতনতর সমস্যা বিপর করিতেছে। সমস্যায় সমস্যায় এখন এমন ৩ট পাকিইয়া গিয়াছে যে, তাঁ করিয়া ইহার যে কোন একটা সমাধান বাহির করিবে পাক খাইবে এমন কথা তো আর মনে করাই যায় না। কোন্ একটি সমস্যাকেই লব্ধ বলিতে চাহি না, বরং প্রত্যেকটিরই আন সমাধান হইলে খুবই সুখের হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতির বেরুপ ক্রম পট-পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে ভারতে আত্মরক্ষা করার সমস্যাটাই যে এখন সব চাইতে বড় হইয়া পাড়াইয়াছে—এই কথাটাই আজ সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসগৃহ, মজুরী, পুনর্বাসন, শিল্পোন্নতি, কৃষি-সমস্যা, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি—নানা বিষয়ে আজ আমাদের দুটি যেভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে স্বাধীনতাই যে কতখানি বিপন্ন সে পক্ষে তাদৃশ লক্ষ্যই পড়িতেছে না। সংবাদপত্রে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দু-একটা সংবাদ হইতে কচিং কখন এরূপ সংশয় হইলেও, সন্দেহ সন্দে এই ভাবিয়া মনে সাহসনা পাইবে, বিশ্বযুদ্ধের বন্ধি হইতে সহসা কেহই সাহস করিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চিত থাকিও উচিত নয়। রাষ্ট্রনাটকেরা চাকে ঢোলে সোরগোল ভুলিতেছেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের কথার কীকে কীকে বেশ বুঝা যাইতেছে—স্বাধীনতা খুবই বিপন্ন।”

—পল্লীবাসী (কালনা)।

সম্মেলনের শেষে

“রামপুরহাট মহকুমার অবহেলিত রাজ্যবাট নির্মাণ ও সংস্কার দাবী সম্মেলনে সুখবিত হইয়াছে। রামপুরহাট কংগ্রেসের তরফ হইতে বহুবার বহুভাবে এই দাবী কর্তৃপক্ষের নিকট তত্ত্ব উপকার জ্ঞপ্তি উপস্থাপিত হইয়াছে। আজ সম্মেলনে সে দাবী সুখবিত হইয়া জোরদার হইয়াছে। বীরভূম জেলা কংগ্রেসকে এই দাবীকে কার্যকরী করিবার জ্ঞপ্তি অবিলম্বে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। ইহাতে মহকুমার কংগ্রেসের শক্তি এবং সংগঠন অধিকতর কার্যকরীভাবে বৃদ্ধি পাইবে। বীরভূমের লুণ্ঠপ্রায় কুটিরশিল্পগুলির পুনরুদ্ধারের দাবী সম্মেলনে ঘনিত হইয়াছে। বীরভূমের কুটিরশিল্প এককালের সম্পদ ও পৌরব ছিল। কেন সেগুলি লুণ্ঠ হইতে চলিতেছে, কি

ভাবে সে লিকে বাঁচান ব্যয় ইহা পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যয় বীরভূম কংগ্রেসকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রচেষ্টার অনকল্যাণ, কংগ্রেস কল্যাণ—উভয়ই সাধিত হইবে। আমরা আশা করি প্রভাবের প্রতিবে তধু প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বীরভূম কংগ্রেস কাঁচ হইবেন না। সমস্ত শক্তিকে সুসংহত করিয়া গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবও বাহ্যতে এই বৎসরেই বাস্তবে রূপায়িত হইবার রং ও বর্ণ গ্রহণ করে—তাহার উক্ত জেলা কংগ্রেসকে অবিলম্বে কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সম্মেলনের সার্থকতা হইবে এইখানেই এবং এই প্রচেষ্টায়।”

—বীরভূমের ডাক।

খাজপত্রিস্থিতি সম্বন্ধে জনক

“এই মহকুমায় গত বৎসর খাজের ফসল অত্যন্ত কম হইয়াছিল। অতিরিক্ত জলের চাপে বারচৌকা, ছবদা, কাঁধি, মগরা, আঁতরাই ও ভূপবানপুর খানার বিরাট অংশে ফসল প্রায়ই নষ্ট হইয়াছিল এবং অত্যন্ত বহু অংশে খাজাবিক ফসলের চার ভাগের এক ভাগ ফসল হইয়াছিল। এই গুরুতর ফসল হানি হওয়া এবং বহু খাজ বাহিরে রপ্তানী হইয়া যাওয়ার ফলে খাজের মূল্য ১৫।০-১৬।০ টাকা ও চাউলের মূল্য ২৫-২৬ টাকা পর্যন্ত মণ দর চলিয়াছে। এই উচ্চমূল্যে ধান চাউল ক্রয় করিতে না পারিয়া বহু গৃহস্থের অনশন ও অর্ধাশন আরম্ভ হইয়াছে। মফঃস্বল অংশে লোকে খাজ ক্রয় করিতেই পাইতেছে না। গত মাঘ মাস হইতে বৃষ্টি হয় নাই, অধিকতর প্রথর সৌন্দর্যের তাপে শুধুই যে ধান চাষের ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতেছে তাহা মনে। তরিতরকারী এবং পশুখাজ খাস প্রকৃতিরও অভাব ভীষণ করিয়া অনুভূত হইতেছে। প্রয়োজনের তুলনায় পাওয়ার কষ্টকর হইয়াছে। তরকারি বাহা পাওয়া ব্যয় তাহা অপ্রিয়ুল্য, সম্বল গৃহস্থের ভ্রাতৃ, সাধারণকেও ঐ উৎকট মূল্য দিতে হয় প্রয়োজনবোধে, মতুবা শুধু নগনের তৃপ্তিতে বাহা হয়। এই ত অবস্থা। ভ্রাতৃমূল্যের মোকামের নামে সরকারী প্রহসনে সাধারণ মানুষ ত্যক্ত বিরক্ত। শুধু প্রত্যাখ্যান, হবে না, নাই, পরে পাবেন ইত্যাদি নেতিবাচক কথাই মারপ্যাচের পোলকবাঁধায় কেলিয়া নিজ অর্ধাশনের পথ করিয়া লওয়া। নানা অভাব অনটনে প্রতিটি মনুষ্যের মন বিচলিত হইয়া আছে তাহার উপর প্রাত্যহিক জীবনের এই বিভীষিকা ভোগ, দৈবী মনো, মনুষ্যসৃষ্ট সৃষ্টিভাড়া প্রকৃত ঐচ্ছিক ব্যবস্থা। তাই ইহা জনসাধারণের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নিধনী নির্বিশেষে সকলেরই অতীব মর্ষ-পীড়াদায়ক হইয়া পীড়া দিতেছে।” —নারায়ণ (কাঁধি)

ভারত কোন্ পথে ?

“ভারত বিভাগের ফলে উদ্বাস্ত সমস্ত ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া দিয়া এক দুর্নীতি ও নানাবিধ অপরাধের জন্মের সৃষ্টি করিয়াছে। শাসন পরিচালনার মধ্যে দুর্নীতি পত্তনভাবে বেধে করিয়াছে। মুনাফাখোরা ধনী সম্প্রদায় রাষ্ট্র পরিচালনার ভার বিস্তার করিয়াছে। প্রতিদিন নানা কুৎসিত ও অচিন্তনীয় পরাধের সংবাদ প্রকাশ পাইতেছে। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাপ্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, এই ঋণযুক্ত হওয়া কোনদিন সত্ত্বপূর্ণ হবে বলিয়া ধারণা হয় না। ঋণ সত্ত্ব ও অপব্যয় এবং অপচয় বৃদ্ধি হইতেছে। রাষ্ট্রভরে উৎসব ও আমোদ আকাজকের ব্যয়ব্যয় হই বৃদ্ধি পাইতেছে। পরোক্ষ ভাবে...”

অব্যয়সূচ্য বর্জিত চলিয়াছে এক সাধারণ মানুষের জীবনসীমা কষ্ট হইতে কষ্টমস্ত পথে চলিতেছে। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতি জনগণ আস্থা হারাইলেও শিকার অভাবে এবং নানা কারণে মুক্তিলাভ বাহিরায় লইতে পারিতেছে। জাতির নৈতিক চরিত্র ক্রমত নিস্কলার হইতেছে। মুসলিমলীগের পুনরুত্থান হইতেছে। ভোটার জয় কংগ্রেস মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলিতে সাহস করিতেছে না। এই অবস্থা কোন বৈদেশিক শক্তি ব্যাধি ভারত আক্রান্ত হইলে কি অবস্থার উদ্ভব হইবে তাহা স্বদেশপ্রেমিক মাজেরই চিন্তা করা ও মুক্তির পথ দেখানর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। কাঁকা কথাই দেশকে শক্তিশালী করা অথবা দেশ রক্ষা করা ব্যয় না। ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।”

—বীরভূমবাসী

বাজালীর অধঃপতন

“গুণ সমস্ত বিভাগে কেন, পুলিশ বিভাগেও দেখিবেন পকাশ কলস পূর্বেও বাজালী ও বিহার বন্দন একই প্রদেশ ছিল, তখন কেবলমাত্র ছাপরা জিলা হইতে এক অধিক সংখ্যক লোক পুলিশের কাজ করিত যে (স্বাধার দেউড়ের মতে) কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর মনিঅর্ডার বোনে ২৬ লক্ষ টাকা ছাপরার প্রেরিত হইত। বিশেষ পকাশ বৎসরে বহু প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে—কলে বহু পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে। তথাপি আজিও বঙ্গদেশ ও কলিকাতায় পুলিশের অধিকাংশ সমস্ত সামরিক পুলিশের প্রায় সকলই বাজালীর বাহির হইতে সংগৃহীত হয়। কলে বাজালী দেশের কোটি কোটি টাকা সেই সকল প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। অস্ত্র একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সকল অবাঙ্গালীগণ আমাদের দেশে বলপূর্বক আপন আপন স্থান সংগ্রহ করেন নাই। বরক তাঁহাদের সাহায্যে যে আমাদের প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলাক্ষয় করতকগুলি অত্যাচারক কার্য স্রষ্টৃত্বাবে সম্পন্ন হইতেছে, ইহাতে আমাদের কৃতজ্ঞ ও স্তম্ভী হওয়া উচিত। কিন্তু একথা তুলিলে চলিবে না যে আমাদের এই অক্ষমতার ফলে বাজালীর শুধু আর্থিক ক্ষতিই হইতেছে না, ভারত সরকারের নিকট বাজালী আজ কেন ও অপদার্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। বাজালীর উদাসীনতার বাজালীর অপরিমিত আর্থিক ক্ষতির কাহিনী যে শুধু বিচিত্র তাহা নহে, বিষয়ও বটে। উড়িষ্যাদেশীয় যে সকল ব্যক্তি বঙ্গদেশে জীবিকা অর্জনের জন্য বসবাস করিতেছেন, সম্প্রতি তাঁহাদের এক সম্মেলনে তাঁহারা বলেন যে, প্রতি বৎসর বঙ্গদেশ হইতে তাঁহারা ৩ কোটি টাকা উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। তাঁহাদের এই হিসাব নিকূল কিম্বা, তাহা সঠিক বলিতে পারি না। তবে বাজালীর স্বয়ংগৃহস্থালীর কাজ, নলামিন্দ্রীর কাজ, ঠেলাওরালা প্রকৃতির কাজে আজ উড়িষ্যাবাসীদের “সর্ব-স্ব সংরক্ষিত” একথা বলিলে বিশেষ অত্যাচার হইবে না। একবারও কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কেন এমনটি হয়? বাজালী প্রমত্তবিগণ কি এতই ধনী অথবা এমনই কর্তব্যবদ্ধ যে উপাধারের এই সকল ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিশ্রুতির প্রায়ই উঠে না?” —মুকুন্দ।

অসমীয়াতারা ও আসামবাসী

“আসামে শুধুমাত্র অসমীয়া-ভাষীরা...”

লোকের বাস এবং অসমীয়া ভাষাভাষীদের দাবীরা রাখিয়া শুধু মাত্র অসমীয়াভাষীরা নিজেদের কোন বিশেষ সুবিধার জন্য দাবী জানাইতে পারেন না ; কারণ আইনতঃ এবং স্ৰাস্তঃ সর্বোত্তম ভাষাভাষী অধিবাসীদের অধিকার তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। কিন্তু ভাষাভাষী আজকাল বিসর্জন দেওয়া হইতেছে বলিয়াই যেমন আসাম রাজ্য সরকারের চাকুরিতে, তেমনই আসাম অয়েল কোম্পানী, কেম্ব্রিজ ডাক ও তার বিভাগ, রেলওয়ে, চা-বাগান ইত্যাদিতে চাকুরী বোগাড় করা আসামবাসী বাঙ্গালীদের পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখন এই ধারণাই পোষণ করেন যে, আসামবাসী বঙ্গভাষীদের চাকুরী লাভের অধিকার লোপ পাইয়াছে। শুধু চাকুরীর ক্ষেত্রে নয়, সরকারী পরিচালনাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদিতেও (কটন কলেজ, ইন্ডিয়ানবোর্ড কলেজ ও স্কুল, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদিতে) সীট বোগাড় করা বঙ্গভাষী ছাত্রদের পক্ষে দুঃসহ ; আর উদ্যত হইলে তো কথাই নাই ; এই সব ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পত্রপাঠ বিদ্যার করিয়া দেওয়া হয়। কলে বঙ্গভাষী ছাত্রদের পক্ষে আসামে উচ্চ শিক্ষা এবং উচ্চ চাকুরী হুই-ই লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহার আওতা প্রতিকার হওয়া আবশ্যিক। যে সর্কারী দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আসামে রাজ্যভাষা আলোচনা পত্রিকা তোলা হইয়াছে, চাকুরীর ক্ষেত্রে অসমীয়াভাষীদের অস্বাধিকারের আন্দোলনটিকে সম্ভবতঃ তাহার পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। কার্যতঃ বেতাবে এই আন্দোলন হুইটিকে পরিচালনা করা হইতেছে, তাহাতে অসমীয়াভাষী নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক অদৃষ্টিতাই প্রকাশ পাইতেছে। বহুবিধ সমস্যাশীড়িত অসমীয়াভাষী কৃত্রিম উপায়ে নূতন সমস্কার সৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত নেতৃবৃন্দ তাহাদের সর্কারী মনোভুক্তির তৃপ্ত সাধন ব্যতীত আর কি লাভ করিতেছেন তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, এক শ্রেণীর অসমীয়া-নেতৃবৃন্দের সর্কারীচিত্ততা হইলে যে আন্দোলনের জন্ম হইয়াছে, তাহার সংক্রমক বিষয় অসমীয়াভাষীদের সুপ্ত সর্কারী চিত্ততাকে জাগাইয়া তুলিতেই সাহায্য করিতেছে এবং আসাম রাজ্যকে বিভক্ত করিবার প্রবণতা ক্রমেই সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

—সুগমজি (করিমগঞ্জ)।

বাস্তবোচিত দূরদর্শিতা

“কার্য-কারণে দেখা যায়, সরকারী যোষণা অসমীয়া ভাষাটিকে আদৌ সর্ব্ব অতুতে বানবাহন চলাচলের উপযুক্ত হয় নাই। যোষণার পর প্রতি বছরেই বর্ষার সময় ভাষায় একটা না একটা বিপর্যয় দেখা দেয় এবং বেশ কয় দিনের জন্য সার্ভিস বাস এবং মালবাহী ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকে। এক একবার বিপর্যয় ঘটে আর একটা একটা করিয়া বিপর্যয়ের কারণ আবিষ্কার হয় এবং সেই অসুপাতে নূতন করিয়া পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমে আবিষ্কার হইল কালভার্ট অপরাধাণ্ড, সফ এবং নীচু ; দ্বিতীয় বারে আবিষ্কার হইল পূর্বতপাত্রে ভাষার পাম তেল না থাকার পাহাড়ের জল

গড়াইয়া বাতাকে ছর্ব্বল করিয়া দেয় ; তাহারই কলে ভাষার লোভিৎ অতলে ভাষাইয়া গিয়া ভাষার উপরে পতীর খান সৃষ্টি হয়— বান-বাহন চলাচল করিতে পারে না, মেদিনী বখচক্র প্রাস করে। ভাষাভাষী নূতন ভাষায় পরিবর্তন রচিত হইয়াছে এবং কালভার্ট ও সোলিং সম্পর্কে নূতন ভাষায় কাজ আরম্ভ হইয়াছে। হুইট সফট সমাধানে যে বাজেট বরাদ্দ হইয়াছে তাহাতে এমন আর একটা নূতন ভাষাই তৈয়ার হইতে পারে। এই কাজ সবেমাত্র শুরু ; সম্পন্ন হইতে আরও হুই-ডিন বছর সময় লাগিবে। এরই মধ্যে তৃতীয় সংকট দেখা দিয়াছে গত ১৪ই জুন। প্রবল বারিশ্রোতে পেচারখলের নিকট একটি সেতু প্রাণিত হইয়াছে এবং সেতুর হুই পাথরিত ভাষার অনেক দূর পর্যন্ত পরিশ্রোতে ভাষিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সমস্তলক্ষ্মিতে আসাম আগরতলা সফ্রকের উপর গিয়া প্রবলবেগে জলশ্রোত বহিতেছে এবং তাহাতে ভাষা ভাষিয়া গিয়া বান-বাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহা তৃতীয় সমস্কার ; সর্কারী বোদী হইলে ভাষার উপর গিয়া জল বায় এবং ভাষা ভাষে অতএব এই তৃতীয় সমস্কার জন্য নূতন সমাধান হয় ভাষা উচ্চ করা, না হয় জল মিকালের পথ বৃদ্ধি করা ভাষীর একটা কিছু ব্যবস্থা অসমীয়া অবলম্বন করতে।”

—পূর্ণানন্দ (আসমরতলা)।

শোক-সংবাদ

নিতাইচরণ পাল

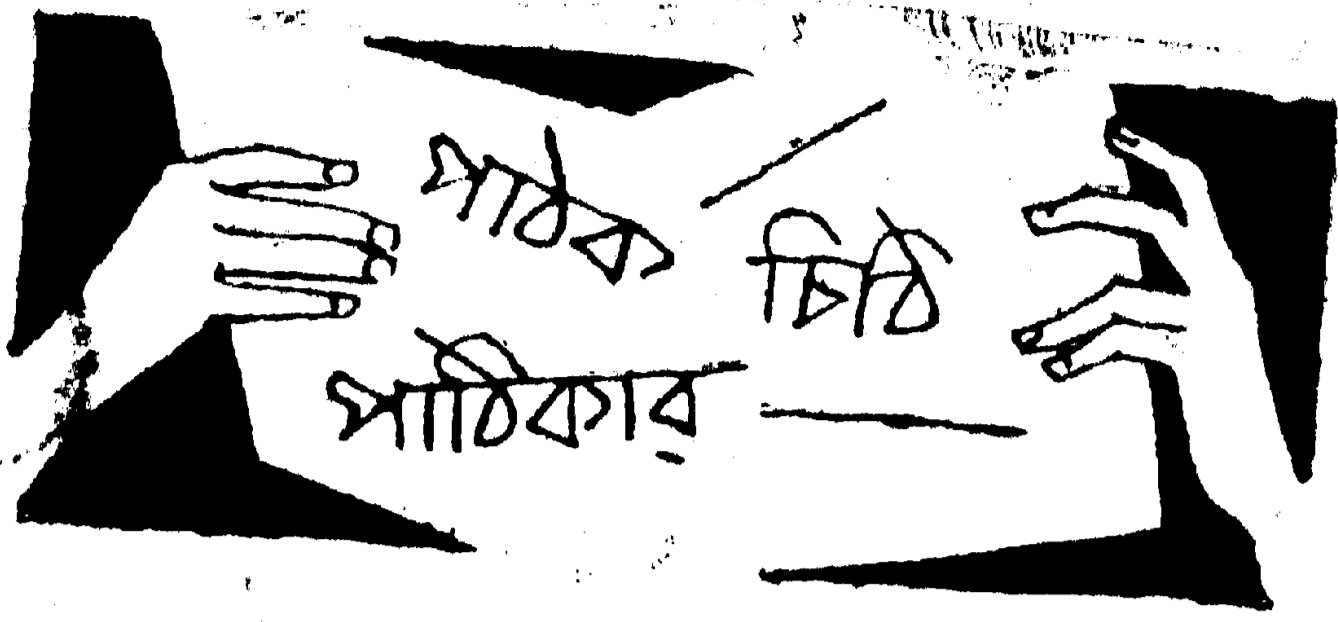
প্রখ্যাত সুশিল্পী ও ভাষার এক বাঙালী সুশিল্পী মহাপ্রাণী পৌরষ নিতাইচরণ পাল ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ৬৩ বছর বয়সে পরলে, গমন করেছেন। বাঙালীদের সুশিল্পকে পত্রপত্রিকার কবল থেকে মুক্ত করে নিতাইচরণ ভাষাকে এক নূতন রূপ দিলেন। সুশিল্পের ক্ষেত্রে অকল্পিত শিল্পী সৃষ্টি করেছেন নিতাইচরণের অবদান অস্বীকারীয়। অকল্পিতনাথ এবং নন্দলালের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং শিক্ষাদানের কলে বাঙালী সুশিল্পের ক্ষেত্রে নিতাইচরণের সাহায্যে এক নবদুসের অবতারণা হ’ল। সুশিল্পী সমাজে নিতাইচরণের পদলোক গমন এক বিরাট স্মৃতিস্মরণ সৃষ্টি করল।

শৈলেশ কলকণ্ঠ

বিশিষ্ট সুশিল্পী এবং সুখ্যাত সর্কারী পরিচালক শৈলেশ কলকণ্ঠ ১০ই জ্যৈষ্ঠ ৬৩ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। বাঙালীতে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীতে কৃতিত্বের লক্ষ্য সর্কারী পরিচালনা করে বর্ষেই পুনায় ইনি অধিকারী হন। ছাত্রছাত্রীতে পূর্ণসম্মান ছাড়াও বহুল প্রচারিত অল্প আধুনিক গানের তিনি সুরকার ছিলেন। কব্, অভিব্যক্তি, হানে-না-হাল যা ও কলে, সন্ন্যাসীরা বুঝিয়ে আছে প্রাণ, রক্তবেগ, কথা কও হালনাথ, সর্কারী কৃতি ছাত্রছাত্রীতে স্মরণীয় হিসেবে তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

সঙ্গীত—প্রোগ্রামটোব খটক

সঙ্গীতভাষা ৩৩৩ না বিশিষ্টসর্কারী পাবলী-স্ট্রট, “কলকণ্ঠী মেডিয়ে” ছাত্রছাত্রীর প্রোগ্রামটোব কর্তৃক বৃত্তিত ও প্রকাশিত।



পত্রিকা সমালোচনা

পত্রগুচ্ছ প্রসঙ্গে

মাসিক বহুমুখীতে প্রকাশিত দেশ ও বিদেশের বিখ্যাত বনীবীদের পত্রগুচ্ছ সমূহ শুধু বঙ্গসাহিত্যের কেবল, বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। অগ্রহারণ মাসে (১৩৬৬) বহুমুখীতে প্রকাশিত বহুমুখীনের ইংরাজী পত্রাবলী হইতে আমরা বঙ্গভাষার এই মহাকবির অন্তর্লোক ও মানস গঠন বৈচিত্র্য সুপষ্টরূপে দেখিতে পাই। এই পত্রগুলির অধিকাংশই ইংরেজী ভাষার অন্তরঙ্গ সুন্দর পৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লিখিত। অজ্ঞাত সাহিত্য অপেক্ষা পত্র সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহাতে পত্রলেখক কবি মনের নিরাবরণ, নিরাতরণ সহজ ও স্বচ্ছ প্রকাশ ঘরা পড়ে। ইহা অকৃত্রিম, অকপট ও অনাবৃত। আমরা যখন কোন প্রবন্ধ বা রচনা লিখি তখন নিজেকে আবৃত রাখিয়া, বধাসম্ভব পরিমার্জিত করিয়া প্রকাশ করি কারণ তাহা বহুর উদ্দেশ্যে লিখিত। আর পত্র রচনার উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ্য একটি মাত্র দরনী স্তম্ভবান পরম সুন্দর সুতরাং তাহার কাছে যে পত্রধারার প্রবাহ বহিয়া চলে, তাহাতে বহুনির কুলহারী বরণীর জলধারার মনের অনেক গোপন কথাই, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বাস্তব হইয়া পড়ে।

কয়েকটি পত্রে বহুভাষাবিদ, বিদগ্ধ বহুমুখীনের পরিচয়টি ধরা ডিরাছে। পৃথিবীতে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বাহারী ভূভাষার ভাণ্ডারে অক্ষয় অমর কিছু রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন তাহার সকলেই বহুভাষাবিদ। পাশ্চাত্য জগতের দান্তে, মিল্টন, স্পীকারের ভায় প্রোচ্যখণ্ডের মহাকবি কালিদাস, বিভূষণ, জয়দেব ওতীদাস, ভারতচন্দ্রের ভায় মাইকেলও ছিলেন বহুভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী। তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেন্স, ফরাসী, ইতালীয়, ইংরেজী ছাড়াও সংস্কৃত, তেলেগু, সাধু ও প্রাকৃত বাংলা জানিতেন। তাহার এইসন দুইটি বড়ো শালিকের ঘাড়ে বেঁটা ও একেই কি বলে সত্যতার পাজপাজীসমূহের অপূর্ণ মধুর সংলাপে এই সত্যটি সহজেই ধরা পড়িবে।

প্রোচ্য ও প্রতীচ্য এই উত্তর মহাদেশের মহাকাব্যের মহারসিক জীবনমুখন প্রকৃত পক্ষে মহাকবিই ছিলেন। মহৎ চরিত্র, মহান করুণা ও মহনীর আদর্শ তাহার চরিত্রকে উদ্ভূত করিত। তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, দীনতা, নীচতা, কপটতা তাহার বিশাল বিরাট চরিত্রে স্থান পাইত না। বাহাতে অন্তর্দাহ হয় জংকল্প-হয়, শবীর যৌনিকিত হয়, বাহেজির শুভ হয়, করনারণ মহা-সমুদ্রের উচ্ছসিত জলকণ্ঠে, বিদ্যুৎস্ফটিক বিধোজ্জল বর্ণনাচ্ছটার জলর হুড় এক পক্ষেজির শুভ হয় সেই মহাকাব্যের মহাকবি হইলেন জীবনমুখন।

যে গ্রন্থে বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীর এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়-লক্ষ্য চিত্রকলাকে জায় চিত্রিত হইয়াছে—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্তমান এবং অদৃশ্য বিজ্ঞানের জায় জ্ঞান হয়—বাহাতে দেব দানব মানবমণ্ডলীর বীর্ষাশালী প্রতাপশালী সৌন্দর্যশালী জীবগণের অদৃশ্য কার্যকলাপ দর্শনে মোহিত ও রোমাঞ্চিত হইতে হয়; যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিশ্বয় কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণ রসে আর্জ হইতে হয় এবং বাস্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয় তাহা বঙ্গবাসীরা চিত্রকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আছে।

সেই অমর মহাকাব্য মেঘনাদবধের করুণা, রচনা ও পরিণতি সত্যিই রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। প্রচলিত মত এই যে, তিনি ইংল্যান্ড ও রাবণ বান্ধসময়কে মহিমময় ও শক্তিশালী করিয়া প্রচলিত ধর্মবিধানের হানি করিয়াছেন ইহা বর্ধাধ নহে—বান্দীকির বামাংগে বান্ধসকুলের চিত্র অতিশয় উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত আছে। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, টাসো, মিল্টন—বান্দীকি, বেদব্যাস, কাশীদাস ও কুন্তিবাস প্রভৃতির আদর্শের ও কবিকর্মের অনুসরণ করিয়া তিনি যে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন— তাহার অমুকরণ নহে, স্বকীর বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত।

উনবিংশ শতাব্দীর সেই বাংলার নব ভাগরণের (রেনেসাঁর) যুগে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত সংঘাতে ও সম্পর্কে যে নব সভ্যতার উন্মেষ হইতেছিল তাহাতে সেই অসাধ্য সাধন করিলেন বহুমুখীনের দত্ত। সামাজ্য ভিখারী রাবণের সহিত যুদ্ধে যুদ্ধ বর্কির কপিসেনার সহিত সংগ্রামে বক্ষোরাজ রাবণের একাদিনের সম্মিত কনকলক্ষা ধূলিসাৎ হইয়া বাইতেছে, প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র মেঘনাদ, বীরবাহ ও পৌত্রের অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাদের জননী ও জায়া রাবণকে অভিসম্পাত করিয়া বাইতেছে—বর্তমান ইউরোপের সৌধকীরীটিনী নগরী সমূহের সহিত, রাবণের পুষ্পকরথ বাহা বর্তমান ব্যোমবানে রূপায়িত—সেই মহাযুদ্ধে ধ্বংসপ্রায়, হতরাজ্য সম্মান-সাম্রাজ্য মহীপতি ধরণীপতি রাবণের রক্ত সমুদ্রতীরের মহাপ্রাণানে বসিয়া বিলাপের সাথে মহাকাব্য শেষ হইয়াছে। ইহা কোন কালের কথা? বান্দীকির যুগের না আমাদের কালের?

হুট বিভীষণ ও অসত্য বানরটসন্দের সাহায্যে নিকুন্ডিলা বজাপাগে নিরস্ত একাকী মহান মেঘনাদের লক্ষ্মণহস্তে অকালমৃত্যুতে, প্রমীলা ও মন্দোদরীর করুণ ক্রন্দন, বান্ধসরাজ রাবণের মর্নভেনী আত্মবিলাপ, হোমারের ইলিয়ার্ডের মত মাইকেল মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বহুমুখীনের ব্যবহৃত হুল অমিত্রাকব হুল; প্রাচীন বাংলা হুলের ইহা তাহার নিজস্ব নুতন সৃষ্টি। যে

মহাকাব্যের শব্দপ্রতিধাত্তে চুলুপি নিনার ঞ্চ হর, বনবটা গর্জনের গভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়, বনভরঙ্গ বিলাসী শ্রমস্ত বোধগণের উৎসাহ বর্ধনের জন্ত তুরী, ভেরী ও হুলুভির ধ্বনি, এবং ধুলুকাবের সঙ্গে শব্দনার ঞ্চতিপোচর হয় তাহা সেই মহাকাব্যে মাইকেল স্মৃষ্টি নব অমিত্রাকর ছন্দে সাহায্যেই ঞ্চত হইয়াছে। সেই ছন্দ নির্মাণের কথা ও উহার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিকথা রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত কয়েকটি পত্রাবলীতে দ্রুত হইয়াছে।

সর্বশেষ এই পত্রগুলি সমূহে বস্তু হইয়াছে মাইকেলের নাটকপ্রীতি। ‘অলীক কুনাট্যরঙ্গ, মজ্ঞে লোক খাঢ়ে বস্জে’ ইহা নিরখিয়া তাহার কবিপ্রাণে বাখা সছিল না বরং দ্বিগুণতর হইল। প্রাক-মধুসূদন বাংলা নাটক উল্লেখযোগ্য নহে। মধুসূদনই প্রকৃত বাংলা নাটকের স্রষ্টা।

কুকুমারী, শর্শিষ্ঠা, পদ্মাবতী ইত্যাদি বঙ্গভাবার শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্ত নাটক—ট্রাজেডি সমূহের স্রষ্টা শ্রীমধুসূদন। মানব-মনের বেদনা, তাহার নিঃসহায়তা ও ভীত নিয়তির সহিত মাহুয়ের অসম দ্বন্দ্ব পৌরুষের লাক্তনা, অলঙ্ঘ্য দৈববাঘ ইত্যাদি ট্রাজেডির উপজীব্যা। পাশ্চাত্য দার্শনিক, সোপেনহাওয়ার, হোগল ও অ্যারিস্টটলের মতবাদ অনুসারে ইহা আত্মার আনন্দ, ভ্রাণ ও অজ্ঞায়ের সজ্বাত, চিত্তবিকোভকারী বস্তু করুণা ও ভয় সাহায্যে আমাদের ভ্রাণ অসহায় জীবের অবস্থিত চরদৃষ্ট ও ক্রেশের উৎপন্ন করা। ট্রাজেডির নায়ক নায়িকার অস্ত্বৎশ্বে ও বহিঃশ্বে আমরা আত্মোপলক্কি করিয়া রসাভাদন করি। সেন্সপীয়াবের নাটক সমূহের ভ্রাণ মধুসূদনের নাটকে দেখিতে পাই নিয়তির নিষ্ঠুর খেলা। আকাশপখে, মৃত্যুরূপা পদ্মিনীর আহ্বান, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। যোদ্ধা মানসিংহ ও জগৎসিংহ একদিকে পিতা ও পিতৃব্যের মানসকা অপূর দিকে পিতৃরাজ্যকে সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ, এই অদ্বন্দ্ব অলঙ্ঘ্য নিয়তির বিধানের করুণা ও বেদনাময় নিষ্ঠুর পরিণামেই নাটকের পরিসমাপ্তি। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে মাইকেলের নাটক-ভাবনা, নাট্যাঙ্গণ, চরিত্রসৃষ্টি ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

সর্বোপরি তাহার পত্রসমূহে প্রকাশ পাইয়াছে মধুসূদনের অতুলনীয় বঙ্গভাষাপ্রীতি, ভাষাজননীকে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যিক অলঙ্কারে রোমাণ্টিক ও বিদ্যামন্ত নাটকে, প্রঃসনে, কাব্যকবিতায় ভূষিত করার আকাখা এই পত্র সমূহে অকপটে ব্যক্ত হইয়াছে। মনীম্রোত বেকুপ তটপ্রোভে আঘাত করিয়া করিয়া উজ্জলিত হইয়া কলভান সৃষ্টি করে সেইরূপ মধুসূদনের চিত্তপ্রোভে পত্রধারার প্রোবাহে প্রোবাহে তরঙ্গিত হইয়া বহুপ্ররয়ে আঘাত করিয়া সমস্ত মানস আকাখা সবুহ ব্যক্ত করিয়াছে। এই লুপ্তপ্রায় পত্রগুলির সংগ্রহ ও প্রকাশ মহৎ সাহিত্যিক কর্ম সন্দেহ নাই।—শ্রীরাবলোচন দে, চকবাভার, পোঃ ও জেলা বাকুড়া।

সূর্য সেন ও নেতাজী

মাসিক বনুমতীর মাঘ সংখ্যায় শ্রীশ্রদয়রঞ্জন ভট্টাচার্যের লিখিত ‘সূর্য সেন ও নেতাজী স্মৃতিচলিত্র’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে এবং ঐ প্রবন্ধটি সম্বন্ধে পরবর্তী মাস সমূহের বনুমতী পত্রিকায় কয়েকজনের সমালোচনা বের হয়েছে। আমি বতদূর জানি, শ্রীশ্রদয়রঞ্জন ভট্টাচার্যের বর্ণিত ঘটনাগুলি সত্য। তবে এক স্থলে লেখক লিখতে

পিয়ে মনে হয় ভাবাবেগে একটা ঘটনাকে বড় করে দেখিয়েছেন। যেমন অত্রাগার লুণ্ঠনের পর চট্টগ্রামের কতক অফিস ইত্যাদির ওপর ভারতীয় পতাকা উত্তোলন। শোনা যায় চট্টগ্রাম সহরের কোথাও ভারতীয় পতাকা অত্রাগার লুণ্ঠনের পর উত্তোলন করা হয়নি, তবে অত্রাগার লুণ্ঠনের পর চট্টগ্রামের অনেক হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে সূর্য সেনের সমর্থক লোকেরা এবং জালালবাদ পাহাড়ে বুদ্ধের দিনে বৃটিশের গুলিতে আহত এবং মৃত্যুপথযাত্রী কয়েকজন তরুণ বিপ্লবীদের সামরিক ভাবে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ইংরেজদের ভারতে আগমনের পর চট্টগ্রামে উহাই প্রথম ও শেষ বারের জন্ত ভারতীয় পতাকা উত্তোলন।

মাসিক বনুমতীর কাঙ্চন মাসের সংখ্যায় ‘সূর্য সেন ও নেতাজী স্মৃতিচলিত্র’ প্রবন্ধটির সমালোচনা করতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন সেন নামে একজন লিখেছেন যে সূর্য সেনকে ধরবার জন্ত বৃটিশ সরকার পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ইহা সত্য নয়। বৃটিশ সরকার সূর্য সেনকে ধরবার জন্ত কোনদিন পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেননি। হৃদয় বাবু যে লিখেছেন বৃটিশ সরকার সূর্য সেনকে ধরবার জন্তে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, ইহাই সত্য।

চিত্তরঞ্জন সেন সমালোচনা করতে গিয়ে আরো লিখেছেন যে ‘সূর্য সেন ও স্মৃতিচলিত্র’ প্রবন্ধে কালোর পোল নামে যে গ্রামটির উল্লেখ আছে, উহার প্রকৃত নাম ‘কালার পোল’ এবং প্রবন্ধে লেখকের উল্লিখিত নামটি ঠিক নয়। এই সম্পর্কে বলতে ইচ্ছা করি যে কলিকাতাকে কেহ কলকাতা, কেহ কোলকাতা, কেহ কলিকাতা বলেন। এইরূপ বলার মধ্যে কোন মারাত্মক ভুল নেই, বেকুপ ‘কালার পোলকে’ যদি ‘কালোর পোল’ বলা হয়, কোনরূপ মারাত্মক ভুল হয় না। এইরূপ ভুল বিষয়ে সমালোচনা করার কোন অর্থ হয় না।

শ্রীশচীন দত্ত নামে কটকের এক সাংবাদিক ‘সূর্য সেন ও নেতাজী স্মৃতিচলিত্র’ প্রবন্ধটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হৃদয় বাবু বর্ণনা মতে সূর্য সেন যে ছয় জন বিপ্লবী সহকর্মী বেছে ‘বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতি’ করে কাজ চালাবার ভার দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উপেন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণনায় উপেন বাবু নাম নেই।

বাঁহারা ইতিহাস পড়েন তাঁহারা জানেন যে, দুই পক্ষে বখা যুদ্ধ হয়, তখন উভয় পক্ষেই বড় ছোট অনেক সেনাপতি সৈ চালানা করেন এবং বুদ্ধে বাঘের কৃতিত্ব বেশী, তাদের নাম ইতিহাসে থাকে। বেকুপ বৃটিশের বিক্রমে যে ছয় জন সেনাপতি চট্টগ্রামের বিপ্লবী সেনাদের পরিচালনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ অধিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি। কয়েকজন বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তাঁদের নামই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। উপেন্দ্র চক্রবর্তী ও অত্রাভ বিপ্লবী সকলের না উল্লেখ করতে হলে প্রবন্ধের আকার আরও বড় করতে হয় অবস্ত এইটি আমার নিজস্ব মত, প্রবন্ধলেখক কেন উপেন বাবু নাম অত্রাগার লুণ্ঠনের পরবর্তী ঘটনাবলীর বর্ণনায় উল্লেখ করেন। তিনিই ভালভাবে জানেন। মাসিক বনুমতীর কাঙ্চন সংখ্যা প্রকাশিত শ্রীশ্রদয়রঞ্জন ভট্টাচার্যের লেখা ‘বঙ্গভঙ্গ’ আন্দোলন

একটি পাঠ করা করে যে তিনি বাংলাদেশ তাদের
 বিদ্যোদী, উক্ত লেখকের মতে, স্বাধীনতা পাই বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা
 স্বাধীনতার একমাত্র কারণ এক হই বঙ্গ মুসলমান মিলিত হলে
 বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানদের সামাজিক জীবনে সুশাসিত করে
 আসবে। তিনি আশাও লিখেছেন, পূর্ববঙ্গ ভারতের মুকের জিভ
 এক পশ্চিম পাকিস্তানের মত কোন মুসলমানস্বায়ত্ত্ব সত্ত্ব মুক্ত
 নয়। তাই ভারতের নিরাপত্তার জন্য এক বাঙ্গালী জাতির
 স্বাধীনতা, ভারতের অবশ্যে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মিলনে একত্র
 প্রয়োজন। লেখকের উক্ত মতের সঙ্গে আমিও একমত এক মনে
 হয় শুধু বাঙ্গালী হিন্দু নয়, মুসলমানেরাও এই বিষয়ে একমত
 হইবেন। বর্তমানে যদি বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানদের এই স্বাধীনতা
 এক নেতৃত্ব হয়, তবে মনে হয় শতকরা ১০ জন ব্যতীত ভারতের
 অবশ্যে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মিলনের জন্য মত দিবে। স্বয়ং বাবু
 ঞ্চি আমিও মনে করি হই বঙ্গ মিলন ব্যতীত বাঙ্গালী হিন্দু-
 মুসলমানদের সামাজিক জীবনে কোনদিন সুশাসিত করে আসবে না।

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন" প্রবন্ধটির শ্রেণীভাগে লেখক স্বয়ং বাবু
 ঞ্চি লিখিত প্রবন্ধটির প্রতি বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ
 করিতেছি।

উপসংহারে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানদের নিকট একান্ত অনুরোধ
 যে, তাঁরা একবার চিন্তা করে দেখুন, বঙ্গ বিভাগের ফলে তাদের
 কত কত দুর্গতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাদের সামাজিক
 জীবনে কত বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এই সমস্যা
 বিবেচনা করে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে যে ভাবে বাঙ্গালী হিন্দু-
 মুসলমানরা মিলিত হয়ে হই বঙ্গ মিলনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন
 এবং শেষ পর্যন্ত চেষ্টার সফল হয়েছিলেন, সে ভাবে সফল সমস্যার
 সমাধানের জন্য আবার বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানদের হই বঙ্গ মিলনের
 জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন কি না?

বঙ্গ বিভাগের তীব্র অভিজ্ঞতা আশা করি বাঙ্গালী হিন্দু-
 মুসলমানেরা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন এবং তাই উপরিউক্ত
 প্রবন্ধটির উক্তর বাঙ্গালীদের দিতে কোন অনুবিধা হবে না মনে করি।

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী, অবধায়ক বিল ক্লার্ক, এইচ. আই, ডিভিশন
 (উপায়ত্তলা), ১১-এ সি ডুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টাকা ১৫/- পাঠাইলার। বখারীতি
 পত্রিকা পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।—বকুলরাশী দেবী, বোম্বাই।

১৩৬৭ সালের বার্ষিক টাকা আদর ১৫/- পাঠাইলার।—শ্রীমতী
 সুরমা দেবী, সিউড়া, বীরভূম।

১৩৬৭ সালের প্রথম ছয় মাসের টাকা ৭'৫০ পাঠাইলার।
 —Sj. J. B. Dutta, Balasore.

Remitting herewith Rs. 15/- being the annual
 subscription of Monthly Basumati from
 'Baisakh' 1367 B. S. Kindly continue the
 magazine & oblige—Sm. A. R. Sinha, Dist.
 Chanda.

মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠাইলার। বৈশাখ হইতে আখিন
 প্রবন্ধি ছয় মাসের।—ঊষা মুখার্জী, প্রমোদগড়।

মাসিক বসুমতীর আদায়ী ছয় মাসের টাকা ৭'৫০ টাকা
 পাঠাইলার।—অর্ণা সত্যাল, হাজারিবাগ।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টাকা (১৫/-) পাঠাইলার।—শ্রীমতী
 সর্বা নিহ, পাটনা।

Herewith my annual subscription for your
 Masik Basumati for the next year—Sm. Nita
 Chakraborty, Bhandara, Maharashtra State.

১৩৬৭ সালের মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টাকা ১৫/- টাকা
 পাঠাইলার।—Miss Aneceta Das, Patna.

Sending subscription for the year 1367 B. S.
 —Baisakh to Aswin. Sm. Bhakti Lata Biswas,
 Vill, Harankura, 24 Parganas.

Please enlist me as a Member of your Masik
 Basumati for 6 months from "Baisakh" 1357 B. S.
 I am remitting herewith Rs. 7'50 nP. for the
 purpose, Miss Krishna Choudhury, Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর এক বছরের টাকা ১৫/- টাকা পাঠাইলার।
 —মমতা বসু, দেবানু।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে আখিন পর্যন্ত মাসিক বসুমতীর
 বার্ষিক টাকা ৭'৫০ পাঠাইলার।—শ্রীমতী বীণা ঘোষ, বোম্বাই।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টাকা ১৫/- পাঠাইলার। গ্রাহিকা
 করিয়া লইয়া অঙ্গুহীত করিবেন।—শ্রীমতী হৃদি মৈত্র, মেওরিয়া,
 ইউ. পি।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫/- টাকা পাঠাইলার।—শ্রীমতী
 সুরিয়া চ্যাটার্জী, Darbhanga.

Sending the yearly subscription for Masik
 Basumati for the year 1367 B. S. Please send the
 copies from Baisakh—Mrs. Uma Goswami,
 Poona.

Annual subscription of Rs. 15/- is sent
 herewith for monthly Basumati.—Dr. N. Ghatak
 D. S. C., Agra.

১৩৬৭ সালের মাসিক বসুমতীর এক বছরের টাকা পাঠাইলার।
 Mrs. Uma Mazumder, Goalpara, Assam.

Remitting Rs. 15/- being annual subscription
 of Masik Basumati for the Bengali year 1367.
 —Sm. Latika Guha, Balasore.

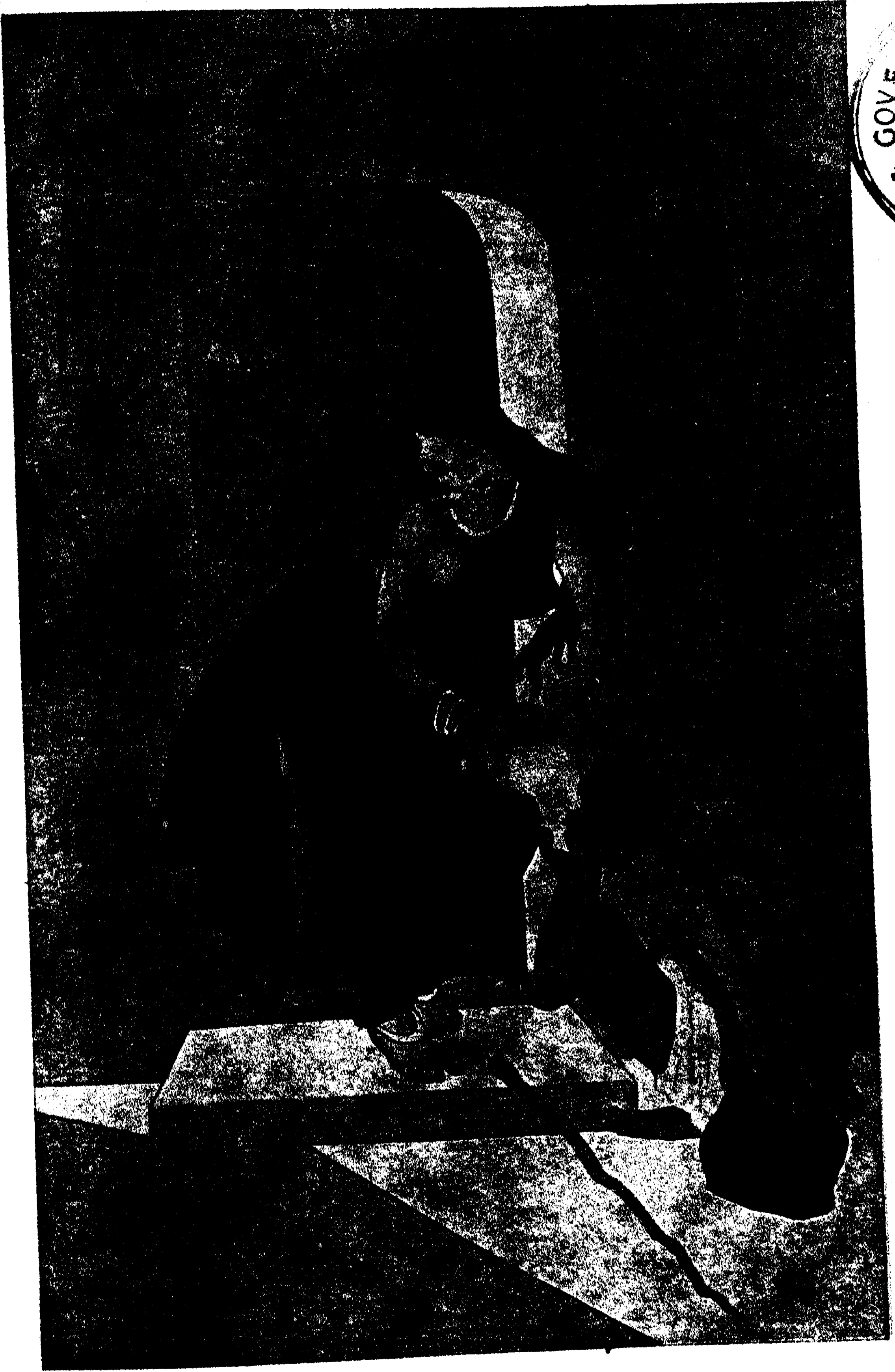
মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টাকা ৭'৫০ টাকা পাঠাইলার।
 —Sm. Geeta Basu, Tezpur, Assam.

আমি মাসিক বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহিকা। বার্ষিক টাকা
 পাঠাইলার।—অর্ণা গুপ্তাচার্য, বোম্বাই।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য আদর ১৫/- টাকা পাঠাইলার।
 গ্রাহিকা প্রার্থীকৃত করিয়া বাবিত করিবেন।—লীলা মুখার্জী,
 আবেদাবাদ।

আপনাদের সহিত আমার সুদীর্ঘকালের সহযোগ আরও ছয়
 মাসের জন্য বৃদ্ধির প্রয়োগে টাকা পাঠাইলার।—শ্রীমতী রাধনী ঘোষ,
 কলিকাতা।

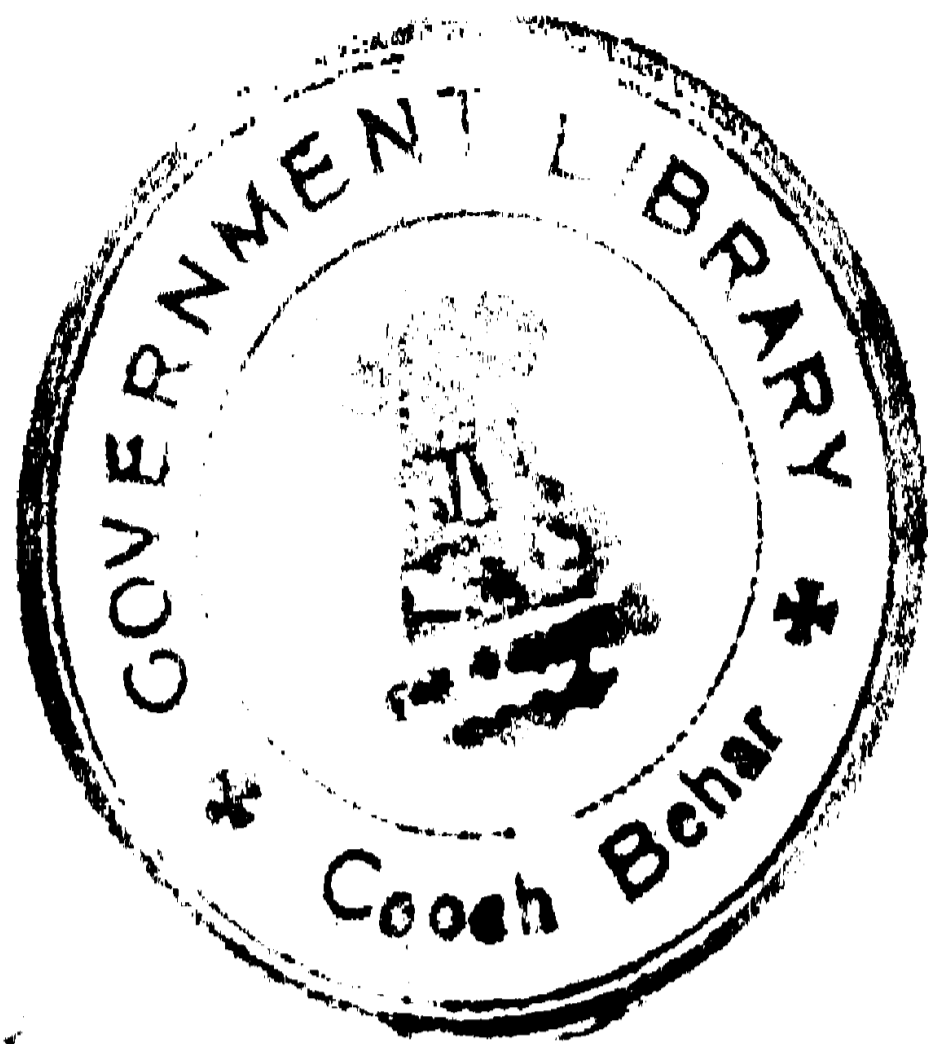
GOVERNMENT



(आर्षा, १७७१)
॥ मासिक वन्द्यती ॥

(अमरु,)

अमरु
—निवणकर कुतु अहित



সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



মাসিক সমুদ্র

৩৯শ বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৬৭]

। স্থাপিত ১৯২২ বঙ্গাব্দ ।

[প্রথম ২৬, ৩৪ সংখ্যা

বিবাহ

একদিকে নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতিপত্নী-নির্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত ; কারণ যে বিবাহ আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নির্বাচন করিব ; অপরদিকে প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্ম নহে, প্রজোৎপাদনের জন্ম। ইহাই এদেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত ; তুমি বহুজনের হিতের জন্ম নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

আমাদের স্মৃতিকার ভগবান মশ 'আর্ধ' সম্বন্ধে এই সঙ্জ্ঞা দিয়াছেন, "সংসন্তান-কামনার ফলে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই আর্ধ।" ভগবানের নিকট সন্তানোদ্দেশে প্রার্থনা ব্যতিরেকে যাহাদের জন্ম হয়

স্মৃতিকারের মতে তাহারা অনাৰ্ধ। সন্তানের জন্ম ভগবানের নিকট কামনা করিতে হইবে। অভিশাপ, অসন্তোষের মধ্যে যাহাদের জন্ম, সংযমের অসামর্থ্য হেতু উদ্ভেজনার অতিক্রমিত সুযোগে যাহারা জগতে আবির্ভূত হয়, সেই সব সন্তানের কাছে কী আশা করা যাইতে পারে ?

যে অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহা ভগবানের প্রতীকস্বরূপ। একটি নূতন জীব কোনও এক প্রবল শুভ বা অশুভ সংস্কার লইয়া জগতে আসিতেছে। একটি পিত্রে নূতন জীবকে জগতে আনিবার জন্ম স্বামী ও স্ত্রীর মিলন—সুতরাং ভগবানের নিকট উহা তাহাদের এক সর্বোচ্চ মিলিত প্রার্থনা। এ কি কৌতুক ? এ কি শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, না পশুপ্রকৃতির চরিতার্থতা ? হিন্দু বলে, 'না না, কখনই না।'

মাকে কেন এত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিব? কারণ আমাদের শাস্ত্র বলে জন্মগত শুভাশুভ সংস্কারই শিশুর জীবনে ভালমন্দের প্রভাব বিস্তার করে। শত সহস্র কলেজেই যান, লক্ষ লক্ষ বই-ই পড়ুন, আর জগতের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গেই মিশুন, পরিণামে দেখিবেন যে জন্মগত শুভ সংস্কারই আপনার সাফল্যের যথার্থ কারণ। জন্ম হইতে আপনার সদসৎ অদৃষ্ট নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—জন্ম হইতেই শিশু হয় দেব, না হয় দানব—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম। শিক্ষা এবং অপরাপর জিনিস সব পরে আসে এবং তাহাদের প্রভাব অতি সামান্য। আপনি যেমন জন্ম পাইয়াছেন, তেমনই থাকিবেন। ধারাপ স্বাস্থ্য লইয়া জন্মিয়াছেন, এখন সমগ্র ঔষধালয় সেবন করিলেই কি আপনি সারা জীবনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন? দুর্বল, রুগ্ন দূষিত-রক্ত পিতামাতা হইতে সুস্থ সবল কয়জন সন্তান জন্মাইতে পারে? শাস্ত্রের বিধান—জন্মের প্রাকালীন প্রভাবসমূহকে নিরস্তিত করিতে হইবে।

আমার মনে হয়, কোন জাতিকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে তাহাকে সর্বপ্রথমে বিবাহের পবিত্রতা ও অবিচ্ছেদ্যতার মধ্য দিয়া মাতৃশ্রমের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব অর্জন করিতে হইবে। রোমান ক্যাথলিক এবং হিন্দুগণ বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য মনে করায় ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত, মহাশক্তিমান ও পবিত্র বহু নরনারীর জন্মদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। আরবগণের দৃষ্টিতে বিবাহ একটা চুক্তি অথবা বলপূর্বক অধিকারের ব্যাপারমাত্র; ইচ্ছামাত্র সে বন্ধন ছিন্ন করা বাইতে পারে। ফলে কুমারী কিংবা ব্রহ্মচারীর কোন আদর্শ তাহাদের মধ্যে স্মৃতিলাভ করিতে পারে নাই। আধুনিক বৌদ্ধধর্ম এমন সব জাতির হাতে গিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথার পূর্ণ অভিব্যক্তি না হওয়ায় তাহারা সন্ন্যাস-আশ্রমকে একটা হান্তাম্পন ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং যতদিন না জাপানীদের মধ্যে শুধু পরম্পরের প্রতি দৈহিক আকর্ষণ ও ভালবাসা ছাড়াও বিবাহের উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে, ততদিন তাহাদের মধ্যে বড় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর উদ্ভব কিরূপে সম্ভব হইবে, তাহা আমি

বলিতে পারি না। আপনি যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সতীত্বই জীবনের একমাত্র গৌরব, তেমনই আমার দৃষ্টিও এবিষয়ে খুলিয়া গিয়াছে যে, আমরণ সাধুচরিত্র জনকয়েক মহাশক্তিশালী ব্যক্তির জন্ম দিতে হইলে জনসাধারণের একটি বৃহত্তম অংশকেও এই সুমহান পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাৱশ্যক।

হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে কথঞ্চিৎ সতীত্বধর্ম উপাদানার্থে তাহাদের সন্তানগণকে এবং ক্রমে সমগ্র জাতিকে বাল্যবিবাহ দ্বারা অধোগামী করিয়াছেন। কিন্তু একথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, বাল্যবিবাহ হিন্দুজাতিকে সতীত্বধর্মে ভূষিত করিয়াছে। তুমি কি ইচ্ছা কর? যদি জাতিকে সতীত্বধর্মে সমধিক ভূষিত করিতে চাও, তাহা হইলে এই ভয়ানক বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত স্ত্রীপুরুষকে শরীর সম্বন্ধে অধোগামী করিতে হইবে। অপরদিকে তুমিও কি নিজপক্ষে বিপদশূণ্য? কখনই না। কারণ সতীত্বই জাতির জীবনীশক্তি। তুমি কি ইতিহাস দেখ নাই যে, জাতির মৃত্যুচিহ্ন অসতীত্বের মধ্য দিয়া আসিয়াছে—যখন ইহা কোনও জাতির ভিতর প্রবেশ করে, তখনই উহার বিনাশ আসন্ন হইয়া থাকে। এই সকল চুঃখজনক প্রশ্নের মীমাংসা কোথায় পাইব? যদি পিতামাতা নিজ সন্তানের জন্ম পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করেন, তাহা হইলে এই তথাকথিত প্রেমের দোষ নিবারিত হয়। ভারতের চুহিতৃগণ ভাবপ্রবণ অপেক্ষা অধিক কার্যকুশল। তাহাদের জীবনে কল্পনাপ্রিয়তা অধিক স্থান পায় না। কিন্তু যদি লোকে আপনারা স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করে, তাহাতে অধিক সুখ আনয়ন করে না। ভারতীয় নাবীগণ বেশ সুখী। স্ত্রী ও স্বামী পরম্পরের মধ্যে কলহ প্রায়ই হয় না। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্যে, যেখানে স্বাধীনতার আভির্ভাষ্য বিরাজমান, সুখী পরিবার প্রায় নাই।... ইহা কি প্রকাশ করিতেছে? প্রকাশ করিতেছে যে, এই সকল আদর্শ দ্বারা অধিক সুখ উপাভিত হয় নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

বঙ্গ-ভাষা সমালোচক রাজশেখর বসু

শিলাদিত্য

বাংলা ভাষার বয়স অনেক, কিন্তু তার যৌবনারম্ভ হয়েছিল মোটে দেড়শ বৎসর আগে, গল্প রচনার প্রবর্তনকালে। তার পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল পঞ্চমর * * * গল্প বিনা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।” (বাংলা ভাষার গতি—বিচিন্তা পৃ: ১০০)

বাংলা গল্প সাহিত্য এই দেড় শ বৎসরে মোটামুটি তিনটি যুগ অতিক্রম করেছে—রামমোহন বাবুর যুগ, বিজ্ঞানগণের যুগ, আর রবীন্দ্রনাথের যুগ।

‘বাংলা ভাষার গতি’ প্রবন্ধে রাজশেখর বসু লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথের পরে কোনও প্রবল লেখকের আবির্ভাব হয় নি, তাই ধরা হয় এখনও রবীন্দ্রযুগ চলতে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। যুগপ্রবর্তকের শাসন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভাব বহু দিন বলবৎ থাকে তত দিনই তাঁর যুগ। * * * * রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সংসর্গ অগণিত লেখককে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তাঁর উদার শাসনে কোনও রচয়িতার ব্যক্তিগত বিকাশের হানি হয় নি। তাঁর তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্যে ভাবগত ও ভাবাগত নানা পরিবর্তন স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিয়েছে।”

এই ভাব ও ভাবাগত পরিবর্তনের প্রারম্ভ রবীন্দ্রনাথ নিজেই লক্ষ্য করেছেন। ‘পরিবেশ’-এর “আগতক” কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

“আজ তোমাদের কালে
প্রবাসী অপরিচিত আমি।
আমাদের ভাষার ইশারা
নিয়েছে নূতন অর্থ তোমাদের মুখে।
ধতুর বলল হয়ে গেছে,—
বাতাসের উলটো পালটা ঘণ্টে
প্রকৃতির হল বর্ণভেদ।”

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের কবি বিষ্ণু দে তো রবীন্দ্র রচনা-শৈলীকে অস্বীকারই করেছেন :

“রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
তিরহারা জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের পূজা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সহস্রের দিকে চলি।”

পরিবর্তনে দোষ মাই। কিন্তু পরিবর্তন কি প্রবর্তন ক’রল
সেইটি বিবেচ্য। ‘বাংলা ভাষার গতি’ প্রবন্ধে রাজশেখর বসু

পরিবর্তিত আধুনিক সাহিত্যের ভাষার কয়েকটি দুর্গতি লক্ষ্য করেছেন। ছয়টি উদাহরণও দিয়েছেন।

প্রথম উদাহরণ দিয়েছেন বাংলা লেখার চলিত ভাষার প্রসার। লেখার চলিত ভাষার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথও করেছেন, প্রথম জৌবরীও করেছেন। সেই ধরনের প্রয়োগে একটা শালীনতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের যুগে চলিত ভাষার নামে সাহিত্যে যে ভাষা আমদানি হ’ল তাতে চলিত ভাষার উপর বধেছাচার, উচ্ছ্বলতা ও গ্রামীণতার প্রবেশ মাধান হ’ল। “বলল, দিলে, কর্ছ” প্রভৃতি অদ্ভুত বানান আর “কাকরকে, তাদেবকে” প্রভৃতি অচল শব্দজাল সাহিত্যের ভাষার ভেদাল চ’লল।

দ্বিতীয় উদাহরণ দিয়েছেন বানানের অসাম্য। এক এক লেখকের এক এক রকম বানানের চর্চা। কেউ লিখবেন ‘বঙ্গ’, কেউ বা লিখবেন ‘বংগ’। ‘আকাজ্জা’ হলে ‘আকাংখা’, ‘উচিত’ লিখতে ‘উচিৎ’, ‘করিল’ না লিখে ‘কোরিল’, ‘বিশেষজ্ঞ’র জায়গায় ‘বিশেষতো’—ধীর বা ইচ্ছা বানান লিখছেন। নিয়ম কাঙ্ক্ষনের বাংলাই নেই।

“বানানের সমতা ও সরলতা” প্রবন্ধে (‘চলচ্চিত্র’ পৃ: ৫০) রাজশেখর বসু অদ্ভুত বানানের আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন—
“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত বানান-সমিতির নিয়মে অসংস্কৃত শব্দে ৭ বাদ দিয়ে শুধু ৬ লেখার বিধান আছে। হিন্দী প্রকৃতিভেদেও অসংস্কৃত শব্দে ৭ নেই, রানী, বরন (বর্ণ), মন (চলিণ সের) লেখা হয়। বাঙালার ‘গিপি সোণা’ মূর্খত ৭ দিয়ে কেন লেখা হয় জানি না, হয়তো সোনার গৌরব-বুদ্ধির অভাব।

আর একটি বিষয় বিচারের যোগ্য। অনেক শব্দে অনর্ধক apostrophe বা উর্ধ্ব-কমা দেখতে পাই। বার্বার্ড ন’, পাট ন’ ইত্যাদিতে উর্ধ্ব-কমার সার্থকতা কি? না দিলেও লোকে ন-এর ঠিক উচ্চারণ করবে, কেউ ন, বলবে না। হ’দিন, ন’টাকা ইত্যাদি বানানে উর্ধ্ব-কমার কিছু মাত্র প্রয়োজন দেখি না।

লখনউ-এর দ্বারা বাসিন্দা তারা সরল বানান লেখে লখনউ, কিন্তু বাঙালী অনর্ধক লক্ষী লেখে কেন? ‘দরভাজা’র দ্বার নেই, বজের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই, তবু দ্বারবজ লেখা হয় কেন? আর একটা উৎকট বানান Sir হানে তার। যেমন ফ্যাট ছাট ব্যাট, তেমনই তার। শুধু তার লিখলেই চলে, সেকলে বানান নয় আরও ভাল মনে করি।

অনেকে মনে করেন, বিদেশী শব্দের হসন্ত উচ্চারণ বোঝাবার জন্ত শব্দে হস্ চিহ্ন দিতেই হবে। এঁরা লেখেন—কাইলেট, টিপট, প্লেট, ডিপ। হস্ চিহ্ন না দিয়ে যদি শুধু ডিপ লেখা হয় তবে লোকে ডিপ শব্দে এমন ভয় আছে কি? অনর্থক হস্ চিহ্ন দিয়ে লেখা কটকিত করার লাভ নেই।

বানানের সমতা বন্ধা সত্ত্বে রাজশেখর বসু নিজস্ব করে কটি মতামত "বাংলা বানান" ('লঘুঞ্জ' পৃ: ১২৭) প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন :

(ক) "সামুভ্যায় লেখা হয় 'করিতেছে, বসিবে', পড়া হয় 'কোরিতেছে, বোসিবে'। চলিত ভাষায় অতিরিক্ত ও-কার, যুক্তাকর এবং হস্ চিহ্ন দিয়ে 'কোর্ছে, বোসুবে' ইত্যাদি লেখবার কোনও দরকার দেখি না, 'করছে, বসবে' লিখলেই কাজ চলে। সুপ্রচলিত শব্দের বানানে অনর্থক অক্ষরবৃদ্ধি করলে জটিলতা বাড়ে, সুবিধা কিছুই হয় না।"

(খ) "আজকাল ও-কারের বাহুল্য দেখা যাচ্ছে। অনেকে সামুভ্যাহাতেও 'কোরিলো' লিখেছেন। এতে বিদেশী পাঠকের কিছু সাহায্য হ'তে পারে, কিন্তু বাঙালীর জন্ত এরকম বানান একেবারে অনাবশ্যক। * * * 'শীত'এর উচ্চারণ হসন্ত কিন্তু 'শীত' অকারান্ত, 'অভিধের' আর 'অবিধের' শব্দের প্রথমটির অ ও-তুল্য কিন্তু দ্বিতীয়টির নয়, সেই রকমেই লিখব—'করিল' আর 'কপিল'এর বানান একজাতীয় হ'লেও উচ্চারণ আলাদা। ধারা পক্ষে অক্ষর-সংখ্যা সমান রাখতে চান, তাঁদের 'আজো, আবো' প্রভৃতি বানান দরকার হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে 'আজও, আরও' হবে না কেন? ও-কারের চিহ্ন লিখতে যে সময় আর জায়গা লাগে, আন্ত 'ও' লিখতে তার চেয়ে বেশী লাগে না।"

(গ) "কাকর' শব্দটি আজকাল খুব দেখা যাচ্ছে। এটিকে blank মনে করি। সাধু 'কাহারও' থেকে চলিত 'কাবও', কথার টানে তা 'কাফ' হ'তে পারে। কিন্তু আবার একটা র যোগ হবে কেন?"

(ঘ) "র অক্ষরটির হ্রস্বকম প্রয়োগ হয়। 'হর, বর' প্রভৃতি শব্দে Y-তুল্য আধিস উচ্চারণ বজায় আছে, কিন্তু 'হালুয়া, খাওয়া' প্রভৃতি শব্দে র স্বরচিহ্নের বাহনমাত্র, তার নিজের উচ্চারণ নেই, আমরা বলি 'হালুয়া, খাওয়া'। 'খাওয়া, বাওয়া, ওয়াল' প্রভৃতি সুপ্রচলিত শব্দের বর্তমান বানান আমাদের এতই অভ্যস্ত যে বদলাবার সম্ভাবনা দেখি না * * * কিন্তু নবগত বিদেশী শব্দের বানান এখনও স্থিরতা পায়নি, সেজন্য সতর্ক হবার সময় আছে। Wavell, Boer, Swan, Drawer প্রভৃতি শব্দ বাংলায় 'ওআভেল, বোআর, সোআন, ড্রয়ার' লিখলে র-এর অপপ্রয়োগ হয় না। War এবং ware দুই এরই বানান 'ওয়ার' করা অপ্রতীক, প্রথমটি 'ওআব', দ্বিতীয়টি 'ওয়ার'। 'মেবর, চেয়ার, সোয়েটার' লিখলে দোষ হয় না, কারণ 'র, রা, রে' স্থানে 'অ, আ, এ' লিখলেও উচ্চারণ প্রায় সমান থাকে।

'তাইএর, বউএর, বোঝাইএ' প্রভৃতিতে যে স্থানে এ' লিখলে উচ্চারণ বদলায় না, কিন্তু লেখা আর বানান সহজ হয়, ব্যাকরণেও নিষেধ নেই।" glide এর অধুহাতে 'ব' প্রয়োগের যুক্তি তিনি

(ঙ) চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ সর্ব্বত্র বঙ্গবন্ধু একটি তালিকা প্রস্তুতের প্রয়োজন বোধ করে তিনি লিখেছেন :

"পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য দেখা যায়। অনেকে 'একবেঁয়ে, পারে কোড়া, খান ইট' লেখেন, যদিও চন্দ্রবিন্দুহীন বানানই বেশী চলে। 'কাঁচ, হাসি, হাসপাতাল' অনেকে বলেন, কিন্তু লেখবার সময় প্রায় চন্দ্রবিন্দু দেন না। পূর্ব্ববঙ্গী অধুনাসিক উচ্চারণে অভ্যস্ত নন, সেজন্য বানানের সময় যুক্তিকিলে পড়েন, বখাওয়ানে ৮ দেন না; আবার অস্থানে দিয়ে ফেলেন।"

একজন নাকি 'বাড়ে কোড়' স্থলে 'বাড়ে কোড়া' লিখেছিলেন।

অধুরূপ তালিকার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন 'ড'এর ব্যবহারে। "পূর্ব্ববঙ্গে ড আকার প্রায় অভিন্ন, সেজন্য লেখার বিপর্যয় ঘটে।" যেমন দেখা যায় 'ঘর জাড়া' লিখিতে 'ঘড় জারা'।

তৃতীয় দুর্গতির উদাহরণ দিয়েছেন সাহিত্যের ভাষায় পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রাদেশিকতার প্রভাব। খাস পূর্ব্ববঙ্গের চলতিভাষায় যদি একটা সাহিত্য সৃষ্টি হ'ত তাহ'লে বলায় কিছু ছিল না। প্রাদেশিকতারও একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে। যেমন সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মাসিক সবুজ পত্রে 'হৈফা' শব্দটি লিখেছিলেন মানিকগঞ্জের মৌখিক ভাষায় :

"মা-বাপ মরা ছোট হাওয়ালটারে যেদিন গায়ে একজন পিঁপড় লোক মাসির বাড়ীতে আই না দিয়া গেল, সেইদিন থিকা তার মাসি সেই হাজিয়ার ছোট হাওয়ালটার কাবল যে আশ্রয়স্থল হৈল তা না,—বেওয়া বিথবা মা'সর অপায়া সংসারটাও ব্যান একটা কিছু হাতের সামনে পান্সা আ'স্তে ঘীরে শুহারা উঠব্যানু লাইগল।

(সবুজপত্র, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃ: ৬৪০)"

বিপদ হয়েছে পাঁচমবঙ্গীয় ভাষায় কাঠামোর পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় কোড়ন দেওয়াতে। উর হরপশরুপ লিখেছেন, "পূর্ব্ববঙ্গবাসী অতিরিক্ত—গুলি আর টা প্রয়োগ করেন, অকারণে 'নাকি' লেখেন, অচেতন পরার্থেও মাঝে মাঝে 'মা' ও 'রা' যোগ করেন। ('আকাশ হতে জলেরা ব'য়ে পড়ছে'), কর্ম্মের রূপে অনেক সময় অনর্থক কে বিভক্তি লাগান ('বইগুলিকে ত'ছ'র রাব')। তাঁরা নিজের উচ্চারণ অধুসারে 'দেওতা নেওরা' (১৬৭) (১৪) স্থানে 'দেয়া দেয়া সোরা' লেখেন, মোমবাতি অর্থে 'মো ম', টেলিগ্রাম অর্থে 'টেলি' লেখেন।"

আরও উদাহরণ দিয়েছেন 'বানানের সমতা ও সরলতা' (চলচ্চিত্র, পৃ: ৩০) প্রবন্ধে ই-কারের অনাবশ্যক প্রয়োগ ব্যাপারে। যেমন লিখেছেন, "এ নেকে মেইন, চেইন, টেইলার' লেখেন। এঁদের যুক্তি—ইংরেজী শব্দে i অক্ষর আছে, উচ্চারণেও তার প্রভাব পড়ে। এই যুক্তি 'বখ্যা'। এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় বদাবধ প্রকাশ করা বা ও না, ক হাকাছি বানান হলেই বখেট। 'মেইন, চেইন' ইত্যাদি লিখলে লোকে ই-কারের উপর অতিরিক্ত জোর দেয়। আর একটি, ভয়ংকর বানান মাঝে মাঝে দেখি—'কেইক' অর্থাৎ কেক। ই-র স্থানে না দিলে বি: 'ক্যাক' পড়বার ভয় আছে।"

চতুর্থ দুর্গতির উদাহরণ দিয়েছেন শব্দের অতর্ক প্রয়োগ। বখা 'চলন্ত' বা 'পাহারী'র স্থলে 'চলমান' বা 'আহরা' রূপ অপভ্রংশের ব্যবহার। আরও লিখেছেন, "কার্বকরী জীলিজ, কিন্তু বোধ হয় স্মৃষ্টি, তাই 'কার্বকরী উপায়, কার্বকরী প্রভাব' ইত্যাদি অপপ্রয়োগ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়। 'কর্ম্মক্ষে' স্থানে 'কর্ম্ম-ক্ষেত্র', 'সংসার' স্থানে 'সংসারাল', 'পরিভ' বা 'পর্যায়' স্থানে

'স্মারিত', 'প্রসার' হাঙ্গে 'প্রসারতা', কোশল বা পছতি অর্থে 'আঙ্গিক', প্রাথমিক অর্থে 'প্রাথমিক', কীপ বা মিটমিটে অর্থে 'ভিত্তিক' ইত্যাদি অত্যন্ত প্রয়োগ আধুনিক রচনার প্রচুর দেখা যায়।

"ভাষার বিত্ত্বি" ('সমুত্ত্ব', পৃ: ১১) প্রবন্ধে অত্যন্ত প্রয়োগের আরও বিস্তৃত উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। লিখেছেন, "উৎকর্ষতা, উৎকর্ষ, প্রসারতা, সৌজন্যতা, ঐক্যতা, ঐক্যতান, উচ্চ প্রভৃতি অধুত শব্দ চলছে। 'আধুনিকী' হাঙ্গে 'আধুনিকা', প্রচুর অর্থে 'বখেষ্ট', সংজ্ঞা বা definition অর্থে 'সংজ্ঞা' প্রায় কয়েক হারে গেছে।"

বড় হুঃখেই লিখেছেন বাকী কথাটির সংস্কৃত প্রয়োগ বড়ী নয়, পাঠার সংস্কৃত পটক নয়, পাহারার সংস্কৃত প্রহরা নয়।

পঞ্চম দুর্গতির উদাহরণ দিয়েছেন ইংরেজীর প্রভাব। বখা, medium এর প্রতিশব্দ 'মাধ্যম'-এর অহেতুক ব্যবহার। লিখেছেন, "ইংরেজী বাক্যরীতির অধুকরণে লেখা হয়—'বাংলা ভাষার মাধ্যমে 'বিজ্ঞানশিকা'। 'বাংলার বিজ্ঞানশিকা' লিখলে হানি কি? . . . promise আর signature-এর বিশেষ অর্থে 'প্রতিশ্রুতি' আর 'স্বাক্ষর'-এর অপপ্রয়োগ আজকাল খুব দেখা যায়।—'নারীমাত্রেই মাতৃষের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন'। 'এই প্রহে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।' একজনের লেখার দেখেছি—'সে এই অপমানের বিজ্ঞপ্তি নিল না' (অর্থীং took no notice)। এই রকম অধুকরণ যদি চলতে থাকে, তবে বাংলা ভাষা ঐক্রেই একটা উৎকট স্কর ভাষার পরিণত হবে।"

ষষ্ঠ দুর্গতির উদাহরণ দিয়েছেন ভাষার অনর্থক উচ্ছ্বাস ও আড়ম্বরের আমদানি। বখা, বাংলা খবরের কাগজে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদে 'বৈদ্যানের তান্তবলীলা' ব্যবহার, অথবা জলে ডুবির খবর দিতে 'সলিল সমাধি' লেখা। বাংলাভাষী না লিখে লেখা হয় 'বাংলাভাষাভাবী'।

উপরোক্ত দুইটি দুর্গতি রাজশেখর বন্দর চোখে পড়েছিল। তিনি নিজস্ব অনবদ্য ভক্তিতে সেগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এতদতিরিক্ত দুইটি দুর্গতি তাঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। সে দুটির দিকে ঐকনিষ্ঠ্যে চক্রবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ৩৫তম বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছেন:

"বিভাগস্বরূপে প্রথমে বাংলাকে সংস্কৃতরূপী হওয়ার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে তার স্বকীয় একটা রূপ দিয়েছিলেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সালসার বাংলা, অক্ষরচন্দ্র সরকার ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছোট ছোট শব্দ দিয়ে গড়া বাংলা, পাঁচকড়ি কন্যোপাখ্যায়ের প্রাচীন কথাভঙ্গীর হাঁচি ঢালা বাংলা এক রাসেলগুণের ত্রিবেদীর অতি পরিষ্কার বাংলা, ইত্যাদি বিবিধ পদ্ধতির রচনার আবির্ভাব হ'লেও বাক্যের মূল কাঠামো ও গঠনপ্রণালীর কোন পরিবর্তন হয়নি। বাক্যের পর বাক্য সাজাবারও একটা সুনির্দিষ্ট ধারা অব্যাহত থেকে গিয়েছিল। নিজের বিশিষ্ট রূপটি রক্ষা ক'রে ঐগম্য বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'রে অবশেষে বাংলা এমন একটা অপরূপ ভাষা হ'রে উঠেছিল যে পৃথিবীর কোন ভাষাই যোগ্য হয় লৌকর্ষে, শক্তিতে ও প্রকাশকর্মতার, যত্নময় ও তীক্ষ্ণতার তাকে অভিহিত ক'রে যেতে পারতো

না। দুর্ভাগ্যবশত 'জীবনমুষ্টি', 'বয়ে বাইয়ে' এক 'চাষ ইয়ারী কথা'র ভাষার উল্লেখ করলেই বখেষ্ট হবে। কিন্তু আজ আমরা ঐ অপরূক সম্পদটাকে যেহাঙ্গার বিনষ্ট করতে বসেছি কেন? কতৃ'পদ, কর্তৃপদ এবং সর্বক পদকে সবলে বাক্যের শেষ প্রান্তে ঠেলে দিছি, অত্যন্ত পদগুলিও বখুছা ওলট পালট করছি এবং বাক্যের গঠন বখু মুষ্টিটাকে অটীক মুষ্টিতে পরিণত ক'রে ও তার গঠির তালটাতে বেতাল চুকিয়ে লও তও ক'রে দিয়ে পরম আনন্দ অধুত করছি। যে হলে আগের কালের ভাষা বলতো, 'শশাঙ্কের বালাকালেই তার কবি-প্রতিভা বিচক্ষণ পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাই তিনি পুত্রকে কারিগরী বিভা শিখতে পাঠাননি"—বে হাঙ্গে আজকের ভাষা বলছে, 'শশাঙ্কের বালাকালেই তার কবি-প্রতিভা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিচক্ষণ পিতার। তাই পুত্রকে কারিগরী বিভা শিখতে পাঠাননি তিনি।' যে হলে আগেকার ভাষা বলতো, 'অত বখ থাকলেও প্রথম দর্শনে তাঁর ব্যক্তির মোটেই আমাকে অভিজুত করতে পারেনি,' সে হলে আজকের ভাষা বলছে, 'অত বখ থাকলেও প্রথম দর্শনে তাঁর ব্যক্তির মোটেই অভিজুত করতে পারেনি আমাকে।' যে হলে আগেকার ভাষা বলতো, 'রজন বললে, 'মিঠে বলও মারে মারে তেতো লাগে,' সে হলে আজকের ভাষা বলছে, 'মিঠে বলও মারে মারে তেতো লাগে' বললে রজন।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ বেন ভাষাটা হুই পা উর্ড়ে তুলে দিয়ে হুই হাতের উপর ভর ক'রে ঐকিক ওদিক বেঁকে বেঁকে টলমল গতিতে চলছে অথবা কোমরে তাত দিয়ে উচ্ছ্বাসটাকে পেছনের দিকে বেঁকিয়ে মাখা দিয়ে মাটি হোঁবার জোঁ করছে। আমার দৃষ্টিতে ভাষার এই ভলীটা রক্ষণ তো নয়ই, উচ্চট।

বাংলার নুতন সাহিত্যে আর একটা ভাষা-রীতিও দেখা দিয়েছে। বিশেষ বিশেষের ছোট ছোট সমষ্টি, তার উপাধান, ক্রিয়াপদ আর সম্পূর্ণ বক্তিত। সমস্ত রচনাটাই বেন একটা তারখাটা।

বাংলা ভাষার বে আধুনিক রূপ রাজশেখর বন্দর কল্পনা করেছিলেন সে সবক্ষে তাঁর বক্তব্য "সাবু ও চলিত ভাষা" ('সমুত্ত্ব', পৃ: ৬৭) প্রবন্ধে দেখতে পাই। সেই প্রবন্ধ থেকে একটি চূর্ণক উদ্ধৃত করলাম।

- "আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে নিবেদন করি।—
- (১) প্রচলিত সাধুভাষার কাঠামো অর্থাৎ অক্ষর পছতি বা Syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর অধুকরণ সাধারণে বরদাস্ত করবে না, তাতে কিছুমান লাভও নেই।
 - (২) ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধুরূপের বসলে চলিতরূপ গৃহীত হ'ক।
 - (৩) অত্যন্ত অসংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দের চলিতরূপ গৃহীত হ'ক। যদি অন্ত্যাসের জন্ত বাবা হয়, তবে কতকগুলি সাধুরূপ কতকগুলির চলিতরূপ নেওরা হ'ক। যে শব্দের সাধু ও মৌখিক রূপের ভেদ আন্ত অক্ষরে, তার সাধুরূপই বজায় থাকুক, বখা—'ওপর, পেছন, পেতল, তেতর' না লিখে 'উপর, পিছন, পিতল, তিতর'। যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে, তার মৌখিকরূপই নেওরা হোক, বখা—'কুয়া, মিছা, হুতা, উঠান, পুয়াসো' হাঙ্গে 'কুয়ো, মিছে, হুতো, পুয়ো'।
 - (৪) বে সংস্কৃত শব্দ চলিত ভাষার অঙ্গ নয়—অর্থাৎ বিখ্যাত

লেখকগণ বা চলিত ভাষায় লিখতে বিধা করেন না, তা কেন বিকৃত করা না হয়। 'সত্য, মিথ্যা, নৃতন, অবত' প্রভৃতি বঙ্গীয় থাকুক।

(৫) এ ভাষায় অনুবাদ করলে রামায়ণাদি সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে, অথবা এ ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান লেখা বাবে না— এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন। হুজুর সংস্কৃত শব্দে আর সমানে সাধু ভাষায় একচেটে অধিকার নেই। 'বাত্যাবিকোভিত মহোদধি উষেল হইয়া উঠিল' না লিখে '...হয়ে উঠিল' লিখলেই গুরুচণ্ডাল বোধ হবে না। হুদিনে অভ্যাস হয়ে বাবে। তখনতে পাই ধুতির সঙ্গে কোট পরতে নেই, পাঞ্জাবি পরতে হয়। এইরকম একটা ক্যাননের অনুশাসন বাংলা ভাষাকে অভিকৃত করেছে। ধারণা ঠাড়িয়েছে—চলিত ভাষা একটা তরল পদার্থ, তাতে হাত-পা ছড়িয়ে সঁাতার কাটা বার, কিন্তু ভারী জিনিষ নিয়ে নয়। ভার বইতে হ'লে শক্ত জমি চাই, অর্থাৎ সাধুভাষা। এই ধারণার উচ্ছেদ দরকার। চলিত ভাষাকে বিয়র অনুসারে তরল বা কঠিন করতে কোনও বাধা নেই।

২

"ভাষায় 'মুক্তাঙ্গ' ও 'বিকার' ('বিচিত্তা', পৃ: ৫৩) প্রবন্ধে রাজশেখর বসু বাংলা ভাষায় লেখকদের চারটি মুক্তাঙ্গের লক্ষ্য করেছেন। যথা—(১) শব্দবৈচিত্র্য বাহুল্য, (২) শব্দবাহুল্য, (৩) শব্দের অপচয়, এবং (৪) শব্দবিশেষের প্রতি যৌক বা আকর্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "বাংলা ভাষায় শব্দবৈচিত্র্যের প্রাচুর্য্য বত বেশী অল্প আর্ষ ভাষায় তত নহে"। যথা—কাঠ কাঠে, সঙ্গে সঙ্গে, চলিতে চলিতে, যুক্তি ঝড়ি, গরম গরম, বাব বাব, বৌচকা বুঁচকি, কাপড় চোপড়, ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোঁষ বিচার চলে না। কিন্তু বৈশিষ্ট্যকেও অপপ্রয়োগ করা যায় এবং করাও হচ্ছে। রাজশেখর বসু এমনি অপপ্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত 'খেলাধুলা' শব্দের ব্যবহারে দিয়েছেন। যেমন—

"সংবাদপত্রে sports অর্থে খেলাধুলা চলেছে। শিশুর খেলাকে এই নাম দিলে যেমানান হয় না, কিন্তু ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতিকে খেলাধুলা বললে খেলোয়াড়ের পৌকব ধূলিসাৎ হয়। লোকে বলে—মাঠে খেলা দেখতে বাচ্ছি। খেলাধুলা দেখতে বাচ্ছি বলে না। শুধু খেলা শব্দে বখন কাজ চলে তখন অনুপ্রাসের মোহে খেলার সঙ্গে অনর্থক ধুলা যোগ করার দরকার কি?"

শব্দবাহুল্য রোগের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন দেশনেতাদের নামের পূর্বে বিশেষণ সংযোগ। যথা, 'নেতাজী সুরভাব বোড'। এ বিশেষণের বহুল ব্যবহারকে উপগর্গ ব্যবহার বলেছেন, যেমন ব্যবহার আছে ষবি বক্রিয়চন্দ্রে বা অপরাধের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রে। কথাটা ঠিক।

"অনামা ভূষণঃ ধন্তে ন কনিষ্ঠা ম মধ্যমা

নিজ নাম প্রসিদ্ধত ভূষণঃ কিং প্রয়োজনম্।"

পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যে একটির নাম অনামিকা। আঙুলি পরা হয় সেই আঙ্গুলেই। সেটি যে অনামিকা অর্থাৎ নামগোত্রহীন। অল্প আঙ্গুলের নিজ নাম প্রসিদ্ধি আছে—কনিষ্ঠা, মধ্যমা, তর্জনী, অন্তর্। সেগুলিতে ভূষণ ধারণের প্রয়োজন নেই।

'সন্দেহ নাই' কথাটা উঠে গেল। লিখেছেন তার বদলে চলছে 'সন্দেহের অবকাশ নাই'। তেমনি চলছে 'দিলেন' স্থানে 'প্রকাশ করিলেন', যোগ দিলেন স্থানে 'অংশ গ্রহণ করিলেন', 'গেলেন' স্থানে 'গমন করিলেন'। এগুলিকে বলেছেন শব্দের অপচয়।

কোন কোন লেখকের বিশেষ কোন শব্দের উপর যৌক বা আকর্ষণ আছে। দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেমন কোন লেখক কিছুতেই 'বুবক-বুবতী' লিখবেন না, লিখবেন 'তরুণ-তরুণী'। তাই বোধ হয় এরকম লিখলে পাত্রপাঞ্জীর 'বয়স কম দেখার এবং জালিত্য বাড়'। অনাবশ্যক হৃস্চিহ্ন ব্যবহার এমনি আর একটি মুক্তাঙ্গ দোষ। উদাহরণ দিয়েছেন, 'ভিন্টি ভিন্ জেজে নিন্, তাতে একটু হুন্ হুন্'।

একটি বিকারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অবিবাহিতা মেয়েদের নামের পূর্বে প্রাচীন রীতির স্ত্রীমতী বর্জ্যন করে ইংরেজী 'মিস' লেখার চলে 'কুমারী' লেখা হয়। এ চণ্ডের দরকার নেই বলেছেন কেননা 'পুরুষের কৌমাৰ্য তো ঘোষণা করা হয় না'। একটা দিক ভেবে দেখেননি মনে হয়। নামের আগে কৌমাৰ্য চিহ্ন কুমারী লেখার ফলে কেহ তো মেয়েটিকে রাজকুমারী বলেও ভুল করতে পারেন।

লিঙ্গ বিপর্যয়ের কয়েকটি মসিক উদাহরণ দিয়েছেন "গ্রহণীয় শব্দ" ('চলচ্চিত্তা', পৃ: ১৭) প্রবন্ধে। লিখেছেন: "স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রতি আমাদের কিছু পক্ষপাত দেখা যায়। জীবনচরিত বা চরিত স্থানে জীবনী, জন্মবার্ষিক বা জন্মদিন স্থানে জন্মবার্ষিকী, পরিক্রম বা পরিক্রমণ স্থানে পরিক্রমা, শতাব্দ স্থানে শতাব্দী, প্রকাশ স্থানে প্রকাশনা ইত্যাদি চলছে। এতে আপত্তির কারণ নেই, কিন্তু স্থানে অস্থানে কার্যকরী শব্দটির এত চলন হল কেন? শুধু ধবয়ের কাগজে নয়, অনেক জনপ্রিয় লেখক আর অধ্যাপকের লেখাতেও দেখতে পাই—কার্যকরী উপায়, কার্যকরী সমাধান, প্রস্তাব কার্যকরী করা ইত্যাদি। কার্যকর বা কার্যকারী লিখতে বাধে কেন?"

আর একটি অদৃষ্ট ক্যানন সম্প্রতি দেখা দিয়েছে স্ত্রীবিভিন্-প্রীতি। পত্রিকা বা পুস্তকের নাম রূপম্, পুস্তকম্, অবনীপ্রচরিতম্ ইত্যাদি রাখলে আপত্তি করা যায় না। বোধ হয় পৌরব বুদ্ধির অল্পই সংস্কৃত বিভক্তিবৃত্ত নাম দেওয়া হয়। ভরতনাট্যম্ এই রকম হতে পারে। অনেক জ্রাবিড়ী নামের শেষে ম্ আছে, যেমন—পায়সম্ রসম্ পপড়ম্ স্ত্রীকম্ চিন্দ্রম্। ভরতনাট্যম্ হরতো সেইরকম। সেদিন রাত্তার একটি কবিরাজী দোকানে সাইন বোর্ড দেখেছি—ঐআয়ুর্বেদম্। সংস্কৃত ভাল করে না শিখলে কবিরাজ হওয়া যায় না। আয়ুর্বেদ পুঞ্জিল শব্দ। দোকানের মাসিক শেষে ম্ যোগ করে আয়ুর্বেদকে নপুংসক করলেন কেন? আর একটি শোচনীয় নাম মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। একজন লেখক তাঁর রচনার শেষে নাম লেখেন—ভারত পুঞ্জম্। এই ভারত সন্তান স্ত্রীকম বরণ করলেন কোন্ হুগে?"

৩

"বাংলা ভাষা বীরে বীরে বদলাচ্ছে। তার এক কারণ, রাজাজীর জীবনযাত্রার পরিবর্তন, অর্থাৎ নৃতন বস্তু নৃতন কৃতি আর নৃতন আচারের প্রচলন। অল্প কারণ, অজান্তাসাবে বা ইচ্ছাপূর্বক ইংরেজী ভাষায় অনুকরণ।" ('গ্রহণীয় শব্দ', চলচ্চিত্তা, পৃ: ১৭)।

তৃতীয় কারণও আছে, বলা—বিজ্ঞান প্রকৃতির আলোচনার পারিতোষিক শব্দের প্রচলন।—নূতন কঠিন কথার “গ্রহণীয় শব্দ” প্রবন্ধে বলেছেন :

(১) “কথার কথার thanks, please, kindly ইত্যাদি বলা ইংরেজী শিষ্টাচার। আমরা তা মেনে নিয়েছি। একবার একটি মেয়ের অটোগ্রাফ খাতার আমি নাম সহি করলে সে বলেছিল, বঙ্গবান। আমি প্রশ্ন করলাম, কে বঙ্গ, তুমি না আমি। মেয়েটি প্রথমে একটু থাকড়ে গিয়েছিল, তারপর উত্তর দিল—আমি, আমি। বঙ্গ শব্দের এক অর্থ কুতর্ভ, আর এক অর্থ খুব বাহাদুর, যেমন বঙ্গ তোমারে হে রাজমন্ত্রী। মেয়েটি প্রথম অর্থে নিজেকেই বঙ্গবাদ দিয়েছিল, দ্বিতীয় অর্থে আমাকে দেয় নি। Thanks-এর বাঙলা চাট, ঠিক সমার্থক না হলেও বঙ্গবাদ মেনে নেওয়া যেতে পারে। Please, Kindly স্থানে অমুগ্রহপূর্বক, দয়া করে ইত্যাদি বলা হয়। হিন্দীতে ‘কৃপয়া’ এই ছোট সংস্কৃত পদটি চলছে, বাঙলাতেও মেনে নেওয়া যেতে পারে।”

(২) “ইংরেজীতে অনেক লোকের নাম একত্র লিখতে হলে আগে Messrs বসানো হয়, অর্থাৎ এঁরা সকলেই Mister। হিন্দীতে তার নকল চলছে সর্বত্রী, বাঙলাতেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই। সর্বত্রী তুলেই মনে আসে হাওড়াঙ্গী বাটরাঙ্গী। লোক যদি এতই স্ত্রীর কাড়াল হয় তবে উৎকট সর্বত্রী না লিখে স্ত্রীর পর কোলন বা ড্যাশ দিয়ে সমস্ত নাম লেখা যেতে পারে।”

ইংরেজী ভাষা অমুকরণশ্রীতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। আরও উদাহরণ দিয়েছেন “বাংলা ভাষার বিজ্ঞান” প্রবন্ধে (‘বিচিত্রা’, পৃ: ৭৩) লিখেছেন :

“অনেক লেখক তাঁদের বক্তব্য ইংরেজীতে ভাবেন এবং বলাবলি বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। এতে বচনা উৎকট হয়। The atomic engine has not even reached the blue print stage,—‘পরমাণু এঞ্জিন নীল প্রিন্টের অবস্থাতেও পৌঁছায় নি।’ এ বাক্য বর্ণনা বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। একটু ঘুরিয়ে লিখলে অর্থ সরল হয়—পরমাণু অঞ্জিনের মকলা পর্বত এখনও প্রস্তুত হয়নি। When sulphur burns in air the nitrogen does not take part in the reaction—‘যখন গন্ধক হাওয়ার পোড়ে তখন নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে না।’ এ বাক্য মাহিমাদা মকল না করে ‘নাইট্রোজেনের কোনও পরিবর্তন হয় না’ লিখলে বাংলা ভাষা বঙ্গার থাকে।”

পরিভাষা সম্বন্ধে উক্তি করেছেন “বাংলা ভাষার প্রয়োগবোণা পরিভাষা আমাদের অবজ্ঞা চাই, কিন্তু সংস্কৃতকালে তুললে চলবে না যে ব্যবহারকেই ইংরেজীর প্রবল প্রতিযোগিতা আছে।”

পরিভাষা ব্যবহার না করে লিখিলে বাংলার কি বিকট রূপ হয় তার একটি উদাহরণ “বাংলা পরিভাষা” (‘লঘুগুরু’, পৃ: ৭৫) প্রবন্ধে দিয়েছেন :

“(প্রায়োকোন রেকর্ড)। Masterটি পরিহার করিয়া ইহার উপর Bronze Powder ছড়ান হয়। Powder বাহাতে ইহার প্রত্যেক groove-এর ভিতর উত্তমরূপে প্রবেশ করে তাহা

Copper deposit করা হয়। এই deposit পরিমাণ অনুযায়ী পুরু হইলে ইহাকে master হইতে পৃথক করা হয়। master-এর music lines তখন এই copyর উপর উঠিয়া আসে। এই copyকে Original বলা হয়।”

আবার বে-আক্কেল পরিভাষা ব্যবহারের একটি উদাহরণও দিয়েছেন :

“নেত্রজলের উপস্থিতিতে অসিটোলিনের উপর কুলহরিণের ক্রিয়া”।

মানে বোকা দাঁড়—আল্লাহ করা বাছে নেত্রজন মানে নাইট্রোজেন, অসিটোলিন মানে এসিটলিন, আর কুলহরিণ কোন আশ্রমস্বর্ণ নয়, বোধ হয় ক্লোরিন।

এ সম্বন্ধে মতামত রাজশেখর বসুর ভাষায় উল্লিখিত করছি :

“বামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন—

‘মঠেশ্বরশালিনী আর্ষা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্বদেশজ শব্দ অজস্রভাবে গ্রহণ করিয়া আশ্রুপুষ্টি সাধনে পরাধীন হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার অভিধান অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল বৈদেশিকের সহিত প্রাচীন হিন্দুর আদান-প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেও সংস্কৃত ভাষা স্বপক্ষীকারে কাতর হয় নাই।... আমাদের পক্ষে সেইরূপ স্বপগ্রহণে কড়িয়া দেখাইলে কেবল আহানমুখ্যতাই প্রকাশ পাইবে।’ (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩০১)।

বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত হতে পারেন, কিন্তু গ্রীক, আরবী, আরবী, পোর্চুগিজ, ইংরেজীও আমাদের ভাষাকে ভ্রমশ্রমে পুষ্টি করেছে। যদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সাবধানে নির্বাচন করে আরও বিদেশী শব্দ আমরা গ্রহণ করি, তবে মাতৃভাষার পরিপুষ্টি হবে, বিকার হবে না। অপ্রয়োজনে আহাণ্য করলে অর্জিত হয়, প্রয়োজনে হয় না। যদি বলি—‘ওয়াইকের টেম্পারটা বড়ই ফ্রেটফুল হয়েছে’ তবে ভাষা-জননী ব্যাকুল হবেন। যদি বলি—‘মোটরের ম্যাগেটেটা বেশ কিন্‌কি দিচ্ছে’, তবে আমাদের আহরণের শক্তি দেখে ভাষাজননী নিশ্চিত হবেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার যে International Scientific Nomenclature সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে, তার দ্বারা ভ্রমভয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী অন্যরাসে জ্ঞানের আদান-প্রদান করতে পারছেন। এই পরিভাষা একেবারে বর্জন করলে আমাদের ‘অহমুখ্যতাই’ প্রকাশ পাবে। সমস্ত না হোক, অনেকটা আহাণ্য মিতে পারি। যে বৈদেশিক শব্দ নেওয়া হবে, তার বাংলা বানান মূলানুযায়ী করাই উচিত। বিকৃত করে মোলায়েম করা অনাবশ্যক ও প্রমাদজনক। এককালে এদেশে ইতর-ভ্রম সকলেই ইংরেজীতে সমান পণ্ডিত ছিলেন, তখন general থেকে ‘জেনারেল’, hospital থেকে ‘হাসপাতাল’ হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে বৃগু নেই, বহুকাল ইংরেজি পড়ি আমাদের জিহ্বার জড়তা অনেকটা বৃদ্ধি। সংস্কৃত শব্দও কটমটির অভাব নেই। কেউ যদি ভুল উচ্চারণ করে ‘বাচ্-কা’কে ‘বাচিলা’, ‘অনৈক’কে ‘অনিক’, ‘মোটর’কে ‘মটোর’, ‘সিগারিনীক’ ‘সিল্‌হেরিন’ বলে, তাহলে কতি হবে না—যদি বানান ঠিক থাকে।”

৪

রাজশেখর বঙ্গ বঙ্গভাষার উপাসক ছিলেন। মাতৃভাষা তাঁর উপাসনা দেবী ছিলেন। সেই দেবীর অঙ্গসজ্জার বিভিন্ন দেশের পুষ্পসজ্জার প্রয়োগে তাঁর চেষ্টার ক্রটি ছিল না। আপত্তি ছিল অমেধ্য, অকাজীৱ দ্রব্য উপচার ব্যবহারে। তাই তাঁর বাংলা ভাষার ক্রটি বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনা এত ভিত্তি।

"ভাষার কথা" প্রবন্ধে, অধুনালুপ্ত 'সবুজ পত্র' সম্পাদক প্রথম জীবনের চলিত ভাষা প্রচলন চেষ্টাকে কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"আমাদের সাহিত্য যে ভাষাবিশিষ্টতার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হইতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার

তত্ত সবুজ পত্র সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন। তাঁর মত এই যে, সাহিত্য পদার্থটি আকারে সাধারণ এবং প্রকারে বিশিষ্ট—এই হইলেই সত্য হয়। এ কথা মানি। কিন্তু হিন্দুস্থানীতে একটা কথা আছে, 'পয়লা সামলনা হুছিল ছায়।' স্বয়ং বিধাতাও মাতৃব্য গড়িবার পোড়ার বানর গড়িয়াছেন, এখনও তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।"

('সবুজ পত্র', ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৃ: ৭২৬)

মহুয়া সৃষ্টি প্রচেষ্টার বানর সৃষ্টির যে আদিম অভ্যাস তাহারই বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর সমালোচনা। বাংলা ভাষা সৃষ্টিতে অকৃতান্তে 'অপভ্রাংশু' সৃষ্টি প্রচেষ্টার চিরবিমোহিতা তিনি ক'রে গিয়েছেন

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতি-বিবর্তন

ডক্টর শ্রীশুধাকর চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যের লক্ষ্য হ'ল বঙ্গসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যে হস্তবস বা করুণরস সৃষ্টি করেন তা প্রাচীন কালের মত নয়। তাঁর হস্তবস বিদ্বকের ঔদরিকতা ও প্রায়াত্ম্যের থেকে মুক্ত, তাঁর করুণ রস গভীর ও গভীর। আর সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান, আদিম ও আদিরস শূন্যবসের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের শালীনতাবোধের কথাও আলোচনা করেছেন কবিগুরু। এক সেকেন্দ্রে পণ্ডিতের প্রাচীন ধর্মের জ্ঞানবসের অবতারধার সজ্জিত হয়ে সেই আলোচনাক্ষেত্রে চ'তে স্রুত পলায়নকারী চঙ্কিমচন্দ্রকে দৃঢ়তর দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা পাই তিনি আদিরস, হস্তবস, করুণরস ইত্যাদির ক্ষেত্রে বঙ্গকৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আলোচনা স্রুতবস সঙ্গ আমরা প্রচলন করবার সময় মনে রাখতে হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা তাঁর বিশ্লেষণের মধ্যে পাই তাঁর ক্রিষ্ণ বসন হলে... চলে এবং মনে তাঁর পরিপকতা। সামনে তাঁর প্রসিদ্ধি, সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু না জীবনে না সাহিত্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ পরিপকতা নিয়ে মাতৃব্য জীবনের পথে অগ্রসর হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতি প্রথম থেকে পরিপূর্ণ বিকশিত ছিল না। অল্প প্রবন্ধে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় বসন্তের যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা প্রথম থেকেই পূর্ণ বিকশিত। কিন্তু প্রবন্ধে তাঁর বন্দোপাধ্যায়ের এ কথা আমরা প্রচলন করতে পারলাম না। বঙ্কিমের প্রতিষ্ঠা প্রথম থেকে পূর্ণ বিকশিত ছিল না। তাঁর কৃতিও প্রথম থেকেই বঙ্গকৃতি ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা পাই, তিনি প্রাচীন সাহিত্যগণা-কলে স্রাম ক'রে হস্তবস ও শূন্যবস পরিবেশন করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিভাঙ্গিপত্র সংস্কৃত-প্রাকৃত নাটকের বিদ্বকের নিকট-মাস্তুর। এ হস্তবস খুব উচ্চতর নয়। আদিরসের ক্ষেত্রেও এখানে তিনি প্রাচীন আদর্শকে বেশ কিছুটা অঙ্গবরণ

শিখর আলোচনা করা হ'ল। সংস্কৃত-প্রাকৃত নাটকে হস্তবস অনেক পরিমাণে বিদ্বক-নির্ভর। এ বিদ্বক ভ্রাঙ্গণ, উদরপত্রবণ, শূল-বুদ্ধিসম্পন্ন। কখনও নায়েন তিনি দাসীর সঙ্গে বৈকল্যের প্রতিযোগিতায়। কিন্তু প্রতি প্রতিযোগিতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় বিভাঙ্গিমাস্তুর বিদ্বকের ঔদরিকতা আর দাসীর বিচলনতা। কলে দাসীকে গামি কেন বিদ্বক। দাসীর প্রত্যুত্তর পাম ভিমি। মাস্তুর শান্তিবিধানের হুমকি আসে ত্রাঙ্গণ। 'শূন্যবস'র বিদ্বক বসন্ত ভ্রাঙ্গণ, ঔদরিক। রাজাকে প্রেয়ে 'বিতোপক্ষে' কেন ভিমি, আর আমাদের পোনাম প্রেয়ে 'পকল্প' কথা, 'শিওবর্জ্য'র অকৃতি কল্যানে মাতৃব্যের যেমন ভিত্তিই করুণর সাং ভাসে সেইরূপ পূর্ণনারী-ভোগ্যরাজ রাজা এখন মুখ বঙ্গভাষার তত্ত আশ্রয়তর সিকে মত্তর সিকেন।" বিদ্বকের মাথার কেবল খাংবার চিন্তা। তাই রাজা এখন তাঁকে একটা পত্র কাক তরতে বলেন তখন চট ক'রে প্রেয় করেন বিদ্বক, "তি কাক? স্রিষ্টি খাংবার খাপার?" "বিভ্রমোর্ব্বিহরম্"-এ বিদ্বক টাং দেখে স্রিষ্টির টুকরোর কথা শ্রবণ করে ("খাং মৌরজ স্রিসো")। রাজার সঙ্গে রাজকিত্রা বসন্ত আলোচনার ভিমি স্রিষ্টি। 'দুর্গেশনন্দিনী'র হস্তবস অনেক পরিমাণে 'বিভাঙ্গিপত্র'-নির্ভর। ঔদরিক ভ্রাঙ্গণ বিভাঙ্গিপত্রের বিভাবুজির পরিচয় তাঁর নামেতেই। আবার বন্দী ভগ্নসিংহ তাঁর কাক থেকে প্রিষ্টি তিলোত্তরার সমাচার সংগ্রহ করতে চেয়েছেন। "কপূ'রমজরী"তে বিদ্বক বসন্তবর্ণনা করেছেন। বসন্তের সাল মুখ তাঁর ক'ছে "হহিব-বহি"র খাপি বহন ক'বে এনেছে।

পেটুক বিদ্বকের পরাজয় ঘটান দাসী বসন্তবর্ণনার বৈকল্যে। তারপর তপ্তকাতীকাতির স্রুত্রে সে-দাসী শূন্যবস পাংর নাখিখাংবার হুমকি দেখিয়েছে, কান তি'তে দেবার ভয় দেখিয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিভাঙ্গিপত্র আশমসী ও বিমলার রূপকল্পে প্রায়কলে মত নাকামি-চুয়ামি খেয়ে যে-হস্তবস সৃষ্টি করেছে তাঁর

করা থাকে। এখানে আশমানী দাসী এবং বিমলা দাসীরূপে পরিচিত। বিভাগিগুঞ্জ পেটুক প্রাকৃত-নিকরোণ রসিক। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে (যখন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পরবর্তী বঙ্কিমের রচনা মত তুচ্ছ হলেও) আশমানী কেবল পরিহাস-রসিকতা করেনি, দিগ্গজের মুখে তিত্তর পানের পিক টেলে দিয়েছে। প্রথম সংস্করণে দিগ্গজ গিলিতেও পারেন না, এই ভোজনের পর এক গাল ধুঁ কেমন করিয়াই বা সেলেন? নীলকণ্ঠের বিবের ভায় গালের মধ্যেই রহিল। প্রথম সংস্করণে আশমানী দিগ্গজের গাল কামড়ে বস্তু বার করে পরিহাসের চূড়ান্ত করেছে। এই ধরণের হাস্যরসকে নিশ্চয়ই তুচ্ছ হাস্যরস বলা চলে না। এ হচ্ছে প্রাচীন ধারার হাস্যরস। এখানে হাস্যরস বর্তমান কালের পাঠকের কাছে বীভৎস রসের উদাহরণ বলে বোধ হবে।

আদিরসের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে প্রাচীন কাব্যধারা-জলে অবগাহন গ্রহণ করেছেন, তা দেখানো যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বে-বঙ্কিমচন্দ্রকে পণ্ডিতী আদিরসের অবতারণায় লজ্জিত হয়ে পলায়ন করতে দেখেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনাকালের সাতাশ বছরের যুবক বঙ্কিমচন্দ্র নন। সকলেই জানেন যে সঙ্কট-প্রাকৃত কাব্যসাহিত্যে সারাদেশের 'স্ট্যাটিস্টিক' (vital statistics) বিষয়ে প্রকৃষ্ট আলোচনার লক্ষ্য হ'ল না। এখন যেমন বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষীর প্রতিযোগিতায় ওপরের ঘের, মাঝের ঘের, আর নিচের ঘের মাপবার জন্য দুই-ইকির দরকার হয়, তখন সঙ্কট-প্রাকৃত কবিতায় নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে কাঠিন্দ ও পীনদ; কটির কণদ; আর নিতম্ব-উষ্ণ গুহর বর্ণনা না হলে কবিতাই হোত না। প্রাকৃতের কবিতার রাজশেখর বালকমুষ্টিতে ধরা যায় এমন নারী-কটির, আর দুই বাহু দিয়েও ঘেরা যায় না এমন নিতম্ব-ঘেরের বর্ণনা করেছেন (মুগ্ধ মজঃ তিবলিবলিদং ডিম্ব মুষ্টিম গৌহ। ধৌ বাহুহি রমণ কলমঃ বেটুটিহু জাদি মোহি।।)। সঙ্কট-প্রাকৃতের পলায়নকারী প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকেরা নারীদেহের ঐ সকল অঙ্গের খোলাখুলি আলোচনা করতে বিধা-সঙ্কোচ বোধ করেন নি। ইংরাজী সাহিত্যের নব-ধারাজলে স্নাত ভিক্টোরিয়-রচিবিশিষ্টরা এবিধ বর্ণনার "শক" (shocked) হয়েছিলেন। বে-বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে দিয়ে প্রাচীনপন্থীর মূল রসিকতার পালিয়ে গিয়েছিলেন সলজ্ঞ-সঙ্কোচে, তিনি ইংরাজী-শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র। আর যে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে কলম ধরেছিলেন তিনি বরসে নবীন আর ইংরাজী-শিক্ষিত হ'লেও ভাটপাড়া এবং সঙ্কট-সঙ্কতি হ'তে ধুবুদু হয়ে ছিলেন না। সেই 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিনি তন-উষ্ণ-নিতম্ব বর্ণনার বসারিত। পরবর্তীকালে তিনি যে কপালকুণ্ডলা, সুখালিনী, সুধাবুধী, কুন্দনন্দিনীর 'ভাইট্যাল স্ট্যাটিস্টিক' দেননি তার কারণ তাঁর মধ্যে নব্য রচনার ক্রমবিকাশ। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে তিনি প্রাচীন সাহিত্য-প্রাণকে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' হ'তে অনেক অংশ বাত দিয়েছেন। আশমানীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :—

‘কুচুপ দেখিয়া দাড়ি বকসেন হাড়িয়া পাটনা-অকলে পলাইয়া
নন্দিনী... দাড়ি ফিঙ্গল ধবলপিবি, তিনি দেখিলেন যে, আশার

চূড়া কতই বা উচ্চ আড়াই কোশ বই কনর, ইহার পরাধর
(পরবর্তী সংস্করণে “এ চূড়া”) অনূন তিন কোশ হইবেক।...
নিতম্ব ধরার অপেক্ষায় বৃহৎ ভাহাতে বিস্তর গাছপালা, গৌ-মহুবা
ধাকিতে পারে, কিন্তু নিকটে উষ্ণরূপ দুইটি কদলী গাছ ;
কদলীগাছের আওতার অন্ত গাছ পড়ায় না ; আর পাছে কদলীগাছ
ধাইয়া কেলে বলিয়া বিবাতা তখার গৌ-মহুবায় স্থষ্টি করেন নাই।।

‘দুর্গেশনন্দিনী’র প্রথম সংস্করণে বেশনিরন্ত বিমলায় অনাবৃত
বক্ষের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন, কাঁচলি-শুক
বক্ষুল কালজয়ী কি না দেখ ?’

পরবর্তী সংস্করণে বিমলা বীরেন্দ্র সিংহের নিকট বিহার নিয়ে
(দশম পরিচ্ছেদ) বিভাগিগুঞ্জের কাছে যাবার প্রাকালে কেবল
দৃষ্টিপাতে বীরেন্দ্র সিংহকে নন্দিত করে গেছেন কিন্তু প্রথম
সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র আদিরস স্থষ্টির এই সুযোগ ছাড়েন নি। সেখানে
‘বীরেন্দ্রের দ্বন্দয়ে (বিমলায়) কাঁচলিযুক্ত স্পর্শ হইল। একবার
ঘায়ের দিকে নেত্রপাত করিয়া (বিমলা) নিজ বসাল ওষ্ঠাধর
বীরেন্দ্রের ওষ্ঠে সংক্রান্ত করিলেন।’

পরবর্তী সংস্করণে মাজিতরচি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে, তিলোত্তমা
গীতগোবিন্দ পড়ে লজ্জিত হলেন। কিন্তু প্রথম সংস্করণে ছিল
তিলোত্তমা গীতগোবিন্দের কোন্ অংশ পাঠ করে লজ্জিত হয়েছিলেন,
('রিপুর্মিব কেলিযু লোলম্')।

কংলু খাঁর হত্যা দৃশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণে বিমলা ও
নর্তকীদের আদিরসের যে ফোয়ারা ছুটিয়েছেন তা পরবর্তী সংস্করণে
কিছু বাত দিয়েছেন (প্রথম সংস্করণের পাঠান্তর 'দুর্গেশনন্দিনী'র
বকীর সাহিত্য পরিবেশ সংস্করণে স্তম্ভ্য)।

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ যে 'দুর্গেশনন্দিনী' হ'তে অনেক বদলেছে
তা আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করলেই বুঝতে পারা যাবে।
ভারতচন্দ্রও কবি, মধুসূদনও কবি। ভারতচন্দ্র প্রাচীন কাব্যধারার
কবি, আদিরসের কবি। মধুসূদন আধুনিক কাব্যধারার কবি,
বীররস বা কল্পরসের কবি। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনাকালে
ভারতচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র অরণ করেছেন বাদল পরিচ্ছেদে। তিনি
আশমানীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বিহার রূপবর্ণনার আদর্শও অহুসরণ
করেছেন। বধা :—

‘আশমানীর বেণীর শোভা কবিতার ভায় ; কবিতা সেই ভাপে
মনে ভাবিল, যদি বেণীর কাছে পরাভ হইলাম, তবে আর এ দেহ
লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজনটি কি ? আদি গর্ভে
বাই। এই ভাবিয়া সাপ গর্ভের তিতরে পেলেন।’

ভারতচন্দ্র বিহার রূপবর্ণনা করে লিখেছেন :—

বিননিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভার।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকার।

সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিতা যে এই সময় গভীর ভাবে
পড়েছিলেন তার পরিচয় 'সুখালিনীর' (১৮৬৯) মধ্যেও দেখেছেন।
ভারতচন্দ্রের বিপরীত বিহার বর্ণনা আদিরস-রসিকের পরম উপভোগ্য
সামগ্রী। তার মধ্যে ভারতচন্দ্রের—

‘জাতি দিন বিপ্রহরে দেবীলাম সখাবরে

কমলিনী বাঁধিয়াছে কনী।’

প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত 'মৃগালিনী'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে
গিরিজায়ার নিরোদ্ধৃত গানটি—

দেখিলাম সরোবরে কাঁপিছে পবন-স্তরে
মৃগাল উপরে মৃগালিনী ।

'মৃগালিনী'র প্রথম সংস্করণে গিরিজায়ার মুখে আদিরসের যে
শ্রীতিটি ছিল সে হ'ল—

কটি-বাস কসিরে বাস-রসে রসিরে
মাতিল রস-কামিনী ।

এই গীতটি পরবর্তী সংস্করণে মাজিতকটি বন্ধিমচন্দ্র পরিত্যাগ
করেছেন ।

'দুর্গেশনন্দিনী' হ'তে 'কপালকুণ্ডলা'র মাত্র এক বছরের
কালান্তরমিক ব্যবধান ও প্রায় এক শতাব্দীর ক্রটি-পার্থক্য ।
পরবর্তী কালে 'মৃগালিনী' একটি প্রতিভাহীনতার অধায় । সে
অধায় অতিক্রম করে বন্ধিমচন্দ্রের ক্রটি প্রাচীন কাব্যধারার
দিকে এগিয়ে চলেছে । 'কপালকুণ্ডলা'তে বন্ধিমচন্দ্রের প্রতিভা
আপন পথ ধুঁজে নিল । সেখানে অনেক কবির উদ্ভৃতির সাথে
পরিচ্ছেদের শিরোদেশে মধুসূদন হ'তে উদ্ভৃতি স্থান পেয়েছে ।
'মৃগালিনী'তে বন্ধিমচন্দ্র বেন হঠাৎ প্রাক-'কপালকুণ্ডলা' যুগে ফিরে
(সত্যই আমার সন্দেহ হয় 'মৃগালিনী' 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী না
পূর্ববর্তী ? 'কপালকুণ্ডলা'র পরে এর প্রকাশকাল বটে কিন্তু রচনা-
কালও কি পরবর্তী ? কেন না, রচনারীতি বিচারে কিছুতেই
'মৃগালিনী'কে 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী বলে মনে হয় না) ।
মৃগালিনীতে ভারতচন্দ্র আবার স্থান পেয়েছেন বন্ধিমচন্দ্রের কাছে ।
পরবর্তী কালে 'বিষবৃক' উপন্যাস ভারতচন্দ্রের স্থলে মধুসূদন অর্ধেক

মহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত । এখানে তিনি অন্তর্ভুক্ত । অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী
মৃগালিনীতে ভারতচন্দ্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে । 'কপালকুণ্ডলা'তে
বন্ধিমচন্দ্র পরিচ্ছেদে মধুসূদনকে শিরোধার্য করেছেন কিন্তু উদ্ভৃতি
ছাড়া আপন বর্ণনার অনুসরণ নেই । বিষবৃক মধুসূদন বন্ধিমচন্দ্রের
বর্ণনার মধ্যে ধীরে ধীরে নিজেকে বিস্তৃত করেছেন । বিষবৃকের মধ্যে
বর্ণনার মধুসূদনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

যেমন বহু দীপ-সমুচ্ছল বহু লোক-সমাকীর্ণ সীতধনিপূর্ণ
নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয়,
এই মহাপূর্বী সূর্যাস্ত-নগ্নেস্ত কৰ্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেইরূপ আঁধার
হইল ।

উপরি-লিখিত অংশটি মধুসূদনের নিম্নোদ্ধৃত অংশের প্রভাবপূর্ণ :

কুমুদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পূর্বী । কিন্তু একে একে
গুকাইছে কুল এবে, নিবিছে দেউটা ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?

বন্ধিম-প্রতিভা বিকাশের ইতিহাসে এই আদর্শ পরিবর্তন বিশেষ
ইঙ্গিতপূর্ণ । 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বন্ধিমচন্দ্র বয়সে নবীন আদর্শে
প্রাচীন । পরবর্তী কালে বিশেষতঃ 'বিষবৃক'-এ বন্ধিমচন্দ্র বয়সে খুব
নবীন (৩৫ বৎসর) না হ'লেও আদর্শে নবীন । তিনি সেখানে
একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা ও বিধবা-বিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি
দিয়েছেন । আবার স্বীকৃতিদানের মধ্যে প্রাচীন সংস্কার-ব্যাধিটি
আবার রিলাপস করে সে বিবাহের মুহূর্ত ঘটিয়েছে ।

ROLLAND AND TAGORE

(Conversation—1930)

Rolland : ..I hear that you have suddenly taken to painting.

Tagore : I must confess that this unexcepted event has indeed happened. At first I did not take it seriously, but I find that your people have seen more in it than I could ever expected..it is the genuine appreciation of the artists and literary people of Europe which has given me such deep pleasure..I wonder what made me take to painting..

Rolland : Your inner dreams want expression and poetry need not necessarily be the only vehicle for expressing your visions.

Tagore : Words are too conscious and while lines are not..Ideas have their form and colour which wait for their incarnation in pictorial art. It is true that I experience a new kind of satisfaction in doing my pictures—something distinct and apart from the ecstasy which the creation of a poem or the composing of a melody could give me..

Rolland : The German poet Hermann Hesse left poetry after his 40th year and took to painting. There is a parallel case to yours. I am glad that you have taken up the brush and go on giving expression to your thoughts and dreams. But at the same time you must go on composing new melodies, and also get your songs together in collected form with, if possible, European notation of the songs. After all, music is as universal as the language painting.

Tagore : Just now painting has become a mania with me. My morning began with songs and poems, now in the evening of my life my mind is filled with forms and colours. My songs and poems, locked up in my native language, I have given to my country ; my pictures I have brought as a gift to the West.

পশ্চিম বাংলার বস্ত্রশিল্প ও শ্রমিক-সমস্যা

শ্রীসূর্যকুমার বসু

[ম্যানিজিং ডিরেক্টর ও ম্যানিজিং এজেন্টস্ টাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ]

বাংলা দেশের বস্ত্রশিল্প ও শ্রমিক সমস্যার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে এদেশে বস্ত্রশিল্পের সূচনা, উদ্ভব ও অগ্রগতির ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে দেওয়া অসমীচীন হবে না।

অতীত ইতিহাস

অধ্যাপক ওয়বার ইম্পিরিয়াল গেজেটারে ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৫। বলেছেন—সুন্দর বয়নের কাজে সংযেব মিশ্রণে, মূল্যবান পাথরের উপর খোদাই-এর কাজে, গুরুত্ব্য উৎপাদনে এবং অস্ত্রাস্ত্র কারিগরী শিল্পে ভারতীয়দের দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রথমাবধি সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে।

খৃষ্ট-পূর্ব ৩০০০ সালেও যে বাবিলনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে। খৃষ্ট-পূর্ব ২০০০ সালেও যে মিশরের মমি অভ্যন্তর ভারতীয় মসলিনের দ্বারা আবৃত হত, সে কথা আজ আর কারো অবিদিত নেই। সেকালে যোগে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের বিশেষ সমাদর ছিল এবং প্রচুর সূতীবস্ত্র ভারতবর্ষ থেকে রোমে রপ্তানা হত। এই রপ্তানো-বাণিজ্য এক সময় এমন বিপুলায়তন হয়ে উঠায় যে এলডার প্রিন্সি এই বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসায় প্রীতি বৎসর রোমের প্রচুর অর্থদণ্ড হচ্ছে। জানা যায়, প্রাচীন গ্রীকদের নিকট চাকাই মসলিন 'গজোটিকা' নামে পরিচিত ছিল।

উপরি-উক্ত তথ্যসমূহ থেকে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দু হাজার বছর পূর্বেই ভারতবর্ষের সূতী এবং বস্ত্রশিল্প এক অভাবনীয় নৈপুণ্য অর্জন করেছিল। ইংল্যান্ড এ বিষয়ে নিতান্ত অধীচীন; সেখানে সূতীবস্ত্র বয়নের সূত্রপাত হয় এই সেদিন—সপ্তদশ শতকে।

অতঃপর পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জাতি এবং সর্বশেষে ইংরেজরা ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী হয় এবং উক্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক লেন-দেন চলতে থাকে। ভারতবর্ষের সহিত সরাসরি বাণিজ্য পরিচালনার জন্ত ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে গঠিত এই কোম্পানী মারকটেই পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

আঠারো শতকের ইংল্যান্ডের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে মিলিকি বলেছেন, সত্তেরো শতকের শেষ দিকে প্রচুর পরিমাণে সস্তা অর্থকর কলিকো, মসলিন ও অস্ত্রাস্ত্র ধরণের সূতীবস্ত্র ইংল্যান্ডে আমদানী হত। এই জিনিষগুলো এত বেশী জনসমাদৃত হয়েছিল যে, পশম ও সিল্ক উৎপাদকরা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। ফলে ১৭০০ ও ১৭২১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট আইন করে ওটিকর বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া পোষাক ও আসবাব তৈরীতে স্থাপনো বা রপ্তানো কলিকোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেন। এমন কি, রপ্তানো স্থাপনো

বস্ত্রের সামান্ত্রতম অংশও কার্পাসজাত হলে তার উপর বাধা-নিষেধ প্রযুক্ত হয়।

মিঃ এইচ, এইচ উইলসনও তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা যায় যে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ভারতে প্রস্তুত সূতী ও বেশম বস্ত্র ইংলণ্ডে তৈরী অনুরূপ বস্ত্র অপেক্ষা শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কম দামে বিক্রয় করেও যথেষ্ট লাভ করা যেত। ফলে প্রথমতঃ আমদানীমুক্ত বস্ত্রের উপর ইংলণ্ডে উৎপন্ন বস্ত্রের দামের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ শুদ্ধ ধাৰ্য্য করে এবং অবশেষে ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করার চেষ্টা হয়। যদি এইরূপ অস্ত্রাস্ত্র শুদ্ধ ধাৰ্য্য এবং নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ না করা হত, তাহলে সেইসঙ্গে ম্যানচেস্টার-এর মিলগুলি সূচনারই বন্ধ হয়ে যেত এবং বাণ্যীয় শক্তির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগেও তা আর কোন দিন চালু হত না। বলা যায়, ভারতীয় উৎপাদকদের স্বার্থহানি দ্বারাই এই সকল মিলের সৃষ্টি। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হত, তাহলে সেও সেদিন পান্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করত, বৃটিশ পণ্যের উপর সেও পান্টা শুদ্ধ ধাৰ্য্য করে নিজের উৎপাদনশীল শিল্পটিকে রক্ষা করত। কিন্তু সেই আশ্বর্যকার অধিকার ভারতের ছিল না, সে তখন পরাধীন—বিদেশী শক্তির মর্জির উপর নির্ভর। তাই কোন শুদ্ধ না দিয়েই বৃটিশ পণ্যের বোঝা ভারতবর্ষের উপর উদ্ভরোদ্ভব অধিক মাত্রায় চাপিয়ে বেতে লাগল। এমনি করে বিদেশী উৎপাদকেরা রাজনৈতিক শক্তির অস্ত্র প্রয়োগে ভারতীয় প্রতিযোগীদের প্রথমে দাবিয়ে রাখতে এবং পরে টুটি টিপে মেরে ফেলতে সমর্থ হয়েছিল। কারণ, শ্রায়সঙ্গত ভাবে ভারতীয় উৎপাদকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার এঁটে ওঠা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিপুলায়তন বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতীয় নাবিকদের দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় বাণিজ্যপোতের সাহায্যেই নিম্পন্ন হত। টেলরের ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থে (পৃঃ ২১৬) এ সম্পর্কে তদানীন্তন ইংরেজ জাহাজ নির্মাতাদের মনোভাব বর্ণিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন :—ভারতীয় জাহাজে করে ভারতীয় পণ্যক্রয় বহন লগুন বন্ধরে এসে পৌঁছাল, তখন একছত্র ইংরেজ জাহাজ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন চাকল্যের সূচনা হল যেন টেমলের বৃকে কোন শত্রুপক্ষের নৌবাহিনী হাজির হয়েছে। এই নিয়ে যে আতঙ্কিত সোরগোলের সূত্রপাত হল, তাতে লগুন বন্ধরের জাহাজ-নির্মাতারা হলেন অগ্রণী। তাঁরা এই বলে চেচামেচি শুরু করলেন যে তাঁদের এতদিনের ব্যবসায় এবারে ধ্বংস হবে এবং জাহাজীদের পরিবার-পরিজন অতঃপর অনাহারে মারা পড়বে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের এই বিপুলায়তন বৈদেশিক-বাণিজ্যের মুখ্য ও প্রধানতম উপকরণ ছিল হাডে-কাটা এবং হাতে

বোনা সূতীবস্ত্র। এবং এই সূতীবস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্র বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য এবং গৌরবজনক ভূমিকা ছিল।

আধুনিক যুগ

এমন একদিন ছিল—বেদিন বাংলা দেশে বহুল পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হত এবং সে তুলার অবিকাশ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা ম্যাকেন্টোরে চালান দিতেন—সেই তুলার উৎপন্ন বস্ত্রই আবার এদেশে আমদানী হত। এই আমদানী-রপ্তানীর খরচ বাঁচাবার জন্যই শেষে কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ীর উদ্যোগে ১৮১৮ সালে ভারতবর্ষের প্রথম কাপড়ের কল “বায়ুভিয়া কটন মিলস্” প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দীর্ঘ দিন ব্যস্ততার—এই শিল্পের আর কোন প্রসার ঘটেনি। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বাইয়ে, ১৮৫৮ সালে—জর্জ বার্নার্ড শ্যান্টন কর্তৃক শ্রীকান্তরাম দাসের প্রচেষ্টায়। ১৮৬১ সালে তৃতীয় মিল প্রতিষ্ঠা করেন আমেদাবাদের শ্রীরণছোড়লাল ছোড়লাল। তাঁর পৌত্র, স্বর্গত স্ত্রীর চুনীভাই পিতামহের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আমেদাবাদে রণছোড়লাল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানে বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে এবং বর্তমানে তা সরকার কর্তৃক পরিচালিত।

অন্যদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ক্রমে ক্রমে আরো কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এমনি করেই আমাদের বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটে।

বস্ত্রশিল্পের গুরুত্ব

একথা সন্দেহহীন: সকলেই জানেন যে, বস্ত্রশিল্প ভারতবর্ষের বৃহত্তম শিল্প এবং মূল্যের দিক থেকে বিবেচনা করলে ভারতবর্ষের শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগই উৎপন্ন হয় কাপড়ের মিলগুলি দ্বারা। বর্তমানে ভারতবর্ষে কাপড়ের মিলের সংখ্যা ৪৭০ (তার মধ্যে আর্থনৈতিক কারণে ৩৫টি এখন বন্ধ করা হয়েছে) টাকুর সংখ্যা ১৩৫ লক্ষ, এবং তাঁতের সংখ্যা ২ লক্ষ। বস্ত্রশিল্পে মোট ৮ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত আছে এবং মজুরী মাহিনা বাবদ তাহারা বৎসরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা উপার্জন করে। তাছাড়া, বস্ত্রশিল্প—শুধু ও বিভিন্ন কর বাবদ কেন্দ্রীয় শুদ্ধ ও রাজ্য সরকারকে বাৎসরিক প্রায় ১০০ কোটি টাকা দিয়ে থাকে। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করে একে জাতীয় শিল্প আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত।

পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্পের দিকে নজর ফেরালে আমরা দেখব, এখানে সূতা উৎপাদন ও বয়ন এই বিবিধ কর্মরত মিলের সংখ্যা ১৭, শুধুমাত্র সূতা উৎপাদনরত মিলের সংখ্যা ৮ এবং পাওয়ার লুম ফ্যাক্টরীর সংখ্যা ১১। বাংলা দেশের বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত সর্বমোট টাকুর সংখ্যা ৫,৮০,৪৬৮ এবং তাঁতের সংখ্যা ১০,১৬২। পশ্চিমবঙ্গের মিলগুলিতে বার্ষিক ১,৮৫,৪০৩ বেল সূতা এবং ১,৭৩,৫৬১ বেল কাপড় উৎপন্ন হয়। গড়পড়তা হিসাব বিবেচনা করলে উৎপাদনের পরিমাণ মাসিক মাত্র ১৪,৪৬৩ বেল (১৫০০ গজের) কাপড়। পশ্চিমবঙ্গের মিলগুলিতে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ৪৬,০০০ এবং তাদের বার্ষিক উপার্জন-মজুরী মাহিনা ও মাগগীতাত্তা সম্মত প্রায় ৭ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনের তুলনায় এখানকার সূতা ও বস্ত্রের উৎপাদন অতি সামান্য, তাই ঘাটতি পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য হতে বার্ষিক

২৫ কোটি টাকার উপর সূতা ও বস্ত্র আমদানী করতে হয়। আমদানীকৃত বস্ত্রের অবিকাশই অবশ্য মিহি এবং অতিমিহি ধরনের কাপড়। পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ও প্রসার ঘটিয়ে এই বিপুল সম্পদ রাজস্বের রক্ষা করা সম্ভব এবং তার ফলে আমাদের বেকার সমস্তার আংশিক সমাধানও হতে পারে। কিন্তু বাঙালী ক্রেতাদের এ বিষয়ে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে, কেন না, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি

হাতে-কাটা সূতা এবং হাতে-বোনা তাঁতকে উৎসাহ দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫১ সালে একটি সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ করেন। এই আদেশে প্রত্যেক মিলকে উৎপন্ন সূতার ৫ অংশ হাতে বুনবার জন্য তাঁতীদের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট করে রাখতে বলা হয়। এর ফলে মিলগুলির প্রায় শতকরা ২৫টি তাঁত কর্মহীন হয়ে পড়ে। নূতন প্রতিষ্ঠিত মিলগুলির প্রতি প্রদত্ত আর একটি কড়া নির্দেশে বলা হয়, ভারত সরকারের পূর্ব-অনুমতি ছাড়া নতুন বসানো একটি তাঁতও কাজে লাগানো চলবে না। এই দুইটি আদেশের ফলে ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের বয়ন-ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস পায়। হাতে-কাটা সূতা এবং হাতে-বোনা তাঁতের উপর সরকার যে অত্যধিক আস্থা স্থাপন করেছিলেন তা সত্য প্রমাণিত না হওয়ার এবং অবন চরকা ও তাঁতীদের সাহায্যে তাহাদের পরিকল্পনামত দেশের প্রয়োজন মিটানো অসম্ভব হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে সরকার ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগে সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশটি প্রত্যাহার করেন।

কিন্তু এর ফলেও যে সমস্যার বিশেষ কিছু সুরাহা হয়নি তা বুঝা যাবে যদি আমরা বস্ত্রশিল্পের টাকুর ও তাঁতের বৃদ্ধির হার তুলনামূলক ভাবে বিবেচনা করি। প্রথমক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, গত ২০ বছরে ভারতের কাপড়ের কলগুলির টাকুর সংখ্যা ১০০ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৩৫ লক্ষ হয়েছে, কিন্তু তাঁতের সংখ্যা এই দীর্ঘ সময় বাবৎ ২ লক্ষে বা তার কাছাকাছি সংখ্যায় সীমাবদ্ধ আছে। ফলে সূতীবস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহারের কোন বৃদ্ধি বা উন্নতি ঘটেনি। সূতীবস্ত্রের সরবরাহ যে স্বাধীনতালভের পর দুইটি পাঁচশালা পরিকল্পনা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এমন কিছু বাড়েনি, তার প্রমাণ প্রাক্যুছ ১৯৩১ সালে যেখানে ভারতবর্ষে মাথাপিছু সূতীবস্ত্র ব্যবহারের হার ছিল ১৫.৭৫ গজ, আজ ২০ বছর পরও তা সে কোঠাকে বেশিদূর ছাড়তে পারেনি।

সুতরাং বস্ত্রশিল্পের বয়ন-ক্ষমতাকে (weaving capacity) সীমাবদ্ধ করে রাখার নীতি কোন দিক থেকে সফলগ্রন্থ হয়নি। এর ফলে কাপড়ের মিলগুলি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি হস্তচালিত তাঁতশিল্পও উপভুক্ত হয়নি। সরকারও এর ফলে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি পরিধেয় বস্ত্রের জন্য অতিরিক্ত দাম দিতে বাধ্য হয়ে জনসাধারণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাপড়ের কলগুলির বয়ন-ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার সুযোগাযোগী লোকদের পক্ষে কাপড়ের হুম্মাপ্যতা সৃষ্টি করা সহজ হয়ে পড়েছে। হুম্মাপ্যতা সৃষ্টির এই অপবাদ যদিও সচরাচর মিলগুলির থাকে চাপানো হয়ে থাকে, তথাপি সহজেই বুঝা যায় যে এতে তাদের কোন হান নেই, থাকা সম্ভব নয়।

সমাপ্তপক্ষে অনিয়নের জন্য কাপড়ের কলগুলির বয়ন-কমতার বধাবধ বৃদ্ধি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এই কারণেই ভারতীয় কাপড়ের মিল কেন্দ্রায়নের সভাপতি শ্রীকমললাল গালাভাই গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রায়নের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার ভারতবর্ষের কাপড়ের মিলগুলির বয়ন-কমতা তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার সময় অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ বাড়াবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছেন।

সরকারী নীতির বিরোধিতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে আবগারীসহ সহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা কর দিয়ে থাকে। এই টাকার সামান্য একটি ভগ্নাংশ যদি সরকার হস্তচালিত তাঁতশিল্পের (যারা আবার মিলজাত সূতার অন্ততম ক্ষেত্র) উন্নয়নকল্পে নিয়োগ করেন, তাহলে আমাদের অভিযোগ করার কিছু নেই কিন্তু হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উপর সরকার যে দায়িত্ব ন্যস্ত এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তা ব্যর্থতার পর্ববাসিত হওয়ার সরকার অথবা সমবায় ভিত্তিতে পাওয়ারলুম ক্যাস্ট্রী প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠপাশকতা করছেন। এই প্রসঙ্গের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই :—

১। সমবায় সমিতির সভারা যে পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করেন, সরকার তার নয় গুণ টাকা মূলধনরূপে ঋণ দিয়ে থাকেন।

২। পাওয়ারলুমে উৎপন্ন কাপড়ের উপর কোন শুদ্ধ ধার্য করা হয় না।

৩। পাওয়ারলুম কর্তৃক উৎপন্ন এই সব কাপড় হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদনরূপে মিলের কাপড় অপেক্ষা অনেক কম দামে বাজারে বিক্রী হয়।

সরকারী নীতির স্ব-বিরোধিতার দৃষ্টান্তরূপে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, কাপড়ের কলগুলিতে সরকারী অর্থের বিন্দুমাত্র নিয়োগ নেই বলেই তারা এর বয়ন-কমতা বৃদ্ধির বিপক্ষে অথচ বিপরীত দিকে সরকারী অর্থ খাটিয়ে সমবায় সমিতির ঘূষা তুলে তারা সেই বয়ন-কমতাকেই পশ্চাদ্ধার দিয়ে বাড়িয়ে তুলতে বিচা করছেন না। সরকারী আচরণ ও মনোভাবের এবিধ স্ব-বিরোধিতার কারণ অনুমান করা সহজ।

বোম্বাই-বাঙালার শ্রমিক-মজুরীর তুলনা।

বার্ষিক-সংশ্লিষ্ট মহল (যে সব শ্রমিক নেতৃত্ব) থেকে প্রচার করা হয়ে থাকে যে বোম্বাই ও আমেরিকাবাদের কাপড়-কল শ্রমিকেরা বাঙালী শ্রমিকের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ মজুরী পেয়ে থাকেন। বস্তুতঃ প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, নীট উৎপাদন ব্যয়ে মজুরীর শতকরা হার বাংলা দেশে বোম্বাই ও আমেরিকাবাদ অপেক্ষা অনেক বেশী। তার কারণ, বাংলা দেশে প্রতি মেশিন-পিছু নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা বোম্বাই ও আমেরিকাবাদের বহু গুণ বেশি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, একটি সিং স্পিনিং মেশিনের দুই ধারের মধ্যে বাংলা দেশের একজন শ্রমিক মাত্র একটি ধার দেখে থাকেন, অথচ বোম্বাই ও আমেরিকাবাদে একজন শ্রমিক দুই মেশিনের চারটি ধার দেখেন। সুতরাং বোম্বাই ও আমেরিকাবাদের একজন শ্রমিক একই ধরণের মেশিন চালিয়ে

বাংলা দেশের শ্রমিক অপেক্ষা ৪ গুণ বেশি সূতা উৎপন্ন করে থাকেন।

সহজেই বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে বোম্বাই-এর উৎপাদন-ব্যয় বাংলা দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। বয়ন ক্ষেত্রে বাংলা দেশে একজন তাঁতী সচরাচর দুটি মাত্র সাধারণ ধরণের তাঁত চালিয়ে থাকেন, অথচ বোম্বাই ও আমেরিকাবাদে একজন শ্রমিক কমপক্ষে ৪টি তাঁত চালান। সুতরাং এক্ষেত্রেও বাংলা দেশে উৎপাদন-ব্যয় বোম্বাই আমেরিকাবাদ অপেক্ষা দ্বিগুণ। স্বয়ংচালিত তাঁতের বেলায় এই পার্থক্যটা আরো দৃষ্টিকটুরূপে বেশি। বোম্বাই আমেরিকাবাদে একজন শ্রমিকের পক্ষে যেখানে ১২ থেকে ৩০টি পর্যন্ত স্বয়ংচালিত তাঁত চালানো রেওয়াজ, সেখানে বাংলা দেশের শ্রমিক ৪ থেকে ৮টির বেশি তাঁত চালাতে পারেন না। এ ছাড়া অন্যান্য দিকেও বাংলা দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা বোম্বাই আমেরিকাবাদের প্রচলিত দক্ষতার মান অপেক্ষা অনেক কম। তদুপরি পশ্চিমবাংলার মিলগুলিতে বোম্বাই-আমেরিকাবাদ অপেক্ষা বছরে ২৫ দিন বেশি ছুটি দেওয়া হয়ে থাকে, তার মতন বাংলার শ্রমিকেরা শতকরা অন্ততঃ ৮ ভাগ বেশি মজুরী পেয়ে থাকে। সুতরাং বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না যে নূনতর দক্ষতা ও স্বরতর শ্রমমজুরীর দক্ষ সূতা উৎপাদন এবং বয়ন—দুই ক্ষেত্রেই বাংলা দেশে উৎপাদনে ব্যয় বোম্বাই আমেরিকাবাদ অপেক্ষা অনেক বেশি। এই কারণেই বাংলা দেশের শ্রমিকদের অপেক্ষা দ্বিগুণ মজুরী দিয়েও বোম্বাই আমেরিকাবাদে মিলগুলির কয়েকটি মুনাফা থাকে, অথচ স্বল্প মজুরী দেওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মিলগুলির মুনাফার অঙ্ক প্রায় শূন্য, কখনও বা তা লোকসানে পর্যাবসিত।

স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, শুধু মাত্র নিজেকেই কমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে স্ব স্ব উপার্জন বাড়ানোর জন্যই নয়, পরন্তু এই জাতীয় শিল্পের পুনর্গঠন ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির কথা চিন্তা করেও বাঙালী শ্রমিকদের দক্ষতা ও শ্রম বৃদ্ধির জন্য তৎপর হওয়া উচিত।

শ্রমিকদের প্রতি সহায়ত্বভূতি ও দরদ

মজুরী সম্পর্কে উপরে যে মন্তব্য করেছি তাতে কেউ কেন মনে না করেন, আমি তাদের উপার্জন হ্রাসে উৎসুক। প্রকৃত পক্ষে অপ্রত্যক্ষ উপায়ে শ্রমিকদের উপার্জন এবং সুখ সুবিধা বৃদ্ধিই আমার কাম্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালনাধীন চাকেশ্বরী কটন মিলে আমি কি ধরণের অপ্রত্যক্ষ সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করেছি তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১। প্রতিভেদেও কাজের যে সুযোগটি সরকার কয়েক বছর পূর্বে মাত্র চালু করেছেন, চাকেশ্বরীতে আমরা তার প্রবর্তন করেছিলাম ২৫ বছর আগে। বর্তমানে প্রতিভেদেও কাজে কোম্পানীর দেয় আশের পরিমাণই বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকার উপর।

২। গ্র্যাচুইটি প্রথা চাকেশ্বরীতে প্রবর্তিত হয়েছিল ২০ বছর পূর্বে।

৩। প্রতি বছর কোম্পানীর নীট মুনাফার শতকরা ১২ এক টাকা শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ার কাণ্ডে দেওয়া হয়। মাসিক ২০০০ টাকার নিম্ন আয়সম্পন্ন কর্মীদের জরুরী পারিবারিক প্রয়োজনে এই কাণ্ড থেকে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

৪। কোম্পানী কর্মীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি প্রাইমারী ও হাইস্কুল পরিচালনা করে থাকেন। এই খাতে কোম্পানীর বার্ষিক ২৫০০০ টাকা খরচ হয়।

৫। কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারী এবং তাহাদের পরিবার পরিজনদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি হাসপাতাল পরিচালনা করেন।

৬। ১৯৪৩ সালে চাউলের মূল্য বর্ধন মণ-প্রতি ৭০-৯০ ছিল এবং অন্যান্যভাবে বর্ধন দেশের ৩০ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুবরণে পতিত হয়েছে, তখন কোম্পানী চড়া দামে চাউল ক্রয় করে ১০০ টাকা মণ দরে মিলের শ্রমিক ও কর্মীদের সরবরাহ করেছেন। এতে কোম্পানীর ১৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

টাকার অভাব পরিণত করলে এই সকল সুযোগ সুবিধার জন্য জন-প্রতি মাসিক ২৫ টাকা খরচ বেশী খরচ পড়েছে। অর্থাৎ, আশ্রয় বিহীন, শ্রমিকদের সুখ-স্বাস্থ্য বিধানের জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয় ট্রাইবুনালের কোন বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি এবং তাঁদের যোগেদানের সময় তাঁরা এর প্রতি কোন গুরুত্বও আরোপ করেননি।

বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা ও কর্ম-ভারের

তুলনামূলক বিচার

বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা ও কর্ম-ভারের তুলনামূলক বিচারের জন্য আমি রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, পশ্চিম-জার্মানী ইত্যাদি দেশ হতে আমার ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালের ভ্রমণকালে সংগৃহীত কিছু তথ্য উল্লেখ করব। প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, কাপড়ের মিলে আমাদের দেশের মত পুরুষ-শ্রমিক আর কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় না, অন্ততঃ উল্লিখিত দেশগুলিতে তো নেই। জেনারেল ম্যানেজার, স্পিনিং মাস্টার, উইজিং মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রী (আমাদের দেশে তাদের 'জব্বার' বলা হয়) ইত্যাদি যে সকল পদে কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন আছে, সে সকল পদে ছাড়া কাপড়ের মিলে কোথাও আমি পুরুষ-শ্রমিক দেখিনি। আমাদের দেশে আজ অবধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরনো ধরণের ৫" লিকট সম্বলিত বিলিতী রিং স্পিনিং মেশিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ইয়োরোপে এই ধরণের মেশিন কবে বাতিল হয়ে গেছে। সে সকল দেশে অন্ততঃ ১০" লিকট বহিন সম্বলিত ৪০০ টাকার রিং স্পিনিং মেশিন ব্যবহার করা হয়। জার্মানিতে এই লিকটের আরো উন্নতি সাধন করে তাতে ১১২" পর্যন্ত করতে দেখেছি। বলা বাহুল্য, ১০" লিকট সম্বলিত বহিনে আমাদের ৫" লিকট বহিনের তুলনায় অনেক গুণ বেশী সূতা ধরে। ঐ সকল দেশে একটি মেয়ে শ্রমিক অল্পতরুপ ৫ থেকে ৬টি রিং স্পিনিং মেশিন চালায়।

এই সকল দেশে সাধারণ তাঁত কমাচিং নজরে পড়ে, যে দুই-একটি ক্ষেত্রে সাধারণ তাঁত চালু রয়েছে দেখেছি, সেখানে প্রত্যেক তাঁতী অন্ততঃ ১৬টি তাঁত চালায়। যেখানে পশ্চিম-বাংলার শ্রমিকরা চালায় মাত্র ২টি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সকল উন্নত ধরণের স্বয়ংক্রিয় তাঁত বসানো হয়েছে, তাতে নকশা তোলার জ্যাকার্ড এবং অন্যান্য

৫৮টি স্বয়ংক্রিয় তাঁত চালায়। ১৯৫৫ সালে জাপানের কয়েকটি কাপড়ের কল দেখতে গিয়ে আরো বিস্মিত হয়েছি। জাপানেও কাপড়ের কলের শ্রমিক মাত্রেরই মেয়ে। অর্থাৎ, এই মেয়ে শ্রমিকরাই ৮ থেকে ১৩টির স্পিনিং মেশিনের দুই ধার দেখাশোনা করে এবং প্রত্যেকটি মেয়ে তাঁতী ৬০ থেকে ৮০ পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় তাঁত চালায়। কলে জাপানে তাঁত-প্রতি তাঁতের সংখ্যা হচ্ছে ৭০।

এতে প্রমাণ হয় যে ঐ সকল দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা ও কর্মভার আমাদের দেশ অপেক্ষা দশ থেকে বিশ গুণ বেশি। সেই কারণেই তাদের উৎপাদন-ব্যয় অবিদ্যমান রকমের কম এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্যের প্রধান কারণও তাই।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে :—মাছুবে মাছুবে দক্ষতা ও সামর্থ্যের এই আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয় কেন এবং হয় কি করে। উল্লিখিত দেশগুলির প্রত্যেকটিতে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে এবং চতুর্দশ পঞ্চদশ এবং বোড়শ বর্ষ পর্যন্ত বালক-বালিকারা (আমাদের দেশের ম্যাট্রিকুলেশান বা স্কুল ফাইনালের জন্য নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা) রাষ্ট্রের খরচে শিক্ষালাভ করে থাকে। তাই নিরক্ষরতার বাল্যই কোথাও নেই। এই কারণে, তাদের কর্তব্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান এবং জাতীয় স্বার্থচেতনা অত্যন্ত উন্নত। পঞ্চাশতাব্দীর আমাদের দেশের শ্রমিকরা জনকতক ছাড়া প্রায় সকলেই নিরক্ষর, এবং উপরোক্ত গুণগুলির বিস্মৃতিও তাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রমিকদের স্বাধীন কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে অনুপ্রাণিত করতে না পারলে এক জাতীয় স্বার্থচেতনা তাদের মধ্যে প্রথরতর না হলে মূলধন সংগঠন, আধুনিক অত্যুন্নত কারখানা স্থাপন উন্নততর ধরণের যন্ত্রপাতি আমদানী ইত্যাদি কোন ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত কলপ্রস্থ হবে না। ভারতবর্ষের উৎপাদকরা বাতে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারেন তার জন্য শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে এবং তাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারেরই অগ্রণী হওয়া উচিত। নতুবা আমরা চিরদিন অহরহত দেশ এই আখ্যায়ই ভূষিত হব। আমার বিশ্বাস শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে শুধু মাত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রেই পুঙ্কল ফলবে না, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার মঙ্গলকর প্রভাব অনুভূত হবে।

রপ্তানী সম্পর্কে সরকারী নীতি

আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে যে, ১৯৫২ সালে ইংল্যান্ডের কলকটনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে সূত্রীভুক্ত উৎপাদক দেশগুলির রপ্তানীর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষের বার্ষিক রপ্তানীর পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছিল ১০,০০০ লক্ষ গজ। গত কয়েক বছরের মধ্যে একমাত্র ১৯৫৭ সালেই আমাদের বহু রপ্তানীর পরিমাণ কোটার কাছাকাছি অর্থাৎ, ৮,৩১০ লক্ষ গজে পৌঁছেছিল। তারপর ১৯৫৮ সালে তা ৫,৮১০ লক্ষ গজে নেমে গিয়ে ১৯৫৯ সালে পুনরায় ৭,৫০০ লক্ষ গজে পৌঁছেছে। এমপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের প্রাথমিক পরিচয় এবং অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য রপ্তানী-বাণিজ্য বৃদ্ধিকল্পে সরকারের সর্বপ্রথম চেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থা তো এই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে বৃহত্তরকালে বিভিন্ন রাজ্যে কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য বহু কোম্পানী গঠিত হয়েছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ

হতে বঙ্গপাতি আমদানী পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু নৃত্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের জন্ত এই সকল মিলগুলির কোনটাই তাদের একটি তাঁতও চালু করতে পারেননি। কলে বাজারে কাপড়ের দুপ্রাপ্যতা সৃষ্টি হয় এবং দাম একটু বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে, ধুতি উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ধুতির দাম শতকরা ৪০ ভাগ থেকে ৮০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আজ পর্যন্ত বহু ব্যবহারকারী জনসাধারণ হয়তো জানে না যে কাপড়ের এই মূল্য বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে ৪টি কারণ ১। সরকার কর্তৃক মিলের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। ২। মজুরী বৃদ্ধি। ৩। চড়া হারে শুল্ক নির্ধারণ। ৪। বিহীন ইত্যাদির উপর কর আরোপ। এই প্রসঙ্গে সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, দেশ বিভাগের পূর্বে বৃষ্টি শাসকরা কোনদিন কাপড়ের মিলগুলির উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেননি, কাপড়ের উপর কোন আবগারী শুল্ক বসাননি এবং মজুরীর খাতে ধরনের মাত্রাও তারা কম রাখতেই সহায়তা করেছিলেন। কলে জনসাধারণ তখন সুলভে কাপড় পেত। আমার বিশ্বাস, আমাদের আভ্যন্তরীণ ক্রেতাদের একশ জনের মধ্যে নিরানকুই জনই জানেন না যে এই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রও তারা প্রতি-ক্রোড়া মাঝাঝি ও বিহি বা অতি বিহি ধুতিতে ২ টাকা থেকে ৫ টাকা শুধু আবগারী-করই দিয়ে থাকেন। হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদন দ্বারা দেশবাসীর চাহিদা মিটাবার পরিকল্পনা ব্যর্থতার পর্যাবসিত হওয়ার সরকার অপত্যা ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগে নৃত্যানিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহার করেন। উৎপাদন ও রপ্তানী হ্রাসের কিছুটা কারণ এই সরকারী নীতির মধ্যেই পাওয়া যাবে। এর কারণ আর কিছু নয়, দীর্ঘ দিন পর সম্প্রতি মাত্র আমাদের দারিদ্রশীল শিল্প ও বাণিজ্য-মন্ত্রীরা উপলব্ধি করেছেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় কাপড় শুধু সকলের চেয়ে নিকট, কিন্তু দামে সকলের চেয়ে চড়া। এই কারণেই সম্ভবতঃ সরকারী উদ্যোগে ভাষনাল প্রোডাক্টিভিটি কাউন্সিল বিভিন্ন দেশের কাপড়ের কল পর্যবেক্ষণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের উন্নতি সাধনের জন্ত সরকারকে পরামর্শ দানের জন্ত ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে একটি বিশেষজ্ঞ দল বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তার ফলাফল কি হয়েছে, আমরা জানি না।

প্রমিক-সমস্যা :—আপনারা জানেন, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৫.৬টি মিল ছাড়া পশ্চিম-বাংলার প্রত্যেকটি কাপড়ের মিলের লোকসান হয়েছিল। তা সত্ত্বেও প্রম ট্রাইবুনাল তার রোয়েকাদে ১৯৫৮ সালের ১লা জুলাই থেকে এই মিলগুলির উপর বর্ধিত মজুরী, মাগুগীতা ও অন্যান্য বাহ্যিক বিধানের জন্ত বার্ষিক অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকার বোঝা চাপিয়ে দেন। মজুরী ইত্যাদির এই বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ট্রাইবুনাল কিন্তু প্রমিকদের দক্ষতার মান বা কার্য মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেননি। এতদবস্থায় পশ্চিমবাংলার কাপড়ের মিলগুলির আর্থিক অবস্থা কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রমিক-প্রতি কর্মের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে তার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু একেত্রে ট্রাইবুনাল তা বিবেচনা না করার ন্যূনতম দক্ষতার নিকটতম বহু উৎপাদনের জন্ত প্রমিকদের উচ্চতম মজুরী ও সুখ-বাহ্যিক দেওয়া হচ্ছে,

বার কলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির কলে অবিকাংশ মিলের পক্ষে লোকসান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। শুধুপরি প্রমিকদের একটি অংশ অসংবত এবং উচ্চমূল্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থহানি সত্ত্বেও তারা ধরবে, লক আউট ইত্যাদির উদ্ভাবন দিয়ে থাকে। এমনও দেখা গেছে যে, এই উচ্চমূল্যতার পরিণতিতে দাদা-হাদায়া এমন কি প্রাপহানি পর্যন্ত ঘটেছে, কিন্তু অভিবৃক্তরা আদালতের বিচারে সুভিলাভ করেছে। কলে প্রমিকদের নিরস্ত্রিত করা আজ শুধু হয়ই নয়, প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

প্রমিক উচ্চমূল্যতার হ্রাস

প্রমিক উচ্চমূল্যতা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তার নিদর্শনরূপে আমি পশ্চিম-বাংলার কেশোরাম কটন মিলের অবস্থা উল্লেখ করতে চাই। কেশোরাম পশ্চিম-বাংলার বৃহত্তম কাপড়ের মিল, মিলটিতে ৮০,০০০ টাকু ও ১.১১০টি তাঁত রয়েছে। ভারতের শিল্পপতিগোষ্ঠীর অন্ততম অগ্রণী নায়ক শ্রী সি ডি বিড়লা এই মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল কর্পোরেশন-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মিলের ম্যানেজার শ্রী এস এন হাদার যে উক্তি প্রকাশিত হয়েছে তা উদ্ধৃত করলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। শ্রী হাদা কলকাতার সাংবাদিকদের বলেন যে গত তিন বছর ধরে মিলের প্রমিকদের একাংশের আন্দোলনে ও উচ্চমূল্যতার কলে উৎপাদনের পরিমাণ এবং গুণ দুই-ই হ্রাস পেয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের কার্যকলাপে বাজারে মিলের সুনামও বর্ধেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই সময়ে উপর কাপড়ের একটি বৃহৎ অংশ প্রমিকদের ইচ্ছাকৃত গাফিলতিতে এত খারাপ এবং ক্রটিপূর্ণ হয়েছে যে প্রকৃত পক্ষে তা বিক্রয়ের অযোগ্য ছিল।

তিনি আরও বলেন যে, ১৯৫৬-৫৭ সালে কোম্পানীর বিক্রয়মূল্য আর ৮৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে পূর্বের তুলনায় ১২১ লক্ষ টাকা হ্রাস পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে বেখানে কোম্পানীর লাভ (প্রম) ছিল ১৮.৭৪ লক্ষ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৪৬.৭৬ লক্ষ টাকার দাঁড়ায় এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে লাভের বহলে ১২.১০ লক্ষ টাকা লোকসান হয়।

শ্রী হাদা বলেন, উপর বহু অতিরিক্ত ক্রটি ও পলনের জন্ত এই কয়েক বছরে বিশেষের রপ্তানী-বাজার প্রায় সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর হাতছাড়া হয়েছে এবং ভারতবর্ষ ন্যূনপক্ষে ১২০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উৎপাদনের গলক বর্ধিত মাত্রা ছাড়িয়ে না বার সেজন্ত বর্ধোচিত ব্যবস্থা অক্ষয়ন অর্থাৎ তাঁতীদের জরিমানা ও অর্থনৈতিক শাস্তি দেবার অধিকার পূর্বে মিল-কর্তৃপক্ষের ছিল। কিন্তু সরকারী চাপে এবং প্রমিকদের আন্দোলনে সে ব্যবস্থা বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। বঙ্গশিল্পের পক্ষে উচ্চমূল্যতার পরিণাম কী ভয়াবহ কেশোরামের ঘটনার তা প্রমাণিত হয়েছে। স্বতাবতঃই, ছোটখাটো মিল গুলি এর কলে আরো বেশি কতিপ্রাপ্ত হয়েছে। বস্তুতঃ, এখনও সরকার যদি প্রমিকদের কর্তার হস্তে নিরস্ত্রিত না করেন তাহলে বঙ্গশিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারায়।

পূর্বসন্ধান, আধুনিক বঙ্গপাতি স্থাপন এবং

শ্রমসাম্রাজ্য রেশমাইলিকেশন

এদেশের অধিকাংশ কাপড়ের মিলের বঙ্গপাতি যে নিতান্ত পুরনো ধরণের তাতে কোন সন্দেহ নেই এক আধুনিক উন্নততর বঙ্গপাতি না বসালে যে ভারতবর্ষের বঙ্গশিল্পকে অগ্রাভ্যন্তরিত করে তোলা অসম্ভব তা বলাই বাহুল্য। বঙ্গতর উৎপাদন খরচে সর্বাধিক উৎপাদন যদি আমাদের কাম্য হয় তাহলে বত শীঘ্র পুরনো বঙ্গপাতির বদলে আধুনিক বঙ্গপাতি বসানো যায় ততই মঙ্গল। আর এ কাজে কিছু সংখ্যক কর্মীকে ছাঁটাই করা অনিবার্য হয়ে উঠবে। কিন্তু ওয়েজ বোর্ড-এর রিপোর্টে আধুনিক বঙ্গপাতি স্থাপন এক শ্রম সাম্রাজ্য নীতি প্রবর্তনের অগ্রতম প্রাথমিক সর্ভ হিসাবে বলা হয়েছে, এর ফলে কোন শ্রমিককে ছাঁটাই করা বা বর্তমান শ্রমিকদের উপার্জনের কোন হ্রাস ঘটানো চলবে না। একই সঙ্গে এই ছুইটি বিপরীত এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ কাজ কি করে করা সম্ভব তা আমার বুদ্ধির অস্তিত্ব অসম্ম্য। শ্রমিকদের দক্ষতা ও কর্মের মাত্রা না বাড়িয়ে আভ্যন্তরীণ ব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদন-খরচ কমানো বা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের রপ্তানী বাড়ানোর বুলি পাছের সোড়া কেটে আগার জল ঢালার মতই নিষ্ফল হতে বাধ্য। অথচ বঙ্গশিল্পের বাস্তব অবস্থা প্রকৃত পক্ষে তাই। উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণের সত্যিকার আগ্রহ যদি আমাদের থাকে, তাহলে মেনে নেওয়া উচিত যে, আধুনিক বঙ্গপাতি স্থাপন এক শ্রমসাম্রাজ্য নীতি প্রবর্তনের ফলে কিছু সংখ্যক কর্মীর ছাঁটাই অপরিহার্য। তবে মিলের সম্প্রদায়িত নূতন কোন বিভাগে বা একই পরিচালনাধীন অন্য মিলে অথবা ভিন্ন কোন শিল্পে এই সকল ছাঁটাই কর্মীদের কর্ম সংস্থানের চেষ্টা করা যেতে পারে। এবং সে কাজে সরকারের সহযোগিতা সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয়।

এসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যে, পুরনো বাস্তব ধরণের বঙ্গপাতি ব্যবহার এবং মাস্তাতার আমলের কর্মনীতি অনুসরণের ফলে ভারতবর্ষের অল্পসংখ্যক গোলযোগ ইংল্যান্ডেও গত কয়েক বছর ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। ইদানীং সঙ্কট এমন চরমে উঠেছিল যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে সেইসঙ্গে ও দ্বানচেষ্টার ফলে কাপড়ের মিলগুলির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার মিলগুলিতে উন্নততর আধুনিক বঙ্গপাতি বসাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কাজে যে মূলধন প্রয়োজন তার ব্যয়ভারের হই-তৃতীয়াংশ সরকার নিজে এবং এক-তৃতীয়াংশ মিল-কর্তৃপক্ষ বহন করছেন। সিদ্ধান্তটিকে অমুনা সেখানে বাস্তবে পরিণত করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের অবস্থান্ত্রে মনে হয়, এখানে কাপড়ের মিলগুলির সঙ্কট আরো গুরুতর। সুতরাং ইংল্যান্ডে যেমন সরকার বেছায় মিলগুলির পুনর্বাসন দায়িত্ব বহুলাংশে আপন কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তেমনি এখানেও কাপড়ের মিলগুলি সম্পর্কে পুরনো নীতি পরিবর্তন করে আগের মৃত্যুর হাত থেকে এই আত্মীয় শিল্পটির রক্ষাকল্পে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দান করা সরকারের উচিত।

ওয়েজ বোর্ড-এর সুপারিশ

ভারত সরকার বঙ্গশিল্পের অস্ত সশ্রুতি যে ওয়েজ বোর্ড গঠন

পশ্চিম-বাংলাত বোর্ড ভারতবর্ষের কাপড়ের মিলগুলিকে কর্মসংক্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ করতে গিয়ে একটি নীতি স্থির করেছেন। কিন্তু সে নীতি শ্রমিকদের দক্ষতা বা কাজের মাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা তার উপর নির্ভরশীল নয়। তা ছাড়া, অল্প ভেঙ্গে কর্মদক্ষতা ও দক্ষতার মাত্রাহারা মজুরীর কিছুটা পার্থক্য যে অবজ্ঞাহারী, সে কথাও তাঁরা বিবেচনা করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের মিলগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে এমনভাবেই নিতান্ত দুর্বল, সুতরাং ওয়েজ বোর্ড অকলনিয়মিত ভাবে যে মজুরীর হার সুপারিশ করেছেন, তার বাস্তবতা তার বহন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। সেই কারণে বোর্ডের সুপারিশ এখানে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। গত ১৯৬০ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভার মিলমালিক সমিতির সভাপতি শ্রীতি এন গুট্টাচার্য বলেছেন :—এই অতিরিক্ত বেতন-ভার জোর করে পশ্চিমবঙ্গের মিলগুলির উপর চাপানো হলে অর্থনৈতিক অক্ষমতার দরুণ অনেক মিলকে বাধ্য হবেই তোলা বন্ধ করে দিতে হবে। আমি নিঃসন্দেহ যে তাঁর এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ভারত সরকার বেখানে নীতিগত ভাবে বঙ্গশিল্পের সম্প্রসারণকে সঙ্কুচিত করে রাখছেন, সেখানে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অনুসরণ করেছে। ফলে, দেশ বিভাগের সময় বেখানে পাকিস্তানে কাপড়ের মিলের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০টি, আজ তার সংখ্যা ১৪০কেও ছাড়িয়ে গেছে। এই সকল মিলের অধিকাংশ ৩ সিক্টে কাজ চলেছে এবং ফলে উৎপাদন দিন দিনই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুতঃ পাকিস্তান আজ স্বীয় উৎপাদনের সাহায্যে শুধুমাত্র তার আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনই মিটায় না, রপ্তানী-বাণিজ্যেও সে আজ অধিকতর মাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছে। আর শ্রমিকসমস্যার কথা যদি বলি, তাহলে ভারতবর্ষে বেখানে শ্রমিক পোলযোগের অস্ত উৎপাদন-ক্ষতি বহুরের পর বছর বেড়ে চলেছে, সেখানে পাকিস্তানে এ পর্যন্ত কোন শ্রমিক পোলযোগ না থাকায় উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মিলগুলির লাভের অঙ্ক যেমন বেড়েছে তেমনি শ্রমিকদের মজুরীও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই দুইয়ের সমতালে সরকারী হস্তক্ষেপের পরিমাণও ক্রমশঃ বেড়ে বাচ্ছে। এ হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, কেন না পাকিস্তানের ৩টি কাপড়ের মিল পরিচালনার সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট।

সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মালিক ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থেই সমভাবে প্রয়োজনীয়। যে সকল শ্রমিক শিল্পকর, নিজেদের স্বার্থ বর্ধাণ ভাবে উপলব্ধি করার বিচারশক্তি থাকে নেই—তাদের সম্পর্কে বিশেষ সত্ব নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আজকাল প্রায় সকল ট্রেড ইউনিয়নই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয় এবং ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার সহায়ক হয় না—শিল্পের অগ্রগতিও সেই কারণে ব্যাহত হয়। এতে করে পারস্পরিক কুল বুঝাবুঝি তুই বেড়েই চলে। আমার মনে হয়, সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নগুলি যদি রাজনীতি নির্ভর বা রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয় তাহলেই স্বার্থ ভাবে শ্রমিকদের শিল্পের ও দেশের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে।

পরিশেষে, আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, সরকার যদি

সহস্রাব্দেই মাত্র পশ্চিম-বাংলার বহুশক্তি আসন্ন সঙ্কটের হাত থেকে
রক্ষা পোতে পারে :—

১। মিলমতীর বহন বিভাগ সম্প্রদায় সম্পর্কে উদারতর নীতি
অবলম্বন, মিলমতীর বহন উপর বর্তমানে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে
সেইরূপে ক্রমিক প্রত্যাহার।

২। পুরানো ধরণের বাস্তব ঘটনাগুলির পরিবর্তে অবিলম্বে
সামুদ্রিক উন্নততর স্থাপত্য স্থাপনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন।

৩। বহুশক্তির উপর ধর্ম বিস্তার করা—যদিও মাত্রা এক
ভারতবর্ষে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক—তা হ্রাস করে স্বাভাবিক মাত্রায়
আনয়ন।

৪। স্বকতা, কর্মের মাত্রা ও উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে
ক্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ।

৫। ক্রমিকদের সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য যথাযথ
ব্যবস্থা অবলম্বন।

রবীন্দ্রনাথ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

[কবির সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে]

রবীন্দ্রনাথ ও আমি যখন সর্বপ্রথম সৌহার্ডের সুনিবিড় বন্ধনে
পরস্পর আকৃষ্ট হই তাহার পর সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল কাটিয়া
গেল। জীবনের বহু বিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে
একদা আমি তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম। সেই স্নানহীন
প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি আমাকে প্রতিদিন সখ্য ও সাহচর্য
দান করিয়াছেন। সহস্র সহস্র বৎসরের মৌনতা বানীহীন তরলতা
অবশেষে একদিন যেন কথা কহিয়া উঠিল, আপনি অন্তরজীবন
সুখ-দুঃখ পতন-অভ্রাণয়ের কাহিনী সে আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া
চলিল। এই স্বচিহ্ন ইতিহাসের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে,
উদ্ভিদ হইতে আবৃত্ত করিয়া উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত নিখিল জীবলোকে
একই প্রাণস্পন্দন অহুত্ব হইতেছে, একই প্রাণধারা সর্বত্রই বহমান।

বাধা একদিন আশ্চর্য হইতে আশ্চর্যকে বিচিন্ন করিয়া
রাখিয়াছিল তাহা দূর হইল, উদ্ভিদ ও প্রাণী একই জীবনধারার
বহুধা বিকাশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই মহা সত্যকে জানিতে
পারিলে জগদ্ব্যাপারে পরম রহস্যের যবনিকা হুচিয়া যাইবে না,
বরং স্তম্ভীরতর-নিবিড়তর হইয়া উঠিবে। যাহুর যে তাহার অসমাপ্ত
জ্ঞান, অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ও অক্ষয় শক্তি লইয়াও অবিনির্দীপ্ত
মিক্ মহাসমুদ্রে হুঃসাহসিক অয়যাত্রায় আপনার চিত্ততরঙ্গী
ভাসাইয়া দিল এ কি কম আশ্চর্যের কথা? যে 'অবর্ণনীয় রহস্য'
তাহার দৃষ্টির অগোচরে ছিল, এই অভিব্যক্তিপথে অকস্মাৎ
এক দিন সে রহস্য মুহূর্তকালের অন্ত তাহার গোচরী
কৃত হইতে থাকে এবং যে আশ্চর্যসর্বস্বতা এককাল তাহাকে
বিশ্বব্যাপী প্রাণস্পন্দনের প্রতি বিরুদ্ধ চিত্ত করিয়া রাখিয়াছিল
তাহা তাহার মন হইতে মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশেষে মিলাইয়া
যায়।

বিশ্ব জনতের এই ঐক্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির নিকটে যেরূপ
দিয়াছে এবং তাহার কাব্যে ও সাধনার এই ঐক্যধারাই আশ্চর্যকান
করিতেছে। প্রতিদিন তাহার দৃষ্টি উদার থেকে উদারতর হোক
এবং তাহার বাণী নিখিলের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হোক, এই কামনা
করি।

সোভিয়েত শিল্পীর চোখে ভারত

অশোক ভট্টাচার্য

গীত ৩০শে মে '৬০ তারিখে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম সালার প্রদর্শনী-রূপে মিনিষ্টি অফ কালচার, ইউ-এস-এস-আর ও মিনিষ্টি অফ সাইটিক্যাল রিসার্চ এণ্ড কালচারাল এক্সচেন্জ, পতর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া-র যুগ্ম প্রযোজনায় এবং ললিতকলা আকাদেমির তত্ত্বাবধানে ভারতীয় জীবন ও নিসর্গ সম্পর্কিত সোভিয়েত শিল্পীদের চিত্রাবলীর এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

এই শিল্পকর্মগুলি হলো সেই সব শিল্পীদের রচনা যারা ১৯৫২ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত পঁচাত্তর সাত বছরের মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। অধিকাংশ চিত্রই তেল রঙের। তবে জল রং ও গ্রাফিক মাধ্যমের কিছু কাজও রয়েছে। একটি খেত পাথরের মূর্তি প্রদর্শনীর বৈচিত্র্য এনেছে।

বিষয়ের দিক থেকে 'সব কটি শিল্পকর্মই ভারতীয়। এবং জীবনযাত্রার বাস্তবায়ন অনুলেখনকে ভিত্তি করেই এগুলি গড়ে উঠেছে। শিল্পী কোথাও বাস্তবকে পরিহার বা অতিক্রম করার দিকে যাননি। বরং তাঁরা মারাত্মক ভাবেই তাঁদের একমাত্র চোখের দেখাকেই ছবিতে প্রতিকলিত করেছেন।

প্রায় দশ বছর আগে একটি বিশাল সোভিয়েত চিত্রকলার প্রদর্শনী কলকাতায় হয়েছিল। শিল্পরসিকেরা তখন ব্যাপক ভাবে সোভিয়েত চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই প্রদর্শনী সম্পর্কে এদেশে সমালোচক ও সাধারণ দর্শকদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছিল। এক পক্ষ সেই শিল্পসমূহে নতুন শিল্প-দিশত উন্মোচিত হতে দেখেছিলেন এবং বাস্তববাদী চিত্রের আদর্শ রূপায়ণ বলে সেগুলিকে মেনেছিলেন। অপরপক্ষ সোভিয়েত শিল্পীদের বিপুল প্রয়াসের মধ্যে বিরাট পরিপ্রেক্ষিত ও সমাজ-জীবনের গঠনতাত্ত্বিক কণোদ্রাবনার সাক্ষাৎ পেলেও মহৎ কোনো শিল্পের সন্ধান পাননি। আজকের এই অপেক্ষাকৃত ছোটো প্রদর্শনীর প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করার হেতু এই যে, মনের দিক থেকে গত দশ বছরে সোভিয়েত শিল্পীদের কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো না।

বিশেষত মনে হয়, বাস্তববাদী চিত্র ও প্রকৃতিবাদী চিত্রের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে এ দলের অধিকাংশ শিল্পীই সচেতন নন। কলে হু'-এক জন শিল্পীর কাজ হ্যাডা—বেমেন কোকোরিনের চুইকভ অধিকাংশ শিল্পীর ছবি দেখে মনে হুঁপ্ত আসে না। মনে হয় বেন তেল রঙে আঁকা কটোগ্রাফ দেখছি। শিল্পীর ব্যক্তিগত আবেগ, মহাহুঁপ্ত ও নির্বাচন খুব অল্পসংখ্যক ছবির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য যে যে ছবিতে শিল্পীর বিশিষ্ট মানসিকতার ছাপ পড়েছে সেগুলি সত্যিই উৎকৃষ্ট শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে আমরা যারা ভারতের জলবায়ু ও প্রকৃতিকে চিনি জানি, তাদের কাছে এ ছবিগুলির মূল্য শিল্প হিসাবে অধিক বলে মনে হয় না। অবশ্য একথা ভাবতে সকলেরই ভালো লাগবে যে সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রগুলির পুরোধা এবং বিশ্বের অন্ততম বৈজ্ঞানিক জাতি আমাদের মাহুয় ও নিসর্গের মধ্যে একটা শিল্প উপাদান খুঁজে পেয়েছে। সামগ্রিক ভাবে তবু একথা মা বলে পারা যায় না যে সোভিয়েত শিল্পীদের অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পথ পার

হয়ে তবেই পৌঁছতে হবে শিল্পজগতের সামনের সারিতে। বিশেষত যে বাস্তববাদী চিত্রের দিকে তাঁদের লক্ষ্য সে পথে এগোতে হলে অনেক মানসিক হুমু এবং জটিলতার পথ অতিক্রম করতে হবে। এ পথে পূর্ব-জাতিগণের শিল্পীদের আপেক্ষিক অগ্রগতি অবশ্যই লক্ষণীয়।

এই তত্ত্বের দিক পরিহার করে সোভিয়েত শিল্পীদের দক্ষতার প্রসঙ্গে এলে কিন্তু অনেকের ছবিই প্রশংসা না করে পারা যায় না। বেহেতু তাঁরা বস্তুর রূপ বা আকৃতিকে যথাযথ ভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন, তাই তাঁদের অনেকের রচনাতেই রূপভেদের জ্ঞান উচ্চস্তরের। রঙের ব্যবহারে অবশ্য কখনও কখনও একটু চড়া রঙের আধিক্যের দিকে এঁদের ঝোক দেখা যায়। তবু নৈপুণ্যের দিক থেকে চুইকভ, কোকোরিন, একানভ ও জেরাসিমভের চিত্রকর্মগুলির প্রশংসা করতেই হয়। এঁরা যে প্রত্যেকেই সোভিয়েত জনগণের প্রতিনিধিত্বানী শিল্পী তা এদের ছবি দেখলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। চুইকভের তৈলচিত্র বৃট পালিশ, জয়পুররমণী, জয়পুরের গলি পথ, কর্মরতা যুবতী প্রমুখ চিত্রে আমরা সেই হুলুত রচনার সাক্ষাৎ পাই যা যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই গৌরবজনক। প্রতিটি ছবিতেই শিল্পীর বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

আর এক শিল্পী হলেন কোকোরিন। একমাত্র তাঁর ছবিতেই এমন কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল যা প্রচলিত সোভিয়েত চিত্রধারার মধ্যে পড়ে না। তাঁর জল রঙের ছবিগুলি এমন এক সুরমার মণ্ডিত বা প্রত্যেক শিল্পরসিককেই মুগ্ধ করবে। রঙের ব্যবহারে এবং বস্তুসংস্থাপনে তিনি অনেক বেশী স্বাধীন মনের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পীর পথ, মধ্যাহ্ন, রাতের বেনারস, গোরালিয়র, বেনারসের প্রাচীন মন্দির ও শিল্পীর বাণিজ্যপথ ছাড়া ফুলিরা, নয়া দিল্লী ও বেনারসের প্রাসাদ ও মন্দির নামক লিথোগ্রাফ কটিও উল্লেখযোগ্য।

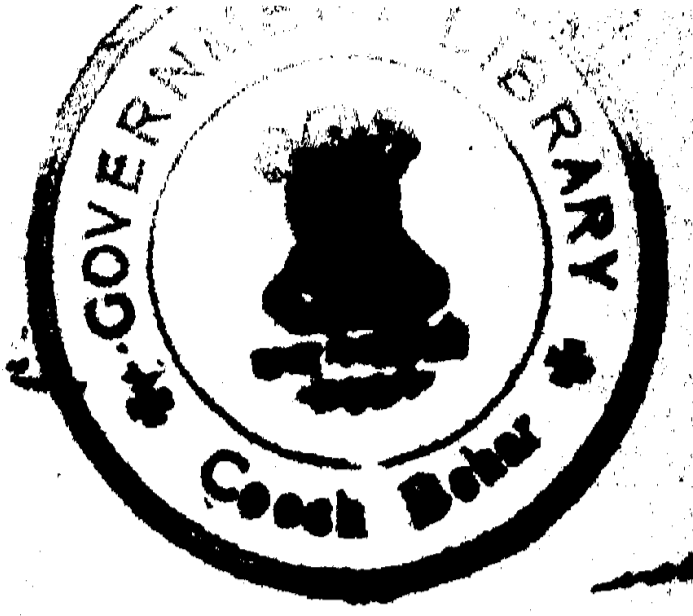
শিল্পী একানভের আঁকা তেলরঙের মিনিয়েচার প্রতিকৃতি চিত্রগুলিতে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় মেলে। বিভিন্ন মাহুয়ের স্বতন্ত্র মনোভাব ও চরিত্রকে পরিস্ফুট করতে তিনি যে নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে শিক্ষণীয়। কাল পাগড়ির ভারতীয়, লাল পাগড়িতে বৃদ্ধ শিখ, শিখ সন্ন্যাসী, পাহাড়ের মেয়ে-মহুয়, শিখ ও শিল্পী নামক প্রতিকৃতি কটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

জেরাসিমভের মহীপুত্রের পথে ও উট প্যারেড ছবি দুটি ভালো লাগলো, যদিও পরবর্তী ছবিটিতে লাল রঙের আধিক্য চোখে লাগে। তরুণ শিল্পী বুলেটভের দুটি জলরঙা ছবি কলকাতা ও পথও উল্লেখ্য।

তবে বিশেষভাবে প্রশংসা করতে হয় আলিম-এর সঙ্কল্পভীর, নালবানডিয়ানের পুরোনো বোঝা ও আশ্রয় বাজার এবং খবর কাগজ বিক্রয়তা বালক ছবি কটিকে। বিষয় নির্বাচনে এবং প্রকাশের চাহুর্থে ও নৈপুণ্যে এই ছবিগুলি অসাধারণ।

পাশাপাশি কিন্তু প্রদর্শনীতে এমন বহু ছবিও আছে যা কিনা ছাত্রসুলভ, কলে প্রদর্শনীর মান তাতে কিংবা যাহুও হয়েছে। তাছাড়া যে একটামাত্র মহুয়া তাও উল্লেখযোগ্য নয়।

বার্থকে



বারানসী

নীলକଣ୍ଠ

ଏକାଦଶ বছরে পা দেবার আগে কাশীতে পদାର্পণ করব না বাবা বলে তারাই পাখরের অক্ষরে খোদিত মানুষের মস্তক প্রবেশের কবিতা ভাঙল দেখবার জন্যে পূর্বদ্বার প্রতীক্ষা করে। এই সব লোকেরেই ধারণা তীর্থ করবার বয়স, ধর্ম করবার বয়স, পরকালের কথা চিন্তা করবার বয়স বর্ষে বয়স না হওয়া পর্যন্ত বৃদ্ধ হতে হবে কারুর হয় না। একেরই কেউ কেউ দাঁত পড়ে গেলে নিদারুণ ভক্ত হয় নিরামিষের; অহিংসাই যে পরম ধর্ম বৃদ্ধ হতে সক্ষম হয় অচিরে। অনেক লোকের তো বটেই; আরও অনেক বেশী অনেক স্ত্রীলোকেরও এই কাণি আইডিয়া কিছুতেই বাবার নয় যে, অন্ন বয়স হচ্ছে শাড়ি, গাড়ি আর গয়নার; কিন্তু প্রৌঢ় পৌছনর অব্যবহিত পরই অতঃপর সকলেরই পরকাল সম্পর্কে দরকার অবহিত হবার। এই মহৎ ইচ্ছার তলা দিয়ে যে পাকের আর ময়লার আর অস্বাস্থ্যের স্রোতবতী বয়ে বায় তা হচ্ছে যৌবনে ফুটি করার দাম লাগে বয়স হলে পরলোকের চিন্তার মন দিয়ে। অর্থাৎ কালোবাচার, ভেজাল অথবা অপকর্ম হোক বচ গুরুতার তীর্থে তীর্থে তৈরী করে ধর্মশালা যাতে মরবার আগেই যুগিতির পর দ্বিতীয় বার সশরীরে বর্গে বাবার পথ আটকাতে না পারে নিজের কিংবা অপরের বড় অথবা ছোট সহজী; মোক্ষ কোনও শালাই আর কি।

কিন্তু অধর্মেরই বয়স হয়; ধর্মের কোনও বয়স নেই। ইহকালের কথা না ভাবলেও চলে; পরকালের কথা না ভাবলেই মানুষ অচল। আগামীকালের কথা সে ভাবতে পারেনি গতকাল সেই কেবল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে মানুষের অধাত সলিলে ডুবে মরার আণবিক অস্ত্র; দানবিক অহঙ্কার। নরলোকে বা করবে পরলোকে তার জীবন দিতে হবে একথা ভাবতে না পারলেই আর ইহকাল নেই; পরকালও গেছে। পরলোক বলে যদি কিছু নাও থাকে, ইহলোক বলেও তবে বার কিছু থাকে না আর তারই নাম মানুষ। এবং এই একমাত্র বিশ্বাস; এই একমাত্র ধর্ম; এই সেই একমাত্র সত্য বা মানুষকে দানবের চেয়ে নরম এবং দেবতার চেয়ে কঠিন করে পড়েছে; তাকে দিয়েছে মনুষ্য। আগামীকালও সূর্য উঠবে,—একথা আজ নিশ্চিত বলা তর্কের দৃষ্টিতে বেঠিক; তবু এর চেয়ে সঠিক, এর চেয়ে সুনিশ্চিত প্রত্যয় আর কিছু মানুষের আছে। যদি এ বিশ্বাসের সূর্য-সুহৃদের জন্যে সংশয়ের মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা না দিত আবার বিগততর দীপ্তিতে তাহলে কে নিশ্চিত নিত্রা বেতে পারত বহিষণ সুখরিত জীবন-রাত্রি? যদি মেঘই সত্য হতো আর সূর্য হতো অসত্য; যদি অবিবাস না হতো অলীক আর প্রত্যয় সূর্য; যদি মানুষের পায়ের অঙ্গার কঠিন হুড়িকা সূর্যের না হয়ে বেত বাখার

ওপর অভাব হলে নিরুপম নীলের; যদি আজকের 'কাল'-টাই কেবল একমাত্র কাল হতো,—গত এবং আগামীকালের সঙ্গে তার কোন হতো বিচ্ছিন্ন তাহলে হয়, হত্যার নয় আত্মহত্যার উত্তম হত বিশ্বলোক। অবিবাসে নয়; আবিবাসে। প্রমাণে নয়; প্রত্যয়ে। বৃদ্ধ হতে নয় বৃদ্ধ্যেরই জীবনের জয়। অবিবাসে বা হতো বিশ্বলোক, বিবাসে তাই হয়েছে ত্রিভুবনের বিশ্বলোক,—মানুষের আবিবাসই এই বিশ্বলোক অবিবাসে বা হতে পারত বিশ্বলোক, বিবাসে তাই হয়েছে চিরকালে ত্রিভুবনের বিশ্বলোক।

উজীরবাদ; পুঞ্জিবাদ; গণবাদ; গান্যবাদ নয়; বাদ দিতে দিতে বয়বান কোর না মানুষকেই। বাদ দেবে কেন? বোপ কর। কর্মবোপ; জ্ঞানবোপ; রাজবোপ; ভক্তিবোপ। বোপ করো; তবেই বোপা হবে। ইহকালের বৃদ্ধ হতে পরকালের বোপ কর পর; মানবীর তনুতে সংবোপ কর ঈশ্বর। এবং উদ্‌বোপ করো বয়স থাকতে থাকতেই। সকাল থেকেই সন্ধ্যা পাকাও সন্ধ্যাকালের আলো জ্বালাতে। 'নিত্যকালের উৎসবলোকে বিশ্বের দীপালিকা' তেল থাকতে থাকতেই দীপ্ত হত; উদ্‌দীপ্ত করো।

ধুব অন্নবরসে হাত দেখে বলেছিলো এক জাতকের এক গণককার, জাতকের ঈর্ষাবোপা বৃদ্ধ হতে কাশীতে; এবং বৃদ্ধ হতে সেই যে 'কুপে' মিলবে শিবলোকের ট্রেণে; বার বার জায়ের অল্পকুপে মরতে হবে না পচে। শুনে পরম নিশ্চিত সেই জাতক অমৃতপানী পানের পর পাপ করতে করতে ব্রহ্মহত্যার দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বৃদ্ধ হতে বাগরে ডেকে পাঠাল সেই গণককে শেষ ইচ্ছা পূরণের সুবোপে; গণকঠাকুর জাতকের মেসোমশাই ছিলেন সম্পর্কে। তাকে দেখে খাগত জানালো কীসীর সঙ্গে জীবনের জয়গানে উত্তম সেই বজ্রাতক; মেসো, তুমিই আমার কীসীর কারণ। তুমি বলেছিলে আমার বৃদ্ধ্য কাশীতে;—সেই ভরসার বা ইচ্ছা তাই করতে করতে বা ইচ্ছা ছিল না আমার কখনও তাই করে ফেলে এখন লটকাতে চলেছি কীসীতে;—তুমি কি এখনও আমার বৃদ্ধ্য কাশীতেই বলতে চাও?

মেসো ঠাকুর বলেন: বাবা, ত্রিভুবন,—তোমার হাত ঠিকই দেখেছিলাম; তোমার বৃদ্ধ্য কাশীতেই ছিলো। কিন্তু এত হৃদয় করলে বাপ আমার ইতিমধ্যে যে 'ক' এর সুখ কীক হয়ে 'ক' হয়ে বাগরার কাশীর বদলে কীসীতে মারা যেতে হচ্ছে তোমার; আমি কি করব বলো?

আমরাই বা কি করতে পারি তাদের জন্যে—বাবা একাদশ বছর বয়স হলে তুমিই কাশী বার মরতে। কাশীতে বৃদ্ধ হলেও তাই যে কাশীতে মারা বাবার আগেই, অনেক আগেই মারা বার যদি,

কাঁচ, বাত, পিত্ত, অন্নপ্লে,—একথা বোঝার কে ? এই কাঁচতে যে ঘরতে জেরেই চিরকাল ; একবার ঘরে বেঁচে বেতে চিরকালের মতো সেই হচ্ছে হিন্দু ; কিন্তু কাঁচতেই বেঁচে আছে বা কেবল — জগতের সব চেয়ে বড়ো, সব চেয়ে উঁচ্বর, মানুষের সব চেয়ে বড়ো সেই ঘরের বাই হিন্দুই ।

একই পর্বত বেঁচে আছে ; কিন্তু আর থাকবে না । হিন্দুধর্মের দুই হলে ; এক তার শবের ওপর বসে বার উঁচ্বর হবে তা হচ্ছে হিন্দুর অর্থ । কাঁচের চতুর্ভুজ হিন্দুর হলে সংস্কৃত পড়বে না আর ; বাহারে বসে তার বচলে হাই ফুলে, ফলধর্মের চার চেয়েই হিন্দী ফলধর্ম : ফলধর্ম কি চৌবাচ্চা । হিন্দু বলতেই এখন আরবা মজা পাই ; হিন্দী বলতে নয় । হিন্দুস্থান হিন্দীস্থান হবার আগেই, হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত মানুষ হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান কাঁচের পাল পাই ; একাধিক কোঠার পা দেবার আগেই ভবনীর কবি এ কাঁচের বিখ্যাত ।

'আম্মার সাথে হ'বে আম্মার মধীর আত্মীয়তা,
হিন্দুমধীরী মানুষ মিলিবে । মছে এ বহুভাষা ।'

আম্মার সাথে আম্মার মিলন অর্থ বেথানেই হোক ভারতবর্ষে আর তা হবার আশা ভাষা মাত্র ; কারণ সিকুলার ট্রেট স্বাধীন ভারত মাত্র মুখে ; ভেতরে তার সিকুল্যার ট্রেট । স্বাধীন ভারতে সেখানে হিন্দু বললেই জাত বার ; হিন্দী বললেই বজ্রাত পায় অর্ধেক হিন্দু পায় রাজকতা সেখানে হিন্দুর আশ্রা খাঁচা ছাড়া হবার আগেই হেবে বাই কাঁচি খণ্ড নয় ; অর্থও ।

কাঁচের ইতিবৃত্ত । কাঁচের বহুকিৎ নয় ; কাঁচের বধাসর্বধ । বহুখা থেকে অসিগমা সেখানে উত্তরবাহিনী সেই বাবাপসী বৌবনের । বহুখা থেকে জীবনের অসি পর্বত মানুষের সমস্ত প্রেমের উত্তরবাহী সেখানে প্রাপগমা সেই পুণ্যভূমি কাঁচি পৃথিবীর প্রগতি গ্রহণ কর আঁচ ।

দুই

কাঁচি কেবল বিশ্বনাথের নয় ; বিশ্বের বহুক অনাথ দুনিয়ার কোথাও বানের জায়গা নেই তারিও স্থান পেয়েছে বিশ্বনাথের বিশ্ববিস্তৃত এই আবাসভূমিতে । কাঁচি কেবল ধর্মের নয়, অর্থধর্মও । এখানে বহু ধর্মের বহু তত অর্থধর্মের পায়ণ্ড : এখানে বহু সাধু তত অসাধু । বহু পাণ্ডা তত দালাল । কাঁচির অসংখ্য গলিতে পাণের সঙ্গে পুণ্যের অনাদিকাল থেকে আশ্রম গলাগলি নয় ডির হবার ; কিছুতেই নয় বিচ্ছিন্ন হবার । কিন্তু গজার বাট নয় ; নয় বিশ্বনাথের মন্দির । হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি নয় ; নয় মণিকর্ণিকার মহাপ্রাণ । ত্রৈলোক্যের সাড়ে চার হাত বিশালকার স্মৃতি নয় : নয় বেনারাস হিন্দু বৃন্দভাষিণী । সারনাথের শাস্ত্র পরিবেশ নয় : নয় ক্যান্টনমেন্টের মেক-আপ করা মুখ । কাঁচির প্রাণের পরিচয় লক্ষকোটি মানুষের স্মরণাতীত কাল থেকে পায়ে চলার এই গলিতেই শুধু সম্ভব । রূপকথার কাহিনীতে বাকসের প্রাণ বক্ষিত হয় হুর্গম অরণ্যের হুল্লভ বুককোটে ; সিন্দুর অতলে আঙ্গগোপন করে আছে যে অশ্রুত মাহ তারই পেটে থাকে বাকসের স্মরণাতীত ; আর নয় জনশ্রুত পাহাড়ের চূড়ার বহু বৃগের ওপার থেকে কঠিন উড়ে আসে যে নীলপাখী স্মরণীয় ব্যবধানে মাত্র একবার তারই বুকের পাঁজরে বুকপুক করে দৈত্যের স্মরণাতীত । কাঁচির অলঙ্কার

কথাও আর কোথাও নেই ; তাও আছে যদি কোথাও থাকে, কাঁচি । এই গলিতেই । গলির শেষ নেই ; বিশ্বনাথের কুঞ্জির বিশ্বও অশেষ ।

বিশ্বনাথের গলিতেই নয় কাঁচির চরম বিশ্ব । তার চেয়েও অধিকার, তার চেয়েও স্বীকৃতির এক গলিতে বেথুছি সেই পরমাশ্রমকে । তাঁকে দেখতেই আমার বার বার কাঁচি বাওরা । বিশ্বনাথকে প্রচার করলে অর্থ পুণ্য হয় কি না জানি না ; পজার জলে একবার অবস্থান করলেই অশ্রুত হয় কিমা পাণের স্পর্শ কলা পস্ত ; কিন্তু কাঁচির গলিতে থাকে দেখা মাত্রই পবিত্র হয় তেহ-মম তিনিই কাঁচির বিচিত্রা । মতের কাছে বসে মাত্র কাঁচির এই একমাত্র বিচিত্রার । বহুতের মতো বেঁচে গেছে পিঠ, চোখ প্রায় অন্ধ । অর্থই যদি মানুষের একমাত্র সত্য হয় তাহলে মিথাক্ষয় মিয়াক্ষয় আমার এই কাঁচির বিচিত্রা । প্রতিপত্তি যদি সামাজিক মতল হয় আজ মানুষের তাহলেও কাঁচির বিচিত্রা মিয়াক্ষয় ছাড়া নয় কিছু । তবু অর্থের ওপরে মিত্রতাই আছে আরও কিছু মিত্রত, তাহলে কেন এত নিশ্চিত সন্ধ্যাকালের মতো শান্ত প্রশান্ত সেই আনন্দ ? কেন তবে সেই দুই চোখে প্রবর্তার মতো দীপ্তি হাসিতে কেন মানুষের প্রতি অর্থহীন বিশ্বাস বিচ্ছিন্নিত ।

লোকে এখন বলে বড়ো বয়সে অর্থ-সহায়-সমলহীন অবস্থার কারুর বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না, তখনই আমার সামনে এসে দাঁড়ান কাঁচির বিচিত্রা । বলতে ইচ্ছে করে, দেখে আর একবার আমার কাঁচির বিচিত্রাকে । অর্থ, সমল, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, লোকসান কত ছোট কত কৈচৌ হয়ে যায় চরিত্রের, হৃদয়ের, ব্যক্তির ঐশ্বর্যের কাছে । বৌবনের গ্রাম্য আর ম্যাক ক্যান্টনের মেক-আপ ; নাইলনের শাড়ি, হামিলটনের পহনা, লেটেস্ট মডেল টি মলাইও বাতাস-নিয়ন্ত্রিত গাড়ি কেমন সজ্জার মুখ ঢাকে সেই কোমর পড়ে বাওরা, কাঁচির দরজার উপস্থিত, দ্বিতীয় হৃৎসর্বধ, নিঃসঙ্গ মানুষটার সামনে ; তাদের কাছে হৃৎপি থেকে পড়ে অস্তঃসাদৃশ্য সমস্ত বাছাড়ধর । লোকে এখন বলে বৌবনের মতো কাল নেই তখন আমার সামনে এসে দাঁড়ান কাঁচির বিচিত্রা । সন্ধ্যাবেলার আকাশের পাটে বসা সূর্যের শান্ত রক্তমাভা হৃৎপি পেছে সূর্যগৌর আননে । মোটসুজির পরমাশ্রম উজ্জল চোখের মীলমণি ; আর সেই সঙ্গেই, একসঙ্গেই আবার, তুল করেছে সারা জীবনে, গিট পাকিয়ে কেলেছে চলার গ্রহিৎ, পায়ে পায়ে আটকে পড়ে গেছে পেড়নে, ছিটকে গেছে সে দলছাড়া গৌত্রহেঁড়া, নামহীন, পরিচরহীন অধিকারের অতলে, সেই পতিত জীবনীদাজীদের প্রতি সীমাহীন সহানুভূতিতে সজল হৃৎচোখের কোণে চিকচিক করছে সব ভোলার সমস্ত কমা করার অপার করণা ।

বৌবন যে মানুষের একমাত্র সূসমর তার মতো হৃৎতাপ্য আর কে ? প্রথম দিনের সূর্য, প্রভাতের প্রথম সূর্য, মধ্যদিনের প্রজলন্ত দিবাকরে উত্তর নেই সত্তার প্রথম আবির্ভাবে সেই প্রেমের, কে তুমি ? দিবসের শেষ সূর্যেও হৃৎ তার জবার নেই ; কিন্তু সেখানে আছে :

'আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
স্মৃতির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর স্মৃতির শেষ রহস্য,—ডালোবাসার অশ্রুত ।'

আমি জানি, আমি মনুষ্য
সকল মনুষ্যের বাহিরে
আবার পূজা আজ সমাপ্ত হোলো।
দেবলোক থেকে
হাস্যলোককে
আকাশে জ্যোতির পূজবে

আমি মনুষ্য হইবে আমার অন্তরতম আশঙ্কে।

মানুষের সৌন্দর্য দেহভাষ্য নয়; কিন্তু মানুষের দীর্ঘজীবন
দীর্ঘজীবনের আধিক্য।

সমাজে বাক্য অসমর্থ বড় ভাষ্যের অভাবের আশঙ্ক বড় করবার
চরমসময়ে লোকের ভো মট্টেট্ট শ্রীলোকেও অস্বীকৃতির বৃত্তকে চিরতরুণ
ঠিকারি করি। আমাদের ধারণার তাৎপর্যেরই কেবল পরিমাণ আছে;
এমন ভাবের কারণ বার্ষিকের মহিমা আমরা জানি না তাই।
অধির ওপর হার হ্রস্ব তখনও যদি ভাষ্যে তরুণ হতে হয় তাহলে
তার চেয়ে তরুণ অবস্থা আর কান? অধিরেও যে প্রবীণ নয়
দীর্ঘজীবন তার পক্ষে নয় আধিক্য। যৌবনের আছে তার;
যৌবনের কেবল আলা। বার্ষিকের আছে প্রশান্তি; বার্ষিকের
নয়নে নির্লিপ্ততা। যৌবনের কেবল রূপ; বার্ষিক্য অপরূপ।
যৌবনের ফুল বার্ষিক্য না পৌছতে পারলে ফুটে ওঠে না
ফুল হয়ে; যে ফুলের চেয়ে অনেক বিউটিকুল আমার কাশীর
দ্বিমিতা। দিনের প্রান্তে পৌছে তবেই পূর্ণের, সম্পূর্ণের পদপদ
পড়েছে যার ওপর তা কেবল অসাধারণ যৌবনের নয়;
তা জীবনের ঘন।

আরেক দল আছেন যারা, এই প্রসঙ্গেই তাঁদের বক্তব্য
উপাধনযোগ্য, আবার বলেন একদম জানান না নিয়ে মরার মতো
শান্তি আর নেই। যুগের মধ্যেই, অথবা শরীরটা একটু খারাপ লাগছে
বলার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সটকে পড়ার মতো মধুর মৃত্যু হতে পারে
না আর কিছুই। কথাটা অস্বীকৃতির চিরতরুণ বলার মতোই
নিছক অবিবৃৎকারিতা ছাড়া আর কি? এই কথা যখন কেউ
বলল তখন আমার সামনে এসে ঠাণ্ডান, ধুলকের মতো বঁকা পিঠ,
প্রায় অন্ধ চোখ এবং সত্তর থেকে তত্তরুবে আশী থেকে যত কাছে,
কাশীর দ্বিমিতা। নির্বিকার মৈত্য়পূরীতে, অর্ধ, সামর্থ্য, সহায়,
সখল, প্রতিপত্তিহীন লোকমান বিহীন সেই বৃদ্ধার জীবনের পথ,
দিনের প্রান্তে এসে নিশ্চেষ্ট পানে গহনে হারাবার আগেও উচ্চারণ
করছে:

‘মান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
একল হইতে নব জীবনের কুলে
চলেছি আমার রাজ্য করিতে সারা।’

এ কেবল ববীন্দ্রনাথের কবিতা নয়; মানব-জীবনের মর্মবাণী।
মানুষের মুখে এই কবিতা মুক্তি হর না সহজে। জীবনে
অনেক দুঃখ না পেলে, অনেক জীবনের দুঃখ এক জীবনে বহন
করবার দুর্ভোগ ঘনঘোর করে না এলে দিবসের শেষ সন্ধ্যার কেউ
যোগ্য হয় না সেই সৌর্যের সেই গর্বে;—বীরের যে সৌর্য, সে
পর্বে তাকে মহৎ জীবনের দেয় অক্ষর অধিকার। যৌবনের দুঃখ
চাই, কিন্তু বয়স হলে অসুখ চাই না, একথা কেবল ভারিই বলতে
পারে সমুদ্রে বড় ঠাণ্ডে বারা সব চেয়ে আগে পরিচয়গ করি ফুটে।

ভাষ্যের অস্বীকার আশঙ্ক; সকলের আগে। তারা পুত্র ময়
কোনওকালে, তারা চিরকাল কাপুক। যে কেবল ভোগের আশঙ্ক
ভারলো, দুর্ভোগের উদ্ভেজনার চল না যোগ্যিত; যে কেবল
ভোগের আসনে বসে মনে করলে ঠিকর আছেন শুধু ঠিকরকে,
দুর্ভোগের দুঃখাসনে ত্রৌপদীর বস্ত্র হয়ে চীন গিলে চূড়ান্ত কুলে যে
না হলো পূর্ণ নির্ভর বস্ত্রকণ না দেখা গিল পথক্রমগণপত্রিকরণ
তরুণ ঠিকর বোমা ময় তার প্রভবকরণ। সে হতভাগ্য জানে না,
দুঃখের বংহার চকের ভল বা নাহলে বস্ত্রের করতার খীরে না বস্ত্র
যথ।

তাই কাশীর মত কেবল; কাশীর দ্বিমিতার ভাষ্যে চলো।
যৌবনে রাজ্যের দুলালী ছিলেম তিনি; তেওঁতে কেবল ছিলেম ভাষ্য
মা। তবে বড় ভাষ্যসাইটে রূপই তাঁর থাকুক সেদিন আশঙ্কের
মতো এমন অপকরণ ছিলেম না ভাষ্য। ভ্রমেতি বিঘাট ভাষ্যের
ভাষ্যভাষ্যি বিঘাট করে নিয়ে যান দ্বিমিতাকে; তাঁর বয়স তখন
যাও। ভাষ্যের মিতের বাতী গিয়ে কলেছিলেম বস্ত্র-
পরিহারকে: এবার যুগের বেগিয়ে কি এনেছি দেখো।
দেখবারই মতো বটে; হাঁ করে চেয়ে দেখবার মতো। যুগের চেয়ে
মানুষের চোখ কত বেশী কত সুন্দর যুগের মত হতে পারে কাশীর
দ্বিমিতার প্রায় অন্ধ হয়ে আসা চোখেও আজও এই দুর্ভোগে তা
পড়তে পারা যার জীবনের অভিন্ন প্রদোষ আলোকে যখন চোখ
তোলেন তিনি নীরব ভিত্তাসার কে এলি বাপ আমার? বোস বাবা
ঠাণ্ডা হ; স্বারে ঘরে যে আজ দেবার মতো নেই কিছু—

বলতে ইচ্ছে করে জড়িয়ে ধরে সেই পড়ে বাওয়া কোমর: তোমার
হাড়া আর কার আছে নিয়ে না ফুটোবার এমন সমুদ্র ফলয়।

এই কাশীর দ্বিমিতার আজ কিছুই নেই; আজ কেউ নেই।
ছেলেটা বাইরে চাকরি করে। একমাত্র মেচের বাস শুধু বোকাই
শহরে; পতিগৃহে। একমাত্র তাই সত্ত পরলোকগত। শুধু যদি
আশা দেবার কারণে কেউ বলে কখনও দ্বিমিতা, আপনাকে দেখবার
মতো আরেকজন কেউ হলে ভালো হত, না? দ্বিমিতা হাসেন;
অস্তরের অস্ত্র:পুর থেকে বেরিয়ে আসে অস্বীকার করা মেঘবৃত্ত
দিনে আকাশের প্রসন্ন বজুর হাসি; হলে ভালো; না হলে আরও
ভালো।

নীলোৎপলনয়ন দেবীর পারে বেধেছিলেন স্ত্রীমচল্ল; নিঃস্বার্থ
ছিলো না সেই প্রণাম কিন্তু। ছিলো সীতা উদ্বারের সাহায্য
প্রার্থনা। দেবী বলেছিলেন তথ্য। সীতা উদ্বার হয়েও কিন্তু
হয়নি রাজসম্মতি; বাটির তনয়া আর কারুর তো নয়; বাটির বুকেই
কিরিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁকে দেবী দুর্গা।

মহিষাসুর প্রার্থনা করেছিলো: জিতুবনে দেব-দানব মানব
কার্য কাছে তার হবে না হার;—সে প্রার্থনাও পূরণ হতে দেবী
হয়নি; দেবীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল তার বিনাশের কারণে;
মহিষের প্রিয়ার হয়েছিলো দেবীর গলায় হার।

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে ৩৮তীর স্তবে:
রূপং দেখি; অং দেখি। মহাচণ্ডী রূপ দিয়েছেন; অংদান
করেছেন; যশোদান করেছেন; শত্রুকে দিয়েছেন পরাজয়। কিন্তু
তারই সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন মায়শাস্ত্র; সে আন্তে সে নিশ্চয় বৃত্তার
আয়োজনকেই শাপ দিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এ প্রার্থনা পৌঁছেছে কখনও মর্ত্যলোক থেকে অমর্ত্যলোকে ।
হলে ভালো ; না হলে আরও ভালো ।

হলে ভালো ; এ পর্বত খোঁচা অথবা না খোঁচা দাঁটার ওপর
সিঁড়ির করে । কিন্তু না হলেও বার নয়ান ভালো তার যত্ন করে
এমন কে আছে ত্রিভুবনে ?

এই কাহিনীতে গেছি বড়বার ভক্ততার কাহিনীনাথের আগে ;
সর্বপ্রকারে লোকের কাহিনীর দিদিয়ার কাছে । আর প্রত্যেকবার
কখনো তাঁর মুখে তাঁর একটি মাত্র বলবার, বার বার বলে না
কুমারীকে সেই অর্ধ-কালীর কাহিনী । কাহিনীর দিদিয়ারই কথায়
একাক্ষর পুস্তক আছে এসেছিলেন অর্ধেক মাসখানেক অর্ধেক ঈশ্বরী
ঈশ্বরীকে এক মাস । তাঁর কথা বলতে কাহিনীর দিদিয়ার স্নান
গেই । তাঁর কথা বলতে বলতেই কাহিনীর দিদিয়া আর প্রায়
অধীতিবরবের মুখা থাকতেন না ; অতঃপর তাঁর জলে উঠতে
দেখেছি আলোর । দেহের সজার দেখেছি হুসুল ছাপিয়ে ডাকতে
জীবনের বক্তা । মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্বত প্রত্যেক
করেছি যোমাকিত হতে । তাঁর নয় আমারও পারে কাঁটা দিয়েছে
প্রত্যেকবার বড়বার শুনেছি অর্ধ-কালীর কাহিনী । ঈশ্বর প্রসঙ্গ
করলে মাহুকের কি হয় পুঁথির পাতায় তা লেখা নেই কোথাও ;
ঈশ্বর প্রসঙ্গ করলে সংসারের সার ভাগ্য করে বারা সংসেজ্ঞে আনন্দ
পায় সেই বকোমধ্যে হংস হয় মাহুব ; ঈশ্বর প্রসঙ্গ করলে বকোমধ্যে
হংস হয় ; ঈশ্বরসঙ্গ করলে হয় পরমহংস । ঈশ্বরসঙ্গ করেছেন
অর্ধকালীর জন্তেও এমন অর্ধকালীর মুখে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শুনে থাকে
যদি কেউ তবে কেবল সেই অল্পভবে আনতে সক্ষম হবে কাহিনীর
দিদিয়ার কাছে অর্ধ-কালীর কাহিনী শুনে কেন এমন হয় ;
হৃদয়ের শেষ আলো মুখে এসে পড়লে কাহিনীর সেই অন্ধকার গলির
এককালি আরও অন্ধকার ঘর আলো হয়ে বার কখন ; কখন
তবে বার রজনীগন্ধার সৌরভে ; বয়ে বার কখন সেই ঘরের ওপর
দিয়ে সুরের সুরধুনী ; আর কাহিনীর দিদিয়ার কণ্ঠে অর্ধ-কালী
আবির্ভূত হন বখন তখন, মনে হয় ফিরে গেছি অন্ধকারে অস্ত
আলো করা আনন্দানন্দ বাস্তবিক মুখে, সেখানে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত
হচ্ছে রামায়ণগান সেই সংখ্যা গণনার অতীত এক না-প্রত্যয়,
না-প্রদোষে ।

তিনশো বছর আগেকার কথা । ঢাকার মাসিকগঞ্জ মহকুমার
মিতরা গ্রামের পদ্মনাভ বংশোদ্ভব শ্রীপোবিন্দরাম ভট্টাচার্যের পুত্র
শ্রীরাধবরাম ভট্টাচার্য তাঁর শিক্ষাঙ্ক মৈমনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার
প্রতিবেশী গ্রাম পণ্ডিতবাড়ীর সাধক বিজয়দেবের টোল থেকে শিক্ষা
সমাপনে প্রত্যাগমন করছেন নিজের গ্রামে নৌকার । নদীর জল
স্রাব্য অন্ধকারেও আলো হয়ে আছে ; সহস্র পদ্মের গন্ধকে হার
মানানো এ কোন্ আশ্চর্য সৌরভ আসছে নৌকার অন্ধবিবর থেকে ?
স্বগ্রামীনরা অপেক্ষা করছে শুধু বিশ্বয়ে সজ্ঞে করে কী এনেছে
রাধবরাম ? পুঁথির পাতায় তো এত আলো নেই ; নৌকার
দেহ তো নয় চন্দনকাঠের ; তবে ? রাধবরামও নেমে আসতে
পারছে না নৌকা ছেড়ে সহসা । বহুনিবিড় হয়ে এলো মিতরা
বুকের ওপর দিয়ে বয়ে বাওয়া নদীতীরে রাধবরাম আর তাঁর
গ্রামবাসীদের ঘিরে । তারপর কোন্ সময়ে যে উঠে গেছে
বন্দিকা সেই পরমের চন্দনকাঠের ; নিজেই আবির্ভূত হয়েছেন

রাধবরামের পরমরমণী জয়হুর্গা । কেউ জানে না । এ কি অপরাধ
আবির্ভাব ? ঘোমটার মুখ ঢাকা ; যেন মেখে ঢাকা পূর্ণপঙ্কি কেউ
পড়তে চাইছে আলোর তার বইতে না পেরে । কিন্তু সেই অন্ধের
বেটুকু হয়েছে দুঃখময় তার বর্ষ নয় বর্ণনীর বিবর । অর্ধেক তার
ঘনভায় আর অপরাধ অপরিণীম মৌর । নৌকার উঠে বাড়াতেই
জয়হুর্গা যেন মুখে উঠল ত্রিভুবন ; সিংহের ওপর যেন আরো
হলেন অগভ্রাতী । রাধবরামের মুখে নিঃসরণ হলো না একটি
বাক্যও ; গ্রামবাসীরাও নির্ধাক । হলাং হলাং করে বয়ে বেতে
গিরে কেবল বিতরা প্রানের মায়হীন সেই মণী, যেমে মেখে বুকি
হুহুর্গের কণ্ঠে ; তারপর বয়ে বেছে আবার বিতরণ বেখে বেখন বয়ে
চলেছে সে চিরকাল ।

রাধবরামের জয়হুর্গা সাধক বিজয়দেবের কস্তা । জয়হুর্গার
আবির্ভাবের আগে বিজয়দেব দীর্ঘকালব্যাপী বহু সাধনার বহুতর
আরাধনার দেবী যোগমায়াকে ডেকেছিলেন দেখা দেবার জন্তে
একবার । আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী যোগমায়া ; বলেছিলেন ;
বর চাও । বর চেয়েছিলেন সাধক বিজয়দেব । অর্ধনয় ; সার্থ্য
নয়, নয় তুচ্ছ লোকমান । চেয়েছিলেন যোগমায়া আত্মন তাঁর
ঘরে । অর্ভুত থেকে নয় ; অস্তরালে থেকে নয় । নির্ভল-স্বর্ধ-
করোচ্ছল যে ভুবনমনোমোহিনীরূপে তিনি ঠাঁড়িয়ে রয়েছে
বিজয়দেবের পানের ওপারে সেই বিচিত্র রূপে আশ্রয় বিজয়দেব বুটীরে ।

দেবী যোগমায়া পূরণ করেছিলেন ভক্তের প্রার্থনা এই বলে ;
তাই হবে তবে । আমি কলির চার হাজার সাত শত বর্ষ পর
অর্ধ-কালী মূর্তিতে প্রমূর্ত হবো তোমারই ঘরে ; আমার অঙ্গ
একাক্ষর হবে কৃষ্ণ এবং অপরাংশ গৌরবর্ণ হবে । পদ্মনাভ বংশের
বিত্তচেষ্টা গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধবরামের সঙ্গে আমার
বিবাহ উদ্ঘাপিত হবে বখাসময়ে ।

দেবী অস্তহিতা হবার আগেই তাঁর দৈববাণীর সমর্থনে জয়ধ্বনি
করলেন দেবলোক । সিদ্ধকাম বিজয়দেব শুনেতে পেলেন গান
উঠেছে দিকে দিকে : ওই মহামানব আসে । দিকে দিকে রোমাক
লাগে মর্ত্যলোকের ঘাসে ঘাসে ।

স্বপ্ন দেখলেন বিজয়দেবের ভাষাও ; দিনরাত্তে তাকিয়ে আছেন
নগেন্দ্রবালা বিশ্ববিমোহিনী মূর্তিতে নিমেষহারা যেমন তাকিয়ে থাকে
মায়ের মুখের দিকে মায়ের কোলে গুয়ে শিশুকস্তা ।

স্বপ্ন সত্য হলো । বখাসময়ে আবির্ভূত হলেন অগভ্রননী
সাধক বিজয়দেবের ঘর আলো করে । বিচিত্ররূপিনীর নাম রাখলেন
তাঁর বাপ-মা ; জয়হুর্গা । অর্ধেক অঙ্গ বীর কালো আর অর্ধেক
বীর আলো, সেই অপরাধ বালিকা বখন ছোট হাত বাড়ালো
নাগালের অনেক বাইরের ফুল পাড়তে তখন সঙ্গীজন দেখলো
অবাক-বিশ্ববে পুষ্পভারনস্ত বুক নত হলো যেন আরও ; যেন
প্রণত হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলো জয়হুর্গার পায়েরে ।

বখাসময়ে বিজয়দেবের টোলে নিজে এসে দেখা দিলো দেবী
নির্দিষ্ট বর স্বয়ং রাধবরাম ছাত্র হয়ে । শিক্ষা সমাপন হলে
গুরুদক্ষিণার সময় আসে । গুরুপ্রাণ শিষ্য রাধবরাম নিবেদন
করেন বিজয়দেবকে ; কি দক্ষিণা, আদেশ করুন ; বিজয়দেব বলেন ;
তোমাকেই চাই রাধবরাম । আমাকে ? হতবাক রাধবরামের
নিমেষহারা নয়ন জানতে চায় তার মতো অতিকিৎকর্যক দিয়ে

কি কাজ হবে ইত্যাদি প্রতীক মর্ত্যলোকে, শ্রীওকর। তোমাকে চাই তোমার জন্মে নয়; আমার একমাত্র কাজ জয়হুর্গাকে দিতে চাই তোমার হাতে। না, না, তীর প্রতিবাদে মুখের হলেন শিখ্য শ্রীওকবাক্যের; এ কখনও হয়নি; এ কখনও হয় না, ওককতা ভগিনীতুল্যা, তাকে বিয়ে করতে পারবেন না রাখব, স্বয়ং বিজয়েব আদেশ দিলেও। হয়; নিশ্চয়ই হয়। আগেও হয়েছে, এখনও হয়, পরেও হবে। বিজয়েব নাছোড়বান্দা। অনেক তর্ক; অনেকতর বিতর্ক। বিচার বিলম্বের, শাস্ত্রের নজীরের শেষে শেষ পর্যন্ত বিজয়েবই জয়ী হন। অবশ্য সেদিন রাখবরামের তাই বোঝাবারই কথা; কারণ তিনি ওককতাকে বিবাহ করতে চাননি কিন্তু বিবাহ করতে বাধ্য হইলেন, কাজেই তাঁর বিচারে সেদিন তাঁরই হার। কিন্তু জয়হুর্গাকে বিবাহ করার জীবনযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছেন তিনি লেখা উপলক্ষি করার সময় ওকনও তাঁর হয়নি। এক সময় না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে কিছুই হবার নয়; হুর্গার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত মহিষাসুরকেই মনে হয় সর্বশক্তিমান। পুরাণের এই প্রমাণ পুরানো হলেও মিথ্যে প্রমাণ হয় না আজও। আজও অগৎ সংসারে যারা অস্ত্রের করে আরামে আছে সেই রাধিকাকে যে শেষ পর্যন্ত হুঃসময় হলে রামে মারবে, সময় হয়নি বলেই আমরা তাতে আস্থা রাখতে পারছি না।

জয়হুর্গা,—ধীর অঙ্গে ভ্রাম ও গৌরবর্ণের সমান সমারোহ সেই বিচিত্ররূপিনী যখন মুহূর্ত্তে নিজে এসে জীবনের সিংহাসন খুলে দেখা দিলেন তখন রাখবরামের সংসার অন্ধকার করে এলো নিদারুণ সামাজিক সমস্তা। একে রাখবরাম বিবাহ করার সময় পাননি স্বগ্রামীন কাউকে জানাবার; তার নতুন বউয়ের অপূর্ণ রূপও কিছুটা বিকৃত করেছে তাদের। তারা নতুন বউয়ের হাতে প্রথমবার গ্রহণ করতে আপত্তি করল। অনেক অস্থানয়ে, অনেক বিনয়ে এক সময়ে গ্রামের সমাজের সকলো স্থানয় ককথাধারায় গললো। তারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল রাখবরামের গৃহে 'নববধূ-ভাতে'-র অস্থানে পাঁচ পাড়বার।

বিবাতার মনে কি ছিলো কে জানে, লম্বকা হাওয়ার উড়ে গেলে মাথার ঘোমটা অল্প পরিবেষণরত নববধূ জয়হুর্গার। মাথা নীচু করে অল্প মুখে তুলছেন সার সার নিমন্ত্রিতেরা; সকলের অলক্ষ্যে জয়হুর্গার অঙ্গে আবির্ভূত হলো বোগমারার আরও হুই হস্ত। নিম্নেবে মাথার ঘোমটা মাথায় টেনে দিয়ে চতুর্ভুজা হলেন আবার দ্বিভুজা; বোগমারা আবার জয়হুর্গা।

সকলের অল্পগ্রহণ সমাপ্ত হলে, চলে গেলে সবাই ঠাকুরঘরে ক্লাস্ত জয়হুর্গা যখন একা, তখন কিবে এসেছে একজন নিমন্ত্রিত; সঙ্গে এনেছে এক জোড়া নয়, দু জোড়া শাঁখা। এসে বলেছে জয়হুর্গাকে সেই শাঁখা পরতে। দুটি শাঁখা হু হাতে পরে জয়হুর্গা জিজ্ঞেস করেছেন; হু হাতের জন্মে চারখানা শাঁখা কেন?

কেন?—পারে লুটিরে পড়ে বলেছে তক্ত: তুমি দ্বিভুজা মও বে মা: তুমি চতুর্ভুজা—

কেনে কেলেকিস?

একবার দেখেছি মা; আরেক বার দেখতে চাই। তুমি পাঁচটিও তোমার জুবনমনোমোহিনী মূর্ত্তিতে—ভক্তের মনোবালা গুণ, সম্পূর্ণ করতে বিবাতার অভিজ্ঞা, জয়হুর্গা পাঁচাল চতুর্দিক আলো করে চার হাতে পরিধান করে চার শাঁখা। ভক্ত অনিমেধ লোচনে দেখে অর্ধশ্রাম অর্ধগৌর জয়হুর্গাকে নয়; ঐ অর্ধ-কালীকে।

মূর্ত্তিত হয়ে পড়ে সে। রূপসম্বরণ করেন বোগমারা। গ্রামের সকলের সমবেত চোঁতেও কিছু মূর্ছা ভাজে না ভক্তের; জয়হুর্গা হাসেন: এ মূর্ছা ভাজবার নয় বে, মর্ত্যবাসীর কানে গেছে বে অমর্ত্যলোকের মূর্ছনা।

দিনের অস্তিম আলো আকাশের আভিনায় মিলিয়ে গেলে কাশীর দ্বিদিয়ার কাছে অর্ধ-কালীর এই কাহিনী তনতে তনতে হোন আপনি বত সত্যতার আলোকপ্রাপ্ত আপনার মনে হবে আপনি কাশীর দ্বিদিয়ার মুখে রূপকথা তনছেন না; তনছেন মানবজীবনের অপকল্প কথা।

[কম্বঃ।

"আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাধনা, আমাদের দেশের সাধনা, আমাদের সৌন্দর্যের সাধনা, আমাদের ধর্মের সাধনা কালে কালে বতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই এই জীবনটির আদর্শ জাঙ্ঘ্যমান হইয়া আমাদের সকল সাধনার অন্তরতর ঐক্য কোথায়, সকল খণ্ডতার চরম পরিণাম পরম পূর্ণতা কোথায়, তাহাই নির্দেশ করিয়া দিবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে বিশ্বমানবের বিচিত্র সত্যতার সকল আয়োজন সুদূর ভবিষ্যতে একদিন যখন এই ভাবতবর্ধে নানা অস্থানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবার জন্ত সমাগত হইবে, তখন ভাবতবর্ধের পূর্ণপ্রাপ্তে এই অখ্যাত বাংলা দেশের মহাকবির মহান আদর্শের তলব পড়িবেই এবং বাস্ত্যাক্রম সমুদ্রপথে নাবিকের চক্ষের সমক্ষে অন্ধকার রজনীতে ঐক্যতার দীপ্তির ভায় এই পরিপূর্ণ আদর্শের নিগন্তব্যাপী রশ্মিছটা সকল সুখের অন্ধকারকে ছুঁ করিবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

পত্রপুস্ত



রবীন্দ্রনাথের চিঠি—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে লেখা

সুভাষচন্দ্র,

বাঙালী কবি আমি, বাংলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশদায়কের পদে বরণ করি। সীতার বলম, সুরভূতের রক্ষা ও হুত্বের বিলাসের ক্ষমতাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। হুর্গতির জালে রাষ্ট্র এখন অন্ধিত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণার আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিশ্চিষ্ট আত্মবিবোধের দ্বারা বিকিপ্তশক্তি বাংলা দেশের অদৃষ্টাকাশে হুর্দাগ আজ ঘনীভূত। নিজেকে মধ্যে দেখা দিয়েছে হুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিকৃত শক্তি। আমাদের অর্ধনীতিতে কর্মনীতিতে প্রয়োজনীয় প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিন্ন, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে ঠাঁড়ে ভালের মিল নেই। হুর্দাগ্য বাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে জীর্ণ মেহে বোণের মতো, তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোককে তারা দূরে কেন্দ্রে আপনাকে করে পর, শ্রদ্ধেরকে করে অসন্মান, স্বপক্ষে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; বোণ্যতার জন্ত সন্মানের বেদী স্থাপন করে বখন স্বভাটিকে বিশ্বের দৃষ্টিসম্মুখে উর্ধ্ব তুলে ধরে মান বাঁচাতে হবে তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষাধিতের আত্মঘাতক হুর্দতা নিশ্চয় ছিন্ন খনন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিশ্বাস করে শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে প্রবল করে তোলে।

বাহিরের আঘাতে বখন মেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তখন নাড়ীর ভিতরকার সমস্ত প্রসুপ্ত বিব জেগে উঠে সাংঘাতিকভাবে এগিয়ে আনে। অন্তর-বাহিরের চক্রান্তে অরসানগ্রস্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এই রকম হুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠা শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিফুল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রকে সাধনার আনন্দকরণ তোমাকে দূর থাকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লয়ে তোমার সম্বন্ধে ঠিক সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে বিধা হুঃসময়ে দেখেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার কর্কলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে তোমার দ্বিচ্ছিন্ন স্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, ক্রমবিকাশে দেখলুম তোমার যে পটিলতা তার থেকে পেয়েছি তোমার হুঃসময় জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে

কারাহুখে, নিধাগনে, হুঃসাধ্য বোণের আক্রমণে, বিদ্রুতে তোমার অভিজ্ঞত করিনি; তোমার চিত্ত ক কবেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে টিউটামের হুঃসময় জেগে। হুঃসময়ে তুমি করে তুলেছ স্বেচছ, বিদ্রুকে কবেছে সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চাঞ্চল্য শক্তিকেই বাংলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলা দেশ বহু কিছু স্বেচছ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিদ্রুতনাকেই সে আপন পৌত্রবের আকর্ষণে ভাগ্যের আশ্রিত্যে পরিণত করে তুলবে, এই চাই। আপাতপরভবকে অস্বীকার করার যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে বাবে জেগে পাবে। আজ চারিদিকেই বেথতে পাই বাংলা দেশের অকরণ অদৃষ্ট তাকে প্রেরণ দিতে বিদ্রুতই এই বিদ্রুততাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার হুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই; বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে হুঃসময়ের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে। হুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিজীবিকার পথ উজ্জীর্ণ হোতে হবে, এই হুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের বাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।

হুঃসাধ্য অধ্যবসারে হুর্গম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে হুঃসময় সমস্তা এইখানেই। কিন্তু কেন বলব "বদি", কেন প্রকাশ করব সংশয়। মিলতেই হবে, কেননা দেশকে বাঁচতেই হবে। বাঙালী অদৃষ্ট কহুক অপমানিত হয়ে মরবে না এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি আগিয়ে তোলো, সাংঘাতিক দ্বার খেয়েও বাঙালী মারের উপরে মাথা তুলবে। তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারণ্য, আসন্ন লক্ষ্যের প্রতিবুদ্ধে আশাকে অবিচলিত রাখার হুর্নিবায় শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে, সেই বিধাবলম্বিত সূত্রায় আশার পতাকা বাংলার জীবনকে তুমি বহন করে আনবে—সেই কামনার আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশদায়কের পদে—অসন্ধিত দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালী আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠা জন্তে তার আসন প্রস্তুত। বাঙালীর পরস্পর-বিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আত্মসংশয়ের নিবারণ হোক তোমার মধ্যে, হীনতা লজ্জিত, ও হীনতা বিদ্রুত

হোক তোমার আদর্শ, করে পরাজয়ে আপন আত্মসম্মত অক্ষর রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক।

বাঙালী নৈরায়িক, বাঙালী অতি নূন বৃত্তিতে বিতর্ক করে, কর উত্তোষের আনন্দ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বক্যা বুদ্ধির পর্বে প্রতিবাদ করতে তার অকৃত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে বহু সন্ধানের ভাঙন লাগানো দৃষ্টিতে তার উৎসুক্য, তুলে বার এই তর্কিততা নিজস্ব বুদ্ধির নিফল শোধিততা হার। আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়, স্বতন্ত্র ইচ্ছার। বাঙালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্ব পদে, এই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি করে তুলুক তোমার মহৎ দায়িত্ব। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিবস্তুকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের শাস্ত্রবস্তু।

বাংলা দেশের ইচ্ছার বৃষ্টি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বহুভঙ্গ-রোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর বিখণ্ডিত করবার জন্তে সমুদ্রত খড়গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বর্ষলশাসী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়ে বিপরীত করা সম্ভব কি না এ নিয়ে সেদিন সে বিজয়ের মতো তর্ক করে নি, বিচার করে নি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।

তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্তে আলো নিয়েই জন্মেছিল, তুল ক'রে আঙন লাগাল, বন্ধ করল নিজেদের, পথকে ক'রে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ তুলের সাংঘাতিক বার্ষতার মধ্যে বীর জন্মের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখি নি। তাদের সেই ভাগ্যের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, আত্ম নিফলতার উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্ভয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তাকায়ের যে স্বয়ংবিচারক প্রমাণ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লালনা বহু মসীলপন করুক তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজস্বিতাকে?

আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেরেছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রকল্প ফুসতে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও কলবান করবার তার নিতে হবে তোমাকে; বাঙালীর স্বভাবে বা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার বঙ্গনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির মানিকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন স্বাধীনতাকে ছুঁ ক'রে সামসিকতার আধরণ থেকে মুক্ত ক'রে নব বসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃৎ গ্রহণ কর তুমি।

বলতে পার, এত বড় কাজ কোনও একজনের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে না। সে কথা সত্য। বহু লোকের দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হ'তে পারলে তবেই হবে অসাধ্য সাধন। বীর দেশের স্বার্থ

স্বাভাবিক প্রতিনিধি তাঁরা করছেন একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তাঁরা বর্তমানের গিরিচূড়ার পাড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরণ্যভাসকে প্রথম প্রগতির অর্থ্যক্ষয় করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংলা দেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্ব সমস্ত দেশকে।

এমন ভুল কেউ বেন না করেন যে বাংলা দেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্রপথে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্বোধন করেছেন, ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন বাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, বাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্তে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলনবস্তুর যে মহৎস্থান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্তে উপযুক্ত আহতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলা দেশের সেই আত্মাহুতি বোধশোপচায়ে সত্য হোক, ওজস্বী হোক, তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জল হয়ে উঠুক।

বহুকাল পূর্বে এক দিন আর এক সত্য আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণী দূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলা দেশের অকিন্তন্যকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেখে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসর। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলা দেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবৃত্ত করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই ভেবে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্বক বৃত্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৃটিশ মন্ত্রিসভাকে লেখা সত্ৰাট নেপোলিয়ানের পত্র

পত্র-পরিচয়:—১৮১৫ সাল, গুয়াটারলুর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। নেপোলিয়ান পরাজিত। পুনরুত্থানের কোন সম্ভাবনা নেই। নেপোলিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করেছেন ২২শে জুন, ১৮১৫। শত্রুসৈন্য বিনা বাধার প্যারিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ফরাসী সামরিক পর্ব্বশ্রেণীর নেতা জেনারেল ফুসে ডিউক অব ওয়েলিংটনের উৎকোচে বধীভূত, কিন্তু প্যারিসের অনসাধারণ নেপোলিয়ানের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করে তাঁর প্রাসাদে সমবেত হয়েছে। প্রজাবর্গ তাঁকে অহুরোধ করেছে—নেপোলিয়ান সে অহুরোধ দেশের কল্যাণে প্রত্যাখ্যান করলেন। ছদ্মবেশে তিনি 'মেলোমিসন' প্রাসাদে বাস পরিবর্তন করলেন। এই প্রাসাদ তিনি নিজের অর্জিত অর্থে ভ্রম করেছিলেন। তাঁর এই স্বাভাবিক প্রাসাদে তাঁর প্রিয়তমা বিবাহ-বিচ্যুতা পত্নী জোসেফাইন শেষ জীবন অভিবাহিত করেছেন।

নেপোলিয়ান ফরাসী দেশ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন— তিনি আমেরিকার চলে যেতে চান। জেনারেল ফুসের দূত

নেপোলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন :—“সম্রাট কোথায় তাঁর বাসস্থান নির্দেশ করেন?” নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন, “আমি এখনো স্তবে স্থির করিনি। কিন্তু এখানে ফরাসী দেশে থাকব না কেন? পলায়ন করা আমি অপমানজনক মনে করি। সম্মিলিত শক্তি একজন নিরস্ত্র ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি করবে? আমি এখানে কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সাথে দূরে, সহরে থেকে দূরে বাস করব। আমাকে আমার পুরুগণ কোথায় পাঠাতে চান—ইংলণ্ডে? সেখানে আমার জীবন নিরাপদে কাটবে না। কেউ ভাবে না যে, আমি সেখানে নিশ্চেষ্ট থাকব। আমার বন্ধুগণ ইংলণ্ডে বাওয়া পছন্দ করবে না। আমি আমেরিকা যেতে চাই, সেখানে আমি সম্রানের সঙ্গে বাস করতে পারব।”

নেপোলিয়ান আমেরিকা বাওয়ার উদ্দেশ্যে ফরাসী দেশ পরিত্যাগের ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করলেন, এবং ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিকট সমুদ্রপথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু ডিউক অব ওয়েলিংটন সে ব্যবস্থা ত’ করলেন না, বরং সমুদ্রপথ আরও বেশী ক’রে অবরুদ্ধ করলেন।

শত্রুসৈন্য মেলেমিসন প্রাসাদ অবরোধ করবার জন্য সমবেত হচ্ছে, ব্যারণ জোরীকে নেপোলিয়ান বললেন, “আমি আমেরিকা যাবো। সেখানে তারা আমাকে কিছু জমি দেবে, অথবা আমি কিনে নেব এবং জমি চাষ করবো।” জোরী উত্তর করলেন, “আপনি ইংরেজ জাতিকে ভীত ও কম্পিত করেছিলেন, এই দুঃসময়ে কি আপনাকে পাণ্ডিত্যে জমি চাষ করতে দেবে? আপনি বতদিন জীবিত থাকবেন অথবা স্বাধীন থাকবেন, ইংলণ্ড আপনার শক্তিকে ভয় করবে। তারা আমেরিকাকে বাধ্য করবে, আপনাকে নির্কাসন দিতে অথবা তাদের নিকট সমর্পণ করতে।” নেপোলিয়ান গভীর ভাবে উত্তর দিলেন, “তবে মেক্সিকো যাবো, অথবা কারাভাসে কিংবা বোনোআইরেসে অথবা ক্যালিকোর্নিয়ার। আমি সমুদ্র থেকে সমুদ্রান্তরে যাবো, প্রান্তর থেকে প্রান্তরে চুটে বেড়াবো, হাছুরের কোষ ও ক্লান্ততার বিরুদ্ধে আমি আশ্রয় খুঁজে বেড়াবো।” জোরী কহলেন, “আপনি কি ইংলণ্ডের সমুদ্রজাল থেকে নিষ্কৃতি পাবেন?” নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন, “অবশ্য ইংলণ্ডের কক্ষতার মধ্যে গিয়ে পড়বো, যদি আমি আমেরিকায় না পৌঁছিতে পারি। বৃটিশ সার্ট্রের কোম্পানী অসহায়তা নেই আমি জানি, কিন্তু বৃটিশ জাতি বিরাট, মহৎ ও উদার। বৃটিশ জাতি আমাকে আমার মর্যাদা উপযোগী ব্যবহার করবে। আমি ইংলণ্ডের রাজশক্তির বিরুদ্ধে কি করতে পারি?”

সেই দিন বার্লিনে সেনাপতি ব্রিচার প্রাসাদ, সূত্রন ও অগ্নিধাহের ক্ষয় বিধ্বংসের অধীনে শিবির স্থাপন করেছেন এবং শপথ গ্রহণ করেছেন যে নেপোলিয়ানকে শত্রু ও শত্রুর সম্মুখে কানীক্ষণে উত্তোলন করা হবে।

বার্লিনে প্যারিস থেকে কয়েকজন বন্ধু নেপোলিয়ানকে প্রবাসে রাখার সম্মিলিত শক্তি তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত করলেন এবং নেপোলিয়ানের সময় অভ্যন্তরীণ অবশিষ্ট রাখল। বার্লিনে নেপোলিয়ান হস্তক্ষেপে প্যারিসের তিন ম’ হাইল রে চার্লসটি মনীষীকে রসকোট-এর দিকে প্রেরণ করলেন। সেখান থেকে সমুদ্রপথে ইউরোপ ত্যাগ করবেন, অতীকে জেনারেল ফুসে চিপসে গিয়ে প্রেরণ ক’রে নেপোলিয়ানের ইউরোপ পরিভ্রমণের

সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করার চেষ্টা করলেন। ৩রা জুলাই তিনি রসকোট-এ উপস্থিত হলেন। তাঁর খাবার ছিল, ছোট একখানা জাহাজে ক’রে তিনি শত্রুর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সমুদ্রযাত্রা করবেন। জেনারেল ফুসের প্রদত্ত সংবাদ পেয়ে ইংলণ্ড সমুদ্রপথ বহুতল সুসংরক্ষিত করে তুললো। কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্র সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করার অসম্ভবতা পায়নি। ১১ই জুলাই, ক্যাপ্টেন মেইটল্যাণ্ডের অধীন “বেলারোকন” বৃহৎ জাহাজ তীরে এসে ঘোষণা করলো যে তাকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট আদেশ দিয়েছেন তিনি কোন জাহাজ বন্দর ত্যাগ করতে দেবেন না। তিন দিন পরে, মেইটল্যাণ্ড নেপোলিয়ানকে জানালেন, যদি তিনি ইংলণ্ডে যেতে চান তবে তাঁকে বেলারোকন জাহাজে আয়োজন করতে দেওয়া হবে এবং জাহাজটি নেপোলিয়ানের আদেশ অনুযায়ী কাজ করবে। নেপোলিয়ান বন্ধুদের সাথে পরামর্শ ক’রে ইংলণ্ডের আতিথ্য স্বীকার করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তাঁর কয়েক জন বন্ধু সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। তাঁরা বলেন যে ইংলণ্ডের শাসকবর্গের উপর জনসাধারণের প্রভাব অতি অল্প। কিন্তু তারা শাসকবর্গের প্রতিহিংসা রোধ করতে পারবে না। নেপোলিয়ান ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি জর্জের নিকট ইংলণ্ডে আশ্রয় প্রার্থনা ক’রে পত্র লিখলেন। “আমার ফরাসীদেশ বহু বিস্তৃত; চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত। আমার রাষ্ট্র জীবনের অবসান হয়েছে। আমি আজ গ্রীকবীর থেমিস্টোক্লিসের মত প্রাক্তন শত্রুর আশ্রয়কামনা করি, আমি বৃটিশ রাষ্ট্রবিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আমি মনে করি যে, আপনি আমার সমস্ত শত্রুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মহত্তম এবং স্থিরমতি।”

বার্লিনে কয়েকজন ফরাসী নৌ-সেনাপতি নেপোলিয়ানকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি ইংলণ্ডকে কখনও বিশ্বাস না করেন। কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁর সংকল্পচ্যুত হলেন না। সেদিনই বেলারোকন জাহাজের অধ্যক্ষ মেইটল্যাণ্ডের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নেপোলিয়ান জাহাজে পরামর্শ ক’রে বললেন, “আমি এই দুহুর্তে বৃটিশ বিধানের আশ্রয় গ্রহণ ক’রে বেলারোকন জাহাজে আয়োজন করলাম।” নেপোলিয়ানকে ক্যাপ্টেন মেইটল্যাণ্ড সম্রাট উপযোগী সম্মান জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

২৫শে জুলাই বার্লিনে বেলারোকন জাহাজে প্রিমাথ বন্দরে প্রবেশ করল এবং সেই দুহুর্তে নেপোলিয়ান তাঁর প্রতি ব্যবহারে বিরাট পরিবর্তন অনুভব করলেন। জাহাজের চারিদিকে প্রহরীর ব্যবস্থা করা হলো এবং কোন লোক কিনা অসম্ভবতঃ নেপোলিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলনা। কিন্তু ইংলণ্ডের লোক নেপোলিয়ানকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে বিধায়িত করলেন। ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের অভ্যর্থনা যতই দুখের হয়ে উঠলো, রাজশক্তির ততটা ততই পরিবর্তিত হলো। ৩০শে জুলাই নেপোলিয়ানকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে জেনারেল বোনাপার্টের হস্তে যদি কোন উপায় থাকে তবে তিনি ইংলণ্ডের এবং ইউরোপের মিত্রশক্তির শক্তি কিনট করবেন। এই কারণে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রয়োজন অনুসারে সংকীর্ণ করা হবে। সুতরাং সেটুকুসেবা বীণে তাঁর বাসস্থান নির্ণয় করা হলো।

এই প্রতিশ্রুতি শুনে নেপোলিয়ান সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং বৃটিশ সরকারের নিকট লিখিতভাবে পত্র —

সমুদ্রপথ

বেলারোকোন্ জাহাজ, অগাষ্ট, ৪, ১৮১৫

“বুটিশ মন্ত্রিসভা !

স্বর্গের ঈশ্বর এবং মর্তের মানুষ সাক্ষী করে, আমার বিরুদ্ধে অত্যাচার এবং আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পবিত্র অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে আমি গভীর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি স্বেচ্ছায় বেলারোকোন্ জাহাজে আরোহণ করেছিলাম। আমি ইংলণ্ডের বন্দী নই; আমি ইংলণ্ডের অতিথি। জাহাজের অধ্যক্ষের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি জাহাজে এসেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে, আমাকে আমার অসুচর্যবর্গ সমেত ইংলণ্ডে নিয়ে যাবার আদেশ তিনি পেয়েছেন। বেলারোকোন্ জাহাজে অধিরোহণের সুস্থূর্ত্তে আমি বুটিশ জাতির আতিথ্যের অধিকার পেয়েছিলাম। যদি বেলারোকোন্ জাহাজের অধ্যক্ষকে আদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বড়বন্দু মাত্র হয়ে থাকে, তবে বুটিশ জাতি তার সম্মান নষ্ট করেছে এবং তার জাতীয় পতাকাকে অবনমিত করেছে। যদি তারা আমার সেট হেলেনা বীপে নির্বাসিত করে, তবে বুটিশ জাতির পক্ষে তাদের সন্ধিহীনতা, তাদের রাষ্ট্রবিধি ও তাদের স্বাধীনতার কথা বলা পরিহাসে পর্যাবসিত হবে। বুটিশ জাতির আত্মসম্মান, বেলারোকোন্ জাহাজে আমার আতিথ্যের অবসানের সহিত অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

আমি ইতিহাসের নিকট আমার অভিযোগ জানাচ্ছি—যে শত্রু বিশ বছর ধরে বুটিশ জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, সে স্বেচ্ছায় তার দুর্ভাগ্যের দিনে বুটিশ জাতির আশ্রয় বাচঞা করেছিল। শত্রুর প্রতি প্রত্যা ও বিশ্বাসের আর কি জাঙ্ঘল্য প্রমাণ সে দিতে পারে? কিন্তু ইংলণ্ড সে মহাহুভব কার্যের কি উত্তর দিয়েছিল? বুটিশ জাতি শত্রুর প্রতি আতিথ্য-হস্ত প্রসারিত করেছিল, কিন্তু শত্রু আতিথ্য স্বীকার করার পরসুস্থূর্ত্তেই বুটিশ জাতি তার শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।”

ইতি—নেপোলিয়ান,

পত্র পরিচয় :—বুটিশ সরকার তাদের কার্যের অটুতা সর্বদে অচেতন ছিল না—কারণ সেট হেলেনা বীপে নির্বাসনের আদেশপত্র কোন কর্মচারী বা মন্ত্রীর স্বাক্ষর ছিল না। তারা নেপোলিয়ানের প্রতিবাদপত্র পড়ে উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এই ব্যাপারে স্কন্ধ হয়েছিল—সন্দেহ নেই। বেলারোকোন্ জাহাজের অধ্যক্ষ ও কর্মচারীগণ এই নির্বাসনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কারণ অধ্যক্ষের প্রতিশ্রুতির উপরে নেপোলিয়ান নির্ভর করেছিলেন। ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ নেপোলিয়ানের জনপ্রিয়তার ভিত্তি হয়ে একটি বহু পুরাতন জাহাজে করে তাঁকে সেট হেলেনার পাঠিয়ে দিলেন। জাহাজের অধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন যে নেপোলিয়ানকে “সন্ন্যাসী” বলে স্বীকার না করা হয়—নেপোলিয়ানকে “জেনারেল” আখ্যা দেওয়া হবে। ইংলণ্ডের রাজপুরুষদের মনের প্রসারতা নেই। নেপোলিয়ান বলেছিলেন—“সমস্ত ইউরোপ আমাকে সন্ন্যাসী বলে সম্বোধন করে। যে নামে ইচ্ছা ইংলণ্ড আমাকে সম্বোধন করুক—তারা আমাকে আমার নেপোলিয়ানত্ব থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।”

ইংলণ্ড নেপোলিয়ানকে এক প্রীয়প্রধান বীপে নির্বাসন

করায়। সেই বীপে নেপোলিয়ান নির্বাসনে তিলে তিলে জীবন কাট করলেন। ইংলণ্ড অসুস্থ ব্যবহার করেছিল বুটিশ রাষ্ট্র মেয়র সঙ্গে; রাষ্ট্র মেয়র এনিজাবেথের সঙ্গে বিরোধ সত্ত্বেও তাঁর আতিথ্য স্বীকার করে বথওয়েলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ইংলণ্ডের মধ্য দিয়ে পথ চেয়েছিলেন। এনিজাবেথ তাঁকে অতিথিরূপে গ্রহণ করে প্রায় ১১ বৎসর “না বন্দী না মুক্ত” অবস্থায় রেখেছিলেন। তারপর অসমর্থিত অপরাধে হত্যা করলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতা ইংলণ্ডের ইতিহাসে নতুন নয়। তবু কারা-জীবনে তিনি মেয়রকে ইংলণ্ডে রেখেছিলেন—কিন্তু নেপোলিয়ানকে প্রেরণ করা হল—“কংস-কারাগারে।” সেখানে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নেপোলিয়ান বলেছিলেন—

“ইংলণ্ড, আমাকে একখানি লাঙ্গল বেও—আমি সেট হেলেনা বীপে চাব করব।”

তাঁর শেষ বাণী :—“England Thy Name is Perfidy.”

“ইংলণ্ড ও বিশ্বাসঘাতকতা” সম অর্থবোধক।”

ভ্রাতা মিহাইলকে লেখা সাহিত্যসম্রাট

ডস্টয়েভস্কির পত্র

পত্র-পরিচয় :—১৮৪১ খৃঃ অব্দ, ডস্টয়েভস্কি যাত্র ২৮ বৎসরের যুবক। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত; অপরাধ—রাজদ্রোহ। ডস্টয়েভস্কির খ্যাতি তখন সমস্ত রাশিয়াতে বিস্তার লাভ করেছে, নবীনমল ক্রমশঃ ডস্টয়েভস্কির গুণ্ড হয়ে পড়েছে। তৃতীয় ক্রাসী বিক্রোহের স্কুলিক সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। অষ্ট্রিয়ার একচ্ছত্র নারক মেটারনিক পলাতক, ক্রাসী রাজা লুই ফিলিপ রাজাহীন, প্রাশিয়া বিকল, জারের পদনিম্নে পোলাও বন্দমান। এমন সময় রাশিয়ান সাহিত্যিকগণের লেখনীর আঘাতে রাশিয়ান জনগণ চঞ্চল। রাজপুরুষগণ বেশ সন্ত্রস্ত। ডস্টয়েভস্কির পুস্তক “পুওর পিপল” (হস্তি জনগণ) এর মধ্যে জার নিকোলাসের বিরুদ্ধে বড়বন্দুর আভাস পাওয়ার মেল; তিনি সবুধু কারাবদ্ধ হলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে—সঙ্গে আরও পাঁচজন বন্দু। তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হুইবারে তাঁদের গুলী করে হত্যা করা হবে—এক এক বার তিনজন, ডস্টয়েভস্কি শেষ বাক্যে। আর এ মিনিট যাত্র অবশিষ্ট—তাঁর মনে কত চিন্তা। প্রাণবাতী গুলীর দ্বারা অপেক্ষায় আছেন, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সন্ন্যাসীর আবেশ এ প্রাণকণ্ড সৃষ্টি; অপরাধীদের নির্বাসন। জীবনমুহুর্য যাক্ষার ডস্টয়েভস্কি অশূর জীবনোপলব্ধি করেছিলেন। চারদিন যাত্র সা তাঁকে দেওয়া হয়েছে—তারপর তাঁরা সাইবেরিয়ার দিকে রত হয়েন। তিনি ভ্রাতা মিহাইলের সঙ্গে সাক্ষাতের অসুস্থতি প্রার্থ করলেন। সাক্ষাতের পরিবর্ত্তে পত্র লেখার অসুস্থতি পেলেন। ত লিখলেন এই পত্র, বৃহস্পতিও রহিতের ঠিক পনের দিন। ঠিক এ কারাগারে অপেক্ষা করছেন—বৃহস্পতি আসন্ন; হঠাৎ বেশ পুনর্জীবন লা করেছে। এই পত্র রাশিয়া, তথা বিশ্বসাহিত্যের একটি অমূল্য রী

পিঠার পল হুর্গ, ২২শে ডিসেম্বর, ১৮১৫

“মিহাইল ডস্টয়েভস্কি।

ভাই মিহাইল, আমার প্রিয়তম বন্দু। সব স্থির হয়েছে, ৪ ২২শে ডিসেম্বর, আনাদিসকে লেকিয়োনভ সুচকাওরানের বরা

দিয়ে যাওয়া হ'ল। আমাদের নিকট মৃত্যুসংবাদ পাঠ করা হল, আমাদের ক্রম চূষন করতে আদেশ করা, আমাদের মাথার উপরে আমাদের তরবারি বিচূর্ণ করা হল। তারপর আমাদের কাঁসীর সাহা পোষাক পরিয়ে দেওয়া হল। আমাদের প্রথম তিনজনকে ভক্তের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তাদের গুলী করা হবে। আমি ছিলাম বঁট। এক একবারে তিনজন মৃত্যুবাণ আমাকে দ্বিতীয় বারে। এক মিনিট মাত্র সময় অবশিষ্ট—তারপর আমাকে গুলী করা হবে। তাই তুমি আমার মধ্যে এসে দাঁড়ালে। তোমার বিবরণ কত কথা আমার মনে এল, আমার সেই চরম মুহূর্তে তুমি একাই আমার সমস্ত মন অধিকার ক'রে নিলে, তখন আমি বুঝলাম যে আমার প্রিয় জাতাকে আমি কত ভালবাসি। আমি কোনমতে আমার বন্ধী-বন্ধু গ্লেনচিয়েড এবং ডুরোভকে চূষন করলাম। তাদের নিকট শেষ বিদায় নিলাম। হঠাৎ প্রত্যাবর্তনের বঁটা বেজে উঠল; আমরা ঘোষণা শুনলাম, সম্রাট জার আমাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করেছেন, তৎপরিবর্তে বিধান করেছেন, নির্কাসনদণ্ড; পদমকে কমা করা হয়েছে, সে তার সেনা বিভাগে কিরে যাবে। আমাকে বলা হয়েছে যে, আজ কিংবা কাল আমরা এখান থেকে চলে যাব। আমি তোমার সাক্ষাতের আবেদন করলাম, কিন্তু উত্তর এসেছে, "অসম্ভব"। আমি তোমাকে পত্র লেখার অমুমতি পেলাম, তুমি খুব তাড়াতাড়ি ক'রে উত্তর দিয়ো, কত শীঘ্র পারো উত্তর দিয়ো। আমার জন্তে ওরেনবর্গ হুর্গে চার বৎসর সশ্রম কারাবাসের বিধান করা হয়েছে, তারপর আমাকে সামান্য পদাতিক সৈন্য বিভাগে যোগ দিতে হবে।

আমার ভয় হচ্ছে, তুমি বোধ হয় আমার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছ। আমাকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন বন্দীর শকট থেকে অসংখ্য জনতা দেখেছিলাম। বোধ হয়, তাদের নিকট আমার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছেছে—এবং তার জন্ত তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ; এবার তুমি আমার সবকিছু নতুন সংবাদ পেয়ে আশঙ্কিত হবে।

তাই, আমি নিরুৎসাহ হইনি, আমার মনের ভেদ নষ্ট হয়নি। জীবনের স্পন্দন সর্বত্র অনুভব করা যায়, জীবন মানুষের অন্তরের মধ্যেই, মানুষের বাইরে নয়। আমাদের চারদিকে সর্বদা মানুষ বাস করবে; মানুষের মাঝে মানুষ হতে হবে, চিরকাল মানুষ হয়ে বাঁচতে হবে, চূড়ান্তের আগমনে আমরা ভেঙ্গে পড়বো না, ভগ্নচিহ্ন হবো না,—এই ত' হবে জীবন। এই ত' জীবনের কাজ, এই সত্য আমি উপলব্ধি করেছি। এই সত্য আমার অস্থি-রাসের মধ্যে প্রবেশ করেছে—আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।

আমার যে মস্তিষ্ক প্রতিদিন নব নব সৃষ্টি করত, শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর সাহচর্য অনুভব করত, আমার যে মস্তিষ্ক আত্মার সর্বোত্তম প্রয়োজন উপলব্ধি করত—সেই মস্তিষ্ক আমার স্বচ্ছত হয়ে গেছে। আজ মৃত্যু মাত্র অবশিষ্ট আছে, তার সৃষ্টি করেকটি প্রতিচ্ছবি মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেগুলি এখনো আমার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ ক'রেসি, সেগুলি আমাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলবে সন্দেহ নাই। এখনো আমার মধ্যে রয়েছে আমার অন্তর, সেই রক্তমাংস যা এখনো ভাল বাসতে পারে, দুঃখ ভোগ করতে পারে, কামনা করতে পারে, স্বপ্ন মনন করতে পারে; মোটের উপর এই ত' জীবন। এবার বিদায় তাই মিহাইল, বিদায়, আমার জন্ত অহুতাপ করোনা।

এবার জাগতিক বাস্তব ব্যাপারে আসব। বাইবেল যতীত আমার সমস্ত পুস্তক, আমার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, আমার নাটকের পরিকল্পনা, আমার সমাপ্ত উপভাস "একটি শিশুর খেলা" (A child's play) আমার নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। বোধ হয় এগুলি তুমি কিরে পাবে। আমার ওভারকোট এবং কিছু পুরাতন বস্ত্র বেখে গেলাম। যদি তুমি লোক পাঠাও তবে সেগুলিও পাবে। তাই মিহাইল, এবার আমাকে অনেক পথ পদব্রজে বেতে হবে, আমার অর্থের প্রয়োজন। যখন তুমি আমার পত্র পাবে, যদি তোমার কাছে থাকে আমার জন্ত কিছু অর্থ পাঠিয়ে দিয়ো। বিশেষ কাজের জন্ত বর্তমান অবস্থার খাসপ্রদ্বাসেঃ বায়ু অপেক্ষাও আমার পক্ষে অর্থের প্রয়োজন বেশী। অবশ্য আমার নিকট কয়েকছত্র লিখো। যদি মস্তো থেকে কোন অর্থ আসে, তবে আমার কথা স্মরণ করো, আমাকে পরিত্যাগ করো না, এই মাত্রই আমার বক্তব্য। আমার কিছু ধন আছে কিন্তু আমি নিরুপায়।

তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের আমার স্নেহচূষন দিয়ো। সর্বদাই তাদের যত্ন করো, আমার কথা বলা, তারা যেন আমার কথা ভুলে না যায়। বোধ হয় আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে। তোমার পরিবারের সকলের সহিত শান্তিতে থেকো, সাবধানে থেকো, তোমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করো।

প্রাণবন্ত হয়ে বেঁচে থেকো, আজকের মতন এমন ক'রে জীবনে আর কখনো আত্মোপলব্ধির প্রাচুর্য অনুভব করিনি। কিন্তু আমার বেহ কি সে তার বইতে পারবে? আমি জানি, আমি আজ কিরণ সীড়িত অবস্থার এই স্থান ত্যাগ করছি। কিন্তু তার জন্ত ভেবো না, তাই। আমি জীবন এত পরীক্ষার ভিত্তর দিয়ে অতিক্রম করেছি যে, কিছুতেই ভয় পাই না। বা' আসে আশুক!

প্রথম পুরবোগেই আমি তোমাকে আমার বিষয় জানাবো। বহু মাইকভ পরিবারকে আমার বিদায় সন্ভাষণ জানাবে। তাদের বলা, তার্কণের সতত সবকিছু জন্ত বক্তব্য দিচ্ছি। আমি চিরকাল তাদের মনে ক'রে রাখব, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে করে রাখব।-বারা আমাকে এখনো ভুলে যাবনি তাদের সকলকে আমার কথা বলা। আর বারা ভুলে গেছে তাদেরও আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও। আমাদের তাই ফুলিয়াকে আমার স্নেহচূষন জানিয়ো। তাই এপ্রিকে পত্র দিয়ো, আমার কথা জানিয়ো। আমার পুরতাত্ত ও ধৃষ্টিমাকে আমার সংবাদ দিয়ো, ওরীদের কাছেও পত্র দিয়ো। আমি তাদের মঙ্গল কামনা করি।

তাই! হয়ত আবার কোনদিন আমাদের দেখা হবে। নিজের বিষয়ে সচেতন হয়ে থেকো। ওপদানকে ভালবেসো। প্রার্থনা করি, তুমি বেঁচে থেকো, বতদিন না আমাদের দেখা হয়। হয়ত কোন একদিন আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে পাবো; আবার আমাদের বিগত তরুণ দিনের কথা আলোচনা করব, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলব—সেগুলি আজ রক্ত দিয়ে জ্বর থেকে মুছে দিলাম, তাদের আজ সমাধি দিয়ে গেলাম।

আমি আর কখনো লেখনী স্পর্শ করবো না, একি কখনো সন্দেহঃ আমার বিশ্বাস, চার বৎসর পরে আবার আমি লেখা আরম্ভ করব। ইতিমধ্যে যদি আমি কিছু লিখতে পারি তবে

কতই তোমাকে পাঠাব। প্রতিনিয়ত কঁচ করা আমার মধ্যে স্ফূর্ত করছে; মনের মধ্যে আমি কত নতন জিনিষ সৃষ্টি করছি—তা কি সব ধ্বংস হয়ে যাবে? আমার মস্তিষ্কে সব বিলীন যে যাবে? তারা সব বে আমার মস্তিষ্কের মধ্যে বিধ হয়ে স্ফূর্তিত হবে। আমাকে যদি লিখতে না দেওয়া হয়, তবে সে যে হবে আমার হৃদয়। এর চেয়ে দীর্ঘ পনর বৎসর আমি কাবাপারে থাকার মনঃ মনে করব, অবশ্য যদি আমার হস্তে একটি লেখনী দেওয়া হয়।

আমার নিকট সর্বদা লিখো। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংবাদ দিতেও ভুলো না। সমস্ত বাস্তব কথা লিখো, প্রতি পত্রে আমাদের পরিবার পরিজনদের ক্ষুদ্রতম সংবাদ দিতে ভুলে যেনো না। এই সংবাদগুলিই আমার মধ্যে আশার সঞ্চার করবে, জীবন সঞ্চার করবে। এই কাবাপূর্ণের অন্তরালে তোমার চিঠি পেয়ে যে কী রকম তৃপ্তি অনুভব করছি, তা যদি তুমি জানতে! গত আড়াই মাস বাৎসর আমার কোন পত্র পাওয়া বা লেখা নিবিদ্ধ ছিল। আমি ক্লেশবাহ্য ছিলাম, তোমার প্রেরিত অর্থ পাইনি বলে তোমার জন্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম, সেজন্য আমার খাবণা হয়েছিল তুমি অত্যন্ত অভাবে আছ।

তোমার সন্তানদের আমার হয়ে চূষন দিয়ে। তাদের সুন্দর কমনীর মুখগুলি আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না। তারা সুখী হউক, তুমি নিজে সুখী হও, ভাই, তুমি সুখী হও।

হুঃখ করো না, ভগবানের ভালবাসা স্মরণ করে আমার জন্ত হুঃখ করো না। তুমি বিশ্বাস করো যে, আমি হতাশ হইনি; মনে রেখো আমি এখনো নিরাশ হইনি। চার বৎসরের মধ্যেই আমার অমৃতের পরিবর্তন হবে। আমি তখন একজন পদাতিক সৈন্য হবো—আর আমাকে বন্দীজীবন যাপন করতে হবে না। মনে রেখো, সে দিন তোমাকে আলিঙ্গন করব। আজ প্রায় পৌশে এক বক্টা আমি মৃত্যুর কবলে ছিলাম; সেই সময়টুকু মৃত্যুর চিন্তা নিয়েই কাটিয়েছিলাম। এখন আমি জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছালাম, তখনই আবার আমি নবজীবন লাভ করছি।

আমার সবচেয়ে যদি কোন ব্যক্তির কোন তিত্ত গুণিত থাকে, যদি আমি কারো সঙ্গে কখনো বিবাদ করে থাকি, যদি কারো সঙ্গে আমার কোন অশ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে, তাদের সঙ্গে দেখা হলে বলো, তারা যেন সে সব কথা ভুলে যায়। আমার অন্তরে কোন ঘৃণা বা ঈর্ষা নেই। এই মুহূর্তে আমার যে কোন পুরাতন শত্রুকে আমি মিথিড় আলিঙ্গন করতে পারি; ও, সে কী অসীম তৃপ্তি! আমি আজ মৃত্যুর পূর্বে মনে মনে যখন প্রিয়জনকে বিদায় সন্ভাষণ জানাচ্ছিলাম, তখন আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার মনে হলো, আমার মৃত্যুসংবাদ তোমার মৃত্যু ভেঙ্গে আনবে, এবার শান্ত হও, ভাই। আমি এখনো বেঁচে আছি এবং ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকব, তোমাকে আলিঙ্গনের আশায়। এক্ষণে আমার মনে কেবল এই একমাত্র চিন্তা।

তুমি এখন কি করছ? আজ সমস্ত দিন ধরে কি করেছ? আমার সবচেয়ে কি সংবাদ শুনেছ? আজ কেমন শীত ছিল?

যদি এই পত্রখানি তোমার কাছে অতি শীঘ্র পৌঁছায়। নজ্জ চার মাস অবধি তোমার কোন সংবাদ পাব না। তুমি যে খামে করে গত দুই মাস টাকা পাঠিয়েছ, সেই খাম আমি দেখেছি—

তোমার নিজের হাতে লেখা ছিল আমার ঠিকানা। তাতে কুণ্ডি হয়েছিলাম যে, তুমি সুস্থ আছ।

যখন আমি অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমার মনে হয়, কত সময় বুঝা নষ্ট করেছি, ভুলের মধ্য দিয়ে, আলস্যের মধ্য দিয়ে। জীবনযাত্রার রীতিনীতি সবচেয়ে কত অনভিজ্ঞ ছিলাম, আমি সময়ের মূল্য বুঝি নি, আমি আমার অন্তর-দেবতা ও আত্মার প্রতি কত অবিচার করেছি। আমার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। জীবন ভগবানের একটি অমূল্য দান, জীবন আনন্দময়, প্রতি মুহূর্তকে এক একটি আনন্দের সুগে পর্য্যবসিত করা যায়। বর্তমানে জীবনের ধারা পরিবর্তন করে আমি আবার নবজন্ম লাভ করলাম। ভাই মিহাইল! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আশাহীন হবো না, আবার আত্মশক্তি অক্ষুর রাখব। আমার চিত্তকে পবিত্র রাখব। সেই আমার একমাত্র আশা, আমার একমাত্র সাহায্য।

কারা-জীবনের প্রভাব আমার মধ্যে দেহের আবেদনের কৃষাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি অতীতে আমার সবচেয়ে পূর্ব সচেতন ছিলাম না। আমার দারিদ্র্য আমাকে আজ কোন আঘাত দিতে পারে না। সুতরাং তোমার কোন ভয় নাই, শারীরিক কোন কষ্ট আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। এটা অসম্ভব! তবে এই অবস্থার স্বাস্থ্য কিরে পাওয়া কষ্টসাধ্য।

বিদায়, ভাই বিদায়! আবার কবে যে তোমাকে লিখতে পাব? তুমি আমার নিকট থেকে এই পঞ্চমস্তমের ক্ষুদ্রতম সংবাদ পর্য্যন্ত পাবে। যদি আমার স্বাস্থ্য অটুট থাকে তবে সমস্তই ঠিক থাকবে।

এবার শেষ বিদায় ভাই, শেষ বিদায়। তোমাকে আমি নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করছি, তোমাকে চূষন দিচ্ছি। হৃদয়ে কোন ব্যথা না রেখে আমার কথা স্মরণ করো। শোক করোনা, তোমাকে মিনতি করে বলছি, আমার জন্ত শোক করোনা! আগামী পত্রে আমার স্বাস্থ্য সবচেয়ে তোমাকে জানাব; তখন মনে করো, আমি তোমাকে কি বলেছি। জীবনের পরিবর্তন করে নিয়ো; জীবন নষ্ট করোনা। ভবিষ্যতের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিয়ো, তোমার সন্তানদের কথা ভেবো। তোমার সঙ্গে দেখা কবে হবে? আবার কবে দেখা হবে? বাহা কিছু আমার প্রিয়, আজ সমস্ত থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছি; এটা অত্যন্ত ক্লেশকর ব্যাপার। নিজেকে বিচূর্ণ করা যে কত বেদনাদায়ক! হৃদয়কে বিধ্বস্ত করা কী হুঃখজনক! বিদায়, ভাই আবার বিদায়। আমি নিশ্চিত যে, আবার আমাদের দেখা হবে। ভুলে যেওনা, আমাকে ভালবেসো। তোমার স্মৃতি যেন মিথিল হয়ে না যায়; তোমার ভালবাসার স্মৃতিই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আবার, আবার বিদায়, ভাই বিদায়—সর্বজনের কাছে বিদায় জানাচ্ছি।

তোমার ভাই—ফিউডর ডস্টরেভস্কি।

পত্র পরিণাম :—এই বিদ্রোহী কবিচিন্তে কত সুন্দর অনাকিল ড্রাফ্‌টেরম্বারা নিরন্তর প্রবাহিত ছিল—কী প্রপাচ সেই প্রেমের অভিব্যক্তি! অবশ্য ডস্টরেভস্কির এই কাবাজীবন ব্যর্থ হয়নি। তাঁর বহু লেখার মধ্যে এই সুদীর্ঘ কাবাজীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতা অঙ্কিত আছে, কাবাজীবনই বহু মাহুয়ের ভবিষ্যৎ মনুষ্যের পূজনীয় করেছ—আত্মোপলব্ধির সন্ধান দিয়েছে। ১৮৩১ সালে তিনি

নিরে বাওয়া হ'ল। আমাদের নিকট মৃত্যুসংবাদ পাঠ করা হল, আমাদের ক্রম চূষন করতে আদেশ করা, আমাদের মাথার উপরে আমাদের তরবারি বিচূর্ণ করা হল। তারপর আমাদের কাঁসীর মাথা পোষাক পরিয়ে দেওয়া হল। আমাদের প্রথম তিনজনকে স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তাদের গুলী করা হবে। আমি ছিলাম বঠ। এক একবারে তিনজন মৃত্যুবাং আমাকে দ্বিতীয় বারে। এক মিনিট মাত্র সময় অবশিষ্ট—তারপর আমাকে গুলী করা হবে। ভাই তুমি আমার মধ্যে এসে দাঁড়ালে। তোমার বিষয় কত কথা আমার মনে এল, আমার সেই চরম মুহূর্তে তুমি একাই আমার সমস্ত মন অধিকার করে নিলে, তখন আমি বুঝলাম যে আমার প্রিয় জাতিকে আমি কত ভালবাসি। আমি কোনমতে আমার বন্ধী-বন্ধু গ্রেসচিয়েন্ড এবং ডুরোভকে চূষন করলাম। তাদের নিকট শেষ বিদায় নিলাম। হঠাৎ প্রত্যাবর্তনের খটা বেজে উঠল; আমরা ঘোষণা শুনলাম, সন্ধ্যাট তার আমাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করেছেন, তৎপরিবর্তে বিধান করেছেন, নির্কাসনদণ্ড; পদমকে ক্ষমা করা হয়েছে, সে তার সেনা বিভাগে ফিরে যাবে। আমাকে বলা হয়েছে যে, আজ কিংবা কাল আমরা এখান থেকে চলে যাব। আমি তোমার সাক্ষাতের আবেদন করলাম, কিন্তু উত্তর এসেছে, "অসম্ভব"। আমি তোমাকে পত্র লেখার অমুমতি পেলাম, তুমি খুব তাড়াতাড়ি করে উত্তর দিয়ো, কত দীর্ঘ প্যারো উত্তর দিয়ো। আমার জন্মে ওরেনবর্গ হুর্গে চার বৎসর সশ্রম কারাবাসের বিধান করা হয়েছে, তারপর আমাকে স্নানান্ত পদাতিক সৈন্য বিভাগে যোগ দিতে হবে।

আমার ভয় হচ্ছে, তুমি বোধ হয় আমার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছ। আমাকে এখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন বন্দীর শকট থেকে অসংখ্য জনতা দেখেছিলাম। বোধ হয়, তাদের নিকট আমার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছেছে—এবং তার জন্ত তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ; এবার তুমি আমার সম্বন্ধে নতুন সংবাদ পেয়ে আশঙ্কিত হবে।

ভাই, আমি নিরুৎসাহ হইনি, আমার মনের তেজ নষ্ট হয়নি। জীবনের স্পন্দন সর্বত্র অনুভব করা যায়, জীবন মানুষের অন্তরের মধ্যেই, মানুষের বাইরে নয়। আমাদের চারদিকে সর্বদা মানুষ বাস করবে; মানুষের মাঝে মানুষ হতে হবে, চিরকাল মানুষ হয়ে বাঁচতে হবে, হুর্ভাগ্যের আগমনে আমরা ভেঙ্গে পড়বো না, গুরুচিন্ত হবো না,—এই ত' হবে জীবন। এই ত' জীবনের কাজ, এই সত্য আমি উপলব্ধি করেছি। এই সত্য আমার অস্থি-মাংসের মধ্যে প্রবেশ করেছে—আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।

আমার যে মস্তিষ্ক প্রতিদিন নব নব সৃষ্টি করত, শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর সাহচর্য অনুভব করত, আমার যে মস্তিষ্ক আত্মার সর্বোত্তম প্রয়োজন উপলব্ধি করত—সেই মস্তিষ্ক আমার হৃৎচ্যুত হয়ে গেছে। আজ সৃষ্টি মাত্র অবশিষ্ট আছে, তার সৃষ্টি করেকটি প্রতিচ্ছবি মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেগুলি এখনো আমার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে নি, সেগুলি আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলবে সন্দেহ নাই। এখনো আমার মধ্যে রয়েছে আমার অন্তর, সেই রক্তমাংস বা এখনো ভাল বাসতে পারে, দুঃখ ভোগ করতে পারে, কামনা করতে পারে, স্বপ্ন মনন করতে পারে; মোটের উপর এইত' জীবন। এবার বিদায় ভাই মিহাইল, বিদায়, আমার জন্ত অমৃত্যুপন করোনা।

এবার আঙ্গুষ্ঠিক বাস্তব ব্যাপারে আসব। বাইবেল ব্যতীত আমার সমস্ত পুস্তক, আমার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, আমার নাটকের পরিকল্পনা, আমার সমাপ্ত উপন্যাস "একটি শিশুর খেলা" (A child's play) আমার নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। বোধ হয় এগুলি তুমি ফিরে পাবে। আমার ওভারকোট এবং কিছু পুরাতন বস্ত্র রেখে গেলাম। যদি তুমি লোক পাঠাও তবে সেগুলিও পাবে। ভাই মিহাইল, এবার আমাকে অনেক পথ পদদ্বয়ে বেতে হবে, আমার অর্থের প্রয়োজন। এখন তুমি আমার পত্র পাবে, যদি তোমার কাছে থাকে আমার জন্ত কিছু অর্থ পাঠিয়ে দিয়ো। বিশেষ কাজের জন্ত বর্তমান অবস্থার খাসপ্রদানসহ বাসু অপেক্ষাও আমার পক্ষে অর্থের প্রয়োজন বেশী। অবশ্য আমার নিকট কয়েকছত্র লিখো। যদি মজা থেকে কোন অর্থ আসে, তবে আমার কথা স্মরণ করো, আমাকে পরিত্যাগ করো না, এই মাত্রই আমার বক্তব্য। আমার কিছু ঋণ আছে কিন্তু আমি নিরুপায়।

তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের আমার স্নেহচূষন দিয়ো। সর্বদাই তাদের যত্ন করো, আমার কথা বলো, তারা যেন আমার কথা ভুলে না যায়। বোধ হয় আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে। তোমার পরিবারের সকলের সহিত শান্তিতে থেকে, সাবধানে থেকে, তোমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করো।

প্রাণবন্ত হয়ে বেঁচে থেকে, আজকের মতন এমন করে জীবনে আর কখনো আত্মোপলব্ধির প্রাচুর্য অনুভব করিনি। কিন্তু আমার বেহ কি সে তার বইতে পারবে? আমি জানি, আমি আজ কিরূপ পীড়িত অবস্থায় এই স্থান ত্যাগ করছি। কিন্তু তার জন্ত ভেবো না, ভাই। আমি জীবন এত পরীকার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেছি যে, কিছুতেই ভয় পাই না। বা' আসে আনুক।

প্রথম সুযোগেই আমি তোমাকে আমার বিষয় জানাবো। বহু মাইকভ পরিবারকে আমার বিদায় সন্তাবণ জানাবে। তাদের বলো, তাদের সন্তত সন্ত হৃষ্টের জন্ত ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি চিরকাল তাদের মনে ক'রে রাখব, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে করে রাখব। ১০-বারা আমাকে এখনো ভুলে যাবনি তাদের সকলকে আমার কথা বলো। আর বারা ভুলে গেছে তাদেরও আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও। আমাদের ভাই কুলিয়াকে আমার স্নেহচূষন জানিয়ো। ভাই এপ্রিকে পত্র দিয়ো, আমার কথা জানিয়ো। আমার গুরুভাত ও গুড়িমাকে আমার সংবাদ দিয়ো, গুড়ীদের কাছেও পত্র দিয়ো। আমি তাদের মঙ্গল কামনা করি।

ভাই! হয়ত আবার কোনদিন আমাদের দেখা হবে। নিজের বিষয়ে সচেতন হয়ে থেকে। তপস্বানকে ভালবেসো। প্রার্থনা করি, তুমি বেঁচে থেকে, বতদিন না আমাদের দেখা হয়। হয়ত কোন একদিন আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে পাবো; আবার আমাদের বিপত ভরণ দিনের কথা আলোচনা করব, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলব—সেগুলি আজ রক্ত দিয়ে হৃদয় থেকে মুছে দিলাম, তাদের আজ সমাধি দিয়ে গেলাম।

আমি আর কখনো লেখনী স্পর্শ করবো না, একি কখনো সন্তব? আমার বিশ্বাস, চার বৎসর পরে আবার আমি লেখা আরম্ভ করব। ইতিমধ্যে যদি আমি কিছু লিখতে পারি তবে

অবশ্যই তোমাকে পাঠাব। প্রতিনির্বৃত্ত কঁপে কঁপে আমার মধ্যে জন্মলাভ করেছে; মনের মধ্যে আমি কত নতন জিনিষ সৃষ্টি করছি—তা কি সব ধ্বংস হয়ে যাবে? আমার মস্তিষ্কে সব বিলীন হয়ে যাবে? তারা সব যে আমার হস্তের মধ্যে বিধ হয়ে সঞ্চারিত হবে। আমাকে যদি লিখতে না দেওয়া হয়, তবে সে যে হবে আমার বৃথা হুঁসুটি। এর চেয়ে দীর্ঘ পনের বৎসর আমি কারাগারে থাকতে প্রেরণ: মনে করব, অবশ্য যদি আমার হস্তে একটি লেখনী দেওয়া হয়।

আমার নিকট সর্বদা লিখো। ক্ষুদ্রাঙ্গি ক্ষুদ্র সংবাদ দিতেও তুলো না। সমস্ত বাস্তব কথা লিখো; প্রতি পত্রে আমাদের পরিবার পরিজনদের ক্ষুদ্র চম সংবাদ দিতে তুলে যেয়ো না। এই সংবাদগুলিই আমার মধ্যে আশার সঞ্চার করবে, জীবন সঞ্চার করবে। এই কারাগারের অন্তরালে তোমার চিঠি পেয়ে যে কী রকম তৃপ্তি অনুভব করছি, তা যদি তুমি জানতে! গত আড়াই মাস যাবৎ আমার কোন পত্র পাওয়া বা লেখা নিবিড় ছিল। আমি রুগ্নশয্যায় ছিলাম, তোমার প্রেরিত অর্থ পাইনি বলে তোমার জন্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম, সেজন্য আমার ধারণা হয়েছিল তুমি অত্যন্ত অভাবে আছ।

তোমার সন্তানদের আমার হয়ে চূষন দিয়ে। তাদের সুন্দর কমরীর মুখগুলি আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না। তারা সখী হউক, তুমি নিজে সুখী হও, ভাই, তুমি সুখী হও।

হুঃখ করো না, গুগবানের ভালবাসা স্মরণ করে আমার জন্ত হুঃখ করো না। তুমি বিশ্বাস করো যে, আমি হতাশ হইনি; মনে রেখো আমি এখনো নিরাশ হইনি। চার বৎসরের মধ্যেই আমার অন্তর্ভেদ পরিবর্তন হবে। আমি তখন একজন পদাতিক সৈন্য হবো—আর আমাকে বন্দীজীবন বাপন করতে হবে না। মনে রেখো, সে দিন তোমাকে আলিঙ্গন করব। আজ প্রায় পৌষে এক বটা আমি মৃত্যুর কবলে ছিলাম; সেই সমস্তটুকু মৃত্যুর চিন্তা নিয়েই কাটিয়েছিলাম। যখন আমি জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছালাম, তখনই আবার আমি নবজীবন লাভ করেছি।

আমার সবচেয়ে যদি কোন ব্যক্তির কোন তিস্ত স্মৃতি থাকে, যদি আমি কারো সঙ্গে কখনো বিবাদ করে থাকি, যদি কারো সঙ্গে আমার কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে, তাদের সঙ্গে দেখা হলে বসো, তারা যেন সে সব কথা ভুলে যায়। আমার অন্তরে কোন ঘৃণা বা ঈর্ষা নেই। এই মুহূর্তে আমার যে কোন পুরাতন শত্রুকে আমি নিবিড় আলিঙ্গন করতে পারি; ও, সে কী অসীম তৃপ্তি! আমি আজ মৃত্যুর পূর্বে মনে মনে যখন প্রিয়জনকে বিদায় সন্ধ্যা জানাচ্ছিলাম, তখন আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার মনে হতো, আমার বৃত্তসংবাদ তোমার মৃত্যু থেকে জানবে, এবার শান্ত হও, ভাই। আমি এখনো বেঁচে আছি এবং ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকব, তোমাকে আলিঙ্গনের আশায়। একশে আমার মনে কেবল এই একমাত্র চিন্তা।

তুমি এখন কি করছ? আজ সমস্ত দিন ঘরে কি করেছ? আমার সবচেয়ে কি সংবাদ শুনেছ? আজ কেমন শীত ছিল?

যদি এই পত্রখানি তোমার কাছে অতি শীঘ্র পৌঁছায়। নতুন চার মাস আর তোমার কোন সংবাদ পাব না। তুমি যেখানে করে গত দুই মাস টাকা পাঠিয়েছ, সেই খাম আমি দেখেছি—

তোমার নিজের হাতে লেখা ছিল আমার ঠিকানা। তাতে বৃষ্টি হয়েছিল যে, তুমি পুত্র আছ।

যখন আমি অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমার মনে হয়, কত সময় বুঝা নষ্ট করেছি, তুলের মধ্য দিয়ে, আলতের মধ্য দিয়ে। জীবনযাত্রার রীতিনীতি সবচেয়ে কত অনভিজ্ঞ ছিলাম, আমি সময়ের মূল্য বুঝি নি, আমি আমার অন্তর-দেবতা ও আত্মার প্রতি কত অবিচার করেছি। আমার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। জীবন গুগবানের একটি অমূল্য দান, জীবন আনন্দময়, প্রতি মুহূর্তকে এক একটি আনন্দের বৃষ্টি পর্যাবসিত করা যায়। বর্তমানে জীবনের ধারা পরিবর্তন করে আমি আবার নবজন্ম লাভ করলাম। তাই মিহাইল। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আশাহীন হবো না, আমার আত্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখব। আমার চিন্তকে পবিত্র রাখব। সেই আমার একমাত্র আশা, আমার একমাত্র সাহায্য।

কারা-জীবনের প্রভাব আমার মধ্যে দেহের আবেদনের ক্ষমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি অতীতে আমার সবচেয়ে খুব সন্তোষিত ছিলাম না। আমার দারিদ্র্য আমাকে আজ কোন আঘাত দিতে পারে না। সুতরাং তোমার কোন ভয় নাই, শারীরিক কোন কষ্ট আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। এটা অসম্ভব। তবে এই অবস্থায় স্বাস্থ্য কিরে পাওয়া কষ্টসাধ্য।

বিদায়, ভাই বিদায়! আবার কবে যে তোমাকে লিখতে পাব? তুমি আমার নিকট থেকে এই পঞ্চমপত্রের ক্ষুদ্রতম সংবাদ পর্যন্ত পাবে। যদি আমার স্বাস্থ্য অটুট থাকে তবে সমস্তই ঠিক থাকবে।

এবার শেষ বিদায় ভাই, শেষ বিদায়। তোমাকে আমি নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করছি, তোমাকে চূষন দিচ্ছি। হৃদয়ে কোন ব্যথা না রেখে আমার কথা স্মরণ করো। শোক করোনা, তোমাকে মিনতি করে বলছি, আমার জন্ত শোক করোনা। আগামী পত্রে আমার স্বাস্থ্য সবচেয়ে তোমাকে জানাব; তখন মনে করো, আমি তোমাকে কি বলছি। জীবনের পরিবর্তন করে নিয়ে; জীবন নষ্ট করোনা। ভবিষ্যতের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিয়ে, তোমার সন্তানদের কথা ভেবো। তোমার সঙ্গে দেখা কবে হবে? আবার কবে দেখা হবে? বাহা কিছু আমার প্রিয়, আজ সমস্ত থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছি; এটা অত্যন্ত ক্লেশকর ব্যাপার। নিজেকে বিচূর্ণ করা যে কত বেদনাদায়ক! হৃদয়কে বিধ্বস্ত করা কী হুঃখজনক! বিদায়, ভাই আবার বিদায়। আমি নিশ্চিত যে, আবার আমাদের দেখা হবে। ভুলে যেওনা, আমাকে ভালবেসো। তোমার স্মৃতি কেন শিথিল হয়ে না যায়; তোমার ভালবাসার স্মৃতিই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আবার, আবার বিদায়, ভাই বিদায়—সর্বজনের কাছে বিদায় জানাচ্ছি।

তোমার ভাই—কিউডর ডস্টয়েভস্কি।

পত্র পরিণাম :—এই বিব্রোহী কবিচিত্তে কত সুন্দর অনাবিল জাতপ্রেমধারা নিরন্তর প্রবাহিত ছিল—কী প্রগাঢ় সেই প্রেমের অভিব্যক্তি! অবশ্য ডস্টয়েভস্কির এই কারাজীবন ব্যর্থ হয়নি। তাঁর বহু লেখার মধ্যে এই সুদীর্ঘ কারাজীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতা অড়িয়ে আছে, কারাজীবনই বহু হাজারের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের পূর্বসূরী করেছে—আত্মোপলব্ধির সন্ধান দিয়েছে। ১৯৬১ সালে তিনি

লিখেন "মৃত্যু-ভবন" (House of Death), ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে লিখেন "ভূগর্ভের পত্রাবলী" (Letters from the under world) ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে "পাপ ও শাস্তি" (Crime and Punishment)—সবগুলিই তাঁর সাইবেরিয়ার বন্দীজীবনের অপূর্ণ অভিব্যক্তি।

ভূগর্ভের ভবনের অল্পভূতির মূল কেন্দ্র ছিল মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বিশ্বশ্রুতির মূলে ঈশ্বর বিশ্বাস। সেই অল্পভূতির পরিচয় এই পত্র মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁর সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সর্ববাসিন্দায়। ১৮১৫-১৯১৫ পর্যন্ত, ফরাসী, জার্মান এবং ইংরাজী সাহিত্যকে তিনি অভিযাত্রার অল্পপ্রাণিত করেছেন, প্রভাবান্বিত করেছেন।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জনস্টোনকে লেখা রাষ্ট্রনায়ক

আব্রাহাম লিন্কনের পত্র

পত্র পরিচয় :—এই পত্রখানি অত্যন্ত বাস্তব। আপাত দৃষ্টিতে এই পত্রখানির মধ্যে লিন্কনের স্বয়ংস্বীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, সামান্য ৮০ ডলার দিয়ে তাঁর পরম আত্মীয়কে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। অথচ এই আব্রাহামই দাসপ্রথা রহিত করার জন্য পণ করেছিলেন, গৃহবৃত্ত আরম্ভ করেছিলেন, আদর্শের প্রতি প্রবল নিষ্ঠার আশ্রয়ে তিনি আমেরিকার ভিত্তি পর্যন্ত আন্দোলিত করেছিলেন। সেই আব্রাহাম নিজের বিমাতাকে, বিমাতাপুত্রকে মাত্র ৮০ ডলার ধার দিতে অস্বীকার করলেন, অর্ধের পরিবর্তে দিলেন উপদেশ। ভ্রাতা চাইল কুটি, তিনি দিলেন পাখরকুটি। তাঁর বৈমাত্র ভাই তখন ইলিনয় প্রদেশে বানের ক্ষেতে ধান তৈরী খাচ্ছে। তাঁর মাও সেখানে। সামান্য অর্ধে, সংসার চলা ভার। তবু আব্রাহাম সাহায্য করলেন না; আব্রাহাম দিলেন স্বল্প প্রত্যাখ্যানের বৃত্তি। সেদিন ছিল খৃষ্টের জন্মদিন। খৃষ্টানের নিকট বড়দিন পূণ্যদিবস, মাহুয় আত্মীয়-বন্ধনকে দান করে, উপহার দেয়। অথচ পুণ্যবান, পুণ্যস্বা আব্রাহাম দান করতে অস্বীকার করলেন। আপাত দৃষ্টিতে স্বয়ংস্বীয়তার পরিচয় বৈ কি।

প্রিয় জনস্টোন, ডিসেম্বর ২৪-১৮৪৮

তুমি ৮০ ডলার ধারের জন্য অস্বীকার করেছ, আমি তোমাকে এই অর্ধ দেওয়া সমীচীন মনে করিনা। আরো অনেকবার তোমাকে এখনই সামান্য ধার দিয়েছি, তুমি বলেছিলে—এবার আমাদের চলে যাবে ভালভাবে; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার তোমাকে অর্ধকৃত্ততার অস্বীকার মধ্যে দেখলাম। তোমার স্বভাবের মধ্যে কোন বিশেষ ক্রটির সন্ধান এইরূপ হয়। আমার মনে হয়, আমি তোমার সেই ক্রটির সন্ধান পেয়েছি। তুমি অলস নও, কিন্তু তুমি কর্ববিরূপ। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার পর তুমি একটি দিনও সম্পূর্ণ দিনভরে পরিশ্রম করেছ কিনা সন্দেহ। তুমি যে কাজ করতে খুব বেশী অনিচ্ছুক তাহাও নয়, তথাপি তুমি খুব বেশী কাজ করনা। তার কারণ এই যে, তোমার বিশ্বাস পরিশ্রম দ্বারা তোমার স্বার্থে উপার্জন হয় না।

যুগা সময় নষ্ট করার অভ্যাসই তোমার সমস্ত অভাবের মূল কারণ। তোমার নিজের হিতার্থে, বিশেষ করে তোমার সন্তানদের ভালের জন্য তোমাকে এই বদ অভ্যাস পরিহার করতে হবে।

তোমার সন্তানদের পক্ষে ইহার প্রয়োজন আরও বেশী; কারণ তাদের স্বভাবে এই মন্দ অভ্যাস দৃঢ়ভাবে বহুসূত্র হবার পূর্বেই এই মোহবৃত্ত হওয়া সহজ হবে। একবার অলস হয়ে পড়লে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন হবে।

তোমার এখন নগদ টাকা প্রয়োজন, আমি তোমাকে বলছি তুমি যে কোন লোকের অধীনে দিব্যরাজ পরিশ্রম করে কিছু নগদ অর্ধ উপার্জন কর। আমাদের পিতা ও তোমার পুত্রগণ মিলিত ভাবে তোমার সংসারস্বার্থের ভার গ্রহণ করুন। তোমাদের জমি চাষ করুন, ফসল জম্বান, আর তুমি নগদ অর্ধের জন্য অন্য কাহারো ক্ষেত্রে কাজ কর। সেই অর্ধ দিয়ে তোমার স্বপ্ন পরিশোধ কর। তোমার শ্রমের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক তুমি পাবে। বেশ, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আজ থেকে ১লা মে পর্যন্ত তোমার পরিশ্রমের জন্য বত ডলার তুমি পাবে, তার সমান ডলার আমি তোমার দেব। যদি তুমি এই পরিশ্রমের জন্য মাসে দশ ডলার পাও, আমি তোমাকে দশ ডলার দেব, অর্থাৎ তুমি মাসে দশ ডলার বেশী পাবে। এই উপার্জনের জন্য আমি তোমাকে সীসার খনিতে কাজ করতে বলছি না, অথবা কালিকোনিয়াতে গিয়ে সোনার খনিতেও কাজ করতে বলি না। তুমি এই ইলিনয়ে থেকে বত বেশী সত্ত্ব হর তাই উপার্জন করো।

যদি তুমি এইভাবে চল, তবে শীঘ্রই তুমি স্বপ্নমুক্ত হবে। এর চেয়ে আরও একটি ভাল কল হবে যে, তবিত্যক্তে স্বপ্ন করা অভ্যাস থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু আমি যদি এ বৎসর তোমার স্বপ্ন পরিশোধ করে দিই, তুমি আবার আগামী বৎসর এমনি স্বপ্নমুক্ত হবে। তুমি বলছ যে, ১০০ ডলারের জন্য তুমি স্বপ্নে তোমার স্থান বিনিময় করতে পার, সুতরাং মনে হয় তোমার স্বপ্নের মূল্য অতিশয় অল্প। তোমাকে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা নিয়ে তুমি ৪।৫ মাসের মধ্যেই ১০০ ডলার উপার্জন করতে পার। তুমি লিখেছ যে আমি তোমাকে উক্ত ধার দিলে তুমি তোমার জমি লিখে দেবে, আর যদি ধার শোধ না দেও, তবে আমি তুমি কেবল নিবে না।

তুমি একটি অকাট স্বপ্ন। তোমার জমি থাকতেই যদি তুমি অর্থনী হয়ে থাকতে না পার, তবে জমি বাদ দিয়ে কি করে বাঁচবে? তুমি আমার পরামর্শ অঙ্গসরণ কর। তুমি শীঘ্রই দেখবে যে, তোমার মূল্য ৮০ ডলারের বহুগুণ বেশী। ইতি—

তোমার স্নেহের ভ্রাতা
এ. লিনকন

পত্র পরিচয় :—পত্র পাঠ করে জনস্টোন লিনকন এই পত্রের উপদেশ অনুযায়ী চলেছেন কিনা জানি না। তবে এই পত্র আব্রাহাম লিনকনের বিবরণ্যের প্রমাণ না করে থাকা যায় না।

তৃতীয় নেপোলিয়ানকে লেখা কবিকুলরাজী
এলিজাবেথ ব্রাউনিঙ-এর পত্র

পত্র-পরিচয় :—বীর নেপোলিয়ানের জাতপুত্র পুত্রতান্তের মামা-মাহাশয়্যে ফরাসী দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছেন; অথচ শৌর্য্যে, বীর্য্যে, চরিত্রে কোন দিক দিয়েই তৃতীয় নেপোলিয়ান তাঁর পুত্রতান্তের সমকক্ষ নন। নামসামঞ্জস্য ভাবপ্রকাশ ফরাসী জাতিতে

সহজেই বিস্মিত করেছিল। কিন্তু ভিক্টর হিউগোর ভার তীক্ষ্ণবী, দুঃস্বপ্নী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে বিচলিত করা সহজ নয়। ভিক্টর হিউগো লিখেন এক অপরাধ ব্যক্তির Les Chatiments "লাস্যাটিমেন্ট"—তৃতীয় নেপোলিয়ানকে আক্রমণ করে এবং প্রমাণ করলেন যে তরবারি অপেক্ষা লেখনী শক্তি অনেক বেশী। তীক্ষ্ণ তরবারিকে ছত্র করা যায়, লেখনী দুর্বল হলেও অতি বলবানকেও ছত্র করে দিতে পারে। বাক্যবোধে অক্ষরিত তৃতীয় নেপোলিয়ান হুসাহলী সাহিত্যিক ভিক্টর হিউগোকে নির্বাসন-বণ্ড দিলেন।

পৃথিবীর চিত্তাঙ্গীল সহস্রভূতিসম্পন্ন অনেকেই এই কার্যের প্রতিবাদ জানাতে ইচ্ছা করলেন কিন্তু নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জানাতে সাহস করলেন না। ইংরেজ-মহিলার মধ্যে এলিজাবেথ ব্যারট ব্রাউনিঙ নিম্পূহ হয়ে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানকে লিখেন একখানি পত্র, ব্যক্তিগত ভাবে। সাক্ষাৎ ভাবে তিনি ভিক্টর হিউগোকে জানতেন না, নেপোলিয়ানকেও জানতেন না। সমর্যবসায়ী শিল্পী, সাধক ভিক্টরের জন্ম সহস্রভূতি প্রণোদিত হয়ে অচেনা বন্ধুর জন্ম তিনি এই অপূর্ণ পত্র রচনা করলেন :—

"সহস্রভূত সম্রাট,

আমি সামান্ত নারীমান্ন। সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতন আমার কোন ঐশ্বর্য্য নাই। আপনার উপর আমার দাবী একমাত্র সবলের উপর দুর্বলের দাবী। সম্ভবতঃ আমি যে একজন ইংরেজ-কবির পত্নী এবং ইংরেজ কবিসৌন্দর্য্যের মধ্যে যে আমি পরিচিত তাহাও হয়ত সম্রাটের জানা নেই। আমি আমার দেশে রাজার নিকট কখনো কোনো আবেদন নিয়ে উপস্থিত হই নাই, এবং রাজপুরুষকে কি ভাবে সম্বোধন করতে হয় তাও জানি না; তবু আমি পুস্তকের মধ্য দিবে এবং সাধনার মধ্য দিবে অনেক বিখ্যাত চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি। সেই তরসারই সম্রাট নেপোলিয়ানকে আমার মনোভাব জ্ঞাপন করতে সম্পূর্ণ অপারগ বলে মনে করি না।

আমি সম্রাটকে একটু ধৈর্য্য ধারণ করে আমার আবেদন পাঠ করার জন্ম অসুখোষ জানাচ্ছি। এ আবেদন আমার পিতৃ নয় এবং আবেদন আমার নিম্নেরও নয়। Contemplation নামে একখানি পুস্তক ভাববিহ্বল চিত্তে, অক্ষয়িত্ত নেত্রে এবং উদার হৃদয় নিয়ে আমি পাঠ করেছি। এই পুস্তকের লেখক-ঐশ্বর্য্য রাজনৈতিক প্রবন্ধের মধ্য দিবে আপনার প্রতি গভীর অন্বেষণ করেছেন, তিনি এখন আরসী বোপে তাঁর অর্ধাটিন এবং অন্বেষণ মন্তব্যের জন্ম নির্বাসন-বণ্ড ভোগ করছেন। এই লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আমার পরিচয় নাই, আমি কখনো তাঁর মুখও দেখি নাই, আমি অল্প এখন তাঁর জন্ম কোন প্রকার ক্রমা প্রার্থনা করতেও আসি নাই, সত্যই ত এই লোক ক্রমা পেতে পারে না। ক্রমা চাওয়ার উপযুক্ত পাত্র তিনি নন। তবে একটি কথা বলব, এই ব্যক্তি আর হাই হট্টন না কেন, তিনি ফরাসী দেশের কবি। আপনি সম্রাট, দেশের সমস্ত মহত্ব ও গৌরবের সর্বাধিনায়ক, আমার অসুখোষ, আপনি সেই কবিকে শরণ রাখবেন এবং তাঁকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না।

সম্রাট, Napoleon le petit (ক্ষুদ্র নেপোলিয়ান) সহজে তিনি যে মহত্ব্য করেছেন, প্রকৃত তাহা সম্রাটের মর্যাদাকে স্পর্শ করেছি। কিন্তু বাহা আপনারকে স্পর্শ করবে তা' ভবিষ্যতের

ঐতিহাসিকপণের লেখনী; তারা লিখবে, ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ানের রাজ্যকালে ফরাসী কবি ভিক্টর হিউগো নির্বাসনে জীবন বাপস্ব করেছেন, যখন আপনার দেশের লোক আপনার অসুখোষ কবি, সৈনিক, বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যা গণনা করবে, তখন হয়ত কেউ জিজ্ঞাসা করবে, আমাদের দেশের জাতীয় কবির নাম কোথায়? হয়ত ভিক্টর হিউগোর নির্বাসন রাষ্ট্রদ্রোহরূপে সমর্থন করবে, হয়ত বা ভাবপ্রবণ উচ্ছাসী প্রজারা তাঁর জন্ম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করবে না। কিন্তু আমার মতন নারীরা? আপনার ভবিষ্যৎ বংশধর যখন তাঁর কবিতা পড়বেন, তখন তিনি গৌরবের সঙ্গে শরণ করবেন যে, তাঁর সম্রাট পিতার মহত্ব একদিন এই মহান কবির দুর্বলতাকে ফরাসী দৃষ্টিতে বিচার করেছিলেন।

হে বিরাটপুরুষ, আপনি অতিশয় মহান, কবিচিত্তের বৈচিত্র্য, বিচার মেধার প্রাচুর্য্য, কবি-মনের ক্রোধ, চাকল্য এবং লোকাতীত তীক্ষ্ণ অসুখোষকে আপনি উদার দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। আপনি মনে করতে পারেন, যে যুহুর্ন্তে কবিরা অকারণে কাহাকেও খুণা করেন, সেই যুহুর্ন্তে তাঁরা অল্প কোন স্বর্ণের প্রেমে ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন, হয়ত কবির দৃষ্টি তখন অল্প কোথায়ও মায়াজ্বর অপূর্ণ আলোর সন্ধান পেয়েছেন। এইরূপ শত্রুকে, দোষীকে, পাপীকে ক্ষমা করুন। আপনার ক্রমা ঐশ্বর্য্যে ভাব কার্যের অস্বাভাবিক প্রমাণ করুন। হিউগোর কাব্যমোহীনের অক্ষরকা বেন আপনার রাজসুটকে অতিবিক্ত না করে। ইশ্বর যেমন তাঁকে প্রতিদান করে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করেছেন, আপনিও মার্জনা দেখিয়ে তাঁর প্রতি পক্ষপাত করুন। তাঁকে আপনি বিনা সর্ভে হেতু কিরিয়ে নিয়ে আসুন, সেখানে যে তাঁর কন্ডার সমাধি রয়েছে।

আমি কাউকে না জানিয়ে এই কয়েকটি কথা লিখলাম। যা নারী হয়ে দরাময়ী সম্রাজ্ঞী ইউজেনের মধ্যবর্তিতার এই প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করা উচিত ছিল; কিন্তু আমি যে পত্নী, পত্নী হই আমি কি করে ধারণা করব যে, সম্রাট-মহিষীর পক্ষে যাই অবমাননাকারীকে ক্ষমা করা সম্ভব? বঙ্গ সম্রাটের পক্ষে অপরাধীকে ক্ষমা করা অধিকতর সহজ।

এক অনমনীয় উচ্ছাস-প্রণোদিত হয়েই আমি সম্রাটের জন্ম এই কল্পনার জন্ম আবেদন জানাচ্ছি। মনে করবেন, হিউগো গুণবৃত্ত বহু ব্যক্তি নীরবে মনের মধ্যে এইরূপ আবেদন পে করেছেন, সে আবেদনকে এক নারী ভাবা দিবে প্রকাশ করে তৃতীয় নেপোলিয়ানের উপর আমার বিশ্বাস আছে। এ লোকায়ত্ত রাজ্য শাসনকে ভালবাসি, তাই প্রথম থেকেই এ বুঝেছি যে, লোকায়ত্ত শাসনধারা আপনার ধারাই আপনার দিবে সমস্ত ইউরোপে সকলজা লাভ করবে। আপনি মনঃ করবেন, সেই বিশ্বাস আমার আছে। আপনি উদারতার সঙ্গে করবেন, এই বিষয়ে আপনি নেপোলিয়ানের অসুখোষী হবেন।"

পত্র পরিণাম :—অবশ্য এই পত্রখানি (১৮৫৭) তীক্ষ্ণ আঁচ সঙ্গে লেখা হলেও নানা কারণে শেষ পর্য্যন্ত তাকে বেওয়া হয় নেপোলিয়ানের হাতে পৌঁছায়নি। কারণ, তাঁর জন্ম ছিল এই পত্রের মধ্য দিবে হুই দেশের মনোবালিত হুট্ট হব। নেপোলিয়ান একটু উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন, তবু ইউ তিনি যথেষ্ট প্রজ্ঞা অর্জন করেছিলেন। তিলা ক্রন্দকার

পরেও নেপোলিয়ানের প্রতি এলিজাবেথের প্রস্তাব গ্রহণ পার নি। তাঁর A Tail of Vilafranca পত্রে নেপোলিয়ানের প্রশস্তি আছে বটে (১৮৬০)

নেপোলিয়ানের রাজত্ব কাল পর্যন্ত ভিক্টর হিউগো নির্বাসনে জীবন বাপন করেছিলেন। ১৮৭০ সালে নেপোলিয়ান সিদানের হুঁকে পরাজিত হয়ে নিজেরই করানী দেশে গিয়ে এসেছিলেন।

বিখ্যাত নাট্যকার ভিক্টরিয়ান সার্ডকে লেখা অবিস্মরণীয় অভিনেত্রী সারাহ বারনহার্ড-এর পত্র

পত্র পরিচয়:—১০ বৎসর বয়সেও ধর্মপাশ বৃদ্ধা করানী অভিনেত্রী আমেরিকার রঙ্গমঞ্চকে জড়িত করে দিলেন। নৃত্য ক্ষেত্রে, অভিনয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার চটল সমাজে সারাহ বারনহার্ড অপরূপ মোহমাল বিস্তার করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও অলৌকিক স্মৃতিশক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করত। সুখী সমাজের সঙ্গে তিনি মিশেছেন অকুণ্ঠভাবে; তাঁর কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা খুব সরস। তিনি যদিও ধর্মবাক্যের অভিভাবককে শৈশবের শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যৌবনের প্রথমপর্বেই কিন্তু তিনি অভিনেত্রীর জীবন আরম্ভ করলেন। কিন্তু কাব্যচর্চা করেও তিনি আনন্দ পেতেন এবং আনন্দ পরিবেশন করতেন। পত্র লেখার মধ্যে তিনি প্রচুর তৃপ্তি লাভ করতেন। পত্রের ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনের কামনা বাসনা বহুধা ব্যক্ত করেছেন। তিনি জীবনকে কখনো সংবৃত করতে চেষ্টা করেন নি, করার প্রয়োজনও মনে করেন নি। বা' পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছেন তাকে পেতে তিনি চেষ্টার কার্পণ করেন নি—সে মানুষ হউক কিংবা বস্তুই হউক। প্রেমের ব্যাপারে সারাহ সম্রাজ্ঞী, খুব কম মানুষেরই শক্তি ছিল সারাহের আকর্ষণকে অতিক্রম করে যাওয়া।

একদিন প্যারিসের এক কক্ষেতে তিনি দেখলেন, ভিক্টরিয়ান সার্ড বসে আছেন। এই সেই বিখ্যাত নাট্যকার? তাকে পেতেই হবে। উৎসাহে সারাহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে লিখলেন পত্র। তারপর অবিরাম পত্রাচার চলছে, বৎসরের পর বৎসর; কোন স্রাতি নেই—অবসর নেই। প্রথম দিন যেমন উদ্যম পত্র লিখেছেন, প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাস—জীবনের শেষ মুহূর্তের

পত্রেও সেই উদ্যমতা। তাঁদের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে হুঁফুর পর। অপরূপ এই পত্রগুলি।

“হে আমার অপরূপ তরুণ বহু! আজ রজনীতে তুমি কোথায়? তোমার পত্র এসেছে মাত্র এক ঘণ্টা পূর্বে। সেই একটি ঘণ্টা কী নির্ভর, কী ভীষণ নির্ভর! আমি আশা করেছিলাম, সেই এক ঘণ্টা আমার সঙ্গে তুমি অতিবাহিত করবে আমার এখানে।

তোমার বিহনে প্যারিস আমার কাছে হুঁফুরা। তোমার সহিত পরিচয়ের পূর্বে, প্যারিস ছিল প্যারিস; প্যারিসকে বর্ণ বলে কল্পনা করতাম, আর আজ প্যারিস আমার কাছে নির্জন, উৎসব, বিরাট মনোপ্রাণের; প্যারিস একটি বিরাট ঘটিকাবন্ধ—যে ঘটিকাবন্ধের হস্ত নেই, বিরামহীন তার গতি।

তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে আমার স্মৃতিকে যে সমস্ত চিত্র দোলা দিত সে সমস্ত আজ সব হুঁছে গেছে, তাবের পরিবর্তে দেখছি আমাদের সেই মিলন-মুহূর্তগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এখন আর আমি তোমার নিকট থেকে দূরে সরে থাকতে পারছি না। তোমার ভাষা যদিও মাঝে মাঝে তিক্ত, তবু আমার মন থেকে সমস্ত পার্থিব চিন্তা দূর করে দেয়। আমাকে আনন্দ দেয়, আমার অভিনয়কলা তোমার ভাষার জীবন্ত হয়ে উঠে, মুহূর্তান্তে এসে আমার অভিনয় তোমার ভাষার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। আজ আমার পক্ষে তোমার ভাষা আলো-বাতাসের মত অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে।

তোমার একটি শব্দের জন্ত আমি কুণ্ঠিত, পিপাসিত। তুমি আমাকে বিহ্বল করে দিয়েছে, তোমার ভাষা আমার খাঁড়, তোমার নিঃশ্বাস আমার সুবাসার। তুমি আমার সর্বস্ব।

তোমার সারাহ।”

পত্র পরিচয়:—এই পত্রগুলি পৃথিবীর প্রকাশিত পত্রাবলীর অন্ততম রত্ন। সারাহ নেই, রয়েছে তার অনবদ্য দান—জীবনের গতির সঙ্গে তাবের সামঞ্জস্য, ভাষার সামঞ্জস্য।*

* উপরোক্ত পত্রগুলি অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রীর অনূদিত “বিখ্যাত বিচিত্র পত্রাবলী” নামক গ্রন্থটি থেকে গৃহীত হয়েছে। আমরা তাঁর সৌজন্য স্বীকার করি।—স

নিজের আঁকা ছবি সহজে রবীন্দ্রনাথ

(শ্রীমামিনী রায়কে লিখিত চিঠি থেকে)

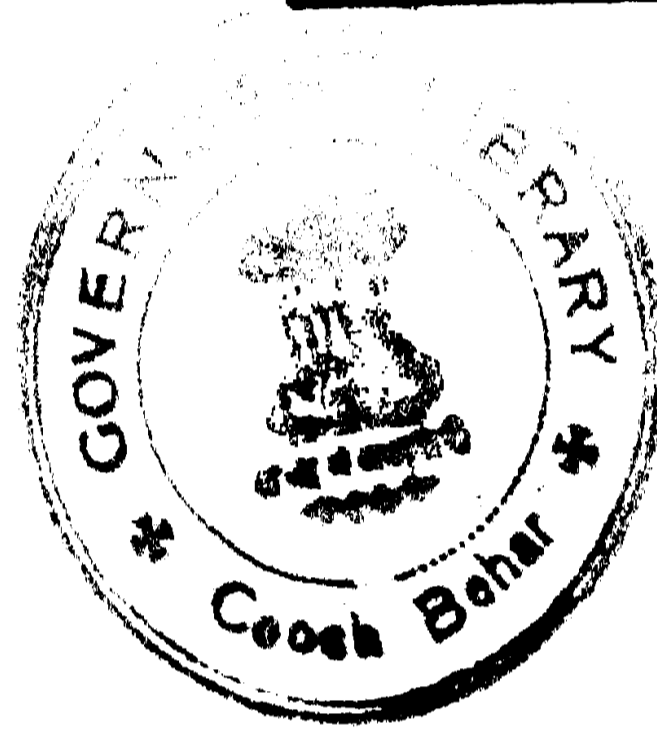
...আমার ছবি আঁকা সহজে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই, আজ সুদীর্ঘকাল ভাবার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাবার ব্যবহারে আমার অধিকার হয়েছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কোনো বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কখনো কখনো কীকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। যখন প্যারিসের আর্টিস্টরা আমাকে অভিনয় করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোনখানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধ করি শেষ পর্যন্তই তুলির সৃষ্টি সহজে আমার মনে কিনা দূর হবে না। আমার বয়সের সোকেয়া আমার স্মৃতিশক্তি থেকে যে কীভাবে অনুভব করি তাকে প্রকাশিত করি

সেজন্য তাঁদের দোষ দেইনে। আমি জানি চিত্রকর্মের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কতৃক্ষের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো কৃষিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রকর্মের গুণ তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলেই মুক্কিরানা করে মহালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এসেলে আমাদের রচনা অনেক দিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে তোমাদের নিকৃত অভ্যর্থনায় মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিচার নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতিলাভ করে বেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।”

যুগের স্মৃতি
—বিজয়কুমার মণ্ডল



আলোক চিত্র



ঐ জানালার কাছে বসে আছে—
—দীপক চাকলাদার



গুরুবাটে
—বিকল দিৱ

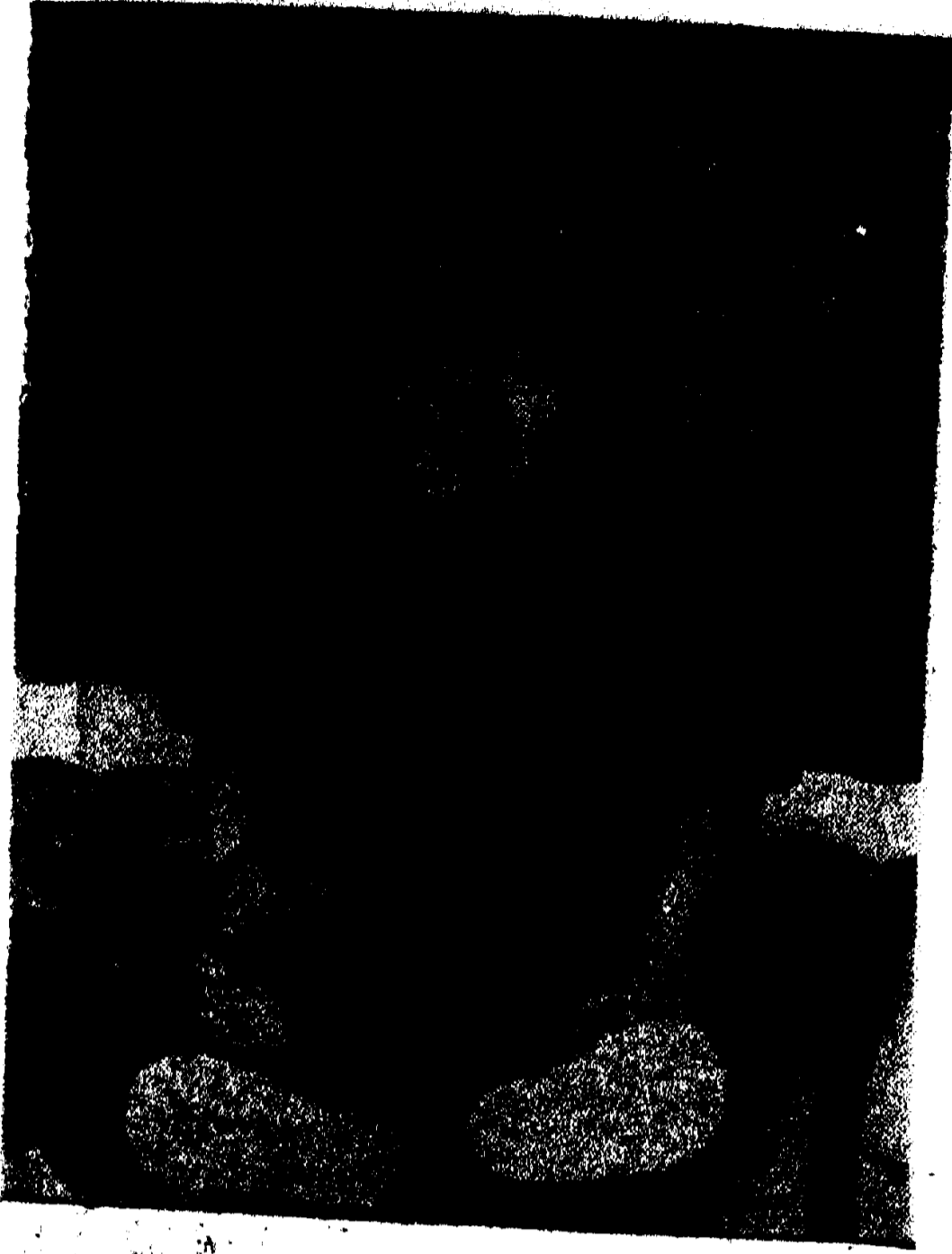
—প্রলাভকুমার বসিক



—দেবরশ্মি চক্রাভাষ্য

—গৌর চক্রবর্তী





—हस्ता वीर

शिशु-महल

—हिमांत सुप्रोनाथार



—उत्तम वीर





बालक टम्

—बालक वर



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

ছত্রিশ

চারুবালা তার সর না। আবার মাহুয শুয়ে পড়ল।
বিনিবউকে বার দুই ডেকে দেখে সাড়াশব্দ নেই। অমনি
স টিপিটিপি বেরিয়ে পড়ল। চোরের বেহুদ।

নৌকো কাল এপারে এনে কোন জায়গায় রেখেছিল, তা সে
জানে। চর হল পচা, চারুবালায় সে বড় অসুগত। জগার অল্পমান
মুখ্য নয়, কেশেভাটার যাবার গোপন খবর সে-ই দিয়েছিল
চারুবালাকে।

বড় তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। হরগোজা-ঝাড়ের পাশে ওপারের
দিকে ছোঁচ রেখে বসে আছে—কখন পচা নৌকো নিয়ে আসে। বড়
হত-কানোয়ার এদিকে না-ই এল, কিন্তু সাপ তো পায়ে পায়ে দেখা
পায়। কিন্তু এখন কেবল পালানোর চিন্তা, অস্ত কথ্য মনে
আসছে না।

নৌকো ডাঙা কাছাকাছি এলে পুটুলি হাতে নিয়ে জলকাদা
ভেঙে গলুইয়ে উঠে বসল। জলে পা বলিয়ে দিয়ে কাদা ধুচ্ছে। একলা
পচা। পচা হেসে বলল, ভাবলে বুঝি তোমার কেল চলে যাব।

চারু বলে, হচ্ছিল তো তাই।

বাজু—টেব পায়ে মজা। আহ হাঙ্গিল-করা জায়গায়।
এর সঙ্গে কিছু মেলে না। সে হল কাঁচা-বাধা—বাঘ বুনা-পুয়োর
বুনা-মোব—

এখানে তেমনি নগেনশশী। আমার ভাই-ভাজও বড় কম
যায় না।

হুইয়ের ভিতরে চুকে চারুবালা চুপচাপ বসল। তার পরে আর
নবাই এসে যায়। শুধী মন্থে আগে আগে, পিছনে শশী গোয়াল
বলাই আর জগা।

চারুবালাকে দেখে শশী ঘোষ বড় খুশি : দিখি বয়েছে। দেখ,
আগি ফুল কয়েছিলার। মেয়েমাহুয হল বকাচণ্ডী। জঙ্গলের
বড় পীর-ঠাকুর বেশির ভাগ হলেন মেয়ে। বউকে যদি সঙ্গে নিতাম,
হলে ক'টা অমন বেঘোরে বেত না। কাঠুরে মউল বাদার বার,
জর। নিয়ে চলে আসে, তাদের কথা আলাদা। বসত ঘর কিন্তু
মেয়েমাহুয ছাড়া হয় না।

তা কেন হল, বাবেজামটা বড় জেরি করছে। কি হল

তার? বউ মাপি ধরে কেলছে না কি বেকনোর মুখে? বা
দজ্জাল বউ! ভাঁটা অবস্ত হয়নি এখনো, জোরায় চলেছে।
কিন্তু চারুবালা আগেভাগে এসে পড়েই হুশকিল করল।
হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে বিনি-বউ দেখবে, চারুবালা বিছানার
নেই। খোঁজ-খোঁজ পড়ে যাবে। গগন তো অনেক খবরই
রাখে—বোনের খোঁজে তাকে তাকে এই অবধি এসে পড়বে হয়তো।
হামলা দেবে নৌকোর। আর কিছু না হোক, টোকাটি হৈ-হরার
ব্যাপার তো বটে। বাবেজাম এসে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ছাড়বে,
ভাঁটা অবধি জেরি করবে না। শুণ টেনে উজান বেয়ে যাবে খালের
এই পথটুকু। করালীতে পড়ে জোরায় মেয়ে উঠবে। তার পরে
দোরানিতে চুকে ভিন্ন মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। ধানের পালার
নিচে ইঁদুরের গর্তের যেমন নানান মুখ থাকে—এক মুখে খোঁড়াখুঁড়ি
লাগালে অস্ত মুখে ইঁদুর কুড়ুৎ করে বেরিয়ে পালার। বাধাবনের
গাড়ে-খালেও ঠিক সেই পতিক।

আসে কই বাবেজাম? বলাই খানিকটা এগিয়ে দেখে আসবি
নাকি?

বলতে বলতে হরগোজা-ঝাড় বেড় দিয়ে উদর হল বাবেজামের
ছায়ামূর্তি। পচা তাকিয়ে দেখে বলে, জাল আনিস নি?
জালের ব্যবস্থা করা হয়নি যে তোর ভরসায়।

বাবেজাম বলে, আছে জাল। আরও সব আছে।

বাবেজামের পিছন ধরে আসে বাজা ছেলেরা। আরও কতক
দূর পিছনে ফুটকাট করে কাদার আওয়াজ তুলে আসে—কী আঁচব,
অন্নদাসী। অন্নদাসীই তো। জালও আছে। বাবেজাম একরাশ
পোর্টলাপুটলি বাড়ে নিয়েছে, জাল বয়ে আনছে অন্নদাসী।

জগা অবাক হয়ে বলে, আন্ত সংসার নিয়ে চলি যে একেবারে।

বাবেজাম আমতা-আমতা করে বলে, বড় ভাগটা ছেলেরা।
ছেড়ে বেতে পারিনি, মন হ-হ করে। আবার যা না হলে
বাজারই বা সামাল দেব কে? কারে কেচে কাপড় কপা করে বসে
আছে, ছেড়ে গেলে বউ রকে রাখত না।

জগা বলে, মিলে তো কোঁকল বাধাবি সেই জায়গায়?

না মিলে এখনই যে লেসে যায়। পাড়া তোলাগাড় হবে—
জানতে কারো কিছু থাকি থাকবে না।

বাড় নেড়ে শশী ঘোর ধুব ভারিক করে : ভালই তো, ভালই তো। কথা-কথাত্তর কি বঙ্গভাষাটি না হল তবে আর বসত কিসের ? সে হল বনবাস। ভাল করেছে রাধে।

জোরারে নৌকা ছাড়ল। বাবে কিন্তু দক্ষিণে—বিস্তর দক্ষিণে। উঁচির শেষ বেখানে। কালাপানির মুখে। হালে বসেছে অঙ্গরাধ, উজান কেটে এগুচ্ছে। রাত্রিবেলা কালাজলে অঙ্গলের মধ্যে গুণ টেনে কাজ নেই। ঝাঁড় রয়েছে চারখানা—বলাই আর রাধেজাম—তিন জোরান লেগে গেছে। বুড়ো শশী কুঁড়ির চোটে বসে গেছে বাকি ঝাঁড়খানার। সে-ও টানছে—কয়েক টানে কাতর হয়ে বসে বসে হাঁপায়। রাধেজাম হেসে বলে, তোমার এ কাজ নয়। কয়েকটা নিরে এক ছিলিম জুত করে সাজ দিকি। সারা পথ তুমি ভাষাক খাইয়ে বাবে সুকলি মশায়।

করালীতে পড়ে এইবার। হাত শক্ত করেছে জগা। হালের মুঠোর কাঁচ-কাঁচ আওয়ার গুঠে, দড়ি কড়কড় করে। কালুকফুলুক কেন করে সে হুইয়ের দিকে—হুইয়ের তলে কি ? ঝাঁড় তুলে ধরে মকোড়কে বলাই ভাকার একনজর জগার দিকে, কথাটা জিজ্ঞাসা করলে হয়। কিন্তু মুখ খোলবার উপায় নেই। মরমাহুবেব এসো-মুখের কথাবার্তা এ জায়গার চলে না। যেয়েলোক রয়েছে। শুধু অন্নদাসী থাকলেও হত-চাকুবালা রয়েছে। মানহেলার ভাল ঘরের মেয়ে—আজ্ঞেবাজে কথা শুনে কি ভাববে ? হয়তো বা করকর করে উঠবে এই মার-গাওর উপরেই।

দোরানির মধ্যে হুকে পড়ে এককণে নিশ্চিত। আর কেউ নিশানা পাবে না। বে খালের দুটো মুখই বড়-পাণ্ডে পড়েছে সেই হল দোরানি—হুই মুখে একই সময় জোরার গুঠে, একই সঙ্গে ভাঁটা নামে। দোরানি বনের মধ্যে শাখা শ্রেশাখা ছেড়ে যায়। কেউ ভাড়া করলে কোন একটা শাখার ভিতর হুকে পড়, নৌকো ঠেসে বাও বোপবাজের মধ্যে। দিবে নিঃসাড় হয়ে বসে থাক হতকণ না বিশদ কেটে বাছে।

দোরানির অভিসন্ধি ঘুরে এইবারে আবার বড়-পাণ্ডে পড়বে। মকাল হল। খাল বড় হচ্ছে ক্রমশ। আর সুবিধা, জোরার শেষ হয়ে ভাঁটার টান ধরেছে। উজান বেয়ে মরতে হবে না আর। আবার এখন হু-বারে। মাহুজন। খালে বেড়-জাল পেতেছে। হু-নৌকোর মুখে সেগরা—জালের মাহুঘ নৌকোর বসে গল্পগল্প করছে, ভাষাক খাচ্ছে। ভাঁটার দাঁড়িয়ে খেপলা জাল কেলছে কেউ কেউ। জলের সন্তান—কালো কালো চেহারা, বাবরি চুল। রূপার পলক কারো পলার, হাতে ভাষার কড়। সাদা মাটির বাঁধ চলে গেছে এবিক তবিক অঙ্গর-সাপের মতন। মরমাহুঘ মেয়েমাহুঘ ঝাঁড় বাঁধের উপর দিবে। মেটে দেহালের ঘর একটা—দেহালে ছন হুটে ভাঁড়ো-ভাঁড়ো হয়ে পড়ছে। ভাল পাহের সোঁড়া—জলের লগা খেয়ে খেয়ে করলার মতন কাল হয়ে গেছে। সাদা সাদা হু একটা একানে, একটা উই ওখানে—ভাঁটা সনে-বাওরা চরের ঘর মুক্কা বাঁধ করে ধরে বাছে।

চলছে নৌকো। পিঠেন বাতাস পেয়ে বাতাস তুলে দিল। ঝাঁড় করে হুটে চলছে—জল হৌর কি না হৌর। ঝাঁড় তুলে দিল। এই বেগে মরম ঝাঁড় পড়তে পার না। পাহ হবার

ভাটে বসে জল কয়েক। খেয়ালনৌকো ভাকছে চিংকার করে একজনে ওপারে আনমনে দড়ি পাকছে বাবলাগাছের দড়ি অর প্রান্ত বেঁধে। খেয়ার মাঝি বোধ হয় ঐ লোকটাই। ভাকছে ভাকুক না—ভাবখানা এই। আরও মাহুঘ অহুক, এক খেয়ার সকলকে তুলে আনবে।

চরের কাছা অনেকটা ভেঙে এসে তবে জল। বাতবাসীশ ক-জনে সেই কাছার মধ্যে জলের ধারে এসে চেঁচাচ্ছে। ভাল কথাই হচ্ছিল এককণ, এইবারের মূর বীকা। দড়ি পাকানো বন্ধ করে বোঁঠে নিরে মাঝি তড়াক করে নৌকোর উঠে কাছি খুলে দিল। অল্প আলকাতরার টিন ভাকছে জলে, জালের মাথা ওর সঙ্গে বেঁধে তাসিরে রেখেছে। বাইনগাছের সারি এইবারে জলের কিনারা ধরে। চলছে, নৌকো চলছে। উঁচু বাঁধের ওদিকে বদতি—খোঁড়া চালের মাথা অঙ্গর বেধা যায়। টিনের খরও আছে যেন—টিনে আর খড়ে একত্র ছাওয়া। টিনের পরমে গা জালা করে, কোন শৌখিন জোতদার টিনের উপরে বড় বিছিয়ে নিয়েছে।

নৌকো বড়-পাণ্ডে পড়ল। বেলা হয়েছে বেশ খানিক। পেয়ে-মাঠ; মাঠ ভয়তি পেয়ে-গুহ। মাঠের মং সবুজ নয়, সাদা নয়—সোলাপি। পাণ্ড ক্রমেই বড় হচ্ছে। এপার বেঁসে চলছে, ওপার ধোঁয়া ধোঁয়া। ঠাঁহর করে দেখলে অল্পট সবুজ টানা-বেধা নজরে পড়বে। ওপারের বন। মানহেলার একবারে শেষ—কাঁচা-বাঁজার গুহ এখন থেকে।

অন্নদাসীর বাচ্চা ছেলে আর চাকুবালা হুইয়ের ধারে উঁচু হয়ে বসে জল দেখছে। কুমির গা ভাগান দিয়েছে ঐ বেধ পুরানো পাহের গুড়ির মতন। বকবক করছে হুহকটে হু-জনে। বাচ্চার সঙ্গে চাকুবালার ভাব জমেছে। আর ওদিকে উঁচুন ধরাছে অন্নদাসী। সোঁড়া মাটির তিন কিকের উঁচুন। নৌকো তুলে তুলে বাছে ঝাঁড়ের টানে। হাওয়ার জল উঁচুন ধরে না—ভাঁটার মুখে হুঁ দিতে দিতে মশ করে একবার বা জলে উঁচুন, আবার ধোঁয়ার। সোঁটা হুই বড়া বলিয়ে দিল তখন ওদিককার হাওয়া ঠাঁকাবার জল। এমনি করে কোন গড়িকে চালে-ভালে মুঠো কুঁড়িয়ে নিতে পারলে যে হয়। পরম বেশি বাচ্চাটায় জল। এখন বেশ কুমির দেখছে, টেটানি জুড়বে হয়তো একটু পরে। ছেসেবাহু চাকুবালাও ভোঁ—ভাঁড় নামলে হাপুলহপুল করে সে-ও চাঁঠি খেয়ে নেবে। অল্প কেউ এখন বাছে না। টানের পাণ্ড, পিঠেন বাতাস। বহুকের ভীবে মতো নৌকো ছুটছে। জলে ভালছে না বাতাসে উঁচুছে, ঠাঁহর হয় না। এই জল ধরখমে হবে, বাতাস পড়ে বাবে—খাওয়ার কথা ভাব আসে নয়। তখন কোন পাপখালিতে নৌকো হুকিয়ে গাছগাছালির সঙ্গে কাছি করে নিশ্চিত হয়ে যেতে বসবে।

ঝাঁড়ের মতচটানি, ছলাখলাং করে জল বা বিছে নৌকোর তলিতে। এই মকর চলল একটানা বিকাল অবধি। বড় একবার পাখি বনের উপর কিচিবিচি করছে। চরের কেতকাপাহে বাবরের হুটোপাটি—ভাল ভেঙে ভেঙে নিচে কেলছে। হারিনের সঙ্গে বাবরের বড় ভাব—হারিনের হল ভাকে এমনিভাবে, কেতকাপাহে বাবরের নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আসে না কেন একটা হারিন ? নৌকো মকলে পড়ে গেল হারিন ?

আনানোনা—পক্ষ পাছে। বাঘের পক্ষ অনেক দূর থেকে হরিণ মাকে পায়।

মাছের একাটা গিরে বাঘের একাকার তারা এখন। মহেশ তাই বলছিল, মাছ এখানে বড় আর জোখে দেখবে না।

ভিত্তকর্মে জগা বলে, সেই জো ভাল। বাঘের চেয়ে বেশি সাংঘাতিক হল মাছ। মাছ তো ঐ বোঁড়া-নগনা, সোপাল ভরদাজ, প্রমথ ম্যানেজার। কাঁটা মাঝি মাছের মুখে—বে ক-জন এই আমরা বাছি, মাছের আর কাজ নেই এর উপর।

বহরশী শশী ঘোষ হেসে বলে খানিকটা পোছপাছ করে নাও, কত মাছ হাঙ্গলা দিয়ে পড়বে দেখো। পাকা কাঁঠাল ভাঙলে মাছি পড় পেয়ে আসে। মাছও তেমনি ঠেকাতে পারবে না।

জোরার আসন্ন। শেষরাতে আবার ভাঁটি মিলবে, সেই অবধি নৌকো বেঁধে থাকা কোন এক জায়গায়। নৌকো বেঁধে তারপরে খাওয়া-দাওয়া। খাওয়ার পরে গা গড়িয়ে পড়া। কিন্তু যত ভর নৌকো বাঁধা যাবে না রাত্রিবেলা। জায়গাটা পরম অর্থাৎ ব্যাসস্কুল কিনা জেনে বুঝে নেবে ভাল করে। একা না বোকা—বেখানেক জায়গা পাচখানা নৌকো, তুমিও গিরে চাপান দেবে সেই শাবরে। একসঙ্গে অনেক নৌকো থাকার নাম শাবর। কিন্তু শাবর পেয়েই নিশ্চিত হোয়ো না—নৌকোর মাছগুলো কেমন, কাজকর্ম দেখে কথাবার্তা বলে আন্দাজ করে নাও। নিরীহ মাঝিমাঝা হয়ে নৌকো নিয়ে ঘুরছে, আসলে তারা হয়তো ঠগ-ডাকাত। সামাল, ধুব সামাল ভাই। সবত কেড়েকুড়ে নিয়ে মাছ ক'টাকে চরের উপর নানিয়ে নৌকোর কাছি কেটে দিয়ে সরে পড়বে। এমন অনেক হয়েছে। দক্ষিণে, একেবারে দক্ষিণে বাছে—ভাঁটির প্রায় শেষ বেখানে, হরিয়ার মুখ। সেদিকে মাছজন কালেভেবে কদাচিৎ যায়, তবু জন্তজানোয়ার। রীতপ্রকৃতি চেলাজানা হয়ে গেছে, মাছেরই মনের তল আজ অবধি পাওয়া গেল না।

কত খাল-সোখালা ছেড়ে বাছে। জগা বারবার সঙ্গর দৃষ্টিতে ভাকালে মহেশ ঠাকুরের দিকে। বাড় নেড়ে মহেশ 'উঁহ' বলে দেয়। বাঁধান তার মঞ্চকর্ণে—এসব খালে ঢোকা যাবে না। বিপদ আছে। বৈধ করে বেয়ে চলে বাও, ঠিক জায়গায় এসে সে বাতলে দেবে। সেই পাশখালিতে হুকে ভিজখানা বাক গিরে বনকরের বাবুদের ছোটখাট আড্ডানা। খালের সিকি আন্দাজ জুড়ে মাচান, তার উপরে ঘর। ঐ মাচানের খুঁটির সঙ্গে নৌকো বাঁধা চলে। বন্ধু আছে বাবুদের। বিশপক নিয়ামক এমন একটা জায়গা রয়েছে, তখন সেইখানে গিরে ওঠে। কাল কিন্তু এমন জায়গাপাবে না। জায়গার জন্ত কাল থেকে হিসাব-কিতাব ভাবনাটিতার প্রয়োজন হবে; কড়া মন্তোর পক্ষে নৌকোর চাপান বিত্তে হবে। আজকে কোন হাঙ্গালা নেই।

পাশখালি হুকে হঠাৎ বা দেখা যায় কাঁড় পোতা রয়েছে। কাঁড়ের হুঁটা মাটিতে, চতুর্দা মাথা উপর দিকে। মাঝে মাঝে এমনিধারা দেখা যায় জন্তলে। পোতা-কাঁড়ের মাথার মাঝা কাশড় বাঁধা, কাশড়ের এক প্রান্তে কাঁঠি চাল বেঁধে মুলিয়ে দিয়েছে, অপর প্রান্তে মাচালে উঠছে নিয়ামকের মন্তর। নৌকোর কোন কাঁড়ি বা মাঝি পড়ছিল এই জায়গায়। বাঁধানে হাঙ্গালায় বলতে নেই, বলবে

পাড়েছে অন্ধু মাঝি কিবা ভাল হয়েছে অন্ধু কাঁড়ের। বাঘের নামও নয়—বলবে বড়-শিরাল বড়-মিঞ ভোঁড়ক বা অবনি একটা-কিছু। নৌকো বেয়ে মাছ কাঁচ-বাঁধার পাড়ে-বালে ঘোরে, আর আচমকা ঐরকম পোতা কাঁড় দেখে হার-হার করে মনে মনে। পাড়ের মোড়ালার মাছ-কাপড়-হাকপ্যাটিও দেখা যায়। খেয়েদেয়ে বাঘ হয়তো হুঁটো কি আঁখানা হাত উছিঁটে কেলে গেছে, তাই সব খুঁতেপতে কবর দিয়ে গেছে ঐ পাড়ের পোড়ার। কাদের ঘর খালি করে বাঁধার এসেছিল গো, সে মাছ আর কিয়ল না।

বাইতে বাইতে তোমার হাতের কাঁড় ভেঙে গেল হয়তো বা মচাৎ করে। কিবা বেসামাল হওয়ার মরম কাঁড় জলে পড়ে ঘোটে ভেসে গেল। বিপদের মুখে তখন কি করবে—পাড়ে নৌকো ধরে নিয়ে নাও ঐ পোতা-কাঁড়। কিন্তু একটানে উপড়ানো চাই—কাঁড় হাতে নিয়েই চকের পলকে নৌকোর উঠে পড়বে। একটানের বেশি লাগলে কিবা ডাঙার উপরে তিলেক দেয়ি হলে রকে নেই। বাঘের পেটে বাঘে নির্বাৎ। বনবিবি ঘরং যদি মূর্তি ধরে আগলে কাঁড়ান, তবু ঠেকাতে পারবেন না।

দক্ষিণে, আর দক্ষিণে। হরিয়ার মুখ—ভাঙা যে অবধি গিরে শেষ। হুঁটা দিন হুই রাতে পুরো চার ভাঁটি নৌকো বেয়েছে। তিলেক জিরোর নি। কেশেভাঙার চর দেখা যায় অবশেষে বোঁকের মাথায়। সন্ধ্যার অন্ন বাকি। শশী ঘোষ বখারীতি কাঁড়ে বসে কিন্তু একটা টানও দেয় নি আজ সমস্ত দিন। ভাকিয়ে আছে দুবের দিকে। চেনা জায়গা তার, বড় আপন জায়গা। এ পথে কতকাল আসেনি! হু-চোখ দিয়ে বেন পান করতে করতে এসেছে এই অন্ধু জল আর সীমাহীন জন্তল। কেশেভাঙার চর দেখা দিতেই উত্তেজিত হয়ে সে আঙুল দেখায়: ঐ, ঐবে আমার কেশেভাঙা। বন্ধু পুঁতে রেখে গিয়েছি চলে বাবার দিন। বিখালির বহু কর্কায়ের গড়া। বিখালির কর্কার ঐধরীপুরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বন্ধু গড়ত, বহু হল সেই কেশের মাছ। কিশাতি বন্ধু কাঁড়তে পায় না বেশি লোহার গড়া বহু হাতের জিনিষের কাছে। বহু করে গেলে, কিন্তু ছেলেপুলেরা কেউ বিত্তেটা শিখে নিল না। আর ও-জিনিষ হবে না।

আবার বলে, শিখেই বা কি হত? এ সব বন্ধু মানবোয়ার জো নিতে দেবে না। বাঁধানে চোবাপোতা নিয়ে কোরো। পোতা মানবোয়ার শতক বায়নাভা, হাঙ্গার মরমের আইন। করতে পারলে কোরবে দড়ি বেঁধে বিকিকি করে টেনে কাঁড়কে নিয়ে পুরবে। কেশেভাঙা ছেড়ে বাবার সবার মাটির বিত্তে পুঁতে হল আবার এমন বন্ধুটা। সে কি আর আছে এদিন? লোনা মাটিতে খেয়ে লোহা কাঁড়বা হয়ে গেছে। জায়গাই খুঁজে পাব না। নতুন পাছপালা করে জন্তল ভেঙে উঠেছে। কিবা জরাল নিয়ে ভেঙেই পড়েছে হয়তো বা পাড়ের খোল।

কোন করে শশী নিয়াম কেলে। বাঘের খালি বন্ধুকের কথা বলছে? বন্ধুকের জন্তই শোক। আরও যে কত কি কেলে গিরেছিল—টাকাপয়সা, বৈভবের মন্তর তিন তিনটে ছেলে—এ সব কথা একটিনিয় মুখে আসে না।

এই জায়গা, বড় পাছপালা নেই। মাঝা কাশড় হুঁটে আছে

অনেক বৃক্ষের নীল বনের খেঁচ অবধি। কাশবন নয়, হুসাগর, হুসিয়ার বাতাস এসে এই নির্জনে বড় ভুলেছে। 'রাত হল, আকাশে চাঁদ নেই। তবু জ্যোৎস্না হয়ে চরভূমিতে কাশের ফুল লুটিয়ে আছে। গাছগাছালির বে বন, তার তলদেশে কাঁকা—নজর করে বসে থাকলে জীবজন্তুর চলাচল বোকা যায়। কাশবনে ভয় অনেক বেশি। জলের নিচের কুমির-কামটের মতন একেবারে নিকটে অলক্ষ্যে ওৎ পেতে থাকে। কোন দিক দিয়ে কখন যে কোন প্রকৃৎ লক্ষ দিয়ে বাড়ি মুচড়ে ভাঙবেন, তার কিছু ঠিকঠিকানা নেই।

ভাঙার নৌকো ধরতে যাচ্ছে, ক্যাপা মহেশ মুখ কামটা দিয়ে ওঠে : ঘটে এক কোঁটা বুদ্ধি নেই কারো তোমাদের ? এ তোমার কুমিরমারির হাটখোলা পেয়েছ, নৌকো বেঁধে নেমে পড়লেই হল ! অষ্টবন্ধন না সেরে নাম দেখি কত বড় বাপের বেটা। টপ করে পালের মধ্যে কামড়ে ধরে ঘাসবনে ডুব দেবে। বুঝতেই পারবে না। বুঝবে বধন দুখানা ঠ্যাং এক সঙ্গে সজনের ডাঁটার মতো কচরমচর চিবাতে লেগেছে।

কাঁচা-বাদার উপর প্রথম পা ছোঁয়ানো চাটি কথা নয়। স্বীকর্তব্য বিস্তার। জ্ঞান করতে হবে সকলের আগে। গাঙের জলে ঝুপ করে পড়ে ডুব দিয়ে নাও গোটা কতক। কুমির-কামটের ভয় থাকলে ডালির উপর বসে ঘটি জরে মাথায় জল ঢাল। অস্ত্রাত সত্ত্বটি অবস্থায় বাদার পা দিলে বন্ধা নেই।

দেহবন্ধন করে নাও। শুশুন মস্তোর পড়ে ফুঁ দিয়ে দেবেন, তোমার দেহ কেউ ছুঁতে পারবে না। জন্তুকানোয়ারে পারবে না, দানো-বটোরোও নয়। বড় বড় শুশুন মাটি গরম করে দেন মন্ত্র-বলে। ঐহিক স্বাস্থ্য ভূমি-আমি কিছু টের পাচ্ছি—মাটি কিন্তু আঙনের মতন তপ্ত হয়ে গেছে, বাঘে পা রাখতে পারছে না, বন ছেড়ে পালাচ্ছে। এমনি কত আছে। বখানিয়ম আটবাট বেঁধে প্রগোর না বলেই এত লোক ভাল হয় কি-বহর, লোকের এত ক্ষতি-লোকসান। নইলে তিল পরিমাণ অনিষ্ট হবার কথা নয়। বাদার মানবলার চেয়েও নিরাপদ।

রাত-বিরেতে অতএব ভাঙার নামা চলবে না। জলে থাকবে নৌকো। জলের মধ্যে ধ্বজি পুঁতে কাছি করে রাখ। সকালবেলা ভাঙার উপর পীর-দেবতাদের বিস্তার পূজোআচ্ছা। উপকরণ সব এসেছে। আগ-নোকোর বের করে এনে মহেশ ঠাকুর সেইসব আবার মিল করে দেখছেন। কোন অঙ্গে খুঁত না থাকে—মিলিয়ে দেখে তবে নিশ্চিত। পাঁচ সের বাতাসা আর আড়াই সের চিনি—এই দুটো পৌড়িলার তো ? শশা হলগে এক ছই তিন চার—হ্যাঁ দশটাই হয়েছে। দুটো নারকেল, নৈবেত্তের পাঁচ সের আতপ-চাল। পাকা কলা ছ-কুড়ি—ইস, কলা বে পেকে উঠেছে। ডাঁসো দেখে কিনতে হয়, এত পথ আসতে আসতে পেকে ওঠে। সিঁছুর পুরো দু-বাণ্ডিল তো ? অনেক কাজ সিঁছুরের, কাল দেখতে পাবে। সাতটা ঘট, সাতটা পিঁদরিম, সাতটা জলের ডাঁড়—ঠিক আছে। দুইটি আছে, দুইটা এসেছে তো ? বেশ, বেশ। পাঁচ গজ সাদা ধান—নতুন এই ধান কাপড় পরে আমি পূজোর বসব।

আজ্ঞার নিখুঁত। মহেশ ভারি খুশি। বেধানটা নৌকো

উঠল। পূজোর জিনিষপত্র নিয়ে মহেশ ব্যস্ত ছিলেন, চমকে ওঠেন। ভীত ভূমিতে ভাকিয়ে পড়লেন। না, সে সব কিছু নয়। বাতাস কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল—এক কাপটা হঠাৎ এসে পড়ার শব্দ হল অবধি। কিন্তু শরবন এত কাহাকাছি থাকবেই বা কেন ? বেহঁশ হয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তো একুপি—বস্তোরি পড়ে চাপান দেওয়া থাকবে অবশ্য নৌকো—তা হলেও অজানা কারিগার সতর্ক বেশি থাকাই উচিত।

গলুরে চলে গিয়ে মহেশ পাঁচ থেকে এক ঘটি জল ফুলে মাথায় ঢেলে দিলেন। অসাকে ভাকেন : তবে বাপ জগদ্রাথ, তুই আর বলাই এক এক ঘটি ঢেলে নে। দুইসিটা কোনখানে রেখেছিস, বের কর।

বলাই আশ্চর্য হয়ে বলে, বল কি ঠাকুর, এখনই নামবে নাকি ?

হ্যাঁ বাবা। জেবে দেখলাম, নামা উচিত একটুবার। লঠন আর মাচবার নিয়ে নে। চট করে সামনের ওধানটার আগুন দিয়ে আসি। চল।

মুগি লাগে বনবিবির পূজোর। যা কালী পাঠার ডুট, যা বনবিবি তেমনি মুগিতে। বনরাজ্যে সকলের বড় ঠাকুর—বনে পা দিয়েই তাঁর পূজা। এ পূজার হালিমা কিছু নেই। পুরুত-বামুন মস্তোরতস্তোর পাঞ্জির দিনক্ষণ কিছুই লাগে না। হুটো ফুল জোটাতে পার ভালই, নয় তো গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পূজো দাও। তাতেই চলবে। একটা গাছ বেছে নিয়ে খানিকটা সিঁছুর মাথাও ডালের উপর। গাছ ঘিরে পাড়িয়ে বস, হেই যা বনবিবি, দোয়া লাগে, দোয়া লাগে। মুগি জলের দিকে ভাড়িয়ে দাও বনবিবির নামে। বাস, হয়ে গেল পূজা।

মুগি ছেড়ে তারপরে তারা শরবনে আগুন দিয়ে দিল। দেখতে দেখতে প্রবল আগুন। সারারাত ধরে জলবে। আগুন বেঁধে জন্তুকানোয়ার শতক হাত ধরে চলে যাবে। একেবারে নিশ্চিত। বাতাসে বিঘম জোর দিয়েছে, কাঁচা ঘাসবনও উত্তাপে ভাকিয়ে পুড়তে পুড়তে যাচ্ছে। ফুলকি উড়ছে এদিক-সেদিক। এখন একটা ভয়, এই আগুন ধরে এসে নৌকোর উপরে ছিটকে না পড়ে। শুকোর ধরে গেল সর্বনাশ। রাত্রি জেগে নজর রাখার প্রয়োজন। আগুন পড়লে জল ঢেলে নিভিয়ে দেবে সঙ্গে সঙ্গে। তা রাত্রি আগবার মাহুবও রয়েছে—কী ভাবনা ! শশী ঘোষ নিম্পলক চোখ মেলে নৌকোর কাড়ালে একভাবে বসে রয়েছে। ভাত খেয়ে মিল, ভাও ঐ এক জায়গায় বসে। ঐখানে ভাত এনে দিতে হল। আর জেগে রইল ক্যাপা মহেশ। শীজার দম দিয়ে কলকের মাথার বস্তরমতো আগনের শিখা ফুলে বম-বম সব ফুলছে পহরে পহরে। সে আছে গলুরে। গলুরে আর কাড়ালে নৌকোর দু-মাথায় দুই পাহারাদার। মির্জাবনার ঘুমাক আর বারা রয়েছে।

শীর্ষিক

রাত পোহাল। পোহাতে কি চার। শশী ঘোষ কতবার ভাসিবি দিয়েছে : বিঘম ধরে আহ ক্যাপা ঠাকুর—কাকবুলি ভাকছে, তনতে পাও না ? বনের দিক থেকে পাখির কলরব আসে ঘটে অজস্র। শেখরাজের তরল জ্যোৎস্না নিম্নরাস বলে ফুল কলরব

পাখীরা শব্দী ঘোষাই সমগোর আর কি। হৈশ্বরী তাকনার মহেশকে মান করতে হল পোহাতিতারা থাকতেই। নতুন বাস করণক পয়েছে, ভগ্নমণে সিঁহদের কোঁটা দিয়েছে কপালে অক্ষতাসুতে বৃকে হু-বাহতে। নৌকোর অস্ত সকলেও মান করে পরিত্যক্ত হয়ে নিল।

শরবন সারাযাত পুড়েছে। ঝিকি-ঝিকি অলছে এখনো দুসের ঝিকে। হাই হুড়ানো সমস্ত জায়গার, হাইয়ের নিচে আঙনও থাকতে পারে। হাইয়ের উপর দিগে বাওয়া হবে না। পা পুড়ে যেতে পারে, সে এক কথা। তা হাড়া আশানুখে বসত বাঁধতে বাছি, হাই মাড়িয়ে কেন যেতে বাব ?

অগ্নিহা হাল ধরেছে ; পাশে ঝাড়িয়ে মহেশ নির্দেশ দিচ্ছে ঠিক কোন জায়গায় লাগাতে হবে নৌকোর মাথা। দুটি তার কেনেডাঙার চরেই বাটে, কিন্তু মহেশ দুর্ভবিত্তীর্ণ কাশবন দেখছে না, সকলের অলক্ষ্য আর কোন বস্ত ঠাহর করে করে দেখছে। যাড় নেড়ে এক একবার সে আপত্তি করে ওঠে : না, এখানেও নয়। হকুম হল না। এগিয়ে চল অগ্নিহা, হরগোজা-বাড় ঝাড়িয়ে ঐ ঠাও এলাকার গিয়ে যদি হকুম মেলে।

হরগোজা-বাড় পার হয়ে নতুন কার এলাকা, সদয় হয়ে যিনি নৌকো বাঁধতে দেখেন—কেউ এসব প্রশ্ন করেনা। সাধারণের যোকবার বস্তও নয়। শুণীন-বাউলেদের ব্যাপার। বাগাবনের ধারা কাণ্ডারী। হকুমহাকাম যার কাছে যা নেবার ঠারাই নিয়ে নেবেন। বিনা তাকে কাজ করে বাবে তোমরা শুধু।

কিন্তু খোর শুণীনকেও বাঘে নিয়ে যায়, এমন হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। মূঢ় লোকে এই নিয়ে সংশয় তোলে। বাঘে নিয়েছে ঠিকই—কিন্তু খবর নিয়ে দেখ, সেখানে শুণীনেরই দোষ। বড় বকমের পোনাহ, ছিল। রোজার উপর অপদেবতার রাগ মস্তর পড়ে ধুনোবাণ সর্বেবাণ নিক্ষেপ করে সর্বকণ ভাদের শাসন করে বেড়ায় বলে। বেকারদার কেলবার অস্ত সর্বকণ তাকে তর্কে থাকে। রোজাও তাই বৃকে অষ্টবন্ধন সেয়ে তাগাতাবিজ নিয়ে তবে বাড়ির পণ্ডির বাইরে যায়। বন্ধনের কোন অঙ্গে দৈবাৎ ফুল হয়ে গেলে নির্ধাৎ রোজার খাড় মটকাবে। বাটার ব্যাপারেও ঠিক ভেমনি। বনের বাঘ জলের কুটির কিবা বাহুবিসারী দানো-বটোরী হুকিয়ে থাকে। শিব-ঠাকুরদের বখানিয়ম দোয়া করে আসেনি হরগো, কিবা মস্তোরে কিছু ছুট হয়ে গেছে—আর তখন যকে মাখবে ? বায়ে বায়ে বৃষু ভূমি খেয়ে যাও ধান, এইবারে বৃষু তোমার বধিব পরাণ।

ভূঁয়ের গারে নৌকো বেঁধে নৌকোবন্ধন সকলের গোড়ার। মা কালীর দোহাই পেড়ে গলা কাটিয়ে চড়বড় করে মস্ত পড়ছে : বাঘ তাড়িয়ে দাও মা, নৌকোর ত্রিশীমানার মধ্যে না আসে। বাঘ এসে পড়ে যদি কোন বকম কস্তির কারণ হয়, কালী ভূমি কাশকপ-কামিখোর মাথা থাকে।

মা কালীর এর পরে বাঘ মা খেদিয়ে উপায় কি ?

একিক-প্রাচিক কাহাকাহি বাঘ আছে কিনা, তাও মহেশ ঠাকুর বলে বেবেন মস্তর জোরে : বাঘ আনার ভাইনে যদি থাক, তান দিকে হাঁক হাড় ; বা দিকে থাকলে বায়ে হাঁক হাড়।

মস্তপাঠের পর বাঘের সন্ধ্যা নেই মাথা ভাঁজে ঘোরা করে থাকবে। ঠিক হাঁক হাড়তে হবে।

বেহবন্ধন হবে এতি জনার—বেহ ছুঁয়ে ওরা মন করতে পারবে না। উণ্টো বকমে বাঘের চোখ বন্ধ করার কারখাও আছে। গুলো-পড়া। গুলো পড়ে বাঘের মাথায় ছুঁড়ে মার। বাঘ দুটি হারাবে, অস্ত হয়ে গিয়ে পালাতে দিশা পাবে না। আবার নিজাবতীর দোহাই পেড়ে দুম পাড়ানো যার বাঘকে : বাঘের চোখে নিদ এলে দাও মা নিজাবতী। কালী আবার ভাইনে, দুম আনার বায়ে। কালীর সন্তান আমি হেলা করলে টের পাবে মজা।

বনের বেখানে বাঘ থাকুক মস্তর সন্ধ্যাহনে চলে পড়বে।

বাঘের হামলার বৃক কাঁপে যদি তারও ব্যবস্থা আছে। মুখবন্ধনের মস্ত। মাড়ি এঁটে বাবে, গলা দিগে আঁগরান বেকবে না বাছাধনের।

চালুক বাঘ থাকে, তারা মস্ত কাটান দিতে জানে। ভাইনে বন্ধ করলে তো বায়ে ঘুরল। বায়ে বন্ধ করলে তো ভাইনে। এদের নিয়েই বিপদ। মাটি পরয়ের মস্ত ছেড়ে লেবে তখন। বেখানে বেখানে বাঘ পা কেলছে—মাটি নয় কেন অরিকুও। বিপন্ন বাঘ পাড়ে খালে কাঁপিয়ে পড়ে গায়ের ছালা জুড়াবে।

মস্ত পড়ছে কাঁপা মহেশ। একেকবারে ভিন্ন মাহুব এখন। ভয় করে তার সামনে গিয়ে কাঁড়াতে। মস্তর কথা অলস্ত ভুবড়ির মতো মুখগহ্বর থেকে কেন ছিটকে বেয়োর। অন্নাল আর অসস্ত। মানঘেলার ভয় মাহুব কানে আঙুল দেবে। কিন্তু মিনমিনে ভয় ব্যাক্যের কস্তটুকু জোর। মস্তর কথার আঙন দেখতে পাওয়া বাছে কেন চোখের উপরে।

নৌকোর কাজ শেষ হয়ে গিয়ে এইবারে ডাঙার নামছে। মহেশ প্রথম পা ঠেকাল। পীর-দেবতার পূজো—একটি ছুটি মন, শুণ্ডিতে পনের। চলল সকলে শুণীন মহেশের পিছন ধরে। কোন ভয় নেই। কি গো শব্দী ঘোষ, ভূমি করেছিলে এ সব ? কখনো না। কয়লি বলেই তো ঠুদের কোপ-নজবে পড়লে। বধাসর্বধ গেল।

পূজোর জায়গা পছন্দ কর। গাভ থেকে অনেক ধানি হয়ে, অন্নাল নিয়ে ধসে না পড়ে কেন পাড়ের গর্ভে। কতদিন মাহুবের বরকসত, ঐ পূজাহানও থাকবে ততদিন। একটা গাছ চাই সেখানে, পূজোর মধ্যে গাছের ব্যবহার আছে। অস্ত গাছপালা কেটে খাসবন কুলে জায়গা সাকসাকাই করো। মহেশ একটা ডাল ভেঙে নিয়ে জায়গাটুকু বেড় দিয়ে বৃত্তাকারে দাগ কেটে নিল। গতি। হরগোর উপর দিগে মহেশ ঠাকুর সবেগে চক্রোর দিচ্ছেন, আর মস্ত পড়েন তড়বড় করে :

গতি আঁকলার ছুঁয়ে। মৌচাকের মস্তন। ঘোনো ছুধ বেও পরী আহ তোমরা ভের হাজার। সবাই গতিব বাইরে থাকবে। বাঘ যদি গতিতে ছুকে উৎপাত কর তো কাশকপ-কামিখোর মাথা থাকে।

উপরে আকাশের মেঘ, আর নিচে মাটির গতি—এই হল আনার সীমানা। আশি হাজার বাঘ ভয়োর মিনপরাি আছ, সবাই সীমানার বাইরে থাকবে। ভিতরে এসো তো দেবীর রক্ত থাকে।

কালী কপালিনী, আমি তোমার হেলে। এই গতি আঁকলার।
অকস্মাৎ তুমি বিয়ে থাকবে আমার। আর আমার এই
লোকজনদের (বা-হাত দুহিরে মহেশ দেখিয়ে দেব সকলকে।)
হাসের মুখে এই বাক্য।

হাসের মুখ ওপারে। এপারে হাসের গতি। মহেশের না
খাটে তো মহেশের শির বাবে।

গতি ঘেরা হল তো গতির ভিতরে পূজার ব্যবস্থা এখানে।
ঘেরে যা ভোগ সাজাও। মরুরেরা ঘর বাঁধ, নিশান পোত। বাচ্চাটাকে
বানিয়ে রাখ অন্নদাসী। নির্ভাবনার কাজ করে বাও, এই গতি পার
হলে আসবে হেন সাধ্য বনের বাসিন্দা কারো নেই। লতাপাতা
ভালপাল্লা দিয়ে ঘর বানিয়ে কেল ছোট ছোট। গুপতিতে সাতটা।
বাঁধা ঘর নিরম রয়েছে। এই ডান দিক দিয়েই ঘর—পয়লা
ঘরে অন্নদাসের। পাশে মহেশের। ঘরের চার কোণে নিশান
পুঁতে হাও চারটে করে। সেই যে গরানের পাঠির মাথার লাল-
কাপড়ের নিশান বেঁধে রেখেছ। ঘরের পুরুখে শিখরিয় আল,
বাতাসা শশা আর চাল-কলা দিয়ে ঠাকুরের ভোগ সাজিয়ে রাখ।

হয়ে গেল। পনের ঘরে মনসঠাকুর। ভোগ সাজাবে
আসেকার মতো। কিন্তু মাটির পাত্রে নয়, কলাপাতার উপর।
বিধি এই রকম। বাড়তি এখানে চাই পূর্বকৃত্ত ও অন্নপন্নব। আর
নারকেল একটা। পূর্বকৃত্তের উপর সিঁদুর দিয়ে মা মনসার হাঁদ
একে দেবে।

এর পরে ঘর নয়—মাটি ভুলে একটু ভিটের মতন গাঁধা।
রূপগরীর খান। রূপ বলসে ঘুরঘুর করেন তিনি, ঘরের মধ্যে চুকে
দুহির হয়ে পূজা দেবার ধৈর্য নেই। মুক্ত আকাশের নিচে বড়
জোর এক লহমা থমকে দাঁড়াবেন। কাঁকার তাই পূজার ব্যবস্থা।
এখানেও মাটির পাত্র নয়, কলাপাতার ভোগ।

ভিটের বাঁয়ে আবার ঘর। দুই দেবী এক ঘরে তাই—ঘর
একটু বড়-সড় করতে হবে। মা কালী আর কালীমারা। কালীমারা
হসেন মা কালীর বেটি। ঘরের চার কোণে লাল নিশান—ভিতরে
দু-দিকে দুই দেবীর ঠাই। পূর্বকৃত্ত বসাবে মুখে অন্নপন্নব দিয়ে।
কালীমারার হাতে সিঁদুরের নারীমূর্তি, হাতে লাঠি। মহেশের
বে ভোগ, এঁদেরও ঠিক ঠিক তাই। কর্তার বা ভোগ, মা-মেষের
ভার চেয়ে কোন অঙ্গে কমতি হবে না। বরক বাতাসার পরিমাণ
বেশি দেবে কালীর ভোগে। মিষ্টিটা পছন্দ করেন বোধ করি
মা-কালী।

আবার ভিটে—ওড়পরীর খান। বাঁধাবন ব্যোপে ওড়পরী উড়ে
উড়ে বেড়ান। ভোগের বিধান অবিকল রূপগরীর মতন।

তার পরে লম্বাটে বড় আকারের ঘর। দুই দেবীর ঠাই
একসঙ্গে এখানেও। কাবাখ্যা আর বুদ্ধিঠাকুর। এই বুদ্ধি-
ঠাকুরটি কে, শাস্ত্র-পুরাণে হদিস মেলে না। তবু পূজা পেয়ে
আসছেন।

গাছ এইবারে। মহেশ ঠাকুর সেই যে গাছ দেখে দিতে
কসলিঙ্গল। সিঁদুর সেপেছে গাছের ওঁড়িতে। গাছ আর মন
একই। মনসঠাকুর। মনসঠাকুর ভোগ দিতে হয় না, তাঁর নামে
আসেই।

পর পর দুটো ঘর এখানে। ঘরের চার কোণে লাল নিশান
উড়ছে। প্রতি ঘর দুই কাঁকার ভাগ করা। পাশি কালু দুই
তাই—দুই পীরের আসন পড়ছে এখন ঘরে। পনের ঘর
হাওরালপীর ও রূপগরীর। হাওরালপীর হসেন গাজির হেলে, আর
রূপগরি তাইপো। গাজি-কালুর বিবর কেবলকি বাঁধাবনে। বাঘ
তাঁদের হকুমের গোলায়, বাঘের মওয়ার হয়ে এ-বনে সে-বনে চুটে
বেড়ান। জললে চুকে আর হিন্দু-মুসলমান নেই। বেই হুও, গাজির
দোহাই দেবে, পীরদের চুট করবে। পাঁচটা করে হাটের জেলা লাগে
পীরের পূজার। শিখরিয় আলবে। তিনি-বাতাসা-নারকেলের
ভোগ তো আছেই।

সর্বশেষ বাহুবলতা। ঘর লাগবে না, কাঁকা আঁকবার তাঁর
খান। ভোগ কলাপাতার।

দেবতা-পীর এতগুলি পাশাপাশি—এক পুস্তক বা এক ককিয়ে
পূজা করে বাছেন। পূজা করলেন ক্যাপা মহেশ। মা
সংকৃত কিছা আরবি নয়, গ্রাম্য ছড়া। ফুল জোটাতে পার
ভাল—নইলে বনবিধির বেলা যেমন হল, পাতালতা ছিঁড়েই
পূজা হবে। মানবেলার দেবতারোসাইর মতন এঁদের অভ
বায়নাতা নেই। পূজা সেয়ে নির্ভাবনার চরে বেড়াও জললে।
গাছ কাঁচ, মৌচাক ভাজ, আবাদ কর, ঘর বাঁধ। পূজার বিধি
ফুলচুক না হয়ে থাকে। আর মনে ভক্তিভাব থাকে, কেউ কতি
করতে পারবে না তোমার। বেখানোই থাক সাতটা দিন অন্নব
কেবল এই পূজাহানে এসে গড় করে বেও। পীর-দেবতার
আশীর্বাদ নিয়ে বেও।

সাত হতে বেলা দুপুর। নিবৃত্ত পূজা হয়েছে। কোন
রকম বাগড়া আসে নি বনের দিক থেকে। পীর-দেবতা
অভাব প্রসন্ন। মনের স্মৃতিতে আবার সবাই নৌকোর উপর উঠল।
মিঠাভলের জায়গা দেখে এসেছে, বালি সরিয়ে জল নিয়ে এসেছে
এক কলসি। নৌকোর উপর বাঁধাবাড়া এখন, নৌকোর খাওয়া।
শশী ঘোষের আঁকলের ভিটে আছে, তার উপরে একখানা ঘর
ভুলে নেবে। সেই ক'দিন নৌকোর ঘাস। বানিকটা গুহিয়ে
নিয়ে আরও লোকজন আনতে বাবে। কত লোক হুকিয়ে আ হ,
খবর পেলে মুক্তভুড় করে এসে পড়বে। বসতি জরজরটি হবে।

খাওয়ারাওরা হতে হতে বেলা ভুবে গেল। ভালই হল—
দিনের খাওয়া রাতের খাওয়া একপাকে। বাঁধাবার বাসেলা
করতে হবে না। অধিক রাত্রে কারো যদি দ্বিবে পাছ পূজার
প্রসাদ রয়েছে। ভাবনা নেই।

আকাশে একটু ঠান দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যা আলল চাকবালা।
হুইয়ের বাইরে এসে এঁদীপ হাতে তালির উপর দাঁড়িয়ে কনের
দিকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সন্ধ্যা দেখার। অন্নদাসী মুখ দুহিরে মাঁখে
হুঁ দিচ্ছে তখন। শখ অবধি নিয়ে এসেছে চাকবালা।
আছা পোছালি মেয়ে।

শশী ঘোষ বলে ওঠে, আঁকরাও কত কাল কাটলে গেছি।
এসব কখনো করিনি। খেরালই হয়নি।

মহেশ বলে, যেসকলক নইলে হয় মা। দ্বিবে এসেছিলে
তুমি হটকো জোরাম কতকগুলো। গুহুবাতিয় বীচকণ কী

ভারা আসে, আর কী করবে। এসেও হিসে ব্যবসত করতে নয়, বনের ধর লুপটাটি করতে। বন তাই ডাঙিয়ে তুলল।

সমুদ্র নতুন হেঁকেহে এই জায়গাছবি। বালু আর বালু। আর কাশবন। গাছগাছালি হু-চায়টে থাকে মাঝে। কাঁচ বাদ্যবন অসভিবুবে—খাবার পর খাবা কেসে ধীরে ধীরে সেই বন এগিয়ে আসছে। গ্রাস করবে চরের জায়গা। সে বনের জীবজন্তুরা নির্ভাবনার বেয়িরে এসে এখানে চরে কিরে বেড়ায়। সমুদ্রের হাওয়া নিশিদিন ছটাপাটি করে, কাশবনে চেঁচি ওঠে সমুদ্র-জলে চেঁচি ওঠার মতন। এবারে হাছব এসে চাপল—বন কেটে বসত পড়বে বেসব হাছব। পাণের নিচে বালুরাটি, যে মাটি এক ফুটা কল দেয় না। সুস্থপানে বনের গাছগাছালি, যে গাছ একটা খাল কল দেয় না। পিছনে কিং ব্যাঙ সোণা জল, যে জল হুখে ঠেকানো চলবে না।

মজা জমে আছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে। বাসির নিচে অবুত্তের ধারা। বাসি খানিকটা সরিয়ে কেল, মিঠা জল এসে জমবে। আঁজলা তরে তুলে খাও। খাও বত খুশি, পায়ে ছিটাও। দেহ স্বীতল হবে, মন আরামে ভরবে। অরণ্য নিফলা, কিন্তু বনলক্ষীর অকৃত্য ভাগ্যর এই অরণ্যে। খালপথের হুঁধারে সোলঝাড়। সোলপাতা কেটে কেটে গাদা কর, লোকে ঘর ছাইবে। দিক্চিহ্নহীন পাতিবন কোন এক হোহানার উপর—পাতি কেটে চরের উপর শুকান্তে দাও, লোকে হাছব বুনবে। কাঠি কত বকমের—সুন্দরী, বাইন, পত্তর, যোন্দল, কেওড়া, গরান, গেরো, গর্জন, হেঁতাল, সিঙড়, গড়ে, কাঁকড়া, খলসি, তাঁড়ার, করজ, হিঙে—গাছের কি অস্ত আছে। গাছ কেটে কেটে বোঝাই কর নৌকো। বড়দলে নিয়ে তোল পুরো দিবারাত্র হুই জোয়ার ও সিকি তাঁটি বেয়ে। অথবা চোত-বোশেখে মটল হয়ে মৌঝির পিছন ধরে ছোট। চাক বেঁকেহে গাছের ডালে ডালে—মথুতে টলটল করছে, কাচের মতন রু। ধামা ভরে চাক কেটে আন, নৌকো বেয়ে হাটে নিয়ে তোল। অতাব কি তোয়ার? চাল-ভাল, পান-ভামাক, কাপড়-চোপড় কেন। শান্তির বন, আশ্রয়ের বন। হায়ে পড়েই বনের বাইরে আসা; বেইমাজ দার চুকল, বনের ভিতর চুকে পড় আবার। মাহ যেমন ছুটা-পাঁচটা আকালি করে পলকের ভিতর জল-তলে চলে যায়; হাছের আর নিশানা মেলে না।

বনের বাঘ, জলের কুমির, গাছের পাখিপাখালি, অণ্ডি আরও কত বকমের বনের বাসিন্দা—এরাই এবারে নতুন পড়পি। চেনা-জানা করে নাও পড়পিরের সঙ্গে। হাছব পড়পি তো জেনে এসে এতকাল, এদের পতিক বোক এইবারে। ডালে জড়িয়ে কোথায় সাপে দোল থাকে, সবুজের এক-মিশাল—সবুজ লতাই হলছে কেন হাওয়ার। কাছে গিয়েছ কি টুক করে আদর করে দেবে। ছটকটরে মর সেই চুখনের আলার।

হরিণ কাছে ডাকবে তো নিজে তুমি গাছের মাথায় চড়, গাছে চড়ে বানর হও। কু-উ-উ—বানরের ডাক ডাকবে, হাছবের গলা না বেরোর। হাছব বুঝলে হরিণ পালাবে। বনে এসে পড়েছ তো বনের জীব তুমি, মানবের কিরলে তখন হাছব।

মিথিখ করে দেখ, হেঁতাল-বৌণের আড়ালে বুঝি চকচকে

ফুটা চোখ। হাছবের এলাকা হেঁকে এসেই এলাকার কুমি এসে। এক মজরে ডাকিলে আছে। ভাব বুকে নিজে। বাঘ বলে জমবে কি আছে? কাপুকবের বন হল বাঘ, শক্তসর্বকি বীভিত্ত ভরার। পিঠি কিরিও না ব্যবহার—হুখোহুখি কঠিন হয়ে কাঁড়িয়ে থাক। বৌণের বাইরে এসে সাহনের পা ডেতে তখন বাঘ হুখোহুখি বসল। ভোরাকাটা হলসে বেহ—কী সুন্দর, কী সুন্দর—বিজলী-কুরে পরে বেন সাজ করে এসেছে। অর্-ব-ব আওয়ার করছে, লালা বরছে গালের কব বেয়ে। চোখে চোখ রেখে হাতের মাটি হমাফ জললে পেটাও। বাঘও ঠিক অমনি লেজের কাপটা দিছে মাটিতে। চেঁচাও জোরে—টসবগ করে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মতো গালি দিবে বাও অবিসাভ। হেদ না পড়ে। তার যে আওয়ার তার হুনো তেহুনো গর্জন তোল। বাঘের হুখে পড়ে তুমিও আর এক বাঘ হয়ে গেছ। বাঘ তখন অবহেলার ভক্তিতে আঙে আঙে শরবনের মধ্যে চুকে পড়বে, কিরেও ডাকাবে না আর তোয়ার পানে।

বনবিবির আদরের হুলাল বাঘ—গাঞ্জি-কালু বার পিঠি সওয়ার হয়ে বন-বনান্তরে ঘোবের। বাঘ নইলে আবার বাবা কিসের? বাঘ মেবে সদরের কর্তাদের বেখালে মেটা বখশিস। কিন্তু পুরোপুরি বাঘটা সেই সদর অবধি নিয়ে হাঞ্জির করাই তো হুশকিল। হাছবে নিতে দেবে না। বাঘের যে বিস্তর গুণ। মরা বাঘের জিতটা টেনে উপড়ে নেবে সকলের আগে। পেট-জোড়া গীহা কুলে ধামার মতো হয়েছে—কনিকাগ্রহাণ ভিত কলার মধ্যে পুরে খাইয়ে দাও। আর নয়তো জিভের টুকরা শিলে বেটে হাঁকোর জলে মিশিয়ে খাওয়াও সাতটা দিন। গীহা শুকিয়ে মোটা পেট চিটে হয়ে বাবে। বাঘের সৌকও অব্যর্থ অবুধ—হাছবের নয়, পক্ষ-হাঙ্গলের। কয়েকপাছি সৌক ডাকড়ার বেঁখে পায়ে বলিয়ে দাও, পায়ে ও হুখের খা সঙ্গে সঙ্গে সেবে বাবে। বাতে শব্যশারী তো বাঘের চর্বি মালিশ কর, খোঁড়া হাছব তড়াক করে শয্যা হেঁকে উঠবে। বাঘের চামড়া চোখ ওঠার ওবুধ। চামড়া পুড়িয়ে হাঁকোর জলে মিশিয়ে কাদা-কাদা করে প্রলেপ দাও, চোখ সেবে বাবে। বাঘের নখ রূপোর বাঁধিয়ে ছেলেপুলের কোমরে ধারণ করাও, আপদ-বিপদের দার নিশ্চিত। কোন বকম দোবহুটি পাবে না। বাঘও যদি লাক দিবে বাঘের উপর পড়ে, ঠাঁত বসাতে পারবে না।

খেয়েদেয়ে মরদ ক'জন পাই-নৌকোর সোল হয়ে বসেছে। পান-ভামাক চলছে। বন হাসিলের কথা উঠল। সেই একবার ম নিয়ে শবী ঘোব চৌচকিত্ত করছিল। বনই জিতে গেল। শেষ পর্যন্ত বখাসর্বব বিসর্জন দিয়ে বন হেঁকে পালাল শবী। সেই কাহিনী সে সবিস্তারে বলছিল। সেবারের জটি আর না ঘটে।

জগার কানে বেতে সে রে-রে করে ওঠে: তোয়ার মতন বসড়া কব না তো বজর সঙ্গে। বন থাকবে। হাছব বাঘ থাকবে। বাঘ না থাকলে বাবুরা সব এসে ছুটবে। মগনা আসবে, টোনি-চকোতি আর প্রমথ ম্যানেজার আসবে। হাওয়ারাখি চড়ে অহুকুল জৌরুরি আসবে পিছন ধরে।

আজকে প্রথম দিনেই সেই ভাবনা মনে চুকেছে। বিশ্বর
ঘাটের জল খেয়ে এসেছে কিনা জগন্নাথ। কেশেভাটার চরে মাছুব
আসে না একটি। জনকজ্বর মেলে না। টাকার লোভ দেখিয়ে
এনেছিল বটে শশী। কিন্তু টেকে না, পালিয়ে যায়। পত্নীকীর
জায়গা—মাছুব থাকবে তো অর্ধেক পুত্র হয়ে থাকতে হবে।
বিনি-খাজনার বন্দোবস্ত সেইজন্ম। কাশবনের চর আর চরের
কিনারার জল উত্তরের একটা সফ খাল অবধি। সেই খাল হল
ওদিকের সীমানা। জমি সাকসাকাই করবে, বাঁধ বাঁধবে, সাদা
বালির নিচে উর্ধ্বর কালো মাটি আবিষ্কার করবে—এত প্রমের
পর আবার নগদ খাজনা গণতে হলে পারবে কেন?
ধরাপাড়া করলে ধরাবান মালিকই বরক সামান্য
হুদে দু-দশ টাকানগদ ছাড়তে পারেন এই মাছুবজন্মের
খোরাকির জন্ম।

পাঁচ বছর না হোক, দশ বছর পরে একদিন তো মাছুব
এসে পড়বে। ঐ যে কথা বলল—দলে দলে আসবে ভাল ভাল
বড় বড় মাছুব। তখন তো আবার পথ দেখব আমরা—এই
যারা গোড়ার মাছুব এসেছি। তাবে জগা, আর হাস
খলখলিয়ে। মাছুবই তো এক বকমের বাঘ। গোবাঘা
আছে, তেমনি মাছুববাঘা। সেই কোন মূলুকে জন্মেছিল,
মাছুববাঘা ভাড়াতে ভাড়াতে কোথায় ভাদের নিয়ে এসেছে।
একেবারে ধরিরার কিনারে।

বনের বাঘ মানবেলার যায় না, মাছুববাঘাও তেমনি

সহজে আসতে চায় না এমনি হুর্গম বনজন্মে। সেইটে বড়
বাঁচোয়া। সেইজন্ম বোকাসোকা জগানের প্রয়োজন। বন
কেটে বসত বানিয়ে দেয়, ছড়মুড় করে তারপরে দলকে
দল এসে পড়ে। ভাল ভাল দালানকোঠা হয়। তারি তারি
মহাজনি নোকো—এবং ক্রমশ ধোঁয়াবল-টিমার দেখা দেয়
জলে। বনারন টাকা-পরসা বাজে। ভাল বাঁচাঘাট হয়
জুতা-পায়ে বায়ুদের চলাচলের জন্ম। ঠেলা খেয়ে এরা চলে যায়
আদাড়ে-আদাডুড়ে। হেজমজে মরে কতক। গগন দাসেরা ভিড়ে
যায় বড়দের সঙ্গে। যারা জগানের মতন, নতুন জায়গায় তলাসে
তারা আবার বেরিয়ে পড়ে।

অথই কালাপানি সামনে—একবেলার পথও নয়। জগা
ভাবে : এখান থেকে তড়া খেয়ে—আর তো ভাড়াভমি মেই, তখন
কি হবে? জলে কাঁপ দিয়ে পড়বে? কালাপানির পারেও নাকি
ভাড়া আছে, শোনা যায়। কিন্তু সীতরে বাওয়া যায় না। ভিডি-
নোকোও ডুবে যায়। জাহাজ লাগে। সে হল মবলগ টাকার
ব্যাপার—কেওড়া গাছতলার ঐ ঘটির সম্পদে কুলায় না।
তারি তারি ডাকাতি আর খুন-খারাবি করলে সরকার নিজ
ধরচার জাহাজে করে নিয়ে যেত সেই কালাপানির পার।
এখন নাকি নেয় না। দিনকে-দিন কী অবস্থা—সব পথে
কাঁটা পড়ে গেল। কাপা মহেশের ধরায় তো কেশেভাটার
এসে পড়ল, কালাপানি পারের জন্ম আবার একদিন কোন
কায়দা ধরতে হবে, কে জানে?

শেষ

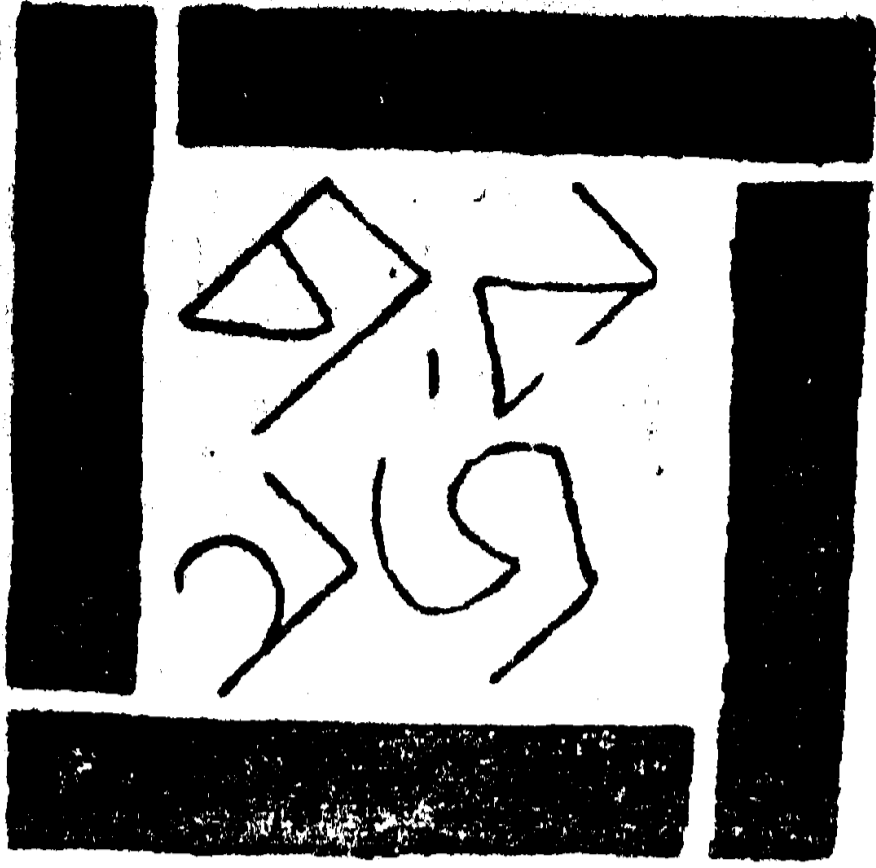
দেশের জন্ম আমার বত কিছু ভাবনা, স্মরণ বাল্যকাল থেকে
বা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করে ছিল চন্দ্রাবল্লভরূপেই শুধু
তা প্রকাশ পায়নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে
চেষ্টা করেছি কাজে। এর জন্মে সর্বত্র পণ করেছিলাম। আমার সর্বত্র
খুব বেশি ছিল না; বতটুকু ছিল, ততটুকুই নিশেবে উজাড় করে
পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। সমগ্রমী ব্যক্তির সহায়ত্বভূক্তি ও সাহায্যের
অভাব হয়নি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পারে পাসলের মত ঘুরে
বেড়িয়েছি পথে পথে, দেশের লোকের প্রাণে সাজা জাগাবার জন্মে
দিনের পর দিন কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সজা করে বসুতা
দিয়ে ফিরেছি। এক মুহূর্ত নিখাস ফেলবার সময় ছিল না।...
আমাদের কাজ ছিল কি? কি ছিল না, তাই ভাবি। জাতীয়
জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দৃষ্টি ছিল আমাদের। দেশীয় বিদ্যালয়
থেকে আরম্ভ করে দেশীয় সমবায় ভাণ্ডার পর্বত সব কিছুই পত্তন
করেছিলাম। শিল্প ও সাহিত্যের প্রসারচেষ্টা তো ছিলই, পরীক্ষণ
পরীক্ষণগঠন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তার, কূটায়শিল্প ও কলকারখানার
সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের বাবতীয় দ্রব্যনির্মাণ—
আমরা করিনি কি?
—মহীন্দ্রনাথ



लेक्ष्मीविलास तेल



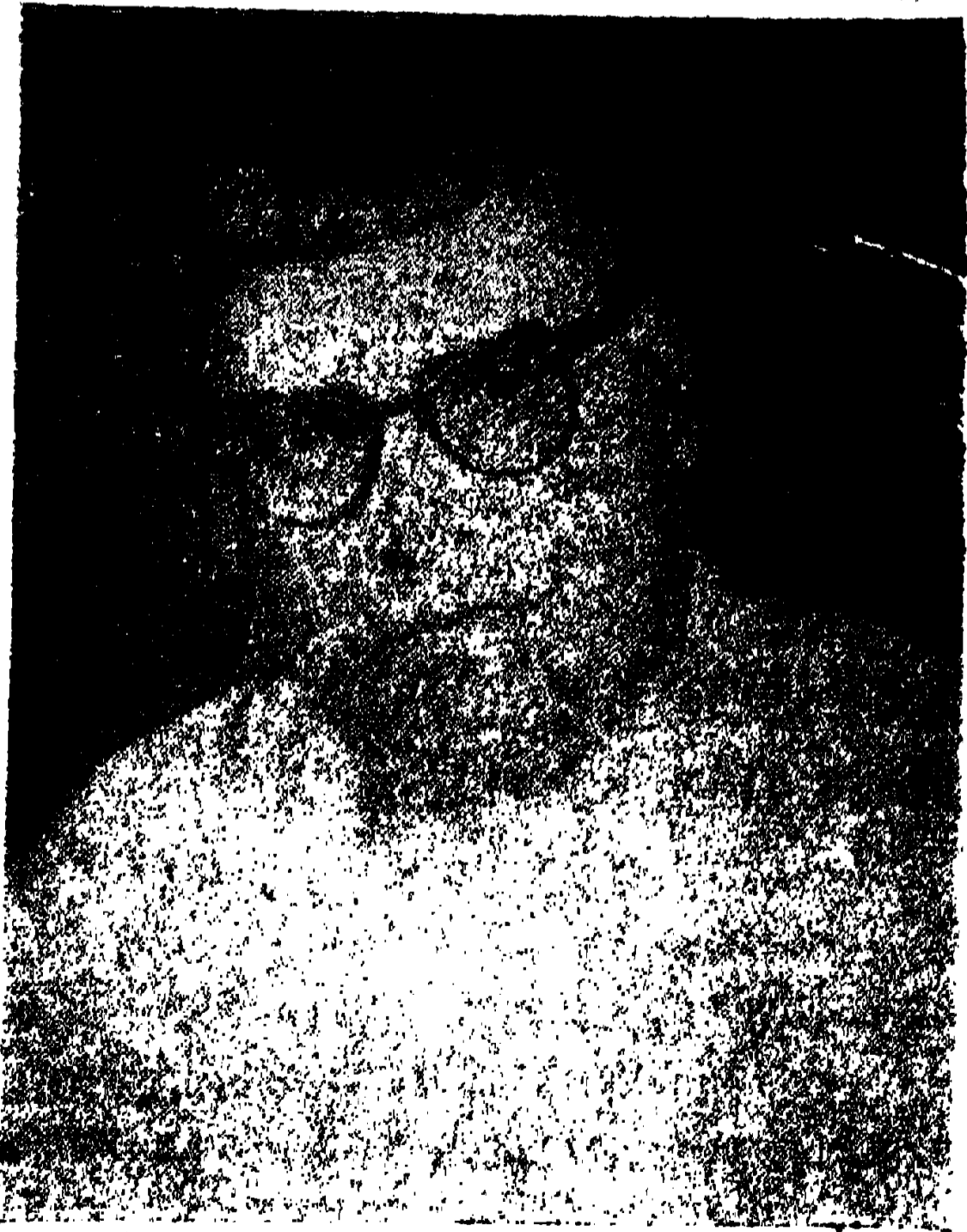
ए. ए. ए. कृ. का. प्राइवेट लि.
मनीफेक्टर्स, कलकत्ता-१



অধ্যাপক হুর্গামোহন ভট্টাচার্য

আজ থেকে ৬১ বছর আগে মুর্শিদাবাদে অধ্যাপক হুর্গামোহন ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বংশের সন্তান তিনি। তখনকার দিনে তাঁর অভিভাবকরা কল্পনাও করতে পারেন নি তাঁকে ইংরাজী লেখা-পড়া শেখানোর কথা! তাই কুলপ্রথা অনুসারে প্রথমে হোল বাংলা অক্ষর পরিচয়, তারপর ৬ বছর বয়সেই সংস্কৃত চতুর্থাঙ্গিতে হোল সংস্কৃতশিক্ষার নৃত্রপাত।

অতি অল্প বয়সেই ধীরে ধীরে একটার পর একটা পরীক্ষার পাশ করে চ'ললেন হুর্গামোহন। কাব্য, সাহ্য, পুরাণ, বেদ যখন শেষ হোল তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর। বললে বিশ্বাস করবার মত নয়, আজকে যিনি এত বড় আবিষ্কারের গৌরবের ভাগী হয়েছেন। সেই বয়স পর্যন্ত ইংরেজী বর্ণমালার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে ওঠেনি। তা না হোক, তার চাইতেও আরও এক বড় সম্পদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সত্তপ্রতিষ্ঠিত সাজ-বেদ-বিভাগয়ে গুরুগৃহে প্রাচীন



অধ্যাপক হুর্গামোহন ভট্টাচার্য

ভারতের আদর্শ অনুযায়ী একেবারে গুরুর অভিবাসী হয়ে তাঁকে অবস্থান করতে হয়েছিল অনেক দিন। গুরুর সঙ্গে গভীরান, বেদমন্ত্র ও ভোত্র আবৃত্তি করতে করতে করে আসা, স্বপাকে খাওয়া ও ব্রহ্মচর্যের বিধি-নিবেদগুলি যথাযথ পালনের কলে এক অপরূপ চারিত্রিক সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। অধ্যাপকের জীবনে আজকের দিনে সেই সম্পদই ফলভ, আর তাই তাঁর এখনও আছে।

একেবারে বোল আনা সংস্কৃতের ছাত্র হুর্গামোহন একজন মনীষীর একটা কথাতেই ইংরাজী শেখার উদ্বুদ্ধ হলেন। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নিরে গিয়েছিলেন তাঁকে আচার্য্য ব্রজেননাথ শীলের কাছে—আচার্য্য শীলের লেখার কিছু অংশ দেবনাগরী হরকে লিখে দেবার জন্তে। সেই কাজে কিছুদিন হুজনে হুজনের সান্নিধ্যে আসেন। একদিন হঠাৎ আচার্য্য শীল বললেন, 'তুমি সংস্কৃত এত সুন্দর জান, একটু ইংরাজী শেখ না কেন?' এই একটা কথাই বর্ষেট। হুর্গামোহনের অন্তরে ইংরাজী শেখার এই প্রথম আগ্রহ হোল।

চতুর্থাঙ্গী ছাড়লেন। বিদ্যায় নিলেন সাজ-বেদ-বিভাগয়ের অধ্যাপকের কাছে। পুরোনো ছাত্রকে হারাতে হবে ভেবে গুরুর সেদিন গভীর দুঃখ হয়েছিল। মুহু বাধাও তিনি দিয়েছিলেন। অধ্যাপক হুর্গামোহন সে সব কথা দুঃখের সঙ্গেই আজ স্মরণ করেন। নিজের মনের গোপন কোণেও কোথাও যেন তাঁর একটা বেদনার কাঁটা আজও বিঁধে আছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যাকে যাকে বললেন, 'যদি সেদিন ইংরেজী পড়তে না আসতাম তা হলে আমি গভীর শান্ত হতে পারতাম। তুল কবেছি কী ঠিক কল্পছি জানিনে, তবে একটা দিক আমাকে হারাতে হয়েছে।'

সেটা ১৯১৬ সাল। সবে ১৭ বছরের ছেলে তখন হুর্গামোহন। বিশ্বজ্ঞানো সংস্কৃত ছাড়া কিছুই সজেই তাঁর পরিচয় নেই। গেলেন কামবাজার টাউন স্কুলে। হাত বোকাই মানপত্র ও সোনারুপার পদক। জানালেন ম্যাট্রিক পাশ করবার ইচ্ছা। ইংরেজী, অক কিছুই জানেন না বটে, তবে খুব খেটে ভৈরী করে নেবেন বললেন। হেডমাষ্টার মহাশয়ের সহায়ত্বুতি হয়েছিল। কে জানে প্রধান শিক্ষাত্রতা করতো সন্তাবনার পরিচয়ও পেয়েছিলেন। ঠিক হোল দশম শ্রেণীতে ভর্তি হবেন। অবোধ্য পাত্রে পড়েনি হেডমাষ্টার মহাশয়ের নির্ধাচন। চিন্তা ও হুশিচকার বোকা মাখার নিরে দিব্যাত্রা খেটে ঐ স্কুল থেকেই ১৯১৭ সালে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন হুর্গামোহন। সেদিন হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁকে একেবারে দশম শ্রেণীতে ভর্তি করে নিরে যে করুণা দেখিয়েছিলেন, তার বোকা এখনও অধ্যাপক বইছেন। দেখলাম, তাঁর প্রেসজ উঠলে কৃতজ্ঞতার হয়ে পড়েন তিনি।

১৯২১ সালে কটিন চার্চ কলেজ হতে বি, এ এবং ১৯২৩ সালে বেদবিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিভাগয় হতেই এম, এ পাশ করলেন।

বিশ্ববিভাগয়ের ছাত্র থাকার সময়েই তাঁর অধ্যাপনা-জীবনের নৃত্রপাত। তখনই কিছুদিন কটিন চার্চ কলেজে অধ্যাপকরূপে কাজ করেছিলেন। তারপর ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত একটানা ঐ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে কাজ করে আসেন।

১৯৫২ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পোর্ট-প্রাইমেরেট বিসার্চ বিভাগে বৈদিক ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অধ্যাপক হয়ে বোপ দেন। এখনও তিনি সেখানেই। কলেজের সুন্দর পরিবেশ,

কর্তৃপক্ষের আন্তরিক্য তাঁকে তাঁর বোগ্য স্থানে পরিপূর্ণভাবেই কাজে লাগাতে পেয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির সঙ্গে কিছুদিন তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদের সদস্য হিসাবেও তিনি ১৯৪৮-১৯৫১ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। পারিভাষিক শব্দচরনে তাঁর দান অসামান্য। এ বিষয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখাও বেরিয়েছে। তাঁর দেওয়া অনেক শব্দ আজও আমরা ব্যবহার করছি। সরকার এই ব্যাপারে তাঁর বিশেষ অবদান স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতের আদর্শকে অবলম্বন করে গুরুগৃহে একদিন যে জীবনের নৃত্যপাত হয়েছিল, ভারীকালেও সে জীবন পথভ্রষ্ট হয়নি। অনাড়ম্বর জীবন ও নির্যাতমান হৃদয় নিয়ে চিরকাল তিনি শুধুই অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা করে এসেছেন। এর সঙ্গে আরও দুটি গুণ সমবেত হয়েছে তাঁর চরিত্রে। একটা হচ্ছে যে কোন সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার একটা শক্তি, আর একটা হোল পুরানো শূঁষিপত্র সংগ্রহ করার উদগ্র নেশা। আজকের এই আবিষ্কারের মূলে এই দুটো গুণ বড় বেশী কাজে লেগেছে তাঁর। যেখানে সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে, মনীষীর দৃষ্টিকে তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। আমি দেশ-বিদেশের অনেক মনীষীর কথা জানি, ধারা অধ্যাপকের চরিত্র ও বিজ্ঞানভার ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছেন। তাঁদের লেখা চিঠি-পত্র আমি দেখেছি বলেই এটুকু না লিখে পারলাম না।

অর্থর্ববেদের বিপুলায়ত্তন শাখার উদ্ধার অধ্যাপকের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার সন্দেহ নেই। কিন্তু এইটাই সব নয়। আজ অবন্ত এইটাই পুরোভাগে এসে প্রাচী-প্রতীচ্য আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং তাঁর জীবনের আর সব কিছু অবদানকে খানিকটা বাহুপ্রস্তু করে ফেলেছে। কিন্তু এর চেয়ে বড় কী না জানি নে, তবে এর চেয়ে কোনও অংশে কম নয় এমন আবিষ্কার তিনি এর অনেক আগেই করেছেন। প্রচারকামী মন তাঁর নয় বলেই সাধারণত তাঁর প্রচার হয় নি। বাংলা দেশে বেদচর্চা ছিল না, এই চিরপ্রসিদ্ধি। বেদশাস্ত্রে বৈয়াক্ষ্যের শাখাত কলঙ্কের যে ছাপ বাঙালী এতদিন বহন করে এসেছে, তার ক্ষালন তিনিই প্রথম করেন। গুণবিষ্ণু বাঙালী ও বেদজ্ঞ ছিলেন, একথা ভারতবর্ষকে তিনিই তুলিয়েছেন। গুণবিষ্ণুর ভাষাও তিনিই প্রকাশ করেছেন। হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্ব্ব' নামে একখানি গ্রন্থ কতকগুলি বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা। সূত্র পাজাবে বসে পণ্ডিত শত্রয় মিশ্রও হলায়ুধের মন্ত্রভাষা তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন হলায়ুধ। এই হলায়ুধের কথা তাঁর মত এমন কোরে কেউ আর বলেন নি। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ হতে অধ্যাপকের সম্পাদনার শীর্ষই 'ব্রাহ্মণসর্ব্ব' বেরোবে। পাঠালী বেদজ্ঞ রামনাথ বিজ্ঞানচম্পতি তো অধ্যাপকের একেবারে নতুন আবিষ্কার। তাঁর ২২ খানা গ্রন্থ আছে এ কথা তিনি বলার আগে কেউ জানতো না। কয়েকখানা তো অধ্যাপকের ঘরেই আছে। রামনাথের 'সামগমন্ত্রব্যাখ্যান' অমূল্য গ্রন্থ। এখনও অধ্যাপকের ঘরে বাংলা হরকে লেখা সামবেদের একখানা প্রাচীন সখর পুঁথি রয়েছে। বাঙালী যে বেদচর্চা করছে এর চেয়ে বড় প্রমাণ ভার

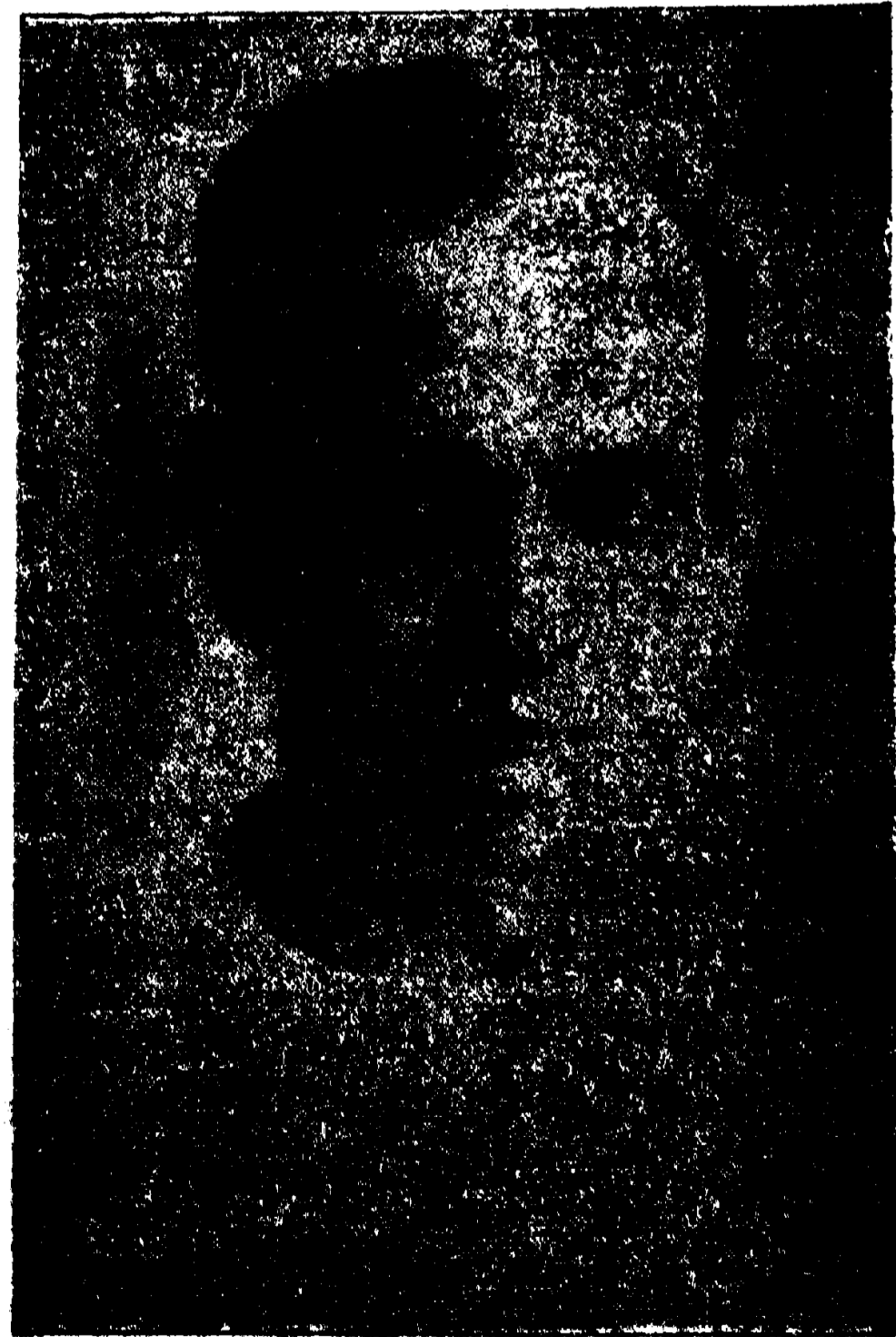
আর কী হতে পারে? 'চিন্নর বন' গ্রন্থে বর্গত কিত্তিমোহন সেন বিশেষভাবে অধ্যাপকের এই অবদানের কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন। এ ছাড়াও 'ছানোগ্য-ব্রাহ্মণ', 'সুস্তাকল', 'ছানোগ্য-মন্ত্রভাষা' প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি সম্পাদনা করেছেন।

অর্থর্ববেদের পুঁথি আবিষ্কার করতে গিয়ে আরও কতকগুলি বিপুলায়ত্তন গ্রন্থের তালপাতার পুঁথি অধ্যাপকের হাতে এসে পড়েছে। 'আদ্বিরসকল', 'কর্মপঞ্জিক', 'অর্থর্বপরহস্ত' প্রভৃতি এই পুঁথিগুলি অর্থর্ববেদী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে জানবার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। সম্পদ তিনি আহরণ করেছেন, আর তা আমাদের জন্মেই করেছেন। কিন্তু তা বর্জন করার দায়িত্ব একজন স্বল্পবিত্ত অধ্যাপকের পক্ষে পালন করা একান্ত 'অসম্ভব'। কয় পুরুষ লাগবে তাই বা কে জানে? তবু জাতি যদি সম্মান হয়, তাঁর উত্তরসাধকরা যদি এ কাজে আগ্রহ ও অধ্যবসায় নিয়ে এখন থেকেই উদ্যোগী হন, সেই হবে অধ্যাপকের জীবনে পরমা শান্তি। তাঁকে সে শান্তি আমাদেরই দেওয়া উচিত।

ডক্টর বি, এন, দে

[কলকাতা পৌরসভার প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার]

ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং জগতে ডক্টর বি, এন, দে (বীরেন্দ্রনাথ দে) মর্যাদার আসন পেয়েছেন বহুদিন। দীর্ঘ বোল বহুর কলকাতা পৌরসভার চীফ ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্বভার তিনি বহন করেন এবং সে নিত্যভাষ্যোগ্যতার সঙ্গে। কলকাতার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাঁর মৌলিক অবদান রয়েছে অনেক, যার জন্তে গর্ভ করার তিনি সত্যি অধিকারী।



ডক্টর বি, এন, দে

ডক্টর দে ২৪-পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুরের সন্ন্যাস কর্মচার-কন্যোক্ত। অবশ্য তাঁর জন্ম হয় কলকাতার ইটালীতে ১৮১২ সালে। ইটালীর বনেদি দে'রা আর জয়নগর-মজিলপুরের কর্মচারগণ একই পরিবারভুক্ত মানুষ। ছেলেবেলাতেই বীরেন্দ্রনাথের ওপর পূজাপার পিতা ভোলানাথ দে ও জেহন্নবী জননী মনোমোহিনী দেবীর প্রভাব পড়ে বেশিরকম। সকলেরই বিশ্বাস আগে—বড় হয়ে দে-বংশের সুখোচ্ছল করবে এই নবজাতক।

ছাত্রজীবনে বীরেন্দ্রনাথ প্রতিটি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর প্রারম্ভিক পড়াগুলো সম্পন্ন হয় কলকাতাতেই, কিন্তু পরবর্তী উচ্চ শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন বিলেতে যেরে। ১১১৫ সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং-এ অনার্স বি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে প্রচুর দক্ষতা ও অধিকার অর্জনের জন্ত গোড়া থেকেই তাঁর ভেতর একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। ক্রমে ইংলণ্ডের বহু বায়গার তাঁর প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে পড়ে—সেদিনে লগুনে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় উপদেষ্টা ইঞ্জিনীয়ার (কনসালটিং ইঞ্জিনীয়ার)। ১১২৪ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং শাস্ত্রেই গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রীতে তিনি ভূষিত হন।

বিলেতে যখন ডক্টর দে'র ইঞ্জিনীয়াররূপে (পরামর্শদাতা) বিপুল পসার হয়ে চলেছে, সে সুহৃৎে তাঁর কাছে ডাক পৌঁছল হাতুড়ুমির—পিছিয়ে পড়া এই কলকাতার। তখন মহানগরীর নান্দা-নর্দাতাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়—যরলা নোংরা জলের মাঝে থেকে নাগরিকদের জীবন বৃষ্টি বাঁচে না। দেশপ্রিয় বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (মেয়র), পঞ্চ প্রধানের অন্ততম শব্দে বহু প্রমুখ নেতৃত্ব বীরেন্দ্রনাথের সক্রিয় সহায়তা দাবী করলেন এর প্রতীকার চেষ্টায়। অর্থ ও মর্যাদার দারুণ সোভ ভ্যাগ করে চলে আসেন অর্থনি তিনি স্বদেশের মাটিতে, এসে বোগ দেন কলকাতা পৌরসভার গোড়া থেকেই চীক ইঞ্জিনীয়াররূপে। সে ১১২১ সাল অর্থাৎ আজ থেকে সোজাশুভি একত্রিশ বছর আগেকার কথা। বলতে কি, ডক্টর দে-ই কলকাতা পৌরসভার প্রথম ভারতীয় চীক ইঞ্জিনীয়ার।

১১২১ সাল থেকে ১১৪৫ সাল অবধি বোলাটি বছর এই কর্মচারিক মহানগরীর উন্নয়ন সক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রত্যক্ষভাবে ব্যাপৃত থাকেন। কি চীক ইঞ্জিনীয়ার, কি স্পেশাল অফিসার (ড্রেনেজ), কি ইঞ্জিনীয়ারিং উপদেষ্টা—এ সকল দায়িত্ববহুল পদে তাঁকে অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে দেখা যায়। উন্নততর পরঃপ্রণালীর ব্যবস্থা দারুণত এক বৈজ্ঞানিক ও অস্ত্রান্ত পুনর্গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তিনি বিপুল পরিমিত অর্থ বাঁচিয়ে দেন পৌরসভায়। কলকাতার আজ যে ভুলনার অল্প মূল্যে বিহ্বাৎ শক্তির ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে, বলতে গেলে বরদী জ্বর ডক্টর দে'রই এ কৃতিত্ব। মহানগরীর উন্নয়ন স্রতে লিপ্ত থাকার কালে তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের (মেতাজী) দক্ষিণ হস্তস্বরূপ, এ সৌন্দর্য ভ্রমাবতঃই তাঁর রয়েছে।

পৌরসভার দায়িত্ব ভার হেড়ে ডক্টর দে পুনরায় পরামর্শদাতা ইঞ্জিনীয়ারের পেশায় আত্মনিয়োগ করেন ১১৪৫ সালে। কিন্তু কলকাতা মহানগরীর উন্নয়ন চিন্তা তখনও থেকেই যায় তাঁর।

পরামর্শদাতা ইঞ্জিনীয়াররূপে তিনি এখানকার নাগরিকদের সেবা করতে থাকেন—জাতি গঠনাত্মক আরও বহু কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত হয়ে পড়েন তিনি ক্রমেই। উপদেষ্টা হিসাবে আহূত হয়ে কিংবা মন্বন করে জানবার সুববার আগ্রহ থেকে তিনি এর ভেতর বহুবার ইউরোপ ও আমেরিকার বেশকালি সফর করেছেন। ১১৩১ সালে তিনি এমন কি পৃথিবী পরিক্রমার বাহির হন এবং ভারতের বাহক ইঞ্জিনীয়াররূপে প্রশংসা লাভ করেন যখন বেথানে গেছেন, সেখানেই। নিখিল চীন-বিক্রান্তী সমিতি কেন্দ্রবেশনের আমন্ত্রণক্রমে ১১৫৫ সালে তিনি নয় চীন সফরে যান।

প্রথম জীবনে বিলেতে থাক। অবস্থাতেই উপদেষ্টা ইঞ্জিনীয়ার ডক্টর বীরেন্দ্রনাথের খ্যাতি ব্যাপক অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। সিলিং, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল—ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রতি বিভাগেই তাঁর পর্যাপ্ত অধিকার রয়েছে। 'কেরো কংক্রীট' জাহাজ নির্মাণের ব্যাপারে তিনি একজন অগ্রণী এবং 'গ্যাস টাইট কেরো কংক্রীট'র তিনিই আবিষ্কার। এ সকল নানা কারণেই আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে আজও তাঁর নাম ও প্রতিষ্ঠা স্বীকার না করলে নয়।

কলকাতা পৌরসভা তথা কলকাতা মহানগরীর সাথে ডক্টর দে'র হৃদয়ের এতখানি নিবিড় যোগ ছটেছে, যেন একে বাদ দিয়ে কোন চিন্তাই তাঁর চলে না। ১১৫৪ সাল থেকে ১১৫৭ সাল অবধি তিনি পৌরসভার কারিগরী পরামর্শদাতা ও পবিত্রন উপদেষ্টার আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সময় মধ্যেই ১১৫৬ সালে পৌরসভার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি (৪৬ কোটি টাকায়) প্রণয়ন করা হয়। মহানগরীর জরুরী সমস্যাজলির সমাধানে আলোচ্য পরিকল্পনার যে যে কাজের সুপারিশ রয়েছে, সে সব অবশ্য সম্পূর্ণ কার্যকরী হতে এখনও বাকী। এ কারণে বীরেন্দ্রনাথের মনে স্বতঃই একটা অসন্তি ও উবেসের ভাব লক্ষ্য করা যায়।

ডক্টর দে'র কথা—আজকের দিনে একটি সুখ্য চিন্তার বিবরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতার বিকল্প জল সরবরাহ ব্যবস্থা। মহানগরীর বুকে কোন্ পরিকল্পনার এতটুকু জল দাঁড়িয়ে থাকবে না এবং নাগরিকদের গৃহস্থালীর কাজে অপরিষ্কৃত জল ব্যবহার না করলেও চলতে পারবে—এ সকল প্রশ্নের ওপরও এখানে কথ ভাবনা দেন নি তিনি। এখানে বিকল্প জল সরবরাহ ব্যাপারে ইঞ্জিনীয়ার দে'র একটি নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে, যেটি তিনি সাহসের সঙ্গে পেশ করেন ১১৩১ সালেই। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী) তখন পৌরসভার অন্তরায়ান—ডক্টর দে'র মন্বন পরিকল্পনাটি সম্পর্কে গভীর উৎসাহ প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে।

ডক্টর বীরেন্দ্রনাথের সোজা দাবী—মহানগরীর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে-টি, সে হচ্ছে জনসংখ্যার সাথে তাল রেখে পর্যাপ্ত পরিষ্কৃত জল সরবরাহ। কতকগুলি অগভীর মলকূপ বসিয়ে প্রায়ের দীর্ঘস্থায়ী দীর্ঘমাস হবে না, এর জন্ত চাই অতি সুব্বাকার মলকূপ—বা মাটির গভীর অন্তর্দেশ বা পাতালপুত্রীর অক্লান্ত জল টেনে তুলতে পারবে। টাকার তথাকথিত অভাব দেখিয়ে এ অন্ত্যাবক পরিকল্পনার রূপায়ণে বিলম্ব ঘটানো তাঁর কাছে অসহনীয়।

যনায়ক ইঞ্জিনীয়ার (স্বাক্ষর) ডক্টর বি. এস. দে আজও অবধি বেশ কর্মরত ও চিন্তাশীল। ভারত ও ভারতের বাইরের ২৪

ইন্ডিয়ায় প্রতিনিধিত্বের সাথে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনি সতাপতি কিংবা অপর কোন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত। বাঙালীর পক্ষে এ গৌরবের বে, আমেরিকার ডেট্রয়েটে ১৯৫১ সালে যে প্রথম বিশ্ব-খাদ্য কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তিনি ছিলেন উহাতে সরকার মনোনীত অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি। কৃষিকার কারিগরী বিজ্ঞান সমিতির নিখিল সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ১৯৫৭ সালে তিনি সোভিয়েট ভূমি সফরে আমন্ত্রিত হন। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাস্তবনির্মাণ বোর্ডের নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। দেশ ও জাতি তাঁর কাছ থেকে এখনও অনেক অবদান পাবে, এ বিশ্বাস রাখা কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি নয়।

আবহুল মোমিন

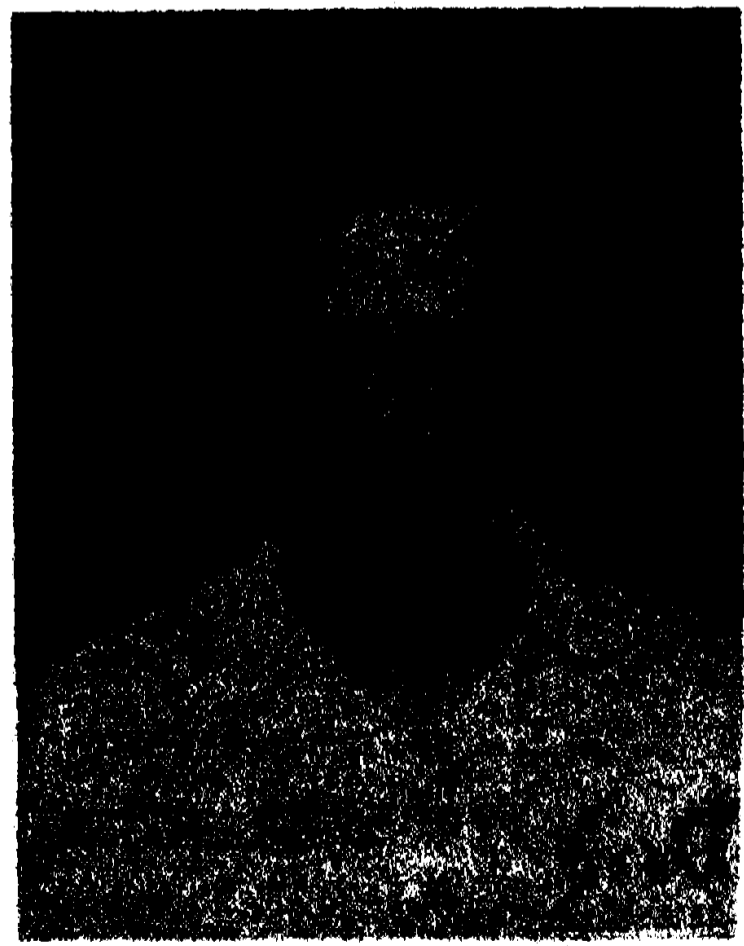
[কমান্ডি পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা]

নিরমধ্যবিত্তঘরে জন্মগ্রহণ—প্রথাবিরোধি অর্থাভাব ও অস্বাভাব—বাল্যে বিপ্লবী দলের সহিত সংযোগ—কৈশোরে মেহনতী জনতার সংগঠন-প্রয়াসী—আর বৌবনের অধিকাংশ সময় কারাগারে অতিবাহিত—এই হল প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন ও সাম্যবাদী নেতা আবহুল মোমিনের জীবনচিহ্নসমূহের সংক্ষিপ্তসার।

রাজসাহী জিলার বিহরপুর গ্রামের মুন্সী ককিলুদ্দীন ও সবেয়া বেগমের একমাত্র পুত্র আবহুল মোমিন মাতুলালয় কেচুড়াডাকার ১৯০৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে স্বগ্রামে ও পরে কেচুড়াডাকায় লেখাপড়া আরম্ভ হয়। তখন প্রথম মহাসমর আরম্ভ হয়েছে—বালক মোমিন ক্ষুধা পেয়ে, অর্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটিয়েছে—পিতা রাজমিস্ত্রী হিসাবে সামান্ত আয় করতেন। জমিদারের বেগার প্রথা খাটার জন্ত পিতাকে প্রকৃত হতে দেখেছে বালক মোমিন। পরসূ অত্যাচার লেখাপড়া বন্ধ ছিল কিছুদিন। বাবা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের নিকট মেধাবী পুত্রের পড়ার ভার নিতে অস্বীকার করেছেন—শেষে এগিয়ে এসেছেন নিজে থেকে 'বাঘা বতীর'এর প্রত্যক্ষ শিষ্যদ্বারীর ছাত্রসংলগ্নের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট বিপ্লবী ব্রজেননাথ পাল। এই প্রভাব মোমিনের পরবর্তী জীবনে প্রকট হয় আর তাঁর নিকট বালক মোমিন জানতে পারে (১) ভয় বলে দুনিয়ার কিছু নাই (২) মানুষ সব কিছু সৃষ্টি করে (৩) বড় হয়ে দেশের জন্ত নিজস্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। এইগুলি মূলধন করে মোমিন ঝাঁপিয়ে পড়েন বিপ্লবী দলের কার্যে। পিতা বিরক্ত কিন্তু মা উৎসাহ দিতেন। শিকারপুর হাই স্কুলে পড়ার সময় তিনি ১৯২০ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন দেখেন—অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জি ও সরস্বতী দেবীর 'ইংরাজ বিতাড়ন' কথা দুটি মনে গেঁথে রইল কিন্তু আর কিছু বুঝলেন না। পর বৎসর কংগ্রেসের সদস্য হন ও কলিকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। সেই সময় অসহযোগ আন্দোলনের কল্পিতরূপে গৃহ হইয়া খিদিরপুর ডক জেলে থাকেন ও হেমন্ত বঙ্গ, বেবেন দে প্রভৃতির সহিত পরিচয় হয়। পূর্বেই বিশিষ্ট শ্রমজীবী, সত্যশ চক্রবর্তী ও পরে ব্রজেন বাবুর শিবপুর গৃহে অত্যন্ত বিপ্লবী নেতাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গি হন। পুলিশ তখন থেকেই তাঁহার উপর নজর রাখে। সীতাপাড়া-সালকিয়া অঞ্চলে থাকার সময় তিনি বহু ছেসেকে ছিল ও প্যারিসে শিখাইতেন

এক বিপ্লবী সংগঠনের জন্ত কর্মী যোগাড় করিতেন। এই সময় একদিন সরস্বতী ঘোষ লিখিত 'বলশেভিকবাদ' পুস্তিকাটি থেকে কিছু উহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া ১৯২৫ সালে তিনি এক টাকা দিয়া কানপুর কেন্দ্রীয় কমান্ডি পার্টির সদস্য হন। কিন্তু উহার জিহ্বাকলাপ কিছুই জানিতেন না। অনেক প্রবীণ বিপ্লবীনেতা তাঁহাকে উক্ত দলে যোগদান করিতে নিষেধ করেন। ১৯২৮ সালে স্বদেশীয় চৌধুরী সহিত তিনি কয়েকটি সভা-সমিতিতে যোগদান করেন কিন্তু মলাহজির প্রকট ছিল সর্বত্র। এই সময় হুর্গাদাস শেঠ কমান্ডি "বন্দোবস্ত" দপ্তরে ও "বৃহৎ" অফিসে বিশিষ্ট নেতাদের ও কাজী নজরুল ইসলামের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সত প্রতিষ্ঠিত Works & Peasants Party অফিসে তিনি পরে নীরাট বড়ুয়া মামলার আসামী ও সাম্যবাদী নেতা হুজাকর আমেদের সহিত সাক্ষাতের জন্ত গমন করিলে আবহুল হালিমের মাধ্যমে কিলিপন প্র্যাটের সহিত পরিচিত হন ও কিছু সাম্যবাদ বিষয়ক পুস্তক তাঁহাকে দেওয়া হয়। পরে অতুল ভণ্ড, হেমন্ত সরকার ও ভারতের অত্যন্ত নেতাদের উপস্থিতিতে উক্ত পার্টির অধিবেশনে শ্রীমোমিন নব-প্রতিষ্ঠিত Young Comrade League-এর সহিত সঙ্গি হন।

১৯২৮ সালে হিদারাম ব্যানার্জি লেনে বিপ্লবী সত্তাব দিল্লী দল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পঠনে তৎপর হইলে শ্রীমোমিন উহাতে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি রাজসহ শীখরাইল পার্টকল শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় বাংলাদেশে সমস্ত পার্টকল-শ্রমিকদের মধ্যে অসহযোগ ঘুমায়িত হইতেছিল। কিন্তু সম্ভবতভাবে তাঁদের দাবীদায়িত্ব উত্থাপনে (বিদেশী মিলমালিকদের প্রতি তৎকালীন শাসকদের প্রচুর সমর্থন থাকায়) বিস্তর অসুবিধা ছিল। শ্রীমোমিনের সংগঠন প্রতিষ্ঠার বঙ্গীয় জুটকর্মী ইউনিয়ন গঠিত হয় ও ১৯২৯ সালে হয় সপ্তাহ সর্বাত্মক ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। শ্রীবর্ত্তিম মুখার্জী ও অত্যন্ত কয়েকজন নেতা তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করেন। সরকারের উত্তোপে মিলমালিকেরা শ্রমিকদের প্রধান



আবহুল মোমিন

দাবীগুলি মানিয়া নেন। ইহার অসাধারণ সাফল্যে অত্যন্ত প্রশংসা করায় মধ্য মাজা পড়িয়া যায় এবং Manager, Strike Company নামে শ্রীমোমিনের নিকট স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া আবদুল মোমিন অনেকগুলি ছোট শিল্পসংস্থার মালিকদের সহিত আলাপ আলাচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবী আদায়ে সক্ষম হন। কিন্তু শ্রীমোমিন ও অত্যন্তেরা অর্থাশয়ে ও অনাহারে বহুদিন কাটাইতে বাধ্য হন। অত্যন্তেরা অর্থাশয়ে ও অনাহারে বহুদিন কাটাইতে বাধ্য হন। অত্যন্তেরা অর্থাশয়ে ও অনাহারে বহুদিন কাটাইতে বাধ্য হন। অত্যন্তেরা অর্থাশয়ে ও অনাহারে বহুদিন কাটাইতে বাধ্য হন।

১৯৩১ সালে বহরমপুর রাজনৈতিক সম্মেলনে মোমিন সাহেব যোগদান করেন ও ইহার পর এগার দিন তাঁহাকে পুলিশ আটক রাখে। উক্ত বৎসর তিনি বেঙ্গল জুট ওয়াকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৪১ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৩১ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে প্রত্যাশিত পৌরোহিত্য করেন। বিভিন্ন ইউনিয়ন অঙ্গসমূহের লইয়া উক্ত সভার পৌরোহিত্য করতেন। বিভিন্ন ইউনিয়ন অঙ্গসমূহের লইয়া উক্ত সভার পৌরোহিত্য করতেন। বিভিন্ন ইউনিয়ন অঙ্গসমূহের লইয়া উক্ত সভার পৌরোহিত্য করতেন।

সম্পন্ন করিতে থাকেন। সেই সময় তিনি কলিকাতার মকদমী ৭০টি ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন ও ট্রাইব্যুনাল ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি পদে প্রভৃতি ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। পর বৎসর নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন এবং উহার কার্যকরী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৪৮ সালের প্রথমে কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হইলে তিনি এপ্রিল মাসে বৃত্ত হইয়া পরবৎসর কারাবাসীতে যুক্ত হন। কিন্তু কলিকাতা সহ পাঁচটি জেলা হইতে বহিষ্কৃত হন। ময়মনসিংহ ১৮ দিন থাকার পর উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করা হয়। কলে তিনি অত্যন্তেরা চলিয়া যান। এই সময় শ্রীমোমিনের আচার্য্য তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী হাসিনা মোমিন পাঁচ মাস কারাবাসী জেলে আটক থাকেন। অর্থাভাব—তাঁহার ময়মনসিংহস্থিত ব্যবসার অচলাবস্থা—নিশুসহ পত্নীর কারাবাস—মানসিক অশান্তি—আর নিজেকে নেপথ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা না থাকায় তিনি পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং উড়িষ্যা সরকারের কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে—উহার সম্মুখীন হইতে মোমিন সাহেব বদ্ধপরিকর হন। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তাঁহার উপর হইতে ১৯৪১ সালের অক্টোবরে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহত হয় কিন্তু এক বৎসরের অল্প তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহার পূর্বে মতবৈধতা দেখা দেওয়ার তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি হইতে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু ১৯৫২ সালে উড়িষ্যা কমিউনিষ্ট পার্টি তাঁহাকে পুনরায় প্রাদেশিক সংস্থায় গ্রহণ করেন। মোমিন সাহেবের বর্তমানে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হল উড়িষ্যা রাজ্য। তথাকার 'ভাগচাষ' আন্দোলনে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সাল হইতে তিনি উড়িষ্যা রাজ্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি পদে বহিষ্কৃত হন এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় তিনি কর্মসম্পন্ন পঠন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১৯৪৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সত্তাবিংশতি অধিবেশনে শ্রীমোমিন A. I. T. U. C.র অত্যন্তেরা প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

সরকারী, বেসরকারী ও জনসাধারণের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ভাবে—অবসর সময়ে পড়াশুনা করেন তিনি—আর অনাদৃতদের বখাসাধ্য সহায়তা করে থাকেন তিনি।

শ্রীমতী মায়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

[পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্তেরা উপমন্ত্রী]

সুখ্যাত: এই নারী একজন দয়ালু সমাজসেবী ও গঠন-কর্মী। কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন ইনি এই মহৎ পরিচয়। মন্ত্রীর পু-উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইতেও নিজের 'মিশন' ইনি তুলে যান নি, এ কম কথা নয়। শ্রীমতী মায়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবী অনুসারে বরং বলা যায় যে, সমাজসেবা বা জনসেবার অধিকতর প্রবোগ মিলবে ভরসাতেই তাঁর এই যাত্রার নতুন দারিদ্র গ্রহণ। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ইছাপুরা গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্রোপায়া মেয়ে শ্রীমতী মায়ী। ১৯২৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন পূর্ববঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিবেশে। কিন্তু তাঁর পড়াশুনা

হয়—কি ছুল কি কলেজে, সবটাই এই কলকাতায়। পিতা বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দেশবন্ধুর একজন সহকর্মী— তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা কর্পোরেশন। বাপ-মায়ের প্রত্যক্ষ অনুশাসনে শ্রীমতী মায়ার হাতী-জীবন অতিবাহিত হয়।

বিক্রমপুরের এই বিশিষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারটির বিপ্লবাত্মক রাজনীতির সাথে যোগাযোগ ছিল সেদিনে। তার জন্ম পরিবারের অনেককেই ইংরেজ সরকারের হাতে ভোগ করতে হয়েছে নানা লাঞ্ছনা ও নির্যাতন। শ্রীমতী মায়ার একটা রাজনৈতিক মন গড়ে ওঠে হাতী অবস্থাতেই। তিনি তখনও ডিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের হাতী—দেশগোবিন্দ মুখার্জির (নেতাজী) গড়ে তুলছেন বেঙ্গল ভাষাটির কোর। সুযোগ খুঁজে নিয়ে তিনি যোগ দিলেন এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে। কলেজ-জীবনেও হাতী-আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আন্ততঃ কলেজ থেকে তিনি ১১৪৭ সালে বি-এ পাশ করেন।

স্নাতক হবার পর শ্রীমতী মায়ার মনে ছিল বি-টি পাশ করে শিক্ষকতার লাইন ধরবেন—যেখানে থেকে সমাজসেবার তাঁর সুযোগ মিলবে যথেষ্ট। সেভাবে ডেভিড হেরার ট্রেপিং কলেজে পড়াশুনাও করলেন। কিন্তু বি-টি পরীক্ষার পর তিনি আর চাকরিতে আবদ্ধ হলেন না। এককালের সুন্দর হাতীকর্মী সমাজসেবী হবার পথ খুঁজে নিলেন অন্ততাবে। ডায়মণ্ডহারবার কাকদ্বীপ এলাকার তিনি জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় কংগ্রেস সংগঠনে শ্রীমতী মায়ার ছিলেন একজন খাঁটি সুভাষিনী। তারপর অবস্থাবশত তাঁর মতবাদের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। ক্রমে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দিকে ঝুঁক পড়েন। ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (আই. এন্. টি. ইউ. সি) গঠিত হলে তিনি এর সাধারণ পরিষদের সদস্য হন পর পর তিন বছর। প্রথম দিকে তিনি মজবুত ফ্রন্টে কাজ করেন, এক্ষেত্রে যেমন রাজ্যের কিষাণ ফ্রন্টে। উভয় ফ্রন্টেই কর্মী হিসাবে তিনি বিশিষ্টতার ছাপ রাখতে পেরেছেন এরই ভেতর।

বাংলার ১১৪৩ সালের চুক্তিক বখন চলেছিল, শ্রীমতী মায়ার তখনও ছিলেন হাতী। কিন্তু দুর্গত মানুষের সেবার তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখা গেছে সেদিনেও। ২৪-পরগণা বিশেষ ভাবে ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে জনসেবামূলক বহু কর্মসূচীতে তিনি এখনও যাপৃত রয়েছেন। ২৪-পরগণা জেলা কংগ্রেস ও



শ্রীমতী মায়ার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা কংগ্রেসের তিনি সেদিন অবধি সেক্রেটারি ছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং এ-আই-সি-সি'রও তিনি একজন সক্রিয় সদস্য। ২৪-পরগণা বেডক্রশ সোসাইটির সাথে তিনি বহুদিন থেকে নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। নারী ও শিশুকল্যাণ কাজেও তিনি এক্ষেত্রে ত্রুতী আছেন এবং শেষ অবধি এই মহৎ কাজ নিয়ে থাকবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর রয়েছে। সমবার প্রচেষ্টার স্বাক্ষর করে, তার পরীক্ষা নিরীক্ষাও তিনি করেকটি চালিয়েছেন।

দেশের বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা ও ক্রিয়াকলাপের সাথে শ্রীমতী মায়ার যোগাযোগ বিস্তারিত। ওয়েস্ট বেঙ্গল কিরিক্যাটিক্যাল এসোসিয়েশনের তিনি সভানেত্রী। ২৪-পরগণার বিভিন্ন স্থানে তিনি কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। বিলা সাধারণ নির্বাচনে কাকদ্বীপ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে তিনি কংগ্রেস প্রার্থীরূপে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন তারপরই নতুন সরকার গঠিত হলে তাতে তিনি একজন উপস্থান নিযুক্ত হন এবং উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের গুরুত্ববহন দপ্তরের ভা গ্রহণ করেন। আজ অবধি সেই দায়িত্বই পালন করতে চলে করছেন তিনি সহায়ত্বভিত্তিক মন নিয়ে। তিনি দাবী রাখেন— কেন্দ্রীয় সহযোগিতা ঠিকভাবে পেলে উদ্বাস্ত পুনর্বাসন সমস্যাটি সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর।

বঙ্গবন্দর বঙ্গবন্দনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্বপশ্চিমের মিলনভঙ্গ আত্মস্থান করিলেন, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে মহাকাশের অভিমুখে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে পাইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে যে দেখিতে দেখিতে এমন বুদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এ-সাহিত্যে এই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে বাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার একের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, বাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্গি বাহা রচনা করিয়াছেন, কেবল তাহার অন্তই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের হাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনভঙ্গ বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিকর্তাকে আশ্রিত করিয়া তুলিয়াছে।

—বীরেন্দ্রনাথ

অমৃত অমৃত
শ্রীমহাদেব
অমৃত অমৃত অমৃত

২৪

পূজার ঘরের দরজা বন্ধ করে নৃসিংহের ধ্যান করছে শ্রীবাস, হঠাৎ কে হুকার করে উঠল বাইরে থেকে। 'দরজা খোলো।'

লক্ষ্য করল না শ্রীবাস। যেমন তন্দ্রায় হয়ে বসেছিল তেমনি বসে রইল।

'কী, খুললে না? খোলো বলছি শিগগির।' বাইরে থেকে দরজায় লাগি পড়ল এবার।

ভীষণ বিরক্ত হল শ্রীবাস। রুদ্ধস্বরে চোঁচিয়ে উঠল: 'কে তুমি?'

'কে আমি?' বাইরে থেকে বললে আগন্তুক: 'যার তুমি ধ্যান করছ সেই আমি। দরজা খুলে দেখ আমাকে।'

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বললে, 'তুই মন্দবুদ্ধি। নিশ্চয়ই তুই মরণেচ্ছু। আর মুমূর্ষুদেরই বাক্যবিপ্লব হয়ে থাকে। নইলে কী সাহস তুই বলিস আমি ছাড়া আরেক ভগদীপ্তর আছে। যদি থাকে, সে কোথায়? যদি বলিস সে সর্বত্র আছে, তবে এই স্তম্ভে তাকে দেখছি না কেন? 'কাসৌ যদি স সর্বত্র, কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে?'

প্রহ্লাদ প্রণত হয়ে বললে, 'বা, ঐ তো দেখা যাচ্ছে।'

হিরণ্যকশিপু বলছে, 'কাসৌ যদি স', অর্থাৎ সে ঐধর যদি আছে সে কোথায়? প্রহ্লাদ বলছে, 'সর্বত্র', অর্থাৎ সর্বভূতে। হিরণ্যকশিপু বলছে, 'কস্মাৎ স্তম্ভে ন', অর্থাৎ, তা হলে ঐ স্ফটিকস্তম্ভে নেই কেন? প্রহ্লাদ বললে, 'দৃশ্যতে', অর্থাৎ, ঐ তো দেখতে পাচ্ছি।

তুমি যাকে শূন্যময় দেখছ, আমি তাকে কৃষ্ণময় দেখছি।

'তোমার শরীর থেকে তোমার শির আমি হরণ করব', হিরণ্যকশিপু ধড়গ কুড়িয়ে নিল, বললে, 'আমাকে ছেড়ে যার তুই আশ্রয় নিয়েছিস সেই হরি আজ তোকে রক্ষা করুক।' সিংহাসন থেকে লাফ দিল হিরণ্যকশিপু আর অভিবলে স্তম্ভে মুষ্টিপ্রহার করল।

তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর শব্দ উঠল স্তম্ভে, যেন ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ বিদীর্ণ হয়ে গেল। ধ্বনির পর প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনির লহরী উঠল চারদিকে। হিরণ্যকশিপু চকিতনেত্রে পাগলের মত চারদিকে তাকাতে লাগল, এই ধ্বনির কারণ কী, নির্ণয় করতে পারল না।

ভক্ত প্রহ্লাদের কথা সত্য করবার ভয়ে শ্রীহরি স্তম্ভের থেকে নির্গত হলেন। কিন্তু এ কী অদ্ভুতমূর্তি। অমৃগ, অমামুষ, অধচ সিংহ আর মামুষ একসঙ্গে, নৃসিংহমূর্তিতে দেখা দিলেন। প্রতপ্ত সুবর্ণের মত চোখ, স্ফীতদীপ্ত কেশর, করালদংষ্ট্র, কুরাস্তজিহ্বা, ভ্রুকুটিভীষণ মুখাবয়ব। কর্ণদ্বয় নিশ্চল ও উর্ধ্বমুখ, নাসিকা পর্বতগুহার মত বিস্তারিত। দেহ আকাশ-স্পর্শী, গ্রীবা হৃষ ও শূল, বক্ষস্থল বিশাল ও উদর অতিশয় কৃশ। নখরনিকরে দুর্ধর্ষদর্শন।

ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়েছিল হিরণ্যকশিপু যে তার সৃষ্ট কোনো জীব, দেবতা বা দানবের হাত থেকে তার মৃত্যু হবে না। তাই এই "ন মৃগ: ন মামুষ:" অদ্ভুত নৃসিংহমূর্তি ধরতে হল ভগবানকে।

'যদিও স্পষ্ট বুঝতে পারছি মহামায়াবী হরি এইভাবেই আমার মৃত্যু চিন্তা করে রেখেছেন, তবুও এ উত্তমে আমার আর কী হতে পারে?' এই বলে গদা তুলে নিয়ে সিংহনাদ করতে করতে নৃসিংহের দিকে ধাবিত হল হিরণ্যকশিপু।

গরুড় যেমন মহাসর্পকে ধরে, তেমনি নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে ধরে ফেললেন। নিজের উরুঘরের উপর রেখে শাণিত নখরে তার উদর বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করলেন। দেবাজনারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। স্তম্ভে মুখর হয়ে উঠল দিগ্বাণল।

কিন্তু এ কী ভয়ঙ্কর মূর্তি নৃসিংহের। ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং—কিছুতেই এর নিরুদ্ভি নেই। দেবতাদের কার সাহস নেই কাছে যাব, তাকে শাস্ত হতে বলে। লক্ষ্মীকে পাঠানো হল যদি তাকে দেখে করুণাপরবশ হন। কিন্তু লক্ষ্মীও এগুতে সাহস পেল না।

একমাত্র দুঃসাহস ভক্তের। যেখানে দেবতার

অক্ষয়, স্বয়ং লক্ষ্মী সশঙ্ক, সেখানে ভক্তই অধিকারী, ভক্তই সম্মানিত।

নারদ বললে,—বৎস, তোমার পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ নৃসিংহদেবকে শাস্ত করো।

পরম ভাগবত বালক প্রহ্লাদ নৃসিংহের কাছে গিয়ে ছুতলে শরীর লুষ্ঠিত করে প্রণাম করল। কৃতান্তি হয়ে স্তব করতে লাগল; হে সঙ্ঘমূর্ত্তে, ক্রোধ সংবরণ করুন। সর্পবৃশ্চিকাদি হিংস্র হত্যায় সাধুও আনন্দিত হয়। অশুরকে আপনি বধ করেছেন, আপনিও আনন্দিত হোন। আপনার রূপ লোকে ভয়শাস্তির জগ্গে স্মরণ করে, তবে কেন আপনি এই কোপমূর্ত্তি ধরে আছেন? আমি কিন্তু আপনার শক্রবিদারী নখাঞ্জে ভীত নই, যেমন আমার ত্রাস সংসারচক্রপেষণে। দুঃখের যা ওষুধ তাও দুঃখ। আমি এই সংসারচক্রে ইক্ষুদণ্ডের মত নিষ্পীড়িত হচ্ছি, আপনি এ বিপন্নকে রক্ষা করুন। করছয়ের কণ্ডুয়নের মত দুঃখের পর সুখের ছদ্মবেশে দুঃখই বারে বারে দেখা দেয়। হে আত'বন্ধু, মথনে যেমন কাঠে অগ্নির অনুভব হয়, তেমনি ভক্তিতে আমার হৃদয়ে আপনার মঙ্গলকোমল দর্শন ঘটুক। এই করাল মূর্ত্তি প্রত্যাহার করুন। হে সর্বকলাণের অধীশ্বর, আমাকে লোকপ্রলোভনে আকৃষ্ট করবেন না, আমাকে নিরুপাধিক ভক্তি দিন।'

প্রহ্লাদের স্তবে দ্রবীভূত হলেন নৃসিংহ। মাটি থেকে তাকে তুলে তার মাথায় অভয়ঙ্কর হাত রাখলেন। বজ্রসার মূর্ত্তি কুমুমসুকুমার হয়ে উঠল।

শ্রীবাস দরজা খুলে দিল। কিন্তু এ কী! এ সে কাকে দেখছে!

এ যে নিমাই পণ্ডিত। তীব্রভেজ সূর্য্যের বীর্য্যজ্যোতি তার সর্বাঙ্গে।

'আমি এসেছি।'

হতচেতনের মত নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল শ্রীবাস। তুমি যে এসেছ! তবে যে আমার পরম কামনার ধন, যাকে জড়ে চেতনে নিত্য খুঁজছি, তুমিই কি সেই নরসিংহ? তোমার পাদপদ্মই কি সংসারমোচক? তুমিই কি সেই বিচিত্রবীর্য পরম পুরুষ?

'তাক্ষিরে দেখছ কী!' বললে নিমাই, 'আমাকে অভিষেক করো।'

এতক্ষণে বুঝি চেতনা হল শ্রীবাসের। উচ্চ কণ্ঠে সকলকে ডাকতে লাগল। গুরে কে কোথায়

আছিস, ছুটে আয়, ভগবান আমাদের গুরে এসেছেন, তাঁর অভিষেক করতে হবে। নতুন কলমী কিনে আন, একশো ঘটে জল নিয়ে আয় গঙ্গা থেকে।

পূজার ঘরে বিষ্ণুর খাটে শালগ্রাম গুরে! তাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে নিমাই সেই বিষ্ণুখাটে বসে পড়ল।

কে আপত্তি করবে! 'আমিই সেই!' শুধু মুখের কথায় নয়, সর্বাঙ্গের অলোকসম্ভব রূপে, দিব্যদীপ্ত কাস্তির সুধা প্লাবনে।

গদাধর ছুটে এল, যে যেখানে ছিল শ্রীবাসের সমস্ত আত্মীয়মণ্ডলী। নিমাইকে উঠোনের মাঝখানে প্রশস্ত পিঁড়ির উপর বসানো হল, আর শত শত গঙ্গাজলের ঘট উপুড় করা হল তার উপর। যারা স্নান করাচ্ছে আর যে স্নাত হচ্ছে, কারুই বাহুজ্ঞান নেই। এত জল তবু গায়ের আভা শীতল হয় না। সোনার কাস্তি সোনার চেয়েও তেজস্বী হয়ে ওঠে।

স্নানান্তে সূক্ষ্ম শুষ্ক কাপড় পরিয়ে নিমাইকে কের পূজার ঘরে আনা হল। আর বলা-কওয়া নেই, নিমাই ফের বসে পড়ল বিষ্ণুখাটে। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল, সকলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। স্তনতে পেল ঘরের মধ্যে বাঁশি বাজছে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরুচ্ছে তেজঃপ্রভা। এমন কেউ দেখিনি, কেউ শোনিনি, কেউ কল্পনাও করেনি।

'শ্রীবাস!' ঘরের মধ্য থেকে গভীর কণ্ঠে ডেকে উঠল নিমাই।

নাম ধরে শ্রীবাসকে এর আগে ডাকেনি কোনো দিন। আর এ অশুরোধের সম্ভাষণ নয়, আদেশের নির্ঘোষ!

ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল শ্রীবাস।

'প্রভু!' দাঁড়াল করজোড়ে।

'তোমার ঘরে আমার জায়গা করে দাও।' বললে নিমাই, 'আমি তোমার ঘরের বাসিন্দে হব।'

খাট থেকে নেমে নিমাই অগ্গ আসনে বসল। আর সেই খাট নিয়ে যাওয়া হল শ্রীবাসের শয়ন-ঘরে। খাটানো হল চাঁদোয়া আর পরদা, খাটে পাতা হল বিহানা। তারপর তার উপরে নিমাই বসল।

গদাধর তাকে সাজাতে বসল ফুল দিয়ে। গায়ে লেপে দিল চন্দন, মাথিয়ে দিল কেশর-কর্পূর। নিমাইয়ের যেন রক্তমাংসের শরীর নয়, শুধু জ্যোতি-শ্রোত। শুধু তেজঃপুঞ্জ।

‘আমি কে বুঝতে পেরেছ ?’

কেউ চামর দিয়ে ব্যজন করছিল, কেউ বা স্তব করছিল তখনই হয়ে, আর কেউ শুধু তাকিয়ে ছিল নিনিমেবে। নিমাইয়ের প্রশ্ন শুনে কাঁদতে লাগল।

নিমাই বললে, ‘আমিই সেই অন্তরবাসী অন্তরতম। যিনি তোমাদের হৃদয়ে বিরাজ করছেন আমিই সেই পরম পুরুষ। জীবের দুঃখ নিবারণের জগ্গে আমি এসেছি। কিন্তু সঙ্গে আমার দণ্ড-অস্ত্র নেই, সৈন্ত-সামন্ত নেই, শুধু প্রেম নিয়ে, ভক্তি নিয়ে এসেছি। শুধু প্রেম-ভক্তিতেই এবার সকলের পাপক্ষয় করব, করব দুঃখ জয়।’

‘কিন্তু প্রভু, রাজা আসছে আমাদের সকলকে ধরে নিয়ে যেতে।’ কে একজন বললে ভয়ের কথা।

নিমাই হাসল। বললে, ‘কোনো ভয় নেই। প্রেম দিয়ে রাজার হৃদয়ও জয় করব দেখো।’

অন্য অবতारे সব সৈন্ত শত্রু সঙ্গে।

চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্ত অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥

অঙ্গ কী? নিমাইয়ের হাত-পা, নিমাইয়ের কৃপাকটাক। বাহুর উত্তোলন আর পদনৃত্যগ্যাস। আর উপাঙ্গ কী? নামকীর্তন। বাহু তুলে হরি বলে প্রেম-দৃষ্টিতে তাকালেই জগত বশীভূত নিমাইয়ের। শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যে দেখবে সেই প্রেমধন পেয়ে যাবে। রাজা যাবে কোথায়?

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।

তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥

তবু যেন কারু সন্দেহ যায় না। রাজা যে বিধর্মী, রাজা যে দুর্ধর্ষ।

নিমাই বললে, ‘বেশ, আশুক রাজা। নিয়ে আশুক তার হাতী-ঘোড়া, সৈন্ত-সামন্ত। সকলকে আমি কৃষ্ণ বলে কাঁদাব। প্রেমে বিকল বিহ্বল করে দেব সকলকে।’

হস্তী ঘোড়া যুগ পাখী একত্র করিয়া।

সেইখানে কান্দাইয়ু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ॥

রাজার যতক গণ রাজার সহিতে।

সভা কান্দাইয়ু কৃষ্ণ বলি ভাল মতে ॥

‘কী, বিশ্বাস হয় না?’ নিমাই সহসা উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠল,—‘নারায়ণী! নারায়ণী!’ নারায়ণী শ্রীবাসের ভাইকি, বয়েস মোটে চার বছর। ডাক শুনে কাছে এসে দাঁড়াল।

নিমাই বললে, ‘নারায়ণী, কৃষ্ণ বলে কাঁদো।’

হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলে তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করল নারায়ণী। ছোট শিশু, তার চোখের জলে পৃথিবী ভেসে যেতে লাগল।

‘দেখলে, দেখলে আমার কৃষ্ণনামের মহিমা।’ নিমাই বললে গদগদ কণ্ঠে, ‘তোমাদের রাজা আশুক, ধরুক আমাকে, তাকেও এমনি কৃষ্ণনামে বিপলিত করব।’

কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।

কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

নাম বিম্বু কলিকালে নাহি আর ধর্ম।

সর্বমঙ্গসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম ॥

হরি নামই কলির একমাত্র সাধন। সত্যযুগের সাধন ধ্যান, ত্রেতার সাধন যজ্ঞ, দ্বাপরের সাধন পরিচর্যা। কলিতে ধ্যান নয়, যজ্ঞ নয়, পরিচর্যা নয়, কেবল হরিনাম। সাধন ভক্তির পঞ্চ অঙ্গ। সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্তি সেবন। ‘এক অঙ্গ সাধে কেহো সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ।’ কিন্তু যে অঙ্গেরই সাধন করে, নামের আশ্রয় ছাড়া ফল নেই।

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।

যেই জপে—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥

সুতরাং আত্মহারা হবেই কৃষ্ণনামে। হাসবে কাঁদবে নাচবে গাইবে। মান-অপমানের জ্ঞান থাকবেনা, লজ্জা-জুগুপ্সা থাকবে না, থাকবে না লোকাপেক্ষা। ধৈর্যের বাধ ভেঙে যাবে। চার পুরুষার্থ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, তৃণতুল্য মনে হবে। ব্রহ্মানন্দকেও মনে হবে অকিঞ্চিৎ। ভক্তিই প্রেমানন্দায়তসিন্ধু। ভক্তিই পঞ্চম পুরুষার্থ।

শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী। সে আর তার তিন ভ্রাতৃদেব এসে দরজায়। শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভাই শ্রীকান্তকে বললে, ‘আমাদের ঠাকুর দর্শন করাও।’

‘সে কি, তোমরা কুলবধু, কোনোদিন দাঁড়াওনি অপরিচিতের সামনে।’ শ্রীকান্ত প্রতিবাদ করল। ‘তোমরা দেখবে কী!’

‘যিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করছেন, তিনি কি আমাদের অনাচার্য, অপরিচিত? তাঁকে গিয়ে নিবেদন করো আমাদের কথা।’ মালিনী অনুনয় করতে লাগল।

শ্রীকান্তর সাহস হল না এই আবেদন নিয়ে দাঁড়ায় নিমাইয়ের সামনে।

নিমাই শুনতে পেরেছে কাতরতা। বললে স্নেহে, 'আসতে দাও। যারা আমাকে দেখবার জন্মে ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়েছে এসে দরজায়, তাদের আসতে দাও স্বচ্ছন্দে।'

মালিনী ও তার ছায়েরা সামনে এসে প্রত্যেকে দেখতে লাগল নিমাইকে। অভিভূত হয়ে পড়ল পদতলে। তাদের মাথায় পা রাখল নিমাই।

'মংপ্রাণা মংপরায়ণা হও।' বরদ হাতে নিমাই আশীর্বাদ করল।

হে প্রভু, যতদিন তোমার হতে না পারি ততদিনই এ গৃহ কারাগৃহ, মোহপাশ পদশৃঙ্খলস্বরূপ। তুমি নিম্প্রপঞ্চ হয়েও আমাদের আনন্দের জন্মে পৃথিবীতে প্রপঞ্চের অনুকরণ করছ। অতএব মমতার আম্পদ এই জগৎ ও দেহ তোমাকেই অর্পণ করলাম। যতদিন কল থাকবে ততদিন তোমাকে নমস্কার।

হঠাৎ নিমাই বিমুগ্ধতা থেকে উঠে পড়ল। বললে, 'এবার আমি যাই। সময় হলে আবার আসব।'

ছকার ছেড়ে মাটিতে পড়ল মুছিত হয়ে।

এ কি, জীবনের চিহ্ন পর্যন্ত নেই! কে ছিল, কে চলে গেল দেহ ছেড়ে?

সবাই ব্যাকুল হয়ে সেবা করতে লাগল নিমাইকে। বাহুজ্ঞান ফিরে আসতেই নিমাই ধীরে ধীরে চোখ মেলল। এ কী, নিমাই আবার রক্তমাংসের মানুষ হয়ে গিয়েছে। তাকে ঘিরে যে জ্যোতিঃসমুদ্র উচ্ছ্বসিত ছিল এতক্ষণ, তা স্তিমিত হতে-হতে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

নিমাই শ্রীবাসকে ডাকল : 'পণ্ডিত।'

শ্রীবাস উৎসুক হয়ে কাছে এল। শ্রীবাসও আর তুচ্ছ ভৃত্য নয়, সম্মানার্থে পণ্ডিত।

'পণ্ডিত, আমি এখানে কী করে এলাম?' বিস্ময়বেশে চারদিকে তাকাতে লাগল নিমাই। 'কে আমাকে এখানে নিয়ে এল? এ কী, আমার গায়ে এত সন্দন কেন? কী, কথা নেই কেন মুখে? আমি কি ঘুমুছিলাম এতক্ষণ? স্বপ্ন দেখছিলাম?'

সবাই নির্বাক হয়ে রইল।

'তবে কি কৃষ্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে চলে এসেছি?' নিমাই ব্যাকুল হয়ে উঠল। 'কৃপা করে বলো কোনো চাপল্য প্রকাশ করিনি তো?'

'না, কোনো চাপল্য প্রকাশ করিনি।' সকলে আশ্বস্ত করল নিমাইকে।

নিমাই বাড়ি চলে গেল।

পরদিন ভোরে আবার নিমাইকে সকলে দেখল। একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া আর সে কী! বড়জোর মধুরস্বভাব বিনয় এক ভক্তমাত্র। কেমন আর্ত হয়ে প্রার্থনা করছে দেখ। বলছে, হে কৃষ্ণ করুণাময়, আমাকে বিষয়বাসনা থেকে উদ্ধার করো। নিজে ঈশ্বর হলো কি আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে?

তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা অক্ষ।

সেই কর্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ।

হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা।

কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা।

যদি ভববন্ধন থেকে মুক্তি চাও, যদি কৃষ্ণভক্তি পেতে চাও, বিষয়ের সংশ্রব থেকে দূরে থাকো। আর যার বিষয়সম্পত্তি আছে আগে থেকে? সে কী করবে? বিষয়সম্পত্তি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের, তাঁর ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কররূপে আমি তাঁরই বিষয়ের অবধায়কমাত্র—এই বিনয় নিয়ে সে বাস করবে। যতটুকু না করলে জীবনধারণ করা যায় না, ঠিক ততটুকুই ভোগ করবে। অতিরিক্ততাই বন্ধন।

হে প্রভু, তোমার কাছে শুধু আমার এক নিবেদন, এক বিজ্ঞাপন। শোনো, অবধান করো। যা বলছি তা মিথ্যে নয়, তা পরমার্থ, তা যথার্থ সত্য। যদি আমাকে তুমি না দয়া করো, তা হলে কোথাও আর কৃপাপাত্র পাবেনা। একমাত্র পতিতই তো দয়ার পাত্র। তাকিয়ে দেখ আমার মত পতিত আর কে আছে? আমার মত দীনহীন, অধন-অধম?

ন যুবা পরমার্থমেষ মে

শৃণু বিজ্ঞাপনমেকাগ্রতঃ

যদি মে ন দরিশ্বসে তদা

দয়নীয়স্তব নাথ হর্লভঃ ॥

সত্য এক বার্তা কহোঁ—শুন দয়াময়।

মো বিমু দয়ার পাত্র জগতে না হয়।

মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।

অখিলব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল।

লোক শিক্ষার জন্মে যাই কেন না কর, তোমাকে আর ভুলছি না, দেখছি না ভুল করে। তুমিই স্বয়ং ঈশ্বর, প্রকৃতির অগোচর সর্বনিরস্তা আদি পুরুষ, তুমিই অন্তরহিত সর্বহস্তা কালস্বরূপ। যতই উদ্ধার করো বলে না কাঁদো তুমিই মৃত্যু-সংসারসাগরে সমুদ্রতা। দৃষ্টি-দোষ ঘটলে যেমন নাট্যধর নটকে

চেনা যায়না, তেমনি দেহাভিমনে জীব তোমার নির্ণয় করতে অসমর্থ। তুমিই বাহুদেব, তুমিই নন্দগোপ-কুমার গোবিন্দ। পদ্মনাভ কমলমালী পঙ্কজনয়ন হৃদীকেশ। সম্পদে মঙ্গল নেই, কোলীশ্বে ঐশ্বৰ্যে বিছাবস্তায় বা সৌভাগ্যমদে মত্ত হয়ে মানুষ তোমার নামোচ্চারণ করতে ভুলে যায়। তুমি অক্ষিণের ধন, যার কিছু নেই, কেউ নেই, তাকেই তুমি দর্শন দাও, তাকেই কৃপা কর। হে করুণাবলোকন, আমাদের দিকে তাকাও।

আর কেউ ভুল করলনা। নরদেহে ভগবান এসেছেন। তাই তো চিন্তা সুখময়, জগৎ সুখময়।

মুসলমান-সৈন্যের ভয়ে মুরারি গুপ্ত স্নান হয়ে আছে। তাকে আশ্বস্ত করা দরকার।

শ্রীবাসের ঘরে নিমাইয়ের সামনে স্তবপাঠ হচ্ছে। বরাহ-অবতারের স্তব যেই পড়া হল অমনি নিমাই হুঙ্কার করে উঠল। দ্রুতবেগে ছুটল মুরারির বাড়ির দিকে। মুরারির বাড়িতে ঢুকেই চৈঁচিয়ে বলতে লাগল, শূকর, শূকর! মুরারি বাড়িতে ছিল, গর্জন শুনে সচকিত হল। কোথায় শূকর, ত্রস্ত হয়ে তাকাতে লাগল চারদিকে। মুরারিকে পিছনে ফেলে নিমাই তার পূজার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখল সেখানে এক বৃহৎ জলপাত্র। নিমাই বরাহরূপ ধারণ করল, দাঁতে করে তুলল সেই জলপাত্র, গর্জন করতে লাগল। সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল রূপ দেখে। নিমাইয়ের হাতে পায়ে চার খুর প্রকাশিত হয়েছে আর সেই চার পায়ে হাঁটছে মাটিতে।

নিমাই বললে, 'মুরারি, কোনো ভয় নেই। আমার স্তব করো।'

মুরারি স্তব করতে লাগল।

'তুমি খুব বেদ মানো, কিন্তু বেদ অন্ধ, সে আমার তত্ত্ব কী জানে?'

'তোমার তত্ত্ব শুধু তুমিই।' বললে মুরারি, 'অনন্ত ভুবন তোমার রোমকূপে। বেদ তোমার কী করে অস্ত্র পাবে? অস্ত্র পায় না বলেই তো অন্ধ।'

'কাশীতে বেদাচার্য প্রকাশানন্দ আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করছে। তার শুধু বেদব্যাখ্যা, সে ভক্তি মানে না, বিগ্রহ মানে না। মানে না ভক্তিই সমস্ত বেদসার।'

'তুমি তাকে জানাও।'

জানাব। তুমিও জানো আর নির্ভয় হও। কার সৈন্য, কে বিধর্মী?' নিমাই তাকাল অস্ত্রনেত্রে। বললে, 'আমি এবার শুবে যাই।'

বলতে বলতেই নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বাহুজ্ঞান ফিরে এলে বললে, 'মুরারি, আমি এখানে কী করে এলাম?'

মুরারি স্তব।

মনে পড়ল নিমাইয়ের। 'শ্রীবাসের বাড়িতে আমি অবতারের স্তোত্র শুনছিলাম। শুনতে-শুনতে এখানে চলে এসেছি বুঝি? কোনো চাপল্য করিনি তো?'

'না, কোনো চাপল্য করিনি।' গম্ভীরস্বরে বললে শ্রীবাস।

নিমাই আবার ঘরে-ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগল। 'তোমরা তো সবাই কৃষ্ণের দাস, বলে দাও আমার কিসে কৃষ্ণে মতি হবে।'

আর ভুলছি না। তোমার ছুই ভাব। কখনো ভক্ত-ভাব, কখনো ভগবান-ভাব। ভক্ত-ভগবান ছুইই তুমি।

হে প্রভু, আমার সমস্ত স্নেহ খণ্ডন করো যাতে আমার চিন্তা কেবল তোমাতেই নিবিষ্ট থাকে। তোমাতেই ধাবমান থাকে। নিয়ত বিপদে রাখো, তাহলেই থাকব তোমার শ্রীপদে। অবিচার বশে বিষয়াভিলাষী হয়ে অনর্থক কাম্যকর্ম করে অশেষ যন্ত্রণা পাচ্ছি, সেই যন্ত্রণা দূর করবার জন্মেই তুমি অবতীর্ণ হয়েছ। তোমার চরিত্র শুনতে দাও, গান করতে দাও, নিরন্তর উচ্চারণ করতে দাও, চিন্তা করতে দাও, অস্ত্র অস্ত্র থেকে শুনে আনন্দিত হতে দাও।

যে ব্রহ্মতেজ চায় সে বেদপতি ব্রহ্মার উপাসনা করে, যে ইন্দ্রিয়ের পটুতা চায় সে ইন্দ্রের, যে সন্তান চায় সে প্রজাপতি দক্ষের, যে সৌভাগ্য চায় সে চূর্গার। যে ধনকামী সে বসুর উপাসক, যে বীর্যকামী সে রুদ্রের, যে রূপকামী সে গন্ধর্বের, যে স্বর্গকামী সে দ্বাদশ আদিত্যের। যে শত্রুর উচ্ছেদ চায় সে রাক্ষসকে ভজনা করবে, যে পদভ্রংশের নিবারণ চায় সে করবে অস্তুরীককে, যে বিয়নাশ চায় সে যক্ষকে, যে রাজকাৰ্য চায় সে ময়ূকে, যে শুধু আরু চায় সে অশ্বিনীতনয়নকে। আর যে ভক্তি চায়, ভগবদমুরারি চায় তার অর্চনীয় শুধু বিষ্ণু।

তার অর্চনীয় তুমি।

[ক্রমশঃ]

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]
ডঃ পঞ্চানন বোষাল

এই ভাবে মূল হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করার পক্ষে আমরা প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের মূলে ছিল এই হত্যা মামলার অন্ততম আসামী কেট্টো বাবুর স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি। এদেশের আইনে পুলিশের নিকট কোনও আসামীর স্বীকৃতি আদালতে প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও উহা এই মামলার প্রধান আসামীর খোকা গোপী-ও কেট্টোর ভাগ্য চূড়ান্তরূপে নির্ধারিত করে দিলে, প্রকৃত পক্ষে এই আসামী কেট্টো বাবুর বিবৃতি অস্বাভাবিক আদি এই মামলার অন্ততম সাক্ষী সত্য গৌরালা, হারু গৌসাই, পৌরী, কণী এবং সাধু বাবাকে ধ্বংস করার পক্ষে পেরেছিলাম, এ ছাড়া কেট্টোর বিবৃতি অস্বাভাবিক মেধনগলির বৌংল থেকে খোকার রক্তরঞ্জিত জুতা জোড়াটিও উদ্ধার করতে পেরেছি। মলিনা ও তার চালক ভৃত্যকে ঐ জুতা জোড়াটি দেখানো মাত্র তারা বলে দিতে পেরেছিল যে ঐ জুতা জোড়ার মালিক খোকা বাবু। তাদের বিবৃতি অস্বাভাবিক জানা গেলো যে গত বৎসর খোকা তাদের নিয়ে পুরীধামে বেড়াতে গিয়েছিল এবং সেখানকার একটি দোকান হতে খোকা তাদের সম্মুখেই ঐ জুতা জোড়াটি ক্রয় করেছিল। এ ছাড়া পৌরী তার বন্ধু কণী সেওড়াফুলির ঘটনাটিও সমর্থন করে। তারা তাদের বিবৃতিতে বলে যে পৌরী গঙ্গার ধার হতে পালিয়ে সেওড়াফুলির একটি কুলটা নারীর বাড়ীতে এসে বসবাস করছিল। খোকা বাবু তাদের ঠিকানাটা সংগ্রহ করে ঐখানে এসে পৌরীকে তার অবস্থার জ্ঞে মারমর করে বার। পৌরীর বন্ধু কণী তাকে রক্ষা করতে এলে সে-ও খোকা কর্তৃক প্রহৃত হয়েছিল।

এই ভাবে সাক্ষী-সাবৃত্ত সংগ্রহ করার পর সাক্ষীদের দ্বারা আসামীদের মিছিল সনাক্তকরণের প্রয়োজন হয়। এই জন্ত কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে পাটনা হাইকোর্টের মাধ্যমে আমরা বিহার প্রদেশের জেল হতে খোকা বাবুকে সমস্ত বাহিনীর পাহারার কোলকাতার চিক্, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আনিতে নিই। খোকাকে বাঙ্গলা দেশে এলে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম মত প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়েছিল। তদন্তের কারণে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাকে আমরা পুলিশ হেপাজতীতে নিতে সাহসী হইনি। এর পর আসামীদের জন্ত মিছিল সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই পদ্ধতিতে আসামীদের অস্বাভাবিক চেহারার ও বেশভূষার কয়েকজন বাহিরের ব্যক্তির সহিত একত্রে মিশিয়ে দিয়ে সাক্ষীদের একে একে সেখানে এনে তাদের সনাক্ত করতে বলা হয়ে থাকে। এইরূপ সনাক্তকরণ ব্যবস্থা জেলের মধ্যে জর্নেক হাকিম কর্তৃক সনাক্ত হন। বলা বাহুল্য, এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থা তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের অস্বাভাবিকই করা হয়ে থাকে।

প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে এই সনাক্তকরণ মিছিলের ব্যবস্থা করা হলে হাকিমের সম্মুখে সাক্ষীদের একে একে এনে আসামীদের সনাক্ত করতে বলা হয়। সাক্ষী সত্য গৌরালা এবং হারু গৌসাই প্রতিটি আসামীকেই সনাক্ত করে বলে যে, তারা এদের সকলকেই পাগলাকে চ্যাম্বি করে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু সাক্ষী পৌরীরা কেবলমাত্র গোপী কেট্টো ও খোকাকে সনাক্ত করে বলে যে, সে এদের অন্তর্ভুক্ত করে জেলের সঙ্গে গঙ্গার ধার দিয়ে পাগলাকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছিল। অপর দিকে সাক্ষী সাধু বাবা কেবল মাত্র খোকাকে সনাক্ত করে বলেছিল যে, সে তাকে একটি পুঁটলী ঐ দ্বায়ে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করতে দেখেছে। তবে সে এ কথাও বলে যে, খোকার সঙ্গে সে একজন কৃকবর্ণের ব্যক্তিকে ঐ সময় দেখেছিল, কিন্তু সেই ব্যক্তি এদের মধ্যে এখানে আছে কি না তা সে বলতে পারবে না। অন্তর্ভুক্ত সাক্ষীরা আসামীদের বিশেষ পরিচিত থাকার আমরা এইরূপ মিছিল সনাক্তকরণের জন্ত তাদের হাকিমের নিকট পেশ করার কোনও প্রয়োজন মনে করিনি। এই ভাবে মূল খুনের মামলার তদন্ত কার্য শেষ করে আমরা অপর একটি বিবরণ মনোনিবেশ করলাম।

খোকার কুপানাথ সেনের বাড়ীতে এক তার দেওবরের আন্তানার আমরা প্রায় পঞ্চাশ সপ্তাহ দুজার হীরা জহরত ও অলঙ্কার উদ্ধার করতে পেরেছিলাম, বলা বাহুল্য, এইগুলি কলিকাতা শহর ও উহার শিলাকলের পৃথিবীভাগে সিঁচ কেটে বা ভালো ভেঙে চূরি করে আনা হয়েছিল। আমরা গত পঁচিশ বৎসরের চুরির মামলার নথীপত্র বেঁটে উহাদের কবিরাসীদের একে একে খানায় ডাকিয়ে এনেছিলাম। এই সময় আমরা ব্যাঙ মিছিল সনাক্তকরণের অস্বাভাবিক রূপে মিছিল সনাক্তকরণেরও ব্যবস্থা করি। এক একটি চোরাই গহনা অস্বাভাবিক কয়েকটি গহনার সহিত একত্রে বা পর পর টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে কবিরাসীদের তাদের আপন আপন অপসৃত্ত দ্রব্য বেছে নিতে বলা হয়। কোনও একটি বহু বৎসর কেহ ব্যবহার করলে উহাতে কোনও চিক্ বা মার্ক না থাকলেও মালিকের উহাকে আপন দ্রব্যরূপে সজ্ঞেই চিনে নিতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ অলঙ্কারের ওজন মেরামতি দাগ, খিঁচ খাঁচ, গুলাংশ ও আকরিক চিক্ হতে কবিরাসীরা আপন আপন অপসৃত্ত দ্রব্যগুলি চিনে নিতে পেরেছিল। অপসৃত্ত দ্রব্যগুলির এইরূপ সনাক্তকরণের পর আমরা খোকা বাবুর বিরুদ্ধে ৭৫টি সিঁকেল চুরির মামলা নিয়ম আদালতে রুখু করতে পেরেছিলাম। কলিকাতার জর্নেক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মি: আই, এম সুখার্জির আদালতে এই মামলাগুলির বিচার হয়। এই সকল মামলা প্রমাণিত হওয়ার আদালত কর্তৃক খোকার এক এক বৎসর করে অন্তত ৭৫ বৎসরের সশ্রম কারাবন্দের আদেশ হয়। বলা বাহুল্য,

যে এতোগুলি চুরির মামলা তার বিরুদ্ধে পূর্বাঙ্কে রুখু করার প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের ছিল তাকে বেশ কিছুকাল জেলের মধ্যে আটকা রাখা। আমরা জানতাম যে, নৈবক্রমে খুনের মামলা কেইল করলে আমাদের জীবন সংশয় হয়ে উঠবে। এই জুই পূর্বাঙ্কে আমাদের এইরূপ এক বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখতে হয়েছিল। এই ভাবে খোকা বাবুকে কিছুকালের জন্য জেলে আবদ্ধ করে আমরা ভাবছিলাম যে এইবার কি করা যায়? এমন সময় কুমরটুলীর বয়েন বাবু নামে এক ভ্রমলোক খানার এসে একটি চমকপ্রদ খবর দিয়ে গেলো। বয়েন বাবুর বিবৃতিটির কিছু অংশ নিয়ে উল্লিখিত করা হলো :

“আমি এই রকের উপর বসে পাড়ার লোকদের খবরের কাগজ পড়ে তন্মাহিলাম। এইদিন খোকা বাবুর প্রেরণার খবরটি বেশ কল্যাণ করে কাগজে বার হয়েছিল। হঠাৎ পাড়ার বিধু বাবু এসে উঠলো ও কি শুধু পাগলাকে খুন করেছে। গত বছর খোকা শিউচরণকেও খুন করেছিল। প্রাণের ভয়ে এতোদিন কাউকে আমি বলি নি। আমি ঐ সময় কুমরটুলীর ঐ মিষ্টির দোকানে বসে পুরী থাকিলাম। শিউচরণও আমার পাশে বসে জিলিপী খাচ্ছিল। হঠাৎ খোকা এসে শিউচরণকে ধরে তার বুকে ছুরী বসিয়ে দিলে। দোকানে তখন শিউচরণ দোকানী হুজনা ও আমি উপস্থিত ছিলাম। রাত তখন দশটা হবে। এই দোকানীরা হুজনা আহার ও খোকাকার সঙ্গে সমভাবেই পরিচিত ছিল। তাই না মে বাজা আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। খোকাকার নির্দেশে দোকানী হুজনা শিউচরণের দেহটা ধরাধরি করে তুলে রাস্তার ওপারে একটা রোয়াকের উপর রেখে দিলে। এর পর খোকা চলে গেলে তার দোকানের মেয়ের উপর বালতী বালতী জল ঢেলে রক্ত ধুয়ে স্নেহে স্নান করলে। এই অবসরে আমিও দোকান হতে সরে পড়েছিলাম।”

এই শিউচরণ হত্যার মামলাটির সময়ও আমি এই খানাতে বসেছিলাম। খুনের সংবাদ পেয়ে উর্দ্ধতন অফিসারদের সঙ্গে বর্তমানসঙ্গে গিয়ে ঐ দোকানের নীচে জেপের মধ্যে আমি লাল রক্তের জল দেখতে পাই। উহা কাঁচের গ্লাসে সংরক্ষণ করে পরীক্ষার জন্য রক্তপরীক্ষকের নিকট পাঠাবার জন্য আমি প্রস্তাবও করি। কিন্তু ঐ দোকানের দোকানীরা উহা পানের পিচ বলে প্রমাণ করার উর্দ্ধতন অফিসাররা উহাই বিশ্বাস করে গেল। ইন্সপেক্টার খুনীল রায় এইবার বিশেষ নৃজটির সাহায্যে সাক্ষীসাবৃত সংগ্রহ করে এই মামলাটিরও কিনারা করতে সক্ষম হন। এই মামলার ঐ সংবাদপত্রটি একটি বিশেষ প্রদর্শনী রূপে গৃহীত হয়েছিল। এর পর আমরা তদন্তকার্য সমাধা করে এই জুইটি খুনের মামলাতেই খোকা বাবু ও অন্যান্য আসামীদের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারামুসারে সোপর্দ করি। কিন্তু ইন্সপেক্টার খুনীল বাবু তদন্তকার্যে এইখানেই ক্ষান্ত হননি। তিনি এই মামলার ব্যাপারে খোকা বাবুর ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র সবদেও অনেক খোঁজ খবর করেন। এই সকল তদন্তে জানা যায় যে খোকা বাবু বহু অনাথা বিধবাদের নিরমিত অর্ধ সাহায্য করেছে। বহু-দরিদ্র ব্যক্তিকে কস্তার বিবাহে অর্থসাহায্যও করেছে। এই সময় একটি চমকপ্রদ ঘটনাও আমাদের গোচরে

আসে, কোনও একটি ব্যারিষ্টারপত্রীকে সে প্রস্তাব করে যে, তিনি তাঁর হাতের সমুদ্র ভাগে উকি দারা ‘প্রাণের বেঁদা’ বাক্য জুইটি লিখে রাখতে রাজী হলে সে তাদের নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করবে। আশ্চর্যের বিষয়, ব্যারিষ্টার-সম্পত্তি তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে ঐ টাকা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এইরূপ বহু বাহাদুরী বা ভ্রাতাভো নৃচক কার্য তার দারা হামেসাই সমাধা হয়েছে। খোকা বাবু তার সাক্ষরদের নগরীর বেজানারীদের উপর কখনও অত্যাচার করতে দেয় নি। এই ব্যাপারে সে তার লোকদের নিবৃত্তি করে উপদেশ দিয়ে বলতো ‘ওরে তোরা জন্মের উপর উৎপীড়ন করিস নি। এক ছান হতে অপর ছানে পুলিশের লোক বধন আমাদের হতে কুকুরের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তখন ওরাই আমাদের আশ্রয় দেয়, আহাৰ্য্য দেয় আর সেই সঙ্গে দেয় একজন সাময়িক স্ত্রী। এরা না থাকলে আমাদের অপরাধী জীবনের কোনও মূল্যই যে থাকবে না।’ কিন্তু এদের উপর খোকা সহনশীল প্রকাশ করলেও যে এদের ধনী নাগরদের উৎপীড়ন করে অপ্রত্যক্ষ ভাবে এদের যে ক্ষতি করেছে এই জন্য খোকা বাবুর ধরা পড়ার সংবাদ খবরের কাগজে বার হওয়ার পর এই সকল হতভাগিনী রূপজীবিনীরা দলে দলে তাদের এই উপকারী বন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য যতঃপ্রযত্ন ভাবে এগিয়ে এসেছিল।

এর পর আমাদের বিশেষ কর্তব্য হলো সাক্ষীদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আদালতে সূত্র ভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ পরিবেশন করা, এজন্য দিবা-রাত্র আমাদের সকলকেই বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। শিউচরণ হত্যা মামলার তবু একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডে খোকা বাবুর সহকারী হিসাবে দোকানী হুজনাকেও চালান দেওয়ার আমাদের মাত্র একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। অপর দিকে পাগলা হত্যার মামলার খুন সম্পর্কে একজন মাত্র প্রত্যক্ষদর্শীও আমরা উপস্থিত করতে পারিনি। এই বিখ্যাত ছুরুখ খুনের মামলাটি প্রমাণ করার জন্য আমাদের একান্ত ভাবে পরিবেশিক প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। খুন কেহ কাহাকেও করতে দেখেনি অথচ আদালতে এই সকল বৃত্ত আসামীরাই যে পাগলাকে খুন করেছে, তা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করতে হবে। এমন বহু সাক্ষ্য প্রমাণ আছে, বার একক অবস্থিতির কোনও মূল্য নেই। কিন্তু উহার একত্রে পরিবেশিত হলে উহার মূল্য হয়ে উঠে অসাধারণ। কোনও ব্যক্তি বিশেষ মিথ্যা বলতে পারে, কিন্তু ঘটনাসমূহ পরিবেশ মিথ্যা বলে না, এই পরিবেশিক প্রমাণের সঙ্গে একটি তারের জালের সহিত তুলনা করা চলে। এই তারের জাল কারও উপর নিক্ষেপ করলে যদি উহার কোকরগুলি বৃহদাকার হয়, তাহলে সে ঐ কোকরের মধ্য দিয়ে বার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঐ কোকরগুলি ক্ষুদ্রাকার হলে সে উহার মধ্য হতে বার হতে পারে না। তখন তাকে ঐ জালের কোনও এক ছুরুল অংশ ছিঁড়ে বার হতে হবে। কিন্তু বধন সে-জাল ছিঁড়তে পারে না কিংবা উহার কোকর দিয়েও বার হতে পারে না, তখন তাকে বলা হয় বেতাজাল।

এইরূপ এক বেতাজালের সঙ্গে পরিবেশিক প্রমাণের তুলনা করা হয়ে থাকে। কয়েকটি পরস্পর মিষ্টির ঘটনাকে একত্রিত করলে উহার সাহায্যে বহু সিদ্ধান্তে আসা যায়।

কিন্তু উহাদের সমাবেশ দ্বারা একত্রিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হলে উহাকে প্রমাণ করা যায় না। এই অবস্থায় অপরাধী অপরাধে সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং এই ক্ষেত্রে সাক্ষ্য অতি সহজেই সূত্র পেতে পারে। তবে যদি এই সকল ঘটনার সমাবেশ দ্বারা মাত্র একটি সিদ্ধান্তই আসা যায়, তাহা হলে ইহা অস্বাভাবিক প্রমাণরূপে বিবেচিত হবে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এইরূপ অস্বাভাবিক প্রমাণসমূহ আদালতে সূত্ররূপে পরিবেশন করতে পেরেছিলাম। এর ফলে এই দুইটি মামলাতেই আসামীর হাইকোর্টের দায়বাহ্য বিচারের ক্ষমতা নিরূপিত কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল। হাইকোর্টে বিচারের সময় আমাদের খোকা বাবুর দক্ষিণা মলিনাকে নিয়ে এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মলিনা খোকাকে বিচারে নিষ্ঠার সহিত সাক্ষ্য দিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে এসে কোঁদে ভাসিয়ে দিতে থাকে। তা ছাড়া আমরা সংবাদ পাই যে খোকাকে আদালতে ভিটেও করার ক্ষেত্রে সে নিজস্বায়ে অভিব্যক্ত আইনজীবী নিয়োগ করার জন্য পোপনে চেষ্টা করছে। মলিনাস্বাক্ষরিত এইরূপ বিপরীতবুধী দুই প্রকার ব্যবহার আমাকে কম আশ্চর্যাবহিত করে নি। আমি এই ব্যাপারে মলিনাকে একবার চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু স্থানীয় বাবু আমাকে তৎক্ষণাৎ এই ব্যাপারে নিরস্ত করে বলেছিলেন—তুলেও এমন কাজ তুমি করে না। নারীর মন হচ্ছে আজও পর্যন্ত দুর্জয়ের। এখানও পর্যন্ত এই মামলার তদানী শেষ হয় নি। তুমি এই সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে তখনি হিতৈষী হয়ে উঠে আমাদের এই মামলা মাটি করে দেবে।

এই মামলা বাংলাদেশের এ্যাডভোকেট জেনারেল ট্যানজি কাউনসিল ডি এন. এম. বাবু সলিসিটর ডি এম. চৌধুরীর সহায়তায় অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু তখন সন্দেহ হাইকোর্টে এই মামলার তদানী সময় আমাদের বহু সমস্তই সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

খোকা বাবু আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও আইনজীবীকে নিয়োগ করে নি। কিন্তু এ দেশে দায়বাহ্য বিচারে আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনে অপারগ হলে সরকার বাহাদুরই নিজস্বায়ে তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবী নিয়োগ করে থাকেন। বলা বাহুল্য যে খোকা বাবু এবং অন্যান্য আসামীদের সমর্থনের জন্য সরকার বাহাদুর কয়েকজন সুদক্ষ ব্যাবস্থাপকের নিয়োগ করেছিলেন। এরা বারে বারে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে সত্য গোহালা, হার গোসাই ও সন্ন্যাসী ঠাকুর ছিল পুন্ড্রের না কি সাক্ষানো সাক্ষী। কিন্তু সকলেই জানে যে ভারতীয় পুলিশ খুনের মামলায় এইরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যার আশ্রয় কখনও নেয় নি। খুন সম্পর্কে মূল দায়বাহ্য সহিত খুনের অন্য বড়বড়ের ঘোরাটো সংযুক্ত ছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে আসামী ভূপেন, কালী, সুবল ও নিতাই এই বড়বড়ের দ্বারা অভিযুক্ত হবে। কিন্তু তখন সন্দেহ জুরীদের চার্জ বুঝাবার সময় একটি বিশেষ প্রমাণ তুললেন। প্রকৃতপক্ষে কোনখানে খুনের অন্য বড়বড় করার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। সন্দেহ থাকে এসে মৌরীর প্রমাণের উত্তরে খোকা বলেছিল—পাগলাকে আমরা টোপ করবার

ক্লিওপেট্রা ও কেতকী



ক্লিওপেট্রার ঘন চিকণ কেশগুচ্ছের মূলে ছিল অলিভ অয়েলের নিত্য ব্যবহার। একালের কেতকীও জানেন যে, কেশবর্ধনে সহায়ক বলে সুবিদিত অলিভ অয়েল এবং অন্যান্য উদ্ভিদ তৈলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ক্যাল-কেমিকোর ক্যান্ডারল কেশতৈল কেশবর্ধনে অপরিহার্য।



ক্যান্ডারল

অলিভ অয়েল সংমিশ্রণে প্রস্তুত একমাত্র সুগন্ধি ক্যান্ডারাইডিন কেশ তৈল দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯।

জন্মে নিয়ে বাছি। ঠাণ অর্থ যে ছুরী মাথা তা প্রমাণিত হয়েছে। জনসাহেবের মতে এইখান হতেই খুনের জন্ম বড়বন্দ্র শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। এই সময় পর্যন্ত সুবল, কালী, নিতাই, ও জুপেন উপস্থিত না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে বড়বন্দ্রের অভিযোগ টেকে নি। ডিকেন কাউন্সিলারের মতে এর আগে পর্যন্ত পাগলাকে যে গোপী কেট্টো ও খোকা খুন করবে তা তাদের জানবার কথা নয়।

যাই হোক, পাগলা হত্যার মামলার বিচারে খালিস পাওয়ার সম্ভাবনাই পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। এইজন্য অবশ্য আমাদের কোনও দৃষ্টিত হওয়ার কারণ ছিল না, এর কারণ সাক্ষ্যভাবে এই খুনের জন্ম তারা দায়ী ছিল না বলেই মনে হয়। কিন্তু আমরা মূল হত্যাকাণ্ড এবং উহার জন্ম বড়বন্দ্র-করার অপরাধ মূল হত্যাকারী খোকা, কেট্টো ও গোপীর বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহ রূপেই প্রমাণ করতে পেরেছিলাম। তবে শিউচরণ হত্যার মামলাটি আমরা সম্যকরূপে প্রমাণ করতে বোধ হয় পারিনি। জন্ম ও জুরীর বিচারে খোকা বাবুসহ শিউচরণ হত্যার মামলার সকলে আসামী সন্দেহাবকাশে খালিস পেরেছিল। অপর দিকে অল্পকাল পরে পাগলা হত্যার মামলার সুবল কালী, জুপেন ও নিতাইকেও আদালত মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু পাগলা হত্যার মামলার জন্ম ও জুরীর বিচারে খোকা, গোপী ও কেট্টো খুনের জন্ম এবং বড়বন্দ্রের জন্ম দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। আসামী গোপী ও কেট্টোকে জন্ম সাক্ষ্যের ব্যয়ে বাবজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু তাঁরা খোকাকে মূল হত্যাকারিরূপে বিবেচনা করে তার কাঁসীর জন্ম আদেশ প্রদান করেন। কাঁসীর দণ্ডাদেশ খোকা বাবুকে শুনানো হলে সে স্থির ভাবে উক্ত দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে বারেক জন্ম সাহেব [বিঃ খোকার] এবং বারেক জুরী মহোদয়দের দিকে চেয়ে তাদের অভিযান জানিয়ে নীচের হাজতঘরে সার্জেন্টের প্রহরার প্রকৃতিতে নেমে আসে। এই সময় একজন ডিকেন কাউন্সিলার তার সঙ্গে দেখা করলে খোকা তাকে আমাকে সেখানে ডেকে জানবার জন্ম আহ্বোধ করে। কিন্তু ঐ আইনজীবী মহোদয় মারকং তাকে এই বিষয়ে আমার অক্ষমতা জানালে সে বলে উঠেছিল— বোম্বাল মশাইকে বলবেন যে চিরদিন আমি কারাগারের চারিটি বেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবো না। তাঁকে বলবেন, শীঘ্রই আমার কাঁসীকার্ডে আমার জীবন অবগান হবে। তিনি তাহলে বেন আমার আশ্রয় সঙ্গে মূল্যকাৎ করবার জন্ম প্রস্তত থাকেন। এর পর স্বভাবতই ভীত হয়ে আমি মাত্র একবার তার সঙ্গে হাজতঘরে দেখা করেছিলাম। আমাকে দেখে খোকা বাবু মটমট করে বলে উঠেছিল—ওঃ আপনি এতো কুলকারাছর ও ভীত ? হিঃ। আমি আপনাকে আমার মত একজন বীর পুরুষ ভেবেছিলাম। আজকে

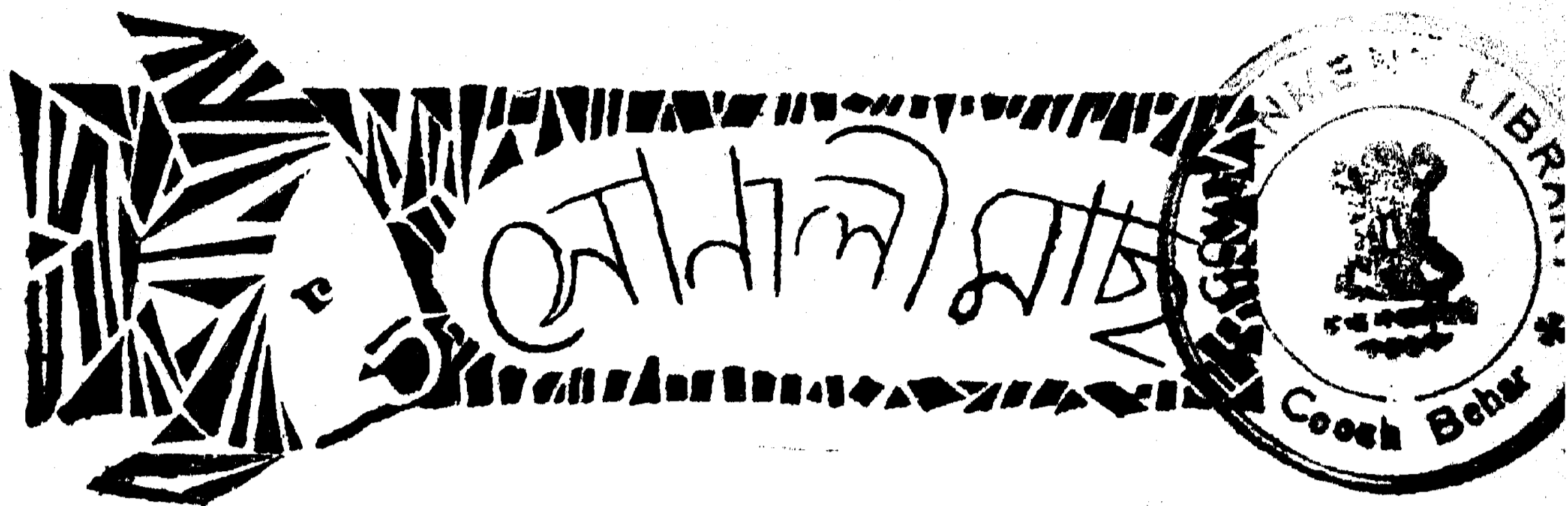
আমার মন প্রকৃতিস্থ নয়। মরা করে কাল পরও একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার সঙ্গে বিশেষ করেকটি কথা আছে।

আমি কিন্তু নানা কারণে খোকার এই বিশেষ আহ্বোধ রক্ষা করে তার সঙ্গে আর দেখা করতে পারিনি। এর পর ৩১ তারিখ জুলাই মাসে ১৯৩৭ সালে সকাল ছয়টার সময় স্নানাহার সেরে খোকা পরিষ্কার কাপড় জামা পরে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কিছু সেন্ট ও কিছু কুস তার শেষ ইচ্ছাক্রমে বাচ্ঞা করে। এই কুস দিয়ে নিজের হাতে মালা গেঁথে সে তা পরে সারা গায়ে পুরানো অভ্যাস মত সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলে বলে উঠে—‘এইবার নিয়ে চলো আনাকে। আমি প্রস্তুত।’ তৎকালীন আলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত জফসার ঐহেমন্ত গুপ্ত (পরে ইনি এসিসটেন্ট কমিশনার হয়েছিলেন) এই সময় কাঁসীমকের নিকট উপস্থিত ছিলেন। এর কাছে খোকা বাবু আমার সবুকে খোজ খবরও করেছিল। এর একটু পরে সহাস্ত মুখে খোকা বাবু কাঁসীকার্ডে উঠে তার শেষ নিশ্বাস পরিত্যক্ত করে। এই বিখ্যাত মামলার ডাইরীর ওজন ছিল সাত সের। এই মামলার আদালতে ৬১ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে এবং ১৩২টি প্রদর্শনী দ্রব্য (Exhibits) প্রদর্শিত হয়। একত্রিশ দিন ধরে এই মামলার শুনানী হাইকোর্টে হয়েছিল। খোকা বাবু আজ আর নেই। সুন্দরী মলিনাও কিছুকাল হলো গত হয়েছে। যে গুলিটাতে পাগলাকে হত্যা করা হয়েছিল জনসাধারণ আজ আদর করে তার নাম দিয়েছে ‘গলাকটা গুলি।’

এর বহু বৎসর পরে দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসানের পর আমি ক্রিমিভ্যাল হেরিডিটি সবুকে গবেষণা করার ছুটি নিয়ে কিছুদিন আন্দামানে অবস্থান করেছিলাম। এই সময় আমি দীপান্তরিত আসামীদের খোজখবর করি। এদের একজনের কোনও খোজ পাওয়া যায় না। জাপানী অধিকারের সময় হতে সে নিখোজ আছে। কিন্তু অপর জনের আমি সন্ধান পেয়েছিলাম। সে সেখানে বিবাহাদি করে একটি দোকানের মালিক হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে একটি খুনের মামলার তার দীপান্তরিত হয়েছিল এবং তদবধি সে এখানে সুখেই আছে। আমিও শুনলাম যে এখানে এসে সে আর কোনও অপরাধ করে নি। কিন্তু ১৪ বৎসর পর আমাকে দেখে সে একেবারেই চিনতে পারে নি। আমিও যে তার এখানে আসার জন্ম দায়ী, তা তাকে আমি না বলেই তার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। কিন্তু খোকা বাবুর সবুকে জিজ্ঞাসিত হলে তার চোখ দিয়ে অলক্ষ্যে এক কঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই জল কেন সে কেগলো, কার জন্মে সে কেগলো, তা আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হই নি। [ক্রমশঃ।]

... এ মাসের প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি মুখের আলোকচিত্র প্রকাশ করা হইল।
আলোকচিত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন ঐজীবনক চট্টোপাধ্যায়।



বিজন ভট্টাচার্য

শুক্লা মাসী পূর্ণিমার রা জ। আকাশে চন্দ্রমতা। স্বর্গ সে দিন মর্তে নেমেছিল।

আকাশে যে তারারা কোনদিন কোটে না, সেই তারারাও বুঝি সেদিন ছোটোপাটি ভিড় করে এসেছিল শাঁখ আর বেলাকুঁড়ির মালা হাতে করে, ছোটখাটো সাজাপোকা কুটকুটে মেয়েমা যেমন। সে রাত্রি ছিল অনভ্যাস্য এক রাত্রি, যে রাত্রিতে বিয়ে হ'য়েছিল সতীর সত্যব্রতর সঙ্গে।

শুভসময়ের সময় সত্যব্রতকে মনে হয়েছিল সতীর রূপকথার এক রাজপুত্রের মত, বিশক অস্ত্র সব প্রতিক্রমণী রাজকুমারদের পরাহিত করে তাকে জয় করে নিতে এসেছে। তাই মালা বলনের সময় একটুও হাত কাঁপেনি সতীর। শুভমুহুর্তির সময় একটি নম্রনেত্রপাত্তেও আড়াল করেনি নিজেকে প্রিয় চোখ থেকে। নিলাজ হাসি হাসি মুখ করে শুধু নিরীক্ষণ করেছে সত্যব্রতকে। কিন্তু বিদেহী সে রাজার কুমার ছিল প্রেমময়ী সুকুমারী সতীর একান্তই মানস কল্পনা। কল্পলোকের স্বীয়সমূহে জয় নিয়েছিল সে। রক্তমাংসের সত্যব্রতর সঙ্গে তার কিছু মাত্র মিল ছিল না। সতীর চোখে তখন পৃথিবী সূন্দর। তুচ্ছ খড়কুটোকাটাতেও সোনা-দানার ব্যঞ্জনা। তাই সত্যব্রত হ'লো কুকসমান। পতঙ্গ পুড়ে মরেছিল আগুন সেই দিন।

বিয়ে হয়েছিল আট বছর আগে। যাত্রাকলস, বৌহত্র আর শ্বশুরভার আলপনার ওপর চিত্তির করা পিঁড়িতে হুখোহুখি বসে। অগ্নিসাকী আছে। অশান্ত হৃদয় সতীর হুলে হুলে উঠেছিল সেদিন সুরত্রেয় মত, চাঁদ পাবে ব'লে। সুনিবিড় সোহাগির সুখকর এক প্রশান্তিতে টেটবু হ'য়েছিল মন-প্রাণ। সারারাত চোখ খুলে সতী দেখেছিল সত্যব্রতকে বিহুগ্না হরিণীর মত। চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-তারার স্বলকানি দেখেছিল সতী সেই দিন সেই প্রিয় মুখে। সত্যি মিথ্যে একাকার হয়ে গিয়েছিল সেদিন সতীর মনে।

এ তো সেল পরম লগ্নের সেই ব্রতকথার রাতের কথা। সেই রাত সতীর জীবনে হবার আসবে না। কিন্তু তারও আগে, পূর্ব্বরাগের অহুয়ানে রাতা হু ছটি বছর কেটে গিয়েছে সতীর জীবনে। দীর্ঘ সেই অবকাশেও সতী ঠিক চিনে নিতে পারেনি সত্যব্রতকে।

পিপাসিত প্রাণ-মন আর বাঁকনহারা উজ্জ্বল নিয়ে কোন কিছুই সত্যি-মিথ্যে বাড়াই হয় না চোখে। প্রত্যাশা করে বসে আছে যে জন, তার চোখে আকাঙ্খিত বস্তু তখন লোক-কটি বিচ্যুতি নিয়েই নয়নাভিরাম। কাদ পেতে যে পাখীটাকে জুলিয়ে জালিয়ে এনে কেনা হচ্ছে খাঁচার, তার অনেক আগেই সেই খাঁচারদুর্ভবক জন্মা

করবার হলে বন্দিজীবন বাপান ক'রছে আর একটা পাখী। সতীরও বেন হলে তাই। কি মানুষ, কেমন মানুষ সত্যব্রত, একথা কুলতে তার মনে হলো না একটিবার। কুক কালো তো সত্যব্রতও কালো। ভালবাসা তখন নীলাঙ্গন পরিয়েছে সতীর চোখে। কোন লোক নেই সত্যব্রতর। চরিত্রের ব্যতিক্রমগুলোকে পর্য্যন্ত অসাধারণ কোন কিছু বলে মনে হলো তার। বিচ্যুতিগুলোকে দেখালো বেন আলোটারির বিপরীত সম্মাত। মানুষ হিসেবে সত্যব্রতর পৌরব বাড়াবার জন্মেই হবিত্তে যেমন মাঝে মাঝে কালোর ছোপ। আশুর্চর্য্য।

আসলে এই ছিল চন্দ্রকপ। জীবনের যে সন্ধিক্ষণে পৃথিবী সূন্দর, সব সূন্দর, সতীর জীবনে সত্যব্রত এসেছিল সেই মহাক্ষণে। এসেছিল চেউতোলা জলে চলকানো চাঁদের মত ভাঙতে ভাঙতে, রসমাধুরী ছড়িয়ে। তা ছাড়া আরও কারণ ছিল খুবী হয়ে খুবী হবার সতীর।

সতীর বাবা শিরগতি অন্নদা বাবুর সংসারে লক্ষীর কুপা ছিল অবহুল। মাস মেলে প্রভূত অর্থের উপার্জন ছিল অন্নদা বাবুর। সওদাগরের সব ক'থানা নৌকোই মনে হয় জেসে উঠেছিল তাঁর ব্যবসায়িক কল্যাণে। জিনিষপত্রে হুড়াহুড়ি সংসার। চালো আর খাও। কোন অভাব নেই।

স্বজনবর্গ বহুজনের আনাগোনা আর অতিথি আপ্যায়নে অন্নদা বাবুর মনোহরপুকুরের বাড়ী ছিল সর্বদা কলহাস্তসুখর। সেনা-অচেনার বালাই নেই। পেট পেরিয়ে বৈঠকখানার চুকসেই ছুটি রাজভোগ সন্দেশের বাধা বরাহ। অন্নদা বাবুর চালাও অর্টার। নেপথ্যে ছিল কমলকামিনী দেবীর সন্ধ্যাপ্রত সুপ্রসন্ন দুটি, কে এসো, কে গেলো; কে খেলো, কে না খেলো;—নিজের চোখে সব দেখাওনো করতেন অন্নদা বাবুর স্ত্রী।

নৈতিক বারব্রত আচার-অহুঠানের বটা ছিল না বাড়ীতে একেবারেই। কিন্তু মাসের মধ্যে চার ছ' বার সামাজিক বৈঠক আর মহালিসের রেওরাজ ছিল বরাবরই।

পাতিয়ালো থেকে এসেছেন ওস্তাদ আমীর আলি খাঁ সাহেব, আছ স্ববোধ বাজিয়ে শোনাবেন; এল্লপ্রেশনিষ্ট কুলের চিত্রী নগেন পাল, ভাল ছবি এঁকেও খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে, কাল তার ছবির এল্লিখিন;—করাসী ট্রারিষ্ট পল অর্জাজ কলকাতার থাকবেন হু-ভিন দিন, পরও সে তার পারদলে আফ্রিকা পরিক্রমার কাহিনী বর্ণনা করবে,—সর্বভারতীয় কবি-সম্মেলনের হুজন বিখ্যাত উর্কু কবি ভেলিসেট হয়ে এসেছেন, হুসায়েরা মেয়ে শোনাবেন সামনের সন্ধ্যা,

এ সেগেই থাকতো। তাহাজা ছোটখাটো জলসা, সামাজিক ও রাজনীতিক বৈঠক, ইলেকশন মিটিং, এ তো ছিল প্রাত্যহিক কর্তব্য। অন্নদা বাবু কিন্তু দল ও মতের অনেক উর্দে। সবার ওপর তাঁর সমান দৃষ্টি। আত্মীয় ও মরহী মেজাজের মানুষ অন্নদা বাবু তাঁর নিজস্ব মতামতটি জিজ্ঞেস করলে হেসে বলতেন, প্রত্যেক ভাল, সব ভাল। এখন বাড়বার সময়। বেড়ে বাও। কাজ করে বাও, কাজ।

অন্নদা বাবুর এক ছেলে, এক মেয়ে। বড় শুভম্বর, বিলেত থেকে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে প্রসিদ্ধি পেয়ে মেম বিয়ে করে তবে দেশে ফিরেছে। বেলঘরিয়া বাগানবাড়ীতে সে আলাদা থাকে। মাকখালে আট বছরের ব্যবধানে শেব সন্তান এই সতী। মেয়েকে অন্নদা বাবু প্রাণাধিক ভালবাসেন।

ছেলের সম্পর্কে বলা চলে, খানিকটা নিরাশ হয়েছেন অন্নদা বাবু। উদারপন্থী ঠিকই, কিন্তু তার খেসারতে যে তাঁকে একদিন এক মেমসাহেবকে পুত্রবধূ হিসেবে বরণ করে নিতে হবে, এ কথা তিনি কল্পনাও করেন নি। স্ত্রী কমলকামিনী তো প্রথমটা 'একটু ভেঙেই পড়েছিলেন। খাবেন না, ছোঁবেন না। কিন্তু পরে শুভম্বরের স্ত্রী বারবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সে মনোবেদনার অনেকখানি উপশম হয় তাঁর। বারবারা বলে, শুভম্বরকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছি। অর্ধের লোভে আকৃষ্ট হয়ে যে সব মেয়েরা অর্ধবান পিতার একমাত্র সন্তানকে হৃদয়ের অঙ্গে বিয়ে করে ঘরসংসারী হয়, অর্ধচ পরে তার সর্বস্ব হরণ করে আগেকার ভালবাসার জনের কাছে ফিরে চলে যায়, বারবারা আদৌ তাদের দলে নয়। জন্মভূমি ল্যাঙ্কাশায়ার হলেও কলকাতার ওপর তার ভালবাসা অপরিণীম। শুভম্বরের কাছে গল্প শুনে শুনে সে এই মনোহরণকুরের বাড়ীটাকে যে কতদিন স্বপ্নে দেখেছে। শুভম্বরের বিয়ে করে সুখী হবার প্রতিশ্রুতি হিসেবে বারবারা আরও বলে যে, সে তার পৈতৃকপুত্রে পাঁচরা দশ হাজার পাউণ্ড-এর ছাবর অছাবর সমস্ত সম্পত্তি ইতিমধ্যেই শুভম্বরের নামে হস্তান্তর করেছে। এবং সেই অর্ধ অন্নদা বাবু যে কোন সময় তাঁর বাণিজ্যিক প্রচেষ্টায় বিনিয়োগ করতে পারেন। অন্নদা বাবু বেন জানেন, শুভম্বর ছাড়া অল্প গতি নেই বারবারার।

দেখে শুনে পরখ করে অন্নদা বাবুর অর্ধসন্ন মন পরে অনেকটা প্রশম হয়েছিল শুভম্বর সম্পর্কে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি মেয়ে সতীর সম্পর্কে বেশ খানিকটা সতর্কও হয়ে যান। তাই সতী বখন এই ঘটনার অনেক পরে সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করলো, তখন অহুয়োধ উপবোধ সত্ত্বেও মেয়েকে তিনি কিছুতেই বিলেত বেত্তে বিলেন না। তার বিনিময়ে মেয়েকে বিলেন বখেছ প্রেশর আর অবাধ অধিকার। বা খুশী তাই পড়, যেখানে খুশী সেখানে বাও। নিজে প্রেম করে বিয়ে করে সুখী হতে চাও তো তাই হও। তাতেও আপত্তি করবেন না অন্নদা বাবু। কিন্তু দেশ-ঘর ছেড়ে কিছুতেই বিদেশ-বিড়ুইএ বেত্তে পারবে না কখনও। অন্নদা বাবুর কঠিন শাসনে প্রথমটা খুবই মুগ্ধিত হয়েছিল সতী। কিন্তু দাদা শুভম্বরের হঠকারিতায় বকপ তার বৃত্তির ধার তখন ভোঁতা হয়ে গেছে। খুব একটা পীড়াপিড়ি করতে চাইলো না মন। বিলেত বাবার এসকটা চাপা পড়ে গেল এইভাবে একেবারেই।

আলীপুরের বাড়ী অঙ্ককার করে বাড়বী সন্নিভা চলে গেল জার্ণালিজম পড়তে লণ্ডন। আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে আর্টিস্ট হাউসে মাত্র একটা একজিবিশান করেই রাণু শুভ চলেলা ক্রাল। লণ্ডনের আর্ট গ্যালারী ক্রালের সুভর ইতালীর সিটাইন চ্যাপেল, সব দেখে শুনে কথা দিয়ে গেল, চিঠি লিখে সে সতীকে প্যারী থেকে। করাসী কনসুলেটে বরাবরি করে কেমন সুন্দর একটি টাইপেণ্ড নিয়ে চলে গেল অনিচ্ছিতা গুহ। এরোডোমে বিহার সর্ধনা জানাতে গিয়ে ছল-ছল করে উঠেছিল সতীর চোখ অশ্রুতীব বেলাতেও। সবাই চলে গেল বার বেথা ঠাই। পড়ে হইল শু সতী একা।

অশান্ত দিন। আরও অশান্ত মন। পিপাসা আছে অর্ধচ নিবৃত্তি নেই এক কোঁটা। মনোহরণকুরের বাড়ীর চৌহদ্দির ভেতরে পড়ে হটফট করতে লাগলো সতী সর্ধরিক্তের মতো।

এদিকে অন্নদা বাবুর মনোহরণকুরের বাড়ীতে আর্ট একজিবিশান হয়, জলসা পানের মুসায়েরা বসে, বিদেশী প্রাণিতত্ত্ববিদ এসে লাইভ লেকচার দিয়ে বান সুখী জনসভার। সতীর ভাল লাগে না কিছুতেই।

কোন কিছুতে মন বসে না, ভাল লাগে না সতীর একেবারেই। এ বাড়ীর অনেক কিছুই তার কাছে বিসর্জন মনে হয়। মনে হয়, সবটাই কেমন বেন সাজানো-শুছোনা। বৈচিত্র্য হয়তো আছে, কিন্তু সেই বৈচিত্র্য এখানে কোনদিনই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে ওঠে না। পূর্বকল্পিত নির্ধকের বরাবীবা ছাঁচে ঢালাই হয়ে যুয়ে যুয়ে আসে। আকাশের নীলিমায় সপ্তভিঙ্গার মত ভাসমান খণ্ড মেঘের হঠাৎ পিঙ্গল থেকে রাগরক্ত রূপান্তরের চমক নেই এখানে কোনখানে। আছে শুধু প্রাণাধিক একটা ব্যালানের বাহাজুরী,—দেওয়ালের বংএ ক্যালেশোরের বং মিলিয়ে; কাঠের একটা অসংস্কৃত গুঁড়ির ওপর টেরাকোটা ছাঁদের কতকগুলো বাঁকুড়ার বেনেপুতুল সাজিয়ে।

দেখে-শুনে এক এক সময় হাঁপিয়ে ওঠে সতীর মন। মনে হয়, বেতলা বেতুরো হঠাৎ একটা চীৎকার করে খান্ খান্ করে জেত্ত দেয় মনোহরণকুরের বাড়ীর জমাট প্রশান্তি। প্রচলিত নিয়ম-কানূনের বাইরে বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে পর পর করেকটা বিসর্জন আচরণ করে চিন্তার কেলে দেয় সবাইকে।

কিন্তু এসব কথা সতী মনে মনেই ভাবে। কার্যত কিছুই করতে পারে না। কাংক্ষ, ব্যতিক্রম কোন কিছু হলে সতী নিশ্চিত জানে, হাজারটা চোখ শুধু তার দিকে অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে। গর্হিত কিছু একটা বেন করে কেলেছে সতী। সে আরও অসহ।

দিন চলে গড়িয়ে গড়িয়ে। সময়ের কোন বহত্তা নেই বেন।

মেয়ের ভাবসাব দেখে মা কমলকামিনী বলেন, হ্যা রে, কষ্ট করে পিরানোটা শিখলি, বাজালেও তো পারিস মাঝে মাঝে।

ভাল কথা মনে করিয়ে দেন বেন কমলকামিনী। সত্যি পিরানো সে অনেক দিন বাজায়নি। সেদিন বড় তোলে সতী পিরানোতে। সাদা-কালো বীভললোর ওপর দিয়ে সতীর আঙুলগুলো পাহাড়ী বর্ণার মত লাকিরে চলে পুরবকার তুলে। গোটা বরলিপিটাকে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো করে সে ছড়িয়ে দেয় জড়োরার দানার মত।

একটানা পূর্বভাগিণি মিনিট কি এক বটা বাজাবার পর বখন

স্নান করে পড়ে সতী, তখন শান্তি আসে। যেন তার কিছুটা। ইতিমধ্যে বিশ্বতোষ এসে যে কখন বসেছে বলে, তারপর বাজনা শেষ হতে উঠে চলে গেছে চুপিসাফে, সতী তা টেরও পায় না এতটুকু।

একটু পরেই যেন চোকেন কমলকামিনী। বলেন, বিশ্বতোষ এসেছিল, হঠাৎ বাজনা থামতেই উঠে চলে গেল তাড়াতাড়ি, কিছু বলে গেছে তোকে বাবার সময়?

হতবাক হয় সতী। হেসে বলে, বাজনা শোনবার শুনে গেলেন একটুখানি। আমাকে আর কি বলে বাবেন মা!

কমলকামিনী খুসী হন না মেয়ের কথায়। একটু অসুযোগের সুরে বলেন, বললেও তো পারতিন চুটো কথা। অত-বড় একটা মামী লোকের ছেলে। বাবু পর্যন্ত কত খাতির করে কথা বলেন।

মা যে কোন সূত্রে কি কথা বলতে চান, সতী তার খানিকটা আলাপ করেই চুপ করে থাকে। যেন কিছুই শোনে নি, কিছুই বোঝে নি, এমনি ভাব রেখিয়ে সুরভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বাবার কারখানার ছ'আনার অঙ্গীদার বিশ্বতোষকে পরিচূড় করবার মধ্যে তার যে কি জাগতিক মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি আছে, সতী তা কিছুতেই বুঝতে চায় না। কমলকামিনীকে সে খুসী করবে কি করে? খুসী করতে হলে কমলকামিনীর মনের হাঁচি নিজের মনটাকে ঢালাই করে পানীয়ের মত করে বিশ্বতোষকে পান করাতে হয়। কিন্তু তা অসম্ভব সতীর পক্ষে।

সেদিনের অসুস্থানটা ছিল একটু বিশেষ ধরনের। দক্ষিণাত্যের হুই কিয়র, গোপালকৃষ্ণ আর মার্জিত সুরকায়ম নাচবেন কথাকলি। সুরতে বীণ বাজিয়ে শোনাবেন শ্রীকৃষ্ণামী আয়েজার।

পূর্বাঙ্কুই নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সুধীজনে। কার্ড ছাড়া কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

রসজ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে খানদানী বংশের বিস্তারিত রাজস্বাড়া ছাড়াও আছেন বিকৃপার ঘরাণার হরিদাস ঠাকুর। বড় কমলাপুরের সেনী ঘরাণার শেষ উত্তরাধিকার ওস্তাদ আবদুলগনি সাহেব। আর মণিপুরের মুকুটমণি নৃত্যবিশারদ শ্রীগিরিধারীলাল।

বারবারও সেদিন বাঙ্গালীমতে খুব সাজগোজ করে এসেছে। দামী লাল সিঁদু শাড়ী আর কালো ব্লাউজে মানিয়েছে তাকে যেন দেখা এক রাজকন্ডার মত। দিশীমতে সামাজিক হবার প্রচেষ্টায় টুকটুকু ছুখানা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে চেনা অচেনা বাকে তাকে নিবিচারে নমস্কার করছে। অসুস্থানের শুভারম্ভে অতিমাত্রিক এই আয্যায়নের ব্যাপারটাও কারো চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকছে না।

সব চেয়ে নজরে পড়ছে বিশ্বতোষকে। ঢিলে পাঞ্জাবী আর চিপা বোধপুরীতে তাকে দেখাচ্ছে এক জোরান পাঠানের মত। আসছে বাচ্ছে, খবরদারী করছে, এমন একটা স্বচ্ছন্দ নিয়ে—যেন এটা তার নিজের বাড়ী, নিজেরই দায়। সব চাইতে ভাল লাগছে তাকে যখন ঐ পক্ষর দেহটাকে সৌজন্দের খাতিরে আড়ম্বি মুইরে জিড়ের ভেতর চলতে চলতে সে একটু পথ চাইছে হাত বাড়িয়ে। যেন কোন বিবিজরী রাজা অভ্যাগ নেই, তবু হাত পেতে জিকে চাইছেন। সবার নজর বিশ্বতোষের ওপর। নজর নেই তবু সতীর একায়। সে দেখছে সত্যব্রতকে। পোষাক-পরিচ্ছদে ঠৈশিকি কিছু নেই।

তবু বন্দরের বৃত্তি-পাঞ্জাবী। অথচ মানিয়েছে যেন সূর্যের সন্ধ্যার। শুভমুহূই আলাপ করিয়ে দেয় সতীকে ভেঁকে।

: তোমায় সঙ্গে আলাপ নেই সতী? আমাদের বন্ধু, সত্যব্রত সেন। আক্...

শুভমুহূইর সুখের কথা কেড়ে দেয় সত্যব্রত। বলে, আমি, সতী।

অবাক হয় সতী। বলে, আপনি আমাকে চেনেন? সত্যব্রত হাসে। বলে, ঠিক চিনি বললে ভুল বলা হবে। তবে নাম জানাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তারপর বলুন আপনার বাজনা কেমন হচ্ছে?

সতীর চোখে বিষয়। যে মাহুটটাকে সে কখনও দেখে নি, কখনও চেনে নি, সে তার এত কথা জানলে কি করে?

শুভমুহূই রহস্যটাকে ভেঙে দেয় এতক্ষণে। সতীকে বলে, সেই যে তুমি মিউজিক করেসপণ্ডেন্ট 'স্পার্ক'কে চিঠি লিখেছিলে ক'খানা আমি বিস্মিতে থাকতে, ইনিই হচ্ছেন সেই স্পার্ক।

আপনিই সেই স্পার্ক? সতীর চোখে ততোধিক বিষয়। সত্যব্রত হেসে বলে, হ্যাঁ মাহুটটা অবিশি একই, তবে মাইনাস দি স্পার্ক। চমকটা নামেই ছিল। আপনার সে চিঠিগুলি কিন্তু আমি এখনও বন্ধ করে রেখে দিয়েছি। নোটেশনগুলো যা পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে লেগেছিল?

সতী গদগদ হয়ে বলে, খুব কাজে লেগেছিল। নইলে খুবই মুগ্ধলে পড়তাম।

হঠাৎ কেমন যেন অভ্যমনক হয়ে পড়ে সত্যব্রত। একটু পরে বলে, তবে কি জানেন, দেখলাম পিয়ানোটা ঠিক আমাদের নয়। ষ্ট্রোক-এর সঙ্গে মানসের কোথায় যেন একটা বিরোধ আছে। ঠিক ঠিক...

সতীর চোখে তখনও বিষয়। হঠাৎ টকার লাগে জারে। বীণ বাজাচ্ছেন কৃষ্ণামী আয়েজার। প্রশান্ত উদাত্ত হোয়ার। কপালে ত্রিগুণক। ব্রহ্মলোক যেন পাঁজাকোলা করে ধরেছেন কোলের ওপর। গমকে গমকে সুরতরঙ্গের সৃষ্টি করছেন। সুর কায়েম হয়ে আসছে বীণে।

বীণ শুধুন, বলে চুপ করে সত্যব্রত। সুর উঠছে, জ্যোতি ফুটছে। তারার উত্তরি পাড়ার থেকে সুধারা গাছার,—বুহুর্ভের বিছাৎ অসুশাসনের পরই যেন অশনিপাত হ'লো কোথাও। তারপর সুর ফিরে গেল সুরে। বারা শুভল, বুকগুলো তাদের ধড়ান ধড়ান করে উঠল। উৎকর্ষ সবাই।

বন্ধার কানে আসছে কিন্তু বন্ধারীকে দেখা বাচ্ছে না। পেছনে ধীর বসেছেন তাঁরা সুহ আপত্তি করছেন। আড়াল করে পাড়িয়েছে সতী।

সত্যব্রত টের পেয়ে সতীর কানে কানে বলে, একটু সরে আছেন। পেছনে ধীর বসেছেন অনুবিধে হচ্ছে তাঁদের।

ব্যথার হাত লেগেছে যেন। কুণ্ঠিত হেসে সতী সরে পাড়ার সত্যব্রতর পাশে।

সত্যব্রত বলে, কেমন লাগছে? জবাব নেই,—বলে উত্তর খোঁজে সতী সত্যব্রতর মুখে। বীণ কেছে চলছে। গমকে ঠালা সুর বীড়ের সুহুর্ভাঙসি যেন

সোনার ওপর জড়োরার কাজ। সুন্দরী কোন নাগরী কেন যাপ-শুনারের ঠমক তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে হাতের বলরককণ।

চমক ভেঙে সত্যব্রত বলে, আমাকে কিছু বলছিলেন ?

কৈ না তো—অস্বীকার করবার মাঝখানে তার একটা স্বীকারোক্তি করল সতী, যেন অনেক কথা তার সত্যব্রতকে বলবার ছিল। তাকিয়ে রইল সত্যব্রত সতীর দিকে।

মেঘের মাঝখানে বিচ্যৎ-এর চমক দিনের আলোভেগে দেখতে পেলো বিশ্বতোষ। ঈগলের মত উড়ে এসে পড়ে সে ধরে নিয়ে গেল সত্যব্রতকে, একেবারে সামনের দিকে, বিশিষ্ট অতিথিরা বেখানে বসেছেন। সতীকে বৃহৎ ভৎসনা করে বললো, কি আশ্চর্য্য, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, এঁদের বসাতে হয় ডেকে। আশ্রম আশ্রম, শুভমর বাবু আশ্রম। আপনাদেরও যদি ডেকে ডেকে বসাতে হয়...। সতীকে বললো, আপনি মাদুমোহাম্মেল একটু মেয়েদের দিকটা তদারক ককন। একেবারে গায়ে জল দিয়ে বেড়াবেন না। মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না।

কপট হেসে সতী বলে, তাই দেখে বৃষ্টি হামলা করতে এলেন ভার্য্য থেকে ?

: নিশ্চয়ই। পেট হয়ে খেটে মরবো আমরা আর হোর্টেস হয়ে...। হঠাৎ হেসে ফেলো। বলে, আশ্রম আশ্রম আপনিও বলবেন আশ্রম।

: থাক, বহুবাদ।

সত্যব্রত আর শুভমর ততক্ষণে খানিকটা এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। বিশ্বতোষ এক বকম জোর করেই ধরে নিয়ে যায় সতীকে। বলে, অন্ত বেরসিক ঠাওরান কেন আমাকে ? আশ্রম, দেখবেন ঠিক পাশাপাশি বসিয়ে দেবো।

বীণ আর কথাকলির মাঝখানে সামান্য একটু বিশ্রাম। একটু চা, একটু পানীয়। পাশের লাউঞ্জ আর লন জুড়ে ঢালাও বন্দোবস্ত। বীণের শেখ বেশ তখনও বাসা বেঁধে আছে হলের আনাচে কানাচে। এমন সময় সবগুলো আলো এক সঙ্গে জ্বলে ওঠে ভেতরে বাইরে। বিরাম।

দশ মিনিটের সামান্য অবকাশ। অর্থাৎ প্রত্যেকটি মুহূর্ত এখন এখানে অতি মূল্যবান।

সুসারে কাল কি হবে, না হবে, বাজার উঠবে না পড়বে, মরবে না বাঁচবে মাছুব, তার কিছুটা আন্দাজ এখানেই সাব্যস্ত হবে কথার কথার।

অন্নলা বাবু সুরেশ্বর মুখ করে এর ভেতরেই ঘুরবেন যাববেন, আর স্বল্প কথার বিহিত করে দেবেন সব সমস্তার,—কতটুকু ধরতে হবে না ছাড়তে হবে লোহা সোনা টাঙ্গির শেয়ার।

লোহালকড়ের কারবারী ইঞ্জিনিং সিং-এর হাতে বিশ্বতোষ নিজের হাতে ভেঙে একটি কোকাকোলা তুলে দেয়। বোতলের মুখে ট্রু লাসিয়ে দেন অন্নলা।

বাচ্চুভাই বে বোলের সবকং খাবেন, সে গেলান জানে হাতে করে বায়বার। শুভমর ততক্ষণ বাচ্চুভাই-এর স্ত্রী দামিনীর চমলের হীরেটার তাতিক করে কথা বলে। হেঁকো কথা, তবু কাজও হয় তারই কাঁকে।

কাজই জীবন। তবু তার মাঝখানেই আনন্দ চাই। একটু বীণ। একটু গান।

এখন কথাকলি। সুদলের ডাকে সড়ি দিয়ে ওঠে আবার সবাই। একটি একটি করে বাতি নিবে বার।

একটু পরেই কলগুজন খেমে যায়। বীণের সময় সিলিংএ বে সানটা জলছিল, এখন সেটিও নিবিয়ে দেওয়া হয় মাচের খাতিরে। হল একেবারে অন্ধকার।

কঠিন একটা দৃশ্য ঠমকে বুক হয় কথাকলি। স্বাক্ষিত সুভ্রক্ষ্যাম সেজেছেন হিরণ্যকশিপু। কৃষ্ণনাম অঃছ তাঁর কাছে। অখচ পুর প্রজ্ঞান কৃষ্ণ বই কিছু জানে না। কৃষ্ণ বই নাম নেই তার মুখে। নিদাক্ষণ য়েবে অধীর হয়ে উঠেছেন দৈত্যকুলাম্বিপতি। মর্ন্তলোকে ত্রাস সকার হচ্ছে। মহা হৃদীন সমাসন্ন। হিরণ্যকশিপু হকার উঠছে থেকে থেকে।

সতী বৃষ্টি খুঁজছিল কাউকে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে না পেরে এসে পড়ে সামনাসামনি। হাত ধরে টেনে পাশে দাঁড় করিয়ে দেয় বিশ্বতোষ।

একটু আচমকা লাগে সতীর ব্যাপারটা। বলে : কে ?

: সৃ-সৃ-সৃ, নাচ দেখুন

: আপনি ?—আমি ভাবলাম...।

: আর কেউ হবে।

: মানে ?

: উঠে এলেন যে ?

: বসলাম কখন ?

: ভাল লাগল না বৃষ্টি ?

: অর্থাৎ ?

হাতটা ঘেমে উঠছে সতীর বিশ্বতোষের হাতের মধ্যে।

ওদিকে হস্তমুদ্রা আর আঁধিঠারে হলুদুল পড়ে গেছে পৃথিবীতে। ফুটি বিপন্ন হয় আর কি। একেবারে উন্নত হয়ে উঠেছেন হিরণ্যকশিপু।

মর্ন্তলোকে যদি কৃষ্ণনাম মুছে যায়, ধ্বংস হয়ে যাবে অন্ধাঙ। মহাপাপে অবলুপ্ত হবে সমাজ-সংসার। হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ বলে বিলাপ করছেন প্রজ্ঞান। কিন্তু শম্ভুচক্রগদাপন্নবীরীর জেধা নেই এখনও।

সতী !—কঠিন আয়েবে কাছে টানে বিশ্বতোষ সতীকে। পিছু হটে বার করেক পা। একেবারে পিছনের দিকে।

: কৈ বললেন না তো কেন উঠে এলেন ?

বিশ্বতোষ বলে : বা বে, ভয় করে না বৃষ্টি ?

: ভয় ! কাকে ভয় ?

বিশ্বতোষের পরম খাস-প্রখাস বাড়ের আলগা আঁধগাটার অহুতব করে সতী। পেশল হাতটা জড়িয়েছে যেন তুচ্ছদের মত কটি বেড়ে। হাঁপিয়ে ওঠে সতী।

: জড়াবেন না তো ?

: চান না বৃষ্টি ?

: না, কোনদিন না।

বর্ন্তমর্ন্ত মসাতলে থাকে। দৈত্যবাজের পঙ্গমবিলারী সীংকার আঁধর করেছে বিত্তমতল। কৃষ্ণতত্ত প্রজ্ঞান হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে

বোধন করছেন। এমন সময় হৃৎপিণ্ড বেজে ওঠে চতুর্দিকে।
বহুতরু স্বর্গের সঙ্গে স্বর্গের-বর্ষা শব্দ বাজে দেবলোকে। কৃষ্ণভক্ত
প্রজ্ঞানের স্পর্শমাত্র ভেঙে পড়ে শিলাভঙ্গ। আবির্ভূত হল জীবক।

বুদ্ধি-অবতাররূপে স্বয়ং নারায়ণ হিরণ্যকশিপুকে না উঠে
না আছে, জন্মান্তরে শাসিত করে দৈত্যকুলাধিপতির নাড়িতুড়ি
টেনে বার করেন। সে এক বীভৎস দৃশ্য! সরোষ হৃদয় আর
বিছাৎপ্রভ নয়নের চকিত 'কটাফে' ছলে-পুড়ে বলসে বার
হিরণ্যকশিপু।

বিখ্যাত্যকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ছিটকে সরে যায় সতী।
হল থেকে একেবারে যাইরে। লাউয়ের দিকে। বিখ্যাত্য ডাকে,
সতী! সতী কিবেও তাকার না আর বার।

ওদিকে জরকার উঠছে। বন্দনা শোনা যাচ্ছে কৃকনামের।
কৃকগ্রাম বই সত্য কিছু নাই।

মাথাটা ঘুরছে। চর্চর লাগছে থেকে থেকে। পঁড়ানো
যাচ্ছে না। দেওয়াল ঘরে ঘরে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই লাউয়ের
সোকার টলে পড়ে যায় সতী! তারপর আঙুলে আঙুলে সজ্জা
হারিয়ে কেলে।

একেবারে দাঁত লেগে গেছে। দূর থেকে বারা দেখলো তারা
ছুটে এলো কাছে। অন্ননা বাবু এলেন খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি।
হাতে পায়ে হাত দিয়ে দেখলেন। না গরমই আছে। মাথাটাই
ঘুরে গেছে হঠাৎ। ডাক্তারকে খবর করে বরফ দিতে বললেন
ইতিমধ্যে। বললেন, পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও।
গন্তগোল করো না। ডাক্তার এসে পড়বেন এক্ষুণি।

দামিনী দেবী বলছিলেন, ভূতিকা চাস, উসিকা ব্যা লেনেসে
ভি কভি কভি আরাম হো বাতা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার এসে পড়েন। সুতরাং চামড়ার
গন্ধ শোঁকাবার আর দরকার হয় না। নাড়ী টিপে বলেন, নার্ভাস
হয়তো দুর্বল ছিল ইমোশনাল মেয়ে। একথাই দেবতার আর
কি সহ হয় হাতে। চূপ করে শুয়ে থাকতে দিন। এক্ষুণি ঠিক
হবে যাবেন।

ডাক্তার চলে গেলে বাহবাণী আর শুভময়ের বন্ধু সত্যব্রত
বসে রইলো সতীর পাশে।

ইতিমধ্যে অন্ননা বাবু আর একবার ঘুরে গেছেন। ডাক্তারের
রিপোর্ট শুনে আশঙ্ক হয়ে গেছেন তিনি। নেহাৎই একটা নার্ভাস
ব্রেকডাউন। অস্থিরতার ব্যাঘাত হবে। তাই খবরটা তিনি
একেবারেই চাপিয়ে হতে দেমনি।

অস্থির শব্দ হতে রাত হয়। আনন্দের আতিশয্যে রসজ্ঞান
অন্ননা বাবুর হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যান বাবার সময়ে।
কলিয়ারী হাচেন্টে জেটুতাই চমনতাই অন্ননা বাবুর হাত ধরে বলেন—
শরীকি আদমী আপ। আপকা ধান্দানু বহুৎ আছা।

বিশেষী চটকল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এডওয়ার্ড
উলক শ্রেষ্ঠার 'বন্দে মাতরম্' গান শুনে চোখের জল কেলে বার। চোখ
পিটিপিট করে অন্ননা বাবুকে নিচু গলায় বলে,—As though I
was listening to my own National anthem বাবার
সময়ে বাহবাণীর খাতিরে শুভমরকে-ও তিনায়ে নেবস্তর করে বার

গরম হলে যান অন্ননা বাবু। উলক সাহেবকে লক্ষ্য করে
পার্টনার বিখ্যাত্যকে বলেন,—স্বাধীন দেশের স্বাধীন লোক।

এদের প্রাণটাই এত বড় যে...। আপটাতে না পেয়ে হাতি
কাক খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন অন্ননা বাবু। একটু পরে বলেন,
সতীর ব্যাপারটা বলিনি তোমাকে? কথাকলির শেখটার কি হলো
হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে কেলে সতী। অবিভি তেমন কিছু নয়।
ডাক্তার বলে গেলেন, নার্ভাস ব্রেকডাউন। পাশের ঘরে শুয়ে
আছে। বাবার সময় একবারটি দেখা করে বেও।

সে কি!—প্রত্যক্ষ ভাবে বিচলিত হয়ে ওঠে বিখ্যাত্য।

খুশী হন অন্ননা বাবু বিখ্যাত্যের উৎকর্ষায়। দাঁতে পাইপ চেপে
কোন মুখছবির কি লাগে যে খেই হারিয়ে কেলে তিনি, মুখ
দেখে তা বুঝতে পারে না বিখ্যাত্য।

কোথায় সতী! সতী!—ডাকতে ডাকতে সতীর সন্ধানে এগিয়ে
যায় বিখ্যাত্য তাড়াতাড়ি।

সামনের লাউয়ে তখন ছোট্ট একটি ককটেল পার্টি জমে
উঠেছে। কোণের একটা টেবিলে মুখোমুখি বসে বারবারা গল্প
করছে শুভময়ের সঙ্গে। হঠাৎ বিখ্যাত্যকে দেখে চেয়ার ছেড়ে
উঠে এসে সজ্জাঘণ জানায় শুভময়। হাত ধরে আপ্যায়ন করে
বলে,—আমরা তোমার জন্মেই অপেক্ষা করছি, বিখ্যাত্য এসো এসো।

না, মানে সতী,—সতীর সঙ্গে একটু দেখা করবার দরকার ছিল।
আছে কেমন এখন সতী! প্রতি কথার উৎকর্ষা বিখ্যাত্যের
সতীর জন্মে।

সতী! হু পা এগিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেয় শুভময় বিখ্যাত্যকে
সতীর ঘর। বলে—There she lies চলে যাও সোজা। এখন
সে সম্পূর্ণ normal কিছু নেই চিন্তা করবার। আছা তা হলে
দেখা করে আসছো কিছ। আমরা অপেক্ষা করবো তোমার জন্মে।

Oh! Sure, Sure: উচ্ছ্বসিত আশ্বাস দিয়ে সতীর
কাছে চলে যায় বিখ্যাত্য। কোন কিছু না খেয়েই একটু হাতাল
হয়ে আছে যেন।

মাথা ঘোরাটা বন্ধ হয়েছে। হাতে পায়ের জড়তাটাও এখন
আর তেমন বোধ করা যাচ্ছে না। তবু কেমন যেন একটা
অবসন্নতার ভাব, তখনও কিম ধরে আছে সর্বদা সতীর।

: এখন কেমন?

: খুব ভাল।

উলুড় হয়ে ডিভানে শুয়ে সতী জবাব দেয় সত্যব্রতের কথায়।
তারপর আবার চূপচাপ। ঘরে নীলচে একটা আলো। কেউ
কোন কথা না বললেও কথা শেখের যৌনতা যেন ঘিরে রাখে গুদের।

সত্যব্রতের চোখে ভিত্তি কৌতুকের একটা চাপা হাসি।

সতী একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কৈ আপনি কিছ শেব করলেন
না পার্ক?

সত্যব্রত বলে—তনবেন, আর একদিন তনবেন। আজ থাক।
তা ছাড়া আপনার শরীরটাও তো তেমন ভাল নেই আজ।

বেশ, কিন্তু পিরানো কবে শোনাচ্ছেন। বলুন!—শিউর
যত অতি কুহুসে সত্যব্রতের মুখের ওপর দোল খেয়ে যুক

সত্যত তখনও কিছু কবুল করেনি সতীর কাছে। শব্দ ও উৎকর্ষ ক্রতির মাঝামাঝি, এমনই একটা উৎকর্ষিত মুহূর্তে হঠাৎ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে বিশ্বতোষ।

শুধু বিজ্ঞান নয়, বিস্মিত হয় বিশ্বতোষ ওদের এই গুসারিখে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্মিত আর কোত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে মনের গভীরে। ভাবে, সত্যতর সঙ্গে সতী একটা ঘনিষ্ঠ হলো কি করে? তবে তো ওদের পরিচয়। আর অসুস্থ বলেই না অন্নদা বাবুর কথা মত ছুটে এলো ঐ সতীকে দেখতে?

বিস্মিত বোধ করে বিশ্বতোষ। খেই হারিয়েও কথা বলে বিশ্বতোষ, ঠিক বুঝতে পারছি না,—মানে, অন্নদা বাবুই বলছিলেন আপনার শরীরটা নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

জ্ঞান একটা নির্লিপ্ত হারি মুখে টেনে সতী বিশ্বতোষের কথাই সমর্থন করে। বলে, হ্যাঁ মানে শরীরটা হঠাৎ—আপনার কথাটা কালকে কি অল্প কোন দিন তুললে হয় না বিশ্বতোষ বাবু?

অবশ্য সৌভাগ্য সতীর। এত বড় অপমান বে সতী ভাকে করে বসবে অতর্কিতে, সে কথা বিশ্বতোষ ভুলেও ভাবতে পারেনি। আর কথাটা ঠিক সত্যতর সামনে হলো বলেই হয় তো নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হলো বিশ্বতোষের।

শুধু ভাবতে হয়, মচকাত্তে নেই কখনও। সতীর কথাই জবাবে বিশ্বতোষ পাণ্টা উত্তর করে, না না, সে কিছু নয়। আর আপনি তখনতে চাইলেই যে বক্তব্য থাকবে আমার তাই বা আপনি ঘরছেন কেন? আমি এলাম...

: বলুন।

বাকি কথাটা মুখে করেই অপ্রস্তুত হয়ে চলে যায় বিশ্বতোষ ঘর থেকে ছিটকে। ঘাট্টাটা সত্যই এবার আর বৃক্ক নয়, একেবারে ষাড়ে এসে লেগেছে।

ষাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে কবিরঘর ঘরে টলতে টলতে বেরিয়ে যায় বিশ্বতোষ। [ক্রমশঃ]

একটি সোনালি সকাল

[বোরিস পাস্তার্নাকের 'Daybreak' কবিতা অবলম্বনে]

একদিন তুমি ছিলে আমার জীবনে বর্ষাশরীর, অন্তরের অন্তরতম
ভাষণের এক মুহূর্ত, এক বিপর্যয়
বহুদিন ধরে তোমার কোন বোঝাই পেলাম না।

অনেক দিন পর আজ আবার সারাটি রাত ধরে তোমার অশরীরী কণ্ঠস্বর
গভীর হয়ে জমাট বেঁধে উঠতে লাগল কেবলি আমার কাছে ;
অবুঝ স্মৃতির উত্তাল ঢেউগুলো
আঘাতে আঘাতে ক্রমশ শিথিল করে দিল
আমার চেতনার ভিত্তিটাকে।

সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লাম পথে :
দাদা বরকে ঢাকা পথ ; তার উপর রঙীন আলোর বিলিমিলি
ঘরে ঘরে চা করার ঝুঁকি-ঠাং শব্দ ; ট্রাম-বাসে কর্ণব্যস্ত মানুষের ভীড়।
দব মিলিয়ে কেমন যেন নতুন মনে হলো সমস্ত স্মরণটাকে।

তখন আমার মনে হতে লাগল,
যদি যেন পথের ওই ডুবাবের সংগে গলে গিয়েছি ;
দকালের ঐ হুরহুর আলো চেউ খেলে বেড়াচ্ছে আমার প্রতিটি শিরার।
দাদার রক্তের মধ্যে অজস্র নাম-না-জানা মানুষের অশান্ত গুণ্ডন।
প্রতিটি গাছের অগাধ অক্ষুরক্ত সবুজের মধ্যে ডুব দিয়ে
দাদার পাণ্ডুর প্রাণ হয়ে উঠেছে যেন চিরসবুজ।

দাদা আমি জনতার মধ্যে হারিয়ে কেলেছি নিজেকে।
বিশাল গণ-জীবনের বিপুল প্রাণের এক সোনালি উত্তাপ
ইহলীভল নিঃসংগতার জমাট বেঁধে যাওয়া
ঐশা কালো আমার সজাটাকে গ্রাস করেছে নিঃশেষে।
দাদা আমি আর তোমার নই, আমি সকলের।

অনুবাদ—সুধাংশুরঞ্জন বোষ

বিলম্বিতা

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছলনা করনি তুমি জান হেসে শুধু বলেছিলে,
"পাঁচটি বছর আগে আমার নিখিলে
কেন যে এলে না হায়
আপাসে না কেন এসে সেদিন আমার?"
আমি মুক্ মুখে শেষে
জান হেসে
কমা চেয়ে কিরেই এলাম।
কি পেলাম
এই কথা নিজেকেই লিখে বার বার
পাখির বৃক্কের মত হেঁয়া পাই কথায় তোমার।
কিরে পাই সেদিনের অলস হৃদয়
কানে বাজে কীণতম্বু মেয়েটির চুড়ির নূপুর।
চোখে ভাসে
জগরের নীলিম আভাসে
তোমার হরিণ-চোখ, লাল টিপ তারার মতই,
এ স্বপ্ন হয়েছিল সেই দিন চেউ-ওঠা সাগর অর্থে।
কিছুই নিলে না তুমি দিলে মুঠো ভরি
চৈতালী আশাটুকু হার বাবাবরী।
ভাষণের আর
ভেঙেনি আমার খেঁয়া, পাইনি তো সাগরের পার।
আজো আমি তাই,
দিনের কাজের শেষে এ ঘর সাজাই ;—
বদি কিরে আসে সেই পাখি।
যে আমার
বলেছিল কথায় কথায়
"পাঁচটি বছর আগে এসে কোন কতি হোত নাকি?"



অসিত গুপ্ত

কিন্তু, আজ বাসবীর কাছ থেকে ফিরে এসেই কেমন বেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। বাসবীর কথা তোমাকে আগে সব বলেছি। ওর ধারণা আমি ওকে ভালোবাসি। একদিন বাসবীকে ধুব হাঙ্গা মেয়ে বলে মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু আজ ওর কতকগুলো কথায় মনে হচ্ছে—না, আমি বোধহয় ভুল করেছিলাম। আসলে ওর বাইরেটার যত আলোড়ন, তেতরটা তত ছিঁর। কড়ের বেগে বায়-আসে ও, যতক্ষণ থাকে অনর্গল কথা বলে, অকারণ হাসে আর কতরকম যে অস্বভাবী করে সে তোমাকে কি বলব। মাকে মাকে ভীষণ একটা হুঃসাহসিকতা দেখিয়ে বসে।

সেই বাসবীর কাছ থেকে আজ সন্ধ্যার পর ফিরে এসে আমার মধ্যে বিরাট একটা বড় বইল। কারণ ও হঠাৎ কতকগুলো কথা বলেছিল আমার। আমি প্রথমটার আমল দিতে চাইনি। কারণ বাসবীকে তো আমি জানি। ওবে কোন গুরুতর কথা বলবে এ আমার ভাবনার বাইরে। তবু শেষ পর্বত ওই আমাকে ভাবাল। ভাবুক বলে অকস্মিক তোমার কাছে চিরকালই একটা বহনাম পেয়ে এসেছি। ইদানীং তুমি আশংকা প্রকাশ করেছিলে যে আমি নাকি ক্রমশঃ মিনিক হয়ে উঠছি এবং অদূর ভবিষ্যতে পুরোপুরি নিউরটিক হয়ে যাব। শোন, একটা বড়নরের কথা বলে কেলি। নিজস্ব মাক কোর। পৃথিবীর সব বেয়াড়া মানুষ-ই অস্বভাবী নিউরটিক। আমিও যে একটু বেয়াড়া, তোমাদের ছাড়া একথা মানো তো। আর নিউরটিক হবার একটা কি সুবিধে জান? মনোজগতের অনেক বড় দরজা একদিন হঠাৎ চোখের সামনে খুলতে আরম্ভ করে।

পৃথিবীর বুকে যে রঙ দেখবার জন্তে তোমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করে নিজেকে খুঁয়ে, নিজেকে তুবিরে সেই নানা বৈচিত্র্যময় রঙে তুমি অহর্নিশি হোলি খেলতে পার। নিউরটিক হবার যজা-ই এই। বাবুগে ওসব কথা। বাসবীর কথা বলি।

আজ বিকেলে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ও অমন কথগুলো ফলু করে বলে কেলল কি করে? মন্দির বলেই কি? বাবী কো

ইন্তক সেগুলোকে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না মন থেকে। কতের ওপর মাছি বসলে লোক হাত দিয়ে যেমন করে তাড়ায় কিন্তু মাছি বার বার এসে বসে—তেমনি করে চিন্তা-মাছিকে আমি নানা প্রবোধ দিয়ে তাড়িয়েছি কিন্তু তারা বার বার এসে বসেছে, আমাকে উৎসাহিত করেছে। হয়ত কোন কোন কথার এমনি জোর, এমনি জাহু থাকে—বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সেগুলো ধ্বনিত হয়ে মাছবের মনে বিশেষ একটা অবস্থার সৃষ্টি করে।

বালি ব্রীজের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আজ বাসবী আর আমি দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলাম। ও প্রায়ই বলছিল, তোমার সঙ্গে যোজ চৌরঙ্গী পাড়ায় হেঁটে হেঁটে আমি বাপু মার্কামারা হয়ে গেছি। রেটুবেটে যে গিয়ে বসব তার অবধি জো নেই। বন-বেয়াবাগুলো পর্বত চিনে কেলছে—তাই গিয়েছিলাম।

ঘরের আলোটা জালিয়েই বেখেছি। তুমি তো আমার ঘর দেখেছ। ঘর নয়, ঘর নয়—আমি একে বলি ঘর। শুধু আঙুর। আমার সারা জীবনটাই শুধু একটা পুঞ্জীকৃত আঙুর। শুধু কতকগুলো কর্কশ, বেয়াড়া শব্দের ও নিঃশব্দের লজা-লজা প্রহর। তোমাকে এসব কথা নতুন করে আর কি বলব, তুমি তো সবই জান। অনেক রাত হয়েছে।

তবু আলো নিবোই নি। আলো হলে চিন্তা করেছ তুমি কোনদিন? করে কেখো, বেশ লাগবে। কেমন বেন একটা উত্তাপ, উত্তেজনা অহুতব করা যায়। মদ কোনদিন খাই নি আমি। তাই তার ছাদ কেমন জানি না। তবে চিন্তা করতে করতে শরীরটা যখন কিছু মেয়ে আসে, শিরাতুলো দপ দপ করে শব্দতে থাকে তখন মনে হয় মদের নেশায় কি এর চেয়েও বেশী ভালো আছে, এর চেয়েও বেশী শান্তি?

বাসবীর ওই কয়েকটা কথা ভাবতে গিয়ে আজ আমার মধ্যে অনেক কথাই ভাঙ করে আসছে। আশ্চর্য, এমন করে তো' কোমলদিন জাবি নি। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, আজ বেন

অনেক কাজের, অনেক কথার মানে বুঝতে পারছি আমি। নতুন করে নিজেকে চিনছি। 'মোহাই তোমার, হেসো না। বিজ্ঞ কৌর না। তুমি হয়ত ভাবছ কথা কি কখনো মানুষকে এমনিধার উতলা করে, পাগল করে? করে, করে। খুব সামান্য জিনিষও মানুষের মনে কখনো-কখনো এমন দাগ ফেলে যায় যে শত চোঁতেও কোনদিন তা আর ওঠে না। মনস্তত্ত্ববিদরা একথা আমার চেয়ে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। আমি তো মনস্তত্ত্ববিদ নই। তবু কথা বখন উঠলই তখন ছোট একটা উদাহরণ দিই, শোন।

এক উদ্ভলোক রাস্তার কুকুর দেখলেই ভয়ে বাড়ী করে যেতেন। ওইটাই তাঁর রোগ। এমনিতে উদ্ভলোকের আর কোন অসুস্থতা ছিল না শরীরে। নামী লোক, প্রচণ্ড পসার। সমাজে বখেঁট প্রতিষ্ঠা আছে, প্রতিপত্তি আছে। শুধু ওইটুকু বা খুঁত। মনোবিজ্ঞানীরা কিছুতেই আর রোগের কার্যকারণ নৃত্ত খুঁজে পান না। শেবকালে জানা গেল যে, বহুদিন আগে উদ্ভলোক বখন নেহাতই কিশোর তখন একদিন নশ্তি নিয়ে তিনি ক্লাসের ভেতর নাক বেড়েছিলেন। আর সেটা বোধহুয়ে পড়ে একটা কুকুরের আকার নিয়েছিল। অনেক সময় দেওয়ালের চূষালি খসেও এরকমটা হয় তুমি বোধহুয়ে দেখেছ। সেইরকম হয়েছিল আর কি। ছাত্রের এই বেচালপনা দেখে শিক্ষকমশাই মহা খাপ্পা হয়ে ভীষণ প্রহার করেছিলেন সেদিন। তারই কল দেখা দিয়েছিল অনেককাল পরে। এখন উদ্ভলোকের সব ভালো, শুধু কুকুর দেখলেই তিনি মনে মনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্মৃত্যু কাব্যে করেকটা কথা আজ যদি আমাকে ভাবায়, নিজেকে নিজের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খোঁজার আর খুঁজতে খুঁজতে কিছু যদি আমি পেয়েই বাই তাহলে সেটা কি তোমাদের কাছে খুব একটা খেলো, খুব একটা হাসির বস্তু বলে মনে হবে? মন বলে কথা। জান, মন আর বন—এ দুইয়ে খুব বিশেষ একটা তফাৎ নেই। দুটোই জটিল, দুটোই গহন। বাকু ওসব।

ঘরের আলো জ্বালিয়েই রেখেছি।

এই কিছুক্ষণ আগেও একটা পোকা তার চারপায়ে ঘুরঘুর করছিল। একবার করে কাছে বাবার চোঁটা করে আর কি করে আসে। পারে না। মশারির চালে গোটাকয়েক রক্তের ছোপ আবিষ্কার করলাম। দেওয়ালে টাঙানো মৃত গুরুজনদের ছবিগুলো আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি এদিক-ওদিক সরবার চোঁটা করে দেখেছি। তবু ওদের চাহনি আমার ওপর থেকে একচুলও নড়ে চড়ে নি। ওরা বোধ হয় আমার ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। জাম্বা, সত্যিই ভেতর বলে কি কিছু আছে? মনের মধ্যে মন? যেমন ঘরের মধ্যে ঘর। কি জানি, মাঝে মাঝে সব কেমন যেন জ্বলিয়ে যায়।

বাসবীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তোমার জানা আছে। আমিও সব বলছি। কিন্তু তার আগের ইতিহাস তুমি বোধ হয় বিস্তারিতভাবে জান না। ভাসা-ভাসা শুনে থাকবে আমার কাছে। উঃ কি পেছো মেয়ে, কি পেছো মেয়ে। বাক্যঃ। আমার সঙ্গে যা করে আসাপ। প্রথমটার ও যেন বর্ণার মতো এসে বিঁধল, তারপর বর্ণার মতো কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমার।

তুমি দেখেছ, আমি রোজই, ইউসিস লাইব্রেরীতে যেছি বই

নিরে এসেছি। এমনিতে তো পড়াভনা বিশেষ হোল না। তার আজ অসময়ে হুবের বাদ' খোলে মিটিয়ে সাধনা পাখার চোঁটা করি নানাতাবে। হার রে পাঁচ থাকতে বাঁচবে পাঁচের মর্দা বোঝে না।

সেদিন ইউসিস লাইব্রেরী থেকে রোজকার মতো বই নিয়ে বেরিয়ে আসছি। সন্ধ্যাবেলা; রাস্তার বখারীতি মানুষের মিছিল। ধাক্কাধাক্কি করতে করতে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে। বাসের হাতল ধরবার জন্তে জীবন পণ করছে। আরেক দিকে রাস্তার কোলকাটার সবমাত্র সাজ-সাজ সব উঠেছে। সেই সময় হঠাৎ দেখি ফুটপাথ থেকে একটা মেয়ে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। তবু মেয়ে বলে নয়, অপরিচিত বা বদ-পরিচিতদের সম্পর্কে আমার একটা স্বাভাবিক জড়তা আছে। আমি কিছুতেই যেন তাদের সামনে নিজেকে খুলতে পারি না, খেলতে পারি না। আমি কঠিন কথা হয়ত সহজে বুকি কিন্তু সহজ কথা সহজভাবে বোঝাতে পারি না। অনাবশ্যক কঠিন হয়ে পড়ে। কি করব বল, চরিত্রটা তো আর জামাকাপড় নয় যে, ইচ্ছে মাসিক বদলে কেসব।

বাই হোক, মেয়েটির ওই অস্তিত্বই চাহনিতে আমি বলাই বাহুল্য অস্বস্তি বোধ করলাম। মুখটা নীচু করে যেই পাশ কাটাবার চোঁটা করেছি আমি একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। বহু বিচিত্র কলরবে মুখের চৌরঙ্গীর সব কণ্ঠ, সব শব্দ সম্বন্ধে বুঝতে এতটুকু বেশি হোল না যে, ওই বিশেষ কণ্ঠটির মাসিক অঠনকা মহিলা এবং সেই মহিলা যিনি একুপি আমার তাঁর নয়নবাণে বিদ্ধ করছিলেন।

—চন্দ্রগুপ্ত।

আমি আহ্বানাহত হয়ে থামলাম। কিন্তু এ কি নামে ডাকা? এ তো আমার নাম নয়? আমি তো অর্নরুদ্র। অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য। পোর্ট কমিশনারের টিপেল ক্লাক বতীন ভট্টাচার্যের পুত্রোপায় কেবাবী-পুত্র। তবে? পিছন পানে তাকালাম। বোধ হোল, মেয়েটির ঠোঁটে এবার হাসি জেগেছে। কারণ অন্ধকারে তার সাদা পাঁচের ঝিলিক দেখলাম।

—আমাকে বলছেন? জিজ্ঞাসা করলাম কাছে এসে।

—হ্যাঁ গো মশাই। বলেই সেই সন্ধ্যাবেলায়, চৌরঙ্গীর সেই বিপুল ভীড়ে সে আমার বা কানের লতিটি ধরে নেড়ে দিল। আমি তো 'খ'। যেসেমানুস্বের সহজ হবার এমন সাহস দেখে আমি বাক্‌হারা হলাম। রাস্তার লোক আমাদের দিকে অর্ধপূর্ণ দৃষ্টি হেনে চলে গেল।

—কোনদিন হাজারীবাগে ছিলে?

হ্যাঁ ছিলাম তো। সে অনেক দিন আগে। বাবা তখন নতুন একটা কাজ পেয়েছিলেন। স্বীকার করলাম।

—কিন্তু কেন বলুন তো?

—চন্দ্রগুপ্ত নাটকে প্রে করেছিলে মনে আছে?

এবার ভালো করে দেখলাম মেয়েটিকে। ভায়লা রক্তের ছুঁটি মেয়ে। চোখের তারার কোঁড়ুল নাটকে। যেমন পুকুঁ শরীর নয় তবু—কাছে এসে সব চোঁথকেই পথ হারাতে হয়।

—তুমি বাসবী?

—চিনতে পেরেছ তাহলে। সর্বাঙ্গ জ্বলিয়ে হাসির ছোট ছোট চোঁটা ফুল বাসবী।

আমি ততক্ষণ অনেকখানি আড়ষ্টতা কাটাতে পেরেছি। কেত কি আশ্চর্য, সেই বাসবী আজ এতবড় হয়েছে, এত বৈচিত্র্যময় হয়েছে। আমরা বাগ টুপেকের দিকে হাঁটছিলাম। হাঁটতে-হাঁটতে হাজারীবাদের স্মৃতিগুলো হাতড়ে-হাতড়ে দেখেছি। বাসবী মাঝে মাঝে খেঁচি ধরিয়ে দিয়েছে।

—মনে আছে আমার আমার বোতাম লাগাতে গিয়ে একবার তুমি কি করেছিলে ?

মনে আছে বৈ কি ! মনে থাকবারই যে কথা। বাসবীর হকের একদিন শিঠির বোতাম খুলে গিয়েছিল। আমাকে বলল, দাপিয়ে কেবে। আমি সেই বোতাম লাগাতে গিয়ে ওর খোলা পিঠির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

বোজ বিকলে ওর বিধবা দিদির সংগে আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসত। ওর দিদি করুণাদি' খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। টার সেই কস'। মুখ আর ভরা শগরটার কথা মনে পড়ে গেল। অনেকটা আমার এই শালা, ফোলা কাঁপা মশাবির এখনকার অবস্থার মতো।

আমরা যে জাহাঙ্গীর খাকতাম তার নাম ওকনী। কিছু দূরেই বাসবীর খাকত। ওর তখন কতই বা বয়স, বছর দশেক বেবে বোধহয়। ফুফু পঃর বৌ হুলিয়ে আসত। করুণাদি' যেতেন ঘা'র সংগে হায়াবরে গল্প করতে। আর ও আমার সংগে পেয়ারাপাছ-তলার পাড়াত। বাড়ীটার বেশ একটা বাগান ছিল।

একদিন করুণাদি' আমার খুব কাছে এসে পাড়ালেন। এত কাছে

এর আগে আর কোনদিন আসেন নি। ওর ভরা শরীরটা খান খান শাদা আমার ভালো করে ঢাকা। করুণাদি'র গায়ের সাদা পেলাম। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন আমার ভেতন কিছু বোধহয় নি। অথচ, কি জজ্ঞার কথা দেখ, আজকে ভাবতে গিয়ে যেন সব কিছুই শিরশিরিয়ে উঠছে। দৃষ্টটা করুণার চক্রে বানিয়ে নিজেই যেন বেশী মাদকতা পাচ্ছি। এমনকি করুণাদি'র সেদিনকার সেই গরম নিখাসটা পর্বন্ত আজ যেন আমার মুখে এসে লাগছে। করুণাদি' বললেন, অল্প নাটক করবে ? আমরা 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রে করছি। তোমার এমন সুন্দর চেহারা, তুমি 'চন্দ্রগুপ্ত'র পার্টটা কর।

সেই 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রের কথা বলেছে বাসবী। করেছিলাম। আমি চন্দ্রগুপ্ত, বাসবী ছায়া। করুণাদি' আমাদের সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বাস্তা দিয়ে মুকুট তৈরি হয়েছিল। বিহানার চাকর টাড্ডিরে স্ত্রীণ আর চৌকি জড়ো করে প্রাটকর্ম।

সেই বাসবী। আজ আর ছায়া নেই। সেদিন বার আতাব ছিল শুধু আজ বয়সের গুণে তা' কারা হয়েছে।

ওদের সব ধবরাধবর নিলাম। এর মধ্যে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাসবীর বাবা মারা গেছেন। মা তো অনেক আগেই গিয়েছিলেন। হাজারীবাদের বাড়ি বিক্রী হয়ে গেছে। ওরা প্রথমে এসে মামার বাড়ীতে উঠেছিল তারপর বাসবীর ওপরের ভাই টুপু একটা চাকরী পাওয়াতে বেলেঘাটার বাসা-বাড়ী নিয়েছে। এমন কিছু চাকরী নয়, এক সরকারী অফিসের এল. ডি. ক্লার্ক। শুধু ওর আয়ে তো আর সংসার চলে না। তাই করুণাদিকেও

স্বৈচ্ছন্দ্য জগতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক



দেবযানী

ফেস্ পাউডার
ট্যালকাম্ পাউডার
স্নো, কুমকুম
হেয়ার অয়েল
মেল্ গলিশ

ডি, জে, প্রোডাক্টস্ * কলিকাতা-১

বেলেঘাটার মহাকালী পাঠশালার মাস্টারী নিতে হয়েছে। তাহাড়া বাসবী বি. এ. পড়ছে। তারও একটা আলাদা খরচ আছে।

পরে একদিন গিরেছিলাম করুণাদি'র সঙ্গে দেখা করতে।

আহা! কি চেহারা-ই হয়েছে, দেখলে হুঃ হুঃ। কস' মুখটা প্রায় বন্ধনুত। শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে। আবার একটা চশমাও নিয়েছেন আজকাল। এই মানুষ কে একদিন কত আনন্দ কয়েকজন আজ দেখলে তা' বিশ্বাস করা যায় না। আমাকে দেখে তাঁর 'নির্জীব' চাহনিতে একটু বেন চাকল্য জাগল। সামনে বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সব জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আবার বিবাদের মূর্তি হয়ে গেলেন।

এর পর পুরনো সবছটা আবার খানিক খানিক ফিরে এল। সুর হোল, হু' বাড়ীতে বাতায়িত। কিন্তু হাজারীবাগের সেই প্রাণ এখানে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ইট-কাঠ-পাথরের চেয়ে অবস্থার চাপায় পড়া আরও অসহনীয়, আরও বহুনাশকারক। সেটাতে মানুষের প্রাণটাকে মঃ মঃ বার করে নেয় কিনা, একবারে তো' শেষ করে না। করুণাদি'র তাই হয়েছে।

তুমি জান, আগে অকিস থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরীতে আসতাম। একটু পড়াশুনা করে, যেতাম সেই হাজারী লেনে। কেন, তাও তুমি জান। কোন-কোনদিন হয়ত বা দল বেঁধে সিনেমা দেখতেও গেছি। কিন্তু কোলকাতার বাসবীদের সঙ্গে নতুন করে দেখা হবার পরই আমার রুটিন বদলাল। অকিস ছুটির পর আর লাইব্রেরী না' গিয়ে প্রায় প্রত্যেক দিনই করুণাদি'দের বাড়ীতে যেতে লাগলাম। অবশ্যই বাসবীর টানে। কখনো কখনো বাসবীকে আসতে বলেছি যেটা সিনেমার সামনে, নয়তো ভিক্টোরিয়ায়।

বাসবী বুঝেছিল, স্থান পরিবর্তনের আগেই বহুস আর মনটার মধ্যে প্রচুর অদলবদল হয়ে গেছে আমাদের। আমি কেন বাই, আকারে ইজিতে কি বলতে চাই, বুঝতে ওর এতটুকু ধেরি হয়নি। একদিন হঠাৎ বাসবী আমাকে জিজ্ঞাসা করল,—'আচ্ছা শেষ অবধি আমার সব্বন্ধে তুমি কি ইচ্ছে কর বল তো'?

প্রথমটার আমি খতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর বেশ করে তাকালাম ওর দিকে। মুখে বেন একটু কৌতূকের ছোঁয়া লেগে রয়েছে। কিন্তু এমন বিজ্ঞিতাবে পা ফেসছে, দেখে আমার কেমন খেঁপা-খেঁপা করতে লাগল।

আমি নিজের খেঁপা-ভাবকে গলায় এবং চোখে তিলমাত্র প্রকাশ করতে না দিয়ে বখেঁট মৌলারেম হয়ে বললাম,—'কি আবার, ইচ্ছে কি কিছু শেষ আছে? তবে আমার বিশেষ ইচ্ছে তোমাকে বেন আরও বেশী করে ভালোবাসতে পাই, আর খুব ঈগণির-ই হুজনে মিলে বেন একটা ছোট করে সংসার পাততে পাই। যেখানে কেউ থাকবে না, কিছু থাক না—তুধু তুমি, আমি আর আমাদের ভালোবাসা'।

খুব জোরে জোরে তেস উঠেছিল বাসবী। তারপর লাভাস' সেনের অঙ্ককারে মুখ নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল,—'এ সব কথা কি অচ সহজে বলা যায়, অচ সহজে বলবার কথা এগুলো?'

আমি চমকে উঠলাম। সেই আমার প্রথম মনে হোল যে, বাসবী বেন খুব কাছের মানুষ নয়। আমি বেন ওকে ঠিক ধরতে পারছি না। বাসবী অঙ্ককারের দেহ। অঙ্ককারের জঘাট রূপটাই তুধু

আঁচ করা যায়, কিন্তু তার দেহ? তাকে তো' বরা বার না, ছোঁয়া যায় না। বাসবী বোধহয় তাই।

পরক্ষণেই অবশ্য আমার সে মনোভাব কেটে গেছে। কারণ আমি তো' ওকে জানি। কথাগুলো ও নিশ্চয় হাফা করেই বলেছিল। ও যে হাফা তা আমি জানতাম। গুরুতর কথা মোটেই বলতে পারে না। আর সব ব্যাপারে শরীর হুলিয়ে হুলিয়ে হাসে। ওর রকম-সকম এক এক সময় আমার কাছে অত্যন্ত বিজ্ঞী ঠেকেছে। আর যা গায়ে পড়া! ভর-ভর বলে কিছু নেই।

আমি বরং মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভেবেছি যে, এমন লজ্জাহীনতা, এমন বিলিয়ে দেওয়া বাসবী কেন—ইত্যাদি (তখন কি বুঝেছিলাম, আমার বঙ সাদা হলে কি হবে, বাসবী মনে মনে আমার চেয়ে অনেক সাদা, অনেক সিধে, তাই তো পারে এমন করে—ইত্যাদি)।

এই বাসবী।

এই বাসবী কিন্তু আজ আমার ভাবিয়েছে। আমার সব ভাবনাগুলো আজ বেন গজাজল হয়ে যেতে চাইছে। আর বাসবী বেন শখিনী। সাদা ধবধবে এক নারিকা। বেন শাঁখ গলে-গলে পড়ছে ওর সব তাত্তে।

বেড়াতে বেড়াতে আজ বিকেলে আমরা দক্ষিণেখর গিরেছিলাম। অকিসে মন টিকছিল না। সকাল থেকেই প্রচণ্ড একটা নিম্পূহতা আমাকে পেয়ে বসেছিল। তাই অকিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে খানিকক্ষণ ফুটপাথ মেপেছি তারপর আর থাকতে না পেয়ে সটাং চলে গিরেছিলাম বেলেঘাটার। বাসবী বাড়ীতেই ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল। আমাকে দেখে ফিক করে একটু হাসল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে আবার চুল বাঁধতে লাগল।

করুণাদি'ও বাসায় ছিলেন। রান্নাঘরের সামনেটার বসে চালুনি দিয়ে আটা ছাঁকছিলেন। আমাকে দেখে একটু বেন অঙ্ককার করে হাসলেন, মুখে বললেন—এসো!

আমি বসে বইলাম। বাড়ীটা একটু ঘুসী-মতো। বিকেলেই সন্ধ্যা নামে। ঠিক পাশে একটা নালি আছে বোধ হয়, তা থেকে আবার মাঝে মাঝে দুর্গন্ধ আসে। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম, এখনকার পৃথিবীটা এমন ম্যাটার অক ফ্যাট হয়ে গেল কেন? করুণাদি'রা সব এত তাড়াতাড়ি প্রাণ হারালেন কি করে?

আরেকবার দেখলাম করুণাদি'কে। মুখটা নীচু করে একমনে আটা ছাঁকে চলেছেন। শব্দ হচ্ছে একটা আর তার সঙ্গে সঙ্গে ওর যোগা পাণ্ডুর শরীরের ওপর দিকটা চলছে। আটাগুলো ছুর তুর করে পড়ছে—নীচে একটা খবরের কাগজ পাতা। একটা কার্টুন আঁকা রয়েছে কাগজে। মুখটা মানুষের আর বাকী দেহটা অঙ্কর। তলার কি বেন লেখা রয়েছে। আমি বাসবীর দিকে তাকালাম। ও তখন চিক্বী দিয়ে বাড়ের কাছের খুচরো চুলগুলোকে ওপরের দিকে তুলে দিচ্ছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলল—চল আমার সঙ্গে, যেদোবে বোধ হয়। আমি তখনও বাসবীকেই দেখেছিলাম। আজ বেন ওকে একটু অভয়কম লাগছে (হয়ত আজ আমি নিজেই একটু অভয়কম)। এমনিতে তো খুব সুন্দরী নয়। মাঝারী পোছের। চেহারার একখানি মুখী মুখ বসানো।

বোকাই বেবোই। লোতে বেবোই আকর্ষণে বেবোই আশার বেবোই। কিন্তু আজ? আজ আমার অস্তিত্বের সবটুকুতে বেন পেরুয়া। কেমন একটা অবসাদ, কেমন একটা শূন্যতা আমাকে ঘিরে। তাই আজও বেবোলায়, তবে বহুচালিতের মতো, বহুচালিতের মতো নিয়ে বাচ্ছ তাই বাচ্ছ।

বেড়াতে বেড়াতে আমরা দক্ষিণেবরে চলে গিয়েছিলাম। এটা অবশ্য বাসবীরই মতলব। ভিক্টোরিয়া, চৌরঙ্গী আব লেক ঘুরে ঘুরে ও ক্লাব হরে পড়েছিল। কিন্তু কোলকাতাটা সত্যিই কি এত ছোট? এত ক্লান্তিকর?

পথে যেতে যেতে বাসবী আজ কতবার খিসখিস করে হেসেছে, কতবার শরীরটাকে বিকীভাবে হুলিয়েছে তা আমি হিসেব করিনি। অর্ধেক কথা কান গেছে, অর্ধেক শুধুই হাওয়ার ভেসেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল।

আমরা চারদিনিক ঘুরে মন্দিরের ভেতরে গেলাম। আজ ও এফটু অন্তরকম। ওর প্রণামের ভঙ্গীটা ভালো লাগল। সাদা শাড়ী পরেছিল বলে কিনা জানিনা, ওর সবটুকুই আজ শাঁখের মতো ধবধবে। আমাকে বলল, প্রণাম কর। আমি সখিত কিরে পেয়ে প্রণাম করলাম মা কালীকে। তারপর হুজনেই কিরে আসছিলাম। আমি আগে বাসবী পিছনে। হঠাৎ বাসবী বলল, আচ্ছা সেদিন কি যে সব কথা বলছিলে আজ এখানে দাঁড়িয়ে সেগুলো আবার বলতে পার? আমি হাঁটা খামিরে একটু অধিক হয়ে তাকালাম ওর দিকে।

—কি কথা?

—মহা, সেই যে সেদিন গলার বেশ ট্রিয়েলো করে কি সব বলছিলে না। মনে নেই? সেই যে ভালোবাসতে চাই, হুজনে মিলে ছোট একটা সংসার পাতে চাই। আরও কি সব বেন বলেছিলে না। বলেই, মুখ নীচু করল বাসবী। আমি ওর লজ্জাবনত ভঙ্গীটার দিকে একটু তাকিয়ে হেসে কেললাম।

—ও, এই কথা! তা একবার কেন কতবার আমাকে নিরে সে কথা বলতে চাও বাসবী? আমি হাজারবার বলেও ধন হব (তখনও জানিনা কি পরিমাণ হুজনার আশ্রয় নিচ্ছি)।

নেবে এসেছিলাম খানিকটা। আবার সিঁড়ি'বেরে ওপরে উঠলাম। বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলতে বাচ্ছ এমন সময় বাসবী পিছন থেকে বলে উঠল,—'দাঁড়াও'।

আমি মুখ কিরিয়ে বাসবীর দিকে তাকাতেই ওর চোখ হাঁটো নজরে এল। একি, চোখে সেই কোঁতুক আর কোঁতুহলের নাচ কই? বাইরেটা অমন গভীর, গভীর, সুস্থিত কেন? এ বাসবীকে তো আমি চিনি না। ওর গলা শুনে মনে হোল বেন অনেকদূর থেকে, অনেককাল পেরিয়ে, কথাগুলো ভেসে আসছে। বাসবী বলল, 'বরং তোমার বলে কাজ নেই'।

আমি নীরব। বাসবী আমাকে সন্মোহিত করেছে। আমি বেন বকে উঠে আমার পাট ভুলেছি। বাসবী বলতে লাগল, 'কি দরকার অপবোধ বাড়িয়ে। দেখ, মাহুদের ঘন আজকাল বজ

ব্যভিচারী হয়েছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে, কতভাবে কতকিছুর বিনিময়ে যে বিকিরে বাচ্ছ—একটুকু লোডের বা লাডের কি পেলোই তার পেছনে ছুটছে সে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ। তাই তোমাকে আর সে পাণের মধ্যে টানি কেন? তুমি তো মাহুব এক আজকালকারই মাহুব! তুমিও বড়ে ভোল, চড়ে ভোল। প্রলোভনের হাতছানিকে তোমার তো উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই, সব খুইয়ে একটা বিশেষ শক্তির কাছে তুমিও নিজেকে বিলিয়ে দাও— তাই কাজ কি। তার চেয়ে এই তো ভালো। বলেই আবার সেই হাসি হাসল, তার পর আমার হাত ধরে হাড়া ধরে বলল—চল।

বেড়ানোর নেশা কেটে গিয়েছিল। আমি মরমে মরে বাচ্ছলাম। বাড়ী কিরে এসে ভাবতে লাগলাম। আমার সব ভাবনা বীরে বীরে গল্জল হয়ে গেল। কেন বলল? বাসবী ওই বেবোলা কথাগুলো কেন বলল (তবে কি ও আমাকে কতদূর-গতায় চিনে কেলছিল, আমি কি সত্যিই তাই?) এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে মনের ভেতরটা হাতড়াতে হাতড়াতে এক সময় বুঝলাম,—না, বাসবী ঠিকই বলেছিল। কিছু অন্ডায় বলে নি। আমিই ওকে চিনতে ভুল করেছি। বরং ওর জন্মে নিজেকে চিনলাম আজ। আমার মুখ থেকে থেকে একটা মুখোস সরে গেল।

ছোটবেলার একরকম ছিলাম বটে। কিন্তু এখন? সত্যিই তো বয়স বাড়ার সঙ্গে কত রকমের লোভ ও লালসার হাতছানিতে যে নিজেকে বিকিয়েছি তার কি কোন হিসেব আছে? সত্যিই তো, আশ্চর্য্য করতে পারি নি আমি, বিকৃত শক্তিকে জয় করতে পারিনি। জোয়ারের মুখে কুটোর মতই ভেসে গেছি। সব সত্যি। সব সব। আর সেই বিকোড়ে বিকোড়ে, বিলোতে বিলোতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আপোষ করতে করতে আমার আসল রূপটা কবে হারিয়ে গেছে, মরে গেছে। আমি ঘোরতর রূপবিলাসী হয়ে উঠেছি। নিজেকে জানতে পারিনি কখন আমার পণ্য, বহু প্রসঙ্গ রূপটাই আজকের আমার সংগে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে। তা না হলে আমি কি বাসবীকে বলতে পেরেছি যে, এতদিন তোমার সংগে যা করেছি তা সব মিথ্যে, তার সবটুকুই হলাকলা? তোমারও বৌবনোদ্ধত দেখে ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পাইনি তোমার মধ্যে? বলতে পেরেছি কি যে, তোমাকে আমি ভালোবাসি না, ভালোবাসতে পারি না? কারণ, তুমি আমার জীবনে আসার অনেক আগেই আরেকজনকে আমি ভালোবেসেছি, তাকেও অমনি করে বলেছি, কথা দিয়েছি। অন্ধকারের শরীর মাড়িয়ে ভিক্টোরিয়া দিবে বেতে বেতে সে-ও আমাকে একদিন বিজ্ঞাসা করেছে,—'আচ্ছা তুমি কি সত্যিই আমার ভালোবাসো?'

আমি প্রথমটায় মিষ্টি করে হেসেছি তারপর অতিক্রম অভিনেতার মতো গলার বেখানে বহুটুকু জোর দেওয়া দরকার, কাঁপানো দরকার ঠিক ততটুকু করে বলেছি—'সেকথা আমি হাজার বার বলেও ধন হব'।

এখন তুমি-ই বল হুজর, আমি সেই উদালকের বৌ হয়েছি গেছি কিনা! আমরা!

মাসিক বঙ্গমতীর প্রচার ও প্রসার বাঙলা দেশের আবঙ্গন!!

ভাষ্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মিখাইল শোলোকভ

হাঁ, আগের দিন আমি যে সেই কিউবিক মিটারের কথা বলেছিলাম তার জন্তে আমার তলব পড়লো ক্যাম্প কমাণ্ডারের শিবিরে। সন্ধ্যায় আমাদের তাঁবুতে একজন দোভাষী সঙ্গে দুজন পাহারাওয়ালা নিয়ে এলো। শোলোকভ এগুী কার নাম? আমি সাড়া দিলাম। আমাদের সঙ্গে চল। হের কমাণ্ডার তোমার সঙ্গে নিজেকে দেখা করতে চান। আমি বুঝলাম আমার ডাক কি কারণ পড়েছে। আমাকে শেষ করে দেবে এখুনি।

আমার সঙ্গীদের কাছে বিদায় চাইলাম। ওরাও বুঝলো এ আমার মৃত্যুবাণী। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওদের সঙ্গে এগিয়ে চললাম। ক্যাম্পের প্রান্তসীমায় এসে একবার আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকালাম। ওদের কাছেও বিদায় চাইলাম। মনে মনে ভাবলাম—এগুী শোলোকভ, ১নং কয়েদী এইবার তুমি অত্যাচারের শেখাপের মুখোমুখি হতে চলেছ। ইরিণা আর ছেলেমেয়েগুলোর কথা মনে এগো একবার। মনটা খাবাপ হয়ে গেল ভয়ানক। তবু আমার শরীরে সমস্ত সাহস ফিরিয়ে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। পিস্তলের চকচকে নলের সামনে ঝাঁড়িয়ে যেন একটুও ডর না পাই। একজন সন্ত্যাকারের বীর সেনানীর মত যেন মরতে পারি। আমার জীবনের প্রতি মায়ার কথা যেন শত্রুরা কোন মতে চের না পায়। তার জন্ত তৈরী হয়ে নিলাম মনে মনে।

কমাণ্ডারের ঘরের জানলার ফুল সাজানো রয়েছে। মনে হলো ঘরটা যেন আমাদের একটা ক্লাবের মত সুন্দর আর পরিষ্কার। টেবিলের চার পাশে ক্যাম্পের সমস্ত অফিসাররা বসে আছে। ওরা সবাই মদে চুর হয়ে বসে বসে শুরোবের চর্বি চুষছে। টেবিলের ওপর একটা বোতল খোলা আছে, কুটি, শুরোবের চর্বি, আপেলের রস; আরও নানারকম সব খাবারের টিন সাজানো রয়েছে। আমি একবার সেই খাবারের দিকে তাকালাম, বললে হয়তো বিশ্বাস হবে না দোস্ত, আমি কিন্তু এগুলো দেখেই ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার মনে হলো হয়তো বা এখুনি বমি হয়ে যাবে। আমি সে সময় নেকড়ের মত ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম। মায়ুককে কি ভাবে খাবারের দিকে তাকাতে হয় তাও আমি প্রায় ভুলতে বসেছি। আমার সামনে এই সব ভালো ভালো খাবারের রাশি। বহু কষ্টে আমি নিজেকে সংবৃত্ত করলাম। খাবারগুলোর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আনতে চোখে জল এসে গেল।

আধামত অবস্থায় আমার ডানদিকে হুলার বসে আছে। পিস্তলটা নিয়ে এ হাত থেকে ওহাতে লোকালুকি করছে। আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে সাপের মত। আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভাঙা গোড়ালিটা এক জায়গা করে তার পর বেশ জোর দিয়ে ঘোষণা করলাম: হের কমাণ্ডার, যুদ্ধবন্দী এগুী শোলোকভ আপনার সামনে হাজির। ও আমার দিকে চেয়ে বললো—আচ্ছা

ঠিক আছে। তুমিই সেই রুশ শয়তান। তোমার পক্ষে চার কিউবিক মিটার পাথর কাটা খুব বেশী মনে হচ্ছে কেমন? আমি উত্তর দিলাম—ঠিক কথা কমাণ্ডার। হাঁ আর এক কিউবিক মিটার তোমার কবরের জন্তে যথেষ্ট কেমন? হ্যাঁ, হের কমাণ্ডার। যথেষ্ট। এমন কি বেশীই বলা চলে।

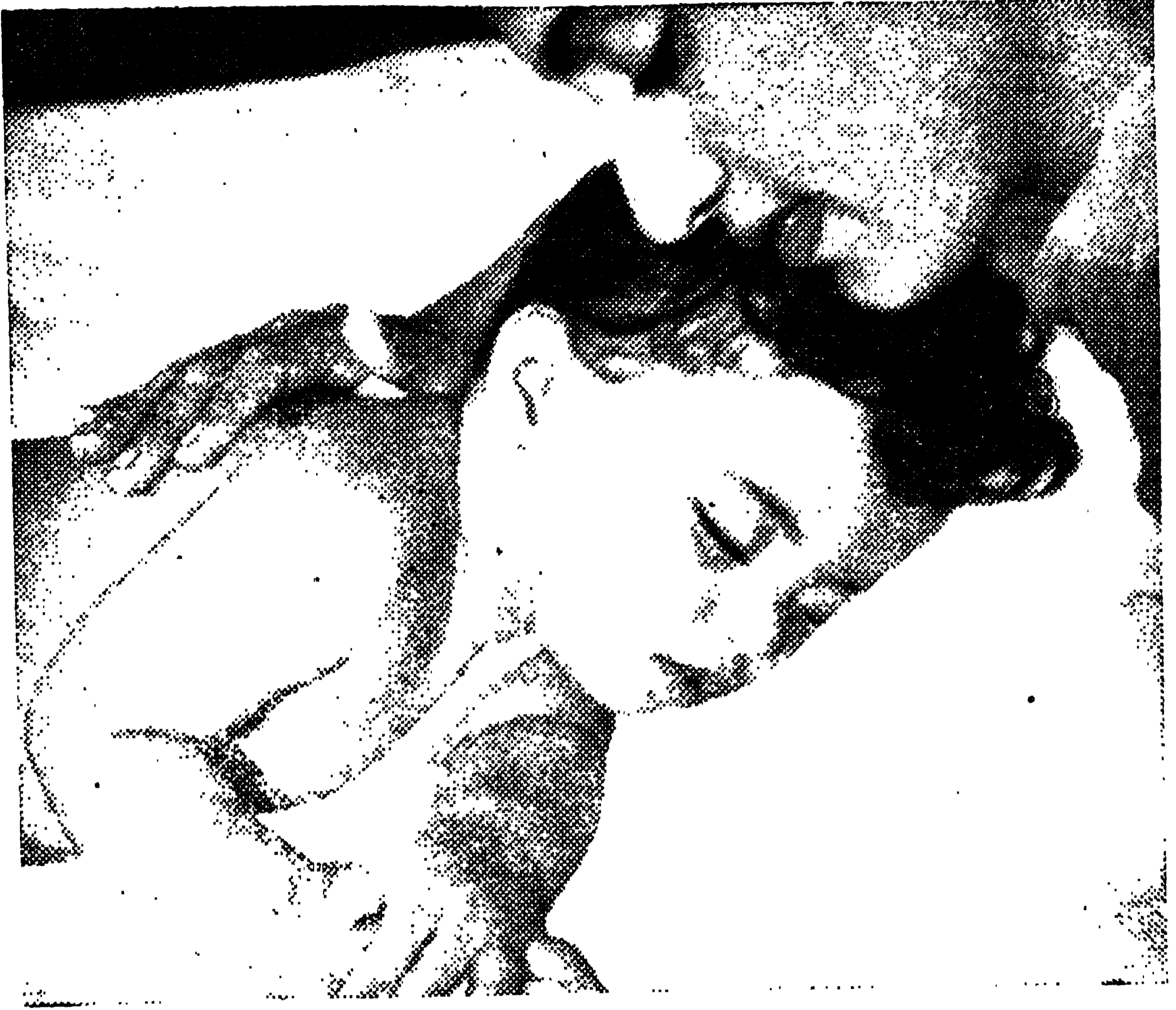
লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো: এই কথা বলার জন্ত আমি তোমায় প্রচুব সন্মান দেবো, এখুনি তোমায় গুলী করে মারা হবে। এখানে এখন গুলী করলে গোলমাল হতে পারে, মাঠ চল সেখানেই তোমায় খতম করে আসি। আপনার যা অভিরুচি। আমি ওকে জবাব দিলাম। এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে নিয়ে কমাণ্ডার হাতের পিস্তলটা টেবিলে রেখে একটা গ্রাসে মদ ঢাললে, এক টুকরো কুটিতে খানিকটা শুরোবের চর্বি দিয়ে আমার সামনে এনে বললো—ওহে রুশ শয়তান, মরবার আগে জার্মান বাহিনীর জয়লাভ উপলক্ষে এই ভোজ খেয়ে নাও।

আমি ওর হাত থেকে মদের গ্রাস আর কুটির টুকরোটা নিতে বাচ্ছিলাম। কিন্তু যখনই গুললাম ওই কথা অমনি আমার অস্তরটা দপ করে জলে উঠলো যেন। ভাবলাম, একজন রুশ সৈনিক হয়ে আমি জার্মানদের বিজয়োসবের ভোজের অংশ নেব? আমাকে নিয়ে আর কি করতে চান হের কমাণ্ডার? আপনার মদ আপনি নিয়ে যান।

আমি গ্রাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললাম—আপনার এই আতিথেরতার জন্ত অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি পান করতে পারবো না। ওর মুখে ক্রুর হাসি ফুটে উঠলো। ও: তাহলে তুমি আমাদের বিজয়োসবের ভোজ নেবে না? ভালো কথা। তাহলে তোমার মৃত্যু উপলক্ষে এই খাবার নাও।

এর পর আর প্রত্যাখ্যান করার কিছুই নেই। মৃত্যুতেই যখন আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হবে তখন এটুকু নিতে কতি কি? গ্রাসটা তুলে নিয়ে সমস্ত মদটা দু চোকে গলার ঢেলে দিলাম। কিন্তু কুটির টুকরো ছুঁলাম না। হাত দিয়ে ঠোঁটটা মুছে নিয়ে আন্তে আন্তে বললাম—আপনার এই সৌজন্যতার জন্ত ধন্যবাদ। আমি প্রস্তুত হের কমাণ্ডার। এবার আমার আপনি হত্যা করতে পারেন।

লোকটা কিন্তু আমার দিকে তীব্রদৃষ্টি ছেনে বললো: মরবার আগে একটু খেয়ে নাও। এক গ্রাস মদ খাওয়ার পর আমি কিছুই খাই না। ওকে জবাব দিলাম আমি। ও তখন দ্বিতীয়বার গ্রাস ভর্তি করে দিল। আমি আবার সেটা পান করলাম কিন্তু এবারেও খাবার নিলাম না। আমি এ সব যা কিছু করছিলাম খুব সাহসের সঙ্গেই করছিলাম। ভাবলাম, মরতে বাবার আগে না হয় খানিকটা মদ খেয়েই বাই। কমাণ্ডার আমার



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিস্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটি কত সুখী, কত সন্তুষ্ট। কারণ ওর স্নেহময়ী মা ওকে নিয়মিত অষ্টারমিস্ক খাওয়ান। অষ্টারমিস্ক বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত খাদ্য। এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিস্ক তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিস্ক পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সবরকম তথ্যসম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়—“অষ্টারমিস্ক”, P. O. Box No. 2257, কোলকাতা-১।

...মায়ের দুধেরই মতন

কার্যকর শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। দুই দেহগঠনের জন্য চার পাঁচ মাস বয়স থেকেই দুধের সঙ্গে কার্যকর খাওয়ানও প্রয়োজন। কার্যকর পুষ্টিকর শব্দজাত খাদ্য-রাগী করতে হয়না—ওধু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চাষতে করে খাওয়ান।



মিকে ডাকিয়ে বললো—ওহে ক্রশ সৈনিক, কেন খাবে না বলতো! না না, আমার কিছু নেই এতে। আমি বন্দুকটা মুকে বললাম—কমা করবেন হের কমাগার! আমি দ্বিতীয় গ্রাসের পরও খাবার ছুই না। লোকটা হঠাৎ মুখটা কাঁক করে নাকের মধ্যে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে বিকট হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই খুব তাড়াতাড়ি জার্মান ভাষাতে কি সব বলে গেল গড়গড় করে। মনে হলো যেন আমার কথাগুলোই ওর বন্ধুদের নিজের ভাবার অনুবাদ করে শোনালো। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলো হো-হো করে। চেয়ারগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিল। মগগুলো ঘুরিয়ে নিয়ে লোকটা আমার দিকে চেয়ে রইলো ওরা সবাই। ওদের সেই চাউনিতে আমি যেন অল্প কিছু দেখলাম। মনে হলো চাউনিটা যেন কিছুটা নয়ম।

কমাগার বন্দন আবার তৃতীয় বার আমার গ্রাসটা ভাঙি করছিল তখনও ওর হাত হাসির গমকে রীতিমত কাঁপছিল। আমি আন্তে আন্তে সে গ্রাসটা শেষ করে ক্রটির টুকরো থেকে সামান্য তুলে নিয়ে বাকীটা টেবিলে রেখে দিলাম। আমি শরতানগুলোকে দেখিয়ে দিতে চাই যদিও আমি ক্রিগের চোটে মৃতপ্রায় আর সেই সময় ওরা এই সংকটজনক অবস্থায় ফেলে আমার ক্রশীয় মর্মান্দ আর পর্বকে পদনলিত করে পত্ততে পরিণত করতে চেয়েছিল কিন্তু ব্যর্থ হতে হলো ওদের।

এর পর আবার কমাগারের মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠলো। বুকের সঙ্গে ফুটোর লোহার ক্রশ এঁটে টেবিলের পিছন থেকে বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ নিরস্ত হয়ে। বললো : দেখ শোকোলভ, তুমি প্রকৃত ক্রশ সৈনিক। একজন আসল বোদ্ধা। আমিও সৈনিক এক উপযুক্ত শক্রকে আমি শ্রদ্ধা করি। শোনো—আমি তোমার গুলী করবো না। আমাদের কোজ ভরা পৌছে গেছে। জালিনগ্রাদ পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে। এটা আমাদের বিরাট সাফল্যের সংবাদ। আর সেই বিজয়সংসর্বে আমি তোমার প্রাণভিক্ষা দিলাম। বাও, তোমার ক্যাম্পে ফিরে যাও। আর এই খাবারগুলো নিয়ে যাও। তোমার সাহসিকতার পুরস্কার। টেবিলের ওপর থেকে একটা পাউন্ডটি আর খানিকটা শূয়োরের চর্বি তুলে আমার হাতে দিল। বতটা জোরে পারলাম ক্রটিটা আমার বুকের সঙ্গে চেপে ধরলাম। বাঁ হাতে চর্বিটা তুলে নিলাম। ঘটনার আকস্মিকতার আমি এতখানি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে দরজার দিকে ফিরবার সময় কমাগারকে বন্দবন্দ জানাতে পর্বত তুলে গেলাম। তখনও ভাবছিলাম যে কোন মুহূর্তেই আমার মাথাটা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবে। এত খাবার আমি আমার সাধীদের জন্তে নিয়ে যেতে পারবো না কিছুতেই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কিছুই হলো না আমার। বুকু আবার আমার পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল। আমি তার নীতল নিঃশ্বাসের আভাসটুকু স্বাক্ষর করলাম।

আমি কমাগারের ঘর থেকে অবিচলিত অবস্থায় বাইরে এলাম বটে কিন্তু বাকী পথটুকু আমি উত্তেজনার কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলাম। কাৎ হয়ে কোন রকমে ক্যাম্পে চুকেই সিমেন্টবাধানো বেড়িতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। সাধীদের সহযোগিতার বন্দন আমার চেতন হলো তখনও চারিদিকে বেশ অন্ধকার। ওরা আমার প্রশ্ন করলো কি ব্যাপার তাই? আমার মনে পড়লো কমাগারের

সব কথা। ওদের কাছে ঘটনাটা কুলে বললাম। আমার ঠিক পাশের মাচার লোকটা প্রশ্ন করলো—খাবারগুলো কি ভাবে ভাগ করবো? সকলেরই সমান ভাগ। আমি উত্তর দিলাম ওকে। সকলেই আমরা একটা দেশলাই বাজের সমান ক্রটির টুকরো ভাগে পেলাম। সামান্য গুঁড়ো পর্বত নষ্ট হলো না। আর চর্বি বা ভাগে পেলাম তাতে কোন রকমে ঠোটটুকু চক্চকে করা চলতে পারে মাত্র। তবু আমরা এই ভাগ-বাঁটোয়ারাতেই খুশী হলাম খুব।

ওরা আমাদের মধ্যে থেকে বলিষ্ঠ দেখে প্রায় শ' ডিনেক বন্দকে একটা জলার জল নিকাশের কাজে পাঠালো। সেখান থেকে গেলাম রুট-এর করলাধনিত্তে। ১১৪৪ সাল পর্বত আমি ওখানে রইলাম। এই সময়ে আমাদের আরও অনেকে জার্মানীর মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লো। তারপর থেকে দেখলাম ক্যাসিন্ডরা বন্দীদের ওপর আর আগের মত কড়া পাহারা রাখলো না। একদিন ওরা সমস্ত দিন আমাদের সকলকে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখলো, করেকজন অফিসার বন্দীদের পরিদর্শন করতে এসে ঘোষণা করলেন—বারা যুদ্ধের সময় সৈন্য-বিভাগে কিংবা যুদ্ধের আগেও বারা মোটর ড্রাইভারের কাজ করেছ তারা লাইন থেকে এক পা এগিয়ে এস। মাত্র এগাধো জন আমরা লাইন থেকে এগিয়ে এলাম। ওরা আমাদের ক'জনকে পোটা কয়েক টিলা পারজামা দিয়ে পাহারাওয়ালার সঙ্গে পোটসডাম নিয়ে চসলো। সেই সময়টার জার্মানরা রাস্তাঘাট তৈরী আর নিঃশব্দে প্রতিরক্ষার জন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিল।

ওপেল অ্যাডমিরাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক জার্মান মেজরের কাছে আমি বহাল হলাম। লোকটা আন্ত ক্যাসিন্ড শূয়োর। বেঁটে লোকটার জলার মত পেট। লম্বা-চওড়াতে একেবারে সমান। পেছন থেকে দেখলে মনে হয় বুকি কোন গর্ভবতী যুবতী। কাচারাকে বোধ হয় বেশ কয়েক হাজার চর্বি বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। বন্দন হেঁটে চলে মনে হয় একটা স্ট্রিম ইঞ্জিন পড়িয়ে চলেছে বুকি। আর বন্দন খাওয়ার জন্ত চেপে বসে তখন পুরো একটা দিন ধরে সমানে চিবোবে আর বোতলের পর বোতল মদ গিলে যাবে। হামেশাই আমাকে এরকম পরিস্থিতির সামনে পড়তে হতো। মাক রাস্তাতেই হয়তো আমার পাড়ী খামাতে বলে শশা আর সসেজ কেটে মদ গিলতে আরম্ভ করে দিল। আর যেজাজ ভালো থাকলে মাকে মাকে আমার দিকে এক আধ টুকরো ছুঁড়ে দিতো কুকুরকে দেওয়ার মতো।

লোকটা কোন দিনও আমার নিজের হাতে তুলে কিছু দেয়নি। একদিনও না। হয়তো গুটা ওর বিবেচনার বাইরে। তবু ক্যাম্পের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না কোন মতেই। এখানে আমি আবার আন্তে আন্তে মাছুয়ের মত হতে লাগলাম। আমার ওজন বেড়ে গেল।

প্রায় হপ্তা দুয়েক ধরে প্রায় প্রতিদিনই আমার মেজরকে নিয়ে পোটসডাম আর বার্লিন যাতায়াত করতে হতো। সেই সময়টাই মেজরকে আমাদের ক্রশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে বুদ্ধকল্পে পাঠানো হলো। আমি তখন রাজে কুম কাকে বলে একেবারে তুলে গেলাম। আমি কেবল চিন্তা করতাম কি ভাবে ক্যাসিন্ডদের হাত থেকে আমাদের বাহিনীকে রক্ষা করা যায়, কি উপায়ে আমার দেশকে বাঁচানো যায়। একদিন আমার পাড়ী নিয়ে যেতে হোলো পোলোভক পহরে। গভ হু'বহুরের মধ্যে এই প্রথম

আমি আমার নিজের দেশের পোলশ্বাল বাহিনীর গোলার শব্দ শুনেতে পেলাম। আশা করি বুঝতে পারছেন আমার সেই বৃহত্তর মানসিক চাকল্যটা। এমন কি আমার প্রাণের ইরিণার সঙ্গে প্রথম মিলনের সময়ও আমার মনে কতখানি উত্তেজনা আসেনি। আমার দেশের বাহিনী আমার কাছ থেকে তখন মাত্র আঠারো কিলোমিটার দূরে ইষ্ট পোলোভকে বৃদ্ধ করছে। শহরের বে দিকটার জার্মানরা আছে সেখানটাকে আন্ত নরকে পরিণত করে রেখেছে। সব সময় হৈ হুলা পোলমাল টেগামেচি। আমার জালাটি দিন-রাত মদ গিলতে আরম্ভ করলো। দিনের বেলায় কোন রকমে ঘুরে ঘুরে কোথায় কি ভাবে সৈন্য সামন্ত সাজানো হবে, কোথায় শিবির হবে এই সব নির্দেশ দিয়ে বেড়াতে আর রাতে আরম্ভ করতো এম গিলতে। ভোগের সমস্ত উপকরণ সর্বদাই ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো। অসুবিধা ছিল না কিছুই।

ভাবলাম আর অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। এই সুবর্ণ সুযোগ। আমি অবশ্য তখন একলা পাললাম না, কারণ আমার সঙ্গে বৃদ্ধ জালাটি আমাদের অনেক কাজ আসবে।

ঘুরতে ঘুরতে ফ্রান্সদেশের ভেতর একটা লোহার ডাঙা পেলাম আর সেটাকে একটা ছেঁড়া কবলে জড়িয়ে রেখে দিলাম। এটা দিয়ে কাউকে আঘাত করলে একটুও রক্তপাত হবার সম্ভাবনা থাকবে না। খানিকটা লম্বা টেলিকোনের তার জোপাড় করলাম। আমার প্রয়োজনীয় সব কিছুই সংগ্রহ করে গাড়ীর সামনের সীটের নীচে লুকিয়ে রাখলাম। হু'দিন পর এক সন্ধ্যায় জার্মানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার গন্তব্য স্থান থেকে কিয়বার পথে দেখলাম একজন জার্মান সৈন্য মাতাল হয়ে দেওয়াল ধরে ধরে কোন রকমে টলতে টলতে চলছে। আমি হতভাগটাকে একটা পোড়ো বাড়ীতে টেনে নিয়ে গিয়ে ওর পা থেকে সমস্ত পোষাকগুলো খুলে নিলাম। মাথার টুপিটাও বাদ দিলাম না। সবগুলোকে আমার সীটের নীচে রেখে প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

২১শে জুন সকালে আমার মেজর আমার ডেকে ঠেকে শহরের বাইরে ট্রান্সিভার্স দিকে নিয়ে বাবার হুকুম করলেন। ওখানে কতকগুলো বাড়ী তৈরী করার দায়িত্ব ছিল মেজরের ওপর। আমরা গাড়ী নিয়ে বের হলাম। মেজর গাড়ীর পিছনের সীটে নিশ্চিন্তে শুয়ে বসে আছেন আর সামনের সীটে প্রবল উত্তেজনায় আমি গাড়ী চলাচ্ছি। উত্তেজনায় বৃষ্টি আমার জুপিগুটা পর্বত মুখের কাছে ঠেলে ঠেলে উঠে আসতে চাইছে। প্রথমটা খুব জোরে গাড়ী চলাচ্ছিলাম, তারপর শহরের বাইরে এসে গতি কম করে আন্তে আন্তে একেবারে থামিয়ে দিলাম। গাড়ী থেকে নেমে এসে বাইরের চারিদিক বেশ ভালো করে দেখে নিলাম একবার। অনেক দূরে খান হুয়েক লরী এগিয়ে আসছে। লোহার ডাঙাটা বের করে নিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে ফেললাম। দেখলাম আমার সেই বৃড়ো জালাটা দিকি আরামে নাক ডাকাচ্ছে, ব্যাটা বেন পাশে বৌ নিয়ে শুয়েছে। আমি ডাঙা দিয়ে ওর বাঁদিককার রগে আঘাত করলাম। মাথাটা বৃকের ওপর ঝুঁকে পড়লো। আরও নিঃশব্দে হওয়ার জন্য ওকে আর এক বা বসালাম। ওকে একেবারে মেয়ে কেসা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ওকে আমি জীবিতাবস্থায় নিয়ে বেতে চাই। ওর কাছ থেকে আমাদের মোকেরা অনেক সুবাদ আদায় করে নিতে

পারবে। ওর পকেট থেকে পিঙ্কলটা বের করে নিজের পকেটে চোকালাম। তারপর সীটের পিছনে একটা ব্র্যাকেট বসিয়ে তার সঙ্গে টেলিকোনের তার দিয়ে বেশ শক্ত করে ওকে বাঁধলাম। জোরে গাড়ী চালাবার সময় বেন কাত হয়ে না পড়ে বার। জার্মান সৈন্যের পোষাকটা বের করে পরে নিলাম। সোজা গাড়ী চালিয়ে বিদায় বেখানে মাটি কাঁপছে, বৃদ্ধ হচ্ছে।

আমি বেই জার্মানদের সীমান্তরেখা পার হতে উত্তত হয়েছি অমনি ওদের একদল সৈন্য গর্ত থেকে বের হয়ে ছুটে এসে আমার দিকে। আমি ইচ্ছা করে গাড়ীর গতি কমিয়ে নিলাম—কারণ ওরা আমার গাড়ীতে ওদের একজন মেজরকে দেখুক এটাই আমি চাই। ওরা আমার অস্ত্র তুলে চীৎকার করে সীমান্ত পার হতে নিষেধ করলো কিন্তু আমি ওদের সংকেত না বোকার ভাণ করে হঠাৎ আশী মাইল গতিতে পার হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা আসলে কি ঘটছে বুকে ওরা গুলী চালাবার আগেই নো-মান্স ল্যাণ্ড-এ পৌঁছে আশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

পিছনে জার্মানদের গুলী আর সামনে থেকে আমার দিকে তেড়ে আসছে। গাড়ীর রেডিয়েটরে চারটে গুলী লাগলো। আমি কোন রকমে কাছেই একটা লেকের পাশে বোপ লক্ষ্য করে চললাম। আমাদের কয়েকজন সৈন্য আমার গাড়ীর দিকে ঘোঁড়ে এসে। আমি বোপের ভেতর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিলাম। দরজাটা খুলে নেমে পড়লাম মাটিতে। দেশের মাটিকে চূষন করলাম বার বার। উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে।

একজন যুবক পোষাকে একটা নোতুন ধরণের খাঁকী কিন্তে এঁটে আমার কাছে এগিয়ে এসে দাঁত বের করে বললো—কি রে শরতান! রাস্তা তুল করেছিস বুঝি? আমি আমার জার্মান সৈন্যদের পোষাক ছিঁড়ে টুপিটা পায়ের তলায় কেসে দিয়ে বললাম—ওহে ছোকরা! আমি যেদিন ভোরোনেজ-এ জন্মেছি, ওখানকার জল-হাওয়ার বড় হয়েছি, সেই দিন থেকেই আমি শরতান। আমি একজন বৃদ্ধবন্দী, বুঝলে? গাড়ীতে এক ব্যাটা ভৌলা শূরোর আছে। ওটাকে টেনে নামিয়ে ওর সমস্ত কাগজপত্র কোড়ে নিয়ে তোমাদের কমান্ডারের কাছে নিয়ে যাও। আমার পিঙ্কলটা ওর হাতে তুলে দিয়ে সন্ধ্যায় সময় আমাদের বাহিনীর কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলার আগে পর্বত সকলের সঙ্গে একে একে দেখা করতে লাগলাম। ওরা আমার খেতে দিল, স্থানের ঘরে পাঠালো, নানা প্রদ্ব করলো। তারপর কর্ণেলের আদেশ অনুযায়ী আমি দেখে এবং মনে পরিচ্ছন্ন হয়ে ঠিকমত পোষাক পরিচ্ছন্ন পরে কর্ণেলের সামনে হাজির হলাম। কর্ণেল টেবিল থেকে আমার কাছে উঠে এসে অস্ত্র অকিসারদের সামনে আমার হাত ধরে অভিনন্দন জানালেন। বললেন—সৈনিক, তুমি আমাদের বা উপহার দিয়েছ তার জন্য তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ! তোমার জার্মান মেজর তার কাগজপত্র থেকে আমরা বা পেয়েছি সে জিনিষ বৃদ্ধকে থেকে কুড়ি জন সৈন্যকে ধরে আনলেও পাওয়ার বেত না। আমি তোমাকে উপযুক্ত ভাবে পুরস্কৃত করবার জন্য ওপরে সুপারিশ করবো। কর্ণেলের সহায়ক ব্যবহারে এতখানি অভিজ্ঞ হয়ে পড়েছিলাম যে কিছুতেই আর ট্রাণ্টের কাঁপুনি বড়

করতে পারছিলাম না। শেষে বললাম—কমরেড কর্ণেল, আপনি আমার পদাতিক বাহিনীতে ভর্তি করে নিন।

কর্ণেল হেসে উঠে আমার কাঁধে একটা সম্মত চাপড় মেরে বললেন—বখন তোমার নিজের পায়ে ভর দিয়ে ভালো ভাবে দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্ষন্ত নেই, তখন তুমি কি করে বুদ্ধ করবে বলতো? আমি তোমাকে এখন সোজা হাসপাতালে পাঠাবো। ওয়া তোমার ঠিকমত চিকিৎসা করে—তোমার শরীরে কিছু খাবার ঢোকাবে। তারপর এক মাসের ছুটিতে বাড়ী গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আমাদের কাছে ফিরে এলে তখন আমরা বিবেচনা করে দেখবো কোথায় তোমায় দেওয়া বাবে।

কর্ণেল আর অত্যন্ত অকিসায়েবা আমার কর্মসূচন করে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। আমি বেরিয়ে এলাম। মাথার ভেতরটা বিমবিসম করছে। কারণ গত দু'বছর ধরে আমি প্রায় তুলেই গেছি যে এ দুনিয়ার কেউ আমার সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করতে পারে। বুললেন দোস্ত, পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার সময় মার খাওয়ার ভয়ে মাথা নীচু করে থাকার অনেক দিনের অভ্যাস হয়ে গেছে। এতকাল এই রকম শিকাই আমরা ক্যাসিন্ড ক্যাম্পে পেয়ে এসেছি।

হাসপাতালে পৌঁছেই ইরিণাকে চিঠি লিখলাম। কয়েকটা কথা ওকে জানালাম। কেমন করে বুদ্ধে বন্দী হলাম আর কি ভাবে মেজরকে নিয়ে পালিয়ে এলাম সে সব কথা লিখলাম। ছেলেরা কোথায় কি ভাবে আমার প্রশংসা করলো সে সব কথা বললাম না, আর কর্ণেল কেন আমার পুরস্কৃত করার জন্য সুপারিশ করবেন সে কথাও লিখলাম না।

সম্পূর্ণ দুটো হপ্তা আমি শুধু খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটালাম। ওয়া আমার খাবার দিত পরিমাণে অল্প কিছু বাবে বেশী। ডাক্তার বলতো আমি বা খেতে চাই তা যদি এক সঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু ওই প্রথম দুটো হপ্তা পরে আর আমি একেবারে খাবারের দিকে তাকাতে পর্ষন্ত পারতাম না। বাড়ীর থেকে চিঠির কোন জবাব নেই। আমি মদ খেতে আরম্ভ করলাম। খাওয়ারাওয়ার কথা আমি তুলে পেলাম। ঘুম আমার কাছে ঘেঁষতে পারতো না। সমস্ত রকম অসং চিন্তায় সব সময় আমার মাথা বোঝাই হয়ে থাকতো। তৃতীয় সপ্তাহে ভোরোনেজ থেকে চিঠি এলো। ইরিণার কাছ থেকে নয়, আমার এক প্রতিবেশী বন্ধু ছুতোর মিল্লীর কাছ থেকে। আমি প্রার্থনা করি আর কেউ যেন কোনদিন কারও কাছ থেকে ওরকম চিঠি না পায়। লিখেছে, আমাদের বাড়ীর পাশে এরোপ্লেন কারখানায় জার্মানরা বোমা কেন্দ্রেছে। একটা বোমা আমার বাড়ীর ওপর পড়েছে। ইরিণা সে সময় ঘেরেদের নিয়ে বাড়ীতেই ছিল। পরে আর ওদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। আমার বাড়ীটা যেখানে ছিল সেখানে বর্তমানে বিরাট আগ্নেয়গিরির মুখের মত গর্ত হয়ে গেছে। প্রথমে আমি আর চিঠিটা কিছুতেই শেষ করতে পারলাম না। চোখের সামনে সব অন্ধকার। আমার বুকটা কেউ যেন ভারী কিছু দিয়ে চেপে দিয়েছে—আর বুকি কোনদিন খুলবে না। বিছানার কিছুকণ চূপচাপ পড়ে থাকার পর একটু শক্তি যেন ফিরে এলো। চিঠির শেষটুকু পড়লাম। আমার প্রতিবেশীটি জানিয়েছে

যে বোমা পড়ার সময় এ্যানাটলি ছিল না বাইরে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় ফিরে এসে বাড়ীর বদলে ওই বিরাট কুরোটা দেখে সেই রাতেই চলে গেছে। আর আসেনি। খাবার সময় বলে গেছে যে খেছাসেবক হয়ে বুদ্ধে চলে বাবে। বাস। এইখানেই শেষ।

বখন মনটা একটু স্থির হলো অল্পভব করলাম যে আমার সমস্ত রক্ত যেন কানের কাছে জমা হয়েছে। মনে পড়লো আমার বুদ্ধভাত্রার সময় বিদায় জানাতে এসে টেমমে ইরিণা আমার কি ভাবে হুহাতে আঁকড়ে ধরেছিল। মেয়েটার মন প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল এ দুনিয়ার আর আমরা পরস্পরে কোনদিন মিলিত হতে পারবো না। অথচ আমি তাকে হাক্সা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলাম।

একদিন আমার পরিপূর্ণ সংসার ছিল। নিজের বাড়ী ছিল। বছরের পর বছর কেটে গেছে ওগুলো তৈরী করতে আর একটা মাত্র বলকে সব শেষ হয়ে গেল। পৃথিবীতে আজ আমি একা পড়ে রইলাম, একা নিঃস্বল অবস্থায়। জীবনের দুর্ভাগা যেন একটা স্বপ্ন বলে মনে হলো। আমার অধিকাংশ রাত্রি আমি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ইরিণার সঙ্গে কথা বলেছি। ছেলেরা কত সাহস দিয়েছে। আমি আবার ফিরে আসছি, তোমাদের হতাশ হবার বা হুঃখ করার কিছু নেই। আমি এখনও বীতিমত শক্ত আছি। একদিন নিশ্চয়ই আমরা একসঙ্গে মিলিত হবোই। তাহলে আমি গত দু বছর ধরে কি শুধু ওই মৃত মানুষগুলোর কথাই চিন্তা করে এসেছি? ওদের মৃত আত্মার সঙ্গেই স্বপ্নে জাগরণে কথা বলেছি?

বিরাট মানুষটা কিছুকণের জন্য চূপ করলো। তারপর হঠাৎ এক সময় বেশ কাঁকি দিয়ে জোরের সঙ্গে বলে উঠলো—আলুন দোস্ত, খানিকটা ধূমপান করা যাক। আমার যেন গলটা বন্ধ হয়ে আসছে।

আমরা সিগারেট ধরলাম। জলমগ্ন বনভূমি থেকে কাঠুরেদের কাঠ কাটার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; উষ্ণ বাতাসে অলডার গাছের পাতার ধসধসানি শোনা যাচ্ছে; নীল আকাশের বৃকে তখনও টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, কেউ বৃষ্টি আকাশের বৃকে সাদা সাদা পাল তুলে নৌকা নিয়ে ভেসে চলেছে। কিন্তু এই পৃথিবী নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়েই সীমাহীন পৃথিবী বসন্তের আগমনে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে, জীবনকে সেই সনাতন প্রতিজ্ঞার আবহু রাখতে। কিন্তু আজ এসব আমার চোখে অন্ধ এরাটা রূপ নিয়ে ধরা দিল।

আমার পক্ষে চূপ করে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠায় আমি ওকে প্রশ্ন করলাম: তারপর কি হোলো কমরেড?

তারপর কি হলো? গল্পকার যেন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাড়া দিল। তারপর আমি কর্ণেলের কাছ থেকে মাত্র এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে ভোরোনেজ পেলাম। আমি যেখানে আমার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করতাম পায়ে হেঁটে সেখানে গেলাম। দেখলাম বিরাট একটা কুরো ময়লা জলে ভর্তি। সব শোকে হুঃমান। চারিদিক শূন্য। কবরখানার মত নিস্তব্ধ নিশ্চাপ। আমার অত্যন্ত ধারণা লাগলো। মনে হলো হয়তো আমি এখনি ধর বন্ধ হয়ে মারা যাবো। ভাড়াভাড়ি ট্রেনে ফিরলাম। একটা বস্টাও আমি সেখানে থাকতে পারলাম না। সেই দিনই আমার সৈন্যবাহিনীতে ফিরে এলাম।

মাস তিনেক পর আমি আবার একটা আত্মনিক আত্মক-সংবাদ পেলাম। বেথের কাঁকে কলিক জোলের কলকের মত। আমি

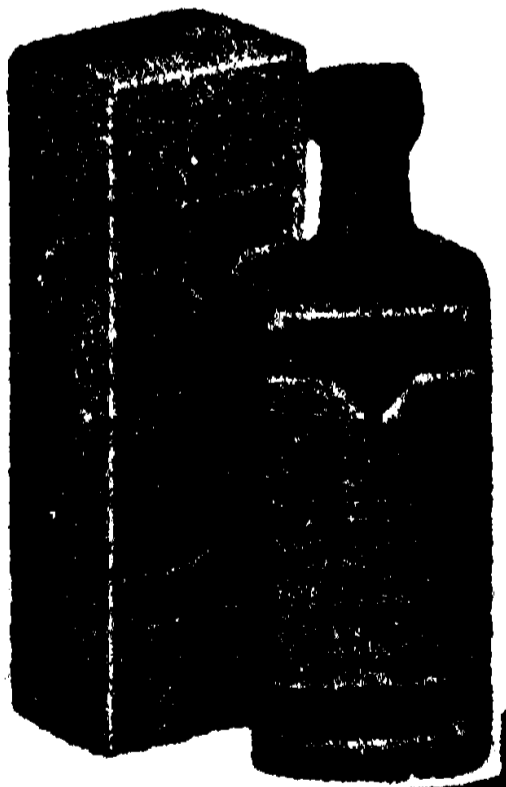
আমার এ্যানাটমির সংবাদ পেলাম। জন্ম একটা বুদ্ধকেত্র থেকে ও আমার চিঠি দিয়েছে। আমার সেই প্রতিবেশী বন্ধুটির কাছ থেকেই আমার এখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করেছে। মনে হয় ছেলেটা সৈন্যবিতাপের কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করেছিল আর অকস্মাৎ ভালো ফল করার জন্তেই হয়তো সেখানে ভালো সুযোগ পেয়ে গেছে। এক বছর পর সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে বৃত্ত বোপ দিয়েছে। ও লিখেছে বর্তমানে ওকে ক্যাপ্টেনের পদে বহাল করা হয়েছে। এখনও পর্যন্তাঙ্গি নব্বই সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক, তাছাড়া এর মধ্যেই ছ'টা পদক পুরস্কার পেয়েছে। এক কথায় ওর সব পুরোনো বন্ধুদের পিছনে কেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সত্যিই ওই ছেলেটার জন্ম আমি রীতিমত গর্ব অনুভব করেছি। আমার ছেলে একটা সৈন্যবিতাপের অধিনায়ক—এ কি বা-তা কথা! তার ওপর সব কটা পুরস্কারও পেয়ে গেছে। বাপ গোলা বোকাই পাড়ী টাটুক আর অস্ত্রেরা সব আরামে বসে থাকবে এটা কোন কাজের কথা নয়। ওর বাপের দিনতো আর শেব হয়ে এলো কিছ সে একজন ক্যাপ্টেন, তারই স্মরণে ওপর এখন সব কিছুই।

বাড়ী তুরে তুরে আমি স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলাম। বৃত্ত বয়সের স্বপ্ন। বৃত্ত শেব হলে আমি ছেলের বিয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে জুখে আবার সংসার পাতবো। আমি ছুতোয় মিত্রীর কাজ করবো আর ওদের বাচ্চাদের দেখাশোনা করবো। যে সব চিন্তা বৃদ্ধেরা সাধারণত করে সে সবই ভাবতাম আর কি! কিছ দোস্ত, তাও

আমার বিকলে গেল। শীতের সময় আমরা অপ্রতীহত গতিতে এগিয়ে চলেছিলাম। পরস্পরের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদানের কাজ সময় মিলতো আমাদের। বৃদ্ধের শেবের দিকে বাগিনের কাছাকাছি একটা বায়গা থেকে এ্যানাটমিকে চিঠি লিখলাম একটা। তারপর দিনই ওর কাছ থেকে উত্তর পেলাম। বোকা গেল আমি আর সে জাৰ্মান রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পথে। বর্তমানে আমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি বাস করছি। আমি ওর সঙ্গে দেখা করার জন্ম অধীর হয়ে উঠলাম। দেখা করার জন্ম এলো। হ্যা, ১ই মে, আমাদের জয়লাভের দিন সকালে জাৰ্মান হাইপারদের গুলীতে আমার এ্যানাটমি নিহত হলো।

বিকলের দিকে আমাদের বিভাগীর কমান্ডার আমার ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখলাম একজন নব্যপত অফিসার তাঁর পাশে বসে আছেন। আমি ঘরে ঢোকান সঙ্গে সঙ্গে উনি উঠে দাঁড়াইলেন। যেন কোন ওপরওয়াল অফিসারের সঙ্গে দেখা করছেন। আমার কমান্ডার বললেন—ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শোকোলভ! কথাটা বলেই জানালায় দিকে মুখটা কিরিয়ে নিলেন। আমার শরীরের মধ্যে তখন যেন খিরখির করে বিদ্যুৎ-শ্রোত বয়ে চলেছে, এগিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। আপনাকে লোকটাকেই কর্ণেল আমার সামনে এগিয়ে এসে বললেন—আপনি তেঁতে পড়বেন না। আপনার ছেলে আমাদের ক্যাপ্টেন শোকোলভ আর সকালে তাঁর কামানশ্রেণীর মধ্যেই নিহত হয়েছেন। আপনি আমার সঙ্গে আছেন।

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ..



খাওয়ার সারাংশ সম্পূর্ণ শরীরের প্রয়োজনে নিয়োগ করলেই অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়। ডায়া-পেপ সিন ব্যবহার করলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন, কারণ ডায়া-পেপ সিন খাওয়া হজমের সাহায্য করে।

যেকোনো খাবার সময় নিয়মিত ছোট এক চামচ খাবেন। ডায়া-পেপ সিন কখনো অভ্যাসে পরিণত না।

ডায়াপেপসিন

ইউনিয়ন ড্রাগ কলিকাতা



আমি কেঁপে উঠলাম কিন্তু পা কেলসায় ঠিক। লেকটরজাট কর্ণেলের সঙ্গে তার গাড়ীতে চেপে পাথর ছড়ানো পথ দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো যেন একটা স্বপ্ন। আমার কুয়াশাছুর দৃষ্টি পথে ভেসে উঠলো সৈনিকরা সার বেঁধে লাল ভেলভেট ঢাকা একটা ককিন বয়ে নিয়ে চলেছে। আপনাকে এখন যেমন পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছি ঠিক তেমনি ভাবেই গ্র্যানাটলি ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। আমি ককিনের কাছে পেলাম। আমার ছেলে শুয়ে ছিল এখানে, এখন আর তাকে দেখলাম না। আমি যে গ্র্যানাটলিকে চিনতাম তার মুখে সর্বদাই মিষ্টি হাসি লেগে থাকতো। কাঁধটা ছিল সফ মত। কিন্তু এখানে দেখলাম একজন পরিপূর্ণ যুবক। কাঁধগুলো বেশ চওড়া। আধখোলা চোখ দিয়ে যেন কোন এক অচেনা জগত থেকে আমার দেখছে। কেবল ওর ঠোঁটের কোণে আমার বাচ্চার মত মিষ্টি হাসিটুকু লেগে আছে তখনও। এই সেই গ্র্যানাটলি—বাকি আমি এক কাল চিনতাম কিন্তু আজ আর চিনি না। আমি ওকে শেখবারের মত চুর খেয়ে এক পাশে সরে দাঁড়লাম। লেকটরজাট কর্ণেল বহুতা করলেন। আমার গ্র্যানাটলির বহু বাছবেরা চোখের জল মুছলো। আমি কিন্তু কাঁদতে পারলাম। আমার সব কিছু জমে যেন পাথর হয়ে গেছে। হয়তো বা এটাই গভীর ছুখের একটা অহুত্ব।

আমি আমার শেষ সখল, আশা-ভয়সা-আনকটুকুকেও বিদেশী জাতিগণের মাটিতে কবর দিলাম—কামানগুলো গর্জে ওঠে ওদের ক্যান্টেনের অভিমুখ্যাকে অভিন্ননিত করলো। আমার স্তন্যটাকে কেন হুমড়ে হুমড়ে দলা পাকিয়ে কেলে দিল মাটিতে। আমি এখন আমার নিজের বাহিনীতে কিংবে এলাম তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না। এই ঘটনার পরেই আমি বুদ্ধকে মিত্র হয়ে দিলাম। কিন্তু বাবো কোথায়? তোয়োনোজ। না না, সে আর আমার দ্বারা সম্ভব হবে না কোন দিন। মনে পড়লো আমার এক বহু একেবারে অকর্মণ্য হয়ে শীতকালে হুৎ থেকে কিংবে এসে বর্তমানে ইউরোপিনক-এ বাস করছে। একবার অবশ্য সেই বহুটি আমার ওর সঙ্গে বাস করার কথা বলেছিল। ওর কাছেই পেলাম আমি।

ওদের সঙ্গারে কেবল ওরা ছজন। কোন ছেসেপিলে ওদের সেই। শহরের এক প্রান্তে নিজেরা একটা বাড়ী তৈরী করে সেখানেই থাকে। সরকার থেকে অক্ষয় তাতা পার আর একটা মোটর সারী ডিপোতে ট্রাইভারের কাজ করে। আমিও একটা কাজ পেয়ে পেলাম। বহু আমার একটা বাড়ী দিল। আমি ওদের সঙ্গেই বাস করতে লাগলাম। আমাদের কাজ ছিলো একেবারে নানা বকম জিনিস আদান প্রদান করা আর শরৎকালে কেবল শস্ত সরবরাহ করতে হতো। আর এই সময়ই ওই বে ছেসেটি বালিতে খেলা করছে, ওকে পেয়ে পেলাম।

হুৎ-দুর্ভাগ থেকে মাল বয়ে এনে আমরা একটা কাকিতে বসে জিরিয়ে নিতাম, এক আধ গ্রাস ভোদকা পান করতাম। সে সময় ধারণা মেলা আমার ভালো লাগতো সে কথা আমি অস্বীকার করি না মোস্ত। একদিন ওই ছেসেটাকে দেখলাম কাকিটার কাছে। পরদিনও দেখলাম আবার। কি ইত্যর ছেসেটা। গোটা দুখটা ভরুকোর রস আর ধুলোতে বোকাই। অত্যন্ত নোংরা। সমস্ত

দেহটা চলে গতি। কিন্তু আশ্চর্য ওর চোখ ছোটো। যেন যুটির নির্মল আকাশের বৃকে ছোটো উজ্জল নীল তারা। ব্যাপারটা হয়তো খুবই হাস্তকর বলে মনে হতে পারে কিন্তু সত্যিই আমি ওর অত্যন্ত অহুত্ব হয়ে পড়লাম। না দেখে থাকতে পারতাম না। গাড়ী নিয়ে তাড়াতাড়ি কাকিতে কিংবার জন্তে সব সময় ব্যস্ত হয়ে উঠতাম। লোকে বা দরু করে দিতো তাই ও ওই কাকিতেই বসে যেতো।

চতুর্থ দিনে আমি সরকারী গোলা থেকে সরীতে শস্ত বোকাই করে সোজা কাকিতে চলে এলাম। দেখলাম ছেসেটা সাঁড়িতে বসে পা দোলাচ্ছে। মনে হলো ওর যেন খুব খুব কিংবে পেয়েছে। আমি সরীর জানলা দিয়ে হুৎ বাড়িয়ে ওকে ডাকলাম—এই জানিয়া, আর, লাকিয়ে উঠে পড়। মালগুলো নামিয়ে দিয়ে এসে এখানে থাকো বাবে। ও আমার ডাকে সিঁড়ির ওপর থেকে লাকিয়ে চলল গাড়ীর পাদানীতে উঠলো তারপর জানলা দিয়ে ওপরে উঠে এলো। আমার নাম যে জানিয়া আপনি কেমন করে জানলেন? ছেসেটা তার ওই উজ্জল চোখগুলো বিক্ষারিত করে উত্তরের অপেক্ষার আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি উত্তর দিলাম—যারা সব কিছু জানতে পারে সেই সব লোকদের মধ্যে আমিও একজন, বুলি?

ও ঘুরে আমার ডান পাশে এলো। আমার পাশে বসিয়ে গাড়ী চালাতে লাগলাম। এমনিতে বেশ প্রাণচকল ছেসেটা কিন্তু হঠাৎ তরানক শান্ত হয়ে যার আর মাঝে মাঝে ওর কৌকড়ামো চোখের পাতার কাঁক দিয়ে আমার দিকে লজ্জার চূপ করে চেয়ে থাকে। আবার এই মধ্যে লজ্জা পেতে শিখেছে। ওর বরসের নিত্তরা আবার লজ্জা পায় না কি? আমি ওকে প্রশ্ন করলাম—তোর বাবা কোথায় থাকে রে জানিয়া? ফিসফিস করে ছেসেটা জবাব দিলে—জিমি তো বুদ্ধকে মিত্র মারা গেছেন। তোর মা? আমরা এখন ট্রেনে করে বাছলাম তখন ট্রেনের ওপর বোমা পড়ার মা-ও মারা গেছেন। ট্রেনে কোথায় বাছলি? তা আমি জানি না আমার মনে মাই। তাহলে তোর আপনার লোক বলতে আর এ সংসারে কেউ মাই? না। কেউ মাই। আছা মিত্র বুমোস কোথায়? বেখানে সুখিণা পাই।

আমার গাল ঘেয়ে গলা পর্যন্ত পর্যন্ত অক্ষয় গড়িয়ে এসেছে বুদ্ধতে পারলাম। আর তখনই হুৎ করে দিলাম আমার কর্তব্য। কেন আমরা একা-একা আর হুৎে ভোগ করি? আমি ওকে আমার নিজের ছেসে করে মেবো। আমার মনটা বেশ সফল হয়ে উঠলো বহুও হোলো। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করে দিলাম, জানিয়া জানিস আমি কে? একটা মিথাস ছেসে প্রশ্ন করলো কে? জবাব দিলাম, ওরে আমি যে তোর বাবা।

ভগবান জানেন তারপর কি হলো। ও ছোট ছোট হাতছাখা দিবে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে, গালে, ঠোঁটে, কপালে অক্ষয় চুমো খেলো। তারপর ছোট পাখীর মত কিচমিচ করে বলতে লাগলো আমি জানতাম বাবা তুমি নিশ্চয়ই আমার খুঁজে পাবে একদিন। তোমার বাই হোক তবু আমার সঙ্গে দেখা হবেই একথা জানতাম। আমিও তো এতদিন তবু তোমারই জন্ত এখানে অপেক্ষা করেছিলাম। সারাক্ষণ ও আমার আঁপটে রয়েছিল।

খাসের পাতার মত খরখর করে কাঁপছিল ওর সর্বাঙ্গ। আমারও চোখ কাপসা। আমি কাঁপছি। আমার হাত কাঁপছে। কি ভাবে গাড়ি চালিয়েছি তা আমি নিজের জানি না। এমন অবস্থা হচ্ছে যে আমি একটা ধানের ধারে এসে গাড়ি থামাতে বাধ্য হলাম। দুটি এত কাপসা হয়ে এলো যে আমার খুব ভয় হলো হয়তো বা কাউকে চাপা দিয়ে ফেলবো। আমরা দুজনে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করলাম সেখানে। ছেলেটা তখনও আমার আপটে করে রীতিমত কাঁপছে। ডান হাত দিয়ে ওকে চেপে ধরে আঁতুড়ে আঁতুড়ে গাড়িতে উঠে বাঁ হাত দিয়ে কোন রকমে গাড়ি চালিয়ে আমি সেখানে থাকি সেখানেই কিরে এলাম। মাল নামাতে বাওয়ার কথা আর ভাবতেই পারলাম না।

গাড়ীখানা গেটের কাছে যেখে আমার নোতুন ছেলেটাকে ধরে নিয়ে এলাম। ও তখনও ওর ছোট ছোট হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ঝুলছে। নিজের নরম গালটা আমার দাড়ি-ভর্তি মুখে চেপে আছে—মাকে মাকে ববছে। আর ওই অবস্থায় আমি ওকে নিয়ে ঘরে চুকলাম। আমার বহুটি আর ওর দুই বয়েই ছিল। আমি ওদের দিকে মিটমিট করে চেয়ে বেশ আনন্দের সঙ্গে জোর দিয়ে বললাম—ওহে জহরহোদর এবং মহিলা, এই দেখে শেখ পর্বত আমি আমার—খুঁজে পেলাম। ওদেরও ছেলেমেয়ে না থাকার মতো এরাও এইরকম একটা শিশু চাইছিল। ওরা ব্যাপারটা অস্বাভাবিক করে নিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। আমিও আর ছেলেটাকে ছেড়ে যেতে পারলাম না। নিজের হাতেই ওকে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলাম। সাবান দিয়ে বেশ ভাল করে হাত-পা ধুইয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর বসালাম। বহুপত্নী ওকে চামচে দিয়ে খাবার প্লেটে তুলে তুলে দিচ্ছিলেন আর চোখের জল মুছছিলেন। ওর সোজাসলে খাওয়া দেখে তিনি আর সহ করতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন। আমার ভানিয়া ওর কারা দেখে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কাঁদছেন কেন ভাবী? বাবা আমার কাকের কাছে খুঁজে পাওয়ার সর্বাই খুঁজি হলো আর আপনি কাঁদছেন? উনি আরও জোরে কেঁদে উঠলেন। চোখের জলে সর্বাঙ্গ ভিজ্জে গেল।

খাওয়ার পর আমি ওকে নাপিতের কাছে নিয়ে গিয়ে চুল কাটালাম। বাড়ীতে আমি নিজেকে ওকে টবে বসিয়ে স্থান করলাম। তারপর একটা পরিষ্কার চাদর জড়িয়ে দিলাম ওর পায়ে। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার হাতের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমি আঁতুড়ে আঁতুড়ে ওকে বিছানায় ওইয়ে দিয়ে লরীর মাল খালান করে গ্যারেজে লরী যেখে তাড়াতাড়ি একটা দোকানে চুকলাম। একজোড়া সার্জের ট্রাউজার, একটা ছোট সার্ট, এক জোড়া শ্রাণ্ডাল আর একটা খড়ের টুপি কিনলাম ওর জন্তে। অবশ্য জিনিষগুলো সব ঠিক মাপ অস্বাভাবিক হলো না আর এমন কিছু উঁচু দরেরও নয়। ট্রাউজারগুলো নিয়ে আমার বহুপত্নী খানিকটা ঠাট্টা করলেন। আপনি কি পাগল হলেন নাকি? এত পরম্পর কখনও কেউ ছেলেকে সার্জের ট্রাউজার পরায়? পর মুহূর্তই উনি বাজ পেটরা যেটে টেবিলের ওপর সেলাই কল নিয়ে বসে পড়লেন আর বটা ধানের মতোই ভানিয়ার জন্তে একজোড়া সুরজের ট্রাউজার আর একটা ছোট সাদা সার্ট তৈরী করে

ফেললেন। আমার বিছানায় ওকে নিয়ে শুলাম। বহুদিন পর আবার আমি আজ পতীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম। তবুও স্বপ্নের মধ্যে চারবার আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার হাতের ওপর ছেলেটা পাখির ছানার মত নিশ্চিন্ত আরামে ঘুচ্ছে। ঠিক বেন ঘরের চালের নীচে একটা ছোট চড়ুই পাখি আঁতুড়ে আঁতুড়ে নিঃশব্দে টানছে। সে যে কি আনন্দ তা আমি আপনাকে কখন বোঝাতে পারবো না দোস্ত! নড়াচড়া করে ওকে বিরক্ত করতে চাইলাম না—আমি পারলাম না। দেশলাই জালিয়ে আমি চূপচাপ গাড়িরে ছেলেটাকে দেখতে লাগলাম।

সকাল হতে না হতেই উঠে পড়লাম। কিন্তু সমস্ত দিনটা কেন যে অত গুমোট লাগলো কিছুই বুঝলাম না। আর আমার ছোট ছেলেটা ওর সাদা চাদর ছেড়ে উঠে আমার কোলের ওপর শুয়ে পড়লো। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ ঘুমোবার ছেলে সে নয় কিন্তু আমি তাকে সে অভ্যাস করতে লাগলাম। কারণ ওকে চোখের আড়াল করে আমি আর একদণ্ডও থাকতে পারবো না। স্বপ্নে অশ্লীল দৃষ্টিতে ওর ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মাঝে মাঝে আদর করে চূলে হাত বুলিয়ে দিতাম। স্বপ্নের ছোখের বোঝাটা বেন তখন একটু হালকা হতো।

প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে লরীতেই ও থাকতো। কিন্তু বুঝলাম এটা করা ঠিক হচ্ছে না। আমার নিজের আর কতটুকু প্রয়োজন? এক টুকরো কুটি, একটা পেরাজ আর খানিকটা ঘূন হলোই সৈনিকের একটা গোটা দিন চলে যায়। কিন্তু এখন ওর জন্তে একটু ছুঁচুই, একটা ডিম সেছ চাই, আবার পরম না থাকলে যেতে পারবে না। কিন্তু আমার তো অল্প কাজ আছে! কাজেই আমাকে একটু শক্ত হতে হলো। বহুপত্নীর তত্ত্বাবধানে ছেলেটাকে রাখলাম। সারাদিন কাঁদতো আর সন্ধ্যা হলোই মালদামে ছুটতো আমার সঙ্গে দেখা করতে। আর রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতো।

ওকে নিয়ে আমার বেশ অস্বাভাবিক পড়তে হলো। এক একদিন দিনের আসো থাকতে থাকতেই অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে শুয়ে পড়তাম। সারাদিন ছেলেটা চড়ুই পাখির মত কিচমিচ করতো আর এই সময় একেবারে চূপ করে যেতো। আমি হয়তো প্রশ্ন করতাম—কি যে ভানিয়া, কি এত ভাবহীন? ও ছাদের দিকে তাকিয়ে

ডাঃ বসু

মেসার্স কার্ডিয়েল

গরীবের স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

প্রথম প্রেসিডেন্ট:

ডাঃ বসু ল্যাবরেটরী লিঃ

কলিকাতা-৯

প্রশ্ন করতো আমার—তোমার সেই চামড়ার কোটটা কি করলে বাবা ?

জীবনে কোনদিনই আমার চামড়ার কোট ছিল না। আমাকে কোন মতে কথাটা ধোঁয়াতে হতো। বলতাম—সেটা আসার সময় ভোরোনেজে ফেলে এসেছি রে। আচ্ছা বাবা, এতদিন ধরে তুমি আমার কোথায় কোথায় খুঁজেই বলতো ? আমি তোর জন্মে জার্মানী, পোল্যান্ড, বিয়ালো রাশিয়ার সব জায়গা ঘুরেছি আর শেষে কি না তোকে পেলাম এই ইউরোপিয়ান-এ। আচ্ছা ইউরোপিয়ান কুবি জার্মানীর খুব কাছে আর আমাদের দেশ পোল্যান্ড থেকে অনেক দূরে ? আমরা না ঘুমিয়ে পড়া পর্বন্ত এই ধরণের কথাবার্তা চলতো সমানে।

ওর ওই চামড়ার কোটের কথা জিজ্ঞাসা করার কোন অর্থ নেই মনে করেন ? না, ওর পেছনে একটা সঠিক বুদ্ধি আছে ? মানে ওর আসল বাবা একটা চামড়ার কোট ছিঁড়ে ফেলেছিল কি করে। আর সেই কথাটাই ছেলেটার আঁকও মনে আছে। জানেন তো শিশুদের স্বরণ শক্তি ঠিক প্রৌঢ়কালের বিদ্যৎ বলকের মত। যে কোন জিনিষের ওপর একবার হঠাৎ বললে উঠে আবার তথুনি মিলিয়ে যায়। তানিয়ার স্মৃতিও ঠিক প্রৌঢ়কালের বিদ্যৎ বলক যেন।

আমরা দু জনে হয়তো আরও বহু বানেক ইউরোপিয়ান-এ থাকতাম। কিন্তু নভেম্বর মাসে আমি একটা দুর্ঘটনা করে বসলাম। একদিন একটা গায়ের কালাভর্তি রাস্তার লম্বী নিয়ে যেতে যেতে একটা গরু চাপা পড়ে যায়। মেয়েটা হৈ-হৈ করে উঠলো, লোকজন দৌড়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘিরে ফেললো, একজন ট্রাফিক ইন্সপেক্টরও এসে গেলো ঘটনাস্থলে। আমি ওর কাছে চলে বাবার অসুস্থতা টাইলম কিছ ও আমার লাইসেন্স কেড়ে নিলো। গরুটা তথুনি উঠে বাতাসে লেজ নেড়ে বাজা থেকে নেমে টগ বগ করে ছুটে পালালো আর আমি লাইসেন্স খুঁয়ে ঘরে ফিরলাম। সমস্ত শীতকালটা ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করে কাটালাম আর এই সময়েই আমার একজন পুরোনো সৈনিক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। আমাদের জেলাতেই মোটর প্রাইভারের কাজ করে। ওর কাছে গিয়ে থাকার জন্ত আমন্ত্রণ জানালো। আর লিখলো যে আমি ওখানে গিয়ে বহু বানেক যদি ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করে কাটাই তারপর ও অকলের জন্ত আবার নোকুন লাইসেন্স পেয়ে যাব। তাই আমি আমার ছেলেকে নিয়ে ক্যানারি চলেছি।

আমি যদি গরু চাপা না-ও দিতাম তাহলেও আমার ইউরোপিয়ান-এ ছাড়তে হতো। কারণ আমি জানি আমার নিয়তি কিছুতেই আমার এক জায়গায় থাকতে দেবে না। যখন আমার জানিয়া বড় হবে, তুলে পড়তে যাবে তখন হয়তো আমি ছিন্ন হয়ে বসবাস করতে পারবো। কিন্তু তার আগে আমরা বাপ-বেটার মিলে সমস্ত ক্রমের ব্যাটিকে তুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াবো।

আচ্ছা, ছেলেটা তো একে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে ? আমি ওকে প্রশ্ন করলাম।

পায়ে হেঁটে বেশীকণ ঘুরতে পারে না। বেশীর ভাগ সময় আমার কাঁধে চেপে থাকে। আর যদি মাঝে মাঝে ওর হাঁটার টুকু হু হু করে লাগিয়ে কাঁধ থেকে নেমে রাস্তার পাশে পাশে ছাপলের মত লাগিয়ে লাগিয়ে চলতে থাকবে। ওসব কিছু নয় দোস্ত, সে সব

দিকে আমরা ঠিকই আছি। তবে একটা ব্যাপারে আমার মনটা কোথায় যেন বাজা থাকে। ঘুরতে পারছি একটা পিসটন বদল করা দরকার। থেকে থেকে ওটা আমার এমন আঘাত করে যে আমি সে সময় ঘুরতেই পারি না যে কি করছি। ওর হর হরতো কোনদিন ঘুমের মধ্যেই মরে পড়ে থাকবো। হোটেলের টয় পেয়ে যাবে। আরও একটা কষ্ট আছে। প্রায় প্রতিরাজেই আমি স্বপ্নের মধ্যে এক এক প্রিয়জনকে হারাই। আমি যেন কোন একটা কাঁটাতারের বেড়ার এপারে পড়ে আছি আর ওরা ওপারে বেশ সুরে আছে। আমি ইরিগা আর ছেলেদের সঙ্গে মানা বিষয়ে কথাবার্তা বলি কিন্তু যেই বেড়াটা ছিঁড়তে বাই অমনি ওরা সবাই এক সঙ্গে আমার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়। এই ব্যাপারে আরও একটা মজার ব্যাপার আছে। সমস্ত দিন নিজেকে খুব শক্ত করে রাখি। গোটাদিনের মধ্যে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল না কিংবা গভীর হয়ে চুপচাপ থাকি না কিন্তু আশ্চর্য রাত্রে মাঝে মাঝে জেগে উঠে দেখি চোখের জলে আমার বামনিশ জ্বলে যায়।

নদীতে আমার বন্ধুর গলার স্বয় আর জলে দাঁড় পড়ার আওরাজ পেলাম। বাকি একজন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে হচ্ছিল সেই অপরিচিত এবার তার কাঠের মত শক্ত বিরাট হাতখানা এগিয়ে দিল আমার দিকে। বিদায় দোস্ত ! আপনার মজল হোক।

—মজল হোক তোমাদের, ক্যানারি বাজা ভক্ত হোক।

—অসংখ্য বঙ্গবান্দ। আর বেটা, আমরা এবার নোকোর চাপিগে। ছেলেটা ছুটে এসে বাপের শতছিন্ন জামাটার একটা কোণ চেপে ধরে ছোট ছোট পা কেলো বিশালকার বাপের সঙ্গে চলতে থাকলো।

ছটি অনাথ, ছটি মরুভূমির কল ঘুঘুর ভরাবহ ঘূর্ণাবর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে কিন্তু ভবিষ্যৎ এদের জন্ত কি করবে ? আমি বিশ্বাস করি রাশিয়ার লোকটি তার বলিষ্ঠ মন নিয়ে হয়তো ঠিকই সোজা থাকবে আর ওই শিশু ওর বাপের পাশে পাশে বড় হবে, নিজের স্বাধীন প্রয়োজন হর তা হলে সমস্ত বাবা-বির অতিক্রম করে সব কিছু তাকে সহ করতে হবে।

ওরা চলে যাওয়ার আগে আমার একটু কষ্ট হলো। হয়তো আমরা যখন থাকবো না তখন জানিয়ার মত সকলের সবই ঠিক হয়ে যাবে। কিছু দূর গিয়েই ও ওর ছোট ছোট পা বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে সোলাগী হাত নেড়ে অভিনন্দন জানালো। আমার হঠাৎ মনে হলো, খুব নরম অথচ শিকারী পাখির খাবা যেন স্বপ্নিতের ওপর চেপে বসেছে আমার। ব্যথায় টন টন করছে স্বপ্নিতটা। আমি ব্যস্ত ভাবে ফিরলাম। ওই সব বুড়োগুলো বানের চুলগুলো সব বহরের পর বহর সংগ্রাম করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে তারা ও দু ঘুমের মাঝেই কাঁদে না চলতে চলতেও কাঁদে। কিন্তু আসল জিনিসটা ও ভালেনি। শিশুর মনে আঘাত সে দিতে চায় না, মাদুঘের গালের ওপর ওকনো গরম অক্ষ সে ওকে দেখতে দিতে চায় না। জানিয়া যেন ব্যথা না পায়।

অশুভবাদক—অলক সিংহচৌধুরী

শেষ

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচ যায়

— অর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা



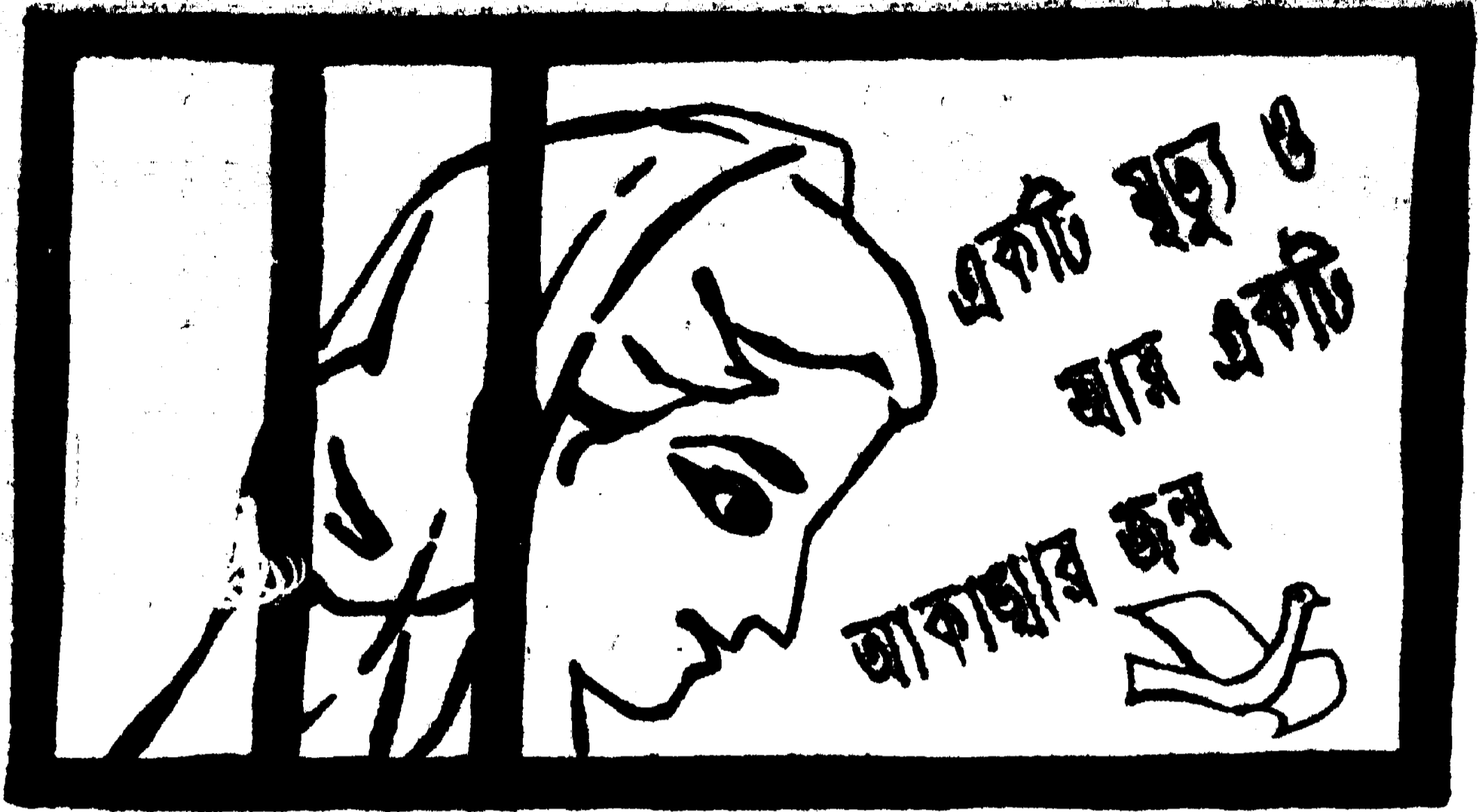
আদরের পুতুলের জন্য স্নানর জামাকাপড়! বিহু তার পুতুলের জন্য সর্কসাই স্নানর জামাকাপড় যোগাড় করে। বিহু তার মিসির জামা নেয়, ওর মার শাটী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় অর একটু সানলাইটে দিয়ে কাচা—কিন্তু কি রপবে কস। আর কক ককে রটীন।

জামাকাপড় ভোরালে আর চাদরগুলোর দিকে বেবুন। অত সব কাপড় কাচতে অরই একটু সানলাইটে মেগেছে। সানলাইটের সরের মত প্রচুর ফেনার অমেত কাপড় কাচা মার, আর আছফনার মরকার মরনা। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সানানই ব্যবহার করুন।

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাধা ও উজ্জ্বল করে

৩/৭. ৪. ৫৫৫ ৫৫

সিঙ্গাপুর সিআর সিবিটিস কর্পোরেশন



শ্রী অশোককুমার গুপ্ত

সুন্দরতারি বড় কষ্ট হয়। মেজদির বড়-জা সুন্দরতা।

সুন্দরতারি বয়স বখন হুজিগ, মেজদির ছাফিগ। আহার আশু কর। বোধ হয় বাইশ। এই বাইশ বছর বয়সেই সুন্দরতারি সঙ্গে আহার পরিচয়।

বেসেটোলা বাই সেনে মেজদির তখন থাকতো। বিসর্পিগ একটা বেধার মত গলিটা। ওপাশের নরসিংহ দত্ত রায় সেন থেকে বেরিয়ে এপাশে বাবুবাম হালদার সেন-এ এসে মিলেছে। ঠিক রাত্তার উপরেই বাড়ীটা। ভাড়া বাড়ী নয় অথচ ভাড়া বাড়ী। সামনে একটা ল্যাম্পপোস্ট আর তার তলার একটা ডাউবিন।

সন্ধ্যা সেনেছে সবে। গ্যাসের মিটারমিটে আলোর দেখে নিলাম বাড়ীর মধ্যবটা। কড়া নাড়লাম।

দরজা খুলে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো মেজদিই। দেখে তো অবাক। খুব খুশীও।

সোভলা বাড়ী। এক তলার থাকে মেজদির। চারদিকে ঘোরানো বাগান। মোট ছ-টা ঘর। মধ্যে পাকা উঠোন। উত্তর দিকের ঘর দুটো মেজদির। অল্পগুলো আর দুই জায়ের।

ঘরে হুতেই মেজদি বললো, বস। খুব ভাল সময়ই এসেছিল অক। বিয়ের পর আর তোকে কোঁটা দিইনি, না ?

বাটের এক কোণে বসে পড়ে বললাম, আর সেইজন্মেই তো সাহেবের সঙ্গে না এনে একদিন আগেই চলে এলাম।

তখন খুব খুশী হল মেজদি। সুখোমুখি বসে খুশী ভয়া চেখে চাইলো।

এতকণে ভালো করে দেখলাম মেজদিকে। খুব স্পষ্ট করে। চিনতে বেশ একটু কষ্টই হচ্ছিল। আমার মত বিয়ের আগে মেজদিকে বার দেখেছে, তাদেরও হবে।

আগের সেই কথা মাজা উজ্জল গায়ের হা আর নেই। চোখের কোলে কালি পড়েছে। বড় ক্যাকাসে ক্যাকাসে দেখাচ্ছে বেশ। কেমন বেশ এক টুকরো স্নাত্ত বিবর হারা মেজদির সমস্ত মুখে-চোখে। সুন্দরলো বড় এসোয়েলো। প্রীতির শৈথিল্য সমস্ত শরীরে। চুড়িগুলো ঠিল ঠিল করছে হাতে। বিয়ের সময় প্রথম একটু বড় করেই

বানিয়ে দিয়েছিল বাবা। বিয়ের পর মা'র হাত মেজদিও হয়তো বেশ একটু মোটাগোটা হয়ে যাবে, এই সম্ভাবনার।

চোখে চোখ পড়তেই নিশ্চুত হাসি হাসলো মেজদি। দেখতে খুব বিজী হয়ে গেছি, না রে ? কী করবো বল ?

সত্যি, মেজদি আর কি করবে ? নূতন একটা প্রাণের স্পন্দন স্পন্দিত হচ্ছে মেজদির ভেতরে ভেতরে। এবারও।

—বাচ্চারা সব কোথায় মেজদি ? বাচ্চা, বুলু, সোনা ?

—আছে কোথাও। মরুক পে ওয়া। ওদের কথা বাদ দে। তোর কথা বল।

সব শুনে মেজদি রাগ করলো খুব। একটু খেমে বললো, ভালই করেছিস এখানে না উঠে। হোটেলের উঠেছিস, ভাল থাকবি, ভাল থাকবি—এখানকার কষ্ট তোর সহ হবে কেন ?

মেজদির এটা অভিমানের কথা। হারিজ্যা মাহুদের আছে, থাকবেও। কিন্তু কি করে বোঝাই মেজদিকে যে কষ্ট আমার কিছুতেই হতো না। মেজদির কাছে বা পেতাম, হোটেলের জা কিছুতেই পাব না। বললাম, তুল করছো মেজদি। সে সব কিছু নয়।

—থাক, তুল আর শোধরাতে হবে না তোকে। একটু ঘরকে দিয়ে মেজদি বললো, যে কয়েক দিন আছিস, আসবি তো প্রতিদিন ?

—বাঃ, আসবো না কেন ?

—কাল কিন্তু খুব ভোরে উঠেই চলে আসবি। থাকি নে কিছু, বুরলি ?

মেজদি যদি শিকড়িত্তী হতো বেশ হতো তাহলে। শাসনের ভজিটা ভারী সুন্দর মেজদির। আগের মত এখনও। একটু হালদার।

মেজদি বললো, হাসছিস রে ?

আর সেই মুহুর্তেই সব হাসিকে ছাপিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় মারার শব্দ এল কানে। তার পর এচও একটা শব্দ। পর পর আরও কয়েকটা শব্দ। ভেঙ্গে চৌচির হয়ে বাওয়ার শব্দ।

মেজদির মুখের দিকে তাকলাম। আরও ক্যাকাসে দেখালো মেজদির মুখটা। ঠাট থেকে মেমে ভাড়াভাড়া বেরিয়ে গেল মেজদি।

আর পর আরও দু'একজন বারান্দা দিয়ে ছুটে চলে গেল। একটা চাপা উত্তেজনা সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়ার ঘমকিয়ে গেল। হড়োহড়ি আর ছুটোছুটির শব্দ লেগে বইল আরও কিছুক্ষণ। তার পর এক সময় হঠাৎ সব শান্ত হয়ে গেল। উত্তেজনাটা আর বইল না। শুধু একটা কারার শব্দ ভেসে এল থেকে থেকে। মেয়েলী কারা। ফুলে ফুলে কারা।

মেজদি এল তার একটু পরেই। মেজদির হাত বাচ্চর কানে। একটু ঘেন ধীপাচ্ছে মেজদি। বেশ একটু উত্তেজিতও।

—কে কীদছে মেজদি ?

—বড়দি। সেদিন আর কিছুই বললো না মেজদি।

বাচ্চু এখনও কীদছিল। আরও ছোটো চড় লাগিয়ে চীৎকার করে উঠলো মেজদি। তাকে না বলেছি এই তিন চার দিন বড়দির কাছে বাবি না। গিরেছিলি যে ?

বাচ্চু কীদলো। আরও জোরোই কীদলো। আর মাঝে মাঝে পিট পিট করে আবার দিকে তাকালো।

একটু হেসে কাছে টেনে নিলাম। লজ্জেল বিকুট দিলাম হাতে। কান্না খেয়ে গেল ওর। ইতস্তত করলো একটু খেতে। ওকে কোলের উপর বসিয়ে বললাম, কী হয়েছে রে বাচ্চু ?

—বড় মা ঘেবেছে।

—বুট মি করেছিলি বুবি ?

—সত্যি বলছি, একটুও না। কাছে কেতেই শুধু ওধু বাচ্চু আধাকে। তারপর টেবিল চেয়ার ছুড়ে...

—বুব হয়েছে নাধুপুধব। এবার চুপ কর। আবার বহি বড়দির ঘরে গেছ তো পা ভেঙ্গে দেবে।

—আর কোন দিনই বাব না ?

—না, কোন দিনই বাবে না।

ঘমকিয়ে বাচ্চুকে তো ধারিয়ে দিল মেজদি কিন্তু আবার বহীপ বহুবের কৌতূহল কতবার যে হোচট খেল তার ঠিকই নেই। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম, সোনা কেঁদে উঠলো। উঠে গেল মেজদি। এল না আরও অনেকক্ষণ।

বাচ্চুকে বললাম, বুলু কোথায় ?

—মা-মদির ওখানে।

—ভেঁকে নিয়ে এস, বাও। বাচ্চু ছুটলো। বুলুর হাত ধরে একটু পরেই ফিরে এস। বেনেটোলা বাই লেনে মেজদির বাড়ীতে এতক্ষণে বুধর হলো সেদিনের সন্ধ্যাটা। খেতে খেতে কলহাস্তে মধুর মনে হল প্রতিটি কথা।

বপ বপ করে আরও কিছুটা অন্ধকার নেমে পড়লো বাই লেনে। নিস্তব্দ আর নির্জন হয়ে এল পলিটা আরও একটু।

এগিরে দিতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আবার মেজদি বললো কথাটা। বুঝ থেকে উঠেই চলে আসবি কিন্তু, বুবি ?

আলৌকিক দৈবশক্তি-সম্মান জরুর মর্কস্মেঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লন্ডন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

মিছিল ভারত কলিত ও গণিত সত্যর সভাপতি এবং কাশ্মীর বারান্দী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দৈবশক্তি-সম্মান জরুর মর্কস্মেঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ। ইনি ও কপালের বেলা, কোষ্ঠি বিচার ও প্রভৃৎ এবং অতত ও হুট প্রহারির প্রতিকারকরে শান্তি-বস্ত্রাদি, তাত্ত্বিক জিনাদি ও প্রত্যেক কলজ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ভাঙ্কার কবিরাজ পরিভাঙ্ক কঠিন রোগাদির নিরাময়ে আলৌকিক কবচাসম্পন্ন। ভারত ও বা ভারতের বাহিরে, কথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে বহুবিধ কপার আলৌকিক দৈবশক্তির কথা একস্বাক্যে বীকার করিয়াছেন। প্রসঙ্গসম্পন্ন বিদ্যুৎ বিবরণ ও ক্যাটালগ বিদ্যাবুলো পাইবেন।

পণ্ডিতজীর আলৌকিক শক্তিতে বাহারা মুক্ত তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

বিঃ হাইনেস মহারাজা আটপড়, হার হাইনেস মানদীরা ঘটমাতা মহারাজী ত্রিপুরা টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মানদীর ভার সন্ন্যাসীরা কেশ-টি, সন্ন্যাসীর মানদীর মহারাজা বাহাচুর ভার সন্ন্যাসীরা হার গৌরী কেশ-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মানদীর বি. কে. হার, বঙ্গীর গভর্নমেন্টের মন্ত্রী রাজাবাহাচুর প্রেসিডেন্টের হারকত, কেটনকড় হাইকোর্টের মানদীর জজ রাজসাজের বিঃ এম. এম. হার, আসামের মানদীর রাজাপাল ভার কল আলী কেশ-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর বিঃ কে. হরণ।

প্রত্যেক কলজের বহু পরীক্ষিত করেকটি তত্ত্বোক্ত অত্যন্তব্য কবচ

কলজের কবচ—ধারণে কলজের প্রভৃৎ ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হর (জ্যোতিষ)। সাধারণ—৭১৮/০, বঙ্গিশালী কবচ—২৩১৮/০, মহাশক্তিালী ও সন্ন্যাস কলজের—১২৩১৮/০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও সন্ন্যাসী কপা লাভের জন্য প্রত্যেক পুত্রী ও বাবদীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য)। সন্ন্যাসী কবচ—সন্ন্যাসী বৃদ্ধি ও পরীকার কবচ ২১৮/০, বৃহৎ—৩৮১৮/০। মোহিনী (বন্দীকরণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত ধনী ও পুত্র বন্দীভূৎ এবং চিরসম্পন্ন মিত্র হর ১১১৮/০, বৃহৎ—৩৮১৮/০, মহাশক্তিালী ৩৮১৮/০। সন্ন্যাসী কবচ—ধারণে অভিলষিত কলজের উন্নতি, উপরিহ মানবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মানদীর জরলাভ এবং প্রবল সন্ন্যাস ২৮/০, বৃহৎ শক্তিালী—৩৮১৮/০, মহাশক্তিালী—১৮৩১/০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাগ্যলাভ সন্ন্যাসী জরী হইয়াছেন)।

(স্থাপিতাব ১৩০৭ খঃ) অল ইণ্ডিয়া এন্টোনমিক্যাল এণ্ড এন্টোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ২০—২ (খ), ধর্মতলা স্ট্রীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশ পথ উল্লেখসহ স্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০৩৫।

সহ-অফিস ৩টা হুটতে ৭টা। ব্রাঞ্চ অফিস ১০৫, প্রে স্ট্রীট, "বঙ্গ বিদ্যালয়", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৩৮৫। সন্ন্যাস প্রাণে ৩টা হুটতে ১১টা।

বেতে বেতে সেদিন সন্ধ্যা রাত্তি শুধু একজনের কথাই ভাবলাম। মেজদি বা জামাইবাবুর কথা নয়, মেজদির বড়-জা মুলতানির কথা। অথচ মুলতানিকে শুধু দেখিনি চোখে, জানিও না ওর সব কথা। বাকি ভাবলাম, যার কথা এত ভাবলাম সেই মুলতানির সঙ্গে পরিচয় হলো কিছ পয়দিন জোরেই।

আমি আর মেজদি গল্প করছিলাম খাটে বসে। ঘরের মধ্যে উঁকি দিল মেজদির বড়-জা মুলতানি। এত হাসাহাসি কেন রে মিলু? এত হাসি তো তোর মুখে দেখিনি অনেক দিন?

চোখের দৃষ্টিটা একটু যেন চকল। উদ্ভাসিত। আলু-খালু বেশ। বড় গলোমেলো চুলগুলো। তবু মুলতানির মুখটা, চেহারার বাঁধুনি, টানা-টানা ক্রুর নীচে বড় বড় ছোটো চোখ—টিকোলো নাকটা। আর মুলতানি গোলপী গায়ের রঙটা।

খেতে গেল হাসি। হঠাৎ একটু গভীর দেখালো মেজদিকে।

—হাস, হেসে নে। সুযোগ পেলো না হেসে কিছুতেই থাকবি নে। হরজা ছেড়ে আমাদের মাঝখানে এসে বসলো মুলতানি। খুব তোর উঠেই যোধ হয় স্নান করেছে। ভিজ্ঞে এক রাশ চুল কাঁপিয়ে পড়েছে পিঠে। জোড়া ক্রুর উপরেই খুব বড় করে দেয়া একটা সিঁদুরের কোঁটা।

সীঁদির সীমন্তেও সিঁদুরের স্পষ্ট ছোঁয়া। বড় মুলতানি দেখাচ্ছে মুলতানিকে।

বড় বড় চোখে আমার দিকে একবার চেয়েই মেজদির দিকে মুখ ফিঁড়িয়ে দিল মুলতানি। কে হয় রে তোর?

—আমার ছোট ভাই অন্ন। অকসের কাজে এসছে কোলকাতার।

—বলিস কি? এই বয়সে চাকরি করছে? ওর তো আমার হাঁটুর সমান বয়সের। খিল খিল করে ছবার হাসলো মুলতানি।

উত্তর দিল না মেজদি কথাটার। খাট থেকে মেঝে মেঝেতে পড়লো আসন। খালার করে দুর্কা, ধান আর বিয়ের প্রদীপ এনে মাড়িয়ে রাখলো। চন্দন হস্ত লাগলো বসে বসে।

পা কোলাতে কোলাতে একদুটে কিছুকণ চেয়ে দাঁল মেজদির বড়-জা মুলতানি। জিজ্ঞেস করলো, কী হবে রে মিলু?

আজ ভাইকেটা, তোমার মনে রেই বড়নি?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলো মুলতানি। চোখের তীরটা কয়েক বার চকল হয়ে উঠলো। শেষ বললো, মনে রেই আবার, খুব মনে আছে। আমিও তো হের কোঁটা।

খাট থেকে হঠাৎ স্থপ করে মেঝে পড়লো মুলতানি। মেজদির পাশে গিয়ে বসলো। একটা সালা বক বৃণ করে যেন মেঝে পড়লো মাটিতে। মুখপুড়ি, লজ্জা করে না তোর? একটু স্নেহভরে থাকবি, তাও কি পারিস না?

সত্যি, বিয়ের পর কেমন যেন নোংরা হয়ে গেছে মেজদি। স্নান করেছে, চুলগুলো আঁচড়াটনি। মাথার সেরনি সিঁদুর। কাপড়টাও পরেছে বড় নোংরা। কেমন যেন একটা ভাব।

সাজাপোজার সময় কোথায়? পেটে তো ধরনি কোনদিন, বুঝবে কি?

খিল খিল করে হাসলো মুলতানি তা বা বললোনি। এবার

ওঠ তো পোড়ামুখি। সজোরে মেজদির চুলগুলো টেনে ধরলো মুলতানি।

—আঃ, হাড়। বড় লাগছে।

—লাগুক, তোর লাগাই উচিত। হাসলো মুলতানি। উদ্ভাসিত, উল্লসিত নিবারণিত হাসি। কোন এক পার্শ্বতা মিক'মিকি হঠাৎ যেন মুখ খাবড়িয়ে পাখরের বৃকে লুটোপুটি খেল।

মেজদি উঠে দাঁড়ালো। না, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না।

মেজদি চলে যেতেই মুলতানি এসে বসলো আমার পাশে। কিক কিক করে ছবার হাসলো। তারপর আবার একটা সালা বক যেন বৃণ করে নেমে পড়লো মাটিতে। চন্দনের বাটি হাতে নিয়ে সম্মুখ এসে দাঁড়ালো মুলতানি। বলল, চুপটি করে বাস, একটুও নড়ো না কিছু।

একটু পরেই মেজদি এসে দাঁড়ালো কাছে। বেশ দেখাচ্ছে মেজদিকে এখন। বলল, ওর যাড়েও চেপেছো বড়নি!

—তুই খামতো মিলি!

মেজদি চুপ করে গেল। চোখের ইসারায় যেন বলতে চাইলো, তুইও কিছু বলিস না যেন। ওকে কিছু বলা যাবে না, বললেও শুনবে না।

একটু পরে মেজদি এসে আবার তাড়া লাগালো।

চন্দনের বাটিটা মাটিতে নামিয়ে মুলতানি বলল, নে মুখপুড়ি, হয়েছে আমার। এবার কোঁটা দে হত পারিস।

ভাইয়ের দীর্ঘকালীন কামনার বোনদের এই পবিত্র অর্ঘ্যসমের সত্যি কোন ফুলনা নেই। পাশে দাঁড়িয়ে শখ বাজাল আর উলু দিল মুলতানি। খুব দৃষ্টি মুলতানির গলার সুরটা। শুধু মুলতানি কেন, উলু বানের দিকে দেখেছি সবাই যেন মুকঠী। কনিষ্ঠরই যেন নিজস্ব একটা মিষ্টর আছে।

উলু মেজদিও দিল। শখও বাজাল। কোঁটা দিল মুলতানি আমার কপালে। প্রণাম করতে যেতেই পিছিয়ে গেল তিন পা। না, না প্রণাম করবে না। কিছুতেই না।

চোখের ইসারায় মেজদিও মানা করলো আমাকে।

খেতে খেতে মুলতানির দিকে চেয়ে দেখলাম। একদুটে চেয়ে আছে আমার দিকে। এতকণ যে দৃষ্টিতে শুধু ছিল বিহ্বলতা, বিতৃষ্ণা এসে বাসা বেঁধেছে সেখানে।

মেজদিও লজ্জা করলো। মুলতানির কাঁধে হাত রেখে বললো, বড়নি, চল আমরা বাই।

চার দিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ যেন এসেছিল মুলতানি, কেবিরে গেল তেমনি হঠাৎই। তারপর সাহায্য আর দেখা পেলাম না।

ছপুয়ের শেষে বিকেলের একটু আগে বাজ, হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে এল। কান দুটো ওর জবাকলের মত লাগ হয়ে উঠেছে।

কে মেঝেছে জা আর জিজ্ঞেস করলাম না। জানি কে মেঝেছে। মুলতানি হাড়া সে আর কেউ নয়।

সত্যি, সে আর কেউ নয়—মুলতানিই।

পরদিন মেজদির বাড়ী গিয়ে কড়া নাড়লাম যখন একবারও ভাবিনি মুলতানিই খুলে যেনে হরজা।

দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ানো সুলতানি। বললো, বাইরে থেকেও দরজাটা খোলা ধার, জানো? উপরের শিকড়লো দিয়ে হাত গলিয়ে দিলেই এখানে ছিটকামিটা।

আর চারটা তখন। বাইরে বেশ রোদ। বাড়ীর ভেতরটা কিন্তু ছায়া-ছায়া। ছপুয় এখানে বিকেলের মত।

দরজা বন্ধ করতে করতে সুলতানি বললো, কিরণমালার কাছে এসেছো? ও তো এখন ঘুমুচ্ছে। ভীষণ ঘুম ওর এখন। শুই ঘুমর। কথা শেষ করে একটু হাসলো সুলতানি। তারপর হাসি থাকিয়ে বললো, চল, আমরা গল্প করি গিয়ে।

ভাষি সুলতানি সাজানো-গোছানো সুলতানির ঘর। সুলতানির পরিচায়ক সব-কিছু। রাশি রাশি বই সাজানো রয়েছে আলমারীতে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বার্ণার্ড শ', গোট্টে, মেলী, কীটস, হেমিংওয়ে থেকে আরম্ভ করে বক্তিমচন্দ্র, বীরেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেউ বাদ পড়েনি। সুলতানি যে শান্তিমিত্তেনের প্রাক্কুরেট আর বই-এর পোকা, পরে শুনেছিলাম।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। সুলতানি একটা কথাও বললো না। আশিও না। একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

হঠাৎ খিল-খিল করে হেসে উঠলো সুলতানি। উচ্ছ্বসিত, উন্নত, কেমন এক অদ্ভুত ধরণের হাসি। সুস্থ সহজ মাহুয় এমন হাসি হাসে মা।

চমকে কিরে তাকালাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজা দিয়ে উড়ে এল ছুটো পায়রা। হড়োহড়ি আর পাখা বাড়ার শব্দে

ফানে ডালা সেপে সেল। পাখা বাড়ার ঠাণ্ডা হাওয়ার গা শিরশির করে উঠলো।

জরে জরে সুলতানির দিকে একবার তাকালাম। চোখের তারা ছুটো থেকে থেকে কাঁপছে সুলতানির। একরাশ আলমারি বিড়কা আর টর্ষা যেম উপচিয়ে পড়ছে চোখে। ভেটিসেটের খোপের দিকে দৃষ্টি রেখে নিশ্চল মূর্তির মত বসে আছে সুলতানি। বন্ধ খোপ। কাঁপড়ের পুঁটলি দিয়ে কে যেম বন্ধ করে দিয়েছে মুখটা।

একবার, দুবার, তিনবার। ভেটিসেটের আশে-পাশে ঘুরে এল পায়রা ছুটো। উলাস-করা হ হ করা ডাক ডাকলো করেকবার। তারপর বেহিয়ে গেল ঘর থেকে।

আবার হাসলো সুলতানি। নিবারণিত, নির্ভরিত হাসি। তারপর খেমে খেমে বললো, বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে।

কেমন জামি একটু অবস্থি হেরে গেল মনে। আভে আভে মেজদির ঘরে উঠে এলাম।

তারপরই ওমলায় এচও একটা শব্দ। পর পর কয়েকটা শব্দ। তেঁকে চৌচির হয়ে বাওয়ার শব্দ। ঠিক যেমন এসে শুনেছিলাম প্রথম দিন এসে।

মেজদির চোখে চোখ রাখলাম। বললাম, সুলতানির এমন কেমন হয় মেজদি?

—সে তুই বুঝবিসে। মেয়েদের ব্যাপার এসব। মাসের তিন চার দিনই ও এমন। কাল বা পরও এসে দেখিস ও একেবারে অল্পরকম।



আনন্দ উৎসবে ক, হোডের প্রসাধন সামগ্রী



ক, হোড ২৩ কোং • কলিকতা-১৯

সত্যি কথাই বলেছিল মেজদি।

মধ্যে তবু হু-দিন বাইনি মেজদির ওখানে। পরদিন বখন সেলাম, বাড়ীটা খুব চূপচাপ মনে হল। বেন কেউ নেই। ছবায় কড়া মেড়ে সাজা সেলাম না। সুলতানির কথা মনে পড়লো। হাত বাড়িয়ে ছিটকামিটা খুলে কেসলাম।

মেজদির ঘরে এসে দেখলাম শিকল তোলা। কোথাও গেছে বোধ হয়। উঠানে এসে দাঁড়ালাম। আকাশটা খুব ঘোলা ঘোলা দেখালো। এক বলক ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে ঝাপটা দিয়ে গেল।

প্রথমে আন্তে আন্তে তার পর একটু জোরে একবার ডাকলাম। সুলতানি।

সাজা সেলাম না। ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বিন্ময়ে নির্ঝক হয়ে সেলাম।

হাঁটু গেড়ে মেঝের উপর বসে আছে সুলতানি। সামনে পড়ে রয়েছে একটা মরা পায়রা বাজা আর ভেটিলেটারের খোপ থেকে ছিটকে পড়া কাপড়ের পুঁটলিটা।

সুলতানি কাঁদছে। বড় বড় চোখ থেকে জল পড়ছে সুলতানির।

পায়রা ছটোও আবার উড়ে এসে ছুটোছুটি করে মনের অস্থির যন্ত্রণা প্রকাশ করছে। উদাস করা হু হু করা ডাক ডাকছে।

কাঁদছে। পায়রা ছটোও কাঁদছে।

—সুলতানি।

একটু চমকে বড় বড় জলভরা চোখ তুলে তাকাল সুলতানি। মেজদির বড়-জা। উঠে দাঁড়াল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো। বললো, বস! কিরণ ডাক্তারের কাছে গেছে। কিরণ মানে মিলু, মিলি। আমার মেজদি।

আজ কত দীর্ঘ, স্থির, শান্ত সুলতানি। এ হু-দিন যেমন দেখেছি, বাকি দেখেছি, সে বেন এ নহ—অন্ত মন, একেবারে অন্ত মনুষ্য।

সাহস

(D. H. Lawrence-এর Courage কবিতাটির অনুবাদ)

মানুষের অতৃপ্তির কারণ,

তার গ্রহণ করে মিথ্যাকে।

মানুষের থাকতো যদি সাহস, পারতো যদি মিথ্যাকে হার মানাতে
জানতোও যদি কী তাদের প্রকৃত ভাবনা, কী তাদের সংকল্প
আর কাজে যদি মাততো সেই মত,

তবে তারা প্রতিটি অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসরণ ক'রে উদ্যমী নির্ভাস,
অবশেষে শরতকালের বাদামের মত, হত
মধুর ও মৃৎ।

সবীমতের বার প্রবীণদের ভিড়ে

সেপ্টেম্বরের বাণাম-বাগানে বেন,

তারা সংগ্রহ করতো বাদাম, পরিণত অভিজ্ঞতার ফল।

এখন, প্রবীণেরা দিতে পারে মাত্র

অঙ্গ, তিষ্ঠ, মিথ্যানির ফল।

অনুবাদক—সুভাষ ভট্টাচার্য।

মরা পায়রার বাজাটাকে নিবিড় মেহে কাগজের উপর তুলে মিল
সুলতানি। বলল, বাই কেলে দিয়ে আসি জলে।

সুলতানি কিরে এলে, মেজদিও এসে গেল। ব'র তুকে বলল,
কখন এসেছিল?

—এই তো, কিছুক্ষণ।

—বাজু কোথায় যে, মিলু? সুলতানি জিজ্ঞেস করলো।

—ঐ তো বাইরে দাঁড়িয়ে। ছেলের রাগ হয়েছে।

কক্ষ হাসি হাসলো সুলতানি। কোলে তুলে নিয়ে চল ওকে।

মাথায় চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলল, কি হয়েছে সোনা?

ঠোট ফুললো বাজুর। তোমার কাছে আর আমি আসবো না।

—কেন যে, কী করেছি আমি?

—তুমি মার। জীবন বক।

—না, না, তোকে আর কোনদিন মারবো না। কখনও না।

নিবিড় মেহে বাজুর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিল সুলতানি।
চোখ দিয়ে মুক্তোর মত হু-কোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

হাসলো মেজদি।

আবার পাখা কটপটানির শব্দ এল কানে। পায়রা ছটো এসে
ছুকলো ভেটিলেটারের খোপে। ডাকল, বক... বক... বকুম।

ঠেচিয়ে উঠলো মেজদি। তাড়াও বড়দি, তাড়াও। না হলে
মরবে।

—না, না ওরা থাক। ভেটিলেটারের খোপের দিকে চেয়ে
শান্ত হাসি হাসলো সুলতানি।

ওরা থাকবে। ডাকবে। একটি মৃত্যু আর একটি আকাঙ্ক্ষার
জন্ম দিয়ে বাবে ওদের মনে।

কিন্তু সুলতানির জীবনে এ আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হয়েছে অসংখ্য বার।
এ আকাঙ্ক্ষা আর রূপ পাবে না কোন দিন।

সুলতানির জন্ম কষ্ট হবে না তো কি?

পাখি

সুশান্ত বোধ

দূরের বাণিতে সুর বাজে ঐ জলভার মেঘের মতন।

খাপনের চোখ বলে অন্ধকারে আকাঙ্ক্ষার প্রলয়ের আগ্নে,

ভারো কাছে কান পাতি, চোখ বুঝি অরূপ রতন

আশা করে ডুব দেয় সরোবরে, সমুদ্রে, সোহাগে।

ক্রমে এক পারিজাত আশা তবু কাছে ডাকে তাকে—

দর্পণের ছায়া নয়, ভূপিত স্পন্দিত মেহ মেহে পাবে বলে

অসতর্কে, পাশে আর কেউ নেই, চেউ চলে

ছুঁয়ে শুধু মুখ-চোখ বুক। আর বিস্মৃত প্রতীকে

লঠনের চোরা আলো আলি। একা জাঙ্কব শহরে

কিরে চাই তুমি ভেলে, বাতায়নে; মমত্বের ঘরে।

পরিকীর্ত মনও বুঝি বলে যায়। কবেকার এমম প্রত্যয়ে

কিরে আসি বরচিত পদচিহ্নে, স্মৃতিস্ব নথরে

কাঁপাই পশরী-শাড়ি। বেন নিম্নীলিত পাখি, তবু

লুক্কর্ক কাঁপে বার বাতায়নে, মমত্বের ঘরে।

বসন্তের কথা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আইভান তুর্গেনিভ

৮

সে তখনও পোবাক পরেনি। ওয়েটার এসে খবর দিলো,

হ'জন ভ্রমলোক তার সঙ্গে দেখা করতে চান। দেখা সেলো তাদের একজন হচ্ছে এমিল, অন্য জন—সুন্দরন ও মনে রাখার মতো চেহারা এক যুবক—সেই হচ্ছে হের কাল রুবার, রুপসী জেম্মার প্রণয়ী।

খুব সম্ভবতঃ সারা ফ্রান্সকোর্ট সহরে হের রুবারের মত ভদ্র, শিষ্ট, মার্জিত ও গভীর প্রকৃতির আর কোনো দোকানী ছিলো না। তার নিখুঁত পরিচ্ছদ ছিলো তার পারিপাট্য ও মর্যাদারই উপযুক্ত। তার পারিপাট্য অবশ্য ছিলো খানিকটা ইংরেজদের মত রক্ষণশীল ও গোঁড়া, ইংল্যান্ডে সে হ'বছর কাটিয়ে এসেছে। তাকে একবার দেখেই যে কেউ বুঝতে পারতো এই সুন্দরন, একটু উগ্র প্রকৃতির, অতি ভদ্র ও অতি কিটকাট যুবকটি বড়দের কাছে অতি সহজেই নত হতে পারতো ও ছোটদের হুকুম করতে ছিলো অভ্যস্ত ও দোকানের কাউন্টারের বাইরে ক্রেতাদের মনে শ্রদ্ধার উদ্বেক করতো। তার অসাধারণ সাবুতা সবক্কে কেউ সন্দেহ করতে পারতো না। একবার মাত্র তার কড়া ইলিকরা শব্দ কলারটির দিকে চাইলেই পরিষ্কার বোঝা যেতো। তার কণ্ঠস্বর ছিলো ঠিক যেমনটি আশা করা যায় কোমল অথচ দৃঢ়, জোর নয় কিন্তু তাতে স্নিগ্ধতার ছোঁয়াচ লাগানো। এই কণ্ঠস্বর ছিলো দোকান-কর্মচারীদের হুকুম করার বখার্ব উপযুক্ত। লাল লায়নস্ ডেলভেট খুলে দেখাও তো দয়া করে কিংবা ভ্রমহিলার জন্ত একটা চেয়ার নিয়ে এসো।

হের রুবার কথাবার্তা শুরু করলো আত্মপরিচয় দিয়ে। তার শরীরটা নোয়ালো অতি শিষ্ট ভাবে, তার পায়ের পাতাগুলো সরালো অতি ভদ্রভাবে, তার গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকালো অতি সভ্য ভাবে যে, যে দেখতো সেই ভাবতো এই লোকটির পরিচ্ছদ ও মানসিক গুণগুলি নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর। তার খোলা ডান করতল (যার করতল ঢাকা ছিলো একটা সুয়েড হস্তানায়, ধরেছিলো আর্পির মত চকচকে একটা টুপি, তার ওপরে ছিলো অন্য হস্তানাটি।) সানিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলো বিনীত ভাবে—অবিশ্বাস রকম সুন্দর ছিলো তার হাতটি—প্রতিটি নখ ছিলো বেন নিপুণ শিল্পীর তৈরী। অতি মার্জিত আরণে সে বললো—সে তার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চায় বিদেশী ভ্রমলোকটিকে, যিনি তার ভাবী আত্মীর, তার প্রেমিকার ভাই-এর এতখানি উপকার করেছেন। এই কথা বলে টুপি মুছে বাহাতটা দিয়ে এমিলকে দেখালো। এমিল অপ্রতিভ হয়ে মুখে আঙ্গুল দিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়েছিলো।

হের রুবার আরো বললো, সে যদি বিদেশী ভ্রমলোকটির কোনো কাজে আসতে পারে তবে খুশী হবে। সানিন খেমে খেমে আঁচলে উত্তর দিলো সে-ও ওদের দেখে খুশী হয়েছে। ওদের জন্ত সে সামান্যই করেছে। ওদের বসতে বললো সে। হের রুবার যত্নবান দিয়ে চকিতে কোটের তলার দিকটা ছড়িয়ে দিয়ে জোরে বসলো। তবে বসলো সে এমন হাডাডাবে যে, প্যাট্টই বোঝা বাচ্ছিলো নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে সে বসেছে। বে কোনো যুহুর্ভেই চলে যাবে। সত্যিই বিনয়নত্র নাচের তালে উঠে ঝাড়ালো ও বললো সে চুঃখিত যে, আর বেশীকণ বসতে পারলো না। কারণ তাকে দোকানে যেতে হবে, জীবিকা চেষ্টাই প্রথম—কিন্তু পরের দিনটি হচ্ছে রবিবার, ফ্রাউ লেনোর ও ফ্রয়লাইন জেম্মার সম্মতি নিয়ে সে ঠিক করেছে সোডেনে বেড়াতে যাবে। বিদেশী ভ্রমলোককে তাতে নিমন্ত্রণ করে সম্মানিত বোধ করছে ও আশা করছে তিনি উপস্থিত হয়ে এই দিনটিকে সকল করতে নিরাল কয়বেন না। সানিন তার উপস্থিতি ব্যাধ এই দিনটিকে সকল করতে অসম্মত নয় শুনে হের রুবার বিদায় দিলো। সেই রকম শিষ্টতা দেখিয়ে, অতি সুন্দর ভাবে তার কড়াইওঁটি রুয়ের সবুজ প্যাট্ট ছুলিয়ে ও ঝকঝকে নতুন বুটের মিষ্টি আওয়াজ করে।

৯

সানিন বসতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও এমিল জানলার বাঁড়িয়ে ছিলো যখন তার ভাবী আত্মীরটি বিদায় নিলো, তখন সন্দেহ ভাবে শিশুসুলভ মুগ্ধভঙ্গী করে জিজ্ঞেস করলো সে একটু বসতে পারে কি না। আরো বললো আজ আমি খুব ভালো আছি। কিন্তু ভাস্তার বাবু আমাকে কাজ করতে বাধ্য করেছেন।

খাঁটি রাশিয়ান যে কোনো ছুতোয় কাজ বন্ধ রাখতে ভালোবাসে। সানিনও খুশী হয়ে বললো, নিশ্চয়ই, বসবে বৈ কি। তোমার কোনো কাজই নেই।

এমিল যত্নবান দিলো ও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে আপন হয়ে গেলো, ঘরের সব জিনিস দেখতে লাগলো। সানিনের সব জিনিষপত্র কোনটা কি কাজে লাগে, কোথা থেকে কেনা হয়েছে জিজ্ঞেস করা হয়ে গেলো। তাকে দাড়ি কামাতে সাহায্য করলো ও বললো তার সৌকর রাখা উচিত। তার মা বোন, পাটালেওন এমন কি টাটালিয়া বলে কুকুরটির সবক্কে জ্ঞাতব্য বা কিছু ছিলো সব বললো, কি করে তাদের দিন কাটে। আগেকার লাডুক ভাবটি সে কাটিয়ে উঠলো। সানিনকে তার ক্রমশঃই তীব্র ভালো লেগে যেতে লাগলো, আগের দিন সানিন তার প্রাণ বাঁচিয়েছে বলে

মত, সে খুব ভালো লোক বলে। নিজস্ব পোশাক কথা বা ছিলো তা সবই মানিয়ে কলা হয়ে গেলো। তার যা চান সে লোকানন্দার হয়ে। কিন্তু সে জানে ও মনে করে সে পারক হয়েই আছে। সে হচ্ছে প্রকৃত ভক্তি। বহালই তার জীবিকা উপার্জনের প্রকৃষ্ট স্থান। এমন কি, পাটালগুন পর্যন্ত তাই চায়। কিন্তু হের রুহবার যার পক্ষে, যার ওপর তার প্রত্যয় খুব বেশী, হের রুহবারের মাথাতেই প্রথম এসেছে যে তাকে ব্যবসায়ী হতে হবে। হের রুহবারের দায়িত্ব, ব্যবসায়ী হতে পারার মত আর কোনো সম্মানজনক কাজ নেই। কাপড় আর হাফজল বিক্রী করা, খাদ্যের ঠিকানো, তাদের কাছ থেকে খোঁকার কর বা হাথিরানের কর (প্রতি বছর যে দানে হাফজল কাছাকাঠে হাথিরান প্রদানকারীরা আসতো। তখন সব জিনিষের দায় বেড়ে যেতো ও তাকে বলা হতো হাথিরানের কর বা খোঁকার কর।) আদায় করা—এই হচ্ছে তার আদর্শ।

সামনের বখর পোশাক পরা ও হাথিরানে চিঠি লেখা হয়ে গেলো, টেবিলে উঠলো এমিল, চলুন এবারে আমার সঙ্গে, বাড়ী বাওয়ার সময় হয়েছে।

সানিন বললো—এত তাড়াতাড়ি যাব না।

এবারে এমিল ওর গা বেঁধে বললো, তাতে কিছু হবে না। চলুন বাওয়া বাক। প্রথমে পোষ্টা পিসে যাবো, সেখান থেকে আমাদের ওখানে। জেন্না আপনাকে দেখে বেজায় খুসী হবে। প্রান্তরাশ আমাদের ওখানেই সেরে নেবেন। তাছাড়া মাকে আমার সব্বন্ধে, আমার ভবিষ্যৎ সব্বন্ধে বলতে পারবেন।

সানিন বললো, আচ্ছা তাহলে চলি। তারা বেরিয়ে পড়লো।

১০

মনে হলো, জেন্না তাকে দেখে সত্যিই খুসী হয়েছে ও ফ্রাউ লেনোর সঙ্গে তাতে স্বাগত জানালেন। বোধ হলো কাল ঠরা তার সব্বন্ধে ভালো ধারণাই করেছেন। এমিল সানিনের কানে কানে বললো, ভুলে যাবেন না। সানিন বললো মনে আছে। এমিল প্রান্তরাশ অর্ডার দিতে গেলো।

ফ্রাউ লেনোর খুব সুস্থ ছিলেন না। তাঁর মাথা ব্যথের ছিলো। চেয়ারে হেলান দিয়ে চূপচাপ স্থির হয়ে শুয়েছিলেন তিনি। জেন্না পরেছিলো একটা হলধে রং-এর চিলে জামা, কোমরে কালো চামড়ার বেল্ট জড়ানো। তাকেও শ্রান্ত ও ক্যাকাশে দেখাছিলো, চোখের নীচে কালি পড়েছিলো। তাতে চোখ দুটির সৌন্দর্যের কিছুমাত্র লাভ হয়নি। পাগুং-এ তার দেহহুল্লভ চেহারার আরো অপকৃপ, আরো মনোহর মনে হচ্ছিলো। আজ সানিনের চোখ পড়লো তার অপকৃপ লাভণ্যময় হাত দুটি। বখন সে তার বেশমের মত কালো চুলের গোছা হাত দিয়ে ঠিক করছিলো, সানিন চোখ কিরিয়ে নিতে পারছিলো না, তার দীর্ঘ নরম, সুন্দর গড়নের আঙ্গুলগুলো থেকে বাকুলের আঁকা ছবি কর নারিনার মত।

সেদিন খুব গরম পড়েছিলো। প্রান্তরাশের পর সানিন বিদায় নিতে উঠলো। কিন্তু তাকে বখন বলা হলো এরকম দিনে যে বেখানে আছে, সেখানেই বসে থাকা ভালো। তখন সে সম্মত হলো ও থেকে গেলো। মহিলাদের সঙ্গে পোহনের একটি ঠাণ্ডা ও সুন্দর ঘরে সে বসেছিলো। জানলা দিয়ে ঘরের পাঁচের ধোপে জরা একটা ছোট

খানাম দেখা যাচ্ছিলো। অক্ষয় মৌসাহি ও বোলতা পাটার ধোপে ও সোনালী ফুলের ওপরে ওনওন করে উড়ে বেড়াচ্ছিলো। জানলার পর্যাটানা ছিলো কিন্তু আবেতহানো পাখিগুলো দিয়ে তাদের অকিরাম ওননের আওরাক আসছিলো। তাতে মনে হচ্ছিলো বাইরে গুমোট গরম পড়েছে, ঘরের কিছু আশ্রয় ঘের আরো বেশী ভালো লাগছিলো।

গতকাল বেয়র অনেক কথা বলতে হয়েছিলো জেন্না হাথিরান মানিন খুব কথা বলছিলো। কিন্তু হাথিরান বা চূপ-জীবনের কথা নয়। তার ছোট বড়ুটি হিসেব রাখা বিধিতে প্রান্তরাশ থেকেই নোজা হের রুহবারের কাছে চলে গিয়েছিলো। তাকে খুসী করার উদ্দেশ্যেই সামিন শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা জ্ঞাতবিদ্যার জুলমাঙ্গলক আলোচনা শুরু করলো। ফ্রাউ লেনোর বখন ব্যবসায় পক মিলেন তখন সে আশ্চর্য্য হলো না, সে ঠিক এইটাই আশা করেছিলো। কিন্তু জেন্নাও তার পক মিলো।

জোরের সঙ্গে হাতটা সামিয়ে সে বললো, যদি কেউ শিল্পী হতে চায়, বিশেষ করে পারক, তবে তার শীর্ষস্থানে ওঠা চাই। এর কমে কিছু হয় না, আর কে জানে কে সেখানে উঠতে পারবে?

পাটালেওনও এই আলোচনার যোগ দিলো। (দীর্ঘদিনের চাকরী ও বুদ্ধবয়সের দৌলতে সে তার মনিষদের সঙ্গে বসতে পারতো, তাছাড়া ইটালীয়ানরা কাহলা কাহনের ধার ধারে না।) স্বভাবতই পাটালেওন ছিলো সম্পূর্ণ শিল্পকলার দিকে। অস্ত তার যুক্তিগুলো সত্যি কথা বলতে কি, খুব জোরালো ছিলো না। সে আরম্ভ করলো—সব্বচেয়ে আগে দরকার হচ্ছে ভেতর থেকে প্রেরণা আসবে—সেই প্রেরণায় অল্পপ্রাণিত হয়ে জাগবে আকাঙ্ক্ষা।

ফ্রাউ লেনোর উত্তরে বললেন, নিঃসন্দেহ পাটালেওনের সেই আকাঙ্ক্ষার অভাব ছিলো না।

পাটালেওন চ'ট গিয়ে বললো, আমার যে অনেক শত্রু ছিলো।

ফ্রাউ লেনোর বললেন—তুমি কি করে জানলে এমিলেরও শত্রু জুটবে না, যদিই বা তার সে আকাঙ্ক্ষা থাকে?

রাগ করে পাটালেওন বললো, আচ্ছা বেশ, তাকে লোকানন্দারই বানান কিন্তু জিরোভান বাটিটা নিজে খাবার বিক্রতা হলেও এরকম করতেন না।

আমার স্বামী জিরোভান বাটিটা বিবেচক ছিলেন এবং বোঁবনে যদি তিনি একটু রাগী না হতেন—

কিন্তু বড়ো আর ওনতে চাইলো না, রাগ করে বললো—জিরোভান বাটিটা। ও বেরিয়ে গেলো। জেন্না বললো, এমিল যদি দেশপ্রেমের উদ্ভূত হয়ে ইটালীর মুক্তির জন্ত সব শক্তি নিয়োগ করতে চায় তবে এই পবিত্র ও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্ত নিশ্চিত ভবিষ্যৎকে ত্যাগ করার সার্থকতা আছে, কিন্তু বহালয়ের জন্ত নয়। এ কথাতে ফ্রাউ লেনোর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তার ঘেরেকে কাতরকণ্ঠে বললেন সে যেন তার ভাই-এর সর্বনাশ না ডেকে আনে। সে নিজে ঘোর সাধারণতরী তাতেই যেন সে সন্তুষ্ট থাকে। এই কথা বলেই ফ্রাউ লেনোর কাঁদতে লাগলেন ও বললেন আর সাধারণ এত ব্যথা করছে যেন মনে হচ্ছে একুণি কেটে যাবে। তিনি সানিন সামনে থাকতে মেয়ের সঙ্গে করাসীতে কথা বলছিলেন।

জেন্না তখনই তার সেবার লেগে গেল। প্রথমে তার তার কপাল



জাদুঘর মার্ঘ



গিনি চান্ড জুয়েলারী জেমশালিষ্ট

এম.বি. সরকার
এও সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৩৭/সি ১৩৭ সি/২ চক্ৰবর্তী ট্রাষ্ট কলিকতা-১২ গ্রাম-বিলিয়ার্ড
৩৩-বালি গল-২০০/২/পি রাসবিহারী এডিনিউ কলিকতা-১৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
স্বাক্ষরিত পুরাতন চিত্রশালা ১২৪, ১২৪/১, অক্ষয়জ্যোতি ট্রাষ্ট, কলিকতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ

B.B.

অতিক্রমণ দিবে ভিকিবে হতো, তারপর হাওয়া করলো, গালে চুপ খেলো, মাথা বঁচে বালিশ বিছো, কথা বলতে বাধা করলো আবার চুপ খেলো। তারপর সানিনের দিকে ফিরে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বহুসভা বলতে লাগলো, তার হা কি চমৎকার আর কি রুগনীই ছিলেন একদা। কিন্তু আরি কেন বলছি এককালে—এখনও কি সুন্দর চোখ ছুটি।

জেন্মা তার পকেট থেকে একটা সাদা কফাল বের করে তার হার খুঁজতে গেলো। তারপর ধীরে ধীরে কফালের তলার দিকটা করে ক্রীটের দিকে টেনে গেলো, প্রথমে কপাল, তারপর কুঁড় ও তারপর চোখ দুটি দেখা গেলো, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে মাকে চোখ খুলতে বললো। ক্রাউ লেনোরের চোখগুলো ছিলো সত্যিই ভয়ানক সুন্দর। চোখ খুলতেই জেন্মা প্রাণসংশয়িত আওয়াজ করে কফালটা তার মুখের ওপর থেকে টেনে নিয়ে মাকে আদর করতে লাগলো। ক্রাউ লেনোর হাসলেন, মাথাটা সরিয়ে মেয়েকে জোরে টেনে দিলেন। জেন্মাও মিহিমিহি জোর করে আদর করতে লাগলো। মার্জারিতুলত করাসী ধরণে নয়, সুন্দর ইটালীয়ান স্টাইলে, হাতে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশেষে ক্রাউ লেনোর জানালেন, তিনি শ্রান্ত বোধ করছেন। জেন্মা তখনই মাকে চেয়ারে বসেই এক কুম ঘুমিয়ে নিতে বললো। মার্জারিতুলত ও মামি ছোট্ট ইঁদুরের মত শক্ত চুপ করে থাকলো।

ক্রাউ লেনোর উত্তরে হাসলেন, চোখ বুজে হ'-একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ও ঘুমিয়ে পড়লেন। জেন্মা তার মার কাছে লুপড়ে গিয়ে চুপ করে বসে রইলো, তার ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল রেখে; একটা হাত মার বালিশের তলার রেখে। সানিন-বেই নড়ে উঠছিলো অমনি সে সানিনের দিকে আড়চোখে চেয়ে শ' করে আওয়াজ করছিলো। শেষে সানিনেরও চুপ করে বসে থেকে কিছুনি এসে গেলো। সে বেন একটা ছবির সামনে বসে ছিলো। আঘো অঙ্কার ঘরটি, সবুজ ফুলদানিগুলোতে রাখা সজ্জা পূর্ণ প্রকৃতিত সোলাপের লাল আভার এখানে ওখানে আলোকিত হয়েছিলো। নিজস্বতা মহিলাটি হাত জোড় করে শুয়েছিলেন, ভূবারওত্র বালিশে তার ক্রান্ত সদয় চেহারা, তরুণীটির সদা ব্যস্ততা, তার বুদ্ধি, করুণা ও পবিত্রতা, তার অবর্ণনীয় সৌন্দর্যবাহি, গভীর, ঘন কালো চোখ দুটি, হারাজুর অঞ্চল অলম্বলে সব কিছু মিলে বেন একটি ছবি। সানিন ভাবে ও প্রাণসংশয়িত বিস্তার হয়ে গেলো বেন। এসব কি? স্বপ্ন না রূপকথা? আর সব কিছুতে সেই বা কি করে হঠাৎ জড়িয়ে গেলো?

১১

সদয় দরজার ওপর ঘটাটি বেজে উঠলো। ফার টুপী ও লাল ওয়েস্টকোট পরে একটি চাবী ছেলে চুকলো এসে দোকানে। সকাল থেকে একজনও খব্বের আসেনি। প্রান্তরায়ের সময় ক্রাউ লেনোর হুঁচ করে সানিনকে বলেছিলেন দেখুন, আমাদের ব্যবসার কি অবস্থা পাড়িয়েছে? এখন তিনি ঘুমোচ্ছিলেন, জেন্মার হাত বালিশের তলার ছিলো, সানিনকে চুপি চুপি বললো, দোকানে গিয়ে আমার হয়ে দেখে আসুন না।

সানিন পা টিপে টিপে দোকানে গেলো। ছেলেটি তিন আউল পেপারমিট লজ্জল চাইলো।

সানিন কিসকিন করে হরজা বিবে ভিকিবে করলো, ওয় কাহ থেকে কত নেবো?

উত্তর এলো ছয় ক্রয়েংসার।

সানিন তিন আউল মেশে, এদিক ওদিক খুঁজে একটা কানজকে পোল করে তাতে লজ্জলগুলো জড়ালো, একবার সব খুলে পড়ে গেলো, আবার জড়ালো, আবার খুলে গেলো। শেষে কোনো হকমে জড়িয়ে গেলো ও খব্বের কাহ থেকে পরমা গিলো। ছেলেটি তার পেটের ওপরে টুপিটা চেপে ধরে অর্ধক হয়ে সানিনের কাণ্ড দেখছিলো ও পেছনের দর থেকে জেন্মা কোনোরকমে মুখে হাত দিয়ে হাসি চাপছিলো। প্রথম খব্বেরটি চলে যেতে না যেতেই একজন ও তারপর আর একজন খব্বের এলো। সানিনের মনে হলো দেখা বাজ্জ, আমার খুব পর আছে। বিস্তার খব্বেরটি এক গ্লাস সিরাপ চাইলো, তৃতীয়টি হ' আউল লজ্জল। চামচ আর ডিশের শব্দ করে, বাজ্জ ও জারগুলিতে হাত চুকিয়ে ব্যস্তমত হয়ে সানিন তাদের চাহিদা মিটালো। অবশ্য পরে হিসেব করে দেখা গেলো সিরাপটা সে কম দামে বিক্রী করেছে আর লজ্জলের জন্ড ক্রয়েংসার বেশী নিয়েছে। জেন্মা তার হাসি চেপে রাখতে পারছিলো না। সানিনেরও মন ভরে গেলো অবর্ণনীয় আনন্দে ও খুসীতে। তার মনে হলো বহুসভা ঠাট্টার হাসিতে মুখ ভরে এই সুন্দর মেয়েটি যদি খোলা দরজা দিয়ে চেয়ে থাকে, তাহলে সে অনন্তকাল ধরে কাউন্টারে পাড়িয়ে সিরাপ ও লজ্জল বিক্রী করে যেতে পারে। গ্রীণ্ডের বোদ এসে পড়েছিলো পাতার ভরা সামনে চেইনটি গাছের সারিতে, তার হলদে সবুজ আভা এসে পড়েছিলো ঘরের মধ্যে, তার মন ভরেছিলো মধুর আলম্বে, মুক্ত আনন্দে, প্রথম বোবনের খুসীর জোয়ারে।

চতুর্থ খব্বেরটি এককাপ কফি চাইলো, তাতে পাটালেওনকে ডাকতে হলো। হের ক্লুসবাবের দোকান থেকে এমিল তখনও ফেরে নি। সানিন ভিতরে গিয়ে আবার জেন্মার পাশে বসলো। ক্রাউ লেনোর তখনও ঘুমোচ্ছিলেন বলে তার মেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলো। সে বললো মার মাথা ঘরা ঘুমের মধ্যে সেয়ে যায়। সানিন কিসকিন করে তার লেনদেনের খবর গিলো। সে দোকানের খাবারগুলোর নাম বলে যেতে লাগলো ও জেন্মা খুব গভীর হয়ে তাদের নাম বলে যেতে লাগলো। তারা বেন একটা হাসির নাটকে অভিনয় করছে মনে করে দুজনেই নিজেদের মনে হাসছিলো। বাস্তায় হঠাৎ তারব্বের ডের ক্রাইস্টিয়ংসের গানের এক কলি বেজে উঠলো প্রান্তরায়ের ওপর দিয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে। এই করুণ গানটি শুক দুপুরের বাতাসকে কাঁপিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছিলো। জেন্মা বললো ও মাকে জাগিয়ে দেবে। সানিন তখনই দৌড়ে বাইরে গিয়ে লোকটির হাতে কয়েকটি পরমা দিয়ে দূরে পাঠিয়ে দিলো। সানিন কিবে এসে জেন্মা মাথা নেড়ে তাকে ধন্যবাদ জানালো। গুনগুন করে আপনমনে মুছ হেসে ওয়েবাবের মনোহুঙ্কর পুরটি গাইতে লাগলো, যেখানে ম্যান প্রথম প্রেমের আনন্দ ও বিশ্বাসের বর্ণনা করেছেন। এখানে সে সানিনকে ভিকিবে করলো সে ডের ক্রাইস্টিয়ংস জানে কিনা ও ওয়েবাব তার কেমন লাগে। ওয়েবাব

থেকে কবিতা ও আধুনিক সাহিত্য, তারপর ইকমানে আসা গেলো।

তখনকার দিনে লোকে ইকমান খুব পড়তো।

ফ্রাউ লেনোর তখনও ঘুমোচ্ছিলেন, এমন কি তার আঙুলে নাক ডাকছিলো; পাখিগুলোর ভেতর দিয়ে সূর্যরশ্মি এসে পড়েছিলো। সূর্যরশ্মি ক্রমশঃ সরে সরে যাচ্ছিলো মেঝের ওপরে, ফার্শিটারের ওপরে, জেম্মার জামার, কুলের পাপড়িতে ও পাঁতাগুলোর ওপরে।

১২

দেখা গেলো, জেম্মা ইকমানকে বেশী পছন্দ করে না, সত্যি বলতে সে ইকমান পড়ে বিরক্তই বোধ করে। তার দক্ষিণ দেশের উজ্জ্বল স্বভাবের একেবারে বিপরীত ছিলো অতীন্দ্রিয় কঠকরনামের উত্তর দেশের এই কাহিনীগুলি। সে বিরক্তির সঙ্গে বললো, রূপকথা গল্প ওগুলো—শিশুদের জন্য লেখা। তাছাড়া ইকমানের লেখা কবিতাময় নয়। অবশ্য একটি গল্প, তার নাম তুলে গেছে, সে গল্পটা তার খুব ভালো লাগে। গল্পটার আরম্ভ ভারী সুন্দর, শেষের দিকটা সে পড়েনি বা তুলে গেছে। গল্পটা ছিলো এরকম একটি তরুণের সঙ্গে দেখা হলো একটি অসামান্য সুন্দরী গ্রীক মেয়ের, সেও এক খাবারবিভক্তার দোকানে। সেই মেয়েটির সঙ্গে সব সময় থাকতো এক রহস্যময় পাজী বুড়ো। তরুণটি প্রথম দর্শনেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো। আর মেয়েটিও তার দিকে করুণ নয়নে দেখছিলো চেয়ে, যেন তাকে মুক্ত করতে প্রার্থনা করছিলো। ছেলেটি এক সুহৃৎের জন্য বাইরে গিয়েছিলো। যখন ফিরে এলো তখন দোকানে সেট মেয়েটি বা বুড়ো কেউ ছিলো না, ও তাদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো। খোঁজ পেয়ে ওদের অনুসরণ করলো কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও ওদের ধরতে পারলো না। সুন্দরী মেয়েটি চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিন্তু সে মেয়েটির মিনতিভরা চাহনি তুলতে পারছিলো না। সে সব সময়ই এ কথা ভেবে কষ্ট পেয়েছে, তার সারা জীবনের সুখ সে আত্মুলের ভেতর দিয়ে গলে যেতে দিয়েছে।

হয়ত ইকমান লিখিত গল্পটির শেষ এরকম ছিলো না কিন্তু জেম্মার স্মৃতিতে এই ছিলো।

জেম্মা বললো, আমার মনে হয় এরকম দেখা হওয়া ও বিচ্ছেদ হওয়া আমরা যত কম মনে করি তার চেয়ে বেশী ঘটে থাকে।

সামিন চূপ করে গুমছিলো। দু-এক মিনিট পর সে হের রু যবারের প্রসঙ্গ তুললো। এই প্রথম সে ওর নাম করছিলো, এতকাল ওর মনেই ছিলোনা ওর কথা।

এবারে জেম্মা চূপ হয়ে গেলো। অন্তরিক্তে চেয়ে তর্জনী খুঁটতে লাগলো। তারপর তার প্রেমিকের প্রশংসা করে বললো, আগামী কাল সকালে পিকনিকে যাওয়ার কথা। সামিনের দিকে একবার চেয়ে দেখে একেবারে চূপ হয়ে গেলো।

সামিন ভাবছিলো এবারে কি বলা যায়।

এমন সময় আওয়াজ করে ফ্রাউ লেনোরকে জাগিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলো এমিল। সামিন এমিলকে দেখে যেন বিহ্বলিত পেলো।

ফ্রাউ লেনোর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পাঁতাগুলো এসে বললো, দুপুরের খাবার তৈরী। পরিবারের বন্ধু, একদা অপেশা পারক তৃত্যটি বা হুনার কাজও করতো।

১৩

মধ্যাহ্ন ভোজনের পরও সামিন বসে রইলো। অসহ পয়সের অল্পহাতে তাকে বেতে বেওয়া হলো না। যখন পয়স কমে গেলো, বাগানে ধরের পাছের তলার বসে তাকে কফি খেতে মেসজুর করলো ওরা। স্থির-নির্দিষ্ট গতানুগতিক জীবনের গতির আড়ালে লুকিয়ে থাকে অন্তর্নিহিত আনন্দ, সেই আনন্দ ও তৃপ্তিতে তার মন ভরে গেলো। যেন বর্তমানের কাছ থেকে কিছুই তার আর পাওনা নেই। জেম্মার মত তরুণীর মহামূল্য সম্পর্কে এসে তার আগামী দিন ও গভাকালের হিসেবে তুল হয়ে গেলো। শিল্পীরই তার কাছ থেকে হস্ত চিরতরেই বিদায় নিতে হবে। কিন্তু উল্লেখের সীতি-কবিতার মত মত দিন জীবনের শান্ত নদীতে বাহ নৌকোতে বসে আছে। তত দিন—বাত্রী, প্রাণ ভরে পান করে নাও আমনের পোয়ানা, স্মৃতিতে সুখে থাকো। সুখী পথিকটির সঙ্গে হলো সব কিছুই মনোহর ও আনন্দকারক। ফ্রাউ লেনোর ট্রেসেট খেলতে ডাকলেন তাকে, পাঁতাগুলো তাকে তাসের সহজ ইটালীয়ান খেলাটি শিখিয়ে দিলো, কয়েকটি ক্রয়েরসার জিতে মিসে ভারী খুসী হলো পাঁতাগুলো। এমিলের অল্পবয়সে এবারে পাঁতাগুলো টাটালিরাকে নিয়ে খেলা দেখাতে শুরু করলো। টাটালিরা একটা লাঠির উপরে লাফালো, কথা বললো (অর্থাৎ ডাকলো), হাঁচলো, নাক দিয়ে দরজা বন্ধ করলো। মনিবের কাছে একটা ছেঁড়া চটি নিয়ে এলো, সবশেষে একটা টেনিসের টুপি মাথার পরে সেনানায়ক বার্পাদোত্তের পাঠ অভিনয় করলো, সম্রাট নেপোলিয়ানের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কটুকথা গুনলো। বলা বাহুল্য, নেপোলিয়ানের পাঠটি অভিনয় করলো পাঁতাগুলো। তার হাত দুটো বুকের ওপর রাখলো, টুপিটা চোখের ওপরে টেনে নিলো। অভ্যস্ত কর্তার ও করুণভাবে করাসীতে কিন্তু হার ভগবান, কি সে ভাবা—বকতে লাগলো। টাটালিরা পায়ের ভেতর লেজটা চুকিয়ে ওটিওটি মেয়ে প্রভু পায়ের তলার বসে অপরাধীর মত পিটপিট করে, টুপির তলা থেকে আড়চোখে চাইছিলো। টুপিটা তার মাথার একপাল করে বসানো ছিলো। নেপোলিয়ানের পলার স্বর যখনই উঁচু পর্টার উঠছিলো, বার্পাদোত্ত পেছনের পা হুঁটার ওপর ভর করে দাঁড়াছিলো। অবশেষে নেপোলিয়ান যখন অতিরিক্ত উত্তেজনার দরুণ তার করাসীত তুলে গিয়ে ইটালীয়ানে চেঁচিয়ে উঠলো 'দু হও, বিশ্বাসঘাতক,' তখন বার্পাদোত্ত সোজা গিয়ে সোকার পিছনে লুকিয়ে পড়লো। অবশ্য তার পরেই আনন্দে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলো যেন দেখাতে যে অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। দর্শকরা সবাই প্রাণভরে হাসলো—সবচেয়ে বেশী সামিন। জেম্মাও অবিরত হাসছিলো, জোরে আওয়াজ করে। আহা, ওর হাসি—কেবল ওর হাসির জন্য সামিন গুকে আদর করতে পারতো।

রাত্রি এলো অবশেষে, এলো তার বিদায় নেবার পালা। বার বার কাল আসবো বলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলো কিন্তু তার হোটেল। এমিল তো সামিনকে জড়িয়ে চুষুই খেয়ে মিলো। সামিন সঙ্গে নিয়ে গেলো মেয়েটির ছবি, হাতময়ী, ভাবুক, শান্ত এমন কি মাঝে মাঝে উনাসীন—প্রতিটি ভাবের ছবি কি সুন্দর, কি মনোহর। তার চোখ কখনও সম্পূর্ণ খোলা ও বলবলে পুরুক ভরা, কখনও চোখের পালকে আঘটাকা, রাত্রির মত গভীর ও

অঙ্ককার; তার সামনে ফুটে উঠতে লাগলো সব চিন্তা, সব ছবি ছাড়িয়ে তার মন ভরে গিলে অভিনব-মাধুর্য্যে।

হের রুহবার ও তার ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে যাওয়ার কারণ— এক কথার কাল যাত্রিতে যে সব কথা সে চিন্তা করছিলো আজ একবারও তা সানিনের মনে এলো না।

১৪

কিন্তু এতকণে সানিনের সবচেয়েও ছ'-একটি কথা আমাদের জানা দরকার। প্রথমেই বলতে হয় অতি প্রিয়দর্শন ছিলো সে। কীর্ঘায়ত দেহ, সুন্দর বদিক একটু ভোঁতা চেহারা, কল্পনা মাখানো মীল চোখ, সোনালী চুল, গোলাপী গায়ের রং, তার চেয়েও ভালো লাগতো তার মুখের সখল ও শান্ত ভাব, অকপট ও নির্ভয়বোধ্য, তার ভালোমাসুখী ভাব দেখে প্রথমে হয়ত তাকে একটু নির্বোধ বলেই মনে হতো, আগেকার দিনে সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলের মতো যে ভাব থেকে স্পষ্টতঃই চেনা যেতো 'বাবার আত্তরে ছেলে, শান্ত শিষ্ট ভদ্র, আমাদের সীমাহীন বুকবিয়ল স্তম্ভভূমির পল্লীকলে জন্মগ্রহণ করেছে ও বড় হয়েছে। অনির্দিষ্ট চলা, আধো-আধো কথা, শিশুর মত হাসি বদি কারো চোখে চোখ পড়ে। সর্বোপরি সন্তোজ স্বাস্থ্য, তার উপর অস্তরের কোমলতা, এই হচ্ছে সানিন—সব মিলিয়ে সানিনের ছবি। দ্বিতীয়তঃ সে নির্বোধ ছিলো না। অনেক বিষয়ে বিজ্ঞান করতছিলো। বিদেশ ভ্রমণ সবেও সে তার চরিত্রের মাধুর্য্য হারিয়ে কেলেনি। সেকালের শ্রেষ্ঠ বুঝকের মাকে মাকে যে সব বস্ত্রধার অশান্তি ও চিন্তার মধ্যে দিন কাটতো সানিন তার কিছুই জানতো না। সে জগৎ তার কাছে ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত।

আমাদের লেখকরা 'নূতন ধরণের চরিত্রের' বৃথা সন্ধান করে ইদানীং বা সৃষ্টি করছেন তাতে দেখা যাচ্ছে বুঝকরা সব ক্ষেত্রেই চরিত্রের সৌকুমার্য্য বজায় রাখছে যে করেই হোক। তারা যেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে সন্ত-আমদানী-করা টাটকা ক্লেবুর্গ বিহুকের মতই নির্বোধ ও নিখুঁত। তুলনার কথাই এখন উঠলো তখন সানিনের তুলনা করতে পারে একটি ছোট আপেল গাছের সঙ্গে, যাকে সন্ত উপড়ে এনে আমাদের কালোমাটি ফলের বাগানে লাগানো হয়েছে। একটু বড়ই হয়ে গেছে উপড়ে আনার পক্ষে, কিংবা বছর তিনেকের, বকবকে, সুন্দর, বড়ে লালিত মোটা গোড়ালিওলা তেজী বাচ্চা বোড়া, আগেকার দিনের কোনো অবস্থাপন্ন লোকের অর্থশালার লালিত, সবেমাত্র আয়োজনযোগ্য হয়েছে। উত্তর-জীবনে যারা সানিনকে দেখেছে তারা কিন্তু দেখেছে তাকে একবারে ভিন্নরূপে; তখন সানিন তার বৌবনসুলভ তাক্য ও লালিত্য হারিয়েছে, জীবন তার প্রতি অবিচার করেছে, অত্যাচারের ছাপ রেখে গেছে তার চেহারায়।

পরের দিন সানিন তখনও শুয়েছিলো, এমিল হাতে ছড়ি নিয়ে, পমেন্টমাখা সুন্দর আঁচড়ানো চুল—সেজেক্কে এসে ঘরে ঢুকলো। বললো, হের রুহবার গাড়ী নিয়ে একুপি আসছেন, দিন খুব চমৎকার করবে মনে হচ্ছে, তারা সকলেই যাওয়ার জন্য তৈরী কিন্তু আবার মাথা ঘরতে যা যেতে পারবেন না। সানিনকে তাকী ছিলো। বললো আর একটুও সময় নেই। সত্যিই হের রুহবার

এসে দেখলো সানিনের তখনও প্রাতঃকৃত্য শেষ হয়নি। দরজার টোকা মারলো, ঘরে ঢুকলো, নত হয়ে অভিবাদন করলো, বললো, সানিন বস্ত্রধার না প্রস্তুত হয় সে অপেক্ষা করবে, টুপিটা হাতাতাবে হাঁটুর উপর রেখে বসলো। পূর্ণ পোষাক পরিহিত কৃতী ব্যবসায়ীটি আতর মেখে এসেছিলো, একটু নড়লেই অতি বৃহ আতরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিলো সারা ঘরে। ল্যাণ্ডো নামে গৌরবাধিত একটি খোলা ও প্রশস্ত গাড়ীতে এসেছিলো সে, একজোড়া প্রকাণ্ড বড় তেজী বদিক তেমন সুন্দর নয়, বোড়া জোতা ছিলো গাড়ীতে। মিনিট পনেরোর মধ্যে সানিন ও এমিল সহ হের রুহবার জগৎ-এই গাড়ীতে করেই খাবারের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ফ্রাউ লেনোর দৃষ্টিতে এই জমণে বেতে আপত্তি জানালেন, জেন্স ও হার সঙ্গে থেকে বেতে চাইলো, কিন্তু তার মা তাকে প্রায় বাড়ী থেকে বের করে দিলেন।

সবাইকে আদান দিলেন তিনি, আমি কাউকেই চাইনে। আমি ঘূমিরে পড়বো। পাটলেওনকেও পাঠাতে পারলে খুসী হতাম, কিন্তু তাহলে দোকান দেখাব কেউ থাকে না।

এমিল বললো—টাটালিয়াকে নিয়ে বাই না?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

টাটালিয়া তখনই গাড়োয়ানের পাশের সিটে গিয়ে বসলো ও ঠোঁট চাটতে লাগলো। বোঝা গেলো, সে এরকম বাইরে যাওয়ারতে অভ্যস্ত ছিলো। জেন্সা বাদামী ফিতে লাগানো একটা খড়ের টুপি পরলো। সামনের দিকে নামিয়ে দিলো টুপিটি যাতে রোদ তার মুখে না পড়ে। টুপির ছায়া শেষ হয়েছিল তার ঠোঁটে এসে, গোলাপ ফুলের পাণ্ডুর মত হালকা ও গোলাপী ছিলো তার ঠোঁট ছুটা, শিশুর মত তার দাঁতগুলো সলজ্জ হাসিতে দেখা যাচ্ছিলো। জেন্সা সানিনের পাশে পেছনের সিটে বসেছিলো হের রুহবার ও এমিল তাদের মুখোমুখি বসেছিলো। যেত বেশপরিহিতা ফ্রাউ লেনোরকে জানলার দেখা গেলো, জেন্সা ক্রমাল নাড়লো তার দিকে চেয়ে, ঘোড়ালো ছলকি চালে রওয়ানা হলো।

১৫

ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে প্রায় আধ ঘণ্টার রাস্তা ছবির মত সুন্দর ছোট সহর সোডেন টাউলুস পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত ছিলো। খনিজ প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত ছিলো এই সহরটি রাশিয়ার, সবাই বলতো দুর্বল-হৃদয় বা খাসঘরের উপকারী ছিলো এই প্রস্রবণগুলি। ফ্রাঙ্কফোর্টের লোকেরা অবশ্য সেখানে যেতো ফ্রুটি করবে বলে। কারণ, সোডেনে একটি সুন্দর পার্ক ও কয়েকটি সবাইখানা ছিলো যেখানে, উঁচু লাইম ও ম্যাপল গাছের ছাওয়ার বসে বিয়ার ও কফি পান করা যেতো। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে সোডেনে যাওয়ার রাস্তা ছিলো মাইন নদীর ডান তীর ঘরে আর তার ছ'পাশে ছিলো কলগাছের সারি। চমৎকার রাজপথ ঘরে এখন গাড়ীটি মস্তুর গতিতে চলছিলো তখন সানিন আড়চোখে জেন্সা ও তার প্রশয়ীর ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছিলো। এই প্রথম সে হৃৎজনকে একসঙ্গে দেখলো। খুব শান্ত ও স্থির হয়ে বসেছিলো জেন্সা, বোধ করি একটু বেশী গভীর ও সমাহিত দেখাচ্ছিলো তাকে। সদায়র শিককের ভাব করে বসেছিলো রুহবার। বেন হারনের সঙ্গে

নির্দেশ্য উন্নয়নোচিত কৃতিত্বে তার আপত্তি ছিলো না। জেন্সার প্রতি তার কিছুমাত্র আসক্তি আছে, সানিনের নজরে এলো না এমন কোনো হাবভাব। হের রুসবার স্বভাবতঃ এই ছোট ব্যাপারটিকে স্থির নিশ্চিত বলেই জেনেছিলো, সে জন্ত এই সবকিছু কোনো বকম উচ্চাঙ্গ বা অহুয়োগ প্রকাশের কোনো সার্থকতা আর ছিলো না তার কাছে। কিন্তু নিজের প্রোঁথ সবকিছু সঙ্গ সচেতন ছিলো সে। খাবার আগে সোভেনের চার পাশে বনময় বন্ধুর উপত্যাকাত্তে তারা বধন বেড়াছিলো, বধন সবাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলো পূর্ণ মাত্রায়। তখনও তার এই অহমিকার ভাব ফুটে উঠছিলো। সময় সময় কড়'খ করার ভাব ফুটে উঠছিলো। বধা, একটি ছোট পাহাড়ী নদীর সবকিছু মস্তব্য করলো; অধিত্যকার উপর দিয়ে বড়ই ঋতুরেখার বয়ে গেছে—কয়েকটি স্নানর সর্পিলা বঁকে বয়ে বাওয়া উচিত ছিলো নদীটির। একটি কিক পাখীর ব্যবহারও তার মনঃপুত হলো না, বললো তার ডাক বড়ই একঘেয়ে। জেন্সার চেহারার অবসাদ বা বিরক্তির চিহ্ন ছিলো না বরং মনে হচ্ছিলো সে সব কিছুই উপভোগ করছিলো। কিন্তু সানিনের মনে হলো এ জেন্সার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। তার চেহারার যে ক্লাস্তির ছাপ পড়েছিলো তা নয়। তার হাত্তোচ্ছল রূপ ভারী স্নানর লাগছিলো, কিন্তু মনে হচ্ছিলো সে যেন আপনাত্তে আপনি বিতোর হয়ে আছে। ছোট হাত্তাটি খুলে গভীর ভাবে নিতান্তই উন্নয়নের তরুণীর মত আন্তে আন্তে পা ফেল হাঁটতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো এমিলও যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না আর সানিন তো নয়ই। কথাবার্তা সব সময়ই চলছিলো জাৰাণে, সেক্ষতও সে একটু স্তম্ভ হয়েছিলো। অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলো না কেবল টাটাঙ্গিরা। ডাকছিলো, ছুটছিলো, শালিক পাখীকে ডাক্ত করছিলো, গাছের ওঁড়ি, ছোট মালা, কাটাগাছ লাফিয়ে ভিকিয়ে বাচ্ছিলো। জলে লাফিয়ে পড়ছিলো, গা বেড়ে নিয়ে আবার তীরবেগে ছুটে বাচ্ছিলো, তার লাল লম্বা জিত বেরিয়ে পড়েছিলো। অতিথিদের চিত্ত বিনোদনের জন্ত বা বা করা হয়কার

মনে করছিলো, হের রুসবার তার জট করছিলো না। একটি বস্ত ওক গাছের ছায়াতে সবাইকে বসতে বললো সে, পকেট থেকে 'হাত্তকোঁতুক বা হাসতেই হবে তোমাকে' নামে একটি ছোট বই বের করলো এবারে, পড়তে আরম্ভ করলো ভীষণ হাসির ছোট ছোট কাহিনী। আর বাবোটি কাহিনী পড়লো সে, কিন্তু কেউই বেশী মজা পেলো না জ্বাত্তে। কেবলমাত্র সানিনই উন্নয়নের খাতিরে একটু হাসতে চেষ্টা করলো। হের রুসবার নিজে অবন্ত প্রত্যেকটি হাসির গল্প শেষ করে সর্গর্বে একটুখানি পরিমিত হাসি হাসছিলো। বাবোটার সময় সবাই সহরের সেরা হোটেলের ফিরে গেলো।

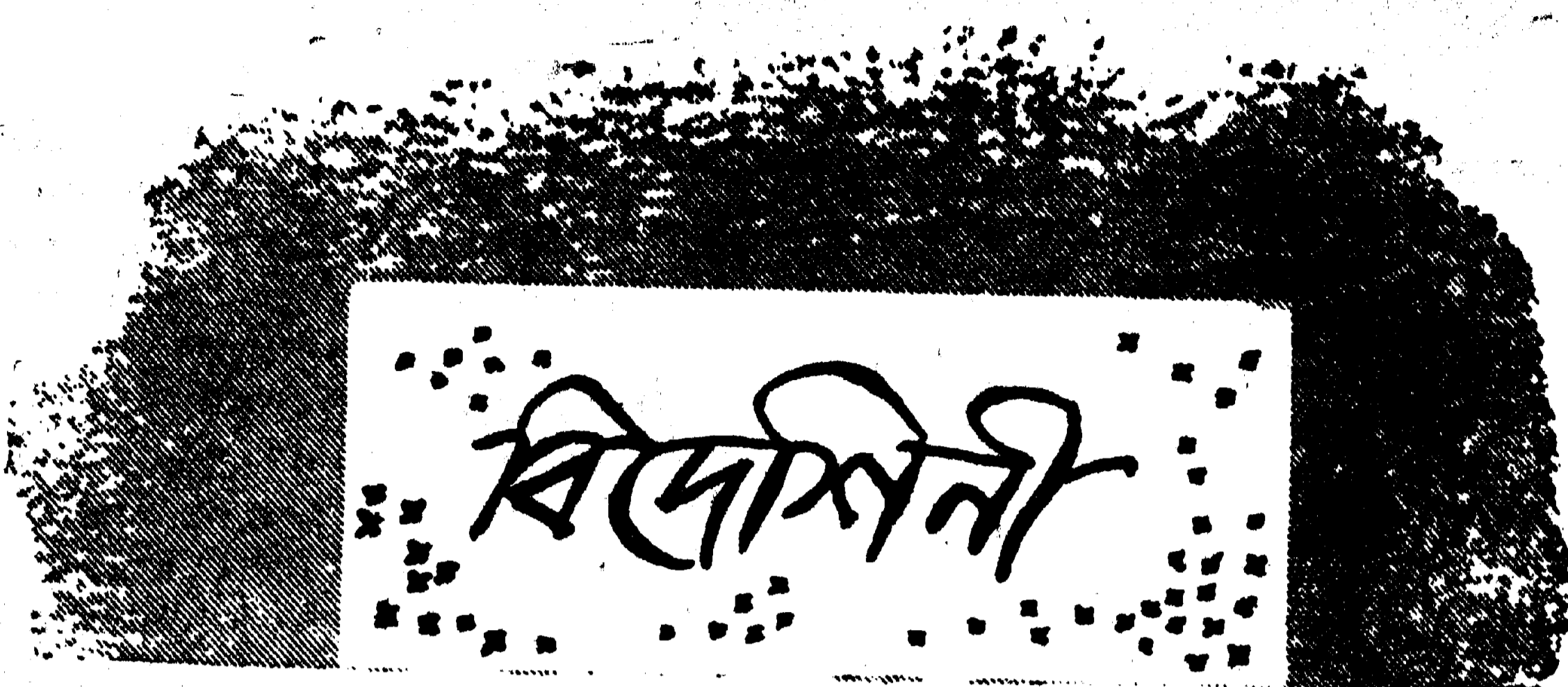
খাবার সময় হয়েছিলো। হের রুসবার ঠিক করলো সবাই পার্টেন সোলোনে অর্থাৎ সবদিকে ঢাকা শ্রীশকালীন ঘরে বসে খাবে। কিন্তু জেন্সা হঠাৎ আপত্তি জানালো, বললো সে খোলা জায়গার হোটেলের সামনে বাগানে যে ছোট ছোট টেবিল রাখা আছে সেখানে বসে খাবে। চেনাখুখ দেখে তার আর ভালো লাগছিলো না, এবারে নতুন মুখ দেখতে চায়। কয়েকটি টেবিলে ইতিমধ্যে সন্ত-আগন্ত কয়েক জন লোক বসেছিলো।

হের রুসবার খুশীমনে তার 'প্রেমিকার খেয়াল' চরিতার্থ করতে হেডওয়েটারের সঙ্গে কথা বলতে গেলো। জেন্সা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, চোখ নীচু করে ঠোট চেপে। সে অস্বস্ত্য করতে পারছিলো, সানিন তার দিকে কোঁতুকলের সঙ্গে চেয়ে আছে। বিব্রত বোধ করছিলো সে। হের রুসবার এসে বললো আর বস্তীর মধ্যে আবার তৈরী হবে, ইতিমধ্যে একটু স্টিটল খেলা বাক, হে হে জ্বাত্তে বিদেহও উল্লেখ হবে। খুব ভালো বল হুজুতে পারতো সে, কাঠের বলটি ছোড়ার আগে বীরগর্বে হাত ছড়িয়ে, পেদী কুলিয়ে এক পারে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কারলা দেখালো সে। তার খেলোয়াড়সুলভ দৈহিক গঠন ছিলো সত্যিই প্রশংসনীয়। তার হাত ছোটো ছিলো ভারী ভঙ্গা ও স্নানর। অতি স্নানর কাজকরা একটা কামাল দিয়ে হাত মুছছিলো সে।

খাবার সময় এসে সবাই গিয়ে টেবিলে বসলো। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—আশা দাস।

"বস্ত প্রত্যেক সত্যতারই একটি মূল আঙ্গুর আছে। সেই আঙ্গুরটি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, তাহাই বিচার্য। যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্মকে সীড়িত করিয়া বর্ধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকেই একমাত্র সীড়িত বলিয়াই বেন বরণ না করি। আমাদের হিন্দু সত্যতার মূলে সমাজ, যুরোপীয় সত্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্বও যাহুয় মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্বও পারে। কিন্তু, আমরা যদি মনে করি যুরোপীয় হাঁচে সেনান পড়িয়া তোলাই সত্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মহত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরজন দাশগুপ্ত

একটু বেলায় ছরটা একটু কমলে মালিন টান্নী আনিবে
আমাকে বাড়ী নিয়ে গেল। যবে নিয়ে সবচেয়ে গুইয়ে দিল
আমাকে খাটে। নিজের ঘরে নিজের খাটে শুয়ে ঘেন অনেকটা
আরাম পেলাম। হুপুরের দিকে একজন বন্ধু ডাক্তার এলেন,
পরীক্ষা করে বললেন—বুকে-পিঠে কোথাও কোন দোব নাই,
এমনি ছর। মালিন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল—ডাক্তারের কথা
শুন ঘেন হাঁক ছেড়ে বাঁচল। ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা মালিনকে
বুঝিয়ে দিয়ে ডাক্তার বিদায় নিলেন।

বাই হোক, ছরটার দরুন আমাকে প্রায় সাত দিন বিছানার
তরে থাকতে হল এবং তারপর উঠেও আরও প্রায় ৭।৮ দিন বাড়ী
থেকে বেহুতে পারিনি—এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম।

এই সময় সেবা-বস্ত্রের মধ্য দিয়ে মালিনের এমন একটা মধুর
রূপ আমার চোখে তেঁসে উঠল যে আমি দুঃখ না হয়ে পারিনি,
একথা মরল ভাবেই স্বীকার করি। সমস্ত দিন সমস্ত রাত
প্রাণ-মন দিয়ে সে ঘেন আকুল ভাবে সজাগ হয়ে থাকত—পাছে
আমার গারে কোনও দিক দিয়ে এতটুকুও আঁচড় লাগে। তবু
তাই নয়, তার সেই পত্নী-বিব্রণ ধরণটিও ঘেন গেল চলে।
সহজ হাসিখুসী ভাবের মধ্য দিয়ে একটা স্বাভাবিক প্রকৃত্তা ছড়িয়ে
দিল সমস্ত বাড়ীতে—অনুহু অবস্থার আমি সহজেই হাঁক ছেড়ে
বাঁচলাম।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই কথা জুলে গেলাম কি? না—
জুলিনি। যত দিন অনুহু ছিলাম মন ছিল দুর্বল, তাই মারে মারে
বখনই কথাটা মনে হত, দুর্বল মনে তার প্রতিক্রিয়াও হত কৌণ,
তাই সহজেই চাপা পড়ে যেত। কিন্তু ক্রমে শরীর সুস্থ হতে
লাগল, মনও হতে লাগল সবল, কথাটাও ক্রমেই মনটাকে জুড়ে
বসতে লাগল—আর চাপা দেওয়া যায় না। ফলে, বখন সম্পূর্ণ
সুস্থ হয়ে সার্বভাষীতে বাওয়া-আসা শুরু করলাম, ঐ কথাটা মনটাকে
সর্বকণ এমন ভাবে চেপে বসল যে তার লারে আমার ঘেন সময়
সময় মন বন্ধ হয়ে আসত। কিন্তু কি করা যায়?

মালিনের সেবা-বস্ত্রের মধ্য দিয়ে তার মধুর রূপটি রচনা করে
মনকে যে লাভ করার চেষ্টা করিনি এমন নয়। কিন্তু হলে কি
হবে—আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি। মন কি লাভ হয়? মনে পড়ে

যার ভারসেটের কথা—ভালবাসার ত এক রূপ নয়, সেবা-বস্ত্রের মধ্য
দিয়ে তার একটা দরদের রূপ প্রকাশ পায় বটে কিন্তু অল্প রূপও ত
আছে?

ক্রমে এমন হল—আমি ঘেন মালিনের কাছে বেশীকণ থাকতে
পারি না। বাড়ীতে বতকণ নেহাত না থাকলে নয়। বাইরে,
বিশেষ করে সার্বভাষীতে, বেশীর ভাগ সময় কাটাতে শুরু করলাম।
মালিন, যদিও তার ব্যবহারে বেশ সহজেই ছিল, কিন্তু আমার দিক
দিয়ে ব্যবহার এমন কি কথাবার্তাও ক্রমে সঙ্কচিত হয়ে গেল।

মাকে মাকে এমনও বে মনে হয়নি তা নয় যে, কেম এক ওরয়ে
যরছি, মালিনকে সমস্ত কথা বলে সোজা প্রর করি, বা হয়
পরিকার হয়ে থাক—তারপর তেবে দেখা যাবে কি করা যায়। সেদিন
ধর না হলে হয়ত কৌকের মাধার তাই করতাম—আমি সোজাই
প্রর করতাম। তারপর বা হয় হত। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল,
এখন ঘেন আর প্রবৃত্তি হয় না, বলতে গেলে যাবে। আমি যে
পরিকার দেখেছি, সন্দেহ ত নয়—কি করে কি বলি।

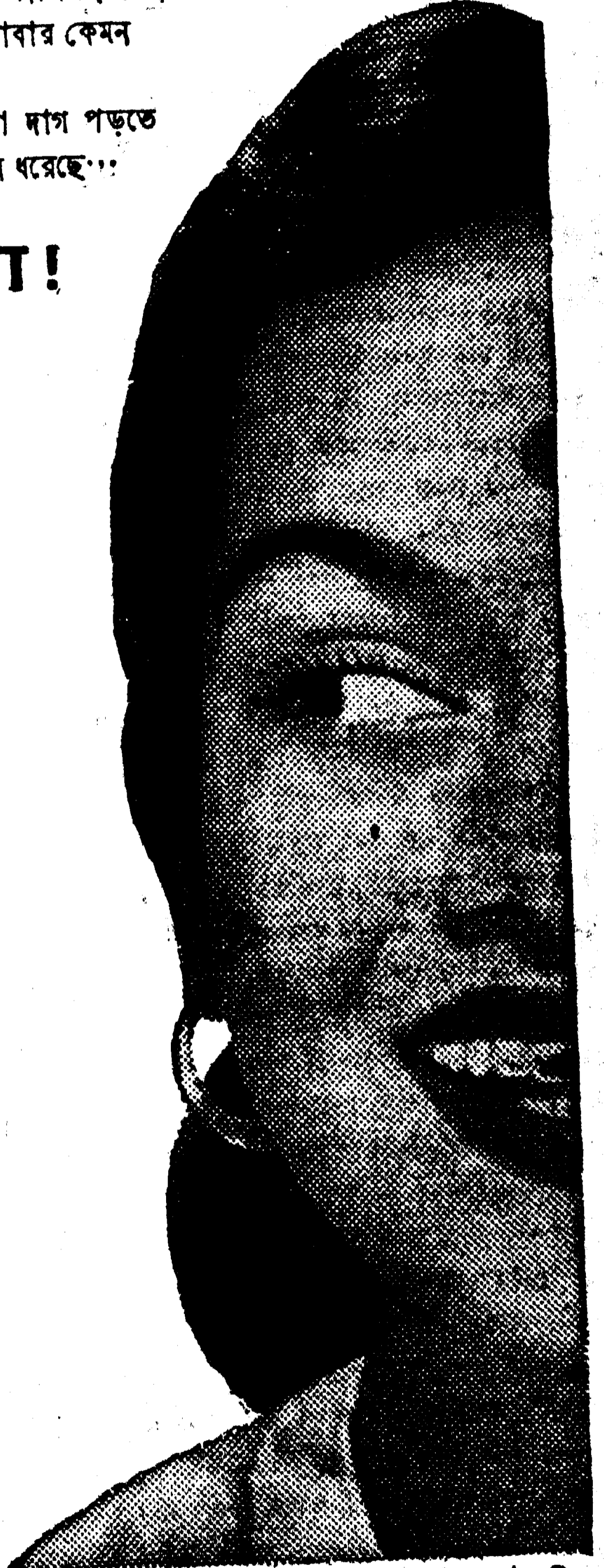
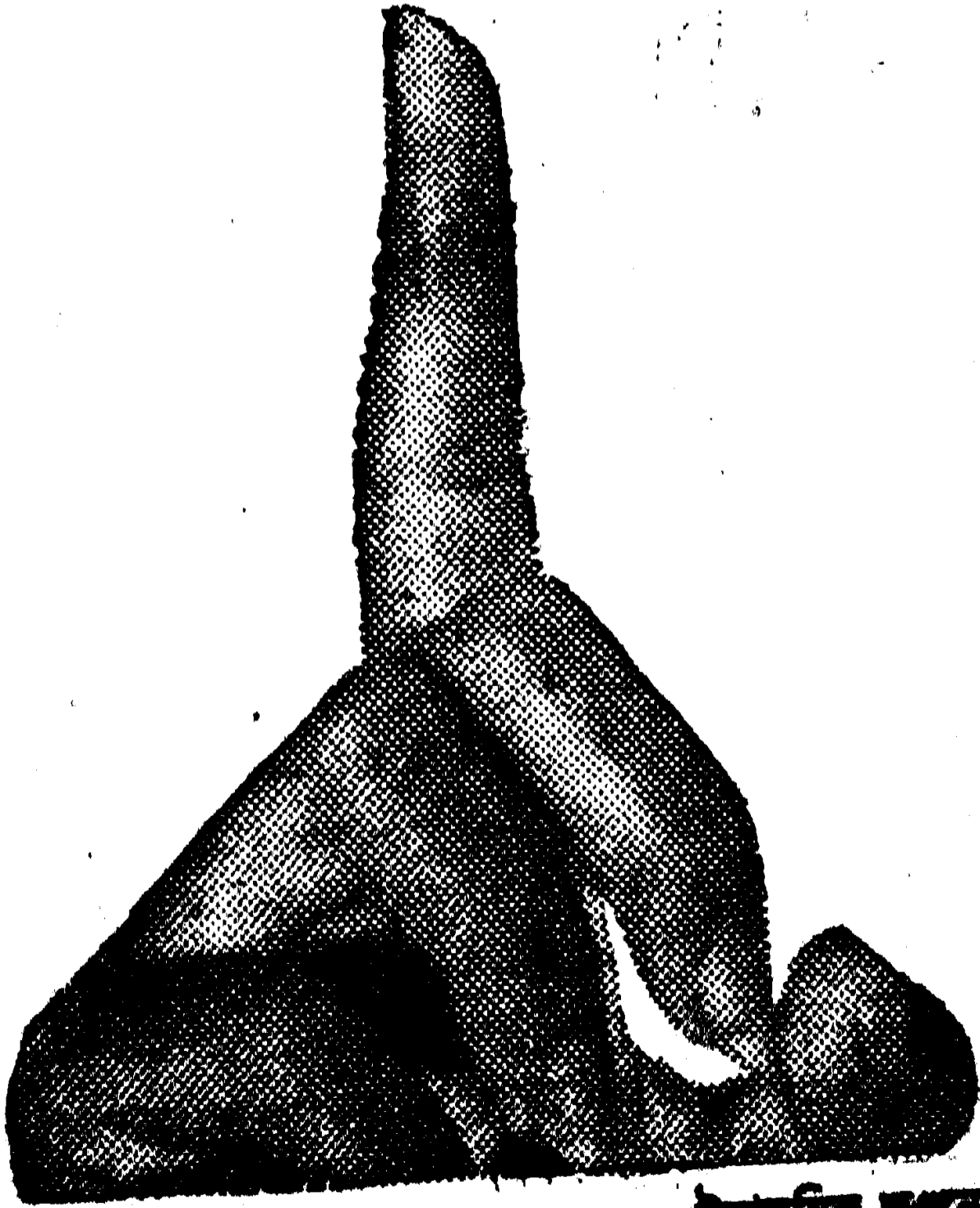
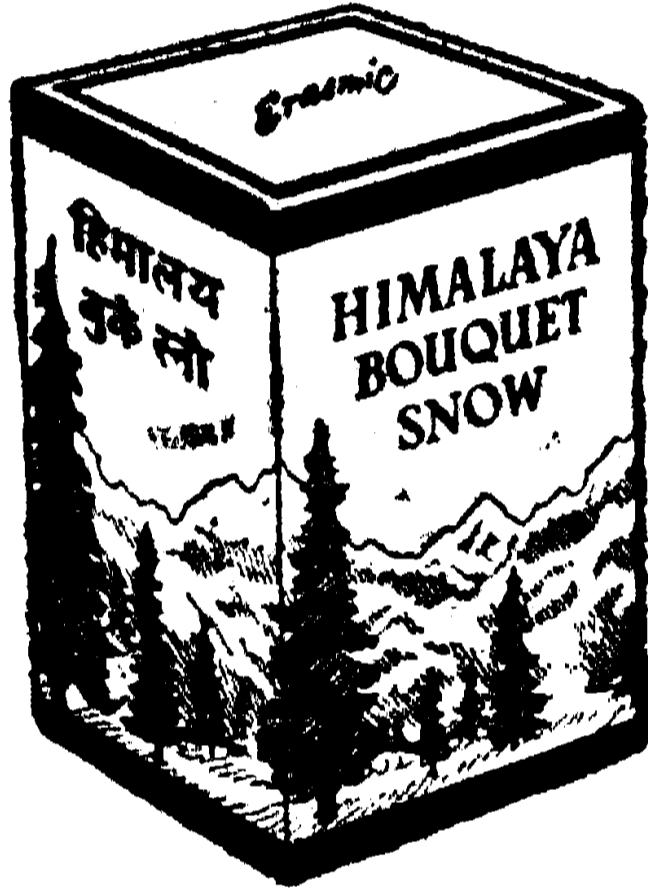
কিন্তু একটা কিছু ত করা দরকার? মনে হল—এ রকম
চূপ করে সহ করা মধো বৈত আছে। সন্ধ্যাটাকে কেমই বা
এমন করে এড়িয়ে চলন? কি করি—পথ খুঁজে পাই না।
মানারকম তাবি। তেবে তেবে ঠিক করলাম—ভারসেটের সঙ্গে
পরামর্শ করা যাক। সে ত সবই জানে। তার কাছে ত লুকান
কিছু নাই। সে-ও ত বুঝিত্তী মেয়ে।

সার্বভাষীতে বাওয়া-আসা শুরু করার পর ভারসেটের সঙ্গে এ
বিষয়ে অবস্ত কোনও কথা হয়নি। আমি সার্বভাষীতে কাজকর্ম করা
ছাড়া বেশীর ভাগই চূপচাপ ঘেনে থাকতাম, এবং ভারসেটও ওদিক
দিকে কোনও কথা তোলেনি। ভারসেট ত সবই জানে, তাই
এদিক-ওদিক পাঁচ রকম-বাজে কথা বলে আমার মানসিক অশান্তিটা
ভারসেটের কাছে চাপা দেওয়ারও কোনও চেষ্টা আমি করিনি। বরং
ভারসেটের কাছে একটা লজ্জাই বোধ করতাম—এত বড় ব্যাপার
ভারসেট স্বচক্ষে দেখল অথচ আমি চূপচাপ করে ঘেন নির্বিবাদে
ঘর-সংসার করে যাচ্ছি, ভারসেট আমাকে ভাবে কি। তাই বখন
ঠিক করলাম—ভারসেটের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করা যাক—কথাটা

আপনার রূপ লাভন্য আপনারই হাতে!

মুখটিকে অকারণ বোদে—খুলোর কালো বা নষ্ট হতে
সেন কেন? চেহারার লাভন্যতা রক্ষার ভার হিমালয় বুকো স্নো ওপরই
ছেড়ে দিন—তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি হিমালয়
বুকো স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কাস্তি ধীরে ধীরে আবার কেমন
ফিরে আসছে! ক্রান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে!
হিমালয় বুকো স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ বা দাগ পড়তে
দেবে না। নিজের চেহারায় দেখুন...লাভন্যতা এনে ধরেছে...:

হিমালয় বুকো স্নো!



চারিদিক থেকে বেশ সুস্থিসহিত বলে মনে হল এবং মনও যোল আনা মার দিল।

ভায়লেটের কাছে কথাটা জুললাম, আমার নিয়মিত সার্কারী বাতাসে মুক্ত করার দিন ২০।২৫ পরে একদিন সকালবেলা বাতাসটা আন্দাজ। যেমি দেখার পূর্ব তখন শেষ হয়েছে। ভায়লেট 'চারের সঙ্গে কিছু স্থায় স্টান্ডাইট সাজিয়ে আমার টেবিলে বসল।

বললাম, ভায়লেট! তোমার সঙ্গে একটা বিষয় আলোচনা করতে চাই।

বলল, বলুন।

একটু চূপ করে থেকে বললাম, তুমিই ত সবই জান—কি বিষয় আলোচনা করতে চাই, সহজেই বুঝতে পারছ?

ভায়লেট একটু চূপ করে বইল। তারপর বলল, হ্যাঁ।

তখালাম, বলত—এখন আমার কি করা উচিত?

আবার একটু চূপ করে বইল। তারপর একটু বেন ঠোঁট চেপে বলল, আমি ভেবেছিলাম—আপনার অস্থির মধ্য দিয়ে আপনার মনুষ্যতার মিলন হয়ে গেছে।

কথাটা শুনে মনটা বিরক্ত হল। বললাম, কিসের মিলন? বা বচনকে দেখেছি তারপর কি স্বামিনীর মধ্যে মিলন হওয়া সম্ভব?

সহজ ভাবেই বলল, কেন হবে না? স্ত্রী যদি অসুস্থ হয়ে থাকে তাহলে কখনো চায়, স্বামীর মন যদি উদার হয়—কেন হবে না?

ভায়লেটের কথার হঠাৎ লালকাকাদের কথা মনে হল। একটু অসুস্থ হয়ে গেলাম। কিন্তু মনে হল—সেখানে ত লুকোচুরির ব্যাপার ছিল না, সবই ছিল স্পষ্ট, সোজা। তাই শেষ পর্যন্ত তদের মিলনও হল সহজ। কিন্তু এখানে—ভাবতে মনটা স্থগার উঠল করে।

সুখে বললাম, ও সব কথা ছেড়ে দাও। আমার স্ত্রী আমার কাছে কখনো চায়নি এবং আমি তত উদারও নই।

সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে উত্তর দিল, তাহলে—'ডিকোন্স'?

বললাম, 'ডিকোন্স' করা কি অত সোজা নাকি?

বলল, তার রাস্তা ঠেতরী করতে হয়।

তখালাম, কি রকম?

বলল, প্রথমত: আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এর পরে একসঙ্গে বাস করা বন্ধ করতে হয়। কখনো করবেন—বা যতটুকু এর পরে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে বাসবাস আপনারই আত্মসম্মানের সঙ্গেও খাপ খায় না।

সত্যিই—কথাটার মন মার দিল।

তখালাম, কি করতে বল?

বলল, 'ডিকোন্স' করার হুটো রাস্তা আছে। হয় এমন কিছু করতে হয়, যাতে আপনার স্ত্রী আপনাকে 'ডিকোন্স' করতে বাধ্য হন কিংবা আপনিও অসুস্থ থেকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে 'ডিকোন্স' আনতে পারেন। প্রথম পথটাই পুরুষোচিত বলে আমার মনে হয়।

তখালাম, তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বলল, আমার কথাটা হচ্ছে—'ডিকোন্স' নেওয়া হাড়া বধন অস্ত্র উপায় মাই, তখন স্ত্রীকে সাধারণের মধ্যে কলভিনী না সাজিয়ে পুরুষের উচিত নিয়মের মাথায়ই কলভের বোঝা দেওয়া।

একটু ভেবে বললাম, তাহলে ত স্ত্রীর সঙ্গে এক বিষয়ে একটা স্পষ্ট কথা বলে নিতে হয়।

বলল, বলতে পারলে ত ভালই হয়। কিন্তু সব সময় ত তা সম্ভব হয় না?

তখালাম, সেখানে কি করা উচিত?

বলল, অনেক কথা বা সুখে বলা যায় না—চিঠিতে বলা যায়।

চিঠিতে বলা যায়—একটু চূপ করে বইলাম। কিন্তু—

তখালাম, এখন তোমার মতে আমার কি করা উচিত—সহজ ভাবে বল।

একটু চূপ করে থেকে মুহূর্তে আমার দিকে চাইল। তারপর বলল, আপনার কি করা উচিত—সোজা পথ। বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে থাকলে, অনেক সময় একটু হুঙ্কিল হয়। আপনার উচিত, বাইরে সকলের কাছে শরীরের মোহাই দিয়ে এক মাসের ছুটি নেওয়া। এবং বর্তমানে আপনার শরীর ও মনের দিক দিয়ে সেটার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে বলে আমার মনে হয়। তারপর ব্লাকপুল কি দূরে কোনও সমুদ্রের ধারে হোটলে গিয়ে থাক।—(একটু চূপ করে থেকে) একা নয়, অল্প একটা মেয়ে নিয়ে স্বামি-স্ত্রীর মতন। এবং সেখান থেকে চিঠিতে স্ত্রীকে সমস্ত কথা জানিয়ে দেওয়া এবং তাকে অসুস্থোধ করা 'ডিকোন্স' নেওয়ার জন্ত।

তখালাম, তিনি যদি না নেন?

বলল, সহজেই নেবেন। কেন না, তিনিও ত'চান সুস্থি। আর এমন অবস্থা করে তোলা যায় যে, 'ডিকোন্স' তাকে নিতেই হবে।

চূপ করে বইলাম। কি বলব ভেবে পেলাম না।

ভায়লেট একটু জোরের সঙ্গে আবার বলল, আপনার এখুনিই এটা করা উচিত। নইলে বা যতটুকু এবং তারপর যে ভাবে আপনি আছেন—পুরুষোচিত একেবারেই নয়।

কিছু না বলে ভায়লেটের কথাটা নিয়ে ভাবছি—হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলাম।

বললাম, ভায়লেট! এখন আমি একটা মেয়ে কোথায় পাই?

আমার সুখের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চূপ করে বইল। তারপর স্ত্রীবা ইবৎ বেকিয়ে মুহূর্তে হেসে বেশ মিষ্টি করে বলল, আমি যাব আপনার সঙ্গে।

মনটা বেন চমকে উঠল। তখালাম, তুমি?

সেই অবস্থায়ই মাথা হুলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

হুজনেই চূপচাপ। আমি ভায়লেটের দিকে একদৃষ্টে আছি চেয়ে। মনটার যে ভায়লেটের প্রতি একটা স্থগার ভাব একেবারেই আসেনি, এমন কথা বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। আমার স্মৃতিতে সে ভাবটা একটু ফুটে উঠেছিল কি? হঠাৎ দেখি—ভায়লেট জীবন গভীর হয়ে গেল। তারপর—বেন একটু ভিত্তর হয়ে বলল—যদি মনে করে থাকেন আমি আপনার প্রেমে পড়ে হাবুচুবু থাকি ত তুল করবেন। প্রেম আমার মনে নাই। তবে—আপনও বসেছি—আপনাকে আমি করণা করি।

এই কল ভিত্তির কথার অপেক্ষা না করে ঘর থেকে চলে গেল।

ডিকোন্সের মাস—সার্কারী থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, মেয়ের ঠাণ্ডা। বাইরে পূর্বের আলো মোটেই ছিল না—হেঁচকা এবং

সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে একটা কনকনে হাওয়া। আমার পাশে অবত ডিসেম্বরের উপযোগী ধুব মোটা ওড়ারকোট ছিল, পলার ছিল উলের গলাবন্ধ, হাতে সস্তানা এবং মাথার ছিল টুপি। তবুও হাতার বেরিয়ে খানিকটা ধুব ক্রতপদে হেঁটে শরীরটাকে গরম করতে হল।

নয়দেখেনে বোড়টি বেশ শান্তিপূর্ণ নিয়মিত রাস্তা। হাতার হুধারে বড় বড় গাছ এবং হাতার হুপাশে বাগানঘেরা বেশ ভাল বাড়ী। মাঝে মাঝে হু'চারখানা মোটর গাড়ী ছাড়া হেঁটে ধুব কম লোকই এ হাতার হাতারাত করে—বড় গাছের নীচে দিগে হুপচাপ আবহাওয়ার এই হাতাটি ধরে হেঁটে বেতে আমার বরাবরই বেশ ভাল লাগে। আমার সাক্ষারী থেকে ওস্ত-হল লেনে বেতে বরাবরই এই রকম। তবে আমার সাক্ষারী থেকে উন্টো দিকে যদি বাই, অর্থাৎ সেল রেলওয়ে ঠেশনের দিকে, তা হলে রেলওয়ে ঠেশনের কাছাকাছি গেলেই দোকান পসার শুরু হয়, লোকজন দেখা যায় এবং ক্রমে হাতাটির চেহারা যায় একেবারে বদলে।

বাই হোক, ক্রতপদে বেশ খানিকটা গিয়ে ধীরে চলতে লাগলাম। তখন আমি আমার বাড়ী করার প্রায় অর্ধেক হাতার এসে গেছি। হাতাঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি প্রায় দেড়টা। ভারসেটের তৈরী হার স্তান হুইট খেয়ে কিনে ছিল না—তাই বোধ হয় এখনই সোজা বাড়ী কিনে বেতে ইচ্ছে চল না। মালিন আমার ভক্ত না; খেয়ে বসে থাকবে? মনে হল—তা থাকুক, তেমন কিনে পার নিশ্চয়ই খেয়ে নেবে।

কিন্তু কি করি? হাতার হাতার ত আর ঘুরে বেড়ান চল না? হঠাৎ চোখে পড়ল—বা পাশে সেই চার্চের পেটটি। হুকলাম তার মধ্যে।

চার্চটির কথা একটু বলি। সাক্ষারী থেকে বাড়ী হাতারাত করতে প্রায় বোজাই এই চার্চটিকে দেখি এক বোজাই মুগ্ধ হই। এত সুন্দর শান্তিপূর্ণ এই চার্চটি। হাতার কটক থেকে অনেকটা পেছিয়ে লাগলুয়ের এই চার্চের বাড়ীখানি—চারিদিকে লম্বা লম্বা পলার গাছে ঢাকা। এখন শীতকাল, তাই গাছে পাতা নাই ধিলেই হয় এক রিক্ত ভাসগুলির বিভিন্ন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে সবুজ-হকিত চার্চের লালবাড়ীখানি একটা ছাবর মতন সহজেই চোখে পড়ল।

হুকলাম। বেশ ভাল কাঁকর-বাধান একটা হাতা চার্চটিকে চারিদিকে ঘিরে রয়েছে এবং তার পাশে পাশে প্রায়শে অনেক দূর পর্যন্ত পলার গাছ ছড়ান—মনে হল, এককালে সাক্ষিরে এগুলিকে লাগান হয়েছিল। তারই তলার পরিষ্কার সবুজ ঘাসের উপর চারিদিকে ছড়ান কবর বাধান, শুধু পাখরে নানা নাম লেখা।

দূর চার্চটির পিছন দিকে গেলাম—চোখ বেশ জুড়িয়ে গেল। পিছনে ধুব করছে কাঁকা, কোনও বসতি নেই। চার্চের সীমানা ছাড়িয়ে ঘন সবুজ মাঠ, তরলারিত হয়ে নেমে গিয়েছে অনেক দূরে। চার্চের পিছনের সীমানার এক কোণে একটা উইলো গাছ পাড়িয়ে আছে। এই গাছটির দিকে খানিকজন হইলার চেয়ে। বৃন্দ। একেবারে গাছগুলির মধ্যে উইলো গাছ টিরকালই আমাকে রুঙ করেছে। যদিও এখন গাছে পাতা নাই—তবু পাড়িয়ে থাকার কি ভঙ্গি। ক্রমে এগিয়ে গিয়ে বসলাম—উইলো গাছের তলার

গাছ ঘাসের উপর, তখনও ততদূর পর্যন্ত কবরগুলি এসে পৌছয়নি। বেখানুর আকাশের নীচে হুপচাপ নিস্তর চারিধার, জনমানব নাই।

মনটাকে সহজেই পেয়ে বসল ভারসেটের কথাগুলি। কিন্তু মন ত ভারসেটের কথায় একেবারেই সার দিল না। এই দূর বিদেশে মালিনের সঙ্গে একটা ডিভোর্স ব্যাপারে জড়তে মন আপনা থেকেই সঙ্কুচিত হল। তারপর ভারসেটের প্রস্তাবিত পথ—হিঃ হিঃ বড়ই কুংসিত। ভারসেট মেয়েটা কি রকম! সুন্দর কুংসিতের সীমানা বেশ হারিয়ে ফেলেছে। ভারসেটের প্রতি একটা ঘুণা যে ইতিমধ্যে মনে জন্মে উঠেছে—টের পেতে দেবী হল না। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে হল—এদেশের মেয়েরা সবই ঐ ধরণের। মনে হল—হাজার হলেও এরা বিদেশিনী, এসের মনের গঠন আলাদা, আমরা চিনি না, চিনতে পারি না। এই সত্যটি চার্চে বসে সেদিন বেশ হঠাৎ নকুন করে আবিষ্কার করলাম।

কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা—সহজেই মন সেই দিকে গেল দুয়েটা। সুখা! সমস্ত প্রাণ জুড়ে বসল সুখা; হার হার। তার প্রতি কি আবিচারই না করেছি—তার প্রায়শ্চিত্ত আজ আমাকে করতে হচ্ছে। আকাশের দিকে চেয়ে ভাবলাম—এ প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণাহুতি হবে কবে? আর যে আমি সহ করতে পারছি না।

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



প্রতি প্যাকেট
২৪ টি
বড় আকারের

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সঞ্চয় রক্ষা করিতে

- কলো প্রস্তুত
- স্ট্রিমে সৈঁকা
- মেনিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী

কলিকতা - ২৯

বুলা ! বহুদিন আগে তুমি একটা চিঠিতে আমাকে লিখেছিলে—আমি বিলেত চলে আসার পর সুখা খাটের বিছানার আর শোরনি, সাজিয়ে বেধেছিল আমার কিরে বাওয়ার জন্ত, মেয়ের তুয়ে তুয়েই বিসম্মত দিল প্রাণ। কথাটা আমি কোনও দিনই তুলিনি—টিরফাল আমার মর্মে লেগে আছে। হঠাৎ মনে হল—সেই বিছানার তুয়ে কি হবে আমার প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণাঙ্গতি? কথাটার বেন মন বোল আনা সার দিল—দেশে কিরে বাই, সেই ভাল, এখন দেশে কিরে বাই। বা কিছু টাকাকড়ি আছে ওহিয়ে নিয়ে দেশে কিরে বাই। সেখানে সুখার স্মৃতির মধ্যে বাকী জীবনটা দিই বিলিয়ে—সুখা-নার্সিং-হোম। ভাবতে ভাবতে প্রায় তুয়ে পড়েছিলাম। উঠে বসলাম।

আমার ভবিষ্যৎ বেন পরিকার হয়ে গেল—সেই কলকাতার সুখা-নার্সিং-হোম। কোনও দিকে মনে কোনও বিধা নাই দন্দ নাই।

হঠাৎ বেন মনে হল—দারুণ শীতে আমি প্রায় জমে উঠেছি। শড়ির দিকে চাইলাম—এ কি। আড়াইটে বেজে গেছে। আর ত বসে থাকা চলে না—এ শীতে বসে থাকা সম্ভবও নয়। উঠে দাঁড়লাম। এই শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্ত ক্রতপদে বাড়ী বাওয়া দরকার।

মালিন।—হঠাৎ মনে এল। বুলা। অস্বীকার বরব না, তার কথা ভাবতেই মনটা কাতর হল—তাকে কেলে চিরদিনের জন্ত দেশে চলে যাব। মনকে বোঝালাম—এ কি তোমার দুর্বলতা, যে অবিস্বাসিনী তার জন্ত এখনও এত দরদ। বোঝালাম—আমি চলে গেলে সে ত ভালই থাকবে। তার টাকাকড়ির অভাব নাই। ক্রয়কপূলে ওদের বা কিছু ছিল, সে সব বিক্রী করার দরুণ এবং পুয়ে লাজলের বাড়ীখানি বেচে মালিনের হাতে প্রায় ৭ হাজার পাউণ্ড ব্যক্তি জমা আছে। তবে? আর আমি চলে গেলে, ডিকোন্সও তার লক্ষ্য হবে এক পরে রোল্যাও—আর পাড়িয়ে থাকা চললনা। প্রায় দুটে বাড়ীর দিকে এগুতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে কুমাণা জমা হতে শুরু করেছিল। বুলা। এদেশের শীতকালের কুমাণা—সে যে কি ব্যাপার বোধ হয় ঠিক ধারণা নাই। বখন খুব গাঢ় হর পাশের মাহুব পর্যন্ত চেনা যায় না। আমি চার্চের গেটের কাছে এসে বেশ বুকতে পারলাম—কুমাণা ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে। নরদেনডেন বোর্ডের এমিক ওমিক চেয়ে দেখলাম—বেশীদূর দেখা যাচ্ছে না। একেই এ রাত্তার বেশী লোকজন থাকে না, বিশেষত এ অবস্থার কেউ কোথাও নেই। বাড়ীর দিকে ক্রতপদে চলতে লাগলাম।

ছুপা এগিয়েই পিছনে খটখট পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম—ক্রমে মনে হল কে বেন ছুটে আসছে। পাড়িয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখি একটি মহিলা—ক্রত আসছে আমার দিকে। চাইলাম—একটু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম—মালিন।

আমার কাছে এসে, আমার বাহুখানি ধরে হাঁকতে হাঁকতে শুধাল, কোথায় ছিলে? আমি স্মৃতি খুঁজে বেড়াছি।

বললাম, এই ত বাড়ী যাছি।

পাড়িয়ে একটু বেস দর নিয়ে, বলল, তোমার দেবী দেখে টেলিকোন করেছিলাম। ক্রতপদে—মনেকরণ—চলে গেছে। সাজিয়ে এসে না।

বললাম, হুঃখিত। একটু দেবী হয়ে গেল।

বলল, তোমার শরীর যে ভাল নয়। ক্রমে অস্থির হয়ে বেড়িয়ে পড়লাম।

আবার চূপ করল—বেশী কথা বেন একসঙ্গে বলতে পারে না।

শুধালাম, তা এদিকে কোথা থেকে আসছিলে?

বলল, সার্জারী থেকে—বদি কিরে গিয়ে থাক।

বললাম, এই একটু বেড়াছিলাম—চল এইবার বাড়ী।

একটু চূপ করে থেকে বলল, একটু কোথাও বসি—বুকটার মধ্যে বেমন করছে।

মালিনকে নিয়ে গিয়ে বসলাম—চার্চের গেটের একটা স্তম্ভের নীচে বাধান জায়গায়।

সুখা-নার্সিং-হোম—মনটাকে বেন পেয়ে বসল। মনে হল—তার মধ্যেই পার হুক্তি। কথাটা নিয়ে ক'দিন অনবরত ভাবতে লাগলাম। কথাটার মধ্যে আমার বর্তমান মানসিক পরিস্থিতিতে আমি বেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেলাম।

কিন্তু মালিন। না—না, তার কাছ থেকে কাপুকবের মতম লুকিয়ে পালান না। তাকে পরিকার সব বলে যাব এবং বদি তার তারও ব্যবস্থা কিছু কিছু করে গিয়ে যাব। কি ভাবে কি বলব—ভাবলাম, আগে নিজের দিকটা সব ওহিয়ে নিই, তারপর ভেবে দেখা যাবে। সেদিন চার্চ থেকে কিরে এসে মালিনের হাটটি আবার পরীক্ষা করে দেখেছিলাম—বাইরের পরীক্ষার বিশেষ কিছু ধোব না পেলোও, খুব সবল বলে মনে হয়নি।

ভায়লেটের কাছে আমার দেশে কিরে বাওয়ার সংকল্পের কথা অবস্ত কিছুই বলিনি। গভীর ভাবে ভায়লেটের সঙ্গে ব্যবহার করতাম এবং এইটেই তাকে বুকতে দিতে চেয়েছিলাম—মালিনের ব্যাপারটা আমি তুলিনি এবং সে বিষয় বা ব্যবস্থা করার আমি একাই করব, কারো পরামর্শ আমি চাই না। ভায়লেট কি বুকেছিল আমি জানি না, সেও চূপ করে গিয়েছিল, ওমিক দিবে আর কোনও কথা জোলেনি।

এই ভাবে দিন দশ বারো কাটার পর ভায়লেট একদিন আমাকে বলল, আপনার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা আছে। কথাটা বলল সকাল বেলায়ই বোগী দেখার পর।

শুধালাম, কি?

বলল, অবস্ত এসব কথা আমার বলা উচিত কি না জানি না। তবে আপনার ছুন খাই, আপনার ভাল-মন্দ না ভেবে পারি না।

শুধালাম, কথাটা কি?

একটু চূপ করে থেকে বলল, মিসেস চাউকুরী আপনাকে ছেড়ে চলে বাওয়ার ব্যবস্থা করছেন।

বদিও এসব নিয়ে ভায়লেটের সঙ্গে আর আলোচনা করব না ঠিক করেছিলাম, তবুও কৌতূহল হল।

শুধালাম, কি বকব?

বলল, মিসেস চাউকুরীর ত ব্যাভে নিজের নামে প্রায় ৭ হাজার পাউণ্ড আছে। তার মধ্যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড তিনি ব্যাভ থেকে তুলে ইতিমধ্যেই গরিয়ে দিয়েছেন।

অবাক হলাম।

তথালাম, তা তুমি কি করে জানলে ?

বলল, অকস্মিক এ সব ব্যাকের গোপন কথা—তারা বাইরে প্রকাশ করে না। তবুও—

একটু জোরের সঙ্গে বললাম, বল সব।

একটু চূপ করে থেকে বলল—ব্যাংকে আমার একটি বহু কাজ করে, তার কাছ থেকে শুনেছি।

তথালাম, কে বহু ?

তৎক্ষণাৎ বলল, কমা করবেন—নাম আমি করব না।

বললাম, সব ব্যাংকে কথা।

আবার একটু ঘাড় বেঁকিয়ে চাপাহাসি মাখান চোখ তুলে আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, ব্যাংকে কথা যে নয়, নিজেকে প্রের করলেই টের পাবেন।

তথালাম, তার মানে ?

বলল, ব্যাংকে যে তাঁর সাত হাজার পাউণ্ড আছে আমি জানলাম কি করে—আপনি শু কখনও দিন আমাকে বলেন নি ?

একটু চূপ করে রইলাম। এবার সোজা আমার দিকে চেয়ে ঠোটে বহু হাসি মাখিয়ে বলল, আর তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

হঠাৎ বাস হল। একটু ব্যাকের সঙ্গে বললাম, তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করব না করব সে আমি জানি, সে বিষয়ে কারও পরামর্শ আমি চাইনি।

উঠে বীড়াল। গভীর ভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল,

ভাল করতে গেলে বক হয়। আপনারই ভালর ভক্ত বলেছিলাম—আবার কি। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সোজা বাড়ী ফিরে এলাম। আজই মার্গিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে কেলতে হবে—মাসিক এ অবস্থা অসহ্য।

গভীর ভাবে লাক খেতে খেতে কোনও কথা হয়নি। মার্গিনও চূপচাপই ছিল—বিশেষ কিছু বলেনি। ইলানীং আমার এই গভীর ধরণে মার্গিন নিজেকে প্রায় গুটিয়েই রাখত—যেন এড়িয়ে চলত, পাছে কোনও সংঘাত হয়।

লাক খাওয়া শেষ হল। গভীর ভাবে উঠে গিয়ে বললাম বসবার ঘরে।

মার্গিন এসে আঙনটা ঠিক করে দিতে লাগল। বললাম, লীনা ! তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে।

আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল এখনই বলবে ? এখন একটু বিশ্রাম করে নাও না ?

বললাম, না—এখনই।

মার্গিন বসল পালের একটা কোঁচে। বলল, বল।

বললাম, ব্যাংকে তোমার সাত হাজার পাউণ্ড আছে ?

চূপ করে রইল।

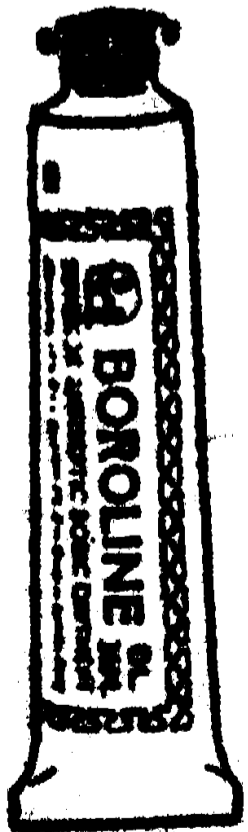
তথালাম, সে টাকাটা কি ঠিক আছে ?

চূপ করেই রইল।

তথালাম, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ?

গ্রীষ্ম দিনে-ও স্নিগ্ধ সজীবতা

গ্রীষ্মের খরতাপে ক্ষেদাক্ত আবহাওয়ার আপনি যখন বিরক্ত তখন আপনার একান্ত প্রয়োজন বোরোলিনের মতো মিষ্টি আর মিষ্টি ক্রেম স্ক্রীম। ল্যানোলিন-বৃত্ত বোরোলিন স্ক্রীমের গভীরের সমস্ত মালিত্ব দূর করে আপনার দ্বাত্তাবিক সৌন্দর্য ব্যক্তিগত আপনার স্বক-কে মিষ্টি ও সজীব করে তুলবে।



বোরোলিন

পরম প্রসাধন

প্রস্তুতকারক :

ভি, ভি, কার্বাসিউটিক্যাল্‌স্‌ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩



বলল, ওসব কথা আর একদিন হবে—আজ থাক।

একটু উত্তেজিত ভাবে বললাম, না—আজই—আর আমি চেপে রাখতে চাই না।

আবার চুপ করে গেল।

বললাম, চুপ করে আছ কেন? কথার জবাব দাও।

তুমি, কি জানতে চাও?

বললাম, তোমার টাকা কি ঠিক আছে—না তার মধ্যে কিছু টাকা তুলে নিরেছ?

পত্তীরভাবে বলল, তুলে নিরেছি।

প্রশ্ন করলাম, কত?

বলল, পাঁচ হাজার পাউণ্ড।

তুমি, কেন?

একটু চুপ করে থেকে কাতর ভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, বিকো! আমার একান্ত অস্থবোধ—

—ওসব কথা এখন শুনতে দেও না। একটু চীৎকার করে বললাম, কেন শুনতে চাইব না?

দ্বী হয়ে আমার সংসারে থাকবে আর ভিতরে ভিতরে তোমার জন্ত একটা জীবন চলবে—স্বামী হই আমি তা মুখ বুজে সহ করব বসতে চাও?

তারি পলায় বলল, বিকো! দোহাই তোমার—আমাকে অবিধাস করো না।

আমি যেন ক্রমেই উত্তেজিত হইলাম। বললাম, তোমার ওসব কথার আর আমি কুলব না। নিজের চোখে অবিধাস করতে পারি না।

আমি কি দেখিনি?

হঠাৎ চুপ করে গেলাম। একটু পরে পত্তীর ভাবে বললাম, অনেক সহ করেছি। আর আমি সহ করতে রাজী নই—কোনও স্বামী করে না।

মার্লিন চুপ করে রইল—একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে। দেখলাম—সেই বিয়র্ক চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছে। একটু চুপ করে থেকে লাভ পলায়ই বললাম, আমার কথার জবাব দাও লীনা।

চুপ করেই রইল।

আবার প্রশ্ন করলাম, পাঁচ হাজার পাউণ্ড কেন তুলে নিরেছ, কি করেছ সে টাকা?

পত্তীর ভাবে বলল, সে কথা আমি তোমাকে বলতে পারি না।

রাগ হল। বললাম, কেন? কেন? কেন বলতে পার না?

চুপ করে রইল।

একটু চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলাম, কথার জবাব দাও।

উত্তর দিল, এ কথার জবাব নাই।

রাগ বাড়ল। একটু বাজবরে বললাম, বুঝেছি—নিজের পোশাক লীনার কুৎসিত কাহিনী আমাকে বলতে লজ্জা পাও—না?

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বীর পদক্ষেপে চলতে লাগল—ঘর থেকে বেরিয়ে বাগবার জন্ত। আমার রাগ আরও বাড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললাম, দাঁড়াও।

ক্রতপনে কাছে গিয়ে হুটো কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, বলতেই পার না—

চোখ দুটো যেন হঠাৎ বলে উঠল।

বলল, বলব না।

রাগ ভীষণ বাড়ল—মার্লিনের এরকম স্পষ্ট বিক্রোহী ধরণ এর পূর্বে ত কখনও দেখিনি। হুটো কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, বলবে না কেন শুনি? অবিধাসিনী!

বাকি কথা যেন পলায় আটকে গেল। ওঃ, বলে একটা নিদারুণ কাতরোক্তি করে মার্লিন যেন ভেঙ্গে পড়ে গেল সেইখানেই মেরে। তারপর সে কি করল, সমস্ত শরীর যেন কান্নার আবেগে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম নিচের দিকে—ভেঙ্গে-পড়া মার্লিনের দেহখানির পানে। কি মনে হল জানি না, হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে গারে ওতারকোট চাপিয়ে টুপি নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলাম ক্রতপনে।

হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—চার্চের কাছাকাছি আসতেই টের পেলাম মনটা একটা গানিতে উঠেছে ভরে। যেনে কি কাণ্ডই না করলাম, এ ত কখনও ভাবিনি! সহজ ভাবে মার্লিনকে সমস্ত কথা বলে, ব্যাপারটা পরিষ্কার করে মার্লিনের কাছ থেকে নেব বিদায়—এই ত ছিল সংকল্প। কিন্তু একি হল—

অসম্ভব ভাবে চার্চের গেটের মধ্যে ঢুকলাম—গিয়ে বসলাম একটা বাঁধান কবরের উপরে। মনটা মার্লিনকে নিয়ে ভরে উঠল। মেরে পড়ে থাকা তার আকুল কান্নার ছবিটা মনটাকে পেয়ে বসল। বুলা! বলতে বিধা করব না, তার প্রতি একটা অক্ষুণ্ণ কক্ষণ মনটা হল আকুল—বেগা। বাই করে থাকুক, তবুও সে মার্লিন। সেই আমার কত দিনের কত স্মৃতি-জড়ানো মার্লিন। সেই আমার বিদেশিনী—যার জন্ত সিকুপারে এসেছিলাম। সহজেই বুঝতে পারলাম—এখনও আমার মর্মে মর্মে তাকে কতখানি ভালবাসি।

বেদীকণ বসে চলল না—দারুণ শীত, বরফ পড়তে শুরু হয়েছে। হুড়িতে দেখলাম—ওটে বাজে, অন্ধকার হয়ে এলো। বাড়ী কিরে বাগবার জন্ত যেন মন অস্থির হল। ভাবলার—এত দূর এসেছি, একবার সাক্ষারীটা ঘুরে কাজ সেরেই বাই।

পেলাম সাক্ষারীতে। ভারসেটের সঙ্গে দেখা হওয়ার্তে তত অভিমানের পর মুখ ঘুরিয়ে নিলাম—ভারসেটের মুখের দিকে চাইতে ইচ্ছে করল না।

ভারসেট শুধু শুধাল, দারুণ ঠাণ্ডা। আপনাকে এক পেরালা লা দিই?

শুধু বললাম, দাও।

তা খেতে খেতে শুধাল, জরুরী যোগী কেউ আছে কি?

আজ আমার শরীরটা তত ভাল নেই। যোগী দেখতে ইচ্ছে করছে না।

ভারসেট বলল, এখন পর্যন্ত যোগী বিশেষ কেউ আসেনি। হুজব এসেছে—হুটী জরুরী বলে মনে হয়।

বললাম, থাক।

যোগী দেখা দেব করে বখন বাড়ীর দিকে হওয়ার্তা হলাম—

উপরে হুড়িতে দেখি আর সাতক এই।

অন্ধকার রাত্রি—দারুণ শীত, চারিদিকে বরফ পড়ছে। থেকে থেকে এক একটা শনশনে হাওয়া অন্তস্তপ পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। সার্জারী ছেড়ে ক্রতপদে ছুটলাম বাড়ীর দিকে—কোন বকমে বাড়ী গিয়ে দরজা বন্ধ করতে পারলে বেন বাঁচি। চলতে চলতে আমার গায়ের ওভারকোট, মাথার টুপি ক্রমে বরফ-পড়া সাদা সাদা বরফে ঢেকে বেতে লাগল।

এলাম বাড়ী। সদর খুলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বেন হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম। এমন রাতে বাইরেটাকে জীবন থেকে বত শীত দূর করা যায়, ততই মজল—বাইরে বেন একটা অমজলের আবহাওয়া। তাড়াতাড়ি টুপি ও ওভারকোটটা খুলে বেড়ে সিঁড়ির কাছে টাঙিয়ে রেখে ছুটলাম বসবার ঘরে—আগনের ধারে বসে শরীরটাকে একটু তাজা করার জন্ত। এমন রাতে মালিনও নিশ্চয়ই আগনের ধারে আছে বসে—মাগুনটাকে খুঁচিয়ে প্রথর করে রাখছে আমারই জন্ত।

সার্জারীতে এবং পথে আসতে আসতে অনেক কথা ভেবেছি। কিরে গিয়ে মালিনের হাত দু'টি ঘরে মালিনের কাছে কমা চাইব। বলব—লীনা! ছুপুরে বা খণ্ডে তার জন্ত আমি হুঃখিত। বলব—বেশ! তুমি যদি তোমার জীবনের একটা দিক গোপন রাখতে চাও, তাই বেশ, কিন্তু এভাবে আমি-স্ত্রীর ঘরকরা চলে না। বলব—তাই আমি ঠিক করেছি আমাদের আলাদা থাকাই ভাল,

আমি দেশে কিরে বাব, তারপর তুমি তোমার জীবনটা মনের হস্তন করে ওছিরে নিও, আমি বাণা হব না, ইত্যাদি ইত্যাদি—কত কথাই না ভেবেছি।

বসবার ঘরে ডাকলাম—কিন্তু কই মালিন ত নাই? এ কি—মাগুনটা বলে বলে নিবে গেছে। মালিন কোথায়! উপরে শোবার ঘরে বোধ হয় শুয়ে পড়েছে—শরীর বোধ হয় খারাপ বোধ করছে।


ঘর পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরে শোবার ঘরে গেলাম—কিন্তু কই, মালিন ত নাই। বিছানা যেমন পাতা ছিল তেমনি আছে—বিছানার ত শোয় নি। শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে ডাকলাম লীনা! লীনা! কোন জবাব নাই।

হঠাৎ মনটা চমকে উঠল—তবে কি? ছুটে সমস্ত ঘর দেখলাম—কোথাও মালিন নাই। নীচে গিয়ে খাবার ঘর বায়ানবর সমস্ত খুঁজলাম—মালিন নাই!

বাড়ীর মাঝখানে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকলাম লীনা! লীনা! লীনা! কোনও উত্তর নাই।

কেন জানি না, ছুটে সদর দরজা খুলে বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে ডাকলাম—লীনা! লীনা! একটা শনশনে হাওয়া তীব্র কশাঘাতে আমার মুখের উপর ঘিয়ে বয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]



নিয়মিত কুমারেশ সেবনে জিভার মুহু থাকে, অঙ্গীর্ণ, অক্ষুধা, পে.ফাঁপা প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না, খিটখিটে মেজাজ, সহজে ক্রান্তি প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয় না।

কুমারেশ

ও. আর. সি. এল. লিঃ
কুমারেশ হাউস
মালিখা, হাওড়া



বিবাহ-সাধনা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৬শতীক্রে মজুমদার

সতীত্ব

দেহের, ভাবময় জীবনের ও আত্মার প্রগাঢ় সঞ্চয় দিয়ে পতি-পত্নী পরম্পরে যুক্ত। এই পরম ঘনিষ্ঠ সঞ্চয়টির কথা বিচার করতে গেলেই দুটি কথা আপনা-আপনি মনে উদয় হয়। সে কথা দুটি পবিত্রতা ও সতীত্ব। এ দুটি শব্দকে একই সংজ্ঞার দুটি রূপ বলে আমার মনে হয়। পবিত্রতার অর্থটি ব্যাপক। সতীত্ব শব্দটা উচ্চারণ করলেই রতি-সঞ্চয় সংক্রমে মনে ইঙ্গিত দিয়ে যায়। পবিত্রতা ও সতীত্ব পরম্পরের অঙ্গ। স্ত্রীতি মেয়েদের স্বাভাবিক গুণ।

স্ত্রীতির পুষ্টিতে আনন্দ। আনন্দ সঞ্চয়কর। শুদ্ধস্বপ্নের ফল পবিত্রতা। কামের ক্ষেত্রে যে পবিত্রতার ব্যবহার তাকেই আমরা সতীত্ব বলে জানি। সতীত্ব জির বোনপ্রেমের মহত্ব রক্ষা করা অসম্ভব কথা। যে মানবসমাজে সতীত্বের উচিত মূল্যবোধ নেই সে-সমাজে আপকাত্যের নিরন্তর সোপানে নেমে গেছে। শুদ্ধস্বপ্নই সতীত্বের ভূমি। বোনপ্রমে সতীত্বের মতো আর কোন গুরু উপাদান নেই। এ কথা ক্রম সত্য যে, পবিত্রতা প্রেমের একমাত্র ভিত্তি। পবিত্র না হলে প্রেমিক হওয়া অসম্ভব কথা।

সতীত্ব ও কঠোরব্রতী সন্ন্যাসিনীর বোননিরোধ কি একই বস্তু? চর্বাঙ্গিতা অর্থাৎ সংযম দুটিরই সমান অঙ্গ। বৈরাগীর নিরোধ উদ্বেগমূলক। তার পক্ষে তার লক্ষ্যসাধন করার নানা উপায়ের মধ্যে নিরোধ একটি ভিত্তিগত উপায়। সে লক্ষ্যটি তার চর্চার পরিধির বাহিরে অবস্থিত। সতীত্ব সতীত্ব চর্চার অঙ্গ, লক্ষ্য সেই অঙ্গটিতেই নিহিত। সতীত্ব তাই একাধারে ভোগ এবং সংযম দিয়ে গঠিত। সতীত্ব একটা রাজ্যের মতো, বা সংযম পরিমিত ভোগ দিয়ে জয় করতে হয়। এই পরিমিত দিয়েই সতীত্ব মহিমা। এডওয়ার্ড কার্পেটের কথাটি চমৎকার যে সেই মানুষই জীবনের প্রভু যে তার দেহের সকল মূল কাহ্ননাগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে তাদের অত্যন্ত হুস্পাণ্ড ও গন্ধবর্ণীভ্য কুসুম্যে পরিণত করতে পারে। প্রকৃত সতীত্ব কামনার সেই বিকশিত, ভাবময় কুসুম। প্রাচীন গ্রীক পদার্থিক প্রেতীর বচন আছে যে ভালোবাসা পাছের মতো; শিকড় তার মাটিতে, কিন্তু ফুলগুলি তার সূর্যমুখী হয়ে থাকে। সতীত্ব ভালোবাসা সেই সূর্যমুখী ফুল। মেহে তার মূল, সেটি মেহ থেকেই প্রাপ্য সঞ্চয় করে, কিন্তু ফুল হয়ে বিকশিত হয় উর্ধ্ব এক লোকে। সতীত্ব সঞ্চয়টির অঙ্গ কিন্তু বৈরাগ্যের অঙ্গ নয়। সেটি কামের দাবীর মতো বৃহত্তর জীবনের অঙ্গ সকল দাবীকে স্বীকার করে

নেয়। সতীত্ব তাকেই বলি বা ভালোবাসার গ্রহি দিয়ে, মেহ ও আত্মাকে একসঙ্গে যুক্ত করে রাখে।

পবিত্রতা নারীচরিত্রের মূল কথা। যে নারী নিজের এই শুদ্ধস্বপ্নটি উপলব্ধি করতে পেরেছে সে কখনো এমন অবস্থায় পড়ে না, যাতে তার এই গুণটিকে বলি দিতে হয়। মূল বস্তু স্ত্রীতির বিকৃতি অপবিত্রতার কারণ। পবিত্র যে সে অপবিত্রতাকে গ্রহণ করতে একান্ত অসমর্থ। এমন নারীর কাম বিতন্ড। বিতন্ড কাম তাই বাকে দমন করবার অর্থবা তা থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজন হয় না। সৌন্দর্য ও আনন্দের অহুভবে সেটিকে তুই করা উচিত। কিন্তু মেহের স্ফূটার তাড়নার, কপিক তৃপ্তির অঙ্গ, বিকৃত কোন যসোপভোগের অঙ্গ বা সাংসারিক কোন লাভ বা সুবিধার অঙ্গ তুই করা উচিত নয়। বিতন্ড কাম তাই যার ভালোবাসার অঙ্গ প্রগাঢ় মিলন উদ্দেশ্য।

কামের ভূমিতেই সতীত্বের লীলা। তাতে কোন দ্বন্দ্ব নেই; কোন প্রয়াসের সহিতও তার সঞ্চয় নেই। রতিজীবনে আদর্শবাহী না হলে সতীত্বের উৎসাহ জাগে না। কামকে স্বীকার করে না নিলে তাকে জয় করাও যায় না। পত্নীর সাহচর্য না থাকলে পতি কামজরী হতে পারে না। সতীত্ব শুধু নারীবই ভূষণ নয়, পুরুষেরও ভূষণ। নারীই কেবল পুরুষকে এ ঐশ্বর্যে ভূষিত করতে পারে। এ গুরুতর কথাগুলির অর্থ আমরা পরে ভালো করে বুঝতে পারবো।

রতির দ্বারাই সতীত্ব ক্রিয়ামূল হয়। সতীত্ব একাধারে মিতাচার ও পৌরবের সহজ সংস্কার। সতীত্ব তাই যা রতিতে লিপ্ত থেকেও জীবনের আর সকল পূজাতে রত থাকে। সতীত্ব সেই মহান রতিজীবনের সহায়, যাতে বিতন্ডস্বপ্ন না হলে প্রবিত্ত হওয়া যায় না।

মাতৃত্ব

মাতৃত্ব নারীর স্বভাবী সংস্কার। এ সংস্কারটি কেবল তার দেহের নয়, ভাবময় জীবনেরও অঙ্গ। পুরুষের অহুরূপ কোন সংস্কার নেই। আমরা বাকে পিতৃত্ব বলি সেটি মাতৃত্বের মতো নারীর টানের কিছু নয়, সন্তানসংহাস অনিভ একটি বিশিষ্ট প্রগাঢ় অহুভূতিমাত্র। সকল মাতৃত্ব নিজের নাড়িতে মাতৃচিহ্ন বহন করে, সন্তানের অঙ্গ; শিশুর কোন চিহ্নই থাকে না। নাড়ি দিয়ে সন্তান নিজের মেহে মায়ের শিকড় বহন করে, সেই শিকড় দিয়ে সে মায়ের অঙ্গ থেকে

নিজের সকল উপাদান ও শ্রাণশক্তি আহরণ করে। জন্মগ্রহণ করার পরবর্তী কালে মাতৃদেহের ন্যস্তিত্ব আর কোন কিছা নেই।

পুরুষ ও রমণীর জননযন্ত্রের গঠনের ও রতিপ্রকৃতি দ্বিধে উভয়ের স্তান-চেতনার পার্থক্যটি বোঝা যায়। বিশিষ্ট এক ধরনের গ্রহি ও সেই গ্রহি সম্পর্কিত অঙ্গ দ্বিধে জননযন্ত্রটি গঠিত। পুরুষের সে যন্ত্রের অবস্থানটি বাহ্যিক, রমণীর সম্পূর্ণ ভাবে আভ্যন্তরিক। পুরুষের রতিপ্রকৃতিটিও বাহ্যিক এবং একটি কেন্দ্রগত; রমণীর অঙ্গগুট, সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত কিন্তু যথাকালে কেন্দ্রাভিমুখী। পুরুষের কাজ দেওয়া, রমণীর কাজ গ্রহণ করা, সংরক্ষণ করা এবং দীর্ঘকাল ধরে ফলের পুষ্টিসাধন করা। পুরুষের বীজবপনের ক্রিয়াটি ক্ষণিক। রমণীর বীজগ্রহণ ও তার পরিণাম-সাধনের ক্রিয়াটি দীর্ঘকালব্যাপী। কেবলমাত্র রতিমিলনে পুরুষের বীজ-উদ্বেগের অবসান, রমণী সেই মিলনের ফলকারী। পুরুষ বেখানে ক্ষণিক স্থখে পরিতৃপ্ত, রমণী তথায় জাতির পুষ্টিসাধনে তৎপর। সন্তানস্খা রমণীর গভীরতম প্রকৃতি।

সন্তানের অদৃষ্ট ভবিষ্যৎকালে নয়, অতীতে বাঁধা। তার জনক-জননীতে যতোই নূতন ধরনের সমন্বয় হোক না কেন, সে অতীত কালের পূর্বপুরুষ হতে নিজের জীবনের উপাদান সংগ্রহ করে। ছাত্তেলক এলিসের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেকটি শিশুর নিজের পূর্বপুরুষ নির্বাচন করে নেবার অধিকার আছে। তার জনক-জননীর মাধ্যম দিয়েই সে এই নির্বাচনটি করে। সুতরাং ভাবী সন্তানের কুশলতার জন্য তার অর্ধেকটি পৈতৃক প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেওয়া জনকের গুরুতম ও পবিত্রতম কর্তব্য। তেমনি অল্প অর্ধেকটি নির্ধারণ করে দেওয়া একান্ত ভাবে জননীর ওপর নির্ভর করে। বিবাহের দ্বারা জনক-জননী সন্তানের পিতৃভাগ্যটি সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণ করে দেয়। উত্তরকালে যে প্রহটি সন্তানের অদৃষ্টকে শাসন করবে, সেটি কোষ্ঠিবিচারক কোন গ্রহ নয়, জনক-জননীই সে-প্রহটিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

জননী মহত্তম জন্মদাতা, জনক পৌণ। জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়ে গরীমসী বলে ঘোষণা করলেও মর্ত্যধামে আমরা জন্মাবধি শুনি যে, পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্বী। পিতা তুষ্ট হলে সকল দেবতা তুষ্ট হন। অর্থাৎ পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের ঘোষণাটাই বেশি। এখনকার কালে এ প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীটি পাণ্টে দিয়ে সন্তানের প্রতি জনক-জননীর গুরুতর কর্তব্যের কথাটা আরো বেশি জোর করে প্রচার করার প্রয়োজন হয়েছে। গভীর ভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে যে, সন্তান একটুতেই সন্তানের কারণ হয়। বারা জন্মপ্রকৃতি, বিকলাঙ্গ ও ছুরারোগ্য রোগগ্রহণ সন্তানের জন্মের কারণ হয়, তারা সন্তানের প্রতি অস্বাভাবিক অপরাধ করে। প্রাচীন কালে এই বিবয় তদাৰ্থে অনাচারকে প্রকৃতি অযোগ্যের মৃত্যু ঘটিয়ে শোধন করে নিতো। এখন আমরা সংরক্ষণ-মূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা জীবনের অযোগ্য মাতৃদেহকেও জীবিত রেখে সন্তানের পুষ্টি ও হিতসাধন (?) করতে চাইছি। ইতিহাসে দেখা আছে যে, পূর্বকালে রাজারা ঐশ অধিকারের দাবী করতো। সে অধিকারটা মিথ্যা বলে কালক্রমে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব মাত্রেই যে প্রজন্ম করবার অধিকার ঐশ অধিকারটি

আজও মহাপ্রবল হয়ে আছে তার লুপ্তসাধন করা বর্তমান কালে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্তান ধারণের জন্য স্ত্রী ও পূর্ণভাবে পরিণত জননযন্ত্রের যত্ন, সন্তানের জালনের জন্যও তেমনি পূর্ণ উৎসর্গপ্রাপ্ত স্ত্রীরও প্রয়োজন। শরীরশাস্ত্র এ অঙ্গটির শোভার বিন্দুমাত্র কোন মূল্য দেয় না। সন্তানকে জন্মদান করাই এ অঙ্গটির মূল ক্রিয়া। যে রমণীর স্ত্রীর উন্নতি নেই তাকে স্বাস্থ্যবতী, পূর্ণাঙ্গ ও বিবাহের উপযুক্ত বলা যায় না। মাতৃদেহের উদ্বেগপূরণে স্ত্রী অপরিহার্য অঙ্গ। প্রায় সকল সন্তানদেহের মাতৃদেহ আজ বলহীন বাধ্য হয়েছে এবং আমাদের দেশের বেলাতেও ব্যাপারটা লক্ষ্যণীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, আধুনিক কালের যুবক পত্নীধারণ করতে গিয়ে একটি অঙ্গহীন রমণীকে বিবাহ করে। তার বিশিষ্ট একটি অঙ্গ এখন দোকানের জানলার কাচের ছুঁধের বোতলরূপে শোভা পায়। সন্তানের নিগূঢ় প্রয়োজনের, তার জীবনের একটি প্রধান উপকরণ এখন আর তার মাতৃদেহে পাওয়া যায় না। যেরূপের এই সাংঘাতিক অঙ্গহীনতার দুটি কারণ আমি দেখি। তরুণ বয়সে বিচ্ছেদের কারণে ও উপযুক্ত যত্নের অভাবে দেহের উৎসর্গ রোধ এবং রমণী-প্রকৃতি বিরুদ্ধ খেলাধুলার প্রভাব। আশুতিকর প্রভাবের ফলে পুরুষালি খেলা রমণীর নানা নিজস্ব প্রকৃতির সহিত জন্মেরও বিলোপ সাধন করে।

প্রত্যেক স্বভাবী (Normal) রমণীর রতিজীবন, অর্থাৎ সন্তানবহন ও পালন করবার কাল গড়গড়তা বক্রিত বক্র বলে হয়ে নেওয়া যেতে পারে। নানা বিচ্ছেদ ও উপসর্গের দ্বারা আক্রান্ত হলেও গর্ভ কোন ব্যাধিত অবস্থা নয়, সেটি শরীরবর্ধনমূলক অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে, খাইবয়েও ও ওস্তেরী গ্রহিণীর বর্ধিত ক্রিয়ার কারণে গর্ভাবস্থার রমণীর দেহধর্মের প্রকৃষ্টতম বিকাশ হয়। রমণীর রূপের বিকাশ সোপানে সোপানে কিন্তু বিভিন্ন। গর্ভবতীর প্রাক-মাতৃদেহ রূপটি বিশিষ্ট। ইউরোপের রেনেসাঁস যুগের ও পরবর্তী কালের চিত্রকলায় যে আদর্শ আজও আমরা দেখি, সেটি এই গর্ভবতীর প্রাক-মাতৃদেহ রূপ। সন্তানের জন্মের পর মাতৃদেহ রূপটি তেমনি বিশিষ্ট মহিমময়। আজও সন্তানবহন মাত্রেই রূপ সকল দেশের চিত্রকলায় একটি বিশিষ্ট আদর্শ হয়ে আছে। নারীসৌন্দর্যের মতো পুরুষের বৌবনে অল্পরূপ কোন ঘন পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের বিকাশ নেই।

সন্তানের গর্ভবাসের কাল সাধারণত ২৭৪ থেকে ২৮০ দিন। শেখ অফুটির দিন থেকে গণনা ২৮০ থেকে ২৯০ দিন। কখনো কখনো এ কালটি দীর্ঘতর হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে সে দীর্ঘদিনের সংখ্যা ৩০০ থেকে ৩২০। সন্তান বহন দীর্ঘকাল গর্ভবাস করে তার পক্ষে ততই মঙ্গল। অল্পপক্ষে গর্ভবাসের কালটি কম হলে সন্তান অত্যন্ত কতিগ্রস্ত হয়। গর্ভাবস্থার জননীর বিশ্রাম সন্তানের বখোচিত পুষ্টির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। যে সৎল রমণী এই কালে বখোঁট বিশ্রাম করতে পার না তাদের সন্তানদের দেহের ওজন কম ও স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। জন্মকালে ও প্রথম বৎসরে কতাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তানের মৃত্যুর হার বেশি।

একটি সন্তান প্রসব করবার পর জননীর দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে আড়াই থেকে তিন বৎসর সময় লাগে। এই সময়ের তেতর

যদি পুনরায় সন্তান-সন্তাননা হয় তাহলে জননীকে দেহ অত্যন্ত কতিগ্রস্ত হয়। একটি স্ত্রী রমণী তার সমগ্র রত্নজীবনে সাধারণত পনেরোটি সন্তান ধারণ করতে পারে। উপরের গণনা হিসাবে তিন বৎসর যদি নিষ্ক্রিয় কাল হয় তাহলে প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যবতী রমণী তার সমগ্র জীবনে দশটি সন্তান ধারণ করতে সক্ষম। এ প্রত্যেকটি সন্তানকে একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করার কাল ন'মাস দশ দিন। এই সন্তানকে আশ্রয়নির্ভর করে তুলতে নানাপ্রকারে দশ বৎসর সময় লাগে। অর্থাৎ দশটি সন্তানকে বঞ্চিতভাবে লালন করতে গেলে জননের একুশে ১১১ বছর ছয় মাসের অবসর দরকার। এ অবস্থার বিশদ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। সন্তানের জন্ম সাধারণত আকস্মিক ঘটনা। আগেকার কালে তাই জননীর স্বাস্থ্য ও সন্তানের জীবন নিরক্ষিত করা অসম্ভব ছিলো। এ আকস্মিকতার ওপর হাত নেই বলেই তখন আমাদের দেশের গৃহিণীরা হতাশ হয়ে বলতেন, জীব দিয়েছেন যিনি, আহা! দেবেন তিনি। বিধাতাকে জীব সৃষ্টি করার ক্ষমতা দারী করা অসম্ভব। কেন না, জীব যিনি দেন তিনি বিধাতা নন, তিনি প্রকৃতি। প্রকৃতি অত্যন্ত সৌন্দর্যে নিষ্ঠুর একটি শক্তি। সে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যোহর চার কেলেক এবং পতি-পত্নীর হাতে হাতে বিচিত্র বিচিত্র এক উদ্ভাবনজনিত ইঞ্জিয় সৃষ্টির অগ্রিম পারিতোষিক দিয়ে তাদের বুদ্ধি ভ্রংশ করে নিজের লক্ষ্য সাধন করে। আগেকার কালে প্রকৃতি গাছারীর শত পুত্রের, বাবুদের পুত্রবাহিনীর এবং অনাছুত জীবেরও আহা! যোগাতো, এখন তার কিছুই পারে না।

কাজেই এই বিবম আকস্মিকতার বন্ধন থেকে মেয়েদের মুক্তির দরকার। বিজ্ঞান যে মুক্তির উপায় তাদের হাতে এনে দিয়েছে তার নাম গঠনমূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ। মাতৃদের, বিশেষ করে মেয়েদের এত বড় মুক্তি আর কিছুতে নেই। মাতৃ এখন অর্ধাঙ্গী নন, তাদের নিজস্বের হাতে। আমার বিবেচনায়, মাতৃ এখন মুক্তি পেয়ে পরম সুন্দর হয়েছে এবং পতি-পত্নীর ভালোবাসাও নিরক্ষণ হয়ে প্রকৃত সর্বাঙ্গসম্পন্ন হয়েছে। সন্তান সৃষ্টি শ্রেষ্ঠতম আর্ট, তাই জননী শ্রেষ্ঠতম শিল্পী। আরম্ভগত হয়ে এই শিল্পের পরম সৌন্দর্যের সন্তাননা হয়েছে এখন। অপরপক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে এখনো অনেকে তর্ক করেন। বহু সন্তানের জন্ম হলে তাদের মধ্যে জড় প্রকৃতি, দুর্বলচিত্ত, পাগল, বন্দ্যবোঙ্গী ইত্যাদি ভয়াবহ কলুষিত সন্তানের জন্ম হবার প্রভূত সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মনেরও ভালো আছে। বৃহৎ পরিবার না হ'লে প্রতিভার জন্ম হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের বহু সন্তানের একজন। তবুও উপযুক্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজন হলেও প্রতিভার জন্ম বিরল ঘটনা। কলুষিত সন্তান কিন্তু একটুও বিরল নয়। তারা পরিবার ও সমাজকে হুঃ, পলু করে। তা ছাড়াও, সহজ ভাবে দেখতে গেলে সন্তানের অকালমৃত্যু, বেঁচে থাকলে উপযুক্ত ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার অভাব এবং চরম অপচরের সম্ভাবনার চেয়ে সে ঋণবিরোধিতা অনেক পুণ্যের। মনীষীরা বিয়ে তত্ত্বাবধি উৎপাদন করে মাতৃদের কল্যাণ-সাধনা করা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কর্ম হলেও যদি শুভকর হয়, তাহলে ভাবী সন্তানের অব্যাপ্যকে নিবারণ করে সুযোগ্যকে আহ্বান করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হলেও অত্যন্ত উচিত কর্ম। বিজ্ঞান পরম হিতকর দুটি জিনিষ আমাদের দিয়েছে, একটি চশমা এবং অন্যটি জন্মনিয়ন্ত্রণের সন্ত্র। চশমা যেমন দৃষ্টিহীনকে

পৃথিবীর কোলে ফিরিয়ে দেয়, অন্য অস্ত্রটিও তেমনি জননী, সন্তান, তাদের সঙ্গার সমাজ ইত্যাদির অসীর মঙ্গলসাধন করে। এই অস্ত্রের দ্বারা জনক-জননী নিজেদের পূর্ণ স্বাস্থ্য, আনন্দ, পরিবেশগত ও ভাবময় জীবনের সামঞ্জস্য, অর্থাৎ সুখের ক্ষেপে সন্তানকে অত্যন্ত লোক থেকে চয়ন করে আনতে পারে এবং তার জীবন বত্বর সম্ভব নিরাপত্তা ও শুভ সম্ভাবনাপূর্ণ করে গঠন করতে পারে।

কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিটি ভালো করে বুঝে নেওয়া কর্তব্য। অধুনা হালে পানি না পেয়ে আমাদের রাজনীতিক কীর্তনীররা জন্মনিয়ন্ত্রণের গান আখরে ভূষিত করে গাইতে আরম্ভ করেছেন, যেন আজ জন্মনিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করলেই হু' বছরেই দেশের জনসংখ্যার সমস্ত সম্ভাবন হয়ে খাণ্ড উদ্ভূত হয়ে যাবে। আমি জন্মনিয়ন্ত্রণকে গঠনমূলক বলেছি। যে সম্প্রতি নিজেদের ইঞ্জিয় সৃষ্টির ও সাংসারিক সুবিধার জন্য সন্তানের জন্মনিরোধ করে, তাদের চেয়ে সমাজ-বিরোধী পাণ্ডুর কর্তব্য করা যায় না। সম্যক জন্মনিরোধে পুরুষ আঘাত পায় না, পায় মেয়েরা। শরীরের দিক দিয়ে তাদের ঐশ্বর্যবিহীন প্রতিনিয়ত অবনতি পেয়ে দেহকে ক্ষুণ্ণ করে। অস্ত্রপক্ষে, তাদের ভাবময় ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষয় হয় না। গঠনমূলক জন্মনিয়ন্ত্রণের একটিনাজ মূল কথা আছে : সে স্বামী তার পত্নীকে সত্য করে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে এবং পত্নীর পূর্ণ উৎকর্ষ ঘটাবার জন্য তৎপর সে, এবং যে সম্প্রতি সন্তানকে শ্রদ্ধা করতে পারে, একমাত্র তারাই প্রকৃত জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী। গঠনমূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ মানে আমি এই বুঝি। শ্রদ্ধার ও বীর্যের ভিত্তি না হলে এ উচ্চতর জন্মনিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্বীকার যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের সাংসারিক দিকটা অপেক্ষাকৃত গৌণ হলেও গুরুত্ববিহীন নয়।

বিগত মহামুছের কিছু পূর্বে ইংলণ্ডের লোকের গড়পড়তা আয়ের হিসাবে স্বাস্থ্যকর এলিস নির্ণয় করেছিলেন যে, সাধারণ ইংরেজসম্প্রতি ২'৩টি, অর্থাৎ দুটি থেকে তিনটি সন্তানের তার বহন করতে পারে। আমি এলাহাবাদের মধ্যশ্রেণীর বাঙালীর একটি দলের আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক লক্ষ্যের নিরিখে অনুসরণ একটি হিসাব করে দেখেছি, তার একজনও একটিও সন্তান পালন করার যোগ্য নয়। অথচ প্রত্যেকের গড়পড়তা পাঁচটি করে সন্তান আছে। ভয়াবহ কথা। এখন টাকার মূল্যকে অত্যন্ত লরোদরশীল বলা যায়, লরের দিকেই যৌক বেশি। কাজেই, এ বিষয়ে আমি কোন মানদণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। কেবল সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে, সন্তানের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষের জন্য দুটি সন্তানের ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ যে শিশু একাকী তার সম্যক উৎকর্ষ হয় না। বহু কম সন্তান হয়, তাদের বৃত্তার সম্ভাবনাও তেমনি কম হয়ে থাকে। যতো বেশি হয়, মৃত্যুও ততো অবধারিত হয়। পাঁচটি সন্তানের একজনের বৃত্তার সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যাবাহুল্য থেকে সংখ্যাগততা জীব-জগতের প্রগতির মানদণ্ড। আমাদের সমাজে সন্তানের অপচর বর্তমান কালে যেন অনিবার্য ঘটনা হয়ে উঠেছে। অধিক সন্তান হলে পুত্রশোক, কঠোর দায়িত্ব, পরিবারের অপচর ও অবনতি হয়। পত্নীর ভাবে সংসারের গতি পর্যবেক্ষণ করলে বেশ বোঝা যায় যে

হাল খুনি আলয়া

আন্ততঃ যুথোপাখ্যায়

৯

চৌথের সামনে বীরাপদ লেখিন নিরতির হোটখাট একটা খেলা দেখে উঠল।

সেই মর্মান্তিক দেখার সঙ্গেও নিজের একটু গুত বোগ ছিল বোধকর।

বীরাপদ মিটে নেবেছিল অমিতাভ বোম্বের ধোঁজে। তাকে না পেয়ে কিরে থাকিল। তার পাশে পাশে জ্যাট বোলানো ঠেলটা হুড়ুড়িয়ে ঠেলে নিয়ে থাকিল লোকটা। পাশে পাশে ঠিক নয়, একটু আগে আসে। লোকটাকে চেনে বীরাপদ। তানিস সর্দার—হৈ-ঠৈ করে কথা বলে, হুড়ুড়িয়ে কাজ করে।

জ্যাট ভরতি লিভার একস্ট্রাট্ট। আলকাত্তরার মত ঘন গাঢ় ফুটল লিভার একস্ট্রাট্ট। কারনেস থেকে নামিয়ে মেম্ বিলডিংস-এর এক তলার সিমেন্টিক-ট্রোয়েজে রাখতে চলেছে। ওয়ার্কশপ থেকে এই পথটুকু কিছুটা এবড়োখেবড়ো। অতবড় এক ফুটল জ্যাট আর একটু সাবধানে ঠেলে নিয়ে বাওয়া উচিত লোকটার। বীরাপদ অবস্থি বোধ করেছিল। হু'নিকের কড়ার বোলানো জ্যাটটা ওর চলার ঠমকে বড় বেশি নড়ছিল, ছলছিল। বীরাপদ অবটন ঘটবে জানত না, অথচ অবটনের একটা ছায়া আশ্চর্যভাবে মনে আসছিল।

অবটন ঘটল। লোকটার নিজের কোবেই হয়ত ঘটল।

মেন-বিলডিংস-এর প্রবেশ-পথের এমাথা-ওমাথা জুড়ে আধ-হাতের মত উঁচু একটাই মাত্র বাঁধানো ধাপ। তারপর লম্বা করিডোর। তরতরিয়ে সেই ধাপের মুখে এসে এক হুহুতও না'থমে লোকটা হু'হাত-ধরা বড় হুটোতে সঙ্গেসঙ্গে নিজের দিকে চাপ দিল একটা। উদ্বেগ, সাধনের ঢাকা হুটো সিঁড়ির ওপর তুলে দিয়ে ঠেসলেই পিছনের চাকাটা আপনি উঠে বাবে। উচিত হোক, অহুচিত হোক, পরিষ্কার বাঁচানোর জন্তে হয়ত এভাবেই কাজ করে অভ্যস্ত।

চিকার চেঁচামেচি, গেল-গেল বব।

ক্যাটরী ভেঙে লোক জৌড়ে এলো।

বীরাপদ চিত্রাপিতের মত ঝাঁড়িয়ে। কোথা দিয়ে কি-ভাবে কি ঘটে গেল ঠিক বুঝে ওঠেনি। লোকটাকে হু'হাত তুলে আর্তনাদ করে উঠতে দেখেছে, তারপরেই গড়াগড়ি খেতে দেখেছে—মাটিতে জ্যাটের ফুটল পদার্থের ফুটল শ্রোত।

লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে বাবার সময় বীরাপদ ভালো

করে দেখল। নিজের মজ বসলে গেছে, ওপরের মজও চমকলে। হুহু, অজান।

পতির যুগ। শান-বাঁধানো জায়গার দাগ মুছে বেলা হয়েছে। তার এধারের মাটিতে অনেকটা জায়গা জুড়ে মত একটা কালিই চাপটা পড়ে আছে। তানিস সর্দার বাঁচবে কি না যে ভাবছে ভাবুক, তার দেহের দাগ দেখে যে শিউরে উঠছে উঠুক। এরকম হোটখাট অবটন নতুন কিছু নয়। কিন্তু ওই কালো দাগটা কোম্পানীর অনিশ্চিত লোকমানের দাগ। সেই দাগটা একেবারে ছোট নয়। ছোট হলেও এই অকাবণ ক্ষতি নীরব সহিষ্ণুতায় বরদাস্ত করার মত ছোট নয়।

ওপরে এসে লাভ্য সরকারের উদ্দেশে গভীর মুখে সিঁতাওঁ মিত্র বলল, কম করে বায়ো-চোক্ষ হাজার টাকা লোকসান।

পাশাপাশি নিজেরের ঘরের দিকে বাঁছিল তারা। বীরাপদ পিছনে।

লাভ্য সরকারের সন্ধিগু মন্তব্য, তার বেশিই হবে।

নিজের ঘরে বসে বীরাপদ চূপচাপ একটা অবস্থি ভোগ করল খানিকক্ষণ। কোম্পানীর ক্ষতি বটে। ক্ষতিটা কর্মচারীর অনবধানের ফলেই। কিন্তু এই ক্ষতি ছেড়ে একটা লোকের ওই ক্ষতটাই বিভীষিকার মত বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। হাসপাতালে কি ব্যবস্থা হল না হল একবার দেখে আসা উচিত কি না ভাবছে। ১০০কেউ তো কিছু বলল না।

চূপচাপ বসে থাকার সময় হল না শেষ পর্যন্ত। খানিক বামে কোম্পানীর গাড়ি নিয়ে ক্যাটরী থেকে বেরিয়ে এলো সে। হাসপাতালে এসে মনে হল, না এলেই ভালো হত। ফ্রী-বেড খালি নেই, সাধারণ পে-ইং বেড ও না। ইয়ারজেদি কেস্ বলে রোগী কেবল দেওয়া হয়নি বটে, বাইরের বায়ান্দার এক্সট্রা বেড কেলে জায়গা দেওয়া হয়েছে তানিস সর্দারকে। সেখানে এরকম এক্সট্রা বেড-এর সংখ্যা এই একটাই নয়। অনেক। দেখলে অনভ্যস্ত চোখে বাঁজা লাগে হঠাৎ। রোগী যেখানেই থাক, হয়ত চিকিৎসার ক্রটি হয় না, হবার কথা নয় অন্তত, তবু বেডগুলোর দিকে চেয়ে অল্পগ্রহের রোগশয্যা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না বীরাপদ।

ক্যাটরীর, ছন্দন কর্মচারী ছিল, সেলাম জানিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তারা অন্তত সরকার মত চিকিৎসা হচ্ছে বলে ভাবতে পারছে না। অধূরের ঘরোলে ঠেস দিয়ে নিয়ন্ত্রণীয় একজন

দ্বীলোক বসেছিল, সামনে পাঁচ সাত বছরের ছোটো নোঙরা ছেলে। কর্মচারী হুঁজন কিছু ইশারা করেছে কিনা বোঝা গেল না। দ্বীলোকটি দিশেহারার মত উঠে এসে ঘীরাপদর ছুঁপা জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল।

বচা দে বাবু, বচা দে!

সে হাসপাতালের নিয়ম-কানুন বোঝে না, সম্ভব-অসম্ভব বোঝে না, ভব্যতা-অভব্যতা বোঝে না। নিজের লোকসান বোঝে। তাই বুঝেছে।

কাঠ হয়ে কাঁড়িয়ে শ্রমিক-বধুর কান্না দেখল ঘীরাপদ।

খোঁজ নিয়ে জানল, ক্যাবিন খালি আছে এবং দিনে তিন-চার টাকার বিনিময়ে তা পাওয়া যেতে পারে। আর গুণ্ণপত্রের খরচও লাগবে। সব ব্যবস্থা করে বেরিয়ে এলো যখন, শ্রমিক-রমণীর কান্নাটা কানে বাজছে তখনো। ভাবছে, এত কান্নার সবটাই কি শুধু নিরাশ্রয় হবার ভয়ে...

ফ্যাক্টরীতে হিমাংগ মিত্র সপ্তাহে সাধারণতঃ ছ'-তিন দিনের বেশি আসেন না। এসেও ছ'-এক ঘণ্টার বেশি থাকেন না। অঘটনের পরদিন এই প্রথম তীর ঘরে ডাক পড়ল ঘীরাপদর।

সাজানো গোছানো মস্ত বড় ঝকঝকে তকতকে ঘর। বড় সাহেবের সামনে সিতাংগ আর লাবণ্য বসে। পাশের হেলান দেওয়া চেয়ারে অমিতাভ ঘোষ—নির্ধিকার মুখে সিগারেট টানছে। মাঝার সামনেও এমন সহজ মুখে সিগারেট টানে, ঘীরাপদ জানত না।

আলোচনা গত কালের অঘটন প্রসঙ্গে। কোম্পানীর লোকসান প্রসঙ্গেও। ঘীরাপদর প্রতি নির্দেশ, তার চাক্ষুশ দেখার একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে, তানিস সর্দারের গাফিলতির কথা লিখতে হবে, কোম্পানীর লোকসানের অঙ্কটাও বসাতে হবে। এদিকটা একুনি ঠিক করে না রাখলে পরে গোলযোগের সম্ভাবনা।

অতঃপর চিকিৎসার প্রসঙ্গ। ব্যবস্থার কথা শুনে বড় সাহেব কিছু মন্তব্য করার আগেই সিতাংগ বিরক্ত মুখে বলে উঠল, আপনি কাউকে না জিজ্ঞাস করে সাত ভাড়াভাড়া এ-ব্যবস্থা করতে গেলেন কেন? নিজের কেয়ারলেসনেসএ অ্যাকসিডেন্ট, এই লোকসানের ওপর আবার আমরা তার ক্যাবিন ভাড়া আর চিকিৎসার খরচা জোগাতে বাব? যেখানেই হোক, ক্রী-বেড পেয়েছিল যখন আপনার ইন্টারকিয়ার করার দরকার কি ছিল?

ঘীরাপদ জবাব দিল না।

হিমাংগ মিত্র আঙুল দিয়ে টেবিলে দাগ কাটছেন, লাবণ্য সরকার গভীর, অমিতাভ ঘোষ চেয়ারে মাথা এলিয়ে সিগারেট টানছে।

একটু বাদে হিমাংগ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ক্যাবিন ভাড়া কত?

কত শুনে একটু আশ্চর্য হতে যাচ্ছিলেন বোধহয়, সিতাংগ তেমনি অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলে উঠল আবার, টাকার জ্ঞে তো কথা নয়, আমরা এ ভাবে আদর-বহু করে চিকিৎসা করালে সকলে ধবেই নেবে যে ওর কিছু গাফিলতি নেই, ক্ষতিপূরণ নিয়ে একটা ঝকঝকি লাগবে হয়ত, এর তো কাউকে না জিজ্ঞাস করে এসব করার দরকার ছিল না কিছু!

—দরকার ছিল। ঠাণ্ডা বিনীত ভাবেই ঘীরাপদ জবাব দিল

এবার।—যেভাবে ছিল লোকটা, সেভাবে থাকলে বাঁচবে বলে মনে হয়নি। হয়ত এখনো বাঁচবে না, যা করেছি নিজের দায়িত্বে করেছি, কোম্পানীর অন্তর্বিধে হলে কোম্পানী দিতে যাবে কেন? একটু খেমে আবার বলল, লোকটার গাফিলতির কথাও সবাই জানে, তবু দরকার হলে কোম্পানী নিজে থেকেই যদি ক্ষতিপূরণ কিছু দেয়, তাহলেও যে-ক্ষতি হয়ে গেছে এর ওপর সেটুকু আর তেমন কিছু বড় ক্ষতির ব্যাপার হবে বলে আমার মনে হয় না, বরং ফলটা ভালো হবে বলেই বিশ্বাস।

হিমাংগ মিত্রর মুখে হাফা বিশ্বয়, লাবণ্য সরকার ঘাড় কিরিয়েছে, অমিতাভ ঘোষ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে আর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে—কৌতুক দৃষ্টিটা ঘীরাপদর মুখের ওপর।

যত নরম করেই বলুক, চূপচাপ বরদাস্ত করার কথা নয় ছোট সাহেবের। করলও না। রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে, আপনার বিশ্বাসের কথা কেউ শুনতে চায়নি। যা হয়েছে লোকটার নিজের দোষে হয়েছে, আমরা তার জ্ঞে এতসব করতে বাব কেন?

তার দিকে চেয়েই ঘীরাপদ তেমনি শান্ত অথচ স্পষ্ট জবাব দিয়ে ফেলল আবারও একটা। বলল, নিজের দোষে কেউ ময়ে গেলেও তাকে কেউ ফেলে দেয় না, তারও সংকারটা হয়ে থাকে।

সিতাংগ নির্ধিক হঠাৎ। নির্ধিক কয়েক মুহূর্ত সামনের হুঁজনও। চীক কেমিষ্ট কড়কড়িয়ে সিগারেট টানছে।

হিমাংগ মিত্রই মধ্যস্থতায় এগোলেন। তেলেকে বললেন, অকারণ বাদানুবাদ করে লাভ নেই, চিকিৎসার সব ব্যয়ভার কোম্পানীর নেওয়া উচিত, কোম্পানীই নেবে। আর ঘীরাপদকে বললেন, লোকটা সেয়ে উঠবে কি উঠবে না তাই যখন ঠিক নেই, পরের কথা পরে—সময় নষ্ট না করে আপাতত অফিসিয়াল স্টেটমেন্টটাই রেডি রাখা দরকার।

ঘীরাপদ চূপচাপ উঠে এলো।

সেদিনও বিকেলে হাসপাতালে এসেছিল। শকু-পিরিয়ড না কাটা পর্যন্ত তানিস সর্দারের ভালোমন্দ কিছু বলা যায় না। তবে চিকিৎসা যে হচ্ছে সেটা বোঝা যায় এখন। ওর বউকেও দেখল। আজ আর কাঁদছে না। ঘীরাপদকে দেখে কালো মুখে আশা আর কৃতজ্ঞতা উপছে উঠছিল।

বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, ক্যাবিনে ঢুকল অমিতাভ ঘোষ। ঘীরাপদ তাকে এখানে আশা করেনি, দেখে মনে মনে খুশি। অমিতাভ কাঁড়িয়ে রোগী দেখল ছ'-চার মিনিট।

বাইরে এসেই হাসিখুশি মুখে বলল, ফ্যাক্টরী থেকে ভাড়াভাড়া পালাতে দেখেই বুঝেছি আপনি এখানে, লোকটা আছে কেমন, বাঁচবে?

জবাব শুনল কি শুনল না। আনন্দে গোটা মুখ উগয়গ, এখানে রোগী দেখতে এসেছে কি ঘীরাপদর খোঁজে এসেছে বোঝা শক্ত। নিজের পুয়নো ছোটো গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। উৎফুল্ল মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে ঠাট দিল। হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডের বাইরে এসেই বলল, আপনি যশাই এমন সামাজিক লোক জানতুম না।

কেন, কি হল।

যা হল বাবু বাবু, ছোটসাহেবের মাথা ঘুরে গেছে, তার মুখের ওপর একরকম কথা কেউ কখনো বলে না।



দিনে
দিনে
দিনে
দি...

রেক্সোনা সাবানে 'কাডল' বলে
একটি বিশেষ ধরণের তৈল মিশানো হয়,
যাতে ত্বক আরও কামল, আরও
সুন্দর, আরও লাভণ্যময়ী হয়... সুবাস
ভরা রেক্সোনার পরশ সারাদিন
আপনাকে সজীব আন সতেজ রাখে।
সৌন্দর্য সাধনায় সর্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন!

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাভণ্যময়ী করে।

RP.164-X32BG

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

ধীরাপদ হেসে ফেলল, চীক কেমিষ্টও না ?

আমার কথা ছেড়ে দিন, ঠোঁটের কাঁকে সিগারেট চেপে হাসছে অমিতাভ, এখানে এই লোকটার জন্তে আপনি যা করলেন চীক কেমিষ্ট হিসেবে সেটা আমারই করার কথা, কিন্তু আমি বললে পাগলের দমদম বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করত, এখন জোড়া পাগলের পাগ্লাম পড়ল কি না ভাবছে বোধহয়।

তার আনন্দ দেখে ধীরাপদর জর হল হাতের হিয়ারিং ঠিক থাকলে হয়। হেসে জিজ্ঞাসা করল, আপনি চলছেন কোথায় ?

চাকরি গুঁথানে। যাবেন ?

চকিতে ধীরাপদ গাড়ির ডিকেরটা একবার দেখে মিল। না ক্যামেরা নেই। বলল, আমি আজ আর না, বাড়ি যাব এখন, আপনাকে এদিকেই মাফিয়ে দিন কোথায়।

চলুন, পৌঁছে দিয়ে বাড়ি—

মেজাজ বখাৰ্খই প্রসন্ন আজ। ক'দিন ধরে এমন একটা সুযোগই খুঁজছিল ধীরাপদ। পুলতান হুটি পাঁচ সাত মাইল পথ এখান থেকে, এই অন্তরঙ্গতার কাঁকে কাজের কথা তোলাটা অসম্ভব হবে না হয়ত। পূর্বপ্রসঙ্গের জের টেনে বলল, আর যে বাই ভাবুক, আপনার মামা যে আপনাকে স্নেহ করেন খুব সেটা নিজেরই আমি সেদিন টের পেয়েছি।

ভেবেছিল কি করে টের পেল সেটাই শুনতে চাইবে, কলে কাজের কথাটা আপনি উঠবে। কিন্তু সে তার ধার দিয়েও পেল না, সিগারেটটা ফেলে হেসে উঠে মস্তব্য করল, খুব স্নেহ করেন, কংসমামার স্নেহ।

ধীরাপদ খাঙ্কা খেল একটা। যোরানো পথে গিয়ে ফল হবে না বুঝে একটু বাদে সমস্তটা সোজানুজি ব্যক্ত করে ফেলল। বলল, আপনাদের ব্যাপার আপনারাই জানেন, কিন্তু এদিকে আমার যে চাকরি থাকে না—

কিছু না বলে অমিতাভ শুধু ফিরে তাকালো একবার, বক্তব্য বুঝতে চেষ্টা করল।

—বসে বসে শুধু ফাইলই খাঁটছি, আর যে-বা বলছে ক'রছি নিজে থেকে কিছু বুঝিও না করছিও না, একটু আণ্টু কাজ না দেখাতে পারলে চাকরি থাকবে কেন।

সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ ঘোষের টিপ্তনী, কাজও তো বেশ দেখাচ্ছেন, প্রবন্ধ লিখে দিচ্ছেন, ভাষণ লিখে দিচ্ছেন, বাণী লিখে দিচ্ছেন—

বক্তোক্তি গায়ে না মেখে ধীরাপদ জবাব দিল, সে-কাজের জন্ত ছ'শ টাকা মাইনে দিয়ে সুপারভাইজার রাখা দরকার নেই সেটা তাঁরা শিগগীরই বুঝবেন।

অমিতাভর মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। শাদাসাপটা বা বলে বলল, শুনতে ভালো লাগার কথা নয় খুব, ভালো লাগলও না। তার গুণ দেখে এখানে আনা হয়নি তাকে, তার কাছ থেকে কাজও কেউ আশা করে না। চাকরি চেয়েছেন বলেই তাকে এখানে এনে বসানো হয়েছে।

ধীরাপদ জানে। শুধু চাকরির এরকম চাওয়ার হেতুটাই দুর্বোধ্য। খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, চাকরির সঙ্গে ব্যবসার কি সম্পর্ক ?

সম্পর্কটা সে জানে না শুনে অমিতাভ যেমন অবাক,

সম্পর্কটা জানার পর ধীরাপদও অবাক তেমনি। সমস্ত ব্যবসারের চার আনার মাসিক চাকরি। বলতে গেলে চাকরির টাকাতাই ব্যবসা শুরু, মামার জিম্মার অমিতাভর মায়েরও কিছু টাকা ছিল। মামার নিজস্ব কত ছিল জানে না। তবে মামা যোটা টাকা খণ্ড সংগ্রহ করেছিলেন আর সেই খণ্ডের দায়িত্বও নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। চাকরির ডাক্তার-খামী বেঁচে থাকতেই এই ব্যবসার জরুরা-কল্পনা চলছিল। মামার সঙ্গে তাঁর বন্ধু ছিল খুব। তিনি মামা বেতে তাঁর জমাজো টাকা, বিষয়ের অংশ, আর লাইক ইনসিওরেন্সের টাকা—সবই চাকরি মামার হাতে তুলে দিয়েছিলেন এই ব্যবসার জন্ত।

অমিতাভ ঘোষ আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ধীরাপদ একেবারে চুপ। কিন্তু ডিকেরটা খুব চুপ করে নেই। চাকরির বাড়ি-গাড়ি বিষয়-আশয়ের ওপর থেকে একজনের অল্পগ্রহের ছায়াটা ঘন থেকে সরে গেল বলে বুঝি হবার কথা। কিন্তু ধীরাপদ সেদিকটা ভাবছেই না। একরকম জোর করেই চাকরি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তাকে। ধরেবেঁধে উপকার করা নিয়ে ধীরাপদ ঠাটা করতে জবাব দিয়েছিলেন, উপকারটা তাঁর একার নাও হতে পারে। পাকাপাকি ভাবে কাজে লাগার পরেও দায়িত্বের কথা বলেছেন চাকরি, বলেছেন সেটা যেন সে ঠিকমত দেখে শুনে বুঝে নিয়ে চলতে পারে।

কিন্তু ধীরাপদ কি করতে পারে ? ওর কাছ থেকে কি প্রত্যাশা চাকরির ?

বিশ্বাস করে একদিন ধীর হাতে বখাসর্ব্ব তুলে দিয়েছিলেন, আজ আর তাঁকে অতটা বিশ্বাস করেন না হয়ত। সেদিন বিশ্বাস করেছিলেন কারণ আর একটা জোর ছিল সেদিন। অনেক বড় জোর। নারীর যে জোরের কাছে অতিবড় প্রবল পুরুষেরও অমোঘ সমর্পণ। সেই জোরটা আজ আর তেমন নেই ভাবছেন চাকরি ? সেই জন্তেই কথায় কথায় ব্যয়েসের কথা তোলেন ? সেই জন্তেই ঘটায় ঘটায় চোখে-মুখে জল দিতে হয় ? আর সেই জন্তেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওকে যুক্ত করার আগ্রহ ?

সবই হতে পারে। কিন্তু ধীরাপদর কেন জানি তা মনে হয় না। এখনও চাকরির বাড়ির দরজায় হিমাংশু মিত্রর লাল গাড়িটা পাড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আর চাকরির স্নেহভাজন বলেই ওর প্রতি অমন বাশভারী বড়সাহেবের প্রচ্ছন্ন প্রীতিভাব একটু।

থেকে থেকে ধীরাপদর কেবলই মনে হল, চাকরির মনের তলায় আরো কিছু আছে...

অনেকক্ষণ বাদে সাদাসিধে ভাবে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আমি এখানে এসে চাকরির কোন্ কাজে লাগতে পারি ?

সামনের দিকে চোখ রেখে অমিতাভ ডুক কুঁচকে জবাব দিল, কাজে লাগার দরকার নেই, চাকরিসির লোক এখানে একজন থাকা দরকার, আপনি আছেন।

তাঁর লোক একজন থাকা দরকার কেন ?

তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

আপনি জানেন না ?

না। হালুকা শিস দিতে দিতে স্পীড কমালো, সামনে জোড়া লম্বী।

বীরপদ হাসছে অল্প অল্প। কিন্তু মনে মনে সত্বর আঁটছে কিছু।...হিতে বিপরীত হবে কিনা কে জানে। হবে না বোধহয়, যেজাজপত্র অল্প রকম দেখছে আজ।

এখানে আমার আগে আমি কি করতাম আপনার জানা নেই, মা?

লরীর পাশ কাটিয়ে ঘাড় ফেরালো, ঠোঁটের কাঁকে হাল্কা লিঙ্গটা ধরা তখনো।

ছেলে পড়াভান আর কবিরাজী ওরুথ আর পূর্বনো বইয়ের লোকানের বিজ্ঞাপন লিখতাম...মাসে পঞ্চাশ টাকা বোজগার করতে কাল-ঘাঘ ছুটে যেত। হাসতে লাগল।

সামনের কাঁকা হাতটা দেখে নিয়ে অমিতাভ আবারও ফিরে তাকালো। লিঙ্গ খেঁচে গেছে।

বীরপদ বলল, আবারও তাহলে সেই অবস্থাতেই ফিরে যেতে বলছেন আমাকে...।

সশব্দ প্রতীকা। কিন্তু কাজ হয়েছে মনে হচ্ছে। ষ্ট্রিয়ারিং হাতে লোকটা ফিরে ফিরে বারকতক দেখল।—ব্যাপারখানা কি খুলে বলুন না, কে যেতে বলেছে আপনাকে?

বা বললেন সেই রকমই দাঁড়ায়, বীরপদ নিবিচার, কারো তাঁবেদারের লোক হয়ে বসতে রাজি নই, আপনার ভরসায় কাজের ওপর দাঁড়াব আশা করেছিলাম।

রাগতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হেসেই ফেলল অমিতাভ ঘোষ। আচ্ছা, আশা বার করছি আপনার। স্পীডের কাঁটা তিরিশ থেকে এক লাফে পঞ্চাশের দাগে। উৎকল বিশ্বয়ে বলে উঠল, অতুত লোক মশাই আপনি!

হাসছে বীরপদও। স্বস্তি।

চাকরির সঙ্গে যেদিন এসেছিল সেদিনও নাকি সুলতান কুঠির এই পরিবেশটা ভালো লেগেছিল অমিতাভ ঘোষের। পৌঁছে দিতে এসে আজ বীরপদের সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। অর্থাৎ একুনি যাবার বাসনা নেই। অগত্যা আমন্ত্রণ না জানিয়ে বীরপদ করে কি।

আস্থান, বাইরেটা ভালো লাগলেও ভিতরটা লাগবে না।

সুলতান কুঠিতে গাড়ি আসা আর সেই গাড়িতে বীরপদের আসা এখন আর উঁকিঝুকি দিয়ে দেখার মত নয় খুব। কিন্তু তার ঘরের সামনের বারান্দায় যে মাল্লুঘটি দাঁড়িয়ে তার বিস্ময়িত চোখে রাজ্যের বিশ্বয়। গণুদা। গণুদার এমন চিত্রাঙ্গিত মূর্তি বীরপদ আগে কখনো দেখেনি।

উঠান পেরিয়ে দাওয়ার উঠে আসতে গণুদার দিশা ফিরল যেন। শশব্যস্তে হুঁহাত জুড়ে আধখানা ঝঁকে বিনয়ে ভেঙে পড়ে অভিবাদন জ্ঞাপন করে উঠল একটা। অব্যবহিত একখানা হাত কপালে তুলে অমিতাভ জিজ্ঞাসু নেত্রে বীরপদের দিকে তাকালো।

—গণেশবাবু, গণুদা...এই পাশের ঘরে থাকেন। ঘরের দরজা খোলার কাঁকে বীরপদ পরিচয়ের বাকি আধখানা এড়িয়ে গেল, কাঁকে নিয়ে এসেছে সেটা আর বলল না। গণুদার প্রস্থার বহর দেখেই যাবড়ো গেছে।

কিন্তু যে-কারণেই হোক ওটুকু পরিচয় গণুদার পছন্দ নয়। যেটুকু পাদ-পূরণ করে দিল সেটাই যেন বড় পরিচয়। বিনয়ের আঁচ:

মাখন-গলানো সুখখানি করে বলল, বীর আয়ার ছোট ভাইয়ের মত...।

অমিতাভর চোখে নীরব কৌতুক। বীরপদের কানেও বেখাঙ্গা লাগল, ফিরে দেখে গণুদার দুই চোখ চাশা আনন্দে চকচকিয়ে উঠেছে। বীরপদ অবাক, মতলবখানা কি গণুদার।

ঘরে ঢুকে ছড়ানো বিছানার অমিতাভ আয়েশ করে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। আধ-ময়লা বাজিখ, আধ-ময়লা চামর, ঘরেও এ-পর্বত ঝাঁট পড়েনি। কিন্তু যে এসেছে এ-সব দিকে তার চোখ নেই। ঘুরে ফিরে ছপূরের সেই মজার ব্যাপারটাই বোম্বুনের বস্ত্র হল আবার। বড়সাহেবের ঘর থেকে বীরপদ বেহিয়ে আসার পর ছোটসাহেব একেবারে গুম নাকি। কিন্তু আসলে দেখার মত হয়েছিল লাবণ্য সরকারের সুখখানা। লাভলি...। মাঝার কাজেও সার দিতে পারে না, সত্বর কথাও মা, সী ইজ মোট চামিং হোয়েন সী ইজ অন্ ট্যা বোটস—মামা ছিল বলে কোনরকমে লোভ সামলে বসেছিল অমিতাভ ঘোষ, নইলে কিছু একটা কবেই বসত হত।

দেখলে কে বলবে অতবড় কোম্পানীর দৌর্দণ্ড প্রতাপ টীক কেমিষ্ট এই মাল্লুঘ। হাসছে বীরপদও, আর তাবছে দিনটা শুভ বটে। এমন অপ্রত্যাশিত অতিথিকে এক পেয়লা চা দিয়েও অভ্যর্থনার ব্যবস্থা নেই ঘরে। সঙ্গে গাড়ি আছে যখন, নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলে তাকে নিয়ে আবার ভালো কোনো



বিখ্যাত
'শঙ্খ ও গদু'

মার্কী গেশ্বী

ব্যবহার করুন

রেজিটার্ড ট্রেডমার্ক

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২৯৯৫

চাঁদের কোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে কিনা ভাবছিল। এই মধ্যে আর এক কাণ্ড।

গুণ্ডা ঘরে ঢুকল, তার হাতে ট্রে একটা। ট্রেতে সুপেরালা জা। পিছনে মেয়ে উমা। তার হুই হাতে ছোটো খাবারের ডিশ।

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল, আনন্দ—আমি তো তাই ভাবছিলাম, ধীরবাবু এখনো চায়ের কথা বলছেন না কেন। ধীরবাবু দিকে তাকালো, চাকরমাসির মুখে শুনে শুনে আপনার ধীর নাম বেশ চিট্টি লাগে, ধীরবাবু নামটা বিচ্ছিরি।

ট্রে বেখে গুণ্ডা মেয়ের হাত থেকে খাবারের ডিশ ছুটো নিয়ে সামনে ধরল। নাম নিয়ে মাথা ঘামানোর ইচ্ছে নেই, প্রথম কথাটার স্মৃতি ধরে সবিনয়ে বলল, আপনি এসেছেন কত ভাগ্য, শুকে বলতে হবে কেন—ঘরের তৈরি সামান্য কিনিস, সাহস করে আনতেই পারছিলাম না...

ধীরবাবু হাঁ করে গুণ্ডাকে দেখছে, আতিথ্যের দায় উদ্ধার হল সে-কথাটা মনেও আসছে না। অমিতাভ ঘোষ ওদিকে ডিঃশের খালা-জবাটি গোটাগুটি মুখে পুরে দিয়ে চিবুতে চিবুতে গুণ্ডার বিনয় বচন শুনল। তারপর গভীর মুখে বলল, ঘরে থাকলে নারকেলের সন্দেশ সাহস করে আর ছ'-চারটে নিয়ে আনুন তো।

গুণ্ডা হস্তদস্ত হয়ে ছুটল আবার। অমিতাভ ধীরবাবুকে চোখ রাঙালো, আপনি বেশ আছেন দেখি মশাই, আঁা? এই জ্বলেই এখানে ডেরা বাঁধা হয়েছে।

গুণ্ডার কথা ভুলে কোম্পানীর ছ' আনার অংশীদার, চৌদ্দ শ' টাকা মাইনের বিলেন্ট-ফেরত চীক কেমিষ্টকে দেখছিল ধীরবাবু। বিধাতা খেয়ালী বটে।

সন্ধ্যার পর কুটির আভিনা থেকে গাড়ির শব্দটা মেলাবার আগেই গুণ্ডা হাজির। নাইট-ডিউটি আছে বোধহয়, পরনে পাট-ভাঙা জামা কাপড়। অতিথি-বিদায়ের অপেক্ষায় ছিল হরত। আগের আর চাপা আনন্দে এই মুখের চেহারাই অস্তরকম। গলার স্বরে অস্তরকম বিষয়।—এঁর সঙ্গে তোমার এত খাতির জানহুম না তো! এঁদেরই কারখানায় চাকরি বুঝি তোমার? আশ্চর্য...

ধীরবাবু চেয়ে আছে। স্বার্থের উদ্দীপনা অনেকটা গিল্টিকরা গয়নার মত, নজর করে দেখলে চোখে পড়ে। স্বার্থটা কি সেটাই এখন পর্যন্ত ঠাণ্ড করে উঠতে পারেনি।—আপনি এঁকে চেনেন কি করে?

আমি? শুধু আমি কেন, আমাদের কাগজের অফিসে কে আর না চেনে শুকে। ফর্সা মুখ হাসিতে ভিজিয়ে বিছানার একধারে বসে পড়ল গুণ্ডা।

অন্তঃপর কাগজের অফিসে কতখানি পরিচিত এবং সম্মানিত ব্যক্তি অমিতাভ ঘোষ, সেই বৃত্তান্ত। খাতিরটা বছরান্তে মোটা টাকার বিজ্ঞাপন আসে বলে নয়, গুণ্ডাদের বর্তমান ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের অস্তরকম বন্ধু সে। একসঙ্গে বিলেন্ট গেছে, একসঙ্গে ফিরেছে। আগে মাসের মধ্যে ছ' তিন দিন অমিতাভ ঘোষ কাগজের অফিসে আসত, এলে দেড় ঘণ্টার আগে উঠত না। এখন অবশ্য কমই আসে, যাবার সময় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিজের সঙ্গে করে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। ওই ওষুধের কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে এতটুকু

কুলচুক হলে মালিকের তলবের ভয়ে বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের পর্বত মুখ শুকোর। আরো আছে, শহরের সব থেকে নামজাদা বিলিভি ক্লাবের মেথার ছ'জনেই, কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের—

ছেদ পড়ল। গুণ্ডার দৃষ্টি অস্বস্তি করে ধীরবাবু দেখল দরজার কাছে সোনাবউদি কাঁড়িয়ে। হারিকেনের আলোর ঠিক ঠাণ্ড হল না, তবু মনে হল মুখখানা হাসি-হাসি।

কাগজের অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে অমিতাভ ঘোষের জন্ততার খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই গুণ্ডার এত উদ্দীপনার কারণ বোঝা গেছে। শেষ আবেদনের প্রতীকার ধীরবাবু সশব্দে মুখ বুজে বসে ছিল।

প্রস্ততির মধ্যপথে হস্তপতন।

সোনাবউদি ঘরের ভিতরে এসে কাঁড়িতে গোটা মুখের প্রত্যাশার আলোটা টুপ করে নিবিয়ে দিয়ে গুণ্ডা বলল, অফিসের সময় হয়ে গেল, কাল কথা হবে'খন।

কাল কেন, আজই হোক না—সোনাবউদির গলার কৃত্রিম আগ্রহ, একদিন না হয় ছ' ঘণ্টা দেয়তেই গেলে, না-হয় না-ই গেলে অফিসে একদিন—এ-সব কথা কি ফেলে রাখার কথা নাকি!

গুণ্ডা সরোষে তাকালো তার দিকে, কিছু একটা কটুক্তি করে ওঠার মুখে থেমে গিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে কাঁড়াল। এখানে বকা-ঝকা করলে যার কাছে সুপারিশের প্রত্যাশা সে-ই বিগড়তে পারে ভেবে সামলে নিল বোধহয়। উল্টে হাসতেই চেষ্টা করল গুণ্ডা, বলল, অফিসটাতো আর শব্দব্যাড়ি নয়, অফিস কি জায়গা তোমার এই দেওরটিকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো—

সামনা-সামনি তোমামোদের ব্যাপারে তেমন সুপট নয় গুণ্ডা, ফলে আরো বিসদৃশ শোনালো। জ্বললোক চলে যেতে সোনাবউদির নির্বাক দৃষ্টিবাহ সয়াসরি ধীরবাবু মুখে এসে বিচ্ছিন্ন হল। স্তম্ভব্য কিছু দেখছে যেন।

বসুন না। ধীরবাবু খুব স্বস্তি বোধ করছে না।

বসতে হবে? বিনীত প্রশ্ন। ধীরবাবু মুখে বিব্রত হাসি। সোনাবউদির মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। মুখখানা অপরাধী অপরাধী করে ফেলে বলল, 'বিছানার চাদরটাতো ময়লা দেখি, বালিশের ঙ্গড়াডুঙলোও তাই—আমার কাছে সব ধোয়া আছে একপ্রহ, এনে পেতে দেব?

ধীরবাবু ধতমত খেয়ে গেল কেমন।

ঘরের দিকে চেয়ে সোনাবউদি আরো সঙ্কুচিত। ঘরটারও একটু বাঁট পড়েনি পর্যন্ত, আপনি দয়া করে একটু উঠলে বেড়েমুছে দিতাম।

ধীরবাবু ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

কুঁজোটার জল ভরা আছে তো? হারিকেনে তেল?

ধীরবাবুই আগে হেসে ফেলল, কি ব্যাপার?

সোনাবউদির আরও চোখ ছুটো ওর মুখের ওপর এসে ধামল আবার। ঠোঁটের কাঁকে বিজ্ঞপের আভাস। দেখল একটু। কি ব্যাপার আপনি জানেন না?

আজুক আর না আজুক ধীরবাবু মাথা নাড়ল, জানে না।

তখন তাহলে, সোনাবউদি বড় নিঃশাস ছাড়ল একটা,

গুরুবের দশ দশা, কখনো হাতী কখনো মশা—মশার দশা গিয়ে এখন আপনার হাতীর দশা চলছে।

এক পশলা ব্যঙ্গ ছড়িয়ে নিজেই গজেন্দ্রগমনে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বীরাপদর দুচোখ দরজা পর্বন্ত অমুসরণ করেছে। তার পরেও বসেই আছে তেমনি।

বীরাপদ গণ্ডার কথা ভাবছে।

গণ্ডার প্রত্যাশার কথা বা আবেদনের কথা নয়।

গণ্ডা ঈর্ষার পাত্র, সেই কথা।

গণ্ডার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াটাই শেষে তাগিদের মত হয়ে পড়াল। পাশাপাশি ঘরে বাস করে বীরাপদ তাকে এড়াতে কেমন করে। তার একটু ইচ্ছিতে গণ্ডার জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে, একটা মাসের মধ্যে তাকে একবার অমুরোধও করা হল না দেখে গণ্ডা মর্মান্বিত। ঘুরিয়ে-কিরিয়ে অনেকবার ওকে বলেছে, সুপারিশের জোর না থাকলে আজকাল কারো কিছু হয় না ডাই, এটা সুপারিশের যুগ।

বীরাপদ জানে। জেনেও কিছু করে উঠতে পারে না। কেমন পারে না সেটা গণ্ডাকে বোঝানো শক্ত। এই একটা মাসের মধ্যে সোনাবউদির সঙ্গে কমই দেখা হয়েছে। বীরাপদর অমুমান, তার ওপরেও একটু-আধটু গজনা চলছে। গণ্ডা ভাবে, স্ত্রীটি একবার মুখ ফুটে বললে অমুরোধ করা দূরে থাক, বীরাপদ অমিতাভ ঘোষের কাঁধে চেপে বসত।

গণ্ডার চাকরির উন্নতি বীরাপদর স্বাম্য। গণ্ডার জন্তে নয়, উন্নতি হলে সোনাবউদি আর একটু ভালো থাকবে, ছেলেমেয়েগুলো ভালো থাকবে। শুধু তাদের কথা ভেবেই অমিতাভ ঘোষকে অমুরোধ করার ইচ্ছে আছে। কাঁক পেলে করবেও। কিন্তু ক্যান্ট্রীর পরিবেশে অমিতাভ ঘোষ ভিন্ন মানুষ। শুধু একটা ক্রকুটিতে অমুরোধটা উড়িয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। অনেক ভেবেচিন্তে বীরাপদ গণ্ডাকে আশ্বাস দিয়েছিল, সুবিধেমত আর একদিন তাকে মুলতান কুঠিতে ধরে নিয়ে আসবে। খামখেয়ালী লোক, একবার পারব না বলে বসলে আর তাকে দিয়ে কিছু করানো যাবে না।

কিন্তু সেই আশায়ও সম্প্রতি ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে বসেছে গণ্ডার।

ইতিমধ্যে ক্যান্ট্রীতে বীরাপদর প্রতিপত্তি বেড়েছে কিছু। বাড়ছেও। তারও মূলে চীক কেমিষ্ট। তানিস সর্দার আরোগ্য-পথে। এখনো বেশ কিছুকাল হাসপাতালে থাকতে হবে বটে, কিন্তু প্রাণের আশঙ্কা নেই। তার চিকিৎসার অপ্রত্যাশিত সুব্যবহার

ফলে কর্মচারীরা দল বেঁধে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিল অমিতাভ ঘোষকে। তানিস সর্দার সর্দারগোছেই একজন। সে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে তাকে বসা-কাজে লাগানো হবে, এমন কথাও শোনা গেছে।

অমিতাভ ঘোষ সয়াসরি বীরাপদকে দেখিয়ে দিয়েছে। বা কিছু হয়েছে তার জন্তেই হয়েছে, আর খেটুকু হবার আশা তার জন্তেই হবে। অতএব সব কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ তারই প্রাপ্য। কর্তাদের সঙ্গে কি ভাবে ঝকঝক করে সুব্যবহারটুকু আদায় করেছে বীরাপদ, মনের আনন্দে অমিতাভ ঘোষ তাও নিঃসঙ্কোচে বলে দিয়েছে।

ফলে কর্মচারীরা নতুন চোখে দেখেছে বীরাপদকে। নিল্মহতার দক্ষন ছোটসাহেবের প্রতি অস্ত্রধার লাভণ্যর প্রতিও অনেকদিনের কোত্ত তাদের। অভিযোগ নিয়ে অথবা সুব্যবহার আরজি নিয়ে এ পর্বন্ত বহুবার তারা দল বেঁধে চড়াও হয়েছে। সব অভিযোগ আর সব আরজিই যে বৃক্তিসঙ্গত তা নয়। টানা-ইছড়ার কখনো কিছুটা আদায় হয়েছে কখনো বা হয়নি। কিন্তু হোক না হোক, তাদের অভিযোগ লাগামটি যে শেষ পর্বন্ত মালিকের হাতেই, সেটা তাদের উপলব্ধি করতে হত। এরই মধ্যে মালিকের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের জন্তে সুবিধে আদায় করেছে একজন, সেটা যেমন অবিখ্যাত তেমনি আনন্দে। তানিস সর্দারের এই প্রাপ্তিটুকু অসময়ে নিজেদেরও একটা প্রাপ্য মজির হিসেবে দেখেছে তারা।

তাদের সোজানুজি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উৎসাহ বেঁধে বীরাপদ অপ্রত্যাশিত একশেষ। জনতার কৃতজ্ঞতার ভেজাল নেই।

অতঃপর ছোটসাহেবের বিরূপতার আঁচ লাগবে সাথে এটা বীরাপদ ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু তার আভাস মাত্র না পেয়ে মনে মনে অবাক হয়েছে। অবশু পরে এর একটা কারণ অমুমান করেছে। ছেলেটার বয়স তো মাত্র আটশ উনত্রিশ, তার ওপর অলস গোছের একটু, একটু বিলাসীও। ভিতরে ভিতরে সবল নয় খুব। বা কিছু জোর আর প্রতিপত্তি সব বাপের জোরে, তাঁর প্রবল-সত্তার নিরাপদ ছায়ায় বসে। সেই বাপই যখন প্রত্নয় দিচ্ছেন, তার তিক্ততা বাড়িয়ে কাজ কি। অস্ত্রের দায়িত্বের ওপর নির্ভর করে নিজের আধিপত্যের ঠাটটুকু বজায় থাকলেই সে খুশি। সেদিক থেকে বাপের সেদিনের ফয়েসলার ফলে লোকটাকে উন্টে আরো একটু বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে হয়ত। বীরাপদর খানিকটা দায়িত্ব বেড়েছে আর ছোটসাহেবের কিছুটা অবকাশ বেড়েছে।

কিন্তু বাপের প্রভাব বত বড়ই হোক, ছেলের বা কিছু উদীপনার উৎস লাভণ্য সরকার। সেই লাভণ্য সরকারও ছোটসাহেবের মনে বিরূপতার ইচ্ছন জোগানো দূরে থাক, বীরাপদর সঙ্গে তারও ব্যবহার ক্রমশ যেন সহজ হয়ে উঠতে লাগল। এক আধ সময়

ডাঃ কার্তিক বসুর

টার্কোপ্রোডা

অল্প, অর্জীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায়

নানালা

ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা ৯

বোটা দিয়ে কথা বলতে ছাড়ে না অবশ্য, কিন্তু যাই বলুক হতভাগ হলে বলে, হাসিমুখে বলে।

বড়সাহেবের ঘরে তানিস সর্দারের কেস্ নিয়ে কথা কাটাকাটির দিন দুই পরে লাভণ্য ওর ঘরে এসে বসেছিল। কাজের কথা নিয়েই এসেছিল বটে, কিন্তু বীরাপদর ধারণা এমনই এসেছিল। সর্দারের প্রসঙ্গ নিয়েই উত্থাপন করেছে। মস্তব্য, লোকটার বরাত ভালো, ওদের জন্তে কে আর এতটা করে।

প্রকারান্তরে সমর্থনের সুরই।

বীরাপদ বলেছিল, হাসপাতালে ওর বউটার সেই কাহ্না দেখলে আপনিও না করে পারতেন না—

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর হৃদয়বিশ্ব মেশানো কৌতুক-বাণ মিসিক্ত হয়েছে একটা।—তাই ঠাকি! আপনি আসলে সেদিন ওর বউটার সেই কাহ্না দেখেই এমন কেপে গিয়েছিলেন তাহলে—

বীরাপদ হালকা প্রতিবাদ করতে ছাড়েনি। আমি কেপতে যাই কেন, আপনাদেরই বরং মেজাজ বিগড়েছিল।

আমারও? নিরীহ বিশ্বয়, আমার বিগড়তে যাবে কেন, আমার কী?

ভিতরে ভিতরে উৎক্ল হরে উঠছিল বীরাপদ। আমিও তাই ভাবি, আপনার সঙ্গে অন্তত আমার কোনো বিরোধ থাকার তো কথা নয়।

ইঙ্গিতটুকু গায়ে না মেখে লাভণ্য সরাসরি চেয়েছিল মুখের দিকে, অবলার প্রতিমূর্তিটি।—অথচ বিরোধ দেখছেন?

বীরাপদ হেসে ফেলেছিল, আমি দেখি না দেখি আপনি যে আমাকে ভালো চোখে দেখেন না সেটা তো ঠিক।

সঙ্গে সঙ্গে নারী-মুখের এক বিচিত্র মাধুর্য-তরঙ্গ দেখেছিল বীরাপদ। লোভ সামলে দৃষ্টি কেব্রাতে পারেনি অনেকক্ষণ। চাপা হাসিতে দুই ঠোঁট টসটসিয়ে উঠতে দেখেছিল। মুখে সঙ্কট-রেখা। চোখের পাতার কৌতুক কাঁপছিল।—আপনাকেও ভালো চোখে দেখতে হবে?

অসহায় দীর্ঘনিঃশ্বাস। অর্থাৎ, কত আর পারি।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে তারপর। আচ্ছা, দেখব চেষ্টা করে।

ইচ্ছে করলে বা প্রয়োজন হলে লাভণ্য সরকার কতটা পারে সে-সম্বন্ধে বীরাপদর মোটারুটি একটা ধারণা ছিল। সিতান্ত মিত্রর মোটরে তাকে এক-রকম দেখেছে, হিমাংগ মিত্রর মোটরে আর এক-রকম। মেডিকেল হোমের নিম্পহ কজীর গাভীরে তাকে এক-রকম দেখেছে, চিকিৎসার পসারের আর এক-রকম। ওষুধের লাইসেন্স বার করে আনার সুপারিশে গিয়ে তাকে একরকম দেখেছে, অমিতাভ ঘোষের ছবির অ্যালবামে আর এক-রকম।

আর, এই আরো এক-রকম দেখল।

বীরাপদর ইচ্ছে হচ্ছিল, তাকে ধরে চেয়ারে এনে বসিয়ে দেয় আবার। দিয়ে বলে, চেষ্টাটা আজ থেকেই শুরু হোক।

লাভণ্য সরকারের সঙ্গে আপসের সূত্রপাত সেই। তারপর এ পর্যন্ত ওতে বড় রকমের কোনো বা পড়েনি বটে, কিন্তু মাঝে-মাঝে চিড় খেত। তার কারণ, লাভণ্য সরকারের হাঙ্কা ঠাটা বা টিপ্পনীর

জবাবে বীরাপদও একেবারে চুপ করে থাকত না। আর বলত এখন কিছু, একেবারে ইঙ্গিতশূন্য হত না সেটা। কিন্তু তা বলে লাভণ্য সরকারের হাসিমুখের ব্যতিক্রম দেখেনি খুব। কখনো সহ্যে হজম করেছে, কখনো বা ছন্দরাগে জোথ রাড়িয়েছে, আপনি লোক সহজ নয় অনেকদিনই জানি, লাগতে আসাই ভুল।

কিন্তু সেদিন এর স্পষ্ট ব্যতিক্রম দেখে বীরাপদ অবাক।

উপলক্ষ অমিতাভ ঘোষ।

তারই উদ্ভূমে এদিককার কাজের ধারারও একটা স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। সেদিন মোটরে বীরাপদর অধুবোণ, আবেদন, আর নিজের প্রতিজ্ঞাভি ভোলেনি সে। বীরাপদ কাজ দেখাতে চেয়েছিল, তাকে দিয়ে কাজ দেখিয়েই ছাড়ছিল। চণুরের মধ্যে নিজের কাজ সেয়ে রাত নটা-নশটা পর্যন্তও বীরাপদর ঘরে কাটাতে দেখা গেছে তাকে। এর পর ক্রমশ চিরাচরিত বিজ্ঞাপন-নস্বার তফাত লক্ষ্য করেছে সকলে, প্রচার-বিবৃতির উন্নতি দেখেছে, আর সব থেকে বেশি দেখেছে কাটনিং আর লেভেলিং-এর বিশেষ আকর্ষণ-বিকাশ। নিজের হাতে কাঁচি ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক-একটা লেভেল মস্ক করেছে অমিতাভ ঘোষ, কাগজের ঘড় নিয়ে আর শেও নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, এমন কি কোন্ প্যাঙ্কিং-এ বাটার-পেশার বদলে সেলোফেন দেবে তাই নিয়েও অনেক ভেবেছে। এমন সমাহিত তদ্ব্যবস্থা বীরাপদ আর বড় দেখেনি। হিমাংগ বাবুর ইঙ্গিতে অভ্যুক্তি ছিল না। ইচ্ছে করলে সে-ই করতে পারে কিছু, পারলে সে-ই পারে বটে। উন্নতির জন্ত কি ভাবে ভাবতে হবে আর কোন্ পথে মাথা ষাটাতে হবে সেই হৃদয় অন্তত বীরাপদ পেয়েছে।

তাদের এই নতুন উদ্যোগের ফলাফল বোঝা গেছে মাস দেড়েকের মধ্যেই। মনে মনে একটু ভয়ই ছিল বীরাপদর, পরিবর্তনের কলে খরচ কিছু বাড়ছিল, সেটা উত্তল হবে কি না। সেল-গ্রাফর দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত, সেটা মাথা উঁচিয়েছে। পরিচিত ডাক্তারদের মস্তব্য অমুকুল, লেভেলিং কাটনিং সুন্দর হচ্ছে, ফোলডার ভালো হচ্ছে। অন্তর্দিকে 'জি-আর' কমেছে। অর্থাৎ প্যাঙ্কিং-সৌষ্ঠবের দরুন গুডস্ রিটারন্ড বা মাল ফেরত কম আসছে।

ক্যাঙ্করীতে সেদিন হিমাংগ মিত্র নিজেরই বীরাপদর ঘরে এলেন। সঙ্গে লাভণ্য। বড়সাহেব ক্যাঙ্করীতে এলে সাধারণত সে-ই সঙ্গে থাকে। বীরাপদর পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করলেন হিমাংগ মিত্র, তার সুবিধে-অসুবিধের খোঁজ নিলেন, নতুন প্র্যান ভাবতে বললেন, টাকার জন্তে ভাবনা নেই সে-কথাও জানিয়ে দিলেন। এমন কি কিছু একটা অন্তরঙ্গ রসিকতার মুখে লাভণ্যকে দেখেই যে খেমে গেলেন তাও বোঝা গেল।

দরজা পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এলেন আবার। ভালো কথা, ওই সর্দার লোকটি কেমন আছে?

ভালো।

গুড! চলে গেলেন।

একটু বাদেই লাভণ্য সরকার ফিরে এসে তার সামনের চেয়ারটার বসল। কোনো একটা দরকারী কথা নিয়েই এসেছে বেন।—আপনার মুখখানা একবার দেখতে এলাম।

বীরাপদ তেমনি জবাব দিল, এমন অবিচার কেন, সেটা কি দেখার মত?

আজ বেশ দেখার মত, হিংসের আমার গা জলে যাচ্ছে।

ধীরাপদ হেসে ফেলল। লাবণ্যও। ধীরাপদ বলল, সাহেব তো নতুন প্যান ভাবে বলে গেলেন, এরই কোনো ওষুধ বার করা যায় কিনা ভাবা বাক আসুন তা হলে।

নিছক ঠাটাই করতে গিয়েছিল, আর কোনো অর্থ হয় কিনা ভেবে বলেনি। লাবণ্যকে মুখ টিপে হাসতে দেখে লজ্জা পেল একটু। তবু ভালো লাগছিল।

গত দেড় মাসে এখানকার কাজে স্ক্রল বা কিছু হয়েছে অমিতাভ ঘোষের জন্মেই হয়েছে, সেটা হিমাংশু মিত্র যেমন জানেন লাবণ্যও তেমনি জানে। তাকে যে এর মধ্যে টেনে আনতে পেরেছে সেটাই ধীরাপদের সব থেকে বড় কেরামতি। লাবণ্যও সেটা মনে মনে অস্বীকার করে না। তবু একটা টিপ্পনীর লোভ সংবরণ করে উঠতে পারল না।—বসে বসে বড়-সাহেবের প্রশংসা তো খুব শুনলেন, আপনার গুরু নাম তো কই করলেন না একবারও?

যত হাসা করেই বলুক, কথাটা ঠিক করে লাগার মতই ছিল। এই খোঁচাটা দেবার জন্মেই আবার ফিরে আসা কিনা বুঝতে চেষ্টা করল ধীরাপদ। হাসিমুখে সেও পাণ্টা লঘু প্রশ্ন ছুঁড়ে বসল একটা, কাজ ফুরোলে গুরুর নাম কে আর করে। আপনি করেন?

ঠাণ্ডে খতমত খেয়ে গেল লাবণ্য সরকার। থমকালো। শাদা আলোর ওপর মেঘের ঘন ছায়া পড়লে যেমন ঘোলাটে দেখায় তেমনি দেখতে হল মুখখানা। ফেঁড়কাল হোমের সামান্য কর্মচারী ভ্রমে তার পৃষ্ঠতা দেখে বে-চোখে তাকাতো সেই চোখে তাকালো। তারপর একটা কথাও না বলে চুপচাপ উঠে চলে গেল।

ধীরাপদ যতই অপ্রস্তুত হোক, মনে মনে অস্বস্তি হয়েছে অনেক বেশি। এতটাই লাগবে ভাবেনি। লাগলেও সেটা প্রকাশ করার মেয়ে নয় লাবণ্য সরকার। কিন্তু কতটা বিধেছে স্ব-চক্ষেই দেখল।

অপরাধ-চেতন অসহিষ্ণুতা? নাকি ও সব জানে টের পেল বলে?

এর পর তিন-চার দিন একেবারে অন্তরকম। লাবণ্য সরকার যেন চেনেও না ভালো করে।

এ ভাবেই কাটত হস্তত আরো কিছুদিন। কাটল না যে-জন্মে সে-ও এক মন্দ ব্যাপার নয়।

গণ্ডার ঐর্ষ্য গেছে তার আঁচ পাচ্ছিল। তা'বলে বে-পরোয়া হলে শেষ পর্যন্ত সে কাক্তিরীতে হানা দেবে ভাবেনি। তাকে সঙ্গে করে যবে এনে হাজির অমিতাভ ঘোষ নিজেই। তার বাক্যছটা থেকে বোঝা গেল, বাইরে গেট-কিপারের জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল গণ্ডাকে। তারা শীতবাবুও চেনে না, ধীরাপদও চেনে না। চক্রবর্তী সাহেব বা সুপারভাইজার সাহেবকে চেনে। নিরুপায় গণ্ডা শেষে অমিতাভ ঘোষের নাম করতে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে এখানে।

গণ্ডা বিব্রত মুখে হাসতে চেষ্টা করছিল, কসী মুখ লাল। ধীরাপদ বড় চাকরি করে এটুকুই জানা ছিল, এমন পরিবেশে আর এমন ঘরে বসে চাকরি করে ভাবতে পারেনি।

কিছু বলতে হলে এই অল্পকূল মুহূর্ত। ধীরাপদ সিগারেটের টিন এগিয়ে দিল তাড়াতাড়ি, বসুন, গণ্ডা কিন্তু আসলে আপনার কাছেই এসেছেন—

আমার কাছে! সিগারেট ধরিয়ে ফিরে তাকালো, আমার কাছে কী?

গণ্ডার দিকে চেয়ে হাসি পাচ্ছিল, লজ্জায় একেবারে অধোবদন। কি, সেটা ধীরাপদই ব্যস্ত করল। আর করল যখন জোর দিয়েই করল। গণ্ডার মত এমন যোগ্য লোকের প্রতি এই দীর্ঘকালের অবিচার শুধু মাত্র তাঁর সুপারিশের জোর নেই বলে। উপসংহার, অমিত ঘোষের সঙ্গে আলাপের পর এখন আর জোর নেই বলা চলে না।

অমিতাভ সিগারেট টানল আর গণ্ডার মুখে শুনল। গাঙ্গীর্ষটুকু একজনের সঙ্কোচ এবং আর একজনের শঙ্কার কারণ। ধীরাপদের বস্তুবা শেষ হতেই বলে উঠল, আমার ঘাড়া কি-সু-সু হবে না। গণ্ডার দিকে ফিরল, চারটে-ছ'টা নারকেলের সন্দেশে এত হয় না, এক কুড়ি চাই। চেয়ারে ঠেলে উঠে ঝাড়াল, আসুন—

ধীরাপদ ইশারা না করলে গণ্ডা বোকার মত বসেই থাকত হস্তত। উঠে শশব্যস্তে অমুসরণ করল। তার মতি-গতি গণ্ডার বোকার কথা নয়, ধীরাপদ বুঝেছে। পাশের ঘরের টেলিফোনে সুপারিশ-পর্বটি এফুনি সমাধা করে ফেলতে চলল।

শেষ পর্যন্ত এত সহজে দায় উদ্ধার হবে ভাবেনি। আরো নিশ্চিন্ত, কারণ, অমিতাভ ঘোষকে ওভাবে উঠতে দেখেই ধরে নিয়েছে, সুপারিশ ব্যর্থ হবে না।

কিন্তু এক মিনিটও হয়নি বোধহয়, ধীরাপদ হকচকিয়ে গেল একেবারে। গণ্ডা ফিরে এসেছে। সমস্ত মুখ শুকনো আমসি। কি হল?

জবাবে গণ্ডা পাণ্ড মুখে শুধু মাথা নাড়ল একটু। অর্থাৎ, হল না কিছু। তারপর চেয়ারে এসে বসে বিড়বিড় করে বলল, কি আর হবে, কপালই মন্দ।

মন্দ কপালের বিবরণ শুনে ধীরাপদও নির্বাক। বেশ হাসিমুখি

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
দ্বারা বিশুদ্ধ
মতে প্রস্তুত

বাকলা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ
রোগী আরোগ্য
লাভ করেছেন

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৩৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, তেঁকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে মারা হতাস হয়েছেন, তাঁরাও স্বাস্থ্যকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। নিফলে মূল্য ফেরৎ। ৩২ ডালার প্রতি কৌটা ৩ টাকার, একডো ৩ কৌটা - ৮।। আনা। ডাঃ. মাঃ. ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়।

হেড অফিস-বল্লিশাল (পূর্ব পাकिستان)
ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকতা-৭

মুখেই ভক্তলোক গণ্ডাকে সঙ্গে করে পাশের ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। ঘরের মধ্যে ফিটফাট সাহেবী পোষাক-পরা একজন লোক একটি মেয়ের সঙ্গে খুব গল্প করছিল। মেয়েটি চেয়ারে বসে ছিল, আর লোকটি মেয়েটির টেবিলের ধারে বসে তার দিকে ঝুঁকে কথা কইছিল আর হাসছিল। মেয়েটিও হাসছিল। তারা ওভাবে ঢুকে পড়তে লোকটি বিরক্ত মুখে ফিরে তাকিয়েছিল, তারপর একটু অবাক হয়েছিল হয়ত। গণ্ডার মুক্কাটি তক্ষুনি চিড়বিড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাকে বলেছে পরে আর একদিন দেখা যাবে। তারপর গনগনিয়ে বারান্দা পেরিয়ে তর-তরিয়ে নিচে নেমে চলে গেছে।

ধীরাপদ শুধু একটাই কথা ভিজ্জাসা করতে যাচ্ছিল, যবে মেম-টাইপিষ্ট ছিল কি না। কি ভেবে সেটা আর ভিজ্জাসা করল না। আশাস দিয়ে মন্দ-কপাল গণ্ডাকে বিদায় করল আগে। তারপর হাতের কাজ একদিকে সরিয়ে রেখে কলম বন্ধ করল। কাজ আর আজ হবে না।

চীফ কমিষ্টের হঠাৎ অমন মেজাজ বিগড়েছে নীতির কারণে নয়। প্রগলভ অন্তরঙ্গতাটুকুই বরদাস্ত হয়নি। কিছু যেন ভাবার আছে ধীরাপদের। ভাবনাটা অমিত ঘোষকে নিয়ে। অমিত ঘোষকে নিয়ে আর লাভণ্য সরকারকে নিয়ে। অমিত ঘোষকে নিয়ে আর ফোটা অ্যালবামের পার্বতীকে নিয়ে।

কুয়াশার ওপর ভাবনার আলোটা জমে উঠতে না উঠতে সুবাহিত বিদ্র আবার। অবশ্য ষড়ির দিকে চোখ পড়লে ধীরাপদ দেখত, কোথা দিয়ে ষট্টাধানেক পার হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

হু'খানা চিঠি হাতে লাভণ্য সরকার ঘরে ঢুকল। তিন-চার দিন আগে সেই উঠে গিয়েছিল, আর এই এলো। সেদিনের সেই রুচ বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই। লঘু, রমণীষ ছন্দে আবির্ভাব।

চিঠি ছুটো তার সামনে টেবিলের ওপর ফেলে দিল।—আপনার জল্পে চাকরি-বাকরি শেষ পর্যন্ত থাকলে হয়, আপনি আসার আগে এখানে যেন কাজই হত না কিছু।

হাঙ্কা বিন্ময়ে ধীরাপদ চিঠি ছুটোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার। মাঝুলী প্রশংসার চিঠি হু'-পাঁচ লাইন করে। নানা

আয়গা থেকে এ-রকম ভালো-মন্দ চিঠি দিনে এক-আধ ভজন এসে থাকে। তা ছাড়া এই চিঠির প্রশংসাও আলাদা করে ধীরাপদই প্রাপ্য নয়।...চিঠি ছুটো উপলক্ষ মাত্র, চিঠি হাতের কাছে না থাকলেও এই আগমন ঘটতই। ধীরাপদ হেসে ভাকালো, বসুন—

বসব না, বেকুব একুনি—খুশি তো ?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, তারপর মন্তব্য যোগ করল।—এই চিঠির জল্পে নয়, আপনাকে খুশি দেখে।

উৎকল্ল বিন্ময়, আমাকে আবার অখুশি দেখলেন কবে ?

ধীরাপদ মনে হল কিছু একটা আনন্দের উৎসে নাড়া পড়েছে। সেই প্রশংসার উঁকিঝুঁকি। বিগত ক'টা দিনের বিরূপতা সত্ত্বেও এখন এ-ঘরে একবার আসার লোভ সংবরণ করতে পারেনি। এসেছে দেখতে। দর্পণে দেখতে।

ওকে দেখার ভিতর দিয়ে আর কাউকে দেখার তুষ্টি।

জবাব শুনবে বলেই যেন টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধীরাপদ যা খুশি বলতে পারে এখন, একটুও বিধবে না।

কিন্তু কিছু বলার আগে সিতাংগ মিত্রকে দরজার এধারে দেখা গেল।

লাভণ্য সরকার সোজা হয়ে দাঁড়াল।—রডি ? চলুন। হাসতে হাসতে বলে গেল, খুশিতত্ত্ব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

চেয়ার ছেড়ে পায়ে পায়ে ধীরাপদ জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। নিচটা দেখা যায়। গাড়ি-বারান্দা থেকে সিতাংগ মিত্রর শাদা গাড়ি বেরুলো। সিতাংগ চালকের আসনে, পাশে লাভণ্য। সেই প্রথম দিনের বোগাযোগে এই গাড়িতে দুজনকে একসঙ্গে দেখেছিল। ঠিক এক রকম নয়। আজ লাভণ্য হাসছে। ষাড় ফিরিয়ে যে-দিকে তাকাচ্ছে সেই দিকে চীফ কমিষ্টের অবস্থান। দোতলার জানালা থেকে ও-দিকটা চোখে পড়ে না।

অমিত ঘোষ কি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ? দেখছে ?

বোধহয় না।

কিন্তু লাভণ্য সর্কোতুকে ষাড় ফিরিয়ে আছে। চাইছে, দেখুক।

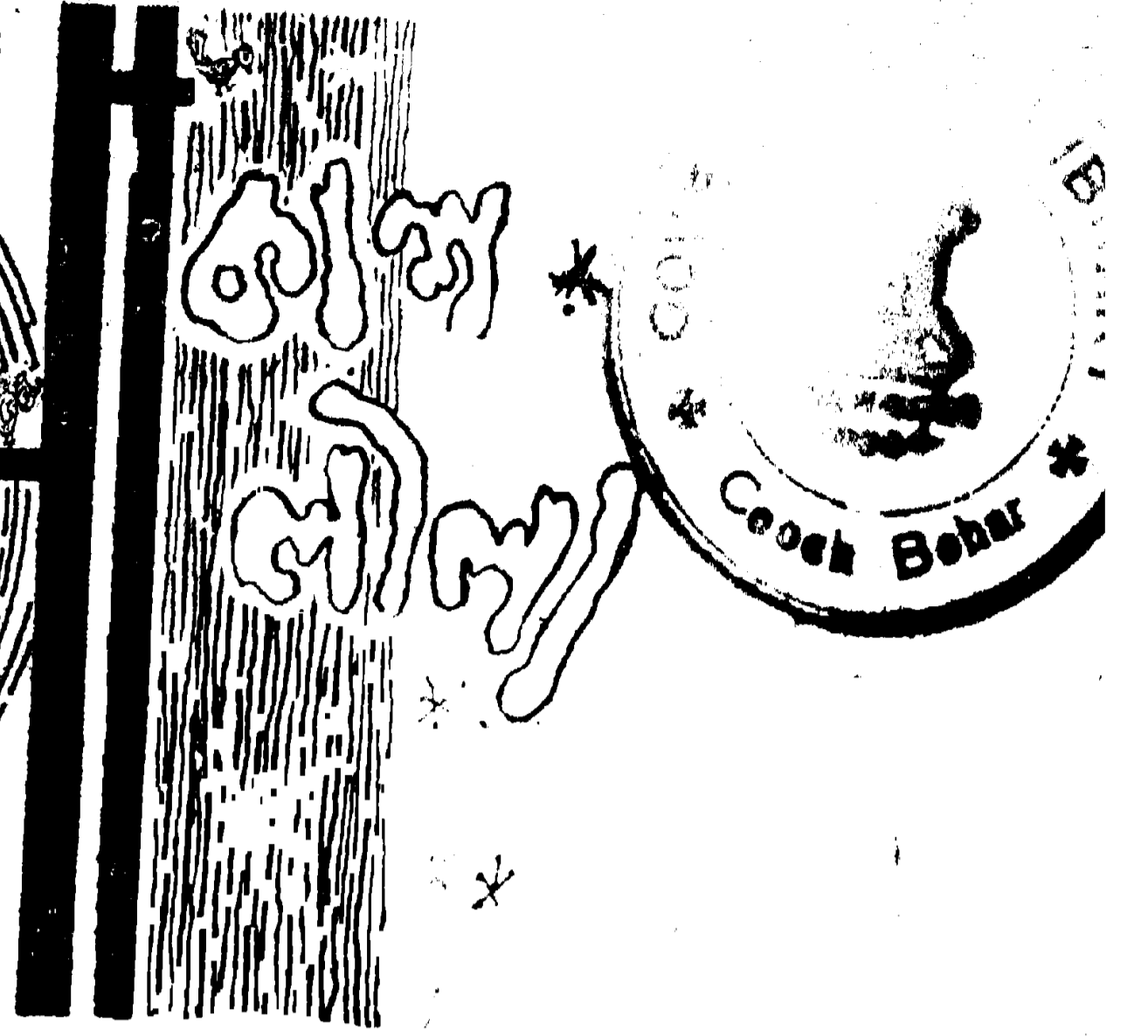
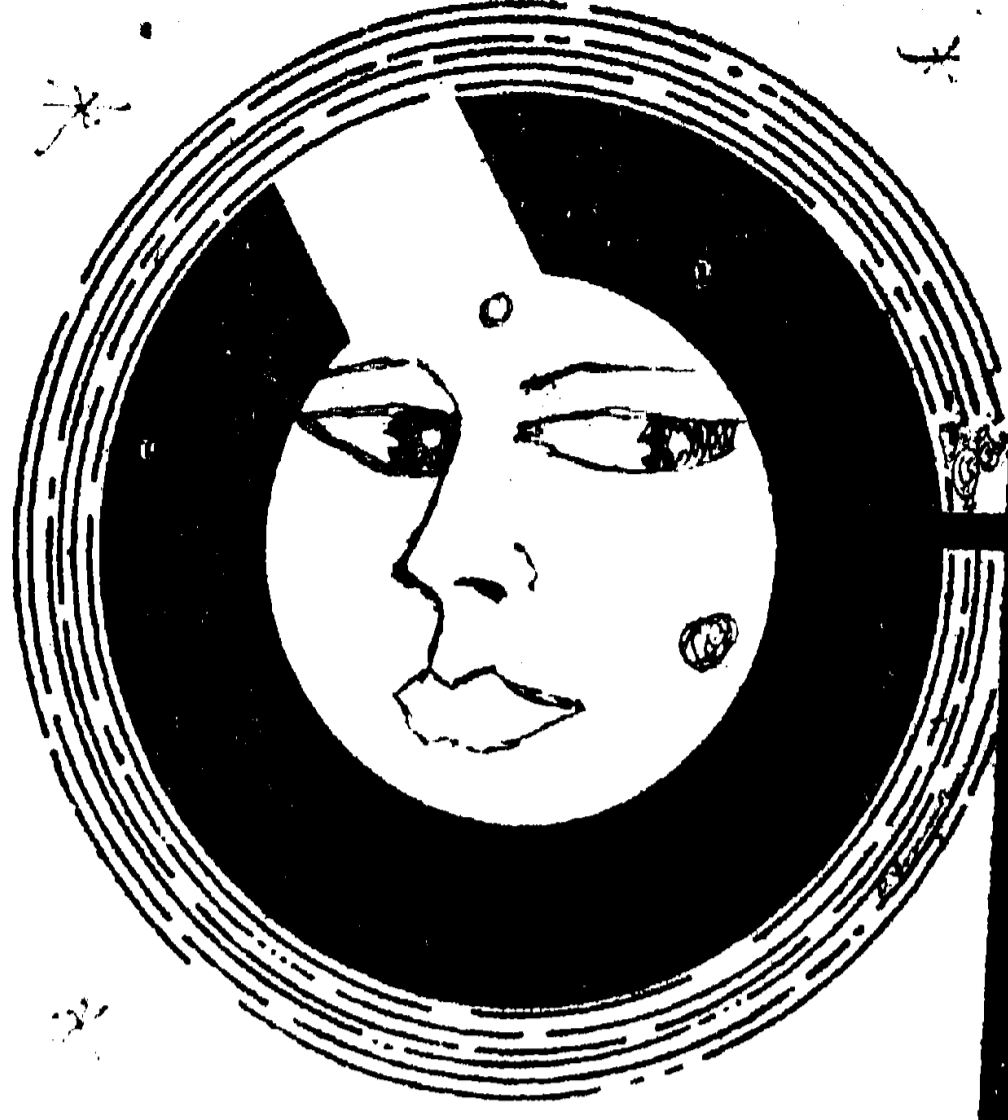
[ক্রমশ:]

বাংলার তাঁতশিল্প

বাংলার তাঁত থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে যথাসম্ভব একান্তভাবেই সেই কাপড়ই বাঙালী ব্যবহার করবে বলে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালীর অন্নপ্রবাহ যদি অল্প প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি।

বাঙালীর ঔদাসীন্ডকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। কলিকাতার ও অগ্রাঙ্গ প্রাদেশিক নগরের মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীয় সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্ন জব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা এবং বাঙালী যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো, যাতে বিশেষ করে তারা বাঙালীর হাতের ও কলের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।

—রবীন্দ্রনাথ



শ্রীমঞ্জলিকা দাশ

তুমি আমার চিনতে পারবে না সুপ্রিয়! বিস্মিত হয়ে ভাববে,—হাজার সমুদ্রের সুরভতা কেমন করে মরা-নদীতে এসে ঠেকেছে! অসহায় এক ভীক-জিজ্ঞাসা ছোপধরা ছিপির মত আমাকে জড়িয়ে ধরেছে! এমন একদিন ছিল যখন দুর্দান্ত হৃদয়বেগ আমাকে অপ্রত্যাশিত ঠকানো ঠকিয়ে গিয়েছিলো, যার প্রথম ধাক্কায় মনে হয়েছিল এর তুল্য আঘাত বুঝি পৃথিবীর কোন বড় বেদনাতেই নেই। যে হৃদয়বেগ একদিন আমার মৃত্যুতুল্য বঞ্চনা দিয়েছিলো সেই আবেগের অভাবই আমাকে আজ হৃদয়হীন করে তুলেছে—যার ফলে আমি এমন বুদ্ধিমতী আর অনেক পরিমাণে দূরদর্শী হয়ে উঠেছি। রাতারাতি এমন পরিবর্তন অবিশ্বাস্য মনে হলেও পুরোপুরি বিশ্বাস্য! দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে তোমার যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তাতে নিগুণ অসুভূতিতে বীরে-সুহৃৎ একটা প্রীতি রূপ নিচ্ছিলো আমাদের সৌহার্দ্যের মধ্যে। বাইরের আদান-প্রদানটা তখনও অনেক দূরে দূরেই ছিল—বিনিময়টা তখন পর্যন্ত মনের সীমাতেই বন্ধ ছিল বলা যেতে পারে। চোখের আলোকেই হৃদয়কে আমরা অন্তরে চিনে নিয়েছিলাম। দেখা পাওয়ার জগতে হৃদয়ে হৃদয়ের কাছে দুর্লভ ছিলাম না বললেই চলে। তাই চোখে হারাবার কথা কোন মতেই ভাবতে পারতাম না,—ভাবতাম না। সত্যি কথা বলতে কি,—বিচ্ছেদের ভাবনা তখন পর্যন্ত মনকে বিভ্রান্ত করেনি। মেটাল ইলেকট্রিসিটি বলে একটা কথা আছে—তুমি বিশ্বাস কর কি না জানি না। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি,—যখন বিচ্ছেদের কথা ভাবতাম না তখনও করতাম,—আজ বিচ্ছেদের দিনে সেই একই কথা ভাবি। বিশ্বাস করে আর কিছু না হোক—মনে মনে অগাধ তৃপ্তি পাই। মনকে নিবিচারী করি, আর একমনে স্মৃতি রোমন্থন করি।

মনে হয়—মেটাল ইলেকট্রিসিটি বলে যদি কোন শব্দ থাকে এবং সেই শব্দের অস্তিত্বে যদি আমি সম্পূর্ণ আস্থাবান হই, তাহলে আমি যে মুহূর্তে তোমার কথা ভাবছি কিবা তুমি আমার কথা ভাবছ—আর ভাবছ বলেই আমিও এমন আকুল ভাবে তোমাকে ডাকছি। হৃদয়ের অগোচরে হৃদয়ের গহনে সেই মেটাল ইলেকট্রিসিটি সর্বসরি কাজ করে যায়। তুমি হয়ত

মনে মনে হাসতে পার। কিন্তু তুমি কি এ কথা বিশ্বাস করো না, যখন একজনের অল্প কোন এক বিষয় সন্ধ্যায় মনের ভেতরে কেমন এক ধরণের এলোপাথাড়ি হাহাকাহ জেগে উঠলো? তখন সেই অদৃশ্য বৈদ্যুতিক টানটা হৃদয়ের মনের ভেতরে একই সঙ্গে ক্রিয়ালীল হয়ে উঠেছে। তাই যদি না হবে, তাহলে মাঝে মাঝে এমন কেন হয়? ধরো ক'দিন থেকে বিশেষ কারণ অল্প মন কেমন করছে, ঠিক ক'দিন বাদেই সে নিজেকে এসে দেখা দিয়ে গেল কিবা তার ভারাক্রান্ত মনের নিদর্শনস্বরূপ একটা চিঠি এসে উপস্থিত হল তোমার কাছে।

প্রথম প্রথম এই বিশ্বাস এবং সান্তনার জোরেই সকাল, বিকেল, সন্ধ্যারাত্রি স্মৃতিপূজা করেই কেটে যেত মর্মভেদী যন্ত্রণার করুণ প্রহর! তুমি যেমন ভাবে আমার অবহেলা করেছিলে তেমনি দয়াহীন নির্মমতায় আমি তোমার স্মৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে শিখলাম। কিন্তু জীবনের বেদনা ভোলা সম্ভব হলেও স্মৃতির বেদনা ভোলা একান্তই অসম্ভব বুঝি বা! স্মৃতিপূজা করে অহনিশি জীবনের পথে আমরণ চলা, এমন অর্থহীন পথে জীবন চলে না। এমন অনিশ্চিত উত্তরকাল নিয়ে জীবন অন্ধকার করে বসে থাকা যায় না। এমন সাহচর্যহীন জীবন নীরস, ভয়াল আর বিবাক্ত। ক্রমশঃ বুঝতে শিখলাম—নিষ্ঠা আর ভালবাসা, এ দুটো শব্দ পরস্পর মনঃপূত নয়। ভালবাসলেই যে নিষ্ঠা দিয়ে ভালবাসতে হবে—এর কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। আর মনোনিষ্ঠ জনকেই যবে জীবনে জীবন যোগ করে পেতে হবে এমন কোন নিশ্চিত বিশ্বাস নেই। আর মধুস্মৃতি চিরকাল মধুময় হয়ে থাকে না। যে স্মৃতির ভাবে জীবনটাকে একদিন হাক পাখির পাখার মত লঘু বলে মনে হয়, সেই স্মৃতিই সমস্ত প্রত্যাশাকে ছর্ব্বহ করে তোলে। সেই প্রথম তোমার সঙ্গে আমার অদর্শনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে সুপ্রিয়! সেই রোগশয্যা অপারেশনের সাদা টেবিল, চকচকে ধারালো ছুরি, গরম জল, ব্যাগেজের গজ-কাপড়, তুলো রাশি রাশি। অপারেশনের টেবিলে শুইয়ে দেওয়ার আগে আমার বুকের সমস্ত হাড়গুলো কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল একটা উত্তেজিত আশঙ্কা। আমাকে

আনালসিয়া করে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার আগে ডাক্তার আর নার্সদের সাহায্যকারী চোখ দুটোর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়েছিলাম। কতক্ষণ জানহারা হয়ে সাদা টেবিলটার ওপর শুয়েছিলাম মনে ছিলো না—জ্ঞান হতেই দেখি, হাসপাতালের বেডে বৃক্ক আঠেপৃষ্ঠে ব্যাণ্ডেজবান্ধা হয়ে শুয়ে আছি। জ্ঞান হারাবার আগে নির্ভয় হবার জ্ঞান মনে মনে শুধু তোমাকে স্মরণ করেছিলাম। আর মস্ত রক্ত হুলবরটার রোগীদের সঙ্গে পাশাপাশি বেডে শুয়ে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার কথা মনে করেছিলাম সুপ্রিয়! অদূরের কোন্ এক রোগী বলছে : এ নতুন পেসেন্ট বুঝি ?—

—হ্যাঁ। অপারেশন হ'লো!

—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ। নার্সের গোটা অ্যাপারনটো একেবারে রক্তে ভিজ্ঞে খই-খই করছিলো। ভয়ে আমি শিউরে উঠে অতিকষ্টে ঘুমজড়ানো চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম। চোখ টেনে মেলা যায় না, হু' চোখে যেন রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হয়েছে। গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ! সেখানে যেন গ্রীষ্মের পিপাসা এসে ভিড় জমিয়েছে। সেই জ্ঞানহারা নিশি—ঘুমের থেকে প্রথম জেগে উঠে তোমার কথাই মনে হয়েছিল সুপ্রিয়! তোমাকেই বার বার দেখতে ইচ্ছা হয়েছিলো, কেন যেন মনে হয়েছিল এই আমার শেষ শয্যা। আমি যেন মুমূর্ষু! আর তুমি আমার শিয়রে এসে শেষ দেখা দিয়ে যাবে। কপালে শীতল হাতের স্পর্শ রাখবে। হু' চোখের স্নিগ্ধ আলোতে সমস্ত কালিয়া মুছে পাবে। ব্যাণ্ডেজটা এমন শক্তভাবে বাঁধা আছে যে এপাশ ওপাশ করতে কষ্ট হয়, এপাশ ওপাশ করা যায় না। কষ্টের আরও একটা কারণ ভালো করে লক্ষ্য করলাম, মাথায় বালিশ নেই। ক্ষীণ স্বরে আবেদন জানালামু : 'একটা বালিশ।'

একজন খেতবসনা নার্স আমার নাড়ী ধরে ঠাঁড়িয়ে ছিল। বোঝা গেল, আমার জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার নাড়ী দেখার প্রয়োজনও কুরিয়ে গেল। সে আমার হাতটা আঁকড়ে করে চেড়ে দিল। স্নিগ্ধ স্বরে বললো : অপারেশনের পর এমনি ভাবেই শুয়ে থাকি নিয়ম।

হাসপাতালের এই রীতির ওপর আমি আর দ্বিতীয় অভিযোগ করলাম না। তোমার স্মৃতি আমার সারা অস্তিত্বে স্তব্ধ সুর সুর করে বেড়াচ্ছিল সুপ্রিয়! জ্ঞান ফিরে গেলেও কেমন ঘুম-ঘুম নেশা নিবিড় করে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল। মনে হচ্ছিল—যেন কত কাল ঘুমোই না। স্নায়ুগুলো দুর্বল বলেই নাকি চোখের পাতা দুটো আপনা থেকেই বৃক্ক বৃক্ক আসছিল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে শেষবেলার রোদ রোগীদের বেডে এসে লুটিয়ে পড়ছে। আঁকাজ করলাম—তন্ত্রার অতল হস্তে প্রথম জেগে উঠে মনে হয়েছিল—এমন অলক্ষ্য অবসাদের ভাবে কে আমাকে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে! মনে হয়েছিল,—আমার হু'চোখে কে যেন দুর্বল পাথর বেঁধে রক্তহীন অন্ধকারে নির্বাসন দিয়েছে। মনে হয়েছিল,—হু'চোখের পাতা যখন আপনা হতে ভারী হয়ে আসছে তখন সুরনিশ্চিত মরণ ছাড়া এমন অন্ধকার নীরব রাজ্য পৃথিবীর কোথায় থাকতে পারে! মৃত্যুর মত এমন মহানুভব মৃত্যু ছাড়া আর কি? এ মরণের আগে চিরতরে ঘুম পাড়াবার জ্ঞান কে আমাকে কোলে নিয়ে মহাদরে দোল দিয়েছিল? তার পরে সব দোল যেন নিঃসাড়

খুনের রাজ্যে এসে নিঃশব্দ হয়ে গিয়েছিল। অপারেশনের টেবিলের ওপর কতক্ষণ ধরে মূর্ছাতুর হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল,—কিছুই টের পাইনি। মহাঘুমের পর আধ-তন্ত্রা আধ-জাগরণের মাঝে চমকে গিয়েছিলাম। কানের পাশে সেই ভয়াল অধঃক্ষুট কথা! নার্সের গোটা অ্যাপারনটো একেবারে রক্তে ভিজ্ঞে খই-খই করছিল।

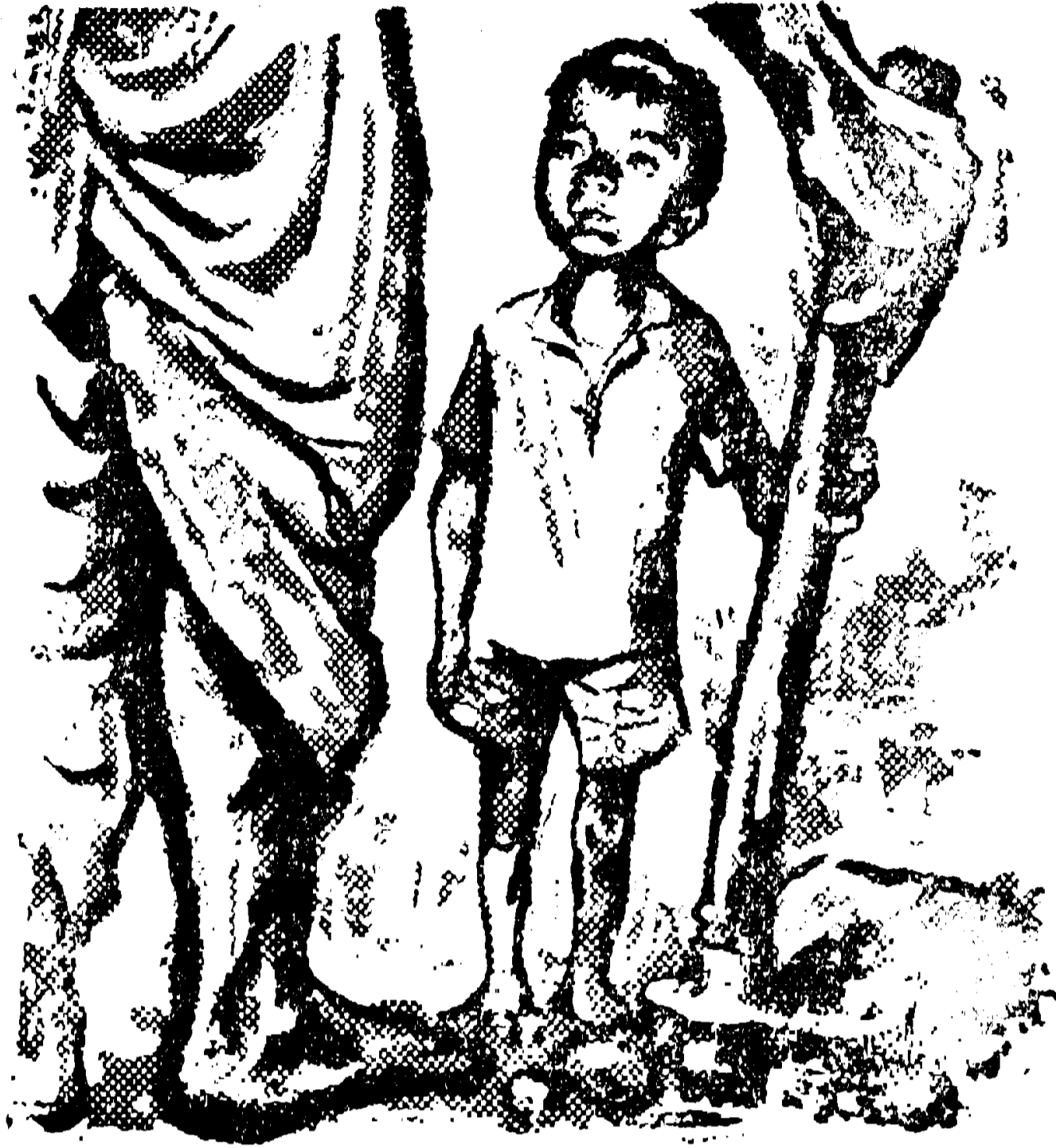
ভয়ে চমকে গেলেও আশঙ্ক হইয়েছিলাম : যাক অপারেশনটা তাহলে চুকে গেছে। আর ঐ শাদা ভয়াল টেবিলটার উপরে তো শুয়ে থাকতে হবে না? নার্স তাহলে এতক্ষণ ধরে আমার জ্ঞান ফিরে আসার জ্ঞান ক্ষয়িক্ত দীপশিখার মত ঠাঁড়িয়েছিল শিয়রে এসে। তন্ত্রার ঘোরের সঙ্গে একটা অতিসাধের স্বপ্ন ছেয়ে রয়েছিল। মনে আছে সুপ্রিয়! পঞ্চাশ-ষাট লাখ পেনিসিলিন—জর্জরিত হাতে, কল্পিত বক্ররেখার তোমাকে কাতর মিনতি করে লিখেছিলাম : আমার এখন মানসিক এবং শারীরিক বিপর্যয়ের দিনে তুমি নিশ্চয় আসবে!... জীবনের অস্থির মুহূর্তে এমন অনেক প্রগলভ অস্থিরতা প্রকাশ করেছিলাম বা অর্ধহীন এলোমেলো প্রলাপের তুল্য। অনেক দিন ধরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি,—ডাক্তার আমাকে কানের কৌকুনি লাগাতে নিষেধ করেছিল—তবু অনেক কষ্ট করে ডাক্তারের নিষেধ ডিজিয়েই চুরি করে ঠিক কলুটোটার মোড়ে গিয়ে নেমে পড়েছিলাম। একটু জ্বর হয়েছিল! ঝিঝি-ঝিঝি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যুনিভাসিটির করিডোরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তুমি ডীক পাথির মত ভয়ে ভয়ে বলেছিলে : ইস্ ভিজ্ঞে গিয়েছ যে দেখছি! বলে পকেট থেকে রুমালটা বের করে সোহাগভরে আমার খোলামেলা ভিজ্ঞে চুল মুছিয়ে দিয়েছিল। আমি নীরব থেকে তোমার সমস্ত আদর হৃদয়ভরে নিয়েছিলাম। তুমি ঈর্ষ ভৎসনা করে বললে : ভিজ্ঞে না এলে চলত না? বাসে চলা-ফেরা করা ডাক্তারের বারণ, তবু আমি তোমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম : তবু আসতে হলো। কত দিন আমাদের দেখা হয় না,—আরও কত দিন হবে না। জানো, বিশেষ আগষ্ট আমার অপারেশন—খুব ভয় করছে। হয়ত পরীক্ষা দেওয়াই হবে না।

তুমি ভিজ্ঞে চুলের স্পর্শ নিতে নিতে বলেছিলে : বনজী, অত ভয় পাচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও।

তুমি নিজ হাতে লিখে দিয়েছিলে, বলেছিলে : দুদিনে কিছু চিঠি যায়—দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর করিডোরটা নির্জন এবং নিভৃত ছিল। তাই বুঝি আমরা দুজনে অকুণ্ঠিত হয়ে ঠাঁড়িয়েছিলাম। সেদিন আমরা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলাম। তুমি স্বভাবতই মিতভাবী এবং বেশ কিছুটা সংযত প্রকৃতির ছেলে ছিলে। সেদিন প্রাণ-মন খুলবার ইচ্ছা থাকলেও আমি ভেতরে ভেতরে কুণ্ঠিত এবং লজ্জিত হয়েছি। সেদিন হয়ত দুজনেই জানতাম, ভালবাসাই নীরব স্বীকৃতি! চোখের নীরব ভাবাই মৌন অন্তরের নিবেদন! সেজন্তই কি আমরা দুজনে দুজনের দিকে নীরব হয়ে তাকিয়েছিলাম? তোমার বাড়ী চক্ৰিশ পরগণা জেলার কোন এক নিরিবিলা গ্রামের আশে-পাশে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : নম্বর নেই তোমার বাড়ীর? শুধু তোমার নাম দিলেই চলবে, অবধায়ক?

তুমি খাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলে। আমরা দুজনেই কি তখন খুব বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম? মনে আছে সুপ্রিয়!



তারপর একদিন ...

বাবার হাতের গাঁইতি খানাও ওর কাছে খেলনা। ইম্পাতের ঐ গাঁইতি খানার সাপে বাবার শক্ত হাত ছোটোর সম্পর্কের কথা ওর জানা নেই। বাবার মতো বাবা সেজে ও খেলা করে। টেলিগ্রাফের ঐ টানা টানা তারগুলো ওর কাছে এক বিষয়, আরও বিষয় তারের ঐ গুণগুণানি। কিন্তু আজ ও যে শিশু...

তারপর একদিন ঐ শিশুই হয়ে উঠবে দেশের এক দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক। কর্তব্য আর কৰ্ম হবে ওর জীবনের অঙ্গ; ছেলেবেলার সব খেলাই সেদিন কৰ্মে রূপান্তরিত হবে। জীবনে আসবে ওর বোধন আর চেষ্টা। মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শান্তিময়, ক্রান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে। বৈচিত্র্য আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যক্রম এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও দেশের সেবায় হিন্দুস্তান লিটার

কিছুক্ষণ বাদেই তুমি দূরে সরে গিয়েছিলে। আমি দূরে এসেছিলাম। কিন্তু নিবিড় এবং গভীর চোখ দুটো সকাতে তুলে হুজনে হুজনের দিকে জীবনের কি এক রহস্যময় অনির্বচনীয় জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরেছিলাম। সে চোখের সঙ্গে তুলনা করি, পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই বুঝি বা। সেই ইশারাময় চোখ দুটোর সুগভীর ব্যঞ্জনা কতদিন ধরে দেখি না সুপ্রিয়। তারই অধেষণে আমার নয়নতারা অনেক দূরে তোমার নয়নতারা দেশে চলে যাচ্ছে। অমনি বিধাসী এবং নির্ভরশীল চোখ দুটিকে সারা জীবন ধরে খুঁজলেও হয়ত পাওয়া যাবে না। সে সব কথা এখন থাক। যুযুঁ অবলাদে আমি এখন হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। বিকেল-বেলাকার গভীর রোদের রেখা একে-বেঁকে জানালা দিয়ে গলে গলে পড়ছে। আমার পাশে যে রোগীটি শুয়ে আছে পৃথিবীতে তার আলো দেখবার মেয়াদ বড় জোর আজকের এই বিকেল পর্যন্ত। তার কাতরানি আমার বুকের বস্ত্রণাকে আরও হুঁবহুঁ করে তুললো। গলাটা অসহ্য রকমের তৃষ্ণার কাঠ হয়ে গিয়েছে। আমি অর্ধক্ষুণ্ট খবর বললাম : জল। নার্স মধুর হেসে বললো : অপারেশনের পর তো জল দিতে নেই ? তৃষ্ণার ছাতি কেটে বাবার মত অবস্থা আমার, তাই বলতে হল : গলা শুকিয়ে কাঠ-কাঠ। সহিতে পারছিনে।

নার্স যত্নস্বরে বললো : আচ্ছা খবর পাঠাচ্ছি। যদি গরম দুধ মেলে। হা হতোহ্মি। এ যেন গভীর বনের অন্ধকারে একটি মাত্র জোনাকী আলো জ্বালাবার আশা দেওয়া। জল পেলাম না। কিন্তু অভিমানে, বেদনায় আমার চোখে জল আসার উপক্রম হল। আর কিছু না হোক এ সময়ে অন্ততপক্ষে তুমি যদি শিয়রের কাছে এসে আমার ভীক, অস্থির হাত দুটোকে তোমার শীতল হাতের বরাভয়ে তুলে নিতে। কিছুক্ষণ বাদেই নার্স আমার মুখের কাছে দুধভরা কিডি কাপটা এগিয়ে দিল। আমি আস্তে আস্তে তৃপ্তি ভরে দুধটুকু চুষুক দিলাম। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে অভিযোগ করলাম : আমার ব্যাণ্ডেজটা দারুণ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। কষ্ট হচ্ছে।

টাইট করে বাঁধা না হলে যে ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিমির হ'ল মন। মুহূর্তে মাথাটা কেমন ঘুরপাক খেলো। কেমন ভয়-ভয় লাগলো। নার্সের অ্যাপারনটা রক্তে ভিজ্ঞে খই-খই করছে। এত রক্ত ফিন্কে দিয়ে ছুটছিলো। মুচ্ছিত শরীরটার ওপর ওরা যথেষ্ট মত ছুরি চালিয়েছে বুঝি ? আঘতপ্রা আর আঘ-জাগরণের স্পর্শে যখন দোল খাচ্ছিলাম তখন বুজে-আসা চোখের পাতা দুটি অতি কষ্টে ঠেলে খুলে তাকিয়ে দেখছিলাম আমার ক্ষীণ হাতের মণিবন্ধে কে যেন রেহমাখা ছুটি হাত ধরে আছে। তখন স্বপ্নের মত মনে হয়েছিল, বুঝি বা তুমি এসে শিয়রে ঝাঁড়িয়ে থেকে সোহাগ ভরে হাত ধরেছ। বিকেলের আলো নিবে যাওয়ার পর নার্স চলে গেল। হা পিত্যেশে তাকিয়ে আছি, একে একে সব রোগীদের ভিজিটাররাই এসে গেল।

শুধু মাত্র আমার মামার বাড়ীর কেউ এল না—রাঙামামী, দিদিমা, দাদু, রাঙামামী কেউ না ! এমন কি তুমিও না ! অভিমানে নীধর হয়েছিল মনের হুঁপটা ! পাশের বেডের বউটির সঙ্গে মনের স্মৃতি দিব্যি গল্প জুড়ে দিলাম। দেখতে দেখতে বউটি কোন এক সময়ে বিছানার ওপর উঠে বসলো। পরিপাটি করে চুল বাঁধলো, হিমালী রাখলো মুখে। চিরস্মৃতি সিঁদুর মাখিয়ে নিখুঁত ভাবে সৌখিনে সিঁদুর পরে নিলো। কোঁটো খুলে এক খিলি পান পুরে দিলো

মুখে। আমাকে অস্থির আর কাতর হতে দেখে বললো : তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন চঞ্চল হয়ে পড়েছ আর আমি হাসপাতালের এই একই বিছানায় হুঁবহুঁ একই ভাবে শুয়ে আছি।

বৌটির ঐর্ষ্যকে মনে মনে যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করতে করতে কিছু বলতে বাব—এমন সময় একজন ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। বৌটি পান-খাওয়া ঠোঁটে লাজহাসি হাসতে হাসতে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দিল। বোঝা গেল, ডাক্তারকে ! আমি নীরবে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। রাঙামামী এল না, দাদু, দিদিমা কেউ না। দিনের আলো নিবে এল দেখতে দেখতে। একটা পরিচিত ছায়াও আমার শিয়রের কাছে এসে ঝাঁড়াল না ! বিধগ্ন অমুভূতির মত পরিচিত সন্ধ্যার নাম নিয়ে অন্ধকার নেমে এল বড় হলঘরটায়। অভিমানে নীধর হয়ে রইলো মনের ভেতরটা। তুমিই শুধু এলে না। আলো জলে উঠলো অন্ধকার ঘরে। বৌটির লাল টুকটুকে ঠোঁটের দিকে অনিমেয় তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার বুকের ভেতরে ভীক এবং লোভী বাসনাটা উপছে উপছে পড়ছে। ডাক্তার বৌটির হাতে বাসন্তী রঙের রেশমীচুড়ি পরিয়ে দিল। সোহাগস্পর্শে বৌটির সুখী নরম ইচ্ছাটুকু গলে গলে পড়তে লাগলো। তার রঞ্জিত ঠোঁট অমুভূত আবেগে উথলে উঠতে চাইল।

আমি মরমী অভিমানে মরে যেতে লাগলাম। সুপ্রিয় ! আমার পাশের বেডের সেই আগলুক ডাক্তারকে তার বাহিতার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন কথাবার্তা বলছিল তার কিছুই কানে আসছে না, কিন্তু প্রাণে এসে ঝঙ্কার তুলছে। তার মধুর আবেশ মনে-প্রাণে যতই নিবিড় হয়ে উঠছে ততই তোমার ওপর তীব্র অভিমনবোধটা জ্যামিতিক হারে বেড়ে উঠছে। মাইনর অপারেশন বলে তার পরদিনই হাসপাতাল থেকে আমি যথারীতি ছাড়া গেলাম। ঘুম-ঘুম অবসাদের ভেতরে কিমিয়ে থেকে মনে হ'ল,—একেবারে মহাঘুম এলেই যেন ভালো হ'ত। তোমার ওপর শোধ নেওয়া যেত ভালো করে। চ্যাংদোলা করে সেই চারতলা হ'তে একতলায় নামিয়ে আনা হ'ল আমাকে। ব্যাণ্ডেজটার এমন শক্ত বাঁধুনি যে—খাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। রাণীশংকর লেনে ফিরে এসেও হাসপাতালের সঙ্গে কোন যোগই যুচে যায় নি, একদিন অস্তর একদিন ডেস করবার জন্ম। রাণীশংকর লেন থেকে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন এমন কিছু দূরে নয়, সেজ্ঞ এ পথটুকু হেঁটেই চলে যেতাম। এমনি এক সকালবেলায় আসা-যাওয়ার পথের ধারে উত্তেজিত ব্লিডিং ব্যাণ্ডেজ ভিজিয়ে দিয়েছিল। সে সব কথা এখন থাক—সুপ্রিয় ! পথচারী বাসগুলোর দিকে উৎসুক আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়ে ছিলাম। যুনিভাসিটির সময় হয়েছে বুঝি বা। টু-বি বাসের জানালা দিয়ে হঠাৎ যদি সেই চেনা চোখ দুটির দেখা মেলে ! এক মঙ্গলবারের সকালে চিত্তরঞ্জন থেকে পথে টু-বি বাসের দিকে অপেক্ষমান যাত্রীর মত উৎসাহ নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম।

মঙ্গলবারের পরের দিন বুধবার। আর বুধবারের পরের দিন বৃহস্পতিবার। বুধবারের রাতে চুপি চুপি ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে অভিমান অভিযোগ মিশিয়ে অর্ধহীন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে কেললাম। তার পরদিন ভীক ভালবাসার পবিত্রতাকে বুকে করে সেই রাণীশংকর লেন থেকে ভবানীপুরের পোষ্ট অফিসে নীলধাম

পোষ্ট করেছিলাম। কল্পিত বৃক্ক নগ্ন পায়ে অনেকখানি পথ হেঁটে এলাম। আকাশের রং নীল বলে হয়ত ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তোমার নীল ধামের প্রত্যাশা করতাম। এক [হৃদয়বেলায় শীতলপাটিতে শুয়ে শুয়ে রাঙামামীর সঙ্গে গল্পগল্প করছিলাম এবং তারই কঁাকে কঁাকে হৃদয়ের রেডিও-প্রোগ্রাম শুনছিলাম, এমন সময় দাছ একটা চিঠি এনে দিলেন আমার হাতে। চিঠিটা আমার হাতে দিতে না দিতেই দিদিমণি শুধালেন : কার চিঠি ? ভয়ে আমার বৃক্ক টিপ টিপ করছিল। নিঃসন্দেহে বুঝেছিলাম অর্থাৎ এ চিঠি তোমার। একটা মিথ্যে মনগড়া কথা বলে দিলাম : সম্পাদকের চিঠি। লেখা ফেরৎ এসেছে। দাছ দিদিমণি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে ফিরে গেলেন। আমি আশঙ্কিত হলাম। কিন্তু রাঙামামী ছুঁচোখে সন্দেহ ভরে বললো : কার চিঠি ?

বললাম : বলেছি তো সম্পাদকের।

রাঙামামী ছুঁচোখে সন্দেহের বাঁধন ঘনীভূত করে বললো : উঁহু তা নয়। মন বলছে অস্বাভাবিক !

রাঙামামী খুব কমবয়সী। তার সঙ্গে আমার প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা। অতএব কিছুকণ ধরে আমাদের দুজনের মধ্যে চিঠি নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। রাঙামামী যেন শিকারী। আমি এমনি ভাবে ভীক হরিণীর মত তার আক্রমণ বাঁচিয়ে তোমার চিঠিখানি পড়ে ফেললাম। নিমেষেই সমস্ত প্রত্যাশা আকাশকুসুম হয়ে গেল। আমার হাতের কাছে রাঙামামীর শিকারী হাত দুটো নেমে আসতে দেখে চমকে গেলাম। কুটিপাটি করে ছিঁড়ে ফেললাম নীল ধামে-পারা অতিসাদের ইশারাটুকু! এই প্রথম বুললাম—কী কঠিন আর কী কঠোর তুমি! ব্যাণ্ডেজের নীচে যে নরম বাসনাটুকু নীরব প্রহরী হ'য়ে ঘুমিয়ে আছে সেখানে অজস্র জিজ্ঞাসা আশাভঙ্গের বস্তুণায় টনটনিয়ে উঠলো। সে গোপন ব্যথার চকিত আভাসটুকু বুঝতে পারলো না রাঙামামী। সে রাঙা অম্লরাগটুকু ঐকান্তিক আগ্রহে ফুটি ফুটি করেও ফুটে উঠতে পারলো না,—তুমি সে বেদনার পরিচয় পাবে কেমন করে? অপারেশনের ভয়াল টেবিলে জ্ঞানহার্য হয়ে পড়ে থাকবার মত মুর্খু অবস্থা ঘনিষে এল বলে মনে হয়। হৃদয়ের দাক্ষিণ্য তোমার পাইনি, এই বুঝি দক্ষিণের খোলা ছয়োর দিয়ে বিছানার নীলচাদর যখনে রাত্রির স্তম্ভ প্রতীক্ষা করছে সেখানে ফিরে এসে দারুণ হতাশায় শুয়ে পড়লাম।

বেশান দিয়ে জানালা দেখা যায়—আর জানালা দিয়ে পথচারী বাসের ইসারা। পথ আর অগণিত পথিক! উৎসুক যাত্রীর চোখের আলোকে কেবল অন্ধকার। সূর্য সেদিন বিকেলে শুধু গাঢ় অন্ধকার, সন্ধ্যারান্তে ধরে শুধু প্রদীপ জ্বল। বাইরে নিকম-কালো রাত্রির নিঃশব্দ প্রহরী। আজ তুমি যে আসতেছিলে আকাশে নক্ষত্র হয়ে বলে উঠবে সেই নিশি-বস্তুণার নিশ্চিন্তি প্রদীপ! রাঙামামী এসে ডাকলো। কপালে শাঁধাপরা ঠাণ্ডা হাত ছোঁয়াল। শব্দের সুর বেজে উঠল দিদিমণির পূজোর ঘরে। আমার মনে হ'ল,—মহাজীবনের খেয়া পেরোতে হবে। দীর্ঘ নদী। ক্লান্ত মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে। খেয়া আপন মনে ভাসতে ভাসতে ডুববে বুঝি। গাঢ় তমিস্রার থেকে মহাসমুদ্রের ডাক এসে পৌঁছল। বৃক্কের ভেতর হাঁসকাঁসকরা অসহ বস্তুণা। শত নার্সের সহস্র অ্যাপ্রণ ভিজিয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজটা বুঝি ছিঁড়ে গেল! রাঙামামী বললো : ঘুমিয়েছ কেন বনলী ?

আর্তনাদের ভেতর হতে চমকে উঠে বললাম : আমি ঘুমাইনি রাঙামামী, আমি মরে আছি।

রাঙামামী কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললো : অসুখ কি কারও হয় না? না, অসুখ করলেই মরতে হবে?

মনে মনে বললাম : তুমি জান না রাঙামামী, আমি বেঁচেও মরে আছি—আমার বস্তুণা জীবন্ত-বস্তুণা। বেঁচেও আমি মরে আছি, মরেও আমি বাঁচিনি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। বললাম : আমি মরে যাব রাঙামামী।

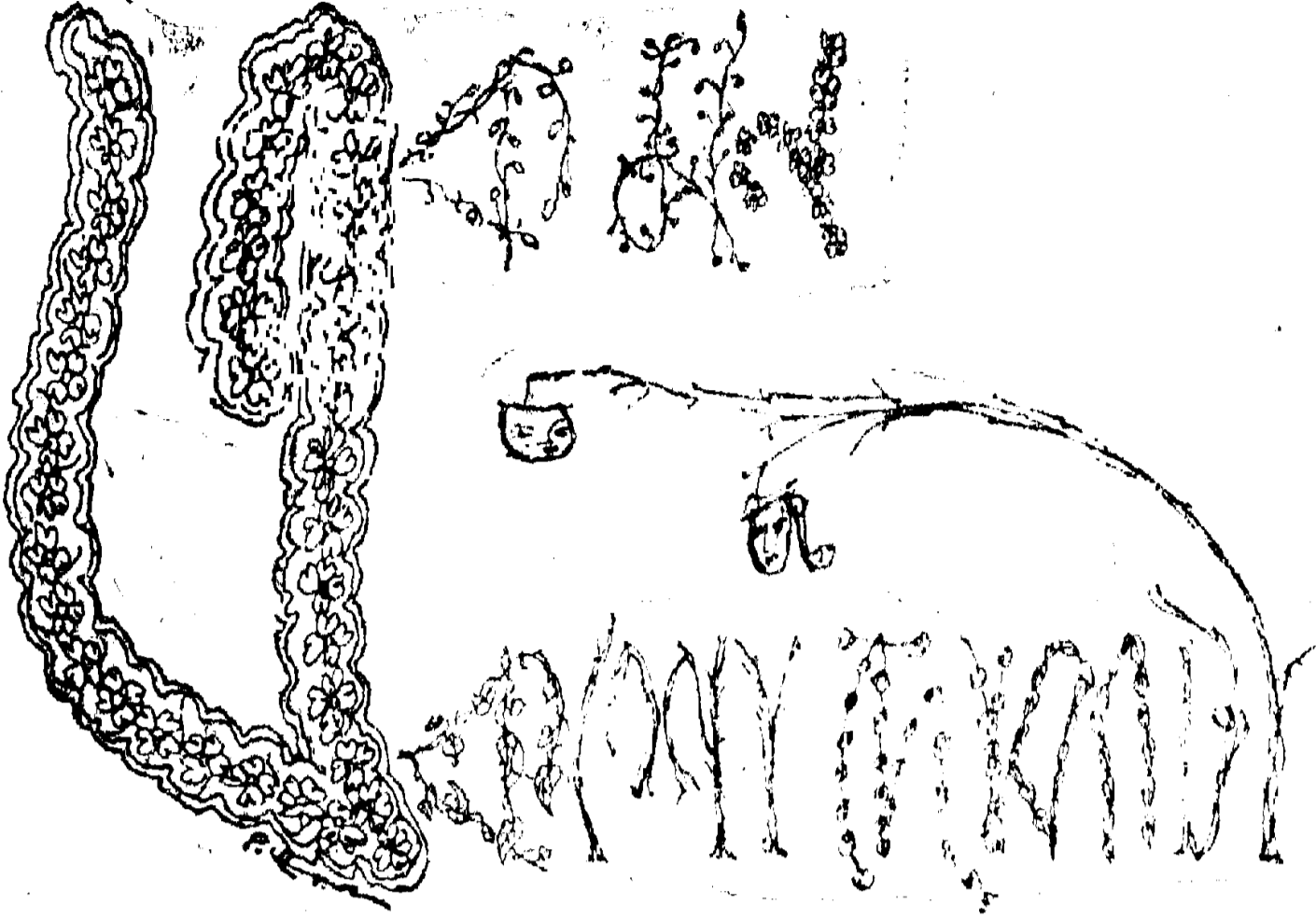
রাঙামামীর সন্দেহ ভেঁসনা দেওয়ালের গায়ে ভেজে পড়লো : চলো। মুখ ধোবে এস। তারপর ব্যালকনি ধরে দাঁড়াই। আলো আর লোকজন দেখি।

আমাকে আরও বেশী করে কঁোপাতে দেখে রাঙামামী গলায় হাত দিয়ে ফের বললো : কেঁদে কেঁদে আবার টেম্পারেচার ওঠাবে দেখছি।

আমি অক্ষুট স্বরে উচ্চারণ করলাম : পৃথিবীর সব আলোই আজ আমার কাছে অন্ধকার, আর হোক—খার্মোমিটারের সব চাইতে উঁচু পদাণ্ড বত ডিগ্রী খুশী ছর উঠুক না কেন, তাতে ক্ষতি কিসের? রাঙামামী আমার চোখে-মুখে জল দিয়ে দিল। সেই চিরকালের সাক্ষ্য-প্রহর বেমন করে লোকজন, আলো আর রাজপথ দেখতাম ঠিক তেমনি করে রাঙামামীর পাশে এসে স্তম্ভীর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আত্মহিকারে আর লজ্জার বেদনায় একজন যে তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরমে মরে যেতে লাগলো, সেকথা রাঙামামী জানতেও পারলো না। তবুও আমার নিশ্চিত ভাগ্যের অমুকুলে তোমার চিঠিটা তার চোখে পড়েনি সুরপ্রিয়! সত্যিই আমি নিরোধ, আবেগের টানে ভেসে চলা, আমার ভালবাসা বিচার-বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না। অতখানি উচ্ছলতা হয়ত আমার প্রকাশ করা উচিত ছিল না। কোন কড়া শাসকের চোখে কি আমার চিঠিখানি ধরা পড়েছিল সুরপ্রিয়? তবু বলব, বিশ্বাস আর ব্যক্তিত্ব কি বিজয়ী হয়ে উঠতে পারল না সবার ওপর?

রাঙামামী বললো : এত চপচাপ যে বনলী ?

আমি মনে মনে বললাম, আমি আর হুঁদিন বাদে লীহীন হব বলে—আমার নামের পাশে ইশ্বরী লেখা হবে বলে। সুরপ্রিয় আমাকে নীরব থাকতে বলেছে বলে। আমি মৃত্যুর মত চিরনীরব থাকব। আমি চির নীরবতার দেশে গিয়ে শীতল অন্ধকার হয়ে থাকব। অশ্রুহীন অভিমানে চোখের নিরুপ্প তারা দুটো ধির হয়ে রইলো, অশ্রু ঝরলো না। আমি সে রাতে কি স্বপ্ন দেখেছিলাম জান সুরপ্রিয়! আমি মরে গিয়েছি। হাসপাতালের অপারেশনের টেবিলে কেউ যেন আমাকে শুইয়ে দিয়েছে। ছুরি, পেন্সা তুলো, এমন কি গরম জল পর্বত রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। আর আমি মুখ খবড়ে মরে আছি সে রক্তের মধ্যে। আমি আকাশলীনা হতে চলেছি। হাসপাতালের সেই চারতলার ঘর থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে আকাশচুম্বী প্রাসাদের চেয়ে অনেক ওপরতলার আকাশে আমাকে মিশিয়ে দিয়েছে। আমি মেঘ হয়ে মিশে গিয়েছি। রাত্রি ভোর হ'লে খাটিয়াতে করে আমাকে সবাই ঋশানে নিয়ে যাবে। রাঙামামী কঁাদবে, রাঙামামী, দাছ, দিদিমা সবাই। হয়ত তোমার ঋশান-বৈরাগ্য জাগতে পারে আমি ঋশানে চলে গেলে। তুমি নির্ভম, কঠোর—তুমি শুধু কঁাদবে না সুরপ্রিয়!



আর্য দেব

প্রায় সবই বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গিয়েছিল। হোল্ড-মল, স্ট্রাকেশ, বেতের ঝাঁপি সমস্তই জড়ো করা হয়েছিল দরজার পাশে। আর ঘরের মধ্যে প্রজাপতি-রঙের শরতের বোদ্ধর ছড়িয়ে পড়েছিল। সবিতার কেমন ছুটি-ছুটি হাঙ্কা-হাঙ্কা মনে হচ্ছিল সব-কিছু। ওর শুছোনো আর শেষ হচ্ছিল না—কী নিয়ে যাবে, আর কী নেবে না তার কিরিস্তি ও যেন কিছুতেই তৈরি করতে পারছিল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি বেজে, উঠলো : টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম !

বিভাস তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে টেলিগ্রামখানা নিয়ে নিল ডাকপিয়নের হাত থেকে। তারপর ঘরে এসে ফাঁস করে খামটা ছিঁড়েই দ্রুত পড়ে ফেলে সেটা বাড়িয়ে দিল সবিতার দিকে : নাও, ছুটি নাকচ হয়ে গেছে—ছুটি দেবে না এবার, যদি কোন গোলমাল হয়-- হলেই হো-হো করে হেসে উঠলো বিভাস। আর সবিতার মনে হল শরতের বোনটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সেই প্রজাপতি-রঙটা যেন একটা কালো মেখে ঢেকে গেছে।

বিভাস ততক্ষণে হোল্ড-মলটা খুলে একটা বালিস আর চাদর গার করে শুয়ে পড়েছে—ওর মুখে লেগে আছে মিটিমিটি কৌতুকের হাসি ! সবিতা চেঁচিয়ে উঠলো : আবার হাসছো ! বেশ হয়েছে—যমুন কাজের মানুষ তুমি, ঠিক হয়েছে—নাও, ছুটির দিনগুলোয় ত পারো কাজ করো। আর অফিসও বটে বাবা—যে যত কাজ হবে তার ঘাড়েই তত চাপাবে, তার বেলাতেই ছুটি নেই, দুটি দিলে চলবে কী করে—

বিভাস বললো : তুমি ভুল করছো—ছুটি বন্ধ মানে শুধুমাত্র হুডকোয়ার্টার্সে থাকো। যদি গোলমাল কিছু হয় অর্থাৎ যদি কোন কাজ আসে তাহলেই কাজ করো, তা না হলে দরজা বন্ধ করে মোও। কিন্তু শোনো, তুমি যাও ; তোমার বাবা-মাকে লিখে দাও যা হয়েছে, তাঁরা ভাববেন—তোমাকে পাঠিয়ে দিই।

সবিতা বললো : তা হয় না—তুমি যাবে না, আমি একলা গিয়ে দী করবো। সবিতার মনটা খুব বিষন্ন হয়ে গেল। সারাবছরে পূজোর এই ক'টি দিনই মাত্র ছুটি—তা নিয়েও ছেঁড়াছেঁড়ি, কাটাকাটি। মঞ্চ সকলেরই যে ছুটি বন্ধ হয়েছে তা নয়। এপাশে-ওপাশে গারদিকের কোয়ার্টার্সই ত কাঁকা। ওদিকে শ্রানিটারি ইন্সপেক্টরের

বাড়িটা বন্ধ। ওপাশে ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টরবাও ছুটিতে বেড়াতে গেছে। ডাক্তারবাবুর বউ-মেয়েবাও পুরী গেছে। চারদিক এখন কাঁকা একেই ত মফঃস্বল বড় নির্জন, নির্বাক—তার ওপর এই ছুটির দিনে নির্জনতা ত আরো বেড়ে গেছে—এই নির্জনতাটাই কেমন যেন চাপা-চাপা গুমোটের মত—কেমন ক্লান্তি আসে সবিতার।

চারদিক যেন ঝিমঝিম করছে। সবিতার মনে হল ওব বাড়ির সামনের ঐ ধানগাছগুলো কেমন ক্লান্তভাবে কাঁপছে, আকাশের টুকরো টুকরো মেঘও যেন কত ক্লান্ত, কত বিষন্ন ! ওদিকে কার কোয়ার্টার্স খালি দেখে একটা গরু নিবিবাদের ফুলগাছগুলো মুড়িয়ে থাকে—এত আন্তে আন্তে থাকে দেখে মনে হয় ও-ও খুব ক্লান্ত। আর মফঃস্বলের বাসগুলোর ত কথাই নেই—ছুটির দিন

বলে যখন খুশী আসছে যখন খুশী যাচ্ছে। কোন শুড়া নেই, মঞ্চগতিতে চলছে ত চলছেই।

হঠাৎ সবিতার মনটা ছ-ছ করে উঠলো। আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করলো। ইচ্ছে করলো মাথার চুল ছিঁড়তে, মাথাটা দেয়ালে ঠুকতে। এর নাম চাকরি ! এই এক বছর ওর বিয়ে হয়েছে—কিন্তু একদিনের জন্তেও ও যেন বিভাসকে সম্পূর্ণরূপে পায়নি। বিভাস শুধু চাকরি করেছে, আর এই ছুটির দিনগুলোতেও সে চাকরির বিরাম নেই। অথচ বাড়িতে নিশ্চয়ই বড়দি, মেজদি এসেছে। দাদা-বৌদির দিন-রাত কাজের বাড়ির লোকদের মত ঘুর ঘুর করছে। তা ছাড়া পাড়ার বন্ধুরাও নিশ্চয় বাপের বাড়ি এসেছে। অমিত্যর ত লক্ষ্যে বিয়ে হয়েছিল সে এসেছে। দীপালি ত কোন এক স্থলে মাঠারী করে, ও নিশ্চয় আগেই এসেছে। কারণ ওদের ছুটির ত অন্ত নেই। চৌধুরীবাড়ির নমিতা এসেছে, পুকতবাড়ির কল্যাণীও এসেছে বোধ হয়।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সরে গেল সবিতার। সংসারের যথারীতি কাজকর্মের কাঁকে কাঁকে ও দেখতে লাগলো বিভাসকে। বিভাসকে আজ কেমন যেন অল্পরকম-অল্পরকম লাগছে। এক পাশে হলে শুয়ে আছে। ওরও আজ যেন কাজের তাড়া নেই। অল্প অল্প দিন যেমন সব তাতেই ওর ব্যস্ততা থাকতো ওর চলার, বলার, দাড়ি কামানোতে, চুল আঁচড়ানোতে আজ তার চিহ্ন মাত্র নেই। সব লক্ষ্য করছিল সবিতা। এতদিন ত বিভাস যখন-তখন অফিসের ফাইল বাঁটতে বসতো ছুটির দিনেও তার ব্যতিক্রম হত না। আজ এতদিনের ছুটি হাতে পেয়ে বিভাস কিছুই করছে না, কেমন আলগা ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছে, উঠছে, বসছে, পায়চারী করছে। আশ্চর্য, বিভাস আবার মাসিক পত্রিকাগুলোর পাতাও উন্টেছে, ছবি দেখছে, মাঝে মাঝে একটু পড়ছে, আবার পাতা উন্টে থাকে। ব্যাক থেকে বইগুলো নামিয়ে নামিয়ে নিজের চার পাশে পাহাড় গড়ছে বিভাস। আবার মাঝে মাঝে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে বিভাস। সবিতাকে যেন এক মজার খেলায় পেয়ে বসলো। সে ভাবলো দেখতে হবে বিভাস কোন দিকে তাকাচ্ছে। ওর দৃষ্টি অসুসরণ করে সবিতা বাইরের দিকে তাকালো না, বিশেষ কিছু না। দুটো ঘণ্টা ওদিকের মাঠটার বসে খুঁটে খুঁটে কী যেন থাকে, এদিক ওদিক

তাকাজে, আবার উড়ে উড়ে এদিক সেদিক বসছে—আর ওরা উড়লে লাঠি ঘোরানোর মত কেমন বন্ বন্ শব্দ হয়। আজ্ঞা, বিভাস কি ঠিক ঠিকই তাকিয়ে আছে? না ভাবছে, ঐ বৃষ্টি বড়সাহেব এল জিপের শব্দ শোনার অপেক্ষার কান পেতে আছে। মাঃ। এবারও সবিতা, চুরি করে ওর দৃষ্টির অহুসরণ করলো হ্যাঁ হ্যাঁ, দূরে ঐ বে বন্ধ কোয়ার্টার্স ঐ দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিভাস। কী দেখছে বিভাস? ও বাড়িতে ত কেউ নেই? ম্যালেরিয়া ইলপেটেরেই সেই সুন্দরী শালীটিও ত ওদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। আর একটু ভাল করে দেখতেই লজ্জা পেল সবিতা—ছিঃ ছিঃ, এ কী ভাবছিল সে! ওদের বাগানে ত একগালা বড় বড় লুইসুখী ফুটেছে। বিভাস নিশ্চয়ই ঐ ফুলগুলোর দিকেই তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য, বিভাস কোটা ফুলের দিকেও তাকাতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই বিভাস যে শুধু দিনরাত অফিসের কাইল পড়ে আর অফিসের কাজে এখানে ওখানে কেবল ঘোরাঘুরি করে, ঘরের কোণে একটু স্থির হয়ে বসার সময় পায় না।

আজ শুধু বিভাস শুধু ঘাঁটি আগলে আছে। অফিস নেই, কাজের তাজা নেই, শুধু সারাক্ষণ বসে বসে বিমোহে। বিভাসের কথাটাই বোধ হয় ঠিক। বিভাস একদিন বলেছিল : চাকরিতে চুকে চেয়ার খালি রাখার উপায় নেই। আজকালকার দিনে চেয়ার খালি রাখলেই অল্প লোকে এসে বসে পড়বে।

সবিতা বলেছিল : যাও আর বেশি ফাজলামি করতে হবে না—

বিভাস হেসেছিল : না, না, সত্যি কথাই বলছি। আর শুধু আজকালকার দিনই বা বলি কেন, এ-ব্যাপারটা চিরকালের সত্য। আগেকার দিনের ঝামু চাকরেবাবুবা সেইজন্মে চেয়ারে একটা চামর বেঁধে রেখে তারপর হয় টুক একচেজে না হয় টিউশনি করতে বেরোত।

কথাটা শুনে সবিতাও হেসেছিল। আর আজও সবিতার মনে হল এবারের ছুটি না-পাওয়ারটাও কতকটা যেন সেই বকমের। প্রয়োজন না হলে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, কোন কাজ করার দরকার নেই—শুধু হেড কোয়ার্টার্সে থাকলেই চলবে।

কাজের ফাঁকে কখন যেন সবিতা ঝড়কির দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাইরের দিকে তাকালেই একটা দৃষ্ট চোখে পড়লো সবিতার। খানিকটা দূর দিয়ে মাঠের আল ভেঙে রঙিন জামা-কাপড়পরা এখানকার স্থানীয় অনেক ছেলে-মেয়ে-বউ বোধ হয় গ্রামে গ্রামে ঠাকুর দেখতে চলেছে। ওদের চলার বেগ আর টুকরো টুকরো কথা শুনে সবিতার হাসি পেল, আবার ভালও লাগলো। আশ্চর্য, এ-দৃষ্ট ত কোন দিন ওর চোখে পড়েনি। এবার চলে গেলে দেখতেও পেরে না।

এদিক-ওদিক মুখ ফিরোতেই সবিতার চমক লাগলো। আজ্ঞা, ওপাশটার যে দোপাটির বন হয়ে রয়েছে কোন দিন তা চোখে পড়েনি ত! একটু এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলো সবিতা। কত বকমের কত রঙের দোপাটি—সাল, বেগুনী, সাদা, গোলাপী, কোনটার পাপড়ি খোকা-খোকা, কোনটার পাতলা-পাতলা। আবার কয়েকটা দোপাটি আশ্চর্য ধরণের—এগুলোকেই বোধ হয় হরগৌরী বলে—এদের অর্ধেক পাপড়ি এক রঙের, আর অর্ধেক অল্প রঙের। কয়েকটা দোপাটি আঁচলে তুলে চলে আসছিল সবিতা—সাঁ করে একটা শব্দ হতেই ধমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল ঝড়কির-লাগানো একটা রূপোলী মাক হটকট করছে খানিকটা

দূরে। ওপাশে যে একটা পুকুর আছে আজই যেন খেরাল হল সবিতার। দেখলো একটা লোক ভাড়াভাড়া এসে মাহুটাকে খুলে একটা ব্যাগের ভেতর পুরে ফেললো। এইবার যেন ভাল করে দেখতে পেল সবিতা—শুধু কি ঐ একটা লোক—ঐ পুকুরটার পাড়ে পাড়ে অনেক লোক বসে গেছে মাহু ধরতে। হিপগুলো উঠছে আবার নিঃশব্দে জলের দিকে নেমে আসছে। কেমন যেন ছুটির আবেশ চারিদিকে।

বাড়িতে ঢুক কখন আজ্ঞেই বৃষ্টি গুন্গুন্ গান ধরেছিল সবিতা। হঠাৎ বৃষ্টি ওর সব কিছু ভাল লাগতে আরম্ভ করেছিল। এ-ও যেন এক নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা। বাড়ি গেলে ত সেই রক্ত-করা মুখগুলোই দেখতো, সেই একঘেরে কথাই শুনে আসতো।

বড়দি বলতো : দেখি, দেখি, তোর শান্তুড়ী কী দিল...

মেজদি বলতো : হ্যাঁ রে সবি, তোর দেওররা ত বড় বড় চাকরি করে সব—বৌদি বলে একটা শাড়িও দিতে পারে নি—অথচ আমার জাখ...

নীতার হালে বিয়ে হয়েছে। তার ওখানে গেলে সে-ও বোধ হয় কাগজের বাস্তবগুলো খুলতে বসতো। নামী দোকানের দামী বাস্তব খুলতে খুলতে বলতো : এটা দিয়েছে শান্তুড়ী, আর এই যে নীল জমি রূপোলী পাড়—এটা দিয়েছে সেজ ননদ—ওরা খুব বড়লোক কি না, ওদের তিনটে মোটর গাড়ি—

ওদিকে অধিমার বাড়িতে গেলে বলতো : সবি, এবারে পূজোর গান শুনেছিল। বলেই গ্রামোফোন খুলে নতুন রেকর্ড বাজাতে বসতো।

সাত কথা ভাবতে ভাবতে কখন সবিতার যেন এখানটাই ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে। সেই প্রজাপতি-রঙ বোধ রটা যেন আবার দেখা দিয়েছে, গাচ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। পাশে-পাশে যখন ঘরে ঢুকলো সবিতা তখন দেখলো—বিভাস সেই আগের মতই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে রয়েছে। কেমন আলগা-আলগা হাঙ্কা-হাঙ্কা ভাব ওর।

বিভাসের পাশে গিয়ে বসে পড়লো সবিতা : ওঠো আর কত শুয়ে থাকবে—বেলা কত হল খেরাল আছে?

বিভাস হাসলো : এই উঠি—বলেই আর এক পাশে ফিরে গেলো।

সবিতার কেমন যেন নতুন-নতুন মনে হতে লাগলো বিভাসকে।

বিভাসই মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলো : কেমন লাগছে সবি?

: কী?

: এই নির্দ্বন্দ্ব নির্জন জায়গাটা? চারিদিকের কোয়ার্টার্সই ত খালি, কেমন আমরাই পড়ে আছি।

সবিতা হাসলো : মন্দ কি!

সবিতার মনে পড়ে গেল—এই এক বছর বিয়ে হওয়ার পর আজই যেন ও প্রথম বিভাসকে একান্ত ভাবে পেল! এখানে চার দিকে কেউ নেই, কেবল নির্জন নিরামা, বিভাসেরও অফিস নেই—আজ ওরা যেন ছজন দুজনের কাছাকাছি। বাড়ি গেলেও সেই রক্ত-করা মুখগুলির মধ্যে, হেঁ-হটগোলের মধ্যে বিভাসকে ঠিক এমন ভাবে একান্ত করে পাওয়া যেত না।

সবিতার মনটা ক্রমশ হাঙ্কা হয়ে গেল, আর ওদিকে প্রজাপতি-রঙের মোটর ঘরে-বাইরে গাছে-পাতায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

সুদর্শন সঙ্ঘে মৌরী যে কেবল বাড়ীর লোকদেরই সতর্ক করে দিলে তাই নয়, নিজেও অসাবধান হতে দিলে না। এ অভিজ্ঞতাটা তার এমন দীর্ঘ দিন আগের নয় যে সে বিস্মৃত হবে—অনেক চিন্তা আছে যার রাশ একবার আলগা করে দিলে শেষে আশ্চর্যকার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ছুদিন বাদে যার সঙ্গে বিয়ে তার ভাবনার রাশ ঢিলে করে দেয় না কে? মৌরীও দিয়েছিল। বরবেশী সুদর্শনের পাশে বধূবেশে নিজে কল্পনা করে যোমাক্তিত হয়েছিল সে একবার নয়, বহু বার। সানাই-এর সুরের সঙ্গে মিলিত পুরোহিতের কণ্ঠের ঠু পুণ্যাহম্, ঠু ঋদ্ধাতাম্, ঠু স্বস্তির সেই মন্ত্রধ্বনি, সেই পরস্পরকে আরো নিকট করার, আরো প্রেমে অহুরাগে যুক্ত হবার, প্রিয় বলেই প্রীতি করবার মন্ত্র, বাইরের সাতপাক ঘোরা বাকি থাকলেও, মনের ঘোরায় চৌদ্দপাকে জড়িয়ে ফেলেছিল তাকে। আজ যদিও ওর বিশ্বাস সেই মনের পাকখাওয়া সে খুলে ফেলেছে, কাঁচা কল্পনার ঝুয়ে ফেলেছে—কিন্তু তাই বলে মনকে মৌরী আর মনে পড়িয়ে দিতে পারে না সে সব কথা। পারে না বাসরশস্যায় সুদর্শনের পাশে নিজে কল্পনা করে যে ঢেঙ-এর স্রোত বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, সেই ঢেউ উঠবার মতো অসতর্ক মুহূর্ত আসতে দিতে। একবারের তরে চিন্তায়ও সুদর্শনকে সন্মুখে এসে দাঁড়াতে দিলে না সে। এমন কি ছুপুরে বিছানায় গিয়ে ঘুমোবার জন্য চোখ পর্দা বন্ধ করতে সাহস করলে না। বই নিয়ে বসল সে। গোটা চারেকের সময় বই বন্ধ করে আড়মোড়া ভাজতে ভাজতে বলল, বাড়া তিনশ পাতার বই একটানে শেষ করলাম, তুই পারবি?

ছোটপিসী যে সুদর্শনের এই আসার খবরটা মোটেই খুশীর সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবেন না তা যতীন বাবু জানতেন। বোনের কালো হয়ে ওঠা মুখে দিকে তাকিয়ে যতীন বাবুর সাহস হলো না যে সংবাদ বোন খুশীর সঙ্গে নিতে পারছে না, সে সংবাদে মনের আনন্দ প্রকাশ করেন। শুধু মুখে হাতের লাঠির উপর থুতনী চেপে বসে রইলেন তিনিও।

তা অস্তরে সুখ হোক আর নাই হোক, বাইরে সুরের খবর করে তুলতে হয় এমন সংবাদের সন্মুখীন হতে হয় মানুষকে বহু। তাই কিছুকণ মুখ কালো করে বসে থাকলেও ছোটপিসী যে কথাটা বললেন, সে কথাটা ভালো কথাই। এর পরও সুদর্শন এসেছে

বলে আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারপর স্বেচ্ছাকৃত কণ্ঠে বললেন,—কিন্তু তোমার মেয়ে কি বলছে? আবার ত তাড়াবে না তো তাকে? ভাই-এর বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অবজায় ঠোঁট উলটালেন তিনি—তা যে মাছ মেয়েরা তোমায় করে, তুমি জানবে কি, বলবে কি—তাড়ালেই বা করবে কি। যা করবার তারা করবে। তোমার ইচ্ছারও হবে না, আমার ইচ্ছারও না। ওদের ব্যাপারে আমাদের কিছু করবার নেই। কিন্তু সুদর্শনকে আমাদের তো সব কথা খুলে বলতে হবে? সে জাহুক কি ষটেছিল। তুমি বলেছ তো তাকে সব বুত্তান্ত? বলোনি? কেন? বাড়ী ছিলে না তুমি সুদর্শন যখন এসেছিল?

যতীন বাবুর ইচ্ছে হচ্ছিল বলেন, না, তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। হয়তো তাই বলতেনও যদি না কথাটা প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকত। স্বীকার করতে হলো তাকে, সবাই-ই বাড়ীতে ছিলেন, তবে কেউ তারা ঘর থেকে বেরননি।

মানে? বাড়ীসুদ্ধ তোমরা সবাই ঘরের ভেতর পালিয়েছিলে! কথাটা ছোটপিসী যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। ঠোঁট দুটো হয়ে উঠল তার যেন ঘুণা-ব্যঞ্জনার ছবি। বললেন, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। আমাকেই সুদর্শনকে ডেকে সব কথা বলতে হবে। এত বড় মিথ্যে কথা আমরা কেন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, এটা তাকে জানানো আমাদের কর্তব্য। নইলে সে ভাববে কি—আমাদের মান থাকবে তার কাছে? উঠে-পড়ে অনর্থক এটা-ওটা করতে করতে আরো কত কী বলে যেতে লাগলেন—যেটা উচিত মনে করছেন, সেটা তিনি করবেন—তার পর আর এই ব্যাপারের ভেতর তিনি নেই। যা খুসী করুক তার মেয়েরা। তাড়াতে হয় তাড়াক। খাতির করতে হয় খাতির করুক। কিন্তু যতীন বাবুর কানে কোন কথাই প্রবেশ করছিল না। তিনি ভাবছিলেন একেবারে অজ্ঞ কথা। মেয়ে কি করবে তা তিনি জানেন না কিন্তু তিনি কি করবেন তা স্থির করে ফেলেছিলেন যতীন বাবু।

তার একেবারেই অভিপ্রায় ছিল না সুদর্শনকে কিছু বলার। মৌরী ডাক্তার এবং নাস'কে মিলিয়ে যে সমস্ত প্রস্ন্ন ফুলেছে, বিয়ে ভেঙ্গে দেবার কারণ হিসাবে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করেছে, সে সমস্ত তাদের পক্ষে সুদর্শনের কাছে উচ্চারণ করতে যাওয়ার মধ্যেও সঙ্কোচ ছিল অপরিণীম। কোন জিজ্ঞাসা নিয়ে যখন সুদর্শন তাদের কাছে আসছে না, তখন সেই তো সসন্মানে মুক্তি দিয়েছে তাদের। তবে আর কেন তার ভেতর তারা চুকতে বাবেন? কিন্তু তার মতামতের স্বীকৃতি বা সম্মান যেমন মেয়েদের কাছে নেই, তেমনি বোনের কাছেও তো নেই। বিবস মুখে বসে রইলেন যতীন বাবু দু হাতের মুঠায় লাঠির মাথা চেপে ধরে।

বদিও পনের দিনই ছোটপিসী চায়ের নেমস্তল্ল করে পাঠালেন সুদর্শনকে। কিন্তু সে বিনীত জবাব পাঠালো, নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো সুদর্শন। কিন্তু হঠাৎ তাকে এক আত্মীয়ের অপারেশন কেস নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে বলে তার সব কিছুই উলটে-পালটে গেছে। তিনি যেন কিছু মনে না করেন, সময় পাওয়া মাত্র সে আসবে।

কিন্তু এসব কথা মঞ্জুরা কিছুই জানলে না। কারণ, যতীন বাবু বাড়ীতে কোন কথাই বললেন না। মঞ্জু ভাবলে, হলো কি? কোথায় সেই সন্ধ্যারই ফের সুদর্শন আসবে, এই তার ধারণা ছিল,

লাইফবয় যেখানে

স্বাস্থ্যও সেখানে!



আ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম!
আর স্নানেরপর শরীরটা কত বর করে লাগে।
ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্যকারী
ফেনা সব ধুলো ময়লা বোগবীজাদু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।
আজ থেকে পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন!



তা সেদিন সকাল তো ঘুমের কথা তারপরও পুরো পাঁচ দিন কেটে গেল সুদর্শনের দেখা নেই। চলতে কিরতে কথাটা সর্বক্ষণ মনের ভেতর ঘোরাফেরা করতে লাগল মঞ্জুর। চিন্তিত ভাবে এসে জিজ্ঞাসা করলে অমিতা, মৌরী নিশ্চয়ই এমন কিছু বলেছে যে, সুদর্শন বাবু আর আসবেন না—তাই মনে হয় না তোমার, এঁয় ?

না, মঞ্জুর তা মনে হয় না। প্রতিটি চরিত্রকে পরিণত সামঞ্জস্যের সমাপ্তিতে টেনে নিয়ে পাঠক-মন তৃপ্ত করতে হবে, বিশ্ব-পল্লকার তেমন দায়িত্ব স্বীকার করেন না। যেখানে সেখানে বধেছ সমাপ্তি টানাই তাঁর স্বভাব—তবু সুদর্শনকে যখন আর একবার এনে হাজির করেছেন তখন এ আসাতেই এ গল্পের শেষ নিশ্চয়ই হতে পারে না।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশে মেঘ-বৌদ্বের খেলা চলছিল। ঝাঁক-ঝাঁক বৃষ্টি বড় বড় কৌটা যেমন একবার বরষার করে নেবে আসছিল তেমনি আবার হঠাৎ করেই থেমে যাচ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বকুবকে বোদে ভরে ওঠছিল। পিসীমা মুখপোড়া বৃষ্টিকে গালাগাল করতে করতে কতবার যে তাঁর বোদের জিনিস ঘরে ঢোকালেন আর বার করলেন তার ঠিক নেই। মঞ্জু আজ ঘেঁই ছিল। তার ঘরে থাকবার কারণ অবিশিষ্ট যে বৃষ্টি নয় সে তো বলাই বাহুল্য। ক'দিন বাবু নীলকে সে উদ্ভিন্ন এবং চিন্তাকুল দেখেছে। তাজ হুদিন হল সে ভাশানেলেও আসছে না। এই হুদিন নোট নেওয়া আর নীলের জন্ত প্রতীক্ষা করা দুটোই একসঙ্গে করে গেছে মঞ্জু। কিন্তু ওর লাইব্রেরী কাজের উৎসাহে কেমন যেন ক্রমশই ভাটা পড়ে আসছিল। একবার নীলের খোঁজে তার ওখানেই বাওয়ার দিকে বুকুেছিল মনটা। কিন্তু গেল না। এ হুদিন জয়াকে দেখতে গিয়ে মমতার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, গল্প হয়েছে। কিন্তু হু দিন দেখা না হওয়ার জন্ত তার খবর জানতে চাইতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করেছে মঞ্জু। বলার মত কারণ কিছু থাকলে বা ঘটলে মমতা তাকে বলত।

এই সঙ্কোচবোধটা মঞ্জুর ভেতরের দুর্বলতা কি? হয়তো। নইলে মঞ্জুর মতো মেয়ে ভীক হয়ে উঠবে কেন?

ঘড়ির কাটা মনের ঘরে যেতে না যেতে জানের ঘরে ছোটা, কিস্তে দাঁতে চেপে ভিজে চুল বাঁধা, তোবকের তলা থেকে আর আলনার উপর থেকে শাড়ী এসে খাটের ওপর কলে ধুঁতধুঁতে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, লাট শাড়ী মনঃপূত না হওয়ার আলমারী থেকে ধোঁয়া শাড়ী বের করা, তাও না থাকলে হু পাট খোলা আলমারীর শাড়ীশূণ্য গহ্বরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অমিতার কাছে শাড়ীর জন্ত ধাওয়া করা আর সব শেষে ভাতের জন্ত রান্নাঘরের দরজায় টেটামেটি গুরু করা—কোন কিছুই করতে না দেখে মৌরী যেন স্মরণ করিয়ে দিল মঞ্জুকে—ন'টা বেজে গেছে কিন্তু অনেকক্ষণ।

আগের দিনের দৈনিক পত্রের একটা লেখা নিবিষ্ট মনে বসে কাটছিল মঞ্জু। বলল—কি হয়েছে তাতে।

—তোমার বেরোনোর সময় চলে গেছে।

—এখন বেরব না।

—বলিস কি! তোকে না দেখলে নাকি রান্না-ঘাট কাঁদে, পিসীমা বলেন।

—ঠিকই বলেন। বাহিরের বড় বড় টপটপে বৃষ্টির কৌটার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু বলল—কাঁদছে তো তারা। দেখছিস নে।

বেলা চারটার সময় জয়াকে দেখতে বাবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিল মঞ্জু। ঘরে এসে প্রবেশ করল অমিতা। বাড়ী ঢোকায় পথটুকুর মধ্যেই এক পশলা বৃষ্টি এসে ওর শাড়ী-আমা ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। শাড়ীটা ভিজে দ্বিতীয়বার পরার অযোগ্য হয়ে গেছে বলেই বোধহয় একেবারে মেঝের ওপরই বসে পড়ল সে। আঁচল দিয়ে ভিজে হাত-মুখ মুছতে মুছতে বললো—আর আপত্তি-টাপত্তির কোন প্রস্ন উঠতে পারে না।

—কি বিষয়ে? জিজ্ঞাসা করতে করতে মঞ্জু অমিতার ভিজে শরীরের দিকে তাকিয়ে বাইরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল কেমন বৃষ্টি পড়ছে দেখবার জন্ত।

—আরে বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে। এখন তোমার বেরুনো হচ্ছে না। অনেক কথা আছে।

—কি বিষয়ে? বাড়িয়ে দেওয়া হাতের তালু ভিজে গিয়েছিল মঞ্জুর। ভিজে হাতটা মুখে বুলোতে বুলোতে অমিতার সামনে এসে দাঁড়ালো সে—কি বিষয়ে এত কথা?

—এই মেয়েটির বিষয়ের বিষয়ে। মৌরীকে দেখালো অমিতা। কোলের ওপর এক বাশ ব্লাউজ নিয়ে বসে মৌরী কোনটার টুকটাকি ছেঁড়া সেলাই করছিল, কোনটার টিপ-বোতাম লাগাচ্ছিল। সে চোখও ফেরালো না ওদের দিকে। সে জানে, ছোটপিসী আজ হঠাৎ বাবা, দাদা, বৌদিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তবে এই জন্তই হয়ত।

জানতো মঞ্জুও। এবং মৌরীর মতই সেও জানত না কারণটা কি। এবার উৎসুক্যে আরো এগিয়ে এলো মঞ্জু—ওখানে সুদর্শন বাবু আজ এসেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তার পর?

—তার পর সব সমস্তা জলের মতো সমাধান হয়ে গেল নিজে নিজে। আর এতেও যদি না হয় তবে বুঝতে হবে, নিছক ছেলেমানবী জেদের ব্যাপার এটা।

—বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করো এবং মস্তব্য বাদ দাও। আমরা নিরপেক্ষ দর্শকজন যাত্র, সেকথা তুলে বাছ কেন?

হাতের নুঁচ-সুতো থেকে মুখটা পুরোও তুলল না মৌরী, তবু যেন পাগলের কাণ্ড দেখেছে এমনি ভাবের একটা তির্যক দৃষ্টি, একবারের জন্ত কেলল অমিতার মুখের উপর। তারপরই ফের হাতের কাজে মন দিল।

বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত অমিতা করতে পারলে না, সে চেঁচাও সে করলে না। সে বললো—ছোটপিসী সুদর্শন বাবুর আসবার কথা শুনেই নাকি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন—মানে, চায়ের নেমস্তন্ন করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এক আত্মীয়ের অপায়েশনের জন্ত তখন সুদর্শন বাবু এসে উঠতে পারেনি। বাবা আমাদের এসব কথা কিছু বলেননি তো—আর আমরা অথবা কত কি ভেবেছি—না পো?

—এতো কত কী ভেবেছ কেন? চোখ দুটো দুইয়ে বোদের দিকে তাকানোর মতো করে কুঁচকে তুলে মৌরী তাকালো অমিতার দিকে।

গ্রাহী করলে না অমিতা মৌরীকে। মনের পেছনে খুসী থাকলে যেমনটা হয়। ঠাট্টা-বিজ্ঞপ পরিহাস সব পিছলে পড়ে। গুরুদায়িত্ব-সম্পন্ন গৃহিণীর মতো ভারি কৈ চালে জবাব দিল—কত কি ভেবেছি তাই নিজের গরজে। মা নেই ঘরে। দুটো মেয়েকে ঘরে-ঘরে পাজি কয়তে হবে—এ কি সহজ কথা! এমন পাজি পেয়েও কপাল দোষে হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখলে মাথা ঠিক থাকে কখনো? তবু আমি বৌদি বলে, মা হলে পাগলা হয়ে উঠতেন, না—না মঞ্জু?

—ঠিক।

ওদের দুজনার চালে বেগে উঠতে গিয়েও হেসে ফেলল মৌরী।

রান্না বৈকালিক চা পরিবেশন করে গেল।

অমিতা চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বললো—আজ সুন্দরন বাবু এসেছিলেন। কথাবার্তা আমাদের সামনে হোক ছোটপিসীর এই ইচ্ছে—নইলে শেষে না তিনি আবার কোন দোষের তলায় পড়েন। কেন, কি বৃত্তান্ত কিছু জানিনে ছোটপিসী ডেকেছেন শুনেই সে কি বুককাঁপুনি। ভেবেছিলাম শরীর খারাপ বলে পাঠাবো। কিন্তু তোমার দাদা এমন চোখ লাগ করে উঠলেন না, যেতেই হলো। তারপর ওখানে গিয়ে—হলঘরে ঢুকে—ওই না দেখলাম সুন্দরন বাবু শুকনো মুখে বসে আছেন—তখন বুকখানার বা অবস্থা হলো না—, বুক হাত চেপে ধরে অমিতা খেন বোঝাতে চাইলে, সে চেপে ধরে কেঁপে ভেঙ্গে পড়া থেকে বুককে বাঁচিয়েছে।

—সংক্ষেপ—

হাতের কাপে চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল অমিতা। তারপর বললো—বাবা কিছুতেই সেখানে থাকলেন না। আমি আর তোমার দাদা বসলাম। কথা আরম্ভের ভূমিকাই বল আর ভদিতাই বল, ছোটপিসী অনেকক্ষণই করে নিলেন কিন্তু আমি শুনি নি—

—বেশ করেছে। কিছু সংক্ষেপ হলো?

—না বাপু, এতো তাড়া করো না। কথা কি একটা, অনেক যে। তুমি বোস।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে কথা বলছিল মঞ্জু। কিন্তু এবার জরাকে দেখতে যাবার ইচ্ছা ভাগ করতে হলো তার। সে ভালো আছে। চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু দরজায় চোখ পেতে বসে থাকবে জরায় ওয় জরায়। শেষে ভাবিত হবে। এমন তো একদিনও হয়নি। কিন্তু কি করা যায়। ঘটনাক্রমে পর আর হাসপাতালে ঢোকায় উপায় থাকবে না। সন্ধ্যা-সন্ধ্যা পায় হয়ে যাবে। অমিতার মতোই মেয়ের উপর বসে পড়ল সে। তারপর পা দুটো মৌরীর ইঞ্জিচেরার কাঁক দিয়ে গলিয়ে তার কোলের উপর তুলে দিয়ে বলল—আঙুলগুলো একটু টেনে দে তো দিদি। আর অমিতাকে বলল—আচ্ছা, তাড়া করবো না। কিন্তু তোমার উপর ঘটনার কিয়-প্রক্রিয়াগুলো বাদ দিয়ে—এঁা?

অমিতা বললো—জানো, ছোটপিসী এমন করে মমতার বাবা মার চাকুরী করে 'নার্স' মেয়ে গছানোর চেষ্টার কথা বললেন যে, আমিই অবাক হয়ে শুনেছিলাম। আমরা তো দুবের কথা, মমতার বাবা-মাও হয়তো এ ভাবে ভাবেননি। বললে বিয়ে হবে না, তাই বলেননি—এই তো। আমার খুব খারাপ লাগছিল—

—তারপর?

—আবার।

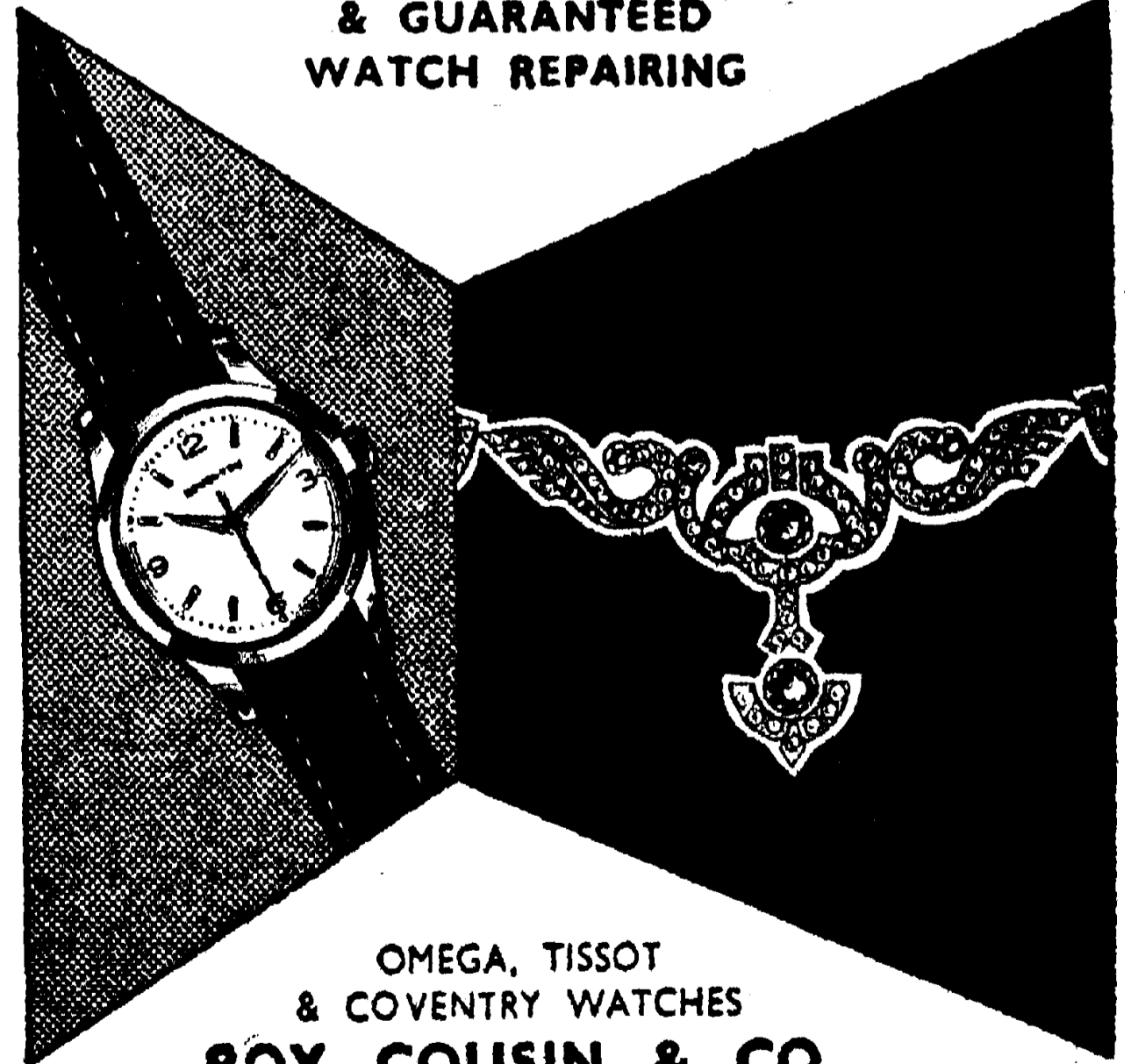
—কি আবার?

—তাড়া দিচ্ছি।

—কোথায় তাড়া দিচ্ছি। জিজ্ঞাসা করছি, তারপর কি হলো? এর পর মনে হলো, অমিতা সংক্ষেপের দিকেই চলে গেল। বললো, ছোটপিসী বললেন, মেয়ে-নার্স জেনে সে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে তারা বাধ্য হলেন। কিন্তু এদিকে বেকথা তারা কেউ যেনও ভাবতে পারেননি, তাদের মেয়ে তাই বলে বসল—দুটো বিয়েকে একসঙ্গে মিশিয়ে কেবল। বললো—একটা ভালো নাকি আর একটাও ভালো। কেন, কি জর? একটার সঙ্গে অন্যটার সম্পর্ক কি? আমরা তো আকাশ থেকে পড়লাম। কিন্তু মেয়ে কাঁদিয়ে ছাড়লে আমাদের। তার সেই এক কথা—বলে মৌরীর সেদিনের কথাগুলোকে বখেটে বখে-ঢেকে, ছোট-কেটেই যদিও ছোটপিসী উপস্থিত করলেন সুন্দরন বাবুর কাছে, তবু তার ভেতর এ কথাটা তো স্পষ্ট হয়েই উঠল মৌরীর বক্তব্যটা কি।

নার্সের কাজে সম্রম বিসর্জন দিতে হয়, এই যদি সত্য—এই যদি সত্য যে এই সেবার কাজ নারীর জাত বাওয়া, তবে বার-বার-বারে দেয় তাদের চাইতে অনেক বেশী অপরাধ।; তার-বার-বার-বারের তাড়নায় নেয়। এই যদি সত্য 'মেয়ে-নার্স' হলে জরঘরের বৌ হয়ে আসবার বোগ্যতা হারায়, তবে বাদে-বার-বার তা-বার-বারে বেশী অযোগ্য জরঘরের মেয়ের পক্ষে—তাই যদি ভাঙ্গে তবে একটা যে কারণে ভালোবে, অপরাধও সেই কারণেই ভালোবে—

for JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

—ঠিক।

—কে বললেন জানো? সুদর্শন বাবু। শুরু হয়ে, একেবারে পাথরের মতো জমে বসে কথা শুনছিলেন, ছোটপিসীর শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন আপনা থেকে তার মুখ দিয়ে 'ঠিক' শব্দটা বেরিয়ে এলো। হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট শুনেছি। শুনব না কেন বল—এই তো চার হাতের লম্বা সোফা, এই সুদর্শন বাবু বসেছেন আর এই তো আমি বসেছি। মাঝে তো মাত্র হাত দেড়েকের তফাৎ।

—তারপর?

—তারপর আর কি? সুদর্শন বাবুর মন্তব্য শুনে আমার এমন আনন্দ হলো যে আর কোন কথা আমি শুনি নি ছোটপিসীর।

—সুদর্শন বাবু আর কি বললেন?

—তিনি একটা কথাও বলেননি। চায়ের আয়োজন করেছিলেন ছোটপিসী প্রচুর। কেউ কিছু বুঝলে না তোমার দাদা বাবা। তারা খেতে পারলেন না। আমি আনন্দে এতো খেয়েছি যে ছোটপিসী নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন। নিজের প্রেটটা খেয়ে তোমার দাদার প্রেটটা থেকে তুলে নিয়েছি। বলে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

অমিতা যেন খেয়ে ছোটপিসীকে ভীষণ জ্বদ করে এসেছে সে। ওর অবস্থা দেখে হেসে কেবল মঞ্জু। বললো—কিন্তু তোমার প্রথম কথাগুলোর মানে কি হয় তবে? আর আপত্তির কারণ নেই। সব সমাধান হয়ে গেছে?

—বাঃ, হলো না?

—কি ভাবে হলো?

—ঐ যে বললাম, আমি স্পষ্ট শুনেছি, ছোটপিসীর মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন বাবু বলে উঠলেন, ঠিক।

—তাতেই সমাধান হয়ে গেল?

—কেন, হবে না? মৌরীর যা মত তাই যদি সুদর্শন বাবুরও মত হলো, তবে বিরোধ রইল কোথায় শুনি?

দুঃখ বড় বড় করে ওরই দিকে জবাবের প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাক। অমিতার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু এবার বলে উঠল—ঠিক। তারপর মৌরীকে জিজ্ঞাসা করল—শুনছি সব কথা?

—নিশ্চয়।

—বৌদির অভিমত, যদি মতের সঙ্গে মত মিলে গেল, তবে আর বিরোধ রইল কোথায়—তাই কি?

—নিশ্চয়।

—খুসী মনে ধন্যবাদ জানাতে পারি তোকে?

—বাধা কোথায়।

—বাধা কোথাও নেই, তোর মধ্যেও না—তাই দুঃখ হয়।

মেকের ওপর শুয়ে পড়েছিল অমিতা। কাত হলো সে। বললো, বাঃ, ওর ভেতরে বাধা না থাক, থাকলেও দূর হয়ে যাক, তাই তো আমরা চাচ্ছি। ওর মধ্যে বাধা না থাকলে দুঃখ হতে বাবে কেন?

—সেই জুই দুঃখ হবে। কাউকে ভুতে পেয়েছে শুনে আমরা দুঃখ বোধ করি। কেন করি, কারণ, আমরা মনে করি ভুত বলে কিছু নেই। বা নেই তাতে পেয়ে বসেছে দেখলে তাতেই দুঃখ পাচ্ছে দেখলে সব ক্ষেত্রেই দুঃখ হয়। তারপর, যদি এই সত্য হয়, তবে ঐ, যদি ঐ সত্য হয়, তবে সেই, যদি সেই সত্য হয় তবে ঐ। বুঝলাম মহিলাটির 'বদি' গুলো 'বদি' ঠিক হয় তবে কথাগুলো তার সব ঠিক—সুদর্শন

বাবুর ঠিকটাও ঠিক। কিন্তু আসলে ঠাড়াচ্ছেটা কি? সব গিয়ে ঠাড়াচ্ছে 'বদির' উপর—যার নিজের পায়ের তলায় ঠাড়াবার মতো এক রত্তি মাটি নেই। ভুললোকটিকে মহাশয় হারিয়ে দিয়ে বসে আছেন যে 'বদির' ত্রিফে, তাতে কেন জেতা তো দূরের কথা কেন কাইল অবধি করা যায় না।

কতক্ষণ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবে কি যেন ভাবলে অমিতা। তারপর উঠে বসে ভাবতে ভাবতেই বললো—দেখো, আমি ভেবে দেখলাম, বলে আবার যেন কি চিন্তা করতে লাগলো।

টিপ-বোতাম সূচ-সূতো সেলাই-এর বাসে ভরে শুছিয়ে গাছিয়ে, কোলের উপরের জামাগুলো হাতে তুলে উঠে পড়ল মৌরী।

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল—কোথায় চললেন আপনি?

—ছাদে।

—হ্যাঁ, বাও বাছা, ঐ তোমার উপযুক্ত জায়গা। ছাদে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকো গিয়ে।

পূর্বদিনের বোদ গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির খেলা আজ আর আকাশে ছিল না। সমস্ত দিন'খরেই বৃষ্টি বরছিল; বাতাস বইছিল। এখন সন্ধ্যায় আকাশটা কেমনধারা যেন একটা আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল পৃথিবীর দিকে। পিসীমা বলছিলেন, আশ্বিনের বাদল-বাতাসকে বিশ্বাস নেই। আকাশের চেহারাটা নাকি ঝড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার স্মৃতিতে জেগে উঠছিল সেই ছাব্বিশ সনের ঝড়ের ছবি। পদ্মা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যার জল যে ঝড়ে মালুয়ের মৃতদেহে ভরাট হয়ে উঠেছিল। বিকেলে যেই বাড়ী থেকে বেরুতে যায়, তাকেই বাধা দেন পিসীমা। কিন্তু কে শোনে? প্রায় একে একে বেরিয়ে গেছে সবাই। অমিতা বাও বা বাড়ী ছিল, এই একটু আগে তার বাবা গাড়া পাঠিয়ে নিয়ে গেছেন তাকে। যে আকাশের দিকে তাকিয়ে পিসীমার চোখ বড় দেখাচ্ছিল, সেই আকাশের দিকে তাকিয়েই কিন্তু আবার রানু শিব-পার্বতীর ঝগড়া দেখছিল। ঐ যে আকাশটা অমন লালচে—ও হলো শিবের রক্ত-নেত্রের ছটা। দুঃখ মা বায়না ধরেছেন বাপের ঘরে আসবার, তাই ধমকাচ্ছেন মহাদেব। সেই ধমকের তো শব্দ ঐ মেঘ-গর্জন। মা দুঃখী কান্দছেন, আর পৃথিবীতে জল ঝরছে। আবার বাবার বেলা, বিজয়ার দিন যে কান্দাটা কান্দবেন মা এক কোটা মাটিও থাকবে না।

চূপচাপ বসেছিল মৌরী। হঠাৎ রানু ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে বললো—দিদিমণি জামাই বাবু।

—জামাই বাবু আবার কে? মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল মৌরী। সে ভাবলে রানু কাউকে বাইরের ঘরে বসিয়ে সংবাদ দিতে এসেছে।

দরজার বাইরে ওরই পেছনে ঠাড়িয়ে থাকা সুদর্শনকে দেখিয়ে রানু বললো—এই যে।

এই যে মানে? রানু কাঁকে সঙ্গে করে একেবারে এখানে নিয়ে এলো। বিরক্তির টানে ক্রকে ঝাঁকিয়ে তুলল মৌরীর। তাড়াতাড়ি উঠে ঠাড়ালো সে আর ওঠা মাত্র চোখ পড়ল গিয়ে সুদর্শনের উপর। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল তার। রানুর এই সন্ধ্যাধনের কথা সে জানত না। তাকে কেউ বলেনি।

মৌরীর মুখের চেহারা দেখে পালালো রানু।

ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে এসে অপরাধীর মতো হাত জোড় করে দাঁড়ালো সুদর্শন। বললো—অপরাধটা সম্পূর্ণ আমার। এর জন্য ওকে ধমকালে আমার গায়ে বজ্র লাগবে। ও দেখেছে এই ভুললোকটিকে আপনার কাছে পৌঁছে দেবার এই একমাত্র উপায়। কিন্তু আমি তো বুঝিলাম ফলাফলটা মধুর হবে না রাসুর পক্ষে। তবে বিশ্বাস করুন, জামাই বাবু ডাকটা আমার শেখানো নয়। বলেন তো ওটার জন্য ডেকে আমি ধমকে দিতে পারি রাসুকে।

সে দিন এসে যে চেয়ারটার বসেছিল সেটাই টেনে নিয়ে নিজেই বসল সুদর্শন। আজ সে তার স্বভাব-বিপরীত ভাবে একটু চঞ্চল, একটু উচ্ছল। আর সে অন্ধকারে নেই। এখন সে আলোতে। সে কি ঘটেছিল তা জেনেছে, নিজে কি করবে তা ঠিক করে ফেলেছে। তার অহত আত্মমর্দাদা নিরাময় বোধ করছে। মৌরী তার কাছে এই ঘটনার ভেতর দিয়ে যেমন আরো বড় হয়ে উঠেছে, তেমনি আরো ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। জানে না মৌরী তার কথার পেছনে যে সত্য রয়েছে, তত বড় সত্য একটা বিশেষ ক্ষেত্রের একটা বিশেষ গোষ্ঠীর গোণা কয়টা মাথায় জন্ম নয়। তার ব্যাপ্তি যাবে গোটা সমাজের মাথা ছুঁয়ে।

বসে পকেটে হাত ঢোকালো সুদর্শন সিগারেট বের করবার জন্য। তারপর শূন্য হাতটা পকেট থেকে বের করে এনে বললো—মাথায় যখন কেবল এক চিন্তা এক কথা জ্বালায় জুড়ে বসে থাকে তখন যে মানুষের কি দুঃস্বপ্ন হয়—দেখুন, ফেলে এসেছি সিগারেট।

মৌরীকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে বতই মনস্থির থাক, সুহৃৎ সুখের সব ঐচ্ছল্য যেন দপ করে নিবে গেল সুদর্শনের। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল সে-ও।

তার অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে খেমে পড়ল মৌরী। বীরকণ্ঠে বললো—আপনার সিগারেট চাই তো ?

কথাটা প্রথমবাক্য নয়। কিন্তু সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সুদর্শনের। সিগারেট চাই তো ? মৌরী যেন তার লখনউ-এর বাড়ীতে, তার ঘরে। সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ার কথা শুনে চাকরকে সিগারেট আনার আদেশ দিতে যাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে তাদের বাগানের কুকুড়া গাছের পাতাগুলো ওরই মতো উচ্ছলতা প্রকাশ করছে। বলছে, মৌরী আমিই তোমার শাড়ীর ছটা আমার পাতার রক্তে রঞ্জিয়ে রেখে এসেছি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে পারব বলে। বুকের উপরের টেনে দেওয়া প্রান্ত পাড়টা ফুলের রক্তে রঞ্জিয়ে রেখে এসেছি তোমার বুকের পাহাড়-রাস্তা বেয়ে তোমার কাঁধে ঠোট ছোঁয়াতে পারবো বলে।

বাইরে মেঘ বৃষ্টি বাতাস, ঘরে সারাহের অস্পষ্টতার ঐটুকু

ব্যবধানে দাঁড়িয়ে মৌরী—ভেতরটা উদ্দামতা প্রকাশ করতে লাগল সুদর্শনের। কোন মতে বললো—দরকার নেই।

দরকার নেইটা নিতান্ত বাজে কথা। কিন্তু সুদর্শনই যদি বলে প্রয়োজন নেই, তবে ওর জোর করার কি আছে ? কিন্তু নিরস্ত হতে গিয়েও আবার হলো না। বললো, মঞ্জুর মতো কবির ব্যবস্থা আমি করতে পারবো না। কিন্তু সিগারেট আনিয়ো দিচ্ছি।

মৌরী চলে গেল। সুদর্শনের মনে হলো, নদ-নদী-গিরি-সমুদ্রের মধ্যে যেমন প্রকৃতিগত কতকগুলো বাধা আছে, মৌরীর মধ্যেও যেন তেমনি কতকগুলো প্রকৃতিগত বাধা আছে ? সেগুলোকে ভয় করে চললে জীবনেও তার কাছে যাওয়া যাবে না।

মঞ্জু আর রাসু একেবারে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে 'উঃ' করে নেমে পড়ল। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে রাগভক্তি মঞ্জু বললো—এমন ছুটে কোথায় চলেছিল ?

—সিগারেট আনতে।

—সিগারেট কার জন্য ?

—জামাই বাবুর জন্য।

ধমকাতে গিয়েও হেসে ফেলল মঞ্জু। বললো, সুদর্শন বাবু বলতে পারিস নে ?

মাথা চুলকোতে লাগল রাসু। বললো—লজ্জা করে।

পত্রিকার কাগজ মাথায় চাপিয়ে রাসু চলে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল মঞ্জু। কোন বাস্তবীর বাড়ী গিয়ে বসে আড্ডা দেওয়া আর ডালমুট ভাজা খাওয়া বাক। বৃষ্টি। তাতে কি হয়েছে ? যেমন বাদলা পথ দিয়ে বাইর থেকে বাড়ী কিরণ, ঠিক তেমনি করে আবার আবার একজনের বাড়ীতে অনায়াসে চলে যাওয়া যাবে। চূপচাপ বেরিয়ে গিয়ে ট্রামে চেপে বসল মঞ্জু। ট্রামের শাসি দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পিঠের জামা-কাপড় ভিজিয়ে তুলল তার। একটু সরে বসে শাসির নীল কাচের পিঠে বৃষ্টির জল পড়া দেখতে লাগল সে। কিছুক্ষণ বাদে একজন বাতীকে জানালা তুলে দিতে দেখে, সে-ও তুলে দিল জানালা। বৃষ্টির জোর নেই। প্রায় খেমে গেছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালো মঞ্জু। আকাশের চেহারাটার এমন একটা মস্ত ভাব ছিল যে তার দিকে তাকিয়ে মনও মাতাল হয়ে উঠতে চায়। আকাশটা দেখতে দেখতে হুটো ষ্টপেজ চলে গিয়ে হঠাৎ তৃতীয় ষ্টপেজে নেমে পড়ল মঞ্জু। নীলের ওখানে গিয়ে তাকে বিস্মিত করে দেবে সে। নাঃ, বৃষ্টিটা একেবারে থামেনি। ওঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে। একটা কোকানে উঠে দাঁড়ালো সে। নীল তাকে দেখে আশ্চর্য্য হবে, আর রজত ? যদি সে এখন গিয়ে রজতের ঘরে উপস্থিত হয়—তার হাতের গ্রাস ছিটকে পড়ে মেঝের চৌচির হবে ? [ক্রমশঃ।

"নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলা দেশ বত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত করে তুলবে, এই চাই। আপাতপরাভবকে অস্বীকার করার যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলা দেশের অকরণ অদৃষ্ট তাকে প্রেরণ দিতে বিমুখ, এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই ; বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রক্ত জাগারের তালা থেকে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

শিশির-সান্নিধ্যে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

একদা নরকে পাণীদের হুবহু দেখে লঙ্কেশ্বর রাবণের মনে হুঃখ হয়েছিল, তিনি স্থির করেছিলেন মর্ত থেকে স্বর্গ পর্যন্ত একটানা সিঁড়ি বানিয়ে দেবেন। তাতে অন্ততঃ নরক-বন্ত্রণা আর মানুষকে সছ করতে হবে না। কিন্তু নানা কারণে তাঁর ইচ্ছা আর পূর্ণ হ'ল না, রামরূপী মৃত্যু এসে তাঁকে পরমধামে পাঠিয়ে দিলেন।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের জীবনের শেষ ছ মাস কাল নানা বাধার দরুণ আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে পাইনি। কলে অনেক কথা পুরো জানা হয়নি, অনেক প্রশ্ন জিগোসাই করা হয়নি তাঁকে। একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—ভালো ভালো নাটকের চরিত্রগুলো অ্যানালাইজ করা প্রয়োজন। আমরা মনে করেছিলাম বিশ্রাম নিয়ে কিরে এলে, তাঁকে দিয়ে এ কাজটা করাবো; যে ক'টি নাটক তিনি পড়ে শুনিয়েছিলেন তাছাড়া আরো অনেক নাটক তিনি আমাদের পড়ে শোনাবেন; মালিনী নাটক রিহাসার্গাল দিতে শুরু করেছিলেন, বধাসময়ে সেটা মঞ্চস্থ করাবো; নতুন কোন নাটক রিহাসার্গাল দেওয়া শুরু করাব। ঔর সাহায্যে আমাদের মধ্যে ধারা নাটক লিখতে পারেন তাঁদের দিয়ে নতুন নাটক লেখাবার ব্যবস্থা করব।

রাবণের অপূর্ণ ইচ্ছার মত আমাদের ইচ্ছাও অপূর্ণ রয়ে গেল। আমাদেরই পরিচিত এক বন্ধু যখন ১৯৫১ এর ৮ই ও ১০ই মে মহাভাতি সদনে ঔর অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, তখনও ভাবতে পারিনি এই তাঁর শেষ অভিনয়! (দীর্ঘ ৬৮ বছর আগে যে আলমগীর নিয়ে তিনি পেশাদারী মঞ্চে অবতরণ করেন ৮ই মে সেই আলমগীরেরই শেষ অভিনয় হ'ল।) অবশ্য পরিচিত মহলের কেউ কেউ শব্দপ্রকাশ করেছিলেন, ঔর স্বাস্থ্য বড় ধারাপ হয়ে গেছে।

ঔর মনে মনে একটা ভয় ছিল, চোখ কাটালেই একটা কিছু বিপর্যয় ঘটবে; তাই অনেক দিন চোখ কাটাতে চান নি, কিন্তু মের শেষ দিকে শেষ অবধি চোখ কাটালেন। জুন মাসে ঔর শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালই, যদিও মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা ধরছিল, কচিং কদাচিং অতি সামান্য খাসকষ্ট হতে আরম্ভ হয়েছিল। তার মারাত্মক কিছু এমন মনে করবার কারণ ঘটেনি। তাই ৩০শে জুনের কাগজে ২১শে জুন শেষ রায়ে তাঁর মহাপ্রয়াণের খবর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই মনে হয়েছিল।

১২

শিশিরকুমারের জীবনের অতি সামান্য এক ভগ্নাংশ কাল আমরা তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম এবং তারও অতি ক্ষুদ্র অংশের পরিচয় এক দিন আমরা সর্বজন-সমক্ষে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছি।

আগেই বলেছি, শিশিরকুমারের জীবনী লেখবার প্রয়াসী আমরা নই আর সে অধিকারও আমাদের আছে বলে মনে করি না। এ কেবল মানুষ শিশিরকুমার, আলাপচারী শিশিরকুমারকে ফুটিয়ে তোলবার সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র।

এ কাহিনীর নায়ক ও বক্তা শিশিরকুমার স্বয়ং, আমরা এখানে অবান্তর। যদি কোথাও আমাদের ব্যক্তিগত বক্তব্যকে ব্যাহত করে থাকে তবে আমাদের লেখা কারো মনে ব্যথা দিয়েছে কিন্তু সে ক্রটি আমাদের ইচ্ছাকৃত নয় বরং সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। তবু ব্যথা ধারা পেয়েছেন তাঁদের কাছে আমাদের আন্তরিক হুঃখ জানাচ্ছি।

শিশিরকুমারের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের সামান্য প্রমাণই আমাদের লেখার প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার-বিমুখ। নিজের সম্বন্ধে কথা খুব কমই বলতেন, সামান্য বেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাও আমাদের সনির্বন্ধ অহুরোধ এড়াতে না পেয়ে অনিচ্ছাসহে বলা।

তাঁর মহাপ্রয়াণের পর বহু জনে বহু কথা বলেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক কথাই বলা হবে। সে সব কথার অধিকাংশই ব্যক্তিগত মতামত আর বহু মত তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন না এমন বহু জনের। এই শ্রবণে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবার ফলে আমাদের যা মনে হয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত সার ব্যক্ত করছি।

প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে তাঁকে মনে হয়েছিল অত্যন্ত গভীর প্রকৃতির মানুষ কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশও দেখেছি আমরা। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয়েছে তখন দেখেছি অত্যন্ত রসিক সজ্জন তিনি। আমাদের সঙ্গে বয়সের তাঁর অশেষ পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা ছিলাম বেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়। যেখানে তাঁর পরিচয় দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত আর আমরা অতি নগণ্য: ধারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন বা আসিতেন তাঁর কথা শুনে, তাঁদের অনেকেই আমাদের চিনতেন না—অথচ তিনি আমাদের কথা সব সময়ে শ্রবণে রাখতেন, ঘরে চুকে প্রথমেই আমাদের (এখানে আমাদের অর্থে যে সব অল্পবয়সী ছেলের দল ঘরে আসার গুলজার করতাম তাদের সকলের কথাই বলছি) খোঁজ নিতেন, কেউ হাজির না থাকলে, তার কুশল জানতে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তাঁর এ স্নেহ শুধু যে আমাদের ওপরই বর্ষিত তা নয়, দীর্ঘ দিন ঘরে ধারা তাঁর থিয়েটারে কাজ করেছে তাঁদের সকলকার সম্বন্ধেই তাঁকে সমান স্নেহশীল দেখেছি। এমন কি ধারা একদিন তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধেও তাঁর স্নেহ অব্যাহত ছিল।

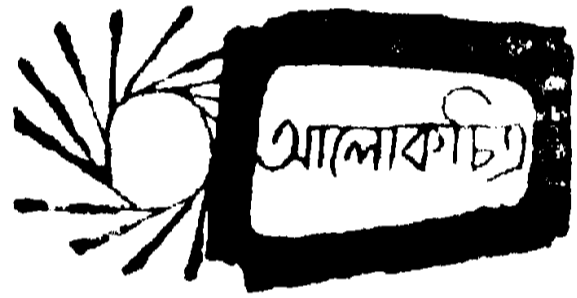
কোন বিশেষ এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সাধারণতঃ অল্প বিষয়ে একান্ত অজ্ঞ হ'ন। শিশিরকুমার পড়তেন এর ব্যতিক্রমের দলে। নাটক ও অভিনয় সম্পর্কীয় অস্তিত্ব বই ত মনোবোগ দিয়ে পড়তেনই, তাছাড়াও ইংরাজী বহু পত্র-পত্রিকা তিনি নিয়মিত পড়তেন। ইংরাজী সাহিত্যের আধুনিকতম গতি-প্রকৃতির বিষয়েও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। ইংরাজী অহুবাংদের মাধ্যমে তিনি অইংরাজ নাট্যকারদের নাটকও পড়তেন, জীবনের শেষ ছুটি বছরে তিনি জার্মান নাট্যকার ও জার্মানীর নব নাট্য আন্দোলনের অন্ততম শ্রষ্টা বার্খোল্ট ব্রেক্টের নাটক অত্যন্ত লক্ষণভাবে বিশ্লেষণ করে পড়েছিলেন। আমাদের কাছে তাঁর লেখা নাটকের উচ্চসিত প্রশংসা করে বলতেন—এসব



—সুব্রতকুমার ভট্টাচার্য্য



শিশু-মেলা

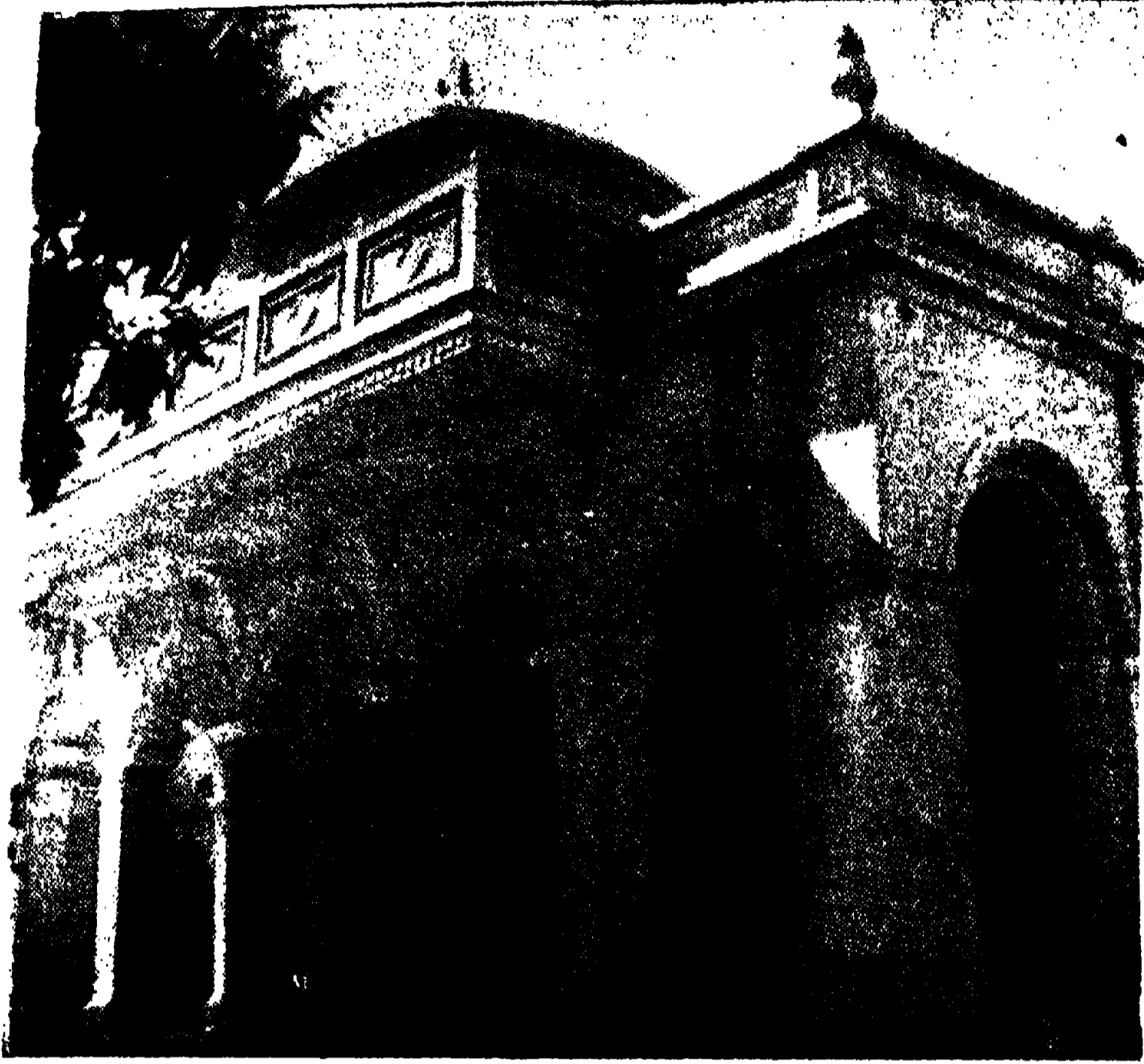


—প্রভাস দাস



—অধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়





সারদা-মন্দির
(জয়রামবাড়ী)

—স্বৰ্ণত মুখাপাখাৰ

পূৰ্বীৰ মন্দিৰ
—দ.শৰণি দাস





হাতেখড়ি

—বঞ্জিং বল



পবনন্দন

—প্রকাশজ্ঞে বহু

মাউরিশাবক

—চিত্ত মন্দী





নন্দরাজ (মহাবলীপুরম্)

—কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও
ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

নাটক পড়, পড়লে জ্ঞান বাড়েবে। তবে বিদেশী নাটক হলেই প্রশংসা করতে হবে এমন একটা মতের অঙ্ক পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। তাই স্বল্পে বলেছেন—ইবসেন ডেটেড হয়ে গেছে। ডগলস হাউসের নোরার চেয়ে শক্তিমতী নাট্যকার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে।

শিশিরকুমারের আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম। মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। নিজের থিয়েটারে তিনি চিরকালই বাঙালী কেতার টিকিট ছাপিয়ে, বাঙালী ধরণে নহবৎ বসিয়ে খাঁটি বাঙালী পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর বাঙালীমানার এখানেই শেষ নয়—অবশ্য বাঙালীমানা বলতে শুধু প্রাদেশিকতা নয়, সত্যকারের বাঙালী স্বপক্ষে গর্ব আর সেই সঙ্গে নিজেদের দোষ-ত্রুটি দূর করে স্বতন্ত্র সম্ভব নিখুঁত হবার আন্তরিক প্রচেষ্টাই বুঝেছি—জগতের যে কোন জাতির সঙ্গে তুলনায় বাঙালী যাতে হীন প্রতিপন্ন না হয় সে জন্ত নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বিদেশীর অহুকরণে গড়া বাঙালার ক্ষেমে আঁটা থিয়েটারে বাঙালী বুদ্ধিবৃত্তি তথা প্রতিভার পূর্ণ বা সম্যক বিকাশ কোনমতেই সম্ভবপর নয়, একথা তিনি একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করতেন আর সেই জন্তই বার বার তিনি আমাদের কাছে বলেছেন যে, বাঙালার নিজস্ব বস্ত্র যাত্রার উন্নতি ঘটিয়ে তাকে বর্তমান থিয়েটারের জায়গায় বসাতে হবে। নচেৎ বাঙালী জিনিয়াস কোন দিনই তার সম্পূর্ণ মহিমায় মুগ্ধরিত হতে উঠতে পারবে না।

অভিনেতা শিশিরকুমার স্বপক্ষে কোন কথা বলা আমরা বাহুলা মনে করি। বাঙালী থিয়েটারের স্বর্ণপ্রস্থ যুগের পরে ধীর নাম একক ও অনন্ত মহিমায় দীপ্যমান তাঁর স্বপক্ষে আমাদের মত ক্ষুদ্র বুদ্ধি মনুষ্যের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না; দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের ইতিহাসে সে পরিচয় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। নাট্যপ্রযোজক পয়িচালক শিশিরকুমার স্বপক্ষেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে কোন কথা আমরা বলতে পারব না, কারণ আমাদের সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত, তখন তিনি ভাঙ্গা হাটের সত্রাট। সন্ধ্যার স্নান আভা থেকে মধ্যাহ্নের দীপ্তি কল্পনা করতে পারলেও তাকে সন্মল করে সম্ভব্য করা চলে না। বরং প্রসঙ্গক্রমে নাট্যশিক্ষক শিশিরকুমার স্বপক্ষে দু'-একটা কথা বলতে চাই।

আমাদের একটা ধারণা ছিল, উনি কাউকে শেখান না কিন্তু প্রথম পরিচয়ের ক্ষণ থেকেই সে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটেছিল। দেখেছি, শেখাতে পেলে উনি আর কিছু চাইতেন না। অর্ধেন্দুশেখর প্রসঙ্গে একদিন বলেও ছিলেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা অর্ধেন্দুবাবুর মত আমিও রিহার্সাল দিয়েছি। রিহার্সাল দিতে দিতে নাওয়া-খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছি।

তাঁর রিহার্সাল দেবার প্রণালী ছিল রীতিমত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাধারণত শিক্ষার্থীকে শিক্ষক তাঁর নিজের ভঙ্গীর অহুকরণ বা বড়জোর অহুমরণ করতে শেখান। হবহ্ব হাবভাব অঙ্গভঙ্গী বাচন-প্রণালী অহুমরণ করে শিখারা সাধারণতঃ গুরুদেবের কার্বন কপি হয়ে ঝাঁড়ান। শিশিরকুমার কিন্তু নাট্যকার চরিত্রটি ভাল করে পড়ে বুঝিয়ে বিশ্লেষণ করে দিতেন। তিনি আশা করতেন, কৃত্তিকাবিনেতা চরিত্রটি অহুবাবন করে তাতে নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারবেন। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর আশা সফল হ'ত না। কিন্তু তিনি তাতে কখনো ঐর্ষ হারাতেন না বরং

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরলস পরিপ্রথম করে চলতেন ক্রান্তিত কলসাজের উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর আশা কলবর্তী হ'ত না, তখন বাধ্য হয়েই বলতেন ঠিক হয়েছে বাবা! সময় মাসিক এগিয়ে গিয়ে টেটিয়ে বলিস।

এই ধরণের রিহার্সাল দেওয়ার যেটা সবচেয়ে বেশী দরকার সেটা হচ্ছে একটা সংবেদনশীল মন। যে কথা তিনি বলতে চাইতেন সে কথা বুঝতে পারার জন্ত মনের কিছুটা প্রস্তুতি থাকা একান্ত প্রয়োজন ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অন্ততঃ শেষের দিকে প্রস্তুতি তাঁর শিষ্যদের কারোরই ছিল না। কলে বার বার তাঁর প্রচেষ্টা ব্যাহতই হয়েছে। অবশ্য চরিত্রবিশ্লেষণ বুঝতে না পারলে বার বার প্রশ্ন করে অপরিজ্ঞাত অংশকে উজ্জল করার সুযোগ ছিল তার প্রশ্নর ব্যক্তিত্বের। আসলে অন্তরা এতদূর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতেন যে তাঁকে পাঁচটা প্রশ্ন করবার দুঃসাহস কারো হ'ত না। এর অবশ্যস্বাবী ফলই তাঁর শেখদিককার নাটকে সুপ্রকাশিত ছিল।

শিশিরকুমারের নট ও নাট্য শিক্ষক-জীবনের গোড়ার দিকে বোধ হয় তাঁকে এতটা মনোভঙ্গের বেদনা অহুভব করতে হয়নি। কারণ, সেই সময়ে তাঁর শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাট্টা, শৈলেন চৌধুরী, জীমতী প্রভা, জীমতী চাকরীলা রবি রায় প্রমুখ এতগুলি প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রী নাম পাওয়া যায় যে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সেই সময় শিক্ষক হিসাবে তিনি চরম সাক্ষ্যই অর্জন করেছিলেন।

নাট্যবোদ্ধা হিসাবে শিশিরকুমার ছিলেন অতুলনীয়। যে কোন নাটক পাঠমাত্রেরই তার দোষ-গুণ তিনি স্ফুটস্বয়ং করতে পারতেন; এমন কি কোন কোন অংশের পরিবর্তন ঘটালে নাটকের নাট্যকীর্ত্তা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা যায়, একথাও অতি সহজেই বলতে পারতেন। এ বিষয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয় প্রফেসর ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীর মুখে শোনা একটি কাহিনী যথেষ্ট আলোকপাত করবে বলেই মনে হয়। ডাঃ অধিকারী বলেছিলেন—আমেরিকায় যাত্রার আগেই যোগেশ বাবু (চৌধুরী) বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকটি লেখেন। তাঁর বাড়ীতে নিশ্চিন্তে লেখার সুবিধা ছিল না বলে, তিনি আমার বাড়ীতে বসে বসেই নাটকটি লেখেন। এক একটা দৃশ্য শেষ হ'ত আর আমাকে পড়ে শোনাতেন, তারপর বিশাল গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে লেখার কোথায় কি দোষ-ত্রুটি আছে, এ নিয়ে আলোচনা করতাম আমরা।

শিশির বাবু আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর নাটকটির কথা তাঁকে বলা হয়, তা তিনি বলেন—লেখাটা একবার পড়ে শোনাতে পারেন? তাঁর বিড়ন ঠীটের বাসায় লেখাটা নিয়ে গিয়ে পড়ে শোনালেন যোগেশ বাবু। সবটা শুনে শিশির বাবু এক এক করে কোথায় কি দোষ-ত্রুটি আছে বলতে শুরু করলেন : ১ম অঙ্কের ২য় দৃশ্যটা বদলানো দরকার। ২য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্য এভাবে থাকা উচিত নয়; ৩য় অঙ্কের ১ম দৃশ্য অপ্ৰয়োজনীয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা দুজনে দুজনের মুখ-চাঁওরা-চাঁওরি করতে লাগলাম। উনি হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—আপনারা আমার সঙ্গে রহস্য করছেন বলে মনে হচ্ছে।

তখন যোগেশ বাবু বললেন—না, রহস্য করিনি, তবে আমরা

হুজনে ছ' মাস ধরে আলোচনা করে যে-সব দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করেছিলাম, আপনি একবার শুনেই তা ধরতে পারলেন কি করে ?

একটু হেসে তিনি বললেন—আমি যে মাতাল।

শিশিরকুমার সবচেয়ে শেষে যে কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলোকে বাদ দিলে, সমস্ত কাহিনীটি থেকে একটা কথাই মনে হয়—কি অসাধারণ সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল তাঁর ! যিনি একবার মাত্র শুনে একটি নাটকের সম্পূর্ণ দোষ-ত্রুটি নখদর্পণে দেখতে পান, নাট্যবোদ্ধা হিসাবে তাঁর নামের আগে কোন বিশেষণই তাঁর গুণের পরিমাপ করতে সক্ষম হবে না।

এই সূক্ষ্ম রসবোধই তাঁকে যে নাটক লোকে অসম্ভব বলেছে তাকেই অপূর্ব সুধামাণ্ডিত করতে সাহায্য করেছিল। সকল রসিকব্যক্তিকে একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সংলাপসমূহও দেনা পাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ বোড়শী শিশিরকুমারের অভিনয় ব্যতিরেকে কোনদিনই নাটক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারত না। জীবনচন্দ্রের মত অসম্ভব চরিত্রও যিনি রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ করে তুলতে পারেন ; তাঁর রসবোধ যে কত সূক্ষ্ম আর কত তীক্ষ্ণ, তা বলে বোঝান বাতুলতার নামাস্তর।

শিশিরকুমারের এই সূক্ষ্মদৃষ্টি শুধুমাত্র নাটক-বিচারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উপরন্তু অজ্ঞাত ক্ষেত্রেও তা প্রধরভাবে প্রকট হ'ত। একটা দৃষ্টান্ত দিই, একবার সারনাথের সংগ্রহশালার বেড়াতে গিয়েছিলেন শিশিরকুমার, সঙ্গী ছিলেন ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, (কাহিনীটি তাঁর কাছ থেকেই আমাদের শোনা)। সংগ্রহশালার কিউরেটর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ ঙ্গাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমদ্রোশ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃবন্ধুকে সম্বন্ধে সমস্ত কিছু দেখাচ্ছিলেন, এই সময়ে ওখানে একটি মূর্তি ছিল, সেটি যে কিসের মূর্তি বিশ হাজার নানান ধরণের দর্শকের কেউই তা ধরতে পারেন নি। অদ্রোশ বাবু শিশিরকুমারকে মূর্তিটি দেখিয়ে জানতে চাইলেন, সেটি কিসের মূর্তি। শিশিরকুমার একটু লক্ষ্য করে বললেন—এ ত মঙ্গোলিয়ান ধরণের ছাবপাল গোছের মূর্তি দেখছি। অদ্রোশ বাবুত খ, বিশ্বয়ের প্রাবল্য কমতে তিনি স্বীকার করলেন, তিস্ততী ধরণের মূর্তিটির সারনাথে উপস্থিতি তাঁদের বিভ্রান্তই করেছে, অথচ বিশেষজ্ঞ বিদগ্ধ দর্শকরাও এর ধরণ ধরতে পারেন নি।

বিশ হাজার লোক যা দেখতে পারেনি শিশিরকুমারের চোখে তা পড়ল কি করে ? তিনি নিজের তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবায় উত্তর দিয়েছিলেন—আমি যে বাবা মাতাল। কিন্তু মাতাল হলেই কি এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি পাওয়া যায় ? তাহলে ত দেশের ভাবত মাতাল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাড়াটি হতে পারত। তা হওয়া সম্ভব নয় আর নয় বলেই মাতাল হ'ল বা না হ'ল শিশিরকুমার শিশিরকুমার, আর অস্তর কিছু নয়। রাজবাণী মীরার একটি ভজনে এ পার্থক্য সূক্ষ্মরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে :—

হৃদ পিনেসে হরি মিলে ত বহুত ব্যসবালা

মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

নন্দলালকে পেতে হলে প্রয়োজন যে প্রেমের এই কথাই সার। অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্যকে লাভ করতে হলে প্রয়োজন সাধনার আর প্রয়োজন সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত বিবিধ কামতা।

শিশিরকুমার সম্বন্ধে আর একটা ভ্রান্ত ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত—তিনি নাকি অত্যন্ত দার্ভিক। প্রতিভার নিজস্ব একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় থাকে, তাকে অহমিকা বলে ভুল করা সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু এ ধরণের ভুল করা অজ্ঞায়, কারণ আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন ব্যক্তিকে দার্ভিক বললে তাঁর প্রতিভাকে অসম্মান করা হয়। প্রতিভার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, সে আপনায় মাঝে আপনি হারিয়ে কোন সূত্র দিগন্তে কল্পনার বড়ী পাখনায় ভর করে ভেসে বেড়ায়, দৈনন্দিনের রূঢ় বাস্তব তাকে স্পর্শ করে কিন্তু মনের মধ্যে তা স্থায়ী হয় না। এই আত্মনিমগ্নতাকে গান্ধীর্ষের আবরণে ঢাকা দেবার চেষ্টা করলে তাকে কি দম্ব বলা যায় ?

শিশিরকুমারের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে বলতে পারি, তিনি মোটেই দার্ভিক ছিলেন না। প্রথম দর্শনে অবশ্য এ ভুল হওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর চারদিকে একটা ছন্ন গান্ধীর্ষের বর্ম পরিবে রেখেছিল। পরিচয় কিছু যিনিষ্ট হলেই বোঝা যেত, অত্যন্ত সদালাপী, হাস্যময় রসিক পুরুষ তিনি। মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে তিনি প্রায় আমাদেরই সমবয়সী হয়ে পড়তেন। তাঁর সরস বাচনশক্তি ও নির্মল রসিকতার প্রায়ই আমাদের দলে হাসির বোল উঠত।

অর্ধের প্রতি শিশিরকুমারের অত্যন্ত মোহ ছিল, এমন একটা কথাও শোনা যায়। আমাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধন পরিচয় হয় তখন তিনি অর্ধাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও সিনেমায় প্রচুর অর্ধপ্রাপ্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, সে দিকে যাননি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন সিনেমা তাঁর সৃষ্টির উপযুক্ত মাধ্যম নয়। আমাদেরও সেই কথাই বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পুরোনো নাটক পড়ে শোনানোর জন্য বন্ধন কথা বলা হয়, তখন তাঁকে দর্শনী নিয়ে নাটক পড়ার কথা আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল। তিনি কিন্তু রাজী হননি, বলেছিলেন—না, বহুলোক এলে ঠিকমত ভাবে তারা পড়ার রস হয়ত পাবে না আর তাতে আমার মনও ভরবে না। তার চেয়ে তোমরা যদি আমার কাছে পড়া শুনে কোন লাভ হবে মনে কর ত তোমাদের কাছে গিয়ে পড়তে পারি। নব্য বাঙলা নাট্য পরিষদ সৃষ্টির গোড়ার কথা এই।

এমন অনেক মানুষ থাকেন—যারা আত্মসম্মানের বিনিময়ে অর্ধোপার্জন করতে চান না। আজকের বহুতাত্ত্বিক যুগে আমরা তাঁদের ব্যবসা-বুদ্ধিহীন বা বোকা বলতে পারি নাই, কিন্তু মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারি না। সেইজন্যই শিশিরকুমার বন্ধন নিজের বিবেকের সঙ্গে আপোষ-রফা না করে বহু লোভনীয় প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে চলে যান, তখন তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাযুক্ত আমাদের হতেই হয়।

শিশিরকুমারের যে অর্ধের প্রতি অপরিমেয় মোহ ছিল না তার প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি, ১১৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। দীর্ঘকাল ধরে বন্ধন ধিয়েটার বন্ধ ছিল তখনও তিনি দলের কোন লোককেই বরখাস্ত করেননি, বরং প্রত্যেককেই নিয়মিত ভাবে কিছু কিছু অর্ধ ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দিয়ে এসেছেন। এ ছাড়া নিতান্ত অক্ষম হলেও পারত পক্ষে তিনি কোন লোককেই ছাড়তে চাইতেন না। এমন কি, অনেকে তাঁর দল ছেড়ে চলে যাবার পর আবার বন্ধনই কিরে আসতে চেয়েছে তখনই তিনি তাদের সাদরে

অত্যাধনা করে নিতেন। এ প্রসঙ্গে কেউ কিছু বলতে গেলে, বলতেন—তাখো, আমার বা বয়েস, তাতে পুরোনো কথা মনে করে রাখাটা অজায়। ব্যাং আসতে চায় তাদের আসতে বাধা দেব না, আর কাউকে সেধে আসতেও বলব না।

ঊনবিংশ শতকে বাঙলা দেশে যে নবজাগরণের তরঙ্গ উঠেছিল, যার সাড়া জীবনের প্রতি কোবে নাড়া দিয়েছিল, যার পরিচয় বাঙলা সাহিত্য, বাঙলার কৃষ্টি, বাঙালী মনীষা, বাঙালীর চিন্তাধারা তথা বাঙালী সমাজের প্রতি স্তরে স্তরে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, শিশিরকুমার তারই অঙ্গতম শেখ ধারক ও বাহক। খিয়েটারে যোগ না দিলে চিন্তাজগতের অঙ্গত্রও তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ স্পৃষ্ট হয়ে উঠত, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তবুও তিনি কেন সামাজিক সাহসনা-গল্পনাকে স্বীকার করে নিয়ে খিয়েটারের বন্ধুর পথে এলেন?

প্রথম ও প্রধান কারণ অবশ্য খিয়েটারপ্রীতি, না শুধু প্রীতিই নয় প্রেম। খিয়েটারকে তিনি মনে-প্রাণে ভালবাসতেন, তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই খিয়েটারের উন্নতির কথাই ভেবেছেন।

তা ছাড়াও তিনি বিশ্বাস করতেন অভিনয়ই তাঁর true vocation, বলেছিলেন—ঐটাই বা কিছু করতে পারি। A nation is known by its stage—এ কথাটা তিনি খুবই বিশ্বাস করতেন, তাই প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই দেশকে জাতিকে কিছু না কিছু ভাববার কথা তিনি গুনিয়েছেন। অবশ্য তাঁর কথা শুধুমাত্র অরণ্যে যৌদন সার হয়েছে কি না সে-খবর আমাদের চেয়ে অধিকতর ওয়াকিবহাল ব্যক্তির বলতে পারেন, আমরা শুধু এইটুকুই বলব যে, চিন্তার যদি সামান্য মূল্যও সমাজ দেয় ত শিশিরকুমারের চিন্তাধারা অমূল্য বলে বিবেচিত হবে।

আজকের সমাজ আর গত শতকের সমাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তাই আজকের দিনে ঊনবিংশ শতকের ধারায় শিক্ষিত ও মার্জিত কৃষ্টির সঙ্গে আমাদের কৃটিকে খাপ খাওয়ানো রীতিমত কষ্টসাধ্য। সমাজের যখন একমাত্র মন্ত্র—Dog eats dog. Everything is fair and devil take the hindmost; তখন শিশিরকুমার যে নিতান্তই বেমানান হতেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। যতই কৃচিবান আর যতই ছন্দসবান হোক, মাস্টার মশায়ের হাতের বেতের কথা সুল-পালানো পড়ুয়ারা ভোলে কি করে? সুতরাং মাস্টার মশায়ের অন্তর্ধানে সকলেই নিশ্চিন্ত।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের অবদান আজকে বিচার করা

সম্ভব নয়, তবু এইটুকু বলা চলে যে, বাঙলা নাট্যজগতের অবিস্মরণীয় স্মরণীয় গিরিশচন্দ্রের কাছাকাছি যিনি পৌছবার দাবী করতে পারেন, তিনি শিশিরকুমার। চাণক্য ক্ষত্রিয়ের দেহে ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক চেয়েছিলেন বিশ্বজয়ের স্বপ্ন সকল করবার জন্য, শিশিরকুমার সেই শক্তির অধিকারী হয়েও ব্যর্থ হলেন কেন, সে এক দুর্ভাগ্য রহস্য।

সহস্রাত কবচ-কুণ্ডলের অধিকারী কর্ণ অপরিমেয় পৌরুষ সত্ত্বেও কেন নিয়তির হাতে ক্রৌড়নক হয়ে রইলেন, কেন বার বার বিরূপ-ভাগ্যের ভাঙনায় করায়ত্ত সাকল্যালাভ করতে পারলেন না, তার রহস্য ছিল তাঁর জন্মমুহূর্তের মধ্যেই। শিশিরকুমারের ক্ষেত্রেও এমনি একটা কিছু ঘটেছিল কি না তা বলতে পারি না, তবে দাতাকর্ণের দানের ছিন্নপথের মত কোন এক কোমলতার ছিন্নপথেই যে নিয়মিত অমোঘ সন্ধান তাঁর মর্মচ্ছেদ করেছিল এ সম্বন্ধে আমরা স্মৃনিশ্চিত।

যে মানুষ দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের কর্মজীবনে সর্বদাই নাটকের আবেদন হৃদয়বেগের দিকে চালিত না করে মস্তিষ্কের দিকে চালিত করেছিলেন তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনে হৃদয়বেগের দ্বারা এক বেশী ভাবে পরিচালিত হলেন কেন, তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। অনেক বিচার বিবেচনা করেও এ সমস্তার সমাধান করতে পারিনি।

নট, নাট্য-পরিচালক প্রযোজক শিশিরকুমার আর ব্যক্তি শিশিরকুমার যেন দুটি বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব। নাটক সঙ্কীর সব বিষয়ে যে ব্যক্তিত্ব অতুলনীয় সেই ব্যক্তিত্বই ব্যক্তিগত হাসি-কান্নার দোলায় সম্পূর্ণ সাধারণ—এই দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বই তাঁর প্রতিভার মহত্তর প্রকাশের পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা হয়ে পড়েছিল। যদি তা না হত তাহলে নাট্যাচার্যের যে অত্যাঙ্কন ভাতি আমরা দেখতে পেতাম তা বা আমরা পেয়েছি তাকে বহু নীচে ফেলে রেখে যেত। কিন্তু নিয়তি: কেন বাধ্যতে!

শিশিরকুমার সম্বন্ধে বা কিছু বলার ছিল তা এবার শেষ হল। পাঠকদের কাছে ব্যক্তি শিশিরকুমারের কিছু মাত্র প্রকাশ যদি দেখাতে পেয়ে থাকি ত তাই আমাদের চরম সার্থকতা। বহুদিন ধরে পাঠকরা যে আমাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনেছেন তার অল্প ধন্যবাদ জানাই।

মানুষ শিশিরকুমার গত হয়েছেন কিন্তু শ্রদ্ধা শিশিরকুমার রইলেন চিরজীবী, সেই মৃত্যুঞ্জয়ীর উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেই এই জীবনী শেষ করছি।

সমাপ্ত

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দুর্ভাগ্য বোঝা বহনের সামিল হয়ে পড়েছে। অধচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বাধিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকার্যতায়, আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী' এই উপহারের অল্প সূক্ষ্ম আবেগের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থালাস। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে খুশী হ'লেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরণের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যে-কোন জাতব্যের অল্প লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।

মাহিতিক কৌতুক

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার বোষ

৩

সুখলা দিগম্বর বিশ্বাসের বাড়ীতে এক সময়ে তাঁর দ্বিতীয় সাবিত্রী ব্রতাপলক্ষে বন্ধিমবাবু ও তাঁর ভাইদের ব্রাহ্মণভোজনের নিয়ন্ত্রণ হয়। বন্ধিমবাবু ও তাঁর ছ'ভাই নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে বান। ভোজনান্তে দক্ষিণা নেবার সময় তিনি ছ'হাত বাড়ালেন। দিগম্বর বাবু বললেন—কি, তুমি ছ'হাতে দক্ষিণা নেবে না কি ?

বন্ধিমবাবু বললেন—না নিলে চলবে কেন ভাই ? গাড়ী ভাড়া এক টাকা দরকার। তিন ভাই-এর রোজগার দেখছি মাত্র বারো আনা, বাকী চার আনা কি আমি পকেট থেকে দেবো না কি ?

উপস্থিতের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটল।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধিমের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। সেই খবর পেয়ে ভূদেব বাবু তাঁর ছেলে মুকুন্দদেবকে তাঁদের উভয়েকেই তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসতে পাঠালেন।

মুকুন্দদেব গিয়ে দেখেন—হেমচন্দ্র কাঁড়িয়ে কাঁড়িয়েই বোতলে মদ খাচ্ছেন বসবার আর ঠিক হয়নি।

তাই দেখে বন্ধিম মুকুন্দদেবকে বললেন—দেখ, দেখ, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির কাণ্ডকারখানা একবার দেখ।

সেই কথা শুনেই হেম বাঁড়ুজ্যে উত্তর দিলেন—আর দেখ তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আদর আপ্যায়নের ধরণ ধারণ, অভ্যাগতকে আসন গ্রহণের আস্থান নেই।

মুকুন্দদেব উভয়ের কীর্তি দেখে ধ'।

দীনবন্ধু ছিলেন বন্ধিমের অভিন্নস্বয়ম্বু। তিনি যখন সুপারনিউমারি ইন্সপেক্টিং পোষ্টমাষ্টার ছিলেন তখন একবার কাছাড়ে গিয়ে ডাকের বন্দোবস্ত করে ফিরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন কয়েক জোড়া সেখানকার কাপড়ের তৈরী জুতো। দীনবন্ধু লোক মারকৎ এক জোড়া জুতো বন্ধিমকে পাঠিয়ে দেন—সঙ্গে একখানা কাগজ, তাতে লেখা—কেমন জুতো ?

বন্ধিমচন্দ্র বন্ধুর লেখা পড়ে হাসলেন ও সেই লোক মারকৎ লিখে পাঠালেন—“তোমার মুখের মত”।

আদালতে বন্ধিমের এজলাসে এক ব্যক্তি নালিশ করে যে সামনের বাড়ীর একটি লোক আনলা খুলে তার দ্বীকে ঘোজ দেখে।

বন্ধিমবাবু রসিকতা করে বলেন—হাওয়া আর চোখ কি কারও মানা মানে গা ?

মামলা মিটিয়ে দেন।

রসরাজ অমৃতলাল বসুর সঙ্গে দেখা করবার জন্ত এক ভ্রমলোক ষিয়েটাবে গিয়ে তাঁর ঠিকানা চান। কোন অভিনেতা তাঁকে ঠিকানা দেন—১নং মৈত্র লেন।

তিনি ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে শ্রামবাজারের অলিগলি ঘোরেন। হমিশ পান না। অবশেষে অমৃতলালের নাম বলায় পল্লীস্থ ভ্রমলোক তাঁর বাড়ীর হমিশ দেন। অমৃতলালের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বলেন—আপনার ঠিকানা খুঁজতে বড় হয়রান হয়েছি, মৈত্র লেন আর খুঁজে পাই না এষে দেখছি বামস্ত্রে মৈত্র লেন তাও ১।২।

তাতে অমৃতলাল বললেন—কে ঠিকানা দিবেছে ?

—ষিয়েটারের কোনও এক অভিনেতা।

—ঠিকই হয়েছে জানেন তো অভিনেতার আদেক দুখত করেন আর আদেক থাকে প্রমটারের হাতে।

একদিন চুঁচড়ায় ভূদেব বাবুর বাড়ীতে বন্ধিম ও ভূদেব উভয়েই কথার ব্যস্ত, এমন সময় বাঁশবেড়ের জমিদার রায় বাহাচর ললিতমোহন সিংহ ও মহেশ জায়রত্ন এসে হাজির। বন্ধিমের সঙ্গে জায়রত্নের আলাপ ছিল না। ভূদেবের সঙ্গে ছিল। ভূদেব তাঁকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাও বুকি শ্রাচ্ছে উপস্থিত হয়েছ ? তাই বুকি বিদেয় মাজতে এসেছ ?

উত্তরে জায়রত্ন বললেন না—না, ললিত বাবুর কাছে একটা বৈবয়িক কাজে এসেছি।

যদিও কথাটা সত্যি, কিন্তু ললিত বাবু তামাসা করবার জন্ত বললেন—বটে, এখনি বামাল ধরিয়ে দেব, গাড়ীতে কলসী এখনও মজুত আছে।

বাস্তবিক জায়রত্ন মশায়ের গাড়ীতে তখন একটা নতুন পেতলের কলসী ছিল। বন্ধিমবাবু আর থাকতে পারলেন না, বললেন—অধ্যাপক মশাই, আপনি এখনও যদি শ্রাচ্ছে বিদেয়ের কলসী গ্রহণ করেন, তবে সেই সঙ্গে একগাছি দড়িও নেবেন। এই দড়ি কলসী নিয়েই তাঁদের সঙ্গে আলাপের সূচনা হয়।

সকরালা দিগম্বর বিশ্বাস বখন বধমানে তখন প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে বন্ধিম, দীনবন্ধু, সঞ্জীব, গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতির সাহিত্যের আসর বসত। একদিন সেইরূপ আসর বসেছে, সেদিন ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। বিভাসাগর সেদিন স্বহস্তে রোধেছিলেন। খাণ্ডতালিকা ছিল—ভাত, মাংস ও আমআদা সহযোগে পাঁঠার মিটুলির অংশ। বিভাসাগর নিজে পরিবেশন করছেন। বন্ধিমচন্দ্র খেতে খেতে বললেন—এমন সুস্বাদু অংশ তো কখন খাইনি ?

সঞ্জীববাবু বললেন—হবে না কেন ? রাজা কার জান ত, বিভাসাগরের।

বিভাসাগর হেসে বললেন—না হে না, বন্ধিমের সর্বমুখী আমার মত মুখ দেখেনি।

একদিন কৈকালার চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বসে বন্ধিমচন্দ্র গল্প করছিলেন। এমন সময়ে সেখানে চন্দ্রশেখর সুখোপাধ্যায় এসে হাজির। ইতিপূর্বে চন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে চন্দ্রশেখর বাবুর আলাপ ছিল না। বন্ধিম চন্দ্রশেখর বাবুকে দেখিয়ে চন্দ্রনাথকে বললেন—ওকে চেন না ?

চন্দ্রনাথ—না।

বন্ধিম—উনি 'উদভ্রান্ত প্রেম'।

প্যারীচাঁদ একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সভায় এক প্রস্তাবের সমর্থন করেন। কিছুক্ষণ পরে উক্ত প্রস্তাবের বিপরীত এক প্রস্তাবও সমর্থন করেন। তখন তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীর আর্থার উইলসন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—এ কেমন ব্যাপার ?

তাতে প্যারীচাঁদ অকুণ্ঠিত ভাবে বললেন—Am I not capable of amendment, Sir.

কোন এক সময়ে বাঙলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর শ্রীর এসলির কাছে প্যারীচাঁদ কোন এক ব্যক্তির হয়ে সুপারিশ করেন। শ্রীর এসলি সেই সুপারিশপত্র সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে দেন। তবুও সেই ব্যক্তিকে বিকল হতে হয়। সেই ব্যক্তি প্যারীচাঁদকে আবার করেন। এবার প্যারীচাঁদ স্বয়ং এসলির কাছে সাক্ষাৎ করেন। প্যারীচাঁদের স্বয়ং আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্যারীচাঁদ বলেন—আগে আপনি যে পত্র দিয়েছেন তাতে 'ক্রীযুক্ত' ছিল না—এবারে একখানি 'ক্রীযুক্ত' পত্র দিতে হবে, এই কারণেই আমার আসা। এসলি রহস্য বুঝতে না পারায় প্যারীচাঁদ তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন—কোন জমীদার তার কোন প্রজ্ঞা আবেদনপত্র আনলে—তাতে স্বাক্ষর করে নায়েবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। নায়েবের প্রতি নির্দেশ ছিল "ক্রীযুক্ত" স্বাক্ষর ব্যতীত কোন আবেদন গ্রাহ্য হবে না। তাই আবেদনে 'ক্রীদীন' থাকলে তা গ্রাহ্য হত না। তাই সেইজন্তে বাতে আপনি 'ক্রীযুক্ত' স্বাক্ষর দেন, তার জন্ত আমি স্বয়ং এসেছি।

একথা শুনে এসলিও হাসতে হাসতে আদেশপত্র দেন। বলা বাহুল্য, সেবারে প্যারীচাঁদের সুখরক্ষা হয়।

বখন শোভাবাজারের নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 'মহারাজা' উপাধি পান তখন তাঁর অগ্রজ রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর 'মহারাজা' হননি।

একদিন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনে হু' ভাইকে একজনে দেখে প্যারীচাঁদ হাসতে হাসতে কমলকৃষ্ণকে বলেন—'রাজা বাহাদুর এবার ছোট ভাই 'মহারাজা'কে প্রণাম কর।'

রাজা বাহাদুর হাসতে লাগলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের কোঁতুক শুনে দীনবন্ধু লিখেছিলেন—

"রহস্য কোঁতুক হাসি রসিকতা ভরা

হতোম পেঁচার ধাড়ী পড়েছেন ধরা"

কালীপ্রসন্নের প্রতিবেশী পাল মশাই গরীবের ছেলে। লেখাপড়া শিখে সজা-সম্মিত্তিতে গিয়ে বেশ গণ্যমান্য হন। কিন্তু তাঁর বাপের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি খালি গায়ে সংসারের কাজ, হাটবাজার করেন। কালীপ্রসন্নের এই সব দেখে বড় বিসদৃশ লাগল। একদিন পাল মশাই সোনার চেন, চাপকান পরে যাচ্ছেন এমন সময় তাঁর বাপ খালি গায়ে বাজার নিয়ে কিরছেন। তাই দেখে কালীপ্রসন্ন গম্ভীর ভাবে বললেন—পাল মশাই, পাল মশাই, আপনি কোথা থেকে এমন চাকর পান ? আমাদের চাকর ব্যাটারী তো দিনরাত পড়ে পড়ে ঘুমায়—আপনার চাকরটি তো বেশ দেখছি রোদ্ধুরে বার বার দোকান বাজারে যায়।

বলা বাহুল্য, পাল মশাই লজ্জিত হলেন আর জানালেন তিনি চাকর নন, তাঁর পিতা।

এক সময় প্রসিদ্ধ ধনী আন্ততোষ দেবের (ছাত্তু বাবুর) বাড়ীতে ব্রাহ্মণ-বিদায় হচ্ছিল। ছাত্তু বাবু স্বয়ং উপস্থিত থেকে দক্ষিণা দিচ্ছিলেন। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ছাত্তু বাবু তিন টাকা দক্ষিণা দেন। তারপর তরুণ বয়স্ক রামনারায়ণ তর্করত্ন মশাইকে দুই টাকা দিলেন। তর্করত্ন হু' টাকা পেয়ে ছাত্তু বাবুকে বললেন—মশাই, আপনি পূর্ব ব্রাহ্মণের প্রতি নেত্রপাত (তিনে নেত্র) আর আমার প্রতি পক্ষপাত (দুয়ে পক্ষ) করলেন। আমার প্রতিও নেত্রপাত করুন।

ছাত্তু বাবু তর্করত্নের বাকচাতুর্যে প্রীত হয়ে আমোদ কল্পবার জন্ত বললেন—তর্করত্ন মশাই, ত্রিনেত্র কেবল মহাদেবেরই সম্ভব, মানুষের তো ত্রিনেত্র নেই ?

তর্করত্ন—আপনাকে তো আমরা আন্ততোষ বলেই জানি, ত্রিনেত্র কই ? পঞ্চানন আন্ততোষের পঞ্চমুখে পঞ্চদশ নৃত্য আছে শুনেছি। তর্করত্নের কথায় প্রীত হয়ে ছাত্তু বাবু তাঁকে পঞ্চদশ মুদ্রা দক্ষিণা দেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও সঙ্গে তর্করত্ন রসিকতা করতে ছাড়তেন না। ছাত্র বাদবকিশোর গৌড়ামীকে ডাকতেন—বাদব কি-শোর (শূকর) আর পড়ায় অমনোযোগী হলে উদ্দেশ্যকে বলতেন—'উ-ভে-বেব।'

একদিন ইন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাসী'র কার্যালয়ে বসে আছেন। আরও অনেকে আছেন। এমন সময় এক বুক এসে ইন্দ্রনাথের কাছে বসলেন। আর কিছুক্ষণ পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—মশাই, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

ইন্দ্রনাথ—হ্যাঁ, পার বৈ কি ?

যুবক—বকিম বাবুর উপজাসগুলির মধ্যে কোনখানি আপনার মতে শ্রেষ্ঠ ?

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ গভীর হয়ে বললেন—‘কৃষ্ণচরিত্র’ নামে সম্প্রতি বকিম বাবু যে উপজাসখানি লিখেছেন—সেখানি সর্বশ্রেষ্ঠ। এই উত্তর শুনে সকলে হেসে উঠলেন—যুবকটি অপ্ৰতিভ হলে।

একদিন কথা উঠল—বকিম বাবু লিখেছেন—যুদ্ধক্ষেত্রেই যে ঐক্য অর্জুনকে তাঁর লোকচার দিয়েছিলেন, তা তিনি বিশ্বাস করেন না।

ইন্দ্রনাথ বললেন—একথা ঠিক, কারণ তখন গীতার ইংরেজি অনুবাদ হয়নি, এ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন তাড়াতাড়ি উহা বুঝবেন কি উপায়ে ?

ইন্দ্রনাথ আদালতে মোকদ্দমা করতে করতে রসিকতার সুযোগ কখনও নষ্ট করতেন না।

কোন এক মোকদ্দমার পদুমণি নামে এক বারাননা সাক্ষ্য দেবার পরে এক পুরুষ সাক্ষী দিতে আসলে সে পক্ষের উকীল তার নাম, পেশা জিজ্ঞাসা করায় ইন্দ্রনাথ এ পক্ষ থেকে বলে ওঠেন—উনি পদুমণির অলি (ওলি)।

এক তত্ত্বাবধায় হাকিমের এজলাসে বিবম গণ্ডগোল হচ্ছে দেখে ইন্দ্রনাথ হাকিমকে বললেন—এ যে একেবারে সূতোহাটার গোল দেখছি।

রায় বেরোলে—ইন্দ্রনাথ তা শুনে বললেন—বোনা হয়েছে বেশ, কিন্তু ধোপে টিকবে না। বলা বাহুল্য সে রায় টেকেনি।

এক সময়ে হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ উকীল তাঁর পিতার কাছে টাকা পাওনা বলে নালিশ করে। প্রতিপক্ষের উকীল হন ইন্দ্রনাথ। একে হাইকোর্টের উকীল তার বাপের নামে পাওনা টাকার নালিশ! আদালতে লোকে লোকারণ্য।

এমন সময় ‘পুত্র’ উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করলে ইন্দ্রনাথ অতি সমাদরে তাঁকে বললেন—আপুন, আপুন, আপনি কখনো পুরুষ, শাস্ত্রে বলে পিতৃধন কেউ শেষ করতে পারে না—আপনি তো ধন শোধ করেছেন—উপরন্তু আপনার পাওনা—আপনি কখনো পুরুষ তাই আজ আপনাকে দেখবার জন্ত লোকে লোকারণ্য।

কোন এক সাহিত্য-আসরে দা’ঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) এলেন। দা’ঠাকুর তখন ‘বিদ্বক’ কাগজের সম্পাদক। সেই আসরে শরৎ চন্দ্রোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র—দা’ঠাকুরকে আসতে দেখেই সাদরে বললেন—এস, এস হে বিদ্বক শরৎচন্দ্র।

দা’ঠাকুরও কম বান না। প্রত্যুত্তর দিলেন—‘কেমন আছ তাই, ‘চরিত্রহীন’ শরৎচন্দ্র।

একবার ‘অ্যাডভার্টাইজিং-এর কানাইবাবুর ঘরে বসে আছি। এমন সময় দা’ঠাকুর এসে হাজির। দা’ঠাকুর আর কানাইদার

সঙ্গে কবিতার লড়াই লেগে গেল। ক্রমে তা আদিরসাত্মক হয়ে উঠল।

আমি বলে উঠলুম—দা’ঠাকুর, আপনার সুখখানা বেন পায়খানা। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না।

দা’ঠাকুর হাত নেড়ে জবাব দিলেন—ঠিকই বলেছিস, আমার সুখ পায়খানা অর্থাৎ খানা (খাবার) পায়।

শরৎবাবু কাশীতে গিয়েছেন—খেরাল হল, কাশীর গঙ্গার ওপারে রামনগরে যাবেন। সকালবেলায় নৌকা ভাড়া করে গঙ্গার ওপর দিয়ে রামনগরের কাছে এসে পৌঁছেছেন—এমন সময় দেখেন রামনগরের তীরে একটি মড়া পড়ে আছে—আর তার কিছু দূরে একটা গাধা চরে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে শরৎ বাবু সঙ্গীদের বললেন—কাশীর মাহাত্ম্য চেরে রামনগরের মাহাত্ম্য বেশী। কারণ এখানে মরলে সত্ত সত্ত কল পাওয়া যায় দেখছি।

সকলে উৎসুক হয়ে বললে—কি রকম ?

—কেন, জানেন না—কাশীতে মরলে স্বর্গবাস আর ব্যাসকাশীতে (রামনগরে) মরলে গাধা হয়। তা ঐ দেখুন, লোকটা সত্ত সত্ত মরেছে আর মরেই সত্ত সত্ত গাধা হয়ে ওখানে চরে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে সকলে হাসতে লাগল।

দা’ঠাকুর পথে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন—

রাহু কোথায় হে ?

বললুম—আশ্রমে আছেন।

বললেন—বেশ আছে। জেনে রাখ—যারা শ্রম করে ধায় তারা শ্রমিক। আর যারা বিনাশ্রমে ধায় তারা আশ্রমিক। বুঝলি, রাহুকে কথাটা জানিয়ে দিস।

অমূল্য বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের বৈঠকে প্রায় প্রত্যেক দিনই আসতেন চারুচন্দ্র মিত্র, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্পানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। নানা আলোচনা চলত।

একদিন গীতারত্ন জিতেন বাবু এসে হাজির। তাঁকে দেখেই বিজ্ঞানভূষণ মশাই বললেন—এস হে গীতারত্ন, গীতার এই শ্লোকটার একটু ব্যাখ্যা করে দাও তো। এই বলে তিনি শ্লোকটি বললেন—

‘নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েন চ।

মদন্তস্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

গীতারত্ন সঠিক ব্যাখ্যা করতে সুরু করলেন—

তাই শুনে তিনি বললেন—না, না, ঠিক হল না, নতুন ব্যাখ্যা। তবে শোন—

এক গুরু আর শিষ্য, উভয়েই মত্তপারী।

শিষ্য—গুরুদেব, শাস্ত্র যে মদের পক্ষপাতী নয়।

গুরু—কে বললে ? শাস্ত্রতত্ত্ব বোঝে ক’জন। আচ্ছা গীতা অর্থাৎ হিন্দুর Bible এর চেয়ে তো আর বড় শাস্ত্র নেই। তাতেও মদের প্রশংসা আছে—মদের মাহাত্ম্য আছে।

শিষ্য—সে কি গুরুদেব ! আমি যদিও সংস্কৃত জানি না। তবুও বাংলা গীতা পড়েছি—তাতে তো মদের কোন প্রশংসা নেই ?

গুরু—চোখ দিয়ে পড়লে দেখতে পেতে। শরৎ ঐক্যক বলেছেন—

আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, তবে থাকি কোথা? 'মদভক্তা ব্রজ
তিষ্ঠান্তি—'মদভক্তা' অর্থাৎ মদের ভক্তরা যেখানে থাকেন তত্র
তিষ্ঠামি—সেখানেই আমি থাকি—নারদ, কিনা—না—বদ; এ
কথার বদ নাই। তবেই বোঝ ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কারা। মদ
বড় ভাল জিনিষ, অতি বলকারক।

গীতার আর একটা উপদেশ আবার শোন—সকল উপদেশের
সার হচ্ছে গীতা তার আর এক কথা শোন—

‘অত্র সুরা মহেশ্বরাণা ভীমার্জুনসমা যুধি’—

এর মানে কি? অত্র সুরা মহেশ্বরাণা অর্থাৎ মহেশ্বর সা সা।
অর্থাৎ এখানে সুরা কিনা মত্ত পান করলে কি হয়? না ভীমার্জুন
সমা যুধি যুদ্ধে যেমন ভীমার্জুনের শক্তি, তেমনই শক্তি হয়।
কিন্তু তখন বা তা মদ খেলে হ'ত না। তখনকার সময়ে ভাল
মদ করত মহেশ্বর সা। সুরায়াং সা সুরা কৌতুসী না মহেশ্বর সা সা,
মহেশ্বর সার দোকানের সুরা।

শিষ্য—আগে জানলে, গুরুদেব, এতটা সময় নষ্ট করতুম না।
এই বলে একটা কাচের গেলাস সামনে ধরলে।

গুরুদেব আহ্লাদের সঙ্গে বললেন—কবিকথা মিথ্যে হবার জো
নেই। কবি বলেছেন—

বোতল আর গেলাস
একটু যদি মেলাস,
মিকসচার বে তৈরী হয়
অতি কাষ্ট কেলাস।

নাও, একটু পরীক্ষা করে দেখ।

চাকবাবু—গীতারত্ন, তোমার বইএ এই নতুন ব্যাখ্যাটা সংযোগ
করো।

এক ভায়শান্ত্র পড়া ছাত্র কলুর বাড়ী এসেছে। কলুর বাড়ীতে
গরুর গলায় টানছে। গরুর চোখে ঠুলি গলায় ঘণ্টা। ভায়বাসীশ
ছাত্র গরুর গলায় ঘণ্টা দেখে কলুকে জিজ্ঞাসা করল—ওহে বাপু,
গরুর গলায় আবার একটা ঘণ্টা লাগিয়েছে কেন?

কলু—আমাকে বাড়ীর অনেক কাজ করতে হয়। সব সময়
গরুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই গরু যখন ঘুরবে না,
ঘণ্টাও বাজবে না তখন আমি বুঝব যানি ঘুরছে না।

তখন নৈয়ায়িক ছাত্র তাঁর টনটনে বুদ্ধির দৌড় দেখিয়ে বলল—
ঘণ্টা নাড়া নিয়ে কথা, তা যদি গরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়ে
তা হলে কি করে বুঝবে? তখন কলু বলল; গরু তো আপনার মত
ভায়শান্ত্র পড়েনি, এই বা সুরবিধে।

তোমার পাঠক নেই

(মাসিক বন্দোপাধ্যায়)

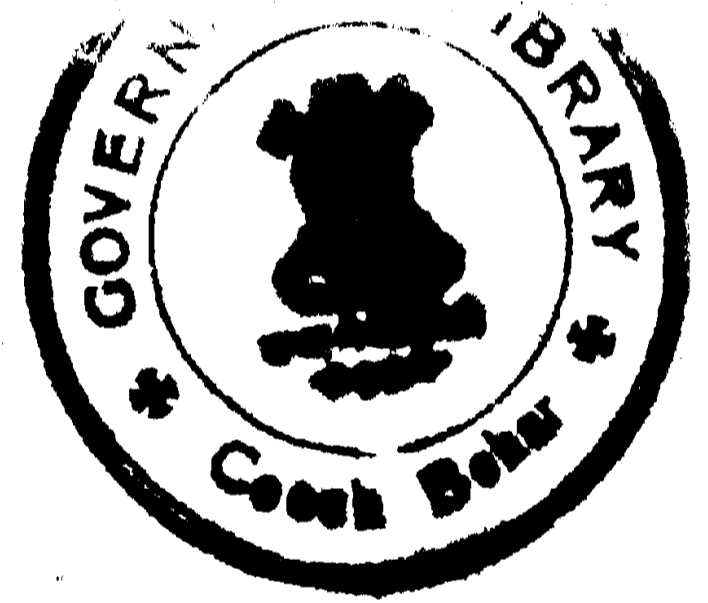
শ্রীকরণাময় বসু

হে অস্থির জীবন যন্ত্রণাকামী
মহাশিল্পী, কার লাগি লেখ উপভাস?
মুচলিত ক্ষীণবুদ্ধি সিনেমা-দর্শক বারা
কি বুঝবে তোমার আশ্চর্য জীবন-শিল্প,—
তির্থক স্মৃতীত্র বেগবান :
অর্থবহ জীবনসংগ্রাম কঠিন কর্কশ সাহিত্যরীতি
অকুণ্ঠিত দৃঢ়হাতে করেছে গ্রহণ।

নির্ভয়ে করেছ বিচরণ কেন্দ্রাতিগ ব্যক্তিত্বের পথে
অবিভক্ত সমাজ-সংস্কার রূপ অসাধু-পঙ্কিল বেধা।
অন্ধকার রোমাণ্টিক সাহিত্যের মর্মভেদ করি
তুমি হলে তীক্ষ্ণ সূর্য-আগ্নেয় উদ্বেগ।
অগ্নিশ্রাবী বেদনার ক্ষুব্ধতার ভাষা
নির্মম সত্যের মতো উলঙ্গ উজ্জ্বল স্পষ্ট শাণিত লেখনীমুখে।

ভণ্ডামি মুখোশ-পরা সৌখীন এ ধনতন্ত্রবাদ
স্বীকার করোনি তুমি, তাই বুঝি আত্মবিসর্জন?
ক্রুর ব্যক্ত বাকানো অস্ত্রের মুখে
খণ্ড খণ্ড বিশ্লেষণে ছিন্নভিন্ন কবিয়াছ
সাধুতার ধূর্ততাকে : ছিন্নভিন্ন করেছ কি তোমার জীবন?
তোমার নির্ভুল সাহিত্য-দর্পণে
বিশর্ভ সমাজ-দর্শন, সমাজের দেবতার দেখে ভরে
নিজেদের অকৃত্রিম ভণ্ডামির রূপ।

তোমার পাঠক নেই,
এ তোমার স্পর্ধিত অহঙ্কার :
মূল কচি বিকৃত বৌদ্বন্দ্বিবাদী সিনেমা-সাহিত্য-পাঠক বারা,
মহোন্মাদে সিনেমার লাবেরাঙ্গা গান বারা শোনে,
কি বুঝবে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-দর্শনবাদ,
আত্মসমীক্ষার নির্ভুল বিচারযুক্তি,
তোমার সাহিত্যের তীক্ষ্ণ সত্য-সূর্যের প্রকাশ।
তুমি এক মহাশিল্পী কঠিন হুঃসহ আত্মবিসর্জনার।
মর্মান্তিক প্রেরণায় উদ্বেগবিত্ত কবিয়াছ
আত্মার চরম অভীপ্সা, জীবনের অস্থির স্মৃতীত্র ব্যথা।
তুমি নেই, তোমার পাঠক নেই,
কে জানে অনতিদূর অনাগতকালে
রাষ্ট্র দেবে সর্বোচ্চ সাহিত্যসম্মান খ্যাতি,
অনগণ নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা দেবে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পীকে।
সেই দিন আর কতো দূর?



অক্ষয় ও প্রাণ



ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রাম

শ্রীমতী আশালতা দেবী

ভারতে দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে। ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছা করে ভারত ত্যাগ করেন নাই। ব্রিটিশের বন্ধনমুক্ত হওয়ার জন্য ভারতের স্থানে স্থানে যে সমস্ত সশস্ত্র বিপ্লব হতো, তাই শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগ করতে অসুপ্রাণিত করে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সশস্ত্র সংগ্রাম হয়েছে, চট্টগ্রামের সংগ্রাম তাদের অন্ততম। ঝাঁক নেতৃত্বে ভারতের এক কোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়মণ্ডিত চট্টগ্রামে বিপ্লবের প্রলয়-বহ্নি দেখা দিয়েছিল, তাঁর নাম সূর্য্য সেন। আজ তিনি সারা বাংলায়, তথা সারা ভারতে মাষ্টারদা' নামে পরিচিত।

কংগ্রেস-সেবক হিসাবে চট্টগ্রামে তখন মাষ্টারদা'র অসাধারণ প্রতিপত্তি। কিন্তু কংগ্রেস-সেবক হইলেও অহিংসপথে স্বাধীনতালাভ হতে পারে, এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাই তিনি স্বেচ্ছায় গোপনে বিপ্লবীসংস্থা গড়ে তোলার মন দিলেন। তাঁর স্বেচ্ছায় চট্টগ্রামের সর্বত্র স্ফূর্ত বিপ্লবীসংস্থা গড়ে উঠতে লাগল। বাংলার তদানীন্তন বিখ্যাত অসুসীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের বহু স্থানীয় কর্মী মাষ্টারদা'র গঠিত বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, দেশের অন্তর্ভুক্ত ইংরেজ-বিষেব পুঞ্জীভূত, বিপ্লবের বহ্নি ধূমায়মান, ইংরেজকে আঘাত হানবার এইটাই উত্তম সুরোগ মনে করলেন মাষ্টারদা'। তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল ভারতের মুক্তির জন্য সূচনা করে। "যুগান্তরের" প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংগীত তাদের শক্তি জোগায় সূর্য্যর জন্য প্রেরিত হতে :—

আর আজ মরিবি কে ?

জ্বার মত না লতি মরণ

সাধকের মত মরিবি কে ?

পিষিতে অস্থি ভষিতে কথির,

নিশীথ শ্মশানে পিষাচ অধীর।

ধাকিতে তত্ত্ব সাধনমন্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি মরিবি কে ?
অশ্রু নিধনে কিসের তরাস ? পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস ?
না গপি বিজ্ঞান কানন ভীষণ বিষম বিপদ মরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি বীরের মতন মরিবি কে ?
উঠিছে সিদ্ধু মথিরা তুকান, ছুটিছে উরি পরশি বিমান,
সাহসেতে ভর করি সে সাগর, হাসিমুখে তোরা মরিবি কে ?
মাতি সৌরভে যশগৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে ?
আর আজ আর মরিবি কে ?

বিপ্লবী দলের সকলের সম্মতি নিয়ে মাষ্টারদা' স্থির করলেন নিম্নলিখিত কর্মতালিকা :—

- ১। নিজাম পল্টনস্থ সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।
 - ২। রেলওয়ে অক্সিজেনকারী বাহিনীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।
 - ৩। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস আক্রমণ ও ধ্বংসসাধন।
 - ৪। রেলওয়ে পথ তুলে দিয়ে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়া।
 - ৫। ইউরোপীয়ান স্নাব আক্রমণ।
 - ৬। সরকারী ট্রেজারী আক্রমণ।
 - ৭। জেলখানা আক্রমণ, কয়েদীদের মুক্তিদান এবং তাদের কাজে লাগানো।
 - ৮। সহরের বন্দুকের দোকানগুলি লুণ্ঠন।
 - ৯। ইংরেজ সমর্থকদের শাস্তিবিধান।
 - ১০। লুণ্ঠিত অস্ত্রে বিপ্লবীদেরকে শক্তিশালী করে এবং বাংলার অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীদের সহায়তায় ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়ন।
- শত শত বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে থেকে মাষ্টারদা' বাছাই করে ৬২ জনের একটি তালিকা তৈরী করলেন। এদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, গণেশ বোব, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এই ছয়জনের উপর ভার দিলেন কার্য্যলুচী অগ্রসারে কাজ চালাবার জন্য, এক কথায় সর্বাধিনায়কের অধীনে এই ছয়জন নির্বাচিত হলেন বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতি, সর্বাধিনায়ক সূর্য্য সেন তাঁর এই বিপ্লবী বাহিনীর নাম দিলেন ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী।
- ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাতের বেলায় ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী কার্য্যলুচী হিসাবে কাজ আরম্ভ করে সেদিনের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বীর যুবকদের সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে বর্ণনা করা গেল।

"মাষ্টারদা'র নির্দেশে চার দল হয়ে,

অন্ধকারে বিপ্লবীরা চলিল এগিয়ে।

আটজন সেনা নিয়ে বীর লোকনাথ বল।

পাহাড়তলী অস্ত্রাগার করিল দখল।

অনন্ত সিং, গণেশ বোব অস্ত্রদল নিয়ে,

পুলিশের অস্ত্রাগার আক্রমিল গিয়ে।

পাঁচশো পুলিশ ঘেরা ঐ অস্তাগার,
নিমেষে দখলে এলো বিপ্লবী সেনার।
সে সময়ে অধিকাৰাবু নিয়ে একদল,
টেলিগ্রাফ, টেলিফোন একচেঞ্জ করিল দখল।
রাতারাতি এক দল গিয়ে লাংগলকোটে,
বোগাযোগ ছিন্ন করতে রেললাইন কাটে।
প্রতিদল নিজকাজ করি সমাপন,
পুলিশ অস্তাগারে গিয়ে লমবেত হন।
“ইনক্কার জিন্দাবাদ” আর “বন্দে মাতরম্,”
মুহুর্হু করে ধ্বনি বীর সেনাগণ।
গঠিত হইল সেখা বিপ্লবী সরকার,
সর্বাধিনায়ক পদে নিঃরাগ হল মাষ্টারদার।
সমগ্র চাটগাঁয় উড়ে তিনবর্ণে জাঁকা,
ভারতের আশাস্ত্রল জাতীয় পতাকা।”

(শ্রীহরদ্বয়জন ভট্টাচার্যের লিখিত “মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম” কবিতা হইতে)

রাতারাতি চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তাঁদের
পরিজনদের নিয়ে নদীর মাঝখানে নোঙ্গর ফেলে রইলেন। তিনদিন
সারা চট্টগ্রামে ইংরেজদের কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না।

রণরাস্ত্র বিপ্লবীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন জালালাবাদ পাহাড়ে।
২২শে এপ্রিল গোরা সৈন্য এসে আক্রমণ করে সেই পাহাড়টি চতুর্দিক
থেকে। মাষ্টারদার নির্দেশে আবার লড়াই শুরু হল। সমস্ত
দিন যুদ্ধ চলল। বিপ্লবীদের ১২জন নিহত হলেন, কিন্তু তাদের
তুলনায় অনেক বেশী ইংরেজ সৈন্য আহত ও নিহত হল।
জালালাবাদে মুক্তিযুদ্ধের বাঙ্গালী যুবক যে বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল
দেখিয়েছিলেন, তা সত্যিই অতুলনীয়। রাত্রির অন্ধকারে ইংরেজ
সেনাদের বেটনী ভেদ করে বিপ্লবীরা জালালাবাদ থেকে বেড়িয়ে
আত্মগোপন করেন। একটানা তিন দিন তিন রাত বিপ্লবীদের
মুখে এক কথা খাত পড়েনি, মুখে পড়েনি এক কৌটা জল। বিজ্ঞান
ও যুম তো তারা তুলেই গেছেন, কী হুঃসহ হুঃখকষ্ট ও উদ্বেগের মধ্য
দিয়ে যে তাদের প্রতিটি ক্ষণ কেটেছে, তা ভাবায় বর্ণনা করা যায়
না। শুধু এই প্রশ্নই বার বার মনে জাগে, কিসের প্রেরণায় এবং
কাদের কল্যাণের জন্ত বিপ্লবীদের এই তিলে তিলে আত্মত্যাগ?

মাষ্টারদার আত্মগোপন করলেন, কিন্তু আত্মগোপন করেও
দলের ছিন্ন সূত্রের যোগসাধনের চেষ্টা করতে লাগলেন কয়েক জন
বিপ্লবী দায়ককে সঙ্গে নিয়ে। ইংরেজ এবার বিপ্লবীদের ধরবার জন্ত
সর্বত্র ফাঁদ পাতিল।

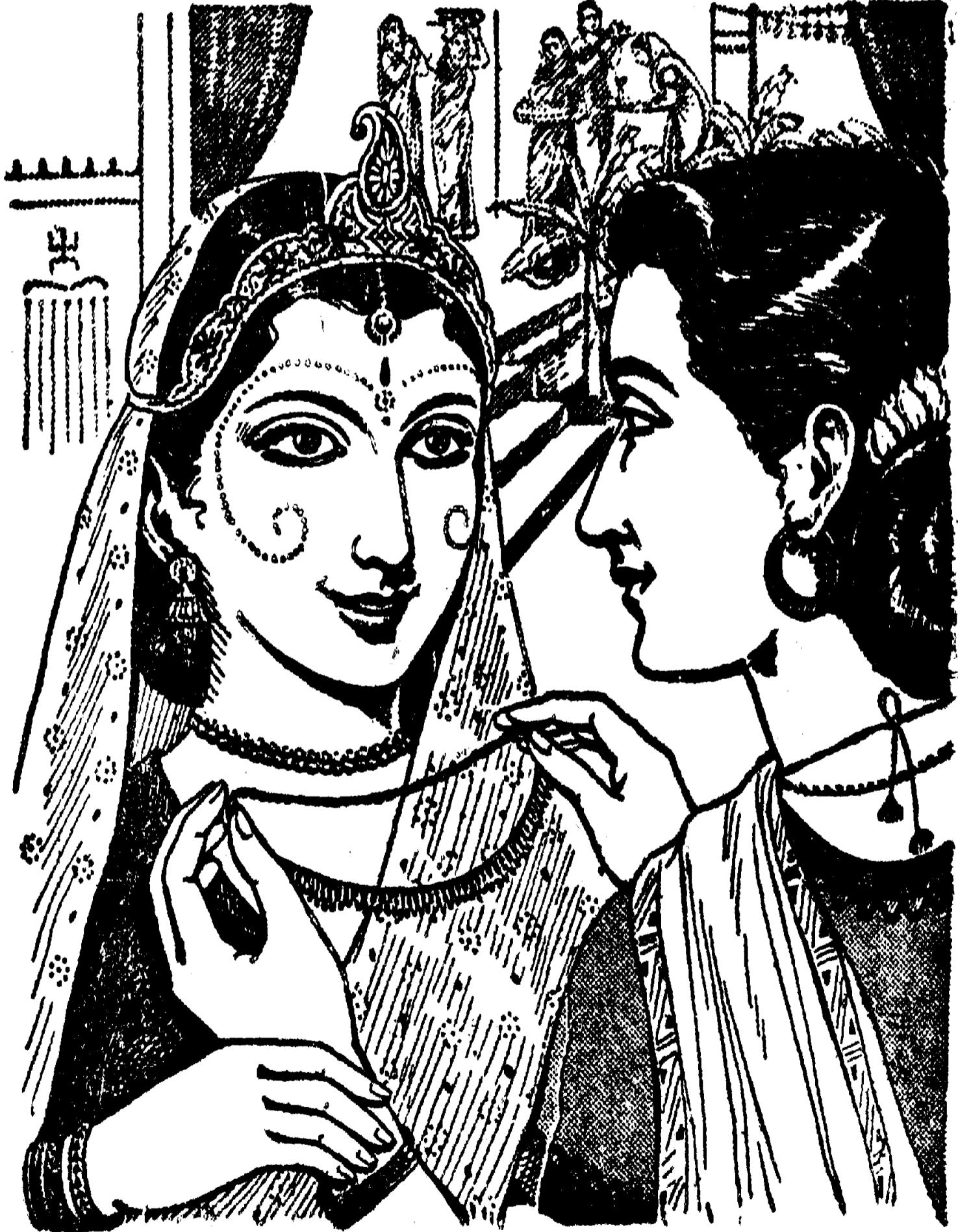
মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”
“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলাস
দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, ভাই,
মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে
ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও
দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলাস

দুইদিন আগের গহনা নির্মাতা ও রত্ন-সম্ভারী
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১৯

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



এই মে ১৯৩০ সাল, রজনীকুমার সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত, ফণীন্দ্র নন্দী, স্বদেশ রায় ও সুবোধ চৌধুরী, এই ছয় জন পলাতক বিপ্লবী চট্টগ্রাম সহরের নিকটবর্তী যেতাজ মহল আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, কিন্তু সেখানে প্রচুর ইংরেজসৈন্য থাকার আক্রমণ করা সম্ভব হল না। তাঁরা ফিরে আসবেন স্থির করলেন, এমন সময় দেখেন সুসজ্জিত ইংরেজসৈন্য তাদের আক্রমণ করেছে আর কালারপোলবাসী দলে দলে মুসলমান ইংরেজের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল গুলী-বিনিময়, একদিকে ছয়জন স্বদেশপ্রেমিক যুবক, অন্যদিকে বিরাট ইংরেজবাহিনী এবং তাদের সাহায্যকারী হাজারের উপর মুসলমান। সুবোধ চৌধুরী ও ফণীন্দ্র নন্দী আহত অবস্থায় ধরা পড়লেন। বাকী চারজন যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত অবস্থায় তিন শত পুলিশ ও অসংখ্য মুসলমানের চোখে ধুলি দিয়ে নিকটবর্তী শনবনে আত্মগোপন করেন।

রাত শেষ হলে পর অসংখ্য পুলিশ এসে শনবন ঘিরে কেলে, আর সাহায্যকারীর দলও তাদের সঙ্গে আসে, একদিকে চারজন যুবক আর অন্যদিকে বিরাট ইংরেজবাহিনী ও গ্রামের অসংখ্য মুসলমান, পুলিশের কর্তা বিপ্লবী যুবকদের আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করলেন। বিদ্রোহীরা জবাব দিলেন গুলী চালিয়ে। আবার লড়াই শুরু হল, যেমন একদিন হয়েছিল বুড়ীবালামের ভীরে—বাঘা বতীনের সঙ্গীদের লড়াই টেগার্টের বাহিনীর সঙ্গে। যুদ্ধ করতে করতে রজনীকুমার সেন, স্বদেশ রায়, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেন প্রাণত্যাগ করলেন।

এর পর পুলিশ আর মিলিটারীর অত্যাচার চট্টগ্রামের বৃক্ অব্যাহত পড়িতে চলতে লাগল। অত্যাচার কতদূর চরমে উঠেছিল, তা নিম্নলিখিত কবিতা হতে বুঝা যায়।

“ধরিবারে বিপ্লবীদের পাতা হল কাঁদ,
হিন্দুপন অত্যাচার চলে দিনরাত।
গুণাদল সঙ্গে করে পুলিশের দল,
নাথীর সতীত্ব কাড়ে গৃহস্থের সম্বল।
হিন্দু ব্যবসায়ী বহু শহর এসেকার,
প্রত্যেকের লুটে ঘর দিনের বেলায়।
অসংখ্য অত্যাচার চলে হিন্দুর উপরে,
ভাবতে না পাই খুঁজে ইহা বর্ণিবারে।
জর্জরিত জেলাবাসী আসামুজ্জার অত্যাচারে,
পথে ঘাটে হিন্দুদের মারে নির্ধিচারে।
চৌক বংসরের বালক এক হরিপদ নাম,
গুলী করে আমামুজ্জার পাঠায় স্বর্গধাম।
সুঁচ ফোটা ব্যাটারী চার্জ আর বেজাখাত,
সঙ্গীদের খোঁচাতে তার করার রক্তপাত।
এ ভাবেতে অত্যাচার চলে বালক উপর,
ভাবায় প্রকাশে না ইংরেজ কতই বর্বর।
প্রতিবার অত্যাচারে বালক উচ্চ স্বরে কর,
বুটশের ক্ষর হোক মাষ্টারদার জয়।
জেলাময় অবিরাম চলে অত্যাচার,
অত্যাচারে প্রতি ঘরে উঠে হাহাকার।”

(জয়দেবরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লিখিত “বুজুযুগে চট্টগ্রাম” কবিতা হইতে)

ইংরেজরা মনে করল যে, নয়নারী নির্ধিচারে সকলের উপর অত্যাচার করলে বিপ্লবীরা ধরা দেবেন। শেষ পর্যন্ত তাদের ধারণাই ঠিক হল। অনন্ত সিংহ হাজার হাজার পুলিশের চোখে ধূলা দিয়ে কোলকাতায় গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি ধরা দেন, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবীও কিছুদিন পর ইংরেজের অতর্কিত আক্রমণে ধরা পড়েন। এবার ইংরেজরা সূর্য সেন, নির্মল সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যে সমস্ত বিপ্লবী শুধনও ধরা পড়েন নাই, তাঁরা কিন্তু চূপ করে ছিলেন না। তাঁরা স্থানে স্থানে ইংরেজদের আক্রমণ করে অস্থির করে তুলতেন, সুবোগ পেলে ইংরেজদের হত্যা করতেন। একদিন প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবী দলের কয়েকজন চট্টগ্রাম সহরের নিকটবর্তী পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। আক্রমণ সফল হল কিন্তু প্রীতিলতা আত্মহত্যা করলেন সেখানেই।

বিপ্লবীদের মধ্যে ধীরে ধীরে পড়লেন, তাঁদের বিচার আরম্ভ হল। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, সহায়রাম দাস, ফকির সেন, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, সুবোধ রায়, রণবীর দাশগুপ্ত এই বার জনের ব্যবজীবন দীপান্তর হল। কয়েক দিনের মধ্যে অধিকা চক্রবর্তী ও সরোজ গুহের বিচার হল, তাঁদেরও ব্যবজীবন দীপান্তর হল।

মাষ্টারদা, এতেও হতাশ হলেন না। তিনি আবার নতুন ভাবে বিপ্লবীদল গঠনে মন দিলেন, তাঁর প্রতিজ্ঞা যে কোন ভাবে ইংরেজদের ভাঙিয়ে দিয়ে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মাষ্টারদার এক মিতান্ত পরিচিত ব্যক্তি ইংরেজদের নিকট হতে পুরস্কারের লোভে তাঁকে (মাষ্টারদারকে) ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেন। মাষ্টারদা গ্রেপ্তার হওয়ার পরও বিপ্লবীদের কাজ চলতে থাকে। এইবার নেতৃত্বের ভার পড়লো বিপ্লবীদের তারকেশ্বর দস্তিদারের ওপর, গোপনে ধর পেয়ে একদিন বিরাট ইংরেজ বাহিনী অতর্কিতে বিপ্লবীদের গুপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র আক্রমণ করে। দুই পক্ষ যুদ্ধ চলল। যুদ্ধে দুইজন বিপ্লবীদের নিহত হল এবং তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত বন্দী হল। তারকেশ্বর দস্তিদার বন্দী হওয়ার পর চট্টগ্রামের বিপ্লবের অগ্নিশিখা মিথেষ গেল।

এইবার মাষ্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিচার আরম্ভ হল। বিচারে মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের কাঁসির হুকুম হল এবং কল্পনা দত্তের ব্যবজীবন দীপান্তর হল। মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের কাঁসির দৃষ্টিতে বুটশ আতির চরম বর্বরতার নিদর্শন, তা নিম্নলিখিত কবিতা হতে বুঝা যায়।

“মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দুই বিপ্লবী নেতার,
বিচারক রায় দেন কাঁসি দুই জনার।
গভীর নিশীথে পুলিশ চুপি চুপি আসি,
দুই বীরে জানাইল দিতে হবে কাঁসি।
কিল ঘূনি মারে পিঠে বিপ্লবী নেতার,
কাঁসির পূর্বেতে করে নিশ্চয় প্রহার।
প্রহারেতে দুই বীর জর্জরিত কাঁদ,
মাতৃমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে কাঁসি-মঞ্চে ধার।

একই সঙ্গে কাঁসি-মঞ্চে উঠে ছইজন,

জাগ্রত পাষণপুত্রী হাঁকে বলে মাতঙ্গম ॥”

(শ্রীধনরঞ্জন ভট্টাচার্যের লিখিত “মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম” কবিতা হইতে)

মাঠারদা’ ও তারকেশ্বর দস্তিদারের কাঁসির পর চট্টগ্রামের বিপ্লবের বহি নিবে গেল সত্য, কিন্তু এই বিপ্লব দমন করতে গিয়ে ইংরেজদের যে বেগ পেতে হয়েছিল, তাতে তারা বুঝতে পারে যে ভারতীয়দের আর বেশী দিন অধীন রাখা সম্ভব হবে না এবং চট্টগ্রামের মত যুগপৎ আর কয়েকটি জেলায় বিপ্লব দেখা দিলে তারা পলায়নের সুযোগও পাবে না। তাই ভারতের অমঙ্গলকামী ইংরেজরা আপোষে ভারতের শাসন-ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে এমন ভাবে ছেড়ে দিয়ে যাবে স্থির করল, যাতে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয়েরা অধীন যুগের চেয়ে বেশী অশান্তি বোধ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় বলেছিলেন, “ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কি লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে।”

কবিগুরুর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত করে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে গেল। কিন্তু পশ্চাতে যে জঞ্জাল রেখে গেল, তার জঙ্গ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ইংরেজকে ক্ষমা করবে না।

আর যে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা ভারতীয় স্বাধীনতার জঙ্গ বৃষ্টির গুলীতে প্রাণ হারালো, তাদের আত্মত্যাগের মূল্য কি কেহ দিয়েছেন? কিসের জঙ্গ এবং কাদের দোষে ভারতীয় স্বাধীনতার অগ্রদূত চট্টগ্রামবাসীরা ভারতে জঙ্গগ্রহণ করেও আজ অভ্যর্থনা? কোন রাজনৈতিক নেতা বা ঐতিহাসিকের নিকট এই প্রশ্নের জবাব কি কোন দিন পাওয়া যাবে?

এসো না আমরা

গীতা মুখোপাধ্যায়

এসো না আমরা অনেক দূরেতে হারিয়ে যাই।
বেখানে কোথাও কোনো বাধা, কোনো বাধন নাই।
বেখানে আকাশ মাটিতে মিশেছে প্রান্ত দেশ;
একা তালগাছ কাঁড়ারে রয়েছে নির্নিমেব।
বেখানে কোথাও কাহারো চোখের ক্রকুটি নাই।
এসো না আমরা সেইখানে প্রিয় হারিয়ে যাই ॥
হেথা কোলাহল, এখানে অনেক লোকের ভিড়;
হুটো কথা বলি, নাহিক এমন শান্তিনীড়।
তোমার আমার হৃদয় হেথা হবে না ঠাই।
এসো না আমরা, অনেক দূরেতে হারিয়ে যাই।
বেথা শালবন শিমূল পিয়াল রঙের ঢেউ;
আমাদের খুঁজে পাবে নাকো আর কখনো কেউ।
সেথা হৃদয় গুঞ্জনভরা জীবনটাই।
এসো প্রিয় এসো, অনেক দূরেতে হারিয়ে যাই।
তোমার বুকতে মাথা রেখে মোর কাটিবে দিন।
উদয় হইতে সূর্য বধন হইবে বিলীন।
চাঁদের আলোর নিবিড় করিমা তোমাকে চাই।
এসো সখা এসো আমরা হৃদয়ে হারিয়ে যাই।

মেঘে ঢাকা তারা

“করাফুল”

‘মেঘে ঢাকা তারা’ নয় মেঘে ঢাকা জাতির জীবন।
রসাতল পানে ছুটে যেতে চেয়ে অক্ষ তমিশ্রায়।
শিহরিয়া উঠে : দেখে সম্মুখেতে অতল গহ্বর
আর্জুনাদে হাহাকারে বলে—বাঁচিতে চাই গো বাঁচিতে চাই।
কলির কঙ্কি—কোথা তুমি বলাে আজও কি গোপন রবে ?
কালোবাজারের পীড়নে মাহুয কাটার অর্ধাহারে
শিক্ষায়ত্তনে তখনচ করে দশ্যুতা করে কারা—
কোন অবু্য ব্যথায় ভেসেছে পরাণ হয়েছে পত্তর সম।

হে শুভ স্মরণ সত্য নির্মল আর কি দেবে না দেখা—
চির কালিমায় ঢাকা রয়ে যাবে আমাদের পরিচয় ?
কেমনে ঘুমাও—শোন না কি ওই কি রোমন দিকে দিকে ?
বাঁচিতে চেয়েছি বাঁচিতে যে চাই বাঁচাবে কে, বাঁচাবে কে ?

স্মৃতি

অনুরাধা মুখোপাধ্যায়

সাঁঝের আকাশে জল-জল করে তারার টিপ,
আঁধারের ছবি রাতের ফেমের বুক জুড়ে
কুহেলির বুক জোনাকিরা আলো সাঁঝ-শ্রীপ
সরমু্য আজ স্বরলিপি খোঁজে ঐ দূরে।

তারার মিছিল চাঁদের সত্য দেয় সাড়া
পাতা ঝির-ঝির সরমু্য আজ ওজ্রাতুর—
মেহেদি গন্ধ বনাস্তরেতে সুরহারা
মনে হ’লো আজ তুমি চলে গেছ কতদূর।

সেদিনও এমনি মেহুর-নরম সন্ধ্যাতে
এক হয়ে ছিলাম তুমি আমি দু’টো ফোটাফুল;
তোমার চুলের পেলব রজনী-গন্ধাতে
ভুলেছিলাম আমি জীবনের যত অ-প্রতুল।

সেদিনও তোমার কাজল চোখের দুইটি তীর
দেখেছি যে আমি অতমু চাওয়ার জলছবি;
ভালবাসা-জলে টইটমুর হৃদয় মীর
পূর্বরাগের রঙ মুছে গেছে আজ সই।

এখন আকাশ অশ্রু স্বরায় : বৃষ্টি-জল
আমার হৃদয় হারিয়েছে তোমা’ সরপি...
স্বপ্ন আমার হারানো ব্যথায় হয় উজল
কুলের সে দিশা হারিয়েছে মোর তরণী।

এস না আমার ব্যর্থ-প্রেমের ভগ্নচূর
মনে হ’লো আজ তুমি চলে গেছ কতদূর।

জাহাঞ্জেরবানু ও শাহারবানু বেগম

শিবানী ঘোষ

দাঁরা শুকোর কন্ঠা জাহাঞ্জেরবানু অত্যন্ত উন্নয়ন হয়ে বসে থাকে আপন কক্ষে। অদূরে বসে রয়েছে তার নিত্যসহচরী মানুষমা।

হৃৎনের মুখেই কোন কথা নেই। কয়েক গোটা চুল উড়ে এসে পড়েছে জাহাঞ্জেরবানুর মুখের ওপর। তার মনটা বড় বেশী ভারাক্রান্ত।

এমন সময় সেই ঘবে প্রবেশ করলেন জাহানারা।

দাঁরা শুকো আওরজাজের চক্রান্তে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হলে তাঁর নাবালিকা কন্ঠা জাহাঞ্জেরবানুকে বৃকে টেনে নিয়েছিলেন শাহজাহান-তনয়া জাহানারা। সেদিন থেকে তিনিই তাকে মানুষ করে এসেছেন অত্যন্ত আদর-বড়ে। তাকে আদর করে নাম দিয়েছেন জানী বেগম। ঐ জানী বেগমও তার পিসিমার আওতার থেকে শিক্ষায় দীক্ষায় হয়ে উঠেছে বিশেষ পারদর্শিনী।

হঠাৎ ঘবে প্রবেশ করে জাহাঞ্জেরবানুকে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকতে দেখে জাহানারা বলেন—কি হয়েছে রে জানী? এমন চুপ করে বসে রয়েছিস যে?

পিসিমাকে দেখে একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যায় জাহাঞ্জেরবানু। তবে তখনই সে ভাব কাটিয়ে উঠে সে বলে—কি আবার হবে পিসিমা! জাহানারা বলেন—উঁহ। চোখ-মুখ ভার-ভার দেখছি। চুলটাও বাঁধা হয়নি। সত্যি করে বলতো কি হয়েছে?

ওড়নার প্রান্তভাগটা আড়ালে জড়াতে জড়াতে মুখ নিচু করে জাহাঞ্জেরবানু বলে—বিচ্ছ হয়নি বলছি পিসিমা!

তখন সহচরী মানুষমা বলে—একেবারে বিচ্ছ হয়নি একথা বলা চলে না বেগম সাহেবা!

জাহানারা জিজ্ঞাস করেন—ওর কি হয়েছে রে মানুষমা?

মানুষমা বলে—আসলে শাহজাদীর হয়েছে কি—

তার কথার মাঝখানেই জাহাঞ্জেরবানু মানুষমার পানে তীব্র কটাক্ষপাত করে বলে—আমার কি হয়েছে তা তুই কেমন করে জানবি?

মানুষমা হেসে বলে—আমি সব সময় তোমার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াই আর তোমার মনের কথা আমি বুঝি না? আসলে কি হয়েছে জানো বেগম সাহেবা, শাহজাদা মহম্মদ আজম যখন আপনার কাছে এসেছিলেন তখন শাহজাদা একবার গিয়েছিলেন এ বারান্দায়। তা তখনই মহম্মদ আজমের দৃষ্টিবাণ এসে আহত করে দিয়েছে কুমারীকে। সেই সময় থেকেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে শাহজাদীর মন।

মানুষমার কথা শুনে জাহানারা জাহাঞ্জেরবানুর কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বলেন—এ কথা সত্যি নাকি রে জানী?

‘জাহাঞ্জেরবানু একটু নিচু করে নেয় মুখটা।

জাহানারা বলেন—তা এতে লজ্জা পাবার কি আছে? আমাকে এতকণ এ কথা বলিস নি কেন? তা হ্যাঁ রে জানী—

জাহাঞ্জেরবানু একবার মুখ তুলে তাকায় তার পিসিমার পানে। জাহানারা বলেন—আজমকে তুই কি সত্যি ভালবেসেছিস?

কোন কথা নী বলে পুনরায় মুখ ঝিঁয়ে নেয় জাহাঞ্জেরবানু। জাহানারা বলেন—কিন্তু ভেবে দেখ জানী, আজম বড় উচ্চত প্রকৃতির মানুষ। সে তোমার স্বামী হওয়ার মোটেই উপযুক্ত নয়। তুই বড় বিভিন্ন গুণের অধিকারিনী। তোমার স্বামী হবে শৌর্ধে-বীর্যে অধিকারী। তবে আজমকে যদি তোমার সত্যি ভাল লেগে থাকে তবে আমি বারণ করবো না। তা ঠিক করে বলতো, তাকেই চাই তোমার?

জাহাঞ্জেরবানু বলে—হ্যাঁ পিসিমা, থাকে না গেলে আমি মুখ পাব না।

সেই দিনই জাহানারা বেগম তাঁর ভ্রাতা আওরজাজকে পত্র লিখে ঠিক করে ফেলেন আজমের সাথে জাহাঞ্জেরবানুর বিবাহ।

এই বিবাহ মোগল রাজপরিবারে আনলো এক আনন্দের জোর। বিশেষ করে জাহাঞ্জেরবানুর পদশ্রমণিতে উচ্চত প্রকৃতির আজম শান্ত হয়ে গেল অনেকখানি। পুত্রের এই পরিবর্তন দেখে অত্যন্ত দুঃস্থ হলেন আওরজাজ। পুত্রবধূ জানী বেগম তাই হুদিনেই প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেন সশ্রাটের।

জাহাঞ্জেরবানুও এতে গর্বদোধ করে বিশেষ করে। স্বামী যে একান্তই তার বল এই ভেবে সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তার এই অহঙ্কারে আঘাত পড়লো বিজাপুর যুদ্ধের সময়।

সে বার আওরজাজ পুত্র আজমকে পাঠাতে মনস্থ করলেন বিজাপুর অবরোধের জন্তে। কিন্তু পতিপ্রাণা জাহাঞ্জেরবানু স্বামীকে একলা যেতে দিতে রাজী হয় না। বলে সে-ও আজমের সাথে যাত্রা করে বিজাপুর অভিমুখে।

কিন্তু বিজাপুর অবরোধের সময় চঞ্চলমতি আজমের পক্ষে সঠিক ভাবে সৈন্য পরিচালনা করা হয়ে ওঠে অসম্ভব। ফলে হৃত্তভঙ্গ হয়ে যায় তার সেনাবল। যুদ্ধ জয়ের আশা হয়ে ওঠে অদূরপাহত।

সেই অবস্থায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হল জাহাঞ্জেরবানু। সে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে থাকে তার সেনাদলকে। তারই প্রচেষ্টায় সে বার সক্ষম হল মোগলের পক্ষে বিজাপুর জয় করা।

যখন বিজাপুর জয় সম্পূর্ণ হল তখন জানী বেগম ফিরে আসে আপন শিবিরে। সেখানে সে অধীর প্রতীক্ষায় বসে থাকে স্বামীর জন্তে। এখুনি হস্ত সে ছুটে এসে নিজের গলা থেকে মালা খুলে পরিয়ে দেবে তার গলায়। কিন্তু তার কিরতে দেবী দেখে চিঙ্কিত হয়ে ওঠে জাহাঞ্জেরবানু।

কি হল, আসতে এত দেবী হচ্ছে কেন? সে তখনই লোক পাঠিয়ে দেয় স্বামীর খোঁজে। কিন্তু খবর পাওয়া গেল মহম্মদ আজমের কিরতে বিবাহ হবে। সন্ধির সর্ত সম্পূর্ণ মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত তিনি আসতে পারবেন না।

এ কথা শুনে অন্তরে অত্যন্ত আঘাত পায় জানী বেগম। তার সাথে একবার দেখা করে বাওয়ার চেষ্টা সন্ধি। সর্ত মিটমাট করার প্রয়োজন হল বেশী? বেশ তবে সে এখুনি ঘি ঘি বাবে দিল্লীতে। তার কোন প্রয়োজন নেই স্বামীর প্রতীক্ষায় বসে থাকা।

সেই দিনই অভ্যস্ত করে দিল্লীর জাসাদে ফিরে যায় জাহাঞ্জেরবানু। সে অভ্যস্ত করে এতে অন্তরে আঘাত পাবে তার স্বামী। তখন সে তার কাছে এসে চাইবে কী প্রার্থনা।

কিন্তু তা তো হলই না, উপযুক্ত আশ্রয় দিল্লী ফিরে এসে একটিবারের জন্তেও সাফল্য করে না তা হ্যাঁ বিজাপুরের সাথে।

স্বামীর এই আচরণে হতবাক হয়ে যায় জাহাঙ্গেরবাহু। হঠাৎ তার এমন পরিবর্তন হল কেন? এরকম ব্যবহার তার সাথে ইতিপূর্বে তো কখনও করেনি?

সেই দিনই সহচরীকে ডেকে জাহাঙ্গেরবাহু জিজ্ঞেস করে—মানুমা, ওর কি হল বল তো? আমার সাথে আর দেখা করছে না কেন? আমি ইতিপূর্বে আরোহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলাম বলেই কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে? না, তার সাথে দেখা না করে দিল্লীতে কিংবে এসেছি বলে ক্ষুব্ধ হয়েছে?

মানুমা বলে—ও ছোটোর কোনটাই নয় শাহজাদী!

—তবে?

—এর কারণ হচ্ছে শাহজাদা এখন আকৃষ্ট হয়েছেেন অল্প লজনার প্রতি।

জাহাঙ্গেরবাহু বিস্মিত হয়ে বলে—অল্প লজনা? কে সে?

মানুমা বলে—সে হল বিজাপুর-সুলতানের ভগিনী শাহারবাহু। স্কির সর্ভ অমুসারে শাহজাদা চেয়ে পাঠিয়েছেন তাকে।

—কি আশ্চর্য! এ-সব কি সত্যি?

মানুমা বলে—মিথো বলে আমার লাভ কি শাহজাদী?

সেই শুনে জাহাঙ্গেরবাহু তখন ছুটে যায় আজকের মন্ত্রণাকক্ষে। তখন শাহজাদা একাকী পারচাণী করছে সেখানে। জাহাঙ্গেরবাহু দ্রুত সেই কক্ষে প্রবেশ করে হীপাতে থাকে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে। আজম বলে—এ কি, তুমি এখানে এলে কেন জানী?

জাহাঙ্গেরবাহু বলে—বাধ্য হয়ে আসতে হল। শুনলাম, তুমি মাকি আবার বিয়ে করবে?

একটু ইতস্ততঃ করে আজম বলে—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে?

জাহাঙ্গেরবাহু দৃঢ়কণ্ঠে বলে—যেমন করেই জানি। কথাটা সত্যি কি না বলো?

—হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু তুমি এত উত্তলা হচ্ছে কেন জানী?

জানী বেগম ফুঁপিয়ে উঠে বলে—কি বলছো, এ সংবাদে আমি বিচলিত হব না? কিন্তু কেন? আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি আবার বিয়ে করবে?

আজম বলে—তোমার অপরাধ কেন হবে? আসলে বিজাপুর জয় করে ওদের গর্ভ ধ্বংস করে দিতেই আমি দাবী জানিয়েছি ওদের মেয়েকে।

—বিজাপুর জয়?—জাহাঙ্গেরবাহু চীৎকার করে ওঠে—কিন্তু সে-জয় কার দ্বারা সম্ভব হল? কার জন্তে আজ তোমরা কিংবে আসতে পারলে প্রাণ নিয়ে?

আজম বলে—সে কথা স্বীকার করছি। তুমি না থাকলে বিজাপুর জয় করা সম্ভব হত না আমার পক্ষে। কিন্তু তা বলে এই বিবাহ ব্যাপারে তোমার আপত্তি রয়েছে কেন বুঝতে পারছি না। মোগল সাম্রাজ্যে কোন্ সম্রাট বা কোন্ শাহজাদা একটা মাত্র সহধর্মিণী নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন বলতে পার?

—না না বলতে আর আমি কিছু চাই না। উঃ, তোমরা সব এমন মিষ্টব। বলেই কারার আবেগ নিয়ে যর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাবে জাহাঙ্গেরবাহু।

ওদিকে শাহারবাহুর চিন্তাধ চিন্তিত হয়ে ওঠে বিজাপুর সুলতান। কুলদর্গীর মোগলের সাথে তাঁর যে সন্ধি হল তাতে তাঁর একমাত্র ভগিনীকে সঁপে দিতে হয় তাদের হাতে। ওরা হল সুলতান সম্প্রদায়ভুক্ত, এ অবস্থায় শিরা সম্প্রদায়ের কণ্ঠা সম্প্রদান করাই অপমানজনক। তার ওপর শাহারবাহুর মত একজন ধর্মপরায়ণা মেয়েকে ওদের হাতে সঁপে দিতেই যেন কেমন লাগে।

তবু অল্পেরে ধৈর্য নিয়ে সুলতান গিয়ে কথাটা জানালেন তাঁর ভগিনীকে। শাহারবাহু প্রথমে শুনে ঠিক বুঝতে পারেন না তাঁর কথা। পরে হতচকিত হয়ে বলেন—সে কি দাদা, আমাকে যেতে হবে দিল্লীতে? সেখানে মোগল হারমে আমার বিয়ে হবে সুলতান সম্প্রদায়ের এক শাহজাদার সাথে?

সুলতান বলেন—সত্যি বোন, এ কথা বলতে আমার কঠোরবে হয়ে আসছে। কিন্তু উপায় নেই। কারণ আমরা পরাজিত হয়েছি মোগলের হাতে। কাজেই তাদের ক্রীড়নক ছাড়া আমরা এখন কিছুই নেই।

এ কথা শুনে ছুটে আসে তাউসমা। তাউসমা ঐ বিজাপুর রাজপরিবারের এক ধাত্রী। শাহারবাহুকে সেই মাহুয করেছে কোলে-পিঠে করে। সে এসে বিস্ফারিত নেত্রের সঙ্গে—কি বললে? বাছাকে আমার পাঠিয়ে দেবে মোগল হারমে?

সুলতান বলেন—কোন উপায় নেই ধাইমা!

শাহারবাহু তখন তাউসমার বুকে মাথা রেখে বলে—তোমাদের ছেড়ে আমি কেমন করে থাকবো ধাইমা?

তাউসমা তাকে বুকে জড়িয়ে তখন কাঁদে হা-হতাশ করে।

কিন্তু তখন কাঁদবারও আর অবসর ছিল না খুব বেশী। শীঘ্রই প্রস্তুত হয়ে গেল শিবিকা। কাজেই সকলের নিকট বিদায় নিয়ে শাহারবাহুকে গিয়ে উঠতে হল ঐ শিবিকায়। পরে দিন কয়েকের মধ্যেই তা এসে পড়ল দিল্লীর রাজপ্রাসাদে। সেখানে জাহাঙ্গেরবাহুর কক্ষের পাশের ঘরটিতেই হল শাহারবাহুর থাকার ব্যবস্থা।

সে রাতে মানসিক ব্যস্তায় ছটফট করে জাহাঙ্গেরবাহু। সত্যিই তবে একজন এসে পড়লো তার আপন অধিকারে ভাগ বন্ডাতে? আর দুদিন পরেই হয়ে বাবে ওদের বিয়ে! তখন ঐ শাহারবাহুই হয়ে পড়বে তার স্বামীর সর্ষ্ব।

আর যেন ভাবতে পারে না জাহাঙ্গেরবাহু। সতীন মিরে যর সে কিছুতেই করতে পারবে না। কাল সকালেই সে চলে বাবে তার শিদিমার কাছে। তবে বাবার আগে একবার দেখে যেতে হবে ঐ মেয়েটাকে, যে এসেছে তার সব কিছু কেড়ে নিতে। দেখতে হবে তার মধ্যে এমন কি আকর্ষণীয় বস্তু আছে বা কেড়ে নিতে পেরেছে তার স্বামীর মন।

পরদিন অতি প্রত্যায়েই জাহাঙ্গেরবাহু প্রবেশ করে শাহারবাহুর কক্ষে। কিন্তু সেখানে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে অবাক হয়ে যায় জানী বেগম। এ কি, এ সারা রাত যসে কেঁদেছে নাকি?

কিন্তু তবু তার কাছে গিয়ে কিছুটা বিজ্ঞপের সুরেই জাহাঙ্গেরবাহু প্রশ্ন করে—আপনার বিবাহ অস্বস্তান কবে হচ্ছে জানতে পারি?

তার কথা শুনে শাহারবাহু একবার চেয়ে দেখে জানী বেগমের মুখের পানে। তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—আপনারা আমার প্রতি কেন এ অবিচার করছেন?

তার কাছা এবং কথা শুনে অবাক হয়ে যায় জাহাজেবাবু। তবে এই বিবাহ কি মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পন্ন হচ্ছে? সে বিস্মিত হয়ে বলে—একে অবিচার বলছেন কেন? এতে আপনার মত নেই?

শাহারবাবু বলে—তুমি আমার কেন, বিজাপুরের কোন নাগরিকের এতে মত নেই। এই কথায় অনেকটা আশঙ্কিত হয় জাহাজেবাবু। মেয়েটির এই বিবাহে কোন স্পৃহাই নেই। শাহারবাবুর প্রতি তার জেগে ওঠে ঋণিকটা অল্পস্পর্শ।

জাহাজেবাবু বলে—আপনি কিরে যেতে চান বিজাপুরে?

সজল চোখে তার পানে তাকিয়ে শাহারবাবু বলে—তা কি সম্ভব হবে? কিন্তু আপনি কে?

জাহাজেবাবু বলে—আমার পরিচয় শুনে বিশেষ আনন্দ পাবেন না। কারণ ধীর সাথে আপনার বিবাহ হতে চলেছে আমি তাঁরই সহধর্মিণী।

—সহধর্মিণী! বিস্মিত হয়ে শাহারবাবু বলে, তবে তিনি আমাকে বিবাহ করে কি আপনাকে পরিত্যাগ করতে চান?

জাহাজেবাবু বলে—না, তিনি ঠিক আমাকে পরিত্যাগ করবেন না, তবে আমিই ছিন্ন করেছি এখান থেকে চলে যাব।

শাহারবাবু বলে—দেখুন একটি কথা আমি বলছিলাম। যদি আপনি না গিয়ে আমার বাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন তা হলে আমার মনে হয় এটা আমাদের উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল হবে।

তার কথা শুনে কিছুক্ষণ ভ্রূক হয়ে বসে থাকে জাহাজেবাবু। তারপর বলে—দেখো বোন, আমি তোমার বাওয়ার ব্যবস্থা এখনি করে দিতে পারি। কিন্তু আমি বলছিলাম কি—

—কি দিদি?

—বলছিলাম কি তোমার গিয়ে আর কাজ নেই। তোমার মত একটি সঙ্গী আমি অনেকদিন খুঁজছিলাম। তা বখন হাতের কাছে পেয়ে গেছি তখন আর ছাড়ছি না। আমার স্বামীকে বিবাহ করতে তুমি মন ঠিক করে ফেলো। তারপর আমরা দুই সতীনে নিত্য বগড়া করে কাটাতে আমাদের সময়। কেমন, তুমি পারবে না আমার সাথে বগড়া করতে?

তার কথা শুনে হেসে ওঠে শাহারবাবু।

এমন সময় সেই ঘরে প্রবেশ করে মহম্মদ আজম। হঠাৎ সেখানে তাদের ছদ্মনকে দেখে সে কিছুক্ষণ ভ্রূক হয়ে ঝাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরপদে এগিয়ে এসে আজম ডাক দেয়—জানী!

জাহাজেবাবু সাড়া দেয়—বলো।

—এঁর পরিচয় তুমি পেরেছো কি?

—পেরেছি।

আজম বলে—তা এ সবকিছু তোমার কি মতামত?

জাহাজেবাবু একবার স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে নিয়ে বলে—শাহারবাবুকে বিবাহ তোমার করতেই হবে। তবে আজ নয়। আমি দু'বছর একে আমার মনের মত করে গড়ে তুলবো। তারপর হবে তোমাদের বিবাহ। বুঝলে?

তার কথা শুনে আজম হেসে ওঠে বলে—বেশ তাই হবে।

প্রণোত্তর

শতভিষা

বন্ধু আমাকে করিছে আজিকে প্রণয়।

কোনও দিন প্রেম জেগেছিলো কি না অধরে,
কোনও দিন কারো কালো নয়নের

কাজলের আঁতায়ণে,

উতলা হৃদয় নেচেছে কি মধু-মত্তরে?

যদি বলি আজ সর্গবে মাথা তুলিয়া

চিরদিনই কিছু ছিলাম না হেন সুপ্রবীণ,
আমারো লাগিয়া বাতায়নতলবর্তিনী

ছলনা করিয়া বাজাত কাঁকন রিণ যিন্।

বল মেনে নেবে নিঃসংশয়ে মোর লাগি পথ চাহিয়া,

আঁখির কাজল ধুয়ে গেছে কারো বিরহ-রজনী জাগিয়া;

অধরের কোণে হাসি করে লুকোচুরি,

ভাবিতেছ করি ভাবের ঘরেতে চুরি,

শোনালাম রূপকথা।

মোদের কালেতে ছিল না মাধবী রাসি,

মিলন-পিয়াসী করে বলে,

কেউ জানিত না সে ভারতা।

বত ফুল ফোটে তোমাদেরি কালে বকুল-চাঁপার বনে,

আমৃত আঁখির বিজলী বলক তোমরাই বোঝ মানে,

আঁচল ছলায়ে চলে গেলে হাসি ভাব কিছু বুঝি নাই।

সঙ্কটময় নিমন্ত্রণের ভাষা প্রয়োজন নাই।

তাই ভালো, ভালো, কিছুই বুঝি না,

প্রেম করে বলে কিছুই জানি না।

ঠোটের হাসি ও চোখের চাঁপার অর্ধ নিরর্থক,

তুকানো বকুলও গন্ধ বিলায় একথা লুকানো র'ক ॥

শাওন এলো

কুমারী ঝর্ণা বোস

শাওন এলো ওঠ, খই খই শাওন এলো ওঠ,

পথ বেঁজা বৈরাগী তোর একতারাটি কই?

ফুলভরা কোন ভুল আজিনায় করলি ওরে ভুল;

শিথ মাগতে গিয়েছিলি কোন ভাঙ্গনের কুল?

বৈরাগী তোর অঙ্গ বেয়ে অঙ্গ ঝর-ঝর,

বকুল ফুলের ছোঁয়ায় কি বুক কাঁপছে ঝর-ঝর?

শাওন গাজের ভাঙ্গন বেয়ে ঘট ভরে কাঁধে,

কোন বিজুলী-কলসে গেল, ঘোমটারই কাঁকে?

কোন কালো চোখের বাদলে ভিছলো গেরুয়াস,

কোন শেকালীর ডালে বেঁধে, শুকিয়ে নিতে চান?

শাওন এলো ওঠ, খই খই শাওন এলো ওঠ;

পথহারা বৈরাগী তোর মনপাখীটা কই?

শ্রীমতী ওয়াহেদা রেহমান
স্বপ্নের "চাদওপতি কা চাদ" ছবিতে

রূপ যেন তার রূপ কথারই রাজকন্যার মতো...



রূপে রূপে অপরূপ। যেন রূপকথার,
রূপবতী রাজকন্যা। এত রূপ, এত
লাবণ্য সে-ওতো ওর নিজেরই চেহার।
রূপসী চিত্রতারকা ওয়াহেদা রেহমান আসেন,
সৌন্দর্যের গোপন কথা হলো স্বকের
কুহুমসম কোমলতা। 'তাইতো আমি
কোজই লাগ ব্যবহার করি। এর সয়েই
মতো ফেনার সতিই স্বক মোলারেন
আর লাবণ্যময়ী হয়' ওয়াহেদা বলেন।
আপনার হৃদয়তাও বাড়িয়ে তুলুন—
নিয়মিত লাগ ব্যবহার করে।



চিত্রতারকার সৌন্দর্য-সাধান
বিশুদ্ধ, শুভ্র, লাগ

হিন্দুস্তান লিভারের তৈ



মহাকবি গ্যোটে'র বাল্যকাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমাদাস সেনগুপ্ত

যুগ্মসী নাট্যকারদের নাটক দেখে ঠিক করলেন যে তিনি নাটক লিখবেন। একখানা নাটক লিখে বন্ধুকে দেখালেন। এই বন্ধুটি কবিকে আশ্বাস দেন যে যাতে কবির নাটক মঞ্চস্থ হয় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। কবির আশা বুধা হল। কাঁচা হাতের লেখা নাটক মঞ্চস্থ হল না। এ রচনাটি বোধ হয় তাঁর পিতার হাতে পড়ে এবং কবি পিতা কর্তৃক তৎসিত হন। কবি নাটকের unity বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্ত করাসী নাট্যকার Racene প্রবন্ধ পাঠ করতে লাগলেন, প্রবন্ধ পড়ে কবির তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। গ্যোটে'র মনে হতে লাগল যে প্রবন্ধকার Unity বিষয়ে পূর্ণভাবে অবহিত নন। উক্ত নাটকের বিষয়বস্তু ছিল পুৰাণ-কাহিনী। নাটকের পাত্র ও পাত্রী ছিল দেব ও দেবী। আর ঈশ্বর, রাজকুমার ও রাজকুমারী ছিল নাটকের পাত্র-পাত্রী। তাঁর মনে হত নাটকের দেব-দেবী তাঁর সামনে সশরীরে হাজির হয়েছে। এই প্রভাব পড়েছিল, কারণ এক পুৰাণ-কাহিনী সম্বন্ধিত অভিনয় তিনি দেখেছিলেন।

এই সময় ইউরোপে সপ্তবর্ষের যুদ্ধ শেষ হয়। তাঁর বাবা শান্তির চিহ্নস্বরূপ একটি আংটি তৈরী করতে দেন, উদ্দেশ্য ছিল গ্যোটে'র মাকে এ-টি উপহার দেবেন। আংটিটা ক্ষত তৈরী হল কি না—এজন্ত স্বর্ণকারের কাছে মধ্যে মধ্যে গ্যোটে'র ভাগিনার যেতেন। গ্যোটে'র অসুস্থতাই ছিল। সব বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল হতে চাইতেন না। অবশ্য বেশী পড়াশোনা তিনি করতে চাইতেন না। স্বর্ণকারের সঙ্গে ভাব জমালেন তিনি। অয়েলরুখে নম্রা কী ভাবে করতে হয় তার প্রয়োগ তিনি নিরীক্ষণ করতেন। সেই স্বর্ণকারের কাছে সহায়তা করার জন্ত উৎসাহ দেখাতেন। দামী পাথরের পার্শ্বকা বিষয়ে সেই শিল্পীর কাছে থেকে অনেক কিছু জানলেন। সব বিষয়ে গ্যোটে'র প্রবণতা ছিল বলে গ্যোটে'কে সকলেই ভালবাসত।

Klopslock পাঠ করে বাইবেল বিষয়ে তাঁর বেশ জ্ঞান

হয়েছিল। এই ইতিহাস পড়ে কবি বেশ উদ্বেগ হন, তাই এক নকলনবীণ ব্রুবকের সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েকটা ভাব্য কবিতার সংযোজন করলেন। এই যুবক গ্যোটে' পরিবারের কর্মচারী ছিলেন। তারপর বইখানা পুস্তক আকারে বাঁধিয়ে গ্যোটে' পিতাকে উপহার দিলেন। এই সময় নির্বাচন এসে গেল। গ্যোটে'র বাবা রাজকীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। উৎসাহও তাঁর ছিল না। নির্বাচন বিষয়ে ছেলেকে ওয়াকিবহাল করার জন্ত গ্যোটে'কে নির্বাচনী পুস্তক ও নানা ইচ্ছাহার পাঠ করান। জোসেফের অভিষেকের সময় ধুব ধুমধাম হয়, সম্রাজ্যীয় আগমনে অভিষেকের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়, সহরে মেলা বসত, মালপত্র বাঁধা ও খোলার তৎপরতা লক্ষ্য করতেন তিনি। যুক্ত আকাশের নীচে ছেলেরা খেলত। অনেক বন্দীবাদক এসেছিল সেই মেলায়, অভিষেকের সময় দেশ-বিদেশের মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি এসেছিল। বিচিত্র সাজ-পোষকের জৌলুয দেখে গ্যোটে' অভিভূত হন।

মাত্র পনের বছর বয়সে কবির জীবনে নারীর অস্তিত্ব অমুভূত হয়েছিল। অভিষেকের সময় গ্রেচেন নামক এক তরুণীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। একদল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলে তাঁর কবিতার উৎসাহী ছিল। এদের সঙ্গে কবির সখ্যতা বৃদ্ধি পায়। একদিন এই বন্ধুরা এক স্থানে নিমন্ত্রণ আছে বলে কবিকে গ্রেচেনদের বাড়ী নিয়ে যায়। প্রথমে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সময় কাটলেও কিছুক্ষণ পর লঘু হাসি ঠাটা কবির কাছে ভাল লাগছিল না। সব কিছু একঘেয়ে বলে মনে হচ্ছিল, মদও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মদ আনবার জন্ত অমুরোধ করা হল, সকলে ভেবেছিল চাকরাণী মদ আনবে। চাকরাণীর পরিবর্তে এল এক কিশোরী। এই কিশোরী-ই গ্রেচেন, বাড়ীতে অমুস্থ রোগী আছে, এই কথাগুলো বলে নিঃশেষ পানপাত্রগুলো নিয়ে বর্ষাবিজ্ঞানের মত অজ্ঞর্হিত হল। এতক্ষণ পর গ্যোটে' উৎসাহী হয়ে বন্ধুদের তৎসনা করে বললেন যে, বন্ধুদের অমুরোধে বাড়ীর বাইরে গ্রেচেনকে মদ আনতে যেতে হয়েছে। বন্ধুরা জানল যে ভয়ের কোন কারণ নাই। কারণ বাড়ীর সামনেই মন্ডের দোকান, কিশোরী গ্রেচেন ইতিমধ্যে মদ নিয়ে যাবে চুকলেন, জটনক অস্তিত্বের অমুরোধে গ্রেচেন সকলের স্তম্ভ কামনার জন্ত স্বাস্থ্য পান করলেন। তারপর বললেন, সকলকে বিদায় নিতে; কারণ বাড়ীতে রোগী আছে। এই অভিষেকের সময় গ্রেচেনকে নিয়ে জন্মণে বার হতেন। গ্রেচেনকে অভিষেকের ইতিহাস ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতেন, একদিন আলাপ আলোচনার বস্তু হয়ে পড়তে বাত গড়িয়ে গিয়েছিল অনেক। খিড়কী দরজার চাবি আনতে গ্যোটে' ভুলে গিয়েছিলেন, গণ্ডগোলের আশঙ্কার সেন্নিন আর বাড়ী ক্রিয়লেন না। কবি পান করা হল। বস্তব্য ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসতে লাগল। গ্রেচেন-পরিবারের জন্ত লোকজনও ছিল সেই ঘরে। গ্রেচেনের সঙ্গে অল্প বেধে গ্যোটে' বুঝিয়ে পড়েছিলেন। ভোরে জেগে দেখলেন তার মানসী আয়নার সামনে বসন-ভূষণ ঠিক করছে। সেই কিশোরী গ্যোটে'র কপালে চুম্বন দিয়েছিল সেদিন।

এর পর গ্যোটে' ভরাবহ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। একদিন ভোরে মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, এর কিছুদিন পূর্বে এক বন্ধুর চাকরী গ্যোটে' নিজে তখির তদারক করে পাইয়ে দিয়েছিলেন, সেই বন্ধু জালিয়াতি ও অন্যায় চক্রান্তজালে জড়িয়ে পড়ে। তাই তদন্ত শুরু হয়েছিল। আর সেই তদন্তে গ্যোটে'কে হাজির দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

গ্যটে হাজিরা দিয়ে জবানবন্দী দিলেন। কিছুও বে মুক্তি পাবে এবিষয়ে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল। গ্রেচেনকে সেই তদন্তে সাক্ষী হিতে হবে বলে তিনি শিউরে উঠে ভাবলেন: গ্রেচেনের পরিণাম যদি ধারাপ হয়, গ্রেচেন সম্প্রতি ভাবে তদন্তে সাক্ষী দিয়ে বার হয়ে এলেন। গ্যটে আনন্দিত হন এ-তে। তারপর ভয়ঙ্কর ভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তদন্তে জেরার সময় গ্রেচেনকে প্রসন্ন করা হয়েছিল গ্যটের সঙ্গে তাঁর মত রমণীর সম্পর্ক কী? উত্তরে বলেছিলেন তাঁর মত কিশোরীর কাছে গ্যটে নাবালক ছোট ছেলে। তাই গ্যটেকে তিনি বোনের মত স্নেহ করেন।

নাবালক ছোট ছেলে!

তাই!

গ্যটে যে গ্রেচেনকে মানসী ভাবতেন, এই ঘটনার পর গ্রেচেন সংসত হন। কথাবার্তায় গ্যটের সঙ্গে গাভীয়া রক্ষা করতেন। ছনয়ের উচ্চাস জানাতে গিয়ে গ্যটে ব্যর্থ হন। এর পর গ্যটে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গ্রেচেন যে তাঁকে ভাই হিসাবে দেখে এই চিন্তা তাঁকে ভীষণ আঘাত দেয়। ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই সময় এক দর্শনের শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ইনি গ্যটের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অমুরাগ আনাবার প্রয়াস করেন। নিজেকে পরিণত মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত কাব্য ও দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন গ্যটে। নির্জন প্রকৃতির মধ্যে ডুবে যেতেন তিনি, দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হলেও দর্শনের প্রতি গভীর অমুরাগ তাঁর মনে তখনও সঞ্চারিত হয় নি। স্বেচ্ছ করতেন তিনি এই সময়। প্রকৃতির প্রতি অমুরাগ দেখে গ্যটের পিতা আশঙ্ক হন। ছেলে যাতে নিসর্গমূলক ছবি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠে এই জন্ত হামবার্গ প্রভৃতি রাইনবিধৌত অববাহিকার পাঠালেন, বোন কর্ণেলিয়া ভাইকে উৎকৃষ্ট রাখবার চেষ্টা করত। নানা অমুঠানের মধ্যে কবি নিজেকে মগ্ন রাখলেন। কবি বুঝলেন, নির্জনপ্রিয় তিনি হতে পারবেন না। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে প্রকৃতির রহস্য ও ভাবা তাঁকে উজ্জীবিত করেছিল। মানসী গ্রেচেনও চিতপট হতে দূরে সরে গেল।

গ্যটেকে এই সময় গ্যটের পিতা আইনের তালিম স্বাধাধ ভাবে দিলেন। Wetzlar এ যাবার প্রস্তাব করলেন গ্যটেকে তিনি। কারণ নিজে সেখানকার ছাত্র ছিলেন। গোটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার প্রস্তাব নাকচ হল। পিতা জানালেন তাঁকে ইটালী ভ্রমণের কথা। ইটালীতে গেলে আর কোথাও যাবার দরকার নাই। অবশেষে লাইপজিগে যাবার সিদ্ধান্ত হল। পিতার শাসন তার অসহ্য লাগছিল। পিতাকে এড়াবার জন্ত তিনিও প্রস্তুত হলেন। পথে কষ্ট হয়েছিল। পথ-ঘাট ভাল ছিল না। এই সময় লাইপজিগে পুস্তকের বাৎসরিক প্রদর্শনী চলছিল। লাইপজিগে যাবার আগে এক বিক্ষিপ্ত নাটক লেখেন। এই নাটকটির নাম বেলশহাজার।

শেষ

ছুটির বাঁশী

শ্রীবিখনাথ চট্টোপাধ্যায়

কাজ-কাজ-কাজ। অসহীন কাজের মাঝে একটুখানি বিয়ায় ওই ছোট শফটতে এখিত হয়ে আছে—'ছুটি'। বর্ষার দিনে একটুখানি সুখের আলোকের মত, বিস্তীর্ণ ক্ষুণ্ণ কোটা

হ-একটি ফুলের মত, মিস্তরজ নদীতে একখানি স্রোতার মত। তুচ্ছ, তবু তুচ্ছ নয়।

কাজ ও ছুটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কাজ না থাকলে ছুটি যে অসহ্য হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেঙ্গপীরের রাজপুত্র বলেছেন, যদি সারা বছরই ছুটি থাকত তা হলে খেলা কাজ করার মতই একঘেয়ে হয়ে উঠত। বার্নার্ড শ' আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন। কোথায় যেন তিনি লিখেছেন, 'A perpetual holiday is a good working definition of hell.' শোনা যায়, নেপোলিয়ন বলতেন, তাঁর অভিধানে 'অসহ্য' বলে কোন কথা নেই। এডগার ওয়ালেসের নায়ক মিষ্টার জে, জী, বীডারের উজ্জল অভিধানে ছুটি বলে কোন কথা ছিল না। তিনি অভিমানব ছিলেন কি না সে বিচারের তার অবশ্য নৃতত্ত্ববিদদের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কারণ, একেবারে ছুটি না থাকলে কাজ অত্যন্ত বিরক্তিকর ত হয়ই, মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার অসম্ভব হয়ে ওঠে। অনেক কাজের পরিপ্রায়ে আমাদের যে ক্ষতি হয় একটু ছুটির বিশ্রামে তার অনেকখানির পূরণ হয়। তাই স্রাবাধের প্রয়োজন। ইহুদীদের সপ্তাহের শেষ দিনে ও খৃষ্টধর্মীদের সপ্তাহের প্রথম দিনে ছুটির আয়োজন।

আর ব্যবহারিক জীবনে ছুটি আমাদের কতই না কাজে লাগে। বা কিছু আমাদের অকাজ সে সবই ত এই ছুটির সময়। ব্যস্তিক যুগের দ্রুততা ও অনিশ্চয়তা জীবনকে যখন একান্তই গণ্ডময় করে তোলে, তখন সেই উত্তরতর কবিতার একটু সরসতা আনবার যে প্রচেষ্টা আমরা করি সে ত এই ছুটির পরম ক্ষণটিতেই। এই ক্ষণেই আমরা প্রিয়াকে প্রিয় করে দেখি, উপলব্ধি করি প্রেমের মূল্য। এই ক্ষণেই আমাদের দেবপূজা, বন্ধুপ্রীতি, সমাজসেবা। এইক্ষণেই কাব্যচর্চা, ছবি আঁকা, সুর সাধনা। কাজ আমাদের এই সব অস্ত্র জীবনের অমুরাগের কথা বার বার তুলিয়ে দেয়। ছার দেয় ক্ষয় করে। ছুটি কখন চুপে চুপে আসে অভিসারিকার মত, তার পর তার কঙ্কণ-নিকণে আমাদের চঞ্চল করে তোলে। ছার বার বার খুলে যায়।

ছুটির দিনের একটি বিশেষ রূপ আছে। এ দিনটি অস্ত্র দিনগুলি হতে স্বতন্ত্র। এ দিনটির একটিমাত্র নিয়ম আছে—সেটি কোন নিয়ম না থাকা। নিয়ম থেকে, বাঁধাধরা ছক থেকে, কঠিনের রাজনীতি থেকে আজ পূর্ণ বিশ্রাম। অনিয়মের রাজত্ব খেরালখুশীর মস্তিষ্ক। এমন দিনেই মনকে নিরঙ্কুশ করা চলে। ছুটির দিনে সে নিশ্চিত ভাবে ছোট্টাছুটি করতে পারে। কোথাও বাধা পাওয়ার ভয় নেই। এমন কি হারিয়ে যাওয়ারও কোন মানা নেই।

ছুটির দিন তাই, উৎসবের দিন। মানস-বন্ধন-মুক্তির উৎসব। সে-আনন্দের কাছে অস্ত্র সব আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। চিন্তের স্বাধীনতা মানুষকে হর্ষের নতুন লোকে উন্নীত করে। সেখানে ছোট নেই, বড় নেই, সকলের সমান পরিভূক্তি। সম্রাট ও শ্রমিক সমভাবে আনন্দিত। সাম্যবাদের জয়জয়কার।

অনেকে আছেন, ধারা ছুটি নিছক আলস্যে কাটিয়ে দেয়, তাঁরা জানেন না কি সম্পদ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়। তাঁদের কথা বলছি, ধারা ভাস-দাড়া-পাশা খেলে এবং অবসরের সব সময়টা ধ' ভাবেই কাটায়। ইচ্ছাবনের বিবিধ বিভীষিকা বা কিঙ্কিমতের

আশঙ্কায় বানের আগরণ বিড়ম্বিত। আবার অনেকে আছে, বারা জাগরণের চেয়ে নিজা বেশী পছন্দ করেন। তারা বোধ হয় আরও বেশী প্রবঞ্চিত হয়। এসব প্রবঞ্চনা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। এতে অবকাশরঞ্জন হয় না, অবকাশের খণ্ডন হয় মাত্র। ছুটিতে ঘরে বসে খেলে বা খাটে শুয়ে ঘুমোর একেবারে অর্থহীন নয়। তবে সেইটুকু এর অর্থ যেটুকু অর্থ আছে সূর্যকে দিয়াশলাইয়ের কাজে ব্যবহার করায়।

নীল গগনে যখন ছুটির বাঁশী বেজে ওঠে, তখন সেই বাজনার বিশেষ একটি সুর থাকে। জামের বাঁশীর সুরের মতই উদ্গাদক সে সুর। সেই সুরে সাজা দেওয়ার মত বার মন আছে, সেই প্রকৃত সহন্য। সে কখনও শুয়ে বসে, শুধু হেলাফেলায় সময় কাটাতে পারবে না। সেই পারবে ছুটির মূল্য দিতে।

ছুটির পরিধি যখন দীর্ঘ হয়, তখন অনেক সময় তার বংশীধ্বনির মধ্যে সূর্যের সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তখন মন কিছুতেই ঘরে বসে না। অচেনা দেশ, অজানা জায়গা কি অপ্রতিরোধ্য ভাবে আমাদের আকর্ষণ করে। বিপুল সূর্য কি ব্যাকুল ভাবে আহ্বান জানায়। সাগর-পর্বত কি রহস্যময় রূপে হাতছানি দেয়। নতুন পৃথিবীর নতুন লোক কি গভীর বন্ধুত্বের বাণী পাঠায়। প্রকৃতিকে নতুন ভাবে দেখার জন্য মানুষের কামনা সীমাহীন হয়ে ওঠে।

কাজ শুধু মানুষের নয়, প্রকৃতিরও রয়েছে। প্রকৃতির ভিতরে কাজের চাকা অবিরাম ঘুরে চলেছে। তাই কবিগুরু বলেছেন, প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সূর্যমার ঐ ফুলটিকে যে দেখেছ, অত্যন্ত বাবুর মতো গায়ে গন্ধ মেখে রত্নিন পোশাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্য এসেছে, তাকে তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব দিতে হয়—বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একটু দোলা খাবে, এমন এক পলকও তার সময় নেই। কিন্তু, এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে তখন তার কিছু মাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ সৃষ্টিমান। এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণ অবকাশ।

মানুষ প্রকৃতির পুত্র। সৃষ্টিকার সন্তান সে। সৃষ্টিকা থেকে তার জন্ম, আর সৃষ্টান্তে সে ওই সৃষ্টিকাত্তেই মিশে যায়। তাই সৃষ্টিকে সে ভয় বতই করুক না কেন, তার জীবনব্যাপী কাজের অবসান ঘোষণা করে যখন শেষবারের মত ছুটির বাঁশী সত্য সত্যই বাজে, তখন সে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পারে, যায় সকলকে প্রণতি জানিয়ে। ঘরের চাবি সে কিরিয়ে দেয়, ঘরের দাবি আর সে রাখে না। ডাক পড়েছে। তাকে যে যেতে হবে।

সাহসে দুর্জয়

শ্রীশ্রীশ্রী চক্রবর্তী

আগুন... আগুন... বুকফাটা আর্দ্রনাদে রাজির আকাশ-বাতাস
বুধিত হয়ে উঠলো। রেজুন সহরের একটি বিরাট কাঠের
বাড়ীতে আগুন ধরেছে। দেখতে দেখতে লেলিহান বহির্বিধা

চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আশে-পাশের বাড়ীগুলি থেকে
দলে দলে নরনারী এসে সমবেত হল। ঘরের জিনিষপত্র ও লোক-
জন সবই বেরলো কিন্তু বেরোতে পারলো না এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধার
বাইরে আসার শক্তি ছিল না। দর্শকজন দাঁড়িয়ে থেকে শুধু আহা
উহ করতে লাগলো, কোন সক্রিয় সহায়ত্ব এলো না কোনদিক
থেকেই। সূতাপথবাত্তো এই অশীতির বৃদ্ধার জীবনের অন্ত হয়তো
কারো প্রাণই কাঁদলো না।

সহসা এক বাঙালী যুবক সাহসে বুক বেঁধে বাঁপিয়ে পড়লো
সেই অগ্নিপ্রবাহের মধ্যে।

সমবেত নরনারী ত্রাসে চিৎকার করে উঠলো। কল্পনাস
স্তবতার ভেতর দিয়ে কেটে গেল কয়েকটি অশান্ত মুহূর্ত। যুবক
বেরিয়ে এলো বৃদ্ধকে কাঁধে নিয়ে অগ্নিবাহ ভেদ করে। চারিদিক
থেকে উঠলো প্রশংসার গুঞ্জন। যুবক সংজাহীন হয়ে পড়লো
সঙ্গে সঙ্গে।

সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো যুবকের শুশ্রূষার জন্য। বহু পরিচর্যা
পর আবার ফিরে পেল সে বাহুজ্ঞান, ডাকলো 'মা' বলে।
অশীতিপর বৃদ্ধার অন্ত জীবন বিপন্ন করার দিকে দিকে ছড়িয়ে
পড়লো যুবকের অকুণ্ঠ প্রশংসা ফুলসৌরভের মত। আত্মত্যাগের
আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বাঙালী তরুণের অশ্রুতময়
জীবন।

এই নির্ভীক বাঙালী যুবক কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস।
শিশুকাল থেকেই সুরেশচন্দ্র ছিলেন ভয়শূন্য ও ডানপিটে।
কুফনপরের কাছে এক গ্রামে ছিল সুরেশচন্দ্রের বাড়ী। তখন
গ্রামে ছিল বঙ্গশূকরের উৎপাত। একদিন সুরেশচন্দ্র মাছ ধরে
ফিরবার পথে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এক জংগলের কাছ দিয়ে যেতে
তাড়া করলো এক বঙ্গশূকর। সুরেশচন্দ্র ভয় না পেয়ে বঁড়শির
ছিপ দিয়ে বেপরোয়া ভাবে মারতে লাগলো শূকরটাকে। শূকরও
প্রাণ ভয়ে শিকার ছেড়ে দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। তাঁর
এই সাহসে খুঁটান মিশনারীরা অবাক হয়ে গেল।

পড়াশুনা কিন্তু সুরেশচন্দ্রের মোটেই ভাল লাগতো না। কিন্তু
দুঃসাহসের কাছে ছিল তার অকুণ্ঠ আনন্দ।

বেঙ্গুনে থাকবার সময় এক কাপ্টেনের সংগে ভাব করে জাহাজের
ইয়ার্ড হয়ে সুরেশচন্দ্র আমেরিকার উপনীত হলেন এবং বুদ্ধিবলে
সৈন্য বিভাগে ভর্তি হয়ে কমশক্তির গুণে লেকটেন্যান্ট পদ
হলেন।

এই সময়ে সুরেশচন্দ্রের সম্মুখে দেখা দিল এক ভীষণ
অগ্নিপরীক্ষা। শত্রুপক্ষ জাধারসহর অবরোধ করে অগ্নিসংযোগ
করলো। প্রধান সেনাপতি যুদ্ধজয়ের সকল আশাই ছেড়ে ছিলেন।
কেউ সাহস করলো না শত্রুর সম্মুখীন হতে। সুরেশচন্দ্র হাত
পাকাপ জন সৈন্য নিয়ে সিংহবিক্রমে বাঁপিয়ে পড়লো শত্রুবৃহৎ
ওপর। অতর্কিত আক্রমণে শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।
সুরেশচন্দ্র যুদ্ধ জয় করে ফিরে এলো। সুরেশচন্দ্র ব্রেন্ডেল সরকারের
কর্ণেল পদে নিযুক্ত হলেন।

যে সমস্ত বাঙালী বিভিন্ন সময়ে বিদেশে গিয়ে জাতীয় মর্যাদ
রক্ষা করেছেন, তাঁদের নামের সংগে সুরেশ বিশ্বাসের নাম
চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দেশী রং

শ্রীহিন্দুবিকাশ দাশ

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, দিদি 'তার পুতুলের কাপড় রাত্তানর জন্ত শিউলী-ফুলের বোটার রস ব্যবহার করত। আমার উপর ভার পড়ত পাড়ার কোন বাড়ী থেকে ফুল কুড়িয়ে আনতে। ফুল কুড়াতে গিয়ে গালি-গালাজ কিংবা প্রহার যে মাঝে মাঝে কুড়াতে হতো নাহিতা নয়। আবার দিদির সঙ্গে ঝগড়া হলে, তার খেলাঘর লগুভগু করে দিতাম, পুতুলের কাপড় নিয়ে দিদির বন্ধুকে দিয়ে তাকে আমার দলে আনতাম, পরের দৃষ্টজানা— দিদির কেঁদে কেটে গিয়ে মার কাছে নাশি ও মার হাতে আমার প্রহার। দিদি ও তার বন্ধুরা ঘটা করে পুতুলের বিয়ে দিত, শিউলী ফুলের বোটার রং দিয়ে নিজেরা আলতা পরত, পুতুলকে পরাত, হাতে, নখে রং মাখত। বিয়ে-বাড়ীতে আমার উপর ভার থাকত, ফুল যোগান দেওয়া।

টুকটুকে রংগীন বোটা ও সাদা পাপড়ি—তার সঙ্গে আবার দেখা, অবশ্য অল্প রূপ ও পরিবেশে,

রং তৈরী

তাজা ফুলের বোটাগুলিকে কেটে বেছে বেছে ফেলতে হবে। পোকা বা অন্য কোন জিনিস যেন না থাকে। ঔষধ মাড়ায়ের চিনামাটির বাটিতে পাথরের ছোট মোড়া দিয়ে বোটাগুলি অল্প খেঁতো করে নিতে হবে। ঐগুলিকে জলে সেদ্ধ করতে হবে প্রায় আধ ঘণ্টা। মাঝে মাঝে অল্প ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে জলের পরিমাণ সমান রাখতে হবে। সেদ্ধ করার জন্ত মাটির পাত্র ব্যবহার করা ভাল। পাত্রটি নামিয়ে রেখে, রংটি ঠাণ্ডা হলে, তা পরিষ্কার মোটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ছেকে নিতে হবে।

অনেক ফুল একসঙ্গে পাওয়া গেলে, বোটাগুলি কেটে রোঁদ্রে শুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। শুকনো বোটা শিশিতে বা জারে অনেক দিন রেখে দেওয়া যায়। শুকনো বোটা মাঝে মাঝে রোঁদ্রে দেওয়া দরকার। বোটা অল্প শুঁড়িয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা জলে একদিন ভিজিয়ে রাখলে রং হবে। শুঁড়ো বোটা মিনিট পাঁচেক জলে সেদ্ধ করলেও রং পাওয়া যাবে। পরে তা ছেকে নিতে হবে।

কাঁচা বোটাকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখলে, তা পচতে শুরু করবে। সেই অবস্থায় বোটাগুলি পরিমাণমত জলের সঙ্গে ভাল করে মেখে ছেকে নিতে হবে। সবক্ষেত্রেই ছেকে নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর বাটির নীচে কিছু তলানি পড়বে। তলানি বাদ দিয়ে উপরের রংগীন জলটুকু সাবধানে গড়িয়ে নিতে হবে অল্প বাটিতে।

সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক ভালো-মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাজন্মে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্রান্ত মানুষের শুভবুদ্ধি, যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুবিত্ত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার কচি বিকৃত হতে থাকে, শৃঙ্খলিত পণ্ডর শৃঙ্খল যায় ধুলে, যোগজর্জর স্বভাবের বিবাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামতা বাতাসে

! রং

ছবি আঁকার জন্ত সস্ত তৈরী অথবা সংরক্ষিত রং-এর সঙ্গে পরিমাণমত গঁদের আঠা মেশাতে হবে। অল্প কোন আঠা ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয় নাই।

দেখা যাচ্ছে কাঁচা বোটা, অল্প পচা বোটা বা শুকনো বোটা থেকে তৈরী রং প্রায় কাছাকাছি হলেও এক নয়। কাঁচা বোটা থেকে তৈরী রং হয় হাল্দের, পরে তা শুকিয়ে আর একটু ঘন হলে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ঘন হলে রং হবে। শেষ পর্যায়ের রংটি মধুর মত ঘন ও আঠাল হয়ে যায়। রং হবে Vandyke brown। শুকনো বোটা থেকে তৈরী রং, Yellow ochre-এর সঙ্গে অল্প Vandyke brown মেশালে যেমন দেখায় অনেকটা সেই রকম। অল্প পচা বোটা থেকে তৈরী রং, শুকনো বোটা থেকে তৈরী রং-এর সঙ্গে অল্প Burnt umber মেশালে যেমন হয়, প্রায় সেই রকম। শুকিয়ে বাওয়ার পর রংগুলি ঘষাঘষিতে ওঠে না বা আঁজুলে কোন দাগ লাগে না। একটু ঘন অবস্থায় রংগুলি খুব মোটা পর্দার কাগজে লেগে থাকে ও শুকোতে কয়েক দিন সময় লেগে যায়। ঘন অবস্থায় এ রং ছবি আঁকার কাজে ব্যবহার করা যাবে না বলে মনে হয়।

এ রং দিয়ে স্কেচ, জলরঙা ছবি ভালভাবেই আঁকা হয়েছে। মণ্ডনশিল্পের নক্সা এ রং দিয়ে কাগজে আঁকা হয়েছে। রংটি কাগজে লাগাতে কোন অনুবিধা হয় না। অল্প রকমের ছবি এ রং দিয়ে পরীক্ষা করা হয় নাই।

শুকিয়ে গেলে রং শিশিতে ভরে রাখা যায়। তাতে পরিমাণ মত জল মিশিয়ে রং করে নেওয়া চলবে। তৈরী রং পরিষ্কার তুলোয় শুবে নিয়ে, শুকিয়ে রেখে দেওয়া চলে। পরে দরকার মত তুলো কেটে নিয়ে জলে রংগড়ে নিলে রং হবে। তুলোয় শুবে নেওয়া রংকে মাঝে মাঝে রোঁদ্রে দেওয়া দরকার।

এই উত্তীর্ণ রংটির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না। গত অক্টোবর মাসে তৈরী রং বা তা দিয়ে আঁকা ছবি আজ পর্যন্ত অবিকৃত আছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। এ রং খেলায় আমার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। রং-এর প্রকাশভঙ্গিমা, বিভিন্ন ধরণের ছবিতে ব্যবহারের উপযোগিতা, স্থায়িত্ব ও অন্যান্য গুণাগুণ নিয়ে আরও বিশদ গবেষণা করা যেতে পারে। এ নিয়ে যারা কাজ করছেন, তাঁদের দেশজ রং সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল 'মাসিক বঙ্গমতী'তে প্রকাশ পেলে অথবা মহকুমা কৃষি আধিকারিক, বাটাল, মেদিনীপুর এই ঠিকানায় আমার কাছে দয়া করে জানালে বাধিত হব।

বাতাসে ছড়াতে থাকে দূবে দূবে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ করে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে, তারা মানুষের শত্রু। কেননা সাহিত্যিক শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।

—রবীন্দ্রনাথ



যুদ্ধ-বিজ্ঞানে ঠাণ্ডাযুদ্ধ তরুণ চট্টোপাধ্যায়

বৃহৎ স্কেডে আগে যার ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ অ্যান্থনি নাটিং সোভিয়েতের প্রথম স্পুৎনিকের ধাক্কায় মস্তব্য করেন :—

পশ্চাত্য শক্তিবর্গের কূটনীতি আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

হালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট-পদপ্রার্থী মি: আডলফ 'করেন অ্যাকেন্সাস' পত্রিকার লিখেছেন :

সোভিয়েত সমাজের নিজের ভবিষ্যতের ওপর আস্থা আছে কিন্তু আমাদের সমাজের কাছে তার ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। অনেকে মনে করেন যে আমরা জাতীয় লক্ষ্য উপলব্ধি করার মত জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলছি।

লক্ষ্যপ্রার্থী মার্কিন সাংবাদিক ওয়াশিংটন লিপম্যান আক্ষেপ করেছেন যে আমেরিকার মানুষের সামনে আজ এমন কোন মহৎ লক্ষ্য নেই বা উত্তীর্ণ হবার জ্ঞান তারা এক যোগে কাজ করতে পারে।

নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা ব্যাপারটা আরো খোলসা করে দিয়ে ১৯৫৯ সালের ক্রীসমাস দিবসের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মস্তব্য করে :

আমেরিকার অধিকাংশ মানুষের সামনে ১৯৬০ সাল ঠিক মার্কিন যেক্ষমহাদেশের মতই নিরানন্দ এক অনাবিষ্কৃত অহল্যা ভূমি। ক্রুচকের রকেটের আওয়াজে মার্কিন আকাশ দীর্ঘ-বিদীর্ণ। আজ মধ্যরাত্রে যে একটি মাত্র গানের সুর ভেসে আসছে তা হচ্ছে আমেরিকানদের এই কথা বলাবলি করা যে তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য তারা দেখতে পাচ্ছে না।

মার্কিন সাংবাদিক সালজবার্গার অতঃক হুঁশ করে বলছেন :

এই ১৫ বছর আগেও আমরা ছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। কিন্তু আজ? আজ আমরা এক অন্ধকার বনের মধ্যে থেকে বার হবার সোজা পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

এই উদ্দেশ্যবিহীন জীবনকে গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার ধারা এই ট্রেড মার্ক মেরে তাকে রক্ষা করার অজুহাতে যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর কূটনীতি আমেরিকা নিজে চালাচ্ছে এবং তার দ্বারস্থ ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে চালাতে বাধ্য করেছে তার পক্ষাঘাত যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে মার্কিন গুপ্তচর বিমান ফরাস ও আইকের জাপান সফর বাস্তবের মধ্যে রয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ। কূটনীতি কিরকম অবস্থার পড়লে কোন দেশ অল্প দেশের মধ্যে সামরিক গুপ্তচর বিমান পাঠানো আন্তর্জাতিক বিধান উপেক্ষা করে প্রকৃত্তে সমর্থন করে তার উদ্দেশ্য করে ব্রিটিশ ডেইলি হেরাল্ড মস্তব্য করেছেন :

সারা পৃথিবীকে গামরিক খাঁটির বেড়াফাল দিয়ে ঘিরে কেশার নীতির ভরাডুবি আরম্ভ হোল। আমেরিকার আজ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বাস্তব দাবী শোনা দরকার, নিজের মর্জির দাবী তুললে আর চলবে না।

নিউজ ক্রনিকল পত্রিকার মতে :

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটলেই মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ সব দোষ কমিউনিষ্টদের ঘাড়ে চাপান। এই ভুল ধারণা দূর করা দরকার।

এমন কি ইউসিস-এর (USIS) অধ্যক্ষ জর্জ অ্যালেনের মত যার সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকও চূপ করে থাকতে না পেয়ে এই বলে মার্কিন কূটনীতির কর্তব্যের নিন্দা করেছেন :

বাঁধ নির্মাণ না করলে আমরা সোভিয়েতকে দোষ দিই, আবার বাঁধ নির্মাণ করলেও দোষ দিই। এই দোষ দেওয়ারটা নেহাতই এক ভয়ে হয়ে পড়েছে।

সেনেটের ফুলব্রাইট যুদ্ধান্তর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে সর্বনাশের পথ বলে বর্ণনা করে মস্তব্য করেছেন :

এই পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবের সম্মুখীন হতে কেন যে চায় না তা দুর্ভোগ্য। আমরা আজ যে দুনিয়ার বাস করছি তার চরিত্র বিচার করার ক্ষমতা এর নেই।

এই মার্কিন রাজনীতিজ্ঞের মতে শীর্ষ সম্মেলন ব্যাপারটা রাজনীতির ইতিহাসে এক গৌরীশৃংগ না হয়ে স্বাভাবিক কূটনীতির নিয়মিত অংশ হওয়া উচিত।

কিন্তু এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে গৌরীশৃংগে আরোহণ করবার যে আয়োজন হোল আইসেনহাওয়ার অ্যালেন ডালস নেতৃত্ব তা বানচাল করে দিয়ে সেনেটার ফুলব্রাইটের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

পরমা নম্বর ডালস মার্কিন কূটনীতির এবং ইহ জগতের দিগ্‌মণ্ডল ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু ডালসের ভূত আমেরিকার কাঁধ থেকে নামেনি। দোসরা নম্বর ডালস মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের বড়কর্তা। সোভিয়েত দেশের সীমানা ভিজিয়ে সামরিক বিমান পাঠানোর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাঁর 'এটা স্বীকৃত। এই অ্যালেন ডালস মহাজনটি কে ?

১৯৪২ সালে নাৎসী বাহিনী যখন স্তালিনগ্রাদে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে তখন জার্মান কটিকা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিমলার ও জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের অধ্যক্ষ শেলেনবার্গ হিটলারের সঙ্গে মিলে ইজমার্কিন-রুশ মিত্রপক্ষের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার এক চক্রান্ত করেন। মন্তব্য ছিল ইজ-মার্কিনদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিয়ে সোভিয়েতকে লালায় করে ফেলা। সেই চক্রান্তের কলে জার্মান কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা গোপনে সুইজারল্যান্ডে যে আমেরিকান ভক্তলোকের সঙ্গে দেখা করেন তিনি হচ্ছেন যুগ্মমান ইউরোপে মার্কিন প্রধান গুপ্তচর এবং ইজ-মার্কিন-জার্মান 'শ্রোডার' ব্যাংকের অল্পতম ডিরেক্টর অ্যালেন ডালস। সেই আলোচনার মি: ডালস মস্তব্য করেন যে মৌলিক কূটনীতির ব্যাপারে তিনি নাৎসী আদর্শের সঙ্গে একমত। বাই হোক সেই চক্রান্ত সফল হয়নি। ১৯৪৫ সালে হিমলার তাঁর সহকারী কাল উলয়েস মারথ যখন ইতালীতে আবার 'ঐ চক্রান্ত খালিয়ে তোলেন তখনও অ্যালেন ডালসকে সেখানে দেখা গিয়েছিল। সেই দেশদ্রোহী ডালস আজ মার্কিন

গুপ্তচর বিভাগের বড়কর্তা হিসাবে বহুরে মার্কিন বাজেটের ২০০ কোটি ডলার নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। তাঁরই পরামর্শে আইসেনহাওয়ার সোভিয়েতের শক্তিশীলতা ও সীর্ষসম্মেলন তুল করার উদ্দেশ্যে 'ইউ-২' বিমান পাঠানো সমর্থন করেন। এই অ্যালেন ডালেসের—খয়রাতির টাকা দিয়েই চিয়াং কাইশেকের দস্যুরা বামার আজও অস্বাভাবিকতা বজায় রেখেছে।

ডালেস-গোষ্ঠী চার্চিলের ফুটন বহুতার সুযোগ নিয়ে আজ ১৫ বছর ধরে বে ঠাণ্ডাযুদ্ধ চালিয়ে আসছে তার প্রধান অধ্যায়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

'ঠাণ্ডাযুদ্ধ' কথাটি রাজনীতির শব্দকোষে প্রথম লিখে দেন মার্কিন ধনকুবের ও প্রথম পারমাণবিক শক্তিকমিশনের চেয়ারম্যান বার্নার্ড বার্কচ। তার আগে ঠাণ্ডাযুদ্ধ শব্দটি চালু না হলেও কার্বত ঠাণ্ডাযুদ্ধ বে চালু হয়েছিল হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা মারার সময় থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্রিটিশ পরমাণু বৈজ্ঞানিক পি এম এম ব্র্যাকটের মন্তব্য থেকে। 'পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার' বইখানিতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :—

জাপানের বিরুদ্ধে অ্যাটম বোমা ব্যবহারটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ ঘটনা ততটা নয় যতটা যুদ্ধোত্তর কালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রথম ঘটনা।

এর পর সোভিয়েতে মার্কিন দূত মিঃ জর্জ কেনান ১৯৪৬ সালে মস্কো থেকে ওয়াশিংটনে রিপোর্ট পাঠান যে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত

জোর করে কমিউনিজম চালিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নকে বেড়াফালে থিয়ে রাখা সরকার।

সেই রিপোর্ট অনুসারে মার্কিন সরকার অ্যাটম বোমার এককর্তা অধিকারের ওপর ভরসা করে ঠাণ্ডাযুদ্ধে নেমে পড়েন। মার্কিন ধনকুবের-গোষ্ঠীও দেশের কারখানা শিল্পকে শান্তিকালীন ভিত্তিতে কিরিয়ে নিয়ে বাওয়ার চেয়ে অস্ত্রসজ্জার রথচক্রে বেঁধে রাখাই লাভজনক মনে করল। সামরিক কণ্ট্রোল্টে কেঁপে ফুলে উঠে টাকার লোভ তাদের বেড়ে গেল বহু গুণ। তারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক যুদ্ধের আওয়াজ ফুলল। কিন্তু বৃহৎ বাধানো সম্ভব হোলনা, কারণ প্রথমত ইউরোপে আমেরিকার প্রয়োজন মত শস্ত্র শক্তি ছিলনা, দ্বিতীয়ত যৎসামান্য ইউরোপের জনগণকে নতুন যুদ্ধে নামানোও সম্ভব ছিলনা।

ঠাণ্ডাযুদ্ধের ২য় অধ্যায় আরম্ভ হয় ১৯৪৯ সালে। আমেরিকা পূর্ব-ইউরোপকে মুক্ত করার সংকল্প ঘোষণা করে এই সময় নাটো জোট খাড়া করে এক অ্যালেন ডালেসের পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম জার্মানিতে এক জলীবাণী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। এই ২য় অধ্যায়ের শেষ পাতা হচ্ছে কোরিয়ার যুদ্ধ। কিন্তু সেই যৌর দুর্দিনেও আমেরিকার পক্ষে বিশ্বযুদ্ধ বাধানো সম্ভব হয়নি, কারণ প্রথমত মহাচীনে মার্কিন দালাল চিয়াং কাইশেকের পরাজয় ঘটে এবং দ্বিতীয়ত সোভিয়েত ইউনিয়নও অ্যাটম বোমার অধিকারী হয়। চলে গেল ১৯৫২ সাল।



ডবল ডিমাई স্মল পাইকা স্ট্যাটিক কাগজে ছাপা ৪০০ পৃষ্ঠার বই। নাট্যাচার্যের পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪খানি আর্ট প্রেট ও অন্তান্ত ১২খানি ছবি।

প্রচ্ছদশিল্পী—সুবীর সেন

॥ অমঃ নটনাথায় ॥

'জিজ্ঞাসা'র সঞ্জ্ঞক নিবেদন

মন্মথমোহন বসু ও শুক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভূমিকা-সম্বলিত যুগপ্রবর্তক নট ও নাট্যাচার্য

শিশিরকুমার ভাঙ্ড়ীর জীবনালেখ্য

॥ মণি বাগচির ॥

শিশিরকুমার

ও
আংলা থিয়েটার

॥ দাম দশ টাকা ॥

জিজ্ঞাসা |

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ঠাণ্ডাবুদ্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের মেয়াদ ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭। সোভিয়েত দেশ এই সময় পারমাণবিক শক্তি হিসেবে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে বাওয়ার আমেরিকার ডালাসপন্থীদের হঠকারিতার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করে। তারই পরিণতি ১৯৫৫ সালের জেনেভা সম্মেলন।

কিন্তু জন ফর্টার ডালাস 'যুদ্ধের কিনারা খোঁবা' নীতি ঘোষণা করে জেনেভা সম্মেলনের সুকল নষ্ট করে দেন।

১৯৫৭ সালে এমন এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যা যুদ্ধের কিনারা খোঁবা ঠাণ্ডাবুদ্ধের রাস্তা কাটিয়ে চৌচির করে দেয়। সেই ঘটনা হচ্ছে সোভিয়েতের প্রথম পুংনিকের সাক্ষ্য। সোভিয়েতের কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহগুলি, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট মিলস-এর ভাবায় প্রচণ্ড আক্রমণের ডালাসীয় নীতিকে প্রচণ্ড মুচতায় রূপান্তরিত করে। তারপর শুরু হয় ডালাসপন্থার নতুন করে মূল্য বিচার। মার্কিন ধনকুবেরগোষ্ঠীর সভা স্তাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ম্যানুফ্যাকচারার্স-এর সভাপতি মিঃ লাইটনার সভার এক অধিবেশনে বলতে বাধ্য হয়েছেন—আমাদের শান্তি ও সমৃদ্ধিগ্ৰহণ হুনিয়া সৃষ্টি করতে হবে। আন্তর্জাতিক সমস্তাগুলির স্তমতীমাংসা হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সুবিধা হবে। সভার প্রাক্তন সভাপতি হারল্ড ম্যাককেলান অল্পসঙ্কার দৌড়কে মাত্ত্বের ষাড়ে এক বোঝা বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেছেন, শান্তিগ্ৰহণ প্রতিযোগিতার পরিবেশে শান্তিগ্ৰহণ সহাবস্থান সম্ভব। মার্কিন ধনপতি সাইরাস ইটন "শিকাগো ডেইলী নিউজ" পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে বলেছেন :—আমি নিশ্চিত শান্তিগ্ৰহণ সহাবস্থানের পক্ষপাতী, কারণ নাস্ত: পছ।। সৃষ্টিমের হলেও প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি আমেরিকার বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির স্তমলক্ষণ নষ্ট করে দিতে না পারে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েত ও চীনের সঙ্গে আমরা বন্ধুভাবে চলতে পারব।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আইসেনহাওয়ার-হার্টার সরকার শেষ পর্যন্ত সেই সৃষ্টিমের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর হুকুম তামিল করছেন। নিউইয়র্কের স্তাশনাল প্রেস ক্লাবে মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ হার্টার সেই গোষ্ঠীর বিশেষ বান্দার মত মন্তব্য করেছেন যে পারমাণবিক অস্ত্র নিবিদ্ধ করা, বৈদেশিক বাঁটি তুলে নেওয়া বা সৈন্তবাহিনী ছাঁটাই করা, এসব দাবী শূন্যগর্ভ। তাঁর মতে আগে নিরস্ত্রণ, পরে অস্ত্রহাস অর্থাৎ নিজের অস্ত্রসঙ্কা অকুণ্ড রেখে সোভিয়েতের সশস্ত্রশক্তির সমস্ত গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু মার্কিন জেনারেল হিউ হেটার বলছেন যে, অস্ত্রের ধবর জোগাড় করাটা আসল প্রথম নয়, অস্ত্রত্যাগটাই আসল কথা। আজ রাস্তা সৃষ্টি: অস্ত্রসঙ্কার অর্থাৎ উন্নততার রাস্তা এবং অস্ত্রবর্জনের অর্থাৎ স্তমবুদ্ধির রাস্তা। কিন্তু হার্টার বা আইসেনহাওয়ার সেই স্তমবুদ্ধির বালাই না রেখে সাইরাস ইটনের ভাবায় তাদের দলে নাম লিখিয়েছেন, যারা যে মুখে বলে কমিউনিজম-এর পতন অনিবার্য সেই মুখেই বলে কমিউনিজমকে এখনই ধ্বংস না করলে কমিউনিজম আমাদের ধ্বংস করবে। মার্কিন জাপান নিরাপত্তা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং সেই চুক্তির এক্তিয়ার সোভিয়েত দুর্প্রাচ্য ও চীনের উপকূল (অর্থাৎ কম্বোডা) পর্যন্ত এই কথা দস্ত করে আহির করে মিঃ হার্টার বেমন সারা হুনিয়ার সামনে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন তেমনি

করেছেন আইসেনহাওয়ার ইউ-২, বিমানের ঘটনাকে মার্কিন রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ বলে ঘোষণা করে। সেই একই নীতি প্রতিকলিত হয়েছে ১০টি জাতির নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে।

নিরস্ত্রীকরণের যে সোভিয়েত প্রস্তাব মিঃ ক্রুচক আমেরিকা সরকারের সময় জাতিসংঘে পেশ করেছিলেন সেটি সমস্ত দেশ সমর্থন করেছিল। কিন্তু ১০টি জাতির নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে পাশ্চাত্য শক্তির সেগুলি তো মানলেনই না, এমন কি তাঁদের ইচ্ছামত মূল প্রস্তাবে যে সব অঙ্গল বদল করা হয়েছিল (ঈর্ষ সম্মেলনে পেশ করার অঙ্গ) সেগুলিও তাঁরা গ্রহণ করতে নারাজ হলেন। তাঁদের বিশেষ করে ফ্রান্সের ইচ্ছা মত পারমাণবিক অস্ত্রের সমস্ত রকমের বাহক (বোম্বার, রকেট ইত্যাদি) নষ্ট করে ফেলার কথাটি প্রস্তাবের মধ্যে স্থান পায়—যার ফলে ক্ষতি সোভিয়েতেরই বেশি হোক, কারণ রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে সে অনেক এগিয়ে আছে। তবু নিরস্ত্রীকরণের পথ প্রশস্ত করার অস্ত্রে সে এই কনসেশন দিতে রাজী হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তির পারমাণবিক অস্ত্র নিবিদ্ধ করার প্রথম ধামাচাপা দিয়ে কেবল ক্ষেপণাস্ত্র নিরস্ত্রণের ওপর জোর দিতে থাকেন অর্থাৎ সোভিয়েত রকেটের নাড়িনক্ষত্র জেনে যেলাটাই তাঁদের আসল উদ্দেশ্য। এই অবস্থায় কোন নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা সম্ভব হতে পারেনা বলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বৈঠক ত্যাগ করবে। মিঃ ক্রুচক পাশ্চাত্য নোটের এই চালচলনের উদ্দেশ্যকে বলেছেন 'আইনামিত সামরিক গুণ্ডচরবৃত্তি।'

প্রথম স্তরে এই আইনামিত গুণ্ডচরবৃত্তি এবং তারপরে আক্রমণ এই হচ্ছে মার্কিন বৈদেশিক বাঁটিগুলির লক্ষ্য। একথা বুঝতে কষ্ট হয়না যে কোন দেশকে সামরিক বাঁটির বেড়া জালে ঘিরে ফেলাই উদ্দেশ্য আত্মরক্ষামূলক নয়, আক্রমণমূলক। মার্কিন বিমান বহরের মূখ্যপত্র 'এয়ার কোর্স'-এ প্রকাশিত তথ্য অনুসারে মার্কিন বিমানবাঁটির সংখ্যা ২৭৪। তার মধ্যে ১৩০টি আছে বিদেশে। সেগুলিকে ক্ষেপণাস্ত্রের উপযোগী করা হচ্ছে এবং মার্কিন বিমান বহরের অধিনায়ক জেনারেল হোচাইট মার্কিন সেনেটকে জানিয়েছেন যে কমিউনিজমকে ঘিরে রাখার নীতির মূলভিত্তি হচ্ছে হাইড্রোজেন বোমা ও বিমান বাহিনী। তুর্কী পত্রিকা হেবার-এ প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় যে সেখানকার মার্কিন-বাঁটিতে যে রকেট বসানো হয়েছে সেগুলির পাছা দেড় হাজার মাইল।

কিন্তু মার্কিন জলীবাধীরা এতেও সন্তুষ্ট নন। পৃথিবীর রাজ্যে এত সামরিক বাঁটি তৈরি করেও তাঁরা নিশ্চিত হতে পারছেন না। এবার তাঁরা চাদে হাত দিতে চান। মার্কিন বিমান বহরের উপাধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডোভাল্ড পুট এক বক্তৃতায় জানাচ্ছেন :— চাদে বাঁটি গাড়তে পারলে পৃথিবীতে পান্টা আঘাত হানবার খুবই সুবিধা হবে।

কিন্তু রাশিয়ানরাও যদি চাদে বাঁটি গাড়ে তাহলে? তখন তাহলে জেনারেল মহাপরকে চাদে পান্টা আঘাত হানবার অস্ত্রে মঙ্গল গ্রহে বাঁটি গাড়বার অস্ত্র উঠে-পড়ে লাগতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন সেনাপতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জলীবাধীকে মহাজগতের গ্রহ-উপগ্রহে ছড়িয়ে দিতে চান। মার্কিন পারমাণবিক কূটনীতির সামনে এ ছাড়া আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর পাণ্ডারা এখন পৃথিবীর গণ্ডীর বাইরে সৌরজগতের অঙ্গ

গ্রহ-উপগ্রহে মার্কিন-মার্কী গণতন্ত্রের তথা পৃথিবীর নিরাপত্তার সন্ধান করেন, তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাঁদের তুলিবাহকরা সম্ভবত একটু অস্বস্তিবোধ না করে পারেন না। কারণ এই ব্যাপার আমেরিকার পারমাণবিক রণনীতির পরাজয়েরই পরিচায়ক, ঠাণ্ডাযুদ্ধের কূটনীতির দেউলিয়াপনার সাক্ষ্য। এই নীতিতে লাভবান হচ্ছে একমাত্র অল্পশিল্পপতিরা। আমেরিকার এ বছরের মোট বাজেটের শতকরা ৪৪ ভাগ মঞ্জুর করা হয়েছে সামরিক বিমান বহরের জন্য যার বেশির ভাগ টাকা বাবে কেপনাঙ্কের পিছনে। গত ১০ বছরে কেপনাঙ্ক কেনার বহর বেড়ে গিয়েছে ৪০০ গুণ। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত রকেট ও কেপনাঙ্কের পিছনে খরচ হয়েছে ২৪৪০ কোটি ডলার। মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডাঃ হিউ ড্রাইডেন সম্প্রতি আক্ষেপ করে বলেছেন :—

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের মহাজাগতিক গবেষণার যদি সামরিক মূল্য না থাকে, তাহলে সরকারী তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া বাবে না।

এই বিপুল অর্থ রকেটের, ড্রপার্ট, ক্রাইজলার, লকহীড ইত্যাদি যে-সব কাতলাজাতীয় কোম্পানীর পেটে বাচ্ছে, সেগুলির ডিরেক্টর বোর্ডের মধ্যে দেখা বাবে মার্কিন মন্ত্রী-উপমন্ত্রী, সেনাপতি-উপসেনাপতিদের (যেমন প্রাক্তন দেশরক্ষামন্ত্রী জনসন, জেনারেল ম্যাকলের ইত্যাদি)।

কূটনীতি জিনিষটা যুদ্ধের মতই পররাষ্ট্রনীতির এক উপায় বিশেষ। ইতিহাসে এমন অনেক যুদ্ধের নজির আছে যার পরিণাম সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গিয়েছে যে সেই যুদ্ধ বাধিয়েছিল। তার কারণ সেই যুদ্ধের পিছনে যে পররাষ্ট্র-নৈতিক লক্ষ্য ছিল তা অজ্ঞান ও অসুস্থরপীর। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিটলারের যুদ্ধের কথা বলা যায়। কূটনীতির ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রযোজ্য। তাই বিসমার্ক কূটনীতির সংজ্ঞা দেন, “বা সম্ভাব্য তা করবার কৌশল।” কিন্তু হিটলারের দার্শনিক রোজেনবার্গ বিসমার্কের সেই উজ্জ্বল উক্তি উল্লেখ দিয়ে বলেন যে “অসম্ভাব্যকে সম্ভাব্য করার কৌশলই কূটনীতি।” মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ রোজেনবার্গের বক্তব্যই মেনে নিয়েছে। মার্কিন কূটনীতির রকমসকম দেখে ১৯১৩ সালে অর্থাৎ সাড়ে চারশো বছর

আগে মেক্সিকোতে মেক্সিকোতে উক্তির কথা মনে পড়ে। ‘রাজকুমার’ নামে বইখানিতে মেক্সিকোতে এক জারপার লিখছেন :—

সংগ্রাম করার উপায় দুটি : একটি হচ্ছে আইনের দ্বারা অন্যটি বলের দ্বারা। প্রথমটি ইচ্ছামত বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয়টি পণ্ডর।

বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু সেই পান্থিক উপায়টিই গ্রহণ করেছে। আপোষ আলোচনা, আইন-কাছনের দ্বার সে ধারে না। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করাই তার মূলমন্ত্র। সেই ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্য সাধনের উত্তোগপর্ষ হচ্ছে ঠাণ্ডাযুদ্ধ। এই ঠাণ্ডা-যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়ে দিয়ে তাঁদের বাস্তববর্জিত কল্পনা জগতে বিচরণ করতে বাধ্য করেছে এবং তাঁদের কূটনীতিকে পঙ্গু করে কেলেছে। অসম্ভাব্যকে সম্ভব করার হুঁশাকে প্রেরণ দেবার জন্তে তাঁরা নিত্য-নতুন নীতি ও কৌশল ভাঁজতেন। পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে বসে সামরিক দিক ছাড়া অন্য কোন দিক তাঁরা চিন্তা করতে পারেন না। পশ্চিম-জার্মান লেখক পল সেখের ভাষায় মহান কূটনীতির ঐতিহ্যবাহীরা আজ জেনারেলদের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। তাই ঠাণ্ডাযুদ্ধের কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা সোভিয়েত সরকারের প্রত্যেকটি সহযোগমূলক কূটনৈতিক চালে বাধা দিচ্ছেন, সব কিছুতেই আগে থাকতে ‘না’ বলে বসে আছেন, এমন কি আজ যাতে ‘হ্যাঁ’ বলছেন, কাল তাতেই ‘না’ বলছেন নিলজ্জের মত। ‘এই প্রস্তাবে নতুন আর কি আছে’—এই হচ্ছে তাঁদের কথার মাত্রা।

১৮৩০ সালের ক্রাসী বিপ্লবের সময় নিজের সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত বংশের মারা কাটিয়ে যে কূটনীতি-বিশারদ ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছেন তিনি হাঙ্কন ডালের। তারপর হুনিয়ার ইতিহাসে আমরা দেখি মেটানিককে, জর্জ ওয়াশিংটন ও জেকার্সনকে। তাঁরা কালের দাবী অনুসারে পররাষ্ট্রনীতি মূলবস্ত বদলে নিতে পেরেছিলেন। আজকের উদীয়মান সম্রাজতন্ত্র যুগে, পরমাণু শক্তি ও রকেটের যুগে যুদ্ধের পথ পরিত্যক্ত—এক উপলক্ষ না করে যে কূটনীতি যুদ্ধের উপাসনা করে, সে কূটনীতি পরাজয় অবশ্যবাহী।

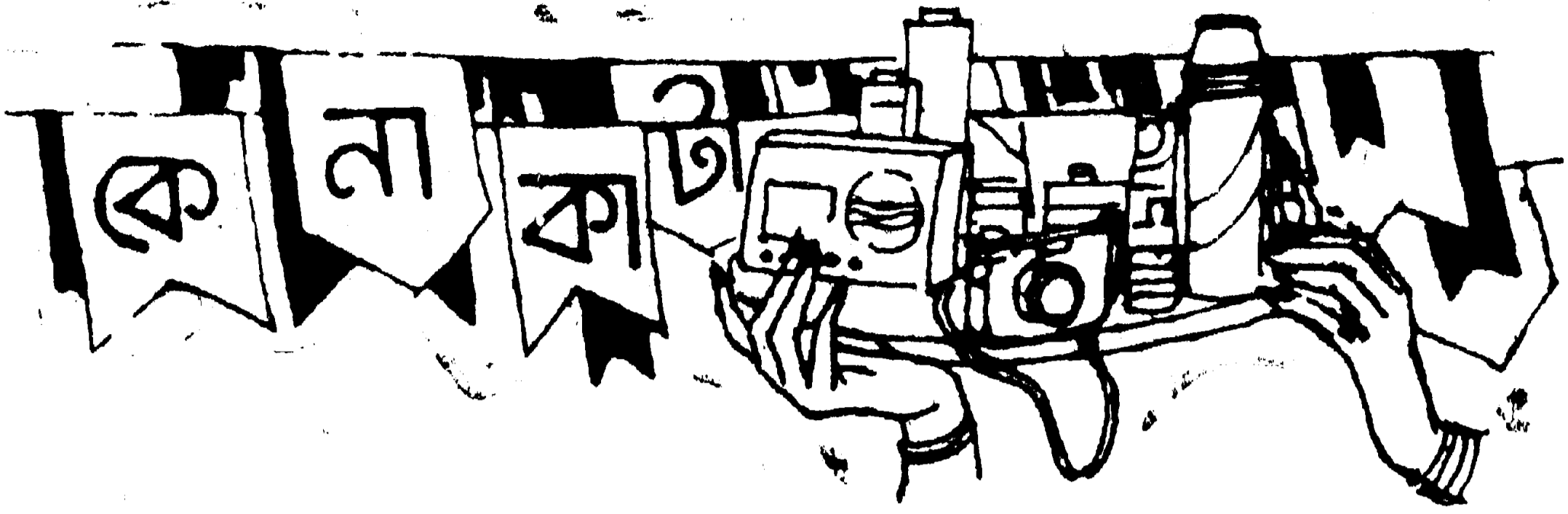
দাবী

শ্রীমতী যুথিকা ঘোষ

পুষ্পরাগপেলব এই মধুমিনীতে
কল্পনার আলপনায় কে তুমি এলে
আমার মনের সব দিগন্তকে বাড়িয়ে,
চেউয়ের পর চেউ তুলে জ্বলয়সমুদ্রে ?
এই মন-দেওয়া-নেওয়া চাওয়া-পাওয়া যত,
আশা নিরাশার দোলানো মিথ্যা হলনা কত,
কাঞ্চনমূল্যে কেনা হল জীবনের পসরা,
পুঞ্জিত প্রণয়ের চাক চয়নিকা, অমি নিপুণিকা।

অঞ্জলি ভরে আজি দিয়ে যাব আমি
শেবে নিবেদনের পরিপূর্ণ পূজাডালি,
আসব-চঞ্চল যৌবনের মর্মবাহী
সেদিন বা পারিনি দিতে তারি সবখানি।
নিফল প্রেমের নিষ্করণ বর্ণকেন্দ্র হতে হুবে
সকল ভাবনা বাসনা বিরহবেদনার অন্তরালে
পরাজব প্রেত্যাখ্যানের প্রাচীর পেরিয়ে
নিকাম চৈতন্তের উদার মোক্ষকূমে

তোমার দাক্ষিণ্যে ভরা এতটুকু শান্তি শুধু চাই,
হে অসুখবাহী। এই মাত্র দাবী-মোর, অক্ষ কিছু নাই।



ঘুম ও ঘুমের ওষুধ

দেহের প্রয়োজনিত ক্রান্তি দূর করা এবং কনসারভেশন—এর জন্মে বিশ্রাম প্রয়োজন। আর পরিপূর্ণ বিশ্রাম অর্থাৎ ঘুম বা নিদ্রা। বেঁচে থাকবার জন্মে এবং সুস্থভাবে বাঁচবার জন্মে এ না হলেই নয়। ঘুম বতটা ভালো হবে, নিদ্রা যে পরিমাণে হবে পাঁচ, শরীরের উপকার হয় সাধারণতঃ সেট অল্পপাতে। এ অজানা নয় কারো, মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে ঘুমের প্রকৃতি ওস্তঃপ্রোত ভাবে জড়িত।

চিকিৎসকরা রোগীদের ঘুমের ওপর যে জোর দেন, তার কারণ সহজেই অনুমেয়। বলা হয়, রোগী যদি ঘুমাতে পারলো, ওষুধ ছাড়াই রোগ নিরাময় হয়ে যাবে অনেকটা। ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টাও একই কারণে হয়ে থাকে। বধোচিত ঘুম না হলে শরীর যেমন সুস্থ রাখা যায় না, তেমনি মাথার কাজ চালিয়ে যাওয়াও কঠিন হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কেও সবল ও সক্রিয় রাখতে হলে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম চাই।

সোজানুজি অনিদ্রা বা রাতে ভাল ঘুম না হওয়ার অবস্থা একটি ক্যাশি ছাড়া কিছু নয়। যাদের চিন্তা ভাবনার দিনাতিপাত করতে হয়, তাদেরই অনিদ্রার ভূগতে দেখা যায়। এ সবের প্রতিকারকল্পে ওষুধপত্র ব্যবহারের প্রয়োজন অস্বীকার করা চলে না। উদ্ভিদরোগীদের ইন্জেকশন প্রকৃতি চালিয়েও ঘুম আসে কি না দেখা হয়। দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে কাটানো হবে, এমনটি হতে পারবেনা কখনই।

ঘুম ভালো হওয়া না হওয়া শরীরের আভ্যন্তরীণ ও বাইরের কতকগুলি অবস্থার ওপর নির্ভর করে। এমন অনেককে দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক নিজের বিছানাটি বা নিজের ঘরটি না হলে যাদের ঘুম হলো না। আবার এ ধরনের লোকও রয়েছে, সারাদিন পরিশ্রমের পর বেখানেই মাথা রাখা, অমনি ঘুমের আবির্ভাব। শ্রমিক শ্রেণীর নারী-পুরুষদের ভেতরই এইটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আবার যারা মেদবহুল বা স্বীকৃত্য পুনিজার জন্মে তাদের অনেককে রীতিমতো আরাধনা করতে হয়।

মোটের ওপর, এটা ঠিক স্বচ্ছন্দ-আরামে ঘুমোতে হলে কুচি অল্পস্বাভী শয্যা ও পরিবেশ চাই-ই। ঘুমের জন্মে সহসা যেন ওষুধ-পত্র সেবনের প্রয়োজন না পড়ে, সেদিকেও সতর্কতা থাকতে হবে। কারণ, স্বাভাবিক নিয়মে ঘুম বেখানে হয়, শরীরের পক্ষে তাই সর্বাধিক কল্যাণকর। দিনের বেলা ঘুম সাধ্যমত বর্জন করতে পারলেই ভালো—অবশ্য, অসুস্থ বা দুর্বল লোকদের আর বৃদ্ধ ও শিশুদের প্রায় অসম্ভব। দিনের বেলা না ঘুমাতে রাতের ঘুম পাঁচ হয়ে থাকে, সাধারণ অবস্থায় এই দাবী রাখা

হয়। এমন কি, বিশেষজ্ঞদের একটি সতর্কবাণীও রয়েছে—দিবানিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকর।

শারীরিক খাতিরই বেখানে ঘুম, সে হলে ঘুমটি কি করে ভালভাবে হতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতেই হবে। খাওয়া-দাওয়ার মতো এ প্রকৃতিরও আদৌ উপেক্ষা করা চলতে পারে না। দিনের বেলায় যেমন ঘুমানো একরূপ নিষেধ, অধিক রাত্রি অর্থাৎ জেগে থাকারটাও অসুচিত। দেহ-বস্তুকে মজবুত রাখার তাগিদে সকাল সকাল ঘুমাতে হবে, উঠতেও হবে সকাল সকাল। খাওয়া-দাওয়া এমন করা চলবে না, বিশেষতঃ রাত্রিবেলা, যাতে করে ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া সম্ভবপর।

পুনিজার জন্মে কতকগুলি প্রক্রিয়া অনুসরণের কথাও বলে থাকেন শরীর-বিজ্ঞানীরা। বেখানে ঘুমাতে হবে, স্থানটি বতটা সম্ভব নির্জন হওয়া চাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। শয়নকক্ষে হাওয়া যদি ভালোরকম খেলে, তা হলেও নিদ্রা সহজেই চোখে জুড়ে বসতে পারে। সর্বোপরি অবশ্যি দরকার—যেমন করেই হোক মনকে চিন্তামুক্ত করা। চিন্তা যদি মাথার চেপে থাকে, ঘুম তা হলে সহসা আসতে চাইবে না। যদিও বা এলো, সে ঘুম তেমন পাঁচ হবে না, শরীরের প্রত্যাশিত ক্রান্তি দূর করবে না। অস্বস্তি, উদ্বেগ ও ক্রোধ—মনের ওপর এ সকলের দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। ঘুমানোর আগে মনকে এ সকল অবস্থা থেকে দূরে রাখতে পারলেই উত্তম। বিছানার শুয়েও যদি দেখা গেল, ঘুম আসছে না কিছুতেই—এক মনে একটা বিষয় ভাবতে থাকলে সে অবস্থায় সুরক্ষা লাভ হয় অনেক ক্ষেত্রে। মনের এই একনির্বিষ্টতা ঘুমের একটা চমৎকার ওষুধ বা ব্যবস্থা-পত্র বলে দাবী রাখা হয়।

ভালো খাওয়ার পাশাপাশি ভালো ঘুম—স্বাস্থ্যের পক্ষে দুই-ই একান্ত অপরিহার্য, এও বলার অপেক্ষা রাখে না। শরীরে ব্যথা-বেদনা থাকলে বেদনা-নাশক পিল খেলে অনেক সময় নিদ্রা এসে যায়। যাদের রক্তের চাপ আছে বা রাতের দিকে বায়ুর প্রকোপ দেখা দেয় বেশিরকম, ইচ্ছামাত্র তাদের চোখে ঘুম আসে না। মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্মে এসব ক্ষেত্রে কবিরাজী তেল ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেখা যায় অনেককে। পেট অতিরিক্ত পূরম হলেও ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া স্বাভাবিক। সে কারণে লক্ষ্য রাখতে হবে—পাকস্থলীর যেন সুস্থাবস্থা থাকে, পেটে যেন বেশি সময় ধরে মল থেকে না যায়। প্রয়োজনবোধে পারখানা পরিষ্কারের জন্মে কোন বেড পিল বা রেচক ওষুধ-পত্র সেবন কিংবা অপর কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এ সকলেরই লক্ষ্য ভালোভাবে নিদ্রা বাওয়া, শরীর সুস্থ ও সক্ষম রাখা।

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হলো এবং এ এমনি স্বীকার্যও যে স্বাভাবিক

নিজাই সবচেয়ে শ্রেয়ঃ ও সর্বসময় কাম্য। ঘুমঘোরে অনেকেরই স্বপ্ন দেখার অভ্যাস আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদের মতে এ ঠিক ভালো নয়। বেশিরকম ভরা পেট থাকলে যেমন ঘুমের পক্ষে অসুবিধা, তেমনি আবার একদম খালি পেট থাকলেও ঘুম আসতে চাইবে না কিংবা ক্লাস্তির দরণ ঘুমালেও জেগে জেগে উঠতে হবে। যত্নে যে কারণেই হোক, বার বার নিজা ভেঙে বাওয়াটাও শরীরের ক্ষতিকারক। দীর্ঘদিন এভাবে চললে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে, দেহ-কাঠামোর ক্রমে দেখা দিবে বৈকল্য।

শরীরবিজ্ঞানীদের একটি অভিমত—দেহ শ্রান্ত হলেই ঘুম আসবে। কিন্তু তার জন্মে মাত্রাতিরিক্ত শ্রম গ্রাহ্য নয়। শ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও চোখে ঘুম আসতে চায় না, এমনও বহু ক্ষেত্রে ঘটে। কেউ কেউ বলেন, নিজা একটা অভ্যাসের জিনিস। সকলে ঠিক ভাবে নিজামুখী করে তুলতে পারলেই নিজাদেবী না এসে থাকতে পারে না। একটানা ঘুম যাতে হয়, সেই লক্ষ্য থেকে বাতের পাওয়ার পর কয়েক মিনিট খোলা বায়গায় হেঁটে আসা, বন্ধু-বান্ধব বা শ্রিয়-পরিজনদের সাথে একটু হাঙা গল্প-গুজব করা, এসব অভ্যাস মন্দ নয়।

মজবুদ স্বাস্থ্যের তাগিদেই স্নানক্রম দাবী রাখা হয়েছে। অনিদ্রা ব্যাধি যদি সত্যি হয়েছে বলে বোঝা গেলো, চিকিৎসা করাতেই হবে, ওষুধপত্র ব্যবহার করতেই হবে। শিশুদের ঘুম বত বেশি সময়ব্যাপী হবে, ততই শ্রেয়ঃ—শোওয়ার সাথে সাথে ঘুমটা যদি ভালোবাকম হয়, সে-ই তাদের শরীর পুষ্ট ও বর্ধনের পক্ষে সহায়ক। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেরও দিনে অন্ততঃ ছয় সাত ঘণ্টা ঘুমাবার অভ্যাস থাকতে হবে। অতিরিক্ত নিজা অবশি বেশী বয়সে ধারণ, কিন্তু একেবারে নামমাত্র ঘুমালেও শরীর টিকবে না, মনও স্বভাবতঃই হয়ে পড়বে অবসন্ন স্কুর্ভিবিহীন। এসব নানা দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে, রীতিমতো ঘুম যাতে হয়, সেই লক্ষ্য থেকে যা কিছু করা প্রয়োজন না করলে চলবে না। ঘুমের ওষুধ যদি সত্যি দরকার হয়, গ্রহণ করতেই হবে। সুস্থ জীবনের জন্মে স্নানক্রম—বিশেষজ্ঞদের এ নির্দেশ যেন আমরা ভুলে না যাই।

দৈহিক ওজন হ্রাসের প্রণ

অতিরিক্ত রোগা হয়ে থাকা যেমন ঠিক নয়, তেমনি মাত্রাতিরিক্ত শরীরের ওজনও অবাঞ্ছনীয়। দীর্ঘদিন অধিক সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকতে হলে দৈহিক কাঠামোটি মজবুদ করে গড়ে তোলা চাই। সেক্ষেত্রে ওজনের প্রণটিও একটি বড় প্রণ, যেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

দেহের অস্বাভাবিক ক্ষীতি বা ওজনবৃদ্ধি (মাত্রা ছাড়িয়ে) একটি রোগ, সন্দেহ নেই। যারা ধনিক, নিশ্চিন্ত জীবন বাতের, তাদের ভেতরই এর আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। মেদ অতিমাত্রা বর্ধিত হতে পারে, এমন খাদ্য-খাবার সাধারণ লোকের ভাগ্যে জুটে না বলেই ওজন হ্রাসের প্রণ তার কাছে অবাঞ্ছনীয়। ক্ষীতোদর বা মেদবহুল মানুষের স্বস্তি নেই কোন অবস্থাতেই, এমন কি ঘুমিয়েও নয়। তাই বাড়তি ওজনটা কমিয়ে কেলার জন্ম তাগিদ তাদের আসতেই হবে।

ওজন হ্রাসের চেষ্ঠার আগে ওজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সত্যি বেড়ে গেছে কিনা; সে সম্পর্কে কিন্তু নিঃসন্দেহ হওয়া চাই। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে শখ করে ওজন বা মেদ কমাবার প্রবণতাও দেখতে পাওয়া যায়। বিলেতে মেয়েদের ভেতর এই ধরণের উচ্চম তুলনায় বেশি। পাতলা ছিপছিপে হলে সৌন্দর্য বাড়বে, এরূপ ধারণা থেকেও ওজন কমবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অধিক কালক্রমে বিপদকে ডেকে আনে—মারাত্মক ব্যাধি সুবোপ পেয়ে দেহবৃত্তকে করে দেয় বিকল।

অতিরিক্ত মাত্রায় ওজন বেড়ে গেছে কি না অর্থাৎ ওজন কমাবার প্রণটি উঠছে কিনা, এ বুঝতে হবে নিজেই। বাইরে থেকে ক্ষীতিকার দেখা গেলেই সব সময় শঙ্কিত হওয়া চলে না। কারণ, সকল মানুষের দেহভার একই রকম নয়, উচ্চতা ভেদে ওজন কম-বেশি হওয়া খুব স্বাভাবিক। একজনের ক্ষেত্রে যা খাটবে, অপরের ক্ষেত্রেও সেই সূত্র হুবহু চলতে পারে না। নিজের স্বাস্থ্যবস্থা বুঝে ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে বাড়তি ওজন কমাবার ধার প্রয়োজন হবে, তারই শুধু সতর্কতা চাই, অস্তের নয়।

কয়েকটি লক্ষণ থেকে ওজন মাত্রা ছাড়িয়ে বেড়েছে কি না, বোঝবার চেষ্ঠা নিতে হবে। শরীরবিজ্ঞানীরা বলেন—জুতোর কিন্তে পরাতে গিয়ে যদি হাঁকিয়ে ওঠতে হয়, এমনি যদি তখন মনে হয় যে, শাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে হবে আলোচ্য ক্ষেত্রে ওজন হ্রাস প্রয়োজন। বে-বয়সে যতটুকু কর্মক্ষমতা থাকার দাবী রাখা হয়, শরীর ক্ষীতির দরণ সেটি হ্রাস পেয়ে চলেছে মনে হলে, সেখানে ওজন কমাবার প্রণ ওঠতে পারে।

কি করে ইচ্ছামুত্ব কুশ বা রোগা হওয়া যায়, এর কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। বাড়তি মেদ বা ওজন কমাবার জন্মে সাধারণ নিয়ম যে-টি বলা হয় সে হলো খাওয়া কমানো, বিশেষ করে চর্বিযুক্ত খাদ্য এড়িয়ে চলা। কিন্তু এমনও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, না খেয়েও শরীর বাড়ছে, ওজন কমতে চাইছে না। এরূপ অবস্থায় সখর চিকিৎসকের পরামর্শ না নিলে নয়। নিজের বুদ্ধিতে কোন ওষুধাদি খেয়ে ওজন হ্রাসের চেষ্ঠাও সমর্থনযোগ্য নহে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শকেই সকলের ওপর স্থান দিলে ক্ষত শুল্ক দেখা দিবার সম্ভাবনা।

ধবল ও

বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল চর্মরোগ, সৌন্দর্য ও চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্ম পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন। সময়—সন্ধ্যা ৬||-৮||টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেণ্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১২



বিজ্ঞানভিক্ষু

ছয়

উড়ন্ত গালিচা

“The riddle does not exist. If a question can be put at all it can also be answered.”

—L. Wittgenstein

সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শংকর প্রশ্ন করে, এবার কী প্রোগ্রাম, সুরমিত্রা ?

কনট, সার্কাসের একটা রেস্টুরার ওদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর্ব সবে মাত্র শেষ হয়েছে। সুরমিত্রা মাথা এলিয়ে দিয়েছে চেয়ারের পেছনে; স্ক্লিবুস্তির আমেজভরা সম্ভাব ওর অর্ধনিম্নিত চোখে। বলে, প্রোগ্রাম তো তোমার ওপরে। তোমার ‘স্বর্গে’ আবার কিবে যাবে বলছিলে না ?

আলস্যভরা কণ্ঠে শংকর বলে, নাঃ। থাকগে যাক আজকের মতো। অস্তিত্ব এই আমেজভরা হৃদয়ে ভুলে যাওয়া যাক হবিবুল্লাহ কথায়। অ্যান্টিগ্রাভিটি—একটা দুঃস্বপ্ন। বাস্তব হচ্ছে ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইন্সটিটিউট, অফ টেকনোলজির শঙ্কর বার আর হার্ভার্ডের ছাত্রী সুরমিত্রা—এদেরই নিয়ে। তোমার সংগে গত সাড়ে তিন বছরের হিসেব নিকেশ মেলানো হোলো না এখনও পর্বস্ত। সময়ই বা পেলাম কোথায় ?

সুরমিত্রা রসভংগ করে, আমার কিন্তু আজ বিকেলে চাঁ-এর নিমন্ত্রণ আছে কুকুস্বামীর বাড়ীতে। মিসেস কুকুস্বামীকে পশম বোনার একটা নতুন প্যাটার্ন দেখাবার প্রতিক্ষিত্ব দিয়ে রেখেছি অনেক দিন। ভক্তমহিলা রাগ করেছেন আমার ওপরে।

কাটিয়ে দিতে পারো না তুমি? শংকরের গলার স্বরে অসহায় ভাব।

সুরমিত্রা হেসে ফেলে, তা না হয় বিলাম। কিন্তু তোমার অবচেতন মনের কথাগুলো সরকারী কাইলে জমা হলে কি ভাল হবে? তার মানে ?

সুরমিত্রা ইসারায় সিকিউরিটির ভক্তলোককে দেখিয়ে দেয়। ভক্তলোক কিছুদূরে একটা ককির পেয়ালার নিম্নে বসে খবরের কাগজে নিমগ্ন।

শংকর বলে, তাইতো। এ আপদের কথা মনেই ছিল না। মহা বড়োটা!

কিছুক্ষণ বিমর্ষ থেকে হঠাৎ সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, চাপাগলার সুরমিত্রাকে বলে, এই সুরমিত্রা, চলো পালানো যাক।

সুরমিত্রা বলে, বাঃ, কী করে পালাব ?

শংকর বলে, খুবই সোজা। তুমি এখান থেকে সোজা মেয়েদের পাউডার ক্রমে চলে যাও। কিরবার পথে রান্নাঘরের ওই পাশের সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠে যেয়ো। খুব সম্ভব উঠবে গিয়ে একটা টানা বারান্দায়। আমার অনুমান, সে বারান্দার অল্প প্রান্তে একটা নামবার সিঁড়িও পাওয়া যাবে। রাস্তায় নেমে প্রথম বই-এর ঠলটার ভেতরে ঢুকে বই-এর দরদস্তুর শুরু কর গিয়ে। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি।

সুরমিত্রা বলে, মতলবের মধ্যে তোমার অনেক অনুমান আছে, যদি কোনো জায়গায় দেখি রাস্তা বন্ধ, তাহলে ?

তাহলে কিবে আসবে।

সুরমিত্রার চোখেও বড়বড়ের চাপা উত্তেজনার ছোঁয়াচটা লাগে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলে, ও সব পারবো না বাপু! ধরা পড়লে মাথা কাটা যাবে যে।

শংকর অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে—তা না হয় গেল। তাছাড়া তোমাকে এ বড়বড়ের অংশীদার করছি কেন? দরকার পড়লে কুকুস্বামীর কাছে তোমাকেই খাড়া করে দেব। তোমার তো ওখানে সাতখুন মাপ।

সুরমিত্রার চোখ কপালে ওঠে। কী সর্বনেশে ছেলে রে বাবা! নিজের খেয়ালের ভক্ত একজন মেয়ের মানসভ্রম বলিদান করতে বাধে না ?

দৃঢ়কণ্ঠে অল্প বোগ করে নাঃ, ওসবের মধ্যে আমি নেই।

শংকর কাঁপরে পড়ে, বহু অনুন্নয় করে কিন্তু সুরমিত্রাকে টালানো যায় না। শেষে পাল্টা অল্পবোগ করে সে—কী ব্যবসাদার তুমি! আচ্ছা তাহলে বেখে দাও তোমার কাছে আমার স্বীকারোক্তি—

পকেট থেকে নোটবুক বের করে শংকর একটা পাতা হিঁড়ে নেয়, তাতে খস-খস করে লিখে যায়—

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাপন করানো হচ্ছে যে আজ (তারিখ) বলা দুটো পঁচিশ মিনিটে সিকিউরিটির ব্যবস্থা লংঘন করবার জন্য একমাত্র আমিই দায়ী। অনিচ্ছুক ভাঃ সুমিত্রা দেশপাণ্ডেকে বাধ্য করানো হয়েছিল এ অপকাজের সহযোগিতা করার জন্য। আমি সজ্ঞানে ইত্যাদি, ইত্যাদি (স্বাঃ) শংকর বার।

এবার রাজী আছ তো ?

সুমিত্রা চিরকুটখানা পড়ে দেখে বলে, উঁহু, এইখানে সুমিত্রা দেশপাণ্ডেকে বাধ্য করানো হয়েছিল, এর পর যোগ কর বলপ্রয়োগে।

শংকর কাঁচু-মাঁচু মুখে বলে, আমাকে শেষে নাতীহরণের মামলায় ফেলতে চাও তুমি ? থাক দরকার নেই।

সুমিত্রা বলে—বাঁচা গেল।

শংকর বলে—বয়েই গেল আমার। তোমার সন্দেহ বলে কোনও জিনিসের বালাই নেই, জানলে ?

সুমিত্রার মুখ গম্ভীর হয়ে যায় বেশ।

কিছুক্ষণ কাটলো নিঃশব্দে। শংকর উসখুস করতে থাকে। শেষে মরীয়া হয়ে যোগ করে বলপ্রয়োগ।

সুমিত্রা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কোনোরকমে হাসি সামলায়। তারপরে কাগজখানা হাতবাগের মধ্যে ভরে পরিকল্পনা মতো চলে যায় পাউডাররুমের দিকে।

রাস্তায় নেমে সুমিত্রা শংকরের স্বীকারোক্তি ব্যাপ থেকে বের করে আর একবার পড়ে নেয়। মুখে তখনও তার কোঁড়কের হাসি। তারপর রওনা দেয় বুকটলের দিকে।

* * * * *

শংকরের সামনে পরিচারক এসে বিল রেখে যায়। প্রায়ের সব কিছুই মিটিয়ে দেয় সে। তার পরেই তাকে আবার ডেকে বিল সম্বন্ধে তর্ক জুড়ে দেয় উচ্চরবে। পরিচারক তাকে বিনীত ভাবেই জানায় যে বিল সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে ম্যানেজারের সংগেই দেখা করা উচিত। শংকর জিজ্ঞাসা করে—কোথায় ম্যানেজারের ঘর ? পরিচারক তাকে দেখিয়ে দেয় রান্নাঘরের পাশের সিঁড়ি। শংকর সদর্পে সেদিকে এগিয়ে যায়—তারপর দেওয়ালের আড়ালে পৌঁছে ম্যানেজারের ঘরের পাশ দিয়ে সোজা গলিপথে নেমে পড়ে।

বাঁকটা ঘুরে সম্ভরণে একবার পেছনে তাকিয়ে দেখে। নাঃ, রক্ষী ভদ্রলোক এখনও টের পাননি ওদের বড়বক্তের কথাটা। নিজের কুতিয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে শংকর।

সুমিত্রাকে দেখা যায় নিবিষ্টমনে একখানা বই-এর পাতা ওপটাতে।

হাঁকতে হাঁকতে শংকর বলে, চলো, এক্ষুণি এ জায়গা ছেড়ে অন্য অঞ্চলে বাওয়া থাক। এতক্ষণে বোধ হয় দিল্লীর সমগ্র পুলিশ বাহিনী আমাদের গ্রেপ্তার করতে মোতায়েন হয়ে গেছে। ট্যাঙ্কি,— এ ট্যাঙ্কি।

সুমিত্রা বলে, দূর বোকা, ট্যাঙ্কি ভাকা মানে আত্মসমর্পণ করা। তার চেয়ে চলো, এ সিনেমা-হলটার মধ্যে আশ্রয় নেওয়া থাক আপাতত।

* * * * *

সিনেমার অন্ধকার ঘরের আশ্রয়ে হুঁজনে হাঁক ছেড়ে বাঁচে।

ম্যাটিনী শো আরম্ভ হয়ে গেছে। নিউজরীল শেষ করে কার্টুন, তারপর পরবর্তী আকর্ষণের খণ্ডবিশেষ দেখানো হয় কিছুক্ষণ ধরে। তারপর বিরতি জ্ঞাপন করে আলো জ্বলে ওঠে।

কানের কাছে একটা চাপা কাশির শব্দ হুঁজনেই পেছন ফিরে তাকায়।

রক্ষী ভদ্রলোক ওদের দিকে পেছনের সীটে বসে আছেন নির্বিকার ভাবে।

শংকরের কান দুটো অসহ্য পরম হয়ে উঠেছে। সুমিত্রা আরম্ভমুখে কমাল চাপা দিয়ে কাঁচ-কাঁচ করে হাসতে থাকে।

রক্ষী ভদ্রলোক এবার আরম্ভ করেন, আপনারা যদি নিরবিচ্ছিন্নে সিনেমা দেখতে চান—আমাকে বলতেই পারতেন। ভেবে দেখেছেন কি, যদি এখন আপনাদের ঘরে ফেলতে না পারতাম, তাহলে আমার চাকরী নিয়েই টানাটানি পড়ত ?

মনে রাখবেন, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ; আপনাদের চলাফেরার স্বাধীনতা ধ্বংস করার এখনও কোনো প্রয়োজন হয়নি। দরকার হলে তাও করতে হবে।

আমার সংগ এড়াবার জন্য আপনাদের মতো পণ্ডিত লোকেরাও এ সম্ভা চালটা চালবেন, এটা আশা করতে পারিনি। এ সমস্ত ব্যাপারে আমরা অনভিজ্ঞ নই, ভবিষ্যতে এ কথাটা মনে রাখবেন।

ভদ্রলোকের বর্ধস্বর মুহু, কিছু ইংগিতটা জোরালো।

শংকর অপ্রতিভ হয়ে বলে, মাপ করবেন, যদি কোনো অপরাধ করে থাকি। সিকিউরিটির বড়া বাঁধনে আমরা অভ্যস্ত নই, তাই কনিকের জন্য বেরিয়ে পড়তে সাধ হয়েছিল। বিশ্বাস করুন, যদি জানতাম যে আমাদের অবিস্ময়কারিতার ফলে আপনার ক্ষতিব সম্ভাবনা—তাহলে কখনই এ পথ নিতাম না। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আজ থেকে আপনাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার লংঘন হতে দেব না।

সুমিত্রা মিনতিভরা বড়ো বড়ো চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপারটা কি, আপনি রিপোর্ট করবেন ?

শংকর দেখে, ভদ্রলোকের ওপরে করুণ নয়নের প্রতিক্রিয়া।

ভদ্রলোক নরম হয়ে যান, এবারের মতো না হয় রিপোর্ট না করলেও চলবে। আপনাদের আমি অবিশ্বাস করি না। আমার শুধু অনুরোধ, যদি ভবিষ্যতে দরকার হয় আমাকে বা অন্য রক্ষীদের একবার জানিয়ে যাবেন। অন্ততঃ এটুকু সহযোগিতা আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করি। সব জায়গায় হয়তো রক্ষী সংগে থাকারও দরকার হবে না। আচ্ছা, আপনারা সিনেমা দেখুন।

ভদ্রলোক চলে যান ওদের দৃষ্টির অন্তরালে।

ইতিমধ্যে সিনেমা আবার আরম্ভ হয়ে গেছে।

আরব্যোপজ্ঞাস থেকে মনগড়া, অবিশ্বাস্ত কাহিনী। টেকনিকলারের অপরূপ স্বপ্নরাজ্য—বাদী থেকে বাদশাজাদীর চোখ বলমানো রূপের সমাবেশ।

পরাজয় আর বতো রাজ্যের চঞ্জার গ্রানিতে অসাড় হয়ে গেছে শংকরের প্রায়মুগ্ধলী—পর্দার ছবি অনেকক্ষণ মনের পটে প্রতিকলিত হয় না। কিছুক্ষণ পরে সুমিত্রার দিকে একবার তাকায় শংকর। রান হেসে পরম সহানুভূতিভরে সুমিত্রা ওর হাতের ওপর হাত রাখে।

তারপর কোন অজানা মুহূর্তে হুঁজনেই আবিষ্ট হয়ে গেছে পর্দার কাহিনীর মধ্যে। উদ্ভূত পালিচা উড়ে চলেছে টানের আলোর

প্রাবিত উজ্জল আকাশে সুপ্ত নায়ককে নিয়ে। গিরি-প্রান্তর,
ময়-কান্তার পার হইবে, কতো জনপদ অতিক্রম করে সাতসহস্রা
বাড়ীর অস্তঃপুরে নায়িকার কক্ষে প্রবেশ করল উড়ন্ত গালিচা।
নায়কের স্বপ্নভঙ্গ হয় নায়িকার করম্পর্শে।

তারপর নায়ক হারায় নায়িকাকে—বাস্তবের সংঘাতে মিলিয়ে
গেল স্বপ্ন। বিপদসংকুল পথে নায়কের অভিযান—হারানো স্বপ্ন
পুনরুদ্ধার করতে। সমুদ্রে জাহাজ ডুবি; সর্বহারা নায়ককে বিক্রয়
করা হোলো বাগদাদের বাজারে; নায়কের পলায়ন; হাজার বাধা-
বিপত্তি অতিক্রম করে, কতো দেশ-দেশান্তর পেরিয়ে—অনেক যুদ্ধ-
বিগ্রহের অন্তে দৈত্যের সহায়তায় হয় পুনর্মিলন।

এখানেই ছবির শেষ।

* * * * *

একটা ছোটো কাকিতে চা-এর পর্ব শেষ করে প্রায়াককার
রাজপথে ওরা নেমে পড়ে। শংকর-সুমিত্রার পরম্পরকে বলবার
কথা বেন ফুরিয়ে এসেছে।

অন্ধকার বনিয়ে এলো, ওরা এসে বসেছে পার্কে। নিঃশব্দ
বাতি আলো উঠেছে চারদিকে। রং-বেরং-এর আভায় কনট সার্কাস
রূপান্তরিত হয়ে গেছে—সিনেমায় দেখা সেই বাগদাদ সহরে।

উড়ন্ত গালিচা।

আরব্যোপভাসের সূত্র ইতিহাসের অন্ধকারময় গলিতে।
কতো শতাব্দী পেরিয়ে, কতো সভ্যতার ধারা বেয়ে পৃথিবী
পরিক্রমা করে—আজও সে-কাহিনীর শেষ হোলো না।
হলিউডের রূপস্রষ্টার মনে সে কথা আলোড়ন তোলে—বিশ শতাব্দীর
প্রথম সূর্যালোকের মধ্যেও। রূপে-রসে-বর্ণে সে কাহিনী জীবন্ত হয়ে
ওঠে রূপালি পর্দায়। ফ্রেঙ্কনো ক্যালিফোর্নিয়ার, নাইরোবি
কেনিয়ায়, সুদূর জাপানের কিয়োটা সহরে বা দিল্লী নগরীতে।

উড়ন্ত গালিচার কাহিনী কি একেবারেই মনগড়া?

মাধ্যাকর্ষণের অমিতলক্ষিত্র পরাভব মানুষ কি প্রত্যেক করেছে
যুগে যুগে?

না, সবই কবি-কল্পনা?

অথবা, ধরো না কেন পুস্পকরত্নের কথা—পক্ষিরাজের কাহিনী।
কল্পনাই যদি হয়, একটা বাস্তব ভিত্তি তো তার থাকে চাই? দৃশ্য
অগতের ওপরে নির্ভর করেই না গড়ে ওঠে কল্পনা? যে বস্তু কেউই
দেখেনি, সেটার কল্পনা মানুষ করবে কী করে?

পরশ পাথর! বহু মনোহী জীবনপাত করেছেন পরশ পাথরের
নিষ্ফল সন্ধান। সেটা কি একটা অলীক কল্পনার ওপরেই ভিত্তি
করে? সত্যই কি কেউ খুঁজে পেয়েছিল পরশ পাথর?

মানুষ ভেবেছে চিরকাল চালু থাকবে এমন বস্তুর কথা—
পার্শ্বেচুরাল মোশান মেশিনের কথা।

কোথা থেকে আসে এসব কল্পনা? কোথা থেকে হবিবুল্লা
পেয়েছিল এ আশ্বাস যে মহাকর্ষের বিপরীত শক্তি তৈরী করবার
একটা উপায় আছে? বহুবিশ্বের গ্রন্থাগারের সাত হাজার বই-এর
মধ্যে কোথাও কি মিলবে এ আশ্বাসের আভাস? তার গবেষণাগারের
কোন বস্তুটা দিয়েছিল পথের সন্ধান?

শংকরের মন ভরে প্রশ্ন আর প্রশ্ন।

* * * * *

বহুক্ষণ বাদে ব্যারাকে ফিরবার পথে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করেছিল,
কি শংকর, পারবে তো সমস্তার সমাধান করতে? আমি কিছু
তোমারই মুখ চেয়ে বসে আছি।

শংকর অস্তমন্ব ভাবে উত্তর দিয়েছিল, কি করে বলি বলা?
তবে হবিবুল্লা খান যেটাকে সম্ভব করেছিল, শংকর রায় যে তা পারবে
না—এ কথাটাও মন এখনও মেনে নেয়নি।

ওর হাতে মুহূ চাপ দিয়ে সুমিত্রা বলেছিল, এই তো মানুষের
মতো কথা। [ক্রমশঃ।

বনহংস

[ইংরাজ কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের 'Wild Swans at Coole' কবিতা অবলম্বনে]

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

হেমন্ত গোধূলি : শান্ত সরোবর
বিষাদ-গম্ভীর হিমেল বনভূমি ;
হে বনহংস, দীর্ঘদিন পর
আবার কেন ওগো এখানে এলে তুমি ?

উনিশ বছর আগে যুগলে জলকলি
এখানে করেছিলে নিবিড় সন্ধ্যাহে
প্রাণের উত্তাপে আবেগে উচ্ছলি
প্রণয়-বন-কণে শান্ত সমারোহে।

অমিত যৌবনে তেমনি বেগবান
অসীম প্রেমমুখে তোমরা উচ্ছল,
আমারি নেই শুধু সে উষ্ণ মন-প্রাণ
প্রতিটি শিবা আজ হিম-নীতল।

হে বনহংস দল, অশান্ত অবিরাম
কেবলি কঁাকে কঁাকে কোথায় বাও উড়ে,
হে চিরচঞ্চল, নয়ন অভিরাম
কোথায় বাবে দূরে কোন সে সরোবরে ?

বিপ্লবের সঙ্ঘাত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে মিলিটারী ধরনের ভ্রাণ্টিকার-বাহিনী সংগঠনের পর সারাদেশে নানা স্থানে সেই ধরনের ভ্রাণ্টিকার-বাহিনী তৈরী হয়েছিল। “মেক্স” সত্যশুপ্তের বি ভি দল এবং চট্টগ্রামের ভ্রাণ্টিকার-বাহিনীর কথা আগে বলেছি। তারা তখন থেকেই “কিছু করবার” গুপ্ত তোড়জোড় শুরু করেছিল। যুগান্তর দলের ছেলেরাও সর্বত্রই অধীর হয়ে উঠেছিল, “কিছু করবার” জন্তে। খাঁটা মিলিটারী প্যারেডের পর কংগ্রেসের নিরামিষ প্রোগ্রাম ছেলেরদের বেখাপ্পা লাগছিল। চারিদিক থেকে ছেলেরা দাদাদের তাগিদ দিচ্ছিল,—অনেকের “দড়ি ছেঁড়ার” মতন মতিগতি।

চট্টগ্রামের দল বিভলভার যোগাড় করার নানা ভাবের চেষ্টা করছিল, এবং সেজন্তে কলকাতায়ও আসতো। কলকাতার যুগান্তরের দাদাদের কাছেও টাকা মারতো, এবং অমুকুলদার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাও করেছিল। সন্তোষ মিত্রের দলের “খোকা” (দেবেন দে) ২২ সাল থেকেই গা ঢাকা দিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামে গিয়ে ওদের আশ্রয়ে ছিল। ওরা নাকি পাহাড়তলী অঞ্চলে এক ডাকাতি (ডাকলুট) করে অর্থসংগ্রহ করেছিল, এবং সেই ডাকাতিতে নাকি দেবেন দেও ছিল। সে তারপরে কলকাতার পালিয়ে এসে অমুকুলদার আশ্রয়ে ছিল। অমুকুলদার সঙ্গে যোগাযোগের জন্ত দাদাদের সাহায্য ওদের দরকার হয়েছিল, এবং সেই নৃত্যেই দাদারা জানতেন, ওরা কিছু করার তোড়জোড় করছে।

এই বকম অবস্থার দাদারা পরামর্শ করে’ স্থির করেছিলেন, কিছু না করলে আর চলে না। কিন্তু যদি কিছু করতেই হয়, তাহলে একটু নতুন-কিছুও হওয়া চাই, এবং দেশের লোকের তাকলাগানোর মতনও হওয়া চাই। অহিংস সত্যগ্রহ করে পড়ে মার খাওয়ার যে-সাধনা স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায় বলে সারা দেশ বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে,—সে-সাধনার নিষ্ক্রিয় ক্রৈব্য বধন বিপ্লবী নওজোয়ানদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়নি, তখন সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শকে আর একবার একটু সাজা করে তোলার মতন কিছু করা—মন্দ কি! তাই তাঁরা স্থির করেছিলেন সাহেব-মারার কর্মসূচী—এক সঙ্গে যত জায়গার পারা যায়, সাহেবদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে হবে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা “অভ্যুত্থান” করলে সেটাই হতো সিংহাসন ধরুণ।

ঠিক হয়েছিল,—ছেলেরা নিজ নিজ খাঁটিতে নিজ নিজ

তৈরী করবে এবং বাছাই করা ছেলের দল নিয়ে তৈরী থাকবে,—দাদারা চট্টগ্রামের সিংহাসন পাওয়ার পর খাঁটিতে খাঁটিতে আদেশ এবং কিছু মালমশলা পাঠাবেন,—তারপর ছেলের দল চারিদিকে ভেল্ দিগ্দিগ লাগিয়ে দেবে—দাদাদের হুকুম না পেয়ে কিছু করবে না।

একটা প্লানের ছক দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। সমগ্র কর্মসূচীর গোড়া কলকাতার মনোরঞ্জনদা (গুপ্ত)—বিভিন্ন জেলার খাঁটিগুলোব সঙ্গে যুক্ত—কাজ শুরু করার আদেশ ও মালমশলা সরবরাহ করা তার কাজ। মুন্সীগঞ্জের বে ছেলের দল ক্ষেপেছিল,—প্রফুল্ল চ্যাটার্জি (জীবনের ভাই বাদল) তার চাই—মনোরঞ্জনদার সঙ্গে তারই সরাসরি যোগাযোগ। তার খাঁটি নারায়ণগঞ্জ—সেখান থেকে একদিকে বরিশাল, আর একদিকে মৈমনসিংহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষারও ভার তার উপর। তার প্লান হল, নারায়ণগঞ্জের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ। তার দলে আছে জন আঠেক ছেলে—তার মধ্যে একজন আছে, ১২।১৩ বছর বয়স—মুন্সীগঞ্জের উমাচরণ সেনের নাতি,—আমাদের বড়দির ছোট ছেলে বাবু, বীণা (বিনয় দত্তগুপ্ত), মনা (বিনয় ব্যানার্জি), “বদেনী” (বদেণ ঘোষ—মুন্সীগঞ্জের প্রবীণ উকীল মতি বোসের ভাগনে) প্রভৃতি। বেঁচে কিরে আসা হবে না বলেই যেতে হবে, এই তারা স্থির করেছিল।

চট্টগ্রামের ঘটনার পর এই ছেলের দল অধীর হয়ে উঠেছে,—কিন্তু কলকাতা থেকে আদেশ বা মাল আসতে না। বাবলের কাছে কিছু মাল ছিল, ছেলেরা বলে, তুমি চূপ করে বসে থাক, মালগুলো আমাদের দাও। শেষ পর্যন্ত তারা বাদলকে শাসিয়েছিল, তোমাকে খুন করে ফেলবো, যদি মাল না দাও। সে ঘাবড়ায়নি,—কিন্তু সেও ছটকট করছিল। বরিশাল খাঁটির খবর নিতে সে বরিশাল গেল। তার ঠিক আগের দিনই সেখানকার খাঁটির ছেলেরা মিটিংয়ে বসেছে, হঠাৎ পুলিশ এসে ঘিরে ধরেছে। বাবল বধন বরিশালে পৌঁছেছে, তখন সেখানে পুলিশ এমন ব্যাপক খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় চালিয়েছে যে, বাদলকে কেউ আশ্রয় দিলে না। সে কোনরকমে সেখান থেকে কিরে এসে মৈমনসিংহে বাবে বলে ঢাকার গিয়ে সেখানেই ধরা পড়ে গেল।

চট্টগ্রামের ঘটনার পর জেলার জেলার পুলিশ এমন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, কোথাও কোনো খাঁটাই কিছু

থক পাঠালেন। মোটামুটি এসে সাহেবকে অন্নদার (চট্টোপাধ্যায়) বাড়ী নিয়ে গিয়ে একদিন বেখে অল্প পাচার করে দিলেন।

ব্যাপার হচ্ছে এই যে, নূর্বসেনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের জেলেই কথা হয়েছিল,—ভবিষ্যতে কোনদিন আশ্রয়ের দরকার হ'লে, তাঁর কাছে এসে তিনি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন। তাঁর ভাইকে সব কথা বলা থাকবে,—তিনি নিজে অল্পপস্থিত থাকলেও কোন অল্পবিধা হবে না। লোকনাথ বল চৈতন্যদেবের বাড়ীর ঠিকানা জানতেন না, শুধু জানতেন তাঁর বাবার নাম, এবং তিনি শ্রীরামপুর কোর্টের উকীল। অন্নাপার লুঠনের নেতা, পলাতক আসামী অত্যন্ত বিধ্বস্ত লোকের আশ্রয় ছাড়া বেখানে সেখানে বেতে পারেন না। তা ছাড়া ঘটনার পর প্রথম দিকের দিনগুলোতে পুলিশ সারা দেশে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে—সর্বত্র স্পাই গিজ গিজ করছে। পলাতকেরা তাদের চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

এখানে একটা কথা বলা দরকার মনে করি। আমাদের যুগান্তর দলের দাদারা অনেকেই প্রচার করে থাকেন,—চাটগাঁর দলটা তাঁদেরই দল। কথাটা ভাড়া মিথ্যা। সকল দলের লোকই সকল দলের পলাতকদের প্রয়োজন হলে আশ্রয় দিয়ে থাকেন,—কিন্তু সাধারণত পলাতকেরা নিজেদের দল বা অন্তরঙ্গ সহযোগী দলের কাছেই প্রথমে গিয়ে থাকে। লোকনাথ বলের উত্তর পাড়ার আগমনও সেই কথারই প্রমাণ। ২৬ সালে নূর্বসেন কলকাতার প্রেক্ষার হয়েছিলেন হরিনারায়ণ চন্দ্রের আশ্রয় থেকে,—এটাও ঐ কথারই প্রমাণ। তার আর একটা প্রমাণের কথা চন্দ্রনগর গৌদল পাড়ার নরেন্দ্রার (নরেন ব্যানার্জি—১৯১৬ সালের "বড়দা") লিখিত পুস্তক "রক্ত বিপ্লবের এক অধ্যায়" থেকে তারই ভাবার শুধন :—

"চট্টগ্রাম অন্নাপার লুঠন সফল কতিপয় বীর সন্তানকে চন্দ্রনগরে স্থানান্তরিত করা বিশেষ আবশ্যিক বোধ হয়। বসন্ত কুমারের অকস্মে বসন্ত কুমার (ব্যানার্জি—"মেজদা") ও ফরোয়ার্ড অকস্মে নরেন্দ্র নাথের সহিত ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত উক্ত বিষয়ে পরামর্শ করিতে আসেন। সহরের তদানীন্তন অবস্থা বুঝিয়া চন্দ্রনগরে আশ্রয়দান অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। সেই সময়ে বসন্ত কুমার কানীক্ষরী পাঠশালার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন, এবং নরেন্দ্রনাথও তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরামর্শ ক্রমে পরে স্থির হয়—তাঁহারা একজন শিক্ষয়িত্রী দিতে পারিলে, এবং স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিবার ব্যবস্থা থাকিলে চন্দ্রনগরে আশ্রয়দান সম্ভব। সেই পরামর্শানুসারে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হিসাবে এবং শশধর আচার্য স্বামী সাক্ষিয়া চন্দ্রনগরে আসেন। সত্যেন্দ্রকুমার পত্নী মধ্যে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবীর নামে এক বাসা ভাড়া করেন। এই বাসা ভাড়া লইবার পূর্বে একবার গণেশ ঘোষ ২১১ রাত্রি কানীক্ষরী পাঠশালা ভবনে অবস্থান করিয়া-ছিলেন। এই নূতন বাসায় অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, মাখন ওরফে জীবনলাল ঘোষাল, আনন্দ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন সন্তান আশ্রয়লাভ করেন। প্রায় চারি মাসকাল তাঁহারা সেখানে নির্বিঘ্নে বাস করেন। কোন বকমে সন্ধান পাইয়া ১৯৩০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর শেখ রাস্তা মিঃ টেগার্ট কর্তৃক

সেই বাসা আক্রান্ত হয়। তাঁহার আগমনের কথা পূর্বে আত্মা জানিতে পারা যায়, এবং বাসা ত্যাগ করিয়া অল্প সন্ধ্যা পড়িবার সময় থাকিলেও কোন বিশেষ কারণে সন্ধ্যা পড়া ঘটয়া উঠে না; তবে সারা রাত্রি পাহারা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া পলাতকেরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। কিছু দিন পূর্বে অনন্ত সিংহ সেই বাসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই বাসা অবরোধকালে উভয় পক্ষে গুলী বর্ষণের ফলে মাখনলালের দেহাবসান ঘটে এবং অপর সকলে গ্রেপ্তার হন। সেই সময়ে পশুচরী পরিষদে প্রজা সমিতি পক্ষের চাকর রায় এবং ভোলানাথ দাস সদস্য ছিলেন। এই অত্যাচারের প্রতিবিধান মানসে উক্ত দুইজন সদস্যকে পশুচরীতে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সেই ডেপুটেশনে চন্দ্রনগরবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই।...."

দেখা যাচ্ছে,—ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত পলাতকদের চন্দ্রনগর রাখার ব্যবস্থায় লিপ্ত হন অন্নাপার লুঠনের প্রায় এক মাস পরে। চট্টগ্রামের দল যদি যুগান্তরদলের শাখা হত,—তাহলে আগে থেকেই চন্দ্রনগরে তাদের ভাল আশ্রয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই রাখা হ'ত।

বাই হোক,—চন্দ্রনগরের ঘটনা যেদিন ঘটলো, তার পরের দিনই কাগজের অসম্পূর্ণ খবরে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগলো—সব কথা ভালো করে জানার জন্তে মনটা ছটকট করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার সময় চন্দ্রনগরে চলে গেলুম। গেলুম গৌদল পাড়ার নরেন্দ্রার বাড়ীর উদ্দেশে। কিন্তু গিয়ে সটান তাঁর বাড়ীতে ওঠা ভাল মনে হল না—যদি ওয়াচ থাকে? সুতরাং রাস্তায় একটু ঘুরলুম,—জুট মিলের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধার পর্যন্ত। তার পর মনে হল নরেন্দ্রার এক প্রতিবেশীর কথা নাম জাহিনাথ মুখোপাধ্যায়—ডাকনাম তেরাজু—দলের লোক নন—কিন্তু আমার চেনা।

তাঁর কাছে নরেন্দ্রার খবর নোব মনে করে তাঁর বাড়ী গেলুম। তিনি বাড়ী নেই—মানকুণ্ডে তাঁর ওষুধের দোকানে আছেন,—ফিরতে বেশী দেবী নেই। শুনে আমি গলিতে একটু পায়চারি করে এক বাড়ীর বাইরের রোয়াকে বসলুম। একজন ছোকরা, বছর ১৯১৬ বয়স, হঠাৎ কোথা থেকে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চান?—কোথা থেকে আসছেন?—ইত্যাদি। তারপর সে চলে গেল এবং একটু পরে এক এক করে কয়েকজন লোক এল এবং ঐ বকম প্রশ্ন শুরু করলে—কি দরকার? অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছি কেন?—ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত এক হোমরা-চোমরা ভদ্রলোক এলেন এবং আমাকে কড়াভাবে ২.১টা প্রশ্ন করে বললেন,—আপনাকে খানায় বেতে হবে, চলুন।

শোনো কথা। মনে মনে আন্দাজ করে নিলুম, পাড়াটা গরম, সুতরাং হয়ত নরেন্দ্রার বাড়ীতে গার্ডও আছে,—না গিয়ে ভালই করেছি। বললুম,—বেশ তো খানায় বেতে হয়, বাবো,—কিন্তু জাহিনাবুর যখন আসার সময় হয়েছে,—তখন তিনি এসে, তাঁকে সঙ্গে নিয়েই খানায় যাবো। ভদ্রলোক বললেন, এ পাড়ার আর কেউ আপনাকে চেনে? তখন মনে হল, লোকটা নিশ্চয়ই বুটিপ স্পাই নয়,—হ'লে পাড়ার ভেতর প্রকাণ্ড গুপ্তগোল করতো না,—হরত দলের দরদী,—হরত আমাকেই বুটিপ স্পাই মনে

করেছে। সুতরাং তখন বললুম,—নরেন ব্যানার্জিও আমাকে চেনেন।

ভক্তলোক ছোকরাকে দিয়ে নরেনদাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে আমাকে দেখে, একটু মুখ টিপে হেসে বললেন,—এ কি? আপনি?—তা আমার ওখানে বাননি কেন? বলে ভক্তলোককে চুপি চুপি কি বললেন। তখন ভক্তলোক আমাকে এবং নরেনদাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে,—প্রথমে একচোট হাসাহাসির পর চায়ের করমাস দিলেন,—আর বললেন,—মাপ করবেন,—বৃটিশ স্পাইগুলো খুব ঘোরাঘুরি শুরু করেছে,—আমি বলি বুদ্ধি—হা হা হা—(হেসে ফেললেন)।

তিনি হুঙ্কন করাসী-পুলিসের ইন্স্পেক্টর করালী বাবু (পদবী মনে নেই)—আমাদের বন্ধু। তা খেয়ে বেরোতেই জাহিবাবু এসে হাজির। আমাকে দেখে বলেন,—খানার নিয়ে যাবে না কি?—করালী বাবু বললেন, সে সব মিটে গেছে। নরেনদাকে বলে স্থির করলুম—জাহিবাবুর বাড়ী যাত্রা খাবো এবং থাকবো—তারপর সকালে তাঁর সঙ্গে কথা করে বাড়ী ফিরবো।

সকালে নরেনদা নিয়ে গেলেন বঙ্গ ব্যানার্জির বাড়ীতে। সেখানে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ শুনলুম। এখানে একটা অবাস্তব কথা বলে রাখতে চাই। আজ,—১৯৬০ সালে, ৭৫ বছর বয়সে সেই নরেনদার না আছে অরের সংহান,—না আছে মাথা গৌড়ার জারণা!

এই ঘটনার পর ডালহাউসী কোয়ারে টেগার্টের গাড়ীতে বোমা হারা হয়,—টেগার্ট ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়,—এবং তার পরই ভারত ত্যাগ করে।

টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টা করে অমুজা সেনগুপ্ত এবং দীনেশ মজুমদার। অমুজা ছিল রসিকদাসের চেলা,—এবং দীনেশ সাতুদার (সাতকড়ি ব্যানার্জি)। টেগার্ট ঐ পথে রোজ নিকিষ্ট সময়ে যেতো,—ওরা হুজনে বোমা এবং রিভলভার নিয়ে চুপচুপ থেকে আক্রমণ করেছিল। প্রথমে গাড়ীতে বোমা মারে অমুজা,—বোমাটা গাড়ীর গায়ে লেগে গাড়ীটা ঝাঁকনি খায়—অমুজা রিভলভার নিয়ে গাড়ী আক্রমণ করে,—ঠিক তখনই আর একদিক থেকে দীনেশের নিকিষ্ট বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অমুজাকেই আহত করে। বিস্ফোরণে অমুজার পেটটাই উড়ে যায়। সে ঘুরে কোয়ারের রেলিং পর্যন্ত গিয়েই পড়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। দীনেশ দৌড়ে পালায় এবং অনেক দূর বাওয়ার পর ধরা পড়ে যায়।

বিচারে তার শাস্তি কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু সে জেল থেকে পালিয়ে যায়, এবং অনেকদিন পরে ধরা পড়ে। ধরাপড়ার সময় পুলিসের সঙ্গে একটা গুলীর লড়াই দেয় এবং সে মামলার তার কীসী হয়।

বাই হোক,—ডালহাউসী কোয়ারের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ নারায়ণ রায়ের ডাক্তারখানা-ল্যাবরেটরী সার্চ হল এবং সেখান থেকে পাওয়া গেল TNT তৈরীর ফর্মুলা ও পদ্ধতির টাইপ করা কাগজ।

সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষার হলেন ডাক্তার নারায়ণ রায়ে,—সীতাংত সরকার, গৌরীবাড়ী সেনের ব্রজহুলাল (ঈমানী?)—ডাক্তার সুপাল বন্দ্য, হিমালি চক্রবর্তী (নাট্যশিল্পী তিনকড়ি চক্রবর্তীর

পুত্র) ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের চেলা কালীপদ ঘোষ, মলিক দাস এবং আরো কয়েকজন। অমুজা নামেও ওরাকে বেকলো—তিনি গা ঢাকা দিলেন। মনোরঞ্জনদা'তো গা ঢাকা দিয়েই ছিলেন। তাঁরা পরে ধরা পড়েন।

হিমালি চক্রবর্তীর ডালহাউসের কারখানার নাকি ডালহাউ-করা বোমার খোল পাওয়া গিয়েছিল। তিনকড়িবাবুর ভবিষ্যে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মামলার সীতাংত এবং ব্রজহুলাল রাজসাকী হয় এবং সরকারী খরচে বিলেত চলে যায়। কালীপদ ঘোষ ছিলেন গোয়েন্দা-কর্তা নলিনী মজুমদারের আক্ষীর। তিনিও সরকারী খরচে বিলেত যান। বাকি সকলের শীপান্তর দণ্ড হয়। রসিক দাসের বোধ হয় ১৫ বছর শীপান্তর দণ্ড হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে আন্দামানে যেতে হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে রাজসাকীর সাক্ষ্যমাত্র ছিল—তার সমর্থনে কোন স্বতন্ত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল না। সুতরাং উকীলরা পরামর্শ করে আপীল করেন, এবং হাইকোর্ট থেকে রসিকদাস বেকসুর খালাস হন। অবশ্য পুলিশ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে তিন নম্বর রেগুলেশনে প্রেক্ষার করে, এবং তাঁকে একা পেলোয়ার জেলে বন্দী করে রাখা হয়।

TNT'র ফর্মুলা ধরা পড়েছে, এবং যে গৌরীবাড়ীতে গোপালবাবু থাকেন, সেই গৌরীবাড়ী থেকে ব্রজহুলাল ধরা পড়েছে, সুতরাং মনটা সুড় সুড় করতে লাগলো। বোস ইনস্টিটিউটে বাগড়া ঠিক নয়। সুতরাং ডালহাউসী কোয়ারের ঘটনার দিনই সন্ধ্যার পর গেলুম গৌরীবাড়ীতে গোপালবাবুর বাসায়।

ফোন ৬৪-৬২৩১

পি.জি.ভাত্য

জুয়েলার

১২৫-বি বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২

তিনি বললেন,—এই সামনের রাস্তা দিয়ে এলেন নাকি? আমি বললুম, হ্যাঁ কেম? তিনি বললেন,—রাস্তায় একপালা স্পাই আছে। তিনি বললেন, আপনিও যা জানেন, আমিও সেইটুকুই জানি। আর কিছু জানি না—শুধু এই পাড়ার এক ছ্যামড়াকে ধরে নিয়ে গেছে—এই মাত্র জানি। বলে, তিনি আমাকে বাড়ীর পিছনের গলি দিয়ে উল্টাডাকার খাল ধারে পৌঁছে দিলেন।

বাই হোক,—দাদাদের সঙ্গে সম্পর্ক হুচলেও যুক্তীগঞ্জের দলের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হয়নি। আমি থাকতুম আশুশক্তি লাইব্রেরীতে, আর ওরা থাকতো ৪১ নম্বর হারিসন রোডে এক মেস করে। আমার সেখানে যাতায়াত তো ছিলই,—রাত্রে গল্পগাছার বেশী রাত হয়ে গেলে ওদের ওখানেই খেয়ে শুয়ে থাকতুম।

চারি দিকে ধরপাকড় আর সার্চ লেগেই ছিল। এক দিন রাত্রে ওখানে থেকে গেছি,—সকালে পুলিশ এসে বাড়ী ঘিরেছে—সার্চ হবে। সে বোধ হয় অক্টোবর মাস। আমাকে সেখানে দেখে এক পুরানো চেনা আই-বি অফিসার বললেন,—আরে,—আপনি এখানে? আপনার জন্তে যে ওরা (একদল পুলিশ) আশুশক্তি লাইব্রেরীতে গেছে।—আমি বললুম, তাহলে শীঘ্র আমাকে ওখানে নিয়ে চলুন,—নইলে হয়ত ওরা তালা ভেঙে বসবে। তিনি বললেন, না তালা ভাঙবে না,—ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

সার্চ চলছে, ওঁদিকে চাও তৈরী হচ্ছে। আমরা চা খেলুম,—অফিসারদের বলা হল চা খেতে—তারা খেলেন না,—শুধু স্কিয়ারা স্ট্রীটের ধানার দারোগা এক কাপ চা খেলেন। তারপর আমাকে নিয়ে আশুশক্তি লাইব্রেরীতে এসে সার্চ করে বললে, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। বুঝলুম গ্রেপ্তার হলুম। ইলিসিয়াম রোডে আই-বি অফিসে এসে দেখি ৪১ নম্বর থেকে মাখন চ্যাটার্জি আর ধীরেন কুণ্ডুকেও নিয়ে এসেছে।

মনটা মুসড়ে গেল। 'রোডস টু ফ্রিডম' বইটার অনুবাদটাকে ছাপার অনুমতি না পেয়ে 'অবলম্বনে লিখিত' বলে প্রেস কপি তৈরী করে ফেলোছিলুম,—প্রকাশের ব্যবস্থা আটকে গেল বলে মনটা হায় হায় করতে লাগলো। সারাদিন interrogation এর পর বখন আমি বললুম,—এক কথা ৫০ বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, আর আমি আপনার কোন কথাই জবাব দোব না,—torture-এর জন্তে প্রস্তুত হয়েই বললুম,—তখন আমার lockup-এ পুরলে। তারপর আর সাড়া-শব্দ নেই। শেষে ন' দিনের দিন আমাদের তিনজনকেই কিছু বচন দিয়ে ছেড়ে দিলে। আমি এসেই সরস্বতী লাইব্রেরীর মহেন্দ্র দত্তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে বইটা প্রকাশের বন্দোবস্ত করে ফেললুম। 'স্বাধীনতার পথ' নামে বই বেরিয়ে গেল।

তখন মনোরঞ্জনলা, অক্ষয় গুহ, ভূপেন দত্ত, সকলেই জেলে, রাজবন্দী হয়ে গেছেন। সরস্বতী প্রেসে এবং লাইব্রেরীতে আছেন শুধু শৈলেন গুহ আর এবং মহেন্দ্র দত্ত। প্রেস ও লাইব্রেরীর অবস্থা কাঙ্ক্ষিত হয়ে এসেছে।

জীবনও জেলে গিয়েছিল, কিন্তু সে আইন-অমাত্য আন্দোলন সম্পর্কে। সুভাষাবাবুর তো আগেই জেল হয়েছিল,—এবং পরে যে এর সেনাপতিরও বোধহয় হুমাস জেল হয়েছিল বি-পি-সি-সি

Council of Action এর প্রথম ডিক্টেটর হিসাবে। তারপর একে একে হরদয়াল নাগ, অমরনা' (চ্যাটার্জি) প্রভৃতি নেতারা, এবং এই ডিক্টেটর-চেনের মধ্যেই জীবনও জেলে গিয়েছিল। কিন্তু মজা এই যে, এক শ্রেণীর নেতাদের কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোলে ছেড়ে দেয়,—আর একশ্রেণীর নেতাদের মেয়াদ ফুরোলে অভিভাবক অনুসারে বিনা বিচারে আটক করে। সুভাষ বাবু, জীবন প্রভৃতি এই দ্বিতীয় দলের।

মুন তৈরীর হিড়িক লেগে গিয়েছিল চারিদিকে—এবং বে-আইনী মুন কলকাতার রাস্তায় বিক্রী করে আইন-ভঙ্গও চলছিল। বরকট এবং পিকেটিংও চলছিল। পুলিশ বেপরোয়া মারও শুরু করেছিল সর্বত্র। তাদের কার্যদা হল, বিশিষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করা, এবং অনুচরদের লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করা। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, এইভাবে ছেড়ে ছেড়ে গ্রেপ্তার করেও জেল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। দমদম ক্যাণ্টনমেন্টের ব্যারাকগুলোকে এই সময়েই জেলে পরিণত করা হয় আইন-অমাত্য বন্দীদের রাখার জন্তে।

মহাত্মা গান্ধী বখন প্রথমে ডাঙীতে বান মুন তৈরী করতে,—তখন পুলিশদল লাইন বেঁধে পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল বাতে কেউ জলের ধারে না যেতে পারে। পুলিশের গায়ে হাত দেওয়া নিষেধ, সুতরাং অহিংস সত্যগ্রহীরা পুলিশের লাইনের সামনা-সামনি গিয়ে আটকে গেল। ফলে অবস্থা দাঁড়ালো, দুই দল পরস্পরের দিকে ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে আছে—নিশ্চলভাবে। সুতরাং মহাত্মাজী অহিংসা বাঁচিয়ে পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্তে কতারা দিলেন,—হুজুন পুলিশের মাঝখানের কাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যাওয়ার জন্তে চেষ্টা করতে দোব নেই। সেইভাবে সত্যগ্রহীরা গোঁস্তা মারার চেষ্টা করে গ্রেপ্তার হলে deadlock কাটলো।

এই ভাবে জীমতী সরোজিনী নাইডু ধরুসনাতে মুন তৈরীর অভিযানে নেতৃত্ব করেছিলেন। পুলিশ দল প্রথমে তাঁদের আটকালো। তারপর নেত্রী দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তারা একখানা চেয়ার এনে তাঁকে বসতে দিলে। তিনি বসলেন। আরো কিছুক্ষণ কাটলো। পুলিশের কর্তা জিজ্ঞাসা করলো, "কতক্ষণ এই ভাবে বসে থাকবেন?" তিনি কবি, তিনি জবাব দিলেন, "Till doomsday", কাজেই তখন পুলিশ তাঁকে সঙ্গমানে গ্রেপ্তার করলে, এবং বাকি সত্যগ্রহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিয়ে বাটনা-বাটা করে ছেড়ে দিলে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্য ইতিহাসের এই সব মাল-মশলা সংগ্রহ করি আর ভাবি, এগুলো একটা বই-এর আকারে চিরস্থায়ী এক স্মরণীয় করে রাখা দরকার। একখানা পুরানো বই পেয়েছিলুম (Conventional Lies.—বইটা ছেঁড়া,—title page ছিল না,—কিন্তু Prefaceটা ছিল। বিলাতী সমাজের ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা, ঐতিহ্য, লোকাচার প্রভৃতির মনোহারী মুখোমুখি নির্ভরভাবে ছিঁড়ে ফেলে লেখক সেগুলোর কদম্ব স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। বইটা সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। লেখক পালিয়েছেন ক্রান্তে। সেখানে বইটা ফরাসী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে, এক সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। লেখক আবার সরে পড়েছেন।

লেখকের ওপর আমার অসীম ভক্তি হল, এবং আমাদের দেশের কাণ্ড-কারখানা নিয়ে টিক এমনি একখানা বই লেখার লো

আমাকে পেয়ে বসলো। খেটে খেটে লিখে খাড়া করে ফেললুম এক বইয়ের ছক "ঐ তঁাওতা"। কিন্তু বুকলুম, কোনো প্রকাশকই এটা প্রকাশ করতে চাইবে না,—হয়ত কপিই মারা যাবে। সুতরাং প্রকাশ করতে হবে আমার নিজেকেই। কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। একমাত্র ভরসা অমরনা (চ্যাটার্জি)—তিনি জেল থেকে বেরলে দেখা যাবে চেষ্টা করে'।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও তার সল্লিট সর্ববিধ সংস্থা বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল—সর্বত্র অফিস শীল করা, কাণ্ড বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি চলছিল। তার ওপর লাঠি-গুলী-জেল চলছিল। ঢাকার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাও এই সময়ের এক বড় ঘটনা। তখন হাডসন সাহেব ছিলেন পুলিশ-সাহেব। তিনি নাকি মুসলমানদের প্রতি বেপরোয়া পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। সে দাঙ্গার এক বিশেষ ঘটনা—হুটি হিন্দু মেয়ে, হুলের ছাত্রী, হুই ভগ্নী লাঠি হাতে বিপুল সংখ্যক মুসলমান আক্রমণকারীকে সফল ভাবে রুখেছিল। পরে বোধ হয় মেয়ে দুটিকে হিন্দুদের তরফ থেকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

৩০ সাল শেষ হয়েছে। বিপ্লবীদের সাহেব মারার ঝোক প্রবলতর হয়েছে। টেগার্টের পলায়নের পর লোম্যান তার পদ পেয়েছেন এবং বিপ্লবীদের লক্ষ্যস্থলও হয়েছেন। এই অবস্থার হঠাৎ একদিন ঢাকার মেডিক্যাল স্কুলে লোম্যান এবং হাডসন বিপ্লবী বিনয় বোসের রিভলভারের গুলীতে আহত হল। লোম্যান মারা গেল, কিন্তু হাডসন বেচে গেল অনেকদিন হাসপাতালে থাকার পর। তার গুলিঘারের মধ্যে গুলী প্রবেশ করে' পাশের দিক ভেদ করে সে গুলীটা আটকে গিয়েছিল। অর্থাৎ সে আহত হয়েছিল পলায়মান অবস্থায়। আততায়ী বিনয় বোস বেমানুম সবে পড়েছিল।

কলকাতার খবর শৌঁছালে চারিদিকে মহা উত্তেজনা—বিপ্লবী মহলে আনন্দোৎসব লেগে গিয়েছিল। বাংলার জেলের ইনস্পেক্টর-জেনারেল সিম্পসনেরও ওপর স্বদেশীরা খান্না হয়েছিল, তার কড়া জেলশাসনের ব্যক্তিগত উগ্রতার। লোম্যান-হত্যার কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন কলকাতা তোলপাড়—রাইটাস' বিল্ডিং-এ দোতালার সিম্পসনের অফিসে তিন বিপ্লবীর সশস্ত্র আক্রমণ এবং সিম্পসন নিহত। আততায়ী বিনয় বোস, বাদল এবং দীনেশ গুপ্ত।

সিম্পসনকে হত্যা করার পর বিনয় বোস নিজের রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করে;—বাদল পটাসসারানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে, এবং দীনেশগুপ্ত জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়ে যায়। শোনা যায়, আক্রমণের সময় ঘরে উপস্থিত আর এক সাহেবের পাংলুন খারাপ হয়ে গিয়েছিল,—এবং বারাগা থেকে এক তরুণ আমেরিকান পাত্রী সাহেব কাণ্ড দেখে আলসে টপকে বাঁটা আমেরিকান পদ্ধতিতে rain water pipe বেয়ে রাস্তার নেমে পালার।

বিনয় নিজে ডানদিককার রগে গুলী করেছিল,—গুলীটা মস্তিস্ককে জখম করেছিল,—কিন্তু অচৈতন্য অবস্থায় তিনদিন পর্যন্ত তার প্রাণের স্পন্দন বন্ধ হয় নি। তারপর তার মৃত্যু হয়।

মুন্সীগঞ্জের মেয়ে আশাগুপ্তা (এখন ব্যানার্জি—সারদার স্ত্রী) ছিল জীবনের দলের মেয়ে,—এবং তার মাও ছিলেন দলের একজন দরদী বন্ধু। দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর আত্মীয় সম্পর্ক ছিল, এবং সেই সূত্রে তিনি জেলে দীনেশের সঙ্গে দেখা করতেন এবং সংবাদ সংগ্রহ করতেন। পরে বিচারে দীনেশের মৃত্যুদণ্ড ও কাঁসী হয়েছিল।

[ক্রমশঃ]

আধুনিক

দীপক মজুমদার

ট্রামে, বাসে, ট্যান্ডিতে,
ট্রেনের দোহুল দোনার কিংবা সৌধীন মোটরের নিভৃত কক্ষের
অনেক বার দেখেছি তোমায়; অনেক বার।
দেখেছি আর ঘেমেছি—আটাশ ইঞ্চি বুকের ছাতি ফুলে ফুলে উঠেছে!

বোড়শ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে
তোমায় লোকে কি বলে ডাকত কে জানে।
হারের অথবা বৃন্দহালের বাইরে বড় একটা আস্তে না,
পরিচিত পুরুষের অন্তর-মহলের বন্দী ছিলে তুমি।
কিন্তু তুমি কম ছিলে কিসে?
কটাক্ষধ্বনে কত আমীর-ওমরাহ আর রাজা-মহারাজের
মন হরণ করেছ।

সেদিনও বুঝি ছিলে আধুনিক।

১ অরিপাড় আর জড়োয়া,
২ বেশনী গড়না আর মাথরা ছেড়ে
৩ আজ তুমি নতুন বেশ ধরেছো।

পাঁচদশ শতাব্দীর সঙ্গে ম্যাচ করে ছোটখাটো ব্লাউজ পরো;
মাথরের মত কোমল কর্ণের একাংশ অনাবৃত রেখে যাও,

কৃত্রিম কৃকিত কেশদাম বোড়ার ল্যাজের মত বলিরে রাখো—
আঙুর ওঠাধর লোভনীয় করে ভাল অনেক বেশী।
পক্ষমতির কবোফ স্পর্শের আবেশ ছড়িয়ে দিয়ে,
নীরব বন্ধ, পোলাপী কপোল আর চপল তলু নিয়ে ভীড় ঠেলে ওঠো
ট্রামে-বাসে।

শব্দগ্রীবা বাঁকিয়ে ছিম্ছাম্ রিটওয়ান্টার টাইম দেখো।
জ্যানিটি ব্যাগের জ্যানিটি না থাকলে তোমাদের চলে না।

দকতরে কিংবা কল-কারখানার,
সাংস্কৃতিক অল্পষ্ঠানে, বাস্তার অথবা মরনাসে—
সর্বত্র তোমার উপস্থিতি।
মাঝে মাঝে সংস্কৃতি-মিশনের সঙ্গী হয়ে তুমি দেশান্তরী হও।

গান গাওয়ার মত কথা বলো,
গলে-পড়া মোমের মত হাসো—
নিঃশব্দে।
আমরাও নিঃশব্দে চেয়ে দেখি।

নাচ গান স্বাসনা

রবীন্দ্রনাথের গান

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতীয় সঙ্গীতের মূল রসটি হোলো নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ব-রস।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি ছিলো নির্বিশেষের লীলাভূমি। বিশেষের স্থান ছিলো না ভারতীয় সংগীতের রাজ্যে। কোনো একটি বিশেষ সকালের রূপ বর্ণনা করে না ভৈরবী কিবা ভৈরবী। তারা প্রকাশ করছে এমন একটি সকালকে বা সব চিহ্ন নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়েছে আপনার মুখ থেকে। আমাদের রাগরাগিণীর রস তাই এই ব্যক্তি-বিশেষত্বহীন নৈর্ব্যক্তিক রস। বৈচিত্র্যের অবকাশ নেই এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বঞ্চিত রাগরাগিণীর মধ্যে। অথচ বিশেষকে নিয়েই সৃষ্টির লীলা। বিশেষ মনোভাব, বিশেষ স্বদ্ব্যবেগ, বিশেষ অমুভূতিকে প্রকাশ করাই হলো আর্টের উদ্দেশ্য। নির্বিশেষের নিস্তরঙ্গ ধারায় বেই বিশেষ দেখা দিলো অমনি ভাব এলো, রস এলো, সৃষ্টি শুরু হোলো। চিরকালের সব সকাল হেঁকে একটি নির্বিশেষ সকালের রসান্বাদন করে মানুষের মন তৃপ্ত নয়। সে চায়—বসন্তের পেয়ালায় ঢালা একটি রঙীন সকাল, শরতের মন-কেমন-করা উদাসী সকাল, কালো মেঘের ঘোমটা দেওয়া বর্ষার সকাল, শীতের কুহেলি-মাথা সকাল, ভালোবাসার আলো-মালা সকাল, বিরহের স্নিগ্ধ প্রশান্ত পাণ্ডুর সকাল, অক্ষয়িত সকাল, আনন্দ-উজ্জ্বল সকাল—এই সকালগুলির প্রতিটির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিশেষ রস আন্বাদন করতে। ভারতীয় সংগীতের নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষের রাজ্যে বিশেষের প্রকাশ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অমুভূতির প্রকাশ নিয়ে এলো রবীন্দ্রনাথের গান। গান আর নৈর্ব্যক্তিক রইলো না। বিশেষ তার অসীম বৈচিত্র্য নিয়ে দেখা দিলো সুরের রাজ্যে। গান আর নিছক সুরের ব্যঞ্জনা রইলো না, গান তখন বিশেষ মনোভাবের ব্যঞ্জনা হয়ে উঠলো। ভৈরবী আর ভৈরবী হার মানলো প্রতিটি সকালের বিশেষ অনির্বচনীয়তাকে প্রকাশ করতে। তাই সুরের মিশ্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়লো। আর এই সুরের মিশ্রণের প্রয়োজন হোলো শুধু সুরের জন্মে নয়, ভাব প্রকাশের জন্মে।

রবীন্দ্রনাথের গান আর একটি নতুন স্রষ্টা নিয়ে এলো আমাদের গানের এলাকার। ভারতীয় দরবারী সংগীতে গানের সুরের ও কথার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো মিল ছিলো না। চমৎকার সুরের সঙ্গে অতি নীরস কথার মিলন ঘটানোই ছিলো বেওয়ারাজ। শুধু সুরটিকে দাঁড় করাবার জন্মেই গানের কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছিলো এতদিন।

গানের কথার রস ও সুরের রস, এই দুই রসের মিলন খটেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। কবিতার রস আর সুরের রস, এই দু'টি আলাদা হলেও এদের মিলন সম্ভব। তবে সব মিলনের মতো এ মিলনও তিনিই ঘটাতে পারেন যিনি প্রজ্ঞাপতি অর্থাৎ স্রষ্টা। রবীন্দ্র সংগীতে গানের কথা আর গানের সুর, এ দু'টির কোনোটাই আত্ম-বিজ্ঞপ্তির অহংকারে কুফচির পরিচয় দেয় নি। কথা সুরকে অবজ্ঞা করে নি, সুরও কথাকে অবহেলা করে আপনার পার্থক্যের অসঙ্গতি প্রকাশ করে নি।

কোনো ক্ষেত্রেই সংস্কারকে সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। সংগীতের ক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য। রাগরাগিণীর এলাকার সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে তো সুর সৃষ্টি হয় না। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'যতো দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হোতে পারি নে। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসাটা তার বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এইরকমই চলবে। কেন না আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্তু তার চলার বাঁধা-পথটার তাকে বাঁধে না।'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানে যদিও বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র্য ছিলো অক্ষুরন্ত, কিন্তু সে গানগুলি সুরের দিক থেকে দরবারী সংগীতের ঠাঁটের মধ্যেই বদ্ধ ছিলো। বাগেন্দ্রী বাহারে তেওড়া তালে 'আমার মিলন লাগি তুমি', বেহাগ চৌতালে 'ভয় হতে তব অভয় হবে', আশাবরী, বাঁপতালে 'মনমোহন গহন বামিনী শেহে', কান্নাড়া চৌতালে 'হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে', শ্রীরাগ, তেওড়ায় 'কার মিলন চাও বিরহী', বড়হংস সারঙ্গ, চৌতালে 'তীরে আরতি করে চক্ৰতপন', আড়ানা, চৌতালে 'বাণী তব ধার'—এইগুলি হচ্ছে এই পর্যায়ের কতকগুলি গান।

প্রচলিত রাগরাগিণী দিয়ে সব অমুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এইটে অমুভব করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এমন অনেক অমুভূতির সন্ধান পেলেন কবি বাদ্যের ঐশ্বর্য, গভীরতা ও চমৎকারিৎ ধরা পড়ছিলো না চলতি রাগরাগিণী দিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ অমুভূতিগুলির পূর্ণ প্রকাশের তাগিদে নতুন সুর সৃষ্টির দিকে মন দিলেন। বলাই বাহুল্য যে, রাগরাগিণীর মিশ্রণ থেকেই নতুন নতুন সুরের সৃষ্টি। তাই ঠাঁট ও মিশ্রণ সবকিছু রবীন্দ্রনাথের ধারণাগুলি আমাদের জানা দরকার। তিনি বলছেন—'গানের জীবকোষ হচ্ছে কয়েকটি বিশেষ সুরের মিলন। এই সব দানা-বাঁধা সুরগুলিকে নানা আকারে সাজিয়ে রচয়িতা গান বাঁধেন। এমন করেই সকল দেশের গানেই আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাঁট তৈরী হয়ে ওঠে। সেই ঠাঁটগুলিকে দিয়েই গান তৈরী হয়।' রবীন্দ্রনাথ

কলছেন—‘এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরেই গান-রচনিতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। সুরের ঠাটগুলি ইটের মতো হলেই তাদের দ্বিগুণ ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়, দেয়াল কিংবা আস্ত মহলের মতো হলেই তাদের দ্বিগুণ জাতিগত সাধারণতাই প্রকাশ করা যায়।’ এটিটি অল্পভুক্তির ‘জাতিগত সাধারণতা’ নয়, তার ‘ব্যক্তিগত বিশেষত্ব’, ফুটিয়ে তোলবার জন্যে রাগরাগিণীগুলোকে ভেঙ্গে চূরে সুরের টুকরোগুলোকে নব নব সুর-রূপে বিকশিত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—‘আমাদের দেশের গানের ঠাট এক একটা বড়ো বড়ো কালি, তাকেই বলে রাগিণী। আজ সেই কালিগুলোকে ভেঙ্গে চূরে সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছামত কোঠা পড়বার চেষ্টা চলছে।’

কিন্তু এই ভাঙ্গা-পড়ার স্বাধীনতা, নব নব সুর-সৃষ্টির জন্যে সুরের উপাদানগুলিকে ভেঙ্গে চূরে নানা ভাবে সাজিয়ে নেবার স্বাধীনতা বেছাচারিতা নয়। রাগরাগিণীর ঠাটগুলিকে ভেঙ্গে কেলে তাদের টুকরোগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে সুরের নতুন জীবকোষ তৈরী করবার যে চেষ্টাই আমরা করি না কেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘সেই টুকরোগুলি যতই টুকরো হোক তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিসটার একটা ব্যঙ্গনা আছে।’ এই ‘আস্ত জিনিসটার ব্যঙ্গনা’-র অল্পভুক্তিই হোলো সুর-মিশ্রণ তত্ত্বের সার কথা। যিনি টুকরোর মধ্যে আস্ত জিনিসটা দেখতে পান না, তিনি মিশ্রণের অর্থাৎ নতুন সুর-সৃষ্টির অধিকারী নন। রূপের অখণ্ড ও সমগ্র অল্পভুক্তি, সৃষ্টির অল্পভুক্তি ও সূঁনার জ্ঞান—এই তিনটি হচ্ছে নতুন সুর-সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য। কি অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ সুরের মিশ্রণ বটিয়েছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গান ‘আছে হুং, আছে মুতু’ গানটি দেখুন। গানটি আশাবরী, ললিত, রামকেলি ও বিভাসের মিলনের ফল। এমনি সৃষ্টির নিপুণতা যে গানটিতে কোনো একটি রাগকে আলাদা করে ধরবার যো নেই। মনে হচ্ছে, বৃষ্টি একটিকে ধরেছি, দেখি, অমনি সে সরে গেছে। শুধু ‘ধা’ ও ‘শুধু ‘নি’র আশেপাশে আনাগোনা নেই, বিভাস রূপহীন, অখণ্ড কতকগুলি সুর আছে বিভাসের প্রতিনিধি হয়ে। রামকেলি লুকিয়ে ফুটেছে স্বরবিভাসে। ‘কুসুম কোটে’ কথাগুলির সুর ললিতকে প্রকাশ করছে। আর সব ছাপিয়ে আছে আশাবরী। ভীষ্মলজ্জীর সঙ্গে মূলভাসের মিশ্রণে অনেক গান রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেমন, ‘বৃষ্টি বেলা যহে বার’, ‘আমার সকল হৃৎকের প্রদীপ জ্বলে’, ‘নাই বস নাই’, ‘আকাশে আজ কোন চরণের আসা বাওয়া’ প্রভৃতি গানগুলি। সারঙ, মজার ও কানাড়ার মিশ্রণ তিনি বটিয়েছেন, ‘চক্রে আমার তুলা’ গানটিতে। স্বীড় ও সূঁনার ঠাসবুহুনি নেই গানটিতে, আকস্মিক পরিবর্তনের খেলা ধরা দিয়েছে এর স্বরসংগঠন সুরে। ভিলক কামোদ ও দেশ, এই দু’টি রাগের সঙ্গে মজার মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ‘বড়ো বার উড়ে বার পো’ গানটি এই তিন রাগের ত্রিবেদীসঙ্গম। ‘আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ’ গানটির সুরে পঞ্চমের সঙ্গে বাহার এসে মিলেছে। ললিতের আমেজও লেগেছে সুরটিতে। সোহিনীর সঙ্গে পঞ্চমের মিলন হচ্ছে ‘আজি বহিষ্য সুখরিত’ গানটিতে। এরকম মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের আরও একটা কথনো করেন নি। কি অল্পময় এই মিশ্রণ। এরকম অল্পময় উদাহরণ দেওয়া বেলে পান্ডে রবীন্দ্রনাথের সুর-সৃষ্টির :

নাই বস নাই
আমি তোমার সঙ্গে
চক্রে আমার তুলা

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নানা সুরের গান রবীন্দ্রনাথ ভেঙেছেন। শুধু ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের সুরে কেন, পাশ্চাত্য সংগীতের সুরেও গান বেঁধেছেন তিনি। বাখীকি-প্রতিভার ‘কালী কালী বলা যে আজ’, গানটি, আর ‘কুলে কুলে চলে চলে’ ও ‘পুরানো সেই দিনের কথা’ প্রভৃতি গান পাশ্চাত্য গানের সুরের ছাঁচে ঢালাই-করা।

ভারতবর্ষের অল্প প্রদেশগুলির থেকে যে সব সুর আহরণ করে গান বেঁধেছেন রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মহীশূরী-ভঙ্গের সুরে ‘আনন্দলোকে মঙ্গললোকে’, বাজাজী গানের সুরে ‘নীলাঙ্গল ছায়া’ ও শিখ ভঙ্গের সুরে ‘বাজে বাজে রম্য বীণা’ গানগুলি।

হিন্দী গানও অনেক ভেঙেছেন, যেমন দ্বিধাকি মজারের সুরে গীথা ‘কোথা যে উঠাও হোলো’ অপূর্ব গানটি। দ্বিধাকি মজারের রাগভঙ্গতা বৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এই গানটির কয়েক ছাপিয়ে কোমল নি, কোমল ধা, নি, পা, এই স্বরগুলি ব্যবহার করেছেন। তাতে শুদ্ধতা-বিশারদ ওভাসদের মনে বিতৃষ্ণা ছাপিয়েছেন হয়তো, কিন্তু সুরটি অপূর্ব হয়েছে। লক্ষ্মী অঞ্চলের সূঁরি ঢালের গানের সুরে বেঁধেছেন ‘তুমি কিছু দিয়ে যাও’। কাফি সুরের হিন্দীগান ভেঙে ‘এসেছে অজ্ঞতরা বেদনা’ আর ‘ভৈরবী সুরে গীথা

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে **ডোরাকিনের**



কথা, এটা
খুবই স্বাভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোরাকিনের
১৮-৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভাসিকার
জন্ম লিখুন।

ডোরাকিন এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এম্বল্যান্স ইন্ট, কলিকাতা-২

সীরাবাসীরেয় একটি গানের সুরে পিলু আর বারোয়। মিশিয়ে বেঁধেছেন 'কখন দিলে সরাসরে'। টগাও মহাকবিবর প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয় নি। তবে রবীন্দ্রনাথ নিধুবাবুর টগার চেয়ে পরিমিত তাঁদের চিকণ ও স্বল্পমকাজের শৌরীর টগার ধরন বেশী পছন্দ করতেন। টগার সুরে বেঁধেছেন—'বজু বহ বহ সাথে', 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ হোসো', 'কে বসিলে আজি হৃদয়-আসনে', 'এ পরবাসে হবে কে' প্রভৃতি গানগুলি।

দেশবিশেষের বহু গানের সুর চয়ন করে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস যেন আমরা কখনো ভুলে না বাই যে তিনি নকলনবিশ ছিলেন না, অর্থাৎ বা পেলেন তাই হুবহু ধরে দিলেন—এই গোলামি তিনি কখনো করেন নি। যা মিলেছেন তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রাণের সুরের দু-একটি সুর মিলিয়ে তাঁর নিজের অন্তর-প্রবর্তের রঙ মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে সত্য করে গ্রহণ করেছেন। নিজের রঙ ও সুর না মেশালে কোনো কিছুকেই নিজের করে নেওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ দেখুন—বাহার রাগের 'আজি বহিছে বসন্ত পবন সুনন্দ' গানটি। এটি হিন্দী গান ভাঙ্গা। গানটি মূলত বাহার রাগে হলেও রবীন্দ্রনাথ গানটির জায়গার জায়গায় এমন দু-একটি স্বর-বোজনা করেছেন বেগুলি রাগের দিক থেকে বিচার করলে শুধু বাহারে লাগে না। এখন যদি কোনো ওস্তাদ 'আজি বহিছে বসন্ত পবন সুনন্দ' গানটিতে শুধু বাহারের রূপ কোটাবার জন্তে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েন তো তাঁকে বোঝাতে না পারলেও সাধারণ মানুষকে এটা সহজেই বোঝানো যাবে যে গানের সুরকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন গানের কথার ভাবটি ফুটিয়ে তোলবার জন্তে, যাক-রাগিণীর রূপ কোটানোর জন্তে সুরকে তিনি কখনো ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—'যদি মধ্যমের হানে পকম দিলে ভালো তনায় আর তাতে বর্ণনার ভাবের সহায়তা করে তবে অরুচরতা বাঁচুন বাঁ মরুন, আমি পকমকে বাহাল রাখিব রাখিব না কেন ?'

তাই রবীন্দ্রনাথের হিন্দী-ভাঙ্গা গানগুলিতে শুধু রাগরূপ ফুটিয়ে তোলবার অমার্জনীর প্রয়াস থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরগুলির বিশেষত্ব লোপ করে তাদের সাধারণ করে জাতে তোলবার চেষ্টা করলে সুরগুলির অনঙ্গসাধারণতা নষ্ট করা হবে।

'কালী কালী, কখন দিলে পরাসে, কোথা যে উধাও হলো।'

রবীন্দ্রনাথের গানে তান বোঝানো সঘনকমে সেই একই কথা থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দীর্ঘ টানাটানি পছন্দ করতেন না। চিকণ কাজের স্বল্প তান এই ছিলো তাঁর পছন্দ। গানের একটি অংশ হচ্ছে রসাত্মক বাক্য। সেই বাক্যগুলিকে ভেঙ্গে চূরে তাদের অংশ নিয়ে বেশদোয়া ব্যবহার করা যায় না। তাতে রদের ব্যাঘাত ঘটে। তান হচ্ছে সুরের অলংকার। অলংকার পরতে জানা চাই। মাত্রাবোধ না থাকলে অলংকার সৌন্দর্যের হানি করে। বহু লক্ষ্যে তাঁদের ললিত মেহে সেই বিপদের প্রমাণ নিরন্তরই বহন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিতে যে স্বল্প তান ব্যবহার করেছেন, সেট ভাবগুলিতে বিস্তারিত করবার অধিকার কারো মেই। কেন বা প্রচীর সৃষ্টির উপর হাত চালাবার অধিকার আটপোরে

মানুষের নেই। প্রচীর তাঁর সৃষ্টির সমগ্র রূপটি উৎসাহিত করেন, তার থেকেই রস, তার থেকে সৃষ্টি। যিনি গান গান তিনি সাধারণত প্রচীর নন, তাই প্রচীর রসোপলব্ধি তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে আর বাদের শিকা আছে তারা গান গায়। এরা দুই জাতের মানুষ। দৈবাৎ এদের জোড় মেলে...। ফলে পাড়ায় এই যে, কলা-কৌশলের কলা অংশটা থাকে পানকর্তার ভাগে আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খার হিসেবেই চলে, সোনা হিসেবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে থাকে মিশল বাড়তেই থাকে। কেন না ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সব চেয়ে বড় দুর্ভটনা।'

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের গানে, তাঁর গানের সুর-মেহে তাঁদের ফীতি না বোগ করবার অধিকার গায়ককে দেওয়ার অর্থ হবে রবীন্দ্রনাথের গানকে সুরপ্রচীর নয় সুর-কৌশলী গায়কের কৌশল দেখানোর বন্ধ করে তোলা।

যেমন বাংলা কবিতার ছন্দের আড়ষ্টতা দূর করেছেন রবীন্দ্রনাথ পরায়ের রাজস্ব যুগ্ম বর্ণকে দু মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করে শব্দের মধ্যে কাঁকটুকু ধ্বনিত্তে বিস্তারিত করে, তেমনি নানা ছন্দের প্রবর্তন করে গানের সুর-মেহকে সাজিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ভাবের উপর লক্ষ্য রেখে গানের ছন্দ-বৈচিত্র্য সাধন করেছেন, যেমন 'কালসুপারার' 'আর নহে আর নহে' আর 'বসন্ত' গীতি-নাট্যের 'ধীরে ধীরে বণ্ড' গান দুটিতে ছন্দের মন্থরতা সৃষ্টি করেছেন ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে। আবার ছন্দে, ও তালে উল্লাস, পৌরুষ ও উচ্চাঙ্গ ফুটিয়েছেন 'আমরা নুতন যৌবনেরি দূত' 'হৃদয় আমার নাচে যে আজিকে' প্রভৃতি গানে।

আবার যুক্তাকরের উচ্চারণে ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। 'সর্বধর্ষতারে দহে', 'গহন কুসুম কুঞ্জমাবে', 'হিংসার উন্নত পৃথী' প্রভৃতি গান যুক্তাকরের ধ্বনির মিশ্রণে অভিনব রূপ লাভ করেছে।

কথার ধ্বনি-বৈচিত্র্যে ছন্দের বৈচিত্র্য এনেছেন, যেমন, 'বাজো যে বাশরী বাজো' গানটিতে 'মধুকরপদভরকম্পিত চন্দক-অজনে' এই কথাগুলির ধ্বনি-বৈচিত্র্যের দ্বারা ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

কোথাও আবার সুরের ছন্দের বিভিন্ন মাত্রার কথার বিধানে ছন্দ-বৈচিত্র্য এনেছেন যেমন 'ফুলে-ফুলে ঢলে ঢলে' এই তিন মাত্রার ছন্দের গানে মাঝের মাত্রার বিধানে দিয়েছেন। *

কোথাও আবার তালের বিভিন্নতার গানে ছন্দ-বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন 'ভামল ছায়া নাই বা এলে' গানটি ২।৪ মাত্রা তালে, 'কাঁপিয়ে দেহলতা ধর ধর' এটি ৩।৪।৪ এই ত্রয়ী মাত্রা শুষ্কের একাদশী তালে, 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' ৩।২ ৩ মাত্রার রূপকড়া তালে, 'ও দেখা দিয়ে যে চলে গেলো' গানটি ৩।৬ মাত্রার নবতালে ও 'বেতে বেতে একলা' গানটিতে ৩।২ মাত্রার রূপক তালে।

* কথার দ্বিতীয় অক্ষরে বোঁক দেওয়া তালও সৃষ্টি করেছেন, যেমন 'তুমি তো সেই বাবেই চলে' গানটিতে।

একই গানের মানা অংশের বিভিন্ন ভাবগুলিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্তে একই গানে বিভিন্ন তাল ব্যবহার করেছেন, যেমন 'ঐ আসে ঐ আসি' ও 'হে নিরুপমা' গান দুটিতে।

ভারতীয় সংগীতের ধারার অন্তর্নিহিত ভাবটি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের সৃষ্টি শ্রোতহীন বহু জলে নতুন ধ্রুব-সৃষ্টির শ্রোত এনেছেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে কোন দিক থেকে ভারতীয় সংগীতের বিকাশ সম্ভব তারও ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন। কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন কিছু করার নেশা বড়ো সর্বনেশে নেশা। নতুন কিছু করার মত্ততার মতো সৃষ্টির শক্তি ধ্রুব কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘সৃষ্টি-শক্তিতে যখন নৈশ্র যটে তখনই মানুষ ভাল ঠুকে নূতনত্বের আফালন করে। পুরাতনের পায়ে নবীনতার অমৃতবস পরিবেশন করার শক্তি তাদের নেই, তাই তারা শক্তির অপূর্ণতা চড়া গলায় প্রমাণ করার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করে থাকে।’

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘আমি তরুণ বলব তাঁদেরই ধাঁচের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগের অরণ্য বর্ণে সহজেই নবীন, চরণ বাঁটার জন্যে ধাঁচের উষাকে নিউ মার্কেটে ‘ধুন’ ফরমাশ করতে হয় না।’

তাক লাগানোর এই নেশার হাত থেকে আধুনিক সুরকারেরা যেন আপনাদের বাঁচিয়ে রাখেন। তবেই রবীন্দ্র-সংগীত-ধারার সঙ্গে যোগ রেখে তাঁদের সৃজন-প্রয়াসে তাঁরা নবীনের স্পর্শ পাবেন।

আমার কথা (৬৬)

শ্রীমতী গীতা সেন

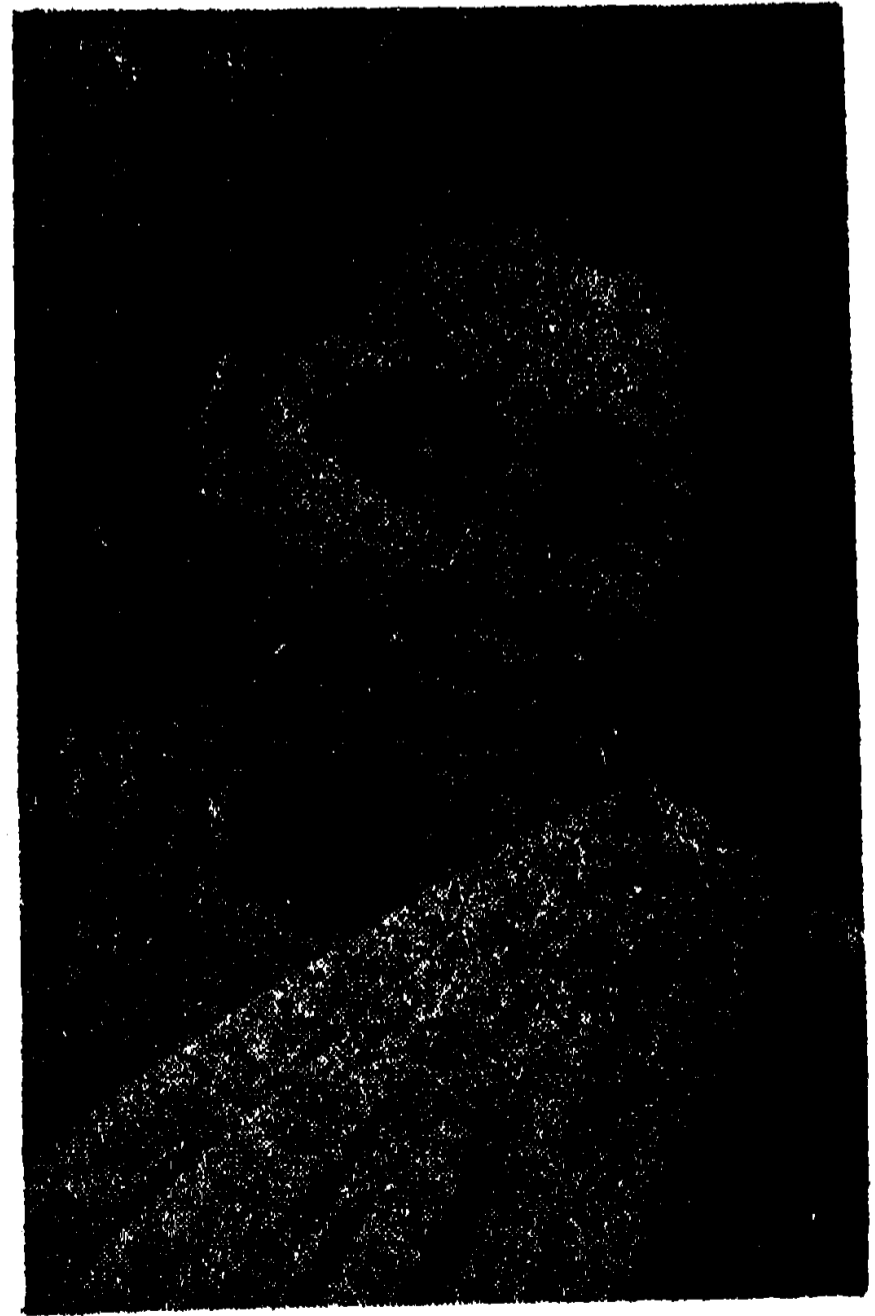
রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে ধারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন—দরদ দিয়া ধারা উহার ভাবধারাকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন—শ্রোতাদের অন্তরে ধারা উহার ব্যঞ্জনাতে হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হয়েছেন আর উহার পরিবেশনায় সুর ও রূপ অবিকৃত রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা ধারা করে চলেছেন—তাঁদের অগ্ৰতমা হলেন সরলমনা, নিরহঙ্কারিণী ও প্রচারবিমুখা শ্রীমতী গীতা সেন। এক বর্ষব্যুৎসব সন্ধ্যায় বসে আমার অহুতোধে তিনি নিজ শিল্পী-জীবন ব্যক্ত করলেন :—

আমি ১১২৪ সালের আগষ্ট মাসে (ভাদ্র) পিতা ঐজিতেন্দ্রমোহন নাহা ও মাতা শ্রীমতী বেণুকা নাহার দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম কন্যা হয়ে কুমিল্লা শহরে জন্মাই। ঠাকুরদাদা ঐরায়বাহাদুর অনঙ্গমোহন নাহা ছিলেন সরকারী উকিল। দাদামহাশয় ত্রিবেণীমোহন বর্দন। মা নিজে গান শিখেছিলেন ছেলেবয়সে কিন্তু বিবাহের পর পারিবারিক রক্ষণশীলতার জন্ত বেনীদুর অগ্রসর হতে পারেননি। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসাহিত্য ভালভাবে তিনি জেনেছিলেন তাই আমার ছয় বৎসর বয়স থেকে মা নিজে এপ্রায় বাজাতেন আর আমার গান শেখাতেন। বাবাও পিয়ানো এবং অর্গ্যান বাজাইয়া আমার নজরুলগীতি ও বিজেন্দ্রলালের গান শেখান। বাড়ীতে কিছুকাল মা’র কাছে পড়িয়া কুমিল্লা ইন্ডিয়ান পাঠশালার ভর্তি হই ও সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাশ করিয়া কুমিল্লা ডিক্টোরিয়া কলেজে আই, এ, পড়ি। মা’র ইচ্ছা ছিল ছেলেবয়সে শান্তিনিকেতনে আসি কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি। দ্বিতীয় মহাসমরের শেষাংশে যখন কুমিল্লা সহরে সৈন্যবাস বৃদ্ধি পেল তখন অর্থাৎ ১১৪৪ সালে আমাকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দেওয়া হল। সেখানে মাসীমা শ্রীমতী ইন্দুলেখা ঘোষ তখন

কলাভবনের শিল্পিকা ছিলেন। তাঁহার প্রচুর প্রভাব পড়েছে আমার শিল্পীজীবনে। শান্তিনিকেতনে এসে গানে বৃদ্ধ হয়ে আমি সঙ্গীতভবনে যোগদান করি ও এক বৎসর পরে পারিবারিক অসুবিধার জন্ত কলিকাতায় বাবা মার কাছে চলে আসি। কিন্তু গান শেখা আমার চলতে থাকে বাড়ীতে নিয়মিত ভাবে। ১১৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমি গীতবিতান-এ ভর্তি হই। তখন শ্রীমতী কনক দেবী ও শ্রীঅনাদি ঘোষ-দত্তিয়ার আমার কণ্ঠধর শুনে ধ্রুব ধনী হন। কয়েক মাস পরে রবীন্দ্র জগোৎসব উপলক্ষে শ্রীদেবপ্রসন্ন বিশ্বাসের সঙ্গে আমি কলিকাতার উম্মুক্ত আসরে প্রথম গান করি।

বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে ভজন গানও শিখি। ক্রমশঃ আমার গলার ভজন গান ভাল হতে লাগল। হারজীবান রাজপরিবারের তনয়া আমতুস সালিম ১১৪৩ সালে কুমিল্লার আহার গলার ভজন শুনে সেবাগ্রামে (ওয়ার্ডা) আসায় ভক্ত অহুতোধ করেন। অসুহ মেহেরালী সাহেব আমার গাণ্ডা ভজন শুনে বলেন Sonorous Voice এবং আমাকে ‘আশ্রম-ভজনাবলী’ পুস্তক নিজ স্বাক্ষর সহ উপহার দেন। আচার্য্য নন্দলাল বসুর বোলপুরের গৃহে আমি প্রায়ই ভজন গাহিতাম। কলিকাতার প্রথমে ডি, এন, মৈত্রের গৃহে আচার্য্য ক্ষিত্তিমোহন সেন মহাশয়ের কথকতার সাথে ভজন গান করি। পরে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার শক্ততার সহিত আমি বহু বার ভজন ও বাউল সঙ্গীত গেয়েছিলাম। কিন্তু কেন জানিনা, কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে আমাকে ‘ভজন সঙ্গীত’ গায়িকারূপে গ্রহণ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন।

সঙ্গীতভবনে আমি শ্রদ্ধের শ্রীশৈলজারজন মজুমদার মহাশয়কে শিক্ষকরূপে পেয়ে যথা হয়েছি আর ‘গীতবিতান’এ কনকবি (শ্রীমতী কনক বিশ্বাস) আমাকে আন্তরিকতার সহিত গান শিখাইয়াছেন। এছাড়া শ্রীঅনাদি ঘোষ-দত্তিয়ারও আমাকে প্রচুর সহায়তা করেছেন। শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিছুদিন



শ্রীমতী গীতা সেন

কান শিখেছি। জীবনের বারও আমার অল্পতম সঙ্গীতশিল্পক
ছিলেন। Traditional বাউল গান আচার্য্য সেন ও
শ্রীমহাশয় সেনের নিকট শিখি।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে
আমি প্রথম গান করি। কয়েক মাসের মধ্যে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী
থেকে আমার প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়—শ্রীমহাশয় সেনের
কথা ও সুর—‘আমার সকল গান তোমারে শুনাতে চাই’ ও ‘মধু
বাগিনীর নিদহারা চাঁদ।’ আর প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড হল
‘আকাশ জুড়ে শুনিছ এ বাজে এ বাজে’ ও ‘তোমার মন বলে চাই
চাই গো’ ১৯৫৩ সালে আমার রেকর্ড হল রবীন্দ্রসঙ্গীতের ‘কম
হে কম’ ‘পথে যেতে ডেকেছিলাম।’ তারপর দীর্ঘ সাত বৎসর
পরে বর্তমান মাসে বেরিয়েছে অতুলপ্রসাদের গান ‘আনন্দে রমক
কুমক বাজে’ ও ‘বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা।’

১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে (১০ই শ্রাবণ ৫৭) শ্রীমহাশয় সেনের
সেনের সহিত আমি পরিচয়পুষ্ট্রে আবদ্ধ হই। বর্তমানে আমি
গীতবিতানে সঙ্গীত শিখাইয়া থাকি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত-শতবার্ষিকী প্রতিপালিত হবে সারা ভারতে ১৯৬১
সালে। উহার উত্তোগ-আয়োজন ইতিপূর্বেই আরম্ভ হয়েছে।
অবিকৃত গায়কী রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনা হবে শতবার্ষিকীর অঙ্গতম
অঙ্গ। এই বিষয়ে প্রচুর সহায়তা করিতে পারেন বেতারকেন্দ্র ও
প্রামোক্তক রেকর্ড কোম্পানীগুলি। বেতারকেন্দ্র হইতে যেমন
শান্তিনিকেতন ‘সঙ্গীত-ভবন’এ শিকাগোও প্রবীণ শিল্পীদের কণ্ঠে
রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনা প্রোতারা আশা করেন, তেমন
উাহাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত রবীন্দ্র-সঙ্গীত রেকর্ডারিত করা
হউক—এই আশাও সমভাবে উাহাদের মনে বায়ে বায়ে
উদ্ভিত হয়।

স্মৃতিরিতাসু

অনিরুদ্ধ কর

প্রোমে পড়া প্রেমিকদেরই সাজে
তোমার আমার মতন বারা লোক
শোভন থাকি কাজের কারকাজে
এস বরং গরু কিছু হক।

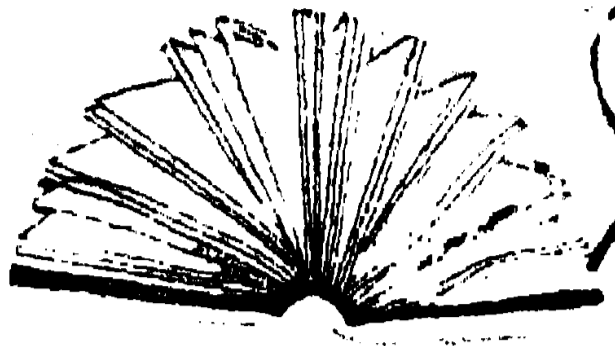
পাতার কাঁকে বোনের বিলম্বিল
সকল সীঁখির মত বসে পথ
কুকুড়া কোটার এপ্রিল
হৃদয়ে চলে এ কার অরুণ ?

তোমার চোখে নিবিড় রক্ত আলো
তোমার লেহে বত নীর প্রোম
রক্তে তার ধনি কে শোভান
অন্ধকারে বিপুল অ্যাগেস।

নিরাপদের রাধি হে ব্যবধান
সাকী থেকে সকল তরলতা
আবেগ যদি হঠাৎ বর উজান
শিখিল তবু করি নি জড়তা।

বেই কথাটা বলব বলে ভাবি
হর না বলা সেই কথাটি আর
নীলবতার হারায় বত দাবী
হৃদয়ে শ্রোত গোপন বেদনার।

প্রোমে পড়া সাজে প্রেমিকদেরই
তোমার আমার মতন লোক বারা
কড়া নিরম প্রোমে পবার বেড়ী
তোমার আমার মতন থাকে তারা।



সাহিত্য পরিষদ

পত্রগুচ্ছ—শ্রীজগদহরলাল নেহরু

আলোচ্য গ্রন্থখানি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজগদহরলাল নেহরু লিখিত বিশ্ববিখ্যাত মনীষিগণের পত্রগুচ্ছের এক শোভন ও সুন্দর সংকলন, এই পত্রাবলীর মধ্যে নেহরুজীর লিখিত কয়েকটি পত্রোত্তরও স্থান পেয়েছে পাঠকের সুবিধার্থে।

শ্রীজগদহরলাল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক, জীবনের অধিকাংশই তিনি অতিবাহিত করেছেন স্বদেশের মুক্তিসাধনার, বর্তমান পত্রগুচ্ছ সংকলনটির মাধ্যমে তারই এক অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করা যায়। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃত্ব মনীষী ও সুধীজন ও অগণিত বাকবের লেখা এই পত্রাবলী ভারতের অসিঃ মুক্তি-সংগ্রামের মূল্যবান ও প্রামাণ্য দলিলরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য, ভারতের এই বরণ্য সন্তানের রাজনৈতিক জীবন ও কর্মধারারও এক ধারাবাহিক ইতিহাস নিহিত রয়েছে এর মধ্যে, যার মূল্য জাতির কাছে কম নয়। রাজনীতিজ্ঞ জগদহরলাল ও মানব জগদহরলাল, এতদুভয়েরই পরিচয় লাভ করি আমরা আলোচ্য গ্রন্থটির মাধ্যমে; বাক্তি জগদহরলাল, কর্মী জগদহরলাল ও নেতা জগদহরলালকে বুঝতে হলে এই সংকলনটি অবশ্য পাঠ্য, এরূপ একটি মনোরম ও প্রয়োজনীয় সংকলন প্রকাশ করার জন্য প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদার্থী। আমরা এই পত্রগুচ্ছ সংকলনটির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শোভন, অক্ষয় আঙ্গিকও ক্রটিহীন। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা—১২ মূল্য—১০/- টাকা মাত্র।

সসেমিরা

সাহিত্যের অঙ্গনে রহস্য কাহিনীর স্থান আজও অনির্দিষ্ট, বস্তুতঃ শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধ হয় প্রথম এই অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত বিষয়বস্তুটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁরই সহায়তায় অপাজ্জের রহস্য কাহিনী পেয়েছিলো একদিন জাত সাহিত্যের সম্মান, হয়ে উঠতে পেয়েছিলো সাহিত্যপঞ্চাঙ্গ। শরদিন্দু বাবু 'বোমকেশ' চরিত্রটি বিখ্যাত বিদেশী রহস্যকাহিনীর অমর চরিত্রগুলির সঙ্গেই তুলনীয়, 'বোমকেশ'র গল্পগুলি প্রথম আন্তঃপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক-চিত্তকে জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো একদিনঃ আলোচ্য গল্পগ্রন্থটিতে যে তিনটি নূতন রহস্যকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে তারও নারক এই বিখ্যাত চরিত্রটি; লেখকের স্বচ্ছন্দ মধুর সাহিত্যরসপূর্ণ ভাষা গল্পগুলিকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে, রহস্যকাহিনী অহরন্ত পঠক বইটি পড়ে আনন্দ পাবেন বলেই আমরা মনে করি। বইটির প্রচ্ছদ ও অক্ষয় অঙ্গসজ্জাও যথায়থ। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এনোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭, মূল্য—৩/- মাত্র।

ঋষেদ

আলোচ্য গ্রন্থটি ঋষেদ প্রথম অষ্টকের পত্নীস্বামী, সংস্কৃত অনভিজ্ঞ সঙ্গীণী পাঠক বইটি পাঠে ঋষেদ সযত্নে একটি স্মৃতি ধারণা করিতে

পারিবেন, শ্লোকশগুলি মনোরম ভাষায় অল্পবানিত হয়েছে, গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে লেখক বেদ সম্পর্কে একটি সহজ সুস্বন্দ্র বিবরণ দিয়েছেন যা বেদানভিজ্ঞ পাঠককে ২সংগ্রহে সহায়তা করবে। বেদ হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থ, ইহার সযত্নে একটু প্রাথমিক জ্ঞান হিন্দু মাত্রেয়ই থাকা উচিত, সেই উদ্দেশ্যে রচিত বর্তমান পুস্তকটি যোগ্য সমাদর পাইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। ঋষেদ—ডক্টর মতিলাল দাস, প্রকাশক—ভারত সংস্কৃতি পরিষৎ আলোক-ভাণ্ডার, প্লট ৪৬৭ নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৩৩ মূল্য—৫/- টাকা মাত্র।

ভারত-তীর্থে

আলোচ্য গ্রন্থখানি ক্ষীণ কলেবর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, শিক্ষাত্রী লেখক মাত্রাজ শিলা সম্মেলনে যোগদান করার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন সুদূর দক্ষিণ ভারতে, প্রত্যাবর্তনের পথে পঞ্জাব প্রদেশে কাটান কয়েকটি দিন; তারই স্মৃতিচারণ এই গ্রন্থটি। সরস কথকের দক্ষ বর্ণনার কাহিনীটি আগাগোড়া উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, গুরুগম্ভীর অধ্যাপকের সাক্ষাৎ কোথাও মেলে না, কোতূহলের দৃষ্টি নিয়ে লেখক ভারত-তীর্থে পদসঞ্চারণ করেছেন, তারই পরিচয়ে যত্ন তাঁর এই রচনাটি পাঠককে এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ দেবে, লেখকের ভাষাও কাব্যশ্রী, আমরা পুস্তকটির সাক্ষ্য কামনা করি। প্রচ্ছদ ক্রটিপূর্ণ, ছাপা ও বাধাই সাধারণ। লেখক—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, প্রকাশক—বিচিত্রা, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২/- মাত্র।

অবাক পৃথিবী

আলোচ্য গ্রন্থখানি খ্যাতনামা সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজকুমার আধুনিকতম রচনা। বর্তমান যুগে সিনেমা বা ছাত্রচিত্রশিল্প একটি প্রধান ভূমিকার অধিকারী, এই চিত্রশিল্প জগতের স্বমিষ্টকার অন্তরালে আজও যে নৈরাশ্রজনক পটভূমি বিস্তৃত রয়েছে তারই আভাস মেলে বর্তমান গ্রন্থটিতে। কয়েকটি মুষ্টিমেয় ক্ষমতামালী পূর্ণিপতির বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল নায়িক গোপা ও তরণ চিত্রশিল্পকর্মীরা, আন্তরিক আগ্রহে গড়ে তুলেছিল তারা পরিচ্ছন্ন একটি ইউনিট, শিল্পনিষ্ঠার ঐকান্তিক আদর্শে অবিচল এই কয়েকটি মানুষ আশা করেছিলো সাক্ষ্যের, স্বপ্ন দেখেছিলো রঙীন ভবিষ্যতের, কিন্তু জোত আ অসত্যের কলুষ স্পর্শে হিরণ্য হলে গেল সব, আদর্শবাদ পরাজয় স্বীকার করল ঐকান্তিক বলদ্বন্দ্ব পাশব শক্তির কাছে; বর্তমান যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যাটাই কুশল লেখক কুটির তুলেছেন আলোচ্য উপভাসখানির মাধ্যমে। সমস্ত কাহিনীটি যেন এক নেতিবাচক স্রবের রাশিণী, লেখকের নৈরাশ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রধান বদৌ সেজ্ঞ তাঁর বক্তব্য কোথাও বিধাকৃষ্ট নয়। লেখক স্বচ্ছন্দ স্বরধরে ভাষা ও তথ্যানিষ্ঠ যুগোপযোগী বিষয়বস্তু এ

রচনাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা সাধারণ। প্রকাশক—চন্দ্রিকা প্রকাশক, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩°৫০ নঃ পঃ মাত্র।

জব চার্ণকের বিবি

বর্তমানে শহর কলিকাতার অতীত অধ্যায় সাহিত্যকারদের উৎসুকা জাগিয়েছে, বেশ কয়েক জন এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে কলম চালিয়েছেন, 'জব চার্ণকের বিবি' নামে সত্তা প্রকাশিত উপন্যাসটিতেও কলিকাতার জনক চার্ণকের জীবন ও কর্মধারার এক বিশদ বিবরণ পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আলোচ্য পুস্তকটির লেখক শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। অতিশয় দক্ষতার সহিত তিনি শহর কলিকাতার নৃচনার কাহিনী বিবৃত করেছেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক সামান্য চাকুরীয়ারূপে ভারতের ঘাটতে পা দিয়েছিলেন একদিন তরুণ চার্ণক। ক্রমে ক্রমে এই বিদেশই কেমন করে তাঁর আপন হয়ে গেল, তিনি ভালবাসলেন এই দেশকে, এই দেশের মেয়েকে, তাঁর জীবনে ঘটলো প্রেমের আবির্ভাব চুপচাপ ভারতীয় নারীকে কেন্দ্র করে; সামান্য গণিকা মতিয়া ভালবেসেছিলো চার্ণককে, সেই প্রেমকে সাদর স্বীকৃতিতে বহু করেছিলেন তিনি পক্ষ থেকে উদ্ধার করে পক্ষজিনীকে স্বচ্ছন্দ সহনয়তার। বর্বর সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন সেদিন এই বীর যুবক অকুতোভয়ে, প্রজ্বলিত চিতার গ্রাস থেকে কেড়ে এনেছিলেন অসামান্য সুন্দরী ব্রাহ্মণ সন্ততিধবাকে। এই রমণীকেই পরে বিবাহ করেছিলেন তিনি, আজীবন বিশ্বস্ত ছিলেন তিনি তাঁর এই বীর্যবতী পত্নীতে। চার্ণকের জীবনে প্রেম ও কর্মপটুতার এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিলো, সেই বিচিত্র জীবনধারার ছবি আঁকতে বসে লেখক কোথাও ইতিহাসকে বিকৃত করেননি আর সেজন্যই তথ্যানিষ্ঠ পাঠকের পক্ষেও রসগ্রহণে কোন বাধা থাকে না। ইতিহাস-রসাম্বিত এই উপন্যাসটি পাঠক-সমাজে সাদরে গৃহীত হবে বলেই আমরা আশা করি। পুস্তকটির অঙ্গসজ্জা অতি সাধারণ। প্রকাশক—অর্চনা পাবলিশার্স, ৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ৫৮ টাকা মাত্র।

রঙে-রেখায়

বর্তমান বাঙলা-সাহিত্যের আসরে রম্যরচনার অত্যন্ত প্রাধান্য, হাঙ্ক। মেজাজের এই রচনাগুলি ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আলোচ্য পুস্তকটিও সেই শ্রেণীভুক্ত, এর রচয়িতা নবাগত হলো বিশ্বকর প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর দিয়েছেন আত্মপ্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, সহজ সরল বৈঠকী ভঙ্গীটি পাঠকমনকে আকৃষ্ট করে তোলে স্বাভাবিক ভাবেই। ইউরোপ ভ্রমণের এক ছবি এঁকেছেন লেখক কালি-কলমে, নানা চরিত্র ভিড় করে এসেছে ঠিক যেন প্রকাণ্ড এক ক্যানভাসে আঁকা হয়েছে নানা রঙ। কয়েকটি ছবি, আপন আপন বৈশিষ্ট্যে তারা উজ্জ্বল, অনন্ত। সন্দেহমাত্রের অবকাশ নেই যে, আলোচ্য গ্রন্থরচয়িতা অক্ষয় হাতে ধরেন না তাঁর লেখনী, শুধু একটি জিনিষ একটু পীড়াবায়ক, তা হল, বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের এক দিকপাল লেখকের রচনাশৈলীর সাথে তাঁর বিশ্বকর সাধু, এমন কি পড়তে পড়তে অনেকবারই সন্দেহ জেগেছে মনে ছন্দনামে উল্লিখিত লেখকেরই কোন নূতন রচনার পরিচয় লাভ করছি কি না;

আশা করি এই ক্রটি সম্পর্কে ভবিষ্যতে লেখক আর একটু সতর্ক হবেন। কারণ অল্পকরণ বতই নিখুঁত হোক না কেন মৌলিকতার গৌরব তার চেয়ে অনেক বড়। আমরা লেখকের সাক্ষ্য কামনা করি। বইটির প্রচ্ছদশির সুবম, ছাপা ও বাধাই ভাল। রঙে-রেখায় ইবনে ইমাম, প্রকাশক—নয়া প্রকাশ, ২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৫ টাকা ৫০ নঃ পঃ মাত্র (ভারত সংস্করণ)।

Autobiography of a Yogi

by PARAMHANSA YOGANANDA

বিজ্ঞানসর্কর যুগে অধ্যাত্মবাদ বা অতীন্দ্রিয় দর্শনের উপর স্বভাবতই সাধুদের অবজার ভাব পরিলক্ষিত হয়, সে ক্ষেত্রে হিন্দু যোগীর আত্মজীবনীর এরূপ সাক্ষ্য লাভ করা সত্যই বিশ্বকর। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধরনের একটি পুস্তকের পক্ষে পাশ্চাত্য দেশে এতখানি জনপ্রিয়তার অভিনন্দিত হওয়া, অবশ্য এটা ঠিক যে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তাঁর জীবনের অধিকাংশ-ই অতিবাহিত করেন পাশ্চাত্য দেশে, গুরু আদেশে তরুণ বোগানন্দ ভারতের অমৃত আত্মার বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন একদিন সাগরপারে আর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল পরে সেই স্থানেই মহাসমাধি ঘটে তাঁর, এই সুদীর্ঘ কালে পাশ্চাত্যবাসী পেয়েছেন তাঁর সান্নিধ্য বহুজন গুরু বলে বরণ করেছেন এই হিন্দু যোগীকে।

হিন্দু যোগীর লিখিত এই গ্রন্থে যোগজীবনের মূলনীতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে অত্যন্ত সরস ও সাবলীল ভাষায়—যাতে যোগবহু সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেও বোধগম্য হয় বিষয়বস্তুর আবেদন, আত্মজীবনীর মাধ্যমে তিনি দার্শনিক অধ্যাত্মবাদী ভারতের মহিমময় রূপটিকেই বিশ্ব মানসের উপলব্ধি গোচর করেছেন। পুস্তকটি পাঠে এই উপলব্ধিই আমাদের পরম লাভ। আমরা আশা করি বিদেশের মত দেশেও এই অপূর্ব গ্রন্থটি পূর্ণ সাক্ষ্য লাভ করবে, বইটির আজিক এককথার ক্রটিহীন, লেখকের ও অজ্ঞাত সাধুপুত্রবংশের সুন্দর আলোকচিত্রগুলি এর অঙ্গতম সম্পদ। প্রাপ্তিস্থান—Yogoda Sat Sanga Society, Dakshineswar, P.O. Ariadah, West Bengal.

ইভুন্সি ইন প্যারিস

আধুনিক সাহিত্যকারদের মধ্যে জনপ্রিয়তার চূর্ণভ অধিকার ধীরে ভোগ করেন সুধীরজন তাঁদেরই অন্ততম। তাঁর এই আধুনিক রচনাটিও পাঠক মনের প্রত্যাশাকে সফল করবে বলেই আমরা আশা করি। আলোচ্য উপন্যাসখানি প্যারিসের নাইট ক্লাবের পটভূমিতে রচিত, নাইট ক্লাবে ভিড় করে প্রমোদ প্রত্যাশী জনতা অধচ সেই আলোকোজ্জ্বল রঙ্গভূমির ঝলমলে ববনিকার অস্তরালে বে কত কালা কত অক্ষ চাপা পড়ে যায় তার হিসাব কে রাখে? নাইটক্লাবের সামান্য এক নর্তকী মিকির জবানীতে লেখক নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন সেই বেদনাকেই।—সুধীরজনের সহজ সুন্দর ভাষা কাহিনীটিকে এক অনন্তসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে, স্বাভাবিক মানবিক আবেদন ছড়ানো রয়েছে রচনার প্রতি ছন্দে, পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম করে যে ছন্দের সত্য্য তারই বন্দনা করেছেন লেখক অকুণ্ঠে। আমরা পুস্তকটির

সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। বইটির অঙ্গসজ্জা কঠিনসঙ্গত। ইতালি ইন প্যাবিস—সুধীরজন মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—শঙ্করকুমার দত্ত, শ্রীলেখা পাবলিশার্স, ১০-এ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫ মূল্য—৩/-

পথ বয়ে যায়

লেখক বলিষ্ঠ হাতে কলম চালান জীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টি ঠাঁড়িয়ে আছে কঠিন মাটিতেই, অবাস্তব কল্পনা বিলাসের কোন চিহ্ন নেই তাঁর রচনার কোথাও, রাঢ় বাজলার একান্ত আপন যে বৈক্যব সংস্কৃতি তারই ছাপ পড়েছে আলোচ্য পুস্তকটিতে, রাঢ় বাজলকে লেখক চিনেছেন ক্রম দ্বিগুণে, মাটির সঙ্গে তাঁর যোগ বাহিরের নয় অন্তরের সেই মাটিরই মাহুঘের আনন্দ বেদনা সুখ দুঃখ কুটিয়ে তুলেছেন তিনি পরম মমতায়; ভবন্বরে সঙ্গীত সাধক নিমাই ৫-স্তোত্রের যে ছবিটি তিনি এঁকেছেন তাতে অভিলুত হয় মন, জীবনদৃশ্য কতবিকৃত নিমাই ওস্তাদ শেষে পেল পরম শান্তি, বৃন্দাবনের পবিত্র পুণ্যভূমিতে রোগগ্রীর্ণ জীবনের বোঝা নামিয়ে মিশে গেল তার প্রাণের দেবতা শ্রীমুকেশ্বরের পায়ে, চরম আত্মসমর্পণে ঘটলো পরম মুক্তি। শিশিরস্নাত গুহ্র যুঁইফুলের স্নিগ্ধ সুবাসই আভ্রাণ করেন বেন পাঠক এই করুণ মধুর কাহিনীটির মাধ্যমে। পুস্তকটির অঙ্গসজ্জা যথাযথ। আমরা আলোচ্য গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। পথ বয়ে যায়—শক্তিপদ রাজগুরু, প্রকাশক—শ্রীতপনকুমার চৌধুরী, চলচ্চিত্রিকা প্রকাশকের পক্ষে। মূল্য—৩/-১৫ নঃ পঃ মাত্র।

মহীয়সী

জ্যোতিষিঙ্গ নন্দী স্বনামধন্য লেখক, দেশ সাপ্তাহিকের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি গল্পেরই নবতম সংগ্রহ আলোচ্য গ্রন্থখানি। তাঁর বিশ্লেষণভঙ্গী বা একান্ত ভাবেই লেখকের নিজস্ব তার পরিচয়ে সমুচ্ছল গল্পগুলি পাঠককে আকৃষ্ট করে সহজেই। মোট ছয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে যার মধ্যে মহীয়সী ও বনের রাজা, এছাড়া বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, শেষোক্ত গল্পটিতে মাহুঘের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন এমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে যা এক কথায় অতুলন, শক্তিমান কথাশিল্পীর প্রধান বা গুণ তা হল পাঠকমনকে রচনার মধ্যে নিমগ্ন করে দেওয়া, এই একান্তবোধের সাধনায় লেখক সফল হয়েছেন, গল্পগুলিও তাই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। গল্পগুলি পড়তে যে ভাল লাগে একথা পাঠক মিশ্রসংগ্রেই বলতে পারেন আর সেটুকুই তো লেখকের সম্পর্কে সবচেয়ে দামী স্বীকৃতি। আমরা আশা করি পাঠক-সমাজ এই গল্পসংগ্রহটিকে সাদরেই গ্রহণ করবেন। বইটির অঙ্গসজ্জা মোটামুটি ভালই। মহীয়সী—জ্যোতিষিঙ্গ নন্দী, প্রকাশক শ্রীশঙ্করকুমার দত্ত, শ্রীলেখা পাবলিশার্স, ১০-এ বকুলবাগান রোড কলিকাতা-২৫ দাম—তিন টাকা মাত্র।

সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা

আধুনিক কালের কবিকুলে ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র একটি স্বরণযোগ্য নাম। শুধু কবি হিসেবেই নয়, প্রাবন্ধিক এবং শিক্ষাবর্তী

হিসেবেও ইনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ। তাঁর বিভিন্ন কবিতা একত্রে সংকলিত হয়ে এই গ্রন্থটির রূপ নিয়েছে। গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতা কবির প্রতিভার পরিচায়ক। রূপ রস বর্ণ গন্ধময় পৃথিবীর বিশেষ রহস্য সন্ধান কবিচিত্ত ব্যাকুল—তাঁর চিন্তার কল্পনায়, নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান মেলে। কবি গভীরতার উপাসক, গভীর থেকে গভীরে তাঁর কবি-মন নিত্য অবগাহন করে চলেছে। গ্রন্থে কবিতাগুলি বলা বাহুল্য যথোপযুক্ত রসোত্তীর্ণ, সাবলীল, স্বন্দর-স্পর্শী। কবিতাগুলির আবেদন অন্তরে যথেষ্ট যথোপাত করে। প্রকাশক—সুধী প্রকাশনী, ১ কলেজ রো। দাম—তিন টাকা মাত্র।

প্রফেসর হৌদারামের ডায়েরি

সরস শিশু-সাহিত্য রচনার লেখক সিদ্ধহস্ত, সত্ত প্রকাশিত তাঁর এই রসরচনাটি বালক-বালিকার চিত্তহরণ করবে। নানাবিধ সমস্তা কণ্টকিত মাহুঘের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আজ হাসতে পারা, আলোচ্য বইটিতে বা শুধু শিশুরা নয় বরঞ্চ ব্যক্তিও উপভোগ করবেন; মোট নয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে যার প্রত্যেকটিই হাস্যর স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাতুহুত্ব দিয়ে নয়। শুধুমাত্র গল্পের পর ক্রিয়াক্রমে একটুখানি বৃষ্টির মতই উপভোগ্য এই ছোট বইখানি এর ছোট ছোট সমঝদারদের ধুন্দী করে তুলবে বলেই আমরা আশা করি। 'প্রফেসর হৌদারামের ডায়েরি'—অজিতকুমার বসু (অ-ক-ব), লেখাপড়া, ১৮বি, জামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—২ টাকা।

ক্রীম

রোমাটিক কল্পনা বিলাস আর আজকের সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য নয়। বর্তমান সাহিত্য ঠাঁড়িয়েছে বাস্তবের কঠিন মাটিতেই। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনের নানান দিকের ছবি আঁকতে বসেছেন আজকের সাহিত্যিক, সাহিত্যের আঙ্গিনায় তাই আমরা দেখতে পাই অপরিচিত মাহুঘের মিছিল—পরিচিত হই তাদের বিচিত্র জীবন যাত্রার বিচিত্রতর রূপের সঙ্গে। আমাদের দেশ তত্ত্ব মন্ত্রের দেশ, ঋশানচরী তাত্ত্বিকের নানা অভিজ্ঞতা, উপলব্ধির কথা শুনিয়েছেন আমাদের অবধূত তাঁর পূর্বতন কাহিনীগুলির মাধ্যমে; আর সেই কাহিনীগুলি এনে দিয়েছে তাঁকে অসীম জনপ্রিয়তা বা সত্যই বিশ্বয়কর; পাঠক পেয়েছেন এক নতুন রসের সন্ধান—তারই অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন লেখক। ক্রীম এই জনপ্রিয় লেখকের নবতম গল্পসংগ্রহ। আলোচ্য সংকলনটিতে মোট চারটি গল্প স্থান পেয়েছে; গল্পগুলি মোটামুটি সুখপাঠ্য, অবধূতের বা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তার থেকে এগুলি বঞ্চিত নয়; স্থানে স্থানে উচ্চাসের আতিশয্য একটু পীড়াদায়ক মনে হলেও, সাবলীল ভঙ্গীতে বলা সহজ গল্পগুলি সহজেই পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা প্রশংসনীয়। ক্রীম,—অবধূত, ত্রিবেদী প্রকাশন, ২ জামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা মাত্র।



শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন-ভাঙ্গিয়া গেল—

কমুনিষ্ট শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ গত ২৭শে জুন (১৯৬০) জেনেভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন পরিত্যাগ করায় আকস্মিক ভাবে উক্ত সম্মেলন ভাঙ্গিয়া গেল। দশ রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আবার কবে আরম্ভ হইবে সে-সম্বন্ধে কোন কথাই বলা সম্ভব নয়। সোভিয়েট প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা মঃ জোরিন সম্মেলন ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের আপামী অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাটি এবং উক্ত পরিষদ ১৯৫৯ সালের ২০শে নবেম্বর যে-প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা রূপায়িত করার ব্যাপারে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা উৎপাদন করিবেন। তিনি অতঃপর ইহাও বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত আলোচনার বিশেষ সমর্থক এবং উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুতই রহিয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, আলোচনার সমাজতান্ত্রিক এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সম সংখ্যক প্রতিনিধির ব্যবস্থা নিরস্ত্রীকরণ সমস্যাটির সাফল্যপূর্ণ সমাধানের পক্ষে অস্বীকৃত বলিয়া এখনও সোভিয়েট ইউনিয়ন মনে করে। সেই সঙ্গে তিনি আলোচনার অস্তিত্ব রাষ্ট্রের যোগদানের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে আলোচনার কল কি হইবে তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। কিন্তু কমুনিষ্ট শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কেন সম্মেলন পরিত্যাগ করিলেন তাহা বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। গত ১৫ই মার্চ (১৯৬০) সর্বদিক দিয়াই একটা অস্বীকৃত অবস্থার মধ্যেই জেনেভায় দশ রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হয়। সম্মুখে ছিল মে মাসে (১৯৬০) প্যারীতে শীর্ষসম্মেলন হওয়ার কর্তব্যচী। চারিদিকেই অবস্থা যখন অস্বীকৃত তখন মার্কিন ইউ—২ গোয়েন্দা বিমানের ঘটনাটি যিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই সমস্ত অস্বীকৃত পরিবেশ আকস্মিকভাবেই ধ্বংস করিয়া ফেলিল। বোধনের পূর্বেই শীর্ষসম্মেলন বানচাল হইয়া গেল। শীর্ষসম্মেলন উপলক্ষে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত ছিল। বিশ্ববাসীর মনে শীর্ষসম্মেলনের ব্যর্থতা নৈরাশ্য আশঙ্কা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি

করে গলেই নাই। তবু শীর্ষসম্মেলনের ব্যর্থতার পরেও গত ৭ই জুন যখন জেনেভায় পুনরায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইল তখন বিশ্ববাসীর মনে আবার আশা জাগ্রত হইয়াছিল। কিন্তু তিন সপ্তাহ আলোচনার পর আকস্মিক ভাবেই এই সম্মেলন ভাঙ্গিয়া গেল।

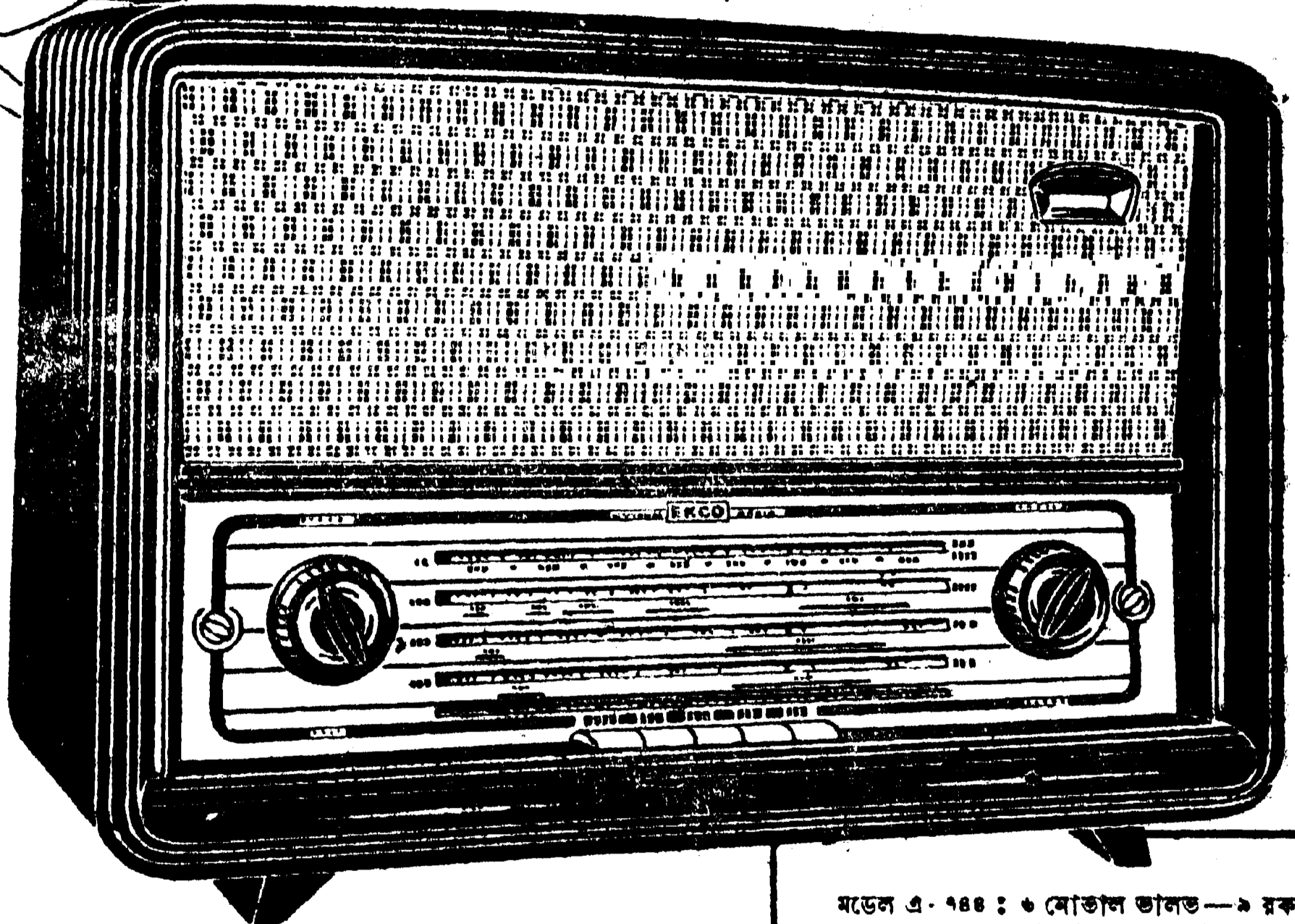
নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দায়িত্ব কাহার, এ সম্পর্কে বিশ্ববাসী সকলেই একমত হইবেন, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। আপাত দৃষ্টিতে হয়ত মনে হইবে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ এং তাঁহাদের সঙ্গে বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, এবং পোল্যান্ডের প্রতিনিধিগণ এক যোগে সম্মেলন হইতে চলিয়া যাওয়ার কমুনিষ্ট শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্রই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্ত দায়ী। কিন্তু যে-সকল ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা সম্মেলন পরিত্যাগ করিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। গত ৩রা জুন (১৯৬০) সোভিয়েট রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একটি সংশোধিত পরিবর্তন ঘোষণা করে। এই পরিবর্তন তিনটি স্তরে বা পর্যায়ে বিভক্ত। এই পরিবর্তন অনুযায়ী চারি মাসের নিরস্ত্রীকরণ কাজ সম্পূর্ণ হইবে। গত ৭ই জুন (১৯৬০) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইলে রাশিয়া আন্তর্জাতিক ভাবে উদ্ভিধিত পরিবর্তন সম্মেলনে পেশ করে। এই সময় সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হইলেও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে আলোচনা ব্যাহত হইবে না, যদিও শীর্ষসম্মেলনের ব্যর্থতা এই সম্মেলনের কাজকে অত্যন্ত কঠিন করিয়াই তুলিয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন প্রস্তাব পশ্চিমী শিবিরে একেবারেই কোন উৎসাহ সৃষ্টি করে নাই, একথা বলা যায় না। ফরাসী প্রতিনিধি-মণ্ডলীর নেতা মঃ জুলে মস (M. Jules Moch) প্রথমে এই প্রস্তাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাহা খুবই উৎসাহ-ব্যঞ্জক ছিল, একথা মনে করিলে ভুল হইবে না। ক্রম পরিবর্তনের প্রথম পর্যায় মেডে বৎসরের মধ্যে পরমাণু অস্ত্র বহনের সব রকম বান নিষিদ্ধ করিতে এবং সেই সঙ্গে বিদেশ হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিতে ও বিদেশে যে সকল সামরিক বাঁটি আছে সেগুলি বিলোপ করিতে হইবে। পরমাণু অস্ত্র বহনের সমস্ত রকম বান নিষিদ্ধ করা হইতেই নিরস্ত্রীকরণের কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত, ইহা ছিল ক্রান্তের অভিমত। সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ক্রান্তের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই প্রস্তাব রচনা করা হইয়াছে।

ক্রম পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ের বিদেশস্থ বাঁটিসমূহ বিলোপের যে প্রস্তাব আছে তাহাই যে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনার অগ্রগতির-কালে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। পরমাণু অস্ত্র বহনের সমস্ত রকম বান নিষিদ্ধ করা এবং বিদেশ হইতে সৈন্য অপসারণের প্রস্তাবও কম প্রবল বাধা সৃষ্টি করে নাই। মঃ জুলে মস পরমাণু অস্ত্র বহনের বান নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে এ সম্পর্কে নিরস্ত্রণ ব্যবস্থার দাবী করেন। বিদেশস্থ সামরিক বাঁটি সমূহ উচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁহার উদ্ভিধিত কথাগুলি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ গোর্ডে বলেন যে, বিদেশস্থ বাঁটিগুলি বিলোপ করিলে সোভিয়েট রাশিয়ারই সুবিধা হইবে। তিনি মনে করেন, সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার কাজে অগ্রসর হইলেই বিদেশস্থ বাঁটিগুলি বিলোপের প্রায় উদ্ভিধিত পারে। মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ ইটন গত ১৫ই জুন নিরস্ত্রীকরণ



অনবদ্য শিল্প-কৌশল...
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য...

ন্যাশনাল একো-র
নতুন মডেল এ-৭৪৪



সঙ্গীত রসিকেরা ন্যাশনাল-একোর চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হ'য়ে পারবেন না। এর অনিন্দ্য গভন, কলাকৌশল ও চক্চকে চেহারা যেমন নরনা-ভিন্নাম, ডেমনি শ্রুতিমধুর ও সুস্পষ্ট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সত্যি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারকে বাজিয়ে শোনাতে বসুন—কোন খরচ নেই।

আমাদের অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো ডিলারের
কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : ৬ মোতাল ভোলভ—৯ রকম কাজ, মনোরম কেবিনেট সমন্বিত ৪-ব্যাণ্ড বুক এপি রেডিও—সারা পৃথিবীর স্টেশন ধরা যায়। পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন; ম্যাজিক আই; গ্রামোফোন ও একস্ট্রা স্পীকারের সঙ্গ বোগা-যোগ ব্যবস্থা; টেপ রেকর্ডারের সঙ্গ বিশেষ বন্দোবস্ত। এক বছরের গ্যারান্টি।

৪১৫৭ নীট

হানীং ট্যাক বস্ত্র



ন্যাশনাল একো রেডিওই সেবা—এগুলি



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যান্টেন্নেস প্রাইভেট লি:



• কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • মাদ্রাস • বাঙ্গালোর • দিল্লী • সেকেন্দরাবাদ

WT. GDA 122

সম্মেলনের অধিবেশনে বলেন যে, বিদেশস্থ বাঁটিগুলি প্রথম পর্যায়ে বিলোপের জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহাতে নিরস্ত্রীকরণের কোন পর্যায়ই কোন পক্ষকেই সামরিক সুবিধা না দেওয়ার নীতি লক্ষিত হইয়াছে। তিনি বলেন মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার নাটো সৈন্যবাহিনীকে যদি ইউরোপ হইতে অপসারণ করা যায় তাহা হইলে ঐ সৈন্যবাহিনী কয়েক হাজার মাইল দূরে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর তীরে অপসারিত হইবে, কিন্তু অধিকাংশ কমিউনিষ্ট সৈন্যই তাহাদের বর্তমান অবস্থান স্থান হইতে মাত্র কয়েক শত মাইল পূর্বদিকে অপসারিত হইবে। রুশ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের আপত্তির কারণ এই সকল উক্তির মধ্যেই প্রকাশিত রহিয়াছে।

গত ১৭ই জুন (১৯৬০) সম্মেলনের অধিবেশন হওয়ার পর মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ইটালীর প্রতিনিধিবর্গ তাহাদের নিজ নিজ সরকারের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ রাজ্যের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। মার্কিং প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ ইটন ওয়াশিংটন হইতে নিরস্ত্রীকরণের নতুন প্রস্তাব লইয়া গত ২৫শে জুন জেনেভায় প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরিবার পথে তিনি লণ্ডন ও প্যারীতে বাইরা উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। পর দিন পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া এই নতুন প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরবর্তী সপ্তাহে কোন একদিন এই প্রস্তাব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উপস্থাপন করার কথা ছিল। হয়ত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উপস্থাপনের পূর্বে এই প্রস্তাব উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার স্থায়ী পরিষদের পরবর্তী প্যারী অধিবেশনেও উপস্থাপিত হইত। কারণ পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যেও এই প্রস্তাব সম্পর্কে একমত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রও উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে এই প্রস্তাবটি উপস্থাপন করার সুযোগ আর হইল না। গত ২৭শে জুন কমিউনিষ্ট শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সম্মেলন পরিত্যাগ করার আকস্মিক ভাবেই সম্মেলন ভাঙ্গিয়া গেল। মিঃ ইটন ওয়াশিংটন হইতে যে প্রস্তাবটি লইয়া আসেন, তাহা তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরটি আবার আটটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের কঠোরতার মধ্যে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাপক জনবিক্ষণসী অস্ত্রশস্ত্র সহ মহাশস্ত্রে ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণ নিবন্ধকরণ। তৃতীয় পর্যায়ে আকস্মিক আক্রমণ নিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব আছে। উহাতে মহাশস্ত্র বান এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের নোটিশ দেওয়ার, আকাশ হইতে এবং স্থলে ইন্স্পেকশানের জন্য অকল গঠন এবং পারস্পরিক সামরিক বাঁটিগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা আছে। চতুর্থ পর্যায় পারস্পরিক সশস্ত্র অনুযায়ী বিমানবাঁটি, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের স্থান, সাব-মেরিন ও বোঁবাঁটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে। পরবর্তী স্তরে পরমাণু অস্ত্র পরিবহন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁটি স্থাপনের জন্য ঐরূপ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখানে নতুন মার্কিং প্রস্তাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার স্থানও আমরা পাইব না। তবে এইটুকু উল্লেখ করা বাইতে পারে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র পূর্বের মতই এই প্রস্তাবেও ইন্স্পেকশানের উপরেই বিশেষ জোর দিয়াছে। অতর্কিত আক্রমণ নিরোধের জন্য এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাশিয়ার

চারিদিকে মার্কিং সামরিক বাঁটি থাকার অতর্কিত আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা যে রাশিয়াই বেশী করে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ১৯৫৫ সালে 'উন্মুক্ত আকাশ' (open skies) প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছিলেন। রাশিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। কিন্তু এই 'উন্মুক্ত আকাশ' পরিকল্পনা দ্বারা তিনি কি ফল পাইবার আশা করেন? অতর্কিত আক্রমণের জন্য রাশিয়ার বিমানবাঁটিগুলিতে বোমারু বিমানগুলি সজ্জিত থাকায় ফটো আকাশ হইতে অবশ্যই গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু ১৯৫৫ সালের বোমারু বিমানের যুগ এখন আর নাই। এখন missile বা ক্ষেপণাস্ত্রের যুগ। ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবস্থাই এমনি-ই যে যে-কোন যুদ্ধে উহা নিষ্কিন্তু হইতে পারে। কাজেই রাশিয়া যদি আকাশ ও স্থল হইতে ইন্স্পেকশনে সক্ষম হইত, তাহা হইলেও ক্ষেপণাস্ত্র নিষ্কিন্তু হইবে কি না তাহা বুঝা বাইবে কিরূপে? রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিবে কি না, কিম্বা কোন সময় নিক্ষেপ করিবে, এ সম্পর্কে রাশিয়ার অভিপ্রায় ইন্স্পেকশনের দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই। রাশিয়ার মনের অভিপ্রায়টি জানিবার উপায় উদ্ভাবিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের অভিপ্রায় তাহার আছে কি না তাহা বুঝিবার বা জানিবার কোন উপায় নাই। বর্তমান যুগে আক্রমণের জন্য সৈন্য সমাবেশ করার প্রয়োজন নাই, বিমানবাঁটিগুলিতে বোমারু বিমান সহ সজ্জিত করিয়া রাখাও নিশ্চয়োজন। ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিতই রহিয়াছে। যে-কোন যুদ্ধে উহা নিষ্কিন্তু হইতে পারে। উহা নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা আছে কি না ইন্স্পেকশান দ্বারা জানিবার উপায় নাই। যে আইনী ভাবে আকাশ হইতে গোপনে ইউ-২ বিমানের সাহায্যে ফটো তুলিয়া কিম্বা আইন সঙ্গত ভাবে 'উন্মুক্ত আকাশ' নীতি অনুসারে ফটো তুলিয়া অতর্কিত আক্রমণ নিরোধ করা ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে অসম্ভব। অতর্কিত আক্রমণ হইলেও বাহাতে সাক্ষ্যের সহিত প্রতিরোধ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করাই অতর্কিত আক্রমণ নিরোধ করিবার একমাত্র উপায়।

ইউ-২ গোরেনকা বিমানের ঘটনা এবং শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড হওয়ার পর নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাওয়া খুবই স্পষ্টপ্রকাশিত ছিল ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ধীরে ধীরে উন্নতি হইতেছিল। মঃ ক্রুশ্চেভের মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণের পর এই সম্পর্কের আরও উন্নতি হয়। কিন্তু মার্কিং ইউ-২ গোরেনকা বিমানের ঘটনার পর এই সম্পর্কের যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহার তুলনা ষ্ট্যালিনের সময়ে রুশ-মার্কিং সম্পর্কের সহিতই করা বাইতে পারে মনে করিলে ভুল হইবে না। এই সম্পর্কের পুনরায় উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আবার আরম্ভ হইবে কি না, হইলেও কোন ফল হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। কমিউনিষ্ট চীনের চাপে রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড করিয়াছে, ভাঙ্গিয়া দিয়াছে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন। এমন কথাও উঠিয়াছে, কমিউনিষ্ট চীন ও রাশিয়ার সাধ্য একটা তাত্ত্বিক বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে, এমন কথাও শোনা যায়। সত্যই তাত্ত্বিক মত বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে কি না তাহা বলা কঠিন এবং সে-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য যে স্থান প্রয়োজন তাহাও এখানে নাই। মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিষ্ট চীনকে জানিয়া লয় নাই। রাশিয়া মার্কিং শিবিরের সহিত সহাবস্থান নীতিকে কার্যকরী করিতে

চেষ্টা করিতেছেন। ইহা লইয়া কমিউনিস্ট চীন ও রাশিয়ার মধ্যে কৌশলগত (tactical) মতভেদ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের সুদূর প্রাচ্যভ্রমণ—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। গত ১২ই জুন (১৯৬০) প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন হইতে সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণের জঙ্গ যাত্রা করেন। এই ভ্রমণের পথে অল্প সময়ের জঙ্গ তিনি আলাস্কায় গিয়াছিলেন। সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি ২৬শে জুন দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার সুদূরপ্রাচ্য ভ্রমণের কথা বলিতে গেলে যেমন তাঁহার ভারত ভ্রমণের কথাই প্রথমে মনে পড়ে, তেমনি তাঁহার জাপান ভ্রমণ বাতিল করা এই ভ্রমণ-সূচীর সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাপান প্রধান মন্ত্রী মিঃ কিশি জাপানে তীব্র বিক্ষোভ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান সফর স্থগিত রাখার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই সফর স্থগিত রাখিলে তিনি পদত্যাগ করিবেন বলিয়াও নাকি মার্কিন সরকারকে জানাইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নিরাপত্তার জঙ্গ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আয়োজনও করা হইয়াছিল। মিঃ হ্যাগার্টির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান ভ্রমণ সম্পর্কে অবিচলিত ছিলেন। গত ১১ই জুন জাপান প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে ইষ্টক নিরুপেছা দ্বারা মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ বধন উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল এবং সেই সময় মিঃ হ্যাগার্টি বধন গোপনে টোকিও ত্যাগ করিয়া আলাস্কায় চলিয়া গেলেন তখনও প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান ভ্রমণের সফর অটুট ছিল। ১৪ই জুন তিনি ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় উপনীত হন। ইহার পরদিন অর্থাৎ ১৫ই জুন ২০ হাজার লোকের এক জনতা জাপান পার্লামেন্ট ভবনের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সময় ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তাহাতে পাঁচ জন ছাত্রের মৃত্যু ঘটে। আহত হয় ৬৫০ জন। এই ঘটনার পর পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে জাপান প্রধান মন্ত্রী মিঃ কিশির টেলিগ্রামের হয়। জাপান মন্ত্রিসভার জরুরী অধিবেশনে জাপান সফর স্থগিত রাখিবার জঙ্গ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে অনুরোধ করিয়া এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাপান সরকারের অনুরোধ গ্রহণ করিয়া প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার জাপান ভ্রমণ বাতিল করেন।

ম্যানিলায় প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বিপুলভাবেই অভ্যর্থিত হইয়াছেন, যদিও জাশনেলিট ইউথ মুভমেন্টের সদস্যরা কিছু সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে প্রেকার্ডগুলিতে লেখা ছিল, “আমরা অর্ধনৈতিক স্বাধীনতা চাই,” “আমেরিকা, আমাদের দাবী মিটাইয়া দাও,” “জাপানকে আমেরিকা অধিকতর পরিমাণে সাহায্য দিতেছে কেন,” ইত্যাদি। ১৫ই জুন ফিলিপাইন কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলেন যে, কমিউনিস্ট নেতৃত্ব গঠনমূলক জাতীয়তাবাদকে শত্রুর দ্বায় ভয় করেন। তিনি কমিউনিস্টকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া আরও বলেন যে, নিজেদের অসং উদ্বেগ সাপ্ননের জঙ্গ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রবেশ করিয়া উহাকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট বক্তৃতা ক্রমাগত চেষ্টার উহাই প্রমাণিত হয়। তিনি

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রশংসা করিয়া বলেন যে, ১৯৪৫ সাল হইতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের অধীনস্থ ৩৩টি দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে চীন-মোজিয়েট আওতার ১২টি দেশের স্বাধীনতা বলপূর্বক হরণ করা হইয়াছে। ১৬ই জুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ফিলিপাইন প্রেসিডেন্ট যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে ফিলিপাইন আমেরিকার নিকট হইতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পাইতে পারে এইরূপ ইঙ্গিত রহিয়াছে। ফিলিপাইন হইতে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ১৮ই জুন ফরমোসায় উপনীত হন। উহার পূর্বদিন এবং ঐদিন সকালে কমিউনিস্ট চীন কুয়ম্বয় দ্বীপের উপর গুলীবর্ষণ করে। ১৮ই জুন তাইপেতে এক বিবৃতি জনসমাবেশে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, “The United States does not recognize the claim of the war like & tyrannical Communist regime in Peiping to speak for all Chinese people. In the United Nations we support the Republic China, a founding member as only rightful representative of China in that organisation.” অর্থাৎ ‘সমগ্র চীন জনগণের হইয়া পেইপিংএ অবস্থিত জঙ্গী মনোবৃত্তি সম্পন্ন, বৈরতন্ত্রী কমিউনিস্ট সরকারের কোন কথা বলিবার দাবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে উহার একজন ‘প্রতিষ্ঠাতা সদস্য চীন প্রজাতন্ত্রকেই উক্ত প্রতিষ্ঠানে চীনের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশে আমরা সমর্থন করি।’ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং চিয়াং কাইশেক যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাইশেকের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ঐ অঞ্চলে লালচীনের ‘চ্যালোঞ্জের জবাব দিবে।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ফরমোসা হইতে ওকিনাওয়া হইয়া দক্ষিণ কোরিয়ায় গমন করেন। ওকিনাওয়ায় তিনি অল্পক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলেন। কইকিউ দ্বীপপুঞ্জ ওকিনাওয়া একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। এই দ্বীপপুঞ্জ এক সময়ে ছিল চীনের অধিকারে। ১৮৭৪ সালে এই দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধিকারে আসে। জাপানের সহিত ১৯৫১ সালে যে শান্তি চুক্তি হয় তাহাতে এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে অর্পিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে ওকিনাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বিমান ঘাঁটি হইতে সর্ব্বের বাইবার পথের দুই ধারে দণ্ডারমান জনতা, “ওকিনাওয়া এখনই জাপানকে ফিরাইয়া দাও,” “হাইডোজেন বোমা লইয়া তাগো” ইত্যাদি ধ্বনি করিতে থাকে। ওকিনাওয়ায় পৌঁছিয়া প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, এই অঞ্চলে যে অবস্থা তাহাতে কইকিউদ্বীপপুঞ্জ ও উহার জনগণের স্বাধীন বিশ্বের জঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবার আছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন। দক্ষিণ কোরিয়ায় ইহা লইয়া তিনি তিনবার গেলেন। দক্ষিণ কোরিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েকমাস পর তিনি প্রথম দক্ষিণ কোরিয়ায় যান। দ্বিতীয়বার যান ১৯৫২ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময়। দক্ষিণ কোরিয়া হইতে তিনি হ্যাংগাই দ্বীপপুঞ্জ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

গত ১৮ই জুন মধ্যরাত্তির পর জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। জাপ সমাজতন্ত্রী নেতারা এই অনুমোদনকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছে। জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি বহাল হইলেও যি:কিংশি চাপে পড়িয়া প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কবে তিনি পদত্যাগ করিবেন তাহা অবশ্য স্থির হয় নাই। জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলিতেছে, সমস্তার কোন সমাধান হয় নাই। এই চুক্তি অনুযায়ী আরও ১১ বৎসর জাপানের বাণিজ্যিক ব্যবহার করিবার অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হইয়াছে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের ফলে উহা কাৰ্য্যকরী করা বড় সহজ হইবে না। এই চুক্তিকে আন্তর্জাতিক কনভেনশনের পরাজয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু মার্কিন বিনান ইউ-২-র ঘটনার পর যে-সকল দেশে মার্কিন বাণিজ্য আছে সেই সকল দেশের জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের মনে এই ধারণা সঞ্চিত হইয়াছে যে, এই সকল বাণিজ্য রাশিয়াতে গোয়েন্দাগিরির জন্য যোগ্য ব্যবহার করা হইতেছে। উহার প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে এই আশঙ্কায় তাহারা ভীত হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। ইহার জন্য কনভেনশনের উদ্বোধনের কোন প্রয়োজন নাই। প্যারীতে শীর্ষ সম্মেলন বন্ধন পশু হইল সেই সময় জাপ পাল্গামেটে জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি প্রবল বিরোধিতার সম্মুখে জ্বরদণ্ডিতে পাশ করাইবার ব্যবস্থা সঙ্গত হয় নাই। প্রথমে স্থির করা হইয়াছিল যে, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার স্বাক্ষর হইয়া টোকিওতে বাইবেন। কিন্তু রাশিয়া ভ্রমণের জন্য তাঁহার আমন্ত্রণ বন্ধন প্রত্যাহত হইল তখনও টোকিওতে যাওয়ার জন্য তাঁহার অভিপ্রায় অবিকলিতই রহিল। যে জাপ-মার্কিন চুক্তির বিরুদ্ধে তাঁর বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে সেই চুক্তি যেদিন অনুমোদিত হওয়ার কথা তাহার পরদিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের টোকিওতে পৌঁছিবার দিন ধাৰ্য হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া এই ক্ষমণ তাঁহাকে বাতিল করিতে হইল। ইহা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে খুবই বিব্রতকর অবস্থা, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

স্বল্পকালে হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্ক ও পাকিস্তানের ভিতর দিয়া আফ্রিকা ও জাপান পর্যন্ত মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক লম্বা রাশিয়ার চারিদিকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। পরমাণু বোমা বন্ধন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া ছিল, তখন এই সকল বাণিজ্য সার্বভৌমত্ব আমেরিকার দিক হইতে হস্ত ছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সাল হইতে রাশিয়াও বন্ধন পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হইল তখন যে-সকল দেশে এই সকল বাণিজ্য অবস্থিত সেই সকল দেশ পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোম্বের আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। এইরূপ আক্রমণের সময়ে এই দেশগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এইজন্য এই সকল দেশ যদি ভারতের মত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির দিকে পুঁকিয়া পড়ে, তাহা হইলে বিন্দিত হওয়ার কিছু থাকে না। রাশিয়া ও চীনের চারিদিকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর লম্বা কনভেনশনের আক্রমণিক বিরোধ করিতে পারিয়াছে কিনা কিংবা পারিবে কিনা, এই প্রশ্ন লইয়া কোন আলোচনা এখানে করিবার স্থান আমরা

পাইব না। কিন্তু যে সকল দেশে মার্কিন সামরিক বাণিজ্য অবস্থিত সেই সকল দেশের জনগণ যদি ভীত হয় এবং বিকৃত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সামরিক বাণিজ্যের কোন সার্বভৌমত্বই থাকে না, সেই দেশের জনগণও গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম কিউবা—

কিউবার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে অর্থনৈতিক বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ক্রমশ:ই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। উহা লইয়া সশস্ত্র লড়াই বাধিয়া উঠিবে কি না, তাহা অনুমান করা সম্ভব না হইলেও কিউবা লইয়া রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গত ১ই জুলাই (১৯৬০) ফ্রেমলিনে অনুষ্ঠিত সারা সোভিয়েট শিকক কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিলে রকেট ব্যবহার করা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রয়োজন হইলে সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী কিউবাকে সাহায্য করিতে পারিবে। তিনি বলেন, “আমাদের দিক হইতে আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা সর্বতোভাবে সহায়তা করিব।” মঃ ক্রুশ্চেভের এই সতর্ক বাণীর জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার গত ১০ই জুলাই নিউ পোর্ট এক বিবৃতিতে বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার আন্তর্জাতিক কনভেনশন নিয়ন্ত্রিত কোন শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হইতে দিবে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কিউবার পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়াও তিনি বলিয়াছেন। কিউবা লইয়া রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর সতর্কবাণী উচ্চারণের তাৎপর্য্য কি তাহাই প্রথমে বিবেচনা করা আবশ্যিক।

কিউবার কান্ট্রো সরকারের সহিত রাশিয়া ও অন্যান্য কনভেনশন রাষ্ট্রের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে একথা স্বীকার করা যায় না। গত ফেব্রুয়ারী মাস কিউবার রাজধানী হাভানায় সোভিয়েট শিল্পের এক প্রদর্শনী হয় এবং ক্রম সহকারী প্রধানমন্ত্রী মঃ মিকোয়ান উহার উদ্বোধন করেন। ঐ সময় কিউবাকে শতকরা আড়াই ভাগ সুদে দশ কোটি ডলার সাহায্য দেওয়ার এবং চারি বৎসরে রাশিয়া কিউবার দশ লক্ষ টন চিনি ক্রয় করিবে, এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। ইহার পর পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার সহিতও কিউবার বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে। ইহার পরে আসিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে অর্থনৈতিক বিরোধ সৃষ্টির ঘটনা। গত জুন মাসে রাশিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে অপরিষ্কৃত তৈল ক্রয়ের এক চুক্তি কিউবা করিয়াছে। উহাই বর্তমান অর্থনৈতিক বিরোধের মূল। কিউবার যে সকল বিদেশী তৈল কোম্পানী আছে তাহারা রাশিয়ার অপরিষ্কৃত তৈল ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিয়াছে। এই সকল কোম্পানী ভেনেজুয়েলা হইতে অপরিষ্কৃত তৈল আমদানী করিয়া থাকে। রাশিয়ার অপরিষ্কৃত তৈল হইতে এই তৈলের দাম অনেক বেশী। কাজেই কিউবার দিক হইতে রাশিয়ার তৈল ক্রয় করা লাভজনক। তা হাড়া উহার জন্য ডলার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু রাশিয়ার তৈল ব্যবহৃত হইলে ভেনেজুয়েলা হইতে তৈলের আমদানী এক তৃতীয়াংশ স্থান পাইবে। বিদেশী কোম্পানীগুলি

তাহার শোধনাপারে রাশিয়ার অপরিষ্কৃত তৈল ব্যবহার করিতে স্বীকার করায়, কিউবার সরকার মার্কিন কোম্পানী টেক্সাকো ও এসো এবং বৃটিশ কোম্পানী শেল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুমকী দিয়াছে তাহারা কিউবার চিনি ক্রয় করিবে না। অন্ততঃ চিনি ক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিবে। কিউবার যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তাহার অর্ধেকই ক্রয় করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন কিউবা অর্ধ নৈতিক বিরোধের পরিণতি কি হইবে তাহা বলা কঠিন। শেল কিউবার আর কারবার করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে। টেক্সাকো কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে। ইহা যেন একটা চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্ম প্রেরণ। এই প্রসঙ্গে ইরানের মোনাকের সরকার কর্তৃক তৈল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার পরিণতির কথা অবশ্যই মনে পড়িবে। মিশর কর্তৃক সুরক্ষাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার ঘটনার কথাও উল্লেখযোগ্য। কিউবার অবস্থা কি ঠাড়াইতে পারে অনুমান করা অসম্ভব সম্ভব নয়। কিউবাতে বিপুল পরিমাণে মার্কিন মূলধন খাটিতেছে। মার্কিন শিল্পবাহিনী প্রতিষ্ঠানের সহিত বিরোধের পরিণামে গুয়াতেমালার কি পরিণতি হইয়াছে তাহা আমরা জানি। বৃটিশ সিগানাকে কমানিষ্ট আখ্যা দিয়া সেখানে জাহাজ বোঝাই সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিউবারও কমানিষ্ট প্রাধান্যের কথা উঠিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত করিতেছে বলিয়া গত ১১ই জুলাই (১৯৬০) কিউবা নিরাপত্তা পরিষদ অভিযোগ করিয়াছে এবং সে-সম্পর্কে আলোচনার জল্প নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জল্প অনুবোধ করিয়াছে। এই অভিযোগ গুয়াতেমালার অভিযোগের পরিণামের কথাই শ্রবণ করাইয়া দিবে।

আলজেরিয়া সমস্যায় অচল অবস্থা—

ফরাসী প্রেসিডেন্ট জর্জ পল গত ১৪ই জুন (১৯৬০) তাঁহার বিবৃতিতে যখন আলজেরিয়ার বিদ্রোহীদের সম্পর্কে নূতন প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং তাঁহার এই প্রস্তাব অনুযায়ী টিউনিশিয়ায় আলজেরিয়ার বিদ্রোহী গবর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করিবার প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে দুইজন প্রতিনিধিকে ফ্রান্সে প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন সত্যই একটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, আলজেরিয়ার বিপুল রক্তক্ষয়কারী সংগ্রামের অবসান বোধহয় আসন্ন। কিন্তু সে আশা ফলবতী হয় নাই। ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্ট জর্জ পলের আলাপ-আলোচনার সর্ব্ব ছিল আগে বিদ্রোহীদেরকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। গত ১৪ই জুনের বিবৃতিতে এইরূপ কোন সর্ব্ব আরোপ করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই আলোচনার ফরাসী সরকার অন্ততঃ পরোক্ষে টিউনিশিয়ায় আলজেরিয়া সরকারকে স্বীকার করিয়াছেন। আলজেরিয়ায় ফরাসী উপনিবেশিকদিগকে আয়ত্তে আনিবার পর এইরূপ প্রস্তাব করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম নেহরু যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন সেই সময় গত ৮ই মে (১৯৬০) প্রেসিডেন্ট জর্জ পল এই সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ।

অনেকে মনে করেন, চীন সরকার আলজেরিয়ার বিদ্রোহী সরকারকে স্বীকার করায় এবং এই সরকারকে চীনের সাহায্যদান বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেসিডেন্ট জর্জ পল আর বিলম্ব না করিয়া প্রেরণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। একটি অসমর্থিত সংবাদ প্রকাশ বিদ্রোহী সরকারের তিনজন মন্ত্রী সম্প্রতি চীনে গিয়াছিলেন। তাঁহারা চীন হইতে যক্ষ্মা হইয়া টিউনিসি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। চীন সরকার নাকি বিদ্রোহী-দিগকে আত্মসমর্পণ না করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং আরও সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছে।

আলজেরিয়ার বিদ্রোহী সরকারের পক্ষ হইতে যে দুইজন প্রতিনিধি ফ্রান্সে গিয়াছিলেন তাঁহারা নিরাপ হইয়া কিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ফরাসী সরকার কোনরকম আলোচনার সম্মত হয় নাই। যুদ্ধবিধি সম্পর্কে নির্দেশ জারি করিবার জন্মই শুধু তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে। বিদ্রোহী সরকারের পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বলা হইয়াছিল যে, বর্তমান অবস্থায় প্যারিসে আর প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। বিদ্রোহী সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিয়দাত আকাস তাঁহার পক্ষে প্রতিনিধি না পাঠাইয়া যদি নিজে যাইতেন তাহা হইলে প্রেসিডেন্ট জর্জ পলের সহিত তাঁহার আলোচনা হইত এবং মীমাংসার পথ খুঁজিয়া পাওয়া বাইত, এইরূপ মনে হওয়াও অসম্ভাবিক নয়। কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪৬ সালে হো চি মিন নিজে ফ্রান্সে গিয়াছিলেন এবং কয়েকমাসে তাঁহার সহিত ফরাসী সরকারের আলোচনাও হইয়াছিল। কিন্তু সে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হয়। ইহার পরেই ইন্দোচীনে আরম্ভ হয় দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সাগ্রাম।

রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রপতি—

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গত ২০শে জুন (১৯৬০) রাশিয়া ভ্রমণের জন্ত বিমানযোগে যাত্রা করেন এবং রাশিয়া পরিদর্শনের পর গত ৫ই জুলাই নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন, এ কথা এই উপলক্ষে স্বতঃই মনে পড়িবে। মঃ ভরোশিলভ-ই তাঁহাকে রাশিয়া পরিদর্শনের জন্ত আমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। মঃ ক্রুশ্চেভও পুনরায় আমন্ত্রণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র পরিদর্শনের জন্মও তিনি আমন্ত্রণ পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথমেই রাশিয়ায় গেলেন কেন, এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে। রাশিয়ার নিকট হইতে ভারত ৩১৩ কোটি টাকা সাহায্য পাইয়াছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে পাইয়াছে ১৬৬৬ কোটি টাকা সাহায্য। খাদ্যশস্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচীর জন্ম ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছে। কিন্তু রাশিয়ার সাহায্য ভারতে ভারী শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। এই জন্ম ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথমে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন, একথা ঠিক নয়। ইউ-২ বিমান সংক্রান্ত ঘটনা এবং শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড হওয়ার বহু পূর্বেই তাঁহার রাশিয়া ভ্রমণের কর্মসূচী স্থির হইয়াছিল।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের রাশিয়া ভ্রমণটা শুধু শিষ্টাচার স্বাক্ষর জন্ম

তাহা বলা যায় না। ইহার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। তিনি যামপহী অর্থনীতিতে বিশ্বাসী নহেন। কিন্তু রাশিয়ার সীমান্ত ভারতের সীমান্তে আসিয়া মিশিয়াছে। চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা বর্তমানে মধুর একথা বলা যায় না। কিন্তু রাশিয়ার সহিত মৈত্রীরক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাও ভারত উপেক্ষা করিতে পারে না। শীর্ষ সংশ্লিষ্ট পণ্ড হওয়ার পর মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি ক্ষেত্রে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে ভারত তাহাতেও সুরী হইতে পারে নাই। ভারত কি রাশিয়ার কি আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির উপর প্রভাব বিস্তারের দুঃশা রাখে না। কিন্তু ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের রাশিয়া ভ্রমণ যদি আন্তর্জাতিক দুর্যোগকে প্রশমিত করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতের পররাষ্ট্র নীতিরই জয় সূচিত হইবে।

আফ্রিকায় স্বাধীনতার অগ্রগতি—

১১শে জুন হইতে ১লা জুলাইয়ের মধ্যে আফ্রিকার আরও চারিটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল। করাসী উপনিবেশ সেনেগল এবং করাসী স্বধান ১১শে জুন মধ্যরাত্রি হইতে করাসী কমিউনিটির মধ্যে আত্মশাসনিক ভাবে স্বাধীনতা লাভ করে। এই দুইটি দেশ সশস্ত্রিত হইয়া মালিয়ুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। করাসী কমিউনিটির মধ্যে মালিয়ুক্তরাষ্ট্রই প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র। ইতিপূর্বে পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা, গিনি, ক্যামেরুন এবং টোগোল্যান্ড স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বৃটিশ সোমালিল্যান্ড গত ২৫শে জুন বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। গত ২৬শে জুন মাদাগাস্কার দ্বীপ মালাগাসি নাম গ্রহণ করিয়া করাসী কমিউনিটির মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বেলজিয়াম শাসিত কঙ্গো রাজ্য ৩০শে জুন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১লা জুলাই ইটালিয়ান সোমালিল্যান্ড স্বাধীনতা লাভ করিল। বৃটিশ সোমালিল্যান্ড এবং ইটালিয়ান সোমালিল্যান্ড একাবদ্ধ হইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু করাসী সোমালিল্যান্ড করাসী কমিউনিটির মধ্যেই থাকিবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে নাইজেরিয়া আগামী অক্টোবর মাসে স্বাধীনতা লাভ করিবে।

কিছুদিন পূর্বে বেলজিয়াম কঙ্গোর প্রধান সহর লিম্বোপোল্ডভিল অস্তিত্ব সহরে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছিল। উহার মধ্যে প্রকাশিত হয় কঙ্গোর অধিবাসীদের স্বাধীনতার জ্ঞাত তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কঙ্গোনিজ জাতনাল মুক্তমেটের নেতা মিঃ প্যাট্রিস লুমুম্বা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং আকালো দলের নেতা কাসাতুবু নির্বাচিত হইয়াছেন রাষ্ট্রপতি। নূতন কঙ্গো প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা লাভের দশ দিন পরেই উহার আফ্রিকাবাসী সৈন্যগণ বিদ্রোহ করিয়া বেলজিয়াম অধিবাসীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। উহার পরিণতি কি ভাবে হইবে তাহা এই মন্তব্য লেখার সময় পর্য্যন্ত বুঝা বাইতেহে না।

চীন-নেপাল সীমান্তে

সম্প্রতি চীন-নেপাল সীমান্তে বাহা ঘটিয়াছে তাহাতে গত অক্টোবর মাসে ভারত-চীন সীমান্তের লাডাক অঞ্চলের ঘটনাই স্মরণ

করাইয়া দিবে। চীন-নেপাল সীমান্তের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ যে, সীমান্ত হইতে কিছু দূরে মুস্তাংয়ের বিপরীত দিকে চীনারা বাঁটি নির্মাণ করিতেছে সংবাদ পাইয়া একটি নেপালী পর্য্যবেক্ষক দল ঐ দিকে অগ্রসর হয়। তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া চীনা সৈন্যরা সীমান্তের মুস্তাং নামক স্থানে প্রবেশ করিয়া উক্ত পর্য্যবেক্ষক দলের উপর গুলী চালায়। উক্ত ঘটনার একজন সুরবেদার নিহত এবং ১৭ জন নেপালী চীনা সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়। এই ঘটনার একদিন পূর্বে চীনা সরকার নেপাল সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে, চীনা সৈন্যরা তিব্বতী বিদ্রোহীদের দমনের জন্ত নেপাল তিব্বত সীমান্তের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে ঢুকিয়াছে। বিদ্রোহীরা দমিত হইলেই তাহারা চলিয়া যাইবে, কিন্তু নেপালের সীমানার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে না। নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৈরলা উল্লিখিত মুস্তাংয়ের ঘটনা সম্পর্কে চীন সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানান। চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই উহার উত্তর দিতে বিলম্ব করেন নাই। উত্তরে তিনি জানান এই ঘটনার সংবাদে তিনি অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন ও মর্মান্বিত হইয়াছেন। উক্ত সংবাদ সত্য হইলে চীন সরকার গভীর দুঃখ প্রকাশ করিবেন এবং নেপালীরা বন্দী হইলে তাহাদিগকে কিরাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়াও তিনি জানান।

অতঃপর চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই নেপালের প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে পত্র দেন তাহা তিনি ৩রা জুলাই প্রাপ্ত হন। ঐ পত্রে তিনি মুস্তাং অঞ্চলের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়া উহার জ্ঞাত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছেন। উক্ত পত্রে তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, কয়েকজন নিম্নপদস্থ চীনা সৈন্য উক্ত ঘটনার জ্ঞাত দাতী। তাহারা নেপালী পর্য্যবেক্ষক দলকে তিব্বতী বিদ্রোহী বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, এই ঘটনার পর চীনা সৈন্যদিগকে ১০ কিলোমিটার পিছনে সরাইয়া আনা হইবে। নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ, ধৃত নেপালীদিগকে এবং ঘোড়াগুলি কিরাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়াও তিনি জানাইয়াছেন। নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৈরলা ৪ঠা জুলাই তারিখে বলিয়াছেন যে, চীনের প্রধান মন্ত্রী যেভাবে নেপালের সকল দাবী মানিয়া লইয়াছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা সম্ভাবজনক। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে যে মতভেদ রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নেপাল সরকার বলেন ধৃত নেপালীর সংখ্যা ১৭ জন। কিন্তু চীন সরকার ১০ জনের কথা স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মিঃ চৌ-এন-লাই বলেন, ঘটনার স্থানটি চীনের সীমানার অন্তর্গত। নেপাল সরকারের মতে ঐ স্থান নেপালের অন্তর্গত। নেপাল সরকার বলিতেছেন, নেপালী পর্য্যবেক্ষকরা নিরস্ত ছিল। কিন্তু চীন সরকার এ সম্পর্কে নীরব। চীন সরকার অবশ্য কতিপয় দিতে চাহিয়াছেন এবং নিহত ব্যক্তির জ্ঞাত সমবেদনাই জানাইয়াছেন। মিঃ চৌ-এন-লাই এই আপাত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার চীন ও নেপালের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন ক্ষুণ্ণ হইবে না।

—১৪ই জুলাই, ১৯৬০।

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন]



ইংলিশ চ্যানেল সম্ভরণ প্রতিযোগিতা বাতিল

ইংলিশ চ্যানেল সম্ভরণ প্রতিযোগিতার আকর্ষণ ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবারকার প্রতিযোগিতার কয়েকজন প্রতিযোগী যোগদানের অল্প লগুনে হার্কির হয়েছেন। ১৫ই আগস্ট এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। সম্প্রতি বিলি বাটলিনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে এবারকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে না। এইরূপ ঘোষণার ভাগ্য তথা বিশ্বের সঁাতাক যে বিশেষ নিরুৎসাহ হবেন তা বলাই বাহুল্য।

১৯৫৩ সাল থেকে বিলি বাটলিনের উদ্যোগে প্রতি বছর ইংলিশ চ্যানেল সম্ভরণ প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে হয়ে আসছে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। বিলি বাটলিন এবারকার প্রতিযোগিতা বাতিল করা সম্পর্কে বলেছেন যে তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বর্ধচরীরা আরও নানা কাজে ব্যস্ত থাকবেন বলে তাঁকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।

পূর্বে স্থির ছিল যে এবারকার প্রতিযোগিতায় যোগদানের অল্প ঝাঁক আবেদন করেছেন—তাঁদের নাম চূড়ান্ত ভাবে শীঘ্রই অনুমোদন করা হবে। কিন্তু নাম অনুমোদনের দিনই প্রতিযোগিতা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় প্রতিযোগীদের মধ্যে গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এবারকার প্রতিযোগীদের মধ্যে অনেকেই এরই মধ্যে ফোকস্টোন ও ডোভারে এসে অনুশীলন আরম্ভ করেছেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে এই প্রতিযোগিতা বাতিল হওয়া সত্যই দুঃখের বিষয়। বহু অর্থ ব্যয় করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে যে সকল সঁাতাকরা লগুনে উপস্থিত হয়েছেন—বিলি বাটলিন কি তাঁদের ক্ষতিপূরণ করবেন? বিফল হয়ে কয়েকজন সঁাতাক নিজের চেষ্টায় চ্যানেল অতিক্রম করবেন বলে ঠিক করেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সকল হউক—এটাই সকলে আশা করেন।

অলিম্পিক প্রতিদ্বন্দ্বিসংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব

সম্প্রতি দিল্লীতে নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের এক সভা হয়ে গেছে। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে অলিম্পিক ক্রীড়াস্থলানে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের সংখ্যা হ্রাস করে ভারত সরকারকে সুপারিশ করা হবে।

ক্রীড়া পরিষদের মতে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার যোগদানে অথবা বিদেশ সফরে ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের উৎসাহ বৃদ্ধি করবে এবং ইহা ক্রীড়া মনোহরতার অল্পতম উপায় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনেক সদস্য

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের যোগ্যতার যে ন্যূনতম মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন—সেই মানে ঝাঁক পৌঁছিতে অসমর্থ হয়েছেন—তাঁদের বহু অর্থ ব্যয় করে রোমে পাঠানো সমীচীন হবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন মেসবোর্ধ অলিম্পিকের বর্ধ স্থানাধিকারীর ক্রীড়ামানের উপর জিভিত্ত করে রোম অলিম্পিকের ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের মান নির্দিষ্ট করে। ক্রীড়া পরিষদ মনে করে মেসবোর্ধের বর্ধ স্থানাধিকারীরা রোম অলিম্পিকে দশম স্থানের উর্দ্ধ উঠতে পারবেন না। কারণ বিগত চার বছরে এথলেটিক ও অস্তিত্ব ক্রীড়ার আন্তর্জাতিক মান অনেক উর্দ্ধে উঠেছে। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের অসুবিধাও এই বিষয়ে আছে। নির্দিষ্ট মানে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের রোমে পাঠাইয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করান যুক্তিসঙ্গত নয়। ইহাতে ভারতীয় ক্রীড়ারও বিশেষ লাভ হবে না।

ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশ কার্যকরী হলে ভারতীয় অলিম্পিক দলে পূর্বে নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বিদের কেহ কেহ শেষ পর্যন্ত বাদ পড়বেন। এই অবস্থার মহিলা এথলীটদের, সঁাতাকদের, রাইফেল স্টার ও ভারোস্টোলকদের অলিম্পিক দল থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা আছে। মুষ্টিযোদ্ধা, মল্লবীর ও জিমনাস্টদেরও বাওয়ার ব্যাপারে বিষয় ঘটতে পারে।

ভারত সরকার অলিম্পিক দলের অল্প দেড় লক্ষ টাকার অধিক বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করতে সম্মত নন। সেইজন্য ভারতীয় দলের কর্মকর্তার সংখ্যাও কমাতে হবে। ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :—

এথলেটিকস—১৩ জন এথলীট (পুরুষ), একজন ম্যানেজার ও একজন শিক্ষক।

হকি—১৮ জন খেলোয়াড়। একজন ম্যানেজার ও একজন শিক্ষক।

ফুটবল—১৮ জন খেলোয়াড়, একজন ম্যানেজার ও একজন শিক্ষক।

মল্লযুদ্ধ—৫ জন মল্লযোদ্ধা। একজন ম্যানেজার ও একজন শিক্ষক।

রাইফেল স্টারিং—২ জন প্রতিযোগী ও একজন ম্যানেজার। একজন চীফ-ডি-মিশন, একজন প্রথম শ্রেণীর হকি আন্দোলকার, ২ জন ম্যাসাজিষ্ট ও ২ জন পাচক।

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের নিশ্চয়ই নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশ মনঃপূত হবে না এবং তাঁরা প্রতিবাদও করবেন। তবে ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশকে ক্রীড়ামোদীরা বাগত

অলিম্পিক রাইফেল স্মৃতি-এর বিচারক পদে

প্রথম ভারতীয়

দক্ষিণ কলিকাতা রাইফেল ক্লাবের অস্ত্র পরিচালক শ্রীপতিতাব নাথুদী আন্তর্জাতিক স্মৃতি ইউনিয়ন বর্ধক রোয় অলিম্পিকে রাইফেল স্মৃতি-এর বিচারকরূপে কাজ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি এই সম্মান লাভ করেছেন। রোয় অলিম্পিকে পোল্যান্ডের মিঃ লুকানিকের সহিত পঞ্চাশ মিটার রাইফেল স্মৃতি প্রতিযোগিতা বিচারের ভার পড়েছে শ্রীনাথুদীর ওপর। একই জোড়াবিদদের মধ্যে একমাত্র তিনিই অলিম্পিক স্মৃতি প্রতিযোগিতা উপলক্ষে যেখানে পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। শ্রীনাথুদী এই সম্মানে ভারতবাসী মাঝেই গর্ব অনুভব করবেন।

ইংলণ্ডের "রাবার" লাভ

ইংলণ্ড ক্রিকেট দল তৃতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে "রাবার" লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম ইনিংসে শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্যয় দেখা যায়। তবে "কলো-অন" করে তারা দ্বিতীয় ইনিংসে দৃঢ়তা পূর্ণ ব্যাটিং করে। যার ফলে ইংলণ্ড দলের পক্ষে ইনিংসে জয়লাভ সম্ভবপর হয়নি।

রাগসংখ্যা :—ইংলণ্ড ১ম ইনিংস ২৮৭ (কাউন্ডে ৬৭, ব্যাটসম্যান ৮০ ; বার্ডডা ৮০ রাণে ৫ উইঃ ও টেক্স ৫৮ রাণে ৩ উইঃ)।

দক্ষিণ আফ্রিকা—১ম ইনিংস ৮৮ (শিখ ৩১ ; টম্যান ২৭ রাণে ৫ উইঃ ও ষ্টেথাম ২৭ রাণে ৩ উইঃ)।

দক্ষিণ আফ্রিকা—২য় ইনিংস ২৪৭ (ম্যাকগ্র ৪৫, এস, জে, ওলিন ১৮ ; মস ৩৬ রাণে ৩ উইঃ ও টম্যান ৭৭ রাণে ৪ উইঃ)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস ২ উইঃ ৪৭

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি হয়েছে। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে নীল ফ্রেজার তাঁর দেশীয় খেলোয়াড় রড লেভারকে পরাজিত করেন। ভারতের এক নব্বয় খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণাণ নীল ফ্রেজারের নিকট পরাজিত হয়েছেন। জেজিলের মারিয়া বুয়েনো মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলসে জয়লাভ করে ত্রিমুকুট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। অল্পের জন্য তিনি ত্রিমুকুট লাভের সোভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। ভারতের তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জী বালকদের সিঙ্গলস ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাগেলস্ট্যামের নিকট

পরাজয় বরণ করেন। নিম্নে সকল বিভাগের ফাইনালের ফলাফল দেওয়া হলো :—

পুরুষদের সিঙ্গলস—নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৩-৬, ২-৭ ও ২-৫ সেটে রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস—মারিয়া বুয়েনো (জের্সি) ৮-৬ ও ৬-৭ সেটে মিস বেনডসকে (দক্ষিণ আফ্রিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস—আর এইচ ওয়ানা (যেকসিকো) ও আর ডি. ব্যালস্টন (যুক্তরাষ্ট্র) ৭-৫, ৬-৬ ও ১০-৪ সেটে ডেভিস ও আর কে উইলসনকে (সুইটেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস—মারিয়া বুয়েনো (জের্সি) ও মিস ডি. আর হার্ড (যুক্তরাষ্ট্র) ৬-৪ ও ৬-০ সেটে মিস এস বেনডস ও মিস আর জয়ানকে (দক্ষিণ আফ্রিকা) পরাজিত করেন।

মিশ্র ডাবলস—রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ও ডার্লিন হার্ড (যুক্তরাষ্ট্র) ও ১৩-১১, ৩-৬ ও ৮-৬ সেটে মারিয়া বুয়েনো (জের্সি) ও রব হোকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস—এ, আর ম্যাগেলস্ট্যাম (দক্ষিণ আফ্রিকা) ১-৬, ৮-৬ ও ৬-৪ সেটে জয়দীপ মুখার্জীকে (ভারত) পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিঙ্গলস—কে, হার্টজ (যুক্তরাষ্ট্র) ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে এল, এম, হার্টজকে (দক্ষিণ আফ্রিকা) পরাজিত করেন।

আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্পোর্টস ফেডারেশনের পরিচালনার আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৪ই আগস্ট থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে।

ফেডারেশনের পরিচালকমণ্ডলী প্রতিটি জেলার তরুণ উদীয়মান ফুটবল খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেওয়ার এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে বাঁকুড়াতে খ্যাতনামা প্রবীণ খেলোয়াড় শ্রী এস, মিত্রের (লাংচা) তত্ত্বাবধানে এই শিক্ষণকার্য চলছে। ২৫শে জুলাই বাঁকুড়ার শিক্ষা-শিবির শেষ হবে। নিম্নে শিক্ষা-শিবিরের চূড়ান্ত তালিকা দেওয়া হলো :—

বহরমপুর—২৬শে জুলাই থেকে ১ই আগস্ট।

বর্ধমান—১০ই আগস্ট থেকে ২৪শে আগস্ট।

চন্দননগর—২৫শে আগস্ট থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর।

সিউড়া—১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর।

জলপাইগুড়ি—১লা অক্টোবর থেকে ১৫ই অক্টোবর।

মালদহ—১৭ই অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবর।

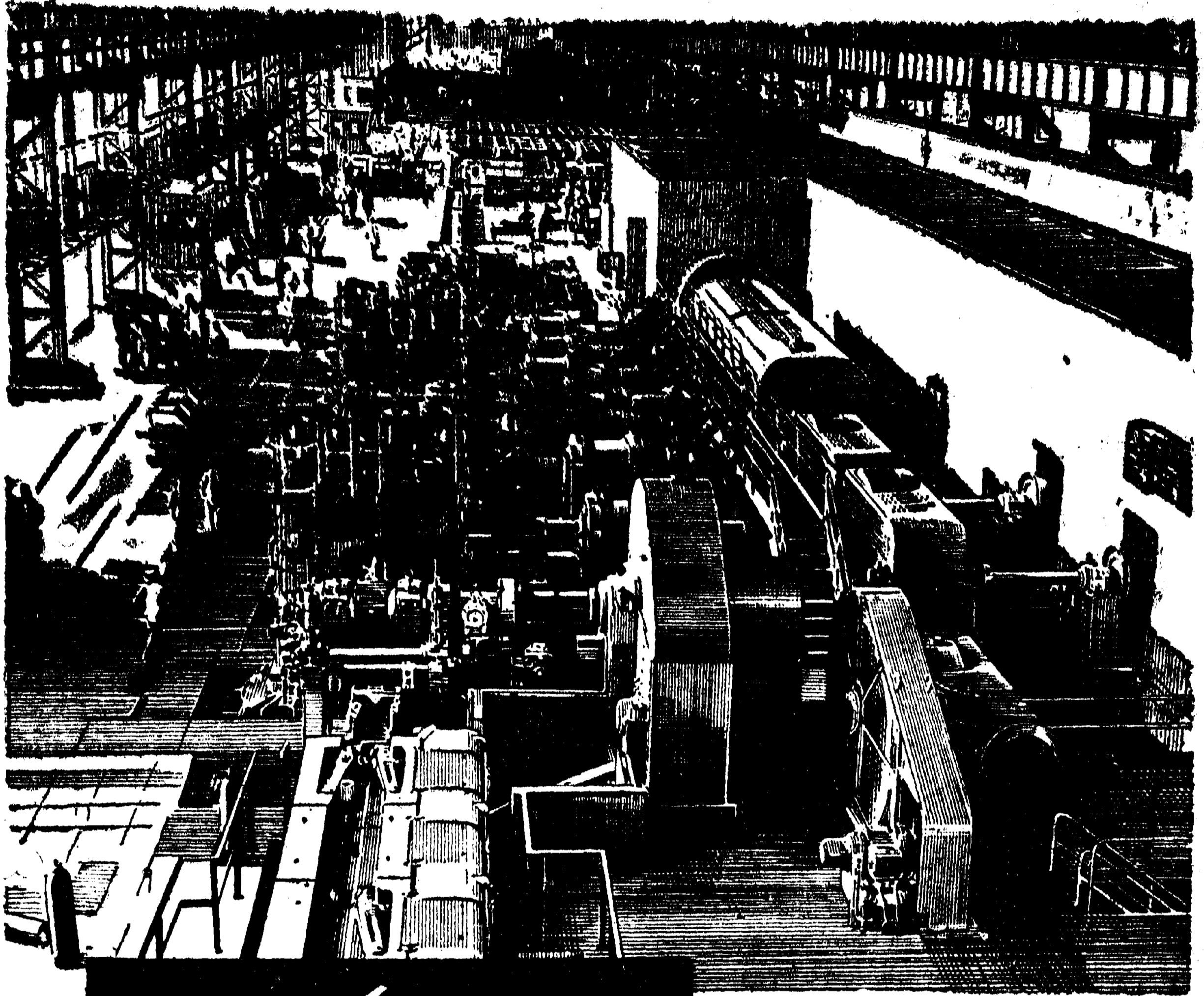
বালুরঘাট—১লা নভেম্বর থেকে ১৫ই নভেম্বর।

২৪ পরগণা—১৭ই নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর।

চুঁচুড়া—১লা ডিসেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর।

পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্পোর্টস ফেডারেশনের এই প্রচেষ্টা সকল করার জন্য সকলের সাহায্য করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

বাঁহারা বাঁজাকে থিয়েটারের সহিত প্রভেদ করেন—তাঁহাদের বোধহয় অজানিত সেন্সপীয়ার বেন জনসন প্রকৃতি মহাকবির নাটক সকল প্রথমে এই বাঁজার ভায়ই অভিনীত হইত কবির বর্ণনার রম্য উপরন, সঙ্গন.



দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানায় উৎপাদিত বিলেট

ইস্কন-এর রোলিং মিল প্লান্টের তৃতীয় অংশ—কন্টিনিউয়াস বিলেট মিলটি প্রাইমারি এবং ইণ্টারমিডিয়েট মিলগুলি চালু হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাজ আরম্ভ করে।

এই মিলটিতে তৈরী বিলেট দেশের রি-রোলিং মিলগুলির কাঁচা মালের চাহিদা বহুল পরিমাণে মেটাতে সমর্থ হবে।

ইস্কন

ইন্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাকশন কোং লিঃ

ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
বেড রাইটসন্স অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ সাইমন-কার্টস লিঃ
বি ওয়েলম্যান সিং গুপ্ত এন্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ

দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ

দি ব্রিটিশ টমসন্স-হস্টন্স কোম্পানি লিঃ

দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ

দি কেন্নেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড

মেট্রোপলিটান-ভাইকাস ইলেকট্রিক্যাল এক্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ

আর উইলিয়াম এয়ল অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ

স্ট্রাকচারাল ব্রিজ অ্যান্ড এন্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিঃ

ডব্লিউ এন্ড কোম্পানি লিঃ (ব্রিজ অ্যান্ড এন্জিনিয়ারিং) লিঃ

কোলেজ পার্কস অ্যান্ড সন্স লিঃ ইস্কন-কেব্লস্ এন্ড

সিঙ্গেল এডিসন সোর্সেস লিঃ

এবং পিরেলি কেন্নেল কেব্ল ওয়ার্কস্ লিঃ)

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবার স্বত্ব

দেশ- বিদেশ

আষাঢ়, ১৩৬৭ (জুন-জুলাই, '৬০)

অসমদেশীয়—

১লা আষাঢ় (১৫ই জুন): চাওড়ায় উদ্বাস্তদল কর্তৃক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস ধ্বংস—উদ্বাস্ত শিবিরে ক্যাশ ডোল বন্ধের জের।

২রা আষাঢ় (১৬ই জুন): দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্ত পুনর্বাসন প্রসঙ্গে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সহিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও রাজ্য পুনর্বাসন সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

৩রা আষাঢ় (১৭ই জুন): পশ্চিমবঙ্গ পৌরকর্মীদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট প্রত্যাহার—পশ্চিমবঙ্গ পৌরসমিতি ও কর্মচারী ফেডারেশনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৪ঠা আষাঢ় (১৮ই জুন): পশ্চিমবঙ্গে ধান-চাউল সরবরাহ সম্বন্ধে কলিকাতার পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও উড়িষ্যার সরবরাহ সচিব শ্রীনীলমণি রাউতের বৈঠক।

৫ই আষাঢ় (১৯শে জুন): পাঞ্জাবী সুরবার দাবীতে দিল্লীতে আকালী দলের দ্বিতীয় মোর্চা আরম্ভ—বিভিন্ন স্থানে আকালী কর্মী ও সদস্যদের গ্রেপ্তার বরণ।

৬ই আষাঢ় (২০শে জুন): রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের যত্নে সফরকালীন অস্থায়ী জজ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরূপে উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ধপল্লী রাধাকৃষ্ণণের শপথ গ্রহণ।

৭ই আষাঢ় (২১শে জুন): তিন দিবসব্যাপী কাশ্মীর সফরকালে কেন্দ্রীয় নেশরকা সচিব ডি. কে. কৃষ্ণমেনন কর্তৃক লাডাক সীমান্ত পরিদর্শন।

৮ই আষাঢ় (২২শে জুন): ১৯৬০-৬১ সালের সেশন হইতে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী গৃহীত।

৯ই আষাঢ় (২৩শে জুন): অসমীয়কে আসামের সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত—বিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনে বিল পেশ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার বিবৃতি।

১০ই আষাঢ় (২৪শে জুন): বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে আসন্ন ১১ই জুলাই হইতে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট—কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের প্রকাশিত আহ্বান।

১১ই আষাঢ় (২৫শে জুন): বিশিষ্ট কবি শ্রীস্বরূপনাথ বস্তের (৫৯) কলিকাতার রাসেল ট্রিটস্থ বাসভবনে জীবনাবলম্ব।

তিনপুর্কিয়া হইতে মহিষাণী পর্যন্ত রেল সার্ভিস সম্পূর্ণ বন্ধ, রেলওয়ে মেলড্যানের অ-অসমীয়া আরোহীদের উপর হারপিট।

১২ই আষাঢ় (২৬শে জুন): রাজারহাট থানা এলাকায় বাঘজোয়ার জনতা, উদ্বাস্ত ও পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ—৪জন নিহত ও ২৫জন আহত; পুলিশের গুলীবর্ষণ ও সমগ্র অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারী।

১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন): বর্তমানে হিমালয় অঞ্চলবাসীদের বিশেষ দাবি 'রহিয়াহে'—নৈনিতালের জনসভায় বেঙ্গীর বরাট্ট সচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পণ্ডের দাবী।

১৪ই আষাঢ় (২৮শে জুন): সারা আসামে 'বজাল খেদা' আন্দোলনের পৈশাচিক রূপ—পথে বাটে বাজালী হত্যা; যেরেদের নির্যাসে মৌলভী হানি।

করাকালী বাঘ পরিকল্পনার আরও রূপাঙ্কন—পশ্চিমবঙ্গ বস্তা তদন্ত কমিটির দৃঢ় অভিমত।

১৫ই আষাঢ় (২৯শে জুন): কবিদাবাদে (পাঞ্জাব) উদ্বাস্ত জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—৪ ব্যক্তি নিহত ও ১৫জন আহত।

১৬ই আষাঢ় (৩০শে জুন): গোঁহাটি সহরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ জারী—'বজাল খেদা' আন্দোলনে নিপুণ অসমীয়াদের হাতে ১৬ জন আহত।

১৭ই আষাঢ় (১লা জুলাই): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শতকরা প্রায় ১১ জন কর্মচারীর বেতন ধর্মঘট—নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সাঙ্গপেগু করার প্রতিবাদ।

১৮ই আষাঢ় (২রা জুলাই): কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের আসন্ন ধর্মঘট (১১ই জুলাই) প্রসঙ্গে দিল্লীতে প্রমসচিব শ্রীগুলজারীলাল নন্দের সহিত কর্মচারী যুক্ত-সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের মীমাংসা আলোচনা ব্যর্থতার পর্যবসিত।

১৯শে আষাঢ় (৩রা জুলাই): বাংলাকে আসামের অন্ততম সরকারী ভাষা করিতে হইবে—শিলচরে নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষা সম্মেলনের সূচনা দাবী।

২০শে আষাঢ় (৪ঠা জুলাই): গোঁহাটিতে উত্তেজিত জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—১ জন ছাত্র নিহত ও ৭ ব্যক্তি আহত।

রাওয়ালপিণ্ডির অগ্নে ট্রেন দুর্ঘটনার ১৩ জন যাত্রী নিহত ও ৩৪ জন আহত হওয়ার সংবাদ।

২১শে আষাঢ় (৫ই জুলাই): তৃতীয় পাঁচসালী পরিকল্পনার দশ হাজার দুই শত কোটি টাকা বিনিয়োগ—পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ।

গোঁহাটিতে শৃঙ্খলা রক্ষার জঙ্গ সৈন্যবাহিনী তলব—ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে সন্ত্রাস ও হাঙ্গামা।

২২শে আষাঢ় (৬ই জুলাই): শিলং ও সহরতলী অঞ্চলে সারা রাজিব্যাঙ্গী কারফিউ—অপরাহু হইতে সহরব্যাপী সৈন্যবাহিনীর টহল সূত্র।

২৩শে আষাঢ় (৭ই জুলাই): সরকারী কর্মচারীদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট দাবিজনহীনতার পরিচায়ক—জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত বেতার ভাষণে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

আসাম যাক্যের মারাত্মক বাকালীসের উপর আসামীদের

পেশাটিক ভাণ্ডার—ধন, জম ও গৃহদাহ এবং বাঙ্গালী নারী মিশ্রিত অব্যাহত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নামে চৌরঙ্গীর (কলিকাতা) নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা—কলিকাতা কর্পোরেশনের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির কর্তৃক সিদ্ধান্ত।

২৪শে আষাঢ় (৮ই জুলাই): কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট কে-আইনী ঘোষিত—রাষ্ট্রপতি (ভারত) কর্তৃক নূতন অর্ডিঞ্জান জারী।

২৫শে আষাঢ় (৯ই জুলাই): ধর্মঘট প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির অর্ডিঞ্জানের প্রতিবাদে সারা ভারতে বিকোভ ও প্রতিবাদ।

২৬শে আষাঢ় (১০ই জুলাই): কলিকাতার জনসভার আসামে বাঙ্গালীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা—পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসভবনের সম্মুখে জনতার বিকোভ।

২৭শে আষাঢ় (১১ই জুলাই): রাষ্ট্রপতির অর্ডিঞ্জান জারী সত্ত্বেও পূর্বে ঘোষণা অনুযায়ী সারা ভারতে (কলিকাতা সমেত) কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট আরম্ভ—কর্মচারী যুগ্ম সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব (শ্রীনাথ পাই ও এম্. এম্. বোশী সহ) প্রেরণ।

২৮শে আষাঢ় (১২ই জুলাই): বর্ধমান ও আমেদাবাদের ধর্মঘটী জনতার (কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী) উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ: ডাক, তার, রেল প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত।

২৯শে আষাঢ় (১৩ই জুলাই): সরকারী অর্ডিঞ্জান এবং ছাঁটাই ও সামপেনস-এর তমকী সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের দেশব্যাপী ধর্মঘট অব্যাহত—ধর্মঘট প্রসঙ্গে সর্বত্র কর্মচারীদের ব্যাপক ধরপাকড়।

৩০শে আষাঢ় (১৪ই জুলাই): কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে অচ্যুত কেন্দ্রের ভার সারা পশ্চিমবঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত সর্বাত্মক হরতাল।

৩১শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই): আসামের রাজ্যমায় ২০ জন নিহত ও ২০ হাজার শরণার্থী—দাঙ্গাবিরোধে আসাম রাজ্য সরকারে দিল্লী ফিরিয়া কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডীর বিবৃতি।

৩২শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই): কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট বিনা সত্ত্বে প্রত্যাহার—কর্মচারী যুগ্ম সংগ্রাম পরিষদের আকস্মিক সিদ্ধান্ত।

সারা বাংলার ঐতিহাসিক সর্বাত্মক হরতাল পালন—আসামীদের নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত দুগার অভিব্যক্তি।

বহির্দেশীয়—

১লা আষাঢ় (১৫ই জুন): জাপান পার্লামেন্ট ভবনের (টোকিও) সম্মুখে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ—৫ জন ছাত্র নিহত ও পাঁচ শত জন আহত।

২রা আষাঢ় (১৬ই জুন): জাপানে গণ-বিকোভ ও আন্দোলনের পরিণতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নির্ধারিত জাপান সফর বাতিল।

৩রা আষাঢ় (১৭ই জুন): মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের দুই প্রান্তে সফর উপলক্ষে কুয়েতের দ্বীপে কমান্ডে চীনের গোলাবর্ষণ।

৪ই আষাঢ় (২০ই জুন): "বিংশশতিকা প্রতিষ্ঠিত না হইলে

মাত্রের অগ্রগতি চিরতরে লুপ্ত হইবে"—রাশিয়ার ১৫ দিনব্যাপী সফর স্ট্রেনার মরকো-এ ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ঘোষণা।

৯ই আষাঢ় (২৩শে জুন): জাপান প্রধান মন্ত্রী মিঃ নোবুকে কিশির পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা—প্রবল জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার।

১১ই আষাঢ় (২৫শে জুন): কমনওয়েলথ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার বহিষ্কার দাবী—আফ্রিকাবাসীদের অহুষ্ঠিত আফ্রিকান স্বাধীন রাজ্য সংঘর্ষের সর্বসম্মত প্রস্তাব।

পাকিস্তানের ১৯ জন নেতৃত্বানীর উল্লেখ্য দাবী—জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর উপযোগী শাসনতন্ত্র চাই।

১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন): ভেনেজুয়েলার প্রাচ্য-প্রান্তিক কৃষি জাতি নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক বার্ষিকতার পর্যাবসিত—রাশিয়ার নেতৃত্বে কমান্ডে রাষ্ট্রগুলির আলোচনা বন্ধন।

১৪ই আষাঢ় (২৮শে জুন): কমান্ডে দেশগুলি কর্তৃক শান্তিগূর্ণ সহ-অবস্থান মীতি সমর্থন—বুখারেষ্ট সংঘর্ষে যোগদানকারী প্রাচ্যের কমান্ডে দেশগুলির (রাশিয়া ও গণচীন সহ) প্রতিনিধিদের বৈঠক ইত্তাহার।

১৫ই আষাঢ় (২৯শে জুন): চীন-নেপাল সীমান্তবর্তী স্ত্রাং এলাকার চীনা বাহিনীর আক্রমণে নেপালী সীমান্তরক্ষী নিহত—১৭জন অসামরিক কর্মচারী নিখোজ।

বেলজিয়ান শাসনাধীন কঙ্গোর স্বাধীনতা ঘোষণা।

১৭ই আষাঢ় (১লা জুলাই): স্ত্রাং এলাকার চীনা হামলার বিরুদ্ধে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাইএর নিকট নেপালী প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি, পি, কৈরালার প্রতিবাদ।

১৮ই আষাঢ় (২রা জুলাই): সাইপ্রাসের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে যুটেন ও সাইপ্রাস প্রতিনিধিদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত।

২২শে আষাঢ় (৬ই জুলাই): খেতকারদের বিরুদ্ধে কঙ্গোতে আফ্রিকান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ—কয়েকটি শিবির দখল।

২৫শে আষাঢ় (৯ই জুলাই): কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের প্রতিশ্রুতি।

২৬শে আষাঢ় (১০ই জুলাই): "কিউবার আন্তর্জাতিক কমান্ডে নিয়ন্ত্রিত শাসন বরদাস্ত করিব না"—মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গ উক্তি।

২৭শে আষাঢ় (১১ই জুলাই): রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কিউবার অভিযোগ—আমেরিকা কিউবার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও আক্রমণাত্মক কার্য চালাইয়াছে।

৩০শে আষাঢ় (১৪ই জুলাই): টোকিও-এ জাপানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নোবুকে কিশি ছুরিকাঘাত—আক্রমণকারী প্রেরণ।

অবিলম্বে কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্যপসারণের দাবী—বেলজিয়ামের প্রতি রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ।

৩১শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই): কঙ্গো প্রজাতন্ত্রকে সাহায্যদানে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভের প্রতিশ্রুতিদান।

বেলজিয়ামের সহিত কঙ্গোর কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ—কঙ্গো প্রধান মন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিক লুলুবার ঘোষণা।

৩২শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই): নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে উপস্থিতি।



অভিনয়ে রীতিবাদ

অভিনয় হচ্ছে একটি বিশেষ শিল্প। শুধু পুস্তক বললে মনে হয় পুরোটা বলা হল না, সূক্ষ্মতার বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয়। উপলব্ধি এবং অনুভূতিকে কেন্দ্র করে এই সূক্ষ্মতার শিল্পটি গড়ে উঠেছে। মূলতঃ এই শিল্প রসাত্মক। একটি আধারের মধ্যে আর একটি চরিত্র ফুটে উঠবে—“আর একটি” কেন—অসংখ্য চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠবে একের মাধ্যমে, বিভিন্নধর্মী একেকটি চরিত্র—একের সঙ্গে অন্যের মিল নেই, চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে আবেগধর্মিতা অত্যন্ত অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু একমাত্র অঙ্গ নয়। অভিনয় জিনিষটি শৃঙ্খলাবিহীনদের জন্তে নয়, চরিত্ররূপায়ণটাই হচ্ছে অভিনয়ের মূলকথা, অভিনয়ে সার্থকতা অর্জনের একটি নির্দিষ্ট রীতি আছে, এ কথা কোনক্রমেই ভুলে চলবে না যে, সেই রীতি অনুসরণ করলে তবেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছানো যাবে, নচেৎ পথভ্রষ্ট হওয়া অথবা ভুল পথে চালিত হওয়া যেমনই স্বাভাবিক, তেমনই অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে খেরালধূসী মাফিক উন্টোপান্টা পথে যেতে আপনি নিশ্চয়ই পারেন, আপনার সে স্বাধীনতার বাধা দেবার কেউ নেই; তবে তা হলে অতীর্থে পৌঁছানো আপনার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। রীতি সম্পর্কে আর একটু বিশদ হওয়া প্রয়োজন,—কিসের রীতি? আগেই বলা হয়েছে চরিত্ররূপায়ণই হচ্ছে অভিনয়ের মূলকথা আর অভিনয়শিল্প গড়েই উঠেছে উপলব্ধি আর অনুভূতিকে কেন্দ্র করে, একটি চরিত্রে আপনি অভিনয় করছেন অর্থাৎ আপনি নিজের মধ্যে দিয়ে সেই চরিত্রটিকে কোটাতে চলেছেন আপনার নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে এবং অনুভূতি দিয়ে চরিত্রটির স্বরূপ আপনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তারই সাহায্যে আপনি চরিত্রটিকে কোটাতে প্রতী হইয়েছেন, এই যে আপনার অন্তরের অনুভূতি—অভিনয় হচ্ছে তারই তো বহিঃপ্রকাশ। সেই অনুভূতিটাই তো আপনার অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে রূপ নেবে তা হলেই এখানে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—অন্তরের এই রীতি হচ্ছে সেই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের রীতি—একটি নির্দিষ্ট প্রণালী যাকে অনুসরণ করাই এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিধেয়।

এই রীতি সম্পর্কেও অনেক কিছু জানার আছে। আছে

এ সম্পর্কে যথেষ্ট জানের অধিকারী বলতে আমাদের মনে পড়বে লি ট্র্যাসবার্গের নাম। পৃথিবীর অভিনয়-রীতি-বিশেষজ্ঞদের যিনি অত্যন্তম এবং এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের যিনি একজন সুবোধ্য অধিকারী। এই রীতির প্রচার এবং প্রসার করে বিশেষ কৃষিকা গ্রহণ করেছেন, প্রায় প্রতিটি মানুষকে তিনি বুঝিয়েছেন কেন এই রীতি গ্রহণীয়, এর পিছনে কি যুক্তি বিজ্ঞান, কোথায় এর সার্থকতা। বলতে গেলে রীতি সম্পর্কে জনগণ এতখানি যে সচেতন হয়ে উঠেছে, আমাদের মনে হয় তার পিছনে রয়েছে ট্র্যাসবার্গের অচিন্তনীয় অবদান। অভিনয়ের রীতি সম্পর্কে পৃথিবীর মধ্যে (বহুদূর আমরা জানতে পারি) প্রথম সজাগ হয়ে উঠল রাশিয়া অর্থাৎ ইয়োরোপ, ইয়োরোপ খণ্ডই বোধ হয় প্রথম বুঝতে পারল যে, অভিনয়ে সফলতার পথ এলোমেলো আঁকাবাঁকা নয়, একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলাযুক্ত পথ, ঠান্ডানিষ্ঠাভিত্তিক এই তত্ত্বের জনক। এঁর কল্যাণেই এই সম্পর্কে অবহিত হ'লে সারা ইয়োরোপ, তারপর ইয়োরোপ থেকে সারা ছনিয়া। তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি আমাদের নমস্কার।

তবে এ কথাও মিনে নয় যে সারা ছনিয়ার এই রীতিবাদের প্রচার বা প্রসার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নি, কোন কোন দেশ নির্বিঘ্নে এই রীতিবাদকে অকৃষ্ট স্বীকৃতি জানিয়েছে, কেউ কেউ তার উদ্দেশ্যে প্রশংসা করেছে রাশি রাশি অবজ্ঞা আর উপেক্ষা। রীতি সম্পর্কে ঠ্যানিষ্ঠাভিত্তিক খুঁটিনাটি নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, অনেক কলা কৌশলের করেছেন প্রাজ্ঞস ব্যাখ্যা, অনেক খুঁটিনাটি বিধয়ের প্রতি করেছেন আলোকপাত। অভিনয় জিনিষটির প্রচলন হাল আমলের নয়, এই শিল্পটির মনোমত বড় কম হল না, সত্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞাত সুরুমার শিল্পগুলির মতই অভিনয়ের আধিষ্ঠানও সেই সুরুমাতীত যুগে। সেই থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে আধিষ্ঠিত হয়েছেন অসংখ্য শক্তিশালী অভিনয়শিল্পী, দল এঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কৃতিত্ব ছিল এবং এঁরা প্রত্যেকেই অভিনয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে কিছু না কিছু আবিষ্কার করে গেছেন কিন্তু সে রীতি বা সে আবিষ্কারের কল থেকে উত্তর-সুরুমারী বা পরবর্তী দর্শকসমাজ বঞ্চিত, কারণ সে সব সম্পর্কে তাঁরা কোন কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখে যান নি ভবিষ্যতের জন্তে। তাঁদের নীতি বা আবিষ্কারের রসাত্মকান করেছেন সমকালীন দর্শক সমাজ, তাঁদের দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের রীতি ও আবিষ্কারের সৌরভও মিলিয়ে গেছে—ভেবে দেখুন যদি বিপরীত ঘটনাটি ঘটত তাহলে আজ আমরা কত উপকৃত হতে পারতুম, ঠ্যানিষ্ঠাভিত্তিক সে ভুল করেন নি, তাঁর বা কিছু ধ্যানধারণা—তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, অভিনয়ের মহড়া দেওয়ার রীতি-নীতি সম্পর্কে তাঁর রচিত বহুমূল্য পাঠ্যপুস্তক তাঁর অভিনব চিন্তাধারার পরিচয় বহন করেছে।

ঠ্যানিষ্ঠাভিত্তিক মঞ্চাভিনয়ে স্বাভাবিকতার দ্বারা চরিত্রের সত্যটিকে ফুটিয়ে তোলার দিকে বড়বান। প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে একটি সত্য আত্মগোপন করে আছে, তার সম্যক প্রকৃষ্ট স্বাভাবিকতার দ্বারা সত্যবর্ণন, তিনি দেখেছেন অনেক ক্ষেত্রে এই সত্যের বখাবধ বিকাশ ঘটে না, অভিনয়ের মধ্যে জড়তা আর কৃত্রিমতাই ফুটে ওঠে, এক্ষেত্রে ইনি শুধুমাত্র শিল্পীকেই দোষ দেন না, তাঁর মতে এ ক্ষেত্রে আংশিকভাবে পরিচালকও দায়ী, কারণ উত্তরের মধ্যে শুরুবোধে সত্যবর্ণনের জন্তেই অবশিষ্ট জিনিষ ঘটে থাকে। উত্তরেই চান

জর আসলে এবং কীকি মেয়ে কাঁধেঁড়ার করতে। একটি বক্সার (Boxer) নিজেকে গড়ে তোলার জন্তে যে পরিমাণ পরিশ্রম করেন, অভিনেতাকেও সমপরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে। অভিনেতা এখানে বোকার সঙ্গে তুলনীয়। বক্সারের সঙ্গেও এখানে তার তুলনা চলে। অভিনেতাকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে তুফল বুদ্ধ করতে হচ্ছে। রত্নিমত লড়তে হচ্ছে, প্রতিরক্ষামূলক বুদ্ধি সে করে চলেছে মঞ্চে উপর, আর একটু বিশদ হই—আপনি যে চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন—আপনার নিজের চরিত্রটি যাতে সেই চরিত্রকে ছাপিয়ে না যায় বা আপনার অভিনয়ে চরিত্রটি চাপা পড়ে সে ক্ষেত্রে আপনার নিজের চরিত্রটি যাতে না বিকশিত হয় এ বিষয়ে আপনাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে, আপনার চরিত্রটি কেবলই আপনার অভিনয় চরিত্রকে অতিক্রম করে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে—আর আপনার শিল্পীসম্মত ক্রমাগত তাকে প্রতিরোধ করে চলেছে—এও তো বুদ্ধ। অভিনেতাকে প্রচুর শ্রম করতে হবে শারীরিক, মানসিক দুটিকে দিয়েই। চরিত্রটির প্রতিক্রিয়া ঘটবে তার আবেগে, তার দেহে, তার মনে, তবেই শিল্পীর সাধনা সার্থক।

আগেই বলেছি যে এই রীতিবাদ সকলে মেনে নেয় নি। এর বলিষ্ঠ বক্তব্যকে ইংল্যান্ড মেনে নিতে পারল না। একজন তরুণ ইংল্যান্ডীয় অভিনেতা প্রকাশ্যে বললেন—“ও সব যত বাড়াবাদি, কোন প্রয়োজন নেই ঐ রীতি অনুসরণ করার। আর একটি উক্তি... লাক্সাশায়ায় আমি রোমিওর ভূমিকায় অভিনয় করেছি, ঐ রীতিবাদ তো আমি মানিনি অথচ বেশ স্পষ্ট আমার নিজের মধ্যে ধারণা ছিল আমিই রোমিও অর্থাৎ আমি চরিত্রটির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিলুম।” এর উত্তর দিলেন এক পরিচালক, তিনি বললেন মানলুম, তুমি নিজে স্পষ্ট অনুভব করলে যে তুমি রোমিও, কিন্তু সেখানেই কি শেষ, দর্শকদের মধ্যেও তো এই বিশ্বাস তোমাকে আনতে হবে—তুমি নিজে ভাবলেই তো চলবে না, তাদেরও মধ্যে এই অনুভূতি আনতে হবে যে তারা তোমায় দেখছে না। তারা রোমিওকেই দেখছে, সে বিষয়ে কতটা এবং কিভাবে কৃতকার্য হয়েছ বল। অভিনেতা চুপ, মুখে কোন কথা নেই। অভিনেতাকেও ব্যায়াম করতে হয় সে এক ভিন্ন ধরনের ব্যায়াম এ ব্যায়ামে শুধু দেহগঠনই হয় না এ ব্যায়ামে মনও গড়ে উঠে ধীশক্তি জেগে উঠে, অভিনিবেশ, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে, এ ব্যায়ামের প্রণালী অবশ্যই আলাদা, কিন্তু মূল একই। অভিনেতাকে পক্ষেত্রিয় সজাগ রাখতে হবে—কোন কিছু যেন তার চোখে এড়িয়ে না যেতে পারে, স্তম্ভের দ্বার তাকে উন্মুক্ত রাখতে হবে, ধীশক্তি, চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি তার হবে প্রথমে, প্রতিটি চরিত্র তাকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে। তবেই সে হতে পারবে একজন সার্থক অভিনেতা। রূপদক্ষ শিল্পী।

ট্র্যান্সবার্গের প্রসঙ্গে এবার আসা যাক। একটি শিক্ষাদানকেন্দ্রের মাধ্যমে ইনি এ বিষয়ে আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আসছেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে “তিনি ক্লাস নেন, রীতিমত পাঠ দেন। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাক, কোন এক অভিনয়ের একটি অংশবিশেষের ‘র্যাকসান’ দেখানো হল একটি ছাত্রীকে। মেয়েটি কিছুতেই ট্র্যান্সবার্গের দেখানো ‘র্যাকসান’টি প্রদর্শন

করতে পারছে না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মেয়েটি বারবার বিফল হচ্ছে, শেষে লজ্জার মেয়েটি প্রায় কাঁদোকাঁদো অবস্থায় যখন স্থানচ্যুত করছে, ট্র্যান্সবার্গের কণ্ঠ আবার শোনা গেল—“শোন”, খুব প্রশান্ত একটি কণ্ঠস্বর! মেয়েটি কিরে তাকাল। ট্র্যান্সবার্গ বললেন—তোমার মধ্যে দিয়ে ঐ ‘র্যাকসান’টি তোমার মত করে যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি, ততক্ষণ কিছ তোমার ছুটি নেই, মেয়েটির বাওয়া হল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে ফিরে এসে আবার কাজে মন দিল। অভিনেতাকে তিনটে কাজ একসঙ্গে করতে হবে; অভিনয়, দর্শন এবং শ্রবণ—অর্থাৎ এইভাবেই শারীরিক এবং মাসিক যুগপৎ শক্তিনিয়োগ। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার ভাষণ এবং অঙ্গসঞ্চালন স্বাভাবিক হচ্ছে কি না, আরও ভাল হয় আপন মনে নির্জনে অবসর সময়ে কোন নাটক থেকে তিন-চারটি চরিত্র-সম্বন্ধিত অংশবিশেষ যদি আপন মনে অভিনয় করা যায়, এর ফলে অভিনয়ের মধ্যে পরিবর্তন আনা সহজ হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে রঙ্গমঞ্চের উন্নতি বিধানের আত্মনিয়োগ করে যে সকল দিকপাল প্রয়োগকর্তা, পরিচালক, শিল্পীরা ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে এই দুজন নিঃসন্দেহে সমান আসন দাবী করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের গরিমাও তো কোন অংশে কম নয়। তাঁদের সাধনা রঙ্গমঞ্চকে যে পরিমাণে পুষ্ট করেছে তার সাক্ষ্য দেবে তাঁদের সৃষ্টি; তাঁদের চিন্তাধারা, ধ্যানধারণা, ধীশক্তি থেকে যাদের উদ্ভব।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

কিছ বিধি বাম! পূর্ণ দৈর্ঘ্য অজ্ঞতার প্রযোজনা এবং তার প্রধান ভূমিকায় আমার অবতরণ কোনদিন সমাপ্ত হ'ল না। আমার অজ্ঞতা প্রযোজনায় স্বপ্ন আকাশকুসুম হয়েই রইল, অথচ এই অজ্ঞতাকে ঘিরে আমার কত স্বপ্ন, কত কল্পনা, কত চিন্তা। ধীরে ধীরে তিলে তিলে শঠন: শঠন: গতিতে এই অজ্ঞতাস্বপ্ন আমার স্তম্ভের পরতে পরতে দানা বেঁধে উঠেছে। পৃথিবীটাই তো স্বপ্নের। জগতের রঙ্গমঞ্চে কোটি কোটি নরনারীর মিছিল চলেছে যুগের পর যুগ ধরে—স্বপ্নই মানুষের অবলম্বন, এর মধ্যে কল্পনার বাস্তবে কোন ভেদাভেদ নেই অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইডিয়ালিসমে এবং রিয়ালিসমে চিরন্তন সংঘাত, স্বপ্নের ক্ষেত্রে নয়, স্বপ্নকে কেন্দ্র করেই মানুষ বেঁচে থাকে। স্বপ্নই মানুষের প্রাণ, স্বপ্নই যে মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান পথের অবশ্য আইডিয়ালিসম এবং রিয়ালিসমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর রূপভঙ্গ আছে কিছ মূল একই। স্বপ্ন খালি কবির জন্তে নয়, শিল্পীর জন্তে নয়, ভাবুকর জন্তে নয়, স্বপ্ন তাদের একচেটির নয়, স্বপ্ন আছে একটি অতি সাধারণ কঠিন কঠোর জীবনধারণকারী, বাস্তবের রূচ আঘাতপ্রস্তু, সম্পূর্ণরূপে কাব্য সাহিত্য চেতনাবর্জিত নীরস ব্যক্তিরও উপার্কনের স্বপ্ন, সকলের স্বপ্ন, সংসারের স্বপ্ন—

সেটা কি স্বপ্ন নয়? স্বপ্ন হতে স্বপ্নতর এক ইন্দ্রিয় থেকে স্বপ্নের জন্ম। সমগ্র চেতনা জুড়ে এর বিস্তার, মূলতঃ এ অপ্রত্যক্ষ ও স্পর্শাতীত, মূলতঃ এ অসুভবের, একে প্রত্যক্ষ করতে হয় অসুভূতির উদাত্ত আলোকে, একে উপলব্ধি করতে হয় স্তম্ভ দিয়ে, ক্রমে তন্ময় মন প্রাণ আচ্ছন্ন করে মানুষের স্বপ্ন বিরাট হতে বিরাটতর রূপ নেয়, যত কিছু সীমা ও গণ্ডী করে অতিক্রম, দিক থেকে দিগন্তরে বহুধা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। দেখা যায় স্বপ্নের গতি বিষুখীন, কখনো মানুষের স্বপ্ন পরিপূর্ণতার স্পর্শ প্রভাবে ভরে উঠে কখনো তা হতাশার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। স্বপ্ন যখন সফল হয় তখন মনে হয় যে জগতের যত কিছু আনন্দ, যত হাসি যত গান—এ যেন আমারই জন্তে। এই উনার উল্লুকে সীমাহীন আকাশ—এ যেন আমারই, নদীর কলকল ধ্বনি, বাতাসের বেগ, বিহগের কলকাকলিতে যেন আমার অবিসম্বাদিত অধিকার। যত কিছু পার্শ্বিক আনন্দ সম্পদ তাদের সৃষ্টি যেন আমারই জন্তে। স্বপ্ন যখন সফল হয় না তখন বেদনা হয়ে ওঠে পুঞ্জীভূত, মনে হয় চারপাশ ঘিরে খাস বোধ করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিবাদের সুউচ্চ দুরতিক্রম্য প্রাচীর গড়ে উঠছে, সারা পৃথিবীকে হুঃখের কালিমায় দেখায় যেন মালিকময়ী। আমার অজস্র স্বপ্ন যখন সফল হয় না তখন ঠিক এই অসুরূপ অসুভূতিই আমার মধ্যে জেগেছিল। অজস্রকে ঘিরে আমার তো স্বপ্নের শেষ ছিল না। দিনের পর দিন এই পরিকল্পনা যত রূপ নিতে থাকে, একে কেন্দ্র করে আমার স্বপ্ন দেখাও তত ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। ভবিষ্যতের সহজে মনের মধ্যে তখন যে কত মনোরম ছবি আঁকা হয়ে গেছে তার সীমা সংখ্যা নেই। পাঠক পাঠিকাদের অজানা নয় যে এই সঙ্গে রিদম্ অফ ভিক্ট্রী নামে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণেও আমি অগ্রসর হয়েছিলুম—বিধি প্রসন্ন। এর চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হতে পেরেছিল। অজস্রের পিছনে যে বিরাট পরিকল্পনা ছিল সেই পরিকল্পনা কেন ব্যর্থ হল—সেও আর এক ইতিবৃত্ত—সে কাহিনী পরে বিবৃত করছি।

একক সময়ে আমার মনে হয় যে কলকাতায় না এসে বসে থেকেই যদি 'রিদম্ অফ ভিক্ট্রী' আর 'অজস্র' পরিকল্পনার রূপদানে ব্যাপৃত থাকতাম তা হ'লে ঘটনার শ্রোত কোন্ ধারায় প্রবাহিত হোত? বোধহলে তখনও অসংখ্য আহ্বান পেয়েছি। ষ্টুডিও মালিকগণ স্বাগত জানাতে বিধা বোধ করেন নি, কিন্তু ব্যাপার কি জানেন? দূর প্রবাসে বড় একা একা লাগছিল তা ছাড়া ঘরের দিকে মনটা ভীষণ টানছিল, স্মৃষ্ণ বোঝাইতে বসে প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল যেন বাঙলা দেশ আমার হাতছানি দিয়ে ডাকছে, সেই স্মৃষ্ণা স্মৃষ্ণা বঙ্গদেশ, আমার জননী জন্মভূমি, যার পুণ্য কোড়ে আমি জন্মেছি, যে বুক দিয়ে আমায় লালন পালন করেছে, যে আমার মুখে দিয়েছে তার বিশ্বাসিত ভাষা, যার অপার করুণা তৃষিত তাপিত জীবনের পরম প্রলেপ। দেশ দেশান্তরে যেখানে তার যত সন্ধান আছে সকলের উদ্দেশে যে বিতরণ করে চলেছে মুঠো মুঠো অমৃত, তার কোল থেকে কতদিন দূরে থাকি যার? মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, চঞ্চল হয়ে ওঠে, উদগ্রীব হয়ে ওঠে ঘরে কেয়ার জন্তে, তাই যখনই কলকাতা থেকে কয়েকজন বন্ধু আমায় আমন্ত্রণ জানাশোন, আমি তৎক্ষণাৎ নিরোধার্থ করে নিলুম

সেই আহ্বান আমার দেশের আহ্বান হিসেবে। তাঁদের সঙ্গে কলকাতার কাজ করার সম্মতি জানিয়েছিলুম তাঁদের। তাঁদের সঙ্গমত্ব এবং আন্তরিকতা আমার মনে থাকবে চিরদিন, আমার শিল্পী সম্প্রদায় এবং সমস্ত কলাকুশলীদের কলকাতার আনিবে কাজ করাতে তাঁরা অরাজী হলেন না।

উত্তরপ্রদেশের (তখনকার যুক্তপ্রদেশ) প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীভগবতীচরণ বর্মা চিত্রনাট্যটি হিন্দিতে অনুবাদ এবং সুসংকৃত করার ভারগ্রহণ করলেন। স্বর্গতঃ প্রহ্লাদ দত্ত পরিচালনা এবং সেই সঙ্গে আলোকচিত্রায়ণের ভার নিলেন। পুণ্য প্রভাত ষ্টুডিওতে এর শিক্ষা পরে পাঞ্জাবে স্বর্গতঃ দলসুখ পাঞ্চোলীর সঙ্গেও ইনি কাজ করেছেন। আমার ছবির নায়ক ছিলেন সাহ মোদক। সুরবাজনার ভার নিয়েছিলেন তিমিরবরণ। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীচাক্র রায় নিয়েছিলেন শিল্পনির্দেশনার দায়িত্ব। ব্যালোতে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে ছিল চল্লিশ। প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সারা ভারতের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ প্রচারবিদ শ্রীসুবীরেন্দ্র সাক্তাল—ভারতের চলচ্চিত্র জগতে একটি বিশেষ আসন যার অধিকারভুক্ত। সমগ্র প্রচেষ্টাটি রূপদানের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন চারজন, তাঁরাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আমার কলকাতার আনান—এই বিরাট প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন তাঁরাই—তাঁদের নাম শ্রী বি-এল খেমকা, শ্রী এস-আর হেমান, শ্রী এস, দত্ত এবং শ্রী এস এন শেহগল।

কলকাতায় ফিরে এলুম। সেই চিরপরিচিত পরিবেশ, সেই কতকালের চেনা লোকগুলি, সেই প্রাণ থেকে প্রিয়তর বাঙলাদেশ, বাঙলার মাটি, আমার দেশ আমার সাদরে গ্রহণ করল এক কথায় কিন্তু কলকাতার শীত আমার স্নানজরে গ্রহণ করল না। কলকাতা আমার মাতৃভূমি, জন্মস্থান, নিজের দেশ, তাই বলতে লজ্জা অনুভব করছি যে দেশের শীত আমার সহ্য হল না—অথচ জীবনের কতগুলি শীত যে এই শহরেই কাটিয়েছি তার সীমা-পরিসীমা নেই, তবুও এ দেশেরই শীত এতকাল বাদে সহ্য হল না। এর মূল কারণ জলবায়ু পরিবর্তন আর একথা সকলেরই জানা আছে যে হঠাৎ জলবায়ু পরিবর্তন সহজে সকলেই সচেতন থাকেন না, কলে ঐ হাওয়া বদলে স্বাস্থ্যকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করে—তার উপর আবার এদেশের জলবায়ুর সঙ্গে এর আগে বেশ কিছুকাল আমার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। অতকাল বাদে কলকাতা কিয়লুম অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন—তারপর সময়টি জলবায়ু পরিবর্তনের—সব মিলে আমার বেশ কাবু করে ফেললে। স্মৃষ্টি যখন চলছিল তখনই আমার স্বর চলছে। শিল্পশাস্ত্রে বিরাট প্রতিভার অধিকারী হওয়ারই শিল্পীর একমাত্র গুণ নয়, যে কাজের ভার গ্রহণ করা সেই কাজটি যথাযথভাবে শেষ করা অর্থাৎ দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করাই শিল্পীর আর একটি বিশেষ গুণ। এদিক দিয়ে যদি কেউ অবহেলা প্রদর্শন করেন তা হ'লে তিনি যতবড় প্রতিভাবান দক্ষ শিল্পীই হোন—যথার্থ শিল্পী বলে কোনদিন বিবেচিত হবেন না। সেদিক দিয়ে বিচার করলে শিল্পী হিসেবে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অজস্রা ছবিটিতে শিল্পী হিসেবে আমি যুক্ত তো ছিলুমই তা ছাড়া ছবিটি ছিল আমার নিজের—আমার নিজস্ব প্রযোজনা—এই ছবি রূপ নিচ্ছিল। স্মৃষ্ণা এই ছবির প্রতি শিল্পীর পু

দায়িত্ব পালন করলেও সম্পূর্ণ হয় না, প্রয়োজিকার দায়িত্বও যে আমার সম্পূর্ণরূপে পালনীয়। এতাবৎ বত ছবিতে কাজ করেছি, শিল্পীর দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেই কর্তব্য সমাধা করেছি। প্রযোজনায় সঘনকে আমার চিন্তা করবার কিছুই ছিল না, কিন্তু প্রযোজনা সঘনকে বত কিছু করবার এ ছবিতে তা সব কিছুই আমাকে করতে হয়েছে। অতএব অনুমান করুন এই বকম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে নিজের স্বাস্থ্য সঘনকে চিন্তা করার অবকাশ কোথায়, তখন অজ্ঞতা, অজ্ঞতা আর অজ্ঞতা—অজ্ঞতাই ধ্যান, অজ্ঞতাই জ্ঞান, অজ্ঞতাই সাধমা, শারীরিক অসুস্থতার দিকে ফ্রঃফ্রঃপ করবার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না—প্রতিটি মুহূর্ত তখন যে কি উত্তেজনায় কাটছে তা ভাবায় কেমন করে প্রকাশ করব ভেবে পাই না, প্রতিটি মুহূর্তই তখন আমাদের কাছে যেন বিধাতার পরম দান। অপরিমাপ্য যেন তাদের মূল্য। আমার মূল চিন্তা তখন চিত্রায়ণ সমাপ্তির দিকে, কবে, কত দিনে ছবির চিত্রায়ণ তথা সম্পাদনা শেষ হবে, তারপর যথারীতি একদিন দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ছবি মুক্তিলাভ করবে, সেই দিনটি কবে কবে—কবে—সত্যি কথা বলছি কারণ নির্দোষ সত্য ভাবে কোন অপরাধ নেই, টাকার দিকেও আমার লক্ষ্য ছিল, ছবিটি মুক্তি পেয়ে যে টাকা আমার হাতে আসবে তারাই যে আমার সমস্ত স্বপ্নকে পূর্ণরূপ দেবে, যে বিরাট স্বপ্ন আমার আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার রূপ পাবে সেই টাকার সাহায্যে। আমার স্বপ্ন-ভ্রমণের একটি বাগান ও আঙ্গিনায়ুক্ত অনতিদীর্ঘ গৃহনির্মাণের এবং একটি নৃত্যশিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণের। এই কল্পনাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করবার ক্ষেত্রে অর্ধেরই প্রয়োজন বিশেষ করে,—তাইতো আমার অর্ধের প্রয়োজন।

কল বা হবার তাই হ'ল শারীরিক অসুস্থতাকে আমি উপেক্ষা করলে কি হবে সে আমার উপেক্ষা করল না, আমি বত তাকে অস্বীকার করতে গেছি সে তত নিবিড়ভাবে আমার ঘিরে রাখলে—কলতঃ আমার শর্যাশায়িনী হতে হল আমার সাধের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। আমার কল্পনায় নিমিত্ত সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল, এক বোড়ো দমকা হাওয়ার আমার তাসের ঘরখানি ভেঙে নিশিচহু হয়ে গেল। একে শারীরিক স্বতন্ত্রতায় মানসিক এই অবসাদ পরিস্থিতিকে একেবারে সোণায় সোহাগা করে তুলল, হতাশায় মন একেবারে ভেঙে গেল, মনের সে যে কি করণ অবস্থা তা ভাবায় ব্যস্ত করা আমার সাধাতীত।

রোগ বেড়ে চলে, অনেক বিখ্যাত চিকিৎসকদের চিকিৎসা চলে, ফল হয় না, শরীরের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যায়। শেষে এলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ রায় বলে গেলেন—নিউমোনিয়া এবং তাও খুব গুরুতর আকার নিয়েছে। তাঁর নির্দেশনায় তাঁর সহকারী স্বর্গতঃ ডাঃ অনিল চক্রবর্তী আমার রোগে সঙ্গ যুদ্ধ চালাতে লাগলেন।

আমার বহুস্বপ্নোপাধিত, সাদরে পুষ্ট, পরম নিষ্ঠায় লালিত সমস্ত স্বপ্ন একেবারে মিলিয়ে গেল তাদের ঘরের মত—বিভ্রান্তলালের ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার কথটি এই প্রসঙ্গে বারংবার মনে পড়ে—কিন্তু আদিও কর্মক্ষেত্রে কয়েকে ইয়ে মরেকে মনে বিশ্বাসী, নৈরাশ্রবাদ আমার কোনদিনই

বশীভূত করতে সক্ষম হয় নি, জীবনকে আমি অর্ষণ করেছি চিরকালই আশার আলোয়। যদিও এত বড় একটা পরিকল্পনা—কত বস্ত্রে কত অধ্যবসায়ে কত নিষ্ঠায় তাকে রূপ দিতে অগ্রসর হচ্ছিলুম এবং নিজের মুখে বললে হয় তো অশোভন হবে তবুও সত্যের খাতিরে বলছি—যে এই প্রচেষ্টা সার্থক হলে ভারতীয় চিত্রজগতে এক বিস্ময়কর আলোড়নের সৃষ্টি হোত। কিন্তু বাই হোক, কর্মের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা, প্রচেষ্টার ব্যর্থতার জন্তে সারা জীবন হা-হতাশ করার থেকে নতুন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাই সবচেয়ে সমীচীন। রোগশয্যায় নতুন ব্যালে সঘনকে আমি চিন্তা করে রেখেছিলুম সূহু হয়ে ওঠার পর সেই ব্যালে সাধারণ্যে প্রদর্শিত হ'ল, তাদের মধ্যে কয়েকটি তো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যদিও আর্থিক সাফল্য তারা অর্জন করতে পারে নি। আর্থিক অসাফল্যের কারণও আছে, এই সময়ে আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হরেনদা নেই—ইতিমধ্যেই নিয়তির নির্ভূর বিধানে হরেনদার জীবন যবনিকার অকালপতন ঘটেছে। পৃথিবী থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়েছেন হরেনদা—হরেনদা যে আমার কতখানি শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। তাঁর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে আমার কর্মসচিব ছিলেন—প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মধ্যে উপযুক্ত যোগ্যতার অভাব ছিল অনেকখানি, আর্থিক দিক দিয়ে আমার সফলগুলিকে তাঁরা সার্থক করে তুলতে পারেন নি—এ ক্ষেত্রে যে বিচক্ষণতার প্রয়োজন সেই পরিমাণ বিচক্ষণতা তাঁদের মধ্যে



পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর



যাদুসম্রাট
পি. সি. সরকার
প্রণীত পুস্তকাবলী
ইঞ্জাজাল (বাংলা) ৫
মেসমেরিজম্ ২ ৫
হিপনোটিকজম্ ২ ৭
SORCAR ON MAGIC
(ইংরাজী) ৩০

যাদুসম্রাট
পি. সি. সরকার
ইঞ্জাজাল পাবলিকেশন
১২/৩এ জামির লেন।
বালীগঞ্জ, কলিকাতা ১২



ছিল না। অবশ্য এজন্মে দোষ আমি কাউকে দিই না, কেনই বা দেব? কারো বিরুদ্ধে আমার বিন্দুস্বর্য অভিযোগ নেই, কারণ ভুল-ভ্রান্তি মানুষেই করে আর এই ভুল করাটাও মানবচরিত্রের একটি অঙ্গ, তা ছাড়া কেউ যদি ভুল করেনো না করে তাহলে ইংরেজীতে "রিচি পারফেকশান" প্রবাদটি বোধ হয় অভিধানের পাতায় চিরকালের মত অনুপস্থিতই থেকে যেত। [ক্রমশ:

অনুবাদ—কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদনের স্মৃতিদিবস : মিনার্ভায় উদযাপিত

উনত্রিশে জুন মহাকবি শ্রীমধুসূদনের যুদ্ধদিন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের এই দিনটিতে মহাকবি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছিলেন। এ বছর লিটল থিয়েটারের অভিনায়কতায় মিনার্ভা

রঙ্গমঞ্চে এই স্মৃতিদিবসটি উদযাপিত হল মধুসূদনেরই 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ' নামক দুটি প্রহসনের অভিনয়ের দ্বারা। প্রহসন দুটির অভিনয়, প্রযোজনৈপুণ্য এবং পরিচালন দক্ষতা ক্রটিহীন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে চিত্র-গুণকই প্রাণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এঁদের অভিনয় এই উক্তিটির সত্যতাই আর একবার প্রমাণ করল। "একেই কি বলে সভ্যতা" প্রহসনটির মঞ্চসজ্জা প্রাচীনকালের রীতি অনুযায়ী দর্শকসমক্ষেই করা হয় অর্থাৎ মঞ্চ সাজানো পর্দার আড়ালে হয় নি, পর্দা ওঠবার পর দর্শকের সামনেই সাজানো হল, তারপর অভিনয় শুরু হল, প্রহসনটি শেষ হতে পর্দা নামল।

প্রহসন দুটির বিভিন্ন ভূমিকায় ধারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী উৎপল দত্ত, তরুণ মিত্র, রবি ঘোষ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য (নাট্যকার), কমল মুখোপাধ্যায়, বিধান মুখোপাধ্যায়, শ্রামল সেন এবং সর্বশ্রীমতী শোভা সেন, নীলিমা দাস, সুরমিতা দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

সখের চোর

হাল আমলের সর্বজনপ্রিয় চিত্রতারকাকে নায়কের ভূমিকা দিয়ে এবং আরও নানাভাবে ছবিটিকে জমকালো করে তোলা হয়েছে, 'হলে কি হবে, যে অন্তঃসাবিশুদ্ধ তার শুদ্ধতা বাহু আড়ম্বর বা চটকদারিতে পূর্ণ করা যায় না। ছবির নায়ক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র এবং যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন। বন্ধুদের সঙ্গে সে বাজী রেখে চুরি করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে বন্ধুবা বলেছিল যে, চুরি করা তার সম্ভব নয়, সে কখনই চুরি করতে পারবে না, এই নিয়ে বাজী হয়ে গেল। যে বাড়ীতে সে চুকল চুরি করতে, সেই বাড়ীর বর্তাটি বাইরে একজন সজ্জাত ব্যক্তি, তিতরে একটি আঁচ ডাকাত। ঘটনাচক্রে তাঁরই কঙ্কার সঙ্গে নায়কের আলাপ হয়ে গেল। আলাপ পরিণত হল ঘনিষ্ঠতার তারপর নানা ঘটনার প্রবাহের মধ্যে দিয়ে নায়ক নায়িকার মিলনে গল্পের সমাপ্তি।

যে মূল পটভূমিকাকে অবলম্বন করে ছবির গল্পাংশ গড়ে উঠেছে, সেই পটভূমিই অবাস্তব। এ কখনও সম্ভব না বুদ্ধিসম্মত যে একটি শিক্ষিত স্ত্রীমণ্ডক ভ্রমসম্মান ছিঁচকে চুরি করতে পারে কি না তাই প্রমাণ করতে বাজী ধরবে? কান ভ্রম শিক্ষিত সমাজে এ রকম বাজী ধরার প্রচলন আছে বলে আমরা তো এ পর্যন্ত শুনি নি। এই অবাস্তব পটভূমির উপর গল্প রচনা করে শুধু আপন চিত্তাশক্তির অসারতাই প্রমাণিত হয় নি সেই সঙ্গে সমাজে একটি কুৎসিত দৃষ্টান্তও যোগে যাওয়া হল। বন্ধুহাই বা কি রকম ভ্রমসম্মান যে, এই নিশ্চলীয় ব্যাপারে বাজী ধরে বা এ বিষয়ে সফলতা নিয়ে বড়াই করে। তবে নায়িকার নামের যে চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে, এ বিষয়ে



সুরমিতা সেন—হায়াবাহীর পরিবেশনার নির্মায়মান "সপ্তপদী"র নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। আঙ্গোকাচিত্র : হেন্সেন মিত্র

আমাদের প্রতিবাদ করার কিছু নেই, এই চরিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক, এবং এই সব চরিত্রের সাক্ষাত আমাদের বাস্তব জীবনে প্রচুর মিলছে। ছবিটি হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এ দেশের মানুষের "অর্থাভাব" কথাটির সঙ্গে আগশেই পরিচয় নেই, টাকাটা যেন এখানকার লোকেরা কোনরকমে খরচা করতে পারলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, যে ভাবে মুড়িমুড়িকির বা হরির লুটের মত টাকা বিতরণ করা হয়েছে তার ফলে মনে হয় যে, পরিচালক হয় তো ভেবেছেন যে টাকাটা খোলামকুচি, অস্বাভাবিকতারও সীমা আছে একটা। আর সেই নৌকো চালাতে চালাতে পানপ্যানানি গানের সেই মাদ্ধাতার আমলের টেকনিক বাংলা ছবিতে আর কতকাল চলবে?

অভিনয়শ্রেণি প্রথমেই উল্লেখ করব ছবি বিশ্বাস এবং উত্তমকুমারের নাম। এঁদের অভিনয় হয়েছে যেমনই সাবলীল তেমনই চিত্রশর্মা। অজ্ঞাত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দক্ষতার ছাপ রেখে গেলেন পাহাড়ী সান্ত্যাল, কমল মিত্র, তরুণকুমার, মন্থন মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাম সাহা, অমরেশকুমার, ছবি নন্দন মলয় বিশ্বাস চন্দ্রাদেবী, বিনতা রায়, শীলা পাল প্রভৃতি। নাট্যিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমতী বাসবী নন্দী ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

তিনজন বিখ্যাত সাহিত্যশিল্পীর কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ। বিয়ের খাতা :

প্রবীণ কথাশিল্পী ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের লেখনীপ্রসূত 'বিয়ের খাতা' কাহিনীটি চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে নির্মলদেব পরিচালনায়। সুরযোজনা করছেন নটিকতা ঘোষ। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, আশীষকুমার, অম্বুপকুমার, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, জহর রায়, সুনন্দা দেবী, পদ্মা দেবী, সন্ধ্যারানী দেবী, তপতী ঘোষ, গীতা দে, মঞ্জুলা সরকার প্রভৃতি শিল্পীরা।

বিষকল্পা :

প্রখ্যাত সাহিত্যিক জরাসন্ধের (শ্রীচাক্রচন্দ্র চক্রবর্তী) 'বিষকল্পা' কাহিনীটি জয়দেবের পরিচালনায় চলচ্চিত্রের রূপ নিচ্ছে। এতে অভিনয় করছেন বলে ষাঁদের নাম শোনা যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, নির্মলকুমার, শিলির বটব্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, পদ্মা দেবী, সুরিন্দা চৌধুরী, তপতী ঘোষ প্রভৃতির

নাম উল্লেখযোগ্য, আলোকচিত্র ও সঙ্গীতের ভার নিচ্ছেন যথাক্রমে দীনের গুপ্ত ও গৌপেন মল্লিক।

মধ্য রাতের তারা :

বঙ্গবিনী সাহিত্যশিল্পী শ্রীমতী প্রতিভা বসুর 'মধ্য রাতের তারা' নামক কাহিনীটিকে এবার আপনারা চলচ্চিত্রের আকারে দেখতে পাবেন এবং এই ছবিটিকে কেন্দ্র করে আপনারা ছবি বিশ্বাস, অতি ভট্টাচার্য, দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবন বসু, মলিনা দেবী, প্রণতি ঘোষ, মিতা চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, শীলা পাল প্রভৃতি অভিনয়শিল্পীর অভিনয়ও দেখতে পাবেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই ছবিটিতে সুরযোজনা করছেন।



রমা গঙ্গোপাধ্যায়—জনতা পরিবেশিত 'গঙ্গা'র নাট্যিক চরিত্রটির রূপদান করেছেন। আলোকচিত্র : হেমেন মিত্র।

সংবাদ বিচিত্রা

চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রপতির রাশিয়া সফর :

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্প্রতি রাশিয়া সফর করে দেশে ফিরে এসেছেন। রাষ্ট্রপতির এই পনেরো দিনব্যাপী রাশিয়া পরিভ্রমাকে উপলব্ধি করে ভারতরাষ্ট্রের ফিল্মস ডিভিসন চিত্রনির্মাণে উৎসাহী হয়েছেন। এর দৈর্ঘ্য হবে তিন থেকে চার হাজার ফুটের মধ্যে। রাষ্ট্রপতির সমগ্র রাশিয়া সফরটিকে এই ছবির মধ্যে ধরে রাখা হবে।

হলিউডে নেপালের রাজদম্পতি :

সাম্প্রতিককালে হলিউডে অভ্যাগত সম্রাট বিদেশী অভিনেদের মধ্যে নেপালের রাজ-দম্পতির নাম উল্লেখযোগ্য। নেপালের রাজা এবং রাণী সম্প্রতি স্যামেরিকা পরিভ্রমণ কালে স্বপ্নপূরী হলিউডে পরিদর্শন করেন। এরা ডিসনোল্যাণ্ডে যান এবং সেখানকার চিত্রায়ণ পর্যবেক্ষণ করেন তারপর প্যারামাউন্ট ষ্টুডিওতে ডিন মার্টিন বালি' ব্যাকলেন, জুলিয়েট শ্রোস ক্লিক রবার্টসন প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গে এঁদের সাক্ষাত হয় ও স্বাক্ষরনিময় হয়। এরপর নির্মাণমান ছবি জি-আই-সু-এর সেটে যান এবং প্রযোজক হাল ওয়ালিস এবং অশেষ জনপ্রিয় শিল্পী এলভিস প্রেসলির সঙ্গে সাক্ষাত করে আলাপ-আলোচনা করেন। হলিউডে রাজদম্পতি মোট তিনদিন অবস্থান করেছিলেন।

চিত্রাভিনেত্রী সম্মানিতা :

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সাম্প্রতিক শুভ জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রাভিনেত্রী ফ্লোরা রবসন সম্মানিতা হয়েছেন। রাণীর জন্মদিন উপলক্ষে চিত্রায়িত যে উপাধি বিতরণের তালিকা প্রস্তুত হয় সেই তালিকার এবারে ফ্লোরার নামও পাওয়া গেল। বর্তমানে ফ্লোরা একজন ডেম। তিনি ডেম অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার উপাধিতে বিভূষিতা হয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য একজন ডেম এবং একজন নাইট সমপর্ষ্যারভুক্ত এবং সমান মর্যাদার অধিকারী।

ইতালীয় অভিনেতাদের ভিনিস ফেসটিভ্যাল

বর্জনের সিদ্ধান্ত :

এবারের ভিনিস ফেসটিভ্যালের নানাপ্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ইতালীয় অভিনেতার দল এই উৎসবে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ক্যাথলিক সিনেমা সেক্টরের প্রাক্তন মুখ্যসচিব এমিলিও লোনেবোকে এই উৎসবে সভাপতিত্বে বরণ করার অন্তেই শিল্পীদের পক্ষ থেকে এই পোলবোগের স্পষ্ট, এর কারণ শিল্পী মহল লোনেবোর প্রতি মোটেই প্রসন্ন নন। লোনেবোর অসুদারনোতাই তাঁকে জনপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত করেছে। ক্যাথলিক চার্চের পক্ষ থেকে ইনি ছবি সেলার করতেন, সংশ্লিষ্ট

মহলের অভিমতে লোনেবোর ধর্ম সত্বে গোঁড়ামী ইতালীয় চলচ্চিত্রের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়।

লীলা-লীনের বিবাহ সম্পন্ন :

ব্রিটিশ চিত্র পরিচালক ডেভিড লীনের (৫৩) সঙ্গে ভারতীয় মহিলা লীলা দেবীর শুভ পরিণয় প্যারীতে গত ৪ঠা জুলাই সম্পন্ন হয়েছে। বিবাহানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মেয়র জিন মেসে এবং এই বিবাহের সাক্ষী ছিলেন চিত্রতারকা মার্গারিট ব্র্যাণ্ডো। কয়েকবছর আগে নয়াদিল্লীতে লীলা-লীনের প্রথম আলাপ, লীন এরপর কয়েকমাস ভারতে থাকেন এবং ক্রমেই লীলাদেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। লীন কিন্তু লীলার প্রথম স্বামী নন। আবার লীলাকে বিয়ে করার আগে লীনও তিনবার বিয়ে করেছিলেন, তিনটি বিবাহই বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছে। এই বিবাহে তাঁর তৃতীয় পত্নী বিখ্যাত অভিনেত্রী স্যান টড তারযোগে লীনকে অভিনয়শিল্পী জানিয়েছেন এবং বলেছেন—আই স্যাম সিওর, হি উইল বি হ্যাপি।

জিন-ষ্টুয়ার্টের বিবাহ বিচ্ছেদ :

কিছুকাল ধরেই শোনা যাচ্ছিল যে, ষ্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জারের এবং জিন সিমন্সের বিবাহবন্ধন শিথিল হয়ে আসছে এবং শীঘ্রই এই বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদে পর্যবসিত হবে। এই নিয়ে অনেকের মধ্যেই বলাবলি চলছিল।

সম্প্রতি লণ্ডনে জিনস এই কানায়ুধার অবসান ঘটিয়েছেন, তিনি প্রকাল্প বিবাহীর্নচিত্তে এই রটনার সত্যতাকে যেনে নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদিও ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক, তবু এই বিচ্ছেদ অবশ্যস্বাভাবী। গ্রাস ইস গ্রীনার ছবিটিতে জিন অভিনয় করতেন সেইজন্য তাঁকে লণ্ডনে থাকতে হচ্ছে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে এই ছবির চিত্রায়ণ সমাপ্ত হওয়ার কথা। দশ বছর আগে ১৯৫০ সালে এঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। জিন ষ্টুয়ার্টের দ্বিতীয়পত্নী। ষ্টুয়ার্ট এবং জিন যথাক্রমে ৬ই মে ১৯১৩ এবং ৩১এ জ্যুয়ারী ১৯২১ জন্মগ্রহণ করেন।

অভিনেতা থেকে প্রযোজক :

শ্রীমতী নারগিসের স্বামী সুনীল হস্তকে অভিনেতারূপেই এতদিন দেখা গেছে। শোনা যাচ্ছে এবার প্রযোজকরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার রূপদানের প্রাকালে তিনি আচার্য বিনোবা ভাবের আশীর্বাদ লাভ করেছেন।

বাঙলা ছবির প্রথম মহিলা সুরযোজিকা :

কথাচিত্রমের উত্তোগে 'দিল্লী থেকে কলকাতা' নামে একটি গল্প চলচ্চিত্রের রূপ নিচ্ছে। এতে সুরযোজনা করেছেন স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীমতী বাশরী লাহিড়ী। প্রসঙ্গতঃ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, বাশরী লাহিড়ীই বাঙলা ছবিছবির প্রথম মহিলা সুরযোজিকা।

মাসিক বঙ্গমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র।

আসামী বাঙালী

“আমরা বলিযাছি, যে বরদলই হল খ্রীষ্ট পাকিস্তানকে দিয়া রাষ্ট্রের অনিষ্টসাধন করিতে বিধায়িত্ব করেন নাই তাহাই “বঙ্গাল খেলা” আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমরা আজ লোক গণনার হিসাব উদ্ভূত করিয়া দেখাইয়াছি, যে সংখ্যা দেখাইয়া আসামে একদল আসামী আজ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সে সংখ্যা নির্ভরযোগ্য নহে। যে সরকার লোক গণনার হিসাবেও সত্যের অপলাপ করিতে বিধায়িত্ব করেন না, সে সরকারকে বিশ্বাস করা সম্ভব নহে। তাহার পর কথা—বাঙালীরা আসামে বহিরাগত নহেন। তাঁহারা অনেকে আসামের অধিবাসী। কাজেই তাঁহারা স্বাধিকারে তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে না পারিলে তাহাই অসঙ্গত ও অশ্রায় হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কংগ্রেসের সভাপতির শিলচরে আগমনের পরেই কেন তথায় “সাক্ষা আইন” জারি করা হইয়াছে? কিন্তু তাহারও পূর্বে জিজ্ঞাসা—প্রথম সপ্তাহের পরেই—হাসানামা দলনে—আসাম সরকারের ব্যর্থতায় কেন্দ্রীয় সরকার কেন আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রেরিত্ত করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন নাই? বাঙালীর—দাবী—(১) যে সরকার নাগরিকদিগকে তাঁহাদিগের মৌলিক অধিকার ধনপ্রাণমান রাখিয়া বাস করিতে দিতে পারেন না, সে সরকার অযোগ্যতার জন্য বহিষ্কৃত হইবার উপযুক্ত। এই কথাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন। সুতরাং আসামের বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করান হউক। (২) নিরপেক্ষ ভাবে আসামের লোক গণনা করাইয়া তথায় বাঙালীর সংখ্যা নির্দ্ধারিত করা হউক এবং সরকারে ও সব চাকরীতে যথাসম্ভব সেই সংখ্যানুসারে লোক নিয়োগের নির্দেশনান করা হউক। (৩) আসামে সম্প্রদায়নির্কিশেবে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের সংবিধানদত্ত অধিকার সম্ভাগের জন্য আবশ্যিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। (৪) বাহারা ভারতীয় নাগরিককে সংবিধানদত্ত অধিকারে বঞ্চিত করিতে প্রয়াসী তাহাদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের বিচারের ব্যবস্থা করা হউক। বর্তমানে আসামে বাহা হইতেছে, তাহাতে আসামই রাষ্ট্রের বাহাকে plague spot বলে তাহাই হইয়াছে। ইহার প্রতীকার দৃঢ়হস্তে ব্যবস্থার দ্বারা করিতে হইবে—নহিলে ভারতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইয়া রাষ্ট্রের বিপদ অনিবার্য হইয়া উঠিত পারে।” —দৈনিক বসুমতী।

একটি ঘটনা

“গোড়েশ্বরে সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা যেমনই বৈভৎস, তেমনই স্তম্ভকরক। স্বামী বাঙালী, শুধুমাত্র এই অপরাধেই সেখানে এক অসমীয়া নারী তাহার পুত্রকে লইয়া নাকি স্বামীর উপরে আক্রমণ চালাইয়াছে। গোড়েশ্বরের বন্দরে এই বাঙালী ভ্রমলোকের বসবাস নেহাত অল্প দিনের নয়, ত্রিংশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের। সেখানে তিনি এক অসমীয়া নারীকে বিবাহ করিয়াছেন; বিবাহের পর কয়েকটি সন্তানও তাঁহার হইয়াছে। কিন্তু যে পুত্রকে তিনি খাওয়াইছেন-পরাইয়াছেন, তাঁহার বাঙালীত্বের অপরাধটা তাহারা ভুলিতে পারে নাই। স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে ঘর করিয়াছে বটে, কিন্তু স্বামীকে ভালবাসিবার পরিবর্তে বাঙালীকে সে ঘৃণা করিয়াছে মাত্র। ঘৃণা করিয়াছে সন্তানরাও। বাঙালীদের উপর অসমীয়াদের অত্যাচার শুরু হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাই স্ত্রী গিয়া স্বামীর উপরে এবং

স্বামীর উপরে আক্রমণ চালাইয়াছে। সাবালক পুত্র নাকি পিতার মাথায় লাঠি মারিবার উত্তোগ করিয়াছিল। অসমীয়া নারীর অসীম দয়া, পুত্রকে ঠেকাইয়া তিনি বলিয়াছেন, হটুক বঙ্গাল, পতি ত বটে। কিন্তু প্রাণে না মারিলেও ভ্রমলোককে তাহারা প্রহার দিয়াছে। হাতে মারিবার পর ভাতে মারিয়াছে। সমস্ত ধনসম্পত্তি কাড়িয়া রাখিয়া তাঁহাকে গৃহত্যাগে বাধ্য করিয়াছে। এ বড় অদ্ভুত ঘটনা। বস্তত, মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি যে কতখানি উন্নত হইয়া উঠিলে এমন বীভৎস ব্যাপার ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। স্ত্রীটির সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলিব না; শুধু পুত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, বাঙালী পিতার পুত্র হইয়াও সে যদি অন্ধ অসমীয়াত্বের অহঙ্কারকেই আঁকড়াইয়া ধরে, তবে যে তাহার পিতৃপরিচয়কেই অস্বীকার করা হয়, এই সহজ কথাটাও কি তাহার জানা নাই?”

—অনন্দবাজার পত্রিকা।

দাসত্ব-প্রথা

“দাসত্ব-প্রথা পৃথিবীর বহু দেশেই আইনানুসারে বিলুপ্ত হইলেও কোন কোন দেশে উহা যে এখনও বর্তমান তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য, যে সমস্ত দেশে দাসত্ব-প্রথা বর্তমান সেখানে উহা সাধারণতঃ গোপনেই চলিতেছে। সেদিন বৃটিশ পার্লামেন্টের লর্ডস সভায় আন্তর্জাতিক দাসত্ব-প্রথা দমন সংস্থা সম্বন্ধে আলোচনাকালে জর্নৈক সদস্য প্রকাশ করেন যে, আরব দেশে এবং আফ্রিকার দাসত্ব-প্রথা এখনও প্রায় পুরাদমে চলিতেছে। বঙ্গাল আরও বলেন যে, তিনি করাসী অধিকৃত সাহারা অঞ্চলে ২০ বৎসর বয়স্ক একটি ক্রীতদাস কিনিয়াছিলেন ৩৭ পাউণ্ড ১ শিলিং দামে। ক্রয় করিবার পর তিনি দাসটিকে স্বাধীনতা দিয়া ছাড়িয়া দেন। লর্ডস সভার অপর একজন সদস্য বলেন যে, আরব দেশে, বিশেষ করিয়া সৌদি আরবে প্রায় প্রকৃষ্ণেই দাস-প্রথা চলিতেছে। কেবল চলিতেছে নহে, বাজারে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের দামও বাড়িয়া বাইতেছে। তিনি বলেন যে, আগে যেখানে একটি মুন্দরী বালিকা দাসীর দাম ছিল ১ শত ৫০ পাউণ্ড, এখন সেখানে ঐ রকম দাসী বালিকার দাম হইতেছে ৪ শত হইতে ৭ শত পাউণ্ড। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আন্তর্জাতিক দাসত্ব দমন প্রতিষ্ঠান বধাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আফ্রিকা এবং আরব দেশ হইতে দাসত্ব-প্রথা নির্মূল করিতে পারে নাই। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারী লর্ড ল্যান্ডাউন বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বিদেশে প্রচলিত দাসত্ব-প্রথার বিলোপের জন্যও বধাসাধ্য চেষ্টা করিবে। সাধু ইচ্ছা সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীন দেশগুলির গভর্ণমেন্ট এক জনগণ যদি দাসত্ব দমনের কাজে স্বেচ্ছায় অগ্রসর না হয়, তবে বাহির হইতে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কতটুকু কাজ করিতে পারিবে?”

অবশ্য, সৌদি আরবের দাগ-প্রথা সবচেয়ে বে খবর বাহির হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জিত কিনা, আমরা জানি না। —যুগান্তর।

তেলের খেল

“আমাদের অবস্থা কিউবা অপেক্ষা বহুগুণ ভালো। আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে তিনটি শোধনাগার তৈরী হইতেছে এবং নিকটবর্তী রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত আমাদের আরো দ্রুত ও স্বল্পমূল্যে প্রায় অপরিমিত পরিমাণে তেল সরবরাহ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, এতবড় বিরাট দেশের বাজার সম্পূর্ণ হাতছাড়া হওয়ার আগে তৈল সস্তাটির দশবার ভাবিতে হইবে। আজ তৈলনীতিতে দৃঢ় থাকিলে আমরা সহজেই সাম্রাজ্যবাদী তৈল কোম্পানীগুলিকে আরো বেশী নত করিতে পারি। সোভিয়েতের সঙ্গে গত পরশু দিনীতে যে নতুন তেল চুক্তি হইয়াছে তাহাতে আমাদের হাত আরো শক্তিশালী হইয়াছে কারণ সোভিয়েত কেরোসিন এবং ডিজেল তেল আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যে ভারতে পৌঁছাবে এবং তাহার মূল্য ভারতের বর্তমানের বাজার দর অপেক্ষা কম। বাজার দরের উপর ইহার প্রভাব না পড়িয়া পারে কি? খনি ও আলানিমন্তী মাল্য নিজেই বলিয়াছেন, সোভিয়েত পেট্রলজাত দ্রব্য ভারতে আসার কালে ইহার বর্তমান মূল্য ত্রাস পাইবে। আমাদের সম্মুখে এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত সাম্রাজ্যবাদী তৈল কোম্পানীগুলির খেল আর বেশীদিন চলিবে না—বদি অবশ্য আমরা এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করি ভারত সরকার ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন, ইহাই আজ ভারতের সকল শ্রেণীর সর্বসম্মত দাবি।” —স্বাধীনতা।

আসাম বয়কট

“বাজার ছাত্রসমাজ আসামের বর্করতার বিরুদ্ধে হইয়াছে। তাহাদের তীব্র বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকেও জানাইয়া আসিয়াছে। এবার কাজে নামিতে হইবে। সক্রিয় প্রতিবাদের পথ জনসম্মত নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থনৈতিক বয়কট আসামী বর্করতার শ্রেষ্ঠ জবাব। বাঙ্গালী ছাত্রেরা এই কাজে অগ্রসর হইলে আসামের বাঙ্গালী নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ হইবে। কোন্ দল এই প্রস্তাব আনিয়াছে তাহা যেন রক্ত হইয়া না ওঠে। কংগ্রেস, কমুনিষ্ট, পি. এস. পি, যে কেহ এই প্রস্তাব আনিলে তাহা আমরা সমর্থন করিতাম এবং ঐ কাজে আত্মনিয়োগ করিতে ছাত্রসমাজকে বলিতাম। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের নেতৃত্বে এই কাজে অগ্রসর হইতে লজ্জা নাই, পৌরব আছে।” —যুগবাণী (কলিকাতা)

পল্লীগামের চিকিৎসা সঙ্কট

“আমরা দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া গ্রামাঞ্চলের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সমস্যার আলোচনা করিতেছি। আমরা গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা ক্ষেত্রটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিবার কথা বলিতেছি। কেননা, গ্রামাঞ্চলের দক্ষিণ মাছুষের যেখানে দুই বেলার আহার জুটিতেছে না সেখানে অসুখ বিপদে ভিজিট দিয়া ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য নাই (গ্রামের ডাক্তার বিষয়ে পরে বসিতেছি) এবং আধুনিক বিজ্ঞান পদ্ধতিতে চিকিৎসার খাত এখন আমাদের গ্রামের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই। জনশিক্ষা ক্ষেত্রে নিরক্ষরতার

বিকল্পে জাতীয় সংগ্রামে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষক প্রেরণের মত গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসক প্রেরণের কথা আমরা বলিতেছি। গ্রামাঞ্চলের সহর অথবা উন্নত উপনগরীতে কিছু কিছু পাশকরা চিকিৎসক রহিয়াছেন, কিন্তু ইউনিয়নের মধ্যে পাশকরা ডাক্তারের ব্যবসায়ের সুযোগ নাই বলিলেই চলে। এটি চিকিৎসক পরিবারের ন্যূনতম দৈনন্দিন সংসার খরচ গ্রামে চিকিৎসা করিয়া উপার্জন হইতে পারেনা। গ্রামবাসীদের আর্থিক দুর্বলতা ও চিকিৎসা অজ্ঞতাই ইহার কারণ। তবুও ইউনিয়নের মধ্যে কিছু কিছু ডাক্তার যে না আছে তাহা আমরা বলি, এই ডাক্তারেরা হইতেছে “লক্ষ ডাক্তার”—অর্থাৎ সহরের কোন চিকিৎসকের ডিম্পেলারীর কন্পাউণ্ডার হইতে এক লাখে ডাক্তার হইয়া গ্রামে বসিয়া রোগী-নারায়ণের দৌলতে সামান্ত রোজগার করে। ইহাকে “কোয়াক” বলা হয়। কিন্তু কোয়াক বা লক্ষ ডাক্তারের হাতে নিরীহ অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের প্রকৃত চিকিৎসা হয়না, জটিল এবং কঠিন রোগের ক্ষেত্রে হাতুড়ে বৈজ্ঞানিক রোগীর কপাল বরাদ্দে ঔষধের ঘারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের লজ্জার কারণ ঘটয়া থাকে। ইহা জাতীয় লজ্জা এবং সমস্ত চিকিৎসা জগতের লজ্জা। চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ব্যবহার প্রয়োগের দিক হইতে দেশের অধিকাংশ মানুষ আজও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সামান্ততম সংস্পর্শে আসিতে পারে নাই, কেননা দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামে রাস্তা নাই, লোকবসতি সহরের মত চাউল গুণামের বস্তাভুল্য ঠাণ্ডাসি করিয়া নাই, জলকাদা ভাঙ্গিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চিকিৎসা করিতে হইলে বহু সময়ের প্রয়োজন এবং এই কারণেই সহরের ডাক্তারগণও সহসা গ্রামের কলে বাইতে রাজি নহেন। বদি যাতায়াতের মোটামুটি সুবিধা থাকে তবেই সহরের চিকিৎসক কলে বাইয়া ব্লাকমার্কেটিং বলিব না তবে মোটা টাকার দর্শনী আদায় করিয়া থাকেন যেহেতু গ্রামে যাতায়াতে যে সময় লাগে তাহাতে সহরের অনেকগুলি বাড়ীর রোগী দেখা চলে।” —বারাসাত বার্তা।

শিক্ষায় গলাদ

“আজকাল মারামারি হাজায়া ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাই গৃহীত হয় না। দেশের নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের এই চণ্ডনীতি সম্পর্কে কটাক্ষপাত করিয়াছেন এবং উপযুক্ত আইন দ্বারা উহা নিষেধ করা যায় কি না চিন্তা করিতেছেন। অনেকে ছাত্রদিগকে রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু চিন্তাশীল শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধকে শুধু ছাত্রদের একতরফা দাবি বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ রচনার যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, সেই নীতিতে বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে পঠন ও অধ্যয়ন হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ রচনার নতুন নীতি অনুসরণ করেন, কিন্তু পড়ানোর সময় কলেজ-গুলিতে সেই সনাতন নীতি অনুসৃত হয়। ইহা সত্য হইলে বিষয়টি জাতীয় গুরুতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেশের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া আজ নানা কারণে ছাত্র সমাজকে বিপথগামী করিতেছে। ছাত্রদের মধ্যে ভ্রম নিষ্ঠার অভাব ঘটিতেছে। তাহার জন্য শুধু ছাত্র সমাজই দায়ী নয়, দেশের ছেলেরা বদি প্রকৃত মানুষ হইতে না পারে নিষ্ঠাবান ও সংযত চরিত্র হইতে না পারে তাহার দায়িত্ব ছাত্রদের নয়

দেশের নেতৃত্ব বাহাদুর উপর স্তম্ভ প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই দায়ী। আইন করিয়া চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেশের চরিত্র সৃষ্টি হয় না, চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইলে সং আদর্শ উপস্থাপিত করিতে হয়। বর্তমান সমাজ একটি পঙ্গুনীতিকে আশ্রয় করিয়া চণ্ডনীতির পক্ষিল আবজ্ঞনার মধ্যে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। ইহার পরিণাম শুভ হইবে না। প্রসঙ্গক্রমে বিনোবা ভাবেজীর হৃদয় পরিবর্তনের মহান উদ্দেশ্যে মহা পরিক্রমার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাসবাসার সামাজ্য একটু আশ্রয় পাইয়া নরপিশাচ ডাকাতরা আজ দলে দলে দস্যুতা পরিহার করিয়া এক মহিমময় বলিষ্ঠ চরিত্রের ছত্রতলে আসিয়া কাঁড়াইতেছে। আর সবলমতি ছাত্রগণ ভাসবাসা এবং সহানুভূতির স্পর্শ পাইয়া বলিষ্ঠ চরিত্রের আদর্শ অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষরূপে পরিচিত হইতে পারিবে না, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়কে বিষয়টি বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।”

—ভাগীরথী (কালনা)।

একটি উপেক্ষিত রেল-ষ্টেশন

“রাণাঘাট লালগোলাঘাট সেক্ষণে বীরনগর ষ্টেশনটি আজ যরণাভীত কাল হইতে অবহেলিত এবং তাহার যাত্রী-সাধারণও উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে ষ্টেশন প্রাটিকর্ষে কোনরূপ সেড় নাট, ফলে যাত্রী-সাধারণকে দাক্ষণ বোর্ডে ও বৃত্তিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। তাছাড়া প্রাটিকর্ষে কোনরূপ পানীয় জলের ব্যবস্থা রেল কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাপি করেন নাই। ফলে বহুলোককে এক ফোঁটা জলের স্তম্ভ বিশেষ কষ্ট করিতে হয়, এমন কি ষ্টেশনে বিশ্রামাগার তো দূরের কথা কোন প্রস্রাবাগার পর্যন্ত নাই। প্রাটিকর্ষের কিয়দংশে বৈজ্ঞানিক আলোর ব্যবস্থা অজ্ঞাপি করা হয় নাই— অথচ এই রেলষ্টেশনটির উপর দিয়া দৈনিক বহু যাত্রী যাতায়াত করেন। দৈনিক ৪।৫ খানি ট্রেনের ক্রসিং হয়, প্রায় পাঁচ শত জনের অধিক মাসিক টিকিটের যাত্রী বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে কিন্তু তাঁদের প্রতি রেল কর্তৃপক্ষ আজও উদাসীন!” —কাণ্ডারী (রাণাঘাট)

বেকারদের চাকুরী পাইতে অনুবিধা

“কমলপুর : বিগত কিছুদিন পূর্বে পরিষদের মালেরিয়া নিবারক সংস্থা হইতে কতিপয় পদ পূরণের নিমিত্ত এখানকার কয়েকজন যুবকের যথারীতি সাক্ষাৎকার লওয়া হইলেও স্থানীয় যুবকদের উপেক্ষা করিয়া আগরতলা হইতেই পদ পূরণ করা হয়। ইহার পূর্বেও আরও অনেকবার স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারভিউ ডাকিয়া আগরতলা হইতেই লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল।”

—সেবক (আগরতলা)

শোক-সংবাদ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বর্তমান কালের অস্তম শ্রেষ্ঠ কবি বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাত্তরী মনস্বী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত গত ১০ই আষাঢ় রাত্রি সাড়ে তিনটের সময়ে ৫১ বছর বয়সে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে দেহব্যক্তি

করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দেশবন্দিত বৈদান্তিক পর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাঙালি নাট্যজগতে ২য় চম্ব নিকপাল মহারথী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং জাতীয়তার পূজারী ১ বীর রাজা সুবোধ মল্লিক বধাক্রমে কবির খুলতাত এবং মাতুল। ১৯০১ সালের ৩০এ অক্টোবর কবির জন্ম। বাল্যকালে য্যানি বেসান্তের তত্ত্বাবধানে বারানসীতে সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন করেন। গ্রাজুয়েট হওয়ার পর শিক্ষানবীশ হিসেবে কিছুকাল পিতা হীরেন্দ্রনাথের সলিসিটার কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২১ সালে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। ১৯৩১ সালে “পরিচয়” পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। যুদ্ধের সময়ে ইনি এ-আর-পিতে যোগ দেন, তার পর একটি ইংরেজি দৈনিকে করগ্রহণ করেন। এর পর তাঁকে দেখা গেল ডি, ভি, সির চীক ইনফরমেশন অফিসাররূপে। সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপক হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানালেন (১৯৫৭-৫৯)। শেষ জীবনে ইনি বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনার রত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির মধ্যে তরী, অর্কেষ্ট্রা, উত্তরকান্তনী, সংবর্ধ, প্রতিধ্বনি, ক্রন্দসী, দশমী, স্বগত এবং কুলায় ও কালপুরুষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ফরাসী ও জার্মান ভাষায় তাঁর বখেই দখল ছিল। সুধীন্দ্রনাথের লোকান্তরে বাঙলা তথা ভারতের মনীষা পাণ্ডিত্য এবং মেধার জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হ'ল।

ডক্টর প্রকৃতিকুমার ঘোষ

ভারতবিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক ডক্টর প্রকৃতিকুমার ঘোষ বিমান দুর্ঘটনার সপত্তী গত ৫ই আষাঢ় '৬১ বছর বয়সে নিহত হয়েছেন। ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অস্তমতম। ১৯২১ সালে ইনি স্নিগ্ধলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ায় এবং ১৯৫৪ সালে ভূতাত্ত্বিক হিসেবে আণবিক কমিশনে যোগ দেন। ১৯৫৮ সালে ইনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

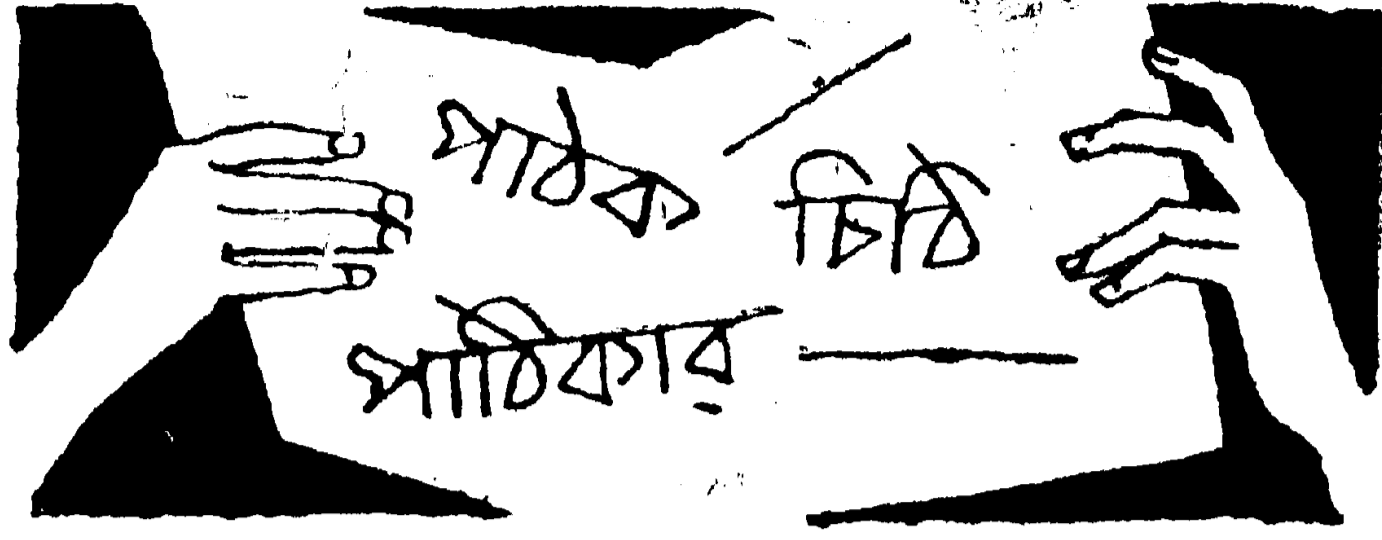
কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা গত ২৭এ আষাঢ় ৬১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইনি আইন ব্যবসায় ছেড়ে পুরোপুরিভাবে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সাময়িকপত্রসেবী হিসেবেও ইনি প্রভূত সুনামের অধিকারী ছিলেন।

তপেন্দ্রনাথ সেন

প্রখ্যাত গ্যাটার্নি তপেন্দ্রনাথ সেন গত ২২এ আষাঢ় রাত্রি ৪৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ গ্যাটার্নি স্বর্গীয় শ্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের পৌত্র ছিলেন। গ্যাটার্নি হিসেবে ইনি বখেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং সংশ্লিষ্ট মহলে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

সম্পাদক—প্রোগ্রামতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিনিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, “বঙ্গমতী রোটারী বেসিনে” শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়—

আমি 'মাসিক বনুমতীর' একজন অসুখাঙ্গী পাঠিকা। 'মাসিক বনুমতীর' প্রতিটি রচনা আমি পড়ে থাকি অত্যন্ত একাগ্রতার সাথেই এবং আমার অত্যন্ত ভালো লাগে পড়ে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ (১৩৬৭) মাসে শ্রীযুক্ত গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'চলার পথে' নামক ভ্রমণ কাহিনীটি পড়ে কয়েকটি কথা না লিখে কিছুতেই পারছি না। লেখকের সাইকেলযোগে সকল বিশদাশঙ্কা তুচ্ছ করে দুর্গম পথসমূহ অতিক্রমের প্রয়াস বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ততোধিক প্রশংসনীয় লেখনীর মাধ্যমে সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সামনে পরিবেশনের প্রচেষ্টা। লেখকের লিপিকুশলতার ভ্রমণ কাহিনীটি সত্যিই উপজীব্য হয়েছে। কিন্তু লেখক একস্থানে খাসিয়া এবং মণিপুরীদের সম্বন্ধে যে কয়টি লাইন লিখেছেন, তার প্রতিবাদকল্পেই এই পত্র লেখা। এখানে বলা প্রয়োজন যে আমি নিজে মণিপুরী এবং মাসুয় হয়েছি শৈশবকাল থেকেই শিলঙে থেকে। কাজেই উপরোক্ত দুই জাতি সম্পর্কে আমার জ্ঞান লেখক অপেক্ষা অধিক বলা যায়। লেখক খাসিয়াদের সম্বন্ধে বা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করছি—“এদের পুরুষেরা অধিকাংশ থাকির হাকপ্যাট এবং কালো ফতুয়া পরে, মাথার কালো কেজের মত টুপী একটা আঁটে, কতকটা নেপালীর মত কিছু লম্বা টিকি এদের মাথার নাই। এরকম পোষাক গারো, লুসাই, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, মণিপুরী ও নাগাদের মধ্যে চলন আছে। বারা লেখাপড়া লিখেছে তাদের সাধারণতঃ কোটপ্যাট পরতে দেখেছি। মেয়েদের পরিচ্ছদ তাজ্জব ধরণের। আমি যে কয়টি জায়গার নাম উল্লেখ করছি, তাদের কথাই বলছি। কালোর ওপর লাল ডোরাকাটা ব্লাউজ পরে আর কোমরে একটা মোটা রকমের লম্বা ওড়নার মতন জড়িয়ে যায়, বারা একটু শিক্ষিতা তারা ঐ ওড়না একটু দামী গোছের ব্যবহার করে আর তার সঙ্গে পেটকাটা ব্লাউজ ও বডিস ব্যবহার করে, এদের হাতে মাঝে মাঝে ড্যানিটি ব্যাগ দেখা যায়।” লেখক হয়ত তাঁর বর্ণিত পোষাক পরা খাসিয়া পুরুষদেরই দেখেছেন। কিন্তু বতব্বর জানি খাসিয়ারা লম্বা প্যাটই বেশী পরে। শিলঙের মত শীতপ্রধান জায়গায় লম্বা প্যাট পরাটাই স্বাভাবিক। কয়েকজন হাকপ্যাট পরলেও তা যে থাকি বেশী তা বলা উচিত নয়, অস্ত্রাঙ্গ রঙের প্যাটও তারা পরে। আর খাসিয়ারা টুপী পরে নানা রকমের। অনেক টুপী মোটেই পরে না। শিক্ষিত এবং সহরবাসীদের মাঝে শতকরা ২১ জনের মাথার মাত্র টুপী দেখা যায়। টুপী দেখা যায় তাদের মাথায় বারা প্রায়, অশিক্ষিত, দিনমজুরী করে এবং বাজারে বসে। লেখকের বর্ণিত খাসিয়াদের জায় পোষাকে মণিপুরী, নাগা, গারো, জয়ন্তিয়া, প্রভৃতিদেরও

দেখেছেন বলেছেন। অস্ত্রাঙ্গ জাতির কথা বলতে পারি না তবে মণিপুরীরা কখনও এরূপ পোষাক পরে না তা জোর করেই বলতে পারি। মণিপুরীদের পোষাকের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিচ্ছি। মণিপুরী ছেলেরা বাড়ীতে সাধারণতঃ বেশ বড়, প্রায় ধুতির মত গামছা পরে। তাছাড়া ধুতিই হল তাদের প্রধান পোষাক। অবশ্য বর্তমানে অস্ত্রাঙ্গ প্রদেশের মত ছেলেরদের অধিকাংশকেই কোটপ্যাট পরতে দেখা যায়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে মণিপুরীরা কখনও টুপী পরে না। আর উৎসবাদিতে তারা সকলেই ধুতি পরে উপস্থিত থাকে, তখন প্যাট পরা নিশ্চয়ই বলে বিবেচিত হয়।

এখন খাসিয়া মেয়েদের পোষাকের কথা আসি। লেখক খাসিয়া মেয়েদের পোষাকের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা যে অত্যন্ত ভুল করেই দিয়েছেন তা বুঝতে পারছি। আসামে বহু জাতির বাস। তাই দিন ছয়েকের জন্ত আগত বিদেশীর পক্ষে এক জাতির ভাষা, আচার ব্যবহার এবং পোষাককে অস্ত্র জাতির বলে ভ্রম করা মোটেই আশ্চর্যের নয়। এখানে লেখক যে পোষাকের কথা লিখেছেন সে পোষাকে খাসিয়া মেয়েদের কখনও দেখা যাবে না। লুসাই মেয়েদের পোষাকেই লেখক খাসিয়া মেয়েদের পোষাক বলে ধরেছেন। তবে সাধারণ মেয়েরা কালোর ওপর লাল ডোরাকাটা ব্লাউজ পরবে কি শিক্ষিতারা পেটকাটা ব্লাউজ পরবে এ সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কৃতি, শিক্ষা এবং ধনীদরিজের প্রকারভেদে সেটার প্রকারভেদ হয়ে থাকে, যেমন হয়ে থাকে বাঙালী মেয়েদের শাড়ী ব্লাউজের মধ্যে। খাসিয়া মেয়েরা সকলেই পরে লম্বা ফ্রক। তার ওপরে কাঁধের ওপর দুদিকে ছোটো চারকোণা কাপড় বগলের নীচ দিক দিয়ে এনে বেঁধে রাখে। তার ওপরে একটা ছোট গোছের চাদরে ঘোমটা দিয়ে সামনে এনে তারপরে পেছনে টেনে গলায় পেছনে বেঁধে রাখে। এই হল অধিকাংশ খাসিয়া মেয়েদের, বারা খেটে খায় তাদের পোষাক। আর বারা শিক্ষিতা ও আধুনিকার্ণী কলেজে পড়ে অথবা চাকরী করে তারা তার ওপরেও একখানা বড় গরম চাদর কাঁধের কাছ দিয়ে সামনে এনে বুকের কাছে বেঁধে রাখে। আর ছোট মেয়েরা ফ্রকের ওপর একটা ছোট চাদরে ঘোমটা দিয়ে সামনে এনে পেছনে টেনে রাখে। খাসিয়া মেয়েদের এরূপ গরম আর ভারী পোষাক পরার কারণ—শিলং অত্যন্ত শীতপ্রধান জায়গা যেটা তাদের বাসস্থান। মণিপুরী মেয়েরা পরে ব্লাউজ ও নীচে লুণীর মত একখানা মোটা কাপড়, তার ওপরে ওড়না দেয়। এখানেও প্রত্যেক জাতের মধ্যে যেমন দেখা যায় সেভাবে বয়স, অবস্থা এবং কৃতির প্রকারভেদে পোষাকেরও এদিক ওদিক হতে পারে। এইত গেল পোষাকের কথা। এখন খাসিয়া মণিপুরীদের সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখক রাহা লিখেছেন তার বিরুদ্ধে

কিছু বক্তব্য আছে। বাসিয়াদের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত বর্ণনাটির বিকল্পে বলায় বিশেষ কিছু নেই। হ্যাঁ, এদের সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্যটাই বেশী। এক কথায় এদের সমাজকে Matriarchal Pattern of Society বলা চলে। কারণ বিয়ের পর মেয়েদের পরিবর্তে পুরুষেরাই বায় স্ত্রীর ঘরে। তাছাড়া স্ত্রী পায় সম্পত্তি। দোকানে এবং বাজারে বসে অধিকাংশ মেয়েরাই। কিন্তু কাঠ কাটা এবং রান্না করা ব্যতীত পুরুষের আর কাজ নেই বলা উচিত নয়। বহু পুরুষেরাও চাকরী করে, বাজারে বসে এবং অন্যান্য বহু কাজও করে। এর পর মণিপুরীদের সামাজিক আদব-কায়দা সম্পর্কে লেখক যে অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন সেটা পড়ে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছি। লেখক লিখেছেন, মণিপুরীদের অতিথি হলাম। গ্রামসেবক আমায় আশ্রয় দিল। আমার আসার খবর দিল সারা মহল্লায়। দুন্দুভি বেজে উঠল, বাজল মাদল। লোকনৃত্যের মহড়া চলল কিছুক্ষণ। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের অভিনয় হল। কেঁদো স্নেহ মদ খাইয়ে ঘণ্টা দুই ঘণ্টা আনন্দের বড়া বহে গেল যোয়ার বনে। পরের দিন সকালে এ রহস্যের তথ্য আবিষ্কার করলাম। অতিথি পরিচর্যার রীতি এদের এইরকম—কুমারী মেয়ের ভাগ্যে যদি একশটি অতিথি বরণ করার সৌভাগ্য ঘটে তবে তিনি সত্যি পুণ্যবতী। আমি নিজে মণিপুরী কিন্তু মণিপুরীদের মাঝে এরূপ কোন রীতি আছে বলে জানিনা। লেখক হয়ত জানেন না যে মণিপুরীরা হিন্দু, তার ওপরে বৈষ্ণব। মদ ত দূরের কথা, মাংস ডিম খাওয়া পর্যন্ত তাদের সমাজে নিষিদ্ধ। মণিপুরে বহু বাজালীর বাস, তারা একথা ভালভাবেই জানেন। তবে প্রত্যেক সমাজেই যেমন আছে তেমনি মণিপুরেও কতকগুলি বেপরোয়া ছেলে মাংস ডিম খায় এবং মাঝে মাঝে লুকিয়ে মদও খেতে পারে। সেটা হল ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু প্রকৃত্তে এভাবে মদ খেয়ে হালোড় করা মণিপুরী সমাজে কল্পনাও করা যায় না। এসম্পর্কে মণিপুরীরা এমন গোঁড়া যে কয়েক বছর পূর্বেও কেউ মদ স্পর্শ করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হত এবং প্রায়শ্চিত্ত করার পরে তাকে ক্ষমা করা হত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মণিপুরবাসীদের চারদিকে বহু পার্শ্বত্যাগীর বাস। আমার মনে হয় লেখক যখন লিখেছেন তখন নিশ্চয় ঘটেছিল এরূপ ঘটনা, কিন্তু তিনি কখনও মণিপুরীর বাসায় থাকেননি, কোন পার্শ্বত্যাগীর মাঝে থেকেছিলেন। যে কোন লেখকেরই কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করার পূর্বে—সে মন্তব্য ভালই হউক আর মন্দই হোক—উহার সত্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাচাই করে দেখা উচিত মনে করি। ভুল তথ্য পরিবেশন করার ফলে যে জাতির সম্বন্ধে লেখা হয় শুধু তার প্রতিই অবিচার করা হয়না। পাঠক-পাঠিকারও তাতে বহু ক্ষতি হয়। উপরন্তু যে কাগজে সে রচনা বেরোয় সে কাগজেরও বদনাম ঘটে। আর দু-একদিন থাকার পরে সে জানের ওপর নির্ভর করে কোন কিছু লেখাও চলেনা; সে বত অল্প কথাই হোক। স্বীকার করি, লেখক ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন, কোন জাতির সম্বন্ধে কিছু লিখেননি। কিন্তু সে ভ্রমণ কাহিনীর কঁাকে কঁাকে কোন জাতির কথা বখন আসবে তখন সেটা চিন্তা করে লেখা উচিত নয় কি? ভবদীয়া মিসেস উবা দেবী—চাকুরিয়া কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Herewith Rs. 15/- only as subscription to M. Basumatī.—Maharani Adhirani Sahiba, Baster, Madhya Pradesh.

Kindly continue to send Masik Basumatī for a further period of one year.—Lilaboti Mukherji, Kanpur.

মাসিক বসুমতী পত্রিকার বাৎসরিক টাঙ্গা ৭।।০ টাকা পাঠাইলাম।—মীনারী চৌধুরী, ধানবাদ।

Herewith sent Rs. 15/- as annual subscription for Monthly Basumatī from Baisakh this year.—Saraswati Panigrahi, Puri.

মাসিক বসুমতীর জন্ম বাংলা ১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে এক বৎসরের টাঙ্গা পাঠাইতেছি।—মহুজা মিত্র, কিরোজাবাদ, আগ্রা।

Herewith please find subscription for six months from Baisakh to Aswin for the current year.—Sm. Niharika Roy, Delhi.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক টাঙ্গা পাঠাইলাম।—মীরা আল, পুরী।

I send herewith Rs. 15/- for annual subscription of Masik Basumatī.—Baghjan Indian Club, Assam.

মাসিক বসুমতীর টাঙ্গা পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে আধিন অবধি ছয় মাসের।—উবা মুখার্জী, প্রতাপগড়, ইউ-পি।

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক টাঙ্গা বাবদ ৭'৫০ পাঠাইলাম।—বেবারাণী সমাদার, আলিপুরছয়ার, জলপাইগুড়ি।

১৩৬৭ সালের মাসিক বসুমতীর টাঙ্গা ১৫৭ টাকা পাঠাইলাম।—অনীতা দাস, পাটনা।

Remitting herewith Rs. 15/- being the annual subscription of Monthly Basumatī from Baisakh 1367 B.S.—Sm. Arati Rani Seriha, Chanda Maharashtra.

মাসিক বসুমতীর আগামী ছয় মাসের টাঙ্গা ৭।।০ টাকা পাঠাইতেছি।—অর্ণা সাত্তাল, হাজারিবাগ।

মাসিক বসুমতীর ১৩৬৭ সনের গ্রাহকমূল্য ১৫৭ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী বিভা মুখার্জী, দিল্লী।

Please find herewith Rs. 15/- towards advance subscription for Masik Basumatī for the year 1367 B.S.—Mrs. C. Kar, M. Sc. Goalpara, Assam.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টাঙ্গা ১৫৭ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সুলতানা রায়, মালদহ।

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী বীণা দত্ত, আয়েলাবাদ।

Remitting herewith Rs. 7.50 being subscription of Monthly Basumati from Baisakh to Aswin.—Mrs. Ava Biswas B. A. (Hons) Hazaribagh.

বৈশাখ মাস থেকে এক বৎসরের গ্রাহকমূল্য ১৫ টাকা পাঠাইলাম।—অর্ণা ত্রিবেদী, বোম্বাই।

আমার দেয় মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ৭।।০ টাকা পাঠাইলাম।—তৃপ্তি বসু, লক্ষ্মী।

Have been impressed watching progress of Masik Basumati year to year. Kindly renew my subscription from Baisakh.—Miss Mahasveta Dutta, Sholapur, Maharashtra.

Remitted Rs. 7.50 being half-yearly subscription for the magazine Monthly Basumati.—Mrs. Mayarani Das, Tripura.

I am sending herewith Rs. 15/- as the subscription of Monthly Basumati.—Begum Akhter Unessa, Barharwa, (S.P.)

বর্তমান বৎসরের জ্যৈষ্ঠ হইতে চৈত্র পর্যন্ত চাঁদা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, দার্জিলিং।

I am sending 7.50 as subscription from Baisakh to Aswin.—Susama Chowdhury, Bolpur.

Sending herewith Rs. 7.50 being the amount for the subscription for six months.—Sm. Kamala Roy, Mehsena.

ছয় মাসের মাসিক বসুমতী পত্রিকার মূল্য পাঠাইলাম। ১৩৬৭ সনের বৈশাখ হইতে বখারীতি পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী দেবী, জলপাইগুড়ি।

চলতি বৎসরের গ্রাহকমূল্য ১৫ টাকা পাঠাইলাম।—মায়ী গঙ্গাধর, আনাম।

Please find herewith Rs. 10.50 nP. being the half yearly subscription including registration fee

of your monthly Basumati. Kindly send the magazine regularly by registered post.—Sadhana Aditya, N. H. T. A.

মাসিক বসুমতীর বৈশাখ হইতে চৈত্র (১৩৬৭) পর্যন্ত এক বৎসরের চাঁদা বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী বসু, কলিকাতা।

Herewith please find the annual subscription of Masik Basumati for 1367 B.S.—Pratima Moitra, Assam.

বসুমতী মাসিক পত্রিকার (১৩৬৭) জ্যৈষ্ঠ ১৫ টাকা পাঠাইলাম।—মায়ারানী বসু, বোম্বাই।

১৩৬৭ সালের চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতীমালা ঘোষ, ধানবাদ।

Sending herewith Rs. 7.50 being the subscription (Renewal) for the next six months from Baisakh.—Mrs. Amola Mukherjee, Darbhanga.

১৩৬৭ সালের মাসিক বসুমতীর গ্রাহক মূল্য বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম।—Rina Roy, Jalpaiguri.

১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত মাসিক বসুমতীর মূল্য বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম।—Sm. Nirmala Roy, Lucknow.

১৫ টাকা মণি জর্ডার কোরে পাঠাইলাম। দয়া করিয়া আমাকে বৈশাখ সংখ্যা হইতে গ্রাহিকাশ্রয়ীভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন।—মঞ্জু দত্ত, বোম্বাই।

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ১৫ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠালে বাধিত হব।—মঞ্জুী ভট্টাচার্য, কাটমতু, নেপাল।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র অবধি মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী রমারানী মিত্র, দিল্লী।

মাসিক বসুমতীর ৬ মাসের মূল্য বাবদ ৭।।০ টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে আধিন মাস পর্যন্ত, নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধী করিবেন।—রাণু সেন, মহলপুর।

মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)		ভারতবর্ষে	
বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ২৪	প্রতি সংখ্যা	১.২৫
বাৎসরিক " "	— ১২	বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ১.৭৫
প্রতি সংখ্যা " "	— ২	পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)	
		বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ	— ২১
		বাৎসরিক " " "	— ১০.৫০
		বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	— ১.৭৫
(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	— ১৫		
" বাৎসরিক সডাক	— ৭.৫০		

মাসিক বসুমতী কিছুল মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বন্ধন ●



RNME
Cool

মাসিক বসুমতী
শ্রাবণ, ১৩৬৭

(তৈলচিত্র)

বিদ্যুৎমিতা
—ঐবি, বি, পালচৌধুরী অঙ্কিত



মাসিক ফুলমতি

৩৯শ বর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৬৭]

। স্থাপি ৩২৯ বঙ্গাব্দ ।

[প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

হিন্দু কি জড়োপাসক ?

যতদূর আমার অঙ্গুলিটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, ততদূর ঐ অঙ্গুলিটি চেতনাময়, কিন্তু অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলে, উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, ইহাতে আর চেতনা থাকে না, তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ।

এই সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তির আধার সকল, অর্থাৎ অগ্নি বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সকল সেই দেহের অঙ্গ বিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতন্যময় পুরুষের অঙ্গ বলিয়া জানি, অগ্নিকে সেই চৈতন্যময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বুঝিব। আর যিনি অগ্নির সহিত সেই চৈতন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না, তাঁহার কাছেই অগ্নি জড় পদার্থ।

আজ-কালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অগ্নিকে (gneous principle) জড় বলিয়া জানেন, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণ অগ্নির সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ

বুঝিয়া উহাকে চেতন বলিয়া বুঝিতেন। আজ-কালকার পাশ্চাত্যগণ অগ্নিগত শক্তিকেই (Heat) জগতের আদি শক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু ঋষিগণও এই অগ্নিকে জগতের আদি শক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তবে প্রভেদ এই—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অগ্নি জড়শক্তি, প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের অগ্নি চেতনায়ুক্ত।

প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য চলিতেছে। এই প্রণবমন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হিন্দুরা বুঝিয়াছিলেন যে, এই অগ্নিগত শক্তি হইতেই এই জগৎচক্র ঘুরিতেছে। কিন্তু এই অগ্নিগত শক্তি যে চৈতন্যসম্বন্ধরহিত, ইহা তাঁহারা কখনও ভাবিতেন না। হিন্দুদের কাছে প্রণবমন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি ব্রহ্মচৈতন্যে চেতনায়ুক্ত।

ওঁকারস্থ ব্রহ্মঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা সর্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

—বকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শহীদ খুদিরাম ও কুমুম মাসী

অমিয় ভট্টাচার্য

এক

শহীদ খুদিরাম অনির্বাণ বহ্নিশিখা। যতদিন স্বাধীন-ভারত বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন খুদিরামকে কেউ ভুলবে না। খুদিরাম বিপ্লবের অক্লান্ত ভাবমূর্তি। খুদিরামের জালা আঙুন বৃকে করে যে মহীয়সী নারী তিলে তিলে দগ্ধ হল সকলের অপোচরে, স্বয়ং খুদিরামের কাছেও যার পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত হল না,—সেই কুমুম মাসীকে না জানলে, খুদিরামের জীবনের তথা বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় বাঙ্গালীর কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে। আজ তার কথা বলতেই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা।

দুই

১৯০৫ সাল। ঋষি অরবিন্দের নির্দেশে গঠিত গুপ্ত সমিতি মেদিনীপুরের কর্ণেলগোলা মহল্লার সভাসংস্থায় সমৃদ্ধ হচ্ছে। এই



খুদিরামের ভাগিনের ও বালাসঙ্গী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়

গঙ্গারিবন্দীর জীবন-কথা, লক্ষ্যরাম গণেশ দেউড়রের 'দেশের কথা' প্রভৃতি গ্রন্থ।

এই মুক্তিযজ্ঞের হোতা ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতৃপুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু,—পুরোহিত তাঁর সহোদর সত্যেন্দ্রনাথ বসু, উদগাতা,—বিপ্লবীদের তৎকালীন নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

আর খুদিরাম এই যজ্ঞে উৎসর্গকৃত-জীবন এক হৃদয় ব্যক্তিক।

তিন

খুদিরাম তখন মেদিনীপুর মানিকপুর মহল্লার তার ভগিনীপতি অনুভলাল রায়ের বাড়ীতে থাকত। ঐ বাড়ীর সদর মহল ও

ভাগিনের ও বালাসঙ্গী ললিতমোহন থাকত ঐ সদর মহলের একটা কুঠরীতে।

মানিকপুর থেকে কর্ণেলগোলা গুপ্ত সমিতির দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল। খুদিরাম রোজ সন্ধ্যার সমিতির চালাঘরে উপস্থিত হত, কাজ শেষে নতুন জীবনের সক্ষম নিয়ে যখন গভীর রাত্রে বাসায় ফিরত, মানিকপুরের পল্লী অঞ্চলে তখন জীবনের কোন সাড়া থাকত না। অন্ধরমহলে মাতৃস্বরূপা স্নেহময়ী দিদি অপরূপা দেবী (যিনি খুদিরামের 'কীন্তিকলাপ সবই জানতেন,—অথচ প্রকাশ করতেন না) সেলাই হাতে নিয়ে জেগে বসে থাকতেন, আর সদর-মহলের কুঠরীতে ললিতের বর্ষাক্ত প্রতীকা নিদ্রায় অবহর হয়ে পড়ত। তারপর অকস্মৎ সেই কুঠরীর দরজার বাজত খুদিরামের সূচু করাঘাত। ঘুমে চুলু-চুলু চোখে ললিত দরজা খুলে দিত, মাঝে মাঝে বিরক্তির সুরে বলে উঠত : 'তোমরা দেশোদ্ধার তো আমনিই করবে বুঝতে পারছি,—মাঝখান থেকে আমরা আর কতকাল তোমার জন্ত না খেয়ে রাত জাগব, বলত ?'

হেসে বলত খুদিরাম :—'ধুব কষ্ট হয়, না যে। তা, কি করবো বল ? রাত জাগা তো নয়, রাতের তপত্না ; ঐ তপত্না না হলে মুক্তির প্রভাত আসবে কেমন করে ?'

চার

এমনি করেই দিন যায়, প্রতীকার রাতও গড়িয়ে চলে।

অবশেষে, একবার অপরূপা দেবীকে বিশেষ কাজে তাঁদের হাটবোছরির প্রাচীরে বাড়ীতে যেতে হল। মানিকপুরের বাড়ীতে রক্তের ভার পড়ল রামধন পাণ্ডা নামধের এক উৎকলবানী পাচকের উপর।



মেদিনীপুর বাজারটাউনে খুদিরামের আবাসস্থল



অমৃতবাবুর বাটার সম্মুখ ভাগ (এই বাটাতে খুদিরাম থাকতেন)

অপরূপা দেবী বা পারতেন, বেতনভুক পাচক তা পারবে কেন? সে স্পষ্ট বলে দিল,—খুদিরামের জন্ম অত বেশী রাত ভাত নিয়ে বসে থাকতে পারবে না।

খুদিরাম বলল :—‘বেশ। তোমাকে রাত জাগতে হবে না। তুমি রাত দশটার মধ্যে রান্না শেষ করে আমার আর হাবলের (লালিতের ডাক নাম) খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে আঙুড়ায় চলে যেয়ো।’ রামধন তাই করল। বোজ রাত দশটার সে চলে যায়। খাবার ঢাকা থাকে অন্দর মহলে। গৃহকর্তা অমৃতবাবু জানতেও পারেন না, কখন জাগ্রত প্রহরী ললিত খুদিরামকে দরজা খুলে দিয়ে অন্দর মহলে নিয়ে আসে, আর কখনই বা তারা খাওয়া শেষ করে সদর মহলে কিরে যায়।

এক রাতে ঘটল বিপত্তি। খুদিরামকে নিয়ে অন্দরে এসে সবিম্বয়ে ললিত দেখল—বেড়াল এসে ঢাকা খুলে ফেলে সব খাবার খেয়ে গেছে। ফুল্লিবৃষ্টির জন্ম করেও কিছু নেই। অথচ দুজনেই ক্ষুধায় অবসন্ন।

খুদিরাম স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস ভঙ্গীতে বলল : ‘তা ভালই হল রে হাবল। মাঝে মাঝে উপোস দেওয়া ভাল। শরীর ভাল থাকে। আজ না খেয়েই থাকা যাক, কি বলিসু। একটা রাতই তো।’

চাপা ক্রোধে গর্জে উঠল ললিত : ‘তোমরা সন্তানের দল। তোমরা দেশোদ্ধার করবে,—সবই তোমরা পারো মামা! কিন্তু আমাদের ষিঙে প্রচণ্ড,—। বসে থাকতে পারব না। চলো বেরিয়ে পড়ি, দোকান থেকেই খাবার টাবার কিছু খেয়ে আসি।’

ছটি কিশোর বেরিয়ে পড়ল খাবারের অন্বেষণে সেই গভীর রাত্রে অন্ধকার পল্লী-পথে।

কোথায় খাবার? দোকান সব বন্ধ। ললিত রাগে গজ গজ করছে। খুদিরাম হাসছে। বলছে : ‘বললাম, উপোস দিতে এক রাত। গারলি নে তো। এখন বোঝো,—কেমন মজা।’

হঠাৎ পাশের কুটারের ভেজানো দরজা খুলে গেল। দেখা দিল এক নারীমতি।

—‘কে যে তোরা, এত রাতে?’

—ললিত চমকে উঠল ‘ঐ তো! ঐ তো কুসুম মাসী! ঠিক হয়েছে! তাইতো মনেই হয় নি তার কথা।’

পাঁচ

কুসুমকুমারী থাকত অমৃতবাবুর বাটার পশ্চিম দিকে, একটি মাটির ঘরে। উদ্ভিন্ন-বৌবনা, বালবিধবা। যে নারীর আশ্রয়ে সে বাস করত, পল্লীতে তার চর্নাম ছিল পতিতা বলে, তবুও চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে কুসুমকে খুবই ভালোবাসতেন অপরূপা দেবী, এবং সেই ভালোবাসার টানে কুসুমের অবাধ বাতায়িত ছিল অমৃতবাবুর বাড়ীতে। কুসুমের দিদি সখোথনে অপরূপা দেবী পুস্তক তৃপ্তি লাভ করতেন। আভিজাত্যের কৌলীজ স্নেহের রসে অভিভূত হয়ে এক অপূর্ব মমতার বোগস্বরূপ রচনা করেছিল দুইটি নারীর মধ্যে। ডালের বড়ী বিক্রী করে কুসুম জীবিকা নির্বাহ করত। তাই অনেক রাত পর্যন্ত তাকে ডাল বাঁটতে হত।

কুসুমও রাত জাগে। খুদিরামও রাত জাগে। কুসুম রাত জেগে ডাল বাঁটে—আর খুদিরাম রাত জেগে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে।

আর, এমনি করেই রাতের পর রাত কাটে।

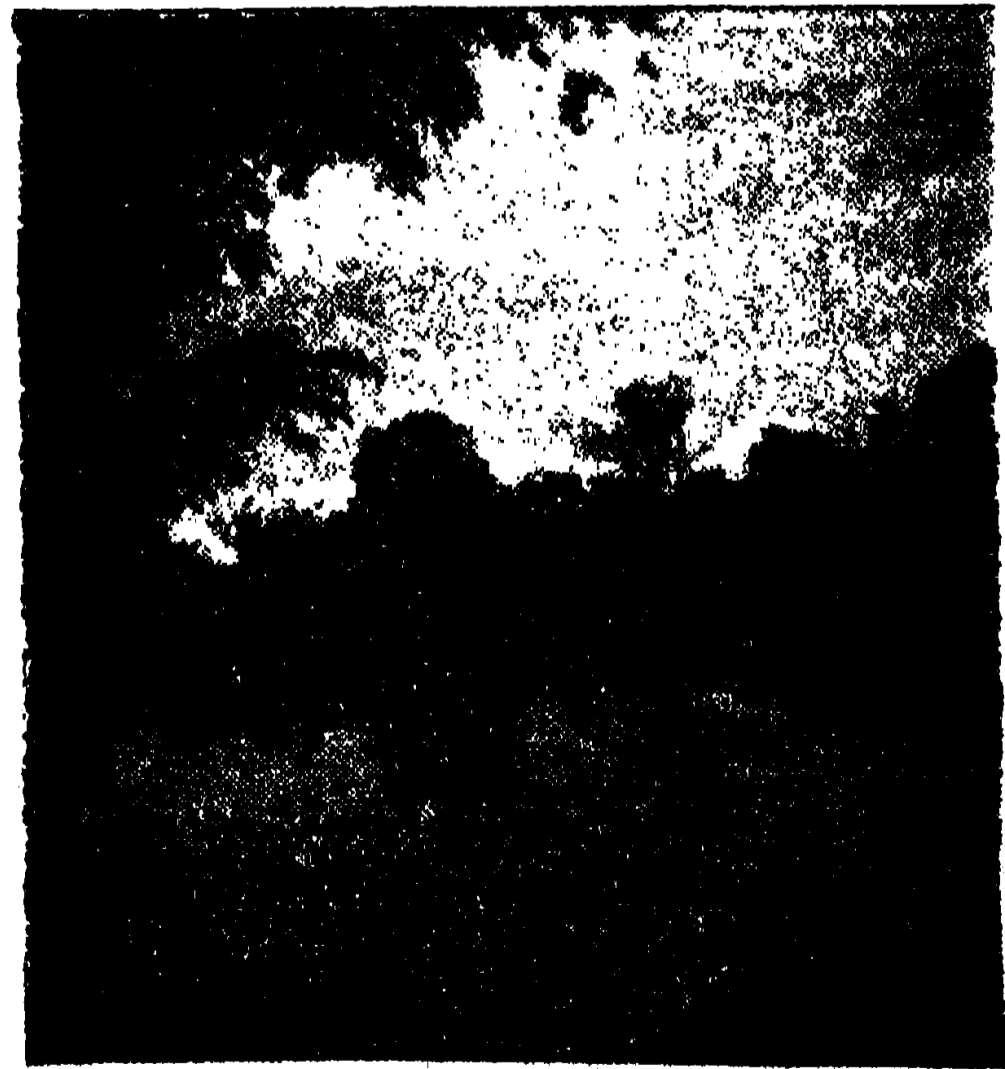
ছয়

কুসুম বলল : এসো, দুজনে ভেতরে এস। খাবার আছে। দুজনেরই হবে।...জজ্ঞা কি? এসো, খাবে এসো।

খুদিরাম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন দেখছে কুসুমের দিকে চেয়ে। লঠনের স্বপ্ন আলোকে ঠিক ঠিক করছে কুসুমের হাতে কি ওগুলো?

ললিত অস্থির হয়ে উঠেছে : মামা, চলো, দাঁড়িয়ে বইলে কেন? কুসুম মাসী ডাকছে। খেয়ে আসি চলো।

খুদিরামের দিকে চেয়ে এবার ললিত আর কিছু বলতে পারল না। বিরক্তি, ক্রোধ, ঘৃণা খুদিরামের মুখে পুঞ্জীভূত হয়ে এক উদ্ভত প্রতিবাদের মত বলসে উঠেছে। সে মুখের দিকে চেয়ে থাকা যায় না।



ইসারার দেখিয়ে দিল খুদিরাম—কুমুম মাসীর হাতে বিলিতী কাচের চুড়ী।

বিলিতী চুড়ী যে পরে, তার দেওয়া খাবার গিলবে খুদিরাম? তার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভালো।

খুদিরামের ভাবান্তর ও রূপান্তর কুমুম মাসীর দৃষ্টি এড়ায়নি। হঠাৎ হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল কুমুম। তারই সঙ্গে তাল দিয়ে বেজে উঠলো চুড়ীগুলি।

বলল : ও, তাই বল।

হঠাৎ ভিতরে গিয়ে কুমুম নিয়ে এল লোহার জাঁতি। হুঁ হুঁ শব্দে ভেঙ্গে কেসল হু' হাতের সব ক'গাছা কাচের চুড়ী। নিস্তব্ধ রাতে সেই হুঁ হুঁ শব্দ চারদিকে যেন এক আবেশময় সৃষ্টি-সঙ্গীত ছড়িয়ে দিল।

আবার হেসে উঠল কুমুম : এইবার হল ত। বাবা : আমিও বাঁচলুম। এইবার খাবে তো আমার হাতে?

আর তো আপদ নেই।

খুদিরাম, ললিত, হুজুনকেই কে যেন বাহুমন্ত্রে যবে চুকিয়ে নিল, আর বাহুমন্ত্রেই যেন হুজনে কুমুম মাসীর পরিবেশিত খাবার নিঃশেষ করে দিল।

বাসায় ফিরে এসে খুদিরাম কিছুক্ষণ শুক হয়ে বসে রইল।

ললিত বলল : কি হয়েছে, মামা?

কহু কঠে বলল খুদিরাম : কুমুম মাসীর আজ উপোস রে। সব খাবার আমাদের ঢেলে দিল। আমাদের জন্ত একটি মেয়ে আজ অনাহারে রইল। আমি সব সইতে পারি, মায়ের জাতের কষ্ট সইতে পারি না। আজ যদি দিদি না খেয়ে থাকতেন, সইতে পারতাম আমি?.. খুদিরামের কঠ অশ্রুকম্পে কহু হল।

সে জানত না, কুমুম মাসীর সে রাতের উপবাস, দীক্ষার রাতের উপবাস, স্বদেশসেবার মন্ত্রে নবজীবনের উদ্বোধন।

সাত

এই একটি রাত কুমুম মাসীর জীবনের মোড় কিরিয়ে দিল। খুদিরামের সঙ্গে তার দেখা হত না, হওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু



অমৃতবাবুর বাঁটা সালর খিড়কী পুকুর

অপরূপা দেবী ফিরে এলে তাঁকে বলেছিল কুমুম : দিদি, খুদিরা আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি পথ চিনেছি।

বড়ী বেচে এতদিন যা সঞ্চয় করেছিল, তাই দিয়ে কুমুম কিনল তাঁতের শাড়ী, বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শাঁখা, দেশজাত নানারকম প্রসাধন-সামগ্রী। সেগুলি বেচতে শুরু করল অমৃতপুরবাসিনী মহিলাদের কাছে। নিজের ভরণ-পোষণের জন্ত লভ্যাংশের সামান্য কিছু রেখে বাকীটা দান করতে শুরু করল তদানীন্তন জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান 'ছাত্রভাণ্ডারে'। সঙ্গে সঙ্গে চলল তার দেশাত্মবোধে নারীজাতিকে উদ্বুদ্ধ করার সাধনা, এক অনাড়ম্বর নিঃশব্দ অভিযানে।

ললিত বলল খুদিরামকে : মামা, শুনেছ? কুমুম মাসী গোপনে গোপনে কি সূক্ষ্ম কাজ করছে! ওকে একটু উৎসাহ দাও না তুমি, বেচারী একটু উৎসাহ পেলে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে দেশের কাজ করবে।

হেসে বলল খুদিরাম : পাগল! উৎসাহের দরকার কি? শক্তি যখন জেগে উঠেছে, তখন আপনিই সে পথ করে নেবে, তা'ছাড়া উৎসাহ না পেয়েও যারা দেশের কাজে লেগে থাকে, তারাই তো খাঁটি দেশপ্রেমিক।

আট

এই নারীর জীবনে খুদিরামের দেখা আর মিলল না। বড়ের মত এক রাতে এসে যে বীর কুমুমের পুরনো জীবন উড়িয়ে নিয়ে নতুন জীবনের তোরণদ্বার খুলে দিয়েছিল তার সম্মুখে, বড়ের মতনই আবার আর এক রাতে সে চলে গেল এক বৃহত্তর রক্তক্ষণে আশ্রয় নিয়ে হোলি খেলতে, আশ্রয় ছড়াতে গোটা দেশে। ১৯০৮ সালের ১লা মে মজঃফরপুরে মিস্ কেনেডি ও মিসেস কেনেডির হত্যায় সেই খেলার শেষ।

আর ৩রা মে মেদিনীপুরের কয়েকটি বাড়ীতে একই সঙ্গে শুরু হল পুলিশী তল্লাস ও ধরপাকড়।

সেদিন মাদিকপুরের বাসায় ছিলেন অমৃতবাবু ও তাঁর ভাই শরৎ। অপরূপা দেবী নেই, পরিজনবর্গের কেউই নেই। মেয়ের বিয়ের আয়োজন করতে সবাই গ্রামের বাড়ীতে চলে গেছেন।

পুলিশ-ইন্সপেক্টর লালমোহন গুহ এসে অমৃতবাবুকে জানালেন— তাঁর বাড়ী খানাতল্লাস হবে।

সমস্ত অমৃতবাবু মুহু কঠে বললেন : বেশ। যান বাড়ীর ভেতরে, কেউ নেই।

কুমুম সবই শুনেছিল আড়াল থেকে। স্বরিতপদে বাসায় গিয়ে ফিরে এল এক নতুন বেশে। এ সে কুমুম মাসী নয়, নয় এ সেই কুমুমসাধনরতা দেশপ্রেমিকা কৃশালী তাপসী, এ এক লাভণ্যময়ী মোহময়ী ঠৈরীণীর বেশ। মাটির কলসী নিয়ে অপরূপ ভঙ্গিমায় ইন্সপেক্টরে সামনে এসে দাঁড়াল।

: আমি একটু খিড়কী পুকুর থেকে জল নেবো বড় বাবু, আমার একটু বাড়ীর ভেতর যেতে দেবেন?

চোখে অপরূপ কটাক—নারীর সেই চিরন্তনী বিজ্রমোৎপাদিনী শক্তি।

ইন্সপেক্টর তখন অমৃতবাবুর কাছ থেকে খুদিরাম সবকিছু বিবরণ সংগ্রহ করছিলেন। কুমুমের দিকে তাকিয়েই কিছুক্ষণের জন্ত নির্ঝাঁকু হয়ে রইলেন। অপরূপ জলীতে কাঁড়িয়ে রয়েছে এক

উদ্ভিন্ন-বোঁবনা নারী—গাগরী ভরণে যেন এক নাগরী চলেছে রূপের মাধুরী বর্ষণ করতে করতে।

রূপ-বিহ্বল ইন্সপেক্টর মুহু হেসে অমুমতি দিলেন : তাড়াতাড়ি খিড়কী পুকুর থেকে জল নিয়ে চলে আসবে। দেয়ী কর না কিছ।

কোমর ছুলিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল কুমুম অন্দরে। অন্দর পার হয়ে খিড়কী পুকুর।

পথেই শরতের সঙ্গে দেখা। ব্যস্তভাবে কুমুম বলল : শুধু দাদাবাবু! খুদিদার ঘরটা আমার তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিন। একটুও দেয়ী করবেন না। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শরৎবাবু মন্ত্রগলিতের মত কুমুমকে খুদিদারের ঘরে নিয়ে গেলেন। উন্নতের মত বিশ্রুবেশা কুমুম সারা ঘর হাতড়াতে লাগল। অবশেষে লেপের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে বের করলো একটা রিভলভার।

শরৎবাবু স্তম্ভিত, আড়ষ্ট, নির্ঝাঁক। একি সর্বনাশ! রিভলভার এখানে এল কোথেকে? 'Young America—Double Action'—গায়ের-লেখা রিভলভার। ধর-ধর করে কাঁপছে শরতের দেহ। কুমুম শরৎকে উপেক্ষা করে চক্কর পলকে রিভলভারটি বেখে দিল তার কলনীতে। তারপর খিড়কী পুকুর থেকে জল ভরে নিয়ে কলসী কাঁখে পূর্বের মতই হাসি ছড়াতে ছড়াতে নৃত্যের ভঙ্গীতে কর্ণবাস্ত ইন্সপেক্টরের চোখে ধুলো দিয়ে সদর মহল দিয়ে বেরিয়ে গেল। খিড়কী পুকুরে কুমুম রিভলভারটি ফেলতে পারেনি। কেন না, তার চারদিকে বহু পুলিশ-কনস্টেবল টহল দিচ্ছিল। জল-ভরা কলসীর মধ্যে অস্ত্রটি নিয়ে কুমুম গেল সদর মহলের সামনেকার রাস্তা পেরিয়ে ডগরা পুকুরে, সেখানেই নিক্ষেপ করল খুদিদারের সেই রিভলভার লোকচক্ষুর অগোচরে।

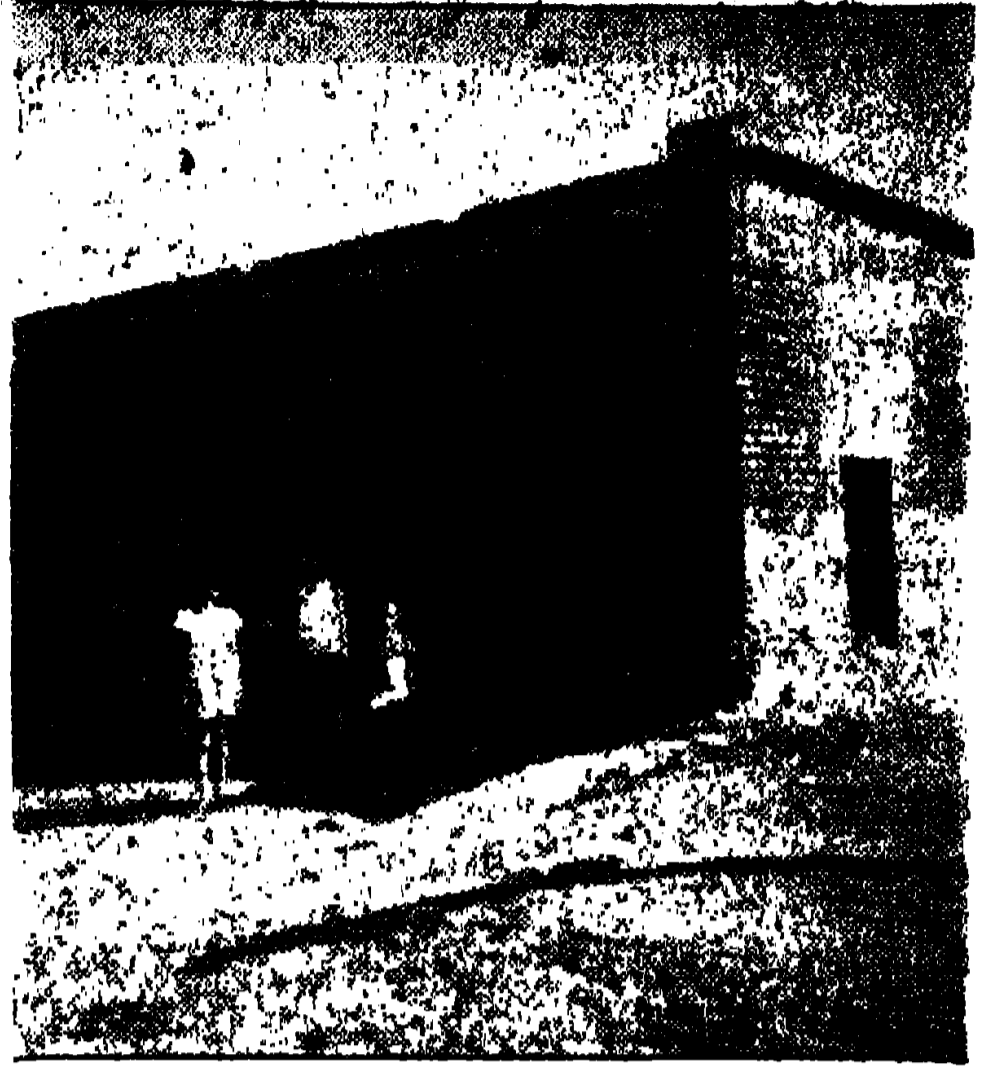
অনেক মহীরসী নারীর কাহিনী আমরা ইতিহাসে পড়েছি। সোনার অক্ষরে লেখা আছে তাঁদের নাম। তাঁদের আমরা পূজা করি, তাঁদের স্মৃতি-তর্পণ করি প্রতি বৎসরে। কিন্তু এই নিরক্ষরা, বুদ্ধিহীন যুবতীর প্রত্যাশমতীত্বের কলে সেদিন একটা পরিবারের তথা জাতির সম্মান যেভাবে রক্ষা পেল, তাও কি আমরা উপলব্ধি করব না অন্তর দিয়ে? বাঙ্গালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি। হয়ত কোনদিনই এই নারীকে আমরা প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারব না।

(তারাকর বাবু! মনে পড়ে আপনার 'ধাত্রীদেবতা'র সেই নীচকুলোদ্ভবা মহীরসী মেথরাণীকে! সেও তো হারিয়ে গেছে শত শত শহীদের স্মৃতিস্বপ্নে!)

আজও হয়ত ডগরা-পুকুরে অহুস্কান করলে খুদিদারের সেই রিভলভারটি পাওয়া যাবে, কিন্তু কুমুম মাসী তো নিজের বলতে কিছুই বেখে যায়নি তার পেছনে,—আগুন বৃকে নিয়ে সে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল,—আগুন বৃকে নিয়েই সে দগ্ধ হয়ে গেছে তিলে তিলে! বিশ্বস্তির ডগরা-পুকুর থেকে আমরা কি তাকে তুলে ধরব না জাতির সম্মুখে?

নম্র

১১০৮ সালের ১১ই আগষ্ট মঙ্গলকরণে কাঁসীর মঞ্চে খুদিদার জীবনের শেষ অঙ্গান গেয়ে চিরকালের মত নীরব হয়ে গেল। কিন্তু তার আলান আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল জেলিহান শিখার। জীঅরবিন্দ, বাবীন্দ, হেমচন্দ্র, আলিপুর জেলে নিকিণ্ড



অমৃতবাবুর বাটার পশ্চাত্তাগ

হলেন। মেদিনীপুর সহরে স্কুল হল পুলিশী তাণ্ডব। দলে দলে মেদিনীপুরবাসী করল কারাবরণ।

এই আগুনের মহোৎসবে কে মনে রাখবে ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা কুমুম মাসীকে? মনে রেখেছিল একজন। সে খুদিদারের সেই বাঙ্গালী ললিতমোহন।

শুনল ললিত,—কুমুম মাসী ছুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে একাকিনী শেবক্ষণের প্রতীক্ষা করছে।

সেই ঘাটির ঘর। নিশ্চয় অমাবস্তার রাত। ঘরে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলছে। জীর্ণশয্যায় কুমুম মাসী যত্ন-বিশ্রাম ছটকট করছে। কেউ নেই পাশে। খুদিদারের তৃপ্তিত আশ্রা হয়ত ঘুরে ঘুরে খুঁজে ফিরছে তার সিদ্ধিকে, কিন্তু সেও কি মনে রেখেছে কুমুম মাসীকে? বোঁবনের সে লাভাণ্য অন্তমিত। কৃশতমু কালিমালিণ্ড। চোখে যেন সূর্যাস্তের লাল আভা। বসন্ত-গুটিকায় সারা দেহ আচ্ছন্ন।

ললিত ডাকল—মাসি!

হঠাৎ চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে জলে উঠল কুমুম মাসীর। আগুন! আগুন যেন শেব শিখা বিস্তার করেছে নেভবার আগে! ললিতের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রলাপের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠল কুমুম : আগুন! আগুন! সবদিকেই আগুন জ্বলছে। ওই ছাখ, সবদিকেই খুদিদার মুখ আগুনের দড়িতে বলছে,—আগুন ঐ ছড়িয়ে গেল সারা দেশে—আমি দেখতে পাচ্ছি—ছাখ,—ছাখ...

কথা শেব হল না। একবার সারা দেহ তাঁর আবেগে কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

আগুন জ্বল দেশে। আগুনের শেবও হল। এল শান্তি। এল স্বাধীনতা। শুধু কুমুম মাসী তার বৃকের আগুনে দগ্ধ হল অপরিচয়ের অন্তরালে। কেউ কি তাকে জাতির সম্মুখে তুলে ধরবে না শহীদের মর্যাদায়? *

* এই কাহিনী আমি শহীদ খুদিদারের ভাগিনের ও বাঙ্গালী জীবুত ললিতমোহন রায়ের মুখে শুনেছি। তাঁকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।—লেখক।

অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথের রচনা অপরূপ শক্তি ও হাতকর চাপস্যের অদ্ভুত সমন্বয়। একদিকে তাঁর রচনার যেমন গভীরতম পাণ্ডিত্য ও বিশ্বকর বহিরঙ্গ মাধুর্য, অপরদিকে তা আবার অহুচিত তথ্যভারাক্রান্ত ও অনেকাংশে রসস্বষ্টিতে ব্যর্থ। তাঁর "জ্যোতির পীঠি" ও রবীন্দ্রনাথের 'হে মোর হৃদ্যাঙ্গা দেশ' আদিক কবিতা বা তাঁর 'তাজ' ও রবীন্দ্রনাথের "এ কথা জানিতে তুমি ভারত জৈবর সাজাহান" আদিক কবিতা পাশাপাশি রাখলেই বুঝতে পারা যায়, তথ্যের অরণ্যে যখন তিনি শ্রান্ত তখন অবলীলাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ফ্লাট্টেকমরী কবিতা রচনার সিদ্ধকাম। মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত অভিযোগ যেমন কিছু পরিমাণে সত্য, অনুবাদের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য।

সত্যেন্দ্রনাথের গভীর পাণ্ডিত্য তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল যেমন করাসী, কারনী, ইংরাজী সাহিত্যের অভ্যস্তরে, নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যেরও অন্তরমহলে। এ-ভাষাও তাঁর কাছে কেবল অনুসন্ধিসা জাগায়নি, অনুবাদের প্রবল প্রেরণাও জুগিয়ে ছিল। আর সে প্রেরণা কোথাও বিশ্বকর অনুবাদরূপে বাংলায় রূপান্তর লাভ করেছে, কোথাও হাতকর ছন্দরূপে দেখা দিয়েছে। 'কাব্যসঞ্চয়ন'-এ সত্যেন্দ্রনাথের একটি চমৎকার অনুবাদ স্থান পেয়েছে। 'অধর্কবেদ' হ'তে অনূদিত কবিতাটি...তার মূল আমি অধর্কবেদ-এর ইংরাজী অনুবাদ বেঁটে কোথাও খুঁজে পাইনি, বোধ হয় ক্রান্ত অনুসন্ধান বশতঃ, কিন্তু অনুবাদটি যে সুন্দর কবিতা হয়েছে তা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। নিচে 'কাব্যসঞ্চয়ন' গুণ কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

মাত্রলিক

এ গৃহে শান্তি কক্ক বিরাজ মন্ত্র-বচন বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা থাকে দূরে চ'লে ;
পুত্রে পিতার, মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক আরো সুমধুর ;
ভায়ে ভায়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা হোক আজি অবসান,
ভগিনী বেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে বেন কর্ণে বচনে তোবে সকলের প্রাণ,
নানা বস্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।

—(অধর্কবেদ) : সত্যেন্দ্র দত্ত

আবার উপরি উদ্ধৃত চমৎকার অনুবাদটির পাশে নিচের অনুবাদটি দেখুন, কি পরিমাণ ব্যর্থ হয়েছে.....

"লাবণ্যধনি নিশামণি কি গো পিতা এই বালিকার ?
কিবা সেই আদ্যিসের রসিক, কুসুম আয়ুধ বার ?
কিবা সে পুষ্পপ্রাবিত চৈত্র ? হেন রূপ নিশ্চয়
বেদ প্রণেতা সে বুড়া ব্রহ্মার সৃষ্টি কখনো নয়।

—রূপসী : কালিদাস : সত্যেন্দ্র

উদ্ধৃত অংশটির মূল "বিক্রমোর্কশীয়ম্" নাটকে শার্দূলবিক্রীড়িত হৃদয়ে ভাবগভীর উনিষৎ অক্ষর পংক্তিক নিয়মিত কবিতা।

লক্ষ্য করার বিষয়, শার্দূলবিক্রীড়িত না হলেও এখানে অনুবাদে অক্ষরসংখ্যা তার কাছাকাছি। আর 'শার্দূলবিক্রীড়িত'-এ যেমন বার আট উনিষৎ অক্ষরের পরে বতি পড়ে, এখানেও প্রায় সেই ধরণের বতিপাত হয়েছে। তবে এখানে 'শার্দূলবিক্রীড়িত' হৃদ অনুসরণের চেষ্টা একেবারেই তিনি করেমনি, কারণ অল্প তিনি লঘু-গুরু, অক্ষর সংখ্যা, বতিপাত সকল দিক থেকে 'শার্দূলবিক্রীড়িত' হৃদকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। এখানে "বিক্রমোর্কশীয়ম্"-এর মূল কবিতাটি দেখুন :—

অশ্রাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্ছ্রোমুকাস্তিপ্রদঃ
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং হু মদনো মাসো হু পুষ্পাকরঃ ।
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং হু বিষয়ব্যাবৃত্ত কোতুহলঃ
নির্মাভুঃ প্রভবেদনোহরশিখরঃ রূপং পুরাণো মুনিঃ ।

অর্থাৎ—

অশ্রাঃ (উর্কশাঃ) সর্গবিধৌ প্রজাপতিঃ কাস্তিপ্রদঃ চন্দ্রঃ
অভুং হু ? (কিম্) শৃঙ্গারৈকরসঃ মদনঃ কাস্তিপ্রদঃ অভুং
হু ? (অশ্রুখা) বেদাভ্যাসজড়ঃ বিষয়ব্যাবৃত্ত কোতুহলঃ সঃ
পুরাণঃ মুনিঃ ইদং মনোহরং রূপং নির্মাভুঃ কথং প্রভবেৎ ?
(ন কদাপি প্রভবেৎ ইতি মে মতিবিতর্কঃ) ।

কি চমৎকার ভাবগভীর মূল ও কি হাতকর তার অনুবাদ ! এ কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে যে-ভাবে অনূদিত হয়েছে, তারই প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ :

কাস্তিপ্রদ শশাঙ্ক কি এ'র জনমিতা ?
আদ্যিস একাশ্রয় স্বয়ং কিগো পিতা ?
কুসুম আকর যোগো মধু চৈত্রমাস,
তাঁহা হ'তে ইনি কি গো হলেন প্রকাশ ?
বেদাভ্যাসে জড়মতি—বিষয় হইতে যার
প্রত্যাহৃত সকল কামনা,
পুরাণ সে ব্রহ্মায়ুনি, সৃষ্টিতে পাবেন কিগো
অপূর্ক এ রূপসী ললনা ?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা অনেক মূলানুগ। তিনি "বেদাভ্যাস জড়ঃ"কে সত্যেন্দ্রনাথের মত "বেদপ্রণেতা" করেন নি এবং তিনি "বিষয়ব্যাবৃত্ত কোতুহলঃ" কথাটি বাদ দেননি সত্যেন্দ্রনাথের মত। হৃদয়েও তিনি কিছুটা সহজ ভাবে পদ্যর দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর অনুবাদটি কবিতা না হলেও, কবিতা আকারে মোটামুটি অনুবাদ হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের এ-কবিতাটি না হয়েছে কবিতা, না হয়েছে অনুবাদ।

কালিদাসের 'শকুন্তলা'র "বসন্ততিলক" হৃদয়ে বিরচিত নিয়োদ্ধৃত কবিতাটি দেখুন :—

বাচ ন মিশ্রয়তি বভূপি মঘচোভিঃ কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাবমাণে ।
কামং ন তিষ্ঠতি মদানন সম্মুখীনা ত্বরিতমভাবিয়া ন তু দৃষ্টিবস্তাঃ ।

আর সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ দেখুন :

নীরবে যদিও রয়ে বালা আলাপনে,
আমি হবে কহি শোনে অবহিত মনে ।

যদিও সাহসে চাহে না সে মুখ পানে ।

দৃষ্টি তবুও তিষ্ঠে না কোনো খানে ।

—পূর্বরাগ : সত্যেন্দ্রনাথ ।

লক্ষ্য করার বিষয় সত্যেন্দ্রনাথ চৌদ্ধ অক্ষর দিয়ে প্রথম কয়েকটি পংক্তি রচনা করেছেন অথচ পরার করেননি, ছ-মাত্রার মূল পর্বের মাত্রাবৃত্ত কবিতা করেছেন বলেই শেষের পংক্তিতে অক্ষরে (পরার বিচারে) কমতি হ'লেও ছন্দে গলদ নেই। কিন্তু এখানে যে চৌদ্ধ অক্ষর তা পরার না হলেও "বসন্ততিলক"ও নয়, কেন তা চৌদ্ধ অক্ষরের হ'লেও তার লঘুগুরু ভেদ ও চাল সম্পূর্ণ আলাদা। শকুন্তলার দৃষ্টি যে "অভবিত্য" নয়, অর্থাৎ সে-চৌধ যে কেবল ঘুরে ঘুরন্তের দিকেই আসছে তা সংস্কৃতে স্পষ্ট হ'লেও বাংলার একেবারে অস্পষ্ট। শকুন্তলার দৃষ্টি কি কোনো খানেই তিষ্ঠনা—এই কথাটি কালিদাস লিখেছেন ?

কালিদাসের 'শকুন্তলা'র চমৎকার প্রাকৃত কবিতাটি স্বরণ করুন—

অহিণহমহলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিষ চুমমঞ্জরিম্ ।

কমলবসইমেক্ত নিবুও মহঅর বিশুমরিওসি ণং কহং ।

সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদটি দেখুন—

নূতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি হে

আম্রমুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে ।

আজি কমলের ছয়ায় মাত্র বুলিয়ে

একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর তুলিয়ে ?

অনুবাদটি আক্ষরিক করার প্রয়াস পেয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ। "অহিণহ মহলোলুবো" বা "অভিনবমধুলোলুপঃ" সত্যেন্দ্রনাথ সুন্দর অনুবাদ করেছেন। মূলের ভাষ্য এখানেও ছবারে 'অলি' ও 'ভ্রমর' কথা ব্যবহার করেছেন যথাক্রমে "মহলোলুবো" এবং "মহঅর" (মধুকর)-এর পরিবর্তে। কিন্তু মূলটি যত সুন্দর, অনুবাদ কি তত সুন্দর হয়েছে? মিলের দিক থেকেও এখানে ক্রটি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ এখানে সমস্ত মন দিয়ে অনুবাদ করেননি; কারণ মিল-মিলোনো খেলায় তাঁর জুড়ি নেই। যদি অনুবাদটিকে অবহেলা না করতেন সত্যেন্দ্রনাথ, তাহ'লে এটি একটি চমৎকার অনুবাদ হয়ে দেখা দিত বলে মনে হয়। *

অথচ মন দিলে তিনি যে ভাল অনুবাদ করতে পারতেন; তার বিশিষ্ট প্রমাণ নিচের অমর শতকের কবিতাটি—

পদ্মে রচিয়া বন্দনা-মালা দেয় না তোরণে দোলায়ে,

সহস তার আঁখি-পদ্মের দৃষ্টি ;

সুরভি অধরে মুহু হাসি লয়ে বাতায়নে থাকে কাঁড়ায়,

পুষ্পদশনা করে না পুষ্পবৃষ্টি !

মঙ্গল-খট বুক ক'রে থাকে শ্রমজলে অভিষিক্ত

মাটিতে নামারে রাখিতে দেখিনি কছু সে,

তরুণীর পতি-অভ্যর্থনা বাহির হইতে রিক্ত

অস্তরে মিঠা অমৃত ছিটায় তবু সে ।

—অভ্যর্থনা : সত্যেন্দ্রনাথ ।

[স্বীকৃতনাথ চমৎকার অনুবাদ করেছেন :

নবমধুলোভী ওগো মধুকর চূতমঞ্জরী চুমি

কমল বিদ্যানে যে শ্রীতি পেয়েছ কেমনে তুলিলে তুমি ?]

এর মূল দেখুন (শার্দূলবিকীড়িত ছন্দে) :—

দীর্ঘা বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্টেব নেকীবটৈঃ

পুষ্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো ন কুলজাত্যাভিভিঃ ।

দন্তঃ শ্বেদযুচা পয়োধরযুগেনার্থো ন কুড্ডান্তসা

শ্বেবেবাবয়টৈঃ প্রিয়ন্ত বিশতন্তয়া কৃতং মঙ্গলম্ । ৪০ ।

—অমরশতক : কাব্যসংগ্রহ : জীবানন্দ বিজ্ঞানাগর

অর্থাৎ—

(দৃষ্টির দ্বারাই) দৃষ্টা এবং দীর্ঘা বন্দনমালিকা (অভিনন্দন-মালিকা) বিরচিতা, (নীলপদ্মের দ্বারা নহে) ইন্দীবটৈঃ ন। (স্মিতহাসির দ্বারা) স্মিতেন পুষ্পাণাং প্রকরঃ (পুষ্প গুচ্ছ) (কুলজাতি প্রভৃতি কুল দ্বারা) কুল জাত্যাভিভিঃ ন (নহে)। শ্বেদযুচা পয়োধরযুগেন (শ্বেদসিক্ত স্তনদ্বয়ের দ্বারা) অর্থাৎ দন্তঃ, ন কুড্ডান্তসা (কুড্ড-অল-দ্বারা নহে)। তন্তয়া শ্বেঃ এবং অবয়টৈঃ (স্বর্গীয় সুলভীর অবয়বযুক্তা তরীর দ্বারা) বিশতঃ প্রিয়ন্ত (গৃহং প্রবিশতঃ প্রিয়ন্ত, ঘরে চুকছে এমন প্রিয়ের) কৃতং মঙ্গলম্ (মঙ্গলিক কৃত)।

অনুবাদ চমৎকার হয়েছে। তবে এখানে আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ বল' যেতে পারে। কারণ সত্যেন্দ্রনাথ অনেক কিছু বোগ-বিয়েগ করেছেন। (মঙ্গলখট অর্থাৎ স্তনদ্বয় মাটিতে নামিয়ে রাখেন সে নিবন্ধ-বোবনা রমণী—এটি কিন্তু মূল কবিতার নেই)। কথা উঠতে পারে মূল কবিতাটিই এখানে গভীর ভাব প্রকাশক নয়, তাই 'হাঙ্কা-চালের লীলাঙ্কর সত্যেন্দ্রনাথ' অনুবাদ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু হাঙ্কাচালের লীলাঙ্কর কেবল নন তা বারাই তাঁর 'মহাসরস্বতী' আমরা 'গজাঙ্করবিবর্তমি' প্রভৃতি পড়েছেন তাঁরই জানেন। আর এখানে অনুবাদে তিনি রাজা অমরুর নামে প্রচলিত হাঙ্কা কবিতাকে যেমন আদর্শ করেছেন, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, নানা উপনিষদ হ'তে অংশ বিশেষকে অঙ্কর অনুবাদের ক্ষেত্রে তেমনি আদর্শ করেছেন। ধরা যাক যজুর্বেদ হতে তাঁর অনুবাদ—

আগিলে যে দূরে, ঘুমালে নিকটে, স্বপনে ফুটায় চৌধ ।

অনাদি জ্যোতির দূরগামী রেখা সে আমার শুভ হোক ।

—মনোদেবতা : সত্যেন্দ্রনাথ ।

অথর্ববেদ হ'তে 'প্রাণদেবতা' অনুবাদটি দেখুন—

নিখিল ভুবন বশে বার সেই প্রাণেয়ে নমস্কার,

প্রভু যে সবার আধার যে ওগো সবারি প্রতিষ্ঠার ।

শক্তি প্রাণে নমি আমি আর নমি কলিত প্রাণে,

প্রাণবিহ্যতে প্রণাম করিগো প্রণমি বর্জমানৈ ।

—প্রাণদেবতা : সত্যেন্দ্রনাথ

'কঠোপনিষৎ' হ'তে তিনি চমৎকার অনুবাদ করেছেন। ভাব-গভীর মূলের রসমধুর অনুবাদটি কিন্তু কাব্যসংস্করণে স্থান পায়নি। সেখানে অনেক বাজে কবিতাকে বাদ দিয়ে এটিকে স্থান দেওয়া উচিত ছিল। এতক্ষণ যে কবিতাগুলি 'আলোচনা করছিলেন, তার মধ্যে সর্বপ্রথম কবিতাটি বাদ দিলে আর কোনটিই সেখানে স্থান পায়নি। একটি চমৎকার অনুবাদ দেখুন :

কঠোপনিষৎ : বহুরূপ : সত্যোক্তনাথ

অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশি,
নানারূপ ধরে আধার ভেদে
নিখিলের প্রাণ তেমনি করিয়া
একা নানা ছাঁদ বেড়ান হেঁদে ।
বাতাস যেমন ভুবনে প্রবেশি
নানা সুরে গাহে বস্ত্র ভেদে
নিখিলের প্রাণ এক ভগবান
তেমনি বেড়ান হেসে ও কেঁদে ।

তপন যেমন নিখিলের আঁধি—
কলুবে দূষিত হয় না তবু,
নিখিলের প্রাণ তেমনি গো তাঁবে
বাহিরের গ্রানি ছোঁয়না কভু ।
সর্বভূতের স্তম্ভরতম
বহুরূপ তিনি গোপনচারী,
আপনার মাঝে তাঁরে যে দেখেছে
অক্ষয় সুখ তারি গো তারি ।

এর মূল দেখুন—

অগ্নিবর্ধৈথকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।
একস্তথা সর্বভূতাস্তরাষ্ট্রা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ।
বায়ুবর্ধৈথকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।
একস্তথা সর্বভূতাস্তরাষ্ট্রা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ।

সূর্যো যথা সর্বলোকান্ত চক্ষুঃ
ন লিপ্যতে চাক্ষুর্বেদ্যাদোষৈঃ ।
একস্তথা সর্বভূতাস্তরাষ্ট্রা
ন লিপ্যতে লোকহুঃশ্চেন বাহুঃ ।
একো বশী সর্বভূতাস্তরাষ্ট্রা
একং রূপং বহুধা যঃ কথোতি ।
তমাস্ত্রহং বেহুপশ্চতি ধীরাঃ
তেষাং স্তুধং শাস্তং নেত্তরেবাম্ ।
কঠোপনিষদ্ ২।২।

লক্ষ্য করার বিষয় এখানে মূলের হ্রস্ব বৈদিক ত্রিষ্টুভ । এ হ্রস্ব
এগার অক্ষর করে চারি পাদ থাকে । সত্যোক্তনাথ এখানে সমস্ত
মন দিয়ে অনুবাদ করেছিলেন, এমন কি হ্রস্বটিও তিনি হ্রস্ব
অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন । তাই প্রথমে
অনেকখানি অংশ এগার অক্ষরের হ্রস্বের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে
হয় । তবে ত্রিষ্টুভ হ্রস্বকে তিনি অনুসরণ করেনি জ্ঞাতসারে ।
ভাবতন্ত্ররত্নাকর সত্যোক্তনাথের সার্থক অনুবাদে অনেক সময়
মূলের হ্রস্বের অনুসরণের উদাহরণ পাওয়া যায় । এটি তেমনি ।
সত্যোক্তনাথের এ অনুবাদটি কেবল ভাল হয়েছে তা নয়, মূলের যে
অংশে একটু অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে, সেখানে তিনি তার একটা

স্পষ্ট রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন । যেমন ধরুন "বায়ুবর্ধৈথকো
ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" এ অংশটি খুব স্পষ্ট
কি ? 'বায়ু ভুবনে প্রবেশ করে রূপে রূপে প্রতিরূপ ধারণ করে'
অপেক্ষা "বাতাস যেমন ভুবনে প্রবেশি নানা সুরে গাহে বস্ত্র ভেদে"
স্পষ্ট ও মিষ্ট নয় ? সত্যোক্তনাথের সার্থক অনুবাদ নির্মিত
লক্ষণাক্রান্ত ।

ষেতাখতর উপনিষদ্ হাতে সত্যোক্তনাথ বাংলার অনুবাদ
করেছেন । আগে মূল ও পরে তার অনুবাদ দেখুন—

ঔঃ স্ত্রী ঔঃ পুমানসি ঔঃ কুমার উত বা কুমারী ।
ঔঃ জীর্ণো দণ্ডেন বক্ষসি ঔঃ জাতো ভবসি বিশ্বভোমুখঃ ।
নীলপতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষশ্চড়িকার্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ ।
অনাদিমম্বং বিভূশ্চেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ।
সত্যোক্তনাথ অনুবাদ করেছেন :—

তুমি নর, তুমি নারী,—
যুবক, বালক, বালা ;
তুমিই আবার লাঠি হাতে ধরি'
বুড়া হ'য়ে হও আলা ।
তুমি আহ চারিদিকে,
চারিদিকে তব মুখ ;
তুমিই আবার জন্ম লইয়া
না জানি কি পাও সুখ !

নীল পতঙ্গ তুমি
রাজা আঁধি তুমি শুক
বিদ্যাং ভরা মেঘ তুমি, প্রভু
সাগর সমুৎসুক !

অনাদি তোমার নাম,
অন্ত তোমার নাই ;
তুমি আহ বলে বিশ্বভুবন
বর্তিয়া আছে তাই ।

—তুমি : সত্যোক্তনাথ

অনুবাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ করে দেখুন :—

(১) ঔঃ জাতো—সত্যোক্তনাথ অর্ধ করেছেন 'তুমি জন্মগ্রহণ
করছ ।'

(২) হরিত লোহিতাক্ষ (পক্ষী)—দেহে সবুজ রং আর
লোহিত অক্ষ বিশিষ্ট পক্ষী অর্ধে সত্যোক্তনাথ অর্ধ করেছেন
'রাজা আঁধি তুমি শুক' ।

(৩) ঋতবঃ—'তুমিই ঋতুসমূহ', সত্যোক্তনাথ বাদ দিয়েছেন ।

(৪) সমুদ্রাঃ—'সাগরসমূহ' । সত্যোক্তনাথ 'সাগরসমুৎসুক' ।

(৫) বর্তসে—সত্যোক্তনাথ 'বর্তিয়া আছে তাই' প্রয়োগ

লক্ষণীয় ।

ষেতাখতর হাতে আর একটি অনুবাদ উপহার দিয়েছেন সত্যোক্তনাথ ।
কবিতাটির নাম "ত্রয়প্রবেশ" ।

নিজ তমু হাতে তত্ত্ব সৃষ্টিয়া

উর্নাতের যত,

আপনার জালে আপনি আবৃত

হয়েছেন যিনি বস্ত্র

সাকী, চেতন, পরম পুরুষ
সেই নিখিলের প্রাণ
আমাদের সবে ব্রহ্ম-প্রবেশ
শূত্র করুন দান।

—ব্রহ্ম-প্রবেশ : সত্যোক্তনাথ।

শেতাখতর-এ আছে :

বহুভূতাত্ত্বিক ইব তত্ত্বভিঃ প্রধানৈঃ স্বভাবতো দেবো একঃ
স্বমাবুণোৎ। স নো দখাদব্রহ্মাপ্যয়ম্। ৬।১০।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুটঃ

সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্ত্বিক।

কর্মধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিवासঃ

সাকী চেতা কেবলো নিত্বর্গশ্চ। ৬।১১।

অর্থ্যৎ—

তত্ত্বভিঃ (তত্ত্বদের দ্বারা) তত্ত্বনাভঃ ইব (মাকড়সার মত)

যঃ এক দেবঃ (যে এক দেবতা) প্রধানৈঃ (আপন অনন্ত কারী
দ্বারা) স্বভাবতঃ স্বম্ (আপনাকে) আবুণোৎ (আবৃত করেছেন)
সঃ (তিনি) নঃ (আমাদের) ব্রহ্মাপ্যয়ম্ (পরব্রহ্মরূপে আশ্রয়)
দখাৎ (দান করুন)। ৬।১০।

একঃ দেবঃ সর্বভূতেষু গুটঃ (অসংখ্যভাবে অন্তর্নিহিত) সর্বব্যাপী
(এবং) সর্বভূতাত্ত্বিক। কর্মধ্যক্ষঃ (সকল কর্মের অধিষ্ঠাতা)
সর্বভূতাদিवासঃ (সকল ভূতের নিবাসস্থান) সাকী চেতা (চৈতন্যরূপ
এবং চৈতন্য কারক) কেবলঃ (সর্বথা বিত্বর্গ) (এবং) নিত্বর্গশ্চ
(গুণাতীতও)। ৬।১১।

উল্লিখিত শ্লোকের মধ্যবর্তী "তিনি আমাদের পরব্রহ্মরূপ
আশ্রয় দান করুন" অংশটি সত্যোক্তনাথে সর্বশেষে "আমাদের
সবে ব্রহ্মপ্রবেশ শূত্র করুন দান" রূপে স্থান পেয়েছে। বাকী
অংশের আক্ষরিক, ক্রমিক ও সুন্দর অনুবাদ করেছেন
তিনি।

সংবাদপত্রে রেফারেন্স বিভাগ

ডি, আর, সরকার

যে কোন উন্নত মানের ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্রের
অফিসে যে সমস্ত নিউজরেফারেন্স প্রয়োজনমত সরবরাহ
করা হয়, তাহা এক দিকে যেমন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, তেমনি
দ্বিতীয় দিক বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা একটি বিশেষ
ধরনের কাজ। কিন্তু বাহাদুরের উপর এই কাজের ভার হস্ত থাকে,
সেই কারণে ইহা মোটেই জটিল নয়, কারণ তাহা হইলে এক
ব্যক্তি একই কাগজে দীর্ঘকাল এই কাজ সৃষ্টিভাবে সম্পাদন করতে
পারতেন না। তবে ইহা অসীম সত্য, বাহাদুরের উপর এই কাজ
করা হয়, তাহাদের বিশেষ অভিজ্ঞ হওয়া চাই এবং সেই সঙ্গে
বিশেষ বিচক্ষণ, স্বতঃপ্রসূত খবর-উৎসুক ও সফল হতে হবে।

আমাদের দেশে যদিও ইউনিভার্সিটিতে আজকাল জারনালিজম
কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু এই রকমের কাজের শিক্ষার
কোন রকম সংস্থান নাই। একমাত্র সংবাদপত্র-অফিসের
ধ্যমেই সুযোগ মত শিক্ষা লাভ করা ছাড়া অন্য কোন
পাথ নাই। একটি বিশিষ্ট দৈনিক সংবাদপত্রে সিটি এডিসন ছাড়াও
তাঁহ ৫ হইতে ৬টি ডাক এডিসন ছাপা হয় এবং বিভিন্ন
ডিসনে প্রাদেশিক প্রয়োজন মত বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয়
খবর ছাপা হয়, বাহার প্রত্যেকটি বিভিন্ন খবরই বিশেষ
প্রয়োজনীয়। তা হলে দেখা যায় সর্বসময়ে বিভিন্ন
সংবাদসমষ্টি গড়ে প্রত্যহ ৪০০ হইতে ৫০০-এর মধ্যে থাকে।
এর পর থাকে ভারতীয় সংবাদ, প্রাদেশিক সংবাদ, নিজস্ব সংবাদ,
ডিট্রিয়ার প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় চিঠিপত্র, স্পেশাল প্রবন্ধ, সান্ডে
গাজিন, বুক রিভিউ, স্পেশাল সাপ্লিমেন্ট এবং আরও অনেক ;
এই সংখ্যা সর্বসময়ে একটি বিরাট অঙ্কের রূপ ধারণ করে।
ধুনিক কালে প্রত্যেকটি দৈনিকপত্র মাত্র বৎসরে ৫৭ দিন
ই প্রত্যেক দিনই ছাপা হয়।

একমাত্র বিজ্ঞাপন ছাড়া বাহার হিসাব ও রেফারেন্স বিজ্ঞাপন
লাগ রাখেন, সমস্ত নিউজ রেফারেন্স—ইনডেক্স করা ও রেকর্ড

করা নিউজ-রেফারেন্স সেকশনের কাজ। আমার বহুদিনের
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি এবং শিখেছি যে, একমাত্র
একটি কাগজই সারা ভারতে বিলাতের 'টাইমস্' কাগজের অনুরূপে
প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নানারকম সরঞ্জাম দিয়া—এবং প্রত্যেক
বিশেষজ্ঞকে ভাল বেতন ও সুবিধা দিয়া এই সেকশনের কাজ
সৃষ্টিভাবে সমাধা করেন। কারণ, তাহাদের মালিকরা জানেন
যে, এই সেকশন কাগজের মেরুদণ্ড স্বরূপ এবং ইহার দ্বারা
সাধারণের প্রয়োজন মিটাইয়াও কোম্পানীর প্রভূত রেভিনিউ আসে।
একটি পুরান কপি সময় সময় ৪০ হইতে ৫০ টাকা মূল্যেও বিক্রয়
হইয়া থাকে, যদি সেই দরকারী নিউজ বা কোটেশনের রেফারেন্স
সময়ে কাগজটি অনুসন্ধান করা যায়। কেবলমাত্র কাগজটি অফিসে
এসে দেখে যাবেন, কি সংবাদটি কপি করবার জন্য অনেক সময়
৫ টাকা থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত চার্জ দিতে বাধ্য করা হয়।

এখন দেখা যাউক, এই হাজার হাজার বিভিন্ন সংবাদ
ও খবর বা ঘটনা—দিনের পর দিন বাহা কাগজে ছাপা হয় তাহা
কিভাবে রাখা হবে, বাহা দরকার হলে অল্প সময়ে বার করা যাবে,
তাহা যত নগণ্যই হউক কিংবা প্রাধান্যমূলক হউক। ইহা ছাড়া
এডিটর, এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরস্, সাব এডিটরস্, রিপোর্টারস্—ইহাদের
প্রয়োজনের বিবাম নাই। প্রত্যেকেই চান সঠিকভাবে রেফারেন্স
দিতে, বাহাতে কোন তারিখ, কাল ও সময়ের কিংবা অঙ্কের
ভুল না হয়। রেফারেন্স সেকশনের প্রধান কর্তব্য যে কোন প্রয়োজনীয়
সংবাদ, তাহা নূতন কিংবা যত পুরাতন হউক, তৎপরতার সহিত
বার করা, কারণ সম্পাদকের কলম ধেমে আছে এই রেফারেন্সের
জন্য। ভাল কাগজের সর্বদা লক্ষ্য থাকে যেন নিত্বর্গ খবর থাকে,
তার ব্যতিক্রম হইলেই অত্যন্ত আলোড়ন হবে এবং একমাত্র
কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগ পুরান ফাইল থেকে নিশ্চিত হতে
চান। এখন চিন্তার বিষয়, কিভাবে এই একটি বিরাট
অনুষ্ঠান চালিত হবে ও রেকর্ড এমন ভাবে কার্ডে ইনডেক্স

হবে, বাহা অতি অল্প সময়ে এবং আয়াসে বার করা যাবে। যিনি রেকর্ডে চাইবেন, তিনি হয়ত আশা করে আনুমানিক তারিখও একটি আপনাকে দেবেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দেখা গেছে যে, এই আনুমানিক তারিখ ভুল এবং তিনি তাহা না দিলেই ভাল করতেন, তাহলে কাজের পরিমাণ কিছু কম হত। তাহা অফিসের বা সাধারণের বাহারই প্রয়োজন হউক। কাজেকাজেই রেকর্ডে সেকসান নিজের বৃদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা, তাহা বাহির করিবে। বিভিন্ন অফিসের নিউজ ইনডেক্স বিভিন্ন পদ্ধতির। বিলাতের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা "লণ্ডন টাইমস্" এ ৫০টি লোক শুধু নিউজ ইনডেক্স সেকসানে এ কাজ করেন এবং যিনি প্রধান, তাহার বেতন মাসিক আনুমানিক প্রায় ২০০০ টাকা।

আজ প্রায় শতাব্দী ধরে প্রতি তিন মাস অন্তর এই পত্রিকার ইনডেক্স বই শারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কাগজের অফিসে, লাইব্রেরী, সামাজিক দপ্তর, রাজনৈতিক অফিস, এবং এমবাসী প্রভৃতিতে অমূল্য সম্পদ। কোন ঘটনা জানিবার প্রয়োজন হইলেই এই সকল বই খোকট পাওয়া যায়। ইহারই অনুসরণ করে ভারতের শ্রেষ্ঠ কাগজ, তবে অনেক স্থলে অদল-বদল করিতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ 'টাইমস' একটি ইন্টারন্যাশনাল কাগজ, প্রত্যেক দিন একটি সংবাদপত্রে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০টি বিভিন্ন প্রকারের খবর থাকে। তাহা হইলে এই কাজ যাহাদের উপর ক্রম থাকে, তাহাদের দিনের পর দিন সেইগুলি ইনডেক্স করতে হয়। প্রত্যেক খবরের মধ্যেও এতরকমের খবরের উল্লেখ থাকে যে, একটি খবরকে দশটি বিভিন্ন পদ্ধতিতেও বিভক্ত করতে হয়। ইহার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা অনেক। বিশেষ করে সম্পাদক ও তাহার এ্যাসিস্ট্যান্টদের লেখবার খোঁজ হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনেক, ইহা ছাড়া News-reference এর দরকার সাব-এডিটরদের, রিপোর্টারদের ও সর্বোপরি দরকার পাবলিকের। একজন লিখলেন—

"বহাশর—কোন একটি কোর্টকেস, বহুদিন আগে এলাহাবাদ হাইকোর্টের, জাজমেন্টটি সেই কাগজ পাঠান। বহুদিন আগে একদল অভিযাত্রী হিমালয় অভিযান করিয়াছিল, সমস্ত খবর সমেত কাগজ পাঠান। ২০ বৎসর পূর্বে কোন মহিলা টেমস্ নদী পার হইয়াছিল, খবরটি পাঠান।" এইসব দরকার ম্যানেজেরিয়াল সেক্সানে থেকে আসে, বাহা কোম্পানীর বেভিনিউ অর্গান।

রেকর্ডে সেকসান প্রত্যেক খবরই Index করিতে বাধ্য, তাহা ফিলার (তৃত্বিত্তিন লাইন) হউক বা ডবল কলাম লিড্ (দিনের শ্রেষ্ঠ সংবাদ) হউক। Refence এ এমন এমন বুদ্ধিমান কর্মচারী আছেন বাহারা গত ছয় মাসের বে কোন খবর নিজের memory থেকে তারিখ, পাতা এবং পোজিসন বলিতে পারেন। অল্প তারিখে অল্প পাতার উপরের দিকে কি নিচে। অনেকসময় একই খবর দু'তিন সোর্স থেকে আসে এবং চতুর সাংবাদিক বেশী লাইনেজ পাবার জন্য তাহার কিছু রূপ বদলে আবার পাঠান। কিন্তু সাব-এডিটর সন্দেহবশে রেকর্ডে সেকসানের উপর নির্ভর করেন, খবরটি আগে পাবলিশ হয়েছে কিনা।

এমন এমন চতুর সংবাদ-সরবরাহকারী আছেন, যিনি অমানবদনে একই খবর বাহা টেলিগ্রাম বোগে আগে পাঠাইয়াছেন তাহাই আবার সাপ্তাহিক নিউজ লেটারের ভিতর অড়িয়ে দেবার চেষ্টা

করেন। তাদের শুধু যে খবরটি পাবলিশ করা হয় না, উপরন্তু News-এডিটরের দ্বারা ওয়ার্ণিং দেওয়া হয়। তাহার পর ধরন বৈদেশিক বার্তা। প্রত্যেক দেশ থেকে রয়টার বোগে খবর আসিতেছে। যদি কোন বিশিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা থাকে, নিজস্বের স্পেশাল রিপোর্টারদের সেখানে গিয়ে সূত্রে সংবাদ COVER করেন। প্রত্যেক খবর বিশেষভাবে রাখতে হবে। এনকোয়ারার খবরটি নামমাত্র বলেন। অনেক সময় খালি অখবর নাম বলিলেন। আপনাকে প্রত্যেক খবরের অখবর নামে আর এক দফা ইনডেক্স রাখতে হবে। যেমন এডিটর বলিলেন, লেবানন থেকে ওয়েস্ট এশিয়ান কনসপেণ্ট অল্প খবর পাঠিয়েছেন, আপনাকে তৎক্ষণাৎ সেইভাবে বোগান দিতে হবে। কেউ বলেন মি: ম্যাকমিলান একটি উক্তি দিয়াছিলেন আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে south আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য ব্যাপারে, খুঁজে বার করুন। কোথায় বলেছেন জানেন না, পার্লামেন্টে কিংবা অন্য কোন বক্তৃতাতে বা কমনওয়েলথ কনফারেন্সে—এই উপর ভিত্তি করে আপনাকে বার করতে হবে রেকর্ডে। কারণ প্রত্যেক উক্তির ১০।১২ জারগার cross Reference রাখা হয়,—একটি ম্যাকমিলানের নামে, একটি subject লইয়া, একটি কমনওয়েলথ, কলামে ইত্যাদি, এর সম্ভবপর জারগার খুঁজিলে খবর বেরিয়ে যাবে। এনকোয়ারার আসবার সঙ্গে সঙ্গে Exportদের টেবিলে এল এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে। একবার কোন বৈদেশিক প্রোগ্রাম এম্পিডিশন্স হিমালয়ে এসে একটি প্রোগ্রামের লোম পাইয়াছিলেন, এখন এনকোয়ারার হইতেছে—লোমের বস্ত্র ধুসর না সাদা। মজা বিভ্রাট! এক একটি এম্পিডিশানের রিপোর্ট বাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া ২।৩ কলামে প্রকাশ হয়, এখন তাহার মধ্যে এত লম্বা একটি আইটেম Index এ নাই। শুরু হল প্রথমে তারিখগুলির খোঁজ, কিন্তু এই জাতীয় বহু এম্পিডিশন্স এসেছে, এর রিপোর্টও বিচ্ছিন্ন; এখন কোনটি খুঁজবেন। একজন ইন্ডেক্সার বলিলেন, বোধ হয় আমি পড়েছি, বিলাতের "ডেলিমেল" এম্পিডিশন্স পাঠাইয়াছিলেন অল্প সময়। বাবতীয় খবরের ভিতর একটি অল্প সময়ে বেরিয়ে গেল। তাছাড়া ধরন বৈদেশিক এক একটি দেশ ছাড়া যেমন (U. K., U. S. A. France, Italy Germany) প্রভৃতি ছাড়াও অনেক বোধ প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন ইউ, এন। সিরাটো। সেন্টো। বাগদাদ প্যাকট, বাহা এখন নূতন নাম পেয়েছে। কমনওয়েলথ, উনেস্কা, এইসব সংস্থানের আলাদা Index রাখিতে হবে। এর পর দুটি বৃহৎ দেশের বিষয়—যেমন আমেরিকা ও ভারতের আদান প্রদান, এই দুই দেশের এমবাসী। (ইন্ডিয়া-ইউকে) ইষ্ট জার্মানি, ওয়েস্ট-জার্মানি ইন্ডিয়া ইউয়োসোভিয়া, ইন্ডিয়া-রাশিয়া প্রভৃতি অল্প বৈদেশিক খবর এক বৃহৎ স্থান অধিকার করেছে। স্পুটনিক, চন্দ্রালোকে রকেট, নিউক্লিয়ার উইপনস্ প্রভৃতি। আপনাদের এখন এই বলিয়া শেষ করিব। বাহারা এই কাজে আছেন তাহাদের বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। কোন ছোট-বড় খবর বিচার করলে চলাবে না এবং সত্যিই যদি অনেকের সহিত কাজ করা যায়, তবে কাগজে বাহা প্রকাশ করা হয়েছে, তাহা নিশ্চয়ই বার করা যাবে। তাহা নতুনই লোক, বস্ত পুরাতনই হোক আর জটিলই হউক।

বঙ্গবাসী : কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশ ও কাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীহারাধন দত্ত

কৃষ্ণচন্দ্রের 'সাধারণী' পরিত্যাগ করে কৃষ্ণচন্দ্র কিছুদিনের জন্য শিবনিবাসে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তদানীন্তন আধুনিক শিক্ষার প্রচারে প্রতী হন। নবযুগের চিন্তা-ভাবনার শীর্ষদ থেকে তাঁর আপন দেশের মানুষ যাতে বাঞ্ছিত না হয়, উদ্দেশ্যেই তিনি শিক্ষা প্রচারের কার্যে অবতীর্ণ হন। এতে আপন জন্মভূমির উপর তাঁর মমতার কথাই প্রমাণিত করে। নীচের ভূস্বামী সরকার-চৌধুরীদের সহযোগিতায় তিনি এখানে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত তাঁর পত্রিকায় তিনি এই বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করতে গিয়েছেন। অচিরে তিনি পণ্ডিত শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই বিদ্যালয়টি আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। উল্লেখ্য এই একটি জুনিয়র হাই স্কুল। কৃষ্ণচন্দ্রের পরে এই স্কুলেই শিক্ষকতা করে শোনঘাটার রাধাকান্ত ভাট্টা ও কৃষ্ণপুত্রের পণ্ডিত হরনাথ চক্রবর্তী অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের শিক্ষক-জীবনের কথা আজও নদীয়ার ঐ অঞ্চলে কিংবদন্তীর মত প্রচলিত আছে। বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত তাঁর জীবন-কথাতো এই স্কুলে পাই "কৃষ্ণচন্দ্র 'সাধারণী' কল্প পরিত্যাগ করিয়া শিবনিবাসে গমন করেন। তিনি জমিদারের সাহায্যে শিবনিবাসে হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কর্মপটুতায় অল্পদিনের মধ্যে এই স্কুলের উন্নতি হয়। শিক্ষক হিসাবে তিনি অনেক শিক্ষকের আদর্শ।" ৩০. কৃষ্ণচন্দ্র শিবনিবাস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, এই সংবাদ অল্পকাল দেখা যায় "Severing his connection with 'Sadharani' Srijut Krishna Chandra went to Shibnibash, his native village and there started a middle A. V. School." ৩১. কৃষ্ণচন্দ্র শিবনিবাসের গ্রামাঞ্চলে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অল্পপ্রকার প্রাচীন প্রচলিত আছে। প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণেরা বলে থাকেন শিবনিবাস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় জমিদার সরকার-চৌধুরী। প্রতী ঐ স্কুলের বর্তমান সেক্রেটারী মহাশয় তাঁর ২৭-২, ৫১ তারিখের এক পত্রে আমাকে লিখেছেন 'From hearsay, I could gather that the Sibnibas School (whatever might be its name) was not established by late Banerjee. The School in its present building was started by him.' মতের এই সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার ঐ অঞ্চলে বঙ্গবাসীর অল্পতম বাতর্বিহী ছিলেন। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানা অঞ্চলে শিবনিবাস স্কুলকে সর্বাঙ্গিক পুরাতন বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রায় ৮৪ বৎসর পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র এই বিদ্যালয় হতে আধুনিক শিক্ষার পথ নিদান করেছিলেন।

বঙ্গবাসীর আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে সকালে একশ্রেণীর প্রবন্ধমা গল্পশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠাতেই তাঁদের অনেকের শিক্ষানবিশি হয় এবং প্রতিষ্ঠা ঘটে। তাঁদের আধিকাংশই বঙ্গবাসী-প্রকাশিত নব্য হিন্দুধর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই সমস্ত সাহিত্যিকদের অনেকেই কৃষ্ণচন্দ্রের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'উদ্দেশ্যেই চন্দ্র বঙ্গ মহাশয়ের সহিত বঙ্গবাসীর সেবার নিযুক্ত থাকিয়া আমাদের অগ্রদূতসদশ কৃষ্ণচন্দ্র, পৃথনীয় শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে বাঙ্গালার হিন্দুধর্মের, হিন্দুভাবের, হিন্দু রীতিপদ্ধতির প্রচার ও উন্নতিগকে সমাজসংস্কার করিয়াছিলেন। পূর্বে বাঙ্গালার ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজে লোকে হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। বঙ্গবাসী সে সঙ্কোচ দূর করিয়াছে। বঙ্গবাসীর সে চেষ্টার মূলে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যুগের হিন্দু ছিলেন না। তিনি কর্মী, আচারবান, গুরুভক্ত হিন্দু ছিলেন। তিনি শাস্ত্রের আদর্শ অনুসারে নিজের জীবনকে প্রণালীবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। সে চেষ্টার তিনি অনেকটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ...তিনি যখন বঙ্গবাসীর সম্পাদক, তখন পণ্ডিত শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অক্ষয় চন্দ্র সরকার, শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠপোষক, লেখক ও পরিচালকবর্গের মধ্যে ছিলেন।' ৩২. কৃষ্ণচন্দ্রের বঙ্গবাসীতে যে সমস্ত লেখক সমবেত হয়েছিলেন—উত্তর কালে তাঁদের অনেকেই খ্যাতনামা গল্পসাহিত্যিক হিসাবে বশবী হয়েছেন। চন্দ্রনাথ বঙ্গ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দেবেন্দ্রবিজয় বঙ্গ, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, হারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বজ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, হারবেশ্বর তর্করত্ন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায়সাহেব বৃন্দাবনচন্দ্র রক্ষিত, প্রভৃতি শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, রায়বাহাদুর দীননাথ সাক্তাল, রায়বাহাদুর জলধর সেন, নিখিলনাথ রায়, হরিশোহন মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের বশবী লেখকগণ কৃষ্ণচন্দ্রসম্পাদিত বঙ্গবাসীতে লিখতেন। হারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের সংগে বঙ্গবাসীর অস্তঃপর মতবিরোধ ঘটে এবং তাঁদের মতামতকুল 'সঙ্গীবনী' প্রকাশ করেন। সেকালের ইতিহাসে অগ্রগামী ভ্রাতৃদের সংগে নবহিন্দুদের বিবাদ সংবাদপত্রের অল্পতম বিষয়-বস্তু ছিল। এই আড়াআড়ির সাক্ষ্য ভারতী, তত্ত্ববোধিনী ও প্রচার, নবজীবনের পৃষ্ঠায় মিলবে। ভারতী-প্রচারের বিরোধ চূকে গেলে নূতন করে দৃশ্য দেখা দেয় সঙ্গীবনী-বঙ্গবাসীর মধ্যে। সঙ্গীবনীর পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখতেন। 'অল্প কিছুদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্যে শিখণ্ডীর ভূমিকা

৩০। বঙ্গবাসী, ৬ই কাঙন—১৩১৭।

৩১। The Telegraph—18, Feb. 1911.

৩২। নাটক, ২য় কাঙন—১৩১৭।

হইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর নেতাদের বি-অ্যাকশনারী চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি সজীবনীতে লিখিয়াছিলেন একটি কবিতা,—
“শ্রীদামু বনু এবং চামু বনু সম্পাদক সমীপেষু।

নাই বটে গৌতম অত্রি যে যার গেছে সরে,

হিঁহু দামু চামু এলেন কাগজ হাতে করে।

আহা দামু, আহা চামু! ৩৩

উল্লিখিত বঙ্গবাসীর লেখকদের অনেকের সংগেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ইন্দ্রনাথের সংগে কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধুত্বের কথা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্রনাথ বঙ্গবাসীতে অতঃপর যে ‘পঞ্চানন্দ’ লিখতে থাকেন—তার পিছনে যোগেন্দ্রচন্দ্রের মত কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেরণাও কম ছিলনা। ইন্দ্রনাথ লিখেছেন “এই সময়ে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বনু পঞ্চানন্দের ‘লাগিয়া আমাকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়াও এই আক্রমণে বনুজের প্রবল সহায় ছিলেন। আমি পরাভবস্বীকার করিয়া বঙ্গবাসীতে পঞ্চানন্দ দিলাম।” ৩৪ ইন্দ্রনাথের ‘কুদিরাম’ গ্রন্থখানি কৃষ্ণচন্দ্রের স্বগ্রাম শিবনিবাস থেকেই লেখা। এসম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন,—
“বঙ্গবাসীর উপহার দিতে হইবে বলিয়া আমি ‘কুদিরাম’ লিখিতে সম্মত হই। ক্রমে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়া গেল, কিন্তু আমার গ্রন্থ লেখা আরম্ভ হইল না। মহাসঙ্কটে পড়িয়া বর্ধমানের একদিন এক পরিচ্ছেদ ‘কুদিরাম’ লিখিয়া ফেলিলাম। কিন্তু আর লেখা কোনমতেই ঘটিল না। অগত্যা, অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করিলাম, বর্ধমান হইতে পলাইয়া শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়ার বাটি শিবনিবাসে গিয়া ৭৮ দিন থাকিলাম, আর সেই কয়দিনে যতদূর পারিলাম কুদিরাম লিখিলাম। তাহাই ছাপা হইল, বঙ্গবাসীর মান বাঁচিল, আমি বাঁচিলাম, এবং পড়িতে হয় নাই বলিয়া বোধকরি ‘কুদিরাম’ অনেককেই বাঁচাইয়াছে।” বঙ্গবাসীতে ইন্দ্রনাথ কৃষ্ণচন্দ্র একরূপ অভিন্ন ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যখন বঙ্গবাসীর সম্পাদক—তখন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর সম্পাদনা বিভাগে প্রবেশ করেন। এই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রকে অগ্রজ ও পথপ্রদর্শক হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। তিনি যে কৃষ্ণচন্দ্রের বঙ্গবাসীর কাছে ঋণী ছিলেন, একথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। তিনি একখানি গ্রন্থ যোগেন্দ্র চন্দ্রকে উৎসর্গ করার কালে লিখেছিলেন—
“আপনার বঙ্গবাসীর সেবার নিযুক্ত থাকিয়া আমি বাংলা লিখিতে শিখিয়াছি। আপনার বঙ্গবাসীর সম্পাদক পদে উন্নীত হইয়া আমি বাঙালীর সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত হইয়াছি। এখন ভাগ্যবশে আমি স্বতন্ত্র, কিন্তু বঙ্গবাসীর ভাব ও ভাষা আমার হইয়া থাকিবে।” ৩৫ আবার এই প্রসিদ্ধ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে লিখেছিলেন “কৃষ্ণচন্দ্র চলিয়া গেলেন, তাঁহার গণা-দিন শেষ হইয়াছিল, তাঁহার ইহজীবনের পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার জীবন-নাট্যের ধ্বনিকা পতিত হইয়াছিল—তিনি চলিয়া প্রভাবে গেলেন, কিন্তু যে ভাবের হিন্দুর হিন্দুত্বের পরিস্ফুটন হইয়াছিল, সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব

হইয়াছিল, যে ভাবের আদর্শে তিনি স্বীয় জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে ভাব, সে ভাবের প্রভাব, সে অগ্নিহোত্রের অগ্নিকুণ্ডের ভাব বহির্ভিত্তি সজীব করিয়া কে রাখিবে? কে হিন্দুকে হিন্দু হইতে বলিবে, হিন্দু হিন্দু হইলে যে কত সুখ, কত আনন্দ, তাহা কে বাঙালীকে বুঝাইবে?” পাঁচকড়ির এই প্রশস্তি নিঃসন্দেহে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু বঙ্গবাসী-প্রবর্তিত হিন্দুধর্ম পরবর্তীকালের বাঙালী গ্রহণ করেনি। কালের নির্মম কুঠারাঘাতে তা বিশ্বস্তির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। সে যুগের ঐ নব্য হিন্দুয়ানিকে সেকালের অনেক কঠিন চিন্তা ব্যক্তিও শ্রদ্ধা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের মত প্রথম চৌধুরীও এই নব্য হিন্দুদের জন্ত লেখেন “বাংলার নব্য হিন্দুয়ানিই আমার কাছে অসহ, কেননা তার মূলে কোনরূপ সরল বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যে নেই, তার প্রমাণ নব্য হিন্দুরা তাঁদের মত খাড়া করাবার জন্ত একবার যান দৌড়ে স্পেন্সরের কাছে, আর একবার শঙ্করের কাছে—তারপর Hegel, Eucken, Bergson, কবিরাজ গোস্বামী, দাশরথি রায়, শশধর তর্কচূড়ামণি, Hertz, Poincare এ সবই তাঁদের গুরু। একটু দাঁড়াবার জায়গা পাবার জন্ত, তাঁরা একবার এর পায়ে ধরছেন, আর একবার এর পায়ে ধরছেন; শুধু এক কাজ করতে এঁরা একান্তই অক্ষম। সে হচ্ছে মনোব্রাজ্যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। এই মানসিক কাপুরুষতা যেমন কমিক তেমনি ট্রাজিক। ৩৬ নবজাগৃতির যে প্রধান লক্ষ্য জিজ্ঞাসা, জীবন-রহস্য মনুষ্যের চেষ্টা, মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধির উপরে নিষ্ঠা—বঙ্গবাসীর হিন্দুধর্মে এই যুগ লক্ষণগুলির অভাব ছিল। রামমোহনের জ্ঞানাত্মিক ব্রহ্মবাদ সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়েছিল এই সমস্ত আবেগপ্রধান ভক্তিবাদ ও অলৌকিক পৌরাণিক ধর্মের প্রাধান্যের জন্ত। কিন্তু কালের রূপান্তরশীল ইতিহাসে রামমোহনের চিন্তাই ক্রমশঃ জয়যুক্ত হয়ে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে আবেগপ্রধান সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র পুরাণকে অবলম্বন করে কাব্য-কাহিনী লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রও যুক্তির দ্বারা পুরাণের অংশবিশেষকে স্বীকার করে নেন। অক্ষয় সরকার, শশধর তর্কচূড়ামণি, পঞ্চানন্দ তর্করত্ন, ইন্দ্রনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণ হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যা করলেন। এলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পূর্ণজাগরণ হল। এই সময়ে—Orthodox Society also tried to rationalise its instinctive resistance, and even Bankim Chandra Chatterjee reacted in this manner. ৩৭ এইগুলিই নবজাগৃতির প্রতিরোধের কারণ হ’ল। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-চিন্তার মধ্যে যে বাস্তব মনুষ্যজীবনের আবেগ ছিল—বঙ্গবাসীর হিন্দু নেতাদের তাও ছিল না। বঙ্গবাসী-হিতৈষী শশধর তর্কচূড়ামণির কাছে ধর্মটা ছিল একটা লৌকিক ব্যাপার। ধর্ম মূল্যতঃ বিধিবদ্ধ পদ্ধতির অঙ্গস্বরূপ মাত্র। ধর্মকর্ম

৩৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড পৃ: ৮।

৩৪। বঙ্গভাবার লেখক।

৩৫। উৎসর্গপত্র, রূপসংগ্রহ।

৩৬। সবুজপত্রের ডাক। দেশ ১৩ই কার্তিক ১৩৩৬।

৩৭। Notes on the Bengal Renaissance

একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কিনা—এসব দিকে লক্ষ্য ছিল না তর্কচূড়ামণির। তর্কচূড়ামণি সেকালে নব্য-হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যার জন্য জনপ্রিয় হয়েছিলেন—বিজ্ঞানাগর, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যুগনারকগণ তাঁর ধর্মব্যাখ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যাত ধর্ম যে সেকালে গ্রহণযোগ্য ছিল না—তা বঙ্কিমচন্দ্র, বিজ্ঞানাগর, পরমহংস প্রভৃতি সকলেই উত্তর কালে এই মত ব্যক্ত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র শশধর তর্কচূড়ামণিকে কি চক্ষে দেখতেন, সে পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের রচনা থেকে এই প্রসঙ্গে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—“পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি সেই সময়ে কোলকাতায় হিন্দুধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা করছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই কৌতূহলী হয়ে প্রথম তাঁর সভাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে তর্কচূড়ামণির দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হননি, এমন কি, এর সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করেছিলেন, তার একাধিক প্রমাণ আছে।” রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির বঙ্কিম-অধ্যায়ে লিখেছেন—“এই সময়ে কোলকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়াছেন—কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগদানে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার ‘প্রচার’-পত্রে তিনি যে ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।” “পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিম ও শশধরের সম্পর্কের পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমকে ‘প্রচার’ ও ‘নবজীবনে’ ধর্মব্যাখ্যায় নিরত দেখে চূড়ামণি তাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন। আলবার্ট হলে বঙ্কিমের সভাপতিত্বে চূড়ামণি বক্তৃতা দিলেন। দু’একদিন পর বঙ্কিম আর গেলেন না। তিনি বললেন, “কয়দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম।... তর্কচূড়ামণি হ্রাসপণ্ডিত, তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়। কি হইলে এদেশের সমাজধর্ম এখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এদের নাই, তাই যা খুসী তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জে ব্যস্ত।” বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তর্কচূড়ামণির মত প্রকাশে অগ্রাহ করেছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির আলোচন দ্বারা হয়নি। ৩৮ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি বঙ্গবাসীর উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক ও লেখক ছিলেন। নীতিগঠনের মূলে মাছুষ তথা মনুষ্য-চরিত্র গঠনই প্রধান—বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠপোষকগণ একথা সম্যক্ অস্বীকার করেননি। আর ঐ মৌলিক ও শাস্ত্র জীবনবোধের অভাবে শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম বিয়রক জ্বালাময়ী বক্তৃতাগুলি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কেবল শশধর তর্কচূড়ামণিই নয়—বঙ্গবাসীর নব্য হিন্দু নেতাদের অনেকের বাণীই কালের ধূসর প্রকোষ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গবাসীর এই নব্য হিন্দু নেতাদের একজন।

বঙ্গবাসী হতে তদানীন্তন কালে যে লেখক-গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে—তাঁদের সাহিত্য-সম্পদের মূল্যায়নের জন্য পৃথক আলোচনার

প্রয়োজন। বর্তমান ক্ষেত্রে তা অভিপ্রেতও নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় কৃষ্ণচন্দ্র ও বঙ্গবাসী। কৃষ্ণচন্দ্রে সংবাদপত্রসেবী হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রে সে যুগের একজন বিখ্যাত গল্পলেখকও ছিলেন। তৎকালে তাঁর রচনাগুলি প্রচুর হয়ে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর Journalistic লেখা ছাড়াও তাঁর প্রবন্ধ সংখ্যাও বড় কম নয়। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মনীতি ও রাজনীতি ও সমাজনীতির উপর লিখতেন। মাঝে মাঝে জীবনী ও রম্য-ভ্রমণকাহিনীও লিখতেন। তাঁর রচনার ভাব ও ভাষা অত্যন্ত সরল—বক্তব্য স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। ‘বঙ্গভাষার লেখক’-স্বীকৃত আলোচনার তৎকালে কৃষ্ণচন্দ্রের যে পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল, তার কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ‘বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুকাল ধাবং সংবাদপত্রের সংশ্রবে আছেন। সংবাদপত্র পরিচালনে ইহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছে। বঙ্গবাসীর পাঠকবৃন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষরূপে চিনেন। রাঢ় অঞ্চলে সেই যৌর দুর্ভিক্ষের সময় ইহার কণ্ঠতৎপরতা, শ্রমসহিষ্ণুতা ও সূক্ষ্ম অধ্যবসায়ের কথা সকলেরই মনে জাগরুক আছে। শাস্ত্রে ও আশুবাচ্যে ইহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। হিন্দুর প্রাচীন রীতিনীতি ও ক্রিয়ানীতি বাহাতে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত রহিয়া যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতার চটকে বাহাতে হিন্দুসম্মান আত্মবিশ্বস্ত তথা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে না পারে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অশ্রান্তশ্রমে ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের দীর্ঘকাল ধরিয়া তৎবিষয়ে লেখনী চালনা করিতেছেন। তাঁহার লক্ষ্য বড় স্থির, লেখনী সংযত। বিপক্ষপক্ষের ডুকুটি ভঙ্গিতে তিনি ভীত হইবার পাত্র নহেন। তিনি নিজ মনে ও জ্ঞানে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, পাঠককে তৎবিষয়ে উপদেশ দিতে কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন। দেশের দুঃখে ও দেশের হৃদয়শায় তাঁর প্রশ্ন ব্যথিত, তাই তিনি সেই আঁতের ব্যথা মুক্তপ্রাণে, নিভীকতা সহকারে পরিব্যক্ত করেন। রাজনীতি হটক, ধর্মতত্ত্ব হটক আর আত্মতত্ত্বই হটক, যে নীতি বা তত্ত্বের তিনি আলোচনা করেন, তাহাতেই উহার একাগ্রতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। ৩১ হিন্দুধর্মের প্রচার ও লোকশিক্ষার জন্য তখন বঙ্গবাসী-কার্যালয় হতে সুলভমূল্যে শাস্ত্রগ্রন্থ ও প্রাচীন সাহিত্য প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রকাশনী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন জৈলোক্যনাথ ভাগবতকৃষ্ণ ও পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়। শাস্ত্রবিদ কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মকূল্যে ও প্রচেষ্টায় এই বিভাগ হতে কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রে সেকালের বিখ্যাত বিখ্যাত পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। সহ-সম্পাদক হিসাবে তিনি সাধারণীকে নানা রচনাসম্বন্ধে সুশোভিত করেছিলেন। ইহা ব্যতীত বঙ্গবাসী, দৈনিক, জগন্মুখি, নবজীবন, প্রচার, বঙ্গমতী, অহুসন্ধান, সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তিনি রচনাদি প্রকাশ করতেন। বিশেষ ‘বঙ্গমতী’র সংগে তাঁর গভীর সৌহার্দ্য ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে ‘নারক’ লিখেছিল—“তাই বলিতেছি, কাঁদ বঙ্গবাসী, তোমার কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য কাঁদ, কাঁদ বঙ্গমতী, যে সভ্যবের কনকলেখায় তোমার অঙ্গ যিনি স্রীসম্পন্ন করিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য কাঁদ”—বঙ্গমতীর পুরনো কাইল অহুসন্ধানের সুযোগ পাই নাই। কিন্তু

কৃষ্ণচন্দ্র যে নিয়মিত বঙ্গবতীতে লিখতেন—তা আর একটি সংবাদে সমর্থিত হয়। বঙ্গবতীতে প্রকাশিত কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ হতে খানিকটা উদ্ধৃত করছি—“গত ২১শে মাঘ ব্রাহ্মমুহুর্তে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কালীলাভ করিয়াছেন। তিনি পূর্বে দিবস রাত্রি ১১টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। অপরাহ্নে তিনি বঙ্গবতীর জন্য তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং দুইটি বহুস্তোত্র প্যাক করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। রাত্রি ১১টার পর তাঁহার একটু মাথা ধরে, তিনি শয্যা গ্রহণ করেন, সেই শয্যাই তাঁহার শেষ শয্যা।” ৪০ উক্ত সংখ্যাতে কৃষ্ণচন্দ্রের একটি রচনাও প্রকাশ হতে দেখা যায়। এই সংবাদ হতেই বঙ্গবতীর সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সখ্যতার কথাটি বোঝা যায়। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সমকালীন পত্র-পত্রিকা-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত গল্প লেখক ছিলেন, একথা আরও তত্ত্ব তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করা যায়। তাঁর রচনার আদর্শ হিসাবে এখানে তাঁর কয়েকটি রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। এগুলি হতেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিগুণের স্বরূপটি সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

“একথা যদি সত্য হয় যে, ভারতের উন্নতি করিতে হইলে, বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহা হইলে এখন হইতে সর্ব ধর্মের, সর্ব বর্ণের, সকল শ্রেণীর বালকবৃন্দের রাজনীতিক আলোচনার পথ বন্ধ করিলে চলিবে না। করিলে আমাদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইবে।

যদি বল, এখন যখন বর্ণাশ্রম ধর্মের শিক্ষা নাই, তখনাবায়ী বিভাগ নাই, সেইরূপ আশ্রমধর্মী বালক নাই, তখন যে আদর্শ এখন আমাদের সমাজ চলিতেছে, সমাজের বর্তমান বাহা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র সকল শ্রেণীর বালকই বিভাগের ছাত্র অভিধানে অভিহিত, তখন পূর্বাভাব পরিবর্তন করিয়া বর্তমান অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া বালকদিগকে রাজনীতিক আলোচনা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। আমি বলি, একথাও ঠিক নহে। বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলেও বালকদিগকে রাজনীতিক চর্চা হইতে নিবৃত্ত করা কখনও উচিত নহে। কারণ বলিতেছি।

কলিযুগে আমরা এখন অন্নগত-প্রাণ হইয়াছি। হা অন্ন, হা অন্ন করিতে করিতেই দেশের সাড়ে পনের আনা লোকের প্রাণ উদ্ধার হইতেছে। দারুণ অন্নচিন্তাতেই সংসারী লোক ভিন্নমান। ইহারা সজীব হইয়াও অন্নচিন্তায় নিমজ্জিত, জীবনের অভিযতন ইহাদের নাই বলিলেই চলে। ইহারা অন্নের ভাবনার সঙ্গ শক্তি, শক্তিহীন, সর্পি চিত্ত। এই চিন্তা ছাড়িয়া অন্ন চিন্তা করিবার শক্তি বা সামর্থ্য ইহাদের প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে। যখনই ইহারা এই ভাবনা ছাড়িয়া অন্ন ভাবনার মন দেয়, যখনই অন্ন ভাবনা ইহাদের অন্নঅন্নের পথে বাধা স্বরূপ হইয়া উপস্থিত হয়, তখনই ইহারা বিশেষাধার, হইয়া দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর দারুণ প্রকটমূর্তি দেখিয়া সে সব ভাবনা-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবল অন্ন অন্নের পন্থাকেই সেবা করিতে থাকে। কাজেই ইহাদের দ্বারা স্বার্থ বিসর্জনকারী দেশের ও দেশের ভাবনা হইয়াই ওঠে না। হইতেই পারে না, হওয়া সম্ভবপর নহে।

ইহারা ইহা আর ম্যালেরিয়া-অরে প্রদীপিত হইয়া দিন দিন অধি মজ্জাশূন্য হইতেছে। অন্ন অর্জন করিবার সামান্য শক্তিটুকুও এইসব পীড়নে দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। ইহার উপর রাজনীতিক চক্রের ফলস্বরূপ স্বকৌশলে পরিচালিত কৃষ্ণ পেষণ আছে। প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—বাহারা দেশের অধি ও মজ্জা, শোণিত ও মাংস, জীবন ও প্রাণ, তাহারা এ দেশে এখন জীবনে মৃতবৎ হইয়া আছে, সজ্ঞানে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে, মাহুৎ হইয়া কালের পুস্তলিকাবৎ ক্রীড়া করিতেছে। এমত অবস্থায় দেশের হিতকারী ব্যক্তিগণ ইহাদের নিকট ঘোর স্বার্থবলির মহাবজ্ঞের আয়োজন-অনুষ্ঠানের, জপ বজ্ঞের সাধনা অনুষ্ঠানের আশা করিতে পারেন কি? ধর্মের পথ কালধর্মের লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, ধর্মের পথও যায় যায়, তাই এই ঘোর আপৎকালে ইহাদের আশা ছাড়িয়া, অন্তর্দিকে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইতেছে।

এমত অবস্থায়, আমাদের এই বর্তমান আপৎকালে, যুবক-বালকবৃন্দই আমাদের আশা, বাহারা এখন অন্নচিন্তায় জর্জরিত নহে, চাকরীর অর্ধনাগপাশে অনেকে আবদ্ধ হয় নাই, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গের স্নেহমতায় বদ্ধ হইয়া অনেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় নহে। এমত অবস্থায়, যেখানে স্বার্থবলির প্রয়োজন, যেখানে ভাবোন্নততার আবশ্যক, যেখানে প্রাণের মায়ী, সংসারের মায়ী বিন্যস্ত হইতে হইবে, সেখানে দেশের একমাত্র আশা বালকদিগের উপর।

পশ্চাত্তম সমাজের আদর্শ আমাদের এ পরম পবিত্র স্মৃতি স্মৃশ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজে ভগ্ন হইতে আসিয়াছে। কিন্তু বাহা, ভাবিয়াছে তাহা সেই পশ্চাত্তম সমাজের আদর্শেই পুনর্গঠিত করিতে হইবে। তাই আমাদের পুনঃসংস্কার কার্যে পশ্চাত্তম সমাজই আমাদের আদর্শ। সেই আদর্শ দেখিতে পাই—বালকগণ-যুবকগণই সমাজের ভগ্নশরীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান সহায়। ইতালী, জার্মানী, গ্রীস প্রভৃতি যে সব পশ্চাত্তম সমাজের লুপ্তপ্রায় গৌরবরবি অস্তমিত হইবার উপক্রম হইয়া সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই দেশের ও সেই সমাজের বালকগণই তাহার প্রধান ও প্রথম সহায়। বয়োবৃদ্ধ গৃহস্থ যখন কর্তব্য নির্ণয়ে পরাধুখ, স্বার্থ চিন্তায় যখন সংশয়চিত্ত, তখন যুবক-বালক হাসিতে হাসিতে সঙ্গ হাসিভরা মুখে ঘাতকের নৃশংস তরবারির সম্মুখে আপনাব মস্তক পাতিয়া দিয়াছে, আপনাকে বলি দিয়া দেশের কাজ ও দেশের কাজ উদ্ধার করিয়াছে; ইতিহাসে ছুরি ছুরি এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তাই বলি তাই, যখন এখন বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহজে বা সহসা করিতে পারিবে না, যখন সংসারে নীচ স্বার্থে বদ্ধ হইয়া সমাজের হিতার্থে, দেশের ও দেশের হিতার্থে আত্মবলি দিতে সমর্থ হইবে না, যখন দেশের ও দেশের ভাবে উন্নাদ হইয়া উন্নয়ন হইতে পারিবে না—তখন বাহারা এ কাজ পারে, তাহাদের পথে বাধা দিও না। অমানিশায় শবসাধনে নিজের শক্তি নাই বলিয়া, যে উহাতে সমর্থ, তাহার পথের কষ্টক হইও না। শাস্ত্রে বাহা নির্দেশ করিতেছে, এই স্বদেশে বসিয়া, গত দুই বৎসরের যত্নেই আলোচনা লক্ষ্য করিলে, তাহার অন্তরায় হওয়া কখনই তোমার উচিত নহে।” ৪১

কৃষ্ণচন্দ্রের এই রচনাংশ হতে সমসাময়িক স্বদেশী-আন্দোলনের প্রতি তাঁর উদারতার ভাবটিই পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। এই রচনাটি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের একেবারে শেষভাগে লিখিত। তখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ভাবটি ক্রমশঃ বর্ধিত হতে চলেছিল। উক্ত রচনায় তিনি নবযুগের রাজনীতির চিন্তা-ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। কৃষ্ণচন্দ্র এদেশের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী উক্ত অংশে সমাজ-ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবটি উপলব্ধি করা যাবে।

“সমাজের সামাজিকগণ সংঘনী না হইলে, বিধিনিয়মের বশবর্তী হইয়া না চলিলে, সমাজ বন্ধন হয়না। ইহা মূল সত্যকথা। সংঘমেই সমাজের বল, সামাজিকগণ খেচ্ছাচারী হইয়া চলিলে, অপর সামাজিকগণের সুখ-দুঃখের দিকে দৃষ্টি না করিলে, প্রবৃত্তির দাস হইয়া নীচ প্রবৃত্তির সেবা পরায়ণ হইলে, সমাজ বলহীন হয়। বর্তমান আমাদের এই হিন্দুসমাজের সামাজিকগণ একথা বুঝিতেন, ততদিন আমাদের এই হিন্দুসমাজ পূর্ববলে বলীয়ান ছিল। ধর্ম শাস্ত্র আমাদের সমাজ-বন্ধনের মূল ভিত্তি। হিন্দুসমাজের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-সমাজ কিরূপ নীতিতে চলিবে, ক্ষত্রিয়-সমাজ কিরূপ নীতিতে চলিবে, বৈশ্য-সমাজেরই রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার কিরূপ হইবে, শূদ্র-সমাজের রীতি-নীতি কিরূপ হইবে, কোথায়ও বর্ণসঙ্ঘ হইলে সেই বর্ণসঙ্ঘ-সমাজের জন্ত বিধি-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা ধর্মশাস্ত্রবেত্তাগণ, নিজ যোগবলে নির্ণয় করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এখন কালধর্মের ধর্মশাস্ত্রের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন সংস্কার করিবার নিমিত্ত যাহারা উদ্ভোগী বা অভিল্যাবী, যুগভেদে এ ধর্মশাস্ত্রের প্রতি, বিভিন্নতার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি করা উচিত। প্রমত্ত বুদ্ধিবলে আজ তাঁহারা যে পরিবর্তন সংস্কারের উচ্চ চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছেন, তপশ্রা ও যোগবলে ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ নিজ নিজ বিজ্ঞানবলে যে তাহা বুঝেন নাই, এমন নহে। বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই যুগভেদে ধর্মশাস্ত্রের ভেদ করিয়া গিয়াছেন। তোমরা এখন তাহা বুঝিতে পার আর নাই পার, তাঁহারা বহুকাল পূর্ব হইতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন—আর বুঝিয়া তোমাদের উচ্ছৃঙ্খল মহাদায় হইতে হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কালোচিত বিধি-ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট তুমি আমি অতি ক্ষুদ্র-দপি ক্ষুদ্র, নগণ্য মনুষ্য, তথাপি তোমার চীৎকার দেখিলে প্রকৃতই প্রাণে ব্যথা লাগে। ১৪২ কৃষ্ণচন্দ্র প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার উপরই বিশ্বাসী। ধর্ম ভিত্তিমূলক বর্ণাশ্রম-সমাজ-ব্যবস্থা কৃষ্ণচন্দ্রের আদর্শ-সমাজ। তাঁর অসংখ্য রচনাতে এই মতবাদই গূঢ়তর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র একালের উৎকট নব্যতার ভোগবাণকে বিক্রম করেছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার বহির্ভূতী স্বরূপকে তিনি সার্থক ভাবে আবিষ্কার করে স্বদেশ-সভ্যতার চিরমুখী মূর্তির সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন। সেই পাশ্চাত্য সভ্যতা হতে তিন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিকৃষ্ট ছাড়া মহৎগুণের সাক্ষাৎলাভ করেননি।

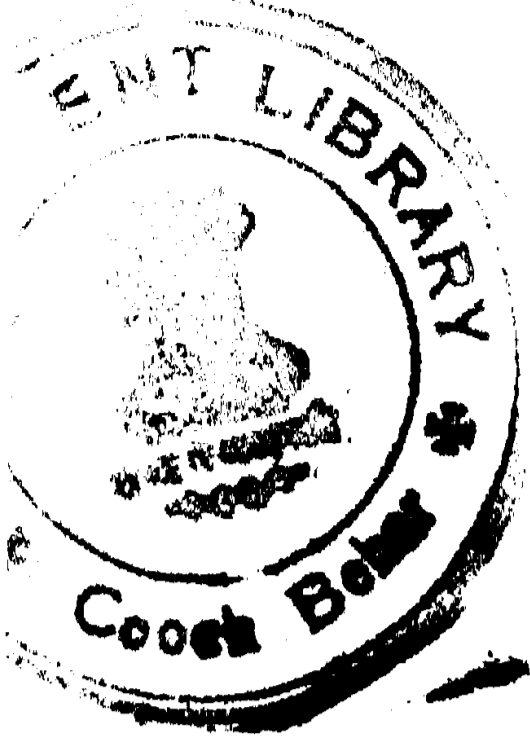
“আমরা যেমন অসত্য আছি—সেই অসত্যতাও আমাদের ভাল, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের ভোগ-সুখের আঁকর কামনা মুখর সভ্যতার আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের পিতৃপুরুষেরা ইন্দ্রিয়ভূক্তিকে তুচ্ছ

৪২। হেলার হারাইও না। বঙ্গমতী, ৬ই কাশ্বন, ১৩১৭।

করিয়া অন্তর্ভূতী প্রবৃত্তিকে বৃদ্ধি করিয়া অন্তরে যে অপার আনন্দ ভোগ করিতেন, আমরা যেন সংসারে সংঘনী হইয়া সেই আনন্দই প্রাপ্ত হইতে পারি। বহির্ভূতী প্রবৃত্তির কাষাগিতে পড়িয়া আমরা যেন দিনরাত্রি জলিয়া পুড়িয়া না মরি। পাশ্চাত্য জগতে দেখিতে পাই, এক জাতি পশুবলে আর এক জাতির উপর আধিপত্য করিয়া নিজজাতির ভোগ-সুখের জন্ত অমবরত চেষ্টা করিতেছে, এই আধিপত্য বিস্তার বা রক্ষা করিবার জন্ত মাহুয মারিবার কত কৌশল আবিষ্কার করিতেছে; সুখশাস্ত্রের আধার সামাজিক রীতি-নীতির সংশোধন আদি ব্যাপারে তাঁদৃশ অর্থ-সামর্থ্য ব্যয় না করিয়া, সময় আয়োজনে, সৈন্ত, কামান, বন্দুক, সময়পোত, বায়ুবান প্রভৃতি সমরোপকরণ সংগ্রহে অকাতরে ঋণের উপর ঋণ করিয়া অর্থ-সামর্থ্য ব্যয় ও কালক্রয় করিতেছে; অন্তরে অন্তরে হিংসার ছালায়, ঈর্ষায়, দংশনে, অসহ ছালা সহ করিতেছে। আর বাহার উপর হিংসা করিতেছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মুখে বলিতেছে, তুমি আমার পরম বন্ধু, জীবন-মরণের সহায়, বিপদের আশ্রয় ইত্যাদি। এই কপট, এই অসরল, এই কৃত্রিম ভাবই পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য রাজনীতির পরিচয়। ৪৩ কৃষ্ণচন্দ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার কপটমূর্তিকে যেমন চিত্রিত করেছেন—তেমনই সেই সভ্যতার অমুকরণকেও কশাঘাতে জর্জরিত করেন। একালের অত্যধিক বিজাতীয় অমুকরণকে বিক্রম দিয়ে তিনি লিখেছেন। “এখন আর আমরা আমার প্রতি, আমার নিজের প্রতি বড় একটা দৃষ্টি করি না। পরই এখন আমাদের প্রধান অন্তরের বন্ধ হইয়াছে। আমার বাহা নিজের তাহা ভাল নহে, তাহা করা আমার বর্তব্য নহে, তাহা করিলে, আমার ভাল না হইয়া মন্দই হইবে। আমাদের এখনকার সমাজে বাহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত বা পরিচিত হইবার অভিল্যাবী, ইহাই এখন তাঁহাদের অনেকের, দৃঢ় ধারণা। অন্ততঃ তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে আমরা প্রতিনিয়ত এই ভাবেরই পরিচয় পাইতেছি। এই ভাবের প্রাবল্য হইয়াছে বলিয়া, আপনাকে নীচ বলিয়া তাহাদের ধারণা হইয়াছে—তাঁহারা এখন পরের অমুকরণ করিতে সদা বাস্তব। এ অমুকরণে সমাজে এ পরভাব প্রবেশ করিলে, পরভাব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলে আমাদের পরিণাম কি হইবে, একথা তাঁহারা ভাবেন না; না হয়, তাঁহাদের বর্তমান বুদ্ধিতে ভাবিতে তাঁহারা অসমর্থ। একজন্ত আমাদের সমাজ এখন ক্রমে অপরের সমাজ হইয়া ঠাড়াইতেছে। আমরা এখন ক্রমশঃ আমাদের নিজস্বকে বিসর্জন করিয়া, স্বহস্তে বলিদান দিয়া, পরের পোষাকে সঙ সাজিয়া পরের আচার-ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া, এক অদ্ভুত জীব হইয়া সমাজে বিচরণ করিতেছি বা তাহারই উপক্রম করিতেছি। এখন আমরা নিজে নিজেই আপনাকে চিনিতে পারি না,—অপরে আমাদেরকে চিনিবে কিরূপে? কিন্তু এ সংসারে আমিই সব, আমার উন্নতি না হইলে এ সংসারের সমাজের উন্নতি নাই। বাহা নিজের তাহা ভাল, বাহা আমার তাহা শ্রেষ্ঠ, বাহা আমার দেশের, তাহা আমার অতি প্রিয়বন্ধ, অতি আদরের সামগ্রী, এইরূপ ধারণা এবং ইত্যাকার ধারণা মনে দৃঢ় না হইলে, আমাদের উন্নতির আর অন্য উপায় নাই” ৪৪ [ক্রমশঃ।

৪৩। সভ্যতা বর্ধরতা নহে। বঙ্গবাসী, ২৪শে পৌষ, ১৩১৬।

৪৪। নিজেকে চিন ও জান।—বঙ্গবাসী ২৩শে আশ্বিন ১৩১৬।



মাহিতিক কৌতুকী

শ্রীশৌরীশ্রকুমার ঘোষ

(৪)

কাকতকবি রজনীকান্তকে একদিন রাম ভাড়াই মশাই বললেন—
রজনী, বিয়েতে গেলে, দিলে কি ? খেলে কি ? পেলে কি ?
রজনীকান্ত বললেন—দিলাম দৌড়, খেলাম আছাড়,
পেলাম ব্যাধা ।

তঁার কাছে এক চাবী মক্কেল এসেছে । জিজ্ঞাসা করলেন—
বিয়ের সময় তোমার বয়স কত ছিল ?

উত্তর—১৭ বছর ।

—তোমার দ্বীত তখন বয়স কত ছিল ?

—বছর ১২ ।

—এখন তোমার বয়স কত ?

—আজ্ঞে, ৩০।৩২ বছর ।

—এখন তোমার দ্বীত বয়স কত ?

—আজ্ঞে, সে তো প্রায় ৪৬।৪৭ বছর হবে ।

—সে কি গো ? তোমার বউ হঠাৎ তোমার চেয়ে বড় হয়ে
গেল—কেমন করে ?

—আজ্ঞে, ঐ কথাটাই কোন ভুললোককে আজ পর্যন্ত বোঝাতে
পারলুম না—দ্বীলোকের বাড়ি যে বড় বেশী ।

রজনীকান্ত কতকগুলি হাঁসের ডিম এনে রাজশাহীর বাড়ীতে
এক কুলুঙ্গীতে রেখে দেন ।

একদিন দ্বীত কাছে ডিম চাইলেন ।

পৃহিনী বললেন—কোথায় রেখেছ ?

রজনীকান্ত—উঁচুতে, পেড়ে আন ।

রামহরি বলল—পণ্ডিত মশাই, আমার এক ছেলের নাম
জগৎপতি, একজনের নাম সুরপতি, একজনের নাম শচীপতি,
একজনের নাম ধরাপতি, আর একজনের নাম লক্ষীপতি । আর
এক ছেলে হয়েছে, তার নাম মেলাতে পারছি না—

পণ্ডিত মশাই—কেন, এ ছেলের নাম রাখ ভগিনীপতি ।

রজনীকান্তের সাংসারিক জীবন বড়ই সুখের ছিল ।
অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল, তাই দ্বীকে তিনি মনের মত করে
গড়ে তুলেছিলেন ।

বিবাহের পর তঁার দ্বী ২৩ বছর শান্তভাবে 'মা' বলতেন
না—আপনি, আশ্রন, বহন এই সব বলতেন । সেই ভ

কবি-জননা একদিন হুংখ করে বলেছিলেন—আমার একটি মাত্র
পুত্রবধু সেও আমাকে 'মা' বলে না ।

রজনীকান্তের কানে একথা পৌঁছল । তিনি দ্বীকে অনেক
করে বোঝালেন—তবুও কোন সম্ভাবজনক উত্তর পেলেন না ।
হুকুম করলে পাছে হিতে বিপরীত হয় তাই তিনি এক কোণল
অবলম্বন করলেন ।

একদিন রজনীকান্ত সপরিবারে নৌকো যোগে ভাঙ্গাবাড়ী
থেকে রাজশাহীতে বাচ্ছিলেন । হঠাৎ নৌকোটা কাৎ হয়ে গেল ।
তিনি পড়ে গেলেন । ঝাঁড়ি মাঝিরা হৈ হৈ করে উঠল ।
বাবু ডুবে গেল, বাবু ডুবে গেল বলে চিৎকার করে ২।১ জন জলেও
ঝাঁপিয়ে পড়ল । জলে বাবুর আর দেখা নাই । কবি-জায়া
উদ্গাদের মত শান্তভাবে পা ছুটি জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে
উঠলেন—মা, কি হবে মা, কি হল মা ।

রজনীকান্ত কিন্তু নৌকোর পাশেই ছিলেন । হুঁ একটা ডুব
দিয়েই নৌকোর উর্চে হাসতে হাসতে বললেন—কেমন, আর তো
'মা' বলতে মুখে আটকাবে না, এবার থেকে মাকে 'মা' বলে
ডাকবে তো ?

তখন সকলে তঁার পূর্ব-পরিকল্পিত মতলবের কথা শুনে হেসে
উঠল—আর তঁার দ্বী লজ্জায় মায়ের পা হুঁটি জড়িয়ে ধরলেন ।

হাইকোর্টে মামলা ।

মকঃবল থেকে মোকদ্দমা এসেছে । এক পক্ষের উকীল
দারকানাথ মিত্তির আর অপর পক্ষের উকীল কবি
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মোকদ্দমাটি জমি সংক্রান্ত । অনেক দিনের ব্যাপার ।
আগে মুল্লফ কোর্টে দু পক্ষই এসেছিল জমির দাবী নিয়ে । এ বলে
আমার জমি, ও বলে আমার জমি । এক পক্ষ বলে, এ জমি
বহুদিন ধরে আমার দখলে আছে, জমির ওপর যে চণ্ডীমণ্ডপ—তাও
আমাদের সম্পত্তি ।

অপর পক্ষ বলে—ও সব মিথ্যে, ও জমি বহুকাল থেকে
আমাদের দখলে । আর ও জমিতে কোন চণ্ডীমণ্ডপই নেই ।

জমিতে চণ্ডীমণ্ডপ আছে কিনা দেখবার জন্য মুল্লফ সেলেন—জমি
দেখতে । গিয়ে সেখানে তিনি দেখলেন, জমিতে চণ্ডীমণ্ডপের কোন

মার্জনা চায় তাহলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। সানিন তার উত্তরে জানালো, বেহেতু সে জানে সে কোনোই দোষ করে নি, তাই সমাজ বা অসামাজ কোনো বকম মার্জনাই সে চাইতে পারবে না।

সলজ্ঞ ভাবে কনসিটার উত্তর দিলো, তাহলে হু'-পক্ষ বন্ধুত্ব পৃথক গুলী ছুঁড়বে ?

সানিন বললো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা কি হাওয়ার উদ্দেশ্যে গুলী ছুঁড়বো ?

দ্বিতীয় লেকটেন্যান্ট এবারে ভীষণ লজ্জা পেয়ে স্তোতলাতে স্তোতলাতে বললো—না, না তা নয়। আমি কেবল বলছিলাম—আপনারা হু'-পক্ষই হচ্ছেন সম্মানিত ব্যক্তি। বাকু, এসব কথা আপনার সহযোগীর সঙ্গে হক্-...আর কিছু বলতে পারলো না ও, বিদায় নিলো।

লেকটেন্যান্ট বিদায় নিলে সানিন চেয়ারে বসে মেঝের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ভাবতে লাগলো। একি হলো, হঠাৎ আমার জীবন একি অভূত পথ নিলো ? আমার সব অতীত, সব বর্তমান যেন অর্থহীন হয়ে গেলো, মনে হচ্ছে ফ্রান্সফোর্টে আমাকে বন্দ্যযুদ্ধে লড়তে হবে এই যেন আমার জীবনের শেষ ও চরম লক্ষ্য। তার মনে পড়লো তার এক বিকৃত-মস্তিষ্ক মাসী একটি গানের কলি বার বার গেয়ে নাচতেন।

'হে প্রিয় লেকটেন্যান্ট, ছোট সঙ্গী হও আমার এখানে এসো, হে প্রিয়।'

এবারে সে হেসে গান গাইতে লাগলো,

'ছোট সঙ্গী হও আমার, হে প্রিয় লেকটেন্যান্ট।'

কিন্তু আর তো সময় নেই, এবারে সত্যিই কিছু করতে হয়, লাফিয়ে উঠলো সে—সামনে দেখলো পাটালেগুন একটা চিঠি নিয়ে ঝড়িয়ে আছে। বুড়ো বললো—আমি অনেকবার দরজার টোকা দিয়েছি, সাড়া না পেয়ে ভাবছিলাম আপনি বেরিয়ে গেছেন। চিঠি দিয়ে বললো, সিনোরিনা জেন্মার কাছ থেকে।

সানিন মস্তবুদ্ধির মত চিঠিটা খুলে পড়লো—জেন্মা লিখেছে বিশেষ একটা ঘটনা বা সানিনও জানে তাকে বড় চিন্তিত করে তুলেছে ও সে সানিনের সঙ্গে দেখা করতে চায় এক্ষুণি।

পেটালিগুন আরম্ভ করলো, সিনোরিনা বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বোঝা গেলো সে জানে চিঠিতে কি লেখা ছিলো। তিনি বলে দিয়েছেন আপনি কি করছেন দেখে যেতে ও আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।

সানিন বুড়ো ইটালিয়ানের দিকে চেয়ে দেখলো, ভাবলো—তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো—অবশ্য প্রথমে অসংলগ্ন মনে হলো ব্যাপারটা। কিন্তু কেনই বা নয় ? নিজেকে জিজ্ঞেস করলো।

এবারে জোরে বললো—ম'সিয়ে পাটালেগুন। বুড়ো চমকে উঠে, তার চিবুক গলাবন্ধে আরো ঢুকিয়ে দিয়ে সানিনের দিকে চাইলো।

সানিন বললো, তুমি জানো কাল কি হয়েছে ? পাটালেগুন মাথা নেড়ে চুলের ঝুঁটি পেছন দিকে কেলো দিলো। ঠোঁট নাড়লো 'হ'।

এমিল বাড়ী পৌঁছেই আত্মোপাস্ত সব বলেছে তাকে।

সেবার্গিন জুয়াও একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

দেবযানী

ফেস্ পাউডার
ট্যালকাম্ পাউডার
স্নো, কুমকুম
হেয়ার অয়েল
মেল্ গলিশ

ডি, জে, প্রোডাক্টস্ * কলিকাতা-১

১৮

তুমি জানো। আচ্ছা, একজন অকিসার এসেছিলো আমার কাছে একটু আগে। সেই ইতরটা আমার সঙ্গে লড়তে চায়। আমিও বলেছি হ্যাঁ, লড়বো। কিন্তু আমার তো সহযোগী নেই। তুমি আমার সহযোগী হবে?

বিস্ময়ে পাটালেওনের ক্রমশ উপরে উঠে চুলের খুঁটির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো। সঙ্কিত কিরে পেয়ে ইটালিয়ানে বললো, সত্যিই আপনাকে লড়তে হবে? এতক্ষণ পর্যন্ত সে ক্রমশ কথটা বলছিলো।

নিশ্চয়ই। না হলে চিরজীবনের জন্য আমার অপবাদ থেকে যাবে।

হঁ, আর আমি যদি রাজী না হই, তাহলে অন্য আরেক জনকে আপনি খুঁজে নেবেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

পাটালেওন এবারে দৃষ্টি নত করলো। সিনোর জ সানিনি, আমি জানতে চাই আপনার এই দৃষ্টিবন্ধের দক্ষণ একটি ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রে কি কলঙ্ক পড়বে না?

আমার তা মনে হয় না, তাছাড়া অন্য কোনো পথ আমার নেই।

হঁ, পাটালেওন তার মুখ গলাবন্ধে আরো চুকিয়ে দিলো আর সেই পাকী ক্রমবারার কি হবে?

তার? কিছুই নয়।

হিঃ, পাটালেওন তাছিলোর সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকুনি দিলো। একটু কম্পিত স্বরে বললো, আমি এই হীন অবস্থার পতিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি যে আমাকে সম্মানিত করলেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি যে অতি উদার প্রাণ তার পরিচয় এই থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু আমাকে আপনার প্রস্তাব সত্ত্বেও একটু বিবেচনা করতে হবে বৈ কি।

তার আর সময় নেই। মঁসিয়ে...সি... সিগ্না...

বুড়ো যোগ করে দিলো টোলা। এক বঁটা চিন্তা করার সময় দিন আমার। আমার উপকারকের মেয়ে জড়িত রয়েছে। আমি একটু চিন্তা করতে চাই...আমি বাধ্য এক বঁটা, পোনে এক বঁটার মধ্যেই আপনি আমার ইচ্ছা জানতে পারবেন।

আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করবো।

এবারে সিনোরিনা জেন্মাকে কি বলবো আমি শিখে?

সানিনি একটা কাগজে লিখলো আমার জন্য চিন্তিত বোধ করবেন না। বঁটা তিনেকের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করে সব কিছু বলবো। আপনার সহায়ত্বের জন্য অনেক ধন্যবাদ। লিখে পাটালেওনকে দিয়ে দিলো।

পাটালেওন চিঠিটা পাশের পকেটে রেখে এগিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বললো এক বঁটার মধ্যে—কিন্তু হঠাৎ কিরে এসে সানিনের হাত ধরে তার বৃকে চেপে বলে উঠলো, হে উদার প্রাণ মহৎ যুবক! এক দুর্বলবৃদ্ধকে তোমার নির্ভীক বীরের হাত ছুটো তুলে ধরতে দাঁও, তারপর একসা পিছিয়ে গিয়ে হাত ছুটো ধরলো ও বেরিয়ে গেলো।

সানিনি তার গমনপথের দিকে চেয়ে রইলো। ধরনের কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলো, কিন্তু বুধাই তার চোখ লাইনগুলো দেখে থাকিল, কিছুই তার মাথার চুকছিলো না।

এক বঁটা পথে ওয়েটার এসে তাকে একটি পুরানো, দাগধরা কার্ড দিলো। তাতে ছাপানো ছিলো 'তারিসির পাটালেওন সিগ্নাটোলা ডিউক অব মডেনার রাজসভার সভাপায়ক।' ওয়েটারের পেছনে পাটালেওনকে দেখা গেলো। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেশ পরিবর্তন হয়েছে। পরেছিলো একটা কালো ক্রকোট ও সাদা সূতীর ওয়েষ্টকোট, তার ওপরে একটা নকল সোনার চেন খুলছিলো, আঁট কালো প্যাণ্টের ওপরে একটা কর্ণেলিয়ান পাথরের সীল খুলছিলো। ধরগোসের চামড়ার তৈরী একটা কালো টুপি ছিলো তার ডান হাতে, বাঁ হাতে ছিলো এক জোড়া পুরু সুরেডের দস্তানা। তার গলাবন্ধটি ছিলো আরো চওড়া ও আরো উপরে তোলা। তার কলারে লাগানো ছিলো একটা পিন। তাতে বৈদূর্ঘমণি পাথর বসানো। ডান হাতের সর্জনীতে ছিলো আংটি, তাতে ডিজাইন ছিলো একটি হলুদ স্তম্ভকে ধরে আছে ছুটি হাত। তার পোষাক থেকে ভাপসা গন্ধ বেরুছিলো কপূর ও কস্তুরী মেশানো। তার অদৃশ্য পাণ্ডীর্ঘ্য যে কোন অস্ত্রমন্ত্র লোকেরও নজরে পড়তো। সানিনি কাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়ালো।

কোমর পর্যন্ত মুয়ে, পায়ের সামনের দিক নাচের ভঙ্গীতে ঘুরে রেখে ক্রমশীতে ঘোষণা করলো, আমি আপনার সহযোগী, আপনার কাছে জানতে এসেছি কয়েকটি বিষয়। আপনি কি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবেন?

শেষ পর্যন্ত কেন? মঁসিয়ে সিগ্নাটোলা! আমি কাল যা বলেছি তার কিছুই অস্ত্রা করবো না বটে কিন্তু আমি তো রক্তপিপাসু নই। দাঁড়াও, আমার বিপদের সহযোগী এখনই আসবে। তোমরা দুজন কথাবার্তা বলে যখন ঠিক করবে সব তখন আমি পাশের স্বরে গিয়ে বসবো। বিশ্বাস করো, তোমার উপকার আমি জীবনে ভুলবো না। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নাও তুমি।

সানিনি তাকে বসতে বলার আগেই পাটালেওন বসে পড়লো চেয়ারে। সকলের আগে মানসম্মত ক্রমশী ও ইটালিয়ান মিশিয়ে গাল দিয়ে বললো সেই নছার পাকী দোকানদার ক্রমবার যদি এখনও না বুঝতে পারে তার কি কর্তব্য, তাহলে থিক সেই ভীককে, অতি অধম সে। এখন বলুন, সহযোগী হিসেবে আমার সব কর্তব্যই আমি করবো। যখন পাড়ুরাতে ছিলাম তখন এক অঝারোহী সেনাদল ছিলো সেখানে। আমার সঙ্গে তার কয়েকজন অকিসারের আলাপ ছিলো। সম্মানরক্ষার সব নীতিই তাদের কাছ থেকে আমি জেনেছিলাম, এই সত্ত্বেও আপনার টারবুধির রাজকুমারের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। অন্য সহযোগীটি কি এখনই আসবে?

সানিনি জানলা দিয়ে দেখে বললো—এখনই আসবে, ওই যে আসছে।

পাটালেওন তার বড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালো। চুল ঠিক করে নিলো, প্যাণ্ট থেকে কতকগুলো সূতো খুলছিলো, বৃটজুতোর মধ্যে চুকিয়ে দিলো। সেই বক্রমঃসলজ্ঞ ও অপ্রতিভ ভাব নিয়ে কিশোর সেকেণ্ড লেকটেনাণ্টটি ঘরে এসে চুকলো।

সানিনি পরিচয় করিয়ে দিলো মঁসিয়ে সিগ্নাটোলা, দ্বিতীয় লেকটেনাণ্ট সিনোর সিগ্নাটোলা সন্নীতশিল্প

সেকেণ্ড লেকটেন্যান্ট বুকের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলো। কেউ যদি তাকে বলতো, এই শিল্পীটি রক্তনিপুণও বটে, তাহলে তার মনের ভাব কি হতো কে জানে! কিন্তু পাটালেওনের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিলো যেন এ তার নিত্যকার কাজ। নিশ্চয়ই রক্তমন্ডের স্মৃতি তার মনে জেগেছিলো আর সত্যিই সে যেন একটা অভিনয় করছিলো। 'হু' পক্ষই এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইলো।

কর্পেলিয়ান সীলটি নাড়তে নাড়তে পাটালেওনই প্রথমে কথা বললো—এবারে আরম্ভ করা যাক।

সেকেণ্ড লেকটেন্যান্ট উত্তর দিলো নিশ্চয়ই, কিন্তু একজন প্রধানের উপস্থিতিতে..

সানিন বললো, আমি এখনই চলে যাচ্ছি। বলে দরজা ভেঙিয়ে দিয়ে শোবার ঘরে চুকলো।

বিছানায় শুয়ে সে জেন্সার কথা ভাবছিলো।

হঠাৎ বন্ধ দরজার ভেতর থেকে সহযোগীদের আওয়াজ ভেসে এলো। ফরাসীতে কথাবার্তা চলছিলো, একজন ইটালিয়ানবোঁবা ও অল্পজন জার্মানবোঁবা ফরাসী বলছিলো—সে যে কি ভাব!—হু'জনে মিলে ফরাসীকে হত্যা করছিলো বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাটালেওন পাড়ুয়ার অস্থায়ী সেনাদল ও টারবুন্ডির রাজকুমারের কথা পাড়লো। সেকেণ্ড লেকটেন্যান্ট সামান্য মার্জনা-ভিন্কা ও বন্ধুত্বচক গুলী ছোঁড়ার কথা বললো।

কিন্তু বুড়ো শুনতে চাইলো না। সানিন শঙ্কিত হয়ে শুনতে পেলো, সে বলছে সব সেনাদলের সব অফিসার মিলিয়ে একটি বিশ্বে ভালো ও নির্দোষ তরুণীর কড়েআঙ্গুলেরও যোগ্য নয়। অত্যন্ত অপমানজনক এই সমস্ত ঘটনা। প্রথমে সেকেণ্ড লেকটেন্যান্টটি বিশেষ উত্তেজিত হয়নি। কিন্তু এবারে সে-ও রাগত্বরে বললো, এখানে সে নীতি সম্বন্ধে বড় চা শুনতে আসেনি।

পাটালেওন চেঁচিয়ে উঠলো, এই বয়সে জার ও নীতির কথা শোনা আপনার দরকার।

একটু খেমেই আবার তাদের কথাবার্তা প্রায় ঝগড়ায় পরিণত হচ্ছিলো। এক ঘণ্টারও বেশী কথাবার্তা চললো, শেষে এই প্রস্তাবগুলি ঠিক হলো! হানাউ-এর পাশে ছোটো বনে ব্যারণ ফন ডনহোক ও ম'সিয়ে জ সানিন আগামীকাল সকাল দশটার হাজির হয়ে কুড়ি পা দূরে থেকে গুলী ছুঁড়বে। সহযোগীদের কাছ থেকে সঙ্কেত পেয়ে প্রত্যেক পক্ষ দু'বার গুলী ছুঁড়বে। এক ঘোড়ার পিছল দিয়ে, রাইফেল নয়। হের ফন রিটার বিদায় নিলে গাভীঘোর সঙ্গে পাটালেওন ফলাফল জানাতে শোবার ঘরে চুকে চেঁচাতে লাগলো, সাবাস রাশিয়ান! সাবাস নবীন! আপনারই জয় হবে।

কয়েক মিনিট পর উত্তরে রসেনীর দোকানের দিকে রওয়ানা হলো। সানিন পাটালেওনকে প্রতিজ্ঞা করলো এই লড়াইয়ের খবরটি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে। বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চোখ পিটপিট করে বললো গোপনীয়, গোপনীয়। মনে হচ্ছিলো তার বয়স যেন কমে গেছে, এত হালকা পায়ে হাঁটছিলো সে। এই অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি যদিও অপ্রীতিকর, তবু রজার্সের সে-দিনগুলো যেন সে কিংবদন্তি পেলো, যখন সে যুদ্ধে কাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সন্মুখ সমরে

আহ্বান করেছে। মাঝারি গলার গাইয়েরা কথায় কথায় শপথ করতে ভালোবাসে।

১৯

এমিল সানিনকে নিয়ে যেতে দৌড়ে বেরিয়ে এলো। এক ঘণ্টার ওপর সে অপেক্ষা করছিলো। সানিনের কানে চুপি চুপি বললো, তার মা এই অপ্রীতিকর ঘটনার কিছুই জানেন না, তাকে যেন কিছুই জানানো হয় না। আরো বললো, তাকে এখন দোকানে যেতে হচ্ছে, কিন্তু তার বাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই, অল্প কোথাও লুকিয়ে থাকবে সে। এতগুলো খবর এক নিশ্বাসে বলে সানিনের কাঁধে চুষু খেলো সে। তার পরই দৌড়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো। দোকানে চুকে জেন্সার সঙ্গে সানিনের দেখা হলো, কি যেন বলতে চাইলো সে কিন্তু তার ঠোঁটটা শুধু নড়ে উঠলো, একবার এপাশে একবার ওপাশে চাইলো সে। সানিন ভাড়াভাড়ি বললো সব কিছু মিটে গেছে। মিটমাট হয়ে গেছে, কোনো ভয় নেই।

সে জিজ্ঞেস করলো, আজ কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি?

হ্যাঁ, একজন এসেছিলো, কথাবার্তা হলো, শেষ পর্যন্ত আমরা ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারলাম।

জেন্সা কাউন্টারের পেছনে গেলো।

সানিন বুঝতে পারলো, জেন্সা তার কথা বিশ্বাস করে নি। বাই হোক, সে পেছনের ঘরে ফ্রাউ লেনোরের কাছে গেলো।

ফ্রাউ লেনোরের মাথাধরা সেরে গিয়েছিলো। কিন্তু তাকে ভীষণ বিষন্ন দেখাচ্ছিলো। সানিনকে দেখে হাসলেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে বললেন, তার আজ মন ভালো নেই। আজ সানিনের তার কাছে বসে থাকতে ভালো লাগবে না। সানিন লক্ষ্য করলো তার চোখের পাতাগুলো লাল ও ভারী দেখাচ্ছে।

ফ্রাউ লেনোর, কি হয়েছে? আপনি কি কাঁদছিলেন?

যে ঘরে তার মেয়ে ছিলো সেদিকে চেয়ে বললেন তিনি চুপ, জোরে বলবেন না।

কিন্তু কেন কাঁদছেন?

ম'সিয়ে সানিন, আমি নিজেই তার কারণ জানি না।

কেউ কি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছে?

না, না, হঠাৎ আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। জিয়োভান বাটিষ্টা ও আমার প্রথম বোঁবন মনে পড়ে গেলো। জীবন কি কখনোই। আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, চিন্তা করতে পারছি না। ভাবতে পারছি না বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে চিরকালই এরকম কটে যাবে। কিন্তু বার্কিক্য এসে যাচ্ছে। ফ্রাউ লেনোরের চোখ জলে ভরে এলো। আশ্চর্য হয়ে গেছেন, না! কিন্তু আপনার জীবনে যখন বার্কিক্য আসবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন কি বিবাহ নিয়ে আসে সে।

সানিন তাকে সাধনা দিতে চেষ্টা করলো। তার সম্ভানদের কথা বলে বললো, তাদের মধ্যেই তিনি তার বোঁবন কিরে পাবেন। এমন কি সে ঠাটা করতেও চেষ্টা করলো—ফ্রাউ লেনোর নিজের সুখ্যাতি শুনতে চাইছেন। কিন্তু ফ্রাউ লেনোর পতীর গলার ভাঙে চুপ করতে বললেন। জীবনে এই প্রথম সানিন বুঝতে পারলো

বাঁধকোর জন্তে বে হুখে দেখা দেয় তার সাহসনা নেই। অল্প কথা বলে তা' তুলিয়ে দেওয়া যায় না। নিজেকে এই বিবাদভাব কেটে বেতে দিতে হয়। এবারে সানিন বললো, ট্রেসেট খেললে কেমন হয়? ক্রাউ লেনোর রাজী হলেন, মনে হলো খুসীও হলেন।

ছপুয়ে খাওয়ার আগে পর্যন্ত তারা তাস খেলে গেলেন। খাবার পরও আবার খুশ হলো। পাটালেওনও যোগ দিলো। তার চিবুক গলাবন্ধতে ঢুকে গিয়েছিলো, চুল এসে কপালে পড়ছিলো। তার চালচলন এতই অদ্ভুত ঠেকছিলো যে, যে কেউ বুঝতে পারতো সে কোনো কিছু গোপন করে রাখতে চাইছে।

সারা দিন ধরে সবারকমে সে সানিনের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা রাখার জটিল করলো না। টেবিলে মেয়েদের ছেড়ে সানিনকেই প্রথম পরিবেশন করলো। তাস খেলতে সব সুযোগ সুবিধেগুলো সানিনকে ছেড়ে দিলো। হঠাৎ নিতান্তই অসংলগ্ন ভাবে বলে উঠলো রাশিয়ানরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে উদার প্রাণ, নির্ভীক ও দৃঢ়চিত্ত জাতি।

সানিন মনে মনে বুড়োকে গাল দিলো।

সানিন বত না মেডেম রসেলীর মনের ভাব দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলো তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হলো তার মেয়ের ব্যবহারে। সে যে তাকে এড়িয়ে যাচ্ছিলো তা নয়, বরং সব সময় তার পাশে বসেছিলো, বখন সে কথা বলছিলো তার দিকে চেয়ে শুনছিলো। কিন্তু কোন কথায় সে যোগ দিচ্ছিলো না আর বখনই সানিন তাকে কিছু বলছিলো উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চলে যাচ্ছিলো। তারপর ফিরে এসে এক কোণে বসছিলো—যেন কিছু ভাবছিলো। ক্রাউ লেনোর পর্যন্ত তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে হুঁ-একবার জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হয়েছে?

জেন্মা উত্তরে বললো কিছুই নয়, তুমি তো জানো মাকে মারে আমি এ রকম চূপ হয়ে বাই।

তার মা-ও সায় দিয়ে বললেন, তা বটে।

এ রকম করে সারাদিন সুখে-জুখে কেটে গেলো। জেন্মা যদি একটু সহায়ভূতি দেখাতো তাহলে সানিন হয়ত লোভ সামলাতে পারতো না, গর্ভভরে সব প্রকাশ করে দিতো, কিংবা বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে চিরবিচ্ছেদ চিন্তা করে হয়ত তার মন ব্যথিত হয়ে উঠতো। কিন্তু জেন্মা কোন কথাই বললো না। তাই ককি পানের আগে সানিন পিয়ানো বাজিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখলো।

এমিল কিরলো দেরী করে, ও এসেই বিজ্ঞাম নিতে চলে গেলো পাছে কেউ হের রু-রবারের সবন্ধে কিছু জানতে চায়। সানিনের বিদায় নেবার সময় এলো। জেন্মার কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে তার লেনকি ও ওল্গার বিদায়ের দৃশ্য মনে পড়ে গেলো, পুস্কিনের লেখা ইউজিন ওনেগিন বইটিতে। জেন্মার হাত জোরে চেপে তার মুখের দিকে চাইলো কিন্তু জেন্মা অজ্ঞদিকে চেয়ে আঙ্গুল ছাড়িয়ে নিলো।

২০

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো তারায় তারা আকাশ—ছোট, বড়,

করছিলো। আকাশে চাঁদ ছিলো না। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো, সানিন রাস্তার শেষ পর্যন্ত গেলো, তার বাড়ী কিরতে ইচ্ছে করছিলো না। মুক্ত হাওয়ার ঘুরে বেড়াতে চাইছিলো সে। সে আবার ফিরে গেলো। রসেলীর দোকানের কাছাকাছি বেতেই রাস্তার দিকের একটা জানলা সশব্দে খুলে গেলো ও অন্ধকারের মধ্যে একজন মহিলাকে দেখা গেলো। ঘরে কোনো আলো জ্বলছিলো না। সে শুনতে গেলো তার নাম ধরে কেউ ডাকছে।

ম'সিয়ে দিমিজি!

দোঁড়ে জানলায় গেলো সে। জেন্মা ডাকছিলো তাকে। সে জানলায় খুঁকে দাঁড়িয়ে মুখ বের করে দিয়েছিলো।

সাবধানী পলায় বললো ম'সিয়ে দিমিজি, সারাদিন ধরে একটি মিনিট আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু এখন আপনাকে হঠাৎ আবার দেখতে পেয়ে মনে হলো ওটা দিলেই ভালো হয়। এই বলে জেন্মা খেমে গেলো, তখনই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো।

আকাশে মেঘ ছিলো না, প্রকৃতি শুষ্ক হয়ে ছিলো। হঠাৎ ভীষণ জোরে বড় উঠলো, মনে হলো যেন সব কিছু কাঁপতে লাগলো। গরম ভাপসা বাতাস পাছপালা, বাড়ীঘর, রাস্তা সব যেন উড়িয়ে দিলো, সানিনের টুপি উড়ে গেলো—জেন্মার চুল এলোমেলো হয়ে গেলো। সানিনের মাথা জানলা পর্যন্ত পৌঁছেছিলো, অজানতেই তার মাথা জানলার ভেতর গিয়ে লাগলো, জেন্মা তার কাঁধ হুহাতে ধরে রইলো ও তার মাথা জেন্মার বুকে ঠেকে গেলো। এই ভীষণ বড় প্রায় এক মিনিট স্থায়ী হলো। তারপর বড় একঝাঁক পাখীর মত উড়ে চলে গেলো, আবার সব কিছু শান্ত হয়ে গেলো।

সানিন মুখ তুলে দেখলো অপূর্ব সুন্দর চেহারা, ভয়ে বিহ্বল অপরূপ মনোমুগ্ধকর বিশাল দুটি চোখ, এই রূপরশি দেখে যেন তার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেলো। একরাশ যেশমী চুল তার বুকে এসে পড়েছিলো, ঠোঁটে চেপে সে শুধু বলতে পারলো ও জেন্মা।

জেন্মার অনাবৃত হাত দুটি তখনও তার কাঁধে রাখা ছিলো। অসীম শূন্যের দিকে চেয়ে বললো, কি হলো? বিহ্বল চমকালো নাকি?

সানিন আবার বললো, জেন্মা।

জেন্মা নিশ্বাস কেলে ঘরের ভেতরে চাইলো ও চট করে একটা বাসি গোলাপফুল তার জামা থেকে বের করে সানিনকে দিয়ে বললো, আপনাকে ফুলটা দিতে চেয়েছিলাম।

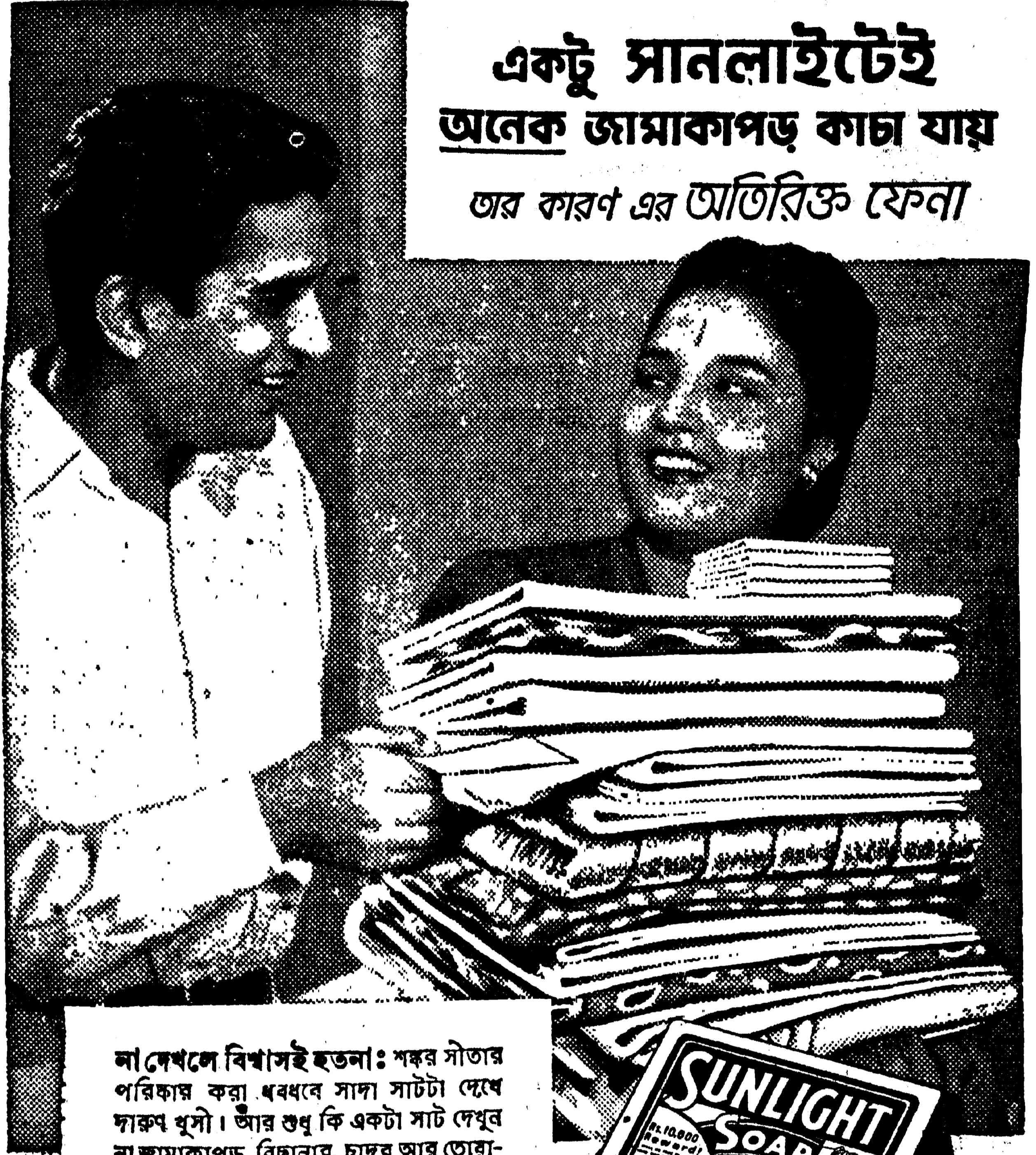
সানিন দেখেই বুঝলো ফুলটা কাল সে কেড়ে এনেছিলো।

সশব্দে জানলা বন্ধ হয়ে গেলো—অন্ধকার পান্নার পেছনে আর কিছু দেখা গেলো না।

সানিন তার টুপি ছাড়াই হোটলে ফিরে গেলো, সে লক্ষ্যই করলো না যে টুপিটা সে হারিয়েছে।

[ক্রমশঃ]

অনুবাদিকা—আশা দাস।



একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায় তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শহর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সাটটা দেখে দারুণ ধূসী। আর শুধু কি একটা সাট দেখুন বা জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোরা-লের সুপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্যকরী ও অফুরন্ত ফেনা কাপড়কে পরিপাটি করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন বা কেন...আজই!



সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

বন্ধন হল না, তখন একদিন ভারসেটকে বললাম ভারসেট, এভাবে আর কত দিন চলবে—ভাল রাখার লোকের কি কোনও ব্যবস্থা করতে পারনি ?

ভারসেট শুধাল, কেন ? আপনার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে ? ভাড়াভাড়া বললাম, না না। সেদিক দিয়ে নয়, তবে তোমার উপর দারুণ অত্যাচার করা হচ্ছে।

বুঝ হেসে বলল, অত্যাচার করার অধিকার খইছায় আপনাকে দিয়েছি বলেই তা সইবার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। এ নিয়ে আপনি ভাববেন না—সময় হলে সব ব্যবস্থাই করে দেব।

আমি চূপ করে গেলাম। এ নিয়ে আর কথা বাড়ানোর ইচ্ছে হল না। আর সত্যিই তা খাওয়া দাওয়ার দিক দিয়ে আমার কোনও কষ্ট ত হচ্ছিল না। ভারসেট নিজেই রাগ করে খাওয়াত এবং তার মধ্যে সেবা-বস্ত্রের কোনও জট ছিল না।

তুখু তাই নয়, ক্রমে ভারসেট সাক্ষাৎকার সমস্ত ব্যবস্থা নিজের হাতে নিল তুলে—আমি কোনও কথা বলিনি। সকালে রোগীর সংখ্যা কমিয়ে দিল অনেক, তিনটি কি বড় জোর চারটির বেশী রোগীকে সকালে আসতে দিত না। বিকালের দিকে রোগীর সংখ্যা দিল বাড়িয়ে। মনে ভেবেছিলাম—সকালে ভারসেটকে রাখাবার করতে হবে, তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু রোগীদের মধ্যে এ নিয়ে যে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে সেটুকু ত আমার অজানা ছিল না। তবুও এ নিয়ে আমি কোনও আলোচনা করিনি। ভারসেটও এ সব ব্যবস্থা অনায়াসে করে যেতে লাগল—আমার সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করে। তুখু তাই নয়, ক্রমে লক্ষ্য করলাম—সমস্ত রোগীকেই সে আমার কাছে আসতে দিত না। নিজেই রোগীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বলে দিত—ডাক্তারকে দেখানোর সময় এখনও আসেনি, দু’দিন এই কর, যদি না কমে ডাক্তার দেখবে। বাই হোক, এতে করে আমার ডালিকায় যে রোগীর সংখ্যা কমে যেতে পারে, সেটুকু কি ভারসেট বুঝতে পারেনি ? নিশ্চয়ই পেরেছিল। তবুও কেন যে এরকম করত, আমি আজও জানিনা। মোটের উপর সাক্ষাৎকার দিক দিয়ে বা কিছু করার ভারসেট নিজের ইচ্ছায়ই করে যেতে লাগল—আমি চূপচাপ পড়ে ছিলাম একপাশে আমার ভাড়া মন নিয়ে গল্প হয়ে।

আমার মন কি ভারসেটের উপর খুব প্রসন্ন হয়েছিল যে সময় ? বুলা! ঠিক তা নয়। ভারসেটের চরিত্রের প্রতি আমার খুব অনেক দিনই হারিয়েছি—তখনও ছিলনা। যদিও সে সময়টা ভারসেটের সেবাসহ আমি যে অভিজ্ঞত একেবারেই হইনি, এমন কথা বলা যায়না। সেই সেবাসহের স্রোতে গা ভাসিয়ে অনায়াসে চোখ বুজে ভেসে চলে যাচ্ছিলাম—জীবনে যেন আর কোনও কিছুই করার নাই।

এই ভাবে দিন পনের কাটার পর একদিন ভারসেটকে বললাম ভারসেট। এই ভাবেই কি জীবনটা চলবে ?

পড়ায় ভাবে বলল, না।

শুধালাম, তবে ?

বলল, আগে আপনি নিজের পায়ে দাঁড়ান—তারপর।

শুধালাম, তারপর কি ?

শুধালাম, কি করতে বল ?

বলল, এখানে যদি আপনার ভাল না লাগে, এখানকার প্র্যাকটিস ছেড়ে দিতে হবে। চলে যাব ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, কি লন্ডনের মতন বড় শহরে। সেখানে একটা প্র্যাকটিস জমিয়ে তুলতে হবে।

চূপ করে বইলাম—কিছু বললাম না।

একটু চূপ করে থেকে বলল, তুখু তাই নয় আরও—চূপ করে গেল।

শুধালাম, কি ?

বলল নিজের দ্বীর্ণ সঙ্গে মিথ্যা বন্ধন ছিন্ন করে ফেলতে হবে, নিজেকে মুক্ত করে নিতে হবে।

শুধালাম, অর্থাৎ— ?

জোরের সঙ্গে বলল, ডিভোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডিভোর্স—মার্লিনের সঙ্গে আমার ডিভোর্স ! চূপ করে বইলাম—কোনও কথা বললাম না।

ভারসেট শুধাল, কি,—চূপ করে বইলেন যে ?

বললাম, আমার দ্বারা কিছু হবে না।

একটু চূপ করে থেকে বলল, বেশ। আমিই সব ব্যবস্থা করব।

শুধালাম, কি ব্যবস্থা করবে তুমি ?

বলল, সব। সে শক্তি আমার আছে। আপনি যেমন আছেন—স্তম্ভনই থাকুন। আপনি যে ধাক্কার মাহুয, আপনার দ্বারা কিছু হবে না—সেটা বোঝা উচিত ছিল। সত্যি। একটা কিছু করা দরকার।

একটা কিছু করা দরকার—কথাটা আমার মনে গিয়ে বিধল। এই দশ পনের দিন আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি—নাগের বিবে জর্জরিত মনে মাহুয যেন ঘুমোয়। কারও সঙ্গে দেখা করিনি, ক্লাবে বাইনি—কাককে মুখ দেখাতেও যেন লজ্জা পেতাম।

ইতিমধ্যে মার্লিন চলে যাওয়ার দিন দুই পরেই হবে, একদিন বিকেলে সাক্ষাৎকারে যাওয়ার জন্ত তৈরী হচ্ছি—মনে হল টেলিকোন বাজল। টেলিকোন করতে প্রথমটা ভয় হল—যদি কেউ মার্লিনকে চায় কি বলব। বাই হোক, টেলিকোনটা ধরলাম—এই বে। প্রেসের গলা। কোনও কথা শোনার আগেই ভাড়াভাড়া বললাম কে—মিসেস লালকাকা, মিসেস চাউডুরী ত বাড়াতে নেই, একটু বেরিয়েছেন।

মিসেস লালকাকা বললেন, ওঃ—তা আপনারা ভাল আছেন ?

বললাম, হ্যাঁ। ভাল আছি। ধন্যবাদ।

বললেন, অনেক দিন দেখা হয় না—

বললাম, মার্লিনকে নিয়ে শীঘ্র একদিন যাব আপনারদের বাড়ীতে।

বললাম, ধন্যবাদ।

টেলিকোন কেটে দিয়ে যেন বাঁচলাম।

মার্লিন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, একথা যে কাউকে বলার নয়—লালকাকাদের ত নয়ই। অথচ কতদিনই বা চেপে রাখব। বাই হোক, এই ভাবে দিন পনের কাটার পর সেই দিন ভারসেটের কথা যেন আগে একটা চমক লাগল—একটা কিছু করা দরকার। যাকে বিদ্বানার স্তম্ভন কথাটা মনটাকে পেয়ে রসল। কি করি

ভালোটেই প্রভাবে মন একেবারেই সার দেয়নি। এ দেশে আবার তুন করে জীবন গড়তে—না না, আমার খাবা কিছুতেই হবে না। ৭ উৎসাহ কোথায়?

ইঠাং মনে এল—সুখা নাসিং-হোম। কথাটা কি ইতিমধ্যে বলে গিয়েছিলাম? কথাটা মনে হওয়াতেই একটা নতুন হসাহের কৌণ সাজা লাগল মনে। সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে দইটেকে আঁকড়ে ধরলাম—সুখা নাসিং-হোম। এই ক'দিনের পাহারা অবস্থায় সহজেই মন যেন একটা অবলখন পেল। খাটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালবেলা উঠে, তৈরী হয়ে তিনখানা চিঠি লিখলাম। একখানা লিখলাম ম্যানচেষ্টারে টমাস কুকের আফিসে। যখন জানুয়ারী মাসের প্রথম দিক, অরুোধ জানালাম—মার্চের প্যালেসি কিংবা এপ্রিলের প্রথম আমার ভারতবর্ষে কিরে বাওয়ার কত কোনও জাহাজে ব্যবস্থা এবং পাসপোর্ট ইত্যাদিরও বন্দোবস্ত করতে। লিখলাম—তারের কাছ থেকে চিঠির জবাব পেলেই আমি ম্যানচেষ্টারে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করব। আর একখানা চিঠি লিখলাম—আমার জানা-শোনা আমি এক বাড়ীর মজেন্টের কাছ, যাদের কাছ থেকে আমার ওস্ত হলে জেনের ডিওখানি কিনেছিলাম। এবং যারা আমার বাড়ীর বিষয় বই জানেন। লিখলাম—আমার বাড়ীখানি আমি মার্চের মধ্যে বেচতে চাই, আট হাজার পাউণ্ড দাম আশা করি। আর একখানা চিঠি লিখলাম, লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা টাইমস-এ। একটি বিজ্ঞাপন—সেই আমার ডাক্তারী প্রাকটীসের বিষয় কিছু বিবরণ দিয়ে লিখলাম, প্রাকটীসটা আমি বেচী করতে চাই। এবং এই চিঠিখানার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের খরচা ইসাবে একটি পাঁচ পাউণ্ডের চেকও পাঠিয়ে দিলাম।

এই সব করে, যখন সাজ্জারীতে বাওয়ার ঞ্জ বেরলাম—নি যেন অনেকটা হাঙ্কা বোধ হল। শুধু তাই নয়, মনে যেন একটু জোরও শেলাম। সাজ্জারীতে গিয়ে ভারলেটকে অবশ্য সব কথা কিছুই বলিনি।

ষতদূর মনে পড়ে, আরও বোধহয় পাঁচ-সাত দিন গিয়ে কথ।

ভারলেট একদিন বলল, আমাকে দু'দিনের ছুটি দেবেন?

তথালাম, কেন? কোথায় যাবে?

সংক্ষেপে বলল, আমার একটু কাজ আছে।

বললাম, বেশ। কিন্তু—

বলল, আপনার খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থাই আমি করে বাচ্ছি। দিনের ঞ্জ একটা নতুন মেয়ে বেখে বাচ্ছি—চালাক চতুর মেয়ে, চাক দেখিয়েও দিয়েছি সব।

আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা তখনও ভারলেটের কাছেই লছিল। ভারলেট যেন এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে নারাজ এবং আমিও এদিক দিয়ে ভারলেটকে অধুনা করতে চাইনি। মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম—ভারলেটের মাহিমার সঙ্গে সপ্তাহ হসাবে একটা মোটা টাকা ভারলেটকে দিলেই হবে।

বললাম, চলে যাবে, কিন্তু সাজ্জারীতে যোগীর কাজ?

বলল, ছুটো দিন যদি আপনি একটু কষ্ট করে চালিয়ে যেন। নতুন মেয়েটিই অবশ্য তাদের বসাবে।

বললাম, বেশ। যা হয় হবে।

ইঠাং মনে হল—ভারলেট কি ঞ্জ কোথাও চাকুরীর চেষ্টা করছে নাকি? কথাটা ভাবতে ভাল লাগল না। আবার নতুন সেক্রেটারী। যুঝতে পারলাম ভারলেটের উপর ইতিমধ্যে আমি মনে মনে অনেকটা নির্ভর করে গেলেছি। সে নির্ভরতাটুকু যেন আর ছাড়তে পারি না।

তথালাম, তুমি কোথায় যাবে? কি কাজ?

যুহু হেসে বলল, সে সব পরে বলব।

ইতিমধ্যে আমার হ'খানি চিঠির জবাব এলো। টাইমস্ লিখেছে, দশ দিন পরে তারা আমার বিজ্ঞাপন কাগজে দেখে। তার পূর্বে স্থান নাই। বাড়ীর এজেন্টদের কাছ থেকেও চিঠির জবাব এলো—ভাড়া শীঘ্রই বাড়ী বিক্রী করে দিতে পারবেন বলে আশা করেন, তবে আট হাজার পাউণ্ড নয় দাঁ-ও পেতে পারে, সাত হাজার পর্যন্ত বোধ হয় পাওয়া যাবে।

ভারলেট কিরে এলো ঠিক দু' দিন পরেই। কিরে এলো শনিবার রাতে। আমি সাজ্জারী থেকে চলে আসার পর, তাই আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। পরের দিন শনিবার সাজ্জারীতে যোগীর বালাই নাই,

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



প্রতি পাউণ্ড
২৪ টি
বড় আকারের

- কলে প্রস্তুত
- স্টামে সেকা
- মেসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সঞ্চয় রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী

কলিকতা - ২২

তাই একটু বেলা করে সাজাৱীতে গেলাম। ভায়লেট একমুখ হেসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

তুখালাম, তুমি কিরলে কখন?

বলল, কাল রাতে প্রায় দশটা।

বললাম, স্নাত রাতে কিরতে পারলে—কাল রাতে যে ভয়ানক ঠাণ্ডা ছিল?

বলল, মনে আনন্দের উত্তাপ থাকলে বাইরের ঠাণ্ডা গায়ে লাগে না।

মুহু হেসে বললাম, এত আনন্দ তোমার কিসে হল শুনি?

বললি। তার আগে একটা কথা শুধাই।

বললাম, বল।

তুখাল, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এইবার আপনার মনে একটু উৎসাহ জেগেছে—না?

বললাম, হ্যাঁ।

বলল, ভালই হল। এইবার জীবনটাকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার সময় এসেছে।

তুখালাম, কি রকম?

মুহু হেসে বলল, আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি।

একটু অবাক হয়ে ভায়লেটের মুখের দিকে তাকালাম।

তুখালাম, কি ব্যবস্থা?

বলল, আমি এখানেই খবর পেয়েছিলাম ম্যানচেস্টারে ডাঃ মাইটনের শরীর ভাল নয়। তিনি তাঁর প্র্যাকটিস ছেড়ে দিতে চান। তাই শুনে ম্যানচেস্টারে গিয়ে ডাঃ নাইটনের সঙ্গে দেখা করলাম।

তুখালাম, তার পর?

বলল, নিজের পরিচয় দিয়ে ডাঃ নাইটনকে বললাম যে, আপনি তাঁর প্র্যাকটিস কিসে নিতে রাজী আছেন?

তুখালাম, বললে?

বলল, হ্যাঁ কেন বলব না। ডাঃ নাইটন শুনে খুব খুশী। তিনি বললেন—বলিও আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ মাই তবুও আপনার প্রতি তাঁর অর্ধেক আস্থা আছে। তাঁর প্র্যাকটিস আপনি নিলে তার মনের ভার অনেকটা কমে যাবে। তাঁর আনন্দের কথা আর কিছু হতে পারে না। তিনি তৎক্ষণাত রাজী হলেন। শুধু তাই নয়—

মুহু মুহু হাসতে লাগল।

তুখালাম, কি?

বলল, ডাঃ নাইটনকে আমি রাজী করিয়েছি, তিনি আপাততঃ সেল-এ আপনার প্র্যাকটিস নেবেন।

অবাক হয়ে তুখালাম, কি রকম?

বলল, তাঁর ত বয়স হয়েছে এবং শরীরও ম্যানচেস্টারে ভাল থাকে না। তাই তিনি ম্যানচেস্টার ছেড়ে একটু কাঁকায় দিৱিবিলি কোথাও থাকতে চান।

আমিই বললাম—আপনি সেল-এর প্র্যাকটিসটা নিন, কাজও বেশী নয়, বরং কাঁকায় ভালই থাকবেন। শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়ে দেবে এলাম। দিন কতক সেল-এ থেকে দেখবেন কি রকম চলে।

ভায়লেট উৎসাহের সঙ্গে বলে যেতে লাগল, আপাততঃ তিনি আপনার ওস্ত হন লেনের বাড়ীও নেবেন—কিমে নয়, ভাড়া হিসাবে। সাজাৱী ত নেবেনই—সব ব্যবস্থা করে এসেছি।

বলে ভায়লেট একটু বেন গর্ভতরে আমার মুখের দিকে চাইল।

আবার বলল, নাইটনের যে রকম নাম এবং ম্যানচেস্টারে যে পাড়ার প্র্যাকটিস—তাঁর প্র্যাকটিস নিলে আপনি সহজেই খুব বড় হয়ে উঠতে পারবেন।

বললাম, তা এক তাড়াতাড়ি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভায়লেট বলল, তাড়াতাড়ি করলে এ-কাজ হত না। নাইটনের প্র্যাকটিস পড়ে থাকত না, চট করে কেউ নিয়ে নিত।

বললাম, কিন্তু ভায়লেট—

বলল, এর মধ্যে কোনও কিন্তু নাই ডাঃ চাউডুরী! শুধুবান আপনার প্রতি প্রসন্ন, তাই চট করে এমন ব্যবস্থা হয়েছে। আর আপনার কোনও বিধা করা চলবে না।

ইতস্ততঃ করে বললাম, ভায়লেট। আমি যে অন্তরকম—

বলল, আপনার কি এখন মনের ঠিক আছে যে ভেবে কিছু ঠিক করবেন? ব্যবস্থার ভার এখন আমি নিয়েছি—আমিই সব করব।

ভায়লেটের কথাই মধ্যে এমন একটা জোর ছিল যে মম আপনা থেকে সঙ্কুচিত হল। ভায়লেটকে প্রতিবাদ করে কিছু বলবার জোর পেলাম মা মনে। চূপ করে রইলাম।

একটু চূপ করে থেকে ভায়লেট বলল, শুধু তাই নয়—আপনার ডিকোর্সেরও ব্যবস্থা করে এসেছি।

চমকে তুখালাম, কি রকম?

বলল, কেটারিং রবিনসন ও কেটারিং—ম্যানচেস্টারের বিখ্যাত সলিসিটার। তাদের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। তারা সহজে কারও কেস নেয় না। আপনার কেস নিতে রাজী করিয়েছি। আপনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবার জন্য তাদের প্রতিনিধি আপনার সঙ্গে এসে দেখা করবে—আমি তাদের চিঠি দিলেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—তারা এখন কেস নিয়েছে, যা কিছু করার তাই করবে। আপনাকে কিছুই করতে হবে না।

সন্তোষিত হয়ে বসে রইলাম। ভায়লেটকে নিয়ে এখন কি করি?

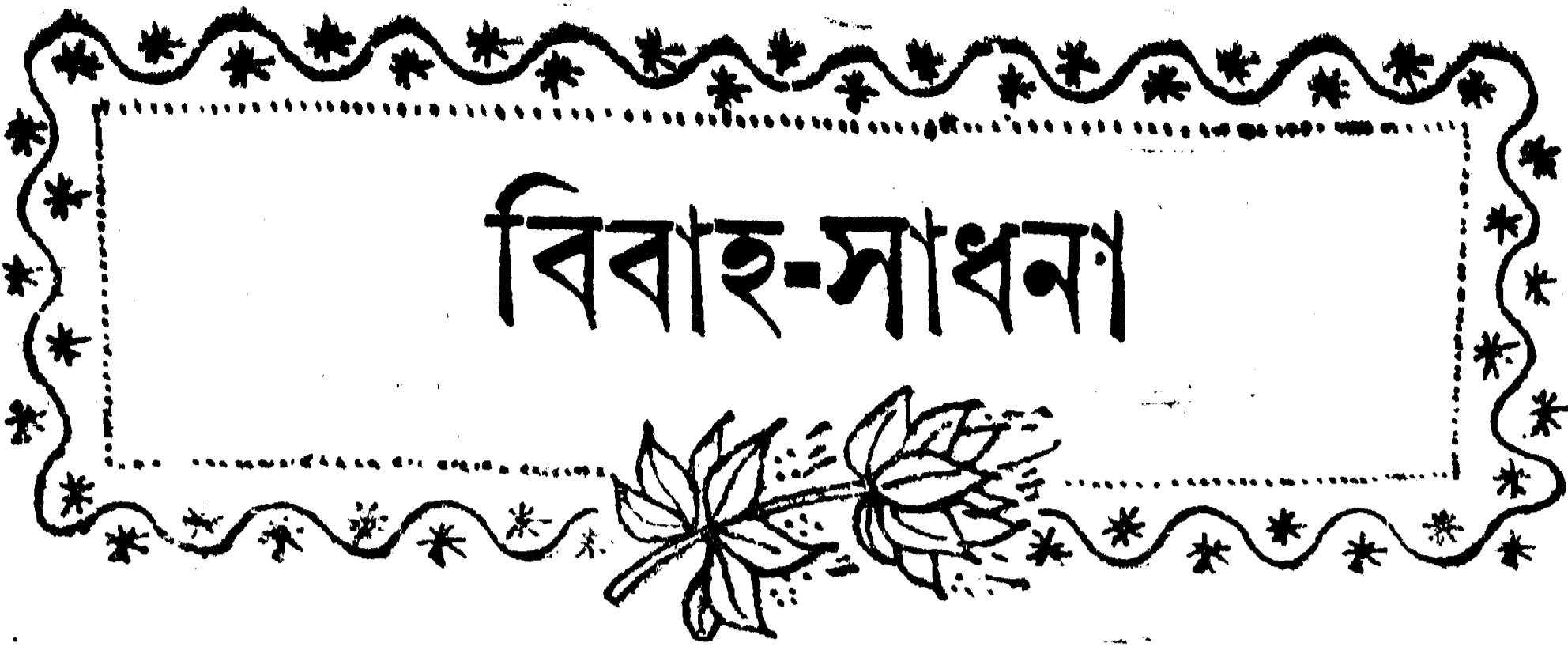
ভায়লেট উঠে পাড়াল। মুহু হেসে আমার কাছে এসে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে একটু বেন আঁদারের মূরে বলল, হুঁদিন ভূতের মতন খেটে এত বে করে এলাম আপনার জন্য—একটা গুরু ধন্যবাদও দিলেন না?

মুখ তুলে ভায়লেটের দিকে তাকালাম। চোখ দুটি খুশীতে শুধু যে জ্বলে তাই নয়, তার তিতরে আরও একটা কি বেন ফুটে বেফছে—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বক্তাচালিত পুতুলের মতন বললাম, ধন্যবাদ।

আমার কাঁধের উপর একটু জোর দিয়ে বলল, Cheer up Doc! কিছু ভাববেন না। ভায়লেটের উপর নির্ভর করুন—ভায়লেট সব ঠিক করে দেবে। বাই আপনার চা নিয়ে আসি।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।



বিবাহ-সাধনা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শচীন্দ্র মজুমদার

সহায়ক

মহত্তর শক্তির রসকে উপলব্ধি না করলে মহত্তর প্রেমের সঙ্কলনও প্রাপ্তি হয় না। জীবনস্থিতির জন্ত সাধারণ বস্তু জীবনস্তরের বস্তু। সমগ্র প্রাণিজগতে সেটির প্রকৃতি এক ধরণের, মানুষের বেলাতেও তার কোন তারতম্য হয় না। জীবনস্থিতির উদ্দেশ্যটি পূরণ করার জন্ত প্রকৃতি মানুষকে নিজের প্রয়োজনের অমুকরূপ এবং অসম্পূর্ণ করে নির্মাণ করে। মানবস্তরে উন্নীত হতে গেলে প্রাকৃতিক জীবনের সূত্য়মুখী গতির উজ্জানসাধনা করে নিরন্তর আত্মপ্রসারের দ্বারা সোপানে সোপানে আপনাকে সম্পূর্ণ করে মানুষকে তার সকল প্রস্তুত শক্তি লাভ করতে হয়। এই বিশেষ প্রয়াসটির নাম সাধনা। মানবস্তরের রতিশক্তি ও রতিপ্রকৃতি সাধনালভ্য বস্তু। এ স্তরের মানুষ জীবনস্থিতির কবল হতে মুক্ত।

পূর্বে বলা হয়েছে যে নারী কিশোর বয়সে সোজাপুজি প্রীতির ভূমিতে গিয়ে পড়ে। কিশোরী সধা প্রীতিসম্মাগ, সেটি তার নিজস্ব ধর্ম। পুরুষের পথ ভিন্ন হলেও কিশোর বয়সে তারও প্রীতির প্রবণতা হয়। জীবনের কঠিন আবর্তে পড়ে গেলে পুরুষ ও নারী, উভয়েই এই প্রীতির অনির্বচনীয় শক্তিটি হারিয়ে ফেলে। অতিশয় সহজেই পুরুষের সে শক্তিটি নষ্ট হয়। এই “কিশোর-কিশোরী” ভাবটা বিবাহের প্রাণ। এ ভাবটি না থাকলে বিবাহ কখনোই পূর্ণাঙ্গ হয় না এবং উচ্চপরিণাম লাভ করে না। পতিপত্নীর কায়িক বয়স বতোই হোক না কেনো, যত থাকলে এ ভাবটি সঞ্জীবিত করে রাখা যায় এবং তাই রাখা বিবাহের আটের সাধনা। বস্তুতপক্ষে, কিশোর-কিশোরী ভাব আধ্যাত্মিক অঙ্গকার। আমাদের বৈকল্য কবির এ তত্ত্বটি নিগূঢ় করে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাই তাঁরা বলেছেন যে “কিশোরী প্রেমের সার।” চণ্ডীদাস তাই বিশেষ করে ইঙ্গিত করেছেন,—

কিশোরী কিশোরী এ দুইজন

শক্তির রসের মূর্তি হন।”

আমরা বলেছি যে, বিবাহ-জীবন বীণায় সুর বাঁধা ও অবিস্রাম সেই সুর সাধা। বীণা এতদাঙ্গ প্রকৃতি সুরবস্ত্রে ধুব টান করে তার না বাঁধলে তাতে সুরের বজ্রাণ ওঠেনা। ঢিলে তারে সুর হয় না। সমগ্র সৃষ্টি এই টানের (Tension) নিয়মের ওপর নির্ভর করে আছে। চন্দ্র পূর্ব গ্রহ মঙ্গলের আকর্ষণের কথা আমরা জানি। টান দিয়েই তারা স্ব স্ব কক্ষে স্থিত। ভূমণ্ডল নানা টানের

সায়ে শূন্যলোকে স্বস্থানে অবস্থান করে। মানবজীবনেও টান ভিত্তিগত সত্য। টান ভিন্ন জীবন গতিশীল ও উৎসাহশীল হয় না। আমাদের সকল কর্মে অস্তুনিহিত টানের বিচিত্র খেলা। আমাদের সকল দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়াসে টানের ক্রিয়া। টান না হলে মানুষের বা সর্বোত্তম প্রকাশ, গান কাব্য প্রার্থনা হয় না। গানে কাব্যে ছন্দের কেন্দ্রাভিমুখী আঁট বন্ধনী এবং ভাবের প্রসাধনশীল কেন্দ্রাপসারী গতি। এই ছন্দের টানে তাদের প্রাণশক্তিও মাধুর্যের সৃষ্টি হয়।

রতিও দৈহিক ও মানসিক টানের সৃষ্টি করে, টান তার অস্তুনিহিত মূলগত সত্য। জীবনস্তরে সে টান নিচু ও স্বল্প এবং মানবস্তরে বর্ণনার অতীত উচ্চ ও তীব্র। তা থেকেই ভালোবাসার উদ্ভব। টানের তারতম্যে প্রেমের নানা পর্যায়। পরমহংসদের ভগবৎপ্রেমের কুলটার উপমায় এই টানের তীব্রতম অবস্থারই ইঙ্গিত করেছেন। মুহূর্তানে কাম, মধ্যটানে ভালোবাসা এবং অধিমাত্র টানে ভক্তি। মুহূর্তরে ইন্দ্রিয়ভূপ্তি, মধ্যস্তরে দেহোত্তর আনন্দ এবং অধিমাত্র স্তরে আধ্যাত্মিক উন্নাস। শেষের অবস্থাটিকে আমাদের দেশের সাধক-সাধিকারা দিব্য মহাসুখের অবস্থা বলেছেন, যার পরে শূন্যতা।

বহু যুগের অভিজ্ঞতার দ্বারা এই তত্ত্বটির গভীর উপলব্ধি করে কামকে পূর্ণী করার জন্ত আমাদের সাধকেরা লীলার সৃষ্টি করেছেন। তার অনেক ছবি আমরা বৈকল্যকাব্যে পাই। কিশোরী-কিশোরী ভাব ভিন্ন সে লীলা হয় না, তাই বৈকল্য সকল কাব্যের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা কিশোর কিশোরী। এ অবস্থাতেই প্রীতি হতে আনন্দ পাওয়া সহজ। লীলার এমন পর্যায় আছে যার টান অবর্ণনীয়-ভাবে তীব্র। সে তীব্রতা এতো যে তার প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে জীবনস্তরের পুরুষ মারা যায়। এ কথাটা প্রসঙ্গক্রমে বলতে হোল। নিজের ভাসাভাসা উপরস্থ শক্তির কারণে পুরুষ স্বভাবে আক্রামক হলেও টান সৃষ্টি করার কাজটা রমণীতে স্তম্ভ। আমাদের বৈকল্যীয় আত্মসাধনার তাই রমণীকে অগ্নিকুণ্ডে বলা হয়। অগ্নিকুণ্ডে যেমন তরল দুধ সিন্দূহরে কীরে পরিণত হয়, নারীর শক্তির অত্যাশ্র টানের সাহায্যে তেমনি পুরুষশক্তি ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়ে উচ্চ পরিণামের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরাজয়। এ বিশিষ্ট গুণে গুণবতী বলে প্রত্যেক কিশোরীভাবাপন্ন পত্নী তার পতির ও নিজের কামশক্তির উন্নতি সাধন করতে সক্ষম।

এই উপস্থিতিতেই নোহোস্তার ডামোবাসা ও তৎপরে তন্ত্রের অবস্থিতি।

আমি আমাদের দেশের সাধকগণ জ্ঞানের কথা বিবৃত করছি, কারণ তাতে মানবকল্যাণ নিহিত আছে। আজ পর্যন্ত এ তথ্য গুরু ও ব্রহ্মসূত্রী বিস্তারিত ছিলো। অবশ্য এখানে বা বলা হচ্ছে তা তথ্যের সীমিত ইচ্ছিতমাত্র, সব কথা বলা অসম্ভব ও উচিতও নয়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত যে এ প্রেমসাধনার কাব্যসাধনা, প্রায়সাধনা এবং বিবেকসাধনা প্রাথমিক ভিত্তি, তা না থাকলে এ সাধনা করা অসম্ভব।

মাহুদের পাঁচটি কথেরি: বাক পাণি, পাণি পানু ও উপহাস। প্রেমেরটিকে আমাদের একটি বিনয়ী জ্ঞানশাস্ত্র আনন্দেত্রির বলা হয়। প্রকৃত আনন্দ ত্রৈলোক্যিক ক্রিয়ায় অভিব্যক্তির দ্বারা লভ্য। সাধারণ মাহুদ ইঞ্জিরসুত্রে আনন্দ বলে জানে, কিন্তু আমাদের সজ্ঞা তির। অধিকাংশ বিবাহিতা রমণী ইঞ্জিরসুত্রেও জানে না, আনন্দ তো ইঞ্জিরসুত্রে অসম্ভব। সাধক-সাধিনী তির অন্তরে সে আনন্দ ইষ্ট এবং তার বিষয়ে চেতনা ও জ্ঞান হয় না।

কথাটা বুঝতে গেলে জানতে হয় যে সাধারণ মাহুদ কিছু মননশক্তি ও সাধাবলী কল্পনাশক্তি নিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। এই স্তরের উর্দ্ধেও যে স্তর আছে তা সে জানে না এবং জানতে চায়ও না। সে নিজের সামান্য মননশক্তি ও সাধাবলী চালাকির গুণ নিয়েই খুশি থাকে, কেনো না তাতেই তার সংসারের সেনসেন করার কাজটা এক রকমে চলে যায়। মননের ওপর বুদ্ধি। সাধারণ ভাষায় আমরা বাকে বুদ্ধি বলি বস্ততপক্ষে সেইটাই চালাকি। চালাকির কোন ধারণা ইচ্ছিত নেই, ইংরাজিতে তাকে Cleverness বলে। বুদ্ধি উচ্চতর বস্তু, বা চেতনা সাধনা তির লাভ করা যায় না। বুদ্ধির ওপরের স্তরে প্রাতিভজ্ঞান। ইংরাজিতে তাকে Intuition বলে পাঠকের তার বিষয়ে একটা বিকল্প জ্ঞান হয়। বিকল্প জ্ঞান মনগড়া প্রত্যয়। কিন্তু প্রাতিভজ্ঞান ঠিক Intuition নয়, তারও উর্দ্ধে। তাকে যোগসাধ্য Intuition বলা ঠিক হবে। বা হোক, মাহুদ মাহুদেরই অসীম প্রশস্ত-শক্তি আছে। প্রাতিভজ্ঞান তার একটি। বিবেকজ্ঞানের উদয় বা আভাসকে প্রাতিভজ্ঞান বলা হয়। উদ্যাকালে সূর্যে যেমন দিনমানের প্রদীপ্ত আলোর প্রতিফলিত, প্রাতিভজ্ঞান তেমনি প্রদীপ্ত বিবেকজ্ঞানের উদয় আলো। বিবেকসাধনার দ্বারা তাকে সূর্য ও আয়ত্ত না করলে সে শক্তিকে লাভ করা যায় না। কখনো কখনো আমরা অকস্মৎ ও বাস্তবিকভাবে প্রাতিভজ্ঞানে গিয়ে পড়ি, নূতন জ্ঞান চর্চায় চিন্তে চমক নিয়ে যায়। কিন্তু সেই স্পর্শের মুহূর্তেই আবার সে ভূমি থেকে সরে আসি। এ ব্যাপারটা চূর্ণভ, কালভঙ্গ বটে থাকে। সাধনালক্ষ্য না হলে কেবল ইচ্ছা বা মনন করলেই প্রাতিভজ্ঞানের ভূমিতে বাওয়া এবং সেখানে অবস্থিতি করা অসম্ভব কথা। উচ্চতম স্তর প্রজ্ঞা, বা জ্ঞানের সীমা, যে জ্ঞান একান্ত ভাবে নিজের প্রতিভার দ্বারা লভ্য; কেউ কখনো তা পেতে পারে না। এ বিজ্ঞান সমাধি তির লাভ করা যায় না।

সাধারণ জীবনতির অবসানে চিত্তভূমির অঙ্ককার সূত্র অবস্থা।

সংসারের দেশে উপস্থিতি। সে রতির

অবস্থা একান্ত এম নিরুদ্ধ হলে সমাধিলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। প্রাতিভজ্ঞান লাভ করতে গেলে সাংসার কালে মনন ও বস্তনাকে নিরোধ করা উপায়। সেগুলি নিরুদ্ধ হলে আমরা প্রাতিভজ্ঞানের সঙ্গুখীন হই। রতি তার স্বর্গে একান্ত চিত্তভূমি। এ অবস্থাটি অসম্ভববোধে। এ বিষয়টিও বেশ অসম্ভববোধে যে যে সময় মনন করনা ও বুদ্ধির কোনই অভিব্যক্তি থাকে না। তাই সকল বস্ত্যতি প্রত্যেক রতিতে এই ভূমিতে গিয়ে পড়ে। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে সেটি তারা কোনদিন উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় না।

কামগন্ধহীন প্রেমের আমাদের যে মহান ঐক্যবীর আদর্শ আছে সেটি এই এবং পরমার্থী উচ্চতর অবস্থার বস্তু। সে মহোত্তর সাধনার প্রস্তুতি অত্যন্ত কঠিন ও তটিল। কিন্তু সে প্রেম সাধাবলী মাহুদের সাধার অতীত হলেও পরম সত্য ভিত্তি, কবির কল্পনা বা রূপক নয়। প্রাতিভজ্ঞানে উপস্থিত হলে মাহুদের বস্তুটি আর একটি অবস্থা লাভ করে, সেটি আত্মহারা আনন্দ। সমাধিকে আত্মহারা আনন্দের অবস্থা বলা হয়। কথাটা বেশ কঠিন হলেও বুঝতে ও অনুভব করতে চেষ্টা করা দরকার যে আমরা সেই অবস্থাকেই আনন্দ বলি—যখন ইঞ্জির নিরুদ্ধ কিন্তু ইঞ্জিরতন্ত্রের ধ্যানগত অসম্ভব থাকে। এই সূত্র অনুভব সৃষ্টি করতে পারে বলেই হিন্দু মনোবিজ্ঞান বৌদ জ্ঞকে আনন্দেত্রির বলা হয়েছে। রতিতে যখন মাহুদ এই ভূমিতে উপস্থিত হয়ে আত্মহারা হয় সেটি সমাধির—এ ক্ষেত্রে রতিসমাধির অবস্থা। তাহলে রতিতে দুটি অবস্থা হয়, রতিপ্রাতিভ এবং রতিসমাধি। যে সমাধিতে একটি মাত্র ইষ্ট জেগে থাকে, সেটি সর্বাঙ্গ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। রতিসমাধিতে আনন্দ ইষ্টটি জাগ্রত, স্মৃতরাং সেটি আনন্দ সমাধির অবস্থা। রতির এই আত্মহারা আনন্দের অবস্থাকে দিবা মহাসুপ্ত বলে।

ইংরেজ রসজ্ঞ ভাবুক, জেমস হিটন সঙ্গীত ও প্রার্থনার সহিত প্রকৃত উচ্চরতির তুলনা করেছেন। বাংলা দেশের সহজিয় সাধকেরা রতিকে প্রকৃতপক্ষে জপে পরিণত করেছেন। সে তপস পুষ্কার এবং পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণের অবস্থা। সে অবস্থা দুটি প্রবর্তসাধক সাধিকার দেহমন আত্মা একীভূত হয়ে জপের ব হয়ে যায়। এ জপের আগেও তাদের নিরুদ্ধ তন্ত্রিসমভোগের ঈশ্বরপ্রতিধানের অবস্থা থাকে। ঈশ্বরপ্রতিধান সমাধিলাভে উপায়। সহজিয়ারা হু:সাহসী ও আক্রামক সাধক। তারা বা যে মাহুদ যেমন পরমেশ্বরকে অধেবণ করে, পরমেশ্বরকেও তেম নিজেই পূর্ণ করার জন্য মাহুদের সহিত মিলন খুঁজতে হয় তাই তারা দিব্য মহাসুপ্তের অবস্থার পরমাত্মাকে ডেকে এনে তাঁ তাদের আত্মহারা পরমানন্দের অংশভাগী করতে চায়। আমরা মনে রাখতে হবে যে, এটি অতিশয় একান্ত সাধনা এবং সাধ সাধিকার এই দৈহিক মিলনটি নৈমিত্তিক। সাধাবলী: পতি' প্রেমভক্তিরসে আগ্রুত ও ঈশ্বরচেতনার অবিচলিত হয়ে থ এবং কখনো কখনো তীর রসোপলব্ধির ক্ষণে মহাসুপ্তের ম পরমেশ্বরের সাধনা করে এবং এ রতির টান ও আত্মহারা সবই পরমেশ্বরে অর্পণ করে। সাধনা সকল হলে এ দেহা



মায়ের মমতা ও অষ্টারমিস্কে প্রতিপালিত

আপনার শিশুর ভবিষ্যত চিন্তা করে আপনি ওর কোন বকণ যত্নের ক্রটি রাখেননি। বুকঢালায়েই ভালবাসার সাথে ওকে নিয়মিত অষ্টারমিস্ক দিয়েছেন। কারণ আপনি জানেন যে অষ্টারমিস্ক ঠিক মায়ের দুধেরই মতো। খার্ট দুধ থেকে অষ্টারমিস্ক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী। আর সে জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

শিশুদের বহুজনিত থেকে ঝেঁপে-বাঁ জনা অষ্টারমিস্কে দেবে আছে। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ্য বস্তু রয়েছে। ফলে আপনার শিশুর 'ডি' ও হাড়কে মজবুত করে ওড়তে সাহায্য করবে।



...মায়ের দুধেরই মতন

বিনামূল্যে! "অষ্টারমিস্ক পুস্তিকা" (ইংরেজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সব রকম তথ্য সম্বলিত। ড্রাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়, 'অষ্টারমিস্ক' পোস্ট বক্স নং ২২৫৭, কোলকাতা-১

এই উপস্থিতিতেই দেহোত্তর ভালোবাসা ও তৎপরে ভক্তির অবস্থিতি।

আমি আমাদের দেশের সাধকদের জ্ঞানের কথা বিবৃত করছি। কারণ তাতে মানবকল্যাণ নিহিত আছে। আজ পর্যন্ত এ তথ্য গৃহীত হয়নি ছিলো। অতঃপূর্বে বা বলা হচ্ছে তা তথ্যের দ্বারা ইচ্ছিতমাত্র, সব কথা বলা অসম্ভব ও উচিতও নয়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত যে এ প্রেমসাধনার কার্যসাধনা, প্রাণসাধনা এবং বিবেকসাধনা প্রাথমিক ভিত্তি, তা না থাকলে এ সাধনা করা অসম্ভব।

মানুষের পাঁচটি কর্মজিহ্বা : হাক পানি, পাক পানু ও উপহাস। প্রেমেরটিকে আমাদের একটি বনিয়াদী জ্ঞানশাস্ত্র আনন্দজিহ্বা বলা হয়। প্রকৃত আনন্দ ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অভিযুক্তির দ্বারা লভ্য। সাধারণ মানুষ ইচ্ছিবশতকে আনন্দ বলে জানে, কিন্তু আমাদের সজ্ঞা ভিন্ন। অবিকার্য বিবাহিতা রমণী ইচ্ছিবশতকেও জানে না, আনন্দ তো ইচ্ছিবশতের অন্তর্ভুক্তি। সাধক-সাধিকা ভিন্ন অস্তের সে আনন্দ ইষ্ট এবং তার বিষয়ে চেষ্টনা ও জ্ঞান হয় না।

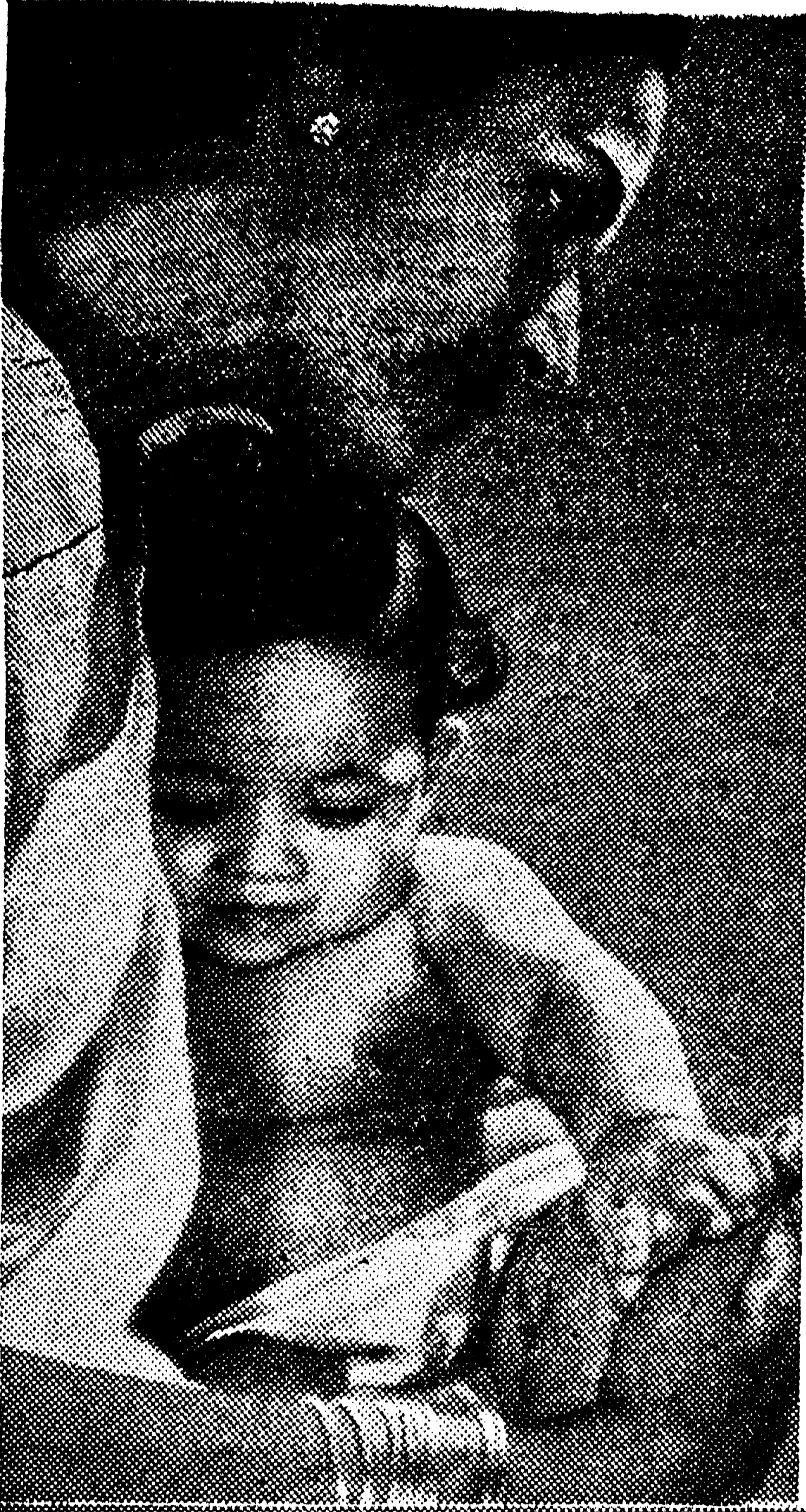
কথাটা বুঝতে গেলে জানতে হয় যে সাধারণ মানুষ কিছু মননশক্তি ও সাধাবী কর্মশক্তি নিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। এই যাত্রার উদ্দেশ্যে যে অস্ত্র জ্বর আছে তা সে জানে না এবং জানতে চায়ও না। সে নিজের সামান্য মননশক্তি ও সাধারণ চালাকির গুণ নিয়েই খুশি থাকে, কেনো না তাতেই তার সংসারের সেনসেন করার কাজটা এক বকমে চলে যায়। মননের ওপর বুদ্ধি। সাধারণ ভাষায় আমরা বাকে বুদ্ধি বলি বস্ত্তপক্ষে সেইটাই চালাকি। চালাকির কোন খারাপ ইচ্ছিত নেই, ইংরাজিতে তাকে Cleverness বলে। বুদ্ধি উচ্চতর বস্ত্ত, বা চেষ্টনা সাধনা ভিন্ন লাভ করা যায় না। বুদ্ধির ওপরের স্তরে প্রাতিভজ্ঞান। ইংরাজিতে তাকে Intuition বললে পাঠকের তার বিষয়ে একটা বিকল্প জ্ঞান হয়। বিকল্প জ্ঞান মনগড়া প্রত্যয়। কিন্তু প্রাতিভজ্ঞান ঠিক Intuition নয়, তারও উচ্চে। তাকে যোগসাধ্য Intuition বলা ঠিক হবে। বা হোক, মানুষ মাত্রেরই অসীম প্রমুগ্ন-শক্তি আছে। প্রাতিভজ্ঞান তার একটি। বিবেকজ্ঞানের উদয় বা আত্মসকে প্রাতিভজ্ঞান বলা হয়। উৎকালে নৃর্ষে যেমন দিনমানের প্রদীপ্ত আলোর প্রতিভ্রতি, প্রাতিভজ্ঞান তেমনি প্রদীপ্ত বিবেকজ্ঞানের উদ্যাব আলো। বিবেকসাধনার দ্বারা তাকে সূর্ত ও আয়ত্ত না করলে সে শক্তিকে লাভ করা যায় না। কখনো কখনো আমরা অকস্মৎ ও বাস্ত্বিকভাবে প্রাতিভজ্ঞানে গিয়ে পড়ি, নূতন জ্ঞান হঠাৎ চিন্তে চমক দিয়ে যায়। কিন্তু সেই স্পর্শের মুহূর্তেই আবার সে ভূমি থেকে সরেও আসি। এ ব্যাপারটা হুলুভ, কালেভদ্রে ঘটে থাকে। সাধনালব্ধ না হলে কেবল ইচ্ছা বা মনন করলেই প্রাতিভের ভূমিতে বাওয়া এবং সেখানে অবস্থিতি করা অসম্ভব কথা। উচ্চতম স্তর প্রজ্ঞা, বা জ্ঞানের সীমা, যে জ্ঞান একান্ত ভাবে নিজের প্রতিভার দ্বারা লভ্য; কেউ কখনো তা পেতে পারে না। এ বিজ্ঞান সমাধি ভিন্ন লাভ করা যায় না।

সাধারণ জীবনতির অবসানে চিত্তভূমির অঙ্ককার মূঢ় অবস্থা। মহত্তর রত্নির অবসানে আলোকের দেশে উপস্থিতি। সে রত্নির সনিক ওপরে বর্ণিত অবস্থাতিলির নিবিড় বোণ আছে। চিত্তের

অবস্থা একত্র এবং নিরুদ্ধ হলে সমাধিলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। প্রাতিভজ্ঞান লাভ করতে গেলে সাধনার কালে মনন ও বস্ত্তাকে নিরোধ করা উপায়। সেগুলি নিরুদ্ধ হলে আমরা প্রাতিভজ্ঞানের সঙ্গুণীন হই। রত্নি তার স্বর্ষে একত্র চিত্তভূমি। এ অবস্থাটি অসম্ভববস্ত্ত। এ বিষয়টিও বেশ কল্পিতবস্ত্ত যে যে সময়ে মনন করনা ও বুদ্ধির কোনই অভিষ থাকে না। তাই সকল সম্প্রতি প্রত্যেক রত্নিতে এই ভূমিতে গিয়ে পড়ে। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে সেটি তারা কোনদিন উপলভি করতে সক্ষম হয় না।

কার্যগতর প্রেমের আমাদের যে মহান ঐক্যবীর আশ্রয় আছে সেটি এই এবং পরবর্তী উচ্চতর অবস্থার বস্ত্ত। সে দেহোত্তর সাধনার প্রস্তুতি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। কিন্তু সে প্রেম সাধারণ মানুষের সাধের অস্ত্রিত হলেও পরম সত্য তিনি, কবির করনা বা রূপক নয়। প্রাতিভ ভূমিতে উপস্থিত হলে মননশক্তির সম্প্রতি আর একটি অবস্থা লাভ করে, সেটি আত্মহারা আনন্দ। সমাধিকে আত্মহারা আনন্দের অবস্থা বলা হয়। কথাটা বেশ কঠিন হলেও বুঝতে ও অনুভব করতে চেষ্টা করা দরকার যে আমরা সেই অবস্থাকেই আনন্দ বলি—বখন ইচ্ছিব নিরুদ্ধ কিন্তু ইচ্ছিবতত্ত্বের ধ্যানগত অনুভব থাকে। এই সূক্ষ্ম অনুভব সৃষ্টি করতে পারে বলেই হিন্দু মনোবিজ্ঞান বৌদ জগকে আনন্দজিহ্বা বলা হয়েছে। রত্নিতে বখন মানুষ এই ভূমিতে উপস্থিত হয়ে আত্মহারা হয় সেটি সমাধির—এ ক্ষেত্রে রত্নিসমাধির অবস্থা। তাহলে রত্নিতে দুটি অবস্থা হয়, রত্নিপ্রাতিভ এবং রত্নিসমাধি। যে সমাধিতে একটি মাত্র ইষ্ট জেগে থাকে, সেটি সর্বজ্ঞ, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। রত্নিসমাধিতে আনন্দ ইষ্টটি জাগ্রত, সূতরাং সেটি আনন্দ সমাধির অবস্থা। রত্নির এই আত্মহারা আনন্দের অবস্থাকে দিব্য মহাসুখ বলে।

ইংরেজ রসজ্ঞ ভাবুক, জেমস হিটন সঙ্গীত ও প্রার্থনার সহিত প্রকৃত উচ্চরত্নির তুলনা করেছেন। বাংলা দেশের সহজিয়া সাধকেরা রত্নিকে প্রকৃতপক্ষে জপে পরিণত করেছেন। সেটি তম্বর পূজার এবং পরমেধরে আত্মসমর্পণের অবস্থা। সে অবস্থায় দুটি প্রবর্তসাধক সাধিকার দেহমন আত্মা একীভূত হয়ে জপের বস্ত্ত হয়ে যায়। এ জপের আর্গেও তাদের নিরুদ্ধ ভক্তিরসভে'গের ও ঐশ্বরপ্রতিধানের অবস্থা থাকে। ঐশ্বরপ্রতিধান সমাধিলাভের উপায়। সহজিয়ারা দুঃসাহসী ও আক্রামক সাধক। তারা বলে যে মানুষ যেমন পরমেধরকে অদেয়ণ করে, পরমেধরকেও তেমনি নিজেকে পূর্ণ করবার জস্ত মানুষের সহিত মিলন খুঁজতে হয়। তাই তারা দিব্য মহাসুখের অবস্থার পরমাঙ্গাকে ডেকে এনে তাঁকে তাদের আত্মহারা পরমানন্দের অংশভাগী করতে চায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এটি অতিশয় একান্ত সাধনা এবং সাধক সাধিকার এই দৈহিক মিলনটি নৈমিত্তিক। সাধারণতঃ পতিপত্নী প্রেমভক্তিরসে আগ্রত ও ঐশ্বরচেতনার অবিচ্ছিত হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো তীব্র রসোপলব্ধির কপে মহাসুখের মতো পরমেধরের সাধনা করে এবং এ রত্নির টান ও আত্মহারা তা সবই পরমেধরে কর্ণণ করে। সাধনা সকল হলে এ দেহমিল ত্যাগ্য। রত্নিসুখ মানুষের জেষ্ঠতম সুখ। সহজিয়ারের মতে



মায়ের মমতা ও অষ্টারমিক্সে প্রতিপালিত

আপনার শিশুর ভবিষ্যত চিন্তা করে আপনি ওর কোন রকম যত্নের ক্রটি রাখেননি। বুকঢালা স্নেহ ভালবাসার সাথে ওকে নিয়মিত অষ্টারমিক্স দিয়েছেন। কারণ আপনি জানেন যে অষ্টারমিক্স ঠিক মায়ের দুধেরই মতো। খাঁটি দুধ থেকে অষ্টারমিক্স বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী। আর সে জন্য সহজে হজম হয়।

শিশুদের রক্তাক্ততা থেকে বাঁচাবার জন্য অষ্টারমিক্সে লৌহ আছে। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয়েছে, ফলে আপনার শিশুর দাঁত ও হাড়কে মজবুত করে গড়তে সাহায্য করবে।



...মায়ের
দুধেরই মতন

বিনামূল্যে! "অষ্টারমিক্স পুস্তিকা" (ইংরেজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সব রকম তথ্য সম্বলিত। ডাক পরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়, 'অষ্টারমিক্স' পোস্ট বক্স নং ২২৫৭, কোলকাতা-১

হুঁধু বেমন করনার, থাকলে সুখ হবার ধারণাটাও তেমনি কাল্পনিক। অনেক সময়ে দেখা যায় যে ভীষণতম কামনার বৃত্তিও হাতে পেলে সুখ বা দুঃখ কিছুই বোধ হয় না।

মনের বিচিত্র লীলাটি জামবায় মতো জিনিষ। বাহিরের কোন উত্তেজনা পেলে মনে ইচ্ছা জাগে, তখন মন সঙ্কলন করে ও পরে সেই অনুসারে কাজ করে। ইন্দ্রিয় উত্তেজনা গ্রহণ করবার এবং কাজ করবারও অঙ্গ। বৃত্তি তিনটির মাত্রাসাম্য আছে। কিন্তু যখন কোন একটি বৃত্তির মাত্রা বেশি হয় তখন সেটা, অল্প দুটি বৃত্তির অভিভাবক হয় এবং অল্প দুটি বৃত্তি অভিভূত হয়ে থাকে। একই কণে তিনটি বা দুটি বৃত্তির একসঙ্গে উদয় হয় না। সুখবোধে সুখ অভিভাবক, দুঃখ ও মোহ অভিভূত। দুঃখবোধে দুঃখ অভিভাবক, সুখ ও মোহ অভিভূত হয়ে থাকে। মোহ যখন অভিভাবক অল্প দুটি বৃত্তি তখন অভিভূত অবস্থা পায়। সর্বস্বলী আমাদের মনে এই বৃত্তিগুলির প্রবাহ হচ্ছে। তারা স্বপ্নে কণ্ঠস্বরী, লয়োকনশীল। একটির উদয় হলে অন্যের লয় হয়। কিন্তু উদ্ভিত বৃত্তিটারও তখনই লয় হয়ে অল্প একটির উদয় হয়ে থাকে। তাই সুখের অভিভাবক শেব হলেই হুঁধু বা মোহের উদয়। ছোট ছেলে মিত্য অক্ষরলিঙ্গ চোখে কীদন্তে কীদন্তেই হেসে ওঠে, আবার পরক্ষণেই দুঃখে কীদে। বয়স্কেরাও দগু করে বেগে হলে উঠে পরমুহুর্তে শান্ত হয়। তাদেরও ঠিক ওই রকম সুখ দুঃখ মোহের চক্রবৎ পরিবর্তনশীল অবস্থা। সুখের অসুভূতির পরক্ষণেই দুঃখের বিষয়বস্তুতে বিরক্তি বা উদাসীনতা আসে। এ সব কথা ও বৃত্তির অভিভাবকদের দশাগুলি একটু হস্তের সহিত আত্মপর্যবেক্ষণ করলে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। সেটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অহুমানের দ্বারা বা কারো কথায় নির্ভর করে সে সত্যকে গ্রহণ করতে হয় না। পাঠক-পাঠিকার সবচেয়ে আত্মপর্যবেক্ষণ করবার অভ্যাসটি করা উচিত, তা দিয়ে নিরন্তর আত্মজ্ঞানের বৃদ্ধি হয় এবং ব্যক্তিগত অনেক জটিল সমস্যারও নিরসন হয়। এ প্রবন্ধে আমি যা লিখেছি তার প্রত্যেকটি কথার সত্যতা নিজেকে ও অপরকে পর্যবেক্ষণ করে পরখ করা যায়। আত্মপর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অনেক বেশি।

সুখ দুঃখ মোহ মানুষের অন্তরের জিনিষ। যদিও বাহিরের উত্তেজনার কারণে তাদের সৃষ্টি হয়, দেহের বাহিরে কোথাও তাদের অবস্থিতি নেই। বলেছি যে, তাদের লয়োকনশীলতা আছে। তবুও আমরা দুঃখকেই বা কেনো মাত্রাবিক এবং দীর্ঘস্থায়ী বলে জানি? কেনোই বা বলি যে সুখের তেমন স্মৃতি নেই, দুঃখের স্মৃতিটা মনে সজীব হয়ে থাকে? তার দুটি কারণ বা মনে রাখবার বোধ্য। প্রথম: সংসারে বাস করে নিজেরা পাওয়া ছাড়া আমরা প্রতিনিরন্তর আত্মীয় বন্ধু, পরিচিত অপরিচিত ব্যক্তিদের দুঃখ পেতে দেখি, তাই আমাদের দুঃখের সংসার গভীর হয়ে আছে। দেখবার সময়ে আমরা চিন্তা করি না যে যাদের দেখছি ও যাদের কাছ থেকে সে সংসারটা গ্রহণ করেছি তারা নিজেরা আকস্মিক ঘটনাপূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত বাহ্যিক জীবনের হাতে এলিয়ে দিয়ে আছে এবং বিপরীত পথে নিজেরা ভাগ্য সৃষ্টি করে চলছে। কারো দুঃখ নিরোধ করবার চেষ্টা নেই। প্রত্যেকটি মানুষ একান্তভাবে জিহ্ন, তার দেখে মন আত্ম

তার স্বকীয় বস্তু। তার নিজের দেহের অস্থি মাস মজা বস্তু তার মন আত্মা ভাগ্য ইত্যাদির নির্মাতা সে নিজে। সাধারণ মানুষ এ সবের কোন উপলব্ধি করতে পারে না, তাই নিজেকে আর পাঁচজনের সহিত অভিন্ন ভেবে তাদের দুঃখ থেকে সে দুঃখের সংসার গ্রহণ করে। ঠিক এক রকমেই রোগ বেমন দুই সহোদর তাইয়েরও হয় না, একই প্রকারের এবং একই মাপের সুখ বা দুঃখ তেমনি সকলের ঘটতে পারেনা। একজনের পক্ষে বা সুখকর বা দুঃখকর তা আর একজনের পক্ষে সুখকর বা দুঃখকর না-ও হতে পারে। এক-পরিবারের বা এক-সমাজভুক্ত মানুষের পরিবেশগত সমতা যে কিছু থাকে তা স্বীকার। কিন্তু মানুষ-মানুষে স্বভাবগত গুণের সমতা কখনো হয় না। এই পরিবেশ থেকে মানুষ দেশের সংসার গ্রহণ করে। সংসার মনের গুহাহিত পৃথকতম বস্তু। দেশভুলক সংসার যথাকালে মূল আকারে প্রকাশিত হয়। আমাদের শাস্ত্র বলে যে সংসার এই দুই জন্মে অথবা অদৃষ্ট কোম জন্মে কলপ্রসূ হয়। শীত্র যে দেশসংসার তা এই জন্মেই কল দর্শায়। আমরা যে পূর্বজন্মের সংসার নিজেকেই আধারে ধরে রাখি তা আমাদের দেশের সুপ্রচলিত একটি বড়ো শাস্ত্রগত বিশ্বাস।

দ্বিতীয় কারণ: মানুষ নিজের দুঃখকে নির্মূল করবার চেষ্টা না করে নিজেকে দুঃখ দিয়ে অভিভূত করে এবং সেই অবস্থায় থাকতে ভালবাসে। ছোট ছেলেরা তাদের মড়া বেদনাময় দাঁতটা নাড়িয়ে বিচিত্র একটা সুখ-বেদনা অনুভব করে। আমরা বয়স্কেরাও যে তা করিনি, তা নয়। বয়স্কদেরও ঠিক তেমনি দুঃখের একটি বেদনাময় সুখ উপভোগ করবার প্রবৃত্তি আছে। তাই আমরা আমাদের দুঃখের কথা সর্বদা বলতে ভালোবাসি। এ কথা মনে রাখা উচিত যে দুঃখ আত্মরিক বস্তু। বাইরের কোন উপকরণ দিয়ে তার নিবৃত্তি করা যায় না, মন দিয়েই তাকে বিনাশ করতে হয়।

সংসারে বাঁকা ও সোজা দুটো পথ। আমাদের চিন্তার অস্থায়ী আমরা পথ বেছে নিই। মানুষের চিন্তার চারটি ধরণ: কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-গুরু, গুরু এবং অকৃষ্ণ-অগুরু। কৃষ্ণচিন্তা দুঃখকর, গুরুচিন্তা সুখ ও শান্তিকর। সাধারণ মানুষ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-গুরু মিশ্রিত চিন্তা করে। আত্মজ্ঞানী কেবল গুরুচিন্তা করে। যে চিন্তা অকৃষ্ণ অগুরু সেটি মুক্ত পুরুষের, অন্তের হয় না।

আমরা সর্বদা কৃষ্ণচিন্তা করি বলে সহজেই সংসারের বাঁকা পথে গিয়ে পড়ি। কৃষ্ণিকার বশীভূত হয়ে আমাদের কৃষ্ণচিন্তা করতে বাধ্য হতে হয়। আমরা সেই চিন্তা দিয়ে পরিবেষ্টিত শুধু নয়, আক্রান্ত। আমাদের অধিকাংশের জীবনে অত্যন্ত ও গুহাহিতের উপলব্ধি নেই, যেনো কেবল একটি বর্তমানের প্রবাহে বেঁচে থাকা। বর্তমানের প্রবাহ হয় না বলে সেটি দুঃখের পথ। সংসারের পঙ্ডলিকা প্রবাহে আর পাঁচ জন বা কয়ে আমরাও অঙ্কুর মতো, বস্তুর মতো তাই করি। মানুষের অপরকে অহুকরণ করবার প্রবৃত্তিটা বিশ্বকর জাবে প্রবল। আমাদের বাহ্যিক জীবনধারা তার কারণ। এই নিহাঙ্করণ কথাটার সাধারণ মানুষের আত্মাভিমানের আঘাত লাগলেও সেটা অত্যন্ত সত্য কথা। অভিশর তুচ্ছ বস্তুতেও আমাদের অহুকরণ বৃত্তির প্রকাশ। এই বস্তুধর্মী মানুষকে বাংলা দেশের প্রাচীন মনোবিচার সংসারা মানুষ বলে। সংসারা মানুষ স্বরপজ্ঞানহীন বস্তু। কেবল সংসারের ভাঙনার ও বহির্গন্তের উত্তেজনা বলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে বস্তুর মতো

কর্ম করে যায়। আমরা প্রত্যেকে, আমরা বানের জানি, তারাও বানের জানে সকলে সংস্কারী মানুষ।

সাধারণ মানুষ নিজের মুখটাকেও চেনে না। আত্মীয়-বন্ধুদের মুখ সে যখন ইচ্ছা স্বরণ করতে পারে, কিন্তু ছ-চার সেকেণ্ডের বেশি কেউ নিজের মুখ স্বরণ করতে পারে না, পরক্ষণেই আত্মবিশ্বাসিত্তে নিমজ্জিত হয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষ তাও পারে না, সমাই তাদের আত্মবিশ্বাসিত্তির অবস্থা। আত্মচেতনাপূর্ণতা সাধারণ মানুষের ভাগ্য।

পায়ের-চলা মেঠো পথ একটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সেটা নিজের খামখেয়ালীতে আঁকা-বাঁকা, শর-বৎ সোজা নয়। মাঠের সবুজ অঙ্গে সেটা মার্জিত পৈতাম্বর মতো দেখায়। একদা কোন ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসিত্ত অবস্থায় সে পথটিকে পেতে দিলো। আঁকা-বাঁকা পথ দীর্ঘতম। তারপর হাজার হাজার পথিক আত্মবিশ্বাসিত্ত হয়ে সেই আঁকা-বাঁকা পথটার শাসন মেনে এসেছে। রবার ট্যাম্পের নাম স্বাক্ষরের মতো সেই অগণিত পথিকেরাও সে পথটার গায়ে তাদের পায়ের রবার ট্যাম্পের স্বাক্ষর রেখে গেছে। মাঠটা অতিক্রম করবার সময়ে কারো তাড়াতাড়ি থাকলেও সেই সেই পথটার শাসন অগ্রাহ্য করে নূতন শর-বৎ সোজা একটা পথ করে নিয়ে পার হয়নি। পাঠক যদি আনমনা অবস্থায় সে মাঠ পার হ'তে বান, তিনিও ঠিক তাই করবেন। অবশ্য এ কথাটা জানার সচেতনতার কারণে করবেন না। চেতনা জাগ্রত হলে অমুসরণ বা অমুসরণ ক্রিয়াটা আর হয় না। চেতনা না হলে সংসারের গতানুগতিক পথ ছেড়ে আপন পথে চলা অসম্ভব কথা।

আমাদের বাউলদের একটা সুন্দর গান আছে :

আসি-বাওয়ার বান্ধা পথে
আজায় না ঘাস কোন মতে।

মাঠের বাঁকা পথে যেমন ঘাস জন্মায় না, সংসারের গতানুগতিকতার বন্ধ্যাপথেও তেমনি স্বরূপজ্ঞানের বিবেকের উদয় হয় না। তাই মানুষ নিজের ভাগ্যটিকে সদাসর্বদা বিকৃত করে পিলনুজের মতো সারা জীবন তেলকালি-মাখা হয়ে থাকে; প্রদীপের সম্প্রকাশ শক্তিটি আর লাভ করে না। সাধারণ মানুষ বহু বসেই চালাক লোকের হুটি করা নানা ধরতাই বুলির দাস হয়ে থাকে এবং সারা জীবন পরনির্ভর হয়ে কাটায়। স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা আত্মকর্তৃত্ব লাভ না করলে মানুষের দুঃখভাগ্য ও দাসভাগ্য এক হয়। কিন্তু জীবনের অহরহ বে প্রতিশ্রুতি আছে, তাতে তার দাসভাগ্যের কথা নেই। জীবন দুঃখের ওপর আধিপত্যের কথা বলে। এ স্বাধীনতা স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা লাভ্য, আর কিছু দিয়ে হয় না।

মানুষ এমন করেই বা কেনো? তার তৃতীয় একটা কারণ আছে। আমরা সামান্য যে মননশক্তি নিয়ে ঘর করি সেটা চিন্তন মনের ক্রিয়া। এ মনের ইংরাজি নাম Intellect. ইউরোপ ইন্টেলেক্টে খুব বেশি দাম দেয়, আমাদের দেশে তা দেওয়া হয়নি। চিন্তনমন অত্যন্ত মহৎগতি। সে তাড়াতাড়ি ও সোজাসুজি কোন জিনিস বোঝে না। বড়ো কথাটা এই যে চিন্তনমনের বা মননশক্তির পরের ব্যবহৃত চিন্তা বা সেকেণ্ডহাণ্ড বিষয় নিয়ে কারবার। সাধারণ মানুষ তাই অবলীলায় পরের মুখের কাল খায়।

নিয়মিত কুমারেশ সেবমে লিভার সুস্থ থাকে, অঙ্গীর্ণ, অক্ষুধা, পেটফাঁপা প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না, খিটখিটে মেজাজ, সহজে ক্রান্তি প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয় না।

কুমারেশ

ও, আর, সি, এন্স, লিঃ
কুমারেশ হাউস
দালিবা, হাওড়া

মাছুব চলা পথটাই চেনে এবং নিজেও সেটা অনুসরণ করে চলে। কৃষ্ণচিন্তা সংসারে ব্যাপক। তার ফলে এতো বাদ-বিবাদ সংঘর্ষ ঘেব হিংসা ঘৃণার প্রকাশ। প্রতিদিনের খবরের কাগজ কৃষ্ণচিন্তার ভরা। "Vice is news virtue is not", সংবাদের এই সংজ্ঞা খবরের কাগজকে শাসন করে। অর্থাৎ তাতে কৃষ্ণচিন্তার স্থান নেই। সাধারণ মানুষ কৃষ্ণচিন্তা করে না শুধু নয়, সেটাকে চায়ও না। রেডিওর দ্বারা আমরা আকাশ থেকেও অবিরাম শ্রোতে কৃষ্ণচিন্তা পাই। এমন ভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে আমরা অল্পকাল চিন্তা করতে বাধ্য হই। কৃষ্ণচিন্তার কারণে আমরা এখন দৈনিক স্বাস্থ্য বলতে রোগের অভাবের অবস্থা বৃদ্ধি, প্রাণশক্তিতে ভরপুর কিছু বুঝিনে। এ চিন্তা হুঃখ-রূপের জনক। মানুষ মুখে হুঃখবিরোধী হলেও কাজে নিজেই হুঃখ দিয়ে অভিভূত করে রাখে। আশ্চর্যের কথা এই যে, সে অভিভূত হয়ে থাকতে ভালোবাসে। অনেক ব্যক্তি তখনই হুঃখকে হুঃখবিলাসে পরিণত করে। তাদের হুঃখ কেড়ে নিলে জীবন স্বাদহীন শূন্য হয়ে যায়।

বেদন-মনটা ভারি মজার জিনিষ। স্মৃতি ছাড়া চিন্তন, সংস্কার, গতি ও কাম মনগুলির হা ও না ছুটি বিভাগ আছে। কিন্তু বেদন-মনের তা নেই। শুধু কোন বেদন তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ হতে পারে। সে কারণে বেশ বোকা যায় যে, এই বাক্যে আমি ভালোবাসলুম, যার প্রশংসা করলুম, সামান্ততম কারণে কিংবা কোন ক্রটি করলুম করে তখনই তাকে ঘৃণা করছি এবং তার নিন্দায় পঞ্চমুখও হয়েছি। আমাদের মনের এমন অবস্থা অনুকরণ ঘটে চলেছে। মৈত্রী উদাসীনতা ও শক্রতা, মাছুবে-মাছুবে এই তিন ধরনের সম্বন্ধ হয়। এগুলিও সুখ হুঃখ মোহের মতো লয়েদয়শীল। পিতাপুত্র, পতিপত্নী, মা ও মেয়েতে মৈত্রীর সম্বন্ধ। এক মুহূর্তে তা উদাসীনতা বা শক্রতার পরিণত হতে পারে এবং নিত্য হয়েও থাকে। দূরতর পারিবারিক বা সামাজিক সম্বন্ধের বিকারের তো কথাই নেই। সুতরাং ভালোবাসার অনেক অন্তরায়। কৃষ্ণচিন্তার মৈত্রী ভালোবাসার স্থান নেই।

সকল কৃষ্ণ প্রকোভ-বিনাশী শক্তি ধরে। ঘেব হিংসা ঘৃণা ক্রোধ লোভ মোহ ভয় দম্ব ইত্যাদি কৃষ্ণ-প্রকোভ। বহুতপক্ষে এগুলি মনের ব্যাধিত অবস্থা। সূক্ষ্ম হলেও তারা সুসরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অর হলে যেমন সকল দেহ অবে অভিভূত হয়, একটি কোন অঙ্গের বেদনার যেমন সর্বঙ্গের বেদনার অনুভব ও পীড়া, প্রকোভেও তেমনি সর্ব দেহ ও মনে অভিভূত অবস্থা। হর্ষে সর্বজনীন হর্ষ। ভয়ে সমগ্র সত্তার ভয়। ক্রোধ হলে মাছুব তার সর্ব দেহ ও মন দিয়ে ক্রোধের একটা পুঁটলি হয়ে যায়। সুখকর ও হুঃখকর সকল প্রকোভের বিষয়ে এ কথা সত্য। আমাদের ঐহিক সকল সুখে হুঃখের বীজ গোপন থাকে। সুখ থেকে বা হুঃখ হয় তা বিরোগজনিত। সুখ পরিণামী বৃদ্ধি, অর্থাৎ মাটিতে বীজ দিলে যেমন পরিণামে একটি গাছ হয়, সুখও তেমনি হুঃখ হয়। পুণ্য কর্মের পরিণাম সত্য সুখ ও আনন্দ। অপুণ্য কর্মের পরিণাম হুঃখ। সে হুঃখ তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণচিন্তার দ্বারা নিজেদের আমরা সর্বদা হুঃখ দিয়ে অভিভূত করে রাখি বলেই হুঃখ হারী বন্ধ। বিবেকী

ব্যক্তির বসেন, 'হুঃখমেব সর্বম' হুঃখই সব। তাই হুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া মাছুবের শ্রেষ্ঠ সাধন।

জিহাংসা, প্রতিঘাতের ইচ্ছা, মানসিক বিদ্বেষ ও ক্রোধ হুঃখের চারটি রূপ, তাদের আরো শাখা-প্রশাখা আছে। হুঃখ বায় একবৃদ্ধি হয়ে মনে হারী হয়ে থাকে সে ব্যক্তি পাগল হয়। সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গেলে চিন্তের তিনটি বৃদ্ধির সহজ লয়েদয়শীলতা থাকা দরকার। হুঃখ-চিন্তার টান অতিশয় তীব্র। সে টান নিত্য ঘটতে থাকলে তার প্রভাব মনে সঞ্চারিত হয়ে হয়ে দেহের রক্তপ্রবাহের ও অঙ্গ উপাদানের স্বাভাবিক ধরণ বদলে যায়, দেহযন্ত্রগুলির স্বভাবী অবস্থা আহত হয় এবং পরিশেষে তা নানা বাস্তবিক রোগের আকারে ফুটে ওঠে। আমরা নিরন্তর যেমন নিজেদের দেহের উপাদান মন ও ভাগ্য নির্মাণ করছি, তেমনি হুঃখকর চিন্তা দিয়ে নিজেদের বাস্তবিক রোগ এবং মৃত্যুও নির্মাণ করে চলেছি। বা হোক, রোগ মৃত্যুর কথা এখানে আলোচ্য নয়, প্রসঙ্গক্রমে কথাটা এসে পড়েছে। দেহ ও মনের কোন অঙ্গ এবং উপাদান আমরা কেলে দিতে পারি না। কেবল কৃষ্ণচিন্তা কেলে দেওয়া যায় এবং তাতে বিন্দুমাত্র কোন ক্ষতি না হয়ে অপরিণীম লাভ ও মঙ্গল হয়।

একটি গুরুতর কথা মনে রাখতে হবে যে, পাঠক বা পাঠিকা সংখ্যায় একজন নন, তিনি বহুসংখ্যক। অর্থাৎ তাঁর দেহ একজনের এবং সাধারণ বোধ একজনের হলেও তাঁর অন্তরে বহুসংখ্যক ব্যক্তির বাস। আমি বলে নিজের পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বহু আমি-র সমন্বয়। বাহিরের এই যে একটি আমি-র বোধ তার কারণ তিনি নিজের একটি নাম দিয়ে সর্বদা পরিচিত; তাঁর একটি দেহ; দেহের সুখকর ও হুঃখকর নানা সংবেদনের ঐক্য এবং নানা অভ্যাসজনিত একতাবোধ। তাঁর অন্তর্দেশে এই যে বহু সংখ্যক ব্যবহারিক আমি ব্যক্তি, তারা পরস্পরে অপরিচিত। একজন অস্ত্রের কাছে তির ভাবাভাষী; তিন্ন স্বভাবের ও তিন্ন ক্রিয়ারত বিদেশীর মতো। যেনো পাঠক বা পাঠিকার মনের পাঠশালার বহু বিদেশীর বাস। যখন কোন একটি আমি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিরের কোন উত্তেজনা গ্রহণ করে, তখনই সে পাঠক বা পাঠিকার দেহ মন ও সমগ্র সত্তার অভিভাবক হয়ে গিয়ে সেই উত্তেজনা অনুভবী ভালো বা মন্দ কাজ সৃষ্টি করে এবং তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগও করে। সে কর্মের ফলভোগ করে আর একটি "আমি," সে করেনা। প্রায়ই আমরা উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ কোন একটা কাজ করে কেলি এবং পরক্ষণে ভাবি যে সে কাজটা করা উচিত হয়নি। তখন তার অঙ্গ মনে মনে অনুশোচনা করি। কাজটা করে আমার একজন "আমি" হুঃখ পায়, অনুশোচনা করে করে তিন্ন একটি "আমি"। কর্মের কর্তা ও তার ফলভোগী দুটি বিভিন্ন ব্যক্তি। মাছুবের অন্তর্দেশে এই বহু "আমি"-র কোলাহল, নানা বিপরীত বস্তুমূলক ক্রিয়া অবিরাম সম্পাদিত হয়ে চলেছে। কোলাহলটা শোনা এবং বিশৃঙ্খলতাটা দেখা না গেলেও তাদের তুলনার কোন সহরের বড়ো একটা চৌরাস্তার কোলাহল ও বিশৃঙ্খলতাকে তুচ্ছ বলা যায়। প্রত্যেক সাধারণ মাছুবের মনে সতাপূর্বে অনন্ত কোলাহল, গুরুবিদর্ষ, তেঁতামেটি, বিশৃঙ্খলতা

বর্তমান। সেখানে কেউ কারো কথা শোনে না এবং শাসন সংঘর্ষ ও ভাবাতার নিয়ম মেনে চলেনা।

এই বহুসংখ্যক "আমি"-রা বাহু রচনা করে নিজের চরম মূল প্রকৃত "আমি," অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানকে আড়াল করে রেখেছে। যে উঠলে আমরা সূর্যকে দেখতে পাইনা, বলি যে সূর্য মেঘে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য মেঘের দ্বারা আবৃত হয় না, আমাদের দৃষ্টি আবৃত হয়। তেমনি নানা আমির আবরণের কারণে আমরা বিবেক বা চৈতন্যে সজে যুক্ত হতে পারিনে। কিন্তু আমাদের অন্তর্দর্শনে বিবেক সর্বদা স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। বহুসংখ্যক "আমি-র" সহিত চৈতন্যকে একাকার বলে মনে হয় বলেই আমরা প্রত্যেকে বলি যে একটিমাত্র এই "আমি" আমার সকল কাজের কর্তা। সাধারণ মানুষ আকস্মিকভাবে কালেভদ্রে, যেমন কোন সঙ্কটের সময়ে, চৈতন্যের সহিত যুক্ত হয় কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই চৈতন্যের ভূমি থেকে সরেও আসে। নিরন্তর সাধনার দ্বারা এই বহুসংখ্যক মিথ্যা "আমি"দের মন থেকে বিতাড়িত না করলে এই বিবেকের দাক্ষ্য পেতে ও তাতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারেনা। বিবেকসাধনা কখনো নিষ্ফল হয়না। বিবেকের পানে যেতে যেতে জ্ঞানদীপ্তি হাত থাকে। নিত্য এবং গভীর আত্মপর্যবেক্ষণের দ্বারা মনের এই বিশৃঙ্খল অবস্থাটির উপলব্ধি করা যায়, আর কোন উপায় করা যায়না।

চেতনার চারটি ভূমি: নিজা, জাগ্রত-নিজা, আত্মচেতনা এবং পরচেতনা। শেষেরটি যে কি তা আমরা জানি না, অতএব তার কথা কিছু বলাও যায় না। নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমরা আত্মচেতনার যুক্ত হতে পারি। সেটি মনের উচ্চতর অবস্থার প্রথম সাপিনমাত্র। সাধারণ মানুষের চেতনার প্রথম দুটি অবস্থার থাকে। জাগরণহীন অবস্থা নিজা। স্বপ্নাবস্থার কথা এখানে বলা যাবস্তর। প্রকৃতপক্ষে মানুষ খুব কম নিজা যায়। আমাদের প্রাচীন মনোবিজ্ঞান মতে চক্রিশ বর্টার মধ্যে মাত্র দুটি বর্টা কাল আমাদের প্রকৃত গভীর নিজা হয়।

যখন আমরা জেগে আছি বলে মনে করি সে অবস্থাটা বস্ততপক্ষে জাগ্রত-নিজা। আমাদের প্রাচীন জ্ঞান দিনমানকে "অবিজ্ঞাতাজি" বলেছেন। অবিজ্ঞা অজ্ঞানতা। অনিত্যকে নিত্য, অন্তরিকে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাসক্তকে আত্মজ্ঞান করা অবিজ্ঞা। সকল দুঃখ রূপের মূল কারণ। লক্ষ্য করতে হবে যে দিনের বেলাটি ছাড়া রাতনার অল্প কোন ভূমিতে অবিজ্ঞার স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া নেই। দিন ময়ক এই অবিজ্ঞা রাজিতে আমরা প্রত্যেকে বশচরী। সে সময়ে আমরা জীবনের অসুখসমস্ত কাজগুলো মোটামুটি খানিকটা বুদ্ধিযুক্ত ভাবেই করি। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মতভেদ, সংঘর্ষ এবং ভেদের নানাবিধ দুঃখ-রূপেরও সৃষ্টি করি। অল্প কোন চেতনার ব্যবহার তা করি না। দিন বলতে এখন অবশ্য সূর্যালোকের বহিষ্টির কালটুকু বোঝার না। বিজ্ঞানের বলে দিন এখন মিত্রিক আলো দিয়ে বহু প্রশস্ত হয়েছে এবং অবিজ্ঞার ব্যবহারকেও তা খট বাড়িয়ে দিয়েছে। দিনের কর্মসাধনেই মানুষের দুঃখের মূলপত্র।

সব মানুষের করনা করবার শক্তি আছে। করনাশক্তিকে মনে রাখা বরকার। সেটি দু রকম: সৃষ্টিকর করনা এবং সাধারণ

করনা। প্রথমটি মহাশক্তি, খুব অল্পসংখ্যক মানুষই সেটাকে লাভ করে। সবগুলি মনের সক্ষমতার অংশগুলিকে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াশীল না হলে সৃষ্টিকর করনার জন্ম হয় না। এ করনার কেবল কবি দার্শনিক চিত্রকর তত্ত্ব ধর্মনেতা প্রভৃতি মহাজনদের অধিকার। সামান্ত মানুষ সাধনা করলেও তার অধিকারী হয় না।

সামান্ত করনা সাধারণ মানুষের একটি বৃত্তি এবং সেটি তার নানা দুঃখ-রূপের আকর। এ করনার অস্তিত্ববিহীন, সর্বৈব মিথ্যা বস্ত সত্য হয়ে দাঁড়ায়। যে বিপদ দুঃখ প্রকৃতপক্ষে ঘটেনি বা ঘটবে না, করনার সেটাকে বর্তমান বলে মনে করে আমরা অনেক যত্নপা ভোগ করি। যাকে আমরা চিনিও না করনার দ্বারা তার ওপর নানা মন্দ গুণ আরোপ করে তাকে ঘেব করি এবং নিজেদের দুঃখ বাড়াই। করনার কারণে আমরা বাড়িয়ে কথা বলি, বহু মিথ্যা কথা কই, বা জানি না তার বিষয়ে জানার ভাণ করি এবং নানা প্রকারে মিথ্যা আচরণ করি। সামান্ত করনার অপগুণের সীমা খুঁজে পাওয়া দুঃকর।

দিনান্তে যদি একবার নিজের সেই দিনটির নানা কর্মের হিসাব-নিকাশ করা যায় তাতে বেশ পরিষ্কার দেখা যাবে যে, মাত্র একটি দিনে আমি কতো দুঃখকর কাজের সৃষ্টি করেছি। এই হিসাব-নিকাশ করাটা বেশ অস্বস্তিকর। তাতে দেখা যায় যে, মূলতঃ আমি নিজেই আমার সকল দুঃখ-রূপের জন্ম দায়ী। এতো যে সুখস্বস্তির কামনা করি তার অল্প মনের একটা ঘণ্টা পরসাত আমি ব্যয় করি না। আরো বেশ বোঝা যায় যে আমার নিজের কাছেই আমি সম্মানের বোণা নই। আত্মজ্ঞান ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ অল্প এ হিসাবনিকাশ অব্যূল্য জিনিষ।

আত্মদর্শনের দ্বারা যায় নিজেকে বিচার করে করে জানবার ও সংবত হবার আগ্রহ হবে তার জেনে রাখা ভালো যে কেবল অনাগত দুঃখকেই নিবারণ করা যায়। যে দুঃখ অতীত হয়ে গেছে তার বিষয়ে কিছু করার নেই — যে দুঃখ বর্তমান তা এখন অতীতে লীন হয়ে যাবে, তার বিষয়েও কিছু করা যায় না। বর্তমানে কালের স্মৃতিটা ক্ষণিকের। অতীত ও বর্তমান দুঃখের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা কেবল অনাগত দুঃখকে নিবারণ করতে পারি।

মানুষের দুটি অবস্থা, একটি প্রকাশিত ও অল্পটি সম্ভাব্য বা অব্যক্ত। প্রথমটি রূপ এবং দ্বিতীয়টি স্বরূপ। উত্তোগী হয়ে সাধনা

ডাঃ বসু

মেমোরি কার্ডিয়েল

জীবন ঝাড়, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

ডাঃ বসু ল্যাবরেটরী লিঃ

কলিকাতা-৯

না করলে অল্প কোন উপায়ে স্বরূপকে লাভ করা যায় না। সংসার সাধারণ মানুষ বহির্ভাগ্যে রূপে বাস করে। রূপের দশায় তার জন্ম এবং সেই দশাতেই অবসান হয়। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ নিজেকে এবং নিজের নিহিত শক্তিকে বিলুপ্ত উপলক্ষি না করে জীবন হতে বিদায় গ্রহণ করে। স্বরূপের স্থিতি তার অন্তর্দেশে। বাইরের রূপের কবাটটি বন্ধ না করে দিলে স্বরূপে বাওয়া যায় না। জীবনে কোন বড়ো কাজ করতে গেলে আমাদের কথায় কথায় রূপের কবাটটি বন্ধ করে দিতে হয়।

* * * * *

বাইরের কবাট দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতে ও তাতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকতে হয়। সে-জীবন নিভৃতের চেয়েও নিভৃত, অস্তরঙ্গতম। তথায় প্রগাঢ়তম মিলন। রূপজীবনের কোন কিছুই সেখানে নিয়ে বাওয়া যায় না। সেখানে কেবল সূনির্ভগ স্বরূপের প্রয়োজন। আমাদের দেশে শয়নমন্দির কথাটা প্রচলিত। বস্ত্রতপস্কে, দাম্পত্য শয়নকক্ষ একমাত্র মন্দিরের সহিত তুলনীয়। কারণ, সে দাম্পত্যমন্দিরে প্রেমদেবতার ঐকান্তিক সেবা, সে-সেবার কাম কামোত্তর পথে ধাবিত হয়। সে-সেবা পবিত্রতম। প্রেমই সেখানে অভিভাবক। সেখানে জগতের পরমতম শিল্প, একটি নূতন মানবের সৃষ্টি; বাবু ছাড়া পিতামাতা সূত্বাশীল হয়েও অমরতা লাভ করে। এই শয়নমন্দিরেই একদা বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষের সৃষ্টি হয়েছিলো এবং এই শয়নমন্দিরেই আগামীকালের মহামানবেরও সৃষ্টি হবে। সেখানে পতি-পত্নীর দ্বৈত জীবনকে অতীত করে অদ্বৈত সত্তার সাধনা। ঠাকুরঘরকে আমরা মন্দির বলি। সেখানে যেতে গেলে আমরা সংসারের যতো অভিমান এবং ঘেব, হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ, লোভ, মোহ সব ত্যাগ করে প্রেমসাধনা করতে যাই। সেখানে নিজের বুক ইষ্টদেবতাকে জাগিয়ে তাঁর সহিত একটি প্রগাঢ় আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাই। সেখানেও অদ্বৈতরূপের সাধনা করি। মানুষের শুদ্ধস্বের নিবেদন জড়ো হয়ে হয়ে আমাদের বিখ্যাত মন্দিরগুলি মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। শুদ্ধস্বের নিবেদন ছিন্ন কোন মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। শুদ্ধস্বের নৈবেদ্য না নিয়ে ঠাকুরঘরে বাওয়া বুধাই বাওয়া।

তেমনি শয়নমন্দিরেও শুদ্ধস্বের নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সব কয়টি মনের সম্বন্ধ জাগ্রত ও একাগ্র না হলে ভালোবাসা হয় না। কোন অভিমান, বিকৃত চিন্তাবৃত্তি, বাইরে থেকে অর্জন করা পারসোনারিটি বা কোন অভিমানজনক উপাধির শয়ন-মন্দিরে কোনই স্থান নেই। সেখানে কেবলমাত্র সৎ স্বরূপ স্থান আছে।

"সাগর বেদন জাগার ধ্বনি,
খোঁজে নিজের রতনমণি।"

শয়নমন্দিরে সৎকে জাগিয়ে কেবল নিজের রতনমণিকে খোঁজা। ভালোবাসা, করুণা, দান্দ্যিত্য, পবিত্রতা, সত্য, সেবা সে রতন। শয়নমন্দিরেই সে সকলের আকর। নারীর মতো পুরুষ কখনো

ভালোবাসার দীপ্তিকে নিজের দেহ-মন আত্মায় বহন করতে পারে না। এ রতনের অলঙ্কার নারীই কেবল অবলীলায় পরতে পারে। ঐ গানটির শেষ কলি, 'নাম ধরে তোর বাজায় বাঁশি কোন অজানা জন।' এ প্রেমজীবনে শুধু সেই অজানা জনের বাঁশি শোনা, সংসারের আর কিছু শোনবার যোগ্য নয়।

বলেছি যে সাধারণ মানুষের সম্বন্ধ শিশুশুলভ, কারণ সেটা শৈশবে অধিষ্ঠিত। হোক তা শিশুশুলভ। শয়নমন্দিরে পতিপত্নীর সেই শিশুশুলভ ক্ষুদ্র সম্বন্ধ ভালোবাসার রসসিকনে প্রতিক্রম সমতুল্য হয়ে বৃদ্ধি পায়। সেই বর্ধমান সম্বন্ধ দাম্পত্যকে সংসারের নানা দুঃখ থেকে রক্ষা করতে পারে, তাদের আনন্দে অধিষ্ঠিত করে রাখতে সক্ষম।

দাম্পত্য কোন দৃশ্যে বাইরের মানুষের পরামর্শ নেওয়া যৌরতম বিপদের কথা। নিভৃত শয়নকক্ষে যেমন বাইরের কাউকে কেউ ডেকে নিয়ে যায় না, তেমনি অপরের বুদ্ধিকেও সে নিভৃত জীবনে তিলমাত্র স্থান দিতে নেই। কারণ প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ নিজের জীবন নিয়ে কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর। তার জীবনের অমুবাগসঙ্গাত পীড়ার অবধি নেই। তাই কারো ওপর নির্ভর করতে নেই, অপর কারো জীবনের অমুকরণ করাও বিপজ্জনক। নিজের দৃশ্য নিজেরাই নির্মূল করা যায়। কৃষ্ণচিন্তায় রঞ্জের, অর্থাৎ দুঃখের অভিভাবক সম্বন্ধ অধিভূত। বুঝতে হবে যে দাম্পত্য ওপরে একটি অদ্বৈত, উচ্চতর তৃতীয় সদা প্রস্তুত অবস্থায় থাকে, সেটি শুদ্ধস্ব। প্রত্যেক দৃশ্যবৃত্ত বাক্যে ও অবস্থায় এ শুদ্ধস্বটি আছে। ভালো-মন্দ শুদ্ধস্ব মহত্তর ভালো। এক পা এগিয়ে তাতে গিয়ে পড়লেই তৎকরণে দৃশ্য তিরোহিত হয়। যে-কোন মানুষ নিম্নত অভ্যাসের দ্বারা প্রত্যেক দৃশ্যের ও সংশয়ের অবস্থায় এ কাজটি করতে পারে। মনই শুদ্ধস্বটির ইঙ্গিত জানিয়ে দেয়। তার কলে তখনই শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়। শান্তি সেই অবস্থা যাতে চঞ্চল বা কিন্তু কোন বৃত্তি অতীত বা লীন হয়ে গিয়েছে। পতিপত্নীর এটি নিরন্তর হাতে-কলমে করবার জিনিষ। তার শুভকর প্রমাণটি প্রত্যক্ষ।

যে ইন্দ্রিয়টি ভয়, অর্থাৎ কর্মে প্রিয় ও জ্ঞানে প্রিয়ের কাজ করে তার নাম জিত। ইন্দ্রিয় সকলের সর্বার্থতা আছে, সকল বৃত্তিতে তারা যুক্ত হয়। কিন্তু জিতের মতো সর্বার্থতা আর কোন ইন্দ্রিয়ের নেই; তার চেয়ে দুর্বল ও দুর্দান্ত আর কেউ নয়। বিবাহে এই ভয়ঙ্কর ইন্দ্রিয়কে বড়া শাসনে রাখতে হয়। জিত বাক্য দিয়ে শুধু বাচালতা করে না, তার নীরব বাচালতাও বিস্ময়কর। বিবাহিত জীবনে জিতের একমাত্র কাজ বর্ধা হিতভাবণ ও লোভ সম্বরণ করা। মাঝে মাঝে নীরবতার অভ্যাসের দ্বারা তাকে শান্ত করে রাখতে হয়।

কল্যাণীর সংসার-সাগরে পাড়ি দেবার তরীটি অতিশয় ক্ষুদ্র। তাতে স্বরূপজ্ঞান ছাড়া রূপজগত থেকে কোন কিছুকে পাথের বলে জড়ো করা যায় না। সংসারের সকল মলিনবৃত্তিকে সে অমুকরণ বলে—

"ঠাই নাই, ঠাই নাই, ছোট এ তরী,
আমার সোনার ধানে গিরাহে তরী।"



বিজ্ঞানভিক্ষু

সাত

কালু সেন—এডিসন

"The trouble with facts seems to be, that if one treats them out of relation to life, they become lies."

—Tames Branch Cabell

পূর্বের দিন ভোরবেলায় শংকর একটা ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে গেলো হবিবুল্লাহ ল্যাবরেটরীর উদ্দেশ্যে।

সেখানে পৌঁছে দেখে যে একেসর শিকদার সকলের আগেই গাড়ির হয়েছেন। প্রতিটি যন্ত্রের ওয় ওয় করে পরীক্ষা করে চলেছেন—অণুবীক্ষণের দৃষ্টিতে। রসায়নগারে প্রতি বোতলটি একে একে খুলে পরীক্ষা করে যাচ্ছেন। হাতে একখানা মোটা নোটবই—প্রতিটি 'আইটেম' তাতে লিপিবদ্ধ করে চলেছেন—নিজের মন্তব্য যোগ করে। মাঝে মাঝে পকেট থেকে গল্পের কিতা বের করে ল্যাবরেটরীর উপকরণের আয়তন—সেওয়াল বা টেবুলের একধার থেকে যন্ত্রপাতিগুলোর দূরত্বের মাপ করে চলেছেন। উঁকি দিয়ে শংকর দেখে যে নোটবই-এর পাতায় ঘরের একটা নক্সা তৈরী করেছেন ভয়লোক।

সপ্রশংসদৃষ্টিতে শংকর শিকদারের কর্মপ্রণালী লক্ষ্য করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। এতো মনোযোগ দিয়ে বৃহৎ পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত যে শংকরের উপস্থিতি তাঁর লক্ষ্যেই পড়লো না।

শংকর চলে গেলো লাইব্রেরীর দিকে। সহকর্মীদের সাড়া পাওয়া গেল। একটা লম্বা বোঝাই করে সকলেই এসে গেছে।

* * * *

বেলা বিপ্রহর অবধি লাইব্রেরীতে কাটিয়ে শংকর যখন আস্তানার ফিরলো, তখন মাত্র আটাত্তানখানা বই-এর পাতা ওলটানো শেষ হয়েছে। হিসেব করে দেখলো যে, এই হারে পর্যবেক্ষণ চালালে শুধু হবিবুল্লাহ লাইব্রেরীটা শেষ করতেই বছর দুবে হবে। কাজটা বারো জনের মধ্যে ভাগ করে নিলেও কমপক্ষে এক মাস লাগবার কথা।

শংকরের মনটা মমে যায়।

আহারাদির পর একটু দিবানিজার বৃথা চেষ্টা! সর্বক্ষণ মনের মধ্যে রয়েছে একটা অস্বস্তি। 'অ্যাণ্টিগ্রাভিটি'র সমস্ত একরশ মন্তোর মতোই কোথায় জট পাকিয়ে গেছে—সে মন্তোর গোড়াও পাওয়া যাচ্ছে না—শেষও পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ এলোমেলো চিন্তার পর শংকর স্থির করল, এবার থেকে সুসংগত শৃংখলার সঙ্গে কটিন করে কাজ আরম্ভ করতে হবে—শিকদার যেমন ভাবে শুরু করেছেন। তা না হলে এ সমস্তা সমাধানের কোনো আশাই নেই।

কাগজের প্যাড আর কলম নিয়ে বসলো শংকর। লিখলো—
আইটেম—১।

হবিবুল্লাহ আবিষ্কার কি—

(ক) বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা যায়, না—

(খ) তথাকথিত মেটাকিজিঞ্জের পর্যায়ে পড়ে?

শংকর ভাবতে শুরু করে।

সুধীজন-সমর্থিত বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলোর মধ্যে যদি হবিবুল্লাহ আবিষ্কারের ভিত্তিটা গড়ে উঠে থাকে—তবেই এ সমস্তা সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। আর যদি যোগবল বা কালো ম্যাজিকই একমাত্র ভিত্তি হয়, তাহলে সাধারণভাবে অ্যাণ্টিগ্রাভিটির সন্ধান মিলবে না।

অন্তত তার দ্বারা সম্ভব হবে না, এ বহুস্তর মূলোদ্ঘাটন।

ধরে নেওয়া যাক ১ (ক)। বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত বিজ্ঞানের তথ্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে হবিবুল্লাহ যন্ত্রের সন্ধান। ডাকিনীবস্ত্রের সংগে এ সমস্তার যোগাযোগ নেই।

সংগত কারণও রয়েছে এ বকম মনে করারও একটা প্রকাণ্ড অতি আধুনিক ল্যাবরেটরীর প্রয়োজন হয়েছিল হবিবুল্লাহ—তাই নয় কি?

হঠযোগীর কোনো উপকরণের প্রয়োজন হবে কেন?

শংকর লিখে গেল—

১ (ক)—সমর্থনে (১) হবিবুল্লাহ বিঘাট পবেষণাগার (২) বিজ্ঞানে তার অসাধারণ জ্ঞান (৩) প্রত্যাগারে বই।

১ (খ)—সমর্থনে—(১) হবিবুল্লাহ প্রত্যাগারে মেটাকিজিঞ্জের বই-এর প্রাচুর্য (২) স্বয়ীকেশ যোগাযোগে তার হঠযোগ-শিক্ষা (৩) সারা দুনিয়ার তার হঠযোগী পর্যটনের বহুস্ত।

প্রোবিলিটি বা সম্ভাবনা ১ (ক)—১ (খ)।

কিছুক্ষণ ভেবে শেষ অনুচ্ছেদের পরে শংকর যোগ করে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন। তারপর লিখে চলে—

আইটেম—২

আ্যাটিপ্রাক্তিটির প্রেরণা বা আইডিয়া হবিবুল্লাহ পেলো কোথা থেকে ?

এই পর্বত্ব এসে আবার কলম ধামাতে হয়। সমস্যাটিকে আরো একটু তেড়ে নেওয়ার প্রয়োজন। শংকর লেখে—

উত্তর আপাততঃ অজ্ঞাত।

আইটেম ৩।

আইডিয়া মানুষের আসে কোথা থেকে ?

শংকর আবার ধামে। দেখা যাক বিশ্লেষণ করে বড়ো বড়ো আবিষ্কারের ইতিহাস।

আর্কিমিডিসের জ্ঞানের জল বাথটাবে ভরা ছিল জল। তার মধ্যে প্রবেশ করলেই খানিকটা জল উপচে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহভারও গেল কমে। আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণের পন্থা হোলো আবিষ্কার। লোকলজ্জা তুলে কিন্তু আর্কিমিডিস রাজপথে ছুটে বেড়িয়ে গেলেন আনন্দের আতিশয্যে—

ইউরীকা ! পেয়ে গেছি সমস্যার সমাধান !

নিউটন। নিউটন বসেছিলেন বাগানের বেঞ্চে। চোখের সামনে খসে পড়ল বৃষ্টিচ্যুত এক আপেল-ফল। তার মধ্যে নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন মহাকর্ষের স্বরূপ ! নিউটন, গ্যালিলিওর আগেও তো জন্মেছিলেন বহু মনীষী—বিরাট প্রতিভা নিয়ে। তারাও নিশ্চয়ই জানতেন গাছ থেকে আপেল পড়ার কথা। কিন্তু তার তাৎপর্য কেন ঘরা পড়ল না তাঁদের মনশ্চকুতে ?

তারতের সেরা বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রমণের কথা মনে পড়ে। কিংবদন্তী আছে, ইউরোপ প্রবাসের পর রমণ দেশে প্রত্যাবর্তন করছিলেন জাহাজে। জাহাজ চলছিল ভূমধ্যসাগরের জল কেটে। হঠাৎ রমণের মনে হোলো যেন ভূমধ্যসাগরের জল অস্ত্রাজ সাগরের চেয়ে বেশীমাত্রায় নীল। তা থেকে আবিষ্কৃত হোলো যুগান্তকারী 'রমণ এক্কেট' পদার্থ থেকে আলোক বিচ্ছরণের অভিনব ব্যাখ্যা।

পেনিসিলিন। আলেকজান্দার ফ্লেমিং-এর গবেষণাগারে। পূর্ব সৃষ্টিকারী বীজপুত্র প্রেটে হল সংক্রমণ আর এক বীজপুত্র কাংগাস এর ব্যাপাংটা ঘটেছিল হয়তো বা কারো অনবধানতা বলেই। ফ্লেমিং লক্ষ্য করলেন যে অনাহৃত কাংগাসের চারিদিকে পূর্বের বীজপুত্র দল মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘনিষ্ঠে এলো আ্যাটিপ্রাক্তিক কেমোথেরাপি'র নূতন যুগ। ফ্লেমিং এর আগেও কি ঘটেনি এমন ঘৃষ্টিনা ? বীজপুত্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধী স্বভাব অহিনকুলের সম্পর্ক তো জানা ছিল মানুষের চরিত্র বহুর ধরে। কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রে সেটাকে কাজে লাগাবার প্রেরণা একমাত্র ফ্লেমিং-এর কল্পনার এলো কী করে ?

সব আবিষ্কারই কি এই রকম ?

জ্ঞান জ্ঞে নয়।

অনেক বড়ো বড়ো আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে বৈজ্ঞানিকদের একাঙ্গ সাধনার। সেগুলোর মধ্যে দৈবের কোনো সংযোগ তো দেখা যায় না ?

আইনষ্টাইন যখন ১৯০৫ সালে প্রথম প্রকাশ করলেন পদার্থের সংগে শক্তির সমতার ইকোরেশন, নীলস বোর যখন পরমাণুর গঠন জগত সমক্ষে ধরে দিলেন তখন থেকেই তো পদার্থবিজ্ঞানীর নানা চেষ্টা চলেছে অ্যাটম তেড়ে শক্তি তৈরী করার। বহু মানুষের সম্মিলিত চেষ্টায়, আপ্রাণ সাধনার সম্ভব হয়েছে আণবিক মারণাস্ত্র ; আইনষ্টাইনের যোগ্যতার চরিত্র বহুর ধরে। এর মধ্যে তো অভাবনী বরাত জোরের প্রশ্ন ওঠে না।

হয়তো বা সব আবিষ্কারের মূলেই ছিল এই কঠোর তপস্বী।

বৈজ্ঞানিকদের জীবনীকার হয়তো আবিষ্কারগুলোর বর্ণনা করেছেন নাটকীয় অত্যাঙ্গির মধ্যে। হয়তো বা দৈবঘটনা বা বরাত জোরকে আমরা মাত্ৰাত্মিক মর্ষণা দিয়ে এসেছি। অনেক সময়ে বিজ্ঞানসাধকেরা নিজেরাই দায়ী আবিষ্কারের নাটকীয় প্রকাশের ভক্ত—

আমি মধ্যাহ্নভোজনের সময় হঠাৎ মনে হোলো এ পরীক্ষাটা করলে কেমন হয় ?

স্বপ্নে পেলাম এই পদ্ধতি।

একটা গঙ্গা কড়িংকে দেখে আইডিয়া পেলাম নতুন ধরণের উড়োজাহাজের।

বিজ্ঞানসাধকের অভিজ্ঞাণে অনেক সময়ই উল্লেখ পাওয়া যায় না এ কথা যে কী কঠোর পরিশ্রম তাঁদের করতে হয়েছে বড়ো বড়ো যুগান্তকারী আবিষ্কার সফল করার জন্য।

আর্কিমিডিস, নিউটন, রমণ বা ফ্লেমিং-এর আবিষ্কারের পেছনেও ছিল না কি এই একান্ত আত্মনিয়োগ ?

আর একটা কথা।

এঁরা জীবনে সফল হয়েছিলেন। যুগ জনসাধারণ তাই তাঁদের নিয়ে কাহিনী রচনা করে। বীরা সফল হলেন না তাঁদের নাম থাকে না মানুষের স্বরণে। হয়তো বা বড়জোর বিজ্ঞানের ইতিহাসের জরাজীর্ণ অবস্জাত পাতায় পাদটীকায় এঁদের উল্লেখ থেকে যায়।

টমাস্ এলভা এডিসন বড়ো হয়েছিলেন। তাই শিশুপাঠ্য কাহিনীতে অমর হয়ে রয়েছে এ-ঘটনা যে এডিসন তাঁর লাবরেটরী গড়ে তুলেছিলেন একটা পরিত্যক্ত মালগাড়ীর মধ্যে। একদিন হঠাৎ আগুন ধরে যায় মালগাড়ীর মধ্যে এডিসনের অনবধানতায়। কর্তৃপক্ষ এডিসনকে অপমান করে বহিষ্কার করে দিলেন।

কালীপুঞ্জার সময় নূতন ধরণের বোমা তৈরী করতে গিয়ে শংকরের গ্রামের কালু সেনের হাতের 'হুটো' আঙুল খোঁওয়া যায়। গ্রামের লোক সে ঘটনার উল্লেখ করতো নিবৃদ্ধিতার একটা চরম ঘৃষ্টি হিঁসাবে। কালু সেন বড়ো হতে পারে নি। কিন্তু টমাস্ এলভা এডিসনের সংগে কালু সেনের সত্যিকারের পার্শ্বক্য কোথায় ?

পাঁচজনের কাছে কেউ যদি আফালন পুক করে মহাকর্ষের শক্তিকে বৃদ্ধান্ত দেখিয়ে আমি শূন্ডে উড়ে যেতে পারি—সকলেই বলবে পাগল, ভগ্ন, প্রতারক ! কিন্তু সত্যই যদি কেউ এ ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারে ? তখন মহাপুংকব, জিনিয়াস বলে সকলেই ছুটে আসবে পাঠার্থ দিতে।

শংকরের কানে ভেসে এল, হবিবুল্লাহ আবিষ্কার সম্বন্ধে কুসুমামীর যোগ্য সেদিনকার সম্ভার বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর অবিদ্যাস অবস্জা যেখানে হাতধরি।

যাঁদের রুচি আছে..

সেই সব মহাআমাদের প্রতি আমার এই ছোট ডাইরীটি উৎসর্গিত হলো। কে আমি প্রশ্ন নয়...তবে আজ আমি তাঁদেরই একজন ষাঁরা স্বপ্নে-জাগরণে কেবলই ভাবেন আলু কফির ডালনার কথা, মটর ডালের কথা, ইলিশ মাছ, রুইয়ের মাথা, মুরগী মাংস আর পায়ের রসগোল্লার কথা। ভাবছেন পেটুক আমি? মোটেই নয়।

কয়েদী মাত্র। কয়েদখানায় আটক নই। আটক আমি হাসপাতালে। জেলা হাসপাতালের কোন এক অজানা বেড থেকে লিখছি। আমার পরিচয় দিয়ে কি প্রয়োজন? শুধু শুনে রাখুন পেটের রোগের সাজায় এখানে আমি বন্দী। ভাল মন্দের আশ্বাদ আমি পাই না। রুচি আছে, তবু ইচ্ছে মতো খাবার আমায় দেওয়া হয় না...এইতো আমার বড় সাজা। ...না, খেতে আমাকে এরা দেয় বৈকি। ডাবের জল, ছানা আর ঘোল...মাঝে মাঝে লবণ ছাড়া মুরগী সুপেরও স্বাদ পাই...স্বাদ পাই দুবেলা সেণ্ডিগ্রেড ধার্মিটারের। কোন এক অজানা দিনের আশায় আছি। যেদিন নির্ভর ডাক্তার বলবে তুমি সুস্থ, তুমি মুক্ত, আজ থেকে খুশী মতো, ইচ্ছে মতো তুমি খেতে পারো। সেদিনের স্বপ্নে বিভোর আমি...

১লা আগস্ট

ঐতো পাশের বেডের ছেলেরা কি যেন গিলছে। মুরগী মাংস! আহা কতদিন খায়নি। আমাদের বাড়ীর সবাই মুরগী খায়। কেবল হেবলুটা খায় না। ছোট ভাই, ওকে কত বলেছি

ওরে খারে খা। মুরগীর মতো মাংস হয় না, তবুও খেতো না।...

৬ই আগস্ট

হাসপাতালে আজ তেরো দিন হলো। মা, হেবলু রোজকার মতো আজ বিকেলেও এসেছে। তবে সঙ্গে খাবার কিছু আনেনি। পাশের বেডের ছেলেরা ইঁ করে তাকিয়ে আছে আমাদেরই দিকে। কেন জানি না ছেলেরা আমাকে কিছুতেই সহ করতে পারি না। হাংলার মতো তাকানোটা অবশ্য ওর স্বভাব, আমাদের নার্সটার দিকেও ও অমন করেই তাকায়। সে যাক্গে। ও কে দেখে আমার ঈর্ষ্যা হয়। পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে আছে। অথচ দু'বেলা মুরগী, মাংস ঠিক গিলছে। আমিও তো ওর মতোই রুগী। অথচ আমাকে ইচ্ছে মতো কিছুতেই খেতে দেওয়া হয় না।...

১৬ই আগস্ট

আজ আমাকে যারা দেখতে এসেছে, তাদের ভেতর একজন হচ্ছে নবাগতা। আমাদের হেবলুর বোঁ। হাসপাতালে পড়ে আছি এরই মধ্যে হেবলুর বিয়ে হয়েছে। কিরণ চাকরী নিয়ে দিল্লী গেছে। নতুন মাষ্টার মশাই এসেছেন। আরও কত কি! অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হেবলুটা বরাবরই বিয়ের বিপক্ষে ছিল। আমি ভাবছিলাম শেষটায় কেলেকারী না হয়। মা'র মুখে শুনলাম না, হেবলুটা ভাল ছেলের মতো সব কিছু মেনে নিয়েছে।...

১৮ই আগস্ট

আজও মা'র সাথে বোঁ-মা এসেছে।

মালতীর (আমার স্ত্রী) মুখে কিন্তু একটা মজার কথা শুনলাম। হেবলুটা মুরগী খায় না। কিন্তু কাল নাকি বোঁ-মা'র হাতের রান্না কেলতে পারেনি। বোঁ-মা ওকে শুধু চাকতে দিয়েছিল। এক বাটি মাংসের সবটুকু খেয়েছে। বাহবা! বোঁ-মা'র রান্নার তবে বাহাদুরী আছে। 'আচ্ছা বোঁ-মা, কি এমন যাহু দিয়ে রাঁধলে যে হেবলুও মুরগী খেলো?'

'যাহু দিয়ে নয়, 'ডাল্‌ডা' দিয়ে।'

'ডাল্‌ডা দিয়ে? 'ডাল্‌ডায়' খাবারের এত ভাল স্বাদ হয়?' 'হ্যাঁ, 'ডাল্‌ডা'র নিজস্ব কোন স্বাদ বা গন্ধ নেই। তবে খাবারের আগল স্বাদটি কুটিয়ে তুলতে এর জুড়ী হয় না।' 'তাই নাকি? কিন্তু এর কি কোন উপকার আছে?' 'আছে বৈকি। প্রতি আউন্স 'ডাল্‌ডা'তেই ৭০০ ইন্টার গ্রাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' ৫৬ ইন্টার গ্রাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'ডি' মেশানো হয়।'

'ভাল, ভাল, খাটি জিনিবে রাঁধাতেও আনন্দ আছে। তা বোঁ-মা আজ একটু বেশী করে 'ডাল্‌ডা' আনিয়ে রেখে। আমি আবার দুদিন পর বাড়ী ফিরছি কিনা। দেখা যাক তোমার 'ডাল্‌ডা'র রান্না কেমন হয়।'

'হবে গো হবে। আগে বাড়ীতে তো এসো।' —মালতী সাহসনা দিল।...সবাই চলে গেল। একটা মাত্র দিন। তারপর আমিও বোঁ-মা'র হাতের রান্না খাবো।...হাসপাতাল ডাইরীর এইখানেই শেষ। আর নয় ...

আজ আর হাসি আসে না কেন ?

সেদিনকার 'প্যারালইয়া'র উদ্ভব আজকের 'জীনিয়াস'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

পাগলে আর জীনিয়াসে তফাৎ কতটুকু ?

অ্যাপ্টিগ্রাভিটি কি তাহলে সত্য ?

কোনটা সত্য ? কোনটাই বা অসত্য ? 'রুজিষ্টন' কি সত্য ? কোনোদিন কি ছিল তা সত্য ? প্রাক-ইলেক্ট্রন যুগের ডালটনের সেই অবিভাজ্য-পরমাণু কি ছিল সত্য ?

কাল বা সত্য ছিল—আজ তা মিথ্যা হয়ে গেল কী করে ? একটা নূতন 'থিয়োরি'র জন্ম ? সত্য কি তাহলে প্রচলিত 'থিয়োরি'রই নামান্তর ?

একশো বছর আগে রেডিও বা টেলিভিযন ছিল অসম্ভব—কল্পনাতীত। কিন্তু আজ তা সম্ভব হয়েছে। অ্যাপ্টিগ্রাভিটি তাহলে কী ? একটা সত্য-অনাগত ভবিষ্যতের ?

বাই হোক, অ্যাপ্টিগ্রাভিটি আবিষ্কারের মূলে নিশ্চয়ই ছিল হবিবুল্লার আজীবন সাধনা। বীজ বপন করা ছিল তার অন্তরে ; প্রেরণার বারিসিঞ্চনে সে বীজ সহসা হয়েছিল অঙ্কুরিত।

শংকর লিখে বার—

তপশ্চা—আইডিয়া

আইডিয়া + প্রেরণা = আবিষ্কার

কালু সেন—এডিসন

এডিসন = কালু সেন + সাফল্য—

পাগল—জীনিয়াস.....

সত্য—f (প্রচলিত থিয়োরি)

ইত্যাদি।

আট

কাকতালীর জ্ঞান

"We must not forget that what we observe is not nature in itself. But nature as revealed to us by our method of questioning."

—Werner Heisenberg (Physics & Philosophy)

সাক্ষ্য বৈঠক শুরু হয়ে গেছে ডিনারের টেবলে। শংকর লক্ষ্য করে ঘরের এক পাশে একটা বিরাট ব্ল্যাকবোর্ড এনে রাখা হয়েছে।

কুকুম্বামী ঘোষণা করছেন,—

হবিবুল্লার বাড়ী খানাতল্লাসী করে কতকগুলো ছিন্নপত্র পাওয়া গেছে—অনুমান যে এগুলো তার ভায়েরীর অংশ। এ ছাড়া পাওয়া গেছে কতকগুলো অংকের খসড়া, 'গ্রাফ'ও নক্সা। সব কাগজের টুকরোর 'ফটোষ্ট্যাটিক' কপি তৈরী করা হয়েছে। এগুলো আগে কর্মীদের হাতে দেওয়া হয়নি, কারণ, হবিবুল্লার জীবনী আর তার আবিষ্কারের পটভূমিকা সম্বন্ধে সকলকে ওয়াকিবহাল করে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

বহু কষ্টে, অনেক পরিশ্রমের পর বিশেষজ্ঞরা মাত্র এক পৃষ্ঠার একটা বড়ো অংশের সন্নিবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন—হেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো থেকে। বাকী টুকরোগুলো অসংলগ্ন অবস্থায়ই রয়ে

গেছে। আমার আশা—হয়তো বা আপনারা এগুলো থেকে একটা কোনো সুসংগত অর্থ করে নিতে পারবেন।

সমবেত বৈজ্ঞানিকের দল সোৎসাহে মগ্ন হয়ে বার কাগজের টুকরোগুলোর 'ফটো-কপি'র ওপর।

শংকর দেখে প্রথমেই একটা বড়ো অংশ—

১।...কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন জানতেন না যে পরবর্তী মাতৃয়ের চিন্তাধারা তাঁরা কতটা প্রভাবান্বিত করবেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সে যুগের প্রচলিত ধর্মীয়তার প্রাচীর ধংস করলেন। বিজ্ঞানের জন্ম তাঁরা আহরণ করে নিলেন 'মিরাকুল' বা অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা। এঁদের চেষ্টাতেই পদার্থবিজ্ঞান উত্তীর্ণ হয়েছিল অলৌকিক স্বপ্নবিলাসের অনিশ্চয়তা থেকে পরীক্ষাগারের যুক্তিসাপেক্ষ, পরিমাপসাপেক্ষ বিজ্ঞানে। তাঁদের বিরাট প্রতিভার ছায়া বিস্তৃত হল কালান্তরে—ক্রান্ত-বর্ধমান বিজ্ঞান সাধনার জটিল শাখা-প্রশাখায়। তাঁদের সময়কার অনেক 'থিয়োরি' প্রায় বিনা প্রমাণেই গৃহীত হয়ে গেল স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে।

টেক্সট বই থেকে স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা শেখে—Laws of Gravitation আর laws of motion—মহাকর্ষ আর গতির নিয়মাবলী। আজকের দিনে এই মূল নিয়মগুলোর কোনো অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন না শিক্ষকমণ্ডলী বা গ্রন্থকারের দল। অকাটা প্রমাণের প্রশ্ন উঠলে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হয় বিশ্বত্রক্ষেপে গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্যের সংস্থান। নিউটনের গ্রাভিটেশনের নিয়মের সামান্য ক্রটি-বিচ্যুতি ব্যতিক্রম সংশোধিত করা হয় আইনষ্টাইনের 'থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি' আপেক্ষিকতাবাদের পলস্তারায়। ছাত্রের দল সন্তুষ্ট হয়—শিক্ষকমণ্ডলীও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এই ভাবে চলছে শিক্ষা বছরের পর বছর ধরে।

কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক মূল সূত্র কি কাকতালীর জ্ঞানের মতো (আসলে কাকতালীর জ্ঞান একটু আলাদা এই সংজ্ঞা থেকে। কাকের ভরে তাল পড়ল এই ব্যাখ্যাকেই বলা হয় কাকতালীর জ্ঞান।) নয় ? একটা কাক ডেকে উঠল, সংগে সংগে তালও পড়ল গাছ থেকে। অতএব এ ছুটো ঘটনার মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কৃত হোলো। থিয়োরি খাড়া করা গেল, যখন তাল পড়ছে, তখনই কাক ডাকছে মাতৃয়ের গোচরে হোক কি অগোচরে তেমনি, আবার যখনই কাক ডাকছে, জগতের কোথাও না কোথাও তাল পড়ছে। এরকম থিয়োরি প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা বেশ দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় কখনো কখনো। অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ খুশী হয়ে বার—বাক তাহলে তাল পড়া অথবা কাক ডাকার একটা কারণ তো জানা গেল। সত্যই তো প্রকৃতির কি বিচিত্র নিয়ম।

আগেকার দিনে...ভারতের দার্শনিক...

এখানেই বড়ো অংশটার শেষ। অল্প টুকরোগুলো সাজানো রয়েছে এই ভাবে—

২।...পৃথিবীর বড়ো বড়ো চুম্বকীয়তার মূলও আছে... আনলুপট, নানা রকমের গ্রহের সংস্থান...আপেক্ষিক গতি। এরকম ছোটোবড়ো নৈসর্গিক ঘটনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না প্রচলিত থিয়োরিগুলো থেকে। হাজার হাজার বছরের লিপিবদ্ধ ঘটনা

বিজ্ঞানসাক্ষক উড়িয়ে দিলে... কারণ তাঁদের বিয়োরি... অমূলক বলে
শ্রমণ... জানবার উপায় নেই।

৩।... বলে 'লেভিটেশন'। মধ্যপ্রাচ্যে ও সূর্য প্রাচ্যে...
আমেরিকার 'লেভিটেশন'-এর প্রমাণ জনসমক্ষে প্রথম... ইংলণ্ডের
ম্যাথামি... ড্যানিয়েল ডগলাস হোম... আশ্চর্য...

৪।... বিজ্ঞান অবজ্ঞা করে গেছে... কিন্তু কোনও সঠিক সমাধান
... ভারতবর্ষে জড়জগতের ওপর আত্মিকশক্তির জরযাত্রার দিকে...
বিয়োরি অফ রিলেটিভিটি... সন্ধান নেই। এই সমস্ত আবি...।

৫।... স্পেনে জামায়ান জিপসীর দলে দেখেছি—আফ্রিকার
জংলেও এই 'কার্ট'... কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেবারও অধিকার...
চলে যায় না।

৬।... মানসার্টিফিকট প্রিন্সিপল বা প্রিন্সিপল্ অফ ইন্টিগার
মিনেসি সত্যকার—প্রোডিংগার-ক্রিকের টেউয়ের ইকোয়েশন থেকে
যা... রূপ ধরা... প্যারিটিবা ডিসপ্যারিটির প্রথম ওঠে না, কেমনা...।

৭।... কেলনারের মতো গণিতজ্ঞ প্রকাশ করেছেন... মহাকর্ষের
বিপরীত শক্তিটার প্রকাশ হচ্ছে... এমরিকো ফার্মিও এই তুল
করেছিলেন... তলিয়ে ভাবতে গেলে একটা ভূয়ো ভিত্তির ওপরে...।

৮।... কোরডোচারের... ইলেক্ট্রন প্রবাহের কথা আমার মনে
এল... ম্যাট্রিক্স এর ইকোয়েশন থেকে পাওয়া গেল...।

৯।... এই (বিটা) হচ্ছে ডাইমেনশন বিহীন। কাজেই
উত্তরে...।

১০।... স্বতঃসিদ্ধ। মিউনীরীয়াসের চূড়াকশক্তি... প্রোটন-
নিউট্রনের মধ্যে মেননের আদান-প্রদানের যে... হয়ে পড়ার না কি ?
কোন...।

১১। চেয়েনকত বন্ধি আলোকতরঙ্গের গতিবেগ অতিক্রম...
তির্ধক ভাবে চলে যায়। নীহারিকা...।

১২। পাতঞ্জলের সংকে কেমন মিলে যায়... হঠবোগীর শরীরে
এই কীল্ড এর প্রতিক্রিয়া... আশ্রয়...।

১৩। ... অ্যাট্রিগ্রাভিটি যন্ত্রের পরিকল্পনা-করে কেলসাম।

১৪। এই বিরাট প্রোত বিষচরাচরে পরিব্যাপ্ত... প্রাইমারী
পার্টিকুল ও তাদের মধ্যকার... প্রোডিটেশন পোটেনশিয়াল...।

১৫। ... সানস্পটের স্থান পরিবর্তন ও তাহলে এই ভাবে...
এই সরল ব্যাখ্যা কেউ কোনোদিন ভেবে... আসবে না ? আমি
পরীক্ষা সূত্র...।

১৬। কনট্রোল সার্কিটে যোগ করা হল এক... ছোটো একটা
ভেরিয়েবল ট্রান্সফরমার... একটা থার্মিস্টরও সংযোগ করলাম...।

১৮। ঠিক মনোমত... পরীক্ষা করার সুযোগ... আজ আর
হয়ে উঠল না। কাল...।

হতাশ হয়ে শংকর প্রশ্ন করে আর কিছুই কি নেই ?

দান হেসে কৃষ্ণামা বললেন—না। এমন কি আমরা স্থির
করে উঠতে পারি নি যে এগুলো একই সময়ের লেখা কি না।
হাতের লেখা যে হবিবুল্লাহই তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই।
কাগজের টুকরোগুলো প্রায় একই ধরণের অর্থাৎ খুব সস্তবতঃ
একই নোটবই থেকে হেঁড়া। তারিখ কোনো জায়গায় পাওয়া
যায় না। তবে বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে যে গত তিন মাসের
মধ্যেই এগুলো লেখা হয়েছিল।

প্রফেসর শিকদার গভীর ভাবে প্রশ্ন করেন, ডায়েরীর পাঠ
এভাবে নষ্ট করার উদ্দেশ্য কী ?

প্রফেসর কৃষ্ণামা জবাব দেন, কী করে জানব ? হয়তো হবিবুল্লাহ
ইচ্ছা করেই ডায়েরীর পাতাগুলো ছিঁড়ে কেলেলি। ধরে নিই,
সন্দেহ হয়েছিল তার যে তার মেদিনের নকল করা সম্ভব এবং কেউ
হয়তো সে বড়বন্দ করছে।

যায়যায়ে আগুন ধরাবার জন্ত হবিবুল্লাহর পাটিকা সংগ্রহ করতো
হেঁড়া কাগজের টুকরো। তার মধ্যেই এগুলো পাওয়া গিয়েছিল।

শিকদার বলেন, তা নাও হতে পারে হয়তো হবিবুল্লাহ হঠাৎ
জানোশ্রয় হয়েছিল যে তার সমস্ত ধারণাই তুল, অ্যাট্রিগ্রাভিটি
এ ভাবে সম্ভব নয়।

জেবে দেখুন, কাগজপত্র নষ্ট করার এর চেয়ে সংগত কারণ আর
কী থাকতে পারে ?

কৃষ্ণামা বলেন, তাও হতে পারে। এ সত্বকে আপনার আলাদা
বেশন একটা আছে আমারও তেমনি একটা আছে। কী করে বলব
কার আলাদা সত্য, কোন কারণটা সংগত ?

তারপর আলোচনা উঠল ইকোয়েশন আর অংকগুলো নিয়ে।
এ সত্বকেও দেখা গেল সকলে একমত হতে পারলেন না। কোনো
জায়গায় ইকোয়েশনের গোড়াও নেই, শেষও নেই। কতগুলো
অবশ্য কম্পিউটার সংক্রান্ত আর কতগুলো হয়তো বা রিলেটিভিটির
ইকোয়েশন। কতগুলো চিরকুটে কেবল সংখ্যা লেখা মনে হয়
কোনো একটা পরীক্ষার ফলাফল নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর অন্তর
টুকে রাখা হয়েছে। নমুনাগুলোও প্রায়ই সবই কম্পিউটারের
অংশবিশেষের।

সে রাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে প্রথম সপ্তাহে সকলে হবিবুল্লাহর
ল্যাবরেটরীর বস্ত্রগুলো আর লাইব্রেরীর বইগুলোর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণই
কাটাবেন।

প্রফেসর গোপালাচারী আর সুমিত্রা কাজের একটা তালিকা
তৈরী করে সকলের মধ্যে বিলিব্যবস্থা করার কতগুলো প্রস্তাব
করলেন। রাও আর শংকরের ওপর তার পড়ল কম্পিউটারের
তত্ত্বাবধান করার। স্বামীজি আর আলিমচান্দানী দরকার হলে ওদের
সাহায্য করবেন। অমল বন্দো আর আলিমচান্দানীকে মোস্তায়েম
করা হল কতগুলো সূত্র মাপের যন্ত্রের অস্থায়ীকরণ করতে।
বাকী সূত্র বস্ত্রগুলোর পরীক্ষার দায়িত্ব রইল দত্তগুপ্ত আর
সুত্রাহনয়নের ওপরে। বড়ো বড়ো বস্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা
করবেন প্রফেসর শিকদার, আর মিঃ জন। স্বামীজি, কাউল
আর সুমিত্রা লাইব্রেরী ঘরের সমস্ত কাজের ভার নেবেন।

একমাত্র প্রফেসর গোপালাচারীর ওপরেই কোনো বিশেষ কাজের
ভার দেওয়া হল না। সতাপতি হিসাবে তিনি সকলের ধরমাধার
নেবেন, প্রত্যেকের অস্থায়ীকরণের ধারার একটা হিসেব রাখবেন।
কোনো স্থান থেকে আশাজনক কোনো সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেলে
সমগ্র, লম্বিলিত শক্তি কাজে লাগানো হবে সেই সূত্রের অন্বেষণে।

এ ব্যবস্থা মনঃপূত হোলো সকলেরই একমাত্র শিকদার ছাড়া।
প্রফেসর শিকদার এব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করলেন। তিনি
স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে চান, যদি অন্য কেউ তাঁর সংগে যোগ দিতে
চান তাহলে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যথেষ্ট ল্যাবরেটরীতে

ঘুরে বেড়াতে চান, একটা বিশেষ কাজের মধ্যে তাঁকে সীমাবদ্ধ করে রাখাটা তিনি অস্বাভাবিক বলে মনে করেন।

প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী, শংকর আর দলের অল্প জনেকেই শিকদারকে যোঝাবার ব্যর্থতা চেষ্টা করেন যে কারো গতিবিধি সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা এটা নয় যে কোনো সময়ে যে কোনো কর্মী যে কোন বস্তু স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করবেন। ল্যাবরেটরীর বস্তুগুলোকে ভাল করে নেওয়া হচ্ছে কেবল অসুশীলনের সুবিধার জন্য, কারণ সময় সংক্ষেপ। কিন্তু প্রফেসর শিকদারকে তাঁর দৃঢ় মতামত থেকে এতটুকু সরানো গেল না। শেষ পর্যন্ত শিকদারের বদলে স্বামীজিকে দেওয়া হল বড়ো বস্তুপাতির ভার, শিকদার রইলেন স্বাধীন গবেষক হয়ে। এইভাবে কোনো রকমে করা গেল তখনকার মতো সমস্যার সমাধান।

এ ছাড়া শংকরের একটা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল যে একদিন অন্তর সন্ধ্যার সেমিনার বা আলোচনা সভা বসবে আর সেখানে সকলেই আলোচনা করবেন হবিবুল্লাহর বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যেকের ধারণা বা আইডিয়া নিয়ে। দরকার হলে অথবা কারো মনে কোনো পরিকল্পনার উদ্ভব হলে কয়েক ঘণ্টার নোটিশেই অতিরিক্ত বৈঠক ডাকা হবে।

নৈশ বৈঠকের শেষে বারান্দার কতকগুলো আরামকেন্দ্রারি বৌগাড় করে আউটা চলছিল—আমাদের 'প্রজেক্ট-এ'র কর্মীদের। তার মধ্যে কোন এক কীকে কালেশ্বর রাও শংকরকে ডাকল, চলো যান, একটু বেড়িয়ে আসা যাক বাইরে থেকে।

পূর্ণিমার ছু-তিম দিন যাকী। অসম্পূর্ণ চাঁদের আলোর পথ দেখা যায়—কিন্তু দূরের আবছায়া দৃশ্যপটে লেগে থাকে স্বপ্নরাজ্যের মায়া। ব্যারাকের পেছনে একটা বড়ো ময়দান—ওপারে আবার ব্যারাকের সারি—অনেকগুলো জানালা আলোকিত। হিম পড়তে শুরু করেছে—ঘাসের আগায় শিশিরের চিকিমিকি।

নিঃশব্দ কিছুক্ষণ পথ চলার পর রাও বলে, রাই, তোমার সংগে এখনো 'প্রজেক্ট' সম্বন্ধে আলোচনা করার সুবিধা হয়নি। সত্যি করে বলো তো, কী মনে হয় তোমার এই স্তূতুড়ে ব্যাপার সম্পর্কে?

শংকর একটা সিগারেট ধরিয়ে হেসে বাল, ঠিকই বলেছ রাও, এ ব্যাপারের সবটাই স্তূতুড়ে। কখনো কখনো মনে হয় যেন একটা কিসের ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু অনুসন্ধান করতে গেলে সবই আবার মরীচিকার মতোই মিলিয়ে যায়।

রাও বলে, কী জানি, আমি তো কোনো ইংগিতই পাচ্ছি না। বিজ্ঞান-সমর্থিত পন্থায় যদি হবিবুল্লাহ সব পথটাই চলত, তাহলে না হয় যে কোনো নূর একটা ধরে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু ডাকিনীতন্ত্র, পাতঞ্জল, 'লিভিটেশন' আর পরলোক-কী-বাস্তব জটিল অগাধচূড়ির মধ্যে রাস্তা বের করা কী করে?

শংকর বলে, আমার মনেও তো ঘুরছে ওই প্রশ্ন, দিন-রাত। হবিবুল্লাহর জীবনে, তার দর্পনে, তার ভাবধারার খাটি বিজ্ঞান ও আমরা যাকে বলি কুসংস্কার—এ দুয়ের এমন অদ্ভুত সংযোগ কেন? আমার ধারণা কি জানো? এই প্রশ্নের উত্তরেই স্মৃতিয়ে ঘুরছে অ্যাংকিপ্রাতিটির মূল ভাষা। স্মৃত্যায় এই প্রশ্নেরই

মীমাংসা করার প্রয়োজন সবচেয়ে আগে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিনারা মিলছে না।

রাও বলে, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ, রাই? অনেক বৈজ্ঞানিকেরই বিজ্ঞান ছাড়াও একটা করে বাস্তবিক থাকে। যেমন গণিতের অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত অবসর সময়ে চিত্র বিনোদন করেন বিস্তৃত সংগীতের চর্চায়। বাথ-এর কন্ট্রাপুন্টাল হচ্ছে তাঁরা খুঁজে পান বড় বড় গণিতের সমস্যার ছন্দোবদ্ধ সমাধান। ষ্ট্রুভিন্‌স্কী বা বেলা বার্টকের বেশুরো সার্বভৌমিক যচনার মধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করেন আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল্-এর অমিত্রাকর ছন্দ। হবিবুল্লাহর ক্ষেত্রেও অকান্ট হঠযোগ বা প্রেতিনীতন্ত্রের চর্চা একটা বাস্তবিকের মতোই কাঁড়িয়েছিল। হয়তো বা মূল আবিষ্কারের সংগে এ গুলোর সম্পর্ক একেবারেই গৌণ।

শংকর এবার তর্ক শুরু করে, রাও, আমি একথা বলছি না যে তোমার অনুমান সত্য নয়। কিন্তু আমি জাবছি কি জানো? আমাদের বৈজ্ঞানিক মহলে একটা আকাশস্পর্শী আত্মসমীক্ষিত কিছুকাল ধরে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির অনেক লীলা আজ আমরা খিয়োরি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি, তাই আত্মপ্রসাদেরও আর সীমা নেই আমাদের। ভেবে দেখলে, আমাদের আত্মবিভাগটা এমন কিছু অসংগতও নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, যে খিয়োরিগুলো অনেক পরিভ্রমে গড়ে তুলেছি, সেগুলো দিয়ে একশোটার মধ্যে কমপক্ষে নিরানব্বইটি ঘটনার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যে ঘটনার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হোলো না—হয়তো বা একশোটার মধ্যে একটা এ রকম ঘটনা পাওয়া যায়—সেটাকে আমরা মনের দরজার বাইরে থেকেই বিদায় করবার চেষ্টা করি—কারো মতিজংশন হয়েছে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে।

তার পর হয়তো দেখা গেল, আমাদের চেয়েও বড়ো দলের কোনো তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিজ্ঞান-সাধক এইরকম দু-একটা ঘটনার মীমাংসা করে দিলেন আমাদেরই জানা বিজ্ঞানের মূলসূত্র থেকে। তখন আর আমাদের পায় কে!

হবিবুল্লাহর ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা থেকে একটা থেকে একটা কথা আমার মনে লেগেছে। আমাদের অনেক ব্যাখ্যাই কি কাকতালীয় ন্যায়ের মতো নয়?

ভেবে দেখো রাও, মাত্র বাট সত্তর বছর আগেও পদার্থবিজ্ঞানী আর রাসায়নিকদের কী আত্মপ্রসাদই না ছিল! পিরিয়ডিক টেবল এর সমস্ত মৌলিক পদার্থের স্বরূপ তাঁরা জানতেন। সে টেবল-এর মধ্যে যে কীকগুলো ছিল সে সম্বন্ধেও তাঁরা ভবিষ্যৎবাণী করতেন, যে যদি কোনো নূতন মৌলিক পদার্থ মেলে ওই কীক ভরাবার জন্য তবে সে সমস্ত এলিমেন্ট-এর থাকবে এই গুণ, আপেক্ষিক গুরুত্ব হবে এতো, আর তার কম্পাউণ্ডগুলোও হবে এই রকমের। দেখা যেতো তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। সেদিনের বৈজ্ঞানিকেরা তাই মনে করতেন যে পদার্থের স্বরূপ প্রাতিটির স্বরূপ বিদ্যাতের স্বরূপ বা চূষকের স্বরূপ সম্বন্ধে আবিষ্কার করার মতো তথ্য প্রায় সব নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কেবলমাত্র মাপজোপের কয়েকটি স্থানতর বস্তু তৈরী করা ছাড়া আর করার মতো কিছুই নেই।

এঁদের এ আত্মবিভাসের ধর্ম কিন্তু মিলিয়ে গেল মাত্র কয়েক

বহুরের মধ্যে। ইলেকট্রন বিদ্যুৎকণার আবিষ্কার হোলো। এলো ক্রুকস রশ্মি, রজনরশ্মি। কুরী-দাম্পতি প্রাণহীন পাথরের মধ্যে থেকে বের করে আনলেন অতি তেজস্ক্রিয় মৌলিকপদার্থের সমষ্টি। পদার্থের ক্ষয় নেই এত বড়ো ভিত্তিটা চোখের নিম্নে ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। গেলো ক্লাসিক্যাল মেকানিকস আর নিউটনের ইখার।

খিয়োবির জগত্বপের মধ্যে নতুন করে আবার গড়ার কাজ শুরু হল প্রায় উনিশশো সাল থেকেই। পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হোলো অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন নামে এক ভূঁইকোড় পেটেন্ট অফিসের কেরাণীর রিলেটিভিটি সম্পর্কে এক অবিখ্যাত প্রবন্ধ। আইনষ্টাইন বললেন—জগতে সবই যারা সবই আপেক্ষিক; বস্তু আর শক্তি একই বিনিময়ের ভিন্নরূপ একমাত্র শাখত হচ্ছে মহাপ্রান্তে আলোকতরঙ্গের অপরিবর্তন গতিবেগ। তুমি যতো বেগে চলো না কেন, আলোকতরঙ্গের আপেক্ষিক গতিবেগের তারতম্য হবে না সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইলের অং থেকে।

তারপর উনিশো আট সালে বোহর রাদারফোর্ড পরমাণুর মডেল জগত সমক্ষে তুলে ধরলেন তার ক্রমবিবর্তন হোলো শ্রোডিংগারের ইকোয়েশনে—যে কোনো চলমান পদার্থের বহন করা যার তরঙ্গরূপে। এলো হাইসেনবার্গের অনসার্টেন্টি প্রিন্সিপল্ যাতে বলা হোলো যে কোনো চলমান কণার প্রকৃত রূপ, অবস্থান আর গতিবেগ এক সংগে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় না।

আজ আমরা কী অবস্থায় পৌঁছেছি ভেবে দেখেছ রাও? 'প্রাইমারী পার্টিকুল' পরমাণুকণার সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

কালকে ভসেছি তা ছিল চকিখ আজকে তুমি বক্রিখ। আবার একটা 'পিরিয়ডিক্‌টেবল' আমাদের গড়ে তুলতে হবে (একটা ছোটো চলেছে এসবছে—ব্রটব্য J. W. Grebe. "A Period Table for Primary Particles"—Annals of New York Academy of Sciences. 1958) সেগুলোকে সংযুক্ত বা তালিকাভুক্ত করতে। আর তোমার সেই আটমের মডেল আজ কোথায় গেল? আজ পরমাণুর মধ্যে চুকেছে 'অনসার্টেন্টি', 'ইন্ডিটারমিনেসি', 'রিলেটিভিটি' আর 'কোর্থ ডাইমেনশন'। কেমন করে সে পরমাণুকে চর্মচক্ষুর সামনে তুলে ধরবে? তার গুণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রূপই গেছে হারিয়ে।

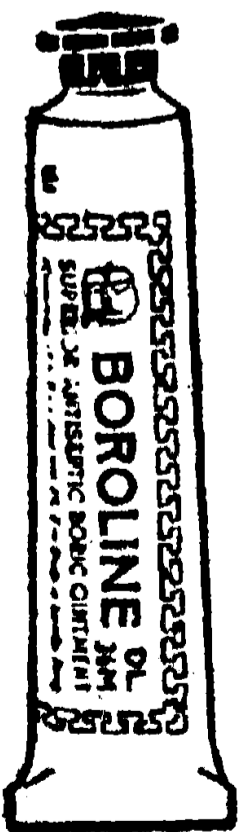
স্বাক্ষানের এ ডামাডোলের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত 'প্যারিটি' বা সমতার নিয়ম গেছে হারিয়ে। টাউ মেনসন আর 'খিটা মেনসন' একই রকমের পার্টিকুল—কোনো তরঙ্গত মেই তাদের ব্যবহারে। কিন্তু একটা থেকে ভেঙে ছুটো রূপা বেরিয়ে আসছে আর একটা থেকে তিনটে।

কে জানে, ভবিষ্যতের কোনো আইনষ্টাইন আমাদের দেখাবেন কিনা বিশ্বজ্ঞানোর আর একটা নতুনস্তর রূপ? বলবেন—সব খটা হার—

রাও অসহিষ্ণু হয়ে শংকরের বক্তৃতার তোড়ে বাধা দিয়ে বলে, ধামো রায়, মেনে নিচ্ছি তোমার সব কথা। মেনে নিচ্ছি যে আমরা অনেক ভুলই করেছি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথটা সরল অথবা লুগম কোনোদিনই ছিল না, আজও নেই। কিন্তু সেই ভুলগুলোর

গ্রীষ্ম দিনে-ও স্নিগ্ধ সজীবতা

গ্রীষ্মের খরতাপে ক্রোদাক্ত আবহাওয়ার আপনি যখন বিব্রত তখন আপনার একান্ত প্রয়োজন বোরোলীনের মতো মিষ্টি আর স্নিগ্ধ ফেস্‌ক্রীম। ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন স্ক্রের গভীরের সমস্ত মালিগ্র দূর ক'রে আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে আপনার স্ক-কে স্নিগ্ধ ও সজীব ক'রে তুলবে।



বোরোলীন

পরম প্রসাধন

প্রস্তুতকারক :

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যাল্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩



সংশোধন করেই না আজ বিজ্ঞানের কাঠামোগুলো শক্ত করে দাঁড় করানো গেছে। তুমি কি বলতে চাও, যে আজকের যে বহুপরীক্ষিত, নির্ভরযোগ্য, ইচ্ছা কঠিন ভিত্তিগুলোর ওপরে আধুনিক বিদ্যার বনিয়াদ গড়ে উঠেছে—‘থারোডাইনামিক্স’, ‘ট্যাটিক্যাল মেকানিক্স’, ‘প্রিন্সিপল অফ রিফ্রেক্টিভিটি’, ‘আনসার্টেনট প্রিন্সিপল’ বা ‘কোয়ান্টাম থিয়োরি’—এগুলো একেবারেই পলকা? না, হার, আমাদের বহু বর্ষের অধ্যয়নে দেখা গেছে—অপভ্রমিত বস্তু হাড়ের বা অভিজ্ঞতা—‘কিনিক্যাল বিরাতি’, বলতে আমরা না বুঝি তার আর সব কিছুই এ ভিত্তিগুলোর ওপরে দাঁড় করানো চলে। শুধু তাই নয়, অসামান্যকালের আবিষ্কার সবকিছু মিস্ট্রী তথ্যবাহী করা চলে আজকের থিয়োরি থেকে। সন্দেহের অবকাশ কোথায়, হার?

খংকর হলে, তোমার এ বৃত্তি কারমনোবাক্যে যেনে সিয়েতি উত্তম। কিন্তু আজকের সর্বাধিক অস্ত্রার হয়ে দাঁড়াচ্ছে হবিব্রার যন্ত্রটা। তেবে দেখেছ কি, তোমার ‘জেনারেল মিসিটিভিটি থিয়োরি’র কী অবস্থা দাঁড়ায় আজ হবিব্রার আবিষ্কারের পটভূমিকায়?

না রাত, যদি আমাদের এ সমস্তার সমাধান করতেই হয়, তবে আবার নতুন করে সূত্র করতে হবে—দরকার হলে গ্রেটের সব লেখা মুছে ফেলে।

রাত, জড়পদার্থের কোনো বিজ্ঞান নেই—তার না আছে ‘কিনিক্স’, না আছে ‘কেমিষ্ট্রি’। তার শুধু আছে গুণ—সে গুণের কতকংশ আমাদের ইন্ড্রিয়গ্রোহ আর একটা অজানা অংশ তার বাইরে। মাহুয়ের তৈরী সূক্ষ্মতম বস্তু ধরা পড়ে ইন্ড্রিয়াতীত ছ-একটা গুণ। ‘কিনিক্স’ কেমিষ্ট্রি, ম্যাথেমেটিক্স এ সবই তো মাহুয়ের মনগড়া। প্রকৃতির কাছে গ্রাম নেই, ‘কিলোভোল্ট’ নেই, ‘আম্পিয়ার’ নেই এমন কি ‘কোয়ান্টাম’ পর্যন্ত নেই। এ সব মাপকাঠি তো মাহুয়েরই তৈরী।

শুধু বিজ্ঞান কেন, ধরো না দর্শন ধর্মশাস্ত্রের কথা। ভগবানের সবকিছু মাহুয়ের চিন্তাধারার কী রকম বদল হয় যুগ থেকে যুগে...

বেশ থেকে দেশান্তরে। ভগবান হচ্ছেন বিরাট এক ‘এক’। অকুরত ‘ইকোরেশন’ গড়ে তোলা যায় ‘এক’ দিয়ে। যে সব ‘ইকোরেশন’ সরল করে আরলেও শেষ পর্যন্ত ‘এক’ থেকেই পারে। ‘এক’ যদি যেনে রাত, তা যে কোনো ইকোরেশনে ইহকায়—পরকায়ের কায় চলে যাবে। নিরাকার ‘ইণ্ডিটারমিনেট নির্যাতীত সংখ্যা’ বলে যদি ‘এক’কে ধারণা করতে পারো তা ভালো কথা। তা যদি না পারো আকার অথবা ‘এক’-এর বদলে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বসিয়ে নিলেও চলেবে। পরার্থের বেলায়ও তাই আর তোমার চুখকথতি, বিহ্যং, পরমাণুশক্তি আর মহাকর্ষের বেলাও তাই।

ব্যারাকের হারবার থেকে খালীবানর দাঁড়ায় পথ আমছে। হুয়ের ব্যারাকটার আলোভুলো একে একে বিবে বাছে। সহস্রা উদ্ভাপাত হল। সেই দিকে কিছুকণ চেয়ে রাত বললে—

তাই, কথাগুলো ঠিক এরকম ভাবে কোনোদিন ডেবে কেবিন। তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা বিজ্ঞানসাধকের দল কতটা রক্ষণশীল। বিজ্ঞানের রাজ্যে আমরা বিলম্ব হুকে দিই না। নিতান্ত অকাজে না হলে পুরোনো থিয়োরিগুলো বর্জন করতে আমাদের বড়ো আপত্তি। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে ভয়সমাজে জরাজীর্ণ থিয়োরিগুলোকে চালু রাখবার আশ্রয় চেষ্টা করি যতোদিন এ ভাবে চালানো যায়। হয়তো বা কিছু গলদ হয়ে গেছে আমাদের অনেক মতবাদের মূলে, তাই বোধ হয় তালিটা প্রায় রোজই লাগতে হচ্ছে।

কে জানে, অ্যাণ্ডিগ্রাভিটির বিকাশ হয়তো হচ্ছে আমাদের সকলের সামনেই। আমাদের সংস্কারের ঠুলিপরা চোখে সেটা ধরা পড়ছে না। মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও রয়েছে নিউটনের আগে অথবা পরে—আবহমান কাল ধরে। কিন্তু সেটার প্রকৃত স্বরূপটা ধরা পড়ে গিয়েছিল একমাত্র নিউটনেরই চোখে। হবিব্রার চোখেও এমনি করে হয়তো ধরা পড়ে গিয়েছিল তার বিপরীত নিয়মটা।

চলো, রাত হয়ে গেল—এবার আন্তানায় ফিরে যাওয়া বাক। ঠাণ্ডাও পড়তে সূত্র করেছে বেশ। [ক্রমশঃ]

সবুজ সাধ

সোনালী দত্ত

সবুজ রঙের ভালবাসা আর নীল আকাশের আলো ;
কালী-হাসি খচিত বিচিত্র জীবনপাত্রের চালো ।
উল্হল ফেনিল ধারা স্বর্গের স্বকক তার কিনারে কিনারে,
আকাশ মাটির জয় বিঘোবিত হ’ক নিখিল প্রাণের
আকাশ-ছোঁওয়া মিনারে ।

আমি যুগ-যুগ সঞ্চিত আকুল ভূবার উল্লিত হয়ে,
বিকম্পিত ব্যগ্র বাহ বাড়ায়ে সে পানপাত্র দৃঢ় মুষ্টিতে লয়ে
নিঃশেষে পান করব । আর বলব, ‘চালো, আরও আরও চালো,
সবুজ রঙের ভালবাসা আর নীল আকাশের আলো ।’

কুজন-গুঞ্জিত বন-মর্মরে বিভ্রম নামবে আঁধি-তারার,
পুষ্পধরুর সুরকীর শবে অস্তর অস্থির হবে উল্হল কামনার কারার
প্রতি অঙ্গে অমুরনিত হবে অতৃপ্ত তৃপ্তির বাণী—

‘আমার তোমার পানে তুলে ধর
তৃপ্ত কর, পূর্ণ কর, হে প্রিয়তম সার্থক কর ।’

আমি আমার পথ তুলে তোমার পথে চলব,
শত সাহায্যের সুরতীর পিপাসায় আমি জীবনপাত্র মেলে ধরে বলব—
‘চালো আরও, আরও—আরও চালো

সবুজ রঙের ভালবাসা আর নীল আকাশের আলো ।’



দিনে
দিনে
দিনে
দি...

রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডল'
থলে একটি বিশেষ ধরনের তেল
নেশানো হয়, যাতে ত্বক আরও
কোমল, আরও সুন্দর, আরও

লাবণ্যময়ী হয়...! সুবাস ভরা রেক্সোনার
পয়শ সারাদিন আপনাকে সজীব আর
সুভেদে রাখে। সৌন্দর্য সাধনার সর্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন।

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিডার লিঃ তৈরী।

BP.165-X52 BQ

কাল্পনিক আলেখ্য

আশুভাষ মুখোপাধ্যায়

১০

কপাল সত্যিই মন মন গুণ্ডার।

সেদিনের মত মেজাজ বিগড়লেও অমিত বোধ তার আবেদন জ্বলেনি। নিজের টেবিলে বসে ধীরাপদর সামনেই বখাছানে টেলিকোন করেছে একদিন। সুপারিশের ছলে অভিযোগ, বোগ্য লোক বছরের পর বছর ধরে হেজ-পচে মরছে, সেদিকে চোখ নেই কর্তাদের। গণেশ বাবু প্রফ-রিডারকে সাব-এডিটর আর কবে করা হবে ?

গুণ্ডার প্রত্যাশা মিথ্যে নয়, ওটুকুতেই কাজ হয়েছে। মহৎজন ভাকালেও ক্ষুদ্রজনের কপাল করে। গুণ্ডার কিরছে। গুণ্ডা সাব-এডিটর হয়েছে। সেটা এত ভাড়াভাড়া বে বিন্মরে আর আনন্দে গুণ্ডা নিজেই আত্মহারা।

পরিভোষণ গুণ একটা আর্ট বিশেষ। তোমামোদ যে করে আর যে তাতে তুষ্ট হয়, দুঃখের মনের তারে মিল হওয়া চাই। অমিলটা জলের ওপর তেলের মত চোখে লাগে। গুণ্ডা সেই মিল বোঝে না, মেলানোর আর্ট জানে না। তার চোখ কান-কাটা বাৎসল্যের টানটা ধীরাপদর-গলায় কাঁসের মত আটকে বসার দাখিল। তাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হুই-এক পশলা বচসা হয়ে গেছে তাও জানে। বিস্মৃত ভাবে না জানলেও আঁচ পেয়েছে। উমা বুঝতে শিখছে একটু-আধটু, আর ধীর-কাঁর ওপর তার এমনই টান যে, যেটুকু বোঝে গোপনে কাঁস না করে পারে না। অবশ্য তার বলাটা বাপের দিক টেনেই—বাবা চায় ধীরকাঁর আগের মতই তাদের ওখানে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উমাও তাই চায়। উমা আর তার বাবার মত মা-বে ধীরকাঁকে অত ভালোবাসে না, মায়ের রাগ আর অবুঝপনা দেখে উমা এই গোপন সত্যটাও প্রকাশ না করে পারেনি।

মনে মনে গুণ্ডার ওপর ভয়ানক বিরক্ত হয়েছে ধীরাপদ। সোনাবউদির ওপর ধুশি হওয়ার কথা, তাও হয়েছে। কিন্তু অভিমানে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছে একটু। বাইরে চিড় খেলেও আর একটা অদৃশ্য বোগ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। এটুকুর প্রতিই ধীরাপদর লোভ। কিন্তু সম্প্রতি সোনাবউদি সেটুকুই ছেঁটে দিয়েছে একেবারে। তার নির্বাক আচরণ প্রায় রুচ। মেয়েটা পর্বত এসে হুঁ দণ্ড বসতে পার না, আগতে না আগতে বাঁঝালো ডাক শুনে বা কঠিন জুকুটির ভাড়া খেয়ে দৌড়ে পালায়।

পরিভোষণ-কলার ব্যাপারে গুণ্ডার বোগ্য দোসর রমণী পণ্ডিত। তাঁকে ঠেকানো শক্ত। পাহাড়ী জলের ধারার মত ধার ধার ঠোঙের খেয়েও তিনি বক্তব্য-কেহ্রে এসে পৌঁছবেনই। কুম্বুয় সেই শান্তির ব্যাপারের পর থেকেই তাঁকে এড়িয়ে চলছিল ধীরাপদ। তাঁকে কুম্বুকে হুজনকেই। কিন্তু রমণী পণ্ডিত না-হোড়। গুণ্ডার পদোন্নতিতে তাঁর কুতিত্ব কম নয় কারো থেকে। গুণ্ডার হবে যে, সেখোবধা তিনিই করেছিলেন—করেছিলেন বলেই বা-কিছু চেষ্টা-চরিত্র। নইলে হাত-পা ওটিয়ে বসেই থাকত হয়ত। অবশ্য গুণ্ডা যে তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ সে-জন্তে, সেটা রমণী পণ্ডিত স্বীকার করেছেন। গুণ্ডার খুব ইচ্ছে, তাঁদের দুঃজনকে বাড়িতে একদিন ভালো করে খাওয়ায়—তাঁকে আর ধীরাপদকে। কিন্তু তার দ্বীটি একেবারে বেকে বসেছে বলে ভয়লোক দুঃখ করছিল সেদিন, একটা বড় রেশমরীর তাঁদের নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে বলছিল।

ধীরাপদর মনোভাব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন রমণী পণ্ডিত, উচ্চস্তরের মন্তব্য করেছেন তারপর, কি দরকার এ-সবের, কোনো প্রত্যাশা নিয়ে তো কেউ আর উপকার করতে যায়নি, ভালো হয়েছে সেই ভালো। পণ্ডিতের কালো মুখে অস্তরঙ্গ হাসি, কিন্তু তাঁর দ্বীটি হঠাৎ অমন বেকে বসলেন কেন সেটাই আশ্চর্য—আমি না-হয় বলতে গেলে বাইরের লোক, আপনি তো আর সেরকম নন, কারো উপকার ছাড়া অপকারও কোনদিন করেননি।

ধীরাপদ সবিনয়ে তাঁকে উঠতে বলবে কি না ভাবছিল। রমণী পণ্ডিত তাও অস্বমন করলেন কিনা কে জানে। কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন চট করে, ভয়লোক দুঃখ করছিল বলেই বলা, নইলে এ-সব নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। ঘুরে ফিরে নিজের দুঃবছার প্রসঙ্গে এসে গেলেন তিনি, ধীরাপদর অস্বগ্রহে বইয়ের বিজ্ঞাপন আর কবিরাজী গুণ্ধের বিজ্ঞাপন লিখে সামান্ত কিছু পাচ্ছেন বটে, কিন্তু তাতে কি আর হয়—এর ওপর মেয়েটা বড় হয়ে গেল, তার বিয়ের ভাবনা। একটা ঘর নিয়ে বসতে পারলে সব দিকে সুরাহা হয়, নইলে তো দুবেলা আহার জোটানই শক্ত, কোন্ দিকে আর তাঁকাবেন।

পণ্ডিত উঠে বাবার পর ধীরাপদ নিজের মনেই হেসেছে অনেকক্ষণ। ব্যাপার বড় মন্দ হল না। এই সুলতান কুঠিতে এক সোনাবউদি ছাড়া আর কেউ তাকে দেখতে পারত না। এখন সকলেই আপনজন তার। গুণ্ডা চাকরিতে উন্নতি হয়েছে

যে ঘুমি তার ওপর, রমণী পণ্ডিত বিজ্ঞানীর কাজ পেয়ে। একাদশী শিকড়ার আর একখানা বাংলা কাগজ পেয়ে ঘুমি, আর শকুনি ভট্টচার্য চাবনপ্রাস পেয়ে। মাঝখান থেকে আপন যে ছিল সেই শুধু দূরে সরে আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় সুলতান কুঠির আড়িনায় একটা পুরনো গাড়ি দাঁড়ানো দেখে ধীরাপদ অবাক। কার কাছে কে এলো আবার। জামা-কাপড় বদলে স্নহ হয়ে বসায় আগেই চমকে উঠতে হল। আগছক একজন নয়, দু'জন—তার পাশের ঘর থেকেই বেরলো। একজন ডাক্তার, হাতে ট্রেসকোপ আর ডাক্তারী ব্যাগ। সন্দের লোকটির হাতে কি সরঞ্জাম দুই একটা, ধীরাপদ ঠিক ঠাণ্ডর করে উঠতে পারল না। পিছনে গুণ্ডা।

কার অনুধ? কি অনুধ? কিছুই জানে না।

ধীরাপদ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তাদের বিদায় দিয়ে গুণ্ডা সামনে এলো। মুখে সলজ্জ হাসির মত।

ডাক্তার কেন?

ইয়ে, একটা ইন্সপেক্টর করলাম, অফিসের ওই ড্রলোক ঘরল খুব, তাছাড়া পণ্ডিতমশাইও পরামর্শ দিলেন—

যন্ত্রির নিঃশাস কেলে ধীরাপদ ঘরে চলে এলো। কিন্তু গুণ্ডার ইন্সপেক্টর বৃত্তান্ত শেষ হয় নি, তাছাড়া একটু গল্পসল্প করার ইচ্ছেও প্রবল বোধ হয়। সময় বা সুযোগ হয়ে ওঠে না বড়। গুণ্ডাও ভিতরে এসে দাঁড়াল।

ইন্সপেক্টর গুণ্ডা একাধি নামে করে নি, স্বামীপ্রী দুজনের নামে করেছে। দশ হাজার টাকা। একজনের অবর্তমানে আধ একজন পাবে। এই বয়সে প্রিমিয়াম একটু বেশিই হল, কিন্তু ছেলে-মেয়ের কথা ভেবে না করেও পারল না। অনুমোদনের আশায় জিজ্ঞাসা করল, ভালো করিনি?

জয়েন্ট ইন্সপেক্টর শুনে ধীরাপদ তাজ্জব, এ বুদ্ধি আবার গুণ্ডাকে কে দিলে। বলল, ভালোই তো—।

বীমা-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গুণ্ডা মিঃ ঘোষের কুলল-সমাচার জিজ্ঞাসা করল, তার মহত্বের কথা বলল। বিকেলে একদিন তাকে চায়ে ডাকা আর এক বাস নাওকেলের সন্দেশ পাঠানোর অভিজ্ঞতাও জানালো। ধীরাপদ কানরকম আগ্রহ না দেখে নিজেও দ্বিধাচিত্ত একটু, অসম্ভব হবেন না কি?

হতে পারে। এ-সবের দরকার নেই।

ধাক তাহলে এখন। গুণ্ডার ভালো-মন্দের সে-ই যেন একমাত্র পরামর্শদাতা।

তাকে বসতে পর্যন্ত বলেনি ধীরাপদ, আপাতত ঘর থেকে বেরলে ঘুমি হয়। কিন্তু গুণ্ডার বাবার ইচ্ছে নেই। ওকে এ রকম অবকাশের মধ্যে পেয়ে সুপরিষ্কৃত সদিচ্ছাটা চাড়িয়ে উঠতে লাগল। স্ত্রীকে দিয়ে হল না দেখে চিড় খাওয়া আত্মীয়তাকে এই কাঁকে নিজেই জুড়তে বসল সে। বাকপটু নয় রমণী পণ্ডিতের মত, একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলতে গেলে মুখ লাল হয়, খেই হারায়।—ইয়ে, একটা কথা তোমাকে বলব ভাবছিলাম, তোমার বউদিকে তো চেনই—নিজের দেওরের মতই দেখে তোমাকে, তুমি গরম এনে দিয়েছ কত ঘুমি—কিন্তু তরানিক অনুধ, একটু আধটু কুল বোঝাবুঝি হলেও আবার কি মিলেমিলে থাকে না কেউ?

ধীরাপদ দুটীটা ধরখরে ইয়ে উঠছে গুণ্ডা লক্ষ্য করল না। স্ত্রীর একরোখা অবাধ্যতার কারণে নিজের সহিষ্ণতা বলার মাঝার চেষ্টা।—কিন্তু তরানিক অধ, মেয়েছেলের এত অধ—কথাটা কিছুতে আর তাকে দিয়ে—

কী কথা?

কঠখড়াটা কানে লাগল খট করে। গুণ্ডা সচকিত। টোঁক গিলে তাকালো, এই বলছিলাম—আগের মতই আবার—

কেন বলছিলেন? সবটা শোনার ঐখ নেই ধীরাপদ।

গুণ্ডা হকচকিয়ে গেল, মুখ শুকালো। তবু সামলাতে চেষ্টা করল কোনপ্রকারে, তোমার খাওয়া দাওয়ার অনুবিধের জন্তে...

আমার অনুবিধে তাতে আপনার কী? অস্বাভাবিক রূপতার গলার ঘর কঠিন হয়ে উঠল আরো, আপনারা ডাকলেই আমি যাব ভেবেছেন কেন? কেন আমার প্রসঙ্গে এসব আলোচনা হয় আপনারদের? কেন বাইরের লোকের সঙ্গে পর্যন্ত আপনি আমার ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন?

নিশ্চলক মুহূর্ত গোটাকতক। বেজাহতের মত বিবর্ণ পাগল মুখে গুণ্ডার প্রশ্ন।

ধীরাপদ বিহ্বাসায় এসে বসল। খানিক বাদে নিজের এই অস্বাভাবিক উত্তরণায় নিজেই হতভম্ব। এ আবার কি কাণ্ড করে বসল। একটা তুচ্ছ কারণে, প্রায় অকারণেই—এভাবে নিজের ওপর নিজের দখল হারিয়ে বসল কি করে? কেন?

কতক্ষণ বসেছিল ঠিক নেই, এক ঘণ্টাও হতে পারে, দশ মিনিটও হতে পারে। অটুট গান্ধীর্ষে সোনাবউদিকে সরাসরি ঘরের মধ্যে চুকে পড়তে দেখে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

হ'হাত কোমরে, কুঁহুলী মেয়ের মত সোনাবউদি বাঁঝিয়ে উঠল, আপনি মশাই আমার ঘরের লোককে এভাবে অপমান করেন কোন্ সাহসে শুনি?

ধীরাপদ বিমূঢ় খানিকক্ষণ। ওর নিজের যেমন অস্বাভাবিক ঐখচ্যুতি ঘটছিল, এই গান্ধীর্ষ আর এই কটুভাষণও বিন্দৃশ লাগছে তেমনি। উক হয়ে উঠতে গিয়েও কেমন মনে হল ঠকবে তাহলে। নিলিপ্ত জবাব দিল, ঘরের লোককে এবার থেকে ঘরে আটকে রাখবেন তাহলে।

কী? আবার কথা টকটকিয়ে। আরো গরম হয়ে চোখ পাকালো সোনাবউদি, আপনি না হয় আছেনই হ'শ টাকা মাইনের চাকুরে, আপনার দৌলতেই না-হয় হয়েছেই বড় একটা প্রমোশন, না-হয় এসেই ছিল আপনাকে একটু তোয়াজ-তোবামোদ করতে—তা বলে লোকটাকে আপনি ঘর থেকে অপমান করে তাড়াবেন?

পাকানে,-চোখের দুই তারার চাপা কৌতুক উপছে উঠতে লাগল, ত্বকের ঘন কুঞ্জন প্রসাসে তরল রেখা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, আর রুঢ় গান্ধীর্ষ চিরে চিরে হাসির বিজলি বলসে উঠতে লাগল। শেষে সমস্ত চাপা অভিব্যক্তিটা গোটাঙটিই ভেঙে পড়ল একসঙ্গে। প্রতিরোধের চেষ্টার বার দুই ফুলে ফুলে উঠে হাসির দমকে সোনাবউদি মেঝের ওপরেই লুটিয়ে বসে পড়ল।

বেদম হাসি।

ধীরাপদ দেখেছে। হ'চোখ জয়ে দেখেছে। চোখের মাঝখানে হাবুতে আর গলার কাছে একটা অস্বাভাবিক জলুকৃতি তরল হয়ে গেলে

আপত্তে চাইছে তার। খুশিতে আনন্দে বীরপদ বিক্রত বোধ করছে।

হাসির সকল সামলে স্থির হয়ে বসতে চেষ্টা করল সোনাবউদি। কি একটা গ্রানি ধূরে হচ্ছে একেবারে পরিষ্কার বেন। বলল, হু'বটাও হয়নি দশ হাজার টাকার লাইক ইঞ্জিওর করে উঠল, মনে কত আনন্দ—আপনি দিলেন সব পণ্ড করে। বাকি বলছে আনন্দের কারণটা তার কাছে স্পষ্ট নয় মনে করে খামল মা সোনাবউদি।—আমি আর যে সে লোক নই, কোন রকমে একবারটি করতে পারলেই কড়কড়ে দশ হাজার টাকা পাইয়ে দিতে পারি।

জীবন-বীমার এই যুগ ধারাটিই গুণা বেছে মিল কেন সেটা বীরপদর মাথার ঢোকেনি ভখনো। ওতে কিছির হার বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ত ওটাও ভালো বলে বুঝিয়েছে কেউ তাকে। হতেও পারে ভালো, বীরপদর বীমার ব্যাপার জানা মেই। সোনা-বউদির কৃত্রিম দস্তের জবাবে সেও ঠাট্টাই করল।—আমি তো দেখছি আনন্দের বদলে উল্লসকের কপালে হুঃখ আছে, আপনার ওই ঘরাটুকু হয়ে মা উঠলেই তো সব গেল।

ঘরা হবে না বলেন কি! হু'চোখ টান করে কেলেল সোনাবউদি, তারপরেই হেসে অস্থির আবার।—ইঞ্জিওর করার তাগিদ অবশ্য আমিই দিয়েছিলাম, কিন্তু ওবল ইঞ্জিওর হল কেন তাও বুঝছেন না? হুজনের কুষ্টি খাঁটাখাঁটি করে গণকঠাকুরটি তো কবেই ভরসা দিয়ে রেখেছেন, দজ্জাল বউ বেশি দিন আলাবে না, অনেক আগেই চোখ বুজবে। চোখ বোজার আনন্দে আবারও চোখ বড় করে কেলেল সোনাবউদি, দজ্জাল হই আর বাই হই, গেলে হুঃখ কম হবে ভাবেন নাকি, ওই দশ হাজার টাকার স্মৃতিটুকুই বা সাধনা ভখন। আনন্দে আমার একুনি মরতে ইচ্ছে করছে।

বীরপদ হাঁ করে গুমছিল প্রথম। তারপর হেসে কেলেল। কিন্তু হাসিটা থাকেনি বেশিক্ষণ। কেন জানি মনে হয়েছে, হাতে কমতা থাকলে জীবন-বীমার এই যুগ ধারাটা সে নাকচ করে দিত। স্মৃতি থাক আর নাই থাক, স্মৃত্যুকে মাঝে রেখে এই বনিকের সাবধানতা বীরপদর ভালো লাগল না।

সোনাবউদি এসজ ঘোরালো, ঘরে গিয়ে হুঃখ কালো করে শুয়ে পড়ল একেবারে, কি বলেছেন?

বীরপদ বখার্বই লজ্জা পেল এবারে, বা বলেছে নিজের কাছেই অবিশ্বাস।

সোনাবউদি দেখল একটু, তারপর টিঙ্গনী কাটল, আপনার আবার এত তেজ হল কবে থেকে?

এবারে জবাব দিল, বলল, যেদিন থেকে আপনি হুঃখবহার শুরু করেছেন আমার সঙ্গে।

আমি! কি হুঃখবহার? জবাবের জন্তে অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে হুঃখ হুঃখ-প্রত্যাশার কিসকিসিয়ে উঠল, কেমন ব্যবহার করতে হবে?

চেষ্টা করে আহত পুরটাই বজায় রাখল বীরপদ, বেশ জোর দিয়েই বলল, গুণ্ডার চাকরির উন্নতিটা তাঁর নিজের চেষ্টাতেই হয়েছে, আমি কিছুই করিনি। আমার ওপর রাগ কেন আপনার... কিছু যদি করতামও সেটা অহুঃখ ভাববেন আপনি?

সোনাবউদি হুঃখের দিকে চেয়েছিল। চেয়েই রইল খানিক।

এই চাউনিটুকু দিয়েই তাঁর অভিযোগ হুঃখ দিল বেন। তারপর হাসল একটু, কি ভাবব?

বীরপদ জবাব দিল না। জবাবের প্রত্যাশাও করল না। সোনাবউদি হঠাৎ নিজের ভিতরেই তলিয়ে গেল বেন। খানিক আগের চপলতা নিশ্চিহ্ন। ছোট একটা নিঃশ্বাস কেলে উঠে পীড়াল, অভ্যমননের মত বলল, রাগ ঠিক নয়, কি জানি কি জন্ম একটা।...অনেক লোভে শেষ পর্বন্ত অনেক কতি, বোধ হয় সেই জন্ম। এবারে বড় করেই নিঃশ্বাস কেলেল, এত রাতে আপনি আর বাইরে খেতে বেরবেন না, বসে থাকুন।

বীরপদ বসেই রইল।

...যুঃ হলে বলত বোধহয়, তোমার সব জন্ম ভাবনা এবার থেকে আমার কাঁধে চাপিয়ে দাও সোনাবউদি। বীরপদরও ইচ্ছে করছিল তাই বলতে।

বলতে যে পারবে মা তাও জানে।

মাসের প্রথম শনিবার। মেডিক্যাল হোমের কর্মচারীদের মাইমের দিন। বেলা চারটে মাপান পরিচিত টেশান ওয়াগনটা লোকানের সামনে এসে পীড়াল। ভিতরে বাইরে তিন শিফটের যেতন-প্রত্যাশীরা অপেক্ষা করছিল। ম্যানেজার থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত। এই একদিন গাড়িটা ছোটো-আড়াইটের মধ্যে এসে যায়। আজ আসছিল না বলে মনে মনে সকলেই উৎকর্ষিত ছিল একটু। এবারে শনিবার পড়েছে মাসের ছয় তারিখে। দিনগুলোকে শনিবার পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে আসতে প্রাণান্ত। তারপর যদিই বা এলো, মাইমে হবে কি হবেনা সে-সবক্কে সংশয়ের কারণ ছিল। গাড়ি দেখে নিশ্চিত তার।

লাবণ্য সরকার নয়, টাকার ব্যাগ হাতে বীরপদ মামল টেশান ওয়াগন থেকে।

তাকে কেউ আশা করেনি বটে, কিন্তু দেখে অবাকও হল না খুব। হবার কথাও নয়। কারণ, লাবণ্য সরকারের অল্পপছিত্তিতে আর কেউ টাকা নিয়ে আসবে সেটাই আশা করছিল তারা। মহিলাকে না দেখে সকলেই বুঝে নিল সে আজও করেনি।

গত চারদিন আসেনি লাবণ্য সরকার, সে কলকাতার নেই, তাও সকলেই জানে।

ক'মাসের মধ্যে মেডিক্যাল হোমে এই প্রথম পদার্পণ বীরপদর। ইচ্ছে করলে এক-আধ বার আসতে পারত। ইচ্ছে একেবারে হয়নি কখনো, তাও নয়। তাছাড়া কীকমত এখানকার কাজ দেখাওনা করাটাও চাকরির অঙ্গ। কিন্তু তেমন কোনো উপলব্ধ হয়নি বলেই আসেনি। তাকে নিয়ে এখানে যে প্রহসন ঘটবে, তারপর অকারণে আসাটা চাকরির দাপট ভাববে সকলে। সেই সন্দোচে আসেনি। নইলে ম্যানেজার না হোক, রমেশ হালদারের মুখখানি অন্তত একবার দেখার লোভ ছিল বীরপদর।

আজ যে আসবে নিজেও জানত না।

এই আসার পিছনে ক্যান্টরীতে আজকের মীরব বৈচিত্র্যটুকু উপভোগ্য। কিন্তু বড় সাহেব হিমাংগ মিত্রর সামনে তেমন উপভোগ্য মনে হয়নি, তাঁর চাপা রাগ লক্ষ্য করে বীরপদ বহুঃ হকচকিয়ে গিয়েছিল।

করছিলেন। শেবে স্থির হল, সেদিনের সকল লগ্নই দোষযুক্ত। পুণ্ড্রাং আজ আর বিয়ে হবার উপায় নেই। বরকর্তা শুনে তো হুঁশিত হলেন—কতটা বর্তার মাথায় বাজ পড়ল। এমন সময় তাঁর গুরুদেব নিমন্ত্রণে এলেন। কতকর্তা ভক্তিরে গুরুর চরণ-প্রান্তে প্রণাম করে লগ্নের বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। গুরু সকল কথা শুনে বললেন—তাই তো, আজ যে সব লগ্নই দুঃস্থ; গোধূলি লগ্ন অবলম্বন করলে ভাল হত—তা এখন রাত হয়েছে আর তো গোধূলি নেই।

শিষ্য অর্থাৎ কতকর্তা বললেন—আপনার বধন শুভাগমন হয়েছে, তখন গোধূলি নেই কেন? আশুন বিয়ে হবে। আপনার চরণধূলিই আমার গো-ধূলি।

এক জায়গায় কতকগুলি লোক বসেছিল। এক ব্রাহ্মণ উঠে গিয়ে দূরে প্রেস্তাব করে এলেন। ব্রাহ্মণ এলে অপর এক ব্রাহ্মণ বললেন—পূর্বমুখে প্রেস্তাব করা উচিত নয়। অল্প এক ব্রাহ্মণ এই কথা শুনে এক টিপ নশ্র নিয়ে বললেন—না, হে না। মনু বলেছেন—দিনে পূর্ব মুখে আর রাত্রিতে পশ্চিম মুখে প্রেস্তাব করা নিবিদ্ধ। সেখানে এক চাষা বসেছিল, সে তাঁদের কথা সব শুনে বললে জাবত—আমরা মুখ্য চাষা লোক, অত শত জানি না। আমরা কি দিনে কি রোতে এই ভ্রশচাজ্যি মশাই যে মুখে কইলেন ও মুখেও প্রেস্তাব করি, আর ঐ ভ্রশচাজ্যি মশাই যে মুখে কইলেন, ও মুখেও প্রেস্তাব করি।

এক বোকা চাষা ভটাচার্যের টোলে হাজির হয়ে বলল—ঠাকুর, আমাকে একটা বিধেন দিতে হবে। ভটাচার্য জিজ্ঞেস করলেন—কিসের বিধান? চাষা বললে—আজ আমার বাপের দিবসি শ্রাদ্ধ; তা আমি করতে পারি কি না?

ভটাচার্য বললেন—তাতে বাধাটা কি?

চাষা বলল—আমার জ্বর গামর বেজার খোস পাঁচড়া হয়েছে, পুঁজ রক্ত বেরোচ্ছে।

ভটাচার্য—তোর জ্বর গামর খোস হয়েছে তো তোর কি? তোর নিজের গামর তো হয় নি?

চাষা বলল—তবে যে আপনারা করে থাকেন—ত্রীপুরুষের এক অঙ্গ, সবই মিথ্যে?

এক বৈরাগীর বাড়ীর উঠানে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল। অসময়ে তাতে একটা কাঁঠাল ধরে। বৈরাগীর একটা ছোট ছেলে ছিল। ছেলেটি কাঁঠালটি পাড়বার অল্প আবদার ধরল। বৈরাগী তাকে সাহসনা দিয়ে বলল—ঐ কাঁঠালে বৈকবসেবা হবে। ওর অস্ত্রে হাজিমা করতে নেই। ছেলে বুঝল। ক্রমে কাঁঠাল তক্তপোষের নীচে স্থান পেল। ছেলে বৈকবসেবার তাগিদ দিতে ছাড়ে নি। পাকও ধরল বধাকালে। কিন্তু বৈকবসেবার উত্তোগ হচ্ছে না দেখে ছেলে জোর তাগিদ লাগাল। একদিন স্ন-অবসর বুকে বৈরাগীপত্নী ও পুত্রসহ পুপক কাঁঠালটি উদর নামক বৃহদেবতার পূজা লাগাল। ছেলেও বাদ পড়ল না বটে, কিন্তু বৈকবসেবার হস্তাংশ হয়ে বাপকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল—বাবা, কই, বৈকবসেবা কোঁ হল না?

তখন বৈরাগী বলল—কেন হল না—বৈকবসেবাই জে হয়েছে—

তুই বৈকব, মুই বৈকব আর বৈকব ঘরে।

তিন বৈকব ঘরে থাকতে কাঁঠাল পাবে কি না পরে।

এক আখড়ায় ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হচ্ছিল। তিন-চারজন পণ্ডিত ব্যাখ্যা করে চলে গেলেন। শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কোন পণ্ডিতের তারিফ করল, কেহ বা বলল—অমন ব্যাখ্যা সকলেই করতে পারে।

সেখানে বসে ছিলেন দামু পণ্ডিত। দামু বললেন, এবারে আমি একটু ব্যাখ্যা করি—আপনারা সব ধীর স্থির হয়ে শুনুন। দামুর হাতে একখানি রামায়ণ ছিল সেখানে ধুলেই তিনি পাঠ শুরু করলেন। বই-এর এক জায়গায় আছে—“রাভণো রাক্ষসাদিগঃ”।

“রাভণ” পাঠ করতেই এক শ্রোতা সেটা অস্তক বলে চীৎকার করে উঠলেন। অমনি অল্প শ্রোতারাও জো পেয়ে বলে উঠলেন—“রাভণ” কখনই হতে পারে না।

দামু পণ্ডিত হঠাৎর পাত্র নন। তিনি সবলকে স্থির হয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন—লোকে না বুকেই ‘রাবণ’ উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত পাঠ ‘রাভণ’—কেন শুনুন, শাস্ত্র বলেছেন—

“কুন্তকর্ণে ভকারোস্তি ভকারশ্চ বিভীষণে।

ত্রীণাং মধ্যে ঘয়োজ্যোষ্ঠে ভকারং কিং ন বিজ্ঞতে।”

মশাইগণ, দেখুন, তিন সহোদরের মধ্যে কনিষ্ঠ হৃৎজন কুন্তকর্ণ আর বিভীষণ, হৃৎজনেরই নামে “ভ” আছে; তবে বড় ভাই যিনি তার নামে “ভ” না থাকে কি কখন সঙ্গত হতে পারে? কাজেই ‘রাভণ’ পাঠই শুদ্ধ, ‘রাবণ’ অশুদ্ধ।

মতি রায়ের যাত্রা হচ্ছে। অভিসার বেশ জমকেছে। সলিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীরা আজ রাত্রে কুঞ্জে যাত্রা করেছেন। কেউ হাতে তাম্বুল, কেউ কস্তুরী, কেউ সুই ফুলের মালা, কেউ গোলপ, কেউ বেলফুলের গড়ে—কেউ বা চন্দন নিয়েছেন—ত্রীকৃষ্ণকে উপহার দেবার ইচ্ছার। কত আশা করে কত প্রিয়-উপহার নিয়ে তাঁরা কুঞ্জে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু কৃষ্ণ আর আসেন না—সখীগণ তাঁর আশাপথ চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিলেন। ভোরের বেলায় মনের হুঃখে সখীরা নিজের নিজের বাড়ীর দিকে ফিরলেন। পথে তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কে কি উপহার এনেছে। সকলেই নিজ নিজ উপহারের নাম করলেন। একজন বললেন—‘বেল-সুইফুলের মালা এনেছি ভাই, কিন্তু আমার এমনই হৃৎপাণ্ড—ধীর জন্ত আনলুম—তিনি তো এলেন না! মালা যে তুকিয়ে পেল’ বলে আক্ষেপ করতে লাগলেন। শেবে একজন সখী বললেন—‘আমি ভাই এনেছি সজনে ফুলের মালা।’ সকলে একসঙ্গে বলে উঠলেন—‘হিঃ হিঃ, এমন কাজ করে—এত ফুল গায়েতে সজনে-ফুল।’ তখন সেই সখী বললেন—‘আমি কি তোমাদের মত বোকা। আমার আশাশেবের কিছু নেই। যদি কৃষ্ণ আসতেন, তাঁর গলায় পরিবে দিকুম—বধন এলেন না, তখন সূতো ধুলে সজনে-ফুলের চকড়ি করে খাব।’

পত্রগুচ্ছ



দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার ও পারস্যধিপতি দরায়ুসের পত্র-বিনিময়

পত্র-পরিচয় :—ভারতের ইতিহাসে মহাবীর আলেকজান্ডারের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন মাসিডোনিয়াধিপতি ফিলিপের পুত্র, পণ্ডিত এরিস্টটলের শিষ্য। আলেকজান্ডার শুধু পারস্য ও তেরকজালেম দেশ জয় করেন নি, আলেকজান্ডারিয়া নগরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর স্বল্প জীবনপরিসরের মধ্যে তিনি এক অপূর্ণ ইতিহাস রচনা করেছিলেন; তাঁর ঘটনা-বহুল জীবনের প্রতি কর্ণে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। আলেকজান্ডারই প্রথম এশিয়া-ইউরোপের মিলনের প্রচেষ্টা করেছিলেন, বিশ্বমৈত্রীর পরিকল্পনা তাঁরই। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপের ভাব-সামঞ্জস্যের দৃষ্টি তিনি পাঁচটি আলেকজান্ডারিয়া নগর স্থাপন করেন; প্রাচ্য প্রতীচোর নরনারীর বিবাহ দ্বারা রক্ত সম্বন্ধের ব্যবস্থা করেন। দর্শন বিজ্ঞান অনুশীলন, অহুবাদ ও প্রচার করে তিনি এক নূতন জগৎ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বাইশ বৎসর বয়সে, ৩৩৪ খৃঃ পূর্বাব্দে, আলেকজান্ডার ত্রিশ সহস্র পদাতিক এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে "প্রাণিকাস" নদীতীরে প্রথম পারস্য-বাহিনীকে পরাসিত করিলেন, এশিয়া-মাইনরের নগরগুলি ক্রমশঃ তাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। পারস্য সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস এই সংবাদে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন করে উঠলেন—"দস্যু-ভক্তরাধিপ আলেকজান্ডারের যুগু চাই, তার অহুচরণের দেহ নদীজলে নিক্ষেপ করা হউক"। তারপর দরায়ুস পত্র লিখলেন আলেকজান্ডারের নিকট। আলেকজান্ডার দিলেন তার উত্তর; চললো পত্র-বিনিময়। সেই পত্রগুচ্ছ মুসলিম ঐতিহাসিক বীরখন্দ তাঁর 'ইখওয়ালুস-সাফা' গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন। এই পত্রের মধ্যে সন্ধান পাওয়া বাবে হুইজান বিশ্ববিজয়লিপ্সু, নরপতির পরম্পরের বিজয় আকাঙ্ক্ষা, দম্ব, এবং তদানীন্তন যুগের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত; শেষাংশে সূদূর অতীত যুগের সম্রাটদের মনোবৃত্তির পরিচয়।

দরায়ুসের পত্র

দস্যুরাজ আলেকজান্ডার। যতদিন আকাশের সূর্য আপনার হস্তকে আলোক সম্পাত করবে, আপনি স্থির জানবেন যে, স্বর্গের দেবরাজ আমাকে মর্ত্য-রাজ্যের আধিপত্য দান করেছেন। বিদ্রোহী আমাকে যথেষ্ট সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য ও সম্পদ দান করে সম্মানিত

করেছেন, আমাকে অগণিত বিশ্বস্ত সামন্ত ও প্রজা দ্বারা সম্বোধিত করেছেন।

আমার নিকট সংবাদ এসেছে আপনি বহু দস্যু তত্ত্বর এক চুবুঁতে সংগ্রহ করেছেন। দস্যুর সংখ্যাবাহুল্য দেখে আপনার মস্তিষ্কে ধারণা জন্মেছে যে, তাদের সাহায্যে আপনি আমার সাম্রাজ্য, আমার প্রজাকুল ধ্বংস করে আমার রাজসিংহাসন ও রাজসুত্ হরণ করবেন।

সমস্ত ইউরোপকে প্রাচ্যদেশীয় লোক "ক্রম" আখ্যা দিত। রোম নগরকে ইউরোপের কেন্দ্র ব'লে বিবেচনা করত। এই প্রকার উদ্ভট কল্পনা ক্রম-দেশের লোকের স্বাভাবিক উন্নততার পক্ষেই সম্ভব। আমার এই পত্র পাঠ করেই আপনি যে স্থান থেকে এসেছেন, সেখানে প্রত্যাবর্তন করুন। আপনার চুবুঁ-প্রণোদিত অপরাধের জন্য আপনাকে আমি অভয় দিচ্ছি, আমার শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে না। কারণ আপনাকে আমি পারস্য-রাজ্যের প্রতিহিংসার উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করি না।

আমার সম্পদ ও শক্তির পরিচয় দেওয়ার জন্য আপনাকে একপাত্র স্বর্ণ এবং এক ভাঁড় তিলশস্ত পাঠিয়েছি। সঙ্গে আরও পাঠিয়েছি একটি চাবুক এবং গোলক। গোলকটি নিয়ে আপনি আপনার বয়সোচিত খেলা-ধুলা করতে পাবেন আর চাবুকটি দ্বারা প্রয়োজন হলে আপনাকে শাস্তি দিতে হবে।

আলেকজান্ডারের প্রত্যুত্তর

পারস্যরাজ দরায়ুস। আপনি দাবী করেন যে, আপনি রাজাধিরাজ; স্বর্গবাসী আপনার ভয়ে কম্পিত, সমস্ত জগতবাসী আপনার আলোকে উদ্ভাসিত। আপনার দাবী যদি সত্য হয়, তবে এই দীন শত্রু আলেকজান্ডারের ভয়ে বিচলিত হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব কি?

সম্রাট দরায়ুস কি জানেন না যে, সর্বশক্তিমান বিখাতা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শক্তি ও সাম্রাজ্য বিতরণ করেন? যখন চূর্বল মানব নিজেকে ভগবান বলে বিবেচনা করে, স্বর্গবিজেতা বলে মনে করে, তখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তার রাজ্য ধ্বংস করেন— এই সত্য সন্দেহাতীত।

যে মানুষ মরণশীল, যে মানুষ নিষ্পাপ নয়, যদি রাজ্য অথ লোক জয় করতে পারে, যে মানুষ তার পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী অল্পের নিকট বেলে দার, তার পক্ষে দেবত্বের দাবী কি করে

সত্ত্বা? আমি স্থির করেছি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, সেইসঙ্গে আপনার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করব। আমি স্বীকার করি, আমি ভগবানের একজন চূর্বল, বিনীত দাস মাত্র, ভগবানের নিকট আমি আমার প্রার্থনা নিবেদন করি, আমার বিজয়ের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করি, ভগবানকে আমি শ্রদ্ধা করি।

আপনার পত্রের সঙ্গে আপনি আপনার বিরাট শৌর্ভের চিত্ররূপে আমার নিকট পাঠিয়েছেন একটি চাবুক, একটি গোলক, একটি স্বর্ণপূর্ণ পাত্র এবং এক ভাব তিল। এই ত্রিনিবগুলিকে আমি সৌভাগ্যের চিহ্ন বলে মনে করেছি এবং মঙ্গলচিহ্নের প্রতীক বলে গ্রহণ করি, চাবুকটি ইঙ্গিত করে যে আমি হব আপনার শাস্তিদানের বহু, আমি হব আপনার শাসক, শিক্ষাদাতা এবং পরিচালক। গোলকটি সূচনা করে যে এই গোলাকার পৃথিবী আমার সৈন্যবাহিনী দ্বারা শাসিত হবে, আপনার সম্পদের অংশরূপে সুবর্ণ পাত্র স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে যে আপনার সমস্ত সম্পত্তি আমার নিকট হস্তান্তরিত হবে। অসংখ্য তিলশস্য সূচনা করে যে এইগুলি অর্গণিত হলেও অতীব মঙ্গল পদার্থ এবং সমস্ত খাদ্যশস্যের মধ্যে সর্বাধিক কম বিষাদ।

এই সমস্ত ত্রয়ের পরিবর্তে আমি আপনার নিকট প্রেরণ করছি একমাত্র সর্বপ; আপনি এই সর্বপ আস্থান করলেই ধারণা করতে পারবেন আমার বৃদ্ধ বিজয়ের তীব্র স্বাদ। আপনি অহঙ্কারের বশে আশ্চর্যে ক্ষীণ হয়েছেন, আপনার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দেখে মদমত্ত হয়ে নিজেকে পৃথিবীতে বিধাতা বলে মনে করেন; আপনি নিজেকে স্বর্গরাজ্যধিপতি বলে ঘোষণা করেছেন। আপনার সুবিশাল সৈন্যবাহিনী, আপনার রণসজ্জা, আপনার শৌর্ভ দ্বারা আমার অন্তরে ভয় সঞ্চার করতে প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য আমি স্থির বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরের অমুগ্রহে সর্বশক্তিমান বিধাতা আপনার অহঙ্কার বিচূর্ণ করবেন। আপনি যে পরিমাণে নিজেকে ক্ষীণ মনে করেন, বিধাতা সেই পরিমাণে আপনাকে সঙ্কুচিত করবেন এবং আমাকে জয়যুক্ত করবেন। ভগবানের করুণার উপর আমার বিশ্বাস আছে, আমার নির্ভরতা আছে, আমার বিদায়-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

তারপর আরম্ভ হ'ল সেই ভীষণ যুদ্ধ। প্রথমে পদাতিক, তারপর অশ্বারোহী, তারপর সেনাপতিবৃন্দ; তার মধ্যস্থলে গ্রীকবীর ও পারস্য-সম্রাট। দরায়ুস হলেন পরাজিত, তিনি ইউক্রেতীস নদী অতিক্রম করে পলায়ন করলেন। পরে প্রস্তাব করলেন সন্ধি বিনিময়ে অর্ধেক রাজত্ব। সৈন্যবাহিনীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে আলেকজান্ডার অবতীর্ণ হলেন দ্বিতীয়বার সন্দ্রোমে।—এবার তিনি জয় করলেন পারস্যরাজের সমস্ত সাম্রাজ্য। তারপর আবার লিখলেন চরম-পত্র দরায়ুসের নিকট। সেই পত্র ছিল বিজয়তার লিপি বিজিতের নিকট।

আলেকজান্ডারের শেষ পত্র

দরায়ুস। এই নামেই আপনি পরিচিত। আপনার সমনামা পূর্বপুরুষ দরায়ুস একদা সাগর-বেলাবেটনবন্দা গ্রীক নগরগুলি ধ্বংস

করেছিলেন, তারপর আবার গ্রীক উপনিবেশগুলি নষ্ট করলেন।... তাঁর সেনাপতি মারদানিয়াস গ্রীসের সমস্ত উর্বর ভূমিখণ্ড, বহু নগরগুলি ভূমিসাৎ করেছিলেন। তারপর এসেছিল ম্যাসিডনের চূর্তাগা—আমার পিতা ফিলিপের হত্যা।—সে হত্যার প্রচ্ছদপট রচনা করেছিল পারস্যরাজ্যের প্রেরণা ও উৎকোচ।

আপনারা অত্যন্তভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করেন, ভীষণ মতন যুদ্ধ পরিচালনা করেন—শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে উপস্থিত হতে সাহস পান না—তাই শত্রুর নিধনের জন্য গুপ্তহত্যার ব্যবস্থা করেন। আপনি শুধু আমার গুপ্তহত্যার জন্য এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন—আপনিই আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সুবিশাল বাহিনী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন, আমি আজ যে যুদ্ধ পরিচালনা করছি—সে আমার আশ্চর্যকার জয়। স্বর্গের দেবতা আজ আমাকে আপনার রাজ্যের বহুলাংশ জয় করতে সুযোগ দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, আমার কার্যের পশ্চাতে সত্য ও সততা আছে। আপনাকে আমি সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজিত করেছি। যদিও আমি কৃতজ্ঞতা বা নীতির অহুরোধে আপনার কোন অমুরোধ রক্ষা করতে বাধ্য নই, তবু আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—যদি আপনি পরাজিত বন্দিরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হন, আমি আপনার মহিষী ও সম্ভানসম্পত্তিদের মুক্তি দেব—তার জন্য কোন মুক্তিযুক্ত্য গ্রহণ করব না। যুদ্ধবিজয়ী রূপে আপনি বখেটে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আপনি দেখতে পাবেন যে আমি পরাজিত শত্রুর প্রতি সম্মানসূচক ব্যবহার করতে জানি। যদি আপনি মনে কোন সন্দেহ পোষণ করেন, তবে দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন, তারা আপনার পার্শ্বদেশ রক্ষা করবে। ইতিমধ্যে যদি আপনার কখনো আলেকজান্ডারের নিকট পত্র লেখার অবসর হয়, তখন স্বরণ রাখবেন যে, আপনি তাকে শুধু সম্রাট আলেকজান্ডার বলে সম্ভাষণ করবেন না, আপনার সম্রাট বলেই সম্ভাষণ করবেন।

পত্র-পরিণাম :—পরিশেষে ৩৩১ খৃঃ পূর্বাব্দে আলেকজান্ডার তাইগ্রীস নদী অতিক্রম করে আরবেলা রণক্ষেত্রে পারস্যরাজ দরায়ুসকে পরাস্ত করেন, এবং পঁচিশ বৎসর বয়সে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। দরায়ুস তাঁর একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা কর্তৃক নিহত হন। অবশ্য জীবিতকালে তিনি আলেকজান্ডারের বশতা স্বীকার করেন নি।

নিরো-জননী এগ্রিপিনার পত্র

পত্র পরিচয় :—রোমান সম্রাট নৃশংস নিরোর নাম ইতিহাস-পাঠকের নিকট অপরিচিত নয়। 'Rome burnt, Nero fiddled', রোম পুড়ে ভয় হয়ে গেল; নিরো টাইবার নদীতে নৌকা-বিহার করে অগ্নিশিখার উৎসব উপভোগ করলেন। মাতা এগ্রিপিনার চক্রান্তে নিরো সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। মাতার বড়বড়ের তার সমস্ত জাতি শত্রুদের বিবপানে হত্যা করান হয়। পরিশেষে অমৃতের পরিহাসে নিরো তাঁর মাতা এগ্রিপিনাকে পুত্র-হত্যার বড়বড়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

নিরোর মতন কুৎসিত পুরুষ তখন রোমান সাম্রাজ্যে কেউ ছিল না। অথচ বহুরা তাকে স্তম্ভের দেবতা এপোলো বলে সম্ভাষণ করলে তিনি ধূসী হতেন। কখনো কোন বহু অথবা

কর্ণচারীর উপর অসন্তুষ্ট হলে নিরো আত্মহত্যার উপকারিতা সবচে পত্র লিখতেন, এই পত্রের ইচ্ছিত অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর দার্শনিক বন্ধু সেনেকা এমনি একখানা ইচ্ছিতপূর্ণ পত্র পেয়ে তরবারির আঘাতে বহুস্তে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

একদা নিরোর বাব্বী পাণাইয়া সাবিনা ঈর্ষান্বিত হয়ে সম্রাট-মাতা এগ্রিপিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে, এগ্রিপিনা তাঁর পুত্র সম্রাট নিরোকে হত্যা করিবার জন্ত বড়বন্দু করেছেন। অথচ একদিন এই এগ্রিপিনা তাঁর তৃতীয় স্বামী ক্লডিয়াসকে হত্যা করেছিলেন—নিরোর সিংহাসন নিরুপেক্ষ করিবার জন্ত। পুত্রহত্যার বড়বন্দু অভিযুক্ত এগ্রিপিনা ক্রুদ্ধ হয়ে সম্রাট নিরোকে একখানা পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে তদানীন্তন রোমের অধঃপতনের কাহিনী, ক্রুদ্ধা কণিনী মাতার গর্জন, আক্ষেপ, আবেদন নিবেদনের মধ্যে কুটে উঠেছে। এই পত্র রোমের ইতিহাসের অমূল্য মণি।

সম্রাট নিরো, আমার পুত্র নিরো! তুমি কি সন্তানের প্রতি মাতার সমতার সংবাদ রাখ না? তুমি কি জান না, সন্তানের প্রতি মাতার প্রীতি কত গভীর, কত অসীম? নিরন্তর স্নেহের একটু প্রবাহে মাতার হৃদয়কে পূর্ণ করে দেয় কে? স্নেহের উৎস মাতা ভিন্ন আর কেউ জানে না: মাতা নিজের জীবনের বিনিময়ে যে বস্তু আহরণ করেন—তার চেয়ে প্রিয় আর কি আছে? সন্তান ধারণের জন্ত মাতা যে দুঃখ, যে যাতনা সহ করে, তার চেয়ে মূল্যবান বস্তু আর কি আছে? মাতা যদি সন্তানের স্বপ্ন না দেখত তবে হয়ত সে সন্তান ধারণের অসহ যন্ত্রণা সহ করতে পারত না,—সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি বিলোপ হয়ে যেত।

নিরো! তোমার কি স্বরণ নেই তোমাকে আমি জঠরে ধারণ করেছি, আমার রক্ত দিয়ে তোমাকে পালন করেছি। তুমি কি করে বিশ্বাস কর যে, আমি এত দুঃখে কষ্টে যে সন্তানকে ধরণীতে এনেছি, পালন করেছি, সিংহাসনে বসিয়েছি, আমার সেই দুঃখের ধনকে আমি বিনাশ করব? হয়ত আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দেবতার অভিলাষের কল, কারণ সন্তান-স্নেহের আতিশয্যে দেবতাকে আমি অবহেলা করেছি। তাই বোধ হয় দেবতা আমাকে শাস্তি দিতে চান।

হতভাগিনী এগ্রিপিনা! তোমাকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে! তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা' তুমি কখনো কল্পনা করতে পারনি। তোমার সবচে অজ্ঞ কেউ কখনো কল্পনা করতে পারেনি।...আজ আমার 'সম্রাজ্ঞী' আখ্যায় কোন মূল্য নেই। আমি সন্তান-হত্যার বড়বন্দু করেছি! হি! হি! কি ঘৃণ্য অভিযোগ! এই অভিযোগ শুনে পৃথিবীর নিকৃষ্টতমা নারীও শিহরে উঠবে! আমি বুঝেছি রাজপুত্রী পুতিগন্ধ যে গ্রহণ করেছে, সে সত্যই হুর্ভাগ্য! রাজপুত্রীর স্পর্শে অতি বড় জামীও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। রাজপুত্রীর প্রশান্তিও ভয়ঙ্কর। না, না, আমি রাজপুত্রীকে অপরাধী করব কেন? তবু বলব এই রাজপুত্রীর সান্নিধ্যই ত আমার বিরুদ্ধে বড়বন্দুর প্রচ্ছদপট! নয় কি নিরো!

নিরো! তুমি বলতে পার—আমি কী লোভে তোমার বিরুদ্ধে বড়বন্দু করব? কেন তোমার প্রাণনাশের বড়বন্দু করব? তোমার কি স্বরণ নেই, তোমাকে সিংহাসনে বসাবার জন্ত আমি কি না করেছি? কি জন্ত আমি তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করব? কোন্ লোভে আমার হুর্ভাগ্য টেনে আনব? তোমার ধ্বংসের উপর আমি কোন্ প্রাসাদ রচনা করব? এ যে আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি জানি সাম্রাজ্যের লোভে অনেক সময় মানুষ প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে। এই প্রকার দোষভ্রষ্ট মানুষের পক্ষে চরমতম শাস্তিও বখেই নয়। উচ্চাভিলাষ সমস্ত অজ্ঞায়কে অভিভ্রম করে যায় ততক্ষণ, বতক্ষণ মানুষ তার অভীষ্ট বস্তুর দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু আমার অভীষ্ট ত তুমি, আমার সন্তান নিরো।... না না, আমি তোমার হত্যার বড়বন্দু করতে পারি না—এ অসম্ভব! আমি যদি তাই করে থাকি তবে কোন্ দেবতার কৃপা-বারি সিকনে আমার পাপ প্রক্ষালিত হবে?

আবার বলি সম্রাট নিরো! তোমার শিরে বুকুট পরাবার জন্ত আমি কত দুঃখ সয়েছি তা কি তোমার স্বরণ নেই? বাক সে সব অতীতের ঘটনা স্বরণ করিয়ে দিয়ে তোমার কৃতজ্ঞতার অপমান করব না, আমার নির্দোষিতা আত্মপক্ষ সমর্থন করবে না; বরং তোমার ভ্রম-বিচারের উপর নির্ভর করবে।

বিদায়—

তোমার জননী

পত্র পরিণাম :—নিরো বিজ্ঞ জননীর পত্রদ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি, মাতার অপরাধ সবচে নিঃসন্দেহ হন নি। নিরো মাতৃহত্যার আদেশ দিলেন। ৫১ খৃঃ-অর্ধে রাজমাতা সম্রাজ্ঞী এগ্রিপিনাকে শ্বাসক্রম করে হত্যা করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী এগ্রিপিনার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া সাবিনা সম্রাট নিরোকে সেই আনন্দ-সংবাদ দিতে এলেন। নিরো মাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে বোধ হয় চঞ্চল হয়ে উঠলেন—সাবিনাকে পর্দাঘাত করলেন, অস্তঃসত্বা সাবিনা সে আঘাত সহ করতে পারে নি। এই বড়বন্দুর মূলে ছিল এই কৃটবুদ্ধি সাবিনা।

চৌদ্দ বৎসর রাজত্বের পর নিরো রোমান সিনেটের নির্দেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু নিরো স্বয়ং তরবারির আঘাতে আত্মহত্যা করে ঘাতকের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন।

মহাকবি গ্যোটার প্রেমপত্র

১৮১১ খৃঃ গ্যোটার দিয়ান কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্য-গুচ্ছে এক কবোক্ষ ভাব প্রকাশ পেয়েছিল। কবির কবিতা তখন প্রায় স্তব্ধ। প্রেমাত্মরূপে রঞ্জিত দিয়ান-কাব্যগ্রন্থটি। এই কাব্যের মধ্যে পারসিক কবি হাকিজ কবিকে প্রেরণা দিয়েছিল। হাকিজের মানসী হাকিজকে যেমন উদীপ্ত করেছিল প্রেমের এক বাসনার ক্ষেত্রে অল্পরূপভাবে গ্যোটার প্রেমকে দীপাবিত করেছিল মারিরানি কন ছিলমেয়ার। ইনি ছিলেন ফ্রান্সকার্টের জর্মনক ব্যাক-ব্যবসায়ীর পত্নী। জীমতীর স্বামী গ্যোটার বন্ধু ছিলেন। জীমতী মারিরানি কবির সঙ্গে কাব্যজগতে একা অল্পভব করেছিলেন। সে সখ্যের মধ্যে কবির সুরের সঙ্গে জীমতী মারিরানির অল্পভবের সুর উচ্চল হয়ে উৎসাহিত হয়েছিল। গ্যোটে জীমতীকে উচ্চ

করে করেকটি কবিতা লিখেছিলেন। উত্তরে শ্রীমতী কবিতা লিখে স্যোটেকে নিবেদন করেন। শ্রীমতীর কবিতা এতই গূঢ়সংকারী হয়েছিল যে, সেই কবিতাগুলি মহাকবি নিজের সঙ্কলনে স্থান দেন। অবশ্য সেই কবিতাগুলি কবির নামেই প্রকাশিত হয়েছিল; শ্রীমতী মরিয়ানি-লিখিত কবিতাগুলো কবিগুরুকে প্রায়ই পরিমার্জন করতে হয়নি। কয়েকখানি পত্রের অমুবাদ দেওয়া হল।

অক্টোবর, ১৮১১।

আমি কিয়ান পড়ছি, কতবার যে পড়েছি তার শেষ নাই। যে ভাব বা অহুভূতি আমাকে আশ্রয় করেছিল তার বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়। আমার আমিও আর আমার অন্তরাত্মা তোমার মিকট স্বচ্ছভাবে ধরা পড়েছে। বাস্তবিক এ-আমি বিশ্বাস করি। আর এ বিশ্বাসবোধের কারণও আছে। কারণ এই যে, আমার অন্তর তোমার সামনে উন্মুক্ত তা তুমি দেখতে পাও—তাই বর্ণনার লাভ নাই। বর্ণনার তা তোমার কাছে পূর্ণবলে মনে হবে না। তুমি কেনেও ছিলে এবং বুঝেও ছিলে যে, আমার ভিতর কী ঝড় বইছিলো। নিজের কাছে আমি নিজেই অভিজ্ঞত হয়ে পড়েছিলাম। নব্রতাবে ও গর্ভভাবে আমি লজ্জিত হয়েছিলাম—আনন্দিতও হয়েছিলাম। সবই স্বপ্নের মত বলে আমার কাছে মনে হয়েছিল। স্বপ্নের মধ্যে একজন তার আপনজনের মূর্তিকে খুঁজে পায়, ফলে তার মধ্যে আনন্দ সঞ্চারিত হয়, কারণ এর মধ্যে সে একজন প্রেরকে ও প্রেরকে খুঁজে পায়। আমাদের অভ্রান্ত দৃঢ় সহযোগিতা ছিল, এইটাই প্রেররূপ—যার মধ্যে আমাদের গুণাবলী বর্তমান। এই গুণাবলী সব সময় আমরা পাই না। তাই অল্প কিছু আবিষ্কার করি—প্রত্যয়লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সব সময় এ গুলি আমরা পাইনা, তবে এর মধ্যে উজ্জীবনী শক্তি আছে।

ইতি—

মনোমোহিনী মরিয়ানি,

আমার কথা না শুনে তুমি আর ব্যাভেনে থেক না। তোমার মধুর অধর নিঃসৃত বাণী আমি শুনছি এই জন্ত যে, তোমার নীরবতা ভেঙেছে। আমি জানি তুমি তোমার স্বামীর কাছে অচ্ছন্ত, তোমার স্বামী আমাকে অভ্যর্থনা জানান। এতে আমার অহুভূতি তোমার সামনে জাগিয়ে তোলা হয়। কেন তুমি নীরবে ছিলে? এখন বল—ওগো বল—আমার কথা তুমি ভাবছ। আমাকে বলতে দাও যে, তোমার অহুভূতির সাড়া আমি দিয়েছি আর দিয়েছি আমার সমগ্র জগৎ। কবি হাকিম বর্ণিত আমি যদি বার্তাবহ দূত হতাম তাহলে তোমার সামনে আমি হাকিম হতাম। আমাকে বার্তাবহ দূত হিসাবে স্বাগত না জানিয়ে তখন হৃদয় স্বয়ং তুমি আমাকে অভ্যর্থনা জানাবে। এই আশা নিয়ে ধায়ছি যে আমরা ওইখানে ছিলাম। ইতি—

২।১২।১৮৩০

• এর পর বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে লিখলেন :

আমাদের সমবেত মিলন, বিরহ ও আশার পরে আমরা যদি নিজেদের আনন্দের কথা মা ভাবি তাহলে খুঁটমাস আগমন উপলক্ষে অন্ততঃ আমরা অপূয়ের জন্ত ভাববো।

• শ্রীমতী ও শ্রীমতী ছিলেনেরায়কে অর্থাৎ মরিয়ানি এবং মরিয়ানির স্বামীকে।

এর কিছুদিন পূর্বে প্রখ্যাত দার্শনিক হেগেল মারা বান কলেরার আর্ন্তদের সাহায্যের জন্ত হেগেল রাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রেরসীকে লিখলেন :

যে বছর চলে গেছে সে বছরের আলোকমণ্ডিত বর্তিকারে ভোলা যায় না। তোমাকে অভ্যর্থনা জানাই। তোমার অহু হয়েছিল তাই আমি উদ্গ্রীব কারণ তোমার কুরূপ প্রতিটি মুহূর্তে সব কিছু পূর্ণ করে। এক হৃৎস্পন্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল এশিয়ার দৈত্য কলেরা মহামারী দেখা দিয়েছে, সকলে এই সংক্রামক রোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্ত পালাচ্ছে। ডাক্তারদের ভবিষ্যৎ বাণী বৃথা প্রতিশ্রুত হয়েছে। বসন্তবাতাস একে দূরে সরিয়ে যে দেয়। রোগ ভয়ে মানুষ ভীত হয়ে পড়েছে। ইতি—

তোমার প্রতি আমার কত আনুগত্য জানি। তোমার মহান স্বামীকে নিয়েই বিপদ! বয়সের কড়াকড়ি হাতের লাগে যখন দেহ ও মন কার্যক্ষম থাকে। এইখানেই আমার নৈপুণ্য। বয়স আমার কাছ থেকে ভয় জিনিষটাই নেয়। আমার প্রিয়তম, গত গ্রীষ্মে আমার গৃহস্থালি কাজের সমস্তার সমাধান করে দিয়েছিলে—তোমার পক্ষে এই ক্ষীণে ঘর-দুয়ারগুলো এই ক্ষীণকালে সাজিয়ে দেওয়া কী সম্ভব হবে। তোমার মুখে যাতে হাসি ফুটে ওঠে তার জন্ত কী পাঠাব, তুমি কিছু খাবার পাঠিও—অন্তর শুদ্ধ হচ্ছে; হৃদয়শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। ইতি

১০।২।১৮৩২

চিঠি পাঠাই তোমাকে। যে জীবন অতিক্রান্ত হয় তা চিঠির মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। এই চিঠিগুলোর মধ্যে তুমি বিশ্বাস নিতে পারো। কাজে অগ্রসর হও—অবশ্য বাধা আসবে। তবু তার মধ্যে থাকবে সার্থকতা, সৌন্দর্যময়তা। তোমার উৎসাহ আমাকে অপরিবর্তিত রাখে। আমার কাছ থেকে না পেলেও আমাকে চিঠি দিও। চিঠি না পাওয়ার জন্ত পত্র দিতে দেবী কর না; কারণ আমার পত্রের পর তোমার উত্তর এলে বহু দেবী হয়ে যাবে। ইতি

মোপাঁসা ও কুমারী মরিয়ানি বাস্কারসেক-এর

পত্র-বিনিময়

পত্র পরিচয়:—মরিয়ানি বাস্কারসেক জন্মে রাশিয়ান। মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই বাসকা তাঁর বিখ্যাত দিন-লিপি লিখতে আরম্ভ করেন। বাস্কারসেকের মাত্র ২৪ বৎসর ছিল পরমায়ু। বন্দারোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বেশ বুরতে পারলেন যে তাঁর পৃথিবীর দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই আরম্ভ করলেন জীবনে বিদেহ উপভোগ। সে উপভোগ লেখার মধ্য দিয়ে, কল্পিত বা বাস্তব মানুষের কাছে প্রের নিবেদনে। কখনো মানুষকে করতেন লুন্ড, কখনো আহত, কখনো আশাবিহীন, কখনো বিজ্ঞান। তাঁর লেখার মধ্যে ছিল আবেগ, ভাবের অকুপণ প্রকাশ, প্রচুর রসপরিবেশন, অপকুপ শব্দবিভাস। তিনি প্রথমেই ছিন্ন করতেন তাঁর পত্রাখাতের পাত্র, পরে নিক্ষেপ করতেন পত্র-শয়। সেই শরে আহত হল লন্ডাট দ্বিতীয় ক্যান্সিস, দ্বিতীয় হেমিলটন, বিখ্যাত কবি জোলা, গনকোট, এবং ইউরোপের বহু শিল্পী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, সৈনিক আরও কত কে! অনেক সময় তিনি

তার একান্ত প্রিয়তমকে বলনা করে লিখতেন পত্র, সে চিঠি থাকত টবিলের উপরে, সেই পত্রের উত্তর দিতেন নিজেই—কল্পিত প্রেমিকের মাসন থেকে, তিনি কখনো পুরুষ, কখনো নারীরূপে নিজের পত্রা জমুভব করতেন।

জীবনের শেষ দিকে তিনি মোর্পাসার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের লাভ সম্ভব করতে পারেন নি। মোর্পাসার লেখনীর প্রসঙ্গিতে সমস্ত ইউরোপ তখন মুগ্ধবিত। তাঁর সৌন্দর্যের খ্যাতি তখন বহু নারীর কামনার ধন—মোর্পাসাকে স্তম্ভের দেবতা “এপলো” নামে সম্মান করত। মিস্ বাসকা মোর্পাসাকে লিখলেন পত্র, ছদ্মনাম মিস্ হেস্টিন্সের আবেশে।

মোর্পাসাও খুব রসিক লোক। তিনি নিজের সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর রূপ সুন্দর, লেখা সুন্দর, তাঁর খ্যাতির বিস্তৃতি বহুদূর; তিনি নারীর সাধনার ধন। সুতরাং তিনিও অপরিচিতা নারীর পত্রের উত্তর দিলেন—তাঁদের মধ্যে বহু পত্র-বিনিময় হল—কেউ কাউকে চিনে না, জানে না, অথচ জানবার এবং জামাবার কৌতূহল তাঁদের অপরিণীম। এই পত্রদ্বারার মধ্যে লেখক-লেখিকার মনের বিচিত্র গতির সন্ধান পাওয়া যায়:—

মারিয়ার চিঠি

“হে ভদ্রমহোদয়! আমি আপনার লেখা পড়েছি। হাঁ, বলতে পারি, ভালই লেগেছে। আপনি খামিকের নিষ্ঠা নিয়ে প্রকৃতির পট রচনা করেন, প্রকৃতির প্রেরণা আপনার অতি অনবদ্য; আপনি আপনার পাঠককে এরূপ অপরূপ মানবীয় ভাব দ্বারা স্পর্শ করেন যে, আমি মনে করি যেন আপনি বৃষ্টি ঠিক আমাকেই আপনার লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুতরাং আমি আপনাকে আমার অহং সজ্ঞা দিয়েই ভালবাসি। আপনি কি মনে করেন যে, এই স্তম্ভ সম্পূর্ণ অর্ধহীন? সত্যি করে বলুন ত, আমাকে বিভ্রান্ত করতেন না।

আপনি বুঝতেই পারছেন যে, আপনাকে আমার অনেক নূতন ও মনোরম কথা বলবার আছে, কিন্তু সমস্ত কথা একসঙ্গে একেবারে বলা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমার দুঃখ এই যে, আপনি মহৎ। আপনার সুন্দর মনের আধার হব, এই সুখকর কল্পনা দ্বারা আমি উদ্ভূত—এই কথা জানিয়ে আমি আপনাকে প্রেরণা দিতে অপারগ, সুতরাং ইহা আমার কম সমুদায়ের বিষয় নয়।

অবশ্য আপনার পত্র যদি সুন্দর না হয়ে থাকে, স্তম্ভের উপাদান যদি আপনার পত্র না নিহিত থাকে, তবে আপনার উত্তর আমি দুঃখিত কিছুই। আমার মনের সুবর্ণবেদীতে আপনার আসন রচনা করে সেব্যমার কাব্য রচনার উৎসাহিত করব, অল্প চিন্তা আপনার মন স্তম্ভ করে দেব।

গত এক বৎসর আপনি আমাকে লিখব ভাবছি—কয়েক বার লিখবার উত্তোলন করেছিলাম—শেষ পর্যন্ত লেখাই হল না; ভাবলাম, হয়ত আমার পত্রের অবস্থা প্রশংসা করছি—সেটা অসুচি। ছদ্মনামে একটা খবরের কাগজে দেখলাম, কোন অনামিকা কীর্ত্যাদিক প্রশংসা করে স্তম্ভ জ্ঞাপন করেছে এবং আপনাকে উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁর ঠিকানা করেছে। আপনার সেই বিজ্ঞপ্তি পাঠ করে আমি

ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলাম; আপনার কবি-প্রতিভা আমাকে নূতন করে অভিভূত করল, তাই লিখছি আপনাকে এই পত্র।

আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি আপনার নিকট আমার পরিচয় প্রকাশ করব না। আপনাকে আমি দূর থেকে দেখব না, কারণ আপনার রূপ আমাকে আনন্দ দেবে কি না কে বলতে পারে? তবে আমি আপনার সম্বন্ধে জানি যে, আপনি তরুণ, আপনি অবিবাহিত। এই দুইটি তথ্যই যে-কোন মানুষকে দূর থেকে প্রশংসা করবার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু আপনার নিকট গোপন করব না যে, আমি খুবই সুন্দরী। এই একটি মাত্র সত্যই আপনাকে আমার পত্রের উত্তর দিতে উৎসাহিত করবে। যদি আমি পুরুষ হতাম, আমি আপনাকে কোন পত্রই লিখতাম না। বৃদ্ধা ইংরেজ রমণীর কুৎসিতদর্শন আকৃতি নিয়ে আমি আপনাকে প্রশংসা-পত্রও লিখতাম না।”

ইতি—মিস্ হেস্টিন্স।

মোর্পাসার চিঠি

“হে ভদ্রমহিলা! আমার পত্র আপনার আশার অসুন্দর হতে না। প্রথমেই বলব যে, আপনার সম্ভবত্বের উত্তর, আপনার প্রশংসার উত্তর, আপনাকে ধন্যবাদ। যাক, এবার বাস্তবজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের মতন কথা বলব।

আপনি আমার মনের আধার হতে ইচ্ছা করেন, বলুন তো কোন অধিকারে? আমি আপনাকে জানি না, আপনার মন, প্রবৃত্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা আমার মনের স্তরে বাঁধা না-ও থাকতে পারে। আমি আমার নারীবন্ধুদের যে কথা খুব আন্তরিকভাবে, আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি, তা আপনাকে কি করে বলব? আপনার সঙ্গে আমার অকপট আলাপ কি নির্কোথের কাজ হবে না? আমার বাকবীদ্যের প্রতি বিশ্বাসহীনতা হবে না?

মানুষের সঙ্গে পত্র-বিনিময়ে কি তাঁর মনের সঙ্গে কোন প্রীতির বন্ধন স্থাপন করতে পারে? পুরুষ নারীর প্রীতির মাধুর্য বহুলাংশে আসে তাদের সাহচর্যের আনন্দ থেকে, পরস্পর আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে। পুরুষ নারীর চকল নরন ও পত্রের ছিন্ন অক্ষর বিভ্রাসের অন্তর্ভালে যে সুন্দর অদৃশ্য মূর্তিটি অঙ্কিত হয়ে উঠে তাঁর সুন্দর ছবিটি কল্পনা করে পুরুষ নারীর পবিত্র প্রেম জন্মে, একথা কি সত্য নয়?

যার রূপ জানি না, যার কেশের বর্ণ দেখিনি, যার হাসির বক্রার তুলনা, তার কাছে অন্তরের আবেদন কি করে ফুটিয়ে তুলব? কি করে অন্তরের গোপন বাণী প্রকাশ করব?

আপনি আমার একখানি আধুনিক পত্রের উল্লেখ করেছেন। এই লিপিবানির লেখক একজন পুরুষ। তিনি আমার কাছে কোন এক বিষয় উপদেশ চেয়ে পাঠিয়েছেন। দেখলেন ত ব্যাপারখানা? এখন বুঝুন, একজন অপরিচিতা নারীর পত্রের উত্তর দেওয়া কি সমস্ত? গত দুই বৎসরে আমি প্রায় ৫০-৬০ খানি পত্র পেয়েছি। এই সব পত্র দ্বারা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেক নারীও আছেন। সেই সমস্ত নারীর মধ্যে আমি কি উপায়ে নিজের মনের আধার খুঁজে বার করব?

যখন সেই সব লেখিকা নিজের পরিচয় প্রকাশ করবেন, তখন সমাজে এসে মিশবেন, তখনই বাস্তবতা ও আন্তরিকতার প্রেরণা উঠতে পারে। তা না হলে আমি আমার প্রিয়দর্শন একজন অপরিচিতা, এমন কি অপরূপ সুন্দরী অপরিচিতার জন্তও আমার পুরাতন বাস্তবীদের অবহেলা করব কেন? আমার অপরিচিতা হয়ত দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত হবে এবং তার মানসিক বৃত্তিও অত্যন্ত নীচ স্তরের হতে পারে। এই কাজটি মোটেই পুরুষোচিত হবে না—কি বলেন? যদি আমি আপনার নিকট নিজেকে নিবেদন করি, তবে সে নিবেদন কি আমার নিজের মহুযাঙ্কের প্রতি বিশ্বাসহীনতা হবে না?

ভদ্রে! বাস্তব মাহুযাঙ্কের বৃত্তিকে ক্ষমা করবেন, কারণ এটা কবির কাজ নয়।

ইতি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ ও অহুভক্ত।

ডা. মোর্গাসা।

পুনশ্চ:—আমার পত্রের অনেক স্থান বুছে দেওয়া হয়েছে, তার জন্ত ক্ষমা করবেন। কাবণ সব পত্রখানি পুনরায় নুতন করে লিখবার সময় নেই।

পত্র-পরিণাম:—এইরূপ পত্র-বিনিময় চলেছিল কিছু কাল ধরে। মারিয়া হলনামরী। তিনি লিখলেন:—“প্রিয় মোর্গাসা,

আমি জানি আপনি খুব জনপ্রিয়। সত্যি কিন্তু আপনি তা না আপনার একান্ত প্রিয়তমা হতে আমি ইচ্ছা করি। তার জে আমি অধিকতর মনোবন্দী”।

ক্রমে মোর্গাসার মনে হল এই মিস্ হেস্টিংস নামধারী লেখিকা পুরুষ মাত্র এবং সেই ধারণার বশীভূত হয়ে তিনি পত্রের রূপ পরিবর্তন করলেন। মারিয়া ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে লেখা বন্ধ করলেন। কি মারিয়ার নীরবতার মোর্গাসার কৌতূহল বেড়ে গেল। তিনি মিস্ হেস্টিংস-এর সত্য পরিচয়ের জন্ত উৎসাহ হয়ে উঠলেন, কিন্তু মারিা কিছুতেই নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন না।

শেষ পর্যন্ত মোর্গাসার আগ্রহাতিশয্যে মারিয়া মোর্গাসা সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু তখন তাঁর মৃত্যুর দিন এগিয়ে এসেছে।

তাঁর সমাধির উপর মোর্গাসার একটি স্মারকলিপি উৎকীর্ণ আছে—“অপূর্ব হলনামরী এই মারিয়া বাস্কারসেক।”

উপরোক্ত পত্রগুলি অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী অনূদিত “বিশ্বের বিচিত্র পত্রাবলী” নামক গ্রন্থটি থেকে গৃহীত হয়েছে। আমরা তাঁর সৌজন্য স্বীকার করি।—স

ডেলী প্যাসেঞ্জার

দিলীপকুমার বসু

আমি নগণ্য কেরানী এক ডেলীপ্যাসেঞ্জার
তাই, শহরের কোনো ঠোঁট-রাঙা নীলিমা রায়
অথবা, কজমাখা যুথিকা দাস ট্রামে-বাসে চড়তে
বা নামতে গিয়ে নজর ফেলবে না মোর পরে।
নারীর সহজাত বুদ্ধিতে তারা জেনেছে
বোজগারের দৌড় আমার মোজার মসজিদ পর্যন্ত :
বাঁট থেকে একশো কুড়িতেই যৌবনের পাতা বাবে ঝরে।
ব্যর্থতার ডিঙি বেয়ে জীবন-সমুদ্রে মোরে হ’তে হবে পার ;
আমি অনিয়মের কলি কাঁধে দিন-বাপনের গ্রানি নিয়ে
উল্লসাসে নিত্য ছুটি স্মৃতি ছাড়া ডেলী প্যাসেঞ্জার।

মনকে বুধা সাধনা দিই, এইতো হয়েছে বেশ,
না হয় হাউইয়ের মতো জলে উঠে হ’লে বাবো শেষ।
হুঃখ কিসের, আমি সব চির ব্যাচিলার।
মোর ভরে দু’ গাঁয়ে পাতার ছায়ার ঢাকা কুঁড়ে ঘরের
আম-জাম-কাঁঠালে ঘেরা প্রৌজনে বসে
হুঃতাক করে কোনো কাজলকালো কমলমণি
অথবা, লাঙ্কুলতা চাকরালো গাঁথবে না হার ;
আমার আসার আশার পথ চেয়ে হুঃ-হুঃ বুক
চকিত নয়নে কেউ কিরিয়ে মুখ চাইবে না বার বার।
হার, আমি যে কেরানী এক ডার, ডেলী প্যাসেঞ্জার।

এমনি ভাবে ছোট্ট মাকেই জীবনে একদিন
মেয়ে আসবে সন্ধ্যা। নিঃসঙ্গ আমি দূর গগনে
কীণ দৃষ্টি নিয়ে আমার ঘরের বারান্দায়
টেলে আনা চেয়ারে বসে তারায় তারায় গড়ে তোলা
ছায়াপথ ধরে হয়তো বা মনের পাখিটি দেব মেলে।
শিরে-শিরে হাওয়ার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে কারো শরিকচিত্তে
সেদিন উঠবে না হলে। সংসারের টুকি-টাকি কথায়, পল্ল-ভজবে,
শব্দার পাশে বসে কেউ আমার হৃদের পাশে এগিয়ে নিয়ে বাবে না ;
হাতের নিস্তকতাটুকু ভরিয়ে তোলার জন্ত আমার কাছে চাবে না।

সংসারের লেন-দেন, বেচা-কেনার হয়ে ^{একদিন} মধু প
নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ আমি হৃদয়হীন এক ব ^{আমি} আনিতার
তাই, বেদিন আমার ডেলী প্যাসেঞ্জার ^{আপন} বিদেহ
হুঃপ্রাণ জানি না স্বর্গে কি নয়থেকে ^{দুঃ} দূঃস্বপ্ন মা
সেদিন সংসার-ঠেপনে ব্যস্ত হ’য়ে ^{ঘরেই} ঘরে, ^{যায়ে,} যায়ে,
জানি, কারো চোখ হ’তে এক ^{রে} বসে, ^{কখনো} কখনো
তবু, শূন্য বুলি নিয়ে পাড়ি দেবার ^{মধ্যে ছিল} মধ্যে ছিল
এটুকু সাধনা নিয়ে বাবো যে, ^{আপন} আপন ^{পাড়া,} পাড়া, পরে
শেষ ক’দিন আমার শুক মর- ^{যাকে} যাকে ^{এক} এক
দুখী মৌসুমী হাওয়ার ওয়ে ^ই জন্ম ^{কোট,} কোট, এবং
অনাধীরা, তবু পরমাধীরা ^{সে।} সে। ^{আপন} আপন ^{কে।} কে। ^{সিসুটার।} সিসুটার।

নিত্যানন্দ; ডাক নাম নিতাই, নিমাইয়ের চেয়ে আট-নয় বছরের বড়। জন্ম বারভূম জেলার একচাকা গ্রামে। বাপের নাম হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ঙ্কা, মায়ের নাম পদ্মাবতী।

ব্রজের যে বলরাম সেই নিত্যানন্দ। শ্রীকৃষ্ণের বলরামকে চাই। তেমনি নিমাইয়ের নিত্যানন্দকে প্রয়োজন। বলরাম যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস তেমনি নিত্যানন্দ নিমাইয়ের। 'নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ।' নিত্যানন্দ নিমাইয়েরই আবির্ভাব-বিশেষ। 'সাক্ষাৎ হলধর।'

‘ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটি সূর্য চন্দ্র ত্রিনি দৌহার নিজধাম ॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্বশৈলে করিলা উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সব জগত-আনন্দ ॥’

সূর্য কী করে? অন্ধকার হরণ করে। আর প্রচ্ছন্নকে প্রকাশিত করে। তেমনি নিমাই-নিতাই দুভাই কী করে? অজ্ঞান হরণ করে। অজ্ঞান কী? তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান কী? শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য আর কৃষ্ণসেবা শুধু কৃষ্ণেরই শ্রীতির জন্মে, এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। আর ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্শের যে বাসনা, যার লক্ষ্য শুধু আত্মপ্রিয়শ্রীতি, তাই অজ্ঞান। সংক্ষেপে, কৃষ্ণভক্তি-কামনা ছাড়া অঙ্গ কামনাই অজ্ঞান।

এই অজ্ঞানের নাম কৈতব। কৈতব মানে আত্মবন্ধনা। জীব যখন ঐহিক বা পার্জাতিক লুখ চায় তখনই সে নিজেকে প্রত্যারণা করে। নিত্য-শাশ্বত সুখ শুধু কৃষ্ণসেবায়, কৃষ্ণভক্তিতে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে নিজের সুখের বা ছুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, ততক্ষণ ভক্তি অমুপস্থিত।

মোক্শবাসনাই শ্রেষ্ঠকৈতব। মায়াধীন জীব যদি নিজেকে মায়াধীন ঈশ্বর মনে করে, তাহলে আর ভক্তি থাকে না, সেব্য-সেবকত্ব থাকে না। শুভাশুভ কর্ম ও কৃষ্ণভক্তির বাধক। শুভকর্মের প্রেরণাও আত্মসুখের বাসনা, আর পাপকর্মের উদ্দেশ্যও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। কিন্তু কৃষ্ণভক্তিতে সুখবাসনার লেশ নেই।

সেই অজ্ঞান। নাশু করে দু-ভাই—নিমাই-নিতাই। শুধু অজ্ঞানই নাশ করেনা, প্রচ্ছন্নবস্ত, তত্ত্ববস্তকেও প্রকাশ করে। তত্ত্ববস্ত কী? তত্ত্ববস্ত কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি আর নামকীর্তন। আর এ তত্ত্ববস্তই আনন্দস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের দুই ভাই

কৃষ্ণভক্তির তিন স্তর। সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি আর প্রেমভক্তি। আর প্রেমভক্তিই প্রগাঢ়তমা।

দুভাই আর কী করে? দুই ভাগবত সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। দুই ভাগবত কী? এক ভাগবত শাস্ত্র, আর এক ভাগবত ভক্ত। 'দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥' ভাগবতসঙ্গ করিয়ে নিমাই-নিতাই ভক্তের বশীভূত হয়ে থাকে। ভক্তের কাছে ভগবানের স্বাতন্ত্র্য কই? ভক্তই ভগবানের হৃদয়, ভগবানও ভক্তের হৃদয়।

সূর্য-চন্দ্র একসঙ্গে ওঠেনা আকাশে। কিন্তু নিমাই-নিতাই একসঙ্গে উঠেছে—“সমকালে দৌহার প্রকাশ।” আর সূর্য-চন্দ্র কি গিরিগুহার অন্ধকার দূর করতে পারে? পারে না। কিন্তু নিমাই-নিতাই মাতৃসুখের চিত্তগুহার অন্ধকার দূর করে। দুই ভাই “হৃদয়ের কালে অন্ধকার।”

নবদ্বীপে গৌরের যেদিন জন্ম হল, সেদিন একচক্রায় নিতাই হুকার করে উঠল। কেউ ভাবল বঙ্গগাত হল বুঝি। কেউ ভাবল বা কামানের গর্জন। কোথায়, কতদূরে?

শিশুকালে ভগবৎলীলার খেলা খেলে নিতাই। বহুদেব দেবকীর বিয়ে দেয়। কারাগার তৈরি করে সকলে মিলে ঘুমোয়, বহুদেব কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসে। শকট তৈরি করে তা আবার ভেঙে ফেলে। অশ্রাণ শিশুদের বক, অঘ, খেহুক সাজিয়ে কৃষ্ণরূপে তাদের নিধন করে। কোনোদিন বা আঙুলে করে পাহাড় তুলে ধরার কসরৎ দেখায়। এত সব কৃষ্ণবাল্যলীলা শিখল কোথায়, কে বলবে?

শিশুকালে ভগবৎলীলার খেলা খেলে।

লীলা করে। কোনো দিন বা শক্তিশেলের আঘাতে মুর্ছা যায়। হনুমানকে দিয়ে গন্ধমাদন আনিয়ে শুষ্ক খেয়ে উঠে বসে। রাবণকে মেরে বিভীষণকে রাজ্য দিয়ে সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় যাত্রা করে। দেশে গিয়ে চার ভাই একত্র হয়।

নিতাইয়ের বয়েস যখন বারো, তখন বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত।

নিতাইকে দেখে তার চমক লাগল। তার বাপ হাড়াইকে জিজ্ঞেস করল,—‘কে এ?’

‘আমার ছেলে।’

‘নাম কী?’

‘কুবের।’

হাসল সন্ন্যাসী। বললে, ‘এ সদানন্দ শিশু আর নিত্যের প্রতি অভিযুক্তী, স্তুরাং এ-ছেলের নাম নিত্যানন্দ।’

রাত্রে অতিথি হল সন্ন্যাসী। সকালে উঠে হাড়াইকে বললে, ‘আমি একটি ভিক্ষে চাই।’

‘কী চাই বলুন?’

‘দেবে?’

‘দেব।’

‘তোমার এই ছেলোটিকে চাই। চিরকালের জন্তে নয়, কিছু দিনের জন্তে। কিছুদিন পরে আবার ও ফিরে আসবে।’

হাড়াই পণ্ডিত কথা রাখল। পদ্মাবতীও বাধা দিলনা।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিতাই বেরুল তীর্থভ্রমণে। প্রথমে বক্রেশ্বর, সেখান থেকে বৈষ্ণাথ, সেখান থেকে গয়া হয়ে কাশী, শিবরাজধানী। গঙ্গা দেখে বড় খুশি নিতাই, স্নান করে, পান করে, তবু যেন আর্তি যায়না। সেখান থেকে প্রয়াগ। প্রয়াগ থেকে পূর্বজন্মান্থান মথুরায়। যমুনার বিশ্রামঘাটে জলকেলি করে, গোবর্ধনপর্বতে গিয়ে বসে থাকে। দ্বাদশবন পরিক্রমা করে কুন্দাবনে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদে। কোথায় কৃষ্ণ? সন্ন্যাসী কিছু বুঝতে পারেনা—কেন এই কান্না? কী করে বুঝবে? সে তো ভক্তির পথের যাত্রী নয়।

নিতাই অবধূত সেজেছে। কিন্তু শিবকে বুকে নিলেও ছদয়ে বাহুদেব।

তারপরে হস্তিনাপুর। ‘বলরামকীর্তি দেখি হস্তিনাপুর। জাহি হলবন, বলি নমস্কার করে।’

সেখান থেকে দ্বারকায়। তারপরে প্রতাস, নৈমিষারণ হয়ে অযোধ্যায়। সেখান থেকে গঙ্গাজন্মভূমি হরিদ্বার। তারপর ঘুরতে ঘুরতে জাবিড়ে, দক্ষিণে। আবার—উত্তরে বদরিকাশ্রমে। এমনি তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ঘুরতে লাগল নিতাই। ‘নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ। ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস ॥’

একদিন স্বামী শঙ্করারণ্যের সঙ্গে দেখা। খুব ভাব হয়ে গেল তার সঙ্গে। কী তার পূর্বাশ্রমের নাম-ঠিকানা জানতে চাইল নিতাই। শঙ্করারণ্য বললে, পূর্বাশ্রমে তার নাম ছিল বিশ্বরূপ, বাড়ি নবদ্বীপ। জগন্নাথ মিশ্র তার পিতা আর তার একটি ভাই আছে, নাম বিশ্বস্তর, ডাকে সবাই নিমাই বলে। কেউ বা বলে গৌর, গৌরা, গৌরাজ। যদি যাও কোনোদিন নবদ্বীপে তাকে দেখে এস।

অমিয়া মথিয়া কে বা লবনি তুলিল গো,

তাহাতে গড়িল গৌরা-দেহ।

জগত ছানিয়া কে বা রস নিজাড়িল গো,

এক কৈল সুধই স্থলেহ ॥

পরে দেখা মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে। যার কৃষ্ণরস-বিনা আহার নেই, কৃষ্ণের বিহার যার দেহে-মনে। ভক্তিরসের যে আদিম সূত্রধার। আকাশে মেঘ দেখলেই যে অচেতন হয়, কৃষ্ণপ্রেমে যে মচপের মত ব্যবহার করে। পরস্পর পরস্পরকে দেখে প্রেমে নিম্পন্দ হয়ে গেল, কাঁদতে বসল গলা ধরে। ঈশ্বরপুরী ও অশ্রাণ শিষ্যরাও কাঁদতে লাগল।

নিত্যানন্দ বললে, ‘যত তীর্থ করলাম এতদিন তার সম্যক ফল আজ মিলল। প্রেমময় কলেবর মাধবেন্দ্রকে দেখলাম। দেখলাম প্রেম কাকে বলে।’

মাধবেন্দ্র বললে, ‘কৃষ্ণ যে আমার প্রতি কৃপালু তা এতদিনে বুঝলাম, নিত্যানন্দের মত তিনি বহু জুটিয়ে দিলেন। যেখানে নিত্যানন্দের প্রেম সেখানেই সর্বতীর্থময় বৈকুণ্ঠ।’

কৃষ্ণনামে যার অহুরাগ হয়েছে তার চিন্তে আর কৌটিল্য নেই, কাঠিগু নেই। সে ক্ষতচিন্ত অর্থাৎ তার চিন্তে জবীভূত হয়েছে। সে শুধু ‘উন্মাদবন-নৃত্যতি লোকবাহঃ।’ লোকে কী বলবে—এর আর সে ধার ধারে না, সে তখন উন্মাদের মত নাচে, হাসে, কাঁদে, গান গায়, আর্তনাদ করে। বাজিকরের হাতে যেমন পুতল তেমনি অহুরাগের হাতে স্তম্ভিত।

“সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়। গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়।”

মাধবেশ্বরের সঙ্গ করে কত দিন চলে গেল খেয়াল নেই—নিতাই চলল সেতুবন্ধ। ধনুতীরে স্নান করে পৌঁছল রামেশ্বরে। সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে নীলাচলচন্দ্রের নগরে। ধ্বজা দেখেই মূর্ছা গেল। আবার জগন্নাথকে দেখে মূর্ছা।

নীলাচল থেকে গঙ্গাসাগর। আবাব সেখান থেকে পুনর্বীর মথুরায়। হাঁটতে-হাঁটতে বৃন্দাবন।

সেখানে আবার ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে দেখা।

‘এখানে কাকে এত খুঁজছ?’ জিজ্ঞেস করল ঈশ্বর।

‘জানোনা কাকে? সেই কোটিমদনবিমোহন অখিললক্ষ্মীচিন্তহারী কৃষ্ণকে।’ বললে নিতাই।

‘সে এখানে কোথায়?’ বললে ঈশ্বর। ‘সে নবদ্বীপে।’

‘নাম কী?’

‘নিমাই পণ্ডিত।’

‘কার ঘর?’

‘শচীমাতার ঘর।’

‘আমি জানি। প্রভুর প্রকাশ হয়েছে নবদ্বীপে।’

আর কথা নেই। নবদ্বীপের দিকে ছুটল নিতাই।

নিমাই পণ্ডিতের কোন্ বাড়ি? জ্যেষ্ঠের রোদ মাথায় করে পথ দিয়ে হাঁটছে নিতাই আর জনে-জনে জিজ্ঞেস করছে,—নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি কোথায়?

সবাই দেখিয়ে দিচ্ছে পথ, নিতাই শেষ পর্যন্ত নিমাইয়ের বাড়িতে না গিয়ে উঠল এসে নন্দন আচার্যের ঘরে।

‘গত রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি,’ সঙ্গীদের বলছে নিমাই, ‘আমার বাড়িতে এক রথ এসে দাঁড়িয়েছে। রথ থেকে নামল এক মহাপুরুষ, প্রকাণ্ড শরীর, কাঁধের উপর বিশাল এক স্তম্ভ। পরনে নীলাম্বর, মাথায়ও নীলবস্ত্র বাঁধা। অবধূতের বেশ, তেজস্কর মূর্তি। প্রবল গঠে জিজ্ঞেস করল আমাকে, এটা কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি? আমি বললুম, ‘তুমি কে? কোন মহাজন?’ সন্ন্যাসী বললে, ‘ভাই হয়ে ভাইকে চিনতে পাচ্ছ না? বেশ, কাল পরিচয় হবে।’ নিমাই ভাঙাল সঙ্গীদের দিকে। ‘তোমরা যাও, মহাপুরুষকে খুঁজে নিয়ে এস। নিশ্চয়ই সে এসেছে নবদ্বীপ, আশ্চর্যগোপন করে আছে।’

বলতে বলতেই বলরামের আবেশ এল নিমাইয়ে, সে গর্জন করে উঠল, ‘মদ আনো, মদ আনো।’

সঙ্গীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। এ কী বলছে নিমাই? মদ পাব কোথায়? মদ দিয়ে কী হবে? নিমাই থাকবে? খাওয়াবে সকলকে?

শ্রীবাস বললে, ‘প্রভু, মদ তো তোমার কাছে।’

‘আমার কাছে?’

‘হ্যাঁ, সেই মদের মালিক তুমি। আর সেই মদিরার নাম প্রেম।’

হাসতে লাগল নিমাই।

শ্রীবাস বললে, ‘অশ্রু লোক সে মদের মাগাল পাবে কি করে যদি তুমি না বিতরণ করো।’ ‘তুমি যাকে বিলোও সেই সে তারে পায়।’

‘আস্বাদ দূরে রছ যার গঞ্জে মাতে মন। আপন বিমু অশ্রু মাধুর্য করায় বিস্মরণ ॥’ শুধু তোমার দয়্য, তুমি সেই মদগঞ্জেই মাতোয়ারা করে দিতে পারো। আর যদি আস্বাদের অধিকারী হতে দাও, তা হলে তো কথাই নেই, উচ্ছিষ্টই আমার মহাপ্রসাদ।

হে আর্ভবাক্ষব, আমাদের কথা শোনো। তুমিই তো একমাত্র নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, তুমিই তো কৃপালু। আর পরহুঃখ বিমোচনের ইচ্ছাই তো কৃপা। কিন্তু তুমি তো দেখছি বাঁশি বাজাতে ব্যস্ত। তোমার মধুর মুরলীরবে তুমি নিজেই বিভোর। সেই সুখালহরী ভেদ করে আমাদের আর্তনাদ কি তোমার কানে পৌঁছবে? কই আর পৌঁছচ্ছে? অবিচার প্রভাবে আতি যে ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না। কিন্তু তুমি তো কৃপাময়, সর্বশক্তিমান, সর্বরক্ষণে সমর্থ। সুতরাং বিশ্বাস করে আছি, তুমি শুনবে। তোমার কাছে আমাদের কাণেশ্বরও গ্রাহ।

নিমাই সঙ্গীদের বললে, ‘তোমরা ঘুরে-ঘুরে দেখ, খোঁজ করো, কোথায় সেই মহাপুরুষ আশ্রয় নিয়েছেন।’

নন্দন আচার্যের ঘরে নিতাই উন্মুখ হয়ে মুহূর্ত গুণছে।

হে ভুবনৈকবন্ধো, হে করুণৈকসিক্কো, তুমি কোথায়? অধরবিশ্বে মধুর, মন্দ হাসে মঞ্জুল, অমৃতনাদে শিশির, দৃষ্টিপাতে শীতল, অরুণনেত্রে বিপুল, বেণুধ্বনিতে বিক্রত—হে মরকতমণিনীল নবকিশোর, কবে দেখব তোমাকে?

কিরে এল নিমাইয়ের সঙ্গীরা, মুরারি মুকুন্দ

শ্রীবাস আর নারায়ণ। বললে, 'নগর তর তর করে
খুঁজেছি, কোথাও মহাপুরুষের দেখা পেলাম না।'

'সব বাড়ি খুঁজেছ ?'

'সব। বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, কোনো ঘরই বাদ
দিইনি। এমন কি পাষাণীদের ঘরও দেখে এসেছি।
কোথাও কেউ নেই।'

মনে মনে হাসল নিমাই। "বড় গুটু নিত্যানন্দ।"
"হুঁবিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ।"

'তুরীয় বিশুদ্ধস্ব সঙ্কর্ষণ নাম।

তঁহো যার অংশ—সেই নিত্যানন্দ রাম ॥'

যিনি সকলের আশ্রয়, সকলের অধ্যক্ষ, সকলের
আশ্চর্য, বিশুদ্ধস্ব সঙ্কর্ষণ তাঁরই অংশ। আর সেই
সঙ্কর্ষণই বলরাম। আর সেই বলরামই নিত্যানন্দ।

ত্রোভায় আবার সেই ছিল লক্ষণ। আগে
ছোট ভাই, এবারে বড়। ছোট-বড় দুই
হয়েই কৃষ্ণের সেবা।

'নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্বে হইলা লক্ষণ।

লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥'

নিমাই বললে, 'চলো আমিও যাই। আরেকবার
খুঁজি।'

তাই চলো।

নিমাই সোজা নন্দন আচার্য্যের ঘরের দিকে
যাওয়া হল।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?' অনুগামীরা প্রশ্ন করল।

'চতুর্ভূজ পণ্ডিতের ছেলে, আমার কীর্তনের সঙ্গী,
নন্দন আচার্য্যের বাড়ি।' নিমাই তাকাল ভক্তদের
দিকে। 'খোঁজ করেছিলে ওখানে ?'

ভক্তবৃন্দ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।
বাড়ির ভিতরে ঢুকে সবাই দেখল বিশালবপু এক
সন্ন্যাসী বসে আছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নলিনত্র,
জ্যোতিমান মধুর মূর্তি। মাথায় নীলবস্ত্র, পরিধানেও
নীলাবর। আনন ধ্যানস্থে পরিপূর্ণ, সদাহাস্ত প্রসন্ন।

নিমাই চিনল। এই তো সেই তার স্বপ্নের
মহাপুরুষ। তার 'প্রাণের ঈশ্বর', নিত্য আনন্দের
উৎসার, নিত্যানন্দ।

আর নিতাই এ কাকে দেখছে ? দণ্ড নেই,
কমণ্ডলু নেই, পরণে ডোর কোঁপীন নেই, নাগরবেশে
এ কে মাধুর্যবারিধি ! কে এই সর্বপ্রাবক উচ্ছলিত
সুখা। নিতাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল নিমাইয়ের
দিকে।

'রসনার লোহে যেন দরশনে পানি।

ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় আণ।

এইমত নিত্যানন্দ হইল স্তম্ভিত।

না বোলে না করে কিছু, সতেই বিস্মিত ॥

নিমাই শ্রীবাসকে বললে, 'ভাগবতের একটি বচন
পড়ো।'

শ্রীবাস তখনি কৃষ্ণকর্ণনার এক শ্লোক পড়ল ;

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং ।

বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালারং ॥

রক্তান বেণোরধরমুখয়া পুরয়ন্ গোপবৃন্দে-

বৃন্দারগ্যাং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীতকীর্তিঃ ।

নটবরমুন্দর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করছে। তাঁর
মাথায় শিখিপুচ্ছ, উভয়কর্ণে কর্ণিকার—ফুল, পরনে
পীত নীল বস্ত্র, গলায় বৈজয়ন্তী। অধর-মুখায় বেণুর
ছিদ্রগুলো ভরে ভরে দিচ্ছে। আর যেখানেই পা
রাখছে সেখানেই চরণচিহ্ন জাগছে রতি শ্রীতি
আনন্দ।

শ্লোক শুনেই নিতাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। যদি
বা জ্ঞান হল, কাঁদতে লাগল, ধূলিতলে গড়াগড়ি
খেতে লাগল। অদ্ভুত কৃষ্ণোন্মাদ আনন্দে লাফাতে
লাগল। সাধি নেই কেউ তাকে ধরে রাখে।
তখন কী হল ? তখন নিমাই এগিয়ে গিয়ে স্পর্শ
করল নিতাইকে।

স্পর্শ করতেই নিতাই নিস্পন্দ হয়ে গেল। আর
নিমাই তখনি তাকে টেনে নিল কোলের মধ্যে। আর
কাঁদতে লাগল অনর্গল।

ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।

শক্তিহত লক্ষণ যেহেন রামকোলে ॥

নিতাইও অশ্রুবিহ্বল। আর অহুচরেরা ? তারা
নিত্যানন্দময়। 'যে অনন্ত নিরক্ষি ধরে বিশ্বস্তর।
আজি তাঁর গর্ভ চূর্ণ—কোলের ভিতর ॥'

কর্তৃকণ পরে দুই ভাই শাস্ত হয়ে বসল। নিমাই
বললে, 'আজ আমার জন্ম সার্থক, ভক্তি কাকে বলে
দেখলাম স্বচক্ষে। এই কম্প আর অশ্রু,
আর এই গর্জন-ছকার ঈশ্বরশক্তি ছাড়া হবার নয়।
তুমিই মৃতিমস্ত কৃষ্ণপ্রেম। তোমাকে ভজনা করলেই
জীবের কৃষ্ণভক্তি মিলবে। তোমার তিলাধ' যে সঙ্গ
করবে তার পাপের বাষ্প পর্যন্ত থাকবে না। তোমাকে
যখন মিলিয়ে দিলেন, তখন আর ভয় নেই, কৃষ্ণ উদ্ধার
করবেন আমাকে। তুমি চতুর্দশ জীবন পবিত্র করতে

পারে, আমি তো কোন ছার। আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী। আমাকেও দাও কৃষ্ণপ্রেম।

স্তুতি শুনে লজ্জিত হল নিতাই। বিনয়বচনে বলতে লাগল, 'অনেক তীর্থ ঘুরে আগছি। যত কৃষ্ণস্থান আছে দেখেছি। স্থানমাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখি কই? সবাইকে জিগেস করি, কৃষ্ণের সিংহাসন পড়ে আছে, কৃষ্ণ কোথায়? কোন্ দেশে পালাল? কৃষ্ণ গেলা কোন ভিত? কেউ কেউ বললে, কৃষ্ণ নবদ্বীপে গিয়েছে। তাই এখানে এসেছি। শুনেছি নবদ্বীপে পজিতের ত্রাণ হবে এবার, তাই, আমি পাতকী, ছুটে এসেছি এখানে।'

ভক্ত অকুগামীর দল দেখতে লাগল ছুজনকে। কেউ বললে, মাধব-শঙ্কর। কেউ বললে, কৃষ্ণ-বলরাম। যেন ছুজনের কতদিনের নিগূঢ় পরিচয়। ঠারে-ঠোরে তাই আলাপ করছে ছুজনে। সাধ্য কি তার এক বর্ণও কেউ বোঝে!

নিতাই বলছে, কানাই, তোর চূড়া কই, বাঁশি কই?

নিমাই বলছে, কই বা তোমার লাঙল-গরু? ত্রাজের খেলা দৌড়োদৌড়ি, নদের খেলা গড়াগড়ি।

নিতাই বলছে, ত্রাজের খেলা বাঁশির তান।

নিমাই বলছে, নদের খেলা হরিগান।

'ত্রাজের বেশ ধড়াচূড়া।' বলছে নিতাই।

'নদের বেশ কোপীন পরা।' বলছে নিমাই।

কেহো বলে 'ছুইজনে বড় পরিচয়।

কিছু না বুঝিয়ে—সব ঠারে কথা কয় ॥'

'এবার উঠুন।' নিমাই নিত্যানন্দকে বললে। 'নবদ্বীপের প্রতি যে আপনার করুণা হয়েছে, এই আমাদের মহাভাগ্য।'

ভূমিস্তল থেকে উঠে দাঁড়াল নিতাই। চলল নিমাইয়ের পিছে পিছে।

নিমাই বললে, 'কাল আষাঢ়-পূর্ণিমা, গুরুপূর্ণিমা। ভগবান ব্যাসের আধিষ্ঠান-তিথি। আপনার ব্যাস-পূজা কোথায় হবে?'

নিমাইয়ের কাছ থেকেই অগোচরে ইঙ্গিত পেল নিতাই। শ্রীবাসকে দেখিয়ে বললে, 'আমার ব্যাসপূজা এই বামুনের ঘরে হবে।'

'কি হে শ্রীবাস, তোমার কোনো অহুকিধে হবে না তো?' নিমাই জিগেস করল।

'না, না, অহুকিধে কী?'

'তোমার উপর বোকা চাপানো হবে।'

'না, না, সমস্ত হৃত-হৃত আমার বাড়িতে আছে।'

বললে শ্রীবাস, 'একমাত্র পূজার পদ্ধতি আমার জানা নেই। কার কাছ থেকে চেয়ে আনব পুঁথি। বর এ তো আমার ভাগ্য। সন্ন্যাসীর ব্যাসপূজা দেখব। আগে দেখিনি কোনোদিন।'

সকলে তখন শ্রীবাসের বাড়ি গেল।

নিমাই বললে, 'কপাট দাও। কীর্তন শুরু করো। ব্যাসপূজার অধিবাসের উল্লাস কীর্তন।'

সঙ্গে হয়েছে। সমবেত কণ্ঠে কীর্তন উঠল। হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগল নিমাই-নিতাই।

কখনো বা কাঁদছে, কোলাকুলি করছে, কখনো বা পরস্পরের পা ধরতে চাইছে। কখনো গর্জন, কখনো রোদন, কখনো মুর্ছা। কখনো বা উল্লাসে মহামত্ত।

বলরাম ভাব ধরল নিমাই। কিছু-বটীর গিঁটে বসল। নিতাইকে বললে, 'আমাকে হল মুঘল দাও।'

হাত পাতল নিমাই। নিতাই যেন তাতে কী দিল হাতে করে। কেউ-কেউ দেখল স্পষ্ট হল আনন্দ মুঘল দিল নিত্যানন্দ।

হঠাৎ আবার গর্জন করে উঠল নিমাই, 'হৃদ আনন্দ মদ আনো।'

শ্রীবাস একপাত্র গঙ্গাজল এগিয়ে দিল। তা যেন মদ, তেমনি করে আনন্দবিভোর হয়ে খেল নিমাই সহসা আবার হুকার করে উঠল। 'নাড়া কই আমার নিত্যানন্দ এসেছেন, নাড়া এখনো আসছে কেন?'

'কে নাড়া?'

'নাড়াকে চেননা? অষ্টোত্ত আচার্যকে আনাড়া বলে ডাকি। সেই তো আমাকে ডেকে এনে বৈকুণ্ঠ থেকে। সে কি এখন আমাকে ছেড়ে থাকে পারে শাস্তিপুরে? তাকে ডেকে নিয়ে এস। যা যে ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচার করে বেড়াব। দীনহীনবে বিলাস হরিতিক্তি! নাড়া না এলে আমার যৌলক্য পূর্ণ হবে কী করে?'

বাহুজ্ঞান করে এনে নিমাই বললে, 'আমি কিছু চাপল্য করেছি? কিছু কি প্রমাণ বকেছি?'

'না, না' সবাই আশ্রয় করল নিমাইকে, 'তু যেমন ছিলে তেমনিই আছ।'

'আমি বালক, আমার কোনো অপরূপ নিওনা। 'তুমি কমনীয় কিশোর।' [কৃষ্ণ

কবি কণপূর-বিরচিত আনন্দ-বন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রী প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৮। মালার স্পর্শ। এ যেন রম্যতম স্পর্শ...নবীন বনভ্রামের। স্পর্শের সে কী অনির্কণীয় কোমলতা, কী আনন্দিত সৌরভ। বুঝভানু-নন্দিনীর মনে হল তাঁর মধ্যে যেন ফুটে উঠেছে শুষ্ক শুষ্ক আনন্দ। সে আনন্দ যেন ফুটে বেরিয়ে এল পুলকাক্ষিত কপোলে, আকুল হয়ে উঠল অলকে, ভেসে উঠল অশ্রুতে, হলে পড়ল লজ্জায়, ধরা পড়ে গেল মধুর অধর-বিশলয়ের হাসিতে।

আনন্দের সেই শুষ্কগুলিকে সত্বর তিরস্কার করতে গেলেন বুঝভানুনন্দিনী, কিন্তু কী যেন কি হঠাৎ ঘটে গেল তাঁর সত্বায়। এ সুরের দশা...মাগে কখনও দেখেননি তাঁর সত্বায়। এ এক অপরিচিতা দশা। তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন "বকুলমালা"কে।

ললিতা বলে উঠলেন—

"ভ্রামা, বকুলমালা ছুটিই কেবল যে নামে সাম্য রয়েছে, শুধে সাম্য রয়েছে, তা নয়, সৌভাগ্যও দেখছি সাম্য রয়েছে। ছুটিকেই শ্রীত করেছে কৃষ্ণের কয়স্পর্শ; ছুটিই লয় হয়ে রয়েছে রাধিকার কঠোর উপকর্মে ;

ছুটিই গুণবতী,

ছুটিই সুকুমারী,

ছুটিতেই রয়েছে মর্দিত গন্ধ।"

ভ্রামা বললেন—

"ললিতে, ললিতা দেখালে বটে ভনিতার।"

২৯। এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন শ্রীরাধার ধাত্রী—"সুচরিতা"। শ্রীরাধাকে নিয়ে বাবার জন্মে তাকে পাঠিয়েছেন পিতৃদেব ভানুসম তেজস্বী শ্রী "বুঝভানু"।

কাণ্ড : তিনি মনস্থ করেছেন যথাবিহিত নীতিবিনীতি বিদগ্ধতাপূর্বক নিমন্ত্রণ করবেন সপরিবার ব্রজরাজ জীনকে ; অতএব এই মহোৎসবের ব্যাপারে, এই অপূর্ব কমনীয়তার ব্যাপারে, সত্বদের সুরের আরাধনা নিয়ে সত্বর পৌঁছতে হবে রাধাকে ; কারণ, রাধা তাঁর কাছে সুরস-রত্ন-কৌশল ও নবনবায়মান রত্ন-চাতুর্যের মূর্তিমতী তুরীয়-দশা।

৩০। ধাত্রী সুচরিতা আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তনিধে দিয়ে শেষে বললেন—

"সুতর-শান্তী প্রভৃতি গুরুজনেরাও আপনাকে বাপের বাড়ী যেতে অনুরোধ দিয়েছেন, এবং জানিয়েছেন তাঁদের অনুরোধ গ্রহণের জন্ত আর আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না। অতএব চলুন, বিলম্ব কাজ নেই। না নড়লে আমি নড়ছি না! শ্রীবুঝভানু আরও আদেশ দিয়েছেন, "হে ভ্রামা, মিথ্যা আলস্য ত্যাগ করে, পঙ্কলিহাদের সঙ্গে নিয়ে চলে এস। রাধার মন করিয়ে নিয়ে এলেই ভাল হয়।"... আর..."

হে বিশাখে, ললিতা বড় গুণী মেয়ে, তাকেও সঙ্গে নিয়ে তুমি এস।"

সুচরিতার বাচন-ভঙ্গিমার আনন্দে হেসে উঠলেন ললিতা। বললেন—

"সুচরিতা, হঠাৎ এই নিমন্ত্রণ মহোৎসবের আয়োজন হল কেন?" সুচরিতা বললেন—

"আকস্মিক নয়। জানেনই তো, সেদিন ব্রজকৃষ্ণে অতিথি হয়ে এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ব্রজরাজ নিমন্ত্রণ করেছিলেন আপামর সাধারণকে। সেই দিনই রাধিকার পিতারও মনে জেগেছিল একটি সুন্দর পরিকল্পনা,—কেমন হয়, যদি নিমন্ত্রণ করি, স-দার স-কুমার স-পরিবার যোযাযীশকে? তাই, এই প্রচণ্ড মহোৎসবের ব্যবস্থা।

৩১। গুণ-সারাধিকা রাধিকাকে ভ্রামাদেবী তখন বললেন, "মস্ত বড় কোঁতুকের ব্যাপার হবে দেখছি। এমন ভুবন-রঞ্জন ব্যাপার না দেখলেই নয়। বিশেষ করে পিতৃহানীরদের আত্মা যখন এসেই গেছে তখন,—উঠে পড়ুন উঠে পড়ুন।"

ভানুভবন বুঝভানু ভবনে যখন সকলে উপস্থিত হলেন, তখন বুঝভানুর মনে হল—মূর্তিমতী মহোৎসব-লক্ষ্মী যেন প্রবেশ করলেন তাঁর ঘরে।

৩২। রাধা এলেন পিতৃগৃহে। "কেমন আছিস, ভাল আছিস তো?"—সুভাগমনের আশীর্বাদান্তে মস্তক আশ্রয় করলেন পিতৃদেব। ততক্ষণ প্রণাম সেয়ে ফেললেন রাধা। বুঝভানু বললেন—"তোমার হাতের রান্না বড় উপাদেয়। এবার রন্ধনের অপূর্ব কমনীয়তার কৌশল দেখিয়ে সার্থক কর তোমার হাত। আগামী কাল নিমন্ত্রিত হয়ে যোযাযীশ আসছেন আমাদের বাড়ীতে, স-পত্নীক, স-সুত, স-স্বাম। তাঁরা ভোজন করবেন।"

৩৩। ললিতা বললেন—

"তাত, রন্ধনের উপকরণ সব প্রস্তুত রয়েছে তো?"

উত্তর দিলেন বুঝভানু,—

"বহুদিন থেকেই রয়েছে। নানান কৌশলে সর্বপ্রকার উপকরণই সংগ্রহ করা হয়েছে। অনন্ত বা অনন্ত।

আজই যে কেবল হয়েছে, বা খেলাচ্ছলে হয়েছে, তা নয়। তোমরা শুভবতীরা ভিতরে বাও, গিয়ে দেখ কোনটা হয়েছে, কোনটা হয়নি, কোনটা পদার্থ, কোনটা অপদার্থ, আরও যদি কিছু আনাতে হয় দেবী কোরো না যেন বলতে।"

৩৪। বাক্যের শেষ হতে না হতেই এক-রাশ বিদ্যুতের মত হর্ষের বিরামহীন ঝিলিক হানতে হানতে কলাবতীরা প্রবেশ করলেন অন্দর-মহলে। রাধার জননীকে প্রণাম করলেন সকলে। সদা-হাস্যময়ী জননী। তাঁকে দেখলেই স্মৃতি ফাটে মনে। প্রণাম করেই তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। যারা বাড়ীখানায় কে যেন উল্লাড় করে রেখে দিয়েছে বিশ্বের কমনীয়তা। আর সামগ্রীর সমগ্রতা। নয়ন ভরে দেখতে লাগলেন সকলে।

৩৫। এদিকে তখন বন থেকে কিশোরী নগল-কিশোরী। নরকাসুরের শত্রু বিনি, যেহু চরিত্রে কিংবদন্তি তিনি ভবনে। নিত্যনবীন, নিরুপট। ব্রজের পথে পথে ছুড়িয়ে নিচ্ছেন হাজার কটাক্ষের নীলপদ্মের পূজা। কিরতেই ব্রজেশ্বর তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে গেলেন, মধুতটে বললেন—

“কৃষ্ণ, বুঝতামু এসেছিলেন। বৎসরাবধি আশা পোষণ করে দেখেছিলেন আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবেন তাঁর ভবনে। ভ্রী-আদি অল্পচরদের পরামর্শও নিয়েছিলেন। জানই তো, তাঁর মূল্য গোপন কারও নেই। তোমাকেও নিমন্ত্রণ করে গেছেন মাগামী কাল। বেতে হবে, তাঁর প্রণয় সকল করতে হবে। ছুমি তরী থেকে।”

৩৬। মা বশোদা সেখানে এসে গিয়েছিলেন। বেই তিনি বলে উঠেছেন—

“ব্রজের কাছেই তোমার সহচরেরা চরাবে খেঁচুর পাল। রক্ষা করতে তোমাকে আর কাল বেতে হবে না।”

অমনি মাত্রাহীন করুণায় বেন বিগলিত হয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ; বললেন—

“এ আবার কি মা! নিমন্ত্রণ খেতে একলা বাব? সহচরেরা বাব পড়বে? কাজ নেই মা আমার অমন নিমন্ত্রণে গিয়ে।”

ছেলের মুখে এ তো অজ্ঞায় কথা নয়। লোক-বীতিজ্ঞা জননী তাই বললেন—

৩৭। “অত পরম হতে নেই গোপাল। তাঁর ঐ এক হয়েছে, সব ছেড়ে দিয়ে সহচরদের নিয়ে মাতামাতি। যদি এতই প্রণয়, তবে তাদের নিয়েই থাক।”

মায়ের মুখ-ঝামটা খেয়ে, যিনি নিখিল ভুবনের উপদ্রব খণ্ডন, তাঁকেও ধামতে হল, বন-বিহার থেকে নিবর্তন করাতে হল মনটিকে; এবং সেটিকে প্রবর্তন করাতে হল সেইখানে, যেখানে কর্ণ-কর্তী শ্রীকৃষ্ণ নিজে চুক্তিতা শ্রীরাধাকে দিয়ে রত্ন-পর্কে ব্যস্ত। যে নাম নিন্দ্য জপেন মনে মনে, সে নাম মনে আসতেই উদয় হল এক অনির্কচনীয় প্রণয়ের। নিমন্ত্রণও এত সরস হয়।

৩৮। তাঁর হল। ব্রজরাণীর মণি নিশান্তে সানন্দে সমাগতা হলেন বুঝতামুর পুরস্কীর্ণ। তাঁরা এলেন, নিশান্তের কিরণাবলীর মত ভাসুর। সাদর অভ্যর্থনার তাঁরা শ্রীভিনন্দা হলেন লজ্জায়। তারপরে রক্ত-যোগহীন ভাবায় বললেন—

“ব্রজেশ্বরী, আপনি ঈশ্বরী। তবু অবধান করুন রাধিকা-জনকের হার্ষসারাবিকা বাণী।

তিনি বলেছেন—

“আপনার বাৎসল্য-লতায় এত ফুল ফুটেছে আর ফুলের গন্ধে এত ভরে উঠেছে আপনার জীবনী, যে বাক্যের ঈশ্বরীরও অসাধ্য পূর্ণভক্তি করা আপনার। অতএব সঙ্গারের তীত্র বাতনাকে হরিভক্তি যেমন করে খণ্ডন কয়ে, তেমনি আমার গৃহে আজ পদার্পণ করে আপনিও খণ্ডন করুন গৃহের আপদ। সদয় আপনন এবং আশা করি সঙ্গে নিয়ে আসবেন ব্রজরাজকে, পুত্রকে, পরিজনদের এবং সপুত্র শ্রীরোহিণী দেবীকে। আপনার করুণায় কল্যাণ হোক বুঝতামুর। আমার গৃহেই আজ আপনাদের সকলকে শুভ-হুষ্ঠান করতে হবে অভ্যাজ-উদ্বর্তন-স্নানাদি কর্ণের। অতএব নিবেদন, ... হরিত শুভাগমন।”

৩৯। হরিত ও সাদর উত্তর দিলেন ব্রজবাণী—

“আর্ধ্যারা এক রাড়িরে তুলেছেন কিন্নর-বাহাধ্য যে তাঁরাই দেব পূর্ণভক্তি লাভ করে সকলের বিদ্য-বাহাধ্য। আপনারা আসুন।

বুঝতামুর অগাধ বিনয় ও সৌজন্তে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আশা করি তাঁর নির্দেশ পালনীয় হবে।”

৪০। সূর্যের কাছে প্রার্থনা করে বুঝতামু যেমনটি চেয়েছিলেন, দেখতে দেখতে ঠিক তেমনিই চতুর্দিকে সংগৃহীত ও সঞ্চিত হয়ে গেল যোবারীশের অভ্যর্থনা-রত্নল চাক উপচার। কার্ণকুশলীর পক্ষে সকলি সম্ভব। পুরতোরণের পুরোভাগে পথের চিকে চেয়ে বসে রইলেন বুঝতামু। মহারাজ আসবেন, ... পথের শোভায় তাই এতটুকু নেই মালিঙ্কের লেণ, কৃণ, কৃণ, করে বাজছে কিঙ্কিনী-জালের মাল্য, শ্রেণীবৎ পূর্ণ কলসের শিখরে শিখরে নাচছে নবীন কিশলয়, মহল-নারক নারিকেল কলের সবুজ বিক্রাসে অমল দীপ-শিখার অনন্ত বাহার। পথের দুপাশে কলস্ত সুরপারীর গাহ আর তরুণ রত্নার স্তম্ভ, তাদের নিবিড় ও অভয়-বিক্রাসে অন্তঃসমিত হয়েছে ডাক্তর-কর। মুহু মুহু বাজছে মৃদল, স্তব-সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে পদবাদি বাদির। কিছুকাল পরেই বুঝতামুর অপেক্ষমান নয়নের উৎসবই বেন দেখতে পেল,—

প্রথমেই শ্রীব্রজরাজ-কিশোর আসছেন।

সহচরণ সহিতে তিনি আসছেন... ভুবনমঙ্গলের বেন গণ-রাজ। বিহাং খেলিয়ে তাঁর আজ বলমল করছে কনকবাস। নাগরত্নের পুঞ্জিত পরিমার গাভীরের মত ঐ যে আভীরের দল, ... তাঁদের ধ্যানের ধন... মাটিতে ঐ চরণ—কেলে ফেলে তিনি আসছেন। আর তাঁর পরেই আসছেন ব্রজরাজ-মহিষী। আহা, এতটুকুও ছলাকলার বালাই নেই তাঁর... বহু পরিবার পরিবৃত্তা হয়ে তিনি আসছেন। আর তাঁর পরেই আসছেন ব্রজপুরপুত্রের শ্রীনন্দ। তাঁর প্রত্যেকটি পরিজন বেন ভুমণ্ডলের সৌভাগ্য-সার। রাজ-দর্শনে উল্লসিত হয়ে উঠেছে জনতা।

৪১। ক্ষতচরণে এগিয়ে গেলেন বুঝতামু। ব্রজের চাঁদ কেশবের কেশের সে কী পারিপাট্য। তাঁকে আলিঙ্গন করে প্রভুসম্পতিকে তিনি করলেন স-বহমান সখ্য-নমস্কার। তারপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন স্বমন্দিরে।

৪২। স্ত্রীপুরুষদের জন্ত পৃথক পৃথক সব ব্যবস্থা। যথাস্থানে তাঁদের পাত্তার্থাদি দিয়ে অর্চনা করা হল। পরিচারক পরিচারিকারা সঙ্কোচহীন সমাদরে নিয়ে এল অভ্যাজ উদ্বর্তন স্থপনাদির বখাযোগ্য উপকরণ। কার্ণপ্রধান বুঝতামুর ক্রটি-হীন ব্যবহারে উল্লসিত হয়ে উঠলেন সকলে। তারপর বুঝতামু নিজে দ্রান সেয়ে এসে প্রসাদিত করলেন সকলকে। রূপায়ু রূপ সঙ্গ্রহান করলেন বরাধর, আভরণ, গন্ধামুলেপন ইত্যাদি। তারপর বিরামহীন প্রমোদে আর্ধ্যারিত করতে করতে তিনি ব্রজপুর-পরমেশ্বরীকে নিয়ে এলেন পাক-ভবনে, যেখানে সাক্ষাৎ মহালক্ষীর মত কিপ্রহন্তে রত্নন করছিলেন সাবধানী রাধা।

৪৩। রূপগুণ ও মাধুরীর শিখরিণী তিনি... বন্দনা করলেন শ্রীবশোদাকে, যিনি নিজের কুলের শ্রী ও বশোদাহিনী। মেহে ও প্রছায় আবদ্ধ হয়ে গেলেন উভয়ে। সম্পূর্ণ গলে গেল বশোদা মন। একটু হেসে তিনি বললেন—

“রমণীদের এত বাহার মণিমাণিক্যের, তবু বলতেই হবে তাঁদের হাতের রত্নকলাটিও এক ধান চলন্ত মণি। কিন্তু তোমার গা মাং কুলের বত কোষল, অত আঁচ কি সইবে? কলসে

নেই, তবু রূপ খুঁজেছে অদ্ভুত। তা এখন দেখাও দিকি কি কি রাখলে।”

শ্রীমতীশোনার কথা শুনে রাধিকার খেন সার্থক হয়ে গেল পরিষ্কার। লজ্জার পড়লেন, কিন্তু কি করেন, বস্তু পদ বেঁধেছিলেন, সবই দেখাতে হল ভ্রমরাশীকে।

৪৪। ভোম্মাভ্যব্যক্তির সৌরভ্য আর সৌরভ্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ব্রজেশ্বরী। বেখেই বুদ্ধকে পারলেন রাধার হাতের রাধার স্মরণ। কপের আদরিণী তিনি, গলে গেল জ্বর। রাখিলেন রাধা, সেই অবস্থাতেই তাঁকে জড়িয়ে নিলেন বুকে, বললেন—

“এত বিচ্ছেদ। চোখ কেহাতে যে পারছি না।”

৪৫। ভায়া ললিতাদি সখীরা ছুটে এসে তাঁকে বন্দনা করলেন। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ব্রজেশ্বরীর আনন্দে। কুমারীরের সকলেরই গায়ে সুরভিসার। সকলকেই আলিঙ্গন করে ব্রজেশ্বরী বললেন—

“বলি ও ভায়া, ও ললিতা, ও বিশাখা, তোমাদেরও প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। ভালবাসায় মন কেড়ে নিয়েছো বন্ধুর। এই সকলের মান-সওয়া রীতিই তো চলিত হওয়া উচিত জেঠাদের মধ্যে।”

ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়ে গেলেন শ্রীমোহিনী। তাঁকে বখাবিহিত সিঁটাচারে বন্দনা করলেন স-সখী রাধা। ব্রজেশ্বরী বললেন—

৪৬। “বলজ্ঞের মা, ভঙ্গসমাজের কাছে পুজো পাওয়া উচিত...এঁদের পূজার-প্রীতির। আর আমাদের রাখাটি এত স্নিগ্ধা, যে বলতে ইচ্ছে করছে, ও খেন পৃথিবীর নন্দন-লতা, ও খেন রূপের মলয়-পাহাড়ের চন্দনলতা। ভাগ্য বটে বুভাভূর। কেউ কি জানে তাঁর কাছে হয়েছে এমন সর্বস্বপ্নের মহামণির এক খনি।”

৪৭। উত্তর দিলেন মোহিনী,—

“শ্রীকৃষ্ণের মা, এর পরে আর কিছু বলা চলে না, ভায়া চলে না। ব্রজপতির বেহর গুণসিদ্ধ নন্দন, বুভাভূরও ভেমনি এই অসুখী নন্দিনী। বৃগলমণি খেন...বোবপুরীর কণ্ঠে।

৪৮। লজ্জার মিলিয়ে গেলেন সুরস্বরী রাধা। ভায়া, ললিতা, সকলে বুচকি হেসে ফেললেন, রাধার সেই মুখ দেখে। মনে মনে তাঁরা বলতে লাগলেন—

(১) “দেবী, যে ভালোটি অদ্ভুত করতে চাই, সেই ভালোটিকে দিয়ে গেল আপনার ভায়া।”

(২) “ধন্ব হলেন, আমরা ধন্ব হলেন।”

(৩) “বৈশাখের তপ্তদেহে এ খেন নিঃসন্দেহে বুটী-ধারা।”

(৪) “ভাগ্যিসু বোবপুরীর কণ্ঠে বৃগল-মণি’ বলেছেন... একাধিকরণেই করণের প্রতিপাদন হল, না-টেনেও টানা যামেটা বোধগম্য হল; কিন্তু যদি বলা হত, ‘বোবপুরীর কণ্ঠ ও মৌলির বৃগল-মণি’...তবেই হয়েছিল আর কি!”

(৫) “অহুস্তিই ললিত হয়েছে।”

৪৯। এমন সময়ে মেয়েরা নিয়ে এলেন শীলমালা, সজলপদ্ম, ধৌতবস্ত্র, তুলসী-বিধবল। এবং সাটাক প্রদান করে আরাধনা করলেন শ্রীকৃষ্ণ-জননীর শ্রীচরণ। ভায়া-গৃহিনী ‘সংজ্ঞা’র মত বুভাভূ-গৃহিনীও সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্তম্ভিত সখীদের মত বিকীর্ণ করতে লাগলেন শোভা ও কীর্তি। তাঁকে কাছে ডেকে আলিঙ্গন করে শ্রীকৃষ্ণ-জননী বললেন—

“বলি, রাখাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? শ্রোতা গৃহিনীর দিয়ে যা করানো উচিত, নবমালিকাকে দিয়ে তা করাচ্ছেন কেন? আঙনের আঁচে মেয়ে কে যোগা হয়ে থাকে। তখন আলিঙ্গন কি যোগা হয়ে থাকবে না...অহুতাপে?”

[কবিতা]

ইস্কুল-মার্কারের রূপকথা

মানস মজুমদার

পাঠল বোন চম্পা ভাই আজকে না হয় এসো
সকাল-বিকেল টিউশনেতে কেনা মাথার চুল—
শখকুমার একটুখানি খাটুক না হয় আজ,
পকীবাজের উড়ন ডানার বাতাস নিখুম বয়।

বাতাস নেই বাতাস নেই ইটকাঠেরা কানে—
করলা ভিড়ে মুদ্রাবাণি খুঁজছে কিরে পথ,
চম্পা ভাই পাঠল বোন আজকে কিরে বাও,
মঠ কেবল বুঝে কৌটা আটাটি চোখের জল।

কাজল জল মাটি মায়ের নিবিড় প্রাণের খাদ,
রাস্তা সেও সূতোর ভালে মিশে অবকনা—
পাঠল বোন চম্পা ভাই ছুল বুঝে না আর
কেনা না জল শর কলস; রাস্তা পাথর জল।

পাথরে সে রূপ-কথাকে কাটতো অমেক দিন
মাছের পড়ার ইতিহাসে রোমাল-কুম্ভকার
আবার বেশ, আবেগ মেলা, আয়েজ লাগা সুর
পাঠল বোন চম্পা ভাই সর্বে কৈতের ছাপ।

সর্বে ফুল বাঁহারী মত গছে মাতে দিন,
ভিতরসে মৌমাছিরের জড়ি শুধু হল,
চম্পা ভাই পাঠল বোন মিছেই নাড়ো জিত,
নদীর বেগ পাবে না আর, তখুই বাস-চর।

বাসির চরার আটক আছাজ : বিকল বেশিনা
নৌদর করেই ব্যবসা কাঁচার ব্যবহাট,
পাঠল বোন চম্পা ভাই ছুল বুঝে না আর
সকাল-বিকেল টিউশনেতে জিয়ার গাঁবা বক।

বিশ্ববের সন্ধানে

[পূর্ব-প্রকাশিত পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বব বোসেরা ছিল মেজর সত্যজ্ঞের বি. ডি. (বেঙ্গল
ডেসাটিনার্স) দলভুক্ত—যাদের প্রধান কেস ছিল
ঢাকায়। আমাদের, অর্থাৎ মুন্সীগঞ্জের জীবন জ্যাটারিয় দলের
সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠতা এবং সহযোগিতা ছিল। জীবনের এক
জুনিয়ার চেলা হিমাংগ বোস থাকতো মুন্সীগঞ্জে, এবং বিশ্বব বোস
মুন্সীগঞ্জের নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজের ছেলেদের প্যারেড শেখাতে
আসতো। এই হিমাংগ ছিল বিশ্বব বোসের আত্মীয়, এবং তার
দায়ক বিশ্বব বোসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হ'ত।

বিশ্বব বোসের মৃত্যুর পর সংস্কারের জন্ত তার শবদেহ দাবী
করা হলে, প্রথমে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে শবদেহ দিতে চাননি
—কিন্তু পরে পীড়াপীড়ি ও তর্কবিতর্ক ফলে তারা এই সর্তে শবদেহ
দিতে রাজী হয়েছিল যে, শ্মশান যাত্রার সময় কোন শ্লোগান বা
ধ্বনি দেওয়া হবে না,—শুধু হরিবোল ধ্বনি দিয়ে নীরবে শ্মশানে
সিঁদে যেতে হবে।

ওর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর মুন্সীগঞ্জ মেস থেকে আমরাই
মর্গের কাছে গিয়ে জমায়েত হয়েছিলুম। বাইরের আরো ২৪
জনও গিয়ে জমেছিল। ব্যাপারটা নিয়ে কোনো সোরগোল হয়নি
বলে কলকাতার লোক জানতেই পারেনি।

জীবনের ছেলেবেলার সহপাঠি হরিভূষণ ব্যানার্জি তখন আই বি
ইনস্পেক্টর,—এবং তাঁর ছোট ভাই হারাণ ব্যানার্জি ছিল জীবনের
একজন সিনিয়র চেলা। এই দুই ব্যানার্জির যোগাযোগেই বিশ্ববের
শবদেহ আমাদের হাতে দেওয়া হয়, ঐ নীরব শ্মশান-যাত্রার সর্তে।

আদেশের আশায় আমরা খাট নিয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে মর্গের
কাছে অপেক্ষা করছিলুম। আদেশ এল, মর্গ থেকে শবদেহ
বায় করার জন্তে পুলিশের পিছন পিছন আমি চুকে পড়লুম—
মর্গের ভিতরটা দেখার জন্তে। ঘরটার মধ্যে বেন একটা হিমবাহ
জমাট হয়ে আছে—আর মেঝের শায়িত এক গৌরবর্ণ স্বাস্থ্যবান
যুবক—বেন ঘুঘিয়ে রয়েছে—শুধু একদিকের রগে একটা রক্তের
দাগ। অস্ত্রাভের সঙ্গে ধরাধরি করে দেহটাকে বায় করলুম।
খাটে শোয়ানোর পর চারিদিকে ভিড় জমে উঠলো। পুলিশের
নির্দেশে অবিলম্বে হরিবোল ধ্বনি দিয়ে শব নিয়ে রওনা হতে
হল। আমি ছিলুম বাহকদের অন্ততম। এসব কথা ভাবতে এবং
বলতে আজও একটা গৌরববোধ হয়।

শবের পিছনে একটু দূরে থেকে একজন পুলিশ চললো শ্মশান
পৰ্বত। তারা কিরে এল শবের চিত্তারোহণের পর। একটা
ছোট ভিড় শ্মশানে গিয়েছিল,—তারাও ২১ জন করে কিরে
গেল। দাঁহের পর চিত্তার জল দিয়ে কিরে আসার সময় দেখা গেল,
আমরা মুন্সীগঞ্জের দলই আছি।

হারাণ ব্যানার্জির বিয়াট আওয়াজে ধ্বনিত হল "বন্দেমাতরম"।
আমরা ফিরতি পথে রওনা হলুম। সমস্ত চাপা উত্তেজনা কেটে
পড়লো "বিশ্বব বোস কি জয়" ধ্বনিতে। সারাপথ প্রচণ্ড শ্লোগান-
ধ্বনি চললো। তখন রাত শেষ হয়েছে,—কিন্তু ভোর হয়নি।
শ্লোগানের আওয়াজে লোকের ঘুম ভাঙছে।

আমহাট্ট স্ট্রীটের মোড়ের কাছে বিটের পাহারাওয়ালী
চ্যালেঞ্জ করে বসলো—কোন্ হায় আপলোক?—কাঁহাসে আতা?—
কাঁহা বাতা?—খানামে জানে হোগা। তার কথায় জবাবে আমরা
আরো জোরে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিই, আর সে আরো যাবড়ে বায়।
শেষে আমরা ঠিক করলুম, খানার বাওয়াটা মন্দ হবে না। চললুম
তার সঙ্গে।

সুখিয়া স্ট্রীট খানার নিয়ে গেল। সেবেস্তার ভিউটি দিচ্ছিলেন যে
এ এস আই,—তিনি চোখ মুছতে মুছতে এসে বিরক্তভাবে ঘটনার
বিবরণ শুনে ঘুমন্ত দায়োগা বাবুর কাছে শবর দিলেন। তিনিও
চোখ মুছতে মুছতে এসে আমাদের মেখে চিনলেন এবং বললেন,
কি ব্যাপার? পাহারাওয়ালী জবাব দিলে বাবুরা বাস্তায় হজা
করছিল। বন্দেমাতরম বলে চেঁচাছিল।

দায়োগা বললেন, "বন্দেমাতরম বোলা? সন্ধান কিয়া? আচ্ছা,
তুম বাও।" তারপর আমাদের কাছে সব কথা শুনে
বললেন,—তাইতো,—সেদিন আপনাদের ওখানে চা খেয়ে এলুম—
আজ আপনাদের একটু চা খাওয়াতে পারলে ভাল হত। কিন্তু—।
আমরা ছুটো হাসি-ঠাটা করে বিদায় নিয়ে চলে এলুম।

এখানে হারাণবাবু এবং হিমাংগ সৰ্ব্বদে ২১টা উল্লেখযোগ্য
কথা বলে নিতে চাই। হারাণবাবু ছিলেন বেনম জোরান,
হিমাংগ ছিল তেমনি দুর্বল, স্বাস্থ্যহীন। কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল
তীক্ষ্ণ এবং সে ছিল গুপ্তসমিতির উপযুক্ত নীরব কর্মী। হারাণবাবু
তাকে ভালবাসতেন, এবং বরাবরই তার ওপর পার্জেনের
মতন তদারক করতেন।

হারাগবাবু মাঝে মাঝে হরিভূষণবাবুর সঙ্গে দেখা করতেন এবং চেষ্টা করতেন, মুন্সীগঞ্জনের সখকে আই বি-র মতিগতি সখকে কিছু জানতে পারেন কি না। এ 'রকম চালাকির চেষ্টা বিশৃঙ্খলক, এবং তার ফলও একটু ফলেছিল।

একদিন হরিভূষণবাবু হারাগবাবুকে বললেন, হিমাকে সঙ্গে নিয়ে একবার আমাদের অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করিস— কিছু কথা আছে। হারাগবাবু তদনুসারে হিমাকে নিয়ে গেলেন। ২।১ টা কথাবার্তার পর হরিভূষণবাবু হিমাকে রেখে হারাগবাবুকে ছেড়ে দিলেন।

অর্থাৎ হিমাকে গ্রেপ্তার করা হল। হারাগবাবু কিরে এসে অপ্রতিভভাবে ব্যাপারটা বললেন,—এক মনকে প্রবেশ দেবার জন্তে বললেন,—“বাই হোক,—মারধরটা হবে না। ছোড়না সে কথা বলেই দিয়েছে।” কিন্তু কিছু মার হলই।

এক সাহেব অফিসার ওকে ধমক দিয়ে বলেছিল coward. ও জবাব দিয়েছিল, আমার মতন একটা ছেলেকে নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে coward বলছো—তোমরা বড় hero। সাহেব ওর পাঞ্জরে একটা রুলের গুঁতো মেরেছিল।

সেই ব্যথায় কিছুদিন ভোগার পর হিমাংগুর প্রুরিসি হল। ডেটিনিউ অবস্থায় প্রুরিসিতে ভুগতে ভুগতে হল থাইসিস। তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। কারমাইকেল কলেজে যেনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল,—কিন্তু কিছু হল না—সেখানেই সে মারা গেল। তখন হারাগবাবুও গ্রেপ্তার হয়ে ডেটিনিউ হয়েছেন।

এই ৩০ সালেই ময়মনসিংয়ের কিশোরগঞ্জে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার সূত্রপাত কিন্তু মোটেই সাম্প্রদায়িক নয়। মুসলমান কৃষকরা চিরকালই হিন্দু-মহাজনদের কাছে বর্জ করে এবং সূদ দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, পুষ্কবাছুক্রমে সে বর্জ শোধ হয় না—অথচ হয়ত আসলের চেয়ে অনেক বেশী সূদ দেওয়া হয়েছে। এই রকমের কতকগুলো কেস ওখানে ছিল। ওখানে একটা ইয়ং কমিউনিষ্ট লাগ হয়েছিল, আগে বলেছি। কৃষক সমিতিও হয়েছিল। ঋণের দায়ে জর্জরিত কৃষকেরা একদিন মরিয়া হয়ে এক হিন্দু-মহাজনের বাড়ী চড়াও হয়ে পুরোনো ঋণের খত কেবল চার—বলে, অনেক সূদ নিয়েছি, আসলের চেয়ে অনেক বেশী দেওয়া হয়ে গেছে, আর দাব না। এরকম অসাধারণ দাবী মিষ্টি মুখে করা যায়না—তারা গিয়েছিল মারমুখী হয়েই।

মহাজন স্বভাবতই সে দাবী প্রত্যাখ্যান করে, এবং উত্তেজিত খাতকদল বাড়ী লুঠ করতে যায়। মহাজনের ঘরে বন্দুক ছিল,—তারা গুলী চালিয়ে ওদের হটিয়ে দেয়। কিন্তু গুলী ফুরিয়ে গেলে ওরা আবার বাড়ী চড়াও করে, এবং বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে, কতাকে খুন করে লুঠ করে, ঋণের খতের বাণ্ডিল পুড়িয়ে সেখান থেকে ক্রমে অস্ত্রাভ মহাজনদের বাড়ীও আক্রমণ করে। এইভাবে এই রকম কাণ্ড চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কলকাতার কাগজে এই খবর প্রকাশ হল সাম্প্রদায়িক ঝড় দিয়ে। কিন্তু ক্রমে খবর আসতে লাগলো, দু-একজন মুসলমানও মহাজনী কারবার করতো, এবং তাদের বাড়ীও লুঠ হয়েছে। আবার আক্রমণকারী কৃষক খাতকদলের মধ্যে কিছু হিন্দুও আছে,

এখবরও এল। এই অবস্থায় ঢাকা থেকে একদল মোহা-মৌলবী সেখানে প্রেরিত হল, এবং কাণ্ডটা শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করলে।

শচীন সেনগুপ্ত নবলক্ষিতে যথার্থ খবরগুলো ছাপতে ছাপতে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন “গণদেবতার জাগরণ।” ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরৎ বসু শচীন বাবুকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না লিখে অমন কথা লিখেছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, যেমন যেমন খবর এসেছে, তা থেকে যা বুঝেছি,—তাই লিখেছি। অল্প রকম লেখার নির্দেশ যদি আগে দিতেন, তাহলে হয় তাই লিখতুম, না হয় চাকরী ছাড়তুম।

এই কথা বলে কিরে এসে তিনি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি দিনকার খবর সাজিয়ে লিখে দেখিয়ে দিলেন, ব্যাপারটার উৎপত্তি মহাজন-খাতক বিরোধ থেকে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই শচীনবাবু চাকরী খতম হল। অল্পহাত অবশ্য অস্ত্র নিরীহ ধরণের। একটা অভিযোগ আগে থেকেই জমে উঠেছিল,—তার সম্পাদনার কংগ্রেসের নীতি যথার্থ ভাবে অনুসৃত হচ্ছে না। আমার লেখা ছাপাটা যে তার অন্ততম প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এদিকে জেল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল সত্যাগ্রহী বন্দীতে। ছোকরার সংখ্যাই বেশী, এবং সবরকমের ছেলেই আছে। জেলে চলছিল বেন ভুতের মৃত্যু। তিন্ন তিন্ন ওয়ার্ডে পৃথক আটক ছেলের দল সারাদিন দেওয়াল টপকে সব ওয়ার্ডে যাতায়াত করে। দিবাকর পাত্র এইভাবে দেওয়াল টপকাত গিয়ে ছোটো পাত্রে এমন আঘাত পায় যে, পরে পা-ছোটো পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বোঁড়া হয়ে যায়। সর্ক লিকলিকে ছোটো পা লটপট করে কোনো প্রকারে হাঁটতো। পরে সে কমিউনিষ্ট তত্ত্বদর্শে বিশ্বাসী হয়েছিল এবং ডেটিনিউ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত '৩৮ সালে সে মানভূম অঞ্চলের কোনো স্থানে এক মহুরা গাছে গলায় কাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। এর মূলে নাকি ছিল এক ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী।

সত্যাগ্রহীদের জন্তে জেলে ডিসিগ্নিন একেবারে ভেঙ্গে পড়ছিল। তাদের দিয়ে কিছু কাজ করাবার খতলবে কর্তৃপক্ষ একদল ছেলেকে জেলের সজীবাগান সাফ করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। তারা এমন সাফই করলো যে, সজীবাগান হয়ে গেল এক পরিষ্কার ময়দান। এইরকম কাণ্ডকারখানার পর দমদমে সত্যাগ্রহী রাখার ব্যবস্থা হল।

সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থার কোম কড়াকড়ি ছিল না। আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আমিও আলিপুর জেলে জীবনের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলুম। একটা ঘরে দেখা করার ব্যবস্থা ছিল। গিয়ে দেখি এক কোণে টেবিল-চেয়ারে সুরভাবাবুর ইন্টারভিউ হচ্ছে—একজন I B অফিসারও আছে। আর এক কোণে এক কবুল বিছিরে জীবন একটি দল নিয়ে বসেছে। গিয়ে বসলুম। হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার কাঁধে একটা আঙুলের চাপ দিয়েছে। কিরে দেখি সুরভাবাবু পাঁড়িয়ে মুহূর্তে করছেন। আমি জীবনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললুম, আমার মাসুতুতো ভাই। সুরভাবাবু মুহূর্তে হেসে ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।

আজকাল পত্র-পত্রিকাদিতে বিশেষ বিশেষ লেখকদের লেখার মাঝে মাঝে দেখা যায়,—তারদের সঙ্গে সুরভাবাবুর ঋণের এমন জগা

ছিল যে, সুভাষবাবুর ডাবটা ছিল বেশ, তোমা বই আর জানি না। আমার সঙ্গে যে সুভাষবাবুর তেমন প্রণয়-টনয় ছিল না, সেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন,—কিন্তু সম্পর্ক একটা ছিলই—অনেকদিন ধরে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উভয় ডাবেই।

হুই বিপ্লবীদের অ্যামেলগ্যামেশন মিটিং যে আমার ঘরেই হয়েছিল, সেটাও সুভাষবাবু জানতেন,—আমি যে সেই মিলন ডকে দাদাদের সমালোচনা করতে আরম্ভ করেছিলুম, তাও তিনি জানতেন। তারপর আমার বিক্রোহ এবং আত্মশক্তি ও নবশক্তিতে বেহুরো লেখার কথাও জানতেন।

২১ সালে যখন হুই বিপ্লবীরা তাঁকে নিয়ে টামাটানি করছে, আর তিনি গভীরভাবে G O C-র চালে হুই দলকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন, তখন তিনি গোপনে পরামর্শ করতেন রাজেন্দ্রনার (রাজেন্দ্রের দেব) সঙ্গে। রাজেন্দ্রনা এবং আমি উভয়েই পৌরাজ প্রেসে (কলেজ ছোয়ার) সুরেশ মজুমদারের অফিসের আড়ার নিয়মিতভাবে যেতুম,—এক সেখানে রাজেন্দ্রনার সঙ্গে আমার সুভাষবাবু ও দাদাদের সংক্ষেপে কথাবার্তা চলতো। এটাও সুভাষবাবু জানতেন।

২১ সালে মুন্সীগঞ্জে মন্দির-সত্যগ্রহ আন্দোলন চলছিল। কালীবাড়ীতে সরাসরি পূজা দেওয়ার অধিকারের দাবীতে নমঃশূত্র সম্প্রদায় সত্যগ্রহ আন্দোলন চালাচ্ছিল—জোর করে দল বেঁধে মন্দিরে প্রবেশ ছিল তাদের লক্ষ্য। হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দ তাদের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। জীবনের দলবল তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করছিল।

এই সময়ে একদিন বেলা দশটার সময় বি সি সি সির অফিস কর্মী বরদা আমার কাছে এল, সুভাষবাবু ফোনে বলেছেন, আমাকে এখনই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করতে। কিছু গুট কথা জানা যাবে মনে করে গেলুম। গিয়ে দেখি সুভাষবাবু এক গাদা কাগজপত্র নিয়ে নীরবে কাজ করছেন,—আর তফাতে বসে গল্প করছেন কিরণ শঙ্কর রায়, সামসুদ্দীন আহমদ এবং জালাল-উদ্দীন হাদেমী।

সুভাষবাবু আমাকে বসতে বলে আবার কাগজপত্রে মন দিলেন,—আর ওরাও আমাকে চিনতো,—ওরাও টাইট হয়ে বসলো, আমার সঙ্গে সুভাষবাবুর কি কথা হয়, শোনার কৌতূহল নিয়ে। কিন্তু ঠিক এমনি ভাবে কেটে গেল প্রায় ঘণ্টাখানেক। ওরা যখন বুঝলো যে, ওদের সামনে সুভাষবাবু আমার সঙ্গে কথা কইবেন না,—তখন নিরাশ হয়ে একে একে সরে পড়লো। তারপর সুভাষবাবু আমাকে বললেন,—উনি খরচ দিলে আমি একবার মুন্সীগঞ্জে যেতে পারি কি না। আমি বললুম, পারি। উনি বললেন, জীবনবাবুর কাছ থেকে জেনে আসতে হবে,—কংগ্রেস ঐ মন্দির-সত্যগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব নিতে পারে কি না—তাঁরা নিচ্ছেন না কেন? চিঠিতে এসব কথা লেখা তিনি ঠিক মনে করতেন না।

অনেকদিন পরে মুন্সীগঞ্জে চললুম। গিয়ে দেখি গোঁড়াহিন্দুবা জীবনের দলের ওপর বেজায় চটে গেছে। একটা ক্যাম্প হয়েছে, সেখানে সত্যানন্দ এবং তাঁর দোসর এক ব্রহ্মচারী থাকে, এবং জীবন, বাদল, সুরেন মজুমদার প্রভৃতিও থাকে। কালী মন্দিরের দালানের ধামের সঙ্গে বেড়া বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের সামনের চালার পুলিশ এবং মন্দিরের রক্ষাকর্তাদের লোক পাহারা

থাকে। আমি যাওয়ার পর একদিন স্থির হল, কয়েকশো নমঃশূত্র উলটিয়ার প্রোশেসন করে মন্দিরপ্রবেশ করতে বাবে।

যথাসময়ে পুলিশ লাঠি হাতে ব্যারিকেড করে দাঁড়ালো। উলটিয়ারদের হুহাতে অঞ্জলিবন্ধ পুজার ফুল—মিছিলের সামনে সত্যানন্দ এবং পিছনে সুরেন মজুমদার। ব্যারিকেডের সামনে গিয়ে মিছিল আটকে গেল। পুলিশ যথাশাস্ত্র হুকুম দিলে মিছিল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্তে। কিন্তু চলমান মিছিল পিছনের ঠেলায় ব্যারিকেডের ওপরে গিয়ে পড়লো। সত্যানন্দকে গ্রেপ্তার করে সরিয়ে নিয়ে পুলিশ লাঠি চার্জ করে মিছিল হতভল করে দিলে। কয়েকজনের মাথা কেটে রক্তপঞ্জা চরে গেল। প্রথম সারিতে আমাদের ২২ সালের চরকা-মিষ্টী পক্ষসাতের ঠাকুরদাস ছিল,—তারও মাথা কাটলো। সুরেন মজুমদারও গ্রেপ্তার হল।

জীবনের সঙ্গে কথাবার্তা চল। তার মত হচ্ছে, হিন্দুদের সমাজ সংস্কারের এ আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগ দেওয়া ঠিক হবে না,—কারণ কংগ্রেস বেছেতু হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক সংস্থা,—অতএব গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় তাতে আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারের অনেক বেশী সুযোগ পাবে।

বাই হোক,—আমি থাকতে থাকতেই তিনু-উত্তমাকে নিয়ে (বামার কংগ্রেস নেতা) ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মুন্সীগঞ্জে এতেন,—ওঁরা বাংলার নানাস্থানে সফর করবেন, এবং সেইদিন বিদ্যালয়ে রওনা হবেন।

আগের দিন সত্যগ্রহ সম্পর্কে এক প্রকাণ্ড জনসভা হয়ে গেছে। উত্তমাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে সে রকম আর একটা সভা করা সম্ভব হবে না বলে স্থির হল, মহিলাসমিতি এক সভা করে তাঁকে অভ্যর্থনা করবে। তার জন্তে এক ভাষণ লিখতে হবে। মেয়েরা ভূপেনবাবুকে বললে, আপনি শুছিয়ে লিখে দিন। তিনি বললেন, নারায়ণবাবু এখানকার কথা সব জানেন,—উনিই লিখুন। সুতরাং আমাকেই লিখতে হল। উত্তমা ছিলেন বামার বিপ্লবীদেরও একজন নেতা।

বিকালে ওঁদের সঙ্গেই আমিও নারায়ণগঞ্জে এলুম এবং পরদিন কলকাতায় চলে এসে সুভাষবাবুর কাছে রিপোর্ট দিলুম। এবারও কথা হল একা একা। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আর কেউ জানলে কোন দোষ হতে পারে। মনে হল, সুভাষবাবু আমার সঙ্গে একা-একা কথা বলার একটা Show করলেন—যেন দাদাদের একটু leg-pulling.—ভেবে বেশ মজা লাগলো। জীবনকে পরে কথাটা বলেছিলুম।

বাই হোক,—সত্যগ্রহীদের “জেলখটার” আর এক নমুনা দেখা গেল দমদম জেলে। শুনেছিলুম, সেখানে অবস্থা ও ব্যবস্থা এমন ঢিলে যে, বাইরের লোক নিঃসাড়ে ভিতরে যেতে এবং বেরিয়ে আসতে পারে। একদিন গেলুম দেখতে।

বাইরের বড় গেটে পুলিশ-পাহারা আছে বটে,—কিন্তু গেট থাকে খোলা এবং দলে দলে লোক যায় আসে। রোজই বহুলোকের interview থাকে। সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিস পর্যন্ত সহজেই যাওয়া যায়—গেলুম। কিন্তু অফিসে না চুকে পাশের জেলের বন্দীশালার দরজার গিয়ে দাঁড়ালুম। সে গেটেও একজন শাস্ত্রী আছে—বার ডিউটী মনে হল শুধু এখানে হাজির থাকা। কারণ

সেই খোলাই আছে, এবং এক-আধজন লোক, সত্যাপ্রহী বন্দী,— ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অকিসে বাচ্ছে বা অকিস থেকে ভিতরে ফুকছে, শাস্ত্রী চূপ করে খাড়াই আছে।

একটু কাঁড়াত্তেই লেখি, ভিতর থেকে রোহিণী (মুখার্জি—মুন্সীগঞ্জ) পোর্টে আসছে। সে আমাকে দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে 'আরে! তুমি আসছো?' বলে আমাকে ধরে সটান নিয়ে চললো ভিতরে। রক্তকণ্ড শাস্ত্রী মনে করলে, নতুন আমদানী।

ভিতরে গিয়ে খানিক দূরে দেখলুম। বিরাট বিরাট ঘর,—মা জমিদার, মা ব্যারাক। তার মধ্যে খাওয়া চলছে—কয়েক ঘরিতে একসঙ্গে খেতে বসেছে পঞ্চাশের লোক—বের মতোই সব চলছে। আমি অস্বাভাবিক বোধ করছি,—যদি কেবোত মা খাশি। রোহিণী বললে, কিছু ভয় নেই,—যখন এসেছে, তখন মা খেয়ে খাওয়াটা কি ভাল। সুতরাং তার সঙ্গে খেতে বসে গেলুম।

তারপর সে গোট পর্বত এসে শাস্ত্রীকে ডাকিয়ে বললে—বাও, অমরলা অকিসে আছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে,—অমরলা (চট্টোপাধ্যায়) এবং বন্ধিম মুখার্জি সারাদিন অকিসে সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে আড্ডা করেন,—যখন খুশী আসেন বান,—আর ভিতরের বন্দীরাও তার বখন প্রয়োজন হয়, তাঁদের কাছে অবাধে যাতায়াত করে। কাজেই শাস্ত্রীর সে বিষয়ে কোনো মাথা-ব্যথা নেই—গেট খুলে কাড়িয়ে থাকাই তার ডিউটা। তা ছাড়া সত্যাপ্রহীরা বে জেল থেকে পালায় না, এটাও সকলেই জানতো। সুতরাং আমি বেরিয়ে সটান চলে এলুম।

এই রকম জেল খাটার সার্টিফিকেটের জোরে অনেক বিশেষ বিশেষ কর্মী আলাও কংগ্রেসী সরকারের বড় বড় চাকরী করছেন। কিন্তু অল্প রকমের ঘটনাও আছে। অমরলা যখন এই দমদম জেলে বন্দী, তখনই কয়েকদিনের মধ্যে মেনিনজাইটিস রোগে অমরলার মেরু ছেলে দেবু মারা যায়—উনিশ-কুড়ি বছরের জোরান ছেলে—ছাত্র। দেখবার জন্তে কয়েকদিনের ছুটি চেয়ে অমরলা দরখাস্ত করেছিলেন,—কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হওয়ার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। আমি সে সময়ে উত্তরপাড়ার তাঁর বাড়ীতে ছিলাম,—এবং শব-সংকারও করেছিলাম।

এদিকে জেলে গাঙ্গীমহলে আর এক বড়স্বস্ত্র শুরু হয়ে গিয়েছিল। মহাস্বস্ত্রের গ্রেপ্তারের পর লবণ আইন অমান্তের সঙ্গে বিলাতী বয়কট এবং পিকেটিংও চলছিল। আগে একচোট লাঠি পেটা করা, তারপর গ্রেপ্তার ও জেল—এই ছিল সরকারী ব্যবস্থা। নিকপায় অসন্তুষ্ট জনগণ স্বচ্ছায় বয়কট সমর্থন করছিল। মুন তৈরী করার চেয়ে বেশী লোক জেলে গিয়ে পিকেটিং করে।

একদিকে এই বয়কটের ফলে ভারতের বিলাতী বণিক সম্প্রদায়ও—বন্দের টাইমস অফ ইণ্ডিয়া পর্বত—ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ভারতকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়ার সুপারিশ করতে আরম্ভ করেছিল,—আর একদিকে বিপ্লবীদের সাহেবমারার হিড়িকে সরকারও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছিল। সুতরাং সরকার মহাস্বস্ত্র সাহায্য সংগ্রহের মতলব আঁটলে।

আগষ্ট মাসের শেষ দিকে হঠাৎ মডারেট নেতা তেজবাহাদুর সাফ্র এবং কংগ্রেস নেতা জয়াকর জেলে মহাস্বস্ত্রের সঙ্গে দেখা করে জানালেন কংগ্রেস যদি আইন অমান্ত ছেড়ে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে

কংগ্রেস নেতা জয়াকর আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগ দা দিয়ে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্ত হঠাৎ খেমে পড়েছিলেন দেখে বেশ মনে হয়, ব্যাপারটা বড়স্বস্ত্র। সাইমন কমিশন বয়কট করার সঙ্গে নেহেরু কমিটির রিপোর্টে যেমন তাদের আলগোছে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কংগ্রেস ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলেই সম্ভব হবে, তেমনি মহাস্বস্ত্র জেলে থাকলে কংগ্রেস নেতা জয়াকর রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগ দেবেন, এটা আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল।

বাই হোক, একচোট আইন অমান্ত ছেড়ে দিয়ে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যাওয়া তো যায় না। তাই দেখা গেল মহাস্বস্ত্রী তাঁর ১১ দফা সর্ব থেকে ৪টে রেখে বাকি ৭টা ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং তখনকার মত দূতীয়ালা ব্যর্থ হল। তদিকে '৩১ সালের আত্মসমর্পণে বিশেষ রাউণ্ড টেবল-কনফারেন্স শুরু হয়ে গেল।

সে দূতীয়ালা ভিতরের কথা কখনো প্রকাশ হয়নি,—হবেও না। কিন্তু মহাস্বস্ত্র ৭ দফা দাবী ছেড়ে দেওয়ার কারণ আন্দাজ করা যেতে পারে যে, আন্দাজের সঙ্গে পরবর্তী ঘটনায় মিল আছে।

সম্ভবতঃ সাফ্র-জয়াকর মহাস্বস্ত্রকে বুঝিয়েছিলেন,—আরউইনের বর্তমান প্রস্তাবের সুযোগ নিয়ে রাউণ্ড টেবল-কনফারেন্সে যাওয়ার জন্তে একটু উদারতা দেখিয়ে আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার না করলে আগামী শাসন সংস্কারেও '২০ সালের মতন কংগ্রেসের কোন দাবীর কোন পাত্তা থাকবে না।

মহাস্বস্ত্র একটু কাৎ হয়েছিলেন, এবং তাঁর বগলের তলা দিয়ে ৭ দফা সর্ব বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সম্ভবতই আরউইন তাতে রাজী হতে পারেন না। সুতরাং দ্বিতীয়বার দূতীয়ালা শুরু হল। মহাস্বস্ত্র বললেন, আরো কাৎ হতে হলে একলা আমার ভয়সা হয় না। ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আমার পরামর্শ করার ব্যবস্থা করা হোক।

দেখা গেল, বিভিন্ন জেল থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নেতাদের মহাস্বস্ত্রের সঙ্গে এক জেলে একত্র করা হল। এবং শেষ পর্বত মহাস্বস্ত্র চিৎ হতেই রাজী হলেন,—একটিমাত্র সর্ব রেখে বাকি তিনটি সর্বও ছেড়ে দেওয়া হল। স্থির হল, সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তনের প্রমাণস্বরূপ অহিংস স্বাভাবিক বন্দীদের ছেড়ে দিলেই আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে।

কিন্তু এততেও সরকার আগে বন্দীদের মুক্তি দিতে রাজী হল না,—তারা চায় একেবারে নাকে খৎ—আগে আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে। সুতরাং সব দূতীয়ালা পণ্ড্রম হল। রাউণ্ড টেবল-কনফারেন্স হয়ে গেল। লড়াই চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর-রইলো না।

ঘর পোড়ানো, দোকান লুট, ফসল নষ্ট করা প্রভৃতি নিত্য নূতন সরকারী অত্যাচারের খবর কাগজে বেরুতে লাগলো। সরকার প্রেস অর্ডিন্যান্স জারী করে কাগজগুলোকে জব্দ করার ব্যবস্থা করলে অনেক কাগজ বন্ধ রাখা হল। Cyclostyle এ ছেপে সবাদ প্রচার হতে লাগলো। সরকার Cyclostyle ধরতে আরম্ভ করলে। বার Secrecyর নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিল, সেই গাঙ্গীপহী সত্যাপ্রহীরাও Cyclostyle আশ্রয় নিলেন। আর একদিকে বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টাও বেড়ে চললো।

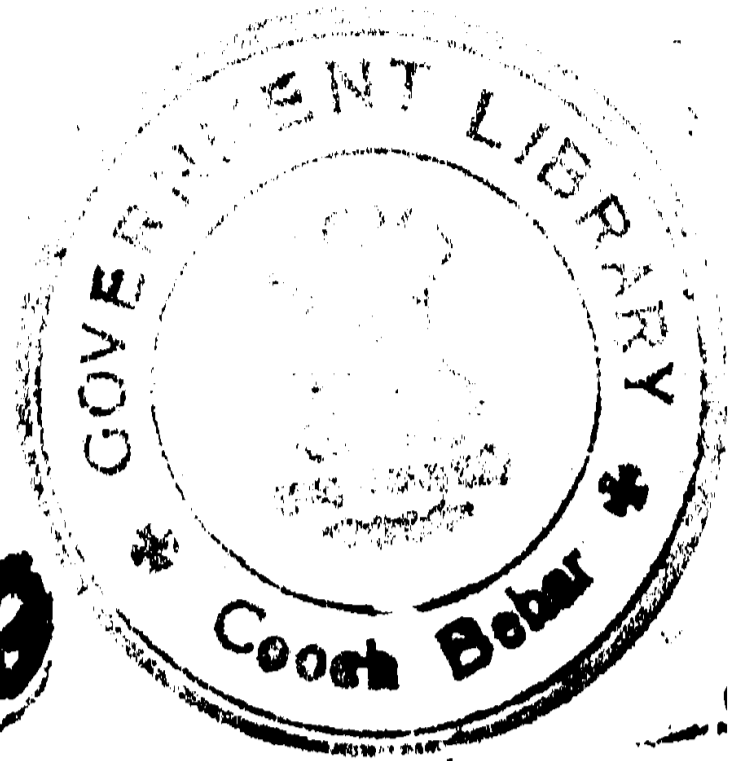
राज्य सरकार - प्रकाश, १९५१

५०१



लक्ष्मीविलास

तेल



एम. एम. क्यू झाउ कोः प्राइवेट लिः
बनौबिमान हाटेन, बलिकाडा-२

সুতরাং প্রথম রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের ফেরতা সাক্ষরকারী
আর একবার মহাত্মার সঙ্গে সলাপরামর্শ করলেন। তারপরই বেথা
পেস, সরকার মহাত্মাকে মুক্তি দিলেন। আর মুক্তি পেয়েই মহাত্মা
ব্রিটেন আর উইনের সঙ্গে বেথা করতে। আরো বেথা গেল,
সাক্ষাতের পরই হুই বন্ধুতে মিল হয়ে গেছে—এক বে একটিমাত্র
মত বাকি ছিল—বন্দীমুক্তি—মহাত্মা সে দাবীটিও ছেড়ে দিয়ে
আগেই আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন।

বন্দীমুক্তি সরকার স্বীকৃত করলেন তারপরে—গান্ধী-আরউইন চুক্তি
স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে—৩১ সালের মার্চ মাসের গোড়ায়। সে
বন্দীমুক্তিও হল ৩য় আইন অমান্য বন্দীদের মুক্তি। বিনা বিচারে
আটক ডেটিনিউরা,—হিংসাত্মক কাজের চার্জ সেই যে ঘোরাট
আমলার আসামীদের ওপর, তারা—পেশোয়ারে দণ্ডিত ধারোয়ালী
সৈন্যকর্ম,—সব বাদ দিয়ে বন্দীমুক্তি।

এই প্যাক্টকে armistice বা যুদ্ধ বিরতি বলে চালানো হল,—
এক ভাড়াভাড়া করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন করে' এই প্যাক্টকে
শাপ করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হল এক অভিনব মাহাত্মিক
কৌশলে। ওয়ার্কিং কমিটীকে দিয়ে এক হিটলারী ফতোয়া দেওয়া
হল,—কংগ্রেসের ডেলিগেটদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনকে নির্বাচিত
করতে হবে আইন অমান্য আন্দোলনের মুক্ত বন্দীদের মধ্য থেকে।
তাদের ভোটের জোরেই কংগ্রেসে প্যাক্ট ratified হয়ে যাওয়ার
ব্যবস্থা এইভাবে করে রাখা হল।

কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকার জন্তে মহাত্মার জন্তেরা ঢাক
পটাতে শুরু করলেন, গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট একটা বিরাট জয়,
—কারণ বড়লাট কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। কে,
এম, মুন্সী তাঁর বইয়ে লিখলেন (I follow the Mahatma)
—এ চুক্তি ভারতের ইতিহাসে বহু শতাব্দীর মধ্যে সর্ববৃহৎ
ঘটনা।

ওদিকে ৫ই মার্চের লণ্ডনের "টাইমস্" লিখলো,—আর কোন
চাইসরয়ের ভাগ্যে এই চুক্তির মতন বিরাট বিজয় ঘটেনি।

মহাত্মাজী বাণী দিলেন,—তাঁর লক্ষ্য যে স্বরাজ,—সে স্বরাজের
সংবিধানে শৃঙ্খল আত্মশাসন প্রতিফলিত হবে,—যে সংবিধান
ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন করবে না।

কিন্তু জনমত ছিল বহুলাংশে প্যাক্টের বিরুদ্ধে। তরুণ,
নওজোয়ান, কমরেড দল তো মহাত্মার ওপর বেশ খাঙ্গাই হয়ে
টুটেছিল। এমন কি, কংগ্রেসের অনেক নেতাও এ প্যাক্ট সহজে
হজম করতে পারেনি। জহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—
তাঁর মনটা মুসড়ে গিয়েছিল—এরই জন্তে কি দেশের লোক একটা
বছর ধরে এমন বীরের মতন লড়ে এসেছে? কিন্তু তিনি মহাত্মার
বিক্রমচরণ করাটা ব্যক্তিগত "হাম্বুডাই" মনে করে চেপে গিয়েছিলেন।
সুভাববাবুও মনেপ্রাণে প্যাক্ট সমর্থন করতে পারেন নি,—কিন্তু
কংগ্রেসে এক বামপন্থী সুরের বিবৃতি প্রচার করেই তিনিও ক্ষান্ত
হয়েছিলেন। হোমরুলার যমুনাদাস মেটা কংগ্রেসে মহাত্মার
বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

বাই হোক, শেষ পর্যন্ত প্যাক্ট সর্বসম্মতিক্রমেই পাশ হয়ে গেল।
শতকরা ৫০ জন লোনা ডেলিগেট ছাড়া এর আরও হুটো কারণ
ছিল। প্রথমতঃ, জহরলালের পরামর্শে মহাত্মাজী প্যাক্ট

ratification-এর প্রস্তাবের সঙ্গে মতামত করে ইতিপূর্বেই
ছুড়ে দিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয়তঃ সরকারী-বেতাল।

ঠিক কংগ্রেসের আগেই জগৎসিং, রাজগুরু প্রভৃতির কাঁসী দিয়ে
সরকার তরুণদের আরো কেপিয়ে দিলে, বাতে তারা মহাত্মার
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং মহাত্মার ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তরুণ
দল ঐ ইতিপূর্বেই সরকারী দাবীর সঙ্গে মহাত্মাকে আঁকড়ে ধরলো,—
প্যাক্ট পাশ হয়ে গেল।

কিন্তু মহাত্মা ইতিপূর্বেই সরকারী দাবীর সঙ্গে একটা 'adjust-
ment' এর কাঁকও বেধে দিতে ভোলেমনি,—এক পাছে সেটা
দিয়ে কেউ হৈ-ঠে বাধার,—তার জন্তে Subjects Committee
তে খুব জোর দিয়েই বললেন—“I shall get you Swaraj,—
I promise it.” সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজের একটা অস্পষ্ট অর্থ
প্রতিমূহ ব্যাখ্যা দোনালেন—“Equal partnership.”

সুতরাং মহাত্মাকে আবার একটা Chance দেওয়ার ব্যবস্থা
হল। আর তরুণদের ওপর থেকে কমিউনিষ্ট আদর্শের প্রভাব
নষ্ট করার চেষ্টার এক সোসিয়ালিষ্ট আদর্শ—মরমণ্ঠী ট্রেডইউ-
নিয়নিষ্ট বা বিলাতের পার্লামেন্টারী লেবার পার্টির আদর্শের—
আমদানী করে কংগ্রেস সোসিয়ালিজমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হল।

এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন জহরলাল। জনগণের মৌলিক
অধিকার এবং জাতীয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সঙ্ঘর্ষে করাচী-কংগ্রেসের
প্রস্তাবই সেই সোসিয়ালিজমের আদর্শ। তাতে মূল-শিল্পের
জাতীয়করণ, শ্রমিকদের অধিকারের সম্প্রসারণ, ডিম-সংস্কার প্রভৃতির
কথা ছিল। প্রস্তাবটা সঙ্ঘর্ষে কে, এম, মুন্সী তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে
লিখেছেন,—“এতে ধনিকরা বিক্ষুব্ধ হবে, অথচ মার্কসবাদীরা সন্তুষ্ট
হবে না। মহাত্মা প্রথমে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উদ্রত
হয়েছিলেন,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত জহরলালের মুখ চেয়ে চেপে
গিয়েছিলেন।”

এই তথাকথিত সোসিয়ালিজমের বাহার ভারতবাসী আজও
দেখছে,—৩১ সাল থেকে ৬১ সাল পর্যন্ত “ভ্রমলোকের এক কথা”
চলছে। আর জহরলালের পরম বন্ধু সাম্রাজ্যবাদীরা আজ পর্যন্ত
ঐ সুবাদেই জহরলালকে “সোসিয়ালিষ্ট” বিশেষণে বিভূষিত করে
পরম পরিতোষ প্রকাশ করে আসছে।

বাই হোক, প্যাক্টকে সরকার যে খাতির দেখালে কংগ্রেসের
আগেই জগৎসিংকে কাঁসী দিয়ে,—সে কাটা ষায়ে হুনের ছিটে
দিতেও তারা কসুর করলে না—হুনের ট্যান্ড বজায় রেখে।
করাচী-কংগ্রেসের বাইরে একটা কৃষ্ণ-পতাকা সহ বিক্ষোভ মিছিলও
দেখা গিয়েছিল। জনগণের যুৎস্ন মনোভাব শাস্ত হয়নি। প্যাক্ট
সই হওয়ার তিন হপ্তার মধ্যে কানপুরে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
হল এবং গণেশশঙ্কর বিতর্কী সে দাঙ্গার নিহত হলেন।

নানাহানে যুব সম্মেলন ও ছাত্রসম্মেলন থেকে চুক্তি-বিরোধী
প্রস্তাবও পাশ হতে লাগলো,—এক মহাত্মা বখন রাউণ্ডটেবল
কনফারেন্সে যাওয়ার জন্তে বসে থেকে জাহাজে উঠছেন, তখনও
বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল।

এই বিলাতবাজার আগে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা
ঘটেছিল। ওজরাটের কাছাকাছি (১) জেলায় অজন্মা হওয়ার ফলে
কৃষকেরা জমির খাজনা দিতে পারেনি, এক সরকার তাদের জমি

করতে শুরু করেছিল। মহাশয়ী চূপ করে থাকতে পারেন না,—সুতরাং তিনি দাবী করলেন, অবিলম্বে একটা "Impertial Tribunal" গঠন করে কৃষকদের অধিকাংশ ও সরকারী কার্যকলাপ সম্বন্ধে অসুসন্ধানের ব্যবস্থা করতে হবে—না হলে তিনি রাউণ্ডটেবল কনফারেন্সে যোগ দিতে যাবেন না।

লোকের মন তাঁর দিকে আকৃষ্ট হল। গভর্নমেন্ট একজন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে অসুসন্ধানের আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাশয়ী সেটাকেই Impertial Tribunal বলে মেনে নিয়ে চর্চা করে জাহাজে চড়ে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও ছাড়লো। তাঁর আগেই তাঁর ছাগলটাকে জাহাজে তোলা হয়েছিল।

এই বুদ্ধের ছদ্ম, যুদ্ধ এবং সন্ধি সম্বন্ধে "ঐত্তাওতা" থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি,—তা থেকেই আপনারা ওগুলোর স্বরূপ এবং জনগণের মনোভাব ভাল করে বুঝতে পারবেন।

(লাহোরে পূর্ণস্বরাজ্যের ছদ্ম)—এক গুরুঠাকুর শিষ্যবাড়ী গিয়েছেন। শিষ্য গুরুদেবের পায়ে কাছের কাছের একটি আধুলি দেখে প্রশংসা করতে গেল। আধুলি দেখে গুরুঠাকুর চটেই লাগল। বললেন,—"তোমার প্রশংসা আমি গ্রহণ করবো না, স্বতন্ত্র না তুই ষোল আনা প্রশংসা দিবি।" শিষ্য কুতাজলিপুটে অনেক হৃৎখের কান্না কেঁদে গুরুদেবের অনেক সাধাসাধনা করে বিফল-মনোরথ হয়ে, শেষে কোমর বেঁধে ক্রতমূর্তি ধরে ছদ্ম দিবে বললেন,—"চরণ দিবি নিরে শালা? তবে আজ তোমার গুরুগিরির দফা রক্ষা করবো।" ভাবগতিক দেখে গুরুদেব ধাক্কা হটেন।

(যুদ্ধ ও সন্ধি ১)—রামচরণ গাঁয়ের মোড়ল। গাঁ সুদ্ধ চাষার তার কথায় ওঠে বসে। কারণ এককালে আদালতে সাক্ষী দিয়ে সে বেশ ছপয়সা রোজগার করতো—এখন বুড়ো বয়সে তারই উপস্থিত থেকে বসে খাওয়া চলে, আর ধর্মকর্মও মতি হয়েছে...

গাঁয়ে অভয়া হল—চাষার জমিদারের কিস্তি দিতে পারলে না। পেয়াদা-বরকন্দাজ এসে আগে ভয় দেখালে,—শেষে অত্যাচার শুরু করলে।...নায়েব বাবু মোড়লকে ডেকে পাঠালেন। মোড়ল জোড়হাতে নায়েবের দরবারে হাজির হল। নায়েব বাবু স্বয়ং পা থেকে ছুতো খুলে মোড়লকে তক্তা করে ছেড়ে দিলেন।

মোড়ল বললে, "বাবুনের জুতো,—এ তো আমার বাবার জাগিয়া।"—নায়েব তার ঘাড় ধরে এক ধাক্কা মেরে বার করে বলে

দিলেন,—"তিন দিনের মধ্যে যদি সব খাজনা আদায় না হয়, তাহলে তো-শালায় ভিটের যুগু চরাবো।"

মোড়ল একছুটে গাঁয়ে এসে হাজির। চাষার চারিদিক থেকে শ্রমের পর শ্রমে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

মোড়ল একটু হাঁক ছেড়ে নিয়ে বললে,—"ওঃ—প্রথমে সে একচোট কী জুতোজুতি! তারপর নায়েববাবু যখন দেখলে, মোড়লের পো সোজাপাত্র নয়,—তখন আপোষের কথা পাড়লে। তোরা সব খাজনাটা আগে দিয়ে দে,—তারপর আমি জমিদারবাবুর কাছে দরখাস্ত লিখে দেব,—আর স্বয়ং নায়েববাবু সুপারিশ করবে। বেচারী মাইনের চাকর বই তো নয়! খাজনা আদায় না হলে তাকে কৈকিয়ৎ দিতে হবে যে।"

(যুদ্ধ ও সন্ধি—২)—পরিভ্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ এক জাহাজে চলেছেন। জাহাজে একটা লোক সমুদ্রের ক্রতমূর্তি দেখে ভয়ে চীৎকার শুরু করেছে—কেউ তাকে শান্ত করতে পারছে না। শেষে একজন মাতিক বিরক্ত হয়ে বললে,—"ওকে আমার কাছে দাও,—আমি ঠাণ্ডা করছি।"

এই বলে সে লোকটার কোমরে একটা কাছি বেঁধে একেবারে ঝপাৎ করে কেলে দিলে সমুদ্রের জলে। জলে পড়ে লোপাজলের নাকানি-চোবানি খেয়ে তার চীৎকার পেটের মধ্যে মৌদিয়ে গেল। তখন তাকে জল থেকে তুলে নেওয়া হল। জাহাজে উঠে সে মনে করলে,—"বাপরে!—বাঁচলুম।"

কাউকে একটা হৃৎখ ভোলাতে হলে তার ঘাড়ের আর একটা বড় হৃৎখ চাপাতে হয়। তারপর সেই দ্বিতীয় হৃৎখটা বুচিয়ে দিলেই সে মনে করে—"বাপরে!—বাঁচলুম! তখন আর তার প্রথম হৃৎখটার কথা মনে থাকে না।

স্বরাজ্যের অভাবের হৃৎখে যদি কেউ আইন অমান্ত করে,—তার মাথা ভেঙ্গে, ঘর জালিয়ে, ফসল নষ্ট করে, তাকে জেলে দিয়ে নাশ্তা-নাবুদ করে দাও। তারপর সেইটে বন্ধ করে রক্ষা করো—লোকে হাঁক ছেড়ে বাঁচবে—পূর্ণ স্বরাজ্য, আইন অমান্ত—তুই-ই ধামাচাপা পড়বে।

এই হল পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামের রাউণ্ড-টেবল-কনফারেন্সে পর্যবসানের ইতিহাস। পরবর্তী ইতিহাস আরো মনোহারী।

[ক্রমশঃ]

রূপকথা

[বোরিস পেটারভাক]

হারিয়ে যাওয়া এক সময়
কোন এক রূপকথার দেশে
স্তম্ভিত আন্দোলিত ভূমি
পার হ'রে গেছে ক্রতবেগে
কোন এক ঘোড়সওয়ার রথপ্রান্তরে।
ঘুলির কুখাটিকার ভেতর
উঠেছে তার সন্মুখে জেগে
অধিকার অরণ্যানী সেই দুর্ভাগে।

উৎকর্ষিত
মনে মনে ভেবেছিল সে :
'সন্মুখে জলাভূমি, সাবধান
দৃঢ় করে ধর পিঠের জিন।'
তবুও শোনেনি কোন মানে
ঘোড়া চলেছে ছুটে
ক্রতগতি
অরণ্যানী-ধরা চালু পথ পাঁচ হয়ে।

পার হ'য়ে গেছে
 ছকিয়ে বাওয়া নদী-পথ ধরে
 পার হ'য়ে গেছে প্রান্তর
 আর পার হয়েছে পাহাড়।
 পথ হারিয়ে সে এলো
 হিংস্র পক্ষ চলা সংকীর্ণ পথে—
 সে পথ চলে গেছে
 জলাভূমির দিকে।
 তবুও ভাবেনি কোন কথা।
 সে সন্দেহ জেগেছিল মনে
 জলন্তেমা তির্যক পথ বেয়ে মেঘে মেঘে খোঁজা
 জলার দিকে।
 জলার অপর পারে
 অগভীর নদীর শেষে
 বলে ওঠে কোন এক গুহা গহ্বরের মুখ
 তদাবহ আলোকশিখার।
 স্তম্ভিম যুমে
 ঢেকে গেছে তার দৃষ্টি
 দূরের ক্রন্দন ধ্বনি
 বেজেছিল অরণ্যের পথে পথে।
 বোড়সওয়ার আবার চলেছে ছুটে
 কারার সন্ধানে
 নিয়েছে পথ চিনে সন্ধানী চোখে
 তারপর মেখে সম্মুখে—
 দৃষ্ট হাতে বর্শা তুলে—
 কোন এক ডাগনের
 মস্তক লেগে
 আর মেহের কঠিন আবরণ
 তার বলন্ত মুখের আঙন
 পড়েছে ছড়িয়ে দিকে দিকে।
 এক যুবতী কুমারী বন্দী
 তার মেহের তিন পাকে পাকে।
 চাবুকের মতো
 ডাগনের গলা দোলে
 কুমারীর কাঁধের কাছে।
 সে দেশের নিরম ছিল
 কোন এক
 রপসী কুমারীকে দিতে হবে সঁপে
 বন্দী আর শিকাররূপে
 অরণ্যের এই বিকট পঙ্কর কাছে।
 এই উপহার
 দিয়েছিল মাগুয়েরা
 ডাগনেরে, নিজেদের
 জীবনের কামনার

কুমারীকে অত্যাচারের হিংস্র আকাঙ্ক্ষার
 ডাগন ধরেছিল
 দৃঢ় পাকে
 বাহু আর শ্রীবায়।

বোড়সওয়ার আকাশে দৃষ্টি তুলে
 জানিয়ে করুণ প্রার্থনা দূর স্বর্গে
 বর্শা তুলে ধরে
 সংগ্রামের তরে।

চক্ষু নিম্নীলিত।
 পাহাড়, মেঘ,
 নদী, জোতখিনী।
 বহর, শতাব্দী।

সংগ্রামের কঠিন আঘাতে কুমিতে পরান বোড়সওয়ার
 হারিয়েছে তার শিরশ্রাণ
 আর প্রভুভক্ত বোড়ার
 পদাঘাতে মৃত ডাগন।

বোড়া আর মৃত ডাগন
 পাশাপাশি বালুকার তরে
 বোড়সওয়ার অচেতন
 আর কুমারী স্তব্ধ।

নীলাভ আকাশ। মৃদু-বাতাসে
 কমলীয় হুপু।
 কে এ মারী? কোন রাণী?
 অথবা কি রাখাল বালিকা? অথবা রাজকুমারী?

আনন্দের উচ্ছ্বাসে
 ধামেনি অক্ষ-বরা
 তবু মাঝে মাঝে দেয় ঢেকে
 কঠিন বাঁধনে মৃত্যুর শীতল যুগ।

তারপর চেতনা এলে কিরে
 বোড়সওয়ার খোলে চোখ
 আর থাকে প'ড়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে
 গভীর বেদনার।

তবুও তাদের হৃদয়ে জোরার আসে
 কখনও বা তার কখনও বা কুমারীর।
 জীবনের সংগ্রামে পরাস্ত
 শুয়ে পড়ে চির-নিজার।

চক্ষু নিম্নীলিত,
 পাহাড়, মেঘ।
 নদী, জোতখিনী
 বহর, শতাব্দী।

আলোক চিত্র

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে
নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে
যেন ভুলবেন না ।]

বিচিত্র পশারী
—সন্তোষকুমার মজুমদার



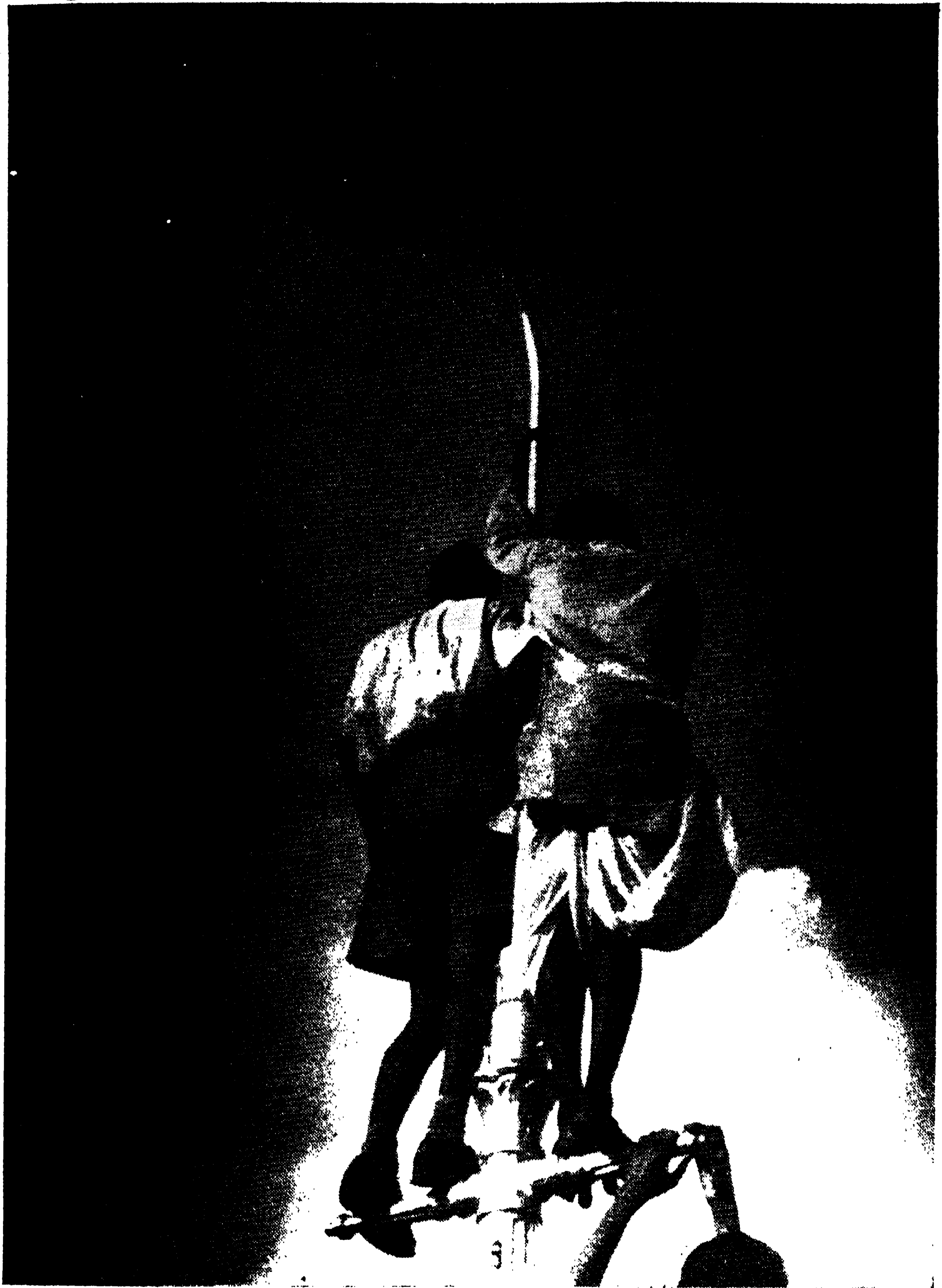
জল-সিঞ্চন
—বিভূতিভূষণ কুমার





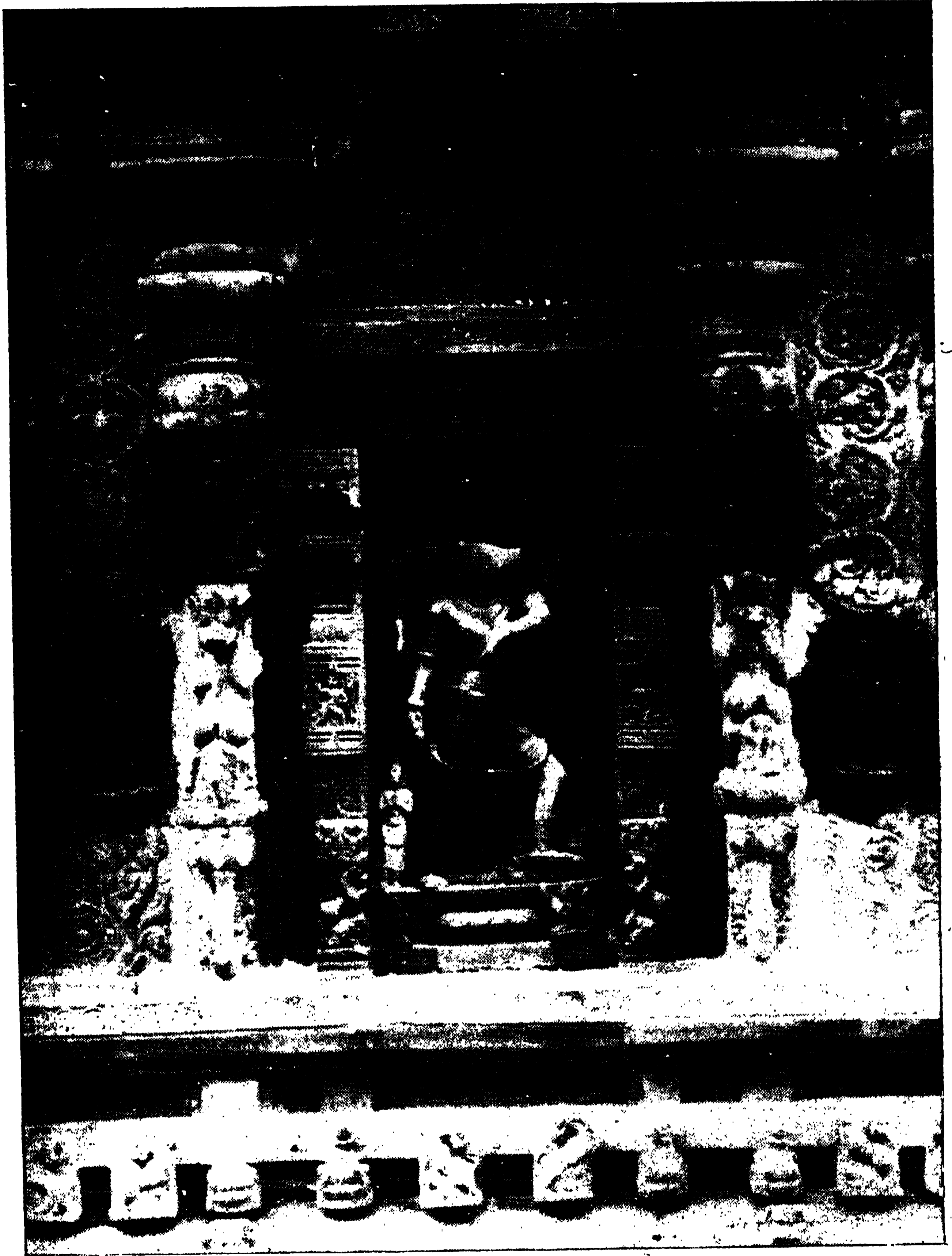
প্রাচুর্য

—আন্তোনিও গিন্স



স্থান-অভাব

—মহন বসু



বরাহ-বিগ্রহ (সীমাচলম)

—খগেন হুথোপাধ্যায়



বিজ্ঞান ভট্টাচার্য

২

আর পাঁচটা জমিদার আর জমিদারীর মতোই দ লেগেছিলো পাঁচবড়ার সেন-বংশে। তিন চার পুরুষ আগেকার কাহিনী সত্যিই রূপকথার মতো। বিখ্যাত অবিখ্যাত কিংবদন্তী কয়টাও চালু আছে বংশাবলী জড়িয়ে। যেমন ঠাকুরাণী পুকুরের গল্প। কি, না আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে, গ্রামে জলকষ্ট। এই সেনবংশেরই তত্ত্ব প্রপিতামহ জনার্দন সেনের স্ত্রী পুষ্করিণী খনন ব্রত করতেন। আড়ে প্রেছে দেখা যায় না এত বড় ঝিল। হাজার বাগদী মজুর কোদাল হাতে নেমে গেছে। খুঁড়ি করে মাটি ফেলে ফেলে পাড় হয়েছে পর্বত-প্রমাণ। ওদিকে গভীরে পুকুর চলে গেছে পাতাল পর্বত। অথচ জলের দেখা নেই। আশ্চর্য ঘটনা। নদীমাড়ুক বন্দোবশ। তিন হাত খুঁড়লে জল। ছুঁড়াবনার পড়লেন জনার্দন।

পাপকালনের জন্মে এক ব্রত ছেড়ে আর এক ব্রত। একদিন খান, তো তিন দিন উপবাস। কুচ্ছসাধনে ক্ষীণ হলো দেহ। এদিকে কোদাল পড়ছে একটি উঠছে। শুধু বালি আর বালি। এক কৌটা জল নেই। ব্রত বৃষ্টি পণ্ড হয়। এমন সময় হঠাৎ একদিন স্বপ্ন পেলেন জনার্দন। মকরে চড়ে শখ-পদ্ম হাতে স্বয়ং গঙ্গাদেবী এসে তাঁকে বলছেন—সুরধুনীর পদস্পর্শ না পেলো আমি আবির্ভূতা হতে পারছি না। তোর বোঁকে পুকুরে নামতে বল।

দুপুর রাতে নিজাতঙ্ক হলো জনার্দনের। কাছাকাঁচার ঠিক নেই। পেটের কাছে কাপড় মুঠো করে চেপে ধরে জনার্দন ছুটলেন অন্ধরবাটীতে—সুরধুনী, তুমি এসো।

ঝাড়লঠন বলে উঠল। মহলে মহলে সাজা পড়ে গেল। এরোক্তোরা সব বরণভালা সাজিয়ে জোকার পুকার দিতে দিতে শোভাযাত্রা করে এলেন। পূর্বোভাগে চললেন সতীসাবিত্রী সুরধুনী। হাতে পঞ্চপ্রদীপ।

তারপর বরণভালা সাধারণ করে একটির পর একটি সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেন অচঞ্চল সুরধুনী গভীর অতলাস্ত তলে। সুরধুনীকে আর দেখা গেল না। স্থির পরিধির ওপর ভেসে এসে হুলতে লাগল শুধু পঞ্চপ্রদীপের ডালা। স্ত্রী-র পুণ্য ব্রত সার্থক হলো জনার্দনের।

সেই থেকে ঐ পুকুরের নাম হলো ঠাকুরাণীর পুকুর। পালপার্বণ ব্রত-অনুষ্ঠানে আজও সন্ধ্যার লোকের কাছে ঠাকুরাণীর পুকুরের জল পাবিছে পঞ্চপ্রদীপ।

—কিংবদন্তী আরও আছে।

এটা আরও পরের ঘটনা। সত্যব্রতের প্রপিতামহ নকুলেশ্বর সেনের সংসারে কোন আসক্তি ছিল না। রাজার মতো ঐর্ষ্য। তবু নিজের ভোগসুখ বিলাস-ব্যসনে তিনি এক কানাকড়িও খরচ করতেন না। সত্যপ্রিয় স্ববিপ্রতিম লোক। পরের চুখে সদাই বিগলিত-করণ। জমিদারীর ভেতরে কেউ অনশন অর্ধাশনে আছে শুনলে নিজে আর সেদিন জলস্পর্শ করতেন না। পূজোপাঠ, বাগবজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সাধারণো দান-ধান, এ ছিলো তাঁর নিত্যকর্ম। অনাসক্ত বিধাগী মন। বিবর-আশয়ের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে নিবন্ধ থাকতো শুধু বহির্বিধলোকে। জাগতিক করণীর কর্তব্য্য তুলচুক হয়ে যেতো প্রায়ই। তবে ভুতের বোঝা ভগবানই বইবেন। সাংঘাতিক কোন বিচ্যুতি কোনদিনই ঘটেনি। হঠাৎ নিস্তরঙ্গ সুখের সংসারে হৈঁচৈ পড়লো একদিন। সূর্যাস্ত হর-হর, তবু লাটের কিস্তি দেওয়া হয়নি। নীলামে উঠলো তবে জমিদারী। ভেনবুদ্ধি অর্ধাচীন সরিকের দল লাফালাফি শুরু করলো, নকুলেশ্বর ইচ্ছে করে তাদের পথে বসিয়েছে।

মহলে মহলে শোকছারা নামলো। নিরতির মতো অনিবার্য নিদারুণ এক রাজদণ্ডের জন্মে প্রস্তুত হয়ে বইলেন সবাই।

তিন দিন তিন রাত বিশালাক্ষীর মন্দিরে দরজা বন্ধ করে বইলেন নকুলেশ্বর। কারো সূখদর্শন করলেন না। এদিকে জমিদারীর তরফ থেকে জরুরী এক প্রতিনিধি দল চলে গিয়েছে কলকাতা। আমলাগোমস্তারা গঙ্গার দিকে চেয়ে আছে কখন বজরা আসে।

সপ্তাহ কাল পরে কালোবিলুয় মতো দেখা গেল বেন নদীবেক—বজরা ফিরছে। অধীর জনতা কান পেতে শুনলো, শুধু আসছে না। বাজনা বাজিয়ে আসছে। লাল নীল হরিৎ নিশান উড়িয়ে প্রমত্ত বজরা হুলে হুলে আসছে।

আনন্দের আভির্ভব্যে অধীর হলো জনতা। আমলাগোমস্তাদের কেউ কেউ মা মা বলে লাফিয়ে পড়লো নদীবেকে। পুকার দিয়ে বেজে ওঠলো শখ পল্লীর ঘরে ঘরে। বাক, তা হ'লে সর্বনাশ হয়নি। প্রতিনিধান হয়েছে। মেজো আর ছোট তরফের বুদ্ধিমস্তার রক্ষা পেয়েছে নকুলেশ্বর সেনের জমিদারী।

পূর্ণমালা দান-ছূর্ষায় অভিনন্দন জানায়না হলো বজরা থেকে মেজো আর ছোটবাবু নামতে না মাঝতেই। নকুলেশ্বরের স্ত্রী স্বয়ং এসে আশীর্বাদ করলেন দেবর জন্মেশ্বরকে। আর আশীর্বাদের ছলে একথাও স্মৃষ্ট করে জানালেন—বীরভোগ্যা বনুছরা। জন্মেশ্বর

থাকতে তাঁদের আর ভাবনা নেই। ব্রজেশ্বর বেন অর্ধ অর্ধ নকুলেশ্বরের সব দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করেন।

প্রমত্তিবাচন আর সাটান প্রমিতান্তের পথ বড়ই আশা করা যায় অস্বস্ত: বাহাহারীর খাতিরেও মনসর্গী ব্রজেশ্বর কিছু বলবেন। কিন্তু ব্রজেশ্বরকে দেখা গেল নতমুখে অবোরধারীর অঙ্গবর্ষণ করছেন। বলছেন—দাদা কই, মহাপাতকী আমি, দাদা আমাকে ক্ষমা না করলে এ তুচ্ছ প্রাণ গঙ্গায় বিসর্জন দেব। উদ্ভ্রান্ত উন্মত্ত ব্রজেশ্বর বজরা থেকে লাফিয়ে পড়ে ভিড় ঠেলে 'দাদা' 'দাদা' করে ছুটলেন গৃহান্তিমুখে। পিছনে চললো কতুলী জনতা। কি ব্যাপার? একটু পরে রক্তখাসে বার্তা জানা গেল যে নকুলেশ্বর ঘায়ের হয়ে একজন অনভ্যা পুন্দরী কস্তা নাকি ক্রাইভের এজলাসে পূর্ব্যাঙ্কের আগুয়েই রাজত্ব নিয়ে এসেছে।

সেই সব খানদানের-ই উত্তর পুরুষ সত্যব্রত। হাবভাব আদব-কারদার চলনের তলোটাই একদিন এমনি ছিল যে আর পাঁচটা চোখ হী করে চেয়ে থাকতো সত্যব্রতর দিকে। সরাসরি কথা কইবার সাহস হতো না। কোঁতুলের নিবৃত্তি হতো অস্ত্র কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে কে তদুরলোক।

তা পাঁচঘড়ার অমিদারদের একটা খানদান ছিল বৈ কি। প্রমিতান্ত সেই নকুলেশ্বর সেনের আমল থেকে তাঁর নাতিমানকুড় সর্বের বিধেশ্বর সেন অবধি ভেজে-বিক্রমে প্রত্যেকে সৌরসেনী। হু ফুট সাড়ে হু ফুট করে লখা দেবতুলভ সেই কাঠিকের কেহকাড়ি দেখলে সত্যিই মাথা আপনা থেকে ঘুরে আসতো। বোঁ আনা হতো কিন্তু বাচাই করে—সাড়ে চার ফুটের বেলী লখা হবে না। কঠিনে অর্থাৎ কোমর বরের হাতের মুঠপ্রমাণ না হলেও নিশ্চিতভাবে সঙ্গ। গড়ন হবে ছিপছিপে অর্থাৎ কতুলী-এর হাড় দেখা বাবে না। আর চাই ডোল। মুখের আলল লখা, গোল, কি তিখাকুড়ি বাই হোক না কেন, চোখ দুটি চাই মস্তকমলের পাঁপড়ি। শুধু পটলচেরা বললে সে চোখের কিছুই বলা হয় না।

রূপারোপের পর বউ বাচাই হতো তারপর গুণসম্পদে।—বউ-এর চলন কেমন, বলন কেমন, বিচার কেমন, শাস্ত্রজ্ঞ কি না, সংস্কৃত বাদেও সংস্কৃতি কিছু আছে কি না—এই সব দেখে। সত্যব্রত সেই বংশেরই সন্তান। কুলকৌলীক আজ আর কিছু নেই। তবু হাবভাব চেহারার কৌলীক একটা কয়লার ময়লার মত থেকেই আছে। এটা অস্বীকার করবার নয়।

পিতৃকুলে অভিসম্পাত আসে সরিকি মামলায়। স্বামী নিজের স্ত্রীর হাতে জলম্পর্শ করেন না। ঘোলের সববৎ-এ বে বিব মেশানো নেই, সে কথা কে বলবে? তারপর ব্যভিচার আর উদ্ভ্রাঙ্কলতা। সেই সশ্রেয় পটলচেরা চোখের দৌরাত্ম্য। রাতের অন্ধকারে মেজো ভয়ক গিয়ে ঢুকেছিলেন সেজো ভয়কের ঘরে। সেজো বাড়ী ছিলেন না। তিন নব্বয় লাটের কাছারীতে গিয়েছিলেন মিত্যে সাকীর ভদ্রিবে, সেই কাকে। তারপর কিরে আসতেই 'খণ্ডপ্রলয়'। মেজো ভয়ক টেনে বার করেন গাদা বন্ধুত, আর সেজো রিতলভার। ঘায়ের প্রাণ মাটির মত। অস্ত্রবিষোথ ঠেকাতে এসে হিরভিন্ন হয়ে বান গুলী খেয়ে। মরবার সময় দারোপার কাছে জ্বানবন্দী দিয়ে বান, বেজার আত্মত্যাগ পথ বেছে নিলাম। শেব-রকে হয় টাকার। জ্বরপর পাশের বাসার সাপের ভিম পাড়ে। নিত্য নকুল শ্রেয়

ফুটে ফুঁসে বেড়ায় কালগোধুরা। একটার পর একটা অনর্থ হতে থাকে সংসারে। নকুলেশ্বর সেনের সার্বিক স্বপ্ন জন্মমাট এক হাঁড়ির পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙা কাচের মত। কালি কালি জ্বির মত চারমহলা প্রাসাদের অভিসন্ধি চিরে সরিকী পাঁচিল ওঠে পাঁচ দশ হাত অস্তর। কাচের মামুখ ঘুরে চলে, ঘায় চিরজননের মত। চোখের দেখাটা পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠে না কোনদিন। সত্যব্রতর বাবা দেবগুপ্ত সেন ঘারা যেতেই এটনীর হাতে সম্পত্তির দায়ভার তুলে দিয়ে সত্যব্রতর মা স্বর্গলতিকা মেয়ে চিত্রলেখার হাত ধরে গিয়ে ওঠেন শ্রীরামপুর, তাঁর ভাই-এর কাছে। সত্যব্রত তখন সবে বি-এ পাশ করেছে। জীবনে উন্নতি করবার শুভসংকল্প নিয়ে সে চলে ঘায় বিলেতে। বিলি ব্যবস্থা মত মাসান্তে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয় সত্যব্রতকে। সবাই মনে করে খেতাবী কোন রাজার বেটা। ক্যাশান শো আর নাইট ক্লাবে বোতাম টিপলেই সজিনী আসে। ছ-এক পাক নাচার পরই পরদেশী 'বালমার' ঠোট কাঁপে। কপালের জ্ব যথুক হয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘারে দৃষ্টিতীর। বারোয়ারী কর্মমতলার এই সব বুদ্ধভূতীদের পাল্লার পড়ে টাকা খরচ চর সত্যব্রতর জলের মত। তারপর আর বাঁও মেলে না। বিদেশ বিভূই, কে-ই বা সাহায্য করে। তালিয়ে যেতে যেতে ধরে ফেলে শুভময়। দেশে কিরিয়ে নিয়ে আসে বারবারার টিউটর করে।

শ্রীরামপুরের—মামাবাড়ীর কেউ বিলেত ঘায় নি। তবু কাজে কধে সাহেবিয়ানা পুরোধমে সাব্যস্ত এ বাড়ীতে। বড় মামা হরপ্রসাদের বক্তপি টিকি আছে, রাড্রে তিনি বোজ মুন্সী খান। বাড়ীর মেয়েরা কনভেন্টে পড়ে না কিন্তু কয়ালী মেমসাহেবের কাছে বাড়ী বসে ক্রেক শেখে। বাজার সরকার দীননাথ বখন হিসেবের খাতায় হিসেব মেলায়, ঠোনোপ্রাকার মিস পার্কার তখন একশ কুড়ি প্নীড়ে পাশে বসেই চিঠি টাইপ করে। ভেটকী মাডের কাঁটা সহযোগে ছাঁচড়া একটা এখনও হয় বাড়ীতে। কিন্তু সেই কাঁটা চিবোতে বাড়ীর মেয়েদের খেতে তিনটে করবার বেওয়াজ নেই। ক্যান্ট্রী সাইরেনের সঙ্গে সঙ্গে কিচেন বন্ধ। একটা বাজলেই ঠাকুর চলে বাবে। পূজোপাঠ হবে হোক, কিন্তু ধুনো ঘিরে খটা করে কাঁধ-খটা বাজবে না। সঞ্জম জীবনে বিজ্ঞান আছে কিন্তু হাই তুলে ভুড়ি বাজিয়ে শ্রীমধুশুধন বলা চলবে না। ঘড়ির টাইসে বাঁধা নির্ধট, যা কলেবু কদাচ ন। শ্রেক কাজ করে বাও।

যুদ্ধের পর বিলেত থেকে বখন প্রথম কিরে এসো সত্যব্রত তখন সে পুরোধের সাহেব। শ্রীরামপুর মামাবাড়ীর হাক আধকাই চাল তার ঠিক পতন হলো না। ঠিক করলো কোন হোটলে গিয়ে থাকবে। মা স্বর্গলতিকা খুব একটা আপত্তি করেন না। হোটলে থেকে পুবিধে হয় কাঁকরোর জো ভাই হবে। বোনের প্রত্যবে সঙ্গে সঙ্গে যায় ঘেন হরপ্রসাদ। পাঁচঘড়ার রাজস্ব, 'ও রক বডই তপ্তনীল হোক না কেন, বিখাস নেই এক বুদ্ধুর্ভ। বলেন, বেশ জো তাই থাকবে। আমার কোন আপত্তি নেই। ঘির হলো হোটলেই উঠবে সত্যব্রত।

কিন্তু হোটলে টাকা কোথায় সত্যব্রত? স্বর্গলতিকাকে ডেকে বলে, এখন জো কিছু দাও। জ্ঞান করবো মস্তক বরবো—এখনই জো করবার টাকার।

চিত্তিত হল স্বর্ণলতিকা। সোনালীনা ঐক্য একদিন কি ছিল না ছিল আজ সে কথা সত্যিই অবাস্তব। এক ছেলের মতোই তাঁকে এ পর্যন্ত কম খেয়াবত দিতে হয়নি। অর্থাৎ কিছু সম্পত্তি ছাড়া কাঁচা টাকা তিনি কোথায় পাবেন? মেয়ে চিত্রলেখার বিয়ের ব্যবস্থা যে টাকাটা তিনি আলাদা করে রেখেছেন এখন তাতেও তিনি হাত দিতে পারবেন না। সে টাকা আছে এটনীর ঘরে, শীলমোহর করা। মেয়ের বয়স বাইশ না হওয়া পর্যন্ত হাত দেওয়া বাবে না সে টাকার। সত্যতর কথা শুনে মাথার হাত দিয়ে বসেন স্বর্ণলতিকা।

: টাকার কথা বলছিস, টাকা কোথায় থাকা।

স্বর্ণলতিকার কথা বিশ্বাস হয় না সত্যতর। অসহিষ্ণু হয়ে বলে, টাকা—নাও টাকা। এখন টাকা কোথায় বললে আমি কোথেকে টাকা পাবো? নাও, দেখো আমি সে টাকা চতুর্গুণ করে তোমাকে কিরিয়ে দেবো একদিন। টাকা চাললে তো টাকা আসবে? টাকা নাও। মা হয়ে ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারছো না।

: বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় খোকা। টাকা আমার নেই। টাকা আমি দিতে পারবো না। দুপ্ত অথচ আহত কঠিনের ক্ষোভ হুঃখ দুটোই সেদিন ফুটে উঠেছিল স্বর্ণলতিকার। কিন্তু সত্যতর চোখে তখন টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। মায়ের কথার উত্তরে গ্লের করে বলে, পূজাপাঠ তো কর শুনি আজও। বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করা তো আমি তাঁরই এক খামখেয়াল, অথচ সে খামখেয়ালীর দায় কেন তিনি দিয়ে বাননি? আর তুমি, তুমি একজন বা-তা লোক, তুমিও দারিদ্র এড়ালে টাকা নেই। কি বলবো, আচ্ছা চল।

চলে গেল হোটেল সত্যতর। হাতে গালাবন্ধু নেই, বিভসবায়ের গুলীও চালায়নি সে, তবু স্বর্ণলতিকার বন্ধ বিদীর্ণ হলো অনিবার্য ভাবে।

৩

দশ ছয় বোল আনা,—দুটো ভ্রাতৃশপথ একত্র করে জুড়ে দিলে যেমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্ত রচনা করে এমন আর কিছুতে নয়। অন্নদা তার অনেক ভেবে-চিন্তে ছিব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

মনস্থির করতেই অনেক সময় লেগে গেল অন্নদা বাবু। অকারণ কতকগুলো ভ্রাতৃ ধারণার বশবর্তী হয়ে অংশীদার হওয়া সম্বন্ধে বিশ্বতোষকে খানিকটা প্রতিক্রমার চোখে দেখে আসছিলেন অন্নদা। ব্যবসায়িক রেশারেশির মনোভাবটা প্রত্যক্ষ না হলেও মনে মনে তিনি যে বিশ্বতোষ সম্পর্কে কোনদিনই সম্বন্ধার্থের একান্ততা অনুভব করেননি, এটা সত্য কথা। আর এই করেননি বলেই, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারেও অন্নদা বাবু খানিকটা বরাবরই বিধাবিত ছিলেন। কলে ব্যবসায়িক সম্প্রসারণটাও ঠিক আশারূপক হয়নি এতদিনেও। চেয়ার অব কমান্সে চটের ব্যাপারে তাঁর কথার দায় কমে গেছে। আর চটের বাজারে কথার দায় কমা মানেই মাহুদ হিসেবে নিজে ছোট হয়ে যাওয়া। এ সব যা হয়েছে, জাতস্বার্থেই হয়েছে তাঁর। কোব কিছের না কাউকেই তিনি এ জন্তে। আজ দেখছেন, কুল করেছেন তিনি মূল হিসেবে গোলমাল করে। ব্যবসা-ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অংশীদার সম্পর্কে প্রত্যয়েরও যে একটা স্বর্ণলতিকার মত, যা ঠিক তিনি বুঝতে পারেননি। একদিন

পর আজ তাঁর সেই জ্ঞানির নিয়মন হয়েছে। একেবারে আগন করে বুকে টেনে নিতে হবে বিশ্বতোষকে। তবেই তাঁর মনেরও সংশয় মিটেবে। প্রকল্পনালিনীর সঙ্গে একদিন অন্নদা বাবু কি সম্পর্ক ছিল, সে কথা বিশ্বতোষ রিচরই মনে করে থাকবে না।

রুইত বিড়ি থেকে অন্নদা বাবু সেদিন একটু তাড়াতাড়িই বেবোলেন। কাজকর্ম সেরে ভেবেছিলেন একেবারে সঙ্গে করেই ধরে নিয়ে আসবেন। কিন্তু বিশ্বতোষের কি একটা আগে থেকেই কাজ ছিল। ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারলো না সঙ্গে। আশীপুরে নেমে গেল। অন্নদা বাবু একাই কিরলেন মনোহরপুকুরের বাড়ী। দোস্তলার উঠেই হাতটা বাড়িয়ে ধরেন কমলকামিনীর দিকে। হাসি মুখে বলেন, সত্যীর বিয়ে আমি ঠিক করে কেললাম কমল।

: সে কি। কার সঙ্গে?

: ছেলে যে তোমার খুব পছন্দ হবে এ কথা আমি হালক করে বলতে পারি।

: তবু তুমি?

: কেন, বিশ্বতোষ। বিশ্বতোষের সঙ্গেই আমি সত্যীর বিয়ে দেবো। তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি, আপত্তির কথা নয়। বিশ্বতোষের সঙ্গে সত্যীর বিয়ে নিয়ে এর আগেও অনেক কথা হয়ে গিয়েছে কমলকামিনীর স্বামীর সঙ্গে। অন্নদা বাবু তখন রাজী হননি। যুক্তি দেখিয়েছেন, তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। আজ হঠাৎ স্বামীর মুখে তাঁর বিপরীত যুক্তি শুনে হতবাক হয়ে বান কমলকামিনী।

: আমার আপত্তি কি বলছো? তোমারই তো ধনুকভাঙা পণ বি ম জানতুম যে বিশ্বতোষের সঙ্গে তুমি মেয়ের বিয়ে দেবে না। আজ হঠাৎ.....

: হঠাৎ নয়, হঠাৎ নয়। অনেক ভেবে-চিন্তেই আমি মনস্থির করেছি কমল। দেখলাম ব্যবসায়িক স্বার্থের খাতিরেই অমিয়নাথের সঙ্গে আমার এখন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার। মেয়ের বিয়ে বখন আমাকে দিতেই হবে...। নিজের ছেলে বা করলে তা তো চোখের ওপরেই দেখতে গেলে। সুতরাং গ্যারান্টি বখন কোনখানেই নেই, তখন বিশ্বতোষ-ই ভালো। ঠিক করিনি?

: খুব ঠিক করেছো। আমি খুব খুসী হয়েছি।

: আমি জানতাম তুমি খুসী হবে।

: সত্যীকে কিছু বলেছো?

: না। সত্যীকে বলা নয়। আমি চাই, একটা সহজ স্বাভাবিক পরিবেশের ভেতর থেকে ওরা পরস্পর পরস্পরকে জড়াক। অঙ্গীকার আর শপথ, যা করবার তা ওরাই করুক। আমরা দেখি। প্রাণের খুশিতে টপকিয়ে ওঠেন কমলকামিনী। বলেন, আমার মেয়ের আমি কিন্তু—বাই বঙ্গো তুমি, অগ্নিসাকী করে মন্ত্র পড়ে বিয়ে দেবো।

: সে তুমি দিও।

অন্নদা বাবু বখন কমলের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তিন জন চাকর বখারীতি তাঁর শরীর থেকে নিত্যকার পঙ্কতি মতো ছুতো-আবা প্যাট খুলে নিয়ে চলে যায়। এক সেট বার আর এক সেট আসে। স্বামিনী-র হাসিঠাট্টার ঠাঁকে ঠাঁকে তারা সুখোপ মুখে কাজ করে চলে। পারিবারিক কোন কথার তাদের আপাত কোন

কৌতূহল দেখা যায় না। যেন অন্নদা বাবু যেনে গেলেন-ও ওরা ভয় পাবেনা। রসিকতা করে হেসে উঠলেন-ও হাসবেনা ওরা। সমীচীন মুহূর্তগুলো বুকে বুকে শুধু হাত-পা শরীর ধরে নাড়াচাড়া করবে। অন্নদা বাবু-ও এমনি ঢিলেঢালা ভাব করেন যে কয়েক মুহূর্তের জন্তে তাঁর কসী নাহুসমুহুস শরীরটা শুনের চোখের ওপর তিনজন চাকর অন্নদা বাবুর আদুড় শরীরটা নিয়ে স্তম্ভিত হইবে বলে কমলের-ও লজ্জা করেনা। অন্নদাবাবুর সঙ্গে কষ্টনটি করে কত হাসি কত কথা বলেন কমল, যেন ঘরে অস্ত্র প্রাণী নেই।

অন্নদা বাবু হেসে বলেন, শুধু অর্ধ আর বৈভব থাকলেই সব হয় না। আমি বলছি সত্যের কথা। স্বয়ংবরসভা থেকে পত্তি-নির্বাচন করতে পারবে না আমার মেয়ে। সে ব্যক্তিত্ব নেই আমার সতীর। সুতরাং তার শুভাকাঙ্ক্ষী হতে গেলে অগত্যা আমাকেই খুঁজে পেতে এনে দিতে হবে ছেলেকে।

: না, ও নিজেরা উত্তোগ করে না করলে কিছুটা হবার নয়। সে আমার ছেলের বেলাই খুব শিক্ষে হয়েছে।

হঠাৎ অন্নদা বাবু মনে পড়ে যান, টেলিকোনে নেমস্তর করে খেতে বলেছেন রাত্রিতে বারবারাকে। স্ত্রীকে বলেন : ভাল কথা। শুনের কিন্তু আমি রাত্রে খেতে বলেছি। শুভমর আসবে বারবারাকে নিয়ে।

: খেতে বলেছো, দেখবে ঠিক ডিনার টাইমে আসবে। আমাদের মতোন? রাত্রিরে নেমস্তর আর সন্ধ্যালে গিয়ে নিজেই কুটনো কুটছি।

: এ তোমার রাগের কথা হলো কমল! বারবারা তার আনন্দ জানবে কোথা থেকে? Dinner at eight. সেদিক থেকে দেখবে বড়ির কাটার এতটুকু এধার-ওধার নেই। ঠিক এসে গেছে বারবারা। তোমার সন্ধ্যালবেলা গিয়ে কুটনো কোটার আনন্দটা এর পরিপ্রেক্ষিতে মিলিয়ে নাও। দেখবে ঠিক আছে হিসেবে। হাজার হলেও মেমসারের তো?

কাহা যেন উঠে আসে কাঠের সিঁড়ি ধরে। আড়চোখে পদীর দিকে তাকিয়ে কমল বলেন : ঐ বুঝি এলো বারবারা।

বারবারা? এত ভাড়াভাড়া? একটু অবাক হন অন্নদা বাবু। উঠে যান হলঘরে।

পারিবারিক প্রসঙ্গ নিয়ে এতই জমে উঠেছিলেন অন্নদা বাবু, যে খেরালই ছিলো না তাঁকে দমদম বিমানখাঁটিতে বেতে হবে বিশ্বতোষের সঙ্গে। মিঃ টমসনকে বিলম্ব বাবার প্রাক্কালে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্তে।

: আরে কি আশ্চর্য দেখ এখন অবধি আমি তৈরী হতেই পারলুম না। কি করা যায় বল তো?

নিজের অপ্রতীতির জন্তে আত্মপক্ষ সম্বর্ধন করে অসহায় বৃত্তি দেখান অন্নদা বাবু।

অসম্ভব একটা দামী স্যুট পরে এসেছে বিশ্বতোষ। চলবার কেরবার প্রত্যেকটি কারদার আভিজাত্যের স্পষ্ট ছাপ। বলে : বেটেটা হলে আমিই বারণ করতুম। কিন্তু টমসন যাচ্ছে আমাদেরই কাছে আপনার পরামর্শ মতো। একবারটি গেলে ভাল হতো না?

হুটো খাওয়ার সূতো একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। উ—একটা ছোট্ট জিজ্ঞাসার শব্দ করে বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন অন্নদা বাবু

বিশ্বতোষের দিকে ঠোঁটটা কামড়ে। বলেন : না, গেলে তো ভাল দেখাতোই। তবে ভাবছি, এই মাস্তর তাকে হোটলে নাথিয়ে দিয়ে এলুম। তারপর তুমি যখন যাচ্ছেই।

কথার মাঝখানে কমল আর সতী এসে হাজির হতেই অন্নদা বাবু যেন একটা খেই পেয়ে যান। বলেন : এক কাজ কর না কেন? কমল তোমার সঙ্গে যাক। দেখাটাই তাহলে আরও ভাল হবে কি বল?

বিশ্বতোষের চোখে-মুখে চমকটা কোটবার আগেই কোঁস করে ওঠেন কমল : কোথায় বাবে কমল? এরোডামে টমসনের জন্তে ফুল নিয়ে? স্বপ্নেও ভেবো না।

অন্নদা বাবু একটা বে-চালের পর মাথা চুলকোন। তারপর মোক্ষম চাল চালেন হাসিমুখে।

: ঠিক আছে ঠিক আছে : বেতে হবে না তোমাকে। তুমি বসে বসে ডিভিডেন্ট খেও। শেরারহোন্ডার হয়ে কোম্পানীর কোন কাজ করছো না তো? সতী বাবে। সতী, তুমি বিশ্বতোষের সঙ্গে দমদম বাবে। টমসন সারের বিলম্ব যাচ্ছে আজ। আমার আগেই বলা আছে মার্কেটে। বাবার পথে কিছু ফুল তুমি নিয়ে যেও। সারেরও খুব খুসী হবে। বলা, বাবার শরীরটা তেমন ভাল নেই। তাই আমার পাঠিয়ে দিলেন। টমসনের পকেট থেকে অনেক চকোলেট খেয়েছো। যাও কাজটি করে এসো।

বিশ্বতোষ কোন কথা বলে না। অন্নদা বাবুর কথার মূল ধরে কমল বলেন : আর এ সব লৌকিকতার ব্যাপারে তড়িঘড়ি নোড়রূপ হলেছোকরাদের পক্ষেই সম্ভব। নাও, যাবে তো তৈরী হয়ে এসো সতী। দেয়ী করো না।

অন্নদা বাবু বিশ্বতোষকে সালিশী মানেন—কি হে পাটনার, বলা কিছু।

খড়পোরা বাঘের মাথাটাকে চাপড়ে আদর করে বিশ্বতোষ। সতীকে বলে : ধাবেন তো দেবী, দেয়ী করবেন না। আবার ফুলের ব্যাপারটা আছে। অন্ততঃ মিনিট পনেরো আগে পৌঁছুতে চাই।

বিশ্বতোষের সঙ্গে ফুল নিয়ে বাবার প্রলোভনে যতটা নয়। বুড়ো টমসনকে একবার চকোলেট দিয়ে অবাক করে দেবার ইচ্ছেটা ছেলেমানুষের মতো পেয়ে বসে সতীকে। বলে : ফুল নয়, চকোলেট। আমাকে চকোলেট কিনে দিতে হবে টমসনকে।

অন্নদা বাবু হাসল। বলেন : বেশ তো। তোমার চকোলেট, আর আমার ফুল। টমসনকে বলে দিও। ভালই হবে।

প্লেনের তাকার চাইতেও তখন বিশ্বতোষের তাড়া বেশী। হাতঘড়ি দেখে সতীকে বলে : আর দেয়ী করবেন না, আছন।

অসহিষ্ণু হয়েছে বিশ্বতোষ। সতী অসহিষ্ণু হয়ে না উঠলে তাকে আজ অনেক কথা বলবার আছে বিশ্বতোষের। সিঁড়ি পর্বত এগিয়ে গিয়ে রওনা করে দিয়ে আসেন কমল শুনের। ঘুরে ফিরে এসে অন্নদা বাবুর হাত ধরে বলেন : চল, এবার আর একবার বেরই। তবে প্লেনে বাবার কথা ভাবলেই যে ভয় করে।

অন্নদা বাবু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—সে তর একলা গেলে। হুকুনে একসঙ্গে থাকলে আবার ভয় কি কমল?

পাটিনটা বন্ধ যেন করে গিয়েছে কমল থেকে। অন্নদা বাবু



আগামীক

প্রস্তুতি

খোঁকা আজ আর খোকা নেই। আজ সে বড় হয়েছে। ছ'দিন পরে বাবার মতো ওকেও অনেক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে সংসারের মরা-বাঁচার সংগ্রামে।.....
বুড় বাবা আজ ক্লান্ত। কপালের ডাঁকে ডাঁকে তার বারুকোর ছাপ। জীবনের সব অবিজ্ঞতা, সব সফর দিয়ে খোকাকে সে বড় করে তুলেছে। তাঁর বুক ঢালা মেহের ছারার দিনে দিনে ছোট চারাটির মতো বেড়ে উঠেছে খোকা, আর জেনেছে জীবনের কঠিন সত্যকে—বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রাম।
এ তুমি আগামীকই প্রস্তুতি। আজকের এই মহান সংগ্রামই যে একদিন শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীকে আনন্দ সুখের উজ্জ্বল হাতি গানের উৎস করে গড়বে।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যক্রম এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামীক পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি, আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে—

হাতটা ধরে একটা কাঁকুনি দিয়ে কমল বলেন : চল না আমরাও
বেসিয়ে পড়ি ওদের পেছন পেছন ?

অন্নদা বাবু হেসে বলেন : মনে আছে? সেই একবার
হেডলাইট মেয়েছিলাম কি টি রোডে। কানিনগর বাহিলে
কালীপুজোর ছুটি তোমার দাদার সঙ্গে ?

পঁচিশ বছর আগেকার কালীপুজোর রাতের কথা ভাল মনে
পড়ে না কমলের। ঈশং হাসিযুখে অন্নদা বাবুর দিকে চেয়ে থাকতে
থাকতে 'বেলকুলের মালা' আর 'ঠাণ্ডিবরক'এর বিমিয়ে পড়া শুরুর
মুহুর কোন কোন পূর্ণিমার স্মৃতি চোখে জেলে ওঠে কমলের।
বসন্ত করে বারবার। শুভময়ের হাত ধরে ঠিক কাঁটার কাঁটার
আঁটটায় এসে হাজির। সত্যসত্যও এসেছে সঙ্গে সঙ্গে।

ওদিকে বিশ্বতোষের পাড়ীর স্পীডোমিটারের কাঁটা ধর-ধর করে
কাঁপছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের কোঠা ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

এক রাতটা ধারণ তার ওপর আবার দু'-এক মিনিট
অন্ধর বানবাহনের বাধা, নইলে মনের আবেগ ঠিক বড়ির কাঁটার
ধরা পড়তো উর্ধ্বাধাস প্রতিবেগে। সীতের ঠাণ্ডায় ওপরের ঘোঁরা
রাতার এসে নেমেছে। দুয়ের পথ অস্পষ্ট। হেডলাইটের
আলোতেও সেই ধূলিধূসর নোংরা আচ্ছাদন ভেদ করার নয়।
সামনের দিকে নজর রেখে স্টীয়ারিং ঠিক রাখে বিশ্বতোষ। বলে :
ফুল আর চকোলেট ভাগ্যে নেই টমসনের, তার কি হবে ?

সতী হাতঘড়ি দেখে বলে : ঠিক পেয়ে বাবো দেখবেন।

: আশাবাদীকে কখনো ভাগ্যবানে বিশ্বাসী হতে নেই।

: মানে ? বুধ কেবোতেই সতীর কানের হীরেটা আলো ফেলে
বিশ্বতোষের চোখে-বুখে। সতী বলে : আপনি বৃষ্টি আশাবাদে
বিশ্বাস করেন ?

: আশাবাদী কে নয় বলুন ? তবে আশা যে ফুলে কুহকিনী
সেখানে একদম নয়। ও হলনার ফুলতে রাজী নই।

: কবিতা বলেন, আশা কিন্তু কুহকিনী।

বলুন কবিতা। আজ-বাজে কথা কইবার লাইসেন্স আছে ওদের।

আবার সে লাইসেন্স নেই। প্রথমতঃ ব্যবসাদার বলে দ্বিতীয়তঃ
পাট আর বাই কলক, কখনও কখনও স্মৃতি করতে পারে না জানবেন।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সতী। বলে : না, তা পারে না
টিকই। কিন্তু পাট নিয়ে যে স্পেকুলেশান করেন আপনারা
তা কিন্তু কবিকল্পনাও ছাপিয়ে যায়। কাটকার বাজারে দেখুন—
আপনারা প্রত্যেকেই উটরেট।

: উটরেটের বিকল্পকল্প কিছ পাট। ফুল ফুল ফুল নয়।
বনলতা সেনের Scope নেই এখানে।

পাড়ীর স্পীড অস্বাভাবিক মন্থর হয়ে যায়। বিশ্বতোষ সতীর
দিকে ঘুরে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরতে ধরতে বলে : আর,
যদি কোন বনলতা সেন আসেনই, তিনি নাটোরেরই হোন বা
বেধানকারই হোন, তাঁকে আসতে হবে পাটের মতো ফুল
সুনির্দিষ্ট ভাবে। আপনার ভাবার 'উটর অব্ জুট'-এর পক্ষে
একমাত্র তখনই স্পেকুলেশান করা সম্ভব। তখন যে কোন মূল্য,
টাকা ছেড়ে যদি আঁচি বোতাম মার তুচ্ছ এ জীবনও।

বিশ্বতোষের চোখ দুটো বিমিয়ে আসে। সতীর মুখের ওপর
কুঁকে পড়ে বলে : জানবেন, আমরা, যারা পাটের কারবার করি
মিস, প্রেক পাট, পাট ছাড়া কিছু বাকি না আমরা। Everything
in terms of jute !

নাকে মুখে অনর্গল একরাশ ঘোঁরা ছেড়ে পায়ের চাপে পাড়ী
ছুটিয়ে দেয় বিশ্বতোষ।

পাটের দাপটের কথা শুনে চূপ করে থাকে সতী। বিশ্বতোষ
বলে : উত্তমটা ভেবে রাখুন। ফেরবার পথে শুনবো। এখনও
হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে। দেখি যদি টমসন সায়েবকে
আপনার চকোলেট ধরিয়ে দিতে পারি। [ক্রমশঃ।

মায়ের মায়ী

(Tennyson রচিত Home They Brought Her Warrior Dead হইতে)

সবিতা রায়-চৌধুরী

তরুণ সেনানী করি ঘোর বরণ,

মহামরণেরে করিলে বরণ,

চিরনিমিত্ত পূণ্য সে দেহ, গৃহে আনা হল তার,

পাষাণ-প্রতিমা বীরপ্রিয়া চোখে

এক কথা জল বয়িল না শোকে,

হায়্যাঁচে চেতনা, সে জো লুটিল না, কলিল না হাহাকার।

সমব্যাধী বত সজিনী দল,

তরুণীরে হেরি হল চকল,

ছিন্ন নির্ঝাঁক, বিধবারে ঘেরি গুজন ওঠে বীরে

জীবন-প্রদীপ নিবিবে তাহার,

স্বদরের চাপা ব্যথার পাহাড়,

কুর্কীর সর্দী-নির্ঝর মধু না পলিলে আঁধি-বীরে।

সত্যবিধবা তরুণীর কানে

সখীকল মিলি, বৃহৎ ওপ-পানে

বহুই দুপ-দুপে, বিপত বীরের বত সৌরবগাথা,

কমালীল অরি, প্রকৃত মিত্র,

প্রেম প্রদানের বোগ্য পাত্র,—

নির্ঝাঁক পত্তি-বিয়োগ-বিধবা কহিল না তবু কথা।

নীরব চরণে এক সঙ্গিনী,

বীর পাশে-বীরে আসিয়া তখনি,

বদন হইতে আবরণখানি সরায়ে লইল বীরে,

চিরনিমিত্ত সেই প্রিয়বুধ

দেখিয়াও তার ভাজিল না বুক,

অসহ ব্যথার লুটিল না তার, ভাসিল না আঁধিনীরে,

বৃদ্ধা তাহার খাজী তখন,

শিঙটিয়ে শেষে করিল স্থাপন,

পাষাণ-প্রতিমা সে উল্লাসিনীর কোমল কর 'পরে,

টুটিল এহার পাষাণের ভার

ছুটে হুর্কীর অজ্ঞোয়ার,

কাঁদিল কহিল, 'যাহা রে আমার, যেতে আ'...

বসন্তের বসন্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আইভান তুর্গেনিভ

১৬

জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনের বেলা তা সবাই জানে। মাকচিনি আর মরমার পিণ্ডের ঝোল। সেদ্ধ করা গরুর মাংস, কর্কের মত শুকনো আর সাগা চর্বির টুকরো লাগানো তাতে। আলু, বীট, মূলো সব সেদ্ধ, তিনিগার দেওয়া ইলমাহ, মাংসের সঙ্গে জেলি আর মেলসু পাইজে অর্থাৎ লাল টক রসের পুডিং। কিন্তু বিয়ার ও ওয়াইন চমৎকার। সোডেনেও তারা এই খেলে। আহার বেশ ভালোভাবেই চলছিলো, সবাই বে খুব ফুটি করছিলো তা নয়, এমন কি হের রুয়বার 'বা আমরা ভালোবাসি' তার উদ্দেশ্যে বখন পান করলো তখনও সবাই চূপচাপই ছিলো। খাবার পর এলো কফি—পাতলা, খয়েরি রংএর সত্যিকারের জার্মান কফি। খাঁটি উজ্জ্বল মত হের রুয়বার সিগার খাবার আগে অমুমতি চাইলো জেন্মার কাছে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ অশোভন ও গ্রানিকর একটা ঘটনা ঘটে গেলো, খানিকটা অশিষ্টও।

পাশাপাশি টেবিলগুলোর একটিতে বসেছিলো প্রধান সেনাদলের কয়েকটি অফিসার। তাদের কথাবার্তা ও চাহনি থেকে বোঝা যাচ্ছিলো জেন্মার রূপ তাদের আকৃষ্ট করেছে। তার মধ্যে একজন তার দিকে এরকম ভাবে চেয়েছিলো যে মনে হচ্ছিলো ফ্রান্সকোর্টে জেন্মাকে দেখে থাকবে। সে নিশ্চয়ই জেন্মার পরিচয় জানতো। হঠাৎ সে গ্রান হাতে করে উঠে দাঁড়ালো, সেনাদলের লোকগুলো ভীষণ মন খাচ্ছিলো, তাদের টেবিলের উপর অনেকগুলো বোতল দেখা যাচ্ছিলো, সে এগিয়ে এলো জেন্মার টেবিলের দিকে। গৌরবর্ণ, সুলভ প্রিয়বর্ষন তরুণ ছিলো সে দেখতে। অবশ্য এখন মস্তপানের ফলে তার গালের পেঙ্গিগুলি কুঁচকে উঠছিলো, চোখ বেরিয়ে আসছিলো। প্রথমে তার সঙ্গীরা তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করলো কিন্তু কি করে সে দেখবার জন্ত তারাও খানিকটা কোঁড়ুলী হয়ে উঠছিলো, আর বাধা দিলো না।

সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলো না অফিসারটি। 'মস্তপানের ফলে তার কঠোর জড়তা এসেছিলো, জেন্মার সামনে এসে চেষ্টা করে জোরে চেঁচিয়ে উঠলো সে 'সারা ফ্রান্সকোর্ট সহরের, না, সারা জগতের সর্বত্রই সুলভী শপগালের (দোকানীময়ের) স্বাস্থ্য পান করি আমি।' বলেই তার গেলাসের অবশিষ্ট পানীর উদরসং করলো। 'আর তার দেবহুল্লভ আজুল দ্বারা আচ্ছন্ন গোলাপটি নিয়ে পুরস্কৃত করি নিজেকে।' জেন্মার প্লেটের পাশে টেবিলের ওপরে রাখা একটি গোলাপ ফুল জুড়িয়ে নিলো সে। প্রথমে বিশ্বরে ও তখন জেন্মা কান্ধাশে হয়ে গেলো। তারপর জয়ের জায়গার দেখা দিলো দুর্ভাগ্যবশত জেন্মা। তার মুখে রক্তিম আভা দেখা

গেলো, তার কালো গভীর হুঁচোখে একবার দুপার একবার কোঁখে চেয়ে দেখলো তরুণটির দিকে। মনে হলো এ দৃষ্টিতে অফিসারটি লজ্জিত হলো, জড়িত কণ্ঠে কি যেন বলতে চেষ্টা করলো, নত হয়ে অভিবাদন করে তার সুলভবর্গের মধ্যে ফিরে গেলো। তারা তাকে অষ্টহাস্তে ও হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালো।

হের রুয়বার টুপি পরে উঠে দাঁড়ালো, মার্জিত কণ্ঠে যদিও উচ্চৈঃস্বরে নয়—বললো 'অত্যন্ত বর্ষর আচরণ' সেই সঙ্গে কড়াপ্পরে ওয়েটারকে ডেকে বিল দিতে বললো। শুধু তাই নয়—গাড়ী জুততে আদেশ দিলো ও বললো, উজ্জলোকদের পক্ষে হোটেলের খাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাদের অপমানিত হতে হর হোটেলের এসে জেন্মা স্থির হয়ে বসে ধাঁপাচ্ছিলো। এ কথা শুনে হের রুয়বারের দিকে চেয়ে দেখলো, সেই দৃষ্টিতে যে দৃষ্টি দিয়ে সে অফিসারটির দিকে চেয়েছিলো। এমিল রাগে কাঁপছিলো।

কঠোর স্বরে জেন্মাকে হের রুয়বার বললো—উঠে এসো। এখানে রসা আর শোভন নয়। চলো আমরা ভেতরে যাই।

জেন্মা চূপ করে উঠে দাঁড়ালো, হের রুয়বার তার কনুই বাড়িয়ে দিচ্ছেছিলো, হাতে হাত ধরে সসজ্জমে এগিয়ে গেলো তারা হোটেলের ভেতরে। হের রুয়বার তার সুবেশ ও সুদর্শন চেহারার সঙ্গে সদর্পে ও সম্মানে ভাল বেধে চলেছিলো। বেচারী এমিলকেও তাদের পেছন পেছন যেতে হলো।

কিন্তু হের রুয়বার বখন ওয়েটারকে বিল শোধ করে দিচ্ছিলো—এক পরসাত্ত বখশিস দেয়নি সে ওয়েটারকে শান্তিধরণ—সানিন ক্রতপায়ে অফিসারদের টেবিলের পাশে গেলো। সেই অফিসারটি যে জেন্মাকে অপমান করেছিলো তার বন্ধুবর্গকে ফুলাটি শৌকার জন্ত একজনের পর একজনকে দিচ্ছিলো। সানিন পরিচয় করা সীতে তাকে উদ্দেশ্য করে বললো, দেখুন, এইমাত্র আপনি যা করে এলেন, তা উজ্জ্বলীভঙ্গিত নয়, তা আপনি যে ইউলিখের পয়েছেন তার অযোগ্য, অতি নীচ আপনি। অফিসারটি লাকিয়ে উঠলো, কিন্তু তার চেয়ে বয়সে বড় একজন অফিসার জোর করে বসিয়ে দিলো তাকে। তারপর সানিনের দিকে ঘুরে করা সীতে উত্তর দিলো, কে আপনি? একজন আত্মীয়, বেয়েটির ভাই না ওর ভাবী স্বামী?

সানিন বললে, আমি তার পরিচিত মাত্র। আমি হচ্ছি রাশিয়ান। কিন্তু এরকম উচ্চ আচরণ দেখে তো চূপ করে থাকতে পারি না। এই আমার কার্ড ও আমার ঠিকানা—মহানরর আমাকে খুঁজে পাবেন।

এ কথা বলে সানিন একটি কার্ড ছুঁড়ে বেললো টেবিলে ও

গ্রেটের ওপর ফেলে রাখা জেনার গোলাপটি তুলে নিলো। সেই তরুণটি আবার জেনার হেঁড়ে উঠতে চেষ্টা করছিলো কিন্তু অফিসারটি চেঁচিয়ে উঠলো 'ডনহোক, বসে থাকো' এবারে সে সমস্তম্বে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে সানিনকে বললো, তাদের সেনাদলের একজন অফিসার কাল সকালে সানিনের সঙ্গে দেখা করবে। সানিন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে তার সঙ্গীদের কাছে কিরে এলো। সানিন যে খানিকক্ষণের জন্ত ছিলো না বা অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছিলো হের রুয়বারের বেন নজরেই এলো না। গাড়োরান খোঁজা জুতছিলো, অস্থির হয়ে সে তাকে তাগাদা দিচ্ছিলো। জেনারও সানিনকে কিছু না বলে অস্তিত্বকে চেয়েছিলো। কিন্তু তার কৌচকানো তুক, শুকনো ঠোঁট ও শান্তভাবে থেকেই তার অধীরতা বোঝা যাচ্ছিলো। একমাত্র এমিলই সানিনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলো, জিজ্ঞেস করতে চাইছিলো। সে সানিনকে দেখেই অফিসারদের কাছে যেতে, একটা সাদা কাগজ চিঠি বা কার্ড ছুঁড়ে দিতে। তার ইচ্ছে হচ্ছিলো সানিনকে জড়িয়ে ধরতে। তার সঙ্গে নিয়ে, ওই অধম অফিসারগুলোর মাথা ভেঙ্গে দিতে, উদ্বেজন্য তার সারা শরীর কাঁপছিলো। কিন্তু কোনো রকমে চাকলা দমন করে সে দেখছিলো তার মহৎ রাশিয়ান বন্ধুটি কি করছে।

গাড়োরান খোঁজা জুতলে পর সবাই গাড়ীতে গিয়ে বসলো। এমিল স্নানকরে গাড়োরান ও টাটারিয়ার পাশে উপরে উঠে বসলো। ওখানেই সে বেশী ঘাঙ্কন্য বোধ করছিলো। হের রুয়বারকে দেখতে হবে না ভেবে সে খুশী হয়েছিলো। সে তার সারা অস্তর দিয়ে ওকে স্তূপা করছিলো এখন।

সারা রাত্তি হের রুয়বার নিজের মনে একাই বকে গেলো। কেউ তার কথার প্রতিবাদ করলো না। অবশ্য তাই বলে তাকে যে কেউ সমর্থন করছিলো তাও নয়। বললো সে ভীষণ ভুল করেছে জন্মের চারদিক বন্ধ করা গ্রীষ্মকালীন ঘরে না নিয়ে গিয়ে। যদি তারা যেতো তাহলে এই অশোভনতা কিছুই ঘটতো না। তারপর বললো, সরকার তার সেনাদলকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয় তার জন্ত তারা জনসাধারণের প্রতি শিষ্ট আচরণ করতে পর্যাপ্ত ভুলে যায়। তার এই ভীষ সমালোচনার বেন নব্যজাতীদের চিন্তাধারার ছোঁয়াচ স্পর্শান্নো ছিলো। সেজন্তই চারদিকে এত অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। একই শেষ পরিণতি হচ্ছে বিপ্লব। এবারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো একটু উদাহরণ রয়েছে ফ্রান্স। অবশ্য সে নিজে শৃংখলা ও নিয়মাবলিভিত্তিকই পছন্দ করে। কখনই সে বিপ্লবী হবে না। জব্ব এ রকম খেঁজাচারিতা দেখে সে চূপ করে থাকতে পারে না। নীতিপরায়ণতা ও মর্যাদা, হনীতি ও আত্মসম্মান সবকিছু আরো আরেকটি অতিপ্রচলিত মন্তব্য বলে সে তার বক্তব্য শেষ করলো।

এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে জেনার তার প্রণয়ীর জন্ত স্পষ্টতই লজ্জা বোধ করছিলো। খাবার আগেও অবশ্য মনে হয়েছিলো কোনো কারণে হের রুয়বারের প্রতি বিরক্তি বোধ করছে সে, সেজন্তই সানিনকে হুঁয়ে রাখছিলো, এমন কি তার উপস্থিতিতে অস্থিত্বই বোধ করছিলো। শেষের দিকে সে খুব কষ্ট পাচ্ছিলো, সানিনকে সে কিছুই বলেনি, কিন্তু মিনতিভরা চোখ নিয়ে চাইলো যে সানিনের দিকে। সানিন বত না হের রুয়বারের প্রতি বিরোধ বোধ

করছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী অসুস্থতা বোধ করছিলো জেনার জন্ত। সারাদিন বা ঘটে গেলো তার জন্ত সে বেন একটু খুশী হয়েছিলো। যদিও সে জানতো কাল সকালে তাকে বন্দ্যুচ্ছে অবতী হতে হবে।

অবশেষে এই বঙ্গবাদ্যিক পরিচ্ছেদের শেষ হলো। বখন যে জেনারকে গাড়ী থেকে নামতে সাহায্য করছিলো, কোনো কথা ন বলে সানিন সেই কেড়ে আনা গোলাপটি আন্তে তার হাতে কিরিয়ে দিলো। সে লজ্জার লাল হয়ে সানিনের হাতে একটু চাপ দিলো তক্ষুণি ফুলটি কোথায় লুকিয়ে ফেললো। সন্ধ্যা সবে ঘনিরে আসছে তখন, তবু সানিন বাড়ীর ভেতর গেলো না। জেনারও তাকে যেবে বললো না। তাছাড়া পান্টালেওন তখনই দরজায় এসে বললো ফ্রাউ লেনোর গুয়ে আছেন। এমিল সসঙ্কোচে বিদায় নিলো, সে বেন সানিনকে এড়িয়ে যাচ্ছিলো—সানিনের ব্যবহার তাকে এতই হুঙ্ক করেছিলো। রুয়বার সানিনকে সঙ্গে করে গাড়ীতে পৌঁছে দিলো তার হোটেলের অত্যন্ত ঘটা করে উদ্ভতার সঙ্গে বিদায় নিলো। এই অতি সম্মতিভ ও মার্জিত জমাণ ছেলেটি পর্যাপ্ত বেন কুণ্ঠিত হয়েছিলো। অবশ্য সকলেই তাই বোধ করছিলো।

বাই হোক, সানিন তার অস্থিত্ব সহজেই ঝেড়ে ফেললে তার জায়গায় তার মন ভরে গেলো মধুর আনন্দে, এমন কি উল্লাসেও বলা যেতে পারে। অকারণ পুলকে তার মন থেকে সব চিন্তা চলে গেলো। পায়চারী করে শিসু দিতে লাগলো সে।

১৭

পরদিন সকালে বখন সে প্রাতঃকৃত্য শেষ করছিলো, জাবছিলো যে অফিসারটির জন্ত দশটা পর্যাপ্ত অপেক্ষা করবো, তার পরে এলে তাকে আমাকে খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু জামাণরা খুব ভোরে ওঠে। নয়টা বাজতে না বাজতে ওয়েটার এসে খবর দিলো সেককও লেকটেনাট ফন বিটার তার দর্শনাভিলাষী। সানিন তাড়াতাড়ি তার কোট পরে নিয়ে উদ্ভলোককে আসতে বললো। উদ্ভলোককে দেখে অবাক হয়ে গেলো সে, নেহাতই বালক দেখতে তাকে। শত্রুগুহহীন বালকটি তার মনে সমস্ত জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলো কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে অত্যন্ত অপ্রতিভ বোধ করতে লাগলো, তরবারি পাশে রেখে চেয়ারে বসতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলো। জড়িয়ে জড়িয়ে, খেমে খেমে কোনো রকমে অতি খায়াপ করাশীতে বললো তার বন্ধু ব্যাষণ ফন ডনহোক, হের ফন সানিন তাকে যে কাল অপমান করেছে, তার জন্ত কমাডিকা চেয়ে পাঠিয়েছে। যদি সানিন কমা না চায়, তবে তাকে দেখে নেবে। সানিন বখন বললো সে কমা না চেয়ে লড়তে রাজি আছে, তখন সে ঠেকে ঠেকে কোনো রকমে জিজ্ঞেস করলো কোথায়, কখন কার সঙ্গে সব কথাবার্তা হবে। সানিন উত্তর দিলো, যদি সে হ' বক্তার মধ্যে কিরে আসে, তবে ইতিমধ্যে সানিন একজন সহযোগী টিক করে নেবে। (যদিও সে ভেবে পাচ্ছিলো না কোথা থেকে এই সহযোগীটি আবিষ্কার করবে সে?) হের ফন বিটার বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালো, দরজায় কাছে গিয়ে বিমর্ষ ভাবে কিরে দাঁড়িয়ে বললো, তার বন্ধু ব্যাষণ ফন ডনহোককে অবশ্য স্বীকার করতে হয়েছে যে, কালকের ঘটনার জন্ত তিনিও খানিকটা দোষী। সেজন্ত সানিন স্বীকার

সকলেই জানে কোম্পানীর কাজে হুঁতিন দিনের জন্ম ছোট সাহেবের সঙ্গে লাভণ্য সরকারেরও বোধাই বাওয়া প্রয়োজন হয়েছে। কোম্পানীর কাজে বোধাই দূর নয় মোটেই। আকাশ-পথে যটা কয়েকের ব্যাপার মাত্র। আর যে বাই ভাবুক, লাভণ্যর বাওয়াটা বীরাপদ অস্ত্রত খুব দরকার মনে করেনি। সেখান থেকে নিয়মিত কাঁচা মাল আমদানীর ব্যাপারে মাঝে মাঝে গোলযোগ হচ্ছে বলে বাওয়া। সিতাও মিত্র একা গেলেই হত। ওষুধের সরকারী অহুমোদন লাভের তদবিরে গিয়ে বড় সাহেব যেমন লাভণ্য সরকারকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, সিতাওরও হয়ত সেই একই উদ্দেশ্য। কিন্তু অস্ত্রগুলোর আর কেউ উদ্দেশ্যের এই একমাত্র সাদাসিধে ব্যাখ্যাটাই মেনে নিতে রাজি নয়। প্রগলভ ক্রকুটি তার কুটিলতা ভরা। তাহাড়া, আর একটা শালা কথা, এই কটা দিন অকিস নীরস লাগছে বীরাপদর।

কিন্তু লাভণ্য সরকারের বোধাই বাওয়ার খবরটা যে হিমাংক মিত্রও জানতেন না, বীরাপদ একবারও কল্পনা করেনি। তিনি ক্যান্টরীতে এসেছেন তাও জানত না, ঘরে ডাক পড়তে অবাক হয়েছিল। গিয়ে দেখে গভীর। তারপর প্রশ্ন শুনে হতভম্ব।

সত্বর সঙ্গে লাভণ্যও যবে গেছে ?

বীরাপদ জবাব দিতে পারেনি, মাথা নেড়েছিল হয়ত।

কাল সকালে বাড়িতে এতকণ কথা হল, একবারও বলানি তো ?

যেন ওরই অপরাধ কিছু। কোনো স্বাস্থ্য সাময়িকীতে ভেজ-উৎপাদন সমস্তাগত রচনা লেখার আলোচনায় গতকাল তাঁর বাড়িতে অনেককণই কেটেছে বটে। মেজাজ বেশ প্রশন্ন ছিল বড় সাহেবের।

এই সব নীরস লেখার মধ্যেও বীরাপদর কাব্য-ভাবের ব্যক্তনা নিয়ে হাল্কা ঠাট্টা পর্যন্ত করেছেন। মস্তব্য, ও বা ওর বউ ছুড়নের একজন কবিতা লেখে মিস্টর। বউ নেই শুনে পাইপ ধাঁতে চেপে লবু বিষয় প্রকাশ করেছেন, হোরাই ? এনি হার্ট ব্রেকিং অ্যাক্‌ফোর ?

ঘুরিয়ে বললে পাঁড়ার, সেই ছেলেবেলার শোক এখনো কাঁটিয়ে উঠতে পারেনি নাকি হে।

এর মধ্যে লাভণ্য সরকার, কলকাতার আছে কি নেই এটা যে একটা বলার মত খবর, একবারও মনে হয়নি। আজই বা হঠাৎ কার কাছে শুনলেন, কে জানে।

জবাব মা পেয়ে উরং ককষরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তার বাওয়ার দরকার হল কেন ?...তোমাকে বলে গেছে কিছু ?

বীরাপদর এবারও বাক-নিসরণ হয়নি, মাথা নেড়েছে। চকিতে আর একদিনের কথা মনে পড়েছে তার। লাভণ্য সরকার ছেলের সঙ্গে কথা কইছেন শুনে বেদিন নিজের গাড়িতে ওকে ডেকে নিয়েছিলেন। সেদিনও এমনি বিরক্তি লক্ষ্য করেছিল বীরাপদ, তবে এতটা নয়।

হিমাংক মিত্র বলেছেন, এভাবে গেলে তাদেরও বলে বাওয়া দরকার, 'তোমারও জেনে রাখা দরকার। মেডিক্যাল হোমের মাইনের দিন আজ, মাইনে যেন হয়—।

আর কিছু বলেনি। মেডিক্যাল হোমের মাইনের দিনের কথা বীরাপদর মনেও ছিল না। উনি বলে না গেলে পশুগোল কিছু হতই, মার্টনে হট্ট না হয়ত। শুধু বীরাপদর বাঃণা, বড় সাহেবের এই উমা সেই কটা গল্পবনার রূপ নয় খানসো। এত

বিরক্তির কারণ শুধু তাঁর অপোচের ছেলের সঙ্গে লাভণ্য সরকার গেছে বলে।

ডাক্তারের চেয়ার বসে লাভণ্যর মত বীরাপদও ম্যানেজারকেই ডাকল প্রথম। হুঁহাত একবার কপালে ঠেকিয়ে ম্যানেজার কলের মত সামনে এসে পাঁড়ালেন। আজকের এই বিপরীত পরিস্থিতিটি উপভোগ্য। আদেশের অপেক্ষায় প্রসারিত হুই গোল চোখ ওর মুখের ওপর স্থির।

বসুন, বসুন—। হাসিমুখে অস্ত্রবজ আপ্যায়ন জানালো বীরাপদ, মিস সরকার আজও করেননি, এদিকে কিভাবে কি হয় আদি জো কিছুই জানিনে—আপনি একটু সাহায্য করুন।

পদস্থ ওপরজলার এ হতভম্ব খুব বিধাসী মনে হল না ভুললোককে। কলের মতই বসলেন, পে-শিটএর নাম আর টাকার অঙ্কগুলো দেখে নিয়ে মুখ তুললেন। অর্থাৎ ঠিক আছে।

বীরাপদ প্রথমেই তাঁর মাইনেটা দিয়ে নিল। তারপর একে একে নাম ডেকে চলল। ম্যানেজার টাকা গুণে দিতে লাগলেন। কিন্তু ভুললোক যে সহজ হতে পারছেন না একটুও বোকা ব্যর, মুখে টু-শব্দটি নেই। এমন কি বারা মাইনে নিয়ে যাচ্ছে তারাও বের চূপচাপ তাদের ম্যানেজারের নীরব বিড়ম্বনাটুকু উপলক্ষ্য করে যাচ্ছে।

বেশ জনাকতক বাকি তখনো। একজন মাইনে নিতে এসে জানালো, চারটের ডাক্তারবাবু অনেককণ এসে বসে আছেন এবং বাইরে থেকেই হুঁ-চার জন রোগী বিদায় করেছেন।



পৃথিবীর সর্কশ্রেষ্ঠ বাহুকর



SORCAR
WORLD'S GREATEST MAGICIAN

বাহুকর
পি. সি. সরকার
প্রণীত পুস্তকাবলী
ইজ্জতাল (বাংলা) ১০
মেসমেরিজম্ ২ ১০
হিপনোটিকস্ ২ ১০
SORCAR ON MAGIC
(ইংরাজী) ৩১

বাহুকর
পি. সি. সরকার
ইজ্জতাল পাবলিকেশন
১২/৩এ জামির সেন।
বালীগঞ্জ, কলিকাতা ১৩



এই সুযোগে ম্যানেজারকেই অব্যাহতি দিল বীরাপদ।—আপনি তাঁকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে দিন, আর এ ক'টা পেমেণ্ট আমি নিজেই করে দিচ্ছি।

প্রায় বহুগালিভের মতই ম্যানেজার উঠে গেলেন।

সব শেষে রমেন হালদারের ডাক পড়ল। দারোরান বেয়ারা কাড়ানোর পরে। বীরাপদ ইচ্ছে করেই আগে ডাকেনি।

কোনো সুখ, চকিত চাউনি। একে একে সকলের মাইনে হয়ে যেতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল হয়ত। কিন্তু ছেলেটা বোকা নয়, এক নজর চেয়েই বুঝল সকলের পরে ডাক পড়াটা কোনরকম ভুল বা অবহেলার দরুন নয়, উল্টে পক্ষপাতিত্বসূচক।

বীরাপদ মিটিমিটি হাসছিল।—বোসো।

বিনয়ের বিয় দূর করে বসল কোনরকমে। মাইনে নিল। টাকাক'টা শুধে নেবার বাসনা থাকলেও কনিকের বিধা কাটিয়ে পকেটে রাখতে গেল।

শুধে নাও, সকলকে দিয়ে খুঁয়ে নিচ্ছ, কম বেশি হতে পারে।

সলজ্জ হাসি। শুধল। নিশ্চিত।

ভালো আছ?

হ্যাঁ। লাজুক লাজুক সঙ্কোচ, আপনি ভালো আছেন?

বীরাপদের মজা লাগছে।—ভাসো আছি কি নেই একবার গিয়ে তো দেখে আসতে পারতে। ক'মাসের মধ্যে একবারও তো এলে না। মনেই ছিল না বুঝি?

ছিল। ঠিক সাহস হয়নি সার...

সার। হাসি চেপে বীরাপদ ডুক কৌটকাতে চেঁচা করল। লঘু বিস্তার।—সার কি হে! তুমি সার বলতে নাকি আগে?

ওই মুখে শোনা লাগল সরকারকে দিদি ডেকে বিপাকে পড়ার গল্পটা মনে পড়ে গেল। অস্ত্রহীন হবার অভিলাস সত্ত্বেও ডরসা না পাওয়ার আত্মত্যাগিক নয়। কিন্তু ছেলে সেহানী কেমন জানে। আনন্দে বিনয়ে আধখানা হয়ে অহুমতি প্রার্থনা করল বেন, আগের মত দাদা বলে ডাকব?

না। ঠাকুরদাদা বলবে। হেসে ফেলল, আর তাহলে আমার সঙ্গে পাটনারশিপে ওবুধের দোকান করবে না ঠিক করেছ তুমি?

কি যে বলল দাদা...। বেন কত ছেলেমাহুবি স্বপ্নের আল বুনেছে একদিন সেটা নিজেই বুঝে এখন।

কিন্তু সঙ্কট আর বেশিকণ থাকল না। খুশিতে আনন্দে চাপা পলায় এরপর অনেক কথাই বলে ফেলল সে। দাদা এমন একজন পদস্থ ব্যক্তি কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, এত সরল আর নিরহঙ্কার বলেই...। এই জন্মেই অমন গণ্ডগোলটা হয়ে গেল, মিস সরকার পর্বত জানত না, অস্ত্রের আর দোষ কি। আর কারো কথা বলতে পারে না কিন্তু ও নিজে খুব খুশি হয়েছে। ক'দিন তো দোকানে শুধু তার কথাই আলোচনা হয়েছে। প্রথম প্রথম

সকলেই ভেবেছে জেনারাল সুপারভাইজার সাহেব এবারে শোধ নিয়ে ছাড়বে, ম্যানেজার রক্তত মজাটি টের পাবেন। শুধু রমেনেরই তা মনে হয়নি এবারও, তার ঠিক বিশ্বাস ছিল দাদাটি কখনো ওরকম লোক নয়।

একসঙ্গে এত কথা বলতে পেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল রমেন হালদার। বীরাপদ টিপনী কাটল, এত বিশ্বাস যে দাদাকে সার বলছিলে।

কি করব, রমেন নিজের মধ্যে কিরে এসেছে প্রায়, এতদিনের মধ্যে আপনি একদিনও এলেন না, সাহস হয় কি করে। একটু খেমে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, এবার থেকে আপনিই আমাদের মাইনে দেবেন বুঝি?

সেটা কি তোমার ভালো লাগবে খুব?

রমেন লজ্জা পেয়ে আবারও। লাগল সরকারকে নিয়ে অনেকদিন অনেক বে-কঁাস কথা বলেছে। ক'দিন নেই বলে কত নীরস লাগছে, আগে হলে তাও রসিয়ে ব্যস্ত করত হয়ত। আজ একদিনে এতটা পেয়ে উঠল না। সত্যি হোক মিথ্যে হোক সামনের মুকুটিকেই তোরাজ করল, আপনি দিলে ভালো লাগবে।

আলাপে ছেদ পড়ল, ভিতরের দয়জা ঠেলে ম্যানেজার গলা বাঙালেন। ছোকরা অর্থাৎ রমেন কেমন জমিরে বসেছে এক নজরে দেখে নিয়ে সংবাদ দিলেন, ক্যান্ট্রী থেকে চীফ কেমিষ্ট টেলিফোনে জানিয়েছেন, তিনি এখানে আসছেন—তার জন্মে বেন অপেক্ষা করা হয়।

গল্প আর জমল না। ছ'পাঁচ মিনিট বসে থেকে রমেন হালদার উঠে গেল।

নির্দেশ শুনে বীরাপদ অবাকই হয়েছে একটু। কি আবার সরকার পড়ল হঠাৎ। কিছুদিন ধরে লোকটির মেজাজের হাদিস পাচ্ছিল না আবার। বহুদিন হাতে ধরে কাজ-কর্ম দেখাচ্ছিল, এক রকম ছিল। ভারী কাছে পেরেছিল অমিত্যত বোধকে ওই ক'টা দিন। এখন আবার কিছু একটা পরামর্শের জন্মে গেলোও রুক্ষ মূর্তি। অথচ ক্যান্ট্রীর কাজেও খুব বে ব্যস্ত তা মনে হয় না। নিজের চেয়ারে কমই দেখা যায় তাকে। বেশির ভাগ সময় হয় আনালিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে নয়তো লাইব্রেরিতে সন্ধান মেলে তার। কিছু একটা বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মাধ্যমে হুকেছে হয়ত। তার এ ধরনের এক একটা ষ্ট্রোকের গল্প বীরাপদ জুনিয়ার কেমিষ্টদের মুখে শুনেছে। তখন কাছে গেলোও বিরক্তি।

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বীরাপদ অস্বস্তি করল সন্ত বর্তমানে চিফ কেমিষ্টের মেজাজ চড়া। কিন্তু কতটা চড়া আর কি কারণে চড়া তখনো বলনা করতে পারেনি। হৃদবড়িরে এসো, ইশারার তাকে ডেকে দোকান ছেড়ে ফুটপাথে এসে পড়াল।

দোকানের লোক তটহ।

[ক্রমশঃ]

Never lend books ; no one ever returns them.
The only books I have in my library are those
people have lent me. —Anatole France

বিকুট  লভঙ্গো

এখানে

কালে
তক্ষি ডি লুঙ্গ

দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুস্বাদু স্বাদে এমনটী আর হয়নি

কোলে বিকুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড • কলিকাতা • ১১



রহস্যপুরীর রহস্যকার

[আড়ভেড়ার এক লে তেরী]

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

হাঁমের দক্ষিণদোর আর কাঁকে বলে। এমন জানলে
এ-রাত্তার কে পা-বাড়াত তোমার সঙ্গে! মিসেস্ এলিসের
কথায় অবশি কুটে বেরল।

তীবুর মধ্যে পেটোম্যাঞ্জের আলোটা কমানো ছিল, তবুও
কাছাকাছির সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছুটো জালের কোলার মধ্যে
একটার মিসেস্ এলিস ও অপরাটার মিঃ লে তেরী শুয়ে। চোখে
কাঙ্করই ঘুম আসছিল না।

চারিদিকে মোরা আর গ্রীনহাট গাছের জঙ্গলে, গাঢ় অন্ধকারের
মধ্যে তাঁবু পড়েছে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে অত্যন্তদেয়ও এখানে রাত
কাটাতে গা-ছম-ছম করে, আর মিসেস্ এলিস তো সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত,
আমেরিকার শহরে মেয়ে। তার পক্ষে ভয় পাওয়া আর বিচিত্র কি?

কি, খুব ভয় করছে না কি? মিঃ লে তেরী প্রশ্ন করেন মিসেস্
এলিসকে।

তা একটু করছে বই কি। এত দিন বইয়েতেই বন-জঙ্গলের
কথা পড়েছি আর কি-গু ছবি দেখেছি, কিন্তু এর জীবন্ত রূপ যে এত
বীভৎস, এর পথযাত্রা যে এত বিপদসঙ্কুল ও প্রাণান্তকর তা সত্যিই
ধারণা করতে পারিনি।

এর মধ্যেই ভয় পেলে চলবে কেন, এই তো সবে আরম্ভ!

তুমিটা প্রশ্ন দিকেই করে বসী, তারপর আন্তে আন্তে সরে
যায়। উত্তরে বললেন মিসেস্ এলিস।

কথাগুলো যদিও বেশ জোর দিয়েই বললেন তিনি, কিন্তু একটা
আড়ভেড়ার সেগুলো বেন মিতান্তই প্রাণহীন বলে মনে হ'ল। অবশিভে
অনবরতই এপাশ-ওপাশ করছিলেন মিসেস্ এলিস।

এমনি পড়ীর জঙ্গলের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তাইই জানে
যাচ্ছে এর ভয়াবহ রূপ ও বিচিত্র শব্দের সঙ্গে কি আতঙ্ক লুকিয়ে থাকে
আমাদের মনের উপর কি অদ্ভুত অস্বস্তিকরী অস্বস্তিই না জাগায়

তাঁরা। সময় সর্ময় হানীর বস্ত-অধিবাসীরাও পাগল হয়ে যায় তাঁরাই
জঙ্গলের এই জীবন্ত ভয়াবহতার। কোথাও হস্ত বিরাহীন ভাবে
একই কর্ণবিদারী শব্দ বস্টার পর বস্টা হয়ে চলেছে, কোথাও বা সে
শব্দ যেমন করুণ তেমনি স্তব্ধবিদারক। কোথাও কোড়ো-হাওয়ার
সঙ্গে গাছের বটাপটি, জীবজন্তদের আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি
দারুণ সজ্বর্ষ। কোথাও বা এক সঙ্গে সব মিলিয়ে মিশিয়ে বিভিন্ন
শব্দের প্রতিক্রমিতে একটা অস্বস্তিকর ভয়াবহ পরিহিত—
সেখানে মানুষের পাগল হওয়া আর বিচিত্র কি?

যাচ্ছে এই জঙ্গলের মধ্যে ঘুম অর্থে যে কি, তা ভাল ভাবেই
উপলব্ধি করছিলেন শ্রীমতী এলিস।

তাঁবুর এক পাশে ছিল মিউ গুয়েনার একদল বস্ত অধিবাসী আর
এক পাশে ছিল কাবির ইণ্ডিয়ানরা। বস্ত অধিবাসী হিসাবে অত্যন্ত
নুশংস ও সন্দিষ্ট এই কাবির ইণ্ডিয়ানদের দল। পরস্পরকে কেউ তারা
বিবাস করে না। এমন কি, বাপ ছেলেকে নয় এবং ছেলে বাপকে
নয়। অতি ভুল কারণে একজন আর একজনকে খুন করে
বসে অতর্কিত আক্রমণে। তারা সকলেই এখন আমাদের এই
অভিধানের সঙ্গী, পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী।

আমাদের মাথার উপর উড়ছিল অজস্র বস্তপারী বাহুড়, আর
কানে আসছিল তাদের পরস্পরের আক্রমণ করার বিকট চীৎকার।
হিংস্র জাওয়াররা হস্ত ওৎ পেতে বসে আছে আশপাশে; আর
ইয়া লম্বা-চওড়া বিরাট মংল সাপরা হস্তো নিঃসাড়ে কোন গাছের
ডালে বেড় দিয়ে শুলছে কাককে ছোবল মারার প্রতীকার। তাঁবুর
বাইরে এসব কিছু না দেখলেও, এমনি আমরা আশঙ্কা
করছিলুম।

দিপ্তবিভূত বনানীর এই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কয়েক দুহুর্ষ
জন্ত হস্ত সব নিস্তর চূপচাপ হয়ে যায়, কোন সাড়া-শব্দ থাকে না—
ঘুমের মায়াজালে বেন ছেয়ে যায় জীব-জগতের এই অন্ধকারপুরী।
মনে হয়, বা হোক এবার বোধ হয় নিশ্চিন্তে একটু ঘুমো যাঁবে,
কিন্তু কোথায় ঘুম! ভাবতে না ভাবতেই সেই নিস্তরতা উল্ল করে
জেগে ওঠে জীবনের সাড়া—নানা শব্দ ও শব্দের কর্ণবিদারী ঐক্যতান-
বেন হঠাৎ কোন অর্কষ্টা পরিচালক হাতের ছড়িটি ফুলে ধরেন তাঁরা
শত্রীদের উদ্দেশে।

সেদিন অন্তগামী সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বনাজল বধন গাঢ়
অন্ধকারে ছেয়ে ফেলল, তখন আমরা তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নিলুম।
কিন্তু রাতের প্রথম দিকেই হঠাৎ একটা বস্টাধ্বনির মত আওয়াজ
আমাদের কানে এলো।

এখানে জঙ্গলের মধ্যে এ আবার কিসের বস্টা? বলে এলিস
লাফিয়ে উঠল।

এর আগে এই শব্দের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাই তাঁকে
বস্টা, এতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই, এটা 'বেলবার্ড' নামক
এক রকম পাখীর ডাক।

এই বেলবার্ডের ডাক শেব হতে মা হতেই তার সঙ্গে আবার
আরম্ভ হল বেবুনের বিকট আওয়াজ। একটা ছুটো করে অসংখ্য
বেবুন সম্বন্ধে চীৎকার করতে আরম্ভ করে দিলে। একদিকে ঐ
বেলবার্ডের গন্ত-বাজানোর শব্দ, আর একদিকে বেবুনের কান-কাটা
আওয়াজ মিশিয়ে রাতের প্রথম দিকেই এলিসকে কাবু করে
দিয়েছিল। দ্বিতীয় প্রহরের কাছাকাছি সম্পূর্ণ রক্তন ধরনের এক
গোড়ামিতে এলিস একেবারে হস্তে পড়ল। কোলা বেবুনের লাফিয়ে

উঠে সে বলল, কেউ কাছেই কোন যেরেহেলেকে খুন করেছে
বোধ হয়—তখন ?

শব্দটা যে খুবই কক্ষণ ছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু
এ শব্দ যে এই বস্ত্র জীবদের মধ্যেই জনৈক কপিধ্বজের, তা জানা না
থাকলে বিশ্বাস করাই কঠিন।

আমি এলিসকে বললুম, জঙ্গলের জীবনই এই,—অসংখ্য
বৈচিত্র্যের মধ্যে অসহ্য ভয়াবহতা। দিনের-পর-দিন নতুন সংশয়,
সন্দেহ আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে হুঃসাহসিক অভিযান—একেই তো বলে
এ্যাডভেঞ্চার।—ভোর হয়ে এলো, এখন একটু ঘুমবার চেষ্টা করো।

বুটিন গুয়েনার বহু যুগের গল্পকথার মত এই 'লট ওয়াল্ড'
বহুস্তর বাহুপুরী—এ্যাডভেঞ্চারে ভরা। বহু পুণাতন সময় থেকে
অভিযানকারীর মল ও বস্ত্র অধিবাসীদেরও অনেকে এখানকার নদ-নদী
ধরে হীরকের উৎস-সন্ধানে গিয়ে পথ হারিয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে,
কেউই সেই আকাঙ্ক্ষিত জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। তবু
মানুষের হৃদয়মণীর আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতির রহস্য-উদ্ঘাটনের অপরাধের
আশা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে, পাহাড়ে-পর্বতে,
মন্দি-নালায়, সমুদ্রের অতলে আর অজানা-অচেনা অপরিচয়ের দেশে
—বিপদের মুখে জীবনকে তুচ্ছ করে।

উত্তর-আমেরিকার এই বুটিন গুয়েনা কেবলমাত্র হীরকের জন্যই
বিখ্যাত নয়,—এর নদী, পাহাড়, জীবজন্তু ও অসংখ্য
বৈচিত্র্যও তাকে বিখ্যাত করেছে। এখনও এর ভেতরকার বহু
রহস্য-সন্ধানীরা উদ্ঘাটন করতে পারেনি। প্রাণিতত্ত্ববিদ, উদ্ভদ-
বিজ্ঞাবিশারদ ও মৃত্ত্ত্ববিদরাও বহু দিন ধরে এখানকার বহু জিনিসের
সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। এখানকার জলা-জলস্রোতের বহু জায়গায়
মানচিত্রও এখনো তৈরী হয়নি। মাঝরুণি, রূপনোনি, সুইবো,
ছুয়াপিরি ও নিগরো প্রভৃতি নদ-নদীর উপস্থিতি, এ্যাকব্যাক—
কোথা থেকে কার কোন্ ক্যাকড়া বেরিয়ে কোথায় গিয়ে পড়েছে,
তাও সঠিক সব জানা যায়নি এখনও।

যে খেত-ইণ্ডিয়ানদের বংশ পৃথিবীর বুক থেকে একদিন সম্পূর্ণ
মিচ্ছিত হয়ে গেছে বলে লোকের ধারণা ছিল, তাদের সন্ধান, কারিব
ইণ্ডিয়ানদের মিহাফণ প্রতিহিংসার নিদর্শন, বর্ণহ্রদের অলৌকিক
কিংবদন্তী, রক্তপারী হিংস্র গাছ-পাছড়া ও অদ্ভুত জীবজন্তুর আকর্ষণ
সুদীর্ঘ মন বছর ধরে যিঃ সে ভেতরকে এই ভয়াবহ দেশের অভ্যন্তরে
ধুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে—হীরকের উৎস-সন্ধান, আবিষ্কারের নেশায়
শাপল করে।

একবার তিনি প্রায় পাঁচ হাজার ক্যারেট ওজনের হীরে ওখান
থেকে সংগ্রহ করে আনেন এবং আর একবার প্রায় ত্রিশ ক্যারেট
ওজনের একট হীরের টুকুরো পান। বহুকাল পর্যন্ত আমেরিকা ও
ইউরোপের মধ্যে ঐতিহাসিক অপরিষ্কার হীরের মধ্যে এইটাই সর্বাপেক্ষা
বৃহৎ বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু তবুও এই দেশের অনাবিষ্কৃত
অভ্যন্তরের সম্পূর্ণ রহস্যের সন্ধান করতে পারেননি বলেই সে ভেতরী
বাং বাব নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও আবার অভিযান করেছেন,
এবং শেষ বাব কি ভাবে নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সস্ত্রীক
জঙ্গলের লোকের কাছে বহু আশ্চর্য, অসম্ভাব্য ও অদ্ভুত জিনিসের
সন্ধান করেন,—এই রোমাঞ্চকর কাহিনী তাই ইতিমধ্যে।

আমি তখন আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বয়স
মাত্র আঠারো বছর। নিউ গুয়েনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়
হবার সুযোগ ঘটে সেই সময়ে। আমি ও আমার এক বন্ধু দু'জনে
একদিন নিহক এ্যাডভেঞ্চারের মন নিয়ে একটা লম্বা ছুটির সযাবহার
করতে মাঝরুণির অভিযানে বেরিয়ে পড়ি। এ-বৎসে বাঘ-ভাল্লুকের
সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ, নরখাদক ক্যানিবলসুদের চাকুব দর্শন যে
সত্যই উদ্ভেকক ঘটনা তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য এর সঙ্গে
বিনামূল্যে সোনা ও হীরে সংগ্রহ করার লোভও আমার কিছু কম
ছিল না।

মাঝরুণির নদীপথে, জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতের পাদদেশে, নদীর
চড়াইয়ে ও জলের মধ্যে স্বর্ণরেণু ও ছোট ছোট হীরকখণ্ডের যে
সন্ধান মেলে তা আমরা আগে থেকেই জানতুম এবং সেই প্রথম
বাজার আমরা সকলকামও হয়েছিলুম খানিকটা। সে বার ছোটবড়
সব মিলিয়ে-মিলিয়ে প্রায় ৫০০০ ক্যারেট ওজনের হীরের টুকুরো
সংগ্রহ হয়েছিল আমাদের। ওখানকার ছোট ছোট হীরের
টুকুরোগুলি প্রধানতঃ বেশীর ভাগ কেড়েই নানা ধরনের শিল্পকার্যে
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বড়ির জুয়েল ও কাচ-কাটার বস্তুই এরা লাগে
সবচেয়ে বেশী। নানা আকারে কেটে উজ্জ্বল্য বাড়িয়ে যে সব হীরে
জুয়েলারীর কাজে বসান হয়ে থাকে, এগুলি ঠিক ততো উচ্চের
না হলেও এদেরও বেশ দাম আছে এবং ওজন হিসাবেই সেটা ঠিক
হয়ে থাকে।

প্রথম বারের এই অভিযানে একবার ভীষণ ভয়ে পড়ে জর্জ
টাউনের এক হাসপাতালে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় আমাদের। সঙ্গে
পরমা-কড়ি বিশেষ কিছু না থাকায়, মৃত্যু হলে কবর-খরচের জন্তে
নগদ টাকার বদলে ৮৫ ডলার মূল্যের হীরে ওখানে জমা দিই।

এর পর ১৯২১ সালে ঐ পথে আমার দ্বিতীয় অভিযান। কিন্তু
সে বারের বাজাটা কেবলমাত্র হীরে-সোনার লোভে বা বস্ত্রজন্তদের
সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের লোভে নয়,—সে বার আমার বাজার সত্যিকার
উদ্ভেক ছিল, হীরকের উৎস-সন্ধান। অর্থাৎ কোথা থেকে, কত
দূর থেকে, পাহাড়ের গা বা গহ্বর থেকে, কোন আকর থেকে
নদীর প্রোতে এই সব হীরের কুচি, গুঁড়ো, গড়াতে-গড়াতে
গুয়েনার জঙ্গল নদীগুলিকে ঐশ্বর্যশালিনী করেছে, স্বচক্ষে তাই
দেখা। পৃথিবীর মধ্যে যে তিন-চারটি জায়গায় সব চেয়ে বেশী
পরিমাণ হীরে পাওয়া যায়, এই বুটিন গুয়েনা আজও তাদের মধ্যে
কৃতীয়-স্থান অধিকার করে আছে।

সে বার ছোট-বড় নদী-নালা ধরে জঙ্গলের অভ্যন্তরে বহুদূর
চলে গিয়েছিলুম আমি—ভূবুরি নারিয়ে নদীর পাক-মাটি পরীক্ষা
করেছিলুম, পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় উঠতেও বাকী রাখিনি।
এ সবের জন্তে বুটিন গুয়েনার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে
হু-হু'বারই আমাকে অনুমতি পত্র নিতে হয়েছিল। জঙ্গলের
একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে আমি বহুদূর পর্যন্ত এসিয়েছিলুম বটে,
কিন্তু কৃতকাৰ্য্য হতে পারিনি—হীরকের উৎস সন্ধানে সাক্ষ্যলাভ
আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবু কোন দিনই আমার মনে হতাম
আশ্রয় করিনি, কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে, আশ্চর্য্য চেষ্টার
লব্ধ জিনিসই সকল হয়। একবারে না হয়, দু'বারে যা হয়,

তিন বাবের বাব আমি কৃতকার্য হবই। এবং মনের মধ্যে এমনি একটা উৎসাহ ছিল বলেই, একদিন আমেজোন ও অরিনকো নদীর মাঝ-বরাবর স্পেনীয় অভিযানকারী যে অগাধ ঐশ্বর্যের খনি 'এল ডোবাতোর' অন্বেষণ করেছিলেন, আমি তার চাক্ষুণ্য প্রমাণই আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করি।

তৃতীয় বাবের পর আমার সঙ্কল্প অত্যন্ত দৃঢ়। যেমন করেই হোক, এবার আমার কৃতকার্য হতেই হবে। যে সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে আমি হু-হু'বার যিকল-মনোরথ হয়েছি, নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়েছি—এবার যেমন করেই হোক সে লজ্জার কালিমাকে মুছে ফেলে, সেখানে গৌরবের জয়-তিলক এঁকে দিতে হবে। মনে এমনি একটা আত্মবিশ্বাস ও আশা নিয়ে সে বাব আমি সমস্ত প্রাণ তৈরী করে ফেললুম। অজ্ঞাত বাবের অভিযানে যে সব কঁাক ছিল, যে সব অসুবিধার মধ্যে আগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এবার আমি তার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললুম। বাতে কোন দিক থেকে কোন বাধা, অসুবিধা আবার না আমার কিরিয়ে দেয়, সে জন্ত সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সকল প্রকার সতর্কতাই আমি অবলম্বন করলুম।

কিন্তু বিপদ হ'ল এলিসকে নিয়ে। এলিস পণ করে বসল, সে-ও আমার সঙ্গে বাবে। এ অভিযান, এ যাত্রা যতই কষ্টকর ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল হোক সে আমার পাশে থাকবেই। মনে মনে ভয়মহিলার আমার উপর এই ভালবাসা ও দুঃসাহনিকতাকে আমি তারিক করলেও, মুখে তাকে না বাওয়ার জন্ত অনেক বোঝালুম, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা—আমার সঙ্গে সে বাবেই।

শেষ পর্যন্ত তার কথাই বইল। সে-ও সাথী হ'ল আমার। তারপর একদিন শুভ-মুহূর্ত্তে আমরা বোর্টন বন্দর থেকে অতলান্তিকের মুখে পাড়ি দিলুম—দক্ষিণ-আমেরিকার নিউ গুয়েনার উদ্দেশে।

আমাদের জাহাজ এসে থামল জর্জ টাউনে। ব্রিটিশ গুয়েনার সমুদ্র-ভীরের প্রধান শহর হচ্ছে এই জর্জ টাউন। এবং এই প্রদেশের একমাত্র বিখ্যাত শহর বলতে এই জর্জ টাউনকেই বোঝায়। এখানকার লোক-সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। নানা জাতের, নানা রঙের, নানা লোককে এখানে একসঙ্গে যেভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর আর কোথাও ঠিক যেমন দেখা যায় না।

এখানে পৌঁছে প্রথমেই আমাদের সব চেয়ে বড় ও প্রধান কাজ হ'ল গুয়েনার জঙ্গলাকীর্ণ অভ্যন্তরে জলপথযাত্রার জন্ত নৌকার ব্যবস্থা করা।

সমস্ত নৌকা তৈরীর পক্ষে স্থানীয় গ্রীনহাট গাছই ছিল প্রশস্ত। সেই কাঠ নিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজন মত হ'খানা মাকারি সাইজের নৌকা ও ছুটি বড়-জাতের বজরা তৈরীর ব্যবস্থা করলুম।

এর পর লোক রিক্রুটের পালা। বখাসভব সতর্কতার সঙ্গে, উপস্থিত সুইবো নদীর মোহানার আমাদের বেস-ক্যাম্প (Base Camp) কাঁড় টেনে আর লগি ঠেলে নৌকা হু'টোকে নিয়ে বাবার জন্তে চুরার জন স্থানীয় অধিবাসীদের আমরা কাজে নিযুক্ত করলুম। কেহ কেহ যে সব লোক আমরা ঠিক করেছিলুম, তারা বাহ্যিক দিক থেকে বেরন ছিল বলবার, ভেতর দিক থেকে ছিল সাজাতিক।

তাদের কার কার চেহারা এমনই সাজাতিক যে, আবছা অন্ধকারের মধ্যে দেখলে সাক্ষাৎ বঙ্গবন্ধু বলে চমকে উঠাও বিচিত্র ছিল না। বনের দক্ষিণ দোর বাবার জন্তে সঙ্গী হিসাবে এরাই বোধ হয় ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত।

লোক রিক্রুটের সময় এক মজার কাণ্ড ঘটল। মাইনে দিয়ে কাজে লোক নেওয়া হবে শুনে, কাতারে কাতারে স্থানীয় বজরা আমাদের কাছে আসতে আরম্ভ করল চাকরির লোভে, এবং এসে বাত্রাপথ সঙ্কে বিপদ-আপদ ও সম্পদ-ঐশ্বর্যের নানা আকর্ষণ অভিভূততার কথা বলতে লাগল। এদের মধ্যে কেউ কেউ অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ এক্সপিডিশনের দলভুক্ত ছিল। সেই অভিযানে বোট ছিল তিনখানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: সেই তিনখানি বোটই নাকি বিস্কুর সুইবো নদীতে ডুবে যায় এবং বহু লোকের জীবনান্ত ঘটে অভিযান পণ্ড হয়ে যায়।

ক্রমশ: বাত্রার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আর যতই আমরা গোছগাছ করতে লাগলুম, ততোই যেন ভিড় বাড়তে লাগল এই সব লোকের। ভয়বাহ্য, শীর্ণকার মুখার্জু ছেলে-বুড়োও ছিল তাদের মধ্যে প্রচুর।

শেষ পর্যন্ত যখন তাদের জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, এ-ব্যাপারে লোক নেওয়া আমাদের শেষ হয়ে গেছে, তখন তারা আমাদের কাছে পরস্র চাইতে লাগল। পেট-বাকিরে খাবার দেবার জন্ত অমুরোধও করতে লাগল অনেকে। কেউ কেউ একটা সিগারেটের জন্তও ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে পায়ে-হাতে ধরাধরি করতে লাগল। অনেক কষ্টে সে-বাত্রা বেহাই পাওয়া গেল তাদের হাত থেকে। এলিসের অমুরোধে এটা সেটা ক'রে সবাইকেই প্রায় দেওয়া হ'ল কিছু না কিছু।

এদিকে মজা হচ্ছে এই যে, এদের মধ্যে অনেকেরই পেটে ভাত নেই এবং দেখলে মনে হয় খিদেয় জ্বালায় মরতে বসেছে, কিন্তু কোমরের সঙ্গে প্রত্যেকেরই ছেঁড়া জাকডায় অথবা ছোট একটি খলিতে কিছু না কিছু চূর্ণ হীরক সঞ্চিত আছে। মরে গেলেও এগুলিকে সহজে ওরা বেহাত হতে দেয় না। এর মূলে আছে আর এক মজার গল্প। সে গল্পের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে: এই হীরে কাছে থাকলে তারা নাকি ডুত-পেড়ীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় এবং এই হীরে সঙ্গে নিয়ে মরলে নরকবস্ত্রগার হাত থেকে বেহাই পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে আমাদের অভিযানকারীর দল সকলেই প্রস্তুত হয়ে গেল। মালপত্র বোঝাই করে আমরা নৌকাগুলিকে লোকজন সমেত আমাদের বাত্রার প্রধান খাঁটি সুইবো নদীর মুখে পাঠিয়ে দিলুম। ঠিক হ'ল, আমরা নিজেরা দেয়ারা নদীর পথে খানিকটা ঠিমারে ক'রে গিয়ে সেখানে পৌঁছব পরের দিনই।

দেয়ারা দিয়ে প্রায় বাট মাইল খাড়া পশ্চিমে গেলে তবে সুইবোর মোহানায় পৌঁছান যায়। বখাসময়ে সেখানে পরের দিনই আমরা এসে উপস্থিত হলুম। সেখানে আগে থেকেই আমাদের পথ-প্রদর্শক কারিব ইণ্ডিয়ান ও বজ্র-অধিবাসীদের দল নৌকাগুলি নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আমাদের উপস্থিতিতে তারা সকলেই উৎসাহিত হয়ে অভিযান জানাল।

নৌকাগুলিতে পাঁড় টানার জন্ত চকিলা জন করে পাড়ি ও একজন করে মাঝি আমরা ঠিক করে দিয়েছিলুম। পাড়িয়া যাত্রা মাঝি

বাধা হয়ে চলে, সে অল্প মাঝিরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া প্রত্যেক নৌকার সঙ্গে একজন করে প্রবীণ লোক ছিল দলপতি হিসাবে। অর্থাৎ সেই হ'ল সকলের উপর; ইংরেজীতে বাকে বলে 'হেড-ম্যান।' তারই নির্দেশে চলতে হবে, সবাইকে মাথা পেতে নিতে হবে তার আজ্ঞা।

এখান থেকেই আমাদের সত্যিকার যাত্রা আরম্ভ হ'ল একদিন। সত্যিকার এ্যাডভেঞ্চারের পথে হেঁ-হেঁ বৈ-বৈ করে যাত্রা করলুম আমরা। এক সঙ্গে প্রায় শতাধিক দাঁড় ফেলার ছপাক-ছপাক শব্দ আর তার সঙ্গে কনাকার কৃচ্চুচে কালো দাঁড়ি মাঝি ও মুটে-মজুরদের সুর-ভাঁজা, সমবেত কোলাহল ও সঙ্গীত প্রভৃতি সব মিলিয়ে মিশিয়ে বেশ একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল সবারই মুখে। [ক্রমশঃ।

ইম্পাতনগরী—ভিলাই

অমরনাথ রায়

গ্রাম থেকে নগরী

মুখ্যপ্রদেশের একটি ছোট গ্রাম—ভিলাই। বছর ছয়েক আগেও সেখানে ছিল চালা ঘর, চাষীর ক্ষেত ও খামার। শান্ত, শ্রদ্ধ ও সুন্দর ছিল ভিলাইয়ের পরিবেশ। দিগন্তবিস্তৃত গমের ক্ষেতের ওপর দিয়ে বাতাস ঢেউ তুলে বয়ে যেত। ভোর না হতেই রাখাল বালকেরা পাঁচন হাতে বেরিয়ে পড়ত গরু চরাতে। আবার পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ঢলে পড়তে না পড়তেই গরুর পাল নিয়ে রাখাল বালকেরা ফিরে আসত ঘরে।

শহরের ছোঁওয়া তখন একটুও লাগেনি ভিলাইয়ের বৃকে। কে জানতো তখন—এই মনোরম গ্রামটিই একদিন পরিণত হবে এক বিরাট বিশাল ইম্পাতনগরীতে। কে জানতো তখন যে এই গ্রামের বৃকেই গড়ে উঠবে একদিন ভারতের অন্যতম বৃহৎ ইম্পাতের কারখানা। লোহার ঠকঠক হুঁনহুঁন আওয়াজ আর অল্পশ্রমিকের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠবে গ্রামখানি। ভিলাইয়ের বৃক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চাষীর চালা ঘর, চাষের ঘুমি ও খামার। আর তার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে এক বিরাট ইম্পাত কারখানা ও অল্পশ্রমিকের অসংখ্য বাসস্থান। পাকা মজবুত ঘর-বাড়ী, পাকা রাস্তা, রেলপথ, ইন্ডুস্ট্রি, হাট-বাজার, হাসপাতাল—সবই হবে। রাস্তার প্রগাঢ় অন্ধকার ঘুচিয়ে দেবে অসংখ্য জোরাল বিজলী ব্যক্তি। ভিলাইয়ের গ্রামঘটুকু যাবে ঘুচে। অখ্যাতনামা এক গ্রাম পরিণত হবে এক অতি আধুনিক বিরাট ইম্পাতনগরীতে।

না, এত বড় পরিবর্তনের কথা ভারতের কোন লোকই ভারতে পাবেনি হ'বছর আগে। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণটা কি? গোড়াতেই তা বলে রাখা দরকার।

কেন এই পরিবর্তন?

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করল। কিন্তু তখন কেবা পেল যে অজান্তে দেশের তুলনায় আমাদের দেশ রয়েছে অনেক শিথিলে। বিশেষ করে দেশের আর্থিক অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়। কাজেই দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা স্বীকারে প্রয়োজন। আর আর্থিক উন্নতি সাধনের

বত বকম উপায় আছে তার মধ্যে একটি হলো দেশে ভারী শিল্প গড়ে তোলা। আর ভারী শিল্পের মধ্যে ইম্পাত-শিল্পই হচ্ছে অন্যতম।

ইম্পাত-শিল্প প্লামাদের দেশে রয়েছে—সত্যি কথা। কিন্তু কারখানার সংখ্যা কম। উৎপাদনও কম। জামসেদপুরের 'টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী', বার্নপুরের 'দি ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী' আর মহীশূরের 'দি মাইশোর আয়রন অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কস'। ভারতের এই তিনটিই হচ্ছে পুরনো কারখানা।

১৯৫৭ সালে ভারতে ইম্পাত উৎপন্ন হলো ১৩৪৪০০০ টন। কিন্তু চাহিদা বেশী। তাই সে বছর বিদেশ থেকে ইম্পাত আমদানী করতে হলো দশ লক্ষ সত্তর হাজার টন। এই পরিমাণ ইম্পাত কিনতে গিয়ে দেশের প্রচুর অর্থ তুলে দিতে হলো বিদেশীদের হাতে। সেটা দেশ ও দেশের ক্ষতি। ভারত সরকার তা উপলব্ধি করলেন এবং দেশে ইম্পাত উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো মনস্থ করলেন। এই উদ্দেশ্যে পুরনো তিনটি ইম্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হলো। সেই সঙ্গে নতুন তিনটি ইম্পাত কারখানা গড়ে তোলাও স্থির হলো। ভিলাই হ'চ্ছে সেই নতুন তিনটি ইম্পাত কারখানার একটি।

ভারত-সোভিয়েট যুগ্ম প্রচেষ্টা

১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে স্থির হলো যে, মধ্যপ্রদেশের ভিলাইএ একটি নতুন ইম্পাত কারখানা স্থাপন করা হবে। এর কিছুকাল আগে থেকেই ভারত সরকারের সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের কথাবার্তা চলছিল নতুন ইম্পাত কারখানাটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। ১৯৫৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে উভয় সরকারের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হলো। সেই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হলো যে সোভিয়েট সরকার নতুন কারখানাটির জন্য প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতিগুলি ধারে সরবরাহ করবেন। একজন সোভিয়েট চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং ইম্পাত শিল্পে অভিজ্ঞ একজন সুরক্ষ কারিগর নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করবেন। শুধু তাই নয়। কারখানার কাজ চালু হওয়ার পরও তিন বছর কিছু সংখ্যক সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার ভিলাইয়ে থাকবেন। তাঁদের কাজ হবে কারখানার কাজ সূত্রভাবে পরিচালনার সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়া। আরও স্থির হয় যে ভিলাই কারখানার পরিকল্পনা ও চলনা প্রণয়নের জন্য সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের পঁচিশ লক্ষ টাকা পারিপ্রমিত দেওয়া হবে। ভারতে অবস্থানকালে সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞ ও কারিগরদের বেতন ভারত সরকারই বহন করবেন।

ভারত সরকারের কাজ হয়ে ভিলাইয়ের পথ-ঘাট, রেলপথ, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি নির্মাণ করা। এক কথায় ভিলাই নগরীটিকে গড়ে তোলা, কারখানা ও শহর পত্তনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালমশলা সংগ্রহ করাই হবে ভারত সরকারের কাজ। ঐ চুক্তিতে আরও স্থির হয় যে ভিলাই পরিচালনার প্রতি পদক্ষেপে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যুক্তভাবে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা কাজ করবেন। কারখানার জন্য সোভিয়েট সরকার যে যন্ত্রপাতিগুলি সরবরাহ করবেন তার মূল্য ৬৩*১ কোটি টাকা। এ যুগ্ম ব্যয়টি সমান বিস্তারিত ভাবে সরকার পৌঁছ করে দেবেন। এদের জন্য শতকরা

২২% হারে খুব দিতে হবে। সমস্ত খণ পরিশোধ করা হবে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে।

ভিলাইয়ে কারখানা প্রতিষ্ঠার সুবিধা

ইম্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে বেশ ভালভাবে চিন্তা করে দেখা হয়েছে সুবিধা-অসুবিধার কথা। পরে ভারত ও সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সুপারিশক্রমে ভিলাইকে ইম্পাতনগরীর উপযুক্ত স্থান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ইম্পাত উৎপাদনের জন্যে দরকার লোহা-পাথর (আয়রন ওর), লাইম স্টোন, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, জল ও বিদ্যুত। কাঁচা মালগুলি ভারতে প্রচুর আছে। আর আছে ভিলাইয়ের কাছাকাছিই। জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত আছে। আর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে নানাবিধ বান বাহনের মাধ্যমে সহজ যোগাযোগ রয়েছে ভিলাইয়ে। সহজে আনা যাবে আর এখানে উৎপাদিত ইম্পাত ভারতের সর্বত্র সহজেই চালান দেওয়া যাবে। এই সব সুবিধার কথা বিবেচনা করেই ভিলাইকে ইম্পাতনগরীর উপযুক্ত স্থান হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে।

শেষ কথা

পরিকল্পনা তো বহু আগেই শেষ হয়েছে। কারখানা ও শহর নির্মাণের কাজও সমাপ্তির পথে। ১৯৫৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভিলাইয়ের প্রথম ব্লাষ্ট কার্ভারটিতে অগ্নিপ্রবেশ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে কারখানার স্বাধোদ্বাটন করে গেছেন। ভিলাইয়ে ইম্পাত উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে। কারখানা ও ইম্পাত নগরী পড়ে তুলতে খরচ হয়েছে মোট ১৭৮ কোটি টাকা।

এত অর্থ ব্যয়, এত পরিশ্রম সার্থক হোক। ভিলাই আমাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করুক। পরিণত হোক ভারতের তীর্থক্ষেত্রে।

ভুলের রাজত্ব

বিনোদ শ দাশ

তোমরা বোধ হয় এক ভুল। মন ভুললোকের গল্প শুনেছো,

বিনি এক কাজ করবেন তবে অন্য কাজ করে বসতেন।

বেয়ম ধরো, স্থান করতে গিয়ে গান করতে শুরু করতেন। বাবার জন্ত আসনে বসে ঘুমিয়ে পড়তেন। সন্ধ্যার বেড়ান শেষ করে ছড়িগাছটিকে ঘরের কোণে রাখবেন তবে সেটাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে নিজেই ঘরের কোণে ঝড়িয়ে পড়লেন। পরে বখন তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়া হোল তখন একগাল হেসে বললেন, ওহো, বুঝলে কিনা ভুলে গিয়েছিলাম

এটা নেহাৎই গল্প, এরকম ভোলা মন মানুষের জন্ম কেবল গল্পলেখকদের কল্পলোকেই নাকি সম্ভব। কিন্তু আমরা এমন বহু মনোবীর নাম জানি ধারা ছিলেন অনেকটা এই রকমের আনুভোলা, বেহিসারী। বিশ্ববিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন না কি ছিলেন আশ্চর্য্যরকমের আনুভোলা। একবার তাঁরা কাজে গিয়েছিলেন যুরোপের একটা বড়ো শহরে। তাঁর স্ত্রী তাঁকে একটা দোকানে বসিয়ে নিয়েছেন অন্য একটা দোকানে কিছু জিনিষপত্র কেনবার জন্ত। এদিকে বৈজ্ঞানিক কিছুকণ বদলার পর আসলেন রাস্তাটিতে

একটু পায়চারী করা বাক কিন্তু কী হুকিল, বেড়াতে বেরিয়ে ভুললো পথ কেমনে হারিয়ে। এমন কি, নিজের হোটেলের নামও মনে পড়ে না। এদিকে স্ত্রী এসে বৈজ্ঞানিককে দেখতে না পেয়ে বহু বিব্রত বোধ করলেন। নোটুন বায়গা। আনুভোলা বৈজ্ঞানিক কোথায় গেলেন। তারপর কিছুকণ খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল বৈজ্ঞানিক দোকানটির পাশের রাস্তাটিতেই হারিয়ে গিয়েছেন। আবার একদিন বৈজ্ঞানিক বাসে যাচ্ছিলেন। কনডাক্টর টাকার ভাঙনী সমেত টিকেট দিয়েছে। ভুললোক কিন্তু খুচরোগুলো গুণে উঠতে পারলেন না। মহা হালুয়া। কনডাক্টর বোধ হয় জোচ্চুরি করে ঠকিয়ে দিয়েছে তাঁকে। কনডাক্টর ভীষণ বেগে বৈজ্ঞানিকের চোখের সামনেই সেগুলো গুণে দিল এবং বলল, মশাই অঙ্ক টক কিছু শিখেছেন না, না ?

কী হাসির কথা তাই না ? বীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে জগতের বড়ো বড়ো অঙ্ক কবিদের মুণ্ড ঘুরে বায় তিনি কিনা সামান্য মুদ্রা গুণতেই ভুল করে কেমনে ?

বড়ো বড়ো মনোবীরের হাতকর ভুলের এমন অনেক গল্পেই তো করা যায়। তাই মনে হয় এমন কোন মানুষ নেই যে না ছোটবড় অনেক ভুল করেছে সারা জীবনে। তোমরা বলবে মানুষের ভুল করাই যদি ধর্ম তবে মাষ্টার মশাইরাও নিশ্চয় ওই দোষে দোষী। মাষ্টার মশাইরাও তো অনেক দিন দেওয়াল বোর্ডে অঙ্ক কথতে ভুল করেছেন, ভুল ইংরিজি বলেছেন, ইতিহাসের ভুল তারিখ বলেছেন। আচ্ছা, মাষ্টার মশাইরা যদি ওই ভুলের দোষী হন তবে ওঁরা তোমাদের প্রতি এত নির্দয় হবেন কেন ? এই দেখো না, সে বার মটু পাঁচ মছের একটা অঙ্ক ভুল করে আনার জন্ত লেটারই পেলেন না। মটু কি কিছু কম অঙ্ক জানে ? কিন্তু নাভঃ পদ্মা। ভাগ্য অঙ্গুর ওর প্রতি। সামান্য ভুলের জন্ত ওর আশা ভঙ্গ হয়েছিল।

তবে কী জানো, এগুলো সবই না জেনে ভুল করা। জেনে শুনে কেউ কী আবার ভুল করে না কি ? তোমরা তুলে কিছ অর্থাৎ হবে আমরা প্রত্যাহ জেনে-শুনে অসংখ্য ভুল করে থাকি। আমরা একটা বিরাট ভুলের রাজ্যে বাস করছি। সে কেমন ? আচ্ছা বলত বুর থেকে উঠে বাইরে এসে তোমরা কী দেখো সকালে ? উত্তরে নিশ্চয় বলবে, কেন সূর্য ? পূর্বদিকে সূর্য ওঠে ? আমি বলব ভুল হোল। তোমরা অর্থাৎ হবে, সে কি। আমরা বোধই তো তাই দেখি। চোখে দেখা কি কখনো ভুল হয় ? ঠিকই বলেছ তোমরা। কিন্তু বলতো, সূর্য কী পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে। আমরা সবাই তো পৃথিবীর আফ্রিক পত্রির কথা জানি তবু এই ভুল করে থাকি কেন ? আমরা আজ জেনেও যে ভুল করছি কয়েক শত বছর আগে মানুষ না জেনেও সেই ভুল করত। যদিও ভারতে আফ্রিক পত্রির কথা আগেই আবিষ্কার হয়েছে। তবু বখন গ্যালিলিও যুরোপে প্রথম পৃথিবীর আফ্রিক পত্রির কথা শোনালেন তখন তাঁকে অনেক কষ্ট সহ করতে হয়েছিল। আবার দেখো, আমরা একটা দিকের নাম দিয়েছি পূর্ব আবার একটার নাম পশ্চিম। কিন্তু ভেবে দেখো তো সত্যিই পূর্ব ও পশ্চিম বলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কী কোন দিক থাকতে পারে ? আমরা কোথাকে চলেচোকে পৌঁছে দেওয়া হোল একটা মাপের করে।

সেখান থেকে তুমি কি বলতে পারবে পৃথিবীর কোনটা পূর্ব আর কোনটা পশ্চিম দিক? তোমরা বলো সমুদ্রের জল আর আকাশের রঙ নীল। কিন্তু ভেবে দেখো তো মহাশূন্যের বা মহাসাগরের কি কোন বর্ণ থাকতে পারে? এই তো গেল দেখার ভুলের কয়েকটা উদাহরণ।

আবার জেনে শুনে আমরা অনেক ভুল কথাও বলে থাকি। যেমন ধরো আমরা বলি বারোটা বেজেছে আবার বলি, আমার বয়স দশ বছর। কিন্তু কথাগুলো কি ঠিক বলা হোল? তুমি যখন ভারতবর্ষের একটা বায়ুগাতে দাঁড়িয়ে বসছ বারোটা বেজেছে তখন ঠিক সেই সময়ে লগুনে তোমার কোন বন্ধু তা অস্বীকার করে বলবে, না বারোটা বাজতে এখন অনেক দেরী। তাহলে তোমার বয়স অল্পস্বল্পে দশ বছর বে পায় হয়েছে তা কি ঠিক হিসেব সম্মত হোল? তাই বলছি, এই মহাশূন্যে কালের কোন মাপ নেই। সময়ের যে কবে শুরু আর কবে শেষ হবে তার কোন স্থিরতা নেই। মহাকালের তাই কোন পরিমাপ নেই। আমরা সময়কে কৃত্রিম ভাগ করে তার কয়েকটা নাম দিয়েছি।

আবার বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, আমরা যদি গ্রহাঙ্গুরে থাকি তবে আমাদের না কি সময়ের মাপের ধারণা হোত অল্প বয়সের, একটা গল্পে আছে, এক ভুল্লোক একদা কিছু সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমোতে ঘুমোতে এক স্বপ্নের রাজ্যে বেড়াতে যান। ঘুম ভাঙবার পর যখন বাড়ি চুকলেন তখন তিনি দেখলেন তাঁর ছেলেপুলেরা সব মরে গিয়েছে। তেমনি বৈজ্ঞানিকদের একটা কথা শুনে তোমাদের আবার গল্প বলে মনে হবে। ধরো, তুমি এখান থেকে পাঁচ মাসের ছুটি নিয়ে গ্রহাঙ্গুরে হাওয়া পরিবর্তন করতে গেলে। প্লেন তোমাকে নিয়ে ছুটল সেই গ্রহটিতে আলোকের গতি থেকেও আরো দ্রুত গতিতে। নির্দিষ্ট সময়ের হিসাব করে, তুমি যখন পৃথিবীতে ফিরবে তখন দেখবে পাঁচ বছরের অনেক বেশী সময় কেটে গিয়েছে। শুধু ভুল কি সময়ের বেলাতেই হয়? তোমরা জ্যামিতিতে পড়েছো, বাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ অথবা উচ্চতা নাই অথচ অবস্থান আছে, তাহাকে বিন্দু বলে। এইরূপ কয়েকটি বিন্দুর সমবায়ের রেখার উৎপত্তি হয়। আচ্ছা, বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা প্রভৃতি যদি কিছুই না থাকল তবে অবস্থান থাকবে কী করে আর যেখাই বা সৃষ্টি হবে কী করে বার স্পষ্টতঃই দৈর্ঘ্য রয়েছে দেখতে পাই আমরা। আর একটা সাধারণ ভুলের কথা বলি শোন। ধরো ট্রেন চলেছে চল্লিশ মাইল বেগে। তুমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঠেলাঠেলি করতে করতে ট্রেনের কামরার একদিক থেকে অপরদিকে হেঁটে গেলে। জিজ্ঞাস করলে বলবে পাঁচ মিনিটে তুমি আট গজ হেঁটেছ। কিন্তু সত্যিই তুমি আট গজের অনেক বেশী হেঁটেছ। কেননা ওই সময়ের মধ্যে ট্রেনটা অত্যন্তঃ ছুই-তিন মাইল হেঁটে গিয়েছে। আবার অনেক সময় তোমরা বোধহয় লক্ষ্য করেছ দুটো বাস যদি পাশাপাশি একই গতিতে সামনের দিকে ছুটে চলে তখন মনে হয় বাসগুলো বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে আর ইঞ্জিন দুটোই শুধু গর্জন করে চলেছে। এটা যদি লক্ষ্য না করেও থাকো তবে আরি বলব এটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যখন ট্রেন ছোট্টে তখন বাইরে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ট্রেনটা স্থির আছে আর বাইরের গাছপালা টেলিগ্রাফ-পোস্টগুলো উলটো দিকে ছুটে চলেছে।

এই রকম জানাশোনা ভুলের সংখ্যা আমাদের জীবনে রয়েছে অগুনতি অথচ কথা বলবার সময় আমরা তা লক্ষ্য করিনে। আজ পৃথিবীতে এমন সব বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে বা হচ্ছে যাতে মনে হইবে পৃথিবীতে সত্য বলে বোধ হয় কিছু নেই। এক সময়ে যে তথ্যকে সত্য বলে জেনে এসেছি সে সব আজ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বলি মানব অর্থাৎ মনুষ্য অপত্য। অথচ বলা উচিত হানব অর্থাৎ হনুয় অপত্য। আমরা জেনে এসেছি মহেঞ্জোদারো হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ আর্ষদের ভারতে আসার আগে স্রাবিড় দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। আজ সে কথা অস্বীকার করলে অনেকেই অস্বাক হবে। আমরা জানি, রাজা পুরু আলেকজান্ডারের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এটা যদি প্রমাণিত হয় যে পুরু হাতে আলেকজান্ডারই এটসা মার খেয়েছিলেন যে পরে রাক্তিরবেলা পুরুর সঙ্গে একটা মিটমাট করে ভারত থেকে চম্পট দিয়েছিলেন, তখন অনেকেরই তা' স্বীকার করতে কষ্ট পেতে হবে। শুধু কি ইতিহাসের পাতাতেই মিথ্যা লুকোন আছে? বিজ্ঞানের বইতেই দেখো না ভুল লুকোন আছে। আমরা জানি পদার্থ হোল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট। একে ইংরাজিতে বলে থি ডাইমেনশনস। কিন্তু আজ বলা হচ্ছে পদার্থের ফোর ডাইমেনশনস রয়েছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ছাড়া চতুর্থ ডাইমেনশনটি হোল সময়। এটি বুঝতে গেলে আমাদের অনেকেরই মাথা গুলিয়ে যায়। ভুল্লোকে দেখো না আমাদের বাবা, দাদারা ভারতবর্ষ বলতে যে ভৌগোলিক স্থানটি জেনে এসেছেন আজ ভারত বলতে আমরা তার থেকেও অনেক ছোট বায়ুগাকেই বুঝিয়ে থাকি।

এখন তোমরা বলতে পারো আমাদের জ্ঞানের জগত যদি ভুল আর মিথ্যেতেই ভরা এবং আমরা যদি কোন কিছুকেই চিরন্তন সত্য বা চিরন্তন মিথ্যে বলে ছাপ মেরে দিতে না পারি, তবে পরীক্ষার খাতার তোমাদের ভুলের জন্ত নম্বর কেটে দেওয়া হবে কেন? আমিও তো তাই বলি। অবশ্য পরীক্ষার খাতার তোমাদের পরিবেশিত অর্গৌকিক তত্ত্বগুলো দেখে আমরা অনেক সময় হেসে থাকি, কিন্তু হলপ করে আমি বলতে পারি সেই খাতাগুলোকে যদি মিউজিয়ামে রেখে দেওয়া হয় তবে কোনদিন ভবিষ্যতের কোন বৈজ্ঞানিক নিশ্চয় তাই থেকে কোন সত্য উদ্ধৃতি করতে পারবেন।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রাবণ ১৩৫০। দুর্ভিক্ষের হাহাকারে বাংলার আকাশ-বাতাস সুধরিত। টাকা দিয়েও খাদ্য মেলে না। ঘরের টাকা বের করে কালোবাজারীদের পেছনে পেছনে চোরের মত ঘুরে পাঁচ টাকার জিনিষ পকাশ টাকার কিনতে হয়। লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রতিদিনের অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে 'ক্যান দাও, একটু ক্যান' বলে মর্মান্তিক চীৎকারে কেঁদে বেড়াচ্ছে মহানগরীর পথে পথে ভূখা মিছিল।

এমনি দিনে পূর্ববঙ্গের অর্ধেক অসহায়ের একবার কন্ডার বিবাহ।

মহাভারতের অন্নবানক কালী সিংহের প্রাসাদোপম গৃহ ভাড়া নিয়ে সম্বৃত হয়েছিল বিবাহমণ্ডপ। বিবাহের ব্যয়বরাদ্দ চল্লিশ হাজার টাকা।

দান সামগ্রী বৌদ্ধকামিতে বিবাহমণ্ডপ এমন ভাবে সাজানো হয়েছিল, যেন কোন প্রদর্শনীর বিভিন্ন জিনিষের ঠল খোলা হয়েছে। হীরা-অহরতের অলংকার থেকে আরম্ভ করে কাঁসা-পেতলের বাসন পর্যন্ত কোনটাই প্রাচুর্য কম নেই।

এই উৎসবে যোগদান করতে এসেছিলেন বাংলার একজন বিখ্যাত লেখিকা। গাড়ী থেকে নেমে বধন তিনি বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর বিশ্বয় আর চেপে রাখতে পারলেন না। সংগীটিকে বললেন : এ যে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব দেখছি !

লেখিকাটির সমস্ত প্রাণ-মন যেন বেদনায় ভরে উঠলো। যে বছরে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নভাবে বন্ধুভাবে পথ-কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই বছরে ধনীর ছুরায়ে ঐশ্বৰ্যের প্রদর্শনী। স্বাহু আহার তাঁর মুখে উঠলো না, পারলেন না তাঁর সংগীটির সংগে প্রাণ খুলে কথা বলতে।

কেরবার পথে সংগীটিকে বললেন : এমন দুর্দিনে যেখানে অগণিত পর্ণদেবতা অনাহারে অনিচ্ছায় তিলে তিলে মৃত্যুর করালগ্রাসে এগিয়ে গলেছে, সেই মুহূর্তে এমন বিলাসিতা, ঐশ্বৰ্যের এমন আড়ম্বর সত্যিই আমার মনকে বড় পীড়া দেয়। অবশ্য চৌধুরী মশাইয়ের একটিই মাত্র কথা এবং দেবার সামর্থ্য তাঁর আছে, তিনি তো দেবেনই কিন্তু এত সংগে দরিদ্র-ভোজনের ব্যবস্থা থাকলে হয়তো এতটা স্নঃপীড়ার কারণ হতো না। দেখো বাবা, জমিদারদের এখন বিলাসিতার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কবিগুরু 'দুর্ভাগা দেশ' একবার মনে করে দেখো, আমার মনে হয়, এ অভিশাপ একদিন সত্য হবে।

অভিশাপ সত্যিই লেগেছে। কবিগুরুর ভবিষ্যৎ-বাণী আজ দমস্ত দেশের ওপর অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে—

'বিধাতার ক্রমবোধে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে

ভাগ করে খেতে হবে সাথে অন্নপান।'

এই লেখিকাটি আর কেহই নহেন, স্বয়ং সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী অন্নরূপা দেবী। অন্নরূপা দেবী সম্পন্ন ঘরের মেয়ে হলেও সমাজের অবজ্ঞাত, নিপীড়িত নর-নারীর প্রতি অসামান্য সহানুভূতির পরিচয় আমরা দারোগ করে কবর পেয়েছিলাম।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে একটি সাহিত্য-সভার বোগ দ্বার অন্ন সাজাদপুরে (পাবনা) গিয়েছিলেন। ট্রেন থেকে নেমে পাঁচ মাইল পথ পাড়ীতে যেতে হয়েছিল। পাড়ী থেকে নেমে কলের কুলবর্তী শুধালেন তিনি।

আমরা বললাম, আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

বললেন, হ্যাঁ বাবা, বয়স হয়েছে, ক্লান্ত হওয়া অসম্ভব কি, তবে এই পাড়ী-বাহকদের কথা চিন্তা করে আর একটু বেশী ক্লান্তি এসেছে।

আমরা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালুম তাঁর দিকে।

অন্নরূপা দেবী বললেন, দেখো, না খেয়ে খেয়ে এই বাগ্‌দীপুলের কি হাল হয়েছে? আমাকে নিয়ে আসতে যেন তাদের কতই কষ্ট হল। অথচ এই বাগ্‌দীরাই ছিল একদিন বাংলার রক্ষক। বাংলার রাজাদের বাগ্‌দী লেঠেল বিদেশের ভয়ের বস্ত্র ছিল। বাগ্‌দী ভাঙাতের নামে সমস্ত দেশ আতংকিত হয়ে উঠতো। আজ পঞ্চাশের দশকতরে তাদের কি ছরবছা, ভাবলে কার না কষ্ট হয়?

আমার লেখা 'কুর্ভাগ ভগবান' কবিতাটি শুনে তিনি বললেন : সত্যিকারের দুর্ভিক্ষের রূপ তুমি দেখেছো বাবা, তাই লিখতে পেরেছো এমন কবিতা। কত লোক মরেছে অনাহারে আর কত লোক লাখ লাখ টাকা করছে কালোবাজারীতে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রাচীন দেশে বাস করে এমনি কুকুর-বিড়ালের মতই মরতে হবে আমাদের। তবু ইংরেজ সরকারের মতে একে দুর্ভিক্ষ বলা চলবে না। একেই বলে নিয়তির পরিহাস।

আমি বললাম : ইংরেজই তো সৃষ্টি করেছে এই দুর্ভিক্ষ, সারা দুনিয়া জানে, কাজেই তার স্বীকার করা না করার কি আসে যায়?

এবার বললেন সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী : অথচ মজা দেখো, লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরছে, কন্ট্রোলার সামনে দিন-রাত্রি যাপন করেও হয়তো এক মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারছে না, মিষ্টির দোকানের সামনে গিয়ে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে আছে অথচ একটি দোকান লুঠের সংবাদও তো শোনা যাচ্ছে না! এমন মিষ্টির ভাবে কোন দেশের লোক মরেছে শুনেছো? আরে বাবা, মরতে বধন হবেই তবে একটা মরণ-কামড় দিয়েই মর...বলতে বলতে তাঁর স্বর উত্তেজনায় ভরে উঠলো। আবার খানিক নীরব থেকে বললেন : তোমরা সাহিত্যসভা কর আর বাই কর, এই সব অল্প দেশবাসীর ভেতর শিক্ষার ব্যবস্থা কর। নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশের অল্প চাষাভূষা, মজুর শ্রেণীর মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান চালাও, অল্পজনে আলো দাও, মৃতজনে দাও প্রাণ, এরা বুঝে নিতে শিখুক নিজেদের পাওনাগণা শুধে-আসলে—

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন অন্নরূপা দেবী।

আজ এতদিন পরে তাঁর কথা লিখতে গিয়ে শুধু মনে হচ্ছে, যে বাংলা-সাহিত্য হারিয়েছে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী আর বাংলার অবহেলিত জনগণ হারিয়েছে তাদের স্নেহময়ী জননী।

People are always blaming their circumstances for what they are. I don't believe in circumstances. The people who get on in this world are the people who get up and look for the circumstances they want, and, if they can't find them, make them.

—Bernard Shaw.

যদি জানতাম

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

সংসারের উনকোটি কাজের মধ্যে যে ক'টা কাজ লোকজনদের হাত দিয়ে করালে কিছুতেই তৃপ্তি মেলে না, সুধাময়ীর তার মধ্যে সন্ধ্যা-আলানোর কাজটিই বোধ হয় সর্বপ্রধান।

বহুদিন ধরে অবশ্রকরণীর তালিকাভুক্ত থেকে থেকে ওটা যেন একটা সংসারে এসে দাঁড়িয়েছে। না দিতে পারলে খুঁতখুঁত করে মনটা—তাই এই ভরা মাষের বর্ষায় উত্তুরে বাতাস যখন পা থেকে মাথা অবধি কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তখনও একদিনের মত মূলত্বের রাখতে পারেন না এ কাজটাকে। শরীরটা দ্রুত আলিস্তি জানালেও মনে মনে চোখ রাঙিয়ে শাসন করেন তাকে।

আর তসর কাপড়ের ওপর পশমের গায়ের কাপড়টা আরও একটু ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে কাঁপা-কাঁপা পায়ে উঠে আসেন তিনতলার ঠাকুরঘরে।

গোপালকে জল-বাতাসা দিয়ে আসনটাতে চূপ করে বসে থাকেন একটুকু। ঠিক যে ধ্যান জপ করেন তা নয়—একটু জিরিয়ে নেন নিজেকে। তা না হলে আজ-কাল তিনতলার উঠতে বড়ো হাঁফ ধরে যায়।

প্রদীপ আলানোর কাজটা কষ্টসাপেক্ষ বলে মনে না হলেও শাঁখ বাজানোর জন্তে একটু দম নিতে হয় আগে হতে।

তার পর অল্প প্রদীপটা হাতে নিয়ে ঘরের চারপাশে সন্ধ্যা দেখিয়ে আবার বেধে দেন শিলসুজের ওপর। আসবার সময় শুধু কয়েকটা ধূপকাঠি জালিয়ে নেন প্রদীপের শিখার ওপর ধরে আর আনেন গজাজলের ঘটিটা। আগে আগে এই সঙ্গে প্রদীপটাও আনতেন হাতে ধরে। কিন্তু আজকাল আর নেন না ওটা। কারণ সন্ধ্যা দেখিয়ে আবার ওটা তিনতলার বেধে দিয়ে যাওয়া আর কামতায় কুলোয় না মোটে।

অগত্যা ধূপকাঠিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। প্রদীপের চেয়ে ওর উজ্জ্বলতা কম কিন্তু ওর সুগন্ধ মনকে স্পর্শ করে। মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দেন সুধাময়ী—এর বেশী আর কী-ই বা করতে পারেন তিনি? সত্যি তো সামর্থ্য তাঁর দিন দিন কমছে বই আর বাড়ছে না?

হিসাব মত বরষেটা তাঁর পকার থেকে বাটের ভিতর থাকলে কী হবে? রসকবহীন শুক জীবনটা যে মনে মনে আঙ্গী-পঁচাশ্রিতে পৌঁছে গেছে একেবারে।

টুকটুক করে তিনতলা থেকে নেমে মোতলার পূর্বদিকের বড় ঘরটার দরজার এসে দাঁড়ান সুধাময়ী। ঘটি থেকে তিন-চার কৌটা গজাজল ছিটিয়ে দেন চৌকাঠের উপরটার।

এ ঘরটা তাঁর নিজের শোবার ঘর। বহুদিনের স্মৃতিজড়ানো দ্রুত একটা সময়টা মিলে আছে এ ঘরের আনন্দ-কালোতে। এখন

অবশ্র আর এত বড় ঘরটার কোন প্রয়োজনই হয় না তাঁর। ধরতে গেলে অব্যবহারেই পড়ে থাকে—তবু বহুদিনের অভ্যাসের ফলে এ ঘরটার এলে শান্তি বোধ করেন মনে মনে। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে খচখচ করে মনটা। অপ্রয়োজনে এত বড় একটা ঘর আগলে রাখার জন্তে মনে মনে দায়ী করেন নিজেকে। হিম্মতিক্তে কত সাধ্যসাধনা করেন—তাঁর সাথে ঘরটা বদলাবদলি করে নেবার জন্তে। তা ছেলে কী তাঁর কোন কথা কানে নেয়? তার সেই এক কথা—আমিই বা এত বড় ঘরটা নিয়ে করবো কী? অবশ্র একখাটা হিম্মতিক্তে দিয়ে কবুল করিয়ে ছেড়েছেন সুধাময়ী যে বিয়ের পর থেকে সে এই ঘরেই শোবে। কিন্তু সেদিন যে কবে হবে।

আর কত দিন এই ক্লাস্ত হাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জালিয়ে দিয়ে এ বাড়ীর অবসন্ন সন্ধ্যাপ্রদীপে অভ্যর্থনা জানাবেন সুধাময়ী? নিশ্চয় এই বাড়ীটাকে বন্ধের মত আগলে নিয়ে আর কত দিন তাঁকে প্রতীকার থাকতে হবে এমন একটি মানুষের, যে এসে তাঁর হাত থেকে তুলে নেবে এ বাড়ীর সন্ধ্যাপ্রদীপ? বন্ধের কাছে একহাতে ধরে রেখে অল্প হাতে আড়াল করে রাখবে বাতাসের দাপট থেকে—ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার আলো দেখাবে এ ঘরে ও ঘরে।

সেদিন পরম নিশ্চিত্তে অবসন্ন নেবেন সুধাময়ী। এমনি শীতের সন্ধ্যায় আর কাঁপা-কাঁপা পায়ে অবশ্রকরণীর কর্তব্যের জের টেনে ঘুরে বেড়াতে হবে না তাঁকে। ভাবতে ভাবতে ঘরের ভিতরে এসে সুমুখের বড়ো খেতপাথরের উপর হাতের প্রথম ধূপটা নামালেন সুধাময়ী। টেবিলের ধারে দাঁড় করানো রজনী বাবুর কটোখানা আঁচল দিয়ে মুছে দিলেন নিত্যদিনের মত।

অসম্মনস্ক মনটা কিছুটা যেন কিরে এলো নিজের জায়গার। ছবিটার উদ্দেশ্যেই যেন অনুটখরে বললেন—তোমার আর দোষ কী বলো? তুমি তো খুঁজে খুঁজে মনের মতন সব জিনিস দিয়েই ঘর সাজাবার চেষ্টা করেছিলে। আমার অর্থেই কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। তুমি থাকলে বোধ হয় এমনটা হতে পারতো না এ সংসারে। ভাবতে গিয়ে কাঁপসা হয়ে আসে চোখ দু'টি। আঁচল দিয়ে মুছে কেলে টেবিলের কাছ থেকে সরে আসেন তাড়াতাড়ি। এই ভরসন্ধ্যাবেলার আর চোখের জল কেলে ছেলেটার অকল্যাণ করবার সাধ নেই তাঁর।

এমনিতেই তো ছেলেটার কী যে হয়েছে হাজার পরবেশা করেও তার হৃদয় করতে পারেন না সুধাময়ী। ছোটবেলা থেকে একটু শান্ত-গভীর প্রকৃতি হলেও এমনতর নিরানন্দ স্বভাব তো কোনকালে ছিল না হিম্মতির? কী ভীষণ পরকূপে যে হয়ে গেছে ও। এ বরষের এই কী বাস্তবিক ধরণ?

পাশের ঘরটার হিমাজি শোখ রাতেব বেলা। সেখানে সন্ধ্যা ঝালাতে এসে ঘরটার অবস্থা দেখে সত্যি সত্যি আবার চোখে জল এলো সুধাময়ী। বইতে আর বিছানাতে একাকার হয়ে আছে ঘরটা।

কেন কিছু বলে না হিমাজি? কেন সে এত উদাসীন? নাঃ, হিমাজির গতিবিধি রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে সুধাময়ীকে। একবার ইচ্ছা হল দেনেশকে ডেকে খুব খানিকটা বকাবকি করেন। তিনি না হয় আগের চেয়ে অক্ষম হয়ে পড়েছেন কিন্তু তাই বলে বাড়ীর সব লোকজনগুলো পর্যন্ত এত কুঁড়ে? বাড়ীর একটা মাত্র ছেলের এত হীনতা?

নেহাত ভয়সন্ধ্যাবেলা বলেই বকাবকিটা তখনকার মত মুলতুবী রেখে আঙুটে আঙুটে নীচের তলার নামলেন সুধাময়ী। বাঁ-পাছের পাতাটার বড়ো ব্যথা হয়েছে—এক হাতে সিঁড়ির হাতল ধরে তবে নামতে হয় আজ-কাল।

নীচের তলার প্রথম ঘরটা ভয়ংকরম সাজানো। রজনী বাবু থাকতে অনেক রাত পর্যন্ত এই ঘরে বসে পড়াশোনা করতেন। দেওয়াল-ভালমারিতে সাজানো গৃহকর্তার আইন বিধক বইগুলোতে বছদিন হাত না পড়ার ধূলো জমেছে। ঐ সব দেখলে নিজের অক্ষমতা আরও বেশী করে পীড়া দেয় সুধাময়ীকে।

ধূপকাঠিটা দরজার ছিটকিনিতে ঝুঁজে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস কেলে অস্তমনে এসে দাঁড়ান বারান্দার টাঙান একটা বাঁধানো ছবির তলার। একটা মেয়ের ফটো। অনুমান বছর পনের বয়স হবে মেয়েটার। ওর আবক প্রতিকৃতিটা হাসুছে শুধু। —ওর হাসিটা বেন হাতের মুঠোর ধরা এক মুঠো যুঁইফুল।

প্রথম বার বছরমপুরে গিয়েই এই ছবিটা সঙ্গে করে এনেছিলেন রজনী বাবু। নিজে হাতে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন এইখানে। তা সে-ও তো আজ বছর পাঁচেকের কম নয়। তবে?

তবে কেন আজও এর কোন মীমাংসা হল না? কোনখানটার যে পরমিল হল কিছুতেই তা ঠিক করতে পারেন না সুধাময়ী। হিমাজিটাও কোন কিছু বলে না যে। এমন বিস্তী চাপাখতাব হয়েছে হতভাগাটার। একটা কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সোজা উত্তর পাবার জো নেই। এই যে সেদিন অত রকম ডুমিকা পাঁচ মিশেলী কথার ভণিতা করে হিমাজির খেতে বসবার সময় রজনীদের কথাটা তুললেন সুধাময়ী—কী ভাবে তা এড়িয়ে গিয়ে সুখ হতে সরে গেল হিমাজি তা কী আর বোঝেন নি তিনি?

গৌরচন্দ্রিকা শুনেই গোত্রাসে কোন মতে খাবারগুলো খেয়ে নিয়ে ধূম পাওয়ার দোহাই পেড়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ার কারণ কী, এখনও তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে হিমাজিকে?

কিন্তু কেন? কেন আজকাল এমন করে এ প্রশ্নটা এড়িয়ে চলে হিমাজি? তবে কী রজনীকে ওর পছন্দ হয় নি? তাই বা কেমন করে হবে? রজনী তো কোন দিক থেকেই অপছন্দের ঘেঁরে নয়? তা হলে কী রজনীদের ভয়ক থেকে কোন ছর্বাংবহার পেয়েছে সে? তাই অমন করে মন শুমরে থাকে ও? নাঃ তাই বা কেমন করে হবে? পরমেশ বাবু তো হিমাজিকে চক্ষে হারান। আর রজনী? না না সে একটু চঞ্চল স্বভাব বটে কিন্তু তেমন ঘেঁরে তো নয়?

আর যদিই বা ঘরে নেওয়া বার যে ওরাই খারাপ ব্যবহার করেছে তা তাতেই বা এত লুকোচুরির কী কারণ থাকতে পারে? তা এমন কী-ই বা হতে পারে বা মায়ের কাছেও বলা চলে না? চরম পর্যন্ত ভাবলে এই অবধি হতে পারে হয়ত যে বিয়ে দেবে না বলেছে ওরা। তাতেই বা কী এমন ক্ষতি হয়েছে? ওদের মেয়ে না পেলে কী সারাজীবন আইবুড়ো থাকতে হবে সুধাময়ীর ছেলেকে?

না—না, এসব কি ভাবছেন সুধাময়ী? সত্যিই হয়ত ওরা পশ্চিমে গেছে হাওরা খেতে। হিমাজিকে ভালো করে যেতে বলেনি—ঠিকানা ঠিকানা জানার নি তাইতেই অভিমানী ছেলেটার মান হয়েছে। আর সত্যিই তো বাপু এ আবার কী ব্যবস্থা? পশ্চিমে হাওরা কী পালিয়ে বাছিলো তোদের? সারাজীবনই তো পশ্চিমে কাটালি, এখনও সখ মেটে নি? অত বড় মেয়ে গলার নিয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে হাওরা খেয়ে বেড়ানো। এ কেমনধারা আঙুলের কাজ?

যাক গে—নানান কথা ভাবতে ভাবতে বড়ো দেয়ী হয়ে বাচ্ছে আজ। একটু তাড়াতাড়ি পা চালান সুধাময়ী। পাশে হিমাজির পড়বার ঘরটার ধূপ নিয়ে আবার ওদিকটার যেতে হবে। ভাঁড়ার ঘরে সন্ধ্যার ছবির সামনে সন্ধ্যা দেখাতে।

কিন্তু আজকের এ কর্তবাটা শেষ পর্যন্ত সৃষ্ট ভাবে সুসম্পন্ন করাটা অদৃষ্টে ছিল না বোধ হয়। তাই হিমাজির পড়বার ঘরের আলোর স্যুইচটা টিপেই ভূতদেখার মত চমকে উঠলেন সুধাময়ী।

দক্ষিণের খোলা জানলাটার কাছে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে আছে হিমাজি। ওর গায়ের ওপরকার অবহেলার ধরে রাখা পশরী চাদরটা হ-হ করে ছুটে-আসা জলো বাতাসটার পক্ষে মোটেই বধেই নয়। ওর কোলের ওপর অবশ্য একটা খোলা বই নজরে পড়লো সুধাময়ীর—বাতাসে তার অনেকগুলো পাতাই ফরফর করে উড়ছিলো। কিন্তু এতক্ষণ এই অন্ধকার ঘরে বসে হিমাজি যে ওর কোন পাতাটার এমন মনোনিবেশ করে সারাটা বেলা কাটিয়ে দিলো তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন!

সুধাময়ীর পক্ষে তা অনুমান করাও সম্ভব নয়। এই নিশ্চয় নিশ্চয় বাড়ীটার হিমাজি যে এতক্ষণ উপস্থিত আছে তার অভিব্যক্তিতেই কোন ধারণা ছিল না তাঁর। সেই ছুপুরবেলার ভাত খাবার পর থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে কতকটা নিজের মনেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে হিমাজি ক্লাপ নিতে গেছে কলকাজে।

তাই বিকেল থেকে তার সবচেয়ে আর কোনরকম তদারক করেন নি তিনি।

আশ্চর্য্য, এমন করেও বসে থাকে মানুষ? একটা সুস্থ সবল জোরান ছেলের এ কী অকাল-বৈরাগ্য? নাঃ, সত্যি হিমাজি পাগল করে দেবে সুধাময়ীকে।

টেবিলের ধারে হাতে-ধরা ধূপ ক'টা নামিয়ে রেখে একটু ব্যস্ত পান্নেই হিমাজির কাছে এসে দাঁড়ান। ওর মাথার এলোমেলো চুলে একটা হাত রেখে চিন্তাব্যাকুল ঘরে বসেন—কী হয়েছে যে হিরু? একলাটি এই অন্ধকারে ভুতের মতন বসে আছিস কেন?

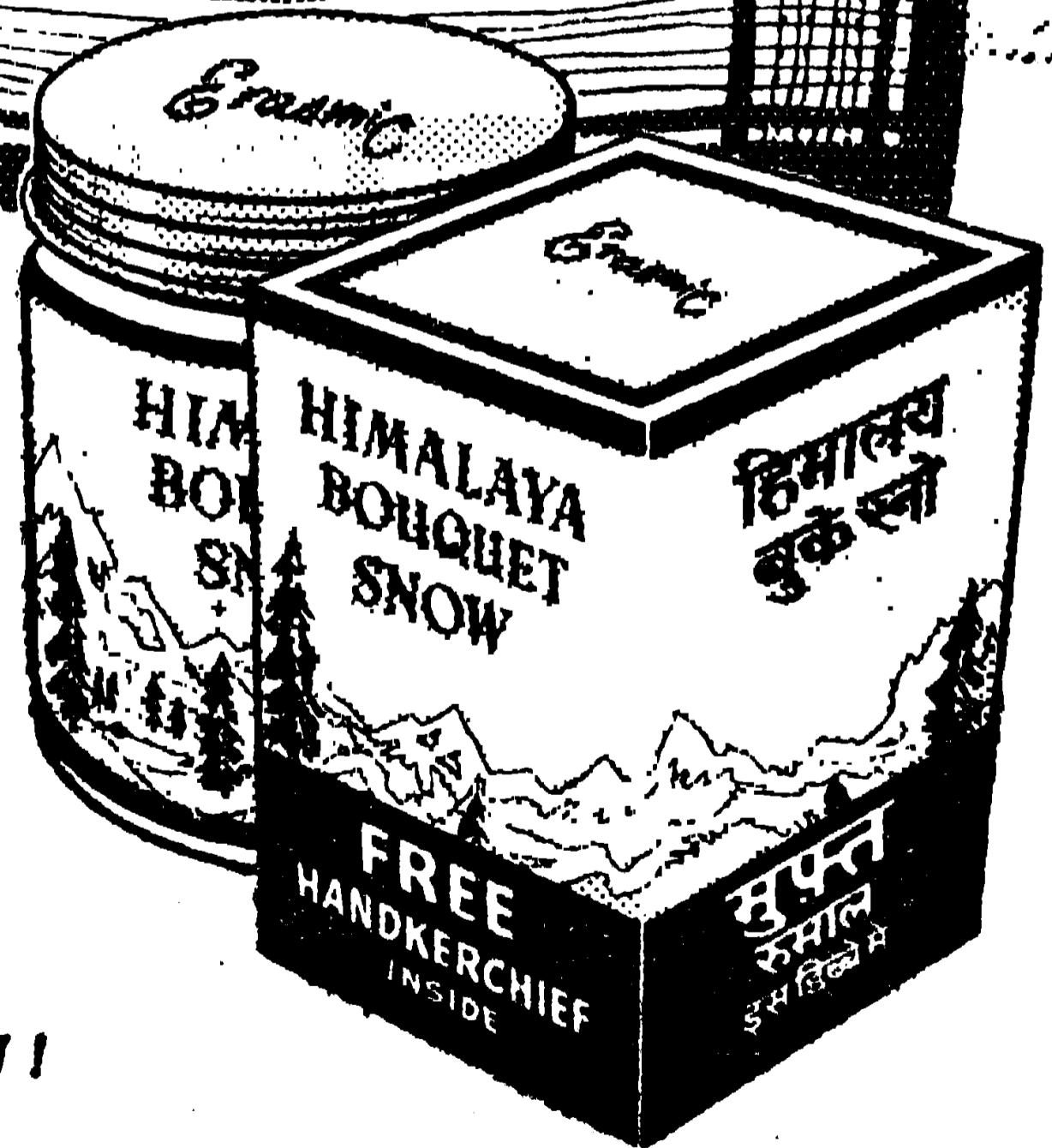
সুধাময়ীকে দেখে পর্যন্তই মনে-মনে এ প্রশ্নের একটা সহস্বর ধুঁকছিলো হিমাজি। পারিনি।

বিনামূল্যে!

লেডিস্‌ রুম্মাল

হিমালয়
বুকে স্নোর
বিশেষ প্যাকেটে

পাছে ষ্টক ফুরিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি করুন।



এক্সক্লুসিভ লগনের পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিডার লিমিটেডের তৈরী

HBS.20-X52 B3

তাই মায়ের দুটি ভ্রূণটাকে একেবারে দিক পরিবর্তন করবার উদ্দেশ্যে সে একটু চেঁচাকুত চপল কর্তাই বললে—দেখো না মা, কী বিশিষ্ট যে বর্ষাকালের মত বৃষ্টি শুরু হল, কিছু ভালো লাগছে না। বিকেল থেকে ভাবলুম একটু বেড়বো, তাও বৃষ্টির আলায় হল না দেখছি।

—তাই বৃষ্টি এই সারাটা বেলা ধরে এই জলো বাতাসে বসে বসে ভাবছিল? খুব হয়েছে আর ভাবতে হবে না তোকে। নে চল তো দেখি, আমার ঘরে চল। মায়ের-বেটার শুয়ে-শুয়ে গল্প করি একটু। বিকেল থেকে তো খাসনি কিছু। তারার মাকে বলি খান-কতক লুচি ভেজে আনুক তাড়াতাড়ি।

—না-না মা, এখন আর খাবো না কিছু। সত্যি সত্যি আমার ভীষণ দরকারী কাজ আছে একটা। ইকনমিক্সের খার্ড পার্টটা ফেলে এসেছি প্রকেশের ঘোষের টেবিলে। রাত্রে এসে বরং আজ তোমার কাছে বসে লুচি খাবো। কেমন?

সুধাময়ীকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আলনা থেকে পরমের পাজাবীটা টেনে নিলো হিমাজি। তারপর দেওয়াল থেকে পাড়ীর চাবিটা নিয়ে চটির আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলো সে।

আর সুধাময়ী? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁকেও বেতে হল ধীরে ধীরে অর্ধদগ্ধ ধূপকাঠিগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিতে।

তিনি নিঃশব্দেই জানেন রাত্রেও তাঁর ঘরে গিয়ে খেতে বসবে না হিমাজি। লুচির খালায় সাথে ছুনিয়ার বত রাত্তর বাজে খবর টেনে এনে সমান ভাবে রসান্বাদন করতে পারবে না আগেকার মতন। সুধাময়ীর সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে বেড়ায় হিমাজি। এইটাই তার বর্তমান বৈলক্ষ্য।

কিন্তু কেন?

নিজেই ভাবে হিমাজি। কেন এমন করে পালিয়ে বেড়ায় সে? যে মা ছাড়া হিমাজির কেউ নেই—কিছু নেই সারা পৃথিবীতে—সেই মাকে সে এত দুঃখ দেয় কী জন্তে?

না—না, মাকে দুঃখ দিতে পারে না।

মা দুঃখ পাবেন, এমন কোন কাজ করবার কথা ভাবতেও ভালো লাগে না তার। তবু সে যে আজ মাকে দূরে রেখে পালিয়ে বেড়ায় সে শুধু মাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্তেই। আর কোন কারণে নয়।

আজকেও তাই নিতান্ত বাধ্য হোয়েই মাকে এড়িয়ে পালিয়ে এলো হিমাজি। সে যে নিশ্চিত জানে মার কাছে বনিষ্ঠ হলেই কোন কথার অবতারণা অনিবার্য।

আগেকার মত এক বিছানায় শুয়ে গল্প করতে গেলোই পাঁচ রকম কথার মধ্যে দিয়ে পরমেশ বাবুদের কথাটা না তুলে মা থাকতে পারেন না কিছুতেই। অবশ্য তার জন্তে তাঁকেও বিন্দুমাত্র দায়ী করে না হিমাজি। মার পক্ষে এ উদ্বেগ অপরিত্যাগ্য, তাও সে বোঝে। কিন্তু উপায় কি?

মাকে সব কথা জানানো কী হিমাজির পক্ষে সম্ভব? আর তা ছাড়া জানিয়ে লাভই বা কী? শুধু মর্মান্তিক আঘাত দেওয়া মাত্র। না, না, অকারণে মাকে এমন করে আঘাত করতে পারবে না হিমাজি।

তার চেয়ে এই ভালো। এই মায়ের-ছেলের লুকোচুরি। এতে

মায়ের মনে একটু অভিমানের মেঘ হয়তো জমছে কিন্তু হিমাজি জানে সে মেঘের গুরুত্ব নেই। হিমাজি যে কোন মুহূর্তে একটু সচেষ্ট হলে তাঁকে উড়িয়ে দিতে পারবে। মায়ের কাছে নিজের মনটাকে উন্মুক্ত করতে না পারার পিছনে অবশ্য আরও একটা ভয় আছে মনে মনে। নিজের যে ক্ষতটাকে সে বহু সম্বরণে মায়ের চোখ এড়িয়ে এখনো লুকিয়ে রেখেছে। এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে সম্ভবতঃ তা প্রকাশ হয়ে পড়বে মায়ের কাছে। হিমাজি আর সেটাকে গোপন রাখতে পারবে না মায়ের নজর থেকে।

কিন্তু নিজের ক্ষত বা ক্ষতির পরিমাণ বহু বেশীই হোক, একটা বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছে হিমাজি, পরমেশ বাবুর বাড়ী আর বাবে না হিমাজি। কোন কারণেই নয়।

গত পনের দিনের মধ্যে অবশ্য দু'বার হিমাজির ডাক এসেছে পরমেশ বাবুর বাড়ী থেকে। বিনীত প্রত্যাখ্যানে ভ্রূণ অজুহাতে দু'বারই সে ডাক ফিরিয়ে দিয়েছে হিমাজি। মলিভিলার সে আর বাবে না—কোন কারণেই যেতে পারবে না সে।

এমন একদিন হয়ত ছিল বেদিন হিমাজির জগত থেকে মলিভিলার অস্তিত্ব লোপ করবার কথা ভাবতেও পারতো না হিমাজি। কিন্তু আজ পারে। বিধাতার অনেক নিষ্ঠুর অহুশাসনের মত সে বিনা প্রতিবাদেই যেনে নিয়েছে মাথা পেতে ভাগ্যের এ পরিবর্তনকে।

কিন্তু তাই বলে গত পাঁচ মাস আগেকার একটা শ্রমণীয় সন্ধ্যার অপমান তুলে গিয়ে মতুন করে আবার মলি-ভিলার যাতায়াত শুরু করা তার পক্ষে অসম্ভব! ঠরাই বা কোন মুখে কোন দাবীতে আবার ডাকতে পাঠালেন, সেই কথাটা ভেবেই আশ্চর্য্য হয়ে যায় হিমাজি। এমন কিছু সুদীর্ঘকাল আগেকার ঘটনা নয় যে একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেলেন ঠরা? কই হিমাজি তো ভোলে নি? জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সেদিনের কোন ঘটনা তুলতে পারবেও না বোধ হয়।

* * * *

বেদিন বিকেলে এই ঘটনার স্মৃচনা হল সেদিনটাও ছিল এমনি বর্ষাশুরার। সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ে পড়ে রাত্তাঘাট থেকে শুরু করে মনমেজাজে পর্যন্ত একটা স্যাঁৎস্যাঁতে ভাব ধরিয়ে দিয়েছিল যেন। বোধ করি তারই আমেজে বিকেলের দিকে কলেজ থেকে বাড়ী ফেরবার সময় এক কাপ চা খেয়ে নেবার বাসনার স্মৃষ্ণের একটা রেস্তুরায় চুকেছিল হিমাজি।

আর সেইখানেই দীর্ঘকালের পর একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেলো কলেজ-জীবনের অন্তরতম বন্ধু অবনীশ রায়ের সাথে।

ওকে দেখে উৎসাহের আভির্ভাষ্য প্রায় লাগিয়ে উঠেছিল অবনীশ। দু'বের চেয়ারটাকে বাতিল করে ওর স্মৃষ্ণের চেয়ারটায় এসে বসেছিল চকুর নিমেষে। তার পর ধূসরেজাজে দু'-তিন রকম খাবারের করমারেস করে দিয়ে হাসি আর গল্পে এক পলকে হৈ-চৈ বাধিয়ে তুললো একেবারে।

ওর চপলতার পরিমাণ দেখে অবাক হয়ে বাছিল হিমাজি। ভাবছিল—কী আশ্চর্য্য, এতটুকুও কী পরিবর্তন হয়নি অবনীশের? ঠিক সেই আগেকার মতই আছে ও! ভেমনি কাজিল আর আজ্ঞাবাজ, দু'-চারটে টুকরো কথা আর কুশল সম্বাদার বিশিষ্টতার

পরেই হোটেলের ডাইনিং হলে উপস্থিত বহুলোকের মাঝখানেই সে শুধিয়ে বসলো—তারপর তোর সেই সুইট-হাটের খবর কী? আর হতকাল ধরে কোর্টশিপ চালাবে তাই? আমাদের নিয়ন্ত্রণটার দ্বারা দেবী কত?

লাজুক-প্রকৃতি হিমালি ওর কথা শুনে ঘেমে ওঠে প্রায়। কমন করে আশেপাশের লোকদের মুখের ভাব লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে। বিব্রত কণ্ঠে বলে—কী আজ্ঞে-বাজ্ঞে বকুছিসু এতলোকের সামনে? সে সব কিছু নয়।

—কিছু নয়? সে কী কথা রে? সে বার তোদের বাড়ীতে আমি নিজের চোখে দেখে এলাম তাঁকে। অত ঘট করে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলি তুই।—চলে যেতে কবিত্ব করে বললি—নি এ বাড়ীর পূর্ণ স্বপ্নে মালিক হবেন অদূর ভবিষ্যতে। তবে দাবার হোল কী, শুনি?

হিমালি বোঝে, অবনীশ সহজে ছাড়ান দেবে না তাকে। তাই দ সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। মুহূর্তে বলে—না ভাই, ও সব কথা তুলে তুই আমার বিড়ম্বনা আর বাড়াস না। ও প্রসঙ্গটা ধতে দে। এটা তো বুঝতে পারছিস হবার হলে এতদিনে নিশ্চয় হয়ে যেতো, হবার নয়—তাই হয়নি।

ওর সংকুচিত ভাবে জরুপও করে না অবনীশ। বলে—ওরে বাবা, এ যে দেখছি বেজায় জখমী লাস। কলজে ফুটো করে টাটা চলে গেছে। আরে ব্যাপারটা কী হল তাই বল না ছাই। কমন হতাশ প্রেমিক-মার্কী মুখ করে বসে আছিস কেন? এমন দিলার বাজারে তোর বার্ষিকপ্রেমের গল্পটাই না হয় শোনা থাক।

—আঃ, অবন তোর এই ফাজলামিগুলো ছাড়বি? সব তাতে মার্কি করা ব্যায়রামটা যে তোর কবে সারবে।

হালকা সুরে কথাগুলো বলবার চেষ্টা করেও ঠিক সহজ হতে পারে না হিমালি। কমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার আভাস থেকে যায় ওর কথার সুরে। তবুও অবনীশ নাছোড়বান্দা। হিমালিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘরের অপেক্ষাকৃত নির্জন এলাকায় বেরারাকেও ইংগিত করে দেয় টেবিল বদল করে খাবার দিতে।

তারপর সেইখানেই জাঁকিয়ে বসে চা-ওমলেটের রসাত্বাদন করতে করতে আগের মতই লঘূহাস্তে বলে—আমার এই ইয়ার্কি করা ব্যায়রামটার কথা বলছিসু? তা বাপু, অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি তাঁরা সবাই একমতে বলেছেন, এ ব্যায়রামটা আমার হবার আগে সারবে না।—কিন্তু সে বাই হোক, আমি কাজিলই হই আর বাই হই না কেন, তোর বন্ধু তো বটে? সে হিসাবে আমার বী তুই অস্বীকার করবি কমন করে? আমার তোকে বলতেই

হবে এমন কী ঘটনা ঘটলো যাতে তোর মত ছেলে নামঞ্জুর হয়ে গেলো সে মহারাণীর দরবারে?

—না রে, তুই একটু ভুল বুঝিস ব্যাপারটা। আসলে ঘটনাটা ঠিক এ ধরণের নয়। তাঁদেরও ঠিক দোষ দেওয়া যায় না, রজনী তাঁদের একমাত্র সন্তান। তাঁরা তো সবচেয়ে সুপারজটির হাতে তাকে তুলে দেবার চেষ্টা করবেনই। সেইটাই তো স্বাভাবিক। তবে রজনীর বোধ হয় এটা ঠিক উচিত হয়নি। তবে একটা কী জানিস? আমাদের প্রত্যেকেরই মনে অবচেতন ভাবে খানিকটা অর্থলিপ্সা বোধ হয় থাকেই। তাই একটু বিবেচনা করে দেখলে সে বেচারাকেও খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না।

—আহা, তা বেশ তো। কে বলছে তাঁকে দোষ দিতে? আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছি, সে নির্দোষ অহরতটি বর্তমানে কোথায় বিরাজ করছেন?

হিমালি এবার নাচার হয়েই বললে—নাঃ, তোর পাজার পড়ে বিপদে পড়লুম দেখছি আজ। নেহাতই যখন ছাড়বি না তখন আগে সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শোন। তারপর তোর ঐ সব টীকা-টীপনিগুলো জাহির করিস।

পরমেশ বাবু অর্থাৎ রজনীর বাবা আর আমার বাবা ছাত্রজীবনে একসময় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমার বাবা এ্যাটর্নি ছিলেন। জানিস তো? পরমেশ বাবু ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তাই পরবর্তী জীবনে যদিও তারা কর্মক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তবু তাঁদের ছাত্রজীবনের মধ্যে অল্পবিস্তর যোগাযোগ বোধ হয় বরাবর ছিল। তাই কলেজ ছাড়বার প্রায় পঁচিশ বছর পরেও বহরমপুর কোর্টে একটা কেসের তদ্বির করতে গিয়ে বাবা পরমেশ বাবুর বাড়ীতে গঠেন। সেইখানেই রজনীকে দেখে খুবই পছন্দ হয়ে যায় বাবার। তাকে একেবারে বৌ করে ঘরে তোলবার পাকা কথা দিয়ে তিনি বাড়ী কিয়ে আসেন।

আমি অবশ্য তখন এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের কাছে এ ইতিবৃত্ত শুনেছি। মায়েরও অবশ্য প্রথমটায় খুব ইচ্ছা ছিল না এ বিয়ে হয়। তাঁর মনে ভয় ছিল বিলিভী ছুলে পড়ে একটু বিলিভী-ধেঁবা আদব-কারদার বড় হয়েছে রজনী, আমাদের প্রাচীনপন্থী সংসারে হয়ত সে নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু রজনীকে একবার চোখের দেখা দেখেই তাঁর সমস্ত আপত্তি কোথায় ভেসে গেলো!

তুই তো রজনীকে দেখেছিস, কাজেই তার চেহারার আর বেশী বর্ণনার দরকার কী? তবে একথাটা বললে বোধ হয় অভিভাবণ হবেনা যে, স্ত্রীর চেহারা ছাড়াও ওর চলনে-বলনে এমন একটা ছুনি'বার আকর্ষণ ছিল যা একবার দেখলেই যে কোন

ডঃ কল্লিক বসুর

টার্কোমোডা

অন্ন, অর্জুন ও ডিমবেগসিয়ার

বানানা

মুখ্য ও খেদমাত

বসুর বাসুর বানানাখোটেদী লি. বানানাখোটেদী

মাছুষকে ওর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে পারতো।—না রে হাসির কথা নয়। আমি রজনাকে অনেক দিন ধরে চিনি বটেই বলতে পারছি, রূপগুণের এমন সমন্বয় খুব অল্প মেয়ের মধ্যেই দেখা যায়। আর সমস্ত কিছুই ওপরে ছিল একটা অদ্ভুত সতেজ প্রাণ। বোধ হয় সহরের বাইরে উন্মুক্ত পরিবেশে বড়ো হয়েছিল বলেই স্বতঃস্ফূর্ত হাসি এত কথায় কথায় গান আমি আর কোন বাঙালীর মেয়ের মধ্যে আগে কখনও দেখিনি। মাকে যে ও কী রকম মায়ার কেলছে সে চোখে না দেখলে তোরা ধারণায় আনতে পারবি না।

—মাকে নাই বা দেখলাম, মায়ের ছেলেকে তো দেখছি, তাইতেই কাজ চালিয়ে নিতে পারবো বলে বোধ হয়। বড়ুর উচ্ছ্বাসে ঠাট্টা করবার এ সুযোগটুকু ছাড়ে না অবনীশ। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি এসজটা পাল্টে নেয় হিমাত্রি। অর্থাৎ রজনীর ব্যক্তিগত স্বভাবের বিশ্লেষণটা স্থগিত রেখে মূল ঘটনার বিবরণ দিয়ে চলে সংক্ষেপে।

—তোকে তো আগেই বললাম পরমেশ বাবু ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সম্প্রতি রিটার্ড করবার পর তিনি কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে একখানি হালফাসানের বাড়ী করেছেন। সংসার অবশ্য তাঁর ভারী নয়। শান্তস্বভাব স্ত্রী আর অশান্ত স্বভাব ওই মেয়েটিই তাঁর সম্বল। রিটার্ড করবার পর বাড়ী করে গুছিয়ে বসতে গিয়ে হাতের সম্বলও বোধ করি প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে। তাই মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েই তিনি ইদানীং প্রায় রোজই সকালে আমাদের বাড়ীতে আসতেন।

রজনীও আসতো তাঁর সঙ্গে। মায়ের রান্নাঘরের রোয়াকে বসে তিনি নানা সাংসারিক বিষয়ের আলোচনা করতেন মায়ের সাথে। সেই সঙ্গে নিজের আর্থিক দীনতার কথা তুলে বার বার লজ্জা পেতেন। আর আমাকে উপযুক্ত যৌতুক দেবার অক্ষমতা নিয়ে আক্ষেপ করতেন।

মা বতই বলতেন—তাতে আর কী হয়েছে বেয়াই? আমরা রজনাকে নেবো বলেছি। আপনার টাকার হিসাবে আমাদের কাজ কী?

উনি ততই বলতেন—না না বৌ-ঠাকরুণ, এটা কী একটা কথা হল? আপনি মহৎ, তাই এতবড় কথাটা বলতে পারলেন, তাছাড়া আপনার লক্ষ্মীর সংসার, অভাবটাই বা কী? কিন্তু আমারও তো একটা সাধ-আহ্লাদ ছিল? খুকী আমার একটা মেয়ে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আপনি ধরে নিতে পারেন যে ভবিষ্যতে বাড়ীখানা—

আচ্ছা আচ্ছা, সে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই হবে খন। বলতে বলতে মা রান্নাঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকতেন ওঁর অলখাবারের জোগাড় করতে।

সত্যি কথা বলতে কী, রান্নাঘরের রোয়াকে আসনপিড়ি হয়ে বসে ওই কাজটা পরমেশ বাবু নিখুঁত ভাবেই সম্পন্ন করতেন রোজ। আর সেই সঙ্গে মায়ের হাতের সূক্ষ্ম, শাকের ঘণ্ট হতে সুর করে শিঠে-পরমায় পর্যন্ত সমস্ত জিনিসেরই অপর্খণ্ড গুণগান শুনিতে মায়ের মনটিকে একেবারে ভিজিয়ে দিতেন। আবার তারই মাঝে মাঝে বলতেন—খুকীকে আপনার বৌ হবার যোগ্য করে নেবেন বৌ-ঠাকরুণ। ওঁ আবার এসব কিছুই জানে না!

আর শিখবার সময় পেলো কখন? তাতে আবার বা চক্রে প্রকৃতি ওর। কে জানে কত বিরক্তই না করবে আপনাকে।

মা তাড়াতাড়ি বলতেন—সে জন্তে আপনি কিছু ভাববেন না বেয়াই মশায়। আমি সব শিখিয়ে নেবো। কিছুই আটকাবে না। ওঁ এখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। বয়েস হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর বিরক্তির কথা বলছেন? ওটা আপনার একদম ভুল ধারণা। আমার মেয়ে নেই—ওর এই ছেলেমানুষি স্বভাব আমার খুব ভালো লাগে। আপনি কেন মিছিমিছি এর জন্তে ব্যস্ত হন?

পরমেশ বাবু সাহসনা পেতেন মায়ের কথায়। রজনাকে ডেকে এনে মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়ে তাকে তার পূর্বজন্মের স্মৃতির কল বোঝাতেন বার বার।

তারপর বাড়ী ফিরে যাবার সময় হলে বেশী ভাগ দিনই আমাকে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ করে বাড়ী ফিরে যেতেন।

একটু খেমে হিমাত্রি আবার বলে—ওঁরা হয়ত আশা করতেন রাত্রের নিমন্ত্রণ হলেও আমি একটু বিকেল থাকতে যাবো। আমারও যে যেতে ইচ্ছা করতো না তা নয় কিন্তু কিছুতেই পেয়ে উঠতাম না সকাল সকাল যেতে। লজ্জা আর সংকোচে আঙু-পিছু করতো মনটা। শেষ পর্যন্ত মা এসে তাড়া না লাগালে কোনদিনই আমার যাওয়া হয়ে উঠতো না।

ওদের বাড়ী গিয়ে পরমেশ বাবুর সাথে দেখা করে যখন উপরে যেতাম, তখন রজনীর মা-ও আমাকে অত্যন্ত স্নেহভরে কাছে বসাতেন। তবে অতি শান্তস্বভাবের মানুষ তিনি, অনেক কথা বলতে কোনদিনই পারতেন না। তাই একটু পরেই রজনীর ঘরে আমায় বসিয়ে দিয়ে সংসারের কাজে তিনি অস্তিত্ব চলে যেতেন।

আর আমি একা ঘরে বসে বসে শুধু অবাক হয়ে দেখতাম রজনাকে।

সকালবেলায় যে মেয়েটি বাপের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াতো। আর দেখা হলেই মুখ নীচু করে হেসে ছুটে পালাতো—বিকেলবেলায় নিজের ঘরে সে স্বরূপে প্রকাশিত।

কী আনন্দ-উচ্ছ্বল নিঃসংকোচ স্বভাব যে ওর। ওকে বতই দেখতাম ততই অবাক হতাম আমি। কোনদিন ওকে চূপ করে কোথাও এক মিনিটও বসে থাকতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। নাচে গানে ও বেন সর্বদাই মুগ্ধ, হাসিমুখীতে সর্বদাই জ্বরপূর। আমি মুখচোরা মানুষ, ওর সাথে মন-প্রাণ খুলে কোলাহল করে নিজের আনন্দ ব্যক্ত করতে পারতাম না। শুধু নীরব দর্শক হয়ে ওর আনন্দটা মনে মনে ভোগ করে নিতাম মাত্র।

একটানা হিমাত্রির কথা শুনে শুনে অবনীশের চপল রসনা অনেকক্ষণ আগে হতেই তাগাদা দিচ্ছিলো অবনীশকে। শুধু হিমাত্রির উচ্ছ্বাসে বাধা দেবে না স্থির করেই সে বহু কষ্টে রাশ টেনে রেখেছিল নিজের। এবার আর পারলে না—বিজয়ের মত মুগ্ধ করে চোখটা একটু ওপর পানে তুলে বললে—বুঝেছি, বুঝেছি। কিছু সংকোচ করিসু না ভূই—বলে যা। তোর বক্তব্যটা আরও একটু সাজিয়ে গুছিয়ে কবির ভাষায় আমিই বলে দিচ্ছি—তোদের হ'জনকার আনন্দ আহরণের রূপটা ছিল স্বস্তি। ও ছিল রুক্মিণী আর ভূই ছিলি

মধুসূদনী। কেমন ঠিক বলেছি না? একটু লজ্জিতমুখে হাসে হিমাজি। তারপর বলে—যে বাই হোক, এমনি করেই নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে দিনে দিনে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে অনেকখানি মেলামেশা করে ফেলেছিলাম ওদের সাথে। এখনও অবশ্য মাঝে মাঝে বাই—কথার শেষের দিকটার কেমন যেন অভ্যমনস্ক হয়ে বার হিমাজি। অর্ধশ্রী অবনীশ আবার তাড়া লাগায় ওকে—কী, আবার কিম্বিয়ে পড়লি কেন? তারপর কী হল তাই ছাই বল না।

একটু চুপ করে থেকে হিমাজি বলে—সুজন মিশ্রকে চিনিস? সেই যে—খুব কেতাহরস্ত ভদ্রলোক।—বেহালার ওদিকটার থাকেন। চেহারাটাও খুব চমৎকার। অবশ্য ভদ্রলোক যে কী কাজ করেন তা আমি এখনও সঠিক জানি না। শুনেছি বিজ্ঞানেশ আছে। তবে অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। ক'খানা যে তাঁর গাড়ী আছে আমি আজ পর্যন্ত তাই দেখে শেষ করতে পারিনি বোধ হয়।

—বটে? তিনিই না কী তোর বাইভ্যাল? কে বল লোকটা? কী নাম বললি? সুজন মিশ্র? নাঃ, এ নামে কারোকে চিনি বলে মনে পড়ছে না। তা রজনাদের বাড়ীতে তার শুভাগমনটা হলো কী করে, শুনি?

হিমাজি বলে—সে-ও এক অভিনব কাহিনী। রজনাদের কলেজ থেকে বঙ্গাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গনা অভিনয় হয়েছিল ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে। আমিও গিয়েছিলাম দেখতে। চ্যারিটি শো—কাজেই বাইরের বহু বড় বড় লোক সেখানে ছিলেন।

আর সেইখানেই সুরূপা চিত্রাঙ্গনার বেশে রজনাকে দেখে মোহিত হয়ে বান মিশ্র সাহেব। ঠিকানা জোগাড় করে বিরাট এক পুষ্পস্তবক নিয়ে পরদিন সকালে তিনি রজনাদের বাড়ীতে এলেন অভিনয়ের তারিক আর অভিনয়কর জানাতে। তারপর আরও কতবি? না তাই, তারপরে আর বলবার মত কিছুই নেই। ঠর অপখ্যাপ্ত উপহারে নিত্য-নতুন গাড়ী আর কড়া ইঞ্জির স্যুটের পাশে অতি সহজেই স্নান হয়ে গেল তোদের এই চারশো টাকা মাইনের প্রফেসর হিমাজি সরকার।

নিজের বাগদত্তা জেনেও যে রজনাকে নিয়ে কোনদিন একলা গাড়ীতে কোথাও বেড়াতে যাবার প্রস্তাব পর্যন্ত করতে পারিনি, ভেবেছি রজনার মা-বাবার কী ভাববেন? মিশ্র সাহেব সামান্য পরিচিত হয়ে সেই রজনাকে নিয়ে সমস্ত বেলার মত পাড়ি দেন দূরের পাল্লার। প্রথমে ভাবতার পরমেশ বাবুরা বোধ হয় চকুলজ্ঞাতেই কিছু বলতে পারছেন না। পরে বুঝলাম তা নয়। পরোক্ষ ভাবে ঠদের সমর্থনই রয়েছে ওদের বেড়াতে বাওয়ার। ঠদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে মিশ্র সাহেবের ঐশ্বর্যের বলমলানিতে। রজনারও বোধ হয় তাই। কিন্তু আমি এখন উঠি তাই? বাইরে এতকণে বোধ হয় যুট্টা ধরেছে।

তবে চল আমিও উঠি এবার। বলে অবনীশও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। কিছুকণ আগেও তার গল্প শোনবার যে অদম্য উৎসাহ দেখা গিয়েছিল এখন আর তার চিহ্নমাত্রও ছিল না।

সোদরপ্রতিম বন্ধুর সমবেদনার বিষয় ছায়া ছড়িয়েছে সারা মুখে। বাইরের করিডরে এসে সে তবু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো হিমাজিকে। তুই তা হলে ওদের ওখানে বাওয়া ছেড়েই দিয়েছিস?

আনন্দ উৎসবে
ক, হোডের
প্রসাধন সামগ্রী

ক, হোড ২৩ কং • কলিকতা-২০

হিমাত্রি বলে—ঠিক ছেড়ে এখনও দিইনি কিন্তু দিতেই তো হবে ভাই। ভূই তো আমার চিনিস, এ ধরনের প্রতিশ্রুতি আমার খাতে পোষাবে না। সাধ্য তো নেই-ই—কিটো নেই হয়তো। কিন্তু মুক্তি হলে কী জানিস? মাকে এখনও কিছুই বলতে পারিনি। শুধু ওরা সবাই পশ্চিমে হাওয়া খেতে গেছে বলে কোন রকমে জুলিয়ে খামিয়ে রেখেছি। তা না হলে ওখানকার খবরাখবর না পেলে মা তরানক বকাবকি সুর করে দেয়। রজনীর ছবেলার খবর না পেলে তাঁর মনই ভালো থাকে না।

এর পর আর অবনীশকে কোন প্রস্তাব করার সুযোগ দেয় না হিমাত্রি। হাত নেড়ে সংক্ষিপ্ত একটা বিদায় অভিবাদন জানিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যায় বিপরীত ফুটপাথে রাখা ওয় ছোট গাড়ীখানার উদ্দেশ্যে।

* * * * *

—দাদাবাবু, ও দাদাবাবু ওঠেন। অবনী-দাদাবাবুরা খোঁজতে এসেছেন আপনারে। আমি তানাদের বোটখানায় বসিয়ে এলাম।

সকালবেলায় দীনেশচরণের ডাকাডাকিতে অবসর ছুটি চোখ মেলে তাকালো হিমাত্রি।

ঘরের মেঝের ওপর রোদ এসে পড়েছে। বেলা হয়েছে অনেক। গতরাত্রে মোটেই ঘুম হয়নি হিমাত্রির। অবনীশের সাথে হোটলে বসে ঐ সব কথা আলোচনা করার ফলে খিতিয়ে আসা স্মৃতিটা আবার গুলিয়ে উঠেছিল মনের মধ্যে। পরিণামের কলভোগে উত্তপ্ত মস্তিষ্কটাই সারারাত্রে জেতে নির্বাসন-সংস্রোগ করলো ঘুমের রাজ্য থেকে। তাই একটা তিক্ত অবসাদ ঘিরে রেখেছে সমস্ত শরীর আর মনটায়।

আজকের প্রভাতী অভিধিরা তাই হিমাত্রির মনের অঙ্গনে করা শেকালীর পথ বেয়ে আসে না। বরং একরাশ বিরক্তি ছড়িয়ে দেয় তার মুখব্যঞ্জনায়। তবুও দীনেশকে চা দিতে বলে দিয়ে অলসচরণে চটিটা গুলিয়ে নেয় হিমাত্রি। তারপর কোনমতে গেঞ্জিটা পারে চড়িয়ে চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে বাইরের ঘরে চলে আসে হিমাত্রি।

ওয় অতৃপ্ত মুখ দেখেই বোধ হয় অবনীশ আন্দাজ করে নেয় ওয় অবস্থাটা। বলে—কি রে, এত বেলা অবধি ঘুমুছিলি নাকি? রাতে ঘুম হয়নি বুঝি?

হিমাত্রি লজ্জিত হয়ে বলে—না না এমনিই, শরীরটা তেমন ভালো নেই, তাই শুয়েছিলাম একটু। বলতে বলতে লক্ষ্য করে হিমাত্রি, অবনীশ একা নয়, আরও একজন অপরিচিত ভ্রমলোক এসেছেন অবনীশের সাথে।

অবনীশ স্বীকৃতমাকিক পরিচয় করিয়ে দিলে ছ'জনার মধ্যে। বললে—হিমাত্রি। একে আমি ধরে নিয়ে এলাম তোর কাছে। পরিচয় শুনে তুই নিশ্চয় একে চিনতে পারবি। ইনি হচ্ছেন চিমললাল এ্যাণ্ড মার্চেন্ট কোম্পানীর অল্পতম অংশীদার শ্রীকমলাক মিশ্র।—আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু। কাজের প্রয়োজনে প্রায়ই ওঁর দরজায় বেতে হয়। আর এর কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি কমল বাবু। ইনি শ্রীহিমাত্রি সরকার। আমার কলেজ-জীবনের প্রাণের দোসর। খুব ভালো ছলার। বর্তমানে বঙ্গভারতী কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক।

কমলাক আর হিমাত্রি পরস্পরের মধ্যে নমনকার-বিনিময় করে নেয়। তারপর দীনেশচরণের পরিবেশিত চা আর চিড়েভাজার মনোযোগ দেয়।

হিমাত্রি মনে মনে বোঝে, ওরা একটা কিছু মতলব উেজে এখানে এসেছে। কিন্তু সেটা যে কি হতে পারে, তা অসুমান করে উঠতে পারে না।

সুস্থখে রাখা খবরের কাগজটা পর্য্যন্ত টেনে নেবার সাহস হয় না, পাছে ওদের প্রতি অমনোযোগিতা প্রকাশ পায়। বরং কমল বাবুর কথা বলার কোন মনোমত গৌরচন্দ্রিকা ধুঁজে না পেয়ে দিনের কাগজটা টেনে নিয়ে মেলে ধরে সামনে। কিন্তু অর্ধেক প্রকৃতি অবনীশ খুব বেশীক্ষণ সময় নষ্ট করবার মাহুঁব নয়।

ছ'চারটে কথার পরই সে আজ প্রভাতে উঠেই ওদের ছ'জনকার মধ্যে আলাপ করিয়ে দেবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সে কেন বোধ করলো তার বিস্তারিত বিবরণ সুর করলো। চায়ের নিঃশেষিত পেয়লাটার মধ্যে দগুপ্রায় সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে—আজ সকালে উঠেই এমন প্রভাতী অভিধান চাললাম কেন জানিস হিমাত্রি! গতকাল সন্ধ্যাবেলা নিজেই একটু দরকারে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম কমলাক বাবুর সাথে। সেইখানেই হঠাৎ কথাপৃষ্ঠে বেরিয়ে পড়লো তোর ওই সৃজন মিশ্রের আসল পরিচয়। সেটা এতই অদ্ভুত যে শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না কিছুতেই। কমলাক বাবুকে একেবারে সজে করে নিয়ে চলে এলাম তোর কাছে। এবার সবটা শুনে তুই তোর কর্তব্য স্থির কর।

হিমাত্রির ভালো লাগে না। নিজের অন্তরের যে পরাজয়ের লজ্জাটুকু সে সকলকার কাছ থেকে লুকুতে চায়, অবনীশ বার বার তাকেই সর্বসমক্ষে টেনে আনবার প্রতিজ্ঞা করেছে বেন। ভারী বিরক্তি লাগে তার। অথচ মুখ ফুটে সে কিছুই বলতে পারে না। উন্টে বরং একটা অগত্যা গোছের ধন্যবাদ দেয় কমলাক বাবুকে। কারণ, শুধু অবনীশের অসুরোধে সে ভ্রমলোক অবাচিত সৌজতে এসেছেন হিমাত্রির বাড়ীতে। এ ক্ষেত্রে সৃজন মিশ্রের আসল পরিচয় জানবার জেতে হিমাত্রি আদপে ব্যগ্র কী না সে কথাটাই অবাস্তর হয়ে গেছে। তাই কতকটা বাধ্য হয়েই হিমাত্রিকে শুনতে হবে ওদের বক্তব্য।

তবে নবাগত বলে কমলাক বাবু বোধ হয় একটু সংকোচ বোধ করেন প্রথমেই এ ধরনের একটা পরচর্চা সুর করলে। তাই অবনীশের জবাবীতেই কথাগুলো হিমাত্রির কর্ণগোচর হল।

—কমলাক বাবু বলছিলেন, কয়েক মাস আগে একজন তুখোড় জালিয়াতের পাল্লায় পড়েছিলেন উনি। আর একটু হলে সেই মহাপুরুষটির কুপায় ওঁর হাজতবাস পর্য্যন্ত হয়ে যেত। লোকটার আসল নাম হীরেলাল পাণ্ডে। স্থানবিশেষে পরিচয় দেয় সৃজন মিশ্র বলে। সূন্দর ঐ চেহারাটা ছাড়া আর কোন ঐর্ষ্যই নেই ওঁর। একটা কানাকড়িও নেই নিজস্ব বলতে। কিন্তু এমন সাজপোষাক করে এত হাইসার্কেলে ও মেলায়েশা করে যে ওকে দেখলে ওয় আসল অবস্থা কাক করনাত্তেও আনবার সাধ্য নেই। যে সুরবাহেই হোক কয়েক জন অবাঙ্গালী ব্যবসাদারের সাথে ওয় খুব খাতির আছে।

কয়েক জন বড় বড় নামকরা লোক এমন কী দেশের কয়েক জন চর্চাকর্তার সাথেও ওর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ইচ্ছা করলে তাদের মারফত অনেক অসাধাসাধনও করতে পারে।

কিন্তু লোকটা একটা বায়ু বদমাইস। ধরাছোঁয়ার পাওয়া যায় না সহজে। আবার সকলকার কাছে বলে বেড়ায় ওর কল্পিত সংগ্রহের ব্যবসা আছে। কিন্তু কমল বাবুর ধারণা লোকটা আসলে একটা স্নাগলার। চোলাই কারবার করে তলে তলে।

উনি তো বলছেন পুলিশেরও নজর পড়েছে লোকটার কার্যকলাপে। কিন্তু অত বড় বড় জায়গায় ওর আনাগোনা বলেই উপযুক্ত প্রমাণ হাতে না পেলে গ্রেপ্তার করতে ইতস্ততঃ করছে ওরা। অবনীশের কথা শুনে শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে হিমালি, চিংকার করে বলে—এ সমস্ত কী বলছিস তুই? এমন একটা ভদ্রলোক।—আচারে আচরণে অত বার—

—সেইজন্মেই তো ছুটে বলতে এলাম রে! ভদ্র শুধু ওর বাইরের আবির্ভাবটা—ভেতরটা মোটেই নয়। সমস্তটাই ধোঁকা। সবটাই ভূয়ো। আর ভূয়ো বলেই নিজের চেকনাইয়ের দিকে ওর অত কড়া নজর। সত্যিকারের লোকটা একটা পেনিলেস্ বেগার। শুধু তাই নয় একটা পাকা ফোর টোয়েন্টি।

—তাহলে তো একুশি একটা কিছু করা উচিত আমাদের? একথা শুনে আর এক মুহূর্তও স্থির হয়ে থাকতে পারছি না আমি। ধাকা উচিতও নয়। কত বড় একটা বদমাইসের খপ্পরে পড়েছে ওরা সেটা ওদের জানানো উচিত। তা না হলে ওরা যে ধরনের অবাধ মলামেশাকে প্রদ্রব্য দিয়েছেন তাতে করে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। সময় থাকতে সাবধান হতে না পারলে রজন্যর সমস্ত জীবনটাই বানচাল হয়ে যেতে পারে হয়ত।

হিমালির মুখের কথাটা লুকে নিয়ে অবনীশ বলে—আমি তোকে সেই পরামর্শ দেবার জন্মেই তো এলাম। তুই আগে গিয়ে তাঁদের সমস্ত কথা জানা। তাঁরা যদি তোমার কথাও ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারেন—চাক্ষুস প্রমাণ চান—তাহলে আমি আর কমল বাবু যাব সেখানে। কমলাক বাবুর অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে—বুঝিয়ে বলে আসবো। কেমন?

এবার হিমালি সুবোধ বালকের মত ধাধা নীচু করে, শোনে অবনীশের পরামর্শ। কিছুক্ষণ আগেও যে অবনীশের এই অবাচিত হিতাকাঙ্ক্ষা বা হিমালি মনে এক তিক্ত বিরক্ত ভাবের সৃষ্টি করেছিল এখন সেই অবনীশের বজুঘাই হিমালির কাছে হস্তের এক অপার্থিব সম্পদ বলে বোধ হল।

কৃতজ্ঞচিত্তে বজুদের বিদায় দিয়ে কালের অধিবেশন শেষ করলো সে। তারপর একলাটি নিজের ঘরে বসে বসে আপনার বিচলিত অন্তরটাকে সন্ধ্যাবেলাকার ঠাকীর পটভূমিকার ওপর অংশগ্রহণের জন্ত গলিম দিতে লাগলো মনে মনে।

কিন্তু সে কী সহজসাধ্য কাজ? অনায়াস সাধ্যসাধনা? রজন্যর অল্প জনকে ভালবাসে অল্পকে পেয়ে সে সুখী হয়েছে, একথা বহু মর্শান্তিকই হোক হিমালির,—তবু তা সবে এসেছে। কিন্তু রজন্যর আজ বিপন্ন তার বাস্তব জীবনে আজ হিমালিকে তার একান্ত প্রয়োজন—এমন কী তার ভবিষ্যতের সমস্ত কিছু ভালোমন্দ আজ হিমালির হাতে—একথা ভাবতে আজও নিভৃত অন্তরে যে মাধুরী ছড়ায় সে যে আরও হৃঃসহ। সে চিন্তা যে আজও জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে বার সারাটা তনু-মনে।

তবুও ওই আলাধর্য চিন্তাটাকেই নেড়েচেড়ে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিলো হিমালি।

কলেজে পড়াতে যাওয়া পর্যন্ত হলো না। সত্যি কথা বলতে কী, পড়াতে যাবার কথাটা মনেই এলো না সারা দিনের মধ্যে।

বেন কলেজে যাওয়ার থেকে অনেক বড় একটা কর্তব্যের সন্ধান দিয়ে গেছে অবনীশ। আর সে নির্দেশ প্রতিপালনের জন্তে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছে হিমালি। পড়াতে যাওয়ার মত তুচ্ছ কাজের অবকাশ কোথা আজ?

মায়ের তাগিদে একবার উঠে দায়সারা মত হুঁটি খেয়ে এলো, তারপর থেকে ওর সমস্ত মধ্যাহ্ন-আকাশ জুড়ে কত যে টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে এলো জমা হলো আবার উড়ে গেলো তার ঠিকঠিকানা রাখার সাধ্য ছিল কোথা? কী সে? সে কী শুধু অলস দিবাসপ্র না অতীত স্মৃতির সবুজ রক্তিত ছায়াছবি?

রজন্যর মুখখানাই বা কত বার কত বিচিত্র ভঙ্গিমায় এসে দাঁড়ালো মুখে। কখনও বা সে মুখ ভ্রুকুটি-কুটিল। হিমালির পানে রোষান্বিত নয়নে তাকিয়ে বলছে—কে? কে তোমায় বলছে রজন্যের স্বভাবচরিত্র নিয়ে গৌরোন্মাদগিরি করতে? জানো না আমি ওকে ভালোবাসি।

কখনও বা সে মুখ রজন্যর স্বভাবশুলভ এসর আননে বলছে—সত্যি হিমালি আমার জন্তে এত ভাবো তুমি? উঃ কী আনন্দ যে হচ্ছে আমার।

আবার কখনও সে মুখ বেদনায় বিবর্ণ। ঠোট ছুটি কাঁপিয়ে অভিমানের সুরে বলছে—কী এমন অপরাধ আমি করেছি—বার জন্তে তুমি আমার জীবন থেকে সরে দাঁড়ালে?

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ডাক্তারজোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত **বাকলা** ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অল্পশূল, পিত্তশূল, অল্পপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, তেঁকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দারি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু ডিকিৎসা করে মারা হত্যাশ হয়েছেন, তাঁরাও স্বাস্থ্যকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরত। ৩২ ডোলাল প্রতি কোটা ৩ টাকা, একট্রে ৩ কোটা -- ৮।। আনাম। ডঃ, মাঃ ও পাইকারীদের পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-স্বর্নেশ্বর (পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

—না না রঞ্জনা, এ আমাদের বিচ্ছেদ নয়, এ শুধু সাময়িক ব্যবধান। আপনি মনেই রঞ্জনার শত প্রশ্নের উত্তর দেয় হিমালি। পরিশিষ্টে আবার সাঙ্ঘন্য দিয়ে বলে—ঐ শয়তানটার হাত থেকে তোমার আমি বাঁচাবই রঞ্জনা! তোমার জীবনের এতটুকু কতিও আমার সহিবে না।

হৃদয় গড়ালো। তবু লোকের বাজী বাবার মত একটা জঙ্গগোছের সময় ধাৰ্য্য করতে হিমালিকে অপেক্ষা করতে হলো। তিনটে থেকে উত্তোগ করে বহু কষ্টে পাঁচটা নাগাদ রওনা দিলো হিমালি।

সে কোথায় যাচ্ছে অথবা কী তার উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে বাজীতে অবশ্য কিছুই জানায়নি সে।

হেমন্তের ছোট বেলা। পাঁচটার পরেই চারিধারে মুঠা মুঠা কুয়াশা ছড়িয়ে দিলো বেন।

বাজীতে থাকতে যে বেলাটা পড়তেই চাইছিল না এখন সে অতি সহজেই একটা ধূসর রংয়ের উড়ানী ঢেকে ক্রতপায়ে চলে গেলো হিমালিকে পথ ছেড়ে দিয়ে।

মলিভিলার পৌঁছে নিজের গাড়ীটাকে গেটের বাইরে রাখলো হিমালি। কারণ, গেটের ভিতর গাড়ী-বারান্দার নীচেটার একটা সাদা রংয়ের সেভরলে গাড়ী আগে হতেই এসে দাঁড়িয়েছে। আর তার খোলা দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে তক্ষ্মাৰ্জীটা ড্রাইভার। অসুস্থমান করা কঠিন নয় যে গাড়ীটা মিশ্র সাহেবের।

বাজীর ভেতর পা দেবার পর মুহূর্তেই কানে এলো রঞ্জনা আর মিশ্র সাহেবের সম্মিলিত পদধ্বনি।

বেড়তে যাচ্ছে ওরা। চকিতে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়ালো হিমালি। ওদের এমন স্নানকর সাদ্য অভিধানের মধ্যে একান্ত অব্যাহিত ভয়ভূতের মত এসে দাঁড়াবার আর ইচ্ছা হোল না তার।

সিঁড়ির তলায় একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালেও ওদের দেখবার কোন অনুবিধাই হোল না ওর।

টুকটুক লাল একটা সাজী পরেছে রঞ্জনা আর সেই রংয়েরই একটা জামা দিয়েছে গায়ে। হিমালির মনে হয় ওর সারা শরীর দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে বেন। গাঢ় রংয়ের লিপটিক লাগানো ঠোঁটের কাঁকে মুক্তোঝরা দাঁতে অনর্গল হাসছে রঞ্জনা। সে হাসি হয়ত কিছুটা উগ্র কিন্তু তবুও অপরাধ।

মিশ্র সাহেবেরও ইভনিং স্যুটে কোথাও ক্রটি নেই, সে-কথা বলাই বাহ্যিক। তাঁরও সূঠাম চেহারা নরন ভরে দেখবার মত। সন্ধ্যার আবহাওয়াতেও হিমালি হুঁচোখ ভরে দেখলে ওদের সান্নিধ্যের নিবিড়তা, হুঁকান ভরে শুনে ওদের কলহান্তের ঐক্যতান।

একবার মনে হল এখান থেকেই কিরে যাবে হিমালি। কী হবে আর ওদের মিলনের অন্তরায় হয়ে? ওরা যদি বাস্তবিকই পরস্পরকে চেয়ে থাকে তবে হিমালি কেন তাতে বাধা সৃষ্টি করবে? কিন্তু কিরে যেতে পারলো না হিমালি। বরং ওরা বেরিয়ে যাওয়া মাজেই দৃঢ়পায়ে ভিতরে ঢুকলো সে। কর্তব্যবোধে সে তখন নিজের বস্তব্য পেশ করবার জন্তে কৃতসংকল্প।

পরমেশ বাবু আর তাঁর স্ত্রী মলিনা দেবী হুঁজনেই বসেছিলেন

বাইরের ঘরে। পরমেশ বাবু বসেছিলেন একটা সাময়িক পত্রিকা হাতে নিয়ে। ঠিক যে মনোযোগ সহকারে পড়ছিলেন তা-ও নয়, চোখ বুলিয়ে পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন শুধু।

আর মলিনা দেবী কী বেন একটা জামার বয়নশিল্পের কারিগরী করছিলেন একমনে। বোনার কাঁটা দু'টো পশমের খেই কাঁধে জড়িয়ে অবিরাম গুঠানামা করে চলেছিলো তাঁর দু'টো হাতের মধ্যে।

হিমালি ঘরে ঢুকতে ওর পদশব্দ পেয়ে হুঁজনেই ওঁরা চোখ তুলে তাকালেন। পরমেশ বাবু ভিজ্ঞাসা করলেন—এই যে হিমালি! তারপর? কী মনে করে?

কিছুদিন আগেও অবশ্য মলিভিলার আসতে হলে কিছু মনে করে আসবার দরকার হোত না হিমালির। বরং কোন কারণে না আসতে পারলে এদেরই মনে করাকরির ধূম পড়ে যেতো একেবারে।

তবুও আজ এ অপমানটুকু গায়ে মাখলো না হিমালি। সে যে আজ অনেক বড় কর্তব্য সম্পাদনের জন্তে এখানে এসেছে। যার ওপর রঞ্জনার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।—এত সামান্য কারণে বিচলিত হওয়া তো তার আজ সাজে না?

তাই প্রসন্নমুখেই জবাব দিলো হিমালি—আজ্ঞে না, এমনিই। ক'দিন আসতে পারিনি। শরীরটারও জুত ছিল না বিশেষ। কথার শেষে ওঁদের হুঁজনকার পায়ের ধুলো মাথায় নেয় হিমালি।

বিনিময়ে মলিনা দেবী ওর চিবুকস্পর্শ করে স্নেহাশীর্ষাদ জানান। পরমেশ বাবু স্মৃষ্ণের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলেন—বসো।

নির্দেশিত চেয়ারটার বসলো হিমালি। ইচ্ছা ছিল ভাসা-ভাসা হুঁ-চারটে কথা বলে নিয়ে তবে আলোচ্য প্রসঙ্গে যাবে সে। কিন্তু মানসিক উত্তেজনা অত ঐর্ষ্য আজ আর রাখতে দিলো না তাকে।

তার আর দোষ কী? আজ তার সারা অন্তর জুড়ে পূজার দালানের ঢাকের বাস্তির মত বাজছে ঐ এক চিন্তা—এক গুরু দায়িত্বের কথা। মস্তিকের অল্প সমস্ত চিন্তাতরঙ্গ দু'বে গেছে সে মহা কলবোলে।

তাই একটু খাপছাড়া সুরেই সে হঠাৎ সুর করলো—আপনাদের সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা ছিল আজ। সেইটা বলবার উদ্দেশ্যেই এলাম আমি।

মলিনা দেবী ওর কথায় বোনা ধামিয়ে প্রশ্নভরা চোখে তাকান ওর দিকে। পরমেশ বাবু বলেন—তা বেশ তো বলো না। কী বলবে?

ভূমিকা করেও প্রশ্নটা সুর করতে বেশ একটু বিধা আসে হিমালির। এ ধরণের পরচর্চার ঠিক অত্যন্ত নয় সে। কারো সম্বন্ধে এতটুকু বিকৃত মন্তব্য করতে তার ক্রটিতে বাধে চিরকাল। তবু আজ জোর করে সংকোচ কাটিয়ে সুর করলো সে।—

আজ সকালে অবনীশ এসেছিলো আমার বাজীতে। ও আমার অনেক দিনের বন্ধু।—কলেজ থেকে একসঙ্গে পড়েছি হুঁজনে। ওর কাছে শুনেলাম, সুরজন বাবু লোক একেবারেই ভালো নয়। অবনীশের সাথে তার পরিচিত কমলাক্ষ মিশ্র বলে এক জঙ্গলোকও এসেছিলেন। তাঁর সাথে সুরজন বাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ওঁরা তো বললেন—সুরজন বাবু আসল নাম সুরজন মিশ্রই নয়।—হীয়েলাল পাণ্ডে। বহু লোককে নাকি আজ অবধি প্রতারণা করেছেন উনি। ব্যবসা বা নিজস্ব সম্পত্তি বলতে নাকি কিছুই নেই।—সমস্ত শুধু চালবাজি।

একটু খেমে সে আবার বলে—হু'-চারজন অবাঙালী চোরাকারবারীর সাথে খুব যোগাযোগ আছে শুনলাম। মনে হয় শ্রাগলিং বা ঐ ধরনের একটা কিছুই করেন উনি। ওরা বলছিল পুলিশেরও নজর পড়েছে ওর কার্যকলাপে। উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই ওকে গ্রেপ্তার করবে ওরা। তাই বলছিলাম, এ ধরনের একটা লোককে—

কিন্তু আমি একটা কথা বলি কিছু মনে করো না, ওর চরিত্র সংশোধনের ভারটা হঠাৎ তোমার ওপর পড়লো কেন ?

—আজ্ঞে না, সংশোধনের জন্তে নয়—সে কথা আমি বলছি না। আমি বলছিলাম—

—থাক থাক, আর তোমায় বলতে হবে না কষ্ট করে। আমি তোমার কথার ভাব বুঝে নিয়েছি। সৃষ্টির সঙ্গে সামনাসামনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস না পেয়ে এবার ব্যাকরাইটিং পলিশী নিয়েছো, কেমন তাই না ?

হিমালয়ী খতমত খেয়ে যায় পরমেশ বাবুর কথার হাবভাবে। ক্রীণকণ্ঠে বলে—এ আপনি কী বলছেন ? আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আমি ওদের ডেকে প্রমাণ করে দিতে পারি।

—কিন্তু দরকার নেই। কারণ কোন কাজ হবে না তাতে। প্রানটা তোমাদের মোটাশুটি ভালই। তবে একটা কথা ভেবে দেখতে তোমাদের ভাল হয়েছে হে ! আমিও একজন রিটার্ডার্ড ম্যাজিস্ট্রেট। লোকচরিত্র সবকিছু আমারও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। মুখের ভাব দেখেই খানিকটা বুঝে নিতে পারি কার কথাটা সত্যি আর কারটা মিথ্যা।

—আপনি আমার এতখানি অবিশ্বাস করবেন, তা আমি কোন দিন ধারণাতেও আনতে পারিনি।

—আমিই কি ধারণা করেছিলাম কোন দিন, স্বার্থের প্রয়োজনে তুমি এতখানি নীচে নামতে পারো ?

এবার ওর কথার বাধা দেবার চেষ্টা করেন মলিনা দেবী।
—এ তুমি কা'কে কী বলছো আজ ? হিমালয়ীকে—

পরমেশ বাবু ধমকে ওঠেন—তুমি থামো। সব কথার মেয়েমানুষের কথা বলা আমি পছন্দ করি না।

তারপর হিমালয়ীর দিকে তাকিয়ে বলেন—যাই হোক, আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না তোমায়। তবে এ কথাটা তোমায় পরিষ্কার বলে দিচ্ছি যে সৃষ্টির চরিত্র সবকিছু তুমি আর তদন্ত করে বেড়িও না। সৃষ্টি যে বড়খয়ের ছেলে সে প্রমাণ আমি পেয়েছি। তাছাড়া সে বড় অভিমানী ছেলে, আমার

বাড়ীতে এ ধরনের আলোচনার আভাস পেলে হয়তো আমাদের তুলে ভুল বুঝতে পারে।

এর পর হতবুদ্ধি হিমালয়ীকে আর কোন কথা বলবার সুযোগই দিলেন না পরমেশ বাবু। একটু চুপ করে থেকে হিমালয়ী প্রকৃতিস্থ হবার আগেই বলেন—আচ্ছা আমি এখন একটু বেরবো মনে করছি। তুমি তাহলে—ওরে ভায়া, বাবুকে সিঁড়ির আলোটা জ্বলে দে।

এর পরেও পিতৃবন্ধুর সম্মান রক্ষা করে আপন ভয়ভা বজায় রেখে নীরবে মাথা নীচু করে মলিনা থেকে চলে এসেছিল হিমালয়ী। কিন্তু আর সে পথ মাড়ায় নি।

অত সহজে যারা মানুষের পুরোন বন্ধুত্বকে অস্বীকার করতে পারে তাদের সঙ্গে হিমালয়ীর কোন সম্পর্ক নেই—থাকতে পারে না।

বরং ভিতরে ভিতরে যারা অত ঐশ্বর্যের কাড়াল, সময় থাকতে তাদের সম্পর্কে ছেদ টানতে পেয়েছে বলে সে ভগবানকে প্রাণ্ডরে ধন্যবাদ দেয়।

• • • • •
মায়ের কিছু উৎকর্ষার শেষ নেই।

তবু তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা কিছুতেই বলতে পারে না হিমালয়ী। শুনলে মা মর্মান্তিক দুঃখ পাবেন। কী হবে তাঁকে অনর্থক দুঃখ দিয়ে ? কাজেই এক সময় মায়ের তাগাদায় বাধ্য হয়ে তাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়। বলতে হয় পরমেশ বাবুরা কলকাতার নেই। বাইরে গেছেন হাওয়া বদলাতে।

মা সুধাময়ী কিন্তু এ উত্তরেও সন্তুষ্ট হতে পারেন না কিছুতেই। বাইরে গেছেন ? বলিসু কী রে ? কবে ? একবার জানতেও পারলাম না ? এত আনাগোনা ? তা যাবার সময় একবার বলেও গেলো না আমার ? তা হ্যাঁ রে, আমার না হয় না বলুক, তোর কাছে চিঠিপত্র ঠিকমত আসে তো ? কী জানি বাবু তোদের আজকালকার রীতি-নীতি ধারা-ব্যবস্থা কিছুই মগজে ঢোকে না আমার।

আর কথা বাড়ায় না হিমালয়ী। চট করে সরে যায় মায়ের সামনে থেকে।

কে জানে, এর পর মা হয়ত নিজেই ওদের চিঠি লেখা মনস্থ করে ফেলে ওদের বর্তমান ঠিকানা চাইতে শুরু করবেন হিমালয়ীর কাছে।

কাজেই মাকে একটু এড়িয়ে না চলে হিমালয়ীর আর উপায় ছিল কী ? [ক্রমশঃ।

অব্যক্ত

দীপাঙ্ঘিতা ভট্টাচার্য

তুমি ভো বলনি কিছু বলবার কিছু ছিল না কি ?
তোমার সন্ধ্যার স্বপ্নে লীন, তবু বিবধ একাকী।
কত বার ভাবি, তবু ডাক দিয়ে যেতে পারি না কো
তোমার চোখের কোণে জ্বলে যদি একবার ডাকো।
তবুও সন্ধ্যার দীপ বধন তোমার চোখ আলো;
সবই কি হয়েছে বলা ? ভাবি এই আশ্চর্য সকালে



ছলল দেববর্মণ

সাধারণ শাদা শাড়ী। লাল পাড়। আঁট-সাঁট করে ফেরতা দিয়ে পরা। গায়ে হালকা চকোলেট রঙের ব্লাউস। কাঁধের দুই দিকে খুলে পড়েছে দু'গাছি বিহুণী। উপরের দিকে তুলে আঁতড়া করে বাঁধা।

এর আগেও শুকে দেখেছি। অনেক বার। রঙীন শাড়ীর আড়ালে ওর নিজস্ব উজ্জ্বলতাটুকু প্রায়ই থাকে ঢাকা। শাদা শাড়ীতে সেই উজ্জ্বল শ্রামলিমাটুকুই যেন ফুটে উঠেছে। বিনতি কসাঁ নয়। কালোও ঠিক না। উজ্জ্বল শ্রামাঙ্গী মেয়ে। কসাঁ ও কালো—হুইয়ের উদারতাটুকুই যেন রূপ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ওর সারা দেহে।

প্রথম থেকেই শুকে ছুটাছুটি করতে দেখছি। সারা মাঠ! স্বৈচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর অধিনায়িকা ও। কাঁধের একটু নীচেই একটা চক্রাকার বিজ্ঞাপন—একটা গাঢ় সবুজ রঙের ব্যাজ। যেমনি গড়ন, উচ্চতাসেও নেহাৎ কম যায় না। বিনতি ছাড়া আর কে-ই বা পাড়তে পারতো অধিনায়িকার পদে।

অস্থানটি চিত্তাকর্ষক। স্থানীয় বালিকা-সমিতির বার্ষিক ক্রীড়াস্থান। বাদ্যের জন্ত এই অস্থান তাদের বয়সীমা অবশ্য খুব বেশী নয়। আট থেকে পনেরো মাত্র। অষ্টমী থেকে পূর্ণিমা যেমন। কিন্তু বারা এটা পরিচালনা করছে, তাদের বয়স ঢের বেশী। বোলো থেকে হুত্রিশ বলা চলে। তার থেকেও কেউ-কেউ বেশী হয়তো। মাঠে এসে দেখা গেলো—প্রতিযোগীদের চাইতে পরিচালিকাদের সংখ্যাই বেশী। দর্শকদের সংখ্যা আবার তার চাইতেও। অবশ্য মহিলা দর্শকও এসেছেন কিছু-কিছু। এই ছোট্ট শহরে যে কতো লোক বাস করে এই মাঠে বসেই তার একটা আনন্দ করা যায়। অন্তত পুরুষগুলোর তো বটেই।

খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। বাচ্চা-মেয়েদের সূচ-সূতো দৌড়, চোখ বেঁধে দৌড়, অংক কবা দৌড় ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। এবার আরম্ভ হবে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মেয়েদের। ব্যালান দৌড়।

চারদিকে লোকারণ্য। তিন-চার সারি লোকের পিছনে পড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম—টুটল সংগে নেই! সে আবার গেলো কোথায়? এইতো কাছেরই দাঁড়িয়েছিলো হাত ধরে! জোর করে কোল থেকে নেমে পড়েছিলো একটু আগে। ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো নাকি? না পাড়ার বাচ্চাদের দলে মিশে—

কি রকম, কাকে খুঁজছেন?

তাকিয়ে দেখি—পাড়ার গণেশ মুখোয়্যে। প্রৌঢ় জয়লোক। বানপ্রস্থে বাবার বয়স। এই প্রথম দেখলাম খেলার মাঠে।

বললাম, টুটলকে খুঁজছি। কাছেরই দাঁড়িয়েছিলো, হঠাৎ—

তাহলে কাছাকাছিই কোথাও আছে, ব্যস্ত হবেন না! আশ্রয়, এখান থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে—

আমি কিন্তু বেশ দেখতে পেলাম না। এক—টুটলের জন্তে ভাবনা, তার উপর বা ভীড়ের বহর! মুখোয়্যে মশাই তো পায়ের আঙুলগুলোর উপর ভর দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে নিজের উচ্চতা বৃদ্ধি করেছেন। আমি দাঁড়িয়েছিলাম তাঁরই পিছনে। খাটো চুল, গোলগাল মাথাটুকুর পেছনটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

একবার জোর হাততালি পড়লো। শুনতে পেলাম। তারপরই একটা বাচ্চা ছেলের কারা! কে কাঁদছে—টুটলের গলা না?

ভীড় ঠেলে কাছে যেতে হলো। বা ভেবেছি! পড়ে গিয়ে খুঁতনিতে চোট লেগেছে! ঠোঁটের খানিকটাও কেটে গেছে বোধ হয়। রক্ত ঝরছে!

কিন্তু এর চেয়েও বেশী অবাক হতে হলো—

টুটলকে দেখে নয়, টুটলকে যে কোলে তুলে নিয়ে বসলো—তাকে দেখেই! সেই শাদা শাড়ী—লাল পাড়! হালকা চকোলেট রঙের—

বাক্য বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাই হলাম। ভীড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জনও শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। খান্কা দিয়ে ফেল দিয়ে আবার আদিখ্যেতা দেখানো হচ্ছে—

বাবা:, মেয়ে নয় তো—দৃষ্টি। উনি আবার এসেছেন ভলাটি টারারী করতে। হতো যদি আমার ছেলে, তাহলে এতরূপ—আর একজনের মন্তব্য: আহা, মেয়েটিরই বা কী দোষ। যে ভীড়, অতটুকু বাচ্চা ছেলেকে ছেড়েই বা দেওয়া কেন? লাইন টপকে মাঠের মধ্যে চলে গিয়েছিলো বোধ হয়—

মাথার মধ্যে অলো উঠলো। তাই বলে অতটুকু ছেলের দাঁত মুখ সব ভেঙে দিতে হবে?

টুটলের কারা প্রায় খেমে এসেছিলো। কাছে গিয়ে একখানা হাত চেপে ধরলাম ছেলেটার—

শুঁকে বললাম, থাক আর আদিখ্যেতার কাজ নেই। দুধের বাচ্চার দাঁত-মুখ ভেঙে দেবার সময় বার খেরাল থাকে না, তার আবার এতো কেন?

আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে শাদা শাড়ীটার অনেকখানিই লাল হয়ে উঠেছিলো। সেই রক্তাক্ত শাড়ীর মতোই আরম্ভ হয়ে উঠলো ওর মুখখানি।

ভীড়ের মধ্যে থেকে ছুঁড়ে দেওয়া মন্তব্যগুলোর দিকে এতরূপ সে ক্রমশই করে নি। কিন্তু আমার কথাগুলো কানে যেতেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো বিনতি। সেই মাঠের মধ্যেই টুটলকে পাড় করিয়ে রেখে সেখান থেকে চলে বাবার জন্তে পা বাড়ালো। আর একবার কিরেও তাকালো না পিছনের দিকে।

ওদিকে তখন বিজ্ঞানের সময়। টিকিন চলছে।

টুটলকে নিয়ে মাঠের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছি, পিছন থেকে ছুটে এলো দু'টি মেয়ে। স্বৈচ্ছাসেবিকা। কাঁধের একদিকে সেই সবুজ রঙের বিজ্ঞাপন। একজনের হাতে আয়োজনের শিপি। আর একজনের তুলো আর ব্যাগেজ।

একজন বললো, ক্যাম্প থেকে আসছি, বিহুদি পাঠিয়ে দিলেন।

একবার মনে করলাম, ওদের সাহায্য নেবো না। তারপর আবার টুটুলের ঠোঁঠের দিকে তাকালাম। মত বলতে হলো। আরো ডিন লাগিয়ে ব্যাগেজ করে দিল ওরাই। হাতগুলি নেহাৎ অগুটু নর দেখলাম।

ফাষ্ট-এইড ট্রেনিং নেওয়া আছে বিহুদির। আমরা তার কাছ থেকেই শিখে নিয়েছি।—জিজ্ঞাসিত হয়ে জানালো ওরা।

ভীড়ের মধ্যে ফিরে এলাম। টুটুলকে বললাম, খুব হয়েছে, চল এবার ফিরে যাই।

টুটুল রাজী হলো না—এখনো যে অনেক খেলা বাকী—! ঐ দেখো না, আবার বাজনা বাজছে!

সমিতিরই বাজনা, ব্যাগুপাটি'। একটা ড্রাম, দুটো সাইড ড্রাম, আর দু'-একটা আম্বুজিক। একজোড়া বিগলও আছে। বাজাতে বাজাতে মেয়ে ক'টা মাঠের চার পাশ দিয়ে ঘুরে গেলো।

ছেলেটাকে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে দিলো তাহলে?

চমকে উঠলাম—সেই গণেশ মুখুজ্যে! বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ফিরিয়ে দেবেন না কেন?

আম্বুসংবরণের ভাগ করলো মুখুজ্যে—এমনিতেই বললাম আর কি! যে ভাবে কোলে নিয়ে বসেছিলো, ভাবলাম বুঝি—

কী ভাবলেন?

বললাম তো, কিছুই না।—সত্যি সত্যিই এবার বাক-সংবরণ করলো মুখুজ্যে।

কিন্তু বাক-সংবরণ করলেও দৃষ্টি-সংবরণ করতে পারলো না। অর্ধপূর্ণ চোখ দুটির দিকে তাকালেই সে চৌর্ধ্ববৃত্তি ধরা যায়।

মুখুজ্যে মশাইয়ের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালাম। টুটুলকে নিয়েই।

কী মশাই, মেয়েটি কি আপনার চেনা?

এখানেও সেই প্রশ্নের ধাক্কা।

প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকালাম। শুধু সেই একখানি মুখই নয়, আশে-পাশে আরো অনেকগুলি—উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে দেখছে!

বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলাম, এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনাদের জানতে না চাওয়াই ভালো।

ও—তাই নাকি!

নেহাৎই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর একজন টিপনী ছুঁড়লো।

তৃতীয় মন্তব্যটি কানে আসবার আগেই আবার স্থান পরিবর্তন করলাম।

আবার বাঁশি বেজে উঠলো। বিশ্রাম সমাপ্ত। অমুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধ আরম্ভের সংকেত-ধ্বনি।

কে যেন একগোছা ফুল হাড়িরে দিলো মাঠের মধ্যে। হাউনির ভেতর থেকে আবার হাড়িরে পড়লো মেয়েরা। সারা মাঠ।

আবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই শাদা শাড়ী, লাল পাড়। সেই হালকা চকোলেট রঙের ব্লাউস। কাঁধের উপরে ঝুলে পড়া এক জোড়া আধ-ভাঙা বিহুগী।

টুটুলকে শুধালাম, ঐ মেয়েটিই তো তোকে ঠলে কেনে দিয়েছিলো, না রে? ঐ যে লাল পাড় শাদা শাড়ী—এই দিকেই

যা—ও আবার 'মেয়েটি' হতে বাবে কেন? টুটুল আমার ভুল সংশোধন করে দিলো—ও তো আমাদের বিহু দিদিমণি।

বিহু দিদিমণি!

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ও আবার তোদের দিদিমণি হলো কবে থেকে?

কেন, সবাই-ই তো ওকে দিদিমণি বলে ডাকে!

সবাই দিদিমণি বলে ডাকে বলে কি তুইও তাই বলেই ডাকবি?

কী বলে ডাকবো তবে?

সে-কথা ওকেই জিজ্ঞেস করিস।

আপাতত: এ প্রশ্নগ চাপা দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তোর ঠোঁটে কি খুব লেগেছে?

টুটুল উত্তর দিলো, না তো!

তবে কঁাদছিলি যে?

সলজ্জ হাসি হাসলো টুটুল। বললো, একটুখানি লেগেছিলো মোটে। দিদিমণি তো শুধু ঠলে দিয়েছিলো, ফেলে দিয়েছিলো ঐ পিছনের লোকগুলোই! বিহুদি তখন ছুটে এসে—



আবার ওকে বিহুদি বলছিল।—এবার একটু তিরস্কারই জানাতে হলো টুটুলকে।

টুটুল আবার শুধালো, কী বলে ডাকবো তবে ?

বলা বাহুল্য, এবারও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না।

উত্তর হয়তো একটা দিতে পারতাম। কিন্তু সে উত্তর আমার মনঃপুত নয়। টুটুলেরও হতো না।

সম্পর্কটা অবশ্য পাড়াভূতো। এক পাড়ারও ঠিক নয়। এক শহরের। তাও খুব বেশী দিন থেকে না। ওরা হচ্ছে নোয়াখালি জেলার। আমরা রাজশাহীর। দেশ-বিভাগের পর বাস্তবত্যাগের ফলস্বরূপ ভাসতে ভাসতে এসে এই শহরের চড়ার আটকে গিয়েছি আমরা। ওরাও তাই। ওরা মানে—ও, ওর মা, ওর একটি ছোট্টো বোন। বিনতির বোন মিনতি।

আমার পরিচয় অবশ্য অল্পরকম।

টুটুল আর টুটুলের মাকে নিয়েই একদিন পাড়ি জমিয়েছিলাম ভিটে-মাটি-দেশ ছেড়ে। নতুন করে আবার জোগাড়ও হলো ভিটের। কিন্তু টুটুলের মাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। আর একটি অচেনা অজানা দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়ে বসলো সে। টুটুল তখন একেবারেই বাচ্চা ছেলে। সবে মাটিতে পা দিতে শিখেছে।

নতুন বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে বললেন, ছেলের মা আর বাবা— দুই-ই হওয়া যায় না একসঙ্গে। অতএব, ওর জন্তে আর একটি মা নিয়ে আসুন।

প্রথমে রাজী হতে চাইনি। টুটুলকে কোলে নিয়েই ফুল থাকতে চেয়েছিলাম টুটুলের মাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখিল বাধলো ঐ টুটুলকে নিয়েই। ও মা চার। রাত-দিন কাঁদতে লাগল মা মা করে।

সুতরাং দুধের স্বাদ খোলে যেটানোর প্রভাবে রাজী হলাম। বাধ্য হয়েই।

বন্ধুরা সব্বদ নিয়ে এলেন। এই শহরেই একটি যোগ্য পাত্রী আছে। দেখতে শুভে মন্দ নয়। লেখাপড়াও জানে ভালোই। কেবল বয়সটা একটু বেশী, এই বা! তা আমার মতো দ্বিতীয় পক্ষের ঘরে—মানাবে ভালোই।

একদিন কনেও দেখে এলাম। বন্ধুরা মিথ্যে বলেননি। বিনতির পরনে সেদিন অবশ্য শাদা শাড়ী ছিলো না। তার পাড়িও ছিলো না লাগ রঙের। গায়েও ছিলো হয়তো অল্প কোনো রঙেরই ব্লাউস একটা। কিন্তু সেই সাজেও ওকে মানিয়েছিলো বেশ। আজও সে কথা মনে আছে।

বিনতির মা অনেক করে বলেছিলেন। হাতে ধরতে বাকী রেখেছিলেন কেবল। গরীব বিধবা মানুষ। মেয়ে ছটিকে নিয়ে বিপন্ন হয়ে আছেন। এখন আমি যদি দয়া করে বড়ো মেয়েটিকে—

দয়া করতে অবশ্য আমারও আপত্তি ছিলো না। থাকবার কারণও ছিলো না বিশেষ কিছু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপত্তি এসে গেলো। একেবারে অনতিক্রম্য আপত্তি। সেই বড়ো মেয়েটির ভয় থেকেই।

বিনতিই বঁকে ঠাঁড়ালো শেষটার। বললে, দোজবরে ছেলেকে ভয় বিয়ে করা যায়। কিন্তু ছেলের বাবাকে—কিছুতেই নয়।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। ক'নের জিন্দেজ জন্তেই সে বাচ্চা হাব খীকার করতে হলো বরকে। বরের বন্ধুদেরকেও।

সেই বিনতি।

বন্ধুরাও অবশ্য বেগে গিয়েছিলেন। ওর চেয়েও নাকি অনেক ভালো মেয়ে আছে! এই মাসের মধ্যেই আমার বিয়ে দিয়ে কেমনে পারবেন। সুতরাং ভয়টা কিসের ?

ভয় অবশ্য আমারও ছিলো না। তবু বিয়ে আর করতে চাইনি। কী দরকার অথবা ঝগড়াট করে? এ ক'বছর যদি ছেলেকে মানুষ করতে পারি, আরো ক'বছরও পারবো। মানুষ হয়ে উঠতে টুটুলের আর ক'বছরই বা।

সেই থেকে বিনতিদের সংগে আমার পরিচয়। তবে বিনতির নিজের সংগে ঐ পর্যন্তই। ওর ছোট্টো বোন মিনতির সংগেই বা দেখা-সাক্ষাৎ হয়। বেশ চঞ্চলা, তরলা মেয়েটি, দেখা হলেই 'বিভূতিদা' বলে ডাকে। কুশল জিজ্ঞাসা করে। আমাকেও জিজ্ঞাসা করতে হয় পাণ্টা প্রশ্ন। ওর মার খবর জিজ্ঞাসা করি। ওর দিদির খবরও। দিদির খবরটা বরং একটু বেশী করেই শোনায় ও। হয়তো ইচ্ছে করেই। দুই, মেয়ে।

মিনতি ডাকে 'বিভূতিদা' বলে। সুতরাং সম্পর্কটা সেই পাড়াভূতোই। অত্যন্ত শিথিল।

না, এই পাগলা ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা বাবে না। অল্পমনস্ক স্বযোগ নিয়ে আবার কখন সরে পড়েছে! আগের বার তো শুধু ঠোঁট আর খুঁতনির উপর দিয়েই গেছে। এবার যদি আবার—

কাঁকে খুঁজছেন 'বিভূতিদা' ?

হাসির ঝলকে চমকে উঠলাম। মিনতি! বললাম, টুটুলকে খুঁজছি। এই তো কাছেই ঠাঁড়িয়ে ছিলো এতক্ষণ। হঠাৎ পালিয়ে গেছে—

টুটুলকে যে এইমাত্র দেখে এলাম,—দিদির কাছেই রয়েছে। ক্যাম্পে বসে গল্প হচ্ছে। আপনি জানেন না ?

কী করে জানবো বলো? আমাকে তো আর জানিয়ে যায়নি কেউ ?

হাসির চেউয়ে চলকে উঠলো মিনতি—চলুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি—

কিন্তু ক্যাম্পের কাছাকাছি এসেই ছুটে পালিয়ে গেলো মিনতি। ওকে দেখতে পেলে ওর দিদি নাকি ভারী বকবে। হুটু, মেয়েটি!

টুটুলের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। প্রথম ডাকে কোনো সাড়া এলো না। দ্বিতীয় ডাকে উত্তর পেলাম—এই যে, আমি এখানে—আইস্ক্রীম খাচ্ছি!

আইস্ক্রীম খাচ্ছি! অতটুকু ছেলের এই অবাধ্যতার জন্তে রাগে সর্বশরীর ঝলে উঠলো। আমার কাছ থেকে পালিয়ে আসা হয়েছে এই ছাই-ভয় থেকে! মজাটা দেখাচ্ছি ঠাঁড়ো—

এই টুটুল, পাত্রী ছেলে কোথাকার—ঈশ্বরের বেরিয়ে আর বলছি! তা না হলে—

তা না হলে কী করবেন, দায়বেন নাকি ?

ধরতে ঠাঁড়ালাম। সরসে এসে ঠাঁড়িয়েছে বিনতি নিজে।

তার এক হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে টুটুল—সেই অবাধ্য ছেলেটা। পরম নিশ্চিন্তে আইসক্রিম গিলছে। বিনতির আর এক হাতে একটি কাগজের ঠোঙা। খুব সম্ভব মিষ্টি-খাণ্ডারে ভর্তি।

প্রথমটার একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে কথাকালের জন্মই। হঠাৎ উত্তাপ ফিরে এলো গলায়—

মেরে-ধরে খোঁড়া করে দিয়ে আবার আদর দেখানো হচ্ছে। নিজেই ছেলে হলে কেউ পারতো ও রকম করতে? পরের ছেলে তাই। কথায় বলে মার চেয়ে মাসীর দরদ, তাকেই বলে—

তাকে যে কী বলে সে কথা অবশ্য উচ্চারণ করিনি। করবার দরকারও ছিলো না আর। ঐটুকু আঘাতেই ও আহত হলো প্রচুর। আহত না হলে তখনই ঠেসে সরিয়ে দিতো না টুটুলকে। শুধু সরিয়ে দিয়েই কান্ড নয়, হন-হন করে তক্ষুণি চলে যাওয়া হলো সেখান থেকে! এমন কি টুটুলের মুখের খাবারটাও নিয়ে গেলো রাগ করে—ঠোঙাওকই।

মনে মনে একটু অনুশোচনাও হলো। কথাটা এমন কড়া করে না বললেও চলতো।

আর একদিনের অপমানের প্রতিশোধ আজ যে এই ভাবে নিতে হবে, তা ঘূণাক্ষরেও ভাবিনি আমি।

ছেলেটাও তেমনি। আবার সেই বায়নাছা। খেলা শেষ হয়ে গেলে নিজেই ওকে নিয়ে গেলাম একটা খাবারের দোকানে। কিন্তু—দোকানের খাবার খাবো না। কোথাকার খাবার খাবে তাহলে? মাসীমার দেওয়া আইসক্রিম—আর রসগোল্লা খাবো। শোনো কথা ছেলেব! আর বিনতিরই বা কি আক্কেল—দিদিমণি থেকে একবারে মাসীমা তাই বলে?

জিজ্ঞাসা করলাম, মাসীমা আবার কে রে?

খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো টুটুল। তার পর বললো, একথাও তুমি জানো না, বাবা? দিদিমণি যে বললেন—আমি তোমার মাসীমা হই?

কথাটা সত্যিই আমি জানতাম না। জানা আমার পক্ষে সম্ভবও ছিলো না হয়তো। স্বয়ং দেবতারাই নাকি বা জানতে পারেন না, আমি জানতে যাবো কোন্ সাহসে?

তবু কথাটা শুনতে ভালো লাগলো। দিদিমণি থেকে মাসীমা! এবার মাসীমা থেকে বদি—কিন্তু সে কি সত্যিই সম্ভব?

সম্ভাবনার কথাটা অবশ্য মনে মনেই কল্পনা করলাম। একবার নয়, অনেক বার।

ছেলেটাকে নিয়ে খুব খানিকটা বুঝলাম। বললাম, চল আরো একটু বেড়িয়ে আসি—বারি?

টুটুল তো বেড়ানোর নামে পাগল। সত্যি যাবে বেড়াতে? তাহলে নদীর ওপারে চলো। ত্রীজের উপর দিয়ে পার হবো। আমি কিন্তু হেঁটে হেঁটেই ত্রীজ পার হবো বলে রাখছি। ভারী মজা লাগে আমার ত্রীজের উপর দিয়ে হাঁটতে—

হুঁ, ছেলেটি কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই সব ভুলে গেলো। কিন্তু আমি ভুলতে পারলাম না। বিনতিকে এমন কড়া করে

বলা সত্যিই উচিত হয়নি আমার। ও হয়তো মনে মনে ভাবছে, লোকটা সত্যিই কী অসত্য! উপকারীর উপকারটুকুও স্বীকার করতে জানে না।

কিরতে একটু রাতই হয়ে গেলো। কিরেই দেখি—অবাক কাণ্ড! দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে একটি মেয়ে। উচ্ছল হাসি—নিশ্চয়ই সেই হুঁ, মেয়েটি!

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মিনতি যে, ব্যাপার কী? এই রাত্রে?

আমি ব্যাপারের কী জানি। দিদিকেই সব জিজ্ঞেস করুন না।

দিদি আবার কোথায়?

হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে মিনতি জানালো, বাড়ীর ভিতরে। অনেকক্ষণ থেকে আমরা বসে রয়েছি। যান—

গেলাম। ভিতরে গিয়ে দেখি, বিনতিই দাঁড়িয়ে আছে। হাতে সেই কাগজের ঠোঙাটি। তবে আরো একটু পুঁট হয়েছে সেটি। পরনে এখনো সেই শাদা শাড়ীই। লাল পাড়। গায়েরও সেই—

টুটুল সংগে সংগেই ছুট দিয়েছিলো। নতমুখী হয়ে টুটুলকে কোলে তুলে নিলো সে। তারপর বললো, শেষ পর্যন্ত তোর জন্মেই আমাকে হার স্বীকার করতে হলো হুঁ, ছেলে।

হুঁ, ছেলেটির মতোই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো টুটুল। হয়তো সমর্থন-স্বত্বক হাসিই।

বিনতিকেও হাসতে হলো। ওর শাড়ীতে এখনো সেই লাল রঙের ছোপ। টুটুলেরই কেটে যাওয়া ঠোঁটের রক্ত। শুধু সেই শাদা শাড়ীতেই নয়, ওর সারা মুখে-চোখেও যেন ছড়িয়ে পড়েছে সেই রক্ত-বস্ত্রী ছাপ। লাল লাল।

আর, সে ছাপ শুধু লজ্জা বা পরাজয়েরই নয়। দাবীরও।

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দুর্ভাবনা বোঝা বহনের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, ঙ্গীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বার্ষিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকার্যতায়, আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী' এই উপহারের জন্ম সূক্ষ্ম আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা যেনে খুশী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরণের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যে-কোন জ্ঞাতব্যের জন্ম লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।

নিবেদ

প্রতিমা দাশগুপ্ত

বৃদ্ধ কোবাধ্যক পুরক বর্ষণের শুক ওষ্ঠাধর গভীর আবেগে ধরধর করে কঁপে উঠলো। কল্পিত কুণ্ঠে উচ্চারণ করলেন :

মা, আমার সারা জীবনের সঞ্চয়—আমার পৃথিবীর, আমার সর্বস্বাধী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন প্রথম তুই—আর দ্বিতীয়—নিজের দক্ষিণ হস্ত সম্মুখের দিকে প্রসারিত করলেন তিনি। স্বল্পালোক-বিচ্ছুরিত ভূগর্ভ প্রোথিত প্রকোষ্ঠের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করে এলো তাঁর সে হাত। সে হস্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়াক্রমিক কক্ষের আকর্ষণীয় রত্নরাজি, মণি-মাণিক্যের রাশি—কাঞ্চন-বাট বক্র বিদ্যুতের উজ্জ্বলতা নিজেদের দেহে ধারণ করে তীব্র হেসে উঠলো। পুরক বর্ষণের কল্পিত কণ্ঠস্বরে মধ্য রজনীর নিস্তব্ধতা শতধা হোয়ে খণ্ডিত হলো সে অপরিমিত কক্ষটির চতুর্দিকে। বনান্তরালে পাণ্ডু চন্দ্রলেখা অন্ত গেল—মণিকুটিমের ভূমিস্থিত যুতপ্রদীপ অবসানের ঐচ্ছল্যে আলোকিত হোয়ে উঠলো।

বন্যহত বনস্পতির মতো আজ আমি নিরুপায়—নির্জিত। সারা জীবনের উন্নতময় এই সঞ্চয় ঐশ্বর্যকে আজ চোখের সম্মুখে কতকগুলি আতশীধরের মতো প্রতীয়মান হোচ্ছে—কঠিন হস্তে পুরক বর্ষণ মাণিক্যের স্তূপ হোতে একটি চন্দ্রোপল মণি তুলে নিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করলেন ভূমির উপর—সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, পিতৃহত্যার স্নেহ-অরণ্যের মধ্যে উৎসাহিত বটকতকর মতো অভিশপ্ত প্রতীয়মান হোচ্ছে আজ আমার কাছে এ সম্পদরাশির আর্জনা, যদি হু হাতে এগুলিকে পিষ্ট করে তোর বহির্ভূতী মনকে গৃহে বদ্ধ করে রাখতে পারতাম তা হোলে এই মুহূর্তে নির্ঝাঁপিত হোমঅগ্নির উদ্দেশ্যে মতো দূরে ফেলে দিতাম পঙ্করছেদিত আমার সারা জীবনের এই সঞ্চয়স্তুপ। আর প্রয়োজন নেই আমার এই বিদীর্ণ কঙ্কালের যেত অস্থিরাশির শূন্যতার মতো এই ধনরত্নের রাশি। যদি ইচ্ছা হয় তুই গ্রহণ কর এ ধন-সম্পদ—আমার অবশিষ্ট জীবনের ঐ হিক সুখ-সম্পদ কুশ-অগ্রের মতো এই মুহূর্তে ত্যাগ করলাম আমি—তুই তুই গৃহে থাক। দীর্ঘ অল্পনয়ে পুরক বর্ষণের বর্ষস্বর কল্পিততর হোলো—অস্থচ্ছ চোখের আবিলতার মধ্যে তাঁর দৃষ্টি সঞ্চালিত হোলো কক্ষের চতুর্দিকে। হুই হস্তে সজোরে নিজের চক্ষু দলিত করলেন তিনি। এতক্ষণ কোন শূন্যতাকে পিতৃহত্যার দৈন্ত জ্ঞাপন করছিলেন তিনি? তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টি আধ একবার প্রদক্ষিণ করে এলো নিঃসঙ্গ কক্ষের প্রতিটি কোণ। কক্ষের অল্পনত চারটি প্রাচীর বিক্রমভরা চাহনি নিয়ে কঠিন হাসি হেসে উঠলো।

বিদ্বিসার তাঁর রাজত্বকালে তাঁর আবাধ্য সহচর ও সুরভূত পুরক বর্ষণকে নিয়োজিত করেছিলেন কোবাধ্যকের পদে। একান্তে তাঁকে আহ্বান করে বলেছিলেন—পুরক, কোবাধ্যকের পদে তোমাকে অধিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নিতান্তই গৌণ—নিরত তোমার সাহচর্য লাভটাই যে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য তা বুঝতে আশা করি তোমার ক্লেণ হয়নি। তারপর মুহূ হেসে বলেছিলেন, তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ ও পক্ষপাতিত্বের তথ্য আমার অমাত্যবর্গেরা আর সকলেই অবগত আছেন, তাই রাজসভার বড়চক্র ও তাঁদের যৌবরহি থেকে তোমাকে নিরাপদ ব্যবধানে রাখাটাই আমার অন্ততম উদ্দেশ্য। কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে পুরক বর্ষণের বর্ষ

সেদিন রুদ্ধ হোয়ে গিয়েছিল। সজল আঁখিপল্লবের সিক্ত ছায়ায় প্রতিবিম্বিত হোয়ে উঠেছিল তাঁর অন্তরের আনন্দ।

কৈশোর-অতিক্রান্ত সত্তর্ষীবনে উপনীত পুরক বর্ষণের তখন অতি দুর্বলতা। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় এতদিন পিতৃব্যগৃহেই প্রতিপালিত হোয়ে আসছিলেন তিনি। পিতৃব্য তাঁর পিতৃকল্পই ছিলেন। এখনও প্রায়ই তাঁর ছবিটি স্মরণপথে ভেসে আসে। ঐ বৃহৎ মাহুবাটির বৃহৎ দেহপ্রাচীরের অন্তরালে ভাগ্যহত বালকটির জন্ম করণা আর স্নেহবাশি হিমালয়-শিখর হোতে নেমে আসা শত-সহস্র গজাজী শ্রোতধারার মতো ব্যাপ্ত হোয়েছিল। ভাগ্যহত ভিন্ন তখন আর কি ছিলেন পুরক বর্ষণ? অতি সাধারণ একজন গ্রামিক ছিলেন তাঁর পিতা। নিজের অবস্থায় অতি পরিতুষ্ট ও সন্তুষ্ট এমন মানুষ সচরাচর চোখে পড়তো না। কোন উচ্চ অভিলাষ ছিলো না তাঁর জীবনে। মাথার উপর বংশপত্রে আচ্ছাদিত একখানি পর্ণকুটির, এক হালী শামাক ধানের জন্ম আর কিঞ্চিৎ মুলা-শূপ ছাড়া আর কোন কামনা ছিলো না তাঁর। নিজস্ব ক্ষুদ্র পৃথিবীর গণ্ডির ভিতর নিজের স্ত্রী-পুত্রকেও তাঁর স্বচ্ছন্দ জীবনগতির বাধা বলে মনে হোতো মাঝে মাঝে। আহার ও নিদ্রা ব্যতীত অবশিষ্ট সময় মুক্তিত নয়নে মলিন শয্যার উপরে অর্ধশায়িত কিম্বা গৃহসংলগ্ন চত্বালের উপর উপবেশন করে ভাবলেশহীন হুই চোখের দৃষ্টি স্তম্ভে প্রবেশ করে কোন পরমার্থচিন্তার তিনি মগ্ন থাকতেন, বালক পুরকের কাছে তখন তা অপার রহস্তের মতোই মনে হোতো।

সে নৈঃশব্দ ভাষাহীন দৃষ্টির দুর্ভেদ্য পরিধায় পিতাপুত্রের মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হোয়ে উঠেছিল তার বাধা ঠেলে বালক পুরক কোন দিন এক পদও অগ্রসর হোতে পারেনি পিতার সান্নিধ্যে। তাঁর জননীও কোনদিন পারেননি তাঁর এই নির্লিপ্ততা দূর্গীভূত করতে। বৃদ্ধ বয়সেও মায়ের শীর্ণ করণ মুখচ্ছবি ভাসমান হোয়ে ওঠে অন্তরের মধ্যে। দারিদ্র্যতৃষ্ণাক্রিষ্টা তাঁর জননী—জীবধাত্রী ধরণীর মতো—মাতৃধৈর্যের মতোই মৌন ছিলো তাঁর অন্তরের শত-সহস্র ব্যর্থতার অল্পবোগ। এখনও মনে আছে, জীর্ণ পেটিকা খুলে মা বের করে দি়েছিলেন তাঁর অবশিষ্ট আভরণ যুগ্ম কেশুর গ্রামের বৃদ্ধ কৃষকের হাতে। কৃষকের কৃষ্ণ-কর্কশ হাতের মধ্যে—বালক পুরকের চোখের সম্মুখে বিদ্যুৎ-সর্পের মতোই বলসিত হোয়ে উঠেছিল জননীর সেই লঘু বর্ষ-আভরণ। তারই বিক্রমলক কার্ষাপণে পুরক প্রবেশ করতে সক্ষম হোয়েছিলেন তাঁর বিজা লাভের প্রথম আরোহণীতে। তারই কিছুকাল পরে গভীর এক মেঘ সংঘর্ষের নিশা অন্তে পিতৃহীন হোলেন পুরক—এক পক্ষও অতীত হোলোনা জননীও তাঁর অল্পগামিনী হোলেন।

অসহায় পুরকের চোখের সম্মুখে নির্দয় পৃথিবী তার তরঙ্গায়িত বারিধিরাশি নিয়ে মুখ ব্যাদান করে এগিয়ে এলো। নিজস্ব বলতে রইলো আবাসগৃহের কয়েকটি স্তূপা ও মাথার উপর একখানি পর্ণ-আচ্ছাদন। সেই সঙ্কটময় মুহূর্তটিতে তাঁর সম্মুখে দেবতার রূপ ধরে দেখা দিলেন পিতৃব্য পদ্মোদ্ভব। জননীর কাছে পিতৃব্যের নাম শুনেছিলেন পুরক কিন্তু পিতামাতা বর্তমানে কোনদিন তাঁর সাক্ষাৎ সৌভাগ্য লাভ হয়নি পুরকের। সে দিন তাঁর পতঙ্গোমুখ গৃহে দিব্যকার্ষ



আদর্শ মাধুর্য



গিনি হাল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

এম.বি. সরকার
এও সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন:- ৩৪-১৭৬১ ১৩৭/সি. ১৩৭ সি/২ চন্দ্রভাগের স্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-গুলিয়াকৈর
৩৯-৩৯/সি. ২০০/২/সি. মাসবিহারী এডভিউ কলিকাতা-১২ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
শোভামের পুরাতন টিলাবা ৩২৪, ৩২৪/২, বঙ্গভাগের স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮-এ

B.B.

পিতৃব্য পদ্মোত্তর নিজের পরিচয় দিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র অন্তর্নিহিত অশ্রুসাগর উচ্ছল হোয়ে উঠেছিল পুরুকের। এক বকম ক্রোড়ে করেই পদ্মোত্তর নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে নিজ গৃহে। নিরুৎসুক পিতার স্নেহের অভাব পূর্ণ করলেন পিতৃকর পিতৃব্য। বর্ধিত হোতে লাগলেন পুরুক তাঁর গৃহে। বিধিসায়ে পিতার অল্পতম প্রধান অমাত্য ছিলেন পদ্মোত্তর, তাই তাঁর গৃহে আর বাই থাক, স্বচ্ছলতার অভাব ছিলো না। পুরুক বর্ধনের সুশিকার সর্ব প্রকার ব্যবস্থাই করে দিলেন তিনি। একমাত্র তাঁরই সহায়তার পুরুক উন্নীত হোতে পেরেছিলেন শ্রেষ্ঠতম বিভাগে ও রাজপুত্র বিধিসায়ে সতীর্থ জনিত সৌভাগ্য লাভে। আশু মহাসকট হোতে পরিজ্ঞান পেলেন পুরুক কিন্তু ছুঁতগা—তাঁর পিতৃব্যপত্নীর প্রসন্নতা লাভ করতে সক্ষম হোলেন না কোন দিন। তাঁর স্বদয়ে স্নেহের ফুল কোটাতে কোন দিন পারলেন না পুরুক। উপরন্তু তাঁর মনের অন্তরালে পুরুকের প্রতি যে তিস্ত বুদ্ধের মূল প্রতিদিন প্রসারিত হোচ্ছিল প্রাথমিকই সেটা সবলে উৎপাটন করে তার বিবর্তিত বসে আগ্রুত করে দিতেন নিরপরাধ পুরুকে।

এক পিতৃব্য ছাড়া তাঁর পুত্র-কন্যাদের কাছে এমন কি তাঁর গৃহ-পরিজনদের নিকটেও তিনি অবাঞ্ছিত অতিথির সমাদর লাভ করতেন। সকলের কাছেই সমভাবে অপরাধী ছিলেন তিনি। স্থানীয় অন্ন পিতৃব্য-পত্নীর প্রার্থনাক্যে বহুই গলদেশে কঠিন শিলার মতো প্রতীকমান হোতো ততই তিনি অধিকতর আগ্রহে আকৃষ্ট হোতেন তাঁর অধ্যয়নে। শুদূর ভবিষ্যতের দিকে আশাপূর্ণ চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে দিতেন কোন দিন যদি দৈব প্রসন্ন হন, কোন দিন যদি এ ক্লাস্ত ধৈর্যের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়। দৈব একদিন প্রসন্ন হোলেন, বখন তরুণ বিধিসার পিতার অকালমৃত্যুর পর রাজপটে আরুঢ় হোলেন। বিভাগয়ের পাঠ সমাপ্ত হবার তাঁর আর প্রায় বর্ষকাল বাকি ছিল। কিন্তু কোন সাহসজরে প্রত্যাখ্যান করবেন, তখন তাঁর এই স্তম্ভাধিক? পিতৃব্য-পত্নীর সুখের গঞ্জায় অন্নের গ্রাস তখন অক্ষয়লগ্ন হোয়ে উঠেছে।

পুরুক অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। পিতৃব্যের গৃহ চিরদিনের মতো ত্যাগ করে আসবার কালে পিতৃব্য-পত্নীর পাদমূলে প্রণাম করে বলেছিলেন, মা, তোমার তুলসের প্রতিটি কণা আমার প্রতিটি শোণিতবিন্দু মধ্য কৃতজ্ঞতার ঋণে জর্জরিত হোয়ে রইলো, যদি কোন দিন সময় আনে—তাঁর বাক্য সমাপ্ত হওয়ার সুযোগ পাবনি। প্রত্যুত্তরে পিতৃব্যপত্নী তাঁর দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, সে চাহনির স্মৃতি এই প্রবীণ বয়সেও মধ্য মধ্য ছুঃস্বপ্নের মতো অন্তর্ভুক্ত করছে ঠাড়াই। পিতৃব্যের কাছে বিদায় গ্রহণ কালে তিনি শুধু বলেছিলেন, কত রেশ পেয়ে গেলে আমার গৃহে। কত আশা করে কত আগ্রহ জবে তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম—পদ্ম হিম-বিন্দুটিকে যেমন সবলে নিজের পত্রের অভ্যন্তরে আবৃত করে রাখে তেমনিই আমি চেয়েছিলাম সকলের নির্দয় আঘাত থেকে রক্ষা করতে কিন্তু পারিনি। আমার প্রতি তুমি কোন অভিমান রেখো না পুরুক। নতজান্ন হোয়ে পদ্মোত্তরের পদপ্রান্তে উপবেশন করেছিলেন পুরুক—তাত। আপনার কৃপা ব্যতীত সে হতভাগ্য বালকের দৃষ্ট ললাট নিরুপণ কোন উৎসর্গ মুখে পরিচালিত করতো তাকে সেদিন? বহু বাক্যে কহু কঠ আর কোন ভাষা খুঁজে

পারনি। সে সুদীর্ঘ কাল হোতে আজ নিশীথের শেষ প্রহরটি পর্যন্ত রাণা বিধিসার প্রদত্ত সে সৌভাগ্যের গুরুভার প্রাণপণে বহন করে চলেছেন পুরুক বর্ধণ। রজনী প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথর ভাঙরের কমাহীন দীপ্তি, কোন অজানিত কৃষ্ণ শৈল-গুহায়ুগের অন্ধকারের মধ্যে তাঁর অবশিষ্ট জীবনের পথ নিঃস্বপ্ন করবে পৃথিবী শুধু আসনে বসে নিখাস সংবরণ করে তারই আশঙ্কায় প্রহর গণনা করছে। অস্তাচল-দ্বিবাঙ্গুতি এখনও নিদ্রাগত—রাত্রির অবশিষ্ট বাম সে ক্লাস্ত গণনার মধ্যবাহে—সম্পূর্ণ তরু তার পত্রাঙ্কদের কঁাকে কঁাকে পাঠ করে নিল পুরুক বর্ধনের জীবনের আর কয়েকটি পরিচ্ছেদ।

কোবাধ্যকের পদে স্থিতিশীল হোয়ে বসবার বৎসর খানেক পরেই নানা স্থান হোতে পুরুক বর্ধনের বিবাহের প্রস্তাব আসতে থাকে। কত অনুচা কুমারীর পিতা, আত্মীয়-পরিজন হতমনোরথ হোয়ে কিরে যেতে লাগলো পুরুক বর্ধনের গৃহ হোতে, দিনের পর দিন কত ঘটক শ্রাক্ষণকে একবাক্যে ম্লান মুখে কিরে যেতে হোলো, কত সুরূপা কস্তার চিত্রপট তাঁর গৃহে সঞ্চিত হোতে লাগলো, কেউই তারা পুরুকের সুমুগ্ধ বৌবননদীকে জাগ্রত করতে পারলো না। বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীর বুকে পুরুকের ধারণার অসীম বিস্ময়কর একটি ঘটনার অবতারণা হোলো তাঁর নিজের গৃহে। এক দ্বিপ্রহরে তাঁর গৃহদ্বারে একখানি পল্যাফিকা এসে থামলো। গবাঙ্কপথে সেই দিকে দৃষ্টি চালিত করে বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হোয়ে গেলেন পুরুক বর্ধণ। চারজন দাসীর হস্তধৃত বস্ত্রাভ্যন্তরের নিম্নে দেখা যাচ্ছে কোন মহিলার পদপ্রান্তদেশ এবং সে গতিশীল পদযুগল তাঁর কক্ষ নির্দেশ করেই অগ্রসর হোচ্ছে। সুহৃৎ পর তৃত্য সংবাদ বহন করে নিয়ে এলো একটি মহিলা তাঁর দর্শনপ্রার্থী।

ব্যস্ত হোয়ে পুরুক বর্ধণ বললেন, তাঁকে শীঘ্র জ্ঞাপন কর—আমার গৃহে কোন পুরুকামিনী বাস করেন না।

তাঁর কথা সমাপ্ত না হোতেই দর্শনপ্রার্থী মহিলাটি সশরীরে তাঁর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই বৎস। পুরুকের গৃহে মাতার দ্বার চিরদিন অব্যাহিত। পুরুকের বিস্ময়াহত চোখের সম্মুখে পিতৃব্যপত্নী তাঁর চিরদিনের কঠোর মুখকোষ উন্মুক্ত করে সম্মুখে দৃষ্টিগম্পাত করলেন। চেতনা কিরে পেয়ে শব্দবস্ত হোয়ে উঠলেন পুরুক। নিজহাতে গৃহতলে বিছালেন তাঁর উপবেশনের আসন।

পিতৃব্যপত্নী বললেন না—বললেন, চলে আসবার সময় তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে একদিন তোমার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করবে, আজ তো সে ছুদিন এসেছে, তোমার বাক্য রক্ষা কর পুরুক। অজানা আশঙ্কায় পুরুকের ললাটদেশে খেববিন্দু দেখা দিল। এতদিন পর আবার নুতন কোন অভিযোগ বহন করে নিরে এলেন পিতৃব্যপত্নী? মৌন পুরুককে লক্ষ্য করে পুনর্বার পিতৃব্যপত্নী বললেন, মাতা আজ বাচ,এল নিয়ে পুরুকের দ্বারদ্বা, তাকে কি বিকল-মনোরথ হোয়ে কিরে যেতে হবে?

এতক্ষণ পর পুরুকের কঠে ভাষা এলো, মা, আমার দৈব তোমার রাষ্ট্রবর্ষ্যে উদ্বাঙ করে চেলে দিলেও সে কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনও পরিশোধ হবে না। সে স্পর্ধা আমি রাখি না। আমার

শক্তির গতিতে আবহ এমন কোন আদেশ যদি আমার উপর থাকে, প্রাণ গেলে তা রক্ষা করবার চেষ্টা করবো।

পিতৃব্যপত্নীর দুই চোখে মৃহুর্ন্তের অস্ত্র দাবিনী ক্রীড়া করে গেল পুত্রকের কথা শুনে—কিন্তু শান্ত কণ্ঠে প্রকাশ করলেন তাঁর বক্তব্য। কোনরূপ আর্থিক সাহায্য লোভের বশবর্তিনী হোয়ে তিনি আসেননি। তাঁর ধনী ভ্রাতার প্রার্থনা কন্ঠাটিকে পুত্রকে গ্রহণ করতে হবে এই তাঁর অমুযোগ। বহুকণ শুক হোয়ে রইলেন পুত্রক। স্বপ্নের বেলাভূমিতে সফেন তরঙ্গরাশি বার বার উচ্ছলিত হোতে লাগলো। আবার স্ব-ইচ্ছায় সে উদ্বলন দণ্ডে মস্তক রক্ষা করবেন! এত নির্কোষ তিনি? পুনরপি পিতৃব্যপত্নী বললেন, তোমার দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোন হেতু নেই পুত্রক! চন্দ্রিকা আমার ভ্রাতৃপুত্রী, সর্বাংশেই তোমার উপযুক্ত হবে। যদি ইচ্ছা কর স্বচক্ষে একবার তাকে দেখে আসতে পারো। বংশায়ুচরিতে সৌন্দর্য্যে ও পিতৃবৈভবে কোন দিক দিয়েই সে তোমার চেয়ে লঘিষ্ঠা নয়। প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জে শেষের কথাগুলি তাঁর ঈর্ষ বক্র হোয়ে উঠলো।

পুত্রকের অস্ত্রস্তল কথা করে উঠলো—এই তো তোমার সময় পুত্রক। তোমার মার্জ্জনার প্রতিবিশ্বের উচ্ছলতার মধ্যে দর্শন করতে দাঁও পিতৃব্যপত্নীর লজ্জাহত অপরাধ-মলিন মুখচ্ছবি। অশান্ত হৃদয়বেগ সংঘত করে কিছুদিন সময় চেয়েছিলেন তিনি। একটি বিনিস্ত বজ্রনী অতিবাহিত হোয়েছিল এই চিন্তায়। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে, স্মৃতির পটভূমিকায় ফুটে উঠেছিল বিগত দিনের কত আলোধ্য ছবি। পরাশ্রয়ী, পরাশ্রয়ী আখ্যা দিয়ে কত দুখের গজনার জর্জরিত করেছেন তাকে পিতৃব্যপত্নী। আজ এই তো প্রকৃষ্ট সময়—তাঁর ক্ষমার উদারতার মধ্যে আজ পিতৃব্যপত্নী দর্শন করুন তাঁর নিজের হৃদয়ের দৈন্দ্র। তারপর বিবাহিত জীবনের সুখ-শান্তি, সেটা অদৃষ্টের ব্যাপার—সে অদৃষ্ট-ক্রীড়ার বিজয়ী বা পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা সমভাবে বর্তমান। তার উপর নির্ভর করতেই হবে।

চন্দ্রিকা—পিতৃব্যপত্নীর ভ্রাতৃপুত্রী তাঁর গৃহে এলো চন্দনচর্চিত ডালে আর রক্ত পট্টাধরে সজ্জিত হোয়ে—সীমন্ত-সীমার মঙ্গল সিন্দূর-বিন্দুর আলিঙ্গন ধারণ করে। কিন্তু পুত্রকের ললাটকলকে বিধাতা পুত্রকের ভবিষ্যৎ লেখন বাল্যকালেই সমাপ্ত হোয়েছিল। দেহের অপরূপ বর্ণনুসমার অমুরূপ প্রতিচ্ছবি চন্দ্রিকার অস্ত্রস্তলে কোনদিন বিকশিত হোতে পারেনি। নীলোৎপলের মতো গাঢ় রঙ্গে আবৃত সে হৃদয় কোনদিন প্রথম-রক্তরাগে রক্তিম হোয়ে উঠলো না। স্বামীর বাল্যের পরকৃত জীবন সে কোনদিন বিস্মৃত হোতে পারলো না। আশ্রয় চেষ্টা করেছিল পুত্রক তার প্রসন্নতা লাভ করতে। কিন্তু তুলতে পারেনি চন্দ্রিকা তার ঐর্ষ্যময় পিতৃগৃহ। পুত্রকের অবস্থাও তখন হীন ছিলো না। তিন বর্ষকাল অবধি কোবাধ্যকের কর্ম সূত্রভাবে পরিচালনা করে নিজের অবস্থার বখেই উন্নতি সাধন করেছিলেন তিনি। চন্দ্রিকার আগমনের প্রাক্কালে ঘোপাচ্ছিত অর্ধের বহুলাংশ ব্যয় করে গৃহসজ্জার আর পরিজন পূর্ণ করে দিয়েছিলেন তাঁর নিজের আবাসগৃহ। চন্দ্রিকার স্বাচ্ছন্দ্যে ও বিলাসে কোথাও বেন ক্রটি না থাকে—পিতৃব্যপত্নীর মুখ পুনর্বার বেন অবজার বক্র না হোয়ে ওঠে। পিচ্ছিল সরণির প্রথম সোপানে সেই সময়ই সর্বপ্রথম পদক্ষেপ করলেন পুত্রক। বহু বর্ষ পূর্বে পুত্রকের

বিবাহ-রজনীর পূর্বে সজ্জার আজকের মতো এমনিই তিনি ঠাড়িয়ে ছিলেন বিবিসারের কোবাগারে। প্রতিপদের চন্দ্রমা সীর্ণ হোতে সীর্ণতরা হোয়ে বিলুপ্ত হোলেন আকাশপ্রান্তে। পুত্রকের হস্ত-রক্ষিত স্তিমিত প্রদীপশিখা সঘন কল্পিত হোয়ে উঠলো। উত্তপ্ত দক্ষিণ হস্ত অর্ধ পথে স্তব্ধ হোয়ে গেল। একি করতে যাচ্ছেন তিনি? কার উপরে চেলে দিতে যাচ্ছেন কুন্তরতার হিংস্র হলহল? পথ-প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করে এনে যে তাকে উপবেশন করালো সৌভাগ্যের সিংহাসনে তাকেই আজ নির্ভর দংশনে কত করে দিতে উত্তত হোয়েছেন?

পরমুহূর্তে সে অস্ত্র স্তিমিত দুর্বল বাণীর কণ্ঠ বক্র হোয়ে গেল কোন কঠিন কৃকর্ণ যুগল পক্ষব হস্তের পীড়নে। মহার্ঘ্য তার উৎকিণ্ড তরঙ্গরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করে তার কত বৈভব সৈকত-পুলিনে—তাতে সে নিঃস্ব হয় না। আজ রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসন পাঠাতে হবে ভাবী পত্নীর পিতৃগৃহে—কোন প্রকারেই বেন তিনি তাঁদের চোখে হেয় প্রতীকমান না হন। দ্বিতীয় বার তিনি চিন্তা করবার অবসর পেলেন না। লৌহ-কলকের মতো কঠিন হোয়ে উঠলো তাঁর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি। সম্মুখের অলঙ্কারের স্তূপ হোতে উঠিয়ে নিয়ে এলেন বহুমূল্য একখানি রক্ত-ললাটিকা। তারপর হোতেই আরম্ভ হোলো পুত্রকের কক্ষণা উদ্ভকময়ী প্রয়াস। ধরিজী দোহন করে তার সম্পদরাশি চন্দ্রিকার পায়ের কাছে উজাড় করে চেলে দিতে চেয়েছিলেন পুত্রক কিন্তু সে সম্পদ মস্তকে ধারণ করবার মতো ভাগ্য চন্দ্রিকার হয়নি। ঐর্ষ্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান ছিলো সে। কারণে অকারণে সেই কথাটিই তার বিশেষ করে মনে পড়তো আর স্বামিগৃহের সঙ্গে পিতৃগৃহের তুলনা করে পুত্রকের প্রতি সারা অস্ত্র ভরে তার ধুমায়িত হোয়ে উঠতো বিদ্রোহ-বহ্নি। সমস্ত দেহমন দিয়ে পুত্রক অমুভব করতো সে বহ্নির তাপ আর অধিকতর আগ্রহে সচেঁটে হোতো সে বহ্নি নির্বাপিত করতে। এই রকমই ঘটে থাকে মানুষের জীবনে। নিজের বিবেককে যদি কোন রকমে একবার প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারে দুর্বল বুদ্ধির ভঙ্গুর আঁচীরের অভ্যন্তরে, তার পরেই ছিন্ন হোয়ে যায় সঙ্কোচের প্রাথমিক আবরণ। প্রথম অপরাধ প্ররোচিত করে দ্বিতীয় অপরাধ প্রবর্তনার। প্রায়ই স্থানান্তরিত হোতে লাগলো নানাবিধ ভ্রূষণ আভরণ বিবিসারের কোবাগার হোতে পুত্রকের গৃহে—কিন্তু বজ্রমণিব মতোই স্ককঠিন



ক্যালকট্টা অর্পাটিক্যাল কোং প্রাইভেট) লিঃ
ফোন-৩৫-১১২৭, প্রত্নপ্রস: ড: কার্তিক মদু কমা স্ম-বি।
গ্রন্থ-কালসংগ্ৰহ: ৪৫ নং প্রত্নপ্রস: ড: কার্তিক মদু কমা স্ম-বি।

হোলে বইল চন্দ্রিকার কঠ—সে কঠ কোনদিন গীতিময়ী হোলে উঠলো না। হতাশ হোলে ক্ষুণ্ণ কঠে অল্পবয়সে জানিয়েছিলেন পুত্রক—আমি তো বিবাহের পূর্বে কিছু গোপন করিনি চন্দ্রিকা। আমার সবচেয়ে পিতৃব্যপন্থীর কিছুই অজানা ছিলো না। বক্র হস্তে উত্তর দিয়েছিল চন্দ্রিকা—সমস্ত জেনেও তাঁর গণনার কিছু জ্ঞান ছিলো। অসম্ভবত মর্যাদার কথাটা তিনি ধার্য করেন নি সে গণনার মধ্যে। আজ তোমার সমস্ত সর্বস্ব দিয়েও পারবে না সে শূন্যতার স্থান পূর্ণ করতে। জ্যোতিরিন্দ্রমের লঘু পক্ষ আকাশের চন্দ্রকে স্পর্শ করে আসবার ক্ষমতা ধারণ করে না।

মুক হোলে গিয়েছিল পুত্রকর সমস্ত অভিযোগ চন্দ্রিকার এই স্পষ্টিক বাণীর সম্মুখে। এক বৎসরের মধ্যে পিতার লোকান্তর ঘটবার পর পিতৃগৃহে গিয়ে চন্দ্রিকা আর কিংলো না স্বামিগৃহে। নিশাচরীর মতো সারাজীবন ধরে ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলো পিতৃদেহ অসীর সম্পদরাশির মধ্যে আর আভিজাত্যের সৌধ-চূড়ে।

যে অল-উজ্জ্বলশূণ্য বালুকা-প্রান্তর কখনও নিজ নেত্রে ধারণ করেনি সজল মেঘের ঘন কঙ্কাল আজ তার ওপর ছায়া পড়লো গভীর ইন্দ্রনীল শৈলমূলের। পাবাণ-বন্ধন টুটে আজ তার সমস্ত সঞ্চিত আবেগ চঞ্চলা নিরুপরিপীর মতো বেরিয়ে এলো। শালবতী এলো তাঁর জীবনে। বারাজনাকে বন্দিনী করলেন নিজের অঙ্গনে। অভিজুত হোলে গেলেন পুত্রক বর্ষণ তার স্নেহছাষার অংশরে। জীবনে এই প্রথম মনে হোলো মানুষের জীবনে সুখ জিনিষটা হোচ্ছে অতি সহজলভ্য—পুষ্পিত গাছের ওপর ফোটা সুগন্ধি ফুলের মতো। হাত বাড়ালেই যেমন তাকে ধরে আনা যায় মানুষও ইচ্ছা করলে সেই রকম সুখ ধরে আনতে পারে তার জীবনের মধ্যে। হোলোই বা সে বারাজনা? ওপরের দেহটার উপরেই সকলের দৃষ্টি কিছ সে স্থল দেহ বিস্তারের অন্তরালে সঞ্চিত রয়েছে যে তার অন্তর ভরা নন্দনবনের মধু, কে তার খোঁজ রাখে?

শালবতীর প্রথম আবির্ভাব হয় বিবিসারের তদানীন্তন রাজধানী রাজগৃহে। তারপর সমগ্র বৈশালী, কোশল, বিদিশা, মগধ জুড়ে মধুপ-গুঞ্জ-ধনির মতো ছড়িয়ে পড়ে তার নাম। জীবনের এক অন্তর্ক মুহূর্তে তার গৃহে প্রবেশ করে পুত্রকর জীবনের গতি পরিবর্তিত হোলে গেল এক রাজির মধ্যে। অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী শালবতীর স্মিষ্ট আদর আপ্যায়ন তার বহিঃস্থ-অর্জবিত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ সেচন করলো। এমন ক্রীতিময়ী চোখের দৃষ্টি জীবনে কোন নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেনি পুত্রক! তাঁর সর্বস্ব বিক্রীত হোলে গেল এক রাজির মধ্যে সে নারীটির কাছে। উন্নতের মতো ভালোবাসতে লাগলেন তাকে। কনক রজত, প্রবাল, মুক্তার অলঙ্কারের উপঢৌকনে আচ্ছন্ন করে দিতেন তাকে প্রায়ই। প্রলোভন বার বার তার শীর্ণ অস্থিময় হস্তে সঙ্কট দিতে লাগলো নিত্য নূতন ছকৃতির প্রেরোচনার।

পুত্রকের ভাগ্যের বক্রিম শ্রোতগতি পরিবর্তনে কোনদিন সন্দেহ হয় নি। শালবতীও পারলো না সে গতির শ্রোত বিপরীতগামী করতে। নিজের ললাটে করাঘাত করে মুখের গঙ্গনার অভিজুত করে দিল পুত্রককে। সচমকে রক্ত বললেন সে কি?

আমাদের উভয়ের এই পরম সৌভাগ্যকে বুধা অভিসম্পাতে অভিশপ্ত করছো কেন? উত্তরে শালবতী একটি তীক্ষ্ণ রক্ত হাসি হাসলো। পাবাণ-শৃঙ্খলে চিরদিনের মতো বন্দিনী করতে চাও আমাকে? এ কথা কি তোমার মনে কখনও উদয় হয়নি যে গীতিময়ী পদ্যাজনা অপরকে আকর্ষণ করতে কখনও সক্ষম হয় না?

সজোরে দুই হস্তে কর্ণরূপধ রুদ্ধ করলেন পুত্রক। শালবতীর জীবনের এই রূঢ় সত্যের দিকটি থেকে এতদিন অন্ধ হোয়েছিলেন তিনি। আজ যেন তামসী অন্ধ বামিনী সহসা সঙ্ক করতে পারলো না রূঢ় মার্ভণ্ডের তীব্র আলোকছটা...। অব্যক্ত বেদনার সর্ব অন্তর মন মথিত হোলে গেল পুত্রক বর্ষণের। নীড়ের বন্ধন, মাতৃহের আশ্রয় কোন প্রকারেই বিচলিত করতে পারলো না শালবতীকে। পুত্রকের গৃহের বন্ধনে আর কিছুতেই অবরুদ্ধ হোলে থাকতে চাইলো না সে। পুত্রকের বহু কাতর অনুনয়ের পর অন্তত গর্ভস্থ সন্তানটি তাঁর হাতে সমর্পণ করতে সম্মত হোলো সে। মহাব্যোমের পারাবারে ভাসমান একটি পরমাণু বিনষ্ট হোতে বন্ধা পেলো সে কাতর প্রার্থনায়।

পুত্রক বর্ষণের জীবনে আর একটি নতুন অধ্যায়ের পত্র উন্মোচন হোলো। তার শুষ্ক ক্ষেত্র ভূমির মতো বিস্তৃত জীবনে কুসুমের সৌন্দর্য নিয়ে ভূমিষ্ঠ হোলো একটি কস্তা। সঙ্গে সঙ্গেই কঠিন পদক্ষেপে শালবতী চিরতরে বিদায় গ্রহণ করলো। মুহূর্তের অল্প ভুলেও একবার দৃষ্টিপাত করলো না পিছনের দিকে। অক্ষয়সাগরের জোয়ার নেমে এলো পুত্রকের দুই চোখে কস্তাটির দিকে তাকিয়ে। সমস্তাও দেখা দিল অন্তর ভরে। তাঁর নারীহীন গৃহে কার বন্ধে কস্তাটি বর্ধিতা হবে? ভাগ্যহত মানুষের জীবনে যখন সৌভাগ্য চিরতরে তার দ্বার রুদ্ধ করে দাঁড়ায়, তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক দিয়ে বিধাতার করুণা অল্প দ্বার উন্মোচিত করে। বিবিসারের করুণাময়ী মন্ত্র মহিষী বার্তাবহ প্রেরণ করলেন পুত্রকের কাছে। ইচ্ছা করলে পুত্রক বর্ষণ কস্তাটিকে রাখতে পারেন তাঁর অন্তঃপুরে। সেখানে কস্তাটি স্নেহে পালিতা হবে, তাঁর দাসীদের কাছে কৃতজ্ঞতার আপ্রত হোলে মস্তক পেতে পুত্রক বর্ষণ গ্রহণ করলেন সে আদেশ। বস্ত্রধণ্ডে আবৃত মুহূর্ণস্পন্দিত উত্তপ্ত শিশুদেহটি বন্ধে ধরে ধাত্রী চলে গেল রাজ-অন্তঃপুরে। কর্ণব্যস্ত প্রহর অস্ত্রে প্রত্যহ অপরাহ্নে উন্মুখ হোলে দণ্ডায়মান থাকতেন অন্তঃপুরের লৌহদ্বারের বাইরে। ধাত্রীহস্তবৃত শিশুটিকে তুলে দিত পুত্রকের দুই সাগ্রহে বাহর অভ্যন্তরে। পিতৃহের আশ্রয়ন তাঁর জীবনে আর একটি নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজন করলো। শুভ্র শেকালিকার মতো শিশুখুশখানির দিকে তাকিয়ে ভুলে যেতেন তিনি বিগত দিনের সমস্ত ব্যর্থতার কোভ। অর্ধ দণ্ড পরে ধাত্রী এসে কস্তাটিকে আবার উঠিয়ে নিতো তাঁর কোড় থেকে। অন্তঃপুরের বিশাল দ্বার ধীরে ধীরে রুদ্ধ হোতো তাঁর ভূমিত চক্ষুর সম্মুখে।

এর পর হোতো কিছুকাল পুত্রক বর্ষণের জীবনেতিহাসের পত্র ধীরে ধীরে সাবলীল গতিতে উন্মোচিত হোতে লাগলো। অপরূপ দেহহন্দ আর পদ্মের মতো মুখলী নিয়ে পৃথিবীগাত্র জ্যোতির্লোভার মতো ফুটে উঠতে লাগলো ক্রীলা পুত্রক বর্ষণের কস্তা...বিবিসারের মন্ত্রমেষীরা রাণীর স্নেহছাষার অন্তরালে তরুণী ক্রীলা তখনও রাজ-অন্তঃপুরে নির্ভীক অন্তরে বৃদ্ধা

ভ্রমণ করে ফেরে। পিতার বন্ধ জরে বার কড়ার অপরূপ মুখের দিকে তাকিয়ে—সঙ্গে সঙ্গে ফীণ একটা আশঙ্কা এক একবার মর্মহীন স্পর্শ করে বার—। শালবতীর পূর্ণাঙ্গ আলোখ্য বীরে বীরে মূর্ত্ত হোয়ে উঠেছে জীলার সর্বদেহে।

—ধীপাল—বিদ্বিসারের জাতি সম্পর্কীয় ভ্রাতৃপুত্র একদিন এলো রাজ-অস্ত্রপুত্রের বিদ্বিসারের মহিবীরের সঙ্গে দেখা করতে।— অস্ত্রপুত্রের ফটিক প্রাক্ষণে জলবস্ত্রের উৎসর্গারা বেখানে ফলোপিত হোয়ে উঠেছে সেখানে সে প্রথম দেখে জীলাকে। মশোক-কুম্বের রক্তরাগে চিত্রিত পদতল উৎসর্গার মধ্যে প্রসারিত করে, বেনীমুক্ত কেশজাল আলুলায়িত করে লীলাময়ী স্ত্রীতে বসে ছিল জীলা। সুর্গীর নখর দেহপল্লবে শেকালীর স্ত্রী রাজানো দুকুল পরম আনন্দে লিপ্ত হোয়ে রয়েছিল।— নিজের অজ্ঞাতে ধীপালের জুগল একত্র সমাবেশিত হোয়ে উঠলো। স্বভাবগত স্ত্রীতে নিরোষ্ঠটিকে দস্তাঘাতে পিষ্ট করে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে দিকে। মুখ তুলে হাসি সেই দৃষ্ট লক্ষ্য করে নিজেকে সংবৃত করে ত্রস্তে স্থান বিত্যাগ করে চলে গেল জীলা। অপ্রস্তুত ধীপালও অগ্রসর হালো অস্ত্রপুত্রের দিকে। পথে সাক্ষাৎ হালো অস্ত্রপুত্রের প্রধান পরিচারিকার সঙ্গে। ধীপালের প্রস্নে পরিচারিকার ধরোষ্ঠ কুটিল হাসিতে বক্র হোয়ে উঠলো। তার মুখে জীলার বিচয় প্রবণ করে প্রচ্ছন্ন আনন্দের আভায় উজ্জলিত হোয়ে উঠলো ধীপালের মুখ। নবোদ্ভিন্ন গুন্দের দুই প্রান্ত বার বার জোরে নিষ্পিষ্ট করতে লাগলো।

—নিজের গর্ভজাত সন্তানটিকে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করে সে বাওয়ার সময় শালবতী আর কিছু দিতে না পেয়ে কুক, মাতৃহের শেষ আশীর্বাদটুকু বেখে গিয়েছিল নিরীহ পুত্রটির ওপর—নিজের দেহের ধমনীগত উচ্ছ্বল শোণিত-রাতোধারা। পিতা পুরু বর্ষের স্নেহরাশি পায়নি সে ঐ গতির স্রোত রুদ্ধ করতে। ধীপালের নিষ্কিপ্ত ফুলশবে জীলা এত শীঘ্র জর্জরিত হবে তা ধীপাল নিজেও উপলক্ষি করতে পায়নি। যে শোণিতের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল শালবতী তার নিরস্ত্রিত জীবনের স্রুত গতি, তারই আস্থান ঘরের বাহির করে নিলো জীলাকে। এক প্রহ-তারকাহীন অন্ধতামিশ্র রজনীতে এলো সে অস্ত্রপুত্রের লোহহারের বাইরে আবাল্য পরিবেশের যা মাতৃ-অধিকা মন্ত্র মহিবীর স্নেহ পশ্চাতে ফেলো। ঘোর শীঘ্রের অন্ধকার তার পিছনে ক্রন্দন করে উঠলো।

সমগ্র মগধের তখন অতি ঘোর হুর্দিন। বিদ্বিসারের অসপত্র জ্যর শাস্তি তখন করাল মূর্ত্তি ধারণ করে শোণিতপত্র আসনে এ জুটুকুটিল বয়ানে সারা মগধের দিকে চেয়ে আছে। ধ্বংসচারী পুত্রের হস্তে আপন প্রাণ বলিগান দিলেন বৃদ্ধ বিদ্বিসার। ১ দিবস সপ্ত রাজি ধরে ধর্ম প্রাণ মগধবাসীরা দলে দলে অতিক্রান্ত হোয়ে বেতে লাগলো মগধ রাজ্যের সীমানা। শুধু দস্তহীন বৃদ্ধ ক বর্ষণ ছাপুর মতো অনড় হোয়ে রইলেন তাঁর নিজগৃহে।

কয়েক দিবস ধরে মগধের জনহীন রাজপথে অর্ধ কুশাহুভুক্ত ধর্ম, বিনয়ের ছিন্ন পত্ররাশি বায়ুস্তরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হোয়ে লাগলো; তারপর শান্ত হোয়ে এলো কাটিকা-বিকুর মগধ

নগরী। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার আবার অভ্যস্ত হোয়ে উঠলো নাগরিকরা। নূতন যুগকে স্থান দেবার জন্ত পুরাতন অক্ষ বীরে বীরে বিদায় গ্রহণ করলো পৃথিবীর রক্তপট হোতে।

অজাতশত্রুর কৃষ্ণিত জ্র ও দৃঢ়বদ্ধ মুখভঙ্গী লক্ষ্য করে সম্মুখে যুক্তকরে দণ্ডায়মান লোকটি শিহরিত হোয়ে উঠলো। কল্পিত কণ্ঠ বললে, আমি মিথ্যা বলিনি তত্রভবান।

মন্ত্রণাকঙ্কের প্রাকার অজাতশত্রুর বিদ্বাদ্গর্ভ কণ্ঠধরে স্পন্দিত হোয়ে উঠলো—তোমার এ অভিযোগের প্রমাণ প্রদর্শন করতে পারো ?

লোকটির আনত দেহ ধু হোয়ে উঠলো উৎসাহপূর্ণ উত্তেজনায়, অবশ্য মহাবীপ! আর যদি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকো অজাতশত্রুর অর্ধসমাপ্ত বাক্যের পাদপূরণ করে দিল লোকটি—আপনার দত্ত কঠিনতম শাস্তি মস্তক পেতে গ্রহণ করবো প্রভু!

মগধ নগরীর উপর শ্রাবণী সন্ধ্যার বরিষণ তখন স্তম্ভ সমাপ্ত হোয়েছে। বিগল্যালে স্রুত পক্ষ সঞ্চালনে বলাকাত্রেণী উড়ে চলে গেল কোন নামহীন সিকুপারে। নীলাধর দেহ আবৃত করে তামসী সন্ধ্যা অবতীর্ণ হালো। রাজবস্ত্রের নির্জ্বল একটি বাস্তার ততোধিক নির্জ্বল একটি বাটে শ্রেণিবদ্ধ হোয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েকটি নারী। আকৃতিতে ও আশ্র বর্ণ ও দেহগঠনে তারা প্রত্যেকেই এক একজন অপর হোতে ভিন্ন কিন্তু তাদের বহিঃসমজ্ঞা ও প্রসাধন বিভ্রাস সম্পূর্ণ এক ধরণের। সুলভ অঙ্গরাগের প্রলেপ ভেদ করে দেখা যাচ্ছে তাদের মুখের পাণ্ডুর বিশীর্ণতা, দেহের ক্রান্তহল তবু তাদের অধর ছুঁয়ে আছে কোঁতুকময়ী হাসি। সহসা কবরীতে কুলমালা জড়ানো একটি স্ত্রীলোক চঞ্চল হোয়ে উঠলো—পার্শ্ববর্তিনী নারীটির পৃষ্ঠে মুহু করাবাত করে বললো—ঐ তাম্র আজও আবার এসে উপস্থিত হোয়েছে। পূর্ব পগনের মূলে ফীণ শশিকলার অস্পষ্ট বিকিরণের মধ্যে দৃশ্যমান হালো দীর্ঘ আনত একটি দেহ। সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক-পর্যবেক্ষণ করতে করতে সম্ভরণ পদক্ষেপে কুজনেহধারী ব্যক্তিটি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হালো সেই শ্রেণীবদ্ধ স্ত্রীলোকগুলির সম্মুখে। হস্ততলে সযত রক্ষিত প্রদীপটি একটি স্ত্রীলোকের মুখের সম্মুখে ধরে একদৃষ্টে কয়েক দণ্ড তাকে নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করলো লোকটি—পরে বার কয়েক মস্তক আন্দোলন করে স্বগত উচ্চারণ করলো, না না এতো সে নয়। এর মুখে কোথায় সে স্বর্ণকমলের মতো ভাস্বতী রূপ? আমারই ভ্রম... আমারই ভ্রম—অহুচ্চরবে নিজের স্বপ্নতোক্তি আবৃত্তি করতে করতে সে বৃদ্ধ ব্যক্তি অগ্রসর হালো পরবর্তিনী নারীটির সম্মুখে। পলকহীন নয়নে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে কল্পিত কণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করলো মা গো, তুই কি আমার জীলা? আহা! মুখের সে অপরূপ স্ত্রী আজ কোন ক্লেমে এমন বিশীর্ণ হোয়েছে। উচ্ছ্বসিত অক্ষর আবেগে তার বর্ধ রুদ্ধ হোয়ে গেল।

স্থিরা তটিনীর জল উদ্ভিন্নুধর হোয়ে উঠলো—। মুখে অঞ্চল দিয়ে সরব কোঁতুক হান্তে কুটি কুটি হোয়ে ভেঙ্গে পড়লো স্ত্রীলোকটি। একে অস্ত্রের পায়ে চলে পড়তে লাগলো সে হুর্ভ হাঙ্গির আবেগে। কেউ বৃদ্ধকে সরোবে গালি দিল, কেউ বা বললো উমান—কেউ কেউ বললো হতিজ্বর কানুক বৃদ্ধ। পংক্তিবদ্ধ রূপালীরাগের আর

একটির দিকে অগ্রসর হোতেই সে বৃহত্তর মধ্যে নীচ হোয়ে ভূমি হোতে এক মুষ্টি মূল্য সংগ্রহ করে ঘরিত হস্তে নিক্ষেপ করলো বৃহত্তর মুখ লক্ষ্য করে। দুই হস্তে নিজের চোখ চেপে ধরে মাটির উপর বোসে পড়লো বৃহৎ। হস্তধৃত মূত্রপ্রদীপ কঠিন মৃত্তিকার উপর পতিত হোয়ে শতধা হোয়ে ভেঙ্গে গেল।

অদূরে তিমির-বনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অজাতশত্রুকে লক্ষ্য করে উল্লসিত কণ্ঠে নিশাপাল বললো, তত্রস্তবান চাক্ষুঃ প্রদর্শন করলেন, আমার অভিযোগ মিথ্যা নয়। প্রতি সন্ধ্যায় বৃহৎ এই অজাত পত্নীতে এই রকম ভ্রমণ করে করে।

চিন্তাবিষ্ট মনে অজাতশত্রু পথ চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর নিশাপালকে বললেন, তুমি তোমার কার্যে যাও। আমার সঙ্গে আসবার প্রয়োজন নেই।

বিধাতরে নিশাপাল বললো, এত রাতে অরক্ষিত অবস্থায় একাকী প্রাসাদে প্রত্যাগমন করা কি প্রভুর সমীচীন হবে? সে কথার উত্তর না দিয়ে অজাতশত্রু দ্রুতপদে অগ্রসর হোয়ে গেলেন।

মরকত পাদপীঠের উপর দুই চরণ স্থাপিত করে শুভ্র কোমল শয্যাগনে অর্দ্ধাসীন হোয়েছিলেন অজাতশত্রু তাঁর নিজস্ব বিশ্রাম-গৃহে। দ্রাক্ষপত্রের আকারে নির্মিত রজতপাত্রের উপর নানা বর্ণময়ী মদিরার স্তবর্ণপাত্র বহন করে দাসী তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মানা হোলো। একটি চবকে কিঞ্চিৎ মদিরা ঢেলে নিলেন অজাতশত্রু, তারপর ইঞ্জিতে দাসীকে বহিষ্কৃত হোতে আদেশ দিলেন কক্ষ হোতে।

কিয়ৎকালের মধ্যে অজাতশত্রুর মন্ত্রী বর্ষকারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন পুত্রক বর্ষণ। অজাতশত্রুর গর্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে পুত্রক বর্ষণের অনিচ্ছাকৃত কোটরগত চক্ষু দুটি সজল হোয়ে উঠলো। বিধিগার প্রাণপ্রতিম স্তম্ভদ, সহোদর-প্রতিম প্রভু—তাঁর জীবনের একমাত্র ও সর্বশেষ আকর্ষণ চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হোয়ে গেল তাঁর শুভ এই জীবনবৃত্ত থেকে। অসীম ভগতের অগণিত জনতারশির মধ্য হোতে লুপ্ত হোয়ে তার পথ নির্দিষ্ট হোলো কোন কোটি কোটি ছায়াপথ নীহারিকার মধ্যে—উদয় অন্তাচলের দুর্গমপথে, অসীম স্বর্গের চিরস্তন রহস্যের মধ্যে।

পুত্রক বর্ষণ?

আনন্তমুখ পুত্রক বর্ষণ সচমকে মুখ তুলে তাকালেন অজাতশত্রুর দিকে। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে মুখে অল্পসন্ধান করতে চাইলেন শিশু অজাতশত্রুকে, যে নধর দুই হাত বাড়িয়ে শিশু হান্তের কলকাকলীতে তাঁর ক্রোড়ে উঠবার জন্য আকৃতি জানাতো।

পুনরায় অজাতশত্রুর কণ্ঠের ধ্বনিত হোলো, প্রত্যহ কোন স্থানে তুমি সান্ধ্য-ভ্রমণে বহির্গত হও পুত্রক বর্ষণ? উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বক্র ও কুটিল হান্তে পরিপূর্ণ হোলো অজাতশত্রুর সর্ব মুখ।

শুভ দৃষ্টি কক্ষের কঠিন প্রাচীরপাত্রে নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন পুত্রক বর্ষণ। গভীর ও ঈর্ষ মত্ত কণ্ঠে পুনরপি অজাতশত্রু বললেন : উপলব্ধি করতে পেরেছি তোমার এ মনোবিকার। বৃহৎ বয়সেও তুমি তোমার ব্যসনে দৃঢ়াঙ্গিত দিতে পারোনি। অসংলগ্ন ভাবে পুত্রক বর্ষণের স্বরণ হোলো একদিন বিধিগার পুত্রকে শিখিয়েছিলেন তাঁকে পুত্রভাত সন্ধান করতে। অজাতশত্রু বলে

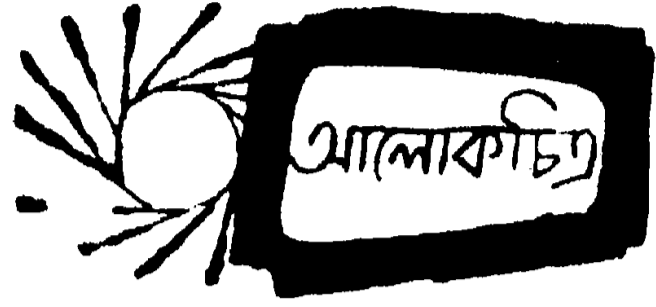
চললেন কিন্তু তোমার প্রতি এই একমাত্র অভিযোগ নয়। তারপর ফিরে তাকালেন মন্ত্রী বর্ষকারের দিকে। বর্ষকার প্রস্তুত হোয়েই ছিলেন, অজাতশত্রুর কথা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের বদ্যভাষ্যর থেকে বাহির করে আনলেন একখানি সমুজ্জ্বল অলঙ্কার। গুরুগভীর স্বরে অজাতশত্রু বললেন, ভালো করে লক্ষ্য করে আমাকে বল পুত্রক বর্ষণ! এ সৌখিনী মৌড় তুমি কোথা হোতে সংগ্রহ করলে?

পুত্রক বর্ষণের স্তিমিত চক্ষুর সম্মুখে জলন্ত প্রস্তরের মতো বলসিত হোয়ে উঠলো বহুদিন পূর্বেই সেই রত্নললাটিকা। তাঁর জীবনের প্রথম অপরাধ তাঁর জীবন ভরা পরাজয়ের গ্লানি আজ আবার নতুন করে উদ্ঘাটিত হোলো তাঁর সম্মুখে। চন্দ্রিকা নিকট প্রবেশের মতো অবলীলাক্রমে ত্যাগ করে চলে যেতে পেরেছিলো স্বামীর সে প্রথম উপহার। তার পর সেটি অধিকার করে শালবতী। তার পরের ইতিহাস পুত্রকের বিদিত নেই।

অসহিষ্ণু অজাতশত্রু মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, এই বৃহত্তর তুমি দ্বারপালদের নিয়ে এই বৃহত্তর গৃহ পুখারপুখারুপে অল্পসন্ধান করে অলঙ্কার-পত্র মূল্যবান সামগ্রী ইত্যাদি যা কিছু পাও এনে রাজকোষে সমাবেশিত কর। তার পর পুত্রক বর্ষণের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, বৃদ্ধিত বৃদ্ধ, নিজেকে অতি চতুর ভেবেছিলে তুমি কিন্তু তোমার চেয়েও চতুরতর প্রাণী যে পৃথিবীতে থাকতে পারে তা তোমার জ্ঞাত ছিলো না। এ অলঙ্কার সম্প্রতি একটি নটীর নিকট হোতে পুনরধিকৃত হোয়েছে। দস্তে দস্ত নিষ্পেষিত করে পুনরায় তিনি বললেন, প্রাণদণ্ডই তোমার যথোপযুক্ত শাস্তি হোতো, কিন্তু তোমার পলিত কেশ আর জরাগ্রস্ত দেহের দিকে লক্ষ্য করে সে দণ্ড থেকে তোমাকে আমি অব্যাহতি দিলাম। কিন্তু স্বরণ রেখো—তাঁর স্বর উচ্চ গ্রামে উঠলো—তোমার কক্ষের চতুর্দিকের প্রাচীরের বাইরে এক পদ নিক্ষেপ করার অল্পমতি এই বৃহত্তর থেকে তোমার থাকলো না। রাজপুরী হোতে প্রত্যহ চই স্থানী অন্ন তোমার অবশিষ্ট জীবনান্ত কাল পর্যন্ত লাভ করবে—তোমার বয়সের দিক থেকে বিবেচনা করে এই করুণা তোমাকে আমি করলাম।

এতক্ষণে পুত্রকের অন্তরের হাহাকার শুভ্র হাসিতে ধ্বনিত হোয়ে উঠলো—শীত-নিদ্রায় আচ্ছন্ন এই জড় মণ্ডকের দেহটার উপর অজ্ঞাত করতে চেয়েছিলে অজাতশত্রু? তার শীতল শোণিতে তোমার অঙ্গই রক্তিম হোয়ে উঠতো শুধু সূর্য-দুঃখ অহুভবের অতীত শুভ তৃণ-পল্লবের মতো এ দেহ তাতে কোন বেদনাই পেতো না। তাঁর প্রগল্ভতার অত্যন্ত বিরক্ত হোয়ে উচ্চ কণ্ঠে অজাতশত্রু বিশ্রামগৃহের দ্বাররক্ষককে আহ্বান করে আদেশ দিলেন, শীঘ্র এ বৃদ্ধকে কক্ষের বাহির করে বর্ষকারের হস্তে সমর্পণ কর। স্থির অবিচল চোখের দৃষ্টি সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ করে দ্বাররক্ষকের সঙ্গে বহিষ্কৃত হোয়ে গেলেন পুত্রক বর্ষণ—শীর্ণ অবরোষ্ঠটি বায়ে বায়ে কল্পিত হোতে লাগলো।

সে নারীটিকে এক বৃদ্ধা খেরীই প্রথম আবিষ্কার করে। জেতবন বিহারের পশ্চাদ্দেশে প্রতি সন্ধ্যায় সে একটি দ্বীলোককে অসংলগ্ন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে। কয়েক দিন লক্ষ্য করবার পর সে ভিক্ষু সোমদেবকে কথটা জানায়। ভগবান সুপ্ত তখন অস্থায়ী ভাবে কিছুদিনের জন্য জেতবনের বিহারে বাস করছিলেন। দ্রুত পরিবর্তনশীল আশঙ্কাপূর্ণ পরিহিতের জন্য ভিক্ষুদের মন ভাঙ



পানীয়া ভরণে
—বরণ ষোষ

পানপাত্র

—অক্ষয়কুমার দে

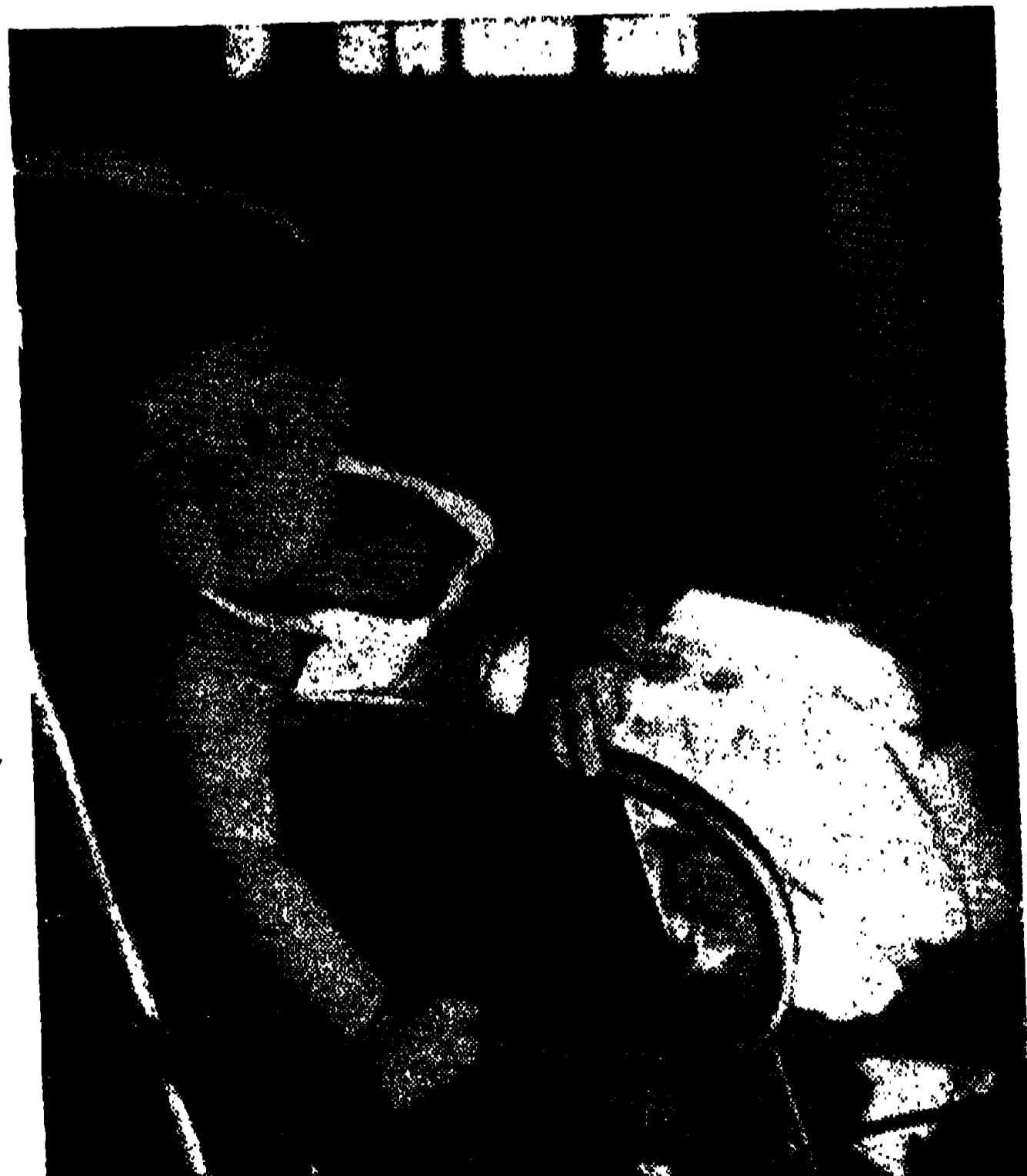




—বকির কুমার

॥ শিশু-মেগা ॥

—হুলাল সেনগুপ্ত





—প্রভাতকুমার মল্লিক



॥ শিশু-মেলা ॥



—শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য



মহুমেন্ট মেরামত

—জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সর্বদাই সতর্ক থাকে। তাই সোমদেব কথাটা শুনে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হোলেন। পরদিন সন্ধ্যায় বিহারের প্রহরকূটার-প্রাচীরের অন্তরালে আত্মগোপন করে রইলেন অপরিচিতা নারীটির আগমন প্রত্যাশায়। তখন শূভ্রে সাঙ্ক্যগনে ধ্যানমগ্ন মহাশাস্ত্রির গায়ত্রী—অনুরে সঙ্ক্যারাম হোতে শ্রমণদের সমবেত কণ্ঠের সুরগভীর স্তব-পাঠের বেশ ধীর মলয়জ বায়ুর সঙ্গে মিলে অনন্ত অম্বরে লীন হোয়ে যাচ্ছিল। বিহারের অদূরবর্তী ক্ষীণা সরসীর প্রান্তে ঘন বকুল-বীধিকার ছায়ার খেত শিলাপটের উপর নতমুখী হোয়ে বসেছিল নারীটি। সোমদেব সম্ভরণ পদক্ষেপে অগ্রসর হোলেন সে দিকে।

পশ্চাদ্দেশে বনানীর গুরুপত্রের চূর্ণিত শব্দে সচমকে ফিরে তাকালো সে নারী—সত্যে উঠে দাঁড়ালো তার শিলাসন থেকে। পিছনের দিকে এক পদ সরে যাওয়া মাত্র সোমদেবের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হোলো তার দিকে নিস্তরু নিষেধের মতো। স্থাণুব মতো দাঁড়িয়ে পড়লো নারীটি। কথা বলার আগে সোমদেব তার মুখের দিকে একবার তাকালেন। বিস্তর মুখের অন্তরালে কোটর-প্রবিষ্ট শঙ্কিত চকুর দৃষ্টির অন্তরালে সম্ভরণে দেখা দিয়ে বাছে বিগত দিনের রূপার্থ্য। চোখের নীচে স্তিমিত দীপশিখার ধূমাক্তিত কালির মত গভীর কৃষ্ণরঙা আর ক্লান্ত দেহছন্দ নিয়ে নতমুখী হোয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। সোমদেব গভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে তুমি ?

আবেগে কম্পিত হোলো সে শীর্ণ মুখের প্রত্যেকটি রেখা। শুভ্র মস্তক-বাসের অন্তরাল হোতে ছুটি একত্রিত হাত বাহির হোয়ে এলো—আমার কোন পরিচয় নেই ভদ্র !

বুধা বাক্যব্যয় না করে সোমদেব বললেন ভালো, তবে প্রত্যহ বিহারের পশ্চাদ্দেশে তোমার এই বিষয়কর পনচারণের উদ্দেশ্যটা কি জানতে পারি ? অপরিচিতা স্ত্রীলোকটির কোটরগত হই চকুর ওপর নীলাঞ্জন মেঘের সজল ছায়া পতিত হোলো—অগ্রমাদ অমৃতের পথ্যাসুকানী হোয়ে এ ক্লিষ্ট দেহভার ভগবান তথাগতের পদতলে রক্ষা করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কয়েক দিবস পূর্বে এখানে উপনীতা হোয়েছি কিন্তু কোন রকমেই সে সুরোগ ও সৌভাগ্য লাভ করতে সক্ষম হুই না। আপনি অমুগ্রহ করে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারেন ভদ্র ?

তরুণ ভিক্ষু সোমদেব ঈষৎ হেসে বললেন, তোমার আকাঙ্ক্ষা দেখছি অতি উচ্চ গগনস্পর্শী। বে বহুদূরী পরাবৃষ্টির মধ্যস্থলে দাঁড়িয়েও আমরা তাঁর চরণপ্রান্তের সীমাদেশে পৌঁছাতে পারিনি তাঁকে তুমি লাভ করতে চাও তোমার কয়েক প্রশ্নের প্রতীকিত আকাঙ্ক্ষার ? তোমার সঙ্গে বুধা বাক্যব্যয় করে লাভ নেই। এখন স্পষ্ট ব্যক্ত কর—কোন তথ্যাসুকানের জন্ত তুমি এমন গুপ্তচরী কার্যে নিয়োজিতা হোয়েছো ?

কঠিন উপলের আঘাতে ব্যথিতা উর্ধ্বমালার মতো তার অন্তরের অঙ্গসাগর-তরঙ্গমেলা উচ্ছলিত হোয়ে উঠলো—সে মর্মভেদী কঠিন বাক্যে সাঙ্ক্যস্তোত্র সমাপন করে প্রবীণতম হুবির আনন্দ উত্তরাসঙ্গে দেহ আবৃত করে নিজের কক্ষে ফিরে যাচ্ছিলেন—তাদের কথোপকথনে আকৃষ্ট হোয়ে ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হোলেন। তাঁকে দেখে কণ্ঠে কঠিন স্বর পরিবর্তন করে সন্নয়পূর্ণ কণ্ঠে সোমদেব বললেন, এ স্ত্রীলোকটির পতিবিধি অতিশয় সন্দেহজনক শাস্ত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে বিহারের বাইরে প্রহরভার

বুরে বেড়ায়। আমার মনে হয়, এ নারীটিকে কেউ নিয়োজিতা করেছো গোপনে আমাদের উপর দৃষ্টি রাখবার জন্ত। হুবির আনন্দ তড়িৎ গতিতে বিচলিত হোয়ে উঠলেন না। সোমদেবের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি বিহারে গমন কর, আমি এর তথ্যাসুকান করছি। সোমদেব চলে যাওয়ার পর আনন্দ স্ত্রীলোকটির আনন্দমস্তক একবার নিরীক্ষণ করলেন। তাঁর বহুদূরী অভিজ্ঞ চকুর সম্মুখে নারীটির জীবনের ইতিবৃত্ত এক মুহূর্তের মধ্যে পঠিত হোয়ে গেল। হতভাগিনীর নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ স্বর্ণসম্পদ প্রথম যৌবনে কনিকের ডুলে রঙ্গপত্রের মূল্যে বিক্রীত হোয়ে গেছে। আজ তার জীবনকুঞ্জে বোধ হয় সমাপ্ত হোয়েছে সে কণিক অভিসার-নিশার—উদ্ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি, বিশীর্ণ কপোলদেশের পাণ্ডুরতা, চকুর নিয়ে গভীর কালিমা তারই প্রমাণ। সোমদেবের মতোই হুবির আনন্দ প্রশ্ন করলেন, তুমি কে ?

বীণার তন্ত্রের মতো কম্পিত হোয়ে উঠলো নারীটির কণ্ঠস্বর, আপনি গুণভূৎ প্রবীণ ব্যক্তি—করজোড়ে আমি প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে ডুল বুঝবেন না। কোন হীন উদ্ভ্রান্ত-পরিচালিতা হোয়ে আমি এখানে আসিনি, পঞ্চম-ক্লান্ত ধূলি-ধূসর আমার এ ক্ষীণপদ—উপবাসক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ এর সত্যতার সাক্ষ্য দেবে।

রৌদ্ধতমানা স্ত্রীলোকটির প্রতি করুণা হোলো আনন্দের। বললেন, কিন্তু কোন আকাঙ্ক্ষায় তুমি এ ক্লেশ সহ করছো ?

সংসারক্লান্ত হৃদয়ের তার বিমুক্ত হওয়ার জন্ত। মহাবোধির চরণ-যুগল-প্রান্তে একান্ত নির্ভরশীলা হোয়ে নির্কীর্ণ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কোন অভিপ্রায় আমার নেই। শান্ত হাসি হাসলেন হুবির আনন্দ। আগে প্রেম সঞ্চর করো তোমার অন্তরের মধ্যে, তারপর তোমার কণ্ঠে আসবে সুর—প্রস্থানোক্ত আনন্দের পিছনে অবহেলিতা নারীটি নিস্তরু ক্রন্দনে বিধুরা হোয়ে উঠলো।

শুভ্রা একাদশীর খণ্ডচন্দ্রের বিপরীতে জাটলি বুকের ছায়া দীর্ঘতর হোয়ে নেমে এলো বিহারের বাহিরের নির্জন প্রান্তে। প্রতিদিনের মত আজও সীতল কুপবাসিতে কমণ্ডলু পূর্ণ করে বিহার অতিমুখে প্রত্যাবর্তন করছিলেন হুবির আনন্দ। পূর্বসন্ধ্যায় অপরিচিতা নারীটি সহসা কোন অলকিত স্থান হোতে বাহির হোয়ে এসে তাঁর পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালো। জ্র কৃকিত করে হুবির আনন্দ তাকালেন তার দিকে। সাহসনয়ে যুক্তকরবদ্ধা নারীটি কাতর প্রার্থনার উদ্বেল হোয়ে উঠলো, আপনার আনন্দলোকে প্রবেশ করবার অধিকার দিয়ে আমাকে বৃত্তা করুন। আশ্রয় দিন আমাকে আপনার স্নেহারপ্যের ছায়ায়।

তার দিকে চেয়ে মুহূর্তকাল চূপ করে রইলেন হুবির আনন্দ। পরে বললেন, তুমি নিজেই তোমার নিজের আশ্রয়। আমি তোমাকে আশ্রয় দেবার কে ?

শান্তা ! এ জীর্ণ দেহতরঙ্গী দীর্ঘকাল চালনা করে শুধু হৃৎস্বয়ং কুলই উত্তরণ করেছি, আশ্রয় কোথাও মেলেনি। সে বিলম্বিত, শূভ্রময় বক্রাপথটাকে এতদিন বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর লেগেছিল। কিন্তু আজ তাকে প্রশ্যাম। আমার গন্তব্য স্থানে অবশেষে তো আমাকে সে পৌঁছে দিল। এইবার আপনি আমাকে কৃপা করুন। তথাগতের চরণ সান্নিধ্যে আমাকে প্রবেশ

করবার অধমতি দিন।—বলতে বলতে নতজানু হোয়ে বসে পড়লো নারীটি আনন্দের চরণপ্রান্তে। তিনি কিছুক্ষণ করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন পদলীনা সে নারীটির দিকে—পরে বললেন, তথাগতের দর্শন লাভ কুমার হস্ত তোমার এ আকুলতা কেন? পরম সত্যরূপ বুদ্ধ যিনি, তিনি এই বাহিরের প্রাঙ্গণে—তোমার দেহের মধ্যেই বিরাজ করছেন—বুধা তুমি বাহিরে তাঁর অনুসন্ধান করছো।

সে নিরাকার বিরাট সত্যকে অন্তর-মন দিয়ে অনুভব করবার মতো শক্তির সাধনা আমার নেই। তাঁর বদ্ধ বিহীন প্রকাশ-রূপ দর্শন করে আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যের পথ বরণ করে নেবো, এই আমার অন্তরের সর্বশেষ কামনা।—আনন্দ চূপ করে ধানিকরণ কি ভাবলেন—পরে বললেন, অন্তর থেকে তোমার এই কামনা, হৃদয়ের সমস্ত মালিন্য দূর করতে হবে—সিত, করুণা, মুদিতা উপেক্ষা সুখ দুঃখ—পুণ্যাপুণ্যের চিন্তা দিয়ে চিত্তপ্রসাদ লাভের অধিকারিণী হোতে হবে তোমাকে। তখন অনুভব করবে তোমার সে বিধা ও বাসনা বর্জিত, আনন্দময় অন্তরে তোমার অভীষ্টকে তুমি লাভ করেছো তাঁর দর্শন জনিত তৃপ্তি আর তখন তোমার থাকবে না—।

কাতর কণ্ঠে বলে উঠলো নারীটি। আমি দুর্বল—সে ক্ষমতা আমার নেই—আপনি আমাকে পথ নির্দেশ করুন।

নতস্থানে পুনরায় কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন স্থবির আনন্দ—পরে বললেন, আচ্ছা, এসো তুমি আমার সঙ্গে—। সারাক্ষর শেষ বেধার মধ্য দিয়ে—সপ্তর্ষিমণ্ডলের কীর্ণ আলোর মাঝখানে নারীটি চলতে লাগলো আনন্দের পাশ্চাতে—তার জীবনের সর্ব শেষ পথ ধুঁজে নিতে।

পূর্বে বনান্তরে অলস পরনে শায়িতা উবার নিজাকান্ত নয়ন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হোলো। শত শত নুপু বিহঙ্গ-কাকশীর সঙ্গে বাহির হোয়ে এলো বাত্রির নিভৃত নীড় হোতে। অসীম গগনগাত্রে বলাকার জেগী খাঁপ দিয়ে উড়ে চললো চিরপরিচিত বাসস্থান ছেড়ে চির-নীহারাবৃত ঠেকলাস পর্জতের সন্ধানে।—

কুম্বী নদীর তুবায়ীতল জলে বার বার নিমজ্জিত হোতে লাগলো একটি নারী।—আজ তার বড়ো আনন্দের দিন।—মহাহবির আনন্দের করুণা আশ্রয় লাভ করে পঞ্চবর্ষ কাল ধরে সে ভ্রমণ করে এসেছে এক বিহার হোতে অস্ত্র বিহারে। আজ সে উপস্থিত হোয়েছে তার তীর্থস্থান কপিলবস্ততে—যেখানে তার ইষ্টদেবতা প্রথম চক্ষু উন্মীলন করেছিলেন। বাত্রার শেষ পথে উপনীতা হোয়েছে সে। জীবন-মন্থনে তার বে হলাহল উঠেছিল অমৃতরূপে রূপান্তরিত হোচ্ছে তারা এক একটি নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে।

দ্বীলোকটির মুণ্ডিতমস্তক আর হরিদ্রা বর্ণে বস্ত্রিত অন্তর্কাসের দিকে তাকিরে মহাহবির আনন্দ মুহূ হাসলে—প্রজ্ঞা পারমিতার প্রদানে তোমার জীবন আজ সন্ন্যাসীর চেয়েও সার্থক। বৃহৎ শান্তি উদার বৈরাগ্য আর নিঃস্বার্থ প্রীতির মধ্য দিয়ে আজ তুমি উপনীতা হোয়েছো তোমার ধ্যানের স্তম্বলোকে।

অন্তর্কাসের ভিতর থেকে বিবর্ণ একটি জলটখণ্ড বাত্রির

করে এনে দ্বীলোকটি বললো, এখনও পাখিব মায়াবিমুক্ত হোতে পারিনি শান্তা। কুম্বী নদীর জলে এ চিত্রপট বিসর্জন দিয়ে সর্বশেষ আকর্ষণ হোতে মুক্তি চেয়েছিলাম—বিধাগ্রস্ত মন বাধা দিল, পারলাম না। আপনার পদপ্রান্তে এ চিত্রপট চিরদিনের মতো বিলীন হোয়ে আমার অন্তর বিধাবর্জিত মায়াযুক্ত হোক—হুহাতে চিত্রপটটি বিদীর্ণ করতে যেতেই তাকে বাধা দিলেন মহাহবির—বৈরীকেও তুমি নিঃস্বার্থ প্রীতি দান করবে যে তোমাকে প্রথম জীবনে বিপথগামিনী করেছিল তাকেও আজ তোমার নির্মল অন্তঃকরণের মৈত্রী দান করবে।

মস্তক নত করে নারীটি গুনলো তাঁর বাণী, পরে বললো, বসার্থ শান্তা। অন্তরে গভীর আনন্দের সন্ধান পেয়ে পাখিব তুচ্ছ ক্রোভ অক্তি অকিঞ্চৎকর হোয়ে গেছে আমার কাছে—চিত্রপটখানি পুনরায় অঙ্গবাসের ভিতর রাখতে রাখতে নত নেত্র নারীটি বললো : এ চিত্রপট আমার বৃদ্ধ পিতার আমার বিগত জীবনের সর্বশেষ আকর্ষণ।

চারিধারের শৈলমালার অভ্যন্তরে নিস্তব্ধ নীল একটি সরোবর, তারই প্রান্তদেশে কয়েকটি স্থূল শিলাস্তম্ভের উপর খেতপ্রস্তর নির্মিত ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ দণ্ডায়মান।

মহাহবির আনন্দের পশ্চাতে সঙ্কুচিত পদক্ষেপে উঠে নারীটি এলো সে প্রকোষ্ঠের ভিত্তিগাত্রে। উন্মুক্ত ধাবের ভিতর দিয়ে আনন্দ বিনা বিধায় প্রবেশ করলেন সেই কক্ষ-অভ্যন্তরে পশ্চাদ্বর্তিনী নারীটিকে নিয়ে। সুগন্ধি সর্বসের ধূমজাল জেদ করে নারীটির অভিজুত চোখের দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ হোলো শুভ্র একটি অমলাসমের উপর—যেখানে জ্যোতিষ্মান এক ব্যক্তি মুদ্রিত নেত্র শান্ত সমাহিত মুখতাব নিয়ে পদ্মাসনে উপবেশন করে আছেন। শুভ্র শুক্রির মতো পদনথরে যেন শত-সহস্র গলিত চন্দ্ররেণুর নির্মলমিকা পরিব্যাপ্ত হোয়ে রয়েছে। রক্তপদ্মনিভ উন্মুক্ত করতলের উপর প্রতিকলিত হোয়েছে যুগ-যুগান্তরের বরাতয় আশ্বাস। সে আশ্বাসবাণী ধারণ করে নারীটির শুষ্ক ছই চোখ সম্মল হোয়ে উঠলো। তথাগত ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করলেন—কমান্বন্দর চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হোলো নারীটির মস্তক লক্ষ্য করে—তাঁর নীরব আশীর্বাদী বহন করে। আর্ন্ত পৃথিবী যেন কম্পিত হোয়ে উঠলো—ধ্বনিত হোলো সে নারীকণ্ঠ :

কিষি বেননার শূলে অর্জরিতা—স্পর্শ করো না এ দুর্নিতাকে। তথাগত অপরূপ হাসি হাসলেন। সমগ্র উর্দ্ধাকাশ জেদ করে মুক্তিকার প্রতি রক্তের অভ্যন্তর হোতে বিশাল বাবিবিরাশি অতিক্রম করে কোন দূর-দূরান্তর হোতে ভেসে এলো তাঁর আশীর্বাদ—পৃথিবীর সত্তোজাত কুমারীর মতো সরল শুভ্র সুলব তুমি—তথাগতের দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে স্পর্শ করলো নারীটির মুণ্ডিত মস্তক—মহাহবির আনন্দের উদাত্ত বণ্ঠ ধ্বনিত হোয়ে উঠলো অমৃতধারায়

অন্তনা চোদয়াস্তানং পটিমাসে অন্তমন্তনা।

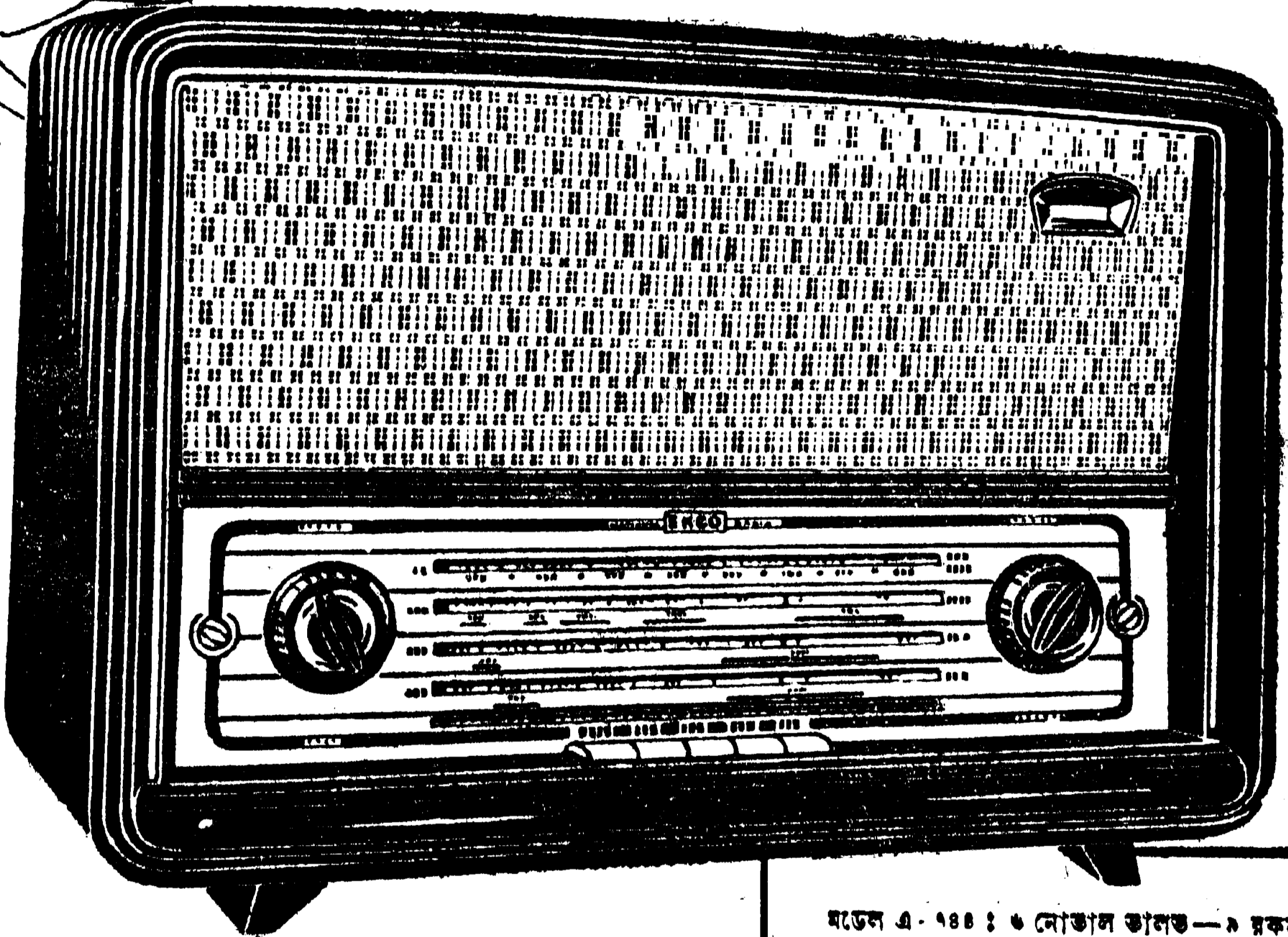
সো অন্ত গুন্তো সতিমা সুখং ভিক্খু বিহাসিনী।

ধরিতীর নির্মল ললাট আজ হোয়ে গেল সে আশীর্বাদে।



অনবদ্য শিল্প-কৌশল...
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য...

ন্যাশনাল একো-র
নতুন মডেল এ-৭৪৪



সঙ্গীত রসিকেরা শ্রাবণ-একের চমৎকার মজুদ মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ মা হ'য়ে পারবেন মা। এর অনিন্দ্য গড়ন, কলাকৌশল ও চক্চকে চেহারা যেমন নয়নাভিরাম, তেমনি প্রতিমধুর ও সুস্পষ্ট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সত্যি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি শ্রাবণ-একো ডিলারকে বাজিয়ে শোনাতে বলুন—কোন খরচ নেই।

আমাদের অনুমোদিত শ্রাবণ-একো ডিলারের কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : ৬ নোডাল তালত—৯ রকম কাজ, মনোরম কেবিনেট সমন্বিত ৪-ব্যাণ্ড ব্লক এসি রেডিও—সারা পৃথিবীর স্টেশন ধরা যায়। পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন; ম্যাজিক আই; গ্রামোফোন ও একস্ট্রা স্পীকারের জুট যোগাযোগ ব্যবস্থা; টেপ রেকর্ডারের জুট বিশেষ বন্দোবস্ত। এক বছরের গ্যারান্টি।

৪১৫৭ নীট

হাবীর ট্যাক বতর



ন্যাশনাল একো রেডিওই সেরা—এগুলি



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যান্ডারেলেক্স প্রাইভেট লি:

কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • মাদ্রাস • বাকলোর • দিল্লী • কেরলাপুত্র



অন্ধন ও প্রাক্ষণ



তুই পিতা, তুই কন্যা

স্মৃতি সেনগুপ্তা

যে যুগের কথা হচ্ছে তখনও পাঙ্কি ছুঁকি চালেই চলে।
প্রামের মেঠো পথে, মাঠের মাঝে "হেইয়ো হেইয়ো" করে

পাঙ্কি চলে ছুঁকি চলে—

সেই সময়ের প্রামের রূপটি এই—শান্ত ছায়া-ঘেরা প্রাম। সবুজ ছায়ায় কোলে কোলে মেঠো ঘরের ভীড়। ছিমছাম পরিপটি করে সেগুলো গোবর দিয়ে নিকানো। নিকানো দেওয়ালের গায়ে সাদা ও গেকরা রং দিয়ে আলপনা আঁকা। অনেক দূর চলে যাওয়া মাঠ। ধানের ক্ষেত, অরহর-ক্ষেত, তিল তিসি-ক্ষেত। মাঝে মাঝে আবার নিজে থেকে ওঠা স্রোণ ফুলে ছেয়ে থাকে সে ক্ষেত। প্রামের মাঝে সবল সাদাসিধে। তারা প্রতাপশালী জমিদারকে ভয় করে, মানেন, বাধ্য হয়ে তাঁদের কথা শোনে। কিন্তু তাঁদের বিক্রমে কেউ কখনো পীড়ার না। হয়ত বুকে আগুন জলে থিকি থিকি, কিন্তু সেটা চাপা আগুন। বাক আমাদের গল্প অন্য ধরনের, কাজেই এ কথার কাজ নেই।

—কুমঠে বাঁশি বাজছে রে ?

—কেনে তুই জানহিস না ?

—না।

—হামি তু-কে বলব না। বা না কেনে তুই ঐ বলাই মোড়লের কাছে। ও তুকে বলবে।

—কেনে তুই বলনা বাই ?

—না তু-কে হামি বলব নি। এতো বোড়ো একটা খোবোর আর তুই কিনা বলহিস—হামি জানহি না ? বা তুকে বলব নি।

—বুল না রে বাই ?

পঞ্চ চলতি ছুটো চাবীর কথা এগুলো। একজন জানিচে চায় আরেক জন বলবে না। তাকে কিছুতেই বলবে না। কেন বলবে সত্যিই তো এতবড় একটা খবর আর কি না ও জানে না ?

সত্যিই মস্তবড় খবর একটা। হয়ত ঐ চাবীটা জানে, খেয়াল নেই। কিংবা ও না-ও জানতে পারে, হয়ত নূতন লোক। কিন্তু জানবারই কথা।

জমিদার-বাড়ীর বাব মহল। সামনের আজিনায় অনেকগুলো সাদা-কালো পায়রা ছড়ানো ধান খুঁটে খুঁটে থাকছে। এক পাশের উঁচু বারান্দায় জমিদার স্বয়ং বসে আছেন পাশে নারের ও ছেলে বিজয়। নীচের উঠানে অনেকগুলো লোক। বাকড়া-বাকড়া চুল, কালো তেল-চুকচুকে পেশীবহুল স্মঠাম মেহের গড়ন। বেঁটেখাটো ধরণের। তাদেরই সাথে জমিদারের কথা লেছিল।

—হ্যা শোন, তোদের ডেকেছি কেন। জানিস-ই তো কাল বিজুর বিয়ে। আজই বরষাত্রীর দল রওনা হচ্ছে বিকেলে। তা তোরা পাঙ্কি নিয়ে বিকেলে চলে আসবি সবাই, আসবি বুলি ? কি রে সবাই রাজী তো ? আর রাজী না-হবারই বা আছে কি ? এই বলে জমিদার হরশঙ্কর বাবু একবার সকলের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে চাইলেন। সকলেই সম্মতি প্রকাশ করল। কেবল এক জনের মধ্যে একটু ইতস্ততের ভাব দেখা গেল। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল। তারপর সেই লোকটা এগিয়ে এল। বুড়ো হয়ে গেছে সে, তবে শরীর বেশ মজবুত। হাত জোড় করে জমিদারকে সে বললে—বাবু, হামি পারব না বাবু, হামি আসতে পারব না।

—কেন 'রে ? আর কোথাও বাবি নাকি ? না না তোরা যাওয়া হবে না। তোরা পাঙ্কিই তো সবচেয়ে ভালো রে মধু। তোরা পাঙ্কিতেই তো বিজু আর বোঁমা আসবে। এ কি তোরা কম জাগ্যের কথা ?

—না বাবু, হামি পারব নি।

—কেন ? এবারে জমিদার বাবুর গলার স্বরটা একটু কঠোর শোনা গেল।

মধু একবার জমিদার বাবুর দিকে চাইল। তারপর মুখ নীচু করে বলল—না বাবু, সে হামি বুলতে পারব নি। হামি যেতে পারবি নি, হামি বাব নি বাবু—হামি বাব নি। গলার স্বর ওর আটকে গেল। অবাক হ'য়ে গেলেন জমিদার হরশঙ্কর। রাশভারী জমিদার তিনি, তাঁর কথা কেউ অমান্য করে না। আর এই একটা সামান্ত ছুলে বাগদী তাঁর কথা শুনেছে না ? কিন্তু তিনি অস্বস্তি হ'য়ে শুধু—আস্তর্বা ! বলেই খেমে গেলেন। হয়ত মধুর হলহল করা কালো চোখের মধ্যে কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি শুধু একবার কঠিন-শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাবের চামড়ার চটিটার শব্দ তুলতে তুলতে বারান্দা পেরিয়ে অন্তরে চলে গেলেন।

বারগাটা কেমন ধমুধমে হ'য়ে গেলো। কিসকাসু কথা আরও হ'য়ে গেলো উঠানে জমা লোকগুলোর মধ্যে। নারের বিজয় সকলেই চুপ। কেটে গেল কয়েক দণ্ড। তারপর বিজয় বাধ্য হ'য়েই বলল—আচ্ছা এবার তোমরা যাও। আর মধু তুবি খেবো, তোমার সাথে কথা আছে।

সবাই হলে গেল। তার পর এর গায়ে সব লোক হলে গেল

রইল। নায়েব মশাইও চলে গেলেন। বিজয় ধীরে ধীরে মধুর দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তার দিকে চেয়ে বলল—মধু, তুমি এমনি করলে কেন? আমরা কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি? সত্যি করে বল তো তুমি এমনি করলে কেন? কি জন্তে তোমার আপত্তি?

এতগুলো প্রশ্নে মধু বোধ হয় ঘাবড়ে গেল। একবার বিজয়ের দিকে মুখ তুলে চাইল। আবার মুখ নাবিয়ে নিল। কিছু বলল না।

—মধু! বল তুমি কেন—

—দাদাবাবু, হামি, হামি বুলতে পারবি নি। না, না, না, দাদাবাবু তালে তুর বে কষ্ট হবে। হামি কামন কইরে বুলব। হামাকে আর কিছু জিগগাস করিস নি দাদাবাবু।

—কেন? না, তুমি বল আমি কষ্ট পাব না। তুমি বল।

—ঠিক বুলছিস দাদাবাবু, তুই কষ্ট পাবি নি তো? ঠিক বুলছিস তুই?

—হাঁ ঠিক।

—বেশ। তবে শুন দাদাবাবু, যখন তুই বুলছিস—তুই কিছু মনে করিস নি বুলবি? তুকে হামি দোষ দিব না, শুধু তুকে আমার দুটো মনের কথা বলব। মধু খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলতে আরম্ভ করল—তাখ দাদাবাবু, এমনি এক দিনে দুবছর আগে তুর বিহা হইছিল। হামার পাকী চড়েই তুই তোর বো নিয়ে আইছিলি। তুর বোকে হামি দেখেছি। খুব সোন্দর হইছিল তুর বো। তুর সেই বোকে তুই ত্যাগ করলি দাদাবাবু? হামি জানতুম ও খুব ভালো বো ছিল রে তোর। কেনে ওকে তুই ছাড়লি রে? হামার পাকীতে ও এসেছিল যা নখখী। আর হামি আরেকজনকে হামার পাকীতে কইরে আনব? সতী নকখীকে বেসজ্ঞান দেইছি হামি, হামার এই পাকী করেই। আবার আরেকজন সেই পাকী করেই আসবে? হামার পাপ হবে না দাদাবাবু? তুই-ই বোল?—সতী নকখী বোকে তুই আর যবে আনবি না দাদাবাবু? ওর কি দোষ রে দাদাবাবু? বল না? সেই জন্তেই তো হামি পাকী দেবো না তোর বিয়েতে। তুই আবার বো আনবি আবার যদি ও বোকে তুই ত্যাগ করিস দাদাবাবু? ও হামি সহিতে পারব নি। তুর পা ছুঁয়ে বুলছি দাদাবাবু হামি পারব নি পারব নি—। হামার পাপ হবে বে। কেনে তুই তাকে ত্যাগ করলি—দাদাবাবু তুই যদি আবার তোর ও বোকে আনতে বাস, তবে—তবে, হামি হামার পাকী নিয়ে তোর বোকে আনতে বাবো। দাদাবাবু বুল, তুই তো উ বোকে আনতে বাবি? উজ্জল হরে উঠল মধুর ছুচোখের দৃষ্টি—

মধু, তা কি হয়, কেমন করে হয় রে?

—ক্যান দাদাবাবু। উ কি কোনো দোষ করছে। হামি তো শুনছি তোর বো সীতা সাবিত্রী ছিল। তবে কেনে তুই উকে আনবি না রে?

—না মধু তা হয় না, সে হয় না, সে হয় না।

—তালি তুই আর কি তুর কমলা বোকে আনবি নি দাদাবাবু?

—না। শুধু একটা "না" বলে বিজয় চলে গেল। হরত হরত মনে পড়ে গেল—

কথা। হরত বা ছুখে পেল। কে জানে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়ল কিনা? কিন্তু বা হবার নয়, তার জন্ত বৃথা ছুখে করে লাভ কি? মনের মাঝে এ রকম একটা ভাবও উঁকি মারল। বিজয় গেল, বোধ করি, এ বিষয়ে মধুর সাথে আর কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না।

মধু নিঃশব্দে সামনের দিকে পা বাড়াল।

এবারে আমাদের একটু পেছনে তাকাতে হবে।... এই তো বছর দুই আগে ধুম-ধাম করে বিজয়ের বিয়ে হয়ে গেল। মধু বাগদীর পাকী চড়ে বো এল। নাম তার কমলা। কমলা এল সুলতান লাল চেলাপরা প্রাম্যা-বধু। কিন্তু একদিন আবার মধু বাগদীর পাকী চড়েই কিরে গেল সেই সে দিনের গাঁয়ে—সেই চলে যাওয়ার পর কত দিন চলে গেল। কিন্তু রাজা চেলাপরা বধু আর কিংল না। গাঁয়ের লোক জানলো না জমিদার-বাড়ীর ব্যাপার, কেন আর বো কিরে এল না? এ প্রশ্ন তাদের মনে জেগেছিল। কিন্তু জমিদার-বাড়ীর রহস্য তাদের দৃষ্টির স্মৃতির অগোচরে। কিন্তু রহস্য লুকিয়ে থাকে না, একদিন তা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েই। তাই এই গাঁয়ের জমিদার-বাড়ীর ভেতরের ঘরেও সব শোনা গেল। এখানে তার পরিচর সংক্ষিপ্ত। জমিদার হরশঙ্কর সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘরের মেয়ের সাথে বিজয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। সে মেয়ে শুধু সুলতানী ছিল বলেই তিনি তাকে পূত্রবধু করেছিলেন। টাকা পরস্যা তিনি চান নি। জানি না এ তাঁদের প্রতি দয়া না ঐশ্বর্যের দস্ত।

কমলা অনেক দিন বাপের বাড়ী যায় না, সেই বিয়ের পর থেকে। তাই বার বার সেখান থেকে চিঠি আসে তার হৃদয়ের কাছে। সে যেন আসে একবার, কতদিন তাঁরা দেখে না। এমনি করে বছর চলে গেল, তবু কমলা এল না। তাই কমলার বাবা হরশঙ্কর বাবুকে চিঠি লিখলেন—তিনি কি তার মেয়েকে একবারের জন্তও তাঁদের কাছে আসতে দিতে পারে না? মেয়েকে কি তিনি কিনে নিয়েছেন নাকি? পিতৃশ্রদ্ধে ভরা এক অভিমান-কুকৃৎ হৃদয়ের কয়েকটা অভিমান ভরা কথার উত্তরে এল কঠোর উত্তর—আপনার মেয়েকে দয়া করে পূত্রবধু করেছি। এক পরস্যাও নেই নি। একেই আপনার ভাগ্য মনে করুন। আমাদের চোটপাট দেখানোর আপনি কেউ নন। আপনার মেয়ে আমার ঘরের বো। সে বাবে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে, আপনার কথার নয়। দারুণ আঘাত পেলেন। আত্মসম্মানে যা দিল কমলার বাবার। তাই তো শেষে একদিন ঐ মধু বাগদীর পাকী চড়েই চলে গেল জামল গাঁয়ের কমল বধু। এদিকে হরশঙ্কর বাবু এর প্রতিশোধ স্বরূপ আবার বিজয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন।

আজ তারই বাজনা বাজছে জমকালো সুরে। এ তো আনন্দ উৎসব নয়, প্রতিশোধের হৃৎকারের মতই মনে হচ্ছে এ বাজনার সুর। প্রতিশোধ। তাই সেবারের চেয়েও এবারের বিয়েতে আয়োজন অনেক বেশী। হরত প্রশ্ন উঠবে—বিজয় কেন এ বিয়েতে রাজী হ'ল? কিন্তু তুললে চলবে না সে জমিদারের বংশধর। ঐশ্বর্যের দস্তের গর্ভে তার শিরার শিরার।

মধু তার বাড়ীর দাওয়ার বসে ছিল। উঠানের জরতী গাছের নীচে বসে মেয়ে লক্ষী বাসন দাড়াইল। এ এক মাস মেয়েই আছে তার। বিয়ে দিয়েছিল কিন্তু আজ্ঞা থাক সে কথা।

খেলো হাঁকোটার মুখ লাগিয়ে জয়ন্তী কুলগুলোর দিকে উদাস ভাবে চেয়েছিল সে। হাঁকোর টান দিতেও ভুলে গিয়েছিল সে।

—বাবা ?

—কেন রে ?

—তুই আজ বাবি না ? জমিদার-বাড়ীতে। হোথার যে আজ বরবাস্তরবা বাবে। তেনাদেরকে লিয়ে তুই বাবি না। তা বাবা তোর পাড়ীটা—

—না রে নকখী আমি এবার যাব না।

—কেন বাবা ?

—পাপ হবে যে রে ?

—পাপ ? কেনে ?

—পাপ হবে না ? নকখী মাকে আমার এই পাড়ী করেই এনেছিলাম। আবার হামারই পাড়ী করে তেনাকে কিরাসে দিসে আলাম। তেনাকে বিদায় দিসে আবার—আর বলতে পারলো না মধু মধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

কুলবধু ঘুচে গেছে। ঐ কমলা বোঁ-এর মত। হরত ধরুন আলাদা কিন্তু পরিণতি তো এক। তাই মধু বাগদীর চোখের জল আজ বাবা মানে না, অ-দূর গাঁয়ের এক তারই মত হতভাগ্য পিতা ও কস্তার কথা ভেবে। যে পিতার মাঝে সে আছে নিজে আর কস্তার মাঝে লক্ষী।

সানাই-এর সুর স্তিমিত হয়ে এসেছিল, আবার জোঁর বেজে উঠল সানাই। সে তীব্র সুর মধু বাগদী সহ করতে না পেয়ে কানে আঁচুল দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল।

সানাই-এর তীব্র সুর খোলা মাঠের বাতাসের আর্দ্রে আর্দ্রে ছড়িয়ে পড়ল।

নীলগিরি

শ্রীমতী ইভা ভট্টাচার্য্য

প্রকৃতির সংগে মানুষের যে কতোখানি সম্বন্ধ ও প্রয়োজন আছে, তা বুঝতে পারা যায় যখন বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরের জগৎকে আমরা দেখি। আমরা যন্ত্রচালিত যুগের মানুষ, তাই আমরা কৃত্রিম উপায়ে গড়ে তুলেছি বড় বড় সহর। কিন্তু প্রাণীর সঙ্গে প্রকৃতির এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাই সে সুরোগ পেলে চোখ-বলসানো আবহ—এই কারণের থেকে ছুটে চলে যায় উন্মুক্ত হাওয়া ও শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচিত সুরের প্রকৃতির কোলে।

দেশ ভ্রমণ প্রত্যেক মানুষকেই আনন্দ দেয়। কিন্তু এই আনন্দ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। নানা অনুরোধ মানুষকে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে। তাই আমি এই রকম ভাগ্যহীন মানুষদের সমবেদনা জানাই। আমার স্বামী একজন রেলের কর্মচারী; তাই সুরোগ-সুবিধা কিছু থাকার বেশভ্রমণের উৎসাহও আমার আর পাঁচজনের অপেক্ষা বেশী।

সমস্তল ভূমির অনেক বড় বড় শহর আমার ইতোমধ্যে দেখা, যেমন দিল্লী, বেবে, পাটনা, কানপুর, পুণা, বাজালোর, মাদ্রাজ, কোচীন ইত্যাদি। বাঙালীর পক্ষে মহানগরী কোলকাতার উল্লেখ

যুক্ত করেনি, যতোখানি করেছে মাথেরান বা উটাকামণ্ডের পার্শ্বভা-শোভা। সত্যি, প্রকৃতির সেই মন ও নয়নমুগ্ধকর সৌন্দর্য বর্ণনার ধৃষ্টতা আমি রাখিনা। তবু ঝাঝা আমারই মত—কল্পনার চক্ষে দেশ ভ্রমণ করে আনন্দ পান, আমি চেষ্টা কোরবো আমার উটীর সৌন্দর্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তাঁদের মানসলোকে ফুটিয়ে তুলতে।

প্রথমে স্থির কোরেছিলাম, এ-বছর স্বাধীনতা-দিবস উটীতেই উদ্‌যাপন কোরবো। কিন্তু দেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাক্ষ্যমণ্ডিত করার দায়িত্ব যাদের ওপর, নগণ্য হলেও আমার স্বামী তাঁদের মধ্যেই। কাজেই গত বছরের মত এবারেও তিনি অধিকতর শ্রমের মধ্য দিয়েই ঐ পূণ্য দিনটি পালন কোরলেম। ২৫শে অগষ্ট মাদ্রাজের রায়পুরম থেকে যাত্রা আরম্ভ কোরলেও তাঁরই সরকারী কার্যোপলক্ষে পথে আর কোনোম জংশনে এক রাত কাটাতে হয়। পরদিন রাতে নীলগিরি এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে আমরা উটাকামণ্ডের পথে রওয়ানা হই। ২৭শে অগষ্ট সকালে আমরা মেট্রোলয়ম্ ষ্টেশনে উটা বাবার জন্ত গাড়ী বদল করি। এই গাড়ী খুব ছোট। ইঞ্জিন সামনে না টেনে কামরাগুলিকে পেছন থেকে ঠেলে পাহাড়ের উচ্চতার নিরে চলে। গাড়ীর মাঝে মাঝে ও একেবারে সামনে সর্বসম্মত চার জন গার্ড। প্রথমে রেললাইন যতদূর দেখা যায় সরল রেখায় এগিয়ে গেছে। পার্শ্বভা-শোভা উপভোগ করার জন্ত কামরায় খোলা জানলার কাচের শাশি স্ববন্দোবস্ত—আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেখতে পেলাম পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের একাকার অবস্থা। গাড়ী ক্রমশঃ ঘুরে ঘুরে ধাপে ধাপে উঠতে লাগলো। পাহাড়ের গায়ে থাঁজ প্রায়ই গভীর হোয়ে উপত্যকার আকার নিয়েছে। সেই খাদগুলি অতিক্রম করার জন্তে ইঞ্জিনীয়ররা নির্মাণ করেছেন অত্যাচ্চ সেতু বা ভায়া ডাট্ট। কোথাও বা পাহাড়ের বুক ফুঁড়ে স্বল্পলোকিত বা তমসাম্পন্ন সড়ক। মেট্রোলয়ম্ থেকে উটাকামণ্ডের সাড়ে আটাশ মাইল রেলপথে এইরকম বোলটি ছোট-বড় সড়ক আমসের বৃক্কে বিখ্যাত বঙ্গ টানেলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নিমেষহীন ছটো চোখ জানলার মধ্য দিয়ে আকুল আগ্রহে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে একেবারে শীর্ষদেশ পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে কী শোভা! নীল, লাল, সাদা হলদে আর কতো রঙের ছোট-বড় ফুল ও লতাপাতা ছুই পাশেই পাহাড় ছেয়ে রয়েছে। মনে হ'ল, জানিনা কোন্ শিল্পী সকলের অলঙ্ক্যে রচনা কোরেছেন এই সুরঙ্গ গালিচা। ছোট ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামলে আমার স্বামী জানালা থেকেই পুষ্পমঞ্জরী চয়ন কোরতেন।

এরই মাঝে মাঝে আবার পাহাড়ের কোন্ উপর থেকে নেমে এসেছে বর্ণাধারা। যখন তুফার্ড্ হুটি চোখ মেঘাবৃত পর্বতচূড়ার শোভা ও মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখছে, তখন গিরিদরী-বিহারিণী বর্ণাও প্রকৃতির আর এক বৈচিত্র্য দেখাবার জন্ত কল্পনামিমে দৃষ্টি আকর্ষণ কোরে চোলেছে। অঝোরঝরা বর্ণার মধুর দৃষ্টি হুহুর্ভম্ভে পর্বতচূড়া থেকে নেমে আসে ফুল ও লতাপাতার সজ্জিত নৃত্যরতা বর্ণার বৃক্কে। কিন্তু কিছুক্ষণেই সেও আবার চলে যায় দৃষ্টির বাইরে, যেমন সূত্র থেকে সূত্রের হয়ে বহুদূরে নীচে মিলিয়ে গেল কাঞ্চানার

নূর মেঘের কাছাকাছি বসে এখন আর নিছক কাব্যকল্পনা নয়। বয়ঃ নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি গভীর অরণ্য; সেখানে নূর্যের আলোও সহজে প্রবেশাধিকার পায় না। যন গভীর অঙ্গল, আর আমাদের গাড়ী উঠছে একেবারে পাহাড়ের গা বেঁধে। যতই উঠতে থাকি ততই শীত অনুভব করি। শেষে আমার ছোট কাপ্তানী শাল বার করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম। ভট্টাচার্য মহাশয় কিছু বাহাহরী করে শার্কডিনের স্যুটেই তখন পর্যন্ত বইলেন। কখনো বোন, কখনো ঘেঘ, কখনো ধুলোর মত হালকা বৃষ্টি। আমাদের পনফা মিটারগেজের গাড়ী দমকা হাওয়ার মাঝে মাঝে একটু হুগছেও। কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই সেখানকার পার্বত্য আবহাওয়ার।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট ষ্টেশন আসছে, কোমটা হিলগ্রোভ, কোনটা বা কলর। দু-একটা ষ্টেশনে আমাদের উল্লগামী গাড়ীর পাশে দেখি উপর থেকে নিম্নগামী গাড়ী এসে দাঁড়ালো। পাশের গাড়ী যখন চালু লৌহপথ বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলো, তখন কেমন জানি মনে হয় এখনি বুঝি হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়বে। আমাদের গাড়ী একক্ষণে সাইডিং ছেড়ে ষ্টেশনে ফিরে এসে আবার উর্ধ্বমুখে ঘূচ-ঘূচ

করে যাত্রা শুরু কোরলো। গাড়ীর পাটাতনের নীচে বটাং কোবে আওয়াজ হলো। এবারে কামরার নীচে বড়ির মতো দাঁতকাটা চাকা রেলপথের ঠিক মাঝে পাঠা অক্ষুণ্ণ দাঁতকাটা পাটি আঁকড়ে ধোরলো। উঁচু-নীচু লৌহপথে পাছে গাড়ী পিছলে যায় তাই লাইন বরাবর এইরকম লৌহদস্তপাটির ব্যবস্থা। তবে ষ্টেশনগুলিকে পাহাড়ের গা কেটে সমতল করা হয়েছে; তাই সাইডিং-এ কোন দস্তপাটির ব্যবস্থা নেই।

অধিকাংশ ছোট ষ্টেশনেই ষ্টেশনমাষ্টারের কোয়ার্টার প্রাটিকনের ওপরেই ষ্টেশনঘরের লাগোয়া। কাছেই লাইনের কিছু দূরে রেল-কর্মচারীদের সারবন্দী নীচু ছোট ছোট ঘর। আমাদের গাড়ী তাদের ঘরো সামনে যেতেই বাসিন্দারা সব কাজকর্ম ছেড়ে দরজায়, জানালার বা এককানি বারান্দার ভীড় করে কোঁহুলের সঙ্গে গাড়ীর যাত্রীদের পর্যবেক্ষণ কোরতে লাগলো। কিছু কেন? এ লৌহপথ ঘরে প্রতিদিনই তো কতো বার গাড়ী যায়, আসে। তবে কি তারা প্রতিদিনই কাজকর্ম ছেড়ে এইভাবে যাত্রীদের মিছিল দেখে? কিছুক্ষণ ভাবতেই বুঝতে পারলাম যে তাদের জীবনে এটুকু বৈচিত্র্যের কতোখানি প্রয়োজন। মানুষ সমাজ ও গোষ্ঠীবদ্ধ জীব কিছু অর্থোপার্জনের তাগিদায় তাদের লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়

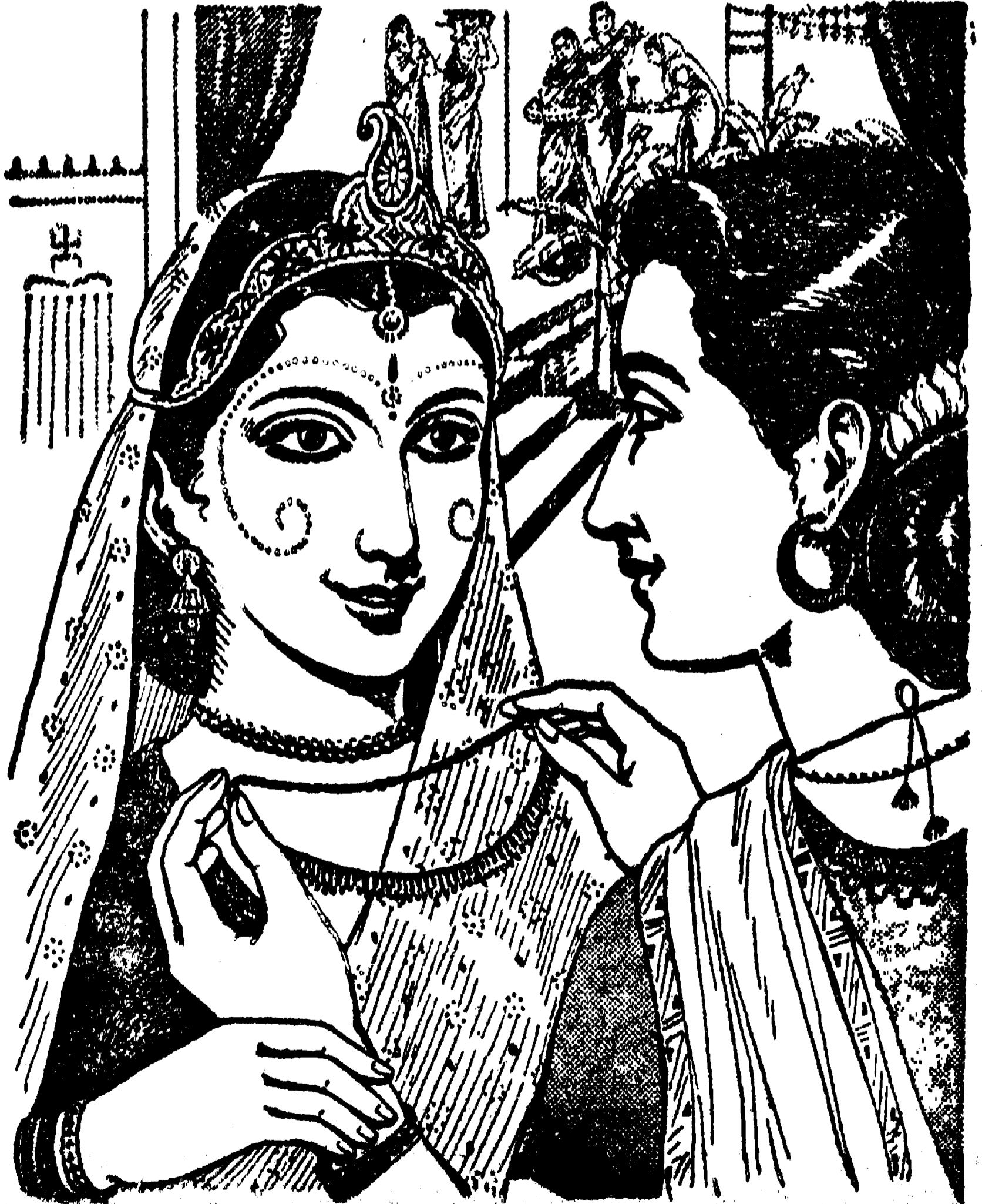
মনের কথা

"এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?"
"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, ভাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও সায়িববোধে আমমা সবাই খুসী হয়েছি।"

মুখার্জী জুয়েলার্স

দৈনিক আলোক গহনা নিরীক্ষা ও রত্ন-কর্মচারী
বড়বাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



পৰ্বতে নিৰ্জন স্থানে নিৰ্কাষিত কোরেছে। সঙ্গী মেলে না তাদের, কইতে পারে না তাদের সুখহঃখের কথা। তাই তারা সব কাজ ফেলে ছুটে আসে বিভিন্ন ভাবতন্ত্রী ও বেশভূষার বিভিন্ন মাল্লুকের চলমান শোভাবাজী দেখতে; আর শুধু দৃষ্টি-বিনিময়ে চলে স্বাবর ও জঙ্গম উভয়ের কথোপকথন।

পথ চলতে গাড়ী মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয়, তুফা নিবারণ করে। চারিধারে বড় বড় ফার্ম, ইউক্যালিপটাস, ঝাউগাছের মতো আরো বড় বড় গাছ। তারি কাঁকে কাঁকে মেঘের ফাটল দিয়ে যেটুকু বোধ পোড়েছে, বাত্মীরা অনেকে গাড়ী ছেড়ে নেমে তাই সেবন কোরেছে। গাড়ী আবার গাছে-ছাওয়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। কোরেখাটুর থেকে আসা দীর্ঘ রাস্তা সাপের মতো পাক খেয়ে খেয়ে আটপুঠে পাহাড় বেঁধেছে। জঙ্গলের মধ্যে বাতাবীলেবুর গাছ খুঁজে খুঁজে গুণছি, দেখি জমজমাট কুণ্ডর শহর এসে পোড়লো। হু'পাশে পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য ধবড়াডী, টালির ছাদগুলো দূর থেকে লাল লাল টুপির মতো দেখায়। পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত মোটরচলা রাস্তা গেছে। ওয়েলিংটনের সেনাছাউনীও পথে পড়লো; আর দেখলাম অল্পশব্দের বিরট কারখানা।

বেলা ছোটো নাগাদ আমরা লাভডেল ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। আপাতত: আমরা এখানেই নামবো। অত্যাঁক ষ্টেশনের থেকে এটা একটু বড়ো। পেছনেই নতুন বাড়ীতে ডাক ও তারঘর খুলেছে। ভাবলাম, বাত্মীর তুলতেই ধখন এতো কিছু দেখলাম, না জানি তিনদিনের অবস্থানে আরো কতো কি দেখবো। হলোও তাই।

লাভডেল ষ্টেশনের পেছনেই উঁচু পাহাড়ের ওপরে যেলের সরকারী বিশ্রামভবনে আমরা আশ্রয় নিলাম। দুসজ্জিত সেই রেট-হাটস সমুদ্রমধ্যতল থেকে সাড়ে সাত হাজার ফিটের মতো উঁচুতে। আরাম আয়েসের উপকরণের অভাব নেই। সারি সারি শোবার, খাবার, মজলিশের ঘর সবই আছে। সামনে বড়ো বারান্দা। বারান্দা কাচের আধরণে ঘেরা। বসবার বা খাবার ঘরগুলিতেও কাচের দোর-জানালা। বেখানেই বসি না কেন, বাইরের প্রকৃতির শোভা ও বিভিন্ন রূপনিবর্তন অব্যাহিত দেখা যায়। আমরা খানসামাকে চা পানের ব্যবস্থা কোরতে; বোলে শোবার ঘরে ইলেকট্রিক রেডিওটার খুলে একটু গড়িয়ে পঞ্চময় অপনোদন করলাম। বাইরের দারুণ শীত ও কমকনে ছাওয়া এড়িয়ে গরম ঘরে বড়ো আরাম পেলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার টোকা পড়লো। বেরিয়ে এসে খাবার ঘরে বোসলাম। ওয়েটার ইতোমধ্যে টেবলে বিলেতী কারদার গরম দুধ, ফ্রুটি, চা ইত্যাদি সাজিয়ে রেখেছে। পেয়ালার চুমুক দিতে দিতে আমরা কাচের দরজা, জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের পার্কভ্যাসোভার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম। মনে হলো শীতের কষ্ট আর ক্ষুণ্ণ নিবারণের তাড়া না থাকলে হয়তো বাইরে বোসে বা বেড়িয়েই বিকেলটা কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু সন্ধ্যাগমের সাথে সাথে শীতের প্রকোপ এতো বাড়লো যে 'বেশী দূরে বেতে ভরসা হোলো না। গরম চা ছাড়া ইত্যাদিতে শরীর একটু গরম হোলো না। ক্রোক চাপিয়ে বাড়ীটার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে হঠকৎ রকম তলের বাগান, ফার্ম-পাইন ও আরো অনেক পাহাড়ী গাছে ঘেরা

টিলাটি প্রদক্ষিণ করলাম। সন্ধ্যার আগেই কাচের ঘরে ফিরে এলাম।

সেই বাড়ীর পাহারাদারকে উটী থেকে তরকারী কিনতে পাঠানো হোয়েছিলো। ইতোমধ্যে সে ফিরে এলো। শীতের দেশের টাটকা ভালো শাকসব্জী দেখে আমি কবুল ছেড়ে রকনশালার ব্যবস্থা দিতে গেলাম। আমার স্বামী ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে রাস্তার সমস্ত ভার বাবুটির হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিত হোয়ে বোসে থাকতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু আমি বাত্মালী; তাই রকন ব্যবস্থার ভার সম্পূর্ণভাবে শীতে জড়সড় বিলাতী কারদাহরস্ত সেই প্রোচ খানসামার হাতে তুলে দিতে কিছুতেই রাজি হোলাম না।

কোলকাতার শীতের বাজারের মতো চমৎকার তরী-তরকারী দক্ষিণ-ভারতে বছদিন পরে পেয়েও যে কোনও জ্বলোক স্বাদগন্ধহীন বিলাতী রাস্তার তৃপ্ত হোতে পারে ভেবে আমি আশ্চর্য হোলাম। বোলতে লজ্জা নেই, আমার প্রতিবেশী এতোকণ ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে পাশের খাটে কবুলের নীচেই ছিলেন এবং অনেক অমুখোখে কবুলের নীচে থেকেই অতি কষ্টে কদাচিত্ত জবাব দিচ্ছিলেন। তিনিও এবার আমার উৎসাহে সুখকর শয্যা ছেড়ে বার হয়ে এলেন আমার সাহায্য করবার জন্ত। জ্বলোকের বিরত দেখে আমি তো অবাক! বাই হোক, মহোৎসাহে আমরা সকলে মিলে রাস্তা কোরে রাতের আহার শেষ কোরলাম।

পরদিন সকালে বাবুটি শোবার ঘরেই প্রাতঃশায়ের ব্যবস্থা কোরে দিয়ে গেলো। চা-পানের পর আমরা উটীর রাস্তা ঘরে মাইলখানেক উপর্যন্ত বেড়িয়ে এলাম। আর মাইল দুয়েক গেলেই উটীর কেন্দ্রস্থলে পৌঁছনো যেত। পথের দুধারে পাহাড়ের চূড়া থেকে পানদেল পর্যন্ত সারবাধা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দেড় হাত দু-হাত উঁচু ঘন সবুজ পাতার কফিবাগান। পিঠে ঝড়ি বেঁধে বহু মেয়ে কফিপাতা তুলছে। হঠাৎ 'পৰ্বতো বন্ধিমান ধূমাং' ভেবে পাড়িয়ে গেলাম। ভালো কোরে দেখি, দূর পাহাড়ে একজন লোক পাছের পোকা মারবার জন্ত পাল্প কোরে ডি-ডি টি ছড়াচ্ছে। আমরা এ পাহাড়ের রাস্তার পাড়িয়েও পাহাড়ে কফিবাগানের কথাবার্তা দিব্যি শুনেতে পাচ্ছিলাম। কফিবাগানের প্রান্তে ফুলের বাগিচা-ঘেরা মালিকের রঙীন বাড়ী, ভারী সুন্দর মানিয়েছিলো। রাস্তার ধারে ধারে জঙ্গলী বিলিতী বহু বা অনাদরে বর্ধিত ফুলের ছড়াছড়ি—লাল, নীল, হলদে মানা রঙের বাহার। নীচে কোন্ অজানা উৎস থেকে নির্ঝরিতী কলকল শব্দে বয়ে চোলেছে আর উপরে কানের পাশে শোঁ-শোঁ করছে ঠাণ্ডা ছাওয়া। আমাদের বেলা এগারোটোর গাড়ীতে উটী বাবার কথা। তাই গরম ওভারকোট খুলে হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে চললাম। পথে বেশ মজার ব্যাপার ঘটলো। ছটি লোক পথের ধারে জেড়া চরাচ্ছিল। দূর থেকে আমাদের আসতে দেখে একজন রাস্তার বোসে পোড়ে আর্তনাদ করে জিক্কে চাইতে লাগলো। আমরা পাশ কাটিয়ে আসতেই লোকটি তার জেড়াঘের শালে ফিরে গেলো।

হুপুয়ে হাফা গরম জায়া চাপিয়ে লাভডেল ছেড়ে উটীর ট্রেন ধোরলাম। গোটা দুই সন্ধ্যা ছাড়িয়ে প্রথমে কাপ্ছিল ষ্টেশন, তার পর উটীর বিখ্যাত লেকের ধার দিয়ে চোলে আমরা পার্বত্য রেলপথের শেষ ষ্টেশন উটাকামণ্ডে পৌঁছলাম। এখানকার ষ্টেশন

হত বড়ো। ইংরেজ-আইনের সাবকী বরবাড়ীতে সাজানো বকরকে শহর উটাকামও। আর আছে ইংরেজী ঐতিহ্যের পুরানো গির্জা ও রেসকোর্স। পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে-ধাপে সারে-সারে বা বিচ্ছিন্ন ভাবে বহু বর-বাড়ী নেবে এসেছে শহরের কেন্দ্রস্থলের সমতল পর্য্যন্ত। আধুনিক বানবাহন মোটর-বাসের পাশেই চোলেছে মোড়ার-টানা ঝটকা গাড়ী। মস্ত বড়ো বোর্ডে ও গাড়ীর গায়ে লাল অক্ষরে লেখা পোড়ে আমি আপন মনেই বোলে উঠলাম এখানেও ক্যালটেক্স।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যান্ডিতে লোক চক্কর দিয়ে আমরা বিভিন্ন রাজা-মহারাজাদের বাগানঘেরা প্রাসাদ, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও রাজভবন দেখলাম। বরোদার মহারাজের প্রাসাদে ইদানীং আঁগমন কদাচিৎ হয়, তাই বাগানে জনকয়েক মালী কাজ কোরলেও বস্তুর অভাব চোখে পোড়লো। তবে লজাপাতার বাড় কেটে ছেঁটে নানা বকম জীবজন্তু বা অন্ত রুপে সাজান হোয়েছে। তার পরে গেলাম মহীশূরের মহারাজার উদ্যানবাটিকা দেখতে। সুসজ্জিত সুন্দর প্রাসাদ, পরিষ্কার খেলার মাঠ, নানা ফুলের ভরা বাগান দেখেই বোকা যায় কাছেই মহীশূর বা ব্যাজালোর থেকে মহারাজা প্রায়ই আসেন। জমকালো দরবার-কক্ষের সিংহাসন, মূল্যবান আসবাবপত্র, কাড়-লঠন, গালিচা, বাঘছাল ইত্যাদি বিলাস উপকরণের শতাংশ পেলেও যে কোনও দরজের ভাগ্য কিরে বাবে। পুরুষামুক্রমে অপচিত সৌভাগ্য-সম্পদের সামান্য নমুনা দেখেই বুঝলাম কিছুকাল আগেও ভারতীয় নবাব-নিজামদের বিলাসব্যসনের মাত্রা কেন ভূখনবিখ্যাত ছিল।

সেখান থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভেতর দিয়ে আমরা রাজভবন দেখতে চোললাম। সুন্দর সাজান বাগান, কোথাও ইতালীয় ঝাঁচে, কোথাও বা জাপানী ঝাঁচে। বিচিত্র ফুলের ফেলা, বন্যের খেলা। কোথাও অগভীর জলাশয়ে সেতু-বাঁধা, কোথাও বা কলসী-কাঁখে নারীমূর্তি সাজানো। যেদিকেই দেখি বকরারি ফুলের ছোট-ছোট বাগান। বাগান ধাপে ধাপে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে রাজভবনের দিকে। এটি একটি বিরাট অষ্টালিকা। বড় বড় কাচের দরজা-জানলা। শোবার বসবার, পড়বার, মজলিশের বিভিন্ন কক্ষ, বিচিত্র তাদের আসবাবপত্র। এক কক্ষের সঙ্গে ককাসুরের আসবাবের ও বিভাসের কিছুমাত্র মিল নেই, কেবল আঙনের চুল্লী ও দেয়ালে দেয়ালে কাঠের কাজের আবরণ ছাড়া। রাজভবন ঘিরে সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ শোভা আর স্থানে স্থানে রং-বেরণের তারার মতো ফুটে রয়েছে দেশী বিদেশী ফুল। সামনে পেছনে কতো বকমের গোলাপ কতো রঙে চারি দিক আয়োদিত কোরে বোয়েছে। অতি বেরসিকও এতো বড়ো বড়ো গোলাপের কদর বোবে, কিন্তু একটু আদর কোরতে হাত বাড়িয়েছি কি, স্বামী দেখালেন কালোরুখে ছোট বোর্ড সাদা দাঁত বার কোরে ফুল তুলতে নিবেদন কোরছে। পেছনের টেনিস লন দুটি তারের জালে লতানে গোলাপ উঠিয়ে আড়াল করা আছে দেখলাম। রাজভবন থেকে আমরা মেবে এলাহ বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্য দিয়েই। কচি সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ মরুদানে মেঘের ছায়া খেলা কোরছে। জমপকারীদের ছোট ছেলে-মেয়েরা ছুটোছুটি কোরে খেলছে। আজকের মজা মাসুখ আমরা। বাইরে

জুতো-চটীতে পায়ের পাতা মুড়েই চলি। দীর্ঘ দিন পরে সবুজ ঘাসে আত্মীর্ণ মাটিতে অনাবৃত পায়ের হাঁটতে বোমাক লাগছিলো। তবে বাগানে বিহাররত আর সকলে বেরকম সর্কোতুলে আমাদের হুজনের জুতো-হাতে খালি-পায়ের চলার দৃশ্য উপভোগ কোরছিলেম তাতে একটু অস্বস্তি বোধ হোছিল বৈ কি। কাছেই আদিবাসী টোন্ডাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান আছে। তবে আজকের মজা মাসুখ তাদের জীবন বাপন বেরকম পশুশালায় আবদ্ধ প্রাণীদের পর্য্যবেক্ষণ করার মতো দেখে, সে কথা ভাবতে কোঁতুকের চেয়ে চুংখই হয় বেশী। উটীর হুপূরে তাপ নেই। হাতঘড়ির দিকে ভাকিয়ে দেখি বেলা আড়াইটা। কাছেই গার্ডেনের নিষ্ক্রমণের মুখেই যে হুজন পেশাদারী কোটোপ্রাফার ক্যামেরা বাগিয়ে ঠুং পেতে প্রতীকার ছিলো, তাদের নিরাশ কোরতে হোলো। স্বামী নিজের ক্যামেরাটি একবার তাদের দেখিয়েই এগিয়ে চোললেন। সিনেমা হল সংলগ্ন একটি আমিষ ভোজনালয়ে ঢোকা হোলো। শরীর তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পোড়ছে। কিন্তু হা ছন্ন! তখন আদেশ মতো বিলিভী চপচপাটা জানতেই বাড়তি কথা না বোলে আহায়ে মনঃসংযোগ কোরলাম। নেপথ্যে সিনেমা হলের মধ্য থেকে ইংরেজী গুর ভেসে চুক-বন্ধের অভাব পূরণ কোরলো।

কেরার পথে ভাবলাম, এসেছি টেনে, কাছেই সড়ক ধরে বাসেই লাভডেল ফিরবো। শহরের অক্ষ বরাবর এই রাস্তাটি কেন্দ্রস্থলে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও বাগ-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে গেছে। হুবারে ছোট বড় বহু দেশী-বিদেশী কারদায় হোটেল, বহু দোকান-পাট। পশ্যামগ্রীর জলুয়ের কোন অভাব নেই সে সব দোকানে। আর উটীর বিখ্যাত জংলী মধু ও ইউক্যালিপ্টাসের আরক তো আছেই। গুটিকয়েক সিনেমা হলে ইংরাজী তামিল ও হিন্দী ছবি চোলছে। আধুনিকতম হলটি বহু অর্ধব্যয়ে তৈরী হোছে। তবে উটীর আবহাওয়ার এরায় কশিশনের প্রয়োজন নেই। বাসে চড়ার প্রায় পনেরো মিনিট পরে ডাইভার গাড়ী ছাড়লো এবং প্রায় পনেরো মিনিট রেসকোর্সের চারি পাশে চক্কর দিয়ে পূর্বের জায়গাতেই ফিরে এলো। অবশেষে বাস শহরতলীর পথ বোরলো ও মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমরা লাভডেল পৌঁছে গেলাম।

শরীর খুব ক্লান্ত। চা-পানের পর আমার স্বামী আবার বাবুর্চির হাতে রান্নার ভার তুল কোরে আমার উফ কবলের ভেতর মুখে নিজে বাবার হিতোপদেশ দিলেন। তিনি অতিকষ্টে চোখ মুটী-খাড়া কবলের মধ্য থেকে বার করে আমার বোলে, পুনরায় কবলের মধ্যে অর্জিত হোলেন। তুললোক আমার অহুরোধটুকু কোরতে এতো বষ্ট স্বীকার কোরলেন দেখে ভাবলাম বাবুর্চিকে ডেকে বা হোক মাস ও এক তরকারী ভাত কোরতে দেওয়া বাক্। বাবুর্চি জানতে চাইলে কোন প্রণালীতে সে এই সব তৈরী কোরবে। অর্থাৎ সে কেবল ইউরোপীয়ান রান্নাই জানে। আমরা বিবেচনা করলাম কচিখুবকর ইণ্ডিয়ান না হোলোও ইউরোপীয়ান খাদে বখন অভ্যাস আছে, তখন তাই রাঁধুক। সব ব্যবস্থা কোরে দিয়ে কবল ও রেডিয়েটরের উকতার একটু গা এলিয়ে দিলাম। কিন্তু হঠাৎ এই অয়েই কি বেহাই গেলাম? পাকস্থলীতে যে জন্মিতের তাড়ন বৃত্য তর হোয়েছে তা উপশম করার লক্ষে রন্ধনশালায় অগ্নিদেব- কি কোর রাঁধুকেন তাই হুশিদ্ধা কোরছি; হঠাৎ পাটের পাতল

খয়ের জানালার বাইরে কিসের বেন শব্দ শুনলাম। কিছুক্ষণ পরে জানালার ধারেই জোরে জোরে নানা রকম শব্দ পেলাম। প্রতিবেশীকে একথা জানাতেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হোলেন না। তিনি আমাকে অভয় দিলেন, বাইরে কোনো শব্দ নেই; রেডিয়েটর খেলেও থাকে তাড়ানো যাচ্ছে না সেই প্রবল শব্দ শীত-ঘরের মধ্যেই তাঁকে আক্রমণ করেছে। সেই দারুণ প্রতাপশালী শীতের কবল থেকে রক্ষা পেতে তিনি লাল কবলের দুর্গে আত্মগোপন কোরলেন। ভক্তলোকের কাছে আর সাহাব্যের প্রত্যাশা না কোরে নিজেই উঠে জানালার বাইরে টর্চ কলে চাৰিধার দেখলাম। কেউ নেই; শুধু অপরীক্ষিত আন্ধার মতো বড় গাছ পালার ঝঁটা ধোরে নাড়ছে; গ্যারেজের টিনের দরজার ধাক্কা মেরে শব্দ কোরছে। নিশ্চিত মনে নিজের বিছানায় ফিরলাম। এককণে আমার প্রতিবেশী অভিকর্ষে দুটি চোখ বার কোরে আমার কুশল-প্রশ্ন কোরলেন।

তখন আমার রান্নার বন্দোবস্ত নিয়ে আশংকা জেগেছে। সন্দের ভৃত্য অনভ্যস্ত শীতে অসুস্থ হোয়ে পড়েছে। ডাক্তার বে পথ্যের নির্দেশ নিয়েছেন তাও তৈরী কোরতে হবে। আমার স্বামীও ততক্ষণে শীতের আক্রমণ খানিকটা সামলেছেন। তাই আমার সঙ্গে রক্তনশালার খোঁজ-খবরে এলেন। গিরে আমাদের কৃত্ত দেখার মতো হতবাক অবস্থা! বলি তাহলে ওহুন! চুম্বীর মুখে একটা পাত্রেয় ঢাকা খুলে দেখি তাতে প্রায় সের আড়াই জলে একটু মুনসহ আধ সের মাংস ও দুটি কাঁচা লংকা টগবগ কোরে ফুটছে। তবু অপর পাত্রটির আশায় ধৈর্য ধোরে তার আবরণ উন্মোচন কোরে কৃত্ত দেখার পর প্রায় জ্ঞানশূন্য হবার অবস্থা। সেখানে দেড় সের জলে বাঁধা কপির কুচো আর মুন, বাস। তার চেয়েও বড়ো দুঃখের কথা যে, আমার স্বামী রেলের লোক খাত-অখাত বিচারের বিলাসিতা তাঁর কর্মজীবনে কদাচিত্ পেয়েছেন।

পাকস্থলীস্বরত বে কোন বস্ত তিনি গলাধঃকরণ করা অভ্যাস কোরেছেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, আদিমকালের ইউরোপীয়ান ক্রিয়িদদের অকৃত্রিম প্রণালীতে প্রোট খানসামা বা রেঁখেছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার কোরে কেলাই ভালো। রাগে তখন আমার সর্গরীর অলছে এবং মুখে একমাত্র মাতৃভাষা বেরোচ্ছে। তাগাক্রমে আমার আশীর্বাদ ও অভিশাপ হুই-ই বাবুটির কাছে সমান দুর্বাধ্য। কাজেই তার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড কোরে আমরা বধন ইউরোপীয়ান সেহুলোকে ভারতীয়-খাদের উপযোগী কোরতে কোমর বাঁধলাম, তখন সে সোৎসাছে আলমারী খুলে কাচের বাসন, গ্রেট, ছুরি, কাঁটা, চামচে খানার টেবলে দক্ষতার সংগে কেতা-অনুযায়ী সাজাতে লেগে গেলো।

পরদিন সকালে শাকসব্জী কেনার উদ্দেশ্যে আবার আমরা উঠি গেলাম। মস্ত বড়ো বাজার। দোকানে দোকানে নানা রকম তরকারী ধরে-বিধরে সাজানো। শীতকালের সমস্ত আনাজই আছে। দোকানী মাজাছে নিয়ে বাবার উপযোগী কোরে বড়ো বুড়ি বেঁধে আলু, ছ রকমের কপি, টোম্যাটো, বাঁট, গাজর, ভুট্টা, পেঁয়াজ ভরে দিলো। সস্তা ভেবে এক বিঘত লম্বা ভালো মটরভাঁটি পাঁচ সের কিনলাম। কিন্তু বিলের শেষের অর্ধটা দেখে তো অধাক! অল্পসন্ধান বুললাম, সাত্বে কুড়ি টাকা হিসাবের বড় অঙ্ক

মটরভাঁটি দক্ষিণ দেশে সত্যিই দেবহুল্য। প্রবেশমুখে বিভিন্ন বাজার-দর অবস্থা তামিল ভাষায় লেখা ছিল, কিন্তু সেটা অবহাভেমে আমাদের নিরক্ষরতাকেই উপহাস করেছে।

হাতে সময় ছিলো। পায়ে হেঁটেই হুদের দিকে চললাম। পথে দু-একজন যেতাকে অধাবোহণ-অভ্যাস করতে দেখলাম। তখন রেসের সময় নয়, কাজেই ময়দান কাঁকা। হুদটি বেশ মনোরম, তবে কোভাইকানালের লেকের অভুলনীর শোভা এখানে নেই। সরকার থেকে নৌকো ভাড়া দেবার ব্যবস্থা আছে। তাতে করে আমরা ঘটাখানেক নৌকাবিলাস করলাম। আমার স্বামী সংগে মাঝি নিলেন না। নিজেই হু' হাতে কাঁড় টেনে লেকের মাঝে নৌকো বেয়ে চললেন। আমি আগে নৌকা বাইবার চেষ্টা কখনো করিনি। তিনি আমার বললেন, 'সাহস করে একবার চালাও দেখি।' এক কাঁড়ে তিনি রইলেন, অপরটা আমার দিলেন। জানাড়া হাতেও দেখি বেশ চালাছি। গত আধ ঘণ্টা স্বামীর অক্রেমে হু' হাতে হু'খানা কাঁড় টানা দেখে ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা সহজসাধ্য। কিন্তু হু' হাতে একখানা কাঁড় অল্পক্ষণ টানাতেই হাঁপিয়ে গেলাম। ভক্তলোক অমুমতি দিলেন, 'থাক, আর চালাতে হবে না।' বিছ তখন আমার বেশ মজা লাগছে, কাজেই পারে না পৌঁছানো পর্যন্ত চালিয়ে গেলাম। সে কি আনন্দ! কিন্তু আমরা হু'জন ছাড়া রোদ ও ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে লেকের বুকে তখন হু'টি বিদেশী পরিবার মাত্র নৌকাবিহার করছিলেন। একটিতে বুড়ো-বুড়ী পাঁচটি বিভিন্ন বয়সী মেয়েকে নিয়ে বৃষ্টিলেন। অপর কর্তা-গিন্নীর নৌকো তাঁদের ছোট থেকে বড়ো পাঁচ জন ছেলেতেই সোৎসাছে পালাক্রমে টেনে পাশে এনে ফেললো। পঞ্চকস্তার পিতা পাঁচ জোয়ানের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেন। আর সময় হাতে না থাকায় আমরা উঁটা ট্রেনে ফেরার পথ ধরলাম। কাজেই বাইচের শেষ দৃশ্য দেখা আর হোলো না।

বড়ো শ্রান্ত হয়েছিলাম। কাজেই লাভডেলে ফিরে অল্প কিছু আহার সেরে লাল কবলের ভেতর আশ্রয় নিলাম। প্রতিবেশী তাঁর বেঙ্গার ভেতর থেকেই জানালেন যে, খাতায় তিনি শুধু ঘর থেকে খরেই নয়, বিছানা থেকে বিছানাতে টেলিকোনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব লিখে বাবেন। এমতাবস্থায় রাত বধন দশটা, আমার নীলগিরি নৈশ শোভা দেখার প্রবল ইচ্ছা জাগে। স্বামীকে সেকথা জানলাম। আজও বোলতে পারি না সে-রাত্তে তিনি বেছার বা আমার সামান্য আশা পূরণের জন্য তাঁর বেঙ্গা ছেড়ে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে বেরোলেন। অবস্থা তিনি শীতের সংগে সংগ্রামে সাজপোষাকের কিছু বাকী রাখেননি। সর্বোপরি প্রিজকোটটিও চাপিয়ে নিলেন। অবস্থা প্রচুর গরম জামা পরা উচিতই হোয়েছিল। কারণ, বেরুতেই তীব্র কনকনে শীতের মালুম পেলাম। শন শন করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, একটু একটু পাতলা বৃষ্টিও পড়ছিল। সঙ্গে ছাতা ও টর্চ ছিল। তাবল্যাম, বধন বার হয়েছি, খানিকটা ঘুরেই আসি।

কেটহাউসের বৈজ্ঞাতিক আলো ছাড়তেই চাৰিধারে মেখে-ঢাকা জম্বাট অন্ধকার ঘেন আমাদের চেপে ধরলো। দূর পাহাড়ের চূড়ার কেবল মিশনারী কুলের কয়েকটি আলো জোনাকীর মতো ঝলছে। শ্রী শ্রীকা চালু রাস্তা হয়ে ট্রেনের দিকে নামতে লাগলাম। জান পালায় রেজিস্ট্রার বাইরে পাইল ও নানা রকম আকাশজ্বালা

গাছ ভূতের মতো কাড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে টর্চের আলোর রাস্তা দেখে নিয়ে সেই অন্ধকারে অন্ধের মতো হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু কিছু দূর যেতেই পাশের অন্ধল থেকে অজানা শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় যেন পায়ের গতি মন্থর হোয়ে এলো। কিন্তু ভবুও হেঁটে বাই, কি এক কোঁড়ালের নেশায়! গভীর অন্ধকারের অতলে ডুবে আমি কেমন না জানি দিশাহারা হোয়ে গেলাম। স্বামী বখন ডান বা বা কোন দিকের পথ ধরবেন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বললাম, 'আর না এগিয়ে ফেরাই ভালো।'

আধুনিক নগর-জীবনে বাস করে এতো নিশ্চিন্ত অন্ধকারে অভ্যাস নেই; তাই হয়তো অহেতুক আশংকায় পা হুমতম করছিল। তাই বা কেন? অন্ধকারের বুক চিরে হঠাৎ আলোর বলকানিতে চিন্তা বলমল না কোরে ভয়ই তো বাড়লো বেনী, বখন আমাদের পাশেই একটি মোটরগাড়ী রাস্তার কাড়িয়ে গেলো বিপরীতগামী অপর একটি জীপকে পথ ছেড়ে দিয়ে। নৈশ অভিবানে আর এগোতে ছঃসাহস হোলো না। গাড়ী দু'টি সঙ্গে যেতেই ক্রতপদে চড়াইয়ের রাস্তাটুকু হেঁটে বেট্ট-হাউসে ফিরে এসাম। অন্ধকারের আতঙ্ক থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে এসে হাঁক ছাড়লাম।

তিন দিন ধোরে নীলগিরির কোলে প্রাণ ভরে বেড়ানো হোলো। তার পর ২১শে আগষ্ট লাভডেল ছেড়ে রওয়ানা হবার জন্ত তৈরী হোলাম। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য সাহেবসহ বৃক্ক বিশ্রাম-ভবনের পেয়ালো সাজানো আজকের দিনে দৃষ্টিকটু বিজাতীর কুকুর ও ঘোড়সওয়ারের ছবিগুলো সন্নিবে কেলতে বিশেষ কোরে লিখলেন। দুপুর দেড়টা নাগাদ নীচে নামবার এক্সপ্রেস-ট্রেন ধরলাম। ফুলের দেশ থেকে ফেরার পথে অনেকই রকমারি চারাগাছ মাটির বা কার্টের টবে ভরে নিয়ে চোলেছেন। সারা দিনই মেঘলা। গরম জামা-কাপড় পরে আছি। প্রতি পাকে ট্রেন নীচে, আরো নীচে নামছে। চারি পাশে মেঘ থেকে অন্ন-বর বৃষ্টিও হোলছে। পাহাড়গুলোর মাঝে কাঁক-কাঁক মেঘ খেলো বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের চূড়াগুলো মেঘে মেঘে উভ্র হয়ে আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে কালিদাসের বর্ণনায় বাচ্চা হাতীর পালের মতো আন্তে আন্তে মেঘদূতেরা উঠে আসছে রৌদ্রদগ্ধ দক্ষিণাপথের হাহাকার বহন কোরে। মাত্রাজে কিয়ই আবার শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যকে তুকার্ত্ত রেল-ইঞ্জিনের জন্ত জলের সন্ধানে কতো বিনিজ্ঞ রজনী বাপন করতে হবে। আর এখানে ঘন অন্ধলের উপর পেক-ভুলোর মতো সাদা মেঘ অবাধ আনন্দে হাওয়ার গা ভাসিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমাদের গাড়ীও মাঝে মাঝে তাদের ভেদ করে নামতে লাগলো। অনেক সময় বেশ দূরে সরে এলে তখন বুরতে পারি এককণ মেঘ কাড়িয়ে এলাম। কিরতি পথে বর্ষাচ্ছন্ন নীলগিরির রূপ দেখলাম।

একটি-দুটি কোয়ে আবার টানেলগুলি পার হোয়ে গেলো, বেন কত দিনের চেনা। টানেলের ভেতরে লাইনের হুঁপালে বর্ষার জল নিকাশের নানাবিধ ব্যবস্থা। ধ্বংস নিবারণের জন্ত পাহাড়ের গায়ে রিটেনিং-ওয়ারের দেয়ালে বহু উইপ-খোল বা অক্ষহিন্ন দিয়ে কোঁটার কোঁটার জল ঝরানো হচ্ছে। চড়াইয়ের পথের অচেনা স্থানগুলো ফেরার পথে বেন বহু পরিচিত বোধ হচ্ছে। চারিপাশের খোজা নিরী

চোখে দেখতে দেখতে আমি অজানত হোয়েছি, দেখি ছোটো পাহাড়ের কাঁক দিয়ে নূর্যাবদ্রির হালকা-লাল আলো উঁকি মারছে। মুখ কসকে স্বামীকে জিজ্ঞাসা কোরলাম, 'এখন সকাল ক'টা হবে? নূর্যাবদ্রের ভোরের আলো দেখতে পাচ্ছি।'

স্বামী পরিহাসের সুবোগ নিয়ে বললেন, 'হাতে ঘড়ি বেঁধে সময়ের হিসেব নেই? নূর্যাব উঠছে না, অন্ধ বাচ্ছে?' নিজের প্রশ্নে ও তাঁর উত্তরে খুব লজ্জায় পোড়ে গেলাম। নূর্যাবের মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমার সত্যিই ঠকিয়েছেন। মেঘে মেঘে কখন বেলা গেছে, টেরই পাইনি।

নীলগিরির ঘনরন্যে নূর্যাব ও মেঘের লুকোচুরি খেলায় আমিও মনে মনে বোগ দিলাম। বখন কোনও পাহাড়ের চূড়ার উচ্চতা অস্বাভাবিক কোরতে উদ্ভ্রীত হোয়ে উপরে দৃষ্টিপাত করি, তখন নূর্যাব ঠাকুর দিগন্তবিহীন মেঘের আড়ালে লুকোন, আবার বখন কাছেই ঝুলন্ত মেঘের ভেগার মনমাঝিকে ভাসিয়ে দিই, সেই অবসরে তিনি আচম্বিতে আমার মুখে আলো কেলো টুকী দেন। শেষ পর্যন্ত সে খেলায় আমিই হারলাম। বতই নীচে নেমে এলাম, ততই পালকের মতো সাদা মেঘের আন্তরণ পূক হোলো, তার ওপরে নীলগিরির বুক তিনি কখন মুখ লুকোলেন জানতে পারলাম না। মেট পালয়র ছাড়তেই সন্ধ্যা নেমে এলো। চোখের সামনে নীলগিরি গত রজনীর নূর্যাবপথের মতো স্বতিতে মিলিয়ে গেলো।

বরষাসুন্দরী

পঙ্কজিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূসর আকাশ হ'তে ধরণীর রূপপথে
নেমে আসে বরষাসুন্দরী;
ঝর ঝর করে জল শতধারে অবিরল
ধরণীরে সুশীতল করি।
নিদ্রাভ তাপেতে হায়, জীবকুল বৃতপ্রায়
বাসবায়ু বহিছে সঘনে
পরশি শীতল বায়ু লভিলা নূতন আয়ু
বরষার স্নেহধারা সনে।
মুছা জননীর প্রায় স্নেহের পরশে হায়
জুড়াইলা তাপ-আলা সবে
ধূম পাড়ানিয়া গানে জগতে আবেশ আনে
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ রবে।
সুকেশিনী মেঘে ভাসি নিবিড় কুন্তল রাশি,
এলাইরা ধায় বায়ু-রথে
হাসির চমকে হায় সৌন্দর্যিনী শোভা পার
মিলাইরা বার অর্ধপথে।
রান ধরদীর রানি বৃত্তিতে বরষা-রাশি
বর্ষে-বর্ষে এস এ ধরায়
সঙ্গীভিত কর বিখে, নবীন বোহন দৃতে
পূর্ণ করে নবীন আশায়।

মধ্য-রাতের কবিতা প্রতিভা রায়

কী একটা স্বপ্নের পর ঘুমটা হঠাৎ বেন ভাঙল ।
কান পেতে শুনি শুধু মশকের গান ।
সে গানের হুর্ভেত্ত ভাষা আমার মনেতে
নতুন চেতনা এক আনল ।

অনুহত গুমোট রাত । বিছানায় বয়ে গেছে বান ।
সামেতে ভিজেছে দেহ । উঠে গিয়ে ছাদে দাঁড়ালাম ।
ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে উঁকি আকাশে তাকালাম ।
দেখি বেন আকাশের বুক
হুর্ভেত্ত ভাষায় লেখা কার বেন নাম ।

কের গিয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায় ।
কানে বাজে একঘেয়ে মশকের গান,
গানের কথা সাথে আকাশের তুলনা করি,
মনে মনে শুধু এক মিল খুঁজে পাই :
এই গানে বার ভাষা, তারি নাম আকাশের গায় ।

হেথা নয় বকুল বসু

চল বাই, ওগো, চল চলে বাই ।
রব না হেথায় কণকাল আর,
আর নয় সন্তাপের পায়াবার—
চল দূর হ'তে দূরে চলে বাই ।

যেখানে মায়ুব নাই, অন্ডায় বিচার নাই,
সেই দেশে চল ওগো হৃদয়ের ব্যথী,
হব দূর-দূরান্তরের সাথী—
ভেবনা কণেক আর, চল চলে বাই ।

হেথা ব্যথা-ভরা স্মৃতি জাগে বায়ে বায়, তাই
হৃদয়ে আগুন বলে—ভীবণ আগুন—
তবু ওগো এলো যে কাণন ।
সাথী ঘরা করে চল, মোরা চলে বাই ।

আজ সব মুছে হৃদয়ের গান শুধু গাই,
তুমি শুধু রবে কাছে—আরও কাছে—
ওগো, হৃদয়ের গভীরতা মাঝে ।
তবু হেথা নয় ওগো হেথা নয়, চল চলে বাই ।

বস্তি

কান্তা দাস

এখানে বস্তির ঘর
হুরহু বৈশাখে,
ঘুরা ঘোরে হ-হ করে
আগুন বাতাসে ।
ঘরের কাজ এইমাত্র সেবে
মধ্যদিনের গৈরিক প্রহরে
সুকান্তের কয়েকটা কবিতা পড়লাম ।
কবিতা ! না বেন বাবছেঁড়া পাগলা স্ফোরার গান ।
“অবাক পৃথিবী অবাক
সেলাম তোমায় সেলাম
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম ।”

তারপর ?
বৌবনের উপোসী প্রাণ
এ বেন বিক্রোহের আয়েক অভ্যুত্থান,

নিব্বাস বস্তির পাশে
এলো-মেলো কালবৈশাখী প্রেতিনীর হাসি
কচি-ককালসার শিশুর পোড়ানি,
এ বেন কুকড়ে কুকড়ে কুকুর-জীবনের অকাল মরণা
আজ
আমি দেখেছি নয়-দানবের বড় নিষ্ঠুর সীতল—
অবিবেকী অস্তি নিব্বাসন মনুষ্যের ।
তাই
বস্তির পাঁজরে পাঁজরে
আত্মকাত-মহাকাল—
বেদনার কি মহা জিজ্ঞাসা তার ;
বস্তির অস্তিম আঁধারে
যে শিশু মতুন শপথের বাণী নিয়ে কুমিঠ হবে,
সেই শিশুর প্রসব কত দূর ?

একনিষ্ঠ বলিষ্ঠতার মাঝে
সুস্থে তার যে ঘোর সঙ্গ্রামী পথ,
তাই
নয়-আটকানো বস্তির জীবন-বৈশাখে



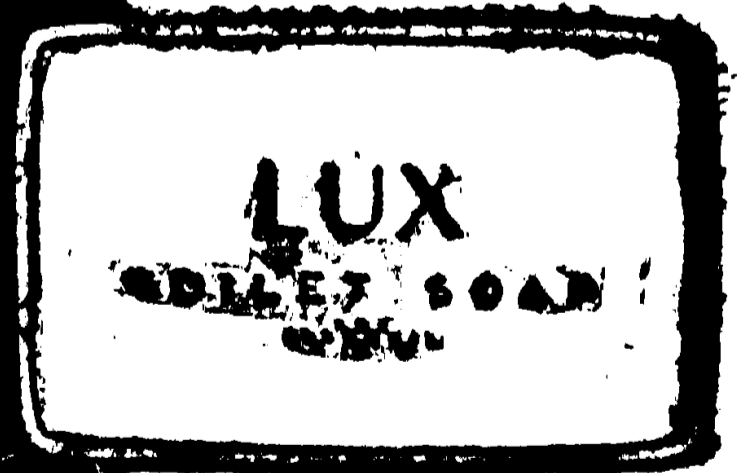
এক বলকে
সবার
চোখে...

সুন্দ
পলক
জোয়ার
রূপে

এক বলকে, চোখের পলক সুন্দ হলো, মুগ্ধ
হলে, স্নিগ্ধ রূপে তোমার। তোমার রূপে হারিয়ে আছে,
সবার চোখের দৃষ্টি... রূপ যে তোমার মারা মধুর মিষ্টি।
এখন দিনটি সবার জীবনে কখন আসে? এ প্রশ্নের জবাব
জানেন লাস্যময়ী চিত্র তারকা শকিলা। 'চেহারার
লাবণ্যতাতেইতো নারীর রূপের বিকাশ। তাইতো আমি
সুবাস উরা লাক্স ব্যবহার করি। এর কুসুম কোমল কেনার
পরশ আমার চুককে সজীব আর লাবণ্যময়ী রাখে'—শকিলা দেবীর
অবিকৃত। আপনার রূপও এমনটিই হবে—নিরমিত লাক্স ব্যবহার করুন

শকিলাকে অমরনাথের "বরাত" ছবিতে

৫২১-৬২২১২১৩৭



চিত্রতারকার বিত্ত
শুভ সৌন্দর্য সাবান
হিন্দুস্থান লিভারের দ্বারা



রাগপ্রধান বনাম বাংলা খেয়াল

অধুনা রাগপ্রধান গান কথাটি বাংলা দেশের সঙ্গীত-সমাজে বিশেষ ভাবে চালু হয়েছে। বর্তমান সঙ্গীত-সমাজের শিল্পীগণই মনে হয় এই নামকরণের স্রষ্টা। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে স্বয়ং রাখা প্রয়োজন যে—“আমাদের সঙ্গীত নিছক খেচ্ছাচারিতা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ইহা যুক্তি ও তথ্যে পূর্ণ একটি কলাসম্পদ। যাত্রা আচারভঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারাই কলুষিত হইয়াছে ও বাহ্য দৃষ্টে আমরাও নিষ্ঠাहीন, অবিদ্যমানী ও বিপথগামী হইতেছি।”

(সঙ্গীতঅনুসন্ধিৎসা)

প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রকার ও সুরকারগণ কেহই মূর্খ ছিলেন না। বয়ঃ সকলেই উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন—যা তাঁদের রচনাবলী পাঠেই জানা যায়। তাঁদের কোন সৃষ্টিই পরম্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল না বরং সুসংবদ্ধতার এক অপরূপ নিদর্শনরূপ অক্ষয় অমর হয়ে যুগ যুগ ধরে বিবাক্তিত রয়েছে।

সৃষ্টির এক ভয়াবহ মোহ বর্তমানে আমাদের পেয়ে বসেছে বা মনে এনে দেয় ঘন ঘন দলাদলি সন্ধেহের তুফান। এ প্রপঞ্চে উদ্ভবের বর্ধিত কারণ বিভিন্ন ভাবে বর্তমানে দেখা দিয়েছে। অন্তর্গত একটি হল রাগপ্রধান কি? ইহা কি রাগের বিভিন্ন প্রকাশ? খেয়াল (হিন্দুস্থানী) সঙ্গীতের পরিপূরক? বাঙালীর নিজস্ব উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সৃষ্টির প্রয়াস? বাংলা রাগপ্রধান গান ও বাংলা খেয়াল-ঠুংরী কি পৃথক বস্তু নয়? বাংলা রাগপ্রধান গানের পাশে বাংলা খেয়াল গানকে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত বলে স্বীকার করা হবে তো? রচনা বাংলা হলে কি তা খেয়াল-ঠুংরী-পদবাচ্য হবে না? তাবা দৃষ্টে কি রাগসঙ্গীত নির্ণয় করা হবে? স্বরই কি আসল নয়? বর্তমানসমাজে কি তাবা প্রকাশ পায়, না কি স্বরসমূহের নির্দিষ্ট বিজ্ঞাস দেখেই রাগসঙ্গীত নির্ণীত হয়?

সঙ্গীতের শ্রেণীবিচারে আমরা অক্ষয় হয়েছি বলেই আজ এত সূক্ষ্ম উপস্থিত হয়েছে। যাত্রাভাব্য প্রতি দরদ থাকলে রাগসঙ্গীত নির্ণয়ের দৃষ্টি থাকলে কখনই এরূপ অবস্থা হোত না। আমরা বোধ হয় এ দিকটার দৃষ্টি চোখেই হারিয়েছি।

আজ স্থির মস্তিষ্কে সঙ্গীত-সমাজকে বিচার করতে হবে রাগপ্রধান কি—খেয়াল-ঠুংরীই বা কি? এদের শ্রেণী কি আলাদা নয়?

আরোহী-অবরোহী স্থায়ী-অস্থায়ী বাদী-সহাদী-অজ-পায়কী-বিভার ভঙ্গ-কাঠ—সরকারী প্রকৃতি নির্দিষ্ট স্বরসমূহের সুবিজ্ঞাস দেখেই কি আমরা রাগ-নাম নির্ধারণ করি না? বিচার করে দেখতে হবে রাগপ্রধান কি।

প্রচলিত মতবাদ, যে গান একটি বা ততোধিক রাগসম্বন্ধে গঠিত এবং বাতে একটি রাগের প্রভাবই প্রধানরূপে বর্তমান, তাকেই রাগপ্রধান গান বলে। রাগপ্রধান গানে কোন বীধাধরা নিয়ম-কানুন মানা হয় না। বাণীবহুল হাঙ্কাধরণের আধুনিক বাঁচের রচনা দেখা যায়। বড়জোর তবটুকু খেয়ালের চালে।

কিন্তু উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের (খেয়ালে) গঠন পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের—উপরি উক্ত রীতি সেখানে প্রযোজ্য হয় না। এখানে অনেক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। নতুবা বিপুলমাত্র ভ্রুটির কলে রাগ-রাগিণী নাম-রূপ ভ্রুট হয়; উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত-পদবাচ্য হয় না। সে নিয়ম-কানুন কি? এখানে সেই গঠনকৌশলের কথা।

অর্থাৎ নির্দিষ্ট আরোহী-অবরোহী স্থায়ী-অস্থায়ী বাদী-সহাদী অজ-বিভার তান-বাট লয়কারী ও ঠাট পরিচয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শন। অস্তথায় এ গান রাগসঙ্গীত-পদবাচ্য হবে না রাগপ্রধান বা রাগপ্রধান নামই প্রাপ্ত হবে। রাগসঙ্গীতে কোন বিশেষ ভাব্যর একচ্ছত্রতা অক্ষতাবে গোড়ামী দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিবেচ্য বশতঃ অনুসরণ করা উচিত নয়—অন্ত ভাব্যর প্রতি ঘৃণাপরবশ হয়ে।

“—বদ অভ্যাসটা এমন শেকড় গেড়েছে মনের মধ্যে যে, গাইলুম হয়তো পুরোদস্তুর একখানি খেয়াল (ঠুংরী), কিন্তু তার ভাষাটা যেই হল বাংলা অমনি ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে বলে ফেললুম এটা খেয়াল-ঠুংরী নয় গো, এটা রাগপ্রধান। খেয়াল-ঠুংরী তার সুরের গড়নে ভাব্যর সংগে কি তার সম্পর্ক? কিন্তু খেয়াল-ঠুংরী গাইলেই ‘সেইরাটিকে’ না হলে আমাদের চলছে না।

.....একদল আছেন ধারা বলেন, খেয়াল-ঠুংরীর মধ্যে আবার তাবা নিয়ে ব্যস্ত হও কেন? সুরের ক্ষেত্রে ভাষাটা কিছু নয়।

ভাব্যর যদি কোন প্রয়োজনই নেই খেয়াল-ঠুংরীতে, তাহলে রামকিরি রাগের গান গাইতে ভোর কি ‘চিড়িইরাকে’ দরকার লাগে কেন? ভাব্যর দরকার আছে, তাবাকে বান দেওয়া যায় না, বান নি। তার অস্তথ্যেই, বাঙালী শ্রোতা ও বাঙালী গায়ক-গায়িকাদের অস্তথ্য তার নিজের মাতৃভাষার খেয়াল-ঠুংরী তৈরী করতেই হবে। রাগপ্রধান বলে ভয়ে ভয়ে হাজির করলে চলবে না। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, খেয়াল গান গাইছি।” (দৈনিক বসুমতী)

আজ সঙ্গীত-সমাজকে ও শিল্পীগণকে রাগপ্রধান ও বাংলা খেয়াল-ঠুংরীর শ্রেণীবিচারে অগ্রসর হতে হবে। নতুবা সঙ্কটের আকর্ষণে হাবুডুদুই আমরা থাক—বাংলা ভাষার উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সৃষ্টিতে অক্ষয় সম্ভব হয় না।

মূল্য রাখতে হবে যে, যে কোন সুনির্বাচিত উন্নত ধরণের ভাষার মাধ্যমেই রাগসঙ্গীতের বাণীবচনা করা সম্ভব। যদিও নূতন ভাষার শূন্য চরম দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ।

এ কঠিন কাজে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মূলতঃ এটি যে, রচনা ভাবসমৃদ্ধ হবে। ভাষা দাঁত-ভাজা ভারী বা খুব হালকা ধরণের হবে না।

হিন্দীর সমান সুরে বা বন্ধে গান বাঁধতে হবে। রচনা মিশ্রই ৪৬ সারির অধিক হবে না। তবেই হিন্দীর সহিত ভাবসাম্য রক্ষিত হবে—উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত-পদবাচ্য হবে। রচনা হালকা-ভারী মিশ্রিত বাণীবচন অবস্থা প্রাপ্ত হলেই এবং অলঙ্কার নিয়ম-কামুন পালন না করলেই গান রাগপ্রধান বা রংপ্রধান হবে বলে মনে করি।

অভিজ্ঞ সংগীতশিল্পীর অনুসন্ধিৎসু মন নিশ্চর বৃত্তিতে পারে যে, হিন্দী ভাষায় একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ এ ভাষার পক্ষে দীর্ঘদিন ধাবৎ অসংখ্য গবেষক ও গুণী সাধক সঙ্গীতজ্ঞের ও গান রচয়িতাগণের নিরন্তর সাহায্য—সর্বোপরি সম্রাট-বাদশাহগণের আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতা।

অধিক অগ্রসর ও উন্নত শিল্পবুদ্ধি অনুভব করিতে পাবেন যে, উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের জন্ম (অপরাপর হিন্দী-গানেও) হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন সাংগ্ৰাহক ও গুণীজন কর্তৃক আংশিক ভাবে (টুকরা টুকরা) অসংখ্য শূন্য সুনির্বাচন যেন অলৌকিক ভাবে করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা যেন কোন না কোন ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আবার দেখা যায় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে (হিন্দী-ভাষার ক্ষেত্রে) গায়কেরা লয়কারী করতে গিয়ে শব্দের বিচ্ছিন্নতা এলেও, অর্থ বিকৃত হলেও আমরা শ্রোতার বিমোহিত যেনে নিই। কিন্তু কই, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের এই উদারতা কোথায়? এক্ষেত্রে আমরা হেঁচ-চৈ করে উঠি। বুরি সব একাকার হয়ে গেল—ভাষা রসাতলে গেল। দরদ উধলে উঠল! বাংলা ভাষায় খেয়াল-তুংরী হয় না। বাংলা খেয়াল-তুংরী রচনাকারীকে ও সঙ্গীত পরিবেশনকারীকে এই ভাবে নিবৃত্ত করা হল।

বাংলা ভাষায় খেয়াল-তুংরী হয়। এ সত্য অচিরেই প্রত্যেককে স্বীকার করতেই হবে। আজ এ সত্য আমরা নিজদের স্বার্থের কারণে স্বীকার করছি না। কারণ, বাঙালী শ্রোতা তার মাতৃভাষার মাধ্যম একবার পেলে—নিজভাষার অপকল্প মোহিনী-শক্তির পরিচয় পেলে নামীদের আজ কল্পি-রোজগার কমে যাবে (কারণ স্বীকার করলেই গাওয়ার দায়িত্ব আসবে আবার সৃষ্টির কন্মতা সকলের নেই, বিশেষ করে বাংলা খেয়াল-তুংরী রচনা।)

“...বাংলা ভাষায় বিত্ত্ব খেয়ালের প্রচলন খুবই কম। বাঁহারি খেয়াল শ্রেণীর গান করে তাঁহারা হিন্দী ভাষা রচিত গান হালকা অস্তিত্বকে বিশেষ নজর দিতে চান না। কিন্তু বাংলা ভাষায় আলাংকারিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া এই ধরণের গান গাওয়া যায় কি না সে সম্বন্ধে গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়—।” (আনন্দবাজার পত্রিকা)

তাছাড়া...সঙ্গীতে রস, রাগের অধীনই হউক বা ভাষার অধীনই হউক, একথা নির্ভরতার সহিত বলা যায় যে, ‘আগে ভাব ও গবেষণা’। ভাষার মাধ্যমে এই ভাব-রসটি যেমন সহজলভ্য ও

সহজবোধ্য হয়, রাগ মাধ্যমে একরূপ হইবার সুবিধা সবিশেষ নাই। তবে এখানে ভাষা নিজ সৃষ্টির জন্ত যেমন রাগকে আশ্রয় করে, রাগও তেমনি নিজ বঙ্গকতার এক বিশেষ অলাংকার হিসাবে ভাষাকেও একান্ত আপন বোধে গ্রহণ করে।” (সঙ্গীতঅনুসন্ধিৎসা)

সংপ্রচেষ্টার মূল্য আছে। চিন্তনীর হিন্দীর মত শত শত বৎসর না হোক, দীর্ঘদিন ধাবৎ কি বাংলা ভাষার উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত রচনার অনুশীলন আমরা করেছি? তবে কেন বলা হবে যে বাংলা খেয়াল-তুংরী হয় না? ধৈর্য ধরে আমাদের সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতই অনুবিধা দেখা দিক না কেন।

তবে সাবধান জাত পাট (শ্রেণী-বিশ্বাস) যেন ঠিক থাকে। রাগপ্রধান ও খেয়াল-তুংরী যেন একাকার হয়ে না যায়। আমরা যেন অপর ভাষার নিকট উপহাসাম্পদ না হই। অবশ্য একথা নিশ্চরই বিশ্বাস করা যায় যে, বাঙালী সৃষ্টিমের গায়ক-গায়িকা (বাঁরা গুরু-স্থানীয়) আজও হয়ত অক্ষমতা বা গোড়ামীর বশে বাংলা ভাষার কার্যক্ষমতা অস্বীকার করবেন, কিন্তু সাধারণ বাঙালী শ্রোতৃ-সমাজ ও উদার সাধক গুণী ব্যক্তি ও সর্বোপরি অবাঙালী গুণী সমাজও একথা জোর করে বলা চলে যে, সত্যকার বাংলা খেয়াল-তুংরী রচিত এবং গীত হলে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন দ্বারা যেনে নেবেন।

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের মাধ্যমে মানব-সমাজকে স্বর্গীয় আনন্দের সন্ধান দেওয়া যায়। সেই সন্ধান দেবার পথ হল রাগ-বাণীবীর

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোরাকিনের



কথা, এটা খুবই আত্ম-বিক, কেমনা সবাই জানেন ডোরাকিনের ১৮৭৫ সাল থেকে দীর্ঘ-দিনের অভিজ্ঞতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার অন্তর্লিখুন।

ডোরাকিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এলগ্যান্ড ইন্সট, কলিকাতা-১

অলৌকিক সুরপথ। এ পথ ধরে গায়ক কি ভাবে শ্রোতৃসমাজকে আনন্দসাগরে অবগাহন করাবেন? সে হল শ্রোতৃসমাজের মাতৃভাষা। এই ভাষা বধন কার্যক্রে বাংলা খেয়াল-ঠুংরীর মাধ্যম হবে তখন এক অনাবিল রসান্বাদনের পুলকে ভাবে-রসে শ্রোতৃসমাজ স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করবে, তার অসীম ক্ষমতা মানুষের পঙ্কিলতা মলিনতা নীচতা অশান্তি দূর করে দেবে।

মানুষের সুরকুমার বৃষ্টির উন্মেষ হবে। সমাজের সুরহতা ফিরে আসবে। তত্ত্বমূলক গানের প্রাবল্য দেশে বাড়বে, চটুল কুৎসিত গানের অপমৃত্যু ঘটবে—রাগ-রাগিনী পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। স্বাধীন ভারতে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে মাতৃভাষার উন্নয়নে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

রাগপ্রধান গেয়ে মন যদি কিছুটা তৃপ্তি পায়—চলুক না। ক্ষতি কি? কিন্তু তাই বলে রাগপ্রধানই সব—রাগ-রাগিনী বাংলা ভাষার প্রকাশমান হলেও এ ভুল ধারণা আমরা যত শীঘ্র ভুলে যেতে পারি ততই মঙ্গল।

রাগপ্রধান এবং খেয়াল-ঠুংরী একেবারে পৃথক জিনিস বলে মনে রাখতে হবে। তবেই উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের দরবারে বাঙালীর বাংলার সম্মান বাড়বে—বাংলা দেশে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করবে। এ বিষয়ে ধীরে অগ্রণী হতে পারেন বঙ্গ-সঙ্গীতের সেই সব নামী-অনামী সাধক-সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতি আমি আবেদন জানাই। আপনারা আজ এগিয়ে এসে বাংলা ভাষাকে সাদরে গ্রহণ করুন—বাংলা খেয়াল-ঠুংরীকে স্বীকার করুন। নিজেদের সৃষ্ট সত্যকার বাংলা খেয়াল-ঠুংরী গান সর্বত্র (রেডিও, সিনেমা, সন্মেলনে, জলসাতে) প্রচার করুন, খেয়াল-ঠুংরী হিসাবেই, রাগপ্রধান হিসাবে নয়।

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে দুই ভাবে।

প্রথমতঃ—সুরের প্রতি—রাগবিভারের প্রতি—দরদের প্রতি শিল্পীর সৃষ্টির অভাব।

দ্বিতীয়তঃ—প্রদেশবাসীর মাতৃভাষার মাধ্যমে গান রচিত না হওয়া। একথা সর্ববাদিসম্মত যে, মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া প্রদেশবাসীর মুখ ভরে, পেট ভরে না। রসান্বাদনের ভাবগ্রহণের যথেষ্ট অনুরোধ ঘটে। 'আছে সবই অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়।'

কাজেই গানে ভাষা ও সুরের প্রাধান্য না দিয়ে কেবলই তান-বাটের দাপাদাপি করলে (অবশ্য সঙ্গীতের সুর ও শুদ্ধতা বজায় রেখে প্রয়োজনীয় সব কিছুই করতে হবে) ভাষা, ভাব ও অর্থ শ্রোতৃসমাজের বোধগম্য না হলে তাঁহারা যে তত্ত্বমূলক সুরাপ্রণী গান ও কীর্তনগানের আসরে অস্ত্রধার হাঙ্গা চটুল গানের আসরে হাজির হবে, তা স্বাভাবিক।

সেজন্য আমাদের আজ বাংলা খেয়াল-ঠুংরী গান রচনার ও সাধনার দ্বারা সুর আয়ত্ত করে ঈশ্বর-নাম-গুণকীর্তন করার মাধ্যমে দেশবাসীর ভিতর ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

তাই বলে ভয়ে ভয়ে অন্ধ গোঁড়ামী দ্বারা বিধেব বশতঃ দলাসক্ত হয়ে সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ধরনের বাংলা খেয়াল-ঠুংরী রচনাকে রাগপ্রধান গান বলা অথচ অজ্ঞার হবে। বাংলা খেয়াল

ঠুংরী নিশ্চয়ই হয় এবং করা যায়। একথা আজ জোর করে বলার দিন এসেছে। আমিও স্বাধীন ভাষার এ বিষয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছি গবেষণালিপ্ত সাধক-সঙ্গীতজ্ঞদের। জনৈক সাধক মহাশয়ী প্রচারবিমুখ সঙ্গীতচার্যকে আমি জানি যিনি স্বীয় শিষ্যদিগকে হিন্দী ও বাংলা খেয়ালতানে প্রতি রাগে বা পৃথক রাগে তালিম দিয়ে থাকেন। ইনি বিভিন্ন সঙ্গীত-সাময়িকী পত্রিকা মারফৎ ইহার প্রকাশ-মাধ্যমে দেশকল্যাণকামী মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি 'সঙ্গীত-অনুসন্ধিৎসা' নামক পুস্তক প্রণেতা এবং মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ওস্তাদ কাদের বকুল সাহেবের সুবোধ্য শিষ্য। তাঁর সৃষ্ট গানগুলি সত্যই বিস্ময় (বাংলা) খেয়াল-ঠুংরী স্বীকৃতি পাবার যোগ্য, একথা যুক্তকণ্ঠে দৃপ্তভাবে বলতে পারি। সে গান শিখলে সত্যই বুক ফুলিয়ে বলতে পারা যায় 'খেয়াল গান গাইছি।'

এর কারণ এই বাংলা-খেয়াল (ঠুংরী) গঠনের পদ্ধতি যা কি না হিন্দীতে অনাদিকাল থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের বিভিন্ন রাগের গানসমূহ স্বারী অন্তরায় মাধ্যমে বধন প্রকাশক্রম হয়, তখন তার মাধুর্যের তুলনা করা যায় না।

বাংলা খেয়াল-ঠুংরী গানে মাতৃভাষার ভাব-রস-অর্থ শিল্পী ও শ্রোতার বোধগম্য হয় বলে এক অপূর্ব সৃষ্টি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে। কথা উঠতে পারে—হিন্দী ভাষার মাধ্যমেও তো এরূপ হয়! কিন্তু সে কেবলমাত্র পাকা বোঝা সৃষ্টিমের শ্রোতার মনে—আপামর শ্রোতার নিকট নয় ভাষা ভাষা ছাড়া। যা কি না বাংলা খেয়াল-ঠুংরীতে স্বাভাবিক ভাবে এবং সামগ্রিক ভাবে ঘটবে।

বাংলার শিল্পীগণকে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতকে বিস্ময় ভাবে প্রচারের কাজে এগিয়ে আসতে হবে—স্বিধাশ্রিত হলে চলবে না।

বাংলা দেশে এবং উহার বাহিরে উভয় গানই গাইতে হবে (হিন্দী এবং বাংলাভাষায়)। তিনভাষীয়া কি বাংলা দেশে বাঙালী শ্রোতার সুবিধার জন্য (যাদের উপস্থিতি সর্বাধিক যে কোন অনুষ্ঠানে) নিজ মাতৃভাষা ত্যাগ করে বাংলা ভাষার গান কায়ন, তাঁদের মাতৃভাষাপ্রীতি সত্যই অতুলনীয়।

সংসদ-লোকলজ্জা ত্যাগ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে উভয় ভাষীর একতৎকা ভাষা-অনুরাগ থাকে ততক্ষণ বাংলা এবং অল্প প্রদেশে আমাদের বাংলা-হিন্দী উভয় গানই পরিবেশন করা সমীচীন বলে মনে করি। মাতৃভাষার বিকাশের প্রতি লক্ষ্য নিতে হবে, তবেই এক দিন বাংলা খেয়াল-ঠুংরী শুধু সর্বজনপ্রিয় হবে না—ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এর অনুশীলনও হয়ত ব্যাপক ভাবে সুরু হবে। এ আশা ছরাশা নয়, বিধেবপ্রসূত নয়। কারণ নিজ ভাষার প্রতি অপরিণীম ও অকৃপণ আত্মগত্য পরভাষার প্রতি ঘৃণা বোঝায় না।

বাঙালী দেশ আবার উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত অনুশীলনে সারা ভারতকে নেতৃত্ব দেবে। বন্ধিত-জননীর মুখে আবার আমরা হাসি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে।

—ঐবিক্রম চট্টাচার্য

আমার কথা (৬৭)-

শ্রীশ্রবিনয় রায়

শান্তিনিকেতন শিক্ষা-ভবনের প্রাক্তন ছাত্র—শান্তিনিকেতন স্নাতক ভবনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক—কবিগুরু শ্বেচ্ছাচার্য বর্ষা-সঙ্গীত আয়ত্ত—পারিবারিক পরিবেশে সঙ্গীত-চর্চা—আর শ্বেচ্ছাচার্য মাতার অনুপ্রেরণা—সমস্ত একত্রীভূত হইয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পিরূপে সজ্জন, সরলমনা ও বিনয়বানত শ্রীশ্রবিনয় রায়ের আবির্ভাব শ্রোতাদের মানস-পটে একটি স্থায়ী চিহ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীমায় বলেন :—

কলকাতার আমার জন্ম চই নভেম্বর ১৯২১ সাল। মাসিকগঞ্জ মহকুমার (ঢাকা) মাগুচী স্বগ্রাম। পিতা শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায় এবং মাতা শ্রীমতী সুধময়ী দেবী হলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাত আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীতানুশ্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। প্রথমে বাড়ীতে ও পরে মেট্রোপলিট্যান ইনঃ (মেন) পড়ি। বাড়ীতে ও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় মা ও মাসীমারা রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন আর আমি ছেলেবেলা থেকে তা শুনতাম। মায় সঙ্গে বাল্যকাল হতে শান্তিনিকেতনে যাতায়াত ও কলকাতার গুরুদেব প্রযোজিত উৎসবাহুষ্ঠানাদিতে যোগদান করেছি। বাঁশী বাজাতে পারতাম নয়-দশ বৎসর বয়স থেকেই। কি করে যে পারতাম—জানিনা। গান-বাজনার সুরগুলি বাঁশীতে তুলে নিতাম তাড়াতাড়ি। ছোটোখাটো অনেক জলসায় তখন থেকেই বাঁশী বাজিয়েছি। অল্পের গাওয়া গানের সঙ্গে বা একক ভাবে উহা বাজিয়েছি। পনের-বোল বৎসর বয়স পর্যন্ত গলায় গান করা বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। মনে মনে গুন-গুন করতাম—কিন্তু কেউ এসে পড়লে খেমে যেত গলা।

১৯৩৮ সালে শ্রদ্ধের শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তাঁর নিকট রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার 'হাতে-খড়ি' হয় আমার। প্রতি রবিবার সকালে তাঁর বাড়ী যেতাম। সেখানে আসতেন শ্রীসমরেশ চৌধুরী, শ্রীসুভিত্তরঞ্জন রায়, শ্রীমুনীকুমার ঘোষ, শ্রীমতী ইলা ঘোষ (মিত্র) প্রভৃতি। চমৎকার ভাবে গান-বাজনা, গল্প-গুজব, চা-পান-এর মধ্য দিয়া সময় কাটত। লোকজনের সাহায্যে গান গাইবার অভ্যাস হতে থাকে আমার সেই সময়—আর অনাদিদার ব্যক্তিগত স্নেহ, উৎসাহ-বাণী, অনুপ্রেরণা ও সফল শিক্ষার গুণে আমার আত্মবিশ্বাস জন্মাতে থাকে। তাঁর পরিচালিত তদানীন্তন কয়েকটি অহুষ্ঠানে তিনি আমাকে গানের মধ্যে নেন ও একক কণ্ঠে গান গাওয়ার সুযোগ দেন। বলে বহু-সঙ্গীত যে আমার হতে পারে—এই কথা আমি অহুভব করি অনাদিদার প্রচেষ্টায়।

পর বৎসর শান্তিনিকেতনে বাই এবং শিক্ষাভবনে আই, এস-সি ক্লাসে ভর্তি হই। রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে শ্রদ্ধের শ্রীশৈলজারঞ্জন মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। 'শৈলজাদা', সঙ্গীত-ভবনের অধ্যক্ষরূপে সুপরিচিত। কিন্তু রসায়ন-শাস্ত্রবিদ ও রসায়নাদ্যাপক হিসাবে দীর্ঘকাল তিনি শান্তিনিকেতনে নিযুক্ত ছিলেন—একথা অনেকের কাছে অজানা রয়েছে। প্রথমে বেশ কিছুদিন তাঁর কাছে রসায়ন-শাস্ত্র পড়ি। গান শেখার কথা

সকালের জন্ম মুখ ফুটে বলতে পারি নি। কিছুদিনের মধ্যে আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি টান ও সামান্য পারদর্শিতা লক্ষ্য করে তিনি আমায় বলেন, "আমাদের এবারকার বর্ষাযজ্ঞের জন্ম রোজ 'নাট্য-স্বর'-এ গান শেখাই; সেখানে তুমি এসো—অনেক গান তুলে নিতে ও পরে অহুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে।" তাঁর নির্দেশমত প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে অহুষ্ঠানের সাথে বর্ষা-সঙ্গীত শিখি আর শৈলজাদার অপূর্ব শিক্ষাদান-পদ্ধতির গুণে অল্প দিনেই আমার মধ্যে সুর-তাল-লয়ের সূক্ষ্ম অহুভূতি জাগতে লাগল এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিস্তৃত গায়ন-পদ্ধতির সন্ধান পাই। উল্লসিত লক্ষ্য করে তিনি স্থানীয় ছোট ছোট সাহিত্য-সভা ও জলসায় আমাকে একক সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ দেন। বিভাগীয় সাহিত্য-সভাগুলিতে প্রায়ই আমার ডাক পড়ত। পূর্বোক্ত বর্ষাযজ্ঞের বিহাসাল তখন পুরাদমে চলছে। একদিন শুনি, কবিগুরু বর্ষাযজ্ঞের জন্ম নূতন গান লিখেছেন ও স্বয়ং ছেলেমেয়েদের সেগুলো শিখাবেন। ১৯৩৯ সালের শ্রাবণ মাস। 'শৈলজাদা' আমাকে নিয়ে গেলেন 'উত্তরায়ণে' এবং গুরুদেবের পদতলে দিনের পর দিন ধরে পনের-বোলটি নূতন বর্ষাসঙ্গীত শিখি। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা ও আমার জীবনে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা।

১৯৪০ সালে কলকাতার কিরে চই বৎসর পরে সিটি কলেজ থেকে বি, এস-সি পাশ করি। সেই বৎসর শান্তিনিকেতনে যাই সঙ্গীত-ভবনে ধারাবাহিক ভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার জন্ম। তখন শ্রীসমরেশ চৌধুরী অল্পতম সঙ্গীতাদ্যাপক ছিলেন। সমরেশদা' রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁর সান্নিধ্য লাভে আমি খুব উপকৃত হই। গান শেখার সঙ্গে তবলা ও এপ্রাজ বাজাইতে শিখি। তখন তথায় সাহিত্যসভা, মন্দিরের উপাসনা ও বিভিন্ন অহুষ্ঠানে একক ভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করিতে থাকি। ব্যক্তিগত



শ্রীশ্রবিনয় রায়

ও পারিবারিক কারণে অল্প দিনের মধ্যে অসমাপ্ত অবস্থায় কলিকাতায় গিৰি। এখানে এসে ১৯৪২ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে অভিশন দিই ও নিয়মিত বেতারশিল্পী হই।

১৯৪৩ সালে শান্তিনিকেতন সঙ্গীত-ভবনে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অধ্যাপক নিযুক্ত হই। ইহার জন্ম আমি প্রথমে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর ও শৈলজাদার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এতদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়েছি—এখন শুধু হল সঙ্গীত-অধ্যাপনা।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে গিয়ে অল্পকাল করতে লাগলাম যে নিজের সঙ্গীত শিক্ষার ভিত্তি, অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে চলেছে। ক্লাস, রিহাসার্সাল, বৈতালিক, বিভিন্ন ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অস্থানের মধ্য দিয়ে যে কি করে সময় কাটত, তা বুঝতেই পারি নাই। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সঙ্গীত শিক্ষাও চলত। ইন্দিরা দেবীর নিকট পুরানো ব্রাহ্মসঙ্গীত ও শৈলজাদার কাছে অনেক দুস্ত্রাণ্য গান শিখতে থাকি। রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অহুসার ইন্দিরা দেবী জাগিয়ে তোলেন। এই পৌর মন্দিরের উপাসনার, বর্ষামঙ্গলে, বসন্তোৎসবে ও মাঘোৎসবে আমি একক সঙ্গীত করি। স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী ও স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভের সুযোগ আমার ঘটে সেখানেই। তাঁদের কাছ থেকে সঙ্গীতসম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও উপদেশবাণী আমার চির-পাথর। আমার সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে কপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরচিত্রা মিত্র, নীলিমা সেন, অরুণভী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৪ সালের শেষ ভাগে শান্তিনিকেতন 'হেডে এসে ইণ্ডিয়ান ট্যাটিস্টিক্যাল ইনঃ এ কাজ নিই। সেই সময় ভবানীপুর পীতবিতানে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হই ও ১৯৪৫ সালে স্থাপিত উহার উত্তর কলিকাতা শাখার কাজ আমার তত্ত্বাবধানে চলিতে থাকে। এই সময়ে শ্রীমুখেন্দু গোস্বামীর সহায়তার তাঁর গুরুজী সঙ্গীতচর্চা

পিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তীর সান্নিধ্য লাভ করি। তাঁর কাছে রা খেলায় শিখা করি পরে মুখেন্দু বাবু ডালিম দেন। প্রমে শ্রীমেশচন্দ্রে বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বহুদিন বিষ্ণুপুরী-স্বরায় ক্রন্দ-ধারায় শিখি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রে এগুলি কতখানি সহায়ক হয়েছে—তাহা ভাবায় প্রকাশ করা যায় না।

এচ, এম, ভি ও কলাধারা রেকর্ড কোম্পানীতে বহু বৎস আমি 'ট্রেণার'এর কাজ করি। কলাধারাতে আমার গাণ্ড রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দু'খানি রেকর্ড আছে।

কয়েক বৎসর পরে আমি 'দক্ষিণী'তে অধ্যাপকের কাজ নি এবং ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে প্রোগ্রামারিক হিসাবে শিক্ষা নেবা জন্ম ইংল্যাণ্ডে বাই। তথায় দেড় বৎসর অবস্থান কালে লণ্ডন অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লেটোর, চিগওয়েল (এসেক্স) ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অস্থানে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করি—রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে বক্তৃতা দিই—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অস্থান পরিচালন করি। চিগওয়েলে অনুষ্ঠিত বিশ্বব-উৎসবে (Reporting bac function) আমি রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করি। এছাড়া লণ্ডন বি-বি-সি কেন্দ্রে হ'তে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়েছিলাম।

১৯৫৩ সালে বিলাত থেকে ফেরার পর I. S. Instt.এ প্রোগ্রামারে যোগ দিই ও বর্তমানে আমি উহার 'মিউজিয়াম'এ তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত আছি।

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে চাঁদপুর বাবুরহাট নিবাসী শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রথম কন্যা ইন্দিরাকে বিবাহ করি।

১৯৫৫ সালে উত্তর কলিকাতায় "গীতবীথি" রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি উহার প্রতিষ্ঠাতা-অধিকর্তা ও অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত আছি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিস্তৃত গায়কীয় সম্যক প্রচার ও প্রসার শ্রীমুখিনরায়ের শিল্পজীবনের বর্তমান কর্মধারা।

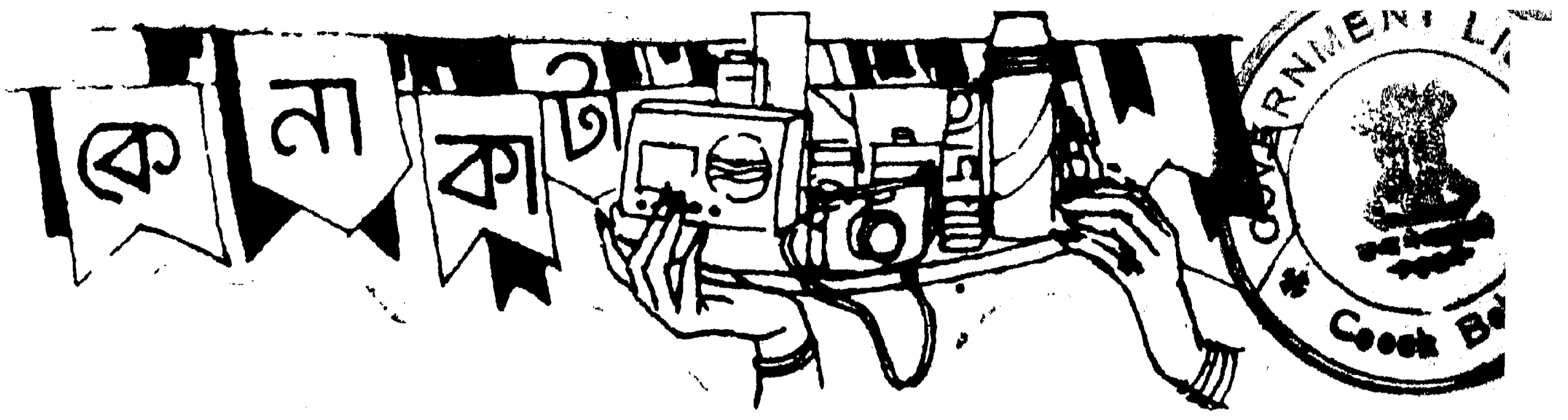
সবুজ বনের ছায়

"Under the green wood tree"

—Shakespeare

সবুজ বনের নিছক ছায়
আমার সাথে রইতে চায়
পাখীর সাথে সুর মিলিয়ে
মনের কথা কইতে চায়
চলিয়া আয়, চলিয়া আয়, চলিয়া আয়।
হেথায় কোন শত্রু নাই
নাইকো কোন অর্বাচীন
হেথায় শুধু বহা-বাতাস ঠাণ্ডালাগা শীতের দিন।

উচ্চ আশা ত্যাগ করিয়া
বোদের' পরে পৃষ্ঠ দিয়া
বাঁচার মত আহাৰ নিয়া
তুণ্ডই বাবা থাকতে চায়
চলিয়া আয়, চলিয়া আয়, চলিয়া আয়।
হেথায় কোন শত্রু নাই
নাইকো কোন অর্বাচীন
হেথায় শুধু বহা-বাতাস ঠাণ্ডালাগা শীতের দিন।



সিগার ব্যবহার—কয়েকটি কথা

ধূমপান সকল সমাজে বা সকল দেশেই চলতি আছে এবং সে এ-যুগেই নয়, যুগ-যুগান্তকাল আগে থেকেই। তবে এইটুকু যার যে, আগে যেমন ছাড়া বা গড়গড়ার তামাক-সেবনের পকতা ছিল, এখন সে-টি তুলনার কমেছে। সেহান ক্রমে দখল হচ্ছে বা করছে সিগারেট ও বিড়ি আর তার পাশাপাশি পাইপ সিগার।

আমাদের দেশের তুলনার আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলিতে এর ব্যবহার অনেক বেশি। বুটেনের জনপদসমূহে প্রচুর ককে সিগার সেবন করতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর ধূমপায়ীরা সিগারেটের চেয়েও সিগার খেয়ে বেশি আনন্দ পান। অবশ্য এর মনে কতকগুলি সুক্তিও তাদের দেখাবার রয়েছে। ভালো ত্র্যাণ্ডের আর ভালো মেজাজ এনে দিতে পারে নাকি সহজেই।

ইংল্যাণ্ডে সিগার-তৈরীর ছোট-বড় কারখানা রয়েছে বেশ কটি। তবে এ সকল কারখানায় যে-সব সিগার উৎপাদিত সেগুলির প্রয়োজনীয় তামাক (পাতা) আমদানী করা বাইরে থেকে। আভ্যন্তরীণ এই ব্যবস্থাতেই বুটেনের আর-চাহিদা কিছু মেটে না। বুটেন তৈরী করা সিগার আমদানী থাকে কিউবা, জামাইকা, হল্যান্ড, ও সুইজারল্যান্ড। তবে কিউবা ও জামাইকার কারখানায় উৎপাদিত আবার দাম একটু বেশি—হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের সিগার সেই তুলনার কম দামেই বিক্রি হয়। সেজন্মে জামাকে ডাচ, সুইচ, বা ব্রিটিশ-ত্র্যাণ্ড সিগারই হাতে তুলে ত দেখা যায় বেশি, দামের প্রায় হাড়া এর গছটাও একেজন্মে দর কাছে পুথকর বলে প্রায়।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সিগার উৎপাদন-কেন্দ্র বলতে পারা যায় স্পেন। এখানে তৈরী সিগারের বিশেষ এই যে, এখানকার কারখানাগুলিতে সিগার উৎপাদনের জন্মে যে তামাক প্রয়োজন হয়, সম্পূর্ণটা সে দেশেই (কিউবা) পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের কারখানার ভার হাজানা কারখানাগুলিকে বাইরে থেকে তামাক আমদানী করতে হয় না মোটেই। হাজানার কুশলী যত্নের হাতেও সিগার তৈরী করে থাকে—যার পরিমাণ গাছ কম নয়।

জামাইকার যে সিগার-শিল্প গড়ে উঠেছে, সেটি অবশ্য তুলনার নিকট। বৃহত্তর কালেই এখানকার কারখানাগুলি অধিক বিলাসিতা করে। সিগারসেবীদের একটি দল আছে, তারা হাজানা আবার পুথকর, আবার আবার এক প্রকার পছন্দ করে জামাইকা

ব্র্যাণ্ড। হাজানা ও জামাইকা বাদের কাছে সমভাবে আদৃত, এমন লোকের সংখ্যাও আজকের দিনে অবশ্য কম বলা যায় না। শুণে, গন্ধে, স্বাদে যেটি ভালো বলে স্বীকৃত হবে, তার বাজার সর্বত্র নিশ্চিত।

সিগারের বহিরাবরণ কালো হলেই যে খেতে ভালো হবে না, এমন কোন কথা নেই। অন্ততঃ নিয়মিত সিগারপায়ী যারা, তারা এইটুকুর দ্বিধাই বলতে পারবেন। আসল কথা হলো, যে সিগারটি খেতে হাতে নেওয়া হলো, তা কোন্ ত্র্যাণ্ডের, কোন্ কোম্পানির। চালু ত্র্যাণ্ড বা কোম্পানির জিনিস হলে ব্যবহারে আনন্দ পাওয়া যাবেই, এ প্রসঙ্গীত। মোটের ওপর রংটাই যে বড় কথা নয়, প্রাচ্যের বর্মী চুরুট থেকেও তা বোঝা যায়। বহুদিন থেকেই বর্মী চুরুটের একটি বেশ বড় বাজার রয়েছে।

সব কারখানাতেই একই কোম্পানির সিগার তৈরী হয় না, সাইজও হয়ে থাকে এর বিভিন্ন ধরনের। সাড়ে তিন ইঞ্চি থেকে প্রায় সাত ইঞ্চি পর্যন্ত সিগার দেখতে পাওয়া যায় বাজারে। বিভিন্ন সাইজের সিগারের নামও বিভিন্ন, দামও স্বভাবতঃই বিভিন্ন। এই শিল্পটি বর্ত দিন বাবে ততই সম্প্রসারিত হবে এবং সিগারেটের সঙ্গে এর চলবে পালা, এইটুকু বলতে পারা যায়।

মানুষের স্বাস্থ্য ও চুল

দৈহিক-সৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ চুল, এ নিয়ে প্রায়ের অবকাশ নেই। চুল বধারীতি আঁচড়ানো বা সুরিন্যস্ত না থাকলে, যথেষ্ট কালো ও ঘন না রাখতে পারলে, মুখশ্রী একটু হলোও স্নান হতে বাধ্য, আর সে নারীদের তো বটেই, পুরুষদেরও। এখানে মানুষের স্বাস্থ্যের সাথে চুলের সম্পর্ক কতখানি অর্থাৎ সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো-মন্দ থাকার ওপর চুলের ভাল-মন্দও নির্ভর করছে কিনা, পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

অমনি মনে করা যায় এবং সে ধরনের দাবী অবাস্তবও নয় যে, মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো থাকলে চুলও ভাল থাকবে, আর স্বাস্থ্য খারাপ হলে পড়লে চুলের ওপর এর প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না। এ দিক থেকে চুলকে অনারীসেই একটি স্বাস্থ্য-নিরূপক 'ব্যারোমিটার' বলা চলতে পারে। সুতরাং চুল সুরক্ষিত রাখতে হলে টাক-পড়া বা অকালপকতার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে চুলের নিয়মিত বন্ধ বেহন চাই, তেমন প্রয়োজন সাধারণ স্বাস্থ্য মজবুত রাখা, শারীরিক সায়র্থা অটুট রেখে চলা।

কিন্তু এই মাত্র চুল ও স্বাস্থ্যের সম্পর্ক বিষয়ে যে সাধারণ নিয়মের কথা বলা হলো, এর ব্যতিক্রম যে হয় না বা হবে না, এমন নয়।

স্বাস্থ্য ভালো আছে, চুল খারাপ হয়ে গেলো, পাক ধরে গেলো অকালেই, এরূপ দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে অল্প। আবার চুল সাধারণ বেশ ঠিক আছে, অথচ সাধারণ স্বাস্থ্য পড়ছে ভেঙে এমন দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল বলা চলে না। কাজেই প্রসঙ্গটি আরও নিবিড় ভাবে দেখান-প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, স্বীকার না করে উপায় নেই।

টাক বা পাকা চুলের ব্যাপার নিয়ে স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা গবেষণা করেছেন, এ যাবত কম নয়। কোনটি কেন হয়, সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতিই এর জন্মে সম্পূর্ণ দায়ী কি না, এ সম্পর্কে ইউরোপীয় শরীর-বিজ্ঞানীরাও চিন্তা-আলোচনা চালিয়েছেন অনেক। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্তে কত ধরণের ওষুধপত্র, টনিক, টেবলেট আবিষ্কৃত হয়েছে, ইয়ত্তা নেই। নানা জাতীয় তেল ওষুধ বের করা হয়েছে চুল মুন্দর ও সতেজ রাখবার জন্তে, এর ক্ষয় ও অস্বাভাবিকতা রোধ করবার জন্তে। এতে কতটা কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে, তা অবশি পৃথক আলোচনার বিষয়।

চুলে অকালে পাক ধরলেই স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ছে বুঝতে হবে কিনা, প্রসঙ্গত এই প্রসঙ্গটি সামনে রাখা যায়। বিলেতের কতক বিশেষজ্ঞের দাবী এব্যাপারে আমাদের সাধারণ দাবীকে একরূপ উড়িয়ে দেয়। সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয়, অল্পবয়সে চুল সব যদি শাদা হয়ে যায়, শরীরের সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন কঠিন রোগ থাকবে। কিন্তু উক্ত বিশেষজ্ঞ-মহল বলতে চান যে, সাধারণ স্বাস্থ্যের সাথে পাকা চুলের সম্পর্ক অল্পরূপ। কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের ভেতর যদি মাথা শাদা হয়ে যায়, তাতেও যাবতাবার কিছু নেই। পরন্তু বুঝতে হবে—এইটি নিশ্চিত ভালো স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

মাত্র কয়েক বছর হলো পাশ্চাত্যের কতিপয় চিকিৎসক এই জিনিসই আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা দাবী রেখেছেন—বৌবনে বাদে চুলে পাক ধরে যায়, সাধারণ স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্ক যথেষ্ট তা প্রায়ই হয় না। বাপ-মায়ের দিকে এমনটি দেখানো আগেই থাকবে, সেখানে এই অকালপকতা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, ভাববারও নয়। তাঁদের দাবী—এমন বহু শতবর্ষীয় বৃদ্ধকে তাঁরা দেখেছেন, বাদে মাথা হয়ত শাদা হয়ে গিয়েছিলো এমন কি বিশ বছর বয়সও হতে না হতেই।

রাতারাতি চুলে সব পাক ধরে গেল, এই জাতীয় ব্যাপারও যে না হয়, বলতে পারা যাবে না। অতিমাত্র উদ্বেগ বা দুঃখ এসে হাজির হলে অর্থাৎ মনের পর্দায় সহসা প্রচণ্ড আঘাত পড়লে চুল দেখতে না দেখতে শাদা হয়ে যেতে পারে। বৌবনেই কারো যদি এমনি ছুঁপিপাক হয়, সে নিশ্চয়ই সাধারণ-স্বাস্থ্যের কারণে হলো না। প্রৌঢ় অতিক্রম করে বার্দ্ধক্যের কোঠায় পৌঁছার পর কারো মাথা শাদা হয়ে পড়লে প্রশ্ন ওঠে না তখন। কেননা, এ একটি স্বাভাবিক অবস্থা—শারীরিক অবনতির সঙ্গে এর যোগাযোগ খুব নিবিড়, সহজেই অনুমেয়। চুল বিবর্ণ হাতে না হয়ে যেতে পারে, সেজন্তে উপযুক্ত বস্ত্র ও চিকিৎসার দাবী উপেক্ষা করা চলে না।

ভিটামিন ব্যবহার ও অন্যান্য প্রক্রিয়া মারকত উপকার দেখা গেল অনেক ক্ষেত্রে, সে-ও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।

ফুল ও অন্ধকার

অল্প সব প্রাণীর জায় গাছকেও বাঁচতে হলে আলো চাই সূর্যরশ্মি চাই। গাছে ফুল ফোটার দাবী রাখলে আলো না হলে সাধারণতঃ চলবেই না। কিন্তু আলো যেমন চাই, অন্ধকার চাই—এইরূপ বললে হেঁয়ালি ঠেকতে পারে। অথচ সম্প্রতিকারে উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের গবেষণার ধরা পড়েছে, গাছ পুষ্পিত হতে হলে আলো-আঁধার দুই-ই সমভাবে প্রয়োজন।

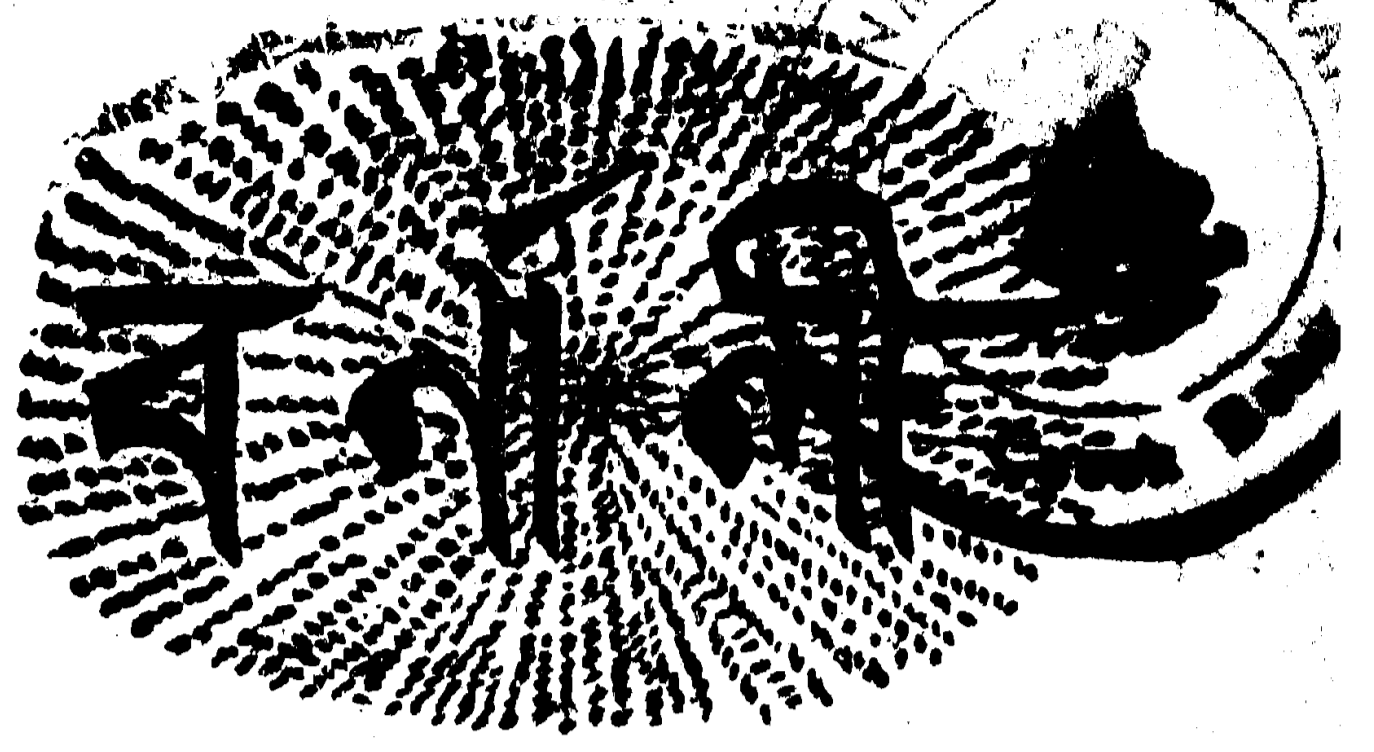
পরীক্ষা করে সত্যি দেখা গেছে—পরিমিত অন্ধকারের অভাবে সবল গাছ-গাছড়াতেও ফুল ফোটে না কিংবা সেই সকল গাছ মুকুলি হতে বাধা পায়। এই ব্যাপারে রাত্রির অন্ধকারের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পত্র পুষ্পে গাছের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্তেই আলো পাশাপাশি থাকতে হবে অন্ধকার।

বিশেষজ্ঞদেরই অভিমত—দিন-রাত্রি প্রায় সমান না হলে গাছের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব হয় না। এইজন্য দিনের আলো অল্পপাতে রাত্রির অন্ধকারও দরকার, বলা হচ্ছে। কতকগুলি গাছ অবশি দিনান্তে অল্প সময়ের জন্ত অন্ধকার পেলেও পুষ্পিত হয় কিন্তু সব গাছের বেলায় এই নিয়ম বা বিধান খাটে না। অনেক ক্ষেত্রে ফুল যদিও বা হলো পর্যাপ্ত অন্ধকারের অভাবে বীজ পাওয়ার ভরসা কমে যায়। আবার, বীজ না হলে নতুন গাছের সম্ভাবনা বিলীন হয়ে পড়ে আপনি।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নেলর ফুলের জন্তে অন্ধকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এর ভেতর গবেষণা করেছেন। দাবী রাখ হয়েছে—এব্যাপারে দিনের বেলা কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করে গাছের ফুল ফোটার সহায়তা করা যেতে পারে কিন্তু রাত্রিতে কৃত্রিম আলো করে কোন গাছকে রাখা হলে দেখা যাবে তা মুকুলি হচ্ছে না। তার কারণও স্পষ্ট-অন্ধকারের মেয়াদ সেক্ষেত্রে কমে যায় বলেই এমনি ঘটে থাকে।

আলোচ্য বিষয়ের গবেষণা এখনও শেষ হয়ে যায়নি, গবেষণা সূচনা হয়েছে মাত্র। অন্ধকারের দীর্ঘ স্থায়িত্বে গাছের জীবনে ওপর কি ভাবে প্রতিক্রিয়া হয়, সে সম্পর্কে বিলেতে চিন্তা আলোচনা চলেছে এখনও। অন্ধকার আলোর অভাব জনিত পরিহ্রিষি ছাড়া কিছু নয়। এই অন্ধকারে এমন কি উপাদান আছে, যা জন্তে গাছ বর্ধিত ও পুষ্পিত হতে পারে? বৃটেনের জায় আমেরিকাতেও এই নিয়ে গবেষণা কম চলছে না। বা হোক এটা সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে যে, গাছের পক্ষে দিনের আলোর জায় রাত্রির অন্ধকারও আবশ্যিক। একটানা শুধু অন্ধকার হলেও চলবে না, সূর্যরশ্মি থাকলেও নয়। একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে হলে চললেই ফুল ঠিক ভাবে ফুটবে। কেন, পূর্বেই বলা হলো এ উক্তর এখনও গবেষণা-সাপেক্ষ।

The nose of the bulldog has been slanted backwards so that he can breathe without letting go.
—Churchill.



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

স্বড়-স্বড় শব্দে ট্রাম এগিয়ে আসতে লাগল। কত নম্বর? গলা বাড়িয়ে, মাথা কাত করে গাড়ীর নম্বরটা দেখতে চেষ্টা করল মঞ্জু। 'পঁচিশ'। যদিও বাঙ্কবীর ওখানে বাবে বলে উল্টো পথে অনেকটা দূরই চলে এসেছে, তবু লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে 'পঁচিশ নম্বরে' চেপে বসলে বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে রক্ততের ওখানে পৌঁছে তার হোটেলের করিডোর-পথ অতিক্রম করে রক্ততের দরজায় টোকা দিতে পারে সে। ডাইভার ব্রেক কবে গাড়ী থামাল। যারা নামবার ভিজে-পথে সতর্পণে পা ফেলে নামল। যারা উঠবার তারা তেমনি সতর্পণে পা ফেলে হাতল ধরে উঠল। পা বাড়ালেই ট্রামের চম্বর। হু'জন ভ্রমলোকের মধ্য দিয়ে মাথা গলিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ল মঞ্জু। কিন্তু না—ট্রামটা যখন মোড়ের মাথায় বাক ঘুরে চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মঞ্জু বুকল ও ট্রামে চাপেনি। হাঁ, শরীর দিয়েই বুকল মঞ্জু, ও যায়নি। দোকানঘর থেকে নেমে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

অবচেতন-মন যেখানে একেবারে ট্রামে চেপে বসেছিল, মঞ্জুর চেতন-মন কিন্তু সেখানে বৃক্কে উঠতেই পারলে না। রক্ততের হোটলে বাওয়ার মতো একটা উদ্ভট আশ্চর্য চিন্তা ওর মনে কি করে এলো। ভাবলো, হবে হয়তো নীলকে ওর হঠাৎ-উপস্থিতি দিয়ে চমকে দেবার কথাটাই ওকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার কথা—ওকে দেখে যে আজ শুধু চমকেই উঠবে না, দেখেও বিখান করতে চাইবে না।

চিন্তা আর স্বপ্ন আনাগোনার অর্থ বিশ্লেষণ আমরা বড় একটা করিনে। যখন করি, তখনও এ ভাবেই করি। এতে কিছু অর্থ যে বোঝা না যায়, তা নয়। কিন্তু সবটা যায় না। গূঢ় অর্থ মনের নিগূঢ়ই থেকে যায়। মঞ্জুরও যে তাই গেল না কে বলবে! অপথের মনস্তত্ত্ব বোঝার যত অহমিকাই করুক, সে সত্য নিজের মনটাও ধরার মধ্যে থাকবে এমন কোন কথা নেই। ডাক্তার কি তার নিজের রোগ ডাক্তার বলেই ধরে উঠতে পারে? না ডাক্তার, ডাক্তার বলেই নিজেই চিকিৎসার সুবিধা করে উঠতে পারে? গভীরে যদি এমন কোন কথা থেকেই থাকে মঞ্জুর যে, তার এই বাওয়ার ইচ্ছাটা রক্ততকে বিন্দুরে অতিক্রম করে দেওয়া ছাড়াও আরো কিছু নিভৃত-অর্থ বহন করে। মঞ্জু তা নির্ণয় করে উঠতে পারেনি—তার জন্ম অর্পোরবের কিছু নেই। মনের অপ্রকাশিত অংশই প্রকৃত এবং জোরালো এ বিখাসে ভ্রান্তি আছে। অনেক সময় তা আদর্শেই ঠিক নয়। মঞ্জুর ক্ষেত্রে তো নয়ই। কারণ, যে গ্রাহ্য করাটা বিদিত-অবিদিত বাহুরে চলা-ঘেরাকে কাটছাঁট করে চলে, সেই গ্রাহ্য করাটাই ওর চরিত্রে অসুপস্থিত। ও যখন বেটা করে বৃক্কে হবে অন্তরে বাইরে সেটারই প্রাবল্য চলছে। তাই মাতাল আকাশের দিকে চোখ পড়তেই ট্রাম থেকে নামিয়ে নীলের ওখানে নিয়ে চলেছে মঞ্জুকে তার মনের যে ব্যক্ত-অংশ, মনের অব্যক্ত-অংশের কাছে তার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

হু'-তিনটে ট্রাম এলো, থামলো, চলে গেল। গেল কয়েকটা বাস। আর্টের-বি, বাসের অপেক্ষার দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু।

একটা ঝিরঝিরে বৃষ্টি ভারী কুরাশার মতো উড়ে চলে গেল শরীরের উপর দিয়ে। ভিজে শরীরে বাতাস ঝাঁক ধরিয়ে দিলে। আঁচলটা পারে জড়িয়েও আরাম হলো না। একবার বৃষ্টিটার যে সাধারণ জোর ধরেছিল। জরাজ ইন্ডের কাচের শার্শি ছইয়ে

জামা আর শাড়ী কিছুটা ভিজিয়ে দিয়েছিল। তা এখনও শুকায় নি—একটা মস্ত হাঁচি বেরিয়ে এলো। হাতে কবাল নেই। ব্যাগটা নাকে-মুখে চেপে ধরে বিজানসমত হাঁচি দিল মঞ্জু। পাশের আনমনা ধূমপানরত ভ্রমলোকটি চমকে উঠলেন। একটা খালি ট্যান্সির ডাইভার ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে গাড়ীর গতি মন্থর করল। ডাকবে? ক'টা টাকা বাবে কিন্তু সময় বাঁচবে অনেক। আজ তার ব্যাগে টাকা আছে। জয়ার কিছু ওষুধপত্রের বাকী বিল মিটিয়ে দেওয়ার জন্ত নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মমতায় সজে দেখা না হওয়ার দিতে পারেনি। মমতা আজ একটা জরুরী কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ততক্ষণে ট্যান্সি দূর। সামনে দাঁড়িয়ে ঝকঝক শব্দ তুলছে—বাদবপুরের বাস। একগাদা ভিড়ের সজে-সজে পায়-পায় চলে গিয়ে বাসে উঠে পড়ল সে। ব্যাগটা বুকের উপর চেপে ধরে ভিড়ের চাপের মধ্যে লেপটে দাঁড়িয়ে রইল।

নীলকে যদি না পার বাড়ীতে? যদিও সে জানে সাধারণতঃ নীল বিকেলে বাড়ী করে আর বেহোর না। নিজের কাজ নিয়ে থাকে। তবু সংবাদ না দিয়ে এলে বাড়ী না পাওয়ার যে একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়—সটা তো আছেই। যদিও পাওয়া বাবে এই আশাতেই বাড়ে—তাই বলে নীলকে বাড়ী না পেলেই কি ওর এই বেরিয়ে পড়া বুঝা কষ্ট ভোগ করা হবে? না। বাসে ঘুরতেও ওর অপূর্ব লাগে। জানালার ধারটিতে একটু বসবার জায়গা পেয়ে বাইরের দৃশ্য—চোখের ওপর নিয়ে ছুটতে পারলে তো কথাই নেই—অপূর্ব! আরো অপূর্ব যদি দিনটা হয় বৃষ্টি-মেঘ-বদলের। উঃ—ভ্রমলোকটি একেবারে ওর পা'টা মাড়িয়ে দাঁড়িয়েছেন। ব্যাধার মুখে সবিনয় হাসি চেঁসে ভ্রমলোককে পা'টা সরতে বলল মঞ্জু। অপ্রতিভ মুখে পা চেঁসে নিয়ে, পেছনের লোকটিকে চেঁসে একটু সরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন তিনি। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গাড়ীর মধ্যে দেহটাকে চেঁসে দিলেন এক পাজারী মহিলা। বাস, আর কার দেহের সজে-কাফ দেহের চুল পরিমাণ কাঁক রইল না। মঞ্জু বুকের ওপর চেপে-ধরা ব্যাগটা সরিয়ে মহিলাটিকে এ ব্যাগের হানটুকু ছেঁকে দিল। চলতে চলতে বার কর বাসের ঝাঁক সামলালো মহিলাটির মাংসল বাহু চেপে ধরে। পকসের লজ্জা দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের ওপর।

বান্দবপুর—গাড়ীর গারে সজোরে খাবড়া মেয়ে হৈকে উঠল কনুটাকটীর। বাব কয় বাছ চেপে ধরার ভেতর দিয়ে যে অপরিচিত বৃষ্টিবিহীন হয়েছিল তাতেই মঞ্জুকে নামবার উত্তোপ করতে দেখে পরিচিতের মতো জিজ্ঞাসা করলেন মহিলা, সে এখানে নামছে কি না। বাবা, নামড়া আর হাসির ভেতর জবাব সেবে নেমে পড়ল মঞ্জু।

তারপর সেই দোকান, বাজার, পথ। এ পথের কোথাও কোন সজ্জা নেই, চমৎকারিষ নেই, শোভা নেই, ঔজ্জল্য নেই। দোকানগুলো প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে ঠাঁড়িয়ে আছে। দোকানীরা টুলে নয়ত লোহার চেয়ে বসে বসে পা নাচাচ্ছে। নিয়ন বদিও কিছু কিছু দোকানে আছে কিন্তু অধিকাংশ দোকানেই আছে বাল্ব। নিয়নের পাশে সে আলোকে দেখাচ্ছে কেরোসিনের আলোর মতো হলুদে নিস্ত্রভ জীহীন। ব্যবসাকেলুটুকুতে তবু এক-ও আছে। তারপরে ছাড়াছাড়া দালান কোঠা-বাড়ী। আর তাঁর খোলা পবাকপথে বা খোলা দরজাপথে দেখা পাওয়া আলো। বাঁধানো রাস্তা যেখানে কাঁচা পথে পড়েছে সেখান থেকে সুর জিঙ্গে মাটি। ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল। ঝিঁঝি পোকাক ডাক, ব্যাঙের ঐকতান। দড়মা-টিন-মাটির চালাঘর। লঠনের মিটিমিটি আলো।

এ পথে মঞ্জু প্রথম দিন এসেছিল, সে-ও ছিল এক উত্তীর্ণ সজ্জা, মমতাকে দেখতে এসেছিল মৌরী আর সে। ভীতু মৌরী ভয় পাচ্ছিল প্রতি পদে। নীলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন সেটাই। দরজা খুলে দিয়েছিল নীল। অপরিচিতের সংক্ষিপ্ত অভ্যর্থনার 'বন্দন' বলে ওদের বসিয়ে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে। তারপর মমতার মা ডেকে আলাপ করিয়ে দিলে ছ'-ছ'টো বিয়ের কথা শুনে সর্কোতুকে জিজ্ঞাসা করেছিল মঞ্জুকে—'আপনার নয় কেন? ভাল দিন নেই আর কাছে?' গাড়ীর কাছে জবাব দিয়েছিল ও, 'ভালো পাত্র নেই কাছে।' ওর জবাব শুনে নীলের দৃষ্টি হঠাৎ যেন ওর সবক্ষে সজাগ হয়ে উঠেছিল। ওর মুখের ওপর চোখের অঙ্গুসঙ্গানী আলো ফেলছিল সে। মঞ্জু জানে না নীল কি দেখেছিল। কিন্তু মঞ্জু নীলকে সেই আলোতেই দেখে নিয়েছিল।

কাঁচা পথে এসে পড়তেই রাস্তার বাতি সব একসঙ্গে ছলে উঠল। বোঝা গেল মেঘ বতাই সজ্জাকে আগবাড়িয়ে নিয়ে আসুক, সজ্জা নামল সবেমাত্র এই।

এই বান্দব-সজ্জা, এই জিঙ্গে-হাওয়া, এই তুবান-সদৃশ বৃষ্টি ঝোপ-ঝাড় কাঁচা পথে রিন্নার টুং-টুং সঙ্গীত—সব কিছু এতো ভালো লাগছিল যে, পান গেয়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল মঞ্জু। প্রকৃতি কেন ওর ভেতরের আনন্দের সঙ্গে সমতালে ওকে ভালো লাগিয়ে বাঁওয়ার প্রতিবোধিতার অবতীর্ণ তার আয়োজন নিয়ে।

ওর আনন্দের সব চাইতে বড় কারণ ও আজ জয়ী। জয়া জলো হয়ে গেছে। জয়ার মন সুর হয়ে উঠছে। জয়ার বিশ্বাস ও মরেই গিয়েছিল। একবিন্দু রক্তও দেখে আর অবশিষ্ট ছিলনা। ওকে বাঁড়িয়েছে মঞ্জু-মমতা-মৌরীরা তাদের রক্ত দিয়ে। প্রথম প্রথম আনন্দ হয়ে এই একই প্রায় সে ওদের বার বার করেছে, মমতা, ভূমি রক্ত দিয়েছে? মঞ্জু কে কে রক্ত দিল কে আরো? জেদ দিদি-বৌদিয়া? ওদের সবাই রক্ত কর বন্দীতে—জয়ার

উপর এই কথার আশ্চর্য্য ক্রিয়া লক্ষ্য করে এখানে ওরা বিমিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর জয়ার মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা শুরু করেছে এই পথে। ঘুরিয়ে কিরিয়ে এই একই কথা ওরা নানা ভাবে শোনার জয়াকে। ডান হাতের পাঁচ আঙ্গুল চুকিয়ে বুকের উপর ছ'হাত রেখে চোখ বুজে থাকে জয়া। যেন নিঃশব্দে অভিযুক্ত দুখ উপভোগ করে।

জয়ার এই সুর, জয়ার এই নিয়াময় মনের আর শরীরের, মঞ্জু কাছে এ কেবল একটি মেয়ের সুরই নয়, বাঁচাই নয়। ওর শক্তির জয়, ওর ব্রতের জয়। জয়া আত্মহত্যা করে ওকে যেন হারিয়ে দিতে বসেছিল।

আর মঞ্জুর আনন্দের কারণ, যে সব ঘটনা ওদের ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো বয়ে ফুরিয়ে গিয়েছিল। পদার ছবির মতো যার নাগক-নাগিকারা ঘটনার শেষের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল জীবন থেকে। কিন্তু হারানোর ব্যথা রেখে গিয়েছিল হৃদয়ে—আবার তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটছে। তারা জীবনে কিরে আসছে! আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরণ্ড, বাড়ীতে ডাক পড়বেই সজ্জাকারের। যে সামিয়ানা নামিয়ে ও তুলে ফেলতে হয়েছিল গাড়ীতে, আবার তা নামবে এসে বাড়ীতে। পুলকে বাবা ধরাখানাকে হাতের মুঠার সবার মতো দেখবেন। বাসরঘরে বসেও দূর লক্ষ্যে মৌরীর দিকে তাকিয়ে থাকবে সুরদর্শন—নীরবে সিগারেট খেয়ে চলবে সে। রমণীর রমণীর সৌন্দর্য্য দূরে বসে সজ্জোগ করবে না বিজয় গৌরব উপভোগ করবে বসে সে—মঞ্জু জানে না। কিন্তু এক একজন ব্যক্তিকে দিয়ে যেমন এক-একটা কাজ কিছুতেই ভাবা যায় না, তেমনি সুরদর্শনকে দিয়েও মঞ্জু কিছুতেই ভাবতে পারে না, দূরে বসে দূর নিরীক্ষণে মৌরীকে দেখতে দেখতে গোটাকর সিগারেট নিঃশব্দে শেষ না করেই মৌরীর কাছে বাসর-সজ্জাষণ নিয়ে এগিয়ে এসেছে সুরদর্শন।

কিন্তু না, মমতাকে মঞ্জু বাসুদেবের পাশে করনা করছে না। ইচ্ছা করে নয়, আজ আর এ করনা সে করতেই পারে না। মমতাকে হাসপাতালে তার কর্মক্ষেত্রের মধ্যে যদি মঞ্জুর দেখবার সৌভাগ্য না হতো তবে ঘটনাটা নিয়ে মনস্তাপ মঞ্জুর থাকতো। কিন্তু আজ নেই—একেবারেই নেই। সাদা পোষাক পরিহিত—সাদা মস্তকাবরণ-আবৃত মমতা। রোগীদের শয্যাপার্শ্বে বুরছে। এর শিয়রে, তার পারের কাছে, ওর পাশে ঠাঁড়াজে। চলতে চলতে খেমে পড়ে রোগীর মুখভাব লক্ষ্য করছে। শিয়রে কোলানো রোগীর অবস্থা লেখা বোর্ডটা হাতে নিয়ে পড়ছে। টান হাঁটা দিচ্ছে বড় ডাক্তারের উদ্দেশ্যে—এ রূপ আশ্চর্য্য। এ রূপ অতুলনীয়। এই সেবা—না ঐ 'সেবা' শব্দ আর নয়। খাত এলাজির মতো মঞ্জুর শব্দ এলাজি হয়েছে। ঐ 'সেবা' কথাটা শুকলেই শরীরে মধ্যে প্রাতক্রিয়া যটে ওর। সে ক্রিয়াটা যে কি হয় বোঝাতে পারবে না। নিজেও বোঝে না। অঠেহ? চাকলা? অস্থিরতা? কি জানি। বোঝাতে পারে না ও।

ওর ধারণা, 'সেবা' শব্দটা ক্রমবিবর্তনের পথে। তার আভিধানিক অর্থ বদলে যাচ্ছে। তার রূপান্তর ঘটছে অমাত্যের ঐশ্বর্য্যচাের সাজোয়ার, ধনীর ভূয়া বিনয়ের মুখোশে। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কামরার বাস করে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত গাড়ীতে—আর বৃদ্ধ ১০৭-এ জন্ম করতে করতে এঁরা প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার

কে জানে আরো কত কত?) বিজ্ঞাপন হুড়ান—‘আপনাদের সেবা’ করতে সাহায্য করুন।’ অর্থাৎ জিনিষের চারপাশ দাম এবং এই বিজ্ঞাপনের টাকা গুণে দিন। আপনাকে আরো নিঃস্ব আয় দামাকে আরো ধনী হতে আপনিই আমাকে সাহায্য করুন। আর রাজত্বের বেলায় কাজ করে বর্মের—লৌহবর্মের চাইতেও প্রচণ্ড বার বাধশক্তি! অস্ত্রে বেধেনা নয়, ও শব্দের শব্দ বৃকে এঁটে রাখলে কউ অস্ত্র নিক্ষেপ করে না।

পাড়ার ভেতর ঢোকায় পর থেকেই কেমন যেন লগুভগু, চহ্নছ দেখাছিল পল্লীটাকে। সবাই যেন বাইরে। কথা বলছে। রটলা করছে। পাড়িয়ে আছে। হুড়াকার জিনিষপত্র, ছেলেতে, ময়েতে বুড়োতে মিলে কুড়িয়ে যবে তুলছে।

মনের ভেতর এতো ছবি, এতো কথা নিয়ে চলছিল মঞ্জু বে, চাখের দেখাটা রিক্সার গতির সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিল, সরে যাচ্ছিল। দেখছিল। বুঝছিল না। নীলের দরজায় নেমে এতক্ষণে চাখের উপর ভেসে-বাওয়া দৃশ্য স্পষ্ট হলো। বাড়ীটা যেন সমগ্র পল্লীর একটা নির্দর্শন হয়ে পড়ে আছে। হাঁড়ি-কলসী বাসনপত্র টেনে হুঁড়ে ফেলা। চাল ডাল ছড়িয়ে আছে সঁাতসঁাতে কেঁচোর-তোলা ভাজে মাটির মধ্যে একাকার হয়ে। বিস্ময়ভাৱে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে দিকে তাকালো মঞ্জু। দেখল ছ’ কল্পই টেবিলে রেখে, ‘করতলে মাখা চেপে যবে চেয়াবে বসে আছে নীল। ভাড়া

চুকিয়ে ধীর পায়ে যবে ঢুকল মঞ্জু। কাছে গিয়ে পাড়ালো। জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে?

আশ্চর্য্য হলোও ধীর ভাবেই হাত নামালো নীল মাখা থেকে। প্রতিশ্রুত করলো সে—কি ব্যাপার—এই বৃষ্টি-বানলের মধ্যে?

—আমার দিকে ব্যাপার কিছু নেই। ইচ্ছে করলো। এলাম। কিন্তু আপনাদের এখানের ব্যাপারটা কি? আপনাদের সবাই যবের জিনিষ বাইরে হুঁড়ে ফেলে দিলে কে?

হাতের ব্যাগ চৌকির ওপর নামিয়ে রেখে নীলের বিছানার উপর বসল মঞ্জু। কিন্তু বেখানটার বসল, সেখানটার চালচোরানো জল পড়ে একেবারে ভিজে আছে। একটু সরে বসতে বসতে তার দিকে তাকিয়ে-খাকা অন্তমনস্ক নীলের দিকে তাকিয়ে কের জিজ্ঞাসা করল সে—হয়েছে কি?

নীল তবু একটু সময় চূপ করে রইল। যেন বে ভাবনাটা ভাবছিল সে, সেটাকে সরিয়ে রাখতে সময় লাগল। তারপর মুখ খুলতে যেতেই, কে যেন বাইরে থেকে হেঁকে উঠল, ওহে নীল, তোমার জিনিষপত্র সব বে বাইরে পড়ে রইল। যবে তোলা। বলতো তোমার মাসিমাকে পাঠিয়ে দি। দেবো?

যব থেকে তেমনি হেঁকে জবাব দিল নীল, দরকার নেই। মট হবার মতো কিছু নেই। আমি তুলছি পরে।

[ক্রমশঃ।

রোগশয্যায়

অসীম বন্ধু

আমাকে এই নির্জনতা থেকে
সরিয়ে নিয়ে যাও।
আমি সইতে পারি না এই নিঃসঙ্গ জীবন,
যেন নির্জনের কাঁধে ভর দিয়ে
মৃত্যু অহরহ চলছে কিরছে
আমাকে চার পাশে রেখে।

এই নির্জনের গন্ধ নিয়ে নিয়ে
মা-মপি, আমি পাগল হোয়ে যাব।
আমাকে সরিয়ে নাও অস্ত্র কোথাও।

কোলকাতার হাসপাতালগুলো বেশ
যান্ত্রিক ধারে। যেখানে অস্ত্র
মামুষের কলগুজন, বাস, ট্রামের
দুর্ভাগ্যত মৃত সঙ্গীত।

মা-মপি, আমাকে ওখানে নিয়ে চলা
আমি কান পেতে শুনবো
অসংখ্য মামুষের কলকণ্ঠ।
আমি কান পেতে শুনবো
মহানগরীর ছাপিণ্ডের ধনি :
আমার অন্তর তুলিয়ে দেবে।

আমি প্রতিদিন জানালা দিয়ে
দেখবো সন্ত-জাগ্রত পহরের কলকণ্ঠের
মধ্য দিয়ে সূর্য্যটা একটু একটু করে
আমার মুখে আলো ফেললো—
বেগু বেগু স্বর্গের কুচিঙলার উত্তাপ
নিয়ে আমি হুহুর্কে গা-ঝাড়া দিয়ে
উঠে পাড়াবো।

মা-মপি, আমাকে এই নির্জনতা থেকে
সরিয়ে নিয়ে যাও।
আমি হাজার মামুষের অস্ত্রিত
মৌলিকের মধ্যে শুনে থাকবো।



ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

শমিতা এবারে নিশ্চিন্তে ক্লাস্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে। বিরাট বাড়ীটাকে ঝেড়ে-ঝুছে পরিষ্কার করতে শমিতার এত শীতেও দেহ দিয়ে ঘাম ছুটে গিয়েছে। ওপরের একখানি ঘর মাত্র তারা ভাড়া নিয়েছে। নীচের এক তলার কেবল রান্নাঘর। ছোট্ট ঘরের মধ্যে ছ'জন বসলে বাসনপত্র রাখার জায়গা থাকে না। তবু শমিতার ভাল লাগে। শ্যামল রান্নাঘরে ঢোকে না। বন্ধু-বান্ধব কেউ এলে চা-এর জন্য রান্নাঘরের দরজায় এসে অন্তরন করে। বলে, ছ' কাপ চা করো না শমিতা ?

তখন শমিতা হয়ত তার চাপিয়েছে। বলে, পারবো না। মুখ না তুলেই জবাব দিয়েছে শমিতা। যেন শ্যামলের কথাটা মন দিয়ে শোনেনি কিংবা শুনেও তার কোন গুরুত্ব দিতে সে চায়নি।

—ভ্রমলোক সকালবেলাতেই এসেছেন। আমাদের প্রথম কুসারে অভিজি এসে এক কাপ চা না পেয়ে চলে যাবে ?

—হ'দিন পরে বুঝি বন্ধু-বান্ধবকে আনা যেত না ?

—বন্ধুরা কি দিন-রুশ দেখে আসবে ?

—বেলা একটার সময় খেতে হবে, যেন মনে থাকে !

—আজ তো ছুটির দিন।

বিলু-বিলু ঘাম জমেছে কপালে। কুঞ্চিত হ'-একটি চুল পাক খেয়ে ঝঁকে পড়েছে কপালের ওপর। কণী রক্ত আঁচের আঁটার খাঁচা হোরে উঠেছে। শ্যামল করেক সেকেন্ডের জন্য শমিতার নুতন

শ্যামল ! শ্যামল ! ডাকতে ডাকতে সোজা দেবেশ ভিতরে চুকে পড়ে।

—এ যে শমিতা ! শ্যামল কোথায় ?

—শমিতা সবে ঘরদোর সাক করে হাতে ময়লা, জামায় কাপড়ে বুলো-লাগা অবস্থায় এলোমেলো হোরে বসে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি কাপড়টা সামলে নিয়ে ঘোমটা টেনে দিল।

—মাঝি দেবেশ। নতুন সংসার পেতেছো ? দেখতে এলাম, কেমন আছ ?

শমিতা কথা বলবে কি, আড়ষ্ট হোরে বসেই থাকে। শহরের মেয়ে সে, এখন পাড়ারগায়ে এসেছে ছুলমাটারের বোঁ হয়ে। শহরের মেয়ে হোরেও বামীর কাছে অন্য পুরুষের স্নর্গুখে লজ্জা করতে শিখেছে। বাড়ীতে মায়ের কাছেও শিখে এসেছে।

—কথাই বলবে না দেখছি ! আচ্ছা চলি।

দেবেশ চলে গেলে ঘোমটা খুলে নিশ্চিন্তে বসেছে আবার। বন্ধুটা কেমন মায়ুষ। বন্ধু বাড়ীতে নেই কেনেও এসে চুকেছে। কেউ নেই বাসায়, এ অবস্থায় তার সঙ্গে ঘোমটা খুলে গর করবে নাকি শমিতা ? নতুন এসেছে সে। লজ্জা করবেনা ? বাড়ীওয়ালারা রয়েছে না ? বার বন্ধু তার কাছে আদর। শমিতার কাছে দেবেশ কে ?

বলেছে, তারি ভাল লাগল হে! বেশ শুধিয়ে নিয়েছ মনে
আর গৃহিণীটাও... হা হা কোরে হেসে উঠেছে দেবেশ।
শ্রামল গভীর হোয়েছে। বুঝতে পারেনি দেবেশ শ্রামিতার
জার জন্ত এই গাভীরা না দেবেশের লজ্জাহীনতার জন্ত।
দেবেশ আর যায়নি শ্রামলের বাসায়। ভেবেছিল, তার দাবী
ছে শ্রামলের কাছে। শ্রামল বেকার বসে থাকার সময় দেবেশ
নের পর দিন শুধু নয়, মাসের পর মাস তাকে বেঁধে ধাইয়েছে।
র বেড়াবার পাশ দিয়েছে। দুই বন্ধুতে একসঙ্গে সিনেমায়
য়েছে। দু'জনে এক বিছানায় অনেক সময় ঘুমিয়েছে। আপনি
কে তুমি ও শেষ পর্যন্ত তুইতে নেমেছে যে সম্বোধন সেখানে, তৃতীয়
ক্তির আবির্ভাবে দেবেশ এতটা যে পর হবে বুঝতে পারেনি!

শ্রামল সব দেবেশকে জোর কোরে ধরে নিয়ে গিয়েছে একদিন।
মিতা চা কোরে দিয়েছে, মুড়ি দিয়েছে। শ্রামল খাওয়ার সময়
সিকতা করার চেষ্টা করেছে।

—মুড়ি কেমন লাগছে খেতে?

হেঁট হোয়ে মুড়ি খাচ্ছিলো দেবেশ। মুখ তুলে শ্রামলের দিকে
য়ে প্রশংসার মানে বুঝতে চেষ্টা করেছে।

—চা খেয়ে দেখ মিষ্টি হোলো কি না।

আবার চাইলো দেবেশ শ্রামলের দিকে—হাসছে শ্রামল।

—মিষ্টি-হাতের চা, মিষ্টি তো লাগবেই! তুমি এই কথা
ানাতে চাও তো ওঁকে?

শ্রামিতা ঘোমটা তুলে দুই বন্ধুর চা খাওয়া দেখছিলো!
বেশের কথাই স্মরণ মুখটা রাঙা হোয়ে উঠলো। শ্রামলের দিকে
য়ে হাসিটা গোপন কোরতে গিয়েও চাপতে পারলো না।

—কি, খুসী তো? কিন্তু আমিও খুব ভাল চা তৈরী করতে
রি, তোমার চেয়েও ভাল। দেবেশ শ্রামিতাকে শোনাতে চাইল।

এবারে শ্রামিতা সরে গিয়েছে। শ্রামল বললে—সত্যি!
বেশের রান্না তুমি খাওনি তাই। চলে গেলে বাজে কথা ভেবে!

—বেশ তো! খাওয়ার ব্যবস্থা কর। এবারে শ্রামিতা ওঁদের
মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

—যাবে কি আমার ওখানে?

—নিয়ে চলুন না।

কথা বলেই শ্রামিতা চেয়েছে শ্রামলের মুখের দিকে। কি কথা
র চোখে-মুখে দেখে নেবে শ্রামিতা।

—বেশ, মাইনেটা পেলেই হবে একদিন। যাবে তো ঠিক?

মাইনে পাওয়ার কথায় সব স্মরণ কেটে যায়। সে কবে?
মিতা ভেবেছিলো এক দিন একটু বেড়িয়ে আসবে। দেবেশের
া খাবার লোভ তার নেই। বরং নিজে দেবেশের সংসারে গিয়ে
রা কোরে ধাইয়ে আসবে। দেবেশ যত ভাল রান্নাই করুক
য়েদের কাছে সে কিছুই নয়। শ্রামলের পুরানো বন্ধু। শুধু
নয়, অন্তরঙ্গ, একান্ত আপনার। দিনের পর দিন শ্রামলকে
ধাইয়েছে। জামা-কাপড় না থাকলে নিজের জামা-কাপড় তুলে
য়েছে অমান বন্ধনে। দেবেশ সেদিন হঠাৎ শ্রামিতা একা-খাকা
বহার বাড়ীতে চুকে যে লজ্জার কেলিছিল, তারপর শ্রামলের
ছে সব শুনে দেবেশের ওপরে সহানুভূতিতে মন জ্বরে
ঠিক শ্রামিতার। আরও মন জ্বরে উঠেছিল দেবেশের একা-একা

অসহায় অবস্থার থাকার কথা ভেবে। অন্তরঙ্গ বন্ধু বিয়ে কোরে
বখন সংসারী হোয়েছে তখন আর এক জন একাই থেকে গেল
নিঃসঙ্গ অবস্থায়!

—তোমার বন্ধুকে এক দিন নেমস্তম্ব কর না? শ্রামলের মেজাজ
বুঝে শ্রামিতা প্রস্তাব তুলেছে।

—হঠাৎ বন্ধুর ওপর এতটা দরদ? বেশ গভীর ভাবেই শ্রামল
কথা বলেছে।

—না, এমনিক্তেই বলছিলাম। নিজে হাতে রান্না কোরে খায়
বোজ-বোজ! পুরুষমানুষ বোজ-বোজ পারে নাকি?

—তা হোলো তুমি গিয়ে রান্না কোরে দিয়ে এসো না মধ্যে
মধ্যে।

—তুমি হোলো পারতে?

—কি দরকার, নিজেকে করতে হবে বলেই তো তোমার নিয়ে
আস।

—তবে বন্ধুর একটা বউ এনে দাও।

—বাঃ! সে বেচারী থাকলে তোমার এই সহানুভূতিতে
তোমাকে হয়ত হাতের কাছে বা থাকত তাই-ই দিয়ে বসত।

কথাটা যেমন কোরে যে সহানুভূতি নিয়ে শ্রামিতা বলতে গিয়েছিল
শ্রামল সে ভাবে নেয়নি। শ্রামিতার নিজেরই কেমন মনে হয়।
শ্রামল যেন তুলে গিয়েছে দেবেশের কথা। দেবেশের প্রতি
শ্রামলের কৃতজ্ঞতা নেই। শ্রামল যেন দেবেশকে এড়িয়ে এড়িয়েই



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
'শঙ্খ ও গদু'

মার্ক গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—ব্রিটেন ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২২২৫

চলতে চায়। শামল যখন কোথাও ঠাই পায়নি দেবেশ তখন তাকে ঠাই দিয়েছিল, সে কথা কেমন ফেঁদে তুলে গেল সে ?

শমিতার পীড়াপীড়িতে শামল একদিন খাওয়ার নেমস্তম্ব করলো দেবেশকে। দেবেশ রাজি হতে চায়নি। বলেছে, মাইনে পাও আগে, তারপর।

—না, শমিতা ধরেছে আজই, মাইনে পেলে তো তোমার বাসায় আমরা যাব।

বেশ, তাই হবে।

রবিবার ছুটির দিন। স্কুলের হাজিমা নেই। দুই বন্ধুতে বহু দিন পরে একসঙ্গে খাবে। শমিতার ভারী আনন্দ। বোজ-বোজ হাত পুড়িয়ে একজন খাবে, আর একজন নিশ্চিন্তে অপরের হাতে আরাম করবে—ভাল লাগেনি এই ব্যবস্থা শমিতার। বয়স উচিত ছিল বন্ধুকে তাদের বাসায় খাওয়ার কথা বলতে। দরকার পড়লে সে অন্তত কিছু দিয়েও খেতে পারত। তাতে সঙ্কোচের কোন কারণ থাকতো না।

সারা দিন ধরে শমিতা খুব ঝড় কোরে রান্না করলো নানা রকম মাছ-তরকারী। কিছুটা স্বামীর ঋণ সে শোধ করবে। অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে এই ভাবে নিমন্ত্রণ কোরে দেবেশকে সে খাওয়াবে।

খেতে বসে দেবেশ যখন রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল শমিতা তখন আড়ালে থেকেই গুনছিল সব। এমন মানুষটার প্রতি শামল অবিচারই করেছে। এরকম বন্ধুকে বিয়ে করে এনে সংসার পাটার পর হাত পুড়িয়ে রান্না করতে দিতে আছে ?

দেবেশ সবল শিশুটির মত এটা-ওটা চেয়ে নিলো। পাশে বসে শামল শুধু দেখতে লাগল, সে দেবেশের চেয়ে অনেক কম খায়। গা ছাড়া শমিতার রান্নার উচ্ছ্বসিত হবার কোন কারণ তার নেই। তার কাছে তো আর নূতন নয়।

খাওয়ার প্রায় শেষে তৃপ্তিতে যখন ঢেঁকুর তোলে দেবেশ, তখন শমিতার মনে হয় মানুষটাকে সত্যিই অসহায়। বলে, বিয়ে করুন, পাঁচ পুড়িয়ে কত দিন খাবেন ?

—বিয়ে করব বললেই কি আর করা যায় ?

—কেন ?

—আমার মত এই চেহারার মানুষকে বিয়ে করবে কে ?

শমিতা হাসল। বলল—বাংলা দেশের ও বদনাম দেবেন না ; পুরুষ-কুপুরুষের প্রসন্ন আছে না কি এদেশের মেয়ের বিয়েতে ?

—আছে বৈ কি। আমার এই চেহারা দেখে একবার গ্রামের ক মেয়ে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। কথার শেষে কেমন রূপ ভাবে হাসতে থাকে দেবেশ।

চমকে ওঠে শমিতা। ঔৎসুক্য বাড়ে।—কোথায় ?

—হুগলির এক গ্রামে।

এবারে শমিতার যেন গলা ধরে আসে। তবু বলে, কোন্ গ্রাম আছে ?

—সে কি তুমি চিনবে ? রাজপুর।

আর ঠাঁড়ায়নি। শমিতা আড়ালে চলে গিয়েছে। আর কথা নী। হঠাৎ কথা বন্ধ করার ওরা ভেবেছে শমিতা সেই মেয়ের বেগেছে। আর দেবেশের প্রতি সহানুভূতিতে হুঃখ পেয়েছে। ওরা কেউই জানতে পারেনি সে মেয়ে ওদের স্নহুখেই। সেদিন

সে নিজে তাকিয়ে দেখেওনি দেবেশকে। শুধু বাড়ী-ওছ লোকে আলাপ-আলোচনা শুনে সে স্পষ্ট স্বাক্ষর জানিয়েছিল যে, ওখা বিয়ে করবে না সে।

শমিতার বাড়ীর লোকে বিয়ে দিলেও দেবেশ নিজে বি করতে না। কতাপক্ষের যে আগ্রহ সাধারণতঃ দেখা যায়, আগ্রহ না থাকায় দেবেশ নিজেই কোন রকমে মেয়ে-সে সেরে চলে এসেছিল। দেবেশ বুকেছিল, এদের কতাদায় গলা বাধেনি। ওদের কিছু-কিছু কথাবার্তাও কানে এসেছিল দেবেশের

তারপর দেবেশ কোন দিন আর বিয়ের কথা মুখে আনেনি মাষ্টারী নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।

শমিতা কতক্ষণ রান্নাঘরে চূপ কোরে ঠাঁড়িয়েছিল খেয়া ছিল না। শামলের ডাকে খেয়াল হয়। ও-ঘরে খেতে দিয়েছে ছাঁ মানুষকে। তুলেই গিয়েছে কখন শমিতা।

—আমাদের পান দেবেনা ?

চোখের কোণে কেন যেন একটু জল এসেছিল। মুছে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো ওদের স্নহুখে।

—খাওয়া হোয়ে গেল ?

—তুমি তো শুধোলে না কি লাগবে না লাগবে ? কোঁতুক উঁকি দিয়েছে শামলের চোখে।

—আমার শরীরটা হঠাৎ—

—খারাপ হোয়েছে ! কি হোলো ? দেবেশ যেন উষ্ণ হোয়েছে ভীষণ।

—না, এমনি হঠাৎ মাথাটা ধরেছে।

—ও !

দেবেশ চলে গিয়েছে। শমিতা ভাত সামনে রেখে শুধুই নাড়াচাড়া করছে। মন চলে গিয়েছে সেদিনের রাজপুরে। দেবেশ চলে আসায় মুখে হাসি ফুটেছিল বাড়ী-ওছ লোকের সঙ্গে তারও। আজ দেবেশের মুখ থেকে শুনে সেদিনের দেবেশের চলে আসার সময়ের মুখটার কথা মনে পড়ে। সে ব্যথা দেবেশ আজও ভোলেনি। এ কি মেয়েমানুষের মন তার ! লেখাপড়া শিখেছে সে। মাষ্টারী করেছে। নিজের সখকে এ রকম ছোট খারাপ কেন ? শমিতার চেয়েও কত সুন্দরী তাকে এখনও স্বামিরূপে পেলে কতাদায়প্রসন্ন বাপ-মাকে শেষ ক'টা দিন একটু শান্তি দিতে পারে। একটু কক্ণ হাসিও ফোটাতে পারে।

—তখন আমাদের খেতে দিলে চলে গেলে যে রান্নাঘরে, আর দেখা দিলে না, ব্যাপার কি ? রাত্রে শামল প্রসন্ন করেছে শমিতাকে।

—এমনিই।

—বন্ধুর হুঃখে ?

—না।

—কোন মেয়ে বন্ধুকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাতে তোমার হুঃখের তো কারণ নেই ? তুমি চেন নাকি সে মেয়েকে ?

কোন জবাব দেয়নি শমিতা। সেদিন তাকে চেনেনি শমিতা, আজ চিনেছে। দেবেশকে দেখে চিনেছে। এমন সদাশিব মানুষকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল বাইবেটা দেখে। লোকটার এই বৈরাগ্যের স্তম্ভ শমিতার নিজেকে খামিকটা দায়ীই মনে হয়।

কয়েক দিনে যখন শমিতা ভুলে এসেছে দেবেশের কথা, তখন শ নিজেই এসে হাজির। তার বালায় বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর মন্ত্রণ।

দেবেশকে দেখে মনে পড়েছে শমিতার আগের কথা। অনেকটা বোকা হোলে গিয়েছে দেবেশ। মুখের দিকে চাইলে মনে বাধায় সে মুখ আহত। তার ওপরে সে পুরুষ হোলে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে নিজে বেঁধে খাওয়াবে বলে।

—আপনি রাগা করবেন তো? প্রশ্ন করেছে শমিতা।

—ও ছাড়া আর কে? জবাব দিয়েছে শামল। আর কাউকে তা সেই দাঙ্গিকা আসতে দেখনি?

যেটাকে শমিতা ভুলে এসেছিল অনেকটা এবং জোর কোরে ভুলতে চেয়েছিল সেখানেই আঘাত দিয়েছে শামল। শমিতা বলেছে—আমি রাঁধব।

—বশ তো! কোঁতুক বোধ করেছে শামল।

—তা কি হয়? তোমার কষ্ট হবে। লজ্জায় কালো মুখকে আরো কালো করে বলেছে দেবেশ।

—আপনি রাগা করবেন আর আমি মেয়ে হোলে খাব, সেটা হয় কি?

—ধাক ভুমিই বাও শমিতা! চল বং আমিও বাই। দেখে আসি দেবেশের সংসার।

সমস্ত ঘরটা একটা ছোটখাটো কুরুক্ষেত্রের শেষে এলিয়ে ইতস্তত পড়ে আছে তরী-তরকারি, জামা, কাপড়, বাসন বালাতি, চা ছুঁ, চাঙ্গ-ডালো আর বিছানায় বইতে। দেখে হাসি পায় আবার শমিতার মত মেয়ের কান্না পায়। নিজে হাতে সবকিছু গোছায়। তার পর রাগার বোকাড় করে। উঠুন আলো, রাগা চাপায়। দেবেশ বসে বসে অবস্থি অহুভব করে। ছটকট করে। আরো ছটকট করে যখন শামল চলে যায় একটু কাজে।

কাজ করতে করতে শমিতা দেবেশের মুখের দিকে না চেয়েই বলে, আচ্ছা সেই মেয়েটির ওপরে আপনার খুব রাগ আছে, নয়?

—কোন মেয়েটির ওপর?

—যে আপনাকে বিয়ে করতে চায়নি।

—না।

—কেন?

—আমাকে সে বাঁচিয়ে দিয়েছে, হয়ত মুখে আপত্তি না জানিয়ে ধসে পরে আমাকে বিপদেই ফেলতো।

—আচ্ছা, তার চেহারা আপনার মনে আছে?

—না। তবে অনেকটা তোমাদের মতই দেখতে।

হঠাৎ মুখ ভুলে চেয়ে দেখলো শমিতা ভয়ে ভয়ে। না শ্রমস্ক দেবেশ।

—আচ্ছা যদি সে মেয়েটার দেখা পান, তবে কি করবেন?

—কিছুই না। তাকে ধন্যবাদ জানাবো।

—সত্যিই আমি তাকে চিনি। তাকে দেখাতে পারি। ঠোটো অজানা ভয়ে কাঁপে।

—তাকে আমি দেখেছি।

শমিতার সেদিনের রাগা কেউ খেতে পারেনি। কোনটা হুলে পোড়া। কোনটা আধসেছ।

মুখ বুজে সকলেই খেয়েছে কিছু কিছু। বেশির ভাগ পড়ে খেকেছে পাতে। একমাত্র শামল বুঝতে পারেনি কার রাগা ওটা। শমিতার না দেবেশের? শুধিয়েছে—কার রাগা এটা? কেউ জবাব দেয়নি।

বাড়ী ফিরে শামল শুধিয়েছে তুমি রাগা করেছ, অথচ এরকম হবার মানে বুঝলাম না।

—ওঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে ও-রকম হোয়েছে।

—কি গল্প? ওর হুঃখের কাহিনী তো?

—হ্যাঁ।

—অভাবের কাহিনী শুনে বুঝি চোখে জল এসেছিল। সত্যিই জল আসে। বিরাট সংসার ওর যাড়ে। একপাল লোক ওর মুখপানে তাকিয়ে আছে। ও টাকা পাঠাবে তবে তার খাবে। এই কাহিনী শুনেছো তো সারাদিন?

কোন জবাব দেয়নি শমিতা। অজানতে কোন সময় চোখে জল এসেছে।

সত্যি হুঃখ হয়। বেচারী ঐ সংসারের জঞ্জাই বিয়ে করতে পারলোনা!

কি বললে? উৎকণ্ঠায় উঠে বসেছে শমিতা।

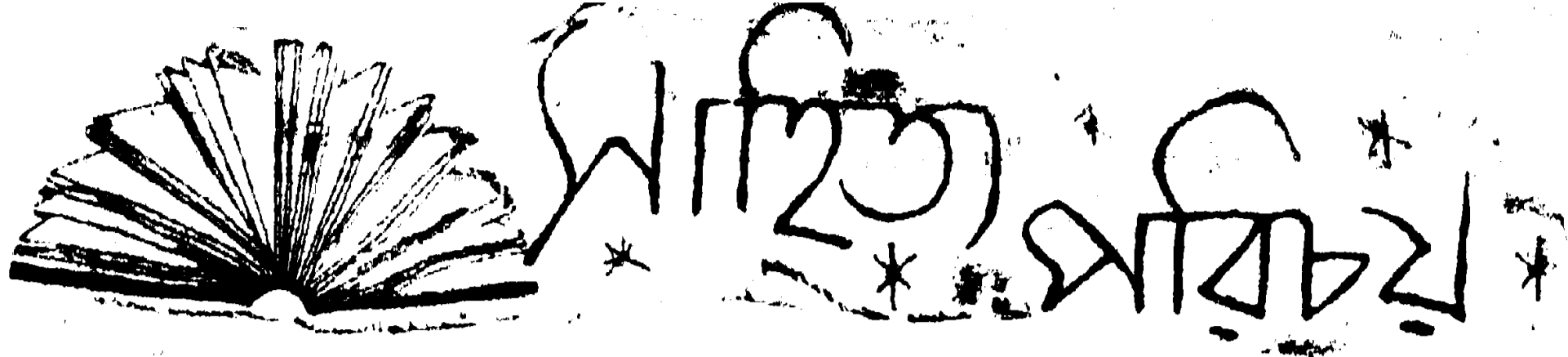
—কিছু নয়, ঘুমোও।

ফোন ৩৪-৬২৩২

পি, প্রি, আড

জুয়েলার

১২৫-বি বহুবাজার ফীট-কলিকাতা-১২



উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

তরঙ্গের পর

আলোচ্য গ্রন্থখানি লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত একখানি প্রেমের উপজ্ঞান, মিষ্টি আমেজ-লাগানো নুরে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে আত্মোপাস্ত। তরুণী নাট্যিকার ঐক্যবালোলুপ ধনলিপ্সু স্বরূপে কেমন করে হঠাৎ জাগলো অবিখ্যাত পরিবর্তন, প্রেমের মায়াবী পরশ দূর করে দিল সব মালিন্য সব কলুরকে। 'কুশল হস্তে লেখক একেছেন তারই ছবি। হরিনারায়ণ বাবুর মনোরম স্নিগ্ধ লিখনশৈলীর গুণে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়েই পাঠকের মনের দরজায় হাজির হয়, উপজ্ঞানের পরিণতিটুকু একান্ত স্বাভাবিক ও সার্থক। সুতপা ভালবেসেছিল তরুণকে একদিন, প্রধানতঃ প্রীতির অর্থসম্পদের বাহ্যিক জলুয়ে আকৃষ্ট হয়েই কিন্তু প্রেমের হুরঙ্গ তরঙ্গে ভেঙ্গে গেল সব আবিলাতা। দয়িতা দয়িতকে চাইলো ভালবাসলো শুধু ভালবাসার দাবীতেই, আত্মপ্রকাশ করলো তাদের স্বরূপের সত্য স্বমহিমায় স্বাধিকারে। কুশলী সাহিত্যিকার নিপুণ হাতে টেনে নিয়ে গিয়েছেন কাহিনীটি, পড়ার শেষে পূর্ণ ভূষিত ভরে ওঠে পাঠকের অন্তর আর সেটাই এই উপজ্ঞানখানি সত্যকে সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। বইটির প্রচ্ছদ ও অন্ত্যন্ত আঙ্গিক ক্রটিমুক্ত। প্রকাশক, মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২, দাম—পাঁচ টাকা।

হিরণ্ময় পাত্র

বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে আলোচ্য পুস্তকটি, আমাদের বেদে-পুরাণে সৃষ্টির তামসী রূপকে দেখানো হয়েছে, সর্বত্রই সত্যের মহিমোজ্জ্বল সত্তার পাশাপাশি। সত্যের ধর্মের জায়ের পরম সূক্ষ্ম সূচিস্নিগ্ধ রূপটিকে আবৃত করে রাখে এই অসত্য তামসী সৃষ্টি বাহ্য সৌন্দর্য্যে এর তুলনা নেই, তাই শাস্ত্রজ্ঞ হিতধী জন সৃষ্টির তামসী সত্তার নামকরণ করেছেন "হিরণ্ময় পাত্র", অসত্যের এই পাত্র অপসারিত হলেই হয় সত্যের প্রকাশ স্বমহিমায়। কদাচার বা পাপের বৃণা ছবি আঁকাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, অন্ধকারের পটভূমি যেমন আলোর উজ্জ্বল্য বাড়ায়, সত্যের আনন্দধন মূর্তিটিরও সম্যক মহিমা আমাদের স্বরূপজন্ম হয় না—যতক্ষণ না অসত্যের অন্ধকার ভেদ করে সে দেখা দেয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেই তামসী সৃষ্টির বর্ধার মূল্য আমাদের উপলক্ষ্যগোচর হয়। বেদ-পুরাণের বিভিন্ন স্থান থেকে মোট বারোটি কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে, লেখক প্রশংসনীয় দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন, আখ্যানগুলির প্রশংসন্যাকে। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের সহিত সমতা রেখেছে তাঁর গভীর ধর্মানুপূর্ণ সমৃদ্ধ ভাষা, যেমন কুশলী সংগীতজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে নিপুণ সঙ্গতিয়া—কোথাও ঘটেনি ছন্দপতন, ভাবা ও ভাব একই খাতে বয়ে গিয়েছে স্বচ্ছ অন্তরঙ্গতার, আর সেটাই এই বইখানির সবচেয়ে বড় সম্পদ। আনন্দ

গ্রন্থটির সাক্ষ্য কামনা করি। প্রচ্ছদ ক্রটিপূর্ণ, অন্ত্যন্ত আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। ত্রিবেণী প্রকাশন—প্রাইভেট লিঃ, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২, দাম চার টাকা মাত্র।

জল পড়ে পাতা নড়ে

বাস্তবের কঠিন মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক সাহিত্য আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন বর্তমান লেখক। সাংবাদিক সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ লিখিত আলোচ্য পুস্তকখানিও বাস্তবের পটভূমিতে রচিত একটি জীবনধর্মী কাহিনীর সার্থক রূপায়ণ। উপজ্ঞানটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি সম্পূর্ণ আঞ্চলিক গ্রাম্য ভাষায় রচিত, বাস্তবায়ন আখ্যানটি সহজেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এর ভাষার বৈচিত্র্যে। এক গ্রাম্য পারিবারিক কাহিনী সহজ অন্তরঙ্গতায় স্থান ভরে নেয় পাঠকমনে, সাধারণ চরিত্রগুলি দেখা দেয় আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে। আকারে বৃহৎ হলেও লেখকের মুল্লিয়ানায় আগাগোড়া কোতূহল বজায় থাকে ক্লাস্তিকর বা বোরিং হয়ে ওঠে না কোথাও। সাহিত্য ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ে আজ যে পরীক্ষা নীরক্ষা চলেছে আলোচ্য গ্রন্থটি তার এক সার্থক নিদর্শনরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। সাহিত্যের অঙ্গনে লেখক সুপরিচিত, তাঁর পূর্ব সুনামকে বর্তমান গ্রন্থটি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখবে, এ আশা আমরা স্বচ্ছন্দেই করতে পারি। লেখকের বিকল্পে আমাদের একটিমাত্র অভিযোগ এই যে, বাস্তবছবি আঁকতে বসে মাঝে মাঝে তিনি শ্লীলতার গণ্ডিকে অতিক্রম করেছেন যা মার্জিতকৃষ্টি মানুষের পক্ষে একান্ত অকৃচিকর, মনে হয় এসম্মুখে আর একটু সংযমের পরিচয় দিলে তিনি ভাল করতেন। বইটি পাঠক-সমাজে আদৃত হবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ সুন্দর, অন্ত্যন্ত আঙ্গিকও প্রশংসনীয়। ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২, দাম আট টাকা মাত্র।

সভাপর্ষ

শক্তিশালী সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নতুন করে কোন পরিচয় দেওয়ার নেই, আলোচ্য বইটি তাঁর সত্ত-প্রকাশিত এক ছোট গল্পসংগ্রহ, মোট সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে এতে। নরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভাবেই আমাদের ঘরোয়া লেখক, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত জীবনের পটভূমিই তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য, আপনক্ষেত্রে তিনি অনন্ত বললেও বোধ হয় অত্যাতি করা হয়না, নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলেন তিনি আমাদের চারপাশের প্রত্যহ দেখা মানুষগুলির এক নতুন রূপ, মানুষের মনের ভেতর রয়েছে যে বিচিত্র মহাদেশ তিনি তারই আবিষ্কারক, আলোচ্য কাহিনীগুলিও সেই একই উদ্দেশ্যের স্বাক্ষরধারী। মানব মনের নানা বিভিন্ন ভাবভঙ্গিকে সার্থক ভাবেই

কাশ করেছেন লেখক গল্পগুলির মাধ্যমে, প্রথম ও শেষ গল্পটি শেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, "সভাপর্ষ" গল্পটির নায়িকার সাধারণী যেনে এক যুহুর্কের জন্মও বে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া লাগল তা লোড়ন জাগায় পাঠকমনেও। সাধারণ জীবন বাপনে একঘেয়েমি ভিত্ত করে তুলেছিল সন্ধ্যার নারীমনকে তাই যুহুর্কের জন্মও মিত্রা হয়ে উঠতে চেয়েছিল অসামান্য যুহুর্কের জন্ম ও বসিয়েছিল যজ্ঞকে নায়িকার আসনে, কল্পনা-আশ্রয়ী নারীমনের এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে কুশল লেখনীতে প্রকাশ করেছেন লেখক আলোচ্য গল্পটিতে; অজ্ঞাত গল্পগুলিও সুপাঠ্য। প্রচ্ছদ শোভন, অঙ্গসজ্জা ধারক। পরিবেশক—ডি হাজারা এণ্ড কোং ১৩ নূর্ব সেন স্ট্রীট কলিকাতা—১২, দাম—ছটাকা পকাশ নয়।

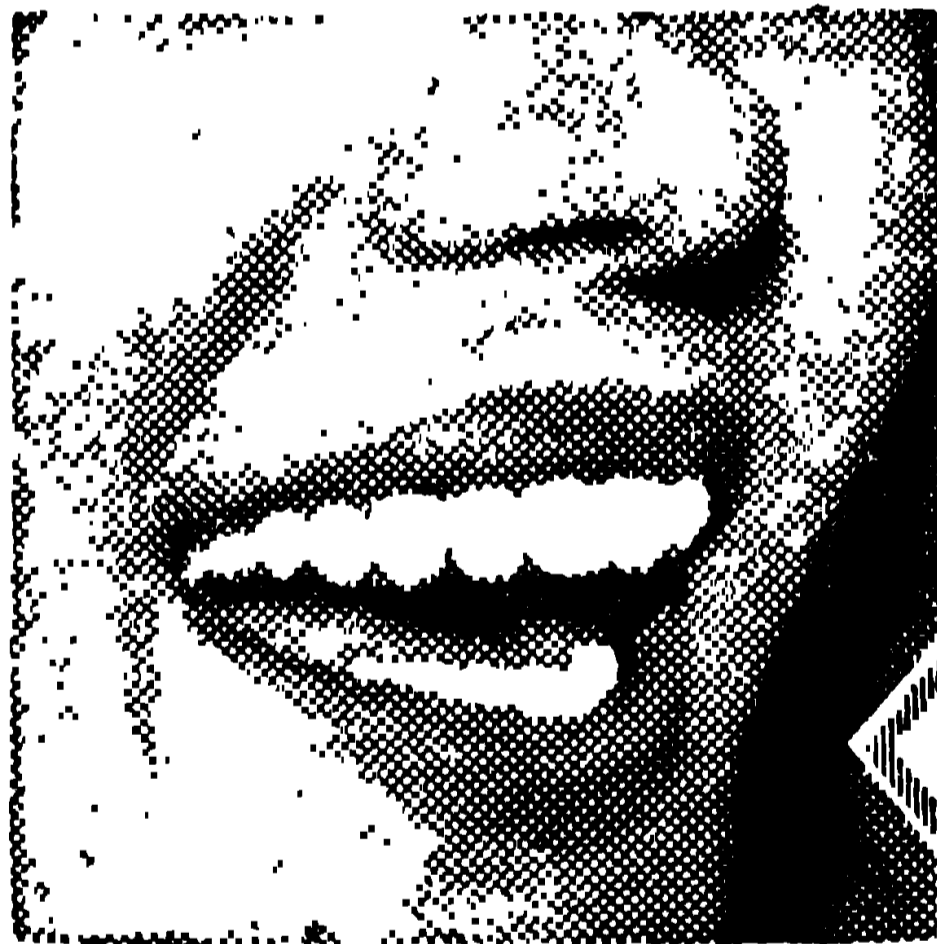
দেহ-দেউল

মাহুঘের মধ্যেই ভগবানের বাস। মাহুঘকে ভালোবাসা ভগবানকে ভালোবাসারই নামান্তর। মাহুঘকে কেন্দ্র করেই যুগে যুগে কালে কালে ভগবানের পুত মহিমার দিগ্য বিকাশ ঘটে আসছে সকল কালে, সকল সমাজে। যুধাতঃ এই পটভূমিকে মনন করাই আলোচ্য গ্রন্থটি রূপ পেয়েছে। একটি অনন্ত-সাধারণ নারীর চরিত্রের মাধ্যমে সুসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই পাখত সত্যেরই জয়গান গেয়েছেন। জীবনের পূর্ণতা প্রেমে, প্রেমের এক অসাধারণ আলেখ্য লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীতে অঙ্কিত

হয়েছে। বিরহ-মিলনের যে সময়ের মধ্যে প্রেমের যে প্রকাশ সেই প্রেমকেই লেখক দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সমগ্র গ্রন্থে রসধন পরিবেশ রচনাতেও গজেন্দ্রকুমার নৈপুণ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের এক পল্লীর সত্যকে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন, কিশোরী বাসু তার মনের পবিত্রতা ও বিতৃষ্ণতার প্রভাবে আপন দেহকে দেহ-দেউলে পরিণত মনে করে বস্তু; তার এই মোহ বর্ধিত থেকে বর্ধিত হতে থাকে অবশেষে, সে-ও জীবনের মূলমন্ত্রের পাঠোদ্ধার করে, সেও খুঁজে পায় জীবনের সারসত্যকে, জীবনের অর্থও আর দুর্বোধ্য থাকে না তার কাছে। গ্রন্থটি সর্বতোভাবে সুপাঠ্য—এবং বক্তব্য হৃদয়স্পর্শী এবং এর আবেদন অন্তর স্পর্শ করে। দেহ-দেউল গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সাহিত্যিক দক্ষতার অস্বতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রকাশক—গ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, এ ১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। দাম তিন টাকা মাত্র।

নীলাঞ্জনের খাতা

আজকের দিনে প্রথম শ্রেণীর যে ক'জন সাহিত্যপ্রণেতার জন্ম বাঙলা তথা সারা ভারতবর্ষ গর্ববোধ করতে পারে, বুদ্ধদেব বসু তাঁদেরই একজন। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-মিলনের সমস্ত এই জীবন, এই জীবনের আছে নানা রূপ; আলোচ্য উপন্যাসটিতে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় বিশেষ একটি রূপের পূর্ণাঙ্গ চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন বুদ্ধদেব বসু। জীবনের এই ঘাত, সংঘাত প্রতিঘাতকে এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন লেখক।



নিম'এর তুলনা নেই

২০০০ বছর দরিয়া ইতার উপকারী গুণগুলি স্থপ্রতিষ্ঠিত

দাঁত স্ফূট করে মাটাও সুস্থ রাখে

নিম টুথ পেস্ট

ইহা নিমের সক্রিয় ও উপকারী গুণ এবং আধুনিক টুথ পেস্টগুলিতে ব্যবহৃত ঔষধাদি সমন্বিত একমাত্র টুথ পেস্ট



পত্র লিখিলে নিমের উপকারিতা সর্বদায় পুস্তিকা পাঠান হয়।

..... মি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা-২২ NT-186.HP-B

কলে বার চিত্তাঙ্গ কেবলমাত্র অকৃত্রিমই নয় সর্বংশে নিখুঁত হয়ে উঠেছে। উপজ্ঞাসটির মাধ্যমে লেখকের বলিষ্ঠ, সারবান এবং অভিনব চিন্তাধারার পরিচয় মেলে প্রকৃষ্ট পরিমাণে। স্বনামধন্য সাহিত্যশিল্পীর লেখনীজাত এই উপজ্ঞাসটি সর্বতোভাবে রসোত্তীর্ণ। ঘটনা-সংস্থাপনে, চরিত্রস্বষ্টিতে, সংলাপ বোজনায় কলা বাহুল্য, সকল দিক দিয়েই বুদ্ধদেব বসু অসাধারণ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাপসী চরিত্রটি সুর্চিত এবং সুরূপায়িত। উপজ্ঞাসটিতে বিশিষ্টতা এবং বিচিত্রতার এক মিলন ঘটেছে। বুদ্ধদেব বসুর বলিষ্ঠ লেখনীর কল্যাণে প্রকৃষ্ট বর্ণনা সাফল্যের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছে। উপজ্ঞাসটির পাতায় পাতায় লেখকের সর্বজনস্বীকৃত বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন বিস্তারিত। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাট্জ্যে স্ট্রীট। দাম—চার টাকা মাত্র।

রাণী বো

সাহিত্যক্ষেত্রে মৌলিকতার দাবী করতে পারেন যে বিবল সংখ্যক কল্প জন, প্রাণতোষ ঘটক তাঁদেরই অন্ততম। তিনি মূলতঃ চিত্রকর্মী সাহিত্যকার তাঁর লেখা পড়তে পড়তে যে আনন্দ পাঠক পান, তা কল্প-জাঁকা নিখুঁত ছবি দেখার, সংক্ষিপ্ত বাক্যের সাহায্যে খণ্ড-খণ্ড জীবনচিত্র তিনি গ্রথিত করে তোলেন সুন্দর মালাকরের মতই সহজ পারঙ্গমতায়। স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাই তাঁর বক্তব্য মুখর ও প্রাণবন্ত। আলোচ্য গ্রন্থটি প্রাণতোষ বাবুর অধুনাতম গল্পসংগ্রহ, একটি বড় গল্প ও ছোট গল্প স্থান পেয়েছে, প্রথম গল্পটির নামেই নামকরণ হয়েছে বইটির, আর এই গল্পট শুধু প্রথমই নয় প্রধানও, সম্পূর্ণ সমাজ-সচেতন কালোচিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত ‘রাণী বো’ গল্পটি একটি সুন্দর বাস্তব জীবনচিত্র। ধন নয়, মান নয়, শুধু দুঃখটো অল্পের অভাব যে কত প্রবল হয়ে উঠতে পারে তারই প্রভাবে মানুষ যে মনুষ্যত্বও পশ্য করে তোলে নির্দিষ্টায়, কুশলী রচয়িতা সেই চিত্রই এঁকেছেন আলোচ্য কাহিনীর মাধ্যমে। ‘রাণী বো’ গল্পটির মধ্যে সার্থক উপজ্ঞাসের পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে, আশা করি যথাসময়ে লেখক এসবকে অবহিত হবেন। লেখকের ডাখাতীতি সুন্দর ও সমৃদ্ধ। পুস্তকটির আজিক প্রকাশনীর ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা—৬ দাম—চার টাকা মাত্র।

গল্প

আলোচ্য পুস্তকখানি শ্রী অন্নদাশংকর বায় লিখিত একখানি ছোট গল্পের বই। মোট পঁচিশটি গল্প স্থান পেয়েছে এতে বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তর্গত হিসাবে; অন্নদাশংকরের লিখন শৈলীর প্রভাবে গল্পগুলি হয়ে উঠেছে নিটোল রসোত্তীর্ণ। বেগবান ভাষা, তাঁর মননশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ‘গল্প’ কে দিয়েছে এক অনন্তসাধারণ মর্যাদা পড়তে পড়তে নতুন করে অভিজ্ঞ হতে হয় এই সার্থক শিল্পীর শিল্পারনে। প্রত্যেকটি গল্পই অনবদ্য, ছোট গল্পের আজিক নিখুঁত ভাবে বজায় রয়েছে সর্বত্র, ‘হাসন সখী’ ‘হুকান কাটা’ ‘উপবাচিকা’ ইত্যাদি

গল্পগুলির সৌকর্য ও তীক্ষ্ণতা যোগ্যতার গল্পের খাদ এনে দেয় য যেমনই নিখুঁত শৈলী তেমনই তাঁর বিশ্লেষণ, কল্পম যে ‘তরবারে চেষ্টা’ এই বিদেশী প্রবাদটিই বার বার মনে জেগে পাঠকের। তরুণ অন্নদাশংকরের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ এক চমক লাগিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকেও। সাদর স্বীকৃতিতে তিনি করেছিলেন সেদিন নবীন আগন্তুককে, আজও অন্নদাশংকর বহন ক চলেছেন সেই উত্তরাধিকারকে—তাঁর সখ্যকে এইই আমায় সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। প্রচ্ছদশিল্প সুবন্দ, অগ্রাঙ্ক আজিক উচ্চাঙ্ক প্রকাশক—শ্রীগোপাল দাস মজুমদার, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

পত্রলেখার বাবা

সতীনাথ ভাট্টার সাম্প্রতিকতম গল্পসংগ্রহ পত্রলেখার বাব মোট নয়টি রচনা স্থান পেয়েছে এতে। মধ্যবিত্ত সমাজের নান চরিত্র বাস্তবায়ন কাহিনীর মাধ্যমে উজ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে লেখকের সুর্চিত অস্বাভাবিক ছাপ পাওয়া যায় প্রায় প্রতিটি গল্পেই ‘পত্রলেখার বাবা’ নামীয় গল্পটিতে মানসিক বিকৃতি বা পার্ভাসনে এক সুস্পষ্ট রূপ দেখা যায়, আলোচ্য গল্পটির নায়কের বিলাস ছি কুৎসামূলক পত্ররচনা, এই মানসিক বিকৃতির আধিক্য শেষ পর্যায় প্রয়োজিত হল তার নিজেরই সংসারে, স্বীয় কল্যায় বিরুদ্ধে বেনামে চিঠি লিখল সে; গল্পটির পরিণতি একাধারে ট্রাজিক ও হাস্যকর নিপুণ প্রয়োগশিল্পের ছাপ সর্বত্র সক্ষণীয়। অগ্রাঙ্ক গল্পগুলি সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিশিষ্ট। লেখকের ভাষা সরল ও বলিষ্ঠ গল্পগুলির তাব প্রকাশে যা একান্ত সহায়ক। বইটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি, একথা অকুণ্ঠই স্বীকার করি আমরা। অন্নদাশংকর বাব প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৪, বঙ্কিম চ্যাট্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা মাত্র।

অন্দর মহল

আলোচ্য গ্রন্থখানি সুধীরজ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের একখানি আধুনিক গল্পসংগ্রহ। লেখকের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায়িত সহজ সাবলীলতার পাঠক-মনকে স্পর্শ করতে তিনি পটু, বর্তমান প্রেক্ষে তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনধারার সার্থক রূপায়ণে বইটির গল্পগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আধুনিক সভ্যতা আশ্রয়ী মানুষ আজ হয়ে উঠেছে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর এরই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ‘অবতরণ’ গল্পটির আবেদন বিশেষ ভাবে মনকে স্পর্শ করে, আবার ‘চন্দন, ধূপ, ধূনোগন্ধ’ গল্পটি প্রকাশ করেছে মনের বাত-প্রতিঘাত বিরুদ্ধ পীড়িত সত্তার বিদ্রোহকে নিপুণ ভাবে, অতি সহজেই লেখক পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর বক্তব্যকে আমাদের কাছে। গল্পটি পড়তে পড়তে পাঠকের হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে সুরবাসা চরিত্রটির জন্ত। আমরা বইটির সর্বজন সাফল্য কামনা করি। আজিক সাধারণ। ত্রিবেণী প্রকাশন—২ জামাচেরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

মাসিক বসুমতীর প্রচার ও প্রচার বাঙলা দেশের বিশ্বয় !

কঙ্গো ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহার জীবনকালের মধ্যে অন্ততঃ এক বার তাহার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এ সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে গঠিত জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) রূপান্তরের মাধ্যমে দখলে বাধা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাট, টাঙ্গোর আক্রমণ হইতে ইথিওপিয়াকে রক্ষা করার জন্য কোন সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা নিঃপ্রয়োজন মনে করিয়াছিল। প্রায়শী ১৯৩৩ সালে এবং ইটালী ১৯৩৭ সালে জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করে। জাপানী ও ইটালীর সাহায্যপুষ্ট ফ্রান্স, স্পেন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করার ফলে ফ্রান্সেই জয়ী হইয়াছিল। কারণতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দারুণ হওয়ার পূর্বেই জাতিসঙ্ঘের ভাঙা ভাঙা হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এ পর্যন্ত কি কি ভাল কাজ করিয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ করিবার স্থান এখানে নাই। নিরাপত্তাপরিষদ তথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোমিশ্যর পৃথক পৃথক হস্তক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিভেদ ও পৃথকীকরণ নীতি এবং আলজিরিয়ার ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইয়াছে। বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সুরেজ খাল আক্রান্ত হইলে গোড়াতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই। রাশিয়া হুমকী না দিলে বৃটেন ও ফ্রান্স সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিয়া তাহাদের জয়কে পরাজয়ে পরিণত করিতে রাজী হইত কি না, তাহা লইয়া মতভেদ অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু কঙ্গোর ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ যে খুবই দ্রুততার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। গত ১৪ই জুলাই (১৯৬০) নিরাপত্তা পরিষদে ৮-০ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবে সন্ত স্বাধীনতা প্রাপ্ত কঙ্গো প্রজাতন্ত্র হইতে বেলজিয়ামকে সৈন্য অপসারণ করিতে আহ্বান জানান হয় এবং সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশীল্ডকে কঙ্গো গবর্নমেন্টকে সামরিক সাহায্য দিবার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রস্তাবে ইহাও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে, কঙ্গোলীজ সৈন্যদল অবস্থা পূর্ণাঙ্গ আয়ত্তে না আনা পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কঙ্গোকে সামরিক সাহায্য দিবে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বৃটেন, ফ্রান্স এবং চিয়াং কাইশেক সরকারের প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত ছিলেন। এই প্রস্তাবে তাহার যে ভেটো প্রদান করেন নাই ইহাই রক্ষা। কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে সন্ত স্বাধীনতা প্রাপ্ত কঙ্গোর অবস্থা সম্পর্কে এখানে প্রথমে কিছু আলোচনা করা আবশ্যিক।

গত ৩০শে জুন বেলজিয়াম কঙ্গোকে স্বাধীনতা দান করে। কঙ্গোর রাজধানী লিম্বোঙ্গোল্ডিলের ৭ই জুলাই তারিখের সংবাদ প্রকাশ কঙ্গোলীজ সৈন্যরা বিদ্রোহ করিয়া খেতাজদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের দেশে বৈদেশিক সংবাদ যেভাবে পরিবেশিত হয় তাহাতে এই বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবু এই সংবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা সেনা বাহিনীর বেলজিয়াম



ত্রিগোপালচন্দ্র নিয়োগী

অফিসারদের অপসারণ এবং বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবী করে। সংবাদে আরও প্রকাশ, ৬ই জুলাই বিদ্রোহীরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এবং পার্লামেন্ট ঘেরাও করিয়া খেতাজদিগকে অপসারণের দাবী জানান। ৬ই জুলাই সন্ধ্যায় এক বেতার ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিক লুলুয়া বলেন যে, এই আন্দোলনের মূল ইউরোপীয় অফিসারদিগকে এবং নন-কমিশন অফিসারদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তথ্যপ্রচার দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ কাশাম্বা বেতার ভাষণে বলেন যে, "আমাদের স্বাধীনতার শত্রুতা সর্বত্র গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছে।" প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুলুয়া এই অভিযোগও করিয়াছেন কঙ্গোলীজ সৈন্যদের বিদ্রোহী হইবার জন্য বেলজিয়াম সেনানায়করাই দায়ী। অনেকে মনে করেন যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ কঙ্গোকে স্বাধীনতা দেওয়ার এই বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটয়াছে। কঙ্গোর জনগণ ও নেতাদিগকে স্বাধীনতা লাভের কোন শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। কঙ্গোতে কোন শিক্ষিত শ্রেণী নাই, দেশী সিভিল সার্ভিস নাই। এই অবস্থায় মধ্যে হঠাৎ স্বাধীনতা লাভ করার গভর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের এই বাধা বুলি আমাদের অন্তত নয়। প্রকৃতপক্ষে এইজন্যই কি স্বাধীনতা লাভের পরেই কঙ্গোতে হাঙ্গামা এবং খেতাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল? খেতাজদের উপর কতটুকু অত্যাচার হইয়াছে, তাহা সঠিক ভাবে জানা যায় না। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কঙ্গোতে যে ব্যাপক ও বিপুল হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহা ছিল স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন। বেলজিয়াম নৃশংসতার সহিত এই হাঙ্গামা দমন করিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল কি? তাহার বিবরণই বা সংবাদপত্রে কতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে?

কঙ্গোলীজ সৈন্যদের বিদ্রোহ এবং খেতাজদের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ অতিরঞ্জিত করিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। খেতাজদের স্বার্থরক্ষার জন্য সামরিক ও বেসামরিক বড় বড় চাকুরীতে খেতাজরাই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কঙ্গোলীজ সৈন্যদের বিদ্রোহ সেই স্বার্থে বাধ সাধিয়াছে। খেতাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সৈন্যরা অত্যাচার করিতেছে,

তাহাদের ধনপ্রাণ মর্যাদা আর নিরাপদ নয়, এই অভ্যুত্থান তুলিয়া বেলজিয়ম সরকার পুনরায় কোঁপলে সত্ত্ব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কঙ্গো দখলের আয়োজন করিলেন। স্বাধীন কঙ্গোর শাসন-ব্যবস্থা সবক্ষে বেলজিয়ম গবর্নমেন্ট ও কঙ্গোর মধ্যে যে চুক্তি হয় তদনুসারে কাটাঙ্গা প্রদেশের কামিনা এবং লিওপোল্ডভেলি প্রদেশের বিটোনার বেলজিয়ান সৈন্যের ঘাঁটি থাকিবে। এই দুইটি ঘাঁটিতে বেলজিয়ান সৈন্য তো ছিলই, তা ছাড়া বেলজিয়ম গবর্নমেন্ট কঙ্গোতে আরও সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্যারাসুটবাহিনী কঙ্গোতে বেলজিয়ান সৈন্য অবতরণ করিতে লাগিল। প্যারাসুটবাহিনী কঙ্গোর অনেকগুলি সহর দখল করিয়া বসিল। কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলে কার্যতঃ বেলজিয়াম সৈন্যের দখলে চলিয়া গেল। বিমানঘাঁটিগুলি, চমাতল ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রগুলি এবং সেতুগুলিও তাহারা দখল করিয়া বসিল। বস্তুতঃ স্বাধীন কঙ্গোতে কঙ্গো সরকারের শাসনের অস্তিত্বই একরূপ বিলোপ হইয়া গেল। সেই সঙ্গে চলিতে লাগিল কঙ্গোলিঙ্গদের উপর বেলজিয়াম সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচার। কিন্তু এই অত্যাচারের সংবাদ বাহির বিশ্বে প্রকাশিত হইতে দেওয়া হইল না। গত ২০শে জুলাই (১৯৬০) ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুম্বা এই সকল অত্যাচারের কিছু কিছু বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। একদিকে বিস্ত্রোহ দমনের নামে বেলজিয়াম সৈন্যরা কঙ্গোর স্বাধীন সত্ত্বার উপর আঘাতের পর আঘাত হানিতে লাগিল, আর একদিকে গত ১১ই জুলাই কাটাঙ্গা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ মোসে সোম্বে (Mr. Moise Tshombe) কাটাঙ্গা প্রদেশকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং রোডেশিয়ার গবর্নমেন্টের নিকট সৈন্যদের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। উক্ত রোডেশিয়া সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখার এবং কতক সৈন্য কঙ্গোতে প্রবেশ করার সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বলিয়াছেন যে, সামরিক সাহায্যের অস্বরোধ আসিয়াছে বটে, কিন্তু কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া এই ধরনের কোন অস্বরোধ তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন না।

বেলজিয়ান সৈন্যের আক্রমণে সত্ত্ব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কঙ্গোর স্বাধীন সত্ত্বা বিলুপ্ত হওয়ার গুরুতর আশঙ্কার সম্মুখে গত ১১ই জুলাই কঙ্গো মন্ত্রিসভা নিয়ম কঙ্গোতে মার্কিন সৈন্য প্রেরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অস্বরোধ জানান। মার্কিন সরকার অবশ্য নিজে এই অস্বরোধ রক্ষা না করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট এই অস্বরোধ পাঠাইয়া দেন। কঙ্গোতে মার্কিন সৈন্য প্রেরণের অস্ববিধা ও বিপদও ছিল অনেক। কঙ্গোতে মার্কিন সৈন্য আসিলে রুশ সৈন্যও যে আসিত না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ১৬ই জুলাই (১৯৬০) নিরাপত্তা পরিষদ গৃহীত প্রস্তাবে যে কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা এবং বেলজিয়ামকে সৈন্য সরাইয়া লইতে অস্বরোধ করা হয় সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে ক্রততার সহিত-ই কঙ্গোতে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামরিক সাহায্যের এক অংশ গত ১৫ই জুলাই (১৯৬০) তারিখেই কঙ্গোতে পৌঁছে। জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের প্রায় ১০ হাজার সৈন্য কঙ্গোতে পৌঁছিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী গঠনেও যথেষ্ট কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কঙ্গোর পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আফ্রিকার স্বাধীন রাজ্যগুলি, আন্তর্জাতিক বিরোধের সহিত জড়িত নয় এইরূপ দেশে এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধে যে সকল দেশ নিরপেক্ষ সেই সকল দেশ হইতে সৈন্যবাহিনী কঙ্গোতে প্রেরণ করা হইয়াছে। মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হইলে রুশ সৈন্যবাহিনীও প্রেরণ করিতে হইত। কঙ্গোতে রুশসৈন্যের উপস্থিতি-পশ্চিমী শক্তি বর্গের অভিপ্রের্ত নয়। কাজেই মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য প্রেরণ করা হয় নাই। যে সকল দেশ সৈন্য সরবরাহ করিবে না তাহারা খাণ্ডদ্রব্য প্রভৃতি সরবরাহ করিবে। ১৭ই জুলাইয়ের সংবাদ প্রকাশ, বেলজিয়ান সৈন্যদল শাস্ত্র ভাবে এবং নিরুপদ্রবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনীর হাতে কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলের নিয়ন্ত্রণ ভার অর্পণ করিয়াছে। কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুম্বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ গ্যালফা বাকের নিকট এক চরম পত্র জালাইয়া দেন যে, ১৯শে জুলাইয়ের মধ্যে বেলজিয়াম বাহিনীকে কঙ্গো হইতে সরাইয়া লইতে যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী বাধ্য না করেন তবে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থী হইবেন। বেলজিয়ান মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, বেলজিয়ানদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য যতদিন প্রয়োজন হইবে ততদিন তাহারা কঙ্গোতে অবস্থান করিবে।

কাটাঙ্গার স্বাধীনতা ঘোষণা—

বেলজিয়াম সম্মত হওয়া সত্ত্বেও কাটাঙ্গার মুখ্যমন্ত্রীর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে কাটাঙ্গায় প্রবেশ করিতে না দিতে অনমনীয় জেদ এবং কাটাঙ্গায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর প্রবেশ স্থগিত রাখা কঙ্গোর সমস্তকে বারুদভূপে পরিণত করিয়াছে ইহা মনে করিলে মোটেই ভুল হইবে না। বস্তুতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কাটাঙ্গায় প্রবেশ স্থগিত রাখার মুখ্যমন্ত্রী মিঃ সোম্বে প্রথম দফা জয়লাভ হইয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হওয়ার কোন কারণ নাই। কাটাঙ্গার মুখ্যমন্ত্রীর অনমনীয় জেদের পিছনে যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন রহিয়াছে, একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। কঙ্গোর কাটাঙ্গা প্রদেশই খনিজ সম্পদে ঐর্ষ্যশালী। কাটাঙ্গায় তামা এবং ইউরেনিয়াম হইতে পশ্চিমী শিল্পপতিরা প্রচুর লাভ করিয়া থাকেন। কাটাঙ্গায় খনিগুলিতে ব্রিটিশ ও বেলজিয়াম পুঁজি নিয়োজিত রহিয়াছে। ব্রিটিশ ও বেলজিয়াম খনিমালিকদের 'কার্টেল' 'Union Minier Du Haut Katanga' মিঃ সোম্বে বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে। মিঃ সোম্বে সম্পর্কে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুম্বা টাস সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট বাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। মিঃ সোম্বে এক সময়ে ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত তাঁহার জাপানুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বেশী দিনের কথা নয়, তিনি হলচাতুরী দ্বারা এবং 'ওভারল্ড' করিয়া বেলজিয়ান কোম্পানীর প্রায় ১ কোটি বেলজিয়ান ফ্রাঁ আত্মসাৎ করার তাঁহাকে প্রেষণ করা হয় এবং তাঁহার বিচার হয়। কিন্তু পরে যে ব্যবস্থা

উত্তর হয় তাহাতে তাঁহাকে ক্ষমা করা হয় এবং ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই হইতেই তিনি বেলজিয়ানদের নির্দেশ নিক্ষিপ্তে মানিয়া লইতেছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা যায়, বেলজিয়ম এখন আর কাটাঙ্গার মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন করিতেছে না। কিন্তু গোপনে কি করা হইতেছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ডাঃ র্যালক বাঞ্চে গত ৪ঠা আগষ্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কাটাঙ্গা প্রবেশের প্রস্তাবের জল্প এলিজাবেথভিলে পৌঁছান তখন সরকারী ভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয় নাই। কিন্তু কাটাঙ্গার মুখ্যমন্ত্রীর সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছে। এই আলোচনার ফলেই যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কাটাঙ্গা প্রবেশ স্থগিত রাখা হইয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

কাটাঙ্গাকে কঙ্গো হইতে পৃথক করিবার জল্প যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের একটা চক্রান্ত চলিতেছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। ১৩ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদে কঙ্গো সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর গত ১৮ই জুলাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আফ্রিকার সমস্ত রাষ্ট্র সমূহ এক বিবৃতিতে বাহির হইতে কঙ্গো সংহতি ফুল করার প্রয়াসের নিন্দা করিয়াছেন। গত ২০শে জুলাই নিরাপত্তা পরিষদের অবিবেশনে কঙ্গো সম্পর্কে আর একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব উত্থাপন করে টিউনিশিয়া এবং সিংহল। এই প্রস্তাবে কঙ্গো হইতে অবিলম্বে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণের জল্প নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ কার্যকরী করিবার জল্প বেলজিয়ম গবর্নমেন্টকে অতুসোধ করা হইয়াছে। তাছাড়া কঙ্গোতে আইন শৃঙ্খলা ও কঙ্গো সরকারের ক্ষমতা পরিচালন ব্যাহত হইতে পারে এবং কঙ্গোর অর্থশক্তি এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফুল হইতে পারে এমন কিছু না করিবার জল্প সমস্ত রাষ্ট্রকেও অতুসোধ করা হইয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ কি ভাবে এই প্রস্তাবের মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন, এই প্রশ্ন স্বতঃই অবস্থা দেখিয়া মনে না জাগিয়া পারে না। কাটাঙ্গা রেডিও হইতে বলা হইয়াছে যে, ব্রুটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অজ্ঞাত বৃহৎ রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর প্রস্তাবিত কাটাঙ্গা প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কাটাঙ্গা রেডিওর এই দাবীর প্রতিবাদ করা হইয়াছে বতিয়া যেমন জানা যায় না, তেমনই কাটাঙ্গার মন্ত্রীরা টেলিগ্রাম, টেলিফোন এবং কেবল দ্বারা ব্রুটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অজ্ঞাত বৃহৎ রাষ্ট্রের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছেন। এই অজ্ঞাত বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে যে রাশিয়া নাই, সে-কথা বলাই বাহুল্য। কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুলুয়া একাধিক বার জানাইয়াছেন যে, কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্য অবিলম্বে অপসারিত না হইলে তিনি রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। রাশিয়াও কঙ্গোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণের কাজ যে ঘোটেই সম্ভাবজনক ভাবে চলিতেছে না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তবু সম্মিলিত বাহিনীর কাজ এ পর্যন্ত মোটামুটি একরকম তালই চলিতেছিল। কিন্তু কাটাঙ্গার খাজা সাপিয়া জরাজীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

মিঃ সোমের উদ্বোধন সৈন্য বাহিনী কিছুই নাই। হাজার ভিনেক সৈন্য মারা গিয়াছে। বেলজিয়ানদের খুব কষ্ট দিয়া

সৈন্য তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে বাধা দিবার স্পষ্ট প্রকাশ করিবার কারণ বলিয়া মনে হয় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী কাটাঙ্গায় প্রবেশ করিলে আক্রমণকারীরূপেই প্রবেশ করিবে এবং তাহাদিগকে প্রতিরোধ করা হইবে, মিঃ সোমের এই সকল উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উহার পিছনে একটা গভীর চক্রান্ত এবং উদ্দেশ্য রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্য ও চক্রান্তের কিঞ্চিৎ আভাস সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কাটাঙ্গা প্রবেশে প্রবেশ স্থগিত রাখার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কাটাঙ্গায় প্রবেশ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট মিঃ হামারশিল্ডের রিপোর্টের মধ্যে। কাটাঙ্গার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ না করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী বাহাতে কাটাঙ্গায় প্রবেশ করিতে পারে সেজন্য তিনি নিরাপত্তা পরিষদকে আইন প্রণয়ন করিতে বলিয়াছেন। কাটাঙ্গার পরিস্থিতি তাঁহার কাছে রাজনৈতিক সমস্যা বলিয়া মনে হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। তাঁহার এই রিপোর্ট একটা সঙ্কট সৃষ্টির ইঙ্গিত দিতেছে। মিঃ সোমের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ বাহাতে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে না পারে তাহার জল্পই এই কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকজন পর্যবেক্ষক মনে করেন, বেলজিয়ানরা আশা করিতেছেন যে, ফ্রান্স ভেটো প্রয়োগ করিয়া মিঃ সোমের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দিবে না। যত্ন হইতে টাস যে সংবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, যথাসম্ভব শীঘ্র কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণের জল্প সোভিয়েট সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন। সোভিয়েট সরকার আরও বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী যদি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে যে দেশের সৈন্য বাহিনী ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে তাহাদের সেখানে প্রবেশ করা দরকার। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্বেই হয়ত নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত জানিতে পারা যাইবে। কিন্তু কঙ্গোকে লইয়া আন্তর্জাতিক আকাশ যে গভীর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কঙ্গোর ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উহার জল্প দারী হইবে পশ্চিমী শক্তিবর্গ। এই ব্যর্থতা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মর্যাদাকেই শুধু বিনষ্ট করিবে না, উহার অস্তিত্বেরও আর কোন সার্থকতা থাকিবে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কাটাঙ্গা প্রবেশ স্থগিত রাখার কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুলুয়া যে সঙ্কট হইতে পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। গত ৭ই আগষ্ট কোনাক্রিতে (গিনি) তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতে তাঁহার সরকারকে তিনি অতুসোধ করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঘানা ও গিনির সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। কঙ্গোতে ঘানার ভিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্য আছে এবং আরও ভিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্য পঠনের পরিকল্পনা আছে। ঘানার বিজার্ড সৈন্যও বধেই আছে। গিনির সৈন্যসংখ্যা ২ হাজার এবং চেকোস্লোভাকিয়ার অল্পসংখ্যক দ্বারা সম্মিলিত। কাটাঙ্গার অর্থমন্ত্রী কসেলস-এ এক সাংবাদিক সংলাপে বলিয়াছেন, ঘানা যদি কাটাঙ্গার সৈন্য প্রবেশ

কবে, তাহা হইলে কাটাঙ্গকে যুদ্ধের জন্ত আরও অধিক প্রস্তুত দেখিতে পাইবে।

মার্কিং বোম্বার্ক বিমান আর-বি—৪৭

মার্কিং ইউ—২ গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করার দুই মাস পরেই আরও একটি মার্কিং বিমান সোভিয়েট রাশিয়া ভূপাতিত করিয়াছে। এই বিমানটি আর-বি—৪৭ সামরিক বিমান। গত ১লা জুলাই (১৯৬০) একটি রাশিয়ান জঙ্গী বিমান আর্কেঞ্জেলের নিকট উত্থাকে গুলীবিদ্ধ করিয়া বারেন্টস সাগরে নিপাতিত করে। দুই জন মার্কিং বৈমানিককে সোভিয়েট জাহাজে তুলিয়া লওয়া হয়, এক জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট তিন জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গত ১লা জুলাই তারিখে এই বিমানটিকে নিপাতিত করা হইলেও ১২ই জুলাইয়ের পূর্বে পর্যন্ত রাশিয়া এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিল। রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ সর্বপ্রথম ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত বৈদেশিক সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে এই বিমানটিকে গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, কোলা উপদ্বীপের (Kola peninsula) নিকটে বারেন্টস সাগরে ভয়াটোই নস্ (Svyatoi Nos) অস্ত্রদ্বীপের কাছে এই মার্কিং সামরিক বিমানটি রাশিয়ার সীমান্তে লঙ্ঘন করে। বিমানখানি আর্কেঞ্জেলের দিকে যাইতেছিল। তিনি আরও বলেন যে, যে দুই জন বৈমানিককে (একজন চালক এবং আর একজন সহকারী-চালক) জাহাজে তুলিয়া লওয়া হয় তাহাদের কথা জানা যায় যে, এই দুই জন ইঞ্জিনিয়ারিং আর-বি—৪৭ সামরিক বিমানটি বৃটেনে স্থিত মার্কিং সামরিক ঘাঁটি হইতে রাশিয়ার উত্তর সীমান্তে গোয়েন্দাগিরির জন্ত যাত্রা করে এবং পরে উক্ত বৃটেনে ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। জরৈনক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মঃ ক্রুশেভ বলেন যে, এই বিমানখানি আর-বি—৪৭ বোম্বার্ক বিমান। মার্কিং যুদ্ধরাত্রে এই বিমান প্রচুর সংখ্যায় আছে। এই বিমান ঘণ্টায় ৮৫০ হইতে ১৫০ কিলোমিটার গতিতে উড়িয়া যায় এবং ১০ হাজার হইতে ১৪ হাজার মিটার উর্দ্ধে উড়িয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে, এই বিমানখানি রাশিয়ার আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল। বিমানখানি ভূপাতিত করার মশ দিন পর্যন্ত কেন নীরবতা অবলম্বন করা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে জরৈনক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মঃ ক্রুশেভ বলেন যে, বিমানখানি নিরুদ্ধেশ হওয়ার ব্যাপারটি মার্কিং যুদ্ধরাত্রে দিক হইতে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহা জানিবার জন্ত কিছু সময় তাঁহারা এ সম্পর্কে নীরব ছিলেন। নরওয়েতে বোডো (Bodoe) বিমান-বন্দরের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সহিত এই বিমানের বেডিও সংযোগ ছিল।

মিঃ ক্রুশেভ বলেন যে, মার্কিং বেডিও কেন্দ্রগুলি বিশেষ করিয়া নরওয়েস্থিত মার্কিং বেডিও কেন্দ্র হইতে এই বিমানখানির জন্ত বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, রাশিয়া গুলী করিয়া বিমানখানিকে ভূপাতিত করিয়াছে অথবা রাশিয়ার অবতরণ করিয়াছে। পরে তাঁহাদের ধারণা হয়, বিমানখানি কোন দৃষ্টনার অগ্নে নিমজ্জিত হয়। এই অবস্থায় মঃ ক্রুশেভ বিমানখানিকে গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করার

বৈমানিকদের উদ্ভিতে প্রকাশ বিমানখানি বৃটেনের অল্পশে শায়াস্থিত মিলি নটনের ঘাঁটি হইতে বাজা করিয়াছিল। যদি এই বিমান সম্পর্কে বৃটেন ও মার্কিং যুদ্ধরাত্রে নিকট প্রান্তিক জানায়। এই ঘটনা সম্পর্কে গত ১৩ই জুলাই বৃটিশ প্রধান মিঃ ম্যাকমিলান কমন্ড সভায় বলেন যে, বৃটেনস্থিত মার্কিং ঘাঁটি সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছে তাহা সংশোধন করার প্রস্তাবটি মার্কিং যুদ্ধরাত্রে নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। রাশিয়ার প্রত্নিবাদের উৎস মার্কিং যুদ্ধরাত্রে জানায় যে, বিমানখানি রাশিয়ার ভূমির উৎস অথবা রাশিয়ার জলভাগের উপরে উড়িয়া যায় নাই। উহা রাশিয়ার জল-সীমার বাহিরে গুলীবিদ্ধ করা হইয়াছে। যাহা হইত রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদে এসম্বন্ধে অভিযোগ করে এবং মার্কিং যুদ্ধরাত্রে বিরুদ্ধে এক নিলান্দ্রচক প্রস্তাব উপস্থাপন করে। যদি অল্পবেধে ২২শে জুলাই (১৯৬০) নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন হইত এবং রাশিয়ার পক্ষ হইতে নিলান্দ্রচক প্রস্তাব উপস্থাপন হয়। ২৬শে জুলাই নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার নিলান্দ্রচক প্রস্তাব ২-৯ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

মার্কিং বিমান আর-বি—৪৭ সংক্রান্ত ব্যাপারটির তদন্ত করি উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠনের জন্ত মার্কিং যুদ্ধরাত্রে পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। ইংল্যান্ড পক্ষ হইতে আরও একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। উহাতে হয় যে, আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে দ্বিতীয় বৈমানিকদের সহিত করিতে দেওয়া হউক। উক্ত দুইটি প্রস্তাব সম্পর্কেই রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করিয়াছে। রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগ অসঙ্গত হইয়াছে কি না এবং আর-বি—৪৭ বিমান সম্পর্কে অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে রাশিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়াছে কি না তাহা বর্কের বিষয় বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

সাম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মার্কিং প্রত্নিনিধি মিঃ হেনরী কাবট লক্ষ গতে ২৫শে জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ বলেন যে, যে-আর-বি ৪৭ বিমানটি রাশিয়া গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে তাহা কোন সমবেই সোভিয়েট অঞ্চল হইতে ৩০ মাইলের বম দূরত্বের মধ্যে আসে নাই। একটি রুশ জঙ্গী বিমান উত্থাকে সোভিয়েট অঞ্চলে তাড়াইয়া উইয়া বাইবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়াই মার্কিং বিমানটি এইরূপ কমে দূরত্বের মধ্যে আসিয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, মার্কিং বিমানটি যে আইনসঙ্গত পথেই উড়িতেছিল ইলেকট্রনিক বাস্তব সাহায্যে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। রুশ প্রত্নিনিধি মঃ কুজনেৎসভ নিরাপত্তা পরিষদে যাত্রা বলিয়াছেন তাহাও বিবেচনার যোগ্য। ২রা জুলাই—মার্কিং বিমান বিভাগ বলিয়াছিল, বিমানখানি কোথায় তাহা তাহাদের জানা নাই। এই কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বিমানখানি কোথায় আক্রান্ত হয় তাহা মার্কিং-যুদ্ধরাত্রে জানাই ছিল, নতুবা ২রা জুলাই তারিখে এরূপ কথা তাহারা বলিবে কেন? তিনি বলেন যে, বিমানখানি যেখানে ধ্বংস হইয়াছে সেখানে উক্ত পাঠি পাঠান হইল না কেন? সেইসময় হাইয়া বাওয়ার বিমানখানি কোথায় নামিতে বাধ্য হইয়াছে, এমন কথাই বা কেন বলা হইল? মার্কিং আর-বি—৪৭ বোম্বার্ক বিমান রাশিয়ার ভূভাগ কিবা রাশিয়ার উপরে গিয়াছিল কি না, তাহা মার্কিং যুদ্ধরাত্রে এবং রাশিয়া হাইয়া আর কেহই প্রমাণ দানিতে

পারে নাই। রাশিয়া বলিতেছে, উহা সোভিয়েট সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়াছিল। কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র বলিতেছে যে, উক্ত বিমান রাশিয়ার সীমান্ত লঙ্ঘন করে নাই। কিন্তু কিভাবে তাহারা তাহা জানিতে পারিল তাহা বলিতেছে না। যদি স্বীকার করা যায় যে, সীমান্ত লঙ্ঘন করে নাই, তাহা হইলে উহা যে ক্রম দরিয়ার নিকটেই কোথাও গিয়াছিল ইহা বুঝা যাইতেছে। মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র সে কথা দাবীকার তো করে নাই, শুধু বলিয়াছে ৩০ মাইলের নিকটতর কোন সময়ই হয় নাই। বিমানখানির উদ্দেশ্য খুবই নির্দোষ হইতে পারে, কিন্তু ক্রম সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়া যে-অত্যন্ত বিপজ্জনক আমেরিকা তাহা বুঝিতেছে না কেন? মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য সন্দেহ সৃষ্টির পক্ষে যে যথেষ্ট একথা স্বীকার করা যায় না। আর-বি-৪৭ বিমান কখনই রাশিয়ার ভূভাগ কিম্বা দরিয়ার উপর যায় নাই, ইহা যদি প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহা হইলেই মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের কেসটি শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

মার্কিং প্রেসিডেন্ট নির্বাচন :-

আগামী ৮ই নবেম্বর (১১৬০) মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই নির্বাচনের তোড়জোড় এখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ডেমোক্যাটিক দল ম্যাসাচুসেটসের প্রতিনিধি সেনেটর জন এক্ কেনেডিকে তাঁহাদের প্রাধিকারে মনোনীত করিয়াছেন। ডাটস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ডেমোক্যাটিক দলের পক্ষে মনোনীত হইয়াছেন টেক্সাসের প্রতিনিধি সেনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা লিগুন জনসন। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম নিম্মন এবং ডাটস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনীত হইয়াছেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মার্কিং প্রতিনিধি হেনরী কাবট লজ। ডাটস প্রেসিডেন্টরূপে মি: নিম্মন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মার্কিং প্রতিনিধি হিসাবে মি: লজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের পররাষ্ট্র নীতিও বিশ্বাসী জানেন। তাহারা নির্বাচিত হইলে এই নীতির পরিবর্তন হইবে, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। শীর্ষ-সম্মেলন সম্পর্কে ক্রম প্রধানমন্ত্রী ম: জুশেভ বলিয়াছেন যে, মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য তিনি অপেক্ষা করিবেন। পূর্ব আর্মীজীর সহিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরও এই কথাই তিনি বলিয়াছেন। ডেমোক্যাটিক পার্টির প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি হইবে ম: জুশেভ হয়ত এইরূপ আশাই পোষণ করেন।

মি: আইসেনহাওয়ারের দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্টসিপের শেষের দিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল ইউ-২ বিমানের ঘটনার তাহা বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর ঘটিল আর-বি-৪৭ বিমানের ঘটনা। ডেমোক্যাটিক দলের প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলে তিনি এই আন্তর্জাতিক দুর্বোপের অবসান ঘটাইতে পারিবেন কিম্বা, তাহা এখনই বলা কঠিন।

তবে এইরূপ আশা করা হয়ত অসম্ভব নয় যে, ডেমোক্যাটিক দলের প্রার্থী মি: কেনেডি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলে তিনি হয়ত বর্তমান মার্কিং পররাষ্ট্র নীতিতে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করিতে আগ্রহী হইবেন। যদি আগ্রহী হন তাহা হইলে উহা কার্যকরী করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না।

বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী—

গত ২০শে জুলাই সিংহলে বে সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেল তাহাতে শ্রীলঙ্কাফ্রিডম পার্টি ৭৫টি আসন দখল করিতে সমর্থ হওয়ার এই দলই মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে এবং পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী মি: সোলোমন বন্দরনায়কের পত্নী শ্রীমতী গিরিমাভো বন্দরনায়ক সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হইলেন। শ্রীমতী বন্দরনায়ক বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনি সিংহল পার্লামেন্টের নির্বাচিত কিম্বা মনোনীতা সদস্য নহেন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি চারি মাস প্রধান মন্ত্রী থাকিতে পারিবেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে। ইহা অবশ্য কঠিন কিছুই হইবে না। শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি যদিও ৭৫টি আসন দখল করিয়াছে তাহা হইলেও নূতন সরকার যে ছয়জন সদস্য মনোনয়ন করিবেন তাঁহাদিগকে লইয়া সরকারী দলের সদস্যসংখ্যা হইবে ৮১জন। সিংহলের প্রতিনিধি পরিষদ মোট সদস্যসংখ্যা ১৫১জন। যদিও এই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব বেশী নয়, তাহা হইলেও এই দল ট্রটেকীপন্থী, কমিউনিস্টপার্টি এবং জাতিক বিমুক্ত পেরামুন্নায় সমর্থন লাভ করিবে। এই তিনটি দল মোট ১৮টি আসন দখল করিয়াছে। শ্রীলঙ্কাফ্রিডম পার্টি কেডারেল পার্টির সমর্থন পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই দল সিংহলবাসী তামিল ভাষা-ভাষীদের প্রতিষ্ঠান। এই দল ১৫টি আসন দখল করিয়াছে।

শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি বে স্থায়ী সরকার গঠন করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত বৎসর ২৫শে সেপ্টেম্বর তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মি: বন্দরনায়ক আততায়ীর গুলিতে আহত হইয়া নিহত হওয়ার পর সিংহলের রাজনীতিকক্ষেত্রে যে-সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল এতাদনে তাহার পরিসমাপ্ত হইল। মি: বন্দরনায়ক নিহত হওয়ার পর শ্রীবিজয়ানন্দ মহনায়ক প্রধান মন্ত্রী হইয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, সিংহলে গৃহযুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় ছিল না। সিংহল গৃহযুদ্ধের পথে গেল না বটে, কিন্তু গত ১১শে মার্চের নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। ইউনাইটেড নেশনাল পার্টি ৫০টি আসন দখল করিয়া বহুসভ্য দলে পরিণত হয় এবং উহার নেতা মি: ভাডনী সেনানায়ক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে সেনানায়ক মন্ত্রিসভার পরাজয় হয়। অন্ত:পর গবর্নর জেনারেল প্রতিনিধি পরিষদ জাতিয়া দিয়া ২০শে জুলাই সাধারণ নির্বাচন হওয়ার দিন ধাৰ্য্য করেন। এই নির্বাচনে সিংহলের রাজনৈতিক অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটিল।

শ্রীমতী বন্দরনায়কের মন্ত্রিসভা পররাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে কো: শিবিরে যোগদান না করার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিবেন

তাঁহার স্বামী প্রাধানমন্ত্রির সময় কলকাতা বন্দর ও পরিবহন ব্যবস্থা রক্ষিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা বন্দরনারকের মন্ত্রিসভা বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিবেন। চাবাগান, রবার বাগান প্রভৃতিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার প্রস্তাব অপেক্ষা ভারতীয় বংশোদ্ভবদের নাগরিক অধিকার লাভের প্রসঙ্গে অধিকার দিতেই তিনি চাহিয়াছেন। ইহা খুবই সুখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সিংহলের কোন প্রধান মন্ত্রী এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। তবে তাহাদের অবস্থা যদি আরও খারাপ না হয় তাহা হইলেই সুখের বিষয় হইবে। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৮ সালের ভাষা সমস্যা লইয়া বে দাঙ্গা হালুমা হইয়াছিল সে কথা স্বতঃ-ই মনে পড়ে। শ্রীযুক্তা বন্দরনারক শ্রীলঙ্কা ক্রিডম পার্টিকে সবল ও সন্তোষ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। যদি তিনি সিংহলের অত্যন্ত কঠিন সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে পারেন তাহা হইলে বিশ্বের প্রথম মহিলামন্ত্রী হিসাবে তিনি একটা কীর্তি স্থাপন করিবেন।

আইসেনহাওয়ারের চ্যালেঞ্জ—

চিকাগোতে রিপাবলিকান দলের জাতীয় কনভেনশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গত ২৬শে জুলাই (১৯৬০) মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সোভিয়েট রাশিয়ার সম্মুখে এক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি রাশিয়াকে আহ্বান করিয়াছেন বিশ্বব্যাপী এক নির্বাচন প্রতিস্থাপিত। বিশ্ববাসী কম্যুনিজম চায়, না স্বাধীনগণতন্ত্র চায় এই প্রশ্ন লইয়া হইবে নির্বাচন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনাধীনে এই নির্বাচন হইবে। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার সাম্প্রতিক ভ্রমণ এবং বক্তৃতার আমেরিকার মৰ্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। উহার উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে, এই তুলনামূলক জাতীয় মৰ্যাদা সম্পর্কে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি মঃ ক্রুশ্চেভকে চ্যালেঞ্জ করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, মঃ ক্রুশ্চেভ কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনার সর্বত্র, প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক মহাদেশে একটি মাত্র সরল প্রশ্ন লইয়া গণভোট গ্রহণে সক্ষম হইবেন? এই প্রশ্নটি হইল, "আপনি কম্যুনিষ্ট শাসনাধীনে, না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে স্বাধীন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহার অধীনে বাস করিতে চান?" প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আরও বলিয়াছেন, "এই গণভোটের কলাকল দ্বারা সোভিয়েটগুলি কি বিধে তাঁহাদের মৰ্যাদা পরিমাপ করিতে ইচ্ছুক আছেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনন্দের সহিত ইহাতে রাজী আছে।" মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার শুধু একটি কথা বলেন নাই। তিনি বলেন নাই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আওতার দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ফরমোসা, ফিলিপাইন, পাকিস্তান ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে যে স্বাধীন গণতন্ত্র প্রচলিত আছে তাহার অধীনে বিশ্ববাসী বাস করিতে চাহেন কি না?

মার্কিন সাহায্যে পৃষ্ঠ দক্ষিণ কোরিয়ার সিম্যান বীর বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানে গণবিক্ষোভের কথা বিশ্ববাসী জানে না, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। জাপানে গণবিক্ষোভের ফলে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে জাপান ভ্রমণ বাতিল করিতে হইয়াছে, জাপান প্রধানমন্ত্রী কিশিকেকে পুনর্ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। কে-সকল দেশ মার্কিন সামরিক স্ট্রোটের

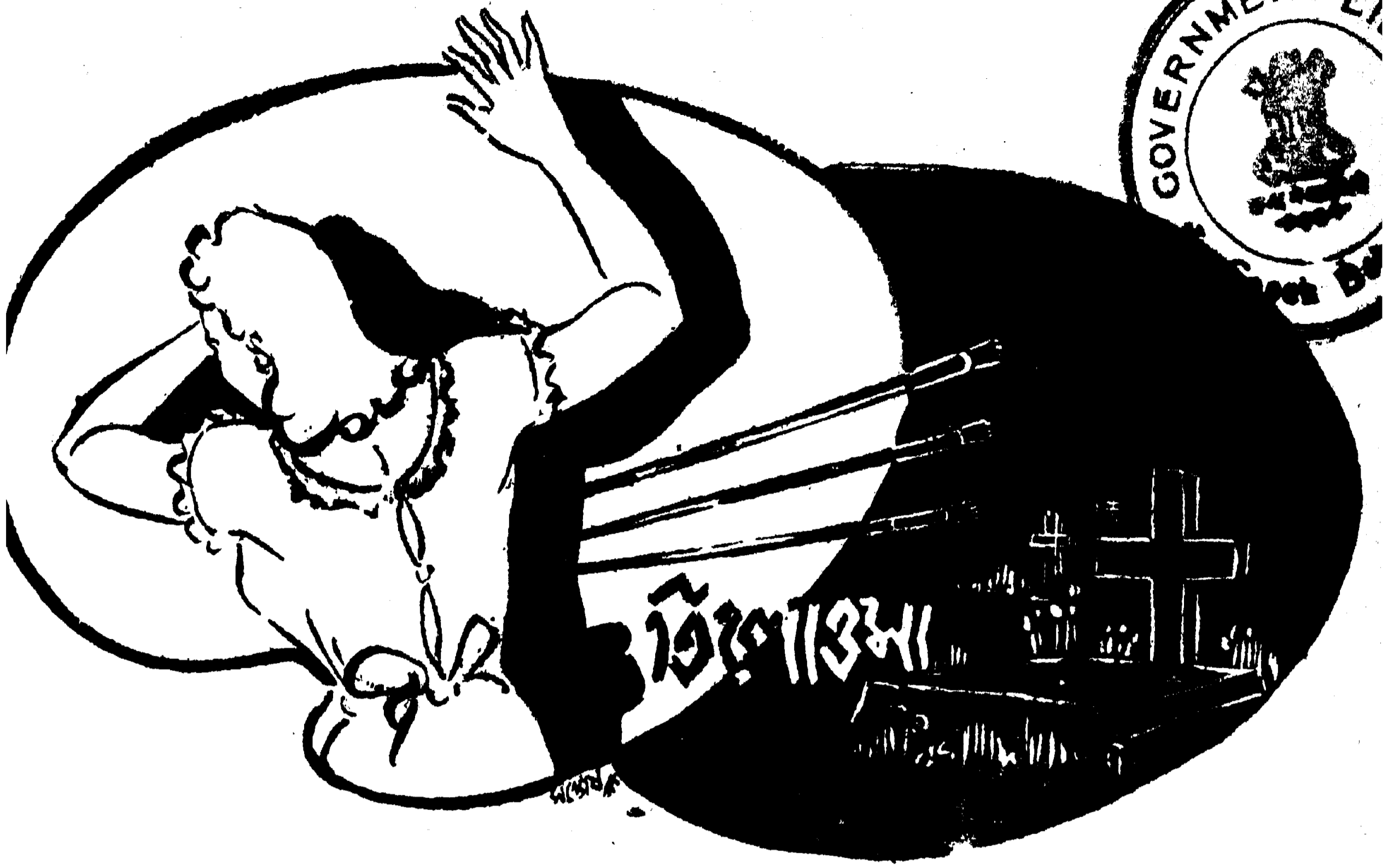
কবলে পড়িয়াছে সেই সকল দেশের সাধারণ মানুষ নিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে। অকৃপণ হস্তে প্রচুর মার্কিন সাহায্য দান করিয়াও এই সকল দেশের জনগণের হৃৎকোরিত্ব্য দূর্ব করা সম্ভব হয় নাই। বরং দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনগণের হৃৎকোরিত্ব্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই সকল দেশে মার্কিন সামরিক বাহিনী কম্যুনিজমের অগ্রগতিককে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। এই সকল দেশের জনগণ সর্বদা পরমাণু অস্ত্রের আক্রমণ আশঙ্কার মধ্যে উদ্বিগ্ন চিন্তে বাস করিতেছে।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যে-ভাবে প্রশ্নটি তুলিয়াছেন তাহাতে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করিবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস দেখা যায়। প্রশ্ন আসলে কম্যুনিজম বনাম গণতন্ত্র নয়, প্রশ্নটি কম্যুনিজম বনাম ধনতন্ত্র। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থাৎ ভোটাধিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতাও অর্জিত হয় নাই, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তো দূরের কথা। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সত্ত্ব স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলিকে অর্থসাহায্য দিয়া অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার বিরুদ্ধে সত্ত্ব স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলি সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চেষ্টা করিতেছে। গণভোট গ্রহণের কলাকল কি হইবে তাহা আমরা অনুমান করিতে চাই না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে যে আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বিশ্ববাসী সে গণতন্ত্র চাহিবে না, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

ইহুদী-নিধনকারী আইখম্যান—

নাৎসী নেতা এডলফ আইখম্যানকে আর্জেন্টিনা হইতে অপহরণ করার উক্ত দেশকে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য ইসরাইলে আহ্বোধ করিয়া গত ২৩শে জুন নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আর্জেন্টিনা এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে যে দুইটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করে, আর্জেন্টিনা তাহা মানিয়া লয়। একটি সংশোধন প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, নিরাপত্তা পরিষদ এ বিষয়ে অবহিত আছেন যে, নাৎসীরা ইহুদীদের উপর যে উৎপীড়ন করিয়াছে তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই নিন্দিত হইয়াছে এবং সকল দেশের লোকেই চায় যে, আইখম্যানের অপরাধের জন্য তাহার বিচার হউক। অপর সংশোধন প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, আর্জেন্টিনার সহিত ইসরাইলের যে সৌহার্দ্য রহিয়াছে তাহা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রস্তাবের পক্ষে ৮ এবং বিপক্ষে ০ ভোট হইয়াছিল। রাশিয়া ও পোল্যান্ড ভোট দানে বিরত ছিল। এই বিরোধে নিজে জড়িত বলিয়া আর্জেন্টিনা ভোট দেয় নাই। ইসরাইল নিরাপত্তা-পরিষদের সক্ষম নহে বলিয়া তাহার ভোটাধিকার নাই।

হিটলারের সময়ে জার্মান কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদী নিধন-যন্ত্রের উদ্ভাবক ছিল আইখম্যান। তখন তাহার বয়স ছিল ৩৩ বৎসর। আইখম্যান ৩০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করে। বৃত্ত পর শান্তির ভয়ে সে-পনের বৎসর লুকাইয়াছিল। ইসরাইল রাষ্ট্র আর্জেন্টিনার তাহার সন্ধান পায় এবং তাহাকে অপহরণ করিয়া ইসরাইলে লইয়া আসে।



রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

চার্চের বট্টা বাজছে; মনে হয় কোন বহুদূরগত আশ্রয় করণ ক্রন্দন। আলো-অন্ধকারে মেশা ঝাউ ও দেবদাকর গাছের ছায়াভলে যে ককিন নামানো হয়েছে তার অস্পষ্ট ইঙ্গিত আজ প্রাণহীন। রাজশিখের হিমেল বাতাস হ-হ করে বইছে—থেকে থেকে কাকজ্যোৎস্নার নীলাভ আলোকরাশি বেন কাঁপছে। কবরের মাটি খোঁড়া শেষ হয়ে গেছে। ককিন নামিয়ে দেওয়া হোল। ওরা আজ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চার্চের বট্টার বিবাদভরা সুরে যে ব্যথাভরা ক্রন্দন সে ওদেরই। চার্চের বট্টার সুরে যে কালা তা হেলেনের চোখের জলে বেন একাত্ম হয়ে গেছে।

মাটি দেওয়া হ'লে গেল। আবার সেই চাপা কালা। এক অস্বাভাবিক চাপা আওরাজ বা বর্ণনা করা যায় না, শুধু অজুতব করা যায়। প্রকৃতির প্রতি অনু-পরমাণুতে সে আওরাজ বৃষ্টি আজও সেই সমাধিক্ষেত্রে শোনা যায়।

আজকাল এখানে আমি প্রায়ই আসি। দ্বিপ্রহরের ধর ঘোঁসে, রাজির পাড় অন্ধকারে দূর থেকে এই সমাধিক্ষেত্রে মনে হয় অশরীরী। দিনের আলোতে মনে হয় দূরবিসর্পী সাদা কুলের এক বিচ্ছিন্ন সমারোহ। অসংখ্য ছোট-বড় খেত স্মৃতিকলক। দূর থেকে মনে হয় সূর্যের প্রথম প্রভাতে এদের সূর্য হয়েছিল। আজও এরা অস্বাভাবিক। রাজির অন্ধকারে এদের রহস্যময়তা বেন আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ধর্মতীর অন্ধকার গর্ভ থেকে এরা এইরাজ বৃষ্টি উঠে এল—আদিম রহস্যময়তা, হিমশীতল কাঠিল বোধ হয় এদের একমাত্র পরিচর। জ্যোৎস্না-রাজির ধু-ধু করা আলোকবতার কখনও কখনও মনে হয় এরা কথা কয়, হাসে। ঝাউ ও দেবদাকর পাতার সুর অর্থহীন আসে।

শুভ স্মৃতিকলকগুলো চাঁদের আলোতে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। সহসা মনে হয়, প্রত্যেকটি স্মৃতিকলক অনেক দিনের না-বলা কথা, অসীম সঙ্গীতে মূর্ত হ'য়ে ওঠে। বহুকালের বর্ষাঘর আজ শুষ্ক হয়ে আছে। চাঁদের আলোতে সে বর্ষাঘরগুলো বেন স্পষ্ট গুনতে পাওয়া যায়—বধন হ-হ করা বাতাসে ঝাউ ও দেবদাকর পাতাগুলো সিপ্-সিপ্ করে। আবার কখনো মনে হয়, কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর অস্পষ্ট চাঁদের আলোর সমবেত কর্ণের একটা চাপা কালা ব্যথাভর বিলাপ স্মৃতিকলকগুলোর রকে রকে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে। এখানে আসতে মাঝে মাঝে ভয় হয়। তবুও এক হুলজ্বা আকর্ষণে কে বেন আমাকে এখানে টেনে নিয়ে আসে। এখানকার নীরব রহস্যময়তা ঝাউ ও দেবদাকর পত্রসর্কার, হ-হ করা বাতাসের মর্দোচ্ছাস মনকে শিশাহারা করে দেয়।

ঝাউ ও দেবদাকরবীধির ছায়ার নীচে দাঁড়ালে দেখা যায় একটি স্মৃতিকলক—শুভ ও স্বভাব; কারুকার্যবিহীন এক খেঁত পাথরের খণ্ডবিশেষ—এখানে দেখা আছে অল্প কয়েকটি কথা।—

“Here lies one who has sipped venom for art's nectar.”

—কথাগুলির সঙ্গে বিশেষ আছে হেলেনের উত্তম অক্ষর। একটি অনন্ত শিল্পিমনের অপসূচ্য, আর কখনও কখনও মর্দোচ্ছাস হাহাকার। কিন্তু কেন?—শিল্পী অজয় তার মাহুয়ের ডেরে ভালবেসেছিল তার শিল্পকে, সৌন্দর্য ভালবেসেছিল; সৌন্দর্যের আধারকে নয়। কিন্তু সে কি তার অপরাধ?

একটি পোর্ট্রেট। মায় দেওয়া হয়েছিল “ভিত্তিমা।” হালকা সূর্য রক্তের পটভূমিকার সেই আয়ক প্রতিভুটিটি সত্যিই অসূর্য। লবণের আশ্রয় তার চোখ দুটি। মনে হয় এইরাজ বৃষ্টি চোখের

পাতাগুলো নড়ে উঠবে, আর অবনতমুখী, লাজনরা তিলোস্তমা বৃষ্টি এক অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রভাতের অরুণিমার মত ফুটে উঠবে অস্পষ্ট আলো-ছাটার কুহেলিতে। ঠিক বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। এমন অস্পষ্ট ছিল সেই 'তিলোস্তমা'। অথচ আশ্চর্য্য! হেলেন বিশ্বাস করতে পারেনি অজয় এত অদ্ভুত শিল্পকর্মের স্রষ্টা!

"আমার সমস্ত সস্তা দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছি এই তিলোস্তমা" বলেছিল শিল্পী ভিনসেন্ট অজয় রায়।

—"কিন্তু, এ-ও আমি—" পরিপূর্ণ বিশ্বাসে হেলেন চিত্রাঙ্গিতের মত বলেছিল।

"হ্যাঁ, তিলোস্তমার অপার্থিব সৌন্দর্য্য হেলেনের দেহাতীত রূপ"—

"কিন্তু"—সেদিন হেলেন আর কিছু বলতে পারে নি।

দিনের পর দিন অজয় সমাধিময় হয়ে থাকত তার ঠুড়িতে। এমন অনেক দিন গেছে, অজয় আহার-নিদ্রা তুলে গেছে। হেলেন উৎকর্ষিত হয়ে উঠত। কিন্তু সে প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অজয় তার নিজস্ব পৃথিবী স্বপ্নময় আত্মনার একাকী নিঃসঙ্গ ভাবে ঘুরে বেড়াত—রঙ ও রূপের আরাধনার। সে জগতে হেলেনের প্রবেশাধিকার কোন দিনই ছিল না। নানা বিচিত্র শিল্পকৃষ্টিতে ভরে উঠেছিল অজয়ের সোনার তরী। কিন্তু সেখানে হেলেনের প্রবেশ নিষেধ। অজয় স্পষ্ট বলেছিল, তার আগমনে ভয়ভূবী হবার সস্তাবনা ছিল বেশী। প্রতিদিন সন্ধ্যার বিবিধ বর্ণ সমায়োছে হেলেনের প্রতিকৃতি সামনে বেখে অজয় কবিগুরু 'উর্বশী' কবিতাটি আবৃত্তি করত। একরাশ রজনীগন্ধার শুভ্র রূপে ও গন্ধে, ঘুপের সুরভিতে ঠুড়িও হয়ে থাকত যেন এক কল্পলোকের অবিস্মরণীয় লীলাভূমি। হেলেন অবাক-বিস্ময়ে সব দেখত আড়াল থেকে। সেখানে ছিল তার প্রবেশ নিষেধ।

অনেক দিন সে ভেবেছে কেন এমন হোল? ভিনসেন্ট নিশ্চয়ই তাকে ভালবাসে,—তিলোস্তমা তার জলন্ত নিদর্শন। অথচ তার সঙ্গ ভিনসেন্ট যেন একেবারে সঙ্গ করতে পারে না। কোনদিন কোনও অলস মুহূর্তে ভিনসেন্ট কি বলেছে—হেলেনের সুরে সুর মিলিয়ে—"আজ এই সন্ধ্যার স্বর্ণালোকে আমরা হৃৎজন অভিন্ন।" কাজের অবকাশে, বস্তুটুকু প্রয়োজন তার বেশী কথা কোন দিন বলেনি ভিনসেন্ট। এক এক সময়ে রুদ্ধ অভিমানে হেলেনের হৃৎচোখ অন্ধ্রতে ভরে ওঠে। কখনও বা একটা নিফল আশানাশে তার কাজল-কালো চোখে বিদ্যাতের শাপিত দীপ্তি বলসে উঠে। অথচ কি-ই বা সে করতে পারে?

ওদিকে রজনীগন্ধার আবেশে, অজয়ের মুগ্ধদৃষ্টিতে তিলোস্তমা বৃষ্টি লাজুকতার মত কেঁপে কেঁপে ওঠে।

চারকোলের কালো আউট লাইন থেকে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ক্যানভাসের ওপর কঙ্কালের প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে। অজয় তন্ময়। তুলির সীলারনে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে চাপা অধরোষ্ঠে রক্তিম হাসির আভাস। অকস্মাৎ হাত থেকে ইয়েলটা পড়ে গেল—

"ভিনসেন্ট?" এক আকস্মিক প্রশ্নে; আচমকা আহ্বানে।

অজয় প্রায় আতঁনাদ করে উঠল, "কে? কে? এখানে?"

ঠুড়ির ভিতরে হেলেন কখন এনে দাঁড়িয়েছে। অজয় চীৎকার করে উঠল—"আবার তুমি এখানে?"

হেলেন ব্যথাক্ষর মুখী নিম্ন বলে, "ভিনসেন্ট, তুমি এত দীর্ঘ?"

"ভিনসেন্ট! কে ভিনসেন্ট? আমি শিল্পী অজয় রায়।" বহুক্ষণ হাসি হেসে বললে হেলেন—"তোমার ধর্মকে তুমি অস্বীকার কর! তোমার মত শিল্পী আমাদের কল্পানুচিত্তে বড় বড় গৌরব।"

অজয় বিকৃতকণ্ঠে বলে উঠল—"কত বড় গৌরব! এ গৌরব কোথায় ছিল যখন তোমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, অর্ধহীন ছন্নছাড়া একটা meaningless Vagabond. তিনি স্পষ্ট বলেছেন—আমি তোমার যোগ্য নয়। তোমাদের গৌরবের মাপকাঠি অর্থের প্রাচুর্য্য, বস্তুতাত্ত্বিক অহমিকা। তুমি তারই মেয়ে—কেন তুমি এখানে আসতে চেষ্টা কর বার বার?" কণকাল পরে উদাসমুখে বললে—"আমি শিল্পী। সেই-ই আমার একমাত্র ধর্ম। তুলে বাও আমি তোমাদের কল্পানুচিত্তির একজন।"

লজ্জায়, অপমানে ও ক্রোধে হেলেন তখন কাঁপছিল। প্রতিবাদ করবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যাপ্ত তার যেন লোপ পেয়েছে। সারা দেহে ও মনে পুঞ্জিত আক্রোশ ও বেদনা ফেনায়িত হয়ে উঠছে অস্বাভাবিক ভাবে। অতিকষ্টে সে বললে ঠোট ছোটো দাঁতে চেপে—"চিরদিনের মত আমাদের সম্পর্ক আজ শেষ হয়ে যাক। কোন দিন আর তোমার কাছে আসব না। আমার ছবি আমাকে কেহও দাও।"

"তিলোস্তমা আমার। তোমার কোন অধিকার নেই ওতে—"

"তিলোস্তমা ও হেলেন কি অভিন্ন নয়?"

"না। সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি ভালবাসি তিলোস্তমা—হেলেনের সৌন্দর্য্য। হেলেনের রক্ত-মাংসের শরীরটা নয়। আমি ভালবাসি দেহাতীত, দেহ নয় তিলোস্তমা দেহাতীত, হেলেন দেহসর্বস্ব।"

সহসা তীব্রকণ্ঠে হেলেন বলে উঠল—"তবে কেন তুমি আমাকে পাবার জন্ত, আমার এই মেহটার জন্ত বাবাকে অহুরোধ করেছিলে একদিন?"

"সেদিন ভেবেছিলুম আমার তিলোস্তমা ও হেলেন বৃষ্টি এক হয়ে মিশে আছে। আজ বুঝতে পারছি ভুল—সব ভুল। আমি দেহাতীতকে চাইলেও দেহ আমাকে ছাড়বে না। কিন্তু তা অসম্ভব।" তারপর গভীর বেদনার স্বরে বললে, "ভালবাসি, কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্যের আধারকে নয়—তবু—"

"না, না—না, এ হতে পারে না; আমি—আমি এ হতে দেব না।" চীৎকার করে ওঠে হেলেন। সামনের একটা সস্তা শেষ হওয়া পোট্রেট টুকরো টুকরো করে কেলে। কতকগুলো তুলি নিফল আক্রোশে ছুঁড়ে দেয় অজয়ের দিকে। হঠাৎ যেন সে বিবাক্ত হয়ে ওঠে। তীব্র বেগে ছুটে যায় সে বেখানে তিলোস্তমা বসান আছে। অজয় চীৎকার করে ওঠে—"তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেলে? হেলেন, হেলেন?" এক প্রবল ধাক্কায়ে সে হেলেনকে কেলে দেয়।

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে হেলেনের ঘর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কাঁচা লাল রক্তের মত কতকগুলো অগ্নিশিখা কাঁপছে, যেন ভয়াল প্রতিহিংসার সহস্র রূপ পৃথিবীর আদিম ড্যাগনের মত উত্তপ্ত নিঃশ্বাস কেলে সারা ঘরময় চলে বেড়াচ্ছে।

একটা কুণ্ডলী-পাকান চিঠি পুড়ছে—তার রক্তবর্ণ শিখাগুলো মাচছে। চিঠির দাঁড়ানোর ইলেকট্রিক হিটারের ওপর—অস্বাভাবিক

বক্তৃৎকার মত। হেলেন স্থিরদৃষ্টিতে নিঃস্পন্দ দীপশিখার মত চেয়ে আছে। কয়েকটা অবিচল মুহূর্ত। কি দেখছে সে?

লাল রঙের অঙ্গারে, দৃষ্টাবশেষ চিঠির অক্ষরগুলো যেন সে এখনও স্পষ্ট দেখতে পায়। অঙ্গরের চিঠি। হেলেনের তীব্র দৃষ্টির সামনে তার অক্ষরগুলো পড়ে, কুঁকড়ে কালো হয়ে গেছে—কয়েকটা কথা কিন্তু হেলেনের বার বার মনে পড়ে যায়, অড়িত ভাবে সে যেন কথাগুলো আবৃত্তি ক'বে—“জোনাকীর আলো আছে তারারও আলো আছে—কিন্তু উত্তাপ নেই। আমার জীবন জোনাকীর আলো, তারকার অসমাপ্ত বিলিমিলি। এ জীবনে নেই কোন উত্তাপ। কিন্তু আলো আছে। আমি দিতে পারি সেই আলোটুকু। জীবনে যদি জোনাকীরা নিবে যায়, তারকার অপমৃত্যু হয়, আর যদি আসে সেই আকাঙ্ক্ষিত উত্তাপ, তুমি কি তা' চাইবে? জোনাকীর আলো আর তারার ইশারা যদি এক হয়ে মিশে যায়—”

—হেলেনের চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে। নিজের অজ্ঞাতসারে তার হাত ছুটো সরে যায়—যেখানে চিঠির দৃষ্টাবশেষগুলো পড়ে আছে। আলতো ভাবে সে স্পর্শ করতে চায়, সহসা একটা দমকা বাতাসে সেগুলো ইতস্তত উড়ে যায়। যেন অনেকটা মোহাবিষ্টের মতই সে খুঁজে বেড়ায় কিছু—বা সমস্ত সত্তা দিয়ে সে চেয়েছিল কিন্তু তার স্পর্শের বহু দূরে রয়ে গেছে সেগুলো। কোন দিন আর পাওয়া যাবে না। গভীর রাত্রিতে অবরুদ্ধ বেদনার হেলেনের ফুলের মত দেহ ধর-ধর ক'রে কাঁপে। চোখের জলে তার বুক ভেসে যায়। আবার পর মুহূর্তেই এক অসহ্য কুটিল আক্রোশ তার সারা দেহ মনকে পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলে। এক অসহনীয় আবেগে নিজেকে চেপে ধরে সে। ঠোঁট ছুটো কামড়ে ধরে নিজের লবণাক্ত বিষাদ রক্তে তার রক্তিম ঠোঁট যেন স্থষ্টির আদিম বক্তৃতার আরও রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। অক্ষুট কণ্ঠে শিকারলুকু নিশাচর পাখীর মত সে উচ্চারণ করে—“আমি চাই অজয় রাখবে—মানুষ অজয় রাখ—তার পোষণ, তার দেহহল'ত দেহরেখা—শিল্পী অজয় রাখের তুলি আর রঙের খেলাকে চিরদিনের মত নিঃশেষ ক'রে দিতে হবে।”

জীবনের দৈনন্দিন ইতিবৃত্তকে কেন্দ্র করে যে ক্ষুদ্র তুচ্ছ আপাত গৌরববিহীন পথপরিক্রমা, তার মূল্যকে অগ্রাহ্য করা চলে না। তাই সেদিনের ঘটনা অজয় কোন মতেই ভুলতে পারে না। হয়ত কিছুই নয়, সামান্ত একটু নারীমনের অর্ধহীন উচ্চাস, অপরিণত মনস্তত্ত্বের ব্যর্থ বিলাপ। কিন্তু সত্যিই কি তাই? হেলেনের চোখে ছিল সেদিন জিহাংগার ক্রুর উপজ্জায়া—সে দৃষ্টি এখনও অজয় চোখ বুজলে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। সে কি অর্ধহীন, তুচ্ছ? মাঝে মাঝে কাজের অবকাশে অলস মুহূর্তে অজয় বিশাহারা হয়ে যায়—হেলেন তার শিল্পিসত্তাকে কি এতই অবহেলা করে? কি চায় সে? অনেক বার্তা যখন অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে যায়, বঙ্গনীপঙ্কার প্রমদির স্মৃতি নিবিড় হয়ে ওঠে—অজয় নিঃশব্দে পদচারণা করে। অসুস্থমান ক'রে করে হেলেনের অতলাত মনের স্মৃতিসিক্যকে। কিন্তু সর্কই নিঃসল। কিছুই পার না সে।—

অপরিণত উৎকর্ষিত কণ্ঠে সেই একই প্রশ্ন—“কেনন আছেন এখন শিল্পী অজয় রাখ? কি ক'রে এমন হোল?”

তিনি সত্যিই অজাতশত্রু। কিন্তু এ কি মর্যাদিক ঘটনা।

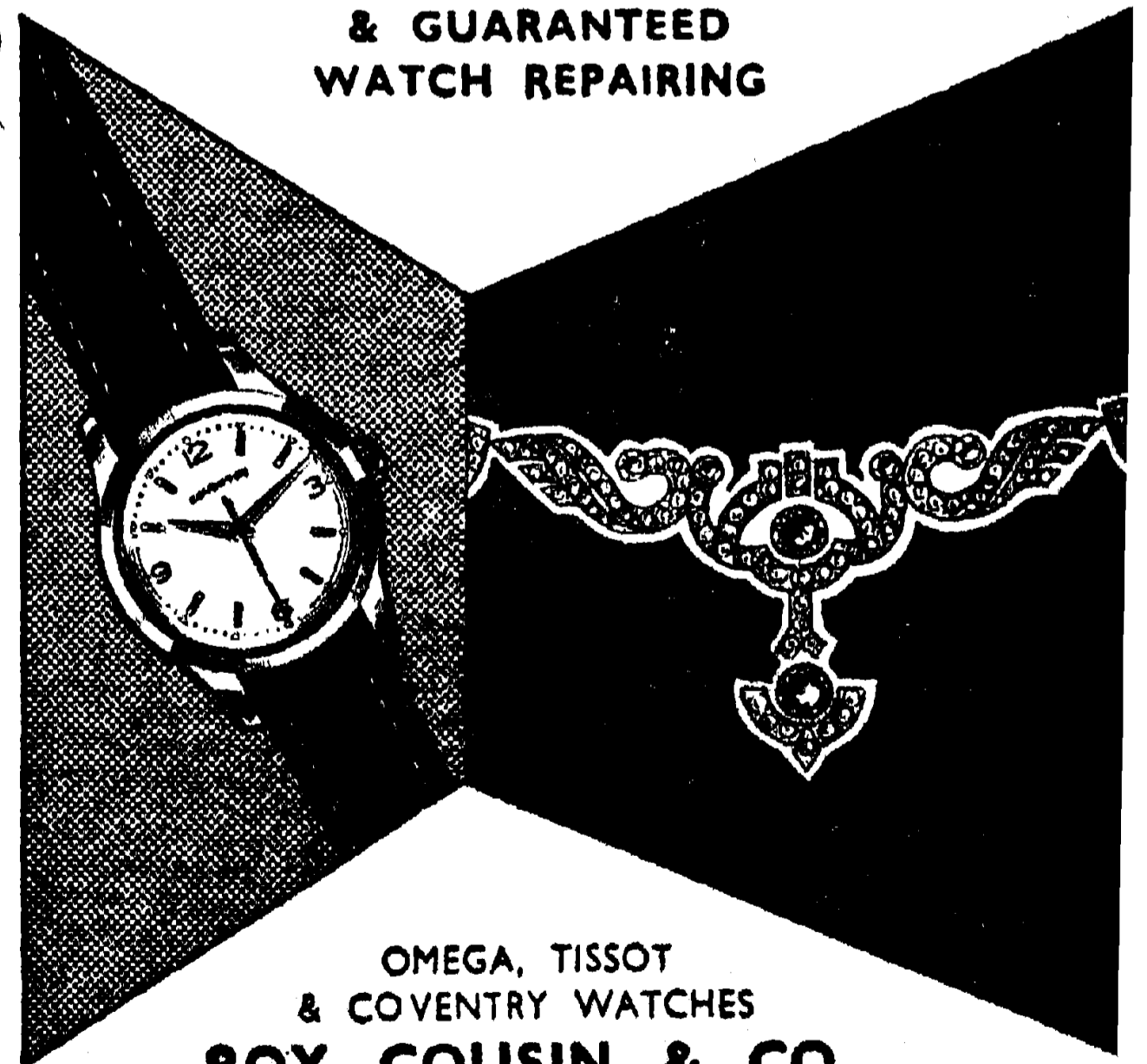
নারিং ক্রমে ভিলধারণের স্থান নেই। যারা অজয় রাখের ছবি ভালবাসে সবাই এসেছে—তুধু এক বার দেখতে শিল্পী অজয় রাখকে।

ডাক্তার চক্রবর্তী বললেন, সকলকে আখ্যাস দিয়ে—“এখন বিপদ কেটে গেছে। ভয়ের কিছু নেই। ডান হাত কিছুই থেকে এ্যামপুট করা হয়েছে—কারণ সাংঘাতিক জখম হয়েছিল রিভলবারের গুলীতে। আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।” পরম নিশ্চিন্তে তিনি ঘর থেকে নিজ্রাণ্ড হয়ে যান।

কিন্তু শিল্পীর শুভাকাঙ্খীরা কি ধুব উৎকল্ল বোধ করেছিল? শিল্পীর হাতের জীলায়নে রঙের যে স্বপ্ন তা চিরদিনের মত অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কোনদিন আর আবির্ভূত হবে না ‘ভিলোত্তমার’ অভিসার—সেই স্বপ্ন নিয়ে, পদ্মকোরকের আবেশ ছিলোলে।—

“এক অন্ধকার রাত্রিতে শিল্পী অজয় রাখ একাকী আক্রান্ত হন। আততায়ীর রিভলবারের গুলীতে তিনি যখন আহত হন তখন পথ ছিল জনবিয়ল—হারিংটন স্ট্রীটের অস্পষ্ট গ্যাসলাইটে কিছুই স্মরণ করতে পারেন নি তিনি।”—সংবাদপত্রে এতটুকু কলাম। এবং এখানেই শেষ। আমাদের দেশের শিল্পীরা এরূপে আর কি-ই বা আশা করতে পারেন? কাগজের এক কোণে তাঁদের সংবাদ এতটুকুই যদি দৈবক্রমে ওঠে—সেটাই তাঁদের পরম সৌভাগ্য বই কি?

For JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

রাজনীতির চতানিনাক্ত সংবাদপত্রে আর সব কিছুই গোপ। বাক্য ও কথা ; তবুও শতসংবাদকে অতিক্রান্ত করে সেদিন সারা পত্রটির একটি সংবাদ কোণে উঠেছিল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কেন এমন হইল ?

...রাতের অন্ধকারে নাগিং রুমের উন্মুক্ত জানালার কাছে এসে কাঁড়ালে কখনও কখনও শুনে পাওয়া যায় এক ফুঁপিয়ে চাপা কান্নার আওয়াজ। অজয় অবাধ শিশুর মত বিহানায় মুখ লুকিয়ে কাঁদে। তার বড়ের স্বপ্ন চিরদিনের মত হারিয়ে গেল। হেলেন কি তাই চেয়েছিল ?

'তিলোসুতার' গলায় যে রজনীগন্ধার মালা এক দিন অজয় অর্পণ করেছিল আজ তা শুকিয়ে গেছে। বৈশাখের আতপ্ত দিবাসনে অজয় নির্বাক হয়ে অশ্লোক দৃষ্টিতে তিলোসুতার অশাখিব রূপময় স্বপ্নের দিকে চেয়ে থাকে। সে শুধু স্বপ্নই। কোন দিন আর অজয়ের হাতে বর্ণাঢ্য রঙের সমারোহ লীলাপদ্ম হয়ে উঠবে না, কোনদিন আর ফুলের সৌরভের মত ভ্রমে উঠবে না শিল্পিমনের গল্পময়তা। সব শেষ। হুঁচোখ বেয়ে টপটপ করে অক্ষর করে পড়ে অজয়ের। সৃষ্টিকার রঙ, আকাশের নীলিমা, প্রকৃতির প্রামলিয়া আজ অর্ধহীন, রূপহীন ; মৃত ও বোবা। সন্ধ্যার অন্ধকারের মত শিল্পী অজয় রায়ের অপমৃত্যু যেন ঘনিষে আসে—নিঃশব্দে অলক্ষ্য অভিশাপের মত। শিল্পের অবলুপ্তিতে আসে শিল্পীর অপমৃত্যু। জীবন তার কাছে গোপ ; একটা পছা মাত্র। শিল্পই তার চরম লক্ষ্য। কিন্তু আজ শিল্পী অজয় রায় হারিয়ে কেলেছে তার শিল্পায়ন। জীবন-মৃত্যুর বেলাভূমিতে কাঁড়িয়ে সেই অনাগত দিনের শেষে কি জবাবদিহি দেবে সে ?

একটা অমম্য আবেগে অজয় শিহরিত নিঃশ্বাসে জ্বার জোড়ায়ো মত উৎক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনের সমস্ত বক্ষস, মমতা, যেন এক মুহূর্তে ভেঙে পড়তে চায় সে শিল্পের অমৃত চেয়েছিল ; কিন্তু পেয়েছে সে আজ তীব্র হলাহল। জীবন আজ বিবাক্ত। জীবনে বস্তুকু অমৃত পেয়েছিল তা অক্ষর থাকুক। শিল্পহীন জীবনে আছে শুধু বিষের অন্ধ কুরাণা। গরলভরা প্রস্রবণ। সহসা হুঁচোখে নেমে আসে তার কালরাত্রির পাচ তমিষা, সে যেন বড় ক্লান্ত আজ। অস্পষ্ট হয়ে সে বিদায় অভিনন্দন জানায়—এই সুন্দরী ধরিত্রী, প্রভাতের অক্ষয়িমা, বিদায়।

—আসে'নিকের তীব্র বিবে তার সারা শরীর নীল হয়ে যায়। মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ে—বেলাভূমিতে আহুড়ে পড়া স্নুয়ের উর্মিমালার মত। অস্তিম মুহূর্তে কুঙ্গ এক চিঠিতে পাওয়া যায় তার শেষ অভিনায়—আমার সমাধির ওপর যেন লেখা থাকে এই কয়টি কথা—“Here lies one who has sipped venom for art's nectar”—আশ্চর্য্য মানুষের মন ! হেলেন অজয়ের আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে লুটিয়ে পড়েছিল তার মৃতদেহের ওপর বাতাহত বেতসীলতার মত। মৃত্যুর পরপারে হেলেন বোধ হয় পেয়েছিল মানুষ অজয় রায়কে তার জীবনের পরম পাওয়ারকে। তখন যে শিল্পী অজয় রায় এ জগতের অন্তরালে নিঃশেষ হয়ে গেছে ! হেলেন কি সুখী হয়েছিল ? কেন ছিল সেদিন তার চোখে অজ্ঞানতা ?

আজও ঝাউ ও দেবদারুবিধির ছায়ার নীচে সমাধিক্ষেত্রে কাঁড়ালে শুনে পাওয়া যায় হ-হ করা বাতাসের মর্দোচ্ছ্বাস। অনাড়ম্বর বেত স্মৃতিকলকটি স্পর্শ করলে অমৃত্যব করা যায় যেন একটি শিল্পিমনের ব্যাধাতরা হাহাকার।

মেঘ

[রূপাট ব্রকের Clouds কবিতাটির অনুবাদ]

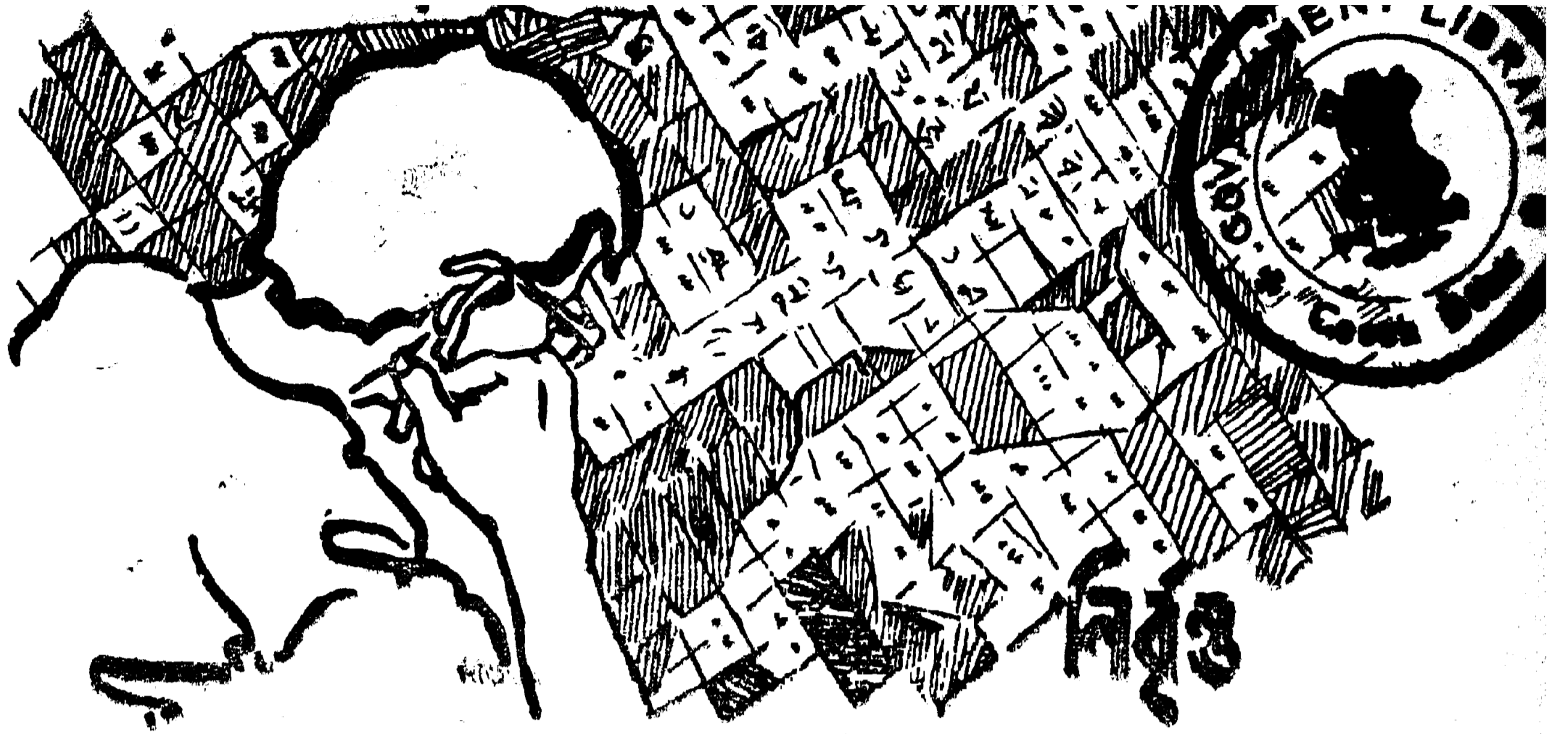
নীল বিভাবরী বেয়ে নেমে আসে শ্রোতের মন্তন
অস্তহীন সৈন্তশ্রেণী অনাহত সিন্ধু কলরবে ;
পৃথিবীর বৃকে নেমে বয়ে চলে প্রাণ-প্রস্রবণ
সুদূর দক্ষিণদেশে, কখনো বা দূর মহানভে
চন্দ্রমার বৃকে ঢাকা সৌন্দর্যের পানে দেয় ছুঁড়ে
ভুবারের গুচ্ছ কত।

—কারা যেন ধমকে কাঁড়ায়
গভীর চিন্তার মাঝে সঞ্জিহীন, ক্লান্ত দুটি পায়
উদ্বেগবিহীন মনে চারিদিকে বহু ঘুরে ঘুরে।
বাধিত হুঁচোখ মেলে গভীর স্তম্ভর কোন সুরে
অপলপ স্নগ কোন অস্পষ্ট বৃহ ভঙ্গিমায়
বিষের কল্যাণ চেয়ে বারবার আশিস জানায়,
যদিও একথা জানে সমস্ত গোপন মন জুড়ে—
ব্যর্থ তবু, পুত্র তবু,

অর্ধহীন এই আশির্বাদ।

মৃতরা মরে না কেউ, তারা বলে সবই বেঁচে থাকে
বাস করে তাদের কাছে সর্বদা—সারা দিন-রাত—
মৃতের আনন্দে যারা ধনী হলো আর তার শোকে।
তারা যেন চলে আলো এই সব মেঘের মন্তন
সিন্ধু শান্ত আকাশের গিঠে চড়ে দৃপ্ত রাজবেশে
বিষের শোভাবাত্রায়, মৃহগতি, অতি বিচক্ষণ ;
এক তাকিয়ে দেখে প্রান্তিহীন দৃষ্টি নির্নিমেঘে
বিকৃত সন্ন্যাস, চন্দ্র আর এই মানুষের দল
বাধা আসে, বাধা যায়,—পৃথিবীতে আজো অধিরল !

অনুবাদ : অক্ষয়কুমার বিশ্বাস



সুদেব সেনগুপ্ত

স্ট্রীটনাটকে রাতটা কাটাতে হোল বন্ধুর মেসে। বন্ধু বলতে অনিমেব। শুকনো মত খিটখিটে মেজাজের গুললেঙ্গুলা একে ধী চেনে এমন বন্ধুমহলে মেলে না সহজে। তবু মনে হয় সকলের চেনা থেকে আমার চেনাকে অতি সহজেই পরখ করে নিতে পারি। কারণ, ওর মনের অন্তরে ডুব দিয়ে তো আর কেউ জানতে চায়নি কেন মাস চার আগে অনিমেব বিষ খেয়েছিল? তাছাড়া ওর সাথে দৃষ্টিভঙ্গীর আমার আদৌ তফাৎ ছিল না বলে বলতে গেলে আমাদের হরিহর আত্মা। তবে মুন্সিগ হোত ওর 'নিউরটিক' কথাটা নিয়ে। নারী নিয়ে কোন উৎসাহ বধনই প্রকাশ করতে গেছি অনিমেব বলতো, কি দিন দিন নিউরটিক হোতে চলেছ তোমরা? কেন, ভিন্ন রং-এ ছাপিয়ে দেখতে পারো না জীবনটাকে? অল্প কেউ হোলে হয়তো ভেবে বসবে, নির্ধাত কেপে গেছে অনিমেব। আমাদের কাছে অবিজ্ঞি এ' একেবারে কিছুই না। তবু সে যা একগুঁয়ে। আইডিয়োলটিক। ওর মতের তিলস্তর নড়চড় হলেই সেবেছে। আনতাবড়ী কথা তুড়িতে সকলকে বোকা বানিয়ে তবে ছাড়ত। তাই মেপে জুপে কথা বলতে হোত ওর সাথে।

সে জন্তেই লাগতে আলোতে সিঁড়ির চাতালে পা দিয়ে ভাবছিলাম ওকে কি বলতে হবে।

অসহায়ের মতো শেষে বললাম—কি করা যায় এখন? ধমকে স্থির নেত্র তাকাল খানিক। অনিমেব এক সময় জবাব দিল—তাতে যাবতাবার কি আছে? রাতটার জন্তে না হয় প্রবাসীই হোলে এখানে।

আলগোছে কথাটা বলে সে তাকিয়েছিল আবছা-আলোতে অস্বচ্ছ পিচঢালা নিচের রাস্তার দিকে। এ ভাবে একটানা পাড়িয়ে আমার হাড়পোড় রীতিমত কনকন করছিল। তবু পরিশ্রান্ত আমার খাবার বা বিশ্রামের আয়োজন না করে নির্বিকারে তাকিয়েছিল। পা টিপে ওর পেছনে যেতেই অবাক হলাম। দেখলাম, এলিয়ে হুলিয়ে শরীরটাকে টেনে অস্পষ্ট ছায়ার মতো মিলিয়ে থাকছিল তবীটা। শেষে শুঁক আর দেখাই থাকিল না। তবু

অনিমেব নেশাড়ে মাদ্রুবেব মতো ভাবনা-বিভোর চোখ দুটো মেলে অপলক তাকিয়ে আছে সেদিকে। সহসা আপন মনে আউড়ে গেল—এক সময় তাকাবার মতো আমারও সব কিছু ছিল। কিন্তু অল্পি চোখাচোখি হতেই হাসিটা লুকিয়ে ফেললাম। আমার পা থেকে মাথা অবধি একবার চোখ বুলিয়ে লক্ষ্যায় সুরেই বলে চলল—দেখেছিস, তোকে যে এভাবে পাড়িয়ে রেখেছি মনেই ছিল না।

—বটে। আমি না হয়ে এখানে অন্তরালবর্তিনীটা যদি হোত তাহলে ব্যস্ততার অন্ত থাকতো না, কেমন?

হেসে আমার কাঁধে ধাক্কা দিল অনিমেব—পাগলামো খুব হচ্ছে না? চল—তেড়ে আমার টেনে নিয়ে চল।

ইতিমধ্যে রাত ন'টা বেজে গেছে। অনিমেবকে বললাম—থেকে নেয়া থাক চল। শুয়ে শুয়ে গল্প জমবে বেশ।

শোবার কথাটার কেমন কুঁকড়ে ওঠে অনিমেব। অস্থির চোখ দুটো একটু এদিক ওদিক চালিয়ে সহসা বলে উঠল—অত শীগগির থেকে কি হবে? তাছাড়া অত তাড়াতাড়ি আমি ঘুমিয়ে পড়ি না।

—তোকে না ডাক্তার বলেছেন বেশি করে ঘুমতে?

—ডাক্তার বললেই হোল?

ওর জবাবটা মনঃপূত না হওয়াতে চুপ করে গেলাম। আমাকে নিশ্চুপ দেখে একটু মেজাজী সুরেই বলল অনিমেব—তাছাড়া আকালকার ডাক্তার না বোড়ার ডিম। সামান্য হুড়ে গেলেই লাগাও এ টি এস পেনিসিলিন। তিলকে ভাল।

আমি তবু নিরস্তর।

—আমার কিই বা হয়েছে যে দিনরাত বিছানার টান হয়ে থাকতে হবে?

ওকে এবার বোঝাবার চেষ্টা করলাম—একই রোগে আমার মেজদাও ভুগছিলেন, জানিস? ওকে হ'মাস বিছানা থেকে উঠতে দেয়নি ডাক্তার।

এবার চেয়ারটাকে সরিয়ে এনে আমার গা বেঁবে বসল অনিমেব। উৎসুক হয়ে সহসা জিজ্ঞাসা—ভাবপর, তোর মেজদার কি হোল?

উত্তাপত্তরে এত জোরে কথাগুলো বললো যে আমি খেই হারিয়ে
কেললাম। কোন জবাব আগছিল না চট করে মুখে।

ততক্ষণে অনিমেয় ডানহাতে আমাকে দীতল এক ঝাঁকুনি দিয়ে
আবার বলে উঠেছে—তারপর তোর মেজদার কি হোল? কি বকম
কৈপে কৈপে উঠছিল কথাগুলো। হাকিমের কাছ থেকে রায় শোনার
জন্তে আসামী ততটা উদগ্রীব হয় না, বতটা উম্মুখ হয়ে আকুল
প্রত্যাশা করছিল অনিমেয় আমার কাছ থেকে জবাব শোনার।

এবার ভাবলাম, সুযোগ একবার পেয়েছি যখন আর ছাড়ছি
না। ওর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে চেঁচা করা বাক কিছু আদায় করা যায়
কি না। কিছুক্ষণ পরেই ওকে বললাম—ঠিক আছে, খাওয়ারটা
সেয়েনি। তারপর সব বলছি।

আশ্চর্য, কথা বলামাত্র উঠে দাঁড়াল অনিমেয়। যেন একটা
বাহিকসত্তার মানুষ আপন পরজে যখন ঠাঁট দেয় তখনই চলে।
নিজের অভিজ্ঞতা কৃত্রিম; মৌলিক এক জীবনীশক্তির অভাবে সে
যেন একেবারে অসার। নিষ্ক্রিয়।

খাবার পাটটা চুকিয়ে চুপচাপ শোবার ঘরে ঢুকে পড়লাম।
টেবিলল্যাম্পটা আলিয়ে বসে পড়লাম ছ'জনে পাশাপাশি। শুরু
হুজনেই। আমিও যেন অবাক হয়ে কি ভাববার চেঁচা করছিলাম।

অনেকক্ষণ পরে গভীর সুরে অনিমেয় বলে উঠল—ক'দিন থেকে
মোটাই পড়াতে মন বসছে না।

—কেন?

—মনে এক খোঁজাধুঁজি করি জবাবটা। মনে হয় যেন কিছুই
করতে পারলাম না জীবনে। ফুসফুসের এক পাশ যেন কে
হুহুড়ে মুচড়ে দিয়ে যাচ্ছে। তালু আঙনের মত তাতানো থাকে
দিন-রাত।

—আচ্ছা, তুই কত হু হু খাস?

—একপো। কিন্তু কেন?—পুফুলের কাঁকে গভীর দৃষ্টি
হানে অনিমেয়।

—সর্বনাশ! মেজদার তো তোর মত এতটা ছিল না, তবু
তিনি রোজ এক সের—

অনিমেয় বেজার চটে গেল—আজ্ঞে বাজে কি বকছিল তুই?
মেজদার কি রোগ আর আমার কি, না জেনে সব গুলিয়ে কেলছিল।
সাইকো এনাটিসিসে ও-সব ছাইমুণ্ডের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু
দেখতে হয়, মনের ইনটিরিয়ারে ঢুকে, হোয়াট ইজ রিপ্রেসড...

জবাবটার স্কুর হলাম। কাঁধটা মুড়ে ঘুমাবার চেঁচা করলুম।

অনেকক্ষণ পর অনিমেয় স্বাভাবিক অবস্থার কিরে এসে আমাকে
ধুসী করার চেঁচা করল—আমার কথা তোমার মেজদাকে জিগসেস
করেছিলে?

আমার কোন জবাব না পেয়েও একটানা ছেঁড়াছেঁড়া অনেক
কিছু বলে চলল। অনেক চেঁচা করেও কথাগুলো একনূত্রে বাঁধতে
পারলাম না। শেষে কানে এলো—মেজদার সাথে আলাপ
করিয়ে দেবে?

—চেঁচা করবো।

—রাগ করেছিল, না? আমার বিছানার এসে বসল অনিমেয়।
জিগসেসবিমিরে আবার বলে চলল—কাঁকে কোন সময় কি বলি

ধেরালই থাকে না। পাগলের কথার বেগে যাওয়া সহমতি
লক্ষণ নয়।

একটু থামে। আবার বকে চলে—আজকাল উয়ানক বাহিন
হয়ে পড়েছি। এম-এটা' পাশ করা চতুর্থ বারেও হবে না দেখছি।
কিন্তু কেন যে এমন হয়! আর ডাক্তাররাও যেন কি! এত দিনেও
আমাকে সুস্থ করতে পারলে না। এদের কাণ্ড দেখে ইচ্ছে হয়
ডাক্তারী পড়ি। দেখিয়ে দি' নার্ভাসনেস কি ভাবে ওড়াতে হয়।
আজকাল বই নিয়ে নিজেই ডাইগনোসিস করি। মনেও হয় আমি
খুব সহসা নীরোগ হয়ে যাবো। কিন্তু ডাক্তাররা কি ইচ্ছে করে
আমাকে ভালো করছেন না? হয়তো ওদের শক্তির বাইরে...

ওপাশ ফিরলাম আমি। অনিমেয় বেরিয়ে গেল। রাত
কিন্তু কাটাতে পারছিলাম না কিছুতেই। স্মৃতির জগল
বেঁটে কত চেঁচা করলাম। কিন্তু সন্ধান পেলাম না এ ধরণের
মনোবিকারের। কারো সাথে মিল পাচ্ছিলাম না অনিমেয়ের। আমিও
কি জানি কেন অস্থির হয়ে উঠেছি সহসা। এ-কাত ও-কাত ছটকট
করে রাত বারোটার অচেনা কোন এক নাড়ির টানে উঠে দাঁড়াতে
বাধ্য হলাম। হকচকিয়ে পেলাম টেবিল-লাইটটা আলো দেখে।
আলতো পা ফেলে এসে দেখতে পেলাম প্রিল সাহেবের সাইকোলজির
একটা বই খোলা। যে অনিমেয়ের কিছুদিন আগে জীবনের প্রতি
বিভূষণ জেগেছিল তার তা হলে আবার প্রাণের প্রতি গভীর মমতা
জেগেছে।

বাইরে এসাম। অনিমেয় আমাকে দেখেনি প্রথমে। বা পাটা
ধুঁড়িয়ে বাড় হেঁট করে দাওয়ার ছোট্টাছুটি করছিল তখনও। ওকে
দেখে আমার মনে কি ভাবটা জেগেছিল জানেন? 'বাকদবিত্ত পাখীটা
মৃত্যুর প্রাক-মুহুর্তে অমাত্মিক বিক্রমে ছট-ফট করতে করতে পাখা
ছটোতে ক্ষীণ শক্তি সঞ্চার করে চাইছিল পালিয়ে যেতে। প্রাণে
বাঁচতে। সহসা ডানা ঝাপটে দুর্বল আক্রোশে দ্রুতগতিতে গোড়িয়ে
নিচে নেমে আসছিল। এন্ধুনিই ধপ করে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।

চঞ্চল হয়ে উঠলাম। একি হোল অনিমেয়ের।

—এখানে কি হচ্ছে? ওকে অপ্রস্তুত করার চেঁচায় ছিলাম।
অনিমেয়ের জন্ত পা ছটো হঠাৎ এমন ভাবে ধমকে গেল, বাবড়ে গেলাম
আমিও। নিমেয়ে ওর ঘোলাটে ভুরুকর চোখ দুটো দেখতে পেলাম।
চোখ নয়তো যেন ছটো অগ্নিপিত্ত। আমাকে চট করে কোন জবাব
দিতে পারছিল না।

বললাম—অস্থির না হয়ে...

কথা কেড়ে নিয়ে অগ্নিষ্ট ঘরে বলল—অস্থির। তুই কি
করে জানলি?

—তুই কি ভাবিস বেঁটোর মনের কথা একটুও জাঁচ করতে
পারি না আমরা?

হঠাৎ আমার প্রতি ওর আঙ্গা বেড়ে গেল। এক বলক চঞ্চল
হাসি খেলে গেল মুখের ওপর দিয়ে—একটা গরু তনবি?

নামমাত্র স্বীকৃতি চেয়েছিল। কোন প্রত্যাশার না নিয়েই
আমাকে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। আমার শোনার
চাইতে ওর বলার আগ্রহটাই যে বেশি।

অনিমেয় নড়ে-চড়ে, পাটাকে বেঁকিয়ে লড়িয়ে হেলান দিয়ে
আওয়াল করে বলার অনেক চেঁচা করল। কিন্তু পারল না।

সময় চেয়ার-টেবিল, বই, সেড-লাইট সবকিছুতে দৃষ্টি চালিয়ে
উঠল—গল্পের সঙ্গে ছাপিয়ে বলব আমার—সব আবেক
র জীবনের একটা ঘটনা। মায়ের কথা আমি, আর মায়িকা
বর্তা সরকার। ঠাড়া, ভেবে দেখি কি ভাবে বললে গল্পটা
লা হবে—

একটা ভ্রাতেরী তরতর করে পড়ে বাচ্ছল বেন। ভবে অনিমেষ
হয়ে বলতে পারেনি বলে সুবিস্তৃত করার চেষ্টা করছি।

শুধুপূর্ণ প্রতিযোগিতার বল একদিন বন্ধুরা এসে জানালো
মাকে। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছি আমি। কোথাকার
নিয়াটোলার অমিতা সরকার প্রথম। পনের টাকা, আর কুড়ি
কা। বন্ধুরা তো জানলে বৃন্দ—এবার আমাদের খাইয়ে দাও।

দিলদরিয়া মন করে গল্পের সব ক'টা টাকা দিয়েই বললাম—
গমাদের বার বা খুঁধি খেয়ে নিও। আমি বাবো না কিন্তু।
বীরটা ক'দিন ধরে ভালো বাচ্ছে না তাই।

—চটে গেলি ?

—না ভাই! হেসে গল্পের বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু
আমি যে সন্তুষ্ট হোতে পারলাম না। 'মিররে' তাকিয়ে দেখলাম
খুঁধি সত্যি কেমনতর বিমর্ষ। কানটা ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠছিল।
ধরা উপশিয়ার অসহ বস্ত্রাণার শ্রোত বয়ে চলছিল—কোথাকার
জ্বাতিতুচ্ছ একটা মেয়েই শেষ পর্যন্ত পেলো প্রথম পুরস্কার।

ছোট খুপরীটা থেকে সেদিন আর বেরোতে পারলাম না।
কবদের নিচে শিখিয়ে দিয়ে এলাম—কেউ খোঁজ করলে যাতে
বাবু নেই বলে। সারাটা দিন অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে কাটল।
সম্পূর্ণ ভক্তি বই একের পর এক টেনেই চললাম। কিন্তু মন
বসাতে পারলাম না কোনটাতেই। রাশি রাশি ভাবনার মেঘ
মানাগোনা করছিল মনের ভেতর। যেন শুধুই চিড় খেয়ে
পড়ছিল—মেয়েমানুষের কাছেই হার মানলাম শেষ পর্যন্ত ?
হি! হি! অদ্ভুত লজ্জা তো!

না, না, না। এ কিছুতেই হোতে পারে না। পেছিয়ে
ধাকবো না আমি। স্ত্রীর দোরে ধর্মা দিয়ে আগে রেজাল্টটা
বাগিয়ে নিতেই হবে ভালো করে। এক বছর প্রাণান্ত চেষ্টার পর
ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ডও হল। স্ত্রীর তো উল্লাসে গদগদ—এ রকম
কিছুই আশা করেছিলাম তোর কাছ থেকে। এম-এতে তুই ফার্স্ট
হবই হবি। ভাবলাম, আমার বি-এ'তে ফার্স্ট ক্লাশ বন্ধুটা
নিজের কথা বলছে না তো।

হারমোনিয়াম শিখে গলাটাকে আগেই ধাতু করেছিলাম।
এবার ভাবলাম, তাহলে কান্ড কেন? চর্চাটা করি না কেন
এক বার? তার পর এক দিন যৌক চাপল ছবি আঁকবো। কিন্তু
কি করে আঁকবো? লোকে অত কি করে আঁকে? আমি ত
কত দিন চেষ্টা করেছি। কই কিছুই তো পারিনি। এ ভাবনা
নিয়ে পেজিল-কাগজ হাতে তিন তিনটে খটা কি করে যে কাটিয়ে
গেলাম নিজেই টের পাইনি।

হঠাৎ অজর চুকেই অর্ধাক হয়ে গেল—এ কি! তুই আঁকতেও
খানিস! বা! কাইন কার্টুন এঁকেছিস তো?

—মানে?—চোখ পড়ল টেবিলের কাগজটার ওপর। পেজিল
দিয়ে হিজিবিজি আঁকিবুকের খেলা খেলছিলাম এতক্ষণ। তাতেই
যে একটা নারীর কার্টুন ফুটে উঠতে পারে ভেবে বিমূঢ় হয়ে বললে
উঠলাম।

—সব দিকেই এতেপট ছাও ব্রাদার! হয়ে বাবে তোমার।

শিশুর মত সরল আবেগ প্রকাশ করলাম—তোদের কাছে শুধু
প্রেরণা চাই ভাই। আত্মবিশ্বাসে অটল আমি।

বহর খানেক বাদে। একদিন প্রতিভা বন্ধুরা ট্রামে বন্ধুর
ইশারায় চিনতে পারি। সেদিন সমস্ত শরীর ছাপিয়ে হঠাৎ
ইর্বার ছালা বাড়ছিল। মহিলা কবি বা সাহিত্যিকের নাম
যে আমি তুনি তা নয়। তবু মেয়ে-সাহিত্যিক দেখে
আমার সামর্থ্যের কোন এক দুর্বল অংশ হঠাৎ বেন বেজায়
কঁপে উঠল। এ তো ইনকিরিয়ারিটি কম্প্রেন্স। মনে হচ্ছিল
পাগল হয়ে বাবো। তখনই বেন বার বার কে যা দিতে
লাগল—তুমি না গর্ব করে বেড়াও তুমি শিল্পী, গায়ক, ভাল
ছাত্র। সাহিত্যিক হোতে পেরেছ আজও।

বন্ধুরা না বলে চলন্ত ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়লাম। শরীরের
লোমকূপ দিয়ে ঝিলিক-ঝিলিক আগুন বেরিয়ে আসছিল
আমার। নিজের এ দুর্বলতাকে ঢেকে তবু যে অক্ষমতার
বিজয়টিকা পরিয়ে দিতেই হবে আমাকে। কি করে পারা বার? টানা-
পোড়েনের মধ্যে রাস্তার এমাথা ওমাথা ঘুরঘুর করে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে
'তিনের-বি'তে চড়ে ছুটে চললাম জ্ঞানশূন্য লাইব্রেরিতে।

এটুকু বলে অনিমেষ খেমে গেল। ওর মনের ভেতরকার উত্তোষী
অহুভূতির আভিভাব্য চোখের কোণে উপচে পড়ছিল। হঠাৎ পাশের দাঁত
ছুটো পিষে আবার বলে চলল। ব্যাপারটাকে গভীরভাবে উপলব্ধি
কাছে ঠেলে দিয়ে ওর নিষ্করণ মুখের দিকে তাকালাম 'চকিতে।'

সুবোধ ঘোষ আর প্রেমেন মিস্ত্রিরের ভাষা মুখস্থ করলাম।
গল্প লিখলাম নিজেকে নিয়ে। পাঁচটা গল্পের সেবাটা বেছে পাঠালাম
'দেশে'। ছাপা হোল। সাগরময় বাবু আমার এ গল্পের দারুণ প্রশংসা
করেছিলেন। ভাবলাম, নিজে কতো প্রতিভা নিয়ে জন্মেছি।

চাড়া হয়ে ভাবছিলাম বন্ধুবন্ধুরা শুধাই—তুমি কেন অর্ধাক
হচ্ছ অনিমেষ? আর্থিক এগিয়ে পাছে গুম হয়ে যায় এই ভয়ে
বললাম না কিছু।

... হঠাৎ আজ মনে হল, যা ছিল সবই তো ব্যর্থ করে ফেলেছি।
প্রতিদানে কি পেলাম? আবার মনে জাগল—আমার জীবনের
এ সব ঐশ্বর্যের মূলে কে? এতো প্রেরণা পেলাম কোথেকে? নারীর
কাছ থেকে হঠাৎ বেন একটা কেউটে সাক ছোবল মারল
অনিমেষকে। সেদিন শুধুপূর্ণ প্রতিযোগিতার কথা মনে পড়তেই
একথা মরণ করতে পারলাম আবার। তার পর মনে হোল,
নিজে কতো অসহায়।

যে নারী এককালে শুধু একরাশ দুখ-তাচ্ছিল্য মাথা ছিল
আমার আজ মনে হোল, সে নারীই যে আমার দৈন্তকে মিটিয়ে
দিতে পারে। আমি প্রাণ-মন দিয়ে নারীই চাই। মোপাসাঁর
'ইভেভের' শেষ ছ'লাইন কি তাহলে মিথো? ছেলেরাই কি
বেশি পাগল হয় মেয়েদের চাইতে?

কিন্তু করে হাসল অনিমেষ। বলার নেশায় এতোই সে বিভোর

হবে পড়ল যে, মনে হল, এখুঁতের সে নিজের অভিব্যক্তি ফুলে চলছে। অনিমেষে সহসা একটা বই টেনে পাতা ওলটাতো লাগল। আচমকা আমার চোখে পড়ল, একটা বিজিৎ কাগজের ওপর বড় হরকে লেখা 'শ্রদ্ধাপূরণ প্রতিযোগিতা।' চমকে উঠলাম হুঁজনেই। ভাববড়ির কামরাটা পূঁঠা হাপা বিয়ে আমার চোখের 'আড়াল' করতে চাইল অনিমেষে।

চিঠি কিস্য অমিত্যকে। চিঠি আর চিঠি আরো চিঠি। শিরোনাম—তোমাকে প্রেমের জা করে পারছিলে। তুমি ফুটিয়েছ আমার জীবনকে। কিন্তু আশ্রয়! কোম মাতা পেলার মা। জাগিয়া কেন, যে কতোই উপেক্ষা করল ততই বেশ ওকে প্রপাট ভালোবাসতে লাগলাম। আমার একবার হবিও পাঠালাম। তবু তাঁর আগ্রহ দেখা গেল না এ আবেগপ্রবণ লোকটাকে দেখার। খুবই ভেবে পড়লাম। লেখা বিলাস খারিয়ে।

এসময় একদিন কী কান্ড! বিমর্ষ হয়ে বসেছিলাম চেয়ারে। হঠাৎ দেয়ালের 'মিররটা'র দিকে চোখ দিতেই আঁতকে উঠলাম। আঁতকে অনিমেষে খুঁটাকে হস্তিত ঘেঁষকম ভয়মাখা করে কেসল ভাতে আঁচিও হকচকিয়ে গেলাম। পুরুলেজের অন্তরালে গভীর ধানের চোখ দুটো সহসা চোখে পড়ল। কে বেন জমিট বেঁধে কাজল লেপে দিয়েছে প্রাণনেপে। প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে চোরালের হাড় দুটো। মাথারি টাক। বীভৎস। শিক্কার দিয়ে বিকট এক আওয়াজে সন্তু কামরাটাকে কাঁপিয়ে তুললাম—চেহারা। কুংসিত। বীভৎস। বিজিৎ। আমার কিছুই নেই এ হুনিরতে আমার চেহারা যে নেই। আমি মিথো।

অনিমেষ বলতে বলতে হঠাৎ আমাকেও কাঁপিয়ে তুলেছে বিকট আওয়াজে, ব্যস্তে পেরে লাল হয়ে উঠল। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম—দমকা হাঁওয়ার মতো লাগিয়ে নামলাম নিচে। আমার চকল খেদাক্ত শরীর লক্ষ্য করে দোকানদার সন্দেহ করছিল। আসেনিক দিতে চাইছিল না। অনেক অমনুর করলাম, ছেড়ে দিন। উঃ! এ্যাপেরিমেন্টের বে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দয়াজা ভেজিয়ে শীতল পা কলে ঢুকলাম ঘরে। চার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চাললাম এক বার। খড়াসু করে উঠল বুকটা। ছোট এক টুকরো কাগজে কিরিস্তি জাহির করলাম। রাত তখন প্রায় একটা। হুঁ—একটা ট্যান্সি আর লরীর বর্ধরে মাঝে মাঝে নড়ে-চড়ে বসছিলাম। আসেনিকের শিশিটা হাতে তুলে ভাবলাম, সামান্ত এক নারীর জন্তে নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করবো? জীবনটা এতো তুচ্ছ। এ আমার নিশ্চয় অভ্যায়।

বিধা-বন্দে - অনেকক্ষণ কাটল। বিব খাবো না সাব্যস্ত করে শুতে বাবো অর্থাৎ আবার ভেসে উঠল নিজের হুবিটা আঁপিতে। কেঁপে উঠলাম। এ চেহারা নিয়ে জীবনটা আমার শুধু হতাশাই হবে। না, মা, এ আর রাখা বার না। পারলাম না নিজেকে সামলাতে। খপ করে খুলে কেললাম শিশির কর্কটা। ঢক-ঢক করে সমস্তটা গিলে অনুরের শক্তিতে ছুঁড়ে কেললাম মিররটাতে।

শেষের কথাগুলো অনিমেষ আমাকে প্রাণ দিয়ে কাতরোক্তি করে ছবির মত সামনে তুলে ধরে বোকাবার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু আমার মনে এভাবে হতে পারে না যদি না মনে

অভিজ্ঞ হয়। দস্তরমত টপ টপ করে খেল পড়ছিল ওর পশুদেখ গড়িয়ে। খেয়ে হঠাৎ কি বেন একটা কথা চিবিয়ে কেসল অনিমেষে। তখন আর আমিও খিলি কিছু।

রাত প্রায় শেষ। খটনাটা ভাঙতে ভারতে তজ্জায় গুটিয়ে আনছিল চোখ দুটো। হঠাৎ জল-চালার আওয়াজ কানে ঢুকতেই চকিতে উঠে ছুঁটটা টিপে বিলাস। বেথলায়, কালো বোতল আর হীলাভ কাচের গ্রাশটা বেখে অনিমেষে নির্বিচার এদিকে আসছে। ফুণ্ডির একটা ডোক খিলে সহসা খোলাট গলার বজল—বাকগে শুধু বুঝানো বাবে মিলিয়ে। এতক্ষণে বেশ ত্রাস্ত হয়েছি।

আমোটা মিবিরে আমার বলে—বুম আসছে না বুঝি ?

না এলিহে বিয়ে ততোলায়—অমিত্যর খবর মিরেছিল কেউ ?

—মেয়ে না মানে ? আমার বাবাই খোঁচ অমিত্যর বাবার সাথে দেখা করে জানেন, অমিত্য ততোবার পর ততোলোকের চাকরীতে প্রয়োজন হওয়ার মেয়েকে তাপ্যবর্তী ভেবে শ্রদ্ধাপূরণ প্রতিযোগিতার অমিত্যর নামে একটা এন্ট্রি পাঠান। তারপর বসন্ত হয়ে সে মেয়েটি মাস দুই বাগেই মারা যায়। কিন্তু আমিই তাই, ভেবে হুঁখে হর একটা জীর্ণ মোহে কি তাবে একটা জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে।

—তাই বুঝি ? তা হলে জীবনটা পৃথিবীর বুক থেকে বিব খেয়ে যুছে বেতে পারেনি।

—সরি। ছেলোটা বিব খেয়েই মারা যায় ? দেখেছি কি, বলতে কি বলেছি ? অনিমেষে আরো গুটিকর বুক দিতে চাইল একতরকা। শুধু এ কথাটা সত্য প্রতিপন্ন করার জন্তে শেষের দিকে বলল—সত্যি, প্রেম একবার আসে মাহুবেব জীবনে।

আগের দিন শ্রদ্ধাপূরণ প্রতিযোগিতার যে কাগজ অনিমেষে লুকিয়ে কেসলে চাইছিল, সকালে সেটা খুঁজে নিলাম। চোখ বুলিয়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম দু'মিনিট।

অনিমেষের সাথে দেখা হোল আবার। চোখাচোখি হোল হুঁজনের। কিন্তু একে অপরকে এমন ভাবে দেখলাম বেন পরস্পর ভীষণ অভ্যায় করেছি। অনিমেষে তবু প্রাণ খুলে কিছুটা বলতে পারছিল। আমার কথাগুলো শুধু পেটের ভেতরই দলা পাকাচ্ছিল। বেরোলনা কিছুতেই।

—আজ কি মনে হচ্ছে জানিস ?

বললাম—কি ?

—তুই বেন আমাকে নীরোগ করেছিস। এক রাতে মাথা কত খোলসা মনে হচ্ছে। সাইকো এনালিষ্টরা এভাবেই মনের ইন্ট্রিয়রে ঢুকে বিকার তাড়িয়ে দেয়। বাকগে তুই মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে বাস, কেমন ? শুকনো হাসলাম।

তারপরও অনিমেষকে দেখেছি। খোঁচা দিয়ে ওকে বলেছি মেয়েদের কোন কথা উঠলে—বন্ধ নিউরটিক তুই।

অনিমেষে হেসেছে। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতো হেসেছে। গভীর হেসেছে। তবু মনে হয়েছে এ হাসি কত শাখত। কিন্তু আজও ওর চোখের দিকে তাকিয়ে তুলতে পারি না—অনিমেষে এক সময় চার মাসের অফেনা শিশুকই ভালোবাসতো। আজকের হাকিম একদিন এ জন্তে আশ্রয়ার্থী হতেও চেয়েছিল। কিন্তু বাবার জন্তে পারেনি। এসব কথা কি আজ ওর মনে আছে ? কলেজ-অধ্যক্ষা ওর স্বী কি এসব শুনেছেন ?

বার্থকে

বারানসী

নীলকণ্ঠ



হই

"The temple is lit by naked electric bulbs that hang from the ceiling and throw a harsh light on the sculpture, but where they do not penetrate render darkness more mysterious. The impression you take away with you, not withstanding that vast, noisy throng, or may be because of it, is of something secret and terrible."

—A Writer's Notebook [page : 290]

৩কালীঘাট থেকে ৩কালী পর্বত ; ৩মা কালী থেকে ৩বিখনাথ পর্বত তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে দেখতে যায় যারা তাদের অনেকের মুখে প্রায় সুনবেন ভারতবর্ষের হিন্দু মন্দির ভারি অন্ধকার ; ভারি অপরিষ্কার। এখানে পাণ্ডাদের আর যাত্রীদের ডিড়ে গুরুগর অধস্তি হয় ; ভালো করে দেখা যায় না মূর্তির মুখ। পূজা করা যায় না প্রাণভরে ; নিভৃতে নির্ভয়ে করা যায় না মন্ত্রচ্ছাদণ। পৃথিবীর দুঃখপ্রাপ্ত থেকে যারা আসে ভারতবর্ষের মাহামানবের মন্দির প্রাঙ্গণে তারাও উদভ্রান্ত হয় এই দেখে ; ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ফিরে যায় নিজের দেশে। সেখানে গিয়ে বই লেখে ; সে বই পড়ে আবার আমবাই মূর্ছা ঘাই। লজ্জা পাবার চেষ্টা করি দেবদাসীর নৃত্যের কথা লেখা আছে দেখে। অথবা আমাদের মন্দির নয় কেন মুক্ত ভীড় আর অন্ধকার আর অপরিষ্কারের কহক থেকে তাই নিয়ে দৈনিক পত্রের মতামতের জন্তে সম্পাদক দায়ী নন' কলামে খোলা চিঠি লিখে গল্পসার্থক করি। ভুল বলেছি। ৩কালীঘাট থেকে ৩কালী ; ৩মাকালী থেকে ৩বিখনাথ। কোথাও, কাউকেই দেখতে যায় না এরা ; দেখাতে যায়। নিজদের জাহির করতে যায় জগতের সর্বত্র। কত তাঁর ঘুরছে তারই সচিত্র সচল বিজ্ঞাপন এরা। এদের লেখা বইতেই পাবেন কেবল ৩কালী কলিকাতা থেকে কতদূর ; এখানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কি কি দেখবার অথবা কেনবার আছে ; হোটেল, ধর্মশালা অথবা যাত্রীনিবাসের সংখ্যা কত ; ইত্যাদি। ওদের বইতেই পাবেন ৩কালীর area কত মাইল-গজ-ফুট-ইঞ্চিতে। পাবেন না কেবল ৩কালী ভারতের হিন্দুর কাছে কি এবং ৩কালীর মন্দিরে আসা লোকে আর অগণিত মাহুঘের পায়ের ধুলার অপরিষ্কার অপরিষ্কারে যিনি স্রবণাতীত কাল থেকে অচল হয়ে আছেন সেই ৩বিখনাথ হিন্দুধর্মের কে।

মন্দিরের বাইরে থেকে যে চলে যাবে না। প্রবেশ করতে পারবে কেবল মন্দিরের মধ্যে নয়,--মূর্তির অঙ্কনে কেবল সেই ভাঙ্গবে জানতে পারবে হিন্দুরা যার আরাধনা করেছে যুগেযুগান্তরে সে মন্দির পুকুল নয় ; প্রাণের প্রতিমা। পৌত্তলিক বলে যারা হিন্দুধর্ম উপহাস করেছে তারা জানেনি যে সে মাটিকে হিন্দুরা মাটি করেনি কোনও দিন। 'মাটির' মূর্তি থেকেই হিন্দুর স্বর্গের চিরকাল মূর্ত হয়েছেন 'মা'-টিই ; প্রমূর্ত হয়েছেন তিনি। যার প্রাণে একবার গেছে এই বাকী, যার প্রাণে একবার বেজেছে এই বাকী কেবল সেই জেনেছে যে মাহুঘের পায়ের মন্দির-প্রাঙ্গণ অপরিষ্কার হয় না ; পবিত্র হয়। হিন্দুর মন্দির মূর্তির আট পেলারি নয় ; কনোমুয়ার অথবা ক্রিটিক ছাড়া সেখানে আর সকলের জন্তই অলিখিত নির্দেশ তুলছে : নো এন্ডমিটাংস। হিন্দু মন্দির নয় আধুনিক ভারতের ডয়িং রুম যেখানে কাপোটের ওপর চার ধানের সোফার মাঝখানে বেতের টেবলের ওপর বাগজের ফুলে আর ঘরের কোণে এক দেওয়াল বেখানে আরেক দেওয়ালের ডিসাইন্সার্ড মুখে চুখন করছে সেখানে সমস্ত ঠাণ্ড করিয়ে রাখা মাটির তৈরী খোড়া অথবা ভাঙ্গা কুঁজায় ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জল উদাহরণ উপস্থিত, কৃষ্টির আর আঁতেলেকতুয়াল দৃষ্টিতেই কেবলমাত্র।

৩বিখনাথের মন্দির এর চেয়ে অনেক বড়ো। এখানে রাজা আর প্রজা ; জানী এবং মূঢ় ; পাপী এবং পুণ্যাত্মক আসন পাশাপাশি। এর অন্ধকারকে যারা শুধু বিদ্যুৎ-আলোর অভাব মনে করে তাদের চোখ আছে তবু দৃষ্টি নেই। কিন্তু এমন কেউ যদি কোথাও থাকে যার বাইরের চোখ নেই কিন্তু ভিতরের দৃষ্টি আছে সে জেনেছে যে এই অন্ধকারের উৎসব হতে যে আলো অনন্তকাল ধরে নিত্য-উৎসাহিত সেই দিব্যালোকে ৩বিখনাথের তন্ত্র আলোকময়। অগণিত, অসংখ্য মাহুঘের পায়ের ধুলোর, জলে-কাদায় পাক যে দেখে মন্দিরপ্রাঙ্গণ অপরিষ্কার সে হুবেলা চোখ ধোর তবু তার দৃষ্টি পরিষ্কার নয়। কিন্তু এমন কেউ যদি কোথাও থাকে যার বাইরের চোখ বোজা কিন্তু অন্ধরের দৃষ্টি পরিষ্কার সে এই অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতির সমুদ্র দেখতে পায় ; এই পাকের মধ্যে পায় পদ্মগন্ধ। তার কণ্ঠে অব্যাহিত হয় সুরের সুরধনী : এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্মরাজ, তারই মধু পান করেছি হস্ত আমি তাই।

অচল ৩বিখনাথের মন্দিরে অন্ধকারে আলো করে এমনই একদিন এসে গাড়িয়েছিল এই ৩কালীতেই একজন, লোকে জানব করে আজও যার উদ্দেশ্য হু-হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে : সচর ৩বিখনাথ। ৩বিখনাথের মন্দিরে, উত্তরবাহিনী গঙ্গার উত্তা

তরল, কখনও তার সূর্যস্নাত ভীয়ে, কখন বহুবার প্রকোষ্ঠের অঙ্ককারে, সূর্য ও বিষ্টাকে, মেঘ ও রৌদ্রকে, শীত ও গ্রীষ্মকে সূর্য ও চুঃখে, পবন পাণ্ডুর গভীর আনন্দ এবং চরম না পাণ্ডুর সূর্যগভীর বেদনাকে তিনি সমজ্ঞান করেছিলেন। সূখে তিনি বিপত্ত-ক্ষয়; দুখে তিনি নিরুচিৎ। বীতরাগভয়ক্রোধ তিনি। তাঁর কথা না বললে আগে, সর্বাঙ্গে স্মরণ না করলে ৮কাশীর কথা বলা হয় না।

এই ৮কাশীতেই ৮কাশী মন্দিরে ঠাঁড়িয়ে এই সচল ৮বিখনাথ একদিন প্রজ্ঞাব করে হিটরে দিতে লাগলেন ৮কাশীর গারে। মর্মে ছিলেন আরেক মহৎ জীবনজিজ্ঞাসু। তিনি এককব আশ্চর্য হুলোহম দেখে অভিভূত। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে জবাব লেখা হলো হাটতে : গজোরকং। কিন্তু ৮কাশীর গারে তাকে হিটরে দেওয়া কেন? তার উত্তর আরও বিস্ময়কর; আরও বিশ্বাসের বাইরে : পূজা।

প্রশ্নাব ধীর কাছে গলাজল; সূত্র ধীর পূজার মন্ত্রপুত বাবি কেবল তাঁকে জানলেই ৮কাশীকে জানা হয়। তাঁর নাম জানলেই প্রশ্নাম করা হয় ৮বিখনাথকে। ৮কাশীতে সূত্র্য হলে কেন হিন্দুবা বিশ্বাস করে যে শিবলোক প্রাপ্ত হয় মাহুয তার জন্তে যেতে হয় ৮কাশীতে নিজের জীবন দিয়ে প্রশ্নাম করেছিলেন যিনি ৮বিখনাথ কেবল অন্ধের দৃষ্টিতেই অচল; মোহাঙ্কের চোখেই সে মন্দির অঙ্ককার; মাহুযের পায়ের ধূলায় সে প্রশ্নাম অপরিহার্য। সূদীর্ঘ কালব্যাপী এই ৮সচল বিখনাথ বসেছিলেন অচল ৮বিখনাথের পায়ের কাছে। যেখান থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মিলিয়ে গেছেন একদিন সেখানেই। মিলিয়ে যাবার আগেই নিজের চুঃসাধ্য সাধনা দিয়ে আর জ্যোতির্ময় আরাধনা দিয়ে মিলিয়ে দিয়ে গেছেন মাহুযের প্রশ্নের উত্তর। কেন একজন চুঃখ পায় আর আরেকজন পায় সূখ। আবার এমন একজনও কেন থাকতে পারেন যিনি সূখে চুঃখ এবং চুঃখে অমুভব করতে পারেন সূখ। যিনি শীতকে উষ্ণ; উত্তাপকে নির্বাণ; রূপকে অপরূপ; মৃত্তকে মন্ত্রপুত বাবি মনে করতে পেরেছিলেন ৮বিখনাথের মন্দির প্রবেশ করবার আগে অমুপ্রবেশ করতে হবে তারই অলৌকিক জীবনের অন্তর্লোকে। অলৌকিক কিন্তু এতটুকু অলৌকিক নয় ধীর দিব্য ইতিহাস সেই ত্রৈলজ্য স্বামীর নাম করে তাঁকে প্রশ্নাম করে আরম্ভ করছি এই ৮কাশীরই কাণ্ড। এই ৮কাশীর কথা অমৃতসমান; যে শোনাচ্ছে এবং যিনি শুনেছেন, সেই চুঃখের ওপরই বর্ষিত হোক সেই একের আশীর্বাদ। সেই এক হয়েছিলেন একদিন এই ৮কাশীতে সেই ৮একজন,—সেই ত্রৈলজ্য স্বয়ং সহায় হোন। তাঁর কথা তিনিই বলুন যিনি মুককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে দিয়ে করান পর্বতলঙ্ঘন। অয়ম্ আরম্ভ ভূতায় ভবতু।

বড় উঠবার আগে যেমন কুকবর্ণ আকাশ ধমধম করতে থাকে আতঙ্কে; আশঙ্কায়, আশ্বিনের আকাশ যেমন নিরুপম নীলে আসন পাতে আসন্ন ৮মহাপূজার; তেমনই মহামানবের সময় হ'লে আবির্ভাবের দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধুলির ঘাসে ঘাসে। অমর্ত্যলোক থেকে মর্ত্যলোকে আসেন এই মহামানবরা; যুগে যুগে আসেন ভগবানের দূত। হিংসার উন্মত্ত পৃথীর ধারা বিধিয়ে দিয়েছে

বায়ু, মিডিয়ে দিয়েছে আকাশ উবুড় করা আলো তাদের দিকে তাকিয়ে কমান্বকর হাতে বলেছেন : কমা করো; ভালোবাসো। বিষেব বিব নাশো। সকল যুগের সব সাধকের ধারা ধেরানে যেলাতে চেয়েছেন ধারা তাঁরা এনেছেন কখনও রাজগৃহের হৃৎফেননিত শব্যায়; কখনও বীন পরিষ্কার পর্ণবুটায়। কখনও অবহেলায় আর অবজ্ঞায় সকলের অগোচরে আশ্রয় হয় তাঁদের জ্যোতির্ধরী ভগ্নতা। লোকে উপহাস করে। উপহাসের উত্তরে হাসেন তাঁরা যেমন হেসেছেন ধনীর বীনভার; জ্ঞানীর যুচতার চিরকাল। আকাশ অঙ্ককার্য হৃৎধোঁধের কালো মেঘে ধেরে ধন্তধাতপূশভবা আনাদের এই বহুভাষা। প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাধী নীরবে নিফুতে কাঁদে। অক্ষয় বালক উন্মাদ বহুধায় পাখরের পায়ে নিফল মাথা কোটে; কবির কষ্ট অক্ষয় হয়; বাঁশি হয় সজীতহার। অমাবস্তার অঙ্ককার লুপ্ত করে গানের আর আলোর জিভুবন, অক্ষয়লে শুধার নিপীড়িত মানবাঙ্কা : বাহারী তোমার বিধিয়েছে বায়ু আর নিভিয়েছে আলো, তুমি কি তাদের কমা করেছ। তুমি কি বেসেছ ভালো?

সেই জিজ্ঞাসায় টলে ধ্যাননিমগ্ন ধূর্জটির আসন। অভয়কর আনন সহসা হয় রক্ত, দীপ্ত ভয়কর। ধেরে আসে ঈশ্বানের পূজ মেঘ অঙ্ক বেগে বাধাবন্ধহারী; মেঘে মেঘে উষ্ণক বাজে নটরাজের, দধীচির অস্থি নামে অভিশপ্ত অনুরলোকের শিরে বজ্র হয়ে। ধূর্জটির আসন টলে আর ছলে ওঠে পৃথিবী; গর্জ ওঠে আকাশ কলহস্ত-য়ালে। প্রস্তুতি পূর্ণ হয় কুরুক্ষেত্র পর্বের; স্মরণ চক্রের দেখা মেলে আর শোনা যায় শঙ্খের মুখে : সজ্জবামি যুগে যুগে। হুর্জনের, হৃৎধোঁধনের বিনাশ; আর ধর্মের, ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে আবির্ভূত হচ্ছি আবার। গীতা, উপনিষদ, বেদ, পুবাণ, শাস্ত্র, পুঁথি পীড়ি, উপদেশ, তর্ক, বিচার, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, টীকা, ব্যাকরণ, মর্শন, তত্ত্ব, তথ্য, স্মৃতি, কারুর শরণ নেওয়ার প্রয়োজন নেই আজ; স্মরণ কর শুধু আমাকে। মামেকং শরণং ব্রজ। যিনি ব্রজ হয়ে হুর্জনের হৃৎধোঁধনের বিনাশ করেন, তিনিই ব্রজরূপে রক্ষা করবেন ধর্মকে; ধর্মরাজকে। আবির্ভাব-বুহুর্জ্তে যেমন রোমাঞ্চিত হয় মর্ত্যভূমি, এঁদের তিরোভাবের লগ্ন আসন্ন হলে তেমনই অব্যবহিত হয় সমুখে শান্তি পারাবার। যাবার সময়ে এঁদের খসে পড়ে তারা। চল গেলে আকাশে উজ্জল হয় একটি নীলাঙ্গনরেখা।

শতাব্দীকাল কি তারও আগে দক্ষিণভারতে এসেছিলেন এমনই এক ভগবানের দূত। সংসারজীবনেই তাঁর নাম ছিলো শিবরাম। তাঁকে কেবল দীর্ঘকায় বললে ভুল হয়; তিনি ছিলেন সূদীর্ঘকায়। সাধারণ মাহুয দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিনহাত হয়; মরে গেলে ওই সাড়ে তিন হাত জমিরই দরকার হয় তার। কিন্তু জীবন বে যুচ্যার চেয়ে চাড়া তাই প্রশ্নাম করবার জন্তেই যেন শিবরাম এক হাত অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর মর্ত্যলীলার। এই শিবরামই উত্তরজীবনে ত্রৈলজ্যস্বামী হলে,—বারাণসীর লোকেরা তাঁকে বলতো সাড়ে চারহাত সাধু। শুধু সূদীর্ঘাঙ্গনয়, সূদীর্ঘাঙ্গুও বটে। কেবল কাশীধামেই তাঁর লীলা দেড়শত বৎসর ধরে অব্যাহত ছিলো। আয়ু নয়, মাহুযের আয়ু এত হয় না। ত্রৈলজ্য স্বামীর হয়েছিলো; তার কারণ আয়ু নয়; আনন্দ উজ্জল পরমায়ু,—বা কেবল যোগী-তত্ত্বতেই সম্বল।

সুদীর্ঘকাল ধরে লৌকিক দৃষ্টির সামনে অনেক অলৌকিক ঘটনের নায়ক এই পরমযোগী নিজের জীবন দিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছেন তা সনাতন ভারতের বাণী। আমরা বাক্যে অলৌকিক বলতে না পেলে বলি অলৌকিক আসলে তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পশুর শক্তি দেখে; মানুষের, মনে। এই মন দিয়ে সে এমন বস্তু নেই বাক্যে না মুহূর্তে তৈরী করতে পারে সর্বদমক্ষে; এই মন নিয়ে সে চোখের পলক পড়বার আগে সেই দুর্বিগম্য স্থান বেখানে না উপস্থিত হতে পারে, এই মন দিয়ে সে এমন মন নেই যার ধবধব না সংগ্রহ করতে পারে ইচ্ছা করলেই। মানুষের মধ্যে এই শক্তি আছে; কেবল তাকে যুগের পর যুগ কাজে না লাগানোর কারণেই, অবশ্য অনেকের মতোই, হয়েছে অকার্যকরী।

ত্রৈলোক্যমীর অনন্ত জীবনকর্ম থেকে মাত্র ছুটি অধ্যায় উপস্থিত করছি এখানে; এই ছুটি দৃষ্টান্তই উজ্জ্বল উদাহরণ, কেন ত্রৈলোক্যকে না জানলে বিশ্বনাথকে জানা অসম্ভব, সেই উক্তি। ত্রৈলোক্য আবির্ভাব অথবা এই দুই ঘটনার কিবা তাঁর তিরোধানের সময়-ভাবিধ উল্লেখ করছি না। কারণ ত্রৈলোক্যের অবস্থান সময়ের উল্লেখ, তাই। প্রথম ঘটনাটি ঘটে কাশীর গঙ্গায়।

ভারতবর্ষের প্রবল প্রতাপাধিত এক ভূপতি সপার্বদ বক্রণ থেকে আসি গঙ্গা বেখানে উত্তরবাহিনী সেখানে নৌকাবিহার করছেন একদিন। আর দেখছেন ভীমকান্তি এক নরদেহ গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে; একখণ্ড বিশাল কালো শিলা যেন ভেসে যাচ্ছে আকাশের নীলনদীতে। দিনের আলো কাশীর গঙ্গায় তখন সবেমাত্র এসেছে। ঘাটে ঘাটে সন্ধ্যার জ্বালা দীপ নেভবার অপেক্ষায়। ঘাটের পর ঘাটের গায়ে গাঁড়ানো আকাশ-উজ্জ্বল বাতিগুলোর গায়ে সাদা কালোর ছায়া, নৌকয় নৌকয় ভরে গেছে গঙ্গার বুক। সেদিনকার কাশীর গঙ্গাবক্ষের বর্ণনায় বলছেন এক বিদেশী লেখক যার ভাবান্তর সম্ভব; কিন্তু ভাবান্তর অসম্ভব:

"Benares...Then in the morning before the sun rises you drive through the city, the shops still closed and men under rugs lying asleep on the pavement; a scattering of people are going down to the river, with brass bowls in their hands, for their prescribed bath in the sacred water. You get on to a houseboat, manned by three men, and slowly row down by the ghats. It is chilly in the early morning. The ghats are unevenly peopled. One, I don't know why, is crowded. It is an extraordinary spectacle..."

"It is a moving, a wonderfully thrilling spectacle; the bustle, the noise the coming and going give a sense of seething vitality; and those still figures of the men in contemplation by contrast seem more silent, more still, more aloof from human-intercourse".

এই মন দিয়ে সে চোখের পলক পড়বার আগে সেই দুর্বিগম্য স্থান বেখানে না উপস্থিত হতে পারে, এই মন দিয়ে সে এমন মন নেই যার ধবধব না সংগ্রহ করতে পারে ইচ্ছা করলেই। মানুষের মধ্যে এই শক্তি আছে; কেবল তাকে যুগের পর যুগ কাজে না লাগানোর কারণেই, অবশ্য অনেকের মতোই, হয়েছে অকার্যকরী।

আসছিলেন জলবিহাররত ত্রৈলোক্যমীর। নৌকার কাছ ধরাবর হতে রাজতরগীতে যারা কাশীর লোক ছিলো তারা সাড়ে-চার হাত সাধুকে চিনতে পারলো; রাজা সেই সিদ্ধযোগীকে সাধুর আহ্বান জানালেন তাঁর নৌকার। সানন্দচিত্তে, কখনও বালকবৎ, কখনও জড়বৎ, কখনও উন্মাদবৎ যুক্তপুরুষ উঠে এলেন জল ছেড়ে কাঠের ডাঙায়। আসন গ্রহণ করলেন কিন্তু কথা বললেন না নির্ধাক সাধু। নিস্তক নৌকাকে নিয়ে বয়ে যেতে লাগলো শান্ত সুরধুনী গঙ্গাবুকুম্ব সঙ্কশ সর্বপায় দিবাকর উদিত হলেন পূর্বদিগন্ত অপূর্ব আলোকে দীপ্ত করে। রাজার তরবারী চেয়ে নিলেন যোগী; তারপর নিক্ষেপ করলেন গঙ্গাবক্ষে। চক্ষের নিমেষে সেই মহার্ঘ্য অস্ত্র নয় রাজ-অলঙ্কার অস্ত্রহিত হলো উত্তরবাহিনীর অস্ত্র। হার! হার! করে উঠলো পার্শ্বের। সূর্যের রক্তিমাতা ছড়িয়ে গেলো কষ্ট রাজনয়নে। তরবারি ব্যবহারের বস্তু ছিলো না; ছিলো মর্দনার প্রতীক। ইংরেজ সরকার দেশী রাজার প্রভুত্বভিত্তে সন্তোষের নিদর্শন দিয়েছিলো, তরবারি উপলক্ষ্য।

হীরকাজুরীকে কেসে দিলে রাজা উত্তপ্ত হস্তেন না এতটুকু। একটা গেলেও দশটা আসতো। কিন্তু এ তরবারি আবার কে দিতে পারে তাঁকে।

কাশীর ঘাটে ভিড়লো কাঠের নৌকা। রাজা কি ভয়াবহ শাস্তি সাধুকে দেন তারই আসন্ন আশঙ্কায় সমস্ত জগৎ নিঃশ্বাসবাহু সঞ্চার করে মহা আতঙ্ক জপ করছে যখন মৌনমস্তরে, তখন ত্রৈলোক্য জলের অস্তল থেকে হুঁহাত দিয়ে তুলে আনলেন তরবারি; একখানা নয়; দুটি তরোয়াল। রাজার হাতে যমজ সেই অস্ত্র তুলে দিয়ে বললেন: 'বেছে নাও; কোনটা তোমার?' হতবুদ্ধি রাজা চিনে উঠতে পারলেন না সেই বস্তু; বা নিজের একান্ত গর্বের একমাত্র বস্তু খোঁয়া গেছে বলে রণহকার দিচ্ছিলেন তিনি তা ফেরৎ পেয়েও ফেরৎ পাচ্ছেন না। রাজা তাকালেন মহাযোগীর ধ্যানাচ্ছাদিত চোখে; মহাযোগী তাকালেন শান্তসমাহিত দৃষ্টিতে রাজার চোখে। সেই দৃষ্টি স্মরণ করিয়ে দিলো যে কত মিথ্যে মানুষের অহঙ্কার। যে মানুষ জন্মমুহূর্তে বাছুরের মতো হাথারবে জানায়, হাম, হাম; অর্থাৎ সব হামারা ছায়। আর সবার বেলায় হার হার করে ওঠে বাছুরের অস্ত্রের মতো ধুসুরী হাতে: তুঁহ! তুঁহ! সব তুমি; সব তুমিরা ছায়।

রাজার ধন রাজাকে কিরিয়ে দিয়ে কিরে যান যোগী অস্ত্র জলের আহ্বানে। নিজের তরবারি নিজের নয় জেনে রাজা তাকে জলে নিক্ষেপ করেন কি না সেকথা আজও অলিখিত রয়ে গেছে ইতিহাসে।

দ্বিতীয় ঘটনাটিই আসলে অদ্বিতীয়। উল্লঙ্গ সাধুকে ধরে নিয়ে এসেছে আদালতে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের আস্তায় মোসাহেবের দল। সাধুর হয়ে কয়েকজন বললেন সাধুর বাহজান বিলুপ্ত; অতএব আচ্ছাদন এবং আচ্ছাদনের অভাব দুয়েই এর সমান অনাসক্তি। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন: খাচের বেলায়? উত্তর হলো: সূর্য ও বিষ্ঠার সমান আসক্ত অথবা সমান নিরাসক্ত; কচিও আছে; অকচিও আছে। বেশ,—সাহেব আদেশ করেন,—সাহেবের খাচ বা হিন্দুর অখাচ তাই আজ খেয়ে দেখাতে হবে যোগীকে যে কিছুতেই কিছু এসে যায় না তাঁর।

সাদু কথা বললেন এককণ্ঠে : তার আগে আমার খাত্তও তোমাকে খেয়ে দেখাতে হবে যে তোমার খাত্ত যেমন আমি খেতে পারি, আমার খাত্তও তুমি খাবার ক্ষমতা রাখো।

সাহেব বললেন : তখান্ত। হিন্দুবা নিরামিশাযী, এই জেনেই ঠ্যা নিয়েছিলেন সাহেব।

ত্রৈলোক্যস্বামী মলভ্যাগ করলেন হাতের তালুতে, তারপর তা গ্রহণ করলেন মুখবিবরে। গ্রহণ করলেন সেই পরমপ্রসন্নমানে যে অনিলে মাতৃস্বনে মুখ দিতে উগ্ৰুহ হর সন্তোজ্ঞাত। সর্বচরাস্তর ব্যাপী বিনি অনলে আছেন অনিলে আছেন; বিনি একই সঙ্গে চলিষ্ণু এবং যুগ যুগ ধরে অপেক্ষামান; বিনি চৈতন্যের আলীর্বাদ চৈতন্যে জড়নের অভিশাপ, বিনি একই সঙ্গে মুক এবং মুখর; বিনি আদি বিনি অনাদি, বিনি অন্তে আছেন; অন্তে আছেন—বিনি একই সঙ্গে নররূপে এবং সিংহরূপে অপরূপ, আজ তিনিই বিষ্ঠার বরে এনেছেন মধুগন্ধ। মুঠোর মধ্যে বাকের ধরেছেন তাকে সীমিত দৃষ্টি দেখেছে মধুযা শরীরের আবর্জনা বলে; তার থেকে নির্গত হচ্ছে নিদারূপ চূর্ণিক।

কিন্তু অসীমে যার দৃষ্টি অব্যাহিত সে জেনেছে এ মল নয়; পরিমল। এখানেও এই মুহূর্তে উপস্থিত তিনি বিনি অল্পপস্থিত হলে নৃশ্বের দীপ্তি, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি, তারার আলো, অশ্বখের পাতা, কোঁস্তভের কান্তি, মহাকালের আবর্তন অপস্থত। এখানেও এই মুহূর্তে তাঁরই অবস্থান বিনি উপস্থিত থাকলে তবেই অস্তিতে উদ্ভাপ, বায়ুতে বেগ, শরীরে প্রাণ, এবং আকাশে সফালসফা হয়।

দক্ষিণ ভারতের এই মহাযোগীর কাছে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে আরেক উদযোগী। গঙ্গার বাটে বসে আছেন ত্রৈলোক্য; হিমালয়ের শিখরে যেন উমানাথ। রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করেছেন আঙলের সাহায্যে ঈশ্বর এক না অনেক? অঙ্গুলী সংকেতে উত্তর এসেছে তার। মহৎ জীবন জিজ্ঞাসার মহত্তর উত্তর : বিনি এক তিনিই অনেক; অনেকের মধ্যে তিনি একাকার।

ত্রৈলোক্যর এই দিব্যজীবন যুক্তিতর্ক বিচার বিশ্লেষণের বস্ত নয়। বিশ্বাসের বিষয়। ভগবান জ্ঞান দেন; বুদ্ধি দেন। বিশ্বাস দেন না। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার বিশ্লেষণে যা হয় না; বিশ্বাসে তাই হয়। বিশ্বাসে যা হয় তা বিশ্বাসের বাইরে। এই বিশ্বাস যে পায়নি সে পায়নি দিব্যজীবনের নাগাল। এবং এই বিশ্বাস তাঁর অহৈতুকি কৃপা। কৃপা ছাড়া এক পা এগুনের উপায় নেই বিশ্বাসের পথে। কার ওপর ভর করবে এই নিঃসংশয় নির্মল বিশ্বাস তা নির্ভর করে কেবল তাঁর ওপর যার কল্পনার মুক হয় কথার

উগ্ৰুহ; পঙ্গু পার হর পাহাড়। সে কোন এক বিশ্বাস যার কথা এখন বলছি তা বুঝবার ব্যাপার নয়; ফলরে বাজবার বীণ। এমনই একটি বিশ্বাসের প্রবলস্ত মূর্তি দেখা গেছে একবার স্মদুর মিশরে।

মিশরে সেবার বৃষ্টি হয়নি। বৌদ্ধকক মক্কতুমির সীমাহীন উর্ধ্ব আকাশের নীল শকুনির মিছিল; তার পাখার ছায়ার ছুঁতিলের কৃষ্ণ পতাকা উড্ডীন। জীবনের জয়যাত্রা ব্যাহত; মহাকালের চাকা অচল। রাস্তার গন্ধ-বাছুর ধুকছে। মাঠের গামলিয়া মুছে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। শবাস্তামলা হয়েছে বিত্তক কঠিন। সব বুদ্ধুক সন্তানের রক্তিম চোখের মণিতে বলছে মায় ভুঁখা হুঁ-র পদ্মরাগমণি। মায়েরা বাপন করছে বিনিস্ত রাতি আকাশের দিকে তাকিয়ে; কখন বৃষ্টি নামবে। আকাশের নীল বুক চিরে দেবতার অঙ্গ কখন কোঁটার কোঁটার নামবে বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনের বুক ভরে দিতে করুণাধারার। ববির আকাশের দেবতা। ধুলির কারা পৌছুর মা গিয়ে তাঁর কানে; তাঁর চোখে আনে না তৃষ্ণার বারি। ধু-ধু করে মক্কতুমির কঠিন বুক। বিস্তীর্ণ জমপদ জুড়ে কেবল মৌচিকার আমন্ত্রণ; যত্নের আলিঙ্গন।

ছুঁতিলের পদধ্বনি জীত মাহুকের মিছিল নীল নদীর তীরে বৃষ্টির জলে বেরিয়েছে প্রার্থনা করতে রাতির অন্ধকারে। মিশরের আবালবৃদ্ধ বনিতার সম্মবন্ধ প্রার্থনার উচ্চারিত হয় : নীল অঙ্গন ঘন পুঞ্জিত ছায়া সম্বত অখর হে গভীর। বৃষ্টির গানে বৃষ্টিহীন রাত কাঁপতে থাকে। মাটি তৃষ্ণা যার বন্ধ জুড়ে সেই ধরিত্রীর আর্তনাদ ওঠে দিকে-দিগন্তরে জল দাও; জল দাও। আকাশের ববির কর্ণে ব্যর্থধ্বনি কিরে আসে প্রার্থিত্বনির ব্যক্তে।

নিঃশব্দ সেই মিছিল চলেছে এগিয়ে। কারুর মুখে কথা নেই। হাওয়ার বন্ধ; মহাকালের রখের চাকাও অচল হয়ে গেছে বুঝি। একটি বালক এই মিছিলের সঙ্গে চলেছে ছাত্তা নিয়ে সঙ্গে। সমস্ত মিছিলে কেবল তারই হাতে ছাত্তা। একজন তাই দেখে বলতে ছাড়েনি : ছাত্তা কি হবে, পাগলা? এতটুকু অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর করেছে মিশরীয় সেই বালক : বা তোমরাই তো বললে প্রার্থনার পর বৃষ্টি পড়বেই—?

অবোধ সেই মিশরীয় বালকের এই অসঙ্কোচ উত্তরে সেদিন নাইল নদীর বৃকে নিঃসীম ছায়া পড়ে আছে যার সেই স্বন্দয়হীন আকাশের চোখে দু'কোঁটা জল টলমল না করে পেয়েছে?

[ক্রমশ:]

When men lie their eyelids flicker. When women lie their eyes tell nothing. They are betrayed by twitching at the corner of their mouths. Men never lie with hands closed. Women generally close their hands when they lie.

—Orson Welles.

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার

ভূমি অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও আবর্তিত কসলের ব্যবস্থা করে, আলু ও চীনা বাণায় থেকে তিন শত বকমের জিনিস তৈরী করার পন্থা উদ্ভাবন করে আমেরিকাকে যে বিশ্বের খাজ ভাণ্ডারে পরিণত করা হয়েছে, সেখানে যে সুবম খাজ বস্তুনের ব্যবস্থা করে দেশবাসীর স্বাস্থ্যের মান উন্নত করা হয়েছে তার মূলে রয়েছেন আমেরিকার অক্সফোর্ড প্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

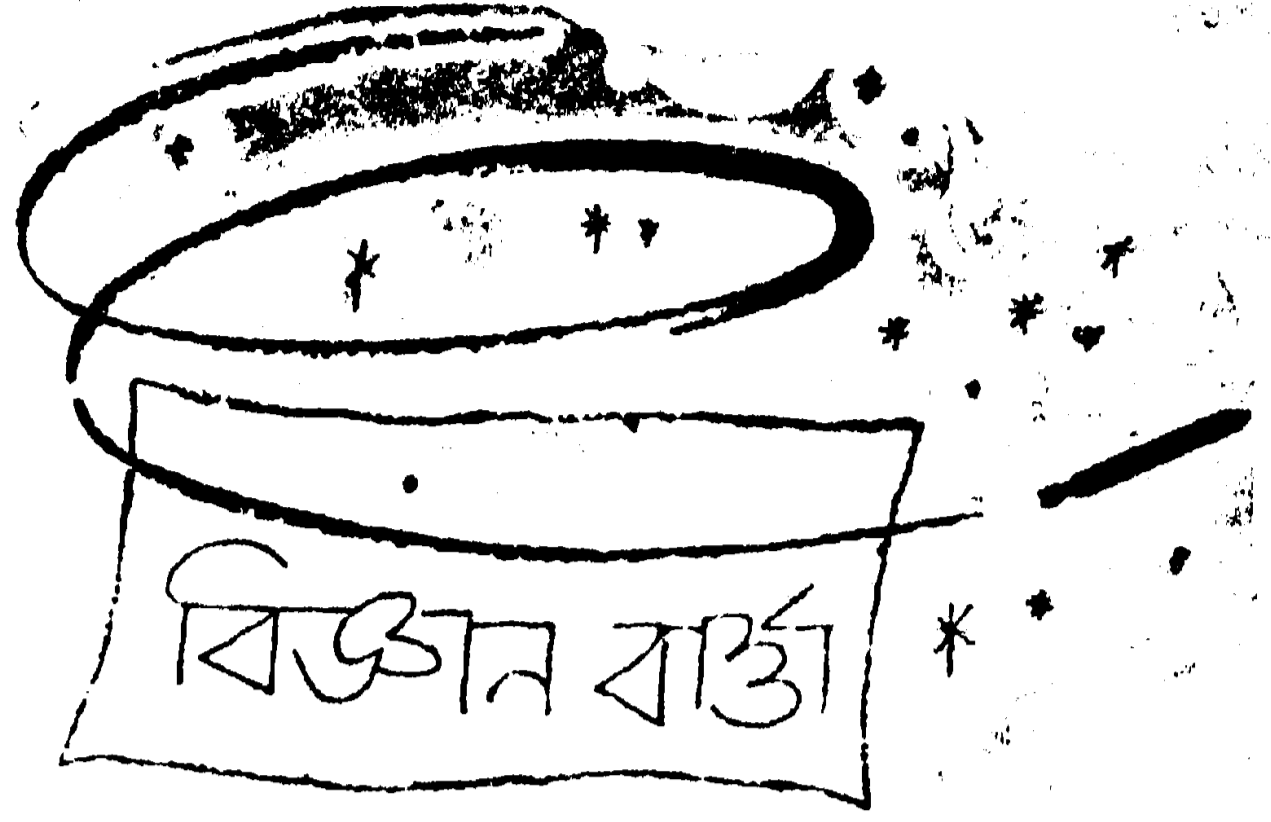
আমেরিকার মধ্যাঞ্চলের রাজ্য মিজুরীতে, তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি উদ্যান উৎসর্গ করা হয়েছে—এটি জাতীয় উদ্যান বা গ্রাশজাল পার্ক। এই ধরনের পার্ক মিজুরীর আর কোথাও নেই। ১৯৪৩ সালে শ্রী কার্ভার লোকান্তরিত হন এবং ঐ বছরেই কংগ্রেসে গৃহীত একটি আইনের সাহায্যে এটিকে গ্রাশজাল পার্কে পরিণত করা হয়। তাঁর জন্মস্থানের সন্নিকটে মিজুরীর ডায়মণ্ডও তাঁর একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং সম্প্রতি এখানে তাঁর স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই অঞ্চলটিকে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী রোজার সি আর্নেস্ট সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থেকে এই জ্ঞানতপস্বীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রদান করেন।

কার্ভারের জীবন ও সাধনা উপন্যাসের চেয়ে বিন্ময়কর। তাঁর অভিভাবকরা ছিলেন খুবই দরিদ্র, তাঁদের তাঁকে লেখাপড়া শেখাবার সাধ্য থাকলেও সাধ্য ছিল না। এই অবস্থায় বালক কার্ভার দশ বছর বয়সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান এবং সতের বছর বয়স পর্যন্ত নানা জায়গায় থেকে অতিকষ্টে স্কুল ও কলেজের পড়া শেষ করেন। এই সুদীর্ঘ সতের বছর নিজের খাইখরচ ইত্যাদি চালিয়ে স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকে ধোপার কাজ, সেলাই-এর কাজ এবং আরও কত কাজই না করতে হয়েছে। ১৮৯১ সালে আইওয়ার স্টেট কলেজ অফ এগ্রিকালচারাল মেকানিক্যাল আর্টস্‌এ ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে পাঁচ বছরেই তিনি দুটি ডিগ্রী লাভ করেন—একটি ব্যাচেলর অফ সায়েন্স, আর একটি মাস্টার অফ সায়েন্স। ২৮ বছর ধরে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের কর্ণধার ছিলেন তাঁরা সকলেই এসেছেন এই প্রতিষ্ঠান থেকে। কার্ভার ছাড়া জেমস্‌ জি উইলসন্ ও হেনরি ওয়ালেসও এই প্রতিষ্ঠানেরই ছাত্র।

পরীক্ষা পাশের পর আইওরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্ত কার্ভারকে আমন্ত্রণ করা হয়। প্রায় দু'বছর তিনি সেখানে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীবগু সংক্রান্ত গবেষণায় এবং গ্রীষ্ম হাউসের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। সেখানে থাকাকালে তাঁর রচিত কয়েকটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।

১৮৯৮ সালে কার্ভারের সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত নিগ্রো শিক্ষাব্রতী, সমাজকর্মী বুকার টি ওয়াশিংটনের দেখা হয়। বুকার ওয়াশিংটন তাঁকে আলাবামার টাসকিগী ইনস্টিটিউটে যোগ দেবার জন্ত আমন্ত্রণ করেন। এর পর তিনি সেখানে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ সালে যুত্মের আগের দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

কার্ভার যখন এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন তখন আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে একটি মাত্র ফসলই হত। তুলাই ছিল তখনকার একমাত্র ফসল। এছাড়া জমির উর্বরতাও গেল নষ্ট হয়ে। কার্ভারের চেষ্টায় এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হল, এক ফসলের আবর্তন, জমি হল হুঁতিন



ফসল। বহু জিনিস তিনি আবিষ্কার করে গেছেন: আলাবামার লাল মাটি থেকে নুতন রং, তুলার গাছ থেকে খেত সার, চীনাবাণায় থেকে ১৯ বকমের রং, আলু থেকে জুতা পালিশের রং, গাছের শেকড় থেকে নকল মার্বেল পাথর, বনজলতা ও টম্যাটো থেকে রং, ৯ থেকে মেরে তৈরীর পাথর প্রভৃতি।

এসব ছাড়া শব্দী থেকে শিশু পক্ষাঘাত রোগের প্রতিবেদন হিসাবে তিনি একটি তেলও আবিষ্কার করে গেছেন। তবে কোন আবিষ্কারই তিনি পেটেন্ট করে যাননি।

জীবনে তিনি বহু সম্মান ও পুরস্কারই পেয়েছেন। ১৯৩৯ সালে যে তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে রজডেন্ট পদক দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন অন্যতম। লণ্ডন রয়াল সোসাইটির সমস্ত ডাঃ কার্ভারকে ১৯৪০ সালে স্থাপত্য শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার ও রসায়নবিদগণের আন্তর্জাতিক বেডারেশনের ব্রোঞ্জ পদক এবং ১৯২০ সালে স্পিনগার্ন পদক দ্বারাও পুরস্কৃত করা হয়। ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার সারা জীবনের সঞ্চয় ৩০ হাজার ডলার টাসকিগী বিশ্ববিদ্যালয়কেই দান করে গেছেন। এই অর্থ সাহায্যে কৃষি রসায়ন সম্পর্কে গবেষণার জন্ত জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার কাউন্সিল স্থাপিত হয়েছে। দিন মজুরী করে কিতাবে লেখাপড়া করা যায় তাই ছিল সেদিনকার সমস্যা—এই সমস্যা সমাধানে টাসকিগী ইনস্টিটিউট অনেকখানি সাহায্য করেছে।

তুম্বারপাতের মধ্যেও গাছপালাকে বাচাবার ব্যবস্থা

ওয়াশিংটন, ৩০শে জুলাই—আমেরিকার ফ্লোরিডার মত বিভিন্ন অঞ্চলে তুম্বারপাতের জন্ত লেবু জাতীয় গাছসমূহকে বাচানো খুব কঠিন হয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, ঐ সকল গাছপালার বৃদ্ধি ও বিকাশ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে পারলে এরা বেঁচে থাকে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এছাড়া এম এইচ—৩০ নামে একপ্রকার ভেষজ আবিষ্কার করেছেন। এই ওষুধ প্রয়োগে এই ধরনের গাছের বৃদ্ধি কিছুদিনের জন্ত বন্ধ হয়ে যায়, এদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। এভাবে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ফলে যে এদের আর যুত্মা ঘটে না এই ধরনের ইউনাইটেড স্টেটস রাবার কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান দিয়েছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত তৈল সংগ্রহের উপায়

জ-বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে পরিমাণ জমাট তৈল রয়েছে তা পালিয়ে সংগৃহীত করতে পারলে পৃথিবীর তৈল উৎপাদনের পরিমাণ সাতগুণ বেড়ে যাবে। আমেরিকার ইন্সটিটিউট

ম্যাক্কাচারার রেথিরম কোম্পানী সম্প্রতি একজন পরীক্ষামূলক এক প্রকার ইলেকট্রনিক হিটার তৈরী করেছেন, এতে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের নল ব্যবহৃত হবে। এতে অতি তীব্র আলোকছট্যরূপে ১০ হাজার ওয়াট পর্যন্ত তাপশক্তি পাওয়া যেতে পারে বলে তাঁরা আশা করছেন।

টেলিফোনে প্রেরিত বার্তা রেকর্ড করার অভিমত বন্ধ

আমেরিকার ইন্টারকমিউনিকেশনস মেন্স কর্পোরেশন টেলিফোনে প্রেরিত বার্তা গ্রহণ ও প্রণালীবদ্ধভাবে রেকর্ড করার একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রটির নাম '১০০১ ডেটা ট্রান্সমিশান সিস্টেম।' কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অতিরিক্ত বেতনের হিসাব ও জিনিষপত্রের তালিকা প্রস্তুত করা, বিল তৈরী করা এবং হিসাবপত্র রাখার ব্যাপারেও এ যন্ত্রটি বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পারে।

আজ্র'তা ও সংক্রামক রোগ বিস্তারের বাহন

মার্কিন ভূপদার্থ বিজ্ঞানী ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ কে 'এইচ কিংডম বলেছেন, আবহাওয়ার শতকরা ৮৫ ভাগ থেকে ৯৫ ভাগ আজ্র'তাই হল বহু সংক্রামক রোগ বিস্তারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত বহন কোন রোগী হাঁচি দেয় তখন সেই হাঁচি হাজার হাজার জনের কণার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ রোগ বীজাণু আবহাওয়ার ছড়িয়ে পড়ে। আবহাওয়ার আজ্র'তার পরিমাণ শতকরা ৮৫ থেকে ৯৫ পর্যন্ত হলে সেই জনকণাসমূহ জনৈককণ থাকে। আজ্র'তার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেলে তারা আরও মাটির কাছাকাছি নেমে আসে। তিনজনে আবহাওয়ার পুষ্টি বীজাণু আজ্র'তা হ্রাস পেলেই জনগোষ্ঠীর মরে যায়। ১৯৫৭ সালে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইনফ্লুয়েঞ্জা যে সংক্রামক রোগ আকারে দেখা দিয়েছিল তখনকার অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই রোগ বীজাণু বহন চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এই রোগের তেমন আক্রমণ হয়নি, হয়েছে তার কয়েক মাস পরে, আবহাওয়ার আজ্র'তা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আজ্র'তার পরিমাণ শতকরা ৮৫ থেকে ৯৫ ভাগের মধ্যে থাকার সময়েই এই রোগ সংক্রমণ বেড়ে গিয়েছিল।

শল্য চিকিৎসাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ

হৃদযন্ত্রের কারণ

আমেরিকার ডেটারেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রাক্তন সৈনিক সংস্থার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ হারী লিট্টন এবং তাঁহার সহকর্মীগণ জানিয়েছেন, শল্য চিকিৎসার সময়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার সঙ্গে বক্তৃত্তর ঘনিষ্ঠ সংস্ক রয়েছে। যখন অতি দ্রুত রক্তপাত হতে থাকে, তখন বক্তৃত্ত থেকেই পোটোশিয়াম নির্গত হয় এবং রক্তে পোটোশিয়ামের অবস্থিতির দ্রুত বিচ্যুতির ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে। দশটি রোগীর মধ্যে চারটির ক্ষেত্রে এই রকম হতে দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন শল্য চিকিৎসা বা সার্জারীর সময়ে অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্য রোগীর দেহে প্রচুর পরিমাণে রক্ত দিতে হলে সেই রক্তটি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে

হবে—পোটোশিয়ামের পরিমাণ যে রক্তে কম সেই রক্তই রোগীকে দিতে হবে। তবে শল্য চিকিৎসার সময়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে খুব কম লোকেই মৃত্যু ঘটে।

হীরার মূল্য নির্ধারণের অভিমত বন্ধ

ভারতী তো জহর জেনেই—কিন্তু সাধারণ লোকেও যাতে হীরা, চুনি, মণি, পারার ভালমন্দ বিচার করতে পারেন, তাদের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন অ্যালবার্ট এস শ্রায়ুয়েল নামে জর্নৈক আমেরিকান তার একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত একটি যন্ত্র সাহায্যে হীরা, চুনি, পারা ইত্যাদির ছবি বৃহদাকারে পর্দার উপর প্রতিফলিত করা হয়। পদার্থটির উপর রেখার চার হাজার সমচতুর্ভুজ বা ঝোয়ার অঙ্কিত থাকে। এই সব মণিমাণিক্যে কোন ক্ষুণ্ণ থাকলে তা ঐ চিত্রে ধরা পড়ে—ঐ ক্ষুণ্ণের জন্য ঐ সকল সমচতুর্ভুজের মধ্যে কোন কোনটিতে তেমন আলোকপাত হয় না, অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এই বিষয়টি বিচার করেই সেই মণিটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার দেড় ক্যারেট ওজনের একটি মণিকে প্রকৃত আকৃতির ৩১১০ গুণ বড় করা হয়।

পরমাণুশক্তির শান্তিকালীন প্রয়োগে খনিজ পদার্থ

শান্তিকালীন কার্যে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান ও সংস্থার কল্পে আমেরিকায় যে সর্বাধুনিক পদ্ধতি চালু রয়েছে তা পর্যালোচনা করার জন্য ভারতের পারমাণবিকশক্তি বিভাগের হু'জন পদার্থ বিজ্ঞানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। এখন তাঁরা নয়াদিল্লীতে ফিরে আসছেন।

এই হু'জন ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞানীর নাম শ্রীযুক্তিষ্টি ও শ্রীনরেন্দ্র দয়াল। উভয়েই পারমাণবিক শক্তি বিভাগের কাঁচা মাল ডিভিশনের কর্মী। তাঁরা ২৭শে জুলাই ওয়াশিংটন থেকে লণ্ডন অভিমুখে রওনা হয়েছেন। লণ্ডনে বরকাল অবস্থানের পর তাঁরা ভারত বাত্মা করবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার উদ্যোগে হু'মাস পর্যবেক্ষণ সঙ্ঘের বর্ণনা করে ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞানীদ্বয় বলেন যে, তাঁরা অধিকাংশ সময়ই যুক্তরাষ্ট্রে ইউরেনিয়ামের স্নায়ুক্ষেপে পশ্চিমাঞ্চলের কলোরাডো, অ্যারিজোনা ও নিউমেক্সিকোতে অন্বেষণ করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বলেন যে, পরমাণুশক্তি সংক্রান্ত খনিজ জীব্যগুলির পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ পরিকল্পনার ভারতে ইতোমধ্যেই বেশ অগ্রসর হয়েছে। ভারতের এই পরিকল্পনার কোন কোন মার্কিন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি কার্যকরী হতে পারে তা পর্যবেক্ষণ করাই তাঁদের যুক্তরাষ্ট্র সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল।

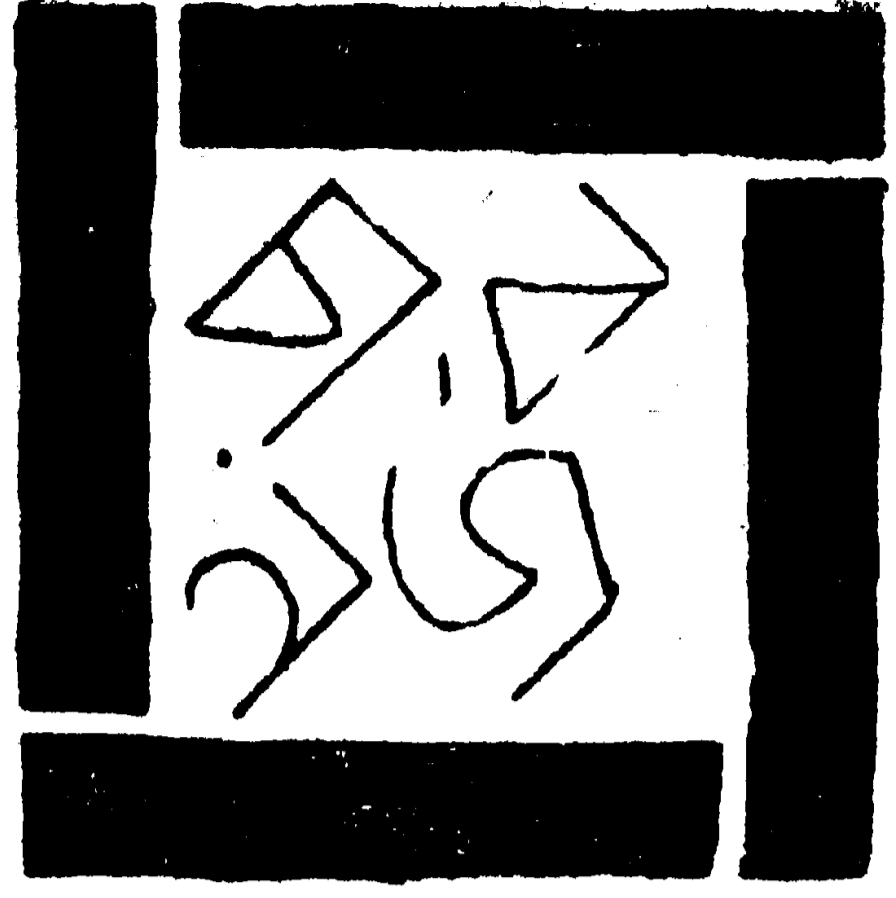
শ্রীদয়াল বলেন, "ভারতে আমরা এই ধরণের কাজ কয়েক বছর ধরেই করছি, তবে উন্নততর মার্কিন প্রক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্যই আমরা যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি।" তিনি বলেন, "ভারতীয় পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি মার্কিন পদ্ধতি যথাযথ গ্রহণ করা যেতে পারে, অপর কতকগুলি সুপোষিত আকারে গ্রহণ করা যেতে পারে।"

শ্রী অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য]

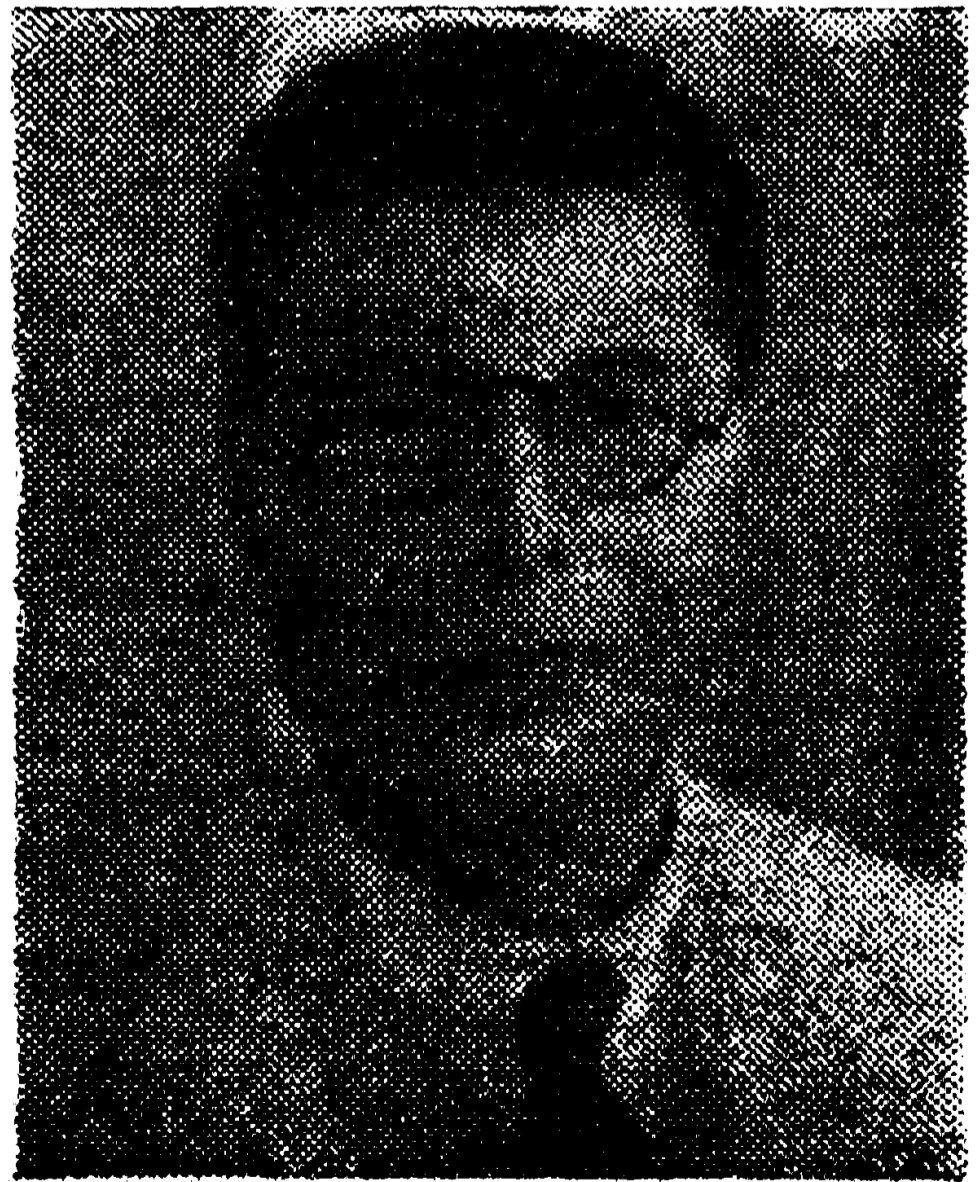
সূর্য-ভারতে তথা বিধে নিজ-শিক্ষণীয় বিষয়ে স্বীকৃতি পেয়েছেন যিনি—বর্তমানে সুব-অনোচিত স্বাস্থ্য, উত্তম ও উৎসাহের অধিকারী যিনি—ছাত্র-সম্প্রদায়ের উচ্ছ্বলতাকে অববোধে অভিল্যে পঠনমূলক কর্মধারায় লিপ্ত আছেন যিনি—আর ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্ত কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করেছেন যে শিক্ষাব্রতী—সেই সম্মানার্থে ব্যক্তি হলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য অধ্যাপক শ্রী অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৯১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর অমিয়চরণ ভাগলপুরে (বিহার) মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন বিচার-বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পিতামহ শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জিলার মাহেশতলার জমিদার ছিলেন। অমিয়চরণের মাতা শ্রীমতী মৃগালিনী দেবী স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র যুগোপাধ্যায়ের কন্যা ও সিভিলিয়ান এস. সি. মুখার্জির বড় ভগ্নী। সন্তোলোকান্তরিত প্রশান্ত মুখার্জি, এয়ার মার্শাল সুরত মুখার্জি ও শ্রীমতী রেণুকা রায় এম. পি. হলেন অমিয়চরণের মাতুল সন্তান। তিনি ১৮৯১ সালে ভাগলপুর জিলা-স্কুলে ভর্তি হন ও তথা হইতে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে ১৯১৩ সালে Applied Mathematics-এ প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরূপে এম-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি অধ্যাপক হিসাবে পেয়েছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডি. এন. মল্লিক প্রভৃতিকে আর তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সুনীল সেন, ডাঃ নীলরতন ধর, সত্যেন্দ্র মোদক, ডি. পি. বৈতান, ডাঃ শতুনাথ ব্যানার্জি, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। অধ্যক্ষ দেবেন্দ্র সেন পরিচালিত বিহার জ্ঞানালয় কলেজের অধ্যাপক থাকাকালীন তিনি ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ পারিভা, শ্রাম ত্রিপাঠী ও আরেকজন সহ বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের স্টেট অলারশিপ পাইয়া ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন পৌছান এবং কেমব্রিজস্থ CLARE কলেজে প্রবেশ করেন। ১৯১৮ সালে তিনি Wrangler (ব্যাঙলার) হইয়া Foundation বৃত্তি পান। সেই সময় তিনি কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির ছইবার সভাপতি নির্বাচিত হন। ইহার পর এক বৎসর Mathematical Physics & Astronomy বিষয়ে Cavandish ল্যাবরেটরীতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিলাতে তিনি এজিটন, হার্ডি, বেকার, লায়মোর প্রভৃতি অধ্যাপকের অনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। ১৯১৯ সালে দেশে ফিরিবার সময় 'ইজিপ্ট' জাহাজে লোকমাত্ত তিলক, সি. ওয়াই. চিন্তামণি প্রমুখ ভারতীয় নেতাদের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। উক্ত বৎসর তাঁহাকে ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগে লওয়া হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয় নাই; কারণ তদানীন্তন ডি-পি-আই মিঃ ফকাস্ বিকৃততা করেন। বাহা হউক, পাটনা কলেজে তিনি 'অস্থায়ী' অধ্যাপকপদে বৃত হন এবং 'পরিদর্শকের শিক্ষা' গ্রহণের জন্ত তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। অমিয়চরণ ইহাতে সুস্থ হইয়া I. E. S. হইতে পদত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ১৯২০ সালে এলাহাবাদ যুইর 'সেন্ট্রাল কলেজে স্থায়ী অধ্যাপকপদে তাঁহাকে লওয়া হয়। সেই সময় কটক কলেজে যোগদানের আহ্বান আসে। কিন্তু



পূর্বপরিচিত তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী (ইউ. পি.) সি. ওয়াই. চিন্তামণি তাঁহাকে এলাহাবাদে থাকার জন্ত অস্বীকৃতি করেন। ১৯২২ সালে তথায় Unitary University স্থাপিত হয়। ১৯২৪ সালে ডক্টর মেঘনাদ সাহা উহার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন তথাকার তিন বৈজ্ঞানিক-অধ্যাপক ডক্টর নীলরতন ধর, ডক্টর সাহা ও শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গভীরভাবে লিপ্ত হন। ফলে ১৯৩০ সালে National Academy of Sciences এবং ১৯৩৫ সালে National Institute of Sciences উদ্বের যুক্তপ্রচেষ্টার গড়িয়া উঠে।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় Hydro-Dynamics, Wave-Mechanics ও ১৯৩৭ সালে Astro-Physics বিষয়ে গবেষণা করেন। তৎলিখিত পুস্তক Recent Advances in Galactic Dynamics, Mathematical Researches in India for last 50 years, Sun & Planets—Part of Cepheid Variable Star ও বহু তথ্যমূলক প্রবন্ধ বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকমহলে সূর্যসী প্রশংসা পায়। এছাড়া শিল্প-ভাণ্ডারী ও প্রবাসীতে তৎলিখিত এবং ধর্ম ও বিজ্ঞান-বিষয়ক তাঁহার প্রবন্ধগুলি এদেশে প্রচুর সমাদৃত হয়।



শ্রী অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩২ ও ১৯৪২ সালে উত্তরপ্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি, ১৯৪০ সালে মাদ্রাজ বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভাগীয় সভাপতি, ১৯২৭—৪৪ সাল পর্যন্ত এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরীর (প্রাদেশিক) কর্তৃপক্ষ, জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমীর ও জাতীয় বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের সভাপতি ও অগ্রতম সহঃ সভাপতি, কলিকাতা ও বারাণসী অঙ্কশাস্ত্র সোসাইটির সভাপতি এবং ১৯৫৩ সালে উত্তরপ্রদেশ অধ্যক্ষ-সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩০—৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি “বিশেষ বিবাহবিষয়ক” রেজিষ্ট্রার থাকাকালীন আচার্য জে. বি. কৃপালনী ও শ্রীমতী সুচেতা দেবী এবং রাজা হাতী সিং ও শ্রীমতী কৃষ্ণা নেহরুর বিবাহকার্য পরিচালনা করেন।

১৯৫০ সালে ভারত সরকার কয়েকজনের সহিত তাঁহাকে আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয় ও মানমন্দির পর্য্যবেক্ষণের জন্ত প্রেরণ করেন। তিনি হার্ভার্ড, মাউন্ট পালোমার, মাউন্ট উইলসন প্রভৃতি মানমন্দিরগুলির কার্যকলাপ দেখিয়া মুগ্ধ হন।

কর্মদক্ষতা ও সততার পুরস্কার হিসাবে রাজ্য সরকার ১৯৫২ সালে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে বৃত্ত করেন। তাঁহার সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এক সুমধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ১৯৫৫ সালে তিনি উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে কমনওয়েলথ উপাচার্য সম্মেলনে (কেমব্রিজ ও ডারহাম) তিনি যোগদান করেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে বিজ্ঞানপ্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে One-man Commission, ১৯৫৬-৫৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা, ১৯৫৮ সালে কৃষিবিভাগে স্পেশাল অফিসার হিসাবে কার্য করার পর তিনি বর্তমানে হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যুক্ত রহিয়াছেন।

১৯২১ সালে হাজারীবাগের শ্রীমতী প্রভা নিয়োগীকে তিনি বিবাহ করেন। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদের প্রথম মহিলা-বিচারক, চৌদ্দ বৎসর স্থানীয় পৌরসভার সদস্য, মহিলা শিল্প-ভবন স্থাপয়িত্রী, স্বাউন্টের সহকারী প্রাদেশিক কমিশনার, নিখিল ভারত গৃহ-শিল্প-বোর্ডের সভা, নিখিল ভারত সমাজ-কল্যাণসংস্থার মহিলা বিভাগের চেয়ারম্যান, নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের (ইউ, পি,) দশ বৎসর সভানেত্রী ও সর্বভারতীয় নারী-সম্মেলনের তিন বৎসর সহঃ সভানেত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি নানা সামাজিক কর্মে নিজেকে লিপ্ত রাখিয়াছেন।

১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক ব্যানার্জির প্রচেষ্টায় ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সোসাইটি স্থাপিত হয়। তিনি রয়্যাল এষ্টোনমিক্যাল সোসাইটির ফেলো, আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউনিয়নের সদস্য, উজ্জয়িনীস্থ কেন্দ্রীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান উপদেষ্টা বোর্ডের সভ্য, জাতীয় ক্যালেন্ডার কমিটির সদস্য ও ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সোসাইটির চেয়ারম্যান রহিয়াছেন।

“অধ্যয়নঃ তপঃ”—এই মহাবাক্যকে রূপায়িত করিতে হইলে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে :—

(১) শিক্ষকদের রাজনৈতিক আবর্তে জড়িত না হওয়া ;

(২) ছাত্রদের এন, সি, সি, স্বাউন্ট, রোভার ও নানাবিধ সমাজ-উন্নয়নমূলক কর্মে লিপ্ত হওয়া ;

(৩) Disciplinary type of education অর্থাৎ শিশুবয়স হইতে ধারাপাত, সংস্কৃত-ব্যাকরণ পঠন প্রভৃতির ব্যবস্থা ;

(৪) কর্তৃনিষ্ঠ, চরিত্রবান্, সততাপন্ন, আদর্শবান্ ও উন্নতমনা শিক্ষক নিয়োগ ;—এই চারিটি পন্থাবলম্বন প্রয়োজন।

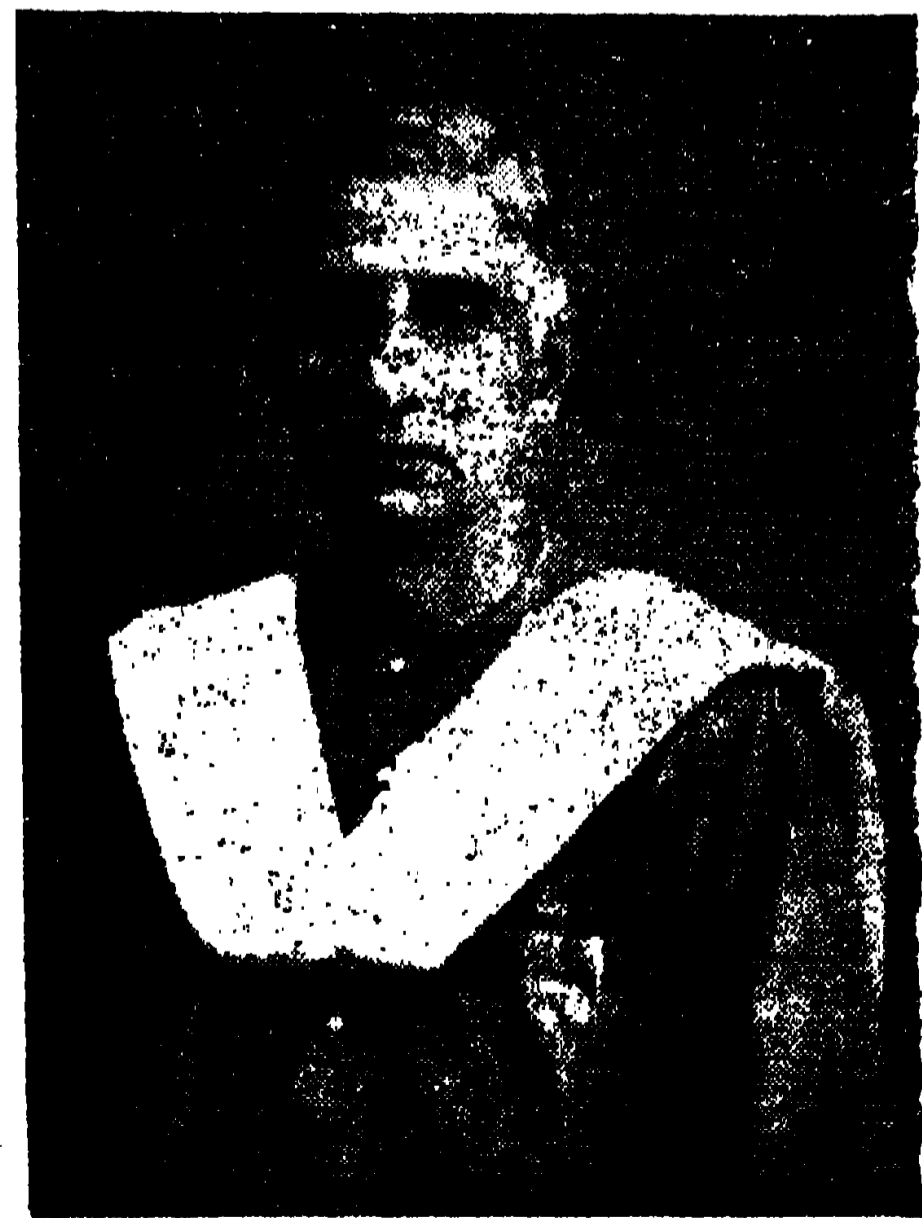
শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

[বঙ্গ-শিল্পের অগ্রতম নায়ক]

“উদ্যোগিনঃ পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ”—এবাণটি বাংলা তথা ভারতীয় বঙ্গ-শিল্পের অগ্রতম নায়ক শ্রীসূর্য্যকুমার বসুর সম্পর্কে বিশেষ ভাবে খাটে। নিতান্ত সাধারণ অবস্থার ভেতরেই তিনি জীবন-পথে পা বাড়ান ; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, সফলতার মালা নিয়ে এগিয়ে আসতে পেরেছেন তিনি বহুদূর। বলতে কি, সূর্য্যকুমারের বিপুল উত্তম ও অসাধারণ কর্তৃনিষ্ঠাই তাঁর সকল সাফল্যের জন্ত দায়ী।

আজ থেকে ৮০ বছর আগে শ্রীবসু বিক্রমপুরের রাউতভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ (১৮৮০ সালের ২৩শে নভেম্বর) করেন। বাল্য-বয়স থেকেই দৈনন্ডের বিক্রমে, প্রতিকূল অবস্থার বিক্রমে, সংগ্রাম দিতে হয়েছে তাঁকে অবিদ্যাম। প্রথমাবস্থায় গ্রামের সার্কুল স্কুলে এবং পরে মিড্‌ল ইংলিশ স্কুলে তিনি অধ্যয়ন করেন। এখানকার শেষ পরীক্ষায় পাশ করার পর প্রথম এসে সামনে পাড়ালো, কি করে আরও এগিয়ে যাওয়া যায়। আর্থিক সমস্যা তো রয়েছেই, তত্পরি আর একটি সমস্যা উপযুক্ত স্কুল পান কোথায় ? রাউত-ভোগের নিকট অঞ্চলে হাই স্কুল ছিল না যে, তিনি বাড়ি থেকে পড়বেন। শেষ অবধি ভর্তি হলেন যেয়ে বিক্রমপুরেরই বঙ্গবোগিনী হাই স্কুলে। গৃহশিক্ষকতায় পেশা নিয়ে তিনি পড়াশুনা চালাতে থাকেন। এমনি ভাবেই তিনি এন্ট্রান্স ও এক, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য হন।

সূর্য্যকুমারের কলেজ-জীবনের পুঁচনা কিন্তু কলকাতায় (ডাফ



শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

হলেজ)। পরে এক সময়ে তিনি কুমিল্লা ডিক্টোরিয়া কলেজে গিয়ে পড়েন এবং সেখানে থেকে বান ঢাকার। ঢাকার কলেজ হতে এফ. এ. পাশ করলে পর তাঁর একটু অবহাতির ঘটে। স সময় তাঁর অগ্রজ জাতা ৬বেবতীমোহন বঙ্গ শিবপুত্র কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবনে চুকেছেন—বার স্বর্ণ স্বর্ধাকুমারের দ্বারা গৃহশিক্ষক হিসাবে কাজ করার প্রয়োজন হয় না।

শ্রীবঙ্গ বখন ঢাকা কলেজের ছাত্র, সারা বাংলায় চলেছে তখন (১৯০৫ সাল) লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রবল চেউ তাঁর তরুণ মনকেও বিশেষ ভাবে দালা দেয়। জাতির সংকল্প ছিল সেদিনে স্বদেশী গ্রহণ ও বঙ্গোত্তী বর্জন। কী করে আন্দোলন সফল হবে, চিরকালের মতো বঙ্গোত্তী পন্থা-বর্জন চলতে পারে কি ভাবে, এই নিয়ে স্বর্ধাকুমারের চাবনার তখন অস্ত ছিল না। ভেবে তিনি এই সিদ্ধান্তেই ঠপনিত হন শেষ অবধি—বিলেতা পন্থা বর্জনের পাশাপাশি নিজেদের শিল্প-প্রতিষ্ঠা না করলে নয়।

বাংলা দেশে বাঙালীদের কোন কাপড়ের কল তখনও হয় নি। ত্রিশিলে বাংলাকে স্বয়ংসম্পন্ন করে তুলতে শ্রীবঙ্গ ব্যাপৃততা প্রভব করেন। কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় এই তিনি কি করে খবর পান—আমেদাবাদে কেশবলাল মানিকরাম মটা বাংলায় যাতে কাপড়ের কল গড়ে উঠতে পারে, সেই লক্ষ্য থেকে বাংলায় কতিপয় শিক্ষিত ও উত্তমশীল ছাত্রকে স্পিনিং উইভিং ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতিতে ট্রেনিং দেবেন, কল্প সে কাজটি কোনরূপ টাকা-পয়সা না নিয়ে। এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্তে স্বর্ধাকুমার স্বভাবতঃই ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ১৯০৬ সালে কাউকে কিছু না বলে আমেদাবাদে চলে যান তিনি। ষ্ট্রমেটা ছিলেন সে সময়ে একটি মিলের উইভিং মাস্টার ও ম্যানেজার। তাঁর অধীনে থেকে শ্রীবঙ্গ শিক্ষানবীশী আরম্ভ করেন নিতান্ত ধারণ নিয়ে। তিন বছর এভাবে কাটিয়ে তিনি বয়স (উইভিং) বয়সে বিশেষজ্ঞরূপে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর সাথে আরও ১৪ জন বাঙালী যুবক এই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন একই সময়ে।

বাংলার মাটিতে বাঙালীর প্রথম সূতা ও কাপড়ের কল হিসাবে গীরা মপুরে ১৯০৬ সালে বঙ্গলক্ষী কটন মিলস্ সিসি স্থাপিত হয়। আমেদাবাদ থেকে কিরই স্বর্ধাকুমার বঙ্গলক্ষীর তদানীন্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনের অধীনে আর্বৈতনিক প্রবেশনাররূপে বয়স বিভাগে কাজে প্রবৃত্ত হন। অল্প দিন মধ্যেই এই লাইনে তিনি প্রভূত দক্ষতা প্রদর্শন করেন—বার ফলে মিল-ফর্ত্বপক্ষ উইভিং মাস্টার ও সহকারী ম্যানেজারের পদে তাঁকে নিযুক্ত করেন পরম আগ্রহে। ১৯২১ সাল অবধি এই দায়িত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন গিনি।

ইত্যবসরে শ্রীবঙ্গের মন পূর্ববঙ্গে একটি বঙ্গ-মিল প্রতিষ্ঠা দরবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু (১৯২১) হয়ে গেছে এর ভেতর দেশের সর্বত্র। বঙ্গলক্ষী মিল ছড়ে ঢাকার চলে আসেন স্বর্ধাকুমার—লক্ষ্য থাকলো কাজের ভেতর দিয়ে স্বদেশী ছড়ানো। অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে স্বদেশী মোক্তার ৬বেবতীমোহন বসাকের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়ে

বার। উভয়ে মিলে নিবিড় পরামর্শ করে ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী সংগঠন করেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা সাড়া পড়ে যায় দেশব্যাপী—৩০ লক্ষ টাকা শেয়ার বিক্রী হয় অল্পদিন মধ্যেই। নারায়ণগঞ্জের শীতলচন্দ্রায় তাঁরে কাপড়ের মিল বসে গেল—স্বর্ধাকুমারের স্বপ্ন ও সাধনা সফলতার পথ পেল খুঁজে।

শ্রীবঙ্গের অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তি ও কর্মপ্রতিভার ফলস্বরূপ ১৯৩১ সালে ২নং ঢাকেশ্বরী মিল স্থাপিত হয় ১নং মিলেরই কাছাকাছি। এই দুইটি মিল আজও পাকিস্তানে বিপুল পরিমিত বস্ত্র উৎপাদন করে চলেছে। তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তম ও প্রচেষ্টার দেশ-বিভাগের পর ঢাকেশ্বরী মিলের আরও একটি ইউনিট (৩নং) স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে। এই মিলগুলিকে কয়েক সহস্র নব-নারী আজ কাজ করছেন, সে কম কথা নয়।

ঢাকেশ্বরী মিলের দায়িত্ব ছাড়াও স্বর্ধাকুমার অল্পপূর্ণা কটন মিলস্ সিসি এবং আরও কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হয়েছেন। এক সময় তিনি ছিলেন বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সভাপতি। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো সহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে পাকিস্তানের অস্ততম প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। সে উপলক্ষে তিনি রাশিয়া ছাড়াও বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইটজারল্যান্ড, জর্জিয়া, পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ সফর করেন এবং বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র-মিলসমূহ পরিদর্শন করে প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে কিরে আসেন স্বদেশে। প্রাচ্যের জাপানে যেয়েও তিনি বহু বস্ত্রপাতি তৈরী কারখানা এবং কতকগুলি বড় রকমের বস্ত্র-মিল নিজের চোখে দেখে এসেছেন। ঢাকেশ্বরী মিলের অগ্রগতির ইতিহাসের সাথে স্বর্ধাকুমার নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে, বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না।

সব কিছু ছাড়িয়ে স্বর্ধাকুমার একটি দরদী প্রাণ—সমাজসেবা তাঁর জীবনের একটি মুখ্য আদর্শ। এযাবৎ অসংখ্য তুর্গত পরিবার তাঁকে আশ্রয় করে পাড়াবার ঠাই খুঁজে পেয়েছে। উদ্বাস্ত-পূনর্বাসন প্রসঙ্গে এই অসীতিবর্ধী বৃদ্ধ এখনও ভাবনা নিয়োজিত করছেন। শিক্ষিত উত্তমশীল বাঙালী যুবকদের ব্যস্তোৎপাদন ব্যাপারে উন্নততর জ্ঞানার্জনের সুযোগ করে দেবার জন্তে ঢাকেশ্বরী মিলেরই আওতায় তিনি একটা ফাণ্ড বেখেছেন—বার নাম কেশবলাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাণ্ড। এই ফাণ্ড থেকে বহু ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয় এবং এমন কি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁদের বিদেশেও শিক্ষার জন্তে পাঠানো হয়। স্বর্ধাকুমারের কাছ থেকে দেশ ও জাতি এখনও আরও অনেক পাবে বলে আশা রাখে।

শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত, এম, বি, ই,

[ক্রীড়া-জগতের অস্ততম ভক্ত]

বাংলা তথা ভারতের ক্রীড়ামোদী মহলে পঙ্কজ গুপ্তের একটি পাকা আসন নির্গত হয়ে আছে বহুদিন। শুধু হকি বা ফুটবলই নয়, বলতে গেলে সমগ্র ক্রীড়া-জগতে নিজ যোগ্যতাবলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। একটি চমৎকার খেলোয়াড়-স্বলভ আনন্দোচ্ছল মন রয়েছে তাঁর ভেতর সব সময়

সজীব—কাছাকাছি বেয়ে একটু আলাপেই বা নজবে পড়ে যায়।

পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম সহরে শ্রী গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ সালের অক্টোবর মাসে। তাঁহার পৈতৃক ভূমি ছিল অবশ্য পূর্ববঙ্গেরই ফরিদপুর জেলায়। মাত্র দু'বছর বয়সে তাঁর, তখনই তিনি শিক্তহারা হন। সেই থেকেই তাঁকে দেখাশুনো করতে থাকেন তাঁর কাকা—বিনি নিজে ছিলেন একজন সরকারী চাকুরে। কাকার অহুশাসনে থেকেই পড়াশুনো হয়ে চলে বালক পঙ্কজের।

প্রবেশিকা পরীক্ষা অবধি ঢাকার উকিলস্ ইনস্টিটিউশনের তিনি ছিলেন নিয়মিত ছাত্র। কাইন্সাল পরীক্ষার পাশ করেই তিনি চলে আসেন কলকাতায় এবং ভর্তি হন সংস্কৃত-কলেজে আই-এ ক্লাসে। ক্রমে এগিয়ে এসে ১৯২২ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। এর পর বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজে তিনি পড়াশুনো করেন আর এখানেই হয় তাঁর ছাত্র-জীবনের সমাপ্তি।

ছাত্রাবস্থাতেই শ্রীপঙ্কজের খেলাধুলোর দিকে প্রবল অনুরাগ ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

শ্রী গুপ্ত সব রকম খেলাতেই প্রায় অভ্যস্ত এবং রীতিমতো উৎসাহীও বটে, কিন্তু এর ভেতর তুলনায় হকি খেলাতেই তাঁর আনন্দ বেশি, দখলও বেশি। অবশ্য ঢাকার গেণ্ডেরিয়ায় প্রথমে তিনি ক্রিকেট খেলা শুরু করেন এবং উয়াড়ী ক্লাবের আওতায় থেকে ফুটবল খেলা। তারপর ক্রমে হকি ও টেনিস খেলার দিকে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়। কলকাতায় এসে কিন্তু তিনি বেশি সময় দিতে থাকেন অস্ত্রাঙ্গ খেলা ছেড়ে হকিতেই। অল্পদিন বেতে না বেতেই ক্রীড়ামোদী মহলের দৃষ্টি পড়ে যায় তাঁর ওপর।

সেকালের বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন রোজার সাহেব। শ্রীপঙ্কজ একদিন ময়দানে হকি খেলছেন আপন মনে, হঠাৎ রোজার বেয়ে দাঁড়ান তাঁর কাছাকাছি। কি



পঙ্কজ গুপ্ত

জানি কি ভেবে তিনি দাবী রাখেন—শ্রী গুপ্তকে একজন নামকরা রেফারী হতে হবে—তাঁর পক্ষে বা হওয়ারটা অসম্ভব নয়। নতুন প্রেরণা ও উত্তম খুঁজে পেলেন এই যুবক—সফলতাও এসে জুটলো তাঁর খুব তাড়াতাড়ি। একজন নামকরা রেফারী (বিশেষ ভাবে সর্বভারতীয় হকি ও ফুটবল খেলার) হিসাবে সেদিনে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেন, তা স্মান হয়ে যায়নি আজও।

ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গণতে পঙ্কজ গুপ্ত একটি মস্ত স্তম্ভস্বরূপ, এ বললে নিশ্চয়ই অত্যাক্তি হবে না। খেলাধুলোর সংগঠন নিয়ে তাঁকে প্রায় দিনরাত ব্যস্ত ও কর্মতৎপর দেখতে পাওয়া যায়। এসোসিয়েশনের আই, এক, এ'র (ভারতীয় ফুটবল সমিতি) সাথেও তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন—কখনও সম্পাদক রূপে, কখনও বা সভাপতিরূপে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ সম্মানজনক আসন তাঁর অধিকারভুক্ত। আই, এক, এ, শীল্ড (কলিকাতা) কাইন্সালের প্রথম ভারতীয় রেফারী তিনিই।

ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞ ও ক্রীড়ামুরাগী হিসাবে শ্রীগুপ্ত এর ভেতর বিদেশ সফরে গেছেন বহুবার। ভারতীয় ক্রিকেট টিম নিয়ে তিনি ১৯৪৬ সালে ও ১৯৫২ সালে বিলেতে যান, আর অস্ট্রেলিয়ার যান ১৯৪৭-৪৮ সালে। ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের নেতৃত্ব করেন তিনি লস এঞ্জেল, বালিন, লণ্ডন, নিউজিল্যান্ড, প্রভৃতি বহুস্থানের বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতীয় ফুটবল টিম নিয়ে সোভিয়েট দেশে যান। টোকিও'র ১৯৫৮ সালে যে এশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়, তাতেও তিনি যোগদান করেন। আন্তর্জাতিক হকি ও অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাঁকে আশ্চর্যের কাজ করতে দেখা গেল কতবারই। ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে তিনি দু'বার ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট-কনফারেন্সে (লণ্ডন) অংশগ্রহণ করেন। বহির্ভারতে যখন যেখানে গেছেন, সর্বত্র সমাদৃত হয়ে আসছেন তিনি এ যাবৎ।

শ্রীগুপ্তের জীবনের আরও একটি বিশিষ্ট দিক—তিনি একজন প্রথম পর্যায়ের ক্রীড়া সাংবাদিক। ছেলেবেলা থেকেই লেখার একটা হাত তৈরী হয়ে যায় তাঁর। সেটা অবশ্য শুধু খেলাধুলো প্রসঙ্গেই নয়, অস্ত্রাঙ্গ বিষয়ও। পুরনো 'বেঙ্গলী' কাগজের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—দেশপ্রিয় জে, এম্ সেনগুপ্তের 'এডভান্স' পত্রিকাতেও তাঁর সক্রিয় অংশ ছিল। ১৯৩৭ সাল অবধি 'এডভান্স'ের ক্রীড়া-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তারপর তিনি যোগদান করেন 'পত্রিকা'তে (অমৃতবাজার পত্রিকা) আর সে-ও ক্রীড়াসম্পাদকরূপেই। এক্ষেপে সেই পদে তিনি অধিষ্ঠিত নেই বটে কিন্তু সাংবাদিকতার নেশাটি তাঁর রয়েছে ভালভাবেই। ১৯২৮ সাল থেকে তিনি 'হিন্দু'র কলকাতার ক্রীড়া-সাংবাদিকতারূপে কাজ করে চলেছেন।

খেলাধুলোর পাশাপাশি সমাজ-সেবা-মূলক ক্রিয়াকলাপেও শ্রীগুপ্ত কম উজ্জমশীল নয়। বাত্যা-বিধগু মেদিনীপুরের দুর্গতলের বাঁচাবার জন্তে সেবারে যে কলিকাতা সাংবাদিক সাইক্লান সাহায্য কমিটি গঠিত হয়েছিল, গুপ্ত সভাপতিপদে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর সম্পাদক ছিলেন তিনি (পঙ্কজবাবু)। সেদিনে জাতীয় সমর কন্টেন্ট তিনি ছিলেন অল্পতম সদস্য। তাঁর বিভিন্ন সেবাকার্যের জন্তে ১৯৪২ সালে স্তম্ভস্বায়ী ইংরেজ

সরকার তাঁকে এম. বি. ই. উপাধি প্রদান করেন। রাজনৈতিক পুঁথি-পুস্তক পড়ার একটি সুন্দর হবি রয়েছে তাঁর বয়সে। তিনি এখনও যথেষ্ট উত্তমশীল এবং নির্ধারিত কাজের ব্যাপারে খুব ক্ষিপ্র। জীবনে এমনভাবে তিনি আরও প্রতিষ্ঠা পাবেন, এ আশা আমরা রাখতে পারি।

শ্রীমতী পূর্বী মুখোপাধ্যায়

[পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রমন্ত্রী]

দেশ ও জাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন, এমন নিষ্ঠাবান কর্মীর সংখ্যা আজও বিরল। ভারতের বঞ্চিত নারী জাতির কায়সস্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, ছাত্র-সমাজকে কঠোর দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁরা বাল্য, কৈশোর ও ছাত্র-জীবনে আত্মনিয়োগ করে পরবর্তী জীবনে দুর্গত, নিপীড়িত মানুষের ও জাতির সেবায় নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন, এমন একজন মহিলা হচ্ছেন পশ্চিম বঙ্গের অল্পমাত্র রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী পূর্বী মুখোপাধ্যায়। প্রচার-বিমুখ নিরলস কর্মী ইনি, দেশ ও জাতির অগণিত মানুষের উন্নতিই এর একমাত্র কাম্য। নিন্দা বা স্তুতির কামনা না করেই দিনের পর দিন ইনি জনমানসের সেবায় আত্মনিয়োগ করে চলেছেন। বাল্যকাল থেকেই জনগণের ও ছাত্র-সমাজের সেবায় দুর্নিবার সক্রম নিয়ে তিনি জীবনপথে এখনও পর্যন্ত এগিয়ে চলেছেন অপ্রতিহত গতিতে। বাধা-বিপত্তি প্রতিকূলতা হয়তো সম্মুখে এসেছে অনেকবার কিন্তু কখনই কোন অবস্থাতেই তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হননি—সবল হস্তে ও সুস্থ মনোবল নিয়ে কর্তব্যের হাল ধরে আছেন সর্বদা। এ জন্মেই তাঁর জীবন এত সার্থক, এত সুন্দর এবং এতখানি সম্ভাবনাময়।

যে সাংসারিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বড় হয়ে উঠেন, সকল দিক দিয়েই তা চমৎকার। তাঁর পিতা স্বর্গতঃ বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী। তাঁদের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ইছাপুর গ্রামে। বিক্রমপুরের এই বিশিষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারটির বিপ্লবাত্মক রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ জন্মে এ পরিবারটির অনেক দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে বৃটিশ শাসনের সময়ে। এই বিপ্লবী পরিবারেরই মেয়ে শ্রীমতী পূর্বী মুখোপাধ্যায়। পরিবারের ঐতিহ্যই তাঁকে দেশ ও জাতির সেবায় উৎসুক করে বাল্যকাল থেকে।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের জীবনে দুটি ধাপ সমান গতিতে চলেছে। একটি তাঁর রাজনৈতিক জীবন আর একটি সাংসারিক জীবন। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলেও তিনি সাংসারিক জীবনের কর্তব্য অবহেলা করেননি একদিনও। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব ও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয়।

১৯২৬ সালের জুলাই মাসে কলকাতাতে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় এবং কলকাতা মহা-নগরীতেই তাঁর শিক্ষাজীবনের

মুদ্রপাত। স্বর্গীয়া সরলাদেবী প্রতিষ্ঠিত ভারত স্ত্রী-শিক্ষা সমনে তিনি অষ্টম-শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। লেখাপড়ার বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী। কিন্তু চোখের পীড়ার জন্মে তাঁকে স্কুল ছেড়ে দিতে হলো। তাঁর লেখাপড়ার ছিল অদম্য আগ্রহ। তাই প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী হয়ে তিনি ১৯৪০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন এবং উত্তীর্ণ হলেন প্রথম বিভাগে। ১৯৪২ সালে বেথুন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আন্তোভ কলেজে এসে ভর্তি হলেন ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে। কিন্তু একদিকে চোখের অসুখ, অন্যদিকে রাজনীতিতে ও ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্মে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়কে অনার্স ছেড়ে দিতে হলো শেষ পর্যন্ত। ১৯৪৫ সালে আন্তোভ কলেজ থেকে তিনি সন্মান্যে ডিগ্রি নিয়ে বচিটচার্ট কলেজে বি. টি. ক্লাশে ভর্তি হলেন। কিন্তু নিপীড়িত জনগণের ও দেশ-সেবার প্রবল আগ্রহে তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হলো না। ১৯৪৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ পরীক্ষা দিবার কথা ছিল, কিন্তু দেশসেবার কঠোর কর্তব্যের আহ্বানে তাঁকে পরীক্ষা দেবার বাসনা ত্যাগ করতে হলো। তিনি ছাত্র-আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে দেশের কাজে বাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র-কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন। এ সময়ে তিনি দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং ছাত্র-সমাজকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানে উৎসুক করেন। ১৯৪৭ সাল থেকেই তিনি কংগ্রেসের সক্রিয় নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের মহিলা-উপসমিতির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে তাঁর কার্যাবলী প্রথমসরীর। বর্তমানে তিনি নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য। তিনি বাঁকুড়া জেলার তালডাঙ্গরা বেল্ট থেকে পশ্চিম-বঙ্গ বিধান সভার সদস্য। তিনি দশ বৎসরের অধিককাল পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য আছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি কটক র্যাভেনসা কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য থাকাকালীন তিনি উদ্বাস্ত পুনর্বাসন ও সাহায্য বিভাগের এবং স্ত্রী-শিক্ষার উপমন্ত্রী হন। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে এ গুরুদায়িত্বভার সম্পাদন করেছেন। সাহায্য ও পুনর্বাসন দপ্তরের কাজে তাঁকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হ'তো। পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তদের সৃষ্ট পুনর্বাসন যাতে হ'তে পারে, এ জন্মে তিনি দিনরাত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন। তাঁর ঘর উদ্বাস্তদের জন্মে সর্বদা উন্মুক্ত থাকতো। বহু দক্ষিণ উদ্বাস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেছেন। ১৯৫৭ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র বিভাগের কারা ও সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। নিজের দায়িত্ব-বোধ, কঠোর কর্তব্য-পালন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্মে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ রায় কৃতিত্বের জন্মে তাঁকে রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে উন্নীত করেন। আমাদের বিশ্বাস শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় নিজের কর্মকুশলতার একদিন পশ্চিম বঙ্গের পুরোপুরি মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হ'বে আরও কৃতিত্বের সঙ্গে দেশ ও জাতির সেবা করবেন।



পূর্বী মুখোপাধ্যায়



স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

ঈশ্বরের আশীর্বাদের কল্পনাধারা নিয়তই করে পড়ে মানুষের উপর। মানুষকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সকল দিক দিয়ে তাকে পূর্ণতাও দেন তিনিই। জীবনের প্রতি মুহূর্তে মিলতে থাকে তাঁর অমৃত আশীর্বাদের স্পর্শ। নিজেকে পূর্ণ করে তোলার জন্যে মানুষকে তিনি অফুরন্ত সুরোগ দিয়ে থাকেন, নানা সুরোগ, নানা বিভাগে। বুদ্ধিমানেরা ঈশ্বরের অমৃতগ্রহের মহিমা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে ঈশ্বরদত্ত সুরোগের পূর্ণ সদ্যবহার করে—অন্তেরা মোহজালেই আচ্ছন্ন থেকে যায় মোহের বন্ধন থেকে মুক্তি পায় না তারা—বিধাতার আশীর্বাদের মহিমার মর্ম তারা করতে পারে না উপলব্ধি। বিধাতার আছবানে তাদের দিক থেকে পাওয়া যায় না কোন সাড়া, ঈশ্বরের ডাকে ছাড়ার তাদের উন্মুক্ত হয় না, সে ডাক কিরে যায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে এই শেষের দলেরই অন্তর্ভুক্ত আমি। ভগবান আমাকে কি দেন নি? রাশি রাশি সুরোগ, কত সজ্জাবনা, কত খ্যাতি, কত বশ, কত নাম, কোন কিছুই তো তিনি অভাব রাখেন নি। কিন্তু হ্যাঁ, ঐ এক কিছুই এর মধ্যে একটি বিরাট ফাঁক, সব কিছুই পেয়েছি তবু, তবু এর মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে এক বিরাট শূন্যতা। খুব সামান্য একটুখানি জারগা জুড়ে এই শূন্যতার প্রথম আত্মপ্রকাশ, তারপর একটুখানি জারগা থেকে ক্রমে এক বিরাট অংশ হল তার অধিকারগত। তারপর তার পরের ইতিহাসও কিছু কম নয়, কত কি ঘটে গেল, আনন্দ-বেদনায় ভরা কত ঘটনার ঘনঘটা হয়ে গেল কিন্তু সেই শূন্যতা আর পূর্ণ হল না। ভগবান সুরোগ-প্রত্যেককেই দেন—সুরোগ তিনি বারংবার দেন—সুরোগ তিনি আপনা থেকেই দেন—কাদের দেন? দেন তাদেরই যারা তাঁর দানের মহিমার মর্মোপলব্ধি করতে পারে, যারা তা পারে না তারা তাঁর দেওয়া সুরোগও একবারের বেশী ছাড়ার পার না। তারা যখন বুঝতে পারে যে বিধাতার ডাক প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে—আমার ছাড়ার থেকে, তারা যখন উপলব্ধি করে তাদের চরম অবিস্বাক্ষারিত। বিবিধত অমৃতগ্রহের মহিমার স্মরণে তারা সমর্পণ হয় তখন কিন্তু "বন্ধন সেরা হয়ে

গেছে" তখন মাথা খুঁড়লেও সুরোগ আর দ্বিতীয়বার আসবে না। আমার নিজের জীবনেতিহাস থেকেই এই অভিজ্ঞতা আমার সঞ্চিত হল তবে সাধনা এই যে আমি একা নই—এ দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে আমার সঙ্গে আরও অনেক নাম উল্লেখিত হতে পারে তবু, এ সম্বন্ধে আমি এখনও এই কথাই বলব যে অনেক কিছুই তো হল, ভগত নানারূপেই আমরা চোখের সামনে ধরা দিল, লাভ-লোকসানের হিসেবটাও তো জমজমাট-তবুও যে সুরোগ আমি হেলায় হারিয়েছি পরে একবার যদি সেই সুরোগ পাই তো ভগবানের সেই আশীর্বাদকে আর আমি কিরে যেতে দেব না যারপ্রাপ্ত থেকে, তার আসন হবে আমার শিরোনামে সেই আশীর্বাদের আলোয় আমি নিজেকে করে তুলব যজ্ঞা, পূর্ণা, সৌভাগ্যশালিনী।

কিন্তু এই ভুলেরও প্রয়োজন আছে, এরাও তাৎপর্যশূন্য নয়, নয় এরা অর্থবিহীন। এই ভুল করা থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পেতে পারি এই ভুলের মধ্যে শিক্ষার বীজ উগ্ৰ আছে। এই ভুলই মানুষের চোখের সামনে এক নতুন দৃষ্টি মেলে ধরে ভুলের মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজেকে গড়ে তোলবার একটা নতুন রাস্তা দেখতে পায়। বলতে গেলে ভুলই মানুষকে খাঁটি করে তোলে, ধাক্কা খেতে খেতেই তো মানুষ সার সত্যকে খুঁজে পায়, তাই দীর্ঘ চলার পথে এই ভুলের আবেদনও তো কম নয়।

অল্প প্রসঙ্গে চোখ ফেরান বাক। যে সময়ের কথা বলছি—সেই সময় "কিন্ম ব্যালে" সম্বন্ধে প্রায়শঃই নানা আলোচনায় নিজেকে লিপ্ত রাখতুম, কিন্ম ব্যালের নানা খুঁটি-নাটি দিক নিয়ে বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত থেকেছি, কিন্ম ব্যালে সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছি সর্বসাধারণ্যে। ছায়াছবিতে এই ব্যালের সুরোগ সম্বন্ধে সেদিন যে সব কথা ভেবেছি প্রসঙ্গতঃ তারই একটি সংক্ষিপ্তসার আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

কয়েক বছর আগেও (তৎকালীন হিসাব অনুযায়ী) কিন্ম ব্যালে পরীক্ষামূলক হিসেবে গণ্য ছিল—কিন্তু আজ তা সকল পরীক্ষার গণ্যী সসম্মানে অধিক্রম করে গেছে। ব্যালে শিল্পী—অর্থাৎ ঠাঁকে ব্যালারিনা বলা হয় তাঁকে ক্যামেরার সামনে নৃত্যপ্রদর্শনের সময় কতগুলি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে, সজাগ থাকতে হবে তাঁর সম্মুখভাগ সম্বন্ধে, তাঁর আলঙ্কারিক পরিকল্পনার সম্বন্ধে, তাঁর প্রচলিত ভঙ্গী সম্বন্ধে—এসব বিষয়ে তাঁকে অল্প সময়েরও সজাগ থাকতে হবে—অল্প সময় অর্থে মঞ্চের উপর যখন তিনি কলার্টনপূর্ণা প্রদর্শন করছেন অর্থাৎ মঞ্চে নৃত্যকলাপ্রদর্শনের সময়ে একজন ব্যালারিনাকে তাঁর সম্মুখভাগ, আলঙ্কারিক পরিকল্পনা, প্রচলিত ভঙ্গী সম্বন্ধে যতখানি সচেতন থাকতে হয় তার থেকে তাঁকে ঐ বিষয়গুলি সম্বন্ধে আরও অনেক বেশী সচেতন থাকতে হয় যখন ছবিতে নৃত্যকলা প্রদর্শন করছেন। এর প্রধান কারণ যে মঞ্চে তিনি নৃত্য দেখাচ্ছেন উপস্থিত দর্শকদের সামনে এখানে দর্শকের সঙ্গে তাঁর সৌজাত্মিক বোগাবোগ, এই বোগাবোগ কোন কিছু মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল নয় এই বোগাবোগ প্রত্যক্ষ—ছবির বেলাতেও তাই—দর্শকের সঙ্গেই শিল্পীর বোগাবোগ তবে তৎকালে এই যে—এ বোগাবোগ পরোক্ষ এখানে ক্যামেরা হচ্ছে মাধ্যম—ক্যামেরা অর্থাৎ যন্ত্র অনেক কিছুই খুঁটিনাটি অবধি ধরা পড়ে যায়—সেইজন্মে ছবির কেলার শিল্পীর প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ছবির ব্যালে অর্থে অবিস্বাক্ষারিত ভঙ্গীমা, মঞ্চের ব্যালে

অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণের সুযোগ। ছবির ব্যালোতে শিল্পীদের ক্ষেত্রে নানাবিধ সজ্জাবনার চিত্র বিস্তারিত, অনেক নতুন নতুন কলাকৌশলের সুযোগ রয়েছে। এই ছবির মাধ্যমে মায়াজাল বিস্তারের সজ্জাবনাও বিস্তারিত নয়। মঞ্চে কলাকৌশলের মাধ্যমে বহুটা মায়াজাল বিস্তারের সজ্জাবনা রয়েছে ছবিতে সেই সজ্জাবনা আরও বেশী আরও বর্ধিত, আরও উন্নত। নৃত্যের শ্রেণী-বিভাগ করলে দেখা যায় যে মার্চ সাধারণতঃ প্রেমমূলক ধর্মমূলক অথবা হুম্মূলক, মোটামুটি এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়, এই পটভূমিকে উপজীব্য করেই নৃত্যাংশ কল্পিত হয়। শিল্পীরা যেন বাকশীল মাহু ব প্রজ্ঞাপতি, সাকল্যের বিজয়োল্লাসের অবিস্মরণীয় মুহূর্তে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষণ শক্তিরই অর্ধাঙ্গত্ব ভূতলে পতনপ্রবণতা। আপন আপন অননুভবনীয় এবং ইচ্ছামুখ্যায়ী গঠনকর্ম শিল্পনৈপুণ্যে দর্শকসাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করাই শিল্পীদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা, অভিলାষ, স্বপ্ন। ছন্দের প্রসঙ্গে মন দেওয়া থাক। ছন্দ কোথায় নেই—ছন্দ এমন একটি বস্তু বা কোন সীমিতির বাধন মানে না, কোন সীমায়িত গণ্ডীজালে আবদ্ধ নয় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে আটকানো নয়, জীবনের প্রতিটি লগ্নে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কর্ণে ছন্দ রয়েছে ছন্দকে বাদ দিলে জীবন নিরর্থক, জীবন রূপহীন, জীবন অসার্থক। ছন্দ জীবনের মধ্যে আছে একটা অর্থ, একটা শৃঙ্খলা, একটা সংহতি, ছন্দ জীবনের একটি বিরাট সম্পদ, এদের পারস্পরিক যোগ্য অপরিহার্য, ছন্দ আর জীবন, জীবন আর ছন্দ—এদের যোগ অঙ্গাঙ্গী। পৃথিবীতে মরমেহে আমরা বা কিছু দেখছি, বা কিছু আমাদের দৃষ্টি সীমার অন্তর্গত বা কিছু আমাদের দৃষ্টির নাগালের ভিতরে সব কিছুই মধ্যস্থ হই ছন্দের স্বাক্ষর দেখা যায়, আমাদের চলাফেরা, কথাবলা, নৃত্যগীত সব কিছুই মধ্যস্থ হই ছন্দের স্বাক্ষর। আলো, শব্দ, বাতাস, জলধারার বহমানতার মধ্যেও ছন্দের স্পর্শ। ললিতকলার মধ্যে নৃত্যের স্থান, সেখানেও ছন্দের সংযোগ কিছু কম নয়। আমার সাকল্যের মূলে এর অবদানের পরিমাণ কিছু কম নেই। ছন্দে ছন্দেই নাচের গতি এগোতে থাকে। আমার নিজের জীবনেই দেখুন প্রথমে বিভিন্ন মঞ্চে নৃত্যপ্রদর্শন তার পর ছন্দে ছন্দে এগোতে এগোতে এলুম চলচ্চিত্রে, মঞ্চে ঈশ্বরানুগ্রহে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হইছি, ছবিতেও (আলিবাবা, রাজনর্তকী, কুমকুম দি ডাকার) জনপ্রিয়তা তো কিছু কম পাই নি।

আমার বিশ্বাস, ফিল্ম ব্যালোর মধ্যে দিয়ে নতুন ধরনের নৃত্যকলার সৃষ্টি হতে পারে এই নৃত্যকলার উদ্ভব, বিকাশ এবং প্রকাশ হতে পারে সম্পূর্ণ ভিন্নতর আঙ্গিকে সে দিক দিয়ে এর উন্নতির প্রচুর সুযোগও মিলবে। বর্তমানযুগে হারটিতে নাচের সুযোগ প্রচুর, সুযোগ অর্থে ব্যাপ্তির ক্ষেত্রেই বোঝাতে চাইছি, সে ক্ষেত্রে সবদিক দিয়েই বৃহৎ—“3-D2” এক সিনেমাস্কোপের কলাপে আজ এর সুযোগের কোন অভাব নেই, কোন অসুবিধার আঙ্গ একে পড়তে হবে না, হতে হবে না কোন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন। বিগত দিনের তুলনার আজকের দিনে ছবির জগতে নৃত্য পরিচালকদের সুযোগ, সুবিধা, প্রয়োজন, গুরুত্ব, মূল্য অনেক অনেক বেশী। আমার জীবনকে আমি নানাভাবে দেখবার চেষ্টা

করেছি আমি ভুব দিয়েছি আমার জীবনের গভীর থেকে গভীরে, আমার জীবনরহস্যের পূত্রসন্ধানে নিজেকে সর্বতোভাবে নিরোজিত করেছি, দেখেছি আমার জীবন বাস্তব আর কল্পনার একটা অদ্ভুত সমন্বয়। ভুল মাহুবেই করে, মাহুবেই তা বুঝতে পারে মাহুবেই তা শোধরাবার চেষ্টা করে, ভুল করাটা মাহুবেই জীবনে স্বাভাবিকই ভুলটা ভুল আর অপরাধটা অপরাধ স্তরায় ভুল মানে অপরাধ নয়, ভুল করাটাও মাহুবেই একটা স্বাভাবিক ‘ধর্ম বিশেষ’।

আজকের দিনের শিল্পীদের কলাকৌশলীদের কত সুযোগ ছিল ও কত সজ্জাবনা, আমাদের দিনে কোথায় ছিল ও “Dimension” আর কোথায় ছিল সিনেমাস্কোপ শুধু তাই নয় আজ বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের বা যোগ যার কলে ভারত নিজেকে নানাভাবে উপকৃত করে ভুলতে পারছে, বিশ্বজোড়া সহযোগিতার অর্জনের পথ আজ তার কাছে উন্মুক্ত এ সব সুযোগ সেদিন ছিল কোথায়? আমার জিজ্ঞাসা, আমাদের দেশের প্রগতিবাদী চিত্র নির্মাতারা কেন সুযোগের বধাবধ সন্ধ্যাবহার করছেন না। রঙ্গীন কার্টুনের কথা কি একবারও তাঁদের চিন্তায় উদ্ভিত হয় না। এ দেশে এখন রঙ্গীন কার্টুন নির্মাণে আপত্তিই বা কি আর বাধাটাই বা কোথায় ওদের দেশে ওয়ান্ট ডিসনী এর পথ প্রদর্শক বলা যায়, সিগারেট, স্নো হোয়াইট হ্যাণ্ড সেভেন ডোরাক্স, স্যালিস ইন ওয়াশিংটন প্রভৃতি তাঁর অসামান্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে ব্যালের অদ্ভুত্ব তিন ঘটিয়েছেন, আমাদের দেশে যে অল্প রূপকথা ছড়িয়ে রয়েছে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে সুন্দর রঙ্গীন কার্টুনচিত্র হয় আমাদের দেশে, আমাদের দেশে কাহিনীর অভাব? গল্পের রাজা আমাদের দেশ। এ দেশের গল্প প্রাচুর্য সারা পৃথিবীকে ভূমিত করে দিয়েছে, আমাদের রূপকথার গল্পগুলিকে অবলম্বন করে ব্যালের অদ্ভুত্ব সহযোগে আমাদের দেশে রঙ্গীন কার্টুনচিত্র নির্মাণে কেন উত্তোঙ্গী হচ্ছেন না এ দেশের চিত্র নির্মাতার দল? কেন? [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণীক বন্দ্যোপাধ্যায়

তৈলঙ্গস্বামী

তমসাজ্জর মানবসমাজে আলোর অমৃত বারতা বহন করার জন্যে, দিকভ্রান্ত নবকূলকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে, অন্ধার, অসত্য, অসুন্দরের একাধিপত্য অবসান করে সেইখানে সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ভারতবর্ষে যে যুগপুরুষের দল বিখ্যাত কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন তৈলঙ্গস্বামী তাঁদেরই একজন। ভারতের মহিমা ভাষার প্রকাশ করা অসম্ভব, স্রবণাতীত যুগ থেকে ঈশ্বরের মানসপুত্রেরা, যুগদেবতারার, পূজ্য সাধকেরা আবির্ভূত হয়েছেন এই ভারতভূমিতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে। তাঁদের পুণ্য আবির্ভাবে ধরার জাতি হয়েছে মোচিত, দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিতে ভবে গেছে দিকমণ্ডল। পরমপূজ্য তৈলঙ্গস্বামীর জ্ঞান যুগবিধায়কের দিব্যজীবনী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রচার করার জন্যে চিত্রনির্মাতারা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ দাবী করতে পারেন। এ প্রচেষ্টা সাধু এ কথা অনস্বীকার্য। তবে এই মহাপুরুষদের আলোকাক্ষয় জীবনকাহিনী যেখানে চলচ্চিত্রের উপজীব্য, চিত্রনির্মাতাদের কর্তব্য কিন্তু সেইখানেই শেষ নয় তাঁদের প্রধান

কর্তব্য যাতে জীবনকাহিনী অবিকৃতভাবে প্রচারিত হয় সে দিকে লক্ষ্যে পরিমার্ণে লক্ষ্য রাখা কিন্তু ছবিটি যখন মুক্তি পেলে দেখলুম অনেক উল্টো-পাল্টা, প্রমাণক তথ্য কাহিনীর মধ্যে পরিবেশিত হয়ে গেছে। কোথাও দেখলুম ঘটনা ঠিক আছে তবে পাত্র বদলে গেছে। জীবনীচিত্র আর ঐতিহাসিক চিত্রের মূলে বা সাধারণ সংজ্ঞায় বলতে গেলে কোন প্রভেদ নেই। অতএব এই সব ঐতিহাসিক চিত্রে ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে তার গুরুত্ব বা মর্যাদা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় আর এ ছবিগুলি মূলতঃ তথ্যপ্রধান। তৈলঙ্গ স্বামীর দীর্ঘ জীবিত দেখানো হয়েছে—তীর পুত্রকর্তার উল্লেখও শোনা গেল অথচ তৈলঙ্গ স্বামীর জীবনকাহিনীর সঙ্গে যারা পরিচিত তাঁরাই জানেন যে তৈলঙ্গ বিবাহিত জীবনে কোনদিনই প্রবেশ করেন নি—সংসার বৈরাগ্য তাঁর আশ্রয় তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু তিনি তাঁর আপত্তি প্রকাশ করায় সে ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নি। শ্রীধরকে এখানে অগ্রজ কণে দেখানো হয়েছে আসলে শ্রীধর ছিলেন তৈলঙ্গের অল্পভ্রাতৃ। নরনার যত্না পুরোপুরি সত্য, মিথ্যার সংশ্রব মাত্র নেই কিন্তু এই দুই-জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল কার সঙ্গে? তৈলঙ্গের মত দ্বিপুত্রক দুটো ভগ্নর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেন? প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল তাঁর সমকক্ষ না হলেও একজন সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গে সেই সিদ্ধ পুরুষের নাম থাকবে বাবা। তৈলঙ্গের মত মহাপুরুষকে দুটো ভগ্নর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ করিয়ে তাঁর চরিত্রটিকে যে কতখানি ছেঁয় করা হল তার ভুলনা মেলা ভার। ছবির পিছনে কোন ঐতিহাসিক পটভূমি নেই। এই ছবির সবচেয়ে বড়

অভাব উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের অল্পপরিচয়, উমাচরণের অল্পপরিচয় ছবিটিকে যে কতখানি শূন্য করে তুলেছে তার ইংগিত মেলে না। ঠাকুরের জীবনে স্বামীজী যেমনই অপরিহার্য তৈলঙ্গের জীবনে উমাচরণও ঠিক তাই, তৈলঙ্গের ভক্ত ছিলেন অসংখ্য কিন্তু নীতিগত শিষ্য ছিলেন মাত্র পাঁচজন। উমাচরণ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তৈলঙ্গাল মিশির ও সাধক জীবনে তৈলঙ্গ স্বামী নাম নেন। ইনি ছোট তৈলঙ্গ বলে খ্যাত; তাঁর অসংখ্য শ্রদ্ধাশিষ্য ছিলেন বা আছেন, অনেকে এই দু'জনকে (তৈলঙ্গ এবং তৈলঙ্গ) এক ও আঁতুর বলে ভেবে থাকেন। তৈলঙ্গ স্বামীর একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছিলেন উমাচরণ এ প্রসঙ্গে তার চেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ আর নেই। উমাচরণকে তৈলঙ্গের জীবন থেকে কোন রকমে বাত দেওয়া যায় না; উমাচরণকেই তৈলঙ্গ তাঁর (উমাচরণের) পূর্বজন্ম দেখিয়েছিলেন এবং তা প্রমাণও করে দিয়েছিলেন, উমাচরণের সামনেই তৈলঙ্গ মাতৃমূর্তিকে প্রকটা করেছিলেন, দেবীমূর্তি বালিকার রূপ নিয়ে উমাচরণের সামনে এসে দাঁড়াল, উমাচরণ ছুটে গিয়ে দেখলেন বিগ্রহ স্থানে বিগ্রহ নেই বালিকামূর্তি অগতাল পরেই মিলিয়ে গেল—উমাচরণ আবার গিয়ে দেখলেন বিগ্রহ বথানানেই বর্তমান, গুরুর কাছে মিনতি জানালেন উমাচরণ—বাবা, আত্মকের এই অলৌকিক ঘটনাকে চিরকালের মত স্মরণীয় করে রাখুন, উমাচরণের অনুরোধে তৈলঙ্গ বললেন,—যা গিয়ে দেখে আয়—শব নেই আর এই মূর্ত্ত থেকে ভা থাকবেও না, উমাচরণ গিয়ে দেখলেন দেবীমূর্তির পদতলশব নেই—সেই প্রতিমা আজও শবশূন্য, সেই আশ্রয় আজও আছে। আজও আছে সেই শবশূন্য বিগ্রহ। বারাণসীর তৈলঙ্গ আশ্রমটির কয়েকটি শট কি দেখানো যেত না। ছবি বিশ্বাসের ও কি রূপসজ্জা হয়েছে? ওই রূপসজ্জা ত্রিকালক সত্যজটী, পূণ্যকর ঋষির নিয়, ও রূপসজ্জা কুৎসিত যোগেশ্বর ব্যক্তির।



তৈলঙ্গ এবং ঠাকুরের যুগপৎ ভূমিকায় অবতরণ করেছেন গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। তাঁর গুরু ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন ৪ বি বিশ্বাস পিতা নৃসিংহের ভূমিকায় নীতীশ মুখোপাধ্যায়, মাতা বিজীবতী, তাঁর সপত্নীর ও কল্পিত তৈলঙ্গজায়া সাবিত্রীর ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন পদ্মাদেবী, স্বাগতা চক্রবর্তী ও তপতী যোষ, বালক তৈলঙ্গের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমান তিলক। কাশীর রাজমন্দিরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মিহির ভট্টাচার্য ও সুনন্দা দেবী, মজলারাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য। অজ্ঞাত-অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন গঙ্গাপদ বসু, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংক বসু তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বীরাজ দাস। ম্যালকম, শ্রীতি মজুমদার, পরিভোষ দাস, সঞ্জীল দাস, শীলা পাল এবং আরতি দাস প্রভৃতি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন চিত্রসাবধী সর্বশেষে এই কথাই আবার বলি যে ঐতিহাসিক পুণ্যকাহিনীর এ রকম প্রমাণক এই ধরনের উপায় সন্ধান করতে পারে এ আমরা ভাবতে পারি নি।

গরীবের মেয়ে

সুখিন্দা দেবী, "শিশুকুমারী-র" একটি বিশিষ্ট চরিত্রে ইনি রূপদান করেছেন।—আলোকচিত্র হেমেন বিজ

সর্বজন অল্পপরিচয় দেবীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে গরীবের মেয়ে অন্যতম, একটি তরুণীর অসাধারণ আত্মত্যাগই এই উপন্যাসের মূল

উপজীব্য। চমৎকার জমাটি গল্প। ছায়াছবির বর্ষে উপাদানও এর মধ্যে বিস্তারিত। গল্প বতই ভালো হোক তাতে ছায়াছবির উপযোগী বত উপাদানই থাকুক পরিচালকের পরিচর্যার উপরই নির্ভর করে তার চলচ্চিত্রায়ণের সার্থকতা। উপযুক্ত পরিচর্যার দৈর্ঘ্যে গল্পের বখাবথ বিকাশ ঘটে না, গল্পীনের মেয়ের চিত্রায়ণ সম্পর্কে এই আমাদের প্রধান বক্তব্য। গল্পীনের মেয়েতে সামাজিক পটভূমিকায় একটি তরুণীর অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ছবিটিকে ঘটনার বনধটার যান্ত্র-প্রতিধাত-সংঘাতে গতির আবেগে ভরিয়ে তোলা হয়েছে ঠিকই সে দিক দিয়ে পরিচালক সফল হয়েছেন বলা যায় কিন্তু চরিত্রগুলির দিকে তিনি বোধহয় নজর দেন নি। আমাদের মনে হয় চরিত্রগুলি যেন বখাবথ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে নি। বিভিন্ন ধরণের অনেকগুলি চরিত্র এখানে মিছিল করে পাড়িয়েছে, কোনটিই যেন শেষ 'পর্বত পূর্ণতা' পেল না।

ছবিটিতে কয়েকটি অসঙ্গতি আমাদের চোখে পড়ল। সুশীল বলেছে সে নীলিমাকে ছোট বোনের মত দেখে আসছে অথচ নীলিমার সঙ্গে সে যে আচরণ করছে তা অপ্রঞ্জস্যমূলক নয় তা প্রণয়ী মূলত। নীলিমা তার মাতৃবিয়োগের পর বখন জলে ঝাঁপ দিল তখন সেইখানে দাহকারীরাও উপস্থিত, অতগুলো চোখের উপর দিয়ে একটি মেয়ে জলে ঝাঁপ দিল আর সেটা কারোর নজরে পড়ল না। শুভেন্দু বুদ্ধিমান না হলেও নেহাৎ গাধা নয়, যে কাগজটাতে সে খবরের সেই মন্তব্য করছিল সে কাগজখানাকে সে নষ্ট করে দিল না কেন সাধারণতঃ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এখানে কি বলে—এসব ক্ষেত্রে ঐ কাগজখানি নষ্ট করে দেওয়ারই কথা আর শুভেন্দুর মত ছেলে সেটিকে সহজে উপেক্ষা করে গেল এই বা কি করে হয়, ছবির শেষাংশে সুশীলের যে বিষের আসর দেখানো হয়েছে ঐ কি বিশ্রদাসের মত ধনী সম্পন্ন ব্যক্তির মেয়ে এবং ভূবন রায়ের মত ধনী সম্পন্ন ব্যক্তির ছেলের বিবাহ আসর? একটা শুভউৎসবে উপস্থিতের সংখ্যার ও রকম দীনতা বিশেষভাবে চোখে লাগে।

এই ছবিতে অভিনয় করে গেছেন স্বর্গত নট বীরাজ ভট্টাচার্য। এই ছবিতে তিনি এক অনন্তসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেলেন, তাঁর এই ছবির অভিনয় বাঙলা দেশের চলচ্চিত্রজগতের গৌরববুদ্ধিকায়ক। রূপদক্ষ শিল্পী বীরাজ ভট্টাচার্যের পরেই এ প্রসঙ্গে ধীর নাম করা যেতে পারে তিনি অনিল চট্টোপাধ্যায়, অভিনন্দন-বোধ্য অভিনয় তিনি প্রশংসন করলেন। তাঁকে সাধুবাদ। এঁরা ছাড়া ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, কার্তিক সরকার, শ্রীমান সুরেন্দ্র, শোভা সেন, সার্বিজী চট্টোপাধ্যায়, সবিভা বসু, রেণুকা রায়, শীলা পাল, সাধনা রায়চৌধুরী, কুমারী রূপা প্রভৃতির নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবিটিতে সুরবোধনা করেছেন স্বনামধন্য শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অর্ডেন্দু মুখোপাধ্যায়।

গিরিশ থিয়েটার

সম্প্রতি বিশ্বরূপার গিরিশ থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন অস্থান নির্বিশেষে এক ভাবগভীর মনোজ পরিবেশে সুরম্পন্ন হয়ে গেছে। অস্থানে পৌরোহিত্য করলেন স্বামী বুদ্ধানন্দ এক প্রথম অভিব্য

আসন অলঙ্কৃত করলেন নটনূর্ব শ্রীঅরীন্দ্র চৌধুরী। অস্থানের প্রারম্ভে গিরিশচন্দ্র রচিত একটি গান গেয়ে শ্রীমতী ছবি বন্দোপাধ্যায় সযবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। অস্থানে বক্তৃতা করেন শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক অজিত বোষ, এবং আলোকশিল্পী তাপস সেন। গিরিশচন্দ্রের রচনা থেকে আবৃত্তি করেন শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য।

ভাউন ট্রেণ গিরিশ থিয়েটারের প্রথম নাট্যোপহার। প্রখ্যাত শিল্পী রাধামোহন ভট্টাচার্য অভিনেতা হিসেবে গিরিশ থিয়েটারে বোগদান করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত জাতির নটগুরু নামাঙ্কিত এই নাট্যশালা জাতীয় সংস্কৃতির গৌরব বৃদ্ধি করুক, এই নাট্যশালার মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্য আরও সমৃদ্ধিশালী হোক, এই নাট্যশালাকে কেন্দ্র করে বাঙলার নাট্যগগনে উদিত হোন প্রতিভার বরপুত্র অনেকানেক নাট্যজ্যোতিষ্ক—গিরিশ থিয়েটারের স্বর্গীয় বোধন লগ্নে এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। পরিশেষে এই মহত্তম প্রচেষ্টার প্রভে উদ্বোধনাদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন নিবেদন করি।

আমি কি ভাবি—বেটি ডেভিস

আমাদের মত বেসব মানুষ জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন ছায়াছবি ও মঞ্চের পটভূমিতে, তাঁরা একটু বিরাক্তি বেধ করেন স্বতঃই সেই সব সবজাতী মন্তব্যে বা নবাগত নবাগতারা অকুণ্ঠেই উচ্চারণ করেন, চলচ্চিত্র শিল্পের ভাল মন্দ ইতিকর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে বে



সখ্যা রায়, "পড়ন্তিলক"এর একটি বিশেষ ভূমিকায় ইনি অংশ গ্রহণ করেছেন।—আলোকচিত্র হেমেন মিত্র

সম্মুখে তাঁদের বলতে গেলে কোন পরিচালক ধারণাই হয়ে ওঠেনি তখন পর্যন্ত।

যে পর্যন্ত না নিজেদের মতকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার মত অভিজ্ঞতা তাঁদের অর্জিত হচ্ছে অসম্ভব: সেই সময়টুকু অবধি তাঁরা একটু কম মুখর হলেই মজল, ব্যক্তিগতভাবে এইসব বালখিল্য সমালোচকদের সম্পর্কে আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই।

বসুমতী না অযোগ্যতা বা অকর্মণ্যতার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সামনে আসে ততক্ষণ অবধি প্রযোজক পরিচালক, নাট্যরূপকার ও আলোকচিত্রীর যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ পোষণ করা অভিনেতা বা অভিনেত্রীর পক্ষে শোভন নয়।

অভিজ্ঞ কর্মী সম্মুখে আলোচনা করতে গিয়ে আমার দৃষ্টিতে জেগে উঠছে বহুপূর্বের কলে আসা কয়েকটি দিনের কথা যখন আমি আলেক গারেনেশের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব প্রোডাকশান, এম্-জি-এম্ এর "দি ক্লেপগোর্ট" ছবির জন্তে কাজ করেছিলাম। বহুদিন ধরে আমি বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি সাধারণ ভাবে ও আলেকের নিজস্ব চিত্র প্রতিষ্ঠান সম্মুখে বিশেষভাবে কৌতূহলী ছিলাম, বিখ্যাত চিত্র "দি ব্রিজ অন্দি রিভার কোয়াই" এর জন্ত যখন তিনি "অন্দি" পুরস্কার পান বা তাঁর যোগ্যতারই এক স্বীকৃতি মাত্র, অল্প অনেকের মতই আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দনে নন্দিত করি অকুণ্ঠে।

আমেরিকার সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বৃটেনের চলচ্চিত্র শিল্পে ও অল্পমাত্র মহাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প সম্মুখে অভিমত যে কি তাও জানবার জন্ত আগ্রহী হন অনেকে; এ বিষয়ে আমার বিশেষ কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ছিল না কারণ দেশ কাল পাত্র ভেদে এই শিল্পের মূলসীতির যে কোন পরিবর্তন ঘটে তা আমার মনে হয় না, অভিনয় শিল্পের মূল কথাটা সর্বত্রই এক।

চলচ্চিত্র জগতে অভিজ্ঞতা সঞ্চার হয় প্রতিক্রমে, নতুন নতুন সহকর্মীদের সান্নিধ্যে প্রতিমুহূর্তে শিল্পী নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন নিজের শিল্পকৃতিকে।—

পরিচালক ও আলোক চিত্রীর নির্দেশ মেনেও ক্যামেরার সামনে সর্বদাই আমি নিজের গতিবিধিকে খানিকটা নিজেই নিয়ন্ত্রণ করেছি যাতে অভিনীত চরিত্রটির মধ্যে আসে ব্যক্তিত্ব ও জীবন।—

চরিত্রটিকে সহজুত্বের চোখে দেখতে শিখলে তবেই তাতে প্রাণ আরোপ করা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব, ব্যক্তিগত জীবনে আমি সর্বদাই এই মতের পরিপোষণ করি, নিজের অভিনয়েও এই ধারা আমি বজায় রাখতে চেয়েছি বরাবর সকল হয়েছে কিনা সে বিচার আমার নয়, শুধু আন্তরিকতার ঘাটতি ছিলনা কখনও এইটুকুই বলতে পারি জোর গলায়।

এ প্রসঙ্গে আজ উঠেছে যে অভিনয় শিল্পের জগতে টেলিভিশনের কি ধরনের ভূমিকা এই শিল্পে T. Vর কি কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় অবদান আছে?

আমার মনে হয় আছে, শিল্প জগৎ ও টেলিভিশন পারস্পরিক উন্নতির পথে পরস্পরের সহায়, উভয়ের কাছে উভয়েই অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে।

কাজেই চলচ্চিত্র শিল্প ও T.Vর মিতালী যে তাদের যুক্ত

ভাবে নিয়ে বাবে উন্নতির ও সাকল্যের পথে এ আশা বোধহয় হ্রাসা নয়।

সব শেষে একটা কথা মনে করিয়ে দিই; T.V,-তেই হোক, পর্দায়ই হোক বা মঞ্চের মাধ্যমেই হোক আমরা দর্শক-কে কি দিচ্ছি সেটাই প্রধান—কিভাবে দিচ্ছি সেটা নয়।

সংবাদচিত্র

দেবী চৌধুরাণীর পরিচালক : সত্যজিৎ রায় নন

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর রচনা দেবী চৌধুরাণী এগারো-বারো বছর আগে একবার চলচ্চিত্রের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিছুকাল আগে শোনা গিয়েছিল যে প্রেম আচ্যের প্রযোজনায় দেবী চৌধুরাণী আবার নতুন করে চলচ্চিত্রায়িত হবে এবং এই পুনঃ চলচ্চিত্রায়ণের বিশেষ আকর্ষণ যে পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা দেবেন সত্যজিৎ রায়। বর্তমানে আমরা শুনে পাচ্ছি যে এই সংকল্প বর্জিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ যে এঁরা জানতেন না যে দেবী চৌধুরাণীর চিত্রায়ণে অনেক আগেই আত্মনিয়োগ করেছেন জীবী, এল, খেমকা এবং তার জন্তে প্রয়োজনীয় যথাযথ স্বত্বাদিও তিনি অধিকারভুক্ত করেছেন।

দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে ছায়াচিত্র : মহারাষ্ট্র সরকারের উত্তম।

মহারাষ্ট্র সরকারের প্রচারবিভাগ দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। এই এক রীলের ছবিটির পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে শ্রীশিবদাসানীর উপর, তিনি বলেছেন যে দৃষ্টিহীনদের জন্তে করুণাভিক্ষা করা এই চলচ্চিত্রায়ণের উদ্দেশ্য নয়, তারা ভাগ্য-বিড়ম্বিত হলেও অকর্মণ্য নয় এ বিষয়ে সর্বসাধারণকে অবহিত করাই এই চিত্রনির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারত-পাক মিলিত উত্তম

ভারতীয় চিত্র প্রযোজক বঙ্গী জং বাহাদুর এবং পাকিস্তানীয় চিত্র প্রযোজক মহম্মদ ইসাক মিলিত হয়ে একটি চিত্র নির্মাণে উত্তমগী হয়েছেন। এঁরা একটি পাঁচাবী ছবির নির্মাণকার্বে রত, ছবি হয়েছে যে কাহিনী, গান, সঙ্গীত পরিচালনার ভার ভারতীয় প্রযোজককে গ্রহণ করতে হবে, কিছুসংখ্যক শিল্পীও তাঁকে সরবরাহ করতে হবে। প্রধান ভূমিকায় একজন ভারতীয় অভিনেত্রী আত্মপ্রকাশ করবেন।

রোম্যান নোভারোর পুনরাবির্ভাব

হাল আমলের হলিউডের সবচেয়ে বিস্ময়কর আনন্দ সন্বাদ হচ্ছে রোম্যান নোভারোর পুনরাবির্ভাব। দীর্ঘকাল পরে রোম্যান নোভারো আবার ছবির জগতে ফিরে এলেন পৃথিবীর চিত্রমৌদীদেব কাছে এর চেয়ে আনন্দজনক সন্বাদ আর কি থাকতে পারে। হেলার ইন পিক টাইটস নামক ছবিটির মাধ্যমে দীর্ঘকাল পরে আবার তাঁর অভিনয় দেখা যাবে। এঁর সঙ্গে এই ছবিতে সোফিয়া লোরেনও অভিনয় করছেন। সে যুগে রোম্যান নোভারো ছিলেন যুগ, জনপ্রিয়তার উচ্চতম শীর্ষে ছিলেন সমানীন, সারা বিশ্ব জুড়ে ছিল

তাঁর অল্পবয়সী গুণগ্রাহীর দল। ১৯১৯ সালে অর্থাৎ আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে 'দি গোট' নামক চিত্রের কল্যাণে তাঁর খ্যাতি দিবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 'দি প্রিন্সার অফ জেসা' 'কারাবুস' 'বোড টু বোমাল' প্রভৃতি তদানীন্তন নির্বাক ছবিগুলির মধ্যে তাঁর অনন্তসাধারণ অভিনয় প্রতিভা স্বাক্ষরিত হয়ে আছে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

ভিগ্লার বছর বয়সী বোটি ডেভিস এবং পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী গ্যারি মিলারের বিবাহ বন্ধন সম্প্রতি ছিন্ন হয়েছে। এই বিবাহ বন্ধন করেক বছর স্থায়ী হয়েছিল। আজকের দিনের হলিউডের অভিনেত্রী কুলের প্রথম শ্রেণীতে ধারা আসন পাবার যোগ্যতা রাখেন স্ত্রীমতী ডেভিস তাঁদেরই অন্ততমা।

শুভ-পরিণয়

সৌন্দর্যময়ী অভিনেত্রী জিনি টিয়ার্নি প্রসিদ্ধ তৈল ব্যবসায়ী উইলিয়ম হাওয়ার্ড লীর সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। লী ইতিপূর্বে প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী হেন্ডি লামারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কাউন্ট অলেগ কাসিনী হচ্ছেন জিনির প্রথম স্বামী। সম্প্রতি মৃত প্রিন্স আলী খাঁর সঙ্গেও এর গভীর প্রণয়ের কথা সুবিদিত। লীর বয়স বর্তমানে বাহাঙ্গ আর জিনির একচল্লিশ।

ড্যানি কে ও ব্রেফ শ্রাণ্ডলার : আরব দেশসমূহে

প্রবেশ নিষিদ্ধ

আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পীস্বর ড্যানি কে এবং ব্রেফ শ্রাণ্ডলারের সম্পর্কে যথেষ্ট তিক্ত হয়ে উঠেছে। আরব রাষ্ট্র এঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার জন্তেই না কি আরব সরকার এই নীতি অবলম্বন করেছেন।

ম্যাডলারের আসনে গোল্ডস্টোন

টোরেন্টিয়েথ সেফুরি কন্সের প্রধান কর্ণার বাতি ম্যাডলার সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করলেন রবার্ট গোল্ডস্টোন। চলচ্চিত্র জগতে ইনিও একজন বনামধন্য পুরুষ। দীর্ঘকাল ধরে ইনিও নানা ভাবে চলচ্চিত্রের সেবা করে আসছেন।

ছুরিকাঘাতের অপরাধে লেখিকা কারারুদ্ধা

চিত্রকাহিনী রচয়িত্রী মিস ম্যানি বারনেবী (৩৮) কে লেকটানেট কর্নেল ওয়ান্টার স্প্যায়াকে ছুরিকাঘাত করার অপরাধে এক বছরের জেলে জীবনে পাঠানো হয়েছে। স্প্যায়ো হচ্ছেন ইংল্যান্ডের রাণী-মাতা এলিজাবেথের সম্পর্কিত ভ্রাতা।

প্যারাসুটের বিশ্বাসঘাতকতা : তরুণী শিল্পী

অকালে নিহত

প্যারাসুটও বিশ্বাসঘাতকতা করল আর তারই কলে, নামে ২৮ বছর বয়সেই করুণ ভাবে প্রাণ হারাতে হল ক্লডেট ড্রিপিলনকে। "ব্যাংকটি গোস টু ওয়ার"এ ইনি অভিনয় করছিলেন, তাতে প্যারাসুটে অবতরণের দৃশ্য ছিল ঐ দৃশ্যের মহড়া দেওয়ার সময় এই ছুঁটনা ঘটল, লাক দেওয়ার পর দেখা গেল প্যারাসুট খুলল না, কলে একটি সঙ্কটবনাকে অকুরে বিনষ্ট হতে হল। মাদুদের জীবন নিয়ে যেখানে প্রাণ সেখানে এই সব কাজের আগে জিনিবগুলি কেন ভাল করে পরীক্ষা করা হ'ল না? এই করুণ ঘটনার ভবিষ্যতে যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহল ব্যবস্থার হলেই আমরা সুখী হব।

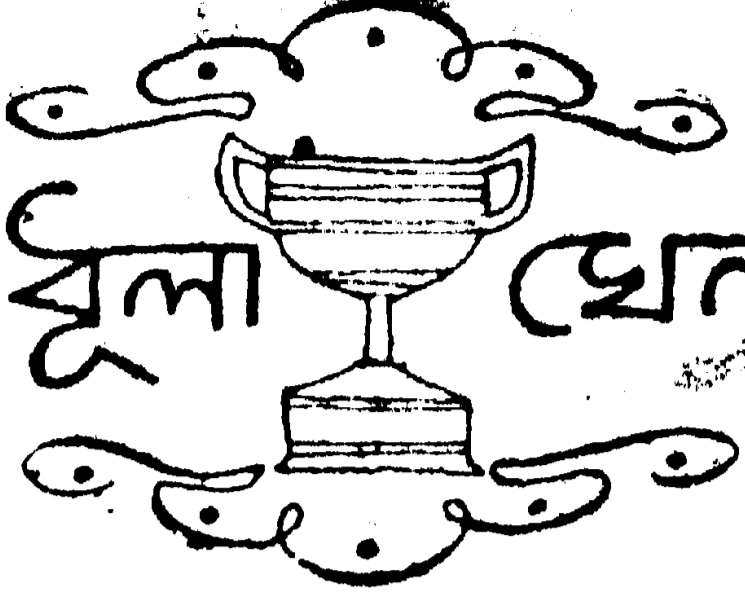
সেখানে আছে সুন্দর মাঠ

Iolo Aneurin Williams-এর 'There are sweet fields'

পাহাড়গুলির নীচে আছে
সুন্দর মাঠগুলি ;
জীবন সেখানে সুখ-আনন্দে প্রবাহিত
যেন ছোট-ছোট বর্ণা।
সূর্য সেখানে তুলে যায়
প্রথম উত্তাপ,
আর উঁচুতে স্থিতি-শীল পাখরগুলোর মাথা থেকে
বাতাস (সেখানে) কখনো প্রবল জোরে নামে না
প্রবীণ ব্যক্তির এই গান
সেখানে একান্ত উপযুক্ত :
তার বোঁবন অনেক বলিষ্ঠ ছিল,
কিন্তু বলিষ্ঠ-বোঁবনের বহু পুরোনো প্রথম
তাকে আর ব্যথা দেয় না।

—সুনন্দার চন্দ্রকর্তা।

খেলাধুলা খেলাধুলা



মোহনবাগানের নতুন অধ্যায় রচনা

একবার নয়, দু'বার নয়—নয় বার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ বিজয় করে ভারতীয় ফুটবলে নতুন ইতিহাস স্রষ্টা বাঙ্গালী তথা ভারতের জনপ্রিয় দল মোহনবাগান তাঁদের ক্লাবের ইতিহাসে আরও একটা নতুন সাকল্য সংবোধন করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এর পূর্বে ভারতীয় দল হিসাবে এক মাত্র মহম্মেডান স্পোর্টিং এই কৃতিত্বের অধিকারী ছিল।

মোহনবাগান শেষ খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলকে দুই গোলে পরাজিত করে। শেষ খেলার দুই পয়েন্ট পেলেই লীগ বিজয়ের কৃতিত্ব লাভ করবে, আর এক পয়েন্ট অপচয়ে লীগ বিজয়ের পথে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় খেলা দেখার জন্য মাঠে অভূতপূর্ব দর্শক-সমাগম হয়। এই দিনকার দর্শক-সমাগম বর্তমান মরশুমের বহু বড় বড় খেলাকে হার মানিয়েছে। দলের সভ্য ও সমর্থকদের ভেতর এই দিন উৎসাহ ও উদ্দীপনার বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। লীগ বিজয়ের সুনিশ্চিত ধারণা নিয়েই সমর্থকরা আনন্দোৎসবের জন্য নানা রকম আতসবাজী, বেলুন, প্রচারপত্র, কানন-ঘণ্টা নিয়ে মাঠে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু এক মাত্র গোললাভের আশায় সভ্য এবং সমর্থকদের উৎকর্ষিত চিন্তে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে যে মুহূর্তে মোহনবাগান গোল করে তার সাথে সাথেই হাজার হাজার কণ্ঠের হর্ষনির্নাদে ময়দানের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। মোহনবাগানের প্রথম গোলের সঙ্গে সঙ্গেই একজন অকৃত্যসাহী কিশোর দর্শক আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে মাঠের অভ্যন্তরে ছুটে গিয়ে গোলদাতা সুনীল নন্দীকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে, খেলা শেষে অগণিত দর্শক মাঠের ভেতর এসে দলের খেলোয়াড়দের পুষ্পমাল্য প্রদান করেন এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ক্যালকাটা মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ক্যালকাটা মাঠ থেকে খেলোয়াড়দের শোভাযাত্রা করে মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে নিয়ে আসা হয়।

নিজ দলের সাকল্যে আনন্দ প্রকাশ করা অস্বাভাবিক নয়। 'তবে কোন দলকেই অন্ধ ভাবে সমর্থনের কোন সার্থকতা' আছে বলে মনে হয় না। জনপ্রিয় দলগুলির সমর্থকরা সময় সময় উৎসাহের আভিষেক মাঠে অশোভনীয় আচরণ করেন, এটাই দুঃখের বিষয়।

১৯১১ সালে ভারতের প্রাচীন ও অগ্রতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই, এক, এ শিরীষ বিজয়ী ভারতীয় ফুটবলে ইতিহাস রচনাকারী মোহনবাগান ক্লাবের সাকল্যে বাঙালী মাঝেই গর্ব অনুভব করবে। দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে সকলেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন, তা বলাই বাহুল্য।

মোহনবাগানের লীগ বিজয়ের তালিকা

	খে	জ	ড্র	পরা	ব	বি	পঃ
১৯৩৫	২৪	১৬	৭	১	৩১	৭	৩৯
১৯৪৩	২৪	১৬	৭	১	৩৫	৬	৩৯
১৯৪৪	২৪	১৮	৪	২	৩৯	৮	৪০
১৯৫১	২৬	২০	৪	২	৪৭	৫	৪৪
১৯৫৪	২৮	১৯	৮	১	৩৮	৭	৪৬
১৯৫৫	২৬	১৫	৮	৩	৩৯	১২	৩৮
১৯৫৬	২৬	১	৫	২	৫৫	৯	৪৩
১৯৫৯	২৮	২১	৬	১	৪৯	৪	৪৮
১৯৬০	২৮	২২	৫	১	৬১	১০	৪৯

আই-এফ-এর বদাগুতা

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে আই, এক, এ-র সম্পাদক শ্রী এম দত্তরায় খেলাধুলার প্রচার ও প্রসারের বিভিন্ন খাতে আই, এক, এ-র তরফ থেকে আর্থিক সাহায্যের এক কিরিস্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে বখনই প্রয়োজন হয়েছে, তখনই আই, এক, এ বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে মুস্তহস্তে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে। এই সকল সাহায্যের ভেতর রাজ্যপালের টি, বি, আকটার কেয়ার কলোনীর প্রতিষ্ঠাকালে ৭৩০০০ টাকা আর জি কব মোড়কেল কলেজে ৫০,০০০ টাকা এবং জন এণ্ডারসন ক্যাজুয়েলটি ব্লকে ২০,০০০ টাকা সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গত বছর আসামের বর্তমানের জন্য ১০,০০০ টাকা আই, এক, এ দান করেছিল। এবারও আসামের দাঙ্গাহাঙ্গামায় দুঃস্থদের আই, এক, এ-র তরফ থেকে ১৫০০০ টাকা সাহায্য করা হয়েছে। শ্রীদত্তরায় এই সকল সাহায্য প্রসঙ্গে কলকাতার ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের অকুপণ সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।

শ্রী দত্তরায় সাহায্যের যে কিরিস্তি দিয়েছেন সকলেই তাতে আই, এক, এ'কে সাধুবাদ জানাবেন। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে প্রতি বছর আই, এক, এ চারিটি খেলা বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে। কিন্তু এই টাকার মোটা অংশ আই, এক, এ-র বেতনভুক সম্পাদক শ্রী এম, দত্তরায়কে পুষতে ব্যয় করতে হয়। চারিটি খেলার অর্থব্যয় করে মোটা মাইনের সম্পাদক পোবার কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। প্রতি বছর চারিটি খেলার সংগৃহীত অর্থ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আই, এক, এ-র তরফ থেকে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, এমন সব প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হয় যাদের মোটেই সাহায্য পাওয়ার উচিত নয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান কেবল সাহায্য পেয়ে থাকে আই, এক, এ-র সম্পাদক শ্রী এম, দত্তরায়ের অগ্রহে।

আই, এফ, এফ চারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ বন্টনের একটা ভল্ল হওয়া দরকার, ক্রীড়ামোদীদের এই দাবী করাটা অসম্ভব হবে না।

ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল দল গঠিত

রোম অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১৮জন খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন। আর একজন খেলোয়াড় বাতে অন্তর্ভুক্ত হন তার জন্য চেষ্টা চলছে। ২৪ বছর বয়স বাজালার খ্যাতনামা খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জী সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন। ১৮জন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাজালা থেকে সর্বাধিক আট জন খেলোয়াড় ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছেন। বোম্বাই থেকে পাঁচজন, অন্ধ থেকে তিনজন এবং সার্ভিসেস ও মাদ্রাজ থেকে একজন খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন।

গত অলিম্পিকে যোগদানকারী ছয়জন খেলোয়াড় ভারতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, এ পর্যন্ত বহুগুলি অলিম্পিক দল প্রেরণ করা হয়েছে তাহা অপেক্ষা এবারকার দলটি সর্বাধিক তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত। খেলোয়াড়দের বয়সের গড় ২৩ বছর। ভারতীয় দলের সর্বাপেক্ষা বয়স্ক খেলোয়াড় বাজালার কেল্পিয়া। তাঁর বর্তমান বয়স ২৭ বছর। আর সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ খেলোয়াড় অন্ধ প্রদেশের সেন্টার ফরওয়ার্ড হামিদ। তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর। অলিম্পিকে প্রাথমিক পর্যায়ের ইন্ডোনেশিয়ার বিরুদ্ধে জাকার্তা ও কলকাতায় যোগদানকারী খেলোয়াড় অন্ধের কালিম ও বাজালার রহমানের পরিবর্তে বাজালার অরুণ ঘোষ ও বোম্বাইয়ের ফ্রান্সোকে দলভুক্ত করা হয়েছে।

তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে অরুণ ঘোষের অন্তর্ভুক্তিকে সকলেই স্বাগত জানাবেন। কিন্তু বাজালার রহমান ও অন্ধের কালিম বাদ পড়ায় সকলেই বিস্ময় অনুভব করেন। দলীয় বাজনাতির কবলে তাঁরা পড়েছেন বলে অনেকেই অভিযোগ করছেন। তা না হলে বোম্বাইয়ের ফ্রান্সো ও অন্ধের হাকিমের দলে স্থান লাভের কি স্বার্থকতা আছে?

বাচা হটক' ভারতীয় খেলোয়াড়রা উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুক এটাই সকলে চান। নিয়ে ভারতীয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম দেওয়া হ'লো :—

গোল—মদ্রাজ (সার্ভিসেস) ও নারায়ণ (বোম্বাই)।

ব্যাংক—চন্দ্রশেখর (বোম্বাই), লতিক (বোম্বাই), ও অরুণ ঘোষ (বাজালা)। হাক—ফ্রান্সো (বোম্বাই), কেল্পিয়া (বাজালা), রামবাহাদুর (বাজালা) ও হাকিম (অন্ধ)।

টপার—আর্নেল সিং (বাজালা) ও ইউনুস খাঁ (অন্ধ)।

ফরওয়ার্ড—পি. কে. ব্যানার্জী (বাজালা) অধিনায়ক, চুনি মোঘলী (বাজালা), কামর

(বাজালা), বলরাম (বাজালা), সিমর মুন্দররাজ (মাদ্রাজ) দেবদাস (বোম্বাই) ও হামিদ (অন্ধ)।

১১তম খেলোয়াড়—ক্যাপ্টেন লাহিড়ী (সার্ভিসেস)।

টাণ্ডবাই—গোল—এস শেঠ (বাজালা)।

ব্যাংক—মাধবন (মহীশূর)।

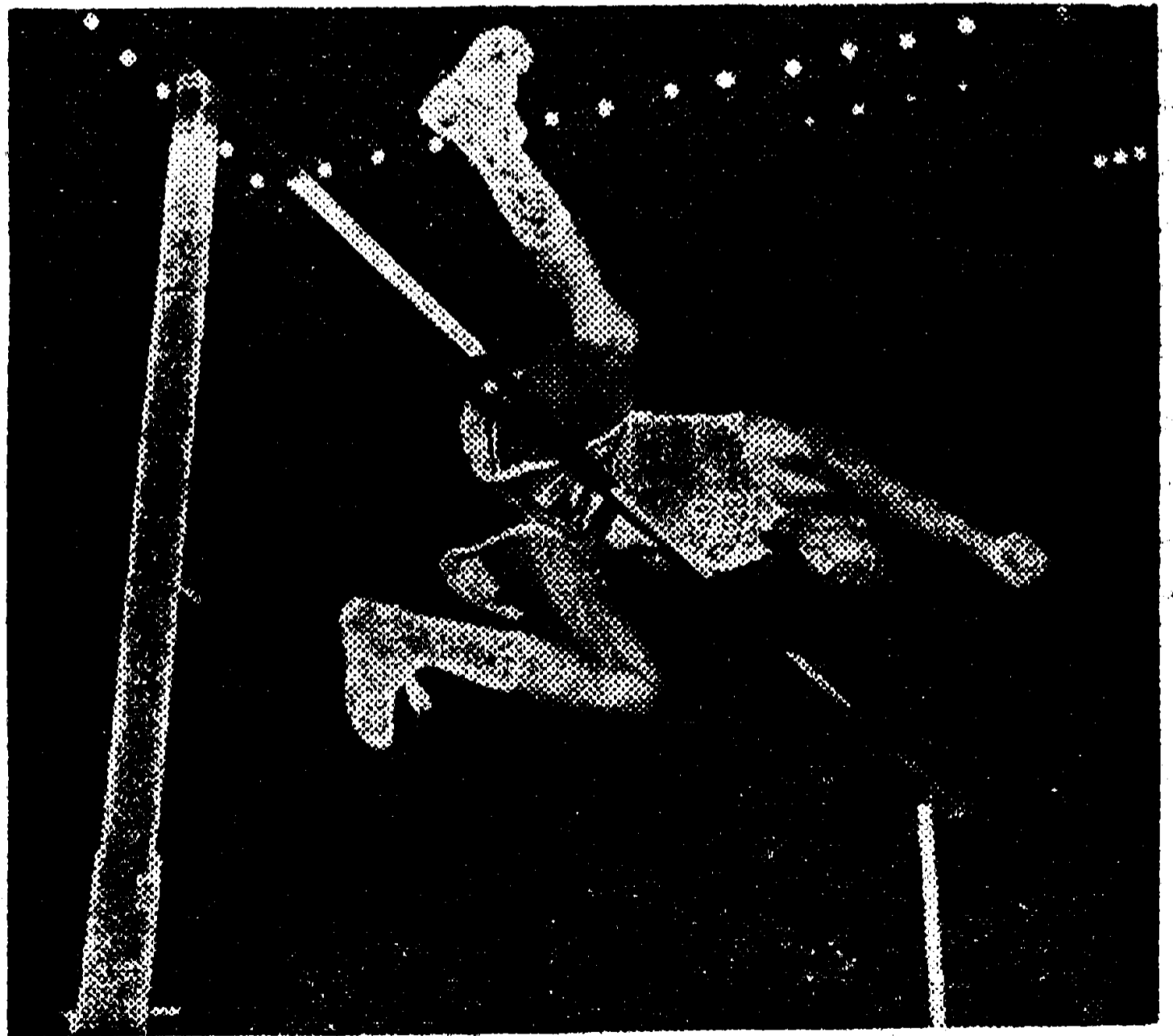
টপার—কালিম (অন্ধ)।

ফরওয়ার্ড—রহমানুল্লা (বাজালা) ও কানাইয়ান (বাজালা)।

আই, এফ, এ, শীল্ড প্রতিযোগিতা

ভারতের প্রাচীন ও অল্পতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা ২৪শে আগস্ট থেকে আরম্ভ হবে এবং সম্ভব হলে ২১শে সেপ্টেম্বর ফাইনাল খেলা হবে বলে স্থির হয়েছে। এ বছর আটটি বহিরাগত দল নিয়ে চৌত্রিশটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে।

আই, এফ, এ, শীল্ডে যোগদান একদিন ভারতের বিভিন্ন স্থানের দলগুলির একটা বড় আকর্ষণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে আই, এফ, এ, কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আটটির বেশী বহিরাগত দল বোম্বাই করতে পারেন নি। এই আটটি দলের মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি দল—মহীশূর একাদশ, টাটা স্পোর্টস ক্লাব ও ইণ্ডিয়ান নেভীর সর্বভারতীয় খ্যাতি আছে। আর বাকি পাঁচটি দল—ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্লাব, কটক সম্মিলিত দল, আহালা জেলা একাদশ, দিল্লী একাদশ ও পাটনা এথলেটিক এসোসিয়েশন এদের খুব বেশী খ্যাতি আছে বলে মনে হয় না। স্থানীয় দলের মধ্যে ছয়টি প্রিয়ান, পোর্ট কমিশনার্স, বাটা, ভবানীপুর, ক্যালকাটা ও জ্যালহোসী—এরা দ্বিতীয় বিভাগে খেলে। জেলা দলগুলির মধ্যে তিনটি দল—বঙ্গবান (বনবিহারী জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশন), হাওড়া ও ২৪ পবগণা আছে। এই দলগুলি বিশেষ শক্তিশালী তা বলা



চ্যাম্পিয়ান হাই-আম্পায়—বোর্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই-আম্পায় ১৮ বৎসর বয়স্ক জন টমাস। ইনি রোমে অলিম্পিক ক্রীড়ার যোগদান করছেন।

হলে না, দুতরাং আই, এক, এ, শীল্ড বিজয়ের চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবারও স্থানীয় দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

গত বছরের অসমাপ্ত আই, এক, এ শীল্ড কাইডালের দু'টি দল—মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলকে তালিকার দুই প্রান্তে রাখা হয়েছে। মোহনবাগানের দিকে তৃতীয় রাউণ্ডে রাখা হয়েছে লীগ "স্বাধীন আপ" মহামেডান স্পোর্টিং, মহেশ্বর রাজ্য একাদশ ও বোম্বাই টাটা স্পোর্টিং ক্লাব। এই চারটি দল বাই পেরে তৃতীয় রাউণ্ডে আছে। তালিকার অপর দিকে ইষ্টবেঙ্গল। ইণ্ডিয়ান নেভী ও ইষ্টার্ন রেলওয়ে দল আছে। এই তিনটি দলও তৃতীয় রাউণ্ডে প্রথম খেলবে।

আই, এক, এ, এ'র সম্পাদক জি এম, দত্তর খেলার ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রস্তুত সম্পর্কে বলেছেন যে "ব্যালট" প্রথমে ইহা করা হয়েছে। খেলার তালিকার মোহনবাগান ও মহামেডান দলকে একই দিকে দেওয়ার ফলে আই, এক, এ, সম্পাদক জি এম, দত্তর এক টুর্নামেন্ট কমিটির অনৈক সমস্তের ভেতর তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়েছে বলে প্রকাশ। "ব্যালট" প্রথমে গোপনীয়তা যে ছিলো না তা এই বাকবিতণ্ডা থেকে উপলব্ধি করা যায়। "ব্যালট" প্রথমেই যদি ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রস্তুত হয়ে থাকে—তা হ'লে কোম দল কোন দিকে থাকবে—এই নিয়ে মতবিরোধ কেন? ভারতের অন্ততম খ্রীষ্ট ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালনা ব্যাপারে এক সব কারসাজি করা হয়ে থাকে—যার ফলে আজ কোন নামকরা দল এই প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। বাহা ইউক, প্রতিযোগিতার পূর্বে ঐতিহ্য আবার কিরে আসুক—এটাই ক্রীড়ামোদী মাত্রই আশা করেন।

আর একবার টেডিয়াম প্রসঙ্গ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছেন যে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর কলকাতার ময়দানে টেডিয়ামের জমি আরও ১০ একর জমি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। পূর্বে তাঁরা ১৩ একর জমি দিয়েছিলেন। এই ১৩ একরের মধ্যে টেডিয়াম হবে। বাকিটার রাস্তাঘাট হবে ও গাড়ী রাখার ব্যবস্থা হবে। ডাঃ রায় আরও বলেছেন যে, রোমের যে স্থপতি টেডিয়ামের নকশাটি করবেন তার কমিশনের দের অর্ধের জমি ভারত সরকার বিনিময় সূত্রে ব্যবস্থা করতেও সম্মত হয়েছেন। এই টেডিয়াম করতে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এই টাকার শতকরা হ'ত্যাগ রোমের স্থপতিকে কমিশন হিসাবে দিতে হবে। তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর যে নকশা পাঠাবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা বিবেচনা করে তাঁকে জানাবেন।

ডাঃ রায় আশা প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে টেডিয়াম নির্মাণের কাজ আরম্ভ হবে এবং কাজ শেষ হতে আঠার মাস সময় লাগবে।

প্রকাশ যে, মোহনবাগান মাঠেও একটি টেডিয়ামের জমি নকশা প্রস্তুত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রোমের স্থপতিকে বলেছেন। ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই টেডিয়ামের পরিষ্কার করা হচ্ছে।

খবরগুলি বেশ সুখরোচক ও গালভরা। কলকাতার টেডিয়াম নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। বাঙ্গালা দেশের সব ব্যাপারই অন্ধুত! ভারত সরকারের বড় বড় উন্নয়ন কার্য হচ্ছে। এখানকার ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতিরাই সকল কার্য করছেন। বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রবাদ আছে—“হলে ধরতে পারে না—তো কেউটে ধরবার সখ” কলকাতার টেডিয়ামের নকশা করার মতন ভারত স্থপতি পাওয়া পেল না? তাই বহু অর্থ ব্যয় করে রোমের স্থপতিকে আমদানী করতে হ'লো? বাঙ্গালা দেশের সব কাজেই বাড়াবাড়ি। তা না হলে কলকাতার টেডিয়াম হলো না। ক্রিকেট টেডিয়ামের বাও বা সুরপাত হলো তাও “আধাখিচুড়ির” মতন রয়ে পেল। তবে হ্যাঁ, ক্রিকেট টেডিয়াম না হলেও কয়েক হাজার টাকা ব্যয়ে “ইলেকট্রিক স্কোরবোর্ড” তৈরী হয়েছে। তাছাড়া বাঙ্গালা দেশ।

মিলখা সিং-এর কৃতিত্ব

রোম অলিম্পিকে ভারতের একমাত্র ভারসাম্য খ্যাতিমানা দৌড়বীর মিলখা সিং অলিম্পিকের পূর্বে সম্প্রতি ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক এথলেটিক প্রতিযোগিতায় ৪০০ মিটার দৌড় ৪৫'৮ সেকেন্ডে অতিক্রম করে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি ফ্রান্সের আবডু সেই ও জ্যামাইকার বেল স্পেলকে পরাভূত করার যোগ্যতা লাভ করেন। আবডু সেই ৪৬'১ এবং মেল স্পেল ৪৭'৫ সেকেন্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মিলখা সিং গত সপ্তাহে গ্রাসপো রেজার্ভের এক প্রতিযোগিতায় ৪৬'৩ সেকেন্ডে ৪৪০ গজ অতিক্রম করে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এই প্রতিযোগিতায় মিলখা সিং 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তিন জন দৌড়বীরকে পরাভূত করেন।

মিলখা সিং-এর এই সাফল্যে ভারতবাসী মাত্রই আসন্ন রোম অলিম্পিকে তাঁর পারদর্শিতা সম্পর্কে আশাবাদী। মিলখা সিং ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুক, ইহাই সকলে আশা করেন।

... এ সময় প্রচুদপাট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে দু'টি আদিবাসী কিশোরীর আলোকচিত্র মুদ্রিত করা হইল। আলোকচিত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন শ্রী কবির খোদ।



লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে!

সুতরাং, লাইফবয় মেখে ঘান করতে কি আরাম! শরীরটা তাজা আর
স্বচ্ছ রাখতে লাইফবয় সাবানের তুলনা নেই। ঘরে বাইরে ধূলা ময়লা লাগবেই
লাগবে। লাইফবয় সাবানের চমৎকার কেনা ধূলা ময়লা রোগ বীজাণু
দূরে দেয় ও স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে। পরিবারের সবার স্বাস্থ্যের স্বপ্ন লাইফবয়ে।

দেশ- বিদেশ

শ্রাবণ, ১৩৬৭ (জুলাই—আগষ্ট, '৬০)

অন্তর্দেশীয় —

১লা শ্রাবণ (১৭ই জুলাই): আসামের উপক্রমত এলাকা সফরকালে গোঁহাটিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য—সাম্প্রতিক হাঙ্গামা ও গোলযোগ (বাঙালী-বিরোধ) আসামের পুন্যমে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে।

২রা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই): আসামের বিরুদ্ধে অর্ধনৈতিক অবরোধের দাবীতে জনসংঘের উত্তোগে সত্যাজিৎ—দমদম বিমান বাঁটিতে দশ জন সত্যাগ্রহী প্রেরণ।

৩রা শ্রাবণ (১৯শে জুলাই): ষষ্ঠঘটকারী দশ হাজার বাঙালী কর্মচারীর (কেন্দ্রীয় সরকার) উপর হাঁটাই-এর খড়গাঘাত।

৪ঠা শ্রাবণ (২০শে জুলাই): দাঙ্গা বিলম্ব আসাম রাজ্য সফরান্তে দিল্লী ফিরিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর কতোয়া—আসামের অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ, উদ্বাস্তরা ফিরিয়া যাইতে পারেন।

৫ই শ্রাবণ (২১শে জুলাই): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত—আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৩৩.৫ ও আই-এস-সিতে ৪৮.৭ জন উত্তীর্ণ।

৬ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই): ষষ্ঠঘটী কর্মচারীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাস্তিদানের ব্যবস্থা নির্ধারণ—বিভাগীয় প্রধানদের প্রতি আবশ্যিক কার্যক্রম গ্রহণের অধিকার প্রদান।

আসাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি. পি. চালাহার এক মাসের জঙ্গ ছুটি গ্রহণ—অর্ধসচিব মি: ফকরুদ্দীন আল আমেদের উপর মন্ত্রিসভার সর্বাধিক দায়িত্ব স্থল।

৭ই শ্রাবণ (২৩শে জুলাই): আসামের প্রায়াকলে বাঙালীদের হুঁহে লুটতরাজ, অত্যাচার ও অগ্নি-সংযোগ অব্যাহত।

৮ই শ্রাবণ (২৪শে জুলাই): "আসাম রাজ্যের বহু স্থলে এখনও ইক্ষিষ্ঠ আক্রমণ চলিতেছে"—দমদম বিমান বাঁটিতে সাংবাদিকদের নিকট আসাম রাজ্যপাস জেনারেল শ্রীনাগেশের স্বীকৃতি।

৯ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই): কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর-সমূহে নীতি ও দৌরাণ্ডার রাজত্ব—ষষ্ঠঘটী বোঙ্গানকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অফিসারগণ কর্তৃক লঙ্ক বিশেষ ক্ষমতার অপব্যবহার।

১০ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই): আসাম হইতে বাঙালী ইতাউলের কলে পশ্চিমবঙ্গে অটিল সমস্তার উত্ত্ব—সমস্তা সমাধানে রাজ্য সরকারের সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রত্যাশা।

১১ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই): আসামে বাঙালীদের উপর

নারকীয় অত্যাচার অব্যাহত—তিনপক্ষিয়ার পরিহিত ধারিকী
মারপিট, লুটতরাজ ও গৃহদাহের সংবাদ।

১২ই শ্রাবণ (২৮শে জুলাই): আসামে বাঙালী নিধন-হত্নে প্রধান উত্তোক্তা আসামের প্রজাসভাজন্তনী দল—সর্ব ভারতীয় স্বাস্থ্য-বাধীনতা সংঘের সভাপতি শ্রী এম. সি. চ্যাটার্জীর নিকট লিখিত পত্রে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

১৩ই শ্রাবণ (২৯শে জুলাই): আসামের পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের আলোচনা।

আসামের গৃহহারাের জঙ্গ অবিলম্বে পুনর্কারণ দাবী—'বঙ্গদেব' আলোকন প্রসঙ্গে দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব।

মোহনবাগান দল কর্তৃক নবমবার প্রথম ডিভিশন ক্রীড়াঙ্গল গীর্ণ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন।

১৪ই শ্রাবণ (৩০শে জুলাই): স্বতন্ত্র নাগা অঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি—দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত নাগা নেতৃবৃন্দের আলোচনার জের।

১৫ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই): কুচবিহারের (পশ্চিমবঙ্গ) গণে আসামের হত সর্ব্ব শত শত উদ্বাস্তর মিছিল—পড়িত ৪০ হাজার বাঙালী যেল কর্মচারীর আসাম হইতে বঙ্গালী আবেদন।

১৬ই শ্রাবণ (১লা আগষ্ট): লোকসভার আসাম সম্পর্কিত হুলস্থূলী প্রস্তাব উত্থাপনের দাবী স্পীকার শ্রীজনশরণনম আবেদার কর্তৃক নাকচ।

১৭ই শ্রাবণ (২রা আগষ্ট): কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বেতন কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি গ্রহণের সিদ্ধান্ত—লোকসভার অর্ধসচিব শ্রীমোরারজী দেশাইর ঘোষণা।

১৮ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট): "এ বাবৎ আসাম হইতে বিতাড়িত ১৩ সহস্রাধিক বাঙালী উদ্বাস্ত নরনারীর পশ্চিমবঙ্গে আগমন"—রাইটাস বিজিৎস-এ সাংবাদিকদের নিকট পশ্চিমবঙ্গের খাত ও ত্রাণ সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্তৃক তথ্য প্রকাশ।

১৯শে শ্রাবণ (৪ঠা আগষ্ট): কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন কলেজে ছাত্র-ষষ্ঠঘট—ছাত্র ভক্তি ও প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা সমস্তা সমাধানের কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি।

২০শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট): কলিকাতা ও কালিম্পাং-এর দশজন চীনার প্রতি এক মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগের নির্দেশ—চীনের (কমিউনিষ্ট) পক্ষে ভারতে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ।

২১শে শ্রাবণ (৬ই আগষ্ট): আসাম সফরান্তে কলিকাতার ভারতীয় জনসংঘের সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের বিবৃতি—তিন দিন আসাম উপত্যকায় সরকারের আঁত্ব ছিল না।

২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট): শিলং-এ বাঙালী আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে কেন্দ্রীয় আইন-সচিব শ্রীঅশোক সেনের অপরূক ঘোষণা—'পশ্চিমবঙ্গে বাইতে চাহিলে কোন সাহায্য করিব না।'

আসামী বর্ধরতার প্রতীকার না করার সরকারের বিরুদ্ধে বঙ্গকট আলোকন—আসাম দিবসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অহুস্তিত বিরাট সম্মেলনে দৃঢ় সঙ্গর অভিভ্যক্ত।

২৩শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট): অত্যাধিকারী সংহার ষষ্ঠঘট মিবিদ্ধ ঘোষণার ব্যবস্থা—লোকসভার খরাষ্ট সচিব পণ্ডিত মোকিব্বরত পদ্ কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রধান সন্নীল স্বরূপ

বিপ্লবিত অওহরলাল মেহতা আসামের ব্যাপারে—অপর্যায়ী
আসাম সরকারের, আসাম প্রদেশ সংসদে ও
উপসভাকারী অসমীয়াগণের অপর্যায়ী উল্লেখ্য উক্ত তাঁহার সকল
কর্তব্যে ও পরোক্ষভাবে প্রবৃত্তি দেখা যাইতে পারে। তিনি বলিতেছেন,
আসামের অবস্থা আত্মবিক। স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রপতির নামের প্রবর্তনের
কোন কথা উঠিতে পারে না। প্রথম কথা—বে সন্থে লোক
তথ্য রাষ্ট্রপতির নাম চাহিয়াছিলেন, তখন অবস্থা কিরূপ ছিল।
তখন কেন সে বিবরণ অবজ্ঞাত হইয়াছিল? হুজুর্গারীদিগকে
সমর্থন করাই কি তাহা করা হয় নাই? দ্বিতীয় কথা—অওহরলাল
আসাম হইতে কিরূপা বাইরাই যে বলিয়াছিলেন, তথ্য অবস্থা
আত্মবিক, তাহা কি নির্জলা মিথ্যা মছে? সেইদিন হইতে আজ
পর্যন্ত কতগুলি দ্বন্দ্ব অত্যাচার অহুস্তিত হইয়াছে, তাহা কি তিনি
জানেন না? আর মিজো জেলায় মিষ্টার লালমাওরালা,
(আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য) ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীমতী
জ্যোৎস্না চক ও শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দেব গত ১০ই আগষ্ট শিলচরে
উদ্বাস্তশিবির পরিদর্শন করিয়া আসিবার পরে মিষ্টার লালমাওরালা
বলিয়াছেন—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আত্মবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়
মাই—প্রমাণ, শিলচর উদ্বাস্ত শিবিরে আগতদিগের সংখ্যা দিন
দিন বর্ধিত হইতেছে। গত ১০ই তারিখে তাহাদিগের সংখ্যা
ছিল (১৫টি শিবিরে)—৪ হাজার ৩ শত ৪১জন। উদ্বাস্তরা
কোন কোন অত্যাচারীর নামোল্লেখও করিয়াছেন। তাহাদিগের
মনে এখনও আতঙ্ক। তাহারা যে সকল অত্যাচারীর নামোল্লেখ
করিয়াছেন—তাহাদিগকে দণ্ডদানের কোন ব্যবস্থাই আসাম সরকার
করেন নাই। বতদিন তাহারা দণ্ডিত না হয়, ততদিন লোক
কিরূপে অওহরলাল কোম্পানীর নির্কিরতার কথায় বিশ্বাস
স্থাপন করিতে পারে? —দৈনিক বনুমতী।

কর্তব্যে উপেক্ষা

‘পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই খণ্ডের ব্যাপারে’ পরমুখাপেক্ষী। এই
পরমুখাপেক্ষিতার জন্ত পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণকে যে কেবল
উচ্চমূল্য দিয়া ধান-কাঁকর ইত্যাদি মিশ্রিত চাউল কিনিয়া খাইতে
হইতেছে তাহাই নহে, এজন্য বৎসর-বৎসর পশ্চিমবঙ্গ হইতে ৩০।৪০
কোটি টাকা উড়িয়া, অন্ন ইত্যাদি অঞ্চলে এবং কেন্দ্রীয় পূর্বদেশের
হাতে চলিয়া বাইতেছে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গে বাহ্যতে অধিকতর
পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের যে সব অঞ্চলে
খাদ্যশস্যের চাব হয় সেই সব অঞ্চলে বাহ্যতে বস্তার জন্ত কসলের
ক্ষতি না হয় তাহা দেখা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু
এই শেখোক্ত ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বরাবরই পাকিস্তান
সেখাইয়া আসিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের

খাদ্যশস্যের একটি উৎসবিন্দু। কিন্তু এই অঞ্চলে সীমা ছাড়া
হইতে জমির কসল ও জমির উর্বরতা বক্ষার জন্ত যে ছই হাজার
মাইলের উপর খাঁধ বহিয়াছে, তাহার বখাবধ সরকারের ব্যাপারে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার বরাবরই উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন।
অথচ ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর-কলিকাতার লবণ হ্রদ সংস্কার
কর্ত্ত তাঁহাদের উৎসাহের অস্ত নাই। সুন্দরবন অঞ্চল এইভাবে
উপেক্ষিত হইবার ফলে প্রত্যেক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনীয়
খাদ্যশস্যের যে কত হানি হইতেছে এবং নোনা জল প্রবেশের ফলে
প্রত্যেক বৎসর কত অধিক যে ছই-তিন বৎসরের জন্ত চাষের অযোগ্য
হইয়া পড়িতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। —সাময়িকের বন্ধিকা।

আসামের ছাত্রসমাজ

‘কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ’ ও সজ্ঞার কথা, অসমীয়া ছাত্র সমাজের
বৃহত্তম অংশ এই সব দুঃখ ভেঁতত ও সরা মানবতায় দাবী হইতে
বহু দুঃ অস্বকারে বহিয়াছে। এমন কি তাদের অধিকাংশই আজও
মধ্যমীর কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং অতি সর্পিণ প্রাদেশিকতা ও জাতি
বিদ্বেষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। যেখানে কলেজ ও
ইউনিভার্সিটির ছাত্রবৃন্দ এবং তথাকথিত দিকিত যুবকেরা, এমন
কি অধ্যাপকেরা পর্যন্ত অতি নিকৃষ্ট স্তরের প্রতিক্রিয়াশীলতার
বন্ধুতে আবদ্ধ, সেখানে সামাজিক মনস্তত্ত্ব কিতাবে প্রগতিবাদের
আদর্শকে গ্রহণ করিবে? এ জন্ত দেখা যায় আসামে সত্যকার
কোন প্রগতিশীল আন্দোলন নাই—যেটুকু আছে তাহাও অধিকাংশ
ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে আবদ্ধ। ফলে আসামে বামপন্থী
মতবাদ ও আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল। ‘আসাম একমাত্র অসমীয়ারদের
জন্ত’ এই অদ্বিত মনোভাব বাহারা বহন করে, তাহা কিতাবে
ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত থাকিতে পারে এবং কি ভাবেই বা সর্বভারতীয়
সাহায্যে ও অর্থে আসামকে গড়িয়া তোলার (যেমন, ব্রহ্মপুত্রের
উপর ব্রীজ নির্মাণ, তৈল শোধনাগার স্থাপন ইত্যাদি) দাবী করিতে
পারে? কিম্বা, আসামের বাহিরে কলিকাতার ও অত্র আসামে
ছাত্রেরা কি ভাবেই বা পড়াশুনা চালাইবার কথা ভাবিতে পারে
একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আসাম ভারতীয় ইউনিয়নের একা
অঙ্গ রাজ্য এবং এখানে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের বসবাসে
জীবিকার্জনের ও লেখাপড়া শিখিবার আইনসমস্ত অধিকার আছে—
যেমন আছে অসমীয়ারদের পশ্চিমবঙ্গে ও অত্র সমান অধিকার
ইহা ভারতীয় সংবিধানে আইনের দ্বারা গ্যারেন্টিকৃত। কি
অসমীয়া ছাত্রসমাজের একটি বৃহৎ অংশ সমস্ত আইনকাহীন
নীতি ও আদর্শকে অলাঞ্জলি দিয়া মধ্যমীর মনোবৃত্তির বহুৎসং
স্বাভিয়ারছে। তাদের এই মানসিক বিপর্ধর সারা অসমীয়া সমাজে
উপর কি ভয়ানক বিবক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছে এবং ভবিষ্যৎ আসামে
নীতিভ্রষ্ট ও চরিত্রভ্রষ্ট করিয়া একটা আরণ্যক ভূমিতে পরিণ
করিতে চলিয়াছে—এই সমাজ-মনস্তত্ত্ব কোন চিন্তাশীল অসমীয়া
কি মনে হইতেছে না? বাঙ্গালীকে মারিয়া জাতি বিদ্বেষে
ভূপ্তি হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা আসামের মনুষ্যত্বকে যে হত
করা হইতেছে, একথা কি ছাত্র ও যুব সমাজের একবারও মনে
না? অথচ কলিকাতার আমরা বিপরীত দৃষ্ট দেখিতেছি—
এখানকার ছাত্র সমাজের গণতান্ত্রিক চেতনা ও প্রগতিশীল আদর্শ
সমস্ত সর্পিণতা, প্রাদেশিকতা ও সার্বভারতীয়তার উর্ধ্ব উঠিয়া

ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে যতদূর আশা কখন করিয়া আনিতেছে।
 আর আসামে—যেখানে ছাত্রেরা বীভৎসতার রপরূপে যাকিরাছে।
 বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে ডাঙা ও ছোরা হাতে ভাঙা করিয়াছে।
 যাবপিট, ধন, অর্থ, গৃহনাশ ও নারী ধর্ষণ—অসমীয়া ছাত্রদের
 (অসমত: একাংশের) বিরুদ্ধে ইহাই হইতেছে অভিযোগ।”

—সুশাস্ত্র।

বাক্যবাণীশ নেহেরু

“এই বাক্যবাণীশ জাতিরা হাখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালিকা
 শিল্পের উন্নতি স্বাধীনতা শিবসের অন্তর্ভুক্ত বহু হইবেন মাই—
 বাণীশব্রাহ্ম কলিকট পোর্ট ও অন্যান্য কয়েকটি বাণীশব্রাহ্মী কলের
 অন্তর্ভুক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের সমাজের আঁচ করিয়া।
 কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী আসামে জাতিরা হাখন, আসামে রাজ্যকারী
 কংগ্রেসী কলের দ্বারা ভারতীয় ঐক্য বন্ধটা বন্ধা পাঠবে তাহা হাখন
 বৃদ্ধিতে শুরু করিয়াছে। স্বাধীনতা ও ভারতীয় ঐক্য বন্ধা বন্ধা
 শক্তি এবং অধিকার ভারতেরই হাখারা জাতিবৃত্তাকারীদের প্রকৃত
 অঙ্গসঙ্গান চায়। শ্রীমতের দীর্ঘ বক্তৃতার এক বড় নিষ্ঠুর ঘটনা
 সম্পর্কে তদন্তের আশাস পর্বন্ত মাই। শুধু কি তাই? এই মনীর
 স্বার্থের বন্ধক বলিতেছেন, আসামে আইন-শৃঙ্খলা কখনো জাতিরা
 পড়ে নাই। কাজেই কেন্দ্রের কিছুই করিবার মাই। এই অতিবিভ্র
 রাজনীতিক আইন-শৃঙ্খলা উল্লেখ করিতে কি বোঝেন আমরা জানি না।
 যে কোনো ভারতীয় নাগরিক এটুকু জানেন যে, কংগ্রেস রচিত
 সংবিধানেও ভারতের যে কোনো নাগরিকের এই দেশের যুঁবে কোনো
 জায়গার নিরাপদে চলাফেরা এবং বাস করার অধিকার আছে। সেই
 অধিকার যখন অন্তর্হিত হয়, হাখন যখন প্রাণের দ্বারে ভিটামাটি
 ছাড়িতে শুরু করে, যখন প্রতি মুহূর্তে শারীরিক নিরাপত্তার উল্ল
 শঙ্কিত থাকে, তখনও আইন-শৃঙ্খলা ভাঙে না? আমরা বলি
 শ্রীমতের নিজেদের সংবিধানটিকে আঁতড়াতে ফেলিয়া দিয়া ভারতের
 আইন-শৃঙ্খলার ব্যাধা করন।”

—স্বাধীনতা।

কর্পোরেশনের কাউন্সিলার

“কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের আবার ভাঙা দেওয়ার প্রস্তাব
 হইয়াছে। এই প্রস্তাব সার্বিক হইবে যদি ভাঙা দিয়াও ভাঙা এবং
 ২০ লোক কর্পোরেশনে আনি যায়। নলকূপ কেলেকারি এবং কলের
 মেইন পাইপ বসানোর ঘটনার দেখা গিয়াছে বহু সততাভিত্তিক
 বেকার এবং অর্ধবেকার কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইয়া আসিয়া
 হুকিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইহাদের মধ্যে বামপন্থী বেশী।
 একবার দুর্ভাগ্য ঘটা পড়িবার পরেও ইহারা পুনরায় পার্টি মনোনয়ন
 লাভ করিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ পার্টির বেতনভুক কর্মী।
 সম্প্রতি শচীন সেন নামক এক কমিউনিষ্ট কাউন্সিলার কংগ্রেসী
 প্রার্থীকে কমিটির ভেপুটি চেয়ারমান পদে সমর্থন করার বিশ্বাসের
 সকার হয়। ইহাতে বিশ্বাসের কিছুই নাই। ইহার পকেট বেঁধিয়া
 গাভানো এই ব্যক্তির একটি বিশেষত্ব। পকেটে ইনি কর্পোরেশনের
 হুলে ঢুকাইয়াছেন, বাড়ীর কাছের একটি খুল চইতে এক শিকিকাকে
 অন্ত্র বদলী কবাইয়া পকেটে সেখানে আনিয়াছেন। কংগ্রেসী
 সহযোগিতা ছাড়া এসব কাজ সম্ভবও নয়। ইহাকে দিয়া কাজ
 পাইতে খুব অনায়াস হয় না, ট্যাক্সি চলাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেই

যথেষ্ট। এই শ্রেণীর লোক বর্তমান কাউন্সিলার থাকিলে ততক্ষণ
 সতরের কোন উন্নতি চইতে পারে না, ইহা পার্টিমেতা এক ভেটী-
 হাওয়ার বর্তমান মা বৃদ্ধি এবং ইহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ মা
 করিবেন ততক্ষণ কলিকাতার ভবিষ্যৎ অধিকারই থাকিলে। ভাঙাও
 অপচয়েই চইবে, কোন লাভ চইবে না। এই ভারতীয় অধিকার
 প্রতিবাদ কংগ্রেস কর্মীরা করিতে আবেদন করিয়াছেন, কলিকট
 কর্মীরা সঙ্গী হইবেন তবে?”

—সুশাস্ত্র (কলিকাতা)।

খামার ঘরেও জল পড়ে

“এতদিন কেবল কলিকট হাখনেই ‘ঘরের ভালে খড় মাই—জল
 পড়ে’—এই ধরনের কথা বলিতে শুনা যাউত। এখন কলিকটেই—
 বীরভূমের পুলিশ বিভাগের ঘরেও ‘ঘরে খড় মাই—জল পড়ে’।
 মহানন্দবাজার খামার ঘরের চাউনী মাই, বর্ষায় ভালে খড় ভিত্তি
 যার। ইহাট আমাদের মহানন্দবাজার খামার বর্ধমান চিত্র। শুধু
 তাহাই নহে, সরকারের বহু বিখ্যাত ‘প্রায়-সভর’ পোর্টালমসং—
 যেখানে আর্থনিক যুগের সুরোগ সুরিধার কমিটি মাই অর্থাৎ কোম,
 বিজলী বাস্তি সবট হইয়াছে কিন্তু এই সব সুরিধার সভরভ্রা সুরোগ
 থাকে সাত্তও উল্ল খামারি এখনও উল্লিখ শক্তের সেট অধিকার
 যুগেই লুপ্তের আলোকে হাট-হাট পা-পা করিতেছে। এই সম্পর্কে
 পুলিশবর্তীরা দুটি আকৃষ্ট কলিকট দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও ইহার কোন
 ব্যবস্থা হয় নাই না এই অব্যবস্থার প্রতিবাদ হয় নাই। জেলার
 পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে অবহিত হইবেন—ইহাট সকলে আশা
 করে।”

—বীরভূমবাসী।

বাঙালী জাগো

“ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য যে বাংলার নব-নারী
 হাসিমুখে বিদেশী শাসকদের নির্ধম অত্যাচার সহ্য করিয়াছে,
 নির্ব্বিচারে জীবন দিয়াছে, অন্নান বদনে কাঁসির মাঝে যুক্তিয়াছে
 সেই বাংলাকেই বলি দিয়া যখন স্বীকৃত হইল ভারতের স্বাধীনতা
 তখনই স্মৃতি হইয়াছিল বাংলার ভাগ্যাকাশে দুঃখ দুর্দশার এই
 চর্চোণ। স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজনে বাংলার যে অংশকে বিসর্জন
 দিতে হইয়াছিল তাহার হিন্দু অধিবাসিগণ যখন অত্যাচারিত হইয়া
 দলে দলে বাংলার আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল তখন বাংলার দেখা
 দিল খাড়াভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব, বৃদ্ধি পাইল
 বেকার সমস্যা, দেখা দিল বাসস্থানের সঙ্কট। বাংলা নির্ভীক ভাবে
 এই সকল সমস্যা সমাধানের দাবী করিয়াছে ভারত সরকারের কাছে।
 ইহা যেন বাংলার উপর অশ্রান্ত প্রদেশের বহুবালের পুঞ্জীভূত ঈর্ষা
 ও ক্রোধে ইচ্ছন সংযোগ করিয়াছে। সেই কারণেই বোধ হয়
 কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃপক্ষ একযোগে চিবতরে বাঙ্গালীর দুঃখ বন্ধ
 করার সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে। প্রোক-স্বাধীনতা যুগে বাংলার কৃষ্টি
 ও শিল্প, বাঙ্গালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ত্যাগ ও
 আতিথেয়তা, দেশাত্মবোধ ও বীর্য অশ্রান্ত সকল প্রদেশের নিকট
 ঈর্ষার বহু ছিল। চাকরীর ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর আধিপত্য অল্প
 প্রদেশের জনগণের অন্তরে ক্রোধের উল্লেক করিয়াছিল। বাংলার
 ক্রোধ ও বিদ্বেষ দাবিকেরা আজ অন্তর্হিত, বাংলার দেহের আঁচ

হর্বস ; তাই সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক চাপের ঝাঁকসে বাঙ্গালীকে নিশ্চেষ্ট করিবার সুযোগ মিলিয়াছে। বাংলার ক্ষয় ক্ষয়ে বাহারা পুষ্ট, বাংলার শিকা সংকুতির আওতার বাহারা মানুষ আজ তাহারা ই বাংলাকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর। অথচ বাঙ্গালী কোনদিন ঐতিহাসিকতার প্রভাব ভেন নাই। বাংলার কলকারখানার অব্যবস্থার নিয়োগ, বাংলার ব্যবসায়িক অব্যবস্থার আধিপত্য বাঙ্গালীর উন্নতির মন্ত্রাভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালীরা জাতের পর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপ এবং বাংলার প্রতি বিন্যাসহীন ব্যবহার বাঙ্গালীর বিঘ্নচক্ষু আজ খুলিয়া দিয়াছে।

—বঙ্গবন্ধু ভারত (চক বাজার, হুগলী)।

শোক-সংবাদ

আচার্য ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

বাঙালীর নারী-জাগরণের অন্ততমা পুরোধা, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের একমিষ্ট সাধিকা সংস্কৃতির ইতিহাসের এক নব অধ্যায়ের সচিবত্রী, রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং পান্ডিত্য-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য (অধ্যায়ী) পঞ্চম শ্রদ্ধাঙ্গণা আচার্য ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার গত ২৭-এ শ্রাবণ অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সৌরভময় জীবনের অবসান ঘটেছে। জ্ঞানের ও প্রজ্ঞার আলোয় সারা ভারতকে ধারা আলোকিত করে তুললেন, পবিত্র ভারতভূমিতে ধারা জাগরণের মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন জাতীয় সজ্জাতার ইতিহাসে ধারা নতুন ঐতিহ্যের ধারা সৃষ্টি করলেন ইন্দিরা দেবী সেই বিশ্বপূজ্য ঠাকুর পরিবারের সার্থকনায়নী দুহিতা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুবোগ্যতমা ভ্রাতৃপত্নী ইন্দিরা দেবী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২১-এ ডিসেম্বর বিজ্ঞাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ইনি কিছুকাল বিলেতে অতিবাহিত করেন। ছাত্রীজীবনে বি, এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করার অল্পে বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে পদ্মাবতী পদক দ্বারা উৎসাহিত করেন (১৮৯১)। ১৮৯১ সালে দিকপাল সাহিত্য-অষ্টা, স্বর্গীয় প্রমথনাথ চৌধুরীর (বীরবল) সঙ্গে ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য সাংগর্ভ প্রবন্ধাদি রচনা করে দেশের সাহিত্য সম্পদের মূল্য ইনি বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন। ইন্দিরা দেবীর সাহিত্য সাধনা ও সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যয়ন সংস্কৃতির এই দুটি বিভাগকে বহুলাংশে পুষ্ট করেছে। ফরাসীভাষার ও বিভিন্ন বাস্তবজ্ঞে তাঁর বখেট দখল ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভূবনমোহিনী পদক দিয়ে সম্মানিতা করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানস্বরূপ দেশিকোত্তমা (ডি লিট) উপাধি প্রদান করেন। রবীন্দ্রভারতী এঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করে এঁর প্রতি প্রবন্ধ-নিবেদন করেন। ইন্দিরা দেবীর অসামান্য লেখনী থেকে যে সকল গ্রন্থ জন্ম নিয়েছে তাদের নাম, নারীর উক্তি, বাংলার স্ত্রী আচার, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগম, পুরাতনী, হিন্দুসঙ্গীত, প্রথম চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্র স্মৃতি।

অগণীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষেণ্য বৈদ্যিক সুপ্রবীণ জ্ঞানতপস্বী বাঙালী ব্যাতিসম্পন্ন লক্ষ্যশিষ্ট শিকারতী পণ্ডিতপ্রবর অগণীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গত ১১শে শ্রাবণ ৮১ বছর বয়সে জীবনাবসান হয়েছে। সংস্কৃতির পীঠস্থান পুণ্ড্রভূমি বাঙ্গা ও কেম্ব্রিজে ইনি শিক্ষার্জন করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে এক-এ, পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ হন। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপকরূপে ইনি বখেট প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশ্মীরী মৈত্রৈয়ম, বেদিক ডি অফ বি স্যান স্মাও ডি ইউনিভার্স প্রমুখ গ্রন্থগুলি তাঁর সুধীসম্মান অসামান্য পাণ্ডিত্যের নিদর্শনস্বরূপ। কলকাতার ভূতপূর্ব মে জ্ঞানবেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী তাঁর একমাত্র কন্যা।

ভেঙ্কেশচন্দ্র সেন

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিশিষ্ট শিকারতী ভেঙ্কেশচন্দ্র সেন শান্তিনিকেতনে ৭ই শ্রাবণ ৩৭ বছর বয়সে শেখ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১১০১ সালে ইনি এখানে বোগদান করেন এ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। ভেঙ্কেশচন্দ্রের মৃত্যুতে বিশ্বভারতী একজন অভিশু দয়দী ও নিষ্ঠাবান অধ্যাপককে হারাল। অধ্যাপক হিসেবে ছাত্রমহলে ভেঙ্কেশচন্দ্র অশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন।

ডাঃ সুধীর বসু

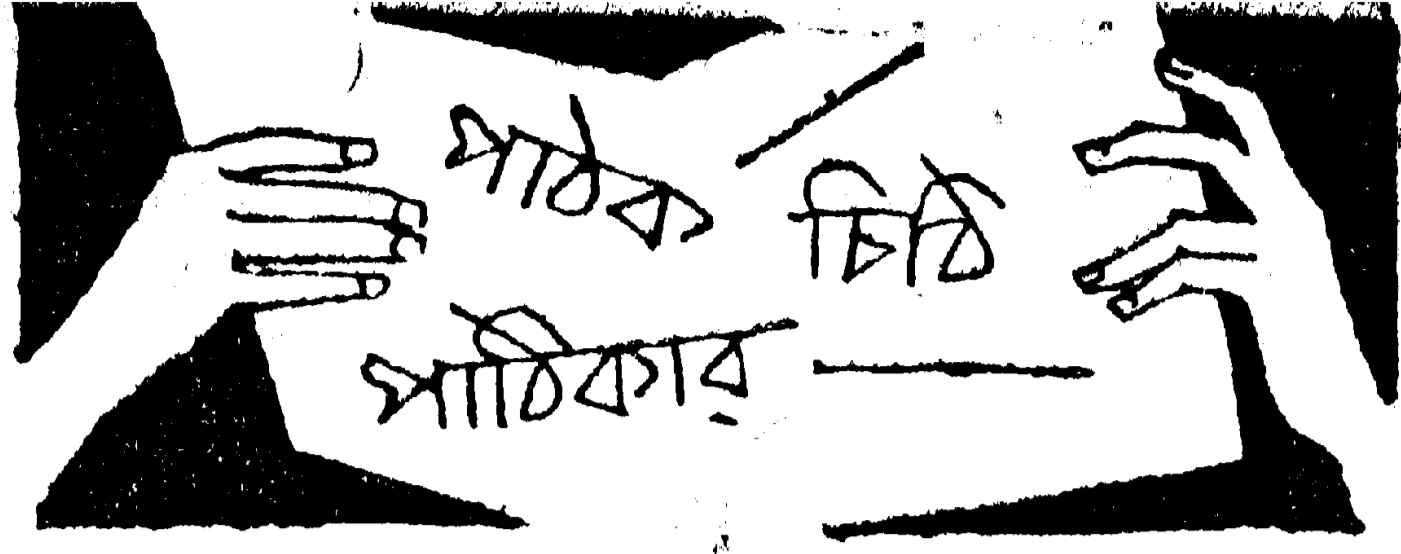
বিখ্যাত দ্বীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ সুধীর বসু, গত ১৭ই শ্রাবণ ৫১ বছর বয়সে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। ১৯২৮ সালে ইনি মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং গুডিভ পুরস্কার লাভ করেন ১৯৪৭ সালে ঐ কলেজেই ইনি অধ্যাপকরূপে বোগ দেন। গ ১লা জুলাই ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে ইনি অবসরগ্রহণ করেছেন। মৃত্যুকালে ইনি ইডেন হাসপাতালে অধ্যক্ষের আসনে সমাসীন ছিলেন। ডাঃ বসু রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস এং রয়্যাল কলেজ অফ অবর্টো ট্রিক্স স্মাও গিনেকোলজীর সদ ছিলেন।

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রখ্যাত শিল্পপতি এবং কলকাতার স্বাধিকারী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১০ই শ্রাবণ মাত্র ৪২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ইনি স্বর্গত রায়বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। বাণিজ্যমহলে ইনি বখেট প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। এঁর আকস্মিক এবং অকালমৃত্যুতে বাংলার বাণিজ্য জগত বহুল পরিমাণে কতিগ্রস্ত হল।

সম্পাদক—ঐপ্রাপতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৩৬ বাং বিপিনবিহারী সাকুলী ষ্ট্রট, "বঙ্গবন্ধু রোটারী বেসিনে" স্বীকারকরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



সমালোচনা

— মহাশয়, আমি 'মাসিক বনুমতী'র একজন নিয়মিত প্রাচীণ।
 পনার ঠিকঠা সংখ্যায় প্রকাশিত গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের "চলার
 পথে" শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনী সখকে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করতে ইচ্ছা
 রি। খ্রীযুক্ত দে মণিপুত্রী অতিথি সংকারেণ ও মণিপুত্রী কুমারীর
 ভারত উদ্ভাবনের যে অদ্ভুত ও অবাস্তব বিবরণ দিয়েছেন, আমি
 কজন মণিপুত্রী কুমারী হয়ে তার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানাই ও লেখককে
 বিলম্বে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করি। পর্ষটক
 হাশয় নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে নিজেরই চরম অজ্ঞতার
 পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই হাত্তকর। আপনারা তো জানেন,
 বিস্তার এই পূর্বপ্রান্তের অধিবাসী ধর্মপ্রাণ বৈক্যব হিন্দু। তার
 মাঝে মদ কেন, মাংসেয়ও প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অস্ত
 গলের গতির সঙ্গে ভাল রাখতে গিয়ে যদি সহরের কোন কোন
 বিবেচক যুবক গোপনে মদ ব্যবহার করে থাকেন খ্রীযুক্ত দে
 জানমতেই তাকে সমাজের নিয়ম বলতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ,
 মণিপুত্রী সমাজ বিশেষতঃ পল্লীসমাজ কেবল সংযমী ও আচারশীল
 র বক্ষণশীলও বটে। কুমারীকৃত্যের পরপুরুষের সহিত অবাধ
 মলামলা নিন্দনীয় বলে গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ভাষাভাষীর
 যো থেকেও মণিপুত্রী সমাজে আজো বাইরের বস্ত প্রবেশ করতে
 পারেনি তেমনি খুব কম মণিপুত্রী কুমারীই নিজের সমাজ ত্যাগ
 করেছেন। এ অবস্থায় কিছুতেই কোন মেয়ে বাইরের কোন
 পুরুষের সঙ্গে এমন কদর্য সখ স্থাপন করতে পারেন না। আমি
 ঠিকের সঙ্গে জানাতে চাই যে, নিজের রীতি-নীতি সংস্কৃতি ও আচার-
 ব্যবহার মধ্য দিয়ে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তের মাহুয় শতাব্দীর এক
 উন্নত ও নিজের সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন যে সভ্যতার রূপ দেখে
 ইংরেজ লেখক T. C. Hodson ও Fanton Bowers আজ
 থেকে প্রায় দেড়শত বৎসর আগে বলেছিলেন An Oasis of
 Civilisation কিন্তু লেখকের হাত্তকর অভিজ্ঞতা পড়ে মনে হলো
 যেন এক হাজার বৎসর আগেকার আফ্রিকার গভীর জংগলের
 ইপকথা শুনিছি। লেখক মণিপুত্রী নারীর চরিত্র এঁকেছে উচ্ছ্বল
 বহুগামী রূপে। কিন্তু লেখককে দৃঢ়কণ্ঠে জানাচ্ছি মণিপুত্রী নারী
 সকল ধর্মপ্রাণা হিন্দুনারীর মতোই একনিষ্ঠ পূজারিণী। লেখককে
 আহ্বান জানাই তিনি মণিপুত্রী পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে দেখুন মণিপুত্রী
 নারীর পাতিভ্রম্যের উচ্ছল ইতিহাসের সাক্ষীরূপে আজও যেখানে
 বহু নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। সঠিক অভিজ্ঞতা লাভ করুন মণিপুত্রী
 রীতির সখকে। লেখক মণিপুত্রী পুরুষের যে পোষাকে বর্ণনা
 দিয়েছেন তাহাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাধারণতঃ যুতি পাঞ্জাবীই
 মণিপুত্রী পুরুষের পরিধেয়। উৎসব বিশেষে উকীলও ব্যবহৃত হতে
 দেখা যায়। তাছাড়া হস্তাক্ষর সাথে আমাদের পরিচয় সেই। আর

দীর্ঘবৎসর খাসিয়া পরিবেশে শিলং সহরে কাটিয়েছি লেখককে এও
 জানাতে চাই খাসিয়া বর্মণীর পোষাক সখকে যে অভব্য মন্তব্য
 করেছেন তাও সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। সর্বশেষে লেখকের ভৌগোলিক
 জ্ঞানের যে নিতান্ত অভাব বোয়ার বস্তের অবস্থিতি নির্ণয়ে তার
 আভাস মেলে। বোয়ার বন বলে কোন জায়গা মণিপুত্রে নেই যদি
 উদার বনকে ভুল করে বোয়ারবন বলে বর্ণনা দিয়ে থাকেন তবে
 লেখককে জানাচ্ছি উদারবন কাছাড়েরই এক মগধ্য জায়গা।
 সে জায়গা মণিপুত্রী পল্লীও নয় এক যে কতিপয় সংখ্যক মণিপুত্রী
 সেখানে বাস করেন তারা সকলেই অত্যন্ত আচারশীল হিন্দু। লেখক
 এরকম পরিমিত জ্ঞান নিয়ে কোন জাতিবিশেষের সখকে এল্পে
 মন্তব্য প্রকাশ না করলেই ভাল করতেন। — খ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী,
 শিলং।

মহাশয়, ঠিকঠা সংখ্যা মাসিক বনুমতীতে প্রকাশিত "চলার পথে"
 প্রবন্ধটি আমি বেশ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছি। আমি শিলং
 প্রবাসী একজন মণিপুত্রী এবং এই প্রবন্ধে লেখক খ্রীগোপাল
 চট্টোপাধ্যায় আমাদের মণিপুত্রী সমাজ সখকে যে বিবরণ পাঠিয়েছেন
 সে সখকে আমি কিছু মন্তব্য করতে চাই। লেখক বলেছেন,
 "এক রাতের ঘটনা উল্লেখ করলে বোধ হয় আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে
 আমার ভ্রমণ কাহিনী। অবিদ্যাত্ত বলে মনে হবে কিন্তু লেখকের
 কল্পিত কাহিনী বলে কেহ যদি ভুল করেন তবে তিনি খুব ভুল
 করবেন।" কিন্তু ঘটনাটি আমার নিকট অবিদ্যাত্ত ও হাত্তকর।
 প্রশ্ন করি, লেখক কি বাস্তবিকই মণিপুত্রী সমাজের আচার-ব্যবহার ও
 চালচলন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রাখেন? তা না হলে তিনি কি করে
 একটি জাতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ মন গড়া ও কল্পিত কাহিনী উপস্থাপিত
 করলেন? সে কি নিজের ভ্রমণ কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে
 তোলার জন্তই? মদ আমাদের সমাজে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শুধু মদ কেন
 আমাদের ধর্মপ্রাণ প্রাচীন বৈক্যবেরা মাদ-মাংস পর্যন্ত আহার
 করেন না। অবস্ত আজকাল কোন কোন যুবক হোটেলের পরিবারের
 চোখ এড়িয়ে ঐসব ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তা বলকি
 মদ বা মাংস আহার করা আমাদের সমাজের প্রচলিত নিয়ম বলব?
 এ ছাড়া আমাদের সমাজে কুমারীদের পরপুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে
 মেলা নিন্দনীয়। লেখকের উক্তি এখানে উল্লেখ করাছি।
 "মণিপুত্রীদের অতিথি হল্যাম, ...একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের
 অভিনয় হল। কেদো সেছ মদ খাইয়ে ঘটা ছুই ধরে আনন্দের
 বস্ত্র বয়ে গেল বোয়ার বনে। পরের দিন সকালে এ রহস্তের তথ্য
 আবিষ্কার করলাম। অতিথি পরিচর্যার রীতি এদের এই রকম
 কুমারী মেয়ের লাগো যদি একশটি অতিথি বরণ করবার সৌভাগ্য
 থাকে তবে তিনি সস্তী পূণ্যবতী।" আমাদের সমাজের অতিথি
 পরিচর্যার রীতি কি এতই কদর্য? আচ্ছবাই বটে, পড়ে মনে
 হচ্ছে আমরা মণিপুত্রীরা আজ থেকে প্রায় হাজার হাজার বৎসর

আমেকার যুগের কোন আদিম অধিবাসী। এ ছাড়া, মদিপুরী ছেলেনের পোষাকের বিবরণও সম্পূর্ণ জ্ঞাত। এও জানতে চাই, বছ দিন যাবৎ আমরা খাসিয়া পরিবেশে কাটাচ্ছি। তাই এই ভয় ও স্বাধীনতা প্রিয় জাতি সম্পর্কে লেখকের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়। খাসিয়া রমণীরা কোমরে মোটা বকুমের লম্বা উড়না জড়ান না। জড়ান নেপালীরা। শিক্ষিতা রমণীরাও পেটকাটা ব্লাউস ও বডিঙ্গ ব্যবহার করে না। সহরে খাসিয়ারা অত্যন্ত শিক্ষিত ও গুণের আচার ব্যবহার সাহেবী ধরণের হলেও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে খাসিয়া মহিলা মোটেই সাহেবী পোষাকের অনুকরণ করে না। এ ব্যাপারে যে কোন জাতি অপেক্ষা ওয়া সংবত ও স্কটিশ পরিচয় দেয়। পরিশেষে আমার অনুরোধ, ঐচ্ছাপাধ্যায় বেন তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। কে, বিজয়া দেবী। বি. এ., তৃতীয় বর্ষ কলা বিভাগ। রেভলেন্ডুল, শিলং।

মহাশয়, আমি আপনাদের একজন ১৩ বৎসর বয়সের গ্রাহক। আমার তিনটি অনুরোধ আছে আপনাদের কাছে: ১ম। আপনাদের 'মাসিক বসুমতী'র স্থলপত্র হয় বিজ্ঞাপনের পূর্বে বা পরে রাখুন—মধ্য ভাগে না বেধে। ২য়। আপনাদের মৌলিক প্রবন্ধগুলি 'অখণ্ড অমির ঐগৌরাজে'র অক্ষরে ছাপিলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহজে পড়িতে পারে। ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে বৃদ্ধদের কষ্ট হয়। ৩য়। ১৩৬৭ আষাঢ় মাসের 'বসুমতী'র ৪১০ পৃষ্ঠায় "চার জন" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ৪১১ পৃষ্ঠায় শিরোনাম 'মাসিক বসুমতী'। ৪১১ পৃষ্ঠায় শিরোনাম 'মাসিক বসুমতী' না হয়ে 'চারজন' হইলে ভাল হয়। এই রূপে অপ্রান্ত প্রবন্ধের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। ইতি। আপনাদের ঐক্ককল্প সেনগুপ্ত, প্যারীসেন লেন, সাহেবজাদা বাজার, কটক—২।

মামনীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, গত ত্রয়োমাসের মাসিক বসুমতীতে আমার ভোলা দুইখানি ছবি ছাপানো হয়েছে, ('শিলালিপি', 'পথ বেঁধে দিল') কিন্তু তাতে ভুলক্রমে আমার নাম 'দীপক চাকলাদার' ছাপানো হয়েছে কিন্তু আসলে ভটা হবে 'দীপক চাকলাদার'। আপনাকে বিশেষ অনুরোধ বেন আগামী মাসের মাসিক বসুমতীর 'আলোকচিত্র-র' পাতায় এই ভুল সংশোধন করে নেন। শুভেচ্ছান্তে ইতি—দীপক চাকলাদার। ১৫-এইচ, কার্ণ রোড, কলিকাতা-১১।

মহাশয়, "বসুমতী" মাসিক পত্রের বিগত বৈশাখ সংখ্যায় "বঙ্গবাসী:—দেশ ও কাল" নামক প্রবন্ধে ঐহারাদন দত্ত মহাশয় আমাদের সম্মুখে একটি মনোরম চিত্র ধরিয়েছেন এ প্রণীর প্রবন্ধ পাঠে মন পুলকিত হয়, এবং হওয়াও বাঞ্ছনীয় বটে। আমাদের বক্তব্য এই যে, উপরোক্ত প্রবন্ধে স্বর্গীয় সৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের "সংবাদ-ভাষ্য" স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের "সাহিত্য" এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে "হিতবাদী" ও "বসুমতী"র নাম পাওয়া যায় নাই। মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির—জন্ম সন প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু বিভাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম সন দেওয়া হয় নাই। অত্র নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্ম সন—১৮৫২ খৃষ্টাব্দ লিখিত হওয়ার প্রমাণ দিরাচ্ছে। কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্ম ১৮৪০ ইং সন বটে। ভবনীর ঐউপেন্দ্র নাথ দত্ত, কালিনগর রূ-বাগান—পোস্ট হামকুনগর।—(কাছাড়)

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

ভারতের বাইরে সাগরপারে আমরা নিম্নলিখিত গ্রাহকবর্গকে পাইয়াছি।

1. Mrs. A. Naylor
No 7, Woodcraff Road
Liverpool (15)
England. U. K.
2. Mr. S. N. Sen
Post Box no 334 (Central)
Tokyo, Japan.
3. Mr. B. K Banerjee
C/o M/s Imperial Chemical
Industries Ltd.
Wilton Castle, Block 'B'
Engineering Dept.
Wilton Middleborough U. K.
4. Mr. Tapan Ukil
ba. A. Mittang.
Kriebathal
Abu Mithwada/sa
East Germany.

I am sending herewith Rs 15/ only, for Masik Basumati from Baisakh to Chaitra 1367 B. S. Secretary Milani, Raigarh—M. P.

এক বৎসরের মূল্য পাঠানাম—Secretary Satsang—S. P. Behar.

We are sending herewith yearly subscription of your esteemed monthly. Please issue magazine from Ashar.—I. E. L. Recreation Centre, Hazaribagh.

ত্রয়োমাসে আমার গ্রাহিকা মেসাদ শেষ হইয়াছে। আজ ১৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। আষাঢ় সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অঞ্জলি বসাক, নিউ দিল্লী।

Please subscribe me for 'Masik Basumati' for one year. Remitting Rs 15/—for the purpose—Juthika Roy B. A.—Shillong.

Sending herewith Rs 7.50 nP. as the subscription for Monthly Basumati for another six months.—Kanak Maitra, Kanpur.

বার্ষিক টালা ১৫ টাকা মাসিক বসুমতীর জন্ম পাঠাইলাম। আষাঢ় হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—ঐমতী সীতা দাশগুপ্ত—Bina—M. P.

I am remitting herewith Rs 7.50 nP, on account of subscription towards Monthly Basumati for the period from Ashar to Agrahayan.—Leele Ghose, Meerut.

Remitting subscription for M. Basumati kindly continue the Magazine and oblige.—G. R. Choudhury, Kimin,

যদি অর্ডার বোলে এই বৎসরের বার্ষিক মূল্য বাকী ১৫ টাকা পাঠানো হইল—Guptipara High School, Hooghly.



মাসিক বসুমতী

॥ ভাদ্র, ১৩৬৭ ॥

(অপ্রকাশিত রেখাচিত্র)

নর্তকী শ্যামাবাঈ

—শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত



মাসিক ফুলমতি

৩৯শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৬৭]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥

[প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

দুঃখ

দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ বাহ্যে কিছু নির্মাণ করিয়াছে, তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে।
 ১ দিয়া বাহ্যে না করিয়াছে, তাহার তাহা সম্পূর্ণ আপন হয় না।
 সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্বীর দ্বারা, দুঃখের দ্বারা আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি—সুখের দ্বারা, আশ্রমের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে বড়ই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি, বর্থাৎ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।
 রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারা ইতিহাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্তি দেখিয়াছে, দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাত্মার তেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে বত বীরত্ব, বত মহত্ব, সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃশ্রমের মূল্য দুঃখে, পাতিশ্রমের মূল্য দুঃখে, বীরের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।
 উপনিষৎ বলিয়াছেন—‘স তপোহিত্যন্ত স তপস্তপ্ত, সর্বমশ্রুত যদিৎ কিৎ।’ তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই বাহ্যে কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিদ্যমান করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে বাহ্যে কিছু সৃষ্টি করিতে

বাহ্যে সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই সৃষ্টির সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্বীকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উদ্বেষিত করিতেছে।
 সেই তপস্বীই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর-এক দিক দিয়া বলা হইয়াছে—‘আনন্দাত্ম্যে বর্ষমানি ভূতানি জাহন্তে।’ আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে। কোহেবানিত্যং কঃ প্রাণ্যং বদেৎ আকাশ আনন্দো ন ত্যং। কুবক চাব করিয়া বে-কসল কসাইতেছে সেই কসলে তাহার তপস্বী বত বড়ো, তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্য-রচনা তো বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।
 শক্তিতে ও ভক্তিতে বাহারা দুর্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাদুশোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারাই বলে, ধনমানিই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্যই ঈশ্বরের মূর্তি, সংসারসুখের সকলতাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং তাহারই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দরাকে তাহারাই বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেইজন্যই এই-সকল দুর্বলচিত্ত সুখের পূজারিগণ ঈশ্বরের

দয়াকে নিজের লোভের মোহের ও ভীকতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু, হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? হৃৎপিণ্ড বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিক্রমে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ; হে মাতা, তুমিই

মৃত্যু, তুমিই ভয়। তুমিই ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং তুমিই—

'লেজিহুসে প্রসমানঃ সমস্তাং লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ ।
তেজোভিরাপূর্ষা অগৎ সমগ্রং ভাসন্তবোধ্রাঃ প্রতপন্তি বিকোঃ ।'
সমগ্র লোককে তোমার জলৎ-বদনের দ্বারা প্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ—সমস্ত অগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া ও বিষ্ণু, তোমার উগ্রজ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছ। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অহল্যা

শ্রীঅনাথবন্ধু বেদান্ত

অহল্যার পাষণ্ড হওয়ার কাহিনী আমরা জানি। কৃষ্টিবাসের রামায়ণে আছে, ইন্দ্র গৌতমের বেশ ধারণ করে অহল্যার নিকট গেলেন। কিন্তু গৌতমরূপী ইন্দ্রকে অহল্যা চিনতে পারলেন না, স্বামী বলেই গ্রহণ করলেন। তখন—

পরিব্রতা নাহি লজ্জ পতির বরণ।

তখনি শয়নগৃহে করিল গমন।

তারপর গৌতম ঘরে ফিরে এসে যখন অহল্যাকে জিজ্ঞেস করলেন—

গৌতম বলেন শ্রিয়ে জিজ্ঞাসি তোমারে।

শৃঙ্গার লক্ষণ কেন তোমার শরীরে ॥

অহল্যা বলেন প্রভু নিবেদি তোমারে।

আপনি করিয়া কর দোষহ আমারে ॥

তখন গৌতম ধ্যানে সমস্ত অবগত হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন—

শাপিলেন অহল্যারে ক্রোধে মুনিবর।

শাপ দিমু তোর তমু হউক প্রস্তর।

ইন্দ্রকে গৌতমের অভিশাপ দেওয়া যুক্তিযুক্ত। এমন যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ পরম্প্রীণামী তার শাস্তি আরও কঠোর হলেও আমাদের কোন ক্ষোভ ছিল না। বরং সময় সময় মনে হয়েছে, ইন্দ্রের শাস্তি পর্দাপ্ত হয়নি। কিন্তু অহল্যা? যতবার কৃষ্টিবাসের রামায়ণ পড়েছি, ততবার মনে এই ক্ষোভ হয়েছে, অহল্যাকে কেন শাপ দেওয়া হোল? কি তার অপরাধ? সে তো ইন্দ্রকে তার স্বামী গৌতম বলেই জেনেছে ও স্বামী গৌতমরূপেই গ্রহণ করেছে। স্বামীর বেশধারীকে সে চিনবে কি করে? তাকে এরূপ অভিসম্পাত দেওয়া গৌতমের অত্যন্ত অন্তায় নয় কি? জানি ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম এরূপ অন্তায় কাজ কেন করলেন? এর কোন সহজত্তর পাওয়া যায়নি, কারণ কোন সহজত্তর এর ছিল না। অহল্যাকে অভিসম্পাত দেওয়া গৌতমের ঋষিভীবনের এক চরম কলঙ্ক। কৃষ্টিবাসের লেখনী গৌতম ঋষির মুখে এরূপ কলঙ্ক-কালিয়া লেপন করেছে। কিন্তু মূল রামায়ণের ঘটনাও কি তাই? বাস্তবিকও কি এরূপ অন্তায় করেছেন? তিনিও কি বিনা অপরাধে অহল্যার প্রতি অভিসম্পাত দ্বারা এক নিরপরাধা নাগীর সমগ্র জীবন ব্যর্থ করে দিলেন? মনে এই সংশয় জাগতেই বাস্তবিক মূল রামায়ণ খুললাম। খুলে দেখি, বাস্তবিক লিখছেন :—

মুনিবেশং সহস্রাকং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।

মতিঞ্চকার তুর্মেধা দেবরাজ কুতূহলাৎ ॥

অখাত্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্ধেনাস্তবায়না।

কৃতার্ধাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥

অর্থাৎ অহল্যা তাকে গৌতমবেশধারী সহস্রাক ইন্দ্র বলে চিনে পেরেও তুর্মেধেতু দিব্যরমনকুতূহল বশতঃ তাদৃশ কার্য করে অভিপ্রায় করলেন। অনন্তর তিনি পূর্ণমনোরথ হয়ে সুরশ্রেষ্ঠ বললেন—প্রভো, আমি কৃতার্ধ হলাম। এখন শীঘ্র এ স্থান হে প্রেহান কর।

সমস্ত সংশয়, সমস্ত সন্দেহের নিরসন ঘটল। মহর্ষি বাস্তবিক প্রতি প্রকার শির আনত হল। তাইতো, ঠিকই তো। অহল্যাকে ১১দশ সত্ত্বও চিনতে পারলেন, কিন্তু তবুও ব্যভিচ করতে মনে স্থিরা হোল না। বরং পাছে ইন্দ্র স্বামীর কাছে য পড়ে, পাছে তার নিজের এই পাপাচরণ স্বামী জানতে পারে এজন্য ইন্দ্রকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বললেন। কিন্তু ইন্দ্রে অদৃষ্ট ধারাপ, অহল্যারও পাপের ভরা পরিপূর্ণ। তাই ই পর্ণশালা হতে বহির্গত হতেই গৌতমের সঙ্গে দেখা। গৌতম তাকে আত্মবেশধারী দেখে ও তাঁর শয়নগৃহ হতে বহির্গত হতে দেবে ব্যাপারটা এক নিমিষেই বুঝে নিলেন। তারপর সে পরদায়বত (গুরুপত্নীবত) পাপাত্মাকে অভিশাপ দিলেন এ তৎক্ষণাৎ নিজ কুটীরে প্রবেশ করে অহল্যাকেও অভিসম্পাত করলেন—

ইহ বর্ষসহস্রাণি যতুনি নিবসিষ্যসি।

বাতস্তক্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মধারিনী।

অদৃষ্টা সর্বভূতানামাপ্রমেহস্মিন্ বসিষ্যসি।

অর্থাৎ এই আশ্রমে বহু সংস্র বৎসর নিরাহারা, বাতস্তক্য ভস্মধারিনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃষ্টা হইয়া অল্পতাপ করত ব করিবে।

নিমিষে অহল্যা অদৃষ্টা হয়ে গেলেন। আমাদের সমস্ত সংশয় অবসান ঘটল। গৌতমের কাজ অত্যন্ত সংগত মনে হোল অহল্যার প্রতি তাঁর অভিশাপে মনে আর কোন ক্ষোভ থাকুল না আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও জানা গেল যে অহল্য পাষণ্ড হন নি, হয়েছিলেন অদৃষ্টা।

প্ৰতিষ্ঠিত ক্ষিত্তিমোহন সেন শাস্ত্ৰী মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা কে না জানে। তিনি মধ্যযুগীয় সাধক দ্বিত্ব কবীর প্রভৃতি 'কামধেনু দোহন করে' 'ভূষিত পবিত্রদের' পরিতৃপ্ত করেছেন। এই 'ভক্তিরসের রসিক' পূজনীয় শাস্ত্ৰী মহাশয়ের আর একদিকের পরিচয় হস্ত সকলের জানা নেই। হিমালয়ের মতো এই বিরাট জ্ঞানযোগীর অন্তর্দেশ থেকে হাত্তরসের একটি সহজ নির্ঝড়িণী সব সময় উৎসারিত হত। ধীরা তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই এটা উপলব্ধি করেছেন। শাস্ত্রিনিকেতনে অধ্যাপনাকালে গভীর তত্ত্বমূলক বিষয় বোঝাবার সময় তিনি মাঝে মাঝে হাত্তরসাস্ত্রক স্কন্দর স্কন্দর গল্পের অবতারণা করতেন। তাতে অনেক জটিল বিষয়ও ছাত্রদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যেত। শুধু গল্প হিসাবেও সেগুলো পরম উপভোগের সামগ্রী। ১৩৪৭ সালে শাস্ত্রিনিকেতনে তাঁর কাছে 'বলাকা' এবং 'মায়ূবের ধর্ম' পড়বার সময়ে তাঁর মুখ থেকে এ-ধরনের অনেক গল্প শুনেছিলাম। এখানে তার কয়েকটি উদ্ধার করে পূজনীয় শাস্ত্ৰী মহাশয়ের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম।

অরসিকেসু

এক সেকলে পিসিমা গান বাজনা মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। গানের সুর কানে ঢুকলেই তিনি বেগে বেগে আঙুন হয়ে উঠতেন। বিধাতার এমনি পরিহাস যে তাঁর আপন ভাইপোকেই গানের বাতিকে পেয়ে বসল। বেচারার এমন দুর্ভাগ্য যে গলা সাধতে বসলেই পিসিমা উগ্র মূর্তি হয়ে তেড়ে আসেন। তবু গানের বাতিক কি সহজে যায়—পিসিমা শত লক্ষ্যনা গজনার বাঁটা মেয়েও রাগ রাগিণীর ভূত তার বাঁড় থেকে নামাতে পারলেন না।

একদিন এক বিরাট তানপুরা নিয়ে সে লুকিয়ে লুকিয়ে একমনে গলা সাধছিল। দুয়ারের দিকে চেয়ে হঠাৎ দেখতে পেল পিসিমা এসে কখন দাঁড়িয়েছেন। আচমকা পিসিমাকে দেখে প্রথমটা বোঝার গলা আটকে যাবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু পিসিমার চোখে মুখে এক অদ্ভূত ভাবান্তর লক্ষ্য করে সে সাহস পেল। আশ্চর্য! পিসিমা সে দিন আর বেগে বেগে তেড়ে আসছেন না, তানপুরাটার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাইপোর মনে হল এতদিনে পিসিমা গানের মর্ম বুঝতে পেরেছেন,—আজকের রাগালাপ শুনে নিশ্চয়ই তাঁর মনে পরিবর্তন এসেছে। দারুণ উৎসাহে সে গলা থেকে রাগ রাগিণী বিস্তার করতে লাগল।

গান থামতেই পিসিমা ভাইপোর কাছে এসে তাঁর স্ব ভাবিক উগ্র মূর্তি ধারণ করে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "হারামজাদা, এত বড় একটা লাউ নষ্ট করে তা দিয়ে গলা সাধা হচ্ছে। বে-হিসাবী কোথাকার। লাউটা দিয়ে সারা গায়ের লোককে নেমন্তন্ন খাওয়ানো যেতো।"

WRONG (রঙ)

এক নর্তকীর নাচে মুগ্ধ হয়ে দর্শকের দল মুহুরূহঃ হাততালি দিয়ে চলছে। যেমন নিধৃত দেহের সৌন্দর্য তেমন নিধৃত নাচের ভঙ্গী। নাচের আসর আশ্চর্য ভাবে জমে উঠেছে। হঠাৎ সহ-নর্তকীর একখানা হাত অসাবধানে নর্তকীর গালে এসে লাগতেই তার ভাল কেটে গেল। নর্তকী হুঁহাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেমন যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নাচতে লাগল। হাততালির বদলে এবার স্কন্দ হলো হই-হলা। নর্তকী ঘুড়ে দিয়ে নাচ থামিয়ে দিল।

ক্ষিত্তিমোহন সেন শাস্ত্রীর গল্প

রথীন্দ্রকান্ত ঘটকোঁধুরী

আসরের প্রথম সারিতে বসে দু বন্ধু নাচ দেখছিল। প্রথম বন্ধু বললে, "There is something wrong with her" দ্বিতীয় বন্ধু নর্তকীকে ভাল করে উঁকি দিয়ে দেখে মিয়ে বললে, "wrong নয়, there is something রঙ with her".

আসলে নর্তকীর গায়ের রঙ ছিল মেক আপ করা। সহনর্তকীর হাতখানা তার গালে লেগে রঙ উঠে যাওয়াতে আসল রূপ ধরা পড়ার ভয়ে হঠাৎ এই পরিবর্তন।

ষাড়

এক মাতাল নেশার ঘোরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ তার বাতাস খাবার ভারি ইচ্ছে হলো। একটা দোকানে ঢুকে দু' আনার বাতাস নিয়ে একখানা পাঁচ টাকার নোট দিল।

দোকানী বললে, "এখন পাঁচ টাকার ভাঙতি নেই, ফেরবার পক্ষে আপনার পাওনাটা নিয়ে যাবেন।" মাতাল দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করল দোকানের সামনে একটা বাঁড় দাঁড়িয়ে আছে।

২টা কয়েক পরে ফেরবার সময় একটা দোকানের সামনে বাঁড়টা দেখে মাতালের পরসার কথা মনে পড়ল। দোকানীকে বললে, "আমার পাওনাটা দিয়ে দাও।" দোকানী তো অবাক, "কিসের পাওনা মশাই।" মাতাল বেগে বেগে আঙুন, "বাটপাড়ী করবার আর জাঃগা পাও না? আমার বোকা ঠাউরিয়েছ বুঝি? এই ঋনিক আগে বাতাসা কিনে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে গেলাম।"

দোকানী বললে, "আপনি ভুল করেছেন মশাই, এটা বাতাসার দোকান নয়, চিটে গুড়ের দোকান।"

মস্তবড় একটা বড়ঘর ধরে ফেলেছে—মাতাল গলার স্বরে সেই ভাব এনে বসলে, "ভেবেছিল আমি কিছুই বুঝতে পারব না। আমার পাওনাটা কীকি দেবার জন্তে এরই মধ্যে বাতাসার দোকান পালটে চিটে গুড়ের দোকান বানিয়েছো। লোক ঠকবার বেশ কার্যনা শিখেছে দেখছি। ভেবেছ, দোকান পালটে বোকা সাজলেই পরস কীকি দেওয়া যায়।" মাতাল বাঁড়টাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "আমি কিছুই লক্ষ্য রাখিনি বুঝি? এই যে সেই বাঁড়—দোকান পালটালেও বাঁড় পালটাতে পারনি।"

বরায় সন্দ্বজ

কত জন্ম বন্ধুতে মিলে গল্প গুজব চলছিল। কোন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে কার কত ঘনিষ্ঠ সন্দ্বজ—সবাই সে গল্প বলে পরস্পরকে ভাল লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। একজন বললে, "ওঃ তোরা সেই বৈজ্ঞানিকের কথা বলছিস—যিনি একটা নতুন ষিওরি লিখে বিলাত থেকে সম্মান নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হন। এখন ঠিক মনে পড়ছে না পিসিমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তোদের বলব।"

আর একজন বললে, "আমার কে হন জানিস? তিনি বাবার আপন মাসতুতো ভাইয়ের মামাখণ্ডর। ছোট বেলায় আমাদের বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়তেন। তখন তাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।"

একজন বাঙালি এতক্ষণ চূপ করে বন্ধুদের কথা শুনছিল—সব মাঝে মাঝে পা দোলাচ্ছিল। হঠাৎ হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বললে, “তা হলে দেখা বাঞ্চে তোদের সকলের চাইতে আমার সঙ্গে তার সবকটা বেশি ঘনিষ্ঠ। কী সবক জািনিস? বরায় সবক।”

সবাই কান ঝাড়া করে উৎসুক ভাবে শ্রব করল, “সে আবার কী।”

বন্ধুটি বললে, “বরায় সবকটা কী তাই জািনিসনে? তবে বলি শোন। আমার যে পিসিমা—তার যে দেবর—তার যে মেসো—তার যে খুড়তোতো ভাই—তার যে মামা তার খত্তরবাড়িতে এক বরই মানে কুলের গাছ ছিল। বৈজ্ঞানিক ছেলেবেলায় সেই বরই গাছ থেকে নিয়মিত বরই খেতেন। সেই নৃত্তে তার সঙ্গে আমার বরায় সবক।”

এ কথা শুনে বাকি বন্ধুরা সব চূপ করে সবকটা তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

বর্বর

এক বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রীরা দারুণ ক্ষেপে গেছে। মেগে মেগে সবাই চলে যায় আর কি। তাদের নাকি মোটেই আদর বন্ধ করা হচ্ছে না—সবাই বরকে নিয়েই ব্যস্ত।

—“এমন ছোটলোক তো কখনো দেখিনি। আমরা খেলাম কি না খেলাম সে দিকে কারো কোন খেয়ালই নেই।”

—“বরতো তাদের আশ্রয়ই। সব সময় আসবে যখন খুশি তাকে আদর বন্ধ করতে পারবে। আমরা কি আর কখনো পাত পাততে আসব?”

—“বরযাত্রীদের তো সবাই বরের ডবল আদর বন্ধ করে থাকে, মশাই।”

কতাপকের লোকেরা এতক্ষণ তাদের রাগ খামাবার জন্তে বহ

সাধাসাধি করছিল, কিন্তু তাদের গৌ কেবলি বেড়ে বাঞ্চে দেখে এবার একজন উত্তর দিল, “তাহলে আমরা বা ধারণা কতেছিলাম—তাই ঠিক। আপনাদের যখন বরের ডবল আদর বন্ধ শ্রাপ্য তখন তো ঠিকই আপনারা ডবল বর অর্থাৎ কিনা বর্বর।”

রাংতা কুড়ানো

ক’জন ভাঙখোয়ের হঠাৎ ইচ্ছা হলো সবাই মিলে দুর্গাপূজা করবে। তখন তাদের নেশা বেশ জমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গেই একজন দুর্গার পোজে ঝাড়িয়ে গেল। কেউ হলো লক্ষ্মী, কেউ সংস্কৃতী, কেউ কার্তিক, কেউ গণেশ। সব চেয়ে বগা প্রকৃতির লোকটি অন্তরের মতো মুখ খিঁচিয়ে ঝাড়ালো। তার পর একজন পুরুত সঙ্গে পূজার কাজ সমাধা করল। পূজার পর সবাই ঠিক করলে এবার প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া যাক। লক্ষ্মী সংস্কৃতী সব সঙ্গে দুর্গাকে বয়ে নিয়ে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়, অগত্যা সাব্যস্ত হলো শুধু মূল প্রতিমাকে বিসর্জন দিলেই চলবে। সবাই মিলে বগল বাজিয়ে দুর্গাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলল। চলতে চলতে পথের পাশে একটা মজে বাওয়া পাতকুরো চোখে পড়তেই সবাই মিলে দুর্গাকে গর্ভের মধ্যে কেল দিল। তারপর বিসর্জনের দুখে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে যে বার বাড়ি চলে গেল।

পর দিন যুগের পরে নেশা ছুটে যেতেই সবাই ভারতে লাগল— দুর্গার না জানি কী গতি হয়েছে—বেচারি হয়তো কুরোর গর্ভে নয় বন্ধ হয়ে মরেই গেছে। তারা একজোট হয়ে ভয়ে ভয়ে দুর্গার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। পাতকুরোর কাছে এসে সবাই গর্ভের ভিতর উঁকি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল। সবাই অবাক হলো দুর্গা মারা যায়নি—ঠিক গত কালকের মতোই দেবীর পোজে ঝাড়িয়ে আছে। আসলে কুরোর গর্ভের ঠাণ্ডায় তার ভাঙের নেশা তখনো বেশ তাজা ছিল। সে ইয়ার বন্ধুদের দেখে গভীর স্বরে বললে, “কী যে রাংতা কুড়োতে এয়েছিল বুঝি।”

জন্মান্তর

বন্দে আলী মিয়া

একটি প্রেমর রাতি কিরবে কি জীবনে আবার
মানস-সাগর হতে কিরবে কি কলহংস দল?
দাকচিনি-বনে আজ নামিরাছে তুবানের ঢল
আমার তাসের ঘর লুটাইছে পথের ধূলার।

আমি কি ছেনেছি কতু কোনোদিন বিয়ের সাগর।
তুমি কি দেখেছো কতু বজ্রাহত মুক বনস্পতি।
শুনছো কি কোনোদিন তটিনীর কুলভাঙা গান—
আমার শৈলচূড়া চূর্ণ হলো তব পদতলে।

এসেছে সিদ্ধবাদ—উড়ে আসে শ্মশান-শকুন
আহাজ হুনিছে বায়ে—হেঁড়া পালে ঝড়ের মাতন।
গরজে লক্ষ উর্নি—প্রলয়ের বাজিছে বিধাণ
মহাকাল প্রাণিরাছে জীবনের স্মরণে আমার।

দুর্বার অশ্বের গতি—বধকে চলে অবিরাম
হরমু কামনা-নাগ দুর যোবে হুঁসিতেছে আজ।
ধূমকেতু পুছে বলে সপ্তর্ষির পাবক দাহন
লক্ষ্মণ-উপজে হোর বহুগুণ আজও দেখা যায়।

বাউল

শ্রীসত্যকিঙ্কর গুপ্ত

জগৎসময়ে বান বাউল হ'লেই এই ছুতোপ। বিষ্ণুপুর থেকে বাবে রাধানগর কিবা রামসাগর ট্রেনে নেমে গয়রাগপুর, কাঁচা-পাকা রাস্তার গেলে তো কোন রকমে ধারকেশবের তীর; তারপর? বাকুণী ঘাটে নৌকা নেই, চলো সদরঘাট। সেখানেও বসে আছে দক্ষ-বিশ্বজন বাত্রী। চলো আরও উজিয়ে পাইকপাড়ার ঘাটে হয়তো চালু হ'য়েছে নৌকা এই আশায়। চলো আরও মাইলখানেক নদীর পাড় ধরে।

ধারকেশবের চর। শরকেশের বন। আর বালি। বালি আর বালি। থমকে দাঁড়াবে। মরুতানের মত এ আবার কি? খানিকটা প্রায়গা ঘিরে ভাল, বেল আর পেয়ারা গাছ। মাধবী আর তরুলতার ঝোপ! সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা কোরবে—“ব্যাপার কি হে? কে ছিলো এখানে?”

“ওটা ছিল আশ্রম, বুয়েচেন” উত্তর দেবে নবনীপুলের পাল, “কোথাকার কোন বাউল আশ্রম বানাতে আর হু'দিন না বেতেই সব ফকির! কোথায় গেল বাউল আর কোথায় বা তার সেবাদানী।”

“গেল কেন? এতো সব তৈরী করে সব চেড়ে ছুড়ে চলে গেল কেন?”

উত্তর পাবে না এবার। কেউ জানেনা সে গোপন কথা। কিন্তু আমি জানি।

আমিই কি আর জানতে পারতাম? যোগাযোগ। সব সেই সময় ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসে আছি।

“শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু, প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ”

কে যেন গেয়ে আসে। একতারা হাতে, পরনে গেকর্যাবন। কাঁচা-পাকা চুলগুলি চুড়ো করে মাথার ওপর বাঁধা। কপালে গোবিন্দ-তিলক। গলার তুলসীর মালা। দরাজ গলার ডেকে চলেছে নিতাই বাউল। ক্রম্প নেই কোন দিকে। চাহিদে নেই ভিক্ষে নেওয়ার। নেহাৎ যারা ছাড়বে না, দেবেই ভিক্ষে, বাটিতে করে নিয়ে আসবে চাল, আলু, বেগুন তাদের জন্মে বা হাতের কন্নুই দিয়ে কাঁক করে ধরবে তার ভিক্ষের ঝুলি। ভিক্ষেতেও নাকি কামনা থাকবে না। ‘কামনা টুকুই তো মরলা’ বলতো নিতাই বাউল।

কত কি যে গুণলায় বাউল আর তার সেবাদানীর বিষয়ে! ক'দিন পরের কথা। নিমন্ত্রণপত্র এসেছে বাউলের আশ্রম থেকে। চব্বিশ প্রহরযাপী হরিনাম সংকীর্তন হবে। তিনদিন হবে মছব। মহোৎসব। নরনারায়ণ সেবা হরিভক্তিপরায়ণ নরনারায়ণদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাউল। আমিও পেলাম।

হে-হে কাণ্ড। মণ্ডপের ওপর হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে। অল্প দিকে দীর্ঘতাং ভূম্যতাং রব। অবাক হ'য়ে দেখছিলাম দরজা-গোড়ার মাধবীলতার তলার দাঁড়িয়ে।

শ্রিতহাস্তে এগিয়ে এল বাউল। “কে রে আমার নিমাইচাঁদ! মানমুখে দাঁড়িয়ে কেন ভাই?”

বুঝলাম না ব্যাপারটা। বললাম, “বোধ হয় ভুল করছেন, আমি নই।”

“সে কি রে?” চিবুকে হাত দিয়ে বললে বাউল, “তুই-ই তো সেই শঠীহুলাল—নইলে এমন গৌরকান্তি, আঙ্গাছলখিত বাহ।”

ভাবলাম, বাউল সন্ন্যাসীর মাঝে থাকে নাকি এমনি পাগলা পাগলা ভাব। হয়তো তেমনিই। টেনে নিয়ে চললো বাউল।

“ওগো ও রাধে—ও ললিতে—ও বিশাখা, কে কোথায় আছিস গো দেখে যা, ধবে এনেছি তোদের ননীচোরাকে।”

আমার অবস্থা 'যে তখন কী! পাগল করে দেবে নাকি আমাকেও! কুলুঙ্গীর ওপর গৌর-নিতাইএর মাটির মূর্তি, গলার টাটকা গাঁদা ফুলের মালা। পাশে নামানো খোল-করতাল। একতারা আর আনন্দলহরী।

বসতে হ'লো মাহুরের ওপর। রাই এলেন। ধীর মছব পদক্ষেপে। গৌরাজী যুবতী। কপালে তিলক, নাকে রসকনি। মিষ্টি হেসে বললেন, “ভর পেলে নাকি খোকা? ওর অম্নিই যতাব। সারা ছুনিয়া ও ওই রকমই দেখে। গৌর অল্প হ'লেই নিমাইচাঁদ আর কালো হ'লেই কাল।”

বাউল ততক্ষণে কস ছাড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে, খেতে হবে। আমি যে ওর নিমাইচাঁদ।

অহরহ লেগেই আছে মছব আর নাম-সংকীর্তন। কোন কিছুই অজুহাতে নয়-নারায়ণ সেবা। রামায়ণ আর কীর্তনীয়ার দল, এক আসর তো গাইতেই হবে বাউলের আধড়ার। তা ছাড়া যেদিন থাকবে না কিছু বায়না, রাত্রের ধোঁরাকীটুকু নিয়ে হ'য়ে যাবে এক পালা। মূলগায়ের আধর দেবে, “এ বুন্দাবনে-শ্রীগোবিন্দ ছাড়া তো পুরুষ দেখি না গো রাই।” চোখের জলে ভেসে যাবে বাউল।

যেখানে-সেখানে বাউলের গল্প। বাউলের নামে মুখের আকাশ-বাতাস। দেউলী থেকে বনকাটি আর কেটপুর থেকে কুমোরহাটি যেখানেই দেখবে দশজন—জানবে ঠিক ওই বাউলের গল্প।

কিন্তু বাউলের গল্প যে কি, সত্যিকার পরিচয় কি ওর, কেউ তা' জানে না। মনগড়া কাহিনীর প্রতিযোগিতা চলে সর্বত্র। কোথেকে আসে এতো পরমা? যে খেলা চালিয়েছে বাউল তাতে ছেলেখেলার মত পরসার দরকার। নিষ্কাম ভিক্ষেতে তো সম্ভব নয় এতো সব। কেউ বলে সিঁছাই। অসিঁছির পেয়েছে হয়তো একটা কিছু। কেউ বা সন্দেহ করে ওর সত্যিকার বাউলকে।

ভাই এলাম আবার। জানতে হবে কি আছে এই অসম্ভবের মূলে।

শান্ত পরিবেশের আশ্রম। ভিড় ভড়কা কিছু নেই। পেয়ারা গাছের ওপর একটা শালিক পাখী। ওপরে একটা শখচিল আশ্রম পরিক্রমা আরম্ভ করে দিয়েছে। চোখাচোখি হ'য়ে গেল আশ্রমকর্তীর সাথে। মুখ নামিয়ে নিচ্ছিলাম। ভরসা পেলাম, “লজ্জা কি ভাই ভেতরে এসো।” জিজ্ঞাসুনেজে চাইতেই উত্তর দিলেন ঠাকুর, “ঠাকুরের কথা বলছো? আসছেন এধুনি। পুজোতে বসেছেন। ব'স। ব'স এই মণ্ডপের ওপর।”

ব'সে থাকলে কি চলবে আমার? জানতে এসেছি যে আমি, দেখতে এসেছি সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেখলাম। জানলার কাঁক দিয়ে দেখলাম কুড়ক করে বসে আছে বাউল। এ সব কি জানুতামি ছাই! বাউলই বলেছিল একদিন পাগলামির কোঁকে, “বাউল হওয়া কি আর সোজা কথা রে নিমাই? বায়তে লর হ'য়ে যাবে, ভবেই না বাউল।”

ঠাকরুণ এলেন। খেতে দিলেন লেবু, কলা, শসা আর শাঁখমালু। গুরুগম্ভীর শব্দে বেজে উঠলো খোল। "গোবিন্দের গোপালা জন্ম জয়" স্তব আরম্ভ হয়েছে গোবিন্দের।

"কে রে আমার নিমাই চাঁদ?" আবার সেই প্রাণগুলানো ডাক, স্নেহমধুর সন্ধান।

নিত্য আসি, নিত্য বাই। ভালবাসেন, বাউল, আপ্যায়ন করেন বাই। দূরত্ব সরে যায় ক্রমশঃ। কিন্তু কাহিনী? বা' শুভে আসি এই বাউলের আখড়ায়। বাউল তার কাছ দিয়ে ঘেঁষে না একটুও। তাই মরীয়া হ'য়ে বলেই ফলসাম একদিন আর্দ্রারের সুরে, "দাদা, একটা কথা বলছি, মনে করবেন না কিছু, বলবেন আমার আপনার পুরানো কাহিনী—মানে আপনার সত্যিকার পরিচয় আর কি! এতো আপন ক'রে নিয়েও দূরে সরিয়ে রেখেছেন নিজেকে?"

সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল। ব্যাঙ্গরূপে এগিয়ে এলো বাউল। "কেন? কেন হে ছোকরা? এই জন্তে বুদ্ধি তুমি এসো এই আখড়ায়? মুখ সামলে কথা বলবে বলছি, ঠিকরে বেরিয়ে এলো চোখের তারাগুলো, দাড়ি জটা গেল দাঁড়িয়ে।

ভয়ে পিছিয়ে এলাম। বললাম, "না—না মাফ করবেন দাদা, ভুল হ'য়েছে আমার, আর জানতে চাইব না কখনও—মাফ করবেন।"

গোলমাল শুনে বেরিয়ে এলেন বাই।

"কি হ'ল—কি হ'ল গো? কার সঙ্গে কেমন ক'রে কথা কইতে হয় জান না?" সামলে নিলেন সেই সাময়িক আবহাওয়াটা।

ভেবেছিলাম যাব না! কী প্রয়োজন ওই সব বাউল বোষ্ট্রমের গুহকথা জানার। কিন্তু মনটা যেন আনুগম্ব করে! ডগ্ ডগ্ ক'রে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাউলের দাড়ি ভরা মুখ, কানে বাজে তার মধুমাথা ডাক, "ওরে আমার নিমাই চাঁদ"।

যাব না যাব'না ক'রেও গেলাম আখড়ায়।

"অভিমান হয়েছিল বুদ্ধি! বুকে টেনে নিলে বাউল। আর, আজ তোকে বলবো আমার কাহিনী। উজাড় কোরে দোবো। বা' আর কেউ জানেনা এই ছনিয়ার তাই শোনাবো তোকে আজ।"

বাংলার কোন অখ্যাত পল্লীগ্রামের ভিখারী বৈকুণ্ঠের একমাত্র সন্তান নিতাই। শিশু বয়সে মাতৃহীন হ'য়ে পিতার কোলে পিঠে মায়ের আদর পেয়ে মানুষ হ'য়ে উঠলো। বাপের গলায় গলা মিলিয়ে শীতের ভোরে নাম দিত নিতাই, "বাই জাগো বাই জাগো" বলে, চব্বিশ প্রহরের ধুলোটির সময় পিতার পাশে পাশে নেচে নেচে পাইতো—

"নিতাই ঘরে এলো—আমার গৌর ঘরে এলো যে,
ধুলো বেড়ে শচীমাতা নিল কোলে ক'রে যে।"

লীল পূর্ণ করে পিতা গেলেন অমর ধামে। বাবো বহুরের বালক নিতাইও চলে গেল গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে। ভাগ্যের অশেষণে নয় বেঁচে থাকার স্বাভাবিক চেষ্টায়।

হাওড়া ট্রেন। বিরাট ভিড় মানুষের। অতো ভিড় দেখে নি সে কখনও। গাঙ্গনের মেলাতেও না। ভয় ভয় করছিল অতো ভিড়ে। বিম বিম করছিল ওর মাথা। এতো আলো। এত উঁচু উঁচু সব বাড়ি। এখানে যে বাঁচতে গিয়ে ম'রে যাবে। তার চেয়ে কিরে যাবে বাপের কুঁড়েতে? হাতে তুলে নেবে করতাল।

নাম সংকীর্তন আর মুষ্টিভিক্ষা। শীতের ভোবে নাম দেওয়া আর গরমের দিনে চব্বিশ প্রহর। উঠে পড়লো নিতাই সামনের একটা গাড়িতে। কত গাড়িই তো ছাড়ছে অহরহ। দরজার কোণায় বসে বইল বালক। ট্রেনের নাম দেখে দেখে যেতে হবে কি না। কিন্তু এ কি!—এ কোথায় চলেছে গাড়ি? তাহ'লে কি—

পাশে বসেছিলেন এক খাঁ সাহেব, তাঁর যেন ধ্যানভঙ্গ হ'ল। সুরমা লাগানো চোখগুলি দিয়ে দেখে নিলেন একবার, ভাঙা বাংলায় বললেন,—"ক'হা বাবি খুতা।"

"আজ্ঞে অশাল, অশালের পর কালিপাহাড়ী তারপর ওই দামোদরটুকু পেরিয়ে জীপাট পুঞ্চ্যে।

হো হো ক'রে হেসে ওঠেন খাঁ সাহেব।

বিরাট শহর বিরাট বাড়ি আর বিরাট মানুষ খান রফিউদ্দিন। ভয় লাগে নিতাইয়ের। অবাক হ'য়ে যায়।

মেহেদি রং-করা দাড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে অখাস দেন খাঁ সাহেব—"বোয় কি রে বাচ্চা—এখানে থাকবি—গান শিখবি আমার কাছে।" কত লোকই তো আসে গান শিখতে খান সাহেবের কাছে। দেখছে তো নিতাই অহরহ। শুধু কি বোম্বাই আর পুণ', কাথিয়াওয়ার আর রাজপুতানা? সারা ভারত ভেঙে আসে সঙ্গীত রসপিপাসুর দল খান রফিউদ্দিনের "কলামঞ্জলে।"

দিন গড়িয়ে মাস হয়। মাস পেরিয়ে বছর। পুরানো ভীতি যায় হারিয়ে। হারিয়ে যায় সব পুরাতন স্মৃতি। খান রফিউদ্দিনের আদরের ছল্লাল দিলখুস খাঁ ভাবতেই পারে না কবে নাকি সে ছিল ভিখারীর ছেলে। হাতে করে মানুষ ক'রেছেন খাঁ সাহেব তাঁর কুড়িয়ে আনা ছেলেকে। তাঁর করনার সঙ্গীতলোক দেখতে পেয়েছেন খান দিলখুসের কণ্ঠে। সাস্তনা পেয়েছেন তাঁর নিজস্ব ঘরানা বাঁচিয়ে রাখার। তাই তো অবাক-বিম্বয়ে সাবাস দিতে দিতে কোলে তুলে নিয়েছেন সঙ্গীতবিশারদ খান রফিউদ্দিন। গায়ে দিয়েছেন রেশমের বুটিনার পিরায়, মাথায় কাশ্মীরী ফেজ, সাথে করে নিয়ে এসেছেন পঞ্চকোটের হোলীর আসরে।

বাগী কন্দনা গাইলো খান দিলখুস। চন্দ্রকোশ বাগের ধ্রুপদ। সঙ্গীত হ'য়ে উঠলো সভাগৃহ। যেন অভিনন্দন জানালো নবীন ওস্তাদকে।

মুদারক জানিয়ে চুকলো বুদ্ধি রণী বাঈ। বাঁধা আসর ওর। দোল দুর্গেৎসব আর সরস্বতী পূজা এ তিনটে সময় নতুন ক'রে জানাতে হয় না ওকে। ও তো আর নতুন নয়। নতুনের ভেতর এবার সাথে নিয়ে এসেছে মেয়ে রোশনাইকে। পরিচয় করিয়ে দিলে বুদ্ধি রাজা সাহেবের সাথে, "বার কথা বলেছিলাম হুজুরকে শ্রীপঞ্চমীর মাইকিলে।" আভূমি কুর্নিস ক'রে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে তরুণী বাঈজী রোশনাই। এগিয়ে আসে সাবেজী। তবলু আর মন্দিরা। হোলীর গান ধরেছে রোশনাই বাঈজী। হোলী খেলতে গিয়ে কেমন ক'রে লাজের মাথা খেয়ে একে গড়িয়ে পড়ে আরেকের গায়ে। সরস্বতীর মেল কোথা তা'দের? তা'রা না কুললনা। দরদস্তরা কণ্ঠে গেয়ে চলে রোশনাই কৃষ্ণপ্রমাকাজুকীদের বৃণাবন লীলা-সীতিক। গানের মীড়ের সাথে মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের তন্ত্রীগুলো। রোশনাই বাঈজীর চোখে জল।

পেটহাউসের ছোট একটা কুঠরীতে বসেছিল খান দিলখুস। নারীকণ্ঠের আহ্বানে ঘুম ভেঙে গেল।

“তনুহেন, ওস্তাদজী তনুহেন, কী ঘুম বাবা, উঠুন না একবার।
তনুহেন, বেরিয়ে আসুন তো।”

ঘুমের ঘোরে বেরিয়ে এলো তরুণ ওস্তাদ বহুচালিতের মত।

“আসুন, আসুন, ভাড়াভাড়া আসুন না পা চালিয়ে।”

জ্যোৎস্নার আলোয় বেশ বোকা যায় রোশনাই বাঈজীকে।
কর্কশকণ্ঠে কী একটা যেন ডেকে উঠলো। চমকে উঠলো ওস্তাদ
দিলখুশ। তাইতো! এ করছে কি সে? জেনে শুনে কি বিপদ
ডেকে জানবে না কি? না কি অসীম শূণ্যতা ভাল লেগেছে ওর!
শেষ রাতের বসন্তসমীরণে যেন ঠাণ্ডার আমেজ। সারা পৃথিবীতে
যেন তৃপ্তিব নিঃশ্বাস। বেশ লাগে। আভিজাত্যের গণ্ডী থেকে
শেকল ফেটে বেরিয়ে আসা। মন তার উদাস হ'য়ে যায়। যেন
মনের মণিকোঠা থেকে তার ভিখারী বাপ হাতছানি দিয়ে বলে ওরে
বৈষ্ণব-রক্ত যে তোরা ধমনীতে। তাইতো রোশনাই বাঈজীর ভেতর
দেখতে পেয়েছে সে তার প্রাণের ঠাকুর বৃষভানুন্দিনীর রূপ।
শুনতে পেয়েছে রাই অভিসারিকার কণ্ঠ। উম্মাদিনী রাই যেন ডাকে।

“ওগো ওঠো এসো—তোমার জন্তে চেয়ে চেয়ে রাতবে গত প্রায়।”

“তাইতো!” ডেকে উঠলো নিতাই।

“কে রাই?”

চূপ ক'রে গেল বাউল। বললাম, “তারপর?”

“তারপর যা দেখেছো। মিলন হলো চরণদাস বাবার আধড়ার।
কনাম নিলাম হ'জনে। প্রচুর অর্থ রাই-এর। অসহৃৎস্বের অর্থ
দব্যয় করা হচ্ছে।” হ্যা হ্যা ক'রে বিকট হাসি হেসে উঠলো
উল।

“কিন্তু ঠাকুরগ ছেড়ে এলেন তাঁর প্রাক্তন জীবন?”

“খরিনি তো কিছু—তা ছাড়ব আর কি?” পেছন থেকে
গিয়ে আসেন রাই ঠাকুরগ। লজ্জিত হ'য়ে পড়ি আমি। তাঁর
মুপস্থিতিতে অজায় হ'লো না কি তাঁর বিষয় আলোচনা করা?

“খরা পড়েছিলাম বুদ্ধি বাঈজীর কাঁদে।” বলে চলেন রাই ঠাকুরগ
। নিঃশিথিল বুদ্ধি—মানুষ করেছিল অমানুষের খোঁরাক
। গাওয়ার জন্তে। কিন্তু আমি তো ভাই মানুষ খুঁজে পাইনি।
যা হুনিয়া খুঁজে মরেছি কোথায় আমার মনের মানুষ—”

হেসে বললাম, “পেলেন তো এবার।”

অহরহ বৃষ্টির আলায় বেশ ক'দিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি আশ্রমে।
কলের দিকে যেন পরিষ্কার হ'য়ে এলো মেঘটা। ভাবলাম দেখি
য়ে কি করছে কেপাক্ষপি এই বাদলার।

দ্বারকেশবের বড় স্রোতটা মিশে গিয়েছে দক্ষিণ দিকের ছোট
। গটার সাথে। আশ্রমের সামনের নিচু জায়গাটা দিয়ে তৈরি
র নিয়েছে তার পথ। একহাঁটু জল পার হয়ে উঠলাম আশ্রমে।
উ কোথাও নেই। গৌরকুঠরীর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।
মালার কাঁক দিয়ে দেখলাম ঠাকুরগ পূজার বসেছেন। নিম্নলিখিত
। আর এক দিন যেমন দেখেছিলাম ঠাকুরকে। কিন্তু এমন
মধে? বাউল নেই আশ্রমে। গেল কোথায় পাগলা? সন্ধ্যা-
নার সময় গেল গড়িয়ে। ঠাকুরগ তো উঠলেন না। বানের
। যে বেড়ে আসছে। ভাড়াভাড়া পা চালিয়ে দিলাম।

তিন দিন তিন রাত্তির চললো প্রতিযোগিতা। ওপরে বৃষ্টি
। বজা। প্রকৃতির প্রাণর লীলা। সূর্য উঠলো চতুর্থ দিনের

সকাল বেলা। দেহে প্রাণ এলো। বান তখন পড়তিব মুখে। মনটা
ভারি হটকট করছিল আশ্রমের জন্তে। যে জায়গায় আশ্রম, তার
কি কোন চিহ্ন আছে?

আছে। শুধু চিহ্ন থাকার মতই আছে। দরজা জানালা
সমস্ত সামনের দেওয়ালটার কোন অভিজ্ঞই নেই। কুলুঙ্গীর ওপর
গৌর-নিতাই। জলে ভেসে চলেছে খোল। বোধ হয় সবাই চলে
গেছে তারই অভিমার্ণে।

কত দিন পেরিয়ে গেছে। কত মাস কত বছর। সংসারের
খানিতে পেবাই হ'য়ে গেছে সব পুরানো স্মৃতি। কী খেয়াল হ'ল
সেদিন জয়দেবের মেলা দেখতে হবে। বাংলার বাউল বাউলমের
না কি মেলা বসে ওখানে।

বাউলের গান হচ্ছিল ছারিকেন টাড্ডিয়ে। কোমরে ডুগি,
হাতে একতারা। সাদা চুলের চূড়োবাঁধা মাথা নেড়ে নেড়ে গেয়ে
চলেছে বাউল—

“পাখী মোর উড়ে গেল যে মন”...

যেন চেনা চেনা। যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর। অজান্তে এগিয়ে
এসেছি কখন। হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। গান গেল
থেমে। হক্চকিয়ে উঠলো সবাই। চিবুকে হাত দিয়ে বললে বৃদ্ধো
“কে বে আমায় নিমাই চান”—হো হো করে কেঁদে উঠলো বাউল।
“বলতে পারিস আমার রাই কোথা?”

অন্ধকার রাত্রে অজয়ের শুকনো বালিতে বসলাম হুজনে,
আবার কতকাল পরে যেমন ক'রে বসতাম দ্বারকেশবের বালুচরে।

“বললে কি জানিসু। বললে তুমি আমার কত যুগের
কামনার ধন। চম্ক উঠলাম আমি। সে কি গো! আমি যে
ভাই নিকাম ভিখারী। পালিয়ে এলাম। ভাড়াভাড়া পালিয়ে
এলাম। কিন্তু ভুল হ'য়ে গেল যে ভাই! মনটাকে তো ছুঁড়ে
ফেলা যায় না। রাই যে আমার গোটা মনটা ছুঁড়ে বসে আছে।
কিরে গেলাম পুরানো আধড়ার। কেউ কিছু সংবাদ দিতে পারে না
ঠিক কোরে। আজ পঁচিশ বছর ঘুরে বেড়াচ্ছি রাই কোথা, কোথা
রাই বলে। একদিন পাবোই দেখা! কি বলিসু!” হাসতে
হাসতে চোখের জলে বুক ভেসে গেল বাউলের।

তিন্ত প্রশ্নটা বাড়িয়ে লাভ কি? বললাম, “দাদা শোবেন
কোথায়?”

“তুই যেখানে শুবি!” যেন কতকাল পরে সাক্ষাৎ পেয়েছে কত
আপনার জনের।

পাশাপাশি শুয়ে সন্ধ্যাসী আর গৃহী। নিকাম ভিখারী আর
কাম-কাকন-বিলাসী। ভাবছিলাম কত আশা। কত বৃদ্ধো হ'য়েও
আশায় বুক বেঁধে দোঁড়াদোঁড়ি করছে বাউল নবদ্বীপের রাসের মেলা
আর জয়দেবের পৌষ সংক্রান্তি, পুরীর রথযাত্রা আর কৃষ্ণগয়ের
দোল। বছর বছর যেখানে সমবেত হয় হাজার হাজার বাউল,
বাউল। পাবেই সাক্ষাৎ একদিন। উনতিরিশ সালের বানের কথা
কি শোনেনি বৃদ্ধো?

বললাম, “দাদা—দাদা—তনুহেন—”

চোখ মেলে দেখি কোথায় দাদা! যেন ভোর হয়ে গেছে।
বেন্দুলীর মাটিতে নেমে এসেছে কুয়াশা। পাগলা বাউল গেল
কোথা? বাহুতে কি লয় হ'য়ে গেল না কি?

পত্রগুচ্ছ



অলিভার ক্রমওয়েলের পত্রাবলী

[সংবাদ পত্রে মুদ্রিত পত্র হিসাবে ক্রমওয়েলের এটি প্রথম পত্র। তখন তিনি "বীর সৈনিক ক্রমওয়েল" রূপে অভিহিত ছিলেন। পত্রখানি জর্জন সরকারী রাজকর্মচারীকে লিখেছিলেন; তবে সম্বোধিত রাজকর্মচারীর নামটি পাওয়া যায় না বর্তমানে। প্রথম গৃহযুদ্ধের শেষ পর্বের পটভূমিকার পত্রটি লিখিত।]

গ্রাণ্টহাম

১৩ই মে ১৬৪৩ খৃঃ

মহাশয়,

ঈশ্বরের কৃপায় আজকের সন্ধ্যায় শত্রুর বিপক্ষে আমরা জয়লাভ করেছি। নানা রঙের ষোড়া নিয়ে তাদের ষোড়সওয়ার বাহিনী স্তম্ভিত ছিল এবং তিন বা চার বাহিনীর পদাতিক সৈন্য ছিল।

সন্ধ্যার শেষের দিকে আমরা কিরছিলাম—শহরের দু' মাইলের মধ্যে তারা এসে পড়েছিল এবং আমাদের মুখোমুখি হয়ে তারা ঠাঁড়িয়েছিল। বখনই আমরা সঙ্কত পেলাম তখনই আমরা সৈন্যবাহিনী স্থাপন করলাম—সেই সৈন্যবাহিনীতে দশটি বাহিনী ছিল—তার মধ্যে আবার কয়েকটি বাহিনীর অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয়ত আর হতে পারে না—সেই সৈন্যবাহিনী দেখলে আপনিও এই কথা বলতেন, তবে ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই সামান্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমরা বুদ্ধে মোড় কিরিয়ে দিলাম। আমরা কিছুক্ষণ ঠাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম—দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অপরের দেহের অংশ হাতবোমার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে—পদাতিক বাহিনী ওপরের উভয় দিকে গোলা ছুঁড়ছিল। আর আধ ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশী সময়ের মধ্যে আমাদের দিকে আমাদের মধ্যে শত্রু বাহিনীকে না আসতে দেখে আমরা তাদের আক্রমণ করার মনস্থ করলাম। তুই দিকে বহু গোলা নিক্ষেপের পর আমাদের ক্লাস্ত দেহ নিয়ে আমরা অগ্রসর হলাম—এবং একরূপ বৃত্তাকারেই আমরা অগ্রসর হলাম, আর তারা আমাদের প্রতিহত করার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। আমাদের লোকেরা তাদের জীবন ভাবে আক্রমণ করল এবং ভগবানের কৃপায় সেই দাজ্জাকারীরা পালিয়ে গেল। তাদের শাস্তি দেবার জন্য আমরা দু' তিন মাইল পর্যন্ত অগ্রসর করেছিলাম। তারা এলোমেলো ভাবে পশ্চাদপসরণ করেছিল।

আমার মনে হয়, আমাদের সৈন্যবাহিনী তাদের দুই বা তিন

জন লোককে টুকরো টুকরো করে কেটেছিল বখন তারা পশ্চাদপসরণ করছিল, কিন্তু যত্নর খতিয়ান করতে গিয়ে পৌঁছেতে সে-বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল নই। আমরা পর্যতাল্লিশ জন লোককে বন্দী করেছি। অথ এবং অল্পশত্রু প্রাপ্তি ছাড়া আমাদের বহু বন্দীকে মুক্তি করেছি—এই সব বন্দীদের আমাদের কাছ থেকে তারা নিয়ে গিয়েছিল—এখন আমি বিশ্রাম করছি। ইতি

ভবনীর অলিভার ক্রমওয়েল।

নিম্নে বর্ণিত পত্রটিও প্রথম গৃহযুদ্ধের শেষ পর্বের ভূমিকায় লিখিত। Lincolnshire প্রায় শত্রু-কবলিত হয়ে পড়েছিল। শত্রুসৈন্যের হাত থেকে নগরীটি মুক্ত করার জন্য নগরীর পুংশাসক এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে পত্রটি লিখেছিলেন।

Lincolnshire

২৮শে মে ১৬৪৩ খৃঃ

মাননীয় Colchester-এর পুংশাসক ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ,

আপনাদের পুনরায় লেখা আমার কর্তব্য বলে মনে করি, কারণ একটি মহৎ কাজের জন্য আমাদের কাছে আপনাদের আরও শক্তি পাঠাতে হবে। আমি অনুমান করি যে, লর্ড কেয়ার ফল্গের পরাজয়ের কথা আপনারা শুনেছেন। আমাদের ওপর ভগবানের অশেষ কৃপা। আর এই কৃপা যদি আমাদের ওপর না থাকত তা হলে লর্ড কেয়ার ফল্গ জানতেন না যে কী ভাবে প্রতিহত করতে হয়। আপনাদের নিশ্চিতভাবে আমি বলতে পারি যে শত্রুসৈন্যকে দমন করতে না পারলে আপনাদের ওপর গিয়ে তাদের চড়াও করা ছাড়া আর কোন কাজ থাকবে না।

আমাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে আপনারা আমাদের বাটিকে কেন শক্তিশালী করবেন না; এই অবস্থার বিচার আপনারা করুন আর ভাবুন কত অশুবিধা, অদূরদর্শিতা আর অসজ্জিত আপনাদের ওপর শেষে বর্তাবে। নিজের বিচার-বিবেচনা ছাড়া আপনাদের আমি আর লিখব না: আমি আপনাদের আবার বলি—আর আমার একথা যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন তা হলে আপনাদের ওপর বিপদ আসবে। আমার কর্তা নিউ ক্যাসেলের হ' হাজার ফুটের কাছাকাছি ঠাঁড়িয়ে আছেন। আর বাট ষোড়সওয়ার বাহিনীর পরে আমার প্রভু কেয়ার ফল্গ তিন হাজার ফুটের কাছাকাছি ঠাঁড়িয়ে আছেন। আর নয় ষোড়সওয়ার

বাহিনীর পর আমরা ছাধিগণি বোড়সওয়ার বাহিনী আর পদাতিক সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সৈন্যরা কেয়ার কন্ন-এর কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। আমার ক্রিয়াকলাপ এবং আপনাদের করিতকর্মা জাব খুব ক্রিয়াক্রম হওয়া উচিত, আর এ না হলে আপনাদের ভাগ আর কিছু করতে পারব না।

আপনারা যদি সাহায্য পাঠান তবে আপনাদের সৈন্যবাহিনী বেঠান বেন আসে। আমি অসুযোগ করছি, আপনারা আমাদের কাছে সৈন্যবাহিনী ক্রত সম্বল পাঠান। অর্ধের কথা ভুলবেন না। খুব পীড়াপীড়ি আমি করছি না যদিও সাহায্যের প্রয়োজন আমার কাছে আছে। আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি পদাতিক সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ বোধনা করতে পারে। একটা হতভাগ্য ভক্তলোকের ঘাড়ে বেশী বোঝা চাপাবেন না; আর এই হতভাগ্য ভক্তলোক তার জীবনের সর্বশেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আপনাদের হিতের জন্য, সেবার জন্য সব কিছু নিঃশেষে দিতে চায়। আমার জন্য আপনাদের অর্থ প্রার্থনা করছি না আমার যদি উদ্দেশ্য থাকত, কোন কিছু আশা করতাম (অর্থাৎ যে অর্থ আমি পদের জন্য পাই) তা হলে আমি খুব খুশতাম না। আমি নিজেকে অধিকারে ইচ্ছা করতে পারি কিন্তু তাতে অপরে ক্ষীত হবে না। আমি অসুযোগ করি সৈন্য ও রসন পাঠান। আমাদের প্রার্থনা ভুলবেন না। ইতি

ভবদীয় অলিভার ক্রমওয়েল।

প্রথম গৃহযুদ্ধের শেষপর্বে ক্রমওয়েল Ely নামক স্থানের শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় মুর্তিপূজা ও কৃষ্ণধর্মের বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট আইন পাশ করে। Ely-এর ধর্মপ্রাণক আইন বাহিনীতে ধর্মীয় বক্তৃতা দিতেন। সেই ধর্মপ্রাণকের অপরিণামদর্শিতা দেখে ক্রমওয়েল নিম্নবর্ণিত পত্রটি সেই পুরোহিতকে লেখেন। ক্রমওয়েলের নির্দেশ সেই পুরোহিত প্রথমে শেনেননি। ফলে ক্রমওয়েল স্বয়ং সেই পুরোহিতের কাছে যান এবং পুরোহিতের নিবুদ্ভিতাকে তিনি ভৎসনা করেন।

Ely 10. 1. 1643.

শ্রীযুক্ত হিচ,

পাছে সৈন্যরা কোন উত্তেজনা বা উচ্ছ্বল সাহাবণতঃ কাথেন্ডাল চার্চের সংস্কার চেয়ে বসে এই কারণে আপনাকে অসৌজন্যমূলক এবং গর্হিত প্র'খনানভার কাজ হতে বিরত থাকতে আমি বিশেষভাবে অসুযোগ জানাই এবং এর পরে যদি কোন গুণগোল দেখা যায় তবে আপনাকে জবাবদায়ী করতে হবে। আমার উপদেশ হল, মৌখিক পাঠ দিন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দিন যার ফলে পার্লামেন্টকে তারা সন্দেহের চোখে না দেখে, এবং ঈশ্বরের পরম অস্তিত্ব বিষয়ে উপদেশ দিন সকলকে। আশা করি এ-সব আপনি সম্যক ভাবে স্বদয়ঙ্গম করবেন। আমার মনে হয় আপনি খুব বেশী ধর্মপাঠ করেন এবং আপনার ধর্মপাঠের তালিম সাধারণ পর্যায়ের উন্নত ছেড়ে 'মাত্রাতিরিক্ত' হয়ে উঠেছে। ইতি

আপনার প্রিয়বন্ধু, অলিভার ক্রমওয়েল।

রচনাকাল : প্রথম গৃহযুদ্ধের শেষ পর্ব।

পত্রটির শিরোনামের লেখা ছিল আমার প্রিয় ভাই কর্ণেল ডালাটাইন।

কর্ণের ডালাটাইনের সঙ্গে ক্রমওয়েলের সহোদরার বিবাহ হয়েছিল।

League before york, 5th July 1644.

প্রিয় মহাশয়,

বিচারের সময় বা শোকেব সময় ভগবানের গুণগান শ্রদ্ধার সহিত করা উচিত যাতে আমরা একসঙ্গে হুঃখ প্রকাশে সমর্থ হই।

বাস্তবিক ইংলও এবং ঈশ্বরের গির্জাগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে যত আশা ভরসা পেয়েছে, কারণ এ-রূপ ঘটনা যুদ্ধের পর আর ঘটে নি, এ পূর্ণ পরাজয়ের লক্ষণ, আমাদের দল সুখাতঃ ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েছে। আমরা লক্ষণকে আক্রমণ কখনই করি নি তাদের আমরা নিবুল করেছি। কতগুলো বোড়া থাকার জন্য যে দক্ষিণের বাহিনী আমি পরিচালনা করেছিলাম সে-বাহিনী কয়েকজন কটকে আমাদের বাটীর কাছে রক্ষা করেছে আর রাজকুমারের সমস্ত বোড়াগুলোকে আঁবাড় হেনেছে। আমাদের অস্ত্রের কাছে তারা মাঝা নত করেছে। আমাদের বোড়সওয়ার বাহিনী দিয়ে তাদের পদাতিক বাহিনী আমরা আক্রমণ করেছিলাম। বিশদ বিবরণ এখন আমি দিতে পারব না—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, রাজকুমারের কুড়ি হাজার সৈন্যের মধ্যে আর চার হাজারও অবশিষ্ট ছিল না।

মহাশয়, গোলায় বর্ষণে তোমার ছেলে মারা যাওয়ার ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেছেন। তার পা ভেঙে গিয়েছিল। প্রয়োজনবোধে তার পা কাটতে হয়েছিল, তারপর সে মারা যায়। ভাই, বিচার এই ভাবে হয়েছে : আমাকে ঈশ্বর তবুও সাহায্য করেছে—আমরা বিবাদ করছি আর বেঁচে আছি। তোমার অমূল্য ধন আনন্দে পূর্ণ ছিল; হুঃখ আর পাপ তাকে আর জানতে হবে না। সে সাহসী মহাহুতব যুবক ছিল। ঈশ্বর তোমাকে সাহসনা দিক। মৃত্যুর আগে তার এত সম্ভাব ছিল যে সে তার আমার পক্ষে বা আরও কারো পক্ষে বর্ণনা করা অসম্ভব। "ব্যথা চেষ্টাও এ মহৎ"—এ কথা তোমার ছেলে বলেছিল, কিছুক্ষণ পর বলেছিল এক তত্কার তার ওপর বর্ষণেছে। আমি তাকে বললাম সেটি কী? সে বলল লক্ষ সৈন্যদের হত্যা করার হাত থেকে ঈশ্বর তাকে মুক্তি দিয়েছে, এ-তে তার বঙ্গনা লাভব হয়েছে। তার বোড়া মারা যাওয়ার পর গুলীর আঘাতে ভূপতিত হয়। আমি জানালাম আমাদের আরও তিনটি বোড়া ছিল। তাদের ছেড়ে দেওয়া হল এবং তোমার ছেলে বলল দক্ষিণ আর উত্তর দিক উন্মুক্ত করতে—যাতে সে হুবৃত্তদের পালিয়ে যাওয়া দেখতে পার। সৈন্যদলে সকলেই তাকে ভালবাসত যারাই তাকে চিনত—কিন্তু ঈশ্বরে প্রয়োজনের জন্য কমলোক তাকে চিনত; কারণ সে বড় বহিল।

ঈশ্বর বর্গে মহৎ সন্ত, এই জন্য বেশী আনন্দ করার তোমার হেতু আছে। এ-সাহসনা তোমার হুঃখকে নিঃশেষে পান করুক, কারণ এ যা বলছি তা সাহসনার জন্য অর্ধহীন শব্দ নয়—উপরন্ত এ-গুলো বাস্তব, সন্দেহাতীত সত্য। ক্রাইস্টের শক্তিতে তুমি সব কিছু করতে পার। তা খোঁজ, তা হলে তোমার বিচার তুমি সহজে সইতে পারবে। চার্চের দেবতার কাছে তোমার এই কক্ষণ তোমার ব্যক্তিগত হুঃখ উপলক্ষ করবে—ঈশ্বরই তোমার শক্তি হোক এই প্রার্থনা করি—

তোমার বিশ্বাসী অঙ্গগত প্রিয় ভাই
অলিভার ক্রমওয়েল।

রচনাকাল : স্কটল্যান্ডের সহিত যুদ্ধ

Alwinek 17-7-50.

ভাই Richard Mayorকে লিখিত

লগনে আমার অনেক কাজ ছিল বলে আমি নীরব ছিলাম, এর জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এর সাক্ষী শুধু আমি, আপনার বা আপনারদের কোন স্নেহ আমি চাই না কারণ আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করেন। সেই ছোট ছোট কী করে জানাবেন। বাপ মা আমার প্রতি অবহেলা দেখালে দোষারোপ করব না। আমি জানি আমার ছেলেরা অলস কিন্তু এককালে পুতুলের প্রতি আমারও আকর্ষণ ছিল। আমি সন্দেহ করি সত্যিই কী সেই মেয়েটির স্বামী মেয়েটিকে নষ্ট করেছে—প্রার্থনা করি আমার কাছ থেকে সে কিছু জাহ্নুক। প্রচুর সময় আমার হাতে থাকলে তাকে আমি লিখতাম। আমার মেয়ে যদি সম্মান প্রসব করে তবে তাকে ক্ষমা করব, তবে তার লালন পালন বিষয়ে আমার অন্ত মত। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করুক। আমি আশা করতে পারি আমার ছেলেকে আপনি সম্প্রদায় দিচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি এর প্রয়োজন আছে। বয়ঃসন্ধিকাল মানুষের জীবনে সবচেয়ে বিপদকাল। আর তা ছাড়া পৃথিবী অন্ধসারল্য। খুঁটন কাছাকাছি থাকা কত ভাল। তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা ভিন্ন অন্য কোন প্রতিশ্রুতি কাজ নাই। তাঁকে ডাক। তা হলেই তুমি আমার আশা আকাঙ্ক্ষা সূত্রে পালন করতে পারবে। তুমি জান, কত কাজের চাপ আমার ওপর। আমার করণার প্রয়োজন। আমি বৃষ্টি আঁকি কী অনুভব করি। পৃথিবীতে রাজপ্রাসাদ আর ব্যবসাই সব চেয়ে কাম্য বস্তু নয়। আমি পৃথিবীতে সন্তান পেতাম না, যদি না ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাস থাকত। সত্যিই এসব আমি চাইনি। তাদের দিকে তাকিয়ে ভগবান আমাকে এ কাজে নিয়োগ করেছেন। সেই জন্য আশা নাই এমন কথা বলতে পারি না; কারণ পরমপিতা সমাজ প্রাণীকে দিয়ে তাঁর মনের ঈশ্বা পূরণ করেন। তিনিই আমার ভবিষ্যত পূর্ণ করবেন। এক্ষেত্রে আপনার প্রার্থনা আমি চাই। আমার স্নেহের বোনের কাছে, ভাইয়ের কাছে, ছেলের কাছে এবং সংসারের অন্য সকলের কাছে আমি তাদের প্রিয় স্মৃতিমাঝে উদ্ভিত হতে চাই। ইতি—

অলিভার ক্রমওয়েল

স্কটল্যান্ডের সহিত যুদ্ধকালীন অবস্থায় পত্রীকে উদ্দেশ্য করে লেখা। পত্রটাই পত্রের অন্তঃসঙ্গতি।

Edinburgh

12. 4. 1651.

আমার প্রিয়তম,

ঈশ্বরকে প্রশংসা করি, জগতের মানুষ হিসাবে আমার শক্তি আরও বেড়েছে; কিন্তু এ আমাকে তৃপ্তি দেবে না যদি না আমি একটি মানুষকে ভালবাসতে না পারি এবং স্বর্গীয় পিতার সেবা উত্তমরূপে সমাধা না করতে পারি। আর যদি না সেই পরমপিতার মুখ হাতে নিঃসৃত আলোক না দেখি—যে আলো জীবনের চেয়েও তাৎপর্য, এবং আমার নামা হৃৎকর্মের মধ্যেও অধিকতর তাৎপর্য আর এই আশাতেই আমি সজীবিত আয় আমি এমন আশা

করি না যা থেকে আমি ভাল কল পেতে না পারি। আমার তুমি প্রার্থনা কর—আমি সত্যি তোমার উত্তম এবং আমার প্রিয় সংসারের অন্য যোজ্য প্রার্থনা করি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর ও আশীর্বাদ আমাদের ওপর করুন।

প্রিয়তম, ঈশ্বরের অনন্ত করণার কথা মনে রেখ। হতভাগ বেটির কথা ভাবি। আমি ভাবি সে যেম প্রয়োজনবোধে ঈশ্বরের না খুঁজে প্রতি কাজে ঈশ্বরের অভিযুখে সত্যিই সে অগ্রসর হয় যে এবং আরও সান্নিধ্য লাভ করে যেন এবং প্রতারণা থেকে স্নেহ হৃদয়ের প্রতি সে বড় করে যেন; আর পৃথিবীর গর্ব, পার্থিব সংসর্গে প্রতারণার হরত সে সেই খপ্পরে পড়ে—এই সন্দেহই আমি করি আমি বেটির অন্য আর বেটির স্বামীর জন্য সর্বদা আন্তরিকতা সহিত প্রার্থনা করি। বাস্তবিক তারা আমার প্রিয়। আ আমার ভয় হয় পাছে শরতানেরা তাদেরকে প্রতারণা করবে। আ আমাদের অন্তর কত দুর্বল, আর প্রতিকূলে সব কত তুচ্ছ আ আমাদের হৃদয়ের প্রবন্ধনা কেমন আর এই মিথ্যা জগৎ আমাকে প্রলুব্ধ করে থাকে। ভগবানের নিফলক মন তাদের ওপর ও করুক। ঈশ্বরকে সত্যের মধ্যে তারা খুঁজুক এবং তা হলে ঈশ্বরে তারা পাবে।

ছোট ছেলেমেয়েদের আমার ভালবাসা দিও; তারা মুখ সুখী হোক এই প্রার্থনাই করি। তারা পত্র দিয়েছে বলে আ খুশী, তারা আমাকে আরও বেশী পত্র দেয় যেন।

লর্ড হাবার্টের আমাদের পৃহে যন যন আসা বিষয় সাব্যস্ত থেকে। তিনি যদি আসেন কুংসা রটতে পারে এই ভেবে যে আ তাঁর সঙ্গে দর কষাকষি করছি। আমার কথা তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ। আমি আর লিখতে পারছি না—আমি রা নিজেই বিশ্রাম দিই।

ইতি—তোমারই

অলিভার ক্রমওয়েল

রচনাকাল : স্কটল্যান্ডের সহিত যুদ্ধ। পত্রটি পত্রীকে লিখিত
Edinburgh, 3rd May 16.

আমার প্রিয়তম,

এই পদ হতে পদত্যাগ করতে আমি আর্দ্র ইচ্ছুক নই যদিও এ বিষয়ে আমার বেশী কিছু বলবার নাই। তবু আমি প্রিয়তমের কাছে লিখতে আমি ভালবাসি কারণ প্রিয়তম আর অন্তরের মধ্যে রয়েছে। তোমার আত্মা সজীবিত হচ্ছে এক ভাবতেই আমি দীপ্ত হই; ঈশ্বর তোমার ওপর করণা বেশী পরিমাণ করছেন। তোমার অন্তর এই ভাব ভাবতে পারে কারণ ঈ তাঁর যুধনিঃসৃত জ্যোতি তোমার ওপর বর্ষণ করেছেন। আর জীবনের চেয়ে ভাল। ঈশ্বর তোমার প্রার্থনাকে আশীর্বাদ করে এবং অপনের কাছে তোমাকে উদাহরণ হিসাবে খাড়া করেছেন। প্রার্থনা করি ঈশ্বরের প্রার্থনা তুমি শোন এবং সর্বদা সেগুলি গ্রহণ কর

আমি জেনে আনন্দ পেলাম এই জন্য যে ছেলেমেয়েরা তোমার কাছে আছে। আমি আশা করি ভাল পরামর্শ শোনবার সুখে দেবে ছেলেকে। আমার কর্তব্য মায় প্রতি আছে, এ কথা মা জানিও। সংসারের অন্য সকলকে আমার কথা বল আর আমার প্রার্থনা কর।

ইতি—

তোমার অলিভার ক্রমওয়েল

পত্রটি ক্রমণ্ডলে কর্তৃক লিখিত। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনি পার্লামেন্টের সর্বময় কর্তারূপে সম্মানিত ছিলেন। এই সময়ে ইউরোপীয় শক্তি ইংলণ্ডের বিপক্ষে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেই কারণে তিনি পত্রকে লেখেন এ বিষয়ে অবহিত করার উদ্দেশ্যে। পত্র হারীকে তিনি আয়ারল্যান্ডের সর্বপ্রধান সামরিক পদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

Whitehall.

26th August 1656

পুত্র হারী,

কয়েকজনের হুম থেকে তনুলায় যে পুর্বাতন শত্রুর আয়ারল্যান্ড এবং ক্রমণ্ডলেখের অপরাধের জন্য আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে—আর শত্রুপক্ষ জাতীয়তাবাদী লোকেরা বহু পত্র লিখতে বাতলে করে সেই খানে হঠাৎ বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সুতরাং আমরা এই ভাবতে পারি যে তুমি যথার্থ উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছ—যাতে করে আমাদের শক্তি যে কোন অবস্থার উদ্দেশ্যে হয়ে বসে আছে। আর সেই প্রান্তে তুমি যত বেশী পার তত বেশী পরিমাণে আয়ারল্যান্ডের কাহিনীর সঙ্গে যোগ রাখবে—আর সৈন্যবাহিনীর দুটি তিনটি দল বেশ বৃহৎ অংশে ছড়িয়ে রাখার—প্রয়োজন বোধে যাতে করে আমরা সাহায্য পেতে পারি। আর ও বিষয়ে তুমি যত্ন নেবে সব চেয়ে ভাল যত্ন নেবে যার ফলে শত্রুদের ব্যর্থ ভেদ করা যায় এবং যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করা যায়—আর এই উদ্দেশ্যের দিকে বিশেষ বন্দোবস্ত করতে হবে—সেখানে নানা অসন্তোষ ও কর্তৃত্বকর্মী লোক নতুন আলোড়নের উদ্দেশ্যে, আর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমি সন্দেহ করছি না, তা হলেও তুমি কর্ণেল কাওপারের কাছে এ সংবাদটা জানাবে। পরিশেষে এই বিপদ বিষয়ে তিনি আরও পরিশ্রম করবেন এবং সাবধান হবেন।

ইতি—

তোমার স্নেহময় পিতা।

Cockpit, Liverpool
17. 12. 60

হারীকে লিখিত ঐমতী এলিজাবেথ ক্রমণ্ডলের পত্র।
প্রিয়তম,

আমি ভেবে অস্বাভাবিক হই যখন তুমি এই বলে দোষারোপ কর যে তোমাকে আমি প্রায়ই চিঠি লিখিনি—বিশেষতঃ সেই সব ক্ষেত্রে যখন তোমার একটা পত্র পেয়ে তোমাকে তিনখানা পত্র লিখেছিলাম। আমি ভেবে নিশ্চিত যে পত্র কৈবল্য লাভ করেছে। পাছে তোমার প্রতি এই কাজে আমার অবহেলা ফুটে ওঠে যদি সত্যিই আমি নিজেকে কোন থাকি তা হলে বলতে পারি আমি পত্র না লিখে থাকতে পারি না। তুমি কি ভাবতে পার পত্র না দিয়ে তোমাকে অবহেলা জানাব? এর চেয়ে আমি আশাকে অবহেলা প্রদর্শন করব।

বিশ্ব প্রিয়তম, যখন তোমাকে পত্র দিই তখন তোমার পত্রের উত্তরে খারাপ কিছুই লিখি না। আর একথা ভাবতেই আমার মনে হয় তোমার কাছে আমি নগণ্য এবং আমার অক্ষমতা ও হর্বলতাকে তোমার প্রেম ঢেকে রাখে।

তুমি যে আমাকে দেখতে চেয়েছ এর উদ্দেশ্যে আনন্দ আমার হচ্ছে। তবু ঈশ্বরের করুণার কাছে নিজেকে আমি সমর্পণ করব যিনি আমাদের দু' জনের মধ্যে বিচ্ছেদ এনেছেন এবং ঈশ্বর কৃপায় আমরা আবার মিলিত হব। তাই তার নাম আমরা করব। সত্যি তোমার অসুস্থতায় আমার জীবন অর্ধেক বলে মনে হয়। ঈশ্বর এ-ও কী তাঁর নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেন বা আমি তার মহত্ত্বের উদ্দেশ্যে স্বীকার করব?

তুমি ভাবছ অল্প জনের কাছে আমি লিখব বাদে কথা আমার মনে আছে। প্রিয় নিজে ভুল করে ভেবে না যে আমি তোমাকে ক্রম পত্র দিই, আমি প্রার্থনা করি তুমি তোমার অসুস্থতাকে মনে রেখ।

ইতি—

তোমারই এলিজাবেথ ক্রমণ্ডেল।

এই সেই—সে তো নেই

শেখ সিরাজুদ্দীন আমেদ

স্মৃতির পাহাড় হাতে পথ এঁকে-বঁকে
চলে গেছে দু' ঐ বিশ্বাসের জলে
জীবনের সব ফুল সব বরা পাতা
গ'ড়ে গেছে পথ'পরে শবের মিছিল
কিছু তার ঢাকা আছে ধুলির চাদরে
কিছু তার কিছু বাকী নেই
কিছু সব ব'য়ে আনে কড়ো হাওয়া জলে
জলে-গলা স্মৃতিপট রোমন্থন করে
যরা পড়ে বরা পাতা ;
স্মৃতি পথ আলতো কোরে হেঁটে
আচমকা কিরে এসে ভাবি
—এই সেই,—কই, সে তো নেই।

সিরিয়ার জাগরণ

সেক্সাউল কর্ণওয়ালিস

সুহ প্রাচীন লেখ বিলুপ্ত হয়েছে কালের অস্ত পর্বে। তাদের সত্যতা, সংস্কৃতি, শিল্পসাহিত্যের কোন মিশ্রণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বহু গবেষণা করে তাদের স্মৃতির ইতিহাসের বঙ্গামাভ উদ্ধার করেছেন, যেগুলি স্মৃতির সত্যের সবচেয়ে আর বিশ্বের কিছু জাতির উপায় মাই। সিরিয়া এখন একটা অসহায় দেশ। বহু শতাব্দী ধরে মাদ্রা ভাবে বিভিন্ন পথে পথিক্রমা করতে করতে ধীরে ধীরে সিরিয়ার সত্যতা পড়ে উঠেছে। সিরিয়ার উপত্যকা, তার পাহাড়-পর্বত, তার বিপুল-প্রমিত মরুভূমি, তার নদীমালা, লাক্ষা দেব বে, সিরিয়া আদিমুপে মাদ্র-সত্যতার ভাঙায়ে অনেক কিছু দান করেছে।

কাল বড় কঠিন বিচারক। কালের কুটিল কশাঘাতে ও তার অসহায় বিচারে বহু জিনিস ধ্বংস হয়ে গেছে। এই কালের অসহায় হাতে সিরিয়ার প্রাচীন সত্যতার বহু মিশ্রণ আজ লুপ্তপ্রায়। আধুনিক যুগে বিবিধ প্রকার ধননকার্যের ফলে প্রতি বছর সিরিয়ার বলিষ্ঠ অধিবাসীদের গৌরবের বস্তগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। সিরিয়ার উপর কত বিজয়ী জাতির অভিযানের ঝড় বয়ে গেছে। কত আক্রমণকারীর দুর্ভাগ্য খাড়া পড়েছে তার উপর। কিন্তু এসব সহ করেও দীর্ঘ যুগ ধরে সিরিয়া বহু সংস্কৃতি ও সত্যতাকে গ্রহণ করেছে। এর ফলে এখানে একটা সামগ্রিক ও সম্মিলিত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বস্তুতঃ, সিরিয়া বরাবর একটা উন্নত সত্যতার মানদণ্ড বজায় রেখেছে।

সিরিয়া প্রাচীন সত্যতার অস্ততম কেন্দ্র-বিন্দু। অস্তিত যুগের প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে জানা যায় যে, সেই আদিমুপেও এখানকার অধিবাসীরা একপ্রকার বহু আবিষ্কার করেছিল, তারই সাহায্যে তারা উন্নত ধরণের চাষ করত। সমুদ্রের তীরে তীরে দাঁড়বাহী জাহাজে করে তারা ব্যবসায় বাণিজ্য করত। এরা মুস্তিকা ও প্রস্তর দিয়ে বড় বড় স্ট্যাটুয়িকা ও সুলব সুলব বাসভূমি নির্মাণ করত। তারা ধাতুর ব্যবহার জানত এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তু ধাতু দিয়ে তৈয়ার করত। অতি প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে অজাববি সিরিয়া একটা জাগ্রত ও জীবন্ত সভ্যতা বজায় রেখেছে। বিশ্বের ইতিহাসের উপর তার সত্যতার ছাপ দেদীপ্যমান। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে সিরিয়ার ইতিহাস সংক্ষেপে তৎকালজাত বিশ্বের ইতিহাস।

সিরিয়ার প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস অস্বকারাজ্বর। প্রাচীন যুগে সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বারা বসবাস করত, তারা ছিল শেমিটিক জাতির পৌত্রিতুল্য। এই শেমিটিকগণ খৃষ্টের আগের তিন হাজার বছর পূর্বে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল থেকে এতদঞ্চলে এসেছিল। শেমিটিকদের এই শাখা অ্যামোরাইট (Amorites) বলে অভিহিত অ্যামোরাইটদের বসতি স্থাপনের বহু পূর্বে থেকে সিরিয়া ও মিশর বরাবরই আরবদেশের সহিত সংস্রব রক্ষা করে চলত। আরব উপদ্বীপ থেকে প্রতিবছর জনশ্রোত সিরিয়া অভিমুখে বাবিত হত।

উর্বরতা আর কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান এই দুটি কারণে সিরিয়া বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত অস্থূল দেশ ছিল। মিশর, গ্রীস, গ্রীস এশিয়া মাইনর, মেসোপটেমিয়া, পারস্ত, এয়ন এই সব দেশের সহিত সিরিয়ার প্রচুর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বহু বারাবর জাতির নিকা সিরিয়া প্রকোভনের বিবর হয়ে পড়েছিল। সিরিয়ার দক্ষিণপ্রাণে ছিল বিখ্যাত মরুভূমি। সেই মরু আরবদের উপজাতিগুলি বহুই জনসংখ্যার ছাপ অস্থূল করত, তখনই তারা মরুভূমি পার হয়ে সিরিয়া চলে আসত এবং বসতি স্থাপন করত। এই সব প্রাচীন জাতি ও উপজাতির পৃথক মায় ছিল, তাদের পৃথক সত্যতা ছিল বস্তু বটে, তারা বিভিন্ন সময়ে সিরিয়াতে বসবাস আরম্ভ করেছে। কিন্তু একই দেশে বহুদিন বাস করার ফলে তাদের মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী যুগে এই সব সম্মিলিত জাতি উপজাতিগুলি "নেমাইট" নামে অভিহিত হয়েছে। একথা মত্যা যে এদের অনেকে আরব-বংশসমূহ। কিন্তু কালক্রমে তারা সিরিয়াতে একই জাতিতে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীযুগে সিরিয়া এরম স জাতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, বারা আরবও মর, শেমিটিকও মর তারা ছিল হিটাইটস (Hittites) এবং হুরিয়ানস (Hurrians) এ খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগে এশিয়া মাইনর থেকে সিরিয়া বসবাস করার জন্ত এসেছিল। মহাবীর আলেকজান্ডারে সিরিয়া অধিকারের পর বহু গ্রীস এখানে বসবাস আরম্ভ করল এর পরে রোম বহু দীর্ঘকাল পর্বত সিরিয়া দখল করে ছি তখনও বহু গ্রীক এখানে বসতি স্থাপন করে ছিল। সিরিয় সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, উক্ত দে পালক্রমে মিশর, পারস্ত, ও বাইজানটাইন কর্তৃক বহু বার অধিকৃত হয়েছিল। কিন্তু এত সব বৈদেশিক অভিযান ও অধিকার সবে সিরিয়া সকল সময় আরব উপদ্বীপের সঙ্গে বন্ধন অটুট রেখেছি এবং এর শেমিটিক কালচারকেও সংস্কৃত রক্ষা করেছিল। সিরিয় অধিবাসীদের অ-শেমিটিকগণ এর সত্যতা ও জাতীয় ভাবের দ্বা প্রভাবিত হয়েছিল।

সিরিয়ার উপর যে সব বৈদেশিক শাসক দীর্ঘকাল ধরে রাই করেছে, তাদের পরিবর্তন হয়েছে, তাদের পতন হয়েছে, তা এসেছে আর চলে গেছে। কিন্তু সিরিয়ান জাতি বরাবর জিত্তির উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারা এক সুস্পষ্ট জাতীয়তার মান রক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়, তা শেমিটিক আরবজাতির সহিত সম্পর্ক রক্ষা করেছে। তাদের উ বৃদ্ধ হয়েছে, বিপর্যয় এসেছে, পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও হয়ে —এই সব উপদ্রব সমগ্র ভৌগোলিক সিরিয়াকে একটা রাজনৈতিক ঐক্য দিতে পারেনি, কিন্তু তবুও সিরিয়ার অধিবাসিগণ বিশ্বসত্যতা ভাঙায়ে কিছুটা দান করতে পেরেছে।

অ্যামোরাইটগণই প্রথম বৃহৎ সত্যজাতি, বারা খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার থেকে আড়াই হাজার বছরের মধ্যে সিরিয়াতে বসতি স্থাপন করেছিল। আলেক্সো অঞ্চলের চতুর্দিকে, তারা ছোট ছোট রা স্থাপন করে। অ্যামোরাইটগণের সমসাময়িক কালে ইউফ্রে নদের অববাহিকা ও মেসোপটেমিয়াতে বসতি স্থাপন ব ক্যানানাইটগণ (Canaanites) এদের কিছু অংশ প্যালেষ্টাইনে এসেছিল। এই অঞ্চলে তারা কয়েকটি নূতন নূতন নগর স্থাপন করল, তাদের মধ্যে জেরুজালেম এক হিব্রন (Hebr

উল্লেখযোগ্য। ক্যানাডাইটগণের একটি শাখা ভৌগোলিক সিরিয়ার নদীতীরবর্তী অঞ্চলের উত্তর দিকে বসবাস করতে থাকে। এসবকে সাধারণতঃ কিনিসিয়ান বলা হয়। সভ্যতার ভাণ্ডারে কিনিসিয়ানগণ যথেষ্ট দান করেছে—তারা এই অঞ্চলের বর্তমানের প্রথম উদ্ভাবক। বৌ-বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্ভূত তারা এই করেছিল সে যুগে।

খৃষ্টপূর্বের অষ্টম শতাব্দীর পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে আরম্ভেরানগণ (Armaeons) সিরিয়াতে বসবাস করতে থাকে। তারা সিরিয়ার উত্তর দিকে শামালের (Shamal) দ্বারা ভাঙে হামা (Hama) এবং দক্ষিণে হামেডমদনের পত্তন করে। আরম্ভেরানগণ এই অঞ্চল সভ্যতার দৃষ্টি নিদর্শন যেনে খেছে—স্থাপত্য ও বাণিজ্যের ভাষা। তারা বড় বড় নগর নির্মাণ করেছে। তাদের সাংস্কৃতিক ছিল উচ্চতর। দেশ বিদেশে তারা বাণিজ্য বিস্তার করেছিল। তাদের ব্যবহৃত বাণিজ্যিক ভাষা আরও প্রচলিত। তারা সিরিয়াতে একটা সুগঠিত পৰ্যটনমণ্ডলের আদর্শ স্থাপন করেছে। খৃষ্টপূর্বের সময় সিরিয়ার সাধারণ ভাষা ছিল আরামাইক ভাষা। বর্তমান সিরিয়ার ভাষা সেই আরামাইক ভাষা থেকে উৎপন্ন। এই ভাষা আরবী ভাষার সঙ্গে আজও জীবিত আছে। এখনও সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন ভাবে আরামাইক ভাষা দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে ব্যবহৃত হয়। খৃষ্টপূর্বের দ্বাদশ হাজার বছরের শেষের দিকে হিরিয়ানগণ এবং হিটাইটগণ সিরিয়া আক্রমণ করে। এ-ছোটো জাতি শেমিটিক জাতি ছিল না এবং এরা বেসীদিন সিরিয়াতে বসবাস করেনি। তবে এদের কিছু নিদর্শন সিরিয়াতে অক্ষুণ্ণ ছিল। অতঃপর শেমিটিক জাতির অপর একটি শাখা এমিরিয়ানগণ (Amyrians) সিরিয়ার উপর বস্তার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই নতুন শেমিটিকগণ এখানে চার শ' বছর প্রভুত্ব করেছিল। সভ্যতার ভাণ্ডারে তারা বেশী কিছু দান করতে পারেনি। অতঃপর পারসিকগণ সিরিয়া অধিকার করল; এবং খৃষ্টপূর্বের চার শত বছর পর্যন্ত তারা এই সেখানে প্রভুত্ব করেছিল।

তারপর এস ম্যাসিডোনিয়ার কর্তৃত্ব। খৃষ্টপূর্বের তেত্রিশ শতাব্দীতে মহাবীর আলেকজান্ডার সিরিয়ার উত্তর সীমান্তে পারসিক সৈন্যগণকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করলেন। এবং রণক্ষেত্রের একটি স্থান নির্ধারণ করে সেইখানে তাঁর বিজয়ের নিশানস্বরূপ আলেকজান্ড্রোপল নগর স্থাপন করলেন। সে-নগর আজও বিস্তারিত। এই ঘটনার পর সমগ্র ভৌগোলিক সিরিয়ার রাজনৈতিক ভাগ্য পশ্চিম দেশের সহিত জড়িত হয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে সিরিয়াবাসিগণ নিজদের সভ্যতাকে ধ্বংস হতে দিল না। আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারিগণ সেলুকাইড (Selukides) নামে অভিহিত। এরা এই অঞ্চল শাসন করতে লাগল। তারা লাটাকিয়া, আন্টিওক, আপামেরা, এই সব বড় বড় নগরের পত্তন করে। একদিকে মিশর ও অপর দিকে মেসোপটেমিয়ার সহিত সিরিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ত ছিলই, তত্পরি গ্রীক সভ্যতার সম্পর্কে সিরিয়ার সভ্যতা একটা নতুন রূপ গ্রহণ করল। হেলেনিক সভ্যতা ও সিরিয়ান সভ্যতার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। এই যুগে কয়েকজন বড় বড় পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল। সিডনের বিখ্যাত দার্শনিক জেনো (Zeno) এবং তাঁর শিষ্য, বিখ্যাত জেনো, সিরিয়াতেই

অনুগ্রহণ করেন। তাঁরা দর্শনের উদাসীন সঙ্কলার (stoics) স্থাপন করেন। তাঁদের দর্শন গ্রীক দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গ্রীকদের পতনের পর রোমকগণ সিরিয়া অঞ্চল অধিকার করে। খৃষ্টপূর্বের অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে রোমকগণ প্রায় সমগ্র সিরিয়া অধিকার করে ফেলল। তারা প্রায় চার শ' বছর ধরে সিরিয়া শাসন করেছিল। তারপর রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনে বিভক্ত হয়ে পেল। পূর্বাঞ্চলের রোমান সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠিত হয়ে পড়লেন বাইজান্টাইন সম্রাটগণ। এঁদের যুগে কতিপয় সিরিয়ার প্রভাবশালী ব্যক্তি রোমের সম্রাটপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। সেপটিমাস সেভেরাস (Septimus Severus), প্রথম সিরিয়াবাসী, তিনি রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন কার্থেজের কিনিসিয়ান বংশদ্ভূত। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী জুলিয়া ডোমনা (Julia Domna) সিরিয়ার মেয়ে। সম্রাট তাঁকে অগাধা উপাধিকার করেন। পরে তাঁদের পুত্র কারাকুলা সম্রাট হয়েছিলেন। এর পর সিরিয়ান বংশদ্ভূত আরও কতিপয় ব্যক্তি রোমান-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রোমে সিরিয়ান সম্রাটগণের রাজত্বকালে সিরিয়ার নগরে নগরে বড় বড় কটালিকা নির্মিত হয়েছিল। তাঁদের নির্মিত বহু মনুমেন্টের ধ্বংসাবশেষ আজও পালমিরা, রেপ্তা, দামেস্ক ও আন্টিওকে দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রীক-রোমান যুগে দর্শনে, স্থাপত্যে, সাহিত্যে, কবিতায় বহু সিরিয়ান সুনাম অর্জন করেছেন। সিরিয়া ইউরোপকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ দিয়েছে, তা হচ্ছে খৃষ্টধর্ম। দক্ষিণ-সিরিয়ার প্যালেষ্টাইনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, মহাত্মা খৃষ্ট। আন্টিওক থেকে সেই ধর্ম ধীরে ধীরে গ্রীক-জগতে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। তারপর সারা ইউরোপ খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করল। সিরিয়ার উপর গ্রীস ও রোমের প্রভাব দীর্ঘকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তবুও সিরিয়া তার উপর থেকে আরব-প্রভাব নষ্ট হতে দেখেনি। রোমের নির্মিত থিয়েটার, বিজয় সৌরণ ও বড় বড় কটালিকা দেখে আরবগণ চমকিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু তবুও সিরিয়ার আরবগণ তাদের বৈশিষ্ট্য হারাননি।

সিরিয়ার সহিত আরব উপদ্বীপের ও আরব জাতির সম্পর্ক প্রাচীন ও গভীর। খৃষ্টপূর্বের পঞ্চম শতাব্দী থেকে আরবগণ সিরিয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। পরবর্তী যুগে মক্কাতে বধন ইসলামের বাণী ঘোষিত হল, তখন সিরিয়া রোমকদের অধীনে ছিল। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর সিরিয়াকে বাইজান্টাইন রোমকদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে খালিদ ইবনে ওলিদ এবং তৎপরে ওবায়দুল্লাহের নেতৃত্বে আরব-বাহিনী সিরিয়ার দিকে ধাবিত হল। তারা ইরাকের যুদ্ধে একটা সুগঠিত সৈন্যসমূহ তৈরি করল। তারপর সমগ্র সিরিয়া আরবদের হস্তগত হ'ল। অতঃপর সিরিয়া আরবভূমিতে পরিণত হ'ল।

উমাইয়া বংশের খলিফাগণ বধন কমতা হস্তগত করলেন তখন তাঁরা দামেস্কে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। তাঁদের শাসনকালে সিরিয়ার ইতিহাসে নতুন যুগ আরম্ভ হল। সিরিয়া হয়ে পড়ল সমগ্র আরব মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। দামেস্কের আরব শাসকগণ একটা সুগঠিত রাষ্ট্র স্থাপন করলেন। তাঁরা

সাম্রাজ্যের জন্ম এমন একটা পলিসি গ্রহণ করলেন যা দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে গেল। তাঁরা সাহা ও জাভয়ের ভিত্তিতে একটা নতুন সমাজ গড়ে তুললেন। বহু উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করলেন। নামেতে প্রতিষ্ঠিত আরব রাষ্ট্র একটা সুদৃঢ় রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। শাসকগণ জাতীয় আরকে নাগরিকদের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করলেন। জাতীয় নিরাপত্তা-রক্ষা ও সম্পদ-বৃদ্ধির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করলেন।

উমাইয়া কব্বের পতনের পর আব্বাসীয় কব্ব বখন বাগদাদে নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন সিরিয়ার রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হল। এটা একটা প্রদেশে পরিণত হল। সিরিয়াবাসীগণ বড় বড় চাকরী থেকে বঞ্চিত হল। আব্বাসী খলিফাগণ পারসিকদের উপর অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করল। তবে প্রথম যুগের আব্বাসী কব্বের খলিফাগণ সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অঙ্গভূমিকে অবহেলা করেন নি। তাঁরা এর বন্দরগুলির সংরক্ষণ সাধন করলেন। যাতে বাইজানটাইনগণ সহজে আক্রমণ করতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সিরিয়ার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এ সব অঙ্গল সুরক্ষিত করার জন্য খলিফা হাফস-অর-রশিদ, প্রতি বছর একবার সিরিয়া পরিদর্শন করতেন।

আব্বাসীদের শাসনকালে সিরিয়ার শাসনকার্য বেশ ভাল ভাবেই চলছিল। কিন্তু খলিফা আলমুতাসিমের সময় আব্বাসীয়গণের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে এল। তাঁর মৃত্যুর পর ধারা খলিফা হলেন, তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। ধারা আরব-বংশ-সম্মত নয়, এমন সব লোকের হাতে ক্ষমতা চলে গেল। তাদের দুর্বলতার কারণে গোটা সাম্রাজ্যটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের ঐমেভাগগণ ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে লাগল। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর সিরিয়াতে শান্তি ফিরে এল বটে কিন্তু পূর্বদিক থেকে দুর্বীর বেগে তাতার আক্রমণ সিরিয়ার মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে দিল। এর কিছুদিন পর মেমলুক বা দাসবংশীয় রাজারা সিরিয়ার উপর বৃত্ত্ব লাভ করল। এই বংশের রাজারা তাতার বা মোগল আক্রমণকে বাধা দিলেন। মেমলুক বংশ মিশর ও সিরিয়ার উপর প্রভূত্ব স্থাপন করল। মেমলুকগণ তিনশ বছর রাজত্ব করেছিল, তাইপার তুরস্কের ওসমানীয় বংশের সুলতান সেলিম ১৫১৬ সালে মিশর ও সিরিয়া অধিকার করলেন। এর পর থেকে সিরিয়ার ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল।

১৫১৬ খৃষ্ট-অব্দ থেকে ১১১৮খৃষ্ট-অব্দ পর্যন্ত চারশ-বছর সিরিয়া ও অপরপূর্ব আরবদেশগুলি ওসমানীয় বংশের তুর্কি সুলতান কর্তৃক শাসিত হয়ে আসছিল। সিরিয়াতে তুর্কি অধিকারের প্রথম যুগ ইউরোপের বিনেসাল এবং ভৌগোলিক আবিষ্কার এই দুটোই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভৌগোলিক আবিষ্কার আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের পথকে সিরিয়া ও আরব দেশ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর ও কুমারিকা অঞ্চলের দিকে নিয়ে গেল। এর পর এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল, ধার কলে আরব-জগত পশ্চিম দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আরব দেশসমূহ পশ্চিম দেশের ক্রমপ্রসারশীল সভ্যতার সম্পর্ক থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে চলে গেল। সুতরাং এখন হতে দেশের বৃহৎ নেমে এল অন্ধকার যুগ। আরবগণ নতুন সভ্যতার

আত্মবিশ্বাস হারা। আরব দেশ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ভাবে পশ্চিম দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। কিন্তু সিরিয়া তুর্কি সাম্রাজ্যের একটা অর্থনৈতিক সম্পদের কেন্দ্র হয়ে থাকল আরও বহুকাল পর্যন্ত। যদিও তুর্কি যুগ সিরিয়ার পক্ষে একটা নিশ্চল যুগ ছিল, তবুও সিরিয়াবাসীগণ বরাবরই স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বতন্ত্রতা জন্ম আন্দোলন করেছিল। এই সব আন্দোলনের মধ্যে কাকুর্দিন আলমা-আলির আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর রাজ্য জর্ডন ও প্যালেষ্টাইনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁরই মত "আল-আহার-আল ওয়র" আর একজন বিদ্রোহী নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন "একর" প্রদেশের শাসনকর্তা। তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তুর্কি-শক্তিকে অগ্রাহ্য করে সংগ্রাম করেছিলেন। এ দুজনের চেয়েও শক্তিশালী আন্দোলন আরম্ভ করেন আমীর এশির আলশিহাবী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ১৭১০ থেকে ১৮৪০ খৃষ্ট-অব্দ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর ধরে আমীর এশির লেবাননের উপর কর্তৃত্ব করেন। তিনি কখনও হির হয়ে বসে থাকেননি। তিনি অনবরত তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রাণ করতে থাকেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়াকে তুর্কি-শাসন-কবল থেকে মুক্ত করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সকল উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গেল। সর্বশেষ প্রচেষ্টা হয়েছিল ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে। তিনি ১৮৩১ সালে সিরিয়া থেকে তুর্কি শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য নতুন আন্দোলন আরম্ভ করলেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। তাঁর ব্যর্থতার প্রধান কারণ ইউরোপের কয়েকটি শক্তি তুর্কির সুলতানকে সাহায্য করেছিল।

১১২০ সালের পূর্বে বর্তমান সিরিয়ার ইতিহাসে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু তার পর থেকে সিরিয়ার ভাগ্যে নানা বিপর্দায় ঘটে গেল। আধুনিক সিরিয়ার সহিত আরব জাতির জাগরণের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য জড়িত। এক দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, সিরিয়ার জাগরণ আরব জাতির জাগরণ। এইখানেই আরব জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। আরব জাতীয়তাবাদের বহুনা ও আবাঙ্কা প্রথমে সিরিয়াতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সিরিয়ার বর্তমান ইতিহাস চারটে সুস্পষ্ট অংশে বিভক্ত — (১) আরব জাগরণের যুগ, (২) করানী ম্যানডেটের যুগ, (৩) স্বাধীনতার যুগ, (৪) মিশরের সহিত ঐক্যের যুগ।

সুদীর্ঘ কাল ধরে তুর্কি সুলতানগণ সিরিয়া শাসন করতেন। তাঁরা নানাপ্রকার ভেদনীতির ধারা আরব-জগতকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেননি। কিন্তু তৎসম্বন্ধে সিরিয়া তার জাতীয়তার আদর্শ পরিত্যাগ করেনি। এবং আরব-জগতের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের আদর্শ প্রচার করেছে। আরবদের সহিত তাদের প্রধান বন্ধন ছিল আরবী ভাষা ও আরবী কালচার। তাদের এই ভাষা ও কালচার তাহাদিগকে অন্ধকার যুগের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে রক্ষা করেছে। সিরিয়া এবং আরবদেশ পুনরায় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই তাদের সাংস্কৃতিক জাগরণের আভাস পাওয়া যায়। তুরস্কের ক্ষমতা বখন স্নান হতে লাগল, তখন সিরিয়ার নেতারা উপলব্ধি করলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করার সুযোগ উপস্থিত। তাঁরা একটি "জাতীয় আরব পার্টি" গঠন

করলেন। এর উদ্দেশ্য হল আরব দেশকে তুর্কি-শাসন থেকে মুক্ত করা। জাতীয় দলের নেতাদিগকে তুর্কি সরকার কঠোরভাবে নির্ধাতিন করতে লাগল। কাউকে দিল ফাঁদী, কাউকে করল নির্ধাসিত। কিন্তু তবুও আন্দোলন দমল না। প্রথম মহাসময়ের সময় আরবগণ দেখল যে, তুরস্কের উপর আঘাত হানবার সময় ও ক্ষণ উপস্থিত। মক্তাব শরীফ হোসেন তুর্কি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সমগ্র আরবজাতি তাঁর আহ্বানে উৎসাহের সহিত সাড়া দিল। একটি আরব-বাহিনী গঠিত হল। এই সৈন্যবাহিনী মিত্রপক্ষের সহিত সহযোগিতা করে সংগ্রাম আরম্ভ করল। তারা ১৯১৮ সালে সর্গোরবে দায়েরে প্রবেশ করল। বিজয়ী বেশে আরবসৈন্যের দায়েরে প্রবেশ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অতঃপর সমগ্র আরব-জগত তুর্কির কবল থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেল। তুর্কি জাঙ্গাল মিতালির বিরুদ্ধে সিরিয়া তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিল। সিরিয়ার স্বেচ্ছাসেবক দল সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলে অত সহজে মিত্রপক্ষ জয়লাভ করতে পারত না। জেনারেল এলেনবির সৈন্যদলকে আরব জাতীয়তাবাদিগণই আমল সাহায্য করেছিল। তাদের তুর্কিবিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে, তারা ধর্ম-নেতা খলিফার বিদ্রোহাচরণ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

কিন্তু আরবদের আন্তরিকতার সুযোগ নিয়ে জয়লাভ করলও মিত্রপক্ষ তাদের প্রতি বে-বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ইতিহাসে তার নজির নাই বললেই চলে। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে যখন সিরিয়ার অধিবাসিগণ নূতন স্বাধীনতার উৎসব পালনে মহাব্যস্ত, যখন সিরিয়ার সিংহাসনে হোসেমের পুত্র ফাইসালের রাজ্যাভিষেক-উৎসবে অধিবাসিগণ মত্ত, এবং যখন প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌক দক্ষায় উৎসাহিত জাতির অন্তরকে স্বাধীনতার আশায় উদ্দীপিত করে তুলেছিল, ঠিক সেট সময় পশ্চিম দেশের সাম্রাজ্যবাদিগণ, আরব-জগতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। তারা মাইক-পিফট গোপন চুক্তিকে কার্যকরী করার জন্য কক্ষচঞ্চল হয়ে উঠল। এই চুক্তি আরব জগতে বুটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করার ব্যবস্থা করল। প্রভাবাধীন অঞ্চল বলে বুটেন লাভ করল মেশোপটেমিয়া আর ফ্রান্স লাভ করল সিরিয়া। ইতিমধ্যে বালকুর ঘোষণার কথাটাও জানাজানি হয়ে গেল। এই ঘোষণার ফলে প্যালেষ্টাইনে ইহুদি রাজ্য স্থাপনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। বালকুর ঘোষণাই সিরিয়ার বর্তমান গণগোল ও ট্রাজেডির মূল কারণ। যখন শেরিক হোসেন, বুটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ করলেন, তখন তাঁকে বন্দী করে সাইপ্রাসে নির্ধাসিত করা হ'ল। সেইখানে গুপ্তমনোরখে তিনি দেহত্যাগ করেন।

সিরিয়া পেল নামমাত্র স্বাধীনতা। গোপন চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স সিরিয়া অধিকার করল। এই ভাবে সিরিয়ার উপর ফ্রান্সের ম্যানডেট চাপান হ'ল। সিরিয়ার উপর বিদেশী শাসনের আর একটি নূতন যুগ আরম্ভ হল। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পর্যন্ত সিরিয়াকে ম্যানডেটের চাপ সহ করতে হয়েছে। ফ্রান্স এই দেশকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করল এবং তাদের উপর বোর্দো প্রত্যাপে রাজত্ব করতে লাগল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী সিরিয়ার অধিবাসিগণ এই ম্যানডেটকে স্বীকার করে দিতে সম্মত হল না। তারা অহরহ বিদ্রোহ ও নাশকতাবূলক

পন্থতির দ্বারা ফ্রান্সকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। অবশেষে ১৯২৩ সালে সমগ্র দেশের জন্য সংবিধান রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠিত হল। কিন্তু এর কাজ শেষ হতে না হতে করাসী হাই-কমিশনার একে বরখাস্ত করে দিলেন। তিনি সিরিয়ারবাসীদের রচিত গণ-পরিষদের নানারূপ পরিবর্তন সাধন করে তাকেই গ্রহণ করার জন্য আদেশ জারি করলেন। করাসীদের সমর্থিত এই সংবিধান অনুসারে একটা সাধারণ নির্বাচনও হয়ে গেল। তাতে ফ্রান্সের বিরোধিতা সত্ত্বেও বহু জাতীয়তাবাদী নেতা নির্বাচিত হলেন। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে কয়েকবারই নির্বাচন হয়েছিল। এই সব নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক স্বাধীনতাবাদিগণই অধিকাংশ আসন দখল করল। তারা কিছুতেই ফ্রান্সের কাছে নতিস্বীকার করেনি। এবং বহু সংগ্রামের পর সিরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করে তুলল। ১৯৩৬ সালেই কবাসীগণ বুঝতে পারল যে সিরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করা তাদের স্বার্থের জন্য একান্ত দরকার। তাদের সঙ্গে একটা সাময়িক সন্ধির জন্য আলোচনাও হতে লাগল। কারণ, সিরিয়ার স্বাধীনতার দাবী আর অগ্রাহ্য করা যায় না। ১৯৩৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর একটা সন্ধি হ'ল। কিন্তু ফ্রান্সের পার্লামেন্ট সে সন্ধিপত্র অনুমোদন করল না। সুতরাং সিরিয়াতে আবার গণগোল বেধে উঠল।

ইতিমধ্যে এল দ্বিতীয় মহাসমর। সিরিয়ার প্রতিরোধ-শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯৪৩ সালে আবার একটা সাধারণ নির্বাচন হ'ল। তার পর বসল একটা নূতন পার্লামেন্ট। সিরিয়া প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হ'ল এবং শাকসী আলকাতলী এই প্রিপাবলিক রাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আলকাতলীর অধীনে যে জাতীয় সরকার গঠিত হ'ল, সে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে করাসী শাসনযুক্ত সিরিয়াকে একটি সুগঠিত রাষ্ট্রে পরিণত করবে। ১৯৪৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর এই জাতীয় সরকার সিরিয়ার বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করল। এই ভাবে সিরিয়া থেকে করাসী ম্যানডেটের অবসানের প্রাথমিক ব্যবস্থা হয়ে গেল।

কিন্তু করাসী সরকার অত সহজে সিরিয়া ছাড়তে রাজী হল না। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে জাতীয় সরকারের হাতে সমর্পণ করতে সম্মত হল না। এবং সিরিয়ার প্রতিরোধকে বাধা দিতে মনস্থ করল। কিন্তু সিরিয়াবাসিগণও সহজে নতিস্বীকার করল না। তারা নূতন সৈন্যদল গঠন করল। করাসী সৈন্যবাহিনীর বহু সিরিয়ান সেনাপতি বিদ্রোহী দলে যোগদান করল। দেশের বহু অঞ্চল থেকে করাসী সৈন্য বিভাডিত হতে লাগল। করাসী সৈন্য যেদিন দায়ের নগরের ওপর বোমা নিক্ষেপ করল, সেই দিন থেকে তাদের পঁচিশ বছরের প্রভুত্বের অবসান সূচিত হল। করাসী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হলে লাগল। সিরিয়ার প্রায় "উনো"তে উপস্থিত হ'ল। "উনো" সকল দিক বিবেচনা করে সিরিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবী স্বীকার করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল। (১৯৪৬ সালের ১৭ই এপ্রিল)। এই ভাবে সংগ্রাম করতে করতে সিরিয়ার জনগণ আলকাতলীর নেতৃত্বে তাদের দেশ থেকে বিদেশী সৈন্যের সম্পূর্ণ অপসারণ করল। তারপর দ্বিতীয়

মহাসম্মেলনে সিরিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃহৎ ঘোষণা করল। মহাসম্মেলনের পর সিরিয়ার স্বাধীনতা অত্যন্ত দেশে স্বীকার করে নিল। সিরিয়ার স্বাধীনতা প্রকারান্তরে আরব-জাতীয়তা ও স্বাধীনতার গোড়ার পত্তন রচনা করল।

সিরিয়ার বহু ভাগ্য-বিভাজিত ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনা হচ্ছে মিশরের সহিত তার ঐক্যগঠন। যেদিন সিরিয়া স্বাধীনতা ও জাতীয়তার দাবী উত্থাপন করেছিল, সেইদিনই সে সমগ্র আরব ঐক্যের উপর জোর দিয়েছিল। কিন্তু সে ঐক্য তখনও সম্ভব হয়নি। তবু সিরিয়া সেই আরব ঐক্যের আদর্শ সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৫০ সালে সিরিয়ার ২৫ সংবিধান রচিত হ'ল, তার গোড়াতেই বলা হয়েছে যে, সিরিয়াবাসীগণ আরব জাতির অন্তর্গত। আরব ঐক্যসাধন তার অন্ততম লক্ষ্য। মিশরের সহিত কিভাবে সিরিয়ার ঐক্য স্থাপিত হ'ল, এবার সেই কথা বলেই প্রবন্ধ শেষ করব।

১৯৫২ সালে মিশরে একটি প্রচণ্ড বিপ্লব হয়ে গেল—তার কলে সেখান থেকে রাজতন্ত্রের মূলোৎপাটিত হয়ে গেল। এবং সেইখানে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হল। মিশরের বিপ্লবী মেতাপন আরব ঐক্যের লক্ষ্য সামনে রেখে বিপ্লবের আদর্শকে রূপ দিতে লাগল। এর ঠিক দু' বছর পর সিরিয়াতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রবর্তিত হ'ল। ক্রমে ক্রমে মিশর ও সিরিয়ার লক্ষ্য ও গতি একই কেন্দ্রবিন্দুর দিকে অগ্রসর হতে লাগল। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করাই এই দু'টি রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্যে পরিণত হ'ল। এশিয়া মহাদেশকে কৃষ্ণিগত করে রাখবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি যেসব দেশ-রক্ষামূলক চুক্তি ও জোট তৈরী করেছিল, মিশর ও সিরিয়া একই সুরে সেগুলির বিরোধিতা আরম্ভ করল। ১৯৫৫ সালে বাঙ্গুডে আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলনে যেসব মৌলিক নীতি গৃহীত হয়ে গেল, এ দু'টি রাষ্ট্র সেই সব নীতিকে স্বীকার করে নিল। তারা আরব জাতীয়তা ও ঐক্যের সমর্থক হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতি ও সহ-অস্তিত্বের আদর্শকেও স্বীকার করল। কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যাপারে সমস্ত প্রকার বৈদেশিক হস্তক্ষেপেরও বিরোধিতা করার নীতির উপর তাদের অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করল। মৌলিক নীতিগুলিতে একমত হয়েই ক্ষান্ত থাকল না, তারা রাজনৈতিক ঐক্যের পথে একটু একটু করে এগিয়ে এল। ১৯৫৫ সালে ২০শে সেপ্টেম্বর মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে একটা সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তি উভয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর উপর বৃহৎ কর্তৃত্ব স্থাপন করল। এই সেনাবাহিনী আরব দেশের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠল। তারপর মিশর যখন সুরেজখালের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করল, তখন সিরিয়া তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত হ'ল। ১৯৫৬ সালে যখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করল, তখন সিরিয়া তার সমস্ত শক্তি নিয়ে মিশরের পাশে এসে দাঁড়াল। এই দু'দিনে মিশর ও সিরিয়ার বন্ধন আরও অদৃঢ় হল। তারপর বাকী ছিল আর একথাপ অগ্রসর হওয়ার। সেটাও অতি সহজে সংঘটিত হয়ে গেল। মিশর ও সিরিয়া বুঝল যে, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যখন এক, তখন আর বস্তস্ত রাষ্ট্র হয়ে থাকবার কোন অর্থ হয় না। তারা এখন উভয়ে মিলিত হয়ে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন করতে প্রস্তুত হ'ল।

১৯৫৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী মিশরের নব-রচিত সংবিধান

ঘোষণা করল যে, মিশর হচ্ছে আরব জাতির অন্তর্গত দেশ। ১৯৫৭ সালে মিশর সিরিয়াকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করল। মিশরীয় সৈন্যদের একটা দল তাদের সিরিয়ান কমরেডদের সহিত উক্ত সীমান্ত একই সঙ্গে লড়াই করেছে। এই বছরই মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হল দু'টি জঙ্গলোকেব চুক্তি—একটি হল সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্বন্ধে, আর অপরাট হল অর্থনৈতিক ঐক্য সম্পর্কে।

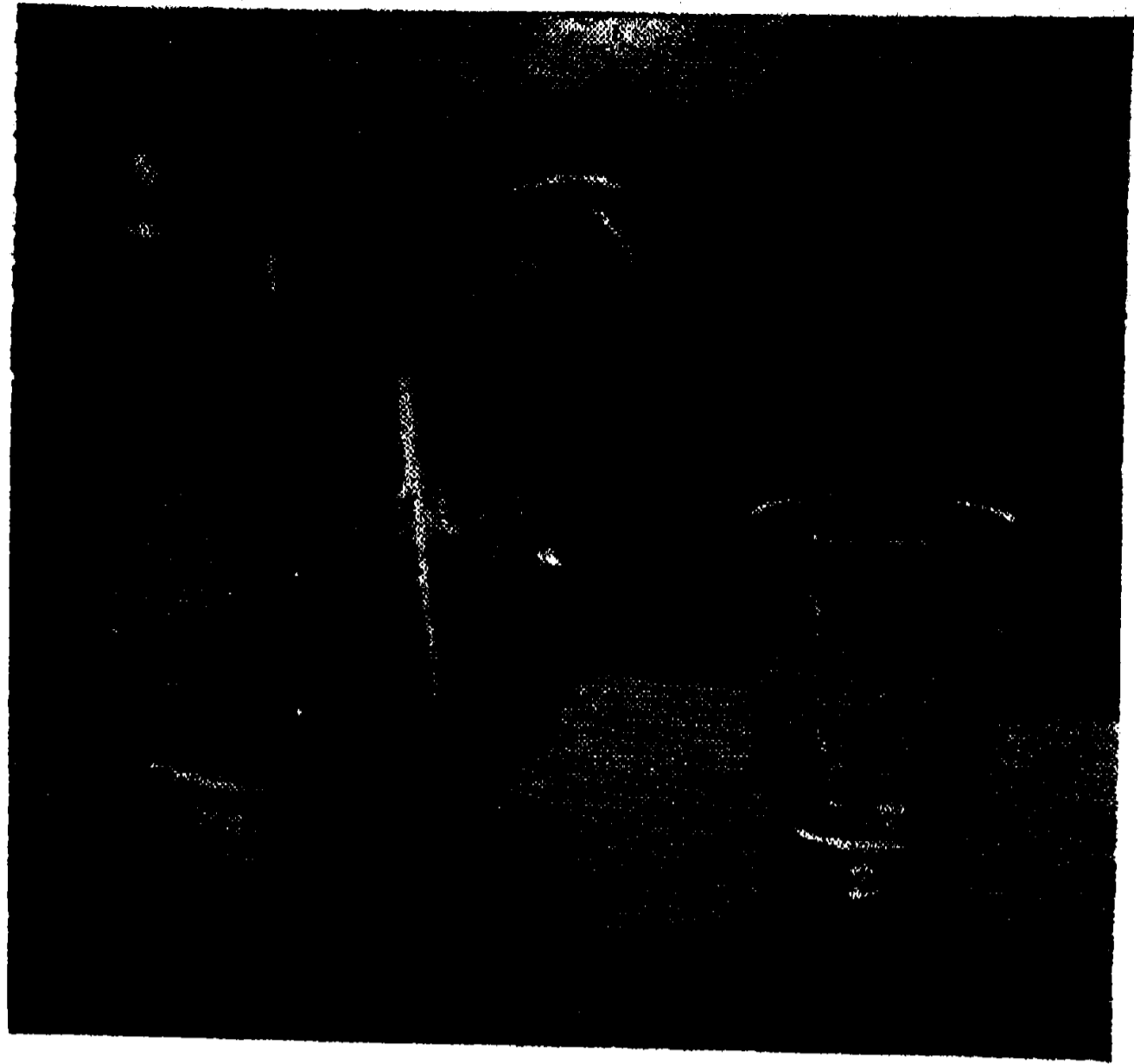
তারপর ১৯৫৬ সালের ৬ই জুলাই সিরিয়ার প্রতিনিধি সভা এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল। এই প্রতিনিধি সভা স্বীকার করে যে, সিরিয়ার অধিবাসীগণ আরবজাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। এই প্রতিনিধি সভার মন্ত্রিসভার সভাপতির মাধ্যমে ঘোষণা করেছে ও আশা করেছে যে, সিরিয়ার সরকার আরব ঐক্য গঠনের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা করতে থাকবেন। এবং তাঁর সে প্রচেষ্টার বিবরণ সভাকে বর্ধমানমতে জ্ঞাত করবেন। অতঃপর সিরিয়ার মন্ত্রিসভা কি করে ও কোম পছন্দ মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র স্থাপিত হতে পারে সে সম্পর্কে মিশরের সঙ্গে আলোচনা চালাতে থাকবেন। মিশর থেকে অতি দ্রুত এর উত্তর এল। মিশরের সভাপতি মাসের সিরিয়ার প্রতিনিধি সভার প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করেন যে, মিশর যেহেতু সিরিয়ার সহিত সংযুক্ত রাষ্ট্রের মাধ্যমে যোগদান করতে প্রস্তুত আছে এবং সেই মর্মে সিরিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তাতে মিশরবাসীরা অত্যন্ত সম্মত হয়েছে।

এর পর উভয় রাষ্ট্রের নেতাদের মধ্যে সরকারীভাবে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হল। উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভা কতকগুলি আনুমানিক প্রস্তাব গ্রহণ করল। উভয় রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ নেতাদেরকে এই মর্মে আরও আলোচনার জন্য আহ্বান করা হল। অতঃপর ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে এসব আলোচনা অত্যন্ত কলগ্রন্থ হ'ল এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে সকলেই সম্মতিজ্ঞাপন করলেন। তাঁরা স্থির করলেন যে কেডারেল ঐক্য অপেক্ষা পূর্ণ একতার বন্ধনে উভয় রাষ্ট্রকে একীভূত করা হোক। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কলে ১৯৫৮ সালের পহলা ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। এইভাবে জন্ম নিল “ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক।”

এই সিদ্ধান্তকে সার্বজনীনভাবে সমর্থন করার জন্য গণভোটের প্রয়োজন হল এবং অবিলম্বে গণভোট গৃহীত হ'লে সমগ্র সিরিয়াবাসী একবাক্যে মিশর-সিরিয়া ঐক্যকে সমর্থন করল এবং এই গণভোটেই নাসেরকে সম্মিলিত আরব-রিপাবলিকের সভাপতি বলেও স্বীকার করে নিল। শত শত বছর ধরে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এবং উত্থান-পতনের ও জয়-পরাজয়ের অনিশ্চিত ও বহুরূপে পাড়ি দিতে অবশেষে আরব ঐক্যের সোনালী স্বপ্নের কিরণসং সফল হল। সম্মিলিত আরব রিপাবলিক আরব দেশের বৃহৎ আরব ঐক্যের আদর্শকে উচ্চে তুলে রাখল। এর নেতাদের যদি দূরদর্শিতা থাকে, ফুর্কি বে-ফুল করেছিল, যদি তারা সবচেয়ে সে-সব ফুল পরিহার করে চলে, তবে তাদের এ-ঐক্য স্থায়ী হবে। সভাপতি মাসের, নবরাষ্ট্র-গঠনের পর যখন প্রথম সিরিয়া গমন করেন তখন তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। এই মার্চ এই নব-রাষ্ট্রের সংবিধান ঘোষিত হল। মিশর ও সিরিয়াতে নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হতে লাগল।



ষ্টীল লাইফ
—তহু দাশগুতা



পদ্মবন
—আত্তোব সিন্হা



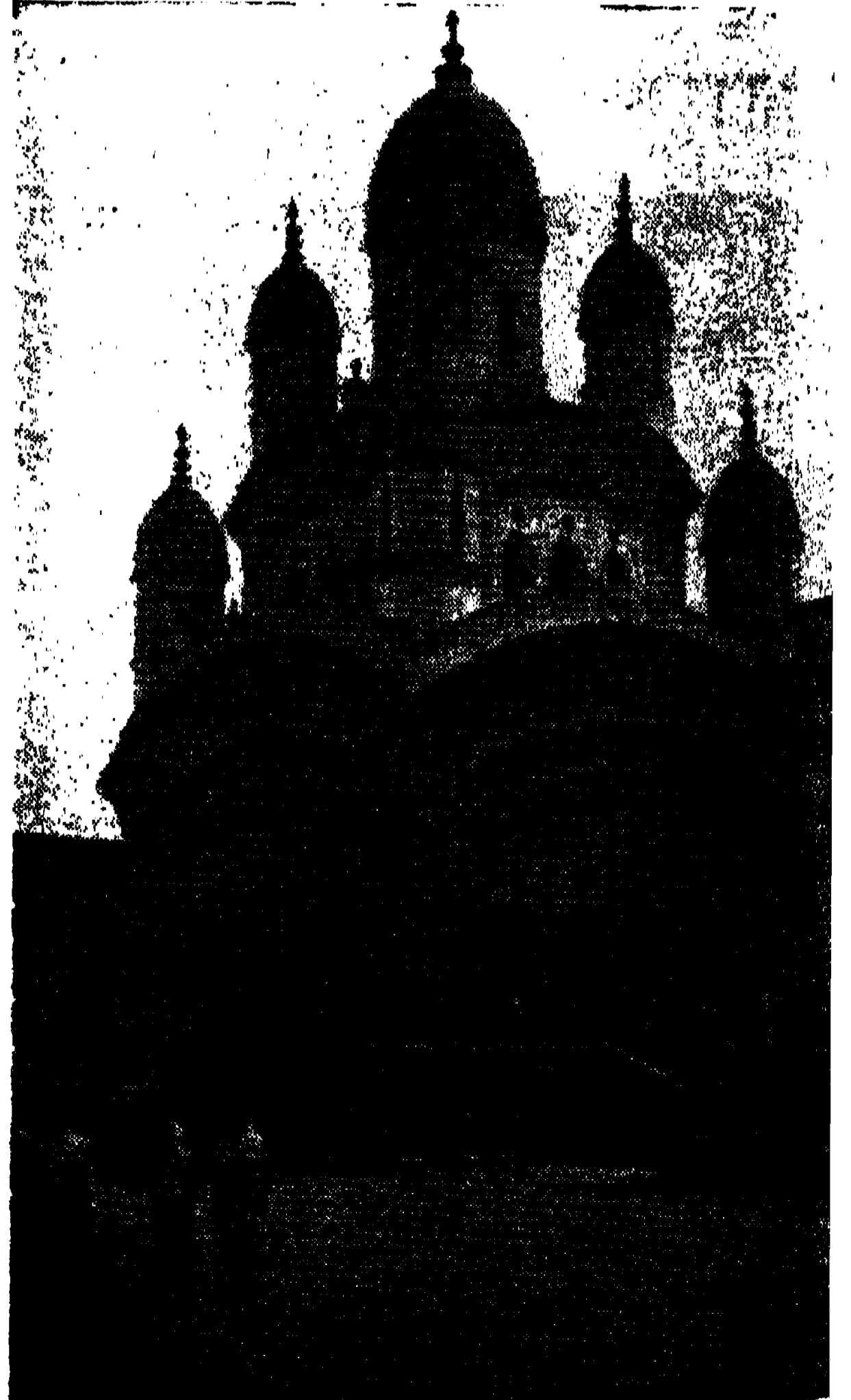


পোড়মাটির কাজ (বংশবাটী)

—শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়

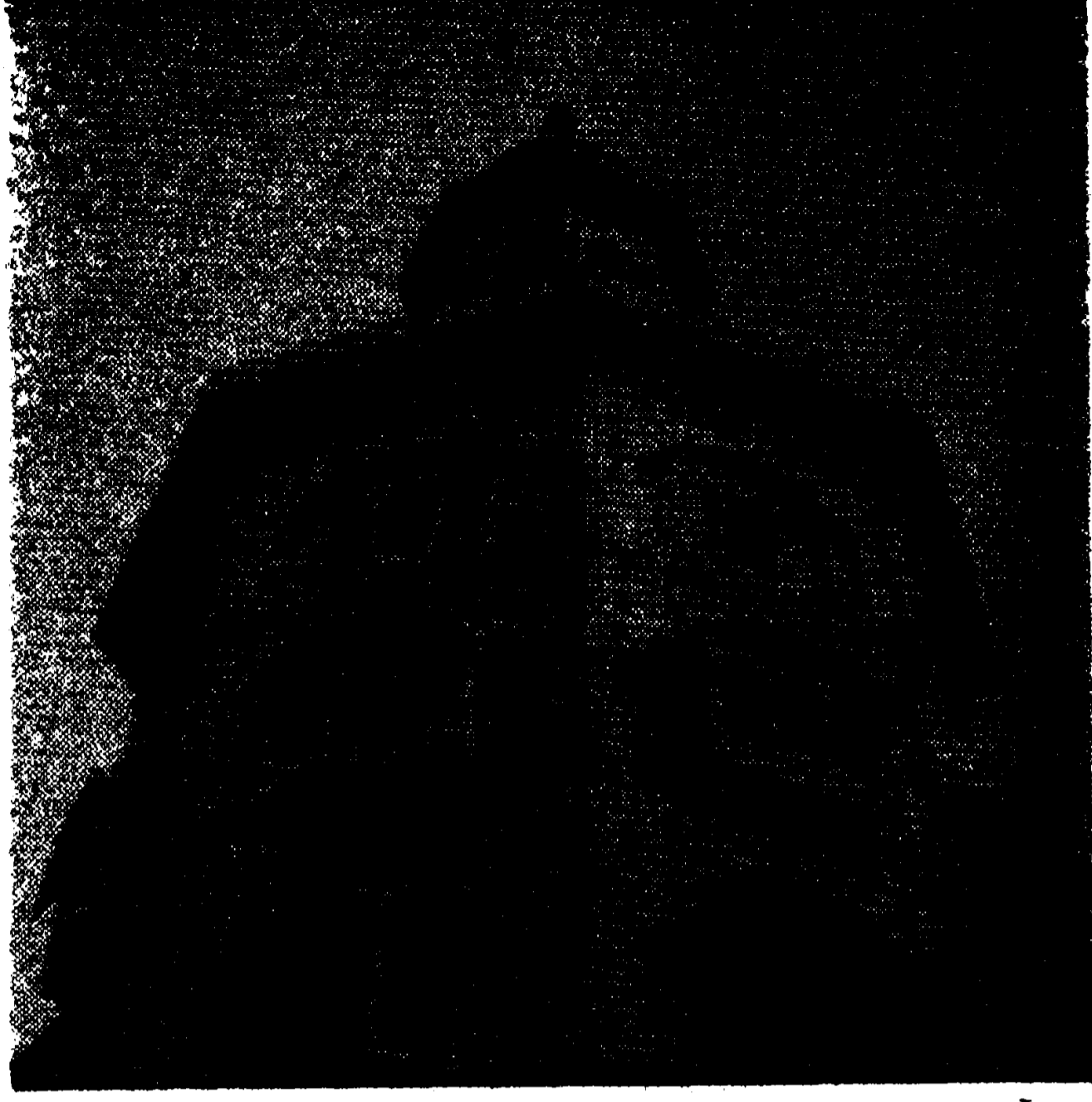
ও

—লালচাঁদ বর্মণ



দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

—কুমারী বাপি শেঠ



বাবা অটল টাওয়ার
(অমৃতসর)

— শান্তিকুমার গুপ্ত

মাছের আশায়

— রমেন বাগচী





ব্যাভীক

—অনোক ধন

স্বতন্ত্রতা

সম্বন্ধ

তখন আমার তরুণ বয়স। ছাত্রজীবন ঠিকমত উত্তীর্ণ হই নাই। বাংলাদেশের প্রায় সীমা-বেধায় একটি শহরে কিছুদিন পদ করিতে হইয়াছিল।

ছোট, কিন্তু পরিচ্ছন্ন শহর। বিশেষ করিয়া যে পাড়াটিতে আমি থাকিতাম, সেটি যেমন বন্ধুকে পরিষ্কার তেমনই মার্জিত-কচি। তখন রাস্তা, নতুন বসতি, শহরের কেন্দ্রে ছাড়াই বাহারা এই পুরুষে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক। ইহারই এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র বাড়িতে আমিও গিয়া বসিত হইলাম।

গিয়াছিলাম, বিশ্রামার্থে। পরীক্ষার পরে বলিয়াও বটে, এবং শরীর কিছু অসুস্থ ছিল বলিয়াও বটে। সেখানে গিয়া স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হইল। করার মধ্যে চারবেলা ঠাসিয়া খাওয়া, বতকরণ ইচ্ছা বই পড়া, আর মাঝে-মাঝে গল্প-কবিতা লেখার মন করা—এই কালের লেখক-জীবনের তখন গোড়াপত্তন হইতেছিল। ধার, সকলের চেয়ে বড় কাজ বতকরণ পারি ঘুরিয়া বেড়ানো।

বেড়াইবার জন্তই গিয়াছিলাম, জায়গাও বেড়াইবার মত। ছোট শহর, তাহার চারি পাশ ফুঁড়িয়া কাঁচা ও পাকা বহুপথ বন্ধিকে চলিয়া গিয়াছে। এক একদিন এক একটা পথ ঘুরিয়া সোজা হাঁটা দিতাম, বতকরণ না ক্লাস্তি লাগে। সীমান্তভূমিতে বাহা হয়—এক একদিকের পথের এক এক রূপ; কোনটার দুইধারে সবুজের সমারোহ, কোনটা বা গিয়াছে তৃণহীন প্রান্তরের বুক চিরিয়া, কোনটার বা পাশে পাশে সংকীর্ণ জঙ্গলভিত্ত। একটা পথের উপর দাঁড়াইয়া অল্প পথের দৃশ্য কিছুতেই তুলনায় মিলানো যায় না। আমি যেদিন যে-পথে ইচ্ছা বাইতাম। বতকরণ চলিতাম, মন ক্লাস্ত হইত না। ক্লাস্ত হইত দেহ। তখন পথের ধারে বসিয়া বিশ্রাম করিতাম, আবার হয়ত আশ্রয় সম্মুখে আগাইয়া বাইতাম, তারপর আবার এক সময়ে ফিরিয়া আসিতাম। কাজও কিছু ছিল না, কৈফিয়ৎ লইবারও কেহ ছিল না।

শরীর ক্রমে সুস্থ হইয়া আসিল। ছুটিও শেব হইবার মুখে। এবার ফিরিবার পালা। মনে মনে প্রেরণা হইতেছি, বাস্তব গোহানো তখনও আরম্ভ করি নাই! এমন সময়ে অকস্মৎ অদ্ভুত এক ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া গেলাম।

বলিয়াছি, আমার দিন কাটিত ঘরে ও পথে। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা আমার বিশেষ হয় নাই। একে ত গায়ে পড়িয়া কাহারও সঙ্গে আলাপ করিতে যাওয়াই আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তাহাতে প্রয়োজনও কিছু ছিল না। শরীর কীর্ণ বলিয়া ক্লাস্তিও সহজে আসিত, কোলাহল কলরব ভাল লাগিত না। তাহার চেয়ে অনেক বেশী আরাম পাইতাম নীরব বিখপ্রকৃতির মধ্যে।

চিরদিন আমি শহরের ঘিঞ্জিতে মাহুব, খোলামার্ঠের লুচুর ডাক বেড়িও-প্রায়মোকনের গানের চেয়ে অনেক বেশী মিষ্ট লাগিত।

পাড়া-প্রতিবেশীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা ঘটিবার বিশেষ উদ্যোগ বা উত্তম কোন পক্ষ হইতেই ছিল না।

তবুও একেবারে নিঃসঙ্গ হইয়া থাকিতে কেহই পারে না। আমারও দুটি-একটি সঙ্গী উহারই মধ্যে ছুটিয়া গিয়াছিল। সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাহার সঙ্গে হইল সে একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশু।

প্রথম দিন তাহাকে দেখিলাম, কালো হাফপ্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে বলমূল করিতেছে—আবার বাড়ির মাঠে সে কড়ি-এর পিছনে দৌড়াইয়া ফিরিতেছিল। বর্ষার ভিজা ঘাসের উপরে বিকাল-বলার রোঙ্গে অসংখ্য কড়ি বসিয়াছে, ছুটিয়া ছুটিয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়াই তাহার খেলা। সঙ্গে একটি বৃদ্ধ ভৃত্য, সে কিছুতেই বালককে ফিরাইতে পারিতেছে না। বৃথাই চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে আর মোটা ছবির দেহটা লইয়া তাহার পিছনে ছুটিবার প্রয়াস পাইতেছে।

এক সময়ে আমার দিকে চাহিল, কহিল—দেখুন ত বাবুজী। একে আমি কি করে সামলাব? এই, শীগগির এস, নইলে বাবুজী ধরে নিয়ে যাবেন।

আমি কহিলাম, থাক না, বেশত খেলে বেড়াচ্ছে। বাগ খোকা, তুমি প্রাণ ভরে ছোটো—আমি কাউকে ধরে নিই না;

খোকা বাবুজীল না, সোজা আসিয়া আমাকেই ধরিয়ে লইয়া চলিল, ধরে দেবে চল না?

—আরে সর্কনাশ! আমি কি ধরতে পারি?

—তুমি পারবে। আমি পারছি না যে। খালি উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

—আমিই না কি করে ধরব? উড়ে উড়ে যাবে।

—বা রে! তুমি—ত বড়।

—আমি উড়তে পারি? পারি নে ত? তাহলে কি করে ধরব?

—পার না?

—না। এই দেখ। ভাল করে দেখ, চার দিকে। ডানা আছে আমার?

খোকা হাসিয়া ফেলিল। মাহুকের ডানা থাকে বুঝি?

—ও! থাকে না বুঝি? তাহলে উড়তেও পারে না। কড়ি ধরে কি হবে? খাবে!

—দূর!

—তবে? ধরলে কড়িটার ব্যথা লাগবে। এই ত বেশ দেখতে হচ্ছে।

—বা। ধরলে সেটা আমার হবে। আমি বাড়ি নিয়ে যাব। এগুলো ত মাঠের।

—তাবো না মাঠটাই তোমার, সবগুলোই তোমার।

—সবগুলো আমার?

—হ্যাঁ ? তাবো, তাহলেই ত হ'ল। তাড়া করলে ভয় পাবে, পালিয়ে বাবে। তাড়া কোরো না। দেখো ওরাই আমবে ভাব করতে।

বলিতে বলিতে কখন একটি ফড়িং আমার কাঁধের উপর আসিয়া বসিয়াছিল। খোকা চেঁচাইয়া উঠিল, ঐ, ঐ, তোমার বাড়ে বসেছে।

আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিতে গেলাম। ফড়িং উড়িয়া গেল। কহিলাম, দেখলে ত ? আমি তাড়া করিনি, তাই আমার কাছে এল। ভয় পেলো না। তুমিও তাড়া কোরো না, তাহলে তোমাকে দেখেও ভয় পাবে না।

সেই হইল আলাপের নৃত্যপাত। খেলার শেষে খোকা আমার বাড়িতে আসিল, বিছুট এবং মিষ্টি খাইল—আমি অননুস্থ ও বাজার দূর বলিয়া এগুলি আমার মজুতই থাকিত—তারপর কাল আসব বলিয়া বিদায় লইল।

পরদিন আসিল ও। সে বয়সে শিশু, আমি রোগশয্যার 'পরে মনে শিশু, দুই অসমবয়সী শিশুর বন্ধুত্ব অচিরাৎ নিবিড় হইয়া উঠিল।

তাহাদের বাড়িতেও সে-ই একদিন আমাকে টানিয়া লইয়া গেল। আমার বাড়ীর কাছেই। পাঁচিলঘেরা ছোট বাড়ি, কিন্তু সৌধিন লোকের বাড়ি। বিস্তীর্ণ উঠান জুড়িয়া ফুলের বাগান, ঘর-বাহির স্বকৃষ্ণ করিতেছে। নূতন বাড়ি।

খোকার বাবা অধ্যাপক, পণ্ডিত ব্যক্তি। মাম শুনিয়া চিনিলাম, এ নাম পূর্বেও শুনিয়াছি, সভাসমিতির বিবরণ, ও তাঁহার রচিত প্রবন্ধ ইত্যাদির আলোচনায়। অস্বাভিক ব্যক্তি, পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নাই, সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির মানুষ। এটা তাঁহার দেশ, কর্মস্থল অত্র। দেশ বলিয়াই বহু বক্তৃৎ এখানে এই বাড়িটি করিয়াছেন। বৎসরের ছুটিগুলি যথাসম্ভব এইখানেই কাটাইয়া থাকেন। আর বেসী দিন চাকরি করিবার ইচ্ছা নাই। প্রয়োজনও নাই বিশেষ। এবার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া এইখানেই থাকিবেন, পড়া আর লেখা লইয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিবেন, এমন করণাও প্রথম দিনের পরিচয়েই ব্যক্ত করিলেন।

খোকার মাকেও দেখিলাম। বেশ সহজেই সম্মুখে আসিলেন, আলাপ করিলেন। চালচলনে শালীনতা আছে, অহেতুক কুণ্ঠা নাই। নন্দর নন্দী মহিলা, এবং খোকার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ও মমতা এত তীব্র যে সাধারণ ভাবে মাতুলের বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট হয় না।

ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। অনেক দিনই সে বাড়িতে গিয়া বিকালবেলাটা কাটাই। কোন দিন খোকা আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, কোন দিন বা নিজেই চলিয়া বাই। আমার লোভের একটা বড় জিনিস ছিল সেখানে—অধ্যাপকের লাইব্রেরি। অল্প বই এবং বহুবিধ বিষয়ের। আলমারিতে স্থান হয় না, টেবিলে চেয়ারে বিছানার উপরে পর্ষদ বই স্তম্ভাকার হইয়া আছে—বেখানায় হাত দিই সেইখানাই দেখিয়া মনে হয় আছা, পড়ার সময় কি পাইব। ইচ্ছা করিতে লাগিল, চুলায় বাউক কলেজ, এইখানেই থাকিরা বাই কিছুকাল, বত দিন পারি প্রাণ জন্দিয়া পড়িয়া লই।

আর কি নন্দর ছিল তাঁহার এই বইগুলির সবক্ষে জাম। বেখানাই ধরি, এমন সহজ নন্দর ভাবায় এমন অনায়াসে তাহার পরিচয় আর বিশ্লেষণ বলিয়া দেন, যেন পাঁচবার পড়া পুথানো বইবৎ একটা নূতন রূপ আর অর্থ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। নেশা ধরিল। প্রায়ই বাই, বসিয়া বসিয়া বই পড়ি। ফেরার সময়ে হু'-একখানা হাতে করিয়া লইয়া আসি, বাড়িতে বতক্ষণ পড়া যায়। এমনই করিয়া কিছুদিন কাটিল। আমার দুটি বত শেষের দিকে আগাইতে লাগিল, আমার পড়িবার ক্ষুধা, তাঁহার মুখের ব্যাখ্যা শুনিয়া তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল, খালি মনে হয়, আরও আগে কেন এখানে আসি নাই, আরও আগে কেন হাঁহাদের চিনি নাই।

সে বাড়িতে বতক্ষণ থাকিতাম, বেসীর ভাগ সময় কাটিত লাইব্রেরি-ঘরে। অধ্যাপক প্রায়ই থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে থাকিতেনও না। তাঁহার বেড়াইতে বাইবার সময় ছিল সন্ধ্যার দিকে—সন্ধ্যায় মুখে বাহির হইতেন, কখন ফিরিতেন জানি না। আমার হিমলাগানো বারণ ছিল, আমি অক্ষকার হওয়ার পূর্বেই প্রায় বাড়ি ফিরিতাম।

অধ্যাপকের দ্বীর সঙ্গে দেখা হইত, ঘনিষ্ঠতা বিশেষ হয় নাই। তিনি আসিতেন বাইতেন, খাবার-টাবার দিতেন, কিন্তু গল্প করিতে প্রায় বসিতেন না। মনে হইত, বাহিরে হাসিমুখী এবং অস্বাভিক হইলেও তাঁহার মনের মধ্যে কোথাও একটা কঠিন সংঘম আছে, ইংরাজীতে বাহাকে বলে reserve। খুব বেসী হইতে করিতে তিনি স্বভাবতঃই পারিতেন না, চেঁচাও করিতেন না। এই বাড়ি, ইহার ঘর-সংসার গৃহস্থালী, বাগান, নানাবিধ পশুপাখী আর খোকা, ইহাকে লইয়াই তাঁহার এক অধিক বাজত, তাহার শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তাঁহার দিব্যাত্রি কাটিয়া বাইত। সে বিধানও বিচিত্র—কুকুর, বিড়াল, পাররা, রাজহাঁস, প্রত্যেকের খাওয়া ও থাকার সর্ববিধ সুব্যবস্থা; ঘরের জিনিসপত্র প্রতিটি নিজের স্থানে ও মহিমায় প্রতিক্রিত, কোনটি একচুল এদিক-ওদিক হইবার জো নাই। খোকার ত' প্রতিটি প্রয়োজনের প্রতিটি ধুঁটিনাটি ব্যবস্থা তাঁহার নিজের হাতে। একটিমাত্র স্থানে তাঁহার সে শাসন খাটিত না, তাহা হইল পড়ার ঘরটি। সেখানে বই মনে দশবার করিয়া ঝাড়িয়া তাকে তোলা হইতেছে, দশবার করিয়া অধ্যাপক তাহাদের টানিয়া নামাইতেছেন, যেখানে ইচ্ছা ফেলিয়া রাখিতেছেন। বিছানার উপরে বইয়ের স্তূপ জমিয়া আছে, তাহারই মধ্যে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া কিঞ্চিৎ স্থান বাহির করিয়া তিনি কোনক্রমে চিং হইয়া শুইয়া পড়িতেছেন, একটা বই চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া সেই অবস্থাতেই পড়িতে লাগিয়া বাইতেছেন।

আমার এ সকল ব্যাপারে দুটি বিশেষ প্রথম নয়, তবু হরত তখনই একটা জিনিস আমার লক্ষ্য হইয়াছিল। হু'জনেই সীপবুধি ও মার্জিতকৃচর লোক, রসিক, অস্বাভিক, কিন্তু ইহাদের দুইজনে বিস্তৃত আলাপ আলোচনা হইত অত্যন্ত কম, অল্পত আমার সম্মুখে। নিজেদের জীবনের আলাপাচারের দিকটা হরত ইহারা নিবৃত্ত অবসরের জন্তই সঞ্চিত রাখিতে চাহিতেন।

আর একটি জিনিস প্রথম দিনেই চোখে পড়িয়াছিল, দুইজনের বয়সের তফাৎ। অধ্যাপকের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ পার হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার দ্বীর বয়স কিছুতেই বিশেষ বাহু বলিয়াও মনে করিবে

পারিতাম না। হযরত দ্বিতীয় পক্ষ, হযরত অধ্যাপকই প্রথম বয়সে পড়াশুনার বাস্তব থাকিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিয়াছেন। অবশ্য বয়সের তফাত থাকিলেও সেটা হঠাৎ বুঝা যাইত না। অধ্যাপকের বয়স পরতান্নিশের বেশী, সেটা জানিয়াছিলাম তাঁহারই কথায়। বাহা ও বৌবন তাঁহার এখনও অক্ষুণ্ণ, একগাছা চুলও পাকে নাই, মুন্দর সুগঠিত দেহ, অক্লেশে বক্রিশ-তেত্রিশ বছর বলিয়া মনে করা চলিত, স্ত্রীটিও তাই—তাঁহার বয়স পঁচিশের উপরে; সেটা অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম অঙ্ক কথিয়া। তিনি গ্রাজুয়েট, ছাত্রজীবনের পরে বিবাহ হইয়াছে। গ্রাজুয়েট হইবার বয়স ও খোকার বয়স যোগ করিলে অঙ্কটা পঁচিশের উপরে উঠে। দেখিয়া তাঁহার বয়স একশ-বাইশের বেশী মনে করিতে পারিতাম না।

অবশ্য এ সকল হিসাব লইয়া তখন মাথা ঘামাইতাম মনে হয় না, এগুলি সম্ভবত সাজাইয়া গুছাইয়া ভাবিয়াছিলাম পরে—যখন হাঁহাদের জীবন লইয়া আরও অনেক কথা ভাবিতে হইয়াছিল।

ছুটি শেষ। বাড়ি ফেরার দিন আসন্ন। হযরত পাঁচ দিন, হযরত বা দশ দিন। তারপরই কিরিয়া বাইব। বাড়িতে সেই মর্মে চিঠিও লিখিয়া দিয়াছি। সেখান হইতে উত্তর এবং ডাক্তারের অভিমত আসিবে, টাকাকড়ি আসিবে, তারপরই এখানকার সমস্ত দায়-দেনা মিটাইয়া দিয়া যাত্রা করিব—হযরত আর কোন দিন আসা হইবে না। তখন একটিকে অধ্যাপকের লাইব্রেরি অল্পদিকে সেই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহ আমাকে প্রাণপণে পিছনে টানিতেছে—গলেই ত চলিয়া গেলাম। দিন-রাত্রির একটি ক্ষণও বুধা কাটিতে দিতেছি না। যতখানি পারি পড়ি আর যতক্ষণ পারি বেড়াই। সন্ধ্যার আইনও আর মনে নাই, যাত্রা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পথে পথে ঘুরি বা জাগিয়া জাগিয়া বই পড়ি।

অনেক রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ভোরের বেলা, চোখের ঘুম তখনও ছাড়ে নাই, হঠাৎ বাইরের দরজার আঘাত পড়িল—বাবুজী। ঘুমচোখেও গলা টানলাম। অধ্যাপকের সেই বৃদ্ধ ভৃত্য, খোকার দেহবন্ধী, রামদীন, এত ভোরে ?

উঠিয়া দরজা খুলিতেই সে কহিল, চলুন। মাইজী ডেকেছেন।

—মাইজী। না বাবুজী ?

—না না। বাবুজী নয়। তাঁহার গলা কাঁপিয়া গেল।

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কি হয়েছে, রামদীন ?

—কিছু না। আমি কিছু জানি না। মাইজী বললেন বাবুকে ডেকে নিয়ে আস।

স্পষ্ট বুঝিলাম কিছু একটা গোপন করিতেছে। সেটা কি বুঝিতেছি না। অথচ ইহাকে সেজন্য পীড়াপীড়ি করিয়াও লাভ নাই। কিন্তু, কি ? কোন বিপদ আপদ ? এমন কি বিপদ হইতে পারে, বাহার অঙ্ক আমার ডাক পড়িল—আমি এক বিদেশী, তাহাতে আর অপরিচিত ?

রামদীন কহিল, বাবুজী, জলদি।

আমি একটা টানিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলাম।

দোকানার পূর্বে কখনও উঠি নাই। নীচে লাইব্রেরি-ঘরেই বসিতাম। রামদীন আমাকে সোজা উপরে লইয়া গেল। পাশাপাশি দুইটি ঘর, তাহার ওপাশে খানিকটা খোলা ছাদ। উঠিয়াই দেখিলাম, প্রথম ঘরটির সম্মুখে বেগিঃ ধরিয়া অধ্যাপকের স্ত্রী পাড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মুখ অল্পদিকে। আমি গিয়া কাছে পাড়াইলাম। কহিলাম, কি ব্যাপার ?

তিনি মুখ কিরাইলেন না। হাত দিয়া ঘরের খোলা দরজাটি দেখাইয়া দিলেন।

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার ইঙ্গিত মানিয়া ঘরের দরজায় গিয়া পাড়াইলাম, তারপর ঘরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে এক পাশে, দেওয়ালের পায়ে একটি খাটে, অধ্যাপক শুইয়া আছেন। হঠাৎ আমার সমস্ত দেহে বিহ্বলের শক লাগার মত হইল। অধ্যাপকের দেহ নিশ্চল। মৃত !

বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ চাইয়া রহিলাম। তারপর বাহির হইয়া আসিলাম। কহিলাম, কি হ'ল ?

—জানিনে।

—কখন হ'ল ?

—জানি নে।

—ঘুমের মধ্যে ? আপনি টের পাননি ?

—আমি ও-ঘরে শুই।

কহিলাম, এখন কি করবেন ?

—বুঝতে পারছি না। তাই আপনাকে ডেকেছি।

—এখানে আপনাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই ?

—খাকলেও জানিনে। আমাদের সঙ্গে কার সম্পর্ক নেই।

—বন্ধু-বান্ধব ?

—সামান্য।

—তাহলে ?

একটু ধামিলেন। তারপর কহিলেন, নির্ভর করা যায় এমন লোক একজনই আছেন, ডক্টর বোস।

—কে তিনি ? আপনাদের ডাক্তার ?

—আমাদের ডাক্তার ঠিক নন, অসুখ বিনুখ বিশেষ হয় না ত। ঠর বন্ধু। খুব শক্ত লোক।

—তাঁকেই ডাকা বাক তাহলে। রামদীন।

রামদীন কাছেই পাড়াইয়া ছিল। মুখ বেদনার্ত। বুড়া মানুষ, প্রভুকে ভালবাসিত। নিঃশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিলাম, তুমি ডাক্তার বাবুর বাড়ি জান ?

—জী।

—তাঁকে ডেকে নিয়ে এস। কত দূরে বাড়ি ?

—দূর নয়।

—বেশ।

—কি বলব ?

অধ্যাপকপত্নী কহিলেন, বা হয়েছে তাই বলবে।

—জী।

—খোকারাবুকে নিয়ে যাও। মামীমার কাছে নিয়ে আসবে। বোলো, তুমিই আবার নিয়ে আসবে, ততক্ষণ থাকবে সেখানে। আর কিছু বোলো না।

খোকা বাগানে ঘুরিতেছিল, তাহার একটি কুকুর, ও দুইটি বিড়াল তাহার পায়ে পায়ে কিরিতেছিল। খোকাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া রামদীন বাহির হইয়া গেল।

বারান্দায় একটা ছোট বেঞ্চি ও গোটা দুই চেয়ার পড়িয়াছিল। অধ্যাপকপত্নী কহিলেন, বসুন।

বেঞ্চিটায় বসিলাম। তিনিও একা, চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। দুই হাতের উপরে মুখ রাখিয়া দূরে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। চোখে জলের আভাসমাত্র নাই, মুখখানি ঈষৎ শুষ্ক, চোঁট দুটি কঠিন হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে। তাঁহাকে কোনদিন বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই। তখন আর কিছু করিবার নাই, অকস্মৎ এমনভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আমার চিত্তশক্তি শুরু হইয়া গিয়াছিল। তিনি একই ভাবে বসিয়া রহিলেন, একটুও না নড়িয়া চড়িয়া। আমার দৃষ্টি বার বার তাঁহার উপরে গিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার মুখে, তাঁহার দেহে, তাঁহার বসার ভঙ্গীটির প্রতি। এক একবার তাকাই। হঠাৎ মনে পড়ে অসভ্যতা হইতেছে, চক্ষু ফিরাইয়া নিই, আবার কখন অতর্কিতে চক্ষু তাঁহার উপরে গিয়া পড়ে। আমার এই দৃষ্টিনিয়োগ তিনি টের পাইতেছেন, এমনও মনে ছিল না। তিনি ধেন গভীর ধ্যানমগ্ন। তাঁহার সেই নিশ্চল দেহ, নিষ্কম্প মুখখানির দিকে চাহিয়া আমার শুধু একটি কথাই মনে হইতে লাগিল—কী অসম্ভব শক্তি এই ক্ষীণদেহ মেয়েটির মধ্যে! কতখানি মনের বল থাকিলে এই অবস্থায় মানুষ এমন স্থির থাকিতে পারে!

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল জানি না। মনে হইতেছিল বহুক্ষণ, কিন্তু আসলে বোধ হয় মিনিট পনের বার বেশী হইবে না। একটি গাড়ি আসিয়া দ্বারে থামিল। রামদীনের আগে আগে দ্রুত পা ফেলিয়া একটি উজ্জলোক বাড়িতে চুকিলেন। মুখ ফিরাইয়া একবার রামদীনকে কি বলিলেন, সম্ভবতঃ প্রস্থ করিলেন কোথায়, তারপর সোজা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন।

আমি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম। দূর হইতে দেখিয়াই লোকটির উপরে শ্রদ্ধা আসিল। এক একজন থাকে, বাহাকে দেখিলেই মনে হয় এ লোক শক্তিদেহ, ইহার উপরে নিঃসংশয়ে নির্ভর করা বাইতে পারে। একটু লম্বার দিকে, মুখে-চোখে বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। দোহারা চেহারা, কিন্তু চলার ভঙ্গীতে বোকা বায় প্রচুর শক্তি ও সজীবতার অধিকারী। চুল পাকা, বয়স পঞ্চাশ ত বটেই, অনেক বেশীও হইতে পারে, কিন্তু জরায় কোন লক্ষণ চোখে পড়িল না। সাধারণ ধূতি-পাজাবি পরা। হাতে একটি ছোট ব্যাগ।

উপরে উঠিয়া তিনি সোজা ঘরের মধ্যে চুকিয়া গেলেন। আমিও তাঁহার পিছনে, খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।

কিছুক্ষণ তিনি একদৃষ্টে মৃত দেহটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একবার তাহার বাহু ধরিয়া নাড়া দিলেন। সমস্ত দেহটা নড়িয়া উঠিল। দেহ শক্ত। তাহার অর্ধ, মৃত্যুর পর বেশ কিছুক্ষণ হইয়াছে। ডাক্তার হাতের আঙ্গুল টিপিয়া দেখিলেন, চোখের পাতা ঠেলিয়া চোখ খুলিবার চেষ্টা করিলেন।

অধ্যাপকের দেহ ও মুখ বিবর্ণ রক্তহীন। নাকের ডগা ও চোঁট ঈষৎ নীল। মুখে ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব, যেন কি একটা কষ্টের ছাপ। কিন্তু কোন বৈলক্ষণ্য আমার চোখে পড়িল না।

ডাক্তার অনেকক্ষণ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর হঠাৎ মুখ তুলিয়া ঘরের চতুর্দিকে তাকাইলেন, তাঁহার দেখাদেখি আমিও ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম।

ঘর বেশী বড় নয়। এ বাড়ির সকল কিছুই মত, পরিচ্ছন্ন ও সমস্তে সামান্য। খাটটি একেবারে নূতন মনে হইল। চকচকে পালিশ, বার্নিশে কোথাও এতটুকু মালিন্দ্য নাই। খাটের মাঝখানে অধ্যাপক লম্বালম্বি শুইয়া। তাঁহার বালিশের পাশে, দেহের পাশে, কস্মেকখানা বই ইতস্ততঃ ছড়ানো। কাল রাত্রিতেও অনেকক্ষণ ঘাবৎ পড়িয়াছেন, বুদ্ধিতে বট্ট হয় না।

খাটটির গড়ন কিছু নূতন রকমের। খুব নীচু খাট, মেয়ে হইতে পুরা এক হাতও উঁচু হইবে কিনা সন্দেহ। খাটের চারপাশে বেলািং, কিন্তু সাধারণতঃ বেলািং যেভাবে হয় সেরকম নয়। প্রায় দশ-বারো ইঞ্চি খাড়া তক্তার বেড় দিয়া খাটটি আগাগোড়া ঘেরা, যেন সবতরফ একটি বাগ্ন, তাহার ডালাটা নাই। এরকম খাট আর কখনও দেখি নাই। সম্ভবতঃ অধ্যাপকের নিজস্ব করনা। খাটের উপরে যাহারা বই খাতা কাগজ লইয়া ঘুমান, তাহাদের পক্ষে এ রকম খাট সুবিধাজনক সন্দেহ নাই। বই, খাতা, পেল্লিল পড়িয়া যাইবার ভয় থাকে না।

এক পাশে একটি বুককেস, বই ভর্তি। অল্প পাশে, জানলার গায়ে, ছোট একটি টেবিল, রাইটিং কেস ও সেক্রেটারিয়াটের সংমিশ্রণ। এ-ও স্পেশাল ডিজাইন। দুইটি চেয়ার। একটি কাপড়ের ব্যাক। সবই নূতন।

দেয়ালে পেরেকের সঙ্গে ফ্রেমে-বদ্ধ টেনিসব্যাট। এখনও খেলিতেছেন তাহা হইলে।

খাটটি দেয়ালের একেবারে গায়ে বেঁধিয়া আছে। দেয়ালে, খাট হইতে কিছু উঁচুতে ও শিয়রের দিকে বাতি বসানো। এটা ধনি-এলাকা, বিদ্যুতের ব্যবহার বেশী নয়, গ্যাসের ব্যবহার প্রচুর। আমি নিজে যে-বাড়িটাতে আছি, সেখানেও গ্যাসের বাতি গ্যাসের উনান। এও দেখিলাম, দেয়াল বাহিয়া উপর হইতে গ্যাসের পাইপ নামিয়াছে, ক্রমে বাকিয়া একটি বাড়িতে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এমন কারদার মাশিরা বসানো যে বাতি জ্বালিলে তাহার আলো ঠিক শয়ান ব্যক্তির হাতের বইতে পড়িবে। ঈষৎ নীলরঙের ডুম্ব বাতির গায়ে। বাতিটা তখনও জ্বলিতেছে। নিশ্চয়ই অধ্যাপক পড়িতে পড়িতে ঘুমানিয়া পড়িয়াছিলেন, ঘুমের মধ্যেই প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। বা হস্ত তাঁহার আলো জ্বালিয়া ঘুমানো অভ্যাস ছিল।

ডাক্তার হাত বাড়াইয়া চাবি ঘুরাইয়া দিলেন, বাতি নিবিয়া গেল। পোড়া গ্যাসের এক বলক গছ নাকে আসিয়া লাগিল।

ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বসিলেন। আমি বেলািং ধরিয়া দাঁড়াইলাম। অধ্যাপকপত্নী তখনও একই-ভাবে বসিয়া আছেন।

ডাক্তারের আহ্বানে তিনি মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। ডাক্তার কহিলেন, কি করে হ'ল?

—জানিনে।

—কোন অন্তঃ-বিমূক বলেছিলেন?

—না।

—কখন হল?

—জানিনে।

—টের পাননি?

—আমি ওষুধে শুই খোকাকে নিয়ে।

—নিয়মিত?

—হ্যাঁ।

ডাক্তার অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, আপনার আত্মীয়স্বজন কে আছেন এখানে?

—নেই। থাকলেও আমি জানিনে।

—খবর দেবার মত কেউ?

—ওর ভাই আছেন, ম্যাগালে-তে। খবর দিতে হবে, আসতে পারবেন মনে হয় না। এসেই বা কি করবেন।

—আপনার দিকে?

—সে-ও বহুদূর। তাদের কথা পরে ভাবলে চলবে।

ডাক্তার আবার চূপ করিয়া কি ভাবিলেন। কহিলেন, আপাতত যা করবার সে আমি ঠিক করে নিচ্ছি। আপনাকে শক্ত হাতে হবে, ভেঙে পড়লে চলবে না।

—ভেঙে পড়িনি ত'?

আশ্চর্য, স্থির ও শান্ত স্বর। একটু বেন ক্লাস্ত, বেন মনের কোন্‌ বত্বর অন্তস্তপ হইতে উঠিয়া আসিল কথাটা।

ডাক্তার একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। তারপর কহিলেন, খোকা কোথায়?

—অন্ত বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

—ভাল করেছেন। কিন্তু একবার তাকে নিয়ে আসবেন না, দেখতে?

—এনে কি হবে?

—তা বটে!

ডাক্তার হঠাৎ আমার দিকে চাহিলেন। আপনি কে?

অধ্যাপকপত্নী কহিলেন, প্রতিবেশী। খোকার বন্ধু। আপাতত যা বলার করার উঁকেই বলতে হবে।

—বেশ।

ডাক্তার আমাকে ডাকিয়া লইলেন। হুঁজনে নীচে নামিয়া আসিলাম। ডাক্তার বলিলেন, এখানে ছেলের একটা দল আছে, এ-সব ব্যাপারে তারাই ভরসা। আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।

রামদীন তাহাদের ডাকিতে গেল এবং বটাখানের মধ্যে তাগারা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে পরিচিত প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবও কয়েক জন আসিয়া পড়িলেন।

ডাক্তার সার্টিকিকিট লিখিয়া দিলেন। মৃত্যুর কারণ লিখিলেন asphyxia বুয়ের মধ্যে শ্বাসরোধ। দেহ লইয়া ছেলেরা চলিয়া গেল। অনিলাম, শ্মশান অনেক দূর। আমার রুগ্ন দেহ, অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল, আমি বাড়ি চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্মশানবাড়ীয়া ফিরিয়া আসিল। সংবাদ পাইয়া আমি আবার গেলাম। তখন দেখিলাম, অধ্যাপকপত্নীর পরিচিত কয়েকজন মহিলা আসিয়াছেন। রাত্রে তাঁহারা কেহ কেহ এ বাড়িতে থাকিবেন।

সন্ধ্যার পরে, কলরব ও আলোচনা বধন ভিমিত হইয়া আসিয়াছে, অধ্যাপকপত্নী হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার

কহিলেন, আমি এই সম্ভাবনাই ভাবছিলাম। এতক্ষণ হয়নি এইটেই আশ্চর্য!

পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কহিলেন, শুইয়ে রেখে দিন। এখন দরকার শুধু বিশ্রাম, আর কিছু নয়। ওষুধ দিয়ে জ্ঞান করানোর চেয়ে এখন এই ভাবে থাকাই ওর পক্ষে ভাল।

আমি কহিলাম, আমি কি থাকব রাত্রে?

ডাক্তার কহিলেন, কিছু দরকার নেই, আমি থাকছি। আপনি বাড়ি যান, দরকার হয় ত' ডেকে পাঠাব।

পরদিন সকালে গিয়া দেখিলাম, যোগিনীর মূর্ছা ভাঙিয়াছে। দুর্বল। শুইয়া আছেন। ডাক্তার উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ডাক্তার তখনও বাড়ি যান নাই। কহিলেন, আপনাকে আমার দরকার আছে।

কহিলাম, বলুন।

নির্জন লাইব্রেরি-ঘরে হুঁজনে আসিয়া বসিলাম। ডাক্তার কহিলেন, আপনার পরিচয় আমি শুনেছি। এদের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। এইটেই দেশ, অথচ এদের লাত্মীয়-স্বজন বলতে বিশেষ নেই। চিরকাল বাইরে থেকেছে, বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও বেশী নয়। আপনি বাইরের লোক, আমিও তাই। অথচ, আপাতত বোধ হয় আমরা দুজনই এদের বন্ধু বা ভরসা।

আমি কহিলাম, সেই রকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি ত বেশী দিন থাকব না। আমার ফেরার সময় হয়ে এল। আপনিও কি এখানকার লোক নন?

—না। মাঝে মাঝে এসে থাকি। এদের সঙ্গে পরিচয় আছে, এইমাত্র। কিন্তু সম্পর্ক গভীর না হলেও, এদের প্রতি আমার কিছু দুর্বলতা আছে। অধ্যাপককে আমি স্নেহ করতাম। আর এই মেয়েটিকে আমি শ্রদ্ধা করি। অদ্ভুত শক্ত মেয়ে।

—তাই ত দেখলাম। এ ভাবে এই ব্যাপারকে কেউ সহ্য করতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।

—সেইখানেই আমার আশঙ্কা। এত বেশীরকম চেপে রাখছে নিজেকে, এর উন্নয়ন বি-অ্যাকশন হওয়া অসম্ভব নয়।

—হ্যাঁ। ফিট হ'লেন দেখে আমার ভয় হয়েছিল।

—ওটা কিছু নয়। বরং ওটা একটা ব্রেট রিল্যাক্সেশন। এরকম ফিট আরও হুঁ-চারবার হতে পারে। তখন চূপচাপ শুইয়ে রেখে দেওয়াই একমাত্র চিকিৎসা। সে যাক, বা বলছিলাম। আপনি কি দিনকতক থেকে যেতে পারবেন?

—কত দিন, বলুন?

—অদ্ভুত এই শ্রাদ্ধের ব্যাপারটা মিটে যাওয়া পর্যন্ত?

—তা পারব।

—এরা ব্রাহ্ম। শ্রাদ্ধ মানে ঠে-ঠে ব্যাপার কিছু নেই। শুধু একটা উপাসনা। আর কিছু লোকজনকে সেদিন একটু জল খাওয়ানো। ভাইটাই কে কে আছে, জেনে নিয়ে তাদের চিঠি দেবার ব্যবস্থা আমি করছি। তারা কেউ আসে, ভাল। না এলে আমাকে আর আপনাকেই চালিয়ে নিতে হবে শেষ পর্যন্ত।

—তারপর?

—তার পর বেশী কিছু নেই। বাড়ি নিজের, টাকাকড়িও আছে। মেয়ে শক্ত। এ এক ছেলে, বামেলা নেই। রামদীন

বহুদিনের লোক, অত্যন্ত বিখ্যাত, মেয়ে তাড়ালেও ছেড়ে বাবে না। শহর জায়গা, হঠাৎ বিপদ-আপদের কিছু নেই। তার পরে আর কি, ভগবান ভরসা।

—বেশ। আপনি বা বলবেন, আমি তৈরি থাকব।

—আপনাকে আমি বলেছি সেটা প্রকাশ করবেন না। ভয়ানক অভিমতী মেয়ে, কারো সাহায্য বা করুণা সহ্যে পারে না। সেইজন্মেই আরও বেশী করে শক্ত থাকার ভাগ করে।

—বুঝেছি। কিন্তু একটা কথা বলুন ত? আপনাকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছি, ভাঙ্গা পাইনি। শুধু আমি বতটুকুন দেখেছি, চমৎকার ছোয়ান খাড়া বলেই মনে হয়েছে। অবশ্য আমি ডাক্তার নই, বাইরে থেকে বা মনে হত তাই বলছি। হঠাৎ কি হ'ল? এভাবে মারা গেলেন কেন?

ডাক্তার হানিলেন। মানুষ মারা যায় কেন? সব মৃত্যুর কি কারণ আমরা বুঝি?

—হার্টফেল? হার্ট কি দুর্বল ছিল?

—অস্বস্ত ছিল বলে আমি জানি নে।

—আপনি সার্টিকিকিট লিখেছেন, 'অ্যাস্কিক্শিয়া', সেটা কি হঠাৎ হ'তে পারে?

—হঠাৎই হয়।

—কি কারণে?

—কারণ অনেক রকম হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ঠিক কি হয়েছিল আমি কি করে বলব?

বলিতে বলিতে ডাক্তার ঈষৎ অস্বস্তান্বিত হইলেন। তার পর সে ভাবটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কহিলেন, আমি চলি এবারে। বিকালে আসছেন ত, এ বাড়ীতে?

—যখন বলবেন, আসব।

—বেশ।

বিকালে গিয়া দেখিলাম, রোগিনী অনেক সুস্থ। খাটোটা অনেক সামলাইয়া লইয়াছেন ইতিমধ্যে। অবশ্য অত্যন্ত বিস্ময় হইয়া পড়িবার লক্ষণ কোন সময়েই দেখি নাই।

ছেলেকেও দেখিলাম, আপন মনে খেলিয়া বেড়াইতেছে। মায়ের অত্যন্ত বাধ্য। তাহার উপরে মায়ের প্রভাব এমনই প্রবল যে, এত বড় ঘটনাটাকেও যেন বহুদূর উত্তীর্ণ করাইয়া আনিয়াছেন তাহাকে। আশ্চর্য মেয়ে।

[ক্রমশ:]

সুরা না সূধা

পানাসক্তি এক বিচিত্র ব্যসন। মানব সমাজে সুরাপানের অভ্যাস বহুল প্রচলিত, এই অভ্যাসের সন্ধকেই দু'চার কথা এখানে বলার চেষ্টা করব।

অনেক সময় অনেকের পানাসক্তি প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়, যেমন শোনা গিয়েছে কোন কোন লক্ষপতি নাকি পুরো দু'-বাতল হইলি দৈনন্দিন জলযোগ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন, এই ধরণের মত্তাসক্তি বলা বাহুল্য মানুষকে নিশ্চিত সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যায়। ক্রম গতিতে পান করলে সুরার অনিষ্টকারিতা বৃদ্ধি পায়, এ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় মগজ আচ্ছন্ন হয়ে যায় যদি অল্প সময়ের ভিতর কেউ অধিক পরিমাণ মত্ত পান করেন—অর্থাৎ ঠিক সেই পরিমাণ মত্তই যথোপযুক্ত সময়ের ব্যবধানে পৃথীত হলে তার ক্ষতিকর প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস পায়। সুরার পরিমাণ অপেক্ষা কি ভাবে তা পান করা হয় তার উপরই তার ক্রিয়া বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। জল বা সোডার সঙ্গে মিশ্রিত মত্ত অপেক্ষা নির্জলা মত্ত অনেক বেশী অনিষ্টকারক।

সুরাপানের সমর্থক কেউ কেউ এমন ধারণা করেন যে মত্তপানে মনের কৃষ্টি ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, সুরার প্রভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি ক্রমেই অকাজ হতে পড়ে এবং সময় বিশেষে সম্পূর্ণ ভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ারও আশঙ্কা থাকে, এ অবস্থার মানুষের মৃত্যু ঘটতে বিচিত্র নয়। এ্যালকোহল সন্ধকে বহু প্রয়োজনীয় তথ্যই আজও সাধারণের অজানা, যেমন নিয়মিতরূপে মত্ত পানে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি যে কোন অন্ত্যস্ত ব্যক্তি

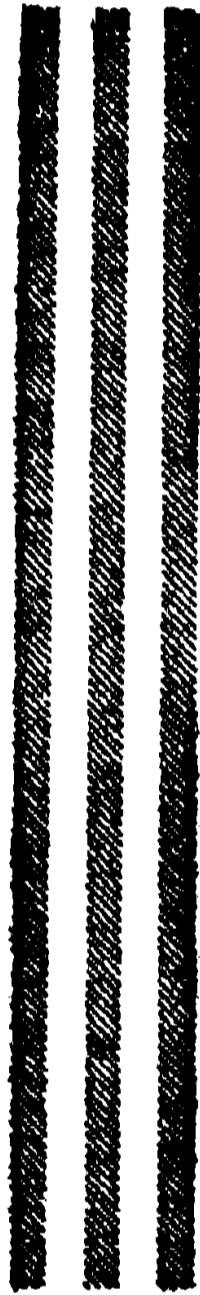
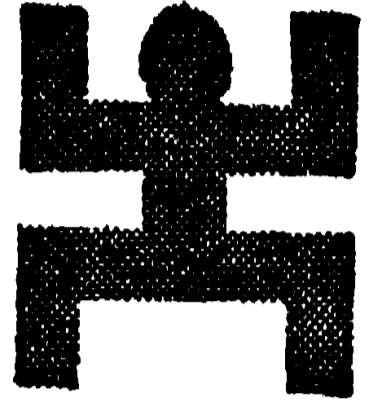
অপেক্ষা অনেক কম সময়ের মধ্যে নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তাও আমাদের অনেকেরই জানা নেই, আবার দুর্বল ক্ষীণ দেহ মানুষের শরীরে সুরাপানের প্রতিক্রিয়া যত ঘনিষ্ঠ হয় কোন সবল সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা হয় না। সুরাপায়ীর পক্ষে কয়েকটি নিয়ম অবশ্য পালনীয়, তিনি যেন সর্বদা মনে রাখেন যে শূন্য উদরে সুরাপান অতিশয় ক্ষতিকর, পানে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে বেশ কিছু আহার করা বিধেয়, পূর্ণ উদরে মত্তপান করলে তার অনিষ্টকারিতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।

অম্লিত অম্বল বা জলপাইয়ের তেল ও মাখন মত্তপানের অব্যবহিত পূর্বে গ্রহণ করলে পানের প্রতিক্রিয়া অনেক কম হয়, মত্ততা যিনি পরিহার করে চলতে চান এমন ব্যক্তি এই নির্দেশগুলি মেনে চললে উপকৃত হবেন।

অনেকে নিয়মিত সুরাপায়ী না হলেও বেশ কিছুদিনের ব্যবধানে মত্তপান করার আগ্রহ অনুভব করেন, বলা বাহুল্য এই ধরণের পানাসক্তি বিশেষ ক্ষতিকর নয়, কিন্তু পানাত্যাস মানুষকে করে তোলে নেশার দাস এবং নিজে যায় ক্রমিক অধঃপতনের পথে।

পরিশেষে একটু বক্তব্য আছে, শীত প্রধান পাশ্চাত্য দেশগুলির অধিকরণে আমাদের দেশেও আজ সুরাপানের অভ্যাস প্রসার লাভ করেছে ক্রমেই ব্যাপক ভাবে, দেশের সরকার ও সমাজ-সচেতন মানুষের দৃষ্টি যদি এখনও এদিকে নিবদ্ধ না হয় তবে কে বলতে পারে যে ভবিষ্যতে এর প্রতিক্রিয়া একদিন আমাদের সমগ্র সমাজ-জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে না?

মাসিক বসুমতী—ভাদ্র, ১৩৬৭

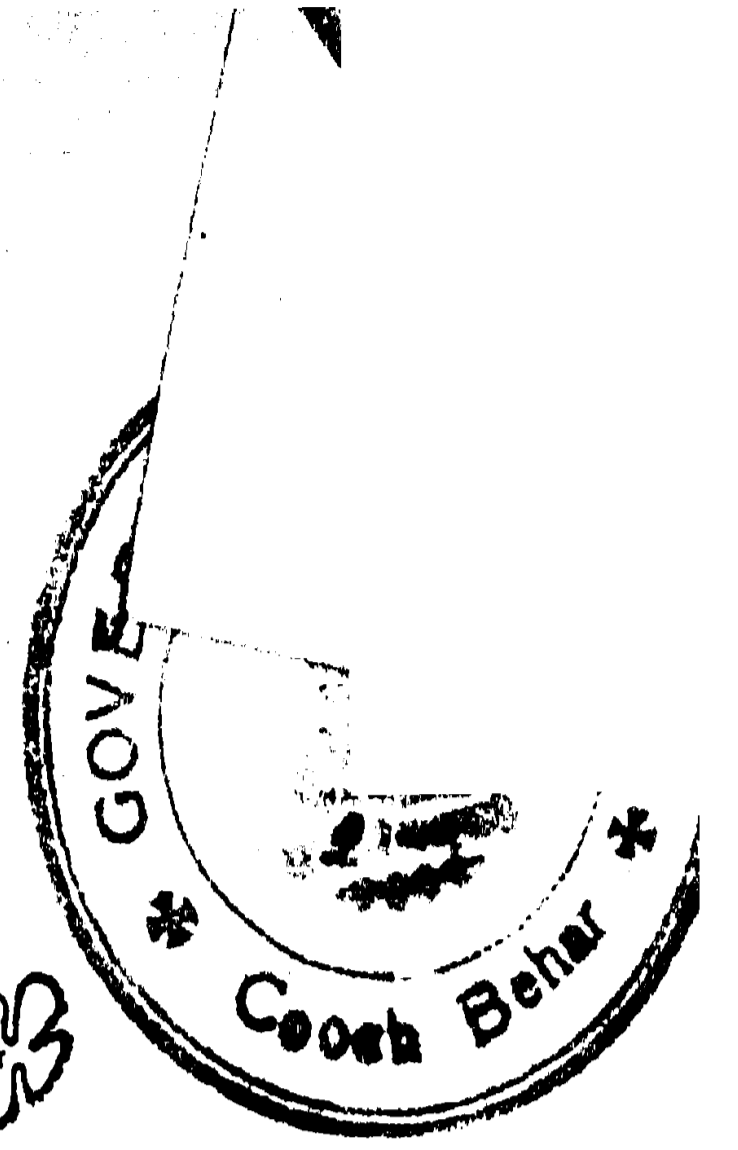


লক্ষ্মীবিলাস

তৈল



এম. এল. বসু য্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লি:
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯



বাঙলায় কনট্র্যাক্ট ব্রাজ

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ভূমিকা

['তাসা কর্পনাশা' এই প্রবাদবাক্যটি শুনে শুনে তাসখেলা সবচেয়ে কোনওরূপ আগ্রহ ছিলনা আমার। প্রথমে ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু প্রভৃতি খেলাঘর খেলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকার দরুণ। এর মধ্যে প্রথমোক্ত খেলাটিই ছিল বেশী প্রিয় আমার, খেলতুমও ভালই যদিও তৎকালীন নামকরা খেলোয়াড় গোষ্ঠী-পাল, উমাশক্তি কুমার, রবি গাঙ্গুলী, সামাদ প্রভৃতির সমকক্ষ নয়। সে সময়ে তাস, পাশা ক্যারাম ইত্যাদি খেলাকে আমল ত' দিতুমই না বরঞ্চ যারা এই খেলা খেলত তাদের কুঁড়ে বলে বিদ্রূপ করতেনও পিছপা হতুম না। তখন এইরূপ কোনও খেলার নিজেও যে জড়িয়ে পড়তে পারি এটি মনেও স্থান পায়নি। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, ১৯২২ কি ১৯২৩ সালে ঠিক মনে নেই দানাপুরে ফুটবল খেলতে গিয়ে ডানপায়ের হাঁটুতে ভীষণ চোট পেয়ে হাসপাতালে দেড় মাস থেকে যদিও সেয়ে উঠি কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শে—ফুটবল খেলা, যা আমার সর্বাধিক প্রিয় খেলা, সেটি ছাড়তে হয়। প্রায় সাত আট বছর বাদে আবার খেলতে শুরু করি এবং চালিয়েছিলুমও হুঁতিন বছর কিন্তু আগের মত খেলতে পারিনি কারণ খেলতুম তখন ভয়ে ভয়ে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয় আরও বাড়তে থাকে এবং ছেড়ে দিতে হয় এই খেলা একেবারে। কিন্তু গোড়া থেকে খেলাধুলায় একটু বিশেষ আকর্ষণ থাকায় বিকেল বেলা মনটা একটু ছুক ছুক করত। গড়ের মাঠে খেলা দেখে তুধের সাধ-খোলে যেটান গোছে কাটতে লাগল মন্দ নয়। তাতেও ভাঁটা পড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে দুটো কারণে। প্রথমতঃ কর্পনখেল থেকে ছুটি পাওয়া বা নেওয়া শক্ত হ'য়ে পড়তে লাগল—কতদিন আর খেলা দেখতে যাব বলে একটু আগে ছুটি নেওয়া যাব? দ্বিতীয়তঃ যদিওবা ছুটি পাওয়া যাব মাঠে ঢোকা একরূপ অসাধ্য হয়ে পড়ল। ছেড়ে দিলুম খেলা দেখা সেদিন থেকে যেদিন চোখের Tear gas-এর জের কাটাতে লেগেছিল প্রায় সাতদিন অর্থাৎ ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের I. F. A. Shield এর কাইনাল খেলার দিনে।

এরপরে সময় কাটাবার জন্ত সন্ধ্যার পর ক্লাবে গিয়ে বসতুম এবং আন্তে আন্তে দেখে শুনে ও জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্রীজ খেলাটি শিখতে লাগলুম। বলাবাহুল্য সেই সময়ে এই খেলাটিই সচরাচর খেলা হ'ত ক্লাবে। খেলাটিও লাগতে লাগল মন্দ নয় কারণ খেলাটিতে ভাববার খোরাক আছে বিশেষ—আমার মনে হয় দাবা-খেলার চেয়ে কোনও অংশে কম ত' নয়ই বরঞ্চ কিছু বেশীই।

ভালভাবে শেখবার উদ্দেশ্যে কিনে ফেললুম বই একখানা Culbertson's Blue Book। পড়ে আকর্ষণ আরও গেল বেড়ে এবং ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বইই কিনলুম, সেগুলির মধ্যে Culbertson's Gold Book, Oswald Jacoby's Four Aces বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে এক সপ্তকর্ম (সর্গীর

নৌতিশাস্ত্র মিত্র) সন্ধান মিলে, গেল জাপ্য গুণ এবং তাঁর সঙ্গ চ করে অভিজ্ঞতাও লাভ করলুম যথেষ্ট। বলতে বাধা নেই যে প্রথমে "তাসা কর্পনাশা" বলে বর্জন করতুম যে খেলাকে সেই খেলাটিই এমন ভাবে ফরম করল আমার যে খাওয়া দাওয়া, সাংসারিক দায়িত্ব কিছুটা শিথিল হ'য়ে পড়ল। এর জের অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং এখনও তার জের টানতে হচ্ছে। কিন্তু এই খেলাটির মধ্যে পেয়েছি বহু জিনিষের সন্ধান যথা ইহা অক্ষয়শক্তি, চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি ও একাগ্রতা চর্চার মাধ্যম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা পুরানো কথা যা কোনও ব্রীজখেলার শেষ পরের পারিতোষিক বিস্তরণ কালে সভাপতি বলেছিলেন :—

...As physical exercise develops the body mental exercise develops the brain and this game seems to be the best medium of such an exercise...

অর্থাৎ 'বেশন শারীরিক চর্চার দ্বারা শরীরের উন্নতি সাধিত হয় সেইরূপ মস্তিষ্কের চর্চার দ্বারা মানসিক শক্তির উন্নতি করা চায় এবং আমার মনে হয় যে এই খেলাটি এইরূপ চর্চার একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।'

উপরোক্ত উক্তির স্বার্থার্থ উপলব্ধি করেছি পরবর্তী কালে নি: কর্পনজীবনে—স্মরণশক্তির অভাব বোধ করিনি সুদীর্ঘ ৩৭ বৎস কর্মকালে কোনও সময়ে এবং একাগ্রতার অভাব হয় না যে কোন বিপরীত পরিস্থিতিতেও।

বা'হোক যবে বসে খেলাগুলির মধ্যে ব্রীজ খেলাকেই শ্রেষ্ঠ মা হওয়ার এবং এই খেলাটির প্রতি আমার নিজের বিশেষ আকর্ষণ থাকায় এই খেলাটি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ প্রকাশে উজোগী হয়েছি, যদি পাঠকদিগের নি: থেকে কিছুটা সমর্থন পাই তাহলে পরিশ্রম সার্থক ও নিজে যন্ত বলে মনে করব।

এইরূপ একটি পাশ্চাত্য খেলার বাংলায় রূপদান করা ব কঠিন মনে করে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়ি সেই সময়ে প্র সাহিত্যিক জীবুজ হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ মহাশয় শুধু মৌখিক উৎ দিয়ে কান্ত হন নি পরন্তু তরুণ হিন্দুস্থান নামক বাংলা দৈর্ কাগজে নিয়মিতভাবে ধারাবাহিক প্রকাশ করে আমার কৃতজ্ঞ পাশে আবদ্ধ করেছেন—আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। পরে ব 'নবশক্তি' ও 'আত্মশক্তি' নামক সাপ্তাহিক আমার লেখা নিয়মিত স্থান লাভ করেছে। জীবুজ সরোজকুমার রায় চৌ মহাশয় এ সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সেই সময়ে প ও পাঠিকদিগের নিকট থেকেও যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছিলুম সৌ আজ বহুবৎসর বাদে এই খেলাটিকে আধুনিক উন্নতহাঁচে নৃতনরূপ দিয়ে প্রকাশে চেষ্টা হ'য়েছি, জানি না কতদূর কৃত হব সবই নির্ভর করছে পাঠক পাঠিকাদের উপর।]

ক্রীড়া খেলার আধার বিবরণী

ক্রীড়া খেলা হ'রকমের—অক্সন্ (Auction) ও কন্ট্রাক্ট (Contract)। প্লেবোক্ত খেলাটির আবির্ভাব আমাদের দেশে বেশী দিনের নয়, কিন্তু এই খেলার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত খেলার (Auction) আদর স্বভাবতঃই কমে গেছে। কারণও খুবই স্বাভাবিক—উৎকর্ষতা লাভের জন্য দরকার নিবিড় মনোযোগ, তাগের বিভাগ ও অবস্থিতি সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা উপরত্ব রয়েছে গেমের (Slam) মোটা অঙ্কের বোনাস (Bonus)। ডাক ও খেলা ঠিকমত না হ'লে এই বোনাস লাভ করা সম্ভব নয় কিছুতেই, আন্দাজে হয়ত এক আধ বার কৃতকার্য হওয়া যেতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ে বিপক্ষ দলের খপ্পরে পড়ে মোটা অঙ্কের খেলারং দিতে হয়। এট বোনাস ছাড়াও কন্ট্রাক্ট খেলার আকর্ষণ হ'ল গেম বোনাস (Game Bonus)। গেমের ডাক ডেকে খেলা করতে পারলেই এই বোনাসের অধিকারী হওয়া যায়, অপর পক্ষে অক্সন্ (Auction) খেলায় কম ডাক হলেও বেশী ডাকের খেলা করতে পারলে ব্লাম ও গেমের বোনাস পাওয়া যায়। সুতরাং কন্ট্রাক্ট খেলায় দরকার বিজ্ঞানসম্মত ধারার ডাকের আদান প্রদান ও দ্রুত ধরণের ক্রীড়াপদ্ধতি এবং এইজন্যই কন্ট্রাক্ট খেলা আজ ক্রীড়াঙ্গতে অধিক আদরণীয় হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে এই খেলার যথেষ্ট আদর আছে বটে কিন্তু সাধনা বা চর্চা গতানুগতিক বক্রমেব। প্রকৃত সাধনা বলতে বা বোঝায় তার নেতৃত্ব অভাব আমাদের দেশে। এর প্রমাণ এই যে, আজ প্লেবোক্ত আমাদের দেশে এ বিষয়ে কোনও পুস্তিকা বা সাময়িকী প্রকাশিত হ'য়েছে বলে আমার জানা নেই। একমাত্র ধনাত্মক ইণ্ডিয়ান ব্রিজ ওয়ার্ল্ড (Indian Bridge world) নামক পত্রিকা ছাড়া। উক্ত পত্রিকার সম্পাদনার ভার আমার ঠানবই পড়েছিল এবং চেষ্টাও করা হয়েছিল প্রচুর চালানোর জন্য, কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য যে ক্রেতার অভাবে বহু টাকা লোকসান দিয়ে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলুম কয়েক মাস পরেই। অথচ পাশ্চাত্য বিদ্যে এই যে, আমাদের দেশে এই খেলার পুরুপাতী মর্ষকের সংখ্যা খুব নগণ্য নয় এবং ক্রীড়াবিদগণ আছেন যথেষ্ট। যারা কবি পাবনতীকালের এইরূপ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং এইরূপ প্রচার ও ক্রীড়ার উন্নতি সাধন করে জগতের ক্রীড়াঙ্গত্রে গণ্ডা তথা ভারত একটি উচ্চ আসন গ্রহণ করবে।

খেলটিকে প্রধানতঃ দুটি অংশে ভাগ করা যায়—১। ডাক Bidding) ও ২। খেলা (Play-out)। খেলা আবার হ'রকমের—(ক) ডাক পূরণের জন্য খেলা ও (খ) বিপক্ষদলের গানের বাধাদানের জন্য খেলা। বহুক্রেত্রে দেখা গেছে যে তাগের দ্বাবস্থিতি ও বিভাগ ঠিকমত আন্দাজ করতে পারলে অভিজ্ঞতার ফলে খেলার সময়ে একটি পিঠ বাডান যায় আবার দূরদৃষ্টি বলে বিচক্ষণতার দ্বারা বিপক্ষ দলের একটি পিঠ কমান যায়। অনেক সময়ে দেখা গেছে যে কোনও একটি দানে একটি নির্দিষ্ট তাগ ধর্ম্মে খেলার দরুণ বিপক্ষদল চুক্তি সম্পাদনে অসমর্থ হয়। গুলিকে হঠাৎ এর (accident) পর্যায়ের খেলা যেতে পারে এবং এসবকে চর্চা অনাবশ্যক।

ক্রীড়া খেলা সম্বন্ধে বইগুলির মধ্যে সবথু গ জানে Culbertson-এর

Blue Book যদিও তার আগে Manning Foster, Dalton প্রকৃতি নামকরা খেলোয়াড়ের বইগুলির খুবই কম ছিল কিন্তু মনে হয়, সবগুলিই চাপা পড়ে যায় উক্ত Blue Book-এর আবির্ভাবে। ইহার কিছু পরে Culbertson আরও উন্নতধরণের পুস্তক প্রকাশ করেন Gold Book নাম দিয়ে এবং বৃদ্ধার কিছু পূর্বে পূর্বোক্ত দুটি বইয়ে ক্রটি-বিচুতিগুলি সংশোধন করে নতুন বই প্রকাশ করেন, আধুনিকতম প্রধার নাম তার Contract Bridge Complete। ইতিমধ্যে নামকরা খেলোয়াড় Oswald Jacoby প্রণীত Four Aces বইটিও খুব প্রসিদ্ধিলাভ করে। বাই হোক, বইগুলির মূল বিষয়বস্তুও লক্ষ্য হ'ল কি তাগে বা কোন প্রধা অবলম্বন করে সহজে ঠিকমত ডাকে পৌছান যায়। বিভিন্ন লেখক নিজ নিজ ভাবধারার বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে ঐ উদ্দেশ্য সমাধানের চেষ্টা করেছেন। গভীরভাবে চিন্তা বা অনুশীলন দ্বারা দেখা গেছে যে একমাত্র উচ্চডাক (Slam Bidding) ছাড়া পৌছান দিকের ডাকের নিয়মগুলি মূলতঃ একই প্রকারের শুধু প্রকাশভঙ্গি কিছুটা পৃথক করে Commercial দর সৃষ্টি করা হয়েছে পাঠকবর্গের হৃদিতোলায়ুযায়ী। সে বাই হোক, লেখক-সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নয় আমার, উদ্দেশ্য হ'ল Bridge খেলা সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদিগকে অবহিত করতে সাহায্য করা। এবিষয়ে যদি কিছুটা সমল হই তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক ও নিজেকে ধৃত মনে করব।

উদ্বোধনী ডাক (Opening Bid)

তাগ বন্টনের পর ডাক দেবার প্রথম পালা হ'ল বন্টনকারীর। প্রথম ডাকে নিচায় করতে হবে যে বক্রপ তাগ তিনি পেয়েছেন সেতপ তাগ ডাক দেওয়া উচিত কি না? এই উচিত কি অসুচিত বিশ্লেচনা করতে গোল দরকার একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (system) যা দ্বিগে নিজে বোঝা যায় ও 'খেড়'কেও (partner) বোঝান যায় সম্বন্ধে যে তাগের পিঠগুলির ক্ষমতা তিরুপ। যে পদ্ধতি অবলম্বনে এই উদ্দেশ্য অধিকতর কার্যকরী হয় সেটিকেই প্রকৃত পদ্ধতি বলে যেতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই খেলাটির আদর পাশ্চাত্য দেশেই অধিক এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা খেলাটির উৎকর্ষ সাধনে গবেষণাও করেছেন বহু। স্বভাবতঃই উদ্বোধনী ডাকের নিয়মও অধিকতর জমেছে নানা প্রকারের। প্রত্যেক প্রকৃকার নিজ নিজ পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নানা রূপ উদ্ভাবন দিয়ে প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছেন যে তাঁর প্রণালীটিই শ্রেষ্ঠ। বইগুলি পড়ে বা অন্তর্গলি পদ্ধতির কথা শুনে প্রথম শিক্ষার্থীগণ পড়েন বিপক্ষে, কোনটি ঐগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা প্রচলিত বিচার করা হয়ে পড়ে কঠিন। কঠিন মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক কারণ পর্যক্রিম বহুরের অভিজ্ঞতার পরেও আমি নিজেই মধ্যে মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি কোনও একটি নির্দিষ্ট তাগে ঠিক মত ডাকে পৌছবার সময়ে। বাই হোক, এ বিষয়ে মন্তব্য করা আমি ধৃষ্টতা মনে করি। আমার নিজস্ব মত এই যে সবগুলি প্রণালীই মূলতঃ এক, শুধু ভক্যং প্রকাশভঙ্গীর বা আগেই বলা হয়েছে।

ডাককে সাধারণ ভাবে Telegraphic code বলা চলে। যেমন তাগ বন্টনকারী তাগ তুলে একটি ইচ্ছাবন ডাকলেন এই code এর অর্থ হল প্রথম দুজনেই খেড়কে জানান যে—ক্রীড়া খেড়ি, আমি

ইচ্ছাবন রংয়ে খেলতে ইচ্ছে করি এবং আমার হাতে একটি ডাকের উপযুক্ত তাস আছে। এই উপযুক্ততা বিশ্লেষণ ও ঠিকমত নিরূপণের জল্পিত system বা নির্দিষ্ট নিয়ম কাম্বুনের উদ্ভাবন। বিভিন্ন লেখক ট্রিকু তাসের অর্থাৎ টেক্স, সাহেব, বিবি, গোলামের পিঠ জয় করবার ক্ষমতামূহুরী দর বেঁধেছেন বিভিন্ন উপায়ে। এগুলির মধ্যে Oswald Jacoby প্রণীত Four Aces বা Culbertson প্রণীত Contract Bridge Complete এই দুটি বইয়ের ধারাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই ধরগুলি নিম্নরূপ :-

	Jacoby	Culbertson
টেক্সা	৩	৪
সাহেব	২	৩
বিবি	১	২
গোলাম	২	১
মোট	৬	১০
চারটি রংয়ের মোট	২৬	৪০
শিছু পিছু গড়	২	৩.০৮

এর পূর্বে culbertson দর বেঁধেছেন ট্রিক (Trick) হিসেবে এবং দেখিয়েছেন যে ৮ থেকে ৮ই ট্রিকে সব পিঠ জয় করা যায় স্বাভাবিক ভাবে। একটু ভালিয়ে দেখলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে উপরোক্ত দুটি বা অপর যে কোন প্রণালীই ধরুন না কেন, মূলতঃ সবগুলিই এক, কারণ উদ্দেশ্য একই—কি প্রকারে ডাকের বিনিময়ে নিজ ও খেঁড়ীর মধ্যে তাসের বিভাগ ও পিঠজয়ের ক্ষমতামূহুরী নির্দিষ্ট ডাকে পৌঁছান যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির দরুণ ঠিক ডাকে পৌঁছাতে সক্ষম হন না কোনও জুটি অথবা ক্ষমতার অধিক ডাকে উঠে খেসারত দিয়ে থাকেন এবং তর্কের থাকিয়ে System এর দোষারোপ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে খেঁড়ীর ভাগ সময়েই দেখা গেছে যে ক্রটি System এর নয়, দোষ উহার অপপ্রয়োগের। আর একটি ক্রটি সচরাচর দেখা যায় যে কোনও কোনও খেলোয়াড় কোনও প্রচলিত প্রণালীর অকৃতজ্ঞ বা দাস হ'য়ে পড়েন অথবা কেহ কেহ প্রচলিত প্রণালীকে নিজেদের মনোমত ভেঙেচুরে ব্যবহার করে থাকেন। এর কোনটিই বাঞ্ছনীয় জ' নয়ই এবং প্রয়োজনও হয় না বিশেষ। প্রথমোক্ত পদ্ধটিকে বিশেষ খারাপ ফলদায়ক বলে মনে হয় না এবং বয়দাস্তও করা চলে কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধটি বঞ্ছনীয় ও অচল। কারণ এটি প্রকৃতপক্ষে পড়ে অসম্ভূতার পর্যায়ে—যদি না গোড়াতেই বিপরীত পক্ষকে উপরোক্ত যত্নবল সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল করা হয়। বা হোক, প্রণালী সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে প্রণালীগুলি নিয়মালুপ হবার সোপান মাত্র, খেলার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়ই প্রধান।

আমাদের দেশে Culbertson Systemই বেশী চালু ও প্রিয় এবং আমি নিজেও এই প্রণালীরই সমর্থক। সুতরাং এই প্রণালীর উপর নির্ভর করেছি আমার মন্তব্য ও লেখাগুলিকে। কিন্তু সামান্য বিপদ দেখা যাচ্ছে ইদানীং কারণ Culbertson তাঁর শেষ বইয়ে (Contract Bridge Complete) উচ্চ তাসের পিঠ জয়ের

ক্ষমতা নির্ধারণে ব্যবহার করেছেন সংখ্যানুপাতিক দর (Numerical value) ট্রিক-দরের (Trick value) বহুলে'বা আগের বলা হয়েছে। কিন্তু উক্ত প্রথারই মূল এক বিধায় এবং সংখ্যানির্ধারণে খেলোয়াড়গণের অসুবিধা ও কিছুটা সময় লাগে মনে হওয়ায় ট্রিক-দর ধরেই বিশদ আলোচনা করা গেল যদিও, পাঠক-পাঠিকাদিগের অবগতার্থে সংখ্যানুপাতিক ভাটিকাও দেওয়া হয়েছে।

ট্রিক-দর হিসাবে Culbertson এর নির্দেশামূহুরী ২ই ট্রিক থাকলে উদ্বোধনী ডাক দেওয়া চলে বা দেওয়া উচিত প্রায়ই পথে, যাতে এবং খেলার টেবিলে এই আড়াই ট্রিক নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতে পাওয়া যায়। এই তর্ক সীমাবদ্ধ থাকে পরম্পরের খেঁড়ীর মধ্যে ও বিষয়বস্তু প্রায়ই হয় আড়াই ট্রিক না থাকা সত্ত্বেও উদ্বোধনী ডাকের পরিণতি বিষয়ে কিন্তু শুনি নি কোনও আলোচনা যে প্রথাকার উদ্বোধনী ডাকের জল্প আড়াই ট্রিকই নির্ধারিত করলেন কেন। এই প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। সেই প্রশ্নের জবাব হিসাবে এবং শিক্ষার্থীগণের সুবিধার জল্প এই আড়াই ট্রিকের অক্ষয়মতে ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হল। প্রথাকার মনে হয় Trade Secret হিসাবে অথবা বিষয়টি অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক বোধে ব্যাখ্যা করেন নি তাঁর কোনও প্রস্তু।

টেক্সা পরে সাহেব, বিবি-গোলাম প্রভৃতি তাসগুলি পিঠ জয় করবার ক্ষমতা লাভ করে একের পর একে। প্রথমে টেক্সা চারটি চার পিঠ জয় করে কিন্তু হিসাবে দেখা যায় যে ঐ সময়ে গড়ে চারটি সাহেবের মধ্যে দুটিকে সজে করে নিয়ে যায় এবং বাকী দুটি সাহেব স্বাধীনভাবে পিঠ জয় করবার ক্ষমতা অর্জন করে অর্থাৎ কেবাই (Free cards) হয়। ঐরূপে টেক্সা, সাহেব চলে যাবার পর বিবিগুলি বধাক্রমে গোলাম, ১০ ও পরবর্তী তাসগুলি এমন কি ২ পর্যন্তও কেবাই হয়। এই নীতির উপর নির্ভর ক'রে Culbertson ঐ উচ্চ তাসগুলির পিঠজয়ের ক্ষমতার অনুপাতে প্রত্যেকটির দর নির্ধারিত করে Honour trick বলে অভিহিত করেন। এই Honour trick এর পূবা দর হ'ল ৮ থেকে ৮। যার দ্বারা তেংটি পিঠই জয় করা যেতে পারে। এই দর নির্ধারণের উপরই উদ্বোধনী ডাকের আড়াই ট্রিকের উৎপত্তি—সাধারণ অক্ষয়মের ত্রৈমাসিক নিয়মের বশে। যথা ৮ থেকে ৮। ট্রিক যদি দরকার হয় তেরটি পিঠ জয় করতে তাহলে একটির ডাকের খেলা করতে হলে অর্থাৎ সাতটি পিঠ জয়ে দরকার হয় অন্ততঃ ৪। ট্রিক। প্রথমে ধরে নেওয়া হয় যে প্রত্যেক খেলোয়াড় ৮টি Honour trick এর মধ্যে গড় অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ বা দুটি Honour trick পেয়েছেন। উদ্বোধনকারীর হাতে যদি গড়ের উর্ধ্বে একটি সাহেব অথবা একটি বিবি ও একটি গোলাম বেশী থাকে তবেই তিনি সাধারণতঃ প্রথম ডাক দেবেন। কারণ স্বাভাবিক বিভাগামূহুরী তাঁর নিজের ২ই ট্রিক এবং খেঁড়ীর ২ ট্রিক ধরে উক্তের বিশে ৪ই ট্রিক হয় এবং ৪ই ট্রিকে সাত পিঠ জয় করা খুবই সম্ভব এক এই হ'ল Culbertson মতে উদ্বোধনী ডাকের মূলনীতি। এই নীতির উপরই পরবর্তী ডাকগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খেলোয়াড়েরা কিছুটা ব্যতিক্রম করে থাকেন এই নীতির এবং খেঁড়ী এই ব্যতিক্রমী ঠিকমত বুঝতে না পারলেই আসে বিপদ ও

হয়ে পড়ে খেঁড়ীতে খেঁড়ীতে কথা কাটাকাটি—কলে পতন আসন্ন হয়ে পড়ে উক্ত দলের। এইরূপ পতন আমি লক্ষ্য করেছি বহুক্ষেত্রে এবং এটি এমন এক ক্রটি বা দলগত স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী যেমন ফলাফল কিছুটা খারাপ হলেই পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ ও নিজ নিজ দোষ কালনের প্রচেষ্টা। খেলার টেবিলে এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি এবং এই ব্যাধি বন্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন দলগত স্বার্থের স্বার্থিতরে। ভুলচুক হওয়াটা মাঝে মাঝে খুবই স্বাভাবিক কিন্তু কার ভুল তা নিয়ে আলোচনা উচিত নয় খেলার টেবিলে। ভুল যদি হ'য়েই পড়ে খেলোয়াড়েরা নিজেরা সে ভুল নিশ্চয়ই পরে বুঝতে পারেন এবং ভবিষ্যতে যাতে সে রূপ ভুল না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হবার অবকাশ তাদের দেওয়া খুবই দরকার। দর্শকগণের সামনে উক্ত ভুল দেখিয়ে অপদস্থ না করে। এরূপে বাড়ে খেড়ীদের মধ্যে মনের মিল এবং এই জুটিদের মধ্যে মনের মিলই জয়লাভের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শুধু এই খেলাতেই নয়, অপরাপর প্রায় সকল খেলাতেই এবং কেবল খেলাতেই কেন, সকল ক্ষেত্রেই—পরস্পরের মধ্যে মনের ও মতের মিল (Teamwork and unity) উন্নতির মূলে একটি বলিষ্ঠ উপকরণ।

অন্ততঃ আড়াই ট্রিক তাস হাতে থাকলে উদ্বোধনী ডাক দেওয়া চলে এটা স্থিরীকৃত হবার পর প্রশ্ন হ'ল কি ডাক হবে? এবিষয়ে বিভিন্ন মত পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থে কিন্তু সবগুলি মতেরই সারাংশ এই যে, অনায়াসে যে ডাকের দ্বারা নিজ হাতের তাসের পিঠ জয় করার ক্ষমতা, তাসের বিভাগ ও পরিস্থিতি নিজ খেড়িকে জানান যায় ক্ষমতার গভীর মধ্যে ডাক শেব ক'রে সেইটিই শ্রেষ্ঠ ডাক। সাধারণভাবে উদ্বোধনীডাকের নিয়মের সারাংশ নিম্নরূপ।

১। নূনপক্ষে আড়াই ট্রিক হাতে না থাকলে 'পাস' (pass) দেওয়া উচিত।

২। আড়াই বা সামান্য বেশী ট্রিক থাকলে রংয়ের (ইন্ডিয়ান, হরতন, ক্রহিতন, বা চিড়িতন) একটি-ডাক দেবে। উক্ত রংয়ের পাঁচখানি তাস থাকা সত্ত্বে টেঙ্কা, সাহেব, বিবি, গোলামের মধ্যে অন্ততঃ একখানি ছবি সমেত আর চার তাসের ডাক হ'লে উক্ত ছবিগুলির মধ্যে দুখানি থাকা প্রেরঃ।

৩। ডাকের উপযোগী ছটি রংয়ের তাস হাতে থাকলে বড় রংয়ের ডাক হবে আগে যাতে অল্পডাকের মধ্যে ছটি রংই দেখান সম্ভব হয় খেড়িকে। যেমন ইন্ডিয়ান ও হরতন বা ক্রহিতন ও চিড়িতন থাকলে যথাক্রমে একটি ইন্ডিয়ান বা একটি ক্রহিতনের ডাক আগে হবে। একটি ইন্ডিয়ানের উপর খেড়ি ছটি ক্রহিতন বা ছটি চিড়িতন ডাকলে ছটি হরতন ডেকে হাতে তাসের বিভাগ ও ক্ষমতা অল্পের মধ্যে জানান সম্ভব। সেটরূপ ক্রহিতন ও চিড়িতনের মধ্যে প্রথমে ক্রহিতনের একটি ডাকের উপর খেড়ি—একটি ইন্ডিয়ান বা একটি হরতন ডাকলে ছটি চিড়িতন ডাকে ক্ষমতা ও তাসের বিভাগ অল্পের মধ্যে জানান সম্ভব।

৪। একটি নো-ট্রাম্প (No trump) ডাক দিয়ে উদ্বোধন করতে হলে ট্রিক বা (Honour trick—playing trick) রংয়ের ডাক অপেক্ষা কিছু বেশী থাকা প্রয়োজন, কারণ অতি স্বাভাবিক বিপক্ষের প্রথমে খেলার সুবিধা পাওয়ার তাদের

রংয়ের তাস কেবাই করে নেওয়ার সুবিধা পায় আগে। সুতরাং রংয়ের ডাকের খেলা করা অপেক্ষাকৃত সহজ 'নো-ট্রাম্প' ডাকের খেলা করা অপেক্ষা যদিও নো-ট্রাম্প গেম করা যায় কম পিঠ নিয়ে। সব দিক বিচার ক'রে বলা যায় যে, একটি নো-ট্রাম্প দিয়ে ডাক উদ্বোধন করতে দরকার ৩ই ট্রিক থেকে ৪+ ট্রিকের তাস আর দরকার অন্ততঃ আটখানি উঁচুতাস (টেঙ্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম ও দশের মধ্যে)। বলা বাহুল্য যে একটি 'নো-ট্রাম্প' ডাক উদ্বোধন করতে হলে বিশেষ নজর রাখতে হবে তাসের বিভাগের দিকে অর্থাৎ বিভাগটি হওয়া উচিত "নো-ট্রাম্প" ডাকের উপযোগী যেমন ৪-৩-৩-৩, ৪-৪-৩-২ বা ৫-৩-৩-২। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে দুই তাসের রংয়ে অন্ততঃপক্ষে সাহেব থাকা প্রয়োজন। এর ব্যতিক্রম হলে বিপক্ষের বোধে কোনও রংয়ের ডাকে উদ্বোধন করাই শ্রেয়ঃ।

উপরোক্ত নিয়মগুলি সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। এ ছাড়াও ডাক উদ্বোধন কালে কতকগুলি বিষয় বিশেষ ভাবে চিন্তা ক'রে ডাক শ্রুত করতে হয়। প্রথমতঃ ডাক উদ্বোধন করার পর খেড়ির কাছ থেকে বদলি ডাক এলে উদ্বোধনকারী উক্ত বদলি ডাক অন্ততঃপক্ষে একচক্র বাঁচিয়ে রাখতে স্মরণঃ বাধ্য এই কারণে যে বদলি ডাকদারের (Responder) তাসের পূর্ণ ক্ষমতা একটি মাত্র ডাকে জানা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর নয়; ফলে ডাকের আদান-প্রদানের মারফত শ্রেষ্ঠ ডাকে পৌঁছানোর সুবিধা নষ্ট হতে পারে—কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন কি, গেম পর্যাপ্তও নষ্ট হওয়া সম্ভব। সুতরাং উদ্বোধনকারীর দ্বিতীয় ডাকের জন্ত প্রস্তুত সর্বসময়ে থাকা কর্তব্য। এই প্রস্তুতির সুযোগ না থাকলে এবং মূল্য আড়াই ট্রিকের সামান্য অধিক হলেও সাধারণ ডাকের চলিত প্রথা থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম করতে হয়। অর্থাৎ সেইরূপ ক্ষেত্রে বড় রংয়ের ডাক (Major suit) আগে না হ'য়ে আগে ডাক হবে ছোট রংয়ের ডাক (Minor suit) যাতে করে অল্প ডাকের মধ্যে উদ্বোধনকারী নিজ তাসের ক্ষমতা খেড়িকে জানাতে সক্ষম হয়। খেড়িও উপরোক্ত ডাক শোনবার পর নিজ হাত অনুযায়ী পছন্দ মত ডাক বেছে নিতে পারে অল্পের মধ্যে এবং অথবা উঁচু ডাকে উঠে খেসারত দেবার সম্ভাবনা কম হয় উপরোক্ত প্রথায়।

পাঠকগণের বিশেষতঃ শিক্ষার্থীগণের সুবিধার জন্ত হ'—একটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হ'ল।

উদাহরণ নং ১। তাস বন্টনকারী তাস পেয়েছেন :—

	ট্রিকদর
ই—টে, বি, ১০, ৫	৩
হ—সা, ৪	৩
ক—৪, ৩, ২	০
চি—সা, বি, ১, ৮	১
	—

মোট ৩

ওপরের তাসটি উদ্বোধনী একটি ডাকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নিয়মসম্মত ডাক হওয়া উচিত, একটি ইন্ডিয়ানের কিন্তু বিচার করে দেখলে ঐ ডাক সমীচীন বলে মনে হবে না। কারণ একটি ইন্ডিয়ান ডাকের উপর খেড়ি ছটি হরতন ডাকলে উদ্বোধনকারীকে বড়ই বিব্রত

হ'য়ে পড়তে হবে। চারতাসে দুটি ইন্ডাবন ডাক দেওয়া উচিত নয়, দুটি নো-ট্রাম্প বা তিনটি চিড়িতন ডাকের উপযোগী ক্ষমতা তাসটিতে নেই অথচ বাধ্যতামূলক উদ্বোধনী ডাকের ক্ষমতা হাতে আছে। এরূপক্ষেত্রে চিন্তা করে ডাক দিতে হবে। চিন্তা করতে হবে খেড়ির কাছ থেকে কি ডাক আসার সম্ভাবনা বেশী। যিনি ঠিকরত আন্দাজ করতে পারেন তিনিই ডাকে সাক্ষ্যলাভ করেন অধিকাংশ সময়ে। উপরের উদাহরণের তাসে খেড়ির কাছ থেকে হ'রতনের ডাক আসতে পারে, এইরূপ আন্দাজ করে প্রথম উদ্বোধনী ডাক হলে একটি চিড়িতনের একটি ইন্ডাবনের বদলে। এর উত্তরে খেড়ির কাছ থেকে একটি হ'রতন বা একটি কহিতনের ডাক এলে উদ্বোধনকারী ডাক না বাড়িয়ে একটি ইন্ডাবন ডেকে নিজ তাসের ক্ষমতা ও বিভাগ খেড়িকে জানাতে সক্ষম হবে। অপর পক্ষে খেড়ির কাছ থেকে একটি ইন্ডাবনের ডাক এলে ঐ ডাক বাড়িয়ে দুটি ইন্ডাবনের ডাক চলবে। এমন কি একটি চিড়িতনের উপর খেড়ির একটি হ'রতন ডাক এলে একটি নো-ট্রাম্প ডাকও অচল নয় বরঞ্চ খেড়ির তাসের পূর্ণ ক্ষমতা জানবার পক্ষে ঐ ডাক বিশেষ কার্যকরী। তাসটির সামান্য অদলবদল করলে, কহিতনের সংখ্যা একখানি কমিয়ে চিড়িতনের সংখ্যা একখানি বাড়িয়ে দিলে দ্বিতীয় চক্র একটি ইন্ডাবনের ডাকই হ'বে খেড়ির একটি হ'রতনের ডাকের উপর আর একটি নো-ট্রাম্প ডাক চলবে না।

উদাহরণ নং ২।

	ট্রিক দর
ই—বি, ৩, ২	২
হ—টে, গো, ১, ৪	১+
ক—সা, ১০	২
চি—সা, বি, ৮, ৭, ৫	৩+

হাতটির মোটশক্তি ২½ ট্রিকের বেশী ও উদ্বোধনী ডাকের সম্পূর্ণ উপযোগী কিন্তু কি ডাক হবে? নিয়মমাসিক ডাক হওয়া উচিত একটি হ'রতনের কিন্তু খেড়ির কাছ থেকে দুটি কহিতনের ডাক আসতে পারে আন্দাজ করে ঐ ডাক থেকে নিবৃত্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। দুটি কহিতনের উপর তিনটি চিড়িতনের ডাক আশ্চর্যাতী এবং দুটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী ক্ষমতা তাসে নেই। সুতরাং একটি চিড়িতনের ডাকই প্রশস্ত। খেড়ি উত্তরে একটি কহিতন ডাকলে দ্বিতীয় চক্র ডাক হবে একটি হ'রতনের এবং একটি ইন্ডাবনের ডাকলে ডাক হবে একটি নো-ট্রাম্প। সুতরাং হাতের শক্তি অসুবিধা ডাক একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

উদাহরণ নং ৩।

	ট্রিক দর
ই—টে, বি, ৭, ৩	১½
হ—সা, বি, ৫, ২	১
ক—সা, ৪	২
চি—বি, গো, ৬	২+
	৩½+

হাতটির শক্তি ৩½ ট্রিকের সামান্য উপরে ও তাসের বিভাগ ৪-৪-২-৩ অর্থাৎ একটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী বিশেষতঃ প্রত্যেক রংয়ের উঁচু তাস থাকা হেতু কিন্তু প্রয়োজনমত হ'বিতাস অর্থাৎ আটখানি না থাকায় একটি ইন্ডাবন ডাকই প্রশস্ত। খেড়ি দুটি

কহিতন বা দুটি চিড়িতন ডাকলে দ্বিতীয় চক্র ডাক হবে দুটি হ'রতন। খেড়ির দুটি কহিতন বা দুটি চিড়িতন ডাকের পর দুটি নো-ট্রাম্প ডাক দেওয়ার পক্ষপাতী কিন্তু সবদিক বিচার করলে এরূপ ডাক যুক্তিযুক্ত নয় যদিচ সময়ে সময়ে ঐরূপ ডাক ফলপ্রসূও হয়ে থাকে। একটি ইন্ডাবনের উপর খেড়ি একটি নো-ট্রাম্প ডাক দিলেও দ্বিতীয় চক্র দুটি হ'রতন ডাকই বাঞ্ছনীয় আবার ঐ ডাক ছেড়েও দেওয়া চলে—নির্ভর করে খেলা সম্পূর্ণ খেড়ির তাসের বিভাগ ও উচ্চতাসের অবস্থিতির উপরে। যদি খেড়ির তাস একটি নো-ট্রাম্প ডাকের সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন হয় এবং ইন্ডাবনের সাহেব ও হ'রতনের টেকা ঠিক স্থানে থাকে তবে তিনটি নো-ট্রাম্পের খেলা করা অর্থাৎ গেম করাও অসম্ভব নয় কিন্তু এরূপ ঘটে শতকরা ২০-২৫ বার মাত্র। সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ছাড়া গেমের ডাকে পৌছবার চেষ্টা আবঞ্ছনীয়।

উদাহরণ ৪।

	ট্রিক দর।
ই—টে, ১০, ৮, ৩	১
হ—সা, ৮, ৭, ৬	২
ক—সা, বি	১
চি—বি, ১০, ৩	২
	৩

এটি ৩নং উদাহরণের তাস অপেক্ষা সামান্য তফাৎ ও কম শক্তিশালী হলেও উদ্বোধনী ডাকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। টেকা, ১০ ও দুখানি ছোট তাস নিয়ে একটি ইন্ডাবন ডাকের উপর খেড়ি দুটি চিড়িতন বা দুটি কহিতন ডাক দিলে দ্বিতীয় চক্রের ডাক একটি সমস্তা হ'য়ে পড়ে। কি ডাক হবে? সাহেবের পর তিনখানি ছোট তাসে দুটি হ'রতনের ডাক অসুচিত এবং দুটি নো-ট্রাম্প ডাকে হাতের বর্ধার শক্তি অপেক্ষা বেশী শক্তি দেখান হয়। এইরূপ তাসে তিন তাসে অন্ততঃ বিবি বড় একটি চিড়িতন ডাক খুব কার্যকরী ও সর্ধনযোগ্য। তিন তাসে চিড়িতন ডাকবার পর আর কোনও রংয়ের ডাক চলেনা, আবার নো-ট্রাম্প বা খেড়ির হ'রতন ও ইন্ডাবনের একটি ডাক বাড়িয়ে দুটি করা। এরূপ ডাকে ও কম ডাকের মধ্যে উভয় হাতের সম্মিলিতশক্তি জানা ও রং নির্বাচনে সুবিধা ও শক্তির বাইরে ডাক দিয়ে অথবা খেসারত দেবার সম্ভাবনা থাকে কম।

তিন তাসের (Minor Suit) ডাক ও আসল ডাকের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখবার জন্য নীচের প্রয়োগগুলি মনে রাখতে হবে, নচেৎ ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আসতে পারে :—

(ক) তিন তাসের ডাক সীমাবদ্ধ থাকলে কহিতন ও চিড়িতনের ডাকের মধ্যে এবং ঐ তিন তাসের মধ্যে টেকা, সাহেব অথবা বিবি থাকা উচিত। বলা বাহুল্য, এইরূপ তিন তাসের ডাক কেবলমাত্র প্রযুক্ত হবে, সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে উপযুক্ত বড় রংয়ের (Major Suit) ডাক দেওয়ার অসুবিধা বা খেড়ির ডাকের উপর বদলি ডাকের অসুবিধা অসুভূত হয়।

(খ) তিন তাসে Minor Suit এর ডাক দিয়ে উদ্বোধন করলে খেড়ির ডাকের পর আর নতুন রংয়ের ডাক চলে না দ্বিতীয় চক্র—নতুন রংয়ের ডাক দিলে প্রথম চিড়িতন বা কহিতনের ডাকটি

সাধারণ ডাকের পর্যায়ে পড়বে আর তখন তিন তাসের ডাকের পর্যায়ে থাকে না। খেড়ির একটি ডাকের উপর একটি নো-ট্রাম্প অথবা সেই ডাক দুইটির ডাকে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশ করে যে প্রথম উদ্বোধনী ডাকটি (একটি কুহিতন বা একটি চিহ্নিতন) তিন তাসের ডাকও হ'তে পারে এবং সেইরূপ বিবেচনা করে খেড়ি পরবর্তী ডাকে অগ্রসর হবেন।

উদ্বোধনকারীকে সর্বসময়ে সচেষ্ট থাকতে হবে প্রথম চক্রে প্রথম ডাকটিকে ডাকের প্রাথমিক নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। এর সামান্য ব্যতিক্রম হ'লে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা এসে পড়তে পারে; যেমন—

১। বিপক্ষ দলের ডাকে খেড়ি 'ডবল' দিলে ছেড়ে দেওয়া হয় কঠিন কারণ, উদ্বোধনী ডাক ঠিকমত না হ'লে সাধারণত ভয় আসে পাছে বিপক্ষদল ডবলের চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলে। এইরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময়ে নিজের ডাকে কিরে গিয়ে খেসারত দিতেও দেখা যায়, যদিও খেড়ির ডবলে খেললে বিপক্ষদলের কাছ থেকে ঐরূপ খেসারত আদায় হ'ত। কেন এই সন্দেহের অবকাশ রাখা? ঠিকমত উদ্বোধনী-ডাক দিলে ঐরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

২। ঐরূপ দু'-একবার ঘটলে অথবা বিপক্ষদল ডবল দেওয়ার পর চুক্তির খেলা করতে পারলে হয় খেড়ির বৈধ্যচুক্তি—বলা বাহুল্য যে, সাধারণতঃ ডবলের খেলা করার পর যে খেলোয়াড় ডবল দেন তার অবস্থা হলে পড়ে কিছুটা হাতকর দর্শকবৃন্দের সামনে, সচরাচর কেউই তলিয়ে দেখেন না যে ক্রটি ডবলদানের (Double) নয় ক্রটি উদ্বোধনী ডাকের। অধিকন্তু আস্থা কমে যাওয়ার উচিতমত ডবল দিতে আসে ভয় এবং স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্যের অভাব ঘটে, ফলে বিপক্ষদল কম খেসারত দিয়ে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়।

৩। ডাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সীমারেখা নির্ধারণ শক্ত হয়ে পড়ে—ফলে নয় বেশী ডাকে উঠে খেসারত দিতে হয়, নতুবা বিপক্ষদল কম ডাকে খেলা করে নিয়ে চলে যায় যেখানে নিজের তদপেক্ষা বেশী ডাকের খেলা করার ক্ষমতা বর্তমান।

ডাক উদ্বোধনকারীকে ডাক শুরু করার আগে স্মরণ রাখতে হবে হ'বে যে Honour Trick ছাড়াও Playing Trickও ডাকের পক্ষে বিবেচ্য বিষয়। সময়ে সময়ে এমন কতকগুলি তাস হাতে আসে যেগুলির Honour Trick হিসাবে একটি ডাকের পক্ষে অনুপযুক্ত কারণ বিপক্ষদলের ডাকে প্রতিরোধ ক্ষমতা (Defensive value) নেই বললেই চলে, একটির বেশী পিঠ এমন কি একটিও পিঠ জয় করা যাবে কিনা সন্দেহ অথচ নিজের রংয়ের ডাকে বহুপিঠ হয়ত বা গেম করাও অসম্ভব নয়। এরকম তাসগুলির অসাধারণতার জন্ত পরে আলোচিত হবে।

উদ্বোধনী ডাকের সারাংশ

১। নূনপক্ষে আড়াই ট্রিক (১১ থেকে ১৩ পয়েন্ট) না থাকলে 'পাস' দেওয়া উচিত।

২। আড়াই বা সামান্য বেশী ট্রিক থাকলে উদ্বোধনী একটি রংয়ের ডাক হবে। ডাক দেওয়ার সময় সাধারণতঃ খেড়ির কাছ থেকে কিরূপ ডাক আসার সম্ভাবনা অধিক এবং খেড়ির ঐরূপ বদলী ডাক এলে দ্বিতীয় চক্রে ডাকের জন্ত প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

৩। সাধারণতঃ দোরংরা (Two suiter) তাস হাতে থাকলে বড়টির ডাক আগে হবে পরে দ্বিতীয় চক্রে ছোটটির ডাক হবে। উদ্বেগ অল্পডাকের মধ্যে খেড়িকে দুটি রংই জানাল এবং খেড়িকে রং বাছাই করার সুযোগ দেওয়া।

৪। সাড়ে তিন ট্রিক থেকে ৪+ ট্রিকের কাছাকাছি তাস হাতে থাকলে এবং তাসের বিভাগ মোটামুটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী হলে ও অন্ততঃ আটখানি ছবি তাস (টে, সা, বি, গো, ১০) থাকলে একটি নো-ট্রাম্প ডাক হবে।

৫। উপরোক্ত তাস অপেক্ষা কিছু কমজোরী তাস থাকলে এবং বিকল্পডাকের পূর্ণক্ষমতা না থাকলে, কম মূল্যের রংয়ের (Minor suit) বিবি বড় তিন তাসের উদ্বোধনী একটি ডাক চলতে পারে। এই ডাকের সুবিধা বহুবিধ, তন্মধ্যে প্রধান এই যে, অল্প ডাকের মধ্যে খেড়িকে তাসের পূর্ণক্ষমতা জানান সম্ভব হয়।

[ক্রমশঃ ।

ফুলকলি

শ্রীকালীপদ কোঙার

মোমাছি মন এক গুন গুন গুন গুন গানে,
মাতাল বসন্তে আজ কথা কয় তোর কানে কানে।
হে অশ্রুটা ফুলকলি, হে কিশোরী মেয়ে,
ভাঙবে না ঘুম কি গো, দেখাবি না চয়ে ?
জাগবি না ঘোবনের মাতাল হাওয়ার,
গানে গানে যেথা ঐ মোমাছি গুন গুন হুড়ার ?

বাসন্তী চূষনে তোরে
জাগলাম ঘোবনের রাতে
চোখ মেলে দেখ ওরে,
তোরই বাহিত ঘন তোমার সত্যতে।

বঙ্গবাসী : কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশ ও কাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীহারাধন দত্ত

নব্য হিন্দুধর্মের উপর কৃষ্ণচন্দ্রের চিন্তা ভাবনা তাঁর অনর্গল লেখনী-
 মুখে এমনি ভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। সমাজতত্ত্ব রাজনীতি,
 ধর্মতত্ত্ব, স্বদেশতত্ত্ব-বিষয়ক কৃষ্ণচন্দ্রের সকল রচনাতেই দেশ জাতির
 ঐতিহ্যপ্রীতির সন্ধান মেলে—উনবিংশ শতাব্দীতে বিজাতীয় সভ্যতার
 প্রায়ে বধন দেশ ও জাতির সূচক সভ্যতার সৌধ ভগ্নপ্রায় হয়ে
 ভাসমান হয়েছিল—তখন এদেশেরই একদল পাশ্চাত্যশিক্ষিত
 মনীষী জাতিকে আত্মনুষ্ঠী করার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন।
 রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-অক্ষয়চন্দ্র সেই মনীষিবৃন্দদের
 মধ্যে বিখ্যাত। কৃষ্ণচন্দ্রও সেই গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক। কৃষ্ণচন্দ্রের
 সুলিখিত প্রবন্ধসমূহ ও তদানীন্তন সমাজকে আত্মনুষ্ঠী করার কার্যে
 ব্যাপৃত ছিল। উনিশ শতকের শেষপাদে কৃষ্ণচন্দ্র সংবাদপত্র
 সেবার মাধ্যমে ঐ মহান আন্দোলকে আগ্রহিত বেধেছিলেন। কিন্তু
 উল্লিখিত মনীষিগণের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগরিমা গ্রহণের
 যে উদ্যোগ ছিল—কৃষ্ণচন্দ্রের রচনাসমূহ হতে সেই উদ্যোগের সন্ধান
 তেমন পাওয়া যায় না। তাঁর দৃষ্টি নিজদেশ ও সমাজের গরিমা
 কীর্তনের মধ্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। নবযুগের
 দৃষ্টিভঙ্গির সংগে এখানেই ছিল তাঁর পার্থক্য।

কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকাংশ রচনা প্রধানতঃ ধর্ম সমাজ ও রাজনীতি
 অবলম্বনে লিখিত। এ ছাড়া সাময়িক বিষয় অবলম্বনে লিখিত
 তাঁর অসংখ্য রচনা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত আছে। ঐ
 সকল সংবাদপত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি বর্তমানে এক প্রকার
 হুমুসাপ্য। তৎসঙ্গেও কৃষ্ণচন্দ্রের রচনা যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা
 গেছে, নিয়ে তারই একটি তালিকা দেওয়া গেল।

জন্মভূমি	১৩০০ সাল (মাঘ)	আনী বেসান্ত
অহুসন্ধান	১২১৬ ৩য় বর্ষ (৪৫)
ঐ	১২১৭ ৪র্থ বর্ষ ১৫ই ভাদ্র	আমাদের আসাম যাত্রা
ঐ	ঐ ১৫ই আশ্বিন	ঐ
বসুধন্তী	১৩১৭ ৬ই ফাল্গুন	হেলার হারাইও না
বঙ্গবাসী	১৩১৪ ১৫ই চৈত্র	রাজনীতিতে হাত্র
"	১৩১৫ ১০ই শ্রাবণ	হিন্দুর লিঙ্গ (১)
"	১৩১৫ ১৭ই শ্রাবণ	ঐ (২)
"	ঐ ২৪শে শ্রাবণ	ঐ (৩)
"	" ৬ই ভাদ্র	ধৈর্য
"	" ১৩ই ভাদ্র	শৌচ
"	" ২০শে ভাদ্র	অক্ষয় (১)
"	" ১০ই আশ্বিন	ঐ (২)
"	" ৮ই কার্তিক	মিতাহার

বঙ্গবাসী	১৩১৫	১৫ই কার্তিক	দয়া
"	"	২২শে কার্তিক	নিয়ম
"	"	৬ই অগ্রহায়ণ	ভাপ
"	"	১৩ই অগ্রহায়ণ	দান
"	"	২৭শে অগ্রহায়ণ	দান—একটি উপাখ্যান।
"	"	১১ই পৌষ	বেদান্ত শ্রবণ
"	"	৩রা মাঘ	আন্তিক্য
"	"	২৪শে মাঘ	ত্রুত
"	"	১লা ফাল্গুন	ঐশ্বরপূজা
"	"	৮ই ফাল্গুন	সন্তোষ
"	"	১৫ই ঐ	মতি
"	"	২১শে ফাল্গুন	ভারতের ভারতত্ব
"	"	১৪ই চৈত্র	লজ্জা
"	"	২৮শে চৈত্র	পরিশিষ্ট
"	১৩১৬	৪ঠা বৈশাখ	আত্মজ্ঞান
"	"	১১ই বৈশাখ	পাত্র
"	"	১৮ই বৈশাখ	আগুন
"	"	১লা জ্যৈষ্ঠ	মানব শ্রেষ্ঠ জীব
"	"	৮ই জ্যৈষ্ঠ	সুখ
"	"	২১শে জ্যৈষ্ঠ	তুভেচ্ছা
"	"	১২ই আষাঢ়	বিচার
"	"	১৯শে আষাঢ়	সংসঙ্গ
"	"	২৬শে আষাঢ়	সন্তোষ
"	"	১লা শ্রাবণ	জীব জুহুয়ী
"	"	৮ই শ্রাবণ	কর্ম
"	"	১৫ই শ্রাবণ	সত্যের ভাণ্ডাল
"	"	২২শে শ্রাবণ	মারা সঙ্করে
"	"	২৯শে শ্রাবণ	প্রত্যাহার
"	"	৫ই ভাদ্র	করণা
"	"	১৫ই ভাদ্র	মৈত্রী
"	"	১১শে ভাদ্র	সুদিতা
"	"	২৬শে ভাদ্র	উপেক্ষা
"	"	২রা আশ্বিন	আত্মমর্ষাদা
"	"	৯ই আশ্বিন	মহুয়া চাই
"	"	১৬ই আশ্বিন	আত্মগুহি মর্হোবধ
"	"	২৩শে আশ্বিন	নিজেকে চিন ও জান
"	"	৩০শে আশ্বিন	শাস্ত্র দিগ্‌ধর্ষন
"	"	৪ঠা অগ্রহায়ণ	পরিণাম ভয়ানক
"	"	১৮ই অগ্রহায়ণ	হিন্দুর মহত্ব
"	"	১০ই পৌষ	ধর্মহীনতা
"	"	২৪শে পৌষ	সভ্যতা বর্ধিততা নহে

(৪৫) এই সময়ে অহুসন্ধান প্রকাশিত রচনার সংগে লেখকের
 মায় প্রকাশ করা হোত না। পত্রিকার প্রচ্ছদেই কেবল মায়
 লেখকসমূহের নাম ঘোষিত থাকতো।

বঙ্গবাসী	১৩১৬		
"	"	২রা মাঘ	ইতিহাসভঙ্গ
"	"	১ই মাঘ	অধঃপতনের কথা
"	"	১৬ই মাঘ	বর্ণবিচার
"	"	৩০শে মাঘ	ধর্ম্মে ভিত্তি—মোকে পরিণতি
"	"	৭ই কাঙ্কন	ক'লমহিমা
"	"	২১শে কাঙ্কন	আর না
"	"	২৮শে কঙ্কন	এ উন্নতি—অবনতি
"	"	৫ই চৈত্র	দণ্ডই মহাজাগ্রয়
"	"	১২ই চৈত্র	পুরুষ প্রকৃতি
"	"	১৯শে চৈত্র	শুভ বিবাহ
"	"	২৬শে চৈত্র	বিবাহে যুগ
"	১৩১৭	৩রা বৈশাখ	বিবাহে সন্দ্বন্ধ বিচার
"	"	১০ই বৈশাখ	বিবাহ সন্দ্বন্ধ বিচারে
"	"	২৪শে বৈশাখ	সন্দ্বন্ধ বিচারের পরিশিষ্ট
"	"	৭ই জ্যৈষ্ঠ	বিবাহে বয়স
"	"	১৪ই জ্যৈষ্ঠ	বিবাহে বাকদান
"	"	২১শে জ্যৈষ্ঠ	গাত্রহস্তি
"	"	২৮শে জ্যৈষ্ঠ	বিবাহে হলুদনি ও শঙ্খনাদ
"	"	৪ঠা আষাঢ়	বিবাহে নান্দীমুখ
"	"	১৮ই আষাঢ়	মার্কিনে বিবাহ ব্যবস্থা
"	"	২৫শে আষাঢ়	বিবাহে জলসাধা ও অন্ন কর্ম্ম
"	"	১৮ই ভাদ্র	বিবাহে বরসজ্জা
"	"	২৫শে ভাদ্র	বিবাহে দানবিধি
"	"	৩১শ ভাদ্র	বিবাহে দানাদিকারী
"	"	৭ই আশ্বিন	বিবাহে সম্প্রদান
"	"	১৪ই আশ্বিন	বিবাহে স্ত্রী আচার

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত রচনাগুলির অধিকাংশই কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ববর্তী ২।৩ বৎসরের মধ্যে লিখিত। এই রচনাগুলি 'হিন্দুর শিক্ষা' শিরোনামায় বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল, মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তিনি অবিচলিত ভাবে লিখে গেছেন। তিনি যে সমস্ত সংবাদপত্রে লিখতেন—সেগুলির উল্লেখ ইতিপূর্বেই করেছি। ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকা হ'তে তাঁর সমগ্র রচনারাজির উদ্ধার কঠিন শ্রমসাপেক্ষ। অথচ কৃষ্ণচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার অবিস্মৃত কীর্তি ঐ রচনাগুলিই। ইহা ছাড়া সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনায় তিনি যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করে গেছেন তা এখানেও আদর্শ ও অনুকরণীয় বলে গৃহীত হতে পারে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—প্রকাশিত তাঁর বহু প্রবন্ধে বাংলার সমাজধর্ম্ম ও রাজনীতির উপকরণ ছড়িয়ে আছে। শুধু সাময়িক পত্রের মধ্যে আবদ্ধ আছে বলেই—তিনি আজ বিন্মুতপ্রায় হয়ে পড়েছেন। তাঁর রচনাগুলি সংগৃহীত হলে সমসাময়িক বাংলা-দেশের ভাব আন্দোলনের একটি বিচিত্রমুখী ধারার অনুসন্ধান পাওয়া যাবে এবং তাঁর বিশ্বাস নিষ্ঠা ও প্রতীতির বলিষ্ঠতা আজও আমাদের প্রজ্ঞা আকর্ষণ করবে।

বঙ্গবাসী পরিচ্যাপ করার পর কৃষ্ণচন্দ্র কিছুকালের জন্য মেদিনীপুর নাড়াজোল-রাজের ম্যানেজারীর পদ গ্রহণ করেন, তিনি আত্মকর্ম-পটুতার নাড়াজোলরাজকে সন্তুষ্ট করেন। এই সময়ে তাঁর বহুত্ব

যোগের সকার হয়, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে পেনসন-রাজের ম্যানেজারী পদ হতে অবসর গ্রহণ করে সম্পাদনা কালে তিনি বৈজ্ঞানিকের বালানন্দস্বামীকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন। বালানন্দের উপদেশ মত তাঁর ধর্ম্মজীবন পরিচালিত হত। জীবনের শেষ বৃহত্ত পর্য্যন্ত বালানন্দ-কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু-শিষ্য সন্দ্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র অবসর কালে বঙ্গবাসী ও বহুভূমীতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতেন। শেষ জীবনে তিনি ধর্ম্মকথা ছাড়া আর অন্য কোন কথাই আলোচনা করতেন না। ১৯১১ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ১১শে মাঘ—১৩১৭) কাশীধামে কৃষ্ণচন্দ্র ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় সংবাদপত্রসেবী, সাহিত্যিক, স্বাঃশিক্ষিক ও স্বধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসামূলক যে সমস্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কয়েকখানি পত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধের অংশ-বিশেষ প্রকাশ করা গেল।

"আবার বন্ধু-বিরোগের বিষয় বাজ বৃকে বাজিল। ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত রবিবার প্রাতঃকালে পুণ্যধাম ৮কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যবাসরে পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যস্থায় শ্রুতসম্মিলন। চিরতাপসোক্ত—মণিকর্ষিকার পুণ্যময় স্মরণ-ক্ষেত্রে উত্তরায়ণে মাঘী পূর্ণিমার সংস্পর্শে শুভ সংক্রান্তির দিনে বাহার দৈহিক অবসান যে অবসানে পূর্বে গঙ্গাগর্ভে অন্তর্গত বিবেকবরের ধ্যানজ্ঞানে বাহার তপস্তিমিত নেত্রের সম্মুখে শত সৌরকরোজ্জ্বল কিরণপ্রভায় সৃষ্টির পথ পলকে পলকে উদ্ভাসিত, তাঁহার পুণ্যময়তার পরিচয় কি আর দিতে হয় ?

আমাদের কৃষ্ণচন্দ্রের এই ঐতিক দৈহিক শেষ। তাঁহার আত্মা আজ পরমাত্মার বিলীন। আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের দেশের কৃষ্ণচন্দ্র দেশের, ধর্ম্মের কৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম্মের, বর্ণের কৃষ্ণচন্দ্র বর্ণের, সমাজের কৃষ্ণচন্দ্র সমাজের, সাহিত্যের কৃষ্ণচন্দ্র সাহিত্যের গৌরব-জীবনে মরণে দেখাটইয়া গেলেন।

চিরগৌরবাবিহিত পুরুষসিংহ কৃষ্ণচন্দ্র চিরশ্মেরানান এজীবনে যে আদর্শের তিরণবাগে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, জীবনের অবসানে সেই আদর্শের পুণ্যময়ী দীপ্তপ্রভার অলৌকিক আলোকবস্তির কোটি রেখা রাখিয়া গিয়াছেন। এ পাখিব প্রপঞ্চে জীবনের আভ্যন্তর এমন পুণ্যময়তা করজনের দেখিতে পাও ? আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের গৌরব রাখিয়াছেন। আজ তাঁহার জীবনাবসানে কাঁদিব, না হাসিব ? বাহার জীবন আভ্যন্তর গৌরব ময়, তাঁহার এই পুণ্যময় অন্তর্ধামে কাঁদিব কেন ?

কাঁদিব না, আজ প্রাণ ভরিয়া হাসিব ; কিন্তু এ কি ? আজ হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেছি কেন ? আজ হান্তবিস্মিত পুলক বিকশিত রেত্রপথে যেন অলক্ষ্যে অধিকল অক্ষধারা ! আজ যে আলাময়ী স্মৃতিআলা বলিয়া উঠিতেছে ! কৃষ্ণচন্দ্র যে বোগীন্দ্রচন্দ্রের অতিরিক্তময় সুরঙ্গ ছিলেন, যে বোগীন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের সেবা প্রসারে, ধর্ম্মব্রতের মতিয়া উদ্ভোধনে, কার্যক্ষেত্রে সাধন-প্রসাদনে, বিধতবা তপ্তাঙ্গগুণ কঠিনোষী জীব-কাতরার জীবনমোচনে নিত্য-সত্য সুরঙ্গরূপে সুরঙ্গ সহায় ছিলেন, আজ আবার তাহার স্মৃতি কাঁদিয়া উঠিতেছে ! ধারামোহনুৎ হৃৎকলচিত্ত জীব আদরা কত

হিব। ধৈর্য্যে, হৈর্য্যে, উদার্য্যে, সাজীর্ঘ্যে, জ্ঞানে, গৌরবে, কাৰুণ্যে, দৈবে, শ্রমে, অধ্যবসারে বোগীন্দ্রচন্দ্র বেমন, কৃষ্ণচন্দ্রও তেমনই যে আদর্শ পুরুষ ছিলেন। প্রতিভার, প্রভাব, সচিবুতার, কৰ্ম্মশীলতার, বিজ্ঞতার, বিচক্ষণতার, ধার্ম্মিকতার, সঙ্গদয়তার, গরিমার, মতিমার এমন প্রাণময় যুগল মিলন অতুলনীয় নয় কি? আজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোগে, যে বোগীন্দ্রচন্দ্রের বিরোগস্থিত চকিতে-চমকে বিজ্ঞানী-বিজ্ঞার কুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার চির দুঃখ-কর্ম্মী, তাঁহার সূচ চিন্তাকর্ম্মী, তাঁহার স্বপ্নন বিরোগে বিচলিত না হইতে পারিতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মখে মখে বুঝিয়াছি, অতি প্রিয়জনের বিরোগেও বিধ্বস্ততার বিন্দুমাত্র তাঁহাদের বাহ্যিক বা বাহ্যতাব বিকশিত করিতে পারে নাই। তাঁহার ধৈর্য্য, হৈর্য্যের আদর্শ পুরুষ বটে; বহু বহু বৎসর ধরিয়া, তাঁহার আমাদের সম্মুখে চরিত্রাদর্শের পূর্ণ চিত্র প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; বহু বৎসর ধরিয়া আমাদের মস্তন শিষ্যমণ্ডলীকে তাঁহার আচার্য্যরূপে ধর্ম্মকর্মে শিক্ষা দিয়াছিলেন; জীবনসত্যের পথ দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু শিষ্যদের মর্যাদা রাখিতে পারিলাম কৈ। সে মহাদর্শের সর্ব্বোন্নত শিক্ষা বা ধারণা করিতে সমর্থ হইলাম কৈ? সে জীবনলক্ষ্যের উচ্চ পথ পাইবার শক্তি সকারিল কৈ? তাইত আজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুণ্যময় হেতুতে প্রাণ কাঁদে, বোগীন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতি জাগরণে নবন ভাসে, ডুলিব কেমনে, সে উদার জীব, সুসমৃদ্ধ পুণ্যগঠিত দীর্ঘকায়। অনর্ক নিদর্শ কৰ্ম্মবীর কৃষ্ণচন্দ্রকে? ডুলিব কেমনে সেই কৃষ্ণচন্দ্রের সেই সম্বোধিত গুরুগাভারী আবার সেই সম্বোধিত পরিচাস-ভ্রাতৃসময় মাদুরী? বহু বৎসর যে একসঙ্গে একসঙ্গে এই বঙ্গবাসীর পবিত্র পীঠস্থানে ব্রতী ছিলাম। তিনি ব্রতসাধনার আচার্য্য, আমরা শিষ্য। কি অকপট শিক্ষকতা! কি কৰ্ম্মণ্যতার আন্তরিকতা! সে কি ডুলিতে পারি? তাইত আজ প্রাণ কাঁদে, বুক ফাটে।

কিন্তু উশায় কি? নিয়তির গতিবোধ কে করিবে? কয়েক বৎসর পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গবাসীর সম্পাদকতার কৃতিত্বের চরম গৌরব লাভ করিয়া ভাষায় রচনার সমগ্র বঙ্গদেশে, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, কৰ্ম্মনীতির আদর্শ শিক্ষা প্রসার করিয়াছিলেন, যিনি আত্মজীবনে আত্মচরিত্রে ধর্ম্মাদর্শে নিরপেক্ষতার নিদর্শন পদে পদে প্রদর্শন করিতেন, যিনি ধর্ম্মকর্ম্মের অপ্রতিহত অকপট সাধন পালনে জ্ঞান্যধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া, গগনভেদী সঙ্কেত পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন; পরন্তু কত পথভ্রষ্ট পথিককে ধর্ম্মবন্ধে কিরাইয়া আনিয়াছিলেন। তিনি নিয়তির নিয়মাত্মশাসনে আমাদের দুর্ভাগ্যে বঙ্গবাসীর সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। সম্পর্ক ত্যাগ করুন, কিন্তু তিনি এক মুহূর্তের জন্য বঙ্গবাসীর হিতসঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। বঙ্গবাসীর শুভাভ্যুত্থানে বঙ্গবাসীর পক্ষে পক্ষে জীবনে মরণে তাঁহার হিতৈষণার চিত্তবোধ পূর্ণাঙ্কিত। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি বহুমুদ্র বোগে ভুগিতেছিলেন। গত কার্ত্তিক মাসে তিনি কাশীবাসী হন। চিরপুণ্যময় স্নিগ্ধ শান্তিপূর্ণ কাশীধামে তাঁহার অন্তরে বাহিরে যে বোগ প্রশমতার সুসঙ্গ, প্রাণে যে প্রসুন্নতার নিদর্শন দেখা দিয়াছিল, তাহাতে মনে হয় নাই, এত স্নিগ্ধ সব শেষ হইয়া বাটবে। কিন্তু নিয়তির গতিবোধ কে করিবে? আজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুণ্যময় হেতুতে তাঁহার চিরসুন্ন গুণস্থিতে প্রাণের ভিতর হরষ বিবাদের যে বাত প্রভিষাত চলিতেছে। তাঁহার পতিত কতদিনে হইবে।

কে বলিতে পারে? তিনি ধুখান্না। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার আদর্শে পূর্ণগঠিত। কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোগে তাঁহাদের স্বপ্নে মলিন শোকছায়া স্পর্শ করিবে না, ইহা বুঝিয়া আমরা শান্তি লাভ করিতে পারি। তিনি নাই, কিন্তু তিনি যে পুণ্যের পুঙ্কপ্রভা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পুণ্যের সংসার উজ্জ্বল রহিবে ইহা আমাদের আশা।" (বঙ্গবাসী, ৬ই, ফাল্গুন—১৩১৭)

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষক এই শিরোনামের সেকালের আর একখানি দৈনিকে বাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। পূর্ণ সম্পাদকীয় নিবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"বঙ্গবাসীর একসময়ে সম্পাদক, সুলেখক, কর্ম্মী ও সাধক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আনন্দকানন কালীক্ষেত্রে, গঙ্গাতীরে গভবল্য রবিবার প্রাতঃকালে দেহত্যাগ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে পরকালে বিশ্বাসী সাধকের পক্ষে এমন মৃত্যু ঈশ্বিত মৃত্যু। উত্তরায়নের কালে মাঘীপূর্ণিমার সম্পর্শন সময়ে, অবিমুক্ত পুরী কাশীধামে, গঙ্গার গর্ভে থাকিয়া, বিশ্বনাথের কুপাবারি স্পষ্ট হইয়া এমনভাবে দেহত্যাগ ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় সাধের বড় সৌভাগ্যের মৃত্যু। কৃষ্ণচন্দ্র মরণে বাহাজুহী দেখাইয়াছেন, মরণে ব্রাহ্মণের সাধ মিটাইয়াছেন। এই তেতু তাঁহার মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত বা শোকসন্তপ্ত হই নাই। মরণকালে তাঁহার বাট বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল; এখনকার হিসাবে মৃত্যুটা নিত্যান্ত অসময়ে ঘট নাই। তবে বাহাদের তিনি অবলম্বন ছিলেন, বন্ধু, সখা, মিত্র, পিতা— আত্মীয় ছিলেন, তাহারা এমন মৃত্যুতে দুঃখিত ও শোকসন্তপ্ত হইবেনই। সে শোকের সন্তান কালপ্রভাবে প্রশমিত হইবে, ভগবানের অপার করণায় তাহা শীঘ্র হইবে। তাঁহার কাশীলাভ হইয়াছে, তিনি শিষ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিত্যধামের আনন্দময়ী স্থিতি আমরা শোকের দীর্ঘধাসে মলিন করিতে চাই না। বাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, আমাদের ব্যথা আমরা সহিব; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র জীবনে কি করিয়া গেলেন, কোন ভাবের বিকাশ করিলেন, তাহা এখনই বুঝিয়া রাখা উচিত।

বোগেশচন্দ্র বন্দ্য মহাশয়ের সহিত বঙ্গবাসীর সেবার নিবৃত্ত থাকিয়া আমাদের অগ্রজ সঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্র, পূজনীয় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে, বাংলার হিন্দুভাবের, হিন্দু রীতি পদ্ধতির প্রচার ও উন্নতিগকে সমাজমাঙ্গ করিয়াছিলেন। পূর্বে বাংলার ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে লোকে হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। বঙ্গবাসী সে সঙ্কোচ দূর করিয়াছে। বঙ্গবাসীর সে চেষ্টির মূলে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মুখের হিন্দু ছিলেন না, তিনি কর্ম্মী, আচার্য্যবান, গুরুভক্ত হিন্দু ছিলেন। তিনি শাস্ত্রের আদর্শ অনুসারে নিজের জীবনকে প্রণালীকৃত করিতে চেষ্টা করিতেন। সে চেষ্টায় তিনি অনেকটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। দীর্ঘকায়, উদারহৃদয়, প্রশস্তচিত্ত কৃষ্ণচন্দ্র কার্য্য করিতে জানিতেন, অনবরত কর্ম্মেই রত থাকিতেন। তিনি বহুতা করিতে জানিতেন না, বহুতা করিতে ও বলমবাজী করিতে ভালবাসিতেন না, তিনি যখন বঙ্গবাসীর সম্পাদক তখন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষয় তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠপোষক, লেখক ও পরিচালকবর্গের মধ্যে

ছিলেন। এই যে ভাষানালিকার কথাটা এখন মুখে গুনিতে পাই, ইহার মূলভঙ্গ বঙ্গবাসীই প্রথমে প্রকাশ করেন। আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ—অনন্ত অতীতকাল হইতে ঋষিযুনিদের সময় হইতে যে ভাবের ধারা, আচারনিষ্ঠার ধারা এ দেশ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা আমাদের পৈতামহ সামগ্রী। একথা ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীক প্রথমে বঙ্গবাসীই শিখাইয়াছিলেন। সে শিক্ষার মূলে আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র, বোগেন্দ্রচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি সমাজতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, আজ সেই মনীষিবর্গের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র চলিয়া গেলেন। বোগেন্দ্রচন্দ্র পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন, পুণ্ডরীক জীবিত ইন্দ্রনাথ বোগেন্দ্রচন্দ্র শায়িত, পুণ্ডরীক জীবিত পুণ্ডরীক তর্কবত্ত যুগ্ম। জানি না ভগবানের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার প্রভাব কোন দিক দিয়া কেমনভাবে চলিতেছে। তবে দেখিয়া গুনিয়া মনে হয় বাহারা এই ভাবের প্রচারক তাঁহাদের অনেকেই যেন প্রাতঃকালের তারকারাজির জায় একে একে নির্বাসিত হইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; আমাদের সাহসনা কেবল দীর্ঘশ্বাসে, হতাশার মর্ম্মবাতনা বিকাশে। কৃষ্ণচন্দ্র চলিয়া গেলেন, তাঁহার গণা দিন শেষ হইয়াছিল, তাঁহার ইচ্ছাবনের পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। তিনি চলিয়া প্রভাবে গেলেন। কিন্তু যে ভাবের হিন্দু হিন্দুত্ব পরিষ্করণ সম্বন্ধে হইয়াছিল, যে ভাবের আদর্শে তিনি খাঁর জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে ভাব, সে ভাবের প্রভাব, সে অগ্নিহোত্রের অগ্নিকুণ্ডের ভাব বহুজিহ্বা সজীব করিয়া কে রাখিবে? কে হিন্দুকে হিন্দু হইতে বলিবে? হিন্দু—হিন্দু হইলে যে কত সুখ, কত আনন্দ তাহা কে বাঙালীকে বুঝাইবে?

কৃষ্ণচন্দ্র সন্ন্যাসীর শিষ্য ছিলেন। তিনি গৃহস্থ হইলেও তাঁহার জীবনের ভঙ্গীটা সন্ন্যাসীর ভাবে বিমণ্ডিত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বিধবা পত্নী ও শিশু-পুত্র-কন্যা-দৌহিত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন বটে; পরন্তু আমাদের মনে হয় সৎগুরুর কুণায় তাঁহার পুত্র-কন্যা সকলের ঐহিক মঙ্গলই সাধিত হইবে। সেজন্য আমরা চিন্তা করি না। সেজন্য আমাদের দুঃখ নাই। দুঃখ কেবল এই যে, কৃষ্ণচন্দ্র যে ভাবের বাহক ছিলেন, যে ভাবের আদর্শে নিজের জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে ভাব বহন করিবার আর কেহ রহিল না। তাই বলিতেছি কাঁদ বঙ্গবাসী, তোমার কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ত কাঁদ—কাঁদ বঙ্গমতী, যে সন্তানের কনক লেখার তোমার অঙ্গ যিনি জীসম্পন্ন করিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ত কাঁদ—আর আমরা দেহের বত্রিশ পঞ্জর চাপিয়া অগ্নির পথ-প্রদর্শকের, কন্ঠীর, গুরুসেবক ও ভগবদভক্তের বর্গারোহণে, বুক কাটাইয়া কাঁদি। কাঁদিতে কাঁদিতে যদি কাজে ও কথার সামঞ্জস্য করিতে পারি—তাহা হইলে এ রোদন সার্থক হইবে, এমন রোদনে সোনা ফলিবে। বাহাদের জোরে আমাদের জোর ছিল, তাহাদের কেহ বা স্বর্গত, কেহ বা অনন্তের তারে বসিয়া দিন গণনা করিতেছেন, কেহ বা জরায়-হৃদয়িতায় মুহূর্তমান হইয়া আছেন—আর আমরা বর্ষাকালের অর্কবৃক্ষের জায় নিম্পত্র ও নিরাতরণ হইয়া 'আছি! যিনি আমাদেরকে এমন বন্ধু, এমন সখা, এমন গুরু দিয়াছিলেন, তিনিই আমাদেরকে এ বিপদে রক্ষা করিবেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা দশদিক অন্ধকার দেখিতেছি, জীতগবান পিতৃলের মঙ্গল করুন।' (নারক। ২য় কান্ডন, ১৩১৭)।

তৎকালীন অনেক ইংরাজী, বৈদিক, সাপ্তাহিক ও কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু

বিশ্বসাহিত্যের দু'খানি অস্বর্ণীয় গ্রন্থ
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বরিস পাস্টেরনাক-এর
শেষ গ্রন্থ
অনুবাদ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'ডক্টর জিভাগো' ছাড়া বরিস পাস্টেরনাক একটি মাত্র উপস্থান লিখেছিলেন, সেটি 'শেষ গ্রন্থ'। 'শেষ গ্রন্থ' রচনাটির শক্তি ও কুশলতা এর জটিলতার মধ্যে, কিন্তু গল্প বা কাহিনীর অংশ খুবই সরল ও সাবলীল। এক ক্লাস অবলম্বন তরুণ লেখক আধ-স্বপ্নে আধ-স্মৃতি-রোগহুনে প্রথম মহাযুদ্ধের আগের যুদ্ধের এক শান্ত উষ্ণ গ্রীষ্মের চিন্তায় বিভোর। স্বপ্ন দেখছে পার্থিব ও অপার্থিব ভালোবাসার—স্বপ্নের চেয়ে ভালোবাসা যখন আরো সহজ ও স্বাভাবিক ছিলো। আর এই স্বপ্নের অধিকাংশ জুড়ে আছে আত্মজীবন ও ইতিহাসের উপর মৈত্রিক মন্তব্য। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উভয় দিক থেকেই 'শেষ গ্রন্থ' অস্বর্ণীয় গ্রন্থ।

॥ দাম—তিন টাকা ॥

সুফান জোয়াইগের
গল্প-সংগ্রহ
[প্রথম খণ্ড]
অনুবাদ—দীপক চৌধুরী

মহৎ প্রতিভার চরিতকার হলেও সুদক্ষ কথাশিল্পী রূপেই সুফান জোয়াইগ বিশ্বসাহিত্যের আসরে সমধিক সমাদৃত। যুরোপীয় সংস্কৃতির অনাবিল প্রাণপ্রবাহ এবং সমগ্রভাবে মানব-সত্যের অশেষ অনুসন্ধিৎসাই জোয়াইগ-এর সৃষ্টিকর্মকে মহিমাম্বিত করেছে। হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির সঙ্গে মনো-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সার্থক সমন্বয়েই তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। শিল্প সুখমার উৎকর্ষে, চরিত্রচিত্রণের নিপুণতায় ও কাহিনীর মনোহারিত্বে সুফান জোয়াইগ-এর এই গল্প সংগ্রহের প্রতিটি রচনাই চিরকালীন সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

॥ দাম—পাঁচ টাকা ॥

কী
রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—১২

অনিত শোকসংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। The Telegraph, পত্রিকার কৃষ্ণচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ হতে দেখা যায়। ইহা ছাড়া সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইংরেজী দৈনিকখানি বা উল্লেখ করেছিল তা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য।

"Yet another, Scarcely have we dried up the tears with which we followed our Kali Prasanna and Chandra Nath to the funeral pire, grim death has claimed its tole from one who was very dear and near to us in life—we mean, the Late Krishna Chandra Banerjee, who for more than a decade was our close friend and associate in the field of Journalism in Bengal. Krishna Chandra, a short sketch of whose life is published elsewhere, was not only a friend and associate, but he was something more; he was indeed a valued preceptor and mentor to whom not only ourselves but the whole range of Bengali writers owe a deep debt of gratitude. He was a devoted and ardent lover of our mother tongue at whose holy shrine he poured forth his life blood to worship and adorn her in the most befitting manner. He spared no pains to promote the cause of vernacular Journalism in Bengal and it is to a certain extent due to him that the influential and widely-read vernacular weekly Bangabasi, which he edited for sometime with marked ability under the guidance of its talented founder and proprietor, the late lamented Jogendra Chandra Bose enjoys its present prosperous condition and high status. His masterly contributions to this paper which embraced wide and varied range of subjects—literary, social, religious, political—have earned

for him something which is sure to out live the ravages of time. He has left behind him something from which his grateful countrymen will surely continue to draw inspirations for generations to come. After severing his connection with the Bangabasi he accepted service under the Narajole Raj as Manager with much credit. Of late he had been spending a retired and pious life on the holy banks of the Ganga at Benares, where he calmly passed away from this world on the holy Sankranti of Magh last. Even on the eve of his death he did not cease from contributing his religious articles to the vernacular papers which will certainly have an abiding place in Bengali literature. In him Bengal has lost a son whose memory ought to be enshrined in the hearts of all genuine lovers of our mother tongue. We offer our sincere condolence to his bereaved family who have this consolation that with them many a sad heart now mourns his loss."

(—The Telegraph, Feb. 18, 1911)

আমাদের এই আলোচনা সর্বজনীন নহে। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের সব কথা, সকল সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার সমগ্র রচনারাজিরও একখানি সার্থক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মময় জীবনের আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করিবার রহিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্গবাসীর যে সংবাদ পরিবেশিত হইল তাও খণ্ডিত। বঙ্গবাসীর ইতিহাস সুদীর্ঘ। আমরা সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের সংগে সংশ্লিষ্ট বঙ্গবাসী সম্পর্কেই সংক্ষিপ্ত লিপিবদ্ধ করেছি। বাংলাদেশে উনবিংশ শতকের শেষপার্শ্বের ভাব আন্দোলনের সঠিক পরিচয় দিতে গেলে—বঙ্গবাসীর বন্ধনশীল অর্থ সংগ্রামমুখী কর্মদর্শনের বিচিত্রমুখী কাহিনী উদ্ধারের আবশ্যিকতা আছে। অচিরে ঐটি সম্পন্ন হলে একটা মহৎকার্য সাধিত হবে।

শেখ

হাসপাতালে

আবদুল মজিদ

এখন শূঁরে তুমি, হৃদয়গের আবের্ষে জাহাজ
যোগাৎ যখন আমি ডুবুডুবু স্বহৃদয় শিকার
শিয়রে পুকুর, জল কঠোর নীরস শুকতার
অকৃষ্টি প্রতিষেধক, প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখে আজ
হলুদ, খড়ির রক্ত ছোট-বড় শিশির উষ্ম
টেবিলে সাজানো পাশে। যোগাৎ শব্দ অগোঁহালো
মলিন, শিথিল, হিম; স্মৃতিমতী মমতা পাঁড়ালো
পার্শ্বে এসে সেবিকার অবয়বে যুগোতে বিশদ।

বড়োই নিঃসঙ্গ আমি, দেহে নিয়ে যোগটা ধারাপ
আমাকে বলেছে হৃদয়ে, 'বাঁচবে না, এমন অকালে
যরণ ধুবই কম, তবু ভাল সংসারের জালে
পড়িমি বিয়েধা করে হয়নি যে সন্তানর বাপ।'
চোখের দেখাও এসে দেখলে না, তোমার আমার
বিয়ের কথাটা ঠিক যদিও বা ছিল পাকাপাকি
ঈশ্বর করেছে রক্ষা, কেউ বলে তুমি তাই মাঝি
পড়নি' আমার হাতে, স্বামিগুণ দ্বীভাগ্যে তোমার।

সকালে ব্যাসপূজা, রাত্রে কী ভাব হল
নিতাইয়ের, হুঙ্কার করে উঠে দণ্ডকমণ্ডলু ভেঙে
ফেলল।

দণ্ডকমণ্ডলু সন্ন্যাসের চিহ্ন। যারা সন্ন্যাসী তারা
যোগমার্গী, কৈবল্যকামী। তাদের ভাগবতী প্রীতি
কাম্য নয়, তাদের কাম্য মোক্ষ। কিন্তু ভক্তের লক্ষ্য
কৃষ্ণপাদমূল। প্রবাস থেকে ফিরে পথিক তার নিজের
ঘরেই সর্বক্লেশের উপশম পায়। তখন সে ঘর আর
সে ছাড়ে না। তেমনি সমস্ত কামনাক্লেশ থেকে মুক্ত
হয়ে ধোঁতায়া ভক্ত কৃষ্ণপাদমূলেই তার সমগ্র বিশ্রাম
পায়। তখন আর সেই চরণাশ্রয় সে ছাড়ে না।

ভোরবেলা শ্রীবাসের ভাই রামাই পণ্ডিত খবর
দিল নিমাইকে।

কী ব্যাপার, নিমাই ছুটল শ্রীবাসের বাড়ি।

গিয়ে দেখল, নিতাইয়ের বাহুজ্ঞান নেই, শুধু
আপন মনে হাসছে।

‘চলো, আমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে চলো।’ নিতাইকে
নিয়ে স্নানে চলল নিমাই। আর নিজ হাতে নিমাইয়ের
ভাঙা দণ্ডকমণ্ডলু গঙ্গায় বিসর্জন দিল।

‘আজ ব্যাসপূজা। তাড়াতাড়ি স্নান করে নাও।’
বিহ্বল নিতাইকে মনে করিয়ে দিল নিমাই। ‘আর
চাকল্য কোরো না।’

স্নান করে নিমাই-নিতাই চলল শ্রীবাসের ঘরে।

শ্রীবাস নিজেই পূজা করছে। আর সব
ভাগবতেরা মিলে কীর্তন জুড়েছে, মেতেছে নৃত্যানন্দে।
পূজাস্তে নিতাইয়ের হাতে এক গাছ ফুলের মালা দিল
শ্রীবাস। বললে, ‘এই মালা নাও, মন্ত্র পড়ে ব্যাসদেবকে
দাও আর প্রণাম করো।’

নিতাই নিলনা মালা।

শ্রীবাস বললে, ‘শাস্ত্রের বিধান, নিজের হাতে মালা
দিতে হবে। মালা পেলে ব্যাস খুশি হবেন আর
তোমার আকাঙ্ক্ষা সফল করবেন।’

কিসের মালা, কোথায় ব্যাস, অভিভূতের মত
নিতাই তাকিয়ে রইল।

‘নাও, মালা ধর।’ শ্রীবাস আবার তাড়া দিল।
‘আমি দিলে হবে না। তোমার পূজা তোমাকেই
করতে হবে।’

নিতাই মালা ধরল। কিন্তু মন্ত্র কী, মনে করতে
পারল না।

কত ব্যাসপূজা করেছে আগে অথচ কিছুই এখন
স্মরণে নেই।

শ্রীবাস
নিমাই
অভিভূতের মত

নিমাই কোথায় ? তাকে ডাকো। সে এর বিহিত
করুক।

আঙিনায় কীর্তনিন্যাদের সঙ্গে ভিড়েছে নিমাই।
দেখুন এসে নিতাই কী রকম করছে। ব্যাসপূজা
করছে না।

‘সে কী ? পূজা করো। ব্যাসের গলায় মালা
দাও।’ নিমাই আদেশ করল।

মুহূর্তে হাতের মালা নিতাই নিমাইয়ের গলায়
উপহার দিলে। আর তক্ষুনি নিমাই ষড়ভুজ মূর্তি ধারণ
করল। আর সেই মূর্তি দেখে মুহূর্তেই হল নিতাই।

প্রভু বোলে ‘নিত্যানন্দ, শুনহ বচন।

মালা দিয়া ঝাট করো ব্যাসের পূজন ॥’

দেখিলেন নিত্যানন্দ—প্রভু বিশ্বস্তর।

মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক-উপর ॥

টাঁচর-চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।

ছয়-ভুজ বিশ্বস্তর হইলা তৎকাল ॥

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুহল।

দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল ॥

ষড়ভুজ দেখি মুছাঁ পাইল নিতাই।

পড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু মাত্র নাই ॥

নিতাইয়ের পায়ে হাত বুলুতে লাগল নিমাই।
বললে, ‘ওঠো, কীর্তন করো। যার জন্মে তুমি এসেছ
সেই প্রেম ভক্তি বিতরণ করো। যাকে খুশি তাকে
দাও, ঢোল দাও সর্বঘণ্টে। প্রেম দিয়ে পৃথিবীর পিপাসা
নিবারণ করো। উদ্ধার করো বসুন্ধরা।’

বাহুজ্ঞান ফিরে পেল নিতাই। কিন্তু সম্যক জ্ঞানে
সে নিমাইয়ের দাস, নিমাইয়ের সেবক। কখনো ছোট
ভাই হয়ে লক্ষণ কখনো দাদা হয়ে বলরাম। আর
সেবকের যে আদর করে না তার বিষ্ণুস্থানে অপরাধ।

যে লক্ষ্মণমন্ত্র ভঙ্গ না করে শুধু রামমন্ত্র ভঙ্গ করে তার সর্বচেষ্টি অফলা।

‘ভক্ত ভেদে রতিভেদ, পঞ্চ পরকার।’ শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য আর মধুর। শাস্ত্র-রতির গুণ কৃষ্ণ নিষ্ঠা। আর কৃষ্ণে তার মমত্ব বুদ্ধি নেই, শুধু পরমাত্মা বুদ্ধি। শাস্ত্র-রতি প্রেম পর্যন্ত যায়।

দাস্ত্র-রতির গুণ সেবা। কৃষ্ণনিষ্ঠা তো আছেই, আছে মমত্ব বুদ্ধি। আর কৃষ্ণ আমার প্রভু আমি তার দাস, আছে আবার সেই সজ্জন বোধ। আমি কি যে-সে পাত্র? আমি কৃষ্ণের কৃপাপাত্র। তাই দাস্ত্র-রতি যায় প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্যন্ত।

সখ্য-রতিতে সজ্জন বোধ, বিশ্বাস-বিস্তার। যে উচ্ছিন্ন কল দাস্ত্র দেওয়া যায় না তাই দেওয়া যায় সখ্যে। দাস্ত্র কৃষ্ণকে বড় মনে করে, সখ্যে সমান সমান। তাই সখ্য-রতি যায় প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ ও অনুরাগ পর্যন্ত।

বাৎসল্য-রতিতে হীনত্ববোধ। কৃষ্ণই তখন অনুগ্রহের পাত্র, আশীর্বাদভাজন। কৃষ্ণ অবোধ, ভালো-মন্দ সে কী জানে কী বোঝে, আমার উপরেই তার নির্ভর, এই বুদ্ধিতে ভক্ত পরীক্ষান। বাৎসল্যে আর বিশ্বাস নয়, অনুগ্রহ। দাস্ত্রের সেবা-সেবক নয়, বাৎসল্যে পাল্য-পালক। প্রয়োজন বোধে তাড়ন-ভৎসন। তাই বাৎসল্য-রতি যায় প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় রাগ অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত।

মধুর রতিতে “অতিশয় সেবা,” দাস্ত্র সখ্য বাৎসল্যের সেবার চেয়েও বেশি। শাস্ত্রের নিষ্ঠা, দাস্ত্রের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের লালন তো আছেই, সর্বোপরি নিজস্ব দিয়েও সেবন আছে। এ ভাব প্রেমসীর ভাব, কৃষ্ণবাঞ্ছার মূর্তির বাইরে যার আর কোনো আরাধন নেই। কৃষ্ণের শ্রীতি বিধানই এ ভাবের সার কথা। তা দেহ দিয়েই হোক পেহ দিয়েই হোক আর লেহ দিয়েই হোক। তাই মধুর-রতি যায় মহাভাব পর্যন্ত।

নিত্যানন্দের কী কথা? নিত্যানন্দের কথা, ‘চৈতন্য ঈশ্বর, মুক্তি তাঁর একজন।’ ‘মুক্তি তাঁর, সেহো মোর ঈশ্বর সর্বধা।’ ‘নিত্যানন্দ অবধূত—সভাতে আগল। চৈতন্যের দাস্ত্র প্রেমে হইলা পাগল ॥’

‘মা, দেখ, দাদা এসেছে।’ বাড়ি এসে নিমাই ডাকল মাকে।

‘কে, বিশ্বরূপ এসেছে?’ শচী ব্যাকুল হয়ে প এল।

‘দেখ, দাদাকে এনেছি। হ্যাঁ, তোমার বিশ্বরূপ। আমার সেই দাদা।’

নিতাইয়ের মুখের দিকে অনিমেমে চেয়ে র শচী। বললে, ‘নিমাই বলছে তুমি আমার বিশ্বরূপ সত্যি, তুমিই কি আমার সেই হারানো ধন?’

‘হ্যাঁ, মা, আমিই তোমার সেই বিশ্বরূপ।’ নিতাই স্নেহ পাড় করে বললে, ‘আজ চতে তোমার আবে সেই ছুই ছেলে।’ নত হয়ে নিমাই প্রণাম করলে শচীকে।

নিতাইয়ের মাথায় ছাত রেখে আশীর্বাদ কর শচী। ‘বাধা, তুমিই আমার বিশ্বরূপ, আমার নিমাইয়ে বড় ভাই। আমার নিমাইকে তুমি দেখো।’

একদিন নিভূতে শচী দেবী নিমাইকে বললে, ‘ক শেষ রাতে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। তুমি নিত্যানন্দ পাঁচ বছরের ছেলে হয়ে গিয়েছ।’

‘বলো কী?’ খুব মজা পেল নিমাই।

‘ছোটোছোটো করে মারামারি করছ ছুজনে। ঠেলাঠেলা করতে-করতে, দেখলাম, ছুজনে ঠাকুরঘরে পি টুকলে। আর অমনি ঠাকুর ঘর থেকে ছোটো নড় ছেলে বেরিয়ে এল, ঠিক তোমাদের বয়সী। তারা জানো?’

‘কে তারা, মা?’

‘তারা কৃষ্ণ-বলরাম।’

‘বলো কী? কী করল তারা?’

‘তারা তোমাদের ছ ভায়ের সঙ্গে মারামারি শু করে দিল। বললে, তোমরা কে? এখানে এসেছ কেন এ বাড়িতে যত দই ছুধ সন্দেশ আছে সব আমাদের এতে তোমাদের কিছু ভাপ নেই।’

‘উত্তরে আমরা কিছু বললাম?’ নিমাই হাস লাগল।

‘হ্যাঁ, নিত্যানন্দ বললে, সকাল আর নেই। ত গোয়ালার যুগ ছিল, দই-মাখন খুব খেয়েছ লুটে-পুটে এখন বায়ুনের যুগ, এখন আমাদের খাবার পালা। ত ভালয়-ভালয় এ ঘর-দোর ছেড়ে চলে যাও, আমাদের খেতে দাও। যদি না যাবে তো মার খাবে বলে দিচ্ছি।’

‘তখন কৃষ্ণ-বলরাম কী বললে?’

‘কৃষ্ণ-বলরাম বললে, আমাদের দোষ নে তোমাদের ছুজনেই তা হলে বাঁধব। বলরামের

বেশি রাগ, আর তার বড় উড়োনো সব নিত্যানন্দের উপর। ভয় দেখায়, শাসায়, আর বলে, এই দেখ, কৃষ্ণ আমার দিকে। নিতাই বলে তুমি কৃষ্ণের কী ভয় দেখাচ্ছ? পৌরন্দ্র বিশ্বস্তুর আমার ঈশ্বর।’

‘বা, ছুই দিকেই ছুই ঈশ্বর উপস্থিত।’ নিমাই পরিহাস করে উঠল। ‘তারপর?’

‘এই রকম ঝগড়া করতে করতে কাড়াকাড়ি করে চার জনে সব খেয়ে ফেলল। এমন সময় স্পষ্ট নিত্যানন্দের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। যেন বলছে, মা, বড় খিদে পেয়েছে, ভাত দাও। ঐ ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। এই অদ্ভুত স্বপ্নের কী অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।’ শচী দেবী বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

নিমাই বললে, ‘তুমি সুস্থ দেখেছ। এ কথা আর কার কাছে বোলো না। তোমার ঘরের ঠাকুর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। আমিও ভোগ দিতে গিয়ে দেখি নৈবেদ্যের আধাআধিই নেই। কোথায় যায়, লজ্জায় বলিনে কাউকে।’

‘কেন, কোথায় আবার যাবে?’

‘আমার কিন্তু সন্দেহ ছিল তোমার পুত্রবধূই ঐ আন্ধক ভোগ সাবাড় করে।’ আবার পরিহাস করল নিমাই। ‘এতক্ষণে আমার সন্দেহের নিরসন হল।’

অন্তরালে থেকে সব শুনতে পেয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া। স্বামীর স্নেহরস পরিহাসে হাসল আপন-মনে।

শচী দেবী বললে, ‘কিন্তু স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করলি?’

‘ব্যাখ্যা তো সোজা। তুমি নিত্যানন্দকে একদিন নমস্তর করে খাওয়াও।’

‘তবে তাই যা, নিতাইকে খেতে বলে আয়।’ শচী দেবী ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তথাস্তু। নিতাইকে গিয়ে তক্ষুনি বললে নিমাই। ‘চলো আমার বাড়িতে আজ তোমার ভিক্ষে। দেখো, যেন চঞ্চলতা কোরো না।’

কে কাকে বলছে। নিতাই হাসল।

নিমাই-নিতাই ছ’ ভাই খেতে বসেছে পাশাপাশি। কিন্তু এ কী দেখছে শচী দেবী? দেখছে কৌশল্যার ঘরে যেন রাম-লক্ষ্মণ খাচ্ছে।

আরবার আমি আই ছুইজন দেখে

বৎসর পাঁচের শিশু যেন পরতেখে ॥

কৃষ্ণ-গুরু-বর্ণ দেখে ছুই মনোহর।

ছুই জনে চতুর্ভুজ—ছুই দিগম্বর।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শ্রী ল মুঘল।

শ্রীবৎস কোস্তভ দেখে মকরকুণ্ডল ॥

কাঁদতে-কাঁদতে শচী দেবী ভাবাবেশে মুছিত হয়ে পড়ল। তখন কোথায় কার খাওয়া। ছ’ ভাই ব্যস্ত হয়ে মাকে মুস্থ করতে বসল।

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্। কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্।
কৃষ্ণই পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ত্ব। কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সর্ব কারণের কারণ। রসময়, রসের সদন। রস-নির্ঘাস-আন্বাদন। একই ঈশ্বর, ভক্তের ভাব অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ। এইরূপ আকারে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ নেই। তাই নিমাইয়ে ভক্তরা কখনো দেখে রামসীতা কখনো বা রাধাকৃষ্ণ, কখনো বা নৃসিংহবরাহ, কখনো বা লক্ষ্মী-কৃষ্ণিণী। একই বৈদূর্যমণি, এক দিক দেখলে নীল আরেকদিক থেকে দেখলে লাল। তেমনি ধ্যান ভেদে বিচিত্র প্রকাশ। প্রত্যেক প্রকাশেই কৃষ্ণ শাস্ত, পরিপূর্ণ। ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নেই। যেমন লবণপিণ্ডের সর্বত্রই লবণ তেমনি কৃষ্ণে সমস্তই আনন্দ। যেই রস সেই কৃষ্ণ, যেই কৃষ্ণ সেই রস।

কৃষ্ণই সর্বাশ্রয়। কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্বধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ববিশ্বের বিশ্রাম ॥ সবার আশ্রয় কৃষ্ণ—কৃষ্ণে সবার স্থিতি। কৃষ্ণই সর্ব-অংশী। সর্বভূতাধিবাসঃ। সর্বভূতান্তরাঙ্গা। সর্বতঃ পাণি-পাদান্তং সর্বতোহক্ষিণিরোমুখম্।

আবার কী? কৃষ্ণ লীলাপরায়ণ। লীলা পুরুষোত্তম। ‘লোকবন্তু লীলা-কৈবল্যম্।’ কৃষ্ণের আবার খেলা আছে। শিশু যে খেলে, কোনো কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে খেলে না, আনন্দের জন্তে খেলে। কৃষ্ণ যে পরম দেবতা তা সে শুধু খেলে বলে। দিব ধাতু থেকে দেবতা। দিব ধাতু ছাতি আর ক্রীড়া ছুইই বোঝায়। তাই যে ছাতি বিস্তার করে বা ক্রীড়া বিস্তার করে সেই দেবতা। কৃষ্ণ পরমজ্যোতির্ময় বা কৃষ্ণের খেলা সমস্তোত্তম, তাই কৃষ্ণ পরমদেবতা। ‘কৃষ্ণের যতক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকের নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ।’ কিন্তু খেলা তো একলা হবার নয়। ‘স একাকী ন রমতে।’ খেলায় আবার সঙ্গী চাই। কৃষ্ণের খেলার সঙ্গীদের

নাম পরিষ্কার। আর খেলার স্থানের নাম ধাম। 'দাস
সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লৈয়া। ব্রহ্মে ক্রীড়া
করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥' সেই ভগবান কোথায়
থাকেন? 'স ভগবান কন্সিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ?' ভগবান
প্রতিষ্ঠিত নিজের মহিমায়। 'স্বৈ মহিম্বীতি।'
নিজের মহিমায় মানে স্বরূপশক্তির মহিমায়। আর
স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষই ভগবানের ধাম।
যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না তাইই
কৃষ্ণের পরম ধাম। 'যদ্ গদ্য ন নিবর্তন্তে ভদ্রাম
পরমং মম।'।

কৃষ্ণ-আবেশে সমাসীন, নিমাই রামাইকে বললে,
'শাস্তিপুত্র যাব, অর্ধেক গিয়ে খবর দাও। বলো
যার জন্ত এত কেঁদেছিলে, হুকুম করেছিলে, সে এসেছে
প্রকাশ পেয়েছে। আর শোনো, নিত্যানন্দের
আসার কথাটাও বোলো কানে-কানে। সমস্ত
আগমনই তার আকর্ষণে। বোলো যেন সঙ্গীক
আসে।'

রামাই ওখুনি ছুটল শাস্তিপুত্র।

সামনে এসে দাঁড়াতেই অর্ধেক বললে, 'কী রে,
আমাকে বুঝি নিয়ে যেতে এসেছিস?'

রামাই বললে, 'সবই তো আপনি জানেন! এবার
তবে চলুন।'

'কোথায় যাব?' অর্ধেক অবাক হবার ভাব করল।
'তোরা একটা ছেলেকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করেছিস
বলে আমিও গিয়ে তোদের দলে ভিড়ব? তোরা কাকে
অবতার বলছিস? কোন শাস্ত্রে নদীয়ায় অবতার এল?
আমি কি তোদের মত নির্বোধ? তোর দাদা জীবাসকে
গিয়ে জিগেস কর আমি কে?'

'তার আমি কী জানি। শাস্ত্রেরই বা আমি কী
বুঝি?' রামাই বললে, 'তবে ভগবান যা বলে দিয়েছেন
তাই আপনার কাছে নিবেদন করছি।'

'কী, কী বলে দিয়েছেন?'

'বলে দিয়েছেন যার জন্তে এতদিন কেঁদেছেন, পূজা
করেছেন, কঠোর উপবাস করেছেন তিনিই আবির্ভূত
হয়েছেন। তিনিই ডেকেছেন আপনাকে।'

যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ত্রন্দন।

যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন ॥

যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।

সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ ॥

'ডেকেছেন?' এ কী, অর্ধেক যে হঠাৎ কঁদতে

শুরু করল। 'সত্যি, সত্যি এসেছেন তিনি? আমাদের
মধ্যে এসেছেন? বৈকুণ্ঠ ছেড়ে তিনি এসেছেন এ খুলির
ধরণিতে?' অর্ধেক উঠে নৃত্য শুরু করল। 'ওরে শোন,
তিনি এসেছেন। আমার ডাকে তিনি নেমেছেন বৈকুণ্ঠ
থেকে। আমিই তাঁকে এনেছি। আমিই তাঁকে
এনেছি।'

বাওয়ার উত্তোগ পড়ে গেল। যড় পূজার সজ্জা
তৈরি হল। অর্ধেকের সঙ্গে চলল তার স্ত্রী সীতা দেবী।
আর অনুগামী রামাই।

পথে আবার বেনুর ধরল অর্ধেক। জিগেস
করল, 'কোথায় চলেছি বল তো, কার
কাছে?'

রামাই বললে, 'তার আমি কী জানি।'

'তোকে কী বলে দিলেন সত্যি করে বল তো
আবার শুনি।'

'শুধু বললেন যেন শির্গাগর আপনি একবার দেখা
করেন তাঁর সঙ্গে।'

'কিন্তু উনিই যে আমার আকাঙ্ক্ষিত তা আমি
বুঝব কিসে?' অর্ধেক আবার দ্বিধায় পড়ল। বললে,
'শোন, যদি উনি আমার মাথায় পা তুলে দেন, পা
তুলে দেবার গুঁর সাহস হয়, তবেই বুঝব তিনি আমার
প্রাণেশ্বর।'

রামাই বললে, 'তার আমি কী জানি। আমার
যদি ভাগ্যে থাকে দেখব সেই অপূর্ব দৃশ্য।'

'দেখবি?' যেন বিশ্বাস্ত্র নয় এমনি জিজ্ঞাসা
অর্ধেকের।

'কেন দেখব না? আপনার জন্মেই তো তাঁর
আসা। আপনারই তো হুকুম এবার যেন ভক্তি
বিতরণ করেন ঘরে ঘরে।'

চিত্ত আর্দ্র হল অর্ধেকের। তবু যেন ঘোর
কাটে না।

নবদ্বীপে পৌঁছে বললে, 'আমি যাব না নিমাইয়ের
কাছে। তুমি গিয়ে তাঁকে বলো যে আচার্য আসেনি।'

'আপনি তা হলে কোথায় যাবেন?' রামাই
অবাক মানল।

'আমি সঙ্গীক নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে
থাকব। দেখি তিনি কী করেন। দেখি তিনি আমাকে
ডাকান কি না।'

নন্দন আচার্যের বাড়িতে অর্ধেককে পৌঁছে দিয়েই
রামাই ছুটল বাড়িতে। নিমাই এখন কোথায়?

দেখ গিয়ে 'ত্রিংশের দায়' তোমাদের বিষ্ণু খটায় এসে বসেছেন।

অদ্বৈত এসেছে, অন্তরে কেনেছে নিমাই। চলো যাই শ্রীবাসের বাড়ি। সেখানে গিয়ে ছুঁকার ছেড়ে বসেছে বিষ্ণু খটায়। বললে, 'ওরে নাড়া এসেছে। নাড়া এসেছে আমাকে পরীক্ষা করতে।' 'নাড়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে।' নন্দন আচার্যের বাড়ি লুকিয়ে রয়েছে। কতক্ষণ থাকবে?

নিত্যানন্দ নিমাইয়ের মাথায় ছাতা ধরেছে, পদাধর কপূর-তাম্বুল জোগাচ্ছে, চামর দোলাচ্ছে নরহরি। মুকুন্দ মুরারি শ্রীবাস করজোড়ে দাঁড়িয়ে।

এমন সময় রামাই এসে উপস্থিত।

'আমাকে পরীক্ষা করবার জন্মে নাড়া পাঠিয়েছে তোমাকে?' বললে নিমাই, 'ওকে গিয়ে বলো নন্দন আচার্যের বাড়িতে আর লুকিয়ে থাকতে হবে না। বলো আমি ডেকেছি। শিগগির যেন চলে আসে।'

আবার ছুটল রামাই।

সত্যি? আমি এসেছি, নন্দনের বাড়ি রয়েছি, কেউ না বললেও টের পেয়েছেন? অভিভূতের মত এগিয়ে চলল অদ্বৈত। অনুগামিনী সীতাও চলল সঙ্গে।

শ্রীবাসের ঘরে এসে দাঁড়াল দুজনে। কই নিমাই কোথায়? এ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বসে। আর এ তো শ্রীবাসের ঘর নয়, এরই নাম বুঝি বৈকুণ্ঠ।

দিব্যদর্শন হল অদ্বৈতের। জ্যোতির্ময় দেবতার। নিমাইয়ের স্তুতি করছে, অগণন ঋষি দাঁড়িয়ে আছে করজোড়ে। পৃথ্বী ও আকাশ এক হয়ে গিয়েছে। সর্বত্র বন্দনার সুধাকরণ।

ঐশ্বর্য দেখতে চেয়েছিল, অদ্বৈত ঐশ্বর্য দেখল।

'আমাকে চিনতে পারছ?' বললে নিমাই, 'আমি ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রামগ্ন ছিলাম। তোমার ছুঁকার আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। জীবের ছুঁখ সহ্য করতে না পেরে জীবোদ্ধারের উদ্দেশ্যে আমাকে তুমি ডেকে এনেছ। কার সাধ্য তোমার ডাক না শোনে!'

সস্ত্রীক কীদতে লাগল অদ্বৈত। বললে, 'আমার শক্তি কী তোমাকে আকর্ষণ করি? তুমি নিজ করুণায় অবতীর্ণ হয়েছ। জীবের ছুঁখ তুমিই ভালো জানো। আর তুমি ছাড়া কে আছে তাকে তুলবে পাপপঙ্ক থেকে? আজ আমার সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল, তোমার দর্শন পেলাম। জন্মকর্ম সফল হল। যদি অনুমতি করো তো চরণযুগল পূজা করি।'

পায়ের কাছে বসল দু'জনে, অদ্বৈত আর সীতা। অশেষ-বিশেষে চৈতন্যচরণ পূজা করতে লাগল। পূজার শেষে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তখন নিমাই কী করল? অদ্বৈতের মনোবাসনা পূর্ণ করল। তার মাথার উপরে পা রাখল।

সর্বভূত-অন্তরাঙ্গা শ্রীগৌরাজ রায়।

চরণ তুলিয়া দিল অদ্বৈত মাথায় ॥

'নাড়া!' ডাকল নিমাই, 'এখন একবার নৃত্য কর। আমি দেখি।'

অদ্বৈত নাচতে লাগল।

আর সকলে কীর্তন ধরল। অদ্বৈতও যোগ দিল কীর্তনে। আর তপস্শা নয়, ধ্যান-জ্ঞান নয়, এখন শুধু নৃত্যগীতে কৃষ্ণভজন।

নিমাই আপন গলার মালা অদ্বৈতকে দিয়ে দিল। বললে, 'বর চাও, বর নাও।'

অদ্বৈত বললে, 'যে বর চেয়েছিলুম তা তো পেয়ে গেছি। আর কিছুই আমার চাইবার নেই।

'না, আছে।' নিমাই বললে জোর দিয়ে।

'তবে এই বর দাও যে প্রেমহস্তি তুমি দিতে এসেই তা যেন সর্বলোকে পায়—সে অধিকারে যেন কোনো উচ্চ-নীচ ভেদ না থাকে। ভক্তিতে চণ্ডালে-ব্রাহ্মণে মূর্খ-পণ্ডিতে যেন তারতম্য না থাকে। নির্বিশেষে সকলে যেন পায় সে করুণা।'

নিমাই বললে, 'তথাস্তু।'

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যও মধুর। মাধুর্যই ভগবন্তার সার। আর কারুণ্যই সেই মাধুর্যের প্রতিবিন্দু। স্বতন্ত্র পুরুষ হয়েও কৃষ্ণ ভক্তপরবশ। 'অহং ভক্ত-পরাধীনঃ।' 'লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।' কৃষ্ণ যদি করুণ না হয় তবে ক্রন্দন শুনবে কে? 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য়ামি-রূপে শিখায় আপনে।' কৃষ্ণের এত করুণা যে নিজেই নিজত্ব শিখিয়েছেন। হয় গুরুর মধ্য দিয়ে নয়তো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাক্ষাৎ ভাবে, অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে। যেমন অর্জুনকে কৃপা করলেন নিজের থেকে। সর্বগুহুতম কথা আবার শোনাই তোমাকে। আমাতে মন ঢালো, আমাকেই খুঁশি করো। আমি যে তোমাকে আগে থেকেই ভালোবেসে ফেলেছি। আর ভালোবাসা ছাড়া কী আছে খুঁশি করবার! এই তো সংসারে সর্বোত্তম কথা—পরমং বচঃ।

[ক্রমশঃ]

বাঙালী জাগো

ডাঃ শ্রীশঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রাক্তন উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

আসামে নয়মেধ যজ্ঞ হইয়াছে। এই যজ্ঞের বলি বাঙালী হিন্দু। শত শত বাঙালী নরনারী নিহত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বাঙালীর ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দিয়া বঙ্গবাসীরা তাহাদিগকে নুতন ইহাদী করিয়া দিয়াছে। অসভ্য, অকৃতজ্ঞ অসমীয়ারা প্রাণান ধরিয়াছে "বঙ্গাল খেদা"। শুধু আসামেই বা বলি কেন প্রায় সব দেশেই বাঙালীকে আর বেন কেহ সজ্জ করিতে পারিতেছে না। অথচ এই বাঙালীর জন্মই ভারতবর্ষ স্বাধীন। এই বাঙালীর জন্ম বিশ্বের দরবারে ভারতের বয়সন লাভ হইয়াছে। এই বাঙালীই যুগান্ত ভারতবর্ষকে "বন্দেমাতরম" মন্ত্রে জাগরিত করিয়াছে। বন্দেমাতরম মন্ত্রের স্রষ্টা একজন বাঙালী। ভারতের সনাতন ধর্ম বিধে প্রচার করিয়াছে একজন বাঙালী বিপ্লবী-সন্ন্যাসী। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন বাঙালী। তিনিই স্বাধীন-শাসনের বীজমন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করেন। বাঙালী ছিল দেশের নেতা। বাঙালী-ই ছিল ভারতের আশ্রয়। বাঙালীই ছিল ভারতের বৃদ্ধ। ভারতের পৌরব। স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা যে বাঙালীর হাতে ছিল তাহা বৃটিশ "রাজ-প্রতিনিধি" ক্যাঞ্জেস বুঝিয়াছিলেন। বাঙালীকে হীনবল করিবার জন্ত তিনি বাংলাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ববাংলা হইল মুসলমান-প্রধান বাংলা বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি মুসলমান-প্রধান দেশ সৃষ্টি করা। বাঙালী হিন্দুকে হুঁসল করা।

অসমীয়াদের বাঙালী-বিদ্বেষের কারণ কি? এই বিদ্বেষ শুধু ভাষাগত, না ইহার অস্ত্র কিছু কারণ অন্তরালে আছে? কেহ কেহ গোপন কারণের ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহাতে কোন সত্য আছে বা ইহা নিছক গুজব, তাহা আমরা জানি না। সত্যতঃ এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেও চাহি না।

এই নরহত্যার তদন্ত করিবার জন্ত কেহ কেহ একটি "জুডিসিয়াল ট্রাইব্যুনাল" গঠিত করিবার জন্ত দাবী জানাইতেছেন। "জুডিসিয়াল ট্রাইব্যুনাল" গঠিত হইবে কিনা জানি না।

আসামের ঘটনা ইনকুয়ারী করিবার জন্ত যদি একটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়, তাহা হইলে কি হইবে তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন কোর্ট বা ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে কোন বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করা যে কি কঠিন, তাহা ব্যবহারজীবী মাত্রই জানেন। এই প্রমাণের প্রথম অন্তরায় "এভিডেন্স গ্র্যান্ট"। দ্বিতীয়তঃ অসমীয়াদের বিরুদ্ধে কোন অসমীয়াই সাক্ষ্য দিবে না। আর তখন যজ্ঞপ্রবাহ দেখিয়া বাঙালী নরনারী ছুটিয়া পলাইতেছিল, তখন

তাহাদের ঘটনাগুলি দেখিবার সময় ছিল কোথায় বা দৃষ্ট বসনা মনে রাখিবার মনের অবস্থাটি বা ছিল কোথায়? তৃতীয়তঃ আসাম গভর্নমেন্ট নিজেকে বাঁচাইবার জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করিবে। তাহাতে বাঙালীদের পক্ষে সাক্ষ্য সাব্যস্ত মিলিবে না। চতুর্থতঃ এখনও মীজ্জাকর আছেন। নিজের মুখ-সুবিধার জন্ত আপনজনকে ভাসাইয়া দিবার লোকের অভাব হইবে না। বিশেষতঃ গভর্নমেন্ট যেখানে সংশ্লিষ্ট। ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইলে কিছু কাল গত হইতে পারে এবং হিন্দু বাঙালী আমরা কিছু সাহসনা পাইতেও পারি— বিচার হইবে। হয়ত হৈ চৈ করিবার বা ভূয়া নাম কিনিবার সুযোগও মিলিতে পারে। কি আসল সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে কি? নিহত ব্যক্তিগণও আর কিরিয়া আসিবে না। যিনি বাঁচাই যুগে বলুন না কেন, গৃহহারাদের আর সম্পূর্ণ পুনর্বাসন হইবে না। পুনর্বাসন যে কি, দণ্ডকারণ্য তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, যদি ইহাই আমার মত হয় তাহা হইলে বাঙালীর বাঁচিবার রাস্তা আমি কি নির্দেশ করিতেছি। আমি বলি, বাঙালীকে বাঁচিতে হইলে তাহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। বাঙালী আত্মরক্ষার মন্ত্র জানে। আজ আপনভোলা ভাবপ্রবণ বাঙালী আত্মবিশ্বস্ত, তাই আজ সে নিঃশ্রান্ত, লাক্ষিত।

তাঁই বাঙালী, আর পরমুখাপেকী হইয়া বসিয়া থাকি-মা। কবে কে তোমাকে সাহায্য করিবে, কবে কে তোমাকে রক্ষা করিবে ইহার প্রতীক্ষা করিও না। তোমরা ত আত্মরক্ষার মন্ত্র জান; সেই মন্ত্রের সাধনার দিন আবার আসিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্ত তোমাদিগকে প্রস্তুত হইতেই হইবে। জননী, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে ভয় করিয়া বসিয়া থাকা চলিবে না তো আর। তোমর অপটু নও তোমাদের পটুতায় এবং শক্তিতে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। তোমরা আত্মবিশ্বস্ত। এবং বার দর্পণে মুখ দেখ— তোমরা কে। অরবিন্দু, সুভাষ, স্কুদিরাম প্রভৃতিকে দেখিতে পাইবে।

সে দিন বোম্বাইতে শ্রীরাজাগোপালাচাৰী বাঙালীর হৃৎখে নাবি কাতর হইয়া বিগলিত অশ্রুজলে আসামে একটা "ভেডেচা মিশন" পাঠাইবার জন্ত বলিয়াছেন। তিনি তো বুড়ো হাড়ে দিল্লী, হিন্দি, মক্ক করিয়া বেড়াইতেছেন এবং চোখা চোখা ভাষণও দিতেছেন। তিনি নিজে আসাম দেখিতে একবার যাইলেন না কেন? অথচ এই অতি বৃদ্ধের লোলুপদৃষ্টি ভারতের সিংহাসনের উপর রহিয়াছে। তাহার দলের একজন বাঙালীকে আসাম বাইয়া আসামের অবস্থা দেখিয়া সে সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে নির্দেশ দিয়া তাহার কর্তব্য কর্ম শেষ করিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রাঁ কিছু করিতে পারিলেন না, সেখানে অস্ত্র বাঙালী কি করিবে? তাই বলি, বাঙালী ঘুমাইও না আর, জাগো! জাগো!

A man who lives for his children, sacrificing everything for them, is doing them a misservice.

—PRIESTLEY.

কমলকর বর্ণনা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আইভান তুর্গেনিভ

২১

ভোরের অল্প আগে সে ঘুমিয়ে পড়লো। স্নাত্তে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। গ্রীষ্মের এই হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটা লেগে সে বুঝতে পারলো প্রায় তখনই—জেন্মা খুব সুন্দরী বা তাকে খুব ভালো লাগেতা নয়, সে তো আগেই জানতো তা নয়—সে বুঝতে পারলো জেন্মাকে সে ভালোবাসে। এই ঝড়ের মতই প্রেম তার জীবনে হঠাৎ এসে দেখা দিয়েছে। আর এখন তাকে বোকার মত লড়াই করতে হবে। দুঃখে তার মন ভরে গেলো। যদিই বা সে প্রাণ না হারায়—এই মেহেটিকে ভালোবাসে কি হবে তার, অজ্ঞের বাগদত্তা সে। যদি সেই অপর লোকটি বড় রকমের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়, জেন্মা যদি তাকে ভালোবাসে, হয়ত এখনই তাকে ভালোবাসে—তাহলে কেমন হয়? একি প্রশ্ন—কি সুন্দরী সে...

সারা ঘরে পায়চারী করতে লাগলো সে। টেবিলে বসে কাগজ কলম টেনে নিয়ে কয়েক লাইন লিখলো—আবার কেটে দিলো। ...জেন্মার কথা চিন্তা করতে লাগলো সে—অন্ধকার জানালায় জেন্মার সেই সুন্দর চেহারা তারার আলোয় ঝড়ে এলেমোলো করা তার চুলের রাশি, গ্রীক-দেবীর মত তার সুন্দর দু'টি বাহু, সেই বাহু দু'টি তার কাঁধের উপরে রাখা।

জেন্মা জানালা দিয়ে যে গোলাপ ফুলটি ছুঁড়ে দিয়েছিলো, সেটা তুলে নিলো। মনে হলো শুকনো পাপড়িগুলো থেকে মিষ্টি হাওয়া মুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বা অল্প গোলাপ থেকে অনেক বেশী মিষ্টি।

কাল যদি সে নিহত হয় বা বিকলাঙ্গ হয়ে থাকতে হয় সারা জীবন?

বেশ পরিবর্তন না করে, বিছানায় না গিয়ে সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

কে যেন তার কাঁধে টোকা দিলো।

চোখ খুলে দেখে পাণ্টালেওন সামনে ঝাঁড়িয়ে।

বুড়ো বললো, 'ব্যাবিলনে যুদ্ধের আগে মহাবীর আলেকজান্ডারের মত সে ঘুমিয়ে আছে।'

সানিন বললো, 'কেন? এখন ক'টা বাজে?'

'পোনে সাত—হানাউ ছ' বটার রাত্তা। আমাদেরই প্রথম পৌছানো উচিত। রাশিয়ানরা সব সময়ই প্রতিপক্ষের আগে চলে। কাঙ্কোর্টের সব চেয়ে ভালো পাড়ী ভাড়া করেছি আমি।'

সানিন মুখ ধুতে গেলো।

'পিছলগুলো কোথায়?'

'পাড়ী নছার জামাণটি পিছল আনবে ভাতারও আনবে।'

কালকের মত পাণ্টালেওন তার হর্ষভাবে বজায় রাখতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু যখন সে গাড়ীতে উঠে সানিনের পাশে বসলো—গাড়োরানের চাবুক খেয়ে যখন ঘোড়াগুলো কমচালে রওয়ানা হলো, তখন পাড়ুয়ার অঝারোহী সেনাদলেব ভূতপূর্ব বজুটির মধ্যে অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখা গেলো। সে যেন নিরুৎসাহ হয়ে গেলো, মুখুড়ে পড়লো। কোনো রকমে খাড়া করা দেওয়াল যেন হঠাৎ ধ্বসে গেলো।

'হে ভগবান, হায় পবিত্র ম্যাডোনা আমরা কি করতে বাচ্ছি!' তার চুলের মুঠি হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে বললো, 'আমি কি বুড়ো হয়ে পাগল হয়ে গেলাম, কি করছি আমি?'

আশ্চর্য হয়ে হেসে উঠলো সানিন, পাণ্টালেওনের কোমর জড়িয়ে ধরে ফরাসীতে বললো—'পাত্তিতে মদ ঢালা হয়েছে পান করতে হবে আমাদের সব তুল প্রমাদ।'

'হ্যা, হ্যা, আমরা দুজন পেয়ালার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত পান করে যাবো। তবু আমি বলবো আমি পাগল হয়ে গেছি। সব কিছু ছিলো কি শান্ত, কি সুন্দর—অকস্মাৎ এ কি হয়ে গেলো?'

সানিন জোর করে হেসে বললো, 'যেমন অর্কেষ্টা একতান বাজায়, কিন্তু তোমার তো কোনো দোষই নেই।'

পাণ্টালেওন সামনে আসা চুলের মুঠি পেছনে করে দিলো, নিখাস ফেসে বললো, 'তা আমি জানি। তাই মনে করি। কিন্তু একি পাগলামি নয়?'

গাড়ী চলতে লাগলো।

ভারী সুন্দর সকাল হয়েছিলো। সত্তজাগ্রত ক্রাঙ্কোর্টের রাত্তা ছিলো পরিষ্কার ও ফিটকাট। জানলাগুলো টিনের পাত্তের মত ঝকঝক করছিলো, যখন তারা নগরঘার পেরিয়ে গেলো শুনতে পেলো ঝবৎ লাল আকাশে লার্ক পাখী গান পাইছে। হঠাৎ পথ বেধানে মোড় ঘুরেছে, একটা বিরাট পপলার গাছের পেছন থেকে একটি পরিচিত ব্যক্তিকে দেখা গেলো, কয়েক পা এগিয়ে এসে ওদের দেখে ধমকে গেলো। সানিন আবার চাইলো...এ কি এ বে এছিল।

পাণ্টালেওনের দিকে ফিরে চাইলো সানিন, 'সে কি? এছিল কি সব জানে?'

নিরুপায় ইটালীয়ানটি প্রায় আর্ন্তনাদ করে উঠলো, 'বলেছি তো আমি পাগল হয়ে গেছি। বেচারী আমাকে সারা রাত শান্তি দেয়নি, অবশেষে আজ সকালে তাকে সব বলে দিয়েছি।'

সানিন নিজের মনেই বললো—এই তোমার গোপনকথা লুকিয়ে রাখা।

এমিল যেখানে বাঁড়িয়েছিলো সেখানে গাড়ী আসতে সানিন বোড়া খামাতে পাড়োয়ানকে আদেশ দিলো—‘বেচারাকে কাছে আসতে বললো।’ অন্ধির পদে এমিল এগিয়ে এলো, তাকে রক্তহীন দেখাচ্ছিলো, যেদিন সে মুছাঁ বার সেদিনের মত ক্যাকাসে। ভালো করে বাঁড়িতে পারছিলো না সে।

ভীষণ স্বরে সানিন বললো, ‘এখানে কি হচ্ছে? বাড়ী ছেড়ে এসে?’

কম্পিত স্বরে হাতজোড় করে বাঁড়িয়ে এমিল বললো, ‘আপনার সঙ্গে আমাকে বেতে দিন।’ ভীষণ স্বরে লোকের বেমন দাঁতে দাঁত লেগে বার সেরকম এমিলের দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছিল ‘কিছু করবো না আমি, বাধা দেবো না, আপনার সঙ্গে বেতে দিন আমার।’

সানিন বললো ‘আমার প্রতি তোমার যদি কিছু মাত্র ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা থাকে তবে এখনই বাড়ী বাও কিম্বা হের ক্লুববারের দোকানে কাউকে কিছু না বলে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।’

এমিল কোনো রকমে কাতরোক্তি করলো, ‘আপনার কিরে আসার? আর আপনি যদি.....’

পাটোয়ানের দিকে একবার সাবধানী দৃষ্টিতে চেয়ে সানিন বললো, ‘এমিল ভেঙ্গে পড়ে না। বাড়ী যাও, এমিল আমার কথা শোনো। তুমি তো বলে তুমি আমাকে ভালোবাসো, অন্তত সে খাতিরে বাড়ী যাও।’

সানিন তার হাত বাড়িয়ে দিলো। এমিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে সানিনের আঙ্গুলগুলো টোটে ঠেকালো, তারপর ঘুরে ক্রাককোর্টের উদ্দেশে মাঠে ওপর দিয়ে ছুটে চললো।

পাটালেওন আপন মনে বললো আর একটি মহৎ প্রাণ স্তব্ব কিন্তু সানিন তার দিকে অন্ধ মনে চাইতেই গুটিগুটি মেরে সিটের এক কোথার বসে পড়লো। সে জানতো সে অপরাধ করেছে। প্রতি মুহুর্তে তার বিশ্বাসের ভাব পাঠ অভিনয় করছে, সে এই কি গাড়ী ভেঙেছে, সব কিছু ঠিক করেছে, তার হুঁটার সমর বাড়ী ছেড়েছে? কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে এবার তার কপ পা ছুটোতে বড় বাধা করছে।

সানিন বুঝলো তাকে খুসী করা ব্যবহার, কি বললে তার উদ্দীপনা কিরে আসবে জানতো। বললো ‘সম্মানিত সিনর সিগ্নাটোলা কোথায় তোমার সেই নির্ভীকতা, কোথায় সেই তেজ আর বীরত্ব?’

সিনর সিগ্নাটোলা তুফ কুঁচকে নড়ে চড়ে বসলো, গভীর স্বরে বললো ‘সেই তেজ আর বীরত্ব? সব শেষ হয়ে যায়নি, এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে।’

শ্রুত করলো এবারে তার শিকা, তার গীতি নাট্যতে গান গাওয়া, মহাপুরুষ গান্দিয়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চড়াগলার গায়ক—এবার এখন তারা হানাউতে পৌঁছালো সে অভ্যাস হয়ে গেছে। তুমি যদি ভেবে দেখো, দেখবে পৃথিবীতে কথার মত শক্তিমান ও কথার মত শক্তিহীন আর কিছু নেই।

বে ছোট বনে বৃদ্ধ হওয়ার কথা ছিলো হানাউ থেকে দুই কালং ঘুরে ছিলো সে বন। পাটালেওনের ভবিষ্যতী সকল কল

তারাই প্রথম এসে পৌঁছালো সেখানে। পাড়োয়ানকে বনে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে তারা একটা ঘন ধোপের ছায়ায় গিয়ে বসলো তাদের প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো।

অপেক্ষা করতে সানিনের কিছু ধারণা লাগছিলো না। সন্ধ্যা পায়ের চলা রাস্তাটা ধরে সে হাঁটছিলো, পাখীর গান শুনছিলো কড়ি এর পেছন ঘুরছিলো, অধিকাংশ রাশিয়ান এরকম অবস্থায় পড়লে বা করে তাই করছিলো সে, অর্থাৎ চেষ্টা করছিলো কোনো চিন্তা না করার। একবার মাত্র চিন্তা তার মনে উদয় হলো যখন সে দেখলো একটা ছোট লাইনগাহ খুব সম্ভবতঃ কালকের ঝড়ে ভেঙে পড়ে গেছে। গাছটি মরে বাঁধছিলো, তার পাতাগুলো শুকিয়ে গিয়েছিলো। তার মনে হলো একি একটা ধারণা লক্ষণ? কিন্তু পরব্রহ্মেরই শিস দিয়ে ভাঙ্গা ভালগুলো ডিজিরে পথ ধরে হাঁটতে লাগলো। বরঞ্চ পাটালেওনই বিরক্তি প্রকাশ করছিলো, তার পিঠ ও হাঁটু ঘেবে, কেশে, জাখানদের অভিশাপ দিচ্ছিলো। উত্তেজনার তার হাই উঠছিলো, তার ছোট শুকনো মুখ ভারী মজার দেখাচ্ছিলো দেখে সানিন হাসি সামলাতে পারছিলো না।

অবশেষে নরম রাস্তায় চাকার শব্দ তাদের কানে এলো। পাটালেওন উঠে বাঁড়িয়ে বললো ‘ওরা আসছে।’ অবশ্য একটু ভীত হয়েছিলো সে কিন্তু ব-ব-ব করে আওয়াজ করে সে তার শব্দার ভাবটা বেড়ে ফেললো। বললো আজ বড় ঠাণ্ডা পড়েছে। ঘাসেও পাতার ঘন হয়ে শিশির পড়েছিলো কিন্তু জঙ্গলে বড় গুমোট গরম ছিলো।

গাছের ছায়ায় শীগগিরই দুজন অকিসারকে দেখা গেলো তাদের সঙ্গে বেঁটে, মোটা গোবেচারা ও বিয়ুনো চেহারার সেনা দলের ডাক্তারকে দেখা গেলো। তার হাতে একটা মৃৎপাত্রতে ছিলো জল—যদি দরকার হয়, বা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে ছিলো ডাক্তারির ছুরি কাঁচি ও ব্যাগেজ। দেখেই বোঝা বাঁধছিলো এরকম পরিষ্কৃতিতে আসাতে সে অভ্যস্ত ছিলো, এ ছিলো তার আয়ের একটি পথ—প্রত্যেক লড়াইতে সে আট চেবতনৎসি পেতো, প্রত্যেক পক্ষ থেকে চার মুত্রা। হের কন রিটার পিস্তল নিয়ে আসছিলো। হের কন ডনহোক এলো ছড়ি যোরাতে যোরাতে—সে ভাবছিলো এটা থাকতে তার সস্তম বাড়ছে।

সানিন কিসকিস করে বললো ‘পাটালেওন, যদি—আমি যদি—মারা বাই—তুমি জানো সব কিছু ঘটতে পারে—তাহলে আমার পানের পকেটে একটা কাগজে একটা ফুল জড়ানো আছে সেটা সিনোরিনা জেন্সাকে দেবে। শুনতে পাচ্ছে? দেবে তো?’

বৃদ্ধ বিবাদমাথা চোখে তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো। ভগবান জানেন সানিন বা তাকে করতে বললো সে তা বুঝলো কিনা।

প্রতিবন্দী ও সহযোগীরা কেতাহুরন্ত ভাবে পরস্পর পরস্পরবে অভিমান করলো। একটি মাত্র লোক অবিচলিত ছিলো, সে হের ডাক্তারটি। সে ঘাসের ওপর বসে হাই তুলছিলো। হের বলবে চাইছিলো ‘আমি তো আর এখানে বীরত্ব ও আদবকারনা দেখাতে আসিনি।’ হের কন রিটার হের ‘শিবাডোলা’কে জায়গা ঠিক করল বললো। হের ‘শিবাডোলা’ আবেগজড়িত কাঠে উত্তর দিলো—‘বা খুসী তাই করুন আপনারা, আমি কেবল দেখে যাবো।’ তাই ‘তেজহের বেওয়ারস’ আবার ভেঙ্গে গিয়েছিলো।

হের ফন রিষ্টার একাই কাজ শুরু করলো। বনের মধ্যে চারদিকে ফুলগাছে ঘেরা একটা খোলা জায়গা বেঁধে বসলো। জায়গা মেপে, একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে চিহ্ন করে দিলো, মাটিতে বসে পিঙ্গল বেঁধে করে গুলী ভরতে লাগলো। ভীষণ ধামছিলো সে, সাদা কামাল দিয়ে ঘনঘন মুখ মুছছিলো। পাটালেওন তার পেছন পেছন ঘুরছিলো—মনে হচ্ছিলো তার ঘেন জ্বর এসে গেছে। দুই প্রতিবন্দী এই সময় দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলো দেখে মনে হচ্ছিল ঘেন শিকক-এর কাছে শাস্তি পেয়ে ছাত্র ছ'জন বিরস বদন করে আছে।

তারপর এলো সেই মুহূর্তটি বধন.....

দু'জনে তাদের পিঙ্গল নিলো হাতে।

এবারে হের ফন রিষ্টার পাটালেওনকে বললো এক, দুই, তিন বলার আগে দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়মানুসারে এখন তার দুই প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করা ও উপদেশ দেওয়া দরকার। এ শুধু নিয়ম বন্ধার্বে তবে হের 'শিবাডোলা' খানিকটা দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবেন। প্রকৃত পক্ষে একজন নিরপেক্ষ দর্শকেরই কাজ এটা, কিন্তু বেহেতু এখানে আর কেউ নেই সেজন্য হের ফন রিষ্টার যেচ্ছায় তার নিজের অধিকার ত্যাগ করে পাটালেওনকে ভার দিচ্ছে। ইতিমধ্যে সেই অপরাধী অফিসারটির মুখদর্শন করবে না বলে পাটালেওন একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে। হের ফন রিষ্টারের অনুমোদনে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বুক চাপড়ে ইটালীয়ান ও ক্যান্সার মিশ্রণে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—'কি হিংস্রতা! দুটি তরুণ প্রাণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রাণ দেবে? কেন? কিসের জন্ত? কি সাংঘাতিক! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।'

সানিন তাড়াতাড়ি যোগ দিলো 'আমি আপোব চাইনে।' তার প্রতিবন্দীও বললো 'আমিও নয়।'

এবারে ফন রিষ্টার বিস্ময় বিমূঢ় পাটালেওনকে বললো, 'এবারে বলুন এক, দুই, তিন।'

বলা মাত্র পাটালেওন জঙ্গলে ঢুকে বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করে চেঁচিয়ে উঠলো 'এক, দুই, তিন।'

সানিনের গুলী লক্ষ্যচ্যুত হয়ে একটা গাছের ডালে ভীষণ দাঁড়ায় করে লাগলো। ব্যারণ ফন ডনহোক সঙ্গে সঙ্গে এক পাশ দক্ষ করে হাওয়ার উদ্দেশে গুলী ছুঁড়লো।

তারপর খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ। শুধু পাটালেওনের কাতরোক্তি শোনা গেলো।

ডনহোক জিজ্ঞেস করলো, 'আবার হবে?'

সানিন বললো 'আপনি কেন শূঁতে গুলী ছুঁড়লেন?'

'তাতে আপনার কিছু এসে যায় না।'

সানিন বললো 'এবারেও কি শূঁতে গুলী ছুঁড়বেন?'

'হয়ত, জানিনে'—

ফন রিষ্টার আরম্ভ করলো 'দেখুন প্রতিবন্দীদের পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা স্বীতিবিরুদ্ধ।'

সানিন পিঙ্গল মাটিতে ছুঁড়ে বললো 'আমি আর গুলী ছুঁড়বো না।'

ফন ডনহোকও পিঙ্গল কেসে দিয়ে বললো 'আমি আর লড়তে চাইনে। তাছাড়া এখন স্বীকার করছি সেদিন আমি জতার কবেছিলাম।'

একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে সে হাত বাড়িয়ে দিলো। সানিন দৌড়ে এসে বাঁকুনি দিলো। পরস্পরের দিকে চেয়ে ছ'জনই সলজ্জ হেসে উঠলো।

পাটালেওন হাততালি দিয়ে গলাফোলা পারবার মত জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো 'সাবাস, সাবাস।' একটা মাটিতে কেলো গাছের ডালে ডাক্তার বসেছিলো, উঠে পাত্রেব জল ঢেলে দিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গেলো।

ফন রিষ্টার ঘোষণা করলো 'সম্মান বন্ধার্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে।' অতীত দিনের কথা স্মরণ করে পাটালেওন চেঁচিয়ে উঠলো 'সাবাস।'

অফিসারদের অভিবাদন পূর্ব শেষ হলে বধন ওরা গাড়ীতে গিয়ে বসলো, সানিনের মনে হলো ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেলো সে, সেই সঙ্গে লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলো। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ এ যে নেহাত লোকহাসানো ছেলে খেলা, গতানুগতিক স্বীতিঅনুসারে ছপকের হাত্তকর পরিস্থিতিতে হাত্তকর আচরণ। সেই গোবেচারা চেহারার ডাক্তারটি তো নাক শিঁটকে হেসেই ফেলেছিলো বধন দেখলো ব্যারণ ফন ডনহোকের সঙ্গে সে প্রায় গলাজড়াছড়ি করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর বধন তার পাওনা চার চেয়ভনংসি পাটালেওন তাকে মিটিয়ে দিচ্ছিলো... সবকিছুই বড় অপ্রীতিকর?

সানিন সত্যিসত্যিই খানিকটা লজ্জিত ও অপরাধী বোধ করছিলো। কিন্তু এ ছাড়া আর কিই বা করা যেতো? সে কিছুতেই এই তরুণ অফিসারটিকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিতে পারতো না হের স্মরণবাহের অনুকরণে। সবই সত্য, তবু তার মন যানি ও অনুতাপে ভরে গেলো।

পাটালেওন বিজয়গর্বে মেতেছিলো, বিজয়ী সেনাপতি বন্ধার্বে থেকে কেয়ার সময় এর চেয়ে বেশী আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করতেন না। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে সানিনের ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করেছিলো। ডন জুয়ানের কমাণ্ডারের পাথরের বা ব্রোঞ্জের মস্তির মত বীরোচিত সম্মানলাভের যোগ্য সানিন—সে স্বীকার করলো—নিজে অবশ্য ভয়ে বা উত্তেজনায় কাঁপছিলো।

'কিন্তু আমি হচ্ছি শিরী, আমার স্নায়ু দুর্বল। আর আপনি হচ্ছেন ডুবুর আর গ্রানাইট পর্বতের পূত্র।'

কি করে যে এই উদ্দীপিত শিরীটিকে শাস্ত করবে সানিন ভেবে পাচ্ছিলো না। ছয়টা পূর্বে তারা বেখানে এমিলকে দেখতে পেয়েছিলো, প্রায় সেখান থেকেই আনন্দে চিংকার করে একটা গাছের পেছন থেকে এমিল বেরিয়ে এলো। টুপি নাড়িয়ে, লাফিয়ে চলল পাড়ীতে উঠে সানিনের উপর বাঁপিয়ে পড়লো।

'আপনি অকৃত দেহে বেঁচে আছেন। আমাকে কমা করতে হবে, আমি আপনার কথা শুনে ক্রাককোর্টে-কিরেঁবাইনি। বেতে পারি নি। এখানেই লপেকা করছিলাম। সব কিছু খুলে বলুন। তাকে কি-কত্যা করেছেন?'

অতি কষ্টে সানিন এমিলকে ছপ করিয়ে পাশে বসালো। পাটালেওন সানন্দে সবিস্তারে ও সাড়বরে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিটি খবর দিলো, জোর মূর্তি কমাণ্ডারের কথাটিও বাদ গেল না। হ'পা কাঁক

করে দাঁড়িয়ে কমান্ডার সানিনের পাঠ অভিনয় করলো। এমিল মন্ত্রস্থের মত শুভছিলো, মাঝে মাঝে আনন্দে চিৎকার করে উঠছিলো, মাঝে মাঝে নির্ভীক বঙ্গটিকে চুম্ব খাচ্ছিলো।

পাড়ী দেখতে দেখতে ফ্রাঙ্কফোর্টে এসে সানিনের হোটেলের সামনে দাঁড়ালো।

যখন সে তার ছদ্মন সঙ্গীর সঙ্গে ভেতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলো, একটি ভঙ্গমহিলা—ওড়না দিয়ে—তার মূখ ঢাকা ছিলো—অন্ধকার বারান্দা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। সানিনের সামনে ধমকে দাঁড়িয়ে একপাশে সরে সিঁড়ি দিয়ে একেবারে রাস্তায় ফ্রুৎপায়েরে নেমে গেলেন। ওয়েটার ওর কাণ্ড দেখে অবাক, আশ্চর্য হয়ে বললো, 'এই মহিলা বিদেশী ভঙ্গলোকটির সঙ্গে দেখা করবেন বলে একঘণ্টার উপর বসেছিলেন।' চকিতের জন্ত ওকে দেখলেও তখনই চিনতে পেরেছিলো সানিন জেন্মাকে। তার রেশমের বাদামী ওড়নার ভেতরে সানিন তার চোখ দুটো দেখতে পেয়েছিলো।

বিরক্তির স্বরে জাৰ্মানে বললো, 'ভাঙ্কলে ফ্রয়লাইন জেন্মা সবই শুনেছেন?' এমিল ও পাটালেওন তার পেছনে ছিলো। আরক্ত মূখে ও অপ্রতিভ হয়ে এমিল খেমে খেমে বললো 'কি করব, আমাকে সবই বলতে হলো। সে বুঝতে পেরেছিলো—কিছুই লুকোতে পারি নি—বাই হোক, তাতে—এখন আর কি আসে যায়।' এবারে উৎসাহের সঙ্গে বললো 'চমৎকার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, আর সে আপনাকে অকৃত ও নুহ দেখে গেছে।'

অনন্তই হয়ে সানিন মূখ ফিরিয়ে নিলো, বললো 'কি বাচাল তোমরা দুজন!' নিজের স্বরে চুকে একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

এমিল আঙ্গারের সুরে বললো, 'আমার উপর রাগ করবেন না।' সানিন কিন্তু সত্যি ওর উপর রাগ করেনি। সে কি সত্যিই অস্তর থেকে চাইছিলো জেন্মা এ সব ব্যাপার সবকিছুই জানবে না? 'আচ্ছা রাগ আমি করছি না। কিন্তু বখেট সন্দর্ভনা দেখানো হয়েছে আমাকে আর নয়। তোমরা গেলে এবারে একটু যুমেতে পারি। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে।'

পাটালেওন বললো, 'হ্যাঁ, সত্যিই বিশ্রামের প্রয়োজন আপনার। মহাপ্রাণ সিনোর, বখেট পরিশ্রম হয়েছে আপনার, চলে এসো এমিল, পা টিপে-টিপে—আন্তে।'

সঙ্গী হু'জনের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্তই সানিন যুমেয় কথা পেড়েছিলো। কিন্তু এবারে একা হতেই সমস্ত অজ-প্রত্যঙ্গে ভীষণ বাধা হয়েছে বুঝতে পারলো। কাল রাতে একটুও ঘুম হয়নি তার—বিছানায় শুতেই গভীর ঘুম অচেতন হয়ে গেলা সে।

২৩

কয়েক ঘণ্টা সে অকাতরে ঘুমালো। স্বপ্ন দেখছিলো আরেকটি স্বপ্ন যুদ্ধে নেমেছে সে এবারে প্রতিপক্ষ হের রু যবার। পাশে দেবদাক পাছের ডালে একটা টিরেপাখী বসে ঠেটিয়ে বাচ্ছিলো এক, দুই, তিন...তিন...তিন-তিন। এই টিরেপাখীটি ছিলো পাটালেওন।

তারপর তিন-তিন আওয়াজটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে আর স্বপ্ন বলে ভুল করা যায় না। চোখ খুলে, বালিশ থেকে মাথা তুলে তুললো কে মরজার টোকা মারছে।

'ভেতরে এসো!'

ওয়েটার ভেতরে এসে বললো একজন ভঙ্গমহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

জেন্মা হরত—তার মনে উদয় হলো, কিন্তু দেখা গেলো, মহিলাটি জেন্মার মা—ফ্রাউ লেনোর।

ভঙ্গমহিলা ভেতরে চুকে একখানা চেয়ারে বসে ফায়ার ভেঙ্গে পড়লেন।

তার পাশে বসে সানিন তার হাত ধরে বললো, 'কি হয়েছে, মেডেম রসেলী, কি ব্যাপার? শান্ত হোন আপনি!'

'হের দিমিত্রি, ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি আমি?'

'কিসের কষ্ট, কি হয়েছে?'

'বিনা মেখে বজ্রাঘাতের মত। কি করে জানবো বলুন? জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিলো তাঁর।

'কিন্তু হয়েছে কি? বলুন আমাকে। এক গ্রাস জল খাবেন?'

ফ্রমাল বের করে এবারে ফ্রাউ লেনোর চোখ মুছলেন। আরো জোরে কাঁদতে শুরু করলেন।

'আপনাকে ধন্যবাদ, জল চাইনে। আমি জানতে পেরেছি সব।'

'সব? কি সব জানতে পেরেছেন?'

'আজ যা ঘটেছে। তার কারণ সব কিছুই জেনেছি। আপনি অতি উদার চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু কি কাণ্ড ভেবে দেখুন। এবারে বুঝতে পারছি সোডেনে যেতে কেন আপত্তি করেছিলেন অবস্ত বেড়াতে বাওয়ার দিন এ সবকিছু কিছুই বলেননি তিনি বিধ এখন মনে হচ্ছে তিনি সব কিছু পূর্বাঙ্কই জানতেন। আমি আপনার কাছে এসেছি, জানি আপনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যদিও আপনাকে মাত্র পাঁচ দিন জেনেছি। কিন্তু দেখুন আমি বিধবা। নিঃসহায় আমার মেয়ে'...

চোখের জলে ফ্রাউ লেনোরের কথা আটকে বাচ্ছিলো। সানিন বুঝতেই পারছিলো না কি হয়েছে। সে শুধু বললো 'আপনার মেয়ে?' ফ্রাউ লেনোরের অশ্রুসিক্ত ফ্রমালের পেছন থেকে আর্ন্তনাদের মত শোনা গেলো, 'আমার মেয়ে জেন্মা...আমাকে বলেছে সে হের রু যবারকে বিয়ে করবে না। আর এ সংবাদটা হের রু যবারের কাছে আমাকেই দিতে হবে।'

সানিন চমকে উঠলো এতটা সে আশা করেনি।

ফ্রাউ লেনোর বলে চললেন, 'কেলেঙ্কারির কথা ছেড়ে দিন, যদিও কে কবে শুনেছে একটি তরুণী তার প্রেমিককে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু হের দিমিত্রি, জানেন এতে আমাদের সর্বনাশ হবে।' ফ্রাউ লেনোর তার ফ্রমালটি মোচড়াতে লাগলেন যেন তার সমস্ত দুঃখ এই ফ্রমালের পাটে পাটে পূর্ণ করে দিতে পারলে খুসী হতেন। 'হের দিমিত্রি, আমাদের দোকানের আর থেকে আমাদের আর চলে না। হের রু যবার সঙ্গতিপন্ন, যতদিন বাবে আরো সঙ্গতি বাড়বে তার। কেন তাকে বিবুধ করবে? সে তার ভারী পঙ্গীর হয়ে লড়েনি, কেবলমাত্র সেজন্ত! স্বীকার করছি, এটা তার খুব উচিত কাজ হয়নি। কিন্তু সে একজন মাগরিক মাত্র, তার বিশ্ববিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা নেই, কিন্তু একজন অচেতা। সামান্য অকিসারের অবিস্বস্তকারিতার বিরুদ্ধে লড়তে বাওয়া কি তার মত স্বর্বাদানীল ব্যবসায়ীর শোভা পায়? আর এ কি অস্বাভাবিক অপরাধ?'

‘মাণ করবেন, ফ্রাউ লেনোর—মনে হচ্ছে আপনি আমাকে এতদূর দায়ী করছেন’—

‘আপনাকে কিছুই জিজ্ঞাস্য দায়ী করছি না। আপনার কথা শুনেই না। সব রাশিয়ানদের মতই আপনি সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত—

‘মাণ করবেন—আমি তা নই—’

‘আপনি বিদেশী, দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন মাত্র, আপনার কাছে কতজ্ঞ আমি’—ফ্রাউ লেনোর সানিনের কথা যেন শুনেই পেলেন না। অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে হাঁপাতে লাগলেন, ক্রমশ ভাঁজ করে নাক ঝাড়লেন। তাঁর দুঃখ প্রকাশের ধরণ দেখে যে কেউ বুঝতে পারতো উদ্ভয় ইউরোপের আকাশতলে তাঁর জন্ম হয়নি।

‘আর যদি ক্রেতারদের সঙ্গে স্বল্পযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় তবে কি করে তার ব্যবসা চলবে? কে কোথায় এমন কথা শুনেছে? আমি তাকে কি করে বলবো জেম্মার সঙ্গে তার বিয়ে হবে না? কি ধৈর্যে বাঁচব আমরা? আগে বাদাম দিয়ে অ্যাঞ্জেল কেক ও নোগাত আমরাই শুধু বানাতাম, তার জন্য খুব বিক্রী হতো আমাদের দোকানে। এখন সবাই অ্যাঞ্জেল কেক বানায়। এ ছাড়াও ভেবে দেখুন আপনার স্বল্পযুদ্ধের কথা সারা সহরে সবাই বলাবলি করবে, চাপা দেওয়া যাবে না। আর হঠাৎ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে। এ যে কেলেকারির একশেষ। জেম্মা খুব ভাল মেয়ে, আমাকে খুব ভালোবাসে—কিন্তু সে জেদী ও সাধারণতন্ত্রী জনমতকে ভয় করে না। একমাত্র আপনিই এর মীমাংসা করতে পারেন।’

আরো বেশী আশ্চর্য্য হয়ে সানিন বলল, ‘আমি? ফ্রাউ লেনোর?’

‘হ্যাঁ, আপনি, একমাত্র আপনিই। সেজ্ঞাই আপনার কাছে এসেছি। এর চেয়ে ভাল সমাধান আর আমি ভেবে পেলাম না। আপনি বিবেচক ও মহৎ। ওর জ্ঞেই লড়েছেন আপনি। আপনাকে সে বিশ্বাস করে। আপনার ওপর আস্থা রাখতে বাধ্য সে—তার জন্য আপনার জীবন বিপন্ন করেছিলেন। আপনিই একমাত্র তাকে বোঝাতে পারবেন—আমার বতদূর সাধ্য আমি করেছি—সে নিজের ও আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন—আমি হাঁটু গেড়ে আপনাকে মিনতি করছি’—এই বলে ফ্রাউ লেনোর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন—মনে হলো এখনই সানিনের পায়ে লুটিয়ে পড়বেন। সানিন বাধা দিলো তাঁকে—‘ফ্রাউ লেনোর, ভগবানের দোহাই! কি করছেন আপনি?’

ব্যাকুল হয়ে তিনি তার হাত দু’টি ধরে বললেন—‘প্রতিজ্ঞা করুন—’

‘ভেবে দেখুন, ফ্রাউ লেনোর, আমি কি করে...?’

‘প্রতিজ্ঞা করুন। আপনি কি চান এই মুহূর্তে আমি আপনার পদতলে প্রাণত্যাগ করব?’

কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না সানিন। ইটালীয়ান প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যেক পরিচয় এর আগে তার হয়নি। বললো—‘আপনি যা বলবেন তাই করব আমি। ফ্রয়লাইন জেম্মাকে বলবো আমি—’

ফ্রাউ লেনোর আনন্দধ্বনি করলেন।

‘কিন্তু সত্যি বলছি আমি জানিনা—তাকে কোন কল হবে কি না।’

ফ্রাউ লেনোর উৎকর্ষিত হয়ে বললেন, ‘আমাকে নিরাশ করবেন না। একবার কথা দিয়েছেন। খুব কাজ হবে তাতে, আমি জানি। আমার বতদূর সাধ্য আমি করেছি, সে অন্ততঃ আমার কথা আর শুনবে না।’

একটু পরে সানিন জিজ্ঞেস করলো, ‘সে হের রুববারকে বিয়ে করবে না—এ কথা নিশ্চয় করে বলেছে আপনাকে?’

‘সে একেবারে অস্বীকার করেছে। সে ঠিক তার বাবা জিয়োটান বাটিটার মত রগচটা।’

সানিন আন্তে আন্তে বলল, ‘রগচটা! জেম্মা?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু তাহলেও খুব ভালো সে। আপনার কথা শুনবে। আসবেন আপনি এখনই? হে আমার প্রিয় রাশিয়ান বন্ধু!’

উত্তেজিত হয়ে ফ্রাউ লেনোর চেয়ার ছেড়ে উঠে সানিনের গলা জড়িয়ে ধরলেন—‘একটি বিপন্ন জননী আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। এক গ্রাস জল দিন আমার।’

সানিন একগ্রাস জল এনে দিলো, কথা দিলো এখনই আসবে বলে, ফ্রাউ লেনোরকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। ঘরে কিয়ে এসে বিষয় বিহ্বল নেত্র চেষ্টে রইল সামনের দিকে।

নিজের মনেই বলল—সব কিছু যেন প্রতিশোধ নিতে চলেছে—মাথা ঘুরে যাচ্ছে। সে তার অন্তরের দিকে পর্বস্ত নজর দিল না, জানতে চাইল না কি হচ্ছে সেখানে। শুধু বুঝতে পারছিল বিপন্ন ঘটে গেছে। আশ্চর্য্যভাবে বলল—‘কি দিনটিই করেছে আজ—রগচটা? সে? তার নিজের মাই তো বললেন—আর এখন আমাকে গিয়ে উপদেশ দিতে হবে—তাকে—কি চমৎকার উপদেশই দিতে হবে আমাকে—?’

সানিনের মাথা বিষম্বিত করছিল। সব অদ্ভুত্ব, সব চিন্তা, সব বোধশক্তি ছাড়িয়ে জেম্মার ছবি ভেসে উঠলো। সেই যেদিন বিদ্যালয়লোকে সন্ধ্যায়, তারারত্তর আকাশের নীচে অন্ধকার জানলার পেছনে জেম্মা ঝড়িয়েছিল সে ছবি চিরতরে তার মনে গাঁথা হয়ে গেছে।

২৪

অনিশ্চিত পা কলে সানিন মেডেম রসেলীর বাড়ী এলো। তার স্বপ্নের দ্রুত স্পন্দন অদ্ভুত্ব করতে পারছিল সে, এমন কি শুনেতে পাচ্ছিল পর্বস্ত। জেম্মাকে কি বলবে সে? কি করে কথাটা স্মরণ করবে? দোকানের ভেতর দিয়ে বাড়ী চুকলো না সে, চুকলো পেছনের দরজা দিয়ে। বাইরের ছোট ঘরটিতে ফ্রাউ লেনোরের সঙ্গে দেখা হল। তাকে দেখে যুগপৎ আশায় ও আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

চুপি চুপি বললেন তার হাত দু’টি হাতে নিয়ে ‘আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বাগানে বান, সে বাগানে আছে। মনে রাখবেন আপনার ওপর ভরসা করে আছি।’

সানিন বাগানে গেল।

জেম্মা বাগানের পারে-চলা রাস্তার পাশে বেঁকিতে বসে একটা বড় বাড়ি থেকে খুব পাকা চেঁচী বেছে বেছে একটা স্ট্রেটে রাখছিল। দু’র্ব তখন অন্ধ বাজে আর সাতটা বাজে মেডেম রসেলীর ছোট বাগানে ভেঁড়া হয়ে অন্ধ-দুর্ভেদ্য লাল রঙি পড়ে সব লালচে

দেখাচ্ছিল। পাভাগলো থেকে শনশন আওয়াজ আসছিল, মৌমাছির শব্দ বারের মত ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছিল পাখার আওয়াজ তুলে, একটা বৃষ্টি অবিশ্রান্ত একঘেয়ে ডেকে চলেছিল।

সোডেনে বাওয়ার দিনের মত জেন্মা সেই বড় টুপিটি পরেছিল। টুপিটির নিচে থেকে এক বলক সানিনকে দেখে নিয়ে সে আবার বড়ির উপর ঝুঁকে পড়ল।

সানিন আঙুলে আঙুলে জেন্মার দিকে, এগিয়ে যাচ্ছিল। অজানতেই তার পদক্ষেপ ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছিলো। তারপর ...কি বলবে সে—কোনরকমে এই কথাটা ভিজ্জেন করতে পারল—

‘কেন সে চেম্বী বাচছে?’
উত্তর দিতে জেন্মার একটু দেয়ী হল। অবশেষে ধীরে ধীরে বলল, ‘ওইগুলো—বেগুলো সবচেয়ে পাকা—ওগুলো দিয়ে জ্যাম তৈরী হবে—এইগুলো দিয়ে হবে টার্ট। জানেন তো আমরা তিনি দেওয়া গোল টার্ট বিক্রী করি।’

এই বলে জেন্মার মাথা আরো নীচু হয়ে গেল। তার ডান হাতে ছ’আঙুলে এক জোড়া চেম্বী ধরেছিল, ধবাই হয়ে গেল।

‘আপনার পাশে বসতে পারি?’

একটু সরে বসে জেন্মা বলল—‘বসুন।’

সানিন বসে পড়ে ভাবতে লাগল কি করে কথাটা আরম্ভ করি? কিন্তু জেন্মাই তাকে সাহায্য করল।

তার আরম্ভিক অল্পময় মুখখানা ফিরিয়ে ঔৎসুক্যের সঙ্গে বলল, ‘আজ আপনি বন্দুকে নেমেছিলেন। কি শাস্ত ও ধীর আপনি। মনে হয় বিপদ কাকে বলে আপনি জানেন না।’ কৃতজ্ঞতার তার হুচোখ জলে ভরে এল।

‘ছেড়ে দিন ওসব কথা। বিপজ্জনক কিছুই ছিল না। অত্যন্ত নির্দোষ ভাবেই সব মিটে গেছে।’

জেন্মা ইটালীয়ান ভঙ্গীতে একটা আঙুল ডান দিক থেকে বাঁদিকে নাড়াল। ‘না, না, এরকম বলবেন না। আমাকে ঠকাতে পারবেন না। পাষ্টালেওন আমাকে সব বলেছে।’

‘আর আপনি তাকে বিশ্বাস করেছেন। কমাণ্ডারের মূর্তির সঙ্গে আমার তুলনা করে নি সে?’

‘তার হাঙ্গর উপমা ও বাক্যবিভাসের কথা ছেড়েই দিন। কিন্তু সে নিজের বা অহুত্ব করেছে বা আপনি বা আজ করেছেন তার মধ্যে হাসির কিছু নেই। আর শুধু আমার জন্ত—কেবল মাত্র আমারই জন্ত, আমি জীবনে কখনো তুলব না।’

‘ক্রয়লাইন জেন্মা—আমি নিশ্চয় করে বলছি’—আরো জোরের সঙ্গে বলল সে, ‘কখনও তুলতে পারব না।’ স্থির দৃষ্টিতে আবার সানিনের দিকে চেয়ে বুয়ে বসল।

এখন সানিন তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের গড়ন দেখতে পাচ্ছিল। তার মনে হল এরকমটি আর কখনো দেখেনি। সেই মুহূর্তে তার মনে যে ভাবের উদয় হল, সে কখনো এর আগে তা অহুত্ব করেনি। তার সারা অস্তর প্রসীপ হয়ে উঠল।

‘আর আমার প্রতিজ্ঞা’ বিছাৎ-বলকের মত তার মনে এল। দ্বৈতিকরণ ইচ্ছাকৃত করে সে শুরু করল আবার—‘ক্রয়লাইন জেন্মা।’

‘বসুন’

তার দিকে না চেয়ে সে পাকা চেম্বীগুলো বেছে বেছে লাগল, সাবধানে বোঁটা ধরে পাভাগলো থেকে চেম্বী ছিঁড়তে লাগল। কিন্তু কি স্থির কি স্নেহসিক্ত হবে বলল ‘বসুন।’

‘আপনার মা আপনাকে কিছু বলেছেন’...

‘কি সখকে?’

‘আমার সখকে?’

বাছা চেম্বীগুলো হঠাৎ জেন্মা বড়িতে ঢেলে দিল।

‘আপনার সঙ্গে মা কথা বলছিলেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কি বলেছেন তিনি?’

‘বলেছেন...আপনি হঠাৎ আপনার পূর্বের অভিপ্রায়...আপনার মত...পরিবর্তন করেছেন।’

জেন্মা আবার মাথা নত করল। টুপির তলার তার মুখ হারিয়ে গেল। এখন শুধু তার নমনীয় কোমল শ্রীবা দেখা যাচ্ছিল একটা বড় ফুলের বোঁটার মত।

‘কি অভিপ্রায়?’

‘আপনার—ভবিষ্যত জীবন—সখকে—’

‘অর্থাৎ—আপনি কি হের রুয়বানের কথা বলেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘মা বলেছেন আপনাকে যে আমি হের রুয়বানের স্ত্রী হতে চাই না?’

‘হ্যাঁ।’

জেন্মা বেঞ্চিত হয়ে বসল। ঝড়টা কাত হয়ে পড়ে গেল। কয়েকটা চেম্বী বাস্তার গড়িয়ে পড়ল। এক মিনিট কেটে গেল—আর এক মিনিট।

এবারে জেন্মার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘মা কেন আপনাকে এ সব বলেছেন?’

সানিন জেন্মার শ্রীবা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অস্বাভাবিক জোরে তার বক্ষ আকোশিত হচ্ছিল।

‘কেন বলেছেন? আপনার মা মনে করেন বেছেছ অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের ধ্বংস নিশ্চিত হয়েছে, আমার উপরে আস্থা জন্মেছে আপনার—আপনাকে আমি উপদেশ দিলে স্তনবেন আপনি।’

জেন্মা হাত দুটো আঙুলে আঙুলে কোলের উপর রাখল। তার জামার ভাঁজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। দ্বৈতিক পর বলল—‘ম’পিয়ে দিমিঞ্জি আপনি আমাকে কি উপদেশ দেবেন?’

সানিন দেখতে গেল কোলের উপরে রাখা জেন্মার হাত দুটো কাঁপছে, বুঝতে পারল তাই লুকোবার জন্ত সে জামার ভাঁজ ঠিক করতে ব্যস্ত। সে আঙুলে আঙুলে জেন্মার সেই কল্পহান, ক্যাঁকালে হাত দুটোর উপর নিজের হাত রাখল। বলল—‘জেন্মা—আমার দিকে চেয়ে দেখবেন না?’

জেন্মা মাথা ঝাঁকিয়ে টুপিটা পিছনে করে দিল। আগের মতই কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসভরা হুচোখ দিয়ে তাকে চেয়ে দেখল। সানিন কি বলে শোনার জন্ত জেন্মা অপেক্ষা করেছিল কিন্তু তার দৃষ্টিতে সানিনের সব তুল হয়ে গেল। অস্তহান পূর্বের শেষ রশ্মি এসে

পড়েছিল তার কচি মুখটিতে, সূর্য-কিরণের চেয়েও উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত দেখাচ্ছিল তার মুখের ভাব।

একটুখানি হেসে, একটুখানি ভুরু তুলে সে বলল—‘মিশিয়ে দিমিড্রি, আমি আপনার উপদেশ শুনব। কি উপদেশ দিচ্ছেন আপনি?’

সানিন বলল—‘উপদেশ? দেখুন আপনার মা মনে করেন সেদিন হের ক্লুয়বার বিশেষ সাহসের পরিচয় দেন নি বলেই তাকে প্রত্যাখ্যান করা’...

জেন্মা আঙে বলল, ‘কেবল সেজন্য?’ নিচু হয়ে বড়িটা তুলে বেঞ্চে নিজের পাশে রাখল।

—‘তাতে দেখুন—অত্যন্ত অববেচনার কাজ হবে আপনার তাকে প্রত্যাখ্যান করা। তার আগে পরিণাম ভেবে দেখতে হবে, আপনার পরিবারের প্রতিটি প্রাণীর স্বার্থ এতে জড়িত।’

‘এ সব তো মায়ের কথা। এ সবই তার মত। কিন্তু আপনার মত কি?’

‘আমার মত?’ সানিন চূপ হয়ে গেল। তার কণ্ঠ বোধ হয়ে গেল, নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল তার। ‘আমিও মনে করি’...কোন রকমে এইটুকু বলল।

জেন্মা কাঁড়িয়ে উঠে বলল—‘আপনি? আপনিও?’

‘হ্যাঁ, অর্থাৎ আমি মনে করি’...আর কথা খুঁজে পেল না সানিন।

‘ভালো, যদি আপনি বন্ধুরূপে আমার মত পরিবর্তন করতে উপদেশ দেন—অর্থাৎ পূর্বের মত পরিবর্তন না করতে বলেন তাহলে আমি ভেবে দেখব।’ বাছা চেবীগুলো অল্প সব চেবীর সঙ্গে মিশিয়ে দিল সে, কি যে করছিল নিজেই বুঝতে পারছিল না। ‘মা আশা করেন আপনি বা বলবেন আমি তাই শুনব। ভাল, হয়ত সত্যিই...’

‘কিন্তু ফ্রয়লাইন জেন্মা, আপনার প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো শুনতে পেলেন খুশী হতাম...’

‘আপনি বা বলবেন আমি তাই করব।’

ভুরু কুঁচকে সে নীচের ঠোঁটটি কামড়ে ধরল, গালে রক্তিম আভার জায়গায় খেঁচাতা দেখা দিল। ‘আপনি আমার জন্ত বা করেছেন তাতে আপনার কথা শুনতে আমি বাধ্য। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করব আমি। মাকে বলব—আবার ভেবে দেখব। ওই মা আসছেন।’

ফ্রাউ লেনোর বাগানের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। অর্ধঘণ্টা হয়ে উঠেছিলেন তিনি, শান্ত হয়ে বসতে পারছিলেন না। হিসেব করে দেখলেন জেন্মার সঙ্গে সানিনের এতক্ষণে নিশ্চয়ই কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে। যদিও মাত্র পনের মিনিট সানিন বাগানে এসেছিল।

বেন ভীষণ আতঙ্কে সানিন মিনতির সুরে বলল, ‘মা, না ভগবানের দোহাই, তাকে এখনই কিছু বলবেন না। অপেক্ষা করুন, আমি বলব আপনাকে, আমি লিখে জানাব। অত্যাচারে ততক্ষণ কোন কিছু স্থির করবেন না। দয়া করে অপেক্ষা করুন।’

জেন্মার হাতে একটু চাপ দিয়ে, বেঞ্চ বেড়ে ফ্রাউ লেনোরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল—টুপি নেড়ে ও অস্পষ্ট করেকটি কথা বলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিস্মিত ফ্রাউ লেনোর মেয়ের কাছে এলেন।

‘জেন্মা—দয়া করে আমাকে বল।’

জেন্মা উঠে দাঁড়িয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। ‘মা, তুমি একটু অপেক্ষা করতে পারবে? কাল পর্যন্ত পারবে? আর কালকের আগে আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করবে না।’

জেন্মা নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল দেখে তার নিজের চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। ফ্রাউ লেনোর আশ্চর্য হলেন জেন্মার মুখের ভাব দেখে—সেখানে বিবাদের ছায়াও ছিল না—খুসীতে ভরা ছিল তার চাহনি।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—‘কি হলো তোমার? তুমি তো কখনো কাঁদ না আর হঠাৎ—’

‘মা এ কিছুই নয়। অপেক্ষা কর। আমরা দুজনেই অপেক্ষা করব। কালকের আগে কিছু জানতে চেষ্টা না, চল, সূর্য অস্ত বাওয়ার আগে চেবীগুলো বেছে ফেলি।’

‘কিন্তু তুমি সব বিবেচনা করে দেখবে?’

জেন্মা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বলল, ‘হ্যাঁ, আমি বিবেচনা করে দেখব।’ চেবীগুলো একত্র করতে লাগলো সে, তার চোখের জলে জেন্মা মুখের সামনে ধরে দেখতে লাগল। অক্ষর তার গালে আপনিই শুকিয়ে গেল মুহূর্তে তুলে পেল সে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—আশা দাস।

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিস্নেহের দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা বহু এক জরুরি বোধ্য। বহনের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, শ্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চল না। কারণ উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারণ শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বার্ষিকীতে, নয়তো কারণ কোন কৃতকার্যতার, আপনি ‘মাসিক বসুমতী’ উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একবার

‘মাসিক বসুমতী।’ এই উপহারের জন্ত স্মৃতি আবিষ্কারের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে খুশী হবেন, সন্তোষিত বেশ করবে। শুভ এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এক এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে কে-কোন জিজ্ঞাসার জন্ত লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



বিজন ভট্টাচার্য

৪

সত্যতর সঙ্গ বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি সতীর। স্বাভাবিক ভাবে কথাটা হয়তো মনেই পড়তো না তার। কিন্তু যে ঘাটুঘটা প্রায়ই আসে যায় বাড়ীতে, আলোচনার সূত্র ধরে নামটা বার বার তখন উঠে পড়ছে এর-ওর কথায়, তাকে সবাই দেখছে সবাই চিনছে শুধু সতীর সঙ্গেই কার্য কারণ বাই হোক দেখা হচ্ছে না কিছুতেই, ব্যাপারটা কেমন যেন একটু অদ্ভুত লাগে সতীর কাছে। তাই এমনিতে যে ইচ্ছটা হয়তো হতোই না স্বাভাবিক ভাবে, অস্বাভাবিক একটা পরিস্থিতিতে পড়ে সেইটেই এখন জিদ-এর মত হয়ে উঠল মনে মনে। যে কোন প্রকারে একটি বার যেন দেখাটা হওয়াই দরকার সত্যতর সঙ্গ।

সেদিনও বিষতোষের সঙ্গে বেড়িয়ে রাত করে বাড়ী ফিরল সতী। বাড়ী ফিরতে মা বললেন, ভদ্রলোকের ছেলেকে কথা দিস অথচ মনে রাখতে পারিস না। তোর গুলো অপেক্ষা করে করে এই একটু আগে চলে গেল সত্যতর। বেশ হাসিমুখী আয়ুদে ছেলেটি। অল্প বয়সে যে কণ্ঠনেটে কাটিয়েছে হাবভাবে তার কিছু মাত্র বোধবার উপায় নেই। তুই ছিলি না, অথচ আমার সঙ্গে বসে বসে সে কত গল্প। এতটুকু দেখাক নেই, অহংকার নেই। ও কে জানিস? ও হচ্ছে শ্রীরামপুরের হরপ্রসাদ গুপ্তর ভাগ্যে। পাঁচষড়ার জমিদার বংশ ওরা। উনি সব খবর রাখেন। আরও বুঝতে পারবি সত্যতর বোন চিত্রলেখার সঙ্গে শ্রীপতি নন্দীর একমাত্র ছেলে শ্রীপতির বিয়ে হয়েছে। মাঘের কথা অবাক হয়ে শোনে সতী। সবাই চেনাজানা, একান্ত পরিচিত লোক। সতী অবাক হয়ে বলে, শ্রীপতিদার পুত্রবী বোঁ চিত্রলেখা তা হলে সত্যতর বাবুর আপন বোন? রাত করে বাড়ী ফিরে মাঘের কাছে এইসব খবর শুনলো সতী সেদিন। তারপর তার দিনসাতক বাদে, ছোট মামার ছেলের অন্নপ্রাশনে বিজন শ্রীটের বাড়ীতে গিয়ে সখীস্থানীয়া ছোট মামী নন্দিতার কাছে শোনে সতী, চিত্রলেখার নন্দ অল্পপূর্বীর সঙ্গে এই সবেমাত্র চলে গেল সত্যতর নেমস্তন্ন খেয়ে। কথাটা উঠল নেমস্তন্ন বাড়ীতে দেহীতে পাতা পড়বার প্রথ নিয়ে। নন্দিতা বললো, অল্পপূর্বীর বরীন্দ্র-সঙ্গীতের পর ছোট মামার অল্পরোধে সত্যতর প্রথমে সোপ্রাণোতে একটা ইংবিজি গান গেয়ে শোনালো। তারপর অল্পপূর্বী বরাধরি করে বসিয়ে দিল পিয়ানোতে। বললে বিশ্বাস করবি না, আধ ঘণ্টা পরগঞ্জিণ মিনিট পিয়ানো বাজিয়ে গেল

সত্যতর একটানা, একবারটি হাত তুললো না। আর সে কি চমৎকার হাত। এক এক সময় ট্রোকেবর গুণে মনে হচ্ছিল যেন রবিশঙ্করের হাতে সেতার শুনি। গান ভালবাসিস তুই শুনলে তোর খুব ভাল লাগতো।

এই রকম একবার না। পর পর কয়েকবার। সতী চলে গেছে, সত্যতর হয়তো ঠিক তার পরই এসে হাজির হয়েছে। অথবা সত্যতর চলে যেতেই সতী গিয়ে উপস্থিত হয়েছে সেখানে। দেখাটা কখনও হয়ে ওঠে নি কিছুতেই।

সেদিন ছিল বারবারার সঙ্গে শুভময়ের বিয়ের রাতের তারিখ। ছোট একটা ঘরোয়া উৎসব। বেশী লোককে নেমস্তন্ন করা হয় নি। অন্নদাবাবু আর কমল সঙ্কোরাতির এসেই আশীর্বাদ করে গেছেন। ছোটমামী নন্দিতার সঙ্গে সতীর যেতে যেতে হয়েছে রাত সাতটা কি বড়জোর সাড়ে সাতটা। শুভময়ের বন্ধু সত্যতর তখন কোন কারণেই উৎসব বাসর ছেড়ে চলে যাবার কথা নয়। কিন্তু সতী গিয়ে শোনে, সত্যতর এসেছিল ঠিকই বিকেল ছ'টা নাগাদ। এসেই ট্যান্ডার লগেজ বস্ত্র খুলে নিউ মার্কেটের সমস্ত গোলাপ ফুল উজাড় করে ঢেলে দিয়ে গেছে। আর যাবার সময় বারবারাকে বলে গেছে, পরের বাসর সাজাতে সাজাতে নিজের বাসরের অকল্যাণ ডেকে আনিছ—হঠাৎ একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে—এ বছরটা তুমি আর শুভমর দুজনে মিলে বাসর শয্যাটা সাজিয়ে নিও মনোমত করে, পারি তো রাত্তিরের দিকে একবার আসবো। অদিন অকণ্ঠে যে বন্ধু দিন রাত চক্ৰিশয্যটা শুভময়ের বাগান বাড়ীতে পড়ে থাকে সৌহার্দ্যের দায়ে, শুভ দিনটিতে সত্যো না লাগতে লাগতেই আঁকপাঁক করে তার চলে যাবার কথা নয়। কিন্তু তবু বিকেল নাগাদ চলে গেছে সত্যতর। রাত করে অবিভি একবার আসবে বলে গেছে কিন্তু তারও কোন নিশ্চয়তা কিছু নেই। সত্যতর সঙ্গ দেখা করবার উদ্দেশ্যেই অবিভি সতীর আজ এখানে আসা নয় কিন্তু এই সাক্ষাৎকার তো হলেও হতে পারতো। হলো না।

মনঃকুল্ল হয় সতী। অকারণে কারণ টেনে বার করে। অনর্ধক হেফুবার এনে সংস্হাপন্ন করে মন। দেখা হবার কথা না থাকলেও ভাবে একটা কথা ছিল যেন এই সাক্ষাৎকারের। ধারণা হয়ে বাঁ মনটা। অথচ এ সম্পর্কে একটি মাত্র বেসী কোঁতুল প্রকা করাও মনে হয় যেন অশোভন হবে। অন্তত: সতী যদি প্রকা করে সেই কোঁতুল তো লাগবেই' চোখে। বারবারা কি নন্দিণ

করলে সে সব কথা মনে হবে না। কেন না সবাই জানে, ওরা ভীষণ উচ্চকিত। একটা কিছু মনে হলে তা নিয়ে বড় বেসী হৈ-ঠে করে। কিন্তু সত্যি সে চরিত্রের নয়। সত্যি ঢাকাঢাকা, সসম্মত, সংবত। তাই কোন আধিক্যই শোভা পাবে না তাকে। সত্যি ক্ষেত্রে সে কোঁতুলকের মানে অল্পরকম হয়ে পড়াবে। মন দেওয়া ধোওয়ার কথা উঠে পড়বে। হঠাৎ যদি কেউ মন্তব্য করে বসে, ভালবাসে তাই, তা হলেও কিছু বিচিত্র হবে না। আর একবার এই কথা এক জনের মনে হলে অল্প পাঁচ জনের মনেও সেই কথা বিজকুড়ি কাটবে। এক জনের মনের কথা তখন পাঁচ মনে ছড়াবে। তারপর সব মন মৌন নয়। কেউ কেউ সেই কথা তখন প্রকাশও করবে। তখন কথার পাখাও নিশ্চিত গজাবে। এক কথা তখন সাত কথা হয়ে বেলঘরে থেকে বাসিন্দার পর্যন্ত উড়ে বেড়াবে। অল্পদাবু শুনেবন, বিধতোষ জানবে, মন্দিরার দাশা অস্তীমদা-ই বা কথটা কি ভাবে মেবেন, বোঝা ধাবে না। অকারণ হাজারটা কামেলা হাজারটা বখেড়া হবে। স্তবরাং কোন কোঁতুলকই প্রকাশ করা সম্ভব নয় সত্যি পক্ষে। অনেককিছু ভেবে চূপ করে থাকে সত্যি। চূপ করে থাকে আর নিজের মনেই নাড়াচাড়া করে কথটা। ঘুরে বেড়ায় খামিকটা আনমনা হয়ে, একা একা। সঙ্গীসার্থী ছাড়া মিসঃসঙ্গতাটাই বেন ভাল লাগে বেশী। নিভৃত নিরাসার নিজের সঙ্গীটাকে হুখানা করে ভেঙে মুখোমুখি খানিকক্ষণ গল্প করা যায়। সত্যব্রতর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে দেখাশোনা হলে হয় তো এ সব কোন প্রশ্নই উঠতো না। কিন্তু সাক্ষাৎ না হয়েই এই আলা হয়েছে সত্যি। প্রশ্নটাও উঠছে তারই স্ত্র ধরে। ফুল পাতা কাণ্ড কিছুই নেই-এ গাছের, অথচ শিকড় চলে গেছে বেন মাটির গভীরে।

রাত ন'টা অবধি অপেক্ষা করল সত্যি নানা অস্থির। কিন্তু সত্যব্রতর সঙ্গে যে দেখা হবে তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শুনেছিল, ভাল পিয়ানো বাজাতে পারে সত্যব্রত। আনন্দ অস্থিরতার মাঝখানে তাই কথাগুলো খাপখাইয়ে বারবারকে বলেছিল কথটা সত্যি। বলেছিল, সত্যব্রতবাবু থাকলে বেশ পিয়ানো শোনা যেতো। উত্তরে বারবার একবার বলেছিল সত্যিকে সেদিনকার মত থেকে যেতে রাত্তিরটা। বলেছিল, তুমি থেকে যাও আমি কোন করে জানিয়ে-দিল্লি মাকে। কথা যখন দিয়েছে আসবে তখন—দেখবে সত্যব্রত ঠিক আসবে। বেশ পিয়ানো শোনা যাবে রাত্তি। বারবারের প্রশ্নাবটা ভাল লাগলেও ঠিক সার দিতে পারে না সত্যি। এক বাত্রার পৃথক ফল, এসেছে নন্দিতার সঙ্গে, কথা আছে ছোটমামার গাড়ীতেই ফিরে যাবে বাজী, কেমন কেমন দেখাবে বেন। তা ছাড়া বেলঘরের বাগানবাড়ীতে সত্যব্রতর পিয়ানো শোনবার অল্প রাত কাটানো, কিছু মনে না করলেও মা কমলকামিনী ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেবন না। আর কথটা শুনেই ছোটমামী নন্দিতা এমনি চোখ করে তাকাবে বেন বোঝাতে চাইবে গুচ এই উদ্দেশ্য নিয়েই সত্যি বাবা মার সঙ্গে না এসে তার গাড়ীতে এসেছে। সত্যব্রত যে প্রথমটা থাকবে না বিকেল নাগাদ ফুল দিয়ে গিয়ে ঘুরে আসবে অনেক রাত্তিরে, আর সত্যিও যে কেবল সময় বারবারের ওখানে থেকে যেতে চাইবে, এসবই আগে থেকে ঠিকঠাক করা, সাজানো-পোছানো ব্যাপার। সাতপাঁচ ভেবে ইচ্ছে থাকলেও বাজী হয় না সত্যি। তবে

নন্দিতার ছেলের ভাত সত্যব্রত যে পিয়ানো বাজিয়েছিল, তার প্রশংসা সত্যি এমন উচ্ছৃঙ্খলভাবে করে গেল বারবারের কাছে যে সত্যব্রত তার আংশিক রিপোর্ট শুনেও পরের দিনই যে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে, সে সম্বন্ধে তার কোন সংশয় রইল না।

রাত ন'টা নাগাদ মনোহরপুকুরের বাজীতে ফিরে গেল সত্যি। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে নিজের বুদ্ধিকে নিজেই তারিক করতে লাগলো এই কথা বলে যে রাত করে বেলঘরে বাগানবাড়ীতে ফিরে গেলেই সত্যব্রতর গুণগ্রাহী বারবারা নিশ্চিতভাবে তার কানে সত্যি প্রশংসা মন্তব্যগুলো তুলে তুলে দেবে, আর তার পরের দিনই সত্যব্রত সেই কথা শুনে নিশ্চিত ভাবে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। হারজিতের প্রশ্ন কিছু নেই। তবু নিজের গলায় নিজের হাতেই জয়মালা পরিবে বিজয়িনী হয় সত্যি।

রাতের প্রসাধন শেষ করে জানালার কাছে পাড়িয়ে খোলাফুল অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা দিবে টেলে টেলে পিছনে বের সত্যি। আকাশে টান নেই, তাই আলো-হারার খেলা নেই আজ। ছাত্তর আলসে ত্রিকোণ হয়ে ভেঙে পড়েনি লনন। রাত্তির ইলেকট্রিক পোষ্ট আর গাছের বোশের কীকে দৈবাৎ যদি লক্ষ্মীপেটা আগে তো আর সাদা ডানা দেখা যাবে না আজ। অল্পট একটু দেখা না গেলে আঁকে বাঁকে কতকগুলো কথার নস্রাও কানে গুলটে ভাল লাগবে না। কান পেতে থাকলেও বোবা রাত আর কথা কইবে না আজ। অপেক্ষা করে করে শুয়ে পড়ে সত্যি।

শুয়ে পড়ে কিন্তু ঘুম আসে না। যে জয়মালা সে একটু আগেই নিজের হাতে গলায় পরেছে, সেই মালাই এখন সে টেনে টেনে ছেঁড়ে। ভেবেছিল সত্যব্রত ছুটে এলেই জয় হবে তার। কিন্তু এখন সে দেখছে সে হিসেব তার সম্পূর্ণ ভুল। বারবারার মুখে ছুটো চাটু কথা শুনেই যদি ছুটে আসে সত্যব্রত ছাত্তর মন্ত তার কাছে, তো সে মাহুঘ তো প্রত্যাশা করে বসে থাকবার মন্ত বিশিষ্ট হতে পারে না। তাই সত্যি চায় না সত্যব্রত এসে তার সঙ্গে কালই দেখা করুক। সত্যব্রত এলেই তার মনের চালচলির ভেঙে যাবে। এলোমেলো কত কথাই যে কত হাঁদে ভাবে মনে, সত্যি নিজেই তার খেই ধরতে পারে না। দিন গেছে এক উৎকর্ষার। এখন সেই উৎকর্ষার যখন নিবৃত্তি হলো তখন এই নিবৃত্তিই হলো আর এক উৎকর্ষার কারণ। আশ্চর্য্য গতিবিধি সত্যি মনের।

তবে তার উৎকর্ষা কার জন্তে? কিসের কারণে? সত্যব্রত তো নিমিত্তের ভাগীদার। তবে সে কি নিজেই নিজেকে পৃথক করে ছুই সত্যি? তারপর এক মুখ অল্প মুখের দিকে তাকিয়ে বাচাই করে মিললো কি না? এত এলোমেলো হয় কি করে?

সারা রাত ঘুম নেই চোখে। ঘরঘর ঘুরে ঘুরে ছায়া কেসে আর ছায়া দেখে সময় কাটে সত্যি। নিজেরই ছায়া। তবু মনে হয় বেন আর কেউ, অল্প কোন জন আছে কোনখানে, এই ঘরের ভিতর।

৫

প্রাণ, কারপো, গ্রেট ইটার্ন হলেই হতো ভাল। কিন্তু মায়ের টাকার পুনের ওপরেই নির্ভর করে, মাস গেলে যখন সন্ধ্যা চায় পাঁচ শ' টাকার জন্তে এটনী মুখার্জি কার্ণের মুখ চেয়ে থাকে, তখন রাজার-চাল আর আসবে কোথেকে।

বাগের প্রথম চোটে শ্রীরামপুর মাসীমারী থেকে বেরিয়ে সত্যব্রত প্রথম মাস দুয়েক রইল ড্রিটল হোটেলে। কিন্তু তার পথেই ধার-দেনা, নেই নেই, বন্ধ বন্ধবৎ বিশেষ পাত্তা দেয় না, সত্যব্রত উঠল গিয়ে পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি ছোট একটা আর্নেনিয়ান হোটেলে। নাম রিকিউজ।

হোটেল কর্তী হচ্ছেন জর্টনকা আর্নেনিয়ান মহিলা। তাঁর নাম খেলমা। হাসি খুসী ঝল্লিগিল্লী চেহারা। তিন মেয়ে নিয়ে হোটেলের চারতলার থাকেন। তিনতলা দোতলার সব বোর্ডার থাকে। স্বর-স্বর করে ভাড়া দেওয়া। লাগাও বাথ কিচেন এর বন্দোবস্ত থাকার চাকর নিয়ে রেঁধে বেড়ে খাবার সুবন্দোবস্ত আছে জা হাড়াও আছে কমন কিচেন, টাকা ফেল থাকে খাও। নৃত্যোটি পর্যন্ত নাড়তে হবে না নিজের হাতে।

প্রথমটা আর্থিক অকুলানের। একখানা স্বর ভাড়া করে সত্যব্রত তাই একা থাকে। নিকুঞ্জ মাইতি পুরোনো চাকর। স্বর্ণলতিকা পাঠিয়েছেন ছেলের খাতিয়ে। সেইসব দেখাশোনা করে।

প্রথম কটা মাস বেশ কাটালো। বাহু চাকর নিকুঞ্জ মাইতি। খেয়াল বাইরে তেমন ভেতরে। ভোল কিরিয়ে দেয় সংসারের ক' দিনের মতোই। তোয়াজে থেকে আর ভালমন্দ জিনিষ খেয়ে শরীর ভাল হয়ে গেল সত্যব্রতর। সর্বসাধারণের 'বিলাডেড মাসীমা' খেলমার-ও নজর আছে। শুভ মনিং করে সত্যব্রতর ব্যক্তিগত কুশল নেওরা তার প্রাত্যহিক কর্ম। নজর মাসীমার প্রত্যেকের ওপর। সকলের জেই সমান দৃষ্টি। সকাল থেকে রাত অবধি দোতলা তিনতলা ঘুরে ঘুরে সযাইকে 'হোম কমর্স' দিয়ে বেড়ান। কাজে কর্মে মেজাজ বিগড়ালেও মুখের হাসি কখনো মিলেয় না। খেলমার হোটেল তাই সব সময় ভরতি। কি শীত কি গ্রীষ্ম, সিট খালি কখনও নেই।

কিন্তু সুপ্রসন্ন মাসীমা বোর্ডারদের বেলাতেই। অজ্ঞদের সম্পর্কে কঠিন, কঠোর। নিজের স্বামীকে-ও খেলমা ছেড়ে কথা বলে না। স্পষ্টই বলে, আমার স্বামীটা একটা জানোয়ার। মেয়ে-বাহুদের বদ দোষ না থাকলে কি হবে, যে লোক অল্প মদ খায় তার সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখি না। 'জোনাকান'কে সে কাছেরই খেঁবতে দেয় না। বেচাল করলে মারধরও করে। সসপ্যান ভো তাই-ই সহ। বেচারী জোনাকান।

স্বামীকে দেখতে পারে না কিন্তু মেয়েদের চোখে হারায় না খেলমা। নজর ভাড়া কখনও নয়। কোন মেয়ে আড় হলো চোখের ভো টেচিয়ে কাটির একসা করবে খেলমা। বা কর, কর চোখের ওপর। আড়াল আবডালে যেতে পারে না। সমাজের পুরুষদের উপর বিশ্বাস নেই খেলমার। একটু অসতর্ক হলে শুধু মেয়ের হাত ধরেই টান মারবে না। ছুঁচ হয়ে চুকে পরে ফাল হয়ে বেরবে। কারবার নষ্ট করবে, ক্ষতি করবে ব্যবসার। তিন মেয়ের কোন মেয়ের তাই বিয়েও হয় নি এতদিন। বড় বড় মেয়ে। বয়সকালে সব সুন্দরী হয়ে উঠেছে। বেটাছেলের গায়ে না মাঁখলেও বেটাছেলেরা এসে গায়ে মাখে। অমান আর কি কুক্কের বেধে ধার সংসারে। টেচিয়ে ঘেচিয়ে অনর্থ করে খেলমা শেখটার বাগের দ্বাধ দেয়। বলে, সব ঐ রকম। ঐ রকমের মধ্যেই চলা আছে।

মেয়েদের আমার কোন দোষ নেই। মাথা ধারাপের কারণ ঘটে এই একটা সময়। নইলে রিকিউজ, সত্যিই রিকিউজ। থেকে আরাম হোটেলটার।

প্রথম কটা মাস বেশ গেল। চাকরী করবে না বিজনেস করবে সত্যব্রত। বিজনেসে পরমা আছে। হাই সোসাইটিতে মেলামেশা করতে লাগলো। গীম্পতিকে মধ্যস্থ করে হু'চারটে পার্টির কাছ থেকে মোটা হাতে কিছু-কামাইও করলো। স্বর্ণলতিকা জানলেন, করিতকর্মা হচ্ছে ছেলে। দায়ভার থেকে এবার মুক্ত হবেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সুর হলো আবার খামখেয়ালী। প্রচুর মদ খেতে লাগলো আর যেসের মাঠে কপাল হু'চারে বাতারাতি ভাগ্য ফেরাতে গেল। বার টাকা মেই তার-চরিজও থাকতে নেই। নিকুঞ্জ দেখে, রাত তিনটে পর্যন্ত আলো নেভেনা ঘবে। জুয়াড়ীর আড্ডা তিন তাসের খেলা বোজই জমে ওঠে রাতে।

পরমা চাই পরমা মেই। নিকুঞ্জ মাইতি ধার দেয়া করে এনে সংসার চালায়। মাইনের টাকা ভো হাতেই পড়ে না। উপরত সত্যব্রত এসে নিকুঞ্জর পিঠ চাপড়ে বলে, তোর আবার টাকার ব্যবহার কিসের? আপাততঃ কিছু ধার দে। টাকা না থাকে ভো হোটেলের দারোয়ানের ঠেতে ধার কর। ইজ্জৎ রক্ষে হচ্ছে না।

নিকুঞ্জর মুখে কথা সয়ে না। অবস্থা বুকে সে চলে ধার শ্রীরামপুর, স্বর্ণলতিকার কাছে। দেশে চাষাবাদের আকাল আর জ্বর অসুখের কথা বলে গচ্ছিত টাকার—শত খানেক এনে ফুলে দেয় সত্যব্রতর হাতে।

এক শ টাকা সামান্য টাকা এ বেলা জানলে ও বেলা মেই। দুদিন বাদেই ঘরে আলো ধলে না। হেসেল বন্ধ করে নিকুঞ্জ তখন ক্রীমুল স্ট্রিটের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর চান। চিবোয়। সত্যব্রত তখন বেলঘরের বাগান বাড়ীতে ধারবারা কে বাংলা শেখায়—আর সুবধে মত ডিনারটা সেয়ে নেয়। বেলা একটা নাগাদ মামাতো তাই ঝণ্টর ম্যালো লেনের অকিসে চু মেয়ে লাঞ্চটা ম্যানেজ করে গ্রেট-ইটার্ণেই। পরমা নেই তো উচ্ছ্বাস আছে,— সত্যব্রত তখন সাহা-সাহিত্য চক্রে এলিয়টের 'হলো মেন' আর-বায়রনের 'সাইনারা' আবৃত্তি করে, মাকিণ হুনিয়ার 'ফাই-ক্রাপার' আর 'গ্যাঞ্জট' এর নিন্দে করে বলে, প্রকৃতিমুখীন না হলে মরে যাবে মানুষ। বেলঘরের বাগান বাড়ীতে কখনও পিয়ানো বাজার ঝড়ের বেগে। আবার গীম্পতির অকিসে বসে বাতিল কামউনিট ইটার্ণশনালের পুনঃপ্রবর্তন দাবী করে লেকচার দেয়। কলকাতার পৌরশাসন ব্যবস্থার গলতি দেখিয়ে 'প্ল্যানিং দি টাউন' শিরোনামা বিতর্কে খবরের কাগজে চিঠি বেয়োর না সত্যব্রতর, এমন সপ্তাহ কমই যায়। বার সম্পর্কে আসে তারা বিজ্ঞান হয়ে বলে দিকভ্রান্ত প্রতিভা। রাদ্ গভর্নমেন্ট এদের সাতিস দেশের কোন কাজেই লাগাতে পারলো না। গীম্পতিদের মহল জহরী চেনে। তারা হেসে বলে, হামবাগ। শুভময় জানে, এ বোড়া কখনো বাজী জিতবে না। বন্ধুদের দার স্বীকার করে বলে মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ লোকসান দিয়ে ধার।

হোটেল ভাড়া বাকি পড়েছে পাঁচ মাস। খেলমা মাসীমা আ ক'রিন হলো সত্যব্রতকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। গৃহস্থানী বা কৃত্য কাব্যে কোন পাত্তা করা থাকে না। রাতে আড়ি গেলে

নিকুঞ্জকে যদিবা ধরা যায় সত্যত্রয় সজে কথা চর না খেলয়।
 প্রথমে নিকুঞ্জ বলে, সত্যত্রয় যাকার গিয়া। দিনের পর দিন
 অপেক্ষা করে করে তিত্তবিরক হবে উঠেছে খেলয়া। তিনিবপত্র
 করে যে খেলয়া বাগ করে বাইরে টেনে ফলে দেবে, সেই ভবে কাটা
 হয়ে আছে নিকুঞ্জ। সত্যত্রয় চোবের মত ঢোকে চোটেলে হাত
 করে। আবার অন্ধকার থাকতে থাকতেই চোবের মত বেবিরে বাস
 পা টিপে।

একদিন চাতে চাতে ধরা পড়ল পলাতক। স্থানটা সেবেই
 হতায় বেলা বেবিরে থাকিল সত্যত্রয়, পড়বি তো পড় সামনেই
 হামীমা। সকাল বেলাই তারঘরে টেচামিটি আনত করল।
 তাহি আমি ধরখানা ধুলে বসেছি তোমার জন্তে? টাকা
 দিতে না পারো তো উঠে যাও এই হুকুর্টে। বরতো আবি তোমার
 পুলিসে দেবো।

হটমোল চেলাচিহ্নি। বোর্ডারবা সব ঘুম চোখে ছুটে এসে
 সাজিঙ্গ করে একটা আপোষ-বফার চেটা করে কিন্তু কে কার কথা
 শোনে? যেমন হামীমা তেমনি সত্যত্রয়। কেউ কাউকে ছেড়ে
 কথা বলতে পশ্চাৎপদ নয়। হামীমা লালবাজারে টেলিফোন
 করে তার দুব-সম্পর্কিত এক সার্জেট ভাগ্নেকে ডেকে এনে সত্যত্রয়কে
 পুলিসী হামলার ভয় দেখায়। তাই শুনে সত্যত্রয় মাথাঘণ্ড খুন
 চেপে যায়। ইজ্জতে যা লেগে সে দেখায় খেলমাকে বিলেতের
 স্টল্যাণ্ড ইহার্ড। চুনোপুটি সার্জেট ভাগ্নে তার কেশাগ্র সম্পর্ক
 করবে কোন সাহসে? সার্জেট ভাগ্নেটিও আবার তৈরী তেমনি
 মামা জোনাপানের ছাঁদে। অফ টাইমে মামীকে শ্রেফ কোমরের
 বেন্ট দেখিয়ে ভাব জমিয়েছে মামাতো বোনের সঙ্গে। সত্যত্রয়
 কথার উত্তরে সে শুধু মিষ্টার মিষ্টার করে আর লম্বা কথায় খেলমাকে
 আশস্ত করে রিপোর্ট লিখে নিয়ে যায়।

বেইজ্জতির একশেষ। উপায়ান্তর না দেখে নিকুঞ্জ টেলিফোনে
 খবর করে স্বর্ণলতিকাকে। কি বলতে কি বলে নিকুঞ্জ—স্বর্ণলতিকা
 বোনের সত্যত্রয়কে লালবাজার থেকে গাড়ী ভরতি পুলিস এসে
 ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

দুপুর বেলাও গোলমাল খামে নি। হামীমা তখনও ভাগ্নেকে
 দিয়ে শ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করাচ্ছে আর সত্যত্রয় অস্থাবর
 মালপত্রের ক্রোক করবে বলে শাসাচ্ছে চীৎকার করে। সত্যত্রয়
 হোটেলের নেই। সার্জেট ভাগ্নে; ওদিকে ভাব জমিয়েছে মামাতো
 বোনের সঙ্গে রিকিউজ-এর চারতলায়। হামীমার বেতে কাটছে,
 আসতে কাটছে। অথচ মুখ ফুটে একটা কথাও বলতে সাহস
 হচ্ছে না ভাগ্নেকে এই অবস্থায়। খেলমা শুধু চীৎকার করে আর
 মাঝে মাঝে তেড়ে তেড়ে যায় জোনাপানের ওপর। বুড়ো শুধু বসে
 বসে থাকে আর মজা দেখবে। আপৎকালেও যে দু পা এগিয়ে
 এসে পাশে কাঁড়াবে স্ত্রীর, এমন ভাগ্য খেলমা করে আসে নি।

জোনাপান বলে, why shout for nothing. Have
 Peace.

গরম তেলে জল পড়ে ছলে ওঠে কড়াই। খেলমা চেচায়:
 Peace! You talk of peace?

খণ্ডপ্রলয় শেষ হচ্ছে না হতেই মহাপ্রলয় লেগে যায় চারতলার
 সিঁড়িতে। কিন মেয়ে আর সার্জেট ভাগ্নে ছুটে এসে না রকে

করলে জোনাপানের সেদিন নিশ্চিন্ত ভাবে অপহৃত বুড়া হতো
 একেবারে উন্টে পড়ে যেতো রেলিং টপকে মীচে।

ইতিমধ্যে ঝপ্ট একবার ঘুরে গেছে হোটেল। সত্যত্রয়কে মনে
 হেথা হয়নি। নিকুঞ্জের পিঠ চাপড়ে বলে গেছে, হাবতায় মত
 কোন ভয় নেই। হাবার সময় হামীমাকে ডেকে পরিস্থিতি জা
 করতে বাবণ করে গেছে বিশেষ ভাবে। বলেছে, টাকার ভবে
 কোন চিন্তা নেই। টাকার গারান্টীর সে নিজে। স্বকম্বাক নতু
 ত্তর গাড়ীর গায়ে সে কথা নিশ্চিত ভাবেই লেখা ছিল খেলমা
 চোখে। তাছাড়া হাববাবাও দুখুব মাগান একবার টেলিফোন কা
 খুব করে ধমকে দিয়েছে খেলমাকে। হামীমা প্রথমটা টেলিফো
 টেচিয়ে উঠেছেই ওপাশ থেকে বাববাবা এক করে ধমক,—আ
 রিকিউজ-এর ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছি কি? আমি তার স
 কথা বলতে চাই সত্যত্রয়র যাকি টাকার ব্যাপাবটা নিজে।

কথাবার্তার ধরণধরণে কতকটা হাট-সোসাইটির চোমর
 চোমরাদের পাজার পড়ে বাওয়া গেছে বলে হাবতা হয়েছে হামীমার
 তারপর তিনটে নাগান এসেছেন স্বর্ণলতিকা, সঙ্গে চিত্রলেখা
 হামীমাকে ডেকে এক চেকে বক্রী টাকা মিটিয়ে দিয়েছেন তিনি
 নিকুঞ্জকে দিয়ে নিউ মার্কেট থেকে বি মরদা চাল ভাল কিনিয়ে এ
 ভাঁড়ার সাজিয়ে দিবে গেছেন নিজের হাতে। হামীমার ছু
 স্বর্ণলতিকার সঙ্গে তিনি ঐ এক বক্রী টাকার কথা ছাড়া অন্য এক
 কথাও বলতে পারেন নি। বলতে পারেন নি, তিনি সত্যত্রয় হামীমা
 চোখে সত্যত্রয়র সুবিধে-অসুবিধে দেখে থাকেন। বলতে পারেনা
 দীর্ঘ পাঁচ মাস কাল অপেক্ষা করে করে শেষবার সত্যত্রয়কে তাড়
 করা ভিন্ন তার আর কোন গতি ছিল না। কৃতকর্মের স্তম্ভ সক্তি
 অমৃত্যপ করেন হামীমা। তারপর স্বর্ণলতিকা চলে গেলে হামী
 পা টিপে টিপে সত্যত্রয়র ঘরে গিয়ে নিজের হাতে ফুল রেখে আসে
 ফুলশানীতে। ছুটো ছুটো চারটে সুদৃশ্য অর্কিড বুলিয়ে দিয়ে আসে
 জানালায়। মেজের ওপরকার ছেঁড়া ম্যাটিং পাণ্টে দিয়ে নতু
 ম্যাটিং বিছিয়ে দেন সেইদিনই।

নিকুঞ্জ মজা দেখে আর মুখ টিপে টিপে হাসে। অল্পসল্প কথা
 বার্তার কাঁকে সে ভাল করেই সমঝে দেয় খেলমাকে, যে স্বপ্নীতিক
 এই ঘটনা উপলক্ষ্য করে আজ হারা এলো আর গেবে
 রিকিউজ হোটেলের, তাদের পদনখের এক কণা ধুলোবাগি দি
 হামীমার এই নগণ্য সরাইখানাটাকে সে তিনবার কিনে বেচ
 পারে।

স্বর্ণলতিকার প্রশংসা আর ধরে না হামীমার মুখে। খালি বর
 She is all queen in elegance. একেবারে রাজবাণী
 মত। বারো শ' টাকার চেকের নীচে লম্বা সইটা সে দেখিয়ে বেড়া
 বোর্ডারদের।

বিকেল নাগাদ হোটেলের করে সত্যত্রয়। জামা জুতো খোলা
 কাঁকে দু-চার কথায় সে সত্যত্রয়কে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলে। ম
 মেজাজ ভাল না থাকায় সব কথা বৈধা ধরে শোনবার তার মেজাজ
 থাকে না। বিশ্ব সংসারের ওপর তার অভিমান। অগ্রাম চেবো
 চোখ বুজে শুবে অপরের চোখে ধুলো দেয় সত্যত্রয়। নিকুঞ্জ
 বলে, দরজাটা জেজিয়ে দিবে যা।

আগের দু-দিন খাড়াই জোটেনি ভাল করে। ঝপ্টর মত

আজ ভরপেট লাফ'-এর পর পোটা ফুরেক বিয়ার খেয়ে শরীর ভেঙে
বুদ আসে সত্যজ্ঞতর। বুমিয়ে খাড়ে সত্যজ্ঞত।

বুদ ভাঙে অবেকার। পার্ক ট্রাষ্টের পশ্চিমের জানলা দিয়ে এক
টুকরো লালা আলো চুরি করে চুকেছে সত্যজ্ঞতর করে। সত্যজ্ঞত
চোখ বুলেই দেখে সত্যী। সত্যী বলে জ্বাছে জামনের চেহারা,
সত্যজ্ঞতের সবটুকু সোনা চোখে-মুখে দেখে।

আন্তর্য্য হয় মা সত্যজ্ঞত। মগন সব কিছু হাত পেতে নিতে
মিতে পাওরাটা একটা অভ্যাসে ঝাঁড়িয়ে দেছে সত্যজ্ঞতর। চোখে
বুখে তখনও বুকের আবেগ। বলে, আশঙ্কি ? কতকথ একেছের
আশঙ্কি ? সত্যীর জবাবের অপেক্ষা না করেই উঠে বলে বলে, কিছু
হলে করবেন না, বুমিয়ে খাড়েছিলাম।

সত্যী বিস্মিত হয়ে বলে, আমি আরও ভাবছিলাম...

ঃ বিয় খটালেন বুকের, এই তো। মোটেই নয়। কারণ আপনি
একেছের বুদ পাও করে। তা সে বা হোক, খারখার কোখার ?
আপনি নিশ্চয়ই একা আসেননি।

ঃ কেন ? আসতে নেই বুঝি ?

ঃ না, থাকবে না কেন। তবে আসেন তো নি কোন দিন।
তাই বলছিলাম...

ঃ না, আমি একাই এসেছি।

সত্যজ্ঞত আপন মনে হাসে। বলে, Morning shows the
day—কথাটা জানলেন একেবারে ভুল।

সত্যী স্মিত হেসে চুপ করে শোনে সত্যজ্ঞতর কথা।

খানিকটা আঙ্গুগত হয়ে কথা বলে সত্যজ্ঞত : আপনি আমার
সকালটা আজ দেখেননি তাই... Stormy, Cloudy, all
thunder and lightning, কিন্তু বেলা চারটের পর থেকেই
অন্ধকার সম্পূর্ণ পরিবর্তন। All sun and sunshine—সবটা
মিলিয়ে কি বলবো, একটা সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্তই তখনই সত্যী। স্বপ্নের সঙ্গে বড়ো বাস্তবটাকে মিলিয়ে
দেখছে সে সামনা সামনি। অপরিজ্ঞাত বা তা আছে অগোচরে।
বিশ্বাস আছে, সে অগোচরও গোচর হবে একদিন। কিন্তু সেকথা
মনে করে আজ আর বসে থাকবার সময় নেই সত্যীর।

সত্যী বলে, আসেননি কেন, এত দিন ?

সত্যজ্ঞতও কম অবাক হয় না সত্যীর কথায়। বলে : বাইনি,
না ? কেন বাইনি।

তারপর হুজনেই হেসে ফেলে একসঙ্গে। একটা নতুন সিদ্ধান্ত।

৬

তারপর মুছে গেল আর সব কিছু.—চেনা জানা পরিচিত মুখ,
লোকলজ্জা তর। টান টান মন দুইটির নিরীখে রাখে এব সত্য—এক
লক্ষ্য ছিঁব। সত্যী জানে এক সত্যজ্ঞত, সত্যী ভিন্ন সত্যজ্ঞতর কেউ
নেই আর।

ব্যাপারটা ঘটলো একটু ভাড়াভাড়া-ই। প্রিয়ার গালের একটা
ভিলের বিনিময়ে মুহূর্তে বিক্রিয়ে গেল সময়খন্দ, বোধারা।

অন্নদা বাবু ক্ষুব্ধ হলেন। খণ্ড-ছিন্ন বিকিণ্ড স্বার্থকে এক ধর্মরাজ্য
পাশে বাঁধবার স্বপ্ন বানচাল হয়ে গেল তাঁর।

সেই সত্যীকে তাকে তিনি বোকাবার চোটা করলেন। কিন্তু
কর্ণকূবর তখন বধির হয়ে গেছে সত্যীর। সত্যজ্ঞত ভিন্ন অন্য কোন
নায় তখন সে আর জনতে পাচ্ছে না কানে।

অন্নদা বাবু বললেন, আমি চাই তুমি সুখী হও জীবনে। কিন্তু
অলৌক একটা স্বপ্নকে আঞ্জর করে যদি কোন সৌখ প্রড়ে ভোল, স্রু
বাস্তবের বাপটার সে ইয়ারং তো ছ' দিনে ভেঙে যাবে না। ষ্যা,
আমি আহি—তোমার অন্নদা। যেউড়ী ঠিক আগলে রাখবো তুমি
স্বপ্নেরে বিপকে বস্তবির আহি, ততক্ষিত বুক দিয়ে কুখে ষ্টাড়াবো সব
অঘটর। কিন্তু মা—অমিত্যাকালের তত্তে তো আমি তোমার ধারোয়ারী
করতে পারবো না। আদ্যারও বয়স হয়েছে, শক্তি কয়ে আরবে
কালের বিহয়ে। ভারী হয়ে আসে অন্নদা বাবুর কর্তব্যর।

অন্নদা বাবুর কথা বিখ্যে নয়। সত্যীকে তিনি প্রাধাধিক
ভালবাসেন। আর ভালবাসেন বলেই তাঁর এই উৎকর্ষ। কিন্তু সত্যী।
সত্যী কি করবে ? ষৈব্যিক তত্তাওতের মিত্যির কাঁটার প্রাণের সন্দেহের
দাম বাচাই করবে ? সৌখডের কোম মূল্য নেই বলে বাস্তব কয়ে
কবে সমস্ত সোলাপ ? পূর্ণ টান, সে তো সোনার হরিণ। সূর্য্য সত্যি,
মিথ্যে টান। কিন্তু চন্দ্রমার নিজের কোন আলো নেই বলে কি
মিথ্যে হয়ে যাবে পূর্ণিমা রাত ? সত্যি মিথ্যে একাকার হয়ে যার
সত্যীর মনে। সে কোন কথা বলে না অন্নদা বাবুর কথার উপরে।

সমুদ্র তখন ফুলে উঠেছে সত্যীর চোখে চাঁদের দিকে মুখ করে।

ছ-টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। সত্যজ্ঞত আসবে কথা আছে
ঠিক সাতটার সময়। হাতে সময় এখনও আধ খটার ওপর। প্রসাধন
সেরে তৈরী হয়ে নিতেই এ সময়টুকু লেগে যাবে। ইচ্ছে ছিলো আজ
একটু সেজেগেজেই বেরোবে সত্যী। জুইফুলের কুঁড়ির মালাটা
জড়াবে খোঁপায়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে সময়টুকুও পাওয়া
যাবে না।

বেগী বাঁধবারই তো ফুরিয়ে হবে না। তা জড়াবে কখন
জুইমালা ? শেষ মুহূর্তে হয়তো খোলা চুল হাতে পাকিয়ে এলো
খোঁপাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে তাড়াতাড়ি। দেয়ী তো আর করা
যাবে না ধরে।

উন্ননা হয় সত্যী। লগ্ন এগিয়ে আসছে। লগ্নই তো।
প্রত্যাশিত এই সব টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলোকে এক তাড়ার
বাঁধলেই তো হলো সেই পরম লগ্ন। ফিরে ফিরে তাকায় সত্যী।
সমস্ত শরীরটার একটা দোলা লাগে পুলকের। হাসবার যেখানে
কোন কথা নেই সেখানে অকারণ খিলখিলিয়ে হেসে উঠে শিউলী
ঝড়িয়ে দেয় শুভ হাসিরাশির।

বিষতোর বিস্মিত বোধ করে একটু। বুকতে পারে না, কি
আনন্দে হাসে এত সত্যী। পরে ভেবে নেয়, নিশ্চয়ই তাকে ধনী
করবার জন্তে। অপর পক্ষের তেমন কোন সাজা না পেলে যাবড়ে
গিয়ে হঠাৎ এমন বেশরো বেতলা হয়ে যায় মেয়েরা। বিশ্বাসটা
বেখানে কম সেখানে আশাস ছাড়া হয় তো প্রাণ ধুলে হাসতে
বাধে। সত্যী বে বেগী হাসছে, সে ব্যতিক্রমটাও ঐ একই কারণে।
তাকাও না বললে চোখে চোখ রেখে ঠিক রমণীয় হয়ে উঠতে পারছে
না। চন্দ্রকানোর চাইতে বলকাজে বেশী। বিষতোর তাকে
সত্যীরও ঠিক ভেমননি কোন একটা কিছু হয়েছে। সত্য বে অকুর্ষ

হয় তো কুণ্ঠিত বলেই। এখন আর কি এতটুকু প্রেমের পেলেই
রূপে রূপে সজীবিত হয়ে উঠবে ঠিক ঠিক।

বেদনাকরণ হয়ে ওঠে বিশ্বতোষের মন সতীর হৃৎকণ্ঠের কথা ভেবে।
এ প্রেমটুকু সে তো অনায়াসেই মিতে পারে সতীকে। শুধু
অল্পবাবুর সঙ্গে জড়িয়ে স্বার্থের কথা ভেবে হতে বাবে কেন, এ কথা
তো তার নিজের অভাবের কথা। সে তো চায় না, এই দীর্ঘ
ধরীকা নিরীকার পালা আরও বিলম্বিত হোক। হৃৎকণ্ঠের মাঝখানে
একটা হৃৎকণ্ঠের পরী অনন্তকালের জন্য আড়াল করে রাখুক
উভয়কে। তবু কেন এই আশু মিরে খেলা করবার হৃৎকণ্ঠ
তার। তবে, তেতর তেতর সে মিতে হরত একটু উদ্ভত। এটা
তার উদ্ভত হাতা আর কিছু নয়। ভালবাসার জন্মে কাঁছে আবার
উভয় মেবার কি আছে? আর এই ঠেলা মারা স্বভাবের জন্মেই
যদি কিছুটা বীভৎস এসে থাকে সতীর মনে, সে কোথায় তার সম্পূর্ণ
নিজের। তার জন্মে সতীকে সে কখনও দায়ী করতে পারে না।
মনে পড়ে সতী একদিন কথাগুলো ভাঙে চরিত্রের দাপট কথাটা বলে
ঠাট্টা করেছিল। আজ বিশ্বতোষের মনে হয়; সত্যি কথাই বলেছিল
সতী। এই দাপটই হয়েছে তার চরিত্রের মস্ত বড় দুর্বলতা।

নিজের অপৌজন্মের কথা শ্রবণ করে নিজেই বিস্ত্রিত বোধ করে
বিশ্বতোষ। কুণ্ঠিত হেসে বলে, হাসলে যে সতী?

: না কিছু নয়, এমনিই।

: এমনিই?

: সত্যি।

বিশ্বতোষ ভাবে, কই, এই হাসি বা এই যে কথা কইল সতী এর
ভেতরে তো কোন অপরিচ্ছন্নতা নেই। বেশ তো সহজ সুন্দর বলেই
মনে হলো। কপটতা তো নেই কোনখানে। এখন তার নিজের
পক্ষ থেকে পাণ্টা একটা স্বীকৃতি পেলেই না আরও বিকশিত হয়ে
উঠতে পারে সতী। কিন্তু কই, সে তার নিজের মুখোশটা তো
এখনও একটানে খুলে ফেলতে পারছে না। বাধছে কোথায়?
বিশ্বতোষের মনে হয়, সে নিজেই নিজের কাঁছে একটা বাধা। তার
পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সে নিজেই। আর কেউ নয়।

ওটিয়ে গিয়ে ফুলে ওঠে বিশ্বতোষ। বলদর্পী ইন্দ্রজিৎ সে।
মেঘের আড়ালে চলে যায় সে। যেন না সতী দেখতে পায়।

নিভুল সঙ্কেতে সময় হিসেব করে ঘড়ি কথা কয়। সাড়ে ছাঁটা
বেজে গেছে। আর দেয়ী করবার সময় নেই। রঙ-এ রঙ মিলিয়ে
কাপড় পরতে হবে, প্রসাধন শেষ করতে হবে। তারপর সেই
দুই কুঁড়ির মালাটা,—এতক্ষণে বুঝি বা ফুটেই উঠলো খেত
পাথরের বাটিতে।

এতটুকু বিধা নয়। উঠে পড়ে সতী। তবু কুণ্ঠিত হয়ে বলে,
আচ্ছা আপনি কিন্তু এখন একটু বসছেন, কেমন? চলে যাবেন না
যেন। এক্ষুণি মা এসে পড়বেন। আপনাকে বিশেষ করে অপেক্ষা
করতে বলে গেছেন।

খুসী হয় বিশ্বতোষ সতীর কথায়। এ বাড়ীর মিসেস রায়
যদি তাকে আশ্রয়িত করবার জন্মে সর্বদা অস্থির। আশ্রয়দায়
তবে যার বিশ্বতোষের বুক। অল্পদা রায়ও ইতিমধ্যে একদিন
বলছিলেন কথায় কথায়—জীবনে বা করবো বলে মনে করেছিলেন,
তার সিকি ভাগ আজও করে উঠতে পারলান না। এখন তোমরা

রইলে,....। সতীকে বেখেছিলেন এই সব কথাগুলোকে ব্যক্তমান
মত, বিশ্বতোষের চোখে চোখে। বলেছিলেন, আমি পারলাম না,
কিন্তু তোমরা ঠিক পারবে। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে
বিশ্বতোষ।

এই সব কথা আর তার নিজের চিন্তাতাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে
হ' আনার হেঁদো মুলিকানা যেন আর মানাচ্ছে না তাকে
একেবারেই। হারাটা ফেলতে হবে এবার আত্মাভি অল্পবাবুকে
অভিজ্ঞান করে,—এই পাটকল চটকল হাতিয়ে, গজার পাড় করে
গজাননী পিছনে কেনে, সাধনের দিকে। সঙ্কল পায়ের সবুধি এবে
সুন্দর হতে হবে তাকে। সে হবে শিল্পশক্তি।

অল্পদা সিগারেটটা হাইলানে তুবিরে কিরে বিশ্বতোষ কিরে
দাঁড়ায় জন্মের সামনে। হাতে ছেদী আর হাতুড়ি। অল্পবাবুর
এক চম্পাশা শিল্পসংগ্রহ। কোম এক মায়তীন 'ছোকরা কাঁচারে
অপূর্ণ কাঙ্ক্ষীর্জি। এই ছেদী আর হাতুড়িই হুঠো করে ধরতে
হবে তাকে। বিশ্বতোষের চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে চেপে বলে
হুকিকে। বিশ্বাসিত হুই চোখ যেন তাকিয়ে থাকে নিজেই হুখের
দিকে,—এক অপরাহত ভাবব।

কার প্রসাধন কে আর করে। হাত কেঁপে কেঁটা নড়ে যায়
সতীর। মালাটা জড়ালো, তাও যেন কেমন আলগা আলগা হয়ে
রইল খোঁপায়। প্রজাপতির পাখার চাকলা নিয়েও হাত পা কেমন
যেন শিথিল হয়ে আসে থেকে থেকে। প্রতি পদেই তার
আবির্ভাব। এই বুঝি এসে পড়লো। হয়তো বা এসে অপেক্ষাই
করছে তার জন্মে। কোনমতে শাড়ীখানা পাক দিয়ে পরে বেরিয়ে
পড়ে সতী। না যদি সে আসে এখনও, তো সে-ই অপেক্ষা করবে
আগবাড়িয়ে। ববে আর মন টিকছে না সতীর।

বিশ্বতোষ বসে আছে। অথচ সেই ডুইংক্রম দিয়েই বেরিয়ে
গেল সতী একটা সোনালী প্রত্যাশাকে অগ্রবর্তী করে চোখের
তারায়। মিহি মসলিনে মুড়ে একটা রেখার মত বজলজে চলে
গেল সতী বসিয়েপারে, বিশ্বতোষকে তার নজরেই পড়লো না। কি
ভেবে একবার ধমকে দাঁড়িয়েছিল ল্যাণ্ডিংএর কাঁছে, ঠিক সিঁড়ির
মুখটার। আবার নেমে চলে গেল।

রূপরাগ দেখে অবাক হয় বিশ্বতোষ। আজই কি তবে কনে
দেখার দিন ছিল?

পাশাপাশি চলতে কিরতে সতীকে বিশ্বতোষ অনেক দেখেছে।
কিন্তু এত সুন্দর তাকে কোনদিনও দেখায়নি। হয়তো বা সেদিন
অল্প কথা ছিল তার মনে। এতটা একাগ্রতা নিয়ে আসেনি সেদিন।
একটু দাঁড়িয়েছিল তবু। তা বিশ্বতোষ ডেকে ফেরালেই পারতো?
তাকে নি কেন? সতীকে তারিক করে একটি কথাও তো
বলে নি বিশ্বতোষ। না শুকে ফেরালে আপনা থেকে কি
কোন মেয়ে কিরে আসে? অন্তত: সে মেয়ে জানে তাতে
তাকে সুন্দর দেখায় না। তাই সতীও কিরে আসে নি।
এটা শীলতার কথা। একটা মেয়ের লজ্জা থাকবে না? লজ্জাই
তো মেয়ের অল্প আভরণ। বিশ্বতোষ ভাবে, শেষ পর্যন্ত
সহজ শালীন বোধটাও কি তার ভোঁতা হয়ে গেল। নিজের হুখের
দাপট তো তার নিজেরই হাতে। অত কবে দাপ টানা কেন তবে

কোনকো যদি বোকা বেচাল হবে? বিশ্বতোষ কি জানে না, যে কোনকো বোকা বেচাল করলে খেলার মাঠে তার কবর পড়ে যাবে? বিশ্বতোষ ভাবে, নিজেই তাকে সে খরঁ করেছিল অনর্থক একটা বাড়াবাড়ি করে।

সতী! সতী!—ছুটে বেরোর বিশ্বতোষ উইংক্রম থেকে বারান্দার। বারান্দা থেকে সিঁড়ি ধরে नीচে।

সেই সতী। এদিক, ওদিক, কোনদিকে মেই। এগিয়ে বার বিশ্বতোষ।

তোকা বাঁধা এক বাড়ি মত কোটা লাল পোলাপ নিয়ে বাঁধিল মালী সতীর করে। বিশ্বতোষ তাকে তেঁকেই সতীর কথা বিজ্ঞানা করে: মালী সতীকে লেখেছো?

বাঁধান আর বাঁধিলা একদিন বেঁটে ফুলের বাঁধতা জেনেছে মালী। হাসি ভরা মুখে আকুলের ইশারায় সে ফুলবাগানের দিকে ইঙ্গিত করে বলে: সতী দিখিমি বাঁধিচার আছেন। চলে বার মালী ফুল নিয়ে হেসে।

শিহরণ লাগে শরীরে বিশ্বতোষের।—বাঁধিচারেই তবে মানাবে ভাল। যদি বোবা না হয় তো তাকে বিশ্বতোষ আজ বুধর করে ফুলবে বর্ণীর মত। এগিয়ে বার বিশ্বতোষ।

হুণ্ডারে কাঠের গ্যালারীতে সারি সারি খেতভদ্র কিসানখামাম আর রাগরক্ত ডালিয়ার সমারোহ লেগেছে। সামনের তারের জালে গুণ্ডলতার বেড়াভাল আড়াল করে রেখেছে লোকালয়। সালা পাথরের ছুঁড়ি ছুঁড়ানো পথ ধরে এগিয়ে বার বিশ্বতোষ বাগানের দিকে।

সামনেই প্রশস্ত টেনিস লন। পাশ দিয়ে চলে গেছে পাথর

বিহানো পারে হাঁটা পথ। লমটাকে পাক দিয়ে কিয়ে এসেছে বাঁধিচার। এখানে ওখানে ছিটিয়ে আছে কয়েকখানা লোহার বেক। আকো বলছে হু তিনটে পাতের কাঁকে। চূপচাপ নিভক নিবানো পরিবেশ।

এখানেই কোথাও সন্ধান পাওয়া যাবে অভিসারিকার। চকল হু পা এগিয়েই হঠাৎ থমকে পাড়ার বিশ্বতোষ। দেখে, মনুীর মত শিঠ টান টান, দীর্ঘ স্তম্ভ প্রতি পদক্ষেপে, হাতে হাত যেনে এগিয়ে চলছে সতী, পাশে সত্যব্রত।

ফুলবাগানে যেন আশ্রম লেগে গেছে। আশ্রমই বলে ওঠে বিশ্বতোষের চোখে। ঠিক সেই আশ্রম উজ্জান। পাতে পাতে যবে যোমথ হুঁখানা হাত যেন বুকের পাটার চাপড় ধরতে থাকে অনর্থক। আকুলেরও যেন নখ বেধিয়েছে। মালী টুইড-এর শক্ত কাঁধ, পাঁচ পাঁচ দশ আকুলের শক্ত মুঠোর চেপে ধরে ছিটকে বেরিয়ে আসে বিশ্বতোষ। মনুত কিছু মেই। পরিষ্কার ছবি। হাতের আঁধারে আরও সন্ধান। নিজের মুখে কালি লেগে দিতে ইচ্ছে করে বিশ্বতোষের। নিজের শরীরের মাংস নিজে ছিঁড়ে খেয়ে হাড়গুলো সব মনে হলো সত্যব্রতের গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে।

দাহ আর দাহ! সমস্ত শরীরে যেন আশ্রম লেগে গেছে আর জলে পুড়ে থাক হয়ে থাকে ভেতরটা। উত্তম মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে গাড়ীতে ওঠে বিশ্বতোষ।

হরস্ত হাড়ন গাড়ী আজ এক আর্ন্তবাহী এম্বুলেন্স-কার। অপঘাতে-আহত কোন আবিবেকী পথচারীকে নিয়ে চলেছে হাসপাতাল। [ক্রমশ]

সম্পর্ক

তরুলতা ঘোষ

প্রত্যাহের
প্রত্যাহ আর রজনীর
আলো আর ছায়া দিয়ে গড়া
চলমান ব্যবধানখানি
সংখ্যাহীন মুহূর্তের অপরূপ খণ্ড দিয়ে ভরা।
তোমার বা আমার
লুকু ফুল ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ দিয়ে
হয়ত পাবনা অমুভূতি—
তবু এরা অপরূপ আপন স্বরূপে,
তাই যদি মেনে নিই তবু কিছু কথা থেকে যায়—
ভেবে দেখ তুমি আর আমি
গহন অন্তর থেকে কত রং এনে
ক্রমাগত বাড়াচ্ছি এদের।
এরা তো আরনার মত
সপ্তবর্ণ কিরে দেয়
তধু যদি পার।

তুমি আর আমি
আলো-প্রতিকলিত তুষারের
বর্ণালী দিয়ে
রূপ-রং রস বা দেবার
দিয়েছি।
একটি মুহূর্ত যদি
তুমি আর আমি
ভিন্ন-ভিন্ন রঙেতে বাড়াই, তবে
হুঁজনেতে
হুই।
হুঁজনের মাঝখানে স্তম্ভলজ্য কালের প্রাচীর।
কিন্তু যদি
একটি সোনার মুহূর্ত
তুমি আর আমি
হুঁজনেতে করি অধিকার,
একই রঙে হুঁজনে বাড়াই,

তবে শোন চূপি-চূপি বলি—

তুমি আর আমি
সেখা এক।



বিজ্ঞানভিক্ষু

সময়

আবিষ্কার বনাম দিরাঙ্কল।

"There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy"
—Shakespeare

"Philosophy contains things of which no trace can be found between heaven and earth"
—Georg, Christoph Lichtenberg
(1742-1799)

স্পিরের দিন সকালে শংকরের ঘুম ভাঙলো অমেক দেবীতে।
প্রথমেই গেল সে স্মিতার সন্ধানে। শুনলো স্মিতা
ভোর বেলায়ই বেরিয়ে গেছে হবিবুল্লাহ ল্যাবরেটরীর দিকে।
প্রাতরাশের সময় আকাশ-পাতাল অমেক কিছুই ভাবলো।
তার পর খেয়ালের মাধ্যম চলে গেল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের
গ্রন্থাগারে। সমস্ত দিন তার কেটে গেল—আইনষ্টাইনের 'জেনারেল
রিলেটিভিটি থিয়োরি'-র মূল প্রবন্ধগুলোর অহুসীলনে। সংগে
একজন রক্ষী থাকটা গা-সওয়ার মতো হয়ে উঠছিল—তাই
পড়াশুনার সময়ও তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি কোনো বিষয়ই সৃষ্টি
করল না।

লাইব্রেরী বন্ধ হবার পর সারা সন্ধ্যাটা তার কেটে গেল
উদ্ভাবিতভাবে পার্কের অপেক্ষাকৃত নির্জন কোণে ক্রমাগত
পায়চারি করে। হবিবুল্লাহ ডায়েরির হেঁড়া পাতার টুকরোগুলো তার
মাঝার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বাজছিল। "আলম্পটের স্থান পরিবর্তন?"
তার সংগে প্রাক্টিসেশনের সবকিছু কোথায়? কোন ছোটোখাটো
নৈসর্গিক স্টনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না "প্রচলিত থিয়োরি
থেকে"? "আন্তরিক শক্তি"র সংগে "থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি"র
কোন যোগসূত্র আছে কি?

"এলরিকো কার্মির ভুল" কোথায়? "কেপলায়ের মতো গণিতজ্ঞ"
কী প্রকাশ করেছেন? এ সমস্তের সংগে "চেরলকভ রশ্মি",
"পাতঙ্গল" আর "হঠাৎগীর শরীরের কীভ" এরই বা সম্পর্ক কোথায়?
কোন ইকোরেশন আছে ভাইমেনশুভ 'থিটা'? ম্যাট্রিক্সের
ইকোরেশন? কিসের ম্যাট্রিক্স?

এ সমস্ত কথার টুকরোগুলো কি কোনো যুক্তির হাতা দিয়ে
গেঁথে তোলা সম্ভব হবে? কে জানে?

ব্যারাকে কিরে এল শংকর নিততি রাতে।

শংকর স্বপ্ন দেখছিল।

একটা বিরাট প্রান্তরে সে আর স্মিতা দাঁড়িয়ে রয়েছে.....
দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর।

হঠাৎ দেখা গেল পশ্চিম কোণে ঝড়ের মেঘ...

না মেঘ নয়, কাতারে কাতারে সৈন্য এগিয়ে আসছে আকাশজুড়ে,
পিঠে তাদের বাঁধা আলুমিনিয়ামের বাঁজ।

হবিবুল্লাহ না?

হ্যাঁ, হবিবুল্লাহই তো! হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ হবিবুল্লাহ
ইনভেনশন শুরু হয়েছে।

এ কী হবিবুল্লাহর মুখ কোথায় গেল? ধোঁয়ায় তাদের সব শরীর
বিলুপ্ত হয়েছে।

না, হবিবুল্লাহ নয়—অগণিত ভাঙা বাঁজ উড়ে চলেছে। কী
সর্বনাশ!

স্মিতা, এখন কী উপায়?

স্মিতা বলে—শংকর একমাত্র উপায় হচ্ছে তোমাকে উড়তে
হবে। তুমি হচ্ছে সেনাপতি, তোমার কাছেই আছে মাধ্যাকর্ষণ
তৈরী করার বন্দুক—আকাশে উঠে মহাকর্ষ সৃষ্টি কর, তাহলেই
ওগুলো সব মাটিতে পড়ে যাবে।

তাইতো শংকর উড়বে কী করে?

নিজের দিকে তাকিয়ে শংকর দেখে যে ইী সেনাপতি ত সেই
তার পরনে রয়েছে ইউনিফর্ম—জেনারেলের ইনসিগনিয়া...

কিন্তু হবিবুল্লাহর বস্ত্রগুলো বড়ো কাছে এসে পড়েছে। চারদিক
থেকে বিমানধ্বংসী কামানের আগুয়াজ, কতগুলো বাঁজ যে কামানের
পালা অতিক্রম করে এগিয়ে এল—

—আমি তো উড়তে পারছি না স্মিতা।

স্মিতা ঘৃণ কণ্ঠে বলে,—সংসার ত্যাগ করো শংকর তা হলেই
পারবে। ওই দেখা, অমল বন্দো, আলিমচান্দানী, সুলতানমনিয়ম
সকলেই উড়ে চলেছেন। পারতেই হবে শংকর, তা নইলে দেশের
সর্বনাশ

শংকর চেঁচা করে—বিশ ফুট, ত্রিশ ফুট পর্যন্ত উঠে আবার সে নেমে যায়। আতঁকতে বলে—সুমিত্রা এখন উপায়? সন্ধ্যার বে আমার কিছুতেই বাজে না।

সুমিত্রা বলে—আচ্ছা দেখি কৃষ্ণস্বামী হয়তো একটা উপায় বলে দেবেন—

বাল্লভলোর শব্দে কথা শোনা যায় না—

সুমিত্রা বলে, শংকর দেখ দেখ কৃষ্ণস্বামী তোমার অস্ত্র উড়ন্ত গালিচা নিয়ে আসছেন।

উড়ন্ত গালিচা আসছে—ভীমবেগে।

শংকর চেঁচা বসেছে উড়ন্ত গালিচার ওপরে হাতে তার বন্ধু— হবিবুল্লার বাল্লভলো কোথায়?

ঐ যে দেখা বাজে এবার তাদের সারি।

এইবার শংকর।

শংকর বন্ধুকের মিশামা ঠিক করে মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করতে থাকে। বাল্লভলোও সব মীচে পড়তে থাকে।

একী বিকীরণ হচ্ছে কোথায়? আণবিক বোমা?

না হবিবুল্লার বাল্লভলোই কেটে বাজে।

এ কী, সারা দিগন্ত লাল হয়ে উঠছে কেন?

বহিবিহংগ।

একী, উড়ন্ত গালিচা হঠাৎ মীচে নামছে কেন?

হোম হচ্ছে। বিরাট বজ্রকুণ্ড। আগুনের লেলিহান শিখা উঠছে আকাশজুড়ে। সব বাল্লভলো তার মধ্যে পড়তে থাকে।

চুকের ছুঁবার শক্তিতে সে হোমকুণ্ড উড়ন্ত গালিচাকে টেনে নিচ্ছে। গালিচা পড়তে থাকে বাণবিদ্ধ পাখীর মতো—কী সর্বনাশ।

একজন পুরোহিত হোম করছেন। না, পুরোহিত নয়, প্রফেসর শিকদার। বাহুজ্ঞানশূন্য শিকদার এক মনে আহুতি দিয়ে চলেছে বজ্রকুণ্ডে।

কী সর্বনাশ! এখনই শংকর পড়বে যে বজ্রকুণ্ডের মধ্যে! এখন উপায়?

চীৎকার করে শংকর বলে—“প্রফেসর শিকদার আমি শংকর। আমাকে বাঁচান।”

তার গলার স্বর কোটে না।

শিকদারের কোনো বাহুজ্ঞান নেই।

তবে—

ধড়মড় করে শংকর উঠে বসে। সমস্ত শরীর তার ঘর্ষিত। বাক, স্বপ্নই তাহলে।

পরদিন প্রত্যবে শংকর হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীতে চলে গেল। প্রথমেই ঢুকলো সে গ্রন্থাগারে। ঘরের মাঝখানে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে নেয়—তারপরে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেল বইএর আলমারীর দিকে। প্রথম যে বইখানার হাত পড়ল, সেটা ফুলে নিয়ে এক জায়গায় খুলে নেয়। তারপর চোখ খোলে শংকর। তাবে, সত্যিই এটা ‘স্মাগম সিলেকশন’ হল কি না।

যে পাতাটা খুলেছিল তাতে রয়েছে—

“The phenomena I am prepared to attest are

so extraordinary, and so directly oppose the most firmly-rooted articles of scientific belief—amongst others, the ubiquity and invariable action of the force of gravitation—that, even now, on recalling the details of what I witnessed, there is an antagonism in my mind between *reason*, which pronounces it to be scientifically impossible, and the consciousness that my senses, both of touch and sight... are not lying witnesses.”

এবং এটা তার উইলিয়াম জুকস্-এর লেখা। তার শিরোনাম—*Researches into the phenomena of Modern Spiritualism*. এটা প্রকাশিত হয়েছিল *Quarterly Journal of Science*, আঠাংশে একাত্তর সালে।

সমস্ত বইখানার এইরকম অনেকগুলো পুস্তিকার সমাবেশ।—হবিবুল্লা বাবিরে মিরোহিল মরোহো লেদারে। শংকর পাতা উল্টে যায়। এটা বিখ্যাত দ্বৈতিক ড্যানিয়েল ডগলাস হোম-এর শূভে বিচরণের কাহিনী।

ড্যানিয়েল ডগলাস হোম।

এখানেই তাহলে হবিবুল্লা পেয়েছিল ওই নামটা।

শংকর উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ বাদে গ্রন্থাগার থেকে কল্পিউটার-এর ‘ম্যায়ুয়েল’ ও কল্পিউটার সংক্রান্ত আরো কতকগুলো বই যোগাড় করে সে ওপরে কল্পিউটারটর পরীক্ষার মগ্ন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে রাও এসে উপস্থিত হল সেখানে। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় সেদিন অপরাহ্নে কল্পিউটারগুলো চালু করা হল।

সেদিন থেকে হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীতেই মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রান্নাঘর থেকে প্রয়োজন মতো চা-কফি বা অল্প পানীয়ের-ও সরবরাহ হচ্ছিল। কাজেই দিনের মধ্যে ব্যারাকে ফিরবার প্রয়োজন ছিল না।

মাঝে একবার গ্রন্থাগারে উঁকি দিয়ে শংকর দেখল সুমিত্রা আর কোঁল একরাশ বইএর গাদার মধ্যে ইন্ডেন্টরী নিতে ব্যস্ত। অস্ত্রত ঘরেও সহকর্মীদের কর্মব্যস্ততার সাজা। নীচের তলার বিরাট ‘পাওয়ার প্ল্যান্ট’কে চালু করানো হয়েছে। সমস্ত বাড়ীটা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে রীম্-রীম্ রীম্-রীম্ শব্দে। শংকরের মনে হল যেন সেটা বহিবিহংগের পাখার শব্দ।

‘ফায়ারবার্ড’ প্রাণ পেয়েছে আবার! ফিনিজের নিজাজগৎ হয়েছে।

সে দিন সন্ধ্যার আগে হবিবুল্লার গ্রন্থাগার থেকে সার উইলিয়াম জুকস্-এর বইয়ের ভাড়া নিয়ে শংকর ব্যারাকে ফিরে এল একাই। হলঘরে প্রবেশ করে এককাপ কফি নিয়ে বসে যায় সে। সহসা তার নজরে পড়ে যে প্রফেসর শিকদারও আর একটা টেবলের পাশে বসে আছেন একা। শংকরকে দেখে শিকদার তাকে আহ্বান করলেন—“এই যে দায়—এসো—এদিকে এসে বোসো।”

শংকরের মনে পড়ে গভীরতার স্বপ্নের কথা। প্রথম পুরোহিতের



মায়ের মমতা ও অষ্টারমিস্কে প্রতিপালিত

আপনার শিশুর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আপনি ওর সেরা রক্ষণ মাতৃর ক্রটি রাখার জন্য মাতৃদুগ্ধ ডালবাসার সাথে ওকে নিয়মিত অষ্টারমিস্ক দিয়েছেন। কারণ আপনি জানেন যে অষ্টারমিস্ক ঠিক মায়ের দুগ্ধের মতো। খাঁটি দুধ থেকে অষ্টারমিস্ক প্রস্তুত করা হয়েছে। আর সে জন্য সর্বোৎকৃষ্ট হয়।

শিশুর মতামত থেকে জানা-
বার জন্য অষ্টারমিস্ক পৌছ
আছে। এতে বিটামিন 'ডি' ও
যোনি কলা হ্যাটস, ফলে আপ-
নার শিশুর দাঁত ও হাড়কে
মজবুত করে গড়তে সাহায্য
করে।



...মায়ের
দুধেরই মতন

বিনামূল্যে! "অষ্টারমিস্ক পুস্তিকা" (ইংরেজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সব রকম তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের জন্য
৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়, 'অষ্টারমিস্ক' পোস্ট বক্স নং ২২৫৭, কোলকাতা-১

বেশে প্রকেশর শিকদারকে চমৎকার মানিয়েছিল কিন্তু। হাসি চাপতে গিয়ে শংকর বিষম ধায়।

শিকদার তার ভাবান্তর লক্ষ্য করেননি। শংকর পাশে গিয়ে বসতেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের সুরেই প্রশ্ন করেন, “কী হে, তোমাদের ‘স্পুটনিক’ আকাশে উড়ছে কবে?”

শংকর একটা পান্টা বসিকতা করবার চেষ্টা করে, “স্পুটনিক আকাশে উড়লেও তো আপনাকে ছাড়া তা উঠবে না জমি থেকে।”

শিকদার পরম বিস্ময়ের ভান করেন, “বলো কী হে, আমাদের মতো বুড়াদের নিয়ে কী হবে? আমরা হচ্ছে নেহাতই মাটির মানুষ। তোমরা হচ্ছে নব্য বৈজ্ঞানিক, আকাশপথে বিচরণ তো তোমাদেরই একচেটিয়া। সে কাজে বিজ্ঞানের যতোটুকু ঘাটতি, কল্পনায় তা পূরিয়ে যায়।”

শংকর এবার তর্ক শুরু করে, “আপনার মতে, ব্যাপারটা তাহলে সম্ভব নয়?”

শিকদার শুক হেসে বললেন, “অসম্ভব কথাটাই হিন্দী-বিজ্ঞানের অভিধান থেকে বাদ পড়ে গেছে। আজকাল কথা বলার আগে ‘প্রোবাবিলিটি’ বা সম্ভাব্যতার মাপকাঠিতে সবই মাপ করে নিতে হয়। সে হিসেবে বলতে হয়—হবিবুল্লার যন্ত্রের ‘প্রোবাবিলিটি’ আমার ইংলণ্ডের রাজা হওয়ার সম্ভাবনার মতো।”

শংকর প্রশ্ন করে, “তাহলে হবিবুল্লা সেটাকে সম্ভব করেছিল কী করে?”

শিকদার বলেন, “সম্ভব হোলো কী করে? এ প্রশ্নের অনেক সহস্রাব্দই দেওয়া যায়। প্রথমতঃ হবিবুল্লা অ্যাটিগ্র্যাভিটি সম্ভব করেনি, কিন্তু ক্যামেরার চোখকে কাকী দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, যদি বা হবিবুল্লা আকাশে উঠবার একটা যন্ত্র তৈরী করে থাকে, অ্যাটিগ্র্যাভিটির সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তৃতীয়তঃ—”

শংকর বাধা দেয়, “তার মানে?”

শিকদার বলেন, “বুঝতে পারলে না? প্রথম রাজ্যে আলোচনার সময় তুমিই তো এর একটা সমাধান দেখিয়েছিলে। মহাকর্ষ একটা শক্তি সে শক্তির সংগে লড়াই করা যায় পান্টা শক্তি লাগিয়ে।”

শংকর বলে, “কিন্তু অতোটুকু যন্ত্রের থেকে অত বড়ো শক্তি পাওয়া বাবে কী করে? এক পাউণ্ড মাল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাইরে পার করতে গেলে রসদই পোড়ানো চাই কমপক্ষে দু’-তিনশো পাউণ্ড। পরমাণু শক্তির মতো কোনো অভ্যুগ্রশক্তি দিয়ে হবিবুল্লার যন্ত্রের মতো ছোটো একটা যন্ত্রেও সেটা সম্ভব হতে পারে বলে সেদিন একটা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু সে আন্দাজ তো ভুল প্রতিপন্ন হল।”

শিকদার বলেন, “তোমরা কোনো জিনিসই তলিয়ে ভাবতে চাও না। চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসো। ছবিতে আমরা যতোদূর দেখেছি হবিবুল্লা তো মহাপুরুষ অবধি পৌছানি, কোনো রকমে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট অবধি উঠেছিল জমি থেকে। হিসেব করেই দেখো না কেন? কতটুকু শক্তির দরকার তিনশতলা অবধি পৌছাতে? একটা মাঝারী ধরণের হাউইন্ডেই সে কাজ চলে যেতে পারে। যদি বলো—হবিবুল্লা একটা নতুন ‘প্রোপালশন’ এর কায়দা আবিষ্কার করেছিল—আমি বলব সেটা অবশ্য সম্ভাবনার বাইরে নয়। কিন্তু তাতেও আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।”

শংকরের মনে কণিক সন্দেহের দোলা কিন্তু তর্কে তা প্রকাশ পেতে দেয় না, বলে, “তাহলে বলতে চান ‘অ্যাটিগ্র্যাভিটির কথাটা মিথ্যে?’”

শিকদার বলেন, “বস্তুতঃ তাই দাঁড়াচ্ছে নাকি? প্রত্যেক বিজ্ঞানের ছাত্রের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক ঘটনারই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা। ‘অ্যাটিগ্র্যাভিটির’ কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয় না, কিন্তু অ্যাটিগ্র্যাভিটি বলে যে ঘটনাটা আমাদের দেখানো হোলো—সেটার ব্যাখ্যা সম্ভব হলেও হতে পারে।”

শংকরের মনটা দমে যায়। ভ্রমলোক হবিবুল্লার যন্ত্র সম্বন্ধে একেবারে মন স্থির করে ফেলেছেন, এ মন্ত বদলানো বাবে না কোনো বুদ্ধি-তর্ক দিয়ে। তবুও চেষ্টা করে সে—

“হবিবুল্লার যন্ত্রের কথাটা না হয় আপাততঃ বাদ দিলাম। কিন্তু প্রকেশর শিকদার, আপনার মতে আজকের দিনের সব মন্তবাদই কি অকাটা? নতুন কোনো বড়ো আবিষ্কারের স্থান নেই কি, আগামী দিনের গবেষণায়?”

শিকদার বলেন, “এইজ্ঞেই তো তোমাদের সংগে তর্ক করতে চাই না। আবার কোনো বিচার না করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলে? তুমি জিজ্ঞাসা করছ—আমার মতে সব থিয়োরি নির্ভুল কী না।”

“না, নিশ্চয়ই নয়। অনেক মন্তবাদই আজ প্রচলিত—যেগুলো আর দশ বছরও খোপে টিকবে না। বরঞ্চ আজকালকার তরুণ বৈজ্ঞানিকদের ‘ক্যাশন’-ই হচ্ছে ভালো করে সব জিনিসের পরীক্ষা না করেই রাতারাতি একটা ‘থিয়োরি,’ একটা মন্তবাদ বা একটা ‘ইকোয়েশন’ বের করে দেওয়া। দুঃখের বিষয়, খ্যাতির অমৃতফলও পেয়ে যান এঁরা রাতারাতিই। কিছুদিন পরে অতি যত্নের সংগে নির্ভুল পরীক্ষা করার পর দেখা গেল যে সে থিয়োরি অচল। তাতে কিন্তু ‘থিয়োরি’র শ্রমের কিছু যায়-আসে না। ততদিনে তিনি অমৃতফলটি হজম করে আবার এক জমকালো থিয়োরি বাজাবে ছেড়েছেন।”

“কিন্তু সব থিয়োরি তো ভুল নয়, যায়। কতকগুলো বহু পরীক্ষিত মন্তবাদের ওপরে নির্ভর করে বিজ্ঞান ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে। এ মন্তবাদগুলো এনে দিয়েছে তথাকথিত ‘থিয়োরি-পঙ্কলেট হাইপোথিসিস’ কটকিত রাজ্যে পরম শৃংখলা। এই সমস্ত সত্য আহরিত হয়েছে তিলে তিলে, যুগে যুগে বহু শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার উজ্জ্বলতম অবদান। মৃত্যুকে এই মহাপুরুষেরা ভয় করেননি। কুসংস্কারের মোহজাল এঁদের বন্ধন করতে পারেনি। একটু আঁটু হয়তো হিসেবের গরমিল পাওয়া যেতে পারে এঁদের আহরিত জ্ঞানে—কারণ শূন্য যন্ত্রপাতি তো তখনও তৈরী হয়নি। কিন্তু মূল সত্যগুলোর বনিয়াদ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।”

“তার ফলে আজ ছনিয়ার রূপ বদলে গিয়েছে।”

“আমি একথাও স্বীকার করি যে ভবিষ্যতে জগতাবেন আরো নিউটন, আরো কেপলার, আরো আইনষ্টাইন। এঁরা শোনাবেন আরও চমকপ্রদ নতুনতর কথা। কিন্তু হবিবুল্লার মতো একজন অধিশিক্ষিত দার্শনিক উদ্ভাসের পক্ষে তা সম্ভব নয়।”

শংকর বুদ্ধি তোলে, “কিন্তু হবিবুল্লাকেই বা একটা তাহিল্য করছেন কেন আপনি? ল্যাবরেটরীর কতকগুলো যন্ত্রপাতির যে

ভাবে সন্নিবেশ করেছিল হবিবুল্লা, দেশে বা বিদেশেও এমন অদ্ভুত কর্মনৈপুণ্য আমার নজরে পড়েনি। ধরুন না কেন, কম্পিউটারগুলোর কথা। কেবলমাত্র যন্ত্রগুলোর ব্যবহারেই যে হবিবুল্লা পারদর্শী হয়েছিল তা নয়, মূল যন্ত্রগুলোর সংগে অনেক নতুন সার্কিটও সে যোগ করেছিল। বলতে গেলে পুরো 'অ্যানালগ কম্পিউটার'টাই প্রায় নিজের হাতে গড়ে তুলেছিল। এগুলো থেকে পরিচয় মেলে তার স্বকীয়তার, তাৎ অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির।

"আর অধঃশিক্ষিত বলছেন কাকে? তার প্রহাঙ্গারে রয়েছে সাত হাজার বই—প্রতি বইখানাই সে নাড়াচাড়া করত। দোষের মধ্যে বলতে পারেন—হবিবুল্লা কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ড কি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হবার সুযোগ পায় নি।

"হবিবুল্লাকে যদি অনধিকারী বলে বাতিল করে দেন, তাহলে ১১০৫ সালে পেটেন্ট অফিসের এক নগণ্য কেরাণীকেও বাতিল করা উচিত ছিল, কয়েক বার ইন্টারমিডিয়েট ফেল করা ছাত্র রামামুল্লকেও বাতিল করা উচিত ছিল আর তৃতীয় শ্রেণী অবধি বিত্তা বলে রবীন্দ্রনাথকেও বাতিল করা উচিত ছিল। এই উল্লাসিক আশ্বস্তুরিতা—"

শিকার হাত তুলে বলেন, "ধীরে রায়, ধীরে। বক্তৃতাটা না করলেও চগবে। আমি বলি কি, তুমি হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীটা আর একবার ঘুরে দেখে এসো। মেনে নিচ্ছি যে কতকগুলো যন্ত্রের সন্নিবেশে অসাধারণ কর্মক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন তোমার 'কম্পিউটার'। আমি অল্প কম্পিউটারের 'সার্কিট

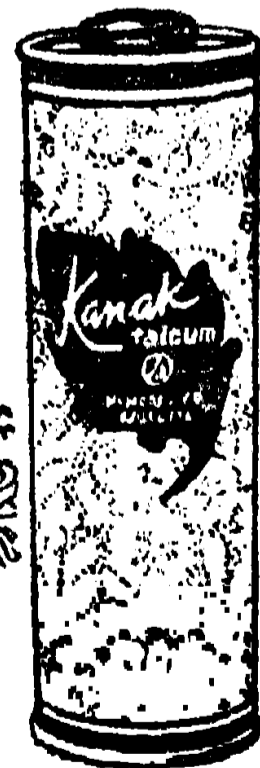
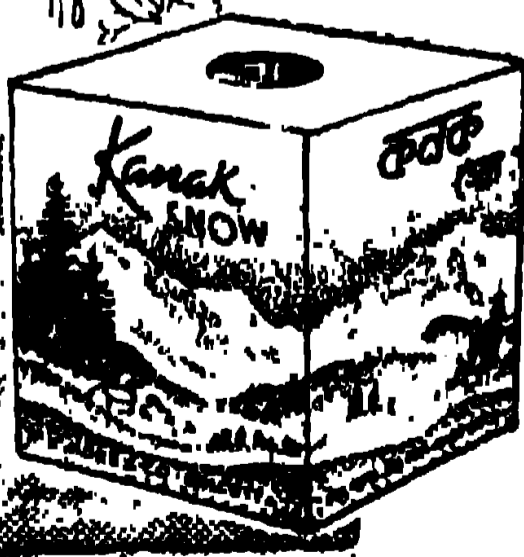
সম্পর্কে বিশেষ খবর রাখি না, কাজেই উদ্ভাবনী শক্তির কথাটার সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারব না। কিন্তু যে লোক কোনো কোনো যন্ত্র গড়ার কাজে প্রশংসনীয় বুদ্ধিমত্তার বা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে, সেই লোকেই গড়া অল্প অনেক যন্ত্রে অত্যন্ত অনবধানতা বা অজ্ঞানতার ছাপ স্পষ্ট। দোতলায় কোণের ঘরটাতে আছে একটা 'ম্যাগনেটোমিটার' তার 'সার্কিট'টা ভুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র এ ভুল করত না। সে ঘরেই আছে একটা 'টাইম-রীলে' সুইচ টেপার পরও সংযোগের সময় নির্দিষ্ট ভাবে বিলম্বিত করবার জ্ঞান। তাতে তিনটে বাড়তি 'ড্যান্ড' লাগাবার কোনো সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। নীচের তলার 'ইলেক্ট্রন ডি ফ্রাকশন ক্যামেরা'-র ডায়াক্রাম করবার ব্যবস্থাতে দোষ রয়ে গেছে। এ রকম আরো অনেক অসংগতি চোখে পড়বে যদি ভালো করে লক্ষ্য কর। তোমাদের প্রধান দোষ, কোনো কিছুই তোমরা খুঁটিয়ে দেখতে চাও না।"

"তারপর, হবিবুল্লার প্রহাঙ্গার। বিজ্ঞানের অমৃতবসের সন্ধান যে পেয়েছে ওই সব 'ট্রাশ' প্রেতিনীরহন্তে কী করে তার মন ভরতে পারে—আমাকে ব্যথিয়ে দাও তো।"

"শেষে একেবারে মোক্ষম যুক্তি তুলতে চাও—রবীন্দ্রনাথ আইনষ্টাইনের নজীর তুলে। আইনষ্টাইনের মূল প্রবন্ধগুলো আর একবার পড়ে দেখলে তোমার যুক্তির অসারতা বুঝতে পারবে। মূল কথাটা হচ্ছে—আইনষ্টাইন কোনো চটকদার যন্ত্র আবিষ্কার করেন নি। তিনি বললেন—বিশ্বজগৎটা এই রকম ভাবে দেখলে অনেক জিমিসেই



আনন্দ উৎসবে ক.হাডের প্রসার্দন সামগ্রী



ক.হাড ২৩ কোং • কলিকাতা-১০

হিসেব মিলে যায়। আপেক্ষিকতাবাদ করলেন অনেক ভবিষ্যদ্বাণী, যেমন মহাশূন্য আলোকতরঙ্গের গতিবেগটাই হচ্ছে সমস্ত পদার্থের গতিবেগের সীমা। তিরিশ বছর পরে সাইক্লোট্রন বহু তৈরী হবার পর তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ইলেকট্রনের ওপরে চুম্বকের সাহায্যে তিন শত গুণ শক্তি প্রয়োগ করলে তার গতিবেগ হওয়া উচিত ছিল আলোকতরঙ্গের তিরিশ গুণ—‘থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি’ সূত্র্য না হলে। কিন্তু কার্যক্রমে দেখা গেল যে সাইক্লোট্রনের দৈত্যাকার সংকরণ ‘কসমোট্রন’-এর শক্তি নিয়েও কোন পরমাণুকণাই আলোক-তরঙ্গের গতির সংগে পালা দিতে পারেন—ছাড়িয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। এ ছাড়া তাঁর আরো কতো ভবিষ্যদ্বাণী কালের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছে—সে সব কথা তোমরা তো পাঠ্যপুস্তকেই পড়েছ। তা সত্ত্বেও আইনস্টাইনের প্রতিষ্ঠা তো বাতারাতি সম্ভব হয় নি?

“আর তোমাদের হবিবুল্লা করলেন কী? কোনো বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা মতবাদের ধার দিয়ে না গিয়ে বাতারাতি একেবারে অ্যাণ্টিক্রাভিটি-মেশিনই আবিষ্কার করে বসলেন। ছেঁড়া কাগজের টুকবোর পাওয়া গেল গুরুগভীর কথা কাকতালীয় জায়, সানস্পট, চেয়েনকক রশ্মি, ফার্মিওন ভুল—আর চিরকুটে হয়তো বা বাজারের হিসেব। তোমরা যদি প্রচার করতে চাও এই কথা—যে হবিবুল্লা ছিল শতকরা একশোভাগ জীনিয়াস—আমি বলব কলকাতায় আমাদের বাড়ীর পাশের বিন্দে সেকরাও ছিল জীনিয়াস। তার হাতের কাজ নাকি ছিল অসাধারণ, আর গহনার নূতন ডিজাইনও সে মাঝে মাঝে করত।

“তবে তোমার হবিবুল্লার একটা ক্ষমতার কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হয়। তার তথাকথিত আবিষ্কারের ফলে আমাদের ক’জনের বেশ জামাই আদরেরই দিন কাটছে—গারী সেনের পরসার।”

শংকর অবশ্য এ সব মন্তব্যের জবাব দিতে পারত। বড়ো বড়ো লোকের ভুল কি হয় না? গণিতের অনেক মহাপণ্ডিত সপ্তাহে সপ্তাহে নূতন ‘সিরিজ’ আবিষ্কার করতে পারেন, দুই হুঁরিয়ার ট্রান্সফরমেশন করে কেলেণ্ডার তারা চোখের নিবেশে—কিন্তু বাজারের হিসাবে প্রায়ই তাঁদের গরমিল দেখা যায়। পুস্তক ‘ম্যাগনেটোমিটার’ এর মতো অতি সাধারণ বস্তু হবিবুল্লার ভুল এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু সত্যিই তো শিকদারের মতো সব বস্তু সে খুঁটিনাটি পরবেক্ষণ করে নি। কাজেই সে বিপজ্জনক তর্কের অবতারণা না করে—তর্কের ধারা বদলাবার চেষ্টা করে—

“হবিবুল্লার লাইজেরীর কথা একটা বিষয় মনে এসেছে, প্রফেসর শিকদার। যুগে যুগে বিজ্ঞান-বহির্ভূত নানা রকম বিষয়—যেমন “মেটাক্সিজিট”, আত্মার স্বরূপ ইত্যাদি অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকেরই কোঁতুল আকর্ষণ করেছে। সার উইলিয়াম ক্রুকস জীবনের শেষের দিকে আত্মা আর মাধ্যমিকের ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছিলেন, অনেক লুপ্ত বস্তুপাতি গড়ে তুলে সে ক্ষমতার পরিমাপ পর্বত করেছিলেন। তারপর, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কি আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটিতেও ইঞ্জিয়ার্সীত বোধ—‘একট্রা সেন্সরী পারশেপশান’ সম্বন্ধে রীতিমতো গবেষণা আজও চলছে। অনেক বুদ্ধিমান পণ্ডিতও বিশ্বাস করেন এ রকম একটা ক্ষমতার অস্তিত্বে। তা ছাড়া নির্ভরযোগ্য বহু লিপিবদ্ধ কাহিনী রয়েছে

‘মিরাকুল’ বা অলৌকিক ঘটনার—বুদ্ধিতে ধার ব্যাখ্যা চলে না। যেমন ধ্বনন, নিউগিনির বহু অধিবাসী সামনের ওই মিলিটারি ট্রাকটাকেই ভুল করবে অলৌকিক ব্যাপার বলে। এ সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?”

শিকদার বললেন, “বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে না—‘বুড়ো বয়সে ভীমরতি।’ সার উইলিয়াম ক্রুকসের সেই দশাই হয়েছিল। তা ছাড়া শেষ জীবনে ক্রুকস তথাকথিত আত্মিক শক্তি সম্বন্ধে তাঁর অনেক ‘নোট’ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন তথাকথিত মাধ্যমিকের দল তাঁর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁকে প্রবঞ্চনা করেছে।

“আর, একট্রা-সেন্সরী পারশেপশান বা ‘প্যারাসাইকলজি’ নিয়ে বচসার শেষ হয়নি। প্রথমতঃ অল্প অনেক বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার সোল অধার জে বি রাইনের অনেক ফলাফল সমর্থন করা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষকের বিশ্বাস বা অশ্বাসের ওপরে নির্ভর করে এ সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল আর তার ব্যাখ্যা।”

“তারপর তোমার প্রশ্ন ‘মিরাকুল’।”

“তথাকথিত মিরাকুল আর অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেটা কি তোমার মতো কৃতী ছাত্রকে বলে বোঝাতে হবে? বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রমাণসাপেক্ষ। কোনো পণ্ডিত হয়তো মস্তো থেকে ঘোষণা করলেন যে তিনি একটা আশ্চর্য ঘটনা বা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। এখানে দিল্লীতে বসেই সম্ভব হবে মস্তোর পণ্ডিতের সে পরীক্ষা হবহু নকল করার। তোমার পরীক্ষাতেও একই ফল পাওয়া যাবে। রঞ্জনের ‘একসুরে’ আবিষ্কার একটা অভাবনীয় ঘটনা কিন্তু আজ বিজ্ঞানের যে কোনো ছাত্রের পক্ষে সম্ভব ‘একসুরে’ তৈরী করা।

“আর মিরাকুল বা অলৌকিক ঘটনা এমনই একটা জিনিস, যে সাধারণ লোক হাজার চেষ্টা করলেও সেটা আবার সম্ভব করতে পারে না। ধরো, আজ রাতে তুমি স্বপ্ন দেখলে যে মংগলগ্রহের প্রধান মন্ত্রী হয়ে বসে আছে। মিরাকুল সম্বন্ধে তোমার অত্যাশ্চর্যের বিবরণী কতকটা সেই রকম আর কি!”

শংকর প্রতিবাদ করে, “কিন্তু ‘মিরাকুল’ সম্বন্ধে একটা খোলা মন রাখা উচিত নয় কি আমাদের? অনেক অলৌকিক ঘটনার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও তো থাকতে পারে। একটা উদাহরণ—যেমন ধূমকেতু। ইচ্ছা করলেই তো আমরা ধূমকেতু সৃষ্টি করতে পারছি না—বা রোজই তা দেখতে পাচ্ছি না। নিউটনের পরবর্তী যুগে বৈজ্ঞানিকদের ধূমকেতু অস্তিত্বটাই উড়িয়ে দেবার একটা হস্তকর চেষ্টা ছিল—যেহে ধূমকেতুর সম্বন্ধে তখনকার জানা বিজ্ঞান থেকে কোনো ব্যাখ্যা মিলত না।

“সেদিন রাতে আপনিই একটা কথা বলেছিলেন—আমার মা আছে কথাটা। ম্যাগিসিয়ান থলি থেকে খরগোশ বের করে চলবে একটার পর একটা করে। এর একটা সহজ সরল ব্যাখ্যা নিশ্চয় আছে। ‘মিরাকুল’-এর কী এই রকম কোনো ব্যাখ্যা থাকা পারে না?”

শিকদার এবার অটহাস্ত করে উঠলেন, “আর, এবার নিজে আলো দিয়েই ধরা পড়ে গেছে। এ পৌলোকধাঁধা থেকে

পেতে গেলে মনস্থির করে নাও। সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপরে আস্থা রাখবে, না মিরাকুল-এর মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়াবে বিশৃঙ্খল খেয়ালে। তোমাদের মনটা এখনও কাঁচা। অভিজ্ঞতার মূল্য তো এইখানেই—বাজে চিন্তার সময়ের অপব্যয়টা বেঁচে যায়।”

শংকর লজ্জা পায় নিজের নিবৃত্তিতার—একটু স্কন্ধও হয়। কী ভাবে শিকদার আলোচনাটার মোড় ঘুরিয়ে তারই অন্ত্রে তাকে পরাস্ত করে দিলেন। না, এবার থেকে বেশ হিসেব করেই শিকদারের সংগে কথাবার্তা বলতে হবে।

শংকরকে নিরস্তর দেখে শিকদার আবার বলেন, “বাবু, তোমার পূর্ববেক্ষণ ক্ষমতা সখকে আমার ধারণাটা উঁচু না হলেও, তোমার জ্ঞান ও প্রতিভার আমার আস্থা আছে। অন্তত: তোমার ‘ইউনিফরমিটি ফিল্ড থিয়োরি’ সখকে প্রবন্ধগুলোর সারবান বুদ্ধি মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। তাই একটা উপদেশ দিচ্ছি। লক্ষ্য করছি, ইদানীং তুমি হবিবুল্লাহ লাইব্রেরীর ‘ট্রাশ’গুলো খাঁটতে সুরু করছো। ও সমস্ত ছেড়ে দাও। আমার ধারণা ক্রমশই দৃঢ়তর হচ্ছে যে হবিবুল্লাহ শুধু ‘প্যারানইয়া’ই ছিল না, তার Schizophrenia ও ছিল।”

শংকর এখন প্রসংগটার মোড় ঘোরাতে পারলে বাঁচে। জিজ্ঞাসা কবে, “আচ্ছা, হবিবুল্লাহ ল্যাভরেটরীতে আর কী দেখলেন?”

শিকদার বলেন, “সবটা দেখা এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সবচেয়ে খটকা লাগছে একটা ব্যাপারে—হবিবুল্লাহর অন্ত বড়ো ল্যাভরেটরীর প্রয়োজন কী ছিল? পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাভরেটরীর সংগে রসায়নাগারই বা কেন? ‘আর্গনমি’ই বা চুকলো কী করে এর মধ্যে? গবেষণাগারের আয়তন আর সাজসরঞ্জামের বাহুল্য দেখে মনে হয় যে কমপক্ষে দশ বায়োজেন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ওর মধ্যে গোটা জীবনই কাটিয়ে দিতে পারেন নতুন কোনো বস্তু আবিষ্কার না করেও। অনর্থক এ অর্থব্যয়ের প্রয়োজন কী?”

“হবিবুল্লাহর স্বভাবটা ছিল অনেকটা আমাদের সেনগুপ্ত সাহেবের মতো। সেনগুপ্ত এখন গবেষণা ছেড়ে দিয়ে ক্যাটালগ দেখছে কোন বস্তুটা নতুন বেরিয়েছে। কাজে লাগুক বা না লাগুক সেনগুপ্তের সেটা চাই-ই চাই। তা নইলে বৈজ্ঞানিক সমাজে তার মান থাকে না।”

বাইরে থেকে এল মিলিটারি ট্রাকের শব্দ। শিকদার এবার উঠে পড়েন, বলেন—“আজ তাহলে ওঠা বাক। ওই দেখ, তোমাদের ‘প্লেটনিক’-এর দল আকাশজয় করে ফিরে এসেছে। মহা হঠগোলের সৃষ্টি হবে এবার।”

যেতে যেতে শিকদার একবার শংকরের দিকে ফিরে তাকান তারপর শেষ মন্তব্য করেন—“একটা কথা কিন্তু জেনে রেখো, বাবু, তোমাদের এই অ্যাণ্টিগ্রাভিটির মূল রহস্য উদ্ঘাটন না করে আমি ছাড়ব না।”

যদি ফিরে শংকর স্থান করতে পেল।

যে সমস্ত নতুন ‘আইডিয়া’র শাখা-প্রশাখা গড়িয়ে উঠছিল

তার মূল যেন শিথিল হয়ে এসেছে। শিকদারের বুদ্ধির সারবত্তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু ভুললোককে ভুল প্রতিপন্ন করার এতো আশ্রয়ই বা কেন তার?

বৈজ্ঞানিক পরপরামের প্রকৃতি চলেছে আর একটা আবিষ্কারের উচ্ছ্বাস করার জন্য। সে চেষ্টার ভার হোক, অভ্যর্থনা হোক যে কোনো উপায়ে বাধা দেবার এই অদম্য প্রবৃত্তি কেন? ভুললোক তো আর শংকরের কোনো ক্ষতি করেন নি।

সুমিত্রা হয়তো এই বিজ্ঞিতার একটা বিশ্লেষণ করে কেলত। কী আছে এই যুগ্মতার মূলে? শিকদারের অসাধারণ পণ্ডিত্য আর পূর্ববেক্ষণ ক্ষমতার ওপর একটা অন্ধ ঈর্ষা? না, ভুললোকের আত্মতরিতার প্রতি একটা অহেতুক ঘৃণা?

কিন্তু শিকদারকে ভুল প্রতিপন্ন করতেই হবে।

শংকর মনকে শাসন করার চেষ্টা করে। যে শংকর বাবু, সহজে শিকদারকে পরাস্ত করতে পারবে না তুমি। পূর্ববেক্ষণ করার শক্তিটা বাড়তে হবে অনেক, কাজও করতে হবে আর সব বাজে চিন্তা বিসর্জন দিয়ে কাঁকী দিলে চলবে না। সহজ নয় খণ্ডন করা বড়ো শিকদারের বুদ্ধিগুলো।

একমাত্র পথ হচ্ছে, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে অ্যাণ্টিগ্রাভিটি সম্ভব হবিবুল্লাহর পছন্দ হোক কি অন্য ভাবেই হোক।

কিন্তু সম্ভব বললেই তো আর কারোঁকার হচ্ছেনা, কাজে সেটার প্রমাণ করা যায় কী করে? কোথায় আছে উপায়?

সুমিত্রা—সুমিত্রাই সুখী—ওকে এতটা বিধাঘ্নে হাবুডুবু খেতে হয় না। মনোবিজ্ঞানী হলে কী হয় আসলে নারীশুলভ ‘ইনস্ট্রিক্ট’-লৈব প্রেরণা হচ্ছে ওদের সব বিশ্বাসের মূলে। ওর কাছে অ্যাণ্টিগ্রাভিটি একটা আবিষ্কার মাত্র। যেমন পেনিসিলিন বা ‘রেভার’ হবিবুল্লাহ বা পারে শংকরেরও তা পারা উচিত। একেবারে সোজা বুদ্ধি!

শংকর অহুভব করে, ‘অ্যাণ্টিগ্রাভিটি’তে তার বিশ্বাস যেন দানা বাঁধতে পারছে না। তুলানগের একদিকে দু’হাজার বছরের পুঞ্জীভূত জ্ঞানের সমষ্টি অন্তর্দিকে একটা ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের বাস। একদিকে শিকদারের দৃঢ় অবিশ্বাস, অন্তর্দিকে সুমিত্রার সরল বিশ্বাস!

হবিবুল্লাহর বস্তুটা হয় একটা ‘আর্টিক্যাক্ট’-একটা মিথ্যা একটা প্রবন্ধনা, না হয় একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। যথাসম্ভব শীঘ্র চাই একটা নির্দেশ একটা প্রেরণা, একটা সিদ্ধান্ত। নচেৎ শিকদারের কাছে বোধ হয় পরাজয় অনিবার্য। দারা ভারতের লোক আজ তাদের বারোজনের মুখ চেয়ে বিকল মনোরথ হলে যনিরে আসবে জাতীয় বিপর্যয়।

চোখের সামনে জেগে ওঠে রাজের সেই দুঃখপূর্ণ হাজার হাজার, লক্ষ-লক্ষ সৈন্য আকাশ জুড়ে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসছে আক্রমণ করতে, পিঠে তাদের অ্যালুমিনিয়ামের বাস।

দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শংকর প্রতিজ্ঞা নের, এ সমস্তা সমাধানের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করতে হবে কাল থেকে।

[ক্রমশ]

যদি জানতাম

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

বড় মনুষ্যগতিতে দিন কাটছিল হিমালয়ের। নিরানন্দ একঘেয়ে দিন বিশ্বাস লাগে। বন্ধুদের সাহচর্যও তার আর ভালো লাগে না আদর্শে। কারণ তাদের হাসি তামাসার কলোচ্ছ্বাসে ওয় অন্ধের সুর মেলে না। সময়সীমাদের হাসি গল্প নিতান্ত ছেলেমানুষী বলে বোধ হয়। নিজেই যে অকালবৃদ্ধ হয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারে না সে।

বেশীভাগ সময়ই তার কেটে যায় আপন পড়ার ঘরের কোণটিতে। এমন ঘরকুণো হয়ে গেছে ও যে বাড়ীতে কোন বন্ধুবান্ধব দেখা করতে এলেও আজকাল বিরক্ত লাগে ওয়। দেখা করতে আদর্শে ইচ্ছা করে না।

অবশেষ অবশ্য এর মধ্যে একদিন এসেছিল। হিমালয় বলতে না চাইলেও ওয় পেটের ভেতর তাড়নার ডুবুরী নামিয়ে সমস্ত কথা টেনে তুলে নিয়েছিল জোর অবরুদ্ধ করে। কিন্তু সেদিনের সব কথা শোনবার পর সেও ভেঙে পড়েছিল একেবারে।

সকলুণ ভাবে বলেছিলো—জোর ভালো করতে গিয়ে খারাপই করলাম শুধু। পারিস তো আমার ক্ষমা করিস ভাই।

হিমালয়ি সান্ত্বনা দিয়ে বলে—না না তোমার আর দোষ কী এতে? স্নেহনকে যে ওঁরা এতখানি বিশ্বাস করে কেলেন তাতো আমিও বুঝতে পারিনি আগে।

আর কিছু বলেনি অবশেষ। মাথা নীচু করে সেই যে সে চলে গিয়েছিল—আর আসেনি।

অন্তান্ত বন্ধুদের হিমালয়ি নিজেই সবকিছু এড়িয়ে চলে। এমন কি তার জন্মে অনেক সময় আজকাল পাওনার তাড়ানোর মত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে সে। তাই তার বৃদ্ধমান চাকর দীনেশচরণ মিলিটারীর মত জোর কন্ডমে বেরিয়ে এসে হিমালয়ি দর্শনাভিলাষী আগন্তুককে জানিয়ে দিয়ে যায় দাদাবাবু বলেছিলেন যে দাদাবাবু বাড়ীতে নেই। এর পর বন্ধুদেরই বা দোষ কি।

অবশ্য হিমালয়ি এই পলাতক মনোবৃত্তির সব চেড়ে বড় কারণ হোল লোক লজ্জা।

ওয় বিয়ের কথাটা বন্ধুমহলে এতদিন ছিল সর্বজনবিদিত। আজ সেটা নাকচ হয়ে যাবার খবরটাও তপ্ত খোলায় ভাজা খৈয়ের মত ছড়িয়ে পড়েছে চার দিকে। কিন্তু তার কার্য কারণ সবকিছু হিতৈষীদের যে অপরিসীম কৌতূহল আছে হিমালয়ি তাকে জীবন ডরায়। আদর্শ তাই শুধু নিজের কানে হাত চাপা দিয়ে নিজেকে নিয়ে পালিয়ে

বেড়ায় পরিচিত জন সমাজের সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার আশায়।

এমন সময় হঠাৎ একদিন ডাকে চিঠি এলো পরমেশ বাবু হিমালয়ি দর্শনাকাজী। শরীর সুস্থ নয় বলে নিজে আসতে পারছেন না। হিমালয়ি যদি একবার সময় করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তবে বড় ভালো হয়।

পরের ডাকেই উত্তর দিলো হিমালয়ি—কাজের চাপে বড় ব্যস্ত সে। আশা রাখে পরমেশ বাবু তাকে মার্জনা করবেন।

এরপর এলো ভক্তহরি পরমেশ বাবুর চাকর। তার হাতে স বিশেষ অনুরোধের চিঠি। একটু ইতস্ততঃ করে তাকেও ফেরালো হিমালয়ি জানালো তার শরীর খারাপ।

ভক্তহরি চলে যাবার পর মনটা অবশ্য একটু খচ খচ করছিলো। মনে হচ্ছিল ব্যবহারটা বড়ো রুচ হলে গেল যেন। তবু নিজের জেদে মনের সে দুর্বলতাটুকু জয় করলো হিমালয়ি। দাঁতে দাঁত চেপে বার বার আঙুলে—না না কিছু অজায় হয়নি। ঠিকই হয়েছে বরং। ব্যয়েসে বত ছোটই হই আমাকে ওভাবে অপমান করা ওঁরই কি সেদিন উচিত হয়েছিলো?

এ ঘটনার দু'তিনদিন পরে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কলেজ থেকে ফিরে নিজের পড়বার ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠলো হিমালয়ি।

পরমেশ বাবু নিঃশব্দে কখন এসে বসে আছেন কোণের একটা চেয়ারে। বাড়ীর কেউই বোধহয় ভাবতে পারে নি তাঁর আগমনের সংবাদ। কারণ জানতে পারলে দীনেশ এসে নিশ্চয় আলো জ্বলে পাখা ঘুরিয়ে খাতিরবন্ধ করে বসাতো। মা আসতেন জলখাবারের রেকাবী সাজিয়ে।

হিমালয়ি তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালালো ঘরের। তারপর নত্র-ভাবেই স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলো ওঁনার কাছে। মনে তার রাগ বা অভিমান হাই থাক কারো সঙ্গে সামনা সামনি রুচ ব্যবহারে সে ঠিক অভ্যস্ত নয়।

কিন্তু কাছে এসে পরমেশবাবুকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল হিমালয়ি। কী ভয়ংকর রোগা হয়ে গেছেন উনি। বঠায় হাড় বেরিয়ে পড়েছে গলায়। মুখের রেখার রেখার দু'শিঙার ছাপ।

একে তো পিতৃভুল্য তুল্ললোক বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও আবার সেধে এসেছেন বাড়ীতে—তাইতেই অনেক নয়ম হয়ে গেছে মনটা। তাকে আবার ওঁর শরীরের এই অবস্থা দেখে রাগটা একেবারেই পড়ে

গেল হিমালয়। ব্যাকটেই সে জিজ্ঞাসা করলে—কী হয়েছে? এত কাহিল দেখছি কেন আপনাকে? অনুধাবিত্ব করেছিল কী?

পরমেশ বাবু কোন কথা উত্তর দেন না নতমুখে বসে থাকেন শুধু। মিনিট খানেক পরে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে হিমালয়ের হাত দু'টো জড়িয়ে ধরা গলায় বলেন—আমাকে তুমি ক্ষমা করে হিমালয়।

—একী বলছেন আপনি? বয়েসে আমার চেয়ে কত বড়ো আপনি।—

—যত বড়ই হই, তোমাকে অপমান করার কোন অধিকারই আমার নেই—সেদিনও ছিলনা। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করে হিমালয়, তোমাকে অপমান করবো বলে আমি ও রকম করিনি। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই ভুল হয়েছিল আমার। ভীষণ ভুল—মারাত্মক ধরণের ভুল হয়েছিল। বার চেয়ে সর্বনাশ। ভুল আর হতে পারে না। তার কলও পাচ্ছি। প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার হয়ে গেছে। আজ আর এর কোন উপায় নেই। সারা জীবনের অনুশোচনাতেও এর বিন্দুমাত্র ভাবও লাগবে হবে না তাও জানি। কিন্তু সেজন্তে নয়। তোমার প্রতি অকারণে যে দুর্ব্যবহার আমি করেছি সর্বকণ তা আমার সজ্ঞা দেয়। তাই এত বড় অঙ্গার করেও আবার বেহায়ার মত এসেছি তোমার বাড়ীতে। ক্ষমা চাইতে। তুমি আমার ক্ষমা করে হিমালয়—বলো তুমি আমার ক্ষমা করেছে। জীবনের পূঞ্জীকৃত হতাশার মধ্যে অন্ততঃ এটুকু সাহসনা আমার থাক।

পরমেশ বাবুর কাতরতা হিমালয়ের মনকে স্পর্শ করে। নরম গলায় সে বলে—আচ্ছা আচ্ছা সে হবে'খন। কিন্তু আপনার কী হয়েছে বলুন তো? বাড়ীর খবর কী? রজনী কাকীমা সব ভালো আছেন তো?

—স—ব ভালো আছে। নিজের নিজের কর্ম অনুধায়ী সবাই ভালো আছে। বলতে বলতে কয়েক কৌটা জল ধরে পড়লো পরমেশ বাবুর চোখের কোণ থেকে।

হিমালয় তখনকার মত ইচ্ছা দেয় এ প্রসঙ্গে। পরমেশ বাবুকে সময় দেয় নিজেকে সংবৃত্ত করার।

দীনেশকে ডেকে তার নিজের আর একজন বাইরের লোকের লসখাবার আনতে বলে দেয়। বাইরের লোকটি যে পরমেশ বাবু সে খবরটা আর মার কানে পৌঁছাতে দেয় না শুধুশি।

কিছুক্ষণ পরে আপনা হতেই কিছুটা সহজ হয়ে আসেন পরমেশবাবু হিমালয়ের সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে তাঁর মনের অর্গলও ধুলে যায়। কতকটা বেন অগোতোক্তির মত বলে বান তিনি—তুমি আমো না হিমালয় সেদিন তোমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহারটা আমি করেছিলাম সেটা আমার হিট অব মোমেন্ট বলা চলে না। কিছুদিন থেকে নানা কারণে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়েছিল।—তিল তিল করে জমা হয়েছিল আমার মনের মধ্যে। অবশ্য এখন একখাটা পরিষ্কার করতে পারি যে নিজের ভেতরের লোভটা উৎকট রকমের বেড়ে গিয়েছিল বলেই আগেকার নজরে লাগা সমস্ত জিনিষকেই ভুল জান করছিলাম সে সময়ে। এক এক সময় এখন ভাবি সবই আমার নিরুত্তির ফল। এদের টানে এ সমস্ত দুর্বৃত্তি হয়েছিল আমার। তা না হলে

এতদিনের ব্যবস্থা করা সাজান জিনিসটা নিজের হাতে এমন করে বানচাল করি?

ওর কথাই হিমালয় বাধা দেয়। বলে—বাক্ বা হ'য়ে গেছে—

—না না হিমালয় আমার বলতে দাও। ক্ষমা চাইতেই যখন এসেছি তখন মুক্ত কণ্ঠে সবকথা না বললে—অকপটে সব কিছু স্বীকার না করলে আমার পাপমুক্তি হবে না। —হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, আমার নিরুত্তিই আমার এমন করে দিক্ ভুল করলে রকমারি টোপ ফেলে ফেলে মনের ভেতরের শয়তানটাকে জাগিয়ে তুললে। মাথাটা ধারণ করে দিলে একেবারে।

যে সময় বেশ কিছুদিন থেকেই সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রস্তাব আসছিল রজনীর সহজে। কে যে এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করে পাঠাছিল আজ পর্যন্ত আমি তা ঠিক করতে পারিনি। কী ধরণের অদ্ভুত সব প্রস্তাব তখনবে? —তখন অবশ্য তোমার কিছুই জানাইনি কারণ আমি জানতাম তোমরা ওসব পছন্দ করতে পারবে না।

হঠাৎ একদিন বড় একটা গাড়ী করে দু'জন ভ্রমলোক এলেন তাঁদের প্রস্তাব রজনীকে সিনেমার নামাবার। প্রথমেই হিরোইনের বোল পাবে আর পকাশ হাজার টাকা। টাকার অঙ্ক শুনে আমি ভবিত্ত হয়ে গেলাম। লোভ যে একেবারেই হয়নি তা বলতে পারি না। দু'একটা এ্যামেচার থিয়েটারে পাট করেছিল রজনী কিন্তু

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



প্রতি প্যাকেজ
২৪ টি
বড় আকারের

- কলে প্রস্তুত
- স্ট্রমে সেকা
- মোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সর্বত্র রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী
কলিকতা - ২৯

তাইতে যে সে লোকের এতটা নজরে পড়ে গেছে তা আমি কল্পনাতেও জানতে পারি নি।

রজনাকে অবশ্য এ প্রস্তাবের আভাসও জানতে দিই নি। মাঠে গানে ওর কী রকম ঝোক জানো তো বাবা। শুনে হরত অঙ্গপশ্চাৎ কিছু না ভেবেই হাজিমা বাধাবে বাবার জন্তে। তাই নিজের মনেই দোমনা করছিলাম। কিন্তু, রজনার মা আমার বড় বিপদে ফেললে। একেই তো আমি মনে মনে বুকতেই পারছিলাম একবার সিনেমার নামলে রজনার পক্ষে আর তোমাদের ঘরের বউ হওয়ার সম্ভবনা কম। তাতে আবার ওর মা কেঁদে একেবারে কুকক্ষেত্র বাধিয়ে তুললো। ওরা আগেকার দিনের মেয়েমানুষ। ওসব অভিনয় শিল্পটির বোধে না। অভিনেত্রী জীবনকে ওরা ঘৃণা করে। তার ধারণা মেয়েমানুষের জীবনে পেশাদার নটী হওয়ার চাইতে যত্ন অনেক মঙ্গল।

কাজে কাজেই শেষ পর্যন্ত ওর জেদে পড়ে এ প্রস্তাব কেবলে হল আমার। হাজির হোক গর্ভধারিণী তো।

এর দিন পনের পরে এলেন এক অল্পপ্রদেশী ভ্রমলোক। তাঁর প্রস্তাব আরও বিচিত্র। সোভাসুজি বলে বসলেন তিনি রজনাকে দাসে পাঁচশ' টাকায় বেঁধে রাখতে চান।

তুমি জানো বাড়ী করে আমি নিঃস্বল হয়ে পড়েছি। সংসারের কোনো আয়ের রাস্তা নেই। তাই টাকার দিকটা হরত মনে একটু ঘিবা জাগালো। কিন্তু সংসার? তাহাজা ভাবলাম এ আর ক'দিনের? বড় জোর হরত দশটা বছর টাকা দেবে ওরা। তার জন্তে মেয়েটার সমস্ত ভবিষ্যত নষ্ট করবো? জাতজগৎ সব খোঁরাবো?

তাই জিজ্ঞাসা করলাম রজনাকে ধাবজীবন এই টাকা দেবার চুক্তি করে উনি লেখাপড়া করে দিতে রাজী আছেন কী না? সে ভ্রমলোক তাতেও রাজী হলেন।

তবুও সংসার ছাড়তে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত বিদায় করলাম তাঁকে। বাবার সমর আবার কী বলে গেলেন জানো? বললেন—অল্পলোকের কাছে যদি আরও বেশী টাকায় আমি কখনও রজনাকে জাড়া দিতে রাজী হই তবে তার আগে যেন তিনি একটা খবর পান। টাকা বাড়তে তাঁর কোন আপত্তি নেই। ভীষণ রাগ হয়ে গেল শুনে, বললাম—রজনা নীলেমের মাল নয়—ভ্রমলোকের মেয়ে। দয়া করে সে কথাটা মনে রাখবেন।

তিনি শু' বিদায় হলেন। কিন্তু একটি কথা তিনি আমার মনে গেঁথে দিয়ে গেলেন যে রজনা আমার যেমন তেমন মেয়ে নয়, তার বিয়ের জন্তে এমন করে লোকের দরজায় গলবস্ত্র হয়ে বেড়াবার আমার কিছু দরকার নেই। বরং একটা ভালো রকম অবস্থাপন্ন ঘরবর দেখে রজনাকে সমর্পণ করে আমাদের সজতিহীন ছুঁটি জীবনের ভবিষ্যতের ভরসা করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ঠিক এই রকম একটা মনের অবস্থায় এলো সুরজন। ওর জাঁকজমক পোষাক আবার গাড়ীর বাহার আমাদের চমক লাগিয়ে দিলো। তার ওপর রজনাকে উপহার দেবার ধুম—সেও তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছো।

আজ আর আমার অস্বীকার করার উপায় নেই—এইবার আমি ঠোপ দিলাম।

সুরজন রজনাকে বিয়ে করতে চায় এ আভাস দেবার পরদিন

থেকেই আমি রজনার জন্তে পুরানো ছকে রাখা ভবিষ্যতটা বাতিল করে দিলাম।

সত্যি কথা বলতে কী তারপর থেকেই তোমার দেখলে আমার রাগ হতো। বোধ হয় বিয়েকটা খচখচ করতো বলেই তোমার ওপর অত রাগ হতো আমার।

—বাক গে, ও অপ্রিয় প্রসঙ্গ যেতে দিন। হিমালজি বলে।

—না না আর সে কথা বলছি না আমি। শুতে নিজেরই লজ্জা বাড়ে বই তো নয়। তার পরের ঘটনা থেকেই বলছি তোমার। কী বলছিলাম? হ্যা, তোমার সঙ্গে যেদিন বকাবকি হল সেইদিনই ওরা বেড়িয়ে ফিরলো রাত এগারোটায়।

একেই তো তোমার কতকগুলো কড়া কথা বলে মনটা ভিত্ত হয়েছিল তাতে আবার রোজই ওদের দেবীর মাজা বাড়ছে দেখে আমি ওদের জানিয়েছিলাম যে এ ধরণের বেড়াতে বাওয়া নিয়ে অনেক কথা কানাকানি সুর হয়েচে। তাই তোমাদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এ ধরণের বেড়াতে বাওয়া তোমাদের বন্ধ রাখতে হবে।

এ কথার সুরজন যেন একটু উত্তেজিত হল, বললেন—আপনি কী আমার বিশ্বাস করেন না?

আমি বললাম—বিশ্বাস না করলে আর তোমার হাতে মেয়ে দেবার মনস্থির করলাম কী করে? কিন্তু এটা বিশ্বাস অস্থিরতার কথাই নয়। সমাজে বাস করতে গেলে দেশাচার লোকাচার তো মানতে হবে। বেশ তো রজনাকে যদি তুমি সত্যিই পছন্দ করে থাকো তাহলে একটা শুভদিন দেখে বিয়ের হাজিমাটা চুকিয়ে ফেলো। তাহলেই তো আর কোন কথা বলবার থাকে না কারো।

কিন্তু এটা তো বোর যে আমার আইবুড়ো মেয়ের সুরনাম বদনামের দিকটা আমার নজর রাখতেই হবে। সেটাকে অগ্রাহ করে এ ধরণের মেলামেশাকে তো আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না।

আমার কাছ থেকে বাধা পেয়ে ওরা বাধ্য হোয়েই বেড়াতে বাওয়া খানিকটা কমিয়ে দিলো। বাড়ীতে অবশ্য সুরজন রোজই আসতো।

কিন্তু আজ বলবো কাল করবো করে করে বিয়ের দিন স্থির করা আর কিছুতেই হয়ে উঠছিল না। কথাটা বখনই উঠতো তখনই একটা না একটা কাজের অজুহাত করে কথাটা ধামাচাপা দিতো সুরজন।

মাঝে মাঝে সপ্তাধানেক এমন কী পনের দিন পর্যন্ত ওর আনাগোনাও বন্ধ থাকতো। শুনেছিলাম ব্যবসার প্রয়োজনে ওকে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়।

কী যে ওর ব্যবসা, কোথায় ওর বাড়ী সে সবকিছুও মাঝে মাঝে আলোচনা করেছি ওর সঙ্গে। বলেছিল—বাড়ী ওর এলাহাবাদে। সেখানেই বন' এ্যাণ্ড অট আপ ও। পশ্চিমা-বাঙালী আর কী। তবে আত্মীয়জন বাপ-মা কেউই নেই। বাবা কিছু টাকা ব্যাঙ্ক ওর নামে রেখে মারা গিয়েছিলেন। তখন ও খুবই ছোট। মা পেছেন তারও আগে। ব্যাঙ্কের টাকার সুরদে একটা বোজিয়ে থেকে লেখাপড়া করেছে বরাবর। তার পর সেই টাকাতেই ব্যবসা সুর করে। সাইনবোর্ড টাঙিয়ে কোন অপিস বা লোকান করার ও কোনদিনই পক্ষপাতী নয়। শুতে নাকি খরচ আর আড়খরচী বজোতা বেড়ে যায়—লাভ থাকে না। তার ওপর বা দাঁড়শ টায়।

তাই ও সাপ্লাইয়ের কাজ করে। ওতে লাভ থাকে বেশী—কিন্তু সরকারের নজর পড়ে না।

হিমালয়, আজ আমি তোমাকে সত্যিই বলছি রজনাকে দোষ দেব কী, ওর কথা শুনে আমি পর্যন্ত যেন কেমনতর হয়ে যেতাম। তাকে সন্দেহ করবার কোন কারণ খুঁজে পাইনি। হয়ত আমাদের যোল আনা বিশ্বাসভাজন হবার জগ্জেই ও'দিন আমাকে সঙ্গে করে সে ছুটো বড় আপিসেও নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে ওর কথাবার্তা শুনে ওর খাতিয় প্রভাব দেখে ওর কর্মকুশলতা সন্দেহ আর কোন সন্দেহের অবকাশও ছিল না। ওর পর্যাপ্ত রোজগার উজ্জল ভবিষ্যতের সন্দেহে আর কোন তদন্তের প্রয়োজন আছে বলেও আমার মনে হয়নি।

ওর কথাবার্তায় চালচলনে ওর সন্দেহে আমরা এত মোহিত হয়ে পড়েছিলাম যে ওর বিয়ে করবার সময়ের অভাবটাও আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বোধ হয় নি। তবু শুধু কর্তব্যবোধে মাঝে মাঝে আমি তাগাদা দিতাম বিয়ের দিনটা স্থির করবার জগ্জে।

এমনই একদিন তাগাদা করবার পরদিন সকালে রজনাকে আর পাওয়া গেল না বাড়ীতে। প্রথমটায় আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে রজনীর মা রজনীর মাখার বালিশের তলা থেকে একটা চিঠি বার করে নিয়ে এলো। রজনা লিখেছে, আমরা যেন তার জগ্জে চিন্তা না করি। সে বাড়ী থেকে স্বেচ্ছায় চলে গিয়ে গোপনে সুজনের সাথে মিলেছে। বুঝা অসুস্কান করে তাদের শাস্তিভঙ্গ না করাই এক্ষেত্রে সমীচীন। পরিশেষে আমাদের আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি শেষ করেছে রজনা। মন খুলে আশীর্বাদ করতে পারলাম কৈ? এই প্রথম আমার মনে খটকা লাগলো—গোলমালে বলে বোধ হলো ওদের ধারাটাকে।

ভাবলাম, আমি তো বিয়ে দিতে রাজীই ছিলাম, তবে কেন এমন করে পালিয়ে গেলো ওরা! অকারণ এ জটিলতা সৃষ্টি করলো কেন? বিয়ের পর প্রতিষ্ঠিত সামাজিকতার দিকে না গিয়ে এমন ভিত্তিহীন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে বাঁপিয়ে পড়লো কেন?

তাহলে কী সুজন রজনাকে সত্যি করে বিয়ে করতে রাজী নয়? আমার নির্বোধ অনভিজ্ঞ মেয়েটা ওর ভালবাসার স্বরূপ বুঝতে ভুল করলো?

কিন্তু হয়ত এমন কোন একটা লজ্জাকর পরিচয় সুজনের কাছে বার দরুণ বিয়ে করতে গেলে নানা কথাবার্তা উঠতে পারে, তা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনের অবগুস্তাবী আনাগোনাতে সে ভয় করে।

রজনীর মাকে পর্যন্ত কিছুটা না বলে ভিতরে ভিতরে অসুস্কান সূত্র করলাম এবার। পরিচিত মহলে রটিয়ে দিলাম রজনা তার পিড়ীর বাড়ীতে বেড়াতে গেছে—কুচবিহারে।

হিমালয় প্রশ্ন করে—অসুস্কান কী করে করলেন? সুজনবাবুর ঠিকানা আপনার জানা ছিলো?

—হ্যাঁ জানতাম। সুজনের বাসায় কোনদিন না গেলেও তার ঠিকানাটা আমি নিয়ে রেখেছিলাম। সেই ঠিকানা মিলিয়ে বেহালার একটা হোটেলে তার খোঁজ করতে গেলাম। গিয়ে দেখি, সুজন সেখানকার বাসা তুলে দিয়ে গেছে।

আরও ভয় হোল। মনে হোল আরও অনেক আগেই খোঁজখবর করা উচিত ছিল আমার। বিশেষ করে হোটেলের

চেহারাটা দেখে চমকে উঠলো মনটা। অতি সাধারণ শ্রেণীর একটা হোটেল। সুজনকে এ পরিবেশে কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

আশেপাশের বাকেরই দেখি তাকেই সুজনের বর্তমান ঠিকানার কথা জিজ্ঞাসা করি। কেউই সঠিক বলতে পারে না। প্রায়গুলোও এতদিনের পরে ক্রমশঃ বাঁকাপথ ধরতে লাগলো আমার। মানে এতদিন পরে ওর স্বভাব চরিত্র সন্দেহে তদন্ত করতে সূত্র করলাম আমি।

কিন্তু বত লোককেই জিজ্ঞাসা করি কেউই স্পষ্ট করে বলতে পারে না তার সন্দেহে কোন কথা।

উণ্টে ছু'-একজন আমার বিক্রপ করে গেলো। বললে—কেন? রাতারাতি বড়লোক হবার আশায় সুগনাতির শেয়ার-টেমার কিছু কিনেছেন না কী? হীরেলাল—খড়ি, মিঃ সুজন মিশ্র মশাইয়ের লজ্জা বড়ই উতলা দেখছি আপনাকে।

কী উত্তর দেব এ কথার? ছুটে বাই অজ্ঞানের কাছে, ওরা বা বলে সে সব মাথাবুগবিহীন কথা। বেশীর ভাগই হেয়ালী—ধোঁয়াটে মতন।

বহু কষ্টে বহুলোকের কাছে ঘুরে বহুলোকের হাতে পায়ে ধরে ওর সন্দেহে যে তথ্য আমি সংগ্রহ করলাম তোমার মস্তব্যের সাথে তার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। নতুন করে সে কথাগুলো তোমার সামনে উচ্চারণ করতেও আমার লজ্জা করছে হিমালয়—সে কথাগুলো এখনকার মত থাক। আমি তারপর থেকে তোমায় বলছি। আমি যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম নিজের নিবুদ্ধিতার পরিমাণ দেখে। কোন উপায় না পেয়ে ছুটে গেলাম এক আইনজ্ঞ বন্ধুর কাছে। সব শুনে অনেক ভেবেচিন্তে সে পরামর্শ দিলো—ওদের বখন এখনও বিয়ে হয়নি তখন এখনও উপায় আছে রজনাকে কিরিয়ে আনবার। কোন রকমে যদি একবার প্রমাণ করতে পারো রজনীর বয়েস এখনও আঠারো বছর পূর্ণ হয়নি, তাহলেই তোমার রজনা আবার তোমার হবে। উণ্টে নাবালিকা হরণের দায় এসে পড়বে সুজন মিশ্রের ঘাড়ে।

আমি পাগলের মত রজনাদের খোঁজ করে বেড়াতে লাগলাম, সেই সময় প্রতি পদক্ষেপে আমার তোমার কথা মনে হয়েছে হিমালয়। প্রতি মুহূর্তে আমি ভেবেছি রজনীর কত বড় হিতৈষী তুমি। রজনীর বাপমায়ের চেয়েও মজলাকাখী। তুমি আমাদের যে সময় সাবধান করেছিলে সে সময় যদি সাবধান হতাম তবে আজ আর এ দশা হতো না আমার মেয়েটার।

রজনীর মা-ও চক্রিৎ ঘটনা এই কথাই বলে। আমারও মনে হয়—তোমার মনে এত কষ্ট দিলাম বলেই রজনীর আমার এত হুর্গতি হল। নিজেকে তাই কিছুতেই আমি ক্ষমা করতে পারি না। তুমি আমার ক্ষমা করো—

এবার হিমালয় ঠকে ধামিয়ে দেয়, বলে—কেন বার বার ও'কথা বলছেন? আপনি আমার পিতৃভূল্য। একদিন যদি ঘটনাটাকে তুল বুঝে আমার ছুটো কটু কথাই বলে ফেলে থাকেন তাহলে এমন কিছু ক্ষতি হয়ে যায় নি আমার। তবে একথা সত্যি সে সময় মনে খুবই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আজ আর কোন কষ্ট নেই—বিশ্বাস করুন। মিছিমিছি এ নিয়ে আর মনে কোন খেদ রাখবেন না আপনি।

হিমালয় কথা শুনে একটুকু চূপ করে বসে থাকেন পরমেশ্বর। তারপর হঠাৎ একবারে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন হ হ করে। বললেন—আমি সোনা কলে জ্বাটলে গেরো কিবেছি হিমালয়। আমার তুলন্য প্রাচুর্য নেই। তোমাকে আমি আর কোন দিন ফিরে পাবো না তাও জানি। কেমন করেই বা পাবো? কোন অধিকারে তোমায় আবার ফিরে পেতে পারি আমি? তোমায় ফিরে পাবার জোরটাই তো হারিয়ে গেছে আমার।

—কন বার বার ও'কথাটা তুলে আমার লজ্জা দিচ্ছেন? তাতে কী হয়েছে? আমি আগের মতই একদিন যাবোঁখন আপনাদের বাড়ীতে। মনে করুন ও সব ছাড়া আমাদের মধ্যে কোনদিন ছিল না—হবার কথাও হয়নি।

—সত্যি বলছো হিমালয়? তুমি আগের মতই থাকবে আমার কাছে? আবার বাবে আমাদের বাড়ী? ওঃ, তা যদি বাও কী খুশী যে হবে রজনীর মা তা আর তোমায় বলতে পারি না। সে যে সত্যি তোমায় এত ভালবাসে আমি আগে তা জানতে পারি নি। এমন দিন যার না যে সে তোমায় নাম করে না কীদে। আর তার শরীরটাও খুব ধারণ। খুব বেশীদিন আর বোধহয় বাঁচবেও না সে।

—আপনি কাকীমাকে বলবেন নিশ্চয় আমি একদিন যাবো আপনাদের বাড়ীতে। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা রিজ্ঞাসা করি—সুজনবাবুদের কী সেই পর্যন্ত আর কোন খবরই পাননি?

—ওঃ কথা শুনেবে? ও, সবটা তোমায় বলা হল না, নয়? ঠ্যা বহু অনুসন্ধানের পর খবর পেলাম ওদের। লক্ষ্যে একটা হোটেলে আছে রজনী আর সুজন।

যে লোকটা খবর দিলে সে অবশ্য রজনীকে দেখে নি। তবে সুজনকে চেনে। বললে—মিষ্ট সাহেব তো নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ান। এখন উনি প্যালেস্ হোটেলেই আছেন। এখন ওখানে বেশ কিছুদিন বোধহয় ঠিকে থাকতে হবে। শুনলাম নতুন বিয়ে করেছেন। স্ত্রীও আছেন সঙ্গে।

বিস্তারিত পরিচয় না দিয়ে মোটারুটি খবর জেনে নিলাম লোকটার কাছ থেকে। তারপর সেই রাত্রের পাড়ীতেই আমরা আমি-স্ত্রী দুজন চলে গেলাম—লক্ষ্যেতে।

রজনীকে আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। ঐ শরতানটার কবল থেকে যে করেই হোক ফিরিয়ে আনতেই হবে আমাদের কাছে। তখন কী ছাই জানি যে আমাদের রজনীই আর আমাদের নেই? তা কেবাবে ক'কে? বাই হোক, বুঝতেই পারছো কী দারুণ উবেগ আর উত্তেজনা নিয়ে আমরা পরের দিন ওর হোটেলে পেলাম।

দোতলার পাড়ীবারান্দার বসে রজনী শান্তভাবে কী যেন একটা বই পড়ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে খুব খুশী হোল প্রথমটায়। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—সুজন এখানে নেই, বৈবাহিক কাজে হু'নিদের সঙ্গে অস্ত্র পেছে।

সুজনের অধুপস্থিতি আমার কাছে ঈর্ষান্বিত হৃদয়ঙ্গম বলে মনে হল। হু'লগটে কথার পর রজনীর শোখার হয়ে চলে এলাম

আমরা। কারণ, যে কথা আমরা বলতে এসেছি পাড়ীবারান্দার মত কমন্ প্লেসে তা তো বলা চল না।

যে'র এসে এ কথা সে কথার পর আমরা আমাদের আসার উদ্দেশ্য রজনীকে বলে বললাম।

শুনে রজনী ঠিৎ পাপলের মত হয়ে গেল। বা ইচ্ছা তাই বলতে লাগলো আমাদের আর তার থাকে।

সব কথা আর পর-পর ঠিক মনে নেই, তাই সব তোমাকে শুধিয়ে বলতে পারবো না।

তবে রজনীর মা-ই বোধহয় প্রথমে বলেছিলেন—সুজন তোকে প্রতারণা করেছে খুশী। আসসে ওর কিছুই নেই। তাই আমরা তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

মায়ের কথা শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লো রজনী। বললে—ফিরিয়ে নিয়ে বাবে আমার? কেন? কে কী বলেছে তোমাদের?

ওর মা বললেন—না যে, এটা বলাবলির কথা নয়। ভালো করে খোঁজ নিয়েই জানতে পেরেছি আমরা। কলকাতার নামকরা জালিয়াত ও। এখনও সময় আছে খুশী, আমাদের সাথে তুই ফিরে চল।

এমনি ধরনের আরও কিছু কথা আমরা বলেছিলাম। এমন কিছু কথা কাটাকাটি বা তর্কাতর্কিও হয়নি। কিন্তু রাগে আর উত্তেজনার কী রকম যেন হয়ে গেল রজনী। বিশেষ করে ঐ জালিয়াত কথটা বলতেই যেন কেপে গেল।

উঠে গিয়ে ঘরের কোণায় রাখা বড় মতন একটা আলমারি খুলে ফেললে। তার ভিতর থেকে গোছা গোছা সাদা স্কাউজ এনে আমাদের সামনে তুপাকার করে ফেলতে লাগলো। বললে—জালিয়াত? নামকরা জালিয়াত? তা এ জিনিসগুলোও সব জাল বলে মনে হচ্ছে না কী? এককাপড়ে বাড়ী থেকে নিয়ে এসে এই হু'মাসের মধ্যে যে আমার কমপক্ষে পাঁচশত হাজার টাকার জিনিস কিনে দিলো তার চেয়ে বেশী প্রতারণা আর কে করেছে আমার?

ওর ভাবভঙ্গিমা দেখে আমরা কিছুটা ধতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হাল ছাড়ি নি। বললাম—ওনেছি বাজারে ওর বহুটাকা দেনা। হয়ত তোকে ভোলাবার জন্যে এ সবও সেই ধারকরা টাকাতাই কিনে এনেছে ও। কিছুদিন পরেই হয়ত—

—কে বলেছে? কে বলেছে এসব কথা? আচ্ছা তাই বা সত্যি হয়—তোমাদের কথাই যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়—আমার স্বামী যদি কপর্দকশূন্যও হয়, আমাকে খুশী করবার জন্যে ধার করেই কিনে এনে থাকে এ সব জিনিস, তবে সেই অপরা তাকে ছেড়ে চলে যেতে বলছো তোমরা? স্বামীর সাথে মেয়েদের সেই সব ছ?

রজনীর মা বললেন—স্বামী? কে তোর স্বামী? সুজন (তোকে বিয়েই করে নি?)

রজনী বললে—না মা, এটা তোমাদের তুল ধারণ। ি আমাদের হয়ে গেছে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে টানা মোঁ আমরা আমি পাটনার। সেইখানেই একজন পুরোহিত এসে করে আমাদের বিয়ে দেন। ঠর হু'-একজন বন্ধুও সেখানে বি

তবে হ্যাঁ, কলকাতার বাড়ী থেকে স্বাভাবিক ভাবে আমাকে বিয়ে করে আনতে ও রাজী হইনি কেন, সেটার কারণটা আজও আমি সঠিক জানি না। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? আমার মনে তো তা নিয়ে কোন খেদ নেই? তবে! হ্যাঁ—এ কথা সত্যি, আমি এভাবে চলে আসার তোমাদের হয়ত অনেকের কাছে অনেক কথাই শুনে হইয়াছে। কিন্তু তার আর উপায় কী বলো? আমার মুখ চেয়ে না হয়—

আমি ধমক দিয়ে বললাম—বাজে বকিস না। আমাদের দুঃখের সাধনা চাইতে আমরা তোর কাছে আসিনি। জেনে রাখ, আজ রাত্রের গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে তোকে। ভালো কথাই যদি না বাস্ তবে আমি জোর করে নিয়ে যাবো তোকে।

এই পর্যন্ত বলে মিনিট দুয়েক চুপ করে বসে রইলেন পরমেশ বাবু। তার পর হঠাৎ অস্বাভাবিক জোর করে বলতে লাগলেন—আরও শুনে হিমালয় এর পর? এর পর রঞ্জনা আমাদের বা ধুশী তাই বলে অপমান করতে লাগলো, ধরতে গেলে তাড়িয়ে দিলে আমাদের। বললে—কী উদ্দেশ্যে আমাকে তোমরা এভাবে উৎপীড়ন করছো তা আমি জানি না, জানবার কোন আগ্রহও নেই আমার। কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা তোমরা করো না—এই আমার অনুরোধ।

কারণ আমি আর নিতান্ত শিশু নেই। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে আমার স্বামীর আশ্রয় থেকে নিয়ে যাওয়ার কাজটা খুব

সহজসাধ্য হবে না তোমাদের পক্ষে। কিন্তু আমি শুধু এই কথাটা ভেবেই আশ্চর্য হইয়া যাই যে, তোমরা একটা বাজে পোনা উড়ো কথার ওপর নির্ভর করে আমাকে আমার স্বামীর স্বর্গ চিরদিনের মত ছেড়ে চলে যেতে বলছো কোন্ বিবেচনায়? হিঃ হিঃ, এই তোমাদের নীতিজ্ঞান? এই তোমাদের সুরক্ষিত পরিচয়? আমাকে তাহলে তোমরা একটা মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে কোনদিনই চাওনি? চেরেছিলে এক-সিন্দুক টাকার সঙ্গে বিয়ে দিতে?

হিমালয়। ওর এই সব বড় বড় কথা আর সহ করতে পারলাম না আমি। মরিয়া হয়ে ওকে আঘাত করবার জেঞ্জিট বললাম, এত নিষ্ঠা তোর ছিল কোথায়? হিমালয়কেও তো একদিন স্বামী বলে জেনেছিলি? তবে তার সঙ্গে এতটা বেইমানী করলি কী করে? কী ব্যবহারটা করেছিলি তার সঙ্গে?

এ কথাটা শুনে একটুকু চুপ করে বসে রইলো হতভাগী। তারপর কী বললে জানো? বললে—হিমালয়বাবুর সাথে কোন ধারণা ব্যবহার আমি করিনি। আমার নিশ্চিত ধারণা হিমালয়বাবু কোনদিনই আমার সর্বাঙ্গকরণে গ্রহণ করতে পারেননি। তুমি তাঁকে তাঁর পিতৃসন্ত্যের কাঁস পরিবে আটপেট্টে বেঁধে রেখেছিলে। তিনি অত্যন্ত ভদ্রলোক—হয়ত সে বন্ধন একদিন ছেছাতেই গলায় তুলে নিতেন। কিন্তু অস্বাভাবিক এ বন্ধন হয়ত একদিন তাঁর কাছে দুঃসহ বোঝার মত বোধ হতো।

তাই স্ত্রীজন আমাদের বাড়ীতে আনাগোনা শুরু করবার

স্বৈচ্ছিক জুয়াতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক















দেবযানী

ফেস্ পাউডার
ট্যালকাম্ পাউডার
স্নো, কুমকুম
হেয়ার অয়েল
নেল্ গলিশ

ডি, জে, প্রোডাক্টস্ * কলিকাতা-১

কিছুদিন পর থেকে তিনি বখন বেছায় আমাদের বাড়ী আসাবাওয়া কমিয়ে দিলেন তখন আমি এতটুকু বিস্মিত হইনি। বুরে বুঝেই আমার তরফ থেকে আমি তাঁকে তাঁর পিতৃসত্য পালনের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু আজও আমি তাঁকে—আমি তাঁকে মানুষ হিসাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি।

হিমালয়, তোমার ওপর তার এই বিশ্বাস দেখে আমি সব কথা খুলে বললাম। বললাম—যে হিমালয়ই সর্বপ্রথম সৃষ্টির স্বরূপ পরিচয় নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। সেদিন আমি তাঁকে বিশ্বাস করি নি।

উত্তরে রজনী বললে—আমি আজ বিশ্বাস করতে পারছি না, হিমালয় তোমাদের এই সব বলেছে।—আর যদি বলেই ছিল তবে সেদিন কেন জানাও নি আমায়? আমি জানি হিমালয় আমার কোনদিনই চায় নি। সে চেয়েছিল তার বাবার কথার দাম দিতে। কিন্তু অমন করে কারো গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে মরণও ভাল। আমি জানি—আমি জানি হিমালয় আমার কোনদিনই চায়নি। তা যদি হোত তবে সৃষ্টির আনাগোনা, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা দেখে অমন করে নিঃশব্দে সরে যেতে পারতো না সে। এগিয়ে আসতো, প্রতিবাদ করতো নিশ্চয়।—কিন্তু আজ আর ও সব কথা কেন? আজ আমি বেছায় বাক বিয়ে করেছি কোন কারণেই তার বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাদের আমি মিনতি করছি এ প্রসঙ্গ খামাও তোমরা। আমি ভুলতে চাই না, জানতে চাই না—কিছু চাই না তোমাদের কাছে। তোমরা চলে যাও—দয়া করে নিকৃতি দাও আমায়।

আর কী বলবো? হার মানলাম নিজের মেয়ের কাছে। মাথা নীচ করে আমরা দুজনে বখন চলে এলাম রজনী তখন তার বিছানার ওপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

রজনীর ইতিবৃত্ত শেষ করে পরমেশ বাবু কখন যে চূপ করেছেন তা টের পায় নি হিমালয়।

সারা মন জুড়ে তার কণপূর্বের শোনা রজনীর কথাগুলোই তোলাপাড় করছে শুধু।

তার উচ্ছাসবিহীন লাজুক ভালবাসাকে রজনী কী রকম সাজবাতিক ভুল বুঝে সেই কথাটাই বার বার আহুড়ে পড়ছিল তার মনের মধ্যে।

চমক ভাঙলো রাত এগারোটা বাজার কথাটা বখন সববে ঘোষিত হল বাইরের বারান্দার দেওয়ালঘড়িতে। পরমেশ বাবু নীরবে উঠে দাঁড়ালেন চলে বাবার জন্তে। হিমালয়ও তাঁকে স্তমনি নিঃশব্দেই বিদায় দিলো। মায়ের সঙ্গে দেখা করে বাবার প্রস্তাবটা পর্যন্ত উঠলো না কারো পক্ষ থেকে।

পরমেশ বাবুর অপস্মরমান মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দরজার কপাট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল হিমালয়। দূরে ল্যাম্পপোষ্টের আড়ালে সে মূর্তিটা বখন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল একবারে তখন আচ্ছন্ন ভাবটা ঝানিকটা কটলো মনের। কর্তব্যবোধটা সজাগ হ'ল। মনে হ'ল ভুললোক হয়ত বাস পাবেন না আর। হিমালয়ের উচিত ছিল ওকে একটু এগিয়ে দেওয়া। ভারী অভ্যস্ত হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ, এই সামান্য কথাটা একটু আগে মাথায় এলো

না। মনটা বেন কী রকম হয়ে গেছে আজকাল। অসভ্যের মত হয়ে গেছে স্বভাবটা।

নিজেকে অনেক শাসন করে হিমালয়। তবু প্রবোধ দিতে পারে না কিছুতে।

আপন মনের এই অপরাধী ভাবটাই বোধহয় মলিভিলার দিকে বার বার অজুলি সংকেত করেছিল হিমালয়কে। তাই দিন তিনেক পরেই একদিন সন্ধ্যাবেলায় মলিভিলার গেটের সামনে আবার এসে দাঁড়ালো হিমালয়। তবে আগেকার মত সরাসরি উপরে উঠে গেলো না আর। ভক্তহরি মারকত খবর পাঠাল অন্দর মহলে।

ওর আগমনবার্তা শুনে ক্ষণকাল পরেই পরমেশ বাবু নিজে নেমে এলেন নীচে। ক্ষুণ্ণবরে বললেন—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ভিতরে চলো। এখনও কী এই বৃড়োটাকে ক্ষমা করতে পারেনি?

—না না সে কি কথা, এমনিই খবর দিলাম ভিতরে। বাড়ীটা বড় নিস্তরক মনে হচ্ছিল—ভেবেছিলাম আপনারা হয়তো বাড়ীতে নেই, বেরিয়েছেন কোথাও।

—কোথায় আর যাবো বাবা। এইখানেই পড়ে আছি দুজনে। তবে বাড়ীটা আমার নিস্তরক নিঃস্বামী হয়ে গেছে হিমালয়—অন্ধকার হয়ে গেছে চিরদিনের মত।

নিঃশব্দে পরমেশ বাবুর অমুগমন করে হিমালয়—উত্তর দেয় না কথার। সত্যি কথা বলতে কী তাঁর আঁকুপে সান্দ্রনা দেবার ভাষা জোগায় না তার মুখে। কারণ তাঁর কথার মধ্যে যে মর্মান্তিক সত্য আছে তা এ বাড়ীতে ঢোকামাত্রই সমস্ত স্তন্য দিয়ে অনুভব করেছে হিমালয়। আপন চর্মচক্ষু দিয়েই দেখতে পেয়েছে এ বাড়ীর নিরানন্দময় রূপটুকু। সে রূপ যেন আশাহীন মুমূর্ষুর শিয়রে নিশিঙ্গাগরণ-ক্লাস্ত সেবিকার মত বিষাদ-গম্ভীর। তার কর্তব্য আছে কিন্তু কর্তব্য সম্পাদনে নেই সার্থক পরিণামের সোনালী আশাস।

জড়েরও যে জীবন আছে, তার প্রতিটি অণুরেণুতে ভরে আছে জীবনের স্পন্দন এ কথা এতদিন শুধু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই শুনেছিল হিমালয়। আজ প্রথম জানলে শুধু বিজ্ঞানেই নয় মানুষের মনেও এর সুস্পষ্ট অনুভূতি পাওয়া যায় সময় বিশেষে।

দৌলার বারান্দায় আলো জ্বলছিল একটা—ঘরগুলো অন্ধকার। হিমালয়ের মনে হল বারান্দার আলোটাও বেন কমজোর হয়ে গেছে আগেকার চেয়ে। কৃপণের মত সংকীর্ণ দক্ষিণ্যে দীনতর করে রেখেছে পরিবেশ। কে জানে ভক্তহরি হয়ত ধূলোমোছার সময় পায়নি অনেক দিন।

শোবার ঘরে এসে পরমেশ বাবু হাত বাড়িয়ে একটা ডিমলাইট জ্বালালেন। তার পর ঘরের বাইরে চলে গেলেন স্বস্তিত চরণে। বোধ হয় সমস্ত ঘটনার জন্তে মনে মনে নিজেকে দায়ী করেন বলেই বিবেক-দংশনে এমন অশান্ত প্রকৃতি হয়ে গেছেন তিনি। কোথাও স্থির হয়ে টিকতে পারেন না এক মুহূর্ত।

মলিনা দেবী শুয়েছিলেন আপন শয্যাপ্রান্তটিতে। হিমালয়ে দেখে বখাসাধ্য ব্যস্তভাবে উঠে বসলেন শয্যার উপর। তাঁকে দেখে কয়েক মুহূর্ত আর কথা বলতে পারে না হিমালয়। শুধু 'জীর্ণশী' বললেও বোধ হয় কিছুই বলা হয় না তাঁর শরীরের অবস্থা। অম

সুন্দর মানুষটার এই অল্প কিছুদিনে শরীরের এত অধোগতি কি করে সম্ভব হ'ল সে কথাটা ভেবে আর কুল পায় না হিমালি। হতবুদ্ধিতাবে বলে—কী হয়েছে? কোন শক্তি অসুখ করেছিল নাকি?

মাথা নেড়ে স্পষ্টভাবে উত্তর দেন মলিনা দেবী—না, না, কৈ? অসুখ তো করেনি আমার। কিছুই হয়নি। কথার শেষে একটু হাসবারও চেষ্টা করেন যেন।

হিমালির মনে হয়, সে হাসির চেয়ে কান্না অনেক ভাল। কি আর বলবে সে? মোহের বশে এঁরা যে ক্ষতি হিমালির করেছেন তার চেয়ে শত গুণ বেশী করেছেন নিজেদের। এদের ওপর অসুযোগ বা অভিমানের চেয়ে সমবেদনাই বেশী আসে যেন। বিশেষ করে এই যে, শাস্তস্বভাব স্বল্পভাষিনী মহিলাটি নিজের একমাত্র সন্তানের নিয়ত ভবিষ্যতের চিন্তায় নিজেকে ক্ষয় করে ফেলেছেন এঁর প্রতি অকৃত্রিম মমতায় হিমালির সমস্ত অন্তর ভরে যায়।

স্বল্পালোকিত সে স্বরখানিতে অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে নীরবে বসেছিল হিমালি। মলিনা দেবীও বিশেষ কিছু বলেননি আর।

কিন্তু তাতে পরস্পরকে বুঝে নেবার কোন অসুবিধা হয়নি ওদের। সমবেদনার মৌন ভাষণই বোধ হয় বেশী প্রাজ্ঞ। কোন কথা না বলে অনেক কথা বলাটাই সহায়ত্ব জ্ঞানাবার সর্বোত্তম ভঙ্গিমা।

চলে আসবার আগে প্রণামান্তে বিদায় চাইলো হিমালি। মলিনা দেবী শুধু দক্ষিণ হস্তটি ওর মাথার ওপর একটুকণ রেখে বললেন—আবার এসো। ঝরঝর করে জল ঝরে পড়লো তাঁর চোখ থেকে।

সকলুণ সে মিনতিভরা অনুরোধটুকু এড়াতে পারে না হিমালি। মাথাটা হুলিয়ে আবার আসবার প্রতিক্রিয়া দিয়ে একটু ক্ষতপায়েই ঘরের বাইরে চলে আসে সে। কে জানে হয়তো নিজের মুখটাকে লুকিয়ে ফেলতে চায় মলিনা দেবীর দৃষ্টি থেকে।

* * * *

এর পর থেকে মাঝে মাঝে মলিভিলার আসতো হিমালি। নিজের পরিচিত পৃথিবীর সকলকে লুকিয়ে অতি সন্তর্পণে নিজের জীবনের দু'-একটি সন্ধ্যা চুরি করে আনতো এই হতভাগ্য প্রৌঢ় সম্পতির জন্তে। অপব্যয় করতো তার কিছুটা মূল্যবান সময়।

ভয় করতো অস্ত্রে হয়ত হাসবে—বিজ্ঞপনেত্রে তাকাতে তার হেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধার' প্রয়াস দেখে। তবু কেন যে হেঁচ টানতে পারে নি, মাঝে মাঝে এখানে এসেছে, এই জড়চেতন নিয়ানন্দ পায়ালপুরী কিসের আকর্ষণে তাকে টেনে এনেছে, তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারেনি।

বোধহয় আপন অন্তরের যে বেদনার বোঝাটা তাকে অহোরাত্র বয়ে বেড়াতে হয় একমাত্র এ বাড়ীর বেদনার্ত বাতাসে তাকে সে মেলে দিতে পারে বলেই এ বাড়ীতে এলে তার মনটা হাকা হয়।

বিশেষ করে পরমেশ বাবু আর মলিনা দেবীর চোখ এড়িয়ে একটুকণ রজনীর ঘরে এনে বসবার সুযোগ হিমালির পক্ষে সেও কি কম প্রলোভন!

নিঃসঙ্গ সে ঘরে বসে কত দিনের কত স্মৃতি বধন রাজির মত

নিঃশব্দে আপনার কুক পক্ষ বিস্তার করে সমস্ত হৃদয় কালো করে তোলে তখন তারই মাঝে কি যে এক স্নিগ্ধতার আভাস খুঁজে পায় হিমালি অন্তর সন্ধান মেলে না।

আজকাল মনে হয় সেদিনের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্তে পরমেশ বাবুকে দায়ী করা বৃথা। এ তার নিজের দৈবভ্রতা, সম্পূর্ণ তার নিজের পরাজয়। কারণ এতদিন ধরে রজনী তার যে ভালবাসাকে কোনদিন অস্বস্তবই করতে পারেনি তেমন নিখর ভালোবাসার এ পৃথিবীতে কোন দামই নেই। পুরুষের প্রেম সমুদ্রের মত উদ্দাম না হয়ে যদি নারীর প্রেমের মত অস্বস্তবী হয় তবে এই তার স্বাভাবিক উচিত পরিণাম।

আর রজনীর স্বয়ংবর-সভাতেই বধন তার পরাজয় ঘটেছে তখন পরমেশ বাবুর মতামত বা অবিচার সে সবই তো গোপ কথা।

আর রজনাই বা অগ্রায় করেছে কোনখানে? সারাজীবন কান পেতে হিমালির ভালবাসার মৌনগুঞ্জন শোনবার সাধনা করার চাইতে তার কানে যদি স্ত্রজনের ভালবাসার মুখর স্তাবকতা বেশী সুখা ঢেলে থাকে, তবে হিমালি কোন যুক্তি দিয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে?

মনের চেতন অবচেতনে এমনিতর কত যে চিন্তা ঘোলা জলের ঘূণীর মত পাক খেয়ে বেড়ায় হিমালি নিজেই তাব ঠে পায় না কিছুতেই।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর



যাদুসত্রাট
পি. সি. সরকার
প্রণীত পুস্তকাবলী
ইঙ্গ্রাজাল (বাংলা) ৫
মেসমেরিজম্ ২ ৫
হিপনোটিজম্ ৩ ৭
SORCAR ON MAGIC
(ইংরাজী) ৩৭

যাদুসত্রাট
পি. সি. সরকার
ইঙ্গ্রাজাল পাবলিকেশন
১২/৩৭ জামির লেন।
বালীগঞ্জ, কলিকাতা ১৯

* * * *

আরও মাস দু'রেক পরের কথা। সেদিন কলেজে শেষের দফায় দর্শন পড়ানোর দায়িত্ব ছিল হিমালয়ের। পড়ানো শেষ হলে অপরাহ্নবেলায় ক্লাসচরমে সুস্থের অজনটুকু পার হয়ে নিজের ছোট হিমালয় গাড়িখানির দিকে পা বাড়িয়েছিল হিমালয়। আর ভাবছিল মা আজ ক'দিন থেকে দক্ষিণেশ্বর বাবার কথা বলছেন—আজ সন্ধ্যাবেলায় না হয় এফবার ঘুরিয়ে আনবে মাকে।

হঠাৎ হিমালয়ের চোখ পড়লো পরমেশ বাবুর দিকে। তিনি এখন এসে গেটের কাছটায় হিমালয়ের জন্তে অপেক্ষা করছেন। ঠিক দেখে মনে মনে ঠর ঠর হঠাৎ এখানে আসবার একটা সম্ভাব্য কারণ খোঁজে হিমালয়।

ঠর ঠরকনে মুখে আর উদ্ভাস চাউনিত্তে কি যেন একটা অশুভ ঘটনার ইংগিত দেখতে পায় হিমালয়। মনে মনে ভয় পায় সে। ঠাড়াঠাড়ি এগিয়ে বাবু পরমেশ বাবুর কাছে। বলে—আপনি এখানে যে? আমার জন্তে অপেক্ষা করছেন? কেন কি হয়েছে?...

কোন কথা না বলে স্তম্ভপ্রাপ্ত টেলিগ্রামখানা হিমালয়ের দিকে এগিয়ে দেন পরমেশ বাবু। হাতটা তার ধর ধর করে কাঁপছে। ঘুরিত হস্তে টেলিগ্রামটা টেনে নিয়ে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরলো হিমালয়। হাজারিবাগ হসপিটাল থেকে আসছে টেলিগ্রামটা। লিখেছে—রঞ্জনা দেবী আপনাদের আশ্রয় কী? যদি হয় তবে বত শীত সম্ভব চলে আসুন। তিনি গত পনের দিন বাবু আমাদের হেপাজতে আছেন।

বিশ্বয়ে হতবুদ্ধি হয়ে বাবু হিমালয়। ধীরে ধীরে বলে—এই তো জনসাম রঞ্জনা লক্সোর হোটেলে আছে। তবে আবার হাজারিবাগ হসপিটালে গেলো কী করে?

পরমেশ বাবু ভারী গলায় বলেন,—আমার কাছেও তো সেটাই সম্ভাব্য। তার ওপর দেখো গত পনেরদিন বাবু হাসপাতালে আছে—লিখেছে। তা আমাদের টেলিগ্রাম করলো না কেন? আর হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই বা আসছে কেন টেলিগ্রামটা? সূজন কোথায়? রঞ্জনার কোন একটা অনুখ-বিশুদ্ধ হলে সে আমাদের জানাতে পারতো না কী?

হিমালয় বিবস গলায় বলে—কি জানি? ব্যাপারটা সত্যিই কেমন যেন অদ্ভুত মতন লাগছে। কিন্তু সে বাই হোক, আপনাকে তো বত শীত সম্ভব বেতে লিখেছে।

একটু থেমে বলে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে এত কথা না বলে চলুন না অন্ততঃ গাড়ীটার ভিতর গিয়ে বস। বাক। পরমেশ বাবু নীরবে হিমালয়ের অনুগমন করে এসে বসেন গাড়ীর ভিতরে। কিন্তু কোন কথা বলেন না। তাঁকে আজ অত্যন্ত অনুমনন দেখায়।

একটু পরে হিমালয়ই বলে—কি ঠিক করলেন? আজ রাত্রে গাড়ীতেই হাজারিবাগ যাবেন তো?

—হঁ। হঁ। আমি তো বাবোই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তোমার কাকীমা বড় গোলমাল শুরু করেছে দেখছি। তাই জন্তেই তো পরামর্শ করতে এলাম তোমার কাছে। ও নিজে তো টেলিগ্রামখানা পড়তে পারছে না—আবার আমার কথাতেও বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। আমি একা বাবো ওনে ওর বাবণা হচ্ছে যে খুকী

অনুহঁ। হাসপাতালে আছে। ও ভতই কীদে আর বলে—মিথ্যা কথা, সমস্ত তোমাদের মিথ্যা কথা। যেখানে যে অবস্থাতেই থাক খুকী আমার সেখানে বেতে বাধা কী?

আমি বলে—তুমি নিজেই যে মরতে বসেছ। তোমার আর যাড়ে করে নিয়ে গিয়ে লাভ কী? তা কোন কথাই কী সে মানছে? বতদূর বৃষ্টি আমার উনি সহজে রেগাই দেবেন না। না গিয়ে হাড়বেন না সজে। কিন্তু আমার পক্ষেই কী সম্ভব ঐ হাড়গোড় বেরকরা মানুষটাকে নিয়ে এত রাস্তা বাওয়া?

হিমালয় কিছুই বলে না। সামান্য একটু সমর্থন জোগায় মাত্র। নিজের অন্তর বলে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে শুধু মাত্র ওদের অশান্তি, ওদের উদ্বেগের, কথা চিন্তা করা হিমালয়ের পক্ষে সেও একটা সাধনা বৈ কি। সহানুভূতির বেশ পরমেশ বাবু সাধে নতুন করে সে যে সম্বন্ধই পাতিয়ে থাক অস্ত্রের বিবাহিতা রঞ্জনার কাছ থেকে সে যে স্তব্ধতম, সে কথা সে ভুলে যায়নি। আজ রঞ্জনা সম্বন্ধে তার উদ্বেগ বা আগ্রহ এতটুকু মাত্রাধিক হলে সেটা অস্ত্রের চোখে যে কতখানি বিসর্জন হবে সে জানে তার আছে।

পরমেশ বাবুও তখন ওর তরফ থেকে কোন উত্তর বা আলোচনার অপেক্ষা না রেখে একলা বলে যাচ্ছেন। অল্পপরীক্ষায় যেমন নিমেষে দিগন্তব্যাপী শব্দজাল বিস্তার করে আবার পলকে তাকে অভ্রভেদী বাণে শতছিন্ন করে আপনার ক্ষমতা সপ্রমাণ করে আজ এই উত্তেজিত মুহূর্তে পরমেশ বাবুও তেমনি মুখে মুখে নিজের জীবনের বিশেষ বিশেষ বিপদ সম্পদের এক ঘন ঘটাময়ী সুদীর্ঘ তালিকা রচনা করে বলে চলেছেন—জানো হিমালয়, এ জীবনে আমি—আমি বহু পথে চলেছি। ভালোমন্দ বহু ধরণের লোকও দেখলাম। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই। সব মারা সব মরীচিকা। তোমার সত্যি বলছি বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছে এ জগতটার উপর। বিশেষ কোন কামনা বাসনাও আর নেই। শুধু ওই খুকীর জন্তে—ওই মেয়েটার জন্তেই বত ভয় বত ভাবনা আমার। ওই আমার একমাত্র বন্ধন। হ্যাঁ, হিমালয় আমি স্বীকার করছি খুকীর মঙ্গলের জন্তে আজও আমি স—ব করতে পারি। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না আমার। এই তো একদিন খুকীর মঙ্গল হবে মনে করেই তোমাকে সরিয়ে সূজনকে আমি প্রেরণ দিয়েছিলাম। আবার আজ যদি রঞ্জনার জন্তে প্রয়োজন হয়, তবে হয়ত সেই সূজনকে আমি খুনও করতে পারি। হ্যাঁ, অমন অবাক হয়ে দেখছো কি? আমি পারি, রঞ্জনার জন্তে দরকার হলে আমি সব কিছু করতে পারি।—পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান কিছুতেই হাত কাঁপে না আমার।

উত্তেজনার মুখে এতগুলো কথা বলে কেলেই দারুণ হতাশায় ভেঙে পড়লেন পরমেশ বাবু। প্রায় অশ্রুবিফুক্ত হয়ে বললেন—কিন্তু কি করতে পারলাম আমি? সমস্ত অন্তরের এই অগাধ প্রেহ দিয়ে কতটুকু মঙ্গলসাধন করতে পারলাম মেয়েটার? অমন ফুলের মত সূজনের নিষ্পাপ মেয়েটা আমার নিঃস্বতির টানে প্রোক্তের মুখে খড়কটোর মত ভেসে গেল পৃথিবীতে? আর ধরতে গেলে আমিই তাকে অকূলে ভাসলাম। একথা সত্যি যে, লোভে পড়েই এতটা অধঃপতন হল আমার। তা না হলে তোমার কাকীমা অনেক চেষ্টা

বাইরে বহুদিন ছিলাম মনে মনে বড় ভাবনা ছিল কী করে মেয়েটাকে সুপাত্রে দেবো, কলকাতায় এসে মাথাটা ঘুরে গেল। নিজের মেয়েটাই যেন আবিষ্কার করলাম নতুন করে। ভাবলাম, এমন যার মেয়ে তার আবার ভবিষ্যতের ভাবনা কী? তখন একটা বড় ঘর দেখে যদি মেয়েকে তুলে দিতে পারি তবে বুড়ো বয়সে মেয়ের দৌলতেই সুখে থাকবো আমরা। উঃ হিমালি, এমন যদি না হতো। এমন করে যদি আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন না দেখতাম আমি।

পরক্ষণেই আবার রাগত্বরে বলেন—কিন্তু এ তুমি দেখে নিয়ো হিমালি—এত সহজে হাল ছাড়বো না আমি। আমার একমাত্র সম্ভাবনার জীবনে যদি এতটুকু ক্ষতি করবার চেষ্টা করে সুজন তবে সহজে নিস্তার দেবো না তাকে। রীতিমত একটা বোঝাপড়া হবে এবার। কিন্তু একটা কথা তুমি আমার রাখো হিমালি—আজ রাত্রের গাড়ীতে তুমি আমাদের সঙ্গে চলো হাজারিবাগে। তুমি সঙ্গে থাকলে অনেকটা ভরসা পাই হিমালি! তোমার কাকীমাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। তোমার ওপরে তার অগাধ নির্ভরতা—

—না না, তা কী করে সম্ভব? আমি কেন যাবো? বাড়ীতে মা নিছক একা থাকবেন। তাছাড়া আপনি বুঝতে পারছেন না, সুজন বাবুরা হয়ত সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে নেবেন আমার যাওয়ারটাকে। ভাববেন, তাঁদের বিপদের দিনে তামাসা দেখতে গেছি আমি।

—না-না দে অসম্ভব। আপনি বরং অল্প কারোকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমায় নয়... আমায় আপনি কমা করুন—

এর পরে আরও দু'-একবার অমুরোধ করে পরমেশ বাবু। বলেন—না হিমালি, তোমাকে আর কোন কারণেই ভুল বুঝতে দেবো না আমি। রজনীও আমার তেমন মেয়ে নয়। একমাত্র সুজন যদি বীকাতাবে নেয় কথাটাকে। কিন্তু আমি বলবো আমাদের পরিবারের পুরোন বন্ধু হিসাবে তোমার নিশ্চয় অধিকার আছে যেখানে গিয়ে ঝাঁড়াবার।

মান একটু হেসে হিমালি উত্তর দেয়—আপনি আমি পুরোন বন্ধু বলে আমাদের সম্বন্ধটাকে বত সহজে বজায় রেখেছি অন্তের পক্ষে কী অত সহজে মেনে নেওয়ারটা সম্ভব? বিশেষ করে সুজন বাবুর পক্ষে?

—তা বটে তা বটে। একদিক থেকে কথাটা তুমি ঠিকই বলেছো। শুধু তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমার দিক থেকে অনেক সুবিধা হতো। আমি যেন ভাবতেই পারছি না সেখানে গিয়ে কী অবস্থায় দেখবো।

—না না অত ভয় পাচ্ছেন কেন? হয়ত দেখবেন তখন কিছুই হয়নি।

—হঁ হঁ, রজনীর মা-ও তাই বলছিল একবার। হয়ত একটা বাচ্ছাটোছা চওয়ার সম্ভাবনাও হয়ে থাকতে পারে। সুজন বাবুর তাই সজ্ঞা হয়েছে খবর দিতে। তা না হলে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ কেন করতে গেলো টেলিগ্রামটা? তোমার কী মনে হয়? কী বলো?

নিজের মনের খবরটা আর পরমেশ বাবুকে খোলসা করে জানাতে পারে না হিমালি, মৌখিক একটু হেসে এ প্রসঙ্গে ইতি টানে। বলে—আচ্ছা, আজ রাত্রের গাড়ীতেই যখন যাবেন তখন আর দেয়ী করাবো না আপনাকে। চলুন একটু এগিয়ে দিয়ে আসি আপনাকে।

কথা কইতে কইতে পরমেশ বাবুকে তাঁর বাড়ীর দরজা পর্যন্তই এগিয়ে দিয়ে এলো হিমালি। ওকেও নামবার জন্তে অমুরোধ করেছিলেন পরমেশ বাবু। কিন্তু হিমালি আর 'রাজী' হল না নামতে। কারণ মলিনা দেবীর কাতর অমুরোধ তার পক্ষে এড়ানো যে কঠিনতর কষ্টসাপেক্ষ হবে তা' সে জানে। তাছাড়া নিজেকে এবার একটু একলা পেতে চায় হিমালি। মনটা তার তাড়া-খাওয়া খরগোশের মত মুখ লুকুতে চাইছে—পালাতে চাইছে পরিচিত জনসামিগ্য থেকে।

একা গাড়ীতে বাড়ী ফেরবার সময় কত কথাই ভাবলো হিমালি। সুজনের কথা, রজনীর কথা, পরমেশ বাবুর কথা।

—রজনীকে উনি ভালবাসেন। নিজের মুখেই তো বললেন সে ভালবাসার কোন মাপকাঠি নেই। তা সে তো ধুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা বিষয়ে আশ্চর্য না হয়ে পারে না হিমালি যে অত স্নেহের পাত্রীর অসুস্থতার সংবাদে ঠিক অতখানি ব্যাকুল হননি পরমেশ বাবু। বরং রজনীর তরফ থেকে ডাক এসেছে রজনীকে তিনি এবার কাছে ফিরে পারেন, এ খবরে নিজের অজান্তেই উনি যেন একটু খুশী হয়েছেন বলে বোধ হয়। তাই প্রথমটার ধুব নার্ভাস হয়ে পড়লেও নিজের মনেই কতকগুলো সান্ত্বনাও বচনা করে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। তবে হিমালিকে এবার উনি দয়া করে মুক্তি দিলেই পারেন। সুজন আর রজনী ফিরে এলে পরমেশ বাবুর সুখের সংসার হিমালি সেখানে একান্ত অবাঞ্ছিত হয়ে যাবেই। না না, আর ওদের বাড়ী গিয়ে নিজেকে লোক-চক্রে এভাবে হাতা-পদ করে তুলবে না হিমালি— কিছুতেই নয়।

[ক্রমশঃ]

ডাঃ কার্তিক বসুর	
টার্কোমোড	নানানা
অল্প, অর্জীর্ণ ও ডিসপেনসিয়ায়	ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ-কলিকাতা ১	



গৌরীশঙ্কর মজুমদার

জল জল আর জল, বেদিকে তাকান যায় সেদিকেই জল। যেন আকাশ আর জলে মিশে গিয়েছে। তার মধ্যে ঠিক দরিয়ায় একটি মাত্র শব্দ ছপ-ছপ-ছপ। একটি ছারিকেন টপ-টপ করে জলছে, তাতে কেবল সেই সৌম্যবন্ধ জায়গাটুকু ভাল লগা বাছে। আকাশের উপর তারার মেলা আর মাথার উপর পূর্ণিমা চাঁদ যেন তার সব জ্যোতি জলের উপর দিচ্ছে। অগণিত ঝরঝরালার সাথে চাঁদের শুভ্র আলোর যেন এক মিতালী ঘটছে। শুধু একটি মাত্র প্রাণী নৌকার বসে তায়ুক টানছে।

প্রাণ যেন বেরিয়ে যায় আর কতক্ষণ ধরে রাখবে, তবুও আশ্রয় চেষ্টায় ছুটছে জোরে খুব জোরে। পিছনে তাকিয়ে দেখে সেই বিরাট দৈত্যটা লগা পা বাড়িয়ে যেন ডাকছে, আর না ভয় পাচ্ছিস কেন? সামনে তাকাতেই একটা আলো যেন চোখটাকে ধাঁধিয়ে দিল। আর ভয় কি, এই তো জনপদে এসে পড়েছি, একবার পৌঁছে নিই, তারপর দেখে নেব।

আয় না পালাচ্ছিস কেন, আয় না।

না না।

কেন আমি কি তোকে খেয়ে ফেলবো?

হ্যাঁ হ্যাঁ—ভাবছো আমি যেন কিছু বুঝতে পারি না তাই না? এখন বেশ আদর করে ডেকে পরে ছাড়ের গুঁড়ো রেখে দেবে। জীবন থাকতে লা হবে না।

আমাকে বিশ্বাস করছিস না? তবে ঠাড়া—

প্রাণপণে ছুটছে আর দৈত্যটাও বড় বড় পা কেল এগিয়ে আসছে। হঠাৎ পা পিছলে বালুর উপর পড়ে পেল আর সেই দৈত্যটা এসে বুকের উপর চেপে বসল। বাঁচাও শের আলি, ককির মিঞা, বসির সাহেব বাঁচাও। ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠল মীরমদন। না, না, আমি মরব না কিছুতেই না;

বলতে বলতে মীরমদন কাঁড়িয়ে উঠে ছুটতে বাবে এমন সময় বসির সাহেব বাঁ হাতে তাকে ধরে ফেলল। চমক কিরতে মীরমদন দেখল অন্ধকার রাত্রি আর এক টিপটিপে আলোতে বসির সাহেব তখনও তায়ুক টানতে ব্যস্ত। স্বপ্ন বুঝতে পেরে একটু মুচকি হেসে মীরমদন বসির সাহেবের পাশে বসে পড়ল। নৌকাটা ঠিক আগের মতন ছপ ছপ শব্দ করতে করতে চলে যাচ্ছে।

আজ প্রায় স্তম্ভীর্ঘ আট বৎসর এই জলের উপর মীরমদনের কেটে যাচ্ছে। নামে মাত্র সে একটা কুঁড়ে ঘর করে বেখেছে, তাও প্রায় ডাঙ্গা থেকে তিন মাইল দূরে একটি ছোট ত্রিভূজাকৃতি দ্বীপের উপর। নারিকেল পাতার ছাউনি, বত সব আগাছা ডাল-পালা দিয়ে বেড়া। কিন্তু যখন সে ভেতরে আসে তখন মনে করে যেন সে রাজপ্রাসাদে গুরে আছে। কেউ তাকে কিছু বলে না। নিজের অবাধ স্বাধীনতা এই ছোট দ্বীপটির উপর।

একবার একটা ছোট গ্রামের কাছে তাদের ছিপ নৌকাটা ভিড়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে মারবয়সী এক লোকের সঙ্গে মীরমদনের আলাপ হয়। ক্রমে আলাপ ঘনিষ্ঠ হতে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠে। একদিন সেই লোকটি মীরমদনকে তার জীবনের ঘটনা বলতে বলে।

মীরমদন বললে, চটগ্রামের এক দক্ষিণ মুসলমান-পরিবারে তার জন্ম। বাবা-মার অনেক প্রার্থনার ছেলে। বড় আদর-বড়ে আমি মানুষ হয়েছিলাম। কিন্তু জানিস ভাই, ছোটবেলা থেকেই যেন ভাল জিনিসকে ভাল মনে হত না। মারামারি কাটাকাটি দলবদ্ধ হয়ে চুরি করা খুন করা এই সমস্ত কাজে বেশ আনন্দ পেতাম। চোখের সামনে কত আত্মীয়-স্বজন কত লোককে মরে যেতে দেখেছি আর তাদের কাগ্না ও বিলাপ শুনেছি। কিন্তু কিছুতেই মনকে গলাতে পারতাম না। সব যেন মনে হত মিথ্যা। লোকে জীবহত্যা করলে আঁহা-উঁহ করে, আর আমি বলতাম, কি রে কেমন বেশ ভাল লাগল তাই না? এ ভাবে যে কত জীবহত্যা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। একবার এক বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে চুকেই দেখি, স্বর্ণালঙ্কার-বিভূষিতা এক মহিলা বৃমাচ্ছে। সাথে সাথে একটা ঔষধ নাকের সামনে ধরতেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়, ধীরে ধীরে সমস্ত গহনা ধুলে নিজের কোমরে বেঁধে ফেললাম। এতটা কাজ, নিমেষের মধ্যে এবং বেশ হাসিমুখে করেছিলাম। বাড়ীতে এই সমস্ত কৃতিত্বের জিনিস দেখানর সাথে সাথে বাবা-মা একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

ছিঃ, এতবড় নিষ্ঠুর পাপী কুলাকার তুমি?

না বাবা!

কেন না বলছ কোন্ মুখে, একজনের সখের জিনিস আর তুমি তা চুরি করে নিয়ে এসেছ?

অজ্ঞার আমি কবি নাই বাবা।

এর চাইতে আর বড় নিষ্ঠুর কাজ কি হতে পারে বা তোমার কাছে অজ্ঞার?

কেন বাবা, একদল লোক যারা সমাজের উচ্চস্থানে বসে ঐশ্বর্য্য লুটে খাবে দরিদ্ররা সেখানে গেলে পদাঘাত করে তাড়িয়ে দেবে, হাত পাতলে একটা পরসা দিবে না। কেবল ঘৃণা আর কেবল ঘৃণা। কেন এমন হবে? কিন্তু কেন

মাসিক বহুমতী-ভা. ১৬৬৪



দিনে
দিনে
দি...



রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডিল'
যলে একটি বিশেষ ধরনের ডেই
মেশানো হয়, যাতে স্বক আরও
কোমল, আরও সুন্দর, আরও
জীবনাময়ী হয়...! সুবাস শুধু রেক্সোনার
পরশ সারাদিন আপনাকে সজীব আর
সতেজ রাখে। সৌন্দর্য সাধনায় সর্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন।

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

রেক্সোনা প্রাইভেট লিঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিডার লিঃ তৈরী।

RP.165-X52 BG

কিছুতেই কর্ণ হল না। খাবা মা ঐ অপরাধ কমা করলেন না।
বাড়ী হতে আমাকে বার করে দিলেন আর বললেন যে, আজ
হতে আমরা মনে করব আমাদের মৃত সন্তান।

তারপর থেকে জীবন আরও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে চলল।
চব্বিশুর মত রাত্তার ঘুরে বেড়ান আর অখাত কুখাত খাওয়া।
একদিন এক গলির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি পিছন থেকে বেন
একটা ডাক এল—কি রে কোথায় যাচ্ছিস শোন না।

একবার পিছন তাকিয়ে আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু
সন্তান কোথায়? দেখি যে সেই লোকটা একেবারে সামনে এসে
পাড়িয়ে পড়েছে।

চল না ছুটো কথা বলবি বসে।

কোন উত্তর দিলাম না।

আরে চল না দোস্ত, লজ্জা করছিস কেন?

না না লজ্জা না।

বাস, তবে আর কি চলে আর।

পিছু নিলাম। খানিকটা আসার পর একেবারে ধাঁড়িতে
এসে পড়লাম। দেখি যে খুব হাসি, ঠাটা-ভামাগা আর সাথে
সাথে মদ।

ওস্তাদ চেয়ে দেখ।

একটু চোখ বাঁকা করে দেখে ওস্তাদ বলল, কি যে নয়া শিকার
করলি বুঝি? তা বেশ হয়েছে এখন ভাল করে তৈরী কর।

হো-হো, হা-হা, হি-হি শব্দে হেসে উঠল ওস্তাদ। তারপর একটু
খেমে বলতে লাগল, জানিস অনেক বেটাকে এখানে আসতে
হবে অনেক কিছু শিখবার জগে—আবার আরম্ভ হল হা-হা,
হো-হো—আর থাকে মদ।

আবহাওয়াটা তখন বেন সেরকম ভাল লাগল না, কিন্তু সেই
বন্ধু পীরমহম্মদ পরে তার ওস্তাদের অনেক প্রশংসা করল।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা ভাই, তোমরা সব কি কর?
আরে সে তুই জানিস না, ও তাছাড়া তোকে বলাও হয়নি।

না বলনি ত ভাই।

বুঝলি, বলতে গেলে আমরা সব এক একজন রাজা।

কি রকম? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আমরা জলদস্যু, যখন যে অভিযানে যাই খলে খলে সোমানানী
টাকাকড়ি আর সব দামী জিনিস নিয়ে আসি। তারপর বেশ
কয়েক দিন হাসিহাসি, মনমাংস আর জুয়া খেলে কাটিয়ে দিই।

কি রকম করে এসব তোমরা পাও আমি পীরমহম্মদকে জিজ্ঞাসা
করলাম।

সে কাজ খুব সোজা যে। ধর না কেন, পাঁচ ছয়জন একটা
নৌকা নিয়ে ছপুয় বাতে বড় নদীতে বেরিয়ে পড়ি। হয়ত
তুরে একটা বড় নৌকা দেখতে পেলাম, আন্তে আন্তে আমাদের
নৌকা তার কাছে নিয়ে গেলাম। তারপর বুঝলাম বেশ কিছু
পাওয়া বাবে, ব্যস আর কি, হেঁ-হেঁ মার-মার করে গিয়ে উঠে
পড়লাম, তারপর বা করলাম তা বেশ বুঝেই পারছিস, কি বল
মীরমদন?

শরীরের ভিতর দিয়ে বেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল,
পীরমহম্মদকে তখন আর কিছু বললাম না।

সারারাত ঘুম হল না, কেবল ভাবতে লাগলাম, কি করব।
একবার সোনার রত একবার টাকার কলকলানামি শব্দ এবং সেই সাথে
ঘুমের অচঞ্চল মেলা এই তিনটে মিলিয়ে যে আমাকে পাগল করে
চুলল, কি করব কি করব। পরক্ষণে ভাবলাম তাইতো করবই বা
কি। পিছনে তাকাতে দেখি সব অন্ধকার, সব বেন দূরে সরে
যাচ্ছে। কোন দিশা ঠিক করতে না পেরে পরদিন পীরমহম্মদকে
বললাম, ভাই, ওস্তাদের দয়া কি আমার উপর হবে?

সাবাস বেটা সাবাস, বলে পিঠে হুই চাপড় দিয়ে পীরমহম্মদ
বলল চলে আর।

কথাটা বলেই কেমন বেন অস্তমনক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ
সেই চাপড়ে চমক কিরতেই বলে উঠলাম, কোথায়?

আরে ওস্তাদের কাছে।

হা চল যাচ্ছি।

সেই থেকে আমার জীবন জলদস্যুতে পরিণত হয়।

এ অনেক দেয়ী হয়ে গেল, আচ্ছা ভাই সাহেব, চললাম
আজকের মত আবার যদি দেখা হয় তাহলে আরো কিছু
বলব খ'ন।

ছিপ নৌকায় কিরে আসতেই দেখি শের আলি, ফকির মিঞা
সব রেগে আঙন। বলি নবাবের কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনতে
পারি?

আরে চল চল, সে সব বলব খ'ন।

আবার ছপা ছপা ছপ শব্দ আরম্ভ হল। বসির সাহেব মনের
আনন্দে গান ধরল।

“সুখের লগে ঘর বাঁধব ঠিক করেছি তু ভাই,

মন আমার কোথাও যেতে চায় না তাই।”

শুধু একটা মাত্র টিমটিমে আলো আর আমরা চারজন। এমন
সময় তুরে একটা আলো টলমল করতে দেখে ফকির মিঞা মীরমদনকে
বলল—এই মীরভাই।

কি কি?

আরে উঠ না, দেখ না একটা আলো টলমল করছে না?

না না।

আরে উঠ না দেখ না।

অনেক টেলাঠেলিতে মীরমদন উঠে দেখল, তাইতো আলোটা
অমন করছে কেন?

ও শেরভাই নৌকাটার খোঁধর জল ঢুকতে আরম্ভ করেছে।
তাই অমন করছে, বলে উঠল বসির সাহেব। আর এদিকে মীরমদন
ও ফকির মিঞা প্রাণপণে দাঁড় টেনে যাচ্ছে ছপাত—ছপাত—
ছপাত। সকলে বেশ বুঝতে পেরে গিয়েছে যে বড় নৌকাটার বেশ
কিছু পাওয়া বাবে। তাই এত আকুল আগ্রহ। বাঁচাও কে কোথায়
আছ—বাঁচাও মরে গেলাম, বাঁচাও বাঁচাও।

আর এদিকে মীরমদন বসির সাহেবকে বলল—বেশ কিছু
পাওয়া বাবে কি বল বসির ভাই?

মীরমদনদের ছিপখানা আর হাত তিরিশ তুরে আছে, এমন
সময় সেই বড় নৌকাটা সব নিয়ে ডুস করে ডুবে গেল। সাথে
সাথে মীরমদন ও আর সবাই জলে লাকিরে পড়ল। সীতার দিকে

তুই দিচ্ছে আর হর সোনার জিনিষ নয় কোন পড় নতুবা কোন দামী জিনিষ পাচ্ছে। পাচ্ছে আর ফেলে দিচ্ছে তাদের ছিপ নৌকার। বেন এসব কাজ কিছু শক্ত নয়, এ কাজে তারা অনেক অভিজ্ঞ।

আরে জলের উপর ও সাদা জিনিষটা কি কার্টের সাথে আটকে আছে? খুব জোরে সঁাতার দিয়ে কাছে গিয়ে সেটাকে টেনে ধরল। বেশ ভারি লাগছে, হ'হাত দিয়ে অভিকষ্টে টেনে তুলল, তুইই মীরমদন একেবারে অবাক হয়ে গেল। এ কি, এটা এখনও বেঁচে আছে! ভাল করে আর দেখা হল না কোনরকমে পিঠের উপর ফেলে নিয়ে ধীরে ধীরে ছিপে এসে উঠল। খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মীরমদন।

ওদিকে শের আলি বসির সাহেব, ককির মিশ্রা মীরমদনকে দেখতে না পেয়ে অনেক ডাকাডাকি করল, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। বিরক্ত হয়ে বসির সাহেব বলে উঠল, আরে চল চল কিরে বাই, ও শালা হয় ভবেছে না হয় কোন কিছুতে খেয়ে নিয়েছে।

এদিকে মীরমদন আলোটা এনে সামনে ধরতেই দেখে, এক পরমাশ্রদ্ধারী কল্যাণী বসুচ্ছে। হাতে ছোট ছোট চুড়ি, পরনে সাদা ফ্রক আর লাল ফিতা দিয়ে চুল বাঁধা, অপূর্ক দেখতে লাগছে। একদৃষ্টে মীরমদন মেয়েটির দিকে চেয়ে আছে, আর ভাবছে আদ্যা বোধহয়, তাকে নিরালস্য বসে তৈরী করেছিল, আজ তোর ভাগ্যে এই ছিল। ঠাৎ কপালের মাঝখানে একটা সফ্র কাটা দাগ দেখতে পেয়ে মীরমদন মনে মনে বলে উঠল—তাই তো বলি তোর রূপ ক দেখবে শুনি, কপাল যে তোর কাটা তোর কপালে হবে না ত কার হবে শুনি? তা না হলে তোর বাপ মা সব ভুবে যার আর তুই কি না আমার মত এক ডাকাতের হাতে পড়িস, দেখছি তোর অনেক দুঃখ আছে।

কি রে তুই বেঁচে আছিস, আমরা ভাবলাম বুঝি তোকে কুমীরে খেয়ে নিলে, কি বল ককির মিশ্রা, বসির সাহেব তাই না? বলে উঠল শের আলি।

কি বলছিস শের ভাই, মীরমদন বলল। আর কি বলব বল, তোর আক্কেলের বাহাত্ত্বি দিই, আসার সময় কি পেলি কিছুই দেখালি না আর কিরেই যদি আগবি ত বলে এলি না কেন? আমরা সব খুঁজে খুঁজে হাজাক।

সর্বনাশ! এই মীরমদন, এটাকে আবার কোথায় পেলি রে! মীরমদনের দিকে চেয়ে বসির সাহেব বলে উ।

কি ভাই সাহেব কি ভাই সাহেব, বলে শের আলি ককির মিশ্রা বসির সাহেবের কাছে এসে নীচে চাইতেই দেখে, সেই মেয়েটি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

আর বলিসনে, বত সব উৎপাত আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। পত কার না কার মেয়ে বাপ মা সব ভুবে গিয়েছে, আর এ টি ঠিক বেঁচে আছে। কেন বাবা সাথে সাথে ভুবে গেলেই টে বেত—সব ল্যাঠা চুকে বেত।

কি রে তোর দেখছি বেশ মারা পড়ে গিয়েছে মীর ভাই, বলল শের আলি।

নে নে জলে কলে দে বত সব উৎপাত। বেশ খাচ্ছি দাচ্ছি

আর ডাকাতি করে বেড়াচ্ছি, কারো ধার আমরা ধারি না, কি বল বসির সাহেব? তার মধ্যে কিনা মীরভাই এক আপদ সৃষ্টি করল। অত মারার নিজেকে জড়াসনে, তাহলে আসল কাজে ছিল পড়ে যাবে তখন কিন্তু ওস্তাদজী রক্ষা রাখবে না, এই বলে দিচ্ছি। চল, শেরভাই, ককিরভাই আবার ওদিকে সব বোধহয় গেল। এই বলে তিন জনেই ছিপ থেকে বাঁপ দিয়ে জলে পড়ল। আর মীরমদন মেয়েটিকে সার্মিনে নিয়ে পাখরের মত বসে রইল।

ভোর হবে হবে, অন্ধকার আর কেটে উঠেছে। শেরভায়ে মীরমদনকে একটু তল্লাহ দিয়ে ধরেছিল। এমন সময় মা-মা! বা-বা শব্দ হইতেই মীরমদন চমকে উঠল। ভাল করে চোখ বুজে মীরমদন মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে মেয়েটি হাসছে। তাহলে মেয়েটা জান কিরে পেয়েছে, মীরমদন মনে মনে ভাবল। প্রথমে শক্ত করার চেষ্টা করল মনটাকে কিন্তু পায়ল না, বাধ্য হয়ে একটু জ্বুটির হাসি হাসল। আর বাবে কোথায়? মেয়েটা হুহাত উঁচু করে মীরমদনের কোলে বাবার আবেদন জানাল।

বা: বা: অত সুখ ধারি না, বেঁচেছিস এই না, বত মনে মনে বলতে লাগল মীরমদন। কিন্তু পার হয়ে যাওয়া কি অত সোজা, আরোও তাড়াতাড়ি মা-মা বা-বা বলতে বলতে মেয়েটি মীরমদনের দিকে চেয়ে হাত-পা ছুড়তে লাগল।

কেমন বেন এক আবেগের মাধার মীরমদন বিদ্র্যাতের বেগে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল।

না না আমি এমন হতভাগিনী না কিছুতেই, না বলে মেয়েটাকে কোল থেকে বর্পাৎ করে উঠিয়ে দিয়ে পিছন কিরতেই দেখে শের আলি, বসির সাহেব সব হাসছে।

দেখ না বসির সাহেব এ এক বড় উৎপাত হয়েছে তাই না?

তাই নাকি মীরভাই? নে আর অভিনয় করতে হবে না, এখন চল তোর ঘরে চল, অনেক বেলা হল।

চল বসির সাহেব, তাই চল বড় ক্লান্ত লাগছে।

আবার শব্দ আরম্ভ হল ছপাত-ছপাত-ছপাত—শের-আলি ও ককির মিশ্রা দাঁড় বাইতে লাগল। ধীরে ধীরে ছিপ নৌকাটা সেই দীপটার গায়ে এসে লাগল।

নে চট করে নেমে পড়, আবার পরে তোর সাথে দেখা করব'ধন বলে উঠল বসির সাহেব।

ডাঃ বসুর
অশোক কার্ডিয়েল
 গারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
 ও সৌন্দর্য বর্ধন করে
 প্রথম প্রস্তুতকারক:
 ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ
 কলিকাতা-৯

কত দিনের বেশ অভিজ্ঞ বেশ বস্তুর সাথে মেয়েটাকে কোলে
তুলে নিয়ে এক-পা দু'-পা করে একত্রে লাগল মীরমদন।

একবার পিছন ফিরে তাকাতাই দেখল, বসির সাহেব ও ক'র
মিঞা হাত নাড়ছে আর হেসে বেন বলছে—বা দোস্ত, এগিয়ে
বা, এগিয়ে বা। বীবে বীবে তাকাও মিজিয়ে গেল।

মীরমদন ঘরে ঢুকে মেয়েটাকে তার সেই বিছানার উপর শুইয়ে
দিয়ে মিসেবের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এখন কিছু খাবারের
কর্তার করতে হবে, না না বলে যেহেঁটা হয়ে যাবে। ঘরে ঘরে
করতে লাগল মীরমদন।

চুই দুই একটা মোটা-মোটা গরুরে আর খেয়ে বেড়াতো দেখে
মীরমদন কাছে গিয়ে ধরল এবং বখ করে গরুটাকে তার সেই কুঁড়ে
ঘরের কাছে নিয়ে এসে একটা কড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। ঘরে ঢুকে
দেখে, মেয়েটা ভীষণ ভাবে কীতছে। একটু বেশ দারী হল, তাই
বলে উঠল, এই ত হয়ে গিয়েছে—মিজি মা, বলে একটা হাটিকে
খানিকটা দুধ নিয়ে পাতার আঙুলে পুরম করে খাটিয়ে দিল। বাস,
সাথে সাথে হাসি আর বা-বা-মা-মা বলে হাত-পা দুঁতে
লাগল। মীরমদন পাশে বসে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। মেয়েটা
অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মীরমদনকে অল্প রকম করে ফেলল।

শুধু এই নিয়ে পড়ে থাকলে তার চলবে না, তাকে আহাতির
সন্ধান করতে হবে, কিছু রোজগারও করতে হবে। তাই মেয়েটাকে
সাবধানে ঘরে রেখে বসির সাহেব ও শের আলির সাথে এক রাতে
সে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

সেই রাতটা বোধ হয় মীরমদনের পক্ষে শুভ ছিল। হয়ত সেই
জতে খানিকটা দুধ যেতেই একটা বড় নৌকা দেখতে পেল।
তাড়াতাড়ি ছিপটা চালিয়ে গিয়ে হৈ হৈ করে চার জনে উঠে পড়ল।
বাঁচাও বাঁচাও, আঁগহাজ আর রক্ত লাল হয়ে যেতে লাগল
পাটাতনটা। তার পর মীরমদন এক জাহগায় দেখে, একটা চৌদ্দ
বহুরের মেয়ে বুমাছে। এক সেকেন্ডের ভিতর কোমর থেকে চকচকে
ছোঁরাখানা বের করে ফেলল। তার পর শুধু একটা শব্দ, উঃ মা।
বাস, আর কিছু না। তাড়াতাড়ি করে গহনাগুলো ধুলে নিল।
সবগুলো হাতে নিয়ে—সব পেয়েছি, সব পেয়েছি—হা হা-হা বলে
জোরে হেসে উঠল।

কি রে, ব্যাপার কি? অত হাসিহিস কেন? বলে উঠল
শের আলি।

হা-হা-হা, হো-হো-হো শের আলি চেয়ে দেখ, জলটা কেমন লাল
হয়ে গিয়েছে। বুলি, শেষকালে মেয়েটা বলে উঠল, উঃ মা, আহা
বেন কত মা-ভক্ত বলতে লাগল মীরমদন।

কেবল তার হয়েছে, এমন সময় মীরমদন তার সেই কুঁড়েঘরে
এসে ঢুকল। ঢুকেই দেখে, মেয়েটা চাঁকায় করে কাঁদছে। রাগে
মীরমদন বলে উঠল, এই সবমাত্র একটা খুন করে এসেছে তখনও
তার নেশা কেটে উঠেনি আর হাত-পা বেশ চালা আছে। মনে
হচ্ছে আরও একটা খুন অনায়াসে করতে পারবে। তীরবেগে
মেয়েটার কাছে এগিয়ে গেল এবং দুটো হাত মেয়েটার গলার উপর
রাখল। জোর দিতে বাবে, এমন সময় একপাল হেসে মেয়েটা
বা-বা মা-মা বলে উঠল। হাত বেন আপনা থেকে সরে এলো,
মীরমদন একদৃষ্টে মেয়েটার দিকে চেয়ে বইল।

সবটাই বেন গোলমাল হয়ে গেল। খানিকটা চুপ করে বসে
থেকে খপ করে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে হেসে আঁর করে
বলতে লাগল, না রে, তোক কি মারতে পারি? একটু পরে
মেয়েটাকে শুইয়ে দিয়ে মীরমদন ঘরের বাইরে গেল, তার পর ঘরে
এসে কাছ করতে বাবে, এমন সময় চেয়ে দেখে, মেয়েটা তার কোলে
বাঁহাজার করে হাত বাড়াচ্ছে।

ওঃ কি আমার রাজহাগী রে! সব সময় কোলে নিয়ে থাকতে
হবে। অত যদি কোজে চড়াই রাখ, তবে বাপ-মাকে খেয়েছিস
কেন? বড় সব আঁর।

এসে পড়েছিল ত এক তাকাতের হাতে, বেঁধে আঁরিস এই মা
কত, আঁর কোলে—বলে মীরমদন নিজের কাঁজে মম দিল।

দেখতে দেখতে মাঝো মাস, বাবোটা বৎসর কেটে গেল। মেয়েটা
বেশ বড় হয়ে উঠল। মীরমদন তার নাম রেখেছে মুন্না। কথায়
কথায় বা-জান বা-জান আর মামা রকম আঁর। মুন্নার মুখের
দিকে চেয়ে মীরমদনও মাঁয়ার গলে যায়। তাই তার আঁর সহ
করতে হয় আর সময় সময় শাসনও করতে হয়। কিছু দিন পর
মীরমদন ঠিক করল মুন্নাকে তার বৌবনে শেখা নানা রকম খেলা
শেখাবে। কারণ মুন্নাকে ছেড়ে সে কোনদিনই থাকতে পারবে,
একথা সে কখনাই করতে পারে না। যদি মুন্না খেলাগুলো শিখে
নিত্তে পারে, তাহলে সে এই দম্ভাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে মুন্নাকে নিয়ে
অল্প কোঁথাও চলে যাবে।

সত্য সত্যই এ স্বপ্ন তার একদিন সফল হল। মুন্না মীরমদনের
নির্দেশমত খেলাগুলো তাড়াতাড়ি শিখে ফেলল। একদিন মুন্না
মীরমদনকে বলল—আচ্ছা বা-জান, চল না, আমরা এখান থেকে
চলে যাই।

কেন মা?

অল্প কোঁথাও গিয়ে এই সব খেলা দেখিয়ে পরমা রোজগার করব
আর দুজনে বেশ সুখে থাকব। এমন মিষ্টি কথা মীরমদন যে কোন
দিন শুনেবে, তা সে ভাবতেও পারেনি। সত্যই ত ভাববেই বা
কেমন করে, খুন আর হিংসা যার জীবনের পেশা, তাকে মিষ্টি কথা
বলবেই বা কে? থাকে দেখলে সবাই বাঁচাও, বাঁচাও ডাক ছাড়ে।

বাব মা বাব, মীরমদন বলে উঠল। কয়েক দিন পরে তাই সে
পাগলের মতন শের আলি, বসির সাহেবদের খুঁজতে লাগল।
একদিন দেখা পেতেই বড় ক্লান্ত হয়ে বলল, তাই সব তোদের সাথে
এই সুদীর্ঘকাল বেশ হাসি আর সুখের ভিতর দিয়ে কেটে গিয়েছে।
কিন্তু তোরা জানিস, মুন্না আমাকে বড় মাঁয়ার ফেলে দিয়েছে।
এখন ওসব খুন করতে গেলেই মুন্নার ছবি মুখের উপর ভেসে উঠে,
তখন না পারি খুন করতে, না পারি ছেড়ে দিতে। তাই ঠিক
করেছি, তোদের এবং ওস্তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অল্প কোঁথাও
চলে যাব। যে বসির সাহেব মীরমদনের মুখে এ রকম
কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিত, সেই বসির সাহেব আজ কোঁ
কথা না বলে মাঁখাটা নিচু করে থাকল।

ওস্তাদজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মীরমদন বেরিয়ে পড়ল
তারপর ঘুরতে ঘুরতে আঁরাকান নামে এক সহরে এসে উপস্থিত
হল। লোকে লোকারণ্য। তাই মীরমদনের প্রথমে গরু বনে
গিয়েছিল। এই বুঝি তাকে চিনে ফেলল আর যদি একবার চিনে

গারে তাহলে দুই একেবারে অবধারিত। তবুও তবুও তবুও বা
হল সে বীণটা থেকে নিয়ে এসেছিল তা থেকে ছোটো বীণ একটা
হলি একটা জোল খানিকটা মোটা তার এবং আরও অনেক কিছু
করে ফেলল। কয়েক দিন পরে বেশ ভাল একট পাড়া দেখে সে
তার তন্ত্রিতরা নিয়ে বসে গেল। ভুগ-ভুগ-ভুগ করে জোলটা বাজতে
লাগল করল। পাঁচ মশ মিনিট পর্যন্ত বিশেষ কোন লোক হল না
যে দুই মীরমদনের কাবের কাছে দুখটা নিয়ে বলল, চল বা-জান
মত জায়গার বাই।

কাঁড়া না দেখে না।

ভেড়ির খেলা বাবু ভেড়ির খেলা, সাথে সাথে ভুগ-ভুগ-ভুগ শব্দ।
বন্ধে দেখতে আর ভিড়িখ জল লোক হতেই মীরমদন দুটাকে
নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দিল। মান্যকর্য ভাবে ভিগবাজী খাওয়া
বিশেষ উদ্যম দুটাকে কাঁড় করিয়ে বীণটাকে সোজা করে কাঁড় করিয়ে
রাখা, খালি হাতে দুটার ডাবের উপর দিয়ে হেঁটে বাঁচা প্রকৃতি
অনেক খেলা দেখাল মীরমদন। খেলা শেষ হতেই টুপ-টাপ করে
অনেক পরশাও পড়ল। দুই সেগুলো শুনে মীরমদনকে বলল,
বা-জান ছুটাকা হয়েছে।

তাই নাকি? মীরমদন বলে উঠল।

মনে মনে বেশ আনন্দ হল মীরমদনের। সে ভাবতে লাগল,
এভাবে পাঁচ জায়গায় খেলা দেখাতে পারলেই মশ টাকা আয় হবে,
দুটনের খেতে চার টাকা আর দুটার এ জিনিষটা ও জিনিষটার অল্প
এক টাকা, বাকি পাঁচ টাকা একেবারে মজুত, কি বল যুরা?

কি বা-জান বাই, দুই তখন জিনিষপত্র গোছাতে ব্যস্ত ছিল।
না ভাবছিলাম কি যে—

কি ভাবছিলে বা-জান?

না না ও সব কিছু না, নে তুই তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে আবার
অল্প জায়গায় যেতে হবে। দুটার সাথে সাথে মীরমদনও হাত
লাগিয়ে জিনিষপত্রগুলো ঠিক করে নিয়ে মেয়ের হাত ধরে অল্প
বগুনা হল। এই ভাবে ছোটো বৎসর কোথা দিয়ে কেটে গেল দুই
মীরমদনও জানতে পারল না।

বা-জান, ঐ কাপড়টা কিনে দেখে, দুই মীরমদনকে বলল।
কথাটা মীরমদনের কানে গেল না। কারণ, তখন সে গভীর
চিত্তায় ব্যস্ত। সে ভাবছে তাহলে আজ্ঞা বোধ হয় দুটার দিকে
চেয়েছে, দুটার একটা গতি হবুত সে করতে পারবে। কিন্তু
পরকণে দুটাকে ছেড়ে থাকতে হবে, চিন্তা করে মীরমদন নিউবে
উঠল। দুই আবার বলতে লাগল ও বা-জান, দেখনা ঐ কাপড়টা
আর ঐ খেলনাটা কিনে দেবে, দাঁও না, বা-জান। মীরমদনের
এককণে চমক ডাঙল, কিহতেই বলে উঠল, ওঃ ওঃ, ঐ কাপড়টা
আর খেলনাটা আচ্ছা তোকে কিনে দেব খন। এই সব কথা
বলতে বলতে তারা সেই বড় দোকানটা ছাড়িয়ে চল গেল।
খানিক দূরে গিয়ে সে মেয়েকে বলল কি করবি মা ঐ কাপড় আর
খেলনা নিয়ে? আমরা বাস্তার বাস্তার ঘুরে বেড়াই, কেই বা দেখবে
ওসব। তার চেয়ে দেখবি তোমার সাদীর সময় আমি কত ভাল

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ...



থাণ্ডের সারাংশ সম্পূর্ণ শরীরের
প্রয়োজনে নিয়োগ করলেই
অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়।
ডায়া-পেপ সিন ব্যবহার করলে
এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন,
কারণ ডায়া-পেপ সিন খাওয়া
হজমের সাহায্য করে।

দুবেলা খাবার সময়
নিয়মিত ছোট এক
চামচ খাবেন।
ডায়া-পেপ সিন
কখনো অত্যাসে
দাঁড়ায় না।

ডায়াপেপসিন

ইউনিয়ন ড্রাগ কলিকাতা



কাপড় কিনে দেব, কি বল মা ভাই মা? মুন্না তখন একটু আঞ্জাদেব নুরের বলল, আচ্ছা আচ্ছা সে হবে খন পরে, এখন তুমি ওটা কিনে নাও না বা-জান। মুন্নার কথা শেষ হতে না হতেই ও ভেঙেওগালা বলে হুটো আওরাজ মীরমদনের কানে এল। পিছন ফিরতেই দেখে, এক তিনতলা বাড়ীর বারান্দা থেকে একটি মহিলা তাকে ডাকছে। সেই বাড়ীর সামনে বেতেই মহিলাটি তাকে তার খেলা আরম্ভ করতে বলল। মীরমদনও সব ঠিকঠাক করে নিয়ে চোলে আওরাজ করল ডুগ-ডুগ-ডুগ।

দেখতে দেখতে বেশ জীড় জমে গেল আরও, মুন্নাও মীরমদনের মাঝে বাঁশের খেলা মনোরম ডিপবাজী দেখাতে লাগল। কিছুক্ষণ পর মীরমদন তার কাঁধ থেকে চোলটা নামিয়ে বলতে আরম্ভ করল ভাই সব, এবার বে খেলাটা আপনারা দেখতে পাবেন তা খুবই দক্ষ ও উন্নত কিন্তু এই আমার মেয়ে মুন্না কেমন সহজে তা করে ফেলবে। এই বলে মীরমদন চোলটা কাঁধে নিয়ে দক্ষ করল ডুগ-ডুগ-ডুগ। ওদিকে মুন্না খালি হাতে একটা তারের উপর দিয়ে হেঁটে বেতে আরম্ভ করল এবং দর্শকরাও বেশ আগ্রহের সাথে দেখতে লাগল। হঠাৎ মুন্নার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল, তখন সে আর ভাল ঠিক না রাখতে পেরে সোজা মাটিতে পড়ে গেল। কি হল কি হল দেখি দেখি বলতে বলতে সব লোক এসে সেখানে ঘিরে ধরল। এ রকম যে একটা ব্যাপার হয়ে যাবে এ ভাবতেও পারেনি সেই তিনতলার বাড়ীর মহিলা। তবু ব্যস্ত হয়ে বাড়ীর কর্তাকে সাথে নিয়ে সোজা এসে জীড়ের ভেতর ঢুকে পড়লেন। তারপর জীড় ঠেলতে ঠেলতে সামনে এসে হাজির হলেন। এসে দেখতে পেলেন মীরমদন, মুন্না তোর কি হল মা বলে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। আঘাতটা বেশ গুরুতর হয়েছে বুঝতে পারলেন সেই ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। ভাই তাড়াতাড়ি একথানা গাড়ী ডেকে অটোচক্র মুন্নাকে তুলে দিলেন গাড়ীতে সেই ভদ্রলোক তাঁর আবহুল সাহেব। মীরমদন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পাশে বসে মিনতির নুরে জিজ্ঞাসা করল, বাবু আমার মুন্না মা ভাল হয়ে যাবে বাবু?

হ্যাঁ, হ্যাঁ কেন যাবে না?

গাড়ী তখন তীরবেগে ছুটে চলেছে সদর হাসপাতালের দিকে। কোথায় থাকল মীরমদনের যোলাবুলি আর কোথায় থাকল তার মন্বল বা সে দীপটা থেকে নিয়ে এসেছিল। হাসপাতালের ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'ইন্টারনাল হেমারেজ' কি হবে তা বলা শক্ত, তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

আবহুল সাহেব ও তাঁর স্ত্রী মীরমদনকে অল্পভাবে বুঝিয়ে বললেন, একটু জোরে আঘাত লেগেছে, তবে দুদিনে সেরে যাবে, তুমি কিছু ভেব না মীরমদন!

আচ্ছা বাবু, আচ্ছা আপনারা মজল করুন, আচ্ছা আপনারা মুখী করুন।

আবহুল সাহেব ও তাঁর স্ত্রী মীরমদনকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মীরমদন কিছুতেই গুল না। ভাই তাঁরা মীরমদন পাগলের মত হাসপাতালের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটা রাত চলে গেল অন্যভাবে অনিচ্ছার, নানা চিন্তা, ভাবনার ভিতর দিয়ে। মনে হতে লাগল মীরমদনের সেই পড়ার বাক্সে নদীর বুক থেকে মেয়েটার প্রাণ বন্ধ করা কথা। মনে পড়ল মুন্নার আবহার ও গারে পড়ার ভাব বা ভিনা তার মত নির্ভর নির্ভর জলদন্তিকে মায়ার আবহ করেছিল। সে নিজে কিছুতেই মায়ার জড়াবে না, এমন কি তার বড় বসির সাহেব বলেছিল 'আরে নিজেকে অত মায়ার জড়াসনে' হয়ত ওর কথা শুনেলে তাকে আজ এমন হতে হত না। বত সব ঐ মুন্নার জন্ত। আবার মনে পড়ল সেই বড় দোকানটার কাছ দিয়ে আসবার সময় মুন্নার আঞ্জাদেব কথা—'বা-জান ঐ কাপড় আর খেলাটা আমার কিনে দেবে। ও বা-জান গুল না কেন?'

সব মিলিয়ে যেন মীরমদনকে আরও পাগল করে তুলল। হিব থাকতে না পেরে একেবারে সোজা সেই তিনতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল।

কি মীরমদন—আবহুল সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

বাবু, আমার মুন্না কেমন আছে? ও ভাল হয়ে যাবে ত বাবু? তা না হলে আমি পাগল হয়ে যাব।

না না ও সব ভাল হয়ে যাবে, তুমি অত পাগল হচ্ছ কেন মীরমদন!

আচ্ছা আপনাকে মুখী করুন আপনার মজল করুন, বলতে বলতে মীরমদন চলে গেল।

পরদিন ঠৈকালবেলার আবহুল সাহেব খবর নিতে গিয়ে শুনেলেন যে মুন্না এক ঘণ্টা আগে মারা গিয়েছে। জ্ঞান সে ফিরে পার নি, শুধু শেষ সময়ে কোনরকমে একবার বা-জান বলে ডেকে উঠেছিল। ব্যস, তার পর সব শেষ হয়ে যায়।

মীরমদন আসতে আবহুল সাহেব অতিকষ্টে তাকে জানালেন আর সাথে সাথে নিজেও কেঁদে ফেললেন।

বাবু আমার মুন্না নেই, আমার মুন্না নেই বলে বুকফাটা কাগ্ন কেঁদে উঠল মীরমদন। তারপর একটু পরে মুন্না, মুন্না, মা আমি বাচ্ছি বলে ছুটেতে আরম্ভ করল অচেনা পথের দিকে। আবহুল সাহেব ও তাঁর স্ত্রী মীরমদন কোথায় যাও শোন একবার শোন—বলে বার বার ডাকতে লাগলেন। কিন্তু সে কথা আর মীরমদনের কানে গেল না।

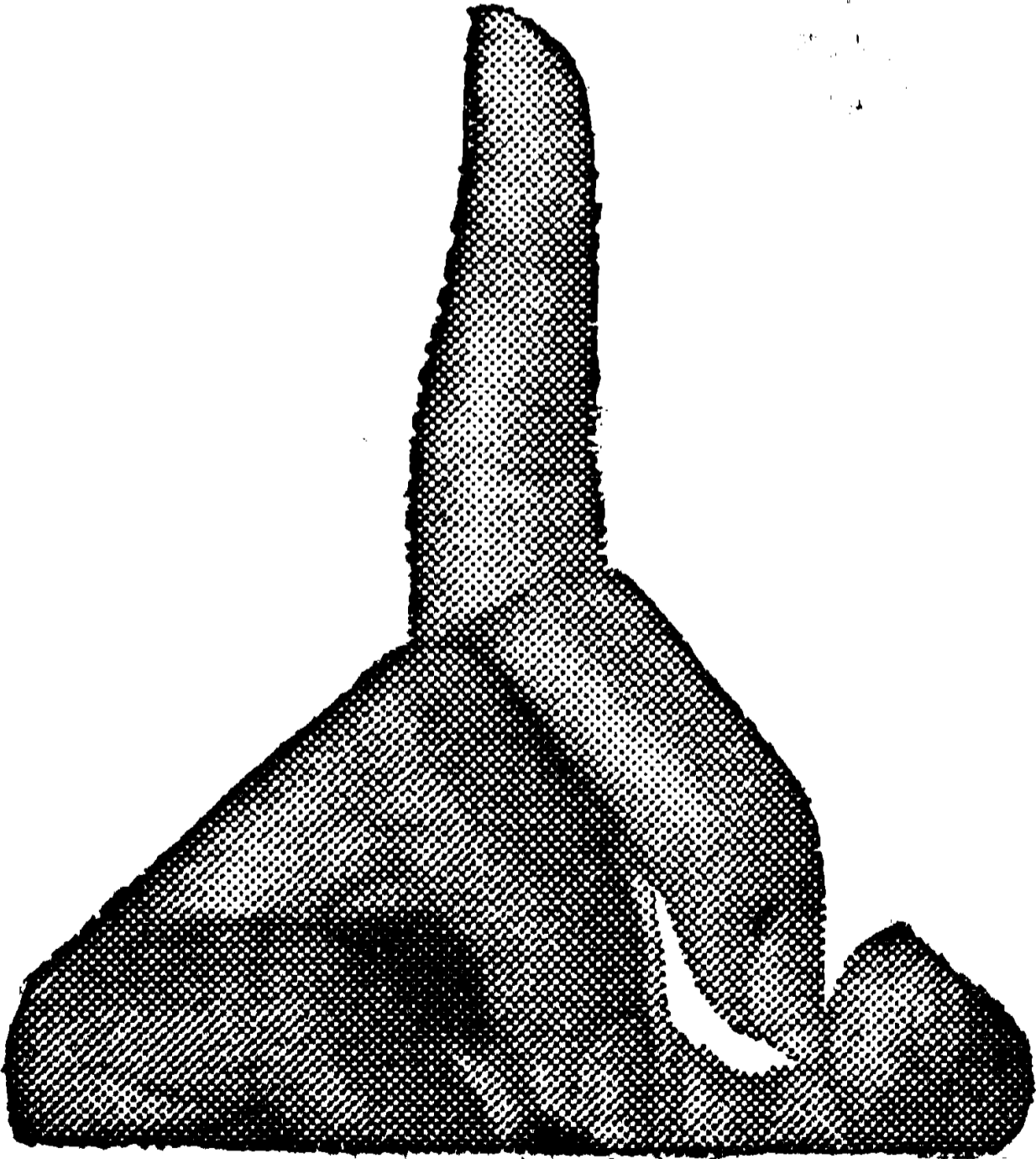
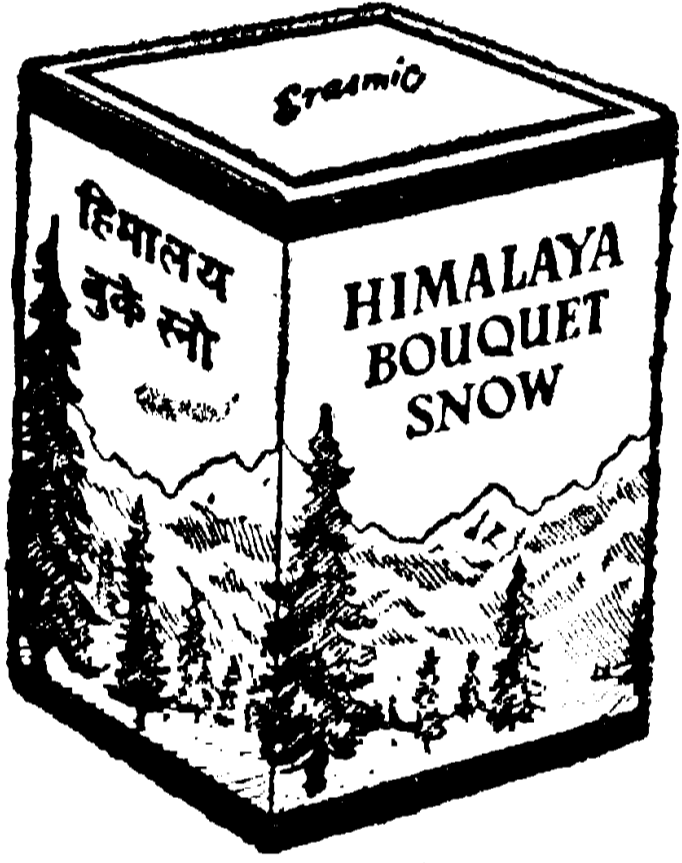
একটা নিদ্রাশালা দেখিয়া আসিলে যেমন মনের ভাব হয় সমস্ত রঘুবংশ পাঠ করিলেও সেইরূপ হয়। অনেকগুলি ক্রমে বাঁধানো ভাল ভাল ছবি।—দিলীপদম্পতির তপোবনে গমন। রঘুর নানা দেশে দিগ্বিজয়। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। দশরথের মৃগয়াগমন। রাম-সীতার-রথযাত্রা। পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী। অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগ। এইগুলি ছবি, বাকি সমস্তই ক্রম।

রঘুবংশে চরিত্র বাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা কেবল বর্ণনামাত্র, চরিত্র রচিত হয় নাই। দিলীপের গুণগ্রাম কালিদাস নীতিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিখিয়াছেন মাত্র—অত নৃপতিদিগকেও সর্বাঙ্গীনভাবে আগ্রহ করিয়া তুলিবার ভেমন চেষ্টা হয় নাই। কেবল কবিগুলির প্রতিই কালিদাসের টান। —বালেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপনার রূপ লাভন্য আপনারই হাতে!

মুখটিকে অকারণ বোদে—ধূলায় কালো বা নষ্ট হতে
দেন কেন? চেহারার লাভন্যতা রক্ষার ভার হিমালয় বুক্লে স্নো ওপরই
ছেড়ে দিন—তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি হিমালয়
বুক্লে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি ধীরে ধীরে আবার কেমন
ফিরে আসছে! ক্লান্ত গুঁড় সজীব হয়ে উঠছে!
হিমালয় বুক্লে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ বা দাগ পড়তে
দেবে না। নিজের চেহারায় দেখুন...লাভন্যতা এনে ধরেছে...

হিমালয় বুক্লে স্নো!



গহনা

শ্রী স্ত্রী মোপাসাঁ

সুখী, লাভাশ্রমী যেরে তিনি। যেন তাগোর দোষে
কেরাণী-পরিবারে জন্ম নিয়েছেন। তাঁর কোন সম্পত্তি
ছিল না এবং কোন ধনী সজ্জা ভ্রমলোকের সংগে পরিচিত হবার
সম্ভাবনা বাঁতালবাগা অথবা বিয়ে হবারও কোন আশা ছিল না।
শিকামতীর দপ্তরের এক সামান্য কেরাণীর সাথে বিয়ে হল তাঁর

কোন গয়না পয়সার সামর্থ্য ছিল না, তাই অতি সাধারণ ভাবে
ধাকতেন। অসুখী—শ্রেণীচ্যুত তিনি। যেরেদের আতি ও শ্রেণী
নেই, সৌন্দর্য এবং লাভাশ্রমী বিয়েই তাদের জন্ম ও পরিবার নির্ধারণ
করা হয়। স্বাভাবিক সৌন্দর্য, ও মার্জিত প্রকৃতি এবং মনের
নমনীয়তা বিয়েই তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সাধারণ যেরেদের
এই সব গুণগুলি থাকলে তারা সজ্জা মহিলাদের সংগে এক পংক্তিতে
স্থান পাবে।

কষ্টের শেষ নেই তাঁর। সৌন্দর্য এবং বিলাসিতার জন্মই যেন
জন্মেছেন—এই মনে করতেন তিনি। দীন আবাসালয়, শোচনীয়
দেয়ালগুলি, বসবার জীর্ণ আসন আর কদম্ব পোষাক তাঁকে উৎসাহিত
করে, কোথানে জালিয়ে দেয়। 'ব্রিটানি'র ছোট মেয়েটি যখন
তাঁর ঘরের কাছ করতে আসে তখন তাকে দেখে মনে পড়ে যায়
হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের কথা। হুঃখে তারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন।...
ভাবতে থাকেন সেই স্বপ্নের কথা আর ব্রোঞ্জ-নির্মিত মশাল
দীপালোকে উদ্ভাসিত সুশোভিত দেয়ালগুলির কথা...খাটো সার্টি
পরিহিত দীর্ঘাকৃতি হুঁজুন পরিচারক প্রশস্ত কেরাণীর তল্লা যার...
আর কৃত্রিম উপায়ে উত্থাপের সৃষ্টি করা হয় কক্ষে। ভাবতে থাকেন
প্রাচীন রেশমী-কাপড়ে সুশোভিত কক্ষগুলির কথা। সৌরীন
আসবাবপত্র, যার ভেতর শোভা পায় বহুমূল্যের অলংকার। মনে
পড়ে সুবাসিত সুদৃশ্য কক্ষগুলির কথা—যেখানে অন্তরংগ বন্ধু বা
পরিচিত অথবা বিশিষ্ট ভ্রমলোক—যাদের সব স্ত্রীলোকেরাই দৃষ্টি
আকর্ষণ করতে চায়, তাদের সংগে পাঁচ-ষটা ঘরে আলাপ
করা যায়।

গোলাকৃতি টেবিলে তিনি আর তাঁর স্বামী সামনা-সামনি খেতে
বসলেন। তিন দিন ধরে টেবিল-রুখটা বদলান হয়নি। ভ্রমলোক
সুপের ঢাকনাটা ধুলেট উদ্গমিত হয়ে বললেন—“না। গরুর
মাংসের সুপ। এর চেয়ে আর কিছুই আমার ভাল লাগে না।”
স্ত্রীলোকটির চোখে আবার তেলে ওঠে অতীত দিনের কাল্পনিক ছবি।
ভাবতে থাকেন তৃপ্তির আহ্বারের কথা। স্বকরকে রূপোর বাসন পত্র
আর “বিপতনের মায়া এবং পরীদের বনের ভেতর বিচিত্র পাখী”
এই ছবি দিয়ে সাজানো দেয়াল কাগজগুলোর কথাও ভাবেন।
কল্পনার দেখতে পান...এই ত মাহ আর জেলিনোত্তের ডানা খেতে
খেতে স্তম্ভিত হন শুনেছেন আর অধরে কুট উঠেছে ফিংকসের হানি।

তাঁর না আছে ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ না রত্নালংকার। শুধু
এই সবই তাঁর ভাল লাগে, এই সবের জন্মই যেন জীবন। তিনি
চাইতেন তাঁকে দেখে সবাই ঈর্ষা কল্ক, প্রলুব্ধ হ'ক। আরও
চেয়েছিলেন নিজেকে দুর্লভ করতে।

কনভেন্টের এক ধনী বাকরী ছিল তাঁর কিন্তু তাঁর কাছে আর
বেতন না। বাকরীর বাড়ী থেকে বিয়ে এলে জীবন কষ্ট হ'ত

নিজের দারিদ্র্যের কথা মনে করে। সারা 'দিন হুঃখে হুঃখ
কাদতেন।

একদিন বিকেলে তাঁর স্বামী হাতে একটা বড় খাম নিচে
গর্বিতভাবে বাড়ীতে ঢুকলেন।

“এই নাও তোমার জন্ম একটা জিনিস এনেছি।”

তাঁর স্ত্রী ভাড়াভাড়া খামটা হিঁড়ে একটা ছাপান কার্ড কে
করলেন, তাতে লেখা ছিল এই—

“শিকামতী এবং মাদাম জর্জ র'পনো ম'সিও এবং মাদাম
লোরাভেলকে ১৮ই জানুয়ারী সোমবার রাজে মন্ত্রীর বাসভবনে
আসবার জন্ম বিনীত আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।”

স্বামী আশা করেছিলেন স্ত্রী খুব খুসী হবেন কিন্তু তিনি কার্ডট
টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—“এ দিয়ে আমি বি
করব?”

“ওগো, আমি ভেবেছিলাম তুমি খুব খুসী হবে। তুমি তো বে
হুও না এটা একটা নুনের সুবোগ। কার্ডটা সংগ্রহ করতে আমা
অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। কেরাণীদের বেশী কার্ড দেওয়া
হয় না আর সবাই এটা চায়। তুমি ওখানে গিয়ে দেখবে সবার
সরকারী কর্মচারী।”

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন স্বামীর দিকে...ঐর্ষ্যাচ্যুত হল তাঁর
“ওখানে আমি কি পরে যাব?”

এত ভাবেনি তাঁর স্বামী; ইতস্ততঃ করে বলেন—“বে পোষাকট
পরে তুমি থিরেটারে বাও সেটাও আমার বেশ লাগে—আমা
কাছে—”

বলতে বলতে তিনি খেমে গেলেন...স্ত্রীকে কাদতে দেখে হতভ
হয়ে গেলেন।

হুঁ কঁটা বড় বড় চোখের জল চোখের হুঁ কোণ থেকে আনে
আস্তে বেয়ে মুখের কোণের দিকে গাড়িয়ে পড়ল।

স্বামী তোলাতে থাকেন—“কি হ'ল? কি হ'ল?”

প্রচণ্ড চেষ্টার নিজের কষ্টকে চাপেন—অশ্রুসিক্ত কপোল হুঁ
মুখে শান্ত কণ্ঠে বলেন—“কিছু না। শুধু আমার সাজবার জিনি
নেই বলেই এই উৎসবে যাব না আমি। কার্ডটা তোমার সহকর্মীকে
কাউকে দিয়ে দাও, তাদের স্ত্রী আমার চাইতে ভাল পোষাক পরে
পারবে।”

স্বামীর হুঃখ হল। বলেন—“শোন মিতিলু। একটা চলনস
পোষাকের কত দাম হবে? সেটা পরে তুমি জন্ম উৎসবেও যে
পারবে।”

একটু চিন্তা করলেন তাঁর স্ত্রী এবং এমন একটা সংখ্যার কা
ভাবলেন যেটা শুনে মিতব্যরী স্বামী ভীতিপ্রদ আর্ভনাদ না কা
অথবা সংগে সংগে প্রত্যাখ্যান না করে। একটু ইতস্ততঃ কা
বলেন—“আমি ঠিক জানি না তবে মনে হয় যে চারশো ফ্রাঁ-তে
হয়ে যাবে।”

স্বামীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সামনের প্রীত্বের সময় বন্ধু
সংগে না'ত্যায়ে প্রতি রবিবারে আনুয়েত পাখী শিকার করতে বাব
পরিচয়না ছিল তাঁর। বন্ধু কেবল জন্ম এই টাকাটাই তাঁ
জমিয়ে রেখেছিলেন। তবুও বললেন—“বেশ তাই হবে। আ
তোমার চারশো ফ্রাঁ দিচ্ছি আর ভালো দেখে একটা পোষাক কিনে
চেষ্টা কর।”

উৎসবের দিন এগিয়ে আসে। মাদাম লোয়াজেলকে কেমন উদ্ভিগ্ন, বিষন্ন দেখায়। পোবাক তাঁর ঠঠরী। একদিন বিকেলে স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করেন—“কি হয়েছে তোমার? আজ তিন দিন ধরে তোমাকে কেমন বিষন্ন দেখাচ্ছে?” জবাব দেয় মাদাম লোয়াজেল—“কোন দামী পাখির অথবা অলংকার নেই বলে অসন্তোষ লাগছে আমার। উৎসবের দিন ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।”

“প্রকৃতির ফুল দিয়ে সাজবে তুমি। এই সময়ে ফুলগুলিও ভারী সুন্দর। দশ ক্রী-তেই ছ’-তিনটে চমৎকার গৌলাপ পাবে।”

কথাটা মনঃপূত হল না মাদাম লোয়াজেলের।

“না। ধনী স্ত্রীলোকদের ভেতর দীনভাবে থাকার মত অবমাননাকর আর কিছুই নেই।” বলেন তিনি। তাঁর স্বামী চেঁচিয়ে বলে ওঠেন—“তুমি কি বোকা। তোমার বহু মাদাম করেসতিয়ের কাছ থেকে গয়না ধার করে নিয়ে এসে যাও। তোমার সংগে তার বখেট বন্ধু আছে, আর সে দেবেও গয়না।”

আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠেন মাদাম লোয়াজেল—“ঠিক। এটা তো আমি কখনও ভাবিনি।”

পরদিন বন্ধুর বাড়ী গিয়ে তার ছুঃখের কাহিনী বলেন বন্ধুকে।

মাদাম করেসতিয়ে কাচের আলমারী থেকে গয়নার একটা বড় বাজ বের করে, সেটা খুলে মাদাম লোয়াজেলকে বললেন—“পছন্দ করে নাও তাই।”

মাদাম লোয়াজেল প্রথমে দেখতে পেলেন কতকগুলো বালা, তারপর একটা মুক্তার হার, ডেনিসিয়ান ক্রশ একটা, সোনা আর

আর দামী পাখরের ওপর চমৎকার কাজ-করা গয়না।... আরনার সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা গয়না পরে দেখতে লাগলেন... ঠিক করতে পারেন না কোনটা নেবেন আর কোনটা ফেরৎ দেবেন। বায়ে বায়ে বলতে থাকেন—“তোমার অল্প আর কিছু নেই?”

“হ্যাঁ আছে। খুঁজে দেখ। জানি না কোনটা তোমার পছন্দ হবে।”


মাদাম লোয়াজেল হঠাৎ কালো সাটিনের বাজের ভেতর একটা চমৎকার হীরের কর্ণহার দেখতে পেলেন—ছদ্মনীর বাসনার স্বার বুকটা ছুঁ-ছুঁ করতে থাকে।... ওটা নেবার সময় হাতটা কাঁপতে থাকে। পোবাকটা উঁচু হয়ে গলার কাছে এসেছে, তার ওপর দিয়ে হারটা গলার পরলেন... খুঁসী হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেন।

একটু ইতস্ততঃ করে উদ্ভিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন—“তুমি এটা আমার ধার দিতে পার?”

“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।” জবাব দেন বান্ধবী।

লাকিয়ে গলার কাছে উঠে আবেগে বান্ধবীকে চুম্ব খেয়ে গয়নাটা নিয়ে চলে গেলেন।

উৎসবের দিন এল। মাদাম লোয়াজেল সাক্ষালাভ করলেন।... তিনি ছিলেন সনাহাস্তময়ী, সবচেয়ে সুন্দরী ও লাভণ্যময়ী নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদের ভেতর। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যেক পুরুষেরাই তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন, নাম জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁরা মাদাম লোয়াজেলের সংগে পরিচিত হবার জন্ত চেষ্টা করছিলেন।



নিয়মিত কুমারেশ সেবনে লিভার সুস্থ থাকে, অজীর্ণ, অক্ষুধা, পেটফাঁপা প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না, খিটখিটে মেজাজ, সহজে ক্লান্তি প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয় না।

কুমারেশ

ও, আর, সি, এল, লিঃ
কুমারেশ হাউস
দালিখা, হাওড়া

মহিমণ্ডলীর সব কর্মচারীরাই তাঁর সংগে নাচতে চাইলেন। স্বয়ং মন্ত্রীও তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

খুসীর নেশার বিস্তারিত হয়ে নাচলেন তিনি। সাফল্যের গৌরবে, স্তুতি এবং ঋদ্ধাঙ্গলির মুখ-মেঘলোকের ভেতর দিয়ে নেচে চললেন তিনি। রূপে তিনি বিজয়ী হলেন—যে বিজয় এত পূর্ণ, এত মধুর স্ত্রীলোকদের কাছে।

মাদাম লোয়াজেল ভোর চারটের সময় বাড়ী বাবার জন্ত বেরিয়ে এলেন। তাঁর স্বামী মাঝরাতের পর থেকে ছোট একটা নির্জন ঘরের ভেতর তিনজন ভ্রমলোকের সংগে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁদের স্ত্রীরাও আশ্রয়-প্রমোদে মত্ত ছিলেন।

মাদাম লোয়াজেলের স্বামী স্ত্রীর যোজ্জকার করবার অতিসাধারণ পোষাকটা এনেছিলেন। ঠিক ছিল এই পোষাকটা পরে তিনি বেরিয়ে আসবেন। মাদাম লোয়াজেলের স্বামী পোষাকটা স্ত্রীর কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিলেন। বল-নাচের জমকালো পোষাকের সংগে যোজ্জকার সাধারণ পোষাকটা অতি বিসমৃশ লাগছিল। বাঁরা দামী ফার-কোট গায়ে দিয়ে এসেছিলেন বাঁদের নজর এড়িয়ে পালিয়ে যেতে চাইলেন মাদাম লোয়াজেল।

স্ত্রীকে বাধা দিয়ে বললেন ম'সিও লোয়াজেল—“দাঁড়াও। বাইরে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে। আমি একটা ঘোড়ার গাড়ী ভেঙে আনছি।”

মাদাম লোয়াজেল শুনলেন না, ভাড়াভাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন। তাঁরা স্বাস্থ্য নেমে এসে কোন গাড়ী দেখতে পেলেন না। দূরে কয়েকটা গাড়ী, চল গেল। অনেক ডাকাডাকিতেও তাঁরা এল না।

হতাশ হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে তারা স্থানের দিকে চললেন। পথে একটা পুরোন জীর্ণ গাড়ী দেখতে পাওয়া গেল। এই গাড়ীগুলো পারী সহরে রাত্রেই শুধু চলাচল করে। যেন এই জীর্ণ গাড়ীগুলোকে দিনের বেলায় বার করতে গাড়োয়ানরা লজ্জা পায়। স্বা মার্টির-এর বাড়ীর দরজার কাছে গাড়োয়ান তাদের পৌঁছে দিয়ে গেল। বিবর মুখে তারা বাড়ীতে চুকলেন। মাদাম ভীষণ পরিশ্রান্ত। ম'সিও লোয়াজেল ভাবতে থাকেন যে দশটার সময় তাকে অকস্মে হাজির হতে হবে।

কাঁধের ওপর থেকে সাধারণ পোষাকটা রেখে দিয়ে মাদাম লোয়াজেল আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন নিজেকে পূর্ণ মহিষার আঁর একবার দেখবেন বলে। সহসা তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। গলার হারটা নেই।

তাঁর স্বামী পোষাকটা অর্ধেক খুলেছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন—“কি হল?”

পাগলের মত তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—“আমি... আমি... মাদাম ফরেষুটিয়ের হারটা দেখছি না তো।”

হতভবের মত ঠাড়িয়ে রইলেন ম'সিও লোয়াজেল... তাঁরপর বললেন—“কি? কি বললে? এ সম্ভব নয়।”

...তাঁরা দুজনে পোষাকের প্রত্যেকটি ভাঁজ—কোটের পকেট সব জায়গায় খুঁজে দেখলেন কিন্তু কোথাও সেটা পাওয়া গেল না।

“তুমি নিশ্চিত যে বল-নাচের পরেও সেটা তোমার গলিতে ছিল?” জিজ্ঞেস করলেন ম'সিও লোয়াজেল।

“হ্যাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ের ঘরের ভেতরে বসন হিলাম তখনও ছিল।”

—“কিন্তু পথে সেটা পড়ে গেলে আমরা শব্দ শুনতে পেত নিশ্চয়ই গাড়ীর ভেতর আছে।”

—“হ্যাঁ, তা হতে পারে। গাড়ীর নম্বরটা জান?”

—“না। তুমিও লক্ষ্য করনি?”

—“না।”

তাঁরা মাথা হেঁট করে ভাবতে থাকেন। ম'সিও লোয়াজেল পোষাকটা আবার প'রে নিয়ে বললেন—“যে সমস্ত পথে আমরা যে গিয়েছি সেই জায়গাগুলো আমি দেখে আসছি।” তিনি বেরি গেলেন। মাদাম লোয়াজেল সেই সাক্ষ্য-পোষাক পরেই চেয়ারে ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন... শুতে বাবারও শক্তি নেই তাঁর ঘরে আগুন নেই। কোন কিছু ভাবতে পারলেন না তিনি ম'সিও লোয়াজেল পুলিশ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সং দেখা করলেন, ধবরের কাগজে ঘোষণা করলেন, কেউ যদি ফের দেয় তাকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনি ঘোড়ার গাড়ীর মালিকদের কাছেও গেলেন। যেখানে হারটা পাবার আশা আছে সেই স জায়গাতেই তিনি গেলেন।

মাদাম লোয়াজেল এই ভীষণ ভাগ্যবিপর্যয়ের ভেতর উদ্ভ্রান্ত মত সারাদিন ঘরে স্বামীর জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ম'সিও লোয়াজেল বিকেলের দিকে বাড়ীতে ফিরলেন। বিবর মুখটা চুপসে গিয়েছে, যেন। হারটা পেলেন না তিনি।

তোমার বন্ধুকে লিখে দাও যে হারটার একটা জায়গায় একটু তেংগে গিয়েছে, সেটা সেরামত করিয়ে ফেরৎ পাঠাবে। আমরাও একটু সময় পাব যদি খুঁজে পাওয়া যায় হারটা।

স্বামীর কথাগুলো মাদাম লোয়াজেল লিখে পাঠালেন।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। তাঁরা হারটা পাবার আশা ছেড়ে দিলেন।

—ম'সিও লোয়াজেলের যেন পাঁচ বছর বয়স বেড়ে গেল। তিনি বললেন—“এই গয়নার মত আরেকটা কিনতে হবে।”

পরদিন তাঁরা গয়নার বাজার নিয়ে তাকে যে দোকানের নাম লেখা ছিল সেই দোকানে গেলেন। দোকানের মালিক কতকগুলো বই দেখে বললেন—“মাদাম, আমি তো হার বিক্রী করিনি শুধু বাজারটাই বিক্রী করেছিলাম।”

স্বামি-স্ত্রীতে মিলে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে খোঁজ করতে লাগলেন কোথায় মেলে সেই হারিন্দে-বাওয়া হারের মত আরেকটি হার। তুংখে, কষ্টে তাঁদের শরীর ভেঙ্গে পড়ল।

শেষে পালে রোইয়ালের একটা দোকানে তাঁরা খুঁজে পেলেন ঠিক সেই রকম একটা হীরের হার। দাম চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। দোকানের মালিক হুজিৎ হাজর ফ্রাঁ-তে বিক্রী করতে রাজী হলেন।

তাঁরা অলংকার-বিক্রেতাকে অল্পরোধ করলেন যে তিন দিন পর্যন্ত হারটা যেন বিক্রী না করা হয়। তাঁরা এই সর্ভ করলেন যে যদি পুরোন হারটা কেবলমাত্র মাস শেষ হবার আগেই পাওয়া যায় তবে তাঁরা হারটা চৌত্রিশ হাজার ফ্রাঁ-তে কিনবেন।

ম'সিও লোয়াজেলের বাবা আঠার হাজার ফ্রাঁ রেখে গিয়েছিলেন। বাপী টাকাটা তিনি ধার করলেন। একজনের

কাছ থেকে ধার করলেন এক হাজার ক্রাঁ, আরেকজনের কাছ থেকে পাঁচ শ', এর কাছ থেকে পাঁচ লুই...ওর কাছ থেকে তিন লুই। শারীরিক এবং মানসিক স্বস্থ্যতার জন্মে তিনি মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নাম সই করে অর্থ সংগ্রহ করলেন।—শেষে হুত্রিশ হাজার ক্রাঁ সংগ্রহ করে হারটা কিনে আনলেন।

মাদাম লোয়াজেল হারটা নিয়ে গেলেন বাস্কবীর কাছে। মাদাম ফরেষতিয়ে অভিমানাহত হ'য়ে বললেন—“হারটা তোমার আগেই ফেরৎ দেওয়া উচিত ছিল, কারণ আমার দরকারে লাগতে পারতো তো।” তিনি আর বাস্কটো খুলে দেখলেন না। মাদাম লোয়াজেলের ভীষণ ভয় করছিল—যদি বাস্কবী বন্দী হারটা বুঝতে পাবেন! তবে তিনি কি বলবেন? হয়তো চোর বলে মনে করবেন!

মাদাম লোয়াজেল নিষ্ঠুর দারিদ্র্যকে সাহসের সংগে বরণ করে নিলেন। এই ভয়ংকর ঋণ তিনি পরিশোধ করবেনই। ঝিক-ঝিক ছাড়িয়ে দিলেন। বাড়ী বদলে একটা পুরোন ভাংগা ঘর ভাড়া নিলেন। বাড়ীর ভারি কাজ, রাগাঘরের সব কাজ তিনি নিজেই করতে লাগলেন। মাটির বাসন আর সূপ্যানের তলা মেজে মেজে তাঁর আংগুলের গোলাপী নখগুলো সব ক'য়ে গেল। নোংরা জামা-কাপড়গুলো কেচে দড়িতে শুকোতে দেন। প্রতিদিন সকালে আবর্জনাগুলো নীচে নামিয়ে এনে বাস্তায় কেল দেন। ওপরে জল তুলে নিয়ে বান মাথপথে ধেমে ধেমে দম নিয়ে। তিনি নিজেই বাস্কেট হাতে নিয়ে বাস্কারে বান—ফলগুয়ালা, মুদীর দোকানে, মাংসবিক্রেতার কাছে বান গরীবের পোষাক পরে। একটি একটি করে 'সু' জমাতে থাকেন। প্রত্যেক মাসে দোকানের বিল শোধ করতে হয়। কাউকে আবার নতুন করে বিল করতে হয়...তাতে কিছুটা সময় পাওয়া যায়।

মাসিও লোয়াজেল বিকেলে এক ব্যবসায়ীর দোকানে হিসেব লেখেন। রাত্রে লেখা কপি করেন—প্রতি পৃষ্ঠায় পাঁচ 'সু' করে গান। এমনি ক'রে দশ বছর কাটলো।

দশ বছর পরে সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে গিয়ে তাঁদের হাতে কিছু হদের টাকাত্ত জমল।

মাদাম লোয়াজেলকে এখন বৃদ্ধা মনে হয়। তিনি এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ। চুলগুলো বিচ্ছিন্ন ভাবে আঁচড়ানো—কাটটা ঠিক করে পরেন নি। হাতটাও লাল। তিনি এখন জোরে কথা বলেন। এখনও জল দিয়ে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করেন।

যখন তাঁর স্বামী অকস্মে থাকেন মাঝে মাঝে তিনি জানলার ধারে বসে পুরোন দিনের সেই বন্-নাচ-উৎসবের দিনটির কথা

তাবেন...বেদিন রাত্রে তাঁকে এত রূপসী দেখাছিল। যদি সেই হারটা না হারাত তা হ'লে এতদিনে তার কি অবস্থা হ'ত কে জানে! কি বিচিত্র, পরিবর্তনশীল এই জীবন!

একদিন রবিবারে সপ্তাহের কাজের ক্লাস্তি দূর করবার জন্ত মাদাম লোয়াজেল 'সাঁ-এলিজে'তে বেড়াতে গেলেন। তথাৎ তিনি একজন ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলেন একটি বাচ্চাকে সংগে নিয়ে বেড়াচ্ছেন...ইনি মাদাম ফরেষতিয়ে...চিরবোবনা, চিরস্বন্দরী, চির-প্রলোভনময়ী।

মাদাম লোয়াজেল একটু বিচলিত হলেন। খুলে বলবেন সব মাদাম ফরেষতিয়েকে? নিশ্চয়ই বলবেন। এখন তো সব দেখা শোধ হয়ে গিয়েছে...তবে কেন বলবেন না? এগিয়ে গিয়ে বললেন—“সুপ্রভাত জান্ন!”

একজন ভদ্রমহিলাকে এমন পরিচিত ভাবে নাম ধরে ডাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন মাদাম ফরেষতিয়ে...তিনি চিনতে পারলেন না মাদাম লোয়াজেলকে। একটু আমতা আমতা করে বললেন—“কি মাদাম...আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।”

“না। আমি মাতিলদ লোয়াজেল।”

“ও বেচারী মাতিলদ, তুমি কি রকম বদলে গিয়েছ!” চেঁচিয়ে উঠে বললেন মাদাম ফরেষতিয়ে।

“তোমার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত দিনগুলি আমার ভীষণ দুঃখ-হৃদশার ভেতর দিয়ে কেটেছে...এর কারণ তুমি!”

“আমি? কি রকম?”

“...মনে পড়ে মন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে উৎসবে যাবার জন্ত তুমি হীরের হারটা আমার ধার দিয়েছিলে?”

“হ্যা...হ্যা, তারপর?”

“সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।”

“কি? তুমি তো আমার ফেরৎ দিয়েছিলে হারটা?”

“আমি ঐ রকমই অল্প আরেকটা হার তোমায় দিয়েছিলাম। আজ দশ বছর পরে হারটা কেনবার জন্ত যে-টাকা ধার করেছিলাম শোধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের কিছুই ছিল না আর হারটা কেনাও আমাদের পক্ষে সহজ ছিল না। যাই হোক, এখন আমি মুক্ত... ধুব খুশী।”

মাদাম ফরেষতিয়ে বিস্মিত হয়ে বললেন—“তুমি বলতে চাও যে আমার হীরের হারটার বদলে তুমি সেই রকমই অল্প আরেকটা হার দিয়েছিলে?”

“হ্যা। তুমি বুঝতে পারনি। দুটো হারই অবিকল এক রকম ছিল।” গর্বমিশ্রিত আনন্দের সবল হাসি ফুটে ওঠে অধরে।

...মাদাম ফরেষতিয়ে বেশ বিচলিত হয়ে বাস্কবীর হাত দুটো ধরে বললেন—“ও বেচারী মিতিলদ! আমার হারটা তো নকল ছিল। ওর দাম ছিল মাত্র পাঁচশো ক্রাঁ।”

অনুবাদক : সুবীরকান্ত গুপ্ত।

It is a woman's business to get married as soon as possible, and a man's to keep unmarried as long as long as he can.

—Shaw.



নিখিল রায়

সুখ ভাঙলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না সুপ্রিয়র।
 বারান্দার দিকে আলসে দৃষ্টি নিয়ে ফিরে শোয়। টবে ফুলের
 চারাটার কাঁচা রোদ এসে সবে নাচানাচি শুরু করেছে। একুপি
 লাকিয়ে এসে পড়বে চোকাঠে। আরেকটু গুটিসুটি মেয়ে এগিয়ে এসে
 মালার অরিপরানো জুতোটার চকমকিয়ে উঠবে। তারপর টেবিলের
 সিগারেট-কেস আর ম্যাশট্রেটার উপর অনেকক্ষণ ধরে বসবে। যব্বুর
 কোথাও কিছু বদলাবে না—রঙ ছাড়া। দরজার পর্দাটা শুধু একটু
 সরে যাবে, চুড়ির হালকা আওয়াজ তুলে চায়ের কাপ হাতে আসবে
 মালা।

না, আজ আর কিছুতেই বেরোবে না সুপ্রিয়র। ইচ্ছা করছে
 সারাটা দিন মালাকে নিয়ে শুধু গল্প করে। পর আর শুধু গল্প।
 কতোদিন হেসে কথা বলেনি তার সঙ্গে, সেই চাকরী বাবার পর
 থেকে। বেচারী খেটেই মরছে কেবল। নিজের জন্ত তাকে এভাবে
 কষ্ট দেওয়াটা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু কি-ই বা করতে পারে সুপ্রিয়র?
 ভেজ না থাকা মনটাকে নিয়ে সে নিজেই কেমন টাল সামলাতে
 পারছে না। কেমন বেন হয়ে যাচ্ছে দিন-কে-দিন। মালা যদি
 নিজে থেকেই কোথাও বেড়িয়ে আসার বায়না ধরে মনটা আপনা
 থেকেই চুপসে আসে সুপ্রিয়র। চাকরী খোঁজার অজুহাত দেখিয়ে
 তখুমি সরে পড়ে। কিন্তু মন তার কেবলই বুর-বুর করতে থাকে
 দাদ-কেলে-রাখা দিনগুলোর আশে-পাশে, গড়ের মাঠ আর কোর্ট-
 উইলিয়মের কাঁধঘেঁষা জায়গাটার। যেখানে লোকের ছোঁয়াছুরি
 নেই। বিহীনরয়ের কতো গান আর উড়ু-উড়ু চুলের গন্ধপাওয়া
 সন্ধ্যার সান্দী ওই নিতৃত জায়গাটুকু। সময় বেশি নিয়ে

কোনদিন ব্যারাকপুর গান্ধীঘাট নয়তো ফলতার মাঠে মাঠে ছুটে
 বেড়ানো।

পুলকে ভরে ওঠে সুপ্রিয়র মন। একটা চাকরী হলেই তো সব
 ফিরে পাওয়া যায়। মালার বায়না থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয় না।
 হুঁটো ফুসফুস ভরে হাওয়া নিয়েও কিন্তু সুখ হতে পারে না সুপ্রিয়র,
 পরক্ষণেই নিভেজ হয়ে যায় তার মন—তাও যুক্তি আর হবার নয়।

বহু মহলে এরই মধ্যে কথাটা উঠেছে। কানাঘুবা চলছে
 আড়ালে আড়ালে। লক্ষ্য করেছে সে এসে পড়লেই আলোচনাটা
 হঠাৎ থামিয়ে দেয় বন্ধুরা। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসির
 চিমটি কাটে। স্ত্রীর রোজগার নিয়ে প্রকাণ্ডেই কেউ কেউ তর্ক
 তোলে। সুপ্রিয়র মেয়েদের রোজগারের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করে
 সবল প্রতিবাদের চেষ্টা করে। কিন্তু এই রহস্যময় ঠোঁটটোপা হাসির
 মধ্যে কোথায় বেন হল আছে। মনে মনে কেবলই বামতে
 থাকে সুপ্রিয়র। এ হাসির অর্থ কি?

অর্থ অবশ্য বেশি দিন চাপা থাকলো না। নীরদ কাল স্পষ্টই
 বলে দিলো, সে নাকি হাসপাতালে স্বচক্ষে দেখে এসেছে। আর
 কিছুদিন এভাবে চোখ বুঁজে পড়ে থাকলেই ব্যস, স্ত্রীরগুটি তামাদি
 হতে আর বাকি থাকবে না। এমন কি অতরু বোসের নামটি পর্যন্ত
 ঠিক ঠিক বলে দিয়েছে নীরদ।

হঠাৎ কে বেন গুঁড়িগুঁড়ি ভুবোকালি বরিয়ে দিলো
 রোদপোরানো বায়নাটার। সুখ সরিয়ে নিল সুপ্রিয়র। কালিপড়া
 হারিকেন চিমতীর ভিতর দিয়ে চেরে থাকা শিখাটির মতো
 তার চাহনিটাও কেমন জ্যোতি মোহালো, রক্তাক্ত। কিছুতেই

বিধাস করতে ইচ্ছা করে না। মালীকে সে এমন করে ভাবতে পারে না। পূর্বে অতম্বর সঙ্গে যে সম্পর্কই থাক, মালা এখন তার দ্বা। এতোদিন পরে আজ খুঁটিয়ে ফুঁটিয়ে মিলাতে বসলো সুপ্রিয়। সম্প্রতি মালার চলন বলাই কেমন আচমকা বা তার মনকে শত ভেঁটা সবেও অবিশ্বস্ত ভাবে নড়িয়ে তোলে। তবে কি—

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। যড়ির দিকে এতোকণে তাকিয়ে দেখলো সুপ্রিয়। মালা ভিউটি থেকে কিরণছে। এক-রাস অবসান নিয়ে ঘরে ঢুকলো মালা।

ভালো করে নিরীক্ষণ করলো সুপ্রিয়, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। রাতভাগা ক্লাস্তিতে মালার পাখুয়ে মুখখানার চোখ দুটি বেন বড়ো উজ্জ্বল, কোন অজানিত সুখভূষণের ছোঁয়া বাই-বাই করেও বেন যেতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছা করে না সুপ্রিয়র।

আড়মোড়া ভেঙ্গে আসলে ভাবলো মালা, উঃ, সারাটি রাত কাল এক পায়ে দাঁড়িয়ে। একটা দারুণ ক্রাইসিস গেল অতম্বর বাবুর। বাক, আর ভয় নেই। কিন্তু আমার বা ঘুম পাচ্ছে ১০-০ কি, এখন কোথায় বেরুচ্ছ ?

অতম্বর প্রসন্ন সুপ্রিয়র গায়ে ছালা ধরিয়ে দিলো। সারা হাসপাতালে অতম্বর ছাড়া কি আর রোগী নেই। ক্রাইসিস শুধু কি একলা অতম্বরই। পাঞ্জাবীর বোতামগুলো দ্রুত পরাতে লাগলো সে। হাত ধরে কেললো মালা, কিছু না খেয়ে বেরিয়ে

না লক্ষীটি। হাসপাতালের পোষাকটা বদলে স্থান করে এখুনি তোমার চা-খাবার করে দিচ্ছি।

ভেতরে টগবগ করতে থাকে সুপ্রিয়। না না, তুমি ব্যস্ত হরো না, আমাকে এখুনি বেরুতে হবে। দরকার বোধ করলে দোকান থেকে কিছু খেয়ে নিলেই চলবে। তাছাড়া সারা রাত তোমার খাটুনি গেছে, একটু বিশ্রাম তোমার একান্তই দরকার।

ও আমার যথেষ্ট অভ্যেস আছে। তুমি দাঁড়াও, পানেরো মিনিটের মধ্যে আমার তৈরী হয়ে যাবে খ'ন।

এমনিতেই দেবী হয়ে গেছে, আর দেবী করলে হয়তো ভয়লোকের সঙ্গে দেখাই হবে না। বানিয়ে বসলো সুপ্রিয়।

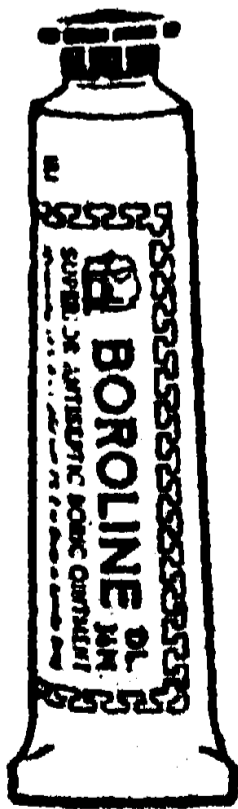
তা'হলে দোকান থেকে কিছু খেয়ে নেবে বল? সাহুনের কঠ মালার। পিছন কিরে পুন্ন বিবাদলিষ্ট হানি হাসলো সুপ্রিয়। তারপর আর দাঁড়ালো না।

মনটা যুড়ে যুড়ে ব্যথিত হয়ে উঠলো মালার। সময় নেই, অসময় নেই যে যেখানে আশা দিচ্ছে সেখানেই ছুটে যাচ্ছে সুপ্রিয়র। নাওরা-খাওরা প্রায় তুলেই গেছে। একটা চাকরীর জন্তই তো! টেবিলের উপর সুপ্রিয়র পাস'টি নজরে পড়তেই আর্ন্তহরে চমকে উঠলো মালা, কি ভোলা মাম্ব! বাঁড়ী না কেবা পর্যন্ত হয়তো কিছু খাওরাই হবে না। মালার চোখ ভরে এলো জলে।

ট্রামে বসেও বস্তি ছিল না সুপ্রিয়র। বৃকের পাশটার মাছলীটা অনবরত খোঁচা মারছিল। ছি ছি, টিকিটটা পর্যন্ত ত্রীম পরসার কেনা। নাঃ, নেমে পড়ে হাঁটতে থাকলো সে। যেমন করে হোক

গ্রীষ্ম দিনে-ও স্নিগ্ধ সজীবতা

গ্রীষ্মের খরতাপে ক্রেদাক্ত আবহাওয়ার আপনি যখন বিরত তখন আপনার একান্ত প্রয়োজন বোরোলীনের মতো মিষ্টি আর স্নিগ্ধ ফেস্ ক্রীম। ল্যানোলিন-বৃক্ত বোরোলীন স্ক্রকের গভীরের সমস্ত মালিগ্ন দূর করে আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে আপনার ত্বক-কে স্নিগ্ধ ও সজীব করে তুলবে।



বোরোলীন

পুরুষ প্রসাধন

প্রস্তুতকারক :

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩



বেশনেই হোক একটা চাকরী তাকে বোগাড় করতেই হবে। খবর কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটা খুলে ধরতেই চাকরী খালির হিড়িক পড়ে গেল। এ পৰ্ব্বন্ত লাগলই অনেক দরখাস্তই করেছে সে। একটা ইন্টারভিউও পায়নি। খবরের কাগজ দেখে চাকরী হয় না, এ ধারণাটা পাকাপাকি হয়ে গেছিলো তার। তবুও ক্লান্ত মনে পাঁতাটা খুলে বসলো সে।

আজ ন'মাস বেকার বসে আছে সুপ্রিয়। ধরতে গেলে মালাই তাকে পালন করছে এখন। ভাবতেও যে কোন পুরুষের পক্ষে লজ্জার। এতোদিনে এই নিষ্কমা স্বামীর প্রতি মালায় আকর্ষণ যদি কিছু কমেই থাকে, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় কি? তাছাড়া এক সময়ে অতলু মালায় বনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিল। বর্তমানে ভারত সরকারের বড় চাকুরে। মোটর দুর্ভটনার আহত হয়ে এসেছে হাসপাতালে। মালা মনোবোগী হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত মনোবোগী! সেবা করতে গেলে দরদী মনের আবেদনের কথা স্মরণ করে কতো বার নিজের কোঁতুল শাসন করেছে সুপ্রিয়। কিন্তু—কিন্তু বখনই মনে পড়ে যায়, এমনি করেই সে-ও একদিন মালায় সেবার মুগ্ধ হয়েছিল। ভালোবেসেছিল। মনে পড়ে, কতো যত্নাভরা রাতে চোখ খুলে সন্ধ্যায় দেখেছে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে অতলু চোখ মেলে তারই দিকে চেয়ে রয়েছে মালা। সে চাহনির মধ্যে থাকতো কি এক গভীর অসুস্থতা। মধুর স্পর্শ! কি জানি, অতলু রাসের মধ্যেও যদি সে ভেমন কিছু খুঁজে থাকে? নীরদের কথাটা মনের মধ্যে মুহূর্তে একটা স্মৃতি দিয়ে যায়। না না, এ-সব কি ভাবছে সে! মালাকে সে ভালবাসে এর বেশি ভাববার দরকার কি? একটা চাকরী হলেই সব আপনি ঠিক হয় যাবে। তখন মালাকে কি সে ফুরসত দেবে না কি? বেড়িয়ে খেলিয়ে বাড়তি সবটুকু সময় সে লুঠ কবে নেবে।

এই তো সেদিন মালা গোটা জ্যাঁকিভকটাই হাতে নিয়ে বাড়ী কিরেছে। অনেক আপত্তি করেছিল সুপ্রিয়। কেন মিহিমিহি থাকে খরচ করতে গেলে, ও তোমার শেলকে সাজানোই থাকবে।

ভালা-ভাগা চোখ দু'টো শুধু টলমল করেছিল মালায়। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, তুমি পড়তে ভালোবাসো বলেই কিনেছি।

বেশ কিছুদিন ধরে অবশেষে একটা কাজ অবশ্য জুটলো সুপ্রিয়। ঠিকে চাকরী। ইংরাজী প্রফ দেখা। মালাকে লুকিয়েই কাজটা নিল সে। হোক না সামান্য কাজ, মনটা হাঁক ছেড়ে তো বাঁচবে ক'দিন।

এরই মধ্যে অতলুও ছাড়া পেয়ে গেছে হাসপাতাল থেকে। একটা বিরাট হস্তিষ্ঠা যেন নেমে গেল সুপ্রিয়র বাড় থেকে।

সে দিনটা ছিল ছুটির। দু'হপ্তা পর সুপ্রিয় এই প্রথম পেল একটা দিনের আয়েস।

তখন বিকেল। বাইরে এবার রক্ত বদলের পালা। আরনার মুখোমুখী বসে চুল আঁচড়াছিল মালা। চুলের বস্তা ঝাড়ের পাশটার বাঁক ঘুরে ঝুপ করে কোলের ওপর আল্পনা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। শেষ প্রান্তটার আলগা হাতে চিকণী চালিয়ে পোছাচ্ছিল সে। গা-খোঁচরা খালি গায়ে শুধু পাঁতালা শাড়ীটা জড়ানো। এখানে সেখানে আঁটসাঁট যৌবন উঁকিঝঁকি মারছে। হাতের সুহু বাঁকুণীও লজ্জা সবে নিটোল বুকটা ছলে ছলে শাড়ির পাড়টার আঁচড় কাটিছে।

কিতোটা কানড়ে ধরে দু'হাত তুলে চুলের গোড়ায় একটা শক্ত প্লাস্টিক দিতে বাচ্ছিল মালা। আরনার দিকে ঝুঁকে পড়ে তড়িং বেগে ঝাড় ফিরালো সে। কি-ও। বড়ো হাসি পেলো তার। একটা ক্রক টেমে ধরে চোখের পাশটার খানিকটা খাঁজ ফেলে দুর্ভটমিতরা একটা ভঙ্গি করলো, তুমি ভারি ইয়ে, কতোক্ষণ ধরে দেখছো বলতো?

হালকা হয়ে যায় সব মেঘ। হাসলো সুপ্রিয়। চাকরী বাবার পর প্রথম হাসি।

অমন ভাবে তোমায় দেখতে পেলে ঘটার পর ঘটা তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। আমি শিল্পী হলে তোমায় ছবি আঁকতাম।

হেসে ফেললো মালা, তবেই হয়েছিল আর কি। বাব্বা, এমন চোর-পায়ে এসেছো জানতেও পারিনি!

সুপ্রিয় পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। দাঁড়ায় মালায় পিঠ ঘেঁষে। কাঁধের দু'পাশে হাত ভরে দিয়ে মালায় মুখখানা বৃকের কাছে উন্টে ধরে।

খিল-খিল করে হেসে উঠে হাত দিয়ে সুপ্রিয়র মুখটাকে আঙুলে সন্ধ্যায় দেয় মালা, উঁহ, ভারী দুর্ভটী আরজ করেছ। ও ধরে যাও দেখি, আমি কাপড় ছাড়বো।

মালাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না সুপ্রিয়র। মালায়ও কি ইচ্ছা করে সুপ্রিয়রবুক থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে? কিন্তু অত সহজেই ধরা দিতে কেমন লজ্জা লাগছিলো তার। স্বামীর মুখে সামান্য একটু হাসি কোটাতে এই ক'মাস ধরে সে কম সাধনা করেনি। তাই সুপ্রিয় বখন আজ নিজে থেকেই এগিয়ে এলো, মালা কিছুতেই পারলো না ধরা দিতে—অন্ততঃ রাজির আগে তো কোন মতেই নয়।

চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি। বিশ্বস্তরা দৃষ্টি নিয়ে সুপ্রিয়র মুখের পানে তাকালো মালা। কি? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

হারানো সুর নতুন হয়ে কণ্ঠে বাজলো। কিন্তু কি করবে মালা? অতলুর সঙ্গে যে আগে থাকতেই সব ঠিক-ঠাক হয়ে আছে। তার লজ্জা অপেক্ষা করে থাকবেন তিনি কাঁটার কাঁটার। টেবিলের ওপর হাতবাড়িটার দিকে আলতো চোখ বুজিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে। আজ থাক। আরেক দিন, কেমন? তোমার বেখানে খুঁশ!

থাক কেন? এমনি বিকেল...

হেসে ফেললো মালা, ভয় নেই গো মশাই আরো পাওয়া যাবে তাছাড়া, ঠোটের কোন টিপে হাসলো, আতুরে বউটি তোমার পাতে থাকলে যে কোন বিকেলই মিঠে লাগবে। সুপ্রিয়র প্রমাণায় চুপে নরম হাতে আঙুল চালিয়ে দিয়ে হালকা ঝাঁকুনি দেয়—তাহলে ছুঁ মঞ্জুর তো!

কিন্তু কোথায় যাবে?

মস্ত খবর জানতে, অতলু বাবুর বাড়ী। হঠাৎ কুম্ভুমের ছি লাগে মালায় গালে। কি একটা লুকোবার চেঁচা একটু হয়ে উঠলো তার চোখে-মুখে।

খিন-খিন করে উঠলো সুপ্রিয়র মন। আল্পা হয়ে গেল বা বাঁধন। ঘর ছেড়ে চল এল ধীরে ধীরে।

অতনু ছাড়া পেলোও মালা যে তাকে ছাড়েনি এ নুস্পষ্ট ইঙ্গিত সুপ্রিয়র চোখও এড়ালো না। এ অভিনায় তাহলে এই প্রথম নয়? কিন্তু মুখের ওপর বলার এ সাহস মালা পেলো কোথেকে। কি বলতে চায় সে? স্ত্রীর অঙ্গে শরীর পুষ্ট করা যে অপৌরুষেব, এই কথাটাই কি সইয়ে সইয়ে বোঝাতে চায় তাকে? এর জন্ত তো সে প্রস্তুত হয়েই আছে। এই ক'মাসেও কি সে তা বুঝতে পারেনি? সে জন্ত অতনু বোসের সঙ্গে এতো গোপন পরামর্শেরই বা কি দরকার? স্পষ্ট বলে দিলেই হয় একদিনের জন্ত নয় বরাবরের জন্তই ছুটি চায় সে।

সিগারেটের আগুন সেক্ দিয়ে পুড়িয়ে দিল আঙুলটা। টুকরোটা ছুড়ে ফেল শব্দ করেই উঠলো, জাহান্নামে যাও।

সামনে দাঁড়িয়ে ঝর-ঝর করে হেসে উঠলো মালা, কাকে জাহান্নামে যেতে বলছ, সিগারেট না আমাকে।

চোখ তুলেই নামিয়ে নিল সুপ্রিয়। কি সন্দেহ করে সাজেছে মালা! ফেলে দেওয়া পোড়া সিগারেট টুকরোটার ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো চূপ করে।

কখন ফিরতে পারবে ঠিক কি। যদি দেরী দেখ রাগ করে না খেয়েই শুয়ে পড়ো না যেন। লক্ষ্মীটি বল, মিছিমিছি অপেক্ষা করে থাকবে না আমার জন্তে। সুপ্রিয়র ষাড় নাড়া সম্মতি আদায় করে বলমলিয়ে সামনে দিয়ে নেমে গেল মালা।

একটা চাবুক খেয়ে যেন চমকে উঠল সুপ্রিয়। এ কি করছে সে? কেন সে মালাকে যেতে দিল? সে কি তাকে ধরে রাখতে পারতো না? এমন ভাবে মালাকে কিছুতেই বয়ে যেতে দিতে পারবে না সুপ্রিয়। হুহুর্তের মধ্যে বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় এনে দাঁড়ালো সে। যেমন করে হোক মালাকে ফিরাতেই হবে।

অতনুর বাড়ীর কাছটায় পথ সোজা করতে গিয়ে সামনের পার্কটায় ঢুকে পড়লো সুপ্রিয়। কিন্তু ওই রাস্তাটুকু পার হবার আগেই তার সমস্ত চেঁচা ব্যর্থ করে দিয়ে অতনুর বিরাট হডখোলা বিউয়ুখানা মালাকে নিয়ে মোড়ের মাধ্যম পিছন কিরলো।

গোটা পৃথিবীটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে পারের তলার ছড়িয়ে পড়লো সুপ্রিয়র। দারুণ আক্রোশে অলতে থাকলো সে। একটা হেস্ত-নেস্ত আজ সে করবেই।

রাত অনেক। বাইরে দরজার গাড়ী খানার শব্দ হলো। নিঃশব্দে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো সুপ্রিয়। গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মালা। অতনুর মুখোমুখী। হু'-এক টুকরো কথা। হালকা হাসির বলক। তারপর অপস্রমমান গাড়ীর লাল আলোটির দিকে ঋনিকরণ তাকিয়ে থেকে বহুদিন পর একটা গানের কলি গুনগুনিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো মালা। খুশির আমেজ যেন উপচে পড়ছে।

বারান্দার আলো ঝাঁলতেই কিছু গর্জে উঠলো সুপ্রিয়। চৌকাঠে পা দিয়েই রীতিমত চমকে গেল মালা। কথু চেহারা। উনকো-খশকো চুল। সুপ্রিয় আজ মরীয়া জয়ংকর। হুহুর্তের মধ্যে সমস্ত উবেগ কঠে এসে জড়ো হলো মালার—একি! আবার অনুখটা.....

এবারে কেটে পড়লো সুপ্রিয়। খামো। বখেট হয়েছে। আমার চোখে আর বুলো দেবার চেঁচা করে না। তার আগে জানতে পারি কি এতো রাত পর্যন্ত অতনু বাবুর সঙ্গে কি জরুরী কাজ ছিল? তোমাকে আর বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বরফের মতো জমাট বেঁধে গেল মালা। মাথাটা কিম্বিষ করছে। এ কথার কি জবাব দেবে সে।

কি, চূপ করে কেন? বিক্রপের কঠে ঝাঁকিয়ে উঠলো সুপ্রিয়। ভেবেছিলে, বা বানিয়ে বলবে তাই বিশ্বাস করবে আমি। কিন্তু আজ হাতে হাতে ধরে ফেলেছি, তাই জানতুম এর কোন জবাব তৈরী থাকবে না তোমার মুখে।

দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ে অতি কঠে সংযত হতেও কয়েক মিনিট লেগে গেল মালার। সুপ্রিয়র চোখে সোজাসুজি চোখ রেখে শান্ত কঠে বললো, এর চেয়ে আর কি বেশি তোমার কাছে আশা করতে পারতাম। জেনে রাখো, অতনু বাবুকে নিয়ে তোমার চাকরীর তব্বিরেই পেছলাম।

অভিমানাহত বুকটা আন্তে আন্তে নেমে এলো মালার। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে টেবিলের উপর হাতব্যাগটা রাখলো। এর ভেতর কাগজপত্র আর দরখাস্তের করম আছে। কাজটা হয়ে যাবে। বড় সারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তারপর আর কোন কথার প্রতীকা না করেই দ্রুত পোবার ঘর ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিলো।

মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)		ভারতবর্ষে	
বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ২৪	প্রতি সংখ্যা ১-২৫	
বাগ্মাসিক "	— ১২	বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ১-৭৫
প্রতি সংখ্যা "	— ২	পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)	
		বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ	— ২১
(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	— ১৫	বাগ্মাসিক " " "	— ১০-৫০
" বাগ্মাসিক সডাক	— ৭-৫০	বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	— ১-৭৫

মাসিক বসুমতী কিনুন ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বসুন ●



দুটি বিদুষকের জন্ম

কবিতা সিংহ

জন্মলগ্নে আমি বছরে একবার আসি। কারণ, বছরে একবারই আমার ছুটি হয়। মা বলেন— 'কি যে তোর এক সইয়ের বৌ-এর বকুলফুলের সরযুদি' হয়েছে।' মায় কথায় অবশ্য প্রেম, প্রেম থাকে না, প্রেম প্রেম থাকে। মা সরযুদিকে ভালোবাসেন। তাঁরা সংসারী মানুষ। তাই যে মেয়ে সংসার-তরবার হাল এত চমৎকার ভাবে ধরে চালিয়ে নিয়ে আসছে তার ওপর ভালোবাসা থাকারই কথা। মা বলেন— 'হু-হুটো যোগ্য ছেলের মধ্যে থেকে একটাকে বেছে নেয়া ত কম শক্ত কথা না, তারপর আর একটা ত বাওয়া হয়ে চলে গেল নেপালে না ভুটানে, সেটাকে আবার কিরিয়ে এনে কাছে বসানো। কাছে রাখা তাই-এর মত বড় করে পোষ মানানো এমনটি আর ক'জন পারে? ধন্ডি মেয়ে বাপু।'

মেয়েদের কথা ত হল; এবার আবার আমাদের, মানে আমাদের সারা জীবনব্যবে ছড়ানো পরিবারের বিভিন্ন বয়সের পুরুষদের কথা বলি। আমরা সময় পেলেই সরযুদি'র কাছে ভুলতে আসি, ভুড়োতে আসি। জন্মলগ্নের সেই নির্জন রাস্তার শেষে সেই সুন্দর শাদা বড় বাংলোটা যেন একটা অতিকায় রাজহাঁসের মত বিশাল ছুটো ডানা ছড়িয়ে নীল আকাশের তলায় ঝড়িয়ে আছে। অল্পাত রুক্ষ শরীরে আমরা যখন ঐশ-জানির পর একা থেকে সরযুদি'র শাদা নির্মল বাংলোটা নিদ্রা আকাশের নীচে দেখতে পাই, তখন যেন একটা কিরিয়িরে ঝড়ার শব্দ শুনতে পাই। এত ভালো লাগে যে মনে হয় যেন একটা সত্যি হয়ে যাওয়া মরীচিকার সামনে ঝড়িয়ে আছি।

আমাদের সত্যিকারের মরীচিকার আঠরোটি চৌকোঘর, বিশাল বাগান, তরকারির, ফুলের,—আর তাছাড়া সরযুদি'র নিজের একটা গোলাপ-বাগান, আর সেই সিমেন্টের শানবীধানো, দিনে হীরের চাঙড়, রাতে রূপোর চাঙড় চাতালেই আমাদের সব চেয়ে বেশী লোভ। এই বাড়িতেই, না একালের, না সেকালের, যেন সকল কালের সরযুদি' লাল গেমিজের ওপর ঘরোয়া করে লাল পাড় শাড়ি পরে, বিদ্যুৎবেগে এঘর ওঘর করে বেড়ান। কখনো গিরে দেখি সরযুদি'র বাগানে ঠাকুরের সঙ্গে ঝড়িয়ে বিশাল বিশাল হাঁড়ি নামাচ্ছেন, কখনো দেখি, আমার আগে হাঁরা এসে গেছেন তাঁদের জন্তে শুদাঘর থেকে চারপাই ঘর করে দিচ্ছেন,

তবে বেশীর ভাগ সময়েই দেখি হয় জামাইবাবুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন, নাহলে নির্মলেসু বাবু সিগারেটের টিনটা লুকিয়ে রেখে তাঁকেও ভোগাচ্ছেন, কখনো দেখি না সরযুদি' একলা বসে আছেন। হাঙ্কা একটা পালক হয়ে আপন মনে হাওয়ার ভেসে বেড়াচ্ছেন। এই দুই বুড়োই তাঁকে আলিয়ে খেল। তিনি যেন বন্দিনী রাজকন্যা। তাঁর যেন একা থাকার উপায় নেই।

চূপ করে সরযুদি'র পাতা চারপাই-এ শুয়ে শুয়ে সরযুদি'র কথাই তাবাইলাম। সেই দারুণ আকাঙ্ক্ষায় রাত্রি আজ কোলাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। সরযুদি'র এখানে শেষ পর্যন্ত আসতে পেরেছি, তাঁর হাতের রান্না খেয়ে তাঁরই পাতা বিছানার শুয়ে আছি। আমার এপাশে ওপাশে পাতা চারপাইতে লক্ষ্মীর বড় মেসো, দিল্লীর রুপু কলকাতার মেজ মামা, সিকির ফুলদাদা, ফুলবৌদি শুয়ে আবি আহািরের পর পরিতৃপ্তির আঁবর কাটছেন। পোলাপের গড় ভেঙে আসছে পশ্চিমের শুকনো বাতাসে। বড় গোল টাঙ্কের আলোর সমস্ত চাতালটা রূপোর চাঙড় হয়ে গেছে। আধো ঘুম আধে জাগরণের মাঝখানে আমরা সবাই মাঝে মাঝে ঘড়ি তুলে রান্নাশালে দিকে তাকাচ্ছি। ঘুরে ফুলবাগান পেরিয়ে তরকারি-বাগান ছাড়িয়ে লম্বা টানা রান্নাশালে সরযুদি'র মড়াচড়া দেখা যাচ্ছে কখনো জ্যোৎস্নার ভিজে নীল হচ্ছে শাদা শাড়ি কখনো রান্নাঘরের হলদেটে তেলপড়া আলোর কমলা হচ্ছে,—সরযুদি' যে কখন আসবেন। ও পাশে ছুটো খাটিরায় দুই মোব পরে আছেন। জামাইবাবু আর নির্মলেসু বাবু। হুজনেই সরযুদি'কে আঁকড়ে থাকবেন। আমাদের জন্ত একটু ছাড়তেও সে নি কল্পুপনা। গেল বছর দিল্লীর রুপুকে একা পোলাপবাগানে ঘেঁরে একটু বুকি মন খুলতে গিরেছিলেন সরযুদি', অমনি একটু বুড়ো খপখপ করতে করতে হাজির—সরযু, আজ তুমি আমা' খাইরে দেবে বলো?

তারও আগের বছর আমাকে, রবিমামাকে, সময় মেসোবে মিহুদি'কে এমন কি মাকেও সরযুদি' কত কথা যেন বলতে চেয়েছিলেন, বলতে পারেননি। আমাদের সকলের কাছেই তা

সরযুদি' একখানা সিকি পড়া বাংলা উপভাস হয়ে আছেন। না, সরযুদি'র কাজ আর শেষ হতে চায় না। রুগুটা শেষ পর্যন্ত হত্যাণ হয়ে গান ধরল,—'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ...'

জামাইবাবু এতক্ষণ বুড়ো আঙলের ডগায় চটি ছুলিয়ে পান নাচাচ্ছিলেন—হঠাৎ ফেটে পড়লেন।—কি রে বাবা, রান্নাঘরেই কি রাত কাটাতে নাকি?

—হ্যাঁ রে, তোর মুণ্ডু ভাজবে,—এ পাশের খাটিয়া থেকে আওয়াজ ছাড়লেন নির্মলেন্দু বাবু।

—খুঁ বুড়োখোকা, জামাইবাবুর গলা শোনা গেল। একটা সিগারের আগুনে আর একটা ছালিয়ে নির্মলেন্দু বাবু বললেন, দূর! হাসির হররা উঠল খাটিয়াগুলোর ভিতর থেকে। বেশ আছে দুই বুড়ো একজন সরযুদি'র স্বামী, অল্পজন সরযুদি'র স্বামীর অবিবাহিত বন্ধু। ওদের বাড়িতেই থাকেন। জামাইবাবু রিটার্ড গভর্নমেন্ট অফিসার। সরযুদি'র চারটি ছেলে। চারজনই কৃতী। ছড়িয়ে থাকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। আর ও এসেছে পূজোর মরশুমে। নির্মলেন্দু বাবু—ট্রিভল্ এম-এ। ইতিহাসে ফিলজফিতে, ইংরেজীতে। আমারও ইতিহাস আছে। ওর সংগে তাই আমার ঘনিষ্ঠতা বেশী। সত্যিই বুড়োখোকাটি আমাদের এই নির্মলেন্দু বাবু, টুক করে আমাকে একটু আচার দিলেন। সরযুদি'র ভাঁড়ারখর থেকে চুরি করা!—চূপ,চাপ, মুখ চালাতে লাগলাম। ওদিকে

জামাইবাবুর সংগে পরামর্শ করা আছে, রাতে কুতের ওর দেখানো হবে অতিথিদের। কিন্তু এই দুই বুড়োখোকাকে আর কতক্ষণ সহ করা যায়? সরযুদি' কখন আসবেন। দূরে বাগানের ধায়া দিয়ে সরযুদি' আসছেন। তাঁর দুধরঙা শাড়ি—নীলচে কাশের মত ফুলছে চাঁদের আলোয়। তাঁকে দেখে দুই বুড়ো বগড়া খামাল, রুগুটা চিংকার আরম্ভ করল।

—কি গো সরযুদি', এত রাত পর্যন্ত রান্নাঘরে কি করছিলেন? আমাদের গল্প যে আর জমছে না।—সার্কাসের ক্লাউনের খেলা আর কতক্ষণ ভালো লাগে? ওপাশ থেকে চিহ্ন মাসিমা ধমকে উঠলেন,—ওকি রুগু, ওঁরা না তোমার গুরুজন হন?

—বাহা বাহা, বেশ বলেছে—নির্মলেন্দু বাবু হেসে উঠলেন। পাকা-পাকা গৌফগুলো হাসির ধমকে নড়তে লাগল। সত্যি ঠিকই বলেছে রুগু। শুনি ত খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার আর অফিসার ছিলেন তুজনে—কিন্তু নিজেদের মর্যাদা বেধে চলতে শিখলেন না এখনো।

হাওয়াটাকে হাক্কা করে উড়িয়ে দিয়ে সরযুদি' বললেন,—হানার মালপোয়া কালকে কে কত করে খাবি বল দেখি?

গালে পান পূরে জামাইবাবুর খাটিয়ার একদিকে বসে পড়লেন সরযুদি।

নির্মলেন্দু বাবু বললেন,—হ্যাঁ রে, খাটিয়াটা লোহার ত? কর্তী-গিন্নীর বা ওজন ফর্দাফাই না হয়ে যায় না—

অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লণ্ডন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত ফলিত ও গণিত সত্যর সত্যপতি এবং কাশীর বারাণসী পণ্ডিত মহাসত্যর হারী সত্যপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও রূপালের রেখা, কোষ্ঠি বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শাস্তি-বন্তায়নাদি, তান্ত্রিক জিন্মাদি ও প্রত্যক্ষ কল্পের কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিভ্রম্য কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংল্যান্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে মনীষীকুল তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিদ্যমান পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাহারা মুক্ত তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া বর্ষমাতা মহারাজী জিপুরা টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মনমথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মনমথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি. কে. রায়, বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত, কেউমখড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব মি: এস. এন. দাস, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল স্যার ফজল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মি: কে. রূচপল।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য কবচ

ধর্মদক্ষ কবচ—ধারণে ব্রহ্মারাসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত)। সাধারণ—৭১।/০, শক্তিশালী ১২১।/০, মহাশক্তিশালী ও সম্বর ফলদায়ক—১২১।/০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর রূপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কৰ্তব্য)। সন্ন্যাসভী কবচ—অরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষার ফল ২১।/০, বৃহৎ—৩৮১।/০। মোহিনী (বশীকরণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১।/০, বৃহৎ—৩৪।/০, মহাশক্তিশালী ৩৮৭।/০। বঙ্গলাভুর্বাণী কবচ—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিস্থ মনিবকে সম্বলিত ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ২।/০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪।/০, মহাশক্তিশালী—১৮৪।/০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জরী হইয়াছেন)।

(হাগিতাব্দ ১৩০৭ খঃ) অল ইণ্ডিয়া এন্টোনমিক্যাল এণ্ড এন্টোনমিক্যাল সোসাইটি (রেজিটার্ড)
বেঙ্গল অফিস ৫০—২ (ব), ধর্মতলা স্ট্রিট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশ পথ ওয়েলেসলী স্ট্রিট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০৩৫।
দায়—বেঙ্গল ৪টা হইতে ৭টা। ব্রাক অফিস ১০৫, থ্রে স্ট্রিট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৬৮৫। সম্বর প্রান্তে ১টা হইতে ১১টা।

আমাইবাবু বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর খাটটার গিরেই বসোগে, পা কিয়ে বা বাঁধাধরের খশবু বেরুচ্ছে।

আবার শুরু হল। না শুরু আর হবে না। সরযুদি' এসেছেন। তিনিই হাল ধরলেন বানচাল আসরের। চিহ্ন মাসী গান ধরল। তারপর গল্প আর গল্প। আন্তে আন্তে কখন যুম এসে গেল। জানি না। মাঝরাতে যুম ভাঙলো। শীত করছে। সমস্ত চাতালটাই প্রায় জনহীন। যে বার ঘরে চলে গেছে। ভারী ভালো লাগছিল। নতুন জামগায় এমন গোল চাদের আলোর তলায় শুয়ে এমনি কোজাগরী পূর্ণিমার মাঝরাতে জেগে উঠবার জন্তেই যেন আমি জবলপুরে এসেছিলাম এমনি মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ ঘুরে কসু করে আশুন জলে উঠল। দেশলাই না? সিগারেটের নেশা জেগে উঠলো আমার। বাগানের দিকে রূপোজী চাতালের শেষ প্রান্তে সরযুদি'র গোলাপ বাগানের অন্ধকারের মধ্যে পা ডুবিয়ে চেন স্মোকার নির্মলেন্দু বাবু একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। আমি এগিয়ে গেলাম। বিশাল, হুল, বেচপ মাল্লবটা চূপ করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। কোমরের কবিটা আলগা হয়ে লুজিটা নীচে একটু নামানো। কালো গোলদাগটা সারা কোমর জুড়ে ভুঁড়ির ভাঁজে লুকিয়ে গেছে। আমার দেখে হাসলেন নির্মলেন্দু বাবু। আমি তাঁর পাশে বসে সিগারেট ধরালাম।

—সরযুদি'র গোলাপ গাছ কিনা, তাই এখন থেকে গোলাপ দিচ্ছে, শীত পড়লে কি বাহারটাই না খুলবে। তখন আমি থাকব না, দেখতেও পার না।

—অন্ধকারে সব গোলাপগুলোই ব্লাকশ্রিল মনে হচ্ছে না যে মিষ্ট, ভারী গলার বললেন নির্মলেন্দু বাবু অথচ দিনের বেলায় দেখো, টকটকে লাগ।

বাঃ! সরযুদি'র বাগান বলেই বৃষ্টি। সব লাগ গোলাপই ত' বাতে কালো দেখায়।

ঠা রে হ্যাঁ তাই বটে,—আজকালকার ছেলেগুলোর সংগে যদি কথাই পারি।

খারুন মশাই, একটু লঘু সুরেই বললাম আমি,—আপনারা হুজনেই দাঁড়ান-বিধান, বত দিন কাজ করেছেন সবাইকে ধরহরি কল্প করিয়েছেন শুনেছি, তবে এখানে এসে ক্লাউন সেজে দিগিটিকে আমার আলাচ্ছেন কেন বলুন ত'?

হাঙ্ক মেজাজে কথাটা বলেছিলাম।

ভেবেছিলাম, এর উত্তর পাবো 'তোরা' দিয়ে শুরু আর 'তোরা' ভাঙে কি রে?' দিয়ে শেষ হবে। কিন্তু বোধ হয় দিনের লাগ কথাও রাতের অন্ধকারে কালো শোনালে আমার কানে। নির্মলেন্দু বাবু তাঁর কাঁচা-পাকা গৌক-দাড়িতে ছাওয়া মুখখানা তুললেন আমার দিকে। চাদের আলোর আমি অবাক হয়ে দেখলাম। হুটো সম্পূর্ণ অচেনা চোখ। এমন চোখ যেন তাঁর মুখে এর আগে আর কখনো দেখিনি। ঠিক বলেছিল মিষ্ট, তুট, রুগু তোরা ঠিক বলেছিল, সত্যি আমি আর স্নেহময় ক্লাউনই বটি। না না কিছু ভাবিস নি, আমি কিছু মাইও করিনি, এতে কিছু অভ্যাস নেই যে,—তবে কি জানিস মিষ্ট, সার্কাসের সবচেয়ে ওস্তাদ খেলুড়েরাই ক্লাউন সেজে থাকে। লোক হাসায়, ভাকা সাজে, আর সার্কাসে

অকৃত সব হাস্যকর ভঙ্গি দেখায়, হাস্যকর ভঙ্গি করেই, অপর আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচার। ওয়ে,—ক্লাউনের মত মৎস জী আর হুনিরাত্তে আছে?

আমি ভিতরে ভিতরে ভীষণ চমকে উঠলাম। যেন একটা অন্ধকার ঘরে হাতড়ে হাতড়ে তার যে ভূগোল তৈরী করেছিল্যা দপ, করে আলো জলে উঠতেই দেখলাম ভূগোলটা আকারে ঠিক হয়ত, কিন্তু প্রকারে কেমন যেন অস্ত!

—তুট ত' জানিস না মিষ্ট সব।

সব জানি না, তবে একটা জিনিষ আমার ভালো লাগেনি—আপনি ত চলে গিয়েছিলেন, আবার যিৎ এলেন কেন?

—কেন? জানি মিষ্ট, তোরা সবাই আমার দোষী করিসু কিন্তু ফিরে এলাম ঠিক সরযু জন্তে নয়—

—তবে?

আমার ভারী অবাক লাগছিল। আশ্চর্য, আমার সামনেই ও গল্প রয়েছে। পাত্র-পাত্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ গল্পটা আমার কেউ দেখতে পাইনি।—কেউ দেখতে পাইনি গল্পটা হয়েছে রয়েছে, ক্রমাগত বদলাচ্ছে, সমানে অস্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার সে সব কেউ দেখতেনি। আমরা এককাল ধরে খালি পুরোনে জায়ের আচার খাচ্ছি।

নির্মলেন্দু বাবু আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। সেই ভিত্তি কোণা ব্যাপারের গল্প আর কি। দুটি প্রেমিক আর একা প্রেমাম্পলা। প্রেমিক দু'টির কথা ত' ভাবলেই হাসি পায়। সরযুদি যদিও এখন প্রায় মায়ের বয়সী, তবু এখনো তাঁর নাকের বাঁশি নিখুঁত, হাসির মধ্যে ইজ্জতমায়ী, চোখ দুটি সেই কোকিল-ডাকা ষড় মত, হঠাৎ ঘর থেকে দুটি কোকিল এসে সমর বলে বায় তুল সময় বলে যায় অবস্ত। কিন্তু সেই দুই স্পৃহকর স্পৃহাত্তের স ডুবে গেছে মাংসে। শরীরের ভূগোলের উঁচু-নীচু সব ভরটি হা গেছে চর্কিতে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ভাগলপুরের বিটারা জঙ্গসাহেবের সেই বাড়িটা।

সরযুদি' তাঁর সেই আঠারো বছর বয়সের ছবিটা থেকে নেমে এ যেন বাগানে বেড়াচ্ছেন। ঠিক জমনি লেশের ঝালর দোলায়ে থি-কোয়াটার ক্লাউজ, ড্রাক মেয়েদের মত শাড়ি পরায় ধরণ। উঁ গলার লম্বা মফচেনে বিকেলের আলো পড়ে বিকৃতিক কংরে সরযুদি'র বাবা মানে আমাদের গৌর মামা ছিলেন বিধম খুটান-ধেঁবা একবার এক মোটর এ্যাকসিডেন্টের সময় এই দুই অভিন্নকর বধ সজে তাঁর আলাপ। ভাগলপুরে বিরাট জমিদারী চূপের ব্যব ইত্যাদির মালিক ছিলেন স্নেহময় চ্যাটার্জির বাবা। তার ওপ তিনি নিজে মস্ত ইঞ্জিনীয়ার। আর নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ষ্ট্রিপ এম-এ, আই-এ-এস অফিসার, তিনিই বা কম যান কিনে এ্যাকসিডেন্টের জের কেটে গেলেও আলাপের জের কিছুতেই কা না। হ' মাসের ছুটিতে পশ্চিমে শরীর সারাতে এসেছিলে নির্মলেন্দু বাবু, হ'বেলা হ' বন্ধুট হাজিরা দিতে লাগলেন জঙ্গসাহে বাড়ি। সরযুদি'র অবস্থা হল সবচেয়ে সজীন। তিনি হ'জ দিকেই আকৃষ্ট হলেন। হ'জনেই সূদর্শন স্তম্বান, সৎশজাত। হ' হুটি তাই। হুটি তাই বললেও যেন দু'রে দু'রে বাধা হয়।

একটি মাহুকের ছ'টি পিঠ। ছ'টি ছায়া। ব্যাপার ক্রমশঃ যখন ঘোরালো হয়ে উঠলো, যখন নির্মলেন্দু বাবু বুঝলেন, স্নেহময় সবুদিকে আর স্নেহময় বুঝলেন নির্মলেন্দু বাবু সবুদিকে ভালোবাসছেন, তখন সত্যিই তারা যে একটি মাহুকের ছ'টি ছায়া, তা প্রমাণ করবার জন্তে দুজনেই পালালেন। একই সময়ে।

পালাবার আর একটা কারণও ছিল,—নির্মলেন্দু বাবু বুঝলেন,—জামরা দুজনেই বুঝতে পেরেছিলাম, অনেক চোখ খারাপের দৃষ্টি যেমন জিনিষের দৃষ্টো করে ছায়া দেখে সবুও তেমনি আমাদের দেখছে। বুঝি মিন্টু, তোমার সবুদী সত্যিই বিচারিণী হয়ে পড়ল। শেষটা এটা বুঝতে পেরেই যেন আমাদের দোঁড়টাও বেশী লোক-দেখানো হয়ে পড়লো।

—জামাই বাবু আবার কিরলেন কি করে ?

—আরে, ওর ত' ব্যবসা চাকরী সব কাছাকাছি, ও ত' আমার মত অতদূর পাড়ি দিতে পারল না। অগত্যা গৌরপ্রসন্ন বাবু ওকে সহজেই পাকড়াও করলেন আর সবু?—যেহেতু এযুগে ছ'জন পুরুষ বিয়ে করবার রীতি নেই, সেহেতু স্নেহময়কেই বিনা বিধায় বিয়ে করে ফেলল। আমি বললাম—তা মশাই ভালোই ত' হয়েছিল, আপনি আবার জুটলেন কেন এসে ?

—আমি জুটিনি যে স্নেহময় চিঠি লিখে আমায় আনিয়েছে। আমি অনেক দূরে পালিয়েছিলাম। ওদের বিয়ের কথা শুনে আমার খুব ভালোই লেগেছিল। আমি ত' স্নেহময়ের জন্তেই সব এসেছিলাম। স্নেহময়ের সংগে সবু বিয়ে হওয়ার ইংক ছেড়ে যাচ্লাম এই ভেবে যে আবার আমাদের বন্ধুচটা সবল হল। ইতিমধ্যে স্নেহময়ের চিঠি এসে হাজির। স্নেহময়ের চিরকালের রীতি হল বিরাট বিরাট চিঠি লেখা। খুঁটি নাটি, বৃত্ত বৃত্তান্ত। কিন্তু খামটা বেশ পাতলা। স্নেহময় যদি শেষ পর্যন্ত চিঠিই লিখল তবে এত পাতলা চিঠি লিখল কেন ? চিঠিটা খুললাম। ঠিক ডিটেকটিভ এই-এর হমকি দেয়া চিঠির মত। শুধু ছ'টি লাইন—'নিম্ন, গীর্গির চলে আর, তোমার পরামর্শ ছাড়া চলবে না'—তাড়াতাড়ি ওনা হল। ট্রেনে বসে বসে তোলাপাড় করছি মনে মনে, এত দক্ষী তলব কেন ? বগড়া টগড়া হল নাকি ছ'জনের ? কালকাতার পড়া মেয়ে, তেজী মেয়ে, মানিয়ে নিতে পারল না। কি স্নেহময়ের সংগে, সারা ট্রেনে মনে মনে তৈরী করতে করতে ললাম গিয়ে কি বলব ? কি ভাবে মেটাব ওদের বগড়া।

ভাগলপুরে নামবার সংগে সংগে হাটের প্যালপিটেশন বেশ ঠিকের পেলাম। কান মাথা সব গরম হয়ে উঠেছে। বুঝলাম ঠান্ডা ভাল হয়ে এতদিনে শরীরে যে ভাজা রক্ত জমেছে সব গরম কানে, মাথার ভলকে ভলকে ঠলে উঠেছে। ওদের বাড়ি যখন চুকলাম, তখন হাটের বিট প্রায় আড়াই শ'। কারণ সিঁড়ির খে দেখলাম অল অল করছে সবু বিয়ে হয়ে যাওয়া রক্তিন সিঁড়ি।

'আমার বুকটা'—সত্যি বলছি মিন্টু—দুর্, দুর্, করে উঠল। সবু আমার দিকে সে যে কি দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। যেন ঠান্ডা হ' চোখের মধ্যে দিয়ে কতদিনের অন্ত্রাত অকৃত্ত ভিচারিণী গকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। আমার বিবম ভয় হতে লাগল। আমি টের পেলাম দুহাতে দুটো প্লটকেশ ধরে আমি যেন হাপুর মত ডিগিয়ে আছি। তবে কি স্নেহময়ের ধারণা হয়েছে যে সবু বিচারিণী

নয়, সে আমাকেই ভালোবাসে। সেই অভিমানে আমাকে ভিড়িয়ে দিয়ে নিজেই কেটে পড়ল।

আমি ভয়ে ভয়ে সবুকে জিজ্ঞেস করলাম,—স্নেহময় আছে ত ? সে মিষ্টি ভঙ্গিতে বলল—হ্যাঁ আছে।

সবু যেন আরো কিছু বলত। তার দুটো ঠোঁট সুরিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু সিঁড়ির তলার লাইব্রেরী ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল স্নেহময়। তার চুল উকোখুকো। চোখ লাল দিশাহারা।

—আর নিম্ন ভেতরে আর।

লাইব্রেরী ঘরে বসে আমরা দুজনে ঘণ্টা দুই আলোচনা করলাম। বিয়ের রাতেই সবু স্নেহময়কে বলেছে—ঐ একই ভাবে নির্মলেন্দুকেও আমার চাই। সামাজিক উপায়ে সম্ভব নয় ছ'জন স্বামীর স্ত্রী হওয়া, কিন্তু অসামাজিক উপায়ে ত' সম্ভব। আমরা ছ'টি বন্ধু দুজনের হাতে হাতে দিয়ে ধর ধর করে কাঁপতে লাগলাম। কিছু ত' একটা করতে হবে ? কিছু কি করতে হবে ?—আবোবন সবুকে তুলিয়ে রাখতে হবে, ঘিবে রাখতে হবে, পাহারা দিতে হবে, ব্যাইগ্যামি থেকে পলিগ্যামিতে চলে যাওয়া এক 'পা দরজা বৈ ত' নয়। ওর বিচারিণী যদি বা সবু ওর বহুচারিণীও যে কিছুতেই সহিবে না।

যখন লাইব্রেরী ঘরের দরজা খুলে গেল, আমিও বেরিয়ে এলাম লাল চোখ আর উকো-খুকো চুল নিয়ে। সবু তখনো সিঁড়ির রেলিং ধরে তীব্র দৃষ্টিতে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু তার অবাধ দৃষ্টির সামনে আমরা দুটি কৃতী যুবক নায়ক থেকে মুহূর্ত্তে ক্লাউনে নেমে গেলাম। আমাদের বিসদৃশ অলভনিক কথাবার্তা সবুকে—অবাধ করে তুলল। সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি কি জানিস আমরা দুজনে প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম, যাতে সে কখনো আমাদের ভালোবাসতে না পারে। স্নেহময় তার স্বামী আর আমি তার স্বামীর বন্ধু এই ভাবে থাকতে থাকতে বুড়ো হতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত এলাম এই অবলম্বুরে। এই নির্বাক পুরীতে সবু আর তার চারটি ছেলে আর দুটি ক্লাউন নিয়ে অলতে অলতে যিমিয়ে এল। তারলুম বয়সের জলে তার আশ্রয় বুঝি নিভেছে। কিন্তু আশ্রয় বলে উঠল আর এক দিক দিয়ে। তাদের টানতে লাগল সবু এই নির্বাক পুরীতে। তোরা আসতে লাগলি। সবু ডাকলে কি না এসে থাকি বায় ?

আপনি কি বলতে চান আমরা আসব না ?

আসবি না মানে ? তোরা আসিস বলেই ত' আমরা খামিকটা বিশ্রাম পেয়েছি। এখন সবু সে বয়সও নেই সে শরীরও না ; ওর সব ভয় দেখানো দাবানল এখন ছেলেখেলার ফুলকি বি হয়ে গেছে। যে জিনিটা ওর ভেতর ছিল, বদলে এ বয়সে যেমন হতে হয় তেমনই হয়েছে, আর আমরা দুটিতে আছি চিরকালে ক্লাউনের সুখোশ পরে। মাঝে মাঝে এক একবার স্তম্ভপনে সুখোশ খুলে দেখে নেই, ছ'জনে ঠিক আছি কিনা।

আমি বললাম, তবু কোনোদিন জানতে ইচ্ছে করে না সবুদী আপনাদের এখনো ভালোবাসে কিনা ?

নির্মলেন্দু বাবু কাঁচা-পাকা গৌকে জাওয়া সুখখানি নামালেন, গোলাপবাগানের দিকে তাকালেন। একদম শেষ ফুলটির দিকেই বোধ হয়। তার পর ভরাট পল্লীর গলার বললেন। করে।

ছ'জনেরই। হ্যাঁ ছ'জনেরই।



বাড়ি-গাথা-ছাগলের কথা

(অপ্রকাশিত)

সুকান্ত ভট্টাচার্য

একটি লোকের একটা বাড়ি, একটা গাথা আর একটা ছাগল ছিলো। লোকটা বেজায় অত্যাচার করতো তাদের ওপর। বাড়িকে দিয়ে ঘানি টানাতো, গাথাকে দিয়ে মাল বওয়াতো আর ছাগলের সবটুকু দুধ দুইয়ে নিয়ে বাচ্চাদের কেটে কেটে খেতো, কিন্তু তাদের কিছুই প্রায় খেতে দিতো না। কথায় কথায় বেদম হার দিতো।

তিন জনেই সব সময় বাঁধা থাকতো, কেবল রাত্তির বেলায় ছাগলছানাদের শেরাল নিয়ে বাবে বলে গোরালঘরের মাচার ছাগলকে না বেঁধেই ছানাদের সঙ্গে তুলে রাখা হ'তো।

একদিন দিনের বেলায় কি ক'বে ঘেন বাড়ি, গাথা, ছাগল তিন জনেই ছাড়া অবস্থার ছিলো। লোকটিও কি কাজে বাইরে গিয়ে কিরতে দেবী করে ফেললো। তিনজনের অনেক দিনের খিদে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই গাথা সোজা বাসায় গিয়ে ভালো জালো জিনিস খেতে আরম্ভ করলো। বাড়িটা কিছুকণের মধ্যেই সাক ক'রে ফেললো লোকটির চমৎকার তরকারীর বাগানটা। ছাগলটা আর কি করে, কিছুই এখন খাবার নেই, তখন সে বারান্দার বেলা একটা আঁড় কাপড় খেয়ে ফেললো মনের আনন্দে।

লোকটি কিরে সে কাণ্ড দেখে তাজব বনে গেলো। তারপর তেলো কাঠ নিয়ে এমন মারলো তিনজনকে যে আশেপাশের পাঁচটা প্রায় জেনে গেলো লোকটির বাড়ি কিছু হ'য়েছে। সেদিনকার মতো তিনজনেরই খাওয়া বন্ধ করে দিলো লোকটি।

রাত হতেই মাচা থেকে টুপ ক'রে লাকিরে পড়লো ছাগল। তারপর গাথা আর বাড়িকে জিজ্ঞেস করলো :—গাথা ভাই, বাড়ি ভাই, জেগে আছো? ছুজনেই বললো :—হ্যাঁ, ভাই।

ছাগল বললো :—কি করা যায়?

গাথা বললো :—কি আর করবো, গলা বে বাঁধা।

ছাগল বললো :—সে জন্তে ভাবনা নেই, আমি কি-না খাই?

আমি এখন তোমাদের গলায় বাড়ি দুটো বেঁধে ফেলছি। আর খিদেও বা পেয়েছে।

ছাগল বাড়ি দুটো খেয়ে ফেলতেই তিনজনের পরামর্শসভা শুরু হয়ে গেলো। তারা পরামর্শ ক'রে একটা সমিতি তৈরী ক'রলো। ঠিক হলো আবার যদি এ রকম হয়, তা'হলে তিনজনেই একসঙ্গে লোকটিকে আক্রমণ করবে। বাড়ি আর গাথা দুজনে একমত হয়ে ছাগলকে সমিতির সম্পাদক ক'রলো। কিন্তু গোল বাধলো সভাপতি হওয়া নিয়ে। বাড়ি আর গাথা দুজনেই সভাপতি হতে চায়। বেজায় ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো। শেষকালে তারা কে বেশি বোগ্য ঠিক করবার জন্তে সালিশী মানতে মোড়লের বাড়ি গেলো। ছাগলকে রেখে গেলো লোকটির ওপর নজর রাখতে। মোড়ল ছিল লোকটির বন্ধু। গাথাটা চেঁচামেঁচি করে ঘুম ভাঙাতেই, বাইরে বেহিয়ে মোড়ল চিনলো এই দুটি তার বন্ধুর বাড়ি আর গাথা। সে সব কথা শুনে বললো : বেশ, তোমরা এখন আমার বাইরের ঘরে খাও আর বিশ্রাম করো পরে তোমাদের বলছি কে বোগ্য বেশি। বলে সে তার গোরালঘর দেখিয়ে দিলো। দুজনেরই খুব খিদে, তারা গোরাল ঘরে ঢুকতেই মোড়ল গোরালের শিকল তুলে দিয়ে বললো : 'মাহুকের বিক্রম সমিতি গড়ার মজাটা কি, কাল সকালে তোমাদের মনিবের হাতে টের পাবে।'

এদিকে অনেক রাত হয়ে যেতেই ছাগল বুঝলো, ওরা বিপদে পড়েছে। তাই আসতে তাদের দেবী হচ্ছে। সে তার ছানাদের নিয়ে প্রাণের ভয়ে ধীরে ধীরে লোকটির বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো বনের দিকে।

সকাল হতেই খোঁজ খোঁজ পড়ে গেলো চারিদিকে। লোকটি এক সময় খবর পেলো বাড়ি আর গাথা আছে তার মোড়লবন্ধুর বাড়ি।

অমনি বাড়ি আর লাঠি নিয়ে ছুটলো সে মোড়লের কাছে জানোয়ার আনতে।

'মাহুকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই' এই কথা ভাবতে ভাবতে খালি পেটে বাড়ি আর গাথা পালানর মতলব জাঁটছিলো। এমত সময় সেখানে লোকটি হাজির হলো।

তারপর লোকটির হাতে প্রচণ্ড মার খেতে খেতে কিরে এসে গাথ আর বাড়ি আবার মাল বইতে আর ঘানি টানতে শুরু ক'রলো আগের মতোই। কেবল ছাগলটাই আর কখনো কিরে এলো না কারণ, অনেক মহাপুরুষের মতো ছাগলটারও একটু দাড়ি ছিলো।

উপদেশ : নিজের কাজের মীমাংসা করতে অস্তুর কাছে কখনো যেতে নেই।

একটি মাতার কাহিনী

[ছাগলের "The story of a mother-এর অনুবাদ]

ছাগল ছেলের শিয়রে বসে আছেন। ছেলোটর চোখ বন্ধ মুখ ক্যাকাসে। খুব ধীরে ধীরে খাল নিচ্ছে ছেলোট। ছেত্রী অবস্থা দেখে মা বড় বিবগ হয়ে পড়েছেন। হবেন বৈ কি একমাত্র সন্তান যে।

হঠাৎ মা বাইরের দরজার কড়া নাড়বার আওয়াজ শুনে পেলেন। মা দরজা খুলেই দেখতে পেলেন একটা বড়ো লোক, মা শরীর একটা বোড়ার চামড়ার তৈরী কবল ঢাকা দিয়ে পাড়িয়ে আন লোকটা জো ঐরকম কবল পায় দেখেই, কারণ বাইরে যে জ

বরফ পড়ছে। বরফ পড়ে পড়ে চারদিক পঁজা তুলোর মতো সাদা হয়ে গেছে। গাছে একটাও পাতা নেই। লোকটি ঘরে ঢুকেছে। শীতে অসম্ভব কঁপছে দেখে, মা তাড়াতাড়ি পানীয় গরম করতে চলে গেলেন। বুড়োটি ছেলের পাশে বসতেই ছেলেকে কেমন বেন চূপ হয়ে গেল।

মা গরম পানীয় বুড়োকে দিয়ে পাশে রাখা একটা ভাজা নড়বড়ে চেয়ারে বসে ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। মা বুড়োকে বললেন— একে বাঁচাতে পারবো না ?

বুড়োটি এমন ভাবে মাথাটা নাড়লো যা'তে হ্যাঁ-ও বোঝা যায় না, না-ও বোঝা যায় না। এই বুড়ো লোকটি কিন্তু আর কেউ নয় বরং বম। মৃত্যুর রাজা।

মা নির্ঝাঁক, নিশ্চল। শুধু চোখের জল তার চিবুক ভিজিয়ে দিতে লাগলো। মার মাথাটা কেমন বেন ভারী ভারী লাগছে। না লাগার কোন দোষ নেই। তিন দিন তিন রাত খাওয়াও নেই, ঘুমও নেই। ঐ প্রস্নের ঐ রকম উত্তর পেয়ে মা বেন কেমন একটু ঝিমিয়ে পড়লেন। ঠিক ঘুম নয়; কেমন বেন একটু তন্দ্রালু ভাব।

মিনিটখানেক পরে মা একটা আওয়াজে চমকে উঠে দেখতে পেলেন, ঘরে কেউ নেই। তার ঝিমিয়ে পড়ার সুযোগ নিয়ে বুড়োটি ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে। ঘরের কোণে বুড়ো-বড়িটা ভাজা আলমারীর ওপরে বসে আর টিক্ টিক্ করে সময় গুনছে না। পেতুলাম স্থির। পেতুলামের সীসের বলটাও নেই। কোথায় বা গড়িয়ে পড়ে গেছে। বড়িটা হারিয়েছে বাস্তবিক প্রাণ। চার দিক নিখুম।

মা বিজ্ঞানায় ছেলেকে না দেখে উদ্ধ্বাসে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে বেরিয়ে মা দেখলেন একটা বুড়ী, কালো লম্বা একটা জামা পরে বরফের ওপর বসে আছে। মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা, বলতে পারো একটা বুড়ো একটা ছোট ছেলেকে নিয়ে এই দিকে গেছে কি ?

বুড়ী বললে—হ্যাঁ, দেখেছি বুড়ো একটা ছোট ছেলেকে নিয়ে গেছে। আর বুড়োটা বে বয়ঃ বম। তা'বদে সে তো হাওয়ার আগে আগে যায়। আর বা নিয়ে যায় তা' তো সে কখনো ফিরিয়ে দেয় না।

মা বললেন—আচ্ছা বুড়ী-মা, তুমি শুধু বলো আমার যে সে কোন দিকে গেছে? বলো। আমি ঠিক তাকে খুঁজে বার করবোই।

বুড়ী বললে—হ্যাঁ, আমি জানি সে কোন পথে গেছে। কিন্তু তার আগে, আমাকে তোমার শোনাতে হবে গান। যে মিষ্টি সুরের গান গেয়ে তুমি তোমার ছেলেকে ঘুম পাড়াতে সেট গান। আমি যে সে গান তোমার শুনেছি। তোমার মিষ্টি গলার মিষ্টি গান শুনে আমি খুব ভালবাসি। আমার নাম রাজি। বখন তুমি ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসি গান গেয়ে তোমার ছেলেকে ঘুম পাড়াতে, তখন তোমার কপাল বেয়ে বে জল পড়তো সে জলও আমি দেখেছি।

মা বললেন—আচ্ছা, আমি তোমার সব গান শোনাবো। বত ঘুমপাড়ানী গান জানি সমস্ত শোনাবো। এখন আমার সময় বইয়ে দিও না। আমার ছেড়ে দাও লম্বীটি। ছেলেকে খুঁজে নিয়ে আসি। তারপর তোমার সব গান শোনাবো। কেমন ?

বুড়ী কিন্তু নির্ঝাঁক নিশ্চল।

মা বললেন—বলো বুড়ী মা, কোন দিকে সে গেছে। বলো চূপ করে থেকে না।

রাজি-বুড়ী বললে—না। তা হ'বে না। জানো তো, আমার কথার কোন নড়চড় হয় না।

মা তখন নিরুপায় হয়ে গাইতে লাগলেন গান। মন প্রাণ ঢেলে গাইতে লাগলেন সব ঘুমপাড়ানী গান, বত গান জানতেন। আজকে তাঁর মিষ্টি গান বেন আরও মিষ্টি হয়ে উঠলো। সেই মিষ্টি গান শুনে রাজি-বুড়ী বললে—সোজা ডান দিকে যাও। ডান দিকে বাবার পর একটা ঘন বন দেখতে পাবে। ঐ বনের দিকেই বমরাজ তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে।

মা চললেন বনের দিকে। বনের ভেতর চুকে হাঁটতে হাঁটতে মা এসে পড়লেন এক চৌমাথা রাস্তায়। মা এখন ভেবে পান না যে কোন দিকে এগুবেন। পাশেই ছিল একটা কাঁটা গাছ। বরফ পড়ে গাছটা হয়ে গেছে একদম শাদা। একটাও ফুল নেই। একটাও পাতা নেই। শুধু আছে কাঁটা।

মা কাঁটা গাছকে জিজ্ঞেস করলেন—বলতে পারো কাঁটা গাছ, কোন পথে বমরাজ আমার ছেলেকে নিয়ে গেছে ?

কাঁটা গাছ বললে—হ্যাঁ বলতে পারি। কিন্তু বলবো না। বতকণ না তুমি তোমার বুকের মাঝে আমার জড়িয়ে ধরছ। মাতৃস্নেহের উত্তাপ যে আমি চাই। দেখছো না, বরফ আর শীতে আমি কেমন জমে মরে বাছি। মা তখন কাঁটা গাছকে বুক জড়িয়ে ধরলেন যেমন করে তিনি স্নেহ বাৎসল্যে জড়িয়ে ধরতেন নিজের ছোট ছেলেকে। কত কাঁটা বিঁধে গেল তাঁর বুক। সারাটা বুক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। সন্তানহারি মায়ের মাতৃস্নেহের উত্তাপে কাঁটা গাছের ডালে ডালে পাতা আর ফুল ফুটে উঠলো। তখন কাঁটা গাছ পথ দেখিয়ে বললে—এই পথে যাও। মা চলেছেন কাঁটা গাছের দেখানো পথ দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে মা এসে পড়লেন একটা বিরাট হ্রদের সামনে। হ্রদ তর্কি স্বচ্ছ নীল জল। এতো স্বচ্ছ যে হ্রদের জলা পর্যন্ত দেখা যায়। হ্রদটা কাঁকা। কোথাও কেউ নেই। একটা নৌকো পর্যন্ত না। চারদিক শুধু জল—আর জল।

মা এই হ্রদ পার হবেন কেমন করে? এমন কি ঠাণ্ডার হ্রদটা জ.মও বারনি, বাতে করে তিনি হেঁটে যেতে পারেন। মা মনে মনে বললেন—যেমন করেই হোক, আমার পার হ'তেই হবে। পার না হ'লে ছেলেকে খুঁজে পাবো কেমন করে? মা একবার ভাবলেন যে হ্রদের সমস্ত জল খেয়ে শুকিয়ে দেওয়া যায় না? আবার পরক্ষণেই ভাবলেন—সে কি সম্ভব? মা প্রার্থনা করলেন—হে ঠাকুর, আমার একটা কিছু বিহিত করে দাও। না হ'লে যে আমার ছেলেকে আর খুঁজে পাবো না। ছেলেহারি মায়ের হৃৎকি তুমি একটুও বোর না ?

হ্রদ তখন বললো—আমায় কি কেউ সাঁতারে পার হতে পারে? সে যে মাতৃস্নেহের অসাধ্য।

মা বললেন—কিন্তু হ্রদ, আমার যে পার হ'তেই হবে। নইলে আমি কেমন করে বমরাজের কাছ থেকে আমার ছেলেকে আনবো? তুমি আমার একটা উপায় বলে দাও, লম্বী।

হ্রদ বললো—বেশ তোমার চোখ দুটো আমার ভারী পছন্দ।

তোমার ঐ সুন্দর কালো হরিণ-চোখ দুটি যদি আমার দাঁও, তা'হলে আমি তোমার ওপারে বমপুরীতে পৌঁছে দেবো। সেখানে বমরাজের সুন্দর আর প্রকাণ্ড ফুলের বাগান আছে। আর ঐ ফুলগুলোই হচ্ছে—এক একটা মানুষের জীবন।

মা আচ্ছা বলেই—নিজের কালো হরিণ চোখ দুটো হৃদকে দিলে দিলেন।

হৃদ তখন মাকে কোলে তুলে নিতুর ওপারে বমপুরীতে পৌঁছে দিল।

বমপুরী একটা বিরাট বাগানবাড়ী। বাগান, পাহাড়, গুহা, দীঘি, কুরো, ফুলগাছ আরো কত কি আছে তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু মা তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। দেখবেন কেমন করে বলো? মার তো চোখ নেই। চোখ তো মা হৃদকে দিয়ে দিয়েছেন।

মা বমপুরীতে চুকেই জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, বমরাজ কোথায়? বমরাজের কোথায় গেলে দেখা পাবো? তিনি যে আমার ছেলেকে নিয়ে এসেছেন।

বমরাজ তো এখনো করেনি। আর তুমিই বা কে? কেমন করে বেঁধা হুকুলে? কেই বা তোমার রাস্তা দেখিয়ে দিলে? বললে একজন কাশফুলের মতো সাদা চুল মাথায় বুড়ী।

মা বললেন—করণাময় ভগবানই আমার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। কে আর দেখাবে বলো? তিনি ছাড়া কে আর আছেন? তিনি করণাময়। তাঁর দয়াক্ষেপেই তো বেঁচে আছি। তুমি আমার একটু দয়া করে বলো না, কোথায় গেলে আমি আমার ছেলেকে খুঁজে পাবো?

তা তো আমি জানি নে। এইটুকু শুধু বলতে পারি যে কাল রাত্তি অনেক ফুল ও গাছ তোলা হয়েছে। বমরাজ একুণি এসে সেই গাছগুলো পুঁতবেন এই বাগানে। তুমি বোধহয় জানো যে এক একটা গাছ এক একটা মানুষের বংশ আর এক একটা ফুল এক একটা মানুষের জীবন। ঐ ফুলের মাঝে তুমি যদি কান পাতো, তা হ'লে শুনে পাবে মানুষের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক আওয়াজ। তোমার ছেলের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ তুমি শুনে পাবে? আচ্ছা, তোমার যে এত খবর বললুম তার বদলে তুমি আমার কি দেবে? যদি আমার কিছু দাঁও তাহলে তোমার আরও অনেক খবর দেবো।

মা বললেন—আমার বা ছিল তা তো সব দিয়ে দিয়েছি। দেবার মত আর যে কিছু নেই।

বুড়ী বললে—তোমার মেঘের মতো কালো কালো চুল আমার সম্বন্ধে ভাল লেগেছে। তোমার ঐ চুলগুলো আমার দাঁও না? তার বদলে আমি যে কিছু দেবো না, তা' কিন্তু ভেবো না। আমিও তোমার আমার সাদা সাদা রেশমী চুলগুলো দেবো। আমার অত স্বার্থপর ভেবো না কিন্তু।

এই নাও বলে মা তার মেঘের মতো কালো চুলগুলো বুড়ীকে দিয়ে সাদা চুল দিলেন।

তারপর তারা দু'জনে চললো বমপুরীর বাগানের দিকে। ফুলগাছের পর ফুলগাছ। এখানে গাছ, ওখানে গাছ। গাছে গাছে ছয়লাপ। গাছে গাছে ফুলগুলো হাসিতে ফুল হয়ে ফুলছে।

মা তখন বুড়ীটিকে বললেন, এক বড় বাগানে, এক ফুলের

মাঝে, আমার ছেলের জীবন কোন ফুলে আছে, বুঝতে পারি না যে।

বুড়ী বললে, চলো তোমার দেখিয়ে দিই তোমার বংশের ফুলে গাছ। সেই গাছের ফুলের ভেতর শুনে পাবে, তোমার ছেলে বুকের ধুকধুক আওয়াজ।

বুড়ী মাকে তার বংশের ফুলের গাছ দেখিয়ে দিয়ে বলতে কান পেতে শুনে বার করে নাও তোমার হারিয়ে-বাগা ছেলেকে।

মা তো চোখে দেখতে পান না। তাই ফুলে ফুলে ভিঁ কান পেতে যাচ্ছেন। কান পেতে যেতে যেতে মা চোঁচিয়ে উ বললেন, পেয়েছি, পেয়েছি এই ফুলটোতে আমার ছেলের বুকের ধুকধুক আওয়াজ শুনে পেয়েছি। ছিঁড়বো, বুড়ীমা, ছিঁড়বো?

বুড়ী তখন চোঁচিয়ে বললে, না। না। ছিঁড়ো না।

বুড়ীমা দেখলেন সত্যিই ফুলটা কেমন যেন একটু গুঁকিয়ে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। গন্ধও ভেঁমন বিশেষ নেই।

বুড়ী ফুল দেখে বললে, ফুল না ছিঁড়ে এখানে চুপটি করে বসে থাকো। যখন বমরাজ এসে এই ফুলটা তুলতে যাবেন, তখন তুমি তাকে বেশ ভয় দেখিয়ে বলবে, বমরাজ তুমি যদি এ ফুলটো তোলা, তা' হ'লে আমিও কিন্তু আসেপাশের যত ফুল আর গাছ গাছ আছে সব পটাপট তুলে ফেলবো। তা' হ'লে বমরাজ ভয় পেয়ে আর তোমার ছেলের জীবন-ফুল তুলবেন না। তাঁকে সব ফুলের হিসেব রাখতে হয়। সেই হিসেব আবার ভগবানের আসল হিসেবের খাতায় তুলতে হয়। ভগবানের হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোন ফুলই তুলতে পারেন না।

এই সব কথা বলতে বলতে বুড়ী আর মা পেলেন বরফ-ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ।

বুড়ী বললে, বরফ ঠাণ্ডা হাওয়া যখন বইছে বমরাজ তখন নিশ্চয়ই আসছেন।

মাকে দেখে বমরাজের বিশ্বাসের আকাশে বাজ পড়লো। বমরাজ বললে, আরে—তুমি এখানে কি করে এলে? রাস্তাই বা তোমায় কে চিনিয়ে দিলে? আর আমার আগেই বা কেমন করে এলে?

মা বললেন, আমি যে মা। সন্ধানের জন্তে আমরা সবখানে যেতে পারি, সব কিছু করতে পারি।

বমরাজ এবার সেই ফুলটি ছিঁড়তে যাচ্ছেন।

তোমায় কিছুতেই আমার ছেলের জীবন-ফুল তুলতে দেবো না বলেই ফুলটিকে শক্ত করে ধরে রইলেন মা।

বমরাজ বললেন—তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না আমি যে বমরাজ।

কেন, করণাময় ভগবান—বললেন মা।

আমি তো তাঁর কথামতই কাজ করি। আমি যে তাঁর বাগানে মালী। তার কথামতো এ স্বর্গরাজ্যে আমি ফুলগাছ লাগাই, ঠ দিই, লালন পালন করি। আবার তাঁর কথামতই সেসব গ কেটে-ছেঁটে তুলে ফেলি। আমি যে তাঁর আজ্ঞাবহ। তাঁর আদেশে তো আমি তোমার ছেলের জীবন-ফুল তুলতে এসেছি।

আমার ছেলে কিরিয়ে দাঁও বলেই মা পালনের গাছের ফুলগুলো আঁকড়ে ধরলেন। আমার ছেলেকে কিরিয়ে দাঁও বলছি। দাঁ

নাও! দেবে না? না দিলে কিছ আমি এই ফুলগুলো ছিঁড়ে
কুটি-কুটি করে ফেলবো বলছি—বললেন মা।

সমরাজ বললেন—দাঁড়াও। হাত দিও না। আচ্ছা, এইমাত্র
তুমি না বললে যে তুমি ছেলেহারা শোকাক্ত মা। সম্ভানের জন্মে
সব কিছু করতে পারো। সবখানে যেতে পারো। আর মা হয়ে
তুমি অল্প ছেলেদের জীবন-ফুল তুলতে চাইছো? মা হয়ে তুমি
এ কাজ করতে চাও। তোমার নিজের স্বার্থ রাখতে গিয়ে শত
সহস্র মায়ের মনে সম্ভান হারানোর কষ্ট দেবে? সম্ভান হারানোর
কষ্ট তুমি এখনও পাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে বাছি, তুমি মা হয়ে
কি করে ও-কথা মুখে আনলে। তুমি জানো, যেটি ফুল এক
একটি ছেলের জীবন। যেটিকে তুলবে, সেইটিই মারা যাবে।

না, না, না। আমি কোন ফুলই ছিঁড়বো না। না, না, না।
আমি কাউকে আর আমার মতো সম্ভান হারানোর শোক
দেবো না। আমি জানি সে কষ্ট, সে দুঃখ, সে শোক।
না, না, না। আমি আর কিছু করবো না, বলেই মা খুব
কাঁদতে লাগলেন।

সমরাজ বললেন—এই নাও তোমার চোখ দুটো। হৃদ পেরিয়ে
আসবার সময় ও-দুটো তুলে এনেছি। চোখ দুটো পরে নাও,
তাহলে সব দেখতে পাবে। তোমায় সব কিছুই দেখিয়ে দিই।

মা এবাবে সব কিছুই বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। পারবেনই
তো। হৃদের স্বচ্ছ নীল জলে ধোয়া চোখ কি না?

এবাবে সমরাজ মাকে নিয়ে এলেন একটা কুয়োর ধারে, আর
বললেন—চেরে দেখো কুয়োর ভেতর।

মা কুয়োর ভেতর দেখলেন—জলে ভাসছে সুন্দর ফুল। দেখতে
দেখতে ফুল দুটো বড় হয়ে উঠলো। একটি ফুলকে ঘিরে দেখা দিল
—সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, আনন্দ আর শান্তি। আরেকটি ফুলকে ঘিরে
দেখা দিল—অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, দুঃখ আর
অশান্তি।

মা বললেন—দু'টি ফুলের দু' রকম জীবনলিপি কেন?

সমরাজ বললেন—সবই ভগবানের ইচ্ছে। তোমরা তো
জানো, যে তাঁর ইচ্ছের ব্যতিরেকে কোন কিছু হবার জো নেই।
তুমি যে ফুলটি তুলতে বাছিলে সেইটিই হোল ঐশ্বর্যবান, সুখী
ফুলটি। আর আমি যেটি তুলতে বাছলাম সেটি হচ্ছে ঐ দুঃখ
দারিদ্র্য, রোগ, শোকভরা ফুলটি।

মা বললেন—এ দু'টো ফুলের ভেতর কি আমার ছেলের জীবন
আছে?

সমরাজ বললেন—হ্যাঁ। ঐ দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ শোক ভরা
ফুলটিই হচ্ছে তোমার ছেলের। তোমার ছেলেকে আজীবন ঐ
রোগ, শোক, ভয় ভয় ভয় হতে হবে। বড় পেতে হবে। তুমি মা হয়ে
কি তাই চাও?

মা বললেন—না! না! তা' আমি চাই না। আমি চাই
ওর সুখ, স্বাস্থ্য ও শান্তি।

সমরাজ বললেন—তাই তো! তোমার ছেলেকে আমি স্বর্গরাজ্যে
নিয়ে যেতে চাই। সেখানে তাকে সপ্নে দেবো ভগবানের পায়ে।
সেখানে শুধু শান্তি! শান্তি! শান্তি!

মা নিজেকে শান্ত ও সবত করে বললেন—হ্যাঁ। হ্যাঁ তাকে

তুমি স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যাও। আমি তাকে পৃথিবীতে কিসের মতো
চাই না। সেখানে শুধু রোগ, শোক, ভয়, দুঃখ আর অশান্তি।

অনুবাদ—দেবশীষ চট্টোপাধ্যায়

ছোটদের বায়না

শশীকাজীবন চক্রবর্তী

সারাদিনে ধরাধরা চকিচকি বটা,
কেন থাকে গোনা গাঁথা বল দেখি ভণ্টা?
হুঁ-চারটে বটা কি, কম করা যায় না,
ভগবান গুবুবেনা—ছোটদের বায়না?

সকাল সাতটা থেকে দশটা না থাকলে?
থাকতে হয় কি বসে বই খাতা আগলে?
তেমনি রাত্রিবেলা ছ'টা থেকে নয়টা,
নাই যদি থাকে তবে করি কার ভয়টা?

এই ছটা বটাই কী যে হয় কষ্ট,
খুলে আর বলব কি, সোজাখুঁজি পষ্ট,
গুনলে বুড়োরা ঠিক, মেরে দেবে গাঁট,
একুণি, গুড়োদের গুণে গুণে আটটা।

পড়তে বসেই কত, নদী বর চক্রে,
পড়ে কি সেদব গুরুজ্ঞানের লক্ষ্যে।
সুত্র থেকে, তাঁরা বন তুলু ছুঁটি কুঁচকে,
হুক হুক বুকে কাঁদি আমরা যে পুঁচকে।

অথচ দিনেরা কিছু হলে কম লড়া,
সরস্বতী-ক বেশ দেখাতুম, বড়া।
পড়ার বটাগুলো হলে নিশ্চিহ্ন,
থাকতো কি কথবার, খেলাধুলো ডিহ্ন।

গুনেছি ত মন দিয়ে, পারে যদি ডাক্তার,
ভগবান পারেন না চূপ করে থাকতে,
আর না বে, সকাই, বলে দেখি আর না,
বিধাতা শোনেন কিনা, ছোটদের বায়না?

পশু-পাখীর ঘুম

মিহিরকুমার ভট্টাচার্য

তোমরা বোধহয় জান যে, প্রত্যেক জীবের বিশ্রামের জন্য
ঘুমের প্রয়োজন। কারো ঘুম বেশী আবার কারো ঘুম
কম। বিভিন্ন প্রাণীর ঘুমের মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এমন
অনেক প্রাণী আছে যারা একটানা সুদীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে কাটায়।
সেজন্য এসব প্রাণীদের কুস্তকর্ষ বল্য যেতে পারে। তবে এর
বহুরের সব সময়ই ঘুমার না কেবল শীতকালটা ঘুমিয়ে কাটাও।

সেজন্য এদের এই ঘুমকে বলা হয় শীত-ঘুম। এবার তোমাদিকে কয়েকটি প্রাণীর শীত-ঘুমের কথা বলছি।

ভালুকের কথা তো তোমরা জান। সারা শীতের সময় এদের দেখা পাওয়া যায় কদাচিৎ। যে বার আন্ডানার লম্বা ঘুম দেয়। তখন এরা প্রায় চার-পাঁচ মিনিট বাদ বাদ একবার করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। যেই এদের শীত-ঘুম ভেঙ্গে যায় তখন এরা কয়েক ঘণ্টা বা দু-একদিনের জন্য বনবাদাড়ে একটু বেড়িয়ে আসে। সাদা ভালুকদের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। এদের মধ্যে বারা সন্ধান-সন্ধান ত্যারাই কেবল শীতের সময় লম্বা ঘুম দেয়—প্রায় তিন চার মাস। আরও মজার কথা কি জান? ভাবী মায়েরা ঘুমাবার সময়ই বাচ্চা প্রসব করে—এবং বাচ্চাসহই ঘুমিয়ে থাকে। ক্রইন নামক তেলী ভালুকবাও শীতের আভাস পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওহার হুকে লম্বা ঘুমের আয়োজনাদি আরম্ভ করে দেয়।

ক্রাউশ সুইবেল (একজাতের কাঠবিড়ালী) শীত-ঘুমে—মড়ার মত পড়ে থাকে তার বাসায়—তখন তার শারীরিক কোন অমুভূতিই থাকেনা। যেই শীত চলে যায়—তখন আবার গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠে নিজের কাজ আরম্ভ করে দেয়। উড-চাক নামক কাঠবিড়ালী শীতের সময় একটানা প্রায় ছ'মাস ঘুম দেয়। ঘুমাবার সময় এদের দেহে কোন চৈতন্য থাকেনা। ওদের খোঁচা দিলে বা কানের কাছে খুব জোরে শব্দ করলেও ঘুম ভাঙেনা। এ থেকেই বুঝতে পারিছো এদের ঘুম কী গভীর। ঘুমাবার জন্য এরা বাসায় (সুড়ঙ্গ) মধ্যে লতা, খাস, পাতা দিয়ে একটা আরামদায়ক বিছানা তৈরী করে এবং বাসায় মুখ আবর্জনা দিয়ে বন্ধ করে দেয় যাতে কোন শত্রু বাসায় ঢুকতে না পারে। মাথাটাকে পিছনের পা-ছটোর মধ্যে রেখে দিবি ঘুম দেয়। ঘুমের সময় এদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি প্রায় থাকেই না এবং দেহের তাপমাত্রাও খুব কম হয়।

শাহুক তোমাদের অনেকেই পরিচিত প্রাণী। ডাকায় যেসব শাহুক থাকে তাদের ঘুমও বেশ লম্বা। এদের লম্বা ঘুম শুধু একটা বিশেষকর ঘটনার কথা জানা গেছে। মিশরের মরুভূমি অঞ্চলে একজাতের অদ্ভুত শাহুক দেখা যায়। এদেরই এক জাততাই শীত ঘুমের ইতিহাসে একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ১৮৪৬ সালের মার্চমাসে বৃষ্টিশ বাতাসে এজাতের একটি শাহুক সংগৃহীত হয়। শাহুকটির দেহে কোন প্রাণের লক্ষণ ছিল না। সুরতরাং কর্মগারীরা শাহুকটিকে মৃত মনে করে রেখে দেন। তার পর চার বছর বাদে ১৮৫০ সালের মার্চ মাসে দেখা গেল যে, শাহুকটির শরীর থেকে আঠালো রস নিঃসৃত হচ্ছে। তখন জলে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেল যে, সে চলা করা আরম্ভ করেছে, 'এই চার বছর সে ঘুমিয়েছিল।

প্রায় সব জাতের শাহুকই শীতকালে লম্বা ঘুম দেয়। তখন এরা মাটির নীচে বা পাথরের কাটলে আন্ডানা পাড়ে যাতে শত্রুর নজরে না পড়ে। আর ঘুমাবার সময় এরা দেহের শক্ত আবরণী চাকনাটা বন্ধ করে রাখে।

লম্বা ঘুমের জন্য আমেরিকার ডরমাউসও (একজাতের ইঁদুর) বিখ্যাত। করানী ভাবার 'ডরমার' শব্দের অর্থ হলো—ঘুমানো। ডরমাউস প্রায় ছ'মাস শীত-ঘুমে কাটিয়ে দেয়। তখন এদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হয় খুব বৃহৎ এবং শরীরটা খুব শক্ত হয়ে যায় ও

দেহের উত্তাপও খুব কম থাকে। শীত চলে গেলেই এরা আবার স্বাভাবিক জীবন আরম্ভ করে।

হেজ-হগ নামক একজাতের অদ্ভুত জন্তু আছে। এদের প্রধান খাদ্যই হলো পোকামাকড়। হেজ-হগও শীতকালে লম্বা ঘুম দেয়। এদের মধ্যে শীত-ঘুমের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। বখন তখন এদের শীত-ঘুম ভেঙ্গে যায়। তবে অধিকাংশ হেজ-হগই বসন্ত ঋতু না আসা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়।

মশার শীত-ঘুমও বিখ্যাত। অধিকাংশ মশাই শীতকালে ঘুমিয়ে কাটায়। দেখা গেছে কোন কোন জাতের প্লীমশা প্রায় দুইমাস ঘুমিয়ে কাটায়—এই সময় এরা কোন খাদ্য না খেয়েই থাকতে পারে।

আফ্রিকার লাং-কিসের শীত-ঘুমও উল্লেখযোগ্য এবং এদের ঘুমাবার কারণটিও বিচিত্র, লাং-কিস জলের তলায় পানির মধ্যে সতেজ-আঠারো ইঞ্চির মত গভীর একটা গর্ত তৈরী করে তার মধ্যে লম্বা ঘুম দেয় এবং লেজটা বাঁকিয়ে মাথার কাছে নিয়ে আসে। সারা শরীরটা একরকম চটচটে আঠালো রস (এদের শরীর থেকেই রসটা নিঃসৃত হয়) দিয়ে মেখে রাখে। এর উদ্দেশ্য বোধ হয়—শত্রু যাতে চট করে তার সন্ধান না পারে। ঘুমের সময় এদের শরীরে জীবনের কোন বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না।

পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলভূক্ত অঞ্চলের কার্পজাতীয় বড় বড় মাছও শীত-ঘুম দেয়। ঘুমাবার আগে এরা জলের তলায় কাদার মধ্যে গর্ত খুঁড়ে নিয়ে—তার মধ্যে ঘুম দেয়। কোন কোন কার্পজাতীয় মাছের দৈহিক উত্তাপ হিমাত্বের নীচে নেমে যায়—এদের শীত-ঘুমের সময়। মার্চন ঠাণ্ডার এদের শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধই থাকে। দেহে উত্তাপ কিংবে এলে আবার এরা চালা হয়ে ওঠে।

এছাড়া বাছড়, ব্যাঙার, কঁকড়া-বিছা, মাকড়সা, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাঙ, গিরগিটি, নিউট প্রভৃতি প্রাণীরাও সাধারণতঃ শীতকালে লম্বা ঘুম দেয়। খাওয়ারাও না করে এরকম লম্বা ঘুম-এর ফলে কিছু এদের দৈহিক পুষ্টির ব্যাঘাত হয় না। তার কারণ হলো এদের শরীরে একরকম চর্বিজাতীয় পদার্থ জমা থাকে এবং সেই পদার্থের সাহায্যেই শীত-ঘুমের সময় এদের শারীরিক পুষ্টি সাধিত হয়।

মুর্শিদাবাদের নাম

বাসুদেব পাল

আজকের মুর্শিদাবাদকে এককালে কেউ বলতো,— 'মুখসুসাবাদ' আবার কেউ বলতো,— 'মুখসুসাবাদ'। সে যে কতদিনের আখ্যান ইতিহাসের হারাপথে তার সঠিক সন্ধান মেলে না। কিংবদন্তীর কথা,—এই মুখসুসাবাদের উৎপত্তি নাকি জর্নৈক বৈকবকে কেন্দ্র করে। নাম তাঁর মধুসুদন দাস। বনকৌলিন্ডের বলে দশদিগের দশজন একডাকেই চিনতো তাঁকে। পরম বৈকব মধুসুদন কালবাণন করতেন নেহাৎ সাধারণভাবে। সামান্য এক আখড়াতেই পরম সুখে দিন কাটতো তাঁর। এহেন বৈকবের এক মোটা অঙ্কের অর্থের দ্বারাই একদা মুখসুসাবাদ শহরের পত্তন হয় এবং মধুসুদনেরই নামানুসারে উক্ত নয়া নগরের নামকরণ করা হয় 'মুখসুসাবাদ'। অপর এক জনজাতিতে পাঁওরা বারঃ মধুসুদন নাকি নানকপদী বাহিক সন্ন্যাসী ছিলেন। একবার গৌড়েশ্বর

হুশেনশাহের নিদারুণ পীড়া হয়। সংবাদ পেয়ে মধুসূদন সেই পীড়া আরোগ্যের উদ্দেশ্যে গৌড়ে যাত্রা করেন এবং অনতিকালের মধ্যেই তাঁর অপূর্ণ চিকিৎসা-বিভার গৌড়েশ্বর সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে ওঠেন। এ-হেন বৈজ্ঞানিক বা পুরস্কার হিসাবে হুশেনশাহ অত্যন্ত প্রভূত অর্থ দান করেন। প্রবাদ মতে, এই অর্থই নাকি মুখসুসাবাদ পত্তনের প্রকৃত ইকন। পৃথিবী পাতায় কিংবদন্তীর কথাও নেহাৎ কম নেই। এও এক প্রবাদ বা কিংবদন্তী, যথা, মুখসুস আলি খাঁ নামে একজন মস্ত ধনী ব্যবসায়ী মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে কাশীমবাজারের সন্নিকটে চূনাখালিতে বাস করতেন এবং তাঁর নামানুসারেই নাকি চূনাখালির উত্তরাংশের নামকরণ হয় মুখসুসাবাদ।

'আকবর নামা'র এক স্থানে এই বাঙালারই শাসনকর্তা সৈয়দ খাঁর ভাই মুখসুস খাঁর নাম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের অভিমতে; এই মুখসুস খাঁ চূনাখালিতে কোজদাররূপে অবস্থানকালে চূনাখালির উত্তরাংশ 'মুখসুসাবাদ' নামে পরিচিত হয়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে) টাটানিয়ার এইক্ষেত্রে উপনীত হ'ন এবং এই সব স্থানগুলোকে তিনি 'অতি মনোরম' বলেই অভিহিত করেন। ইনিই এর নাম নির্দেশ করেছেন 'মদেস্তুবাজারকী'। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে রহিম খাঁ ও শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় এই মুখসুসাবাদ লুণ্ঠিত হয়। কাশীমবাজারের বনিকগণ বিদ্রোহীদের খে এক চুক্তি দ্বারা এই আসন্ন বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। লাহোর চিত্রশালার রক্ষিত (১৬১৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত) আওরঙ্গজেবের আমলের একটি টাকার প্রতিকৃতি দৃষ্টে অবগত হওয়া য় যে, ঐ সময়ে মুখসুসাবাদে মুঘলদের এক টাকশাল ছিল।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার রাজধানী ছিল হাকীমনগর বা ঢাকায়। ঐ সময়ে আওরঙ্গজেবের পৌত্র জিম উনশান বাংলার সুবাদার ছিলেন আর মুর্শিদকুলী খাঁ ১০১ খৃষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হ'ন। অকস্মাৎ জিম উনশান এবং মুর্শিদকুলী খাঁর মধ্যে রাজত্ব সংক্রান্তে গভীর ঝামালিভের সৃষ্টি হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার দখলে অবস্থিত মুখসুসাবাদেই তাঁর সমস্ত দপ্তর স্থানান্তরিত হ'ন। তাঁর সাথে জগৎ শেঠের পূর্বপুরুষ মানিকচাঁদ এবং নারায়ণ কানন গো মুখসুসাবাদে উপনীত হ'ন।

আওরঙ্গজেবের দেহাবসানের পর মুঘলদের মধ্যে প্রচণ্ড গৃহবিবাদ হয়। মুঘলদের এহেন গৃহ-দ্বন্দ্বের সুযোগে মুর্শিদকুলী খাঁ প্রভূত বিস্তার করতে সক্ষম হ'ন এবং ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শিয়ারের সময়ে বাংলার নবাবী পদেও অধিষ্ঠিত হ'ন। ঐ মুখসুসাবাদের নাম পরিবর্তিত হয়ে মুর্শিদাবাদ নামে পরিণত হ'ল। মুর্শিদকুলী খাঁ খাঁটি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে প্রাচীরপিতা তাঁকে ইরানদেশীয় এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় করেন। উক্ত বনিক তাঁকে ইম্পাহানে নিয়ে গিয়ে পুত্রের জায় পালন করেন এবং তাঁকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত নামকরণ করেন—মহম্মদ হাদী। পরিণত বয়সে মহম্মদ বেহারের দেওয়ানের অধীনে সামান্য এক চাকুরী গ্রহণ করেন। কিরৎকালের মধ্যে উক্ত কার্যে অপূর্ণ দক্ষতা প্রদর্শন করে হায়দারাবাদের দেওয়ানী পদ লাভ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবই

তাঁকে এহেন সম্মানে ভূষিত করেন। অতঃপর মহম্মদ হাদী বাংলার দেওয়ানীপদ গ্রহণ করে কারতলব খাঁ আখ্যা লাভ করে ঢাকায় গমন করেন। ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত স্থানেই খাঁর কর্মদক্ষতার গুণে মহম্মদ হাদী বা কারতলব খাঁ পুনরায় বাদশাহ কর্তৃক 'মুর্শিদকুলী মতিমন্টলমুক আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নাসিরী জঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত হ'ন। সেই থেকেই তিনি 'মুর্শিদকুলী খাঁ' এই নামে পরিচিত।

রহস্যপুরীর রত্নোদ্ধার

(প্রাভুক্তকার অফ লে ডেরী)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

৩

আমরা যাত্রা করলুম ভোর থাকতে-থাকতে। সামান্য জলপথ অতিক্রম করতে-না-করতে চারিদিক ঝলমল করে উঠল। মাথার উপর প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্যকরোজ্জ্বল নীলাকাশ আর নীচে কাকচক্রুর মত জলের উপর দিয়ে আমরা হেল-হুলে চলতে লাগলুম। বজ্রার ছাউনির মধ্যে বসে থাকার সময় সেটা নয়। কাজেই আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে পাটাতনের উপর বেতের চেয়ারে বসে সিগারেট খেতে-খেতে গল্প করতে লাগলুম।

এলিস আমাদের সঙ্গী দাঁড়ি-মাঝি ও এই সবলকার লোকদের খোলা শরীরের দিকে লক্ষ্য করে বললে, আচ্ছা গুনি তো এরা ভাল খেতে পায় না, অথচ এদের এমন সুন্দর স্বাস্থ্য হয় কি করে?

উত্তরে আমি বললুম, মুক্ত বাতাস আর বিস্তৃত জল—প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সম্পদ এই দুটি। জল-বাতাস শহরের পরিবেশে দূষিত হয় বলেই সাধারণত আমাদের স্বাস্থ্য ধারাপ হয়ে যায়। তার উপর খাও তো আছেই। তাছাড়া প্রত্যেক জাতির বংশাধিকারিক ধারাও আছে একটা।

গল্প করতে করতে বেলা বাড়তে লাগল। বজ্রার পাটাতনের উপরেই আমরা বসে প্রাতরাশ সাবলুম। সঙ্গের নৌকাগুলি সমস্ত বজ্রা এগুতে লাগল ঘণ্টায় প্রায় ছ'সাত মাইল করে। শহরতলী ছাড়িয়ে ক্রমশঃ আমরা প্রামের পরিবেশে এসে পড়লুম। ছ'পাড়ের দৃশ্যও গেল বললে। কোলাহল নেই, কলের চিম্নীর বিবাক্ত ধোঁয়া নেই, নির্মল আকাশ। মতদূর চোখ যায় বিস্তৃত শান্ত পল্লীজীবন দৃশ্য—সবুজের পর সবুজের বিবিধ সমারোহ। বোড়-খায়, ক্ষেত-খায় আর চাবীদের নিজের হাতে গড়া ডালপালা দিয়ে তৈরি ছোট ছোট কুঁড়ে। বাঁকে বাঁকে পাখীরা অসঙ্কোচে এখানে উড়ে বেড়াচ্ছে, গল্প-বাতুর চরে বেড়াচ্ছে মাঠে-বাটে। মধ্যে মধ্যে ভেড়ার গাল নাচানাটি কবছে মনের আনন্দে। হিংস্র জীবজন্তুর সমাগম এখানে যে নেই তা এদের দেখলেই বেশ বোঝা যায়। মধ্যে মধ্যে ছ'চারজন কোঁপীনধারী বুনো মাল্লবকেও বোঝা-কোঝা করতে দেখা যাচ্ছে। কোথাও তীর-ধুক নিয়ে শিকারের সন্ধানে কেউ ওত পেতে বসে আছে, আবার কেউ বা বর্ণা হাতে ধুনীর মত দাঁড়িয়ে

আছে নদীর পাড়ে আমাদের দিকে লক্ষ্য করে। এরা আমাদের লোকজনদেরই সমপোক্তীয়।

দৃষ্টির এই পরিবর্তন ইতিমধ্যেই শহরে মেবে এলিসের মনে শিহরণ এনে দিয়েছে। অপলক দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই বিচিত্র শোভার মধ্যে ডুব দিয়েছে সে। নদীর জলের বড় কিছুদূর অন্তর মধ্যে মধ্যে বদলাচ্ছে বহুধরনের মত। কোথাও জল কাঁচের মত স্বচ্ছ, কোথাও ঘোলা, আবার কোথাও বা গাঢ় কালো। এই নদীতে শ্রোত কিছ সর্বত্রই ভয়াবহ প্রধর। কোথাও-কোথাও আবার বাঁকের মুখে শ্রোতের জল বাধা পেয়ে পাক খাচ্ছে। নদীর এই জায়গাগুলি একটু ভয়ের; এখানে খুব সাবধানে দেখে-শুনে নৌকা চালাতে হয়।

এবার পল্লীর দৃশ্য ছাড়িয়ে, ছোট-বড় উন্মুক্ত প্রান্তর, জলাভূমি অতিক্রম করতে করতে আমরা ক্রমশঃ জঙ্গলের সম্মুখীন হতে লাগলুম। হুঁপারেই এখন নানা ধরনের ছোটবড় গাছ নজরে পড়তে লাগল। আর ঐ সব গাছদের কোন-কোনটার গায়ে লতাগুহ্য পাক খেয়ে উপবে উঠেছে। অল্পত সব পরগাছা বিচিত্র পত্রপল্লব আর ফুল নিয়ে উদ্ভিদ জগতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে এই নিভৃতে। আমেরিকায় থাকতে শুনেছিলুম, এখানে নাকি বহু মূল্যবান অর্কিডের সন্ধান পাওয়া যায়।

নদীর পাড়ে বড় বড় গাছ থেকে মোটা কাছির মত ঝরি নেমেছে। ডালপালাও কোথাও-কোথাও ঝুঁকে পড়েছে জলের উপর। বতই জঙ্গলের মধ্যে আমরা প্রবেশ করছি, নদীর হুঁপাড় ততই ক্রমশঃ আমাদের কাছে সরে আসছে—সন্নিহিত হয়ে আসছে তার প্রকার! এবং এই চওড়া বতই কমে আসছে, জলে টানের তীব্রতা ততই বাড়ে বেড়ে।

দাঁড়ি-মাঝিদের উপর এখন জোর পড়ছে অনেক বেশী। তারা প্রাণপণে দাঁড় টেনে চলেছে বটে, কিন্তু এর আগে যে গতিতে নৌকাগুলি এগিয়ে চলেছিল, এখন সে গতি প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে এঁয়াকর্ষ্যাকের মাথায় নৌকাগুলিকে সামলাতে এখন বেশ বেগ পেতে হচ্ছে সবাইকে। হুঁপাশের ঘন বনের মধ্যে আকাশের নীলিমা তখন প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে—চারিদিক থেকেই ঘন ছেয়ে আসছে গাঢ় তমিষ্র। পত্র-পল্লবিত বিবিধ গাছের শাখা-প্রশাখার স্তম্ভের ভিতর দিয়ে আমাদের নৌকাগুলি এগিয়ে চলতে লাগল উজান ঠেলে। বিরুদ্ধ-শ্রোতের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করে দাঁড়ি-মাঝিরা যেম্নে নেয়ে উঠেছে সকলে। অত্যন্ত দ্রুত দাঁড় ফেলে চলেছে তারা। কিন্তু এই দাঁড় বশীকরণ তাদের আর ফেলতে হ'ল না, একটা বাঁকের মুখ অতি কষ্টে অতিক্রম করতেই ধরশ্রোতের গুরুগম্ভীর আওয়াজ ও উপর থেকে জল পড়ার মত প্রবল শব্দ আমাদের কানে আসতে লাগল। ক্রমশঃ নদীর চেহারা গেল বদলে। যেসব টুকরো টুকরো কেনা নদীর বুকে ইতস্ততঃ ভেসে বেড়াচ্ছিল, সেগুলি গাঢ় জমাট বেঁধে টানের সঙ্গে নৌকার গায়ে এসে ধাক্কা দিতে লাগল। সজিন অবস্থা! সারা নদীর জল তখন এই গাঢ় জমাট ফেনায় ঢাকা পড়ে গেছে। তাদের ঠেলে নৌকা নিয়ে দশ হাতও আর এগুনো অসম্ভব হয়ে উঠল। এ অবস্থায় এগুতে গেলে বিশদ বাড়বে বই কমবে না ভেবে আমরা সেদিন আর না এগিয়ে, নৌকাগুলিকে নিয়ে পাড়ে জেড়াবার আয়োজন করলুম।

নদী এখানে খুব চওড়া না হলেও, শ্রোতের তীব্রতায় গাঢ় কেন ঠেলে তীরে পৌঁছতে আমাদের বেশ হিমসিম খেয়ে যেতে হ'ল নদীর পাড়ে কয়েকটা মোটা গাছের সঙ্গে কোন রকমে কাছি দি়ে নৌকাগুলিকে আমরা বেঁধে ফেললুম।

তীরের সর্বত্রই এখানে জঙ্গল। হুঁপাশে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যদিও আমরা চলেছিলুম, তবু এই জায়গাটা অপেক্ষাকৃত কাঁকা বলো মনে হ'ল।

উপস্থিত শ্রোতের ভয়াবহ টান ও কেনার চাপ না কমা পর্য্য এখানেই আমাদের তাঁবু ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সজের লোকের কাঠ-কাঠরা, ঝোলা-ঝুলি, তাঁবু, খুঁটি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নাবিয়ে নদীর পাড়েই উন্মুক্ত জায়গায় রাজিবাসের আয়োজন করল খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হতে লাগল নৌকার মধ্যে। শ্রোতের বেগে নৌকাগুলি এ-ওর গায়ে অনবরত ধাক্কা খাচ্ছিল আর ঘুরছিল তা ছাড়া ফেনাসমেত ঢেউগুলি এসে উপছে পড়তে লাগল নৌকা পাটাতনের উপর। বজ্রার উপর থেকে নদীর পাড়ে 'গ্যা ওয়ের' মত কাঠের সিঁড়ি লাগিয়ে, আমিও এলিস ডাঙায় নে এসে আশ্রয় নিলুম তাঁবুর মধ্যে।

হরন্ত নদীর এই উন্মুক্ত শ্রোত রাজে আরও কি ভয়াবহ আকা ধারণ করবে তা আমাদের কারুরই জানা ছিল না বলে, ডাঙা তাঁবুতেই সে ব্যতী আশ্রয় নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে আমরা মনে করেছিলুম।

বেলা থাকতে থাকতেই জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া নামে কোন কোন ক্ষেত্রে ঘন গাছপালার আচ্ছাদন ভেদ করে সূর্যের আলো মাটির বুক স্পর্শ করতে পারে না। চিরদিনই এমনি অন্ধকারাচ্ছা হয়ে থাকে জঙ্গলের বহু জায়গা।

কিছুক্ষণ পূর্বেও নদীর বুকে পড়ন্ত সূর্যের রঙিন রশ্মি ছত্র ড় কেনার উপর পড়ে যে রংমশালের আলো ছড়াচ্ছিল, নৌকার উপরে যার তাপ আমরা ধানিকটা অল্পভব করছিলুম, নদীর পাড়ে নে তার সবটুকুই ঘন লোপ পেয়ে গেল। যদিও বেলা তখন প্রা পড়া পড়া, তবুও চারটে না বাজতে-না-বাজতেই এই ধরনের অন্ধক আমাদের আশ্চর্য্য করে দিল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘূট ঘূ অন্ধকারে যে চতুর্দিক ঢেকে ফেলবে তা বুঝতে মোটেই দেরি হ'ল না

দলের লোকেরা বিশেষ করে কারিব ইণ্ডিয়ানরা (সাধারণতঃ এ দেশীয় অধিবাসীদের ইণ্ডিয়ানই বলা হয়ে থাকে) ইতি মধ্যেই মশা আলতে শুরু করে দিল। বন-জঙ্গলে হিংস্র জীব জন্তদের ভয় দেখাতে বা তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্তে এই আণ্ডনই হচ্ছে সব চে ভাল প্রতিরোধক।

আমাদের প্রধান যে 'গাইড' তার নাম দিয়েছিলুম আর টাইগার। খুব শক্তিশালী ও বিজ্ঞ পুরুষ সে। এ পথের অর্থে কিছুই তার জানা। এখানে ক্যাম্প ফেলার পর টাইগার বলা রাজের দিকে রক্তপায়ী এক প্রকার বাছড়ের ভয়ই নাকি এখানে চেয়ে বেশী। এই বাছড়ের পরিচয় আগে থেকেই আমি জানতু অন্ধকার রাজে তাদের তাঁটার মত চোখগুলো জ্বলতে থাকে, এই মারাত্মক ধরনের সন্ধানী চোখ দিয়ে তারা জীব জন্ত ও ম খুঁজে বেড়ায়। কোথাও কোন ঘুমন্ত পত বা মাছুরের শরীরের

খালা অংশ পেলেই, নিঃসাড়ে তার ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ অথচ সূক্ষ্ম দাত অনাবৃত জায়গায় ধীরে ধীরে চালিয়ে দিয়ে শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে খেয়ে নেয়। হঠাৎ মাছুব যখন বুঝতে পারে, তখন তার উত্থান শক্তি প্রায় রহিত হয়ে যায়, এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই মারাত্মক জীবটির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্তে, এখানে আমাদের তাঁবুতে এক প্রকার মজবুত তারের জালে বেশ ক'রে ঢাকা দিয়েছিলুম। বাকী আমাদের নিজস্ব রক্ষীয়া ক্যান্টিন ও চট্টের খেলের তাদের সর্বত্র ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করেছিল।

সারা দিনের ক্লাস্তিতে চোখের পাতা বদিও ভারী হয়ে এসেছিল, তবু এই নতুন জায়গায় ভয়-ভয় মনে ঘুম আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল।

পরের দিন ঘুম ডাঙতেও বেশ বেলা হয়ে গেল আমাদের। বহুটুকু ঘুম হয়েছিল, তাতেই শরীরটা বেশ ঝর ঝরে মনে হ'ল। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে লোকজনদের মনটা আজ বেশ প্রফুল্ল। তাঁবুর মধ্যেই আমরা প্রাতরাশ সারলুম। সে দিনটা ছিল আবার এলিসের জন্মদিন। প্রতিবাবেই এই জন্মদিনে আমরা প্রচুর আমোদ মাহ্লাদ করি, কিন্তু এখানে তার উপায় কোথা! তাকে কি উপহার দেয়া যায়, আমি তাই ভাবতে লাগলুম। হঠাৎ তাঁবু থেকে বাইরে বকতেই অনতিদূরে পত্রপল্লবহীন শুক একটি গাছের গায়ে একটি গাছের গায়ে এক খোকা বিচিত্র রঙের অর্কিড আমার নজরে পড়ল। ফুলের চেয়ে পবিত্র জিনিস যেমন আর কিছুই নেই, তেমনি আমার কাছে এর চেয়ে মূল্যবান জিনিসও নেই আর কিছু।

আমি তৎক্ষণাৎ আমাদের গাইড ও দোভাষী বানধাইকে ডেকে বললুম, আজ এলিসের জন্মদিন শুকে কিছু অর্কিড দিতে চাই ঐ গাছটা থেকে ফুলগুলো সংগ্রহ করে আনো দেখি। জন্মদিনের কথায় বানধাই উল্লসিত হয়ে আরও কয়েক জনকে সঙ্গে করে তখুনি ঐ ফুটন্ত অর্কিডগুলি এনে হাজির করল আমার কাছে।

অর্কিড দেখে এলিস তো মহা খুশি। সত্যিই এমন বড় ফুল, এমন রঙের বিচিত্র রূপ এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে করতেই পারলুম না।

সেগুলিকে নিয়ে সম্বন্ধে ছোট একটি ভাসের মধ্যে রেখে দিল এলিস, আর কয়েকটি বেছে বেছে নিজের জামায় পরে গর্ভবোধ করতে লাগল। অরণ্যপুরীর মধ্যে প্রকৃষ্টি এই দান সেদিন এলিসের জন্মদিনকে সার্থক ক'রে আমাদের দু'জনকেই প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল।

সেদিন একটু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একদল বগা আকাওরার জাতির সঙ্গে দেখা হ'ল আমাদের। এরা বাঘাবরের দল। বন থেকে বনাঙ্কুরে শিকার ক'রে, কাঠ পাথর কুড়িয়ে যুরে বেড়ায় এরা। মাঝে মাঝে, হু'এক বছর অন্তর শহরে গিয়ে বস্ত্র জীবজন্তুর মাল, রকমারি পাথর ও শুকনো অর্কিড বিক্রি করে আসে। স্থানিক শহরের বাজারে মেমেদের টুপিতে লাগাবার জন্তে শুকনো অর্কিডের বেশ চাহিদা আছে।

গত রাতে এই বনের কিছু দূরেই ছিল ঐ আকাওরার। শিকারের মধ্যে সেখান থেকেই আমাদের তাঁবুর আশপাশের আগুন ধরবে নজরে পড়ে, তাই ভোরের দিকেই আমাদের দেখতে ওরা এসে গিয়েছিল।

আকাওরাদের প্রকৃতি কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ। ওরা যখন অবতারাৎ বংশধর কিনা কে জানে! দেখতে যেমন বেঁটে, গায়ের বড় তেমনি কালো আবলুস কাঠের মত। এছাড়া নাক-মুখও ভারী বিস্তীর্ণ, বদখত। এঁদের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা যিনি, তিনি হচ্ছেন চারকুট পাঁচ ইঞ্চি। বাকী সবাই সাড়ে তিন ফুট চার ফুটের মধ্যে। পরনে তাদের কিছু নেই বললেই হয়—একেবারে বেন 'ছুড়ি' কলোনীর লোক! মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই সামান্য ইঞ্চি-তিনেক একটু লজ্জাবস্ত্র কোমরে মোটা দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে কেবল। কেউ কেউ আবার গাছের ছাল বা শুক ঘাসের শুকু দিয়েও লজ্জা নিবারণ করেছে।

এলিস এদের দেখে কিছুতেই তার হাসি চাপতে পারেনি না। আমি তাদের কাছে ডেকে বসলাম এবং তাদের দলপতিকে একটা মোটা সিগার খেতে দিলাম। ধূমপানে এরা কিন্তু বেশ অভ্যস্ত। কি করে, কোথা থেকে এই অভ্যাস যে এরা আরম্ভ করেছে তা ধরবার উপায় নেই। বন থেকে সংগ্রহ করা এক শুকনো পাতা পাকিয়ে, চকমকির আগুন জালিয়ে সিগারের মত সেগুলিকে তারা ধায়। আমার কাছ থেকে সিগার পেয়ে ওদের দলপতি ভীষণ উৎসাহিত হয়ে উঠল। তারপর আমার দেওয়া সিগারে হস-হাস বয়েকটা টান মেরে, ধোঁয়া ছেড়ে, অস্ত্রাস্ত্রদের প্রসাদ দিল। সিগার খেয়েই হোক বা আমাদের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতির জন্তেই হোক, সে একটা ছোট মোড়কের ভিতর থেকে একটা পাথর বার ক'রে সেটা আমাকে নিতে অনুরোধ করলে। এ ধরণের পাথর এর আগে কখনো আমার চোখে পড়েনি। অত্যন্ত স্বচ্ছ ও শুভ্রবর্ণের সেই পাথরের স্তেতর থেকে নানা রঙের জেমা ঠিকরে বেরচ্ছে—খানিকটা ওপেল পাথরের মত।

পকেট থেকে আই-গ্রাসটা বার করে সেটাকে ভাল করে দেখতে লাগলুম। জিনিসটা যে মূল্যবান কিছু হবে তাতে আর সন্দেহ রইল না। আমি পাথরটার বিনিময়ে তাকে রূপোর কয়েকটা মুদ্রা বার করে দিতে গেলাম, কিন্তু টাকার উপর তার বিশেষ লোভ নেই, সে খাবারদাবারের দিকে ইজিত করলে। তখন আমরা তাকে আমাদের যে সব টিন-ফুড ছিল, তার কয়েকটা টিন ও কিছু কুচি তাকে দিলুম। এক মুখ হেসে সে সেগুলি গ্রহণ করে দলের সবাইকে বিতরণ করে দিলে। তাদের মত বস্ত্র বর্কর জাতির মধ্যেও সকলে মিলে এই ভাগ-বাটোয়ারা করে খাওয়ার দৃষ্ট দেখে আমার মন খুশিতে জ্বরে গেল। এলিস হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ, ও দলপতি হবার উপযুক্তই বটে!

আমার মন ছিল কিন্তু তার ঐ পাথরের দিকে। আমি ইশারায় তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এ পাথর তুমি কোথা থেকে পেয়েছ?

আমাদের দোভাষী বানধাই হু'তিন রকম ভাষায় কথা বলতে পারে। সে তাকে আমার কথাগুলো নানাভাবে তার কানে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তার কথা সে যে ঠিক বুঝতে পাচ্ছে বলে মনে হল না। অবশ্য এ নিয়ে বহুক্ষণ বাগবিতণ্ডার পর বা বোঝা গেল, তা হচ্ছে: এই জঙ্গলের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে যে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছিল, তারই কাছাকাছি জায়গা থেকে সে সেটা সংগ্রহ করে। আজ ল দিয়ে সেট পাহাড়ের দিকটাও সে দেখিয়ে দিলে।

পরের দিন রাত্রিটাও আমাদের এইখানে কাটাতে হ'ল। তখনও কিঞ্চিৎ নদীর ক্রুদ্ধ গর্জন ধামেনি। তবে আশা করা গেল যে, নদীর প্রবল স্রোত পরের দিন একটু কমবে।

কিন্তু পরের দিন ভোর হবার আগেই লোকজনদের চীৎকারে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। এলিস ও আমি পেট্রোম্যাক্সের আলো ও রিভালবার হাতে নিয়ে ভাড়াভাড়ি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলুম।

ব্যাপারটা চীৎকার-শব্দ করার মতই। কালী আদমিদের মধ্যে পাঁচ-সাত জন একেবারে ধরাশায়ী। গভীর রাত্রে রক্তপায়ী বাহুড়ের রক্তশোষণে তারা ক'জন বিমিরে পড়েছে এবং যে সব জায়গার তারা দাঁত ফুটিয়েছিল, সেই সব কত্থান থেকে তখনও রক্ত বেরুচ্ছে চুইয়ে-চুইয়ে।

রাত্রে ঘুমের যোরে কখন পায়ের কাপড় একটু সরে গিছিল, সেই সময় ওত পেতে বসে থাকা ঐ পিশাচ-বাহুড়ের দল-নিঃসার্ভে গাছ থেকে নেমে এসে পায়ের অনাবৃত জায়গা থেকে রক্ত চুষতে আরম্ভ করে দেয়। এমন কার্যনা করে দাঁত ফোটায় তারা এবং ডানা দিয়ে এমন করে বাতাস করতে থাকে যে, ঘুমন্ত মানুষ কিছুই টের পায় না,—বতকণ না এই রক্ত-শোষণের ফলে তার দেহে বহুপার উদ্বেক হয়।

আমরা ভাড়াভাড়ি গিয়ে তাদের তুলে বনালুম এবং কত্থানগুলি বাতে বিমিরে না বার, সে জন্মে লোহার ছেঁকা দিয়ে পুড়িয়ে, একটি করে 'আয়রণ পিল' খাইয়ে দিলুম। 'আয়রণ পিল' শরীরে নতুন রক্তের সঞ্চয় করে এবং অন্নরূপের মধ্যেই দুর্বল মানুষকে চাঙ্গা করে তোলার পক্ষে অব্যর্থ ওষুধ। আগেকার দিনে প্রত্যেক শিকারী ও অভিযানকারী দলের সকলের সঙ্গেই এই 'আয়রণ পিল' থাকত।

আজ আমাদের যেমন করেই হোক এখান থেকে আস্তানা তুলতে হবে। শুধু পিশাচ-বাহুড়ের ভয়েই নয়, বৃথা সময়ও আমরা নষ্ট করতে চাই না। তাছাড়া শেষ রাত থেকেই নদীর কেনিল জলস্রোতের তীব্রতা কমতে আরম্ভ করেছিল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ঐ বাহুড়-চোবা লোকেরা কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠতেই আমরা মালপত্র গোছাতে আরম্ভ করে দিলুম। দড়ি-দড়া খুলে, বেঁধে, সমস্ত-কিছু গুছিয়ে নৌকার তুলতে বেশ বেলা হয়ে গেল। দাঁড়ি-মাঝি ও লোকজনদের সমবেত সুরে সেই গান আরম্ভ হয়ে গেল—

ইয়া ইয়া বো-চালুকা লিও

ঐ ঐ বো-লিও বো-লিও চুলুও।'...

চলতে চলতে বোঝা গেল, জলের উপর আগেকার সেই কেনার ধাক্কা এখন না থাকলেও, স্রোতের টান বিশেষ কিছুই কমেনি। কোন রকমে দাঁড়ি কেলে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলতে লাগল নৌকাগুলি ও আমাদের বজরা।

যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছিল, সেখান থেকে এখন বেশ ধানিকটা পথ চলে এসেছি আমরা। সভ্য মানুষের সাক্ষাৎলাভের পালা অনেক আগেই ভো প্রায় শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এখন ক্রমশঃ যেন মন্থর্য সমাজ থেকেই আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগলুম। ডাঙার, নদীর চরে কিনারে বা পান্তলা-ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোন জীবের গন্ধ-বাস্প নেই! এই ধরণের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নদী-পথে অনেকটা অতিক্রম করলুম আমরা।

ক্রমশঃ নদী আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে লাগল। দু'ধারে ঝাপ অঙ্ককারের মধ্যে এখন শুধু আকাশচুম্বী সবুজের প্রাচীর। হঠাৎ দুক্তের বেশ কিছুটা পরিবর্তন হ'ল এখানে। বহুবর্ণের বৃক্ষ লতাগুল্মের সাক্ষাৎ হতে লাগল। কোন কোন জায়গায় এখানকা গাছগুলি এমন ভাবে হলে পড়েছে যে, আমাদের নৌকাগুলি নিচে তার তলা দিয়ে পার হওয়াই মুশকিল। তাছাড়া এই জায়গাটা আমাদের কেবল ভয় হচ্ছিল যে, কোন হিংস্র জন্তু না এই সঃ হলে-পড়া গাছের ডালপালা থেকে নৌকার উপর লাফিয়ে পড়ে।

একথা ভাবতে-না ভাবতেই দাঁড়িদের মধ্যে কয়েকজন হঠাৎ বিকট চীৎকার করে উঠল, 'ট্যাপির ট্যাপির!' এই ট্যাপির এক প্রকার জলহস্তী বিশেষ। দেখতে মুখটা এদের শূকরের মত।

আমি ও এলিস বজরায় ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমাদের গাইড 'টাইগার' অনতিদূরে একটা গাছের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। দেখি, নদীর পাড়ের দিক থেকে জলের উপর হলে-পড়া একটা মোটা গাছের ডালে, বেশ মোটা মোটা একটা জন্তু জল থেকে ওঠবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর ডালটার গায়ে সম্ভবতঃ শেওলা থাকায় বার বার পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

দাঁড়িদের খুব আস্তে দাঁড়ি ফেলতে বলে, আমি আমার দূরবীণটা এনে চোখের উপর তুলে ধরলুম। সমস্ত জিনিসটা অপেক্ষাকৃত অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সামনে।

জন্তুটা গাছের ডালে ওঠবার চেষ্টা করছিল যে একান্ত প্রাণভয়ে তা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা জানতে পারলুম। এবং চান্দু যা দেখলুম, তাতে আমাদের হাত-পা ভয়ে পেটের মধ্যে ঢুকে যাবা অবস্থা! এই নাতিশ্রু নদীর গর্ভে এই ধরণের বৃহদাকার জন্তু থাকার ব্যাপারই প্রথমটা আমাদের যেমন আশ্চর্য করেছিল তেমনি তার চেয়েও আশ্চর্য করল এখানের রাক্সে মাহরা আকারে তারা খুব বড় না হলেও, দলে ছিল অসংখ্য। সম্ভব ভাবে জল থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠে ঐ জলহস্তীকে তারা আক্রমণ করছে। তাদের হাঁ ও ধারাল দাঁতগুলি পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট ধর পড়ছিল আমাদের দূরবীণের মধ্যে।

ট্যাপির বেচারা যখন কিছুতেই ঐ গাছের ডালটিতে আশ্রয় নিতে পারল না—বা অবশ্য তার পক্ষে খুবই অসম্ভব ছিল, তখন সে নিতান্ত অসহায়ের মত জলের উপর গা-ভাসিয়ে দিল। আ তখন তারা অর্থাৎ ঐ মাহেরা চতুর্দিক থেকে তাকে হোবলাতে লাগল নৃশংসভাবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সর্কাজ ছিন্নভি করে ফেলল।

নদীর স্রোতে আমাদের নৌকা তাদের অত্যন্ত কাছে ভেে আসছিল দেখে, দাঁড়িরা আবার দাঁড়ি টানতে শুরু করলে।

নিরীহ মন্থকুলের এই হিংস্রতা দেখে এলিস ও আমি হতবাক হয়ে গেলুম। প্রকৃতির বৃকে এমন কত বিচিত্র জীবই যে আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। চেরি ক্রেটনের না তোমরা হয়ত অনেকে শুনে থাকবে। আফ্রিকার নিভৃত জঙ্গলে বহু বিচিত্র জীবজন্তুর জীবনযাত্রার বিচিত্র কাহিনী কিংয়ে তুে তিনিই প্রথম পৃথিবীর সভ্য মানুষদের উপহার দিয়েছিলেন। কিং এই রাক্সে মাহদের কথা তাঁর কাছেও শোনা যায়নি, বা আজ আমরা চান্দুব দেখার সুযোগ পেলুম। [ক্রমশঃ।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায় তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা



ঠাকুরারও পছন্দঃ ঠাকুরমা কি আছকের লোক-
তার এতদিনেব অভিজ্ঞতা! তিনিও বুশী হয়েছেন
লক্ষ্মী সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি
ধপধপে ফর্সা, আর বকবকে রঙীন।
লক্ষ্মী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড়
কাচা যায় এবং লক্ষ্মী এটাও দেখেছে যে ধুতি, সাট,
বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য রকম
সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য-
করী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটি কণাকে বার করে
দেয়, কাপড় আহড়ানোর দরকার হয়না। আপনার
পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট
সাবানে ব্যবহার করুন না কেন?

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S. 268 C-X52 B3

হিন্দুস্তান লিটারি লি. কর্তৃক প্রস্তুত।

অক্ষয় ও প্রাক্ষয়



বিয়োগান্তক

শ্রীমতী প্রতিমা সেন

লতিকাদি' সীগণির বান, পাঁচ নম্বর কেবিনের সিঁড়িয়াস্ ফেস, বলে নাস' নমিতা অল্প ঘরে চলে যায়।

লতিকা আপন মনে গল্প গল্প করতে থাকে—একটু কি বসবার জো আছে, রুগীর সেবা করতে করতেই জীবনটা গেল, আর পারি না। বলতে বলতে এগিয়ে যায় পাঁচ নম্বরের দিকে।

পাঁচ নম্বরের রুগী তখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায়। সকালের দিকে অপারেশন হয়েছে, অক্সিজেনের সাহায্যে এখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

লতিকা একবার নাড়ি দেখে পাশের চেয়ারে এসে বসে। লতিকা প্রবীণা মহিলা, চল্লিশের ওপর বয়স। আজ প্রায় বিশ বছর এই নাসের কাজ করছে। পাঁচ ছয়টা হাসপাতাল ছেড়ে এই সরকারী হাসপাতালে প্রায় সাত আট বছর একটানা কাজ করছে। কখনও ছুটি নেয় না লতিকা, ছুটি পুরনো হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। নেহাত যদি শরীর ধারণ হয় তো হু'তিন দিনের বেশী ছুটি নেয় না।

তাই বধন লতিকা হঠাৎ আসে না, হাসপাতালে হৈ হৈ পড়ে যায়, সিঁটাররা বলাবলি করে কি হলো লতিকাদি'র।

মণিকা বলে, লতিকাদি' না এলে ভাল লাগে না; বেশ মাল্টিব্যাট।

সবিতা বলে, আমাদের খুব ভালবাসেন।

আমার তো অনেক সময় রাত্রে ডিউটি করে দিয়েছেন, সরমা বলে।

সত্যি নিজের দিকে কখনও লতিকা তাকিয়ে দেখে না। সারাদিন পরিষ্কার করে। অল্পদেরও অনেক কাজ প্রায়ই করে দেয়।

লতিকাকে সারাদিন নিজের মনে খাটতে দেখলে মনে হতো কি যেন চাকতে চাইছে লতিকা।

সরমা নমিতা ওয়া মাঝে মাঝে 'লতিকাকে ধরতো,— লতিকাদি' বসুন, একটু গল্প করা বাক্, এখন তো আর আমাদের ডিউটির সময় নয়।

লতিকা বলতো, তোরা বস না, আমার কি আর বয়স আছে, বুড়ো হয়ে গেলাম, কাজই ভাল লাগে।

—আহা, কি এমন আপনার বয়স হয়েছে? খেটে খেটেই তো বুড়ো হয়ে গেলেন। কোন রকম আমোদ সৃষ্টি করবেন না শুধু কাজ, সরমা বলে।

নমিতা বলে, লতিকাদি' এবার আপনি কিছুদিনের ছুটি নিন, আপনার শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ ছুটি নিয়ে কি করব শুনি? আমার কে আছে, যে আমি ভাববো—মরে যাবো হয়ে যাবে।

—আচ্ছা লতিকাদি', আপনার কি কেউ নেই? নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছেন।

—নেই কেন যে, ওই তো মনোরমাদি' আছে, যে আমাকে মাগুব করেছিল, বলতে বলতে লতিকা অল্প ঘরে চলে যায়।

লতিকা কিন্তু সত্যি এই বিশ-বাইশ বছর ধরে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেও হার মানছে। মনের কাঁকটা সব সময়েই কাজ দিয়ে ভরে রাখতে চায়। কিন্তু কাজ দিয়ে চাপতে গিয়ে নিজেকে প্রায় নিঃশেষ করে এনেছে।

মাঝে মাঝেই আজকাল ভীষণ দুর্বল মনে করে। মনে হয় আর বেশীদিন বাঁচবে না। ভাত্কারেও বলেছে, আপনার হাট অত্যন্ত দুর্বল, আপনি কিছুদিন রেষ্ট নিন।

লতিকা শুনে দুদিন চূপচাপ থাকে। তার পর আবার খাটতে থাকে, বলে তোদের লতিকাদি' এমনি মরবে না, এই তো বেশ আছি।

লতিকা ভাবে, হঠাৎ যদি মরে যাই তো ভালই হয়, তবে একবার যদি,—আপন মনেই বলে কে জানে আর দেখা হবে কি না।

এই ভাবেই চলছিল লতিকার। হেসে না'মতা, মণিকা জিজ্ঞাসা করতো লতিকাদি', আপনার তো কেউ নেই, এত যে টাকা জমাচ্ছেন কাকে দিয়ে যাবেন?

মরবার সময় থাকে মনে পড়বে তাকেই দিয়ে যাবো।

লতিকার সেদিন রাত্রে ডিউটি, পাঁচ নম্বর রুগীকেই বিশেষ করে দেখতে বলা হয়েছে। লতিকা অল্প ঘর ঘুরে এসে পাঁচ নম্বরে ঢোকে।

অল্পমনস্ক হয়ে রুগীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কাঁচাপাকা গৌকে মুখ ভর্তি। বহুদিন রোগ ভোগের জন্ম চোখের কোলে কালি। বছর পঞ্চাশ-বাহাশ বয়স, মাথার ছপাশে টাক। রুগীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই লতিকার মনে হয়, এত রুগীর সেবা করলাম একবার যদি রুগী হয়েও এখানে আসে, তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

আজকাল প্রায় একটা কথা লতিকার মনে হয়, এমন করে নিজেকে গোপন করা হয়তো ঠিক হয়নি। যতই হোক হিন্দুর মেয়ে, আরও কিছুদিন সইলে বুঝি ঠিক হয়ে যেত। কত মাল্টিব্যাট কত দুঃখের জীবন ওনেছে, তারা তো এভাবে পালিয়ে আসেনি।

মাঝে মাঝে লতিকার মনে হয় কিবে যাবে নাকি? ছেলের জন্মই না হয় কিবে যাবে, এইভাবে থেকেই কি সুখ পাচ্ছে?

এতদিন চেষ্টা করেও তো মন থেকে মুক্তে পারেনি। ছেলের জন্ম তো তার প্রাণ সব সময় আকুল হয়ে আছে। ছেলের কথা মনে পড়তেই চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সারলে নেয় ললিতা। না না সে কখনই ফিরে যাবে না, এইভাবে নিঃসঙ্গ জীবনই টেনে নিয়ে যাবে, জীবনের শেষ দিন অবধি। আর তার ছেলে হয়তো তাকে এখন চিনতেই পারবে না, সে তো আরও লজ্জা।

হঠাৎ ললিতার চিন্তায় ব্যাঘাত হয়। কুণ্ডী চোখ মেলে চেয়ে বলে একটু জল, একটু জল।

ললিতা তাড়াতাড়ি কিডিং গ্রাসে করে জল নিয়ে মুখে ঢেলে দেয়।

—আঃ কি আরাম হলো, কখন থেকে জল-তেষ্ঠা পাচ্ছিল, বলে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে।

ললিতা মন থেকে সব ঝেড়ে আবার নিজের কাজে মন দেয়। কুণ্ডীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে কিছু দরকার কি না, গায়ের চাঁদরটা ভাল করে ঢেকে দেয়।

সেদিন কোয়ার্টার্নে ফিরে ললিতা শুয়ে পড়ে। মনটা ভাল লাগে না, মনে হয় ললিতা শেষ অবধি ঠিক থাকতে পারবে কি না? শরীর ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মনও যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে, এতদিনের চেষ্টা সবই বুঝি একদিন ব্যর্থ হয়ে যাবে! শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে, মনের পাতায় গ্রামের মেয়ে ললিতা ভেসে উঠে, মনে পড়ে...

ললিতার বিয়েতে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। পাড়ার লোক ও আত্মীয়রা সকলে এসেই একবার করে সতী দেবীকে বলেছিল, তোমার খুব বরাত জোর, নয়তো ললিতার এভাবে বিয়ে হচ্ছে। এখন তো নয় মেয়ে তোমার সুলন্দরী, দুটো পড়তে শিখেছে না হয়, তা আঙ্গকাল অমন কত মেয়েই আছে, সবই বরাত।

সতী দেবীও সেটা খুব বেশী মেনে নিয়েছিলেন, নয়তো বোনের বিয়ের সখ্যক করতে এসে ললিতাকে পছন্দ হয়ে গেল।

ব্যাপারটা হয়েছিল একটু মজার। বোনের বিয়ের সখ্যক করতে ঝাড়গ্রামে গিয়েছিল। গ্রামের রাস্তা ভাল করে বুঝতে পারেনি মোহন, ভুল রাস্তায় ভুল বাড়িতে ঢুকলো।

সদরের কড়া নাড়তেই ললিতা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কাঁকে চাই, বলে ললিতা সরে দাঁড়িয়েছিল; সুলন্দর সুলন্দর চেহারার যুবক দেখে চমকে যায়, ভাবে, ঐ গ্রামের লোক বলে তো মনে হয় না।

মোহনও আমতা আমতা করে বলে,—একটু দরকারে এসেছিলাম, মানে—

ভিতরে এসে বসুন, মাকে বলছি।

কিন্তু একটু পরেই মোহন তার ভুল বুঝতে পারে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বাবার জন্ম, ললিতা ততক্ষণে চা-মিষ্টি হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

সতী দেবী বাধা দিয়ে বলেন, তাতে কি হয়েছে, শহরে ছেলে গ্রামের রাস্তা চিনতে পারিনি, একটু মিষ্টিমুখ কর, এই অবেলার কিছু খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই?

মোহন লজ্জিত হয়ে বলে, আবার মিষ্টি কেন? দেখুন জে কি যকম ভুল করে আপনাদের বিরক্ত করলাম, আমি চলি।

কিন্তু সতী দেবী হাড়েন না, না না মিষ্টিমুখ খেয়ে বাও, গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।

মোহনও আর কথা বলে না, ঘোরাঘুরি করে সত্যি অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছিল, সেজন্ম মিষ্টিমুখে আবার আপত্তি করে না।

বাবার সময় সতী দেবীকে প্রণাম করে উঠে পাড়ায়, সতী দেবী এতে একটু বিস্মিত বোধ করেন, কে জানে যদি ব্রাহ্মণ হয়, কিন্তু সে সঙ্কোচটা মোহনই ভেঙ্গে দেয়, বলে আপনি আমার মায়ের মতন, আমার নাম রাখামোহন দে, ললিতাকে নমস্কার করে বিদায় নেয়।

সতী দেবী রাখামোহনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন, মনে মনে বলেন জামাই করার মত চেহারা, নামটিও খাসা রাখামোহন দে।

ললিতার মনেও রাখামোহন রেখাপাত করে যায়, কি'সুপুরুষ চেহারা, জেমনি চলার ভঙ্গিমা, ললিতাও তাই একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিল রাখামোহনের চলে যাওয়ার পর। কলকাতার ছেলে শুনে মনটাও একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাহলে আর দেখাও হবে না।

রাখামোহন পথে নেমে নামটা একবার দেখে নেয়, ঈহরিসাধন দত্ত। বোনের বিয়ের কথা শুধন আর মনে নেই মোহনের, সোজা কলকাতার চলে যায়।

মনটা বেশ খুসী করেই বাড়ী ঢোকে, আশালতা ভাবেন, বুঝি মেয়ের বিয়ের কিছু আশাস নিয়েই এসেছে।

সে ভুলটা মোহনই ভেঙ্গে দেয়। বোন মঞ্জুকে ডেকে বলে তোর বিয়ের আগে আমার বিয়েটাই হয়ে যাক।

আশালতা শুনে বলেন, কেন ওঁরা কি বদলি বিয়ে দিতে চান?

মোহন বলে, না না ওঁদের ওখানে যাওয়াই হয়নি।

—সে কি! ওখানে না গিয়ে গেলি কোথায়?

যাওয়া হয়নি শুনে মঞ্জুও একটু দমে যায়। মোহন শুধন আগাগোড়া সব ঘটনাটা বলে। আশালতা শুনে খুসী না হলেও মুখে খুসীর ভাব ফুটিয়ে বলেন, মেয়ে দেখেই যখন পছন্দ হয়েছে শুধন মেয়ে তো সুলন্দরী, কি বল?

—না তা ঠিক বলা যায় না, তবে আমার ভাল লেগেছে, আমি ওখানেই বিয়ে করবো।

আশালতা বুঝলেন এর পর আর কোন কথা চলবে না, ভবুও মনের কথাটা চাপতে পারলেন না, মঞ্জুর বিয়েটা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিত হতাম।

ললিতাকে দেখতে মোটেই সুলন্দর নয়, অতি সাধারণ মুখ-চোখ, তার উপর সামনের দাঁত একটু উঁচুও ছিল। সেজন্ম সতী দেবীর যথেষ্ট ভাবনা ছিল, বিয়ে দেবেন কি করে, তার উপর সে রকম সঙ্গতিও নেই। হরিসাধন দত্ত গ্রামের সুলের হেড মাস্টার। ললিতাকে তাই কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, আইডেটে ম্যাট্রিক দেওয়াবেন ভাবছিলেন।

মোহন বাবার ছদ্মনি পর এক বছর এসে খবর দিয়ে গেল সতী দেবীকে। সতী দেবী আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন যেন। আনন্দে দিশেহারা হলেন।

ললিতাও আনন্দে ও লজ্জায় মুকিয়ে মুকিয়ে বেড়াল। মাকে

মাঝে আরনার মুখখানা ভাল করে দেখে নিল। না মন্দ লাগলেনা, সেদিনও তো ঠিক এমনি করেই ছিল। ললিতা ভাবে, রং মাল্য মাজা তা হোক অনেক আবার এমনি রংই পছন্দ করে। ঠাতটা একটু উঁচু, নয়তো নাক মুখ চোখ কিছু মন্দ নয়।

ললিতার চুলের খুব বাহার, কপালের উপর চুলগুলো খুব সুন্দর লাগে। কোমর অবধি কৌকড়া কৌকড়া চুল। পিছন থেকে ললিতাকে বেশ সুন্দর লাগে।

হরিসাধন শুনে বলেন, অত হৈ-ঠৈ করার কিছু নেই, ছেলের রূপ দেখে তো মেয়ের বিয়ে দেবো না। আগে খোঁজ খবর নিই, তার পর হৈ হৈ করো।

সতী দেবী কিছু চূপ করে থাকতে পাবেন না, সকলকেই স্তম্ভিত করে দেন। মুখে মুখে সকলেই জানতে পারে।

সতী দেবী বেশ গর্ব অহুভব করেন, বিয়ে হোক বা না হোক মেয়েকে পছন্দ-স্তম্ভিত করেছে। মনে ভাবেন, মেয়ে খারাপ দেখতে হলে কি হবে, রাধামোহন যদি জামাই হয় তো দেখাবার মতই হবে।

হরিসাধন খবর নিলেন। জানাশুনার কাছে বাচাইও করে নিলেন। সকলেই বললে এ বিয়েতে আপত্তি কিছু নেই। হরিসাধনও দেখলেন, পাত্র ভালই, চাকরী করে কলকাতার, নিজের বাড়ী—সংসারও বড় নন্দী ছুই ভাই চাকরী করে, এক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে আর দু'টি বোন অবিবাহিতা। আপত্তির কিছু নেই।

সাত দিনের মধ্যেই ললিতার বিয়ে হয়ে গেল। হরিসাধন বধা সাধ্য ঘটা করেই বিবাহ দিলেন।

বর দেখে শুনে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন, ললিতা সত্যি সৌভাগ্যবতী।

বিবাহের প্রথম বছর ললিতারও বেশ সুখেই কাটে। স্বত্তরবাড়ীর লোকেরা সে রকম সন্তুষ্ট না হলেও, স্বামীর দিক থেকে কোন প্রকার অভ্যর্থনা প্রকাশ পায়নি। ললিতাকে প্রথম থেকেই শান্তি নন্দ ভাল চোখে দেখেনি। মজু তো একদিন বলেই ফেললো, এই দেখে স্বামীর মাথা ঘুরে গেল।

শান্তি ও অজ সকলে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলে, তাদের পছন্দ নয়। তবুও ললিতা স্বামীগরবে গরবিনী ছিল, যার সঙ্গে বিয়ে হয়েচে তার তো পছন্দ। সে গর্বও ললিতার বেশদিন রইল না। ক্রমেই স্বামীর মনেও অসন্তোষ দেখতে পার।

বিবাহের বছরেই ললিতার ছেলে হয়। ছেলেকে নিয়েই সময় কাটাতো। ললিতা বুঝতে পারে স্বামীর সে রং কেটে গেছে, ললিতার আসল রূপ দেখে বিরক্তই হয়। ললিতাও প্রথম প্রথম সহ্যই করতো, যাতে স্বামী স্বত্তরবাড়ী পছন্দ হয় তাই করে। শুধু রূপ ঢাকার চেষ্টা করে।

সারাদিন সংসারের সব কাজ নিজেই করতো। কিন্তু ললিতার দিকে কেউ কিরেও তাকাত না। মোহনের সঙ্গে তার বিবাহ হওয়াটাই যেন তার অপরাধ, এমনি সকলের ভাব। তাও ললিতা মুখ বুজে সহ্য করতো, স্বামীকে কিছুই জানতে দিত না।

মোহন অকস্মিক থেকে আসার আগেই ললিতা সব কাজ সেবে রাখতো, তাবতো এতে মোহন খুসী হত। কিন্তু তাতে কল হতো বিপরীত।

প্রত্যহই মোহন এ কাজ সে কাজ নিয়ে সারাদিন করতো, সেদিন যেন সারাদিন বসে বসে প্রকাশ পায়।

—সেজেগেজে বসে থাকার কি আছে। যা-বোনের একটু সাহায্য করলে তো পার, আর তাও যদি তেমন দেখতে হতে।

ললিতা চূপচাপ উঠে বার, জানায় না যে সেই সব কাজ করে এই বসেছে, পাশে গিয়ে টিপটা তুলে ফেলে, মুখটা আঁচলে মুছে নেয়।

এরকম প্রায়ই হয়, ললিতা চূপ করে থাকে, মোহনও ভাবে ললিতা সারাদিন কিছু করে না। আশালতাও কিছু প্রকাশ করেন না, বরঞ্চ খুশি হন ছেলে-বো-এর বগড়ায়।

আড়ালে পেলে আশালতা ললিতাকে হুকথা শুনিতেই দেন, খুব তো ভুলিয়ে বিয়ে করলে, এখন কেন ভোলাতে পারছ না? এদিকে বছর না ঘুরতেই ছেলে হয়ে গেল, শুনি নি কখনও বিয়ের দশ মাস পরেই ছেলে হওয়া।

আশালতার এই অপোত্তন ইজিতে ললিতা লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না, চোখ কেটে জল আসে। মনে মনে ভাবে আর যেন ছেলে না হয়। যাত্রা প্রায়ই না খেয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু ললিতার খাওয়ার কথা কেউ জানতেও চায় না। স্বত্তরবাড়ীর এই নির্দয়তা ক্রমেই ললিতার অসহ্য হয়ে উঠে। এক এক সময় মনে করে মার কাছে ফিরে যাবে কিংবা পরকণ্ঠেই মনে হয় না মার কাছে ফিরে যাবে না, মাকে তার মুখ জানাবে না। তা উপর বাবা নেই। বাপের বাড়ীতে ললিতার সুখের কথাই জানে। ললিতা কোন দিনও তার মুখের কথা জানায়নি।

এদিকে স্বত্তরবাড়ীও অসহ্য হয়ে উঠেছে। স্বামীও যদি একটু কিরে চাইতো। ললিতার এক এক সময় কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করতো। বাই করে তাতেই মোহন রাগ প্রকাশ করে, কি করলে যে স্বামীর মনের মত হবে, কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারে না।

আশালতাও সুবিধে পেয়ে গেলেন। মোহনের কাজ প্রায় নিজেই করতে লাগলেন। ললিতা এগিয়ে এলে বলেন, তোমার বা কাজের ছিরি। ওরকম মোহনের অভ্যাস নয়। গ্রামের মেয়ে জানবেই বা কি করে, আমি করে দিচ্ছি, নয়তো বলবেন, মজু করে দিচ্ছে। ললিতা চূপ করে সরে বার; অলক্ষ্যে চোখের জল ফেলাই সার হয়।

একদিন আশালতা মোহনের সামনেই বললেন, বো-এর যে কোন কাজ নেই, তোকে খেতে দেওয়া এসব তো আমরাই করে দিচ্ছি, আমি ভাবছি বিকে বেধে কি লাভ, বোমাই তো করতে পারে। কটা লোকের এক কাঁকে বসে বাসন মাজা।

মোহনও সার দিয়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ কিরের কি দরকার, গ্রামের মেয়ে ওদের ওসব অভ্যাস আছে, পারবে না কেন?

ললিতা আর যেন থাকতে পারে না। সারাদিন ছেলে দেখা রান্না করা তার উপর এতগুলো লোকের বাসন মাজা।

ললিতা গ্রামের মেয়ে হলেও বাসন মাজতে সে তার মাকেও কখনও দেখেনি। সে রকম অবস্থাও তার বাড়ীর নয়। অমিহমা ওদের যথেষ্ট আছে, বাপের বা আর ছিল তাতে ওদের ডিন ভাইবোনের খুব ভালই চলতো। আর সতী দেবী খুব

কিছু বাতির ঘেঁরে বলে ওদের চানচলে বেশ বন্দেখিরাই ছিল।
কিন্তু সে কথা ললিতা বলে কি করে?

বাসন মেজে সংসারের সব কাজ করতে লাগলো। মোহনকে
তাতেও প্রসন্ন দেখল না। আশালতা ভাবেন আরো কি কাজ
দেওয়া যায়।

এদিকে ললিতার শরীরও দিনের দিন খারাপ হতে লাগলো।
সেদিন তাই ভেঙ্গে পড়লো ললিতা মোহনের কাছে—কেন তুমি
আমার দিকে ফিরে তাকাও না? আমি যে আর পারছি না। সব
কথাই মোহনের কাছে জানালো। শেষে বললে আমার যে ছেলে
আছে সেটা ভুলে যাও কেন? ছেলেকেও তো কেউ দেখবে না।

কিন্তু এতটুকু মহাহুত্ব পেল না বরঞ্চ আরো কটু কথাগুলো।
—তামার ছেলে ওরা দেখতে বাবেই বা কেন? ওদের কতো কাজ
আছে, আর দশমাসের বিয়েতেই কাকর ছেলে হয় তাও তো
তিনি, এতো লোকের তো বিয়ে হ'লো কাকর তো হয়নি। কার
ছেলে কে জানে।

ললিতা আর স্থির থাকতে পারে না টলে পড়ে যায়। মোহন
ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

ললিতা ঠিক করে আর কিছুতেই এবাড়ীতে থাকবে না। বেখানে

তার চরিত্রকে সন্দেহ করে সেখানে ও থাকবে না, বেখানে হোক
চলে যাবে। ভাবে ছেলেকে নিরেই পালিয়ে যাবে, আবার ভাবে
না, নিরে যাবে না, তাতে সন্দেহটাই খাঁকার করা হয়। ছেলের
জন্ম ডুকরে কেঁদে ওঠে। দুখার লজ্জার ললিতা কাঁপতে থাকে।
যাকে এত ভালবাসে, যাকে খুসী করার জন্ত সব হাসি মুখে মেনে
নিরেছে, তার কাছে এই নির্ভরতা।

ছপুরবেলা কাউকে 'না' জানিয়ে ছেলেকে কেলেই ললিতা
পালিয়ে যায়।

পথে নেমে কোথায় যাবে ঠিক করতে পারেনা আর কোথায়
যাবে ঠিকও নেই। পাগলের মত হন্ হন্ করে চলতে থাকে,
ছেলের জন্ম চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। কোনদিকে না তাকিয়েই
এগুতে থাকে। হঠাৎ একটা পাথরে হোট খেয়ে মুখ খবড়ে পড়ে
বাসের সামনে। ললিতা জ্ঞান হারায়।

সেখানেই নামছিলেন হাসপাতালের কাজ সেরে মনোরমা।
ভিড় ঠেলে মনোরমাই এগিয়ে এসে ললিতাকে নিয়ে গিয়ে তোলে
নিম্নের বাড়ীতে। মনোরমার সেবাতেই ললিতা জ্ঞান ফিরে পায়।
ঠোঁটের সামনেটা কেটে গেছে, সামনের কাঁত ভেঙ্গে গেছে।

ললিতার জ্ঞান ফিরলে পর মনোরমা জানতে চান কোথায়

মনের কথা

মনের সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?
সামান্য সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স
যাহেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই,
নর মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে
ক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও
মিত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।

মুখার্জী জুয়েলার্স

মিনি স্টোর গহনা নির্মাণ ও রত্ন-সংগ্রহ
বহুজাতীয় মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



বাড়ী। ললিতা কিছু বলে না। মনোরমা বোঝেন এখন বলবে না—ভাবেন থাক, পরে জানলেই হবে।

মনোরমা হাসপাতালের নার্স। এক মেয়ে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হন। নার্সিং পড়ে এখন নার্সিং করছেন। একলাই থাকেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

ললিতা বেশ নুহু হলে পর বলে, আপনি আর কতদিন রাখবেন, আমি দেখি কিছু করতে পারি কি না।

ললিতা ঠিক করে যেমন করে হোক নিজের পায় দাঁড়াতে হবে। কিরে বাওয়া কোম প্রকারেই সম্ভব নয়, তাতে আরো দুর্দশা বাড়বে।

মনোরমা অনেক পীড়াপীড়ি করেন কিরে বাবার জন্ম কিন্তু ললিতা কিছুতেই রাজী হয়না, বলে, আপনি একটা কাজ বোগাড় করে দিন আমি চলে যাবো। মনোরমা তাও একবার শেষ চেষ্টা করেন বলেন, ছেলের জন্ম কিরে বাওয়া উচিত, কিন্তু তাতেও ফল হয় না অগত্যা বলেন, এই কাঁচা বয়সে তো আমি তোমাকে যেখানে সেখানে কাজ দিতে পারি না, তা তুমি যখন কিছু পড়েছ তখন একটা পাশ করে নাও তারপর দেখি কি করা যায়।

মনোরমার কেমন যেন মারা হয় লতিকাকে দেখে। ললিতা নিজের নামটা লুকিয়েই লতিকা বলে। সেই থেকেই লতিকা নাম।

লতিকাকে আর লতিকার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, লতিকা ভাবে ভালই করেছিল নাম লুকিয়ে। নতুন নামে তার নতুন জন্মই হয়েছে। চেহারায়েও মিল নেই। টোঁটের উপর সেলাই-এব দাগ। সামনের দাঁত বঁধান, দাঁত উঁচু আর নেই।

লতিকাকে পাশ করিয়ে নার্সিং পড়াল। তারপর থেকে এই নার্সিং করছে।

মনোরমা মাঝে মাঝে লতিকাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন আর ভাবতেন আশ্চর্য মেয়ে। স্বামী পুত্রের জন্ম সব সময় কাঁদছে কিন্তু মুখে বলবে না।

তাই দেখে মনোরমা বলতেন, কি রে, এবার কিরে বাবি? রাগ পড়েছে?

লতিকা বলতো, তোমার তাই মনে হচ্ছে, না? একটু খেমে বলতো মনোরমাদি' তোমাকে বড় ভালাতন করছি, একটা কাজ দেখেই চলে যাবো, এতটা যখন করলে তখন আর একটু কষ্ট কর আমার জন্তে।

মনোরমা বলেন, তা আর বাবি না, কাজ হয়ে গেল এখন কেলে বাবি বই কি।

লতিকা বোঝে কোথায় আঘাত দিয়েছে তাড়াতাড়ি বলে তুমি তাড়িয়ে না দিলে আমি যাবোই না।

সেই থেকে লতিকা মনোরমার কাছেই ছিল। মেয়ের মত মনোরমার সব দেখা-শুনা করতো।

মনোরমার কাছেই লতিকা থাকতো যদি না মনোরমাকে তাঁর ভাই এসে নিয়ে যেত। বয়স হয়েছিল মনোরমার, প্রায়ই নিজের লোকের নাম করতেন। ভাই ভাই এসে নিয়ে যেতে চাইলে লতিকাই জোর করে পাঠিয়ে দেয়। বুড়ো বয়সে নিজের লোকের কাছে শান্তি পাবেন।

লতিকা একেবারে একা হয়ে যায়। হাসপাতালের কোয়ার্টাসেই থাকে।

সারাটা দিন ভাবতে ভাবতেই কেটে যায়। ভাবে, লুকিয়ে থেকে কি লাভ, এ ভাবে ছেলেকে ত্যাগ করা ঠিক হয়নি। সে তো কোন অজ্ঞান করেনি। এখনও যদি কিছুদিন বাঁচে তাহলে বাকী জীবনটা হয়তো মুখে কাটবে। কিন্তু বাওয়ার কথা ভাবলেই লতিকার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মন কিছুতেই সায় দেয় না। আবার ভয়ও হয় ধরা দিলে তারা হয়তো এতদিন পর স্বীকার নাও করতে পারে। আর কে জানে ছেলে বেঁচে আছে কি না। যার জন্ম প্রাণ আকুল হচ্ছে সেই হয়তো নেই, ছেলের কথা মনে আসতো চোখে জল আসে, হু'বছরও হয়নি তখন।

পরের দিন হাসপাতালে আসতেই লতিকা শোনে, পাঁচ নম্বরে রোগীর অবস্থা ভাল নয়।

লতিকাকে যেন কাজে পেয়ে বসল। দিবারাত্র খাটে লাগলো। মনে হতো লতিকা যেন নিজেরই কাজের সেবা করছে বাত্রে ডিউটি করে আবার বিকেলের দিকেই চলে আসতো।

লতিকার জন্মই পাঁচ নম্বর রোগী বেঁচে উঠলো। লতিকার কম-সকম দেখে মিষ্টাররা ঠাটা করে জিজ্ঞাস করতো, কি লতিকার পাঁচ নম্বরের সঙ্গে প্রেমে পড়লেন নাকি?

লতিকা হেসে বলতো, হয়তো তাই।

সেদিন পাঁচ নম্বরের রোগী মিষ্টার দে ভালই ছিল। আপন মনেই বলে উঠেন আজ আর কেউ এলো না।

লতিকা বলে, ভাল আছেন দেখেই হয়তো আসেনি, ক'দিন বা গেল আপনার।

—আসবারই বা কে আছে, ওই ছেলে। মেয়ের কথা বাদ দাও। লতিকা যেন চমকে যায় মেয়ের কথা শুনে, শান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে আপনার আর কেউ নেই, স্ত্রী, ছেলের বো।

—না স্ত্রী আমার অনেক দিন মারা গেছেন। ছেলের বিয়ে এখনও দেওয়া হয়নি।

—ওই ছেলে রেখেই বুঝি স্ত্রী মারা যায়, নির্দিশু হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—হ্যাঁ ওই একরকম। অনেক খোঁজ নিয়েছিলাম, কোন খবর পাইনি। হয়তো আত্মহত্যা করিয়েছিল।

লতিকা মিষ্টার দে'র খোলামনের পরিচয় পেয়ে, সাহস করে জিজ্ঞাসা করে—কেন?

—সে অনেক কথা। হয়তো আমারই অজ্ঞান হয়েছিল ছেলের কাছেই বেশী লজ্জা করে। মাকে মনে না থাকলেও ম মতই স্বভাব পেয়েছে।

লতিকা চুপ করে থাকে। কিন্তু মিষ্টার দে'র সব কথা জ্ঞান জন্ম বড় আগ্রহ হয়। মিষ্টার দে-ই আগে কথা বলেন, আ' ভাগ্যেই হয়তো বো থাকবার নয় মিষ্টার। নয়তো দ্বিতীয় জন্ম আমার রহিল না, ছেলেকে মাহুব করার জন্ম বাধ্য হয়েই করতে হলো, কিন্তু সে-ও বছর পাঁচেকের মধ্যে রেখে মারা গেল

মিষ্টার দে এমন ভাবে কথা বলেন 'যেন কোন আপন লে সঙ্গে কথা বলছেন।

বাবার দিন মিঠার দে-কে সকলেই বিদায় দিতে এলো। অনেকদিন ছিলেন হাসপাতালে। মিঠার দে নিজের ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বললেন, এই আমার ছেলে মানসকুমার দে, এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। সকলেই মানসকে প্রতি নমস্কার করলো, কিন্তু কেউ লক্ষ্য করলো না লতিকা ছির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কাকে খুঁজছে মানসের মধ্যে।

মানসও বাবার সময় কি ভেবে লতিকাকে প্রশ্নাম করে, লতিকা অপ্রস্তুত হয়ে সরে যায়. মানস বলে, আপনার জন্মই আমি বাবাকে আজ কিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আপনার সেবায়ই বাবা বেঁচে উঠলেন। লতিকারও ইচ্ছা করে মানসকে জড়িয়ে ধরতে।

এর পরই লতিকার অদ্ভুত পরিবর্তন হয়। সকলেই লক্ষ্য করে লতিকা ভীষণ গভীর হয়ে গেছে। সব সময় কিছু ভাবছে। লতিকা এখনও খুব খাটে কিন্তু সে রকম কাজে উৎসাহ নেই প্রায়ই ছুটি নেয়। বলে, আর পারছি না, বুড়ো হতে চললাম খাটার শক্তি আর নেই।

লতিকার জীবন বাঁধাধরা গতেই চলতে থাকে, কিন্তু কারুর লক্ষ্যে না পড়লেও লতিকাকে প্রায়ই শিমুলিয়া লেনের মোড়ে দেখা যেত, মনে হতো কার জন্ম অপেক্ষা করছেন। কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বলতো, এই একটু দাঁড়িয়ে দেখছি। বেশ কাঁকা জায়গাটা, ভাল লাগে। লতিকার বুড়ো বয়সে কবিত্ব জেগেছে ভেবে সকলে হাসাহাসি করতো। লতিকা বাবে না ভাবলেও, কে যেন ওকে টেনে নিয়ে যেত।

এর পর অনেক দিন কেটে যায়। লতিকার সেবার কত লোক ভাল হয়ে চলে গেল। লতিকা ভাবে এ বেশ কাজ কর্তব্য লোকেরা সব আসবে, তাদের সেবা করো, তাদের যত্ন কর ভাল করে তোলা, তার পর প্রিয়জনের হাতে তুলে বিদায় নাও। এর পর আর কোন সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে।

হুদিনের অতিথি হয়ে আসে—আপন মনের দয়দ দিয়ে সেবা করো। কিন্তু সেবার সঙ্গে মায়া যেন না থাকে। লতিকা ভাবে কগীর হয়তো এসব কথা মনেই আসে না, ভাবে পরসার বিনিময় পেয়েছি। আবার ভাবে হয়তো মনে থাকে, এই যেমন সে নিজে ভাবছে, সেই রকম হয়তো তারও মনে পড়ে।

লতিকার মনে হয়, সারাজীবনটা তো সেবা করেই গেল কিন্তু নিজে কি সে কারুর সেবা পাবে? পরেই লতিকা ভাবে, কগীর সেবা করেই যেন যেতে পারি, সেবা যেন নিতে না হয়।

ভগবান হয়তো ওনেছিলেন লতিকার কথাটা। লতিকাকে কারুর সেবা নিতে হলো না। হু'তিন দিন ভূগে হঠাৎ লতিকা স্বপ্নরোপে মারা গেল।

সকলে লতিকাকে মৃত্যুশয্যার দেখে অবাক হয়ে গেল মাথায় লম্বা করে সিঁদুর, সিঁথিটা অল অল করছে। পাশে মানস দাঁড়িয়ে। মানসকে সরমাই চিনেছিলো।

সরমা বলে উঠলো, আশ্চর্য, লতিকাদির স্বামী পুত্র সব ছিল।

মানস গভীর হয়ে বলে, মা বেঁচে থাকতে মাকে চিনলাম না।

আয়েষা সুলতান বেগম শিবানী ঘোষ

সুলতান আহমদ মির্জার স্ত্রী কুতুক বেগম সবগে আপন কক্ষে প্রবেশ করে ডাক দিলেন—গুলনর।

বান্দী এসে কুনিশ জানিয়ে বলে—আদেশ করুন বেগম সাহেবা। কুতুক বেগম দেহের ওড়নাটা খুলে বিছানার ওপর ছুঁড়ে কেলে দিয়ে বলেন—অসহ। বুঝলি গুলনর, আমি একেবারে অসহ হয়ে উঠেছি।

চূপ করে থাকে গুলনর। কে কার জন্মে অসহ হয়ে উঠেছে তা তার জানা আছে ভাল করেই। কিন্তু তবু বেগম সাহেবার সুখের ওপর তো কিছু বলা যায় না। দাসী বান্দীদের এক্ষেত্রে চূপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কুতুক বেগম বলেন—শোন্ গুলনর, আমার ঐ সতীন-বেটীর হিংসের ফেটে যাচ্ছে। আমার স্বামী আমার রূপের বশ, তাই ওদের অসহ্য। তাই ওরা সরাতে চায় আমাকে। কিন্তু গুলনর, তুই ওদের বলে দিস, শয়তানীতে আমিও কিছু কম যাই না। দরকার হলে ওদের বৃকে আমি ছুরি বসাতেও পারি।

গুলনর বলে—আপনার এইখানে শরাব নিয়ে আসবো কি বেগম সাহেবা?

—শরাব? আচ্ছা নিয়ে আর।

শরাবের বোতল এবং পেয়ালো নিয়ে আসে গুলনর। কুতুক বেগম জাজিমের ওপর বসে তাকিয়ার ঠেস দিয়ে বলেন—পেয়ালোটা ভর্তি করে দে গুলনর।

সকেন শরাব-ভর্তি পেয়ালো বেগম সাহেবার হাতে এগিয়ে দেয় গুলনর। কুতুক বেগম পেয়ালার চুমুক দিয়ে বলেন—ঃ, এতক্ষণে যেন ভেতরটা একটু জুড়োলো। সতীন-বেটীরা বৃকে একেবারে আলা ধরিয়ে দিয়েছিল।

গুলনর বুঝতে পারে, এইবার নেশার বোঁকে প্রলাপ বকা শুরু হবে বেগম সাহেবার। কাজেই তাঁর কাছে আর না থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সে আর একটা পেয়ালো ভর্তি করে দিয়ে চলে যায় সেখান থেকে।

নেশার ধীরে ধীরে বৃন্দ হয়ে যান কুতুক বেগম। এমন সময় সেই ঘরে প্রবেশ করলেন সুলতান আহমদ মির্জা।

স্বামীকে দেখে কুতুক বেগম জড়িত কণ্ঠে বলেন—কিছু বলবে আমাকে?

আহমদ মির্জা বলেন—হ্যাঁ একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন তো দেখছি তুমি প্রকৃতিস্থ নও।

—প্রকৃতিস্থ নই? কি বলছো প্রিয়তম। একটু গলা ভিজিয়েছি বলে তুমি মনে করছো আমি মাতাল হয়ে গেছি? আরে না না কুতুক বেগম এমন অল্পে মাতাল হয় না। যা বলবার বলে ফেলা।

আহমদ মির্জা বলেন—আমি বলছিলাম কি, আরেবাকে আমি এবার সময়খনে রেখে আসবো।

কুতুক বেগম পুনরায় শরাবের পেয়ালো ভর্তি করতে করতে জড়িত কণ্ঠে বলেন—হঠাৎ পাঁচ বছরের শুকীকে সময়খনে রেখে আসার কারণ?

—তার কারণ তোমার আঙুলের খাকলে সে তোমার বড় মেয়ের মতই কুচক্রী হয়ে উঠবে।

শায়ীর কথা শুনে কুতূহ বেগম বলেন—কি! কি বললে? আমার বড় মেয়ে সালিকা কুচক্রী হয়েছিল?

আহমদ মির্জা বলেন—হ্যাঁ বিলক্ষণ। তোমার আঙুলের মানুষ হলে তারও মনের প্রসারতা বাড়তে পারে না। তোমার কাছে থেকেই সালিকা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সংকীর্ণমনা।

তীর কথা শুনে চা-চা করে হাসতে হাসতে কুতূহ বেগম বলেন—তুমি আজকাল বেশ ভালো ভালো কথা বলতে শিখেছো তো? তা নাও একটু শব্দ দিয়ে গলাটা ভিঁষিয়ে নাও।

আহমদ মির্জা উঠে পড়ে বলেন—খাক ও জিনিষ তোমারই রাখো। আর শোনো, আয়েষাকে আমি সময়খন্দ নিয়ে গিয়ে ওমর শেখ মির্জার সাথে কথা করে ওকে বাবরের বাগদত্তা করে রাখবো। পরে ওর যৌবন আগত হলে ওদের বিবাহ হবে।

কুতূহ বেগম বলেন—ছোট মেয়ের জন্মে তোমার ভাবনা বড় বেশী দেখছি। বলি বড় মেয়ের বিয়ের জন্মে কিছু ভেবেছো?

আহমদ মির্জা বলেন—সালিকার জন্মে তোমার মত কুচক্রী মানুষকেই তো মনোনীত করে রেখেছো। এতে আমার আর ভাববার প্রয়োজন কি? আচ্ছা এখন আমি চলি। বলে ঘর থেকে চলে যান আহমদ মির্জা।

কুতূহ বেগম শব্দের পেছালি রেখে দিয়ে খানিকটা বিম্ব হয়ে জাবেন—তাই তো ও এমন করে এসে কথাগুলো বলে গেল কেন? গলায় শব্দের মধ্যে কোন মিষ্টতার আভাষ পাওয়া গেল না তো? তবে কি তাঁর রূপ নষ্ট হয়েছে? একবার আঁচনাত্তে দেখতে হবে মুখটা। কুতূহ বেগম হাঁক দেন—ওরে কে আঁচিস এখানে?

ছুটে আসে কিশোরী সালিকা বেগম। সে বলে—জানো মা, বাবা আয়েষাকে নিয়ে সময়খন্দে চলে গেলেন ঐ সংমায়েরদের জন্মে—তাঁরাই নাকি বলেছেন ওকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে অল্প জায়গায় মানুষ করতে।

কুতূহ বেগম বলেন—ঐ সতীন-বেটীদের এবার আমি জীবন্ত কবর দেবো। কিন্তু তার আগে একবার আমার রূপটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে হবে। সালিকা, একবার আঁচনাটা দিস তো।

সালিকা বলে—ও ভারী আঁচনা আমি আনতে পারি না।

কুতূহ বেগম বলেন—আচ্ছা তবে গুলনরকে ডেকে দে।

আহমদ মির্জা সময়খন্দে গিয়ে দেখা করলেন, ওমর শেখ মির্জার সাথে। ওমর শেখ পাঁচ বছরের কুটকুটে মেয়ে আয়েষা সুলতানকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তখনই মেয়েটিকে তাঁর পুত্র বাবরের বাগদত্তা হিসেবে কথা পাকা করে কেললেন আহমদ মির্জার সাথে।

আয়েষা-সুলতান তখন সময়খন্দেই মানুষ হতে থাকে এক বাজীর কাছে। বয়োবৃদ্ধির সংসেই সে পারদর্শিনী হয়ে ওঠে বিভিন্ন বিবয়ে। রূপ গুণ ক্রমশঃই পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে তার সারা অঙ্গে। এই ভাবে সে হয়ে ওঠে ঘোড়শব্দীরা এক কিশোরী।

এমন সময় একদিন কিশোর বাবর করগনা থেকে এলেন সময়খন্দে।

সেদিন আয়েষা সুলতান একাকিনী পারচারী করছে নির্জন উল্ভানে। চঠাং সে শুক হয়ে বার এক অজানা অচেনা যুবককে দেখে। আয়েষা তখন ছুটে চলে যেতে উত্তত হয় সেখান থেকে। তখন যুবকটি একবার ডাক দেয়—শোনো।

যমকে দাঁড়ায় আয়েষা। যুবকটি এগিয়ে এসে বলেন—তুমি আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছো কেন?

মুহু হেসে মেয়েটি বলে—কই না তো!

যুবকটি প্রশ্ন করেন—তোমার নাম কি?

—আয়েষা।

—কাদের বাড়ীর মেয়ে তুমি?

আয়েষা সুলতান অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দেয় তাদের বাড়ী।

যুবকটি উল্লসিত হয়ে বলেন—ও তুমিই আহমদ মির্জার মেয়ে? তবে তুমিই হবে আমার জীবনসার্থী।

আয়েষা চমকে উঠে বলে—তা কেমন করে হবে। আমি যে একজনর বাগদত্তা।

যুবকটি বলেন—তুমি কার বাগদত্তা তা জানো কি?

আয়েষা বলে—হ্যাঁ, ওমর শেখ মির্জার পুত্র জহিরুদ্দিন বাবর হবেন আমার স্বামী।

যুবকটি হেসে বলেন—আমিই সেই জহিরুদ্দিন বাবর।

বিস্মিত হয়ে আয়েষা বলে—তুমিই বাবর?

বাবর এগিয়ে এসে ধরেন আয়েষার হাতটা। আয়েষা স্মিত হেসে তাকিয়ে থাকে তার মুখের পানে। সহসা পেছন দিক হতে পদশব্দ শুনে চমকে উঠে আয়েষা বলে—কে যেন এদিকে আসছে। আচ্ছা আমি এখন চলি, আবার পরে দেখা হবে।—বলেই তুলে হরিণীর মত ছুটে চলে যায় আয়েষা সুলতান।

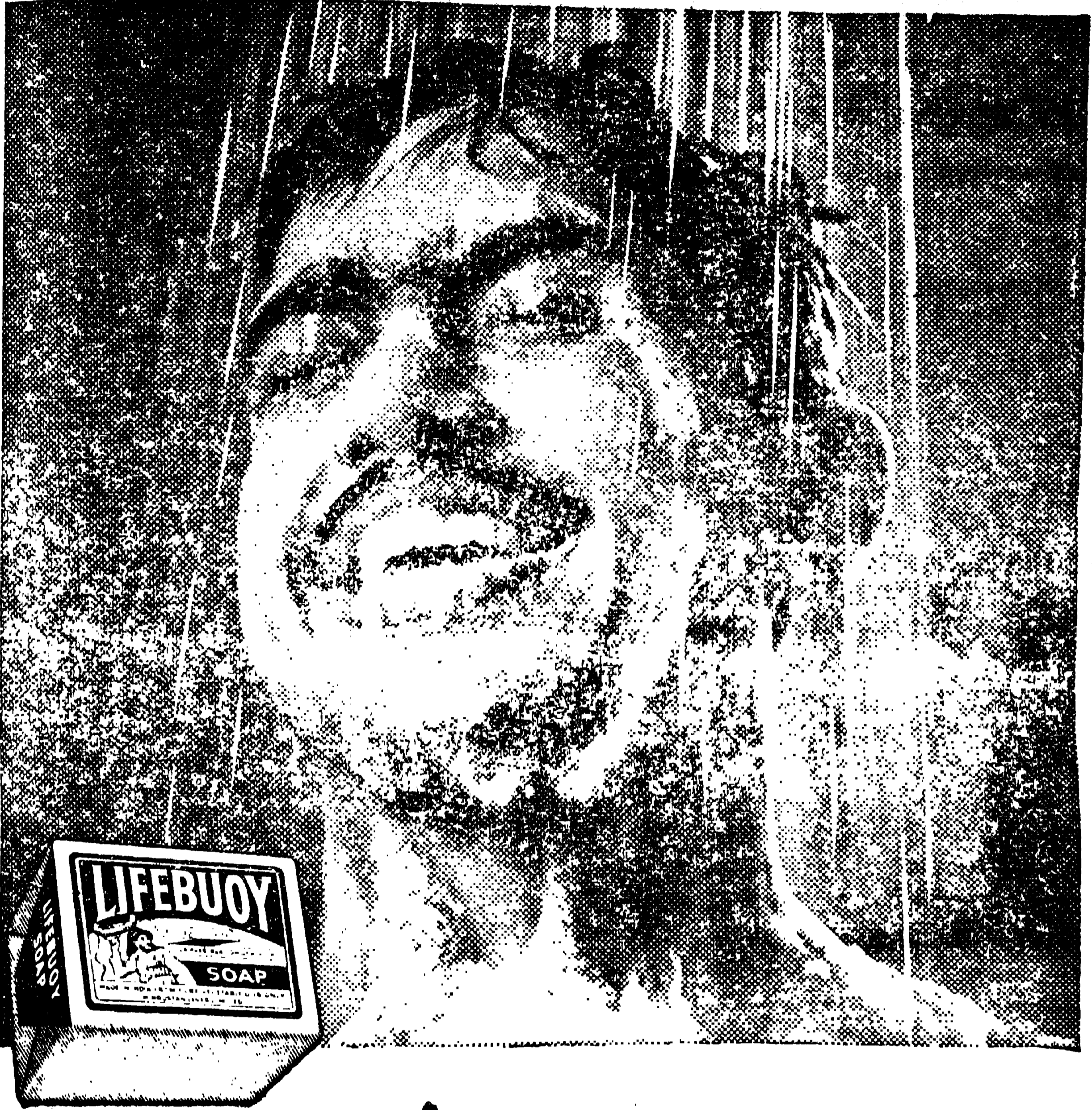
বাবরের মন তখন জ্বরে ওঠে আনন্দে। বড় চমৎকার তে মেয়েটি!

১৫০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বাবরের সাথে হল আয়েষা সুলতানের বিয়ে। এই উৎসব অল্পস্থিত হল খোজন্দ সহরে। তখন বাবরের জীবনে নানান দিক থেকে এসেছে নানান বাধা বিশেষ করে খুসরো শাহ, আর আহমদ, তাহলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় বিশেষ অশান্তি এসেছে তাঁর মনে।

তবু আয়েষাকে পেয়ে তখন তাঁর সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে আয়েষা তখন বাবরকে যেন এক নতুন জীবন দান করেছে। তা বাবরের সমস্ত ভালবাসা তখন কেন্দ্রীভূত হয়ে বসিত হয় ঐ মেয়েটি ওপর।

এই আয়েষা-সুলতানের গর্ভেই হল বাবরের প্রথম কন্যা-সন্তান তার নাম রাখা হল কককরিসা। কিন্তু বাচল না শিশুটি। ৭ মাস পূর্ণ হতেই সে চলে গেল এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে। কন্যা-বিয়োগে বাবর এবং আয়েষা দুজনেই অভিভূত হই পড়েন শোকে।

এই সময় বাবর ছিলেন করগনার সম্রাট। তাঁকে সিংহা থেকে বিতাড়িত করবার জন্মে তখন উঠ-পাড় লেগেছে তাঁর বা আন্দীর-অনাঙ্গীয়েরা। বিপদ দলের দলপতি হলেন সর্দি বেগমের স্বামী মাহুদ। কিন্তু সেই কুচক্রী লোকটি বাবরকে কোটা



লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে!

সুঁতিই, লাইফবয় মেখে গান করতে কি আরাম! শরীরটা তাজা আর
স্বস্তিরে রাখতে লাইফবয় সাবানের তুলনা নেই। ঘরে বাইরে ধূলা ময়লা লাগবেই
লাগবে। লাইফবয় সাবানের চমৎকার কেনা ধূলা ময়লা রোগ বীজাণু
হয়ে ঘরে ও বাহ্যিক বন্ধ করে। পরিবারের সবার স্বাস্থ্যের বন্ধ লাইফবয়ে।

আরও করতে না পেরে একটি হৃৎপিণ্ড সিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে
আপন স্ত্রী সালিকাকে পাঠিয়ে দিলেন আরেবার কাছে।

বহুদিন পরে দ্বিধিকে দেখে আনন্দে উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে আয়েষা
সুলতান বেগম। তার বাবা যা তো কবে গত হয়েছেন, এখন
আপন বলতে আছে শুধু এই দ্বিধিটি। সে সাদর অত্যাধনা জানিয়ে
সালিকা বেগমকে নিয়ে যায় ভেতর-বাড়ীতে।

সালিকা জিজ্ঞেস করে—তোমার স্বামী কোথায় ?

আয়েষা বলে—ও হুদিন হল বাড়ী নেই। নানা দিকে নানা
পোলমালা চলেছে তো তাই ও খুব ব্যস্ত রয়েছে।

সালিকা বলে—হুদিন বাড়ী নেই ? তা তুমি ওকে কিছু বলবি
না ?

আয়েষা বলে—কি আবার বলবো দ্বিধি ! এরকম তো অনেক
দিনই ওকে বাইরে কাটাতে হয়। আর না করলেই বা চলবে কেন ?
আমি ওড়না আড়াল করে ওকে যদি সব সময় কাছে রাখি তবে দেশ
শাসন হবে কি করে ?

বোনের কথা শুনে সালিকা বলে—এই জন্মেই তোমার এই দশা।
পুরুষদের অন্ত বিশ্বাস করা ভাল নয়। এই যে হুদিন তোমার কাছে
রইলো না তা রাতটা কোথায় কাটালো শুনি ?

আয়েষা বলে—হি দ্বিধি, একি তুমি বলছো ! ও সে-ধরণের
মানুষই নয়।

সালিকা বলে—আরে বাবা কত মানুষ দেখলাম। বাইরে
তাদের কতই না ভাল মনে হয় এদিকে ভেতরে ভেতরে তাগাই করে
বেড়ার কত কাণ্ড। আর তোমার স্বামীর মন যদি নিষ্পাপ হত তা
হলে তোমার কোলে সন্তান এসেও কি কখনও চলে যায় ? তা বা
হোক বাপু তোমার সংসার তুমি বুঝিস, এখন আমি চললাম।

আয়েষা বলে—সে কি দ্বিধি এখন চলে যাবে ?

সালিকা বলে—হ্যাঁ হাই। তা শোন, তোকে যে কথাটা বলতে
এসেছিলাম। আমার ছেলের জন্মদিন দোস্তরা শাবানে। যাবি,
বুঝলি ?

—আচ্ছা।

সালিকা সুলতান বেগম চলে যেতেই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে
আয়েষা সুলতানের মন। সত্যি অনেক রাতই তো তার স্বামী বাড়ী
থাকে না। তবে সত্যি কি ওর অন্ত কোন প্রেয়সী আছে ? নিশ্চয়ই
আছে। না হলে তার দ্বিধি এমন কথা বলে যাবে কেন ? ও নিয়ে
সেখানেই রাত কাটায়। বাবার সময় মিথ্যে করে বলে যায় অন্ত
কাজের কথা।

—কি এত ভাবছো প্রিয়তমা ? বলি এই রকমটিকে নয় তো ?

আয়েষা বেগম কোন কথা না বলে একবার বিবাহ নয়নে তাকায়
বাবরের মুখের পানে।

বাবর বলেন—আবার তুমি মেয়ের কথা ভেবে শোক
করছো ? আমি তোমাকে বলছি না তুমি ছেলে ভালবাসো,
দেখবে এবার তোমার কোলে আসবে একটি ফুটফুটে ছেলে।

আয়েষা বলে—এই হুদিন তুমি কোথায় ছিলে ?

বাবর বলেন—ও আর বলো কেন ! বনে-বাদাড়েই প্রায়
কেটেছে এই দুটো দিন।

আয়েষা জিজ্ঞেস করে—রাত্রে কোথায় ছিলে ?

—সেও প্রায় বনে-জঙ্গলেই কেটেছে। দুটো রাত একেবারে
বুমোতে পারিনি। আমাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে যে কি
জঘন্য বড়বন্দু চলেছে, তা তোমাকে কি বলবো ? কিন্তু আমিও
এসবে বড় কম যাই না। তাদের কি ভাবে শাস্তি দিতে হয়, তাও
আমার ভাল রকম জানা আছে।

আয়েষা বলে—তুমি সত্যি বলছো রাত্রে বনে-জঙ্গলে কাটিয়েছো ?

বাবর বলেন—তবে তোমাকে কি আমি মিথ্যে বলছি ?

আয়েষা বলে—আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা। তুমি
কাজের নাম করে নিশ্চয়ই কোন বিলাসকুঞ্জে গিয়ে রাত কাটাও।

তার কথা শুনে বাবর বিস্মিত হয়ে বলেন—এ কি তুমি বলছো
আয়েষা ?

আয়েষা বলে—ঠিকই বলছি। তোমার মনে পাপ আছে বলেই
আজ আমি কষ্টাহারা।

আয়েষার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান বাবর। এবার তিনি
এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলেন—এসব কথা তোমাকে কে
বলেছে ?

আয়েষা বলে—আঃ, আমার হাত ছাড়ে।

বাবর বলেন—না আগে বলো, তোমায় কে বলেছে আমি
বিলাসকুঞ্জে গিয়ে রাত কাটাই ?

আয়েষা বলে—কে আবার বলবে ! তুমিই তো বলছো
জৈনব সুলতানকে তুমি ভালোবাসো।

বাবর বলেন—হ্যাঁ, জৈনব সুলতান বেগমকে আমি ভালবাসতাম
সত্যি কথা। কিন্তু যেদিন আমাদের বিয়ে হয়েছে, সেদিন থেকে
আমি তার কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

আয়েষা বলে—আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস করো না ! তবে দূর হয়ে যাও আমার সামনে
থেকে !—বলেই বাবর ক্রোধে আরক্ত হয়ে সজোরে ধাক্কা দে
আয়েষাকে।

আয়েষা বেগম সেই ধাক্কার টাল কোন রকমে সামলে নিয়ে ব
—ইস, এই তোমার পৌত্র ! বেশ, তবে আমি এখন চলে বা
তোমার বাড়ী থেকে।

আয়েষা তখন নিজের হুঁ-একটা প্রয়োজনীয় জিনিস
বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে। এবং সে গিয়ে ওঠে তার দ্বিধি সারি
বেগমের কাছে।

আয়েষা সুলতান বেগমের এই আচরণে অত্যন্ত অবাক
যান বাবর। হঠাৎ ওর মধ্যে এমন পরিবর্তন এল কি করে ?
আয়েষাকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসেন, সে এমন ভাবে
যেতে পারলো ? না কি এইটাই তার আসল পরিচয়। এ
তা চাপা ছিল অন্ত কোন কারণে। তখনও মাথা ঠাণ্ডা করে
ভাবতে পারেন না বাবর। তবে মনে মনে এইটুকু স্থির
রাখেন, আয়েষাকে তিনি আর কখনই ঠাই দেবেন না
কি। অল্পতপ্ত হয়ে সে কিরে এলেও তাঁর মন গলবে না।
তিনি জৈনব বেগমকেই বিবাহ করবেন। যে আয়েষার জন্যে
সেই মেরটিকে অবহেলা করছেন, এবার তিনিই তার প্রতি
করবেন।

ওদিকে আয়েবাকে আসতে দেখে অত্যন্ত ধূসী হয়ে ওঠে সালিকা সুলতান বেগম। তবে তার চেয়েও ধূসী হয়ে ওঠে তার স্বামী মান্নদ। বাবরের কাছ থেকে যখন তার স্ত্রীকে টেনে আনা গেছে, তখন করগনা অধিকার করা তার পক্ষে আর মোটেই কষ্টকর নয়। এখন শুধু কৌশলে আয়েবার নিকট হতে বাবরের কতকগুলো গোপন তথ্য জানার অপেক্ষামাত্র।

এদিকে বাবরের সাথে বিবাদ করে চলে এসে দিন কয়েকের মধ্যেই অত্যন্ত বেদনার ভরে ওঠে আয়েবার মনটা। তার মনে হয় এমন করে চলে আসা তার পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। স্বামীর সাথে এমন রূঢ় ব্যবহার সে কেন করলো। হাত কামড়ায় আয়েবা। কান্নায় সজল হয়ে ওঠে তার চোখ।

সেদিন বেদনা-ভরা মন নিয়ে একাকিনী বসে রয়েছে আয়েবা। এমন সময় সেই ঘরে প্রবেশ করে মান্নদ। তাকে দেখে বুকের ওড়নাটা সামলে নেয় আয়েবা।

মান্নদ বলে—জানো আয়েবা, এতদিন আমার বাড়ী ছিল অন্ধকার। তুমি আসাতে চতুর্দিক যেন আলোয় ঝলমল করছে।

আয়েবা ব্যস্ত হয়ে খানিকটা সরে বসে বলে—এ কি আপনি আমার গা ঘেঁষে বসবেন নাকি ?

মান্নদ ক্রুর হাসি হেসে বলে—তা বসলামই বা। দুদিন পরে যাকে নিকে করতে হবে তার দেহের পরশ না হয় একটু আগেই পেলাম ?

তার কথা শুনে শিউরে উঠে আয়েবা বলে—এ কি বলছেন আপনি। আমার স্বামী জীবিত থাকতে এমন ঘটনা কখনই ঘটতে পারে না।

তার কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠে আয়েবা বলে—স্বামীর গরব আর কয়ো না আয়েবা। বাবর এবার এক অস্ত্র নারীর পাণিগ্রহণ করবেন। তিনি তোমাকে আর কখনই গ্রহণ করবেন না। তা তুমি যদি বাবরের কতকগুলো গুপ্ত কথা আগাকে জানিয়ে দাও, তবে আমি এই রাতই গিয়ে তাকে শেষ করে আসতে পারি।

আয়েবা তার কথা শুনে চমকে উঠে বলে—কে বলেছে আমার স্বামী আবার বিয়ে করতে যাবেন। কে বলেছে তিনি আমাকে আর গ্রহণ করবেন না ?

মান্নদ বলে—এ কথা আজ আর কারও অজানা নেই। তাই বলছিলাম আয়েবা তুমি আমার বৃকে এসে আমার সব জালা দূর করো। বলেই সে চেপে ধরে তার হাতটা।

তখন আয়েবা সুলতান বেগম সজোরে চীৎকার করে ওঠে—ছেড়ে দিন! ছেড়ে দিন আমার হাত! আমি আপনাকে এক মুহূর্ত সহ করতে পারছি না।

তার চীৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে সালিকা সুলতান বেগম। এসেই সে স্বামীকে তৎসনা করে বলে—আচ্ছা তুমি এত তাড়াতাড়ি করছো কেন? তোমাকে কতবার বলেছি না একাজ ধীরে শুষে করতে হবে। ওকে এখন একা থাকতে দাও। দেখছো ওর মনটা ভাল নেই। বলেই বোনের প্রতি ফিরে সালিকা বলে—তুই কিছু মনে করিস না আয়েবা। এখন শুয়ে পড়। রাত অনেক হল।

এই বলে সালিকা ও মান্নদ চলে যায় ঘর থেকে।

এদিকে আয়েবা, তার দিদি এবং দিদির স্বামীর কথায় এবং ব্যবহারে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার বুঝতে বাকী থাকে না এরা তাকে দিয়ে ওদের নিজেদের কার্যসিদ্ধি করতে চায়। এরা হত্যা করতে চায় বাবরকে। দিদি সালিকার প্রতি তার ভ্রমণে ওঠে এক নিদারুণ বিতৃষ্ণা। এই ভয়েই সেদিন সে গিয়েছিল তার বাড়ীতে এবং মিথ্যে সে বাবরের ছুঁচাম রটিয়ে তার মন দুঃখিত করেছে। আয়েবার দারুণ আকস্মিক হয় সেদিন সে তার কপট অভিসন্ধি না বুকে স্বামীকে কি অকথা-কুকথাই না বলেছে। কিন্তু না আর নয়। আজ রাতের অন্ধকারেই আয়েবা এই শত্রুপুত্রী থেকে চলে যাবে তার স্বামীর কাছে। গিয়ে সে তাঁর পায়ের লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইবে তার অপরাধের।

এই মনে করে নিশ্চপ হয়ে বিছানায় বসে থাকে আয়েবা। ক্রমশঃ গভীর হয়ে আসে রাত। বাড়ীর সকলেই অভিভূত হয়ে পড়ে নিদ্রায়। তখন আয়েবা অত্যন্ত সতর্পণে সেই বাড়ী থেকে নিজস্ব হয়ে পাহাড়-পর্বত ভিত্তিতে ছুটে যায় করগনার দিকে।

যখন আয়েবা বাবরের প্রাসাদের কাছাকাছি পৌঁছালো তখন ভোর হয়ে এসেছে। আবছা আলোয় দেখা গেল অত্যন্ত সুসজ্জিত করা হয়েছে প্রাসাদটি। দেখে একটু অবাক হয়ে যায় আয়েবা। বিশেষ কোন উৎসব না থাকলে এমন করে তো প্রাসাদ সাজানো হয় না। তবে আজ কিসের উৎসব? কই এত তাড়াতাড়ি কোন উৎসব আছে তা আসবার সময় তো আয়েবা শোনেনি।

একটা গাছের আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আয়েবা। চেয়ে দেখলো সেদিক পানে এগিয়ে আসছে একটি কাঠকুড়ানী বৃদ্ধা। আয়েবা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গো, বলতে পারো এই করগনার রাজপ্রাসাদ আজ এত সুসজ্জিত কেন ?

কাঠকুড়ানী বৃদ্ধাটি বলে—ও মা আজ যে সত্রাট বাবরের বিয়ে। চমকে উঠে আয়েবা বলে—সে কি সত্রাট, কি আবার বিয়ে করবেন ?

বৃদ্ধা বলে—হ্যাঁ গো। তা না হলে তাঁর চলবে কেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী যদি তাঁকে পরিত্যাগ করে অস্ত্র একজনের সাথে টলাটলি করে তবে তাঁর বিয়ে না করে আর উপায় কি বলুন মোসাম্মৎ।

আয়েবা জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা সত্রাট এবার কাকে বিয়ে করছেন তুমি বলতে পারো ?

বৃদ্ধা বলে—এবার তিনি বিয়ে করবেন সুলতান মহম্মদ মির্জার মেয়ে জৈনব সুলতান বেগমকে।

—জৈনব সুলতান কে! কথাটা উচ্চারণ করে আর যেন স্থির থাকতে পারে না আয়েবা। মনে হচ্ছে তার সমস্ত শরীরটা যেন টলছে। সে একটা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে বসে পড়ে সেখানেই।

তাকে ঐ ভাবে বসে পড়তে দেখে বিস্মিত হয়ে কাঠকুড়ানী বৃদ্ধাটি বলে—আপনার কি হয়েছে মোসাম্মৎ ?

আয়েবা সুলতান হুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলেন—না গো আমার কিছু হয়নি।

কে তুমি

কুমারী মধুসূন্দা দাশগুপ্তা

বোধ হয় বিধবা ও
তাই পুরে সাদা শাড়ী থাকে নিরাতরণা,
এলোচুলই ভালবাসে
মাঝে মাঝে খোঁপা রাঁধে
খুবই সন্তর্পণে, যেন কত অপরাধ ।
বিমর্ষ মুখখানি
তবু ভারী সুন্দর
হুঁটি সুগভীর চোখ
দেখে মায়ী লাগবেই
আমার তো বেশ লাগে চুরি করে দেখতে ।
আবার কখনো ভাবি
বোধ হয় কুমারী মেয়ে
জন্ম মনের মত পবিত্র বেশবাস
কাছ থেকে হরতো বা মনে হবে কোটা ফুল ।
কেন এ বিয়োগ ওর ?
একটু সাঙ্গলে পরে এমন কি কতি হয় ?
নিটোল ফর্সা হাতে
ষড়িটা কি অপরূপ
আরেকটা হাত কেন খালি থাকে কে জানে !
এ হাতে সোনার বালা
মানাতো কি সুন্দর ।
সাধ হয় দেখি ওকে লাল শাড়ী পরিহিতা
কপালে ছোট টিপ
কানে মুক্তার কথা
একটু গোলাপী আভা অধরে ।
সকালে বিকেলে শুধু বার কথা ভেবে মরি
জানি না কিছুই তার পরিচয়
হয়তো সে কল্লনা
কিংবা কুহেলী, মায়ী
অথবা মানসী প্রিয়া আমারই ।

কল্লনারী : ১১ শতাব্দী

কাকলী বসু

"আমরা তো অশ্রুচি নির্বল কর্তন দিনে
বুহুর্ন্তের চূড়া থেকে উম্মুক উদ্ঘাটন
আত্মত্র নয়তা হ'তে খোঁয়াত্তরা আকাশেতে
নিবিশেষ সমর্পণ ;—ক্রম থেকে সাবরণ ।
তবু তো বৃহা আছে", এই বলে সে তাতাল
মেয়েটির দিকে ।

মেয়েটি তাকিয়েছিল
আকাশের পানে । যে আকাশ কাল হলো
মিলের খোঁয়ায় । যে আকাশ দিয়েছে আশাস
প্রথম পুরুষ আর প্রথম নারীকে ;
সে যে সেই নারী ।
অপ্নের খোঁসা দেখে কাঁপে তার ঝপিল ছায়া ॥
ছেগেটির মুখ,
নির্ধিকার প্রেতাগ্নিত ঠাণ্ডা শায়ুক
অব্যক্ত বিগলিত অন্ধকার রাতে
শূন্যতায় প্রকিপ্ত মূর্তি যেন এক ।
শব্দময় স্তব্ব বৃকে তার
সময়ের দাগ কাটে চেতনের নিভৃত কোণায় ।
ছেলেটি তাবগো শেষে এই শ্রিয়া তার
গুহা হত গুঢ় অন্ধকার,
ঠেলে দোছে ছেলে দেবে হাজার মশাল ।
নাই বা রহিল তার নাগরিক কাপট্যে ছলনা
কর্কশ গুরুতা থাকে আদম ইভের
তবু জানে তারা, হৃদয়ের স্পষ্ট উচ্চারণে
প্রচ্ছন্ন প্রাণের আয়োজনে
মন তার সুব্যক্ত, বাহ্যে ।
নরনারী : প্রমত্ত সত্যতা আর রক্তাক্ত হৃদয়
চিত্তার তৃণ ছিঁড়ে বুধা শুধু স্নায়ু অপব্যয়
তার চেয়ে জমা হোক কাল্লার ফসল
শব্দহীন অটহাস্তে শতাব্দীরে নির্ধূম ঘুণায় ।

সর্বশ্রেষ্ঠ

(Browning-এর Summum Bonum হইতে)

এক মৌমাছি বাপ্য বেখেছে
সারা বছরের মধুরিমা আর সৌন্দর্যের দল :
একটি বকু জন্মস্বতে ধরে
বিশ্বর আর খনির বিস্তর স্থল :
মুক্তার মাঝে জড়াইয়া আছে
সিদ্ধর ছায়া-আলো:

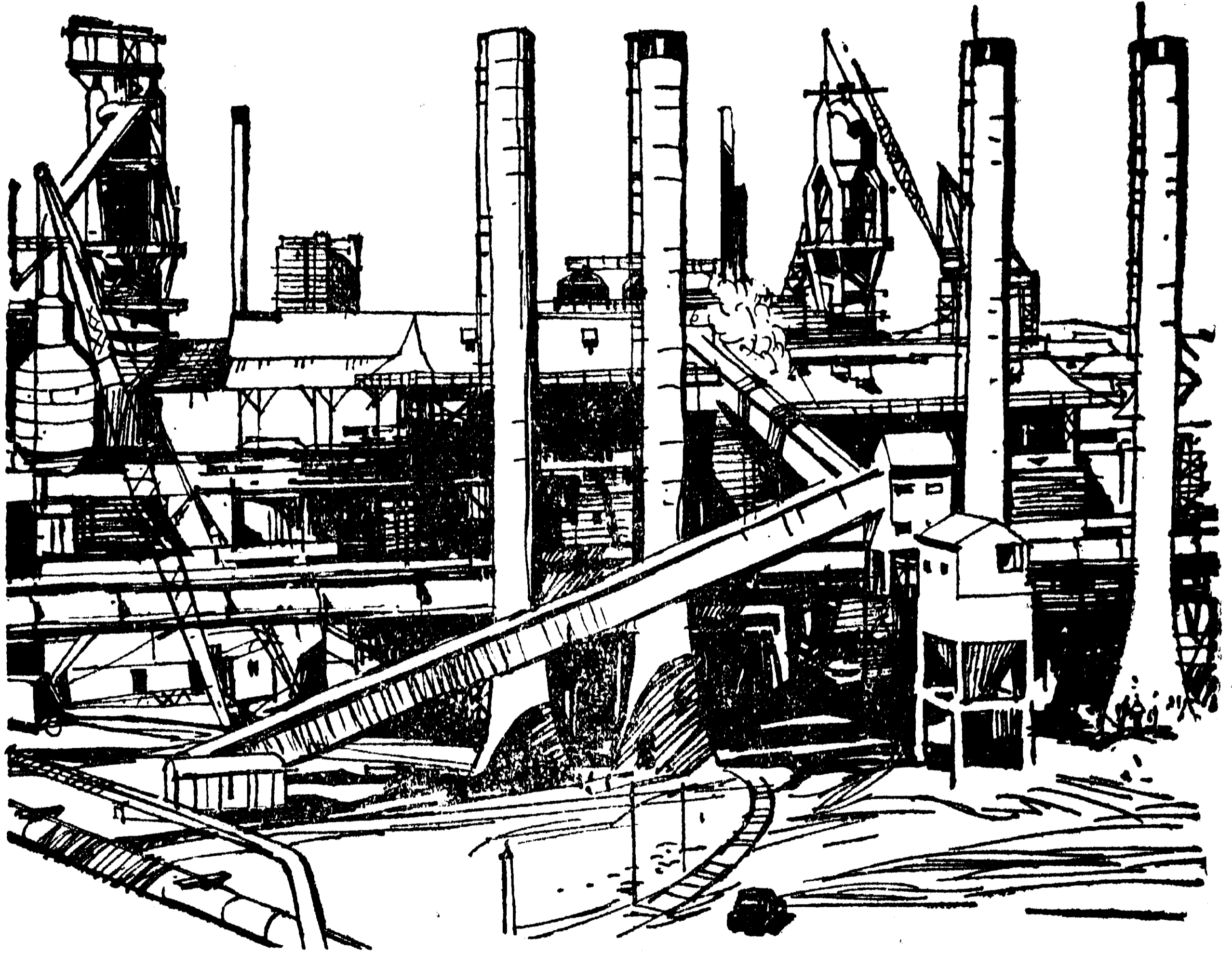
মধু ও পুষ্প, ছায়া আলো, আর বিশ্বর, বৈভব
সত্যের কাছে উচ্ছলতার বস্তুর পরাভব,
বিশ্বাস সে ত পবিত্র চেয়ে মুক্তাখণ্ড ভালো
বিশ্বের এই দীপ্ত সত্য, প্রত্যয় পুততম
আমার জন্ম, মনে
জমা রহিয়াছে তবু কুমারীর একটিই চুবনে ।

অনুবাদিকা—শ্রীমানসী ব



দুর্গাপুরের কেন্দ্রস্থলে

ব্রিটিশ বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠান ইঙ্কন দুর্গাপুরের কেন্দ্রস্থলে
সম্পূর্ণ ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করছেন। এই সমস্ত
কার্য শেষ হলে এই কারখানাটি অস্বাভাবিক বহু ইস্পাত
সংস্থার আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াবে এবং ভারতের হস্ত
লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে দেশে নতুন



ইঙ্কন

ইন্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কন্সট্রাক্শন্স কোং লিঃ

এই ব্রিটিশ
কোম্পানিগুলি
ভারতের
সেবার রত

ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
হেড রাইটসন্ অ্যান্ড কোম্পানি লিঃ সাইমন-কার্ভস্ লিঃ
দি ওয়েলম্যান শিখ ওয়েন এন্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ
দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ ব্রিটিশ টমসন্-হস্টন কোম্পানি লিঃ
দি ইংলিশ ইলেক্ট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেক্ট্রিক
কোম্পানি লিমিটেড মেট্রোপলিট্যান-ভাইকস্ ইলেক্ট্রিক্যাল
এক্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ ডার উইলিয়াম অ্যাল অ্যান্ড
কোম্পানি লিঃ ক্রীডল্যান্ড ব্রিজ অ্যান্ড এন্জিনিয়ারিং
কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লন্ড (ব্রিজ অ্যান্ড এন্জিনিয়ারিং) লিঃ
জোসেফ পার্কস্ অ্যান্ড সন্ লিঃ ইঙ্কন কেব্লে গ্রুপ (সিমেন্ট
এডিসন সোয়ান লিঃ এবং গিরেলি জেনারেল কেব্লে ওয়ার্কস্ লিঃ)



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরজন দাশগুপ্ত

ভায়লেটের এ-সব ব্যবহার আর যে কোনও প্রয়োজন নাই, আমি যে অল্প বকম ঠিক করেছি—বলি-বলি করেও ভায়লেটকে বলা হলনা। এই ঠাণ্ডার ম্যানচেষ্টারে গিয়ে দুদিন খেটে সব ব্যবস্থা করে এক প্রাণ উৎসাহ ও আনন্দ নিয়ে আমাকে এসে বখন সব বলল, তখনই তার মুখের উপরে এ সব ব্যবস্থা বুঝা, বলতে আমার বাবল।

তুণ্ড তাই নয়, আমার কথাটা বললে ভায়লেট হঠাৎ ভীষণ দুঃখিত হবে—কেন জানি না, এরকম একটা ধারণাও আমার মনে হয়েছিল। মার্চিন চলে বাওয়ার পর ভায়লেট সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে আমাকে যে বকম সেবা-বহু করেছে তাতে সে যে আমার প্রতি একেবারেই উদাসীন নয়, সহঃ বৃদ্ধিতে পেরেছিলাম। আমাকে আবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে সুখী করার উদ্দেশ্যে সে যেন প্রাণপাত করেছে। তাই চর্চায় তার মনে দুঃখ দিতেও মন সঙ্কুচিত হল। কিন্তু বলতেই তা হবে।

বলি-বলি করেও সেদিন কথাটা বলা হলনা। ভায়লেট যেন সমস্ত দিন নিজের প্রাণের আনন্দে মগন হইয়া বসে বসে—নিজের ভাবই তন্নয়। পাঁচ বাঘ আমার কাছে এসে—ম্যানচেষ্টার গেলে কি বকম কি ব্যবস্থা হবে না হবে—এই কথা গেল বল।

পরের দিন সকালবেলা মনে হল—আর দেবী কয়া উচিত নয়। আজট ভায়লেটকে সব বলব। সকালবেলাই একখানা চিঠি পেলাম—টমাস কুকের চিঠি। মার্চের শেষ সপ্তাহে P&O জাহাজে আমার ভ্রমণের বাণ্যের ব্যবস্থা তারা করেছে এবং আরও লিখেছে—পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যাপার তারা ঠিক করে দেবে। তবে বর্তমান সমস্ত ম্যানচেষ্টারে গিয়ে তাদের সঙ্গে একবার দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছে আমাকে। চিঠিখানি পকেটে নিয়ে সামান্য অভিমুখে যাবানা হলাম।

ভায়লেটের সঙ্গে দেখা হল—একগাল হেস আমাকে অভিনন্দন জানাল। এত প্রাণখোলা হাসি ভায়লেটের এর আগে দেখেছি কি না সন্দেহ।

চিঠি বোঝা গেল। তাদের দেখার কাজ শেষ করে, ভায়লেট 'তা' নিয়ে আমার গবে বসে বলল, "দেখুন, ডাঃ নাইটকে আজই আপনার একখানা চিঠি লেখা দরকার—তাকে বিশেষ বক্তব্য দিয়ে

এবং ব্যবস্থা পাকা করে। দিন কয়েক বাদে একদিন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই চলবে।"

মুখে কিছু না বলে পকেট থেকে টমাস কুকের চিঠিখানি বাব করে ভায়লেটকে দিলাম। বললাম, "পড়ে দেখ।"

ভায়লেট চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল। লক্ষ্য করলাম, পড়তে পড়তে মুখ অস্বাভাবিক গভীর হয়ে গেল। পড়া শেষ করে চোখ তুলে সোজা আমার দিকে তাকাল। শুধাল, "এর মানে কি?"

বললাম, "ভায়লেট। আমি আর এদেশে থাকব না। নিজের দেশে ফিরে যাব ঠিক করেছি।"

একটু স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে বইল চেয়ে। সহজেই বুঝতে পারলাম—দারুণ বেগে গেছে, চোখ দিয়ে যেন আশ্রন বেরুচ্ছে। শুধাল, "তাহলে আমাকে এখন নাচালেন কেন?"

বললাম, "ভায়লেট। ভেবে দেখ, বা ঘটেছে তারপর এদেশে আমার মন আর থাকতে চাইছে না—সেইটেই স্বাভাবিক।"

বেশ জোরের সঙ্গে বলল, "তা একথা আগে বলেননি কেন?"

বললাম, "ভায়লেট। উদ্বেজিত হয়ে না। তুমি যে এত শীঘ্র এক কাজ করে বসবে—আগে বুঝতে পারিনি।"

বলল, "কি বুঝছিলেন? আমি শুধু শুধুই এতদিন আপনার বোকা বইছি?"

কথাটা ভাল লাগল না। বললাম, "ভায়লেট। এতদিন তোমার উপর একটা বোঝার মতন ছিলাম—সে অল্প আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

বলল, "চুকে গেল? শেষ পর্যন্ত আপনার মুখের একটু দুঃখ প্রকাশেই আমি কৃতার্থ হয়ে যাব ভেবেছিলেন? আপনার দত্ত কয় নয়?"

জোরের সঙ্গে বললাম, "ভায়লেট। কি যা-তা বলছ?"

খানিকক্ষণ চুপ করে বইল। তারপর নিজেকে যেন সামলে নিল। ধীরে ধীরে বলল, "এদেশে আপনার এমন সোনার ভবিষ্যৎ—সব ছেড়ে আপনি দেশে ফিরে যাবেন? না—না ডাঃ চাউডুরী! তা হতে পারে না, ভেবে দেখুন—তোরাই আপনার।"

দৃঢ় হয়ে বললাম, "ভায়লেট। আমি ফিরে যাবই।"

মুখখানা যেন কেমন একটু কক্ষ হয়ে উঠল। একটু যেন কাতর ভাবেই বলল, "কেন যাবেন? কি আছে দেশে আপনার?"

একটু পর্ক ভবেই বললাম, “বা আছে, তা তোমরা ধারণাও করতে পার না। আছে—সত্যি পুণ্য স্মৃতি।”

তথাল, “তার মানে?”

বললাম, “খোন ভারলেট। মালিনের আগে দেশে আমার আর এক বিবাহ ছিল। সে মারা গেছে। আমারই জন্ম দিয়েছে প্রাণ। তবে তার স্মৃতি আছে। দেশে কিং গিরে তার নামে নার্সিংহোম করে নিজেকে দেব বিলিয়ে—সেই স্মৃতির তর্পণ।”

ভারলেট আবার বেন উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, “উঃ অসহ, অসহ! পুরুষের মধ্যে এই ভাববিলাস অসহ।”

বললাম, “এ সব বোকার শক্তিটুকুও নাট তোমাদের।”

তীক্ষ্ণ ভাবে বলল, “এ-সব বৃত্তে কোনও শক্তির দরকার হয় না। এ-সব মনের আদিম দুর্বলতা।”

গম্ভীর ভাবে বললাম “বাক, এ-সব নিয়ে আর কোনও আলোচনা করতে চাই না তোমার সঙ্গে।”

একদৃষ্টে চেয়ে বসল আমার দিকে। চোখের মধ্য দিয়ে বেন একটা বাগ ও ঘুণা ঠিকরে বেরুচ্ছে। একটু পরে বেন নিজের মনেই বলতে লাগল “সত্যি। সত্যি। বার বিষয় জানিনা সেই সত্যি। জীবনে সত্যি কেউ নেই ডাক্তার। ওটা একটা আদর্শ—একটা কল্পনাবিলাস মাত্র। এখানে আমি আপনার চোখ খুলে দিয়েছি। সেখানে যদি কেউ আপনার চোখ খুলে দিত, দেখতেন—”

চৈচিয়ে ধমক দিলাম, “ভারলেট। চূপ—তার বিষয়ে কোনও কথা আমি সহিব না। এ তোমাদের দেশের মেয়ে নয়।”

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে বসল। তারপর এ কি। মুখখানা একটু নবম হয়ে ক্রমে বেন গেল ভেঙ্গে। চোখ দিয়ে টস-টস করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মায়া হল কি? বেচারি। জীবনে স্নান চিনল না। ধমকটা একটু বেন বেশী বকমের হয়ে গেছে।

একটু সাবনার সুরে বললাম, “ভারলেট। বুধা নিজেকে অতিক্রম কর না।”

হঠাৎ টেবিলের উপর মাথাটি বেখে ফুঁপিয়ে উঠল কৈদ।

কাল্পজড়িত কাণ্ড বলল, “বুধা। বুধা। নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর আপনি। কোনও ইংরেজকে নিয়ে আর সম্ভব নয়, তাই আপনাকে নিয়ে জীবনটাকে হরত নতুন করে গড়তে পারব—হরত দেখতে পাব আবার জীবনে স্নানকে। সব ভেঙ্গে গেল—সব—”

হঠাৎ উঠে ক্ষতপদে ঘর থেকে গেল চলে।

সেদিন ভারলেটের ওখানে আর লাঞ্চ খাওয়া হল না। খানিকক্ষণ অফিসঘরে চূপচাপ রইলাম বসে। শুভিতে দেড়টা বখন বাজল—লাঞ্চ খাওয়ার ডাক এল না, তখন নিজেই উঠে গেলাম খাওয়ার টেবিলের কাছে। দেখলাম—খাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত নাই। ভারলেট কোথায়? শোবার ঘরে? ডাকলাম—ভারলেট। কোনও জবাব এলো না। বসছে? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সার্জারী থেকে বেরিয়ে পড়লাম—টেশনের কাছে একটা কাকে আছে, সেইখানে বা হয় কিছু নেব খেয়ে।

বিকেলবেলা সার্জারীতে বখন এলাম—তখন সন্ধ্যা হয়েছে। সার্জারী মাসের দশ-বারো তারিখ—এখন ত ওটা বাজার সঙ্গে

সঙ্গেই সন্ধ্যা হয়। সার্জারীতে গিয়ে দেখলাম—সার্জারীর দরজা বন্ধ। একটু অবাক হলাম। রোগীদের জন্ম দরজা ভারলেট ত খুলেই রাখে।

দরজার ঘটা টিপতেই—সেই মেয়েটি এসে দরজা দিল খুল। সেই মেয়েটি—বাকে ভারলেট ম্যানচেষ্টার বাওয়ার সময় আমার রোগীর জন্ম রেখে গিয়েছিল। একটি ১৮ ১৯ বছরের মেয়ে—নাম মিসু হোয়াইট। তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে তথালাম, “তুমি। ভারলেট কোথায়?”

মুহূ হেসে বলল, “তিনি চলে গেছেন সার।”

তথালাম, “কোথায়?”

বলল, “তা ত বলে বান নি? তবে আমাকে সব বুঝিয়ে বলে গেছেন—আপনার রান্নাবান্নার ব্যবহার কথা।”

অফিসঘরে গিয়ে বললাম। এ কি। টেবিলের উপর চাপা দেওয়া একখানি চিঠি। চিঠিখানা খুললাম—ভারলেটেরই চিঠি বটে।

লিখেছে—“ডাঃ চৌধুরী। আমার জীবনে আপনাকে আর প্রয়োজন নাই। এমন কি—আপনার মুখ দেখাও ইচ্ছা আর নাই আমার। তাই চলে যাচ্ছি, টাকাকড়ির কোনও দাবী-দাওয়া আমি রাখি না, তাই এক মাসের নোটিশ দেওয়ার কোনও কারণ নাই।”

ইতি—

ভারলেট মিলবার্ণ।

চিঠিখানা পড়ে, খানিকক্ষণ চূপ করে বসে রইলাম। ভারলেটও জীবন থেকে চলে গেল।

বারো

ভারলেট চলে যাওয়ার বোধ হয় পাঁচ-সাত দিন পরেই—ব্যাপারটা ঘটল।

একদিন রাত্রে, রাত তখন বোধ হয় দশটা, আমি আমার লাউজে বসে আছি—শুভে বাব-বাব ভাবছি। আঙুনটাকে বহুদূর সম্ভব প্রথর করে দিয়েছি, কেন না বাইরে হৃদ্য শীত—বোধ হয় এতক্ষণে বরফ পড়তে আরম্ভ হয়েছে। আঙনের কাছ থেকে বেন নড়তে পারছি না, তাই শুভে বাই-বাই কবেও শুভে বাওয়া হয়ে ওঠেনি। এমন সময় হঠাৎ টেলিকোন বাজল। এত রাত্রে কে টেলিকোন কবে—জরুরী রোগী? না—বাবে না, এত রাত্রে এই শীতে বেকনো অসম্ভব—ভাবতে ভাবতে গিয়ে টেলিকোন বললাম। এ কি! গ্রেস লালকাকা।

তথালাম, “কি খবর—এত রাত্রে?”

গম্ভীর গলায় বলল—“আপনি এখুনিই চলে আসুন আমাদের বাড়ীতে। দেবী করবেন না।”

তথালাম, “এত রাত্রে কেন?”

বলল, “সব কথা টেলিকোনে বলা যায় না। চলে আসুন—এতটুকুও দেবী না করে।”

কিছুই বুঝলাম না, তবুও বুকটা বেন কৈপ উঠল। কি হল? টেলিকোনে গ্রেসের বেরকম গলা লালকাকার সাংঘাতিক একটা কিছু হয়েছে কি? বাই হোক, অমন করে ডেকেছে—বেকতেই ত হবে।

পায়ে মোটা ওভারকোট চাপিয়ে, মাথার টুপি দিয়ে ঢেকে কোনও

রকমে কাঁপতে কাঁপতে গ্যারাজে গিয়ে পাড়ী বার করলাম। চললাম—লালকাকাদের বাড়ীর দিকে।

পাড়ীতে যেতে যেতে মনে হল—মার্লিনের কথা ভিজালা করলে কি বলব। বলব—শুয়ে পড়েছে। আর ত হুটো মাস—তারপর আমাকে এদেশে আর কে কোথায় পাচ্ছে।

পাড়ী গিয়ে দাঁড়াল মাস'লাও রোডে—লালকাকাদের বাড়ীর সামনে। দেখি—দরজায় একজন পুলিশ প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ কেন? বাড়ীর সদর খোলাই ছিল। দরজা দিয়ে হুকতে বাছি পুলিশটি শুধাল—“আপনি কোথা থেকে আসছেন স্যার।”

বললাম “আমি ডাঃ চৌধুরী। লালকাকাদের বিশেষ বন্ধু।”

পুলিশটি বলল, “ওঃ! আচ্ছা আপনি বান ভিতরে, উপরে সবাই আছেন।”

ভিতরে গিয়ে সোজা উপরে উঠে গেলাম। লালকাকাদের বসবার ঘরে গিয়ে দেখি—মিঃ লালকাকা মিসেস লালকাকা ও আরও দুজন ভ্রাতৃলোক আছেন বসে। আমি বাওয়া মাত্র মিঃ লালকাকা উঠে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। গ্রেস গভীর ভাবেই বসেছিল। আমার অভিনন্দনের উত্তরে সামান্য একটু মাথা নাড়াল মাত্র।

দুটি ভ্রাতৃলোকের সঙ্গে মিঃ লালকাকা আমার আলাপ করিয়ে দিলেন—ইনি ডাঃ রাসেল এবং ইনি পুলিশ ইন্সপেক্টর জোল। ডাঃ রাসেল ক্রকলানের ডাক্তার মাস'লাও রোডের দিকে প্রাকটিস। এ কথা আগেই জানতাম। উত্তরে উঠে আমার সঙ্গে কথামর্দন করলেন।

বসে শুধালাম, “কি ব্যাপার?”

সকলেই খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর ইন্সপেক্টর জোল গভীর ভাবে বললেন, “ডাঃ চৌধুরী! কমা করবেন। আপনার স্ত্রীকে আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।”

চমকে শুধালাম, “আমার স্ত্রী! তিনি কোথায়?”

ইন্সপেক্টর জোল বললেন, “তিনি এখানেই আছেন।”

কেমন যেন ক্যাল-ক্যাল করে সকলের মুখেব দিকে চাইলাম। কিছুই যেন বুঝতে পারছি না। ইন্সপেক্টর জোলই আবার বললেন, “তাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি—জেল থেকে পলাতক আসামীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে এবং শুধু তাই নয়, টাকাকড়ি দিয়ে তাকে এ দেশ ছেড়ে আবার পলায়নের সাহায্য করতে। গুরুতর অপরাধ।”

অবাক হয়ে শুধালাম, “সে কি?”

ইন্সপেক্টর জোল বললেন, “আপনি কিছুই জানেন না—আমরা জানি। (বুহু হেসে) আপনি ভেবেছিলেন তিনি আপনাকে ছেড়ে অভ পুরুষের সঙ্গে পালিয়েছেন। কিন্তু তা নয়। আপনি সব জানলে আপনাকেও ত গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হতাম।”

একটু চুপ করে থেকে গ্রেসের দিকে চেয়ে আকুল ভাবে শুধালাম, “মিসেস লালকাকা! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।”

গ্রেস এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। আমার কথা শুনে চোখে ক্রমাল দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। একটু নিজেকে সবত করে থেকে থেকে বলে যেতে লাগল, “কি চরিত্র! কি চরিত্র! পাছে আপনাকে বললে, আপনিও তার অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যান—তাই আপনাকে

কিছু বলেনি। বাঁচিয়ে গেছে আপনাকে। প্রথম যেদিন বড়ের রাত্রে আমাদের কাছে এসে আশ্রয় নিল, আমাকে পর্যন্ত কিছু বলেনি। পাছে আমাদের পারে কোনও আঁচড় লাগে। শুধু বলেছিল (আবার কান্নায় গলা ভেঙ্গে গেল এবং একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে) ভাই! কিছুদিনের জন্য তোমার এখানে থাকতে চাই। ভেবেছিলাম হয়ত আপনার সঙ্গে একটা ঝগড়াঝাঁটি করে চলে এসেছে। আজ পর্যন্ত আমরাও ত কিছু জানতাম না।”

হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে শুধালাম, “তা এতদিন আপনাদের কাছে ছিল, খবর দেননি কেন?”

শান্ত গলায় গ্রেস বলল, “বারণ করেছিল। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার শক্তি ত আমাদের নাই ডাঃ চৌধুরী। বলেছিল—সময় হলে আমিই খবর দেব ভেব না। শুধু একদিন বলেছিল টেলিকোন করে একটা খবর নাও ত কেমন আছেন, আমার কথা কিছু বলো না।”

উঠে দাঁড়ালাম। শুধালাম, “কোথায় সে? কোথায় সে?”

ডাঃ রাসেল কথা কইলেন, “অন্ত উত্তেজিত হবেন না। ডাঃ চৌধুরী! তাঁর শরীর খুব খারাপ। হাটের অবস্থা ভাল নয়। এখন একটু ঘুমাচ্ছেন—তাই আমরা সব অপেক্ষা করছি। নাস'পাশে আছে। ও অবস্থায় আপনি গিয়ে ঘুম ভাঙালে এতদিন পরে হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হলে হার্ট সে ঝাঙ্কা না-ও সহ্যে পারে।”

কি বলব বুঝতে না পেরে আবার বস্তুচালিতের মতন বসে পড়লাম।

গ্রেসই ভাঙা গলায় বলে যেতে লাগল, “আমার দু'-তিন দিন পর থেকেই শরীর বিশেষ খারাপ হতে শুরু হল। প্রায়ই শুয়ে থাকত, বৃকের মধ্যে কি রকম অস্থিরতা। মাঝে, একটু একটু অরও হতে লাগল। ডাঃ রাসেল যোজ এনে দেখতেন। কতবার বলেছি—ডাঃ চাউডুরীকে একটা খবর দি। গভীর ভাবে বলেছে—না, সময় এখনও হয়নি। আজই পুলিশ আসার পর বলল—এইবার সময় হয়েছে, ঠকে খবর দাও। ঘুম ত একেবারেই ছিল না। এঁরা এসে ত তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমিই ডাঃ রাসেলকে খবর দিলাম। তার পর, আজই দেখলাম—কেমন যেন এলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিই এঁদের বললাম—ঘুমটুকু শেষ হতে দিন। তাই এঁরা দয়া করে অপেক্ষা করলেন।” এই বলে চোখে ক্রমাল দিয়ে আবার কাঁদতে লাগল।

ইন্সপেক্টর বললেন, “আমরা এখন ঠকে সোজা ম্যাক্টোরে জেল-হাসপাতালেই নিয়ে যাব ডাঃ চাউডুরী। সেখানে চিকিৎসার ক্রটি হবে না। আপনি ভাববেন না।”

হঠাৎ কেন জানি না, ইন্সপেক্টর জোলের দিকে চেয়ে বললাম, “কি করে জানলেন—আমি কিছুই জানি না? আমিও অপরাধী।”

বুহু হেসে ইন্সপেক্টর বললেন, “না, ডাঃ চাউডুরী! আমরা সমস্ত খবর জানি। অনেক দিন ধরে আপনি ও আপনার স্ত্রীর উপর নজর রেখেছি—যদি তাকে ধরতে পারি। খবরাখবরও নিয়েছি অনেক। আপনাকে বিশেষ করে বাঁচিয়ে দিল—আপনার পূর্বতন সেক্রেটারী মিস ভারলেট মিলবার্ণ। তাঁর কাছে আমরা সবই শুনেছি। বাই হোক, অন্তিম দুঃখের বিষয়, অনেক দিন ধরে চেষ্টা করলাম, কিছুতেই ত লোকটিকে ধরা পেল না।”

গেলাম, "কে সে, কে?"

ইন্সপেক্টার বললেন, "আপনার দ্বীপ তাই।"

চূপচাপ হয়ে গেল ঘর। কারও মুখে কোনও কথা নাই। একটু পরে ডাঃ রাসেলকে কাতর ভাবে বললাম, "আমি শুধু একবার পা টিপে টিপে দেখে আসব—যুম ভাঙাব না ডাঃ রাসেল।"

ডাঃ রাসেল বললেন, "আপনিও ত একজন বিশিষ্ট ডাক্তার। আপনি নিজেই ত বুঝতে পারছেন। হঠাৎ যদি কম ভেঙ্গে যায়—সেটা কি ঠিক হবে?"

হার রে! নিজের দ্বীপকে একবার চোখে দেখাও এখন অপরের অহুমতিসাপেক্ষ!

* * * *

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে নাস' এসে খবর দিল—যুম ভেঙেছে। গ্রেস তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল—"আমি যাচ্ছি। ডাঃ রাসেলও উঠলেন তাঁর হাতবাক্স নিয়ে। দুজনে চললেন মালিনের ঘরের দিকে। বাওয়ার সময় ডাঃ রাসেল আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি এসেছেন, এ খবরটা ক্রমে আমরা জানিয়ে দেব মিসেস চাউডুরীকে।"

ইন্সপেক্টার বললেন, "যদি বিশেষ কিছু বাধা না থাকে ডাক্তার, তাহলে ঠুকে নিয়েই আসবেন। আমরা আর বেশী দেরী করতে চাই না। নইলে আবার এতদূরান্তে পুলিশ-সার্জনকে খবর দিতে হবে।"

বেতে বেতে ডাক্তার বললেন, "আমরা ঠুকে নিয়েই আসব। বোধ হয় বেতে পারবেন। দরকার হলে ইঞ্জেকশানের ব্যবস্থা ত আছে আমার সঙ্গে। আপনাদের গাড়ী—"

ইন্সপেক্টার বললেন "আমাদের গাড়ী রাস্তায় অপেক্ষা করছে।"

দুজনে চলে গেলেন—মালিনের ঘরে।

প্রায় ১৫।২০ মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। লালকাকা বা ইন্সপেক্টার কেউ কোনও কথা বলেনি। তবে ইন্সপেক্টার ইতিমধ্যে

একবার উঠে নীচে গিয়ে একজন সার্জেন্টকে ডেকে নিয়ে এলেন উপরে।

কতক্ষণ পরে মনে নেই, ক্রমে মালিনের ঘরের দিক থেকে এগিয়ে এল তিন জন—ডাঃ রাসেল, গ্রেস ও মালিন। ইন্সপেক্টার ও লালকাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি শুধু উঠে দাঁড়াননি নয়, কেন জানি না সরে গেলাম চোখের সোজাদৃষ্টির সামনে থেকে একটু আড়ালে—মালিনকে সোজা নিজের মুখ দেখাতে হঠাৎ একটা লজ্জা এলো কি প্রাণে?

গ্রেস মালিনের বাহুখানি ধরে এগিয়ে আসছিল—চেয়ে দেখলাম মালিনের মুখের দিকে। কেঁপে উঠল প্রাণ—একখানি শীর্ণ গাঙ্গী মুখে সেই গভীর দুটো বিবর কালো চোখ আরও কিপাল আরও গভীর হয়ে উঠেছে, যেন তার মধ্যে তলিয়ে যেতে ভয় হয়, পায়ে ধৈ না পাই।

ঘরে এসে দাঁড়িয়েই সেই চোখ দুটি চাষিদের মতো বেড়াতে লাগল—যেন কিসের সন্ধানে। পড়ল এসে আমার মুখের উপরে। সজল হয়ে উঠল চোখ দুটি—ঠোটে উঠল ফুটে বৃহৎ হাসির রেখা। অক্ষুণ্ণের মুখ দিয়ে বেরল—"বিকো।"

আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ক্রতপদে এগিয়ে গেলাম—মালিনের কাছে। ঝাঁপিয়ে এলিয়ে পড়ল মালিন আমার বুকে। একপ্রাণ নিশ্বাস ঢেলে আমার কানে কানে যেন বলল, "আর আমাদের মধ্যে কোনও আড়াল নাই বিকো।"

আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরল না। লীনা—এ নামটুকু ও যেন গলায় আটকে গেল।

তারপর সব শেষ। গেল চলে। বাওয়ার সময় মুখ ফিরিয়ে একবার চেয়েছিল আমার দিকে—বুলা! অমন কক্ষণ বৃহৎ হাসি আমি আজ পর্যন্ত জীবনে দেখিনি।

[ক্রমশঃ।

আফ্রিকা

মুশাস্ত ঘোষ

অদূরে বিশাল এক মরুভূমি কবেকার শীতোক উষ্মার
ভলার, বাণিজ্য আর গাঢ় তামসিক মূলা সমারোহে
ছড়িয়েছে, বুদ্ধের সজ্জের ভাঁকে। তৈলাক্ত নেশায়
হুর্দল অস্থির শিরা কাঁপছে না। জলমগ্ন প্রথম প্রবাহে
সমুদ্রের টানে—কত কাল কেটেছিল ভাবো কতদিন—
কে তার হিসেব রাখে? সন্ধ্যার খেলার শেষে কে
অবুঝ ছরস শিশু, সে কি বোঝে ছন্দ-তর্পণ
নিবিড় রক্তেই কেন হতে চায়? নিজেদের প্রাচীন সে ঘরে।

অন্ধকারে চেনা ছিল আরেক শ্মশান, কোন গুপ্তচর
ফিরে এল নিধর কঠিন অমারাতে? বিবর্ণ পৌঁচার
নির্জীব কোটর হ'তে দৃঢ় চোখ অলে উঠে যেন
শরীরকে নিবে গেল। আর মোহনার থেকে শব্দকর্ষ
ভেসে আসে, বীণার পূজার স্তব, পূজারী কুলুর্ষ
আনন্দ প্রধানে, সবাই দেখবে ভাবে একবার কালিয়দমন।

পুরাণ-প্রেমকথা

(দণ্ডকারণ্য)

মায়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরী বীরে গড়ে উঠেছে এক জনপদ শত শতাব্দীর অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে।

দিকে দিকে আজ প্রাণের সাজা পড়ে গেছে। আশা আর আশাসে আনন্দ আর উল্লাসে কোলাহল পড়ে গেছে এই বনভূমিতে।

দৈত্যগুরুর অভিশাপে অরণ্যে পরিণত এই জনপদে আজ শ্রেয়সেছে সেদিন থেকে বহু যুগ পেরে আর এক অকারণেই অভিশপ্ত, গৃহহারা বাস্তব্যাগীর হল।

এই অভিশপ্ত কাননকে শাপমুক্তির উল্লাসে মনের আনন্দে তারা গৃহকুটীর গড়ে তোলে। বছরদিনের বক্ষা সৃষ্টিকার পড়ে খনিজের আধাত; সৃষ্টিকা শিউরে ওঠে আতঙ্কে নয়, আনন্দে; নতুন করে শতভাষা হওয়ার আনন্দে, ফলবতী হওয়ার আশাসে।

শিউনের কলকাকলির সঙ্গে আজ বনের পাখীরাও সে ঐক্যতানে সুর মিলায়,—জানায়—‘এস এস, সুস্বাগতম।’

বরবার বারিধারা আজ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে সঞ্জীবিত করে তোলে এ অহলা কাননকে।

আর জনগণের সকল শ্রমের সার্থক মূল্যস্বরূপ গড়ে ওঠে তাদের কুলে-কলে সুশোভিত আনন্দ নিকেতন তপোবনের শান্ত আর উপবনের সৌন্দর্য নিয়ে। আর আপন শ্রমের সার্থক আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে এ বাড়ীর এক তরুণ পুরুষ আনমনেই চারিদিক তাকিয়ে দেখে, তার পর এর সময়ে চোখ পড়ে যায় পাশের বাড়ীর লতাকুঞ্জের দিকে। যেখানে আজ শ্রেয়সেছে কোন দূর দেশের এক তরুণী কন্যা তার পিতা-মাতা বা আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে।

আপন কাজে ব্যস্ত সে মেয়েটি, হরত সেই দৃষ্টির আকর্ষণেই চোখ তুলে একবার তাকায় আর সে দৃষ্টির ভাবা উপলব্ধি করে একটু বা হাসে, একটু রাজা হয় আর নিরালার হয়ত স্বপ্ন দেখে।

যে স্বপ্ন দেখে চিরকালের কুমার-কুমারী, যে স্বপ্ন দেখেছিল এই মাটিতেই বহু যুগ আগেকার এক তরুণ-তরুণী। অজা আর দণ্ডক।

এক সরলহৃদয়া, অপাপবিদ্ধা ঋষিকুমারী, আর সব পেয়েও সে ভাগ্যদোষে সর্বহারা; নির্বাসিত রাজপুত্র কুমার দণ্ডক...এই সেই দণ্ডকারণ্য। তারও বহু পূর্বে সূর্যবংশের আর এক রাজপুত্রের নির্বাসনস্থল এই দণ্ডকারণ্য।

অত্যাচারী আর রাজকার্যে অহুপযুক্ত, তাই জ্যেষ্ঠপুত্র হয়েও রাজসিংহাসনের পরিবর্তে নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হলেন কুমার দণ্ডক। আজ শ্রম নিলেন এক অরণ্যের উপকণ্ঠে। কিন্তু সত্যই কি অত্যাচারী ছিলেন সেই কুমার? ছিলেন রাজ্যশাসনের অহুপযুক্ত? অথবা এই নির্বাসন-দণ্ডের অন্তরালে ছিল কোনও বিমাতার কুটিল অহুশাসন? স্বীয় পুত্রকে রাজসিংহাসনের অধিকারী করার আকুল আগ্রহে যিনি তার অজায়, বর্ষ, অবর্ষ সব তুলে গিয়েছিলেন? কে জানে সেই যুগ যুগ আগেকার কথা।

কিন্তু নির্বাসিত রাজপুত্রের সঙ্গে ছিল তার একান্ত অহুগত, অহুচরের দল। ছিল পাত্র, মিত্র, আত্মীয় বান্ধব, ছিলেন শুভাকাঙ্খী অমাত্যবর্গ। যেহারা নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছিলেন তারা কুমারের সঙ্গে এই অরণ্যপ্রান্তে।

আর এই অহুপযুক্ত রাজপুত্রের বাইবেলে এবং অমাত্যবর্গে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আজকের মতই সেদিনও বীরে বীরে গড়ে উঠেছিল এক ঐশ্বর্যময়ী নগরী; তার পিতৃবাজ্য থেকে অনেক—অনেক দূরে। কুমারের নাম অহুসারে সে রাজ্যেই নামকরণও হয়ে গেল।

—রাজ্যপাট ত গড়ে উঠল; রাজসম্মানও পেলেন কুমার কিন্তু শুভাকাঙ্খীদের মনে স্বস্তি নেই, তাদের আকাঙ্খা উপযুক্ত কোনও রাজতন্ত্রের পাণ্ডিত্য গ্রহণ করলে কুমার আর মহা সমারোহে অভিব্যক্তির আয়োজন করে একেবারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করবেন তাতে গড়ে তোলা এ রাজ্যের। কুমার সব দেখেন আর মনে মনে হাসেন ভাবেন—কই তেমন কন্যার সন্ধান পাই কই? বাক্যে দেখলে মনে হবে—এই ত সেই! যুগ যুগ ধরে বাক্যে কামনা করে আসি এই সেই অহুপরতমা প্রেমলতা।

মনের কথা প্রকাশ পায় না। তাই অহুশপ্ত আর যুগযুগ মিঃ কাটায়—রাজকার্যের ভার অমাত্যবর্গের হাতেই থাকে। এমনিই এ বসন্ত-প্রভাতে যুগযুগ গিয়েছিলেন কুমারী সঙ্গে ছিল বহু অহুচরের দল। নগরের প্রান্তেই এক অরণ্য। পশু-পক্ষি-সমাকীর্ণ গহন বন; অরণ্যের মাঝে এ বনকুঞ্জের পশুচারণ করতে গিয়ে সেদিন পথ হারিয়ে ফেলেন কুমার। দলহারা হয়ে পড়েন সঞ্জীবের কাছ থেকে। দৃষ্টিভ্রান্ত অহুচরদের বিস্তর অহুসন্ধানের পর যখন পথের খোঁজ পেলেন কুমার, তখন তাঁর কিছুটা উল্লাস আর উত্তম ভাব দেখে বিস্মিত হলেন তাঁরা।

কি হয়েছে তাঁর? সঞ্জীবী বলাবলি করে, জানে না তারা সেদিন বন মধ্যে শুধু পথই হারাননি তিনি; মনও হারিয়ে এসেছেন সেই অরণ্যের এক সরসীতটে।

আর সেই মন খুঁজতেই তিনি প্রায় প্রতিদিনই যেতে লাগলেন সেই বিজন বনে সান্ত-সাধীদের এড়িয়ে—একাকী। তারই মনের অহুসন্ধান। অথবা অহু কারও মন পেতে কে জানে?

সান্ত-সাধীরা তাঁর হাব-ভাব দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। শুভাকাঙ্খীরা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। কোথায় যান কুমার একাকী সেই বিজন বনে? আর তাঁর বন্ধাকল্পেই বন্ধিগণ অহুক্ষ্যে তাকে অহুসরণ করে; বহুশ্রমও কৌতূহলী হয়ে যুগযুগেই বনমধ্যে হাতারাত স্রু করেন। তাদেরই মধ্যে একজন একদিন ছ’টি যুগশাবক শিকার করে আনেন। এক আশ্রমবালকের পালিত যুগশাবক নেহাৎ কৌতূহলেই ধরে আনল। আর পল্লবিত হয়ে সে কথা প্রকাশ পায় বনপ্রান্তের এক আশ্রম-তপোবনে। জীত-সম্ভব হয়ে ওঠে নিরীহ আশ্রমবাসিগণ। উপজীবের আশঙ্কায় শঙ্কিত হন তাঁরা।

২

—“অজা! সবি অজা!” নিস্তর বনভূমির মধ্য থেকে ভেসে আসে একটি আকুল তরুণীকণ্ঠ। অতি ক্রমগতিকে এগিয়ে আসে সেই সুললিত কণ্ঠধর, বসন্তের পাতাঝরা পথে মধুরধ্বনি তুলে। কিন্তু ধ্যানমগ্ন অজার কানে সে স্বর পৌঁছায় না।

কোন চিন্তায় কে জানে আপন ভাবে বিভোর হয়ে বসে আছেন ঋষিকুমারী অজা! বনসরসীর শান্ত জলের পানে চেয়ে। কি দেখে অজা জলের দিকে হেঁট হয়ে চেয়ে?

—নিজের রূপ না সেই কুলকমলের মত...? চিন্তায় ভাঁহির করে সেই সুললিত কণ্ঠধর অজার কানে প্রবেশ করে...“সাজা হাও না কেন সবি? কোথায় তুমি?”

কামিনীকদম—ডি. অতপ্তের
'নাথো কি কাহানী' ছবিতে

সোনার মেয়ের
হরিন চোখে
রূপের নাচন দেখে...



L.TB. 73-X52 BG

সোনার মেয়ের হরিন চোখে
রূপের নাচন দেখে, নিউলী পাখে কোকিল
লাকে, মনমাতানো সুরে... নাচিয়ে হৃদয়
বনের ময়ূর নাচছে অনেক দূরে !
শাসাময়ী চিত্রতারকা কামিনী কদমের চোখে মুখে
স্নাজ ময়ূর-নাচের চঞ্চলতা, রূপের মহিমার
ক্রেসিত আজ এ নারী হৃদয় । 'কোনই বা হবেনা,
স্বপ্নের কোমল পরশ যে আমি প্রতিদিনই
পেরেছি '—কামিনীকদম জানান তাঁর রূপ
লাবণ্যের গোপন রহস্যটি ।



আপনিও ব্যবহার করুন
চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, শুভ্র,
সৌন্দর্য সাবান
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

আরও ক্রম পালন কাছে এসে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অজান্তেই ললিতা। তখনই তাকে অজান্তে ধ্যান। ললিতাকে অমন বিম্বিত মেয়ে তাকাত্তে দেখে অপ্রতিভ অজ্ঞা, লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়ায়। মুখে জ্বলন্ত হাসি, ঈর্ষ চকিত নয়ন—কেমন যেন ধরা পড়ে যাওয়া ভয়।

অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, “জল নিতে এসেছিলাম।” তারপর সচকিত্তে তাকিয়ে দেখে, নাঃ জলপাত্রটি ভেসে যায়নি; ধারেরই কাঁচ হয়ে পড়ে আছে। তাই তাত্তাত্তি সেটি তুলে জল ভরার জন্ত এগিয়ে যায় জলের ধারে।

অবাক কণ্ঠে ললিতা বলে—“সে কি, এই ভর সন্ধ্যাবেলায় আঁধারে তুমি জল নিতে এসেছ?”

...“না না, এসেছি ত অনেকক্ষণ” বলেই ধমকে গিয়ে চূপ করে যায় অজ্ঞা।

...“তাহলে এককণ তুমি কোথায় ছিলে? কি করছিলে?” এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পেয়ে খতমত খেয়ে চূপ করে থাকে অজ্ঞা। আর ধীরে ধীরে আননে তার রজন ফুলের ছোপ ধরে। কিন্তু সেদিকে তাকাবার মত মনের অবস্থা নেই ললিতার। তার প্রশ্নের উত্তরের প্রতীকা না করেই শঙ্কাঘাতক কণ্ঠ বলে, “জানো, এ বনে আজ মস্তুর আগমন হয়েছে।”

ললিতার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে হল না বলে বেঁচে গেল যেন অজ্ঞা। তারপর বিম্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল—“মস্তুর।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, মস্তুর নয়ত কি।” অস্তরের উৎকর্ষা কুটে ওঠে শঙ্কুমারী ললিতার অঙ্গভঙ্গিমায়। চকলা কিশোরী না জানি কিসের আশঙ্কার ভীত-ক্রম হয়ে সাবধান করতে এসেছে প্রিয় সখীকে।

শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, “জানো আশ্রমবাসীরা বলছেন অরণ্যপ্রান্তের নূতন নগরী থেকে অত্যাচারী রাজপুত্রদের আনাগোনা শুরু হয়েছে আমাদের এ ভূপোবনের আশে-পাশে।”

—সে কি! অজ্ঞা ভরা কনক কাঁখে তুলে জল ছেড়ে উঠে আসে পথে, ললিতার নিকটে; ঈর্ষ বিম্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—“আমাদের এ ধারেরও এসেছে? কে বললে তোমায়?”

“কে আবার বলবে—জানো মৃগয়ার নামে এরা সারা বন ভোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। আর কোনও শিকার না পেয়ে দেবলের যে হরিণশিক্ত হুঁটি খেলে বেড়াচ্ছিল তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে” বলতে গিয়ে চোখে জল এসে যায় ললিতার। “অপদার্থ, কাপুরুষ।”

তুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় অজ্ঞা। এ কি করে সম্ভব! পোবা হরিণশিক্ত, তাই মাহুঁষ দেখলে তরে পালার না তাদের ধরে নিয়ে গেছে? কোথায় চকল হয়ে ওঠে। হঠাৎ ক্রমতঃ এসে ললিতার হাত চেপে ধরে বেতে বেতে বলে, “এস ত’ দেখি কোথায় তারা?”

“না না তুমি তাদের কাছে কোথায় যাবে সখি।” বা হাতে নিজের চোখ মুছে বাধু দিতে দিতে চলে ললিতা—“তারা বড় দুর্ভাগ্য আর অনাচারী। এরা না পারে এমন কাজ নেই। আর আশ্রমবাসীরা বলছিলেন শুধু মৃগরই এদের উদ্দেশ্য নয়। অস্ত্র হয়ত কোনও অভিসন্ধি আছে এদের। তাই এত আনাগোনা। তুমি একা সেখানে যেও না সখি। হাত ছাড়া আবার উঃ।”

এবার অজ্ঞা দাঁড়ায় অজ্ঞা। হাত ছেড়ে দেয় সখীর।

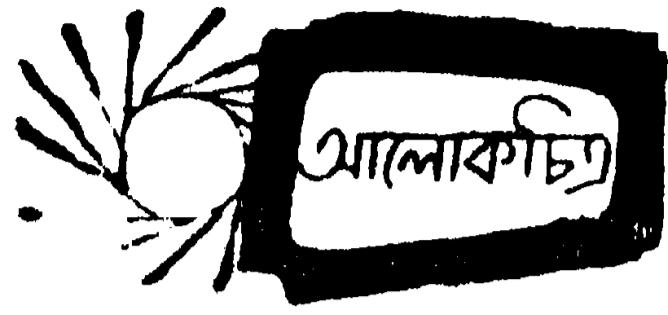
উদ্ভেদনার তার মাথার ঠিক ছিল না। তাই ত’ কোথায় যাবে সে? যদি সত্যিই অত্যাচারী আর অনাচারী হয় এরা? ললিতার কথাই সত্যতা উপলব্ধি করে মত পরিবর্তন করে। এই হরিণশিক্ত হুঁটি তাদের বড় প্রিয়, তাই তাদের মৃত্যু আশঙ্কার নিশেহারা হয়ে পড়েছিল অজ্ঞা, এবার শাস্ত হয়ে খানিক চিন্তা করে তারপর বলে—“আচ্ছা গৃহে যাও ললিতা। আমি কুটিরে গিয়ে পিতার বিশ্রামাবকাশে সবকথা জানিয়ে এ সমস্তা সন্ধানের চেষ্টা করব।” মনের রাগ মনে দমন করে ধীর আশ্রমকুটিরে ফিরে আসে অজ্ঞা।

কিন্তু বলি বলি করেও বলা হয় না কোনও কথা পিতার কাছে। নিজের পিতাকে সে চেনে, তাই জানে সারাদিনের জপ, তপ, ধ্যান, ধারণায় গুঢ়, আতপ্ত হয়ে আছেন পিতা এখন। এ সময় কোনও অজ্ঞার বা অত্যাচারের কথা কর্ককুহলে প্রবেশ করা মাত্র, অগ্নিসংযোগ হবে তাত্তে, ক্রুদ্ধ সে তেজবে সহ করা সম্ভব হবে না কোনও অনাচারীর পক্ষে। হয়ত লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে যাবে তাদের। তাই চিন্তা সংযত করে আপন গৃহকার্যে মনোনিবেশ করে সে। কিন্তু হরিণশিক্ত হুঁটির কথা কিছুতে ভুলতে পারে না। মনের আকাশে ভেসে ওঠে ললিতার অঙ্গভঙ্গা হুঁটি চোখে। শুধু আর হুঁধু হরিণছানা হুঁটি আজ নৃশংস এক পাবণের কবলে, কে জানে এখনও জীবিত আছে কি না। মাতৃহারা হুঁটি অসহায় মৃগশাবক সমিধ সংগ্রহ কালে বনমধ্যে একদিন কুড়িয়ে পায় দেবল, ললিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই থেকে ললিতা আর দেবল পালন করে আসছে তাদের। কত দিন অজ্ঞার কাছ থেকে হুঁধু চেয়ে নিয়ে গেছে দেবল—শিশু হুঁটিকে খাওয়াবে বলে কোঁতুহলী অজ্ঞা হুঁধু নিয়ে নিজেই গেছে দেবলের সঙ্গে। কিশোরী ললিতা সবতনে হুঁধুর পাঞ্জটি শিশু হুঁটির মুখের সামনে ধরেছে। শুধু একটু সবল, তাই সাগ্রহে চুক্-চুক্ করে সে হুঁধু পান করেছে; কিন্তু হুঁধু দুর্কলা, তাই তার নামকরণ করেছে দেবল শুধু আর হুঁধু।

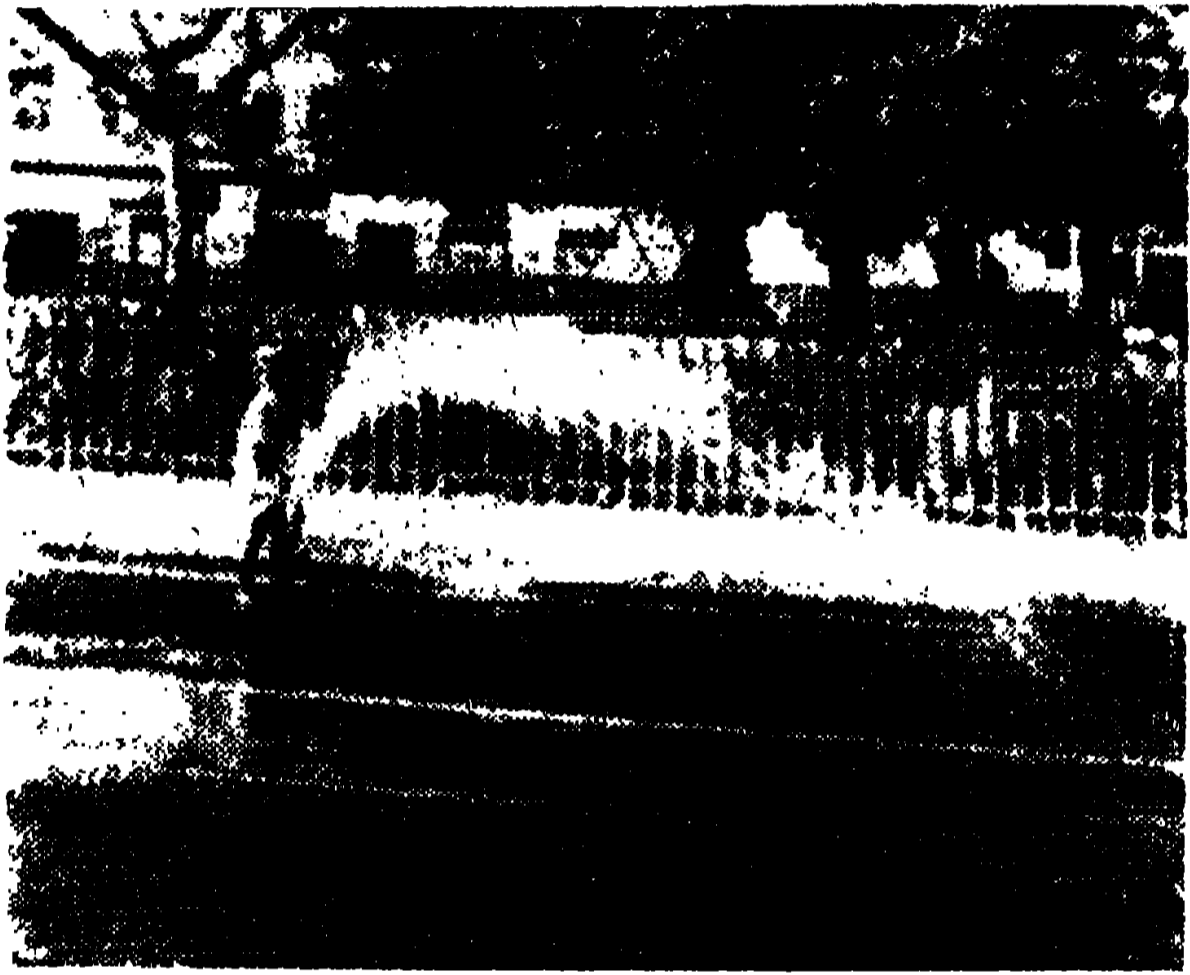
হুঁধুর নিজের পান করার ক্ষমতা নেই দেখে ললিতা অতি স্নেহে সবতনে আপন অঙ্গে তুলে নিয়েছে তাকে। আর কার্পাসে পলিতা করে হুঁধু ভিজিয়ে ভিজিয়ে তার মুখে দিয়েছে আর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছে তাদের পরম স্নেহে। এমনি করেই বা করে তুলেছে তাদের। আর অবাক-বিশ্বরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে অজ্ঞা, শঙ্কুমারী এই কিশোরীর এমন নিঃস্ব-মাতৃমুখে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। আর আপন মনেই ভেবেছে কোঁ থেকে আসে এই অপত্যস্নেহ। কি বোঝে এই বালিকা মাতৃস্নেহের অথবা প্রতি কস্তারই এটা জন্মগত সংস্কার, শুধু থাকে অজ্ঞা আর আধার পেলে এমনি ভাবেই করে পড়ে সেই অপত্যস্নেহ।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অজ্ঞা আর আবেশে নিজেরও হৃদয় ওঠে এক অপূর্ণ পুলকরসে। এক সময়ে সেও বসে পড়ে ললিতা পাশে আর হরিণশিক্ত হুঁটিকে তুলে নেয় আপন অঙ্গে। স্নেহে সমাধরে তাদের পায় হাত বুলোতে থাকে।

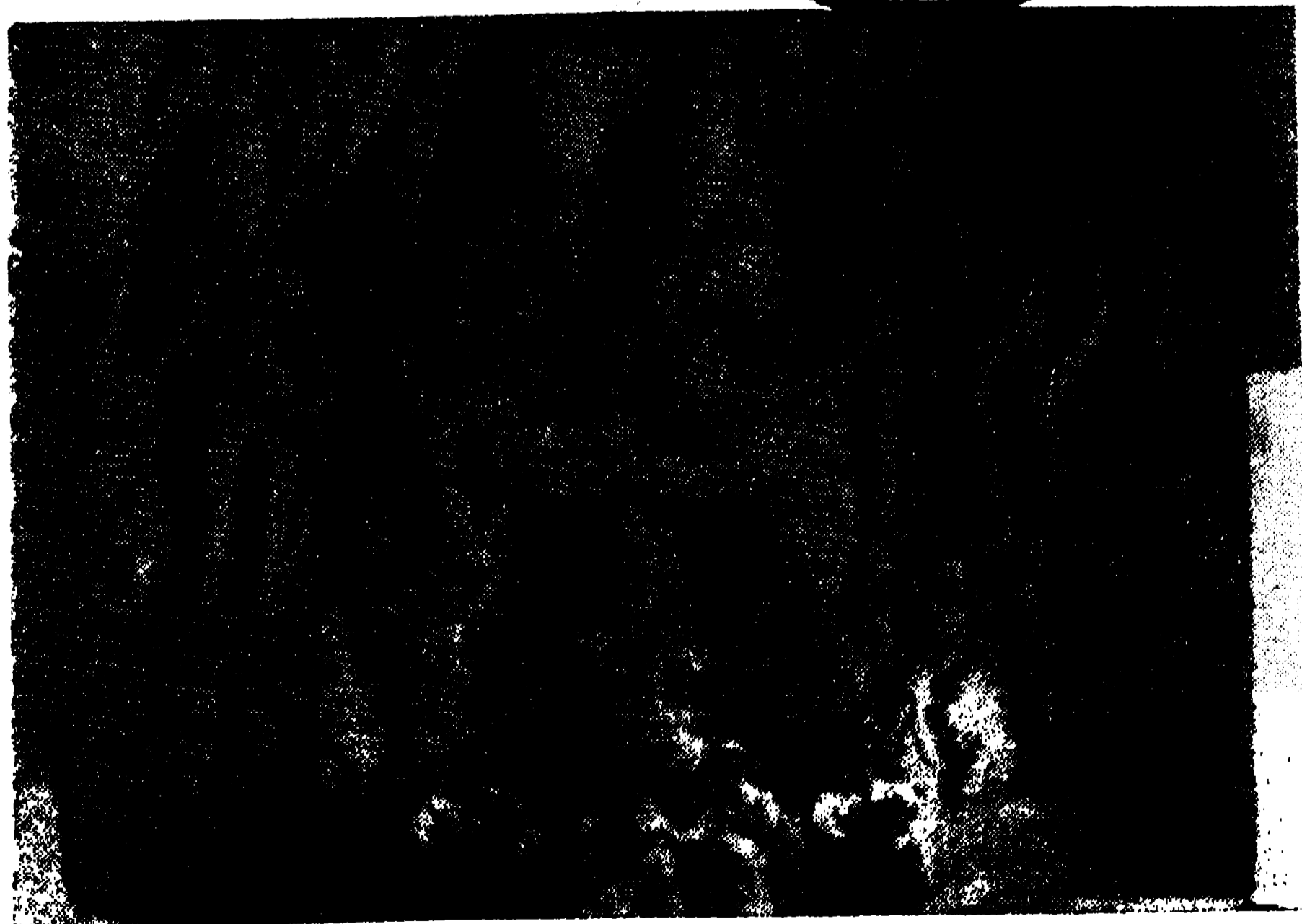
হরিণশিক্ত হুঁটিও পরম তৃপ্তিতে গুয়ে গুয়ে সে আহার উপভোগ করে। এমনি ভাবে হুঁটি হরিণশিক্তকে কেন্দ্র করে পড়ে ওঠে ত’ তিনটি প্রাণীর খেলাধরের সংসার। মনের আনন্দে ও মুগ্ধে। ওঠে দিন দিন শুধু আর হুঁধু। দেবল কচি কিশলয় আহরণ এসে তাদের খাওয়ার। সঙ্গে করে নিয়ে যায় বন-উপবনে।



জলসিঞ্চন
— ভাস্কর চক্রবর্তী



শিবভূর্গা (ইলোরা)
— সুখেন্দুকুমার মণ্ডল



ব্রজপ্রাসাদ (জয়পুর)
— যশোজনাথ পাল

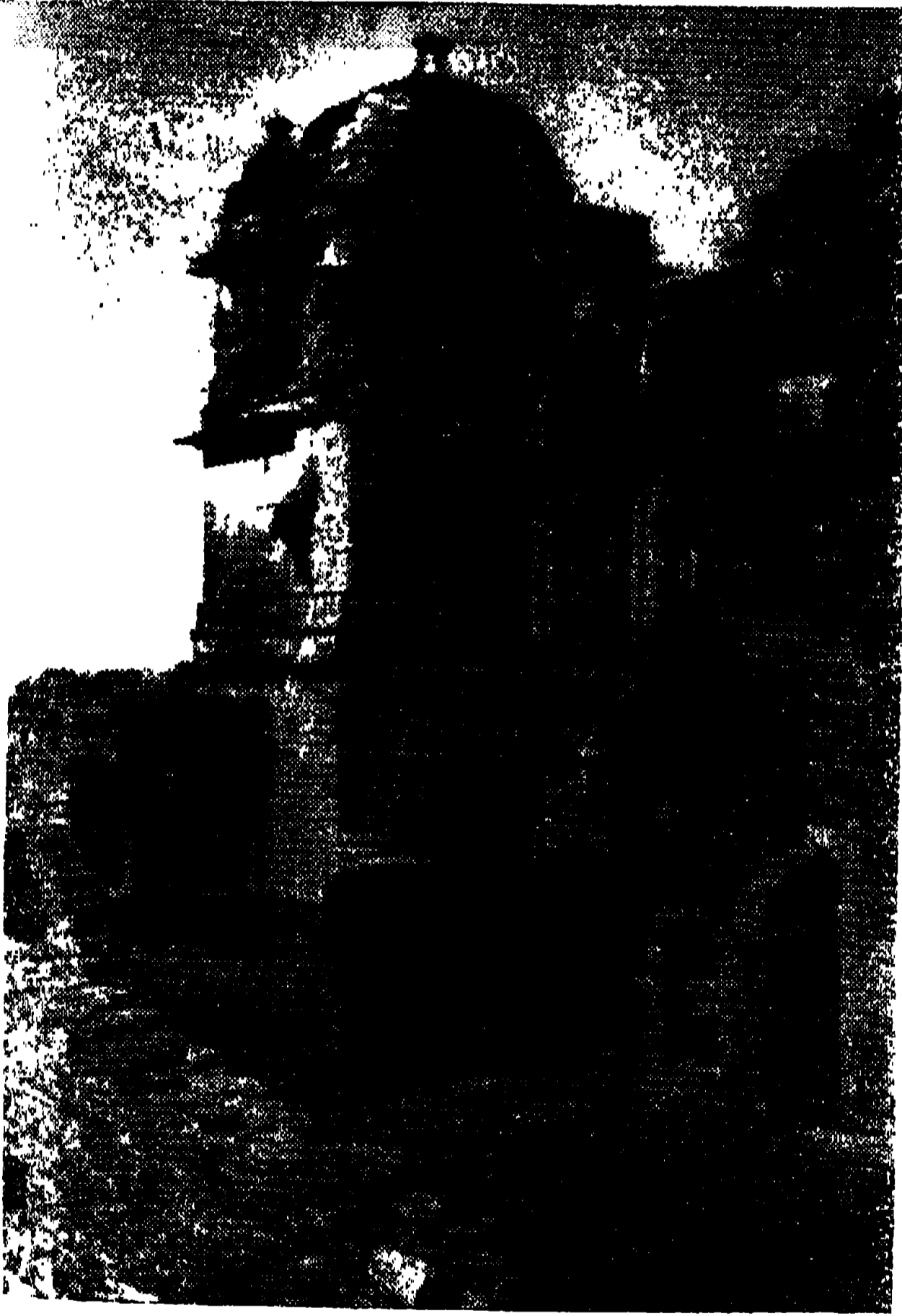


স্মৃতির ব্যথা

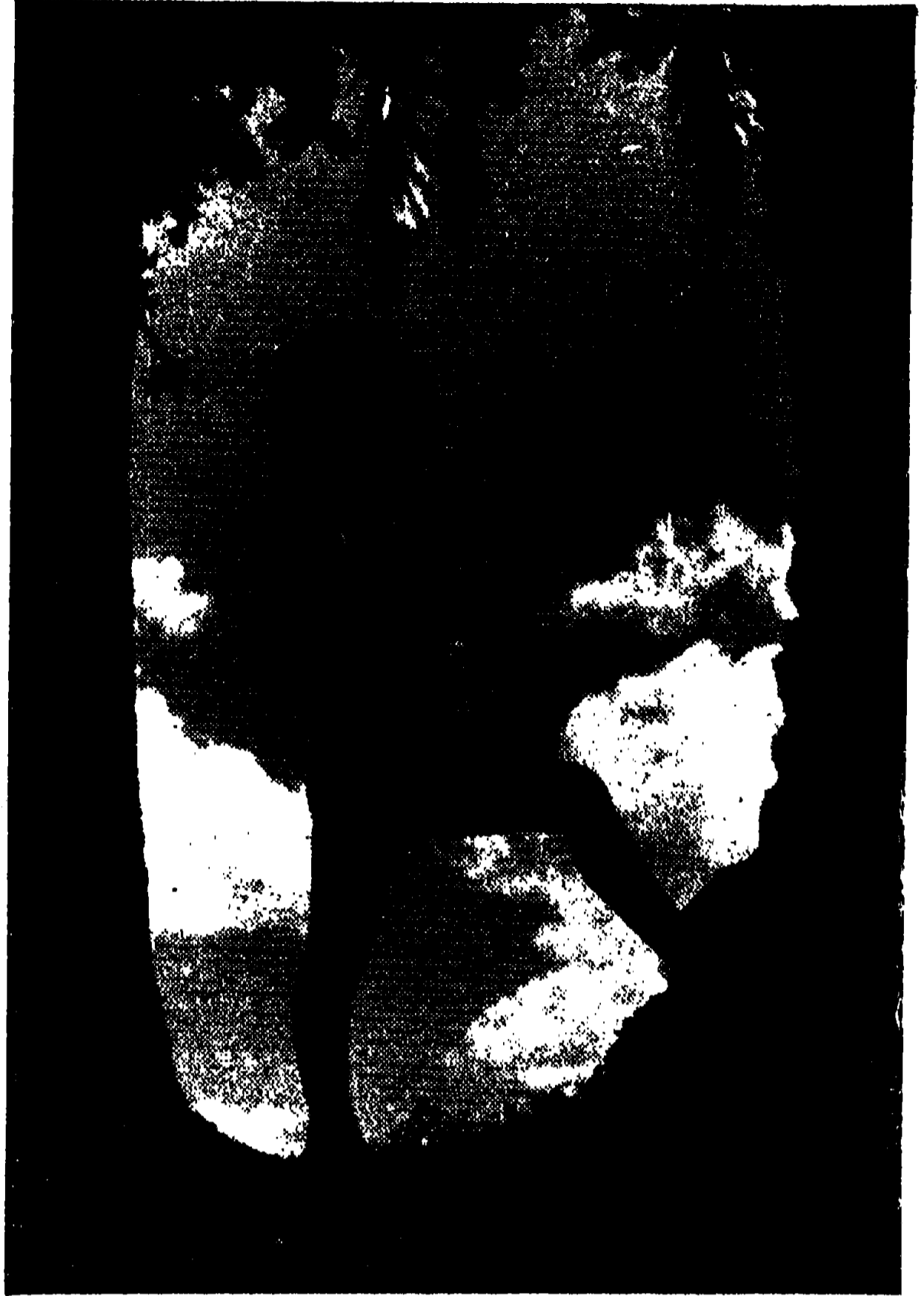
—দীপেন অধিকারী

বাঁশুরিয়া

—রামকিঙ্কর



ধাত্রীপান্নার ভবন
—বাদসা ঠাকুর

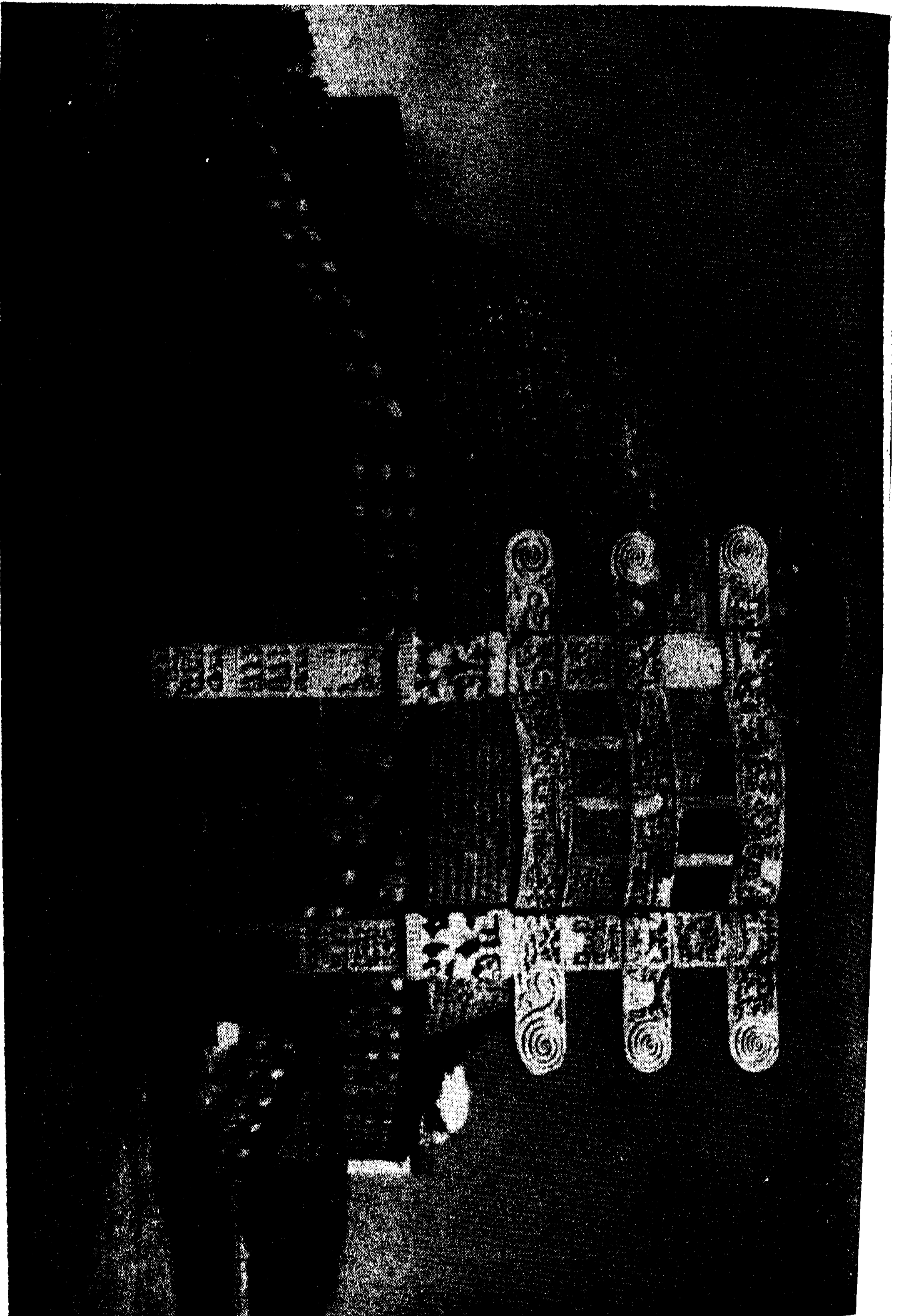


পাঠিকা

—মহাদেব পাল



शक्तिचूषण



—शक्तिचूषणानि शक्तिचूषण

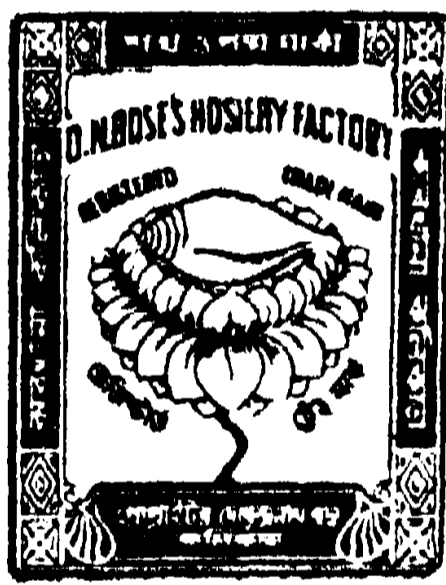
দারিয়ে বাবার ভয়ে অজ্ঞা নিষেধ করে তাকে দূরে নিয়ে যেতে, ললিতা পক্ষায় নালিশ জানায় মায়ের কাছে। ঋষিগণ্ডী হাসেন আর দেখেন হাতুস্নেহের বীজ অকুরিত হতে শুরু করেছে নববোঁবনা মুনিতনদ্বাদেশ দেখে-মনে। কিশোরী ললিতা এখনও এ হাসির মর্ম হৃদয় তক্ত বোঝে না কিন্তু যুবতী অজ্ঞা বোঝে সখী-মাতার এ হাসির অর্থ। তাই সর্বমে রাজা হয়ে উঠে, আন্তে ব্যস্তে আপন অক হতে নামিয়ে দেয় শ্রু শুধুকে। তারপর এ কথা সে কথা বলে এক সময়ে নিজ গৃহ পানে যওনা হয়, কিন্তু মনের মধ্যে গাঁথা চরে থাকে সখীর মায়ের সেই নিগূঢ় হাসির ছবি। লজ্জিতও হয়ে ওঠে। কিন্তু আপন মনে নিরালা গৃহকোণে বসে স্বপ্ন দেখে একটি সুখময় আনন্দময় গৃহ সংসারের বাসিন্দার পবিত্র শান্ত তৃপ্ত এক গৃহকোণ। নারীর চিত্তন স্বপ্ন।

এখন এক স্বপ্নে বিভোর হয়ে গিয়েছিল অজ্ঞা। সেদিন সবসীতটে দিনান্তের কর্ণ শেষে গিয়েছিল বৈকালিক স্নানের অস্ত্র তপোবন-প্রান্তে দীঘির ঘাটে। স্নানান্তে শীতল হয়ে বসেছিল এসে জলাশয়ের পাশে, কুমুদ কল্লার ফুটে আলো করে ছিল সে জলাশয়। ভ্রমর অবিরাম গুঞ্জন করে ফিরছিল এ ফুল হতে সে ফুলে মধু পানের আশায়। চারি দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল অজ্ঞা, অক্ষুট স্বরে বলেছিল, বসন্ত এসেছে, বনে বনে অশোক-কিংককে তাই এত রং-এর মেলা। সূর্যাস্তের রক্তিম রেখা পড়ে অপরূপ হয়ে উঠেছিল সেদিন বনের শোভা। সেই অপরূপতার মাঝে মুগ্ধ আবেশে তদুন্ন হয়ে গিয়েছিল অজ্ঞা, বাই বাই করেও গৃহে ফিরতে তখনই মন সরছিল না গার। এখন সময়ে পিছনে কার পদশব্দ সচকিতে ফিরে তাকায় অজ্ঞা। আর তাকিয়েই শুরু হয়ে যায়—অপরূপ এক যুবা পুরুষ। অল্পদে কুণ্ডলে সুরশোভিত টাচর চিকুর বেষ্টিত, মদনবিজিত এক যৌৱমুষ্টি। মধ্যাহ্নের রবিকরে স্নান আনন্দ আনন্দ, ধূলিপ্রলিপ্ত দেহ। অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে বোধ করি কলখনা এই শ্রোতাবিনী দেখে জল পানের আশায় নেমে এসেছেন তিনি। আর নিকটে এসে ভাববিহ্বলা এক তরুণীকে দেখে ধমকে দাড়িয়ে পড়ে অবা-বিশ্বয়ে নিরীকুণ করেছিলেন তাকে। অকারণেই রাজা হয়ে ওঠে অজ্ঞার মুখ। সঙ্কচিত হয়ে পথ ধোঁকে সে উঠে আসবার। আর তখনই সস্থিত ফিরে পান সেই তরুণ পুরুষ এবং জলপাত্র দেখে তার কাছে পানীর আঁকাজুক করেন। পাত্র পূর্ণ করার কথা এতক্ষণ খেরাল ছিল না অজ্ঞার। স্রুত পদে গিয়ে জল নিয়ে এসে সেই অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে জল ঢেলে দি য়ছে। অজ্ঞা পিপাসার্তিকে জল দানে তৃপ্ত করে পূণ্য সঞ্চর করেছে। তৃষ্ণা নিবারণ করে যত্নবান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। বিশ্বয়মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্নিমেষ নরনে তাকিয়ে থাকেন এই আলুনারিতকুন্ডলা স্পসী কস্তার পানে। তারপর অক্ষুট স্বরে বলেছেন, “কে তুমি অল্পময়া—বনদেবী অথবা জলপরা কেউ?”

অজ্ঞা মাথা নেড়ে জানায়—‘না।’ কথা বলার শক্তি নেই অজ্ঞার, সমস্ত শরীর তার ধর-ধর করে কেঁপে ওঠে সেই মুগ্ধ পুরুষের সুললিত স্নানিময় কর্ণস্বর শুনে—এ কি শিহরণ বয়ে চলেছে তার সমস্ত দেহে? অকপিকাস্তি এমন উন্নতের মত নাচতে শুরু করেছে কেন? কি এক আবেশে অবশ হয়ে যায় অজ্ঞার সমস্ত দেহ। মাটির জলপাত্র বন লোহার মত ভারী লাগতে থাকে, বিস্তৃত বোধ করে অজ্ঞা। পথিককে সচেতন করার উদ্দেশ্যে পিছনে ফিরে জল নেওয়ার ছলে

দীঘিতে নেমে আসে অজ্ঞা, আন্তে আন্তে জলে চেঁটে ফিরে ফিরে জল ভরতে থাকে। কিন্তু একটি পাত্রে আর কতকগুলি জল ভরা বার? তাই নিজেকে সংবৃত করে কলসী কাঁধে নিয়ে উঠতে গিয়েই ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। স্নান পথিক তখন চলাচলের পথের ওপরেই এলিয়ে দিয়েছে তার পরিষ্কার দেহ—মস্তকের আবরণ পরিপূর্ণ হয়েছে বীজন-পত্রে, স্বীয় স্নানি দূর করার মানসে। নরনভ্রমরা কিন্তু অস্ত্র কাজে ব্যস্ত। প্রলুক মধুকরের মত এক কুম কুমলিনীকে অল্পসরণ করে চলেছে। এবার অজ্ঞা কাছে এসে দাঁড়াতেই পুনরায় অঞ্জলিবদ্ধ করে মুখের কাছে ধরেন, সেই অপরিচিত পথিক মুহূ হেসে বলেন, “তৃষ্ণা মেটেনি, আরও জল খাব।” এবার জলপানে কিছু শ্রু বোধ করেন তারপর অপার কৌতূহল নিয়ে অজ্ঞার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, “কে তুমি কুমারী? এট নিবিড় বনমধ্যে সত্যই মানবী কি? অথবা তৃষ্ণার্ত পথিককে জল দান করতে এসেছে কোনও দয়ারী জলকন্ডা মুষ্টিতে?”

সর্বমে রাজা হয়ে মুহূকঠে অজ্ঞা জানায় তার পরিচয়। নিকি বন এ নয়। বনপ্রান্তেই আছে এক তপোবন, সেই তপোবনেই আশ্রম তাদের। দৈত্যগুরু গুক্রাচার্য্য তার পিতা। তপশর্ধ্যা মানসে বাস করেন এ বনে। সঙ্গ আছে কনিষ্ঠা কস্তা; কুমারী অজ্ঞা। পিতার সেবার মানসে ধীরে ধীরে আলাপে মগ্ন হয়ে বার উভয়ে। অপরিচিত সেই পুরুষও জানান তার আপন পরিচয়—এই বনের অস্ত্র প্রান্তে গড়ে উঠেছে এক নতুন নগর। সেইখানেই বসতি করেন তিনি। আজ যুগযায় এসে দিক্ভ্রম হয়ে বার তাঁর।



রেজিটার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত

‘শঙ্খ ও পদ্ম’

মার্কী গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২১১৫

সজিসাধীদের খুঁজে না পেয়ে, অনেক ঘুরে ভ্রমার্জ ও পরিশ্রান্ত হয়ে অবশেষে নেমে এসেছিলেন এই সরোবর-কূলে। আর মুগ্ধ নয়নে সেই রূপসীর পানে তাকিয়ে মনে মনে বলেন—“এমন অপূর্ণা এক সরসী-কমলের দর্শন পাব, এ ছিল আমার স্বপ্নেরও অগোচর।”

কিন্তু মুখই কি শুধু মনের ভাব প্রকাশ করে? নয়নের কি ভাব নেই? আছে বই কি। নতুবা অজ্ঞা কেন অত সরমে সঙ্কচিত হয়ে ওঠে? অচেনা পুরুষের বাঙামর সেই দৃষ্টির ভাবায়! অকারণেই সে লাল হয়ে ওঠে বসন্তের অশোক-কিংকরের মত।

দেখে দেখে আশা বেন মেটে না, সেই অরুণ সদৃশ তরুণ পুরুষের কত সময় পার হয়ে যায় এ ভাবে, কে তার হিসেব রাখে? দিনান্তের রক্তিমভাষা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় বৃক্ষান্তরালে, গোধূলি লগ্ন পার হয়ে যায় সন্ধ্যাদেবীর আবির্ভাবে। একটি দু'টি করে তারা ফুটে ওঠে; দীঘির সীতল জলে আপন প্রতিবিম্ব দেখার আশায়। এমন সময় দূরে ভেসে ওঠে জনকোলাতল। উৎকণ্ঠিত অল্পনকানে ব্যস্ত মাল্লবের সাড়া পড়ে যায়। সচকিত হয়ে উঠে পড়েন সেই কুমার। অসীম আগ্রহে অজ্ঞার মূগ্ধ সদৃশ হাত দুটি আপন হস্তে তুলে নিয়ে অল্পনর জ্ঞান আবার দর্শন পাবার। তারপর ক্রতগতিতে অগ্রসর হয়ে বনান্তরালে অদৃশ হয়ে বান।

আপন ভাবে বিভোর হয়ে বসে থাকে অজ্ঞা। এ এক নতুন অহুত্ব। তার কুমারী জীবনে এক নবচেতনার উন্মেষ হয়। কল্পললিতা বেন প্রকৃষ্টিত হতে শুরু করেছে অরুণ সদৃশ এক তরুণের প্রেমকিশোরে।

এমন সময় যান ভাঙায় এসে ললিতা। সারা তপোবন খুঁজে এসেছে ভাঙে। তাঁদের জ্বর লতাবাটিকার, কুজমাননে। অবশেষে হতাশ হয়ে ভীত অজ্ঞারই এসেছে এই সরসীকূল, এসে অবাক হয়ে গেছে সখীর এই তরুণ রূপ দেখে। তার বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে অজ্ঞা লজ্জিত হয়ে উঠেছে আর তখনই গৃহ সংসারের কথা তুলে বাস্তবতার ভাণ করে আপন কুটির কিরে এসেছে।

কিন্তু মন পড়ে থাকে তার সেই উপবন মধ্যে—সরসীর জীবে, আর প্রত্যহ মিবসের কর্ণব্যস্ততার মধ্যেও আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে অপরাহ্নের সেই অবসর কালের জল—বেধানে নিষ্কণ্টে মিলিত হয় দুটি তরুণ-তরুণী উৎসুক-ব্যাকুল হৃদয়ে। ধীরে ধীরে গাঁথা হতে থাকে একটি অপরূপ প্রেমমালিকা দুটি তরুণ হৃদয়ের বাসনাকূলে প্রণয়রক্তনে গাঁথা এ মালিকা—বৌবনদেবতার প্রেষ্ঠ উপহার তরুণী অজ্ঞা রূপান্তরিত হয় যুবতী প্রেমিকার সার্থক আনন্দে।

৩

“অজ্ঞা-মা!” সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হয়েছে পিতার। ত্রস্তে উঠ পড়ে সাড়া দেয় অজ্ঞা। আপন চিন্ত সংঘত করে পিতার আহ্বারের ব্যবস্থা করে। সবতনে পিতা আসনের সামনে হস্ত মর্জনা করে। তারপর নিয়ে আসে আহাৰ্য্যপাত্র। কল, মূল, শর্করা, সামান্য দুই দিনান্তের আহাৰ্য্য। তৃপ্ত মনে কুন্ঠিবৃত্তি করেন মুনিবর। তারপর পিতা ও মুহিত্যর আলাপ-আলোচনা চলে। সমস্ত দিনের নানান

সাংসারিক ও পারিবারিক ঘটনা শোনার অজ্ঞা পিতাকে। পিতাও জ্ঞান বাহির-বিশ্বের অনেক কাহিনী কতাকে। শাস্ত্রকথাও শোনান কতাকে অবসর বিনোদন কালে। এমনি কথোপকথন কালে বলেন সেদিন অরণোর লোকসমাগমের কথা। শুনেছেন তপোবনের অজ্ঞাত আশ্রমবাসীদের কাছ থেকে। তারা ভীত-সঙ্কস্ত হয়ে উঠেছেন। তপোবনের ধারে-কাছে রাজপুরুষদের আনাগোনা দেখে সন্দেহ হয়েছে হয়ত মুগ্ধরাহলে অল্প কোনও উদ্ভেদ আছে তাদের। মুনিবর চিন্তিত মনেই বলেন—“হয়ত একথা সত্য নয় নেহাৎই বৌবনের ক্রীড়া-কৌতুক এ-সব। কিন্তু তবু সকলের সাবধান হওয়া ভালো।” তিনি সেই পরামর্শই দিয়েছেন সবাইকে। কতাকেও বলেন সাবধানে থাকতে। ফলাহরণে, পুষ্পচয়নে অথবা পানীয় আনয়নকালে সজিনীদের সঙ্গে যাওয়া ভালো। আরও বলেন, “এ অরণোর অল্প প্রান্তে যে নতুন বসতি গড়ে উঠেছে তার সবচেয়ে নাম জনব উঠেছে। কেউ বলে, অত্যাচারী আর উচ্চত এক রাজপুত্র তার অল্পচর নিয়ে লীলাক্ষেত্র করে তুলেছে সে অঞ্চলকে। আবার কারও মত বৌবনধর্মের স্বাভাবিক চাপলা ব্যতিরেকে অল্প কোনও অন্যায় দেখা যায় না এ কুমারের চাল-চলনে। নেহাৎ ভাগ্যদোষে সে নির্বাসিত।” বলতে বলতে অল্পমনস্ক হয়ে পড়েন, ত্রিকালজ এই মহাপুরুষ। ভাবেন—সুধবংশে হয়ত অভিশাপ আছে কোনও, তাই রাজ-সিংহাসনের পরিবর্তে নির্বাসন-দণ্ড ভোগ তাদের বো করি ললাট-লিপি।

তার পর এক সময়ে উঠে পড়েন শিকুদেব। শিষ্য-প্রশিষ্যো সমাগম হয়েছে বাহিঃপ্রান্তরে; অধ্যয়ন অধ্যাপনার প্রবৃত্ত হবে তিনি। পিতা প্রস্থান করেন আর বলি বলি কবেও মুখ-মুখ কথা পিতাকে জানাতে ভরসা হয় না তার। তবে কি জানি, এ অন্যায়ী রাজপুরুষদের সঙ্গে কোনও সংযোগ থাকে, তার পরিচি সেই যুবাণ্ডবের?—“আচ্ছা তিনিও ত মুগ্ধর এসেই পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন” আপন মনেই ভাবে অজ্ঞা; “বেদিন প্রথম কে হয়েছিল তার সঙ্গে। তাহলে তিনিও কি সেই অত্যাচারী রাজপুরুষদেরই কেউ?” সন্দেহে সঙ্কচিত হয়ে ওঠে তার মন—“লীলা-মুগ্ধর হলেই কি আসেন তিনি প্রতিদিন তার সমীপে না না না, তা কখনোও সম্ভব নয়”—আপন মনেই শিউরে উ মাথা নাড়ে অজ্ঞা। “অমন মনবিভিত রূপ অমন প্রশস্ত হৃদয় আ মুমধুর কর্তব্য কোনও দুর্দিনীভের হতে পারে না। ইনি আলা ইনি পিতার বর্ণিত সেই অন্যায়ীদের কেউ মন। বিস্ময়ী শাস্ত্র এই যুবক অতি তরুণ অতি মুগ্ধ। পিতা তার শাস্ত্রগুরু মাত জেনে সাগ্রহে শিষ্য হবার বাসনা প্রকাশ করেছেন তিন।” ই রান কঠে একদিন জানিয়েছিলেন—কৈশোরে সুযোগ হ তাঁর কোনও বিভ্রান্ত্যের বা শাস্ত্রপাঠের। নিজের অপ স্বীকার করেন, অল্পশস্ত্র নিয়েই কাটিয়েছেন, শাস্ত্রপাঠে যে আকাঙ্ক্ষাও হয়ত ছিল না। তবে উপযুক্ত গুরুর সন্ধান ব পেয়েছেন, তখন তাঁর পদপ্রান্তে বসে শাস্ত্রশিক্ষা করবেন তিনি অজ্ঞা সানন্দে সার দিয়েছে তাঁর এ প্রস্তাবে। অজ্ঞা আবার কি করে দেবলের মুখ-মুখ কথা পিতার কাছে না বলে কাল দেখা তাঁরই কাছে মিনতি জানাবে সে, যদি উদ্ধার করে এনে দিতে পা তিনি।

৪

পরদিন প্রাতে ইবং ভাগী মন নিয়ে গৃহকার্য করে চলেছিল অজা। সুধু-সুধু কথা চিন্তা করে মন ভালো ছিল না, ইতিমধ্যে হঠাৎ বহিঃপ্রাঙ্গণে অতি পরিচিত একটি পুরুষ-কণ্ঠস্বর শুনে ধমকে দাঁড়ায় সে। এ কার কণ্ঠস্বর? সত্যিই কি তিনি এসেছেন? অজা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে শোনে, হ্যাঁ তিনিই এসেছেন পিতার নিকট। ভক্তিতবে চরণ-বন্দনা করে অতি বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করেছেন আপন অভিলাষ। পিতাকে গুরুপদে বরণ করে শাস্ত্রশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ তাঁর। তাই শরণ নিয়েছেন তাঁর। পিতারও কণ্ঠস্বর শোনে অজা। নানাবিধ প্রশ্ন করে চলেছেন তিনি এবং প্রয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে সাগ্রহে অমুমতি দেন। কুমার দণ্ডককে শিষ্যরূপে পোতে।

আনন্দে উৎকুল হয়ে ওঠে অজা, তারপর পুষ্পচয়ন উদ্দেশ্যে লতাকুল্লের দিকে অগ্রসর হয়। পথেই দেখা হয় দেবল ও ললিতার সঙ্গে। সুধু-সুধু কোলে নিয়ে অজার কাছেই চলেছিল তারা। সানন্দে উল্লাসে জানায় তারা, সুধু-সুধুকে উদ্ধার করে এনে দিয়েছেন এক মহামুত্তব ব্যক্তি।

দেবল আরও সংবাদ পরিবেশন করে। তিনিই গুরুদেবের কাছে শিক্ষাগ্রহণ মানসে তপোবনে এসেছেন।

ওঃ তিনিই! এবার চমকিত হয় অজা, তাহলে তিনিই বাজকুমার? উদ্ধার করে এনে দিয়েছেন সুধু-সুধুকে? প্রত্যয় আগ্রহ হয়ে ওঠে অজার বক্ষণী-হৃদয়।

এর পর দেবল ও ললিতার সঙ্গেও ভাব হয়ে যায় কুমারের। সুধু-সুধুকে বিমি উদ্ধার করে এনে দিয়েছেন, তিনিও পরমবন্ধু তাদের। একসময় দেবল বড় বড় চোখ করে প্রশ্ন করে সে তরুণ পুরুষকে, নিশ্চয় খুব শক্তি আছে তাঁর? তাই অমন হৃদ্যন্ত দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এনেছেন তাদের।

হ্যাঁ, মাথা 'নেড়ে স্বীকার করতে হয়, কুমারকে প্রায় বৃত্ত করেই উদ্ধার করতে হয়েছে। তারপর কমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে অজার পানে চেয়ে বলেন,—“অবশ্য আশ্রমযুগ এবং দেবল ললিতার পালিত যুগশিও এ দুটি, সেটা তারা জানত না বলেই ধরে নিয়েছিল নতুবা—”

বাক্যে বাক্যে, অতি উদ্ধার চিন্তেই কমা করে দেবল সেই হৃদয়কারীকে এবং সাগ্রহে সমাদরে পরমবন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা এই বীর যুবাকে।

তাদের খেলাঘরের একজন সঙ্গী বাড়ে। প্রত্যহ সমিধ সংগ্রহে বনমধ্যে ফল আহরণের কালে এবং ললিতা অজার পুষ্পচয়ন কার্যেও সহায়তা করেন তিনি। আবার গুরু পদপ্রাপ্তে বঁসে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা চলতে থাকে নিয়মিত। আর সবার চোখের অন্তরালে ছুটি তরুণ হৃদয়ে কন্দর্পের আবির্ভাব হয়। একজনের যুহু চরণধ্বনি অস্তের হৃদয়স্তম্ভীতে ত্রিধিকিণি পুর তুলে পুলক জাগায়, আবার সকল কন্ঠের মাঝেও উচ্চকিত হয়ে থাকে অজা। কুমারের গলার ধ্বনিময় স্মৃষ্টিধরে হৃদয় মধুর আবেশে ভরে ওঠে তার।



'নিম'এর তুলনা নেই

২০০০ বছর ধরিয়৷ ইহার উপকারী গুণগুলি স্মৃতিষ্টিত

দাঁত সুদৃঢ় করে মাঢ়ীও
সুস্থ রাখে

নিম টুথ পেস্ট

ইহা নিমের সক্রিয় ও উপকারী গুণ এবং আধুনিক টুথ পেস্টগুলিতে ব্যবহৃত ঔষধাদি সমন্বিত একমাত্র টুথ পেস্ট



পত্র লিখিলে নিমের উপকারিতা সহকারী পুস্তিকা পাঠান হয়।

..... বি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা-২১
NP-186.NP-B

৫

প্রথম দিনগুলি যেন পাখীর ডানায় ভর করে চলে যায়। কিন্তু সুখ নেই ললিতামাতা সুদতী দেবীর প্রাণে। “হায় সরলা বালিকা কিসের মোহে আবিষ্টা হয়েছে জানে না।” অভিজ্ঞা রবী তাই একই নাটকের পুনরভিনয়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে থাকেন, নিতান্ত শুভার্থিনী মমতাময়ী মুনিপত্নী এক সময়ে সাবধান করেন অজ্ঞাকে। “স্মরণ করিয়ে দেন কৃষ্ণপতিপুত্র কচের কথা। কে জানে ইনিও তেমনই ছলনার মোহে ভুলিয়ে রাখতে চান কি না তাদের? হয়ত তেমনি করেই শিক্ষার্থীর হৃদয়ে এসেছে এই যুবক সুদতীবনী মন্ত্রশিকার লোভে। আর অজ্ঞার জ্যেষ্ঠা ভগিনী দেবানার মতই বাদ একদিন পরিত্যাগ করে চলে যায় তাকে খীর অতীর্ষ সিদ্ধির পর? তাছাড়া পিতার কানে গেলেও কল খুব শুভ হবে না। সব শুনে বেদনায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে সরলা তরুণী। ভাবে, কি হবে তাহলে তার? যদি কুমার তাকে গ্রহণ না করেন? হুশিয়ার, বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে অজ্ঞা। তবে তার প্রাণ শুকিয়ে ওঠে। তাই পালিয়ে বেড়ায় অজ্ঞা নিজের কাছ থেকে, দণ্ডকের কাছ থেকে। সন্ধ্যের বিষ কত-বিকৃত করে তোলে তাকে।

এসবের কিছুই জানতে পারেন না কুমার। তাই অজ্ঞার এমন আচরণে বিস্মিত হুঁক হয়ে ওঠেন। ব্যাকুল চিন্তে ভাবেন, কেন অজ্ঞা এমন করে এড়িয়ে চলেছে, তারপর একদিন আঁহর হয়েই অজ্ঞার অঙ্গুষ্ঠানে এসে পঁড়ান, লতাকুঞ্জের নিকটে ফুলবীথিকার আপন মনেই ফুলমালা গেঁথে সাজি তরিয়ে তুলছিল অজ্ঞা অপরাহ্নবেলায়। অকস্মৎ পদশব্দে সচকিতে তাকিয়েই দেখে, পথরোধ করে পঁড়িয়ে আছেন কুমার। বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে দেখেন কুমার—অতি বিষন্ন মলিন মুখ অজ্ঞার। আপন অশান্তি তুলে আকুল কণ্ঠে ডাকেন—“অজ্ঞা।”

এ সেই কণ্ঠস্বর। যে মধুর স্নানিময় সুর প্রথম দিনে তুলিয়ে নিয়েছিল অজ্ঞার সকল সত্তা। সে বড়মড় করে উঠে পড়ে।

হু হাতে পথ রোধ করে বলেন—“কি হয়েছে অজ্ঞা—কেন তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ আমার কাছ হতে এমন করে? আরও কাছ সরে আসেন তিনি—“কথা বলবে না?” হায়, কি করবে অজ্ঞা এখন? তার সকল সংস্রব ভেঙ্গে যায় সেই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে। ধর ধর করে কৈপে বসে পড়ে অজ্ঞা। হু হাতে মুখ ঢেকে আকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে।

বিস্মিত হল কুমার। বসে পড়েন অজ্ঞার পাশে, তারপর অতি স্নেহে সমাদরে শান্ত করতে থাকেন তাকে। ধীরে ধীরে আপন হাতের মধ্যে তুলে ধরেন অজ্ঞার অক্ষকাতর মুখ, আশাসবালীতে অন্তর দিয়ে শোনেন সব কথা। আর আপন অন্তর দিয়ে অনুভব করেন কুমারী অজ্ঞার অন্তর-বাখা। তার পর মুহূর্তে হাতে অজ্ঞার মুখের অতি নিকটে আপন মুখ রেখে পাচ ধরে বলেন, “আমাকে তোমার সেই বকম স্নানিময় বলেই মনে হয় অজ্ঞা।”

অজ্ঞা লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে বলে, না। কিছু শান্ত হয়েছে সে ততক্ষণে। কুমার এবার মনঃস্থির করে আপন কণ্ঠস্বর খুলে অজ্ঞার গলার পরিবেশন।

অজ্ঞা শিউরে উঠে অকুট কণ্ঠে বলে, “এ কি?”

ধীর মধুর কণ্ঠে বলেন কুমার, “অরণ্য সাক্ষী রেখে আজ তুমি সন্ধ্যায় তোমাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করলাম অজ্ঞা। আমি স্নানিময়রূপে বরণ করে নিলাম তোমায়।”

—“কুমার!” ধর ধর করে কৈপে ওঠে অজ্ঞার স্নানিময় মুখ মুখে ওঁহরবে বিহ্বল হয়ে পড়ে সে।

—“না কুমার নয়, বলা, স্বামী” “আমাকে তোমার মালা দেবে : অজ্ঞা?” প্রেমস্বিকৃত মধুর হাসিতে তরে ওঠে কুমারের মুখ অজ্ঞার সরমরঞ্জিত আননে তখন ফাগের খেলা চলেছে, অলি লজ্জিতা কম্পিতা দুটি মৃগাল বাহ এক সুগন্ধী বনকুমুমের মাং তুলে নেয় সাজি হতে। পরিবেশে দেয় তার প্রেমের দেবতাকে তারপর আবেগ-সুরিত কণ্ঠে বলে, “স্বামী।”

“অজ্ঞা। প্রিয়া। প্রিয়তমা। গভীর আবেগে সাগ্রহে দণ্ডক বক্ষে ধারণ করেন অজ্ঞাকে; অতি সমাদরে মস্তক চুষ করেন তার। আর অজ্ঞা? অজ্ঞা বুকি মরে বাবে এত মুখে তার কুমারীস্নানিময় একান্ত কাঁধনা বাসনা আজ সকল হয়েছে স্বামীর বক্ষলীনা অজ্ঞা। ভাবে এত সুখ বুকি বর্ণেও নেই।

“অজ্ঞা।” আপন বক্ষলীনা অজ্ঞার ফুল কমলের মত মুখখানি তুলে ধরেন কুমার। ডাকেন, “প্রিয়া।”

অজ্ঞা স্বামীর দিকে একবার তাকিয়েই পলকে মুখ নামিয়ে নেয় সপ্রেম নয়নে তাকিয়ে থাকেন কুমার সেই অপকরণ মুখখানির পানে তারপর অধীর আগ্রহে ও আবেগে চুষনে চুষনে তরিয়ে সে অজ্ঞার মুখ।

“আর ভয় নেই ত তোমার?” কানে কানে বলেন তিনি স্বামীর আদরে ব্যতিব্যস্ত অজ্ঞা মুহূর্তে হেসে মাথা নাড়ে জানায় “না” মুহূর্ত-মধুর কণ্ঠে স্বামী বলেন—“তোমার শুভার্থিনীকে বলা অত মুত সন্তীবনী মন্ত্রর জন্তে আসিনি আমি এখানে। মর জগতে এই পারিজাত কুমুমটির লোভেই আমার আগমন।” অজ্ঞা সলো স্বামীর বৃকে মুখ লুকায়। স্বামী স্নেহে বৃকে চেপে ধরে কানে কা অকুট কণ্ঠে বলেন—“অনুভবময় দেশের স্নেহহীন প্রেমহীন দেবতা অপেক্ষা অগন্যারী এ পৃথিবীর সুখকেই আমি চাই অজ্ঞা। কি হ আমার সেই অনুভবের ভাণ্ড নিয়ে যদি তোমাকেই বকনা করতে হয় অজ্ঞার সাড়া নেই। সে যেন বুঝিয়ে পড়েছে স্বামীর বকে।

৬

জানকে আবেগে অতি মধুর হয়ে ওঠে তাদের দিনগুলি দিমের পর রাত্রি আসে রাতের পর দিন। আর এক বসবে পালা শেষ হয়ে আসে শুভ পূণ্যাহ কাল, বৈশাখ মাস মার্গশ্রু ৫ চলেই বীর বিক্রমে, তাঁর সপ্তরথের অজ্ঞা উড়িয়ে বজন, বাজ দান, ধ্যানে প্রবৃত্ত হল পূণ্যকামিগণ। এই মধ্যে আমা আসে পাভালপুরী থেকে। দৈত্যরাজ দানবজের আয়োজ করেছেন। বিশাল সে আয়োজন! স্বর্গ মর্ত্য পীতালে। আয়োজনের সাড়া পড়ে যায়। উৎসুক আগ্রহে বোগদান করা প্রস্তুত হয়েছেন নিমন্ত্রিতগণ। দৈত্যরাজ গেলেন সসম্মান নিমন্ত্রিত হয়ে অজ্ঞা মুনি-ঋষি সমভিব্যাহারে। প্রিয় শি দণ্ডকের উপর দিয়ে গেলেন আগ্রহের ভার।

মুখে ও আনন্দে দিন কাটে দু'টি তরুণ-তরুণীর। বাধা-ভয় হীন উজ্জল শ্রোতে ভেসে চলে তারা। মনের আনন্দে স্বপ্ন রচনা করে ভবিষ্যৎ দিনের। দণ্ডক শোনাল তার কল্পনার কথা তরুণী শ্রয়ার কানে কানে; বলে—“গুরুদেব কিরে এলে নিয়ে যাবো তোমাকে আমার আপন আলয়ে।” সেই বকম ব্যবস্থা করেছেন তিনি। খবর দিয়েছেন তিনি অমাত্য-প্রধানদের।

—“কি খবর?” কুমারের কথা শেব না হতেই উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে অজ্ঞা।

—“সুখবর।”

প্রশ্নর হাশ্বে মুখ উদ্ভাসিত করে কুমার বলেন—“তাদের রাজ্যের রাণী আছেন এই বনের মধ্যে। উপযুক্ত সম্মানে নিয়ে যেতে হবে তাঁকে?” গভীর স্নেহে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন “আর আমিও পাব তোমাকে প্রকাশ্য ভাবে আমার সকল কাজের মাঝে।”

—“কিন্তু পিতা? তিনি কি অহুমতি দেবেন?” অজ্ঞার স্বরে উৎকণ্ঠা।

“ওঃ গুরুদেব। এবার কুমার কিছু চিন্তিত হন, বাহুবল্লভ শিখিল হয়ে আসে তাঁর—এ চিন্তা তাঁরও হয়েছে ক’দিন থেকে।

স্বামীকে চিন্তিত দেখে শঙ্কিত হয় অজ্ঞা। প্রথম মিলনের উচ্ছ্বাসের পরে মনে হয়েছে অজ্ঞার, পিতার কথা। কঠোর-তপস্বী বেদজ্ঞানী শাস্ত্রাচার্য্য তিনি। যদি স্বীকার না করেন তাদের এ গাফিলতি মিলনকে? ভবিষ্যতের ভাবনার শঙ্কিত হয় অজ্ঞা, হয়, কেন তার আগে মনে হয়নি এ কথা? সরলা অজ্ঞার এখন এ কথা স্মরণে এস না যে তখন হারাবার ভয়েই অধীর হয়ে ছিল সে। সময় ছিল না তার এত অগ্রশব্দ্য বিবেচনা করার। আজ পূর্ণ মুখ উপভোগ করে দ্বির হয়েছে তার মন। তাই ভবিষ্যৎ চিন্তার অবকাশ হয়েছে। আর সেই চিন্তাতেই মনে সুখ নেই তার।

—“কুমার, কি হবে তাহলে?” স্বামীর হাত দু’টি ধরে বলে অজ্ঞা। কুমারের সস্থিত কিরে আসে। দ্বীর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্বাসের হাসি হেসে বলেন—“তাঁর পারম্পর্ক করে কমা চেয়ে নেবো, ভয় কি?”

এ আশ্বাসের স্বাণীতে তরসা পায় মা অজ্ঞা। পিতাকে সে চেনে, দৈত্যগুরু ব্রাহ্মণ গুরুচার্য্যের কন্যা হলে, কজিয়কুমারকে বরণ করেছে সে, এ অপরাধ কমা করবেন না পিতা। তাই সকল কাজের মাঝেও একটা অশান্তি পেয়ে বসে তাকে। স্বামীর আকুল আহ্বানেও তেমন সাড়া দিতে পারে না সে। কুমারের বাহুবল্লভের মধ্যেও অহমত হলে পড়ে, নিউরে উঠে এক একদিন।

“কি হলো?” স্বামী সবিম্বরে প্রশ্ন করেন—“অমন চমকে উঠলে কেন?” পিতার জন্ত আশঙ্কার কথা নিয়ত বলে মন খারাপ করতে চায় না স্বামী। কিন্তু তার ভাবনার যেন শেব নেই। এইরূপে একদিন খবর এল বজ্র শেব হয়েছে পাতালরাজের। ত্রিপুরা জ্বলি দান করে বিকূপনাশিত হয়েছেন বলিরাজ। পিতা কিরবেন এবার তাহলে। আর কোনও কথা গোপন থাকবে না।

গোপন রাখার উপায়ও নেই। সুরভী দেবী জানিয়েছেন তাঁর মাতৃস্ব স্বভাবনার কথা। শুনে লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে সে। লজ্জিতা, দেবল এ সংবাদে মহা ধূলী হয়ে উচ্চস্র প্রকাশ করেছে। এক শিশু সঙ্গী আসছে তাদের। সুখ

দুখ এখন বড় হয়ে গেছে, কোলে থাকতে চায় না। স্বামীর ভাবে চলাকোরা করতে পারে। তাই এমন দিনে একটি শিশুর আগমনবার্তা তাদের প্রাণে উল্লাসে ভরে দিয়েছে। কুমার দণ্ডক আদরে আদরে বিপর্য্যক্ত করে তুলেছেন তাকে। আশায় আশ্বাসে বলেন, আর দেরী করব না আমি। এবার তোমার নিয়ে বাবার ব্যবস্থা করব। গুরুদেব কিরে এলেই সব কথা বলে অহুমতি নেব।

শুনে ঈষৎ স্মিয়মান কণ্ঠে অজ্ঞা বলে, কিন্তু পিতা? চেন না কি তাঁকে?

—“চিনি বই কি? রাজকীয় গাভীর্য্যের স্বয়ং কুটে গুটে কুমারের কণ্ঠে। “যুক্তি দেখিয়ে কমা চেয়ে নেবো তাঁর কাছ থেকে।”

“যুক্তি? কি যুক্তি?” অজ্ঞাকারে আলো ধুঁজে বেড়ায় অজ্ঞা।

“যুক্তি এই যে জ্যেষ্ঠা কন্যাও তাঁর কজিয় রাজ বধাতি-মহিষী আর তা ছাড়া তুমি আমার স্ত্রী। আমার ভাবী সন্তানের মাতা। সন্তান আদরে সাধনা দেন অজ্ঞাকে।

অজ্ঞাও আশঙ্কিত হয় স্বামীর সাধনা-বাক্যে। সুর হর তাদের জন্মনা করনা ভাবী সন্তানকে ধিরে। এমনি দিনে দৈত্যগুরুর আগমন-বার্তা আসে। বজ্র শেবে রওনা হয়েছেন তপোবন অভিবুখে। যুগপৎ আনন্দ ও আশঙ্কার অজ্ঞা অধীর হয়ে থাকে পিতার প্রত্যাগমন আশায়। এই সময় একদিন দণ্ডক এলে সানন্দে বলেন, “জানো অজ্ঞা, পিতা কমা করেছেন আশাকে।”

—“পিতা কমা করেছেন?” বিস্ময় ও চাকল্যে উঠে ধাঁড়ায় অজ্ঞা।

—“পিতার সঙ্গে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হলো? কি বললেন তিনি?”

—“ওঃ নাঃ”—এবার ধতমত খেয়ে চূপ করে বান কুমার। তারপর হাসিমুখে বলেন, “না গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। আমি আমার পিতার কথাই বলছি। সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি কমা করেছেন তাঁর অধম সন্তানকে—বুড় অশুভ তিনি, কিরে যেতে আহ্বান জানিয়েছেন।” “আবেগে হল হল করেন কুমার। আপন মনেই বলেন “কতদিন দেখিনি তাঁকে?” তারপর বলেন তার শৈশব কালের কত স্মৃতি কত আনন্দবেদনার কথা।

নিজে আজ পিতার আসনে বসে শৈশবের কাহিনীকে বিচার করে চলেন। উদ্ধত কৈশোরের ভাঙনার কত অজ্ঞার না মেনে করেছেন। শাসন করার কারণ করার তেমন কেউ ছিল না তাই একঘোষা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ভয় করত তাকে সবাই মাত্তও করত হস্ত কিন্তু ভালোবাসত কি না কে জানে? না না ভালোবাসাও পেয়েছেন বই কি অনেকের। বিশেষ করে আচার্য্য বশিষ্ঠদেব অত্যন্ত স্নেহ করতেন তাকে।

—“আর জানো অজ্ঞা, তাঁরই আগ্রহে আমি পিতার কমা পেয়েছি, অজ্ঞাত সব বাধা বিপত্তিরও অবগান ঘটিয়েছেন তিনি।”

“তিনি নিজেই আসছেন আমাদের নিয়ে যেতে।”

“আমাদের?” অতি স্মিয়মান কণ্ঠে প্রশ্ন করে অজ্ঞা।

এ প্রশ্নে ঈষৎ চকিত হয়ে কুমার তাকান অজ্ঞার দিকে, আপন আনন্দের আবেগে দ্বীর ভাবনার কথা মনে ছিল না তাঁর। তাই সচেতন হয়ে সাগ্রহে বলেন—“হ্যাঁ আমাদের বই কি। আমাদের

হৃদয়কেই নিতে আসছেন তিনি। তুমি তাই নয় আরও এক ভাবনার কথা মনে হয়েছে তাঁর সেই পরামর্শই করেন তিনি অজ্ঞার সঙ্গে।

ভক্তদের ত্রুটিচার্য্য আশ্রমে প্রত্যাগমন করলে কুমার স্বয়ং গিয়ে নিজে আসবেন আচার্য্য বিশিষ্টদেবকে। তাঁর অসুযোগে হরত কমা পাবেন তাঁরা এবং অযোধ্যাপতি খাগুয়াজের পুত্রের হাতে কড়া সমর্পণ করতে হরত আপত্তি থাকবে না তাঁর। কত আশা কত পরামর্শ।

রাজকুমার নির্কামন-দণ্ড থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। ফিরে চলেছেন পিতৃরাজ্যে। বৌবরাজ্যে অভিবিক্ত হতে। দণ্ডক নগরীতে তাই উৎসবের আয়োজন পড়ে যায়। আলোরমালার পত্রে-পুষ্প দিনে দিনে সুসজ্জিত হয়ে উঠতে থাকে নগরী। সে নগরের আনন্দ-কোলাহলের ঢেউ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শান্ত তপোবন-তটে এসে লাগে সেই ঢেউ। সুদতী দেবী আনন্দিতা হন মুনিব্রতের রাজবাণী হওয়ার সংবাদে। দেবল মহা আনন্দিত, তার পরম সুহৃদ আজ রাজা হতে চলেছেন। আর ললিতা তার সখীর সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনার কাতর হলেও তার মুখে সুখীও বটে। তাই বিদায় দিনে তাকে কি ভাবে সাজিয়ে দেবে তারই জল্পনা করনা চলে।

কিন্তু হায়, 'নিয়তি: কেন বাধ্যতে'।

তাই দৈত্যাতক তাঁর প্রত্যাগমন কালে পশ্চিমঘোঁষে শোনে এক অজ্ঞতপূর্ব্ব বারতা। তিনি স্তম্ভিত হয়ে বান। এ-ও কি সম্ভব? পথপ্রদর্শক রাজ মুনিবর, মনের অবস্থাও খুব সুখকর নয়। বলিরাজ পরাজিত হয়েছেন দেবতার হুলনার। পুনর্কীর এক পরাজয় ঘটল দেবতার কাছে দৈত্যের। মনে মনে পুত্র অপমানবোধ নিরন্ত পীড়া দিয়ে চলেছিল তাঁকে।

তারপর এ-কান সে-কান করে বিকৃতরূপে সংবাদ পান তিনি। দণ্ড করে বলে ওঠে তাঁর কুংপিপাসাতুর অপমানিত মন। "কি এত বড় স্পর্ধা।" শিব্যের হৃদয়ে এসে নষ্ট করেছে তার আশ্রয়ের পবিত্রতা: এক অনাচারী যুবরাজ? সরলা কড়ার প্রতি অর্টবধ আচরণ করে ধম্মনাশ করেছে তাঁরই প্রিয়তমা কড়ার আর তাঁর অসুযোগের অপেক্ষা না রেখেই তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাঁর কাছ থেকে? কোথায় অধীর হয়ে ক্ষত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হন তিনি অজ্ঞার অভিমুখে। দেবতার সঙ্গে সামান্য মাহুও হুলনার পরাজিত করতে চায় তাঁকে? অভিশাপের ডর নেই প্রাণে? কোথায় কোথায় অধীর উন্নতভাবে প্রবেশ করেন আশ্রম-প্রাঙ্গণে। আর প্রবেশ করেই ধম্মকে পাড়িয়ে পড়েন—পিতার আগমন প্রতীকার সাধনেই উৎকর্ষিত আগ্রহে দাড়িয়ে আছে কড়া। কিন্তু তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে বান তিনি। ও: তাহলে জনবর মিথ্যা নয়। তাঁর কুমারী কড়া আজ সম্ভানসম্ভবা। আর তারই পশ্চাতে দণ্ডায়মান সেই মুক্তকারী পাশায়া। আগুন নিয়ে খেলা করার শাস্তি আজ পাবে। অবরুদ্ধ কোথায় বিকিধিকি বলে ওঠে তাঁর হৃদয়ন। এদিকে পিতাকে দেখে দণ্ডক ও অজ্ঞা নতমস্তকে পিতার পদবন্দনার জন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু সরে বান কঠোর তপস্বী গ্রহণ করেন না প্রশান। প্রবলিত মননে অভিশাপ দেন আপন বজ্রোপবীত হিঁড়ে বলে—'সবংশে-ধ্বংস হও, পাপিষ্ঠ। যে আগুনে আমার অস্তর পুড়িয়েছে সেই আগুনে হারখায়ে যাবে তোমার সর্ব্বব।'

—'না না না পিতা' অজ্ঞা আর্টনামে অজ্ঞা পিতার নিকটে আসে। কিন্তু ভক্তরূপে আর্টকোলাহলে ডরে ওঠে দশদিক। 'আগুন—আগুন লেগেছে কোথায়। আস্তকে আর্টনাম করে জানহারা হয়ে পড়ে কড়া পিতার পারের নিকটে।

—হায়, ব্রহ্মশাপের আগুনে দাবানল বলে ওঠে সেই বিকৃত অরণ্যে। আর সে অগ্নি তার শত শত লেলিহান জিহ্বা মেলে ছুটে চলে এক আনন্দ নগরীর পানে। সে নগরের আনন্দ আস্তকে পরিণত হতে দেবী হয় না। অকস্মাৎ অগ্নি-প্রতিত হয়ে মুহুর্তে রূপান্তরিত হয় আর্টকোলাহলে। কে আহ! বাঁচাও বাঁচাও, জল জল এ কি হল! একি করে সম্ভব হল! দূর অরণ্যের দাবানল কি করে এতটা পথ অভিক্রম করে এখানে বলে উঠল, কিছু বুঝব নাগেই ভয়ে পরিণত হয়ে গেল তিল তিল। করে গড়ে-ওঠা এক জনপদ, ব্রহ্মশাপের রোষাগ্নিতে।

হায় ব্রহ্মশাপ! হায় অগ্র-পশ্চাৎ-বিবেচনাহীন ক্রোধ! কত আশা, কত ভরসা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত আনন্দ। সবই নিম্নে পরিণত হয়ে গেল ভয়ভূপে।

তারপরও কি বেঁচেছিল অজ্ঞা? স্বামীর ভয়ভূত দেহের পানে পড়ে থাকা সে কড়া বোধ হয় যুত্ব্যর অধিক ব্রহ্মণার পাষণ হয়ে গিয়েছিল।

তারপর, সেদিনের সেই জনপদ পরিণত হল ধীরে ধীরে বিজনবনে। কুমার দণ্ডকের কড়া-আশার কত আকাঙ্ক্ষার নগরী রূপান্তরিত হল খাপদ-সকুল গভীর অরণ্যে দণ্ডকারণ্য নাম নিয়ে।

তারপর কত যুগ কেটে গেছে। মহাকালের বধ বহু যুগের পথ অতিক্রম করে গেছে। আকাশে বাতাসে বন মন্ডর ধ্বনিত্তে গেছে কত হাহাকার, সেদিনের সে কথা স্মরণ করে। প্রেমেন্দু মন্দিরে আজও শত শত নয়নারী প্রজ্ঞালি জানার বহুকাল আগের পুরাণের ছুটি তরুণ-তরুণীর প্রেমকথা স্মরণ করে। সে প্রজ্ঞালির সঙ্গে একবিন্দু নয়নজলও কি পড়েনা সেই অকৃত কামনা অভিশপ্ত দম্পতির উদ্দেশ্যে? হরত পড়ে, আর সেই অজ্ঞা-জলেই হরত ত্রবীভূত হয়ে গেছে, শতাব্দীর অভিশাপ, কে জানে?

তারপর একদিন সেই ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে বেগে উঠছে এই অরণ্য। তারই প্রভাবিত চলেছে আজ। বহু বহু কাল পরে তাই বসতি করতে এসেছে আর একদল অভিশাপগ্রস্ত মাহু; এ অরণ্যকে সেদিনের মতই সুজলা সুকলা শতপ্রামলা-করার আকাঙ্ক্ষা কৃকে নিয়ে। বিবে বিবকর হয়ে যাবে, আবার বেঁচে উঠবেন দণ্ডক নতুন যুগের মাহুয়ের আশার আকাঙ্ক্ষার মাঝে। আজকের অজ্ঞার প্রাণে থাকবে না আস্তক আশা, থাকবে না অভিশাপের ভয়, শাপ-রুদ্ধ অহল্যার মত মুক্ত হয়েছে। আজকের দিনের মাহুবেগ তাই মুখে আনলে বর বাঁধতে চলেছে নতুন উৎসাহে। অভিশাপের আশঙ্কা নয়, দেবতার আশীর্বাদই বহিত হোক তাদের ওপর,। দৈত্যচার্য্যের যুতসজীবনী মস্তেই সজীবিত হয়ে উঠুক আজকের নতুন মাহুবেগ।

মাসিক বসুমতীর প্রচার ও প্রসার বাওলা দেশের বিদ্যর!!

আধুনিক
গৃহিণীদের
মতে

সার্ফে কাচা কাপড় সবচেয়ে ফরসা হয়

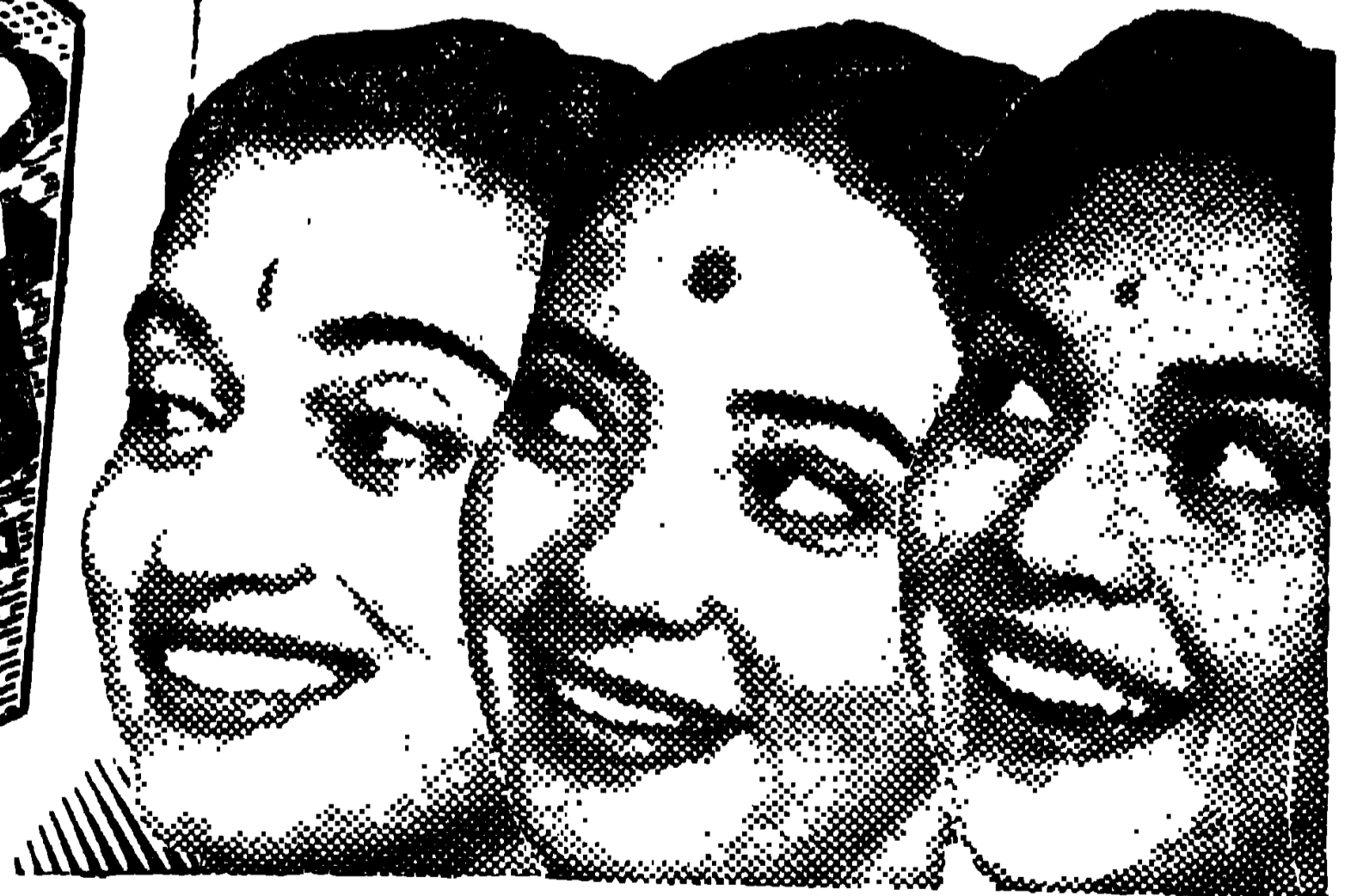
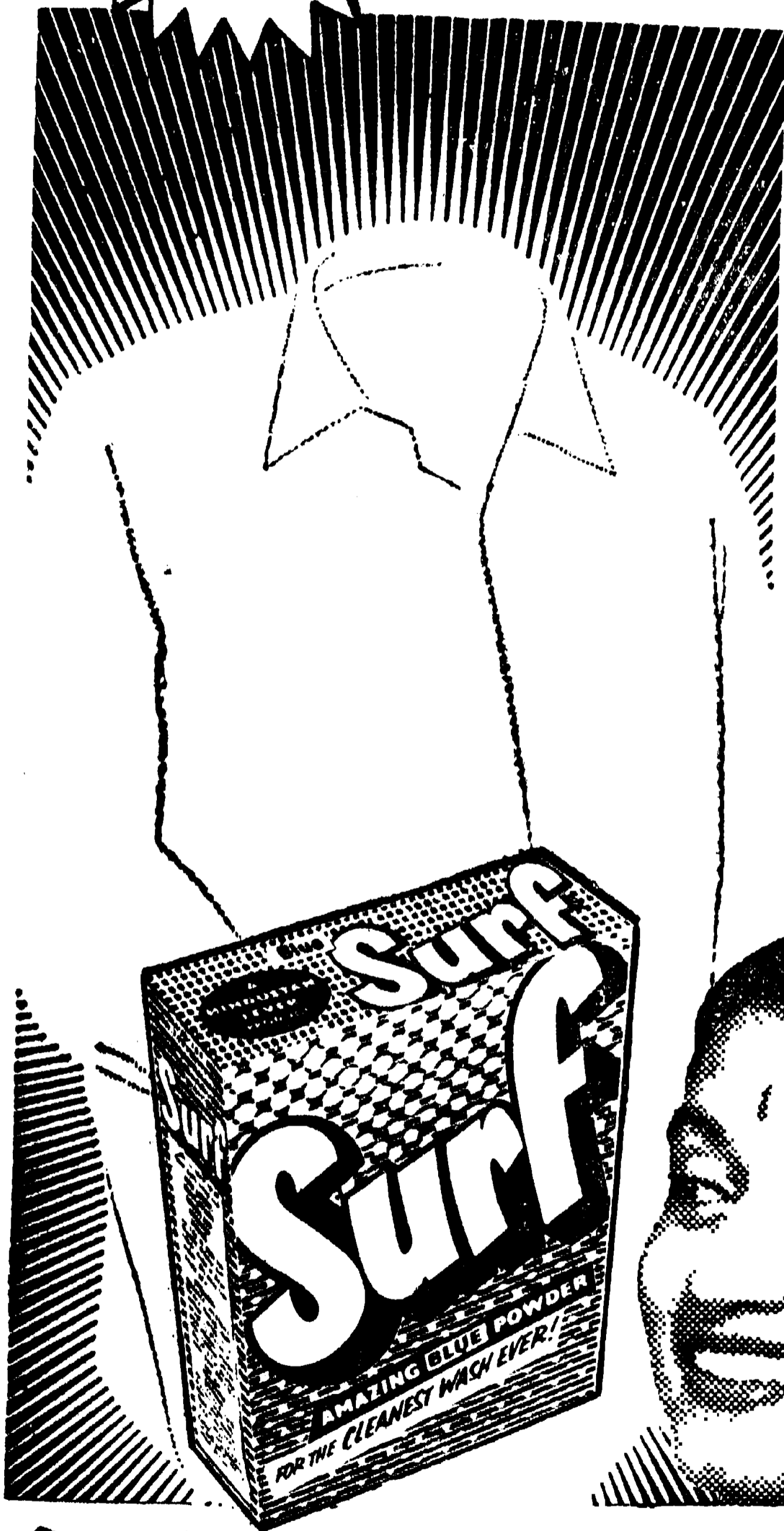
খুব সহজে !

হাজার হাজার গৃহিণীরা আজ সার্ফ ব্যবহার করে জেনেছেন যে সার্ফের মতো এত ফরসা করে কাপড় আর কোন কিছুতেই কাচা যায় না।

সার্ফের কাপড় কাচার শক্তি অতুলনীয়। কাপড়ের ভেতরের সব ময়লা, এমনকি লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে—তাই সার্ফ কাপড় সবচেয়ে ফরসা হয়।

আধুনিক এই কাপড় কাচার পাউডারটিতে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। তাই সার্ফই আজকের দিনে কাপড় কাচার সবচেয়ে সহজ উপায়।

ধুতি, শাড়ি, ব্লাউজ - জামা, ফ্রক, সার্ট, তোয়ালে, ঝাড়ন, বালিশের ওরাড়, বিছানার চাদর, এক কথায় আপনি বাড়ীর সব কাপড় চোপড়ই সার্ফে কাচুন—দেখবেন মসৃণ কাপড় ঝলমলে আর সাদা কাপড় ধবধবে ফরসা করে তুলতে সার্ফের জুড়ী নেই।



সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় **সবচেয়ে ফরসা** হবে

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের ভৈরী

বিপ্লবের সঙ্ঘাতে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরপাড়ার মানিক ব্যানার্জি (স্বতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু মুসলমান-দাঙ্গার শান্তিপ্রচারণার সময় পার্কসার্কাসে শতিন মিত্র সহ নিহত) আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে আসতো—সে তখন এম, এ পড়তো (৩০ সাল)। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে কৃষিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, এবং তার নীতি-কর্মসূচী প্রভৃতির তুলনা করে আমি আলোচনা করতুম, মানিক ছিল আমার উৎসাহী সমর্থক। তখন আমাদের দেশে কৃষ-বিরোধী অপপ্রচার চলে প্রচুর—কৃষিয়ার বইপত্র আসে না—পাশ্চাত্য লেখকদের কিছু কিছু বই আসে, যার মধ্যে প্রচলিত অপপ্রচারের বিরোধী কিছু কিছু কথা পাওয়া যেত—যেমন ওয়েব-দম্পতির বই, মরিসভিগোসের বই, জেলনা কোটসের লেখা প্রভৃতি। তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত্যেগো কথা উদ্ধৃত করে মাঝে মাঝে “মতর্প বিকিউ” কিছু লিখতো। আমরা সেই সব লেখা প্রাথমিক পুঁজে পড়তুম—আমি এবং মানিক।

একদিন সে লণ্ডনের “ইকনমিষ্ট” পত্রিকার এক স্পেশাল সাপ্লিমেন্ট এনে হাজির—বললে যা কাগজ এসেছিল, সব সাবাড় হয়ে গেছে—আমি শেষ মুহূর্ত এক কপি পেয়ে গেছি। সেটাকে কৃষিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরের অল্পত সাকল্যের রিপোর্ট বেরিয়েছিল। ধনবাদী হুনিয়ার অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতেরা যে পরিকল্পনাকে অসম্ভব করনা বলে বিক্রম করেছিলেন, তাঁরা একটু গভীর হয়ে গেছেন। সাকল্যের আংশিক স্বীকৃতির সঙ্গে তাঁরা মতুন ধরণের অপপ্রচার শুরু করেছেন, টেলিম কেমন করে কৃষ জনগণকে আধিপেটা খাইয়ে চাবকে খাটাচ্ছে। ধনবাদী হুনিয়ার তখন অবস্থা ২১-৩৪ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট চলছে।

বাই হোক, কগাচী কংগ্রেসের আগে অমরদা (চ্যাটার্জি) জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছেন। তিনি কংগ্রেসে যাবেন—আমার মনটা ছটফট করতে লাগলো এই বিশিষ্ট কংগ্রেস মেধার জন্মে— তাঁকে বললুম। তাঁর মায়া হল, তিনি আমাকে সঙ্গে নিলেন। তিনি যে আমাকে স্নেহ করতেন, তা ভাবায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসে গেলুম, ভেলিগেট হয়ে নয়, নর্শক হয়ে। সেই প্রথম সরোজিনী নাইডু এক বক্তৃতা শুনলুম, তেমন বক্তৃতা আর কখনো শুনিনি এবং শুনবোও না। চমৎকার আলঙ্কারিক

ইংরাজী ভাষায় প্রায় দু'ঘণ্টা বড়ের মতন আবেগময়ী বক্তৃতা—যেন প্যাগেলবুক সকল লোককে মাতিয়ে তুললো। শুধু কথা, আর কথা এত কথা কোথা থেকে কেমন করে জোগায়, তাবলে অবাক হতে হয়।

সরোজিনী নাইডু একবার কংগ্রেস কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেরিত হয়েছিলেন ভারতীয়দের অবস্থা পরিদর্শন এবং কংগ্রেসী প্রচারণার জন্মে। তখনকার একটা কথা মনে আছে। জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং কথা-কাটাকাটি চলছে। স্মাটস বলেছেন, I am a strong man, সরোজিনী নাইডু তেড়ে কুড়ে জবাব দিচ্ছেন, I am also a strong woman।

বেপরোয়া মেয়ে। পরবর্তীকালে তার আর এক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল। একবার তিনি কলকাতার এসেছেন—ঠিক মনে মেই—হয়ত ৩৮সালে ওয়েলিংটন কোয়ারে এ-আই-সিসির মিটিংয়ের সময়েই হবে। কে একজন তাঁর সামনে কথাবার্তার মধ্যে জিয়ার নাম করে বলেছিলেন agent of British Imperialism, সরোজিনী নাইডু কেপে গিয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চড় উঁচিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—Say once more—অর্থাৎ আর একবার বললে চড়িয়ে গাল তেজে দেবে। সবাই ‘থ’ হয়ে গিয়েছিল।

এ-আই-সি সি য়ে সভার প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিনি,—এবং সে সভায়ও তিনি এমন এক বেপরোয়া কাজ করেছিলেন,—যা না করলে ভারতের পরবর্তী ইতিহাস হয়ত অন্য পথে চলতো। সে সভার কংগ্রেসের নির্ধাচিত সভাপতির পদত্যাগ পত্রের আলোচনা হওয়ার কথা ছিল বলে সুরভাবাবু সভার প্রেসিডেন্ট হননি। সেই সভাতেই প্রেসিডেন্টের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেস সভাপতিরূপে নির্ধাচিত করা হয়। সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন, Even at the risk of being a bit unconstitutional, আমি এই নির্ধাচনের অমুমতি দিলুম, কারণ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পদ এক দিনও খালি থাকা উচিত নয়।

কেউ কম বান না! ব্যাপারটা শুধু অবৈধ নয়,—সৌভাগ্য-হীনতার একটা দৃষ্টান্ত। কারণ এ অবস্থায় প্রেসিডেন্টকে তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অস্বীকার করে কেবল পাঠানোই

দেওয়া। কিন্তু কংগ্রেস হাইকমান্ড সুভাবাব্যুকে বর্জন করার এই first chance পেয়েই চোখ-কান বুজে কাজ হাসিল করে নিলেন। বঙ্গলোকের অভিমানী ছোট ছেলের মতন সুভাবাব্যুর এই পদত্যাগপত্র দেওয়ার কাজেই কংগ্রেস হাই কমান্ডের পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

বাই হোক, '৩১ সালের করাচীর যে চেহারাটা আজও মনে আছে, সে হচ্ছে প্রশস্ত ও পরিষ্কার সড়ক। মনে হয়েছিল, করাচী সহরের ছোট বাস্তবশালোই কলকাতার সেটাল অ্যাভেনিউয়ের মতন চওড়া, —আর প্রধান সড়কটা সেটাল অ্যাভেনিউয়ের দ্বিগুণেরও বেশী চওড়া। পথ বাট চমৎকার পরিষ্কার। বড় বড় বেইরুটের সামনে রাস্তার ধারের ফুটপাথের মতন জায়গার Upholsterd sofa settee ও টেবিল দিয়ে সাজানো, দলে দলে লোক সেখানে বসেই চা প্রকৃতি খায়—বেশ অছুত লাগে।

ফেরার পথে সুরঙ্গর বাঁধ দেখলুম—সুবিদ্যুর্ণ সিদ্ধু নদের শুক গর্ভের ওপর বিরাট নির্মান কার্য চলছে। একজন বাঙ্গালী ওভার-সিয়ারের অতিথি হলুম। ভঙ্গলোকের কথাবার্তা অছুত দে-আঁশলা হয়ে গেছে। খচ্চরের পিঠে বস্তা চাপিয়ে সারি দিয়ে মালবহন চলছে সিদ্ধুগর্ভের ভিতর দিয়ে। ভঙ্গলোক বললেন, চালু পথের বাইরে অনেক জায়গায় চোরাবালি আছে, সেখানে গিয়ে পড়লে মারা যেতে হয়,—একবার “দো গাধাহা মাটির ভিতরে ধসে গেল,—বাঁচবার উপায় নেই।

তিনিই আমাদের গাইড হয়ে নিয়ে গেলেন মহেঞ্জোদাড়ো

দেখতে—কাছেই। কাগজের লেখা পড়ে বা মনে আশা করে বেখেছিলুম, সেসকম কিছু নয়। তবে উপরের তুপুটেক বেশ ধানিক নীচে একটা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে গলিপথ, দেওয়াল, খাম, কুঠুরী,—বেন কাঁচা ইটের গাঁথনী,—একটা অভিনব ব্যাপার বটে। তখনও খনন কার্যের অনেক বাকি,—প্রথম দফার আবিষ্কার নিয়েই কাগজে প্রচুর লেখা বেরিয়েছে। খনন কার্য হুগিত আছে' সময় সংক্ষেপ করার জন্য আমাদের অবশ্য সবটা দেখা হয়নি।

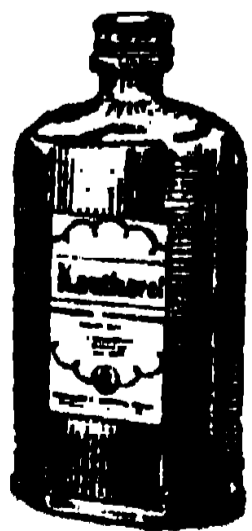
তারপর গেলুম “সাধ-বেলা” দেখতে সিদ্ধু-বিদ্যুর্ণ গর্ভের মধ্যে স্বল্প-পারিসর জলধারার পাশে এক ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্কুণ্ড শোভিত ঘোপের-মতন—ছোট ঘোপ, কিন্তু বেশ উঁচু। তখন বোধহয় চৈত্রমাস। বর্ষার বধন সিদ্ধু বিশাল ও প্রবল জল স্রোত এক সমুদ্রের আকার ধারণ করে, তখনও “সাধবেলা” তার মধ্যে মাথা উঁচু করে-পাঁড়িয়ে থাকে। শিখ সাধুদের আশ্রম—এক মোহন্ত মহারাজ কিছু লোক-লঙ্কর নিয়ে সেখানে বাস করেন, আর মাঝে মাঝে ২।১ জন উটকো শিখ সাধু সেখানে অতিথি হন। অমরদা পলাতক অবস্থায় কিছুদিন জটাভূটধারী শিখ সাধুবেশ ধারণ করে ভারত পরিক্রমা করেছিলেন, এবং সেই অবস্থায় কিছুদিন সেখানে ছিলেন। বৃদ্ধ মোহন্ত মহারাজ তাঁকে ভালবেসে সেখানেই থেকে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু অমরদা হঠাৎ একদিন সরে পড়েছিলেন, এবং কিছুদিন পরে পুলিশও সেখানে গিয়েছিল তাঁর সন্ধানে।

আমরা বধন গিয়েছিলুম, তখন বৃদ্ধ মোহন্ত মহারাজ মারা গেছেন, তাঁর শিষ্য গদী পেয়েছেন। আশ্রমের বিরাট দেবোত্তর

ক্রিওপেট্রা ও কেতকী



ক্রিওপেট্রার ঘন চিকণ কেশগুচ্ছের মূলে ছিল অলিভ অয়েলের নিত্য ব্যবহার। একালের কেতকীও জানেন যে, কেশবর্ধনে সহায়ক বলে সুবিদিত অলিভ অয়েল এবং অগ্নাত উদ্ভিদ্ধ তৈলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ক্যাল-কেমিকোর ক্যান্ডারল কেশতৈল কেশবর্ধনে অপরিহার্য।



ক্যান্ডারল

অলিভ অয়েল সংমিশ্রণে প্রস্তুত
একমাত্র সুগন্ধি ক্যান্ডারাইডিন কেশ তৈল
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২১।



সম্পত্তি এবং নগদ আয় আছে—শিখ রাজারা এবং বড়লোকেরা ভক্ত। মহারাজ অমরদার বাঙ্গালী ভক্তলোকের বেশ দেখে আগে চিনতে পারেননি। পরে এক একা কিছু কথাবার্তার পর পরিচয় দিতে তিনি চিনতে পারলেন, এবং একঠোকা পেস্তা কিসমিস প্রসাদ দিলেন। অমরদাও কিছু নগদ প্রণামী দিয়েছিলেন।

তারপর যাওয়া হল লাহোরে এক বাঙ্গালী ভক্তলোকের অতিথি হয়ে। সেখানে ট্রিবিউনের সম্পাদক বিখ্যাত সাংবাদিক বুদ্ধ কালীনাথ রায় এসে অমরদার সঙ্গে দেখা করলেন এবং অমরদা তাঁর কাছে আমাকে পরিচিত করে দিলেন—ভবিষ্যতে পরিচয়টা কোন কাজে লাগতে পারে। তারপর সেখান থেকে, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা বৃন্দাবন ঘুরে কলকাতায় ফিরে আসা হল।

তখন আমার মনটা নেচেছে,—কোন প্রকারে রুশিয়ায় যাওয়া যায় কিনা। কবাচীতে সেই চেষ্টার কাজ শুরু হয়েছিল। পেশোয়ারের কংগ্রেস নেতা ডাক্তার চাকু ঘোষ অমরদার সঙ্গে দেখা করতে এলে অমরদা আমার পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি আমার রাশিয়ায় যাওয়ার কোন বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন কিনা—পেশোয়ারী ব্যবসায়ীদের সাহায্যে—যাও মধ্য এশিয়ায় সঙ্গে ব্যবসা করে। চাকুবাবু বললেন, পুস্ত ভাষায় ভাল কথাবার্তা বলার মতন শিক্ষা থাকলে তিনি চেষ্টা করতে পারেন। তারপর তিনি কলকাতার বড় বাজারের পেশোয়ারী কংগ্রেসনেতা মোস্তাফিজুল হককে ডাকিয়ে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ব্যবস্থা হল, কলকাতায় ফেরার পর আমি মোস্তাফিজুল হকের কাছে পুস্ত ভাষা শিখবো, এবং তারপর পেশোয়ারে চাকুবাবুর কাছে যাবো। ব্যবস্থা হয়েছিল ভালই, কিন্তু ব্যাপারটা বেশীদূর এগোতে পারিনি। কেন—তা পরে বোঝা যাবে। ঐ সব ব্যবস্থার পর চিন্তাধারা একটু নতুন পথ ধরেছিল। একখানা ঘরের প্রয়োজন বোধ করছিলুম,—যেখানে আমার গোপন আস্তানা হবে, বইপত্র থাকবে, লেখাপড়া করবো। প্রকাণ্ড আস্তানা অবশ্য আত্মশক্তি লাইব্রেরীতেই থাকবে। মাড়োয়ারী বন্ধুকে বললুম। সে বললে, ভবানী দত্ত লেনে বসন্তলাল মুখারকাদের বাড়ীর নীচে একটা ছোট “বাইবের ঘর” আছে। সেটা প্রায় খালিই থাকে, সেটা হস্তান্তর করা ভাড়া দিতে পারে। আমি কোনে জিজ্ঞাসা করে বলবো।

বসন্তলাল অমরদাকে খাত্তির করেন, জানতুম। আমি অমরদাকে বললুম। তিনি বসন্তলালকে জিজ্ঞাসা করতে বসন্তলাল বললেন, হ্যাঁ, ঘরটা দেওয়া যায়, কিন্তু আমাদের এক মাড়োয়ারী ছোকরা এক বাঙালী বাবুর সঙ্গে ঘরটা চেয়েছে, আর ঐ ছোকরার একটা দল আছে, তাদের “বোম্ব-ওয়ারিকা খেয়াল” আছে। তাই আমি “না” বলে দিয়েছি।

অমরদা বললেন, সে সব ভয় কিছু নেই—আমার জানা লোক। তখন বসন্তলাল রাজী হলেন,—ঘরটা পেলুম। মাড়োয়ারী বন্ধুকে কাণ্ডটা বললুম। সে কখনো সে ঘরে আসার চেষ্টা করেনি। বসন্ত—আমি চ’মাসের ওপর সে ঘরে ছিলাম,—কেউ জানতেই পারেনি—কাউকেই বলিনি বা আসতে দিইনি। শুধু অমরদাই মাঝে মাঝে আসতেন,—আমি জানতেন শুধু আত্মশক্তির মোটীদা আর মানিক। মানিককে বলে রেখেছিলুম, আমি যদি জেল

বাই, তাহলে সে যেন আমার সংগৃহীত বইয়ের গাদা থেকে ভাল বইগুলো বেছে নিয়ে নিজের হেপাজতে রাখে, যাতে ফিরে এসে পাই। ভাল বই আমার অনেক জোগাড় করেছিলুম, তার মধ্যে ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্তের মিলিটারী ও অস্ত্র অভিযান সংক্রান্ত বই এবং মাপও অনেকগুলো ছিল।

সেখানে বসেই “ক্রীড়াগতা” সম্পূর্ণ করি। আর রজনীকান্ত দাসের বইগুলো এবং “মডার্ন রিভিউ” থেকে পণ্ডিত ব্রহ্মসুন্দরমের প্রবন্ধগুলো নিয়ে একখানা বড় বই লিখতে শুরু করি “ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন।” দেশে ও বিদেশে ভারতীয় শ্রমিক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথার ঠাসা বই। ১৯২০ সাল পর্যন্ত লিখে বেশ বড়সড় প্রথম খণ্ড শেষ করে,—তার পরের অবস্থায় নতুন ফ্যাক্টরী লেভিসলেশন, কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতি লেখা হয়েছিল।

তারপর অমরদারই অর্থাভুকুল্য আত্মশক্তি লাইব্রেরী থেকে নিজের নামেই “ক্রীড়াগতা” প্রকাশ করলুম। ভয় ছিল, বইটা বাজেরাপ্ত হবে, কিন্তু হল না। কিন্তু বাঙ্গালার রাজনৈতিক সাহিত্য-জগতে একটা রীতিমত সোরগোল উঠেছিল। এখানে বলা দরকার, “ক্রীড়াগতা” কথাটার সাহিত্যে প্রচলনের গৌরব বা অগৌরব আমারই। আমার “ক্রীড়াগতা” প্রকাশের আগে কথাটা সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পায়নি, কারণ ওটা নেহাৎ পশ্চিমবঙ্গের একচেটিয়া একটা slang শব্দ। আর শব্দটা রাজনৈতিক সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করেছে।

Advance কাগজে বিজ্ঞান সেনের লেখা এক কলাম রিভিউ বেরিয়েছিল—তাতে বলা হয়েছিল,—(Advance 9. 8. 31)

“The author is well known as a writer of political articles.... The main burden of his thesis is that, political India has now fallen a victim to some false theories.... and blurred the vision of the people, moreover, a set of men, some selfish and some misguided, installed themselves on their shoulders, and are leading, or more appropriately misleading, them from one futility to another..

“The charges are downright, and in setting them forth the author has shown so much analytic skill, courage of conviction, and wealth of language, that even those who will honestly differ, will not be able to withhold word of admiration for them....

“The infusion of so much heat into the discussions is, we believe, partly due to his great sincerity of convictions and partly to the consciousness of the fact that a desperate disease calls for a desperate remedy, We welcome the book as an extremely thought-provoking political production.”

“অনুভবাজার পত্রিকা”তে রিভিউ বেরিয়েছিল ভাল, কিন্তু ছোট আর প্রবর্তক এক লম্বা রিভিউ করে শুধু আকর্ষণ করেছিল, এম সর্বদেশে আইকিয়া দেশে কোথা থেকে এল? ইত্যাদি—

ব্যক্তিগত অভিনন্দনও বেশ কিছু পেলুম। উপেনদার সবচেয়ে বড় appreciation “ত্যাগোড়”—তিনি আপ্যায়িত করেন “ত্যাগোড়” বলেই। তাঁর যে আমার ওপর স্নেহটা প্রায় ভক্তির পর্যায়ে উঠেছিল, তার বহু প্রমাণ পরবর্তী কালে পাওয়া গেছে। যথাসময়ে সে কথা আসবে।

উত্তাপাড়ার চৈতন্যদেবের কাকা বৃদ্ধ সর্বজনমাত্ত পণ্ডিত ব্যক্তি— তিনি আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে আলাপ করে পিঠ চাপড়ে আশীর্বাদ করলেন। আবহুল মোমিন congratulate করলেন। টালায় তখন কমবেড বাদল গাজুলী (বর্তমানে স্বতন্ত্র পার্টির অগ্রতম সংগঠক) এক সাম্যরাজ পার্টি গঠন করেছেন—তিনি সেই থেকে হলেন আমার একজন বন্ধু ও admirer, একদিন ছাব্বিসন বোড়ে বেনেটোলার কাছে অভুল সেনের (নোয়াখালীর অসহযোগী উকীল ও বিখ্যাত অ্যামেচার হাত্ত-কৌতুকশিল্পী) সঙ্গে দেখা। তিনি রাস্তার মাঝে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার চাপদাড়ি শোভিত দুই গালে দুই চুষু খেয়ে, কাকানি দিয়ে একাকার। গান্ধী-কংগ্রেস-বিরোধী আবহাওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ এই “শ্রীভাঁওতা” appreciation, হুড়ুড়ুড় করে অনেক বই বিক্রী হয়ে গেল।

এর পর সেনগুপ্ত এবং অমরদা বেরলেন পূর্ববঙ্গ সফরে। সঙ্গে চললেন ডক্টর কানাই গাজুলী, শচীন মিত্র, হাওড়ার কৃষ্ণ চ্যাটার্জী—আমি সঙ্গে নিলুম কিছু “নিয়নক্সই বনাম এক” এবং কিছু “শ্রীভাঁওতা” সঙ্গে নিয়ে। সিলেট, শিলচর, করিমগঞ্জ, কুমিল্লা এবং ধুলনা ও বাগেরহাটে কিছু বই ছড়িয়ে এলুম।

শ্রীহটে জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অতিথি। কুমিল্লার হরদ্বাল নাগের বাড়ীতে একদিন থেকে, এক মিটিং করে অখিল দেশের বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ খেয়ে (অমরদা ও আমি) শ্রীহটে এসেছিলুম। সেখানে সেনগুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। অমরদা ও আমি একদিন বেলা থেকে গেলুম। এক মিটিংও হল। ২২ সালের বিক্রমপুরের বানরী বিজ্ঞানশ্রমের অগ্রতম সংগঠক তখন শ্রীহটে এক বিজ্ঞানশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের পুরাতন সহকর্মী—দেখা হল এবং আলাপ-আপ্যায়ন হল। পলাতক বনভূষণ দত্তগুপ্ত, আমাদের বীণা, তখন সেখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে। সে গোপনে এসে দেখা করে গেল।

জমিদারের অতিথি—দুপুরে খেতে বসেছি তিনজন একসঙ্গে— একে অমরদা, এক পাশে ব্রজেন্দ্র বাবু, এক পাশে আমি। কাণ্ড খালার চারিদিকে গোটা কুড়ি বাটি সাজানো—নানা কন্ডের কাণ্ড, বোড়শোপচার কোথার লাগে।

কথাবার্তা চলছে রাজনীতি নিয়ে—ব্রজেন্দ্র বাবু ইউনিভার্সাল ইন্সটিটিউটের কথা তুলেছেন। মনে রাখা দরকার, সেটা '৩১ সাল, ৩৫ সালের শাসনবিধিতে প্রদেশে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল তরুণ মাত্র ১৩ জনের। সুতরাং অনেকেরই মাথায় তখন বিজ্ঞানী ভোটার অধিকারটা ছিল একটা সুখস্বপ্নের মতন। আমার মাথায় তখন কমিউনিজম গিজগিজ করছে, আর সুখটাও হয়ে গেছে পান খানিক চিলে। আমি সচীন বলে বসেছি,—ওটাতো বড় লোকদের যাচুরী মশায়।

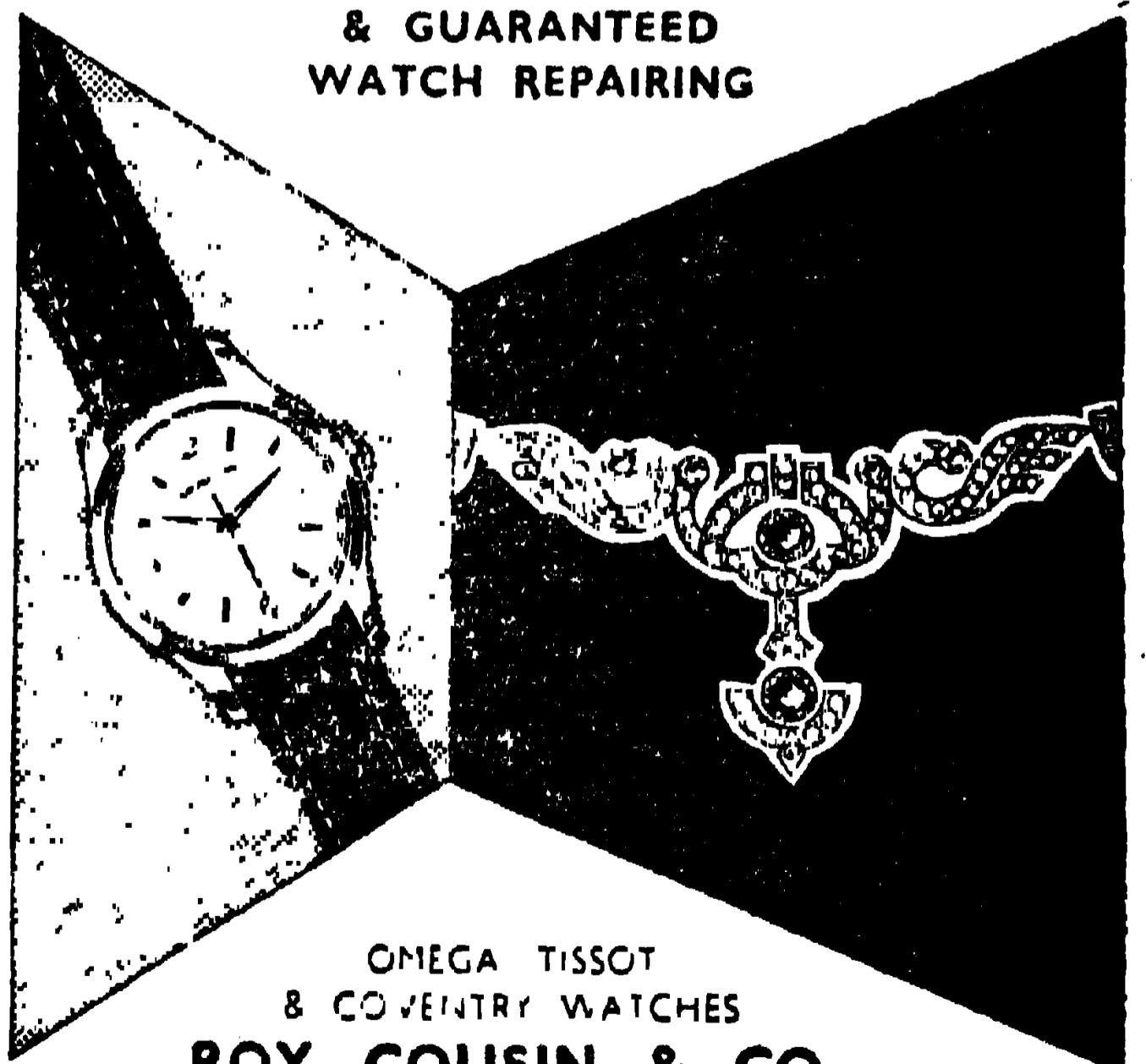
বলেই অপ্রতিভ হয়ে গেছি—বোড়শোপচারে অতিথি সেবার সে জমিদার গৃহস্থায়ী কথার এই জগাব! কিন্তু সামলে নেওয়ার

অন্তে তেড়ে ফুড়ে বলে চললুম, ক্যাপিটালিষ্ট রাজ্যে জনগণের সার্বজনীন ভোটার মোট ফল, ইলেকশনের সময় কোন বড়লোক কত ছলে বলে কত ভোট সংগ্রহ করতে পারে, তারই কম্পিটিশন। ব্রজেন্দ্র বাবুও আমার বাণী শুনে অপ্রতিভ হয়েছিলেন, তিনি আমতা আমতা করে বললেন, তা বটে, তা যা বলেছেন, ঠিকই।

বাই হোক, সেখান থেকে গেলুম শিলচরে, এবং অতিথি হলুম সতীন্দ্র দেবের (কংগ্রেস নেতা)। তারপর করিমগঞ্জে শ্রীশ দত্তের বাড়ী হয়ে, আখাউরা থেকে চাঁদপুরে রেল এসে ষ্ট্রিমায়ে এলুম একেবারে ধুলনার এবং কংগ্রেস নেতা উকীল নগেন সেনের অতিথি হলুম। আবার দমদম জেলের যে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কথা আগে বলেছি, তিনি ইতিমধ্যেই রিটারার করেছেন এবং ধুলনাতেই তাঁর স্বগৃহে এসে বসেছেন। তাঁর বাড়ী গিয়ে অমরদা আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। এক এক কপি বই তাঁকে উপহার দিলুম। বই দিচ্ছিলুম গান্ধীভক্তদের বাদ দিয়ে। বাগেরহাটে গিয়েও কয়েক ঘণ্টা থেকে এক কর্মীদের আড্ডায় বই দিয়ে এসেছিলুম। পরে তাদেরই একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বহরমপুর বন্দিশালায়, '৩৪ সালে।

সফরের দলটার মধ্যে সেনগুপ্ত, শচীন মিত্র এবং কৃষ্ণ চ্যাটার্জী গান্ধী কংগ্রেসপন্থী—অমরদা কংগ্রেস লীডার বটে, কিন্তু বিপ্লবী চরিত্রও তাঁর অটুট ছিল, আর কশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রতিও তাঁর দরদী মনোভাব ছিল। ডক্টর কানাই গাজুলী কথাবার্তা এবং বক্তৃতার সোসিয়ালিজম-কমিউনিজম বলতেন। আর আমি নিজেকে কমিউনিষ্ট মনে করতে সুরু করেছি। একদিন কানাই গাজুলীকে যাচাই করার জন্তে জিজ্ঞাসা করলুম,—আপনি যে ভাবায়

for JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

সোসিয়ালিজম-কমিউনিজমের কথা বলেন, সেগুলো বেশ স্পষ্ট নয়—বলশেভিকদের প্রেলোটারিয়ান রেভোলিউশন, ডিক্টেটরশিপ তক দি প্রোলোটারিয়েট মানেন?—বুর্জোয়াদের নিরস্ত্র করা এবং ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া মানেন?

তিনি গাঁইগুঁই করে যা বললেন, তাতে ধরা পড়ে গেলেন যে, তিনি বলশেভিকবিরোধী সোসিয়ালিষ্ট। কিছু বাণী দিয়ে ছেড়ে দিলুম। তিনি পরে অমরদার কাছে অসুযোগ করে বলেছিলেন, নারায়ণ বাবু এ সব radical idea কোথায় পেলেন? অমরদা হাসতে হাসতে কথাটা আমার কাছে বলেছিলেন। “ও বলতে চায়, আমার চেলায় মতিগতি এমন হল কি করে?”

বাই হোক, কিরে এসে “ভারতীয় শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন” বইটা ছাপাবার কথা অমরদার সঙ্গে আলোচনা হল। নভেম্বর মাসে (ঠিক মনে নেই) বহরমপুরে প্রাদেশিক কনফারেন্সের ব্যবস্থা হচ্ছিল। ঠিক হল, কিছু ছাণ্ডবিল ছাপিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে বিলি করতে হবে, তাতে বইটার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে advance booking এর ব্যবস্থার কথা থাকবে। বিজ্ঞাপনের খসড়া লেখা হল।

এমন সময় একদিন হঠাৎ বিনা মেখে বন্ধাঘাত। “ক্রীড়াগতা” সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তরুণ সাংবাদিক তখন Advance কাগজে চাকরী করে, এবং Editor বলে তার নামই ছাপা হয়—জেল এডিটর—কোন কারণে এডিটরের জেল হলে সে জেলে যাবে। বাবু দেশ প্রেমিক মালিকদের খেল।

কাগজের অফিসে অফিসে সরকারী প্রেস নোট এসেছে—তার মধ্যে খবর—“ক্রীড়াগতা” proscribed. শচীনন্দন সংবাদ জানা মাত্র ছুটে এসেছে আক্ষয়জি লাইব্রেরীতে খবর দিতে। আমি খবর পেয়ে রাত্রেই বই সরাবার বন্দোবস্ত করে ফেললুম। আর কোন উপায় না দেখে আক্ষয়জি লাইব্রেরীর সামনের পাইওনিয়ার টেলারিং নামক দর্জি দোকানের এক ছোকরা assistant-কে বললুম। বাড়ীটার ভিতরে ওদের একটা ঘর ছিল, এবং সেখানে রাত্রে সে থাকতো। বন্দোবস্ত হল, কতকগুলো বইএর বাস্তিগ সেখানে একদিনের ভাড়া রাখা হবে,—পরের দিন সন্ধ্যার পর আমি সেগুলো আবার সরিয়ে নিয়ে যাবো। তদন্তসারে বাস্তিসর্বাধা বইগুলো সেখানে সরালুম—এবং একুশ কপি বই লাইব্রেরীর সেল্কেই সাজানো থাকলো। রাত-তখন অনেক।

পুলিস সার্চ করতে আসবেই, এবং একুশ কপি বই পেয়ে গেলে পরম পুলকিত হবে, আর বেশী খোঁজাখুঁজি করে আমাকে বিস্ত্রত করবে না। হলও ঠিক তাই। পরদিনই সার্চ হল, এবং একুশ কপি বই পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। একবার জিজ্ঞাসা করলো আর বই কি হল? আমি বললুম, সব বিক্রী হয়ে গেছে। দপ্তরীর ঠিকানা নিয়ে সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে বই পায়নি। ল্যাঠা চুকে গেছে।

রাত্রে একটা বাখটবে বইয়ের বাস্তিগগুলো বোঝাই করে একটা ছোট কাপেট চাপা দিয়ে এক চেনা স্কুটের মাথায় দিয়ে ঘরে নিয়ে গেলুম। পরে '৩৪ সালে বহরমপুর বন্দিশালার টালার কিতাশ ঘোষের (detenu—কমিউনিষ্ট) মুখে শুনেছিলুম—ওরা মোটাদার কাছ থেকে পোপনে এক টাকা দিয়ে বইটা কিনে নিয়ে গিয়ে চারপাঁচ টাকার পর্বত বিক্রী করতেন।

সাধারণত বই প্রকাশের পরই Proscribed হয় “ক্রীড়াগতা” বেলার দেবী হল কেন? আদ্যে একটা কারণ খুঁজে নিলুম। সাধারণত বই হাতে পেলে লোকে গোড়াটা এবং শেষটা আগে দেখে নেয়। বিশেষত বইগুলো পড়ে দেখাই যাদের চাকরী, তাদের ও কাজটায় আনন্দ থাকে না, এবং তারা বইটা পারে সটকাট করে। সন্তুষ্ট: I. B-র যে অফিসারের হাতে কাজটা পড়েছিল, তিনি গোড়াটা এবং শেষটা একটু দেখেই বুঝে নিয়েছিলেন, বইটা একটা ব্যঙ্গ-কৌতুক বা কাজলামি মাত্র। তার কারণ হচ্ছে, প্রথম অধ্যায় স্ক্রীই একটা ভাঁওতা। তাতে লেখা হয়েছে।

“স্ক্রী পূর্বে বখন কোথাও কিছু ছিল না,—বেদের ভাবায়—বখন অন্ধকার ঘারা অন্ধকার আবৃত ছিল—তখন একদিন স্বয়ং ব্রহ্ম হঠাৎ কট করে’ আপনি গজিয়ে উঠলেন।...”

“সেই নিরবিচ্ছিন্ন, নিবিড়, নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে গজিয়ে উঠে একা একা তিনি বড় কাঁপরে পড়লেন। কাজেই অনেক ভেবে চিন্তে শেষে প্রকাশ এক ভাঁওতা ঝাড়লেন।

“দেখতে দেখতে অন্ধকারের মধ্যে ক্ষিত্যপতেজমরুছোয় গজিয়ে উঠলো। ক্রমে গ্রহ উপগ্রহ, নন্দনদী, পাহাড়, জল, মন্ত-কুর্প, বরাহ প্রভৃতি সবই কটকট করে গজালো। তারপর যেদিন মাহুধ গজালো, সেইদিন থেকে ব্রহ্মাবুড়োর মাতঙ্গরীতে যুগ ধরলো।

“তোজোর আগেই উদর গজানোতে, সে গহ্বর পূর্ণ করার জর বখন সকলে হাঁ করে ব্রহ্মা বুড়োকেই গিলতে উদ্ভত হও, তখন ঘাবড়ে গিয়ে ব্রহ্মা বললেন,—বৎসগণ, ছিরোভব। আমার গায়ে আর কতটুকুই বা হাড়-মাস,—তোমাদের এতগুলি কাড়তো এবে ভরবে না। তা আমি এর উপায় করে দিচ্ছি।

“এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি কতকগুলো নখ, দাঁত, হল, লেজ বনুঠাট, ইলেকশন তৈরী করে ভিড়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললেন এই সব অস্ত্রশস্ত্র তোমাদের দিলুম, তোমরা যে ঘর পার পরস্পরে যুগপাত করে ক্ষুদ্রবৃত্তি কর।

“ব্রহ্মার ভাঁওতা বুঝতে পেরে মাহুধও সেই সর্বশক্তিমান ও ভাঁওতার সাধনা আরম্ভ করলে। আনোরারগুলো সোজাশুজি বাকে পারে, ধরে ধায়। কিন্তু মাহুধ মাহুধকে ধায় বটে, কিন্তু ভাঁওতার কুপায়, যে ধায় সে-ই টের পায়,—বাকে ধায়, তার হয় হয়ে বাওয়ার আগে পর্বত হ’সই থাকে না।...”

তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়—অবতার—

“ভাঁওতার বিনি বত বড় ওজাদ, তিনি তত বড় অবতার—আধুনিক ভাবায়—ল’ডার।

“মাহুধের মধ্যে প্রথম অবতার বিনি,—বিনি তখনো আ দীর্ঘে মাহুধের পুরো অবয়ব পাননি,—তিনি ভাঁওতা মে বলিরাজাকে পাতালে পাঠালেন।

“পরশুরাম একটু কাটখোটা ধরণের ছিলেন, কাজেই ভাঁওতা বা তিনি একটু কম জানতেন। তাই মাহুধ আজ তাঁর কথা কুে মেরে দিয়েছে।

“রামচন্দ্র রামহানিক্য হলেই মানাতেন ভাল—ভাঁওতা তিনি ওজাদ ছিলেন না। কিন্তু ভাঁওতার মহিমা তাঁর হা-কুর্প হয়নি। কৈকেয়ীর ভাঁওতার দশরথ এবং রাবণের ভাঁওতার রাবণের বা কুলঙ্গ নামজ্ঞকে আজ কে চিনতো?...”

বনস্পতি

সম্বন্ধে সত্যিকথা

সম্প্রতি বনস্পতির পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে খবরের কাগজে ও জনসভায় কতগুলি বিভ্রান্তিপূর্ণ উক্তি করা হয়েছে। এই সব উক্তি নিতান্ত ভুলধারণা-প্রসূত—এগুলির ভিত্তি তথ্য বা নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

গত ৫০ বছরেরও আগে থেকে বনস্পতি বা শটনিং এবং মার্গারিন ইত্যাদি হাইড্রোজেনযুক্ত জমাট স্নেহপদার্থ তৈরী ও ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতীয় ও বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা তখন থেকেই পুষ্টিগুণ গবেষণা করে দৃঢ় অভিমত দিয়ে আসছেন যে এসব স্নেহপদার্থ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী ও পুষ্টিকর। এখানে কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও জননেতার অভিমত দেওয়া হচ্ছে—

“বনস্পতি স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং পুষ্টির দিক থেকে বিচার করে দেখলে এর ব্যবহার বাড়ানোর আপত্তির কিছু নেই।”

—ডাঃ ডবল্যু. আর. আইক্রয়েড, ভারতের প্রাক্তন ডিরেক্টর অব নিউট্রিশন রিসার্চ এবং বর্তমানে রাষ্ট্রস্বত্বের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর অব নিউট্রিশন। (১৯৪৬)

“স্বাস্থ্যের ওপর বনস্পতির ক্ষতিকর প্রভাব নেই।”

—১৯৪৭-৪৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক কয়েকটি ধারাবাহিক অনুসন্ধানের ফল।

“আমার পরামর্শ হচ্ছে, বনস্পতি ব্যবহার করতে দেওয়া হোক, কারণ এটি ভাল ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য।”

—ডাঃ (শ্রম) এস. এস. ভাটনগর, কে. টি. ডি. এস. সি. এক আর আই সি, এক আর এস, ডিরেক্টর জেনারেল অব স্যামেন্টিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ। (১৯৪৯)

“গর্ভমের্ত নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছেন যে বনস্পতির ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারী পরীক্ষায় বার বার দেখা গেছে যে বনস্পতি বা তার তুল্য জিনিস পৃথিবীর

বারো আনা দেশেই ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু তাতে কারুর কোন ক্ষতি হয়নি।”

—প্রধান মন্ত্রী, পণ্ডিত নেহেরু—১৯৫২ সালের ১০ই জুন লোকসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

“হাইড্রোজেনযুক্ত জমানো তেলের ফলাফল পুষ্টিগুণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে চিনা-বাদামের তেল কি তিলের তেল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তেল এবং এসব তেলে তৈরী ৩৭° সেন্টিগ্রেড তাপে স্রবণশীল বনস্পতি ও মাখনের পুষ্টিকারিতা প্রায় সমান। হজম হওয়ার দিক থেকেও বনস্পতি এবং জমানো হয়নি এমন উদ্ভিজ্জ তেল দুই-ই সমান। খাওয়ার ক্যালসিয়াম প্রভৃতি উপাদান পরিপাক সাধারণ উদ্ভিজ্জ তেল ও মাখনের ষা কাজ, বনস্পতিও সেই কাজই করে। উপরন্তু, ভারতে যে মাখন ও বনস্পতি পাওয়া যায় তা ‘এ’ ভিটামিনে সমৃদ্ধ।”

—ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের অনুসন্ধানের ফল; ১৯৫২-এর ১১ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডি. পি. কার্ণারকার কর্তৃক লোকসভায় উপস্থাপিত।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, বনস্পতি বিশেষ পুষ্টিকর। প্রতি আউন্স বনস্পতিতে ভিটামিন ‘এ’ ৭০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট এবং ভিটামিন ‘ডি’ ৫৬ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট মেশানো থাকে। অতএব, বনস্পতি আমাদের উৎকৃষ্ট ভোজ্য স্নেহপদার্থগুলির মতই পুষ্টিকর, বরং যেসব ভোজ্য তেলে ভিটামিন মেশানো হয় না তাদের চেয়ে বেশী পুষ্টিকর।

কাজেকাজেই, বনস্পতি যে ৩০ বছরেরও ওপর ভারতের ঘরে ঘরে প্রতিদিন ব্যবহার করা হচ্ছে এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। গত ১৮ বছর ধরে বনস্পতি আমাদের সৈন্যবাহিনীর লোকদের খাওয়ার মধ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। গুণু তাই নয়, উদ্বাস্ত শিবিরে, হোটেলে, রেস্তোঁরায়, ক্লাবে, হাসপাতালে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যেখানেই কম খরচে স্বাস্থ্যকর ও উপাদেয় খাবার তৈরী করা হয় সেখানেই বনস্পতি নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন :

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া
ইণ্ডিয়া হাউস, কোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই-১

“ঈকুকের ভাঁওতা বা কীর কথা লিখতে গিয়ে মানুষ কত বড় বড় শাস্ত্রই না লিখে ফেলেছে। তাঁর সব চেয়ে বড় ভাঁওতা কুরুক্ষেত্রে মটর-ড্রাইভারি। অর্জুনের পাশে নিরস্ত্র বসে বসে সারা লড়াইটার তাঁকে উত্তেজিত করলেন,—কৈরী পরিহার কর। হত্যার পাপ হত্যার নয়, কারণ কে কাকে হত্যা করে? তুমি যাকে হত্যা করবে,—আমি তাকে আগে থেকেই মেরে রেখেছি। স্বরাজ ভোগের কামনার নয়, পরজ হৃষ্টের দৃষ্ণের জগৎ—ভারতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জগৎ বোগহ হলে, মারা-মমতা শূন্য হয়ে শত্রু নিধন কর,—যুদ্ধ কর।

“ঈকুকের পর বুদ্ধদেবের অহিংসার ভাঁওতা। আজ পর্যন্ত কোটি কোটি লোক সে ভাঁওতার চক্রে পড়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছে। Laboratory, factory, dock এ disarmament হচ্ছে,—সবরমতীতে পূর্ণ স্বরাজ্য তৈরী হচ্ছে,—বৌদ্ধ চীন আধ-শতাব্দী ধরে আরশোলাব বদলে মানুষ ভক্ষণ করে পালোয়ান হয়ে উঠলো। আমাদের দেশে এখনো সকলে ওটাকে ঈর্ষ্যভাঁওতার লীলা বলে বোঝে না, সুতরাং আমরাই হচ্ছে আসল বুদ্ধ।

“তারপর কলির আমল। এইবার ঘোড়সওয়ার এস সব কচুকাটা করবে।

“খৃষ্টানীর ভাঁওতার ইম্পিরিয়ালিজম নন্দের আলয়ে কুফো মতন দিনে দিনে বাড়ছে—ইউনিটির ভাঁওতার ভ্যানিটি; পরিতৃপ্তি চলছে; বামিনাইয়ের ভাঁওতার কোটি কোটি মূর্খ কুড়ে প্রতিপালিত হচ্ছে। সত্যতার ভাঁওতার ক্যাপিটালিজম দুখেভাতে আছে। শাসন সংস্কারের ভাঁওতার ঘৃণ, Law and order এর ভাঁওতার বধেছাচার, election এর ভাঁওতার বড়বড়, Contract এর ভাঁওতার লুঠ চলছে। কাল পূর্ণ হয়েছে—কতী বুকি এল।”

বইটার শেষ অধ্যায়ের শেষ অঙ্কচ্ছেদ বলা হয়েছে,—“এই ঈর্ষ্যভাঁওতার লীলা যে ভক্তিতরে অহুসরণ করে,—অচিরে তার গৌরব মৌচন হয়ে সে দাদালোকে স্থান পায়। অতএব সকলে একবার বদন ভরে বস, জয় ঈর্ষ্যভাঁওতা!”

সম্ভবত বইটার গোড়া ও শেষ একটু পড়ে ওটাকে একটা ব্যঙ্গ রচনা মাত্র মনে করে গানায় ফেলা হয়েছিল,—তাই সঙ্গে সঙ্গে ওটা proscribed হয়নি। পরে হয়ত বা অসং কোন I.B অফিসার বইটা পড়ে কর্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার কলেই শেষপর্যন্ত proscribed হয়েছিল। হুঁ একটা উদ্ভৃতি দিলেই কথাটা প রক্ষার বোঝা বাবে। ধরুন,—তৃতীয় অধ্যায়—ঈশ্বর।

“ক্রমবিকাশ জগতের অপরিবর্তনীয় নিয়ম,—এবং কার্য-কারণ সঙ্কটবোধ মানব মনের চরম পরিণতি। একটা মিথ্যা গৌরামিলকে বস্তই প্রাপণ-এ আঁকড়ে ধরে এক স্থানে থাকতে চেষ্টা করুক না কেন,—মানব মনকে প্রকৃতির নিয়মে উন্নতির পথে চলতেই হবে,—এবং কার্য-কারণ সঙ্কট-বোধ তাকে পদে পদে বস্তজগতে টেনে আনবেই।—

“তাই বর্তমান যুগের মানবমন বস্তজগতের প্রতি কতক পরিমাণে মনোযোগী হয়েছে, এবং মধ্যমর প্রেমময় ইচ্ছাময়ের অস্তিত্বে—সন্দেহ প্রকাশ করেছে। যে সমাজে সবাই মাতাল, সেখানে মদ না খেলে একঘরে হতে হয়। কাজেই এই সন্দেহবাদীরা পাপিষ্ঠ বলে অভিহিত। এই সন্দেহবাদকে চেপে রাখবার জগৎ জগৎ বহোদয়গণের

কি বিরাট সংঘবদ্ধ অভিযান! কত তন্ত্র, কত মন্ত্র, কত মন্দির, কত পূজা, কত গুরু-পুস্ত, কত আয়োজন-অহুষ্ঠান।

—প্রাচীন ভারতের প্রকৃত বীরত্ব অবাস্তব ধর্মরাজ্যের কল্পিত রাজাধিরাজ ঈশ্বরের খাসমহাল স্বর্গে বাবার জন্তে পক্ষীরাজ অথবা ডিমে বহুশত বৎসর তা’ দিয়েছে,—এবং মধ্যযুগে বৈদেশিক শত্রুর সম্পর্কে আসার পর বেশী দিন নিজ গৌরবময় স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি —

“এই অস্ত্রায়, অত্যাচার, অসাম্য মুষ্টিমেয় লোকে চালাচ্ছে কোটি কোটি লোকের ওপর,—যে কোটি কোটি লোক ইচ্ছা করলে মুহূর্তে এই অত্যাচারীদলকে গিয়ে মারতে পারে কিন্তু চার্চ আর শাদরী সম্প্রদায় তাদের বিজ্ঞান করে নিয়ত দুর্বল করে রাখছে। God, king and Countryর দোহাই দিয়ে অত্যাচারীর দল জনগণকে মুঠের ভেতর রেখেছে। আমাদের দেশেও আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের দাড়ি আর ঈশ্বরের টিকির লড়াইয়ে সমাজ পঙ্গু হয়ে আছে।—বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সমাজের বিবোধ হলে, তার মীমাংসা সম্ভবপর হয়। কিন্তু অশ্বভিষের বর্ণগন্ধ নিয়ে বিবোধ হলে তার মীমাংসা কে করবে? কাজেই জগতে ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, অধর্ম এবং শয়তানীরও অস্ত্র নেই।

“অহেতুকী ঈশ্বরভক্তির মোহ থেকে বাঁচিয়ে তরুণ মনকে অনন্ত উন্নতির পথ ধরিয়ে দিতে হবে। সর্বশক্তিমান ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উদ্ভেকের সাধনার পরিবর্তে মানবজীবনের সমস্তাগুলোর সমাধানের ভার নিজেদের স্বক্ষেই বহন করার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে তরুণের দৃষ্টিকে শূন্যমার্গ থেকে টেনে এনে বাস্তবজগতেই নিবদ্ধ করতে হবে।—তরুণজগতকে বোঝাতে হবে যে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র প্রত্যক্ষ শক্তি প্রকৃতি। জগৎ প্রকৃতিরই সম্পূর্ণ অধীন—আর কারো নয়।

“যদি পূজা করতে হয়, তারই পূজা কর। কিন্তু তার জগৎ কোন fashionable মন্দির-মসজিদ, স্তোত্রামোদমূলক মন্ত্রতন্ত্র, মলাদলির কল আচার অহুষ্ঠান, জগৎকে মিথ্যা বলে বর্জন করার মতন বৃথা-চেষ্টামূলক আহ্বান্যকী সাধনা,—বা হস্ত-পদ-চিন্তা-বুদ্ধিবৃত্ত মানুষের শালগ্রাম শিলায় মত জড়ত্ব প্রাপ্তি বা সমাধির মতন সিদ্ধির কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতির পূজার প্রকৃত মন্দির ল্যাবরেটরী, মানমন্দির, গুয়ার্কপপ,—প্রকৃত মন্ত্র বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র, প্রকৃত আচার-অহুষ্ঠান কৃষি-শিল্প-বানিজ্য—আবিষ্কার-সভ্যতা, প্রকৃত সাধনা অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, ব্যবস্থাপ্রণয়ন প্রভৃতি জ্ঞানানুশীলন, এবং প্রকৃত সিদ্ধি এই অমূল্য মানবজীবনের পরিপূর্ণ সজোগ, সন্ধ্যবহার, সার্থকতা।

“এই সিদ্ধির পথে সংগ্রাম মানব জাতিকে পরিচালিত করার জন্তে—ধর্ম ও সৃষ্টির একীভূত প্রতীক ঘোষা কতীর আবির্ভাব প্রয়োজন। অস্ত্রায়, অত্যাচার, অসাম্যের স্তূপের মধ্যেই সেই কতীর বীজ লুকিয়ে আছে। অহুসন্ধান করে বাঁচ কর। তার ধ্বংসপাগল রক্ত পতাকার তলে সমবেত হও... ইত্যাদি —

তার পর ধরন চতুর্থ অধ্যায়—ধর্ম—তাতে ক্রমবিরোধী প্রচলিত অপপ্রচারের জবাবে লেখা হয়েছে,—

“এই ধর্মপ্রসিদ্ধিত হুমিরাটার মধ্যে জনসাধারণের স্বাধীনতা আর মুখ-মুখিয়ার প্রতিষ্ঠার যারা অধর্মী, সেই কুমিরা সম্প্রতি ধর্মের

বিস্কুট  লডেন্স

এখানে



দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুস্বাদু স্বাদে এমনটী আর হয়নি

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-১০

বিলোপ সাধনের দ্বারা 'কর্মজীবীদের দরবারে অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু... গত ১১৩০ সালের ২৫ জানুয়ারীর বিসাতী Forward পত্রে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে,—

"The Church of the Tsarist regime was a slave Church in bondage to the now universally admitted corrupt wealthy ruling powers who in Russia formed the state... The Church was left entirely free to deal with important questions such as whether the raising of two or three fingers should be the sign of the cross; whether the priest should be ordained by a Bishop laying his hands on his head or not, whether holy oil should be used or not, and whether or not the priest should be forced to shave off their beard. In exchange for these holy privileges there were certain duties and obligations. The metropolitan or the chief leader of the Church had to live near and in close touch with the grand princess, and he had to give them support in all their wars against all their enemies, The Church leaders had to take their side in suppressing civil disorders and in allaying discontent among the serfs and lower orders." (বামপন্থী ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টির কাগজ)।

"সরলার্থ:—যটার বাঁটের নৈর্ঘ্য কতখানি হওয়া উচিত, বা কোন্ দিকে মুখ করে' আঁটানো দরকার, আত্মার সঙ্গতির জন্ত

এই সব গুরুতর বিষয়ে' পাঁতি দেওয়া সবচে পুরুতরা স্বাধীন। তবে এই স্বাধীনতার বিনিময়ে বড় পুরুতঠাকুর কয়েকটা ছোটখাটো ব্যাপারে বাধ্য থাকবেন। বধা—তিনি রাজপ্রাসাদের কাছেই বাস করবেন, সকলপ্রকার যুদ্ধব্যাপারে সম্রাটকে সমর্থন করবেন, এক অন্তর্বিদ্রোহ বা ছোটলোকদের অসন্তোষ ঘটলে তাঁকে সাহায্য করবেন (এবং প্রত্যহ তাঁদের সাতগুটির জয়কামনা করবেন)।

"১১১৪ সালে ক্রিমিয়ার চার্চের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল নগদ প্রায় ২৫ কোটি টাকা। চার্চের কর্মচারী বা পুরুতদের হাতে নগদ টাকা ছিল প্রায় সওয়া বারো কোটি। এছাড়া দেবোত্তর পরিমাণ ছিল ৫৪ লক্ষ একর বা দেড় কোটি বিঘার উপর জমি। তার খাজনা আদায় হত তিন কোটি টাকারও বেশী।

"বিপ্লবের পর এই সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে" জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করা হচ্ছে। কাজেই চীৎকার করছে পুরুতের দল এবং 'সম্পত্তিহারা' কয়েকজন ধনী।

"যুব দিয়ে ধর্ম পোষা ক্রিমিয়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন সেখানে যাব বা ইচ্ছে সে সেইরকম বিশ্বাস বা ধর্ম আচরণ করতে পারে।..."

বাই হোক, জীর্ভাওতা জন্ম হওয়ার পর আরো বেশী সতর্ক হয়ে চলছিলুম গ্রেপ্তার ও বন্দনদশার অপকার। অবশেষে সত্যই একদিন পালে বাঘ পড়িল—নভেম্বরে একদিন হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে detenu হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে চুকলুম এবং অনেক ঘাটের জল খেয়ে মুক্ত হয়ে কলকাতার কিয়লুম '৩৭ সালের শেষে।

এই ছ'বছরে জেল, বন্দিশালা অন্তরীণের অপূর্ব বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমান্তরালে বাইরে চলছিল অপূর্ব বিচিত্র রাজনৈতিক বড়বন্দ, '৩৫ সালের শাসন সংস্কার, প্রদেশে কংগ্রেসী শাসন এবং গণআন্দোলনের মধ্যে কমিউনিষ্ট মতাদর্শের প্রচার। বিপ্লবান্বলনের দ্বারা বইতে মুক্ত করলো এক নতুন খাতে। (ক্রমশ:।

তোমাকে, একদিন এক—

সমরেন্দ্র ঘোষাল

তোমাকে একদিন এক বিশ্বরকর সূর্যোদয় দেখিয়ে

আমার আরো কাছে টেনে এনে বলেছিলাম :

'এ সূর্যোদয় যেন শুধু তোমার আমার'।

তুমি চোখ নাঘিয়েছিলে।

বলেছিলে : 'বাও কাব্য কোরো না।'

আরও সেদিন, একটি বিকশিত গোলাপের বুকে যেদিন

হেমন্তের হু' কঁটা শিশির

চেরেছিল তার কলকালীন অস্তিত্বকে

দ্বিতীয়া-চাঁদের কাছে সাক্ষী রাখতে।

তোমাকে, আমার আরো কাছে পেয়ে বলেছিলাম :

'এ মায়ারাত যেন শুধু হু'জনায়।'

আজ সময়ের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে

তোমাকে আমাকে।

তোমার কবিতা আজ নিরুন্মিত স্থান পেয়ে চলে

সহরের সেরা বক্ত সান্ত্বাহিকে।

আমি আজ খুঁজে মরি পশ্চাতের আমাকে

দশটা-পাঁচটা শুধু জেলপ্যাচ-কাইলে।

হাল খুনি আলয়া

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আন্তোব মুখোপাধ্যায়

শীতের শেষ হলও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ ততক্ষণ। কোম্পানীর স্পেশাল ওয়াগনটার সামনে আর কোনো গাড়ি চোখে না। অমিতাভ ঘোষ ট্রামে বা ট্যান্ডিতে এসেছে। নিজের গাড়িটা তাকে কমই চালাতে দেখেছে। নিজের অত ধৈর্য নেই। হতে পারে আবার চাকরির নিবেশের দরুণও হতে পারে। ট্রান্সিং-এ বসতে দেখলেই চাকরির নাকি বুক কাঁপে, যে নক্ষ, কখন কার ঘাড়ে গাড়ি তুলে দেবে ঠিক নেই। চাকরিকে শুনেছে, ছোঁড়া হাড়-বেগুন, চোন্ধণ' টাকা মাইনে পায়, ওপর ব্যবসার লাভ—ব্যাকের টাকায় ছাত্তা পড়ছে, না কিনবে। নতুন গাড়ি না রাখবে একটা ড্রাইভার।

ওই গাড়িটা আপনি এনেছেন ?

বীরাপদ মাথা নাড়ল, সে-ই এনেছে।

দরাসরি গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল সে, পিছনে বীরাপদ। তার ঘাড় ফেরালো, সঙ্গী প্রতীক্ষা, অর্থাৎ কোন্ দিকে যেতে

পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করতে করতে ইশারার

র রাস্তা দেখিয়ে দিল। সিগারেট ধরানো হল। চূপচাপ খানিকক্ষণ। অপরিচিত। মত গভীর মুখে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে।

কাথার বাচ্ছি ?

চাকরির বাড়ি। সংক্ষিপ্ত জবাব।

কম সক্রম দেখে বীরাপদ ঘাবড়ে বাচ্ছিল। কোনো খারাপ খবর বুঝে না। জিজ্ঞাসা করল, সেখানে হঠাৎ ?

বে বসল।—আমাকে বাবার জন্ম টেলিফোন করেছিল। কু অভিব্যক্তি, আপনার বাবার ইচ্ছে না থাকলে নেমে যান।

বীরাপদ হাসি চাপল। কারণ না জানলেও যেজাজ পরম কতখানি। তার হেপাজতে পাকি, তাকেই নেমে যেতে বলা।

কিন্তু এই রাগ সবটাই বে ওরই ওপর, বীরাপদ স্বপ্নেও ভাবেনি।

কিন্তু শুনে সচকিত। নিজের অপোচরে পকেটের প্যাকেট

আছে আবার। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা ওর মুখের ওপর।—আপনি

জাজ আজকাল তাহলে ভাবোই দেখাচ্ছেন ?

টাই প্রশ্ন নয়। নিরীহ মুখে চূপচাপ প্রতীক্ষা করাই সমীচীন

ল বীরাপদর।

আর ঠিক এই কারণেই হঠাৎ একেবারে বেন কেটে পড়ল লোকটা।—হাঁ করে দেখছেন কি, কাজ দেখাবার খুব সখ, না ? কেন আপনি মাইনে নিয়ে এলেন ? নিজের কাজ কলে কেন আপনি এ-সব কাজ করবেন ?

বীরাপদ বিমূঢ় খানিকক্ষণ। আক্রমণটা এই পথে হবে ভাবা শক্ত।—না করলে আজ এদের মাইনে হত কি করে ?

ফুটন্ত তেলের ওপর জলের ছিটে পড়ল বেন।—না হলে না হত, তাতে আপনার অত মাথা বাথা কিসের ?

দুর্ভোগ্য রাগের ঝাপটার বীরাপদ নাজেহাল। হঠাৎই আবার মনে হল, লাভণ্য সরকার সিংহাসন সজে বোম্বাই গেছে, হিম্মাত বিক্র সে খবরটা আজই পেলেন কেমন করে ? অমিতাভ বোম্বাই বা হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠল কেন, তার কি অভিজ্ঞা ছিল ?

বীরাপদ আবারও বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল তাকে, লোকগুলো এই একটা দিনের আশায় সারা মাস কাজ করে, তাদেরও ঘর-সংসার ছেলে-পুলে আছে, মাসের এই ছ' তারিখেও মাইনে না পেলে তাদের জয়ানক কষ্ট হত—

ধাক্ ধাক্ ! সরোবে আধখাওয়া সিগারেটটা পায়ের পিছল বারকতক।—ও-সব বড় বড় লোকটার আমার বক্রতার জন্ম লিখবেন, তারা কষ্টে পড়ত—পড়ত, তাতে আপনার কি ?

অন্য রাগ যুক্তি দিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা বিড়ম্বনা। বীরাপদ আর সে চেষ্টা ধরল না। চূপ একেবারে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাও বরদাস্ত হল না, অমিতাভ সল্লখে বলে উঠল, কিরে এসে ওই ঘরে আপনাকে খুব ধস্তবান দেবে ভেবেছেন, কেমন ?

—তাই তো। নরম হবার কলে বার বার যা পড়ছে দেখে বীরাপদ অত রাস্তা ধরল, আমাকে চাকরির বাড়ি ধরে নিয়ে চলেছেন কেন, বিচার-টিচার করবেন ?

একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমিতাভ পকেটে হাত ঢোকালো আবার। সিগারেট চাই। প্যাকেট আর শলাই পাশে রেখেছে খেয়াল নেই। বীরাপদ ঝাঁক লে ছটো তুলে তার হাতে দিল। তারপর শান্ত অথচ ঈর্ষ বাঁঝালো সুরে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ? অবুঝের মত এভাবে মাথা গরম করছেন কেন ?

জবাবে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সরোবে জানালার দিকে মুখ

বুঝিয়ে বসল সে।

একটু অবকাশ দিয়ে বীরাপদ আবারও তেমনি জোর দিয়ে বলল, কারো ধস্তাধস্তি ঘর ঘরি না, আপনার মামা বলেছেন মাইনে বেন হয়, তাই দিয়েছি। এতে অপরাধটা কোথায় হল জানলে বোঝা যেত... মুখের ওপর পারব না বলে দিলে খুশি হতেন ?

জানালা থেকে মুখ ফেরালো। সিগারেটটা ধরানো হয় নি। মাথার কথার মাইনে নিয়ে এসেছে জানতু না বোঝা গেল। গলার স্বরও উগ্র নয় অতটা।—মামা কখন বলেছে ?

হুগুনে, ক্যান্টরীতে।... তাঁকেও বিরক্ত দেখলাম খুব, মিস সরকারও বদমে গেছেন জানতেন না।

রাগের বদলে আশ্রয় দেখা গেল ইয়ৎ।—কি বলেছে ?

বলেননি কিছু। বীরাপদ হাসল, তিনিও আপনার মতই অসন্তুষ্ট আমার ওপর, কেন গেল, কি বুজাত কিছু ধর রাখিনি কেন। তবে, মনে হয় আসল রাগটা মিস সরকার গেছেন বলেই।

তবু মেজাজ ঠাণ্ডা। শেষ বচনে তাপ মোচন। স্নেহে, বিজ্ঞপ্তি খলখলিয়ে উঠল হঠাৎ, রাগ হবে না। কতবড় মহারথীর মেয়ে পাকড়াও করবেন ছেলের জন্তে, ভবিষ্যতের কত আশা, তার মধ্যে এক ডাক্তার মেয়ে।

হল-হলে মুখ করে সিগারেট ধরালো। বীরাপদ মেজাজের উজানে পড়ে ছিল এতক্ষণ। এবারে স্রোতের মুখে। নিরাপদ নয় কোনো। হোমরা-চোমরা রাজনৈতিক কর্ণধার-বিশেষ একাধিক জনের সঙ্গে বড় সাহেবের অন্তরঙ্গ সন্ততার কথা সকলেই জানে। উঁচু মহলের অনেকের সঙ্গেই খাতির তাঁর। ইজিতটা কার প্রতি, অথবা, বিশেষ কারো প্রতি কিনা, বীরাপদ ঠাণ্ডা পেল না।

আর কিছু বলল না দেখে কৌতূহল চেপে বীরাপদ বলল, তা তো হল, কিন্তু আপনার ব্যাপারখানা কী? ও বেচারাদের আজ মাইনে হল বলে আপনি অমন বেগে গেলেন কেন? আপনার বেন কিছু একটা উদ্দেশ্য পণ্ড মনে হচ্ছে ?

অনেক মানসিক রোগ আছে বা রোগী নিজে দেখতে পেলেন সারে। অন্তর্ভুলের তেমনি একটা বড় ইচ্ছার ওপর এক বলক আলোকপাত হল বেন। নিজেরই অস্বস্তি। তবু গৌরবের মতই জোর দিয়ে বলল, হয়েছে তো, আপনি সর্দারী করতে গেলেন কেন ?

কেন গেল সে কৈকিয়ত বীরাপদ আগেই দিয়েছে। ডাক্তার মেয়ের সঙ্গে ছেলের ঘনিষ্ঠতার মামাটির বীতর্যাসের একটা কারণ ভনেছে। কিন্তু এই খার্বটাই সব বলে বীরাপদের অন্তত মনে হয়নি। কথা-প্রসঙ্গে আয়ো কিছুই পাঁচ পাঁচ ভেবেছিল।

কিন্তু প্রসঙ্গের আপাতত ওখানেই ইতি। অমিতান্ত ঘোষ বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ছিল। ডাইতারের উদ্দেশ্যে হঠাৎ নির্দেশ দিল, ওই মোড়ের মাথায় গাড়িটা রাখো একটু—

কিছু না বলেই গাড়ি থেকে নেমে গেল। অদূরে ফুটপাথ বেঁধে লাইটপোর্টের উণ্টো দিকে কোটো-টুডিও। সেখানেই গেল। কোটোর কথা মনে হলোই বীরাপদ অস্বস্তি বোধ করে কেমন। কি একটা অনস্বস্ত প্রলোভন উকিঝুকি দেয়, সেটা নিমূল করার ডাক্তার নীরব ঘোষাযুক্তি চলে খানিক।... ক্যামেরা নেই সঙ্গে, বাত করে ওখানে আবার কি কাজ পড়ল এখন। হয়ত ছবি ভেঙেপ ক করতে দিয়েছে, নয়ত কিনা-টিনা কিনবে কিছু।

অদূরের লাইটপোর্টের ওখানে চোখ পড়তেই বিবম চমকে উঠল বীরাপদ। সর্বাঙ্গে বিহ্বল-ভরঙ্গের কাঁকুনি একটা।

বীটার রাইস।

আশ্চর্য, মেয়েটার কথা বীরাপদের মনেও পড়েনি এতদিন।

বাস-টপে প্রতীকারত সেই দেহ-পসারিণী মেয়ে। বৌবন বিকি-কিনির আশায় যে-কোনো আগন্তকের প্রত্যাশায় যে কাঁড়িয়ে থাকে। সেই ক্রীণ ভয়, সেই কড়কড়ে লাল ব্লাউস, সেই স্বকমকে ছাপা শাড়ি, সেই দগবগে প্রসাধন, সেই সব কিছু। মেয়েটা জায়গা বদল করেছে, এলাকা বদল করেছে। এক জায়গায় পসার বেশিদিন চলে না বলে পসারিণী জায়গা বদল করেছে।

বীটার রাইস। বীটার রাইস। বীটার রাইস।

আশ্চর্য। বার বার আউড়েও শব্দ ছুটো স্নায়ুতে স্নায়ুতে সেভাবে আর ঝনঝনিতে উঠছে না। শিরায় শিরায় সেভাবে আর তরল আগুন ছড়াচ্ছে না। ভেতো-চাল কটু-চাল কবা-চাল? না, যুংসই বাংলা খোজার ডাক্তার ভিতরটা সেভাবে আর উদগ্র উঠছে না। ছবিটা বে দেখাই হল না শেষ পর্যন্ত সেই খেদও তেমন করে আর উপলব্ধি করছে না।

মেয়েটা জায়গা বদল করেছে...।

বীরাপদ কী বদল করেছে ?

মোড়ের মাথায় আলো কম একটু। মেয়েটা পায় পায় এগিয়ে আসছে। গাড়ির দরজা খোলা, বীরাপদ ও-ভাবে চেয়ে আছে বলেই এগিয়ে আসছে। প্রত্যাশার সম্ভাবনা কতটুকু দেখতে এগিয়ে আসছে।

বীরাপদ চেয়ে আছে চিত্রাঙ্গিতের মত।

একেবারে ঘটনা ধরে না চিলুক, মেয়েটারও চেনা-চেনা লাগল বোধহয়। লাগাই স্বাভাবিক। অনেকদিন দেখেছে। একেবারে কাছাকাছি মুখোমুখিও দেখেছে। গাড়িটার পাঁচ হাতের মধ্যে এটা কাঁড়িয়ে গেল সে। আর নড়ল না। প্রসাধনের কাটলে কাটলে হাসির রেখা গোটাকতক, চোখের তারায় আমন্ত্রণের প্রত্যাশা একটা একটুখানি ইজিতের আশা।

হঠাৎই চমকে উঠে হাত ছুঁই দূরে সরে গেল মেয়েটা। বীরাপদ হাঁস কিয়ল বেন। সামনেই একটা প্যাকেট হাতে অমিতান্ত ঘোষ সন্ধিরে বীরাপদের দিকে তাকালো একবার, তারপর অদূরবর্তী দিকে। কিছু বুঝে উঠছে না কি ব্যাপার।

মেয়েটার মুখ নিশ্চয়, আশাভঙ্গের কোণ্ড আর বাতনা। আশাটা গোটাগুটি বিসর্জন দিয়ে উঠতে পারছে না বোধহয়। এ একটু করে সরে বাচ্ছে বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা এদিকেই। বাচাই দৃষ্টি। এতটুকু ইশারার আঁচ পেলে আবার কাঁড়াবে। আ এগোবে।

উঠে আসুন।

বীরাপদের ডাকে অমিতান্ত গাড়িতে উঠে বসল। দরজা করল। গাড়ি চলল।

কি ব্যাপার? মেয়েটিকে চেনেন নাকি ?

বীরাপদ মাথা নাড়ল। চেনে।

ওভাবে কাঁড়িয়ে ছিল কেন? কি বলছিল ?

বলছিল না কিছু, শুধু এসে কাঁড়িয়েছিল।

দুইটা বড় অক্ষত লেগেছিল অমিতাভর, কথা শুনে আরো
যাক।—কি জতে?

বীরাপদ মুচকি হাসল একটু।—আমার জতে আপনার জতে
। কোনো একজনের জতে।

অমিতাভ ক্যাল ক্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।
রপয় হঠাৎই বোধগম্য হল ব্যাপারটা।—বাই জোত! উৎস
ধ সামনের দিকে ঝুঁকে বসল, নিচুগলার বলল, দেখার মত তেমন
গা দেখলাম না...কিন্তু আপনি চেনেন কি করে? ঘটনা আছে
কি কিছু?

বীরাপদ হাসছে অল্প অল্প। মাথা নাড়ল। আছে।

আপনি তো সাজ্বাতিক লোক মশাই, অঁা? দেখতে এমন,
।৭৮...বলুন না ছাই, শুনি?

সব্ব সময় না যেন। এই ব্যাপারে ঠিক কেমিষ্টের ছেলেমানুষ
নিন্দ লক্ষ্য করছে বীরাপদ। আড়চোখে পাশের প্যাকেটটা দেখল
কবার। কি আছে...হবি না কিন্ন?

তারপর বলল।

দিনের পর দিন মেয়েটার বাস-ঠাণে গাঁড়ানোর গল্প আর আশার
গল্প।

ময়দানের গল্প আর শীতের রাতে বিনামূল্যে পসারিণীর সেই
সার লুঠ হবার গল্প।

মেয়েটার সেই কারাগার গল্প আর সেই বুকভাঙা হতাশার গল্প।

অমিতাভ ঘোষ শুরু। একটু আগের বাসনাসিক্ত প্রসঙ্গততা

নিশ্চিহ্ন। নির্বাক খানিকক্ষণ, তারপর ভেঙে উঠল হঠাৎ। এখন হাঁ
করে বসে না থেকে তখন বললেন না কেন? ডাইভার—

ডাইভার সচকিত।

বীরাপদ বাধা দিল, না ঠিক আছে, চলো।

অমিতাভ ঘোষ ছুই এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অবুঝের মতই
ঝাঁকিয়ে উঠল আবার, মেয়েটার এই অবস্থা আপনি আগে বললেন
না কেন?

মেয়েটার এই অবস্থা তাতে আপনার কী?

খানিক আগে মেডিক্যাল হোমের কর্মচারীদের হরবস্থা প্রসঙ্গে
অমিতাভ ঘোষ বীরাপদকে, ঠিক এই কথাই বলেছিল। তখন
বিংধেছিল বলেই হোক বা লোকটাকে শান্ত করার জেতেই হোক,
বীরাপদ ঠিক তেমনি করেই বলে বসল মুখের ওপর।

সিগারেটের খোঁজে পকেট হাতড়াচ্ছে। সিগারেট পেল। ধরালো।
ওতে উদ্বেজন্য কমে কি বাড়ে বীরাপদের ধারণা নেই। কিন্তু যে
কোনো বিকিণ্ড মুহূর্তে এই যেন একমাত্র সখল লোকটার।
বাকবিত্ততার স্পর্শ নেই আর, চুপচাপ সিগারেট টানতে লাগল।

ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অস্বাভাব্য ভোগ করছে বীরাপদ।
অমিতাভ ঘোষকে গল্প বলে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে, অতনু-উচ্ছলতার
মুখে বরক-পলানো জলের ঝাপটা পড়েছে যেন। কিন্তু বীরাপদ নিজে
তেমন ঠাণ্ডা হতে পারছে না। নিজের প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিযোগ কি
একটা, নিজের প্রতি নিজের বিদ্বেষ। আর কোথাও না গিয়ে বাড়ি
যেতে পারলে হত।



রম্যরুচি

একটি মধুরতম সুবাস নির্বাচনে যিনি
ক্যালকেমিকোর সুরভি নির্বাস 'কান্তা' পছন্দ
করেন তিনি রম্যরুচিরই পরিচয় দেন।
'কান্তা' এমন একটি বিশিষ্ট গন্ধসার যার সুমিষ্ট
স্বাস সবারই অন্তর স্পর্শ করে।

কান্তা

মম-ছোঁয়া সুরভিসার

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লি:

কলিকাতা-২২

তারপর ভেবেচিন্তে দেখা যেত, নিজের দিকে আকানো যেত, বিচার বিবেচনায় বসে যেত।

রাত মন্দ হল না, সেখানে দেবি হবে না তো ?

অমিতাভ জবাব দিল না, জানালার পায়ে মাথা রেখে সিগারেট টানছিল, চিবুক নামিয়ে একবার তাকালো শুধু।

বাইরের ঘরের আলোর বাগানের ওধারে চাকদির গাড়িটা দেখা যায়। সিঁড়ির পায়ে টেপান-ওরাগনটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে দোরগোড়ায় দেখা দিল পার্বতী। বাইরের ঘরেই ছিল, কেউ আসছে জানত হয়ত। কিন্তু আসছে বলে কোনরকম আগ্রহ নেই।

একজনের বদলে দু'জন দেখে পার্বতী রমণীর অটল পাণ্ডুরে একটু বেন চিড় খেল মনে হল বীরাপদর। আজ পর্যন্ত পাঁচটা কথাও হয়নি, তবু তার প্রতি মেয়েটাকে বিরূপ মনে হয়নি একদিনও। আশ্চর্য, আজও মনে হল না।

অমিতাভ আগে ঘরে ঢুকে ধুপ করে সোফার বসে পড়ল। পিছনে বীরাপদ।

কত্নীকে খবর দেবার কোনরকম ভাড়া দেখা গেল না পার্বতীর। চুপচাপ ঘরের মাকারাকি এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই রইল। জোরালো আলোর লক্ষ্য করলে মুখে একটু প্রসাধনের আভাস মেলে। মাথার চুলও চকচকে, টেনে বাঁধা। আর একদিন চাকদি যেমন করে বেঁধে দিয়েছিলেন। সেদিনও অমিতা ভোবের আসার কথা ছিল। পরনের করসা জাঁট শাড়ির জাঁচলটা গলার জড়ানো।

বীরাপদর মনে হল এসে ভালো করেনি। খানিক আগেই সেই অস্বাভাবিক বোধটা বেন হঠাৎই কোন মন্তব্যে পরিপুষ্ট হয়ে ঠেলে উঠতে চাইছে। সামনে যে দাঁড়িয়ে তাকেই শুধু দেখছে না, কোটো আলবামের স্নায়ুবিভ্রমী ছবিগুলোও চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে। এই আকর্ষণ জাঁট বসনার সঙ্গে সেগুলোর মিল যেমন স্পষ্ট, অমিলটাও ভীষণ তেমনি।

এই বসন নীরবতাটুকুও বিসদৃশ রকমের ভারী লাগছিল বীরাপদর।

চাকদিসি কই ? প্রশ্ন অমিতাভরই বটে, কিন্তু সে প্রশ্নে জাঙ্গিল নেই কিছুমাত্র। হুচোখ পার্বতীর মুখের ওপর।

বাড়ি নেই।

পার্বতীর সংক্ষিপ্ত ঠাণ্ডা জবাব শুনে বীরাপদ অবাক। জবাবটা অমিতাভও আশা করেনি বোধ গেল। জোড়া তুফ কুঁচকে গেল একটু, আমাকে টেলিকোনে আসতে বলল, বাড়ি নেই মানে ? পাড়িও তো দেখলাম বাইরে ?

পার্বতী নিরুত্তর। অর্থাৎ, জানাবার যেটুকু জানিয়েছে।

বীরাপদ কি ভুল দেখেছে ? বিরক্তির বদলে অমিতাভ ঘোবের সমস্ত মুখে একটা চাপা খুশির ভরজ দেখেছে,—ভুল দেখেছে ? পকেটে হাত ঢোকালো, সিগারেটের খোঁজ। কিন্তু সচেতন মনে খুঁজছে না, হাত পকেটেই থেকে গেল। মামা এসেছিল ? মামার সঙ্গে বেরিয়েছে ?

পার্বতী এবারেও জবাব দিল না। নিবিচার পাণ্ডুরে হাবতাব লক্ষ্য করছে, পরিবর্তন লক্ষ্য করছে।

জবাবের প্রত্যাশাও বোধ হয় করেনি মামুট। আনন্দসিক্ত তরল তরল মুহূর্ত পোটা কড়ক।

বীরাপদর সঙ্গে লেবোজাখি হয়ে গেল অমিতাভর। চমকালো একটু। সহজতার আড়ালে ঢোকায় অপটু প্রয়াস। পকেট থেকে হাত বেরুলো, সিগারেটও। কিন্তু ঘোঁরা তুফা প্রবল নয় আশান্ত, প্রয়োজনে ওটা সহায়ও বটে। শলাই-প্যাকেট সোফার হাতলের ওপর রেখে সাদাসাংপটীভাবেই বলে ফেলল, কোনো সিনেমায় গিয়ে চুকেছে তাহলে, বাড়ির দিকে চোখ, শিগগীর ফেরার আশা নেই—আপনি কি করবেন ?

অর্থাৎ, চাকদির কিরতে বস্তু দেবিই হোক, তাকে অপেক্ষা করতেই হবে, এখন সমস্ত বীরাপদকে নিয়ে। পাড়িতে তাকাতাড়ি ফেরার কথা বীরাপদ বলেছিল বটে। প্রকারান্তরে তাই স্বরণ করিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এখানে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথা আর মনেও ছিল না, সংগোপন নিম্মুতে একটা লোভনীর দেখার ভোজে মর ছিল। অমিতাভ খোবের ভণিতা ক্রমশই স্পষ্ট বে হেসে ফেলার কথা। কিন্তু তার বদলে একটা ঝাঝা খেয়ে অপ্রতিভ একেবারে। এই দুজনের মাঝখানে সে অবাঞ্ছিত দ্বিতীয় লোক বসে আরে একজন।

না, আমি আর রাত করব না, উঠি—

পোটাওটি উঠে দাঁড়াবার আগেই পার্বতীর হৈর্বে চাকদিসি দেখা গেল। তার দিকে ঘুরে নিরুত্তাপ গলার বলল, তাঁরা সিনেমা বানসি, আপনি বসুন।

প্রায় আদেশের মত শোনালো কথা ক'টা। বীরাপদ হকচকিয়ে গেল কেমন। না পারে কিরে বসতে না পারে যেতে। কি অমিতাভ ঘোবের ইচ্ছার বেগে আর যাই থাক, দুর্বল হলনা নেই সেটা যেমন স্পষ্ট তেমনি কলাকৌশল-বর্জিত। এক চাপ রেবারেবির আনন্দে তার পোটা মুখ উৎফুল্ল। বলে উঠল, সিনেমা না গিয়ে থাকলে গলার ঘরে গেছে, সেই দু'ঘটার ঝাঝা—বং তাহলে।

অনাবৃত্ত বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে বীরাপদ নীরবে হাবুডুবু খে উঠল একপ্রহ। অপলক নেত্রে পার্বতী ওই লোকটার দিকেই চে রইল খানিক, তারপর বীরাপদর দিকে।

বীরাপদ পালাতেই চায়। আর এক মুহূর্তও থাকতে চায় এখানে। হাগতে চেঁচা করে, মেরুদণ্ডহীনের মতই পালা অজুহাত খুঁজে নিল। বিড়-বিড় করে বলল, না আমি ব কোম্পানীর গাড়ি সেই সকাল থেকে আটকে রেখেছি, ড্রাইভারটাে ছেড়ে দেওয়া দরকার।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সটান গাড়িতে। চলো—

কাঁকা রাস্তার গাড়ি ছুটেছে। কিন্তু বীরাপদ বিরক্ত, যত যে ছোটো দরকার ততো জোরে ছুটেছে না। এক আসনে মাথা আর এক আসনে পা ছড়িয়ে বসেছে। স্নায়ু শিথিল হোক, মা পুত্র হয়ে থাক, শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল ঠাণ্ডা হোক। শুধু দেখার কথা, দেখেছে। দেখে দেখে হাসার কথা। অন্তত কি একটা ঘূর্ণীপাক থেকে মুক্তির তাড়নার বীরাপদ হেসেই উঠল।

...কিন্তু পুরুষের কোন্ কাঁকটা নারী ভরে তোলে ? সন্নিধ্য ভালো লাগে—কেন লাগে ? এই ভালোলাগার সাথে এমন অস্বাভাবিক এমন অপরিহার্য কেন ? বীরাপদ আগে শুধু ও হাসত। এখনও তাই করবে। লাভ্য সরকার বোধাই

সিতাও নিরুদয় সঙ্গ, হিমাংগ নিরুদয় সঙ্গ চাকুদি বেড়াতে বেরিয়েছে—
অমিতাভ আসবে কেনেও বেরিয়েছে। এলেই বা, পার্বতী
মাছে বাড়িতে, পার্বতীর চুল কে বেঁধে দিয়েছে আজ?...
চাকুদিই হয়ত।

বীরপদ হাসতে পারছে বটে। কিন্তু হাসিটা ভিতর থেকে কে
যেন টেনে নিচ্ছে, শুধু নিচ্ছে। ছুঁজনের নিরিবিলির ছুরত লোভে
অমিতাভ ঘোষ প্রকারান্তরে ঠেলে তাড়িয়েছে ওকে। বীরপদের
হাসতে পারার কথা। পারেনি। উটে, দেখার কঁাকে প্রলোভনের
তীরে ভিকুকের মত বসে ছিল, বসে থাকতে চেয়েছিল। পার্বতী যে
কারণে থাকতে বলেছিল ওকে, কিছু না বোঝার ভাণ করে সেই
কাবণটাকেই প্রসন্ন দিয়ে পালিয়ে এসেছে সে। তাকে দরজা-বুঠোর
কলে বেধে এসেছে। কিন্তু সে-জন্তে মূহু পরিভাষ দূরে থাক,
তলার তলার কার নির্মম উদ্গাম। নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল
বীরপদ। ছুই চোখ বিস্ফারিত। কাকে দেখছে? কার উদ্গাম?

কি করবে? চোখ বাতাবে তাকে? বসে বসে শুধু শুকনো
বিস্ময় নিঃশ্বাস কুড়োতে বলবে কতগুলো? অর্গৎ দেখতে বলবে?
সঙ্গে কি পাবে। সে তো কেবল বলছে ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো।

বাসনার বিবরে একটা সুপ্ত প্রতিবাদ অজগরের মত কুণ্ডলি
পাকিয়ে উঠছে থেকে থেকে। তার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কামনার
কথা। তার পদসঞ্চার আগুনের মত, ঘাতকের মত। সুধাতুর
বৃত্তুর মত। সে আপোষ জানে না।

...লাবণ্য বোঝাই গেছে সিতাংগুর সঙ্গ। হিমাংগ বাবুর সঙ্গ
বেড়াতে বেরিয়েছে চাকুদি। ঘরে অমিতাভ ঘোষ আর পার্বতী।
নারী আর পুরুষ। নারী আর পুরুষ আর প্রকৃতি। বিশ্ব ছুটেছে
এক সুনিশ্চিত কক্ষপথে।

বীরপদের নির্দেশে ঠেশান-ওয়ারগন বে-পথে চলেছে, সেটা
মূলতানকুঠির পথ নয়।

আসার সময় বে-পথে এসেছিল, সেই পথ।

মোড়টার বেশ কিছু আগে নেমে পড়ে গাড়িটা বিদায় করে দিল।
চৈতনার কক্ষরে কক্ষরে বত রাত তরাত হয়ে উঠেছে, বাইরের রাত
অত নয়। লোক চলাচল কিছু হাঙ্কা বটে। দোকান-পাট একেবারে
বন্ধ হয়নি, ফোটো-টু ডিওটা আধখানা খোলা।

লাইট-পাষ্টের গায়ে ঠেশান দিয়ে মেয়েটা ঠায় দাঁড়িয়ে তখনো।
সেই মেয়ে। খন্দের জোটেনি।

চকিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। দু'ব কয় নয়, তবু কি
করে টের পেল সেই জানে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল।
ব্যবধান কমছে, সংশয়ও কমে আসছে।

বীরপদ হাণ্ডের মত দাঁড়িয়ে।

কাহাকাহি এনে থমকালো একটু। চিনেছে। আর ইশারার
প্রয়োজন নেই, আমন্ত্রণ দরকার নেই। একেবারে কাছে এসে
দাঁড়াল। পাশে এসে। হাসছেও বোধ হয়। অমুরাগের ছক-বাঁধা
হাসি, খন্দের বুকে ওজন-করা হাসি। কিন্তু বীরপদ একবারও
তাকালো না। তাকাত্তে পারল না। এক-পা ছুঁ-পা করে বড়
রাঙা হয়ে চলতে লাগল সে।

মেয়েটা পাশে পাশে।

ঢ়াঙ্গি। বীরপদ চমকেই উঠেছিল :...ঢ়াঙ্গিঅলায়াও জানে

বোধ হয় সব, বোধে বোধ হয়। গতি মূহুর করে ঢ়াঙ্গিঅলা গলা
বাড়ালে, ধামবে কিনা নির্ধাক প্রঙ্গ।

দরজা খুলে দিতে মেয়েটাই আগে উঠল। কলের ম উঠে
বীরপদ দরজাটা টেনে দিল। ড্রাইভার পিছন কিরে শু ালো
একবার, কোনো নির্দেশ না পেয়ে সামনের বড় রাঙা ায়েই
চলল সে।

রাঙার থেকে ঢ়াঙ্গির মধ্যে আলো কম অনেক। বীরপদ মূহু
বে:ধ করল একটু, মূহু বোধ করতে চেটা করল। মাঝখানে কিকে
অঙ্ককারের ব্যবধান। সে এ-পাশের দরজা বেঁধে বসে আছে মেয়েটা
ওপাশে। কিরে কিরে দেখছে, ও একবার তাকালেই সরে আসবে
হয়ত। সঙ্গীর হাবভাব খেখে খুব যেন ভরসা পেয়ে উঠছে না।

চৌরঙ্গীর ওপর পড়ে ড্রাইভার ভিজানা করল কোথায় বেতে
হবে?

বীরপদই কি জানে কোথায় বেতে হবে। গাড়ি থামাতে বলল।
নেমে মিটার দেখে ভাড়া মেটালো। মেয়েটাও নেমে দাঁড়িয়েছে।

চৌরঙ্গীর জোরালো আলোর বীরপদ এই প্রথম চোখ মেলে
বেন। সঙ্গ সঙ্গ চমকে উঠল, আঁতকে উঠল প্রায়। তার কি
হয়েছিল? একোন্ প্রেতিনীর সঙ্গ নিহেছে সে। এক আচমকা
আঘাতে দিশা কিরে পাওয়া মাত্র উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে পালাতে ইচ্ছে
করল। কিন্তু পা ছুটো মাটির সঙ্গে আটকে আছে বেন। বীরপদ
দেখছে, নারী নয়, নারীর কঙ্কাল। কটকটে লাল র্ন উসটা চোখে

ঃ 'বলাকা'র বই ঃ

॥ উপস্থাপন ॥

মেঘভঙ্গুর ॥ প্রশান্ত চৌধুরী ॥	৩১	সারা ভারতের
বন্ধনহীম গ্রন্থি ॥ বাসবী বসু ॥	২১	রেলওয়ে বুকষ্টলে
পথ আরও দূর ॥ রণজিতকুমার সেন ৩১		আমাদের বই
তেউ ॥ কপিঞ্জল ॥	৩.২৫	পাবেন
বানিয়ে বলছি না ॥ প্রবুদ্ধ ॥	৩.৫০	

॥ হাসি ও
কাঁচুনের বই ॥

(সমস্ত প্রকাশিত)

এক পকেট হাসি ॥ প্রবুদ্ধ ॥ ২.৭৫

ছুই পকেট হাসি ॥ প্রবুদ্ধ ॥ ২.৭৫

॥ বিহঙ্গ বিজ্ঞান ॥

পাখির পৃথিবী ॥ 'মুগ্ধ' পত্রিকার লখন-প্রতিনিধি বিশ্বনাথ
মুখোপাধ্যায় ॥ ২.২৫

॥ জীবনী ॥

বিদ্যালয়গরের ছাত্র-জীবন। প্রবোধচন্দ্র বসু ॥ ২.২৫
(একটি অবশ্য পাঠ্য বই)

॥ 'বলাকা'র পালা সিরিজ : ছোটদের মাটিক ॥

সমস্ত প্রকাশিত তৃতীয় পালা ॥ তেপান্তর ॥ প্রশান্ত

চৌধুরী ॥ ১.৫০

প্রথম পালা : বক বধ পালা ॥ জীলা মজুমদার ॥ ১.২৫

দ্বিতীয় পালা : সুভক্তের মিত্রাভঙ্গ ॥ প্রশান্ত চৌধুরী ১.২৫

॥ বলাকা প্রকাশনী ॥ ৫৩, পটুয়াচাঁপা লেন, কলিকাতা-৩

হুলের মত বিবহে, মঙ্গলগে কত-ছাপের মত লাগছে ছাপা শাড়িটা, মুখের শুকনো প্রসাধনে হিহিবিকি চিড় খেয়েছে।

বুহুর্বে সমস্ত মুখ কঠিন হয়ে উঠল বীরাপদর, ধারালো ছ'চোখে মোহমত্ত উকতার লেশমাত্র নেই, একটা ছঃসহ কোত্ত গুমরে ঠেলে উঠছে ভিতর থেকে।

মেয়েটা ব্যবড়ে গেছে। ছ'চোখ টান করে চেয়ে আছে তার দিকে। এই আলোর কোয়ারার মধ্যে এসে, কোথায় গোলবোগ ঘটে গেছে, বুঝেছে। ছই চোখে নীরব অভিযোগ নীরব উঃসগ, আর নিঃশব্দ আশা। ও-চাউনির ভাবা মুক নয় আনো, আমি অঙ্ককারের মেয়ে, অঙ্ককারে ছিলাম, এই আলোতে তুমি আমাকে টেনে এনেছ। সেই সঙ্গে অব্যক্ত আকৃতি, তোমার মোহ তেজেছে সে-সেই আমার নয়, আমাকে ঠেলে দিও না, আজকের এই দিনটার মত আমাকে বাচার প্রতিশ্রুতি দাও, আমি বড় রাস্তা, আমাকে বুণা করলেও দয়া করো, এ অভিশেষ মিছিসে আমিও তো একজন—

মাথার ভিতরটা বিম-বিম করছে বীরাপদর। মুখের কঠিন রেখাগুলো মিলিয়ে গিয়ে কোমলতার ছাপ পড়ছে একটা। পণ্যা নারীকে নয়, মেয়েটাকেই দেখতে চেষ্টা করল সে। আগে যেমন দেখত বয়েস বার কুড়ি একুশ, অপুষ্টি, বড় শুকনো আর বড় কক্ষণ, ওই প্রসাধন পরিহার করলে মুখখানা বার সুখীই মনে হয়। এত কাছে থেকে এভাবে অবশ্য আগে দেখেনি। পুরুষের অকল্প বিশ্বাসঘাতকতার ময়দানে কেনে ভাসিয়ে ছিল বেদিন, সেদিনও না। এই মুখ হুড়িকের মুখ। প্রাণের শিখাটুকু শুধু ধিকি ধিকি জ্বলছে।

সামনেই বড় রেশমী একটা। নৈশ ভোজনবিলাসীর ভিড় কম নয় একেবারে। ক্যাবিনে ঢোকায় মুখে বীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। অনুরের এক কোণে কল-বেসিন দেখিয়ে বলল, হাতমুখ ধুয়ে এসো ভালো করে।

মেয়েটা চল গেল। বীরাপদ চূপচাপ এসে বসল। বয় খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল—রাতের পুরো খাবার।

হাতমুখ ধুয়ে কমালে মুখ মুছতে মুছতে মেয়েটা কিংয়ে এলো।

বীরাপদ এই বকমই করনা করেছিল, চমকে উঠল তবু। প্রসাধনের বড় ধুয়ে-মুছে গেছে। সমস্ত মুখে বেন বস্ত নেই এককোটা। নিঃসাড়, বিবর্ণ, পাণ্ডুর।

আধ ঘণ্টা।

খাবারের ডিশে বীরাপদর আঙুল ক'টা নড়াচড়া করছে শুধু। মুখে কিছু উঠছে না বড়। মেয়েটা থাকে। বীরাপদ তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে। এমন খাওয়া আর দেখেনি। হাত দিয়ে, মুখ দিয়ে, চোখ দিয়ে সমস্ত সজা দিয়ে থাকে বেন। এক একবার সামনের লোকটার দিকে চোখ পড়ে বাজে হঠাৎ, কুঠাও বোধ করছে হয়ত একটু। পরকণে এক খাওয়া ছাড়া আর কিছুই মনে থাকে না।

অব্যক্ত বাস্তবায় গলায় ভিতরটা বুজে আসছে বীরাপদর। চোখের কোণগুলো শিরশির করছে। এক একজনের দেহের সূখা বেটাবার অস্ত্রে দাঁড়িয়ে থাকে যে সূখার তাড়নার সেটা এই সূখা।

খাওয়া হয়ে এসেছে। অন্ন অন্ন হাঁপাচ্ছে। বীরাপদর ডিশের দিকে চোখ পড়তে লজ্জা পেল একটু। বৃহৎ করে বলল, আপনি কিছু খেলেন না তো ?

তোমাকে আর কিছু দেবে ?

নীরব কৃতজ্ঞতার শুধু মুখ ভুলে থাকালো একবার। মাথা নাড়ল। আর কিছু না।

তোমার নাম কী ?

কাকন।

নাম শুনে হাসি পাচ্ছে বীরাপদর, কাকনই বটে, নইলে পরিহাস এতদূর গড়াবে কেন।—কোথায় থাকো ?

প্লেটের ওপর আঙুল ক'টা নড়াচড়া করতে লাগল। নিরুত্তর। বীরাপদ আবার জিজ্ঞাসা করল, থাকো কোথায় ? গলায় বয় উৎস রহ।

মেয়েটা মুখ তুলল একটু, কিন্তু তাকাতে ভরসা পেল না। চোখ নামিয়ে নিল। এমন লোকের পাঞ্জার সেও আর পড়েনি বোধহয়।

সেটা কোথায় ?

বলল।

সেখানে আর কে থাকে তোমার ?

বাবা আর ভাইবোনেরা।

তারা কি করে ?

বাবার চোখে ছানি...চোখে দেখে না।

আর ভাইবোনেরা ?

ভারা ছোট।

কাক নেই কোথাও। মঞ্চে-ধরা নাটকের মত, আট ঘাট বাঁধা। বাবার চোখে ছানি, ভাইবোনেরা ছোট। ট্রবড় বে, সে দারিৎ নিয়েছে। কিন্তু দারিৎ পালনের এই রাস্তাটা ওকে শেখালো কে ? বীরাপদ জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও করল না। থাক, আরো কি শুনবে কে জানে।

রেশমী থেকে বেরিয়ে আবার ট্যান্সি ধরল একটা। ভাইভারকে বে পথের নির্দেশ দিল শোনা মাত্র মেয়েটা চকিত্তে হুরে বসল আধা আধি। লোকটার মাথায় ছিট আছে কি না সেই সঙ্গেই হওয়াও বিচিত্র নয়। এবারও সরে এসে বসতে বা কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না সে।

বীরাপদ কোণে মাথা রেখে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। তোমার বডি এলে বোলো।

কম পথ নয়। এতটা রাস্তা মেয়েটা রোজ হেঁটে আসে হেঁটে করে ? না কি তার খেদেররা পৌছে দিয়ে বার ? কিন্তু আর কিছু জেনে কাক নেই বীরাপদর। অনেক জেনেছে। জানার বকলে মায় অবশ।

একটা কাঁচা গলির মুখে ট্যান্সি দাঁড়াল। আলো নেই। এক-কালি সফ লখা অঙ্ককার বেন হাঁ করে আছে। সেই হাঁ পেরিয়ে বডি। টিম-টিম আলো জ্বলছে। সেই আলোর দূর থেকে বাঁকড়া বাঁকড়া অঙ্ককারের মত দেখাচ্ছে বডিঘরগুলোও।

মেয়েটা নেমে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট তার হাতে দিয়ে বীরাপদ সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আবার। ট্যান্সি-ভাইভারকে চালাতে নির্দেশ দিল।

নোট হাতে মেয়েটা বিনুত মুখে দাঁড়িয়ে।

ললন্ত ট্যান্সি থেকে একটা অলন্ত দৃষ্টি নিঃসরণ করল বীরাপদ।

অন্ত অবাক হবার কি আছে! সেও তো খন্ডেরই বটে। খন্ডের ছাড়া আর কি।

দাঁতে করে নিজের গায়ের মাংস টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে বীরাপদর।

সুলতানকুঠি।

টার্ন অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। আজকের মত নিজের অস্তিত্বটুকুও মুছে ফেলতে চায় বীরাপদ। এই রাতের অস্তিত্বও। গায়ের নিচে শুকনো পাতা আর শুকনো কাঠ-কুটোর শব্দ খড়খড়ে বিক্রমের মত লাগছে। সুলতানকুঠিতে নিবুতি রাত। চোরের মতই সেই স্তম্ভের গহ্বরে এসে দাঁড়াল সে।

একবারেই ঘরে না গিয়ে কদমতলার বেঞ্চিতে এসে বসল। ঘরে ঢুকলেই তো আলো আলতে হবে। বাক আরো কিছুকণ। আলো নাকি জীবনেরই প্রতিবিম্বিত মহিমা। এই মুহূর্তে অন্তত বীরাপদ সেই মহিমার সুখোন্মুখি দাঁড়াতে চায় না।

কিন্তু না চাইলেই ছাড়ে কে। মাথার ওপর ওই তারাময়ী আকাশটাও নিরলঙ্কার, বিবন্দনা। বৌবন-স্বপ্নে বিভোর।

বীরাপদর কানের কাছটা গরম ঠেকছে আবার। একটু আগের অমন বাস্তব আশান্তটাও মিইয়ে আসছে। বীরাপদ উঠে দাঁড়াল চট করে। গায়ের নিচে কঠিন মাটি-উপলব্ধি করতে চাইল।

দরজা খুলে ঘরে এলো। অন্ধকারে জামা-কাপড় বদলে অন্ধকার হাতড়েই গামছাটা কাঁধে নিল। পা-টিপে কুয়ো-স্তম্ভার দিকে চলে গেল তারপর। ভীক সতর্কতায় কয়েক বালতি জল তুলল কুয়ো থেকে। একটুও শব্দ যেন না হয়, শব্দ হলে অপরাধ হবে যেন। সুলতানকুঠির স্তম্ভ-ঘন অন্ধকারের পরদাটা ছিঁড়ে বাবে।

শান্তি।

শরীরটা জুড়িয়ে গেল, ঠাণ্ডা হল। বেশ বীরে-সুখে আরাম করে সবটা জলই মাথায় ঢালল সে। একটা বিকারের ঘোর কেটে গেছে যেন, আর ভাবনা নেই, আর সমস্যা নেই।

গা মুছে ভিজ কাপড়ে ঘরের উদ্দেশে পা বাড়াল। কাপড় আনেনি, ঘরে গিয়ে বদলাবে।

কিন্তু সোনারউদির ঘরের পিছন দিকের শেষ জানালাটা পেরবার

আগেই মুহূর্তের অন্ধ হুঁপা আড়ষ্ট একবারে। অন্ধকারে জানালার গরাদ ধরে সোনারউদি দাঁড়িয়ে। চাপা বিষয়ে ভিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার। এত রাতে চান কেন?

পরম লাগছিল কেমন। অক্ষুট জবাব দিয়ে বীরাপদ দ্রুত ঘরের দিকে পা চালিয়ে দিল। সে পালাতে চায়।

পালানো হল না।

ঘরে এসে দেখে 'সোনারউদি' বাবান্দার তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। কাছে আসতে আপাদ-মস্তক দেখে নিল একবার।— কি হয়েছে?

বীরাপদ সেই জবাবই দিতে বাচ্ছিল, গরম বলতে পারল না। সোনারউদির দিকে চেয়েই 'চোখ দুটো ধমকালো হঠাৎ। আতঙ্ক গায়ে শাড়ির আঁচলটা বেশ করে জড়ালো। নিজের অপোচরে সোনারউদির মুখের ওপর থেকে তার চোখ দুটো নেমে এসেছে। বৌবনের কোমল তরঙ্গ হৃদয়ের তীরে এসে শুক বেখানে— সেইখানে।

কিছু না... বীরাপদ হঠাৎই আবার সবলে ছিঁড়ে নিয়ে এলো নিজেকে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে সঁধিয়ে গেল। তারপর নিম্পদের মত দাঁড়িয়ে রইল খানিক। এবারেও আলো আলল না। সোনারউদি' অবাক হয়ে খানিক অপেক্ষা করবে জানা কথা। আলো জ্বলে আবারও হস্ত ঘরে আসবে। সর্বত্র একি অদ্ভুত কড়বড় আজ? সেই বড়বড় সোনারউদি'ও একজন।

এট না একটু আগে ঠাণ্ডা হয়েছিল, গা জুড়িয়েছিল, সব সমস্যার শেষ হয়েছিল। কাপড়টা তো এখনো জবজবে ভিজে। সোনারউদি' কি দেখল? কি বুঝল? কি ভাবল?

বীরাপদ কি করবে এখন? নিজের এই চোখ দুটোকে খুবলে তুলবে?

অন্ধকারেই কাপড়টা বদলে নিল।

তারপর বসল। বিছানায় নয়, মাটিতে। ঠাণ্ডার তাসিদ আবারও। আকুতি। মাটিতেই গুরে পড়ল আস্তে আস্তে।

ঠাণ্ডা মাটি।

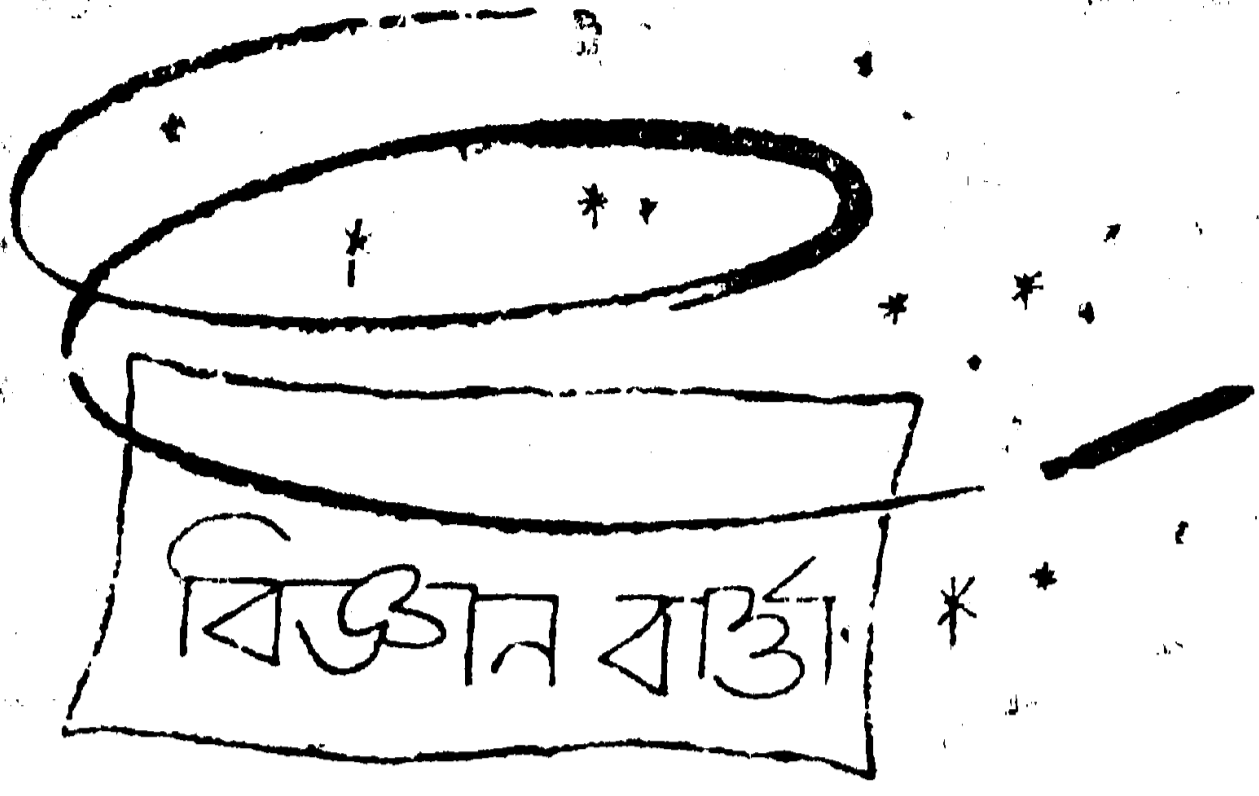
[ক্রমশঃ।

প্রথম প্রেরণা, শেষ সান্ত্বনা

শ্রীঅয়নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার প্রথম দিনের কবিতায় অঙ্করে কথায়,
সতর্ক শিল্পীর মত গড়েছি যে সবক্কে তোমায়,
অক্লিমিা রায়।
চুপি চুপি নেমে এনে শিশিরের শব্দের মতন,
ভোরের কুঁড়ির বুকে হুম্হুম্ ছায়ার কম্পন।
চোখ চেয়ে চারি দিকে মোম-রং নূর্ষের উত্তাপে,
প্রথম কবিতা তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে হুঁসীসার শাপে?
যুগে যুগে যে ছবি এঁকেছি সবাই সেই ছবি আঁকার উল্লাসে,
সারা'রাত পতঙ্গের পাখা উড়ে উড়ে আলোর চারি পাশে,
অনেক কবিতা আমার পুঁকে হল কয়।

মরে-বাওয়া নক্ষত্রের হিম,
সকালের পতঙ্গের মৃত্যুশীত কার্পেট শয্যায়।
আমার উন্মাদ কল্পনা বড় হ'য়ে ভেজে দিল লবঙ্গের বন,
উর্জ্বাসে ছুটে গেল উত্তরের হাওয়া, বেধে গেল
স্বাক্ষর নির্জ্বলন।
বশ এল, অর্ধ এল, পরিশেষে সব গেল চলে,
লুপ্ত হল নূর্ষের রঙীন টিপ পড়ন্ত বিকোলে।
সব শেষে প্রতিভার সৌম্য স্পর্শ বেধে গেল
সমাধি-সন্ধ্যায়,
প্রথম কবিতা তুমি কিরে এলে চুপিসাড়ে অক্লিমিা রায়।



স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও আমাদের খাদ্য

প্রাচীন কালে যোমের লোকেরা মনে করতেন যে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা সিমের মধ্যে বাস করে, তাই অস্ত্র্যক্রিয়ার সময় যোমের লোকেরা সিম খেতেন।

যে সমস্ত ক্রীতদাস পিরামিড তৈরী করতো তাদের দেহ বেশ দুহু ও সবল থাকবে, এই আশায় মিশরের লোকেরা তাদের রক্তন খাওয়ারতেন।

এমন কি, ঔপনিবেশিক আমেরিকান্তেও রক্তনবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি বহুল-প্রচারিত প্রহে বলা হয়েছে, খাওয়ার আগে বিয়ারের মত কটিও ভাল করে পাকিয়ে নিতে হয়।

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে নানা রকম ঐন্দ্রজালিক গুণের আবিষ্কার করা হয়েছে। এমন কি, আগেকার দিনেও খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে হাজারো রকমের বিভ্রান্তি ব্যাপক ভাবে প্রচারিত আছে।

আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতাল, সরকারী গবেষণাগার, সরকারী খাদ্যদপ্তরের প্রায় ১৪ হাজার খাদ্যবিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত আমেরিকার ডায়েটিটিক অ্যাসোসিয়েশান খাদ্য সম্বন্ধে নানা রকম ভুল ধারণা দূর করার জন্য সারা দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু করে দিয়েছেন।

এই বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন সেবা সমিতি, মহিলাদের ক্লাব, বিদ্যালয় প্রভৃতিতে বক্তৃতা দেন। তাঁরা রেডিও এবং টেলিভিশনেও বক্তৃতা দেন। ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন দেখলেই তাঁরা তাঁদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। খাদ্য সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রচার করা এবং এ ব্যাপারে হাতুড়ে লোকদের ভ্রান্ত প্রচারকে লোকচক্ষে তুলে ধরাটা এঁদের প্রধান কাজ।

এক উঠতে পারে, খাদ্য নিয়ে এক হৈ-চৈ কেন? কির বা ভাল লাগে তা খেতে দিতে আপত্তি কি?

আমেরিকার ঐ অ্যাসোসিয়েশান খাদ্য সম্বন্ধে ৩৬ পৃষ্ঠার একটি ছোট পুস্তিকাতে এই প্রশ্নের জবাব জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। ঐ পুস্তিকাতে তাঁরা বলেছেন, বর্তমান শতাব্দীতে খাদ্য সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রে যে সব ভুল ধারণা প্রচলিত আছে সেগুলো ঠিক। প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে তার প্রমাণ দেওয়া হুঁকিল। কিন্তু লোকের মুখে মুখে বংশাবৃত্তে যে সব ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে সেগুলো কম অনিশ্চিতজনক নয়। এই সব ভ্রান্ত প্রচারে আত্ম হ্রাসন করে বহু লোক এখনও পুষ্টিজনক খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করতে পারছেন না।

প্রধানত তিনটি কারণে খাদ্য সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যসমূহকে ভুল থেকে আলাদা করে প্রথা প্রচলিত।

প্রথমতঃ, চিকিৎসা বিবরক খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বিশ্বাস স্থাপন করে বহু লোক উপযুক্ত সময়ে রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, পথ্য হিসাবে শুধু কল খেলেই ক্যান্সার সেরে যাবে। অথবা বখাসমতব অনাহারে থাকলে বহুমাত্র ডাল হয়ে যাবে, এই ধারণা বিশ্বাস করে অনেক রোগী সময়মত ডাক্তার ডাকেন নি।

দ্বিতীয়তঃ, আধিক—গৃহকর্তারা জল দিয়ে গুঁড়ো-করা শস্ত, 'উর্ধ্ব' ডিম, কাঁচা ছূধ এই সব তথাকথিত 'স্বাস্থ্যকর খাদ্য' কিনে সংসারের খরচ বাড়ান। শুধু যে এতেই খরচও বাড়বে তা নয়, এই সব ধারণা আমাদের খাদ্যশিল্প সম্পর্কেও অবিশ্বাস জন্মায়।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষাগত—বাঁরা খাদ্য সম্বন্ধে এই সব ভুল ধারণার আত্ম স্থাপন করেন, তারা আজ বিজ্ঞানের নিত্যনূতন আবিষ্কৃত তথ্যগুলি মোটেই বিশ্বাস করতে পারেন না।

আজকের যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য সম্পর্কে বহুল প্রচারিত কতকগুলো ভুল ধারণা, এবং ঐ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের তালিকা দেওয়া হোল। আপনার খাদ্য বস্ত সম্পর্কে কুসংস্কার দূর করতে এই সব তথ্য আপনাকে সাহায্য করবে।

১। সাদা ডিম বাদামী রঙের ডিম থেকে বেশী পুষ্টিকর।

—প্রকৃত তথ্য হচ্ছে ডিমের রঙের উপর উহার গুণাগুণ মোটেই নির্ভর করে না। ডিম তিন জাতের মুরগীর ডিম তিন তিন রঙের হয়।

২। বাড়ীতে-ভাঙা আটা বা ময়দা কলে-ভাঙা আটা বা ময়দা থেকে বেশী পুষ্টিকর।

—আসলে কলে-ভাঙা গম আর চাকীতে-ভাঙা গমের গুণগত কোন পার্থক্যই নেই। কলে না ভেঙে বাড়ীতে কষ্ট করে গম ভাঙানোর চেহাঁকে বর্তমানে মিলের কাপড় বাদ দিয়ে আভিকালের সেই চরকা-তাঁতের আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

৩। কৃত্রিম মাখন আসল মাখনে থেকে কম ক্যালরি খাদ্যবস্তু থাকে।

—এটাও মোটেই সত্য নয়। ছুটোর মধ্যেই ক্যালরির পরিমাণ সমান।

৪। চিটাগড়, রক্তশূন্যতা আর বাতের রোগীর পক্ষে ভাল।

—চিটাগড়ের মধ্যে ভিটামিন আছে একথা সত্য, এর মধ্যে অন্য কোন বিশেষত্ব নাই। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই গুড় জীবজন্তুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়—এবং এটা ঐ ভাবেই ব্যবহৃত হবে।

৫। মাংস, ডিম আর ছূধ না খেলে গের্টেবাত সেরে যায়। —এ রকম কোন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না।

৬। প্রচুর পরিমাণে মাছ এবং সেলারী শাক খেলে মস্তিষ্কের উন্নতি হয়।

—এ ধারণাও ভুল। কসকারাস মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী; আর মাছে কসকারাস আছে এজন্যই সম্ভবতঃ মাছ খাওয়ার পক্ষে বৃদ্ধি দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু মাংস, ডিম আর ছূধেও প্রচুর পরিমাণে কসকারাস আছে। এইগুলিও মাছের চেয়ে কম উপকারী নয়। কিন্তু সেলারী শাকে কসকারাস নেই। কাজেই সেলারী শাক মস্তিষ্কের উন্নতি করতে পারে না।

৭। বিহুক, কাঁচা ডিম এবং অলিভ বোন শক্তি বৃদ্ধি করে। —অত্যন্ত বহু খাদ্যের মতই এগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। কিং বৌমশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে এর বিশেষ কোন গুণ নেই।

৮। পপকর্ণ নামে এক জাতীয় কুট মাংস এবং হৃৎকের স্থান প করে।

—ভূটা কখনও মাংস আর হৃৎকের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। কর্ণের মধ্যে ক্যালসি আছে যথেষ্ট কিন্তু মাংস আর হৃৎকের মধ্যে হ্র প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ধাতব পদার্থ; পপকর্ণের মধ্যে হ্রটো এককম নেই।

৯। মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে অতিরিক্ত খাদ্য রাজন।

এটাও অলীক বলনা। তিন বার উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ সেই শরীর ঠিক থাকে। অনাহারেও মস্তিষ্কের কাজের বিশেষ নি তারতম্য হয় না। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক হ্রয় ১২ জন ছাত্র দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৪২ দিন করে না খেয়ে ক। ঐ সময় মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে অনাহারে দেব বুদ্ধিবৃত্তি বা উপলক্ষ্যের বিশেষ কোন তারতম্য হয়নি।

১০। কোষ্ঠ করা মাংস রান্না করা মাংসের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর।
—পরীক্ষা করে দেখা গেছে রান্না করা মাংস আর রোটের মধ্যে ন মূলগত পার্থক্য নেই।

১১। পাকা এবং সুমিষ্ট চেবীকল দেহের ঈর্ণ তত্ত্বকে নষ্ট দেয়।

—কোন খাদ্যই দেহের তত্ত্বকে নষ্ট করতে পারে না। বুড়ো বয়সের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে দেহের পুষ্টির পক্ষে সহায়ক খাদ্য মমত গ্রহণ করতে হবে। মানুষের বয়স খুব বেশী বাড়তে ক তখন আগের মত কর্মক্ষমতা থাকে না। সেই সময় আগের মতই বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করতে হবে কিন্তু পরিমাণ হ্রটা কম।

১২। টাটকা কমলালেবুর রস জমানো কমলালেবুর রস অপেক্ষা উপকারী।

কমলালেবুর মধ্যে ভিটামিন সি থাকে খুব বেশী। টাটকা র জমাট সব কমলালেবুর মধ্যেই ভিটামিন সি সম পরিমাণেই ক। কাজেই উপকারিতার দিক থেকে এদের মধ্যে কোন তম্য নেই।

১৩। সব রকম ফল এবং শাক-সজ্জা কাঁচা খাওয়া উচিত।

—সব খাদ্য তার স্বাভাবিক অবস্থার খেতে হয়। এইরূপ তত্ত্ব কই বোধ হয় উক্ত ধারণা প্রচলিত হয়েছে। শাকসজ্জা রান্না করা হজমের সুবিধা এবং সুস্বাদু করার জন্য। কিন্তু এটা ঠিক যে করে নিছক করলে খাদ্যের ধাতববস্তু ও ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

১৪। শসা আর তরমুজ খেলে পোলিও রোগ হয়।

—এক জাতীয় জীবাণু পোলিও রোগ সৃষ্টি করে। কোন এই জীবাণু থাকে না।

১৫। খোলা ক্যানের মধ্য থেকে খাদ্য বের করে নেওয়া ত—ঐ ক্যানের খাদ্যবস্তু থাকা বিপজ্জনক।

—বুদ্ধবৃদ্ধির কৃষিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বলেছেন যে, নটি খোলাব পূর্ব খাদ্যবস্তু সেই ক্যানের মধ্যেই রাখা ভাল। কিন্তু ক্যানটি ঢাকা দিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হবে। খাদ্যবস্তুর অন্ন পদার্থ কিছু থাকলে ঐ ক্যান থেকে সামান্য পরিমাণে হ্র পক্ষে খেতে পারে, কিন্তু উহা খাওয়ার পক্ষে মোটেই কতিকর

নয়। এই সব ক্যানের খাদ্য ভরতি করার সময় ক্যান এবং খাদ্যবস্তুকে জীবাণুশূন্য করে নেওয়া হয়। অন্য কোন পাত্রে জীবাণু থাকতে পারে এবং ফলে খাদ্যবস্তু নষ্ট হয়ে যেতেও পারে।

১৬। শাকসজ্জা রান্না করার সময় জল তিনবার করে পালটিয়ে নিতে হয়।

—রান্না করার আগে সব শাকসজ্জা বা কাঁচা জিনিষই ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। কিন্তু রান্নার সময় জল বদলানো উচিত নয়। শাকসজ্জা, ফল প্রভৃতি রান্নার সময় জল যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল, না হলে ভিটামিন আর ধাতবপদার্থ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

১৭। দুধ কোষ্ঠবদ্ধকারক।—
এই তথ্যও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। দুধ খাওয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র আপত্তি হবে কোন রোগী বেশী পরিমাণ দুধ খেলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্য খাদ্য কম থাকবে। কাজেই কোষ্ঠবদ্ধতার রোগীকেও দুধ দেওয়াতে কোন আপত্তি নেই কিন্তু তাকে সঙ্গে সঙ্গে অন্য গুণসম্পন্ন খাদ্যও খেতে হবে।

১৮। জল চর্কি বৃদ্ধি করে।
—এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই। জলের মধ্যে ক্যালসি থাকে না, কাজেই চর্কি বৃদ্ধিতে বিন্দুমাত্র সহায়তাও জল করতে পারে না।

১৯। বয়স্কজল খেলে হৃদরোগ হতে পারে।

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সাধারণ মানুষের একটি রূপ আছে যে রূপটিকে বলা যায় বিশ্বজনীন। দেশ-ভেদে, সময়ভেদে তার বিশেষ তারতম্য নেই। কিন্তু এছাড়াও মানুষের একটি জাতিগত রূপ আছে, যা দেশ-কালভেদে আপন ইতিহাস অনুযায়ী গড়ে ওঠে এবং যা মানুষের বিশ্বজনীন রূপ থেকে খানিকটা স্বতন্ত্রও ঘটে। জাতিগত জীবন-দর্শন ও ধর্মচরণের ক্ষেত্রে দৃষ্টি-পাত করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কৃত হয়। ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও সাহিত্যে 'শক্তি-সাধনা' একটি বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দাশগুপ্ত এই গ্রন্থটিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যের তথ্যসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনা করে এদেশের ইতিহাসের এই দিকটা রূপায়িত করেছেন; শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে শাক্ত ধর্মের আধ্যাত্মিক রূপটিও তুলে ধরেছেন। বিন্দু ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক-মণ্ডলীর কাছে বইটি অপরিহার্য। দাম পনের টাকা।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—২

॥ আমাদের বই সব সস্তা শুদ্ধ দোকানে পাবে ॥

—স্বদ্রোগ হওয়ার কারণ ভিন্ন। তবে বিশেষ ধরনের কোন একটি স্বদ্রোগে আক্রান্ত রোগী বরফজল অথবা অন্য কোন উত্তেজক পানীয় পান করলে বুকে একটা ব্যথা অনুভব করতে পারেন।

২০। খাওয়ার পর স্থিতি করলে ওজন কমে।

—ওজন কমানোর এই পথ একেবারেই বাজে। খাওয়ার পর স্থিতি করলে অবশ্য ক্ষুধা বাড়তে পারে—পরের বার খাওয়ার সময় আগের থেকে বেশী করে খাওয়া যায়। স্বাভাবিক পরিমাণে তিনবার খাওয়ার চেয়ে কম পরিমাণে 'বার বার খেলে হয়তো অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ হতে পারে।

২১। পাঁউরুটি অপেক্ষা রুটির মধ্যে ক্যালরি কম থাকে।

পাঁউরুটিকে সোঁকে নিয়ে টোট্ট করতে হয়। একমাত্র পাঁউরুটির জল শুকিয়ে যাওয়া ছাড়া টোট্টের মধ্যে পাঁউরুটির সব গুণই থাকে। জলের মধ্যে ক্যালরি নেই। তাই টোট্টের ক্যালরির কোন হেরফের হয় না।

২২। দুধ-মেশানো কফি ব-কফির চেয়ে বেশী ক্ষতিকর।

—দুধ বা চিনি ছাড়া কফিতে কোন ক্যালরি নেই। কফির সঙ্গে দুধ আর চিনি মেশালে কফিতে ক্যালরির সৃষ্টি হয় অথচ কফির উত্তেজনা বৃদ্ধি শক্তির কোন তারতম্য হয় না।

২৩। আঙ্গুরের রস ক্যান্সার আরোগ্য করে।

—পরীক্ষা করে এ রকম কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

২৪। রোজ একটা করে ভিটামিন ট্যাবলেট খেলে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ভাল হয়,—তবে রোজ দুটো-তিনটে ট্যাবলেট খেলে স্বাস্থ্য আরো ভাল হবে।

—আসলে কিন্তু অতিরিক্ত ভিটামিন খেলে ক্ষতি হতে পারে, বিশেষ করে শিশুদের পক্ষে তা বটেই। কাজেই কোন অসুখ করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজন মত ভিটামিন খেতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে শরীরের পুষ্টি ও জল সাধারণ পুষ্টি কর খাওয়াই বটে। এই খাদ্যতালিকার থাকবে কিছুটা দুধ, সামান্য পরিমাণ মাংস, মাছ অথবা ডিম, কিছু পরিমাণ শাকসব্জী এবং ফল আর ততটা পরিমাণের রুটি বা অন্য কোন খাদ্যশস্য।

ক্যালিকোর্শিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন-স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার রুথ এল্ টুয়েনম্যান বলেছেন, "অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য কিছুই নেই; দরকারী হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টিজনক খাদ্য।"

আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে খাদ্য সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো ত্যাগ করুন।

সহরের রাস্তায় খালিপায়ে চলবেন না

খালিপায়ে পথ চললে কি পায়ের গঠন ভাল থাকে?—এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন ওয়াশিংটনের ডাঃ আর্ন রবিন।

তিনি বলেন, প্রাচীরের পথে বেখানে পাকা রাস্তা নেই সেখানে খালিপায়ে হাঁটা পায়ের পক্ষে মন্দ নয়। এরূপ ক্ষেত্রে চলার সময় পায়ের সব জায়গাতেই সমান জোর পড়ে পায়ের স্বাস্থ্যে ভাল করে তোলা।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে বেশীর ভাগ সহরেও রাস্তা পাকা। এখানে খালিপায়ে পথ চললে পায়ের একই অংশের উপ সব সময় জোর পড়বে। ফলে সেই অংশগুলো বেশী শক্ত হই সমতার সৃষ্টি করবে। কাজেই সহরের পথে জুতো পয়ে দিয়ে প চলা নিরাপদ তো বটেই, পায়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্তও একা অপরিহার্য। জুতো পয়ে থাকলে চলার সময় জোরটা পায়ের : অংশেই পড়বে। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশে অর্থাৎ ঘাসে-চাঁ নরম পথে খালি পায়ে চলতে আপত্তি নেই।

সেই ছেলে

কান্তা দাশ

অমৃত লীলার সন্ধ্যানে
জন্ম নেয় এক শিশু,
মুখখানি হাসিতে ভরে
কুড় কুড় সৃষ্ট অবিজ্ঞান বটনার
বিপর্ষয়ের সূত্র ছিঁড়ে সেই শিশু বাড়ে।
অবাক আমি কণ্ঠে প্রশ্নের বাক্য চেপে
বিস্ময় মনে নিস্তরক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি,
মেধি—
জল-জল সংগ্রামীর রক্তাভা পথে
রক্তগামী নিশান অগ্রবর্তী হাতে
ওই শিশু
কঠিন জ্বালাতে বাক্য মেশানো মনে
বিক্ষোভক বিক্ষোভে :
ধরিজীর রক্ত বাতাস রক্ত করবার অঙ্গীকারে
পুঞ্জীভূত মনের আগুনে মিছিলে জাগে,
মহুযাঘের আদর্শ অক্ষয় রাখতে
ধনীনের অভিশাপ কুড়ায়,

আর একদিন...?
শিশু ঝড়ের রক্ত গতিতে
মনের উত্তাপ শাখায় বাঁচবার প্রতিজ্ঞায়
কানের পাশে—
বুকের রক্ত উগ্র শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে।
কেন ?
জ-কুণ্ডিত করে প্রশ্ন করি
মনের কার হাজার ব্যথা নিয়ে,
মহুযাঘের আদর্শের বলস্ক শপথে
গুপ্ত গুহার নীরব নিল্পন অন্ধকার ছিন্ন করে
বে শিশু জেগে ছিল
কেশরদোলা ঝড়ের রাগে,
হঠাৎ কেন সে হারিয়ে গেল রক্তবরা কুরাশাতে
তাই—
সূর্যোদয়ের মহাক্ষেপে দীপ্তমুখে
শিশুর উঠে আশার নতুন পথ চেয়ে,
জায়ে আহার মনের আকাশ কাঁপে।

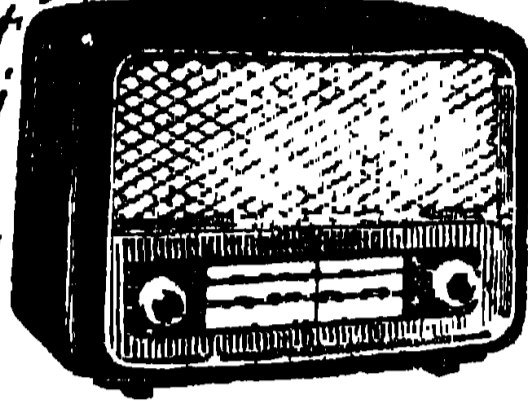
এই উৎসবের দিনগুলোয়—

সঙ্গীতে ও কোঁতুকে আপনার গৃহ আনন্দমুখর
করে তুলতে সুন্দর একটি

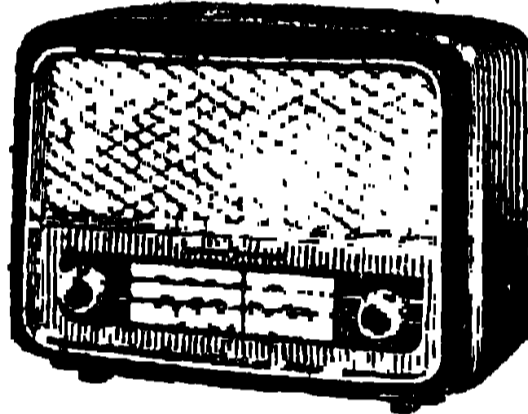


ন্যাশনাল একো

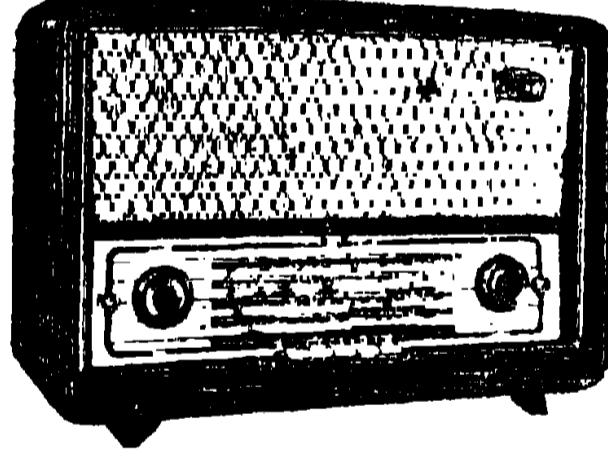
রেডিও
ঘরে রাখুন



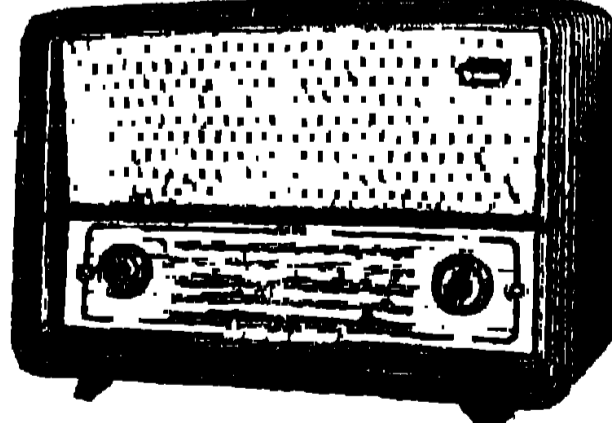
মডেল ইউ-৭১৭: ৫ ভোল্ট, ৩ ব্যাণ্ড
এসি বা ডিসি। বাদামী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০ টাকা।
ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙের।
২৬০ টাকা।



মডেল বি-৭১৭: ৪ ভোল্ট, ৩ ব্যাণ্ড,
ড্রাই ব্যাটারী। বাদামী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০ টাকা। ক্রীম,
নীল ও সবুজ রঙের। ২৬০ টাকা।

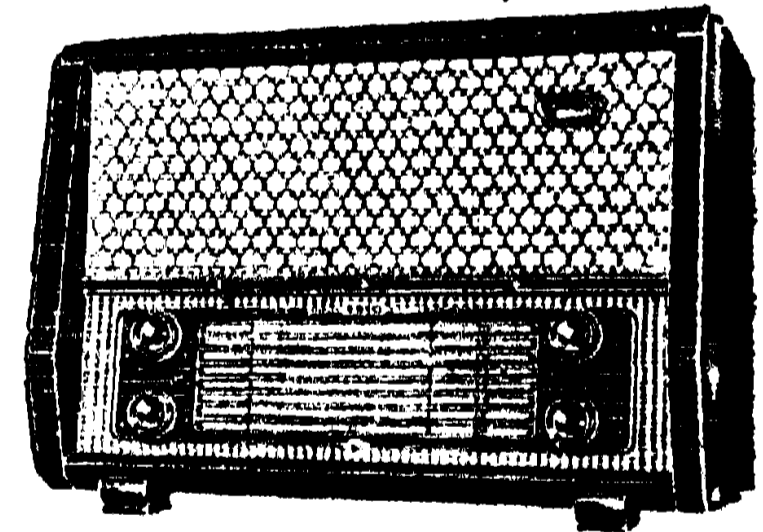


মডেল বি-৭৫১: ড্রাই ব্যাটারীতে
চালাবার জন্তে এ-৭৪৪ মডেল-এর
ট্রানজিস্টার রেডিও। ৩টি ট্রান-
জিস্টার এবং ২ ভোল্ট-এর ফাংশান-
যুক্ত ৪ ভোল্ট। দাম ৪২৫ টাকা।



মডেল এ-৭৪৪ : ৪ ব্যাণ্ড,
এসি রেডিও। ৬ নোভাল
ভাল্ব ২ ভোল্ট-এর কাজ করে।
পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন।
হাঁচা চালাই স্থলর কেবিনেট।
দাম ৪১৫ টাকা।

উৎসব-রঙীন দিনগুলি। এমন দিনে বাড়ীর
সবাইকে একটি মনোরম অল-ওয়েভ
শাশনাল-একো রেডিও উপহার দিন যা তারা
বহু বছর ধরে সানন্দে উপভোগ করবে!
বাড়ীর প্রত্যেকে এতে প্রতিদিন গান ও
প্রমোদ-অনুষ্ঠান শুনে খুশী হবেন; অথচ এর
জন্তে খরচ খুবই কম। প্রত্যেকের সাখামুখারী
দামের ভেতর সুন্দর সুন্দর অল-ওয়েভ
শাশনাল-একো রেডিও কিনতে পারেন। এসব
সুদৃশ্য মডেলের ভেতর কোনটি পছন্দ এখনই
দেখে নিন। আজই আপনার কাছাকাছি
শাশনাল-একো ডিলারের দোকানে আসুন।



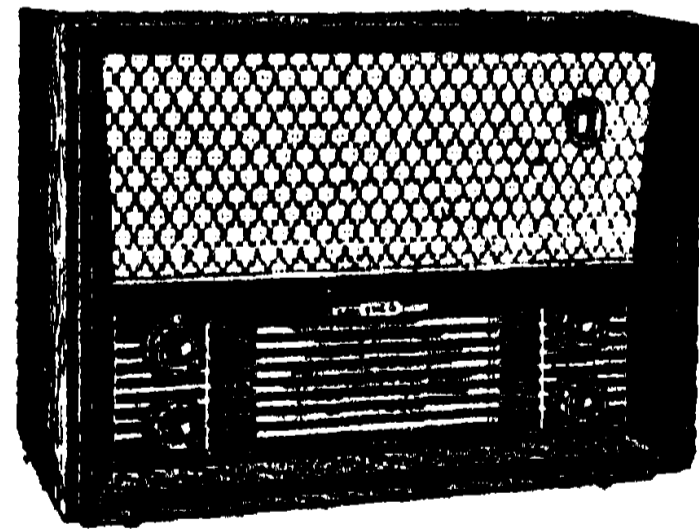
মডেল এ-৭৩১ : ৭ ভোল্ট, ৮ ব্যাণ্ড, এসি &
শকগ্রহণ ক্ষমতা অত্যন্ত উঁচু দরের। স্বরনিয়ন্ত্রিত
আর, এক, স্টেজযুক্ত। সমস্ত শাশনাল-একো
রেডিওর মধ্যে সেরা। ৬২৫ টাকা।

সবই নেট দাম—টাক্স আলাদা
এক বছরের গ্যারান্টি।



জেনারেল রেডিও এণ্ড এপ্লায়েন্সেস
প্রাইভেট লিমিটেড

৩ মাদান স্ট্রীট, কলিকাতা-১০। অপেরা
হাউস, বোম্বাই-৪। ফ্রেজার কলেজ, পাটনা।
১/১৮, মাউন্ট রোড, মাদ্রাস। ৩৬/৭৪,
সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর।
জোগেশ্বর কলোনী, চাঁদনী চক, দিল্লী।
রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দ্রাবাদ।



মডেল-৭৩০ : ৬ ভোল্ট, ৮ ব্যাণ্ড,
'মাগ্নি-ব্যাণ্ড' টিউনিং। মডেল এ-৭৩০
এসি; মডেল ইউ-৭৩০ এসি বা ডিসি।
৪২৫ টাকা।

শাশনাল-একো রেডিওই সেরা

—এগুলি 'মনসুনাইজড'

কবি কর্ণপুর-বিরাচিত

আনন্দ-রত্নাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৫০। বুঝভাঙ্গুগৃহিণী বললেন—“ব্রজেশ্বরী, এ যে আমার অবিবেচনার কাজ হয়েছে, তা আপনি ঠিকই বলছেন। তবে আমার মেয়েটি রত্নময়সিকা। ওটি ওর স্বভাব। তার উপর বিশেষ করে আজকের দিনটি উদার আনন্দের মহোৎসবের দিন। দারাসুত নিয়ে ভোজন করবেন ঘোষাধীশ, তাই মেয়ের আমার বৃদ্ধি ভাল, নিজেই রাগার কাজ নিয়ে যেতেছে। ওরও আনন্দ কি কম? আর তাও বলি, ওর হাতের এমনিই গুণ যে বাই রাঁধুক না কেন, সে রাগাটি হতেই হবে চেহারার ভাল, সুখরোচক আর সুগন্ধি।

৫১। তাই, ওর বাপ কৌতুক করে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওদিকের ঘরে আরোও অনেক রাঁধিরে রয়েছেন; পুরুষই বলুন আর মেয়েই বলুন, সকলেই নিজেকে নিজে কুতর্ভ করতে চাইছে আজ। এখন আপনাকে স্বয়ং এঁদের অভিজ্ঞাবিকা হবে দেখতে হবে, সামঞ্জস্য রেখে উদ্ভাসের সঙ্গে সব ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা।”

কথা শুনে ব্রজেশ্বরী পবনেশ্বরী সেই হাসতে হাসতে বলেছেন—“তাহলে যেমনটি আদর করে রাখা আমাদের বেঁধেছেন, ঠিক তেমনটি শিল্প কলিরে রোহিণীকে করতে হবে পরিবেশন...”

৫২। অমনি কথার শেষ না হতে হতেই বলে উঠলেন বুঝভাঙ্গুগৃহিণী—“ঘোষেশ্বরী, রাম আর কৃষ্ণ, আহা, আমাদের কুমার দুটি, যেন খেতকমল আর নীলকমল। তাঁদের আর আমাদের ঘোষাধীশকে, এবং স্বামিনোহাগিনী আপনাকে আর রোহিণী দেবীকে পরিবেশন করতে দিন আমার মেয়েটিকে। শ্যামা, ললিতা, ললিতার বাল্যসখীরা, তাবাও কেউ কম ঘায় না, লঘুহস্তে তারা বরঞ্চ পরিবেশন করুক শ্রীকৃষ্ণের সহচরদের।”

৫৩। এসব শোনার মত কথা, কানে পশবেই। কিন্তু মনের ভাব গোপন করলেন রাধিকা। মিষ্টি-মধুর একটি হাসি অধরকিশলয়টিকে স্নান করতে করতে হঠাৎ যেন কেমন লয় পেয়ে গেল। নিকট বাণীর মধ্য দিয়ে তার আত্মগরিমা হঠাৎ যেম দেখিয়ে গেল এক অভিনয়; সৌহার্দ্যের তীব্র নীতিশব্দটিকে সখীদের জগরে যেন ছুড়ে মারতে মারতে নিরকণ্ঠে তিনি মাকে বললেন,—“একটু স্নান হয়ে পড়েছি মা, ব্রজেশ্বরী আর আপনি যদি বলেন তাহলে ভিতর-বাড়ীতে পরিবেশনের ভার আমি নিই। বাইরে পরিবেশনের ভার দিন শ্যামা। আমাদের মধ্যে উনিই একমাত্র সাবধানী। ওঁর পক্ষে ভালই হবে।”

৫৪। পরস্পরের সমান ইচ্ছে, সমান ভাব, সমান ভাবের উদ্বোধন, সমান পাণ্ডিত্য। শ্যামা বললেন—“অমন হরিণচোখে আর নীতিশাস্ত্র শেখাতে হবে না সই! মোটেই উপদেশ নয়, পরিবেশনে বক্তব্য হওয়া আপনারই কর্তব্য, কারণ আপনার পিতৃদেবই নিমন্ত্রণ করেছেন এঁদের। এঁদের সকলেই শিবঠাকুর ইত্যাদিদের মতই দুঃখ ঘোচাতে পারেন।”

৫৫। অতএব আরম্ভ হয়ে গেল দুটি কলহংসিকার মধ্যে কৌতুক-কলহ। সে কলহ সকলের কানে ঢালতে লাগল অতিরস। রসদ জোগাল কুতূহলের। এমন আমোদ আর কখনও পান নি ব্রজেশ্বরী। বাৎসল্যের, সম্পদের, মাধুর্যের যিনি ঈশ্বরী তাঁরও মনে অনির্বচনীয় একটি প্রীতির ফুল ফুটিয়ে দিল সেই কলহ। তিনি বললেন—“তোমাদের ছাঁজনের পক্ষেই ভাল হবে। অত ভয় কিসের? আমার আদেশ উপদেশ তোমাদের ছাঁজনকেই দিশা দেবে। ছাঁজনেই পরিবেশন করবে।”

৫৬। রত্ননিবিড় আনন্দে তার পদে পড়তে লাগল সার সাংগভারী কাঠের পিঁড়ে, শুভ্র সূক্ষ্ম বসনের আসন পাঁতা হল পিঁড়ে উপর। ঐ দেখ বেঁকে-চুরে যাচ্ছে। ব্রজেশ্বরীর আদেশে, স বাঁকা নোলা হয়ে গেল। স্বাক্ এবার সবাই বসবেন সুখাস আনন্দে।

৫৭। পাদপদ্ম ধৌত করে উপবেশন করলেন সান্ত্বক্কেম্ভেস্ত তাঁর স্নেহের গভীর মধ্যে দক্ষিণে বসলেন ফটিকেশ্বর-সুন্দর বলরা বামে বসলেন নীলমণীন্দ্র-সুন্দর কৃষ্ণ। কৃষ্ণের বামে বসানো কুমুদাসবকে। বিজয়া বলে কী তাঁর মোহের মত তার ঘায় তাঁর বামে বসলেন বধাক্রমে সুবলাদি কৃষ্ণের শ্রিয় সহচররা।

ব্রজেশ্বরী ঐরকমের মাঝে উপবেশন করে ঐরকমের মূল কা ব্রজরাজ ছোট একটি কল্যাণ-হাসি হাসলেন। ছড়িয়ে পূ অপূর্ব কমনীয় তাঁর আদর। কুতূহলী হয়ে উঠলেন হঠ সেই কুতূহলের চেউ লাগল গিয়ে দমুজেশ্বর-দলন তদমু দ্বিধ বালকধর শুক বিদূষকে, এবং শ্রেয় বসু-বল সুবল সাধাগণে যখন শোতার আভাসমা ব্রজরাণী ডাক দিলেন শ্রীরাধা! কিন্তু এগিয়ে যাবেন কেমন করে বুঝভাঙ্গুগৃহিণী? নবীন ও ও শ্রদ্ধার আবহ হয়ে গেল যেন তাঁর চরণ। সৌন্দর্য্য যেন কম উপহার কেলে গেল তার চরণে। আবার তাঁকে ডাক দি ব্রজরাণী। তিনি তখন বহমান-পুরঃসর ব্রজরাজের ধ পরিবেশন করলেন অন্ন। বাৎসল্যের স ধাকে রাঙিয়েই বেধেছে আর আনন্দ পেতে কতকণ, রামকে পরিবেশন করলেন শ্যামা।

৫৮। তারপর যখন রামাঙ্ককে পরিবেশনের সময় এল ব্রজেশ্বরী বলে উঠলেন—

“বুঝভাঙ্গুগৃহিণী, তুমি নইলে শ্যামার আর পরিবেশনের চলে না। তোমার খুব কাছেই রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই বরং লাও।”

এহের মত একটি আগ্রহের হৃৎপা রাখার মধ্যে ফুটি-ফুটি হয়ে ছুটে উঠেছিল লজ্জা-ধ্বংসী একটি চাকলা, শুকিয়ে গেল সেই অভিব্যক্তি। নিত্যকালের পরমায় একটি মুহু আঘাতে যেন পরাস্ত হয়ে গেল তাঁর মন।

কল্পিত হল তাঁর কর। তারপরে জোর করে নিজেকে সামনে নিতে নিতে তিনি পরিবেশন করলেন শ্রীকৃষ্ণকে।

৫১। ব্রজরাণীর আদেশে হুঁজুনেই বখন কুসুমাসবাদি সহচরদের পাতে পরিবেশন করতে লাগলেন অন্ন তখন আশ্চর্যবাহার খই ফুটল কুসুমাসবের মুখে।

প্রথম মৈ। “আমরা ব্রাহ্মণ, পৃথিবীর দেবতা-বাড়। আমরাও আজ পবিত্র হয়ে গেলুম, বুঝভাঙ্কুস্তার হাতের রান্না খেয়ে।”

দ্বিতীয় মৈ। “সাক্ষাৎ লক্ষ্মী গো...পরমা রমা। এর তুণ্ডিটি কোথায় পাবে, কোন্ দেশে, কোন্ কালে?”

তৃতীয় মৈ। “বুঝলে হে, এঁর হাতের রান্না খাচ্ছ এর পরে আর...নাঃ, অন্ন হাতের রান্না মুখে কচবে না।”

চতুর্থ মৈ। “তুমি তো নিজের আলোর নিজেই বল, এখন কি বলা হে বরশ্র।”

প্রহসন-মাধুরীর সে কী চেউ নাচানো বটুর, বুঝভাঙ্কুস্তার হাতের রান্নার সে কী পাতভরানো তার। থাকতে পারলেন না শ্রীকৃষ্ণ মনের ভাব লুকিয়ে, রাগের ভাণ করে বললে—

“বাচাল, বাচালের বাক্যিতে কেবল প্রহসন, অত বকিস নি।”

৬০। বটু বললেন—“কেন বদন বুজে খাব নাকি? হাজার বদনে বকলেও কি এমন রান্নার ব্যাখ্যান কুয়োয়?”

৬১। বটু আর কৃষ্ণের মাঝখানে বসেছিলেন শ্রী শুক। নড়ে নড়ে উঠছিল তাঁর ঘাড়ের কুকাটিকা। দপ করে রেগে ওঠাই তাঁর স্বভাব। মনের মত কৃষ্ণের দেওয়া খাবার খেতে খেতে কী যেন বলবেন বলে সেই গলা বাড়িয়েছেন, অমনি বলে উঠলেন ব্রজেশ্বরী—“দ্বিজোত্তম, কি বলতে চাইছেন বলুন।”

বটু বললেন—“আজ দ্বিজোত্তম হয়ে গেছি।”

ব্রজেশ্বরী—“শুককে জিজ্ঞাসা করছি।”

৬২। শুক—“ওহে দ্বিজকুমার, দয়া করে তোমাকে আর চাতুরী ফসাতে হবে না বচনে। আমার চেয়েও তুমি বেহেট। আগল নেই তোমার মুখে। লাব বলতে হবে না। নীরস চেষ্টা। যেহাই দাও ব্রজকুমারকে। বলে বসলেন কিনা “রমার চেয়েও পরমা” বলিহারি তাঁর সঙ্গে উপমার বহর। এ তোমার হুঁকার অপরাহত অপরাধ।”

তুনে ব্রজরাজ বলে উঠলেন—“কোন দেশের এ পক্ষী? —মহাবিজ্ঞ তো? ব্রজরাজকে পূর্ববৃত্তান্ত জানিয়ে দিলেন ব্রজেশ্বরী।

৬৩। ব্রজরাজ তখন বললেন—“তাহলে ইনি কেন নিজের দেবীর গৌরবকে টেনে নামাচ্ছেন?”

মহারাজী বললেন—“রমা দেবতা, তাঁর সঙ্গে রাধার উপমা? অপরাধের আশঙ্কা রয়েছে তাই রাধার জন্তে বেচারীর অত ভয়-ভাবনা, অত মমতা, রাধাকেও আবার ভয় করেন তো। অনেক বুদ্ধি খরচ করে বলেছেন।”

৬৪। এদিকে অন্ন ঘরে ততক্ষণে মুখে কথা নেই, দুটি পরিবেশনকারিণী হেসেই কুটিপাটি। হান্তমুখী রাধা শেষে বললেন—“একজোড়া দ্বিজমার বাচালতার আমি যেন লতার ডোরে বাঁধা পড়ে গেছি। শুল্করী ভামা, তুমিই পরিবেশন কর তাই।”

পরিবেশনের ভার হত্যাশ হয়ে ছেড়ে দিলেন রাধা। এর পরে সত্যিই কিরে গিরে পরিবেশন করা অনন্তব্য ব্যাপার বুঝেই ব্রজেশ্বরী

তুণলেন প্রমাদ, অতএব নিজেই সেই ঘরে গিরে চুকলেন এক রাধাকে ঘরে নিয়ে এলেন পরিবেশন মাজল্যে।

৬৫। দুটি সখীই পুনর্বার রত হলেন পরিবেশনে। পূর্ব-ক্রমটিকে আক্রমণ করেই সে যেন এক পরাক্রম কলিরে আরম্ভ হল এই পরিবেশন। আনন্দ ঘরে না ব্রজরাণীর। যেন হল সন্তোষে অভিনন্দন জানিয়ে কিছু বললেন, কিন্তু মনে মনেই বললেন—“দ্বিজ-শিত্ত অতি স্তবে লজ্জাধ বাঁধা পড়েছিলেন, পরিবেশনে তাই এমন এই অনিয়ম। অম্বকের মেয়েই বটে। তা মেয়ে তুমি অম্বকের মেয়ে নও, বটু সত্যিই বলেছে তুমি বন্ধাকরেরই পুত্রী।”

কিন্তু মনের বলা এক আর মুখের বলা আর এক।

তাই মুখ দিয়ে কেবল বেরল—“বধাক্রমেই শুভবতীর পরিবেশন চলুক, কেমন?” আজ্ঞার বিজ্ঞা হলেন রাধা।

৬৬। এই রকমের সবস হান্ত পরিহাস ও পরিতোষের মধ্য দিয়ে ভোজন-পর্ষ এগিয়ে চলল। খেতে খেতে ব্রজরাজ আনন্দে হাসছেন...ইয়া বেঁধেছে বটে, পরিপাটি রান্না, পাকা হাত। অম্বমোদনের সে কী বটা। যেন ব্যজনগুলিতে আবির্ভূত হয়েছেন বড়রস। বলরাম প্রভৃতি সহচরদের ঐ একই দশা, সবাই তৃপ্ত। কিন্তু কেমন যেন উন্নয়ন হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব। তাঁর মনে হল—খাচ্ছেন তিনি এবং যে দেবী বেঁধেছেন তিনিই খাওয়াচ্ছেন অন্ন; অধচ সেই অল্পে যেন একটি ভাবের সৌরভ লেগেছে; ও-অন্তর থেকে এ-অন্তরের, এ-অন্তর থেকে ও-অন্তরের। বসান্তরের পথে তিনি যেন পৌঁছে গেছেন অতিরসঘে।

৬৭। ভোজন-পর্ষ সাজ হল নিমন্ত্রিত সকলকেই বরাধর, অন্ন কঞ্চনাদি ভূষণ, মালা, আলোপন, তাম্বুল, স্তম্ভিবাদ ইত্যাদিতে অর্চনা করে বিশ্রাম নিতে চললেন বুঝভাঙ্কু স্বয়ং। ভিতর বাড়ীতে তখন খেতে বসলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের দুটি জননী। গরীয়সী ও দয়াবতী দুটিকে পরিবেশন করে খাওয়াতে বসলেন বুঝভাঙ্কুস্তার। বাঁর যেটি ভাল লাগছে আনিয়ে দিচ্ছেন সেটি তাঁকে, সে এক নবীন আমোদের ধারা। বসাবাদে মুগ্ধ হয়ে দুটি জননী বলাবলি করতে লাগলেন—“বটুর মুক্তের বালাই নেই, কিন্তু তখন বা বলেছিল এখন দেখছি ঠিকই বলেছিল...এর পরে আর অস্ত্রের হাতের রান্না মুখে কচবে না বরশ্র।”

৬৮। তারপরে ব্রজেশ্বরী বললেন—“রাধিকা, তোমার কাজের ধারা বড় শুল্কর! তোমার হাতের রান্না না হলে এর পর দেখছি কারোর হাতের রান্না আর আমার মুখে কচবে না। আমার ছেলেটিরও না। তাই ভাবছি, আগে থেকেই তোমার গুরুজনদের এমন হিত-কথায় অম্ববোধ করব, বা অম্বমতির আভাস না পেলে এমন ভাবে সেটিকে রোধ করব, বাতে করে তুমি আমার ঘরে সৌখীন রাধুনী হয়ে আবির্ভাব হও, আমার হাতে নিত্যানুতন গয়নাগাটি পাও আমারও লাভ হয়, আর আমার কৃষ্ণও মজল হয়।”

৬৯। সেই শুনে রাধাজননী বলে উঠলেন—“ব্রজেশ্বরীর বুদ্ধি বটে! আমাদেরও বুদ্ধি খুলল। কথায় যেমন আলো তেমনি প্রেম রাধাকে তো বাড়াচ্ছেনই, বাঁরা দ্রীত করেন তাঁদেরও তুবছেন প্রত্যহই...সাত তাড়াতাড়ি গিরে ও বেঁধে দিয়ে আসবে, সত্যিই বাবে আপনার বাকী। আপনার প্রসাদেই তো ব্রজলোক আর লোকোত্তর, কালক্রমে তোকে কাঁপায় না, আপনিই আমাদের গতি

গুরুজনদের কাছে এই যে সম্মতি পাওয়া হল, সেই থেকে অস্ত গেল রাধার গমনাগমনের ভয় এবং প্রশান্ত হয়ে গেল...বা মন চায়, তা পাওয়ার পথ।

১০। এই ধরণেই, কিন্তু প্রকারান্তরে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোকুল-কুলললনাদের স্বন্দর-কারাগারের অভ্যন্তরে, স্বন্দর-চোরের মত দুর্দান্ত ভাবে বাঁধা পড়ে যেতে লাগলেন গোকুলচন্দ্র। স্বন্দরগুলিও বেশ প্রবল ভাবে ও দৃঢ়ভাবে অমুভব করতে লাগল কাঙ্ক্ষ-সান্নিধ্যের দিক-শোভনতা। কুল তোলায় নাম করে লতাকুঞ্জে ঘূষ-ঘূষ করার মাথ তাঁদের বেড়ে গেল। ঘোঁষনের সম্পত্তি দিলে, যে দেবতা মিলিয়ে দেন মনের মাহুঁষ, অজহীন সেই দেবতার মতই সেই কুঞ্জে যে বেড়িয়ে বেড়ায় তাঁদের স্বন্দরনাথ অঙ্গসঙ্গের চাহিদার সুরতম থাকতে পারে, কিন্তু কুলবাণ যে রেহাই দেয় না কাউকে...বিধবেই। ভাই মিলনের শিক্ষার নীচে...রসের প্রদীপ হতে চাইল সকলের মন। কুঁড়ি ছিল, কুন্ডল হয়ে ফুটল অমুবাণ, এক বছরের এই খেলার আকাশের মেঘ কি অস্ত নীল হয়?

এই খেলায় দোষে, যে সম্ভাবনা থাকতে পারে, ভাবতেও পারলেন না গুরুজনেরা। কারণ, যিনি বিশ্বস্বন্দররূপে চির-আগরুক হয়ে রয়েছেন স্বন্দরে, নিখিল ব্রহ্মজনের যিনি প্রেমাস্পদ, তিনিই যে তাঁদের অর্কতব প্রেমের আশ্রয়। আত্মসাধারণ্য উপাধিহীন, স্বাহুকুল দোষ-মুসন্ধানশূন্য অভিসরণ করতেন ললনারা, তখন তাঁদের প্রণয় চাপল্য আচ্ছন্ন হত না গুরুজনদের বাধার, সকল হয়ে উঠত তাঁদের মনোরম।

১১। এই নিত্যসিদ্ধাদের মধ্যে, এই লক্ষণীর চেয়েও প্রেমসী ও প্রেমসীদের মধ্যে যোগমায়া তাঁর নিজের মায়াহলের আত্মকুল্যে

সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন "উচ্যতি" অর্থাৎ 'আমরা পরকীয়া' এ ভাবনাটির এবং সেই ভাবনাটিকেই পূজা করতেন গোকুল কুলললনারা...উৎকর্ষা, ভয় প্রভৃতি প্রেমসঙ্কোচের নৈবেদ্য দিয়ে 'আমরাই গুরুজন' এই অভিমান করতেন যে সব গৌরবাবিভারা 'আমাদেরই পতি' এই অভিমান ছিল যে সব নারীদের সেই "যোগমায়ারই" কৃপায় তাঁদেরই তত্ত্ব-প্রতিচ্ছায়ার সৃষ্টি হয়ে গেল তাঁদেরি কান্তি-স্বরূপিণী অস্তা নারী এবং সেই মাটির নারীগণও বিবাহ করতে লাগলেন যে যার স্ব-স্ব গৃহে গৃহে। এর "যোগমায়ার" কৃপাতেই গুরুজনদের অবিসর হয়ে পড়িয়ে গেল কুল সঙ্গ তাঁদের নদী-সাগরের মত মিলন প্রসঙ্গ।

১২। এই বকমের একটি সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হলেও শ্রীনন্দ বশোদার মধ্যে কিন্তু উদ্ভিত হল এক অভিনব অমুভূতি। বাৎসল্যে লতার বাঁধনে তাঁরা বাঁধা। শিব-ব্রহ্মা-বন্দনীধ তাঁদের তনয় যে সময়ে কুন্ডলমণ্ডলের শরণ্যতার বশোধারী হয় মানব, পুত্রের সেই কৈশোর-কাল উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কিন্তু অমুভব করলে: কিশোর হয়নি তাঁদের পুত্র, এবং কমনীয়তার পৌগণ্ড ভয়ময় নিঃছেলের পৌগণ্ডও এখনও যায়নি ও সীত্র বাবে না। অস্তএব কমল নয়নাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন-প্রসঙ্গ সহসা সঙ্গোপনীয় না হলে তাঁদের উভয়ের কাছেই হয়ে রইল সম্ভাবনার অবিসর।

১৩। এমন কি, বহুমহিমের পরাক্রমেই গোকুলকুল ললনাদের উপর আপনা হতেই তাঁদের অভ্যস্ত হয়ে গেল...ব সবক; অসহ বোধ হল...স্বকলুতা। স্বভাব-শক্তির ব বিস্ময়কর তেলোবৈভব। [ক্রমশ:

ইতি নিমন্ত্রণ-স্বীকার-কৌতুকো নাম দশমঃ স্তবকঃ।

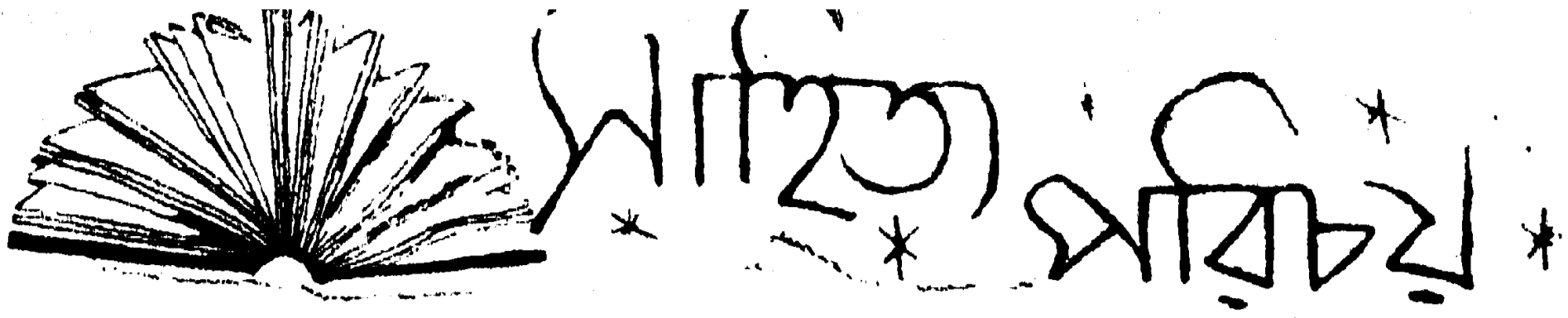
অবাস্তিত অতিথিকে এড়াতে চান ?

সম্ভবতঃ আপনি কখনও না কখনও অবাস্তিত অতিথি সমাগমের অস্বস্তি ভোগ করে থাকেন? এমন অবস্থায় পড়েন যখন ভয়ত বাঁচিয়ে গা-ঢাকা দেওয়ার উপায় অন্বেষণ করেন মনে মনে? আমাদের মধ্যে প্রায় সকলকেই এই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয় মাঝে মাঝেই। এই সমস্যা নতুন কিছু নয়, সপ্তদশ শতাব্দীর এক অনারী দার্শনিক এই প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান কথা বলে গেছেন বহুশূর্কেই, 'অনাতুত বাকব সময়াপহারী তত্ত্বর মাত্র।' এখন প্রশ্ন এই যে, এরূপ অবস্থাপন্ন মাছুষের কি করণীয়? ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বচন আছে 'Prevention is better than cure'. অর্থাৎ রোগ 'আরোগ্য করার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা অধিকতর কাম্য, সে হিসাবে অবাস্তিত অতিথির আগমন-সম্ভাবনা মাত্রই বর্জনীয়। সূচতুর সেক্রেটারী বা একান্ত সচিব নিয়োগ করে আপনি অস্ততঃ অকিনে এই 'অপ্রীতিকর পরিস্থিতের হাত থেকে মুক্ত হতে পারেন, এই কার্যে পুরুষ অপেক্ষা নারী আপনার পক্ষে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। কারণ একথা কি স্বতঃসিদ্ধ নয় যে, সময়োচিত মিথ্যা উদ্ভাবনে পুরুষ অপেক্ষা নারীজাতির মস্তিষ্ক অনেক বেশী উর্কর ?

অস্তএব একটি বুদ্ধিমতী মেয়েকে একান্ত সচিবরূপে বরণ করুন, তারপর প্রয়োজনমত তাঁকে শুধু বলে দিন যে, 'ভয়ে! আপনি অস্তব ভীতবীসম্পন্ন, আপনাকে আর বেশী কি কইব, শুধু দেখবেন বেন

কাজের মাঝে আমাকে কেউ না ছালায়।' অস্ত:পর অবাস্তিত ভী ঠেকিয়ে রাধার জন্ত এই সুশীলা ২য়ীটি যে সব উপায় অবলম্ব করবেন, তা জানতে পারলে আপনার নীতিবোধ কিঞ্চিৎ বিপর্য্য হবে বটে কিন্তু উদ্বেগ সাধিত হবে যথার্থই।

নির্কীক ভাবে গুনবেন আপনার প্রভুভক্ত সেক্রেটারী এ সহু:দ্রো কখনও মরণাপন্ন রুগী জানিয়ে আপনাকে নার্সিং হো পাঠাচ্ছেন, কখনও অকিনবোর্ডের অস্তরী মিটিং-এ বসাচ্ছেন অ কখনও বা আকস্মিক দুর্ঘটনাগ্রস্ত পত্নীর (আপনার স্ত্রী থাক না থাক) পাশে হাজির করে দিচ্ছেন। স্বকর্ণে গুনে এই স নির্জলা সত্যভাষণের প্রতিবাদমাত্র করতে পারবেন না আপনি কা তাতে ক্ষতি আপনারই। এসম্বন্ধে যদি কোন নাছোড়বান্দার হা হতে নিষ্কৃতি না পান সামনা-সামনি হতেই হয় তার সঙ্গে তখন দেখবেন বিপদে মনুদনের মতই আপনার সেক্রেটারী প্রবেশ করা অকুস্থলে, ব্যাকুল উদ্বেগ চোখে-মুখে ফুটিয়ে বখোচিত গাষ্ট্রীয় সহকা সে আপনাকে জানাবে, স্বয়ং বড়সাহেব বোর্ড মিটিং-এ আপন উপস্থিতি তলব করেছেন সেই মুহূর্তেই। ব্যস, আপনাকে পায় কে অবাস্তিত হস্তভাগ্যের চোখের সামনে দিয়েই হাওয়া হয়ে বাবে আপনি বহুক্ষে, তত্ত্বতানুচক করেকটি অর্ছোচ্চারিত অসমা কথার মধ্যেই।



উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

যোগজ্যেষ্ঠ

আলোচ্য উপন্যাসটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক রচনা। তারাশঙ্কর মহৎ শ্রদ্ধা, তাঁর সাহিত্যে তাই আমরা যিনি গভীর সম্পন্নকেই অমুভব করতে পারি নানা বৈচিত্র্যের মাঝে। বর্তমান গ্রন্থটিও সেই জীবনবোধেরই পরিচয়বাহী। ভূমিকার খক উল্লেখ করেছেন যে কিছুদিন হতেই সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যিনি মনে যে সংশয় জেগেছে—মামুষ কেন আসে এ পৃথিবীতে, যিনি মহাশক্তি এর—পেছনে আছে কি না, এই মর্মজিজ্ঞাসাই এই রচনার কারণ। তাঁর অন্তরের মর্মাত্মিক ব্যাকুল প্রার্থনারই স্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। তাঁর অন্তর্দর্শনে চ-বিক্ষত হয়েছে সুদর্শন আর তার জীবন-জিজ্ঞাসা হয়ে উঠেছে যথেষ্ট তীব্রতার দিনের পর দিন, কাসির মঞ্চে জীবনাবসানের মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সে প্রশ্ন করে গেছে “আমি কে, আমি কী, আমি ন” ? এই জিজ্ঞাসা চিরন্তন মানবের; উদ্দেশ্যহীন আদর্শহীন—ধুনিক মামুষের তো এটাই একমাত্র প্রশ্ন, জীবনবোধসম্পন্ন ধুনিক মামুষ সর্বক্ষণ এই প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে, স্তব্দবাদী এই জগতে ঈশ্বরবাদের স্থান নেই, অথচ সব সংশয়ক একদিন মামুষ মুক্তি পেয়েছিল শুধু এইটুকুরই জোরে। গলিত ঈশ্বরবাদ বর্তমান মেনে নিতে পারে না, আর দেহজন্মই যার আত্মার অশান্ত ক্রন্দনেরও অন্ত নেই। তারাশঙ্করের অনিন্দ্যমণী এই যুগবন্ধনাকেই অনবচ্ছিন্ন কুটিয়ে তুলেছে। হতাশা-সংশয়পীড়িত মানবাত্মার প্রতিবাদ স্বনিত হলেই আলোচ্য রচনার প্রতি ছন্দে, যে জিজ্ঞাসা, যে প্রতিবাদের উত্তর বর্তমান যিনি প্রত্যেকটি জীবনবোধসম্পন্ন মামুষই অধেষণ করে চলেছেন যথেষ্ট অক্লান্ত ভাবে।— গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা যথাযথ, প্রকাশক—বঙ্গী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ ২ গ্রামাচারণ মে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২—পাঁচ টাকা।

নির্বাসিতের আত্মকথা

আলোচ্য গ্রন্থখানি অগ্নিযুগের বিখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত একটি পুরানো বইয়ের আধুনিকতম সংস্করণ। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে একদিন যারা জীবন-মৃত্যুকে ধর ভৃত্যসম জান করতেন লেখক তাঁদেরই অন্ততম। সেদিনের আত্ম রূপকথার পর্যবেক্ষিত, ত্যাগ হৃৎস্বরের অগ্নিপত্রিকা হলেছিল সেদিন যাদের, তাঁদের কথা আজকের স্বাধীন ভারতের যিকেরা কতটুকুই বা মনে রেখেছেন ? তবু এ সত্য অনস্বীকার্য তাঁদের তুলে যাওয়া চলে না, তুলে যাওয়া অপরাধ। এই সত্যেরই যথেষ্ট বহন করে এনেছে বর্তমান গ্রন্থটি। লেখক বিখ্যাত বিপ্লবী বোম্বার সামলার স্বাক্ষরিত কারাবাসের দণ্ড নিয়ে

যান আন্দামানে, সেখানে যে দশ বৎসর তিনি অতিবাহিত করেন করেদীরূপে, তারই একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বিবৃত করেছেন তিনি আলোচ্য গ্রন্থে। লেখকের ভাষা বেগবান ও সরস, মর্মাত্মিক হৃৎস্বরের কথাকে তিনি যে ভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে অভিভূত হতে হয়, কোথাও এতটুকু হতাশার সুর নেই, নেই বেদনার কাঁহুনি গাইবার সামান্ততম প্রয়াস। যে নির্ভীক অনমনীয় মনোবল একদিন প্রেরণা যুগিয়েছিল বাঙ্গলার এই বীর সন্তানদের “কাসির মঞ্চে জীবনের জয়গান” গেয়ে যাওয়ার তারই সুরে অমুভবিত সমগ্র রচনাটি। বইটি এক কথায় অনবচ্ছিন্ন। আমরা পুস্তকটির সর্বাঙ্গীণ সাক্ষ্য কামনা করি। বইটির আঙ্গিক রুচিসঙ্গত। প্রকাশক—ভাষাশাস্ত্র পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—তিন টাকা।

অপরাহ্ন

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিমল কবির আধুনিকতম উপন্যাস “অপরাহ্ন”। আলোচ্য গ্রন্থখানিকে উপন্যাস না বলে উপন্যাসধর্মী বড় গল্প বলাই বোধ হয় সমুচিত, পাত্রপাত্রীদের আত্মকথার মাধ্যমে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে; তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ভঙ্গীতে চারটি মামুষের মনের বাত-প্রতিঘাতকে প্রকাশ করা হয়েছে। লেখক এই ধরনের লেখা লিখতে পারদর্শী, বর্তমান গ্রন্থেও তাঁর সেই পটুত্বের স্বাক্ষর রয়েছে, নরনারীর প্রেম যে শুধু বোবনেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, শুধু জৈবিক নিয়মেরই দাসত্ববাহী নয়, বোবনের অপরাহ্নে আগতা কমলা ও প্রৌঢ় অবিবাহিতের জীবনে এই প্রশ্নই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল একদিন, জীবন-গোধূলির এই শান্ত ও প্রসন্ন প্রেমকে গ্রহণ করতে পারল না কমলার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকর্তা, স্বীকৃতির বদলে বিস্তার দিয়ে তারা সরে গেল দূরে। স্বজন-পরিত্যক্ত কমলার জীবনে প্রেম এলো বিস্তারিত উপহারে ডালি সাজিয়ে; প্রেমের দানে কি পেলো আর কি পেলো না, এই আত্মজিজ্ঞাসায় অর্জুরিতা হল বয়স। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি পলে। নিপুণ কলমে লেখক কমলার অন্তর্দর্শনকে কুটিয়ে তুলেছেন। বইটি যে আমাদের আনন্দ দিয়েছে একথা আমরা অকুণ্ঠেই স্বীকার করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। প্রকাশক ডি, এম, লাইব্রেরী। ২৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা।

উত্তর পুরুষ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র আজ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাধিকারে, নতুন করে তাঁর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর সত্ত্বপ্রকাশিত একখানি বড় গল্প বা উপন্যাস। গ্রন্থের বিষয়বস্তু বর্তমান সমাজের একটি সমস্যা, পুত্রবতী নারীর পুনর্বিবাহ,

আজকাল বহু সংসারেই এই ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, আলোচ্য বইটির নায়িকা, স্বামীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এই ঘটনা তার পূর্বস্বামীর পিতামাতার মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে ও তাঁরা তাঁদের বংশধর বাচ্চুকে তার মার সম্পর্কচ্যুত করে মারুব করে তুলতে প্রয়াসী হন, নায়িকা ইভার মাতৃস্বপ্নকে ফেলে আসা সন্তানের মায়ার অস্থির হয়ে ওঠে বার বার। বার বারই সে ছুটে যায় বাচ্চুর ধোঁজে তার পূর্বস্বামীর গৃহে, এই টানাপোড়েন চলে বাচ্চুকে নিয়ে তার মা ও পিতামহের মাঝে অবশেষে বাচ্চুর বৃদ্ধ পিতামহর মৃত্যুর পর সে কেমন সহজে তার বংশের উত্তরাধিকার স্বীকার করে নেয় সেইটুকুর ইঙ্গিত দিয়েই উপভাসটি সমাপ্ত করা হয়েছে। এই সমসামূলক উপভাসটি নিপুণভাবে রেখায়িত হয়েছে বঙ্গবী কথাসিদ্ধীর কুশল কলমে, মাতার পুনর্বিবাহ সন্তানের জীবনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তার একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় বইটিতে, লেখকের ভাষা সহজ ও মনোরম, সাবলীল ভঙ্গিতে বলা গল্পটি পাঠকের ভাল লাগবে বলেই আমরা আশা করি। আজিক সাধারণ। প্রকাশক—ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬। মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

ঋণাঞ্জলি

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি ইংরাজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক জীনির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মূল গ্রন্থের সম্পূর্ণ বস বজায় রেখে এই অনুবাদটি আমাদের উপহার দিয়েছেন—যা অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুর্লভ বললেও অত্যাুক্ত করা হয় না। মূল গ্রন্থের রচয়িতা চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রু-এর নাম ভারতবাসী মাত্রই জ্ঞাত আছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এডুকেশনের মধ্যে মিলন সেতু নির্মাণে এই মহাপুরুষের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; ১৭৯৯-১৮০০-এর বরীজনাথ একদিন তাঁকে যে দীনবন্ধু নামে ভূষিত করেন অ্যাণ্ড্রু-এর জীবনে সেই নাম সফল ও সার্থক হয়ে ওঠে সম্পূর্ণরূপে। দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রু ছিলেন খৃষ্টীয় ধর্মবাহক, বীণথুর্টের জীবনবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে কাটিয়েছেন তিনি জীবন, আলোচ্য গ্রন্থে খৃষ্টের ধর্ম ও মানবিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁর মতে খৃষ্টের ধর্ম স্থান নেই কোন সঙ্গীতের কোন ধর্মীয় গণ্ডীর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মকে মিলিয়ে তবেই অ্যাণ্ড্রু উপলব্ধি করেন একদিন বীণথুর্টের সত্যধর্মকে সামগ্রিক ভাবে। তিনি বলেছেন, 'এই ভারতভূমিতে বসে যদি আমার পরমপ্রভু বীণকে প্রকৃত মানবপুত্ররূপে অন্তরে পেতে চাই তাহলে ভারতবাসীদের সঙ্গে এক-প্রাণ এক-আত্মা আমাকে হতে হবে, বিদেশী বলে দূরে থাকলে চলবে না।' এই সত্যকে অ্যাণ্ড্রু নিজের জীবনে কর্মের মাঝে উজ্জ্বল করে তুলেছেন, শুধু মাত্র উপলব্ধিগোচর করেই খেমে যাননি। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর এই জীবনবাদেরই পরিচায়ক। ভারতে তিনি যে হৃৎজন মহাপুরুষকে পথপ্রদর্শকরূপে বরণ করেন, তাঁদের একজন ১৭৯৯-১৮০০-এর বরীজনাথ অপর জন ১৮০০-এর গান্ধী। এই দুই অগম্যেণ্য মহামানবের জীবন ও ধর্মধারার খৃষ্টের সত্যধর্মকেই প্রতিকলিত হতে দেখেন অ্যাণ্ড্রু আর সকল সংসার সকল বিধার অবসান ঘটে তাঁর। ধর্ম যে কখনও ক্রম গণ্ডীর চেতন আকর্ষ থাকতে পারেনা এ সবচেয়ে নিঃসংশয়

হন তিনি। আপন জীবনের এই চরম উপলব্ধিকেই রূপ দিয়েছেন তিনি আলোচ্য গ্রন্থে, বীণথুর্টের প্রকৃত মহিমা যে দেশ কাল পাত্রের পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ নয়, এ কথাটাই এই বইয়ের মূল প্রতিপাত। নিজের বক্তব্যকে অসংশয়ে প্রকাশ করেছেন দীনবন্ধু, কোন দুর্বলতা কোন মোহ আচ্ছন্ন করতে পারেনি তাঁর সত্যদৃষ্টিকে, ধর্মের এক পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল ব্যাখ্যা করেছেন তিনি আলোচ্য গ্রন্থে। এই মহাপুরুষের জীবন-দর্শনকে উপলব্ধি করতে হলে বইটি অবগতপাঠ্য। আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। প্রকাশক রাইটার্স সিন্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ দাম—চার টাকা।

মহাশ্বেতা

অতুলনীয় অপরাধের কথাসাহিত্যিকের বিস্ময়কর সৃষ্টি "মহাশ্বেতা"। তারালক্ষ্যের লেখনী বহু বিস্ময় সৃষ্টি করেছে আজ অবধি তবু মনে হয়, সে সবই তাঁর এই নবতম সৃষ্টির পাশে ম্লান হয়ে পড়েছে। বর্তমান উপভাসের নায়িকা নীরার যে ছবি এঁকেছেন তিনি তা শুধু অনবদ্যই নয়, অভাবনীয়। অগ্নিসাধিকা এই নারী জীবনে কখনও অজ্ঞানের সঙ্গে আপোষ করেনি, পুরাণোক্ত মহাশ্বেতা-চরিত্রটির মতই তার চরিত্র তেজে তপস্রায় পরিভূত, যে তেজ জীবনের কঠোর পরীকার শাসনে ভেঙ্গে পড়েনি কোথাও এক মুহূর্তের জন্যও। চরম প্রয়োজনের দিনেও বলে উঠেছে সে আপন মহিমায় আপন সত্যে সমুজ্জ্বল হয়ে। অগ্নিসম্বা এই নারী ভালোবেসেছিল একদিন, অপর সব নারীবই মতন সমস্ত মন-প্রাণ উজাড় করে অথচ তার সেই একান্ত প্রিয়জনকে অপরাধী সন্দেহ করে বিচার করল বখন সে, তখন কোন স্তম্ভন্যদোষকেই প্রার্থনা দেয়নি সে। তার প্রেমকে ছাড়াতে দেয়নি কঠোর অকরণ জ্ঞান-নিষ্ঠার পথ মুহূর্তের তরেও। আবার বখন ব্যাল সে ফুল করেছে, অবিচার করেছে ভ্রম-সংশোধনের জন্ত তিলেক দ্বিধা করেনি। ছুটে গিয়েছে প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে, মার্জনা ভিক্ষা করে তার অনুগামিনী হয়েছে জীবনের সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা সব সুখ-সম্পদকে ঠেলে ফেলে দিয়ে অকাতরে। কোমলে কঠোরে-মেশা 'নীরা' চরিত্রটি অপরূপ বললেও অত্যাুক্ত করা হয় না, চিরবিবাহিনী মহাশ্বেতা জীবনব্যাপী ত্যাগ ও তপস্রায় পরিভূত হয়ে তবেই লাভ করেছিলেন তাঁর দায়িত্বকে একদিন, "মহাশ্বেতা"র নায়িকা নীরার লাভ করল তার দায়িত্বকে জীবনব্যাপী কঠোর সংগ্রামের পরই, দীপ্তিমতী এই মেয়ের অপরূপ জীবনালেখ্য সুন্দর পরিপত লেখনীতে রেখায়িত করেছেন তারালক্ষ্য। পড়তে পড়তে পাঠকের মন তুলিয়ে যায়, হারিয়ে যায় বিস্ময়বস্তুর মধ্যে সম্পূর্ণরূপেই। আমরা বইটিকে সাধর স্বাগত জানাচ্ছি। প্রচ্ছদ মনোরম, অপরাপর আজিকও ভাল। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

নবাবু

মুসলমান সাত্তালের এই উপভাসটি নবপ্রকাশিত নয়, এটি এই উপভাসের সত্ত্ব-প্রকাশিত শোভন ও সুন্দর দ্বিতীয় সংস্করণ 'নবাবু' পাঠে আমরা আনন্দিত হয়েছি, একথা অকুঠেই স্বীকা

বি। আশা করি, এই সুন্দর পুস্তকটির নব আবির্ভাবকে পাঠক-মাজ ও সাদর স্বীকৃতি দেবেন। উপভাস-বর্নিত চরিত্রগুলি বিশিষ্ট উজ্জ্বল। বিশেষতঃ ছবির চরিত্র এক কথার অপূর্ব, চারদিকের ব-কৃতি-স্বংসের মধ্যেও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে না, সে পথচলা ধামার। মুহূর্তের জন্তও, নতুন পৃথিবীর গৌরবময় পথচলার অঙ্গী হওয়ার আশা ও ভরসা-ভরা মনকে নবীন উৎসাহে ভরে নিয়ে পথ চলে সে চরিত্র পদক্ষেপে। ছবির চরিত্রটিই আলোচ্য বইখানির সব চেয়ে বড় পদ, লেখিকার ভাবাবীতি সহজ ও সরল রসোপোভোগের সহায়ক। আমরা গ্রন্থটির সাক্ষ্য কামনা করি। প্রকাশক নয়া প্রকাশ, ৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬, দাম সাত টাকা মাত্র।

Literatures in Modern Indian Languages

আলোচ্য পুস্তকটি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যের বয় যে বক্তৃতাদি প্রদত্ত হয়েছে তারই এক স্মৃষ্টি সংস্করণ। বিখ্যাত নীতিগণ পুস্তক ও আধুনিক এই উত্তরবিধ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক বন্ধে গবেষণামূলক যে সব সূচিস্থিত ভাষণ প্রচার করেছেন বেতার বিক্রেতার অধিকাংশই সংকলিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। ভারতীয় ধান প্রধান ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে একটি সুসম্পূর্ণ ধারণা পাওয়ার বইটির মধ্যে, এ জন্ত সাহিত্যাত্মবাহী ও সাহিত্যজীবী উত্তরবিধ ঠিকই সংকলনটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সবক্ষেত্র কয়েকটি সারগর্ভ রচনা এতে নি পাওয়ায়, গ্রন্থটিকে একটি প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ সংকলনের গৌরব ওয়া যায় স্বচ্ছন্দেই, সংকলনকারের স্বলিখিত সুন্দর ভূমিকাটি এর ঠিক এক আকর্ষণ, আমরা পুস্তকটি পাঠে পরিতৃপ্ত হয়েছি একথা হলেই বলতে পারি। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। Literatures in Modern Indian Languages, Edited by V. K. Lokak, The Publications Division Ministry of Information and Broadcasting Government of India, Delhi. Price Rs 2-50

প্রবাদ বচন

অভ্যন্তর সকল ভাষার মত বাঙ্গলা ভাষার অসংখ্য প্রবাদ বচন চলিত আছে, আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতাভ্যর সেই সব প্রবাদ বচনের বিদগ্ধ সংগ্রহ করে সুস্বচ্ছন্দে প্রকাশ করেছেন। প্রবাদ বচনের ব্যবহার বহুল প্রচারিত, পাঠক ও লেখক এই উত্তরবিধ সম্প্রদায়ই যে উত্তমানে পুস্তকটি সমাদরের সহিত গ্রহণ করবেন সে আশা আমরা অসংশয়েই পোষণ করি। কারণ ভাব প্রকাশকে জোড়ালো করার জন্ত

প্রবাদ বচন সর্বদাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রবাদ বচনগুলি বর্ণাঙ্কমিক শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজানো হওয়াতে প্রয়োজন মত সেগুলি খুঁজে নেওয়া সহজ হয়ে উঠেছে। আমরা বইটির সাক্ষ্য কামনা করি। বইটির অঙ্গসজ্জাও প্রশংসনীয়। লেখক—শ্রীগোপালদাস চৌধুরী ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

প্রতিবিম্ব

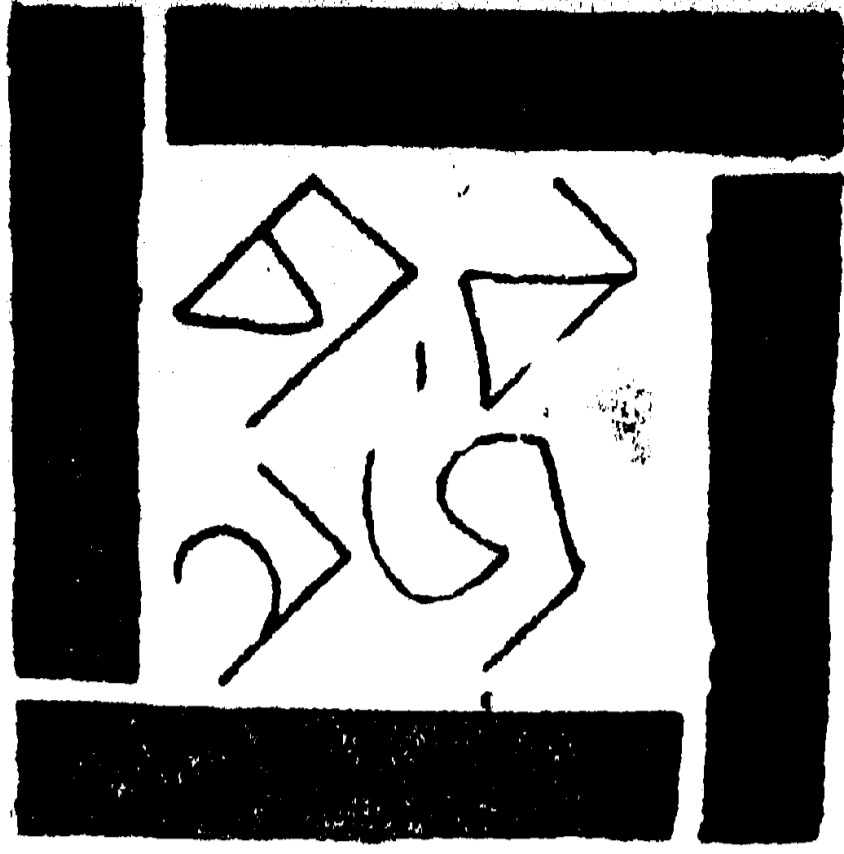
ছোট গল্পলেখক হিসাবে প্রভাত দেবসরকার সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁর অধুনাতম উপভাস 'প্রতিবিম্ব'র মূল গল্পাংশটি আত্মপ্রকাশ করেছিল 'দেশ' সাময়িকীর পাতায় ইতিপূর্বেই। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে তীর্থের আকর্ষণ বড় কম নয় তীর্থবাসী এক শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধার মাতৃস্বপ্নের অপরূপ আলেখ্য এঁকেছেন লেখক আলোচ্য উপভাসটিতে। পুত্রহারা বিনোদিনী তীর্থের পথে পা বাড়িয়েছিলেন একদিন তীর্থের মাটিতেই দেহরক্ষণ করবে, এই ছিল তার সুপ্তবাসনা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মাতৃস্বপ্ন কেঁদে উঠল অবলম্বনের জন্ত, মাটির ঠাকুর পাথরের গোপালের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল বস্তুমাংসের বন্ধন, অকালে কালাভরিত সন্তানের একমাত্র চিহ্ন বালক পৌত্রকে বুকে চেপে ধরে আপন ঘরেই ফিরে গেল সে। মাতৃস্বপ্নের এই স্বপ্নকে কুশল কলমে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে বয়সসংখ্যক চরিত্রগুলি সুন্দর ভাবে, পাণ্ডা পীতাম্বরের অর্ধলোলুপতার অন্তরালে লুকিয়েছিল যে মমতান্নিগ্ন হৃদয় তার আত্মপ্রকাশ ও মুক্ত করে মনকে। গ্রন্থখানি স্বল্প কলেবরের মধ্যেই সুসম্পূর্ণ ও জন্মগ্রহণী। প্রচ্ছদ ও অভ্যন্তর আজিক মোটাশুটি। আমরা পুস্তকটির সাক্ষ্য কামনা করি। পরিবেশক—ডি, হাজারা এণ্ড কোং। ১৩ নর্থ সেন স্ট্রীট। কলিকাতা-১২ দাম—দুই টাকা।

সঙ্গীতমুকুর (প্রথম খণ্ড)

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সঙ্ঘকে লিখিত আলোচ্য গ্রন্থখানি সঙ্গীতরসিক ও লিঙ্গার্থিগণের নিকট সমাদৃত হবে বলেই মনে হয়, লেখক স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী, সহজ সবল ভাষায় তিনি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কয়েকটি রাগ-রাগিণী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ও সেগুলির বাণীরূপ প্রকাশ করেছেন স্বরলিপি সমেত, ত্রিজ্ঞান শিকারী বিশেষভাবে উপকৃত হবেন পুস্তকটি পাঠে। আমরা গ্রন্থটির সাক্ষ্য কামনা করি। অঙ্গসজ্জা সাধারণ। লেখক—শ্রীসত্যবিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—২৫।ই বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, ভায়বাজার কলিকাতা-৪, মূল্য—দেড় টাকা মাত্র।

এ মাসের প্রচুদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে জনৈক বঙ্গললনার প্রতিকৃতির আলোকচিত্র মুদ্রিত হইতেছে। প্রচ্ছদশিল্পী শ্রী পি. সাহান।



ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার

(চিকিৎসক, সমাজসেবক কৃষ্ণীপুরুষ এম. বি. জে. পি]

রাষ্ট্রনৈতিক জীবনবাদ দিয়েও যে দেশ ও দেশের সেবা করা যায় তার পরিচয় পাওয়া যায় ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের জীবনে। আত্মবিশ্বাস, একনিষ্ঠতা ও সত্যতা থাকলে যে ক্ষুদ্রকেও বিশাল করা যায় বর্তমান জ্ঞানানাল মেডিক্যাল কলেজ তার সাক্ষ্য।

ডাঃ সরকার ঐ কলেজেরই অষ্টমতমিক সম্পাদক এবং কলেজ সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক হাঙ্গামাতালের সুপারিনটেনডেন্ট। আদি নিবাস বর্তমান জিলা হলেও ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ১৯০৬ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে হিন্দু স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে উক্ত কলেজ হতে আই, এস সি পাশ করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯২৯ সালে সসন্মানে এম, বি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে ডাঃ সরকার তদাঙ্গীন জ্ঞানানাল মেডিক্যাল স্কুল বর্তমান জ্ঞানানাল মেডিক্যাল কলেজে—প্যাথিওলজির শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। ১৯৪৮ সালে জ্ঞানানাল মেডিকেল স্কুল মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হলে ডাঃ সরকার ঐ কলেজের প্যাথিওলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে ডাঃ সরকার কলেজের অষ্টমতমিক সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। অতাবধি ডাঃ সরকার ঐ পদে বহাল আছেন।



ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার

বর্তমানে ডাঃ সরকার (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল ক্যাফাণ্ডী (২) পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল ক্যাফাণ্ডী (৩) পশ্চিম মেডিক্যাল কাউন্সিল (৪) পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিল এবং (৫) ট্রপিক্যাল পথিচিকিৎসক সমিতি সংস্থার সদস্য। ডাঃ সরকার একসময় কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলরও ছিলেন। ১৯ সালে ডাঃ সরকার জে, পি উপাধিতে ভূষিত হন। এ ছাড়া ডাঃ সরকার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, নীলবর্তন সরকার মেডিক্যাল কলেজ এবং কলিকাতা ডেন্টাল কলেজের ছাত্র ও নির্বাচক কমিটির সদস্য ছিলেন এবং আছেন। ডাঃ সরকার কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ৬মতমতম সরকারের এ সন্তান।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

[পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার]

ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার আগ্রহ ছিল এই মানুষটির মনে যা গেলে ছেলেবেলা থেকেই। সঙ্কল্পিত পথে এগিয়ে গেলে বিপুল প্রেরণা ও উৎসাহ দেন তাঁকে তাঁর পিতৃদেব। আগ্রহের অধ্যবসায়ের বন্ধন মিলন ঘটলো, প্রত্যাশিত সফলতা তখন বেন হাজির হলো আপনি। পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশনের বর্তমান ইঞ্জিনিয়ার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এদিক থেকে সত্যি একজন স ও সফলকাম পুরুষ।

শ্রীরায়ের পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকা জেলার দোহার গ্রামে তাঁর বাবা রায় সাহেব দেবেন্দ্রকুমার রায় ছিলেন রংপুর সহ নর্মাল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট। এই সহরেই রমেশচন্দ্রের জন্ম বাৎ ১৩১১ সালে। অল্পদিন মধ্যে রায় সাহেব দেবেন্দ্রকুমার ঢাকা নর্মাল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে বদলী হয়ে আ হন। তাই পুত্র রমেশচন্দ্রের পড়াশুনার ব্যবস্থাও হয় রং পরিবারে, ঢাকাতেই। একদিকে তাঁর পিতৃদেব যেমন ছিলেন বি শিক্ষাহুরাগী, অপরদিকে মা (৬হেমন্তকুমারী দেবী) ছিলেন এ ধর্মপরায়ণা নারী। ছেলের জীবনের ওপর বাপ-মায়ের চারি প্রভাব পড়ে থাকবে অনেকখানি, সেটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

১৯২১ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে শ্রীরায়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৎপরে ১৯২৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস-সিতে (পাণকোস) প্রথম স্থান অর্জ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যাবেন বলে তাঁর মন ব্যাকুলতা অ করছিল কতকাল থেকেই—একশে সত্যি সত্যি সে দিকে হ ছাড়পত্র তিনি পেলেন। কলিকাতায় এসে শিবপুর ইঞ্জিনি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হতে আর দেরী করলেন মনোমত বিষয় পড়বার সুযোগ পাওয়ার তিনি অসীম উৎসাহ করতে থাকেন। কলেজে বৃত্তি লাভ করলেন এবং বি-ই (কাই) পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রমাণ তুলে ধরলেন আপন যোগ্যতার।

তারপরই শুরু হয় শ্রীরায়ের কর্মজীবনের গৌরবমণ্ডিত অ বি-ই পোশ করার সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ছাঁট বৃত্তি পান এবং এই পর পর রেলওয়ে এবং পিওর্ভিউ ডি'তে আবর্তক ট্রেনিং করেন। তাঁর সর্বাঙ্গীন কাজ নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি



শ্রী রমেশচন্দ্র রায়

ইঞ্জিনীয়ার রূপে সেখানে তিনি রেখেছেন তাঁর দক্ষতার প্রাথমিক স্বাক্ষর। ১৯৩২ সালে তিনি সরকারী চাকরিতে যোগ দেন এবং সহকারী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, তিনি কখনও কাজ করেন নয়মনসিংহে, কখনও কলকাতায় আবার কখনও বা আলিপুরছায়ায়। দশটি বছর এমনি কর্মস্থলীর ভিতর দিয়ে তাঁর চলে যায়। তৎপর ১৯৪২ সালে তিনি সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে ডেপুটেশনে যান এবং একত্রিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের পদে উন্নীত হন। ১৯৪৬ সালে আবার ফিরে আসেন তিনি তৎকালীন বাংলা সরকারের ওয়ার্কস এণ্ড বিল্ডিংস বিভাগে। ছ'বছর বাদে জাতীয় সরকারের নামে তিনি সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের সমধিক স্বাধিপূর্ণ পদ লাভ করেন। এই সময় থেকে তিনি রাজ্যের সড়ক উন্নয়নের কাজে ব্যাপ্ত থাকেন নিবিড়ভাবে। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লাভ করেন সরকারী সড়ক উন্নয়ন ডাইরেক্টরেটের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সম্মানিত পদ। সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন তিনি বর্তমান বর্ষের জানুয়ারী মাসে। কিন্তু তাঁর আগ্রহ ও কর্মক্ষমতা সর্বত্র স্বীকৃতি পাওয়ার অল্পদিন মধ্যেই তাকে পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত করা হয়। আজও বখেট সম্মানের সঙ্গে তিনি এই বিস্তৃত আঙ্গনটি অধিকার করে আছেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ইঞ্জিনীয়াররূপে রমেশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ কারকী বা পরামর্শে বহু গঠনমূলক কাজ হয়েছে এবাবত। সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে ডেপুটেশনে তিনি যখন গেলেন, সে সময় দেশে সাতটি বিমানঘাটি নির্মিত হয়—বার পিছনেই কর্মী পুরুষের শ্রম রয়েছে বিপুল। পরবর্তী দিনগুলোতে শ্রীয়ার সড়ক বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপন যোগ্যতার প্রমাণ তুলে দেন জাতির সম্মুখে। দেশ বিভাগের দুই স্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সড়ক ছিল মোট ১১০০ মাইল। এক্ষণে এই খণ্ডিত রাজ্যেই ৩০ মাইল যোগে সাত হাজার মাইলের ওপর এক অধিকাংশই সুন্দর ঢালা কিংবা সিমেন্ট কংক্রিটের পথ। রাজ্যের নদী-নালাগুলোর পিছনে সড়ক বহু সেতু তৈরী হয়েছে স্বাধীনতার পর এই ১৯৫৩

বছর মধ্যে। এ সকল জাতীয় উত্তম ও প্রচেষ্টার অনেক ক্ষেত্রেই শ্রীয়ারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। এক্ষণে রাজ্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের দায়িত্ব নিয়ে যখন আছেন, সে সময়ও তাঁর সামনে রয়েছে দুটি বৃহৎ সড়ক নির্মাণ পরিকল্পনা—কলকাতা-হুগলীপুর এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ ও কলকাতা-নয়দম সুপার হাইওয়ে নির্মাণ পরিকল্পনা। আলোচ্য পরিকল্পনা দুটিকে রূপদানের জন্তে তিনি সজাগ ও তৎপর রয়েছেন সর্বক্ষণ এবং তাঁর এই স্বপ্ন ও প্রয়াসও সফল হবে, এরূপ আশা নিশ্চয়ই পোষণ করা যায়।

ডাঃ শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জী

[চিকিৎসা জগতে বাংলার মহিলা এম, এম]

“বিজ্ঞা বিনয়ঃ দক্ষতি” চিরসত্য কথাটির প্রমাণ পাওয়া গেল

ডাঃ শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জীর সাক্ষাতে। রাত সাড়ে নটার বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়তেই হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন ডাক্তারী বিজ্ঞায় কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা মাষ্টার অব সার্জারী ডাঃ শ্রীমতী অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। বাংলা দেশে আজ পর্যন্ত আর কোন মেয়ের পক্ষেই সে ডিগ্রি নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে নাই। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য পূর্ন হতেই একটু আভাস দিয়েছিলাম বলে দ্বিতীয়বার আর কুম্ভকার দরকার হয় নাই। হাস্যোজ্জ্বল মুখে একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চললেন শ্রীমতী মুখার্জী। প্রশ্ন করতে দেবি হলেও উত্তর পেতে দেবি হয় নাই।

শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জী ১৯১৮ সালে কলিকাতায় এক ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার পঞ্চম সন্তানের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মুখার্জী। পিতা কামলকুমার মুখোপাধ্যায়কে কর্মব্যপদেশে সর্বদাই হানাস্তবিত হতে হতো। বাল্যের শিক্ষা তাকে ঘরে বসেই সম্পন্ন করতে হয়। অবশেষে ১৯৩৪ সালের কলিকাতার ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাশে ভর্তি হয়ে ১৯৩৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৭ সালে আন্তোভ কলেজ হতে আই, এম, সি পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৪৩ সালে এম, বি ডিগ্রি লাভ করেন। এম, বি ডিগ্রি লাভ করার পর



ডাঃ শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জী

শ্রীমতী মুখার্জী সার্বভৌম সর্বোচ্চ ডিগ্রি এম, এস এর জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন এবং ১৯৫৪ সালে এম, এস পাশ করিয়া মাস্টার অব সার্বভৌম উপাধি লাভ করেন।

১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে কলকাতা প্রানে প্রাথমিক সার্বভৌম উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীমতী মুখার্জী ইংল্যান্ডে গমন করেন এবং তথায় একবৎসর বিভিন্ন হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে দেশে ফিরে আসেন। শ্রীমতী মুখার্জী ব্রিটিশ এসোসিয়েশন অব প্রাথমিক সার্বভৌমের এসোসিয়েটেড সদস্য। বর্তমানে শ্রীমতী মুখার্জী মেডিক্যাল কলেজে সিনিয়র ডিগ্রি সার্বভৌম পিডিবিএফিকস এবং সার্বভৌম ইন্টার প্রাথমিক সার্বভৌম ইউনিট পদে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীমতী মুখার্জীর মা ও তিনটি ভাই বর্তমান। ভাইয়েরা সবাই কৃষী। ডাক্তার হওয়ার পিছনে কাহারও কোন অনুপ্রেরণা আছে কিনা প্রশ্ন করলে তিনি জানান যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পটভূমিকা না থাকলেও কাহার মা এবং মায়ের খুড়ো মশাই ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের আগ্রহ এবং আশীর্বাদ তাঁহাকে এ বিষয়ে যে বিশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী মুখার্জী আজ পর্যন্ত অবিবাহিতা। একমাত্র ইংরেজী নভেল পড়া ছাড়া কাহার অন্য কোন ব্যক্তিগত সখ নেই।

ডাঃ কনকচন্দ্র সার্বভৌম

[মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও হাসপাতাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট]

বাংলাদেশের বহু বিস্তৃত সার্বভৌম পরিবারের সুনাম, স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। সেই ঐতিহ্যেরই একটি উজ্জলবিকাশ প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ কনকচন্দ্র সার্বভৌম। জীবনে স্বপ্ন দেখাটাই এই মানুষটির কাছে বড় নয়, স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণেরই মূল্য দিয়ে এসেছেন তিনি বরাবর। এ বাবত সাক্ষ্য তাঁর জুটেছে প্রতিটি ধাপেই—আপন বোগ্যতাবলেই আজ তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও



ডাঃ কনকচন্দ্র সার্বভৌম

সুপারিন্টেন্ডেন্টের দায়িত্বভার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সার্বভৌমের আনহার্ট স্ট্রীট (কলকাতা) প্রাচীন ভবনে কনকচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯১০ সালের ১২ই অক্টোবর। খনামত সার্বভৌম স্বর্গত কর্ণেল সুরেশচন্দ্র সার্বভৌম সার্বভৌমের তিন প্রথম সন্তান ও একমাত্র পুত্র। এদেশের জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে কর্ণেল সার্বভৌমের অবদান সর্বজনবিদিত। বেঙ্গল এডুকেশনাল কোর্স কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পদাভিক বাহিনীর তিনিই উদ্ভোক্তা। আর জি, কব মেডিক্যাল কলেজেরও (তখনকার কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজ) তিনি অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মী। এদেশে তিনিই হলেন প্রথম সুযোগ্য ডাক্তার যিনি স্বতন্ত্রভাবে শল্য চিকিৎসাতেই নিজকে একজন বিশেষজ্ঞ করে তোলেন। সেদিনে ইংরেজ আই-এম-এসদের সঙ্গে সর্বভাবে টেকা দিয়ে ভারতী ডাক্তারগণের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁরই ছিল অগ্র ভূমিকা। কনকচন্দ্রের পূজ্যপাদ পিতামহ রায় বাহাদুর ত্রিগেভিয়ার সার্বভৌম স্বর্ধাকুমার সার্বভৌম ছিলেন একজন নিতান্ত ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ। রায় বাহাদুর স্বর্ধাকুমার আগে আর কোন বাঙালীই ত্রিগেভিয়ার সার্বভৌমের দায়িত্বশীল আ পাননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবী উপাচার্য পরলোক সাহেব দেবপ্রসাদ সার্বভৌম ছিলেন কনকচন্দ্রের প্রকৃত জ্যেষ্ঠতাতাল্য বাল্য বয়সে পিতৃহারা কনকচন্দ্র এই পুত্রচরিত্র পুরুষের সঙ্গাগ দূর প্রত্যক্ষ অনুশাসনে থেকেই বড় হবার পথ খুঁজে পান।

ডাঃ সার্বভৌমের ছাত্রজীবন ধাপে ধাপে সাক্ষ্য অর্জনের নিদর্শন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৬ সাল—এই বছর ইনি পড়াশুনো করেন কলকাতার হেয়ার স্কুলে। ১৯ সালে তিনি কৃতিত্ব সহকারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এ থেকেই। হেয়ার স্কুলে পড়বার সময়ই তিনি 'সব দিক থেকে ছেলের জন্মে নির্ভারিত স্বর্ণপদক পান। আই-এম-সি পরীক্ষা করেন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আর সেটি ১৯২৮ সালে কনকচন্দ্র ডাক্তারী লাইনে বাবেন, এ বছর আগে থেকেই নির্ভারিত ছিল এবং সেভাবেই চলেছিল তাঁর জীবন সংগঠন। দেখা গেলো আই-এম-সি পাশ করার পরই তিনি ভর্তি হয়ে যেন আর, জি, কব মেডিক্যাল কলেজে (তৎকালীন কারমাই মেডিক্যাল কলেজ)। শুধু ভর্তি হওয়াই নয়, সেখানে প্র পরীক্ষাতেই বিশিষ্টতার ছাপ রেখে চলেন তিনি। ১৯৩৪ এম, বি কাইডাল পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন এবং কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক ও অনার্স সার্টিফিকেট পান।

ডাঃ সার্বভৌমের সাক্ষ্যময় কর্ম-জীবনের সঙ্কলিত প্রস্ততি এইখানেই ঠিক শেষ হয়ে গেল না। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৭ অবধি তিনি হাউস সার্বভৌম (শিক্ষানবীশ) আর মেডিক্যাল হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। কিন্তু সার্বভৌম শল্য চিকিৎসাতন্ত্রে উচ্চ শিক্ষালভের জন্মে তাঁর মন বিশেষ হয়ে ওঠে। ইত্যবসরে তিনি চলে যান ইংল্যান্ডে এবং মিড হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সরাসরি চুকে 'আউট উত্তম ও অধ্যবসার গুণে প্রাথমিক এক-আর-সি-এস ডিগ্রি করে বলেন অজদিন মঘোই (১৯৩৯ সাল)। এর প বাবলোনিও হাসপাতাল (লন্ডন) ও রয়েল ইনকারমারি (এডিংবুর্গ)

—এই দুটি শিক্ষা-সংস্থার তিনি সার্জারী বিষয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করেন।
গাপন নিষ্ঠা ও শ্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি পেয়ে যান হাতে হাতে—
১৯০ সালেই এডিনবরা এক-আর-সি-এস ও লণ্ডন এক-আর-সি-এস
পরীক্ষায় সকলকাম হন এবং গৌরব বর্ধিত করেন পরিবার ও
মাতুলের। সার্জারীতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির দাবী থেকে তিনি
দার্বাণী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি বহু দেশের বহু হাসপাতাল ঘুরে
দেখেছেন সেইদিনে।

বিলেত থেকে দেশে ফিরে (১৯০০) ডাঃ কনকচন্দ্র আবার
যোগদান করেন আর, জি, কব হাসপাতালেই, তবে এবারে
পার্শ্বিক্যাল বিভাগে ভিজিটিং সার্জনরূপে। ১৯০৬ সালে এই
হাসপাতালে তাঁরই উত্তোগে একটি অর্থোপেডিক (বিকলাঙ্গ ও অস্থি
চিকিৎসা) বিভাগ খোলা হয় আর তিনিই নিযুক্ত হন এই নতুন
বিভাগের প্রধান। এই সময় থেকেই চিকিৎসার এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে
বিশেষজ্ঞ হবার জন্মে মনে তাঁর সঙ্কল্প প্রবল হয়। সেই সঙ্কল্প বাস্তবে
রূপায়িত হ'তে বিলম্ব হয় না, সে প্রমাণ বিশেষ ভাবে আজ সকলের
চাখের সামনেই।

অর্থোপেডিক বিভাগের দায়িত্ব ছাড়াও ডাঃ সর্কাধিকারী আর, জি,
কব হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯১১
সালে। এই পদ অলঙ্কৃত করে থাকেন তিনি ক্রমাগত প্রায় তিন
বছর অর্থাৎ ১৯৫২ সাল অবধি। ইতোমধ্যে পাবলিক সার্ভিস
কমিশনের নির্বাচন অনুসারে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের
অর্থোপেডিক সার্জারীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মেডিক্যাল কলেজের
সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সম্পর্কের প্রথম সূত্রপাত কিছ এইখানেই। তিনি

শেঠ মুখলাল কারনানী হাসপাতালের সঙ্গত সঙ্গীত করেছেন ভিজিটিং
অর্থোপেডিক সার্জনরূপে। বিকলাঙ্গ চিকিৎসার এই বিশেষ
দিকটিতে বিপুল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হওয়ার পরে তিনি
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোপেডিক বিভাগের (স্নাতকোত্তর)
অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। গত ১লা জুলাই মেডিক্যাল কলেজ
ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও সুপারিনটেন্ডেন্টের গৌরবময় আসন তিনি
লাভ করেছেন—এ নিঃসন্দেহে তাঁর বিশেষ যোগ্যতা, ব্যক্তিগত ও
সংগঠনশক্তির স্বীকৃতি।

জনকল্যাণ ও সমাজসেবার অস্তিত্ব দিকেও ডাঃ কনকচন্দ্রকে বঞ্চিত
উৎসাহী দেখতে পাওয়া যায়। রাজা রামমোহনের জন্মস্থান,
সর্কাধিকারীদের আদি নিবাস হুগলী জেলার রাধানগরে বে পল্লী
উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে, এর সঙ্গে তিনি বহু বছর ধরে নানাতাবে
সংশ্লিষ্ট। কলকাতা রোটারী ক্লাবের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সংযোগ
রয়েছে ১৯৫১ সাল থেকে। এই ক্লাবের উত্তোগে বিকলাঙ্গ শিশুদের
চিকিৎসার জন্মে টেম্পল স্ট্রীটে বে হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, এর
প্রাথমিক ব্যবস্থাপনার ডাঃ সর্কাধিকারীর অবদান কম নয়।
ঝামাপুকুর লেনে (কলকাতা) বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্মে হেল্প
সেন্টার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁকে নিতান্ত
উত্তোগী দেখা গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন
প্রাক্তন ফেলো। আজ ডাঃ কনকচন্দ্র যে সম্মানের
আসন অলঙ্কৃত করেছেন, তা বহন করে আনবে তাঁর
জন্মে আরও নতুন মর্যাদা, এ আশা ও দাবী রাখা চলে
সহজেই।

আছো কি হেথায় কেহ

(Walter de la Mare রচিত The Listeners-এর অনুবাদ)

'আছো কি হেথায় কেহ?' শুধালো পখিক
চাঁদের আলোতে ছুয়াবে হানিয়া কর,
অথ তাহার তৃণ-আহরণে রত
শুধু কাননে তুলিল বে মর্শ্বর।

গম্বুজ হতে মাথার উপরে উড়ে গেল কোন পাখী?
পুনঃ কর হানি 'আছো কি হেথায় কেহ?' পখিক কহিল ডাকি
কাককাজ করা জানালার কাঁকে কেহ তো দিল না দেখা;
বাহিরে যেথায় পখিক দাঁড়িয়ে নীরবে আছিল এক।
ধূসর তাহার নয়ন-দৃষ্টিতে প্রেম রহিল অঁকা।

অশরীরী বারা সেই গৃহবাসী, উঠিল চমকি সবে,
ভাবে নাই তা'রা মরজগতের কেহ আসি কথা কবে।
চাঁদবরা রাতে অসীম আঁধার হলের প্রান্তে আসি
শিহরি শুনি, পখিক কণ্ঠে নীরবতা গেল নাপি,
সচকিত হয়ে নির্জন রাত চুপিচুপি উঠে হাসি।

এতক্ষণে বুঝি পখিক বুঝিল ভিতরে রয়েছে কারা,
ইন্দ্রিয়াতীত কোনো অনুভূতি বলে—তাই বুঝি তারা
শুধু এমন তর, বাববার ডাকে কথা নাহি বলে।
আস্থানে তার আশছায়া রাতে বাহু কাঁপে ধরধর,
তারকা খচিত পর্ণছায়ার রচিত বে অশ্রু—
তারি ভলে থাকি অথ তাহার তোলে একা মর্শ্বর।

সহসা আবার করহানি ঘারে অধিক উচ্চস্বরে—
মস্তক তুলি উচ্চনয়নে কহিল পখিক শোনো—

'বোলো তাহাদের বোলো,
আমি এসেছি, সাজা তবু পাই নাই
প্রতিক্রিয়া আমি যেখেছি আমারি জেনো।'
একাকী কেবল ছায়ামুগতির নীরব প্রাসাদ বাবে
কথাগুলি তার প্রতিফলি হয়ে একেলা একেলা বাজে।
অশরীরী শ্রোতা শুনিল সকলি রহিল অচঞ্চল,
অথের পদাঘাতে বনপথ হয়ে উঠে উচ্চল;
ক্রমে ক্রমে সেই শব্দ দিলালো, গেল চলি বহুদূরে,
ধীরে ধীরে পুনঃ সেই জগতের শান্তি আসিল কিরে।

অনুবাদিকা—পূর্ববী ঘোষ



শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পাওয়ার্সের বিচার—

সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বোচ্চ সামরিক আদালতের বিচারে (Military Collegium of the Supreme Court of the U. S. S. R) মার্কিন ইউ—২ গোয়েন্দা বিমানের চালক ক্যাপ্টেন গ্যারী পাওয়ার্স দশবৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বিচারের তৃতীয় দিবসে প্রেসিকিউটর জেনারেল রোমান রুদেনকো তাঁহার উপসংহার বক্তৃতায় বলেন যে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবহাওয়ার পরিবর্তিত পাওয়ার্সের মত ব্যক্তি কোন দ্বিধা না করিয়াই পরমাণু বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা বর্ষণ করিতে পারিত; তিনি তাহাকে কঠোর দণ্ড দিবার দাবী করেন। তিনি বলেন, পাওয়ার্স যে অপরাধ করিয়াছে তাহার জন্য সে যত্নদণ্ড পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু সে আন্তর্জাতিক অনুশোচনা প্রকাশ করার তিনি তাহাকে ১৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার দাবী পেশ করেন। পাওয়ার্সের পক্ষে রুশ কৌশিলী গ্রিনেভের (Grenyev) সমস্তাটা বড় সহজ ছিল না। অসামান্য অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, অপরাধও অত্যন্ত গুরুতর। সোভিয়েট রাশিয়ার আইন অনুযায়ী তিনি অপরাধীর পক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকারও করিতে পারেন না। কিন্তু গ্রিনেভ একজন দক্ষ কৌশিলী। মুয়েনবুর্গের বিচারে তিনি জাৰ্মান যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। পাওয়ার্সের কৌশিলী হিসাবেও তিনি বিশ্বের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। অপরাধী পাওয়ার্সকে প্রেরণ করিবার সময় এবং তাঁহার উপসংহার বক্তৃতায় মানবীর দিকটাই তিনি বিশেষভাবে আদালতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন প্রেরণে পাওয়ার্সের জীবনের যে-সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে সে-গুলি শুধু উল্লেখযোগ্যই নয় রাশিয়ার জনগণের মধ্যে উহা সাদা জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ। গ্রিনেভ পাওয়ার্সের পিতামাতা, তাহার পিতার ব্যবসা, পরিবারবর্গ ইত্যাদি সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহার উত্তরে জানা যায়, তাহার পিতার জুতো তৈয়ারীর ব্যবসা ছিল এবং তাহার মাতা গৃহকর্ম করিতেন। তাহার পিতা বহু বৎসর কয়লায় খনিতে কাজ করিয়াছেন। একটি দুর্ঘটনার কালে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, তিনি অল্পের জন্য বাঁচিয়া যান। একটি প্রেরণের উত্তরে পাওয়ার্স বলে যে, সে শ্রমিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

তাঁহার পিতার কিছু জমি আছে বটে, কিন্তু এই জমির উপর হয় তাহা বাজারে বিক্রয় করা হয় না। গ্রিনেভের প্রশ্ন হইতে আরও যে সকল তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা হইতে আরও জানা যায়, তাহার পিতার জুতা তৈরী করার কোন মাইনে করা শ্রমিক নাই। পাওয়ার্স তাঁহার পিতা অনেক কাজে সাহায্য করিতেন। কিরণ পরিবেশের মধ্যে পাওয়ার্স বর্ধিত হইয়াছে তাহা প্রমাণের জন্য কয়েকখানি কটোও গ্রিনেভ কোর্টে দাখিল করেন। পাওয়ার্সের পিতার সম্মান-সম্মতি সম্পর্কে-সকল প্রশ্ন করা হয় তাহার উত্তরে প্রকাশ, তাহার কোন ভাই নাই তাহার পাঁচটি ভগিনী আছে। একজন জুতা প্রস্তুতকারক সহিত তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় ভগিনীর স্বামী ইলেকট্রিক কিটারের কাজ করে। তাহার তৃতীয় ভগিনী একজন প্রাক্তন শিক্ষককে বিবাহ করিয়াছেন—তাহার স্বামী এখন একজন ডাকপিয়ন। তাহার এক ভগিনীর বিবাহ এখনও বাকী আছে পাওয়ার্সের শিক্ষার জন্য তাহার পিতামাতাকে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে সে প্রাজুয়েট এবং জীব বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান তাহার প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। তাহার শিক্ষার জন্য পরিবারের যে ব্যয় হইয়াছে তাহা লাঘব করিবার জন্য অবসর সময়ে তাহাকে খাটিতে হইত। পাওয়ার্স কেন পাইলট কাজ গ্রহণ করিলেন তাহার কাহিনীও তিনি বিবৃত করেন, গ্রিনেভ তাঁহার উপসংহার বক্তৃতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলেন যে, ব্যাপক বেকা সমস্যার জন্যই পাওয়ার্স সামরিক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তিনি বলেন যে, রাজনীতির প্রতি পাওয়ার্স কোন আগ্রহ নাই। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যও তিনি নহেন কোন নির্কীচনে সে কোনদিন ভোট দেন নাই। গ্রিনেভ তাহা বক্তৃতায় মার্কিন জীবন যাত্রার বিরুদ্ধে প্রবল ভাবে আক্রমণ করেন উল্লেখের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, উল্লেখ হইতে পীড়িত শয়তান। অর্থ অন্তলম্পর্শী সাগর। সম্মান, সত্য সবই এ অন্তলম্পর্শী সাগরে নিমজ্জিত হয়। পাওয়ার্স অবশ্য বলিয়াছেন যে তিনি অর্থ চাহেন ভাল ভাবে জীবনযাপনের জন্য, ভাল গৃহ নির্মাণে জন্য এবং ব্যবসা করিবার জন্য।

প্রেসিকিউটর জেনারেল রোমান রুদেনকো পাওয়ার্সের গুরুতর অপরাধের কথা যেমন বলিয়াছেন তেমনি কঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন মার্কিন রাজনীতিকেরা। শীর্ষ সম্মেলন বার্ষিক হওয়ার জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এ বিচারের সময় শুধু পাওয়ার্সের অপরাধই উদ্ঘাটিত হয় না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীর গুরুতর অপরাধজনক আক্রমণাত্মক কার্যাবলীও উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আক্রমণাত্মক গোয়েন্দাপ্রতির সহিত সংযুক্ত থাকার জন্য তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান ও নরওয়েকেও দায়ী করেন। পশ্চিম জাৰ্মানীর চ্যান্সেলার এডেলহুইসকে তিনি হিটলারের আনুগামী বলিয়া অভিহিত করেন তিনি বলেন যে, পাওয়ার্সের শাস্তি শুধু তাহার পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ ন আক্রমণাত্মক শক্তি সহিত শান্তির শক্তির সংগ্রামেও উহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। পাওয়ার্সের কৌশিলী গ্রিনেভ মার্কিন জীবন যাত্রার বিরুদ্ধে আক্রমণ করিয়া যে অবস্থার মধ্যে পাওয়ার্স অপরাধের অস্থান করিয়াছেন সে-সম্পর্কে বিচারপতিকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। সকলভাবে এবং আন্তর্জাতিক সর্বি



বীজ থেকে বৃক্ষ...

ছোট একটি বীজ মাটিতে পোতা হলো। তারপর মাটির রসে আর আলো জলে পুষ্ট হয়ে ঐ বীজই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলো এক বিরাট বৃক্ষের রূপ নিয়ে। শাখায় পাতায় ফুলে ফলে কোথায় যেন হারিয়ে গেল সেদিনের সেই ছোট বীজটি।...

ঐ যে মাঠের কাদা-জলে রোদুর মাথায় করে চাষি ধান বুনাচ্ছে, একদিন ঐ ছোট ধানের চারাও কিন্তু এমনি করেই বেড়ে উঠবে। সারা মাঠ সেদিন ধানে ধানে ছেয়ে যাবে। আর তারই জন্মইতো আজকের এ মেহনত।...

মেহনতি মানুষের মহান চেষ্টা থেকেই একদিন লক্ষ দৈন্য, লক্ষ দুঃখের মাঝে শান্তির সুর ভেসে আসবে, আনন্দ সুখের গানে গানে ভরে উঠবে পৃথিবীর আলো আর বাতাস।...

আজও তাই অতীতের সমৃদ্ধির গৌরবে হিন্দুস্থান লিভারের জব্য-সামগ্রী ভারতের ঘরে ঘরে সুখের প্রদীপ অনির্বাণ রেখেছে, প্রতি ঘরের সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে। তবু তার চেষ্টা আছে আগামীতে দেশবাসীর নিত্য নতুন চাহিদা মেটাতে দেশের অগ্রগতির সাথে তালে তাল মিলিয়ে নতুন সৃষ্টি, নতুন পণ্য নিয়ে এগিয়ে যাবার।

আজও আগামীতেও দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

পাওয়ার্স সমস্ত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সোভিয়েট আইনের মধ্যে মানবিকতা রহিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া একটা বিরাট শক্তি, পাওয়ার্সের যত ব্যক্তির প্রতি উদারতা অবলম্বন করা তাহার পক্ষে খুবই সহজ। তিনি লন্ডনের প্রার্থনা জানান। গ্রিনেলের বক্তৃতা শেষ হইলে আদালতকে সম্বোধন করিয়া পাওয়ার্স বলেন, তিনি স্বীকার করিতেছেন যে তাহার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর এবং শাস্তিবোধ্য। শুধু তাহার অপরাধের কথা বিবেচনা না করিয়া কি অবস্থায় তাহা অমুষ্টিত হয় তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি বলেন কোন গুপ্ত তথ্য ও রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের হস্তগত হয় নাই। সেগুলি সমস্তই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের হাতে পড়িয়াছে। কৃতকার্যের জন্ত তিনি পতীর অমুতপ্ত এবং আদালতের কাছে এই নিবেদন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোন দিন রাশিয়ার জনগণের প্রতি কোনরূপ শত্রু ভাব পোষণ করেন নাই, তাঁহারা যেন শত্রুভাবে নয়, মানুষ হিসাবেই তাহার বিচার করেন। পাওয়ার্সের উক্তি যে বিশেষ রেখাপাত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাওয়ার্স তাহার কৃতকার্যের জন্ত শুধু অমুশোচনাই প্রকাশ করেন নাই, বলিয়াছেন, তাহার মনে হইতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনি খুব ক্ষতি করিয়াছেন। এলা মে তারিখে তাহার বিমানযাত্রার দুই সপ্তাহ পরে প্যারীতে যে শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর দিয়া বিমান চালনার ফলে তাহা বানচাল হইয়া বাইতে পারে, এই সম্পর্কে কোন প্রমাণই তাহার মনে জাগে নাই। তাহাকে যখন আদেশ দেওয়া হয় তখন শীর্ষ সম্মেলনের তারিখের কথা তিনি জানিতেন না। এইরূপ বিমান চালনার ফলে, সংঘর্ষ সৃষ্টি হইতে পারে কি না, তাহা বাহারা তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের বিবেচ্য। পাওয়ার্স বলেন, "আদেশ পালনই আমার কাজ।" এই কাজ যে তাহার ভাল লাগে নাই তাহাও পাওয়ার্স অকুণ্ঠ ভাবের স্বীকার করিয়াছেন। ভাল কাজ পাইলে তিনি পুনরায় আর এই কাজের জন্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেন না। কাজ যে অত্যন্ত কঠোর, দেহ মনের উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে তাহার কথা উল্লেখ করিয়া পাওয়ার্স বলেন যে, একবার বিমান চালানার পরে তিনি দুই দিন সমস্ত কাজের অবস্যা হইয়া পড়েন। এই ইউ-২ বিমান পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে গোরেন্কা-পিরি করা সে সম্পর্কে প্রথম হইতেই তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতরে প্রায় ১২০০-১৩০০ মাইল প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার বিমান যখন গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হয় তখন বিমানখানি ৩৭-৬৮ হাজার ফুট উচ্চে ছিল। আকাশ হইতে কটো তুলিবার যন্ত্রপাতি বিমানে ছিল কিনা তাহা তিনি জানিতেন না। তবে তিনি একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, রাডার স্টেশনের কাজকর্মে বাধাসৃষ্টি করিবার যন্ত্রপাতি তাহার বিমানে ছিল। কিন্তু পাওয়ার্স ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বিমানে যে সকল যন্ত্রপাতি ছিল সেগুলি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের যে জ্ঞান থাকে তাহা তাহার নাই। তবে তাহাকে যেরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তদনুসারে তিনি সূঁচ খুলিছেন ও বন্ধ করিতেন। কিম্বাজার মিটার উচ্চে যে-বিমান উড়িতেছে তাহাতে কি আছে তাহা মাটি হইতে দেখা অসম্ভব। বিমানে পরমাণুবোমা থাকিলে কোন

হাতল ঘুরাইলে উহা বর্ষিত হইত কিনা, প্রেসিকিউটর জেনারেলের এই প্রশ্নের উত্তরে পাওয়ার্স বলেন যে, হ্যাঁ বর্ষিত হইতে পারে। তাহার উত্তরে আদালত গৃহে একটা চাকল্যের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ করিয়া পাওয়ার্স বলেন যে, তাহার বিমানে পরমাণুবোমা ছিল না। তাহার সঙ্গে একটি শব্দহীন পিস্তল এবং ২০৫ রাউণ্ড গুলী ছিল। পাওয়ার্স বলেন উহা শিকারের জন্ত তাহার সঙ্গে ছিল। কোন মানুষকে হত্যা করিবার কল্পনাও তিনি করিতে পারেন না। তাহার সঙ্গে একটি বিষভরা পিন ছিল। সে-সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে পাওয়ার্স বলেন যে, তাহার উপর অত্যাচার করা হইলে আত্মহত্যা করিবার জন্ত ঐ পিন তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার উপর কোন অত্যাচার করা হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাহার উপর কোন অত্যাচার করা হয় নাই। তাহার প্রতি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মনোভাব কিরূপ এবং তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে পাওয়ার্স বলেন, তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করা হইয়াছে।

সোভিয়েট সামরিক আদালত পাওয়ার্সকে দশ বৎসর কারা দণ্ডে দণ্ডিত করেন। রায়ে আরও বলা হইয়াছে যে, এই দশ বৎসরের প্রথম তিন বৎসর তাহাকে কারাগারে থাকিতে হইবে এবং অবশিষ্ট সাত বৎসর কোন কর্মশিবিরে থাকিতে হইবে। এই দণ্ডদেশ এলা মে হইতে বলবৎ হইবে। পাওয়ার্সের প্রতি দণ্ডের কঠোরতায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার হৃৎক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পাওয়ার্স তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর সহিত তাহার যে-যুক্তি হইয়াছে তাহা প্রকাশ করার অপরাধে মার্কিন আইন অনুসারে তাহার দশ বৎসর কারাদণ্ড, অথবা দশ হাজার ডলার জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারে। পাওয়ার্সের বিচার ১৭ই আগস্ট (১৯৬০) আরম্ভ হয় এবং ১৯শে আগস্ট শেষ হয়। এই বিচার অমুষ্টিত হয় ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের কলাম হলে (Hall of Columns of the House of Trade Unions)। বিচার দেখিবার জন্ত দেড় হাজারের অধিক লোক আদালতে উপস্থিত ছিল। ১৪০ জনেরও অধিক বৈদেশিক সংবাদদাতা বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন। পাওয়ার্সের পিতা অলিভার পাওয়ার্স, মাতা ইভা পাওয়ার্স, পত্নী বারবারা, শাওড়ী মোটলে ব্রাউন, পাওয়ার্স পরিবারের একজন বন্ধু এবং তিনজন ব্যবহারদ্রাবী এই বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন। মার্কিন ইউ-২ গোরেন্কা বিমানের পাইলট পাওয়ার্সের বিচার শেষ হওয়া উক্ত বিমান সংক্রান্ত ঘটনার একটি দিকের উপর যবনিকা পাত হইল। কিন্তু পাওয়ার্সের বিচারের সময় শুধু পাওয়ার্স নিজেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়ায় নাই, পাওয়ার্সকে বাহারা গোরেন্কাপিরির জন্ত পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদেরও বিচার হইয়াছে বলিতে পারা যায়। তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিবার ক্ষমতা সোভিয়েট সামরিক আদালতের নাই, তাঁহারা তাহার এজিয়ারের বাহিরে। বিশ্বজনমতের আদালত তাঁহাদের সম্পর্কে কি রায় প্রদান করিবেন, সে-সম্পর্কে এখানে কোন আলোচনা আনয় করা যাইবে না। কিন্তু সোভিয়েট প্রেসিকিউটর জেনারেল রুডেনকো পাওয়ার্সের অপরাধ অপেক্ষা মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নীতিকেই তীব্রভাবে

প্রক্রমণ করিয়াছেন। এই বিচারে আইসেনহাওয়ার, বিয়ন এবং গটারই মুখ্য স্থান পাইয়াছেন, উপরওয়ালার নির্দেশ পালনকারী গিওর্গাসের স্থান হইয়াছিল পৌণ।

স্বাধীনতার পথে আফ্রিকা—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ভাবে জাগ্রত হইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু অল্প স্বাধীনতা লাভ করে নাই। স্বাধীনতার জন্য কোথাও বিপ্লবী, কোথাও অপেক্ষাকৃত কম দিন স্থায়ী সংগ্রাম চলিয়াছে। এখনও কতকগুলি দেশের স্বাধীনতা লাভ হয় নাই। তন্মধ্যে আলজিরিয়ার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আলজিরিয়ার গত চিচ-ছয় বৎসর ধরিয়৷ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলিতেছে। স্বাধীনতা গণের পরেও প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুশক্তি সেই স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কাজে ইহার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। আফ্রিকার আধুনিক স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি প্রকৃষ্টিত হওয়ার অনেক পূর্বে আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বর্তমান আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৬ সালে ইটালী ইথিওপিয়া দখল করে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ইথিওপিয়া পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন স্বাধীন দেশ হইলেও এই স্বাধীনতা শুধু খেতাজদের স্বাধীনতা। কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা ফার্মাসা হইয়া আছে। তাহাদের কোন স্বাধীনতাই নাই। ১৯শ ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বাধীনতা লাভ করে। লাইবেরিয়া প্রকৃত পক্ষে কোন সময়েই বৈদেশিক প্রভুশক্তির অধীনে আসে নাই। গত ১৯৪৭ সালে লাইবেরিয়ার স্বাধীনতার শতবার্ষিকী ২৯শ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ দশ বৎসর পূর্বে আফ্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, মিশর, আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া এবং লাইবেরিয়া এই চারিটি দেশমাত্র স্বাধীন ছিল। মোটামুটিভাবে ৩০টি দেশে বিভক্ত আফ্রিকা মহাদেশে উল্লিখিত চারিটি দেশ ছাড়া আর কোন দেশ স্বাধীন ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আফ্রিকা মহাদেশে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা লাভ করে লিবিয়া ১৯৫২ সালে। এই দেশটি উত্তর আফ্রিকার পশ্চিমে টিউনিসিয়া ও মিশরের মধ্যে অবস্থিত। বোড়শ শতাব্দী হইতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত এই দেশ ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অঙ্গভুক্ত। ইটালী এবং তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধের ফলে ইটালী লিবিয়া অধিকার করে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিপসীর পতন হয় এবং লিবিয়া যুদ্ধশক্তিহরণের যুদ্ধ শাসনাধীনে আসে ১৯৪৯ সালের ২১শে নবেম্বর সম্মিলিত জিপসীপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে লিবিয়াকে ১৯৫২ সালে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৫১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর লিবিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। ইথিওপিয়া ইটালীর দখল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনশাসিত অঞ্চল

হিমায়ে ইথিওপিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। এখানে মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। উত্তর বোতেশিয়া, দক্ষিণ বোতেশিয়া এবং ভ্যাঙ্গালাও লইয়া ১৯৬৩ সালে এই ফেডারেশন গঠিত হয়। এই ফেডারেশন আসলে দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। সুদান, মরোক্কো এবং টিউনিসিয়া ১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। পোল্ডকোট ১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত হইয়া খানা নামে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ফরাসী উপনিবেশগুলিকে লইয়া ১৯৫৮ সালে যখন তথাকথিত 'ফরাসী পরিবার' গঠিত হয় তখন ফরাসী গিনি উহা হইতে বাহির হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী ক্যামেরুন গত ১লা জানুয়ারী (১৯৬০) স্বাধীনতা লাভ করে। ইহার পর পশ্চিম আফ্রিকার নিগেরো অধুষিত টোগোলাও ফ্রান্সের অধিষ্টি হইতে মুক্ত হইয়া গত ২৭শে এপ্রিল (১৯৬০) স্বাধীনতা লাভ করে এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে এই দেশটি আর্থাগীর অধীনে আসে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য টোগোলাও দখল করে। যুদ্ধের পর সন্ধির সর্তাধুসারে উহার দুই-তৃতীয়াংশ ফ্রান্সের দখলে চলিয়া যায়। পশ্চিমের একতৃতীয়াংশ ব্রিটিশের অধিকারে যায় এবং উহাকে পোল্ডকোটের সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হয়। খানা নাম গ্রহণ করিয়া গোল্ডকোটের স্বাধীনতা লাভ করার টোগোলাওয়ের ব্রিটিশ অধিকৃত উক্ত অংশটুকুও স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৬০ সালের জুন, জুলাই এবং আগষ্ট এই তিন মাস আফ্রিকার অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ফরাসী উপনিবেশ সেনাগল এবং ফরাসী সুদান ১৯শে জুন মধ্যরাত্রি হইতে স্বাধীনতা লাভ করে। এই দুইটি দেশ মিলিত হইয়া মালি ফেডারেশন গঠন করিয়াছে। তথাকথিত ফরাসী পরিবারের মধ্যে উহাই প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই ফেডারেশনে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। সেনাগল তাহার স্বাভাব্য ঘোষণা করিয়াছে। কি ভাবে উহার মেংসা হইবে তাহা এখনও বুঝা বাইতেছে না। ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড গত ২৫শে জুন এবং ইটালীয় সোমালিল্যান্ড গত ১লা জুলাই স্বাধীনতা লাভ করে। এই দুইটি দেশ যুক্ত হইয়া সোমালিয়া প্রজাতন্ত্র গঠন করিয়াছে। ২৬শে জুন মাদাগাস্কার দ্বীপ মালাগাসি নাম গ্রহণ করিয়া ফরাসী পরিবারের

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ডাক্তারগোঁরাই শুধু জানেন !
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বাহু গাছ গাছড়া **বাকলা** ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ
দ্বারা বিশুদ্ধ **বাকলা** রোগী আরোগ্য
মতে প্রস্তুত **বাকলা** লাভ করেছেন

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অঙ্গশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, চেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দারি, বুকজ্বালা,
আহারে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম।
দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বাহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও
স্বাস্থ্যকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বকোষে মূল্যে ফেরত।
৩২ ডোলায় প্রতি কৌটী ৩ টাকা, একডো ৩ কৌটী -- ৮-।। আন্য। ডঃ, মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস- শালিগঞ্জ (মুর্শি পাকিস্তান)
ফোন-২৪৯, মহাশ্মা গাঙ্গী রোড, কলিকতা-৭

মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বেলজিয়ান কঙ্গো গত ৩০শে জুন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরেই বেলজিয়মের হস্তক্ষেপের ফলে কঙ্গোতে যে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান কিভাবে হইবে তাহা এখনও বুঝা যায়নি।

আগষ্ট মাসে (১৯৬০) ফরাসী কমিউনিটি বা ফরাসী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আরও নয়টি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। উহাদের নাম দাহোমে, নাইজার, আপার ভোল্টা, আইভরি কোস্ট, চাদ, উবাল্ডীসারী, মধ্য কঙ্গো, গাবোন এবং মৌরিটানিয়া। বৃটিশের স্বাধীনত্ব নাইজেরিয়া অক্টোবর মাসে স্বাধীনতা লাভ করিবে। স্বাধীনতা পথে অগ্রগতির দিক হইতে ১৯৬০ সালটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এই বৎসর আফ্রিকার অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল এবং আরও হয়ত করিবে। কিন্তু সবু আফ্রিকার অনেকগুলি দেশের স্বাধীনতা লাভ বাকী থাকিবে। বর্তমান সেপ্টেম্বর মাসে বৃটেন টাঙ্গানাইকাকে স্বকিঞ্চিৎ স্বায়ত্তশাসন দিবে। জায়াসালাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ারও একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। উগাণ্ডা, কেনিয়া, সিয়েরালিওন এবং গাম্বিয়াকে কিছু কিছু স্বায়ত্তশাসন দিবার জন্য বৃটেন আলোচনা-আলোচনা চালাইতেছে। ফরাসী অধিকৃত মাতানিককে স্বাধীনতা দিবার জন্য আলোচনা আরম্ভ হইবে। কিন্তু আলজিয়ার ভবিষ্যৎ এখনও বুঝা যায়নি। ফরাসী সোমালিয়াও এখনও স্বাধীনতা লাভ করে নাই। বৃটিশ প্রটেক্টরেটের অন্তর্গত বেচুয়ানালাণ্ড, বাঙ্গুটোলাণ্ড এবং এবং সোমালিল্যান্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কিছু অনুমান করা যায়নি। মরোক্কোর যে অংশ স্পেনের অধিকারে ছিল তাহা স্বাধীনতা পাইয়াছে বটে, কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকাস্থিত সাহারা একটি অংশ এবং স্পেনীয় গিনি এখনও স্বাধীনতা পায় নাই। ইউরোপের শক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব প্রথম আফ্রিকায় আসে পর্তুগাল। আফ্রিকায় তাহার সাম্রাজ্য অবশ্য খুবই বিস্তৃত নয়। পশ্চিম আফ্রিকায় এঙ্গোলা, পূর্ব আফ্রিকায় মোজাম্বিক, সোমালিল্যান্ড উপকূলে পর্তুগীজ গিনি এবং কোপ ভেরডে দ্বীপপুঞ্জ, সানটোমে এবং প্রিন্সিপি দ্বীপপুঞ্জ পর্তুগালের অধিকারে রহিয়াছে। পর্তুগাল হয়ত সর্ব শেষে আফ্রিকা ছাড়িবে।

স্বাধীন সাইপ্রাস—

গত ১৬ই আগষ্ট (১৯৬০) মধ্যরাত্রে সাইপ্রাস স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে চুক্তি অনুসারে সাইপ্রাস স্বাধীনতা লাভ করিল তাহাতে সাইপ্রাসে বৃটেনকে সামরিক বাহিনী রাখিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের পর হইতে সাইপ্রাসে স্বাধীনতা এবং গ্রীসের সহিত যুক্ত হওয়ার আন্দোলন তীব্র আকারে আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু উহার অনেক পূর্ব হইতেই এই আন্দোলন চলিতেছিল। কিন্তু বৃটেন মধ্যপ্রাচ্যে তাহার এই সামরিক বাহিনী সহজে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয় নাই। মিশরের স্বাধীনতা লাভ এবং উহার পরে সুরেজ অঞ্চলে বৃটিশের সামরিক বাহিনী রাখা এখন আর সম্ভব হইল না, তখন বৃটেনের সামরিক বাহিনী হিসাবে সাইপ্রাস বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিল। গ্রীস নাটোর সমস্যা

কাজেই সাইপ্রাস গ্রীসের সঙ্গে যুক্ত হইলেও নাটোর বাহিনী সেখানে রাখার কোন অসুবিধা হইত না। কিন্তু বৃটেন তাহাতে রাজী হইল না। বৃটেনের বিভেদ নীতি সাইপ্রাসেও চলিতে লাগিল। সাইপ্রাসের গ্রীক অধিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহাদের দাবী এনোসিস অর্থাৎ গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসের সংযুক্তি। এই দাবীর পান্টা দাবী হিসাবে সাইপ্রাসের তুর্কী দাবী করিল উহাকে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত করিবার। উভয় দাবীর মীমাংসার জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া আলোচনা চলিল। অবশেষে একটা মীমাংসাও হইল। কিন্তু সাইপ্রাসে বৃটেনের সামরিক বাহিনী রাখা লইয়া আর একটি সমস্যার সৃষ্টি হইল। এই সমস্যার সমাধান হওয়ার সাইপ্রাস স্বাধীনতা লাভ করিল। কিন্তু এই স্বাধীনতা লাভ করিবার ছয় বৎসর ব্যাপী যে তীব্র আন্দোলন হইয়াছে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। সাইপ্রাসকে বিভক্ত করিবার হুমকীও দেখানো হইয়াছিল।

সাইপ্রাসের অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জনই গ্রীক। তুর্কীর সংখ্যা শতকরা ২০ জন মাত্র। যে-চুক্তি অনুযায়ী সাইপ্রাস স্বাধীনতা পাইল তাহা সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক। সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হইবেন একজন গ্রীক। গ্রীক অধিবাসীরাই তাহাকে নির্বাচন করিবেন। একজন তুর্কী হইবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তাহাকে নির্বাচন করিবেন তুর্কী অধিবাসীরা। প্রেসিডেন্ট সাথ জন গ্রীক মন্ত্রী এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট তিন জন তুর্কী মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। সরকারী চাকুরীগুলিও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বণ্টন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রীক অপেক্ষা তুর্কীদিগকে তাহাদের সংখ্যার হার অপেক্ষা বেশী চাকুরী দিবার ব্যবস্থা হইবে। গ্রীকরা শতকরা ৮০ জন হইলেও তাহারা পাইবে শতকরা ৭০টি চাকুরী। তুর্কীরা শতকরা ২০ জন হইলেও শতকরা ৩০টি চাকুরী পাইবে। সামরিক বিভাগে শতকরা কত সৈন্য গ্রীক এবং কত সৈন্য তুর্কী হইবে তাহাও স্থির করা হইয়াছে। দুই হাজার সৈন্যের শতকরা ৬০ জন হইবে গ্রীক এবং ৪০ জন হইবে তুর্কী। যে অঞ্চলে শুধু এক সম্প্রদায়ের লোকই বাস করে সেই অঞ্চলে অসামরিক শাসন পরিচালক, পুলিশ ইত্যাদি সবই ঐ সম্প্রদায়ের লোকই হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা দ্বারা যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়, তাহা হইলে সাইপ্রাসে কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যাই আর থাকিবে না। এই ভাবে সমস্ত বিষয়েই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা দ্বারা যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সাইপ্রাসকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যে বিভক্ত করা হইবে না, সে-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। বস্তুতঃ সাইপ্রাসের পাঁচটি প্রধান সহরের প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া পৃথক এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ মিউনিসিপালিটি গঠন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে নাটো কন্সপঙ্কের নির্দেশে গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী এবং তুরস্কের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে আলোচনার ফলে যে ফরমূলা নির্ধারিত হইয়াছে তদনুসারেই বৃটিশ গবর্নমেন্ট সাইপ্রাসের সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন।

উল্লিখিত ফরমূলায় স্থির করা হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচিত আইন সভার, রচিত কোন আইন সম্পর্কে কোন

সম্প্রদায়ের আপত্তি থাকিলে তাহা জানাইবার জন্য একটি কাউন্সিল অব ট্রেড থাকিবে। একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি উহার প্রেসিডেন্ট হইবেন। সাইপ্রাস যুক্ত থাকিবে একটি যুক্তকমাণ্ডের মাধ্যমে। গ্রীক ও তুর্কী পালান্দ্রম এই কমাণ্ডে নেতৃত্ব করিবে। সাইপ্রাসের আইনসভার জন্য গত জুলাই মাসে নতুন শাসনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচন হইয়াছে। এই নির্বাচনে আর্কবিশপ ম্যাকারিওয়ে প্রগতিগতিক ফ্রন্ট ৩০টি আসন দখল করিয়াছে এবং ডাঃ কুচুকের নেশনালফ্রন্ট দখল করিয়াছে ১৫টি আসন। 'আকেল' অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টি পাঁচটি আসন পাইয়াছে। প্রগতিগতিক পার্টির সহিত আকেলের নির্বাচনী তর্কাতর্ক ছিল। সুডান প্রগতিগতিক পার্টির গবর্নমেন্ট যে স্বায়ী এবং শক্তিশালী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাইপ্রাসের ভবিষ্যত উন্নতি নির্ভর করিবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রচিত এই শাসন ব্যবস্থায় গ্রীক ও তুর্কীরা কি ভাবে কার্য করিবেন তাহারই উপরে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে গ্রীক ও তুর্কীরা যদি মিলিত ভাবে চলিতে না পারেন, তাহা হইলে সাইপ্রাস সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা একেবারে উপেক্ষার বিষয় নহে।

জীবন্ত প্রাণীর মহাশূন্যে অভিযান—

সোভিয়েট রাশিয়া জীবন্ত প্রাণীসহ যে মহাকাশচারী জাহাজ (Space Ship) মহাশূন্যে প্রেরণ করিয়াছিল উহা হইতে প্রাণীদিগকে জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছে। এই মহাকাশচারী জাহাজটি ভূপৃষ্ঠ হইতে দুই শত মাইল উর্ধ্বে প্রতি ১১ মিনিটে একবার করিয়া ১৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার পর উহা হইতে প্রাণিবাহী ক্যাপসুলটি অর্থাৎ আধারটি খলিত হইয়া গত ২১শে আগষ্ট (১৯৬০) নির্কিষ্মে পুনরায় পৃথিবীর বক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই জাহাজটিতে ট্রেসকা ও বেলকা নামক দুইটি কুকুর, ৪০টি নোংরা ইন্দুর, ২টি ইন্দুর, কীটপতঙ্গ, গাছ, তণ্ডুলশস্য এবং কতগুলি জীবাণু প্রেরণ করা হইয়াছিল। ক্যাপসুল বা আধারটি ভূপৃষ্ঠের যে-স্থানে অবতরণ করিবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল তাহা হইতে মাত্র ছয় মাইল দূরে পৃথিবীতে নামিয়া আসে। পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিবার পর দেখা গেল কুকুর দুইটি, ইন্দুরগুলি এবং কীটপতঙ্গগুলি জীবিত এবং সুস্থই বহিয়াছে। তাহাদের স্বাস্থ্যের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, তাহাদের কর্মক্ষমতা যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে। মহাকাশচারী জাহাজে চড়িয়া জীবন্ত প্রাণীর মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা এবং জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া আসা যে যুগান্তকারী ঘটনা একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। প্রাণীগুলি যেমন জীবিত ও সুস্থ বহিয়াছে, কুঁড়িগুলি তেমনই ফুটিয়াছে ফুল হইয়া। এই ঘটনার মধ্যে সাফল্যের সঙ্গিত মানুষের প্রচেষ্টার ভ্রমণের বিপুল সম্ভাবনা সূচিত রহিয়াছে।

রাশিয়া সর্বপ্রথম মহাশূন্যে স্পটনিক প্রেরণ করে ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। ঐ বৎসর ৩রা নবেম্বর জীবন্ত কুকুর লাইকা সহ বিত্তীয় স্পটনিক মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কুকুরটিকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু জীবিত প্রাণীসহ বকেট শূন্যে প্রেরণ করিয়া আবার জীবিত অবস্থায় সেই প্রাণীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অবিরাম গবেষণা ও পরীক্ষা

চলিতেছিল। মহাকাশচারী জাহাজে করিয়া জীবিত প্রাণী মহাশূন্যে প্রেরণ করা আর কঠিন নয়। কিন্তু মহাশূন্যে প্রাণীর দেহমন সুস্থ রাখা এবং সুস্থ দেহমন সহ আবার তাহাকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা এত দিন বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাহিরে ছিল। আজ উহা মানুষের আয়ত্তাধীন হইতে চলিয়াছে। মানুষের প্রচেষ্টার ভ্রমণও সম্ভব হইবে, এমন শুভদিনের আর বোধহয় ধুব বেশী দেবী নাই।

কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কঙ্গোর সত্ত্বপ্রাপ্ত স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা আশঙ্কায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশীল্ড যে নীতি অনুযায়ী কঙ্গোতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন তাহার সাম্রাজ্যবাদী রূপ ক্রমশঃই পরিষ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, আশঙ্কা হইতেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কঙ্গোতে সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকাটী গ্রহণ করিতেছেন। প্রথমতঃ গত মে মাসের মধ্যে কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণ করা সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অসামর্থ্যের ভিত্তি এইরূপ হইয়াছে ইহা স্বীকার করা সম্ভব নয়। বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে মিঃ হ্যামারশীল্ডের নিকট যে তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে প্রকৃত অবস্থার সহিত যে তাহার কোন মিল নাই, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে বেলজিয়ান তাঁহাকে মিথ্যা কথাই বলিয়াছে। ইহাতেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নির্কিষ্ম। কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার অজুহাতে কাটাঙ্গা সম্পর্কে তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কঙ্গোর অখণ্ডতাকেই ক্ষুণ্ণ করা শুধু হয় নাই কাটাঙ্গার বিদ্রোহী সরকারকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিঃ সোম্বেকে মিঃ হ্যামারশীল্ড যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাতে কাটাঙ্গায় সৈন্য ও পুলিশ সজ্জিত থাকিবে এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার কাজ করিয়া যাইবে। তাহাদের কাজকর্মের সহিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। এই সুযোগে অখণ্ড কঙ্গোর সমর্থকদিগকে কাটাঙ্গার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সম্মুখেই কাটাঙ্গার পুলিশ ও সৈন্য ঠেঙ্গাইতেছে, গুলী পর্যাস্ত করিতেছে।

কাটাঙ্গার মত কাসাই প্রদেশও বিদ্রোহ করিয়াছে। কঙ্গো বাহিনী যখন এই বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদ্ধে ব্যাপ্ত সেই সময় প্রেসিডেন্ট কাসাভুব লুমুবা মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার যে ঘোষণা করিলেন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কর্তৃপক্ষ যে ভাবে কঙ্গোর বেতার কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বিমান চলোচল বন্ধ করিয়া দিলেন তাহার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করা যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কর্তৃপক্ষ এমন ভাবে কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন তাহাতে কাঙ্গা চিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পশ্চিমীশক্তিয়ার্গরূপে সৃষ্টি হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট কাসাভুব যে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত দ্বারা পরিচালিত হইয়াই উল্লিখিত ঘোষণা করিয়াছেন তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কাসাভুব যখন লুমুবাকে কমতাচ্যুত করার ঘোষণা করিতে বেতারকেন্দ্রে আসেন

তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জবাহিনী তাঁহাকে বাধা দেয় নাই। কিন্তু লুঘুয়া বধন বেতার বজ্রচা দিতে আসেন তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষ্য লাভ করিতে পারে নাই।

সংবাদে দেখা যাইতেছে, মিঃ লুঘুয়া এখনও ক্ষমতার আসীন রহিয়াছেন। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী তাঁহার প্রতি আত্মগত্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহারই নির্দেশমত চলিতেছে। তিনি আজ স্বাধীন ও অখণ্ড কঙ্গোর প্রভৌক হইয়া উঠিয়াছেন। *কিন্তু দেখা যাইতেছে পশ্চিমী শক্তীগোষ্ঠী তাঁহার পতন দেখিতে চান, তাঁহার পতন ঘটিলেই তাহার আনন্দিত হইবেন। কাসাই প্রদেশের বিজ্রাহীদের দমনের জন্য রুশ বিমানে সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে। এই জন্যই বোধহয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী বিমান চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মিঃ লুঘুয়ার রাশিয়ার সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনার মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বিচলিত হইয়াছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলিয়াছেন “আফ্রিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে রাশিয়া কঙ্গোতে একতরফা কার্যকলাপ চালাইতেছে।” উহার বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি উহা বন্ধ করিবার জন্য রাশিয়াকে অহুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বেনামীতে কঙ্গোর স্বাধীনতা হরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা আজ স্পষ্ট হইয়াই উঠিয়াছে। মিঃ লুঘুয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। এখন তাঁহাকে অপসারিত করিয়া কঙ্গোর ঘাড়ে চাপিয়া বসিবার যে চেষ্টা চলিতেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহারই অঙ্গীকার হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ বে-ভাবে উকানী দিতেছেন তাহাতে এই গৃহযুদ্ধে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিশক্তি জড়িত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে।

জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী নিহত—

গত ২১শে আগষ্ট (১৯৬০) প্রকাশ্য দিবালোকে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রিদপ্তরে একটি বোমানিক্রিপ্ত হওয়ার কলে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী শাশা এল হাজ্জা মাজালী নিহত হন। বোমাটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত আরও ১২জন নিহত হইয়াছে। জর্ডানের রাজা হোসেনকে হত্যা করাও নাকি ঐ বোমা নিক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার নাকি ঐ সময় পররাষ্ট্র দপ্তরে বাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার রওনা হইতে বিলম্ব ঘটয়াছিল। তিনি তাই রক্ষা পাইয়াছেন। জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মাজালী ধনী বেহনই শেখ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। গত বৎসর বসন্ত কালে আর একবার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টাতেই জর্ডান বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্য কূটনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য বৃটে তুর্কী সাম্রাজ্যের খানিকটা ভগ্নাবশেষ লইয়া জর্ডান রাজ্য গঠিত করিয়াছে। জর্ডানের প্রথম রাজা আবদুল্লা আন্তর্জাতিক হস্তে নিহত হন। রাজা আবদুল্লার পুত্র প্রিন্স তালাল বধন সিংহাসনে আরোহণ করিবেন সেই সময় তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া বোষণা করা হয়। তিনি হরত এখন কোন উন্মাদ আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পুত্র হোসেনকে রাজা করা হয়। তাঁহার বয়স বর্তমানে ২৩ বৎসর। ইরাকে অভ্যুত্থানের সময় রাজা হোসেনের বাসভবন অবসান হইয়া আসিয়াছিল। বৃটিশ সৈন্য আসিয়া তাঁহার সিংহাসন রক্ষা করে।

অনেকে মনে করেন, গত ২১শে আগষ্ট যে বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে জর্ডানে অবস্থিত প্যালাটেইন উদ্যানের গোপন হস্ত আছে। জর্ডানের অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ তাহারাই। জর্ডানের সৈন্য বাহিনীতেও তাহাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ইরাকে অভ্যুত্থানের পর তাহাদের স্থানে বেহুইনদিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে। বোমা-বিস্ফোরণের ইহা আর একটি কারণ হইতে পারে।

লাওসে সামরিক অভ্যুত্থান—

লাওসের রাজা সতং ভাধামা এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলী বধন লুয়া প্রবাংয়ে গিয়াছিলেন সেই সময় গত ১ই আগষ্ট ক্যাপ্টেন কংলর নেতৃত্বে রাজধানী ভিয়েনটিয়েনে সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং শাসন ক্ষমতা তাহাদের অধিকৃত হয়। বিপ্লবী কমিটি জাতীয় পরিষদের সভাপতি প্রিন্স স্তোভমনফুমাকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে। তিনি উদার নৈতিক জাতীয়তাবাদী। তিনি পাণ্ডেট লাওয়ের সহিত আপোশ করিয়াছিলেন এবং দেশকে নিরপেক্ষ রাখিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। ১৯৫৮ সালের উপনির্বাচনে পাণ্ডেট লাও নেতারা অধিকাংশ আসন দখল করিলে মার্কিন সাহায্য বন্ধ হইয়া যায় এবং স্তোভমনফুমা প্রধানমন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী হন কুই সামানিকোন্। তিনি পার্লামেন্ট বাতিল করিয়া শাসন বিভাগ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সময় যে বিস্ফোরণ হয় সে সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি এই বিস্ফোরণের সহিত উত্তর ভিয়েটনামের কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পান নাই।

উক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের পর লাওসের অবস্থা ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া উঠে। রাজধানীতে একটি সরকার এবং মধ্যস্থলে আর একটি সরকার দেশের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিতে থাকেন। গত ৩০শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, তিনসপ্তাহব্যাপী সঙ্কট অবস্থানের জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স স্তোভমনফুমা বামপন্থী দক্ষিণপন্থী সর্বকম সদস্য গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

—৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

Happiness ? Good health ; bad memory.

—Schweitzer.

বার্থকে

বারানসী

নীলকণ্ঠ

তিন

ভ্রমণ কথার গোড়াতেই কেন ভ্রম শব্দটা বসানো কে জানে ; কিন্তু ঠিক শব্দটাই ঠিক জায়গায় বসেছে।

বাঙলায় যে সব ভ্রমণ কাহিনী বেবোয় এবং জীবনচরিত তার প্রথমটার ভ্রম এবং দ্বিতীয়টার বিভ্রম ছাড়া আর কিছু উপাদানের প্রচেষ্টা থাকে কদাচ। এর জন্মে, এই কাল্পনিক ভ্রমণের এবং অবাস্তব জীবনের জন্মে বাঙালী লেখকদেরই কেবল দায়ী করে লাভ নেই ; পাঠকের দায়িত্বও কম নয়। ভুল বললাম। বাঙলা বইয়ের পাঠক আজও আসেনি ; বাঙলা বইয়ের পাঠক যারা আজও তারা সবাই আসলে পাঠিকা। সেই পাঠিকাদের মনোরঞ্জনের কারণেই ভ্রমণের দুধে ভ্রমের জল মেশানো। বাঙলা জীবনচরিতে জীবন ছাড়া আর সবই উপস্থিত। যারা বলে বাঙালী উপভাস লিখতে পারেনি একথানা আজও, তারা আজও একথানাও বাঙলা বিওগ্রাফি পড়েনি,—তাই এমন কথা বলে। জীবনচরিতের ক্ষেত্রে বাঙালী অনায়াসে ফ্যাক্টের পরিবর্তে ফিকশন চালায় এবং পাঠকরা তা গলাধঃকরণ করে উইদাউট ব্রাইট ফ্রিকশান। ভ্রমণের ক্ষেত্রেও যা দেখেছে সে তার চেয়ে অনেক বেশী যা দেখেনি, যা দেখা যায় না, যা দেখা যাবে না কোনওদিন তারই উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় পাতার পর পাতা অপব্যয় না করা পর্যন্ত আর বাই হোক রমণীর ভ্রমণকাহিনী হলো না। বাঙালী পাঠিকা তথা পাঠকদের কৃপায় যদি ভ্রমণকাহিনীকে বেট সেলার হতে হয় তাহলে মনের কথা চাই বেশি ভ্রমণের কথাই চেয়ে ; সে কথায় যত মগ ভ্রম তত মনোযোগ পাঠকের ; খুঁড়ি—পাঠিকার।

এইজন্মেই হিমালয়ের কথাতেই কেবল হিমালয় ভ্রমণের বই লেখল। শুধু কুয়াশার কথায় হিমালয়ের কথা লিখলে সে বই পোকায় কাটে ; আধ্যাত্মিক কু-আশায় আবৃত করতে পারলে হিমালয় যুতান্তের আপাদমস্তক, তখনই সে বই ধক্কের কাটে। তখনই হিমালয়ের বইয়ের আদর হিমালয় থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থিত কলকাতার বাঙালী আলয়ে। শুধু পাইল-চালিত হলে বাঙলা ট্রাভেলগ চলল না ; প্রয়োজন হয় পথ দেখিয়ে দিয়েই অসুস্থ হয়ে যাওয়া তৈয়বী মিস-পাইন্ডের। অথবা লেডি কেয়াপীর সঙ্গে পানিতে হয় রাজপুত্রের আনরোমান হলিডে-র আয়ব্যোপভাস ; হুড়াক্তে হয় হইশপারিং ক্যাম্পেন, সে পাঠক তো বটেই হিমালয়ে যাদের আজন্ম বাস, বেশির ভাগ সময়ে উপবাস এবং অপমৃত্যু তারাও পানিতে চেয়েছে একে ? এ কেবলকে ? জানতে চাইবেনই তো !

তুয়ারমানব পর্যন্ত শোনা গেছে ; তুয়ারমানবীর কাহিনী বাঙলা হিমালয়কাণ্ড ছাড়া, এমন প্রকাণ্ড মিথ্যা আর কোথাও খুঁজে পাবে না তা জানি—সকল দেশের রানী সে যে আমার লেডি কেয়াপী।

এই গেলো এক ; এর ওপর আছে আবার আরেক। গোদের ওপর বিবকোড়া ; বোয়ার ওপর শাকের আঁটি ; দেশে-বিদেশে চালু অলীকবাবুর গণপোর ওপর মেরুতীর্থ পর্যটকের অলৌকিক অধভূত অর্ধেক-ভূত আর অর্ধেক অধুত। বাঙালী যেমন যতক্ষণ না কেউ বাপ-চৌদ্দপুরুষের রেখে যাওয়া যথাসর্ব্বর উড়ে ফুঁকে দিয়ে নীল রক্ত লাল করছে, ততক্ষণ তার জীবনী পড়তে নারাজ ; তেমনই যে জায়গায় যেতে হলে রক্তবমি না হয় অসম্ভব একজনের ; কয়েকজনের যদি দুর্গন্ধযুক্ত এমন 'অতীত' না থাকে যা স্বীকার না করা পর্যন্ত মেরুতীর্থ-পরিক্রমার পুণ্য অনর্জিত থাকে ; যদি না এর ওপরেও থাকে সব কল্পনের মাথা ধারণ হয় তাহলে সে বই-এর আশা নেই পাঠিকার মন কাড়ার। পুস্তকপ্রিয়াদের পসন্দ নয় সে বই। যে বই বর্তমানে যত বিকৃত সে বই-ই বর্তমানে তত বিক্রীত।

কাশী হচ্ছে ভারতের সেই একমাত্র তীর্থক্ষেত্র যা এই দুই দুর্ভাগ্য সুখবঞ্চিত। কল্পনার বুরকার ঢাকা নয় তার আপাদমস্তক। অশুর্দম্পত্তা নয় বিখনাধাম ; দিবালোকের মত স্পষ্ট ; বাঙালীর ওপর অবাঙালী সর্বভারতের পুঞ্জিত ক্রোধের চেয়েও স্পষ্ট। কাশীর কোথাও ঘোঁরা নেই। পৌছবার কষ্ট নেই কাশীতে। কাশীর গলি হোক যত ঘোরালো ; তার মন্দিরে হোক যত অন্ন আসো ; সেখানে ধুকতে ধুকতে কাউকে করতে হয় না রক্তবমন অতীত-দুর্ভাবের ক্রমী-স্বীকৃতি না উচ্চারণ করা তক। অথবা সে গলিতে সম্ভাবনা নেই কঠাৎ-সাক্ষাতের, 'দেখা না দেখায় মেশা কোন বিদ্যারত্নার।' সেখানে যারা যার তাঁরা হয় ধর্ম, নয় অধর্ম করতে যায় ; সেখানে যারা যুরে বেড়ায় তারা হয় ধর্মের যত্ত, নয়, যতক অধর্মের দারুণ পায়ত্ত। কিন্তু ধর্মে অধর্মে, যত্তে পায়ত্তে, বিখনাধ এবং বিশ্বের যতক অনাধ নিয়ে কুহেলিকায়ুক্ত কাশী ভারতের মধ্যে মহাতারত। এই মহাতারতের কথা যিনি পরিবেশনে উক্তত তিনি কাশীরাম দাস নয় ; অতএব তা অমৃতসমান নয়। যিনি শোনাচ্ছেন তিনি যত হতে চান না ; যিনি পড়বেন তাঁর পুণ্যবান না হলেও চলবে ; কিন্তু পড়তে পড়তে চোখ কান খোলা না রাখলে চলবে না।

চলবে না যে তার কারণ কাশীকাণ্ড কেবল পড়বার নয় ; দেখবারও। কাশীতে যাবার পথেই প্রয়োজন সঙ্গায় দুটি অসতর্ক

কানের। যদিও কাশীতে যেতে ষোড়া অথবা উটের পিঠের দরকার নেই; যেমন দরকার নেই নৌকা, ডিম্বার অথবা জাহাজের। উড়ো জাহাজের পিঠে অবশ্য চাপা যায়; পৌঁছনও যায় কয়েক ঘণ্টারও কম সময়ে; কিন্তু পৌঁছনও যায় না কোনও দিন সেই মাসুকের কাছে যে মাসুকের সমস্ত মন্দিরের চেয়ে বড়, গীর্জার চেয়ে অনেক বড় তীর্থস্থান। সকল কালে সকল দেশে সমস্ত দেবতার চেয়ে বিদ্র, প্রথমা; সকল যুগের সাহিত্য আর ইতিহাসের সে বর্তনীর একমাত্র উপাদান। সেই মাসুকের আর মধ্যেই কেবল আর কৃষ্ণ কখনও আলাদা আলাদা আধারে, কখনও একই সত্যতার চরম ছদ্মের আধারে পরমাবিভূত স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। যে মাসুকের দল্লভবেশে কখনও দলিত; আবার দুর্গা বলতে আর ও কখনও নীলোৎপল হু চোখ বেয়ে ভক্তির অশ্রু উধেলিত। আমার এই কাশীর কথাও কল্পিত ভ্রমণকাহিনীর অকল্পিত কথা নয়; মাসুকেরই অপকল্প কথা। সেই মাসুকের যাদের দি,—কাশীতে মন্দিরে শিবলোক-প্রাপ্ত হয়; আর ব্যাসকাশীতে ল পরাধীন ভারতে যে গর্ভ হতো; স্বাধীন ভারতে আজ সে লী হয়। কাশী উপলক্ষ্য মাত্র; সেই লক্ষ কোটি মাসুকেরই আর লক্ষ্য কেবল।

হেঁটে গেলেই সব চেয়ে ভালো হয়; কারণ:

উড়ে যেতে চাও উড়ে যেতে পারো

মেসিন-পক্ষীবাঁজে;

যেতে চাও কাঁদা ছুড়ে যেতে পারো

মোটর যানে তা সাজে।

সস্তার হারে টুয়ে যেতে চাও

ট্রেনের টিকিট কাটো;

মাসুকের যদি কাছে পেতে চাও

সবার সঙ্গে হাঁটো।

আজকের গতির যুগে হেঁটে যাও মানেই হঠে যাও। অবশ্য এই রকম গতির বাকী এখনও অনেক দূর; অনেক দুর্গতির বাকী তার। দুই হেঁটে নয় কিছুতেই। কিন্তু হেঁটে নয় যেমন, তেমনই নয় উড়ো জাহাজে 'দেশে দেশে চলি উড়ে' বলতে আমার আপত্তি দারুণ; কারণ আমি কেবল বাঙালী নয়,—আমি নিদারুণ প্রভিন্সিয়াল হিণ্ডু। এবং বাঙালী মাত্রকেই নিজেকে 'ডেড' না মনে করতে সবার বাঙালী মাইণ্ডেড মনে করতেই হবে নিজেকে। উড়ে যাবার দরকার কেবল তারই যাওয়া আসা আর ব্যবসা; আসা যাওয়া আর যশা সে কোন হুখে তাড়া করতে বাবে অস্ত; অস্ত তাড়াতাড়িতে তাড়াতাড়িতে যাবার তার দরকার কি। আস্তে আস্তে হাসতে-হাসতে আসতে আসতে বাবে সে। যেমন সন্ধ্যারাগে বিলিমিলি বিলম্বের প্রান্ত বখন বঁকা তখন যেমন উড়ে চলে, অনেক ওপর দিয়ে নীল পানীর জলে যেমন মরাল, তেমনই বলাকাবা, মুখে নিয়া সৃষ্টির প্রথম পক্ষী; হেঁথা নয়; হেঁথা নয়; অস্ত কোথা; অস্ত কোনখানে। উড়ে যাওয়া হচ্ছে পরীক্ষার পড়া; রবীন্দ্রনাথের কবিতাও আর কলে রীতস টিউটরিয়েলে পয়সুন্দ। জলে জাহাজে এবং ডাঙার জাহাজে চলে যাওয়া হচ্ছে ভাবভক্তের মত বিতক বিবরণ রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে সকলের বিশ্বয়।

তাই ট্রেনে চাপো। কাঁদা ক্লাসে অথবা শীতাতপনি কামরায় নয়; তৃতীয় শ্রেণীতে। গাছীর মতো নামে খাড়া, কাঁদা ক্লাসের চেয়েও আরামপ্রদ নয়। যে গাড়িতে যোগ্য আপায়ের জনসাধারণ চলেছে দুর্গকবুজ ল্যাভাটির হাজা, হারপে দংশন, অন্ধকূপ হত্যার আশঙ্কার সহ বাত্মী হয়ে, স্বাধীন ভারতের জনগণ মন অধিনায়ক, ভাষা বিধাতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাস ক প্রতি অল্প সপরিবারে অসংখ্য কামরাবুজ প্রাসাদে আর আর আবার বনিতারা উপবাস করে অসংখ্য লোকে মিলে অতি স্বল্প স্থানে ব করার দুর্ভাগ্যের স্বর্গে, এবং সে প্রাসাদে রাজপ্রাসাদের বাস আ কতকাল যে অব্যাহত থাকবে বলা অসম্ভব,—কারণ রবীন্দ্রনাথ আ অগেই বলে গেছেন: হে রাজেন্দ্র তব হাতে অস্তহীন কাল। স্বা ভারতের ট্রেনে চাপো আর গায়ে অলিখিত নির্দেশ সর্বদাই ঝুলছে বক্রিণ জন বনিবেক; চৌবাটী জন পাড়াইবেক; একশত আটাশ ও বেকিয়া পাড়াইবেক; এবং দুই শত ছাপ্পান্ন জন ঝুলিবেক।

এই ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে চাপো যদি স্বাধীন ভারতে হতে চা জীবনের সহযাত্রী।

এই তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেই, কাশী যাবার পথে আমার স্মরণ রাখের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। অদ্বিতীয় সুদর্শন যায়। কাশী বললে যেমন কাশীর দিদিমার কথা মনে পড়ে তেমনই আর কথা সঙ্গে সা না মনে পড়ে পারে না, তাইই নাম সুদর্শন। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের যুগের সঙ্গে পায়শের; বিশ্বনাথের সঙ্গে বিশ্বের যতক অন্যথ্যে যেখানে দেখা মেলে চোখ ঝুললেই; সে চোখ না ঝুললেও মেলাই দে মেলে এমন বৈপরীতের সেই কাশীর উত্তর মেরু হল যদি কাশী: দিদিমা; তবে তার দক্ষিণতম প্রান্ত হচ্ছে সুদর্শন নিঃসংশয়ে। বিশ্ব রাবণ ছাড়া একা রামে জমে না রামায়ণ; কেবল সুধিষ্টিরে আধুনিক নিউ রিগালিসতিক ক্যাসনে তোলা আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত বিরসতম অধাতু গল্পের নামে ইনহিউম্যান দলিল চিত্র হয়; দুর্ধোখনে বিনা সুন্দর সূচ্যগ্র মেদিনী না দেবার প্রতিজ্ঞা ছাড়া অসম্ভব হয় কুরুক্ষেত্রের নাটক। শুধু কাশীর দিদিমাকে কাশীকাণ্ডের প্রকাশ্য কঁক থেকে যায়। মেঘ ছাড়া রোদের ছায়াবিহীন আলোর কালোহারা সাদার; দল্লভীন স্বাচ্ছন্দ্য জীবনহীন জীবনের দল্লভ হয়; জীবননাট্য হয় না। তাই সুদর্শন রাখকেও উপস্থিত কর চাই। কাশীর মাহাত্ম্য খর্ব করবার অস্ত নয়; কাশীর কাব্যে উপস্থিত মহাকাব্যে উত্তীর্ণ করবার কারণে; কাশীর রূপকে অপকল্প কণ্ট্রাষ্ট দেবার অভিজ্ঞাষে।

সুদর্শন যায় বলে আর কথা এখন বলতে বাচ্ছি; সুদর্শন তার নাম নয়.—'যায়' নয় তার পদবী। নাম আর পদবী বানানো বটে; তবে আর কথা বলতে বাচ্ছি সে লোকটা সত্য। কাশীর দিদিমার মতোই জ্যান্ত তার চেয়েও জলজ্যান্ত এই মাসুকের কথা বলতে বসে তার নাম, পদবী, ধাম বাধ্য হচ্ছি পালটে দিতে; কারণ লোকটা বেঁচে আছে আজও। এবং আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, মড়ার ওপর খাঁড়ার যা দিলে তার না হলেও, বাঁচার ওপর যে কোনও যা দিলেই, তা আরও অস্তার হয়। অবশ্য সুদর্শন আর আজ কেবল বেঁচেই আছে তার স্বনামে। বেঁচে মরে আছে কোনও রকমে; মরে বেঁচে যাবার আশার ওই কাশীতেই। সুদর্শন আর একদিন অবশ্য জীবিত ছিলো, প্রতি মুহূর্তে জীবিত। এই যার, এই আধমরার দেশে যা মেরে

চাঁদার মস্ত সজ্জা করে নিয়ে এসেছিলো সে ; মস্তর বেমন মেঘ হলে পঞ্চম তোলার নিয়ে আসে প্রেরণা অল্প মুহূর্তেই, কর্ণর অঙ্গে বেমন লমস করত সহজাত কবচকুণ্ডল ; সুদর্শন রায় এই ভেজাল নাম দার পদবীর আড়ালে যে মাছবটা বাস করত ; করত একদিন, দাঙ্গ আর করে না, সেই মাছবটা ঠোঁটের কোণে তেমনই ভূমিষ্ট হবার লগ্নেই সজ্জা করে এনেছিল নির্ভেজাল হাসি।

সুদর্শনের হাসিকে কেবল হাসি বলে ছেড়ে দিলে ববীন্দ্রনাথের বলাকা-ক' আরেক খানি বই মাত্র বলার অপরাধ হয় ; অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়, প্রথম ছন্দন বাঙালী প্রাজু-স্বর্গের অন্ততম, মাত্র এই হয়ে কাঁড়ায়। সুদর্শনের হাসি,—আমি তো ছেলে মানুষ, কান্দীর এই মহাভারত যদি স্বয়ং কান্দীর লিখতেন তা হলেও শক্ত হতো তার বখার্ব বর্ণনা করা ; কারণ তা বর্ণনার বিষয় নয় ; শোনবার বিষয়। উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত সেই হাসি যেন শিবের জটা থেকে যর্ভাভিমুখে অবতরণরত প্রাণগঙ্গার কলমন্ত্র বোল। চুঃখের বরষায় তার সেই হাসির দমকে মেঘ কেটে বেরিয়ে পড়ে সূর্যের প্রসন্নানন ; মলে খোয়া আকাশের বৃকে বকমক করে বর্ষার রৌদ্রের পদ্মবাগমণি।

কিন্তু তবুও তা হাসি নয় ; কান্দীর মুখোস মাত্র। একদিন সেই হাসির মুখোস সবে গিয়ে উম্মুক্ত না হলে তার অশ্রু-মুখ ; জীবনের কুর না হলে প্রতিবিশিত,—সুদর্শন রায়ের কথা, কান্দীর কথা মতে বসে, লেখা সবচেয়ে সিয়েরিয়াস কলমেও বিড়ম্বনা ছাড়া আর কে হতো ? নিছক অবিম্ব্যাকারিতা ছাড়া কি হতো আর তা। সুদর্শন নয় কেবল। গোটা মানবজীবনটাই হাসি-কান্দীর মুখোস মাত্র। কান্দীকে চাপবার কারণে মাছবের হাসি এবং পবের পতনে অস্তরের হাসিকে কুমীর-ক্রন্দনে আবরণ দেওয়ারই ছন্দনাম জীবন। লাইফ ইজ এ ব্রিক ক্যাণ্ডেল নয় ; লাইফ ইজ এ লং স্ক্যাণ্ডাল। হাসিকে কান্দা এবং কান্দীকে হাসি করার চেয়ে স্ক্যাণ্ডালস আর কি আছে। আয়ুব বাল্ব কত স্ক্যাণ্ডাল পাওয়ার,—এ প্রশ্ন দেহপীয়ার মস্ত ; মাছবের আয়ুব বাল্ব কত স্ক্যাণ্ডালপাওয়ার তাই হওয়া উচিত কিন্তু আসলে জীবনসজ্জা জিজ্ঞাসা।

সুদর্শন রায়ের সজ্জা সেবাবে দেখা কান্দী বাবার পথে নতুন করে আবার। সুদর্শন সেই সুদর্শনই আছে। সেই হাসি সেই বেপরোয়া বোহেমিয়ান সুদর্শন রায়—বার মতে বাঁচার উদ্দেশ্য মাত্র দুটি। একটি মদ ; অপরাটি মেয়েমাছব। কিন্তু সেখানেও, সেই চরম অধঃপতনের পথে প্রথম অগ্রসর সুদর্শন রায়েকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। কারণ কোনটাই তার লুকোবার চেষ্টা নেই। বাইরে বৈরাগ্যের বেশ পবে আত্মীয়-অনাত্মীয়-ঘরে লুকিয়ে নোংরামি করার প্রবৃত্তি নয় তার ; হৃৎসরিজ্ঞতার সমস্ত রকম রাস্তা জানা থাকলেও ঘর নষ্ট করার মস্ত্রে তার অকৃটি ছিলো। পরস্ত্রী, কুমারী, কি বিধবার সজ্জা প্রণয় অনেক পূর্বের কথা ; পরিচয় পর্বস্ত সে এগুতো না। কেন জানতে চাইলে, বলত সুদর্শন রায়ের দোষ অগুণতি ; গুণ একটি। সে হৃৎসরিজ্ঞ পুরুষ ; কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কাপুরুষ নয়। তার প্রচুর মজপান এবং প্রচুরতর সেই স্ত্রীলোকের সজ্জা সমাজের অভিধানে বাদে সংজ্ঞা পতিতা, তাকে নিশ্চয়ই সমাজের সেই সব জীবদেব পরিভাষায় সর্বনেশে লোক বলে অভিহিত করেছিলো অথবা করবে চিরকাল যারা ছিক করেও মাতাল হয় কদাচ ; এবং বারা সময়ে সয়ে পড়তে

জানে বলে বড় বড় ঘরের বড় বড় স্ক্যাণ্ডালের জনক হওয়া সবেও যবে বাবার পর ওবিচুয়ারি পায় প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রের আধকলম জুড়ে যার মধ্যে মোটা লাইনে দাগানো কথাগুলো হচ্ছে : স্বভাব এবং আদর্শচরিত্রের গুণে তিনি ছিলেন সকলের অনুকরণযোগ্য।

ওবিচুয়ারি ঠিকই লেখে। যে সমাজে একদিন সবাই অজ্ঞার ছাড়া আর কিছু করতেই ভয় পেত না,—সে সমাজে নয় ; যে সমাজে আজ কারুরই অজ্ঞার ছাড়া আর কিছু করতেই ভয় ; সেই সমাজে এই জাতীয়, এই বজ্জাতীয় জীবেরাই যে সকলের অনুকরণযোগ্য বিবেচিত হ'বে, তা আর বিচিঞ্জ কি।

সুদর্শন রায় অবশু চিরকাল এ রকম ছিলো না। তার ঘর ছিলো ; মনের মতো ছিলো খণী ; এবং রাজকন্ডার মতো এক মেয়ে। প্রচুর বিস্ত সেদিনও ছিলো ; আজও যেমন আছে। সুদর্শন ছিলো সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব ক'লকাতার মহামণি। তার বাড়ি ছিলো কালচারের পীঠস্থান। বারো বছর ঘর করবার পর তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে একদিন চলে যায় মেয়ের মাঠারের সঙ্গে। কেন যায় তা অজ্ঞ কেউ জানেই না, সুদর্শনের আজও পর্বস্ত তা অজানা। এবং চলে যাবার আগের মুহূর্ত পর্বস্ত তার স্ত্রী, যার নাম দিলাম এখানে আলেয়া, এমনও কোনও কারণ ঘটায়নি যা থেকে, নাকি কল্পনা করা যায় এত বড় দুর্ঘটনার উৎস পর্বস্ত। মেঘের যে মাঠার সে যে কেবল অর্থেই দরিদ্র তা নয় ; স্বাস্থ্যও হ্রতসর্বস্ব। তার মধ্যে আট বছরের মেয়ের মা কি দেখলো তা সেই জানে ; চলে যাবার পর তবেই ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে বেরুতে লাগলো চিঠির টুকরো ; প্রেমের প্রমাণ। সেই টার্ণ নিলো সুদর্শন। মদ আর মেয়েমাছব ; মেয়েমাছব আর মদ। ডুবে গেল সে অধঃপতনের অন্তলে। জেগে রইলো তখনও কেবল তার বোঁবনের উগ্গাংশেব,— হাসির ডগাটুকু।

কান্দী বাবার ট্রেনে হঠাৎ দেখা সুদর্শনের সজ্জা কত বছর বাদে বলা অসম্ভব ; অর্থাৎ ইটস এন্ডেস সিনস আই লাষ্ট স হিম। ফাঠ' ক্লাসের প্যাসেঞ্জার সুদর্শন নিয়ে গেলো তৃতীয় শ্রেণী থেকে হতভাগ্য আমাকে প্রতি মুহূর্তের চেকারতাড়িত হবার রিসকের মধ্যে। থার্ড ক্লাস থেকে আমাকে টানাটানি করে নামিয়ে নেবার আগে কিছুক্ষণ তাকে থাকতে হয়েছিলো গান্ধীর ক্লাসে বাধ্য হয়ে। সেখানে তখন জোর তর্ক চলছিলো মানত করার মানে হয় কিনা। একজনের মতে এর প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় হাতে হাতে। আরেকজনের অভিমতে, এ সবই অন্ধ কুসংস্কার নয় কেবল ; নিজের স্বার্থের জয়ে পাঠা মানত করা রীতিমত নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা। অজ্ঞ আরেকজন তর্কের ধার দিয়ে গেলো না ; সে সুর করে দিলো এক গল্প। মুহূর্তে কলহে রূপান্তরিত হতে পারত যা তা নেমে এল সাগ্রহ উৎকর্ণতার সবাই ঘেঁষে বসলো ; গল্পবলিয়ের কাছ ঘেঁষে।

মা কান্দীর কাছে গেছে মধ্যবিস্ত উকিল বাপ ছেলের চাকরি জন্তে ; সওয়া পাঁচ আনার পূজা দিয়ে বলেছে : আমার অবস্থা পাড়া বটু ঘোষের চেয়ে অনেক খারাপ ; শুনেছি সে পাঁচসিকের পুতে দিয়েছে ; মানত করেছে ছেলের চাকরি হলে জোড়া পাঠা দেবে তার কথা শুনো না মা ; তার ছেলের চাকরি না হলেও চলবে তার পাঁচসিকে পূজোর জায়গায় আমার সোয়া পাঁচ আনা পুতে দেওয়াতেই তো বুঝবে আমার কি অবস্থা এবং আমার ছেলে

চাকরি হওয়া কত দরকার। মা কালী বলেন : তা যদি বলে তো তোমার পাড়ারই আরেকজন এসেছিলো আজ সকালে তার ছেলের চাকরির জন্তে ; সে এক পরসার পূজোও দেয়নি ; মানতও করেনি এক কানাকড়ি কোন কিছু। অবস্থা তেবে চাকরি দিলে তো তার ছেলেকেই দিতে হয়। উকিল খচে বার সাজাতিক ; এডঃজার্নমেন্ট প্রাণ্ট না করা জাজের ওপর রাগের মতোই মা কালীর মেজাজের ওপর সব নির্ভর করে জেনে বিমর্ষ হ'য়ে চলে যাবার আগে স্বপ্নতোক্তি করে : তাহলে তোমার বা ইচ্ছে তাই করো ! শুনে মা কালী কিন্তু রাগ করেন না ; উক্তের প্রতি অল্পরাগের একগাল হাসি হেসে বলেন : তাই তো করি ; তোরা যে কেন মার খেকে মানত মেনে মরিস, সেইটেই শুধু স্বয়ং মা কালী হয়েও আজও বুঝতে পারি না।

মানতের বিপক্ষে বারা তাদের হাসির গমকে অথবা ট্রেনে পৌঁছবার কারণে মনে নেই ট্রেন ধামতেই এক ঝটকায় আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার কামরার ভোলে স্মদর্শন। বক্ত বাধা দিই তত বলে চেকার ধরলে টাকার জন্তে ভাবনা নেই ; তার জন্তে আছে স্মদর্শন বার। বুকি স্মদর্শন কিছু বলতে চায় ; এমন কিছু বা বলা বার না হাটের মধ্যে ; তাই চূপ করে বাই।

কিন্তু স্মদর্শন বার প্রথম শ্রেণীর অভিজাত নিভূতে যেকথা প্রথমেই বলে সেকথার আর চূপ করে থাকি বার না, চমকে উঠতে হয়। স্মদর্শন আমার দু'হাত চেপে ধরে বলে : ও গল্প কান দিও না ; মানত সত্য বলে জেনো ; মানতে কাজ হয়— ! থাকতে না পেয়ে উচ্চকণ্ঠে না বলে পারি না : দাও টু ক্রটাশ ? মুহূর্তে সেকথা চাপা দিয়ে স্মদর্শন এবার আরো চমকে দেয় : জানো, আলোর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার ?—কোথায় ? আমার কণ্ঠে কৌতূহলের বান ডেকে বার। কালীতেই একদিন দেখা হয়ে বার স্মদর্শনের তার বাবোবছরের বিবাহিত জীবনের বৃষ্টিচাত বউয়ের সঙ্গে। যেভাবে দেখা হয় তা বানানো গল্পের খাতিরেরেও বিশ্বাস করা অসম্ভব হোত। কিন্তু জীবনের কাছে জীবন্ততম উপভাসও অলৌকিককে কিছু নয়। তাই। স্মদর্শন এসময়কাল কালীতেও ধর্মস্থানের চেয়ে অধর্মস্থানের প্রতিই আকর্ষণ অল্পভব করে বেশী। পতিতালয় থেকে পতিতালয়ে বাসিন্দার সুর থেকে সুরে ; সুরার পাত্র থেকে সুরার পাত্রে সুরবিহার এবং সুরবিহার করে বেড়ায় স্মদর্শন। সেই সময়ে দালাল একদিন নিয়ে বেতে চায় তাকে এমন

এক পতিতার কাছে যে পতিতা হয়েও নয় সম্পূর্ণ অধঃপতিতা। তার ইচ্ছের ইর্বাযোগ্য সান্নিধ্য বা নির্ভর করে অর্থের ওপর নয় ; তার মেজাজের ওপর। কৌতূহলী হয়ে বারে স্মদর্শন। স্মদর্শনের কথাও দালালের মুখে শুনে দালাল এসে সেই 'নহে মাতা নহে বধু' উর্বশী স্মদর্শনের সম্মুখে।

স্মদর্শনের মুখ দিয়ে বেরোর : আলোয়া ?

আলোয়া শুধু বলে : তুমি ?

চূপ করে বার স্মদর্শন। আলোর কথা চাপা দিতে মানতের কথাই তুলি আবার : স্মদর্শন,—মানতের কথা কি বলছিলে ! বলতে বলতে খেমে গেল কেন ? স্মদর্শন হাসে। খেমে বাইনি ; সেকথার আসবার জন্তেই আলোর কথা পেড়েছিলাম। তুমি এতকণ তাবছিলে মাল খেয়ে কথার খেই হারিয়েছি,—তাই না ! স্মদর্শনের খোঁচা গায়ে না মেখে জিজ্ঞেস করি। মানত কবেই কখনও ?

করেছি,—বলে স্মদর্শন। কালীতে বিখনাথের মন্দিরে মানত করেছিলাম—

কিসের জন্তে ?

আলোর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দেবার প্রার্থনা জানাতে গিয়েছিলাম বিখনাথের কাছে ; বিখনাথ তাঁর কথা রেখেছিলেন ; এখন ভাবি কথা রাখার চেয়ে কথা না রাখাই তাঁর ভালো ছিলো—

কি মানত করেছিলে ?—একটু চূপ করে থেকে জানতে চাই আমি।

চোখের জল ! অব্যব করে স্মদর্শন বার।

মানে ?

প্রতিজ্ঞা করি, জীবনে কোনও বেদনায়, কোনও আঘাতে, কোনও বিচ্ছেদে কোনও দিন চোখ দিয়ে বার করব না এক কৌটা চোখের জল।

বলেই হা-হা করে পাগলের মত অর্ধহীন হাসে স্মদর্শন।

আমার কাছে সে মুহূর্তে তার হাসি কিন্তু অর্ধহীন মনে হয় না। শুধু স্মদর্শনের নয় ; তার হাসির মধ্যে দিয়ে সকল কালে সব মানুষের হাসির অর্থ কুড়িয়ে পাই আমি। চোখের জল ঢাকা ছাড়া মানুষের হাসির অর্থ নেই আর কিছু !

[ক্রমশঃ]

মায়াময়মিদং

বিমলচন্দ্র ঘোষ

হৃৎখের দিনে প্রেম পলাতক উড়ে বার সুর বড়ে।

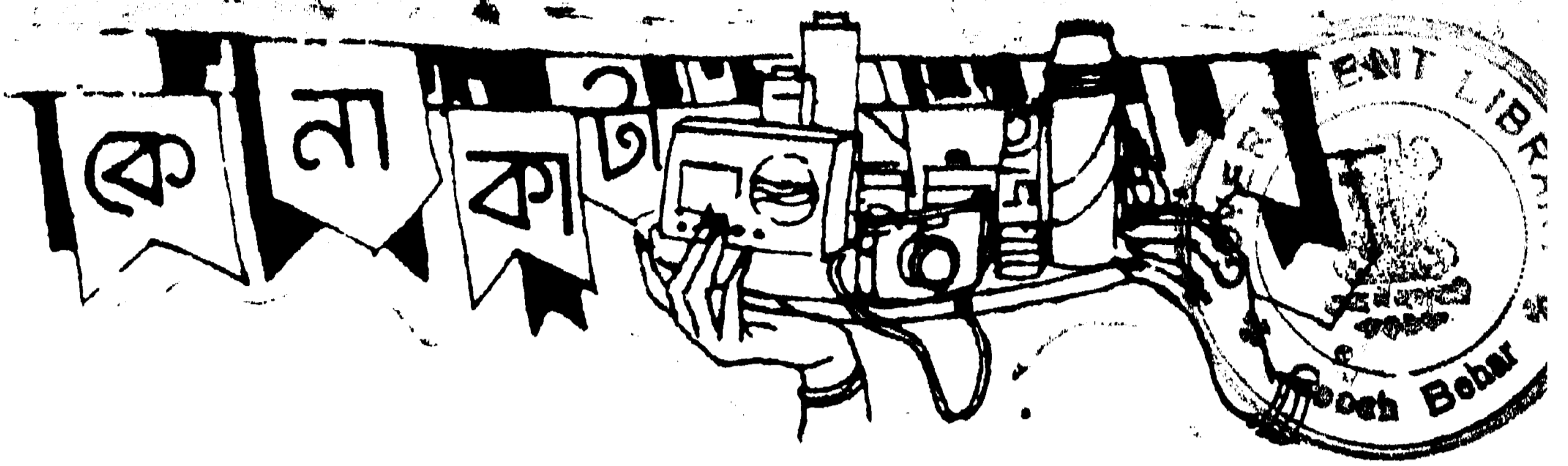
দরকের ভয় বুড়োর আদরে ফুল তো মুবড়ে পড়ে।

দারিদ্র্য দেখে মমতা পালার বিপদে উধাও নেহ।

প্রতিজ্ঞার খ্যাতি বাড়ে চিরদিনই স্থানে পুড়লে দেহ।

ক্ষেপে বার মেহ একবার ছেড়ে দু'বার চেঁচিয়ে ডাকলে।

কপূর হ'য়ে মোহ উড়ে বার দিনদাত কাছে থাকলে।



অর্থোপার্জনের জন্য লেখা

লেখকরা যে লিখে থাকেন সে তাঁদের পেশা না নেশা?

এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠতে পারে। এর উত্তর দিতে যেয়ে লেখক-শ্রেণীই হয়ত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবেন। কেউ কেউ হয় তো দাবী করবেন, লেখার মূলে রয়েছে নেশা, টাকা-পয়সা অর্থাৎ পেশাগত প্রস্তুতি এখানে গৌণ। আবার অপর শ্রেণীর লেখকগোষ্ঠী সোজা বলতে চাইবেন—পেশাটাই আসল কথা, লিখে রাজস্ব হলে, সুনাম জুটলে লেখবার নেশাও হবে আপনি।

এই নিয়ে প্রচুর গবেষণা-আলোচনা ও বিতর্কের অবকাশ রয়েছে বটে কিন্তু 'তৈলাধার পাত্র' কি 'পাত্রাধার তৈল'—এ ধরণের জটিলতার ভেতর ঢুকে নীট লাভ কতটা? লেখক লিখে থাকেন, অন্তত: আজকাল, শুধু নেশায় নয়, পেশাগত প্রস্তুতিও এখানে আছে। আবার পেশাকে সফল ও জোরদার করতে হলে নেশার মাত্রাও না বাড়ালে নয়। এ শুধু এ দেশেই নয়, সকল সমাজের লেখকদের দিকে তাকিয়েই বলা চলতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের গোড়াকার দিনগুলোতে, এমন কি সে-দিন অবধিও বলতে পারা যায়, কবি ও সাহিত্যিকগণ এদেশে সেভাবে সমাদৃত হন নি। অর্থাৎ লিখে টাকা-পয়সা তাঁদের বস্তা পাওয়া উচিত ছিল, তা তাঁরা পান নি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিতান্ত দৈন্যের ভেতর দিনান্তিপাত করতে হয়েছিল তাঁদের। তবু যে বিচিত্র রচনা ও রস-সম্ভার তাঁরা দেশ ও জাতিকে দিয়ে গেছেন, এ নেহাৎ নেশা ছাড়া কিছু নয়। সেখানে তাঁরা দি তাঁদের লেখার উপযুক্ত দাম পেতেন, বিনিময়ে দিতে পারতেন সাহিত্যের আরও নতুন নতুন অমূল্য উপহার, এ হয়ত ঠিক।

সাহিত্য লেখকের নেশা ও পেপা দুই-ই না হলে সাধারণতঃ লাভে পারে না। ক'জন এমন আছেন, যিনি শুধু লিখেই যাবেন নেশা পেয়ে, টাকা-পয়সার দিকে তাকাবার তাঁর দরকার নেই। কথা ঠিক, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রস-রচনা প্রভৃতির কোনটাই এইরকম থেকে অমনি হাজার হবার নয়। এ সম্পূর্ণভাবে অন্তরের প্রসঙ্গী—আবেগ ও প্রেরণালব্ধ সম্পদ। প্রকৃত দামী কিছু পরিবেশন করতে হলে নেশার বিজ্ঞান হওয়া চাই বৈ কি। সেই সঙ্গে খাওয়া-পাওয়ার জন্তে ভাবতে হবে না, এইটুকু নিশ্চয়তা যদি থাকে, তবে ব দিক থেকেই আশার কারণ হয়।

একটি জোরালো দাবী অহুসারে লেখক ঠিক আপন মনে লিখে যেন বটে কিন্তু সে লেখা প্রকাশের জন্তে উপযুক্ত মাধ্যম বা ব্যবস্থা থাকলে নয়। ধনী-গৃহেই সব কবি-সাহিত্যিকের জন্ম হবে, ননকোন কথা নেই। জীব-সম্পদ কখন কার কাছে ধরা দেবে,

বলা কঠিন। গুণী ও শিল্পীর আবির্ভাব সব কুলেই হতে পারে, গরীবের ঘরেও। কিন্তু অর্থের আহুকুলা না পেলে নিছক জীব-সম্পদের অধিকারী হয়ে ক'জন লেখকের পক্ষে কতদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব? কালিদাস মহাকবি আখ্যাত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন, রাজা বিক্রমাদিত্যের আর্থিক সাহচর্য্য পাবার পথই। মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরথও চলার বেগ পেলে তখনই বেশিরকম, যখন তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য রচনাবলী অবশ্য তাঁর পুরোপুরি নেশা থেকেই সৃষ্টি—অর্থ পাওয়ার প্রয়োজন ও তাগিদ হতে ততটা নয়। কিন্তু কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে লিখে টাকা-কড়ি তেমন না পেলে সৃষ্টির পথ বিঘ্নিত হতো বা হতে পারতো। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানসাগররূপে ধাঁকে পাওয়ার সৌভাগ্য জাতির হলো, প্রথমাবস্থার তাঁকে কতই না কৃচ্ছতা স্বীকার করতে হয়েছে। এমন দুর্ভাগ্য পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় আছে এবং দেখানোও যায়।

আজকাল একরূপ বাজারই দাঁড়িয়ে গেছে—অর্থোপার্জন নয় জন্তে লেখা। সাহিত্য শিল্প-কর্মের 'হাতে খড়ি'র কতক কাল হয়তো নেশাটারই প্রাধান্য থাকে, কিন্তু সে মোহ বা আবেশ কাটতে বিলম্ব হয় না। বাজারে দর দাম না হলেই, লিখে সাধারণ কিছু পারিশ্রমিকও না মিললেই কলমের ভড়তা আপনি আসতে থাকে। আবার আলোচ্য বিষয়টির আর একটি দিকও বিবেচনা করবার আছে। আজকের বাজারে ভাল লেখা পরিবেশন করলে, সাহিত্য-কর্ম মোটামুটি নিখুঁত ও রসোত্তীর্ণ হলে সাধারণতঃ না বিক্রিয়ে পারে না। অর্থাৎ কোন না কোন মহল থেকে লেখক আপন সৃষ্টির দাম পাবেনই, এমনটি আশা রাখা চলে। টাকা-পয়সা বা পারিশ্রমিক পাওয়া যায় বলেই এ যুগে লেখকসংখ্যা বাড়ছে অতি দ্রুত—পুরনো খ্যাতিমান সাহিত্যিকগণ নতুন খ্যাতি অর্জন করছেন দিন দিন। বিচিত্র হাতে বিচিত্র রচনা সৃষ্টি ও পরিবেশিত হওয়ার পথ আগের তুলনায় সে জন্তেই এখন অনেক বেশি। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করবার জন্তে জাতীয় সরকারও কিছু কিছু ব্যবস্থা করেছেন, এ-ও নিশ্চয়ই একটি আশার কথা।

মোটের ওপর ব্যাপারটি এই পর্য্যায়ের এসেছে, এখনকার লেখক-সমাজ লেখাটাকে পেশাই করে নিয়েছেন কতক সংখ্যক লেখক পুরোপুরি, অনেকে হয়ত বা অংশতঃ। লিখলেই নাম মাত্র হলেও টাকা পেতে হবে—নিছক একটি নেশা থেকে বা একদম বিনে পয়সার এমনটি দীর্ঘদিন চলতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বহু লেখক ও সাহিত্যিক রয়েছেন আজকের দিনে জীবিকা নির্বাহের জন্তে লেখাটাই তাঁদের এক মাত্র পেশা বা সখল। লিখতে পারেন ভালো

ভালো, অল্প কাজে মন নেই কি হাতই নেই, তেমন লেখককে লেখা বিকিয়েই টাকা-কড়ি না পেলে নয়।

বিলেতে লেখা ও লেখক প্রসঙ্গে বহু আলোচনা-গবেষণা হয়েছে এ যাবৎ। সংশ্লিষ্ট মহল বিচার করে দেখেছেন লেখকের লেখার তাগিদে পিছনে অজ্ঞান জিনিসের মধ্যে ধন ও মান লাভ আর মনের কৌতূহল মেটানোর প্রবল। তার ভেতর টাকা-কড়ি পাওয়ার প্রবলটিকে স্থান দিতে হয় বলতে গেলে সকলের আগে। বাজারে নাম কিনতে চান প্রত্যেক কবি ও সাহিত্যিকই, কিন্তু টাকা-পয়সার কথা সম্পূর্ণ ভুলে নয়। অবশ্য একবার বাদে পেশাদার লেখক পর্যায়ের খ্যাতি হয়ে গেছে, সাহিত্যিকর্ম তাঁদের যে মানেরই হোক, বর্তমান বাজারে দাম পেতে খুব আটকায় না।

আরও একটি কথা—মৌলিক রচনা ছাড়া অনুবাদ সাহিত্যেরও বাজারে আজকাল দাম-দর মিলছে। অনুবাদ যদি সত্যি সবেস ও সার্থক হয় এবং উচ্চদের বইকে কেন্দ্র করে সে অনুবাদ হয়ে থাকে, অনুবাদ-শিল্পী বা সাহিত্যিক পারিশ্রমিক আদায় করতে পারবেনই, এ আশাও আজ ঠিক অব্যাহত নয়। তবে সাহিত্য-কর্ম করতে চেয়ে রাতারাতি সুনাম অর্জন যেমন সচরাচর সম্ভবপর নহে, তেমনি প্রথম পাদেই সকল লেখকই টাকাকড়ি পেয়ে যাবেন, এমন দাবীও রাখলে চলে না। অনেককেই আশায় বসে থাকতে হবে একটা সময় পর্যন্ত বাড়িয়ে যেতে হবে এর ভেতর স্ব স্ব লেখনীর রচনাশক্তি। অর্ধোপায় বা টাকা রোজগার করা ছাড়া লেখার পিছনে অল্প কারণ আছে বলে ধারা ভাবেন, বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ডাঃ শ্রামুয়েল জনসনের মতে তাঁরা একরকম নির্বোধ। শ'ও নাকি অর্থ ছাড়া লেখনীতে হাত দেওয়ার কথা ভাবতেই পারতেন না—অবশ্য প্রচুর সুনাম ও সম্পদ হুই-ই পেয়ে গেছেন তিনি জীবনে।

লেখাটাকে পেশা হিসাবে যেখানে গ্রহণ করতে চাওয়া হবে, যেখানে মনে নিতে হবে একে অর্ধোপার্জনের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম, সেক্ষেত্রে লেখকের বেশ কয়েকটি দায়িত্ব পালনের প্রবল থেকে যায়। সতর্ক ও দয়ালু শিল্পী হতে হবে এমন লেখককে—বাস্তবকে অস্বীকার করার চরমপন্য তাঁকে সহসা না পেলেই ভাল নয়। নিজের কলমে ওপর পুরো আস্থা থাকা চাই প্রতিষ্ঠাকামী লেখকের আর ভরসা রাখা চাই—লেখা ঠিক মানসম্পন্ন হলে দামও মিলবে, আজ না হোক, দু'দিন বাদে। সত্যিকারের ভালো লেখা বাতে ভালো দাম পায় কুশলী ও চিন্তাশীল লেখক বাতে বঞ্চিত ও অবহেলিত না হতে পারেন, বলা বাহুল্য, সে-সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে লেখক-সমাজের নিজেদেরই।

মানুষের স্বাস্থ্য—কয়েকটি কথা

স্বাস্থ্য অর্থাৎ শরীরের সুস্থ অবস্থাই মানুষের পরম সম্পদ, কথাটি মোটেই নতুন নয়। আর এ-ও জানা কথা—স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে, টাকা-পয়সা, নাম-বশ-প্রতিপত্তি কোন কিছুই ভাল লাগে না। এমন কি খেলাধুলো, আমোদ-আহ্লাদও নিতান্ত বার্থ। কিন্তু বে-স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল বলে এমনি দাবী রাখা হয়, কি ভাবে একে দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, কোন্ অবস্থায় শরীরকে রাখা চলে বরাবর ব্যাধি-বিমুক্ত, সেইটি বড় কথা এবং এই নিয়ে শরীর-বিজ্ঞানী বা স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের ভাবনা আজও শেষ হয়নি।

পুঁথি-পুস্তকে স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলো সাধারণ-বিধি লিপিবদ্ধ

হয়েছে—বেশলো প্রতিটি মানুষেরই অবশ্য পালনীয়। শরীর ও মজবুত রাখতে হলেই নিরামিত্ত জ্ঞান, আহাৰ ও ঘুম চাওয়া-পর্যাপ্ত একটু বেশ ভালো ধরনের চাই, আর সর্বোপরি নিশ্চিন্ত ও বলিষ্ঠ মন। কিন্তু কার্যতঃ এ সব নিয়মকানুন অল্পক্ষেত্রে পালিত হয় না এবং এ অক্ষমতার পিছনে রয়েছে একটি বৈ একাধিক কারণ। যেখানে অর্থনৈতিক দুর্গতি ব্যাপক, বাঁচবার চন্দ্রাশ্রম দিয়ে দিয়ে যে সমাজে মানুষের মেরুদণ্ড গেছে বঁকে, সেখা স্বাস্থ্যবিধি কার পক্ষে কতটুকু রক্ষা সম্ভব? তবু এর ভেতরই নিবে অবহেলার দরুণ স্বাস্থ্য বেন ভেঙ্গে না পড়তে পারে, সেদিকে বনজর না রাখলে নয়।

বর্তমান অগণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে সাধারণতঃ যেটি ল করা যায়, অসুস্থ বখন হয়ে গেলো, তখনই মাত্র চিকিৎসার কথা হ অসুখ বাতে শরীরে দেখা দিতে না পারে, সেই প্রতিব্যবস্থার সুরে এ সমাজে কোথায়? সহস্রাঙ্কলে জনমত সজাগ থাকার ব্যবস্থা যেটুকু চালু আছে, পল্লী অঞ্চলসমূহ এদিক থেকে এখনও বর্ষেই উপেক্ষা এই অবস্থায় ব্যষ্টিগত স্বাস্থ্য তথা সঙ্গঠিত স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, এ রাখলেও অর্থ হবে না। এক্ষণে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কয়ে মতামত পর্যালোচনা করা যাক। ভাল স্বাস্থ্য নেহাৎ ভাগ্যের ব্যা কিনা, এ প্রশ্ন ওঠানো হয়েছে এবং এই নিয়ে গবেষণা-আলোচন করেছেন বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা। বিলেতের চিকিৎ গবেষণা পরিষদের বিভাগীয় ডিরেক্টর ডাঃ জেরেমি মরিস এই অভি প্রকাশ করেছেন—ভালো স্বাস্থ্য ঠিক টাকা-পয়সার ওপর নি করে না। সে টাকা-পয়সা কোন্ সুস্থ বা পছন্দ ব্যয়িত হলো, আর ক্ষেত্রে সেইটিই বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। ভালো মন চি ভালো পরিবেশের মধ্যে থাকলে অনেক বিপদ থেকে রেহাই পা সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগরিকরা নিজেদের স্বাস্থ্য-সমস্যা চি নিজেদের ভেতর আলোচনা করতে পারেন এবং এরূপ চি আলোচনার সুকলও পাওয়া যায়। হাতে টাকাকড়ি আসার প এমন অনেক লোক আছেন যারা সুস্থ পরিবেশের জন্তে ব নন, বদৃচ্ছা জীবন যাপনেই বাদে মনের তাগিদ। শরী সঙ্ক্ৰামক ব্যাধিগুলোর আবির্ভাবের দ্বার খুলে রাখা এমনিভাবে। যারা নিরক্ষর বা সামান্ত শিক্ষিত, স্বাস্থ্যের এ তাদের অনেকেই উদাসীন বলেই যে কোন কাকে বিপদ দেখা যে সহজ কথায় জীবিকার মান উন্নয়ন বা দায়িত্বের বিলুপ্তি—ওপু হলেই হবে না, উন্নত স্বাস্থ্যের অল্প আরও কিছু চাই, বিশেষত চাই স্বাস্থ্য বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা।

একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়, যারা খেটে খেতে অভ্যস্ত, তা শরীর অল্প সকলের তুলনায় ভাল। আর যারা একান্ত আশ্রমপ্রী কর্মবিমুখ, তাহাদের প্রায় একটা না একটা অসুস্থ লেগেই থাকে শ্রমজীবীদের মাঝে ক্ষয়রোগের (করোনারী) আক্রমণ খুব কম দেখা যায়, অথচ যারা কায়িক শ্রম এড়িয়ে চলেন, ক্ষয়রোগীর সংখ তাঁদের মধ্যেই বেশি। বিলেতের চিকিৎসা-গবেষণা পরিষদের সামা ইউনিট দশ বছর এই ব্যাপারে গবেষণা চালিয়ে এমন অভি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে কর্মবিমুখ লোকদের বত কম ব ও বতটা সহজে রোগ দেখা দেয়, কর্মব্যস্ত মানুষের শরীরে সে রোগ অল্পপ্রবেশ করতে পারে না, এ পরীকার দেখা গেছে।

নাট্যগান বাঙ্গলা

স্বর ও শ্রুতি-তত্ত্ব

আমাদের কণ্ঠস্বরকে আমরা দু'প্রকারে ব্যবহার করি—
ভাবাকথনে ও সংগীত পরিবেশনে অর্থাৎ কথা বলায় ও
নি কবায়। একই কণ্ঠের ধ্বনি ভাবরূপে ভাব প্রকাশ করে,
যদি সেই ধ্বনি সংগীতোপযোগী হলে গান-রূপেও ভাব প্রকাশের
বিধ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে যোঝা যায় স্বর
দুই অর্থে দুই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়—ব্যাকরণের ক্ষেত্রে
সংগীতের ক্ষেত্রে। বর্তমান প্রবন্ধের মূল্যায়ন প্রধানতঃ সংগীতের
ক্ষেত্রে স্বর ও সমীচীনতা: ব্যাকরণের ক্ষেত্রে স্বর সম্বন্ধ সংক্ষেপে
হু আলোচনা করব।

আমাদের সংগীতে 'সপ্তক' শব্দটি বহুল-বিদিত। সাতটি স্বরের
ই সপ্তক-পদবাচ্য। এই সাতটি স্বরের উচ্চারণ—সা রে গা মা
ধা নি। কিন্তু এ হল সংক্ষিপ্ত রূপ। আসলে স্বরগুলির পূর্ণ
যথাক্রমে বড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ঐষভ ও
দাদি। এর মধ্যে বড়জ প্রায়ে বড়জ, ঋষভ ও গান্ধার স্বরত্রয়ের
পর ক্রমিক অল্পপাত পঞ্চম, ঐষভ ও নিষাদ স্বরত্রয়ের পরস্পর
মক অল্পপাতের সহিত তুল্য-মূল্য। অর্থাৎ পঞ্চমকে বড়জ
ভাবে ধরলে পঞ্চম, ঐষভ ও নিষাদ যথাক্রমে বড়জ, ঋষভ ও
দাদি হয়। তিন স্বরবৃত্ত এই দু'প্রস্থ স্বরের মধ্যস্থিত (মধ্য
বোধক) মধ্যম বোগসূত্র স্থাপনা করে সপ্তক গঠন করেছে।
কোর সাতটি স্বরের মধ্যে বড়জ (বড়জ নয়—ড হসন্ত, জ হসন্ত
) স্বরের স্থান প্রধান। 'বড়জি: জায়তে' এই অর্থে বড়জ;
১৫ যে স্বরের অল্পপাতে বাকি ছটি স্বরের (ঋষভ, গান্ধার,
ম, পঞ্চম, ঐষভ ও নিষাদ) স্থান স্থিরীকৃত হয় সেটিই বড়জ।

প্রাচীন কালে আমাদের সংগীতে এক সপ্তকে এই দু'টি স্বর
দ্বিগুণ আয়ো ছটি স্বর বিশেষ নামে পণ্য হত, যথা—অন্তর
দাদি ও কাকলী নিষাদ। সংগীতের এই সব স্বরের সঙ্গে
স্বরণশাস্ত্রের অ, ই, উ ইত্যাদি স্বর গভীর সম্বন্ধযুক্ত। ব্যাকরণ-
ক্ষেত্রে স্বর বলতে সেই বর্ণগুলি বোঝায়, যেগুলি উচ্চারণের জন্য
কোনো বর্ণের সাহায্য আবশ্যক হয় না। সংগীতশাস্ত্রে
যদি যেমন বড়জ, ঋষভ, গান্ধার ইত্যাদি বোঝায়, ব্যাকরণ
ক্ষেত্রে স্বর দ্বারা ভেদনি অ, ই, উ ইত্যাদি বর্ণ বোঝায়। সংগীতের
ও ব্যাকরণের স্বর যে পরস্পর গভীর সম্বন্ধযুক্ত, নিরোদ্ধৃত
দিকা ১ থেকে তা পরিষ্কৃত হবে—

১। পণ্ডিত ওকারমাধ ঠাকুরকৃত 'প্রণবভারতী' গ্রন্থ থেকে
৩৩ অনুবাদিত।

ব্যাকরণের স্বর	ব্যাকরণের স্বরের দার্শনিক অর্থ	সমকক্ষ সংগীতের স্বর	সংগীতের স্বরের ভাবরূপ বা বৈশিষ্ট্য
অ	অক্ষর ব্রহ্ম বা নিষ্ঠুর ব্রহ্ম	বড়জ	বটচক্র থেকে উৎপন্ন ও বটচক্রের অনক
ই	শক্তি	ঋষভ	বীর্ষ ও পরাক্রমের স্তোত্রক
উ	পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বা সন্তোষ ব্রহ্ম	গান্ধার	শৃঙ্গার, করণ রসের স্তোত্রক
ঋ	পরব্রহ্ম	অন্তর গান্ধার	বিজ্ঞানের স্তোত্রক
৯	পরমেশ্বরের মনোবৃত্তি, কাকলী নিষাদ	কাকলী নিষাদ	বিকাশের স্তোত্রক
এ	শিব ও শক্তির মিলিত ভাবরূপ	মধ্যম	শান্তরস, গভীর ভাব
ও	সন্তোষ ও নিষ্ঠুর ব্রহ্মের মিশ্ররূপ	পঞ্চম	আগৃতিশূচক
ঐ	ব্রহ্ম ও জ্ঞানের একরূপতা	ঐষভ	দুই রূপ—এক রূপে শান্ত, যুহু; দ্বিতীয়, ক্রিয়ামুক কথা উন্নতা ভয় ও দুঃস্বপ্নার ভাব
ঔ	বিধে পরমতত্ত্বের ব্যাপকতা	নিষাদ	শৃঙ্গার, করণ রস

এই তালিকার ব্যাকরণের স্বরের আ, ঐ ও উ উল্লিখিত হয়
নি। কারণ, আ—অ+অ, ঐ—ই+ই এবং উ—উ+উ,
অর্থাৎ প্রত্যেকটিই দু'স্বরের দ্বিগুণ মাত্র। তা ছাড়া, অন্তর
ব্যাকরণের স্বর, অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদ সহ নংটি সংগীতের
স্বরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অবশ্য এ সম্বন্ধে আরো অনেক বিচার-
বিশ্লেষণের ক্ষেত্র আছে, বর্তমান প্রবন্ধে ধার আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে বলার আছে উল্লিখিত
তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন বড়জ প্রায়ে স্বরাবলী ও
ব্যাকরণের স্বরাবলী বান্ধ সঙ্ক-যুক্ত বিশেষ বিশেষ স্বরসমষ্টি
দ্বারা গঠিত বিশেষ বিশেষ রাগে ব্যবহৃত স্বরাবলীর একটি
সামগ্রিক ভাব-রূপ প্রকাশ পায়। আবার, রাগ গানে বোঝিত
হলে সেই গানই সার্থক হয়, যে গানে রাগের ভাব-রূপটি
গানের কথা কাজের ভাব-রূপের সঙ্গে সমঞ্জস হয়। আমাদের
সংগীতের প্রাচীন যুগের আচার্যগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ
ছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

এবারে প্রতি প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রতি কাকে বলে? বা শোনা যায় তাই প্রতি? কথটা মেনে নিলে বর্ধে কাক থেকে যায়। তা হলে প্রতি কাকে বলব? বা স্বরের শুদ্ধ অশুদ্ধ অথবা অবিকৃত ও বিকৃত অবস্থার কারণ, বা স্বরের উচ্চতা নিম্নতা পার্থক্যের মানদণ্ড, বা স্পষ্টরূপে প্রয়োগ হলে স্বর-রূপে গণ্য এবং প্রয়োগ না হলে প্রতিরূপে গণ্য, বা স্বর থেকে ভিন্ন হয়েও অভিন্ন এবং গমকাদি প্রয়োগে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্বর অভিব্যক্তির সহায়ক, সেই অম্বরগনাস্বক ও অম্বরঙ্গক প্রবণবোগ্য ধনিকে প্রতি বলে।

আমাদের সংগীতের প্রাচীন আচার্যগণ এক সপ্তকে সংগীতোপযোগী, প্রবণবোগ্য, অম্বরগনাস্বক ও অম্বরঙ্গক এরূপ বাইশটি ধনিস্থান গণ্য করেছেন এবং তাদের প্রতি আখ্যা দিয়েছেন। তা ছাড়া আরো নূন প্রত্যন্তর আছে। কিন্তু সে-সব নূন ধনি কানে শুনে অমুভব করা ও অমুভব করানো এবং প্রত্যেক ক্রিয়ায় প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। একত্র আবহমান কাল থেকে বাইশটি প্রতিই স্বীকৃত হয়ে আসছে। বাইশটি প্রতির নাম যথাক্রমে এইরূপ—১, তীত্রা ২, কুমুদতী ৩, মন্দা ৪, হ্রস্বাবতী ৫, দয়াবতী ৬, বঙ্গনী ৭, রক্তিকা ৮, বোত্রী ৯, ক্রোধা ১০, বঞ্জিকা ১১, প্রসারিণী ১২, শ্রীতি ১৩, মার্জনী ১৪, ক্ষিতী ১৫, রক্তা ১৬, সন্দীপনী ১৭, আলাপিনী ১৮, মদন্তী ১৯, রোহিণী ২০, রম্যা ২১, উগ্রা ২২, কোমিনী। প্রাচীন বড়ঙ্গ গ্রামে তীত্রাকে প্রথম প্রতি গণ্য করে চতুর্থ প্রতি হ্রস্বাবতীতে বড়ঙ্গ, সপ্তম প্রতি রক্তিকাতে ঋষভ, নবম প্রতি ক্রোধাতে গাঙ্কার, ত্রয়োদশ প্রতি মার্জনীতে মধ্যম, সপ্তদশ প্রতি আলাপিনীতে পঞ্চম, বিংশ প্রতি রম্যাতে ধৈবত ও দ্বাবিংশ প্রতি কোমিনীতে নিবাদ ব্যবহৃত ছিল। তা ছাড়া ছিল অম্বর গাঙ্কার ও কাকলী নিবাদ যথাক্রমে একাদশ প্রতি প্রসারিণী ও দ্বিতীয় প্রতি কুমুদতী-আশ্রয়ী। এ সম্পর্কে পরমপুণ্য আচার্য ভরত ঋষির নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

বড়ঙ্গচতুঃপ্রতিজ্ঞৈঃ ঋষভাঙ্গিপ্রতঃ সূতাঃ।
 দ্বিপ্রতিশ্চাপি গাঙ্কারো মধ্যমশ্চ চতুঃপ্রতঃ।
 চতুঃপ্রতিঃ পঞ্চমঃ স্তাৎ ত্রিপ্রতিধৈবতস্তথা।
 দ্বিপ্রতিস্ত নিবাদঃ স্তাৎ বড়ঙ্গগ্রামে স্বরান্তরে ॥

—নাট্যশাস্ত্র

অর্থাৎ, বড়ঙ্গ চার প্রতি, ঋষভ তিন প্রতি, গাঙ্কার দুই প্রতি, মধ্যম চার প্রতি, পঞ্চম চার প্রতি, ধৈবত তিন প্রতি ও নিবাদ দুই প্রতি—বড়ঙ্গগ্রামের স্বরান্তর এরূপ।

প্রাচীন কালে গায়ন ও বাদনক্রিয়া বীণা বন্ধে আধারিত ছিল। বীণার উপরিভাগে মেরুকে শূন্য ধরে সেখান থেকে চার প্রতি অন্তরে দ্বিতীয় পর্যায় হ্রস্বাবতী প্রতিতে বড়ঙ্গ এবং তারপর উল্লিখিত প্রতি-ক্রমায়ুক্ত নির্দিষ্ট পর্যায় অন্তর স্বর ব্যবহৃত ছিল। এই ভাবে ব্যবহৃত স্বরগ্রামই বড়ঙ্গগ্রাম নামে পরিচিত। এই বড়ঙ্গগ্রামে বড়ঙ্গ, মধ্যম ও পঞ্চম চতুঃপ্রতিক, ঋষভ ও ধৈবত ত্রিপ্রতিক, এবং গাঙ্কার ও নিবাদ দ্বিপ্রতিক। নিম্ন-তালিকা থেকে বিষয়টি পরিষ্কৃত হবে :

বীণার উপরিভাগ প্রতির ক্রমিক সংখ্যা প্রাচীন বড়ঙ্গ

থেকে পর্যায়-সংখ্যা	ও নাম	গ্রাম
	১ তীত্রা	
১—২	কুমুদতী ...	(কাকলী নিবাদ)
	৩ মন্দা	
২—৪	হ্রস্বাবতী •••	বড়ঙ্গ
	৫ দয়াবতী	
	৬ বঙ্গনী	
৩—৭	রক্তিকা ...	ঋষভ
	৮ বোত্রী	
৪—৯	ক্রোধা ...	গাঙ্কার
	১০ বঞ্জিকা	
৫—১১	প্রসারিণী ...	(অম্বর গাঙ্কার)
	১২ শ্রীতি	
৬—১৩	মার্জনী ...	মধ্যম
	১৪ ক্ষিতী	
	১৫ রক্তা	
	১৬ সন্দীপনী	
৭—১৭	আলাপিনী ...	পঞ্চম
	১৮ মদন্তী	
	১৯ রোহিণী	
৮—২০	রম্যা ...	ধৈবত
	২১ উগ্রা	
৯—২২	কোমিনী ...	নিবাদ

কিন্তু বর্তমানে উক্ত বড়ঙ্গ গ্রামের মধ্যমকে, ভরতোক্ত অবিদ্যাপী, অবিলোপী ও অজ্ঞ্য মধ্যমকে, বড়ঙ্গ গণ্য করে গায়ন ও বাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বড়ঙ্গের স্থানের এরূপ পরিবর্তনে আভ্যন্তরিক স্বরে প্রত্যন্তর ব্যবহার কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তা হলেও বড়ঙ্গ গ্রামে ও আধুনিক স্বর-সপ্তকে মোট প্রতি-সংখ্যা ঠিক বাইশ-ই আছে। নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে বিষয়গুলি পরিষ্কৃত হবে। উক্ত তালিকায় ক্রমিক প্রতি-সংখ্যা ও নাম, প্রাচীন বড়ঙ্গ গ্রাম, আধুনিক স্বর, বিকৃত স্বর, নাম ও মতান্তর প্রভৃতি উল্লেখ করা হল। আশা করি, তাতে বোধগম্যতার দিক থেকে সুবিধাজনক হবে।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রাচীন বড়ঙ্গ গ্রাম	আধুনিক স্বর	বিকৃত স্বর	মতান্তরে বিকৃত
১	তীত্রা			
২	কুমুদতী (কাকলী নিবাদ)			
৩	মন্দা			
৪	হ্রস্বাবতী	বড়ঙ্গ		
৫	দয়াবতী			
৬	বঙ্গনী			
৭	রক্তিকা	ঋষভ		
৮	বোত্রী			
৯	ক্রোধা	গাঙ্কার		
১০	বঞ্জিকা			
১১	প্রসারিণী (অম্বর গাঙ্কার)			
১২	শ্রীতি			

২। কুলনী : প্রবণাঙ্কভয়ো বতাঃ—সংগীতমহাকব্য।

৩	মার্জনী	মধ্যম	বড় জ
৪	কিত্তী		অতি কোমল ঋষভ
৫	রক্তা		কোমল ঋষভ
৬	সন্দীপনী		প্রাচীন শুদ্ধ (ত্রিশ্রুতি) ঋষভ
৭	আলাপিনী	পঞ্চম	ঋষভ
৮	মদন্তী		অতি কোমল গাঙ্কার
৯	যোহিণী		কোমল গাঙ্কার
১০	রম্যা	ধৈবত	গাঙ্কার
১১	উগ্রা		তীব্র গাঙ্কার
১২	কোমিনী	নিষাদ	মধ্যম
১	ভীরা		তীব্র মধ্যম
২	কুমুদতী (কাকলী নিষাদ)		তীব্রতর মধ্যম
৩	মন্দা		তীব্রতম মধ্যম
৪	ছন্দোবতী	বড় জ	পঞ্চম
৫	দয়াবতী		অতিকোমল ধৈবত
৬	বঙ্গনী		কোমল ধৈবত
৭	রক্তিকা	ঋষভ	ধৈবত
৮	রৌদ্রী		অতিকোমল তীব্র নিষাদ (চতুঃশ্রুতি) ধৈবত
৯	ক্রোধা	গাঙ্কার	(কোমল কোমল অতি কোমল নিষাদ) নিষাদ নিষাদ
১০	বজ্রিকা		অনুকোমল কোমল নিষাদ নিষাদ
১১	প্রসারিনী	(অস্তর গাঙ্কার)	নিষাদ
১২	শ্রীতি		তীব্র নিষাদ
১৩	মার্জনী	মধ্যম	বড় জ

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাচীন বড় জ গ্রামের গাঙ্কার ও নিষাদ, বর্তমান কোমল গাঙ্কার ও কোমল নিষাদের সঙ্গে তুলনীয়, যদিও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বড় জ গ্রামের মধ্যম স্বরকে বড় জ গণ্য করে আত্মপাতিক ভাবে যে আধুনিক স্বরাবলী পাওয়া যায়, তাতে নিষাদ কোমল হয় (খাঙ্কার) কিন্তু আধুনিক শুদ্ধ স্বরসমূহে এই কোমল নিষাদের পরিবর্তে বড় জ গ্রামের অস্তর গাঙ্কারের সঙ্গে আত্মপাতিক সম্বন্ধযুক্ত নিষাদকে (শুদ্ধ) গ্রহণ করা হয়েছে (তালিকা স্রষ্টব্য)।

বর্তমানে সাধারণভাবে বলা হয়, স্বর বারোটি; যথা—বড় জ কোমল ঋষভ, ঋষভ, কোমল গাঙ্কার, গাঙ্কার, মধ্যম, তীব্র মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, ধৈবত, কোমল নিষাদ ও নিষাদ। পূর্বলোচনা থেকে জানা গেছে, এক সমুহে ঋষভ-সংখ্যা বাইশ। উক্ত বারোটি স্বর বাইশ ঋষভের মধ্যে বারোটি স্থান অধিকার করে থাকে, আরো দশটি ঋষভ অতিরিক্ত থেকে যায়। এই ঋষভগুলির কার্যকারিতা কি? এ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে আর একটি তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সেটি হল, স্বর-সংবাদ তথ্য।

আমাদের সংগীতে স্বরসংবাদ একটি অপরিহার্য তথ্য। বিষয়টি সরলভাবে বুঝতে হলে একটি কৃষ্টিভঙ্গের সাহায্য নেওয়া সুবিধাজনক। সামাজিক ক্ষেত্রে বহু ও শকতা শব্দ দুটি পরিচিত। যেখানে

বহু সেখানেই সামঞ্জস্য ও ভাবের আদান-প্রদান হয়। শকতার ক্ষেত্রে তার উল্টা ভাব। সংগীতে স্বরগুলিও পরস্পর বহু অথবা শকতার ভাব ধারণ করে, তাকে বলা হয় যথাক্রমে সংবাদ ও বিবাদ। দুটি স্বরের মধ্যে পরস্পর ধ্বনি-সামঞ্জস্য হলে হয় স্বর-সংবাদ। কিন্তু ধ্বনি-সামঞ্জস্য না হলে বিবাদ উপস্থিত হয়। একটা কৃষ্টিভঙ্গ নেওয়া যাক। তানপুরা বাঁধার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তানপুরা সামনাসামনি রাখলে মাঝখানের তার দুটি বড় জে, ডান দিকের প্রথম তারটি মন্ত্র পঞ্চমে ও বাঁ দিকের শেষ তারটি মন্ত্র বড় জে বাঁধা হয়। উক্ত রীতিতে তানপুরা ঠিকভাবে মেলানো হলে বড় জের সঙ্গে পঞ্চমের সংবাদ সাধিত হয় এবং আওয়াজ সুবেলা মনে হয়। বড় জের সঙ্গে পঞ্চমের তেরো ঋষভ্যন্তর (তালিকা স্রষ্টব্য)। এ ক্ষেত্রে বড় জ ও পঞ্চমের মধ্যে তেরো ঋষভ্যন্তরে (বড় জ পঞ্চমভাবে) সংবাদ হয়। কিন্তু পঞ্চমের তারটি কিঞ্চিৎ চড়িয়ে বা নামিয়ে দিলে এই সংবাদ বিঘ্নিত হয়ে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং আওয়াজ বেশুরো মনে হয়। আবার, তানপুরার প্রথম তারটি পঞ্চমের পরিবর্তে মধ্যমে ঠিকভাবে মেলালে বোঝা যাবে, এ ক্ষেত্রেও ধ্বনি-সামঞ্জস্য ঘটে অর্থাৎ বড় জ ও মধ্যমের মধ্যে স্বর-সংবাদ হয়। বড় জের সঙ্গে মধ্যমের নয় ঋষভ্যন্তর (তালিকা স্রষ্টব্য)। বড় জ ও মধ্যমের মধ্যে নয় ঋষভ্যন্তর (বড় জ-মধ্যম ভাবে) সংবাদ হয়। কিন্তু মধ্যমের তার নূনাধিক করলে সংবাদ বিঘ্নিত হয়ে বেশুরো আওয়াজের সৃষ্টি করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, বড় জ ও মধ্যমের নয় ঋষভ্যন্তরে (বড় জ-মধ্যম ভাবে) সংবাদ সাধন করে এবং বড় জ ও পঞ্চম তেরো

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা সবাই জানেন ডোয়ার্কিনের ১৮৭৫ সাল থেকে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার কল লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এম্বল্যান্ড ইস্ট, কলিকাতা - ১

শ্রুতান্তরে (যড়জ পঞ্চম ভাবে) সংবাদ সাধন করে। শুধু তাই নয়, যে কোনো দুটি স্বরের মধ্যে নয় শ্রুতি বা তেরো শ্রুতির অন্তর থাকলে যথাক্রমে যড়জ-মধ্যম ভাবে বা যড়জ-পঞ্চম ভাবে সংবাদ সাধিত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা এ প্রসঙ্গে অসুধাবনযোগ্য।

যড় জ-মধ্যম সংবাদ	যড় জ-পঞ্চম সংবাদ
যড় জ—মধ্যম	যড় জ—পঞ্চম
কোমল ঋষভ—তীত্র মধ্যম	কোমল ঋষভ—কোমল ধৈবত
ঋষভ—পঞ্চম	ঋষভ—ধৈবত
কোমল গাঙ্কার—কোমল ধৈবত	কোমল গাঙ্কার—কোমল
গাঙ্কার (আধুনিক)—ধৈবত	নিবাদ
(ত্রিশ্রুতিক)	গাঙ্কার (আধুনিক)—নিবাদ
	(আধুনিক)
মধ্যম—কোমল নিবাদ	মধ্যম—যড়জ

রাগের বাদী-সংবাদী তত্ত্ব এই যড়জ-মধ্যম ভাব অথবা যড়জ-পঞ্চম ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রাগের বাদী ও সংবাদীর মধ্যে হয় যড়জ-মধ্যম ভাব তথা নয় শ্রুতান্তর অথবা যড়জ-পঞ্চম ভাব তথা তেরো শ্রুতান্তর বিস্তারিত থাকে আবশ্যিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাগের বাদী সংবাদী ঠিক ধার্য হয়েছে কিনা সহজেই যাচাই করে নেওয়া সম্ভব। একমাত্র তন্ত্রানুক রসের রাগের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন মারবা রাগে তীত্র ধৈবত(৩) বাদী ও কোমল ঋষভ সংবাদী। তীত্র ধৈবত থেকে কোমল ঋষভ সাত, শ্রুতান্তর মাত্র যা যড়জ-মধ্যম বা যড়জ পঞ্চম ভাবে বহির্ভূত। কিন্তু যেহেতু মারবা তন্ত্রানুক রসের রাগ, সেজন্য এই রাগের পক্ষে তীত্র ধৈবত কোমল ঋষভের বিবাদের প্রয়োজন আছে এবং সেইজন্যই এই রসে বাদী ও সংবাদী হিসাবে যথাক্রমে তীত্র ধৈবত ও কোমল ঋষভ স্বর গ্রোহ। নয় শ্রুতান্তর ও তেরো শ্রুতান্তর স্বর-সংবাদই প্রধান। তা ছাড়া, হয় শ্রুতান্তর ও সাত শ্রুতান্তর সংবাদও প্রামাণিকভাবে গ্রোহ—অবশ্য এ দুটি অপেক্ষাকৃত অল্প প্রধান সংবাদ।

রাগ রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্বর-সংবাদ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তা না হলে রাগ-রূপায়ণ ব্যাহত হয়। এ দিক থেকেও বিবরণটি আলোচনা করা প্রয়োজন। যেমন, ধরা বাক, ভীমপলাসী ও মালকোব রাগ। দুটি রাগেই কোমল নিবাদ ব্যবহার হয়। দুই রাগে ব্যবহৃত কোমল নিবাদের স্বরূপ অর্থাৎ স্থান (শ্রুতি-স্থান) সম্বন্ধে আলোচনা করলেই বিবরণটি পরিষ্কৃত হবে। পঞ্চম-যুক্ত ভীমপলাসী রাগ পরিবেশন কালে তানপুরার ডান দিকের প্রথম তারটি মধ্য পঞ্চমে বাঁধা হয়। কিন্তু পঞ্চম-বর্জিত ও মধ্যম-যুক্ত মালকোব রাগ পরিবেশনকালে ঐ তারটি মধ্য মধ্যমে বাঁধা হয়। ভীমপলাসী রাগ পঞ্চম-যুক্ত ও মালকোব রাগ পঞ্চম-বর্জিত। এই কারণ ছাড়াও তানপুরার তার উচ্চ সীমিত্তে বাঁধার অল্প গুচ কারণ আছে। বাঁধা যোগ্য গুরুর নিকট রাগ-সংগীতের চর্চা করেন তাঁরা জানেন ও উপলব্ধি করেন, ভীমপলাসীর কোমল নিবাদ সাধারণ কোমল নিবাদ অপেক্ষা এক শ্রুতি উঁচু। কোমল নিবাদ কোমিনী শ্রুতি—আশ্রয়ী (যড় জ গ্রাম দ্রষ্টব্য) এক পঞ্চম থেকে পাঁচ শ্রুতান্তরে অবস্থিত। পূর্বের আলোচনা

থেকে জানা গেছে, পাঁচ শ্রুতান্তরে স্বর-সংবাদ হয় না। সেজন্য ভীমপলাসী রাগে কোমল নিবাদ কোমিনীর পরবর্তী শ্রুতি তীত্রকে আশ্রয় করে এবং পঞ্চমের সঙ্গে যট শ্রুতান্তর বন্ধ করে। তখন তানপুরার পঞ্চমের সঙ্গে তীত্র শ্রুতি-আশ্রয়ী এই কোমল নিবাদের যট শ্রুতান্তর সংবাদ হয়। সে-ক্ষেত্রে তীত্র শ্রুতি-আশ্রয়ী এই কোমল নিবাদ স্বর-রূপ গ্রহণ করে এবং কোমিনী কোমল নিবাদ-রূপ স্বর বর্জন করে শ্রুতি হিসাবে গণ্য হয় ও ভীমপলাসী রাগে প্রয়োগহীন ভাবে থেকে যায়। অপর পক্ষে, মালকোব রাগে কোমল নিবাদ কোমিনী শ্রুতি-আশ্রয়ী ও মধ্যম থেকে নয় শ্রুতান্তরে অবস্থিত। সেজন্য তানপুরার মধ্যমের সঙ্গে এই কোমল নিবাদের নয় শ্রুতান্তরে যড়জ-মধ্যম-ভাবে সংবাদ হয়। সুতরাং মালকোব রাগে কোমিনী শ্রুতি-কোমল নিবাদ স্বর-রূপ ধারণ করে রাগে এবং তীত্র শ্রুতি, বা ভীমপলাসী রাগে কোমল নিবাদের স্ব-রূপ গ্রহণ করেছিল, শ্রুতি হিসাবেই থেকে যায়। সেজন্যই আমাদের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রকারগণ বলেছেন, শ্রুতি ও স্বর পরস্পর পৃথক হয়েও অভিন্ন। তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য রাগগুলি বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে, বিশেষ বিশেষ রাগে বিশেষ বিশেষ স্বরের আশ্রিত শ্রুতি-স্থান পৃথক এবং আবহমান কাল থেকে স্বীকৃত বাইশ শ্রুতিই আমাদের সংগীতের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া-ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। যে রাগে যে শ্রুতিগুলি ব্যবহৃত হয় সে-রাগে সেই শ্রুতিগুলি স্বর-রূপে গণ্য হয় এবং অবশিষ্টগুলি শ্রুতিরূপে গুপ্ত থাকে।

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।

পূজার নতুন রেকর্ড

কলকাতা

- GE 25016—(আধুনিক) "রঙিলা রঙিলা মন নিলায়ে" ও "এইটুকু এই জীবনটাকে।" গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।
- GE 25017—(আধুনিক) "আর ডেকে না সেই মধু নামে" ও "মধুমালতী ডাকে আর।" গেয়েছেন গীতলী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।
- GE 25018—(ধর্ম-মূলক) "আর লুকাবি কোথায় মা কালী" ও "কালো মেয়ের পায়ে তলার।" শ্রীমা-সংগীত গান হুখানি গেয়েছেন পার্শ্বাল ভট্টাচার্য।
- GE 25019—(আধুনিক) "কপালে সিঁহুর সিঁহুর টিপ" ও "আমি ভাবি শুধু ভাবি।" গেয়েছেন স্মিতেন মুখোপাধ্যায়।
- GE 25020—(আধুনিক) "তোমার কেন লাগছে এতো চেনা" ও "নব মঞ্জরী ঐ ফুটেছে।" গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।
- GE 25021—(ধর্ম-মূলক) "সই কেবা তনাইল শ্রাম নাম" ও "সখিগণ সঙ্গে চলি।" কীর্ত্তন হুখানি গেয়েছেন গীতলী হবি বন্দ্যোপাধ্যায়।
- GE 25022—(আধুনিক) "অলির কথা শুনে" ও "আমি দুঃ হতে তোমারেই।" গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
- GE 25023—(আধুনিক) "ও বাঁশী হার" ও "ওগো আর কিছু তো নাই।" গেয়েছেন লতা মজুমদার।
- GE 25024—(আধুনিক) "ওগো আমার মনের" ও "কথা আছে তুমি আজ জানবে।" গেয়েছেন গীতলী হবি

তীত্র ধৈবত—চতুঃশ্রুতি ধৈবত (তালিকা দ্রষ্টব্য)।

GE 25025—(আধুনিক) “তুমি দিয়েছো বত” ও “এ মন ফেরন করে জেনেছে।” গেয়েছেন গায়ত্রী বসু।

GE 25026—(ধর্ম মূলক) “রাধার কি হলো অস্ত্রে ব্যথা” ও “গৌরান্ন না হত।” কীর্ত্তন হুখানি গেয়েছেন কীর্ত্তন-কলানিধি বধীন্দ্রনাথ ঘোষ।

GE 25027—(বিজ্ঞান-গীতি) “তোমায়েই ভালবেসেছি” ও “আগরে বসন্ত ও তোয়।” গেয়েছেন কুঞ্চ চট্টোপাধ্যায়।

GE 30456—(চিত্রগীতি) ‘কানা মাছি’ চিত্রের গান। “এক কথতে গেলে” ও “এই নিবিবিলা বিলিবিলা।” এই গান হুখানি গেয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

P 11934—(পল্লীগীতি) “দূর কোন্ পরবাসে” ও “বাঁশী শুনে আর কাজ নাট।” গেয়েছেন কুমার শচীন দেব বর্ষণ।

N 82887—(আধুনিক) “বদি তুমি না এই গান” ও “এ জীবনে আমি যাবে চেয়েছি।” গেয়েছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

N 82888—(আধুনিক) “কত ব্যথা করে যার” ও “ধুম ধুম এই রাত সুরুর।” গেয়েছেন উৎপলা সেন।

N 82889—(আধুনিক) “দোল দোল চতুর্দলার চড়ে” ও “পাল্লা হীরা চুনী তো নয়।” গেয়েছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

N 82890—(রবীন্দ্র-গীতি) “নিশীথ শয়নে ভেবে রাধি মনে” ও “পথ চেয়ে যে কেটে গেল।” গেয়েছেন কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

N 82891—(আধুনিক) “এই তাঁবু-ঘরে দেখবে এসো” ও “কুসুম মস্তব কুসুম মস্তব।” গেয়েছেন সনৎ সিংহ।

N 82892—(পল্লীগীতি) “ও আমার দরনী” (ভাটিয়ালী) ও “ও কানাই পার করে দে” (সারি গান)। গেয়েছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং অন্নাভ শিল্পী।

N 82894—(আধুনিক) “কত আশা নিয়ে তুমি” ও “আমি যে কত একেলা।” গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

N 82895 (আধুনিক) “ও কালো কোকিল তুমি” ও “বোদ পেয়ানো হলে পাতা।” গেয়েছেন ইলা বসু।

N 82896—(আধুনিক) “আমার না বদি থাকে সুর” ও “জানি তোমার প্রেমের।” গেয়েছেন মান্না দে।

N 82897—(আধুনিক) “সন্ধ্যা বেলায় একটু হাওয়া” ও “কেন এই গান গাওয়া।” গেয়েছেন নির্মলা মিশ্র।

N 82898—(আধুনিক) “এই আঁধারে আমি চলে গেলে” ও “এই মন সেই গান গেয়ে যায়।” গেয়েছেন জামল মিত্র।

N 77014—(চিত্রগীতি) ‘কোন এক দিন’ চিত্রের গান। ‘খোকা এসো খুকু এসো’ ও ‘ওগো পথ তোমার কথা।’ গেয়েছেন জামল মিত্র ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা (৬৮)

শ্রীবিজেন মুখোপাধ্যায়

ওধু বালা দেশে নয়, সমগ্র ভারতের সঙ্গীত-জগতে জনপ্রিয়তার পিথরে পিথরে ধাবমান তরুণ সঙ্গীতশিল্পী বিজেন মুখোপাধ্যায়ের জীবন কাহিনীও এক অপূর্ণ সঙ্গীত।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, ১৯২৭ সালে এই কলিকাতার বুকেই আমার জন্ম। পিতা শ্রীঅতুলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ সন্তান আমি। শ্রীমহাশয় এ, ডি স্কুল হতে শিক্ষা সমাপনান্তে কিছুদিন চাকুরীও করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতচর্চা করে যাচ্ছি। কোন কল্পনা বা কোন খ্যাতির আশা অথবা কোন অহুপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে সঙ্গীত শিক্ষা করি নাই। বাড়ীতে বাবা, মা, ভাই বোন কেউই বিশেষ খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও সকলেই অল্প-বিস্তর গান গাইতে পারেন। ফলে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষের মত গানটা আমাদের সংসারে একটা বাঁধা-ধরা নিঃস্বের মত চলে আসছে। প্রথম জীবনে নিজের শিক্ষক নিজেই ছিলাম। পরে নিজের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না রাখতে পেয়ে সুশান্ত রায় মহাশয়ের ছাত্র হয়ে পড়লাম। জনসাধারণ সুশান্ত বাবুর প্রতিভার সম্যক পরিচয় না পেলেও আমি তাঁর কাছে চিরঞ্চা। সঙ্গীত-জগতে কাঁড়াবার প্রথম শিক্ষা তাঁর কাছেই পেয়েছি। গান শিখছি। তাই উৎসাহ বাড়াবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে অডিশন দিই কিন্তু হৃৎথের বিষয়, আমি নাকি কোন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর স্বর নকল করি, সেই অভূহাতে বেতার বর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেতারশিল্পী বলে মনোনীত হতে পারি নাই। নকল করার উদ্দেশ্য আমার কোনকালে ছিল না এবং নাই। যাহা ঈশ্বরের দান তাহার উপর আমার হাত নাই।

কোন বকম নিকংসাহ না হয়ে সঙ্গীত চর্চা করে যেতে লাগলাম এবং ১৯৪৬ সালে মেগাকোন কোম্পানীতে “তুমি নাই, তুমি নাই” গানখানির রেকর্ড করলাম। এই আমার প্রথম রেকর্ড। এর পরেই ১৯৪৬ সালে পুনরায় অল, ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে দ্বিতীয়বার অডিশন দেওয়ার জন্তে ডাক আসে, যথারীতি অডিশনও দিই এবং এবার বেতারশিল্পীরূপে মনোনীত হই। যতদূর মনে পড়ছে, আমিই প্রথম বেতারশিল্পী, গোড়া হতেই সন্ধ্যার দিকে প্রোগ্রাম



শ্রীবিজেন মুখোপাধ্যায়

পাই। বেতারে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪৬ সাল হতেই কলকাতার নিয়মিত ভাবে রেকর্ড করে বাই। ১৯৪৭ সালে "কুমি কেমন করে গান কর" "স্বামল বরণী ওগো কড়া" "হে মহাপৃথিবী" গানগুলি রেকর্ড হওয়ার পর "জানাগার কাছে বসে আছ।" গানখানি নিজের দেওয়া সুরেই রেকর্ড করি।

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্য মনোনীত হয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার জন্তে রাশিয়া, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলি ঘুরে আসি। বিদেশে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মর্যাদা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি! রবীন্দ্রনাথের দেশে অন্য, তার উপর রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়ক আমার আদর দেখে কে। ১৯৫৭ সালে সলিল চৌধুরীর পরিচালনায় বোধেতে জ্ঞান, স্থানিযুন এবং মারা প্রভৃতি চিত্রে গান গেয়ে আসি। বাংলা চিত্রে যে কয়টি বইয়ে গান গেয়েছি তার মধ্যে স্মৃতি পাষণ,

অসবর্ণা, সাপসিকা, ভদ্র, বাতী, বাঁশিওলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৫ সালে সবিতা চাটার্জীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। বর্তমানে কলিকাতার বেতার কেন্দ্রে ছাড়াও রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার জন্তে দিল্লী বেতারকেন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত আছি। তাছাড়া ভারতের প্রায় সমস্ত বেতার-কেন্দ্রে হতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার জন্তে যাবে মাঝে ডাক আসে।

বর্তমানে আমি কোন সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে এসেই গান শিখে যায়। সঙ্গীত-জীবনে বাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছি তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি দা (শান্তিদেব যোব) নীহারবন্ধু সেন, সলিল চৌধুরী, অক্ষয় ঘটক, সুধীরলাল চক্রবর্তী, নটিকতা যোব, অতিথি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর দাশগুপ্ত, প্রবীর মজুমদার এবং রত্ন বুদ্ধোপাধ্যায়ের নাম চিরদিন স্মরণ থাকবে।

কুল-এ বুনো হাঁসের দল

(W. B. Yeats-এর The Wild Swans at Coole-এর

আক্ষরিক অনুবাদ)

চিত্রভাসু বন্দ্যোপাধ্যায়

শায়র হাসির মুক্তা হবে সবুজ গাছের কাঁকে,
রুদ্ধ ধূলায় সরণি-প্রাপ্ত গহন বনের বাঁকে।
প্রদোষ আলোর নিখর জলে আকাশ পড়ে ধরা,
বাড়তি জলের উপল বৃকে ওই বুনো হাঁস ওরা।
উনিশ শরৎ অতীত হ'লো প্রথম গোণার পরে।
গোণা আমার কই হ'লো শেষ? ঐ বে ডানার ভরে
শূন্য ওরা ছড়িয়ে পড়ে মুগ্ধ খুসির বোলে;—
ছিন্ন-মালা সাজায় বেন মুক্ত গগন-কোলে।
কী অপরাধ উজ্জল গাথা—তাকিয়ে আমি থাকি,
ব্যথিত মম হৃদয় আজি বিবাদভায়ার ঢাকি।
'কুল'-এর এ তীর সেদিন ছিল প্রদোষ আলোর ঢাকা,
উড়তে ছিল সেদিন তারা কাঁপিয়ে তাদের পাখা,—
অপলক সেই প্রথম দেখা—হাঁকা চরণ ফেলে,
হায় যে আমার সেদিনগুলো হারিয়ে কোথায় গেলে।
ক্লাস্তিহীন কিন্তু এরা মুগ্ধ যুগলভায়।
নীল আকাশে, শীতল জলে ব্যস্ত মুখরভায়।
কোমল ওদের হৃদয় মাঝে সময় অচল নাকি?
বাক না বেথায় পাখনা মেলে আবেগপ্লুত পাখী।
নিখর জলে ভাসছে বেশ! ত্যজি এমন তীর
নলখাগড়ার অস্ত কোথায় বাঁধবে পুনঃ নীড়?
হঠাৎ জেলে দেখবো যেদিন, চলেই গেছে তারা—
কোন সে হৃদয়ের মাছ সেদিন পাবে খুসির ধারা?

চ্যুতি

উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লাস্ত রুগ, আঘাত-কালো মেঘ-সজল দিন,
বনবীথিতে ত্রস্ত মুগী চপল চোরা আঁধি—
অনেক দূরে স্মৃত্তমু ঝড়ু সুরণ মুগ ফেবে,
চকিত তার পদধ্বনি শুনতে পেলো না কি?

বহুধা পথ বহু বিপদ জেনেছে মুগী বলে,
ঝঞ্জা স'রে কেটেছে তার বয়ঃসন্ধিরুগ,
কিশোরী ছিল, যৌবনের চাক্র আবেশ এলো,
অপরিচিত ব্যঞ্জনাতে ভরেছে তার-ও মন।

পরিমাতারা দেহের সাথে চরণ ছিল লঘু,
এসেছে বতো লুপ্ত মুগ জীবনে ছায়া ফেলে—
পড়েছে তারা অনেক পিছে, হ'য়েছে আঁধি ভোর,
প্রদোষ আজ আলোকে ভরা, স্থানি কি আর মেলে।

অপরিণীত পূর্ণভায় তৃপ্ত ছিল প্রাণ,
নিজেকে নিয়ে মগ্নতার কেটেছে দিনরাত—
আজকে তবে কেন এ চ্যুতি, বাঁধন কেন শেষ,
বাইরে-মনে জমেছে ভার, ঘটাতে ধারণাত।

ভূকাতুরা হয়েছে চেয়ে বাঁধনধারার পানে
তৃপ্তি নেই, অকস্মাৎ কেটেছে বেন বতি—
পূর্ণ ছিল জীবন, আজ পূজক এলো ছেয়ে,
ভরণ মুগ আনুক তবে হুঁস্বাধিত গতি।

এ সব ছত্রাকার জিনিষের ভেতর নষ্ট হবার মতো কিছু নেই। পরে সব ঘরে তুলছে সে—নীলের এই জবাব শুনে বাইরের কণ্ঠস্বর বাধারির সীমানা-বেড়ার উপর দিয়ে গলা বাড়ালো,—না, না নীল, জিনিষগুলো ঘরে তোল তুমি এ সবের প্রয়োজন বুঝবে না। কিন্তু তোমার মার কাছে এর একটা হাঁড়ি শিশিও দরকারী। খুব জোর বুট আসবে মনে হচ্ছে। এখন না তুললে বাবে কিছু সব নষ্ট হয়ে।

অগত্যা উঠে গিয়ে নীলকে বলতেই হলো—আচ্ছা তুলছি আমি। মঞ্জু উঠে পাড়ালো—চলুন আমি আপনাকে সাহায্য করি।
—আপনি বসুন। ফের ঘরে এসে চুবল নীল। বললো—আমি এখন ওসব তুলতে বাচ্ছি নাকি।

—আচ্ছা, আপনারই বা দরকারটা কি? আমিই তো তুলে রেখে আসতে পারি—না?

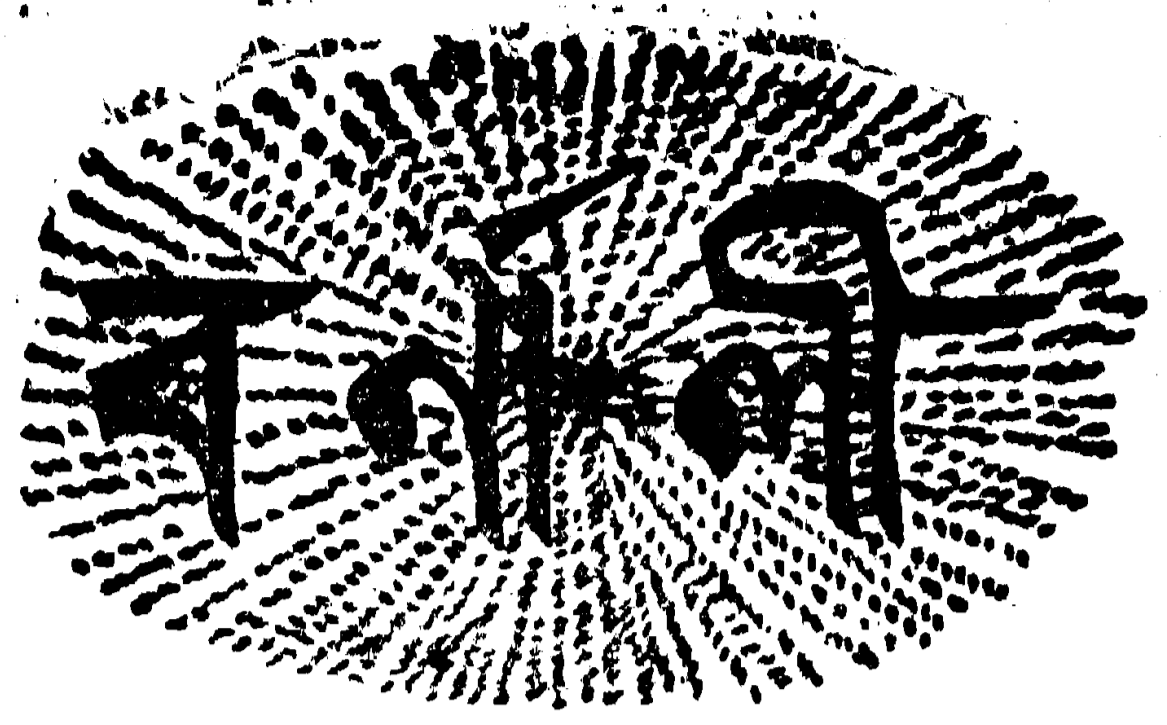
—আরে পাগল নাকি! বসুন আপনি। আছে কি বলুন। কতগুলো হাড়ি-কুড়ি-টিন এই তো। মা চলে যাবার পর ওগুলোয় মুখও খোলা হয়নি। ভেতরে কিছু থাকবার কথা নয়। হয় তো নেই-ও। থাকলেও আজ আর তা থাকার বোগ্য নেই। বুটী আসে তো ধোয়া হয়ে থাকবে। মমতা এসে যদি মনে করে ওগুলো অপরিহার্য তো ঘরে তুলবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। বসুন।

বসল মঞ্জু। বললো—বেশ। তবে শুনি এখন হয়েছেটা কি? কে বা কারা আপনাদের গোটা পাড়াটার সংসার এমন করে বাইরে টেনে ফেলে দিয়ে গেল?

ঘরের ভেতর হাঁটাইটি করতে করতে কথা বলা, কথা শোনা, ভাবা এ অভ্যাসটা রক্তের। নীলের নয়। কিন্তু মঞ্জু দেখলো, আজ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে তিন হাত বস্তুকুই এদিক ওদিক ঘুরকয় হাঁটাইটি করলে নীল। তারপর বে চেয়ারটার বসে টেবিলের উপর কনুই আর হু' হাতের তালুতে মাথা চেপে বসেছিল, সেটার ঠা বসে এসে বসল সে মঞ্জুর কাজের চৌকির সঙ্গে লাগানো বেতের চেয়ারে। বসেই আবার উঠল। সিগারেট আর দেশলাইটা নিয়ে এলো টেবিল থেকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে দেশলাই আর গ্যাকেটটা একটু ছুঁড়ে দেওয়া ভাবে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বললো—জ্বর-দখল কলোনী কাকে বলে নিশ্চয়ই জানেন?

—জানি।

—এটা হলো সেই জ্বর-দখল কলোনী। অনাবাদী পতিত মিতার সাপখোপ জঙ্গল নিয়ে পড়েছিল মনুষ্য বসতি থেকে হু'য়ে। একদল রাজনৈতিক-বলির মানুষ এলো। আশ্রয় নিল। জল কাটলো। বন পরিষ্কার করলো। দরমা-মাটি-টিন-বাঁশের লা তুলে—ঘর বানালো। ঘর—একটা দুঃখের তির্যক রেখা ঠিলে ওপর হাসির টানে টেনে নিলে নীল—ঘর, কিছুই নয়, ধু' একটা আশ্রয়। জীবন-যাত্রার একটুকরো নিশ্চিন্ততা। আড়ালে সে উপোষ করবার আর সুত্বা এলে রুচু রাস্তার উপর না মরে। কিছু নির্জনে নিঃশব্দে চোখের পাতা ছুটি বুজবার একবিশু মর্বাদী—ই তো। হঠাৎ রাশ টেনে আবেগ সংবত করলে নীল। একেবারে উত্তর কণ্ঠে বললো—তা জমির মালিক ইচ্ছে করলে প্রথমেই হয়ত মাথা দিতে পারতো। কিন্তু হয়নি। পড়ে জমি, পড়ে আছে। আরো বহু কাল ধরে পড়ে থাকবে। তার চাইতে মানুষ আশ্রক। শক্তি পড়ে উঠুক। জমি বাবে কোথায় বতকণ পূর্ণপূর্বের পকাশ কা দিয়ে কেনা পকাশ বিবে জমির হলিগটি মুঠোর রয়েছে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

হাতের সিগারেটটা ঘরে ফেললেও ক্রটি ছিল না। আরো ক'রটা সিগারেটের টুকরো মেঝের ওপর ইতস্ততঃ পড়ে রয়েছে। দরজা খোলা ছিল বসেই বোধ হয় বাইরের দিকেই এবার সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলল নীল। বললো—অবশি মালিক ব্যক্তিটি জানেন, খুব সহজে সুবিধে করে ওঠা বাবে না। তাই পথ বেছে নিয়েছেন অতর্কিতে হামলা করে তখনই করে দিয়ে যাওয়ার। আমাদের শক্তি হবে না লড়াই করবার, না লাঠি ঘায়া, না আইনের দরজায় অর্থের দ্বারা।

মঞ্জু বসে রইল।

নীল উঠে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। নীরবে কতটুকু সময় পারচারি করলো। তার পর এক সময় বলে উঠল—গিয়েছিলাম ভুললোকের কাছে। কিন্তু এক মারোয়াড়ী জমির টাকা নিয়ে বসে আছে। সে এখানে বং-এর কল বসাবে। ভুললোকটিরও আত্ম টাকার প্রয়োজন। কংগ্রেস নমিনেশন পেয়েছেন। সামনের ইলেকশনে পাড়াচ্ছেন—

—ও, সেবার জন্ত তৈরী হচ্ছে না—বুঝি বলতে বাচ্ছিল মঞ্জু। প্রথম মুখ খুলতে বাচ্ছিল মঞ্জু কিন্তু খুললো না সে। 'সেবা' শব্দটা উচ্চারণ করতেও আজকাল ওয় ঘৃণা হয়—হাঁ, ঘৃণা হয় মঞ্জুর। শুধু উচ্চারণ করতে নয়—শুনলেও হুকানে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছে করে ওয়। মঞ্জুর মনে হয়, 'সেবা' কথাটা যদি আজ হারিয়ে যায় তবে, দেশটা বিনির মতো কেঁদে উঠবে 'হারিয়ে গেছি আমি' বলে।

মাটির দিকে চোখ রেখে পারচারি করতে করতে নীল বেন নিজেকেই প্রশ্ন করতে লাগল—এখন কথা হলো, মানুষগুলোকে নিয়ে বাই কোথায়! ষ্টেশনে, বেত্তিয়ার, বিহার দণ্ডকারণ্যে—কোথায়?

—নীল আছো নাকি হে? ডাক এলো বাইরে থেকে। নীল সাড়া দিলে তারা দরমার দরজা ঠেলে এসে ভেতরে ঢুকে উঠানে পাড়ালো। এখন কি করা কর্তব্য—পরামর্শ করতে এসেছে তারা নীলের সঙ্গে।

মঞ্জুকে একটু বসতে বলে উঠানে নেমে এলো নীল। যেমন বসেছিল তেমনি হু' হাত কোলের উপর রেখে টান হয়ে বসে রইল মঞ্জু। বেন ছবি তুলতে বসেছে সে।

ঘরের আলোটা বে' জনার মুখের ওপর এসে পড়েছে, তাদের দিকে তাকিয়ে রইল মঞ্জু। উদ্বিগ্ন কাতর শব্দায় ভরপুর কতগুলো মুখ—দখল তো নীল দেশের ব্যাপার? দিনে ডেকে নিয়ে, রাতে

পাগলা কুকুর কেপা হাতি ছেড়ে দিচ্ছে। ঘরে দিচ্ছে আঙন লাগিয়ে। কে ভেবেছিল এমন অবস্থা হবে বলো? তবে কি...এ অবস্থায়... ষ্টেশনে...কিন্তু কথা হলো তোমার মা মাসিমারা...ষ্টেশনের ঐ — বাইলা-বাতাস তাদের গায় জড়ানো কোচার খুঁট, মাথার চুল উড়িয়ে বয়ে যেতে লাগল। পাঁথের একটা দীর্ঘ টানা শব্দ উঠে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। নীলেরের বাড়ীর সামনে টিউবওয়েলটার ঘটং ঘটং শব্দ উঠতে লাগল জল তোলায়। আসবার পথে যে মেয়ে বৌদের হারিকেন লঠন হাতে করে কলের জল পাশ্প করতে দেখে এসেছিল তাদের জল তোলা এখনও চলছে। আজ হাজারিয়ার জল হয়তো কাকুরই সন্ধ্যায় জল তোলা সম্ভব হয়নি।

যে মেঘটার কথা বলে এই কিছুক্ষণ পূর্বে নীলকে বৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করে কে যেন জিনিষপত্রগুলো ঘরে তুলতে বলে গিয়েছিল। সেই মেঘটা এখন আকাশ কালো করে গুমোট বেধে রয়েছে কিনা মঞ্জু জানেনা। নীলের ঘরের দরজা এমন উঁচু নয় যে আকাশ দেখা যাবে। মেঘ থেকে থাকলেও বৃষ্টি নামেনি। আকাশ ভরা বৃষ্টি যে কোন মুহূর্তে মাথার নেমে আসার কথা ভাবছেও না কিন্তু এরা। এখানে তো নীলের ঘর রয়েছে, দাঁড়া রয়েছে। মাঠের উপর থাকলেও বোধহয় ভাবতো না। গিয়ে আশ্রয় নিত গাছের তলায়। পাতাগুলো আশ্রয় চেষ্টা করতো এদের মাথাগুলো বাঁচাতে। কিন্তু পারতো না।

এই যে কোচার খুঁট গায়ে তুলে দিয়ে ভেঙ্গে বাওয়া চোরালো, বিধ্বস্ত চেহারার বারা ঝড়িয়ে আছে, ব্যক্তি হিসাবে মঞ্জুর এঁরা কেউ চেনা নয়। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে সবাই ওর চেনা, জানা, দেখা। পূর্ব বাংলার মেয়ে সে। এঁরা অপরিচিত হবে ওর কাছে কি করে। ঐ যে জল তুলছে মেয়েরা টিউবওয়েলে ঘটং ঘটং শব্দ তুলে, ও তাদের দেখেছে নদীর জলে কলসী ডুবিয়ে জল তুলতে। ভরা জল ছলছলিয়ে ঘরে ফিরতে। ভরা পদ্মার টানে ভরা কলসী উপর করে কেয় জলতে আনতে যেতে।

পদ্মা—পাড়াপাড় লীন পদ্মা তার চেউ, তার উত্তাল জলরাশি নিয়ে ছুটে চলেছে সমুদ্র সঙ্গমে। ঘূর্ণিল মস্ত মস্ত ঘূর্ণিসৃষ্টি করে, পাক খেতে খেতে ছুটে চলেছে যেন কোন অতল পানে। লম্বা লম্বা জেলে নৌকো জাল ফেলছে। মাছ ধরছে? ইলিশে মাছ ধরা জালের ছোট ছোট বাঁশের খুঁটি চেউএর দোলায় ডুবছে ভাসছে। রূপালী রোদ চিক্চিক করছে নদীর বুকে রূপায় চেউ তুলে। পাড় ভেঙ্গে পড়ার শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে ঝপ্ ঝপ্। গ্রামান্তরের নৌকো এসে লাগছে পাড়ে। সতর্ক মাঝি নৌকো বাঁধছে সাবধানে? ছেলেরা নৌকে থেকে লাফিয়ে পাড়ে নামে—মেয়েরের নামাচ্ছে হাত ধরে ধরে—

কুশল জিজ্ঞাসা করতে করতে, সংবাদ দিতে আর নিতে নিতে, এর বাড়ীর উঠোন, তার বাড়ীর পুকুর পাড়, ওর বাড়ীর ঘানের গোলার পাশ দিয়ে যেতে দেখেছে মঞ্জু বাদের এরাই তো তারা। মঞ্জুর অচেনা হবে কি করে এরা। আজ তাদের সেই বাড়ীঘর, জোত জমি, বাগান পুকুর কোথায় গেল? এরা নিঃশব্দ হল কেন। এক টুকরো জমি, এক কলসী জলের জল এরা মেয়ে পুকুরা বিজ্ঞানের মতো ছুটোছুটি করছে কেন?..দেখছ তো ব্যাপার স্যাপার দিনে ভেঁকে নিয়ে যাচ্ছে; রাতে ঘরে আঙন লাগিয়ে দিচ্ছে—

আর তারপর লোকগুলোর উর্দ্ধ্বাস দৌড়ের দিকে আজুল দেখিয়ে বলছে, ঐ দেখো ঘরখুঁচো বাজালী। ছুটেছে ঘরের দিকে। আমরা কি করবো।

সবাই চলে গেলে নীল এসে ঘরে ঢুকল। হুহাতে মাথাটা চেপে ধরে বাঁকি দিতে দিতে বললো, মাথাটা জমাট বেঁধে আছে। একটু চা না হলে চলছে না। চলুন কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক।

নীরবে উঠে পাড়ালো মঞ্জু।

দরজায় তাল দিতে দিতে নীল হাসল। বললো, জানি নেওয়ার মতো কিছুই নেই তবু তাল না দিয়ে শান্তি নেই—সত্যি মামু একটা অদ্ভুত সৃষ্টি।

দরজায় তাল ঝলিয়ে পোছন ফিরে দেখল মঞ্জু উঠানের ছড়িয়ে থাকা টিন কোটো তুলে তুলে বুক হাতে জড়ো করছে।

—এ কি করছেন।

—জিনিষগুলো তুলে রেখে যাই। একটা ছড়ানো সংসারের ওপর দিয়ে কি কোন মেয়ে হেঁটে চলে যেতে পারে।

নীল এগিয়ে এলো আরো কাছে।—আচ্ছা, আপনিই বলুন, এগুলো এখন তোলার মানে হয় কোন? বারা টেনে কেলে দিয়ে গেছে, তারাও হু আজুলের বেসী চার আজুলে ধরায়—সন্মান দেখনি। টিনগুলোর গড়িয়ে পড়া মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে উঠোনঘর ছোটাছুটি করেছে বত আরশোলা—আমার বা কষ্ট হয়েছে সে ঐ আশ্রয়চ্যুত আরশোলাগুলোর জন্ত। নইলে ঘর দোর—পরিষ্কার হয়ে তো আমি বন্ধ পেয়েছি।

তবু মঞ্জু বললো—ঐ দাঁওয়ার উপর রেখে যাই?

—আপনি কিন্তু আমার আত্মদাম্পনে আঘাত করছেন। আপনি রাখুন—বলে মঞ্জুর রাখার অপেক্ষা করলে না। নিজেই নীল তার হাত থেকে কোটোগুলো নিয়ে ছুঁড়ে কেলে দিলে উঠানের ওপর তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে দিয়ে বললে, নিন মুছুন হাতটা। ইস; দেখুন তো শাড়িটার কি হাল করছেন।

মঞ্জু হাত দিয়ে কাপড়টা ঝাড়লে। বেরিয়ে আসতে আসতে একবার আকাশের দিকে তাকাল। তেমনি কালো—মেঘে ঢাকা আকাশ। মাটি ভিজে আরো এক আধবার গুঁড়ো বৃষ্টি বোধহয়—বয়ে গেছে। হুজনে নীরবে পথ চলতে লাগল। রাস্তার বাতির ব্যাসের তলাটুকুতে একটু উজ্জ্বল আলো। তারপর সেই আলো তরল হতে হতে কিছু দূরে মিলিয়ে গিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে। আবার কতটুকু ব্যবধানে আবার একটি আলো। তার তলার ব্যাসটুকু তেমনি আলোকিত। তারপর সেই আলো আবার তেমনি তরল হতে হতে অন্ধকারে কেয় মিশে গেছে। হুজনে মাথার উপর আকাশ ভরা মেঘ, পায়ের তলায় কাঁচারাতার জল কাঁচা মাটি আর এই আলো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। যে নীলকে দেখে সেই খেমে পড়ে। জীত অসহায় চোখে তাকায় তার মুখের দিকে। জিজ্ঞাসা করে, এখন কি করা যায়, মারোয়াড়ী যে টাকা দিতে চাচ্ছে, তার কিছু কম সমণ্ড ওয়া যদি ঘরে দেয় তবে ও মালিক জমি তাদেরই দিয়ে দেয়। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস ফেল তারা। সে কথা আর ভেবে কি হবে।

তবে অল্পই গিয়ে তো শেষে—কেপা হাতির পায়ের তলায় পিঁঠে মরতে হবে—নয়তো আগুনে পুড়ে। এখানেই থাকার—একটা কোন উপায় যেন বের করে নোল।

বাজারের ওপরের চায়ের দোকানটার চুকে ছুটো চেয়ার টেনে বসল ওরা। চায়ের অর্ডার দিলে নীল। পরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে—কথা হচ্ছে কি—জানেন, মাসুখগুলো মানে আমরা বোধ হয় মরেই গেছি। দেশই বলুন আর ব্যক্তিই বলুন মরে না গেলে কি কেউ পড়ে পড়ে এমন মার খায়, না এতো পর্বত প্রমাণ ধুঁটতা সহ করে।

—না, মার খাওয়া ছাড়াও অল্প কারণ থাকতে পারে।

—যেমন ?

—যেমন ধরুন, গ্রামে ডাকাত পড়েছে। গ্রামের লোক ঘুমে অচেতন। ডাকাত দল গ্রামের সব ধনরত্ন লুণ্ঠে নিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। এমনি সময় এক গৃহস্থ সবার আগে জেগে উঠলো। ডাকাতদের হাত থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে আনবার জন্য তাদের বিতাড়িত করবার জন্য সংগ্রাম করলো এবং সব চাইতে বেশী মূল্য দিল—সংগ্রাম শেষে সেই গৃহস্থের সাময়িক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যদি গ্রামের লোকেরা তাকে নিষ্ঠুর আঘাতে মেরে ফেলতে চায়। ছলে বলে কৌশলে ঠকায়, বকনা করে, প্রতারণা করে—তখনকার মতো তার নীরবে সহ করা ছাড়া উপায় কি ? অন্ধমের মার দুর্বল মুহূর্তের জন্যই তোলা থাকে। এবং সে মার বীরকেও এক এক সময় সহ করতে হয়।

নীল তাকিয়ে রইল মঞ্জুর মুখের দিকে।

মঞ্জু কয়েক ঢোক চা খেয়ে নিয়ে বললো—কিন্তু এ মার খাওয়া কখনোই চিরকালের জন্য হতে পারে না। বড় জোর গৃহস্থের বাধ্য করে পাওয়ার কালটুকু পর্যন্ত। তবে হ্যাঁ, যদি গৃহস্থের শক্তি ফিরে পাওয়ার ভয়ে মাথাটা তার খড় থেকে আগেই কেটে ফেলা যায় অর্থাৎ যে অল্প সেই চেটাই করছে সবাই মিলে—এবং যার জন্য তার ওপর কোপের ওপর কোপ ; ছুরির পর ছুরি চালানো হচ্ছে, তবে অবশিষ্ট ভিন্ন কথা। একটু খামল মঞ্জু। তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর বললো কিন্তু শক্তিমানকে নিঃশক্তি করে ফেলাকেই যারা নিজেদের অধিকার বজায় রাখার একমাত্র উপায় মনে করে—নিজেদের শক্তির ওপর এই বাদের শ্রদ্ধা, তারা কি শুধু আপাত অধিকার বলে পারে একটা গোটা জাতকে মেরে ফেলতে ? তাও পেছন থেকে ছুরি চালিয়ে ? অসম্ভব।

একটা দমকা জলো বাতাস এসে ঢুকলো ঘরে। দেয়ালের কালেক্টরটা উড়ে গিয়ে পড়ল একটি লোক—বোধ হয় এই

বাজারেরই কোন দোকানদার হবে তার চায়ের কাপের ওপর কাপটা উল্টে চা নিচে পড়িয়ে পড়লো লোকটির কাপড়ে। দোকানে ঠাণ্ডা চা—শরীর পুড়ল না। জামা কাপড় নষ্ট করে দিলে। উঁপাড়িয়ে জামা কাপড় ঝাড়তে লাগল লোকটি—বললো, পেল যে পশ্চিমশাই গরিবের ছ'টা পয়সা জলে।

যে ছোকরা ময়লা জাকড়া দিয়ে টেবিলের চা মুছে নিচ্ছিল তাকে ঠেলের মানেজার পশ্চিমশাই আদেশ করলো, বিশ্বনাথও এক কাপ চা আর এক পিস কেক—তোমাকে দাম দিতে হবে ন বিশ্বনাথ আমি খাওয়াচ্ছি তোমাকে। বিগলিত মুখে লোকটি কে বসে পড়ে পশ্চিমশাইকে ভিজ্ঞাসা করলো—তা, পশ্চিম শশী সেদিন আপনার ইন্তী এসেছিলেন এখানে ? ওয়া সবাই বললে খুব সোন্দর নাকি দেখতে ?

পশ্চিমশাই-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—কে কে বললে হে ? নরেন্দ্র দেখেছে ? হ্যাঁ, কমলার চেহারাটা—চোখট আড় করে পশ্চিমশাই মঞ্জু আর নীলের দিকে এক পলক তাকালো। তার স্ত্রী যে রূপসী সে কথাটা ওরা শুনেছিল কিনা সেটাই বোধহয় দেখলে—

মঞ্জু আর নীল আরো এক কাপ চা খেয়ে উঠে পড়লো। বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে।

—কি করে যাবেন ?

একটু ভাবলো মঞ্জু। তারপর বললো, এ বৃষ্টি খারবে না শীগগির। বরং আরো জোরে আসবে। ঐ তো বাস ঠ্যাণ্ড—আমার কষ্ট হবে না। আপনারই বাড়ী কিরতে হবে অনেক পথ ভিজ্জে।

কিন্তু পথে নেমে কয়েক পা যেতেই একটা ঝালি ট্যাঙ্কি দেখে হাত তুলে খামালো মঞ্জু। দরজা খুলে নিজে উঠে বসে, নীলকে ডাকলো—আশ্রন।

গাড়ীতে উঠে বসল নীলও। কমল দিয়ে ভিজ্জে হাত মুখ মুহুতে মুহুতে বললো—উঠলাম তো। তারপর ? আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো ?

—আমাকে পৌঁছে দিতে হয় না।

—তবে আপনি আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছেন ?

—না।

—তবে ?

—চলুন তো।

—কোথায়—দিল্লী নয়তো ?

—কেমন হয় গেলে ?

[ক্রমশঃ

If you're a film actress in Britain, you spend your life smuggling your physical equipment through the Customs.

—KAY KENDALL.



স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

রোগমুক্তির পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় সিমলা গেলুম। অপূর্ব লাগল এই সিমলা পাহাড়। প্রকৃতির বেন লীলাভূমি। প্রকৃতি এখানে মুক্তহস্ত, এতটুকু কার্পণ্যের প্রকাশ নেই এখানে। অকুপন হাতে তার অকুরন্ত সম্পদে সে ভরিয়ে তুলেছে এই শৈলশৃঙ্খকে। এ বেন চিরধৌবনের প্রতিমূর্তি। আমার হোটেলের চারপাশ ঘিরে সুলভ প্রাকৃতিক পরিবেশ আমার রোগহত মনকে যে কি পরিমাণে আনন্দের প্রলেপে ভরিয়ে তুলল তার তুলনাই মেলে না। মন যেখানে পূর্ণ থাকে সেইখানে সবচেয়ে বড় আনন্দের স্পর্শচিহ্ন। পূর্ণতার মধ্যেই আনন্দের উদ্ভব। শরীর থেকে রোগ বিদূরিত হয়েছে, ধীরে ধীরে দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশাতেই এই শৈলশিখরে বাসা বাঁধা। এখানে এসে দেখলুম স্মৃতির প্রচুর খোরাক এদিকে সেদিকে ছড়ানো। হোটেল থেকে দুই বিস্তরে প্রকৃতির অকুরন্ত অবদানগুলি প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যে কত অকুপ্তেরণা এসেছে তার সীমাসংখ্যা নেই। সিমলা পাহাড়ের মনোরম পরিবেশে অতিবাহিত ১৯৪৬ সালের সেই কটা দিনের স্মৃতি আমার জীবনে চিরকাল বেঁচে থাকবে। ১৯৪৬ সাল ভারতের স্বাধীনতার আগের বছরটি। সিমলার থাকতে থাকতে এই সংক্রান্ত অনেক কল্পনা আমাকে ঘিরে ধরে। স্বাধীনতা সংক্রান্ত অনেক চিন্তাই আমার মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

১৯৪৬ সাল। সারা ভারতে একটি পরম উত্তেজনাপূর্ণ বছর। পরের বছর আমরা স্বাধীনতা পাচ্ছি। দু'শো বছরের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে কত সহস্র আত্মত্যাগ সকল হতে চলেছে কত ক্ষয় কত ধ্বংস কত বিপর্যয়ের মধ্যে যে দীর্ঘকালীন স্বাধীনতা সংগ্রাম—সেই সংগ্রাম আজ বিশ্বয়লম্বীর রূপা পেতে চলেছে, যে স্বাধীনতা বক্তার সৃষ্টি হয়েছিল তার বক্তব্য আজ লভ্য বলেই হয়। কত লাহনা, কত আত্মত্যাগ, কত উৎসাহের সঙ্গীত সঙ্গীত স্বাধার স্বাধীন হয়ে গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে। কত

হাঁকের কোল ঝালি হয়ে গেছে। কত সর্বস্বার্থী বাবার বুকখাটা আর্ডিনাদে ভরে উঠেছে আকাশ বাতাস। কত ধরনী চোখের জল কেলতে কেলতে সিঁচুর মুহুরে—সে সাক্ষ্য তো অমুপস্থিত নয়—কিন্তু সকল প্রকার ছাটার এইবার অবসান, এবার ছালা নয় এবার প্রশান্তি, এবার বাতনা নয় এবার সমৃদ্ধি, এবার বন্ধনা নয়, এবার সম্ভাবনা।

সিমলা তখন জমজমাট, স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ভাগ্যনির্ধারণকন্দের আলাপ আলোচনা পূর্ণগতিতে চলছে তখন। মুহুরে: বসছে বৈঠক পরাধীনতার শেষে স্বাধীন ভারতের রূপটি হবে কেমনতরো, কেমনতরো হবে তারা শাসনতন্ত্র, তার রাষ্ট্রের স্বরূপটি হবে কেমন, কতগুলি বিভাগে শাসন প্রশালীকে ভাগ করা হবে, কতগুলি সমস্তার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সমস্তাগুলির সমাধান হবে কোন পথে...এই সব সাধুচিন্তার তখন শেষ নেই। সব মিলিয়ে সিমলা তখন রীতিমত জমজমাট। ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ তখন সেইখানেই।

আমার পরবর্তী ব্যালোগুলির সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রচুর সুবিধে পেয়েছিলুম, স্মৃতির অল্প উপকরণ আমার দৃষ্টি পথে পতিত হয়েছিল। উপাদানের অপ্রাচুর্য বা দৈর্ঘ্য মোটেই ছিল না। মন প্রকল্প, প্রশংসা স্মৃতি, শারীরিক ক্রমপ্রগতি তখন যথেষ্ট আনন্দই দিচ্ছে, প্রাকৃতিক অপরূপ দৃশ্যাবলী আর তার উপর পরাধীনতার বন্ধনমোচনজনিত এক আন্তরিক উল্লাস এই সব মিলে রক্তের মধ্যে এক বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করে তোলে।

তারপর 'একদিন কলকাতার ফিরে এলুম। মায়ের কাছে ছিলুম কিছুদিন। কিছুকাল মায়ের কাছে কাটিয়ে আবার চলে গেলুম বোম্বাই। বোম্বাইতে এবারে মাসখানেক অতিবাহিত করলুম। আমার এক মাস বোম্বাই-বাসের মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট তারিখটিও পড়ে যায়। সেই তারিখ জাতির বন্ধনমোচনের দিন, জাতির নব-অঙ্গের দিন, জাতির নব-আগরণের দিন, সেই পরম পবিত্র মুহূর্ত, সেই পুণ্য-পবিত্র লগ্ন, সেই পরম পুণ্যক্ষণ। সেই বহু বছরপোষিত স্বপ্নটির সকল হওয়ার দিন সেই গ্লানি ক্লেশ থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির দিন, সেই নবোদযাতিত যাত্রাপথের প্রথম পদার্পণের দিন। বোম্বাইতেই এই শুভদিনটি উদযাপন করলুম।

ফিরে এসে কয়েকটি ব্যালে নিয়ে কিছুকাল নিমগ্ন ছিলুম, ব্যালোগুলির সম্বন্ধে যে সব কল্পনা আমার মনের মধ্যে ছিল সেগুলি আন্তে আন্তে রূপ'পেতে' থাকল। তারপর সেই রূপায়ণের তোড়জোড় আর বিলিবিবস্থা। শেষে একদিন তারা মঞ্চস্থ হল। সেগুলিকে মঞ্চস্থ করার পর কলকাতার বাইরে তাদের মঞ্চস্থ করার অভিপ্রায়ে কিছুকালের জন্তে কলকাতা ছাড়তে হল। এবারে আমার গন্তব্য বৃন্দপ্রদেশ এবং পূর্বপাঞ্জাব (কিরোজপুর পর্যন্ত)। ব্যালোগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল, তাদের মধ্যে "বার্ষিক ক্রিডম", "উইদার নাও?", "ভূখ", "ডিভাইন সোঙ্গ" "সমর্পণ" এবং "অজ্ঞান" নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। কি সমালোচকেরা, কি দর্শকেরা স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসায় এবং অভিনন্দনে ভরিয়ে তুলেছিলেন এদের। আমার একক নৃত্য "মৌপদী"ও যথেষ্ট সাধুবাদ অর্জন করতে পেয়েছিল। আমার প্রচেষ্টা পরিপূর্ণতার

স্থল দেখল। সেই পরিপূর্ণতা দর্শক দরবার থেকেই তো এসেছে, তাঁদের সাধুবাদই তো আমাদের পাথর।

১১৫৭ সালের ১৪ই ও ১৫ই নভেম্বর বার্ষিক কলকাতা (T. I. S. C. O.), ১১৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে চিত্ররঞ্জন আর ১১৫৮ সালের ২১শে জুন কলকাতায় আমি নৃত্য প্রদর্শন করি। সেই ২১শে জুনই আমার শেষ নৃত্য প্রদর্শন। শেষ বেদিন নৃত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মঞ্চে আরোহণ করি—সেদিন আমার নাচের বিষয়বস্তু ছিল "ক্রৌঞ্চী"।

আবার কয়েক বছর আগে পিছিয়ে বাই—কয়েকটি বছর পিছন ফিরে না তাকালে কয়েকটি কথাও না বলা থেকে যাবে। একরূপ মঞ্চরঙ্গের সঙ্গে আমার যোগাযোগ সবুজ কিছু বলা হল। এইবার চিত্ররঞ্জনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ সবুজও হৃৎকথা বলা দরকার আমার জীবনভিবৃত্ত থেকে এদের বাদ দেওয়া যায় না। ছবির কাজ তখনও করে গেছি, মঞ্চের সঙ্গেও যোগপূত্র ছিন্ন করি নি। ফেমাস পিকচার্স প্রযোজিত "ভোলা শঙ্কর" এ আমি মোহিনীর ভূমিকাটি গ্রহণ করি। পৌরাণিক পটভূমিকায় এর গল্পাংশ পড়ে উঠেছিল। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন স্বনামধন্য ভীষ্ম বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগলেকার পরিচালিত এম রাণ্ড টির নন্দকিশোর ছবিটিতেও আমি অভিনয় প্রদর্শন করি। এই ছবিটিতে দেবদাসীর চরিত্রটির রূপ দিই। এরপর আমাকে সত্যিই একটি ভাল ভূমিকায় অভিনয় করার জন্ত আহ্বান জানানো হয়। চলচ্চিত্ররঙ্গের প্রখ্যাত পুরুষ জী পি, এল, সস্তোবীর কাছ থেকে এই আহ্বান আসে। তিনি আমাকে তাঁদের সস্তোবী প্রোডাকশন্সের "শিন শিনাকী বুল্লাবু" ছবিটিতে অভিনয় করার জন্তে আমন্ত্রণ জানানেন। এর বৈচিত্র্যপূর্ণ, বর্ণবহুল কাহিনী গড়ে উঠেছিল যবদীপ বলিঙ্গীপকে পটভূমি করে। আমার অভিনয় চরিত্রটি আরম্ভে খুব বড় ছিল না। বিরতির আগে অবধি চরিত্রটির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু চরিত্রটি আমার খুব ভালো লেগেছিল, বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলুম এই চরিত্রে রূপ দিয়ে, চরিত্রটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নাট্যরস ছিল। এরপর বিখ্যাত প্রযোজক জৈমিনী দেওয়ানের "তিতলীতে" পার্বতীর ভূমিকায় আমি আত্মপ্রকাশ করি। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন এক দিন

একটি পথে প্রতিনিরত পড়ছে হাজার হাজার পথিকের পদচিহ্ন, কিন্তু তারই মধ্যে যে কত বোরবার আছে, কত জানবার আছে, কত দেখবার আছে এ খোঁজ ক'জন রাখে—তবে কেউ কেউ রাখে—যারা রাখে তারাই তো সন্ধানী। সেই সন্ধানীদের চোখে এখন অনেক কিছু ধরা পড়ে যায় যা সাধারণের চোখে পড়ে না। 'কোন এক দিন' ছবিটির গল্পাংশ এমনই এক বিচিত্র পটভূমি অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। নায়ক বাবা-মার ছিন্ন করা বিবাহে আপত্তি আনিতে বড় ট্যান্ডি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং সারাদিন সে ট্যান্ডি ড্রাইভার সেজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র চরিত্রের একাধিক আরোহী তার পাড়ীতে গুঠে, বিভিন্নতার সমাবেশে সে একটি বিশেষ রূপ গুঁজে বার করতে সমর্থ হয়, এক এই

ব্যাপকতার স্পর্শে রঙ্গরের এক নরচিত্র উদ্ঘাটনে সে সমর্থ হয়, রঙ্গত তার আসল রূপটি নিয়ে তখন নায়ক কমলেশের সামনে নিজেকে মেলে ধরে।

ছবিতে আরোহীদের সংলাপ কিছু কমালে ভালো হোত। শব্দগ্রহণ ব্যর্থ, কলে ছবিটি অনেকখানি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কাহিনীর বৈচিত্র্য দর্শকসাধারণের অন্তরে রেখাপাত করবে। কাহিনী ঘটনা করেছেন সুবীর হাজার। পরিচালনার ক্ষেত্রে তরুণ পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন নির্মলকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। অস্তিত্ব চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন কমল মিত্র, পদ্মপদ বন্দ্য, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবিতে পুর বোজনা করেছেন সরোজ কুমারী।

যাত্রী

একটি অভিনয়নবোণা প্রচেষ্টায় সকল হলেন এস, এম, কিলম ইউনিট। সকল হলেন সচিবানন্দ সেন মজুমদার। চিত্রাঙ্গোদীর কাছে এক অনবদ্য চিত্রোপহার দিয়ে চলচ্চিত্রের দরবারে একটি বিশেষ আসন নিজের অধিকারভুক্ত করলেন। যাত্রীর বিশেষত্ব এবং অভিনয় আমরা আশা রাখি আপনাদের মুগ্ধ করবে। ছবিটি ভারতদর্শনের ছবি, একদল যাত্রী একটি স্পেশাল ট্রেনে সারা ভারত দেখতে বেরিয়েছে। দর্শকসাধারণের সামনে রূপালী পর্দায় সমগ্র ভারতের ছায়াছবি প্রকট হয়ে উঠবে, সারা ভারতের অসংখ্য দর্শনার



ঊর্ধ্বস্থান, মন্দির, শিল্পকর্ম, দর্শকের সামনে ভুলে ধরা হয়েছে। সকলেই স্বামী। কাহিনীতে একাধিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। বহু'র সমাবেশে "এক"-একটি বিশেষ রূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে, পরিচালক প্রধান চরিত্রগুলির প্রতি স্মৃতিচারণই করেছেন। তাদের চরিত্রের বধাধখ বিকাশের ক্ষেত্রেও কোন বাধা সৃষ্টি করেননি। সারা চরিত্রের মধ্যে যে শাখত সত্যের অবস্থান, সেই শাখত সত্যের উপোদ্ঘাটনই এই ছবির মূল লক্ষ্য। স্বাভাবিক, অতুলপ্রসাদ প্রকৃতির গানগুলি সন্নিবেশিত করে ছবির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অভিনয়শিল্পীরাও সকলেই নবাগত। এই ছবি হুঁতাবে আনন্দ দেবে, অনেক দর্শক ভারতবর্ষের বিভিন্ন দর্শনীর স্থান, তাদের বিশেষত্ব, তাদের শিল্পসম্পদ ইত্যাদি দেখে আনন্দলাভ করবেন আবার অনেকে এর অন্তর্নিহিত গভীরতার অন্বেষণ করবেন। ছবিতে ক্রটি নেই, এ কথা বলব না, বলা সঙ্গতও হবে না, তবে এঁরা যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাটির রূপদানে সমর্থ হলেন, চলচ্চিত্রঙ্গতে যে নতুনত্বের আমদানী করলেন, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যে নতুন পথের সন্ধান দিলেন সেদিক দিয়ে বিচার করলে তো এঁরা নিঃসন্দেহে বায়ংবার সাধুবাদের অধিকারী। আমরা এঁদের অভিনন্দন জানাই।

বিশ্বরূপা

গত ২০এ অগাস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার বিশ্বরূপায় বহুজন প্রাংশিত "সেহু" নাটকটির দুই শত বক্তার অভিনয়-উৎসব মহা আড়ম্বরে



ক্রীমতা কানন দেবী

অমুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ঐ দিন বিশ্বরূপায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটেছিল। অমুষ্ঠানে নাট্যকার, কাহিনীকার, পরিচালক, আলোকশিল্পী, শিল্পবৃন্দ এবং বিভাগীয় কর্মীগণকে বহুমূল্য উপহার প্রদানে আপ্যায়িত করা হয়। অমুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথির আসন অঙ্কিত করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং উপহারগুলি বিতরণ করেন শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। আমরা এই প্রসঙ্গে বিশ্বরূপায় উত্তরোত্তর সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

রাডল্ফ ভ্যালেন্টিনোর গল্প

কি রহস্য, কি ইন্দ্রজাল, কি পরমাশ্চর্য, অবিশ্বাস করার উপায় নেই, ঘটনা নয় ঘটনা, জনজ্ঞপ্তি বা কিম্বদন্তী নয়—সত্য। স্পষ্ট সত্য, প্রত্যক্ষ সত্য, অকাট্য সত্য। কোন রূপকথার রাজকুমার, কোন কল্পলোকের অধিবাসী, কোন পরমশুন্দর তরুণ—যার একটিমাত্র নাম শিহরণ বইয়ে দিয়েছে তরুণী-সমাজে, আলোড়ন এনেছে বুবতীমহলে, উদ্‌ঘাটনা এনেছে নারীচিন্তে। অবিশ্বাস হলেও সত্য—এতে কোন ভুল নেই। নারী-জগৎ তার অটল আসন বিশ্বয়ে বিমূঢ় করে দিয়েছে সমকালীন সমাজকে, তাকে অদেয় কিছুই নেই নারীদের, নারীদের হৃদয়-সিংহাসন কেবলমাত্র তারই জন্তে। এমন কি যারা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নয়, যাদের সঙ্গে তার পরিচয়ই নেই, যারা তাকে চোখে দেখেনি পর্ষদ তারও তার জন্তে উদ্‌ঘাট, তাদেরও তাকে অদেয় কিছুই নেই, তার জন্তে তারা দিশাহারা, প্রতিটি হৃদয়হর্গের হারগুলি এর কাছে অর্গলমুক্ত, সেখানে এ বিজয়ী বীর। রাডল্ফ ভ্যালেন্টিনো সেই বিশ্বয়কর নাম, হলিউডের ইতিহাসে যে নাম চিরকালের জন্তে স্বর্ণীয় যার প্রভাব নারী-জগৎ থেকে মুছে বাবার নয়! হাজার হাজার তরুণী যার কাছে মনে মনে নিজেকে সমর্পণ করে মনে করেছে জীবন ধন্য, ভগ্ন সার্থক।

ভ্যালেন্টিনোর পূর্বো নাম রাডল্ফো আলফানজো ব্যাকেলো পিয়ারে ফিলিবর্ত গার্লিয়েলমি দ' ভ্যালেন্টিনো দ' আন্তনগুয়েলা।

১৮৯৫ সালে রাডল্ফের জন্ম। বাবা ছিলেন সেনাবিভাগের একজন সচিব। ভ্যালেন্টিনো তাঁর বাবাকে হারালেন যখন তাঁর বয়স এগারো। আঠারো বছর যখন ভ্যালেন্টিনোর বয়স তাঁর বিধবা মা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ইতিপূর্বে ইটালির রয়্যাল ব্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচারের একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে ভ্যালেন্টিনো যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

ম্যামেরিকার গিয়ে দেখলেন জীবিকা সংগ্রহ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। যে আট শ' পাউণ্ড তাঁর সঙ্গে ছিল দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়ে গেল। এইবার কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হল, হাতে হ'ল রুঢ় বাস্তবের সম্মুখীন, প্রথমে নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্ক মালীর কাজ নিলেন তিনি তারপর একটি জোজনালয়ে খালা ধোওয়ার কাজ নিলেন সেখানে কাচের খালাগুলি এত ভাঙতে আরম্ভ করলেন যার ফলে তাঁকে ইস্তফা দিতে হল সেখান থেকে, কিছুকাল পেশাদারী নর্সকের কাজ করে চিত্রঙ্গতে প্রবেশ করলেন। পোড়ার দিকে ছোট ছোট ভূমিকা—তারপর নায়কের ভূমিকার দেখা দিলেন কোর হর্সমেন অফ দি ম্যাপোক্যান্ডিলিস'তে, এটি একটি বৃহৎ। এরপর ভ্যালেন্টিনোকে দেখা গেল 'ব' শ্রেণি ছবিতে

এই ছবিই তাঁকে অগণিত্যাক করে তুলল। ছবিটি একটি ব্যর্থ ছবি কিন্তু সেই ছবি ভ্যালেন্টিনোকে উপস্থাপিত করল সকলের পুরোভাগে। ভ্যালেন্টিনোর নাম ছড়িয়ে পড়ল দীর্ঘদিনে, মুখে মুখে ঐ একটি নাম। মেয়েদের স্বপ্ন তখন ভ্যালেন্টিনো। অসংখ্য বিবাহের প্রস্তাব আসতে লাগল অগণিত প্রেমপত্র লিখিত হতে থাকল ভ্যালেন্টিনোর উদ্দেশ্যে। মেয়েদের চোখে, (সে পরিচিতাই হোক আর অপরিচিতাই হোক) ভ্যালেন্টিনো যে কি ছিলেন সে সম্বন্ধে এই রচনার প্রথমংশেই আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু ভ্যালেন্টিনোর ব্যক্তিগত জীবন সুরের হয় নি। তাঁর প্রথম স্ত্রী অভিনেত্রী জীন একার বিবাহ-সম্বন্ধনার পূর্বেই তাঁকে পরিত্যাগ করেন। যদিও তাঁদের বন্ধু চিরদিন অটুট ছিল আর মজার ব্যাপার এই, কাগজে কলমে জীন চিরকাল নিজেকে পরিচয় দিয়ে গেছেন "মিসেস ভ্যালেন্টিনো দি ফার্স্ট" বলে। দ্বিতীয় সহধর্মিণী রূপে ভ্যালেন্টিনোর হাতে হাত রাখলেন ছায়াভঙ্গতের বিশিষ্ট শিল্পজ্ঞাকারিণী নাটাসা রামবোভা, নাটাসাকে যখন বিয়ে করলেন ভ্যালেন্টিনো জিনের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ তখনও আইনের চোখে স্বীকৃত হয় নি। ফলে ভ্যালেন্টিনোকে যেতে হ'ল হাজতে, হানিমুনের পরিবর্তে, পরে স্থির হ'ল যতদিন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হচ্ছে ততদিন তিনি ও নাটাসা পৃথক অবস্থান করবেন। এ বিবাহ সুরের হয়েছিল কিন্তু স্থায়িত্বলাভ করে নি ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে নাটাসার সঙ্গে তাঁর পরিণয়ভোর ছিল হয়ে গেল। এর পর তাঁকে সর্বত্র দেখা যেত অভিনেত্রী পলা নেগ্রির সঙ্গে, একরকম প্রায় স্থিরই ছিল যে পলা ভ্যালেন্টিনোর তৃতীয় স্ত্রী হবেন কিন্তু আকস্মিকভাবে ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসে মাত্র ৩১ বছর বয়সে ভ্যালেন্টিনো তাঁর জীবনের শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করলেন। ভ্যালেন্টিনোর প্রচুর সম্ভাবনাময় জীবননাট্যের যে এত ক্ষুদ্র বনিকাপতন ঘটবে তা ভাবা যায় নি।

একটি মানুষের মৃত্যু যে এতগুলি নারীকে শোকাচ্ছন্ন করতে পারে এর অসুস্থত্ব তুলনা মেলে না, আজ পর্যন্ত সারা হলিউডে দেখা গেল না যে ঐ রকম আর একটি ঘটনা ঘটল, এমন কোন মানুষ আর চোখে পড়ল না যে অতগুলি নারীর প্রেমলাভে সমর্থ হয়েছে। তাঁকে নিয়ে শেষবারের মত যে শোভাযাত্রা হল মেয়েদের ভীড় সামলাতে পুলিশ রীতিমত দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, কত দোকানের কাচ ভেঙে কেলেছে মেয়েরা শেষবারের মত তাঁকে দেখবে বলে। শব্দগামিনীর মোট সংখ্যা তিরিশ হাজার। য়ামেরিকাতেই এই মৃত্যুসংবাদে পনেরোটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করল, অনেক মেয়ে পাগল হয়ে গেল।

এই সেই মানুষটি বঁকে নিয়ে এত মাতামাতি মেয়েদের চোখে ঘুম নেই বার অস্ত্রে, বঁর নামে মেয়েরা সারাটা পৃথিবী হারিয়ে কেলে, সে মানুষটি দেখতে কেমন, কেমন তার রূপ, কেমনতরো তার আকৃতি? এই বিবরণীটি পাঠ করার পর এ প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক ভাবেই আপনার মনের কোণে ছ'একবার উঁকি মারবেই—খুব যদি আগ্রহ থাকে সে সম্বন্ধে জানবার—তবে জেনে রাখুন, যে মানুষটি খুব একটা সুপুরুষ বা আকর্ষণীয় ছিলেন না! তবে...?

সেলার প্রসঙ্গে : যে দৃশ্যগুলি আমরা কখনও

দেখতে পাব না

সেলার সম্বন্ধে রজামোদীদের কাছে নতুন করে বলার কিছু নেই। সেলার বোর্ড কি, কি উদ্দেশ্যে ঐ বোর্ড গঠিত, চলচ্চিত্রে ঐ বোর্ডের করণীয় কি এসকল বিষয়ে জনসাধারণ সবিশেষ অবহিত আছেন। ছবির যে সব অংশ সাধারণ্যে প্রদর্শনের অসুপযোগী বলে তাঁরা মনে করেন তৎক্ষণাৎ সেই অংশগুলি তাঁরা কাঁচির সাহায্যে নির্মূল করেন। এ সকল তথ্য সাধারণ্যে সুপ্রচারিত। তবে ছবির যে সব অংশে সেলারের কাঁচি পড়ল সেই অংশগুলির ইতিবৃত্ত সাধারণ্যে অজ্ঞাতই থেকে যায়। সেলারের নির্দেশাঙ্কসারে কয়েকটি ছবির পরিবর্তিত অংশ সম্বন্ধে বধাসংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র আমাদের পাঠকপাঠিকার সামনে তুলে ধরাছি। এই অংশগুলি বাকি দিয়ে সংশ্লিষ্ট ছবিগুলিকে ভারতবর্ষে প্রদর্শনের অসুযোগ দেওয়া হয়েছে।

প্রিন্স হ ওয়াস এ থিং (মার্কিন ছবি):

একটি নাচের দৃশ্যে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে পরিধেয় পরিচ্ছদ অভ্যন্তরীণ পাতলা স্বচ্ছ ও কৃষ্ণবর্ণের ছিল, সেই নাচের দৃশ্যটির উপর প্রবল বেগে সেলারের কাঁচি চলল, দৃশ্যটিকে অনেকখানি ছোট করে



শ্রীমতী কামরী ওহ

দেওয়া হল। যে সব দৃশ্য পা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপনবাসগুলি এবং মেহের বিশেষ বিশেষ অংশ আপত্তিকরভাবে পরিদৃশ্যমান হচ্ছে—সেই দৃশ্যগুলি একবারে বাদ দেওয়া হল।

গ্যাডভেল্ডাস অফ ক্যাপ্টেন কেবিরান (বৃটিশ ছবি) :

যে দৃশ্য দেখান হচ্ছে জর্জ তার গুরুজন আত্মীয়কে গলা টিপে ধাঁসক্ক করে মেরে ফেলছে সেই দৃশ্যটি কাঁচি চালিয়ে বৈধর্যে ছোট করে দেওয়া হল।

টোরি অফ এসখার কোষ্টেলো (মার্কিং ছবি) :

মিঃ লানির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এসখার বধন "নো নো নো" বলছে—সেই শব্দগুলি বাদ দিয়ে দেওয়া হল।

দি গ্রীণ ম্যান (বৃটিশ ছবি) :

একটি ব্যাংক—Everyone blamed the referee, কেবলমাত্র একটি বাদ দেওয়া হল।

গর্ভবর্ত্তা (ভারতীয় ছবি) :

গৃহস্থামী একটি ভাড়াটের শিরোনামে পদাঘাত করছেন—এই দৃশ্যটি কেটে বাদ দেওয়া হল।

সাকী (ভারতীয় ছবি) :

সোহনের সীমাকে ধর্ষণের প্রচেষ্টার সমুদয় দৃশ্যটিই বর্জন করা হল।

কোণাভীতি ডোজা (ভারতীয় ছবি) :

একটি নাচের দৃশ্য নর্তকী নানাভাবে অঙ্গসঞ্চালন করে রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি করছে, নৃত্যটিও আপত্তিকর, দর্শকরা সেই উত্তেজনার বশীভূত হয়ে আপন আপন গুঁঠ লেহন করছে এবং নিজেরা পরস্পরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হচ্ছে—এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হল।

ডোজালু ডোজা (ভারতীয় ছবি) :

সি, আই, ডি, ইন্সপেক্টার স্নানাগারে বন্দী হয়ে আছেন—এই দৃশ্যটি কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হল।

আপনি জানেন ?

প্রশ্ন :

১। তাঁকে "টোটেম পোল উইথ এ টুথেক" এর মত দেখায় বলে তাঁর আকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে। আসল "বীক কেক বয়" আখ্যাত্তেও তিনি পরিচিত। কে এই অভিনেতা ?

২। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সর্বপ্রথম ছবিটি গৃহীত হয় ১৯৩২ সালে নামভূমিকায় কে অভিনয় করেন ?

৩। "কন্টিনেন্টাল" সুরধ্বনিকে কোন পুরুষশিল্পী বিখ্যাত করে তুললেন ?

৪। "৩-ডি"তে গৃহীত প্রথম কিচর ফিল্মটির নাম কি ?

৫। স্যানা ল্যানোরেলের কাহিনী একটি সঙ্গীতমুখর

রোম্যান্টিকধর্মী ছায়াছবির বিবরণবলিতে পরিণত হল—কার ছেলেমেয়েদের তিনি পাঠ দিতেন ?

৬। একটি ফিল্ম ক্যামেরা প্রতি সেকেন্ডে কতগুলি করে ছবি তুলতে পারে—(ক) ১২টি, (খ) ১৬টি (গ) ২৪টি ?

৭। ৩৫ এম, এম গজের একটি হাজারফিট দীর্ঘ সেলুলয়েড-রীল কতক্ষণ ধরে চলতে পারে—(ক) ৩৩ সেকেন্ড, (খ) ১০ মিনিট (গ) ৪ মিনিট ১১ সেকেন্ড ?

৮। ছবির প্রদর্শন যখন চলতে থাকে তখন সময়ের প্রতি অর্ধাংশে দর্শক নিশ্চিন্ত অঙ্ককারকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন আর তা সম্পূর্ণরূপে নিজের অজ্ঞাতসারে—এই ধারণা কি সত্য ?

৯। আয়রণ পেটিকোট ছবিটিতে কৃষ্ণ বৈমানিকের ভূমিকাগ্রহণ কে করেছিলেন ?

১০। একটি আট-রীলের ছবিতে পৃথক পৃথক কতগুলি করে ছবি থাকে ? —(ক) ২২,০০০ (খ) ১,০০,০০০ (গ) ২,৩৪০,০০০

১১। (ক) ম্যারিয়া ভন লস এবং (খ) ফিলিস ইসলি—এই দুইজন স্বনামধন্য শিল্পী রঙ্গঙ্গগতে কোন নামে প্রচারিতা ?

১২। একটি "ক্যালেশোর-ভক্তির" কল্যাণে নর্মা জিন বেকার ৫০ ডলার উপার্জন করেন ? কে ইনি ?

১৩। একটি ছবিতে অভিনয়কারাকালীন জিন সিবার্গকে এক লোহনিরিত পরিচ্ছদ পরিধান করতে হয়, এই পরিচ্ছদটির ওজন ৩৫ পাউণ্ড, এটি পরিধান করতে এবং পরিহার করতে আধঘণ্ট সময় লেগেছিল—ছবিটির নাম কি ?

১৪। ১৯২৭ সালে গৃহীত আল জনসনের যে ছবিটি অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের মুখে শব্দ এবং সঙ্গীত বোজনা করে—সেই ছবির নাম কি ?

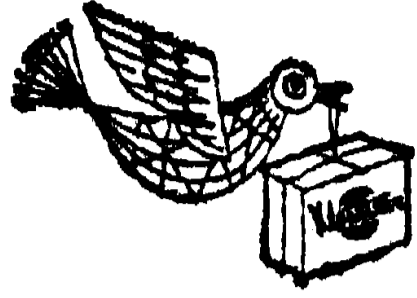
১৫। আট বছর ধরে এডনা পারভার্সা ধীর জীবনে অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রধান সঙ্গিনী ছিলেন ১৯১৫ সালে তাঁর সাপ্তাহিক আয় ছিল ১২৫০ ডলার। ভিত্তিতে থাকেন তিনি—কি নাম এ শিল্পীর ?

উত্তর :

১। ভিক্টর ম্যাচিয়োর, ২। বরিস কারলোক, ৩। রে ম্যাটায়ার, ৪। বাওয়ানা ডেভিল, ৫। শ্যামের রাজার, ৬। (গ) ৭। (খ), ৮। হ্যা, ৯। ক্যাথারিন হেপবার্গ, ১০। (খ) ১১। (ক) মার্জেন ডিরেট্রিচ এবং (খ) জেনিথ জোল, ১২। মার্লিন মোনরো, ১৩। সেন্ট উয় (St. Joan), ১৪। দি জাজ সিডার, ১৫। চার্লস চ্যাপলি

From middle-age on, everything of interest is either illegal, immoral, or fattening.

—ALEXANDER WOOLCOTT.

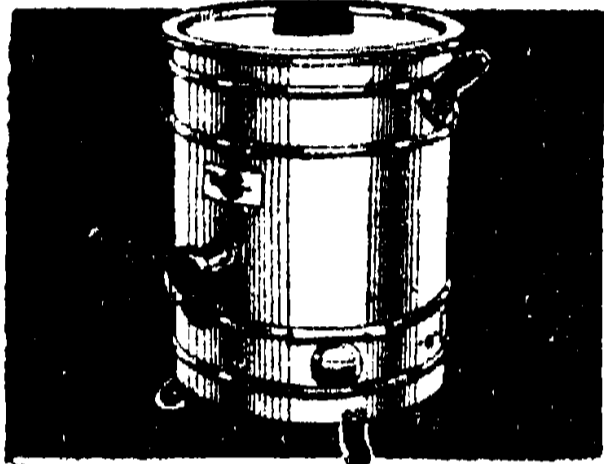


এই উৎসব-রাঙিত দিনে...

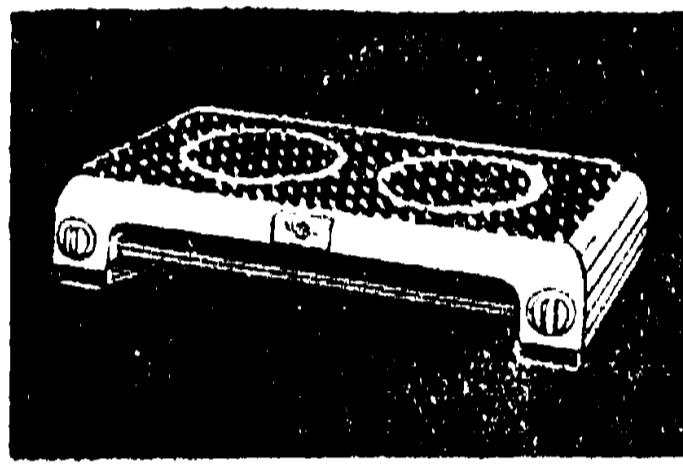
দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আরো স্বচ্ছন্দ্য এনে দেবে

Kleertone ক্লীয়ারটোন সামগ্রী

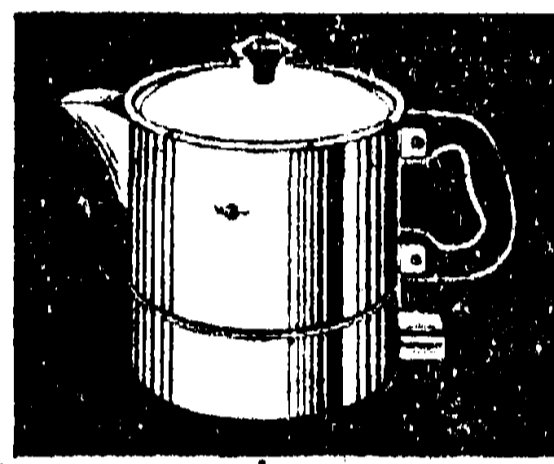
বাড়ীর সবাইকেই ক্লীয়ারটোন জিনিসগুলির একটা-না-একটা ব্যবহারের সুযোগ দিন। প্রত্যেকটি জিনিস কাজকে আরো হালকা, জীবনকে আরো স্বচ্ছন্দ করবার দিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরী হয়েছে। বাড়ীর সবাই এসব পেলে খুশি হবে। আপনার কাছাকাছি ক্লীয়ারটোন বিক্রেতার দোকানে আজই সকলে মিলে গিয়ে জিনিসগুলি দেখুন।



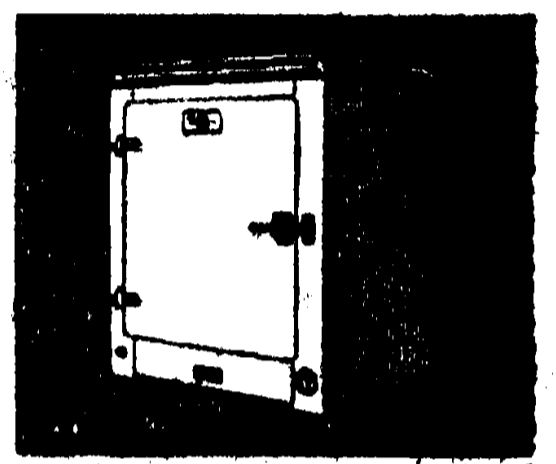
ক্লীয়ারটোন
জল গরমের পাত্র



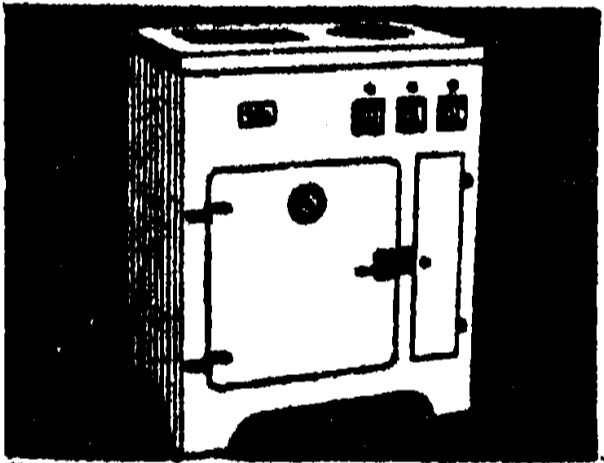
ক্লীয়ারটোন
হট প্লেট



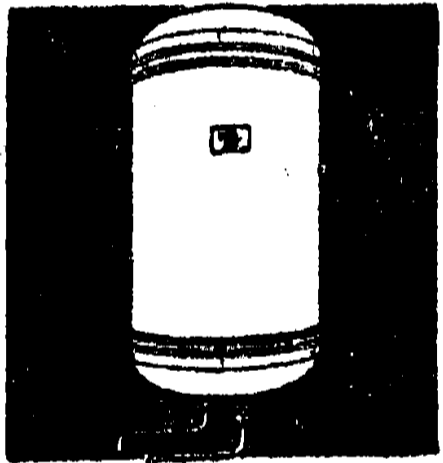
ক্লীয়ারটোন
বৈদ্যুতিক কেটলী



ক্লীয়ারটোন
হট কাবার্ড



ক্লীয়ারটোন
কুকিং রেঞ্জ



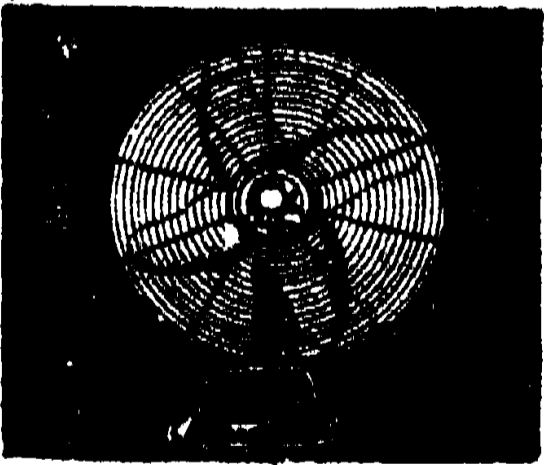
ক্লীয়ারটোন
ওয়াটার হীটার



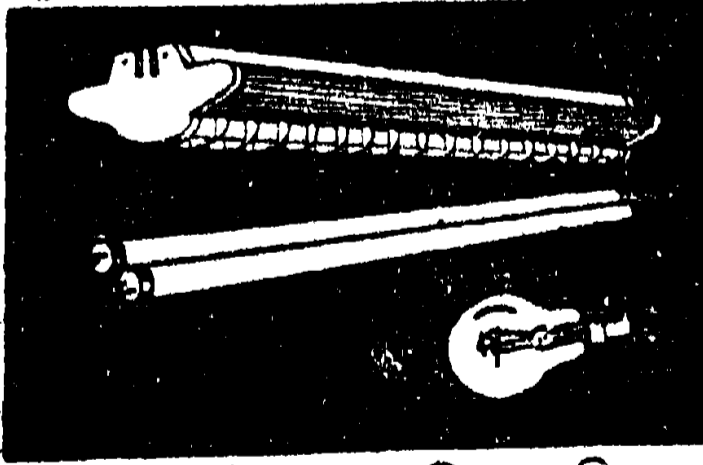
ক্লীয়ারটোন
পারিবারিক ইন্ড্রি



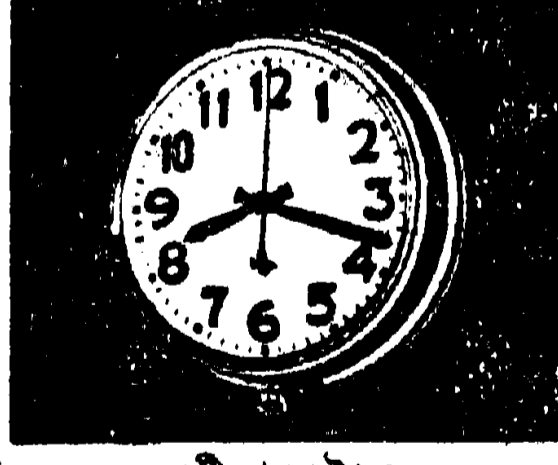
ক্লীয়ারটোন
ফোল্ডিং স্টীল চেয়ার ও টেবিল



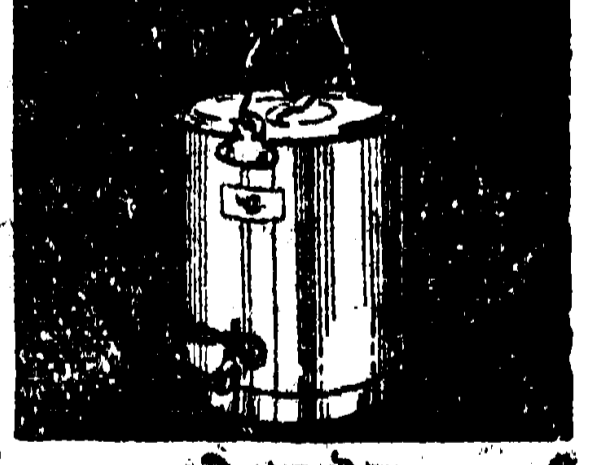
ক্লীয়ারটোন
পাখা



ক্লীয়ারটোন বৈদ্যুতিক বাতি,
ফ্লুরোসেন্ট টিউব ও সরঞ্জাম



ক্লীয়ারটোন
বৈদ্যুতিক ঘড়ি



ক্লীয়ারটোন
ধারমালা জার

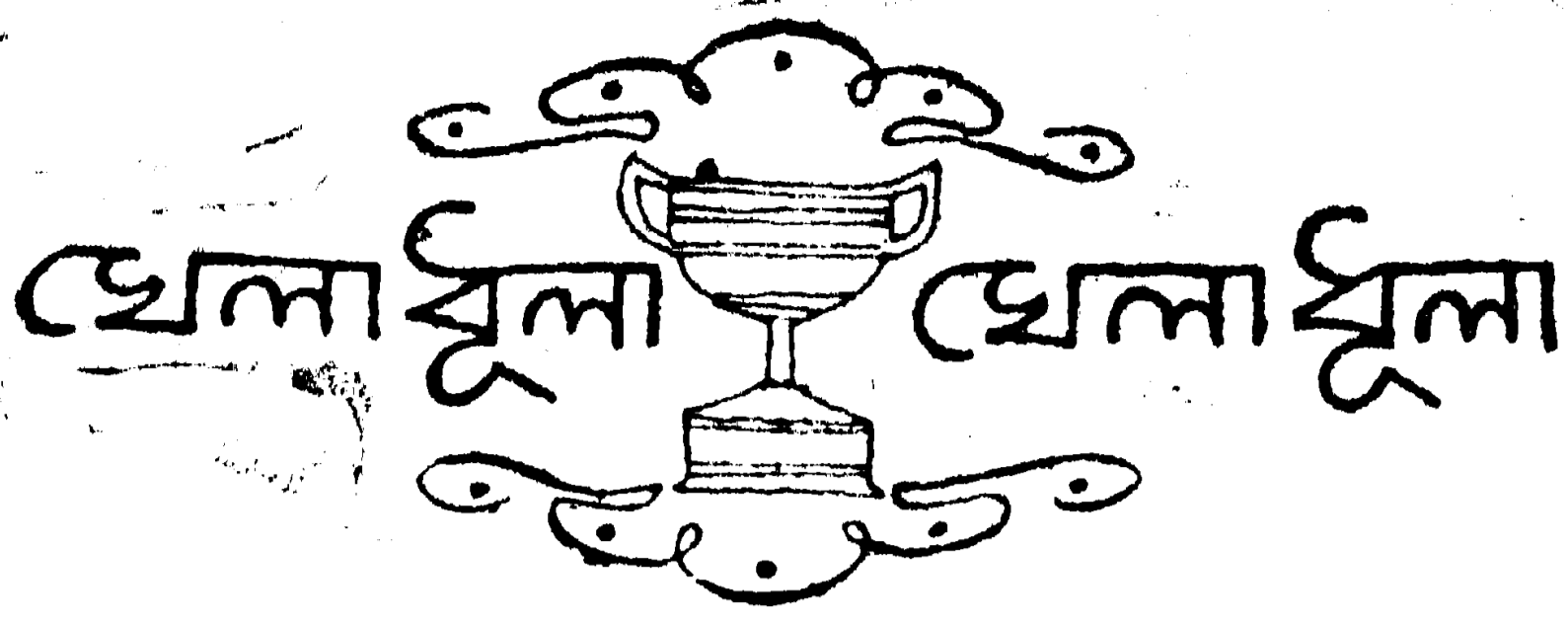
কাছাকাছি ক্লীয়ারটোন বিক্রেতার দোকানে গিয়ে আপনার বাড়ীর জন্যে এইসব দরকারী জিনিস দেখুন



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা - বোম্বাই - পাটনা - মাদ্রাজ - বাংলোর - দিল্লী - সেকেন্দরাবাদ

Kleertone ক্লীয়ারটোন—স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্য সুন্দর জিনিস



রোমে সপ্তদশ অলিম্পিকের পরিসমাপ্তি

এবার রোম মহানগরীতে সপ্তদশ অলিম্পিকের আসর বসে।

৮৫টি রাষ্ট্রের আট সহস্রাধিক ক্রীড়াবিদ বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এর আগে মেলবোর্ণ অলিম্পিকই সর্ববৃহৎ আসর বলে খ্যাত ছিল। এই অনুষ্ঠানে ৬১টি দেশের ৫৮৬৭ জন প্রতিযোগী যোগদান করেছিলেন। আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা হয়েছিলো—৬৪ বছর পূর্বে এখানে। সেই অনুষ্ঠানে মাত্র ১৩টি রাষ্ট্রের ২৮৩ জন ক্রীড়াবিদ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এবার নিয়ে রোমে দ্বিতীয় বার অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। আনুমানিক দ্বিসহস্রাধিক বছর পূর্বে রোমে প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সম্রাতি বেশ কিছুদিন রোম মহানগরী উৎসব-সুখরিত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের সকল ক্রীড়াযোদীর দৃষ্টি থাকে রোমের দিকে। তবে সকলেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আলাপ-আলোচনার অবসান হয়েছে। ১৯৬৪ সাল না আসা পর্যন্ত অলিম্পিক আসর আর বিশেষ জমবে না। তবে বর্তমানে বেশ কিছুদিন কে কি পেলো— এই নিয়ে সকলে আলোচনার মত্ত থাকবেন।

এবারকার প্রতিযোগিতার কত ঘটনা ঘটেছে—তার ইয়ত্তা নেই। প্রথম দিনেই কয়দোজা টীমকে কুরোমিটং নামে মার্চ পাঠে অংশ গ্রহণ করতে হয়। তারা অবশ্য প্রতিবাদ করতে ছাড়ে নি। সারা পত্রিকার 'প্রতিবাদ' লিখে তারা মার্চ পাঠে যোগ দেয়। তারপর 'ডেনমার্কের সাইকেল-চালক নাট প্র্যানমার্কের বৃদ্ধকে সমগ্র অলিম্পিক নগরীতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তারপর ম্যারাথন দৌড়ে বিশ্বের খ্যাতনামা এ্যাথলীটরা পরাজিত হল ইথোপিয়ান অধ্যাক্ষ দৌড়বীরের কাছে।

এবার রোমে অভ্যধিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতিযোগীদের বেশ-কিছুটা অসুবিধার পত্তভে হয়। তবে রাশিয়ার প্রতিযোগীরা কি তাপ, কি ঠাণ্ডা—সবটাত্তেই নিজেদের মামিয়ে মেওয়ার তারা সাকল্য অর্জন করেছেন।

রাশিয়া ৪৩টি স্বর্ণপদক পেয়ে এবারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমেরিকা ৩৪টি স্বর্ণপদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থান পায়।

অলিম্পিক এ্যাথলেটিক আট দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল। এবার নয়টি বিভাগে 'বিখ-রেকর্ড ভঙ্গ অথবা উত্কার সমতুল্য হয়েছে। তার মধ্যে ছয়টি ক্ষেত্রে পুরুষ এবং তিনটিতে মহিলা প্রতিযোগীরা কৃতিত্ব প্রকাশ করেন।

বিখরেকর্ড ছাড়া কমপক্ষে ৩৬ বার অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ হয়—আর না হয় উত্কার সমতুল্য। তার মধ্যে পুরুষ এ্যাথলীটই ২২টি নতুন রেকর্ড করেছেন। রাশিয়া জিম্নাস্টিকে ও আমেরিকা এ্যাথলেটিকসে সর্কাপেকা বেশী সাকল্য অর্জন করেছে। সম্ভরণে আমেরিকা এবার অষ্ট্রেলিয়ার আধিপত্য ভেঙ্গে দিয়েছে। সাইকেল

চালনার ইটালী বিশেষ সাকল্য অর্জন করেছে। সুইয়ুছে আমেরিকা ও ইটালী দুই জনেই বেশী স্বর্ণপদক ভাগ করে নিয়েছে। ভারোত্তোলনে রাশিয়াই সর্কাধিক সাকল্য অর্জন করে।

হকি ছাড়া ভারত কোন পদক লাভ করতে পারে নি। তবে এবারকার অলিম্পিকের কয়েকটি বিষয়ে ভারতের ক্রীড়া পদ্ধতির উন্নতি দেখা যায়। এ্যাথলেটিকসে ভারত বিশ্ব-খ্যাতি অর্জন করে। চ'ল্লশ কোটি ভারতবাসীর আশা-ভরসা উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে সাকল্য লাভের জন্ত বিদেশী দৌড়বীরদের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও দশমিকের এক ভগ্নাংশের জন্ত ব্রোঞ্জপদক লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কেবল ভারত বলেই নয়—এশিয়ার এই দৌড়বীর বিদেশী প্রতিযোগীদের সঙ্গে বেরূপ পাল্লা দিয়েছেন তা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। সাধ্যমত চেষ্টা করে এমন কি যে স্বল্প সময়ে তিনি ইতিপূর্বে কখনও দৌড়াননি, সেই স্বল্প সময়ে দৌড়ে স্থান অধিকার করতে পারেননি—তাতে ভারতবাসীর দুঃখ করার কারণ নেই। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, মিলখা সিং ৪৫.৫ সেকেন্ডে দৌড়েও প্রথম তিনটি স্থান লাভে বঞ্চিত হয়েছেন। তবে সুদীর্ঘ ৬০ বছর পর ভারতীয় এ্যাথলীট মিলখা সিং শেষ পর্যায়ের দৌড়বার অধিকার লাভ করেন। এ ছাড়া ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণে ভারতের জোড়া সিং অষ্টম স্থান লাভ করেন। এটাও কম কৃতিত্ব নয়।

ক্রো পিজিয়ন স্ট্রিং-এ ভারতের কারনি কাইতালে উঠেও অষ্টম স্থান পান।

পাকিস্তানের কাছে হকিতে ভারত পরাজিত হওয়ার প্রতিটি ভারতবাসীই বাধিত হয়েছেন।

১৯২৮ সালে সর্কাপ্রথম বিশ্ববিজয়ী হকি চ্যাম্পিয়ন আখা লাভ করার পর দীর্ঘ ৩২ বছর ভারতের সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে টোকিওতে ১৯৬৮ সালের এশীয় ক্রীড়ার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাইতাল খেলা অসীমাসিত্ত ভাবে শেষ হলে পাকিস্তান গোলের গড়পত্ততার হিসাবে স্বর্ণপদক লাভ করেছিল।

ষ্ট্রিকের কারনা অপূর্ক দক্ষতা সম্পর্কে প্রাক-বৃদ্ধ-কালে ভারতের যে খ্যাতি ছিল ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালেও যাতার নতুন দেখা গিয়াছিল এবার ভারতীয় দলের খেলার তা দেখা যায় নি।

ভারত—তার দীর্ঘ বিখ খেলার চারাবার ফলে চতুর্কিকে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। পাকিস্তানের সুখামত্ৰী সর্কার প্রতাপ সিং কাইরণ বলেন, "রোমে ভারতীয় চকি পরাজয়ের কারণ—হকি খেলার রাজনীতির অসুপ্রবেশ। তবে এই পরাজয় ক্রীড়ামূলক মনোবৃত্তিতেই প্রকাশ করতে চলে ও আগামী অলিম্পিকে হাতে গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারা যায়—তার ব্যবস্থা এখনই করতে হবে।"

বিজয়নগরের মহারাজকুমার বলেছেন, "ভারতের এই পরাজয় চরম বিপর্যয়ের কারণ। পাকিস্তান দল যে জিতেছে—তার একমাত্র কারণ দলের খেলোয়াড়রা প্রত্যেকে দলের আধিনায়ক ও দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ দান দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। পাকিস্তানের জয়লাভের জন্য অভিনন্দন করা উচিত। এর মধ্যে কাকি নেই।" মাত্র বার বছর সাধনার ফলে পাকিস্তানের অতীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। ভারত না পেলোও পাকিস্তান পাওয়ার হকির বর্ণপদক এশিয়াতেই এসেছে। তবে এশিয়ার এই আধিপত্য আর কত দিন চলবে—তাঃবলা কঠিন। বর্তমানে স্পেন, ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার খেলায় বখেট উন্নতি দেখা গেছে। এর মধ্যে স্পেনের খেলাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদি স্পেন হকি নিয়ে সাধনা করে—তা হলে ১৯৬৪ সালের অলিম্পিকে তারা শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করতে পারবে বলে মনে হয়। তা ছাড়া ভারতীয় খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত কেনিয়ার খেলার মানও খুবই উন্নত হয়েছে। আশ্মাণীর খেলার ধারাও বেশ ভাল হয়।

ফুটবলে যুগোস্লাভিয়ার এবং চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। ডেনমার্ক দ্বিতীয় স্থান পায়। ফুটবলে ভারত নিজ গুণে মাত্র

এক পয়েন্ট পেয়ে সর্বনিম্ন স্থান পেলেও এবার ভারতীয় ফুটবল বিধে স্বীকৃতি পেয়েছে। পেকর বিকছে বিশেষ সুবিধে করতে না পারলেও হাজেরী ও ফ্রান্সের বিকছে ভারত বেরূপ উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে তাতে বিশ্বের দরবারে ফুটবলে ভারতের মর্যাদা সত্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়ে অলিম্পিকের বিশিষ্ট খেলোয়াড় বর্ণপদক লাভকারীর নাম প্রদত্ত হইল :—

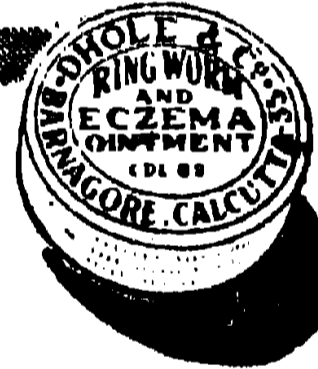
গ্র্যাথলেটিকস

- ১০০ মিটার দৌড় :—পুরুষ—আরম্যান হারী (জার্মানী)।
মহিলা—উইলমা কুডলক (আমেরিকা)।
- ২০০ মিটার দৌড় :—পুরুষ—লিভিও বেকটি (ইটালী)।
মহিলা—উইলমা কুডলক (আমেরিকা)।
- ৪০০ মিটার দৌড় :—পুরুষ—ও, ডেভিস (আমেরিকা)।
- ৪০০ মিটার হার্ডল :—পুরুষ—গ্লস ডেভিড (আমেরিকা)।
- ৮০ মিটার হার্ডল :—মহিলা—আইরিন গ্রেস (রাশিয়া)।
- ১১০ মিটার হার্ডল :—পুরুষ টি ক্যাগপুন (আমেরিকা)।

ডোল এণ্ড কোম্পানীর

দাদ ও কাউরের

স্মরণ



কিউটা-টোন

কাটা, চর্মরোগ ও বেদনার জন্য

নিম্ন মলম

খোন্স পাঁচড়া ও চুলকানীর জন্য



ডোল এণ্ড কোং

বরানগর • কলিকাতা-৩৫

- ৮০০ মিটার দৌড় :—পুরুষ—পিটার শ্বেল (নিউজিল্যান্ড) ।
 মহিলা—এল শেভাকোভা (রাশিয়া) ।
 ৫০০ মিটার দৌড় :—পুরুষ—ম্যারে হ্যাগবার্ট (নিউজিল্যান্ড) ।
 ১০,০০০ মিটার দৌড় :—পুরুষ—পি, বোলিটানিকভ (রাশিয়া) ।
 ১৫০০ মিটার দৌড় :—পুরুষ—হার্ক হনিয়ট (অষ্ট্রেলিয়া) ।
 ৪ × ১০০ মিটার রিলে :—পুরুষ—জার্মানী । মহিলা—যুক্তরাষ্ট্র ।
 ৪ × ৪০০ মিটার রিলে :—পুরুষ—আমেরিকা ।
 ৩০০০ মিটার ট্রিপলচেজ :—পুরুষ—জেড ক্রিমকোবাইক (রাশিয়া) ।
 উচ্চ লম্ব :—পুরুষ—আর শ্চাভিরকেজ (রাশিয়া), মহিলা—ইওল্যাভা ব্যানাস (রুম্যানিয়া) ।
 দীর্ঘ লম্বন :—পুরুষ—রালফ বোর্টন (আমেরিকা) । মহিলা—ভি, ক্লেবাকিনা (রাশিয়া) ।
 ডিসকাস ছোড়া :—পুরুষ—গ্র্যাল ওয়েটার (আমেরিকা) । মহিলা—নিমা পোক্রোমাবেভা (রাশিয়া) ।
 বর্শা ছোড়া :—পুরুষ—ভি, টেলিবুলেভো (রাশিয়া) । মহিলা—ই, ওজোলিনা (রাশিয়া) ।
 লম্বপাট :—পুরুষ—ডব্লিউ নাইডার (আমেরিকা) । মহিলা—ভামারা গ্রেস (রাশিয়া) ।
 পোলডল্ট :—পুরুষ—ডন ব্র্যাগ (আমেরিকা) ।
 ২০ কিলোমিটার ভ্রমণ :—পুরুষ—ভাভিমির গোলুভগিচি (রাশিয়া) ।
 হপ-স্টেপ-জাম্প :—পুরুষ—পাইমাণ্ডো ভি, ইনজের (ইটালী) ।
 ম্যারাথন :—পুরুষ—বিকিলা আবেচে (ইথিওপিয়া) ।

সস্তুরণ

- ১০০ মিটার ক্রিষ্টাইল—পুরুষ জন ডেভিট (অষ্ট্রেলিয়া) ।
 মহিলা—ডন ক্রেসার (অষ্ট্রেলিয়া) ।
 ২০০ মিটার ব্রেট স্ট্রোক পুরুষ—ডব্লিউ মুলিকেন (আমেরিকা) ।
 মহিলা—অমিতা লেনিসত্রো (বুটেন) ।
 ১০০ মিটার বাটারফ্লাই : মহিলা—ক্যারোথিন সুলার (আমেরিকা) ।
 ২০০ মিটার বাটারফ্লাই : পুরুষ—মাইকট্রুম (আমেরিকা) ।
 ৪ × ১০০ মিটার মিডল রিলে : পুরুষ—আমেরিকা ।
 মহিলা—আমেরিকা ।
 ৪ × ২০০ মিটার ক্রিষ্টাইল রিলে : পুরুষ—আমেরিকা ।
 ৪ × ১০০ মিটার ক্রিষ্টাইল রিলে : মহিলা—আমেরিকা ।
 ৪০০ মিটার ক্রিষ্টাইল : পুরুষ—ম্যারে বোজ (অষ্ট্রেলিয়া) ।
 মহিলা—ডন জালজা (আমেরিকা) ।
 ১৫০০ মিটার ক্রিষ্টাইল : পুরুষ—জে, কনরাতস (অষ্ট্রেলিয়া) ।
 ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক : মহিলা—এল, বার্ক (আমেরিকা) ।
 প্লিং বোর্ড ডাইভিং : পুরুষ—ম্যারী টোবিয়ান (আমেরিকা) ।
 মহিলা—ইনগ্রিড ক্র্যামার (জার্মানী) ।
 হাই বোর্ড ডাইভিং : পুরুষ—আর ওয়েবটার (আমেরিকা) ।
 মহিলা—ইনগ্রিড ক্র্যামার (জার্মানী) ।

সাইকেল রেস

- ১০০ কিলোমিটার দলগত রেস :—ইটালী । ১০০০ মিটার সাইকেল রেস :—সান্তো গার্দোয়ানী (ইটালী) । ২০০ মিটার ট্যাণ্ডেম রেস—জিয়ালি বরোটা ও সার্জিও ব্র্যানচেটো (ইটালী) । ৪০০০ মিটার টিম পারসুটা (ইটালী) । ১০০০ মিটার ফ্রন্ট—সান্তো গার্দোয়ানী (ইটালী) । ১৭৬ কিলোমিটার রেস—ভিক্টর ক্যাপিটনভ (রাশিয়া) ।

মল্লযুদ্ধ (রোমান ফাইল)

- ফ্রাইওয়েট—ডি, মট্টা পিক্তেভেঙ্ক (রুম্যানিয়া) । ব্যাটাম ওয়েট—ওলেগ ক্যারাবেগি (রাশিয়া) । কেদারওয়েট—মুজাহির শেখ (তুরস্ক), লাইট ওয়েট—এ্যাডিয়াভি কোজিঙ্কভ (রাশিয়া), ওয়েটার ওয়েট—সিটহাট ব্যরবেক (তুরস্ক) । মিডল ওয়েট—ভিমিট্রো ভববেভ (বুলগারিয়া), লাইট হেভি ওয়েট—ষ্টেভিক কিস (হাঙ্গেরী), হেভি ওয়েট—আইভান বজগান (রাশিয়া) ।

মল্লযুদ্ধ (ফ্রিফাইল)

- কেদার ওয়েট—এম, অ্যাগিমানি (তুরস্ক), মিডল ওয়েট—এইচ, গাজার (তুরস্ক), লাইট ওয়েট—এগ, উইলসন (আমেরিকা), ব্যাটাম ওয়েট—টি, ম্যাকনান (আমেরিকা), ওয়েটার ওয়েট—ডগলাস ব্র গাগ (আমেরিকা), হেভি ওয়েট—ডব্লিউ ডিরেইট (জার্মানী) ।

মুষ্টিযুদ্ধ

- ফ্রাই ওয়েট—জি, টোবক (হাঙ্গেরী), কেদার ওয়েট—এক, মুসো (ইটালী), লাইট ওয়েট—কে, ব্যার্ডজিয়র (পোল্যান্ড), লাইট ওয়েটার ওয়েট—বি, মেমক (চেকোস্লোভাকিয়া), ওয়েটার ওয়েট—জি, বেনডেঙ্কইটি (ইটালী), ব্যাটাম ওয়েট—ওলেগ গ্রিভরেভ (রাশিয়া), লাইম মিডল ওয়েট—ই, উইলবট ম্যাকলীর (আমেরিকা), মিডল ওয়েট—এডওয়ার্ড ক্রফ (আমেরিকা), লাইট হেভি ওয়েট—ক্যাবিস ক্লে (আমেরিকা), হেভি ওয়েট—ক্যাবিসকো ডি মিশেলো (ইটালী) ।

ভারোত্তোলন

- লাইট ওয়েট—ভিক্টর রোসেখ (রাশিয়া), মিডল ওয়েট—জুরিনভ (রাশিয়া), লাইট হেভি ওয়েট—আইরামুল প্যালিনিভি (পোল্যান্ড), মিডল হেভি ওয়েট—আরকাডি বোরেন্ডিঙ্কভ (রাশিয়া), ব্যাটাম ওয়েট—ইউরিভ্রাশভ (রাশিয়া) ।

জিম্ন্যাস্টিক

- পুরুষদের :—একক—বোরিস শ্রামালিন (রাশিয়া) । দলগত—জাপান । মহিলাদের :—একক—লারসিনা ল্যাটিনানা (রাশিয়া), দলগত—রাশিয়া । মহিলাদের :—দ্বিম ব্যালান্স—ইভা বসকোভা (রাশিয়া) । পুরুষদের :—পেটেন্টহর্স—ই, একম্যান (ফিনল্যান্ড), পুরুষদের রিং—এ, অ্যাসিরিয়ান (রাশিয়া), পুরুষদের হরাইজাণ্টাল বার—জাপান । পুরুষদের—ক্রি ট্যাণ্ডিং—এম, আইওহারা (জাপান) ।
 বাস্কেট বল—আমেরিকা । ওয়াটারপোলো—ইটালী । ডেকাথলন—ক্যার অনসন (আমেরিকা) । মর্ফ পেটাথলন—কেবল মেমেন (হাঙ্গেরী) । দলগত—হাঙ্গেরী ।

তাৰ, ১৩৬৭ (আগষ্ট-সেপ্টেম্বৰ, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা তাৰ (১৭ই আগষ্ট) : ৰাজ্যসভাৰ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কের সূচনাৰ ভারতের কম্যুনিষ্ট পাৰ্টি ও নিখিল ভারত শান্তি পরিষদের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুৰ বিবোধগার— ভারতীয় হইয়াও নিজেদের দেশকে ছেঁয় করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ।

২য়া তাৰ (১৮ই আগষ্ট) : সীমান্তে চীনা আক্রমণ বোধকরে ভারত সরকার কর্তৃক সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন—ৰাজ্যসভাৰ পৰৱৰ্ত্তি বিষয়ক বিতর্কের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী নেহরুৰ ঘোষণা।

পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় পরিকল্পনার ৩৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ— ৰাজ্য মন্ত্রিসভাৰ বিশেষ অধিবেশনে খসড়া পরিকল্পনাৰ চূড়ান্ত রূপ প্রদান।

৩য়া তাৰ (১৯শে আগষ্ট) : আসামে হাজামা দমনের জন্ত প্রয়োজন হইলে গুলী চালানো হইবে—ধুবড়ীৰ জনসভাৰ আদ্যমের বরাষ্ট্রপতি মি: কককদীন আলি আমেদের ঘোষণা।

৪ঠা তাৰ (২০শে আগষ্ট) : "আসামে ভারতীয় সংবিধানের ধারা লঙ্ঘিত হইয়াছে এবং পরিস্থিতি আরও পানয়ন ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে"—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের কঠোর মন্তব্য।

৫ই তাৰ (২১শে আগষ্ট) : উড়িষ্যাৰ বিত্তীর্ণ এলাকাৰ বস্তাৰ ভয়াবহ ভাণ্ড—লক্ষ লক্ষ নৱ-নারী ও শিশু বিপদের সম্মুখীন এবং ৰাজ্যৰ ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি।

৬ই তাৰ (২২শে আগষ্ট) : ভারতে সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা সংগঠনের সঙ্কল্প পুনর্ঘোষণা—লোকসভাৰ তৃতীয় পরিকল্পনাৰ খসড়া সম্পর্কিত বিতর্কের সূচনাৰ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুৰ ভাষণ।

৭ই তাৰ (২৩শে আগষ্ট) : কলিকাতায় রাইটাস' বিভিন্ন-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত আসামের উপক্রম অঞ্চল সরকারী সংসদীয় প্রতিনিধিদের জরুরী বৈঠক।

৮ই তাৰ (২৪শে আগষ্ট) : দিল্লীৰ পথে আসামের ৰাজ্যপাল জেনাৰেল শ্রীনাগেশ ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা—দমদম বিমানঘাটতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত আসাম পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা।

৯ই তাৰ (২৫শে আগষ্ট) : আসামের দাঙ্গা সম্পর্কে দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুৰ সহিত আসাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা ও অর্ধনাটব শ্রীককদীন আলি আমেদের দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক।

আসাম পরিস্থিতি আলোচনাৰ জন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভাৰ বৈঠকেৰ দাবী—মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত ৰাজ্যৰ বিদ্যোদী নেতাদের আলোচনা।

১০ই তাৰ (২৬শে আগষ্ট) : তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাৰ খসড়া (১০,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ) লোকসভাৰ অনুমোদিত।

১১ই তাৰ (২৭শে আগষ্ট) : আসামে তদন্তেৰ জন্ত সূত্রীম কোর্টেৰ জন্ত নিয়োগেৰ দাবী—ভাৰতীয় জনসংঘ কেন্দ্ৰীৰ কাৰ্যনির্বাহক কমিটিৰ সভাৰ (হাৱজাবাদ) পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়েৰ (জনসংঘ সাধাৰণ সম্পাদক) ৰিপোর্ট গৃহীত।

১২ই তাৰ (২৮শে আগষ্ট) : তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাৰ আঁৰ তিন হাজাৰ কোটি টকাৰ ৱস্তাৱীৰ লক্ষ্য পূৰ্ণ হইবে—দিল্লীতে

দেশ-
বর্দেশ

ৱস্তানী উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য ও শিল্পসচিব শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীৰ আশা প্রকাশ।

১৩ই তাৰ (২৯শে আগষ্ট) : আসাম পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনাৰ জন্ত কংগ্ৰেস পাৰ্লামেটাৰী পাৰ্টি ও পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা কর্তৃক ৰাজ্য বিধান সভাৰ জরুরী অধিবেশন আহ্বানেৰ সিদ্ধান্ত।

লোকসভা সদন্ত শ্রীকংসারি হালদায়েৰ (কম্যুনিষ্ট) বাবজীবন কাৱাদও—আলিগুয়েৰ তৃতীয় ট্ৰাইব্যুনালাে কাৰখীপ বড়বস্ত্ৰ মামলাৰ ৰায় প্রদান।

১৪ই তাৰ (৩০শে আগষ্ট) : "আসামেৰ ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তেৰ প্রয়োজন নাই"—আসাম সরকারী সংসদীয় প্রতিনিধি হল কর্তৃক পাৰ্লামেটে ৰিপোর্ট পেশ।

১৫ই তাৰ (৩১শে আগষ্ট) : নেকা (উত্তৰ পূৰ্ব সীমান্ত এজেন্সী) সীমান্ত লঙ্ঘনেৰ অভিযোগ সম্পর্কে চীনেৰ উত্তৰ দান— লোকসভাৰ পৰৱৰ্ত্তি সংক্রান্ত বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুৰ ঘোষণা।

"আসামেৰ উপক্রম অঞ্চলসমূহ হইতে এবাৰ ৪৪ হাজাৰ শরণার্থী (বাঙালী) পশ্চিমবঙ্গে আগমন"—রাইটাস' বিভিন্ন-এ (কলিকাতা) পশ্চিমবঙ্গের ত্ৰাণমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনেৰ বিবৃতি।

১৬ই তাৰ (১লা সেপ্টেম্বৰ) : আসামেৰ হাজামা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তেৰ দাবী নাকচ—লোকসভাৰ আসাম বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুৰ বক্তৃতা।

১৭ই তাৰ (২য়া সেপ্টেম্বৰ) : আসামেৰ ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে সৰ্বাত্মক বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভাৰ সৰ্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত।

১৮ই তাৰ (৩য়া সেপ্টেম্বৰ) : ৰথাসময়ে আসাম দাঙ্গাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক অবস্থাৰ বিচার বিভাগীয় তদন্ত সম্পর্কে লোকসভা কর্তৃক শ্রীঅতুল্য ঘোষেৰ (পশ্চিমবঙ্গ কংগ্ৰেস প্রধান) প্রস্তাব গ্রহণ।

১৯শে তাৰ (৪ঠা সেপ্টেম্বৰ) : পোৱালপাড়া, কাছাড় ও ত্ৰিপুরাৰ পশ্চিমবঙ্গভুক্তিৰ দাবী—পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংস্কৃত পরিষদের স্মারকলিপি প্রচার।

পাঞ্জাবেৰ ভয়াবহ বস্তাৰ পরিস্থিতিতে ৪০ হাজাৰ নৱ-নারীৰ ৱোটক সহৰ ত্যাগ—সহৰ ৰক্ষাৰ জন্ত ডিম সহস্ৰ সৈন্ত ও দুই সহস্ৰ বেছাসেবক নিয়োগ।

২০শে তাৰ (৫ই সেপ্টেম্বৰ) : ভাৰতীয় বিমান বাহিনীৰ বিমানে বিক্রোহী নাগায়েৰ ৩১বৰ্ষেৰ সংবাদ—হুইখানি বিমান ৰায়েল : একধাৰি বিমানেৰ লোকজন নিৰ্বোজ।

চন্দ্রগ্রহণের চূড়ামণিবোগ উপলক্ষে গঙ্গার (কলিকাতা) বাট-গুলিতে লক্ষ লক্ষ পুষ্যার্থী নর-নারীর অকৃতপূর্ব সমাবেশ।

২১শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর): শোষণ ও বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের স্বাধীনতা ক্রমশঃ সঙ্কোচ করার দৃঢ় সঙ্কল্প—রাজ্যসভার প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য বর্ণনা।

২২শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর): আসামের ঘটনাবলী সম্পর্কে সরকারী নীরবতার ব্যাপক উদ্ভেদ দাবী—রাজ্যসভার কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও পি এম পি সমন্বয়ের সংশোধন প্রস্তাব।

২৩শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর): ৪০ হাজার পোষ্য সহ পশ্চিমবঙ্গের ৮ হাজার কেন্দ্রীয় কর্মচারীর শোচনীয় অবস্থা—শান্তিমূলক বিধান প্রত্যাহারের ব্যবহার জন্ম রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট বামপন্থী নেতাদের আবেদন।

২৪শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর): ভারতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন হ্রাস: জীবনমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ—ভারত সরকারের নিকট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ।

২৫শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর): আসামের সরকারী ভাষার প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা—১৭ই সেপ্টেম্বর গোঁহাটিতে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের প্রতিনিবেদনের বৈঠক আহ্বান।

২৬শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): দাজি (বাঙালী উৎসাদন) সমর নগরী জেলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত—আসামের অতিরিক্ত চীক সেক্রেটারীর রিপোর্ট: ডেপুটি কমিশনার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহ তিনজন উর্দ্ধতন অফিসার সসপেক্ষ।

২৭শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর): "বিপদের ঝুঁকি, লইয়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে সতী হইতে হইবে"—জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

কাছাড়, গোরালপাড়া ও ত্রিপুরাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী: আসামের পার্শ্বতা ও উপজাতি এলাকা স্থানীয় স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের প্রস্তাব—কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান।

২৮শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর): কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট নিবিদ্ধ করার প্রচেষ্টা—দিল্লীতে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী সংমেলনে সাধারণভাবে অনুমোদন।

নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও স্বরাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত পঙ্কজ সহিত আসাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি. পি. চালিহার বৈঠক।

২৯শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর): "বহিঃশত্রু নহে—আন্তর্ভরণ শত্রুই ভারতের বিপদের হেতু"—কুমনাথ কলেজের (বহরমপুর) শতবার্ষিকী উৎসবে ভাষণ প্রসঙ্গে 'উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ এম. রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য।

৩০শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর): আসামে উদ্বাস্তদের (অসমীয়া দাজি বিপন্ন) পুনর্বাসন সম্পর্কিত প্রশ্ন—কলিকাতার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত আসাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার আলোচনা।

৩১শে ভাদ্র (১৬ই সেপ্টেম্বর): ৬ই অক্টোবর হইতে সারা পশ্চিমবঙ্গে লোকগণনার প্রারম্ভিক কার্যের সূচনা—সাংবাদিক

বৈঠকে (কলিকাতা) রাজ্য সরকারের চীফ সেক্রেটারী শ্রীআর গুপ্তের বিবৃতি।

বহির্দেশীয়—

১লা ভাদ্র (১৭ই আগষ্ট): রাষ্ট্রসংঘের ৮২-জাতি নিবন্ধীকরণ কমিশনের বৈঠক শুরু—পরমাণুশক্তি উৎপাদনের ব্যব্যাদি প্রস্তুত বন্ধ করার জন্ত হুই দফা মার্কিন প্রস্তাব পেশ।

কলোতে ছয় মাসের জন্ত সামরিক শাসন প্রবর্তন—সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মি: প্যাট্রিক লুয়ুয়ার ঘোষণা।

৩রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট): ভূপাতিত মার্কিন ইউ—২ গোয়েন্দা বিমানের বৈমানিক-ক্রাফ্টিস প্যারি পাওরাসের দশ বৎসর কারাদণ্ড—গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ সম্পর্কে বিচারে রুশ সামরিক আদালতের রায়।

৪ঠা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট): লিওপোল্ডভিলেতে ভারতীয় সামরিক কর্মচারীদের উপর কলো সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ—কলোর প্রধানমন্ত্রী লুয়ুয়ার নিকট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর প্রতিবাদ লিপি।

২১শে আগষ্ট তারিখে উৎকিণ্ড রুশ মহাকাশ বানের নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন—শ্রেণিত কুকুরঘরের জীবিতাবস্থার মহাশূভ হইতে নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণের ঘোষণা।

৬ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট): কলো প্রধানমন্ত্রী মি: লুয়ুয়ার তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কলোর ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী-জেনারেল মি: দাগ হামারকজোভের কার্য-ব্যবস্থা সমর্থন।

৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট): রোম নগরে সাড়ধ্বরে সপ্তদশ অলিম্পিক ক্রীড়ার উদ্বোধন—ইটালীর প্রেসিডেন্ট সিনর-গ্রাক্সর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

১০ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট): রোম অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় হাজেরীর নিকট ভারতের ২-১ গোলে পরাজয়বরণ। বেলজিয়ানদের সহিত জাতিসংঘ বাহিনীকেও কলো ছাড়িয়া বাইতে হইবে—কলো প্রধানমন্ত্রী মি: লুয়ুয়ার ঘোষণা।

১২ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট): সেরিডার নিগ্রোদের সহিত খেতাজদের দাঙ্গা—খেতাজ পুলিশের গুলীচালনার কয়েকজন হতাহত—আমেরিকার নিগ্রো নির্বাসন অব্যাহত।

১৩ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট): জর্ডনের প্রধান মন্ত্রী মি: হাজ্জা মাজালী (৪৪) ও অপর নয়জন নিহত—আম্মানাহ জর্ডানী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বোমা নিক্ষেপের জের।

১৭ই ভাদ্র (২রা সেপ্টেম্বর): মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ার সহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানদের রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের আসন্ন আধিবেশনে (২০ শে সেপ্টেম্বর) যোগদানের জন্ত রুশ প্রধান মন্ত্রী মি: নিকিতা ক্রুশ্চেভের আহ্বান।

কমিউনিস্ট চীনকে স্বীকার ও চিয়াং চীনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন—কিউবান প্রধানমন্ত্রী মি: কিসেল কাষ্ট্রোর ঘোষণা।

১১শে ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর): বৃদ্ধ বাধিলে বিশ্বের বিশেষভাবে ছোট ছোট দেশগুলিরই সর্বাধিক বিপদ—হেলসিংকিতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মি: ক্রুশ্চেভের সতর্কবাণী।

খালের জল সংকোচ চুক্তির কলে কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসার

পঞ্চ প্রদত্ত—রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক প্রেসিডেন্ট আব্দুল খানের ঘোষণা।

২১শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) : রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে কজোর প্রেসিডেন্ট জোসেফ কাসাকুবু অপসারিত—প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুয়ুয়া কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ।

রাষ্ট্রসংঘে গণ চীনের প্রবেশের প্রক্ষেপে ক্রিমির ব্যাকুলতা—প্রশ্নটি রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের কর্মসূচীভুক্ত করার জন্য সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারস্কজোল্ডকে অনুরোধ।

২২শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর) : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দাস্তর্জাতিক ভিত্তিতে বয়কট ব্যবস্থা—দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মিলিত ফুটবল পরিষদের ঘোষণা।

২৪শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর) : অলিম্পিক হকি ফাইনালে রোমে অনুষ্ঠিত) পাকিস্তানের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য—প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয়ী।

কাটাঙ্গা প্রদেশে কজো সেনাবাহিনীর প্রবেশ—কজোর প্রধান স্ত্রী মিঃ প্যাট্রিস লুয়ুয়া কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ।

২৬শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর) : রোমে সপ্তদশ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি—ক্রিমির চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন ও ৪৩টি স্বর্ণপদক লাভ : ৩৪টি স্বর্ণপদক পাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় স্থান অধিকার।

লাওসে পুনরায় গোলযোগের সূত্রপাত ও সামরিক আইন জারী—প্রিন্স বেনি অউম (সরকারের ইন্সপেক্টর জেনারেল) কর্তৃক সরকারের (প্রিন্স সৌভানা ফুমা সরকার) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।

২৮শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর) : সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ—প্রেসিডেন্ট সুয়েকার্ণোর কার্যব্যবস্থা।

২৯শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর) : বকেটযোগে ৬০ মাইল উচ্চাকাশে মানুষ প্রেরণ ও নিরাপদে উদ্ধার—সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সফল প্রচেষ্টার সংবাদ।

৩০শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর) : কজোতে সামরিক অভ্যুত্থানের (সাত্রাজ্যবাদী) ব্যর্থ চেষ্টা—রাষ্ট্রপ্রধান যুবুট কর্তৃক জঙ্গী নেতা কর্ণেন মোঠুতু গ্রেপ্তার।

কয়েকটি দিন

জয়ন্তী রায়

প্রাত্যহিক প্রয়োজনে কতদিন পার হ'য়ে আসি,

কত বে ঘুমের রাত এসে চলে যায়,

সেই সব নিমেষে কুরায়।

কিছু তার বেশ

অবসর কালে তার কোন অবশেষ,

মনের গহন থেকে হঠাৎ হাওয়ার

ফুটে ওঠা ফুল-সম জাগেনা তো মনে ;

ওরা যেন অরাপাতা করে যায় মনে।

কিন্তু মনে থাকে,

সুন্দর কয়েকটি দিন, দূর থেকে ডাকে,

আকাশের নীলিমায়, ঘাসের শিলিরে,

অথবা ফুলের মুখে তার মিল থাকে।

হয় তো এক-একটা দিন মনে হল আশ্চর্য্য রঙীন,

বিকেলের লালরোদ ফুটন্ত চাঁপার মত সুন্দর সৌধিন,

স্বকটি গন্ধের মধু সমস্ত মনের মাঝে স্তব্ধ হ'য়ে বাজে।

হয়তো বা একটি সকাল :

পূর্ব-দিগন্ত তার লাল ঘন লাল

আকাশ উজ্জ্বল, আর হাওয়ার শরীর

দৃঢ় হ'য়ে আসে যেন নভোচাঁষী ছোট পাখীটির ;

মনে মনে গান জাগে, কী যে ভাল লাগে

সমস্তটি দিন—সমস্তটি দিন,

আনন্দ আওয়ার যেন বাজে রিনঝিন্

সেই সব নিমেষে কুরায়।

আর, এক একটি ছুপুবে,

অকারণ উদাসীন বাউলের গান

টেনে নিয়ে যায় দূরে, প্রান্তরীন মাঠ, ধান,

আর নীল আকাশ সেখানে

মিশে গেছে, মিলে গেছে, একই

লয়ে তানে—

তাঁই বলি,

যেন এক-একটি কলি

সেই সব দিন, কেবলই মনের মাঝে

ফুটে ফুটে ওঠে—স্বব হ'য়ে বাজে

সেই সব অকারণ অবারণ মনোহর দিন।

আর সব প্রাত্যহিক প্রয়োজনে

কতদিন পার হ'য়ে আসি,

কত রাত এসে চলে যায়

সেই সব নিমেষে কুরায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আসামের রহস্য.

“১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যপাল সার আকবর হায়দারী যে বিষয় বিস্মিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতীকার করা কি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য ছিল না? কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কি রাষ্ট্র খণ্ড খণ্ড করার প্রতীকার না করা—রাষ্ট্রপ্রাধিকার অভিযোগ উপস্থাপিত করা যায় না? আইন অনুসারে—বিমলাপ্রসাদ চালিহা ও ককরদীনের মত জওহরলাল নেহরু ও গোবিন্দবল্লভ পন্থকেও বাঙালীদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচারের জন্ত দায়ী করা যায় না—তাহা আজ রাষ্ট্র সচেতন ও অধিবাসী মাত্রকেই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ডক্টর কুঞ্জ ও সর্দার পাল্লিকর বাহা বলিয়াছেন, তাহার পরেও যে সরকার পদত্যাগ করিতে অসম্মত, সে সরকারের সম্বন্ধে রাষ্ট্রবাসীর অবশ্যই কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য—সরকারের পরিবর্তন সাধন। আর আজ বাঙালীকে তাহার কর্তব্য আবার ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে। অত্যাচার বন্ধন উগ্র হয়—আর বাহারা কমতার পরিচালক তাহারা সেই অত্যাচারের (সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়) সমর্থক হয়, তখন কি হয় অববিন্দ বলিয়াছেন—“To hit back, to assail and crush the assailant, to vindicate one's manhood becomes an imperious necessity to outraged humanity.” বাহারা—ভারত সরকার ও আসাম সরকার কর্তৃক বিকৃত—ভারতীয় সংবিধান দেখাইয়া বাঙালীদিগকে আসামে বাইতে প্রবোচিত করিতেছেন, তাহারা কি স্বীকার করেন না, আসামে বাঙালীদিগকে আত্মরক্ষার ও বাঙালী রক্ষার জন্ত সম্মত হইয়া প্রস্তত থাকি প্রয়োজন ও কর্তব্য? যদি কোথাও কোন বাঙালীর উপর অত্যাচার হয়, তবে তখন স্বামী বিবেকানন্দের সেই উপদেশ মরণ করিয়া কাজ করিতে হইবে—কেহ যদি তোমার গালে একটি চড় মারে তবে তাহাকে দশটি চড় কিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে হইবে—তাহাটী গৃহীর ধর্ম। আসামের ব্যাপারে কংগ্রেস কিরূপ কাজ করিয়াছে—কংগ্রেসের সত্যাপত্তি কি তাহা আসাম সরকারের ও আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সাক্ষাৎ গাঢ়িয়াছেন এবং শেষে ক্রীতদাসা যোবের দ্বারা ব্যাপক ভঙ্গ “বধাকালে” হইবে স্বীকার করাটীয়া যে কুতারা করিয়াছেন—তাহা যেন বাঙালী ভোটদাতারা নির্বাচনের সময় মনে রাখেন।”

—দৈনিক বসুমতী।

শিক্ষা-বিপর্যয়

“হাবড়া হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা একটি খবর পাঠাইয়াছেন। তাহাতে জানা গেল, সরকারী সাতারো গ্রামাঞ্চলের বালিকাদের পড়াশুনা করিবার যে সুযোগ বর্তিয়াছে, তাহা সঙ্কুচিত হইবে। ডি আই অফিস হইতে এক সাকুলার পাঠাইয়া নাকি জানানো হইয়াছে যে, ৮ম শ্রেণী অথবা তাহার নিম্ন কোনও শ্রেণীর সাতারো সাতারো সাতারো মধ্যে ১৪ বৎসরের অধিক বাহাদের

বয়স, অধ্যয়নের ব্যাপারে তাহারা আর সরকারী সাহায্য পাইবে না। এই সিদ্ধান্তটা যদি কার্যকরী হয়, তবে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ঘরের অনেক মেয়েদেই যে পড়াশুনা একেবারে বন্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তার কারণ, শহরের মেয়েরা বস্ত্র অল্প বয়সে বিত্তালয়ে ভর্তি হয়, গ্রামের মেয়েদের সচরাচর তার চাইতে কিছুটা বেশী বয়সেই বিত্তালয়ে পাঠানো হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় এই সাকুলার যে গ্রামাঞ্চলের বালিকাদের খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, তাহাতে সংশয় থাকিতে পারে না। আবার, ব্যাপারটাকে যদি বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখা যায়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ক্ষতি শুধু গ্রামাঞ্চলের মেয়েদেরই হইবে না; ক্ষতি হইবে শ্রমিক-প্রচারের আদর্শবও। সে-কথা বিবেচনা করিয়াই আমরা বলিতেছি যে, এই সাকুলারটি এখন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

শিয়ালদহ বিজলী ট্রেন

“রাজ্যসভায় একটি প্রস্তাব উত্তরে বেল বিভাগের উপমন্ত্রী মিঃ শাহনওয়াজ খাঁ বলিয়াছেন যে, শিয়ালদহ বিভাগে বৈজ্ঞানিক ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা অন্ততঃ আংশিকভাবে ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে চালু হইতে পারিবে। অবশ্য তিনি এই ঘোষণার সঙ্গে একটা মন্ত “যদি” যোগ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ট্রেন চালু হইতে পারিবে, যদি ঐতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা এবং শেট্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগও তাঁহাদের আবশ্যকীয় কাজ সমাপ্ত করিতে পারে। এই “যদি” মিঃ শাহনওয়াজের অন্তর্গত আশাপ্রদ ঘোষণাকে কার্যতঃ নৈরাস্তপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মোটের উপর শিয়ালদহ বিভাগের রেলের বৈজ্ঞানিকরণ কোন-না-কোন অজুতাতে বেরূপ বিলম্বিত হইয়া আসিতেছে, তাহা মনে করিলে ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের মাঝামাঝি সে কার্য আংশিক-পরিমাণে সমাপ্ত হইবার আশা চুরাশা বলিয়াই মনে হইবে, যদিও রেলের বাত্মীনের হুঃখ ও হুঃভোগের কথা ভাবিতে গেলে শিয়ালদহ বিভাগের বৈজ্ঞানিকরণ অনেক আগেই সমাপ্ত হওয়া উচিত ছিল।”

—সুগভর।

কৃষক সার পায় না কেন?

“গভকল্যকার “বাধীনতা”র প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখা যায় যে, আমোনিয়া সারের অভাবে কৃষকদের মধ্যে ভীষণ বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। বর্তমানের কৃষকগণ চেষ্টা করিয়াও সার পাটতেছেন না। সাধারণ ডিলাবরণ কিছু কিছু পরিমাণ সার বিক্রয় করিতেছেন কালোবাজারের দ্বারা। সম্ভাব্য সম্মিতিকৃতিক পর্ষাদ সার দেওয়া হইতেছে না, কোন কোন ক্ষেত্রে সরবরাহ করা হইলেও তাহার পরিমাণ অতিশয় নগণ্য। পশ্চিম বাংলার সার বিতরণের তার এখনো পর্যন্ত গ্যালী ড্রাদার্স, শ'ওরালেশ প্রভৃতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়। ইহা সত্যই বিশ্বকর। এদিকে বিপুল পরিমাণ সার পশ্চিম বাংলার বাহিরে চালান হইয়া যায় এ ঘটনাও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কংগ্রেস সরকার সব ব্যাপারে যেমন এ ব্যাপারেও তেমনই। আইনসভার ভিতরে এবং বাহিরে বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও এবিষয়ে জনগণের কোন লাভই হইতেছে না। গত বৎসর যদিও বা সার

বিতরণ ব্যবহার কিছুটা সংশোধনের ইচ্ছিত দেখা গিয়াছিল, এবারকার অবস্থাটা পূর্বপেক্ষা আরো খারাপ। দেশের খাত উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সরকার এ বিষয়ে এখন তৎপর হইবেন বলিয়া আশা করা বাইতে পারে কি? —স্বাধীনতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক সিদ্ধান্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া যাওয়ার এখানে মহা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পাঁচটি পদের তিনজন পদত্যাগ করিয়াছেন, রেজিষ্ট্রারও পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিতে চাহিতেন না এবং অধ্যাপক সিদ্ধান্ত কেন এখানে কাজ করা মুঞ্জিল বলিয়াছেন তার উপযুক্ত অনুসন্ধান এবং প্রতিকার আবশ্যিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদেমোক্রাসি প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেই বাতিল করিয়াছেন, বর্ধমান বা কল্যাণীতে তাহারা উহা গ্রহণ করেন। ঠাই তিন টাকায় গ্রাজুয়েট ভোট কিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা একমাত্র কলিকাতাতেই আসিয়াছে, ফলে একদল ভাগ্যাসেম্বী এবং শিক্ষার সহিত সম্পর্কহীন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা হইয়া গিয়াছেন। লেখাপড়া এবং গবেষণা রসাতলে গিয়াছে, অর্থলোভ, ক্ষমতালোভ এবং আশ্রিত-বাৎসল্য উহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সাত বৎসরের কাজ তদন্ত করিবার জন্য এবার একটি তদন্ত কমিশন বসিলে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইবে। নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার পদে বাহাদের নাম হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এই দুটি নাম আমরা সমর্থন করি।”

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

জার বাজার

“প্রতিবারের মত এবারও পূজা আসিতেছে। বত হুঃখকষ্টই থাক না কেন, বৎসরের এই সময়টিতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি উৎসব-মুগ্ধ হইয়া উঠে। কয়েকদিনের জন্ত হতশাস ও অশ্রু দমিত হয়। গত বৎসর বৎসর ধরিয়া এমন বৎসর মনে পড়ে না, যে-বৎসরে কোনও না কোন হুঃভাগ্য বাঙ্গালীকে বিত্রস্ত করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, পঞ্চাশ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু, ৪২-এর রক্তাক্ত বিপ্লব, ছাত্র-বিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, খণ্ড আন্দোলন—ইত্যাদি ঘটনা বাঙ্গালীর বুকে রক্তের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। এ-বৎসরও আসিয়াছে আসাম-হাঙ্গামা—নারকীর তাণ্ডব। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে বিতাড়িত ৫০ লক্ষ বাঙ্গালী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আসাম সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যে দাঙ্গিত ও ব্যথিত বোধ করিতেছেন। তথাপি পূজা আসিতেছে। স্তব্ধ পূজার বাজারও সর্বস্বয়ম হইতে শুরু হইয়াছে। বৎসরান্তে এই সময়ে পুত্রকন্ডা, আত্মীয় স্বজনকে নববেশে সজ্জিত করিতে হয়। ইহা আমাদের উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ। যে বাঙ্গালী অর্থাভাবে পুত্রকন্ডার জন্ত নূতন বস্ত্রাদি কিনিতে না পারে, হতাশাসে তাহার বুক ভরিয়া যায়। কিন্তু দীর্ঘ ১৩ বৎসরের ‘সমাজবাদী শাসনের’ ফলে অসংখ্য বাঙ্গালীরই এই অবস্থা। ইহাদের কথা কে ভাবে? আমরা আত্মজ্ঞাতিক ভাষাপন্ন। কল্যাণ, কিউবার জন্ত মাথা বামাই,

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর হুঃখে বিগলিত হই-কিন্তু নিজ দেশবাসীর দিকে দৃষ্টি দিতে ভুলিয়া বাই। আমাদের এই আত্মভোগ স্বভাবের জন্তই হুঃখকষ্টের সীমা-পরিসীমা নাই। আসামের দাঙ্গার পর আশা করা গিয়াছিল যে, বাঙ্গালীর চোখ খুলিবে। কিন্তু তাহার লক্ষণ এখনও দেখা বাইতেছে না। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।”

—মেদিনীপুর হিষ্টরী।

স্ত্রী-শিক্ষা

“অধুনা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার বাড়িতেছে ইহা একটি শুভ লক্ষণ। এক সময় মেয়েদের শিক্ষিত করা এ দেশের অনেকেই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি লোকের অধিকতর আগ্রহ বাড়িয়াছে। জাতীয় সরকারও স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতির পথে সহায় হইয়াছেন। তাই বিভিন্ন স্থানে বড় বড় নারী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শিক্ষার পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষায় গড়িয়া উঠিতে না পারিলে দেশের সর্বস্বাধীন উন্নতির আশা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারকল্পে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের স্কুলের বেতন মকুব করিয়া দিয়াছেন। ইহা একটি উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি সহরাকলের জন্ত নহে; পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির জন্ত। সহরাকলের অধিবাসিগণের অধিক সজ্জতি বা উপার্জন ক্ষমতা নাকি বেশী এবং এই কারণেই সহরের বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কাঁচি সহরের বালিকা বিদ্যালয়গুলিও সেই আওতায় পড়িয়াছে। কাঁচি সহরটি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে অবস্থিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি গ্রামাঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং সেই সমূহ গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসিগণের আর্থিক অবস্থাও খুবই নহে। কোনওরূপে সহরের পাশে থাকিয়া পুত্র-কন্ডাদের শিক্ষা দীক্ষা ও সহরের আত্র বজায় রাখিয়া চলিয়াছে এবং অধিকাংশ ছাত্রীরাই পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে এই সহরের স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতে আসে। কিন্তু সরকারী এই বিধানের মূলে উহাদের শিক্ষার পথ কি করিয়া প্রশস্ত হইতে পারে। ঐ সব স্বল্প আয়বিশিষ্ট পরিবারগুলির ছাত্রীদের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ থাকিলেও অর্থাভাবে উহাদের পড়া বন্ধ করিতে হইবে। নচেৎ সুবোগ সুবিধা মত উহারা মফঃস্বলের স্কুলগুলিতে গিয়া পড়িতে পারে একরূপ সামর্থ্যও অনেকেরই নাই। কাজেই ঐ সব ছাত্রীদের পড়াশুনা বন্ধ হাড়া উপায় কি।”

—নীহার (কাঁচি)।

চরম উপেক্ষা

“ভারতের লোকসভায় আসামের নির্দাক্ষণ হত্যাকাণ্ড বর্ষণ ও বঙ্গাল খেদা বিবরণের উপর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে—ব্যাধির দাওয়াই হিসাবে প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবে বাঙ্গালীকে মর্ধ্যদায় প্রতিষ্ঠা করিবার পরিবর্তে সর্বসাপেক্ষ চপেটামতই করা হইয়াছে। ধর্মিত, নিহত, অত্যাচারিত এক ভাবাত্মী মানব সমাজের উপরে চরম উপেক্ষা আর অবহেলাই এ প্রস্তাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ধারণের চরমতম কল বাঙ্গালী লাভ করিয়াছে। সত্যের বিকৃত রূপের উপর বাহবা তাহার আশাকে

গুলি স্থানে করিয়াছে। ১লা সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যে সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাব বাহা আবেদন-নিবেদনের স্তর ধরিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে অস্বস্ত: তাহাই লোকসভার সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সে আশা নির্মূল হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাঙ্গালী মানুষের সমবেত জন-প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে প্রথিত আওয়াজ দিল্লীর প্রাকারভেদে অসমর্থ হইয়াছে। কতিপয় লেজুড়বাদী পদপ্রাপ্তে করজোড়ে বন্দনারত নেতৃদ্বয় প্রয়াসীর নরম গরম উভয়বিধ কৰ্মপন্থা গ্রহণ ও মধ্যপন্থা সবদিকের ঠাট বজায় রাখা প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইয়াছে। সুচতুর দিল্লীর নায়কগণ ঐ পন্থাই সাবাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাই এইরকম যে, একুল-ওকুল ছুকুলই বন্ধা পাইল। মীরজাকরী চক্রান্তের বনিয়াদ বেশ পাকা করিয়া অলোক ভারত-মাতার বন্দনা চলিবে। তাই বাঙ্গালী, তোমার ভাগ্যাকাশে আজ চরম দুর্দিন। তুমি আজ পরাভূত, ধবিত। নেতৃদ্বয় তোমার স্বার্থক্ষায় প্রয়াসী নয়—যারা প্রয়াসী তারা অবহেলিত, উপেক্ষিত কারণ বাঙালী যৌবনকে ডাক দিতে তাহাও ত্বর পায়। —বীরভূমবার্তা।

পুজার বাজার ও ত্রিপুরা সরকার

“পুজার বাজারে বাস্তব মূল্য সম্পর্কে আমরা বহু আলোচনা করিয়াছি কিন্তু আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই। সারা ভারতে যে বিষয়ের উপর এত আলোচনা হইয়া গেল, সর্বত্র দর কমাইবার নীতি গ্রহণ করা হইল, আমাদের সরকারের এই বিষয়ে কোন কর্তব্য আছে কি না তাহাও তাহারা প্রকাশ করেন নাই। সারা ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরাও জড়িত। সর্বত্র যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, ত্রিপুরা সরকার তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক: করিতেছেন কেন? তাহা হইলে কি আমাদের বুঝিতে হইবে যে ত্রিপুরা সরকারের যে বিভাগটির অস্তিত্ব এইসব দেখাশুনার জন্ত রহিয়াছে তাহারা বাহিরের জগতের কোন খবরই রাখেন না? ত্রিপুরারাজ্যেও এতদসম্পর্কে যে সব আলোচনা হইতেছে, তাহাও তাহাদের কর্ণে গিয়া পৌঁছিতেছে না। এতখানি অর্থ বা অপদার্থ ভাবিবার কারণ হয়ত হইত যদি মাঝে মাঝে তাহাদের কর্মসংপন্নতার আভাস আমরা না পাইতাম। তাহা হারা ইহাই কি ধারণা করিয়া লইতে হইবে যে তাহারা মতলবমত জাগেন এবং মতলবমত জাগেন না এবং মতলবমত চোখ, কান, বুজিয়া “সোহহম” মন্ত্র জপিতে থাকেন? দুর্গাপূজা উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী হিন্দু মাজই কিছু না কিছু নূতন কাপড় খরিদ করিয়া থাকে, ইহা অনেকটা উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই চল হইয়াছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই পুজার কেনা কাটা শেষ হইয়া যাইবে। প্রতি বছর এই সময়টার বস্ত্রের মূল্য যেভাবে উর্দ্ধগতি হয় তাহা কি ত্রিপুরা সরকারের বিশেষ বিভাগটি জানেন না? সরকারীভাবে জানার চেষ্টা না হইলে বে-সরকারীভাবে এবং ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদের কেহ কেহ কি টের পান না? অস্তান্ত বৎসর এই সম্পর্কে আলোচনা হইলেও সরকারপক্ষ হইতে হয়ত করণীয় কিছু থাকে না। কিন্তু এই বৎসর যেখানে দর কমাইবার

জন্ত নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সেখানেও তাহাদের হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবার কারণ কি? —গণরাজ (আগরতলা)

বাংলা কি এখনও ঘুমাইয়া রবে?

“অসমীয়া বর্করতা আজ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে বাঙ্গালী তথা বাংলা আজ কোথায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। সমগ্র বাংলা আজ সঙ্কটাপন্ন—সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আজ রিক্ততার ও অসহায়তার উপাশ্বে আসিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতেছে যেন। প্রবাসে বাঙ্গালী নিধন, বিতাড়ন, স্বদেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী অনশন অন্ধাশন ব্যাধি মৃত্যু—চতুর্দিকে যে মহামরণের ছায়া ঘনায়মান! সমগ্র বাঙ্গালীজাতির জীবনে যে একটি অবক্ষয় দেখা দিয়াছে, তাহার চিহ্ন আজ যেন সুস্পষ্ট। জীবন আর জীবিকার ওড়াই এ বিস্তৃত বিড়ম্বিত বাঙ্গালী আজ নৈরাশ্রের অকুল পাথারে হাবুড়বু খাইতেছে। এই বিপদের অকুল পাথার হইতে বাংলাকে উদ্ধার করিতে হইলে বাস্তব চেতনা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে উদ্ভূত করিয়া তুলিতে হইবে; নেতৃবৃন্দকে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সুচিন্তিত কৰ্মপদ্ধতি, বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা এবং দেশাত্মবোধের জাগৃতি বাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী কী ছিল আর এখন অর্থাৎ পঞ্চাশ পরে বাঙ্গালী কী হইয়াছে? দেশের কল্যাণলী অরুণ, প্রাণচাক্ষুস্তিমিত—এই দুই চিত্র অবলোকন করিলে বার বার মনে প্রশ্ন জাগে বাঙ্গালী কোন্ পথে ছুটিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ কী? তাই বলি জাগো যে বাংলা জাগো, আর ঘুমাইয়ো না।”

—মাসিক (আসানসোল)।

আর ধামা চাপা নয়

“লোকসভায় বিতর্ক না হওয়া পর্যন্ত ভারতের কোন প্রান্তেই আসামের ব্যাপারে কাহারও টনক নড়ে নাই। সেদিন খোদ রাজধানী দিল্লীতেই নাগরিকদের এক বিরাট সভায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হইয়াছে। সভার সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ লী এন্ সি চট্টোপাধ্যায় দুইটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়াছেন। হয় আসামকে বহুভাষী রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে, আর নয় তো গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও ত্রিপুরাকে পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুনর্কাসন পরিষদও এই মর্মেই স্বারকলিপি প্রচার করিয়াছেন। আসামের ব্যাপারটা আর ধামাচাপা দেওয়া চলিবে না—যে কোন একটা বিকল্প ব্যবস্থা মানিতেই হইবে।”

—পল্লীবাণী (কালনা)

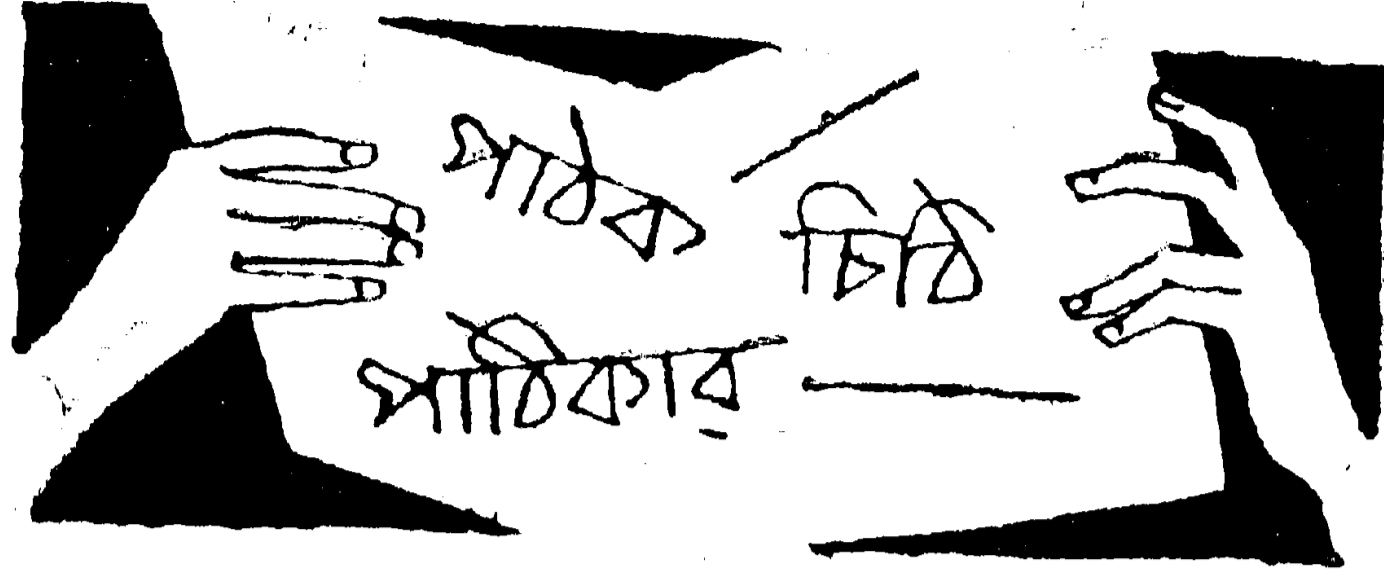
শোক-সংবাদ

হিরণ্ময়ী দেবী

সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের সহঃস্বিলী হিরণ্ময়ী দেবী গত ১৫ই তারিখ ৭৬ বছর বয়সে পাণিডাস গ্রামে পরলোকগমন করেছেন।

সম্পাদক—প্রোগ্রামের ঘটক

কলিকাতা ১৩৬ নং বিনিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রট, “বঙ্গবন্ধী মোটরী বেলিনে” প্রোগ্রামের ঘটক হিরণ্ময়ী দেবী ও প্রকাশিত।



পত্রিকা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন, আমি মাসিক বসুমতীর একজন প্রাচীক। আমার ছেলেবেলা থেকে অর্থাৎ আজ প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগে থেকে মাসিক বসুমতীর সঙ্গে পরিচয় আর সেই পরিচয় এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে আমাকে আজ তার একনিষ্ঠ ভক্ত করে তুলেছে। এ কথা আজ বলাই বাহ্যামাত্র যে সকল দিক দিয়েই মাসিক বসুমতী আজ সর্বভারতীয় সাময়িক পত্র-পত্রিকার নেতৃস্থানীয়। আজ মাসিক বসুমতীর সমকক্ষ ভারতের মধ্যে কোন পত্র-পত্রিকাই নেই, এ দিক দিয়ে বিচার করলে মাসিক বসুমতী আজ শীর্ষস্থানীয়। মাসিক বসুমতী দীর্ঘকালের পত্রিকা—কিন্তু আপনার সম্পাদনাই তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে আপনি যেদিন থেকে মাসিক বসুমতীর তার গ্রহণ করলেন সেইদিন থেকেই মাসিক বসুমতীর জয়যাত্রা সার্থকতার মুখ দেখতে লাগল আর আজ তো কথাই নেই, আজ তার গতির সঙ্গে পাল্লা রাখা কঠিন। আপনার সম্পাদনার মাসিক বসুমতী উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধির মুখ দেখুক—এ শুধু আমার নয়, এ সারা বাঙালী জাতির প্রার্থনা। পাঠক-পাঠিকার মনের কথাটি আপনি যে ভাবে ধরতে পারেন তা ভাবতে সত্যিই বিস্ময় জাগে, এ কথার অর্থ—যেটি আমরা চাই—সেইটিকেই আপনি কোন না কোন সময়ে তুলে ধরেন মাসিক বসুমতীর পাতায়। মাসিক বসুমতী মুক্তহস্তে পাঠকসাধারণের চাহিদা মিটিয়ে চলেছে। আপনার প্রবর্তিত বিভিন্ন বিভাগগুলি মাসিক বসুমতীর আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। একটি পত্রিকার মধ্যে একসঙ্গে অতগুলি বিভাগের সমাবেশ এবং তাদের স্ফূর্তিরূপে সম্পাদনা—এ নিঃসন্দেহে অবর্ণনীয় প্রতিভার পরিচায়ক। আপনাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। আচ্ছা! বহুকাল আপনার কোন লেখা মাসিক বসুমতীতে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সেই 'রাজার রাজ্য' তো কবে শেষ হয়ে গেছে। চিঠিখানি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়ল, আপনি কর্মব্যস্ত মানুষ এই চিঠি হয়তো আপনার অনেকখানি মূল্যবান মুহূর্ত কেড়ে নেবে; সে জন্তে মার্জনা চেয়ে রাখছি।—বিনীত—নন্দিনী সেন, নয়াদিল্লী।

বৈজ্ঞানিক সাহিত্য

"মাসিক বসুমতী"র সর্বসহা বলে একটা প্রসিদ্ধি রয়ে গেছে। খ্যাতি, কি অখ্যাতি—সে প্রশ্ন অবাস্তব। ঠিক মনে পড়ে না কেমন করে রচনা হয়েছিল কথাটার। যতোদূর স্মরণে আসে, ক্রীসজ্ঞানীকান্ত দাসেরই দেওয়া বিশেষণ এটা—শনিবারের চিঠির সেই অধ্যায়ের আর অগ্রিত্যবণের যুগের।

অকালে হঠাৎ হোলো দুর্ভাগ্য। যাঁ করে একখানা উপভাসই লিখে কেললাম। যে বয়সে প্রথম সাহিত্য অথবা

কাব্যচর্চাটা মানায়, সে সময়টা কেটে গেছে হালে-পালে। আজ বাজে কাজে পরম লগ্ন গেছে বয়ে। বাংলা ভাষার রচনাটা এতদিন ছিল, নিতান্ত অপরিহার্য—আমি ভালো আছি, খোকার জয় হইয়াছে—ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আত্মবিশ্লেষণ করেও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এ অকাল-বসন্তের সার্থকতা।

আপনাকে সাবধান করে দেওয়ার প্রয়োজন উপভাসটা বেশ বেয়াড়া ধরণের। বৈজ্ঞানিক উপভাস বা "সায়েন্স ফিকশন" আমাদের সাহিত্যে নতুন নয়। শ্রদ্ধের হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ প্রাজ্ঞের দল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেই এ ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। ছেলেবেলায় শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রে তাঁদের রচনা আমাদের মনে জাগিয়ে তুলতেন নানা রকমের স্বপ্ন। সত্য কথা বলতে গেলে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উজ্জ্বলিত্তে আমাদের যুগের অনেককেই প্ররোচিত করেছে এই সব স্বপ্ন।

আজও অপেক্ষাকৃত তরুণ লেখকদের মধ্যে কয়েকজন সে ধারাটা বজায় রেখে চলেছেন। জুলে ভার্নে আর এইচ, জি, ওয়েলসএর বহু উপভাস বার বার অমুবাদ করা হয়েছে বাংলা ভাষায়। তবে দেখা গেছে, এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক গল্পের প্রচার বা চাহিদা সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী পাঠকদের মধ্যে।

'সায়েন্স ফিকশন' এর কটু সমালোচনাও শোনা যায় বিদেশের বাজারে—"Science fiction is that which is neither science nor fiction"। উপভাসটা লেখার সময়ে এ সংজ্ঞাটা হৃৎস্পন্দের আবছায়া স্মৃতির মতো জড়িয়ে ছিল আমার চেতনায়। শেষ পর্যন্ত শ্রীম-কুল দুইই বজায় রাখতে পেরেছি কিনা সে বিচারটা ছেড়ে দিলাম আপনাদের ওপরে। আর আপনাদের চালুনীতে ছাঁকাই করে যদি লেখাটা রসোত্তীর্ণ বলে উত্তীর্ণ হয় তবে পাঠক পাঠিকাদের ওপরে।

বলা বাহুল্য, এটা পরিণত বয়স্কদের জন্য লেখা (দয়া করে পরিণত বয়স্কের 'ডেকনিশন'এর প্রশ্ন তুলে আমাকে আর মুঞ্চিলে ফেলবেন না) বিশেষ করে দেশের বৈজ্ঞানিক সমাজের জন্য। এখানে বিজ্ঞান কথাটার ব্যাপক অর্থটাই ধরে নেওয়া হয়েছে সমাজবিজ্ঞান ও মানববিজ্ঞান—'সোশ্যাল সায়েন্স' ও 'হিউম্যানিটিজ' অন্তর্ভুক্ত করে।

সমাজবিজ্ঞানের একজন দিকপালের সার্টিফিকেটটাও এখানে জুড়ে দিচ্ছি "হবিবুল্লাহ মেশিন"-এর সমর্থনে—

"Viewed as literature, science fiction is only, of moderate interest. It is often crudely written lacking in characterization, and without insight

into human emotion and motivation. Viewed sociologically, however, it is of extreme interest. For one may observe in science fiction, almost in the classic form, the interplay which exists between social forces and the emergence and success of a new literary regime."

[Arthur. S. Barron, "Why do scientists read science Fiction ;" Bulletin of Atomic Scientists, February, 1957]

বিজ্ঞানের উপরোক্ত সংজ্ঞা যদি মেনে নেওয়া যায় তবে আপনাদের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সব গল্প-উপন্যাসই-সাম্প্রতিক কল্পনা। কেন না, মনোবিজ্ঞান অথবা সমাজবিজ্ঞানের কোনও না কোনও মূল সূত্র আবিষ্কার করা যায় প্রতি কাহিনীর মধ্যেই।

তাই ভরসা আমার, হিন্দু হিন্দু থেকে শুরু করে পক্ষধর মিশ্রের আধুনিক বিজ্ঞানবর্তী স্মরণ্য বিশ্লেষণ পর্যন্ত নানা শ্রেণীর বিস্তৃত গ্যালারীতে "হবিবুল্লাহ মেশিন" একেবারে অপাংক্তেয় হবে না।

আরো একটা কথা। পরার্থবিজ্ঞানের গল্প লিখতে বসলে বিজ্ঞানের দুর্ভাষাশব্দগুলো একেবারে পরিহার করা যায় না। বীদেয় এতে ঐর্ষ্যচ্যুতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের আখ্যায় দেবার জন্ত একথা বলছি, যে যন্ত্রপাতির নাম অথবা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রিনো—নিউক্লীয়ার ম্যাগনেটিজম ইত্যাদির ব্যাখ্যাগুলো না জানা থাকলেও মূল কাহিনীর রসগ্রহণে কোনো বাধা পড়া উচিত নয়। সব কিছুই বিশদ ব্যাখ্যা করতে গেলে "হবিবুল্লাহ মেশিন" পরিভাষার একখানা অভিধান হয়ে দাঁড়াত। তা ছাড়া পরিভাষার "ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণিকা"র চাইতে ইলেকট্রন যেন সহজ বলে মনে হয় আমার কাছে—সেজন্ত সুবিধামতো মূল শব্দগুলোই ব্যবহার করেছি। এটা কিন্তু পরিভাষা কমিটির ওপরে কোনো কটাক্ষ নয়, সে কথাটাও জানিয়ে রাখা দরকার।

"বিজ্ঞানভিক্ষু" ছদ্মনামেরও একটা তাৎপর্য আছে শেষটা বিদ্যকরবার চেষ্টা কবেছি কাহিনীর মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে প্রত্নকারের কৈফিয়তের মধ্যে। নীতিমূলক বক্তৃতায় বীদেয় আপত্তি এ কাহিনী তাঁদের জন্ম নয়। আচ্ছা, তাহলে দেখুন হবিবুল্লাহ মেশিন চালু করা যায় কি না। ইতি—শ্রীপ্রভাতকুমার ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানভিক্ষু), ই-৩৭ এন সি এল কলনি পৃষ্ঠা ৮।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মাসিক বসুমতীর চাঁদা ৬ মাসের জন্য ৭।০ টাকা পাঠাইলাম। শ্রাবণ সংখ্যা থেকে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠিয়ে বাধিত করবেন—ভারতী মুখার্জী, পূণা।

আমি আপনার মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই। অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ১৫০ পাঠাইলাম। আষাঢ় হইতে নিয়মিত সংখ্যা পাঠাইবেন—শ্রীমতী কল্যাণী গাঙ্গুলী, চাকুলিয়া (সিঁড়ম) বিহার।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫০ টাকা পাঠাইলাম।

আশা করি শ্রাবণ সংখ্যা হইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইতে থাকিবেন—মালতীরাণী গাঙ্গুলী, বোম্বাই।

I am sending my yearly subscription from Sraban to Ashar.—Santana Debi, Burdwan.

মাসিক বসুমতীর আগামী এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলাম।—অনিতা গুঁই Katni, M. P.

শ্রাবণ সংখ্যা হইতে এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন—শ্রীমতী নির্মলা সাহেলা, Shahdo, M. P.

Remitting herewith Rs 15/- towards my annual subscription for your famous Monthly Basumati. Kindly continue to send the same from Sravan and oblige—Protima Das, Rajkot

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা হিসাবে ১৫০ টাকা পাঠাইতেছি। ভাদ্র মাস হইতে শুরু করিবেন—S. N, Bhattacharyya, Bongaon, 24-Parganas.

শ্রাবণ সংখ্যা হইতে ত্রয়োষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত চাঁদা পাঠাইলাম। Aloka Sadhu Khan, Calcutta.

Remitting Rs. 7.50 as the subscription of monthly Basumati for further six months from the month of Ashar.—Mrs. Gouri Mazumder, Jamnagar.

Please find herewith the renewal subscription of one year for your most widely read monthly magazine.—Mrs. Sudhira Ghosal, Varanashi.

বার্ষিক চাঁদা ১৫০ টাকা পাঠাইলাম। শ্রাবণ মাস হইতে এই চাঁদা চলিবে। আষাঢ় পর্যন্ত দেওয়া আছে—কমলা ব্রহ্মচারী, এলাহাবাদ।

Herewith Rs. 15/- towards yearly subscription of your monthly.—Sm. Bela Banerjee, Dhanbad.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা পাঠাইলাম। শ্রাবণ সংখ্যায় আমার গত বৎসরের মূল্য শেষ হইয়াছে। সুতরাং ভাদ্রের সংখ্যা বধ্যবধ পাঠাইবেন—শ্রীমতী সুমিতা মল্লিক, বোম্বাই।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫০ টাকা পাঠাইলাম। সংখ্যাগুলি নিয়মিত পাঠাইবেন—নীলিমা মুখার্জী, পাটনা।

আগামী শ্রাবণ সংখ্যা হইতে গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিলে অশেষ সুখী হইব। ১৫০ টাকা বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী রমিতা দত্ত দায়, আসাম।

শ্রাবণ মাস থেকে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম—নিবেদিতা রাহত, জলপাইগুড়ি।

আগামী ভাদ্র মাস হইতে পুনরায় ১ বৎসরের জন্য গ্রাহিকা মূল্য বাবদ ১৫০ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—শ্রীমতী শীলা বসু, ভুলসাল, মহারাষ্ট্র।

এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর মূল্য বাবদ ১৫০ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া শ্রাবণ সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—শ্রীমতী বেলা বাগুচী, এলাহাবাদ।



মাসিক বঙ্গমতী
॥ আশ্বিন, ১৩৩৭ ॥

(অপ্রকাশিত রেখাচিত্র)

জনৈক বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী
—শিলাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র যুথোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



মাসিক ফুলমতী

৩৯শ বর্ষ—আশ্বিন, ১৩৬৭]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥

[প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শরৎ

শরতের রঙটি প্রাণের রঙ। অর্থাৎ, তাহা কাঁচা, ঝেঁ নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, মীলটি তাজা; এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-হলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম, শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার এই হাসি এই কান্না। সেই হাসিকান্নার মধ্যে কার্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এমনি হালকাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তার পায়ের দাগটুকু পড়ে না—জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া গাইবোনের মতো যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে, অথচ কোন চিহ্ন রাখে না।

ছেগেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিষ, হৃদয়ের জিনিষ নহে। প্রাণ জিনিষটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে, তাতে মাল ঝোঝাই নাই; সেই ছুটিয়া-লা প্রাণের হাসিকান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিষটা

ঝোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে—তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝরণা—সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া-আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরণাই উপত্যকায় যে-সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে। তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিঝিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আটকা পড়ে না। তাই দেখি, শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি-চলি করে—বর্ষায় মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায়, শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশপ্রাঙ্গণ হইতে তখন সভার আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর-এক পার পর্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সেদিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল ছড়িয়া বসিয়াছে, সেইজন্যই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরৎ বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরৎ ফসলখেতের ঋতু। এই ফসলের খেত একেবারে মাটির কোলের জিনিস। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি-দাদারা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, ইক্ষু, এরা যে ছোটো, এরা যে অল্প-কালের জন্ম আসে—ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই ছুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সূর্যের আলো ইহাদের জন্ম যেন পথের ধারের পানসত্রের মতো—ইহারা তাড়াতাড়ি গম্বুধ ভরিয়া সূর্যকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া যায়, বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই-সব ছোটোদের, এই-সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে, তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরেটা শূন্য আকাশের নিচে হা-হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে; তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবিদাওয়ার দলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, “হে শরৎ, তুমি শিশিরাক্ষ ফেলিতে ফেলিতে গত এবং আগতের ক্ষণিক মিলনশয্যা পাতিয়াছ। যে বর্তমানটুকুর জন্ম অতীতের চতুর্দোলা দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারই মুখচুসন করিতেছ—তোমার হাসিতে সোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।”

মাটির কণ্ডার আগমনীর পান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দী-ভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুদিন হইল ধরাজননীর কোলে

রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া; তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই, হাসির চক্ষুকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ঐ পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশমীরাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, “বসন্ত তার উৎসবের সাজ বুধা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার পর পাতা খসিতে খসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে।” তিনি বলিতেছেন, “ফাল্গুনের মধ্যে মিলনপিপাসিনীর যে রসব্যাকুলতা তাহা শান্ত হইয়াছে, জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তপ্তনিঃশ্বাস বিক্ষুব্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লগুভগু অরণ্যের পায়ন-সভায় তোমার ঝোড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের রুদ্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারই মৃত্যুশোকের বিলাপগান গাহিবে বলিয়া। তোমার বিনাশের শ্রী, তোমার সৌন্দর্যের বেদনা ক্রমে স্তূতীত্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিক্রম।”

কিন্তু তবুও যে-শরৎ বাষ্পের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে-শরৎ মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসিমুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের ছুঁয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাত আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধূধা। সেই ধূধাতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদবেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনীগানের আর তন্তু নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি, পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, “তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধূধা; তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।” —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



শ্রীগঙ্গাধর দাস সরস্বতী

বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্বরাগ সাহিত্যের তথা পদাবলীর প্রাণস্ফূর্তি করে স্রষ্টার সৃষ্টি করেছে ;—আর সেখান থেকে বিস্তৃত লোহিত স্রোত সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের শিবার, উপশিবার ছড়িয়ে পড়েছে ।...তাই, সেদিন হতেই শ্রীরাধার অন্তরে যেন দাবানল দাহ ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে ! হায় ! আমার একি হল !

শুধু—“কামু হেরব ছিল মনে বড় সাধ ।

কামু হেরইতে ভেল পরমাদ ॥” (বিজাপতি)

আগ কি দেখিছ বনুনার কুলে,—কালো তমালের তলে, শান্তশ্রোতা বনুনার তটে, কুফকান্তি, চাঁচর-চিকুর, আয়ত নেত্রের কালো কাল চাঁউনি, আর আভাসুলবিত বাহু,—হাতে তার বাঁশের বাঁকী, মস্তকে বনফুল আর শিখিপুচ্ছ...একে যেন আমি চিনি।—সখি রে ! মনে হয় হৃৎ হৃৎ বা হৃদয় আগে এরই সাথে একই খেলাধরে খেলার মস্ত ছিলাম, জানি না,—কি কারণে আজ বিশ্বস্তির অন্তর্ভুক্তি...কছু মনে পড়ে, কিছু মনের গহনে চিন্তার জালে স্মরণে আসে না কে সে ! তার সাথে আমার কি বা সখ ! কোন নূতন অহুভূতি নয়, কোন নূতন উপলক্ষি নয়—আমি শুধু নূতন জীবনের সন্ধান পেয়েছি। তাই পূর্বরাগ বলে,—রূপ নয় অরূপের ব্যাধার সখিগণ লয়ে উন্মাদা, আবেগাকুলা, সংশয়চিত্তা, জঞ্জালিন্দ্রা শ্রীরাধা মস্ত...সখি রে, মেঘ দেখে এলাম বনুনার কুলে, তার কালোজলে সেই মেঘ প্রতিবিম্বিত হয়েছে । আসন্ন বরিষণ, কুফ মেঘের কোলে যেমন বলাকা-শ্রেণী সারি বেঁধে ধাবিত হয়—বনফুলমালা গলে তেমনিই শোভা পাচ্ছে । আসন্ন বরষার ধারা ভূপতিত হচ্ছে—শ্রীরাধা কাঁদছে ।

চতুরা অষ্টসখি—লজিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিজা, ইন্দুযেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবিকা—প্রায় সকলে রূপে গুণে বিশেষতঃ বয়সে শ্রীরাধার সমান । তাই শ্রীরাধার আসল কথা জানতে পেরেও তারা তামাসার মস্ত হয়েছো,—বল, বল না সখি,—পূর্বগগনের মেঘের কথা ; আহা চুই মেঘের বুঝি আর সময় হল না রে ! সখীরা শ্রীরাধাকে ছাড়বে না ;—কি অলক্ষণে মেঘ বা তাদের শ্রীরাধাকে পেয়ে বসেছে, তার প্রতিকার তারা করবেই—শুধু মেঘের পরিচয় পেলেই হয় । বল না সখী সেই মেঘের

কথা ! সখিগণের সহানুভূতিতে দ্রবীভূতা হয়ে শ্রীরাধা তখন বলে,—

“শুনলো প্রাণের সেই মনের কথা তোরে কই

গিয়েছিলাম বনুনারি জলে ।

নন্দেরি তুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের কাঁদ
ব্যাধ ছলে কদম্বেরি তলে ।

দিয়া হাত সুখচাঁদ অঙ্গ ছটা আভা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল

মন-মৃগ সেই কালে পড়িল রূপের জালে
বন্ধ হয়ে সেখানে রহিল ॥” (শ্যামানন্দ দাস)

অষ্টসখীর মুখের হাসি মনেই যদ্যে গেল,—শ্রীরাধার অবস্থা দেখে আর সেই হাসি ওঠে-অধরে, পরাবিত হল না । তার বিকারগ্রস্তা শ্রীরাধাকে কত কথায়, বত সান্তনায়, কত বিচিত্র আলোচনায়, অবশ্য সে আলোচনা, সে সান্তনা ও সে কথা ঐ দারুণ আঘাতকারী ‘মেঘ’-কেন্দ্রিক,—তবুও তার যোর কাটল না । তখন সখিগণ জানাল,—ওরে, তুই বা কেন এত ভেঙ্গে পড়তিসু বল ? পবনের অহুকুলে মেঘ ওঠে আবার বিপরীত পবনে সে কেটে যায় । তাই শুধু ক্ষণিকের মেঘ ; ও মেঘ যেমন উদয় হয়েছে, তেমনিই সহসা কেটে যাবে রে, তুই আর কাঁদিসু না । কিছ না—“হেম গৌরী তরু রাই

আঁখি নয়শন চাই
যৌদন করিব অতিলাষ,
জলধর চর চর অঙ্গ অস্তি মনোহর
রূপে ভুবন পরকাশ ।

সখিগণ চারি পাশে সেবা করে অতিলাষে
সে সেবা পরম সুধ ধরে ॥”

(নরোত্তম)

শ্রীরাধা কাঁদবেই ।—সে নিত্যকে, নিয়ন্তাকে, প্রেম ও প্রেমিককে, প্রাণ ও প্রাণেশ্বরকে, নয়ন ও নয়নমণিকে প্রত্যক্ষ চাক্ষুযই যুগ করেনি—সেখানে অঙ্গ-অঙ্গান্তরের একই সঞ্চার আভাষ পেয়ে স্নান-বিনিময় হয়েছে । তাই আজ ব্রজভূমিতে নরলীলার বাণী ও কুফ হুই নর-নারী অতিরিক্তার অভাবে বিচলিত । অর্থাৎ শ্রীরাধার এই যৌদন বা প্রেমোদ্বেগ অতিরিক্তা আনয়ন করে, মিলনের সঙ্কেত বা রাধাকৃষ্ণ দারুণতার গৌরচন্দ্রিকা এই পূর্বরাগ ।—এই

প্রথম দর্শন শ্রীরাধা-অঙ্গে এক তার মন-ভূমিতে "শ্রীভ্যকু" উল্লেখ
হয়েছে। কাজেই সখীদের কোন সাধনাই কাজে লাগল না,—
বখন তারা শ্রীরাধাকে স্তুতি করছে,—

"বৃন্দাবনেধরি! বয়োগুণ রূপলীলা

সৌভাগ্য কেলি-কল্পনা-জলধে-অবধেহি।"...

কিন্তু শ্রীরাধার এখন কোন স্তুতি, কোন সাধনা স্তনবার মত
অবস্থা নয়। ওয়ে সখি, তোরা আবার আমার সেইখানে নিয়ে
চল,—...পূর্বরাগের মেঘ জমাট বেঁধে শ্রীরাধার অন্তরাকাশে অহুরাগের
বর্ষণবারা সঞ্চিত হয়েছে। তাই কীভাবে কীভাবে অনুভব করে
সখিদের পারে ধরে বসছে,—ওয়ে, তোরা আমাকে বাঁচা ; আর
একটিবার সেইখানে চল, যেখানে যেব উঠেছে। সে মেঘের রূপ
বর্ণনার তোদের আমি বুঝতে পারবো না, সে শুধু আমার নয়নের
জলে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, চল, চল তাকে আর্ষণ দেখতে চল।...
পূর্বরাগ বিরহে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

কিন্তু এতে সখীদের বখেই আপত্তি আছে। তারা বার বার
বলছে, নায়ে সখি, তুই ভুল করিস না ;—

"তুই হুণ মঞ্জরী . . . রূপে গুণে আগরী

মধুর মাধুরী গুণ ধামা।

ব্রহ্ম নব যুবকল প্রেম সেবা অমুকক

এইছে বরণ তহু ভ্রামা।"...

[শ্রীনিবাস আচার্যের নিজস্ব প্রার্থনা]

শ্রীরাধাকে অষ্টসখি গর্ভিত করে তুলছে, তারা তাকে উদ্ধৃত
করছে, ওয়ে,—তোরাই বা রূপ কম কি, গুণ তোরাই বা কম কিসের ?
তোরা জন্মেও সে চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে, তুই ধাম ধাম—ব্যস্ত হোস না।

সত্যিই শ্রীকৃষ্ণচিহ্নও বিকল হয়েছে,—শ্রীরাধাকে দেখে তার
চকচকিতে বেন সব কিছুই অভাব জেগে গিয়েছে—তার মন-আলা
বেড়ে গিয়েছে,—

"ধনী অলপ বয়স বালা

জন্ম গাঁথছি পুহপ-মালা

খোরি দরশনে আশ না পূবল

বাটল মদন-আলা।"

(বিজ্ঞাপতি)

তাই, শ্রীরাধাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণেরও মনে অহুরাগের মেঘ এসে
জুড়ে বসল। তার আঁখি-পাখি—

"ধাতুল হুহ" লোচন রে বতহি গেলি বরনারী।"

(বিজ্ঞাপতি)

শ্রীরাধা বতনূর গেল, সেই পথে তার দৃষ্টিও ছুটল। না ছুটে
পারে না।...সখিরা পরম্পরের এই প্রেমোক্তক জেনেই বলেছে,
ওয়ে সখি তুই কানিস না। সেই, সেই-ই আসবে।

কিন্তু লজ্জিত শ্রীরাধা পরমপ্রকৃ, হৃদয়েধরকে ছোট করতে তো
চাই-ই না, উপরন্তু একথা শুনে মহাপাতকী হবে বলে সখীদের
কাছে জানাল,—ওয়ে, তোরাও কি আমার মত বিকারগ্রস্ত হবে
ভুল কথা বলছিস ? তোরা কি জানিস না,—

"কো বাধম ওলাস্তমবলব্য প্রীতিমপি ন কুৰ্যাৎ।"

কে সে অধম আছে যে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছ্বসিত প্রেম সেবা না
করবে ? তাই সখি তোরা কার কাছে আমার রূপের গর্ব করছিস ?

তখন অষ্টসখি আবার শ্রীরাধাকে বাগান্ধিকার গুণ বর্ণনা
দিয়ে বুলাল।—না সখি আমরা ভুল করিনি, তোরা মনে প্রেক্ষা
সফার হয়েছে আর সেই হেতুই তোরা কণে কণে ভ্রাম,—কে
তুই কি জানিস না ?—

"ভক্তো ষণু ভগবান স্বরমেব বশীভূতঃ স্তিষ্ঠতি,
তাৱরস-কোষে মধুপ ইব, বসিক যুভ্যামিতি।"

ওয়ে আবেগমনা, সংসারকুলা—তবে শোন, যেমন ঘোঁচা
গড় পেয়ে দিগন্ত হতে মোমাছি ছুটে আসে, তেমনি ভক্তির
সুগন্ধ ও আশ্রয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ আপনিই আসবে। তুই কি বল
না,—"প্রেমে কুক হয় বল।"

শ্রীরাধা তবু তাদের কথা শুনবে না—

"কহহিমো সখি কহহিমো কতয়ে তা হেরি বাসা,

দূরহ হুগুণ এড়িমো আবরো পুহু দরশন আশা।"

(বিজ্ঞাপতি)

সখি তোরা আমাকে বল, দূরত্ব বিগুণ হলেও আমি তাকে দেখতে
যাবো—যাকে দেখে আমার নয়ন, মনপ্রাণ, জীবন বোঁবন চির
ধন্য হবে। বল তোরা—সে কোথায় থাকে ?

কিন্তু না, বখন সখীরা তার কথার রাজী হল না, তখন
উপারাস্তর না দেখে,—

বসিয়া বিরলে

ধাকরে একলে

না শুনে কাহারো কথা।"

(চণ্ডীদাস)

তখন শ্রীরাধার—"দিবা নিশি দিশি দিশি কালা মনে পড়ে।"
তখন সখীরা চিন্তার অধীর হয়ে উঠল। তারা শ্রীরাধাকে তিরস্কার
করে বলল,—আচ্ছা বলত দেখি,—তুই যে এমন করছিস তা তোরা
শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদের আঁচলে সর্বদা বাঁধা থাকবে, না বে ? তোরা
প্রয়োজন মত আমরা তোকে দেবো।

উত্তরে শ্রীরাধা জানাল,—সখী, রাখ তোদের গর্ব। তোদের
ভরসা আমি করি না। কালাকে আমিই বেঁধে রেখেছি,

—"কালা সে কেশ

কালা সে বেশ

লোটন বাঁধিয়া রাখি,

বখন কালায়ে

পড়য়ে মনে

আউলিয়া তাহা দেখি।" (চণ্ডীদাস)

কালা আমার চুলের খোঁপায়। বখন কালা দরশন তরে চিত্ত
চঞ্চল হয়, তখন চিকন-কালো চুলের গোঁড়া বৃক্ক আঁকড়ে কাঁদি।
এই তো আমার কালা। আমার জন্ম জন্মান্তরের তপস্তার কালা
চুলেই কালাকে দেখি। আর সেই রূপ-সাগরে, নয়নের স্রোতে
মন প্রাণ অঙ্গ ভাসিয়ে দিয়ে কোন বিনিবৃত্ত মহাসমুদ্রে শান্তির
তরঙ্গোন্মাদে নৃত্য করি। তাই-কালার আলা আমিই বেঁধে
রেখেছি।

এমত অবস্থার ব্রহ্মভূমিতে ব্রজাঙ্গনা শ্রীরাধার গোপন কুক-
প্রেমের সমালোচনা সূত্র হয়েছে। তাই আবার সীধরা তাকে
নিবৃত্ত হতে বলছে। কিন্তু ছুট্ট বাঁধি বে "রাগা রাগা" ছাড়া বাক্য
না। পুর নয় ত প্রাণের ডাক ; প্রেমমিলনের ইজিত। তাই
ব্রজনারীদের অপবাদে সে নিরস্ত হতে পারবে না। কারণ আত্মকে
বাদ দিয়ে যেমন সজীব দেহ নয়, তেমনি প্রাণেরধরকে বাদ দিয়ে

প্রেমতত্ত্ব

স্বধাংশু চৌধুরী

অন্তরে অনন্তসৌন্দর্যের মধুরতা নিয়ে প্রেম মানুষের প্রত্যক্ষ অপ্রেমিক মানুষটিকে প্রেমিক করে তোলে। বসন্ত-স্পর্শে ঝরাপাতার বৃকে যেমন জাগে নবজন্মের শাখত সুখমা, তেমনি যৌবনের উপবনেও নবজন্মের শাখত সুখমা নিয়ে আসে মধু বসন্ত। সে বসন্ত-স্পর্শ স্বয়ং-আনন্দলোকের সুপ্ত বনাকুয়ে বহে আনে চিরানন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ফল প্রবাহ। যুকুল থেকে পূর্ণ বিকাশের আনন্দে ফুল যেমন অনন্তস্থতির অমর্যাবতীতে তার পবিত্র সুরভির ঘর ধুল দেয়, প্রেমও জীবনোজানের বৃকে প্রস্ফুটত হয়ে তার সুরভির স্পর্শে অন্তরের সুপ্ত প্রেমময় মানুষটিকে জাগ্রত করে তোলে। তখন 'The roses of love glad the garden of life'—প্রেমের পুষ্পমঞ্জরী যৌবনের উপবনকে করে তোলে আনন্দময়। তখন সৌন্দর্য-বোধশক্তি জাগে, মানুষ হোরে ওঠে তখন সুন্দরের উপাসক—তোয়ে ওঠে প্রেমিক। মন হয় কোমল। নিজীব হোরে ওঠে সঙ্গী। অকবি হোরে ওঠে কবি। সুরা হোরে ওঠে সুর। সে মিলনমধুর সুর মূর্ছনার গোধুলীর সোনারা সন্ধ্যায় মন চায় মানস-সায়রে ভাসিয়ে দিতে জীবনের আশা-আনন্দের মূর্ত প্রতীক সে ছোট ভেলাখানিকে। যে ভেলা সুরেলা প্রেমের বার্তাকে বহন করে তেলে বাবে আনন্দের অমর্যাবতীতে—চিরবসন্তের স্বপ্নকূলে—কোন নাম-না-জানা মানসীর মানস-কূলে।

প্রেম সুন্দর। তাই প্রেমের দিব্যদৃষ্টির কাছে সৃষ্টি মধুর—সৃষ্টি সুন্দর। অন্তরে প্রেমের রঙ লাগে, সে রঙে পৃথিবী হোরে ওঠে রঙিন। তখন সুন্দর আর অনন্দরের মধ্যে থাকে না কোন বিভেদ। প্রেমের দৃষ্টিতে সব কিছুই সুন্দর, তাই প্রেম সুন্দর।

প্রেম পবিত্র। প্রেমের পবিত্র স্পর্শে অন্তরে জাগে পবিত্র জীবন। প্রেম সমস্ত বাসনা-কামনার উর্ধে, তাই বাসনার রঙে রাঙিয়ে তাকে অপবিত্র করা যায় না। প্রেম কলনিনারিনী জাগীশ্বরীর মতোই পবিত্র। সাংখিক এবং শাখত প্রেমের কাছে কোন অপবিত্রতার স্থান নেই, তাই প্রেম পবিত্র।

প্রেম অন্তর্ধামী, 'Love's a stranger to the breast' কিন্তু অমৃতভূতির মধ্যে দিয়ে তাকে অমৃতভব করা যায়। তার গন্ধকে অমৃতভব করা যায়। তাই কবিগুরু বলেছেন,—

...প্রেম অন্তর্ধামী।

বিকলিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন,

গন্ধ তার লুকাবে কোঁঠার ?

কিন্তু প্রেমকে আমরা দেখতে পাইনা, 'গোপনে থাকে প্রেম, যায় না সে দেখা।' তাই তাকে অন্তর দিয়ে অমৃতভব করতে হয়, তাই প্রেম অন্তর্ধামী।

লজ্জায় প্রেম সুন্দর। 'লাজরক্ত হইল কল্পা পরথম যৌবনে'—লজ্জায় প্রেমের ক্রমবিকাশ। লাজরক্ত প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ। যে লজ্জাশীলা তাহাকে বৃক চিরিয়া রাখিতে পারি... প্রেম পুরাতন হয় না। লজ্জানত্র দেখিলেই সে প্রেম নবীন হইয়া উঠে। (উজ্জ্বল-প্রেম)

কবিগুরু তাঁর 'লজ্জা' কবিতায় তাঁর মানসীর প্রেমকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন,—

আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান
কেবল শরমখানি রেখেছি।

চাহিয়া নিজের পানে নিশিদিন সাবধানে
সবতনে আপনারে ঢেকেছি।

* * *
বসন্ত নিশীথে বঁধু লহো গন্ধ, লহো মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ে।

দিয়ে দোল আশে-পাশে কোয়ো কথা মৃদুভাবে
* * *
শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ে।

শুন বঁধু শুন তবে, সকলি তোমার হবে,
কেবল শরম থাক্ আমারি।

প্রেমসীর মুখ দিয়ে লজ্জার যে প্রকাশ, এ প্রকাশে প্রেম আরো সুন্দর—আরো মধুর—আরো স্বর্গীয়।

এই যে স্বর্গীয় প্রেম, এ প্রেমকে বিশ্বরণের পদা দিয়ে কোনদিন ঢেকে রাখা যায় না। সুখক্লেশ ষাত-প্রতিঘাতের মধ্যে নানাভাবে কেটে যায় জীবনের মুহূর্তগুলো। জীবনের অনেক অরণীয় ঘটনা বিশ্বরণের অতলতলে তলিয়ে যায় কিন্তু জীবনে প্রথম-আসা প্রেমের স্মৃতিকে কোনদিন ভুলতে পারা যায় না। তাই বাইরণ বলেছেন,—

When age chills the blood,
When our pleasures are past,
For years fleet away with the wings of the dove,
The dearest remembrance of will still be the last,
Our sweetest memorial the first kiss of love,
(The first kiss of love)

কবি এখানে বলেছেন, যখন আমাদের রক্তপ্রবাহ হোরে আগবে শীতল, নিভে যাবে আসক্তির আলামর বাহাশখা, আর জীবনের মুহূর্তগুলো পাখীর ডানার ভয় দিয়ে যাবে উড়ে, তখনো আমাদের অন্তরের প্রত্যঙ্গে প্রথম প্রেমের সে মধুর স্মৃতি অজ্ঞান এক অবিস্মরণীয় হোয়ে থাকবে।

একথা আবার আমরা উজ্জ্বল প্রেমের লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকেও শুনতে পাই—এতোদিন যে দেখি নাই, তবুও—

'সে চাঁদমুখের মধুর হাসনি সদাই মরমে জাগে।'
তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রেম যেমন অমর, তার স্মৃতিও তেমনি অমর। অন্তরের প্রত্যঙ্গে সে স্মৃতি অমর হোয়ে থাকে।

অপরিচিতের ভেতর দিয়ে পরিচিতির যে চিরন্তন প্রবাহ, সে প্রবাহের পথ-রেখা ধরেই প্রেম আসে আমাদের জীবনে। সে হুটি মন একঘের মূর্ছনার মুখর ও মধুর হোরে ওঠে—চাঁওরা ও পাওয়ার কামনার রাঙিয়ে তোলে মনের আকাশকে—মুখের ভাষা হারিয়ে যখন চোখের ভাষার উঠে আসে প্রেমের মৌন-মুখরতা, সে সময়

যদি দুটি মনের মধ্যে আসে বিচ্ছেদ তখন প্রেমকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিরহে প্রেম সুন্দর। কারণ—

‘ব্যর্থ সে মিলন সুখ—মুচ্ছনাটি তার
বিশ্বে তবু জাগি রবে বহি স্মৃতি ভার।

(‘অকথিত’—কান্তিচন্দ্র ঘোষ)

সে স্মৃতিভাব প্রেমের বিরহব্যথাই পূর্ণ থাকে, তাই সে স্মৃতির মুচ্ছনা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে। বিরহের মধ্যে প্রেমিক বা প্রেমিকাকে যে অনুরাগ, যে অন্তর্দর্শন, যে শূন্যতা, যে বিরহাকৃতি, যে ব্যাকুলতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয়, তাতে প্রেমের গভীরতার দিকে আরো এগিয়ে যাওয়া যায়। বিরহের যাতনায় ব্যাকুল কোন একজন উর্ধ্ব কবির মনের বাথাকে এখানে তুলে ধরছি—

‘দিদার বাদা হসলা সাকী

নিগাহ হে মস্ত।

বাজমে খেয়াল মায় কাদহ

এবে খরোশ হায়।’

প্রিয়াকে কাছে পাবার জন্য মনের নেশার মতো ঘিরে ধরেছে কবির মনকে। কিন্তু যখন তিনি ভাবেন তাঁর প্রিয়াকে তিনি আর কোনদিনই পাবেন না—সে অধরা, তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তখন তিনি তার মমতায় ভরা প্রাণের তারাটিকে খুঁজে ফেরেন লক্ষ লক্ষ তারার মধ্যে—

মিলেই চরখ মে হবু আখতার

আগর দিল হায় তো কেয়া

একদিল হোতা যো দরদ সা

কাবিল হো তা।’ (উর্ধ্ব শের্কা)

কারণ, এ নিষ্ঠুর আকাশের বৃকে লক্ষ লক্ষ তারা আছে, কবির কাছে তারা নিষ্ঠুর হৃদয়। তিনি তো সেগুলোকে চান না, তিনি চান তাঁর মনের তারাটিকে। সে তারাটি মমতায় ভরা—যে তারাটিকে তিনি ভালোবাসেন।

সে মমতায় ভরা তারাটি তাঁর কাছে অনন্য এবং অসাধারণ। কারণ প্রেমের দৃষ্টিতে রূপের প্রয়োজন নেই। সেখানে প্রাণের আকর্ষণই বড়ো। তাই প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমসী বাহ্যিক রূপহীন। হলেও সে সুন্দরী—সে মধুর। তাই লক্ষ লক্ষ হৃদয় যতই মাধুর্যময় হোক না কেন, কবির মানসীর কাছে তারা যে সুন্দর নয়। এই বিচ্ছেদের মধ্যে প্রেম পবিত্র—প্রেম অন্তরতম। তাই প্রেম বিচ্ছেদেরও প্রয়োজন। কারণ, ‘বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না’। প্রেম সুখও আছে দুঃখও আছে। তাই কবিগুরু বলেছেন—

...হৃদয়ের প্রেম

সুখদুঃখ বেদনার

আদি অন্ত নাহি যার

চিরন্তন চিরপূর্ণ হেম। (হুবোষ)

দুঃখ বেদনা ছাড়া প্রেম হয় না। তার ইংগিত আমরা বাইরের মধ্যে পায়—

Ah ! Love was never yet without
The pang the agony, the doubt
Which rends my heart with ceaseless sigh
While day and night roll darkling by,
(Translation of a romaic love song)

টেনিসনের মধ্যেও অনুরূপ স্তনতে পায়—

Love is hurt with jar and fret,

Love is made a vague regret,

(The Miller's daughter)

তাই সহজেই বলা যায়, প্রেম হুল্লুভ রঙ্গ। তাকে পেতে হলে দুঃখ-যাতনা, সন্দেহ মুতাসাতনা ও বক্ষ বিদীর্ণ করা অন্তরের শত শত দীর্ঘশ্বাসকে দিনের পর দিন সবে যেতে হয়। এই দুঃখসমুদ্রে মগ্নন করে যে অনন্ত রঙ্গকে লাভ করা যায় তাই হলো ‘প্রেম’।

কিন্তু এই প্রেম গোটা একটা মানুষকে চম্বছাড়া করে দেয়—আবার গোঁববের আসনেও সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পাবতীর বিরহে দেবদাস হয়েছিল চম্বছাড়া আর শৈবলিনীর বিরহে প্রতাপ তোয়ে উঠেছিল বীরশালী। তাই প্রেমের মধ্যে সুখও আছে, দুঃখও আছে। শান্তিও আছে, অশান্তিও আছে। আবার চিরবিচ্ছেদে প্রেমের অনুলভিত্য মধ্যে যেমন আছে হাহাকার, তেমন আছে মনকে উচ্চতর আদর্শের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা। কালিদাসের ‘বাথার দান’ আর চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’ যেমন আছে হাহাকার, তেমন আছে মানসীর ‘প্রেমকে পবিত্র’ এবং শাশ্বত বলে অনুলভ করা বাকী। তবুও উদ্ভাস্তপ্রেমের সেখানকার অতিবড়ো প্রেমের মধ্যে যে মর্মদাহী জ্বালা আছে, সে জ্বালা তাঁর প্রেমিক মনকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। সেইজন্তই হয়তো তিনি বলেছেন—

‘অব বিষ সম লাগয়ে মোই।

হরি হরি ! পিরীতি না করে জনি কোই।’

এই যে আঘাত, এ আঘাতে প্রেমকে আরও মহৎ করে তোলে। ‘আঘাতে আঘাত করে মহৎ উদ্ধার’। প্রেম আঘাত আছে, প্রত্যাঘাত নেই। প্রেম যেখানে সত্য সেখানে কোন প্রত্যাঘাতই আসতে পারে না। তাই বাইরের বিচ্ছেদ-বিধ্বয় মন প্রিয়াকে আঘাত দিতে পারেনি। ভগবানের কাছে তার সুখই কামনা করেছেন—

Alas ! again no more we meet,
No more our former looks repeat ;
Then let me breathe this parting prayer,
The dictate of my bosom's care ;
May Heaven do garde my lovely Quaker,
That anguish never can o'ertake her ;
That peace and virtue ne'er forsake her,
But bliss be aye her hearts partaker !

(To a beautiful Quaker)

হায় ! যদিও কবির সংগে তাঁর মানসীর আর দেখা হবে না—হবে না চোখে চোখে সে মধু-মিলন, তবুও তিনি মনে প্রাণে ভগবানের কাছে তাঁর মানসীর সুখ কামনা করেন, ভগবান তুমি তাকে বক্ষা কোরে—দুঃখযাতনা ও মনস্তাপ যেন তাকে কোনদিন স্পর্শ করতে না পারে—শান্তি এবং ধর্ম যেন তাকে কোনদিন ছেড়ে না যায়—‘নিমন্ত যেন তোমার আশীর্বাদ তার অন্তরকে বিবে বাধে।

তাই বলেছি প্রেম যেখানে সত্য সেখানে প্রত্যাঘাত নেই। একজন অসুখী হোয়েও আর একজনকে সুখী করার জন্য যে দুর্বীর কামনা সেখানে প্রেম সত্য। ভালোবাসা সাক্ষিক।

শ্রেয়স অতল-স্পর্শী এবং পবিত্র । সে পবিত্র প্রেমকে বাসনার স্পর্শে
কলুষিত করবার অধিকার কারো নেই । তাই কবিগুরু বলেছেন—

জীবনে মরণে
শত শত-আবর্তনে
শতদল উঠিতেছে কুটি—
স্বতীকর বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
লহ তার মধুর দৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ,
মধু তার কর তুমি পান,
ভাগ্যবাসো, প্রেমে হও বলী
চেওনা তাহারে ।

আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্ম মানবের । (নিফস কামনা)
স্বতরাং বাসনার বহি নিতিয়ে আমাদের অন্তরের প্রেমকে অন্তরে
রেখে তার পবিত্রতাকে আমরা মনোমান করবো । সে প্রত্যন্তের
লুকানো প্রেম হবে পবিত্র ।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার স্বপ্ন তলে মানিকের মতো বলে,
আলোতে দেখায় তারে কলঙ্কের মতো ।

('ব্যক্তপ্রেম'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সেইসময়ই হয়তো কবিগুরু তাঁর 'শ্রেয়স কবিতা'র নারিক-নারিকাকে
শ্রেয়স বন্ধনে বন্দী করে বাসনার বন্ধন থেকে দূরে সরিয়ে
রেখেছিলেন । কারণ বাসনাটাই বড়ো নয় । 'মহৎ প্রেম শুধু
কাছেই টেনে রাখে না, দূরেও সরিয়ে দেয় ।'

শ্রেয়স স্বর্গীয় । সে স্বর্গীয় প্রেমের কাছে একদিন ভগবান
ঈশ্বরকেও মাথা নোয়াতে হয়েছিল । রাখার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—

স্বর-গবল-ধ্বনিং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পদ্ম-মুদারম্ ।
অলক্তি ময়ি দাক্ষণ্যমদনকদনাকরণো
হরতু তদুপারিত—বিকারম্ ।

(গীতগোবিন্দম্, দশমঃ সর্গঃ, গীতম্ ১১১।)

'হে রাধে, কামবিন বিনাশক তোমার ঐ মনোহর পদপদ্ম
আমার মস্তকে স্থাপন কর । আমার অন্তর দাক্ষণ্য মদনাকরণে
লিপ্তেছে, তোমার চরণ স্পর্শে সে বিকার দূরীভূত হউক ।'

এই তো গেল প্রেমের বাসনাহীন স্বর্গীয় ভূমিকা, কিন্তু বাস্তব
করে শেলী মিলন পিয়ালী । প্রিয়াকে কাছে পাবার যে হুনিবার
ক্ষণ তা কুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে—

The fountains mingle with the river
And the rivers with the ocean,
The winds of Heaven mix for ever
With a sweet emotion ;
Nothing in the world is single,
All things by a law divine
In one spirit meet and mingle
Why not I with thine ?

নির্ভর মিশে তটিনীর সাথে তটিনী মিশিছে সাগর জল
লহরীর পর লহরী তুলিয়া পবন মিশিছে গগন তল
একটির সাথে আরটি মিলিবে ভগতে কেহই হবে না একা
তুমি আমি সাকী কেন না মিলিব এবে বিধাতার বিধিতে লেখা ?
তাঁই—

What is all this sweet work worth—
If thou kiss not me ? (Love's Philosophy)

মিছে এতো হাসি, মিছে এতো গান, মিছে এতো আলো ভুবন ভরে,
তুমি যদি প্রিয়ে নাহি দাও চুমা বারেক এ মোর কপোল 'গরে ?
তাঁর মতো আমরাও বাস্তববাদী । কারণ, প্রেম যে স্বর্গীয়, সে
স্বর্গের অমরাবতী তো আমাদের এই মর্ত্যের বকেও আছে—
Some portion of paradise still is on earth,
And Eden revives in the first kiss of love.

এবং এখানেই তো রয়েছে ইডেন, যেখানে আদম আর ঈভের
মিলনে সৃষ্টির বকে নবজন্মের স্বাক্ষর বহন করে এনেছিল ।

যেদিন পৃথিবীতে প্রেম বলতে কিছু ছিল না, ছিল না বাসনার
বহি আলা, সেদিন তো সৃষ্টির উৎসও ছিল না । আর যেদিন সৃষ্টির
উৎস নিয়ে পৃথিবীর প্রথম পুরুষ আদম আর প্রথম নারী ঈভের
মধ্যে মিলন হলো, সে মিলনে ছিল প্রথম প্রেম, প্রথম চম্ভা,
প্রথম অমুরাগ, প্রথম শিহরণ, প্রথম সুখাত্তভূতি—আর ছিল
প্রথম কামনার সৃজনশীল আলিঙ্গন । সে আলিঙ্গনে ইডেনের
স্বপ্নকল্পে হয়তো মধুরাতি স্থাপন করলো পৃথিবীর প্রথম পুরুষ ও
নারী । তখন পুরুষ ও প্রকৃতির চোখে সূন্দর বলে মনে হলো
পৃথিবীকে । মধুর বলে মনে হলো পৃথিবীকে ।

শ্রেয়সীন পৃথিবী নীবস । বাসনা না থাকলে সৃষ্টি হতো না ।
তাঁই আমাদের জীবনে প্রেমেরও প্রয়োজন, বাসনারও প্রয়োজন ।
ফুলেরও প্রয়োজন, তার সুরভিরও প্রয়োজন । ফুলকে বাসনার
রাঙে রাঙিয়ে বৃকে আঁকড়ে ধরবো আর তার সুরভিকে রাখবো
দেবতার চরণে অর্ঘ্য দেওয়ার জন্ত—পূজো করবার জন্ত । তাঁই
মানসীকে বলবো—

এসো থাকি দুইজনে
সুখে দুঃখে গৃহকোণে
দেবতার তরে থাক পুষ্প-অর্ঘ্য তার ।

তারপর একদিন ঝরে বাবে বাসনার ফুল—মিশে বাবে পৃথিবীর
ধূলো-কাদায় । তারপর থাকি থাকবে সে সুরভি, তারপর থাকি
থাকবে বাসনা-কামনার উর্ধে যে অমর—চিরন্তন প্রেম, সে প্রেমকে
সঙ্গে নিয়ে অন্তহীন অনন্তের পদপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াবো আর বলবো—

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের স্বপ্ন-উৎস হতে ।

আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে, মিলন-মধুর লাজে ।

পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে ।

আজি সেই চির-দিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হোয়ে তোমার পায়ের কাছে ।

নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের ঐতি—

একটি প্রাণের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি ।

—মধুরেব—

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

করঞ্জাক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্ৰাচীনতার নাগপাশে আমাদের মাতৃভূমি শৃঙ্খলিত।
 মা বেগানে বন্ধিনী, ছেলে-মেয়েদের জীবন যে সেখানে
 ছবিবহু, স্বাধীনচেতা মানুষমাত্রকেই সে-কথা বলে জানাবার দরকার
 হয় না। তেমনি এক দিনে জানা গেল যে, একজন শিক্ষাব্রতী,
 কলকাতার একজন অধ্যাপক, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার (স্বাধীন
 জগতে বর্তমানের লোকসভা) সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন আরো
 অনেকের সঙ্গে। অধ্যাপক তখন তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর বাইরেও
 নামী-লোক বলে পরিচিত হ'তে শুরু করলেও, পরবর্তীকালের
 জনবরণ্য দানবীর বলে তখনো সর্বজনপরিজ্ঞাত নন। শুণীকে
 চেনবার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বঙ্গগৌরব আন্তোষ।
 তিনি ঐ অধ্যাপককে করতেন স্নেহ এবং দিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর
 যোগ্য সমাদর। এর পর অধ্যাপক Constituent Assemblyতেও
 (অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা) যখন নির্বাচিত হলেন, তার
 আগের একদিনের ঘটনা—যেদিন আমাদের বর্তমান সহঃ রাষ্ট্রপতি
 তৎকালীন আমাদের বাণীমাড়কার অধ্যাপক দর্শনাচাঁদ রাধাকৃষ্ণণের
 একমাত্র ভারতবাসী হিসেবে বিলেতের বিজ্ঞান-সভা বৃটিশ
 স্যাসোসিয়েশনের সদস্য নির্বাচিত হওয়া উপলক্ষে কলকাতায় এক
 সম্মেলন-সভার আচাঁদ রাধাকৃষ্ণণ তাঁর প্রতিনিধিত্বে বললেন যে,
 তিনি উপলক্ষ হাত; যে গৌরব তাঁকে কেন্দ্র করে অর্পিত হয়েছে
 তা অর্পণ করা হয়েছে তাঁর দেশকে, দেশবাসীকে, আর যে বা
 কবনের তার লক্ষ্য থাকে বেন দেশ ও দেশবাসী। ব্যক্তিগত
 গৌরব অর্জন করার ভাগ্য অনেকেরই হয়েছে, সেটা এমন কিছু
 শক্ত কাজ নয়, আর আমাদের এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
 মধ্যে ও বাইরে এমন শুণী ব্যক্তি কয়েকজন আছেন, যারা খ্যাতির
 প্রত্যাশা না করে নিঃস্বার্থভাবে করে যাচ্ছেন মহৎ কাজ, যা
 দেশেবা আর তাঁদের মধ্যে একজনের নাম আমার কেবলই মনে
 পড়েছে, যিনি হলেন আদর্শপুরুষ আচাঁদ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।
 তারপর থেকে এই আদর্শপুরুষ ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে
 দেখবার, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা জাগল। আমার
 পুরাতন বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চল রক্ত শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
 হরেন্দ্রকুমারের আত্মীয়। হেমকে একদিন বললুম—তুমি আমার
 তাঁর মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে? সে বলল—আগে
 খোঁজ মিই, তিনি কলকাতার আছেন কি না। তিনি তো হয়
 ধুপুবে, নয় সিল্লীতে প্রায়ই যান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল,
 তিনি তখন কলকাতার বাইরে। তাঁরপর পরিচিত হবার বাসনাটা
 যখন করতে হ'ল সাময়িকভাবে নানা করণের জন্তে ব্যাপৃত থাকার।
 কত বড়, কত ছুঁকান মানুষের জীবনে, আর সংসারে সার পাওয়ার
 পরিবর্তে সংসেই নানা পথ আতিক্রম। কেটে গেল কয়েকটা বছর।
 পরে একদা ঘোষিত হ'ল হরেন্দ্রকুমারের রাজ্যপাল পদে নিয়োগের
 সংবাদ। সেলুর একটা উপলক্ষ আর লিখে জানালুম তাঁকে
 খবরদিনন্দন। উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গে—সুপথ গ্রহণ অসুষ্ঠানেই
 পরিচিত হবার সুযোগ মিলবে মেনে আনন্দিত। সেদিন
 থেকে তাঁর ঘের দিন পর্বত তাঁকে জানবার, তাঁর বিবৃতি

জন্মের পরিচয় লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেই
 অমায়িক জানী মানুষটির সাদাসিধে পরিচ্ছদে হাতোছল মুক্তি
 আনো বেন প্রতিভাত আমার সামনে। ওরকম সৌজতপূর্ণ
 ব্যবহার কম লোকের মধ্যেই দেখেছি।
 তাঁর জীবনে একটি রূপ চোখে পড়েছিল প্রথম, যা হ'ল সংযমের।
 'দা ঠাকুরের' ভাবার সংসাজানো বমকে অর্থাৎ তাকে কলা দেখানো।
 রাজ-ভবনে যে-যে তিনি বসতেন, একদিন সেই ঘরে, শীতের কোলা
 দশটা হবে তখন, তিনি এসে বসলেন, পরনে আধুনিক ভারতীয়
 গলাবন্ধ কোট ও ট্রাউজার। নানা কথাই বলে পোষাক নিয়ে
 কথা উঠল, কোন্ কোন্ পরিচ্ছদের কী কী তাৎপর্ষ সেই সবচে
 বলতে লাগলেন। বললেন—শীতকালে বৃষ্টি পরলে—তাঁর সঙ্গে
 শালটাই পছন্দ করি, যেটা হ'ল ভারতের নিজস্ব, আদি যুগে
 গ্রীষ্মেও অবশ্য ছিল এবং বর্তমানে স্যাক্রিকার কয়েকটি দেশেও আছে
 প্রচলন আর এককালে খোলা-বুক কোটের সঙ্গে দিনে টাই ও
 বিকেল থেকে বো বখেটে। পরেছি কিন্তু ঐ টাই বা বো গলাবন্ধ
 ভারতীয় বা ব্রেজিলীয় কোট পরলে আর প্রয়োজন হয় না এক
 হওয়া উচিতও নয়, কারণ যদিও আদি যীষ্টধর্মাবলম্বী কিন্তু আমাদের
 দেশে তো সর্বধর্মের সমান অধিকার, তাই দেশীয় বা জাতীয় পোষাকের
 সঙ্গে ও ছোটো যে বাদ দেওয়া হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে, কারণ ও
 ছোটো হ'ল যীষ্টধর্মের ক্রমের প্রতীক। তারপর উঠল তামাকের
 কথা, যার প্রচলন জাইগীরের সময় থেকে। বললেন—প্রথম
 দারে প'ড়ে আর সমরাতাবে চুক্রিকা (cigarette) কুঁকতে
 হয় কিন্তু তামাকের সঙ্গে কি ওর তুলনা চলে? আদি বন্ধার
 তামাকই খেতুম; এখনো রাতে সকল কর্মের অবসানে খেয়ে থাকি।
 ট্রেণে খাবার জন্তে আমার একটা গড়গড়া আছে, যেটা মাত্র পাঁচ
 হাতের কিছু বেশি উঁচু, তার মাথার ঢাকা লাগানো, কলকোটা
 তার ভিতর বসিয়ে ঢাকা লাগিয়ে দিলে সেটা থেকে আগুন ছড়াবার
 ভয়ও নেই আর সেটা দেখতে একটা গল্পগয়লা মনিরের মতো।
 বাস্তবজগতের মূল বিষয়ের আলোচনা থেকে ক্রমে এসে
 পৌঁছানো গেল বিষয়ান্তরে। বলতে লাগলেন—মধুপুরের বাড়িটা
 করেছিলুম প্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্তে। তাই তো মাঝে মাঝে
 সেখানে ছুটে বাই। ইট, কাঠ, পাথর, ঘোঁরা আর হঠগোলে তমা
 নগরজীবনের হটমনিরে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, স্নানি করে গুঠে। সবুজের
 সমারোহ যে প্রাণশক্তিকে শান্তি দেয়, তাই দৃষ্টিপথে পাহাশালা দেখলে,
 জামল মাঠ দেখলে, তা আত্মার আনন্দের বাণী আসিয়ে দেয় অন্তরে।
 আদর্শ ভবন বলতে বোঝার উদ্ভানবৃত্ত ভবন, যাতে বাস করা
 ক'জনের ভাগ্যেই বা খটে শহরে। তপোবনের বাসিন্দা না হয়ে
 যদি খবিরী বৃহৎটাজালশোভিত প্রাণ আকর্ষণ করা অট্টালিকা-
 নগরীতে বাস করতেন তা হ'লে বোধ হয় তাঁদের অনেকের ভাগ্যেই
 বৃহৎ বৃহৎ by since. ঐ ভাবারমান নবুকের মাঝে পানিহাতিতে
 Bengal Chemical-এর কারখানায় কিছুদিন বাস করে এসে
 দীর্ঘকালের বাসস্থান ও সাধনকেন্দ্র কলকাতা-বিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয়
 কবনের সঙ্গে তুলনা করে আচাঁদ প্রকুরচন্দ্র কলকাতার প্রবর্তনা

হ'ল মননপুরী আর বিতীরাটা? কী সজ্জা দেওয়া উচিত? অথচ কর্ম ছাড়া মানুষের চলে না, তাই কর্মভূমির সঙ্গে যোগ অবিস্মর। প্রতীচ্যে নগরপ্রান্তিক গ্রাম বা শহরতলীর সঙ্গে কর্মভূমির জনচকল মহানগরীগুলোর যেমন সহজে ভিন্ন সময়ে বাতায়নের নানা সুযোগ সুবিধা, আমাদের দেশে তো এখনো তা হয়নি। উদ্দেশ্যে দেশে শহরতলী বা গ্রামের উন্নতি হয়েছে, হচ্ছে, চেষ্টা আছে, নগর-জীবনের নানা সুযোগ সুবিধা বাতে প্রতিটি গ্রামে মেলে তার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে আর আমাদের গাঁওলো? চিকিৎসক, ডাকঘর, বেল ষ্টেশন, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ, কোনটি সহজে মেলে? যাকবপুর, ব্যারাকপুর অঞ্চলগুলোর তবু bus পাওয়া যায় কিন্তু এমন অসংখ্য গাঁও এখনো আছে যেখানে সাইক্ল রিক্শই একমাত্র ভরসা। সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য চেষ্টা চলছে সব গাঁকেই আলোকিত করার, সে আলোর রশ্মি দেখে যাব কি না জানি না। দেশ যখন ছিল পরাধীন, তখন নীরব ও সত্যিকারের কর্মীর অভাব ছিল না, কিন্তু আজ? মানুষ ভাগ্যের দাস, তাই ভাগ্যন্যেবে আজ কাজের চেরে কথা বেড়ে চলছে। কেন এমন হ'ল? কর্মীর সত্যি অভাব যটোছে—এ কথা যে বিশ্বাস করতে মন চায় না কিছুতেই। রাজ্যপালের আসনে আমরা অনেককেই দেখেছি স্বাধীন ভারতে কিন্তু এই মানুষটিকে পেয়ে ঐ আসনে বসে থক হয়েছে। বাংলাদেশের নানা সামাজিক ও ধর্মীয় উন্নতির পক্ষে তাঁকে দেখা গেছে পুরোধারূপে। ধর্মের কুম্ভকার সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে পারেনি এই উদার প্রাণকে। সেই তাঁকে দেখি জীবনমুকুট রবীন্দ্রনাথের অন্বোধসবে, বিভাসাগরকে, অরবিন্দকে প্রত্যাশ্রিতিতে আবার কলকাতার নেপাল-রাজের সর্ধনা সভার বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক্রীন্দান হয়েও "ব্রাহ্মণরূপে" রাজাকে আশ্রিত জানাতে। সর্ধনের লীলাক্ষেত্র এই ভারতভূমি আর তার চেতনার উন্মেষণ বহুভূমিতে। সমস্বয়ের বীজ এদেশের মাটিতেই অঙ্কুরিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে কলে-ফুলে নগাধিরাজের অস্তচম শিখরে, গলাস্তম্বিত তটভূমিতে। বিশ্বভ্রাতৃস্ববোধের সুর মেলে আছে এদেশের পল্লবমর্মরে। এদেশের কবি বন্দনা জানিয়েছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব আগরণকে, এদেশের শিল্পী তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে ধ'রে রেখেছেন এখানকারই সৌন্দর্য, এখানকারই ব্যথা-বেদনার ইতিহাস, এখানকার লোকেরই কণ্ঠে জাগে সেই গান, যে-গানে মেলে স্বরণাতীত কাল থেকে আধুনিক কালের নানা জীবনের নানা বিরহ-মিলনের, নানা সংঘাতের, নানা উপলব্ধির কাহিনী। হরেন্দ্রকুমার এই দেশেরই লোক। আজও এখানকার এই সব-কিছুর সঙ্গেই তিনি ছিলেন পরিচিত।

একদা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের এক সভার দেখা। তাঁর মনে যে কত-কিছু ভাবে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সভার অবকাশে জীমতী সুখোপাধ্যায় বললেন কথার কথায়—কুমারী কত বড় বড় আঁচু পেভেন, তাহ'লে আরো অনেক কিছুই আমরা তাঁর কলম থেকে পেতুম। তাঃ সুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাত্ বললেন— তা যখন হয়নি, তখন বড়টুকু পাওয়া গেছে, তাই নিয়েই বিশ্লেষণ ও আলোচনা সমীচীন আর এও তো হ'তে পারত যে, সবার হস্তে তিনি পেতে পারতেন—কিন্তু বীরকীবনে বড়ি তাঁর কর্মরতের অবস্থা হ'ত? তাহ'লে? সত্যিই কো, এমিকটা কো

আমরা জানি না। সুখোপাধ্যায় মহাশয় ব'লে চললেন—মাছ বা বলে, তা সব-সময় ভেবে বলে না; কিন্তু কতকগুলো বিষয়ে না ভেবে অনেকেই একই ফুল কথা ব'লে থাকে। যেমন বলে—ঈশ্বরকে তো দেখিনি, কিন্তু কই বলে না তো গান দেখিনি, হাওয়া দেখিনি। গান যে দেখবার নয়, শোনবার; হাওয়া যে বোধ করবার, তেমনই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হয়, তারপর মর্শন ব্যাপারটা অস্ত ভয়ের। এমনিধারা বৃষ্টির দীপ্তি প্রকাশ পেত তাঁর বহু কথার বলকে।- আর একদিন। এসেছেন আমাদের কলকাতার কুটনৈতিক Corps-এর এক সভায়। সমাপ্তি-বাচনে মাহুলি কথার বললে বললেন—আমি একটা গল্প বলি। ব'লে গল্প শুরু করলেন—বাত্মাপথের গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পূর্বে অনেকের মানসিক অবস্থা নিয়ে। বললেন—বে-পথে বেতে অনেকগুলো পাহুনিবাস পড়ে, তার শেষেরটার পৌঁছতে কেউ কেউ পারে না অনেক কারণে। অজ্ঞপ্রেরণীর মানুষের মধ্যে এটি বেশি লক্ষ্য করবার। তারা ভুতেই আটকে গেছে, ভগবানে পৌঁছতে পারেনি। আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না কিন্তু ভুতের আবির্ভাব? এই সোজা কথাটা কেউ ভাবে না কেন যে—যুদ্ধে ও দাজায় যে বেচারারা প্রাণ হারিয়েছে, তারা তাদের হত্যাকাশীদের সখকে কোন শোধ নিতে পেরেছে কি কোনোকালে? আধারবিহীন আত্মা শক্তিহীন। প্রদীপবিহীন আলো কি বলে?

অভিনয়কলা সম্পর্কেও একদিন তাঁর আলোচনা শুনেছিলুম। চৌধুরীকলার অভিনয়শিল্পের স্থান থেকে আরম্ভ ক'রে চ'লে এলেন বর্তমানকালে। বললেন—"দেহ-পট সনে নট সকলই হারায়"—এ কথা আর এখন বিজ্ঞানের কুণায় চলচ্চিত্রের যুগে খাটে না, তবে গিরিশচন্দ্র, অর্ধেশুশেখর ও শিশিরকুমার সমশক্তিমান অভিনেতাকুলতিলক হ'লেও গিরিশই বেশি ক'রে টিকে থাকবেন অনাগতকালে তাঁর সব নয়—কয়েকটি গ্রন্থের মাধ্যমে। অপর ছাত্রদের যে সেদিকটার কোনো অবদান আমরা পেলুম না।

বে-কোনো ব্যাপারে তাঁর সৃষ্টিভঙ্গি ঠিক সাধারণ প্রেরণীর ছিল না, তাও লক্ষ্য করেছি। বহুভাষাবিদ হরিনাথ প্রসঙ্গে অনেকে বললেন এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন হরিনাথ কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথ যেমন কবিতায় লিখে গেছেন যে তাঁর সৃষ্টিতে কবি দেখতে পাচ্ছেন যে এক একটা দেশের এক একটা ভাবের প্রতীকরূপে বেন পুড়ে বাছে ঐ চিতায়, তেমন হরেন্দ্রকুমারকেও বলতে শুনেছি, যেদিন হরিনাথের সৃষ্টি ধর পেলে সেদিন মনে হ'ল বেন নিজের কাণে শুনেতে পেলে এই তরুণ বাঙালীর মহাভারত নামা দেশের ভাব-সরস্বতী কন্দনরতা। আমরা Live for others, think of others ভুলে গেছি স্বার্থের সন্ধানে। দিনের পর দিন ব্যাপৃত থাকি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে। ভাববার সময় পাই না প্রতিদিনের দেখা সেই পুরোনো আকাশটা কী ক'রে প্রতিদিনই অমন নতুন থাকে। "এই বিশেষতাবীরে যা হুখে দিয়েছে মহিমা" কথাটা খুব সত্য স্বীকার করলেও ইতিহাস কী বলে? আগের শতাব্দীগুলোর কি হুখে র'লে কিছু ছিল না। হয় তো হুখবোধের ধারা ও পটভূমিকা ছিল আলো। উনবিংশ শতাব্দীতে দেখি বেন জানালোকবর্তিকার মিছিল বেধিয়েছে সেই বর্তিকাবীরী ধারা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তো 'সেরা সেরা

কাজ' করেছেন। সে কাজ কি অনারস আদর্শে হওয়া সম্ভব? কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনা, কত নিপীড়ন তাঁদের সইতে হয়েছে প্রতি পদক্ষেপে। তাই আজ আমরা তাঁদের কর্মের সুফল ভোগ করছি আর তাঁদের বিষয়ে যত কিছু দুঃখ, বাধা, নির্মমতা পার্শ্ব নিয়মে তাঁদের জীবনাবসানের সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যেমন মিলিয়ে যাবে আজকের শত প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের গুণমধুরি মহাকালের ইঙ্গিতে আগামী কালে।

কিছুকাল আগের তুলনায় বর্তমানকালে আমাদের দেশে আয়ু বেড়েছে যদিও তারই কঁাকে কঁাকে অকালমৃত্যু বা চিরকালই ছিল, আজো আছে, তবু জেনে আনন্দ হয় যে চ'লে কিরে বেড়াচ্ছেন শতাব্দীর্ষি ভাঃ কেশব কার্ত্তে, একশর করে পা দিলেন ভাঃ মোক্ষগুণ বিশ্বধরার। এ ছাড়া আমাদের অবগতির অন্তরালে আরও কত দীর্ঘায়ু বর্তমান আছে তার তো সীমা সংখ্যা মেলে না। সে তুলনায় আশি পার করতে না পারলেও খুব কাছাকাছি গিয়েছিলেন হরেন্দ্রকুমার। তাঁর এই দীর্ঘজীবনে তিনি কি দেখলে সুখী হন একদিন প্রশ্ন করায় বলেছিলেন—মনীষার, প্রতিভার জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদান অস্বীকার্য আর আজো নবীন যুগের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তার বিকাশ দেখা যাচ্ছে কিন্তু তাদের একটা দিক বড় কষ্ট জাগায় মনে, বা হ'ল তাদের স্নানি স্নানি আছে কিন্তু স্নানি নেই, সমৃদ্ধি নেই, উপার্জন আর খাত-বস্ত্রের জন্মে যেভাবে তারা সংগ্রাম করে চলেছে দিনের পর দিন তাতে অনেকের আয়ু সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। সমস্ত দিন আশার ছলনে ধাটুনির অন্তে দারুণ হতাশা তারা বোধ করে, কর্মের কঁাকে কঁাকে বা অন্তে বারা কাজ ক'রে তারা, আর বারা কর্মের সংস্থানে যাবে যাবে 'হত্যা' দিয়ে নিরাশ হয়ে নৈরব্ব্যের ক্রক মূর্ত্তিই উহবহ দেখছে তারা, "অন্নহারী গৃহহারী চায় উন্ন'পানে, ডাকে জগবানে।" যদি তিনি দেখে যেতে পারেন এদের অর্থাৎ তাঁর দেশবাসীকে বেকার জীবন কাটাতে হবে না, তারা পাবে শান্তি, রচনা করবে নীড়, পথে প্রান্তরে গাছতলার জীবনযাপন করতে হবে না কাউকে, তবেই তিনি আদর্শে নিশ্চিন্ত মনে চোখ বৃজতে পারবেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু নব নব কর্মও তো উদ্ভাবন করা যেতে পারে, করবার কত কাজই তো প'ড়ে রয়েছে, কিন্তু করাবে কারা? এ তো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সমষ্টিগত। শুধু উপযুক্ত বেতন পেলে, হাতে মোটা ভাত-কাপড়ের আর গৃহের সমস্তা মেটে, এমন বহু লোক আছে বারা কর্মের ভিতর দিয়ে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পারবে। এখন এদের কাজ দেবার মালিক শুধু রাষ্ট্র নয়। শিল্পপতিরা শুধু নিজেদের লাভের দিকটা দেখে যে-সব বিরাট প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন তা ছাড়াও তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে অন্নহীনদের মুখে অন্ন দেবার জন্মে কিছু করতে, অবস্ত বা সমাজসেবা এবং service to humanity বলে গণ্য, তাহ'লে তাতে যে তাঁদের কেবলই ক্ষতি হবে এমন কথা আমার নয় বরং আমি আমার ক্ষুজ-শক্তির উপর নির্ভর ক'রে এইটুকু বলতে পারি যে, রাষ্ট্র হাতে তাঁদের প্রতিষ্ঠাকে সাহায্য করে সে জেটা আশ্রয় সকল করতে আমার দিক থেকে কোনো ক্রটি হবে না। যামেরিকা যুবেরপুত্রী কিন্তু রাশিরা আর জাপানের দিকে চাইলে স্বাধীনতার বুক ফুলে খাট। ক'টা বছরের রক্ত কী ভাবে

তারা বেকারীতে উচ্ছেদ করার চেঁয়ার সার্থকতা দেখিয়েছে। অন্নহী, বস্ত্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ভোগকে ধ'রে নিয়েও প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের দেশে কিছু কম নয়। প্রাকৃতিক দুর্ভোগকেও উত্তীর্ণ হতে হবে বৈজ্ঞানিক পন্থায়। তাদের এড়িয়ে, বোধ ক'রে আর সম্পদের ব্যাধক সধ্যবহার হাতে হয় সে অভিবানও চালিয়ে যেতে হবে। যাদুবেদ চেঁয়ার কী না হয়? দেশকে ধনধান্যপুষ্পভরা সম্পদশালিনী মূর্ত্তিতে দেখার আশা যে তিনি পোষণ করতেন, তা জানতে পেরেছিলুম সেদিন বা তাঁর বহুস্থানের ভাষণের মাধ্যমে কচিং জানা যায়। বরণ্য জননায়ক শ্রামাপ্রসাদ একদা ছিলেন হরেন্দ্রকুমারের ছাত্র। গুরুর বিবর একদিন গল্প করতে করতে তিনি বলেছিলেন—শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কি শুধু বাঁধা ধরা সময়ে পঠনপাঠনে? শিক্ষক যতদূর সম্ভব সব শিক্ষাই দেবেন ছাত্রছাত্রীদের সন্মুখে, লক্ষ্য রাখবেন তাদের ভালোমন্দের দিকে আর হরেন্দ্রকুমার সেদিক দিয়ে আদর্শ শিক্ষক। তিনি শুধু—

ছাত্রী ও ছাত্র,

চিরদিন সবে তারা শিক্ষার পাত্র।'

ব'লে নাক সিটকেননি। তাদের নানাভাবে উপদেশ দিয়েছেন। পুত্র-কন্যা ও ছাত্র-ছাত্রী বড় হ'লে সব চেয়ে আনন্দ তো পিতা-মাতার ও শিক্ষক-শিক্ষিকার। তাই ছাত্রদের খাওয়ার দিকেও ছিল তাঁর যথেষ্ট নজর। বলতেন—Health is wealth, একে তো খাতশক্তিবৃদ্ধ সুখের আজকাল দুর্মূল্য ও সাধারণত দুর্আপ্য প্রায়, তাই মুখরোচক অখাতশক্তির সস্তায় খারাপ দোকান থেকে কিনে, খারাপ রেস্টুরাঁ থেকে না খেয়ে, হয় ভালো দোকান থেকে এনে, ভালো রেস্টুরাঁয় গিয়ে খাও, আর নইলে সস্তায় অখাতের বদলে ডিম, দুগ্ধজাত জব্য, সস্তা ফল সদ্যব্যবহার করো। বীজাণু ভয় থাকবে না, খারাপ বিষের জন্মে ভাবতে হবে না।

১১৫৬ সাল। জুলাইয়ের শেষের দিকেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেদিন ভাবতে পারিনি যে এই সুস্থ মানুষটি (বাইরে থেকে বা দেখেছি) আর ক'দিন পরে ৭ই আগষ্ট আকস্মিক ভাবে হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দেবেন। কার কখন ডাক আসে বলা তো যায় না। এ বেন—

মৃত্যু যেদিন বলবে জাগো প্রভাত হ'ল তোমার স্নানি নিভিয়ে যাব আমার বকের চন্দ্র পূর্ব হুটো বাতি।

৭ই আগস্টের সংবাদপত্রগুলির বিশেষ সংখ্যা 'টেলিগ্রাম' যে সংবাদ পরিবেশন করলে তা পাওয়ার পর কেবলই মনে হয়েছে দিনে দিনে তিলে তিলে যে-জীবন-ডালি কত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহ, হাসি কান্নার ভিতর দিয়ে সাজানো হয়, তা উজাড় ক'রে কেলে দিতে মাত্র এক মুহূর্ত্ত সময় লাগে। তবে যে-মানব-জীবন ফুল-ফোটা আর ফুল-ঝরা, হাজারে হাজারে বা পৃথিবীতে বটছে প্রতিদিন, সেই অসংখ্য জীবনের সঙ্গে এই জীবনটির তুলনা হয় কি? এ আলোচনা জাতের, এ জীবন ধীর, তাঁর উচ্ছেদে বলতে পারা যায়—

Harendro Coomar is dead
Long live Harendro Coomar,

বলা যায়

অগণতীর্ষ পরিষ্কার অস্ত্রে আবর্তন
তবু তাঁর জীবনরসি আলোকিত করে মন।

আধুনিকতায় ভারতীয় নারী

শৈলদেব চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক সত্যতা, বা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সত্যতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ও সমাজে আসে নানা বিবয়ের সংস্কার। "Old order changeth, yielding place to the new." এই হ'ল সত্যতার ধারা। ক্রমবিকাশের নিয়ম। পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত।

পরিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্তন, এ কটি আসে মানুষের প্রয়োজনে, সমাজের তাগিদে অথবা রাষ্ট্রীয় অঙ্গুষ্ঠানে।

কিন্তু এই তাগিদ বা চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের, তথা তার সমাজের, আসে মঙ্গল অথবা চিন্তাবিজ্ঞান; বার থেকে মানুষকে অনেক সময় ভাবতে হয় সে এগিয়ে চলেছে, না পিছিয়ে যাচ্ছে। যেমন সেকালের যুদ্ধে দেখা যেত একটি তরবারি বা বরসের আঘাতে একটি শত্রু নিহত কি আহত হ'ত। আর এখন একটি বোম্বাটে একটি 'হিরোশিমা' শহর শেষ হ'লেও বলি এইটেই সভ্যযুগ। আদিমযুগ বর্বর যুগ। তাই সভ্য অসভ্যের বিচার কোন্ মানুষে করবে কে জানে? কোন কালে এর সীমানা হবে কি না তাই বা কি ক'রে জানবো?

তাই এখন দেখা যাক আমরা এই সভ্যযুগের নারী-প্রগতির কি আখ্যা দেব। আদিম না আধুনিক?

ঐতিহাসিক সত্যতার যে জড় পৃথিবী চকল হয়ে উঠেছে, এতে সন্দেহ নেই। মাটি, জল, স্থল, অন্তরীক—সবই যেন কম্পমান। সবই যেন জাগ্রতের উদ্গারে উদ্গসিত। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাপেক্ষে, ভাষায়—এক কথায় সর্বতোমুখী একটা আমূল পরিবর্তন। গতি। অতি বেগবতী গতি। অতি ক্রমগতিশীল পদার্থ যখন তাকে তখন তার ভাঙনও যেন কোন 'সাবধানী' পদার্থের দাপেকাও ভরাবই হয়। এমন কি গতিশীলটির চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না, এটা আমরা দেখি। ওই সকল সংস্কারের সঙ্গে এলো, ধর সংস্কার। প্রয়োজনও ছিল, কিন্তু 'শিব গড়তে বানর গড়া' কথাটি আজও পুস্ত হরনি।

ভারত চাইলো তার পূর্ব আদর্শের নারীর আমূল পরিবর্তন। চাতে কি এলো কে জানে। তা'ছাড়া অসংখ্য সংস্কারের ফুলনার নারী-প্রগতিটার যেন সর্বদা সংস্কারের লক্ষ্য হ'ল।

ইংরেজ যুগে যা আসছিল আজ আবার তাকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি বলেছিলেন 'ভারতীয় নারীকে ভাবতে হ'লে, চাই তাদের অন্তর বিচার।'

তাই তাঁরা তাঁদের ভাবধারার প'ড়তে উপদেশ দিলেন তাঁ নারীকে।

পরবর্তী কালে এলো ভারতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সঙ্গে সঙ্গে কর্মকর্তারা চাইলেন নারীকেই স্বাধীনতার অগ্রগণ্য হিসাবে। সে যে কারণেই হোক, তাঁরা চান ভারতীয়-আদর্শের ন বৃত্তা। যুগ বা কালের তাগিদে তাঁরা চান নারীকে অর্ধনৈ কাঠামোর তৈরী ক'রতে। বেতে যার যাক ভারতীয় ন সংস্কৃতি! আহা! যাক ভারতীয় আদর্শের নারী। বিবেকানন্দের ভারতীয় নারীর উচ্চ-প্রশংসার আদর্শবাদ! আনন্দকৃষ্ণের বিচিত্র ধারায় নারীর নব নব রূপ। বিবেক চেরেছিলেন কবে ভারতীয় নারী আমেরিকার নারীর মতই বা ভাবে চলা কেরা করবে,—হাটে, বাজারে, স্কুলে, কলেজে, খেত এবং ধর্মাচরণে,—পুরুষের সকল কাজের সহায়করূপে, সমসাময়িক একান্ত সহধর্মীকরূপে।

পরিবর্তনে এলো কি তাই? মনে হয় এসেছে খৈরাচারি যথেষ্টাচারিতা।

মানুষের বিবেক বুদ্ধি থাকতে মানুষকে বলি মানুষ। 'পক্ষে পত। তবু মানুষের ফুলেই মানুষ ভাল মনের কল চে করে। কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গায় আপাত ভালকেই ভাল ম করে। চোখে, মুখে ভাল লাগলেই দেখে, ধার ও উপভোগ করে তাই কবিও বলেন;—

"চোখে যদি লাগে ভাল কেন চাইবোনা?"

বৈদিক যুগের নারীর কোন কিছুতে পরাধীনতা দেখি না বৌদ্ধ যুগের তো কখাই নেই। লক্ষ্যবতঃ মুসলমান যুগে হি নারীর পরাধীনতা ও সকল কিছুতে উপেক্ষিত। পরে জাতি কৃষ্টি জর ক'রতে এসে ইংরেজ তাদের অঙ্গুষ্ঠানে চাইলো ভারতী সকল সংস্কৃতির পরিবর্তন, নারী-আদর্শও।

এখনে বঙ্গদেশেরা চীৎকার ক'রে উঠলো। কিন্তু বা আমরা ক্রমাগত এসে গেল। বারা চীৎকার করার তারা চীৎকার ক' বার। বারা ভেঙে গড়ার তারা গড়ে। তারপর যুগের 'নবান্ন আচ্ছই। তাকে কেউ রোধ ক'রতে পারে না। যদি বা সে ধাক পিছনে যথ চলে যায়।

এখন দেখা যাক কেমন ক'রে আসতে আসতে এলো এই নারী আধুনিকতা। এখনেই বলেছি, ঐতিহাসিক সত্যতার বা বিজ্ঞান

মহাকাব্যের সঙ্গে সঙ্গে যেমন করে এলো সাইকেল, রেল, মোটর ; যে মানুষ উড়তেও শিখলো, ডুবতেও শিখলো, ভাসতেও গেলো। তারপর আরও এগিয়ে এলো। মানুষের ছায়াছবি গলোকে হাত পা নাড়তে শুরু করল। আবার সেই ছবি যেমন ছবির গলা নকল করে কথা কইলো, বক্তৃতা শিল্পো, গানও হইলো, ঠিক তেমনি করেই এলো এই আধুনিক নারীর আধুনিকতা।

হাতে হাতে এলো বাস্তব, এলো স্কুলে, কলেজে, বক্তৃতা-ক্ষে। এমন কি শেষ পর্যন্ত অকসের টেবিলে। আর এক দিকে ষা দিল গানে, নাচে, জলসায়, নাট্যকলায়, শেষ পর্যন্ত সিনেমার পালী পর্দায়। নব নব রূপ-সম্ভার। শেষকালে যেটি এলো, ইটেই মনে হয়, স্ত্রী-পুরুষের আধুনিকতার আদর্শ হ'য়ে দাঁড়াল।

এই আধুনিকতা পৃথিবীর অপর পিঠে ছিল। আমাদের দেশেও হাতে হাতে এর বিস্তৃতি হ'ল। তার থেকে কি এলো! কেমন এলো! কে বিচার করবে। কে বলবে।

বাই হোক, প্রাচীন বৈদিক যুগ হ'তে কোন দিনই শিকার ভারতীয় নারী যে অনগ্রসর ছিল, তা আমার মনে হয় না। তাঁরা কলদিকেই উন্নতা এবং স্নহ-চিন্তাশীলা ছিলেন।

তবে মধ্যযুগে যে কোন এক বর্ষরতায় নারীকে অনগ্রসর অস্তঃপুংবাসিনী করে তুলেছিল, তার অবসান দরকার যেছিল, এ কথাও অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রকৃত নারী-প্রকৃতিকে কব-প্রকৃতিতে পরিণত করতে যাওয়া—সেটা নারীদেরই অপমান নয় পুরুষ-প্রকৃতিতে নারী-প্রকৃতিতে ঢালাই করতে গেলে কব-প্রকৃতিরও মানও থাকে না।

স্ত্রী-শিকার অকাটা বৃত্তির কথা অস্বীকার করবে কে? এর প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিতসমাজ মাঝেই উপলব্ধি করবে। তাই আমাদের দেশের মহাপ্রাণ রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে ভাসানগর, পরে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অপূর্ণ পশন-ভঙ্গিমায়, নারী তার পূর্ব সংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে থাকে। তাদের লেখনীই আজ বাংলার তথা ভারতের নারীকে এগিয়ে গিঠতে থাকে। কে-কোন ভাল জিনিষ বা সংস্কার আসে হামানবের প্রচেষ্টায়। কিন্তু অবশেষে কালের গতির সঙ্গে এবং নিপুণদের হাতে পড়ে, আরম্ভ হয় তার বিকৃতি। কারণ হাত রে সকল জিনিষই ময়লা ও আবিলতাযুক্ত হয়।

তাই স্ত্রী-শিকার সঙ্গে এলো স্ত্রী-স্বাধীনতা বা আধুনিকতা। বিপর আধুনিকতা থেকে এলো প্রায় বখেছাচারিতা। সেটা করার ফল নয়, নেওয়ার ফল।

রাষ্ট্র স্বাধীনতার মানুষ পায় সম্পদ, স্বাধা, এককথায় মানুষ তার বহুব্যয় আর জাতি পায় প্রাণ। তেমনি স্ত্রী-শিকার বা আধুনিকতার আমরা আশা করি মহিমমণ্ডিত মাতৃজাতি। বার স থাকবে নৈতিক কাঠামো, মহিমময়ী মর্যাদা, আনন্দিক ও বিদ্যা উন্নতি ও সৌষ্ঠব। অপর পক্ষে চলন-বলনের কারদা, বি-সংস্কার বাহার ও অস্বাভাবিক শুধু পৌরাসী পুতুলের মতই দাস। কে করে রাখতে বা জানতে আনন্দ, কিন্তু অস্তঃসারশূন্য ও শিথিল পুতুলিকার মতই। তাতে করে আমরা তাকে দিতে বি কিছু, কিন্তু আতিশয়তে পাবে না একটুও। যুগের পরিবর্তন

কেউ এড়িয়ে চলাতে পারে না। তেমনি সুসংগত মানুষের অসংগত কেমন করে এসে যায়, পরবর্তী যুগে মানুষই ভেবে পায় না।

তাই স্ত্রী-শিকার মাধ্যমে এলো আধুনিকতা। কিন্তু যেমন বস্তার জল এনে তাগিয়ে নিয়ে যায় সজ্জিত আবিলতা, তেমনি আবার দিয়েও যায় কতকগুলি অনাবৃত্তক ও অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা। বার থেকে পরে দেখা দেয় মহামারী। তাই আমাদের দেশে বিদেশী শিকার যে আধুনিকতা এলো, তাতে শতাব্দীর সজ্জিত ময়লা গেল সত্যিকথা, কিন্তু পরবর্তীকালের মানুষ সামান্য বিশ বছরের ভেতরেই যা দেখলো তাতে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ ভারতীয় নারীর কোন বিশিষ্টতা বা ভারতীয় নারী নুতন ভাবধার। কিছু দিতে পারলো বলে মনে হয় না। বা দিলো তাতে নুতন কিছু নেই। বা নুতন সেটুকু মনে হয় সাজ-সজ্জা, জাঁক-জমক, আড়ম্বর-প্রিয়তা, বাকু-পটুতা ও বেছাচারিতা। এখন আর ভারতীয় ঐতিহ্যের কিছু দেখা যায় বলে মনে হয় না, কোন সভ্যতার আদর্শে পড়বে তাও বলা যায় না। তবে ধানিকটা "সিনেমা সভ্যতার" যুগ বললে অস্বাভাবিক হবে না। অবশ্য পুরুষও এ সভ্যতার বাদ পড়ে না। তবে এখানে তাদের বিষয় আলোচনা করছি না।

স্ত্রী-শিকার যে প্রয়োজন ছিল, এ কথা কে অস্বীকার করবে? সে শিকার আশা ছিল নারীকে প্রকৃত নারীদের শিকার শিক্ষিত করা। যাতে করে একটি নারী জীবনে, স্মৃষ্টি-কতা, মনোরমা ভাষা, সম্পূর্ণ মাতা হতে পারে। এই শিকার শিক্ষিত হ'তে গেলে চাই স্বাধা, মনোবল, দেহের শুচিতা ও মনের পরিষ্কার। কারণ দেহ-মন যদি অশুচি ও অপবিত্র হয় তাহলে কোন মহৎ জিনিষই অশুচি হ'তে পারে বলে মনে হয় না। কারণ লোমকুপই যদি ময়লা দিয়ে বন্ধ করে দিই তো' তেতর পরিষ্কার হবার উপায় রইলো কোথায়?

এর জন্ম ভ্রম মহিমময়ী নারীর দোষ বা গুণের বিচার করতে চাইনা, তবে আধুনিক শিক্ষা ও অনাচারই এর জন্ম প্রধানত: দায়ী। বিখের প্রতিটি জিনিষই নিয়মের মাধ্যমে চলে। নারীর শিক্ষা কি পুরুষোচিত হলেই নারী হয়? না নারীকে পৌরস্বের মত নারীদের লাহনা করা হয়? তাই পুরুষ শিকার অহুপ্রাণিত নারী, সমাজকল্যাণকারী হবে কি করে? তাই আজকের ভারতীয় তথা বাঙালী নারী কখনই স্পর্ধা করে দাবী করতে পারে না সমাজকল্যাণকারী কতা বলে। তাই এই শিকার বলে নারী না পারছে সম্যক পুরুষ হ'তে, না পারছে পরিপূর্ণ নারী হ'তে। কলে গাইছা জীবনে আসছে অসন্তোষ ও পারিবারিক বিগ্নব। তাই পারিবারিক জীবনের মাঝে হয়তো কবিত্তর পানই মনে পড়ে, "আজি কী পাইনি"।

আজ ফুল কলেজে যে শিকার মাধ্যমে নারী নিজেকে পুরুষোচিত আদব-কারবার তৈরী করছেন, তা না করে নারীদের মর্যাদার নিজেকে গঠন করলে নারীদের বা মানুষের শিকার উতাসিত হয়ে উঠবে। অবশ্য সাঙ্গরপারে তা' বলে না। সেখানের আদর্শ যে আমাদের আদর্শ নয়, তা' হোপাসার "Useless beauty" নয় থেকে বড় ভয়ঙ্কর বোঝা যায়। গল্পের মাতিকা বলছে, "নির্মূলক মানুষের তার বৈদিক রূপ সভ্যতার স্বর্গ

ইসর' বাছে। কুরবিত বোবন কীটনষ্ট কুলের বড় অসৌন্দর্য-সমূহ হচ্চে।" তাই শেষকালে স্বামীক অস্বীকার করে মুক্ত স্বাধীনতার মত লোকচককে রূপময়ী হতে চান। কিন্তু ভারতীয় আদর্শ তা' ছিল না। এখন অবশ্য প্রায় কাউন্টেন্স ও মাসকেটের মতই অতিক্রমিতই এসে বাচ্ছেন। ভারতীয় আদর্শ শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন। চরিত্র বড় কথা। এর মাঝে বহু কিছু পড়ে। মারা, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ঠৈদহিক ও মানসিক তুচ্ছতা ইত্যাদি।—হুৎধের বিবদ, এ সবেস ধার আজকাল কেউ ধারে বলে মনে হয় না।

তাই মনে হয়, স্ত্রী শিক্ষার বা আধুনিকতার সকল Logyই থাক, সকল Isms থাক। তবে সবেস মাঝে থাক নারী-চরিত্র গঠন শিক্ষা। যে শিক্ষার নারী হ'তে পারবে প্রকৃত কথা, মনোবরা ভার্যা, আদর্শ যাতা। তার মত, সতী, সীতা ইত্যাদি থাকবে হুৎধে আদর্শরূপে। তাহলে কোন আদর্শবাদই নারীকে বিচারভীর ক'রে তুলবে না। এতে করে এমন বুঝবো না যে, আমরা সে মুগে বা সত্যবুগে কিরে যেতে চাই। চাই কি? আদর্শ, বলিষ্ঠ, স্বতন্ত্র আধুনিকতার ভারতীয় নারী হ'তে। অস্তিত্ব পাশ্চাত্য অগতে, নারীকে সম্মানিত ও নারী-পূজা করতে গিয়ে নারীকে ভোগের দিল-বাহার ক'রে তুলেছে। হয়তো আগে হত পর্যা রেখে স্বাধীনভাবে, আর এখন হয়তো হয় সেইটে উন্মুক্ততার মধ্য দিয়ে। বল একই। তফাৎ দেখার। তফাৎ চিন্তাধারার। তফাৎ মনন-শীলতার। ভারতীয় নারী-ছিলেন মাতৃপূজার প্রতিমা। অর্থাৎ সংক্ষেপে, পাশ্চাত্য অগৎ নারী পূজা করেন ভোগের সামগ্রী হিসেবে, আর ভারত পূজা করে মাতৃরূপে।

তাই মনে হয়, আধুনিকতার নারীর পোষাক বা সাজসজ্জার মূল্য আগের থেকে আজ বেড়েছে সত্যি কথা, কিন্তু আদর্শের দিক দিয়ে, ভারতীয় আদর্শের কাছে নারীর মূল্য ক'মেছে বই বেড়েছে বলে মনে হয় না। অগতের সত্য অগতেই লুকিয়ে আছে; মাহুয ভাবে, মাহুয তার অঙ্গ দিচ্ছে। পৃথিবীর ধসে পৃথিবীই লুকিয়ে রেখেছে; মাহুয ভাবে সেই সৃষ্টি করছে। দেহ, বস, স্বভাব, নারীর জিনিষ কিছু কিছু স্বভাবজ, দেশজ, প্রকৃতিগত। এমন কি, আবহাওয়াও স্বভূগত। বার মত এক ভারতেই বহুবর্ণ ও বহু আকৃতি-প্রকৃতি বিশিষ্ট মাহুয দেখা যায়।

ভারতীয় শিক্ষা ও আদর্শ কারদাগও সব দেশের এক ক'রতে গেলে উপকারের তুলনার অপকারই বেশী আসে। কমার তুলনার স্থান উল্লেখ হয় বেশী। আপাতঃ সুখ, আপাতঃ মধুর ভারত কোনদিন চায়নি। সাত্বিক সুখ, সাত্বিক আনন্দ, এমন কি আহািরেও সাত্বিকতা ধারা চেয়ে গেছেন, তাঁরা কোনদিনই সাময়িক সুখে উৎসুক হ'তে পারেননি। তাঁরা যে কোন জিনিষ 'সুগ' হ'তে বুঝাতের মত, হান হ'তে হানাতের মত, এমন কি লোক হ'তে লোকাতের মত সৃষ্টি ক'রতেন।

তাই সীতার প্রীতিক ব'লেছেন:—

"উর্ধ্ব গচ্ছতি সমুদ্রা মধ্য তিষ্ঠতি রাজস্যাঃ।

অমত অপরুতিয়া অযোগচ্ছতি তামসাঃ।"

তাই এখন তমো ভাবিত্ত পৃথু সাত্বিকতা তুলে বেতে চায়। লোকত মতও বিদ বিদ কেউই চলেছে, কলের আশাত সেই। যদি বলে

পূর্বকালে আশা হয়। কারণ কোন পাপ ধসে হবার পূর্বে মাহুযে স্ব-ভাব ও স্ব-বুদ্ধি অস্তর নিতে চায় না। তাই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন অতি অকাটা। সকল দিক থেকেই। কারণ মানব-মানবী নিচ বাস ক'রতে হ'লেই চাই শিক্ষা, চাই স্বাস্থ্য, চাই আধুনিকতা এ সবেস উদ্দেশ্য মানবীকে পুন্দর থেকে পুন্দরতর করা। সভ্য থেকে সভ্যতর করা। মধ্যাদাসম্পন্ন থেকে মধ্যাদাসম্পন্নতর করা। আধুনিকতা ও স্ত্রী-শিক্ষার মূল্য ও উপভোগ্য উদ্দেশ্য।

তাই নারীকে পূজ্যতর ভারতই একা বসুখানি ক'য়েছে, ততখানি কোন দেশই করেনি। বিবেকানন্দ সত্যিই বলেছেন,— "মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশ, যে জাতিতে, মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ, সে জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কখনিকালেও পারিবে না। তোমাদের জাতির যে এত অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই সব শক্তি-বৃ্তির অবমাননা করা।"

তাই শিক্ষিতা নারীর সৃষ্টি ক'রতে গিয়ে, আধুনিক নারীর সৃষ্টি ক'রতে গিয়ে যদি নারীকে আমরা বখেচ্ছাচারিতার নামিয়ে দিই, যদি ভারতীয় আদর্শচ্যুতা করি, তাহ'লে আমরা এ অপরাধের শাস্তি নিজের ওজনে কিরে পাব বা পাচ্ছি।

রূপ-বোবন উপভোগ ও সাজ-সজ্জার আড়ম্বরকে, ইঙ্গ-বদ মিলিত কারদায়, নিত্যনূতন ভূষণলাভিতা নারীকে আধুনিক সৃষ্টি সজ্জা, শিক্ষিতা বা আদর্শ নারী, পূজাযোগ্যা নারী বলে চলে কি? চলেও প্রকৃত জ্ঞানের ছরারে মুক ও গচ্ছহীন চামেলীর লাষণ্য বিলাস। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা এক আমাদের বেশী বৃর্থ ছিলেন? নিশ্চয় না। সংসারের বাইরে থেকে ধারা কিসে মানব সমাজের মজল হয়, তাই কল্পনার পাট বাস্তবে রূপ দিতেন অনাদি ও অক্ষয় আদর্শ। বার কাছে পাশ্চাত্য ঋষিরা অবাক হয়ে মাথা ঠেঁ করেছেন।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন আমেরিকার, "যে জাতি সীতাচারিত্র প্রসব করিয়াছে, ঐ চরিত্র যদি কালনিকও হয়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, নারীজাতির উপর সেই জাতির বেশপ প্রমা, অগতে তাহার তুলনা নাই।" অবশ্য আজকাল এসব চরিত্রকে উপহাসের পর্যায়ে কেলতেও কেউ কেউ কুষ্ঠাবোধ করে না। এরমত মা বোনেরা দারী নয়, সমগ্র জাতি দারী—তথা শিক্ষা ও আচার।

অবশ্য একথাও সত্য যে, মাহুযের জীবন যে স্বাধীনতার মত শুক ও রুক সৃজে আবছ থাকবে, একথা সত্যই অসত্য ও অস্তায়। তথাপি একথাও ঠিক যে, এতবড় বিশ্বকর্মাত্তও নিয়ম ব্যতিরেকে চলে না। প্রতিটি গ্রহ উপগ্রহ জীবন বেগবান আবার্ডে এচওবেগে ঘূর্ণিত হচ্ছে; তথাপি সকলেই নিয়মে ধাধা। এতইই ব্যতিক্রম হ'লে মহাপ্রলয় হ'য়ে বেতে পারে। তাই নারীর আধুনিকতা, শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞানসম্বিত হ'য়ে, বহুতোয় সময়ীতে রাজহসীর মত বিচরণ করে কলক—কিন্তু ঐ সময়ীতেই। আকাশে উড়তে গেলেই আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা হ'য়ে বেশী।

যে আধুনিকতা, যে স্ত্রী-শিক্ষার বেগে আজ আমরা বেশবান হ'য়ে উঠছি, বার পাকজ আমাদের মধ্যজাতির—মাহুযজাতির

ক্রীমেনে অভাবনীর সাড়া এসে গেছে, লেটা বাগের দেশ থেকে এলো, তাদের কি হ'ল ?

Modernism তথা আধুনিকতার গুরু হ'ল কবাসী রাজ্য। তাদের দেশের নারী কি ? কবাসী নারী বিলাসিতার রাঙতা-মোড়া পুরুষ চকের বিশ্রুত ধাঁধা। কল্পলোকের মেনকা অথবা উর্দী। যাতে ক'রে পুরুষেরা ভুলে গেল মাতৃভাষা। ভুলে গেল জীবনাংশ তথা জীবনের অভিব্যক্তি। ভূবিদ্যে দিল রমণীর মদিরালসে জীবনের উৎস। সেখানের মুক্ত আধুনিকারা মুক্তভাবে পুরুষের হ'ল বিলাস-তরঙ্গিনী। সে নারীর এখন আদর্শই হ'ল পুরুষাভুগ এবং পুরুষের তরকেও ওই একই জীব। উভয়পক্ষই আজ উভয়পক্ষের অন্ত পেয়েছে কতকগুলি নিলজ্জ মেহলিম্বার উদ্গাদ পরিকল্পনা। পুরুষপক্ষে লাভ হ'ল হীনবীর্যতা, শৌর্ধাহীনতা ও ক্রীবতা ; আর নারীর লাভ হ'ল এক কথায় 'যে তিমিরে, সেই তিমিরে।' অর্থাৎ জ্ঞান-পরিমা বাদে পুরুষের ভোগ-সামগ্রী। আসল কথা হচ্ছে, যথা পুরুষ তথা পরম। সেই নারী নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। সরকারী দপ্তরখানায়, সমাজে, সামাজিকতায়, বেখানে বেখানে তাদের প্রবেশ নিবেদন ছিল, সেখানে সেখানে আজ অবাধ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে সত্যি কথা, কিন্তু সেইটেই নারীর যোগ্য আসন, বা তাতেই কি আধুনিকতার চমোৎসব ? মনে হয়, না।

প্রকৃতিপুরুষের চিরন্তন ঘর বাঁধার ইচ্ছা, মাতৃঘরের গৌরব না পেলে কি নারীঘরের ক্রীবতা হয় না ? এই যে মুক্ত ক'রলেও বারি বন্ধন চায়, এটা অস্বীকার করে লাভ কি ? সেই জন্মই এই আধুনিকতার বাস্তব সমাজে হয়তো প্রতিষ্ঠিত ক'রতে সুযোগ দেয়, কিন্তু মনের জগতে এই আধুনিকত্ব নারীকে অন্তঃসারশূন্য ক'রে তুলবে না কি ?

নিরর্থক ভোগেচ্ছার, বিলাসিতার, প্রগল্ভতার বাকচাতুর্যে, পরিচ্ছন্নতার, অবাধ মেলামেশার দৈহিক শুচিতা, মানসিক শুচিতাও নষ্ট হয়।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "বাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে তাহা না জানিয়া, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণে প্রেস্তর দেন, তাঁহাদের গহিত আমাদের অসুখমাত্রও সহায়ত্ব নাই।"

তাই এর কুকল সর্বত্র আজ প্রকট। কবাসীরাজ্য-প্রত্যাগত বহু-বাক্যের মুখে তাদের আধুনিকতার রহস্য শুনে কি যে ব'লবো, তাই ভাবতে হয়। তাই আজ নেপোলিয়নের ক্রাল মাত্র সাতদিনে বিজিতার পায়ে আত্মসমর্পণ করে। কিসের অভাবে ? শুধু অস্ত্ররলের, বাহুর অভাবে ? কখনই না। নৈতিক বলের অভাবে, নৈতিক দুর্বলতাই এই অধোগতির প্রধান কারণ। জাতির হীনবীর্যতাই দায়ী। কিসে এই হীনবীর্যতা ? উপরি-উক্ত আলোচনায় তা' প্রকটিত হয়েছে। আমাদের যথা প্রত্যাশ, শিবাজী যুদ্ধের পর-পরাজয়ের সম্মুখীন হ'তেন, কিন্তু বিজিতা কখনই মনোরাজ্য দমিত করতে পারতো না ; তাই মানসিক ভেদ তাদের কখন খর্ব হ'ত না। তাই বিজিতারা তাদেরকে কখনই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রব্যয়ে সমর্থ হ'ত না।

এই মজাবল, এই ভেদ, এই অহংকার পরমর্শী মুগ্ধে অবিদ্যা নেতাজীভেও পাই। বারবার কানাকড় হ'লেও কেন তাঁর মনোবল ফুর হয়নি ? নৈতিক চরিত্রবলে, অদম্য উৎসাহের জোরে, গগনস্পর্শী সাহসের গুণে। কোথা থেকে আসে এই শক্তি ? সাধিক বাহুবলে। যোগ্য মায়ের পরিবেশনে। পূজাযোগ্য মায়ের ছায়ায়। যা ভাল না হ'লে, সন্তান ভাল হবে কি ক'রে ?

আজ মায়েরা আধুনিক হ'লেন। বীর সন্তানও বালো তথা ভারত থেকে অন্তহিতপ্রায়। রোধ করা যায় না। কাল্প এখানকার সমাজ-ব্যবস্থাই এইরূপ। বীর জন্ম ইংরাজীভে বাকে বলে outstanding genius, আজ আর তার একটিও দেখা মেলে না। তার কারণ বহু কিছু থাকতে পারে ; কিন্তু বর্ধপ্রধান কারণ, Cinematic civilisation, অর্থাৎ "গানের-লাজ" civilisation এর কারণ। পুরুষেরা গভীর কোন চিন্তা করতে পারে না। এক কথায় পুরুষেরা 'মেনিয়ুখো' হ'লে উঠেছো গভীর চিন্তার অবসর কোথায় ? নিজেকে সন্তানের অবসর নেই। সব দেশই 'প্যারিস' হবে। জাতির অভিব্যক্তি আধুনিকদের কাছে কিরে চাইতে হবে। আধুনিকদের উন্নত ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারায় নিয়ে যেতে হবে। সমাজ-ব্যবস্থায় আধুনিক-পৌরাণিক মিশ্রিত ক'রে আধুনিকতা ক'রলেই জাতির বা অত্যাধুনিক হবে।

মৃগয় মূর্তিকে শুধু সাজিয়ে, জাঁকজমক দিয়ে, বাস্তব সহকারে পূজা করলেই মায়ের পূজা হয় না। অন্তরের সাধিক প্রবৃত্তিকে জাগাতে হয়, তবেই পূজার সার্থকতা ধরা দেয়।

'পতাবলি' উঠিয়ে দিলেই অন্তরের পশুঘের বিনাশ হয় না। তাই আন্তরিক পশুঘের বলিদান চাই। তা' না হ'লে পূজা অসহীন হয়।

তের্মনি আধুনিকতা তৈরী করতে হলে পৌরাণিক-কুলস্বাক্ষের কৃত তাড়াতে হবে সত্যিকথা ; কিন্তু নারী-চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদানগুলি পরিত্যাগ ক'রে শুধু জাঁকজমকে ও সাজ সজ্জা দিয়ে নারী পূজা ক'রলেও সে পূজা ঠিক উপরিউক্ত তামসিক পূজাই হবে। তাতে অন্তরের পশু-প্রবৃত্তির উদ্বোধন করা হবে। মাতৃঘর আজকের মত শিক্মোদর-পরায়ণ হয়ে উঠবে। তাতে জগতের অকল্যাণ এগিয়ে আসবে। পশু-প্রবৃত্তি থেকে পশু-স্বভাব সন্তানদের দ্বারা পৃথিবীর কোম উপকারই হবে না। কালাপাহাড়ের মত তামসিকতার আচ্ছন্ন হ'লে সৃষ্টিকে ধ্বংসের মুখেই এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই জন্মই পশু কোম সৃষ্টি-শির জানে না ; ধ্বংস কার্যই তারা জানে।

তাই এই আধুনিকতায় ভারতের নিজস্ব দান খুঁজে পাওয়া যায় না—আছে পাশ্চাত্যের র-বাঁহা। সেটা রূপচর্চা পর্য্যায় পক্ষে। তাতে আজকের জগতে নাটকীয় অভিব্যক্তি আছে। আজকের শিক্ম বা আধুনিকতার নারী কি ক'রে তার স্বকীয় চেটার রুজি-মোজকার ক'রবে তা' থাকতে পারে। কিন্তু কিসে জাতির স্বর্গালা, বাহু, উন্নত জীবনধারা, নূতন আত্ম-চেতনা, নূতন সৃষ্টিশক্তি, কল্যাণের পক্ষে নিয়ে যাবে, সে আধুনিকতাব কি আজ নারী তথা আধুনিকতার সুরণ করেন ? তাই যদি না হয়, তাহলে জীবনধারা কি এলো ? আর আধুনিকতারই বা মূল্য কোথায় ? চমকবিজ্ঞান ও মোজবিতার সৃষ্টির জন্ম তো নৈবই নারীকে জিরকপে গড়ছেন ; তাতে যদি

হ'এক পৌচ বাজির বিশেষ কি দক্ষতার পরিচয় দিল। সে তো
মৃত্যু-শিরীর মত পুতুল সাজানোই হ'ল। প্রাণ পেল কই ?
প্রাণহীন "ভাঙ্গমহলের" থেকে তাই প্রাণময় শা-আহান আরও
বহান্। তাই কবি বলেছেন :-

"কীর্তির চেয়ে তাই তব জীবনের মধ
তোমার পশ্চাতে কেলিয়া যায়
তুমি যে মহৎ, কীর্তিরে তোমার বায়বার।"

তাই নারীর মোহ উদ্দীপক রূপ শুধু বর্ণা হ'য়ে আশা পর্য্যন্ত।
দাসল এবং প্রকৃত রূপ পায় মাতৃম্বের অতল সমুদ্রে। বর্ণা কিছু
হ'য়ে রাখে না। সব ধূরে নিরে এসে রত্ন-গর্ভা অতল সমুদ্রে, মাতৃম্বের
মহিমময়ী মৃত্তিতে স্নগভীর ভাব ধারণ করে সেখানে, আর যৌবন-
টহলা বর্ণারূপ নেই। রত্নগর্ভার গর্ভে ছিন্ন, মৌন, স্নগভীর।
দাবার সেখানে মহা-ওকার ধ্বনিতে উষেলিত। তাই নারীর
আধুনিকতার বর্ণাধারার মত উচ্ছলতা থাক, কিছু আবিলতাও
দাসে আশ্রুক, কিন্তু সমুদ্রের মত মাতৃম্বে এসে বেন নিজেকে বহুরূপে
মদ, নদী, হৃদ, বর্ণা, বৃষ্টি হ'য়ে যেমন সমুদ্র সন্তানরূপে বহে, যেমন
দাবার মাতৃম্বে বিলীন হয়, তেমনি ভারতীয় জ্ঞান-পরিমার, স্বাধ্যে,
সৌন্দর্যে, শত সহস্ররূপে এই বিশেষ বিকশিত হ'য়ে বেন আধুনিকারা
অতল সাগরের মতই রত্নগর্ভা হয়ে বিশেষ বিরাজ করুন। তবেই
হবে আধুনিকতার চরম উৎকর্ষ, চরম ও পরম নারীম্বের অতুলনীয়
আধুনিকতা।

এই আধুনিকতা পাশ্চাত্যের দু'এক logyতে আসবে না।
আসবে বাঙালীর তথা বাঙালীর হৃদয়-জ্যোতিঃ বিবেকানন্দের

মানস চক্রে দেখা ভারতীয় নারীর আদর্শবাদ থেকে। সেই এ
ভারত-ললনাদেরকে উদ্দেশ্য করে বুব সন্ন্যাসীর উদাত্ত আহ্বান :-
"হে ভারত, তুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ, সীতা, সাকিনী,
দময়ন্তী; তুলিও না তোমার উপাত্ত উমানাথ সর্বজাগী শব্দ;
তুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রি-
শুখের, নিজের ব্যক্তিগত শুখের জন্ম নহে; তুলিও না তুমি ধন
হইতে মায়ের জন্ম বলি প্রদত্ত। তুলিও না তোমার সমাজ যে
বিরাট মহামায়ার হারা মাত্র।"

ভারত সবই তুলে গেছে। আশ্বভোলা শব্দ হ'য়ে আজ
সকলেই গরল পান ক'রে চলেছে। কিন্তু জাতিকে আজও
প্রাণময় করতে পারে শক্তিবরূপিণী শক্তির আধার ভারতীয়
নারীজাতি। সন্তান পৃথক্ হ'লেও, মাতৃজাতি কিভাবে তাঁদেরকে
আধুনিক ভাবে, কিভাবে সন্তানকে পরিচালিত করবেন, এ চিন্তা
তাঁদেরকেই করতে হবে। নইলে পশুমাতা হ'য়ে সন্তান সমেত
শিকারীর গুলীতে নিহত হ'তে হবে।

ভারতের নারী সর্বতোভাবে ভায়তীয়া, ভারতীয়ভাবসম্বা,
সিন্ধুপারের বিদেশিনী নয়—অ-ভারতীয় জীবনাদর্শে প্রভাবিতা
হইলে ছিন্নমূল্য লতার ভায় বিভ্রা; বিদীর্ণা, মৃতকন্না ও পরিশেষে
পর্ষ্যাবিতা হইয়া সমাজে মহতী বিনষ্টির কারণ হইবে—এই
অধগুনীর স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত মননশীল প্রবক্তার
যুগোপযোগী সতর্কবাণী শ্রদ্ধার সহিত, নিষ্ঠার সহিত জ্ঞাত হউক,
শ্রবণান্তে জীবনে অহুশীলিত ও সমাচরিত হউক। যে মহিরা
প্রতিষ্ঠিত হউক ভারতীয় নারী।

দ্বিতীয় স্বজন

নটিকেরা ভরদ্বাজ

জলদিন আকাশে কোনো মেঘ ছিল,—মেঘের কী যে বস ছিল—

আজ কিছু মনে নেই তার।

হাঁওয়ার প্রৌড়র ছিল। অখণ্ডের ডালে মনে আছে
পাতারা কাঁপছিল স্নখে। বিলের নরম জলে রূপোলী ছপূর
কয়েকটি ডেউ তুলে নূপুর বাজিরে গেছে।

আকাশের আলোর বিস্তার

কয়েই পশ্চিমে চলে, তুমি এলে গান-গান কথার স্নধূর
তু ঠেঁটে বাজিরে ধীরে,—শেষ খাপে বসলে এসে
বেখানে নির্জন জলে বর্ণ বলিয়াছে।

কবিতা পড়লাম আমি তুমি তনলে তপ্পর হয়ে।

আমার বৃষ্টির মোম দীপ হয়ে জলে থাকল, আর এক সন্তার গভীরে
সমস্ত স্নতের মত, জাঁকা থাকল আকাঙ্কার জলে।

তুমি কি জেনেছ কিছু,—অথবা জামোনি। মৌন স্পন্দর বিজরে
আমি তবু অন্ধকার। সময়ের অতল তিমিরে

সব মুছে গেলে তবু-সবুজ ভনব আমি সেদিনের স্নর্বেব কল্পোলে।

কখন যে এসেছ হয় ? এসে কেন পূর্ণতা পৌঁছে

আর এক জনের ঠিক বুকের বিজরে ?

কয়েকটি তিব্বক রশ্মি পড়ছে পায়ের কাছে। কী একটা পাখীর ছানর
ডাকছে শিরীর গাছে। পাতা পড়লো অখণ্ডের থেকে।

তুমি একটু নড়ে বসলে। আলতো ছুটি মূহ হাত বইয়ের উপরে
বসলে, "পাতাটা দেখব ?"...জেগে থাকল তবু একটি স্নিত পরিচর
সব প্রখ মুছে গিয়ে। অখচ একটি মুখ অপর মুখের কাছে

বিস্ময়ে—বিবেকে

কী গভীর অন্ধকার। কেউ কাউকে চেনেনা এ সময়ের বড়ে।

পরিচর প্রাণ পেল। হৃদয়ের মুহূ পথ তারপর কত একে বেকে
একক অর্ঘ্যত হল। তবু মনে হয় আজো নির্জন প্রহরে..

তোমাকে আশ্রয় লাগে। মাহুব কী করে পার মাহুবের মন
কী করে ছচোখ জানে আর ছুটি চোখের আহ্বান,

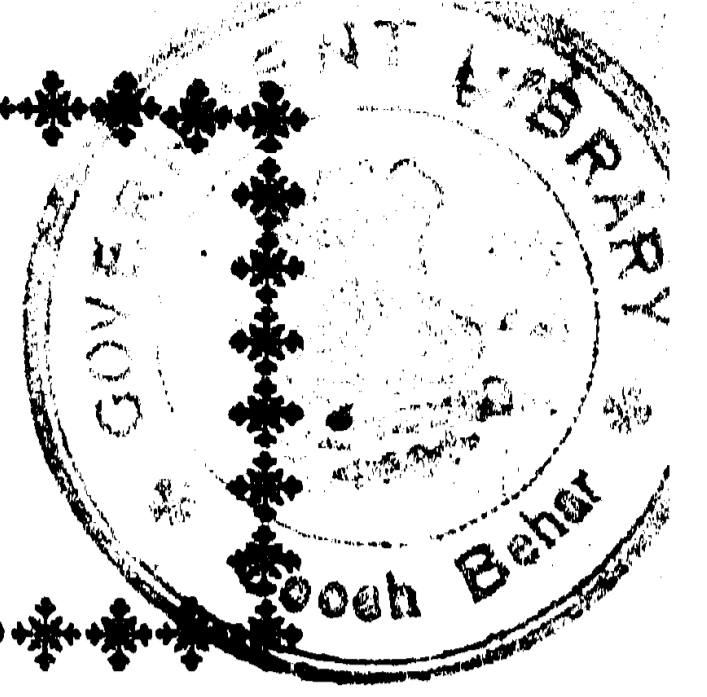
কী করে মনের মুখ দেখা বার আর এক মনের আয়নার..
—একথা ভেবেছি আমি—একক অর্ঘ্যত এই ভালোবাসা

কেন তবে খুঁজে মরে আর এক বিকীর বসন ?
কারণ এ জীবনই যে আর এক জীবনের দাস।

মায়ের ছেলে

(অপ্রকাশিত নাটক)

স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী



প্রস্তাবনা

(গান)

জননী, ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি,
ত্রাস-কঙ্ককঠ শঙ্কিত ভাষা
নাহি আলো নাহি আশা

কিছু নাহি নাহি নাহি—

কেমনে জননী তব ভক্ত মহিমা-
গাথা গাহি।

গেছে সত্য ধর্ম ত্রেতা দ্বাপর বিপাল ধর্ম
কলিকাল কবলিত পুণ্য ভারত ভূমি
লুপ্ত সকল কুলধর্ম।

জানি না জননী আর কার মুখ-চাহি
অলস জীবন-ভার বাহি।

কে আমি জানি না কোথায় বসতি ঘর,
চির পর-প্রত্যাশী চিনি না আপন পর,
রোগ শোক জর্জর, কামিনী-কিঙ্কর
পাহি, পাহি, মাগো পাহি,

তব করুণা-সলিলে অবগাহি,

তব ভক্ত মহিমা—গাথা গাহি।

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীভবদেব সিদ্ধান্তের বাড়ীর অন্তঃপুর।

(ঠাকুরঘর হইতে উগ্রচণ্ডামূর্তিতে শ্রীমত্যা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর
দরদালানে প্রবেশ)

সিদ্ধেশ্বরী। ও মা অপর্ণা, অপর্ণা, ওরে ও-মুক্তকেশী—ওরে তোরা

সব কোথায় গেলি। একবার দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ।

(একটু জল ককে লইয়া কল অপর্ণা (গৃহিনী) প্রবেশ করিলেন)

অপর্ণা। (স্বর করিয়া গজাঙ্কব পাঠ)

বন্দমাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা তনি
পতিত-পাবনী পুরাতনী,

বিষ্ণুপদে উপাগান, ত্রবময়ী তব নাম
সুরাসুর নরের জননী।

ব্রহ্ম কমণ্ডলে বাস, আছিল ব্রহ্মার পাশ
পবিত্র কবিতা ব্রহ্মপুত্রী,

জীবে দেখি দূষণ্য নাশিবারে তব ভয়,
অবনীতে অবতীর্ণা হইলে আপনি।

সিদ্ধেশ্বরী। বলি শুনছিস, না কানের মাথা খেয়েছিস?

অপর্ণা। (হস্ত সঙ্কত করিয়া নিবেদন) —আ:

(দালান হইয়া ঠাকুরঘরের ভিতরে গেলেন, ঠাকুর-
ঘরের অন্ত দোর দিয়া শ্রীমান গঙ্গেশ বাহির হইল)

সিদ্ধেশ্বরী। বলি তোদের এটা বামনবাড়ী না চাড়ালের বাড়ী?
জাতজন্ম বলতে যে আর কিছুই রইল না। নৈবিত্তি এঁটো
করে খায়, এমন তো কখন দেখিনি বাপু।

গঙ্গেশ। (মুখ ভেজাইয়া) এই বুদ্ধি খুৎখড়ি!

সিদ্ধেশ্বরী। এই, এই, কি দশি ছেলেগো, এর ঠাকুর দেবতা বলে
ভয় নেই।

গঙ্গেশ। না নেই। চোখ বুজিয়ে গালে মুখে চড়িয়ে বববম
বববম করলেই-বুঝি পূজো হয়। এখন ভৈরব এসে তোমার
ঘাড় মটকে দেবে তখন মজাটি টের পাবে।

সিদ্ধেশ্বরী। যত বড় মুখ না তত বড় কথা, ভৈরব আমার ঘাড়
মটকাবে। আর তোরে বুঝি কোলে নিয়ে নাচবে। আমার
মহাদেব কিরিয়ে দিয়ে যা, ফিরিয়ে দিয়ে যা বলছি।

গঙ্গেশ। না, তুই আমার হাত থেকে খাবার কেড়ে-নিলি কেন?

সিদ্ধেশ্বরী। ঠাকুরের নৈবিত্তি খেলে যে মরবি হতভাগা।

গঙ্গেশ। হ্যা মনুবা, ঠাকুর বুঝি মানুষ মারে? তবে মানুষ এখন
তখন ঠাকুরের নাম করে কেন? ঠাকুরকে ডাকে কেন, আমার
মা বলে গিয়েছে, ঠাকুর কাউকে মারে না, আমার বাবার সঙ্গে
ঠাকুরের কত ভাব ছিল। ঠাকুর আমাদের আপনাই লোক।

সিদ্ধেশ্বরী। দে আমার ঠাকুর দে, ছেলে মুখে বুড়োর হাড় জালানো
কথা।

গঙ্গেশ। তোকে দেব না, তুই পূজো করতে জানিসনে। ঠাকুরের
মাথায় ফুল দিয়ে নাউশাকের মাচা ভাবিস।

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। গঙ্গেশ।

গঙ্গেশ। (নিরীহ ভাল মানুষটির মতো) কেন?

অপর্ণা। তোর হাতে ও কি?

গঙ্গেশ। মাটির ডেলা।

অপর্ণা। তুই আমার মাকে গালাগাল দিয়েছিলি?

গঙ্গেশ। (মাথা নাড়িল)

সিদ্ধেশ্বরী। গালাগালি দিসনি, মিথ্যুক কোথাকার।

গঙ্গেশ। নাউ গাছের মাচা বুঝি গালাগাল।

অপর্ণা। তুমি চপ কয়ো মা। তুই আমার মায়ের শিবঠাকুর
তুলে এনেছিস?

গজেশ। বুদ্ধি যে আগে আমার গালাগাল দিল।
 অপর্ণা। তুই ঠাকুরদের নৈবিদ্যি চুরি করে খেয়েছিলি ?
 গজেশ। চুরি করিনি ঠাকুরকে বলে খেয়েছি।
 অপর্ণা। ঠাকুর খেতে বলেছিলেন ?
 গজেশ। বারণ করেনি তো।
 অপর্ণা। মান করেছিলি ?
 গজেশ। না।
 সিদ্ধেশ্বরী। ঐ শোন, নিজের মুখে গুণের সব কথা শোন
 মা। চান করবে। এড়া কাপড়ে খায়, চাঁড়াল
 চাঁড়াল।
 অপর্ণা। মা—তুমি ধাম। সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছিলি ?
 গজেশ। (মাথা নাড়িল) আমার মস্ত মুখই নেই।
 অপর্ণা। এতগুলি আক্রমণ হলে এ বাড়ীতে রয়েছে তাদের কাউকে
 মস্ত পড়িয়ে দিতে বললিনে কেন ?
 গজেশ। কেউ মস্তুরের মানে বলে দিতে পারে না।
 অপর্ণা। তোর পৈতে কই ?
 গজেশ। (দেখিল সত্যই গলায় পৈতা নাই) বাঃ রে আমার পৈতে
 কোথায় গেল ? ঐ বুদ্ধি আমার পৈতে লুকিয়ে রেখেছে।
 শিগ্গীর আমার পৈতে কিরিয়ে দাও। নইলে ভাল হবেনা
 বলছি।
 অপর্ণা। তোর পায়ের কাছে দেখ দেখি ওটা কি ?
 গজেশ। (বুদ্ধির প্রতি) আমার পৈতে আর লুকিয়ে রাখতে
 হয় না। (কুড়াইয়া গলায় দিল)
 অপর্ণা। তুই আমার মাকে বুদ্ধি বলিস কেন ?
 গজেশ। বুদ্ধিকে বুদ্ধি বলবো না তো কি বলবো ?
 অপর্ণা। দিদিমা বলবি। দে মায়ের শিব ঠাকুর কিরিয়ে দে।
 (কিরাইয়া দিল) মা তুমি যাও চলল মসগে আমি নতুন
 নৈবিদ্যি তৈরী ক'রে দিচ্ছি। [সিদ্ধেশ্বরীর প্রস্থান] ওরে
 মুক্ত। (গজেশের প্রতি) এইদিকে আর, আমার কাছে বাস।
 (গজেশ বসিল) হ্যারে তোরে এত করে বুঝিয়ে বলি, ও রকম
 অনাচার করিসনি। ব্রাহ্মণের ছেলে সকালে উঠে গঙ্গা নাইবি,
 সন্ধ্যা-আহ্নিক করি, পূজা করি, তারপর তোর মামার কাছে
 পড়বি, তবে তো ওর মতো পণ্ডিত হবি।
 গজেশ। আমি পণ্ডিত হবোনা। মামীমা—তোমার পায়ের পড়ি
 মামীমা তুমি মামাকে বুঝিয়ে বল, মামা যেন আমার পণ্ডিত
 করে না দেয়।
 অপর্ণা। কেন রে, ব্রাহ্মণের ছেলে পণ্ডিত হবি না কেন ? পণ্ডিতের
 কত মান। দেখছিলি তো তোর মামাকে, বড় বড় রাজা
 জমিদার সদাগর সবাই এসে ব্যবস্থা নেয়, কত বিদেয় দেয়।
 দেশ-বিদেশের কত লোক তোর মামাকে মানে চেনে, ওর মতো
 হতে তোর ইচ্ছে হয়না ?
 গজেশ। না—
 অপর্ণা। পণ্ডিত হবিনে তো কি করি ? একটা কিছু করতে
 হবে তো।
 গজেশ। আমার মূৰ্হ হতে ইচ্ছে হয়। সত্যি মামীমা আমি
 মূৰ্হ হয়ে তোমাদের সঙ্গে ভাত বাঁধবো, কুইনো কুইবো।

রাখালদের সঙ্গে মাঠে গরু চরাব, গাছ থেকে কল পেড়ে খাব।
 বেশ মজা হবে।
 অপর্ণা। হ্যারে তুই বলিস কি ? এতবড় পণ্ডিতের ভায়ে হয়ে
 তুই মূৰ্হ হয়ে থাকবি। লোকে যে আমার দূষবে, বলবে,
 গজেশের মামী গজেশকে সংসারে খাটায়, তাই ওর লেখাপড়া
 হলনা। তোর মা মরবার আগে তোকে যে আমার হাতে দিয়ে
 গিয়েছে, ছষ্টমি কোরোনা লক্ষ্মীবাবা, ভাল করে লেখাপড়া শেখ।
 গজেশ। মায়ের কথা তোমার মনে আছে মামীমা ?
 অপর্ণা। তা আর নেই, যেবার মারা গেল, সেইবার পুজোর
 এখানে এলো, আহা কত ছুঃখু করতে লাগল, সেইবারই তো
 বলেছিল, আমি যদি মরি তুমি আমার গজেশকে দেখো বো।
 গজেশ। মায়ের সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল মামীমা ?
 অপর্ণা। আমি তাকে নন্দ ভাষিনি। সে আমার ছোট বোন
 ছিল, বাও বাবা বাও, গঙ্গা নেয়ে এসে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেয়ে
 নাও। এখনি তোমার মামা টোলে গিয়ে বসবেন।
 গজেশ। আমি এখানে বসি মামীমা। তুমি আমার কাছে বসে
 মায়ের গল্প বল আজ আর খেলতে বাব না। আচ্ছা আমার
 মা কেমন দেখতে ছিল বলতো ? খুব ভাল ? না ? আমার
 একটু একটু মনে পড়ে, মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট দেখি, আবার
 গুণ্ডগোল হয়ে বাব, তুমি বল।
 অপর্ণা। সে আর একদিন বলবো, তোমার মামার আসবার
 সময় হল, এখুনি টোল বসবে, তুমি যাও বাবা নেয়ে এসো,
 মন দিয়ে পড়াশুনো করগে।
 (বৈরাগী বাউলের প্রবেশ, সঙ্গে নারী)
 বাউল। ছুটা ভিক্ষে পাই মা, একটা গান শোনাবো ?
 অপর্ণা। শোনাও—
 (গান)
 গুরুমশায় পায়ের ধরি লেখাপড়া শিখিওনা আমার—
 তোমার বিজ্ঞা তোমাতে থাক্ ওবিজ্ঞা দিওনা আমার—
 (অবিজ্ঞা দিওনা আমার)।
 মুখা ছেলে হয়ে আমি চরাব ধেমু,
 সাজের বেলায় কদমতলার বাজাব বেণু,
 ধুলো বেড়ে মা জননী বলবে গোপাল কোলে আর।
 খাওরে ননী বাহুমণি রোদ লেগেছে সোনার পায়।
 সকাল বেলা বাজবে শিলা ঢোল, বলবে সবাই
 গা তোল গা তোল।
 দিয়ে ক্ষীর নবনী (আমার) সাজিয়ে দেবেন মা জননী—
 পীতধড়া মোহন চুড়া, হাতে বাঁধি মুখে হাসি,
 বাজন নুপুর পায়।
 (সন্তোষভবদেব সিদ্ধান্তের প্রবেশ)
 ভিকি লইয়া বাউল চলিয়া বাইতেছিল, সিদ্ধান্ত মশায় তাহাকে
 বাইতে নিবেদন করায় সে দাঁড়াইল।
 গজেশ মামাকে দেখিয়া সকলের অলক্ষ্যে চলিয়া গেল।
 ভবদেব। শুধে পায়ের শোন, শোন, তোমার একি গান ? প্রাকৃত
 রসের গান, না অপ্রাকৃত রসের গান ?

বাউল। আমি অত শত জানিনে ভট্টচার্য্য মশায়—

ভবদেব। না, না, আমি তোমার অতি সহজ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করছি। যে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর আজীবন মূর্খ হয়ে থাকবেন সন্দেহ করলেন, বস্তুতঃ তিনি কি প্রাকৃত মনুষ্যসম্ভান, না অপ্রাকৃত কিশোর কৃষ্ণচন্দ্র, তুমি কার কথা বলছ ?

বাউল। আমি আসি পণ্ডিতমশাই।

ভবদেব। না, না, শোন, এখানে মূর্খ শব্দটি কবি কোন্ অর্থে ব্যবহার করেছেন, শব্দটি ভাব-বাচক না অভাব-বাচক ? যদি অভাব-বাচক হয়, তাহলে অপ্রাকৃত কিশোর মনুষ্য সে শব্দ প্রযুক্ত হতে পারে না, ত্রিকৃষ্ণচন্দ্র যিনি সর্ববয়সের কর্তৃক, তিনি যে মূর্খতা কামনা করেন সে অবস্থা বিচারে অভাব নয়, সর্ববিস্তার পূর্ণতা, মহাবিজ্ঞা।

বাউল। আমি আপনার কথা বুঝতে পাচ্ছি না পণ্ডিত মশাই, আমি এখন আসি। (প্রস্থান-উদ্যত)

ভবদেব। না, না শোন তোমার এ গানে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে।

অপর্ণা। না গো বাছা তুমি যাও। (বাউলের প্রস্থান)

ভবদেব। আহা—কেন ওকে যেতে বললে, কেন ? ওর কাছে আমার প্রশ্ন আছে। সত্যই আমি তত্ত্বটি প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত ঠিক সিদ্ধান্ত করতে পাচ্ছি না।

অপর্ণা। ও গরীব মানুষ একা তোমার বাড়ীতে ভিক্ষে করলে ওর চলবে ?

ভবদেব। আজ না হয় এখানেই আহারাদি কর্তৃক দেখলে না গানটির মধ্যে কোথাও কৃষ্ণচন্দ্র কি বশোমতীর নামোল্লেখ নাই। অথচ পীতমণ্ডা, মোহনচূড়া, সরনবনীর কথা রয়েছে—তারপর এ গুরুমশায় কে ? ইনি কি পৌরাণিক সন্দীপনিমুনি।

অপর্ণা। ও বাউল তোমার মত স্তায়শাস্ত্র পড়ে গান গায় না, তুমি তর্ক করলে ও পারবে কেন ?

ভবদেব। না, না, আমিতো তর্ক করছি না। সিদ্ধান্ত আমি নিজেই কোর্কো, আমি শুধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলাম।

অপর্ণা। ও কথা থাক। তুমি গঙ্গেশের পড়ার কি ব্যবস্থা করছ তাই বল।

ভবদেব। গঙ্গেশ, তুমিছ ওর বুদ্ধি খুব প্রশংসা তবে পাঠে তেমন মন নেই।

অপর্ণা। শুনেছ কি গো, তুমি নিজে ওকে পড়াওনা ?

ভবদেব। ওতো এখন ব্যাকরণ পড়ে, আমার অধ্যাপনা ঠিক বুঝতে পারবে না, তাই আমি ভূতনাথের উপর ওর পড়ানোর ভার দিয়েছি—সেই মায়ে মায়ে বলে গঙ্গেশের তেমন অভিনিবেশ নেই।

অপর্ণা। ভাল করে পড়ালে পড়বে না তেমন ছেলে তো ও নয়। ভূতনাথ ওকে পড়াতে পারে না, তাই ও মন দেয় না। তুমি নিজে পড়িয়ে শুনিয়ে ওকে একটু শিগ্গির শিগ্গির পণ্ডিত করে দাও, আমি কুলক্রিয়া করে একটা পুস্তক বউ করে আনি।

ভবদেব। ও ! তাই বল, তোমার শাস্ত্রী হবার সাধ হয়েছে।

(হুক্তকেশীর প্রবেশ)

হুক্তকেশী। বাবা ! তোমার সন্ধ্যা-আফ্রিকের জারগা হয়েছে। মা ! উম্মন ধরিয়ে দিয়েছি এস।

ভবদেব। হ্যাঁরে গঙ্গেশ কোথায় গেল রে ?

হুক্তকেশী। আমি পুকুরে চাল ধুতে গিয়েছিলাম, দেখে এলাম গঙ্গেশ সেই বাউলটার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে।

ভবদেব। সে কি ! ব্রাহ্মণের ছেলে বাউলের সঙ্গে ফিরবে কেন ?

অপর্ণা। হ্যাঁ, ওর যেমন কথা, বাউলের সঙ্গে ফিরছে, ভাল লেগেছে তাই গান শুনেছে বল।

হুক্তকেশী। না মা—আমি কত ডাকলাম, আমার কথা শুনলো না। অপর্ণা। তুমি তাহলে কাঁউকে খোঁজ নিতে পাঠাও।

ভবদেব। আমি এখন সন্ধ্যা-আফ্রিক করব, না, গঙ্গেশের সন্ধান করব, এদিকে বেলা হয়ে—ওহে ভূতনাথ।

(নেপথ্যে—আজ্ঞে যাই ভট্টচার্য্য মশায়) (ভূতনাথের প্রবেশ)

ভূতনাথ। আমার কিছু আজ্ঞা করছেন কি ?

ভবদেব। গঙ্গেশ কোথায় একটু সন্ধান করোতো বাপু।

ভূতনাথ। আজ্ঞে তার কথা ক'দিন থেকে আপনাকে বলবো মনে করেছি, পাছে আপনি রাগ করেন সেই ভয়ে বলিনি।

ভবদেব। যা বলবার পরে বোলো, এখন তার খোঁজ করো, যেখানে থাকে সেখান থেকে তাকে নিয়ে এস।

ভূতনাথ। আপনার গঙ্গেশ যেমন অবাধ্য তেমনই ছুঁট, তেমনই অনাচারী, আমি কিছুতেই ওকে পেরে উঠিনে।

ভবদেব। এখন আমি তোমার কোন অভিযোগ শুনবো না, আগে সে ছুঁটকে চতুপাঠিতে নিয়ে এসো, তারপর তার অনাচার সম্বন্ধে বিচার হবে।

ভূতনাথ। যদি আমার কথায় না আসে ?

ভবদেব। তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে যাবে, তাকে ধরে আনবে, বেঁধে আনবে।

ভূতনাথ। আপনার অসুস্থতি পেয়েছি, এখন আমিই ওকে শাসন কর্তে পারবো।

অপর্ণা। তুমি ভাল মুখে আসতে বোলো, সে আসবে না কেন, নিশ্চয়ই আসবে।

ভূতনাথ। আপনি ওকে জানেন না, মা, ও ভয়ানক ছেলে, আপনার কাছে শাস্ত্রশিষ্ট হয়ে বসে থাকে বলে আপনি ভাবেন ও তেমন ছুঁট নয়।

অপর্ণা। নিজের ভাই ছুঁট হলে তার সঙ্গে যেমন ব্যাভার কর—

হুটো কড়া কথা বললে, আবার একটু কোলে টানলে।

ভূতনাথ। আমার ভাই যদি ওরকম হয়, আমি এমন মার দিতাম, তার হাড় একদিকে, মাস একদিকে হত, মায়ের কাছে সবাই জর।

ভবদেব। ওহে ভূতনাথ, তুমি এরকম প্রশংসার পক্ষপাতী তাতো আমি জানতেম না, আমি তোমার যে হুঁ একটি ছাত্রের পড়ার ভার দিই, তাদের তুমি তাড়না কর, প্রশংসা কর—আজ্ঞা যাও, আগে গঙ্গেশকে নিয়ে এস, যদি না আসে ধরে আনবে, সহসা প্রশংসা কোরো না, বুকেছ ?

[ভূতনাথের প্রস্থান।

অপর্ণা। এই রকম পণ্ডিতের কাছে তুমি গঙ্গেশকে পড়াতে দিয়েছ ? ও ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে।

ভবদেব। তাইতো দেখছি, ছাত্রটি মেধাবী কিন্তু ওর প্রকৃতি যে
এতখানি রাজনিক, তাতো আমার জানা ছিল না।

(মুক্তকেশীর প্রবেশ)

মুক্তকেশী। আমি দেখেছি বাবা, ভূতনাথনা গঙ্গেশকে বখন
তখন মারে।

ভবদেব। তুই খাম্ ছুঁড়ী, ও আবার রসান দিচ্ছে, তোমার ভাইটিও
বড় সোজা ছেলে নয়।

মুক্তকেশী। গঙ্গেশের মুখ ভারি আলগা, ও বা খুনী তাই গালাগাল
দেয়, নৈবিদ্য চুরি করে খেয়েছিল, তাই দিদিমা ওকে বকে-
ছিলেন, দিদিমাকে কত গালাগাল দিলে।

অপর্ণা। তোর এরকম খুঁড়াব কেন হচ্ছে, আমায় বলতে পারিস্,
এর কথা ওকে, তার কথা আর একজনকে, এক কথা পাঁচ
জনকে পাঁচরকম করে লাগাস্ কেন, বলতো ?

ভবদেব। কি করে বল। কাজ-কর্মতো কিছু নেই, ভাত হজম
করা দরকার তো। পাড়ায় কি কি ঘটনা ঘটেছে
একবার খবর নিয়ে এসোতো মা, মুখুন্ড্যদের বড়বোঁ আর
ছোটবোঁতে পরদিন দুপুর বেলা যে কলহ হয়ে গেছে, তার
কলাফলটা শুনিয়ে দিবে ষাও।

অপর্ণা। তুমি সন্ধ্যা-আছিঁচ করবে না ?

ভবদেব। আমার সন্ধ্যা-আছিঁচ ও একরকম বিভ্রম। বললেই হয়
গৃহিনী। শাস্ত্র-ব্যবসার দিবেছন, তবু এমনি মায়ের পেলা,
পরমতত্ত্ব বিচার—তাও অদৃষ্টে নেই। সেখানেও দশজনের
জন্ত শুধু বস্ত্র আর পদার্থের বিচার, কেউ একবার বলেও না
ঠাকুর এই তত্ত্ব বিচার কর, এই রস বিচার কর। শুধু
পদার্থ—পদার্থ আর পদার্থ। বুঝেছ ব্রাহ্মণী—এই পদার্থ বিচার
করে দিন দিন অপদার্থ হয়ে গেলাম।

(ভূতনাথের পুনঃ প্রবেশ)

ভূতনাথ। ভূতচ্যাবি মশায়।

ভবদেব। কিহে তুমি গঙ্গেশের খোঁজ কর্তে যাওনি ?

ভূতনাথ। আমি সন্ধান নিয়ে জানলাম, এ-পাড়ায় এক চণ্ডালের
ছেলে ওলাওঠায় মারা গেছে, তাদের শব বইবার লোকের অভাব
পড়ে। গঙ্গেশ চণ্ডালের শব নিয়ে ঝাশানে গেছে।

ভবদেব। হা অগদখা, কি সর্বনাশ, চণ্ডালের শব নিয়ে ঝাশানে
গেছে। ব্রাহ্মণের ছেলে চণ্ডালের শব নিয়ে গেল।
কোন চণ্ডাল ?

(মুক্তকেশীর প্রবেশ)

মুক্তকেশী। পাঁচু গরলা বলে গেল, বজ্রেশ্বর চাঁড়ালের ছেলে
বিষ্ট মারা গেছে।

অপর্ণা। ছুঁড়ের ছেলে, চাঁড়াল মিনষেরা কি বলে তাকে নিয়ে গেল ?

মুক্তকেশী। তারা যেতে বলেনি, গঙ্গেশ ইচ্ছে করে নিয়েছে।

ভবদেব। তোমার কাছে সব খবরই আসে দেখছি।

মুক্তকেশী। আমি তো আর পাড়ায় বাইনি, পাঁচু বলে গেল যে,
তোমার কাছে কথা বলতে সাহস করে না, তাই আমার কাছে
বলে।

ভূতনাথ। এখন আমি কি করবো বলুন ?

ভবদেব। বলবো আমার মাথা আর মুণ্ডু।

ভূতনাথ। ঝাশানঘাট থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসবো ?

অপর্ণা। তাই যাও—একে ওলাওঠা ব্যায়রাম তার উপর চাঁড়ালের
মড়া, ওই কচি ছেলে।

ভূতনাথ। তার উপর আজ শনিবার চতুর্দশী রাত্রে অমাবস্তা।

ভবদেব। আরো কি কি সংযোগ হয়েছে পাঁজি-পুঁথী দেখে
আমায় বল।

অপর্ণা। আর পাঁজি-পুঁথী দেখতে হবেনা, তুমি যাও বাবা তাকে
ডেকে নিয়ে এসো।

ভবদেব। না, না, তা হয়না গৃহিনী—শবাস্থগমন করেছে দাহ
শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঝাশানঘাটে থাকতেই হবে।

অপর্ণা। সমস্তদিন থাকবে হবেনা যে।

ভবদেব। তা আর কি করবে বল ? যেমন অব্যাহা সন্তান।
তার ওপর ব্রাহ্মণের ছেলে চণ্ডালের শব বহন করেছে, সমাজে
জাতিচ্যুত না করে।

অপর্ণা। হ্যাঁ জাতি-পাত করবে না আরো কিছু। গঙ্গায় ডুব
দিলেই শুদ্ধ হবে।

ভবদেব। তুমি তো এক কথায় মীমাংসা করলে। আমি তো
আর পারবো না—আমায় এখন সমস্ত প্রায়শ্চিত্তবিধিটি তন্ন
তন্ন করে বিচার কর্তে হবে। নারায়ণ পূজোর অবকাশ নেই।
সন্ধ্যাছিঁকে মন দিতে পারিনে। এখন যাই প্রায়শ্চিত্ত-বিধি
ওলটাই গিয়ে, সে প্রকাণ্ড গ্রন্থ, অল্প নৈমায়িকদের নিয়ন্ত্রণ
করি। এখন পাঁচ সাতদিন এই তর্কই চলল আর কি, হা
মহামায়া, খেলাঘর বেঁধেছ বটে।

(বিবকল্পক)

গায়িকা।

বড় মজার খেলাঘর—

পঞ্চভূতে হাসে-কাদে কেউ সাজে বউ

কেউ সাজে বর।

(আমি) অন্ধি সন্ধি পাইনে ধুঁজে

কে জানে কে কারিকর।

নব দ্বারে নয়টি দ্বারী

নিশানধারী চলন ভারি,

করে পারচারি—

(শুধু) কর্তা কোথায় শুধাইলে

বলে জানিনে খবর।

এখের ঘরনী যিনি

নাম শুনি তাঁর মহামায়া,

কৈলাসেতে শিবের বামে

কাশীধামে স্বর্ণকারা,

সবাই চায় তাঁর জীচরণ-দ্বারা—

এখন তিনি থাকেন না ঘরে

ঝাশানে মশানে নাচেন শবের উপরে,

তাঁর চরণ ধরে আনতে ঘরে

ঘর ছেড়েছেন ভূতেশ্বর,

সেই অবধি ভূতের বাসা হয়েছে এ ঘর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শশান ভৈরব ঘাট।

বৈরাগী, গঙ্গেশ, অনুরে বৈরাগীর সহধর্মিণী মহামায়া।
(বৈরাগী গঞ্জিকা সেবন করিতেছিলেন ।)

বৈরাগী। তুই আমার সঙ্গে এখানে এলি কেন ?
গঙ্গেশ। তোমার সঙ্গে আসিনি আমি মড়া পোড়াতে এসেছি।
বৈরাগী। তুই এইটুকু ছেলে তুই আবার মড়া পোড়াবি কি ?
তুই আমার কাছেই এসেছিস, কেন এলি ?
গঙ্গেশ। তোমার গান আমার ভাল লাগল যে।
বৈরাগী। মড়া পোড়ান হয়ে গেছে ?
গঙ্গেশ। চিত্তেয় তুলে দিয়েছি।
বৈরাগী। কে মরেছে, মেয়েছেলে না ব্যাটাছেলে ?
গঙ্গেশ। যোয়ান ব্যাটাছেলে।
বৈরাগী। বাপ আছে ?
গঙ্গেশ। আছে, বুড়ো।
বৈরাগী। কঁাদছে ?
গঙ্গেশ। ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কঁাদছিল।
বৈরাগী। হুঃ। আর কে আছে ?
গঙ্গেশ। মা আছে। বউ আছে। ছেলে আছে।
বৈরাগী। সবাই কঁাদছে ?
গঙ্গেশ। আছাড়ি পিছাড়ি করে কঁাদছিল এখন মাঝে মাঝে কঁাদছে ?
বৈরাগী। তিনমাস পরে আর কঁাদবে না, হুঁমাস পরে জুলে যাবে।
আজ খুব কঁাদছে, না ?

গঙ্গেশ। হ্যা, কান্না দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল।
বৈরাগী। (গাঁজার কলিকা দিয়া) এই নে খা।
গঙ্গেশ। আমি খাইনে।
বৈরাগী। তবে রেখে দে, চিত্তেয় শুইয়েছে কেমন আছা।

(একতারা বাজাইয়া গান ধরিল)

(গান)

কে গো তুমি অন্ধ মেলে শুয়েছ চিত্তায়।

(তুমি) আজ সকালে বলেছিলে

যর ছেড়ে যাবে না কোথায়।

যবে তোমার কতই আকিঞ্চন

সাধ করে অষ্ট অঙ্গে নিয়েছ বাঁধন।

(তোমার) ক্ষেত খামার রইল পড়ে গোলা ভরা ধান,

কার উপরে করলে অভিমান।

(আজ) আসবো বলে চল গেলে

বলে গেলে না কোথায়।

(তোমার) মা কঁাদে, বাপ কঁাদে

কঁাদে তোমার ছেলে।

প্রাণপ্রিয়া পত্নী কঁাদে

বলে কোথা যাও গো আমার ফেলে।

তুমি কারো কথা শোন না যে, এ'কি বুঝে পেল তোমার।

(গানের সময় পূত্র-শোকাতুর যজ্ঞেশ্বর আসিল)

গান শেষ হইলে বৈরাগীর পায়ের ধূলা লইল।

যজ্ঞেশ্বর। এখন আমি কি করি বলত ঠাকুর ?

বৈরাগী। তুমি কে বাবা ?

যজ্ঞেশ্বর। আমি যজ্ঞেশ্বর চাঁড়াল।

বৈরাগী। তোমার ছেলে ?

যজ্ঞেশ্বর। হ্যা বাবা-ঠাকুর, জল-জ্যান্ত যোয়ান ছেলেটাকে চিত্তেয় তুলে দিয়ে আলাম।

বৈরাগী। ঐ বিছানায় তো সবাইকেই একদিন শুতে হবে।

যজ্ঞেশ্বর। আজ যদি আমি শুতে পার্তাম, তাহলি তো কথা ছেল না। মাগী মুচ্ছা গিয়েলো। আমার অমন নজ্জাশীলে বউ ঘরের লক্ষী কখনো কারো সামনে বেরোয় না। আমার পায়ের উপর পড়ে বললে তোমরা ওরে কোথায় নিয়ে যাও, নিজেই নিজের চোখের জল মুচি, মনরে বলি, মন তুমি শক্ত হও। আমি আমাদের ওনাদের শাস্ত করি।

বৈরাগী। কি বলে শাস্ত করলে ?

যজ্ঞেশ্বর। ঐ আপনি আমাকে যে কথা বললে, আমিও তাঁনাদের সেই কথাই বললাম। একদিন সবাইকেই যাতি হবে, তুমি যাবা, আমিও যাবা, তবে দুদিন আগে আর দুদিন পাছু।

বৈরাগী। এইতো তুমি আসল কথাটি বুঝেছ বাবা।

যজ্ঞেশ্বর। না বাবা বুঝিনি কিছু, ও মুখের কথা বাবা, শুনে শেখা, পাঁচজনে বলে আমিও বলি, এখন তো মনে হচ্ছেনা আমি মরবো।

বৈরাগী। আমি আর তোমায় কি শেখাব বাবা! আমিও তোমার মতো আসল ব্যাপার কি কিছুই জানিনে। তুমি ক্ষেত খামার কর, কেউ সংসার করে, কেউ টোল করে, ছাত্র পড়ায়, আমি দোরে দোরে ভিক্ষে করি।

যজ্ঞেশ্বর। না বাবা-ঠাকুর, আমার ছলনা করোনা, তুমি তো পেটের দায়ে বৈরাগী নও বাবা। তুমি গান কচ্ছিলে আমার প্রাণ শীতল হয়ে গেল, কত বৈরাগীর গান শুনেছি, এরকম ভো শুনিনি।

বৈরাগী। তোমার পরিবার মুচ্ছা গিয়েছে, আহা মার প্রাণে বড় লাগে—তোমার পরিবারের তুলনায় তোমার শোক কিছুনা। সে ভুলতে পারবে না। মনে হয় আর পাঁচটার মুখ চেয়ে ভুলবে। ভোলে না। মায়ের শোক কি সোজা শোক বাবা। বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন, দশ মাস পেটে জায়গা দিয়েছে, বিইয়েছে, তিল তিল করে এইটুকু রক্তের দলাকে অতবড় বোরান করেছে। তারপর বমের হাতে তুলে দিয়েছে। আমার মা আমার দিকিকে দিয়েছিল। দিয়ে আর ওঠেনি। সেই শোওয়াই শেষ শোওয়া। দিন পনের পরে মাকে চিত্তেয় তুলে দিলাম, সেই থেকে আর ঘরে বাইনি। মাগী বললে আমার কোথায় রেখে যাবে? আমি বললাম সাহস থাকে সঙ্গে এসো। স্বামী স্ত্রী-তে ভিক্ষা করি, কত লোকে কত বলে। বলুকগে।

যজ্ঞেশ্বর। তুমি তাহলে হুঃখ পেয়েছ বাবা-ঠাকুর।

বৈরাগী। হুঃখু পারিনি, এমন একটা লোক দেখাতে পার ? পারবে না বাবা। বাড়ী যাও, পরিবারকে বড় করো। আর একটি দিনও রাগ করে পরিবারকে কড়া কথা বোল না।

বদি কখনো কিছু অভ্যর্থন করে মনে করো যে ছেলেকে চিত্তের
তাইয়ে দিয়েছ সে তার মা, মা—মা—বড় সহজ জিনিষ নয় সব
মাই এক। আমার মাঝে বলে তার ছেলে মরেনি, এ মায়ের
কোল ছেড়ে সেই মায়ের কোলে গিয়েছে। মায়ের কতখানি
মমতা জান ?

গান (বিভাষ)

তুমি আসবে বলে স্বপ্নানে (জীবনান্তে শেষের দিনে)

ধাত্রী রূপে জগদম্বা বলে আছেন এখানে।

(সেদিন) ভাই বন্ধু স্ত্রী দারা দেখবেনা কেউ আর

গঙ্গাজলে ধুয়ে দেবে দেহের অঙ্গার

(ক্রমে) ভুলে যাবে সকল সংসার।

(তোমার) সোনার অঙ্গ ছাই হবে

জগতে ঘোষণা হবে,

যে ছিল সে নাই, নাই,

গেছে কোথায় কে জানে।

লোকে বলে শিবের তরে স্বপ্নান-বাসিনী—

আমি বলি জীবের তরে অক্ষুর-নাশিনী

(হলেন) দয়াময়ী মা জননী মধুর-হাসিনী

নিলেন কোলে আপন বলে

অনাথ সন্তানে।

বৈরাগী। (যজ্ঞেধ্বরের প্রতি) বাও—বাবা, চিত্তের আগুন নিবিয়ে
বাড়ী যাও। তোমার ছেলে মা আনন্দময়ীর কোলে হাসছে
খেলছে আনন্দ করছে,—মা আনন্দময়ী, বাঁর সংসার তিনি ঠিক
চালাচ্ছেন (যজ্ঞেধ্বর চলিয়া গেল) আমরাই বুঝতে পারিনি।
(গঙ্গেশের প্রতি) কই তুই গেলিনে ?

গঙ্গেশ। না।

বৈরাগী। কেন ?

গঙ্গেশ। ওদের সঙ্গে যাবনা।

বৈরাগী। এই যে বললি মড়া পোড়াতে এসেছিলি। ওয়া তো
এইবার বাড়ী যাবে।

গঙ্গেশ। আমি চাড়াালের মড়া ছুঁয়েছি। মামার বাড়ী কিরে গেলে
সবাই আমার বকবে।

বৈরাগী। তবে তুই এসেছিলি কেন ?

গঙ্গেশ। তুমি বললে, তুমি স্বপ্নানে থাক, ওয়া স্বপ্নানে আসছিল,
তোমার দেখা পাব বলে আমিও এলাম।

বৈরাগী। গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে নে, চল আমি তোকে মামার
বাড়ী রেখে আসি।

গঙ্গেশ। মামার বাড়ী যাব না।

বৈরাগী। কি করবি তাহলে ?

গঙ্গেশ। তোমার কাছে থাকবো।

বৈরাগী। আমার কাছে থেকে তোর কি লাভ হবে ?

গঙ্গেশ। তোমার কথা ভাল লাগে, তোমার গান ভাল লাগে,
তোমার দেখতে ভাল লাগে।

বৈরাগী। এই মাটি করেছে, আমার ভাল লাগে কিরে। তুই
আমার মতো বরছাড়া বৈরাগী হবি নাকি ?

গঙ্গেশ। হব। তুমি আমার ওই রকম গান শিখিয়ে দেবে ?

বৈরাগী। বৈরাগীরা শুধু গান গায় না, আবার ভিক্ষে করে।

গঙ্গেশ। আমিও ভিক্ষে করবো।

বৈরাগী। বড়লোক গেরস্ত বখন বলবে, ভিক্ষে নেই দেয়েছে
খেটে খেতে পার না হতভাগা ? এইনা বলে বখন তোমার
পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবে, তখন তাদের ওপর রাগ করতে
পারবে না বাবা।

গঙ্গেশ। কুকুর লেলিয়ে দেবে কেন ?

বৈরাগী। তুমি গরীব মানুষ, দুর্বল, প্রাণের দায়ে লাকাত লাকাত
পালাতে থাকবে। কুকুরটা পিছনে পিছনে ছুটেবে। লোকে
হাততালি দেবে। দেখলে বেশ আমোদ হবে।

গঙ্গেশ। তোমায় কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলো ?

বৈরাগী। হ—কতবার—

গঙ্গেশ। আমি যদি কুকুরটাকে ধরে একদিকে টান মেরে কেলে
দিই তাহলে কোন দোষের হবে ?

বৈরাগী। পারিস তুই ?

গঙ্গেশ। আমি বাঘের বাচ্ছা ধরতে গিয়েছিলাম।

বৈরাগী। ধরতে গিয়েছিলি ধরিসনি তো ?

গঙ্গেশ। না, আমার মা বারণ করেছিল।

বৈরাগী। তাহলে তুই এখানে থাকবি ?

গঙ্গেশ। হ্যাঁ আমার মা কোথায় তুমি জান—

বৈরাগী। (উচ্চকণ্ঠে) মহামায়া।

গঙ্গেশ। তুমি কাকে ডাকছ—মহামায়াকে ?

(মহামায়া আসিলেন)

মহামায়া। এস, ছুটো খেয়ে নাও।

বৈরাগী। এই ছেলেটি আমাকে ছাড়ছেন।

গঙ্গেশ। তোমার নাম মহামায়া ?

মহামায়া। হ্যাঁ বাবা, আমার নাম মহামায়া।

গঙ্গেশ। খুব আশ্চর্য্যতো।

মহামায়া। কি আশ্চর্য্য।

গঙ্গেশ। আমার মাঝে সবাই মহামায়া বলে ডাকতো।

মহামায়া। তোমার মা কোথায় বাবা ?

গঙ্গেশ। মা নেই, মামীমা বলে মা মারা গেছে।

মহামায়া। তোমার মা কতদিন মারা গেছে ?

গঙ্গেশ। অনেকদিন, আমি তখন খুব ছোট।

মহামায়া। সেই থেকে মামার বাড়ীতে আছ ?

গঙ্গেশ। হ্যাঁ, আমার মনে হয় মা আমার পাশে পাশে
আছে। আচ্ছা, মানুষ মরে গেলে কোথায় যায় বলতে
পার ?

বৈরাগী। মা মলে আর সেটি জানবার উপায় নেই বাবা।

গঙ্গেশ। তুমি জান, আমার বলছনা। বসনা তোমার পায়ে গড়ি,
আমি আমার মাঝে দেখতে চাই, মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়ে
থাকি, মনে হয় চোখ খুললেই দেখবো সামনে মা পাড়িয়ে
আছে।

[ক্রমশঃ

কাশ্মীরের কোলে কয়েকদিন

শ্রীশ্রীমজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রাবস্থায় ভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে রচনা লিখেছি, হাজলিটের প্রবন্ধ পাঠও করেছি। কিন্তু সেই সময় যদি ইস্কুল বা কলেজ থেকে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো, যেমন শুনেছি পাশ্চাত্যদেশে আছে, তাহলে আমাদের শিক্ষা যে কতটা বাস্তবায়ন ও সম্পূর্ণ হত তা আজ যখন বেড়াবার নেশায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরতে শুরু করেছি, তখন মর্মে মর্মে উপসক্তি করছি। ইতিহাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যদি পাঠ্যবিষয়গুলি অথবা দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি, ত্রিচীনপল্লী, দেবগিরি, অসমাবাদ প্রভৃতি ষটনাঙ্গলগুলি স্বচক্ষে দেখতাম, তাহলে আর ইতিহাসের পাঠ মুখস্থ করতে এত বেগ পেতে হত না। ভূগোলের বেলায় সেই একই কথা। প্রদেশের অবস্থান, প্রধান সহর এবং পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীর নাম মুখস্থ করতে করতে সেদিন যে গল্পগম্বীর হয়েছি, আজ যখন সেইগুলির অবস্থান ও গতি নিজচোখে দেখছি তখন মনে হচ্ছে—হায়! এইগুলি সেদিন কেন দেখিনি! মুখের বিষয়, স্বাধীনতার পর এদিকে কিছুটা সাড়া পড়েছে। ভ্রমণকালে এবার কয়েকটি শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে দেখাও হল। মনে হয় এই সুযোগ আরও ব্যাপক ও প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উত্তরভারত ও দক্ষিণভারত ভ্রমণ মোটামুটি শেষ হবার পর থেকেই মনে হয়েছে কাশ্মীর ভ্রমণ না হলে উত্তর-ভারত ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই 'ভূত্বর্গ কাশ্মীর' দর্শনের লোভ অনেক দিনের। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক শোভা ও তুষারমৌলী হিমালয়ের আকর্ষণ চিরন্তন। তাছাড়া আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তথা বিশ্বরঙ্গমঞ্চে আজ কাশ্মীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই এবার পূজার ছুটিতে কয়েকজন বন্ধু কাশ্মীর ভ্রমণের প্রস্তাব করায় সে সুযোগ ছাড়তে পারলাম না। তাছাড়া শৈলশিখরে বাত্রা ট্রেন কন্সেসনও এই সময় রেলকর্তৃপক্ষ যখন দিচ্ছেন তনাম, তখন একেবারে থাকে বলে সুবর্ণ সুযোগ তাই ঘটে গেল। ১৮ই অক্টোবর ১১৫৮ বেলা ১০।০ টায় তুফান মেলে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের দলে সর্বসমেত ১১ জন সভ্যাসভ্য। দুইটি পরিবারে মেয়ে পুরুষে ৭ জন এবং আর ৪ জন দুইপরিবারের বন্ধু। সাধারণ আনন্দ-কোলাহল করতে করতে আমরা ১১শে রাত্রি প্রায় ৮।০ টায় নয়াদিল্লী স্টেশনে পৌঁছলাম। এখানে এনে প্রথম বিপত্তি হল আমাদের ট্রেন দিল্লী অর্থাৎ পুরাতন দিল্লী স্টেশনে যাবে না—এই সংবাদে। এই সংবাদ আবার সংগ্রহ করা গেল বেশ ঋনিকটা দেয়ীতে। আমরা ট্রেনে নিশ্চিত বসে আছি ট্রেন পরের স্টেশন পর্যন্ত যাবে বলে, অথচ দেখছি অল্প কামরার বাত্রীরা একে একে নেমে পড়ছে এবং কেহ কেহ পাশেই দণ্ডায়মান কাশ্মীর মেল ডুপ্লিকেটে অর্থাৎ অতিরিক্ত কাশ্মীর মেলে গিয়ে উঠছে। আমাদের আসন রিজার্ভ করা আছে কাশ্মীর মেলে, ডুপ্লিকেট মেলে নয় অথচ সেই ট্রেন অল্প স্টেশন থেকে ছাড়বে শেষ যুক্তি জানা গেল। আমরা ভাড়াভাড়া নেমে পড়ে ট্যান্ডি নিয়ে

অচেতন ও 'সচেতন' মালপত্রসহ পুরাতন দিল্লী অভিমুখে উর্ধ্বাঙ্গে ছুট দিলাম, নচেৎ সব-ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবে। দিল্লী স্টেশনে এসে দেখলাম কাশ্মীর মেল ট্রাডিয়ে আছে এবং আমাদের অল্প দুইখানি কামরা রিজার্ভ আছে। রাত্রিটা সুনিদ্রায় কাটবে আশঙ্ক্য হয়ে তবে আহা হারাদির চিন্তায় আমরা মন দিলাম।

শরতের শিশির-ঝলমল, শেফালী-হুলপল্লিশোভিত সোনালী প্রাতে পূর্বদিন বাড়ী ছেড়েছি। বাঙলার প্রাণের উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজার আগমনী-গান সানাইএর সুরে বাজছে তনতে তনতে এসেছি, তার বেশ পরের দিন সন্ধ্যা দিল্লী নগরীতেও কানে বাজছে, হৃদয়তন্ত্রীতে যেন করুণ সুরই রণিয়া রণিয়া উঠছে। পূজার কয়টা দিন বাঙালী বাড়ী যেতেই ব্যগ্র, বাড়ী ছাড়া তার কাছে সত্যিই পীড়াদায়ক। কিন্তু উপায় নাই, কারণ পূজার ছুটির কয়েকটামাত্র দিন সম্বল করে সকলে বাইরে পাড়ি দিয়েছি, কাশ্মীর বাতায়তে পথেই যে কেটে যাবে ৬-৭ দিন আর মাত্র ৩ দিন থাকে কাশ্মীরের জঙ্গ। কাশ্মীরে অবসর বাপন দূরের কথা, প্রধান প্রধান দর্শনীয়গুলিই সব দেখা যায় না ৩ দিনে অতান্ত তাড়াহুড়া করেও। তাই পঞ্চমীর দিনে পূজামণ্ডপে শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার আবরণ উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে মাকে প্রণাম জানিয়েই যাত্রার দিন বেড়িয়ে পড়তে হল। ইচ্ছা ছিল দিল্লী পৌঁছিয়ে যে সময়টুকু পাওয়া যাবে তার মধ্যেই নয়াদিল্লী কালী-বাড়ীতে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীকে সপ্তমী দিবসে প্রণাম করে আসব। কিন্তু একে ট্রেন পথে বিলম্ব করল, তার উপর স্টেশনে এসে এক বিভ্রাট। ফলে সে আশা ত্যাগ করে পাঠানকোটের পথে পা বাড়ানো গেল।

দিল্লী ছাড়ালেই পাঞ্জাবে পড়লাম। পঞ্চনদের দেশ সম্বন্ধে ভূগোলে পড়েছি, এর বীরত্বকাহিনী ইতিহাসের পাতার পাতায় স্বর্ণাকরে লেখা আছে। ভারতের বহু রাজ্যের উত্থানপতনের কাহিনী পাঞ্জাবের পথে পথে মিশে আছে। পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবার ভারতের ভাগ্য নির্ণীত হয়েছে। আজিও স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবের তরুণরা দলে দলে যোগ দেয় স্বাধীনতা রক্ষার জঙ্গ বৃকের রক্ত ডালি দিতে। পাঞ্জাবের অমৃতসরেই জালিয়ান ওয়ালাবাগ নিরীহ ভারতের জাগরণ এনে দিয়েছে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতি এই মহাতীর্থেই রক্ততিলক ললাটে পরে স্বাধীনতার সূত্রগম পথে একদা যাত্রা শুরু করে। বাঙলার ভার পাঞ্জাবও বিপ্রবান্দোলনের ইতিহাস রক্তাকরে লিপিবদ্ধ করে। ত্যাগে, শৌর্ধে, বীর্যে পাঞ্জাব ভারতের ইতিহাসে একদা গৌরবময় অধ্যায় রচনা করলেও, নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে পাঞ্জাব ঋণিত হল—স্বাধীনতার যুগকাল্টে সে তার শেষ বলি নিবেদন করল নিজের অজ্ঞেয়ে। পাঞ্জাব বলতে আজ পূর্ব-পাঞ্জাব। বাঙলার ইতিহাস এই একই ইতিহাস। তাই বাঙলার ও পাঞ্জাবের ভাগ্য একদিক দিয়ে একমুখে গ্রথিত। পাঞ্জাবের পূণ্যধূলি শিরে নিয়ে আমরা ধন্য হলাম। হৃর্তাগ্য যে, সমরাস্ত্রাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের মহাতীর্থে দর্শন ঘটল না—দূর থেকে

তাকে প্রণয় জানালাম। পাঠানকোটে ট্রেন এসে পৌঁছুল পরদিন সকাল ৮টার।

ট্রেন থেকে আমরা পাঠানকোটে নামলাম গরম জামা-কাপড় পরে কাশ্মীরের শীতের সঙ্গে যেন লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে। এর পর আর ট্রেনে নয়, একেবারে বাসে ২৫০ মাইল ত্রীনগর। বয়সে ঝাঁক নবীন, তাঁরা বেশভূষার পারিপাট্যে মগ্ন, তাঁরা তো গরমের রকমারি স্ট্রট নিয়ে গেছেন, যেন কার কত রকমের স্ট্রট আছে, তার প্রদর্শনী তাঁদের এক একজনের স্ট্রটবেসে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের বাসে সুন্দরী তরুণীও ছিলেন এক-আধজন। মেয়েরা শাড়ী পরে শুধু গরম লেডিস-কোট ও মোজাতেই সজ্জিত হলেন। আমি দলের পুরুষের মধ্যে বেশভূষায় একমাত্র ব্যতিক্রম অর্থাৎ ধূতি-পরিহিত। অবশ্য ভিতরে একটি সূতী ড্রয়ার, পারে মোজা এবং গায়ে সোয়েটার ও গরম কোট ছিল। আমরা দার্জিলিংএ বাওয়ার সময় সুখনা ছাড়ালেই ঠাণ্ডা অনুভব করি, তাই এখানেও হয়ত খানিকদূর গিয়েই ঠাণ্ডা পাব এবং বেশি ঠাণ্ডা পাব এরূপ অনুমান করেই শীতবস্ত্ররূপ বসে আমরা আগে থেকেই দেহকে সুরক্ষিত করলাম। অথচ জম্মু ও কাশ্মীর রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাসে বেলা ১০ টায় রওনা হয়ে প্রথম যেখানে থামলাম অর্থাৎ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রবেশদ্বারে অনুমতিপত্র (permits) পরীক্ষা করানোর জন্য লখনপুর্বে চেক পোস্টে, সেখানে রীতিমত গরম করতে লাগল। একে একে গরম কোট সকলে খুলতে আরম্ভ করলেন। পাঞ্জাবের সীমানা ছাড়িয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের এলাকায় পৌঁছিয়ে মনে এক অচিন্তনীয় আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম। দূরে হিমালয়ের বিভিন্ন শাখা দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেঁষা জম্মু উপত্যকার মধ্য দিয়ে আমাদের বাস ক্রমশঃ গতিতে ছুটল। চারিপাশে সবুজ গাছপালা, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র যেন হরিৎবর্ণের গালিচা ধূসর বর্ণের পাহাড়ের বর্ডার দেওয়া। বাংলাদেশের অনেক গাছপালা চোখে পড়ল। রাস্তার উভয়পার্শ্ব কাশ্মীরের সীমানা সারি যেন চামর ছলিয়ে আমাদের মতো অতিথিদের অভ্যর্থনা করছে। পাঠানকোটে থেকে জম্মু শহর পর্যন্ত ৫৭ মাইল একরকম সমতল বললেই হয়। জম্মুতে পৌঁছতে আমাদের বেলা প্রায় ২টা হল। এইখানেই মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করা গেল টুরিষ্ট সেন্টারে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকার এইরূপ টুরিষ্ট সেন্টার জায়গায় জায়গায় স্থাপন করেছেন টুরিষ্ট বা ভ্রমণার্থীদের সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখার জন্য। বলতে ভুলে গিয়েছি, পাঠানকোটে ট্রেন থেকে নামতেই আমাদের পরিচয় পেয়ে সেখানকার টুরিষ্ট অফিসার সদর সঞ্চর্না জানিয়ে তাঁদের কেন্দ্রে নিয়ে যান, বাসে আসনের ব্যবস্থা করেন এবং ২৫০ মাইল পথে যেতে রাত্রি হয়ে গেলে মধ্যপথে ডাকবাংলোর আমাদের রাত্রিবাসেরও ব্যবস্থা করে দেন। তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আমরা অবশ্য টেলিগ্রাম করে খবর দিয়ে রেখেছিলাম কলিকাতা থেকে রওনা হবার আগেই। জম্মুতে ভ্রমণার্থীদের কেন্দ্রে থাকবার ও খাবার ভাল ব্যবস্থা আছে, ভাল হোটেলের জায়গাই ব্যবস্থা। জম্মুতে বহু হিন্দু আছেন, হিন্দু মন্দিরও দেখা গেল। কাশ্মীরে কিন্তু বিপরীত। জম্মু আসার পথে আমরা পাঞ্জাবের রাবি নদীর বাঁধ ও সেচ খাল দেখলাম। দূরে পাকিস্তানের

সীমানা দেখলাম। নদীর জলের মুখ বন্ধ করে দিয়ে খাল দিয়ে জলধারা পরিবর্তিত করার ফলেই নাকি পাকিস্তানের সহিত 'খালের জলের বিরোধ' নামে খ্যাত বিরোধের সৃষ্টি। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা জম্মু ত্যাগ করে রওনা হলাম কাশ্মীর অভিমুখে। ড্রাইভার বললেন পথে সন্ধ্যা হলে প্রথমে যেখানে ডাকবাংলো পাওয়া যাবে সেইখানেই রাত্রিবাস করা হবে। ভ্রমণার্থীর ভীড় বেশ হয়েছে, তাই যাদের বাস আগে পৌঁছুবে তারাই আগে ডাকবাংলো দখল করবে। এই অপরিচিত, নির্জন, নির্বাকব হুর্গমস্থানে দারুণ শীতের মধ্যে রাত্রি যদি আশ্রয় না মিলে তাহলে কি উপায় হবে এই কথা ভেবে আমরা শিউরে উঠলাম। কুদে ডাকবাংলোর স্থানাভাব। তার পরবর্তী ডাকবাংলো যে স্থানে তার নাম বটোটি। জম্মু পর থেকে সমতল ছেড়ে বাস পাহাড়ের আঁকাবাঁকা সর্পিলা পথে ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল এবং উঠতে উঠতে সাড়ে ছয় হাজার ফুট উচ্চ কুদে সন্ধ্যায় যখন পৌঁছুল তখন বেশ শীত লাগতে লাগল। কুদের উচ্চতা দার্জিলিংএর সমান। এই খানেই কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী সেখ আবহুলা বন্দী আছেন। কুদ থেকে বটোটি হয়ে বানিহাল গিরিবন্থ অতিক্রম করে তবে কাশ্মীর উপত্যকায় পৌঁছাতে হয়। জম্মু থেকে বানিহাল পর্যন্ত পথ যেমন হুর্গম ও ভয়ঙ্কর, তেমনই সুন্দর। মেয়েদের মাথার কাঁটার জায় সর্পিলা পথ বারে বারে অতিক্রম করতে হয় এবং একধারে স্থাপন-সঙ্গুল ভঙ্গসাকীর্ণ পর্বতমালা এবং অপরাধারে অতল গহ্বর—এরই মাক্ধান দিয়ে বাস ছুটে চলেছে দূরে বহুদূরে। লোকালয়শূন্য জনহীন দীর্ঘপথেই বেশী। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে যত্নে ভয়কে তুচ্ছ করে ভয়ঙ্কর ও ভীষণের ভিতরে যাত্রা করার মধ্যেও আনন্দ আছে। একেই ইংরাজীতে বলে Adventure বা দুঃসাহসিক যাত্রা। তবে দূরে সূর্য্যকরোজ্জ্বল তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলির অপূর্ণ শোভা, মাঝে মাঝে কোথায়ও নিকরের কলগান, কোথায়ও পার্বত্য নদীগুলির উদামতা, পাহাড়ের বক চিহ্নে সাগরের উদ্দেশে নদীর এই অভিসার মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। এই পথেই পাঞ্জাবের শতদ্রু (রাবি) পড়ছে, তারপর বানিহালের পথে আমরা চেনাব বা চন্দ্রভাগা নদীকে এক গভীরতম প্রদেশে প্রবাহিত দেখলাম যে, উহার জল নীল বলে প্রতিভাত হল। এদেশের লোক এইরূপ এক জায়গার নাম 'কালাপানি' দিয়েছে। অসংখ্য নদীনালায় এই দীর্ঘপথে পুণ্ডের সংখ্যাও কম নহে। বানিহালের আগেই বটোটিে আমরা সন্ধ্যায় সময় পৌঁছলাম। এই জায়গাটা কুদের পরে এবং কুদের চেয়েও কিছুটা নীচে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চে। এখানেও অত্যধিক শীত। শীতের প্রচণ্ডতা একটু অনুমান করা যাবে আমাদের সঙ্গীদের রাত্র শরনকালে লেপের মধ্যে জামাকাপড়ের হিসাব পেলে। প্রকাশ, বন্ধুবর অজিত শোবার সময় গায়ে সূতিগেজি, সোয়েটার, গরম কোট, গরম প্যাঁট, গরম মোজা, এবং বিরাট অলস্টারও লেপের নীচে পরে ছিলেন। আরও দুই একজন এরই রকমের। এখানকার শীতের সঙ্গে শীতকালে দার্জিলিংএর শীতের তুলনা করা চলে। এরূপ প্রচণ্ড শীত কিন্তু কাশ্মীর ভ্রমণের কোথায়ও এমন কি তুষার-রাজ্য খিলামার্গেও পাইনি।

বটোটিে রাত্রিবাসের পর ভোরে বাসে, চেপে আমরা রওনা দিলাম। বটোটি ডাকবাংলোটি পাহাড়ের গায়ে। এখানকার

প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম। এখান থেকেই রামধন নামক যন্ত্রবিভাগ আরম্ভ। কিছুদূর অগ্রসর হতেই ডালিমগাঁছের সারি দেখা গেল। আগেই বলেছি, কুম থেকে বটোটি হয়ে বানিহাল পর্যন্ত পথটি যেমন ভয়াবহ তেমনই সুন্দর। বানিহাল সমগ্র পথের মধ্যে উচ্চতম স্থান। প্রায় নয় হাজার ফুট অর্থাৎ দার্জিলিংয়ের যুয়ের চেয়েও উঁচু। বানিহালে একটি টানেল বা সুড়ঙ্গপথ আছে। এই অঞ্চলে ভূবারপাতের কলে পথ বাতে রুদ্ধ হয়ে না যায়, তার জন্য অত্যধিক ভূবারপাতের এলাকায় মাঝে মাঝে রাস্তার উপর ঢালা তুলে দেওয়া হয়েছে এমন করে, যাতে ভূবার ঢাল ঢাল বেয়ে রাস্তায় না পড়ে থাকে পড়ে। এখানে একটি নূতন টানেল বা সুড়ঙ্গপথ পাহাড় কেটে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে তৈরী করা হচ্ছে দেখলাম। বিরাট বিরাট বহুপাতি ও সাজসরঞ্জাম পড়ে রয়েছে, কুদে রেল-লাইন বসানো হয়েছে পাথর কেটে কেটে ছোট ছোট রেলে বয়ে আনার জন্য। শুন্দাম, জাৰাণ ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে এই সুড়ঙ্গপথ নির্মিত হচ্ছে। একটি বাওয়ার ও আর একটি আসার জন্য দুইটি আপ ও ডাউন পথ। এই নির্মাণমান টানেলের নাম দেওয়া হয়েছে 'জওহর টানেল'। এই টানেল সমাপ্ত হলে ২০ মাইল পথ সংক্ষেপ হবে জানা গেল। এই সংক্ষিপ্ত পথে বর্তমান পথের স্তায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাওয়া যাবে কিনা জানি না। পথ তো আরও সংক্ষেপ করা যায়, যদি বিমানে পাঠানকোট থেকে জীনগরে যাওয়া যায়। এতে শুধু পথ নয়, সময়ও সংক্ষেপ হয়। কিন্তু দুর্গম পথে চলার দুঃসাহসিকতার (Adventure) যে আনন্দ, শিখরের পর শিখরে আরোহণ এবং শুভ্রশীর্ষ ভূবার-কিরীট ও রক্তশোভা স্বর্ণধার নয়নলোভা সৌন্দর্যের সমারোহ দর্শনে যে তৃপ্তি, তা বিমানে গেলে মিলে কিনা সন্দেহ। এ যেন "শিখরের পর শিখরে ছুটিব, কুধরের পর কুধরে লুটিব"....। বানিহাল থেকে আমরা ক্রমশঃ পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামতে আরম্ভ করলাম। এর পর থেকে কাশ্মীর উপত্যকা আরম্ভ হল। সমতল ভূমি উপত্যকা থেকে ক্রমশঃ উপরে ১০০০ নয় হাজার ফুট উচ্চ উঠে আবার নামতে নামতে কাশ্মীর উপত্যকার সমতলভূমিতে জীনগরে চলেছি। এ যেন See-Saw খেলা। আমাদের বাস যেন উঁচু-নীচু এই পথে চলতে চলতে ক্লাস্ত হয়ে কঁাস কঁাস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলতে লাগল। ডিজেল-চালিত এই বিশেষ ধরনের বাসে নাকি মাঝে মাঝে হাওয়া ছাড়ার কঁাস কঁাস করে শব্দ হয় এইরূপ শুনলাম। বেলা ১টার আমরা কাজীগঞ্জ নামক জায়গায় পৌঁছলাম। কাজীগঞ্জ সমুদ্রতট থেকে ৫২০০ ফুট। এইখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর উপত্যকা শুরু। এখানে ডাকবাংলোর বসে মধ্যাহ্নভোজন সন্ধ্যা করা গেল। রাস্তার ধারে পাঞ্জাবী হোটেলে অর্ডার দেওয়া ১টি ও মাংস ভাজাতাড়ি খেয়ে লওয়া গেল। হোটেল যেমন নোংরা, রাস্তাও তেমনই ধারাপ। এখানে গেয়ে সেদিন তৃপ্তি হল না। এখানে ধর্ম্মীর ইচ্ছা আমাদের আদৌ ছিল না। ডাইভার আমাদের নামতে বললেন এখানে Check post আছে, check হয় এই কথা বলে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দেখলাম এখানে check হল না এবং ডাইভারের নিজের কোন দরকার ছিল বলে আমাদের জিনি ধারা দিয়েছেন। পরে ভাঙা গেল আমাদের অর্ধেক দরালু

বন্ধু নয়নদার কাছে ডাইভার খাবার জন্য কয়েকটি টাকা নিয়েছেন। আমাদের আহাৰাদির পরেও অনেকক্ষণ ডাইভারের যখন কোম্পানী পাওয়া গেল না, তখন অনেকে প্রমাদ গণলেন। ডাইভার আসলে কি খেতে গেছেন সেই চিন্তা সকলকে বিব্রত করতে লাগল। কারণ পথ বড় দুর্গম, কোন বিশেষ পানীয়ের প্রভাবে আমাদের বিপদ না হয়, এই কথাই সকলের মুখে মুখে। তবে যাবার সময়কার এই ডাইভারটি ছিলেন যে অত্যন্ত দক্ষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইবার পথটুকু সবটাই সমতলে, তাই জীনগরে পৌঁছতে আমাদের যত্নাখানেকের বেশি লাগল না; যদিও ডাইভার মহাপুরুষ জীনগরে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন করার কথা বললে তিনি বলেছিলেন যত্না ছুই লাগবে অর্থাৎ ৪টা বাজবে জীনগরে পৌঁছতে। দেখা গেল ১টার সময় কাজীগঞ্জে না থেমে সোজা জীনগরে গেলে দুই জোর ২টা বাজতো। আমরা কাজীগঞ্জ থেকে ২টার বেয়িজে ৩টার মধ্যে জীনগরে পৌঁছলাম অর্থাৎ আমাদের journey's end বা ভ্রমণের শেষ সীমায় এলাম। কলিকাতা থেকে জীনগরে ট্রেনে ও বাসে মোট ১৪৭০ মাইল দীর্ঘ পথ আমরা অতিক্রম করলাম। ২৬৭ মাইল পথ এবং তাও পার্বত্য পথ বাসে অতিক্রম করাও আমাদের জীবনে অভূতপূর্ব ঘটনা। দুইদিন ধরে বাসে চলাও ইহাই প্রথম। এতকালে আমরা আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত খাস কাশ্মীরে পৌঁছলাম। বানিহাল গিরি-পথ কাশ্মীর উপত্যকার প্রবেশদ্বার, একথা পূর্বেই বলেছি। ৮০ মাইল দীর্ঘ এবং ২৫ মাইল প্রস্থ এই কাশ্মীর উপত্যকাই তার অপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে, তার নদী, নিরঝরিতী, হ্রদ, ভূবারশিখর নিয়ে, তার মনোরম মোগল উদ্যানগুলি নিয়ে পারস্য কবি বর্ণিত 'ভূবার' নাম সার্থক করেছে। এই সুবাসময়ী কাশ্মীরভূমি এশিয়ার, এমনকি বোধহয় জগতে অতুলনীয়। ইহারই কোলে কয়েকদিন অবস্থান যে কোন ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ বস্তু। কাশ্মীর উপত্যকা চারিদিকে পর্যন্ত বেষ্টিত, অসংখ্য ভূবারগুড় শৈলশিখর রৌত্রকিরণে বলমূল করে' নয়ন মুগ্ধ করে। বিলাম নদী জীনগরের চরণ চূষন করে কল কল নিনাদে ছুটে চলেছে পাহাড় উপত্যকা অতিক্রম করে সাগরের বুকে মিলিত হবার জন্য। বিলামের উত্তরতীরে জীনগর—কাশ্মীরের রাজধানী—অবস্থিত। ১টি সেতু সহরের দুই তীরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছে। এছাড়া জীনগরের আর একদিকে ৫ মাইল লম্বা ও ২।০ মাইল চওড়া পর্বতবেষ্টিত মনোরম ডাল হ্রদ। এই হ্রদে সারি সারি নৌকা সজ্জিত রয়েছে। এই নৌকাগুলির মধ্যেই এক একটি গৃহ—কাককাঁধাখচিত শয়নকক্ষ, ডইং রুম, ডাইনিং রুম, বাথরুম ইত্যাদি। এই গৃহ-নৌকা (House-boat)তে বাস করা এখানকার একটি বৈশিষ্ট্য। এই সকল কারণে জীনগরকে প্রাচ্যের ভেনিস নগরী (Venice of the East) বলা হইয়া থাকে। নৌকা-গৃহ থেকে দূরে ধ্যানগভীর হিমালয় দর্শন করলে মনে বিচিহ্ন ভাবের উদয় হয়। কত কবি হিমালয় দর্শনে কত কাব্যরচনা করেছেন। মহাকবি কালিদাস একে 'দেবতান্বা হিমালয়' বলে অভিহিত করেছেন। এই হিমালয় দর্শনে কবিত্বক রবীন্দ্রনাথ হিমালয়কে তপোমূর্তিবলে অভিহিত করে বলেছেন—

"ভূমি আছ হিমালয় ভারতের অনন্তসংকীর্ণ তপস্তায় মত্তো।"

কবি-হিমালয়ের শিখরের পর শিখরের দুঃস্বপ্ন ভঙ্গ দেখেই হইল

হোমশিখার অস্থায়ী প্রেসশিখার পরিণত হয়েছে বলে কখনা বাব না, হোটলে বাব। আমরা তো এমন পণ্য।

একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমসি-আহতি

ভাষাচার্য মহাবর্জী প্রকাশিতে করিছে আকৃতি,
সেই বহু-বাণী আজি অচল প্রেসশিখারূপে
শৃঙ্খ শৃঙ্খ কোন মন্ত উচ্ছসিছে মেঘধুম্রুপে।

হুইধারে ঋজু ঋজু পপলাব শ্রী শোভিত প্রশস্ত বাজপথ দিয়ে
আমাদের বাস এসে পৌঁছুল কাশ্মীরের রাজধানী জীনগরের কেন্দ্রস্থল
ভ্রমণার্থীদের বিশ্রামকেন্দ্র (Tourists' Reception Centre)।
বিরাট অটালিকা, বিরাট অফিস—সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—
ভ্রমণার্থীদের বিশ্রামের মনোরম স্থান। আমরা পৌঁছুতে না
পৌঁছুতে কাশ্মীর সরকারের ডিরেক্টর অব টুরিজম ও এসিষ্ট্যান্ট
ডিরেক্টর আমাদের সাদর স্বাগত জানালেন এবং আমাদের তাঁহার
কি সাহায্য করতে পারেন জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তাঁদের
ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম যে, আমাদের থাকার ব্যবস্থা আমাদের
বন্ধুগণ ইতোমধ্যেই ঠিক করে রেখেছেন গৃহ-নৌকায় বা House-
boatএ এবং আমরা বন্ধুদের সঙ্গে একত্র সপরিবারে থাকবো।
আমি সাধারণতঃ এইরূপ ভ্রমণের সময় আত্মপরিচয় দিই না,
কারণ, পরিচয়হীন একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে ভ্রমণে বের
না হলে ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ অনেকখানি কুণ্ণ হয় এবং
জনসাগরে একান্ত হয়ে না বেড়ালে অনেককিছু জানা ও শেখা
যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অর্থাৎ ছাত্রলিটের ভাষায় Citizen
of the World বা বিশ্বনাগরিক হওয়ার আনন্দ পাওয়া যায়
না। কি করে কাশ্মীরের Tourist Directorate আমাদের
পরিচয় পেয়ে শুধু বিশেষ আদর আপ্যায়নই করলেন না, বাস থেকে
নাম্বার সঙ্গে সঙ্গে টুরিষ্ট অফিসের প্রাঙ্গণে সত্ত আরোজিত
কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসত যুবরাজ করণ সিং এর সম্মানার্থে এক
পার্টিতেও নিমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন। চারদিন ট্রেন ও বাসে
১২০০ মাইল ভ্রমণ করে আমরা তখন অভ্যস্ত ক্লান্ত। যাপ
করবেন বলে পাসিয়ে বাঁচলাম। অবশ্য ধরা যখন পড়লাম, ইচ্ছা
ছিল পরে একবার সৌভাগ্যমূলক সাক্ষাৎ করে আসব যুবরাজ ও প্রধান
মন্ত্রী বন্ধু সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু এমন তড়িৎ-গতিতে ভ্রমণ সারতে
হল যে, সময়ই পেলাম না।

বাসকে অতিরিক্ত কিছু ভাড়া দিয়ে আমরা মালপত্র নিয়ে
ভালগেট রোড দিয়ে আমাদের অস্থায়ী নৌকাবাসের দিকে গেলাম।
বড় নৌকাগৃহে সহর থেকে বাতায়াত করতে হবে একপ্রকার ছোট
নৌকা করে। এগুলোকে এখানে বলে 'শিকারা'। বতবার
পারাপার করতে হবে ততবার এর জন্ত পরসাতো দিতেই হবে,
কিন্তু সব চেয়ে বেশি অসুবিধা বাতায়াতে সময় বেশি লাগবে।
ইচ্ছা হল খণ করে সহরে চলে গেলাম, কেনাকাটা করলাম বা
সহরে বেড়ালাম, তা হওয়ার কিছু অসুবিধা আছে। এইজন্য
আমাদের মধ্যে অনেকে নৌকাগৃহে বাস করতে আপত্তি জানালেন।
কলিকাতা চইতে জর্টনক বন্ধু মারকত হাউসবোট ঠিক করা হয়েছে,
মালপত্র নিয়ে লেকের তীরে এসেও পড়েছি। শরীর এত ক্লান্ত ও
অবসন্ন যে, কোথাও একটু স্থিতি হতে পারলে বাঁচি, এমন সময়ে কেহ
কখন অর্থাৎ কোন কোন মহিলা সঙ্গিনী থেকে বসলেন,—হাউসবোট

সকলেরই কক্ষ। এমন সময় হুইদলের পক্ষ থেকে হুজন উগেদী
ওরুণ প্রতিনিধি 'শিকারা'র করে নক্ষত্রবেগে হাউসবোট বাচাই করে
দেখতে বেরিয়ে পড়লেন। এই কথা বোঝা করে গেলেন যে, যদি
হাউস-বোট বাসের উপযোগী না হয়, তাহলে আমরা অন্য
যাব মচেন এমন সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করার সুযোগ
ছাড়ব না, কারণ এখানে বাস করার একটা বিশেষ মূল্য
আছে, পারাপারের বতই অসুবিধা থাকুক না কেন। তাঁরা ঘুরে এসে
ঘোষণা করলেন যে, প্রথমে আমাদের জন্ত যে হাউস-বোট নির্দিষ্ট ছিল
সেটা পরীক্ষা করে তাঁরা বাতিল করেছেন এবং অপর একটি সুন্দর
হাউস-বোট তাঁরা নির্বাচিত করেছেন। এক্ষণে ঐধরীর সীমা শেষ
হবার উপক্রম হওয়ার সকলেই বিকল্পিত না করে 'শিকারা'র গিরে
বসলাম। হাউস-বোটে আমাদের সমগ্র দলটি হুইদলে বিভক্ত হয়ে দুটি
ঘর দখল করলেন। ঐরা করিংকর্মা তাঁরা নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত
ভাল ষরটি যে নেবেন, জন্ত কোন বিবেচনা করবেন না, এটা
সহজেই অনুমেয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও চা পানের পরই আমরা
আবার হুই দলে হুখানি শিকারায় বেরিয়ে পড়লাম সহর দেখতে।
প্রথমেই আমরা বিজলী আলোতে লেখা 'নেহেরু পার্ক' শিকারায়
করে গেলাম। পাছাড়ের পটভূমিকায় ডাললেকের তীরে
মনোরম বেড়াবার স্থান এই পার্কটি। এখান থেকে কাশ্মীর
রাজপ্রাসাদ দেখা যায়। এখান থেকে আমরা স্থানীয় বাজারে
গেলাম। বাজারে অল্পক্ষণ ঘুরে আমরা রাত্রে বোটে কিরলাম।

পরদিন সকালে আমরা হুখানি শিকারায় বেরিয়ে পড়লাম 'সহর'
জীনগর দেখতে। প্রথমে আমরা লেকের গলিপথে কুবকদের—
লেকের তীরে সারিবদ্ধ বাড়ীর মধ্য দিয়ে চললাম। যারা ভূমির
মালিক কুবক, তাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। লেকের ধারে ধারে,
কোথাও লেকের মধ্যস্থলে ঘোপের মতো সব ছোট ছোট জমি। এই
জমিতে প্রধানতঃ তার-তরকারির চাষ হয় দেখলাম। কপি, শালগম,
গাজর, লাউ, কুমড়া, লঙ্কা প্রভৃতি শাকসব্জী ইহাদের অর্থাৎ লেকের
ধারের চাষীদের প্রধান উপজীবিকা। এই সব শাকসব্জী ছোট ছোট
নৌকায় করে এরা হাউস-বোটে প্রিয় করে ও সহরের বাজারে চালান
দেয়। এই সব সজীচাষীরা কত পরিশ্রমী তা দেখলে অবাক হতে
হয়। ছোট ছোট নৌকার ছোট ছোট ছেলে, কখনও মেয়েরা
লেকের পাঁক ও পানা বোঝাই করছে আর সেগুলি নিয়ে
গিরে লেকের ধারে ধারে চাষের জমিতে সার হিসেবে দিচ্ছে।
এই পাঁক ও পানা জমির ধারে ধারে জড় করে স্থানে স্থানে
লেক বুজিয়ে কেলে জমি বাড়াবারও অপচেষ্টা হচ্ছে। জনলয়
এই চাষীরা শাকসব্জী বিক্রী করে এবং নিজেদের শ্রীতকালের সকলের
জন্ত কিছু কিছু শাকসব্জী পূর্ব থেকে শুকিয়ে রাখে। কারণ শ্রীত
সমাগমে তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেলে এরা চাষের কাজকর্ম
করতে পারে না এবং খাদ্য সামগ্রীরও অভাব হয়। তাছাড়া
কাশ্মীরী লঙ্কা বাইরে রপ্তানি করাও এদের একটা প্রধান ব্যবসা।
এই লঙ্কার রঙ লাল এবং এতে তরিতরকারী লাল রঙে রঞ্জিত হয়
বটে তবে স্বাদ নেই। এইজন্য নাকি কাশ্মীরী লঙ্কার কদর খুব।
কোন কোন চাষীর বাড়ীতে লঙ্কা মালার মতো করে ঝলছে, কাহারও
কাহারও হান লঙ্কার শুপে লাল হয়ে গেছে দেখা গেল। [ভ্রমণ:

বিপ্লবের সন্ধানে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যে সময়ে "শ্রীভাওতা" লিখি, ঐ সময়েই আর দুজন তরুণ লেখক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। একজন কবিরূপে, আর একজন রাজনৈতিক প্রাবন্ধিকরূপে। প্রথম জন হচ্ছেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (বর্তমান বুগান্ডার সম্পাদক)—তার "বিপ্লবী-নারিকা" ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়, এবং হঠাৎ একজন নতুন ভাল কবির আবির্ভাব কলকাতার সাহিত্যের বাজারকে সচকিত করে তোলে।

দ্বিতীয় জন শিবরাম চক্রবর্তী (বর্তমানে শিশু-সাহিত্য ও রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত)। কৃষ্ণবিরোধী প্রচারণার অত্যন্ত প্রধান আঙুল পশ্চিমবঙ্গের 'অরবিন্দ-আশ্রম' থেকে নলিনী গুপ্তের "বলশেভিকী" নামক এক বই কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে শিবরাম এক প্রবন্ধ লেখেন "মক্কা বনাম পশ্চিমবঙ্গ"। একজন তরুণ লেখকের লেখনী থেকে এমন জোরালো যুক্তিপূর্ণ প্রাঞ্জল লেখা বেরতে পারে দেখে যেন লোকের তাক লেগে গিয়েছিল।

কিছু ঘটনাচক্রের আবর্তনে কবি হলেন বিরাট সাংবাদিক, আর প্রাবন্ধিক হলেন হাশু-কৌতুকে মাতোয়ারা। আমার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, শিবরাম রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে সরে না গেলে বিবেকানন্দেই পর্যায়ের সাংবাদিক হতে পারতেন। কিন্তু তা না হয়ে হস্ত ভালই হয়েছে।

বই হোক, চট্টগ্রাম অঙ্গাগার লুণ্ঠনের পর থেকেই পলাতকদের ধরার জন্তে পুলিশ যে সন্ত্রাসের রাজত্ব করেছিল,—তারই সঙ্গে চলেছিল চট্টগ্রাম থেকে মিলিটারী বাহিনীর গ্রামাঞ্চলে রুটমাচ। তারা এক একটা গ্রামে যায়, এক একটা কুলে চুকে শিক্ষকদের মটান ঠেঙ্গাতে শুরু করে, জোর করে লোকের বাড়ী চুকে ছাগল-যুগী কেড়ে এনে ধায়, এমনি করে গ্রামের পর গ্রামে চলে রুটমাচ। তখন গবর্নর অ্যাণ্ডারসনের রাজত্ব,—আর্যাল্যাণ্ডে সিনফিন কমন্সের (Black and Tan) সন্ত্রাসবাদী শাসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বাংলার এসেছেন। আজও লোকে অ্যাণ্ডারসনী শাসন বলে সরকারী সন্ত্রাসবাদী শাসনের নামোল্লেখ করে থাকে।

সুতরাং বিপ্লবীদের সাহেব-দারার প্রোগ্রামও এপিয়ে চলেছিল সমান্তরালভাবে। হুগলী-বিজ্ঞানসন্নিহিত কংগ্রেসকর্মী সিরাজুল হক (হামিডুল হকের ভাই) ৩১ সালে কলকাতার পটুয়াটোলা লেনে এক সাধানের কারখানা খুলে বসেছিল এবং ডক এলাকার

জাহাজের খালাসীদের সঙ্গে গুপ্ত বোগাযোগ করে' রিজলভার সংগ্রহের চেষ্টা করতো। আত্মশক্তি লাইব্রেরীতেও সে আসতো—আমার সঙ্গে বিজ্ঞানসন্নিহিত আলোচনা এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমি তার কাছ থেকে দুটো ভাল "গুপ্ত" কিনেছিলুম, এক লাইব্রেরীতেই বই এর দুটো সারি বাগিলের মাঝে লুকিয়ে রেখেছিলুম মজবুদ Walking Stick—বাঁটের কাছের একটা পিনের মাথাটা চাপ দিলে ভিতর থেকে সফ লম্বা কিরীচ বেরিয়ে আসে—তা দিয়ে অতি সহজেই মানুষের দেহকে ফুঁড়ে ভেদ করে দেওয়া যায়। সে দুটো অস্ত্র সরাবার আগেই পুলিশ আসে আমাকে গ্রেপ্তার করতে। পরে এক রিজলভার সহ ধরা পড়ে' সিরাজুল জেল হয়েছিল।

পুলিস অফিসাররা বই খাঁটিতে সুরক্ষ করেই আমি একটু রাগতভাবে বললুম,—আপনারা বন্দুন, আমি সবই আপনাদের দেখাবো,—আর তা না হলে আমি এই বললুম, আপনারা সব লুণ্ঠন করুন। সুতরাং তাঁরাই বসতে রাজি হলেন—আমি পটাপটা এক দিক থেকে এক এক গোছা বই নামিয়ে তাঁদের দেখিয়ে আবার বখাওয়ানে রেখে দিই। খানিকক্ষণ এমনি চলার পর "আসল" সেলকে হাত পড়লো। দুটো লম্বা তাক বোঝাই দু'সারি করে' চার সারি একই রকমের বাগিল—তারই এক তাকে আহে গুপ্ত।

আমি এক দিক থেকে একটা বাগিল টেনে কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দেখালুম—উপেনদার "Memoirs of a revolutionary" বই। নিরীহ তাকটার মাঝখান থেকে আর একটা বাগিল, এক আর এক কিনারার আর একটা বাগিল টেনে দেখালুম। বললুম উপেনদার "নির্বাসিতের আত্মকথা" সব বিক্রী হয়ে গেছে,—ইংরাজী বইটা কিছু বিক্রী হওয়ার পর সবই রয়ে গেছে। অফিসাররা বললেন—থাক থাক আর দেখার দরকার নেই।

যদি আমার কোন জিনিসপত্র পাওয়া গেল না দেখে আট-বি অফিসার বললেন,—আপনার জিনিসপত্র কৈ? আমি কাঁচ বার করে বললুম—কিছুই নেই। তিনি বললেন,—কাপড়-চোপড়? আমি পকেট থেকে ডাইং ক্লিনিং-এর এক বসিধ বার করে দেখিয়ে বললুম—এক সেট এই, আর এক সেট দেখছেন আজ। তিনি বললেন, গামছা? আমি জজ্ঞার চংরে বললুম, দরকার হয় না, কমান্ডেই চলে,—কারণ আমি মানই করি না। তিনি বললেন, বিছানা? আমি বললুম, নেই,—কাউটারে শুই, হাত

বা বই মাথায় দিয়ে। তিনি বললেন,—সেবারে যে একটা বড় ঠাঁক দেখেছিলুম? আমি আবার দাঁত বার করে বললুম,—সেটাকে বেচে খেয়েছি।

এততেও ওদের কোন সন্দেহ হয়নি,—কারণ ওরা বেশ জানতো, আত্মশক্তি লাইব্রেরী ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয় নেই।

বাই হোক,—গুপ্তির কথা মোটাদার কাছেও গোপন করেছিলুম—সেজন্মে একটা হুশিচন্ডা নিয়েই জেলে চললুম। বাওয়ার সময় লাইব্রেরীর চাবিটা রেখে গেলুম শ্রামাচরণ দে ঠাঁটের কোথায় আর্টপ্রেসের মালিক অতুল ঘোষের কাছে (বশোরের লোক এবং ছাত্র নেতা)—আর তাঁর আলোয়ান খানা চেয়ে নিলুম—বললুম, মোটাদার কাছে বলবেন, তিনি জেলে আমার কাগজ-চোপড় দিয়ে আসবেন এবং আপনার আলোয়ান নিয়ে আসবেন। আশা করেছিলুম, মোটাদাকে গুপ্তির খবরটা জানিয়ে দিতে পারবো—কিন্তু তার কোনো সুরোগ পাইনি।

আমি দশটার সময় লাইব্রেরী খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পুজি এসেছিল। মোটাদা একটু দেরীতে আসতেন। এক হিসাবে ভালই হয়েছিল। একা বলে আমি ম্যানেজ করেছিলুম ভালই।

আমাকে প্রথমে ইলিদিয়াম রোতে S B Office নিয়ে গেল। ভিতরের লম্বা বারান্দায় কয়েকখানা টেবিল-চেয়ার ছড়ানো আছে। এক টেবিলে এক ছোকরা বসে আছে—আর এক টেবিলে আমাকে বসালে। এক অফিসার আমার পাশ দিয়ে বেতে বেতে ছোকরাকে দেখিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু গুঁহুসি হেসে জিজ্ঞাসা করলে, চেনেন নাকি ছোকরাকে?—আপনাদেরই দেশের। আমি বললুম, কোথায় বাড়ী? তিনি বললেন, বিক্রমপুরেই। আমি বধাশাস্ত্র “চিনিনা” বলে চেপে গেলুম। বুঝলুম,—অফিসার জানেন, আমি বিক্রমপুরের লোক।—মন্দ নয়।

একটু পরে এক সিনিয়র ইনস্পেক্টর সুরেন ঘোষ এসে আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলেন এবং প্রথমেই ভিনতা সুরুর করলেন,—হুঃ—হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল! আমি বললুম, কি হল? তিনি বললেন, সেবার গিরিজাবাবুই কিছু করতে পারলেন না,—আর এবার আমাকে পাঠিয়েছে, আপনাকে tackle করতে।

মনে করলুম, যে বকম কোলানো কথা বলছেন,—হয়ত এখনই ল্যাং মারবেন। কিন্তু দেখলুম,—তিনি কথাটা বলেছেন আন্তরিক ভাবেই। কাগজ কলম নিয়ে বললেন, এখন বলুন তো, আপনার দেশ কোথায়? আমি বললুম, সবইতো আপনাদের সেরেস্তায় আছে। তিনি বললেন, তা হলেও আমাকে লিখতে হবে—duty—কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখা গেল কলমে কালি নেই। আমার কলমটা চাইলেন,—দেখা গেল, তাতেও কালি নেই। হুস্তোর বলে পেলিলেই লিখতে সুরুর করলেন,—বললেন, পরে কালিতে লিখে নোব'খন। এরই মধ্যে একজন অফিসার এসে তাগাদা দিলেন hurry up—van ready.

দেশ কোথায়, বাপের নাম কি, বর্তমান ঠিকানা, কি পেশা ইত্যাদি লেখা হল। পূর্বোক্ত অফিসার আর একবার তাগাদা দিয়ে বললেন, তিনি আর দেরী করতে পারেন না। সুরেনবাবু লেখা বন্ধ করে বললেন,—মরুকগে বাবু—আপনি এইখানেই একটা বই করে দিন। আমিও সটকাট করে একটা বই করে

দিয়ে প্রিন্ট জ্যানে গিয়ে উঠলুম। দেখলুম, আর কয়েকজন অচেনা বাড়ী।

জ্যান প্রেসিডেন্সি জেলের কটকে পৌঁছালো। সন্ধ্যা হয় হয়। ঘরে ঘরে বিজলী বাতী জ্বলেছে, বাইরে দিনের আলোর রেখা আছে। গেটের ভিতরে ডিড় জমেছে—“বদেশী বাবু” এসেছেন দলের লোকদের receive করতে।

সুরেশ দাস, হরিদা এবং ভূপতিলা এসেছেন,—মুন্সীপঞ্জের দলের কয়েকজন ছেলেও এসেছে, অস্ত্র দলেরও কিছু লোক আছে। তখন রোজই সন্ধ্যায় এক গাড়ী করে নতুন মাল আমদানী হয়। বিভিন্ন দলের লোক নিজ নিজ দলের লোকদের ঘরে নিয়ে বার নিজেদের আড্ডায়—বারা বেশী মাল পায়, তাদের ভারি কুর্তি, আর বারা কিছু পায় না, তারা মুখ চূপ করে কিয়ে যায়। অতুত মনোবুত্তি—যেন বারা বত বেশী ধরা পড়ে, তারাই ততবড় পাটি!

ভূপতিলা পরাদের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন,—আমাকে দেখে পিছিয়ে গিয়ে হরিদাকে সংবাদ দিলেন,—নারাণ এসেছে! তারপর একটু পরামর্শ করে তিনজনে কেটে পড়লেন। আমি ভেতরে ঢুকতেই মুন্সীপঞ্জের দল—বানল, মাখন, বীরেন কুশারী (জিতেন কুশারীর ভাই) প্রকৃতি আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো,—তাদের কাছে থাকতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করে জানলুম অহুকুলদাও আছেন, বললুম, আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারপর ছির করবো। ওরা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। আমি তাঁকে চূপি চূপি বললুম, আপনার কাছে থাকবো খাট আনান।

তারপর মুন্সীপঞ্জের ছেলেরা আমাকে তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে জেদ ধরে বসলো, তাদের সঙ্গেই থাকতে হবে। কাজেই শেষ পর্যন্ত বললুম, আমি অহুকুলদাকে বলে এসেছি, ওখানেই থাকবো। তার বলে, আমরা অহুকুলদাকে গিয়ে বলে আসছি। আমি বললুম, তাই চেয়ে ভোররা সকলেও আমার সঙ্গে চল, অহুকুলদার কাছে থাকবো। তারা বললে, আমাদের অস্ত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেট সম্ভব নয়, কারণ সে হবে একটা রীতিমত ওলটপালটের ব্যাপার শেষ পর্যন্ত তারা বাপ মানলো। বললে, দাদারা যে আমাদেরই খুব পছন্দ করেন, তা নয়।

ব্যাপার হচ্ছে,—জেলে ভেটিনিউদের ভিতরে “কিচেন” বা পুখ ভিতরে “হাড়া” বড়ল বৃগান্তর পাটি ও তাদের সহযোগীরা—তারা যে ওয়ার্ডে থাকে, সেটার নাম “সাতখানা”—দাদারা ও তাঁদের ডেলারা, মুন্সীপঞ্জের ছেলেরা, ক্রীসংঘের অনিল দার প্রভৃতি থাকেন। অহুকুলদার পাটির ওয়ার্ড পৃথক। আর “বার্ড কিচেন” হচ্ছে পাঁচশিশেলী—তার মধ্যে একদল কমিউনিষ্ট বা কমিউনিষ্টিক,—কিছু বৃগান্তরের “revolt”—কিছু অহুকুলদার “revolt”—২১ জন “চুটকো”—এবং অহুকুলদার মতন ২১ জন “বিশিষ্ট ব্যক্তি। দিনের বেলা ওয়ার্ডের ঘরগুলো খোলা থাকে, সকল সব ঘরে আসা-বাওরা এবং মেলাবেশা করে। রাত ১টার সব ঘরে বরজার-তাল পড়ে।

পরদিন সিকেন্স-বার্ড বেকাছি,—ভূপতিলা এসে বললেন,—দেখ, তোমাকে একটা কথা বলি,—এখানে মুন্সীপঞ্জের দলের

পাশের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে না। আমি বললুম, ল. আপনিও ছেলেদের একট বলে দেবেন,—আমাকে যেন না টায়। এইভাবে এক শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান চুক্তি হয়ে গেল।

তারপর যোজাই দেখি, ২৩ জন করে ডেটিনিউকে ইলিসিয়াম গাঁবে নিয়ে যায়,—৩৪ খণ্ডা বসিয়ে রেখে কিছু গল্পগাছা করে কেবল রে যায়। প্রয়োজনীয় সংবাদ বা হিন্দু সংগ্রহের নতুন প্লান।

একদিন বরিশালের শঙ্কর মঠের আশ্রমদেবীকে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি কিরে এসে নলিনী মজুমদারকে (I B Chief) ক চিঠি লিখে আমাকে দেখাতে এনেছেন। দেখি, চিঠিতে তিনি লিখেছেন,—‘আমি মজুমদার মানি না,—কিন্তু আপনি মানেন। মজুমদারকে, শূন্য যদি আশ্রমকে ধর্মোপদেশ দেয়, তাহলে তার ভিত্তি ভঙ্গ করা বিধেয়। সুতরাং মজুমদারের কথা অনুসারে আপনার ভিত্তি ভঙ্গ করা বিধেয়।’ চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে তিনি বললেন,—‘আমার সঙ্গে ধর্ম-আলোচনা করতে আসে—বেটা শয়তান!’

একদিন হঠাৎ ডাক পড়লো তিনজনের—আমি, হরিদা এবং মর যোব (অতুলদার ভাই)। মোটাদাকে খবর দেওয়ার কোন বিধে করতে না পেরে মনে মনে অনেক ভ্রম-ভ্রমনা করছিলুম,—খন একটা চাল নেওয়ার চেষ্টা করলুম। ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং আধ কি চওড়া একটা কাগজে আশ্রমজক্তি লাইব্রেরীর বইয়ের তালিকালো ভাল করে গুছিয়ে রাখতে লিখলুম—কাগজটাকে কিয়ে হুড়ির মতন করে বা হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর উদ্যায় টিপে নিয়ে গেলুম যদি পাঠার করার কোন সুযোগ জুটে যায়।

সুযোগ জুটে গেল ভালই! পূর্ণদাসের একজন লেকটুরার যেন সাহা এক ছোকরার সঙ্গে তথ্যের করতে গিয়ে I. B. Office-এ বসে আছেন—আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালে সেট ঘরেরই তার এক টেবিলে। হরিদার একবার আড়চোখে সুরেনসার দিকে চেয়ে পাশের ঘরে চুকলেন। আমার অফিসার ভিতরে গেছেন, রজায় আছে এক কমন্টেল পাহারা। খানিকক্ষণ বসে থাকার পর কিসার আগছে না দেখে কনষ্টেবল দরজার বাইরে গিয়ে উকি মেয়ে লিখে,—ঠিক এই অবসরে আমি বা হাতটা সুরেনসার দিকে বাড়িয়ে লিখলুম—তিনিও হাতটা বাড়িয়ে দিলেন—‘হুড়িটা পাশহয়ে গেল—আমি শুধু আস্তে বললুম—‘মোটাদা—আশ্রমজক্তি লাইব্রেরী।’

জলে কিরে এসে তিনি,—হরিদার প্রচার করে দিয়েছেন,—সুরেনসারটা স্পাই হয়ে গেছে। প্রমাণ,—সে প্রোপাগান্ডা না হয়ে I. B. Office-এ বসে আছে! অর্থাৎ কাণ্ড! আমার চিঠি লিখা ঠিক মোটাদার কাছে পৌঁছেছিল,—এবং মোটাদার গুপ্তহুটো পরেছিলেন এবং সরিয়ে ফেলেছিলেন। পরে সুরেনসার কাছে লিখে গল্পটা বলেছিলুম। আজও মাঝে মাঝে পথেঘাটে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে সেই গল্প শ্রবণ করে হাসাহাসি হয়।

বাই হোক, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন জেলে একটা সাড়া পড়ে গেল,—বীণা দাস অ্যাগারসনের ওপর গুলী চাতিয়ে প্রোপাগান্ডা করে এসেছে। চারিদিকে ছুটোছুটি—তাকে দেখবার জন্যে—কিন্তু সে তো চলে গেছে কিম্বা ইয়ার্ডে! আমি ঘবে ঘবে গিয়ে লিখে এলুম—‘আমাদের দলের মেয়ে।’ বড়াই করে বেড়াবার ক্ষেত্রে যাদের মুখ চূড়কে উঠছিলো, তাদের মুখ বন্ধ হল—মুখ দেখে তাদের প্রতি কলোভাবটাও বোঝা গেল।

সাহেব-দারার করনুষ্ঠীর লীক পরিত্যক্ত পাওয়া গেল। বীণাদাস বোধ হয় কমলা দাশগুপ্তার সঙ্গে সঙ্গিত ছিল—বুগার দলেরই মেয়ে। ভালই লাগলো—মনে হল, প্রোপাগান্ডার রক্তমিউশনে এই রকম মেয়েরাই একদিন অচটন ঘটাবে, নেতৃত্ব করবে।

খবর পেলুম, অজিত মৈত্র প্রেসিডেন্সি জেলেই করেদী হয়ে জেল খাটছে—জেলের তাঁতের কারখানার কাজ করছে। কারখানা দেখার অভূহাতে গেলুম। দেখি অজিত করেদী পোষাক পরে সতর্ক বুনছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বাপার কি? সে হাসিমুখে বললে, ১১০ ধারা, ১ বছর। বললুম,—গোয়েন্দা বিভাগের ২৬ নম্বরের দায়েরের।

জেলের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব কারখানা দেখেন,—এবং তাঁর নীচে কাজকর্ম তদারক করে এক একজন করেদী মেট, এক এক বিভাগে। তাঁতঘরের তদারক করেন তখন ব্যারিষ্টার বি. কে. লাহিড়ী—বি ডিভিশন করেদী মেট! তাঁর সঙ্গে আলাপ করলুম। তিনি হুঃখ করে বললেন, ‘যে সব স্বদেশী বাবুদের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দিয়ে ব্যবসারে সাহায্য করেছি, তাঁরা অনেকে রাজকন্বী হয়েছেন,—আর আমিই হয়েছি চোর।’—কথাটা ভাববার মতন।

আমি একখানা সতর্কতার অর্ডার দিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এলুম, অজিত বুন দেবে আমার পছন্দমত ডিজাইন অনুসারে। ৮' X ৫' মাপের চমৎকার মজবুত সতর্ক—ওজন চার সের, লাম বোধহয় লোগছিল ১৪ টাকা। এই উপলক্ষে অনেকদিন কারখানায় যাতায়াত চলেছিল। একখানা ‘নিরেনকরুই বনাম এক’ এবং একখানা ‘ভাঁওতা’ গোপনে আনানোর জন্যে ওয়ার্ডারদের সঙ্গে গল্পসল্প করে ভাব করতুম। একজন জড়াই-কেরতা শিখ এবং একজন হিন্দুস্থানী ওয়ার্ডারের সঙ্গে বন্দোবস্তও করে ফেলেছিলুম।

অমরদার কাছে এক চিঠি লিখে উপেনদার সন্ধান নিলুম একটু কাহন্দা করে। এক প্রকাণ্ড পোস্টকার্ডে বাবা, মা, বৌদি, নিতাইকাকা, ধনুদা (অমরদার পিসতুতো ভাই—ওর বাড়ীতেই থাকেন) এবং তাঁর সঙ্গে বাবার বাপের শুভসংবাদ চেয়ে লিখলুম এবং সকলের শুভসংবাদ পেলুম। বাবার বাপ হচ্ছেন উপেনদা—বাঁকা হচ্ছে শ্রীমান গণেশ—জেলে বেলার তারি শয়তান ছিল বলে, ওর নাম রাখা হয়েছিল বাঁকা—সর্বদা বেকেই আছে!

উপেনদার কাছে বই আছে নিশ্চয়, এবং তাঁর কাছ থেকেই আনানো সহজ,—কারণ কলকাতার তাঁর দেখা পাওয়া সহজ। তখন তিনি কর্পোরেশনের চাকরিতে চুকছেন এবং ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার—কাট রেজিষ্ট্রেশন পদ পেয়ে পার্কসার্কাসের মোড়ের অফিসে বসেন। আমার শিখ ওয়ার্ডার দোস্ত তাঁর কাছে ছানি ঘুরে এক কপি ‘ভাঁওতা’ সংগ্রহ করে এনে দিলে—একদিন রাত বায়োটার পর ডিউটে এসে। হিন্দুস্থানী ওয়ার্ডার দোস্তও ইতিমধ্যেই একদিন রাত্রে এক কপি ‘নিরেনকরুই বনাম এক’ এনে দিয়েছিল অর্থাৎ কারো কাছ থেকে—মনে নেই। বই দুটো বি কে লাহিড়ীকেও পড়তে দিয়েছিলুম। আরো অনেকও পড়েছিল—রীতিমত গোপনে।

আমাদের ‘কিচেন’ তখন দিবাকর পাঠ্য ছিল, চন্দননগরের কালীচরণ ঘোষ (বর্তমানে কমিউনিষ্ট নেতা) ছিলেন। আমি ওয়ার্ডারদের সঙ্গে বড়ায় পর বড়া—বাজেও—কি অর্থাৎ কবি—তিনি জানতে লাইসেন্স। আমি বললুম, আমি আসে ওয়ে

বাড়ীর অবস্থা নিয়ে শুরু করি, তারপর গরীব আর বড়লোকদের জীবন এবং পরে মালিকদের শোষণের কথা পাড়ি। বলি—গরীবের এ গরীবী বুঝতে পারে, যেমন কৃষিয়ার হয়েছে—সবই ওরা বেশ মন দিয়ে শোনে এবং সাং দেয়। কিন্তু বখন বলি কপালের লেখা, ভগবানের বিধান, এইগুলো বর্তমান গরীবদের মাথা থেকে না মুছে বাবে, ততদিন কিছু হবে না,—তখনই ওরা তর্ক শুরু করে দেয়। একজন ওয়ার্ডারের এ বিষয়ে—রহা উৎসাহ—রহা তর্কিক বেটা। তাকে বোঝানোর জন্তে সেদিন এক লম্বা বক্তৃতা করেছি।

তখন কালীবাবুরও উৎসাহ বেড়ে গেল। তিনি বললেন, “আমার মুখিল হচ্ছে, আমি মোটেই হিন্দী বলতে পারি না। আপনার এই বক্তৃতাটা আমাকে বাংলা হরফে লিখে দিন, আমি মুখস্থ করবো।” মন্দ নয়! দিলুম লিখে হিন্দী বক্তৃতা বাংলা হরফে।

আমাদের “কিচেনে”র ম্যানেজার ছিলেন খুলনার নির্মল দাশ কমিউনিষ্ট। প্রায় ত্রিশজন ডেটিনিউয়ের daily allowance প্রায় ৪০ টাকা—রোজ বাজার হয় এই টাকার, অথচ খাওয়া-দাওয়া থাকেতাই। নির্মল দাশের পৃথক ঘরে টেবিলে মজুদ থাকে নানা বস্তুর খাতবস্তুর টিন প্রভৃতি—সে সব মাল কেউ পায় না। উনি বলেন, ঠিক কি-সব ব্যাধি আছে, তার জন্তে উনি মেডিক্যাল প্রাউণ্ডেট্রিসের জিনিসের extra supply পান। একটা চাপা গুণ্ডরণ চলে। পরে আমরা শুনেচলুম,—তিনি নাকি কিছু কিছু টাকা বাঁচিয়ে বাইরে পাঠান—পাটির জন্তে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একদিন মিটিং বসলো, এবং অনেক ক্যাচালের পর ঠিক হল, পালা করে’ এক এক মাস এক একজন ম্যানেজার হবে। প্রথম নতুন ম্যানেজার করা হল দিবাকর পাত্রকে। প্রথম দিন থেকেই খানার সুস্পষ্ট উন্নতি দেখা গেল।

ইতিমধ্যে জেলে সংস্কারী পূজা হয়ে গেছে। সাতখাদার অল্পতম লীডার অনিল রায় প্রধান উদ্ভোগী—ভূপতিদা প্রভৃতিও আছেন। ঠিকার আর দুই “কিচেন”কে নিয়ন্ত্রণ করলেন উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্তে। আমাদের খাট কিচেনে মিটিং বসলো—কি করা হবে। কমিউনিষ্টরা বললেন—ঠাকুর পূজা আমরা মানি না—আমরা যোগ দিতে পারি না—পূজা-সংক্রান্ত সকল উৎসব আমরা বর্জন করবো। অল্প অনেকে বর্জন করার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করলেন। আলোচনা গরম হয়ে উঠলো। আমার মত জিজ্ঞাসা করলে আমি বললুম, বর্জনের পলিসি ভুল, ওতে কল হয় বিপরীত। প্রথমতঃ, আপনাদের সঙ্গে কমিউনিষ্টদের ওপরে ওদের মন আরো বিরূপ হবে, আর দ্বিতীয়তঃ, পূজার ওপর ওদের আরো জেদ চড়ে যাবে। সুতরাং আর কেউ যোগ না দিলেও আমি যোগ দোব। অল্পলিতে নয়, উৎসব-আনন্দে। অল্পলিতে যোগ দেওয়া অবশ্যকর্তব্য নয়। কলতঃ অর্থাটন কটর কমিউনিষ্টরা ছাড়া বাকি সকলেই যোগ দিলে। থিয়েটার হ’ল—পরশুরাম রচিত বিরিকি বাবা। আমি বিরিকি বাবায় পাট করলুম। অনিল রাই আমাকে অস্বরোধ করেছিলেন—চরিত ভূপতিদার পরামর্শে। তখন সুখেশু গোস্বামীও ওখানে ডেটিনিউ ছিলেন, ভাল গান গাইতে পারেন, তখনও বিখ্যাত গায়ক হননি—একদিন তাঁর গান হল আরো ২।১ জনেরও। আমাকেও শীড়ানীড়ি করে’ বিপদে ফেলা হয়েছিল। আমি মাটিকের পরে প্রেসনের মতন এমন এক গান গাইলুম, বা অনিলরাইয়ের এলাকার বহির্ভূত।—পাড়ার্গেরে বাজারদের “বেহলা”

পালা শুনেছিলুম তারই এক গান typical বাজার সুর। চান্দসাগর বাণিজ্যবাজা থেকে ফিরে এসেছেন, তাঁর স্ত্রী সনকাসুন্দরী গাইছেন—

হৃসূকের কথা বলবো কি আর—শোনো বলি ও সদাগর
তোমা বিনে এ জীবনে যে দশা হয়েছে আমার
পঞ্চমাস গর্ভকালে বাণিজ্যোত্তে গিড়েছিলে
অনেক জন্মের পুণ্যফলে পেয়েছি পুত্র লখিন্দর।

হঠাৎ একদিন এক আই-বি অফিসার চাজব—ডেটিনিউদের সঙ্গে আলোচনা করে সরকার family allowance দেবেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার familyতে আপনার dependant কে কে আছেন?” আমি বললুম,—“আমার dependant কেউ নেই, non-dependant কেউ নেই, familyই নেই।” তিনি বললেন,—“আহা, বুঝতে পারছেন না। সরকার family allowance দেবে বলেই এই এনকোয়ারী হচ্ছে।” আমিও বললুম,—“আহা, বুঝতে পারছেন না—আমার কেউই নেই।” শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝলেন না, এবং আমাকেও বোঝাতে না পেরে বিদায় হলেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর খুলনার এক ছোকরা ডেটিনিউ, সরস্বতী লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট, আমাকে এসে ধরলেন—আমার দোস্ত ওয়ার্ডারকে দিয়ে বাইরে একখানা চিঠি পোষ্ট করতে হবে, এবং চিঠিখানাও শুধিয়ে লিখে দিতে হবে। তিনি অফিসারের কাছে বলেছেন, তিনি প্রতিমাসে বাড়ীতে ৪০ টাকা করে পাঠাতেন। বাড়ীতে যদি পুলিশ এনকোয়ারীতে যায়, বাড়ীর লোকেরা যেন সেই কথাই বলে—‘না হলে—বোঝেন না?’ বললুম, চিঠি লিখে দিলুম, এবং পোষ্ট করিয়ে দিলুম।

৩১ সালের শেষে আমি বখন জেলে বাই, তখন ডেটিনিউদের allowance fix করা হয়ে গেছে—কিন্তু বখন থেকে জেলে ডেটিনিউ রাখা শুরু হয়েছে, তখন থেকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কোনো fixed allowance ছিল না—তু ধু একটা চালোরা হুকুম দেওয়া ছিল—ডেটিনিউদের যা যা প্রয়োজন সবই দেওয়া হবে। প্রয়োজনটাও বখন স্থির করে দেওয়া হয়নি, তখন স্বভাবতই প্রয়োজন মানে ডেটিনিউরা যা প্রয়োজন মনে করবে, অর্থাৎ চাইবে। একজন করিৎকর্মা ডেপুটি জেলার ছিলেন ডেটিনিউদের সংক্রান্ত সকল ব্যাপার দেখাশোনা করতেন, এক প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করতেন।

প্রথমে ব্যবস্থা ছিল ডেটিনিউরা একটা Requisition বইয়ের order লিখে দিতো, এবং Office থেকে সব জিনিসের একটা list করে দেওয়া হ’ত কনট্রাক্টরের হাতে। ডেপুটি জেলারবাবু কাজ সংক্ষেপ করার জন্তে পরে ব্যবস্থা করেছিলেন,—কনট্রাক্টর একটা লম্বা বোঝাই করে নানাবিধ ব্যবহার্য্য জব্য একেবারে জেলের মধ্যে ডেটিনিউদের ইয়ার্ডের দরজার নিরে হাজির করে,—আর ডেটিনিউরা হাজির লুঠের মতন যার যা পছন্দ বা যে যা পারে হাতিয়ে নিয়ে ঘরে চলে যায়,—আর তারপরে কনট্রাক্টর একটা Cash Memo বই এবং একটা খাতা নিয়ে ডেটিনিউদের ঘরে ঘরে গিয়ে বসে জিনিস মিলিয়ে নামে নামে খাতায় লিখে Cash Memo লিখে দেয়। তারপর আবার ডেটিনিউরা বলে দিতো—আমার জন্তে একটা অল্প কমিউনিষ্ট আনবেন। দারী দারী চারকরা

হটকেশ হোট বড় ৩৪টে পর্যন্ত এক একজন নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২'৪ জন গ্রামোফোন পর্যন্ত কিনেছে।

বোধহয় আপনাদের মনে হচ্ছে আবার গল্প—এও নাকি হয়। হয়—এবং গড়ায়ও অনেক দূর পর্যন্ত। যখন allowance fix করা হল, তখন কে কত টাকার জিনিস নিয়েছে, তার একটা হিসেব করা হল। দেখা গেল, অনেকেই অনেক বেশী টাকার জিনিস নিয়েছে, এবং তার ব্যবস্থাও হল,—মাসে মাসে allowance-এর অর্ধেক টাকা কেটে নেওয়া হবে। ডেটিনিউরা বললে,—ব'য়ে গেল।

কিন্তু আবার গল্পটা এখানেই শেষ নয়। ডেপুটী জেলাস্বাক্ষর নামে ৪৬ (বা ৮৬) হাজার টাকা তহরুরের চার্জ দিয়ে তাঁকে Suspend করা হল। তিনিও বললেন,—ব'য়ে গেল।

কনট্রাক্টরের কনট্রাক্টরীও গেল—তিনি 'ব'য়ে গেল' বলেছেন কি না জানিনা।

এই সময়ে বোধ হয়, ১৯৩২ সালের এপ্রিলে গভর্নমেন্ট এক ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়। সরকারী কর্মচারীদের বেতন সাময়িকভাবে কিছু কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়—নীচের গ্রেড বাদ দিয়ে কিছু উপরের গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতনের শতকরা দশভাগ—তার উপরে শেষ ধাপ পর্যন্ত শতকরা ১৫ ভাগ, এবং অ্যাং লাটসাহেব স্বচ্ছার বেতন কম নেবেন শতকরা ২০ ভাগ, এই রকম ব্যবস্থা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডেটিনিউদের daily (food) allowance একটাকা ছ'আনা থেকে একটাকার নামিয়ে দেওয়া হয়। নতুন সমস্যা—আমাদের মিটিং বসলো—লড়তে হবে। প্রথমে দরখাস্ত করা হবে, তারপর দরখাস্ত না-মঞ্জুর হলে hunger strike. প্রথমে প্রস্তাব উঠলো আমাদের allowance কমানো চলবে না বলে দরখাস্ত করতে হবে কারণ আমরাতো সরকারের কর্মচারী নয়।

আমি বললুম ওরা ব্যয় সঙ্কোচের যে ব্যবস্থা করেছে, তাতে আমাদের ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনের নীতিটি মনে নেওয়া দরকার, কিন্তু শতকরা হিসাবে আমাদের allowanceটা যে সর্বোচ্চহারে কাটা হয়েছে, সেটার কোন যুক্তি ওরাও দিতে পারে না। সুতরাং ওদের হিন্দাব মতই আমাদের allowance ছ'আনা কমানো হলে আমরা রাজী আছি—অন্তথা লড়াই করবো, এটভাবে দরখাস্ত করা হোক। অমুকুলদা আমাকে সমর্থন করলেন, কিন্তু অনেকেই চূপ করে থাকলে, এবং প্রথম প্রস্তাবই পাশ হয়ে গেল।

দরখাস্ত করা হল, এবং কয়েকদিন পরে দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ার খবর এল। আবার মিটিং বসলো। Hunger Strike এর নোটিশ দেওয়ার প্রস্তাব হল। অনেকেই বললেন, একচোটে ঐ নোটিশ না দিয়ে, আমরা নিজেরা Catering চালাতে পারবো না বলে Catering ছে'ড় দেওয়া হক। তাই হল।

ভেল কতৃপক প্রায় কয়েকদিনের মতন খানা নিয়ে এল বেলা দেড়টার সময়। মুখে তাদের ওপর হ'বতর্ষি করলে করতে একদল চালাক ডেটিনিউ হুড়োহুড়ি করে সার দিয়ে খেতে বসে গেল, এবং তাড়াতাড়ি বেকী করে খেয়ে তা'চ ডাল ফুরিয়ে ছেড়ে দিলে। বাকি লোকের খাওয়া হলনা—ওরা আবার ভাত আনলে, তবে খাওয়া হবে। আর ডেটিনিউদের তো উপোস করিয়ে রাখা চলবে না, হুড়ো ভাত আনতেই হবে।

কিন্তু সারাদিন কেটে গেল, দকার দকার অকিসে ভাতের জন্তে তাগাদা গেল, কিন্তু বর্তাদের কলাটি। হিসেব করে য়েঁখেছে, না কু'লালো তো বয়েই গেল। আবার খাবার এল রাতে। কে খেলো বা কে খেলোনা, কেউ দেখলে না।

ওদের জব্দ করার এই পদ্ধতিতে অনেকে ক্ষেপে গেল। বারা প্রথমেই ঠেসে খেয়ে ওদের জব্দ করার প্রায় করেছিল,—তাদের উপোস করানোর জেদ নিয়ে উপোসীরাই জোরের সঙ্গে Hunger Strike declare করার প্রস্তাব করলে। অনেকেই সেটা সমর্থন করতে হল। প্রস্তাব পাশ হল। Hunger Strike-এর নোটিশ দেওয়া হল।

অমুকুলদা চূপচাপ সব দেখছিলেন—তিনি আমাকে বললেন,—আমি কিন্তু Hunger Strike এ যোগ দাব না—একলায় চাল-ডাল আনিয়ে নিজের য়েঁখে খাবো। ভরসা পেয়ে আমি বললুম,—আমি থাকবো আপনার সঙ্গে। অমুকুলদা বললেন,—বেশ,—আর কাউকে কিন্তু নেওয়া হবে না। কিন্তু হাওড়ার ধীরেন মুখুজ্য জানতে পেয়ে এসে অমুকুলদাকে ধরলেন,—এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকেও সঙ্গে নেওয়া হল। তিন জনের নামে অকিসে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল, এবং বাজারের ফর্দ পাঠিয়ে মাল আনিয়ে একজন "ফ'লতু" (কয়েদী attendant) নিয়ে আমাদের তিন জনের এক "কিচেন" হল। দাদারা বোধহয় তখন বদলী হয়ে গেছেন।

নোটিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনশন শুরু করে দেওয়া হয়েছিল,—কয়েকজন উগ্র বীরের প্ররোচনায়,—বারা বেশী ভাত খেয়ে কতৃপককে জব্দ করেছিলেন। অনেকেই অনশন শুরু করেছিল একটা দিবা নিয়ে। দু একদিন উপোস করার পরই যখন নোটিশের জবাব এল, সরকার তার নীতি বদলাবে না, এক দরকার মত ব্যবস্থা করবে—তখন পেটের ক্ষুধা এবং মনের বিধা মিলে অনেকেই বেহাল করে ফেলেছে—তারা ধড়বড় করছে Hunger Strike ছাড়বার জন্তে।

জেলায় ছিল ছোট রাগান সাহেব—১৯২৬ সালের আলিপুর সেন্টাল জেলের জেলায় রাখান সাহেবের ছোট ভাই—প্রায় দাদার মতনই নিরীহ মানুষ। আমার সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল হুড়নের নাম উপলক্ষে। দুদিন কথাবার্তার আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল বলে আমি বলে দিয়েছিলুম,—"তোমাকে একটা কনফুলা বলে দিই, তাহলে আমার নাম মনে থাকবে। তোমার নাম তো রাখান? আর আমার নাম না-রাখান—তুমি Positive, আর আমি Negative. সেই থেকে সে আমার নামতো ভুল করেইনি,—দেখা হলই দুটো কথা না করে বেতো না। সে একদিন বললে, "অনেকেই বলছে, তারা Hunger Strike ছাড়তে রাজী, কিন্তু পারছে না for others. আমি ওদের বোঝাই যে, allowance কাটা হয়েছে temporarily—আবার বাকিরে দেওয়া হবে কিছুদিন পরে।"

তারই দু একদিন পরে strike মিটে গেল। সকল দলই নিজ নিজ "কিচেন" হাতে নিলে। আমরা কিন্তু আমাদের "কিচেন" তাজলুম না। আমাদের তিন জনের একটা "কোর্ব কিচেন" বজায় রইলো। সব কিচেনের চেয়ে আমাদের কিচেনে

খাওয়া ভাল—অমুকুলদা যেমন গোছালো “গিরী”—তেমনি ফাঁসিয়ে।

একদিন আমাদের খাওয়া কিচেনে feast হল,—আমাদের কোর্স কিচেনের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করে’ ওরা মাংসের পোলাও খাইয়ে দিলে। ওরা ২৭ জন, আমরা তিন জন। আমি অমুকুলদা’কে বললুম, ওরা চাল মারলে। একদিন আমাদের কিচেনে ওদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দেওয়া যায় না? অমুকুলদা বললেন, পোলাও করেই খাইয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু নিরিরিবিয় পোলাও—সে অবশ্য ওদের পোলাওয়ের চেয়ে খেতে ভাল ছাড়া মন্দ হবে না—লাগতে চাও একদিন? ২।৪ দিন নিজেদের একটু সাদামাটা খেতে হবে।

তাইই স্থির করা হল,—এক নিঃসোড়ে কয়েকদিন ধরে, কিছু পোলাওয়ের চাল আর যি আনিবে জমানো হল। তাছাড়া কিছু কিছু বিড়ি আর তামাকপাতা আনিবে কালতুদের দিবে ডবল দামে বিক্রি করিয়ে কিছু নগদ পওসাও জমানো হল। তারপর হঠাৎ একদিন ওদের নিমন্ত্রণ করা হল। বে ওয়ার্ডার আমাদের বাজার করে দিতে। তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, নগদ টাকা, একদিনের allowance এবং পরের দিনের allowance এর পরিমাণ টাকা তার কাছে ধার নেওয়ার বন্দোবস্ত করে’ দই আর মিষ্টি আনিবে নেওয়া হল। অমুকুলদা কোমর বেঁধে লেগে পেলেন। আমাদের তিনজনের কিচেনে ওদের ২৭ জনকে বাদাম-পেশতা-কিসমিস্ দেওয়া চমৎকার নিরামিষ পোলাওয়ের নিমন্ত্রণ খাইয়ে দেওয়া হল। ওদের তাক লেগে গেল।

জেলের মধ্যে যখন এই সব রকমারি খেল চলতে,—তখন বিলাতে আর একরকম খেল চলছে রাউণ্ড টেবিলকে কেন্দ্র করে’। মহান্বাজী ছিলেন কংগ্রেসের Sole delegate—plenipotentiary—সর্বকমতাসম্পন্ন একক প্রতিনিধি—তার কথাই কংগ্রেসের কথা। সরোজিনী নাইডু এবং পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যও গিয়েছিলেন, কিন্তু সে নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্বের অধিকারে। মোসলেম লীগ দল বেঁধে গিয়েছিল। হিন্দু-মহাসভার তরফ থেকেও এম এন সরকার, বি সি চ্যাটার্জি প্রভৃতি একটা দল গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কয়সালার একটা সর্বসম্মত করণী আবিষ্কার করার দুশ্চেষ্টা হুনিয়ার চোখের সামনে ব্যর্থ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়,—ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী তথাকথিত সোসিয়ালিস্ট শ্রমিক নেতা র্যামসে ম্যাকডোনাগোর হাতে সকল দল মিলে কয়সালার ভার ছেড়ে দিলেন—তিনি বা বা কতোয়া দেবেন, তাই হবে শেষ কথা।

স্বরাজকে লাহোরে Complete Independence করে’—তাকে আবার ‘পূর্ণ-স্বরাজ’ করে’—বিলাতে গিয়ে মহান্বাজী গান্ধী আবার নেহেরু রিপোর্টে ফিরে গিয়ে বললেন, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলেই ভারত সন্তুষ্ট হবে।—লাহোরোত্তর কংগ্রেসের Sole delegate, plenipotentiary।

ভূতপূর্ব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ মহান্বাজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—কংগ্রেসের Creed হল independence,—আর আপনি বলছেন, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলেই ভারত সন্তুষ্ট হবে,—কেনন করে’ হবে? মহান্বাজী বললেন,—“মানে,—আমরা স্বাধীন হইব; স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো, ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্তই থাকবে।” লয়েড জর্জ চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন,—“অ।” (Oh I see)।

যেচারা লয়েড জর্জের মাথারও টোকেনি—সব সদরেরই একটা করে খিড়কী থাকে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার বহুবস্ত্রের গোড়া এইখানে। বাই হোক, মহান্বাজী ফিরে এলেন খালি হাতে। ভারত-বাসী আবার সংগ্রামের জন্ত উন্মুখ। ফেরার পথে পোর্ট সৈয়দে এসে মহান্বাজী বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বললেন,—তিনি শান্তির জন্ত তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। বস্তুতে পৌঁছেই তিনি এক প্রস্তাব রচনা করেছিলেন,—আবার সংগ্রাম শুরু করা হবে না বলে’। ৩১ সালের শেষ—তখন লর্ড আক্রইন চলে গেছেন, এবং নতুন বড়লাট এসেছেন উইলিংডন। তিনি তৈরী হচ্ছিলেন, রাউণ্ড টেবিলের অবসরে,—আক্রমণ শুরু করার জন্তে। সে সুযোগও এসে গেল।

মহান্বাজীর বসে পৌঁছানোর কয়েকদিন আগেই উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি খাজনা বন্ধের নীতি ঘোষণা করে এক প্রস্তাব পাশ করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে সরকার বাহাদুর জহরলাল, সেরওয়ানী প্রভৃতি নেতাদের ধরে জেলে পুরলে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লালকোর্তা আন্দোলনের সংগঠক ও নেতা খাঁ আবদুল গফুর খাঁ এবং তাঁর ভাই ডক্টর খাঁ সাহেবকেও জেলে পোরা হল। বাংলায়ও আরো নেতাদের গ্রেপ্তার করা হতে লাগলো—জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। ঠিক মনে নেই,—বোধ হয় এই সময়েই শরৎ বন্দু এবং জে এম সেনগুপ্তকেও অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়।

শরৎ বন্দুকে বোধ হয় কার্শিয়ংয়ে রাখা হয়েছিল। উপযুক্ত family allowance ছাড়াও তাঁর Insurance premiumও সরকার দিতে বাধ্য হয়েছিল—১০০০ টাকা হিসাবে। সেনগুপ্তকে রাখা হয়েছিল রাঁচীতে—এবং বোধ হয় ৩২ সালে, সেখানেই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর দেহাবসান ঘটে।

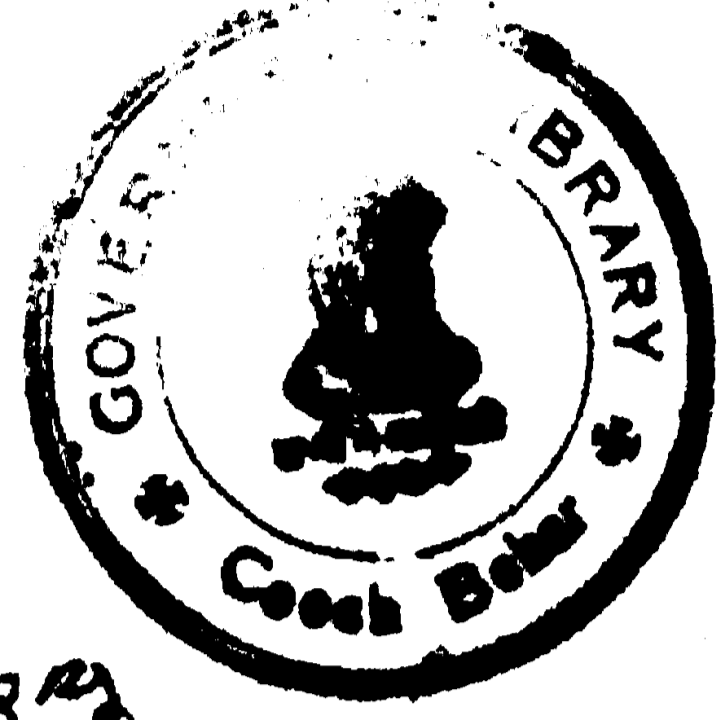
জেলে সুভাববাবুর স্বাস্থ্য আবার ধারাপ হয়েছিল, এবং তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা চলছিল। সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুক্তি দেন এই সর্তে যে, তিনি সরাসরি সুইজারল্যান্ডে চলে যাবেন চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্তে। সেই সর্তে মুক্ত হয়ে তিনি ইউরোপে চলে গিয়েছিলেন।

১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী মহান্বাজীকেও গ্রেপ্তার করা হল। তার আগে তিনি সরকার কর্তৃক চুক্তিভঙ্গের নানা অভিযোগ শুনে বড়লাট উইলিংডনের সঙ্গে দেখা করার জন্ত এক চিঠি লেখেন, কিন্তু বড়লাট তাঁর দেখা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মহান্বাজী এব্যাপারটাকে সরকারের দুতন নীতি বলে বিশ্বয় প্রকাশ করেছিলেন।

মহান্বাজীর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর একবার সারা দেশে কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হয়, সর্বত্র নেতাদের গ্রেপ্তারও করা হয়, কংগ্রেসের সংগঠিত সর্বপ্রকার সংস্থাও বে-আইনী ঘোষিত হয়, সর্বত্র কংগ্রেসের অফিস, ছাপাখানা, তহবিল প্রভৃতিও বন্ধ, দখল বা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯৩২ সালের ২রা মে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের রিপোর্টে জানা যায়,—প্রথম চার মাসের মধ্যেই ৮০০০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। [ক্রমশঃ

শান্তিপুত্র
শ্রীমদ্রামায়ণ

শান্তিপুত্রের জীবনী



২৭

শান্তিপুত্রের ফিরে গেল অদ্বৈত। কিন্তু শান্তি কই ?

আবার জেগেছে অবিশ্বাস। যা দেখে এলাম সব সত্যি তো ? না কি ছায়াবাজি ?

ঠিকতে পারল না। আবার চলল নবদ্বীপ। হাজির একেবারে শ্রীবাসের আস্থানায়।

এ কি, স্বয়ং প্রভু এখানে! আর যেখানেই নিমাই, সেখানেই কৃষ্ণকথা।

অদ্বৈতকে দেখে উঠে দাঁড়াল নিমাই। কোথায় অবিশ্বাস ? পূর্ণপ্রসন্ন মনে অদ্বৈত প্রণাম করল নিমাইকে। নিমাইও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। প্রণাম করল অদ্বৈতকে।

‘সীতাপতির জয় হোক।’ পরিহাস করল নিমাই। ‘লোকাভিরাম সীতাপতি যখন এসেছে তখন আর আমাদের ভয় কী।’

অদ্বৈতের স্ত্রীর নাম সীতা। সেই ইজিতে এই পরিহাস।

‘কই—এখানে রঘুনাথ কোথায়?’ অদ্বৈত প্রতিধ্বনি করল। ‘এখানে তো রঘুনাথ বসে।’

‘তা তুমি যদি শান্তিপুত্রে থাকো, আমার নবদ্বীপ চলে কি করে?’ নিমাই আবার সরস ইজিত করল।

তার মানে, তুমি যদি শান্তুরসেই ক্রান্ত থাকো, আমার এই নবদ্বীপ ভক্তি তবে কে আশ্বাদ করে? দ্বীপ যদি জলের মধ্যে আশ্রয়, ভক্তিও তাহলে সংশয়ের মধ্যে স্থিরস্থিতি।

ভাংপর্য বুকতে পেরেছে শ্রীবাস। উৎকল-হর

বললে, ‘কই আর থাকতে পারলেন শান্তিপুত্র। তোমার আকর্ষণে চলে এসেছেন নবদ্বীপ। যে নবদ্বীপে এখন নিত্যানন্দের অবস্থিতি। আর কে না জানে, ভক্তিই নিত্য আনন্দের উৎস।’

‘তারি জন্মেই তো শ্রীতে যার বাস সেই শ্রীবাস এখানে চরিতার্থ।’ অদ্বৈতও খেই ধরল।

‘শ্রী মানে লক্ষ্মী তো?’ বললে শ্রীবাস। ‘লক্ষ্মী আর কোথায়? এখন তো বিষ্ণুপ্রিয়া।’

নিমাই হাসল, বললে, ‘শ্রীশব্দের আরেক অর্থ ভক্তি। তোমরা সকলে যেখানে উপস্থিত, সেখানে শ্রী নেই—ভক্তি নেই—এ হতেই পারে না।’

‘শ্রীবাস ঠিকই বলেছে।’ অদ্বৈত বললে, ‘ভক্তি তো বিষ্ণুর প্রিয়া। স্মৃতবাং শ্রী ওখানে বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে বিরাজ করছে। বিরাজ করছে তোমার ঘরনী হয়ে।’

ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয়। অতীষ্টকে পাবার জন্মে যা করতে হয় তাই অভিধেয়। এক কথায়—কর্তব্য। অতীষ্ট কে? অতীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় বলেছে শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না। মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিত্ততে। ব্রহ্মের আনন্দ অনুভূত হলে থাকেনা তার ভয়লেশ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কদাচন। ভগবানকে জানলেই জন্মমৃত্যুর পার হওয়া যায়, তা ছাড়া পার হবার আর পথ কই? তমেব বিদিত্বা অভিমৃত্যুমেতি নাশ্চঃ পশ্চা বিত্ততে অয়নায়।

কিন্তু ভগবানকে জানবার উপায় কী?

একমাত্র ভক্তিই উপায়। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ।

ভাগবতে বলছে শ্রীকৃষ্ণ, একমাত্র ভক্তিতেই জানা যায় আমাকে। গীতাতোও সেই কথা। ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাতি। সেই কথা আবার বেদান্তে। বিঠৈব তু তল্লিধারণাৎ। বিছাই মুক্তির একমাত্র উপায়। বিছা অর্থ জ্ঞানাত্মিকা ভক্তি। ভক্তি দিয়ে শুধু জানা নয়, ভক্তি দিয়ে দেখা যায়, প্রবেশ করা যায় তব্ধে, স্বরূপের উদঘাটনে। ভক্ত্যা তনুভূয়া শক্যঃ অহমেব-স্থিধোহজুন। জাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তব্ধেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরমুপ।

এখন নবদ্বীপ, নববিধা ভক্তির সাধনের কৌশল কী?

শ্রবণ। বারে বারে শোনো কৃষ্ণকথা। অভ্যাস করো বলতে। শুধু নামের অক্ষরের উচ্চারণেই ভক্তি জাগবে। 'নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হতে'।

স্মরণ। বারে বারে ভাবো কৃষ্ণকে। তার লীলাচিন্তন করো। একমাত্র ভগবৎস্মৃতিই ভক্তি।

তারপরে পাদসেবন করো। অর্চন-বন্দন করো। নয়তো বন্ধুতা করো, না পারো, দাসত্বের বোঝা তুলে নাও। আত্মনিবেদন করো। গলিয়ে ঢেলে দাও নিজেকে।

অশু বাঞ্ছা, অশু পূজা রেখো না। অশুভিলাষিতা-শূন্যতায় চলে এস। সর্বোপাধিবিনিমুক্ত হয়ে সেবা করো।

ভক্তনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ণন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥

'শচীদেবী আমাকে পাঠিয়েছেন।' একজন লোক এসে বললে।

'কী খবর?' ব্যস্ত হল শ্রীবাস।

'অদ্বৈত আচার্যকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন। যেন তাঁর ওখানে উনি বিশ্রাম করেন।'

'কী আনন্দ।' উথলে উঠল অদ্বৈত। 'স্বয়ং শ্রীভগবানেব সঙ্গ্রে জগজ্জননী হাতে আজ প্রসাদ পাব।'

'আমি দেখতে পাব না সে দৃশ্য?' শ্রীবাস বললে, 'আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। আর যদি গিয়ে পড়ি, আমিও না কোন্ ছুটি প্রসাদ পাব?'

'বা, তুমি যাবে কোন্ স্ববাদে?' বললে অদ্বৈত। 'তোমার নেমস্তম্ভ হয়নি।'

'তা ছাড়া তুমি গেলে ছজনের রান্না রাঁধতে এঁর কষ্ট হবে।' নিমাই বললে স্নেহে।

'আমাকে বলছেন?' চমকে উঠল অদ্বৈত। 'বা, আমি রাঁধতে যাব কেন? আপনার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া রাঁধবে।'

'হ্যাঁ, তাঁর কষ্ট হবে।' মমতামাখানো স্বরে বললে নিমাই।

'হোক কষ্ট। শাস্তি-বোয়ে খাটবে। খাব আমরা ছজনে। ছাড়ব না।' শ্রীবাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

লোক ছুটল শচীকে খবর দিতে।

ভোজন পরে হবে, আগে দর্শন করতে দাও। সেই তরুণারুণকরুণাময় বিপুলায়ত নয়নকে দেখতে দাও চোখ ভরে। যার নয়ন তরুণ-অরুণ, করুণাময়, বিপুল ও আয়ত, সেই বিশ্ববিমোহনকে তুই চোখে আশ্বাদ করি। নেত্ররসায়নকে দেখে শীতল করি নেত্র।

অদ্বৈত শ্রীবাসের কানে কী বলছে অশ্রুটে।

'কী বলছে অদ্বৈত?' জিগপেস করল নিমাই।

'বলছে, নিত্যানন্দকে যে রূপ দেখিয়েছিলে তা কেন দেখাচ্ছ না?' বললে শ্রীবাস।

'বা, এই যে আমাকে দেখছ, এই তো আমার যথার্থ রূপ।' সরল কণ্ঠে বললে নিমাই, 'আর এই রূপ—এই গৌররূপই তো অদ্বৈতের প্রিয়। কি, ঠিক নয়?'

অদ্বৈত কাঁপরে পড়ল। যদি বলে, ঠিক, তা হলে অশুরূপ আর দেখা হয়না। আর যদি বলে, না, শ্যামসুন্দরকেই দেখতে চাই, তা হলে গৌররূপে অনাদর আসে।

'গৌররূপের মত প্রিয় আমাদের আর কিছু নেই, তবে স্বরূপে সেই যে শ্রীকৃষ্ণ তা একবার এখন দেখতে চাই।' অদ্বৈত বললে।

'কি করে কী দেখানো যায় তার কিছুই আমি জানিনা।' নিমাই বললে কুণ্ঠিতের মত। 'কিছুই আমার ইচ্ছাধীন নয়। যদি শ্যামসুন্দরকে দেখতে চাও, চোখ বুজে হৃদয়ে কৃষ্ণকে ধ্যান করো। কৃষ্ণই কৃপা করে দেখাবেন তাঁর নিজ রূপ।'

অদ্বৈত চোখ বুজল।

এ কি, চোখ যে একবার বুজল, আর খোলে না দেখি। অনড় কাঁঠ হয়ে গেছে অদ্বৈত। বলে বলেই অচেতন হয়ে পড়েছে।

‘আচার্যের এ কী হল?’ সবাই ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে উঠল।

‘বোধহয় হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছে।’ বললে নিমাই। ‘তাই আনন্দে নিম্পন্দ।’

চিত্রং তদেতৎ চরণারবিন্দং

চিত্রং তদেতৎ নয়নারবিন্দম্।

চিত্রং তদেতৎ বদনারবিন্দং

চিত্রং তদেতৎ পুরস্চ চিত্রম্ ॥

‘আচার্যের কী ভাগ্য!’ বললে শ্রীবাস, ‘গৌররূপ তো দেখেছেই, দেখল আবার শ্যামরূপ।’ চেতনা ফিরে পাচ্ছে অদ্বৈত।

আর সঙ্গে-সঙ্গে বলছে গদগদ হয়ে, ‘এই যে এতক্ষণ দেখছিলাম জ্যোতির্ময় শ্রীমূর্তি, সে কোথায় গেল? সেই নয়নোৎসব কোথায়? সেই বিমুগ্ধ-হাসমধুর কোথায় লুকোল? দৈবতং জীবিতঞ্চ, প্রাণের দেবতা ও বল্লভকে কোথায় পাব?’

‘তুমি কাকে দেখলে বলো স্পর্শ করে।’ সবাই ঘিরে ধরল অদ্বৈতকে।

‘আর কাকে!’ অদ্বৈত ইঙ্গিত করল গৌরাঙ্গকে। ‘যিনি এই সামনে বসে আছেন সেই করুণা-বলোকনকে। সব, সব তাঁর কীতি।’

‘বা, আমি কী করলাম?’ সরল সাজল নিমাই।

‘আমি যেই চোখ বুজলাম উনি আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করলেন।’ বলতে লাগল অদ্বৈত। ‘প্রবেশ করে শ্যামরূপ ধরলেন। বহুল জলদের ঘনীভূত কান্তি কারুণিক কিশোর মূর্তি। দেখা দিয়ে আবার চলে এলেন বাইরে। বাইরে এসে দেখ আবার ধরেছেন নিজরূপ।’

‘তুমি বসে বসে ঘুমুলে আর স্বপ্ন দেখলে, তাতে আমার কী দোষ?’ মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল নিমাই।

গভীর নিশীথে বনে বনে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ? ব্রজের তরুলতা জিগপেস করল গোপবালাদের। আমরা একটি চোরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার নাম কী? চোর বলেই তো তার নাম করব না। কিন্তু তোমাদের উপর তার মন নেই, তাকে খুঁজলে তোমাদের মানের লাঘব হবে। জানি লক্ষ্মীর কটাক্ষে সে কোথাও বিভোর-বিবশ হয়ে আছে, আমাদের দিকে সে চাইবে কেন? আমাদের সঙ্গে তার সংসর্গ কী? সে লক্ষ্মীর সেব্য, বন্ধুদের প্রতি কেন তার আকর্ষণ

হবে? শুধু যে চোর, তাকে ধরতে হবে বৈ কি! খুঁজে বার করতে হবে।

তোমাদের কথা বিশ্বাস করি না; বললে তরুলতা। তোমরা কার কথা বলছ বুঝতে পারছি। কিন্তু সে তো সুশীল, তার নামে অযথা অপবাদ কেন?

সে সুশীল? খুব চিনেছ তাকে। সে সব চেয়ে পাকা চোর। তার মত দৃঢ় সাহসী আর কেউ নেই। শোনো, আকাশ থেকে নিবিড়নীল মেঘমালার কান্তি পর্যন্ত হরণ করেছে। কত বজ্র দিয়ে সুরক্ষিত সেই কান্তি। সেই চোরের হাত থেকে সেই কান্তিরও নিস্তার নেই। আমরা তো সামান্য। অবলা অথলা, আমাদের মনোরত্ন চুরি করে পালাবে সে আর এমন কী বেশি কথা। জগতে যত মাধুর্য আছে সমস্তের পরিপাক হচ্ছে কন্দর্পে। বলতে পারো বা চন্দ্রে, পদ্মে, হংসে, যুগে, মীনে, পুষ্পপল্লবে। সকলের মাধুর্য চুরি করে এই চোর নিজ মাধুর্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। সে কোথায় পালাল বলতে পারো?

কী করে বলব? যে চুরি করে সে কি কখনো ধরা দেয়? আর চোর যত দূরে থাকে ততই ভালো। কত দূরে?

দূরেই হোক অদূরেই হোক তাকে দেখতে পাবেনা। সে বড় চতুর। সে লুকিয়ে থাকবে।

কোথায় লুকোবে? তার মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া। দূর হতে দেখলেও তাকে চিনতে পারব।

চিনেই বা লাভ কী! ধরবে কী করে? তোমরা পিছু পিছু ছুটবে আর সে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ধরা দেবার জন্মে? কেন, সেও ছুটতে পারবে না?

না, সেটি হবার জো নেই। এ অশুরকম চোর। এ বিলাসী। আর বিলাসে তার পতি অলসমস্তুর জানোনা বুঝি, সে চলে আবার থমকে-থমকে দাঁড়ায়।

তাই বুঝি? কিন্তু তার গায়ের রঙ তো কালো আর এই রাতও কালো। তাতে আবার বনে আঁধার। যদি কোনো কুঞ্জের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকে তাকে দেখবে কি করে?

বলো কী? আঁধার কি তাকে লুকোতে পারে? বরং আঁধারই তাকে দেখে মুখ লুকোবে। কোটি চন্দ্র-সূর্যের জ্যোতি তার সর্বাদে।

তাই যদি হয়, এ বৃথা প্রয়াস ছাড়ো। শেষকালে ঐ চোরই তোমাদের ধরে নিয়ে পালাবে। রাত্রি অবসর হোক, প্রভাতে তাকে আবেশন করো।

আমাদের নিয়ে সে পালাবে কী! তার আরেক গুণের কথা জানানো বুঝি। সে আবার আমাদের অপাঙ্গ দৃষ্টিপ্রসঙ্গে একেবারে বিবশবিভোর। তাই যদি পথ জানো তো বলে দাও কোথায় আমাদের সেই সৌন্দর্য মাধুর্যের অফুরন্ত সমুদ্র?

‘পুণ্ডরীক! পুণ্ডরীক!’ একদিন হঠাৎ উচ্চরোলে কান্না জুড়ল নিমাই। ‘তোমার কিরহ আমি আর সহ করতে পারছি না। বাপ রে, বন্ধু রে, একবার দেখা দে। একবার কাছে আয়। আমার নয়ন ও হৃদয় শীতল কর।’

কে এই পুণ্ডরীক?

সবাই ভাবল, পুণ্ডরীক বলতে কৃষ্ণকেই ইঙ্গিত করছে। নিমাইয়ের এ কাতরতা কৃষ্ণ ছাড়া আর কারু জন্তে নয়।

কিন্তু ঐ শোনো। নামে আবার নতুন বিশেষণ দিচ্ছে।

‘পুণ্ডরীক, ও বাপ বিদ্যানিধি, দেখা দে। আমার মন-মনের তৃষ্ণা দূর কর।’

তবে এ পুণ্ডরীক নিশ্চয়ই কোনো প্রিয়ভক্ত, বিদ্যানিধি তার উপাধি।

‘কার জন্তে কঁাদছেন? যদি কোনো ভক্ত হয় তো লুন ডেকে দি। আপনার এই বিলাপে বুক ফেটে যাচ্ছে আমাদের।’ ভক্তদল মিনতি করল।

‘তোমরা বিদ্যানিধিকে চেন না? চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার, কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর।’ বললে নিমাই। ‘কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধুমাবে ভাসে নিরন্তর। অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর ॥’

‘চট্টগ্রামের লোক?’

‘হ্যাঁ, এখানে, নবদ্বীপেও তার একখানা বাড়ি আছে। বাইরে বিলাসী, অন্তরে দীনাতিদীন। কেউ তাকে, তার আসল রূপকে চেনে না। দারুণ গঙ্গাভক্ত। পাদস্পর্শভয়ে গঙ্গাস্নান করে না, সমস্ত দেবার্চনের আগে গঙ্গাজল পান করে। দিনের বেলায় লোকেরা গঙ্গায় নেমে কুলকুচো করে, দাঁত মাঝে, চুল ধোয়, এসব দেখে ভীষণ যন্ত্রণা পায়। তাই গভীর রাতে, গঙ্গা যখন নির্জন, তখন সে আসে দর্শন করতে। কিন্তু কবে আমি তাকে দর্শন করব? তাকে ছাড়া আমার স্বাস্থ্য নেই, শান্তি নেই।’

‘সে তো এখন চট্টগ্রামে। সে আসবে কি করে?’

‘আসবে, শিগ্গিরই আসবে।’ বললে নিমাই ‘আমাকে ছেড়ে সে পারবে না থাকতে। কিন্তু এলে তাকে চিনবে কি তোমরা? তাকে তোমরা বিদ্যা মনে করবে। মনে করবে বা সংসারদাস। আস ভক্তকে চেনে কয়জনে?’

কদিন পরে ঠিক পুণ্ডরীক চলে এল নবদ্বীপ।

এসে থাকল গুপ্তভাবে। একমাত্র মুকুন্দ দখবর পেল। মুকুন্দ দত্তর বাড়ি চট্টগ্রাম-হয়তো সেই-স্ববাদে।

এদিকে নিমাইয়ের কান্নার বিরাম নেই। ‘বাপ বিদ্যানিধি, দেখা দে। কেন এসেও আসছিস না আমার কাছে? তোমাকে ছাড়া প্রাণে বাঁচি কি করে?’

এসেছেন বলছেন, তবে কোথায় সে? ভক্তের দল পরস্পরের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু হয়ে।

গদাধরের সঙ্গে মুকুন্দের গাঢ়তম বন্ধুতা। তাই মুকুন্দ গদাধরকে বললে চুপি চুপি, ‘ভাই, নবদ্বীপে একজন বড় ভক্ত এসেছেন, দেখতে যাবে?’

‘বা, নিশ্চয় যাব।’ গদাধর লাফিয়ে উঠল। ‘ভক্ত দেখতে আমার বড় লালসা। কিন্তু কে সে মহাজন?’

‘আমাদের গ্রামের এক জমিদার, আর এরই নাম বিদ্যানিধি।’

‘নিশ্চয় যাব। এখনি যাব।’

গদাধরকে মুকুন্দ নিয়ে গেল পুণ্ডরীকের বাড়ি। এই দেখ, এই আমাদের বিদ্যানিধি।

দেখে অশ্রুভক্তি উড়ে গেল গদাধরের। এ সে কী দেখছে, কাকে দেখছে?

দেখল খাটে পুরু বিছানার উপরে পুণ্ডরীক বসে আছে, চারধারে নরম বালিশের স্তূপ, মাথায় চন্দ্রাতপ। গায়ে বিলাসবেশ, সুরূপ সুন্দর, পাশে রূপোর পানের বাটা, তাম্বুলরাগে অধর রক্তবর্ণ। দিব্য গন্ধে আমোদ করছে ঘর। পাশে দাঁড়িয়ে ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়ে চাকর ব্যজন করছে। কেশভারের সংস্কারটিও মনোরম। এ বৈষ্ণব ভক্ত কোথায়? এ যে মহাভোগী। ঐহিক সুখে অনুরক্ত।

পুণ্ডরীক গদাধরের পরিচয় জানতে চাইল।

‘ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র। আজন্ম বিরক্ত।’ বললে মুকুন্দ। ‘ভক্তি-পথের যাত্রী। চিরকুমার।’

আর গদাধর ভাবছে পালাতে পারলে বাঁচি। বাটা থেকে কেমন পান জ্বলে-জ্বলে খাচ্ছে দেখ।

চলে আমলকীর সুগন্ধ মেখেছে। পানে পর্যন্ত
সুবাসের স্পর্শ।

মুকুন্দ বুঝতে পেরেছে গদাধর পুণ্ডরীকের নৈকবধে
সন্নিহান হয়েছে। এতটুকুও মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়
এমনি ভঙ্গি করেছে আড়ষ্ট।

তখন সে কী করে? সুসরে ভাগবতের একটি
শ্লোক আবৃত্তি করল। ভক্তিমহিমার সেই প্রসিদ্ধ
শ্লোক। লোকবালরা কৃষিরাশনা পুতনার কথা।
তার ধাত্রীগতি লাভ করার করুণার কাহিনী।

রাক্ষসী পুতনা—শিশু বাইতে নির্দয়া।

ঈশ্বর বধিতে গেলা কালকূট লৈয়া ॥

তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।

না ভঞ্জে অবোধ জীব হেন দয়ালুরে ॥

শোনামা এই বিজ্ঞানিধি কাঁদতে লাগল অঝোরে
মূর্ছিত হয়ে খাট থেকে পড়ে গেল মাটিতে। যদি বা
জ্ঞান এল, ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে দিতে বিলাপ করতে
লাগল: 'কৃষ্ণ রে ঠাকুর রে কৃষ্ণ রে মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষণ সমান।'

গদাধর গতবুদ্ধি, হতচেতন।

উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে লাগল, লাধি দিয়ে
ভাঙতে লাগল জিনিসপত্র। ছুহাত দিয়ে ছিঁড়তে
লাগল জামাকাপড়, আবরণ আভরণ। কোথায়
পানের বাটা, কোথায় বা সুগন্ধের ঝারি। কোথায়
বা ছুফ্ফেনের শয্যা, ময়ূরপুচ্ছের পাখা। আর
রূপবান সেই রা: পুত্রের সর্ব-অঙ্গ ধূলিধূসর।

গদাধর ভয়ে কাঁপতে লাগল। এহেন ভক্তকে
আমি অবজ্ঞা করলাম। ভক্তদ্রোহী হলাম। যার
শরীরে তিলমাত্র ধাতু নেই, যে অবিচ্ছিন্ন আনন্দসমুদ্র,

তাকে আমি চিনলাম না। ভেবেছিলাম, বে কোপীন
পরে সেই বৃষ্টি ভক্ত, আর যার মাথার সুগন্ধি তেল,
সে পাষণ ছাড়া কিছু নয়।

'মুকুন্দ।' হৃদয় দিল গদাধর। 'তুমিই আমাকে
দেখালে কাকে বলে বৈষ্ণব, কাকে বলে ভক্ত প্রধান।
বিজ্ঞানিধিকে দেখলে ত্রৈলোক্য পবিত্র হয়, আমিও
হয়েছি। শোনো, আমার কথা নেই, আমি বিজ্ঞানিধির
থেকে মন্ত্র নেব। তাঁকে মনে মনে এতক্ষণ যে অবজ্ঞা
করেছি, তাঁর শিষ্য হয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। তাঁর
শিষ্য হলে তিনি নিশ্চয়ই আমার সব দোষ ক্ষমা
করবেন।' অবিরল ধারায় কাঁদতে লাগল গদাধর।

গদাধরকে কোলে ধরলেন পুণ্ডরীক। বললেন,
'এ তো পরম সন্তোষের কথা। যে শৈশব থেকেই
ভক্ত, তাকে দীক্ষা দিতে পারার মত সৌভাগ্য বা
ক'জনের হয়? আগামী শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে তোমার
সঙ্কল্পসিদ্ধি হবে। তার আগে আমার গৌরবায়কে
একবার দেখে আসি।'

'তাঁকে আর দেখেননি আগে?' জিগ্গেস করল
গদাধর।

'না, কই আর দেখলাম!'

'দেখেননি, পরিচয় নেই, তবে যাবেন কেন?'

'যাব কেন? সে যে আমাকে ডাকছে। আমাকে
চানছে। সে ছাড়া যে গতি নেই, ইতি নেই, চোখে
আলো নেই, বুকে নিশ্বাস নেই। সেই তো আমার
মনোনেত্রের রসায়ন।'

'কবে যাবেন? কখন?'

'আজই যাব। যাব একাকী। যাব নিশিযোগে

[ক্রমশ:

যুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়; আমেরিকা,
অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কেপ বলাভিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্যন্ত পাইতেছি।
হয় পরকে কাটিয়া-মাখিয়া-খেলাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে
নিজের বিধানে সংযত করিয়া সু-বিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই
রকম হইতে পারে। যুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ
উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে
ক্রমে ধীরে ধীরে আপনায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি বর্ষের প্রতি ব্রহ্মা থাকে,
যদি বর্ষকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া গৃহণ করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই
শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

—বদীন্দ্রনাথ

পত্রগুচ্ছ



॥ স্মার উইলিয়াম জোনসের দুঃপ্রাপ্য পত্রাবলী ॥

[ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সাহিত্যমুখী ভ্রমজিগাসু বাঙালী সমাজ স্মার উইলিয়াম জোনসের নামের সহিত অপরিচিত নয়। বাংলা ভাষা ভারতে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তনের যুগে প্রাচ্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আইনজ্ঞ ও ভূমোক্ষণী এই মানুষটি এসেছিলেন বিত্তে থেকে এই দেশে। এখন হতে সে প্রায় পোনে দুই শত বছর আগেকার কথা। ওয়ারেন হেস্টিংস তখনও ভারতের গভর্নর জেনারেল পদ অর্জিত করেছেন, আর স্মার উইলিয়াম নিযুক্ত হয়েছেন কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারক। এদিক থেকে সে যুগের বাংলা তথা ভারতীয় ইতিহাসে জোনসের আপনি একটি বিশিষ্ট স্থান রয়ে গেছে। বিচারকের দায়িত্ববহুল ক্ষত্র ছাড়াও প্রতিভাদীপ্ত এই মানুষটির স্বাক্ষর রয়েছে আরও বহু বাৎসরিক। বাংলা সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের সাথে অসংখ্য মতোই তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ঘটে যায়—মহানগরী বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটি নামে যে সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীনত্বের গৌরব নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে, স্মার উইলিয়ামই এর প্রতিষ্ঠাতা। আরবী, পারসিক ও সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ বৃৎপত্তি ছিল তাঁর। প্রাচ্য-সাহিত্য নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করে ইংরেজ জাতির মাঝে তার প্রচলনে তাঁকেই প্রথম উজ্জাগী হতে দেখা যায়। বিচিত্র গবেষণামূলক নিবন্ধ তিনি সেদিনে লেখেন এবং সেই অমূল্য রচনাবলী বধারীতি প্রকাশিত হয় 'এশিয়াটিক রিসার্চ' নামক গ্রন্থে। 'গীতা-গোবিন্দ', 'শকুন্তলা', 'হিতোপদেশ'—এ সকল বহু সংস্কৃত গ্রন্থে ইংরেজী অনুবাদ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। স্মার উইলিয়ামের জীবন-যাত্রার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক—ছেলেবেলা হতেই পত্র লেখায় তিনি ছিলেন নিত্যন্ত অত্যন্ত ও নিপুণ শিল্পী। এমন অসংখ্য পত্র লিখে গেছেন তিনি, যাতে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার ছাপ পড়েছে। সে ধরণের কয়েকখানি দুঃপ্রাপ্য অমূল্য পত্রই (বঙ্গানুবাদ) এবারে আমরা আমাদের মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের সামনে রাখছি।—সম্পাদক]

জ্যেষ্ঠা ভগিনী মেরীকে লিখিত পত্র

প্রিয় ভগিনী,

আপনার পত্র পাইয়া আপনার বহু মিঃ বেনেডিক্টের মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। আমি মনে করি যে, এই শোক-বার্তা আমাদের উভয়েরই সমান দুঃখের। অবশ্য তাঁহার (বেনেডিক্ট) নাম বা পরিচয় খুব বেশীদিন জানি না, ব্যক্তিগত আলাপ-সলাপও তাঁহার সহিত আমার কখনও হয় নাই, তবু যে কোন সম্মানিত ব্যক্তির মৃত্যুতেই আমরা শোক-প্রকাশ না করিয়া পারি না। আপনার পত্রেও আপনি সেই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন।

...আবার, দার্শনিক দিক হইতে বিচার করিলে এই কথা না বলিয়া পারিব না যে, কাহারও মৃত্যুতে দুঃখ করা নিঃস্বয়োজন ও অর্থহীন। কেন না, আমাদের এইরূপ দুঃখের কারণ কি? যিনি মরিয়া গেলেন, তাঁহাকে আমরা মৃগা করি বলিয়াই কি এই দুঃখ? প্রিয়জনের মৃত্যুতে যদি আমাদের শোকের কারণ হয়, সে ক্ষেত্রে আবার জবাব হইবে, বিপদ ও অনিশ্চয়তার অবস্থা নইয়া বে-জীবন, তাহা ছাড়িয়া বাওয়ার আনন্দই করা সমীচীন। সাধারণ ভাব হইতেছে—'বিশেষ পুণ্যবান কেহ বেহত্যাগ করিবেন, ইহা কেহ জানারক' কিন্তু আমি উহার বিপরীত কথাই বলিব।

একজন গুণী মানুষের মৃত্যু সংবাদ শুনিলে আমি না ভাবিয়া পারিব না যে, তিনি সত্যই কত সুখী, যিনি জীবনে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন অথচ তাহা ফুল হইবার আর ভয় নাই। মৃত্যু তাঁহার উপর এমন আঘাত জড়াইয়া দিল, বাহাতে পাপ ও অপবাদ তাঁহাকে এখন স্পর্শ করিতে পারিবে না। পরন্তু জীবনে কোন কিছুই নিশ্চয়তা নাই। আজ যিনি আমাদের চক্ষে সম্মানিত, একদিন এমন কারণ ঘটিতে পারে, আমরা হয়ত সে সম্মান তাঁহাকে দিতে পারিব না। সেজন্যই জীবনের বনিকাপাত না হওয়া পর্যন্ত কে সুখী আর কে দুঃখী, কে পুণ্যবান আর কে পতিত, বলা সম্ভবপর নয়। মানুষের পক্ষে অপবাদ এড়াইয়া চলা খুবই কঠিন; পক্ষান্তরে অপবাদ এমনি জিনিস যে, ইহা ছড়াইয়া পড়িতে সময়ের প্রয়োজন হয় না। মৃত্যু হইয়া গেলে গুণী ও সম্মানিত ব্যক্তির সেই ভয় আপনি তিরোহিত হয়।

আমল কথার আবার কিরিয়া আসা বাউক। এই সময় কি ভাবিয়া আপনি এতটা বিচলিত হইতেছেন, সেই প্রশ্ন তুলিব। তাহাইরা দেখুন, প্রতি মূহুর্তে হাজার হাজার লোক মরিতেছে। আমরা যখন কথা বলিতেছি, তখনও কত হতভাগ্য কৃষার আলার কিংবা দারিদ্র্যের কশাঘাতে তরবারির মুখে জীবন দিতেছে। সুতরাং বাহারি অধিকতর দুঃখী, তাহাদের সহিত আমরা আমাদের দুঃখের তুলনা করিব, বাহারি অধিকতর সুখী,

তাহাদের সহিত নয়। এখানে আমি আর বেশী কিছু লিখিতে ইচ্ছা: বোধ করিতেছি। আগামী সপ্তাহে যখন বুঝিতে পারিব যে, আপনার মন অনেকটা প্রবোধ মানিয়াছে, তখন এ বিষয়ে আরও লিখিব। কবাসী ভাষাতেই আমি এই পত্রখানি লিখিতে উদ্ভোগী হইয়াছিলাম কিন্তু পরে ভাবিলাম, নিজের মাতৃভাষাতেই (ইংরেজী) অধিকতর জোর দিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে।

...এখন আমি পড়াশুনার বিষয়ে ব্যস্ত রহিয়াছি। সেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজারে এটেনীর বক্তৃতাটি আমাকে করিতে হইবে। যখন আমি শহরে আসিব, ঐ নাটকখানি আপনাকে পড়িয়া শুনাইব।*

আপনার শ্রেয়ভাজন জাভা
উইলিয়াম জোনস

মি: রেভিকম্বির (১) নিকট লিখিত পত্র

(ক)

*পারসিক কবিতা লইয়া আমাদের যে অর্ধঘণ্টা আলোচনা হয়, তাহাতে আমি যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি। আমি মনে করি, আমাদেরই মধ্যে ইহাতে একটি অতি চমৎকার বক্তৃত্বের সূত্রপাত হইল। কিন্তু অনিবার্য অবস্থায় আমরা এক প্রায়গায় থাকিব না ভাবিয়া আমার মনে হতাশা জাগিতেছে। আমার যে পেশা, তাহাতে বতটা চাহিতেছি, তদপেক্ষা বেশী সময় আমাকে দেশেই আটকাইয়া থাকিতে হইবে। আর জানিলাম, আপনি অবিলম্বে জাখাণীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমাদের মততা বুঝি অল্পেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এইজন্য আমার পরিতাপ হইতেছে। অবশ্য এই সাক্ষাৎকৃত্ত আমায় থাকিবে যে, আপনার সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা না করিতে পারিলেও অন্ততঃ পত্রালাপ করিতে পারিব। এইভাবে আমাদেরই ভাব এবং অজিত জ্ঞানের আদান-প্রদান চলিতে থাকিলেও আনন্দের কারণ হইবে। আমাদের বক্তৃত্বের উল্লেখ করিতে যাইয়া আমি নিশ্চয়ই সমুচিত দাবীর অপরাধে অপরাধী হইতে যাইব না।

...আমাদের উভয়ের গবেষণার বিষয় এবং লক্ষ্য একই। এইটুকু অবশ্য পার্থক্য আছে যে, আপনি আগেই প্রাচ্য-বিজ্ঞান যথেষ্ট অধিকার অর্জন করিয়াছেন আর আমি তাহার প্রথম সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি। আমি কিন্তু আপনাকে এই ক্ষেত্রে একক আপাইয়া যাইতে দিব না। ছেলেবেলাতেই গ্রীক কবিতা পড়িয়া আমি মুগ্ধ হই।...কিন্তু যখন আরবী ও পারসিক কবিতার আবাদন পাইলাম...

* তার উইলিয়ামের বয়স যখন মাত্র চৌদ্দ বছর, সেই সময় বর্ষ ১৭৬০ সাল নাগাদ এই পত্রখানি লিখিত হয়।

(১) গোড়ার দিকে রেভিকম্বি ছিলেন ওয়ারশ-এ রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী, পরে ইনি ইংলন্ডে থাকাকালেই তার উইলিয়ামের সাথে তার সখ্যতা ঘটে।

(খ)

নভেম্বর ১৭৬৮, অক্সফোর্ড

আপনাকে চিঠি লেখার লোভ আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তবে আমার ভয় হইতেছে, আমার চিঠি পৌঁছবার পূর্বেই আপনি হয়ত এই দেশ ছাড়িয়া যাইবেন।

আপনার সান্ন্যগ্রহ পত্র আমি পাইয়াছি। সেই সঙ্গে হাকিমের (২) বন্দনাসূচক একটি চমৎকার গীতিও আপনি জুড়িয়া দিয়াছেন। গভীরতর আনন্দের সহিত আমি উহা পাঠ করিয়াছি, বলিতে গেলে উহা আমি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছি।

কিন্তু এক্ষণে অধিক লিখিয়া লাভ কি? কারণ, এমনও হইতে পারে, আমি বাহা লিখিব, আপনার নিকট আদর্শেই পৌঁছাইল না। তবে আপনি যেখানেই যাইবেন, সান্ন্যগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ রাখিতে বারবার অনুরোধ জানাইব। আপনি যেন তাড়াতাড়ি চিঠি পত্র লিখিবেন এবং বতদূর সম্ভব দীর্ঘ পত্র লিখিবেন। আবারও আমি এই কথা বলিব যে, আপনার সৌহার্দ্য অপেক্ষা আর কোন জিনিসই আমাকে অধিকতর আনন্দ দিতে পারে না।

(গ)

নিস, এপ্রিল ১৭৭০

আপনার নিকট হইতে কোন চিঠিপত্র না পাওয়ার আমি যে কতখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছি, খুলিয়া বলা সম্ভব নয়। আমি শুধু এই ধরিত লইতে পারি যে, আপনি আমার ক্ষেত্রসারী মাসের পত্রখানি পাঠ নাই কিংবা আমার মনে এই সন্দেহেও জাগিতে পারে যে, আপনি স্মৃতির রাজ্যে আমার আর স্থান নাই। আপনাকে আমি এখানে হইতে একখানি দীর্ঘ চিঠি পাঠাইয়াছিলাম। তাহাতে অত্যন্ত জিনিসে ভিতর আমার নিজের বিষয়ে অনেক কথা ছিল। প্রত্যক্ষ ভিয়েনা হইতে পত্র আসিয়াছে কি না, আমি খোঁজ করি কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, কোন উত্তর নাই আমার ব্যাকুলতা ও অস্থি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে—প্রায় দুই মাস আপনি একেবারে নীরব। এই অবস্থার আমি কি করিতে পারি? অথবা কি উপায় খুঁজিয়া পাইব?..আপনার নিকট হইতে কোন খবর না পাইয়া আপনার লেখাগুলিও কেবল পাঠাইতে সাহস পাঠিতেছি না। আমি অবশ্য এই সঙ্গে আমায় মন্তব্য জুড়িয়া দিতেছি। ভাল না লাগিলে এইগুলি আপা আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারেন। কেন না, আমার সমালোচন হয় ত আপনার নিকট বেশ কঠিন মনে হইতে পারে।

তুর্কীদের সামরিক কলা-কৌশল সম্পর্কে আপনার নিবন্ধসমূহ পাঠ করিয়া আমি খুব আনন্দ পাইয়াছি। ইহার চেয়ে অধিকব কাজের কিছু হইতে পারে না। আমার এই চিঠি আপনার হা পৌঁছান সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না; সেইখ বেশী কিছু লিখিতে আমি বিরত রহিলাম। হাওয়ার সহিত য বলিবার আগ্রহ আমার নাই। ইহার জন্য যে-সময় আমার ম হইবে, তাহা আমি অন্য কাজে ভালভাবে নিয়োজিত করিতে পারি খুব সম্ভব এই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ এই শহর হইতে চলে যাইব। ইটালী অভিবানের আমার যে প্রত্যাশ ছিল, তাহা এ স্থগিত রাখিলাম। প্রিয় চার্লস, বিদায়। আমি যেমন আপনাকে

(২) চতুর্দশ শতকের বিখ্যাত পারসিক কবি।

স্বপ্ন রাখিরাছি, আপনিও যেন আমাকে সেভাবে স্বপ্ন রাখিবেন। ইংল্যাণ্ডে কিরিতা আপনাকে প্রায়ই আমি লিখিব এবং আমার পত্রগুলি আরও দীর্ঘ হইবে, আনন্দদায়কও হইবে।

(ব)

লণ্ডন, ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৫

আজকাল আমি চিঠিপত্র কম লিখি বলিয়া ভাবিবেন না যে, আমি আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছি। এমন নির্ভরশীল লোক আমি দেখি না, বাহার হাতে আমার পত্রগুলি দিতে পারি। পরন্তু আমার মনের মতো পত্রগুলি ডাকযোগে পাঠাইবার ঝঁকি লইতে আমি রাজী নহি। সেই সকল পত্র আপনার নিকট আর্দে পৌঁছিতে কি না, তাহাতেই আমার সন্দেহ আছে। ..ওয়ারশ হইতে গত জানুয়ারী মাসে আপনি যে পত্রখানি লেখেন, তাহা খোলা অবস্থায় আমার নিকট বিলি হয়। অসম্ভব কিছু নয় যে, আপনিও সেইভাবে এই পত্রটি পাইবেন। আইন ও রাজনীতি হইয়া আমি এতই নিমগ্ন যে, সাহিত্য চর্চায় অবকাশ আমার নাই। আমার দুইখানি গুরুত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। নিরাপদ কোন সুরোগ পাইলেই সে দুইটি আপনাকে পাঠাইব। আমার অনুরোধ, আপনি চিঠিপত্র লিখিবেন। আপনার বন্ধু আমার মনে প্রচুর আনন্দের খোঁজা জুগাইয়া থাকে। আপনি যদি ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করিতে পারিতেন কিংবা আমি জার্মানীতে, তাহা আমি কতভাবে কামনা করি। আমরা উভয়ে যদি একত্র থাকিতে পারিতাম, সেই জুই মনের আকুলতা।

সর্বোপরি, তুরস্কের দূতাবাসের দাঁড়িছ গ্রহণের কথা আমি ভাবিতেই পারি না। আমি আমার স্বদেশেই বাস করিব। আল! এখানে রাষ্ট্রতন্ত্রের ভূমিকায় আপনাকে যদি দেখিতে পাউতাম, কতই না আনন্দ হইত! ইউরোপ ও এশিয়ার রাজারাজড়াদেরও তখন ঈর্ষা করার আমার কিছু থাকিত না। বারবার বিদায় অভিবাচন জানাইতেছি।

লেডী স্পেন্সারের নিকট লিখিত পত্র

প্যারিস, ৪ঠা জুন ১৭৭০

আমার নিকট হইতে পত্রাদির এইরূপ একটি পার্সেল পাইয়া মাননীয়া মহোদয়া হৃদয় বিস্মিত হইবেন। কিন্তু গত এক মাসকাল আপনাকে কিছু লিখি নাট বলিয়া আমি মার্জনা চাঙিতে প্রস্তুত। সত্য কথা বলিতে কি, সেই সময় আমার বিশেষ কিছু লিখিবার ছিলনা। প্যারিসে পৌঁছিয়া বন্ধুবর যেভিক্সির একখানি পত্র পাই—সহে থাকে আর্চডাচেসের (অষ্ট্রিয়ার সম্রাট-কন্যা) বিবাহ উপলক্ষে রচিত একটি সুন্দর কবিতা। আমি সাচস করিয়াই বলিব যে লর্ড স্পেন্সার এইটি খুব পছন্দ করিবেন এবং সেই কাবলেই এই পত্রের সহিত তাহা জুড়িয়া দিলাম। লেখাটির দুই তিনটি ব্যঙ্গ্য ক্রটিপূর্ণ বলিয়া আমি চিহ্নিত করিয়াছি। একটি স্তবকের তাৎপর্য আমার কাছে স্পষ্ট নহে, উচাও চিহ্নিত করা আছে।

..বাকি পড়াইবার দিন রাত্রিতে এখানে যে মর্মস্বন্দর দুর্ঘটনা ঘটয়াছে, তাহা আপনি শুনিয়া থাকিবেন। এক মত ত্রিশ জনের অধিক লোক নিহত হইয়াছে। অভিজাত পরিবারের কতিপয় নরনারী নিজেদের বাড়ীতে বসিয়াই প্রাণ দিয়াছেন। আমাদের নৌভাগ্য যে, এই ভয়াবহ বিপদ্যের দুই দিন পর আমরা এখানে

পৌঁছি। আমরা আবার ইংল্যাণ্ডে বাইতে পারিলে হুঃখিত হইব না এবং আশা করি, খুব শীঘ্রই সেই আনন্দ পাইব। ভাল কথা, আমার বিরোগাত্ত রচনাটি সবে শেষ হইয়াছে। অল্প সময় মধ্যেই মাননীয়া মহোদয়াকে আমি উচা দেখাইতে পারিব, আশা করি।

বিনীত—উইলিয়াম জোন্স

এইচ, এ সুলটেন্সকে লিখিত পত্র

(ক)

জুলাই, ১৭৭৪

মিঃ ক্যাম্বেল-নামক একজন যুবক আপনার নিকট এই পত্রখানি লইয়া বাইতেছেন। এই ভুল্লোক খুবই বিনয়ী ও যোগ্যতাসম্পন্ন। আমার অনুরোধ, আপনি তাঁহার বক্তব্য ভালরকম শুনিবেন। ইনি একজন ব্যবসায়ীরূপে ভারতে বাইতে চাঙিতেছেন। কিন্তু তাহাতে পাণ্ডি দিবার পূর্বে বিদেশী ভাষা—এশীয়, বিশেষভাবে পারসিক ভাষা চর্চায় কিছু সময় দিতে তাঁহার ইচ্ছা। এই ব্যাপারে আপনি তাঁহাকে কোনরকম সাহায্য করিলে, সেই সাহায্য আমাকে করা চইল, ধরিয়া লইব এবং এই ভুল্লোক তাহার জ্ঞান বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ..এখন আদালতেই আমার সকল সময় নিয়োজিত। যে-টুকু অবসর পাউ, আইন ও ইতিহাস অধ্যয়নেই সে সময়টা নিয়োগ করি। আশা করি, আপনি আমার প্রেরিত ভাষ্যাবলী পাইয়াছেন। এখন আসি।

(খ)

অক্টোবর ১৭৭৪

সেপ্টেম্বর মাসে লিখিত আপনার পত্রখানি পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। ..আপনার পিতা ও আপনি নিজে যে আমার ভাষাসমূহের প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাতে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। আপনি লিখিয়াছেন যে, সাহিত্য সেবার ক্ষেত্রে হইতে আমার চলিয়া যাওয়া আপনার কাছে অসম্ভব, ইহাও কম বন্ধু ও ঔদার্যের কথা নয়। কিন্তু প্রিয় সুলতান, পাশার চাল দেওয়া হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আমার আর বাচাবাচিব কিছু নাই। সমস্ত পুঁথি-পুস্তক ৭ পাণ্ডুলিপি অক্ষকোর্ডে তাল মাপানো অবস্থায় আছে। একমাত্র আইন ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বইগুলি বাচিতে রাখিয়াছি। আমার পেশা (আইন) সংক্রান্ত পুঁথি-পুস্তক তাড়া অপরাপর গ্রন্থ অন্ততঃ আগামী কুড়ি বৎসর পড়িবনা, সন্দেহ নিয়াছি। কেন এইরূপ সঙ্কল্প গ্রহণ করিলাম, সেই কারণ বর্ণাইয়া আপনাকে বিবৃত করার প্রয়োজন নাই।

..আপনার বিবাহে আমার মাতা, ভগিনী এবং আমি নিজে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাইতেছি। আপনার প্রিয়তমা পত্নীকেও আমার শুভেচ্ছা জানাইতে বলিব এবং আপনার পরমপূজ্য পিতাকে জানাইব শ্রদ্ধাভিবাচন। আমষ্টার্ডামে আপনি যে আমার বাইবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, তজ্জন আপনাকে ধন্যবাদ। আমি এইমাত্র বলিব যে, এই সুরোগ গ্রহণ করিতে পারিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। বিশ্বাস করুন যে, আপনি আমার অন্তরে প্রচার সু-উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। আপনার নিকট হইতে প্রায়ই যদি পত্র পাই এক এক একটি দীর্ঘ পত্র, তাহা হইলে ইহাও চেয়ে আমার আর কিছু আনন্দের কারণ থাকিবে না। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখিবেন এবং আমার উপর প্রীতিভাব অটুট রাখিয়া চলিবেন, অনুরোধ।



—কামিনী মহাপাত্র

ভাই-বোন

আ
লোক
চিত্র



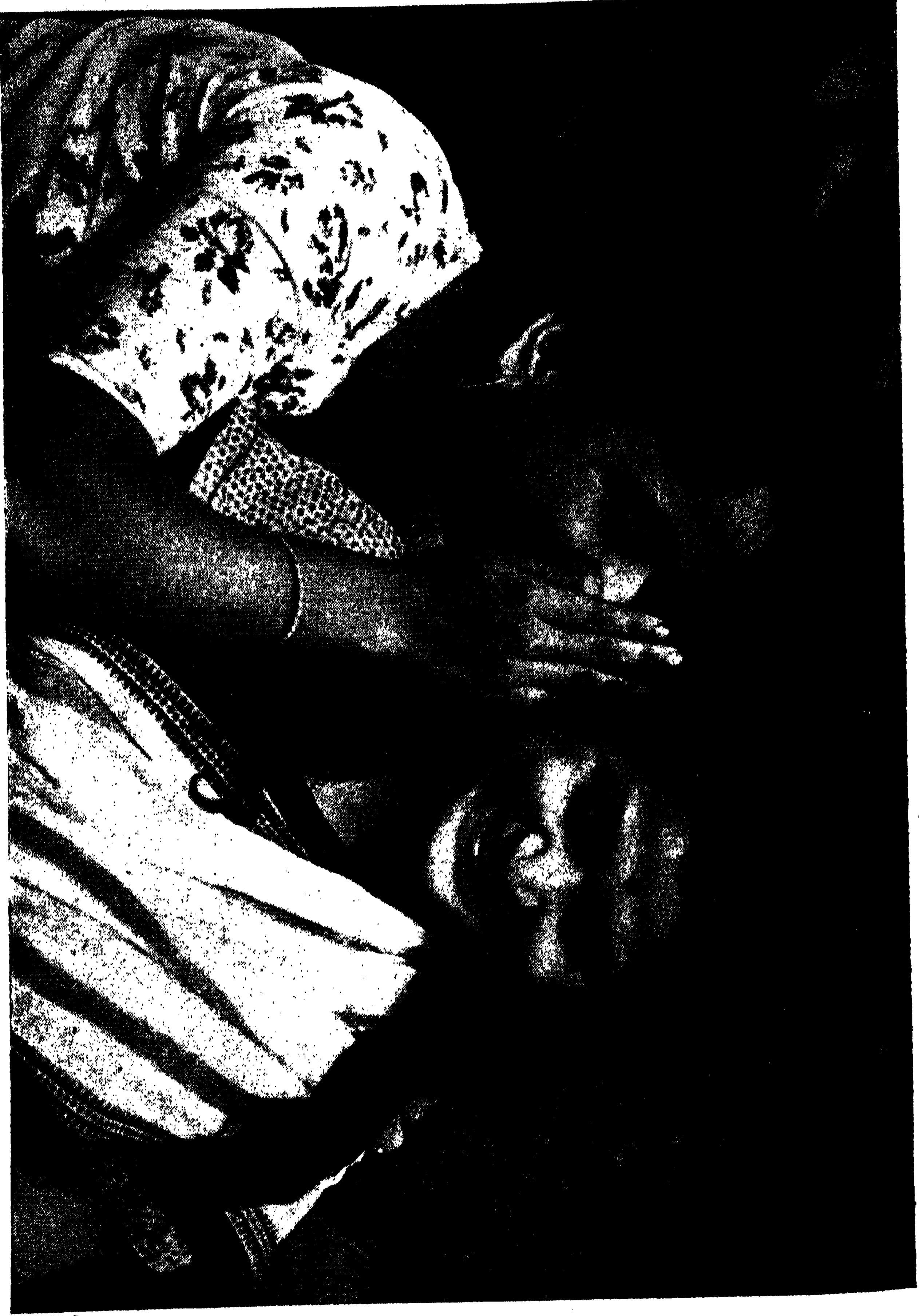
—হীরালাল মল্ল

লোভকে যে অয় করেছে

—সোবিন্দলাল দাস



କହିବା ସ୍ୱାକାଳ କାଳ



—ଶିଖି ନରକାମ



বিজন ভট্টাচার্য

৭

একজন আর একজনের কাছে বক্তৃতা নিষ্ঠুর গোপন ছিল, পুরাতন মত লুকিয়ে ছিল পাপতির ভেতর, ঠিক ততক্ষণই রাজন হয়েছিল সফোপনের। তখন ছিল হুজুমে মিলে শুধু কথা 'পাল'। মাত্র একটা কথা, ভালবাস কি না বাস, মিজের কবে জানবার বৃদ্ধবার জন্মে আজ-বাজে কত-না সহস্র কথার তাৎপা। মাত্র একটা চাচনি, একটা দৃষ্টি চেনবার জন্মে পাশাপাশি ধামুশি বসে কত ছাঁদেই না সেই লুকিয়ে দেখা। তার পর কত ত অভিসারের পর, সেই রহস্য বখন আর রহস্য বইল না কিংবা ই রহস্য বক্তৃতা না দৃষ্ট আর স্রষ্টার সামনে আর এক রহস্য খুলে ল, তখন আর নিরালা নিষ্ঠুর প্রয়োজন বইল না। একজন ধন আর একজনকে ভুবন জুড়ে দেখছে। আশে-পাশে কেউ পাখাও নেই, কিছু নেই।

এর আগে এক সঙ্গে ওদের কেউ দেখেনি কখনও। সব সময়ই ডাল দিয়ে দিয়ে। আজ আর সে সবে কান বালাই নেই। আগে মাহুকের কোঁড়ুল ছিল, এখন সে আর কোঁড়ুল নেই। কখনকে আর একজন এখন প্রকাজেই আগলে নিয়ে চলে। সত্যি হলে তো সত্যব্রতকেও দেখা বাবে পাশে। বসে বসে ওরা গল্প বলে। বড় কথা, তুচ্ছ কথা, ছেঁড়া কথা—খালি কথা বলে, লে, লুটোপুটি খায়, কখনও বা রেগেও যায়। মান-অভিমানের ঠিট ছোট পালা চলে নিজেদের মধ্যে। চলছেই। সবাই চলছে, বাও চলছে, চলবেই।

ইতিমধ্যে কতকগুলো ব্যাপার হয়ে গেছে। শুভময় এসেছিল ইতিমধ্যে একদিন অল্পদা বাবুর কাছে। সত্যি-সত্যব্রতর ব্যাপারটা এখন একেবারেই হাতের বাইরে চলে গেছে, তখন অল্পদাবাবুর কাছে এসে আপত্তি তুলেছিল শুভময়। বলেছিল, সত্যি সম্পর্কে আমার কান দারিৎ আপনার স্বীকার করেন কি না জানি না। কিন্তু সত্যি আমারই বোন। সত্যব্রতকে বিয়ে করে সে মস্ত বড় একটা ফুল করেছে জীবনে। আপনি এ বিয়ে ভেঙে দিন বাবা।

অল্পদাবাবু আগে থেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। শুভময়ের কথার ইচ্ছন পেয়ে কেটে পড়েন এখন। বলেন, বিয়ে ভেঙে দেওয়া, কোন তদ্বরলোকের কাজ হতে পারে না। এ বিয়ে ভাঙতে হলে তোমার বিয়েও আমার বিয়ে ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা আমি করিনি। ছেলেপুলে বড় হলে সব সময়ই যে তারা

বাপ-মায়ের ইচ্ছে মত ভাঙ করবে, এমন না-ও হতে পারে। তোমার এক মত। তোমার বোনের এক মত। এ কেনে আমার মতামতটা বখেট পরিমাণে প্রফের হচ্ছে না বলে আবার ছুঁধু করতে বলছো কেমন আমার ?

শুভময় তবু আপত্তি জানায়। বলে, কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না বাবা।

: আবার বুঝতে পারছি না কি, সবই বুঝতে পারছি আমি। —নইলে আমি তো স্থির করেছিলাম সত্যি বিয়ে দেবো বিশ্বতোষের সঙ্গে।

ঠিক এই সময়টাতেই সুরে সুর মিলিয়ে দিলে উত্তরাধিকারের উত্তরপথটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। বিকৃত না করে শুভময় বলে, আমিও ঠিক এই কথাই ভেবেছিলাম বাবা।

শুভময়ের দিকে তাকিয়ে একটু চূপ করে থাকেন অল্পদা বাবু। কোথায় যেন একটা সাধনা পান মনে মনে। আশ্চর্য হয়ে বলেন, বাগগে, তুমি আমি কি মনে করেছিলাম এখন সে কথা অবাস্তব। তোমার মা-ও ভেবেছিলেন এই কথাই। কিন্তু সত্যিকে অস্বীকার করে আমাদের কোন আন্তরিকতারই মানে হতো না। সুরতরাং বিয়ে হবে, হোক। সত্যি সুরা হলেই সুরা হবো আমি।— কর্মকল অনেকখানি, কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখছি অনেকখানি মাহুকের জীবনে। There are times when we have got to gulp bitter pills. Facts be lie calculations. জটপাকানো চিন্তার ডুবে গিয়ে খেঁই হারিয়ে ফেলেন অল্পদা বাবু।

বিশ্বতোষের কথা মনে পড়ে অল্পদাবাবুর। চমৎকার ছেলেটি। টেহরি গাড়োরাল থেকে মাখাসমেত তিনটে বাঘের চামড়া পাঠিয়েছে শীকার করে। ক্যাম্প ফেলে ফেলে বনে জঙ্গলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ মাসখানেক। ফিরবো ফিরছি করেও ফিরে আসতে পারছে না কলকাতায়। ফিরে এলে সামনাসামনি যে কি জবাব দেবেন অল্পদাবাবু, ভেবেই পান না।

আশা করেছিলেন অনেক কিছু। অতীতের সংশয়ও দূর হয়েছিল ইদানীং বিশ্বতোষকে দেখে। ব্যক্তিগত জীবনের অতীত সব কিছুই নিরস্রণ করে না মাহুকের বর্তমান ভবিষ্যৎ। অমিরনাথের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কতটা কি সখ্যতা ছিল, সেটা বিশ্বতোষের কিছু জানবার কথা নয়। স্থির করেছিলেন, সত্যিকে তিনি বিশ্বতোষের সঙ্গেই বিয়ে দেবেন। বিশ্বতোষকে নিয়ে কোম্পানীটা আসন্ন টেলে

লাজবেন। নতুন মূলধনের আঁকানি কঁরে ধ্যবসায়ীর পছিনসটা আরও সম্প্রদায়ণ করবেন। উৎপাদন বাড়ান দিকে দিকে বিশেষ থেকে যত্নপাতি আনিবে। কিন্তু আর কোন উৎসাহ পাচ্ছেন না বলে অন্নগা বার। সমস্ত পরিকল্পনাটাই বেন ভেঙে পড়ছে হুঁচোখের সামনে।

বিশ্বতোষ নেই। স্ত্রতরাং অফিসে যোজ একবার করে বেরতেই হয় অন্নদাবাবুকে। এক গাদা কাগজপত্রর সহী করা ছাড়াও হাজারটা কাজ, মিটিং আর ট্রাইব্যুনাল, টেশোর আর কোর্টেশন— একেবারে হিমশিম খেয়ে বেতে হয় দিনের শেষে। কর্মক্লাস্ত দিন অবসান হলে আসে তবু শুভ ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন ধুয়ে দিতে বত মনের গ্রানি। কিন্তু এখন গোটাটাই ব্যর্থতার পর্বসিত হতে বসেছে,—সবটাই একটা একটানা ক্লাস্তি।

কমলকামিনীও ভেঙে পড়েছিলেন প্রথমটা কিন্তু পরে দেখা গেল, তিনিও সামলে নিয়েছেন আঘাত। সতীকে পাশে নিয়ে এখন তিনি সারা শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পাটি দিচ্ছেন। জিনিষ কিনছেন। বাড়ীতে জুয়েলার্স আসছে, দর্জি চুকে, ডেকরেটর এসে মাণকোপ করে বাছে—সবই শুভাবধান করছেন কমলকামিনী। আর থেকে থেকেই ছুটে বাছেন শ্রীরামপুর; সত্যজ্ঞতকে ধরতে, স্বর্ণলতিকার আর চিত্রলেখার সঙ্গে গল্প করতে, মামা হরপ্রদায়ের সঙ্গে বিবাহ সংক্রান্ত ছুটো কথা বলতে। সত্যজ্ঞতর মা স্বর্ণলতিকাকে তাঁর অসম্ভব-ভাল লেগেছে। সত্যজ্ঞতর চাইতে সুপাত্র নেই তাঁর চোখে।

এ বাড়ীতে কন্ঠিন্‌কালেও নহতং বসে নি। কমলকামিনী এবার রত্ননর্গৌকি বনাবেন দেউড়ী জুড়ে। শুভবিবাহের প্রস্তাবনা থেকে বরকনে বাজার শেষ বিদায়কণটি পর্যন্ত সেরা বাজিয়েরা এসে শানাই বাজাবেন রাগরূপ ধরে ধরে। সতীর ফরমায়ের আছে ছুটে—আহিরী তৈরো আর ললিতপকম। তার অনেক দিনের সখ।

৮

সতীর বিয়ের তিন দিন আগে হঠাৎ একদিন কলকাতায় ফিরলো বিশ্বতোষ। কোনরকম খবরবার্তা ছিল না, স্ত্রতরাং কোন গাড়ীরও বন্দোবস্ত ছিলনা, কোন লোক-ও যায়নি ট্রেশনে।

কুমায়ূনে প্রচণ্ড শীত এসময়ে। তোরাজে থেকেছে আর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছে ইচ্ছামতো, শীকার করেছে খেরালধুসীতে। এক মাসে খাদ্য করে বাবার কথা। কিন্তু শরীরটা-ই বেইমানী করেছে। ক'-দিন থেকেই বেজুত বাচ্ছিলো দেহ। অর-অর ভাব। গাড়ীতে বধন ওঠে, তখনই গা গরম। হাওড়া ট্রেশনে নামলো বিশ্বতোষ বেশ টেম্পারেচার নিয়ে। রক্তবর্ণ চোখ। মাতাল-মাতাল ভাব, হিঁড়ে পড়ে বাছে মাথা। সতীর বিয়ের কার্ড পৌঁছবার পর থেকে শারীরিক অবস্থা এই একই রকম চলেছে। মহাউষিগ পিতা অমিয়নাথ।

শরীর বা মন, কোনটাই বশে নেই বিশ্বতোষের। প্রথমটা ভেবেছিলো বিয়েটা একেবারে পার করে ফিরবে। কার্ডটা বেনিন প্রথম পৌঁছলো পিওনের হাতে, চোক মাইল উজিরে সেদিন রাতে একটি সুহৃৎের অস্ত্র-ও বিজ্ঞান নেয়নি বিশ্বতোষ। সারারাত জঙ্গলে জিপ নিয়ে স্পট করেছে, জানোয়ার আর বেথড়ক ওলী চালিয়েছে।

গোলমাল একটা হয়েছে কোথায়, নিজেই বুঝতে পারছিল। কাজবিলখ না ক'রে পরদিনই ক্যাম্প ওটিয়ে চলে আসে শাশীখেত। তিন দিন মুসৌরীতে ছিলো। কিন্তু ভাল লাগলোনা। ডিক্‌স্টা বেকী হয়ে বাচ্ছিলো। আচার ব্যবহারে-ও বেচাল হয়ে পড়ছিলো পাটিতে। একদিন নাচতে গিয়ে বলা নেই কওয়া নেই, এক মেমসাহেবকে ধাক্কা দিলো নাচেব ফ্লোরেই। বে-ইচ্ছতের একশেষ। কি ভাগ্যে হোটেলের ম্যানেজার চেনাজানা মামুষ। হাত জোড় ক'রে 'সিষ্টার সিষ্টার' ক'রে বাগ মানিয়ে পাঠিয়ে দিলো কলকাতা। ট্রেশ থেকে-ই গা গরম।

বাড়ী ফিরে প্রথমমেই টেলিফোনে সতীকে সন্তাবণ জানায় বিশ্বতোষ উচ্ছসিত হয়ে। সতীকে কথা বলবার কোন সুযোগ না দিয়েই অন্নদা বাবুকে খবরটা দিয়ে দিতে বলে যে অন্নদাবাবু সে অন্নদাবাবুর সঙ্গে সেদিন আর দেখা করতে পারবে না। সুবিধেমতো পরে দেখা করবে। সস্তবতঃ অফিসেই।

এত উচ্ছাসের ব্যাপারটা বুঝলো সতী। কিন্তু এ কথাটা আলোচনার বিষয়বস্ত নয় বলে একেবারেই চেপে গেল। অন্নদা বাবুকে, বিশ্বতোষের প্রত্যাবর্তনের খবরটা শুধু পৌঁছে দিলো।

অন্নদা বাবুর মনটা আগে থেকেই টকটক করছিলো। খবর পেয়ে ছুটে আসেন সতীর কাছে।

: আমি জানি বিশ্বতোষ দেখানেই থাকুক, ঠিক ফিরে আসবে। সতীর বিয়ে হচ্ছে—তা কি বললে? অন্নদা না কি বেন বলে পাঠালে?

সতী নিঃশ্বেষে কঠে জানায় খবরটা অন্নদা বাবুকে। আরও জানায়, বলেছেন অফিসে দেখা হবে।

অফিসে দেখা হবে—হেঁয়ালির সুরে কথাটার পুনরুক্তি ক'রে অন্নদা বাবু সতীকে বলেন—

: তা, তুমি বাড়ী আসতে বলতে পারলে না?

: শুনছো অন্নদা।

: ও অন্নদা। অন্নদাটা আর কি? অন্নদা...

কথাটা বলতে বলতে চিত্তাগ্রস্ত হয়ে বেরিয়ে বান অন্নদাবাবু, বেন তাঁর নিজেরই অন্নদা করেছে। অন্নদা বাবুকে দেখে মামা হর সতীর।

সতী জানে, অন্নদা বাবুর ছুঃখটা কোথায়। কিন্তু এ ছুঃখ দূর করার কোন ক্ষমতাই নেই সতীর আজ।

বিকেল নাগাদ নেমস্তন্ন করতে বেরবার কথা ছিল সতী আর অন্নদা বাবুর। কতকগুলো বাড়ীতে অস্ত্রতঃ নিজে গিয়ে নেমস্তন্নপত্র না দিলেই নয়। সামাজিকতার কথা ছেড়ে দিলেও আন্তরিকতার প্রস্ন জড়ানো। স্ত্রতরাং সতীকেও বেরতে হয়।

নির্দিষ্ট কর্মসূচী অন্নদাবাবু সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণকার্য সমাধা করে সন্ধ্যা নাগাদ অন্নদাবাবু সতীকে নিয়ে বিশ্বতোষের ওখানে বান। ধুসী হয়ে অমিয়নাথ সতীর সঙ্গে কিছুকণ গল্পগল্প করলেন। কানে ভালো শুনতে পান না, তাই মাঝে মাঝে ইয়ারকোমের টিউবটা ছুঁড়ে দেন সতীর দিকে। সেকালের আর এ কালের বিয়ে নিয়ে অমিয়ে তোলেন আলোচনা। বলেন—

এখন বেন সবই রসহীন। কবিতার কাব্য নেই। বিয়ে একটা কটমটে হুজিপত্র। তা-ও কতকটা কাটকা খেঁবা। লাগলো ত'

ভাল। আর কয়েক গেলে তুল হয়ে গেল সংসার। আগে ঠিক এমন ছিল না। বৈদ্যা থাকে সঙ্গেও ঐক্যসূত্র মিল খরে খরে একজন আর একজনের কাছে আসবার চেষ্টা করতো। এটমবোমার যুগে তেলেরেয়ের হাতে সে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় কই? মন্ত্র পড়ে যে বিয়ে করবে সে সময়ও কম। বিয়ে হচ্ছে কর্ণে সেই করে। সাকীসাবুদ রেখে। ভাড়ি।

অমিয়নাথের কথা শুনে সতী হাসে। বলে: আমি কিন্তু বিয়ে করছি জ্যাঠামশাই, মন্ত্র পড়ে, বাজনা বাজিয়ে। সুতরাং আপনাকে সাকী হচ্ছেই হবে।

অমিয়নাথ সন্দেহে বলেন: বাব নিশ্চর বাব।

অন্নদা বাবুকে এগিয়ে দিতে বিধতোষ এসে হাজির হয় বাবাব ডুরিকমে। অন্নদা বাবু বলেন: কই, বিধতোষকে নেমন্তন্ন করলে না সতী?

হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ায় সতী। চোখে-মুখে সলাজ একটা মিনতির ভাব। কোন কথা বলে না। অন্নদা মুখখানা হেলিয়ে রাখে শুধু এক পাশে।

বিধতোষই কথা বলে: নিশ্চরই বাবো।

বাকি কথাগুলো হুড়ুড় করে এসে বুক আর দম আটকে কেল। এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না বিধতোষ। অন্নদাবাবু সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে যায় ডুরিকম থেকে বাইরের বারান্দায়।

বাজিটা ছিলো নিজের সঙ্গেই। হারজিতের কথাটাও আর কেউ জানে না সংসারে। এমন কি সতীও না। তবু এড়ানো যাচ্ছে না দৃষ্টি। নিজেরই চোখ। তবু সেই চোখে যেন অল্প হাজারটা চোখ সারাক্ষণ নিরীক্ষণ করছে বিধতোষকে। সে স্বপ্নের দৃষ্টিতে ঘরা পড়ে গিয়েছে মর্মস্তম্ব একটা সত্য। জিততে গিয়ে যাচ্ছেতাই ভাবে বাজি হেরেছে বিধতোষ। আর বাজি হেরে এখন জন্ম হয়েছে, যে দাঁড়াতেই পারছে না স্থির হয়ে।

বেসের খোড়া হ'লে নিঃসন্দেহে কপালে যিভসবায়ের গুলী স্মৃতি করা হতো।

৯

সতীর বিয়েতে খুব ধুমধাম হলো। রাজারাজড়া থেকে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বৈদেশিক রাষ্ট্রপুত্র, কানে হীরে-পর্য চেষ্টায়, কোটিপতি শেঠ সবাই বিবাহমণ্ডপে এসে আশীর্বাদ করেন নববধূকে। বিধতোষ এলা একটু রাত করে। এক মুহূর্তের জন্তে মেসেদের ঠেলে বাসরে চুকে সত্যব্রতের হাত দিয়ে সতীর গলায় পাঁচ হাজার টাকার একটি বস্ত্রহার পরিবে দেয়। সত্যব্রতকে কানে কানে বলে বাব, পরে দেখা হবে ভ্রাদার।

মেসের বিয়ে। অন্নদাবাবু পরসা খরচ করেছেন জলের মতো। নিরামিষ হবিষ্যায় থেকে দশ বারো কোর্সের সায়েরীখানা সবকিছুই করাও বন্দোবস্ত। অতিথি অভ্যাগতেরা স্বজনবর্গ সহ ভুরিভোজনে পরম আপ্যায়িত হয়ে বস্ত্র বস্ত্র করে যান। ক্রিয়াকর্মে কোথাও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। সামান্ত বা সুর কাটে তা সত্যব্রতের মাথা চরপ্রসাদের আচরণে। উদয়লোক হঠাৎ ঠিক বরাহুগমনের আগে বরপুত্রের কর্তৃত্ব নেজে পনেরোহাজার টাকা মোড় দিয়ে বের করে যেন অন্নদা বাবু কাছ থেকে। অন্নদা বাবু প্রথমটা বুঝতেই

পারেননি। পরে দাবীর কথাটা বুঝে নিজেই বিশেষ লক্ষিত হয়। হরপ্রসাদকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেন, না না আমারই হয়তো অভাব হয়ে গেছে। অতটা খেরাল করিনি। যেহীন বিধবাভাব, সহায়স্বলহীন, ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন। বেশ, ও-টাকাটা আমি দিয়ে দিছি, কিন্তু দেখবেন ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয়।

ক্যাপিটাল দেখেছেন অনেক, কিন্তু ক্যাপিটালিষ্ট দেখেননি হরপ্রসাদ। মেজাজ দেখে হতবাক হয়ে যান তিনি। কতাসম্প্রদান পর্বের আগেই বাধক্রমে গিয়ে চেকটা পড়ে দেখেন। ঠিকই আছে টাকাটা, কিন্তু এ্যাকাউন্টপেরী হচ্ছেন বর্ণলতিকা দেবী।

ভুছ ঘটনা। তবু শাদাকরাসের ওপর দোয়াত ওল্টানো কালির দাগের মতই ব্যাপারটা চোখে লাগে অন্নদা বাবু। ইচ্ছে ছিলো ছেলেকে স্বতন্ত্র একখানা বাড়ী দেবেন, গাড়ী দেবেন, নগদ ক্যাশ-ও কিছু হস্তান্তর করবেন সত্যব্রতের নামে। কিন্তু এই ঘটনার পর সেই সব আন্তরিক ইচ্ছে আর কোন মূল্যই রইলো না অন্নদা বাবুর কাছে। তবে যেহে সতীকে দিলেন হ'হাত ভরে। উপরন্তু কারেন্ট এ্যাকাউন্টে জয়েটনামে পঞ্চাশ হাজার টাকার একখানা ছোট পাসবই বিয়ে দিলেন সতীর সঙ্গে। সরকার হলে কাজে লাগবে। কনকাজলি চলে দেবার আগে মোটকথা লক্ষ টাকার বুর দফাওয়ারিভাবে লিষ্ট করে দেওয়া হয় সতীর সঙ্গে-ই।

অর্ধেক রাজস্ব আর রাজকন্ডা নিয়ে সত্যব্রত প্রথমটা ওঠে জীরামপুরে মামার বাড়ী। সপ্তাহখানেক পর সেখান থেকে হানিমুনে ওয়ালটেরার। সমুদ্রসৈকতে এক মাস অহোরাত্রি বাসর উদ্ভাপনের পর কলকাতায় এসে 'কুইন্স প্যালেস'-এ স্ট্যাটভাড়া। সতীর জীবনের সবখানি, সবটুকু আনাচ-কানাচে তখন জুড়ে রয়েছে সত্যব্রত।

পরিচর আগেই হয়েছিলো মনোহরপুকুরের স্বত্ববাড়ীতে। একদিন আলাপ হলো সত্যব্রতের বিধতোষের সঙ্গে। সতীর মুখে বিধতোষের কথা আগেই খানিকটা শুনেছিলো সত্যব্রত। শুনেছিলো বড়লোকের ছেলে, মেজাজী মাহুব। ভীষণ দাত্তিক, আর অহংকারী।

কিন্তু বিধতোষের সঙ্গে আলাপ করে সত্যব্রতের সেরকম মনেই হলো না। বিধতোষ বলছিল: একখানা গাড়ী না হ'লে তো দেখছি নড়তে-চড়তেই অসুবিধে হচ্ছে আপনাদের। অন্নদাবাবু যে কি যুগের লোক বুঝতে পারি না। মেসের বিয়েতে এত খরচ করলেন আর বাবাজীকে একখানা গাড়ী দিতে পারলেন না? বলবেন না মশাই, সেনিগিটি, সেনিগিটি, বাধ'কা, আসল কথা খেরালই নেই। মুখ ফুটে বলুন। দেখবেন জিত কেটে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়বেন। সকালবেলা উঠে দেখবেন একখানার জারগার হ'খানা গাড়ী আপনার দোরগোড়ায় রাখা রয়েছে। কিন্তু জামাইমাহুব হয়ে সে কথা বলেনই বা কি করে আপনি? 'বস'-এর আবার সবই ভাল। শুধু একটু—বুঝলেন না? ঘরের লোক সবই জানবেন ক্রমে ক্রমে।

মন্তব্য করে হাসিমুখে চূপ করে বসে বিধতোষ। কিন্তু কথাবার্তা, হাকভাব, আচার আচরণে এমন একটা আন্তরিকতা দেখায় যে সত্যব্রত মুগ্ধ না হয়ে পায় না। এই লোক দাত্তিক অহংকারী? সতীর কথা মনে করে আপনি মনেই হাসে সত্যব্রত। মনে হয়, বুঝতে তুল করেছে সতী। বড়লোকের মেয়ে। বাস ছিলো

পল্লবভূমিয়ারের স্তম্ভ চূড়ায়। মাহুয় চিমতে ফুল তো তার হতেই পারে। কতটুকু আর দেখেছে সতী।

হামিলটনের বাড়ীর সিগারেটকেস খুলে ধরে সত্যব্রত বিশ্বতোষের সামনে। বিশ্বতোষ পা তুলে বসেছিলো সোকার হেলান দিয়ে। ভাড়াভাড়ি উঠে ব'লে হাসিমুখে একটি সিগারেট ফুলে নের। লাইটার জ্বলে সত্যব্রত-র সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজে ধরায়। চার্চ'মান। হ'লে জ্যাগটা দেখে ঘুরিয়ে। সত্যব্রত বলে—আমার এই জ্যাগ।

: বড় কড়া মশাই, বাই বলুন।

: আর কোন জ্যাগ খেতেই পারি না।

: জানা রইলো। জামাই মাহুয়। যদি কখনো পদধূলি কেন পর্ষীবখানায়।

: আপনি বড় বিনয় করছেন। বলুন, কবে যাবো?

: বেদিন খুসী। শুধু আগে থেকে আমি একটু জানবো। জানবো, কেন না বুঝেনই তো? খেটে বাই...পাঁচ জনের সঙ্গে সম্পর্ক, কে কখন এসে পড়ে। সেক টেলিফোনটি তুলে একটু জানিয়ে দেবেন আমাকে। ভালো কথা। গাড়ীর কথা হচ্ছিলো, একখানা গাড়ী না হ'লে তো আপনাদের ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে নড়তে চড়তে। এক কাজ করুন না কেন?

সত্যব্রত না হেসে পারে না। বলে, বলুন।

: না না, বলবেন আপনার। আমি শুধু সবিনয়ে প্রস্তাবই করতে পারি—বলতে পারি না। যদি বন্ধ বলে স্বীকার করেন, তবে প্রস্তাব এই—আমার ছ'খানা গাড়ী। এখন ছ'খানা-ই তো আমি সুপ'ং চেপে বেড়াচ্ছি না।

: না নিশ্চয়ই নয়, হেসে ফেলে সত্যব্রত।

: আচ্ছা, তা তার একখানা আমি স্বচ্ছন্দে আপনার ব্যবহারের জন্যে দিতে পারি আপাতত। নতুন গাড়ী—চালু থাকলে ইঞ্জিনটাও ভাল থাকবে। আমি একুশি জানিয়ে দিচ্ছি।

: কি?

: আবার কি মশাই, গাড়ী! সতীকে বলবেন না কিন্তু দোহাই আপনার। 'বস'-এর মেয়ে ইজ্জতের ব্যাপার-স্বাপার থাকতে পারে। আমার চাকরীটি নট হয়ে যাবে পরের দিনই।

সত্যব্রত কিছু বলবার আগেই করিডোরে গিয়ে কোন তুলে নেয় বিশ্বতোষ এবং ডাইভার ইসমাইলকে বখারীতি নতুন যোভারগাড়ীখানা নিয়ে মনোহরপুকুরের বাড়ীতে অন্নগাবাবুর নতুন জামাই-এর হাতে সোপর্দ করে পুনরায় না পর্বন্ত হজুরে হাজির থাকতে নির্দেশ

দেয়। টেলিকোমটা মেয়ে আসতে বড়জোর ছ' মিনিট লেগেছে বিশ্বতোষের। এসেই দেখে অপরূপ লাভ নিয়ে সতী সত্যব্রতর বুকের ওপর আধশোয়া হয়ে কোর্টের বোতাম খুঁটতে খুঁটতে কি বেন বলছে কানে কানে। আচমকা চুকেই একেবারে অপ্রত্যাশিত অবস্থা। মুখ ঘুরিয়ে ভাড়াভাড়ি বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। সতী কিন্তু এতটুকু চমকায় না। তেমনি নিলাজ ভঙ্গিতে বুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কথা বলে সত্যব্রতর মুখের ওপর। ততক্ষণ বোকার মত শিতর চাপল্য নিয়ে ভাড়াভাড়ের কাইটিং মাহুয়র আনাগোনা লক্ষ্য করে বিশ্বতোষ কাচের একোয়ারিয়ামে। এর আগে মাহু ছিল ডিনটে। দুটো কিং একটা কুইন। এখন এসে ঠেকেছে এক জোড়ার। একটা কিং আর একটা কুইন।

পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়ায় বিশ্বতোষ বারানায়। সত্যব্রত দেখে ঘুরে ঘুরে—বাইরে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। পর্দার নীচ দিয়ে এখনও ওদের পা দেখা যাচ্ছে। সত্যব্রতর স্যু-জুতোর কাছেই চিত্তিয়ে আছে সতীর ছ'খানা পা। এখনও ওরা কথা বলছে তেমনি। সত্যব্রতর ভারী গলায় আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কানে বিশ্বতোষ। সতীই কথা বলছে বেশী। অল্পনয় করে করে। প্রার্থনার সুরে কি একটা আদ্য করছে বেন। মীড় খেয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে সত্যব্রতর মস্তুরের অপেক্ষায়। ভালবেসে কথা। বলছে বলেই হয় তো এমনি মিষ্টি লাগছে শুনতে সতীর কথা ভালবাসলে নাকি মেয়েরা অল্প রকম হয়ে যায়। তখন নাকি তাদের চলনে ছন্দ আসে, মাহুর্ষ্য আসে কথায়। বিশ্বতোষকে ভালবেসে বিয়ে করলে সতীর এ রকম হতো কি না, কে জানে?

হঠাৎ বিশ্বতোষের মনে হয়, সে যে এখানেই ছিল, ফুলের প্রেমের ওরা। নইলে কথা বলতে বলতে উঠে এসে এতক্ষণ যে বাইরে কাড়িয়ে আছে বিশ্বতোষ, সে কথা ওদের খেয়াল-নেই কেন? অপমান আবার তেমন করে করে অল্পকে? খেয়াল আসে নিজের ওপরেই। আর এখানে বাইরে ঘুরে বেড়ানোটা নিজের চোখেই বিসদৃশ ঠেকেছে।

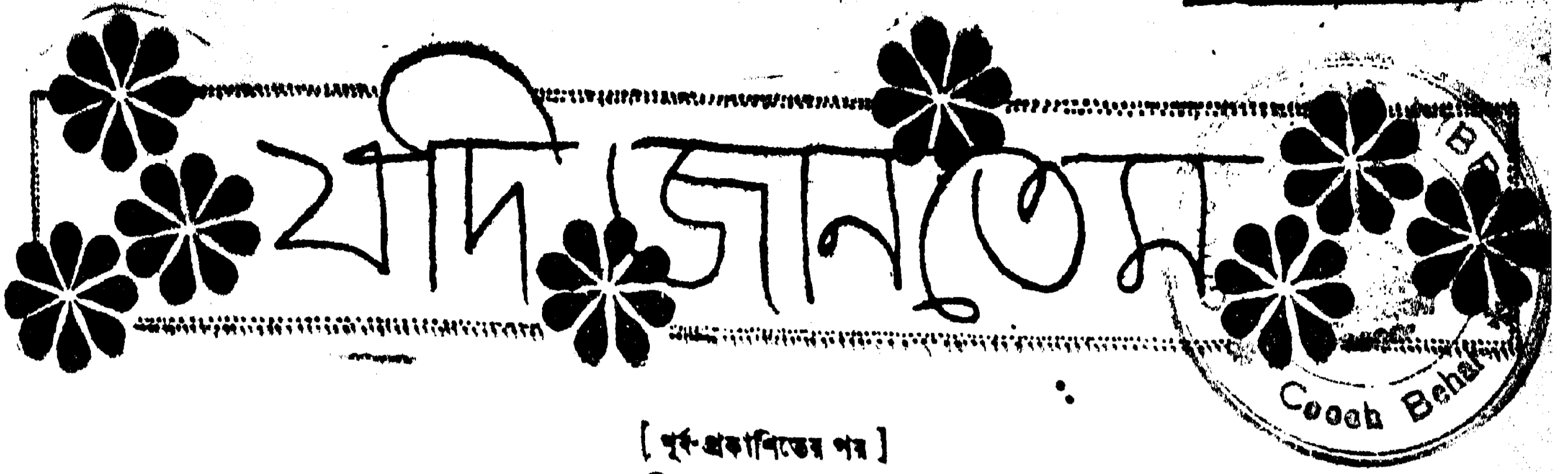
আঙলের চাবি রূপোর শিকলিতে ঘুরোতে ঘুরোতে সিঁড়ি ধরে নীচে নামে বিশ্বতোষ। রাত বাজে মাত্র ন'টা। এত সকাল সকাল বাড়ী ফিরে গিয়েই বা কি করবে সে? ভাবতে ভাবতে গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দেয় বিশ্বতোষ।

গড়িয়ে যায় হর্ডমন। সামনের হেডলাইটের চোখ এলোমেলো যে দিকে যায়, সেই দিকেই চলে গাড়ী। [ক্রমশঃ।

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিমূল্যের দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধ-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা বেন এক দুর্বিবহ বোঝা বহনের সামিল হয়ে কাড়িয়েছে। অথচ মাহুয়ের সঙ্গে মাহুয়ের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বাধিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকার্যতায়, আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে সারা বছর ধ'রে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একবার

'মাসিক বসুমতী।' এই উপহারের জন্য স্মৃতি আবারও ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে খুসী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরণের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এক এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যে-কোন জাতব্যের জন্য লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

এবারেও কিছু নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনা হিমালি।

আরও দিন দশেক পর্যন্ত বৈধব্য অটুট বেখেণ্ড বধন ওদের কোম খবরাখবর পাওয়া যায় না তখন সে ছটকট করে বেড়ায় মনে মনে।

—না না, অস্ত কোন কারণ অবস্ত নেই। শুধু একজনের অসুস্থতার সংবাদেই যেন মনটাকে এতটা চঞ্চল করে তুলেছে। যে কোন একজন পরিচিত মানুষের প্রতি মানুষমাত্রেই এ অতি স্বাভাবিক মমতা।—একবার শুধু জেনে আসতে হবে রঞ্জনার কী হয়েছিল আর এখন সে কেমন আছে। তাছাড়া এত কথা শোনবার পর একটা ধবর পর্যন্ত না নিলে সেটা ভারী অভদ্রতা হয়ে যায় না কী?

নিজের মনটাকে অনেক আঁধি ঠেরে বিকেলবেলার বাড়ী থেকে রওনা হল হিমালি। মলিভিলায় গেট থেকে একটু আগে থেমে চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করলো গাড়ীটা। তারপর নিঃশব্দ চরণে এগোলো গেটের ভিতর।

বৈঠকখানাটা অন্ধকার। উপরস্তলার উজ্জলতাও লক্ষ্য করবার মত নয়। স্বল্পালোকিত মলিভিলাকে একান্ত প্রহেলিকাময়ী বলে মনে হল আজ। তার বিবরণ পরিবেশে কী যেন একটা অশুভ সংবাদ প্রতীক করে আছে।

স্বারপ্রান্তে তারই অদৃশ ইংগিত হিমালির পা' ছটোকে ভারী করে তুললো যেন। একবার মনে হল নিঃশব্দে যেমন এসেছে তেমনি কিরে যায়। কিন্তু তাও পারলো না হিমালি। এতদূরে এসে আবার কিরে বাওয়াটা নিজের কাছেই কেমন যেন অদুত বলে মনে হল।

এমনি দোরনা অবস্থাতেই সিঁড়ির তলাটার ঠাঁড়িয়েছিল হিমালি। হঠাৎ ভজহরির নজর পড়লো তার দিকে।

পরম হৃৎকের একটা পেয়লা নিয়ে ত্রস্তপায়ে বারান্দার থেকে উপরস্তলার দিকে চলেছিল ভজহরি। সিঁড়ির গোড়ায় হিমালিকে অমন কুন্তের মতন ঠাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালো সে। তারপর কোঁচার কাপড়টার চোখ ঢেকে কেঁধে উঠলো হ-হ করে।—আর কী দেখতে এলেন গো দাদাবাবু! সব শেষ হয়ে গেছে যে।

হিমালি ভক্তিত। একবারও তার মনে আসেনি এমন একটি ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা। রঞ্জনা নেই? অমন ফুলের মত পুন্দর যেসেটা এত দীর্ঘ পৃথিবীর মারা কাটাণো? না না, এ সময়ে

পরমেশবাবু বা মলিনা দেবী কারো সামনে গিরে দাঁড়াবার সাহস নেই হিমালির। এইখান থেকে কিরে বাওয়াই বরং ভালো। এ শোকে সাহসনা দেবারি স্পর্ধা তার নেই।

ভজহরিকে কী বলবে, তাই বোঝহয় ভাবছিল হিমালি। কিন্তু ততক্ষণে শোকের প্রথম বেগটা সামলে নিয়েছে ভজহরি। চোখটা একটু মুছে সে আবার বলে—শরীলটা তাঁর অনেকদিনই কাছিল হয়েছিল কী না, ততখানি পথ আনাগোনার ধকল সইল না আর। দিদিমণিকে নিয়ে সেই যে পশ্চিম থেকে এসে শয্যে নিলেন মাঠাকরণ—আর মাথা ভোলা হলনি তাঁর।...এমন সোনার সংসারটা ভানিয়ে দিয়ে চলে গেলেন...কী মনিব হারালুম গো দাদাবাবু, মানুষ নয় দেবতা। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো ভজহরি। অনেক দিনের লোক সে। বাস্তবিকই ভালবাসে মনিবকে।

ওর কথা শুনতে শুনতে হিমালির গুলিয়ে-ওঠা মাথাটা ঠিকিয়ে আসে আবার। রঞ্জনা তাহলে মারা যায় নি—মারা গেছেন মলিনা দেবী।

ব্যাপারটা মর্মান্তিক হৃৎকের। কয়েক মিনিট কথা বলতে পারে না হিমালি। মাতৃরূপা মানুষটির জন্ম অত্যন্ত বেদনা অহুতব করে মনে মনে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাটাও সে হিরমস্তিকে অহুতব করে যে রঞ্জনার মৃত্যুর চেয়ে এ তবু মন্দেয় ভালো। কারণ, মলিনা দেবী বেঁচে থেকে যদি রঞ্জনা মারা যেত তবে মলিনা দেবীর পক্ষেই তা হত মরণাধিক বস্ত্রণ।

তবু এ আকস্মিক সংবাদে সমস্ত মনটা অসাড় হয়ে যায়। মুহূর্তে সে ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করে—কবে এমন হোল?

—আজ তিন দিন। আপনি কী জানতেন না দাদাবাবু? মাথা ছুলিয়ে কোনমতে একটা অস্পষ্ট না বলে ভজহরির পিছনে পিছনে উপরস্তলার উঠে আসে হিমালি। অবশ পা ছটোকে বিবেকের তাড়নার চালিয়ে নিয়ে আসে জোর করে।

দক্ষিণের খোলা ছাদে অন্ধকারে মানুষ বিছিরে বসেছিলেন রঞ্জনা আর পরমেশ। ভজহরির পিছু পিছু সংকুচিত চরণে সেখানে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো হিমালি।

তারপর হৃৎকের কাপটা নামিয়ে দিয়ে ভজহরি নীচে চলে গেলে বণ করে বসে পড়লো মানুষের এক প্রান্তে।

ও যেন নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায় ওখানকার উজ্জ্বলশহীন শোকসভায়। সাহসনা দিয়ে নয় নিজে শোকছাড়ার অংশগ্রহণ

করে ওখানকার, বেদনাক্ত পরিবেশের তার লাগব করে দিতে চায়।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পরমেশবাবু প্রথম কথা বললেন—কিছু মনে করো না হিমালি, আমারই উচিত ছিল তোমাকে একটা খবর দেওয়া। কিন্তু একলা মাতুল—কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল তাড়াতাড়িতে। তা না হলে—

—আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আমি মোটেই ধারণা করতে পারিনি আপনারা এর মধ্যে কিরে এসেছেন। আমারই উচিত ছিল একটা খবর নেওয়া। কিন্তু এ রকম বে হতে পারে, তাই তো আমার ধারণার আসেনি কোনদিন।

—না, বা কোনদিন তাবি না তাই যেন আমার জীবনে পর-পর হয়ে চলেছে।—খুঁকীরও শরীর খুব খারাপ। খুব অস্থির করেছিল সেখানে।—ঠিক, তুমি ছুটা খেলে না মা? ওটা বে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল একেবারে।

হাঁটু ছোটোকে বুকের কাছে মুড়ে বসেছিল রঞ্জনা। এবার সে পা ছোটো নামিয়ে বসে ছুঁকের পেয়ালাটা হাতে তুলে নেয় কোন কথা না বলে। একটু পরে শূভগর্ভ পেয়ালাটা আবার নামিয়েও রাখে তেমনি নীরবে। হিমালি লক্ষ্য করে ওর ছুঁ খাওয়ার ভঙ্গীটা যেন বস্তুর মত নিষ্ক্রিয়।

আরও কিছুক্ষণ সময় চলে গেল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। পরমেশবাবুর ব্যয়স হয়েছে, বোধহয় সেই কারণেই অল্পসময় তিনি একটু বেশী কথা বলেন। কিন্তু আজ তিনিও বিবাদগস্তীর।

আর একটু কিছু বলা উচিত বুঝেও সারাটা সন্ধ্যার মধ্যে বলবার মত একটা কোন কথা খুঁজেই পেলো না হিমালি। শুধু হাতড়ে খুঁজে বেড়ালো মনের ভিতরটা।

আর রঞ্জনা? যে কিছু বলতে চায় না। শুনতেও চায় না কিছু। এমন কী নিজের অস্তিত্বটাকেও লুকুতে পারলে সে বাঁচে। শুধু হিমালির সামনে থেকে নয়—সমস্ত পৃথিবীর স্রষ্টা থেকে নিজেকে ঝিয়ে নিতে পারলেই সে আজ সুখী হয়। তার সম্বন্ধে প্রত্যেকটি জনালোকের অবশ্যস্বামী কৌতূহলের সমুখীন হওয়ার চেয়ে দুর্ভোগ আর কী থাকতে পারে? বিশেষ করে এই যে হিমালি। কী জানাতে এসেছে ও? সহানুভূতি না করণা? কী নিছক একটু চামালা দেখবারই লোভ আছে ওর? একটু প্রশ্রয় পেলেই আরও পাঁচজনের মত ও'-ও কী জেরা করতে শুরু করবে না?

—এতদিন ছিলে কোথা?

—কেমন ছিলে?

—তারপর? কিরলে কেন?

—একা দেখছি যে?

—না না রঞ্জনা পারবে না। এ ধরণের কোন প্রশ্ন বরদাস্ত করতে পারবে না সে।

এত কাণ্ডের পরও মুখ পুড়িয়ে সংসারের যে মিষ্টতাটুকুর লোভে সে ফিরে আসতে চেয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস মায়ের স্নেহটাই তো হারিয়ে কেলেছে সে। আর তার দরকার নেই পরিচিত পৃথিবীর স্নেহ পরিবেশে। তার চেয়ে অনেক ভালো সকলকার স্রষ্টা থেকে সরে থাক রঞ্জনা—নিজেকে নিয়ে পালিয়ে থাক চিরদিনের মত। এমন একটা আয়নার চলে থাক সে কোথায়

তাকে কেউ চিনবে না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে কেউ তাকে বিরত করে তুলবে না—সুজনকে বিরত করে সে তুল করেছিল কী না সেই বিষয়ে।

যদি তুমিই করে থাকে তবে তার জন্তে কী হাঙ্গুল দিতে হল তাকে?—তা নিয়ে কোন জবাবদিহির দায় থাকবে না রঞ্জনার। কিবা যদি তুল না করে থাকে সে তবে এককাঁড়ি গরনাকাপড় ছাড়া আর কী পেয়েছে সুজনের কাছ থেকে? তার একটা তালিকা করে দিতে হবে না জগতের লোকসবকে? নিজের জীবনের জমাখরচ লাভ লোকসানের হিসাব রাখিল করতে হবে না অত কারো কাছ।

সেই ভালো—বা হোক একটা চাকরী নিয়ে একেবারে অচেনা কোন বিদেশে চলে যাবে রঞ্জনা। একটা দিনও আর এখানে থাকবার সাধ নেই তার।

কিন্তু মুখিল হয়েছে বাবাকে নিয়ে। একে তো যা চলে যাওয়ার সংসারটার সমস্ত মাথুরাই বুচে গেছে, তার ওপর বাবাকে এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় রেখে যার কী করে রঞ্জনা?

তা না হলে নিজের জীবিকার সংস্থানটুকুর জন্তে কারো প্রত্যাশা না রাখবার মত মনের জোর আছে রঞ্জনার।

অবশ্য ঘটনাটিকে শরীরটা তার এতই ভেঙেছে যে বর্তমানে চাকরী করা তার পক্ষে সত্যি সত্যিই সম্ভবপর কী না, সেটাও যথেষ্ট বিবেচনা-সাপেক্ষ।

ভাঙা শরীরটাকে তবু না হয় মনের জোরে কাঠে-কাঠে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু নতুন এই যে, মাথার বস্ত্রাটা স্রষ্টা হয়েছে রঞ্জনার—তাকে সে সামলাবে কী করে? বাবা ব্যস্ত হবেন, তবু পাবেন বলে যদিও সে বহু সতর্পণে বাবার নজর থেকে এটাকে লুকিয়ে রেখেছে তবু নিজের মনে মনে সত্যিই তার রীতিমত চিন্তা হয় এ ব্যাপারটার জন্তে।

সমস্ত মাথার ভেতরটার কী যে একটা কষ্ট হয় চেষ্টা করলেও সেটা ভাবার ব্যস্ত করতে পারবে না। মাঝে মাঝে সব কিছু গোলমাল হয়ে যায় যেন।

আচ্ছ', হিমালি কী এর মধ্যে আরও এসেছিল এ বাড়ীতে? তাই তো মনে হল ওর ভাবভঙ্গী দেখে। কিন্তু কেন?

রঞ্জনার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক স্থাপনের কথা ছিল তা নাকচ হয়ে বাবার পরও কী করতে আসতো ও?

ভালবাসার টানে? অসম্ভব! রঞ্জনাকেই যে কোনদিন আগ্রহ সহকারে চায়নি, রঞ্জনার বাবা-মাকে সে কী করে এত ভালবাসতে পারে?

সে সব দিনগুলো কী তুলে গেছে রঞ্জনা? যখন সুজন প্রতিবৃহস্পতি নতুন নতুন ভাবার স্তবগান রচনা করে রঞ্জনাকে দিক্ভ্রান্ত করে তুলেছিলো?

রঞ্জনার নাচগান রূপগণ সমস্ত কিছুর অপরিমিত প্রশংসা করে রঞ্জনার মন থেকে নীতিজ্ঞানটা পর্যন্ত ভাসিয়ে দিয়েছিল প্রায়। তা না হলে চিরকালের পরিচিত বাপ-মায়ের স্নেহ-আবেষ্টনীর বন্ধন ছিন্ন করে কী ভরসায় কোন নির্ভয়ে সুজনের হাত ধরে অত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে পা বাড়িয়েছিল রঞ্জনা? ঠিক বাপ-মায়ের অনুমোদন পেয়েও হিমালি তো কোনদিন এত আগ্রহে এগিয়ে আসেনি রঞ্জনার

হাত ধরতে? একই গান শুনে বেখানে সুরজন বাতোরারা হলে গেছে, সেখানে কোনদিন এতটুকু উদ্ভাসও আসেনি হিমালয়ের তরফ থেকে।

তাই তো শেষের দিকে মনের মধ্যে রীতিমত হৃদয় হতো—সন্দেহ হতো হিমালয় তাকে সত্যিই চায় কী না? না কী শুধু পিতৃসত্য বলা করে পিতৃবন্ধুকে কড়া দায় থেকে উদ্ধার করাই তার উদ্দেশ্য?

অনেক ভেবেছিল রজনী এই নিয়ে। একদিনেই সুরজনের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি সে। এমন দিনও ছিল যেদিন প্রতিমুহুর্তে হিমালয়ের জন্তে প্রতীক্ষা করে থাকতো সে।

উদ্ভূত হয়ে থাকতো হিমালয়ের গাড়ীর হর্ণ শোনবার আশায়। হিমালয়ের চোখে চোখ রেখে অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকতো এতটুকু প্রশংসার হাসি দেখবার আশায়। হয়তো পেতোও—কিন্তু সুরজনের অকৃপণ দাকিণ্যের তা নিতান্ত স্নান, নিতান্ত নগণ্য।

রজনী কী লক্ষ্য করেনি সুরজনের মুখে রজনীর প্রশংসা শুনতে শুনতে কতদিন গভীর হয়ে উঠেছে হিমালয়ের মুখ। কতদিন কত আনন্দতরঙ্গ সুরজনের সন্ধ্যায় উদ্ভাসিত সুরজনের কথার অর্ধপথেই বিদায় চেয়েছে হিমালয়। রসভঙ্গ করে বাড়ী চলে গেছে বা হোক একটা অস্থির করে। প্রথম প্রথম হিমালয় চলে বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রজনীর কাছে সন্ধ্যাগুলো স্নান হয়ে যেত। মা-বাবাও ওদের থেকে এসে জিজ্ঞাসা করতেন, কেন হিমালয় চলে গেল এমন করে?

কিন্তু আশ্চর্য্য। সুরজন একটুও দমতো না। কত রকমের হাসি কত ধরণের গল্প শুনিতে শুরুর চড়াবার চেষ্টা করতো রজনীর সুরকাটা সন্ধ্যাগুলোর।

উঃ, এত অভিনয়ও শিখেছিল সুরজন? রজনীর জীবনটাকে নিয়ে ছিমিছিমি খেলবার জন্তে মনোরঞ্জনের এত বিস্তারিত সে আয়ত্ত্ব করে রেখে দিয়েছিল আগে হতে? অঙ্গবস্তুর চোখে চোখ পড়া হরিণীর মত একটু একটু করে সম্মোহিত করে বেঁধে নিয়েছিল রজনীকে তার সর্বপ্রাণী কবলে। কিন্তু কৈ, রজনী তো কারোকে কোনদিন প্রতারণা করে নি? তবে কেন এমন হল? কেন এমন ব্যবহার পেল সে? যতদিন পর্বত হিমালয়কে স্বামী বলে ভাবতো সে ততদিন সর্বাঙ্গকরণেই তার সাহচর্য্য কামনা করেছে। প্রতি মুহুর্তে আশা করেছে হিমালয় এগিয়ে আসুক। সুরজনকে হুঁহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রজনীকে তার পাশে টেনে নিক। কিন্তু কৈ হিমালয় তো এলো না? রজনীর সমস্ত প্রতীক্ষা ব্যর্থ করে দিয়ে আস্তে আস্তে সে শুধু নিজেকে সরিয়ে নিলো রজনীর অগত থেকে। আজও ভাবতে গেলে মাথার ভিতরটার গুলিয়ে ওঠে রজনীর, হৃদয়ে ওঠে বৃকের দাঁতখানটার।

—সেদিন নিজেকে বোঝাতে আরও অনেক বেশী কষ্ট হয়েছিল রজনীর। তবু সে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে এই কথাই বার বার বলেছে—এ ভালোই হল। হিমালয় এখন এ বন্ধন থেকে মুক্তি পেতেই চাইছে তখন তাকে মুক্তি দেওয়াই মঙ্গল। রজনীর মত কষ্টই হোক তবু সে কারো গলগ্রহ হওয়ার লজ্জা মাথা পেতে নেবে না। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে এই কথাটাই তার বার বার মনে হয়েছে যে, সুরজন তাকে পেতে চাইবে রজনী বলে আর হিমালয় তাকে গ্রহণ করতে চাইছে বাগদত্তা বধু হিসাবে। এ দুয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

তাইতো সুরজনের আনাগোনা হঠাৎ বন বন হতে লাগলো হিমালয়কে ততই সরে যেতে দেখে বিস্মিত হয়েনি রজনী। মনে কষ্ট হলেও নিজেকে কঠিন হাতে দমন করে রেখেছে, লুটিয়ে পড়তে দেয়নি হিমালয়ের পারে।

তারপর?

তারপর বাকী থাকে সুরজনের সাথে রজনীর অনিষ্টকারী ইতিহাস।

সে ইতিহাস রজনীর বাস্তব রচিত হয়নি। হয়েছিল সুরজনের আগ্রহের আভিষে। তবু যেদিন থেকে সুরজনের হাতে হাত; মিলিয়েছে রজনী সেদিন থেকেই প্রাপণ সাধনার তাকেই মেনে নিতে চেষ্টা করেছে সে। বলা করেনি কোনখানে।

তবে সুরজন এ কী করলো তার? কেন এমন করলো তার সঙ্গে?

ভাবতে গেলে মাথার মধ্যেটা বিম্বিতম করে ওঠে। কুপার কুঁচকে যায় সারা শরীরটা।

এত ভালবাসা—সব অভিনয়? মাকড়সার মত একটু একটু করে শূন্য জাল বিস্তার করে বসে থাকার প্রয়াস?

হ্যাঁ, একথা সত্যি, গয়না-কাপড় ভালবাসতো রজনী। সুরজনের দেওয়া গয়না-কাপড়ের মোহে পড়ে সে নিজের বাপ-মাকে পর্যন্ত একদিন অপমান করেছিল। কিন্তু আজ ঐ গয়না-কাপড়তেই তার পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বিড়কা জমেছে। ঐ গয়না-কাপড় আর গয়না-কাপড়ের দাতাকেই আজ সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে রজনী।

রজনী ভালো করেই জানে—সেদিনও জানতো, প্রিয়জনের সাহায্যার্থ মিশে থাকে বলেই মেয়েরা গয়না-কাপড় ভালবাসে। কিন্তু যে গয়না-কাপড়ে তা নেই—সমস্ত হৃদয়বৃত্তিটাই বিকিয়ে গেছে মূলতর বিনিময়ের কাছে, সেখানে গয়নাকাপড় শুধু জ্বাল ঐশ্বর্য্যের বিড়খনা।

একটা বিষয়ে অবশ্য রজনী স্থিরনিশ্চয়ে জানে যে হিমালয় তাকে ভুল বুকেছিল এইখানে। নিশ্চয় ভেবেছিল, দামী দামী উপহার পেয়ে রজনী সুরজনকে প্রার্থয় দিচ্ছে। কিন্তু হিমালয়ের এটা একেবারে ভুল। আর এই ভুলটাই বরাবর করে আসছে সে। রজনীকে দেখেছে দূর থেকে শো'কসে সাজিয়ে রাখা পুতুলের মত। কাছে এসে রজনীর ভিতরের মানুষটাকে চিনতে সে কোনদিন চায় নি। তা যদি সে চিনতো তাহলে এ সহজেই বুঝে নিতে পারতো অত সহজে বিকিয়ে বাবার মত মনুষ্যের মধ্যে নয় রজনী। নিউ মার্কেটের লেবেল-মারা ছুঁটো কুঁচু তোড়া আর সাহেবী দোকানের টরলেট সেট পেয়ে গলে যায় না সে তাই যদি হোত তবে সুরজনের সঙ্গে মিশবার পরও প্রতি মুহুর্তে হিমালয় সঙ্গে সুরজনকে ভুলনা করে হালকা মনে হোত না তার। হিমালয় আত্মগভীরতার পাশে সুরজনকে লম্বাচিন্ত বলে কত বার যে সে মনে মন বিস্ময় হয়েছে তা যদি একটিব্যপও জানতে পারতো হিমালয়।

তবু কী ভাই? হিমালয়কে না পাওয়ার সাথে বার আ ভালবাসা হারাতে হল রজনীকে, তাঁকেও কী একেবারে ভুলে গে রজনী? কত রেহুহুঁতে রজনীকে তিনি কাছে ডেকে নিয়েছিলেন প্রতীক্ষা করে দিন গুণেছিলেম কবে রজনী সম্পূর্ণ তাঁর হবে—সে কথা

কী একেবারে ভোলা যায় ? হিম্মতির মায়ের সেই আজীবনের সব্ব-
রক্ষিত গৃহকোণ কী কম প্রয়োজনের জিনিস ছিল রজনীর কাছে ?

তুচ্ছ দুটো উপহারের লোভে কোনদিন তাকে ছেড়ে বাবার কথা
ভাবতেও পারতো না রজনী। যদি হিম্মতির তরফ থেকে এমন
হিম্মতস উদ্যোগীতার বাতাস অহর্নিশি সূচের মত তার গায়ে না
বিঁধতো।

কিন্তু আজ আর এ সব পূর্বোক্ত কথা বাঁপি নিয়ে কেন মিছে
ভোলাপাড়া করছে রজনী ? কী লাভ হবে এমনতর এসোমেলো
চিন্তা করে ? তবু অকারণে চিন্তা করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মাথাটা।
গত কয়েকটা রাতের মত আজও হয়ত সারাটা রাত জেগে জেগেই
কেটে যাবে।

—না মা, আর কারো কথা ভাববে না রজনী। মা বুকুতে পারলে
বড় কষ্ট হয় তার। মাথার ভিতরটার অসহ্য কষ্ট হয়। সেই যে থাকে
জেগেছিল মোটরে সেই জায়গাটার—ঠিক সেই জায়গাটার।

মনে হয় চার পাশে যেন কারা সব হাসছে। হা-হা করে।
তাদের কাছ থেকে ছুটে পালাতে চায় রজনী। তারপর আর
কিছু মনে থাকেনা তার। মাঝখানে একদিন রাতে এমনি ধরনের
একটা দুঃখের দেখে তার পেরে এমন চীৎকার করে উঠেছিল রজনী
যে পরমেশবাবু আর ভজহরি ছুটে এসেছিল অস্ত্র ধর থেকে।

মা থাকলে আরও কত ভয় পেতেন হয়ত। নিজে ভয় পেতেন
আর ভয়সা দিতেন রজনীকে।

—উঃ, কোথা দিয়ে কী যে সব হয়ে গেল ?

না—না, আর কিছু ভাববে না রজনী। এমন করে একা বসে
একটা কিছু ভাবতে গেলেই আজকাল বড় কষ্ট হয় তার। প্রাণটা
হাঁকিয়ে ওঠে যেন।

হিম্মতির গেল কোথা ? ঐ তো গোট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে
হিম্মতি। পরমেশবাবু ওকে তুলে দিতে গিয়ে কী যেন কথা বলছেন
নীচে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে।

—কে ? কে ওখানে ? ও ভজহরিদা'। তাই বলা।—এমন
ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তা কী বলছো ? খাবার দেবে কী না—
তাই ভিজাস করছো ? আচ্ছা দাও।—একটুখানি অপেক্ষা করো।
পাঁচ মিনিটে একবার জ্ঞান করে আসি আমি। না না কিছু ঠাণ্ডা
লাগবে না। অশোচ বলে ক'দিন তেল মাখতে পাই নি তো—
বড় পরম লাগছে তাই।

হিম্মতিকে গাড়ীতে তুলতে এসে পরমেশবাবু সকাঁতরে অস্বাভাবিক
করেছিলেন, হিম্মতি যেন কষ্ট করে অস্ত্রতঃ কয়েকটা দিন বিকেল-
বেলাতে তার বাড়ীতে আসে। তা না হলে দিন কাটানো রীতিমত
চুরচুর হয়ে পড়েছে তার পক্ষে।

বিশেষ করে রজনীর সঙ্গে একা কোন গল্পই তিনি শুধিয়ে
করতে পারেন না। কথা কইতে বসলেই যার কথা বলে কেঁদে
তানিয়ে দেয় রজনী—কিছুতেই তাকে অস্ত্র প্রসঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে
পারেন না পরমেশবাবু। অথচ রজনীর এখন মোটেই অস্ত্র মন
খারাপ করে থাকা উচিত নয়।

—ভাকারেরা বার বার বারশ করে দিয়েছেন এমনতর মনওম্বরে
থাকতে। একটা হেতী সন্ধ্যা পেয়েছে তো ?

একটু খেমে নিয়ে উনি আবার সুর করেন—ওর শরীরের অবস্থা
তো নিজের চোখেই দেখে গেলে বাবা। অভাগীর একটু খোঁজখবর
নিয়ো। আমি আর ক'দিন বলা ? আমারও খটা বাজলো বলে।
এবার এখানকার পাঁচতাড়ি গুটোতে হবে। আর আমিও তাই
চাই—আর বাঁচব, সাধ নেই আমার। কিন্তু বাব বলেও যেন যেতে
পারছি না আমি। ওর মা তো কেমন চট করে সব কেল-টোলে
পালিয়ে গেল। কিন্তু আমি পারছি কৈ ? ওকে এমন করে রেখে
গেলে মরণের পরেও আমার শাস্তি হবে না যে।

তুমি কিন্তু একবার করে সন্ধ্যাবেলার দিকে এসো বাবা।
তোমার হয়ত একটু বইই হবে। পেট্রল পুড়িয়ে উজান বেবে
একটা আসা—তবু বলছি, দিনান্তে একবার অস্ত্র তুমি এসো।
নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হচ্ছে হিম্মতি। নিজের বুদ্ধি নিজের
ভাগ্য কোনটার ওপরেই আর আস্থা নেই আমার। তবু তোমার
দেখলে খানিকটা ভরসা পাই বাবা। বিশ্বাস করো, তোমার
স্বপ্ন দেখলে অর্ধেক দুঃখ কষ্ট তুলে যাই আমি। তুমি
আসবে তো বাবা ?

পরমেশবাবুর কাতরতা অসহায় ভাব হিম্মতির মনকে স্পর্শ
করে কিন্তু অস্ত্র সময়ের মত দ্রব করতে পারে না। মনটা প্রায়
মানা ভিজাস তার সাবা মমটা জুড়ে রয়েছে, অস্ত্রের অস্ত্র সেখানে
ধুব বেশী স্থান সংকুলান করা কঠিন।

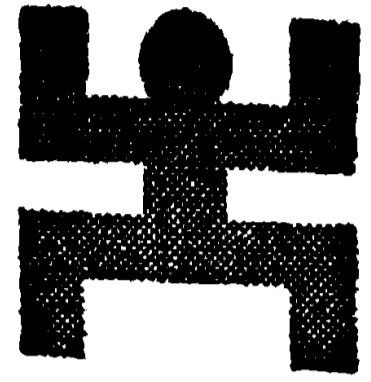
যুগচোরা হিম্মতি যদিও তার প্রায়শ্চলিত একটা প্রায়শ
স্বপ্ন কুটে পরমেশবাবুর সামনে শুধাতে পারলো না, তবু আবার
আসবার মৌন প্রতিশ্রুতি দিয়েই পালিয়ে এসে, তবুও কেরবার
পথে সারাটা রাত্তা সে কল্পনার অগণিত প্রায়শ্চলিত করে
তুললো পরমেশবাবু আর রজনীকে।

তার মধ্যে সর্বপ্রথম প্রশ্ন—রজনী কোথায় ?

সারাটা সন্ধ্যার মধ্যে তার নাম একবারও উত্থাপন হোল না
কেন ? আচ্ছা রজনী, তুমি তো লক্ষ্যে ছিলে, হঠাৎ হাজারিবাগ
হাস্পাতালে এলে কী করে ?

আবার পরমেশবাবুকে উদ্বেগ করে বলে—রজনীর শরীর খুব
খারাপ তা তো আপনি বললেন কিন্তু অনুখটা কী, তা তো বললেন
না ? তাহাড়া ওর শরীরটা খারাপ সে তো সত্যিই চোখেই দেখলাম—
কিন্তু হাসপাতালে বাবার কারণটা ঠিক বুঝলাম না তো ? কী
একটা হেতী সকের কথা বলছিলেন না ? সেটা কী ? মলিনা দেবীর
মৃত্যু ? না আরও কিছু ?

ভাবতে ভাবতে আবার নিজের মনটাকে শাসন করে হিম্মতি।
কৌতূহলটা তার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না ? এটা কেন তুলে যাচ্ছে
যে পরমেশবাবুর সংসারে সে এখন সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি। বাইরের
যে বসে দুটো গল্প করে চলে আসার বেশী অধিকার তার নেই—
না কিছু জানবার না কিছু জানাবার, পরমেশবাবু তাকে মন ভালকা
করবার অস্ত্র দুটো গল্প করতে আসবার আহ্বান জানিয়েছেন বলেই
সে কিছু তাঁর দণ্ডবৃত্তের বিধাতাপূর্বক হয়ে বসেনি ? যে ভালোমন্দ
ভার-অভার সমস্ত কিছুই জমাখরচ দিতে হবে তার কাছে ? আর
তাহাড়া হিম্মতি চায়ই বা কী ? হিম্মতিকে বিয়ে না করে রজনী
অনুখী হয়েছে—রজনীর সঙ্গে তার বনিবনা হয়নি—তনলে কী
সে খুঁই হয় ? না—না কখনই নয়। রজনী খুঁই হোক। আজও



লক্ষ্মীবিলাস

তৈল



এম. এল. বসু য্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লি:
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

সে রজনাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখে। তার কোন কৃতির কথা ভাবতেও সে কষ্ট পায়।

সব চেয়ে ভালো হয় ও-বাড়ীতে আর না গেলে। নিজের মর্যাদাও থাকে আর রজনী সত্বে নিজের আগ্রহ বা কোঁতুহল কোনটাই প্রকাশ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাই বা পারছে কৈ হিমালি! পরমেশবাবু যে তাকে কী আশুপা গেরোর বক্তা বাধুনি বেঁধে বেঁধেছেন—চেষ্টা করুক সে বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না সে।

এর পরের দিনও ভেবে গিয়েছিল হিমালি যে আজকে যাচ্ছে বটে কিন্তু আর সে যাবে না মলিভিলায়। পরমেশবাবুকে বুঝিয়ে বলে আসবে যোজ আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কৈ? শেষ পর্যন্ত করতে পারলো কৈ সে? আবার সেই চলে আসবার সময় কান্তর হয়ে অল্পবোধ করতে লাগলেন আবার আসবার জন্তে।

হিমালি ছু'-একবার তার অনুবিধার কথা বলবার চেষ্টা করতেনই ওর হাত ছুটো ধরে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলতে লাগলেন।—আমার ওপর রাগ করে তুমি রজনাকে শাস্তি দিও না হিমালি। এমন করে মন গুমরে থাকলে ও আর বাঁচবে না। আমি ওর বাপ হয়ে ওর জন্তে নতজাহু হয়ে দয়া-ভিক্ষা করছি তোমার কাছে।—ওকে তুমি ক্ষমা করো।

হিমালি অবাক হয়েছে পরমেশবাবুর কথার ধরণ শুনে। আপত্তি করে বলেছে—এ আপনি কী বলছেন? আমি রজনাকে ক্ষমা করার কে? আর আমি মা এলে সেই বা মন গুমরে থাকতে যাবে কেন? আপনাদের এ কথার কোন অর্থই আমি বুঁজে পাচ্ছি না।—

—সে তুমি বুঝবে না বাবা। কত অন্তর্জালীয় যে লাভজনকার মাথা খেয়ে তোমার কাছে আমার বলতে হচ্ছে তা তোমার বুঝিয়ে বলবার ভাষা নেই আমার। জোর করে দাবী করবো সে অধিকারও নেই। তাই তোমার দয়ার প্রত্যাশী হয়ে করুণাভিক্ষা চাইছি আমি। করজোড়ে তোমার মিনতি করে বলছি বাবা, নিতান্তই যোজ আসা যদি তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে একদিন অন্তর এসো অন্তত।

এর পর আর কী-ই বা বলবে হিমালি? ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, আগ্রহে বা অনাগ্রহে হোক, মলিভিলায় আসা বন্ধ করা তার আর হয়ে ওঠে নি।

এসেছে, দিনের পর দিন এসেছে আর আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করেছে রজনাকে। কী অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তার। কোথায় গেছে তার সেই হরিণীর মত প্রাণচঞ্চলা, বিচলিত মত সজীভবুধরা মেয়েটি! সেখানে এসেছে একটি অভিশপ্ত সংবত স্বভাব মহিলা। যেন অধিকল ছোট মলিনা দেবী।

রজনীর যে মলিনা দেবীর সাথে এক সাদৃশ্য কোনকালে ছিল চোখে দেখেও তা আগে কোনদিন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি হিমালি।

প্রথম দিন ছাদে অন্ধকারে আরও ছোটো জিনিস নজর এড়িয়ে গিয়েছিল হিমালি। তার প্রথমটা হল সেদিন ছাদে বা লক্ষ্য করেছিল রজনীর শরীরটা তার চেয়েও অনেক বেশী ধারাপ। ও যেন চমকে কিরতে কথা বলতেও অবসর হয়ে পড়ে আজকাল।

যে মানুষ মাত্র ছু'-তিন মাস আগেও নিজের সৌভাগ্যের গর্বে গরবিণী হয়েছিল—এত ক্ষীণ তার স্বাস্থ্যের এত অবনতি কী করে সম্ভব।

সবচেয়ে বড় কথা, রজনীর সীমিত সিঁদুর নেই। খুব ভালো করেই লক্ষ্য করে দেখেছে হিমালি—একটুও সিঁদুরের দাগ পর্যন্ত নেই মাথার কোনখানে।

কিন্তু কেন? হিন্দুমতেই তো বিয়ে হয়েছিল ওদের। তবে? তবে কী স্ত্রজন বেঁচে নেই? তাই রজনীর 'হেতী স্ক' পাওয়ার কথা বলছিলেন পরমেশবাবু? রজনাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্তে তাই এত ব্যাকুলতা ঠর?

কিন্তু কী করে এমন হল? আর মৃত্যু হল মানুষকে কী মানুষ এমন ভাবে এড়িয়ে চলে? মলিনা দেবীও তো মারা গেছেন। ওখানকার কথাবার্তার মধ্যে তার প্রসঙ্গ তো প্রায়ই আলোচনা হয় কিন্তু স্ত্রজনের কথা একবারও হয় না কেন?

নিজের অন্তরের অদম্য কোঁতুহল চিন্তাধারাকে লাগাম-হেঁড়া খোড়ার মত এলোপাখাডি ছুট করিয়ে মিশে বেড়ায়। কোনমতেই কোন সমাধানে এসে দাঁড়াতে দেয় না স্থির হয়ে।

একবার ভাবে, চুপি চুপি না হয় তত্ত্বহরিকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে—স্ত্রজন কোথায়?

কিন্তু সাহস হয় না। কী জানি পরমেশ বাবু বা রজনীর কানে যদি উঠে যায় কথাটা? ওরা কী ভাববেন? ভাববেন—হিমালি 'যে অনধিকার চর্চা করছে তাই শুধু নয়, চাকরবাকরের কাছে বাড়ীর কথা জানতে চেয়ে নিজের অসুস্থত মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে।

কাজে কাজেই তত্ত্বহরির কাছে স্ত্রজনের সংবাদ মেওয়া আর হয়ে ওঠে নি হিমালির।

আরও একটা কথা ইতিমধ্যে বার বার মনে হয়েছিলো হিমালির—মনে হয়েছিল মলিনা দেবীর মৃত্যুর পর মাকে একবার সজ্ঞে কবে নিয়ে ওদের বাড়ী যাওয়া তার কর্তব্য। কিন্তু বহু বার আন্ত-পিছু কবেও কিছুতেই সে পেরে উঠলো না মাকে নিয়ে মলিভিলায় যেতে।

মা খুবই দুঃখিত হবেন এ সংবাদ পেলে। যেতেও চাইবেন নিশ্চয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি কিছু এলোমেলো কথা বলে কেলেন? আজকেই প্রায় করে ওদের বিব্রত করে তোলেন? মায়ের পক্ষে তো সেটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়? কারণ, মাঝখানের কিছুদিনের খবর তো মা কিছুই জানেন না। তিনি হয়ত যেচেই বলে কসবেন—আর কেন দেবী করছেন বেরাই মশাই? আমার রজনাকে আমি কার ভরসায় আর এখানে কেল য়েখে নিশ্চিত হয়ে থাকবো? এবার প্রসন্নমনে অহুমতি দিন একটা ভালো দিন দেখে মাকে আমার বাড়ী নিয়ে যাই।

কিন্তু হয়ত অভিমানের স্বরে বলবেন—হঠাৎ বাইরে চলে গেলেন তা একবার জানাতেও নেই আমার? একটা মানুষ তো চিরকালের মতন চলেই গেছে আর রজনীর শরীরেরও এই অবস্থা। এ কী করেছেন আপনি? এই ঠিক বিয়ের সময়টার ওর কী চেহারা হল বলুন তো? আমার তো একটা ছেলের বউ, এখনই তো পাঁচজনে দেখবে? আমি কোনমুখে বউ দেখাবো?

—না না, সে ভীষণ লজ্জার কথা হবে। হিমালি তাহলে আর মুখ দেখাতে পারবে কারো কাছে? তার চেয়ে বরং মাকে না নিয়ে যাওয়াই সহস্রগুণে ভাল ওখানে।

এর পর থেকে বাধা-বাধকতার পড়েই নিত্য সন্ধ্যাবেলায় মলিভিলায় একা-একাই আনাগোনা করতো হিমালি। ওখানে বাতাসের স্পর্শে তার নিজের মনস্তত্ত্বটাই সবচেয়ে বিচিত্র। ওখানে বাওয়ার আগে পর্যন্ত সে পরমেশবাবুর ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয় মনে মনে। তাকে এভাবে উৎপীড়ন করার জন্যে মনে মনে যথেষ্ট কটু কথা বলে তাঁর উদ্দেশ্যে। নিজেকে তো বত পারে গাল পাড়ে প্রাণ ভরে। কিন্তু যেদিনই স্থির করে 'আজ আর যাবে না ওখানে' সেইদিনই তার শান্তিটা হয় সব থেকে বেশী।

সন্ধ্যাটা যেন আর কাটতে চায় না। মনটা কেমন যেন ভার হয়ে ওঠে অকারণ। অদ্ভুত একটা বিরক্তি ছড়িয়ে থাকে সব কিছুতে। সব শেষে বার বার বড়ি দেখে ভাবতে চেষ্টা করে এখানে বসনা হলে একটা ভ্রমজনোচিত সময়ের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুতে পারা যায় কী না?

কিন্তু সেদিন ওখানে পৌঁছে যখন ভ্রমহরির মুখে খবর পেল—বাবু তো বাড়ীতে নেই দাদাবাবু! কী একটা অক্ষয়ী কাজে বেরিয়েছেন একটু। আমরা বলে গেছেন—আপনি এলে বসতে বলতে। তা আপনি বসেন। আমি চা আনছি।

বাইরের ঘরে বসে মনে মনে বিরক্তবোধ করে হিমালি। চলে যেতেও পারে না অথচ নির্জন বাড়ীটাতে একা বসে থাকতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগে তার। পরমেশবাবুর ওপর রাগ হয়। তাকে আসতে বলে এ রকম চলে যাওয়ার মানে কী?

আজকাল প্রায়ই এ রকম করতে শুরু করেছেন পরমেশবাবু। অথচ হিমালি যদি একদিন না আসে তবে তাঁর যেন আর দুঃখের অস্ত থাকে না। কিন্তু উনি কী বুঝতে পারেন না এভাবে একটা নির্জন বাড়ীতে বিশেষ যেখানে রজনী একা আছে সেখানে বসে থাকা হিমালির পক্ষে শুধু অস্বস্তিকর নয়, বিলম্বশও বটে। এই তো সেদিন রজনীকে হিমালির কাছে বসিয়ে দিয়ে নিজে গান করতে বাবার নাম করে পাঠা ছ'বটা বাধকমে কাটিয়ে এলেন পরমেশবাবু। সেদিন কী মুখিলে যে পড়েছিল হিমালি।

রজনী কিছু তার সম্পূর্ণ অপরিচিত নয় যে টেশনের ওয়েটিংরূমে অপেক্ষমান বাজিঘরের মত ছ'জনে ছ'দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে একেবারে। অথচ নিতান্ত মামুলী ছ'-একটা কুশল-বিনিময় ছাড়া আর কী-ই বা কথা কইবে তারা?

আজও ঠিক সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বৈঠকখানায় আলো জালিয়ে পাখা ঘুরিয়ে হিমালিকে বসিয়ে নীচে থেকে চা করে আনতে গেল ভ্রমহরি। বাবার সময় আবার বুদ্ধি খরচ করে রজনীকে ডেকে দিয়ে গেল হিমালিকে আপ্যায়িত করার জন্যে।

কে জানে, এ বিষয়েও পরমেশবাবুর কোন নির্দেশ দেওয়া ছিল কী না?

বাই হোক, হিমালিকে আজকেও বেশীক্ষণ একা বসে থাকতে হল না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রজনী এসে ওর সামনের চেয়ারে বসলো ভ্রমতা মন্দা করতে।

বললে—অনেকক্ষণ এসেছেন না কী?

—না—না এইতো এলাম। বড় জোর পাঁচ মিনিট হবে। আবার সব চূপচাপ।

ভ্রমতা বজায় রাখার মত আলাপ চালিয়ে বাবার চেষ্টা করছে ছ'জনেই। কিন্তু মনে মনে কেবলই ওরা কথাগুলোকে সাজাচ্ছে আর নাকচ করে দিচ্ছে।

কারণ ভাষাটা যদি মনোমত সাজানো হচ্ছে তো প্রসঙ্গটা সব হচ্ছে একেবারে অবাস্তব। আবার প্রসঙ্গটা যদি বা অতিক্রম্যে পার্ব হচ্ছে তবে সেটা প্রকাশ করার ভাবার দৃষ্টে একেবারে খাঁটি পড়ে যাচ্ছে বার বার।

অবশেষে অনেক ভেবে হিমালি বললে—কৈশরীরটা তো সারছে না একটুও?

উত্তরে রজনী শুধু হাসলো একটু। নতমুখে একটু বসে থেকে বললে—সাদে সাতটা বাজলো—বাবা যে কোথায় গেলেন এই সন্ধ্যাবেলায়।

একটু চূপ করে বসে থেকে আবার বলে—আচ্ছা আপনার গরম বোধ হচ্ছে না তো? পাখাটা বাড়িয়ে দেবো একটু? উঠে গিয়ে পাখার রেগুলেটরটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে সে। কিন্তু ফুলমোশানে ঘোরা পাখাটা আর বাড়াবার কোন উপায় ছিল না। বোধহয় তাই হাতের কাছে করবার মত কোন কাজ না পেয়ে নিজের উপরেই একটু বিরক্ত হল রজনী। তারপর কী ভেবে বললে—আচ্ছা আমি ও-ঘর থেকে আসছি একটু। আপনি বহুদ, কেমন?

ভ্রমপায়েরই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রজনী। হিমালির মনে হল যেন পালিয়ে গেল ও। হিমালির মুখে একা বসে থাকতে অস্বস্তি বোধ করছিল, তাই অছিল। খুঁজছিল উঠে বাবার।

কিন্তু কেন? হিমালি তো কোন বিষয়ে অহেতুক কোঁড়ুল দেখিয়ে বিরক্ত করেনি রজনীকে? বেরাঙ্গি করেনি কোন বিষয়ে? তবে? তবে কী হিমালির গোখে আজও তেমন কোন রজনয়ঙ্গি দেখতে পায় রজনী বা তার অন্তরের অন্ততল ভেদ করতে পারে?

সেদিন কী পরমেশবাবু সেই ইংগিত দিয়েছিলেন তবে? আজও কী রজনীর মনে—হি হি এ কী কথা ভাবছে সে। রজনী যে সুরজনের বিবাহিতা স্ত্রী। হিমালি সবচেয়ে যদি কোন অহুতুল মত থাকে তবে আজ আর তো সে কথা প্রকাশ করার পথ নেই তার?

না—না হিমালির সাথে রজনীর এখন নিভৃত সাক্ষাৎ আর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হিমালিকেও এ হর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। পরমেশ বাবু বতই বলুন এ বাড়ীতে আজও হিমালির ওই যে আকারণ আনাগোনা, লোকে এটাকে কী বলবে?

অন্ধ মোহে এ কী করে চলেছে হিমালি? নিজেকে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে দাঁড় করাতে চায় সে?

ভাবতে ভাবতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে হিমালি। নীচে নেমে এসে ভ্রমহরিকে ডেকে বলে—ভ্রমহরি ও ভ্রমহরি! শোন একবার এদিকে।—বাবু এলে বলে দিও আজকের মত চলে—যাচ্ছি আমি। পরে এসে দেখা করব খ'ন।

ভ্রমহরি একটু আপত্তি করে বলে—কিন্তু বাবু যে আপনাকে বসিয়ে রাখতে বলেছিলেন দাদাবাবু। আপনি চলে গেলে তিনি আমার ওপর রাগ করবেন এসে।

—না না, তুমি বলে দিও—আমার কাজ আছে একটু। বলতে বলতে ভয়ভয় করে বারান্দা পার হয়ে আসে হিমালি। কিন্তু চলে বাওয়া আর হয়ে ওঠে না। করিডরের কাছে আসতেই পরমেশবাবুর সাথে দেখা হয়ে যায় তার। তিনি শক্ত হাতে পাকড়াও করেন তাকে।

—আরে হিমালি, তুমি বাজী চলে যাচ্ছা না কী? সে কী কথা? তুমি আসবে বলে কত তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম আমি।—কাজ আছে? আরে রাত্তিরবেলায় আবার কিসের কাজ তোমার? বসো বসো, যাবে এখন। গাড়ীতে তো যাবে, কতক্ষণই বা সময় লাগবে যেতে?

অর্থাৎ হিমালির কোন ব্যক্তিই এখনে রাজী নন উনি। আর একটু না বসিয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না হিমালিকে। অগত্যা একটু বসতে হয়।

তবে ওপরের তলায় আর ওঠে না হিমালি। পরমেশবাবুও সম্ভবতঃ ওকে ওপরে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সিঁড়ির তলায় এক পাশে পাতা একটা বেধিতে হিমালিকে নিয়ে শুইয়ে বসে জিজ্ঞাসা করেন—তজা তোমার চা-খাবার দিয়েছিল তো? হিমালি লজ্জিত কণ্ঠে বলেন—ও চা করতে গিয়েছিল, আমিই তাড়াতাড়ি করে চলে এলাম বলে আর—

—এই দেখো। হতভাগাকে বার বার করে বলে এলাম—দাঁড়াও, আমি বলে আমি চায়ের কথা।

—না না আপনি কেন যাবেন কষ্ট করে। বরং এখান থেকে আমি বলে দিচ্ছি।

—না না আর চেঁচামেচি করে কাজ নেই—রজনীর সাথে দেখা করে চলে যাচ্ছি বলে এসেছো তো? ভালই হয়েছে—এখোন এইখানে একটু বসো চূপ করে। তোমার সঙ্গে দু'-একটা পোপন কথা আছে আমার।

হিমালির আপত্তি না শুনে পরমেশবাবু নিজের উঠে গিয়ে চায়ের কথা বলে এলেন ভক্তহরিক। তারপর ফিরে এসে আলপাশে একবার চোখ বুন্ডিয়ে নিয়ে পকেট থেকে দুটো সিনেমার টিকিট বার করে গলা নামিয়ে বলতে থাকেন—এ দুটো তোমার কাছে রেখে দাও হিমালি। কালকে ঠিক সময়ে এসে রজনীকে নিয়ে যেও সিনেমার।—আমি ওকে ঠিক রাজী করিয়ে দেব এখন।

আর একটা কথা বলে রাখি—ওকে যেন বলোনা যে আমি টিকিট কেটে এনেছি, কেমন পারবে তো?

হিমালি বিষয়ে বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকে পরমেশবাবুর দিকে। বলে—এ আপনি কী বলছেন? আমি কেন রজনীকে নিয়ে সিনেমার যাবো? সে কী ভালো দেখায়? এ ধরণের একটা প্রস্তাব করলে রজনীই বা কী মনে করবে আমার?

—কিছু মনে করবে না বাবা, কিছু মনে করবে না। তোমার যেরূপ ফিরে গেলে ও হতভাগী বেঁচে যায় এ জন্মের মত।

বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে হিমালি বলে—বার বার এ কী কথা আপনি বলছেন? আপনার কোন কথার অর্থই বুঝতে পারি না আমি। আমার সঙ্গে একলা বাতায়ত করা রজনীর পক্ষে খুব শোভনীয় হবে কী?

হিমালির হাত দু'টো জড়িয়ে ধরেন পরমেশবাবু। কিছুটা

আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন—শোভন-অশোভনের কথা এখন আর আমার চিন্তা করবার সময় নেই বাবা। মেয়েটাকে আমার বাঁচাতে হবে তো? ও যে অহোবাক্র অমন দুখভার করে থাকে এ যে আর আমি সহ্যে পারি নে। তাছাড়া সেদিন যে তোমার বলহিলাম ডাক্তারবাবু বার বার বারণ করে দিয়েছেন—ওকে অমন করে মনমরা হয়ে থাকতে। ওর মাথায় একটা চোট লেগেছে কি না। তার ওপর দারুণ একটা আঘাত পেয়েছে মনে—এ ভাবে থাকলে ও হয়ত নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না শেষ পর্যন্ত।

—আচ্ছা আঘাত পাওয়ার কথাটা বার-বারই আপনি বলছেন, তাই না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারছি না। কী সবার কথা বলছেন? কাকীমার কথা? না আর কিছু?

—হ্যাঁ, সে তো বটেই। তার ওপর ওই মাথায় চোটটা? সেটাও কী কম সাজ্বাতিক হয়েছিল? হাসপাতালে জ্ঞান হবার পরও পরের দিন আমাদের নাম ঠিকানা পর্যন্ত বলতে পারে নি মনে করে। আর একটু হলে শ্রুতিশক্তি লোপ পেয়ে যেতো হয়ত।

—কিসে লাগলো চোট? তাই তো জানতে পেলাম না। সুরজন বাবু কোথায়? তাঁকেই বা দেখতে পাচ্ছি না কেন এ পর্যন্ত? নিজের অন্তরের সবচেয়ে বড় প্রেরণা করে ফেলে হিমালি। পরমেশবাবু এখন নিজেই আজ কথা কইতে চাইছেন তখন সে-ও তার কিছুদিনের বয়ে বেড়ানো কথাগুলো না করে থাকতে পারে না।

উত্তরে পরমেশবাবু বলেন—সুরজন? তুমি সুরজনের কথা জিজ্ঞাসা করছো? না সুরজন আর আসবে না। সুরজন মারা গেছে।—এ্যাকসিডেন্ট। মোটর এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল ওদের। হাজারিবাগের ওই দিকটার মোটরে করে বেড়াতে গিয়েছিল ওরা। বলতে বলতে অস্বাভাবিক বড় হয়ে ওঠে পরমেশ বাবুর চোখ দুটো। আশ্চর্য হয়ে হিমালি লক্ষ্য করে অদ্ভুত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন উনি। কপালের দিরা ফুলে উঠেছে। মুখের ভাব অত্যন্ত উগ্র।

এই সময় আবার তাঁর নজরে পড়লো ভক্তহরি চা আর কী যেন খাতসামগ্রী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে পিছন দিক থেকে। অকারণে ভীষণ রেগে গেলেন পরমেশ বাবু। খামোকা গাল দিয়ে উঠলেন ভক্তহরিকে—পিঠের গোড়ায় এসে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন যে হারামজাদা? ঘরের কথা শোনবার জন্তে চাকিশ ঘণ্টা কান পেতে বসে আছো নয়? জুতোর চোটে আড়ি পাতা রোগ ছুটিয়ে দেবো জন্মের মতন।

ভক্তহরি ধতমত খেয়ে বার। তাড়াতাড়ি খাবারের ট্রেটা নামিয়ে দ্বিগুণ ভিতরে চলে যায় মুখটা বিকৃত করে। সে যেটার কিছুই জানে না—আড়িও পাতেনি। খাবার দিতে এসে মনিবের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়িয়েছিল মাত্র।

হিমালি পরমেশ বাবুকে শান্ত করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি তখন তাঁর আপন খেয়ালে।—এ ছনিয়ার কারকে বিশ্বাস করে মুখ নেই, জানলে হিমালি! কখনও কারোকে বিশ্বাস করো না জগতে। বিশ্বাস করেছ কী মরেছ একেবারে।

তবুও চা খেয়ে বিদায় নেবার আগে হিমালি আর একবার বলে—কিন্তু আমি বলহিলাম কী—রজনীকে নিয়ে সিনেমার যাবার

আগে আর একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল না কি? এবারের মত আপনিই ওকে বুঝিয়ে নিয়ে আসুন না কেন? পরে না হয় আমি একদিন—

—তুমি কেপলে? আমার সঙ্গে সিনেমার গেলে ওর ভালো লাগে কখনও? আর তাছাড়া বুড়োবয়সে আমারও আর পোষার না ও-সব। না না ও কোন কাজের কথা নয়, তুমি চলে এসো কাল বিকেলে। আমি বরং বাড়ীতে একা বসে না থেকে তোমার বাড়ীতে গিয়ে কাটিয়ে আসবো কালকের সন্ধ্যাবেলাটা। বোঁঠাকুরের সঙ্গে অনেক দিন মন খুলে তেমন করে গল্প করা হয়নি আগেকার মতন।

কথার শেষে হতচকিত হিমালির হাতে টিকিট ছ'খানা একবকম জোর করেই ওঁকে দেন পরমেশ বাবু। তারপর আর একবার মনে করিয়ে দেন হিমালিকে—খুকীর সামনে খবরদার বেন বলে ফেলো না টিকিট দুটো আমি কিনে এনেছি।—জানোই তো বাবা মেয়েটা আমার একটু একবগগা মতন আছে। আর দেখো যদি ইচ্ছা করে কাল রাত্তিরে কোন হোটেলে একটু খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা করতে পারো। না—না আমার কোন আপত্তি নেই। মানে ওর ভেতরের সেই আগেকার স্মৃতিভাবটা আবার কিরিয়ে আনতে হবে। বুঝলে না?

হাতের মুঠোর টিকিট দুটো কোনমতে ধরে নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে হিমালি। আকাশে বত তারা মাথায় তার তত চিন্তা।

সারাটা রাত্তা কী ভাবে গাড়ী চালিয়ে বাড়ী এসেছে তা তার নিজেরই হ'স নেই। মোড়ের মাথায় ট্রাকিক পুলিশ রাত্তা পেরিয়ে বাবার অনুমতি দিয়েছিল কী না—বাড়ী ফেরবার দেয়ী দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে মা জানলায় ঠাড়িয়ে কোন ব্যাকুল প্রার্থ করেছিলেন কী না, কিছুই সে জানে না। শুধু সন্দোহিত মানুষের মত অস্পষ্ট চেতনার অহিলায় অভ্যস্ত কাজগুলো সেবেছে সে। যাতে করে পড়বার নিজের ঘরটার তড়াতাড়ি খিল লাগাতে পারে নিরুপদ্রবে।

নিজের সঙ্গে তার মস্ত বড় একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন বয়েছে আজ। কী অদ্ভুত বিচিত্র একটা সমস্তার সম্মুখীন হতে হল তাকে। সারাটা মন-প্রাণ জুড়ে তারই ভাবনা আজ পেয়ে বসেছে তাকে।

পরমেশ বাবুর আজকের কথা তো শুধু ইংগিতেই শেষ নয়। স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে তাঁর বক্তব্যের মূল। আভাসে ইংগিতে যে কথা এতদিন শুনে—বুকেও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি হিমালির সেই কথাই আজ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন পরমেশ বাবু।

রজনাকে এবার তিনি হিমালির হাতেই তুলে দিতে চান। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এ কথা শুনে হিমালি তার নিজের অন্তরে খুব একটা সাড়া পাচ্ছে না তো? মনের মধ্যে রজনাকে পাবার আগেকার সেই ব্যাকুল আগ্রহ কী আর আছে এখনও? সে কী ঠিক আগেকার অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারবে রজনাকে? খোঁধ হয় না।

তাঁর কারণ সেনিনের রজনী আর আজকের রজনীর অনেক

তফাৎ। আজকের রজনী আর আগেকার সেই কুমারী কিশোরী মেয়েটি নেই—সে অন্তের বিধবা।

হিমালির বাড়ীর গৃহলক্ষীর আসনে বাবার পূর্ণ অধিকারই কী তার আর আছে? কেমন করে তা সম্ভব? মা জানতে পারলে আশ্চর্য্যাতী হবেন। হিমালিরও অন্তরে যে কল্যাণময়ী মূর্তিতে—যে মধ্যমায় রজনী একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজ তার কিছু স্পর্শদোষ বটেছে না কী?

তাছাড়া এর ভেতর পান-অপমানের প্রয়ও একটা আছে বৈ কী। যে হিমালিকে একদিন অহুপযুক্ত সিদ্ধান্ত করে বাতিল করে দিয়েছিলেন পরমেশ বাবু—ওধু বাতিলই নয়, বা ইচ্ছা তাই বলে অপমানিত করেছিলেন তার ব্যক্তিসত্তাকে। আজ তাকেই কী 'ছাই কেলেতে ভাঙা কুলো' বলে মনে পড়লো তাঁর?

—না, আজ আর রজনাকে নিয়ে সিনেমার বাওয়া সম্ভব নয় হিমালির পক্ষে—গ্রহণ করা তো নয়ই।

সে খুবই দুঃখিত রজনীর জন্তে। কিন্তু উপায় কী? সে কী করতে পারে এ ব্যাপারে?

একথা অবশ্য সত্যি যে, রজনাকে একদিন সর্বাঙ্গকরণেই ভালবাসতো হিমালি। আজও হয়ত মনের নিভৃত কক্ষরে একটুখানি হৃদয়লতাই আছে তার ওপর। কিন্তু তাই বলে এ কী অসম্ভব প্রস্তাব!

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"

প্রতি প্যাকে ২৪ টি বড় আকারের

- কলে প্রস্তুত
- স্ট্রমে সৈঁকা
- মেসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি ও সর্বস্তর রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী
কলিকতা - ২৯

বিধবা বিয়ে যে শাস্ত্রসম্মত, সে কথা হিমালির বত ভালো করেই জানা থাকে: তবু এ কাজ সে কেমন করে করবে? তাছাড়া কাজ পূর্ণন নেই বলে তার পরিত্যক্ত আসনে নিজে বসবার জন্ত প্রসূর হওয়ার চাইতে হীনতা আর কী হতে পারে? পরমেশ বাবু বত উপরোধই করুন এ কথা ভাবতে গেলেই নিজেকে ছোট মনে হয় হিমালির।

না না এ কাজ সে পারবে না। পরমেশ বাবুকে সে কথাটাই জানিয়ে দেবে 'সে। মুখে যদি না-ও-পারে তবে চিঠিতে লিখে জানিয়ে দেবে অন্তত। তাছাড়া ঈশ্বরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই তার।

কিন্তু রজনী? রজনী কী মনে করবে? হিমালির কাছ থেকে যদি এখন অবহেলা পায় তবে সে কী দারুণ ব্যথা পাবে না মনে মনে? বেহনার বিবর্ণ ছ'টি ক্লাস্ত চোখ, বার সুরমুখ থেকে সমস্ত আশার আলো নিবে গেছে সেই ছ'টি চোখ জলে ভরে আসবে না কী হিমালির নির্মম ব্যবহারে?

ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়েটা জীবন সবক্ষে আরও বীতশ্রু হলে উঠবে না কী? নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎ ভাগ্য তার কাছে কী নিরাশার মসীলিগু হয়ে যাবে না?

তাহলে সত্যিই কিন্তু রজনীকে আর বাঁচানো যাবে না। ওই তো ওর শরীরের অবস্থা, তার ওপর বা কিছু ওর অবলম্বন, বা কিছু ওর ওপর ওর ভরসা তাই যদি ভেঙে পড়ে তবে সে আঘাত সহ্য করার মত শক্তি সত্যিই ওর আর নেই।

না না, ওর ওপর এত বড় নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতে হিমালি পারবে না। তারপর রজনীর বিবাদমান মুখখানা ভাবতেও ব্যথা লাগছে যে। স্বয়ং বিবাতা বাকে এত নির্দয় হাতে শাসন করেছেন— কারোই কাছেও কী এতটুকু সহানুভূতি সে পেতে পারে না?

তাছাড়া রজনীকে এত দুঃখ দিয়ে হিমালি নিজে কী পাবে? কতকগুলো অন্ধ সংস্কারকে বাঁচাতে গিয়ে সে রজনীকে অবহেলা করবে? নিজে হাতে ঠেলে সরিয়ে দেবে সুরমুখ থেকে?

সে ইচ্ছা করলেই নিজের মনের প্রসারিতা দিয়ে রজনীর যে কলংকের দাগটুকু অনায়াসে মুছে দিতে পারে কী হবে সকলের সামনে সেদিকে অঙ্গুলি সংকেত করে?

মাত্র ছ' মাস।

ছ' মাস সময় চলে গেছে মধ্যখান থেকে। কিন্তু কতটুকুই বা আসে-যায় তাতে। বাকী সমস্ত জীবনটাই বাকী এখনও।

কেউ জানতেও পারবে না। ছ'-একটা ভাসা ভাসা প্রশ্ন ছাড়া তলিয়ে কেউ তন্মামীও করতে আসবে না এ দেয়ীটুকুর কারণ নিয়ে। যদিই বা কেউ জেরা করে তবে রজনীর মায়ের স্মৃতিটাই তো যথেষ্ট কৈকিয়ত। শুধু হিমালি যদি ক্ষমা করতে পারে তাহলেই সমস্ত জিনিষটার মীমাংসা হয়ে যায়।

এইটুকু দেয়ী আর দেয়ীর কারণটুকু যদি ভুলে যেতে পারে হিমালি, তাহলেই রজনী জীবনে তার পূর্বপ্রতিষ্ঠা করে পেতে পারে। আর তাতে এই এত বড় পৃথিবীতে কতই বা কার? 'কিন্তু মা? মা যদি কোনদিন জানতে পারেন?

অসম্ভব! হিমালি না বললে মা জানতে পারবেন কী করে? আর পরে-পশ্চাতে যদিই বা কোনদিন লোকমুখে কোন উড়োখবর কানে আসে তাঁর—তা তিনি বিশ্বাসই করবেন না। নিজের বাড়ীর বৌয়ের সবক্ষে তেমন কোন কথাই কানে নেবেন না কিছুতেই।

তবে? এখন কী করা উচিত হিমালির? পরমেশ বাবুর মুখ চেয়ে না হোক, রজনীর অবলম্বনশূন্য ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে-ভনেও সে কী হাত বাড়াবে না রজনীর দিকে? চোখের সুরমুখে তাকে তলিয়ে যেতে দেবে নিরাতর অন্তর্গর্ভে? [ক্রমশঃ।

আমি তো চাইনি তবু

আশিস সান্ত্বাল

আমি তো চাইনি কোন প্রতিভাত দৃষ্টির গভীরে
প্রশস্ত-ব্যাকুল স্পর্শ। তবু কেন এনেছ আমাকে—
নিভৃত বিজন থেকে উন্মোচিত পথের রেখায়
সুদূর বিপুল দৃষ্টি? স্নিগ্ধতার দেখায়েছ দূরে
নীরব জলের রেখা; তটপ্রান্তে, মুগ্ধ বালুচরে
সুমন্ত বোধের শাড়ি উদ্ভাসিত হাওয়ার রঙীন,
আমি তো চাইনি তবু প্রার্থনার বিস্মৃষ্ট প্রহরে—
তুমিই ছড়িয়ে দিলে ধনিময় প্রসারিত দিন।

তুমিই নিবিড় কণ্ঠে অব্যবহিত শব্দের মর্মরে
শোনায়েছ প্রতিদিন আকাঙ্ক্ষার শিথিল গাথায়
স্বপ্নত মুখের গল্প। অতি দূর দিগন্তরেখায়
দেখায়েছ প্রত্যাশার জানময় গভীর আকাশ;
আমি তো চাইনি তবু প্রতিশ্রুত দিনের শিখরে—
তুমিই দিয়েছ তরে অকরণ মুগ্ধ অবকাশ।



বিজয়িনী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সেদিনটি অরণীর বৈ কি। ইতিহাসে—অনন্ত ওর ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখার দিন।

সেদিন চারিদিক থেকে এসেছিল অভিনন্দন, এসেছিল আনন্দোচ্ছ্বাস—তার চেয়েও বড় কথা, বহু বাকবী—আত্মীয়রা চাখে দেখেছিল কুটিল ঈর্ষার প্রকাশ। সেদিন ওর জীবনে চরম বিজয়গর্বের দিন সন্দেহ নেই।

কত কি বলেছিল ওকে।

সেদিনের সে উদ্ভূত আনন্দের বর্ণাবর্তে কত কি উড়ে এসে পড়েছিল—রোমের কার্নিভালে দেখা সেই অনন্ত কাগজের কিতোর মত—চারিদিক থেকে, অজস্র।

বন্ধুদের কেউ বলেছিল, 'তুই-ই এ যুগের উমা। সেই ট্যাড্ডিনকে আবার রিতাইত করলি।'

কেউ বলেছিল, 'সাক্ষাৎ পার্বতী। সত্যি—তোরই তপস্বী সার্থক।'

কেউ বা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল, 'নামটা পাণ্টে নে নীলা। ও নাম তোকে মানার না। তোর নাম অপর্ণা রাখাই উচিত। সেই পর্ণহীন উপবাসের কাহিনী যে সত্য—তা তোকে দেখেই বুঝি।'

হ্যাঁ—আজ আর আত্মপ্রবন্ধনা ক'রে লাভ নেই—গর্ব একটু হয়েছিল তার।

আর গর্ব হবারই তো কথা। চারিদিক থেকে এই যে স্তুতি ও ঈর্ষার বড় বড় বয়ে গিয়েছিল তাকে কেন্দ্র ক'রে—তার মধ্যে বড়

সাক্ষ্য একটা 'কিছু নিশ্চয়ই ছিল। একটা বড় রকমের কৃত্তির বিজয়ের ইতিহাস।

শিবের স্তুত নষ্ট করেছে সে। যোগীশরের ধ্যান ভেঙেছে।

চির উদাসীন চির নিস্পৃহ বৈরাগী তোলা মহেশ্বর আজ গৃহবাসী হয়েছে—সে তো তারই জন্ত। তারই কৃতিত্বে।

শেখাজি বোখাল মনসিজের আরক্তের বাইরে, বেহেতু মন বলে বস্ত্রটি তার নেই, এই কথাই সকলে জানত।

সেই শেখাজি বোখাল পরাজিত হলেম তার কাছে—একটা সাধারণ সামান্য মেয়ের কাছে—এ কি কম কথা।

এট একটি দিনের বিজয়গর্বের বিনিময়ে বাকী সমস্ত পরমাত্ম দিতেও প্রস্তুত ছিল সে। সমস্ত প্রাণ পণ ক'রেই তো এ তপস্বীর নামা তার।

কিন্তু বিধাতা যে তার প্রাণ নিয়েই এ তপস্বী সার্থক করবেন—এ-হেন সিদ্ধি যেবেন তাকে—তা কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল? জয় হ'ল তার ঠিকই—কিন্তু এর আনন্দ যে ভোগ করবে সে কোথায়?

শেখাজি বোখাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক।

কিন্তু সেইটাই তো তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়?

তিনি সত্যকারের পণ্ডিত, জ্ঞানতপস্বী। সেখাপড়াই তাঁর অঙ্গ, ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর প্রাণ—তার বাইরে কোন কিছু আছে বলে তিনি

জানেন না। তাঁর এক একটি ছাত্রের কৃতিত্বই তাঁর জীবনের এক একটি সার্থকতা। তাঁর ঐ আশার সাক্ষরতার যোগেই অল্প বয়সে বাঙালিরা এককালে হী-হী করত—তাঁর বাবা মা মারা যাওয়ার পর। কিন্তু আজ সেখানে বোধ করি একটি ফুলদানীও রাখার স্থান নেই। সদর দালান থেকে শুরু করে ওপরের চিলেকোঠা পর্যন্ত ভরে গেছে বই আর পুঁথিতে। আলমারী, ব্যাক, তক্তপোশ, খাট, টেবিল যেখানে যা ছিল, সব বইতে ভরে গেছে। বেসব আসবাব বই বহন করার যত্ন নহ, তা নির্মম ভাবে বিক্রয় দিয়েছেন তিনি—বইয়ের দোকান কিংবা আলমারীর স্থান করার উদ্দেশ্যে।

সেকালের বাড়ি, প্রতি সন্ধ্যায় বাধকম ও পাইখানা ছিল। তার ঘো গোড়ালার দিক ঘাস বেখে বাগী দুপ্রান্তই ঘর করে ফেলেছেন—আজ সে ঘরে এখন বই থাকে। বাগী ভাঁড়ার চিঠি ঘর এখন ছাত্রদের ব্যবহার করার ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে—কারণ সেই ঘরেই বই দুখাপ্য ট থাকে—সেখানে একটা কবে টেবিলও পাতা আছে, তার সঙ্গে 'খানা' করে টল।

এই হলেন শেখাজি ঘোষাল।

স্বপ্নরূপ—তাঁর একদা স্বপ্নরূপই ছিলেন চরিত্র আজও একেবারে স কাঙ্ক্ষি বিনষ্ট হয়নি কিন্তু তিনি নিজে সে বিষয়ে সচেতন নন। এখন যৌবন এসে, কতদিন ছিল, কবে প্রৌঢ় হয়ে পরীক্ষণ করলেন তা বাধ করি কোনদিন ভেবেও দেখেননি। আজ তাঁর সব চুলই প্রায় পেকে এসেছে—চরিত্র একটু অকালেই পেকেছে, কিন্তু তাঁরই জন্মকক্ষ বিপুল অনিচ্ছা চুল যে এক কালে তরুণ তরুণীয়া হী করে তাকিয়ে দেখত তা তিনি আজও জানেন না। এমন কি, কোন কালে সে চুল কালো ছিল কিনা তা আজ তাঁকে ভিজ্ঞাসা করলে হয়ত বিস্তৃত হয়ে পূর্বনো পুঁথির পাতা ওলটতে বসবেন, অর্থাৎ তাতে কিছু লেখা আছে কিনা সে বিষয়ে।

যিনি নিজের চেহারা সবকিছু সচেতন নন—তাঁর কাছে বাস্তবিক আর কোন বিষয়ের সচেতনতা আশা করাই অসম্ভব। বিবাহ তিনি করেন নি—জ্ঞানচর্চার ব্যাধাত ঘটবে বলে। বাপ-মায়ের এক ছেলে তিনি—অবশ্য এক মাত্র সন্তান নন। একটি বোন ছিল, তার ছেলেমেয়েরা আজও আছে। তারা আসেও কখনও-সখনও, এসে তিনি বখেই বাস্তব হয়ে পড়েন কিন্তু পরকণ্ঠে ভুলে যান, এমন কি ছুটির মধ্যেই আবার দেখা হলে আকাশ থেকে পড়েন, 'আরে সুনীল যে, কখন এলি?' কিংবা 'বৃদ্ধমা, কখন এলে মা?' ইত্যাদি। তারা আজকাল তাই আসাই ছেড়ে দিয়েছে। কলকাতায় এসেও অল্প কোন আত্মীয়ের বাড়ি ওঠবার চেষ্টা করে। শেখাজির মা মারা গিয়েছিলেন অনেক আগে। তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে কী হ'ত বলা যায় না। বাবা বেঁচে ছিলেন, ওঁর খ্রিস্ট বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু বিবাহ দিয়ে যেতে পাবেন নি। বহুবাই বলেছেন, চেষ্টার যে খুব ক্রটি করেছেন বা কর্তব্যে অবহেলা করেছেন তা নয়—কিন্তু বই বারই কথা পেড়েছেন তত বারই শেখাজি তা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন আগামী কোন অনিশ্চিত দিনের জন্য। বাবা তো আর মা নন—মায়ের তুণে বস্ত্রকম অল্প থাকে তার কিছুই প্রায় নেই। তাই একদা ছেলেকে বাউণ্ডলে বেখেই শেখাজির বাবাকে পরলোক বাগী করত হয়েছিল।

ব্যস, তার পর থেকে শেখাজি নিশ্চিত।

বোন থাকত বিদেশে—চিঠি লেখা ছাড়া বিশেষ কিছু করে উঠতে পারতনা সে। তাও সে অতি অল্প বয়সে মারা গেল। আর চেষ্টা করে কে? মাসী, কাকী, জেঠী, পিসি একেবারে না ছিল তা নয় কিন্তু শেখাজি তাঁর চার পাশে নীরস শুক বইয়ের নিশ্চয় প্রাচীর রচনা করে তাঁদের আক্রমণ অনায়াসেই প্রতিহত করতে পেরেছিলেন।

সুতরাং শেখাজির সংসার বলতে চিঠি চাকর ভরসা। এরাই বাগী-খাওয়া বাড়িঘর সাক করা অতিথি সংকার, ছাত্রদের চা জল ইত্যাদি সরবরাহ এমন কি আত্মীয় এসে আদর আপ্যায়ন সব করে। তার চেয়েও বড় কাজ—বইয়ের পরিচর্যাও তাদেরই করতে হয়। কাজের তুলনায় লোক বয়ং কর—কিন্তু বেশী লোক রাখা মানেই বেশী আয়সা জুড়ে থাকা—কাজেই ছাত্রদের বেশী লোক রাখতে তিনি রাজী নন। আগে একজনই ছিল তবে তাতে বড় অনুরোধ—সে দেশে যেতে চাইলে কি অন্তত্ব হয়ে পড়লে বড় হুঙ্কিলে পড়তে হয়। একবার বঙ্গীবন্দন একজন বঙ্গলী বেখে দেশে গিয়েছিল। নতুন লোকটা এ বাড়ির হালচাল এবং বাড়িওয়ার ধরণ ধারণ দেখে হকচকিয়ে গেল। বুঝল যে এ কাজ তার দ্বারা চলবে না। তখন বুদ্ধিমানের যা কাজ সে তাই করল—বাজার করার নাম করে একটি দশ টাকার নোট বাগিয়ে নিয়ে সরে পড়ল। শেখাজি তা টেরও পেলেন না, তাঁর মনেও ছিল না কথাটা। এমন কি তাঁর ছপুয়ের খাওয়া যে হয়নি তাও মনে পড়ল না। তিনি জামা-কাপড় ছেড়ে বখারীতি অভ্যাসের মতই পোর্টফোলিও বাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দরজা দেবার কথা কতকি বলা মিস্ত্রীহোজম, কারণ বঙ্গীবন্দন নিত্য বন্ধ করে। সেই কারণেই নিজেরও বন্ধ করলেন না। ঐ বন্ধ হা-হা করছিল সদর দরজা বলেই বোধহয় কোন চোর ভাবতে পারেনি যে বাড়ি সম্পূর্ণ খালি, বাড়িতে কেউ নেই। তাই বড় রকমের চুরি কিন্তু হয়নি। কেবল পাতার বস্তির ছেলেরা সদরের ছুঁপাকার করা বই থেকে কিছু নিয়ে গিয়েছিল খেলা করার জন্য, হুঁ-একখানা ঐখানে বসেই হিঁড়ে নষ্ট করেছিল।

বাড়ি ফিরে সে দুই বেখে জোখে অস্ত্রশরী হয়ে শেখাজি চিৎকার করে বঙ্গীবন্দনকে ডেকেছিলেন। সাদা মা পেরেও মনে পড়েনি কথাটা। ভেবেছিলেন বাইরে কোথাও গেছে। আরও চটে গিয়েছিলেন ওর এই বেআইনে-পনাকতে। তারপর রাত আটটা পর্যন্ত বধম ফিরল না তখন তাঁর মনে পড়ল যে বঙ্গীবন্দন দেশে গেছে এবং তার বঙ্গলী একটা লোক বেখে গেছে। সে লোকটাই বা কোথায় গেল? তখন মনে পড়ল তার দশ টাকার নোট নিয়ে বাজার যাবার কথা—আর তখনই মনে পড়ল যে সকালে আজ তাঁর খাওয়া হয়নি। কেন যে ছপুয়ে অত ক্রমে পাচ্ছিল এবার তাও পরিষ্কার হয়ে গেল।

এর পর তাঁকে আর একটা চাকর খুঁজে বার করে কাজ বুকিয়ে দিতে বখেই বেগ পেতে হয়েছিল। সেই কারণেই বঙ্গীবন্দন ফিরলেও একে আর ছাড়ান নি, ছাত্রদেরই আছে। এই লোকটা নাকি চোর, বঙ্গীবন্দন প্রায়ই অহুযোগ করে—কিন্তু সে অহুযোগ শেখাজি পারে মাথেন নি। তাঁর আছেই বা কি এমন, আর তার কতই বা চুরি করবে? বইটাই ওরা তত বোঝে না, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

হ'ল টাকা চুরি বরং সহ হবে—কিন্তু ভৃত্যহীন অসহায় অবস্থা সহ হবে না।

এই শেবাজির বোঝাল।

এতদিন ধরে নিবন্ধন ভাবে নিবৃত্ত নীরব জানতপত্রা চালিয়ে এসে—এই প্রায় যুদ্ধবয়সে নীলার কাছে পরাজিত হলেন।

এ গৌরব কি কম।

নীলা তাঁর ছাত্রী। সুনাম শোনাই ছিল, কাছে এসে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। এ-ই তো বর্ষা অধ্যাপক, এইজন্মে সেই প্রাচীন কালের আচার্য। জান আহরণ ও বিতরণ—পঠন ও পাঠন, এর বাইরের জগৎ বলতে কিছুই জানা নেই।

কিন্তু শ্রদ্ধা তো করে অনেকেই, যারা যারা শেবাজির সংস্পর্শে এসেছে, সকলেই। মুগ্ধ হয় তাঁর নির্মল দেবতুল্য চরিত্রে, শিশুর মত স্বভাবে।

নীলা সেইখানেই খামল না।

তাঁর মনে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল, এক আকাশস্পর্শী ছরাশা।

এই বোঙ্গীখরের বোঙ্গ ভাঙাতে হবে, আশানবাসীকে করতে হবে গৃহী। তপস্বীর তপস্বাকে ধুলোর লুটিয়ে দিতে হবে। তাঁর পায়ের ধুলোর।

'মুনিগণ ধ্যান ভাজি দেয় পদে তপস্বীর কল।'

না-ই বা হ'ল সে উর্ধ্বশী, তবু সেই জাতেবই তো!

ঐ সাধকের সমস্ত সাধনা তাঁর এই কমলকোমল রক্ত চরণপ্রান্তে সমাধিহু করতে না পারলে, তাঁর এতদিনের তিল তিল

তপস্বীর রচিত চারিত্রিক ছন্দটিকে ধূল্যবলুণ্ডিত না দেখতে পেলে বুধাই তাঁর নারীজন্ম!

সে অবশ্য নিজের সংকল্পের কথা জানাল না কাউকে, কিন্তু কাজে লেগে গেল।

তখন শেবাজির বয়স আটচল্লিশ, নীলার একুশ।

তাই নীলা যখন ছাত্রীর মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল, তখন না শেবাজি না তাঁর পরিচিত অস্ত কেউ—তাঁর এই সংকল্পের কথা অসুমানমাত্র করতে পারেনি। এদিকে যে কিছু অসুমান করার আছে তাও ভাবতে পারেনি। পাঠে অসুযোগিতা ছাত্রী এমন অনেক আছে, বাদে সাধকের চেয়ে সাধ বোধী—তাঁরা পড়ার চেয়ে অধ্যাপকের সেবা করেই পরীক্ষাপূর্ব্ব এবং তাঁর পরের পরীক্ষাও তরে যেতে চায়। তাছাড়া শেবাজি বোঝালের ক্ষেত্রে অস্ত, এরকম তদগত ভক্তির নিদর্শন খুব হুলুভ ছিল না।

না কেউই সন্দেহ করেনি—নীলার গোপন অন্তরবাসিনী চিরকালীন নারীর শাশ্বত বিজয় বাসনা।

নীলা এম, এ পাস করল, রিসার্চ ফেলোশিপ পেল, বিসিসও দিল। সে বিসিস বলতে গেলে শেবাজির মুখ থেকে অতিশিথনে লেখা—মুতরাং ডি, ফিলও আটকাল না।

শেবাজি প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে নীলা, তুমি এখন কি করবে?'

'আপনি তো স্ত্রীর বিলেত বাচ্ছেন—সে কবে?'

'সামনের অক্টোবরে।'

'আমিও যাব।'

'কি করে'—বিস্মিত শেবাজি আকাশ থেকে পড়ল।



রূপচর্চায়

কে.হাডের

প্রসাধনী



কে.হাড ২৩ কং • কলিকাতা-১৪

‘সে আমি যেমন করেই হোক যাব। ভাববেন না।’

‘কিন্তু তুমি! তুমি বিয়েটা করবে না? সংসারী হবে না?’

‘আপনার মুখেও এ প্রশ্ন স্তর? আমি যদি বলি আপনি পথ দেখান?’

এই বয়সেও লাগ হয়ে ওঠেন শেখাজি। মাথা হেঁট করে বলেন, ‘কী যে বলো নীলা!’

‘ঠিকই বলছি—আপনি আচরি ধর পরেরে শিখাও।’

শেখাজি আরও বিব্রত হয়ে হাটের খাতাটার দিকে চেয়ে রইলেন।

‘সে সব কথা থাক স্তর! কিন্তু আমি না গেলে আপনি বড় অনুবিধায় পড়বেন। বই খাতা কাগজ এ সব গুছিয়ে রাখবে কে?’

‘তা বটে। কথাটা সত্য।’

মনে মনে শেখাজিও স্বীকার করেন। নীলা কবে যে তাঁর ছাত্রী থেকে সেক্রেটারীতে রূপান্তরিত হয়েছেন তা তিনিও জানেন না। শুধু এইটুকু জানেন যে আজকাল তাঁর সব দরকারী কাগজপত্রগুলো নীলা ঠিক করে রাখে এবং প্রয়োজনমত ঠিক ঠিক হাতে জুগিয়ে দেয়—সে জারি আরাম। আগের মত একটা খাতা কি একটা বই হাতড়ে বার করতে এক ঘণ্টা সময় লাগে না।

তিনি খুশী হয়ে বলেন, ‘বেতে পারো তো ভালই। কিন্তু কী পড়বে?’

এবং তার পরই মহা উৎসাহে নীলা এখন ওখানে কী কী পড়তে পারে, কী পড়া উচিত কত কি সুযোগ আছে—সেই আলোচনাতে ডুবে যান।

নীলা করলেও অসাধ্য সাধন। কোথা থেকে কী কত বই সে একটা সন্ধ্যারামপ যোগাড় করলে তা কেউ টেরও পেল না। বাকী রইল বাঙলা-ভাষার খরচা—সেটাও এক জোঠার কাছ থেকে নিয়ে শেখাজির আগেই সে বিল্ডে পৌঁছে গেল।

শেখাজির তাতে সুবিধে হ’ল খুব, সেটা তিনিও একদিন স্বীকার করলেন।

শেখাজি গিয়েছিলেন অধ্যাপক হয়ে—এক বছরের জন্য। তাঁর বখন কেবলবার সময় হ’ল তখনও নীলার কাজ সামান্য বাকী আছে।

শেখাজি বলেন, ‘তোমার ওপর নির্ভর করা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে নীলা যে এই ক’টা মাস ওখানে গিয়ে খুব অনুবিধা বোধ করব।’

নীলা আর তিনি একই পাড়াতে ছুখানা ঘর পেয়েছিলেন—কাছাকাছি বাড়িতে। সেও অবশ্য নীলারই কৃতিত্ব, কারণ ঘর সেই ঠিক ক’রে রেখেছিল। এখানে আসার পর কোন অনুবিধাতেই তাই পড়তে হয়নি শেখাজিকে। ঠিক নিজের কাজে বসতটুকু অনুপস্থিত থাকা প্রয়োজন ততটুকু—এবং রাতে ঘুমের সময় ছাড়া সমস্ত সময়ই কাছে কাছে থাকত। জোরে উঠে চলে আসত ওঘারেও বহু রাত্রি পর্যন্ত থাকত। সেক্রেটারী, ছাত্রী, ব্যক্তিগত সেবিকা—নীলা ছিল একাধারে সব। কী নোট কোনদিন টাইপ করতে হবে, পরের দিনের লেকচার নোট তৈরী করতে কোন কোন বই লাগবে—সে সব ছিল ওর নখদর্পণে—চাইবার আগেই হাতের কাছে জুগিয়ে রাখত সে।

তাতে কাজ করার খুব সুবিধা হ’ত শেখাজির। সময়ও অনেক বাঁচত।

সেদিনও নীলা জোরের চা খেয়েই চলে এসেছিল ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে। সে শেখাজির কথার উত্তরে বেশ সপ্রতিভ ভাবে বললে, ‘কিন্তু ক’টা মাসই বা বলছেন কেন স্তর! এবার দেশে কিয়লসেই বা আমাকে ক’দিন পাবেন?’

‘কেন? পাবো না কেন?’ শেখাজি বেন আকাশ থেকে পড়েন।

‘বাঃ, আমি কি চিরকালই এমনি থাকব? আমাকে এবার যা হোক কিছু সেটল করতে হবে না? হয় বিয়ে নয় চাকরি—যাই কেন না করি এখনকার মত অত স্বাধীনতা থাকবে না এটা তো ঠিক। হয়ত কলকাতাতে থাকাই হবে না।’

শেখাজির মুখ গুঁকিয়ে গেল। তিনি কিছুকণ বিহ্বল ভাবে বসে থেকে বললেন, ‘তাই তো। এটা তো ভেবে দেখিনি। সত্যিই তো, তোমারও তো ভবিষ্যৎটা ভাবতে হবে। স্বার্থপরের মত নিজের কথা তো ভাবলে চলবে না।’

সুটকেশটার জিনিসগুলো মেঝের ম্যাটিং-এর ওপর ঢালতে ঢালতে নীলা বললে, ‘একটা কিছু উপায় আছে স্তর।’

‘কী বলো ত?’ সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন শেখাজি।

‘আপনার আর আমার ভবিষ্যৎ মিলিয়ে দেওয়া।’

খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে বলে নীলা।

এত সহজ এবং এত স্বাভাবিক যে শেখাজি কথাটা ধরতেই পারেন না। অবাক হয়ে খানিকটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, ‘অর্থাৎ—?’

‘অর্থাৎ আমাকে যদি বিবাহ করেন তা হ’লে এসব কোন সমস্যাই আর থাকে না।’

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শেখাজির পৌরবর্ণ তামাট হয়ে গেছে। তার ওপরও মেচেতার মত ছোপ পড়েছে স্থানে স্থানে—তবু তিনি যে অক্ষয়বর্ণ হয়ে উঠলেন তা বেশ বোঝা গেল।

‘বাঃ, কী যে বল নীলা! তোমার ঠাট্টাগুলো—। বাঃ!’

বারপার-নাই অপ্রতিভ হয়ে পড়েন শেখাজি। কথাগুলো ছেলেমানুষের মতই অসংলগ্ন হয়ে পড়ে তাই। কী বলা উচিত ভেবে না পেয়ে বিশেষ কিছুই বলতে পারেন না।

‘আমি কিন্তু ঠাট্টা করিনি স্তর। সিরিয়াসলিই বলছি। অনেকদিন ধরে ভেবে দেখেছি। আপনার বা অসহায় অবস্থা, আমি চলে গেলে আপনি খুব অনুবিধের পড়বেন—আমিও কেসে গিয়ে স্বস্তি পাবনা।’

‘তাই বলে—। নাঃ, কী যে বলো। তোমার বয়স আর আমার বয়স।’

‘সে আপত্তি তো আমার তরফ থেকেই ওঠবার কথা। আপনি সে কথা চিন্তা করছেন কেন?’

‘না না। আমার এই বয়সে বিয়ে! কী বলছ নীলা! সে যে আমি ভাবতেই পারি না।’

‘সে ঠিক দিয়ে ভাবছেনই বা কেন? যেমন আছি তেমনিই থাকব।—শুধু সেই তাৎবে চিরকাল হাতের কাছে থাকবার একটা সামাজিক অনুমোদন দেওয়া বই তো নয়।’

‘না না—এসব জিনিস এক তুচ্ছ নয় নীলা। মেয়ের ঘর আছে।’

বরষের এক তফাত। ধরো আমি আর দু'একবছরের মধ্যেই বুড়ো হয়ে যাব—তুমি তখনও যুবতী থাকবে। তোমার বাবা-মাই বা রাজী হবেন কেন? আর লোকেও যা-তা বলবে।'

'আপনি এসব কথা এখনও চিন্তা করেন তাহলে! লোকে কী বলবে, দেহের ধর্ম—এই সব তুচ্ছ কথা!' ঈদং কি ব্যক্তের পুত্রই গলায় কোটে নীলার?

ফুটলেও শেখাজি সেদিক দিয়ে যান না। বলেন, 'না না—এসব ভাবতে হবে বৈ কি। জীবন নিয়ে কথা। না, ওসব কথা যাক নীলা!'

নীলা আর কথা কয় না। যেমন তিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছিল তেমনিই দিতে থাকে।

তার পরবর্তী কথা এবং আচরণও সহজ এবং স্বাভাবিক স্তরেই মেমে আসে। অল্প দিনের সঙ্গে এদিনের কোন তফাত বোঝা যায় না। যেন এই মধ্যবর্তী সময়ের কথাগুলো কোনপক্ষেই উচ্চারিত হয়নি।

শেখাজি কিন্তু সত্যিই বিলেত থেকে ফিরে বড় স্নেহবিধা বোধ করতে লাগলেন। যখন একা ছিলেন তখন ঠিকই চলে যেত—কিন্তু মধ্যে এই কটা বছর নীলা এসে সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে। অত্যাশটা গেছে ধারণা হয়ে। এখন কিছুই হাতের কাছে ধুঁজে পান না। না বই, না খাতা, না কোন নোটস—এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস জামা-কাপড় পর্যন্ত।

ধুঁজে পান না—তার কলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অথচ সে বিরক্তি

কার ওপর বোঝাও যায় না। অল্প ছাত্র-ছাত্রীরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে কিন্তু তাদের আনাড়িপনা আরও বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে।

আর তার কলে—বে ছ'নাম ঠর কখনও ছিল না খিটখিটে বলে একটা ছ'নাম বটে যায় ছাত্রসমাজে।

এরই মধ্যে একদিন এসে পড়ল নীলা।

সত্যি-সত্যিই তাকে বলে বেঁচে গেলেন শেখাজি। যেন কোন বাহুমন্ত্র বলে সব আবার ঠিক হয়ে গেল।

ভেল-দেওয়া কলের মত সব নিঃশব্দে ও নিশ্চিত গতিতে চলতে লাগল।


এ জেলীর জিনিস শেখাজির চোখে পড়বার কথা নয় কিন্তু এবার যেন, তফাতটা বড় বেশী বলেই চোখে পড়ল।

আর চোখে পড়ল বলেই বে কখাটা একদা অসম্ভব, অসম্ভব বিবেচনার অবোধ্য বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কখাটাই নতুন করে ভেবে দেখতে লাগলেন।

অবশ্য ভাবাও তাকে ঠিক বলে না। মমের অবচেতন থেকে সচেতনতার মধ্যে এই চিন্তাটা উঁকি যারার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধমক দেন, জোর করে ঠেলে সরিয়ে দেন তাকে। কিন্তু আবারও সে উঁকি দেয়—আবারও নিজের উপস্থিতিটা জানিয়ে দেয়।

ছি ছি! কী লজ্জা, কী লজ্জা!

এ কী স্বার্থপর হয়ে উঠলেন তিনি!



নিয়মিত কুমারেশ সেবনে লিভার
সুস্থ থাকে, অজীর্ণ, অক্ষুধা, পেঁকোঁপা
প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না, খিটখিটে
মেজাজ, সহজে ক্রান্তি প্রভৃতি উপসর্গও
দেখা দেয় না।

কুমারেশ

ও, আর, সি, এল, লিঃ
কুমারেশ হাউস
মালিখা, হাওড়া

কিন্তু সুবিধা খুব—এটাও মনে মনে স্বীকার না করে পারেন না।

তবু—হয় ত কথটা শেখানি কিছুতেই তুলতে পারতেন না—খদি না নীলা নিজে থেকেই কথটা তুলত।

নিজেই একদিন বললে, 'আমি স্তার সাগর ইউনিভার্সিটিতে একটা কাজ পাচ্ছি। ভাল মাইনে। ওখানেই চলে যাব ভাবছি।'

'সাগরে?' চমকে ওঠেন শেখানি, 'সে যে অনেক দূর।'

'হ্যাঁ, তা দূর আছে একটু।' স্বীকার করে নীলা।

'কেন—এখানে তো সেই কী বলছিলে কী একটা কলেজে—'

'সে অনেক কম মাইনে। এখানে বা পাচ্ছি তার সিকি।'

'তা—তা তোমার বাবা-মা তোমার বিয়ের কথা তুলছেন না?'

'তুলছেন বৈ কি। কিন্তু তাতে আপনার কি সুবিধা হবে বলতে পারেন? সে তো আরও দূরে চলে যাব?'

'কেন—এখানে কি সবকিছু হ'তে পারে না? কলকাতাতেও তো চের ভাল পাত্র আছে।'

'সে দূরের কথা বলিনি।' শেখানির অবৈবয়িকতার প্রায় হতাশ হয়ে পড়ে নীলা, 'আমি বলছি বিয়ের পর আমার স্বামী বা স্বস্তরবাড়ি তো আর আমাকে এমন করে দৈনিক বোল বটা আপনার কাছে থাকতে দেবেন না?'

ও, তুমি সেই কথা বলছ।' বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েন তিনি, 'আমি সে ভেবে, শুধু নিজের অসুবিধার কথা ভেবেই বলিনি।'

'কিন্তু সেটা কি ভাববার মত কিছু নয়?' ভীক দৃষ্টিতে ঠর মুখের দিকে চেরে প্রশ্ন করে নীলা।

'কিন্তু—কিন্তু সে আর—মানে তার আর আমি কি করব? কী আর করতে পারি? মানে তুমি কি বলতে চাইছ নীলা?'

'বলতে চাইছি যে জীবনে চের নিবৃত্তিতা করেছেন আর করবেন না। আমিই আপনার লাঠি চাল। আর কেউ সহজে আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না। চাইলেও—আপনার তাতে কোন সুবিধে হবে না। এখনও সময় আছে, আমাকে বিয়ে করুন—আর কিছুই ভাবতে হবে না।'

প্রথম প্রথম নীলার কথার বিন্দিত হতেন শেখানি, তাঁর ভঙ্গভার আশাত লাগত। কিন্তু আত্মকাল আর হন না। কারণ বুঝে নিয়েছেন যে ওর স্বভাবই ঐ রকম। তাছাড়া এতদিনের বনিষ্ঠতাতেও অনেকটা অধিকার বেড়েছে নীলার। অনেক বেশী সহজে কথা বলার অধিকার।

আজ আর তিনি উড়িয়েও দিলেন না কথটা সেদিনের মত। খানিকটা চূপ করে থেকে বললেন, 'কথটা কি তুমি ভাল করে ভেবে দেখেছ নীলা?'

'দেখেছি বৈ কি। অনেক দিন ধরেই ভাবছি বলতে গেলে।'

'সব প্রায় স্যাক্ষরনসু? এ বিবাহে আমিই জিতব, পাব অসেক, তুমি কিছুই পাবে না। টাকা কড়িও আমার বিশেষ নেই। পৈত্রিক অর্থ বা ছিল তা সব ভাগে ভাগীদেব, দিয়েছি। থাকার মধ্যে এই বাড়িটা আছে আর বইগুলো। বইগুলো সরবার জায়গা নেই বল বাড়ি বেরামত করা হচ্ছে না। ভাবছি আর একটা বাড়ি

ভাড়া করব বইগুলো রাখার জন্ত—সে আরও খরচ। আমার বা আর তাও তুমি জান সংসার চালাতে পারবে?'

'না পারি নিজেও চাকরি করব। তখন এখানে থেকে বা পাই তাতেই খানিকটা উপকার হবে।'

'তোমার আমার বয়সে কিন্তু অনেক তকাং.'

'তা জানি।'

'তবু একবার ভাল করে ভেবে জাখো নীলা। মনস্থির করার আগে একটু সব দিক ভেবে নাও। হয়ত সে সুযোগ আর পাবে না। এর পর কেবল আরও পথ থাকবে না।'

'কিন্তু আপনি কি ভেবে দেখেছেন?'

এবার আর কঠোর নিষ্পৃহতা রাখা যায় না। আগ্রহ ও উৎসুক্য বেরিয়েই পড়ে।

'হ্যাঁ—তা মানে লাভের পালা তো আমার দিকেই ঝ'কছে। কিন্তু আমার কথা ভেবো না নীলা—তোমার কথাই ভাবো। শুধু তোমার দিকটা।'

পরের দিন নীলা ট্যানি নিয়ে আসে একেবারে।

'চলুন।'

'কোথায়?' আকাশ থেকে পড়েন শেখানি।

'রেজিষ্ট্রারকে একটা নোটিশ দিতে হয় সেটা সেরে কেলা দরকার। কম আমি নিয়েই এসেছি, ফিল-আপও করেছি শুধু সইটা বাকী। পাড়ি নিচে ঠাড়িয়ে আছে।'

'রেজিষ্ট্রার?'

'হ্যাঁ। রেজিষ্ট্রার বিয়েই তো হবে? এ বয়সে নিশ্চয়ই আনুষ্ঠানিক বিয়ে করতে চাইবেন না আপনি। সুতরাং একটা নোটিশ দেওয়া দরকার।'

'ওঃ।'

কমেন যেন 'বিহ্বল হয়ে পড়েন শেখানি। এত শীঘ্র মনস্থির করা শুধু নয়, কাজও সেরে ফেলতে হবে তা তিনি ভাবেননি।

একেবারে চিরদিনের মত অন্ধ গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া। প্রত্যাবর্তনের তুল সংশোধনের আর সুযোগ পর্বস্ত না রেখে।

'তুমি মন স্থির করেছ তো? সব দিক ভেবে দেখেছ তো? অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করে শেখানি।

'সে তো আমার স্থির করাই ছিল—আপনাকে বলেছি।'

'তা বটে। তবু—জাখ কেবল আর পথ থাকবে না। কাজটা করতে বাচ্চ চিরদিনের মত।'

'সে চিরদিনের আর কত বাকী আছে আপনার? বেশীর ভাগই তো একা একা স্বার্থপরের মতো কাটিয়ে দিলেন। এখন দৃষ্টিভা তো বয়ঃ আমারই হবার কথা।'

'না, সেই তোমার কথাই বলছি।'

'চলুন চলুন, উঠুন। এতকাল আপনার কথাই তো বড় ভাবলেন। এই যে দৈনিক এতখানি সময় আপনার কাছে কাটাই—তাতে কে কী বলছে, আমার ভবিষ্যতটা কি হবে তা কখনও ভেবেছেন? নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা ভাবা আপনার অভ্যাস আছে?'

কামিনীকমল—ভি. অভ্যুত্তর
'সাথো কি কারানী' ছবিতে

সোনার মেয়ের
হরিন চোখে
রূপের নাচন দেখে...



LTS. 73-X52 BG

সোনার মেয়ের হরিন চোখে
রূপের নাচন দেখে, পিউলী নাখে কোকিল
ডাকে, বনমাতানো হুরে নাচিয়ে স্বপ্ন
বনের মধুর নাচছে অনেক ঘুরে !
লাস্যময়ী চিত্রতারকা কামিনী কমলের চোখে মুখে
আজ মধুর-নাচের চকলতা, রূপের মহিবার
উলসিত আজ এ নারী হৃদয়। 'কোনই বা হুবেমা,
লাগের কোমল পুরন বে আমি প্রতিদিনই
পেরেছি' —কামিনীকমল জানাব তাঁর রূপ,
লাগের সোপন রহমাটি।



আপনিও ব্যবহার করুন
চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, শুভ্র,
সৌন্দর্য সাবান
হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী

‘তা বটে। বড়ই অস্তায় হয়ে গেছে। তোমার কথাটা তাই উচিত ছিল। বরং—

‘উঠুন বেরিয়ে পড়ুন। আর বরং-এ কাজ নেই। এত কাল যা করলেন না—এখন আর পারবেন না।’

অপত্য শেখাত্তিকে উঠতে হয়েছিল। রেজিষ্ট্রারের অফিসে গিয়ে নোটিশও দিতে হয়েছিল একটা।

তার পর বিয়ে, তত্পলকে গ্রেট ইন্টার্নে প্রীতিতোজ—আপনার সহজ নিয়মেই এসেছিল—একটার পর একটা। অভিনন্দনে-ঈর্ষার-উপহারে জড়ানো সে অদ্ভুত দিন কটা গেছে। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কলসান দিন। মনে হয়েছে সে সকলকে ডেকে বলে, ‘বাস্তবী জীবন। বস্তু সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী’ কথাই কথা নয়।

সে নিজেই তার প্রমাণ।

সে আজ এক কহরের কথা। আজ তাদের বিবাহ-বার্ষিকী।

সেই কথাই ভাবছে নীলা পাড়িয়ে পাড়িয়ে।

সুদীর্ঘ একটি বছর কেটে গেছে। বিজয়িনীর জীবনপাত্রের সমস্ত গৌরব সুখটুকু নিঃশেষিত হয়েছে।

আজ আর বস্তু নেই। বাস্তবের সুখোমুখি পাড়তে হয়েছে।

আজ মনে সেই প্রথমটাই বড় হয়ে উঠেছে। তপস্বীর সিদ্ধি তো ছিলে—কিন্তু কী মিলল শেষ পর্যন্ত?

কী লাভ হ’ল তার?

শেখাত্তি নিশ্চিত হয়েছেন সুখীই হয়েছেন বলতে হবে। সংসার সবচেয়ে নিজের জীবনের দৈনিক বা ব্যবহারিক দিক সবচেয়ে আর কিছুই ভাবতে হয় না। কিছুই ভাবতে হয় না তাঁকে—সমস্ত সময়টাই তাঁর বই ও পুঁথিতে দিতে পারেন।

কিন্তু নীলারও যে একটা জীবন আছে, তারও যে কৈবিক সজ্জা আছে, একখাটা শেখাত্তি একবারও ভেবে দেখেন না।

বরং বিয়ের আগে ভেবেছিলেন। কথাটা তুলেও ছিলেন। তাই থেকেই নীলার কোথায় একটা সুন্দর আশা জেগেছিল মনে। কিন্তু এখন একেবারেই নির্বিকার শেখাত্তি। রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত পড়াশুনো করে বসে তিনি এসে শোন, তখন এই ঘরেরই আর একটা খাটে, তাঁর চার হাতের মধ্যে আর একটা প্রাণী যে তখনও পর্যন্ত হয়ত বা বিনিদ্র, জেগে বসে আছে, সে কথাটা একবারও মনে পড়ে না তাঁর।

নীলাকে একটা চাকরি দিতে হয়েছে। হয়ত শীগগিরই টিউশানী খুঁজতে হবে। এত টাকা মাইনে শেখাত্তির—কিন্তু সংসার চলে না তাতে। বইয়ের দোকানেই সব টাকা চলে যায়। শেখাত্তি যে এমন নিঃস্ব, কোথাও এক পরস জমানো বা উদ্ভূত নেই—একটা লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি পর্যন্ত না—তা একবারও ভাবতে পারেনি নীলা। আছে শুধু বাড়িটা সেও যে কতকাল মেরামত হয়নি তার ঠিক নেই, এবার হয়ত ভেঙ্গে পড়ে যাবে। হুঁবহুঁয়ের টাকারই বাকী পড়েছিল—নীলা শোধ করেছে। বাড়ি মেরামতের টাকা তাকেই ঝোগাড় করতে হবে—এক পাড়িয়ে থেকে ব্যবস্থাও।

তাহলে সে পেল কি?

গৌরব। সুখ নির্বোধ নীলা। সেটাও সে নিজের সৃষ্টি করা মানসিক দৃশ্য দিয়ে অনেকটা বাড়িয়ে দেখেছিল।

কিছু দিন পরেই সে তুল গেলো তার।

শেখাত্তির পরিচয় কতটুকু পতীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। শুধু এই বিশেষ বিষয়ের ছাত্রসমাজে ও কতকগুলি অধ্যাপকের মধ্যে। বাকী কে ধরবে রাখে? অপরে তাদের স্বামি-স্ত্রী পরিচয় পেলে মুচাক-হাসে। করুণার হাসি। কৌতুকের হাসি। বুদ্ধত তরুণী ভাব্যা। ‘যারা শেখাত্তির পরিচয় জানে তারাও মনে করে নীলা পরসার লোভে শেখাত্তিকে বিয়ে করেছে। তারাও হাসে মনে মনে। সুতরাং কী এমন গৌরবই বা পেল সে?’

কোন এক অপরিণত বয়সে মনকে সে বুঝিয়েছিল যে এরকম ঘটনা ঘটলে শিকিত সমাজের মাথার ওপর দিয়ে চলতে পারবে সে, সবাই তাকে খাতির করবে, সমীহ করবে স্ত্রীলোকরা ঈর্ষা করবে। আজ সে কল্পনার সঙ্গে বাস্তব কিছু মাত্র মেলেনা। কেউ তাদের কথা নিয়ে মাথাই ঝানার না। তাছাড়া তারা বারই বা কোথায়? কোথায় তাদের সমাজ? চাকরী বজায় রাখতে বাওয়া ছাড়া শেখাত্তি কোথাও নড়তেই যে চান না। তার কলে শরীরও ভেঙ্গে পড়েছে তাঁর। ডায়াবেটিস, লোপ্রেসার, বাত। সেই ত্রিবিধ করতে করতেই নীলার অর্ধেক সময় চলে যায় আজকাল।

অর্থাৎ বর্তমানও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। কিছুই নেই তার। সম্ভান হবে না, টাকাও থাকবে না। বতদিন বেঁচে থাকবে নিজেকে চাকরী ক’রে খেতে হবে। হয়ত বা স্বামীকেও খাওয়াতে হবে....

ঘর থেকে শেখাত্তি ডাকলেন, ‘নীলা—’

‘কী বলছ?’ ঘরে গিয়ে দাঁড়াল সে।

‘আচ্ছা, ক্যালেন্ডারের আজকের তারিখে লাল পেন্সিল দাগ দিয়ে রেখেছ কেন বলত?—আজ কি কোন এনুগেজমেন্ট ছিল আমার?’

‘না। ওটা আমার এক নিবুঁদ্ধিতার স্মারক; ও কিছু না। ও পাতাটাই ছিঁড়ে ফেল।’

‘নিবুঁদ্ধিতা? কিসের নিবুঁদ্ধিতা? কী বলছ কিছুই বুঝি না। তোমার মুখটাই বা অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন নীলা? শরীর ধারণ হচ্ছে?’

বহুকাল পরে বোধহয় নীলার মুখের দিকে তাকাবার সময় হ’ল তাঁর। এঘরপের কুশল প্রশ্নও তাঁদের বিবাহিত জীবনে সম্ভবত এই প্রশ্ন।

সহসা নীলার চুই চোখ ঝালা ক’রে জল ভরে আসে।

তবু তার সৃষ্টি স্নিগ্ধ হয় না—বরং তা থেকে যেন আগুনই ঠিকরে বেরিয়ে আসে। ‘তুমি, তুমি আমাকে আগাগোড়া ঠকিয়েছ। তুমি ভণ্ড, তুমি অপদার্থ—তুমি জোচ্ছোর। তুমি আমার সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ ক’রে দিলে।’

বহুদিনের রুদ্ধ রাগ আর ব্যর্থতা কেটে পড়ে তার কণ্ঠস্বরে।

অনেককণ স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে চেয়ে বসে থাকেন শেখাত্তি। কী বোঝেন কে জানে। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, কিন্তু আমি তো তোমাকে ঠকাতে চাইনি নীলা। তোমার কাছে গোপনও করিনি কিছু—বরং সত্য বলে সতর্ক ক’রে দিতেই চেয়েছিলুম। তুমিই শুনে চাওনি কোন কথা যে।—আসলে তুমিই তোমাকে ঠকিয়েছ।’ এই মর্মান্তিক সত্য—বা ক্রমাগত ক’দিন ধরে তার মনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছিল—স্বামীর মুখ থেকে কিছুতেই সঙ্কর করতে পারে না নীলা। সেইখানেই মেঝেতে আছড়ে পড়ে নির্বম ভাবে মাথা ঠুকতে থাকে।



বিজ্ঞানভিত্তিক

দশ

সংখ্যাত

"O ye speculators on perpetual motion; how many will-o'-the-wisps ye have fashioned! Go and rub noses with those who dream of creating gold!"

—Leonardo da Vinci

"O my dear Kepler, how I wish that we can have one hearty laugh together! Here at Padua, is the principal professor of philosophy, whom I have repeatedly and urgently requested to look at the moon and the planets through my glass, which he pertinaciously refuses to do. Why are you not here! What shouts of laughter we should have at this glorious folly! And to hear the professor of philosophy at Pisa labouring before the Grand Duke with logical arguments, as it with magical incantations to charm the new planets out of the sky!"

—Galilei Galileo

কার্যতালিকা বেধে নিয়ে শংকর রটিন-মাসিক কাজ শুরু করে।

সমস্ত দিন তার কেটে যায় হবিবুল্লাহ ল্যাবরেটরীর বহুপাতিগুলো নাড়াচাড়া করে—কম্পিউটারগুলো নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা করে। নোটবই তার ভেত্রে উঠল হবিবুল্লাহ বৈজ্ঞানিক পটভূমিকার ওপর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায় দিনের কাজের রোমহুনে। তার পর রোজই প্রায় বসে সেমিনারভিনার টেবলকে কেন্দ্র করে। সে বৈঠকের বেশ চলতে থাকে নিত্যই রাত পর্যন্ত—পাঁচজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্কে আলাপ-আলোচনার। সুরমিয়ার সঙ্গে একান্ত আলাপনের সুযোগ আজকাল বড়ো একটা মেলে না—লাইব্রেরী সংক্রান্ত কাজে আর বৈজ্ঞানিকদের কাজের যোগান দিতে সে-ও ব্যস্ত থাকে-সারাক্ষণ। চাঁ-এর টেবলে বা নৈশভোজনের সময় ছুঁড়নের বিনিময় হয় ক্লাস্ত হাসি।

হবিবুল্লাহ প্রোগ্রাম থেকে সহকর্মীদের করমাস মতো বই বিতরণ করা আর দরকার হলে লজ লাইব্রেরী থেকে বই আনিতে দেওয়া সুরমিয়ারই কাজের তালিকার মধ্যে।

রোজ রাতে শংকরের টেবলে তিন-চারখানা করে বই রেখে সে চলে যায়। গভীর রাতে শংকর সেগুলো নাড়াচাড়া করে বিনিময় চোখে।

সহকর্মীদের মধ্যে ইতিমধ্যে তিনটি-দলের সৃষ্টি হয়েছে। বাও, আলিমচান্দানী, খামীজি, জন আর কেঠল মোটামুটি শংকরের মতই সমর্থন করেন। পুরামিয়ার অবিধাসীর মধ্যে একমাত্র শিকদারই রয়ে গেলেন। তবে প্রফেসর গোপালাচাঁরী, সুরত্রাহমনিয়ন আর অমল বন্দ্যো অনেক সময়ে শিকদারকেই সমর্থন করেন—যদিও তাদের অবিধাসের ভিত্তি কিছুটা শিথিল হতে শুরু করেছে। বাকী বৈজ্ঞানিকের দল কখনও এপেকের কখনো বা বিপেকের হয়ে তর্কে যোগ দেন। বিধাসের ছেলে শিকদার যেমন শূত্র, সুরমিয়া তেমনি একশোর মাত্রার। অবশ্য কথাটা সুরমিয়া কোনোদিন প্রকাশ করে'না। কিন্তু শংকর জানে।

প্রথম রাত্রেই সব থিয়োরি নিয়ে আবার অনেক আলোচনা হয়েছে—অনেক নতুন মতামত তার সংগে যোগ করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল, কোনটাই পরীক্ষাসাপেক্ষ নয়। কিছুটা সম্ভাবনা হয়তো আছে হু'-একটা থিয়োরির, কিন্তু সেগুলো নিয়ে পরীক্ষা করার কোনো উপায় দেখা যায় না।

হবিবুল্লাহ বস্তুর ওপরে রাসায়নিক 'অ্যানালিসিস'-এর রিপোর্ট পাওয়া গেল। বস্তুর মূল উপাদানে কোনো অসাধারণ মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় নি। অ্যালুমিনিয়ামই তার মধ্যে প্রধান আর সংগে মিশে রয়েছে লোহা, তামা, নিকেল, টিন, ভারমেনিয়াম, ম্যাংগানীজ, ম্যাগনেসিয়াম, টাংস্টেন, সিলিকন, অংগার, গন্ধক ও ককরাস ইত্যাদি নিত্যই সাধারণ বাতু ও মৌলিক পদার্থ। আর পাওয়া গেছে তিন চার রকমের প্রাকৃতিক ও রবার, কাঠ আর কাঠের চুকরো। তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলতে নামমাত্র থোরিয়াম।

হবিবুল্লাহ সম্পর্কে তদন্ত করে স্বরাষ্ট্র বিভাগ নতুন কোন উদ্বেগবোধ্য খবর আবিষ্কার করতে পারেন নি। কেবল পাওয়া গেছে, গত কয়েক বছরে হবিবুল্লাহ আয়ব্যয়ের হিসাব বেশ-বিদ্যে বিভিন্ন ব্যবসারে হবিবুল্লাহ মালিকানার অংশ—তার ছাব্ব অর্ধ

সম্পত্তির তালিকা। ইতিমধ্যে ছ'বার বৈজ্ঞানিকেরা টিমারপুরের ভ্রমীকৃত ভগ্নভূপ দেখে এসেছেন। বিজ্ঞীর উপকর্মে খান কোম্পানীর সব কারখানাও তাঁরা পরিদর্শন করে এসেছেন। বলা বাহুল্য, মাধ্যাকর্ষণের সব্বন্ধে নূতন কোনো ইংগিত পাওয়া যায় নি এ সমস্ত জায়গা থেকে।

আর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, লক্ষ্য থেকে একবার হরিকিষণ গুপ্তকে জানা হয়েছিল কয়েক বছর জন্ম। হবিবুল্লা সব্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে নূতন কোনও সংবাদ রূ. তথ্য পাওয়া গেল না। অন্তর্গত অবস্থার পর হবিবুল্লা যেন অস্ত মায়া হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ প্রয়োজন না হলে মনের কথা হবিবুল্লা গুপ্ত সাহেবকেও বলত না। গুপ্ত সাহেবও হাজকে চিনতেন—তাই জানতেন অবধা কোঁতুল প্রকাশ করেও লাভ নেই।

দেখা গেল, হবিবুল্লার প্রতিভা সব্বন্ধে হরিকিষণ গুপ্তের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।

শংকর ক'দিন উৎসাহের সংগে 'সেভিটেশন' সব্বন্ধে পড়াশুনা আরম্ভ করেছিল। খোলা মন নিয়ে বোমশক্তি সব্বন্ধেও চর্চা করতে শুরু করলে। কিন্তু কিছু দিনেই প্রাণ তাঁর হাঁকিয়ে ওঠে। এ যেন আর এক নূতন জগত! 'একটোপ্রাজম', অপানবায়ু, সূর্য্য নাড়ীর মালমশলা দিয়ে তৈরী। কতদূরে আছে অতি পরিচিত শ্রোজিঙ্গার, ডিরাক, কাশিবোর-এর অ্যাটমের জগত! নদীর ছুই তীরের মধ্যে মিলনসেতু কোথায়?

এ মাটির বাস্তব পৃথিবীর কোন উপকরণ দিয়ে গড়া হয় অপানবায়ু? অনু-পরমাণু আছে কী? আমাদের অস্ত্রিজন হাইড্রোজেন পরমাণুই কি রূপান্তরিত হচ্ছে একটোপ্রাজমে—এংগেলস্-এর কোয়ার্টিট-কোরালিটি রূপান্তরের নিয়মে?

স্বামীজির সংগে শংকর আলোচনা করে এ সব্বন্ধে। কিন্তু দেখা গেল, তিনিও শংকরের যতোই পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

অস্ত্র সহকর্মীরাও অনেক উৎসাহ নিয়ে—হবিবুল্লার ডায়েরীর হেঁড়া পাতার কথাগুলো ভিত্তিতে অন্বেষণ শুরু করে। তারাও বিকল-মনোরথ হয়। এন্ট্রিকের কার্ভির ভুল বেরোল না তাঁর জীবনের সমস্ত কাজ তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করে। কেপলারের কোনো প্রকাশিত রচনার মধ্যেও পাওয়া যায় না নূতন কোনো আলোর আভাস।

হবিবুল্লার লাইব্রেরীর অবৈজ্ঞানিক বইগুলোরই কেবল চাহিদা বেড়ে চলে।

এদিকে হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীতে ছোটো বড়ো প্রায় সমস্ত যন্ত্রগুলোকেই চালু করানো হয়েছে। শংকর কয়েকদিন কম্পিউটারগুলো নিয়োগ করেছিল—তার 'ফীল্ড ইকোয়েশন' সংক্রান্ত কাজে। একদিন রাতে অ্যাট্ট্রনমিক্যাল টেলিফোনটিও চালু করানো হয়েছিল। কিন্তু কোথাও মিললনা একটা নির্ভরযোগ্য ইংগিত, একটা নির্দিষ্ট পথের সন্ধান। এই ভাবে দিন কেটে চলল।

শংকর লক্ষ্য করে যে ইতিমধ্যেই সকলের উৎসাহে তাঁটা পড়তে শুরু করেছে। অবধা তাঁর ভাগটাই বেড়ে চলেছে কাজে অকাজে, আলোচনা-আলোচনার কখনো সে তাঁর রূপান্তরিত হচ্ছে নসাদলি আর প্রকৃত কলহে। বৈঠকের বাইরে ছুজন সহকর্মী একত্রিত হলেই সর্বাঙ্গে ওঠে কোনো তৃতীয় সহকর্মীর আলোচনা।

প্রফেসর শিকদারই এর মধ্যে থাকেন নিজের কাজে সমাহিত হয়ে। কেবল কালেভাঙে শোনা যায় তাঁর কাছ থেকে কষ্ট মন্তব্য রূপান্তরিত সব্বন্ধে কারো অনবধানতা সম্পর্কে আর কারো অবৈজ্ঞানিক যুক্তির কঠোর সমালোচনা। সুরমিত্রাও নিঃশব্দে নিজের কাজ করে চলে সাদ্য বৈঠকে বেশীর ভাগ সময়ে থাকে নীরব শ্রোত্রী হয়ে।

সহযোগীদের মনের অবস্থা লক্ষ্য করে শংকর চিন্তিত হয়। একদিন সুরমিত্রা আর কৃষ্ণস্বামী সংগে একান্তে এ প্রসঙ্গের আলোচনা তোলে। কৃষ্ণস্বামী হেসে মন্তব্য করেন, "আমাদের জাতীয় গুণগুলোর প্রকাশ হতে শুরু করেছে। বিদেশে আমরা এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলেন—এঁড়ে তাঁর করে না নিজের মধ্যে—এমন ভারতীয় ছাত্র তাঁর নজরে পড়েনি।"

সেদিন সিদ্ধান্ত হোলো, যে সেমিনারগুলো আরো জোরালো ভাবে পরিচালনা করতে হবে। মহাকর্ষ আর সংগে জড়িত বিষয়গুলো সব্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা যাবে। পালা করে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিককে এক একদিন করে বক্তৃতা করতে হবে প্রোভিটেশন সব্বন্ধে জানা তথ্যগুলোর ওপর।

প্রথম দু-চারদিন এ ব্যবস্থার কল মন্দ হোলো না সভাও চলল বেশ শৃংখলার সংগেই। কিন্তু সে সভাও শেষ হয়ে ঝাঁড়াল আহরিত জ্ঞানের নিছক পুনরাবৃত্তি আর চর্চিত চর্চণের ক্ষেত্র। অন্ততঃ শংকরের তাই মনে হোলো। কৃষ্ণস্বামী তখন দেশরক্ষা বিভাগের কয়েকজন হোমরা চোমরাদের সংগে করে আনতে শুরু করলেন। যদি বাইরের লোকের উপস্থিতিতে বৈজ্ঞানিকদের মাত্রাজ্ঞানটাকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। এঁরা এসে বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন 'প্রজেক্ট-এ'র "আশাতীত প্রগতি"কে অভিনন্দন জানিয়ে।

সেমিনারের পরিচালক হিসাবে শংকর আর একটা কারণে বেশ অনস্বিধায় পড়ল। দেখা গেল, দলের মধ্যে অবিকাশ কর্মীরই মাষ্টারী করবার প্রচুর উৎসাহ। সুরবোগ পেলে যায় যায় তাঁরা শ্রোতাদের বিজ্ঞানের অ-আ-ক-থ শেখাতে ছাড়েন না। বাধা দেওয়াও চলে না, দিলেই মনোমালিঙ্গের সূত্রপাত হবে—বক্তারা নিজেদের অপমানিত বোধ করবেন।

বাধ্য হয়েই তাই বৈজ্ঞানিকদের দিনের পর দিন পরিপাক করতে হয়—প্রাতিটি সব্বন্ধে বিজ্ঞানের ইতিহাসের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। গ্রীক ও রোমান দার্শনিকেরা মাধ্যাকর্ষণ সব্বন্ধে কী ভাবতেন; কোপারনিকাসের দান; যেনে লেবার্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাকর্ষ সব্বন্ধে পুরাতন মতবাদের কী ভাবে খণ্ডন করলেন। টাইকো ব্রাহে প্রহের সংস্থান অন্বেষণ করে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; কেপলারের গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ নির্ণয়। নিউটনের "প্রিন্সিপিয়া, পড়ন্ত আপেলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি; অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ক্যাভেন্ডিশ এর প্রোভিটেশন কনস্ট্যান্ট নির্ণয়। তারপর গণিতশাস্ত্রের অগ্রগতি হল কেমন করে আকর্ষণ, বিকর্ষণ-আর মহাকর্ষের ক্ষেত্রে—ল্যাগ্রেঞ্জ পোটেনশিয়াল; 'লাগ্রাম-পরশন ইকোয়েশন' আর তা থেকে নেপচুন ও পরবর্তী যুগে প্রচুর আবিষ্কার; আকর্ষণ-বিকর্ষণ সব্বন্ধে কার্যতে আর ম্যান্ডারেলের এর দান; চুম্বকশক্তি বৈজ্ঞাতিক শক্তি আর মহাকর্ষের সমতা আর বিভিন্নতা। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'হাঙ্কস্'-এর আবিষ্কার—বৈজ্ঞাতিক ভরণ (রেডিও ভরণ) আর

আলোক-সংস্পর্শের পদ্ধতিগণের সমতা; লয়েজ-কিটেরোস্তের নিয়মে গতির বৃদ্ধির সঙ্গে পদার্থের সংকোচন মাইকেলসন মরলীর পরীক্ষার ইধারের নিশ্চিন্তি। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের স্পেশাল 'থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি' আর ১৯১৩ সাল থেকে 'জেনারেল রিলেটিভিটি থিয়োরি-র' সূচনা। আলোচনা শেষ হয় যোজাই 'ইউনিফাইড থিওরি'-র চর্চিত-চর্চণে।

এই ভাবে কেটে গেলো—একটা মাস।

বড় কিছু একদিন উঠল।

শংকরের বলবার পালা ছিল সেদিন। বহু বক্তৃতা করে সে বক্তৃতাটা তৈরী করেছিল। বিবরণটা ছিল প্রাতিষ্ঠান থেকে ফিউচার অ্যান্ড মোটাফিক্সের বক্তব্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা। কিন্তু শংকর কিছু বলার আগেই—শিকদার তাকে বাধা দিলেন। তারপর মিছেই এগিয়ে গেলেন ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। কতকগুলো ইকোয়েশন নীরবে লিখে গেলেন বোর্ডের ওপরে। ইকোয়েশনগুলো শংকর চিনতে পারে—আইনস্টাইনের 'পশ্চিম্লেট অফ ইকুইভ্যালেন্স'—'প্রাতিষ্ঠান' সংগে ইনারশিয়া বা টৈব্বের সমতার অংক।

তবু শংকর নম্র—সভার মধ্যে অনেকেই বিবস্ত্র হন শিকদারের এই ব্যবহারে। শিকদারের কিন্তু কোনো বোধ নেই সে সম্বন্ধে। সভাস্থ সকলের অসুস্থতি নেগুয়াটাও তাঁর উদ্বেগভাবের মধ্যে আসে না। সকলের দিকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন শিকদার, তারপর আনন্দ করলেন গুরুগম্ভীর ভঙ্গীতে—

"বহুগণ, যে বক্তৃতা সন্ধান আমি করছিলাম এত দিন, আর তা পেয়ে গেছি। আপনাদের সমক্ষে আমি হবিবুজ্জার বক্তৃত্তর মূল স্বরূপ উদ্ঘাটন করব।"

শিকদার কিছুক্ষণ ধামলেন—প্রোভাতনের ওপর তাঁর এই বোধ্যার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্ত। প্রোভাতনের মধ্যেও লেখা বাধা চাকস্য, তারপরে একটা উৎসুক নীরবতা।

আনুপ্রসাদের হাঁসি শিকদারের মুখে।

"আপনাদের সমক্ষে, আজ আমি প্রমাণ করে দেব, যে হবিবুজ্জার ভাষাকথিত আবিষ্কারে একটা বিরাট প্রবন্ধনা। আপনারা সকলে জানেন কী না জানিনা যে, বোর্ডের ওপরে লেখা অক্ষরগুলো প্রকাশ করছে ডাঃ আইনস্টাইনের 'জিলাপল অফ ইকুইভ্যালেন্স' আমার কথার বিধান না হ'লে, অন্ততঃ আপনাদের সুখপারি ডাঃ হাব বা ডাঃ হাও আপনাদের বলতে পারবেন যে একলা ঠিক লেখা হয়েছে কি না।"

শংকরের দিকে সমর্থনের অপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন শিকদার। শিকদারের ভঙ্গীটা অনেকটা মঞ্চের ওপরের বাহুকরের মতো। যেন এককোড়া ভাস দর্শকদের সমক্ষে মেলে বদেহেম বাহুকর— "দেখুন আপনারা পরীক্ষা করুন—এর মধ্যে বৃহৎকী কোথাও আছে কি না।"

শংকর নিঃশব্দে বাঁড় নেড়ে শিকদারের মন্তব্য সমর্থন করে যায়।

শিকদার আবার আনন্দ করেন, "বহি আমরা এই

স্বোচ্চ জুগোও একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

দেবযানী

ফেস্ পাউডার
ট্যালকাম্ পাউডার
স্নো, কুমকুম
হেয়ার অয়েল
মেল্ গলিশ্

ডি, জে, প্রোডাক্টস্ * কলিকাতা-১

'ইকোয়েশন'গুলোর সত্যতার বিধান কি, বস্তুতঃ সত্যকারের বৈজ্ঞানিক এমন কেউ নেই, যিনি আজ এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবেন—তাহলে এই সাত নম্বর 'ইকোয়েশন'-এ দেখতে পাই যে কোনো পদার্থ 'ম্যাটার'—যার 'মাস' বা গুরুত্ব আছে মাধ্যাকর্ষণের অমোঘ নিয়মকে সেটার লঙ্ঘন করবার কোনো উপায় নেই এই সাত নম্বরকে, আরো একটু ভেঙে নিলে নিম্নলিখিত 'ইকোয়েশন'গুলো পাওয়া যায়—

শংকর নিম্নলিখিত চোখে বোর্ডের দিকে চেয়ে থাকে। শিকদারের বক্তৃতা তার এক কানে প্রবেশ করছে, অল্প কান দিয়ে বেরিয়ে চলেছে। যুড়ো শিকদারের বুদ্ধিভরা গুরুগভীর কথাগুলো অন্তরে কোথাও রেখাপাত করে না। 'ইকোয়েশন' নিতুল, বুদ্ধিগুলোও শূণ্য, অকাটা। কিন্তু শিকদারের আশ্চর্য্যিতা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে।

শিকদার নিতুলই গোড়ার কোথাও তুল করেছেন—যদিও তাঁর অংক এগিয়ে চলেছে নরম মাটিতে কাদাখোঁচা পাখীর দলের সারস্বতী পায়ের ছাপের মতো অনিবার্য নিতুল পরিণতির দিকে। তুল তাহলে কোথায় ?

সে তুলের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না—অর্ধচেতন মনের বন্ধ ঘরের প্রান্তে এসে আঘাত করে আবার মিলিয়ে যায় ধরাছোঁয়ার আগেই। সুমিত্রা বলবে এটা একটা অস্বভূতি—একটা অপরাধী 'ফীলিং'। সর্বদেহে সঞ্চারিত হয়ে ক্রমে ক্রমে সেটা মিলিয়ে বাচ্ছে।

পার্শ্ববর্তী নির্বাক শ্রোতৃমণ্ডলীর তিস্তাক্রিষ্ট মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে শংকর স্থির করে ফেলে—'প্রজেক্ট-আর্টিফ্রা'টিটি'-র সবচেয়ে বড়ো শব্দ যদি কেউ থাকেন তিনি উমাকান্ত শিকদার। বিবাহিত সহকর্মীদের সমস্ত বুদ্ধি চুষকের মতো আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছেন শিকদার অংকের ধাপে ধাপে—

"এই তেরো নম্বরের ইকোয়েশন তাহলে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে হবিবুল্লাহর বস্তুর মতো বস্তু কোনো দিনই ছিল না।

"যার একরকম ভাবে এটা প্রমাণ করা যেতে পারে।

"ধরে নেওয়া যাক যে হবিবুল্লাহর বস্তুর অস্তিত্ব আছে, আর সেটা মহাকর্ষের বিপরীত শক্তি তৈরী করত। ধরে নিলাম যে তার 'মাস' হচ্ছে 'এম', 'ডাইনামেশন' এতো, ইনারশিয়া—এতো। আগের ইকোয়েশনে সেগুলো বসিয়ে দিলে আমরা পাই চোকে। মন্বরের ইকোয়েশন তা থেকে পনোরো—তারপর যোলো, 'ইকোয়েশন' করলে সতেরো আর সহজ করলে পৌছনো যায় এই আঠারো নম্বর 'ইকোয়েশন'।

"এই আঠারো নম্বর ইকোয়েশনের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা একটা 'অ্যাবসার্ট' অসম্ভব ইকোয়েশন যার কোনো মানে হয় না। 'মাস' এর যে কোনো 'কাইনাইট জ্যালু' নির্দিষ্ট সংখ্যা বসালেও তার অর্থ হয় না।

"অর্থাৎ হবিবুল্লাহর বস্তু যদি সম্ভব হতো তবে এই যে খড়ির টুকরোগুলো ওপরে ছুঁড়ে দিছি সেগুলো 'সীলিং', এই আটকে থাকতো।'

খড়ির টুকরোগুলো সীলিং-এ আটকে থাকে না। আবার নীচে স্নেহে আসে প্রাক্টিশনের অনিবার্য শক্তিতে। তার মধ্যে একটা

লজ্জার আঘাত করে প্রফেসর গোপালাচারীর কেশবিরল মাথারি। ভুললোক দেখামে হাত বোলাতে থাকেন। শিকদার সেদিকে ক্রক্ষেপ না করে বলতে থাকেন—

"হবিবুল্লাহর বস্তুর অস্তিত্ব থাকলে পৃথ পৃথিবীকে আকর্ষণ করত না, পৃথিবী চন্দ্রকে আকর্ষণ করত সমস্ত বিশ্বজগৎও ব মতো নয়।"

শংকর ভাবে শিকদারের একটা বিহিত করতে হয়। সুমিত্রার মুখ বেন অতিমাত্রায় ককণ হয়ে উঠেছে। সত্যমূলে যুত্বার নীরবতা। শিকদারের কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চগ্রামে উঠে গেছে।

শংকরের চোখের সামনে থেকে বোর্ডের ইকোয়েশনগুলো সহসা মিলিয়ে যায়। তার জায়গায় ভেসে ওঠে বিরাট একটা জ্যোতিঃস্বর রাশিচক্র। মাঝখানে প্রকাণ্ড বড়ো একটা কুঠার—পরশুরামের কুঠার। শংকরের মাথার মধ্যে আগুন বলে ওঠে।

শিকদার বক্তব্য শেষ করেন আঠারো নম্বর ইকোয়েশনের নীচে তিনটে গভীর রেখা টেনে, উত্তেজনার আতিশয্যে ভুললোকের হাতের খড়ি ভেঙে ছুঁটকরো হয়ে যায়। তারপর সকলের দিকে একটা তাকিলোর দৃষ্টি হেনে শিকদার সশব্দে আসন গ্রহণ করেন।

শংকর দাঁড়িয়ে ওঠে।

ঈশৎ কল্পিত কণ্ঠে বলতে শুরু করে, "প্রফেসর শিকদার, এই সত্য আপনার বক্তব্য আপনি প্রকাশ করেছেন জ্ঞানগর্ভ বুদ্ধিপূর্ণ ভাষায়। সেজন্য আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই—

"সুমিত্রার নীরব সমর্থনে শংকরের কণ্ঠস্বর বক্রিষ্ট হয়ে উঠে, বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আপনার ইকোয়েশনও যেমন নিতুল, হবিবুল্লাহর আবিষ্কারটাকে তেমনি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবারও কারণ যেটেনি এখনও পর্যন্ত। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়—যে মূল 'পশ্চলেট'-এ আমাদের পলদ রয়ে গেছে।

"সোজা ভাষায় বলতে গেলে—আপনার নিতুল বুদ্ধি দিয়ে আপনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে 'ইকুইভ্যালেন্স প্রিন্সিপল'-এর সত্যতার সন্দেহ করবার বিলক্ষণ কারণ আছে।"

প্রফেসর শিকদার দাঁড়িয়ে উঠে এমন ভঙ্গী করলেন যে তিনি নিজের শ্রবণশক্তির ওপরে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর মুখ হোলো রক্তিম, নাসারন্ধ্র হোলো ফীত। বোম্বার মতো কেটে পড়েন শিকদার—"প্রফেসর কৃষ্ণাচারী, যদি এই সত্যমূলে এমন অর্বাচীন কেউ থাকেন, যাকে বলে বোঝাতে হবে যে ডাঃ আইনষ্টাইনের 'পশ্চলেট অফ ইকুইভ্যালেন্স' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জগতের বিদ্বৎসমাজে অখণ্ডনীয় বলে, আমার অনুরোধ, যে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হোক। এটা অশিক্ষিতদের জায়গা নয়।"

শংকর মনে মনে একটু হেসে নের, লক্ষ্য করে সুমিত্রার আয়ত চোখের স্থির দৃষ্টি তার ওপরেই নিবদ্ধ। তারপর অবিচলিত কণ্ঠে বলে—"প্রফেসর শিকদার, দয়া করে ধৈর্য হারাবেন না। কিন্তু আপনাকে আবার জিজ্ঞাসা করছি হয়তো বা অর্বাচীনের মতোই যদি 'পশ্চলেট অফ ইকুইভ্যালেন্স' সত্য না হয়, তাহলে কী হবে?"

শংকরের স্পর্শীয় শিকদারের বাস্তুত্ব হয় না, তারপর ব্যঙ্গ

হয়ে বলেন, "কী আবার হবে, বিশ্বস্নাত্ত লোপ পাবে আর কিছুই নয়।"

শংকর এবার হেসে কেলে একান্তেই, "বিশ্বস্নাত্ত লোপ পাবে একটা থিয়োরির জন্ম? তবে দেখুন, প্রফেসর শিকদার, কতো শক্তো থিয়োরি পরিত্যক্ত হোয়েছে ইতিহাসের জীর্ণ পাতায়, তার জন্ম কি দৃষ্টমান অগন্তের কিছু পরিবর্তন হোয়েছে? আইনষ্টাইনেরই 'কস্মিক স্থিতিশীলতার থিয়োরি' কি বাতিল হয় নি? কিন্তু আইনষ্টাইন ছিলেন মহামানব—তাই বড়ো পলার একথা বোঝা করতে বিধা হয় নি তাঁর 'কস্মিক স্থিতিশীলতা'-এর থিয়োরি আবার জীবনের সব চেয়ে বড়ো ভুল।"

শংকর চেয়ে দেখে যে সত্যই সকলের নীরব দৃষ্টির সমর্থন সে পেয়েছে। তাই আশ্চর্যবোধের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে তার কথায়—

"প্রফেসর শিকদার, হবিবুল্লাহ প্রমুখগণের অবৈজ্ঞানিক বইগুলো দেখে আপনি মর্মান্বিত হয়েছেন, আমরাও অল্পবিস্তর হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার সাবধানবাণী শুনেও সে সমস্ত বই নিয়ে আমি কিছু নাড়া-চাড়া করেছি। আমি জিজ্ঞাসা করছি, জৈলংগখামী বা মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো সিদ্ধপুরুষ যখন বিনা অবলম্বনে শূন্যে চলাকরা করতেন—বহু বিশ্বাসযোগ্য বুদ্ধিমান পণ্ডিত লোকের লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য আছে এ ঘটনাগুলোর—তখন আপনার 'পল্‌লেট' অফ ইকুইভ্যালেন্স থাকতো কোথায়? আমাদের দেশের এই সমস্ত বিবরণী না হয় কুসংসার বলে উড়িয়ে দেওয়া গেল কিন্তু পাশ্চাত্য দেশেও এরকম কতো বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। ড্যানিয়েল উগলাস। হোম হেনরী স্লেড, ইউসাপিয়া প্যালাডিনো এদের মাধ্যাকর্ষণকে লক্ষ্যন করার ক্ষমতার কথা জানা গেছে কোনো নাটক নভেল থেকে নয়—ডুকস, অলিভার লজ জোলনায়, প্রফেসর লোম্ব্রাসো, কুরী দম্পতি, বের্গলর এ সমস্ত ঘটনার দর্শক ছিলেন—আপনি কি বলতে চান এদের সকলেরই মতিভ্রংশ হয়েছিল?

"সত্য কথাটা কি জানেন, প্রফেসর শিকদার। আপনার পল্‌লেটে এ সমস্ত ঘটনার কোনো সনাক্ত নেই, তাই সবগুলোই কল্পনা-প্রসূত বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

"আপনাকে আর সমবেত বন্ধুদের আর একটা প্রশ্ন করছি। বলতে পারেন ভারতীয় শাস্ত্রে ও কাহিনীতে 'লেভিটেশন' শব্দে এতো তথ্য রয়ে গেছে কেন? আমার ধারণা—হবিবুল্লাহ এই প্রশ্ন থেকে শুরু করেছিল—আর সে প্রশ্নের একটা সনাক্তও পেয়েছিল। যদি আপনাদের থিয়োরি এর সনাক্ত না দিতে পারে তা হলে সে থিয়োরি আর একবার বাতাই করে নেওয়া উচিত নয় কি? শুধু তাই নয়, যদি আমাদের হবিবুল্লাহ তাত্ত্বিক বস্তুটিকে গড়ে তুলতেই হয় তা হলে মহাকর্ষ শব্দে সমস্ত মতবাদেরই আর একবার খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে।"

প্রফেসর শিকদার সমর্থনের আশায় সকলের দিকে চেয়ে দেখেন। কোনো উৎসাহ না পেয়ে মন্তব্য করেন—"বিজ্ঞানের বা বক্তব্য তা বোর্ডে লেখা আছে। তাতে যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, তবে সব ভেক ধারণ করে জৈলংগখামী হন গিয়ে।" দীর্ঘ পরবেশে সত্যমূল্য ত্যাগ করলেন তিনি।

অপ্রত্যাশিত ভাবে এবার এগিয়ে এলেন প্রফেসর সোপালাচারী শংকরকে সমর্থন করতে।

"আমি ভাঃ রায়ের সংগে সম্পূর্ণ একমত। গত কয়েক সপ্তাহে আমার মনের মধ্যে একটা তুফল তোলপাড় হয়ে গেছে। আপনাদের সকলের মধ্যেই এই একই আলোড়ন লক্ষ্য করেছি, হয়তো সে প্রতিক্রিয়া শব্দে আপনারা সকলে সন্মত নন।

"আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার আবার মকুন করে হিসেব মেলাতে শুরু করেছি। আমাদের ভারতীয় কলেজ-শিক্ষকদের মধ্যে প্রায়ই একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় চল্লিশ বছর পার হতে না হতেই আমরা নিজেদের বিবরে প্রবেশ করি বাইরের আলো বাতাস থেকে বখাসভব হয়ে থাকবার জন্ম। আমাদের জ্ঞান বৈজ্ঞানিক পুস্তকের বাইরের কোনো জিনিসকে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে ফেলার কার্যক্রমটাও অবলীলাক্রমে শিখে ফেলি।

"তদুপরে আমাদের পদোন্নতি হয়। হয়তো বা সম্মানিত প্রফেসর অথবা কোনো ল্যাবরেটরীর পরিচালকের আসন গ্রহণ করতে আহ্বান আসে। দেখি, গুরুত্ব বৈজ্ঞানিকের দল বিশেষ থেকে ঘরে কিরূপে সুনাম অর্জন করে। অনেক সময়ে যে প্রেরণা—যে রক্ত আমরা পথের মধ্যে হেলায় ফেলে এসেছি আমাদের জ্ঞানের সংগে খাপ খাওয়াতে পারলাম না বলে—এরা সেগুলোকে কুড়িয়েই বিজ্ঞানকে অগ্রসর করে এসেছে। সেই তারুণ্যের প্রতি আমাদের উর্ধ্বাটাই যায় বেড়ে। নানা কন্দী-কিকিরে এদের বহির্ভূঁ প্রভিভার রাশ টেনে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করি নিজেদের প্রিয় থিয়োরিতে পড়া অচল্যভূতনের ব্যবহার মধ্যে। যখন দেখি এরা বশ মেনেছে আমাদেরই অল্পরূপে পরিণত হয়েছে, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। কাঁকটা কিন্তু পড়ছে আসলে দেশের বিজ্ঞান সাধনার।

"আমাদের মনের গঠন অনেকটা বহু নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প-এর মতো। অভিজ্ঞতা বাড়ার সংগে সংগে আমরা একটা বিরাট বাঁধ তৈরী করি জ্ঞানের প্রান্তকে বেঁধে রাখার জন্ম। তাতে বোঁপ করি কতকগুলো 'স্লাডপেট' বাড়তি জ্ঞান বা তথ্য নিকাশ করে দেবার জন্ম। আমাদের পরিচিত বিশ্বজগতের বতো কিছু আছে 'সেল-ডেটা' তার কিছুটা সীমার সংরক্ষণ করি বাঁধের পেছনে, আর বাকীটা বার করে দিই 'স্লাডপেট'গুলো দিয়ে। বয়স বাড়ার সংগে সংগে স্লাডপেটগুলোও এমন ভাবে আমরা সাজাতে আরম্ভ করি যাতে নতুন কিছুই যেন পেটের পেছনে না জমে থাকে।

"প্রকল্প-এর অভিজ্ঞতা আমার এই বড়ে বাঁধা স্লাডপেটের ব্যবহার মধ্যে হঠাৎ এনে দিয়েছে একটা বিশৃঙ্খলা। নতুন তথ্য গ্রহণ করে সেটাকে ধরে রাখবার একটা চেষ্টা যেন পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে মনের মধ্যে।

"আজ আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই—যে ভাঃ রায় সত্য কথাই বলেছেন। মহাকর্ষ শব্দে সব ক'টা মতবাদেরই একটা অল্পপরীক্ষা প্রয়োজন। আমি একথা বিশ্বাস করিনা, যে আমাদের শাস্ত্র সব রসাতলে বাবে অ্যাট্রিগ্রাভিটি সন্তবপর হলে।

"হবিবুল্লাহ যে এ সমস্তার সমাধান করেছিল—এ ঘটনা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করাটাই পণ্ডিত্য। এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য

হচ্ছে সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলা—সে আবিষ্কার আর একবার সফল করে তোলা।”

এর পরে উঠলেন মুহাম্মাদ হুসাইন। বললেন,—‘অ্যান্টিগ্রাভিটি’ এমন কিছু অসম্ভব নয়, সহকর্মীদের সে কথা স্বরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি বলছি বিপরীত পদার্থের অ্যান্টিগ্রাভিটির কথা। অনেক বিজ্ঞানসাহসকের এই বিশ্বাস যে পদার্থের গুণ হয় মাধ্যাকর্ষণ, বিপরীত পদার্থের গুণ হবে ঠিক তার বিপরীত। অনেক কল্পনা করেন বিজ্ঞানজগতের মধ্যে কোনো কোনো জড় নীহারিকাপুঞ্জ হয়তো এই বিপরীত পদার্থ গড়া। আমাদের নীহারিকা—‘মিডল-ওয়ে’তে বিপরীত পদার্থ থাকার সম্ভাবনা খুব নেই যদি বা থাকে তবে যে হয়তো খুবই অল্প পরিমাণ—সহ্যাত্মক ছড়িয়ে। কারণ পদার্থ বিপরীত পদার্থের সংঘর্ষে ছটোয়ই হয় নয়।

এখানে অস্বাভাবিক হচ্ছে ‘জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি’ নিয়ে—কারণ তার সঙ্গে অ্যান্টিগ্রাভিটি খাপ খাওয়ানো যায় না। • আর আপেক্ষিকতাবাদ এত কাজে লেগেছে বৃহত্তর জগতটাকে বুঝতে যাতায়াতি সেটাকে বরখাস্ত করাও ঠিক হবে না।”

যাও সম্ভব্য করে, “সে সম্ভাবনাও আমার মনে উদয় হয়েছিল। কিন্তু ‘অ্যান্টিপ্রোটন’ কি ‘অ্যান্টিম্যাটার’ তৈরী করতে লাগে বিরাট শক্তি। আর একশো কোটি ‘ইলেকট্রন ভোল্ট’-এর শক্তি দিয়ে যদি কোন পরমাণুকণা পদার্থের নিউক্লিয়াসের এলাকার নিয়ে যাওয়া যায় তবেই সৃষ্টি হয় একটা প্রোটন আর একটা অ্যান্টিপ্রোটনের। কিন্তু এই কল্পনাতীত শক্তি তৈরী করার জন্ত যে বিরাটাকার কসমোট্রন বহু লাগে সেটা গড়ে তুলতে গেলে চাই প্রচুর অর্থ আর অনেক সময়। অতটা ব্যয় করতে হয়তো সরকারও কুণ্ঠিত হবেন।”

শংকর যোগ করে, “আর তাছাড়া হবিবুল্লাহ ল্যাবরেটরীতে কসমোট্রন তো দূরে থাকুক, একটা ছোটোখাটো সাইক্লোট্রন পর্যন্ত নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটা নিত্যন্ত সাধারণ ‘ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটর’।”

শংকরকে সমর্থন করে আরো দু’-একজন কর্মী কহুতা করলেন।

শংকর দেখল, যে তার জয় হয়েছে সম্পূর্ণ ভাবে। শিকদারের নেতিবাদের প্রস্তাব থেকে প্রজেক্ট-এ^১ ইয়েছে মুক্ত। সুমিত্রার আয়ত চোখের উচ্ছ্বাসতার আনন্দের আভাস। অবশেষে সেও কিছু বলবার লোভ সংবরণ করতে পারে না।

সুমিত্রার বলার একটা শাস্ত-সহজ ছন্দ আছে। সাধারণতঃ সে থাকে নীরব—বৈজ্ঞানিক লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করার জোরালো ভাসিলা না এসে। কিন্তু তার বক্তব্য রাখা পাত করে সকলেরই মনে। বক্তৃতা শেষে বাবার পরে সুমিত্রার কঠোর বোধ শংকরের মনে বাজতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে।

“আজ যে আলোচনা কোনো তার সম্পূর্ণ মর্দার্থ গ্রহণ করা

* Special Relativity Theory থেকে anti-matter-এর anti-gravity সম্ভবপর হয় না। দ্রষ্টব্য Gravitational properties of Anti-matter. L. I. Schilf. Proceeding of the National Academy of Sciences

(U. S.) Vol. 45, P 69 (1959)

আবার বিভাব অতীত। কিন্তু একটা ধারণা আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে যে আজ আমরা একথাও এগিয়ে এসেছি অ্যান্টিগ্রাভিটি আবিষ্কারের পথে। এ বোঝটা জম্বালা কেবল আপনাদেরই মুখের দিকে চেয়ে। কালও পর্যন্ত যেখানে দেখেছি সন্দেহ-সংশয়ের ছায়া। আজ তার লেশমাত্রও নেই।”

“আনা-বিজ্ঞানের বিধি-নিবেদের বেড়া ভেঙে আজ আমরা যেখানে এসেছি।

“কিন্তু যে কতো বড়ো একটা অজ্ঞানতার মাহুকের এগিয়ে চলার পথে, যমোবিক্রানের বেটা হচ্ছে একটা প্রধান উপজীব্য। যমোবিকারের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে সংস্কারের সঙ্গে বুদ্ধির জড়তাই। এই জড়তায় সংস্কারে বুদ্ধির জয় হলেও, অনেক সময়ে ‘ইকুইলিব্রিয়াম’ বা জম্বতা বার হারিয়ে। এমন কি, বুদ্ধিমান বহু মাহুকের মনেও সংস্কার যে কেমন করে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে উপস্থিত বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে—তার উদাহরণ পাওয়া বাবে একটা সত্য ঘটনা থেকে।

“একটা বিরাট মোটার ‘ট্রাক’ একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধির ট্যাংক বহন করে নিয়ে বাচ্ছিল রেলের কোনো একটা ‘কালভার্ট’-এর তলা দিয়ে। সহসা ‘কালভার্টে’ ‘ট্যাংক’র ‘গান্-টারেট’-টা আটকে গেল। দেখা গেল পুলের উচ্চতা আর মাত্র দু ইঞ্চি বেশী হলেই সে ট্যাংক অনায়াসে গলে যেতে পারত।

“এখন—এই রাস্তাটা হচ্ছে সহরের প্রধান শিরা। রেললাইনটাও একটা প্রধান শাখা—রোজ লক্ষাধিক যাত্রীকে বহন করে সহরে নিয়ে আসে। মিলিটারি কর্তৃপক্ষ রেলের কর্মচারীদের নির্দেশ দেন—‘পুল ভেঙে ফেল’।”

রেলের কর্তৃপক্ষ জবাব দেন—‘পুল ভাঙলে ট্রেন চলাচল যে বন্ধ হয়ে বাবে দীর্ঘকালের জন্ত—কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হবে আমাদের। অতএব একমাত্র উপায় হচ্ছে ট্যাংকের ‘গান্-টারেট’-টা কেটে ফেলে দেওয়া।

মিলিটারি চক্ষু বজ্রবর্ণ করে রেলকে বলে, “তোমরা দেশজোহী, জানোনা—এই ট্যাংক চলেছে সীমান্তে? সামান্য কয়েক লক্ষ টাকার জন্ত দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাধা দিতে চাও?”

“ইতিমধ্যে এই ট্রাকের পেছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে ট্রাম-বাগ নানা রকমের যানবাহনের এক মাইল লম্বা সারি। ওদিকে আবার ট্রেন-চলাচলও বন্ধ। অফিসবাড়ী সব মারমুখো হয়ে উঠেছে।

কর্পোরেশন এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষ, উভয় পক্ষকে অহুন্নয় করে তোমানের মধ্যে যা হয় একটা মীমাংসা করে আমার রাস্তাটা খুলে দাও।

এক ঘটনারও ওপর বচসা চলতেই থাকে। তিন পক্ষের চীক এক টাক বড়ো ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞদের কাছে খবর যায়। এরা মাথা চুলকিয়ে বলেন সমস্তা বটে।

রগড়া যখন সপ্তমে উঠেছে, একটা স্থলের ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—ট্রাকের টায়ার থেকে ধানিকটা হাওয়া বের করে দাও না কেন?

বড়ো বড়ো বিশেষজ্ঞদের সংস্কারের চশমা ভেঙ করে এতো সহজ সমাধানটা মজবে পড়েনি।

একদিক থেকে দেখতে গেলে হবিবুল্লাহ একটা সুবিধা ছিল

—কালের বিধিবিধানের নিয়মতান্ত্রিক বিজ্ঞানের পাঠ মেওয়া তার হয়ে ওঠেনি। তাই সে ছিল কতকটা সংসারমুগ্ধ। বিদ্যার বিধি-নিয়মগুলো হরতো বা তার ভালো করে জানার অবকাশও হয়নি। তাছাড়া ছিল তার একটা অসম্য ইচ্ছা সাধারণ মানুষকে ছাড়িয়ে বাবার। এটাই হচ্ছে অ্যাঁটিগ্রাভিটির ইতিকথা।

প্রতিভার কথাটা একেবারে সোঁপ। আমার ধারণা যে এ সত্যের ধারা উপস্থিত আছে, প্রতিভার দিক থেকে হবিবুল্লাহ থেকে কেউই কম নয়। সত্যি কথা বলতে কি, মনোবিজ্ঞান ব পরীরিজ্ঞান এখনো প্রতিভার উৎস সন্ধান করে পারেনি। আমরা শুধু জেনেছি যে হৃৎকেন্দ্রের একটা ক্ষুদ্র অংশেই রূপায়ন করা যায় মানুষের চৌর্ধ্ব জীবনের যতো করণ্য যতো অসুস্থতি, যতো অভিজ্ঞতা। বাকী অংশটা যে কী কাজে লাগে সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিমা। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের মস্তিষ্কের কমতা অপরিণীম হবার পথে কোনো বাধাই আমাদের মস্তিষ্কে আসে না। প্রতি সেকেন্ডে যদি একটা নতুন সাদা একটা মস্তিষ্ক অভিজ্ঞতা সেখানে মুদ্রিত হয় পঞ্চাশ লক্ষ বছরেও মস্তিষ্কের শত শত কোটি কোষগুলোর কিছু অংশ অব্যাহতই থেকে যাবে।

অসম্য ইচ্ছা থাকলে আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে না কেন ?

“মস্তিষ্কের কমতা মূল হবার কথা নয় জয়গন্ত হলো।

“কিন্তু কেন হয় না আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথ-আইনষ্টাইনের আরো বেশী সংখ্যায় ? হবিবুল্লাহ আগে অ্যাঁটিগ্রাভিটি-মেশিনই বা সম্ভবপর হয়নি কেন ?

মনোবিজ্ঞানের একটা সহজ উত্তর আছে এ প্রশ্নের। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে শিশু জগতটাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। সব কিছুই তার কাছে নতুন—প্রতিমুহূর্ত তার ভরে যায় অজ্ঞানার বিচিত্র আশ্বাসে। তারপর ‘সুস্থ হয় রুটিন-অভ্যাসের পাল। নির্দিষ্ট সময়ে তাকে স্থলে যেতে হবে, নির্দিষ্ট পাঠ শিখতে হবে, সমাজের সহবৃত্ত আর বিধি-নিয়ম তাকে অভ্যাস করতে হবে। তখন থেকেই দেওয়াল গড়া হচ্ছে তার করণ্য-উদ্ভাবনী শক্তির চাবিকি। বলা হচ্ছে এটাই তোমার সীমা—এটাই হচ্ছে উদ্ভ্রজনসমর্ধিত নিরাপদ পথ—আর কোনো পথ নেই। একদিন আসে যখন ছাত্রজীবন

শেষ করে তাকে বেয়োতে হবে জীবিকার সন্ধান। চাকুরী-ব্যবসায় গবেষণা কি সরকারের দৈনন্দিন রুটিনটা আরো কড়া, বিচ্যুতি হলো সমাজ ও কর্মক্ষেত্রের সীমাল কোণ্ডের শান্তিটা আরো জবরদস্ত। তাই এই অসীম কমতা হয়ে যায় ডিসিঙ্কনের নাগপাশে বন্ধী। ছোটো সীমার মধ্যেই তার রাজত্ব। এই ভাবে বয়সের সঙ্গে কেড়ে উঠে প্রাচীর—উচ্চতার হয় আকাশস্পর্শী।

“প্রকৃতির গোপালাচারীর কথায় এটা বৈজ্ঞানিকভাবে বীধ।

“তারপর দেহবৃত্ত হতে থাকে বিকল, জরাজীর্ণ, জীবনযাত্রার সংশ্রমে কতবিকল। এ সীমার মধ্যে যে স্বাধীনতাটুকু ছিল মগজের সেটাও মিসিয়ে হই অপরূপ দেহবৃত্তের তার বহন করে। এই ভাবে একেবারে হয়ে থাকে অসীম শক্তি যুগের পর যুগ ধরে।

“এই বেড়ার মধ্যেও ছ’-একজন আকস্মিক ভাবে—হরতো বা কোনো অজানা দৈবঘটনার ফলেই—এই সীমা অতিক্রম করে বাইরের সূর্যালোককে বেয়ে পড়েন—তারা হই হল—সেঙ্গপীঠার—রবীন্দ্রনাথ-আইনষ্টাইন।

“দয়া করে কল বুঝবেন না, আমার বক্তব্য এ নয়, যে বিধি-নিয়ম সব তুলে দাও, রুটিনবদ্ধ শিক্ষার রীতিটা ব্যতিল করে দাও—সহবৃত্ত শিক্ষার জলাঞ্জলি দাও। বিবর্তনের ফলে হরতো শুধু ভবিষ্যতের উন্নততর মানুষের করণ্যাতীত সমাজ এ সমস্ত ব্যবহার প্রশোজনকে অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু আজ তা অসম্ভব। এমন কি আজকের সমাজবিধান আর শিক্ষা প্রশালীর শৃংখলা বজায় রেখেও কী ভাবে মানুষের মননশক্তির সীমারেখা সমস্তা বাড়ানো চলে, এ সম্বন্ধেও কোনো সহজ সমাধান আমার বুদ্ধির অগোচরে।

“কিন্তু প্রশ্নটা উপস্থিত করতে চাই আপনাদের মতো সুরীজনের সামনে। আমার আশা যে, আপনাদের উজ্জলতর প্রতিভা, প্রশস্ততর অভিজ্ঞতা আর গভীরতর সমাজবোধ এ সমস্তার সীমাংসার কোনো পথের সন্ধান দিতে পারবে।

“প্রগল্ভতা আমার মার্জনা করবেন—এ দীর্ঘ অনধিকার চর্চা করলাম এইজন্ত যে, আপনাদের চোখে আজ দেখছি নতুন আলো—সীমার বাইরের জগতটার আভাস।

“এই পথেই অসম্ভব হয়েছিল হবিবুল্লাহ আবিষ্কার।” [ক্রমশঃ]

খরজীবনের মধ্যবেলায়

জগৎকুমার বিশ্বাস

ছাত্রাভরা পথে হেঁটে কেটে গেছে সে ত্রিংশৎ সন্ধ্যা
লব্ধ সমতাঘেরা আর কত পুষ্প মনোহর ;
ভাদের মধুর গন্ধে উবেলিত সোনার প্রহর
পারিজাত-কীর্ণ বনে নিয়ে গেল। শুক মহাকাল !

আশাহীন দীপ্ত চোখে নেমেছিল মধুর বিষয়—
নন্দনের ত্রিংশৎ সূর্য্য আলোকিত আমার আকাশ।
বলো, কে বা ভেবেছিল এটি শুধু ক্লিন্ন পরিহাস,
কমাহীন দেবতার এ শুধু নিষ্ঠুর অভিনয়।
হঠাৎ খেরাল হলো,—কেন আগে বার্থতার সুর ?
প্রাণের গোপন ব্যথা প্রচণ্ড সূর্য্যের মত বলে—
আলামত তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ আর স্বপ্নের কবলে
বৃত্তান্ত পড়ে আছে কজোড়া বিধর হুপুয়।

পুষ্পবৃন্তে ফুটে-ওঠা টলোমলো নদীর উচ্ছ্বাসে
রক্তের প্রতিটি বিন্দু শোনে আজ অনাহত ডাক ;
হুচোখে সমুদ্র শান্তি তুল ভালে, তাই উর্ধ্ব্বাসে
নূতন আশার ছন্দে ছুটে চলে স্বপ্নের নির্বাক।

এবার জেনেছি আমি জীবনের অর্থ কোথা আছে—
তুকার পবিত্র তীর্থে চাহি তাই বন্দাকিনী-ধারা
সুতাহীন শৈত্য বার অভিশপ্ত মরুভূর কাছে,
প্রাণের মেঘমায়া, অসুস্তের বঙ্গসিঁদ্বি, ত্রিংশৎ ব্যথাহরা।



জন্ম

বাসব ঠাকুর

স্বামীর মৃত্যুর পর

পঁয়ত্ৰিশ বছর বয়স থেকে নয়নতারা আজ পঁচাত্তর বছর কালীতেই বসবাস করেন। এখন চুনিয়ায় আপন বলতে আছে তাঁর একমাত্র বোন সুমিত্রা। যে বয়সে তাঁর চেয়ে আট বছরের ছোট। সুমিত্রার স্বামী ব্যবসায়ী লোক, বনেদী ঘরের ছেলে, নয়নতারা জানেন যে অবস্থা ওদের ভালই। বালীগঞ্জ নিজের

একটা দোতলা বাড়ী, আর একটা ছোটখাটো মোটরও আছে। নয়নতারার স্বামীও তাঁর জন্ম যে টাকা বেখে গেছেন তাতে কোরে একটা বিধবা মাহুদের খুব ভাল ভাবেই বাকী জীবনটা চলে যাবার কথা। সব সময় তিনি কালীতেই থাকেন, তবে পরমের সময় প্রায় প্রতি বছরই কিছুদিনের জন্ম সুমিত্রার কাছে আসেন।

এবার ছোট বোনের সংসারে এলেন হ' বছর পরে। কৈলাস ও দারকার বাওয়ার দরুন পঁচাত্তর তাঁর আর কলকাতার আসা হয়ে ওঠেনি। পরাশর রোঙে সুমিত্রাদের বাড়ীতে টাক্‌দি থেকে নামভেই সবার আগে ও মা মাসী এসেছে। বলে নয়নতারার পায়ের উপর কাঁপিয়ে পড়লো সুমিত্রার মেয়ে বৃষ্ণ, সে যেন এই পঁচাত্তর হঠাৎ কেমন বড় হয়ে গেছে। নয়নতারা হিসেব কোরলেন বয়স তার আঠারো কিংবা উনিশ হবে, তবে এতদিন সে কক্ষ পরতো এবার দেখলেন সে শাড়ী পরতে শুরু করেছে। মেয়েটাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! বৃষ্ণকে আদর কোরতে কোরতে নয়নতারা বসবার ঘর এসে কোঁচটার একধারে বসলেন।

নয়নতারা জানেন এখন সুমিত্রার বিবাহের সময়, এই সময়

সে ঘর ঘর কোরে জ্যান চাঙ্গিয়ে মেয়েস উপর করে সখ্যা পাঁচটা 'অবধি একটা লক্ষ্য দূর দিয়ে নেয়। তার অঙ্গ কেউ তাকে জাগিয়ে দিলে প্রোচই তার মাথার জ্বলা আরম্ভ হয়ে যায়। কালী থেকে এই ট্রেণটা বড় অসময়ে আসে। আড়ইটার পৌছবার কথা কিন্তু আজ লেট হয়েছে। যদিও এখন পাঁচটা প্রায় বাজে, তবু তিনি বড়তে বারণ কোরলেন তার মাকে ডাকাত্তাকি কোরতে। সুমিত্রার ছেলে পলটু পরমের ছুটির পর একজামিনের পড়ার ব্যস্ত কিনা ডিপোল করলেন। জানলেন

সে বাড়ী নেই, এই সময় পাড়ার ক্লাবে বল খেলতে যার, কোরে সাতটার সময়। সুমিত্রার স্বামী বরেশ ম'টার আগে অকিস থেকে কিরতেন না, আজকাল শুনলেন কখনও কখনও এগারটাও হয়ে যার কিরতে। ভাবলেন বরেশ নিশ্চই আর কোথাও যার, যাক এগারটার আবার কোনও অকিস খোলা থাকে নাকি। বৃষ্ণর কাছ থেকে সুমিত্রার সংসারের বেশির ভাগ খবরই জানতে পারলেন তিনি। তবে ভাবলেন ওদের অবস্থা আগের তুলনায় ধারাপ হয়ে গেলেও নিশ্চয় খুব বেশী হয়নি। কারণ তা হলে এখনও প্রায় সবই আগের মত কি আর থাকতো? একটি কৰ্মী দেখতে কমবয়সী মেয়েকে কলতলার দিকে যেতে দেখে বৃষ্ণকে জিগ্যেস করে জানলেন মেয়েটি ওদের নতুন কি পয়। বললেন, হ্যাঁ বে, হিরগুরী কি চলে গেছে? সে আজ ন' দশ বছর আগের কথা।

বৃষ্ণর যখন আট আর পলটুর দশ বছর বয়স, সেই সময় সুমিত্রা অল্পবে পড়ায় বিধবা হিরগুরী প্রথম ওদের সংসারে আয়া হয়েই এসেছিল। পরীব হলেও সে উল্লবের মেয়ে। বিয়ের আগে পর্যন্ত পড়াশুনাও করেছিল এবটু। ক্লাস এইটে ওঠবার পরেই ওর বিয়ের সন্ধর্ভ আসে। গরবেব মেয়ে পরীব লোকের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়। মহেশ ছেলেটি ভালই ছিল, ব্যারাকপুর কাঁচড়াপাড়া লাইনে বাস ডাইভারী করে মন্দ রোজগার হোত না তার, তবে আন্তে আন্তে জানা গেল খুব কম বয়স থেকেই ও মদ খাওয়া শুরু কোরেছিল। বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই মাকে মাকে রাত্রিতে সে মাতাল অবস্থায় বাড়ী কিরতে লাগলো। কষ্টে-সুটে কোন রকমে হিরগুরী বিয়েটা দেবার পর ওর বিধবা মা-ও অল্পবে পড়েছিলেন। তার পর মহেশ একদিন মাতাল অবস্থায় বাড়ীতে আর না এসে, বাসটাকে খানায় ফেলে নিজে এমন এক জায়গায় পৌছে গেল, যেখান থেকে পৃথিবীর সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখা যায় না। খবরটা পেয়ে হিরগুরীর মনের ভাবটা কি হল ঠিক বোঝা যায়নি, তবে ওর অল্পই মায়ের অল্পখটা এই শোকে এতই বেড়ে গেল যে দিন কয়েকের মধ্যেই তিনিও ইহলোক ত্যাগ করলেন। বিয়ে হবার বছর দুয়েকের মধ্যে সংসারে ওর আর কেউই রইলো না।

বাস কোম্পানী পরীব বিবাহের উপর করা দেখিয়ে বাসখানা তেজে বাওয়ার বে অন্ত হাজার টাকা কতি হল (যার জন্ম অবস্থ মহেশকেই উগা স্বামী বরেশ) তা সঙ্কেও সে কথা ভুলে গিয়ে হিরগুরীকে মহেশের

পাঠনা এক মাসের মাইনে উপর আরো এক মাসের মাইনে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটার একটা সহজ মীমাংসা করে ফেললেন। ঐ সামান্য কাঁচি টাকা মূল্য করে বাধ্য হয়েই তখন হিরণ্যরীকে চাকরির বোঝে বেহাঙে হোল।

এই সময় একটি বৃহৎ সন্তানের জন্ম দিয়ে সুরমিত্রা রীতিমত অসুস্থ হোয়ে পড়ে, তাই ওর ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনার জন্ত ওদের একজন মহিলার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মাসিক পনের টাকা বেতন ও খাওয়ানোর পরিবর্তে প্রথম এই সময়ই হিরণ্যরী ওদের সংসারে কাজ করতে আসে। সুরমিত্রা সেই বেঁটুঅসুস্থ হয়ে পড়ে তখন থেকে আজও সে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠেনি। ডাক্তাররা বলেন নার্ভ আসলে ওর একটুতেই বুক বড়ফড় করে, কিংবা মাথা ঘুরা হয়, বাব জন্ত ওর মেজাজও আজকাল খিটখিটে হোয়ে গেছে।

মাসীর প্রেরণ উত্তরে বৃহৎ বলে, হিরণ্য আছে তবে কাজও বেড়েছে বলে একজন বি রাখতে হয়েছে। তার মা তো হিরণ্যকে তত দেখতে পারে না, তাই সব কাজে ওকে থাকতেও দেন না। পন্নই আজকাল মাঘের বেশির ভাগ কাজ করে। কথাধ কথাধ কিছুটা সময় কেটে গিয়েছিল, তাই এব মধ্য সুরমিত্রা ঘুম থেকে উঠে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

দিকিকে দেখে খুশী হয়ে বলে, কখন এলে দিদি! আমাকে ডেকে দিসনি কেন বৃহৎ? এই বা তো পন্নকে বল আগে দিদির উপরের ঘরটার জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে সব পোছপাছ কোরে দেবে। বিছানার চাদরটা যদি তত পরিষ্কার না থাকে তো বলবি কাল বেন ওটা কেচে দেয় আর হিরণ্যকে ব্যস্ত করবার দরকার নেই।

বৃহৎ বলে, বাড়ীতে একটাও সাবান তো নেই কাচবে কি করে? চাদরটা আমি কালই কাচিয়ে ইত্তি কোরে রেখেছি, ঘরের আর সমস্ত ব্যবস্থাই করা আছে। মাসীমা বরং উপরে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিন, চানের ব্যবস্থাও সব কোরে রেখেছি।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে কখন যে হিরণ্যরী নিঃশব্দে এসেছিল তা ওরা লক্ষ্য করেনি। ওর কথার সবার সঙ্গে ঘরে মাসীমাও কিরে তাকালেন ওর দিকে কিন্তু সেই সন্ত্রহ চাউনি বেন নেই! নয়নতারা বললেন কাঁড়াও বাছা, এতদিন পরে আত্মীয়-স্বজনের কাছে এলুম আগে হুটো মুখচুঃখের কথা করে নি, চান করা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। হিরণ্যরী বুঝতে পারে না মাসীমার মনটা এখানে আসার পর সুরমিত্রার কাছে কিছু শুনেই ওর উপর বিরূপ হয়েছে কি না। সে বলে তা তো নিশ্চয়, তবু আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি, আপনার যাতে কোন অসুবিধে না হয়—বলে হিরণ্যরী নয়নতারার সটকেসটা ভারী হলেও একাই সবজার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে সোজানার উঠার নির্দিষ্ট দিকে

চলে যায়। হিরণ্যরী বোঝে না কি জন্ত সুরমিত্রা তাকে দেখতে পারে না।

খানিক পরে নয়নতারা উপরে তাঁর জন্ত নির্দিষ্ট ঘরে এসে দেখেন, তাঁর প্রয়োজনীয় সব কিছু ঠিক আগের দিনের মতই বধাবিধি শুছিয়ে রাখা আছে। বাড়ীতে এসেই বৃহৎ ও সুরমিত্রার বেশভূষায় এবং কথাবার্তার কোথায় বেন একটা দায়িত্ব ও অস্বাচ্ছন্দ্যের আভাস ফুটে উঠছিল, তাতে তিনি এবার এখানে থাকার ক'দিন নিজের সুখ-সুবিধের বেশ কিছুটা বাব দেবার জন্তই প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

কিন্তু উপরে তাঁর ঘরটিতে এসে সাজানো-গোছানোর ব্যবস্থার কোথাও কোন জ্রুটি দেখতে পান না নয়নতারা। এমন কি তাঁর বিশেষ প্রিয় একগোছা বজনিপছাও একটি কাচের ফুলদানীতে সাজানো আছে। এই সব দেখে-শুনে নয়নতারার বিশ্বাস হয় মা বে ওদের অবস্থা কিছু খারাপ হয়েছে।

মান মেয়ে নয়নতারা ক্যানের তলার ইজিচেয়ারটার বসেছিলেন চুল তকোতে। এমন সময় পন্ন এসে একটা প্রণাম করে বললে, মাসী, পত বছর আসোনি কেন?

—পত বছর এ সময় যে দায়কার গিয়েছিলুম বাবা, তা ছুঁমি কেমন আছ?

—ভাল আছি।

—কিন্তু একটু রোগা হয়ে গেছ বে, পড়াশুনোর খুব চাপ পড়েছে বুঝি? এই নাও—বলে নয়নতারা একটা বশ টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বললেন, কিছু বই-টাই কিনো। এ বছর একজামিনের রেজাল্ট ভালো হয়েছে তো?

—এ বছর একজামিন দিইনি।



—ও মা, কেন ?

—কলেজ থেকে নাম কেটে দিয়েছে।

—সে কি ! কোন ছুট্টা মি করেছিলে বুঝি ?

—না, মাইনে দেওয়া হয়নি বলে।

ঠিক এই সময় নীচের দরজায় কড়া মার্ডার শব্দ পেয়ে পল্টু বললে, বাই মাসী, দরজাটা খুলে দিবে আসি।

—কে রমেশ এলো বুঝি ?

—মা, বাবা নয়, ও হচ্ছে বিজুতি।

—বিজুতি কে ?

—মোটর মেকানিক, হিরণের ঘাড়ের বন্ধু, আমাদের গাড়ীটা আজকাল ওই যেরামত করে। আমি নীচে বাচ্ছি মাসী, মা বললেন ভোমার চান হ'লে গেলে নীচে আসতে, জলখাবার দেওয়া হয়েছে, মাথের এখনো সিঁড়িওয়া বারগ, তাই আসতে পারছেন না। পল্টু নীচে চলে গেল। নয়নতারা দেখলেন, ওর প্যাণ্টের ছদিকে জালি দিয়ে সেমাই করা। অর্ধচ সুনলেন ওদের মোটরটা এখনো আছে এবং রিপেয়ার হচ্ছে।

নীচের খাণ্ডরঘরে খানিক পরে এলেন নয়নতারা, ওর জলখাবার ঠিক আগের দিনের মতই তৈরী করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। তবু স্মিত্রা বললে, বিদির এবাধে এখানে থাকতে কষ্ট হবে হয়তো। লোকজন পূর্বোক্ত হলে যে এতটা মাখার চড়ে যায়, তা কি করে জানবো বলে, ঐ হিরণের কথাই বলছি, দেখ না খাবার দিয়ে একটু ঝাঁকাবে তো, যদি কিছু দরকার পড়ে তা না, এখন তিনি উপরের ঘরে ঠেঠকখানার আসর খুলে বসলেন। ঐ মোটর মেকানিক ছোঁড়াটা তো সব সময় আছেই আবার একজন উকিলবাবুও মাঝে মাঝে আসেন। এ বাড়ীতে আজকাল যেন বারো ভূতের আনাগোনা, তা আর হবে না বাড়ীর মালিক স্বয়ং যদি এক ঝিকে অত আঁকা দেয়।

স্মিত্রার কথার রহস্যের কুশালা তেদ কোরে নয়নতারা একক্ষণে যেন একটা স্পষ্ট জিনিষ দেখতে পেলেন। কিন্তু তবু তাঁর কথাটা বিশ্বাস করতে বাগলো, অমন বনেদী বংশের ছেলে রমেশের মত লোকের মন কখনো এক বিষয়ের উপর বুকতে পারে ? তা' সে হিরণই হোক আর বেই হোক। মা না, এ নিশ্চয় স্মিত্রার অপরূহ মস্তিষ্কের কল্পনা।

জলখাবার শেষ কোরে একটু বিশ্রামের জন্ত আবার উপর তলার ঘরে এলেন নয়নতারা। জানলার ধারের ইজিচেয়ারটার বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তা খেয়াল ছিলনা। দরজার করাঘাতের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে দেখলেন, কালো আকাশ অসংখ্য তারায় ভরে গেছে, বেশ রাত হয়েছে, ভাড়াভাড়ি দরজা খুলে দিতেই রমেশ ঘরে এলো, বললে কেমন আছো দিদি ? তুমি আসবে বোলে আজ একটু ভাড়াভাড়ি কিরবো জেবেছিলুম, তাও ট্রামের ভীড়ের জন্তে দেখ না সেই আবার দেরি হয়ে গেল, আমাদের গাড়ীটা খারাপ আর ট্যাকসি এসদর পাওয়াই যায় না।

রমেশকে দেখে নয়নতারা একটু চমকে উঠেছিলেন। স্মিত্রার কথার মধ্যে একটু আগে যে এক্সর ইংগিত পেরেছিলেন তাতে রমেশের চরিত্র সবচে তাঁর মতোই বিশ্বাস থাক না কেন তাতে

একটু সন্দেহের ছায়া পড়েছিল। তার উপর সে আজকাল অনেক রাত কোরে বাড়ী কোরে ওমে ভাবছিলেন যে তার চরিত্র যদি নির্দোষ মাই থাকে তাহলে অনেক রাত্তে হয়তো সে আজকাল মাতাল হয়েই কোরে যেটা ঠিক স্পষ্ট কোরে বোলতে হয়তো স্মিত্রারও বাগছে। তাই তিনি একটু পূরে পূরে খেবেই ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। কিন্তু ওর মুখ থেকে একটুও মদের গন্ধ না পেয়ে এবং ওর চেহারা যদিও একটু রোগা হয়ে গেছে তবে খুঁটিয়ে দেখেও ওর হাবভাবে তেমন কোন পরিবর্তন ধরতে না পেয়ে ধীরে ধীরে আশঙ্ক হালেন নয়নতারা। কিন্তু রমেশ বতই খুসীভাবে দেখাক না কেন, রমেশের কথাবার্তার বোঝা গেল যে এবার নয়নতারার কলকাতার আগমনে সে যেন তেমন খুসী হতে পারেনি। রমেশ চলে যাবার একটু পরে হুঁ হুঁ এসে বললে, খাবার হয়ে গেছে মাসীমা, উপরে পাঠিয়ে দিতে বোলবো ? তুমি কেন আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে খাওনা মাসীমা ? সে নয়নতারার উজ্জল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি যে বিধবা, তার উপর শুধু মীক্ষা নিয়েছি। আমাদের যে মাচ-মাংসর ছোঁয়া খেতে সেই মা। আর আমার পাশে একটু বোস, বলে ঝুঁর হাত ধরে বিছানায় নিজের পাশে আদর কোরে বসিয়ে নয়নতারা বলেন, ওকথা বাক তোমর ধবর একটু বল, তুই কি ট্যাকসিই হয়েছিস প্রায় তোমর দাদার সমান, গানের ইচ্ছা কি শিখলি আমার শোনাবি তো ?

হ্যা নিশ্চয়, কিন্তু আমার গলাটা খারাপ হয়েছে গেছে বলে গানের ফুলে আজকাল আর বাইনা।

গলা খারাপ না মাইনে বাকী পোড়েছে, ঠিক করে বলতো ? নয়নতারার প্রশ্নে ঝুঁর কোন উত্তর না দিয়ে চুপ কোরে থাকে। তিনি আবার বলেন, কি, চুপ কোরে রইলি যে, মা বুঝি বলতে বারণ করেছে ?

এবার গলাটা একটু পরিষ্কার কোরে ঝুঁর বলে, না না, তা ছাড়া আজকাল বাড়ীতে আমার অনেক কাজ করতে হয় কিনা। হিরণকে মা কোন কাজ করতে দেন না, মা চান ওকে ছাড়িয়েই দিতে। হিরণ তো শুধু বাবার জন্তই টিকে আছে, মা ওকে একদম দেখতে পারেন না। কিন্তু বাবা চান না যে ও চলে যায়, তাই ওর বদলে আমিই অনেক কাজ করে দিই। আমার কিন্তু হিরণকে খুব ভালো বলেই মনে হয়।

হিরণের উপর স্মিত্রার বিষেধের আর একটা সম্ভাব্য কারণ যেন আরও বেশি স্পষ্ট হোয়ে ওঠে ঝুঁর কথায়। তাই তিনি নিশ্চিত হবার আশায় ওকে জিপ্সো কথেন হ্যা রে, হিরণকে তোমর মা কেন দেখতে পারেনা বলতো ? হিরণ তো আগের মতই সজ্জয় করে আর কাজকর্মও কিছু কম করেনা দেখছি, তা ছাড়া ওর চাল-চলনও তো ঠিক আগের মতোই তরু আছে ; তবে তোমর মা ওকে দেখতে পারেন না কেন বলতো ?

কি জানি, মা বলেন ওর জন্ত বত সব বাইরের লোক বধন তখন বাড়ীর মধ্যে আসে বার।

কে তারা ?

ঐ বিজুতি আর উকিল বাবু। বিজুতি কাউকে প্রাঙ্কই করে না কি না, তাই মা খুব বেগে যান, মা বলেন ওর বন্ধু দেখে মনে হা বাড়ীটা যেন আমাদের নয়।



মায়ের মমতা ও অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত

আপনার শিশু ভবিষ্যত চিন্তা করে আপনি ওর কোন রকম মড়ুর ভ্রুটি রাখেননা। সুকটালার মত ভালবাসার সাথে ওকে নিয়মিত অষ্টারমিল্ক দিয়েছেন। কারণ আপনি জানেন যে অষ্টারমিল্ক ঠিক মায়ের দুধেরই মতো। খাঁটি দুধ থেকে অষ্টারমিল্ক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী। আর সে জন্য সহজে হজম হয়।

শিশুদের রক্তাক্রম থেকে ষাঁচা-ষাঁচা জনা অষ্টারমিল্কে লৌহ আছে। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয়েছে, ফলে আপনার শিশুর দাঁত ও হাড়কে মজবুত করে গড়তে সাহায্য করবে।



...মায়ের
দুধেরই মতন

বিনামূল্যে! "অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা" (ইংরেজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সব রকম তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়, 'অষ্টারমিল্ক' পোস্ট বক্স নং ২২৫৭, কোলকাতা-১

তবে তখনকার, ঐ বিভূতি নাকি তোদেরই মোটরটা সারাবার জন্ত আসে ?

হ্যাঁ, আর বাবা ওকে ডেকে পাঠান বলেই তো ও আসে।

তোমার বাবাই যদি ওকে ডেকে পাঠান তাহলে ও কেন আসবে না বল, তাছাড়া ও তো তোদেরই মোটর ঠিক করতে আসে বাপু!

হ্যাঁ কিন্তু মা ভাবেন পন্টকে বিভূতিই সিগারেট খাওয়া শিখিয়েছে। ও কিন্তু পন্টকে মোটরের কাজট শেখায়, যাতে পন্টর একটা চাকরি হতে পারে। মোটরটা সারাতেও কোন পরসাম নেইনি বিভূতি। তবু মা ভাবেন ও হিরণের বন্ধু একটা মিত্রী, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ওর সঙ্গে অন্ত মাথামাখি ভালো নয়। আমাকে ওর সঙ্গে কথাই বলতে দেন না। আমি যদি বিভূতির সঙ্গে কথা বলি অমনি মায়ের কাছে বকুনি খেতে হয়। অথচ পন্ট হিরণের কাছে থেকে টাকা ধার করে পদ্মর সঙ্গে লুকিয়ে সিনেমাও দেখতে যায়। মা কিন্তু তা জানেন না হয়তো, জানলে কি করতেন জানিনা, তুমি যেন বোল না।

নয়নতারা অবাক হয়ে বান কথাটা শুনে। বলেন ছিঃ ছিঃ, বি-চাকরদের সঙ্গে মেলামেশা আবার তাদের কাছে টাকা ধার নেওয়া খুবই অস্বাভাবিক। পন্ট তাহলে বকে যাচ্ছে বল ? আহা তোমার মায়ের শরীর খারাপ বলেই এই সব হচ্ছে দেখছি। বন্ধু উত্তর না দিয়ে চূপ কোরে থাকে। হিরণের কাছে থেকে তুই কখনও ধারটার নিসনি তো ?

তবু একবার নিয়েছিলুম। মাকে বোলানা যেন।

নয়নতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। বলেন, না তা বোলবো না কিন্তু আর কখনও নিসনি যেন। তিনি ধানিক চূপ কোরে থেকে 'কাঁড়া' বলে উঠে গিয়ে দুটেকশটা খুলে একটা ছোট কাগজের বাঁধ থেকে এক জোড়া কাগজের ছল বাঁধ কোরে ওর হাতে দিয়ে বললেন দেখ, নিকি পরে কেমন দেখায়। ছল জোড়া হাতে পেয়ে বন্ধুর মুখ-তোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বন্ধু চলে যাওয়ার পর নয়নতারা ভাবতে থাকেন নানা কথা। তিনি যেন দেখতে পান তাঁর বোনের পরিবারে খুব স্ত্রুতই বইছে একটা ভাবনের স্রোত। তাছাড়া চাকর-বাসীরা সত্যি কি রকম মাথার চক্রে গেছে এ বাড়ীর। তাঁর বাবা ছিলেন সিভিল সার্জেন এবং তিনি মেয়েদের যে ভাবে মাদ্রাস করেছিলেন তাতে রমেশের পরিবারের এই পরিস্থিতি নয়নতারা বা সুমিত্রার পক্ষে বরদাস্ত করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরা বুঝন আর মা বুঝন আলাদা। মায়ের বইছে একটা নতুন যুগের হাওয়া। এখন বি-চাকররা হচ্ছে সংসারের সাহায্যকারী এবং মিত্রীদের বলা হয় শিল্পী।

নয়নতারার চিন্তাধারার বাধা দিয়ে হিরণ নয়নতারার কাছে থেকে হাঁক দিয়ে বললে, মাসীমা খাবার এনেছি, আসবো ?

এসো। হিরণ খালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

নয়নতারা লক্ষ্য করেন, সাত-আট বছর আগেকার হিরণের সঙ্গে এ হিরণের কোথায় একটা তফাত। সুমিত্রার সংসারে এই ক'বছর থাকার কলেই হোক, আর যে কারণেই হোক ওর চেহারা যেন আজ অনেকখানি সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ওর পায়ের রংটা উজ্জ্বল ভাববর্ণ হয়েছে হিরণের আঁচল লম্বা গড়নের। সঙ্গে স্ত্রী

তোখ-মুখ দেখলে সোঁড়া থেকে ওকে সন্দেহই মনে হোত। তার উপর ওর চাউনি ছিল এমন একটা করুণ ভাব যে, ওর দিকে চেয়ে সহজেই সকলেই আকৃষ্ট হোত।

হিরণ জানলার কাছে আসল পেতে খাবারের খালা-বাটিগুলো সাজিয়ে পাখরের পেলাসে জল দিয়ে কিছু না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। নয়নতারা বললেন, শোনো।

হিরণ ঘুরে দাঁড়ালো, বলুন মাসীমা, আর কিছু নিয়ে আসবো ?

না আর কিছু আনতে হবে না, তোমাকে একটা কথা জিগ্যাস কোরবো, হিরণ, এবাড়ীর আবহাওয়া এবারে দেখছি কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে, ঠিক কোরে বলতো এর কারণটা কি ?

হঠাৎ এমনি একটা সোজা-সুজি প্রশ্নে হিরণ একটু ধতমত খেয়ে যায়। তারপর সামলে নিয়ে বলে, অস্বাভাবিক! কই আমরা তো তেমন কিছু বুঝতে পারিনি মাসীমা! তবে বাবুশায়ের বাবসায় সম্প্রতি অনেক কতি হয়ে গেছে, আপনি বোধহয় সে কথা জানেন না। একটা পুল তৈরীর কাজে গোলমাল হওয়ার সরকারের সঙ্গে উনি মামলার জড়িয়ে পড়েন, তাই বিলের টাকা সব আটকে গেছে। সেই জন্তই ওকে অতর্কণ আঁকাল অকসে থাকতে হয়। তাই সংসারেও টানাটানি। তার উপর মায়ের শরীরটা আজও ভালো হোল না। প্রায় দু'বছর আমাকে ওরা মাইনেও দিতে পারেন নি।

নয়নতারা আসনে গিয়ে বসেছিলেন কিন্তু তখনও খেতে আরম্ভ করেননি। হিরণের মুখে বা শুনে তার জন্ত কতকটা তিনি যেন প্রস্তুতই ছিলেন। তবু বললেন, তোমাকে জিগ্যাস করবো জাবছিলুম পন্ট তোমার কাছে কত টাকা নিয়েছে ? বন্ধু বলছিল ও নাকি তোমার কাছে ধার নেয় ?

বন্ধু বৃষ্টি এই সব আবার আপনাকে বলেছে! সে আর কতই বা হবে, ঠিক মনে নেই।

তবু আন্দাজ ?

বড় জোর ৫০০ কি ৬০০ টাকা হবে।

তাওতো কম নয়। ও টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দেবো।

না না মাসীমা, ওটা আপনাকে দিতে হবে না। এঁদের বাড়ীতে এককাল আছি পলটুকে এই ক'টা টাকা দিয়েছি বলে আমার কোন আকশোষ নেই।

আর কিছু দিওনা বাছা, ছেলেটা বকে যাচ্ছে এট কোরে তা তুমিই বা অতো টাকা পাও কি করে? এই তো বলতে বছর দুই এদের কাছে মাইনেও পাওনি।

সে অনেক কথা মাসীমা, তবে আপনাদের আশীর্বাদে বা আর আমার টাকার অভাব নেই।

হিরণের কথার সূত্রতার নয়নতারা বোঝেন টাকার অভাব সতি ওর নেই। এবং একটু অবাক হয়ে বান, বলেন এটা খুবই ভাল কথা হিরণ, যেন তোমার টাকার অভাব বুচেছে। কিন্তু ছেলে তোমার কাছে টাকা নিয়ে কোন ভালো কাজে লাগায় না তুমি বোধহয় জানো না ও কি করে? তাহলে হয়ত দিতে না।

না মাসীমা, টাকা নিয়ে ও যে কি করে তা আমি কথা জিগ্যাস করিনি। আপনি কি জানেন ও কি করে ?

হ্যাঁ কিন্তু সে কথা পরে বলবো, আগে তিনি কি করে গলে ভূমি অত টাকা ?

সে অনেক কথা জানীয়া, আপনি হয়তো দেখেছেন, বিদ্যুতি বলে যে ফ্লেটটি মাঝে মাঝে এখানেটুকু আসে—ও আর আমার স্বামী একই কোম্পানীতে কাজ করতো, ও ছিল প্রধানকার মেকানিক শিক্ষানবীশ, তাই ও জানতো যে আমার স্বামী যে বাসটার এক্সিডেন্ট করেছিলেন সেটা প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল, তার ব্রেকটা ছিল না বললেই চলে। এ বিষয়ে হুড মেকানিকের রিপোর্ট সম্বন্ধে টাকার লোভে মালিকরা জোর করেই আমার স্বামীকে ঐ বাস চালাতে বাধ্য করে এবং নই জব্বই এক্সিডেন্ট হয়। ঐ বিদ্যুতিই আমাকে উকিল বাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় আর ওদের সাহায্যেই কোম্পানীর কাছ থেকে আমি দু'হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাই। পরে ওই টাকা উকিল বাবুর সাহায্যে লাগি করে কোম্পানীর কাগজ কিনে বেচে হুদে-আসলে দু'-চার বছরের মধ্যেই অনেক বেড়ে গেছে।

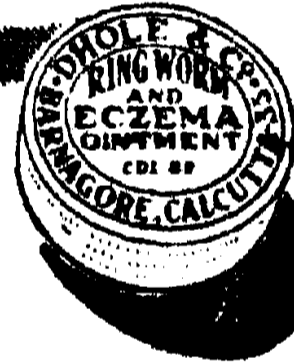
নীচে থেকে সুমিত্রার ডাক শোনা যায়। হিরণ আসছি জানীয়া, কিছু দরকার হলে ডাক দেবেন বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

হিরণ চলে গেলে খাওয়া শেষ করে রান্না পরীয়ে আলো নিবিয়ে সেদিনের মত শুয়ে পড়েন নয়নতারা। কিন্তু অতঃপর ঐশ্বর্য্যর্গির রান্নাভিত্তেও তাঁর চোখে ঘুম আসে না। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবতে থাকেন বিশেষ কোরে সুমিত্রার সংসারের কথাই। ভাবেন সুমিত্রাকে পুষ্টিই বোলবেন টাকার দরকার হলে তাঁকে জানাতে সে বেন কুণ্ঠিত না হয়। না হয় কিছু টাকা তাঁর জীবিত অবস্থায়ই ওদের হাতে দিয়ে দেবেন। অস্তিত্ব ছেলে-মেয়েগুলোর পড়াশুনো, ব্যবস্থাটা তো হওয়া চাই—হঠাৎ তাঁর চিন্তাশ্রোতে বাধা পড়ে—মনে হয় কে বেন সন্তর্পণে পাকলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে আসছে। রাত তখন অনেক। উপরে দাঁড় হু'খানি ঘর, খোলা ছাদের ওপাশে একটা ছোট ঘরে থাকে হিরণময়ী। এ ঘরের যে ঘরে নয়নতারা আছেন আগে সেইটেই ছিল সুমিত্রাদের শোবার ঘর, এখন সুমিত্রার অস্থখ বোলে ওরা সকলে নীচেই থাকে। তিনি বুঝতে পারেন না এতো রাতে কে আসছে, ওপায়ে হিরণ তো কিছু আগেই নিজের ঘরে চলে গেছে। তিনি ওর ঘরে খিল দেবার আওয়াজও শুনেছিলেন। পারের লক্ষ মিলিয়ে বাবার একটু পরে আবার তিনি হিরণের ঘরেই দরজা

ডোল এণ্ড কোম্পানীর

দাদ ও কার্ডের

স্মরণ



কিউটা-টোন

কাটা, চর্মরোগ ও বেদনার জন্য

নিম্ন মলম

খোন্স পাঁচড়া ও চুলকানীর জন্য



ডোল এণ্ড কোং

বরানগর-কলিকাতা-৩৫

খোলার বা বন্ধ করার আওয়াজ পেলেন। এই সব আওয়াজ পেয়ে তিনি আরও সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। এতো রাতে হিরণের ঘরে কে এলো? তবে কি সেই মোটর মেকানিক ছোঁড়া না উকিল বাবু? বেয়াদবির একটা সীমা আছে তো, তব্বলোক গৃহস্থর বাড়ীতে এ কি কাণ্ড! হিরণের চরিত্র তাহলে?

এর একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আজ ওদের অবস্থা না হয় খারাপ হয়ে গেছে, তাই বলে বাড়ীর ভেতর এমনি বাছেতাই কাণ্ড হবে? তিনি নিজের ঘরের আলো না খেলেই দরজা খুলে হিরণের ঘরের দিকে এগিয়ে যান। হিরণের ঘরের ভেতর তখন আলো জ্বলছিল। দরজাটা খোলাই ছিল, তারই কাঁক দিয়ে তিনি যা দেখলেন তাতে তার বিশ্বাসের সীমা রইলো না। বিকৃত, উকিল বাবু অথবা অল্প কেউ নয়, হিরণের ঘরে যে এসেছে সে হলো রমেশ। হিরণ ছিঃ ছিঃ, বতই তার চেহারার চটক থাক, মাত্র একটা আয়া। আর না পাড়িয়ে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে নয়নভারা করে এলেন নিজের ঘরে।

অনেক রাত অবধি জেগে থাকার জন্ত পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে নয়নভারার বেশ একটু দেবী হয়ে গেল। তিনি প্রাতঃকৃত্য শেষে নীচে এসে দেখলেন, সুরমিজার ঘরের কাছে পলটু, হিরণ, পদ্ম এবং রমেশ উদ্বিগ্ন ভাবে পাড়িয়ে চাপা গলার কি বেন বলাবলি কোরছে, শুকে আসতে দেখে রমেশ 'আমি আসছি' বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। হিরণ তাড়াতাড়ি ঠর কাছে এসে বললে, থাকেন চলুন মাসীমা, আপনার খাবার অনেকক্ষণ তৈরী।

নয়নভারা কিছু একটা বটেছে আশংকা কোরে বললেন, সুরমিজা কোথায়? তোমাদের এত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন?

মা তুমি আছেন, ওর শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে। আপনি থাকেন চলুন।

পাড়াও বাছা, বলে উনি দরজা ঠেলে সুরমিজার ঘরে ঢুকে দেখলেন, সে বেন বেহঁস হয়ে গেছে, তার মাথার ওড়িকোলনের পটি দেওয়া আর বিছানার উপর পাশেই পড়ে আছে একটা চিঠি। চিঠিটা ফুলে নিয়ে পড়তেই তিনি বুঝলেন যে যুগু হঠাৎ এবাড়ী ছেড়ে চলে গেছে এক ঐ মোটর মেকানিক ছেলেটাকেই বিয়ে করবার জন্ত। নয়নভারা ভাবলেন, এই চিঠিখানা পড়ে সুরমিজা যে জান হারাবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? বেচারী অনেক আগেই নিশ্চয় বুঝেছিল ওদের ভিতরে ভিতরে কি চলছে।

হিরণ পাশেই পাড়িয়ে ছিল, সে বললে, মাসীমা ভাববেন না, বাবু মশার ডাক্তার ডাকতে গেছেন। আপনি ও ঘরে চলুন খাবার দেওয়া হয়েছে।

নয়নভারা কোন উত্তর না দিয়ে বোনের মাথার হাত বুলুতে বুলুতে ওর দিকে শুধু এমন একটা স্থণার দৃষ্টিতে চাইলেন যে হিরণ তার সামনে পাড়াতে না পেয়ে আন্তে আন্তে ঘর থেকে চলে গেল, কিন্তু যুগু কি চাপা ঘেয়ে বাবা! কাল ওর সঙ্গে কথা বলার সময় করনাও করা যারনি যে হঠাৎ ও এমন একটা কাণ্ড করে বসবে! আর কি না ঐ ছোঁড়াটার সঙ্গেই? এর জন্ত হিরণের উপরই নয়নভারার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে। তিনি মন মনে ঠিক করেন রমেশকে হোসে আজই ঐ কালমাসিনীকে এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করবেন।

একটু পরেই রমেশ ফিরে এলো। সঙ্গে ওর খামার ইঞ্জপেট্টার বাবু আর একজন ডাক্তার। ডাক্তারের সামান্য চেঁচাতেই সুরমিজার জ্ঞান ফিরে এলো এবং ওর শকটা কাটাবার জন্ত তিনি ওকে একটা ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে চলে গেলেন। তারপর বসবার ঘরে ইঞ্জপেট্টার বাবু ওদের জবাববন্দী নিতে বসলে রমেশ বললে— বিড়তি ছেলেটাকে আমার ভালই লাগতো। ও এক মোটর মেকানিক, হিরণের যুখে একথা শুনে ওকে আমাদের মোটরটা সারাতে বলি আর মোটরটা ও সারিয়েও দিয়েছে, এ ছাড়া আমি ওর বিষয়ে আর বেশি জানি না। হিরণ হয়তো আরও জানে। এই সময় পদ্মকে এক গ্লাস জল নিয়ে সুরমিজার ঘরের দিকে যেতে দেখে ইঞ্জপেট্টার বাবু লাফিয়ে উঠে রমেশকে বলেন, ঐ মেয়েটি আপনার ঘরে কে?

ও আমাদের কি, পদ্ম।

ওকে একটু ডাকুন তো?

পদ্ম এলে ইঞ্জপেট্টার বাবু সোজাসুজি ওকে বলেন, আমার সঙ্গে আপনাকে খানায় যেতে হবে।

সকলে অবাক হয়ে যায়। রমেশ জিজ্ঞেস করে, কেন?

ইঞ্জপেট্টার বাবু পকেট থেকে একটা ছবি বার করে ওদের দেখিয়ে বলেন, ইনি হচ্ছেন প্রফেসর রায়ের মেয়ে পদ্মিনী রায়, বাপ-মা বার সঙ্গে বিয়ের ঠিক করেছেন তাকে পদ্ম হুনি বলে উনি আজ মাস দুয়েক বাড়ী থেকে উদ্বাও। ওর মত এক আধুনিক কলেজের মেয়ে যে এক বি সজে কোথাও থাকবেন, ঐ আমবা করনাও করতে পারিনি।

এই সময় পেছন থেকে হিরণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না না সে হতে পারে না। বাড়ীর বউ কখনও খানায় যেতে পারে না। বাবু মশার আমাকে মাপ করবেন, এর জন্ত আমিই দায়ী। পলটুর সঙ্গে ও এক কলেজে পড়তো, সেইখানেই ওদের আলাপ হয় কিন্তু ওর বাপ-মা ওকে না জানিয়েই ওর বিয়ের ঠিক করেছিলেন অল্প একটা ছেলের সঙ্গে, তাই বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে বেজিন্দী অফিসে ও পলটুকেই বিয়ে করে। সব শুনে বাতে আর কোন কলেকারী না হয় সেইজন্ত আমিই ওকে এ বাড়ীতে কিছুদিন বি সজে থাকতে পরামর্শ দিই। কলেজ ছাড়ার পর পলটু বিড়তির কাছে কিছুদিন মোটর গাড়ীর কাজ শিখেছিল বলে ষ্টেট্রাপোটে চাকরীর দরখাস্ত কোরে একটা কোরম্যানের কাজও পেয়েছে। সামনের মাসের পরলা থেকে ও কাজ আরম্ভ করবে। আমি বলেছিলুম সেই সময়েই সব কথা আপনার ঘর জানাতে। আর বিড়তিকে আপনারা শুধু একটা মিন্দ্রী বলেই জানেন। ও হচ্ছে এক বাপ-মা মরা ছেলে। তাই ওর জাতি শরিকেরা ওর প্রাণ্য বিষয় থেকে ওকে বঞ্চিত করার চেঁচায় ছিল কিন্তু উকিল বাবুর সাহায্যে কেসু কোরে কোরে এতদিনে ও তার সমস্তই উদ্বার কোরেছে, সে অনেক টাকার সম্পত্তি। ওরা আপনার ঘরজাতি আর যুগু যখন নিজের ইচ্ছায় ওকে বিয়ে করতে গেছে, বাবু মশার, কেন আর ওদের বাধা দেবেন?

ব্যাপারটার হঠাৎ এই পট পরিবর্তনে সকলেই হতবাক হয়ে যায়। ইঞ্জপেট্টার বাবু পাড়িয়ে উঠে বলেন, এটা তাহলে ভেবে দেখুন রমেশ বাবু, আপনার ঘর জেলে-মেয়েরা সকলেই সাবালক, ওরা যদি আইনজ বিয়ে করে থাকে তো আমাদের

বেশি কিছু করবার কমতা নেই। এটা বরং আপনারা আপোসেই মীমাংসা কোবে ফেলুন, আমি তাহলে আসি।

রমেশ ওর ঘরে বসে ভাবছিল, এতদিন ব্যবসার গোলমালের জন্ত ছেলেমেয়েদের বিবরণ ও সত্যি বিশেষ ভাবে পারেনি। আর বেচারী স্মিত্রা তো অসুস্থ। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা আরও কত কি করে বসে, তবু হিরণ ছিল বোলে তেমন সাংঘাতিক কিছু একটা হয়নি। আর এ বরং একদিক দিয়ে ভালই হোল।

এই সময় নয়নতারার ওর ঘরে এসে ভণিতা না করেই বললেন, রমেশ, তোমাকে একটা কথা বলতে এলুম। জানোতো স্মিত্রা আমার কত আদরের বোন, ওকে যদি আমার সঙ্গে কাশী নিয়ে বাই তো তুমি কি আপত্তি করবে? হিরণ থাকতে তোমার কোন অন্তর্বিধে কি আর হবে? ওই তো সব কাজ চালিয়ে নেয়। কেমন ছেলেমেয়েদের বিবরণ ব্যবহাও করে দিয়েছে।

রমেশ নয়নতারার কথার প্রচ্ছন্ন শ্বেব আর অভিমানের ইঙ্গিত না ধরতে পেয়ে বলে, সত্যি দিদি, ও না থাকলে আমাদের যে কি হোত তাই ভাবি। আমার ব্যবসা যে কি অবস্থার দাঁড়িয়েছিল, তা আমি কাউকেই জানতে দিইনি। এ বাড়ীও এক মাড়োরারীর কাছে বাণা পড়ে যায় এবং স্নদ দিতে পারিনি বলে বাড়ীটা শেবে নিলেম হয়ে যেত। সেই সময় ঐ হিরণই জানতে পেয়ে জোর কোরে ওর নিজের জমানো টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ীটা উদ্ধার করে। এ ছাড়া আমাদের না জানিয়ে সংসারের অনেক খরচও নিজের টাকা থেকেই চালিয়ে নিয়েছে অনেক সময়। এখন গুণ্ডামেষ্টের সঙ্গে কেসে আমার জিত হয়েছে। মাত্র কয়েক দিন হোল আমার সমস্ত বিলের টাকাও পেয়ে গেছি। কাল বাড়ী এসে খাওয়া-দাওয়ার পয় হিরণকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্নদস্নদ ওর

পাওনা টাকার একটা চেক দিতে গিয়েছিলুম কিন্তু তাও সে নিলে না। বললে, বাবুমশায়, এই টাকার আমার স্বামীর নামে একটা হাসপাতালের পত্তন করিয়ে দেবেন, এটা আপনার কাছেই থাক।

বাই হোক, এখন আমার টাকার অভাব নেই। ছেলেমেয়েগুলো নিজের নিজের একটা ব্যবহা করে নিয়েছে বটে, তবু আমার কর্তব্য আমি কোরবো। বিভূক্তি আর ঝুঁকে ঝুঁকে বার কোরে ভালোভাবে এই বাড়ীতেই ওদের বিয়ে দেবো। পলটুকে ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের কোরম্যান হতে হবে না। ০. আমরা সবাই ভাবছি একবার ইউরোপে যাবো। পলটু জার্মানিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবে, পদ্মও ওর সঙ্গে থাকবে। আর আমি স্মিত্রাকে ভিয়েনার নিয়ে গিয়ে কোন নার্স স্পেশালিষ্টকে দেখাবো। দেখি, ওকে সারানো যায় কিনা।

আমি সেয়ে গেছি। ওদের পেছন থেকে স্মিত্রা বলে ওঠে। এই কথাগুলো আমাকে বলোনি বলেই তো এতদিন ভুগেছি। বেচারী হিরণ আমাদের জন্ত এত করেছে অথচ তাকে কত সন্দেহ করেছি, তার বিবরণ কি-ই না ভেবেছি।

ডাক্তারের ইন্সেকশনের ঘোর কেটে গেলে রমেশের কাছে কুছর খবর নিতে এসেছিল স্মিত্রা। নয়নতারার সঙ্গে রমেশের প্রায় সব কথাই সে ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। ওরাও খেরাল করেনি সে কখন এসেছে। নয়নতারার তাড়াতাড়ি ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তুই উঠলি কেন? চল চল ওয়ে থাক আর একটু। কিন্তু স্মিত্রা ঠর হাত ধরে ঘর থেকে যেতে যেতে বলে, না দিদি, আমার এখন আর কোন অসুখ নেই। হিরণের সঙ্গে আমি না বুঝে অনেক চর্ব্যবহার করেছি, চল ওর কাছে ক্ষমা চাই।

নয়নতারার বলেন, আমিও ওকে বড় ভুল বুঝেছিলুম। ঠরা তুই বোনে হিরণের ঘরে এসে দেখলেন, সে তার স্বামীর একটা ক্রেমে বাধানো ছবির সামনে লুটিয়ে পড়ে কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কাঁদছে।

সিনেট হাউস

জগদীশচন্দ্র দাশ

কলকাতার সিনেট হাউস তাঙছে।

পড়ন্ত বেলায় স্বরমুখো জনতার মাঝে পথ চলতে চলতে

ক্রমত্তরমান সিনেট হাউস চকিতে মমের পথ আগলে দাঁড়ায়।

ওর দিকে একটা নাম-না-জানা মনোভাব নিয়ে তাকাই আর ভাবি,

যেন কোন পুরাকীর্তি দেখছি।

কবির কথার মনে স্ব—

হেথা হতে যাও পুরাতন।

তবু মানে না মানা মায়াবী স্বদর।

গোটা বিশ্বটাই অতীতের দিকে ধাবমান।

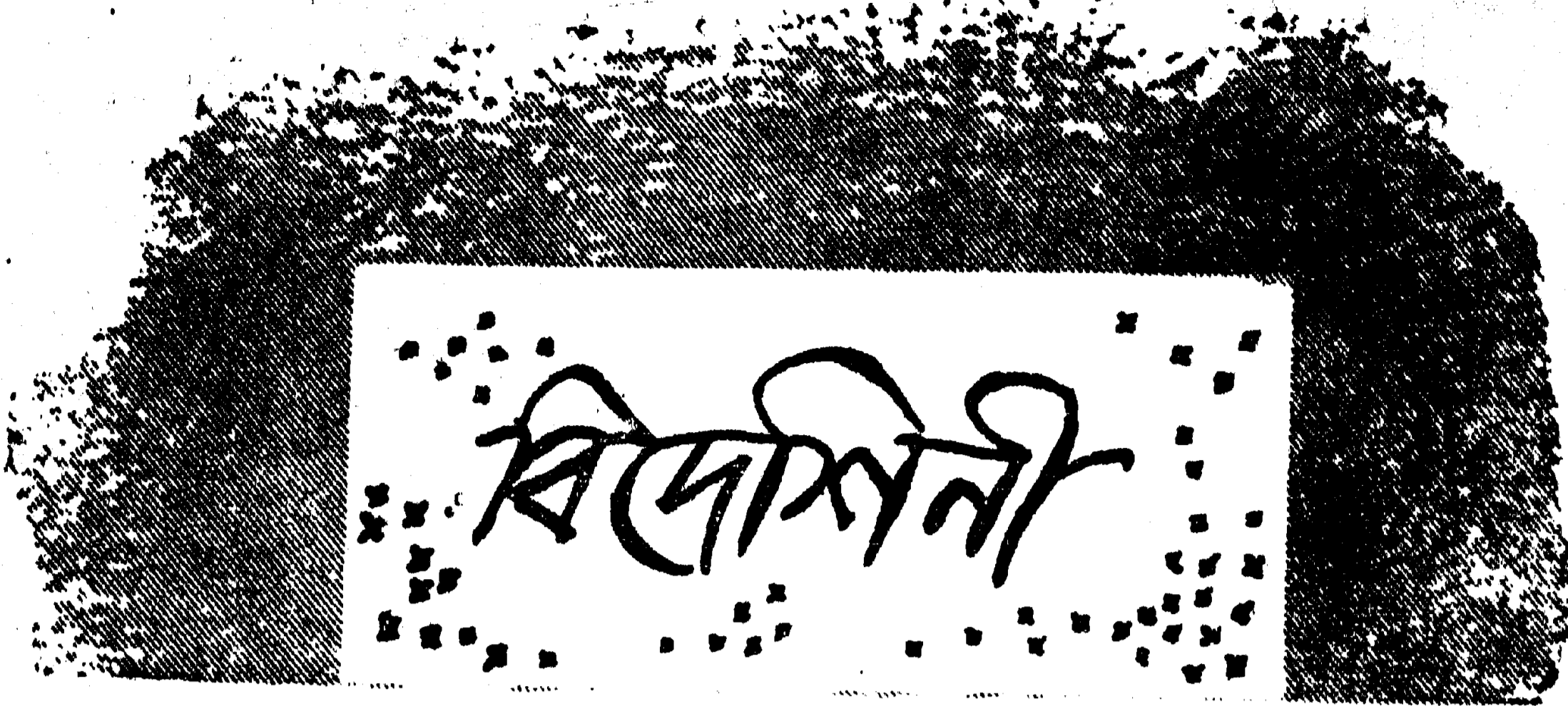
সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে

পুরাতন অধিকত্তর পুরাতন হয়।

কিন্তু নূতন কতু নূতনতর হতে পারে'না।

কালকের নির্মোরমান নূতন সিনেট হাউস।

আবার ঐতিহাস রচনা করবে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরসরঞ্জন দাশগুপ্ত

পরের দিন সকালবেলা তৈরী হলেই গাড়ী নিয়ে ছুটলাম—
মানচেষ্টারে। প্রথমে গিয়েই দেখা করলাম—কেটারিং
রুথিনসন ও কেটারিং সলিসিটারদের সঙ্গে। মালিনের কেসটি তাঁদের
হাতে তুলে দিলাম। জোরের সঙ্গে বললাম, “কেসের ভবিষ্যৎ যেন
কোনও কার্পণ্য না হয়। ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টারকে দিয়ে
মালিনের পক্ষ সমর্থন করাবেন।”

চেকবই বার করে একটা মোটা অঙ্কের চেক লিখে দিলাম
তাঁদেরই নামে। তাঁরা মালিনকে বাঁচাবার জন্য বখাসাধ্য করবে—
কথা দিল আমাকে।

তার পর গিয়ে দেখা করলাম—জেল-হাসপাতালে ডাঃ ওয়ালেসের
সঙ্গে। জেল-হাসপাতালের তিনিই কর্তা। ওড্র-চুল প্রধান
ডাক্তার—দেখলেই প্রচণ্ড হতাশ। তিনি আমার সঙ্গে খুব স্নেহ ব্যবহার
করলেন এবং বললেন, “জেলের আইন অনুসারে আমি ত আজই
আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিতে পারি না—কর্তৃপক্ষের অনুমতি-
দাপেক। আর তাছাড়া রোগিনীকে এখন ক’দিন আমার পর্যবেক্ষণে
 রাখা দরকার। আপনার টেলিফোন নম্বর ও ঠিকানা রেখে বান,
ব্যবস্থা করতে পারলেই আমি আপনাকে খবর দেব।”

তথালাম, “কত দিনে হবে উঠবে মনে হচ্ছে?”

বুহু হেসে বললেন “এই ৫-৭ দিন। একটু বৈষ্য ধরে থাকুন।
আপনি ভাববেন না। আপনার স্ত্রী আমার হাতে বন্ডেই
 থাকবেন।”

বললাম, “বিশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু সলিসিটাররা ত এসে দেখা
করে ঠিক বা বলার আছে তনে বাবে।”

বললেন, “ও, তাদের কথা আলাদা। তারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি
 নিয়েই যা করার করবে।”

মালিনের সঙ্গে দেখা হল না—হতাশ হয়ে ফিরে এলাম।
৩ দিন গেল, ৪ দিন গেল, ডাঃ ওয়ালেসের কাছ থেকে কোন
খবর এল না। কিন্তু ৫ দিনের দিন সকালবেলা চিঠি এল—
ডাঃ ওয়ালেসের নর, সলিসিটারদের। তারা লিখেছে—তারা
অত্যন্ত দুঃখিত, মালিনের কেস তারা নিতে পারবে না। লিখেছে
—মালিনের সঙ্গে তারা দেখা করেছিল কিন্তু মালিন ইতিমধ্যেই
 কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের সোধ স্বীকার করে সমস্ত কথা বলেছে।

এবং সলিসিটারদের বোঝান সত্ত্বেও সে কথা সে কিছুতেই প্রত্যাহার
করবে না; নিজেকে বাঁচাবার জন্য কিছুতেই সে নেবে না মিথ্যার
আশ্রয়।

আমার চেকখানিও তারা চিঠির মধ্যে কেবল পাঠিয়েছে।
চিঠিখানা পড়ে হতভিত হয়ে বসে রইলাম।

আরও দু’-তিন দিন গেল—মানসিক অস্থিরতা ক্রমেই দারুণ
বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত ডাঃ ওয়ালেসের যখন কোনও চিঠিই
এল না—ডাঃ ওয়ালেসকে টেলিফোন করলাম।

ডাঃ ওয়ালেস বললেন—“আপনার স্ত্রী এখন একটা সজিন
অবস্থায় মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন—কর্তৃপক্ষ যদিও অনুমতি দিয়েছে—
আমি এখন কারও সঙ্গেই তাঁকে দেখা করতে দিচ্ছি না।”

আকুল ভাবে তথালাম—“কি—কি অবস্থা?”

ডাঃ ওয়ালেস বললেন—“সে সব কথা কি টেলিফোনে হয় তাঃ
চৌধুরী, দেখা হলে হবে।”

তথালাম “কবে? কবে আপনার সঙ্গে দেখা করব?”

একটু চূপ করে থেকে বললেন, “আমি জানাব।”

হতাশ ভাবে টেলিফোন রেখে দিলাম। মনে হল ডাঃ
ওয়ালেস এখন বোধ হয় আমার সঙ্গে মালিনকে নিয়ে আলোচনা
করতে রাজি নন, যে কারণেই হোক।

এর দু’-তিন দিন পরেই এল ১২ই ফেব্রুয়ারী। ১২ই ফেব্রুয়ারী
—দিনটা কোনও দিনই ভুলব না।

চিঠি এল। বিকেলের দিকে চিঠি এল ষোটা খামে—ডাঃ
ওয়ালেসের চিঠি এবং সঙ্গে আরও দুখানা। ডাঃ ওয়ালেস
লিখেছেন, “প্রিয় ডাঃ চৌধুরী, গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনার
স্ত্রী গত শেষ রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন—চলে গেছেন
আমাদের ছেঁকে। আমাদের বিশ্বাস করুন আমি আমার বখাসাধ্য
করেছি এবং আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের দিক দিয়ে আর কিছু
করার ছিল না। তবে এইটুকু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি—আমি
যে তাঁর জন্য প্রাণপণ করেছি, সে শুধু কর্তব্যের দিক দিয়েই নয়,
তাঁকে আমি নিজের মনের মত ভালবাসেছিলাম। তিনি কি

অপরাধ করেছিলেন জানি না, তবে তাঁকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ভাল না বেসে যে উপায় ছিল না।

আপনি আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুন।

ইতি হে, ওয়ালেস।*

পুঃ—সঙ্গে একখানি চিঠি পাঠালাম—তাঁর চিঠি। সূভার দিন সকাল বেলা সলজ্জ মূহু মধুর হেসে আমার হাতে তুলে দিয়ে অহুরোধ করেছিলেন—আপনাকে পাঠিয়ে দিতে। কি মিষ্টি হাসি দেখেছিলাম—জীবনে ভুলব না।

একটা আচ্ছন্ন ভাবে যন্ত্রচালিতের মতন দ্বিতীয় চিঠিখানাও পড়লাম। কর্তৃপক্ষের চিঠি। মার্জিনের সূত্রে দিয়ে সমবেদনা জানিয়ে মার্জিনের সূত্রে তার নিঃস্বার্থ বিবাহিত ব্যবস্থা করতে আমাকে অহুরোধ জানিয়েছেন। তৃতীয় চিঠিখানা—মার্জিনের হাতের লেখা। হঠাৎ বেন চমকে অস্তরের অন্তস্তল থেকে একটা তীব্র কম্পনে আচ্ছন্ন ভাবটা গেল কেটে।

মার্জিন নাই—মার্জিন আর ইহজগতে নাই! সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চোখে এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল।

বুলা! সেদিন আর মার্জিনের চিঠিখানা পড়া হল না। পড়তে গেলেই চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে—কিছুতেই বেন নিজেকে সংযত করতে পারিনি, সমস্ত রাত একটা অমানুষিক মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে রাত পোহাল—জানালা দিয়ে জোরের দিকে চেয়ে দেখি, দাক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। উঠে মনকে দৃঢ় করে কোনও রকমে মার্জিনের চিঠিখানি পড়লাম। মার্জিন লিখেছে—

আমার দিকে। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—আমি জানি কিন্তু আমার কথা ত তোমাকে বলা হল না। তবে তোমার স্নেহ আমার দেখা হবে জানি না—হবে কিনা তাই বা কে জানে তাই আমার কথাগুলি চিঠিতেই লিখে রাখছি। তোমার স্নেহ একটা আড়াল বেধে মরেও যে আমার শান্তি নাই।

তুমি যাকে বোলাও ভেবেছিলে—সে আমার ভাই। অস্বাভাবিক ভাই। আমার মাকে বিবাহ করার আগে আমি বাবার আর এক বিবাহ ছিল। আমার ভাই—নাম এ্যালবার্ট—তাকে বছর চারেকের বেধে তার বা মারা যান। তার বা খানেক পরে আমার বাবা আমার মাকে আমার বিবাহ করে বিবাহের বোধহয় বছর দেড়েকের মধ্যে আমার জন্ম।

ছেলেবেলা থেকেই এ্যালবার্ট একটু তির প্রকৃতির ছি। শুনেছিলাম—অতটুকু ছেলে কিছুতেই আমার মাকে 'মা' বল রাজী হয়নি। আমার মাকে ত জান। শান্ত স্নেহপ্রবণা ছি তিনি। তিনি নাকি ওকে অনেক বড় করে আপনার করার এ করেছিলেন কিন্তু কিছুতেই ও আমার মার কাছে ধরা দেয়নি কলে, একটু স্বতন্ত্র ভাবে আমাদের বাড়ীতে ও বড় হয়ে উঠ লাগল।

কিন্তু ওর আর একটা দিক ছিল। ছেলেবেলা থেকেই আমাকে ভীষণ ভালবেসেছিল। শুনেছি বড়ার পর বড়ী আম কোলে করে আদর করতে ওর বেন কোনও ক্লান্তি ছিল না।

এবং এ-ও শুনেছি—সেটা সাধারণতঃ করত মার জো আড়ালে। মার সামনে পড়ে গেলে, আমাকে কেলে দিয়ে

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ...

খাওয়ার সারাংশ সম্পূর্ণ শরীরের প্রয়োজনে নিয়োগ করলেই অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়। ডায়া-পেপসিন ব্যবহার করলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন, কারণ ডায়া-পেপসিন খাদ্য হজমের সাহায্য করে।



ডায়াপেপসিন

দুবেলা খাবার সময় নিয়মিত ছোট এক চামচ খাবেন।
ডায়া-পেপসিন কখনো অভ্যাসে দাঁড়ায় না।

ইউনিয়ন ড্রাগ • কলিকাতা

পালাত। এই নিয়ে বাবা-মার মধ্যে নাকি মানে মানে একটু হাসাহাসি হত—সেটাও মার কাছেই শোনা।

বাই হোক, আমরা বড় হয়ে উঠলাম এক একটা নিবিড় বেহ গড়ে উঠল আমাদের ভাই-বোনের মধ্যে। এক ক্রমে এটাও লক্ষ্য করলাম, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সঙ্গে ওর বোস ক্রমেই ছিন্ন হতে লাগল। এক খাওয়ার খাওয়ার সময়ে ছাড়া ওকে বড় বাড়ীতে দেখা যেত না, বাইরে বাইরে কিছুবাক্যের সঙ্গে খেলাধুলা হৈঁহৈ করেই বেদীর ভাগ সময় কাটাত। খুলে অবস্তা বেত—কিন্তু পড়াশোনার মোটেই ভাল ছিল না এবং এই নিয়ে বাবার কাছে প্রায়ই ওকে বকুনি এমন কি মার খেতেও দেখেছি। বলতে লজ্জা করত না—ও বখন মার খেত, আমি আড়ালে লুকিয়ে কাঁদতুম।

একদিন বলেছিলাম, “এ্যালবার্ট, তুমি বাড়ীতে থেকে ভাল করে লেখাপড়া কর না কেন? তাহলে ত বাবার কাছে মার খাও না?”

বলেছিল, “মারকে আমি ভয় করি না। পড়াশুনা আমার ভাল লাগে না।”

বলেছিলাম, “পড়াশুনা না করলে জীবনে বড় হবে কি করে? বাবা ব্লাকপুলের কত বড় লোক।”

বলেছিল, “বাবা বড়লোক, তা আমার কি—আমি বড় হতে চাই না।”

বললাম, “তুমি ভাল করে পড়াশুনা করলে বাবা কত খুশী হবেন।”

বলল, “খুশী হলেন বা না হলেন—আমার বয়েই গেল।”

এই ধরনের কথা ওর মুখে শুনে মনে মনে কষ্ট পেতাম। কিন্তু উপায় ছিলনা, ও কিছুতেই নিজেকে সংশোধন করল না। ওর মনে কোথায় যে কি চরম অভিমান ছিল জীবনের প্রতি—কিছুই বুঝতে পারিনি। আর একটু বড় হলে একটা কথা কানাবুঘোর আমার কানেও এসে পৌঁছেছিল—ওর মা আমার বাবার অবহেলারই নাকি লক্ষ্যে প্রাণ দিয়েছেন। এই কথাটাই কি ওর কানে উঠে ওর মনকে দিয়েছিল বিবিধে? জানিনা।

বিশ্ভারিত বলার প্রয়োজন নাই। ক্রমে আরও ছ-চার বছর পরে, এর বখন বছর উনিশ-কুড়ি বরস হবে বাবা একদিন কি একটা গািপায়ে ওকে খাসন করিতে গেলেন বাবার মুখের উপর কড়া কড়া দৃষ্টি বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। এবং ক্রমে একরকম হেনায়ের বাইরেই গেল চলে, —বাড়ির সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই ছিল না। লেখাপড়া ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিয়েছিল—হবেলা চুপি পি এসে খেয়ে বেত এক অনেক রাতে আসত শুভে—বাবা মার মনে কিছুতেই বেতনা। একমাত্র আমি—আমিই হবেলা কে চুপি চুপি খাওয়ারতাম। এবং রাতে বস্ত্রকণ না শুভে আসত আমিই ছটকট করে এখর ওখর করতাম—আজও মনে আছে।

কলে ব্লাকপুলের একটা খারাপ দলের সঙ্গে মিশে, অসংস্পর্কে ক্রমেই উচ্ছ্রের পথে এগিয়ে যেতে লাগল—এই কথাটা মনে এসে। তখন আমার বরস বছর পনেরো। বাবা সতীর মার কাছে অনেক কথা বললেন—আমি শুনেছিলাম। বাবার এই কথা আজও মনে আছে। বাবা বলেছিলেন—“আমার

ব্লাকপুলের এক বড় সম্মান—এই ছেলে আমার মুখে চুপ-কালী নিচ্ছে।” বাবার ব্যথিত মুখের দিকে চেয়ে বাবার কথাটা শুনে মনে একটা কষ্ট হয়েছিল, আজও তুলিনি।

এর ছ-তিন দিনের মধ্যেই একদিন এ্যালবার্টকে জড়িয়ে ধরে বললাম, “এলবার্ট! তাই! তুমি ভাল হও। ওসব দলের সঙ্গে আর মিশোনা। বাবার মনে আর একরকম কষ্ট কিওনা।” কথাটা বলতে বলতে আমার চোখে জল এসেছিল।

আমাকে আদর করে বলল, “বাবার মনের দিক দিয়ে নয়, তোমার মনে যদি কষ্ট হয়—আমি ও দলের সঙ্গে আর মিশব না। আর আমার ভালও লাগেনা, ওদের সঙ্গে মিশতে।”

হাসিমুখে বললাম, “বেশ, আমি বাবাকে বলব—তুমি এবার ভাল হবে।”

তাড়াতাড়ি বলল “না—খবরদার কিছু বলবি না।”

এর, ছ-তিন দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটল—ব্লাকপুলের এক ব্যাঙ্ক একটা ডাকাতি হল, সঙ্গে খুন। কলে ও বে দলের সঙ্গে মিশত তারাই হল গ্রেপ্তার। শুধু তাই নয়, বে রাতে ডাকাতিটা হল সে রাতে ও বাড়ীই কেবেনি। আমি বিশেষ ভয় পেয়েছিলাম, বাবাও খুব উদ্ভয় হয়েছিলেন। কিন্তু ওকে প্রথমেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। বলটা গ্রেপ্তার হলে, আমি ভয়ে ভয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম “এ্যালবার্ট! তুমি ওর মধ্যে ছিলে না ত?” হেসে হেসে বলল “না বে। মাসখানেক থেকে ওদের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই—তোকে ত কখাই দিয়েছি।”

তখালাম, “তবে সেদিন রাতে তুমি বাড়ী কেবেনি কেন?”

বুহ মুহ হেসে বলল, “তার একটা কারণ আছে।”

জোরের সঙ্গে বললাম, “কি কারণ আমাকে বলতেই হবে এ্যালবার্ট।”

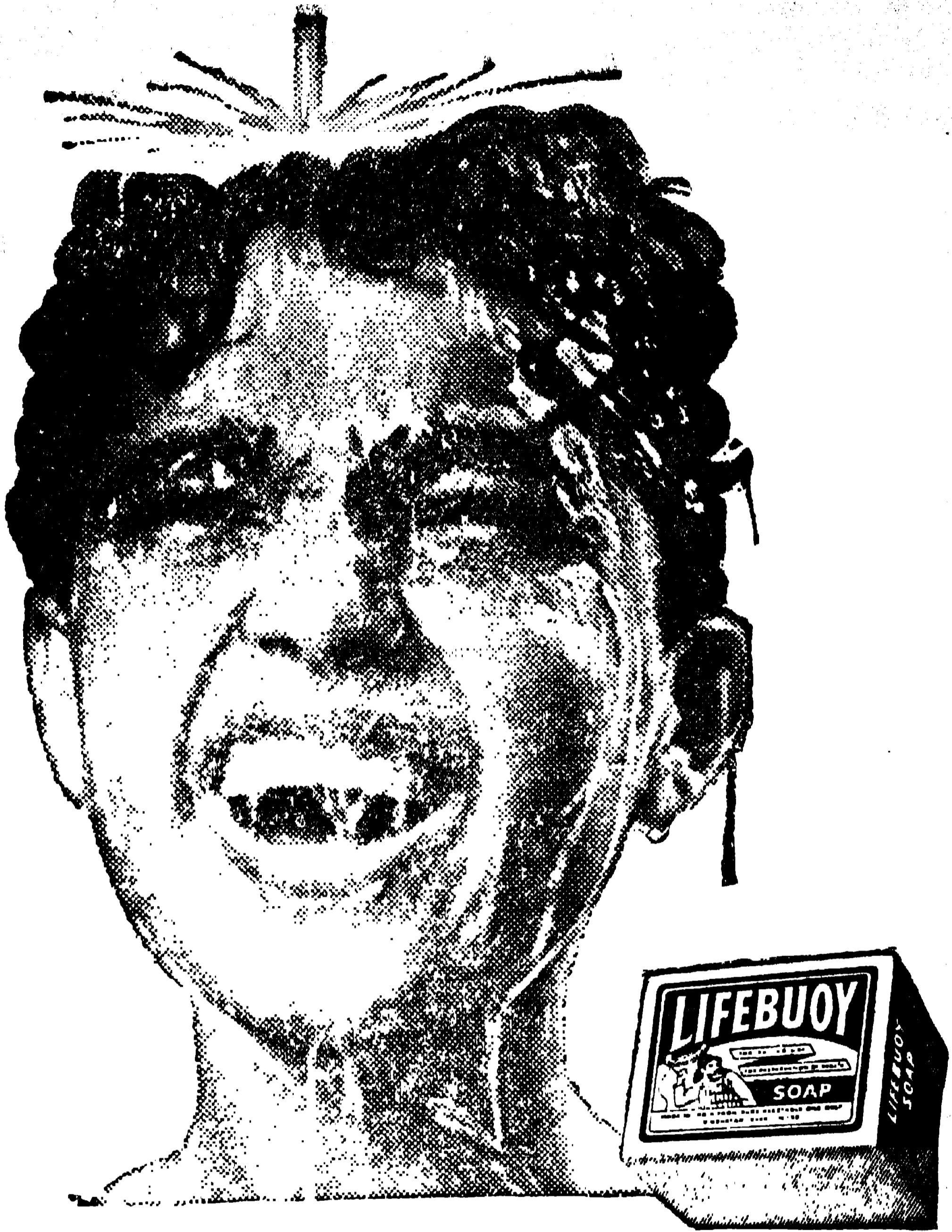
প্রথমে কিছুতেই বলবে না—হেসে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমি বখন কিছুতেই ছাড়লাম না, বখন কাতরভাবে বললাম—সমস্ত না শুনে ভয়ে রাতে আমি ঘুসতে পারছি না—তখন আমাকে সব বলল। বা বলেছিল সংক্ষেপে বলি।

ব্লাকপুলের মাইল ছ’-তিন দূরে সমুদ্রের ধারে একটা গ্রাম আছে—নাম বীসপাম। সেই গ্রামে মিঃ ও মিসেস রো বলে একটা সম্পত্তি বাস করতেন। মিঃ রো প্রৌঢ় কিন্তু তাঁর স্ত্রীটি তরুণী। এই স্ত্রীটির সঙ্গে এ্যালবার্ট কি করে জামি না, একটা গভীর প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এবং ইদানীং মাকি বেদীর ভাগ সেইখানেই কাটাত। ঘটনার দিন মিঃ রো এখানে ছিলেন না, লগুমে গিয়েছিলেন—নিজের শরীরের অনুরূততার জন্য বিশেষতঃ কোমল ডাক্তারকে দেখাতে। তাই তরুণীটির সঙ্গে রাত্রিবাসের প্রয়োজন এ্যালবার্ট ছাড়তে পারেনি—তার কাছেই সমস্ত রাত কাটিয়েছিল।

শুনে বললাম—“হিঃ হিঃ এ্যালবার্ট—তোমার এত অধঃপতন হয়েছে। পরস্ত্রীর সঙ্গে—”

হেসে বলল—“তুই বড় বোকা। পরস্ত্রী তা কি। আমার হৃদয়ে হৃদয়কে তরানক ভালবাসি। মিঃ রো-র আর বেদীদিন নেই—ক্যানসার হয়েছে। তারপর আমরা হৃদয় হৃদয়কে বিয়ে করব—সব ঠিক।”

কথাটা শুনে মনের মধ্যে একটা দুপার ভাব যে কেটে গেল,



লাইফবয় যেখানে

স্বাস্থ্যও সেখানে!

আঃ! লাইফবয়ে গ্রান করে কি আরাম! আর স্নানের পর শরীরটা কত স্বরস্বরে লাগে!
ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্যকারী ফেনা সব ধুলো
ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আজ থেকে আপনার
পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে গ্রান করুন!

L-16-X52 30

বিশ্বব্যাপী বিক্রয়

তা মোটেই নয়, কিন্তু এ্যালবার্টের দিক দিয়ে বেন নিশ্চিত হলাম।
বাক, খুন ডাকাতীর অপরাধে আর ধরা পড়বে না।

কিন্তু বিকো! ইঞ্জির হলো আমরা ত ঠিক ইংল্যান্ডের লোক
নই—সে কথা ইংরেজরা বেশ বোঝে। বিদেশীদের প্রতি বতই
ওদের মুখের ভঙ্গি থাক, সঙ্গীভুক্তি একেবারেই নেই। তাই
অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সামান্য প্রমাণে—এ্যালবার্টকে গ্রেপ্তার
করতে ইংল্যান্ডের পুলিশ বিধা করেনি। পরে শুনেছিলাম—প্রমাণ
ওর বিকল্পে বিশেষ কিছুই ছিল না। সেই দলেরই একটা লোক
যার সঙ্গে এই যেহেঁটা অর্থাৎ মিসেস বোর্কে নিয়ে ওর একটু
বেচারেবি ছিল সেই মধ্য করে ওকে জড়িয়ে দিয়েছিল।

মনে আছে, আমি পাগলের মতন হয়ে উঠলাম। বাই হোক,
আমি আর বেশী কি করতে পারি—তবুও একদিন ছুটে গেলাম
বীসপারে মিসেস বোর কাছে। তাকে অনেক অমুনয় বিনয়
কারীকাটি করে বললাম—পুলিশকে সব কথা খুলে বলতে। বলতে
—সেদিন রাতে সমস্ত রাত ও তার কাছেই কাটিয়েছিল। কিন্তু
আশ্চর্য! এত ত তার সঙ্গে এ্যালবার্টের গভীর প্রণয়—সে
অস্বীকার করল। যে অপরাধে এ্যালবার্ট গ্রেপ্তার হয়েছে, তাতে
কোনো পর্যাপ্ত হতে পারে জেনেও অনায়াসে সে অস্বীকার করল।
বাক ভালবেসেছে, তার প্রাণের বিনিময়েও একটা কলঙ্কের বোঝা
মাথার নিচে সে নারাজ। বিকো! এই ইংল্যান্ডের মেয়ে!

কিন্তু এ্যালবার্ট! পাছে তার প্রেমিকার গায়ে কলঙ্কের আঁচড়
লাগে—একটি কথাও বলল না। সে রাতে সে বাড়ীতে ছিল না
প্রমাণ হল কিন্তু কোথায় ছিল—শেষ পর্যাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে
একটি কথাও বলেনি। আমি একদিন পুলিশ তদন্তের সময় বাবার
কাছে কারীকাটি করে কর্তৃপক্ষের অমুখতি নিয়ে জেলে গিয়ে ওর
সঙ্গে দেখা করে অনেক বুঝিয়েছিলাম, তবুও বলতে রাজী হয়নি।

বাই হোক, ক্রমে বিচার হল। বাবা খুব বড় ব্যারিষ্টার দিয়ে
ওর পক্ষ সমর্থন করালেন। কিন্তু হলে কি হবে—ইংল্যান্ডেরই ত
জুরী। তারা সেই ইংরেজ যুবকটির মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে ওর
পক্ষের কোন কথাই নিল না। ফলে সাব্যস্ত হল দোষী।
সাবজীবন কারাগারের আদেশ হল।

আমি প্রায় সাত দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছি—মনে আছে।
কিন্তু বাবা! মাঝে মাঝে বিছানা থেকে উঠে বাবার মুখের দিকে
দেয়ে চমকে উঠেছি—বাবার মুখের চেহারা এ কী রকম হয়ে যাচ্ছে।
কি নিদারুণ কষ্ট তিনি মনে মনে পেয়েছিলেন—প্রমাণ হল
মাসখানেকের মধ্যেই। বরাবরই রক্তের চাপ তাঁর বেশী ছিল—
হঠাৎ একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন—আর উঠলেন না। ছ'দিন
অজ্ঞান অবস্থার থেকে তাঁর শেষ হয়ে গেল।

তার পর আর কি? এত বড় একটা ঝড় বয়ে গেল
আমাদের উপর দিয়ে—ব্র্যাকপুলে থাকা আমাদের আর সম্ভব হল
না। বাবা ব্র্যাকপুলের খুব বড় সলিসিটার ছিলেন। তাঁরই
অফিসের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর সাহায্যে ব্র্যাকপুলের আমাদের
বাড়ী বা অফিস বা কিছু ছিল সব বেচে মা আমাকে নিয়ে গিয়ে
বসবাস শুরু করলেন সুদূর কেম্ব্রিজ নগরের পলীগ্রাম—লণ্ডন।
লন্ডনের বাড়ীখানি উইসবীচের মাসীই ব্যবস্থা করে মাঝে কিনিয়ে
দিয়েছিলেন।

ছ'-দিন বহর থাকার পরে খবর পেলাম—বতহর মনে।
উইসবীচের মাসীর কাছ থেকে যে এ্যালবার্ট জেলেই মায়া পেয়ে
দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন মনে—বলাই বাহুল্য। বাই হোক
লন্ডনে পাঁচ ছয় বছর থাকতে থাকতে মন আমার ক্রমে শ
হয়ে গেল। তার পর হল দেখা তোমার সঙ্গে। তোমাকে পে
বেন একটা নতুন জীবনের সাজা পেলাম আমার মর্মে মর্মে।

তার পর ত তুমি সবই জান। ক্রমে তোমার সঙ্গে বি
হল—আমি বেন স্বর্গ হাতে পেলাম। তখন তোমাকে নি
মনের আনন্দে আমি ভরপুর—এ্যালবার্ট মনের তলায় কোথ
গেল তলিয়ে।

একটা প্রশ্ন সহজেই ওঠে—বিবাহের আগে এ সব ক
তোমাকে বলিনি কেন? বিকো! এর সঠিক উত্তর আম
কাছে নাই। বলিনি—কেন না বলা হয়ে ওঠেনি। বলিনি—
কেন না বলায় কোন কারণ ঘটেনি। এ্যালবার্ট ত আর ইহুজগ
নাই—তখন ত তাই জানতাম—সে শুধু তখন আমার জীব
একটা ছুঃখের মত হয়েছিল। তাই বোধ হয় সে ছুঃখের কা
প্রাণের অন্তস্তম থেকে আবার খুঁটিয়ে তুলতে প্রাণে লাগত—
তাই বোধ হয় বলিনি। কিংবা একটা কথা এখন ভাবি
বিবাহের আগে থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম। তোমার মনে কলঙ্কহী
বংশমর্ষাদার আভিভ্রাত্য অত্যন্ত প্রবল—তাই কি বলতে আম
বাধত? ঠিক বুঝিনি।

বিকো! আমাকে ভুল বুঝ না—তোমার কাছে চিরদিন লুকি
মাথার সিদ্ধান্ত যে আমার মনে ছিল, তা একেবারেই নয়। প্রয়ো
হলেই বলব—এই ধরনের একটা মনোভাব ছিল আমার। কি
প্রয়োজন যখন হল তখন আর বলা গেল না। পলপেরোতে ও
বুলারকে দেখেই চিনতে পেয়েছিলাম। বুঝতে আমার দেয়ী হয়
—এ্যালবার্ট মরেনি, এ্যালবার্ট জেল থেকে পালিয়ে জন বুলার
পলপেরোতে আছে। পরে এ্যালবার্টের কাছে শুনেছিলাম—
বুলার বলে অল্প একটা কয়েদীর সঙ্গে ওর জেলে ভাব হয় এবং ত
কাছ থেকেই করীতে তার অল্প বিকৃত-মস্তিষ্ক মায়ের খবর টের পার
জেল থেকে পালিয়ে করীতে গিয়ে মায়ের কাছে জন বুলার সে
পাছে করীতে ওকে কেউ জন বুলার নয় বলে চিনতে পারে—মা
নিয়ে পলপেরোতে এসে বসবাস শুরু করে। সে এক আশ্চ
চমকপ্রদ ঘটনা! কোনও দিন দেখা হলে বিস্তারিত বলব।

সহজেই মনে হল—এইবার তোমাকে সব বলবার সময় এসেছে
কিন্তু মনে একটা খটকা লাগল। তুমি যদি জানতে পার পুলিশ
খবর দেওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য হবে। সেটা আমি যে একেবারে
চাইনি। আহা বেচারী, নিরপরাধী সে—একটু শান্তিতে আর
আবার তাকে জেলে-পাঠান কেন?

তারপর ডাটমুরে মিঃ বোল্ডের সঙ্গে দেখা হল। মনে আ
ত—তাঁর কাছে স্পষ্ট শুনেলাম যে জেল থেকে পলাতক আসার
খবর জেনে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানান অবশ্য কর্তব্য, নইলে কঠি
শাস্তি পেতে হয়। আমি নিজেকে সহজেই অপরাধিনী বলে ক
কবে মিলাম। কিন্তু বিকো! তোমাকে অপরাধী করি কি করে?
দেশের পুলিশ বিদেশী হলে নিরপরাধীকেই অনায়াসে শাস্তি দেয় ও
সত্যিকারের অপরাধ পেলে ত কথাই নাই। তুল হল না—তোমা

ধরটা বললে, তুমি যে আমার মনের বিকল্পে উৎকর্ষিত পুলিশকে ধরবে, এ সন্দেহ আমি তোমাকে করিনি। কিন্তু আমার ভাইয়ের জন্ম সারাজীবন এদেশে তুমি একটা অপরাধের বোকা হয়ে নিয়ে বেড়াবে—ভাও কি আমি সইতে পারি? বুঝতে আমার দেরী হল না—ভাগ্যবিধাতার নির্ভূব লীলায় তোমার আমার মধ্যে একটা আড়ালের সৃষ্টি হল। কিন্তু সেটাও যে আমি সইতে পারছিলাম না। ডাটবুরের হোটেলে একদিন সমস্ত হাত কেঁদেছি।

বিকো। লিখতে আমার বড় কষ্ট হয়। তাই পরের কাহিনী সংক্ষেপে শেষ করি। কিছুদিন পরে পুলিশ কি করে জানি না, পলপেরোতে গুর সন্ধান পেল এবং সেখান থেকে ওকে আবার পালাতে হল। কিছুদিন এ দিক ওদিক লুকিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে সেল-এ আমার সঙ্গে এসে দেখা করে। বলেছিল—ইংল্যান্ডে গুর আর বাস করা চলবে না। দূর বিদেশে কোথাও ওকে পালাতে হবে। সব ব্যবস্থাই করেছে, তবে টাকার দরকার। এই নিয়ে গোপনে ও ছ'-চার দিন আমার সঙ্গে এসে দেখা করেছিল।

বাক্যে ত আমার হাজার সাতকে পাউণ্ড ছিল। সবই ত বাবার টাকা। তাতে ত গুরও অধিকার। বলেছিল—হাজার পাঁচেক পাউণ্ড হলে ও সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। তাই টাকা আমি অনায়াসে গুর হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

ও এদেশ ছেড়ে পালাল—পুলিশ ওকে আর ধরতে পারেনি—সেই দিক দিয়ে আমার মনে একটা মস্ত বড় ভূষ্টি আছে। যেদিন তোমার জ্বর হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলাই ও আমার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে গেল চলে।

বাই হোক, টাকা দিয়ে ত ওকে বিদায় দিলাম এবং বখাটা আমার মনে গোপনেই রইল। কিন্তু যেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে আসি সেদিন তোমার কথায় ও ব্যবহারে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, তোমার কাছে আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। বলতেই হবে তোমাকে সব। তাই ঠিক করে কেসলাম, পুলিশকে সব জানিয়ে তোমাকেও সব বলব। তবে তখনই নয় আরও অন্তত মাসখানেক পরে। কেন না, এ্যালবার্ট বিদায় নিয়ে খাওয়ার সময়ে বলেছিল তার গুড়িয়ে স্ত্রী-কন্ডা নিয়ে এদেশ ছেড়ে যেতে কিছু সময় লাগবে। তাকে তাই আরও কিছু দিন সময় দিতে চেয়েছিলাম। এবং সেই সময়টুকুর জন্মই বাড়ী থেকে এসেছিলাম চলে। হঠাৎ তোমার সঙ্গে বা ঘটল তারপরে ত আর তোমার সঙ্গে ও ভাবে একদিনও এক সঙ্গে থাকা চলে না। ইচ্ছে ছিল বখাসময়ে পুলিশকে সব জানিয়ে তোমার কাছে আবার বাব কিরে, বিকো। বলব তোমার সব। তারপর বা হবার হবে। বিকো। তুমি আমাকে চেননি, আমি অবিধাসিনী নই।

লীনা

বসবার ঘরে আগুনের পাশে বড় কোঁচটার উপর গুরে চিঠিখানা শেষ করলাম—চূপচাপ নিস্তর চারিঘর। শারীর্ষাটা জানালার ভিতর দিয়ে কুরাসাচ্ছর মেখে ভরা প্রভাতটির দিকে চেয়ে কতকণ বখাবিষ্ট হয়ে ছিলাম মনে নাই। হঠাৎ চোখ ঘুরে এসে পড়ল হুসনানীটার উপর—কুল নাই শূন্য হুসনানী। চমকে উঠে বললাম—লীনা নাই, লীনাও আর নাই। নিজের কথা বলে গেল আমার কথা তখন গেল না। আমার পিতামহ মুশান্ত সার যে জেল হয়ে ছিল—সে কথাটি ত আর বলা হল না।

বুলা। কি আর লিখব। আমার কথা শেষ হল। মরদেহভেদে রোড়ের সেই চার্জটির পিছনে এক কোণে উইলো গাছটির ডলার মালিনকে কবর দেওয়া হল—কাড়িয়ে দেখেছি। আমার পাশেই প্রেসকে ধরে মিঃ লালকাকা ছিলেন কাড়িয়ে—সমস্তকণ প্রেসের কাছার বেন অন্ত ছিল না। আমি কিন্তু কাড়িনি, চূপ করে কাড়িয়ে ছিলাম।

বুলা। এদেশ ছেড়ে আর বাব না—বাকী জীবনটা সেলেই কাটাব। সেলেই যে ওস্তাদেবত ভাবে তার স্মৃতি জড়ান। সেলেই যে তার কবর।

প্রায়ই আমি উইলো গাছটির ডলার বাই—কুল দিয়ে সাতাই কবরটি। বলি—ওগো বিদেশিনী! সিদ্ধুপারে এসে তোমাকে পেয়েছিলাম কিন্তু তোমাকে চিনি নি। তুমি বিদেশিনী হয়েই রইলে আমার জীবনে। কিন্তু কবির বাণী মিথ্যা হবে না—তাই তুমি মহাসিদ্ধুপারে চলে গিয়েছ। আজ আমি তোমাকে চিনি গো চিনি।

চিনি গো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনী!
তুমি থাক সিদ্ধুপারে
ওগো বিদেশিনী!

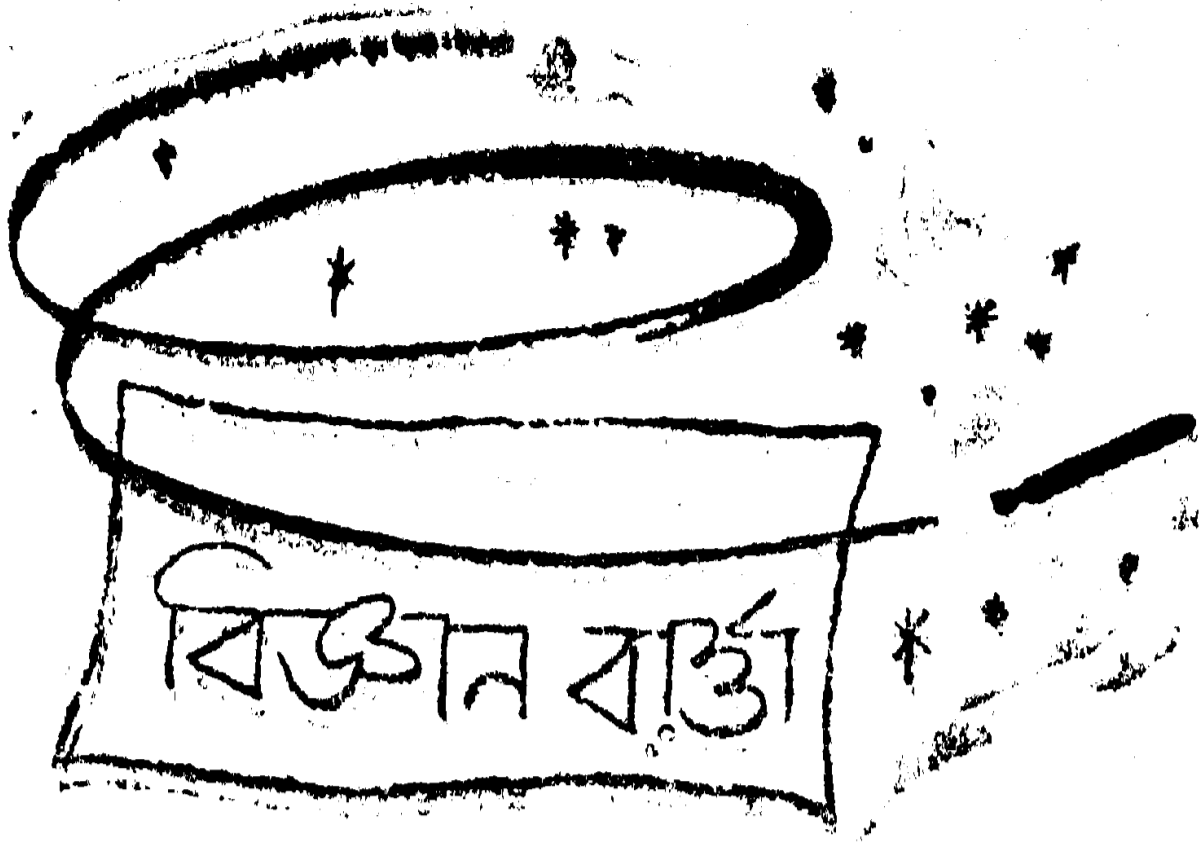
সমাপ্ত

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর



যাদুসম্রাট
পি. সি. সরকার
প্রণীত পুস্তকাবলী
ইঞ্জরাল (বাংলা) ৫
মেসমেরিজম্ এ ৫
হিপনোটিকস্ এ ৩
SORCAR ON MAGIC
(ইংরাজী) ৩০

যাদুসম্রাট
পি. সি. সরকার
ইঞ্জরাল পাবলিকেশন
১২/৩এ জামির সেন।
বালীগঞ্জ, কলিকাতা ১২



মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন করতে পারে বি, ডেনিলিস, এম-এস-সি (যন্ত্রবিদ্যা)

প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এবং সকলের আগে আবহাওয়া ও জলবায়ু ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্ভাব্যতা প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বহুদিন। মেঘকে আঁকড়ে ধরে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অমিত্তে যদি বারিপাতের সম্ভাবনা ছুটি করা যায়, তা কি সত্যি লোভনীয় হবে না? আকস্মিক বর্ষণ ও বজা, দুর্গিবাত্যা ও অনাবৃষ্টি, শিলাপাত ও মূলি-ঝড়ার বিপাক থেকে মানবজাতিকে রেহাই দেবার প্রকৃতি আরও প্রেরণাসঞ্চারক।

কিন্তু প্রকৃতিতে আপনা থেকে বেসব ঘটনা ঘটে থাকে, সেগুলোর ওপর প্রাথমিক স্থাপন কি কার্যতঃ সম্ভবপর? আমরা কি আশা করতে পারি যে, মানুষ আবহাওয়া ও জলবায়ু স্বেচ্ছামতো পাল্পিয়ে দিতে সক্ষম হবে?

বায়ুমণ্ডলের গতি-প্রকৃতির ওপর ব্যাপক আকারে প্রভাব বিস্তারের জন্য বিপুল পরিমিত শক্তি নিয়োজিত না করলে হতে পারে না। উদ্দেশ্যসাধনের পথে এই হলো দৃষ্ট বাধা। এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, জলুগী নদীতে লেনিন জলবিদ্যুৎ-শক্তি কারখানার ভায় কমতাসম্পন্ন করেকটি জলবিদ্যুৎ-শক্তি কারখানায় যে শক্তি



কারখানার আবহমণ্ডল পরীক্ষার বকেট তৈরী হচ্ছে

উৎপাদন সম্ভবপর, সেই পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন হয় সম্ভবতঃ আকারের একটি মেঘপুঞ্জ তৈরী করতে। এই হিসাবে যাত্র ১০ কিলোমিটার স্থান জুড়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে ১০-২০ মিটার বেগে বাতাস বহাতে হলে শক্তির প্রয়োজন পড়বে আরও বেশ গুণ বেশি।

সেই কারণেই বিজ্ঞানীরা এই প্রকৃতির ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে শুরু করেন। প্রত্যাশিত লক্ষ্যের দিকে বাতাসে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যায়, তার জুড়ে কোর পদা ও উপায় কি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না? সেক্ষেত্রে আপনা থেকে সংঘটিত প্রাকৃতিক ঘটনার ওপর আধিপত্য স্থাপনে যে বিপুল পরিমিত শক্তির প্রয়োজন, তার ব্যবহার পড়বে না আরো।

মোড়িয়েত বিজ্ঞানীরা যে গবেষণা চালিয়ে থাকেন, সব বিষয় খেতেই তা বিরাট। একই সময়ে তাঁদের গবেষণা চলে ছলে, সাগরে ঘরকাবুত মেঘ অঞ্চলে এবং উর্দ্ধাকাশে। স্বর্ষের বিষয়, অবিদ্যাত প্রবেশ কলে ও বহু বিজ্ঞান-কর্মীর বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ এই প্রয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ধারা সম্পর্কে সম্ভান মিলেছে প্রচুর মতামত অজ্ঞাত তথ্যের। ইতোমধ্যে এই তথ্যসমূহ বিজ্ঞানীদের চোখে সামনে বিস্তৃত ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই গবেষণায় বাস্তব মূল্য কতটা সেই সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা মোটেই সম্ভা নয়। অপর দিকে আলোচ্য গবেষণা চালনার সময় অপ্রাধিকার পায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য সংক্রান্ত প্রশ্ন দুইটি।

আকাশের যথেষ্ট উর্দ্ধস্থলে প্রাকৃতিক ঘটনার কি কি ভাবে সংঘটন হয়, সেই সব বিবিধ আবিষ্কারের তাগিদে আবহ-বিজ্ঞান বহুপাতিও নিয়ে বাওয়া প্রয়োজন হয় উর্দ্ধে ঘটনার উৎস এলাকার বকেট ও স্পটনিক মারফৎ আমাদের গ্রহের বায়ুর আবরণ সম্পা অনেক নতুন তথ্য উদ্ধার হয়েছে। যেমন, পার্থিব বায়ুমণ্ডলে গবেষণার ১০-১২ কিলোমিটার উর্দ্ধে বাতাসের গতিবিধি 'কর' সেইটির আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে আর এই গবেষণালব্ধ কল বিম চলাচলের অগ্রগতির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধতন স্তরে গবেষণা চালিয়ে উত্তর গোলার্ধে

দুর্গিবাত্যার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য জানতে পারা গেছে। বকেট ও স্পটনিকের সহায়তায় পরীক্ষা চালনা মারফৎ বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের ঘনত্ব ও তাপের যে দ্রুত হ্রাস বৃদ্ধি ও ওঠাপড়া হয় এবং এর সঙ্গে যে সৌর ক্রিয়াকলাপের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে এইটি।

আমাদের গ্রহে যে শান্ত বয়ফ ও তুষার রয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম গবেষণা চালানো হয়। সেই থেকে জানা যায় যে, মানুষ বাস করে সমগ্র হুলভূমির মাত্র প্রায় দশ ভাগ অংশে, আর বরফও অধিকার করে আছে অল্প অংশ। কুমের অঞ্চলে বরফের ঘনত্ব হচ্ছে ৪,০০০ মিটার। এই বরফপুঞ্জ যে বিপুল জলরাশি জমা

আছে, তার পরিমাণ কীভাবে ২ কোটি ২৭ লক্ষ বর্ষ কিলোমিটার অর্থাৎ পৃথিবীর নবীর ও মহাবরসমূহে যে পরিমিত জল রয়েছে, এ হবে তার প্রায় দশ গুণ। এই 'অকৃত বরকপুঞ্জ'কে যদি গলানো যায়, তা হলে সাগর ও মহাসাগরে জল বেড়ে যাবে ৫৭ মিটা বরও বেশি।

বরক ও আর্দ্রতার অপূর্ণ সংশ্লিষ্টে হিমশ্রোত কঠি হর বাতে করে জলবায়ু ওপর এর বিঘাট প্রভাব বিস্তার সত্ত্বপন। এ অবস্থা শুধু যে বরক অঞ্চলসমূহেই হবে, এমন নয়। এই পরিবর্তন ঘটতে পারে প্রচুর সর্ফত্র। মেরু সাগরে জাসমান চুম্বক-পর্কিত বিধ্বংস করবার যে উদ্দেশ্য সমস্ত, এর সমাধান একপে আর কল্পনার বিবর নয়। আর এই কাজটি সাকল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হলেই প্রচণ্ড চুট কোটি বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে বিরাজ করতে থাকবে নরম ও আর্দ্র জলবায়ু। এর ফলে চিরবরফাবৃত সাইবেরিয়া ও আলাস্কার এখনকার অমূর্ক অঞ্চলসমূহও কলের গাছগুলোতে ফলফুল দেখা দিবে।

মেঘদলের ওপর প্রভাব বিস্তার কি ভাবে করা যায় এবং কি ভাবে কৃত্রিম বাবিপাত ঘটানো চলতে পারে, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আজ তা ভালোয়কম জানেন। এ-ও দেখা গেছে যে, কৃত্রিম শব্দের সাহায্যেও এ ঘটানো সত্ত্বপন। শব্দ কি ভাবে বর্ষণ ঘটায়, এই বাপারে প্রথম পরীক্ষা চালান সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান আকাদেমীর এলত্রাস উচ্চ পর্কতাভিধানের সদস্যবৃন্দ। উদ্ভেদ-সাধনের জন্য ব্যাক্সাক জর্জের টালুভূমিতে কয়েকটি শক্তিশালী শব্দ উৎপাদন যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এক একটি যন্ত্রের হর্ণ ছিল নয় বর্গ মিটার এবং সেই থেকে বিচ্ছিন্নিত হয় ২৫ কিলোগ্রামের শব্দশক্তি। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন শব্দশ্রোত 'তপ্ত' মেঘের দিকে চালিয়ে দেওয়া হয়, অমনি মুহূর্তান্তম যে অসংখ্য জলকণা নিয়ে মেঘের সৃষ্টি, সেগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে, একে অন্ডের গায়ে ধাক্কা ধায়, আবার জড়ো হয়, ওজনে ভারি হয় আর শেষটার ভূপতিত হয় বৃষ্টির আকারে।

একই পদ্ধতির সহায়তার মেঘ ও কুরাসার কবল থেকে বিমানবাঁটি সমূহকে মুক্ত রাখা যায়। সম্প্রতিকালে সোভিয়েত দেশে কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের ওপরকার মেঘস্তরকে বিক্ষিপ্ত করবার জন্যে পরীক্ষা চালানো হয়েছে একাধিকবার আর সেইটি অমুষ্টিত হয়েছে সাকল্যের সঙ্গে।

প্রাকৃতিক অবস্থা—বাবস্থা নিয়ন্ত্রণের যে স্বপ্ন মানুষ এতকাল দেখে এনেছে, তাকে বাস্তব করে তুলতে এর ভেতর সে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। সেদিনও আর অধিক দূরের নয়, যখন মানুষ শুধু আবহাওয়াই কেন, আপন চাহিদা অনুযায়ী সমগ্র জলবায়ুকেও নিয়ন্ত্রণ করতে জানবে।



উদ্ধাকাশে আবহমণ্ডল পরীক্ষার একটি জাহাজে রকেট প্রেরণের মুহূর্ত

মানুষের মগজ ও মেশিন

অধ্যাপক এস, ব্রেইনেস

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ কত বিচিহ্ন ও কত জটিল যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করেছে। বর্তমান যুগকে ভেঙে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বয়ংক্রিয় মেশিনের যুগ বললেই হয়। মানুষের এই অসামান্য কীর্তি ও কৃতিত্ব সবেও এখন পর্যন্তও প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রই সব চেয়ে নিখুঁত। প্রকৃতি আমাদের এমন সব বিস্ময়কর যান্ত্রিক ব্যবস্থা দিয়েছে, যেগুলি অমূর্ক পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে চলতে পারে। জীবদের এই রকম অদ্ভুত যন্ত্র-সজ্জা।

প্রকৃতির দেওয়া এই সব স্বয়ংক্রিয় নিখুঁত যন্ত্রের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। বুদ্ধি-বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুনা সাহায্যে আমরা এমন দিনের কথা অনায়াসেই ভাবতে পারি যেদিন মানুষও প্রকৃতির তৈরি মেশিনেরই মতো অতীত নির্ভরযোগ্য ও নিখুঁত মেশিন তৈরি করতে সক্ষম হবে। সে যন্ত্র সক্ষম হবে বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে টি মতো কাজ করতে।

সেদিন কত দূরে? সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয় তবে যে রকম দ্রুত গতিতে বিজ্ঞান ও যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতি হতে আছে সেই অনাগত দিন খুব বেশি দূরে যে নয়, এ-কথা তব

করেই আজ বলা চলে। একটা বিষয় সুস্পষ্ট। প্রথমে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু নিতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা, প্রকৃতির সব চেয়ে সেবা ও সব চেয়ে নিখুঁত সৃষ্টি যে মানুষের যত্ন, সেই সৃষ্টিকর্তার নিজে আমাদের পুষ্টিগত গবেষণা ও পর্যালোচনা করতে হবে।

স্বচ্ছাচারিত বা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের উন্নতির বর্তমান ক্ষেত্রে মনে পড়বে তখনও প্রকাশ করলে নিরুদ্ভূত ভুল করা হবে না বলেই আমাদের ধারণা।

নিউরোসাইবারনেটিক পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার পথে সোভিয়েত দেশে একটি শিক্ষণকম স্বয়ংক্রিয় ইউনিটের প্রথম মডেল তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষণকম বলতে বোঝায় পরিবর্তনশীল পরিবেশে সাদা দিবার মতো এক প্রকার আচরণ।

এ রকম স্বয়ংক্রিয় ইউনিট উদ্ভাবন করার আগে জীববিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের জীবজন্তুর ব্যবহার বিশদভাবে পর্যালোচনা করতে হয়েছে।

জল ও খাদ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে, বিপদ এড়াবার ক্ষেত্রে পতনের কতকগুলি নির্দিষ্ট আচরণ করতে হয়। যেমন, এই আচরণ-প্রক্রিয়ার বিশদ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমরা কুকুর নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। আহাৰ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি কুকুর বিভিন্ন সঙ্কেতে যে বিভিন্নরূপে সাদা দেয় সেই প্রক্রিয়া আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। কুকুরটি অবশ্য প্রথমেই এক নতুন আচরণের পরিচয় দেয় নি। আমাদের কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। ঠিক মতো আচরণ করতে কুকুরটিকে শিখতে হয়েছে। কুকুর ও অরার জীবা উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা কণ্ঠশব্দ রিফ্লেক্স শৃঙ্খলের যে প্রক্রিয়া জানতে পায়েন সেই জানই তাঁরা শিক্ষণকম স্বয়ংক্রিয় ইউনিট উদ্ভাবনের কাজে প্রয়োগ করেছেন।

স্বয়ংক্রিয় কলাকৌশলগুলি যতই জটিল হয়, ততই সেগুলির দ্বারা অধিকতর নির্ভরযোগ্য কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে এই নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নের একটা সমাধানের পথ অনেকখানি সহজ ও সুগম করা যায়।

মস্তিষ্ক অত্যধিক নির্ভরতার এক চমৎকার মডেল। মস্তিষ্ক চালিত বা নিয়ন্ত্রিত হর তার আত্মশিক্ষার ক্ষমতার দ্বারা। মস্তিষ্কের কোনো একটা উপাদান যখন বিগড়ে যায়, তখন অত্যন্ত সব অংশ

সেই উপাদানের সরবরাহ দেয়। সোভিয়েত অধ্যাপক পি. কে. আনোখিন এক পরীক্ষাধীন পশুর গুরু মস্তিষ্কের ধূসর বাহ্যংশের বেশ খানিকটা সরিয়ে ফেলেন। কিন্তু কণ্ঠশব্দ রিফ্লেক্স-এর নতুন শৃঙ্খল চালু হওয়ার ঐ অংশসারণজনিত ক্ষতি আর টের পাওয়া গেল না।

যাহূষ ও স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমস্তা অতীব জটিল। যাহূষের কাজের ভারপ্রাপ্ত স্বয়ংক্রিয় বহু কতক পরীক্ষা কার্যকরী হতে পারে? মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ কাজ নতুন মেশিনের দ্বারা সম্ভব নয়? এই সব প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক চলছে। এই কথা মনে রাখতে হবে যে, ইতিমধ্যে মেশিনের দ্বারা যেসব কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে (যেমন, জ্যামিতিক উপপাদ্যে প্রমাণ, এক ভাষা থেকে আর ভাষার তর্জমা ইত্যাদি) সে সব কিছুকাল আগেও অসম্ভব বলে মনে হত।

এ কি জীববিজ্ঞানের দ্বারা বহুবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করার ব্যাপার? আদৌ তা নয়। বরং বিপরীত প্রভাবের কথাই আমাদের ভাবতে হবে। ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির আশ্রয় না নিয়ে জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বহু প্রশ্নেরই মীমাংসা করা চলছে না। শারীরতত্ত্ববিদ্যা ও চিকিৎসকরা বহুকাল যাবৎ জীবদেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়া অনুশীলন করে আসছেন। এই সব প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং রক্তের চিনির ভাগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার কার্যকলাপ।

এ-সব ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি নিঃসন্দেহে এক ফলপ্রসূ উপায়। যেমন, এই পদ্ধতির কল্যাণে এ, নাপালকক, ডি, স্ট্রিচিন্‌ক ও এই প্রবন্ধকার জীবদেহের আভ্যন্তরীণ শারীর প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার একটা প্রকল্প খুঁজে বার করার কাজে হাত লাগাতে পেরেছিলেন।

চিকিৎসকরা বলেন, দেহের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার কারণে বহু ব্যাধি দেখা দেয়। এই কারণেই এই ব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যকলাপ জানা এতখানি অত্যাৱশ্যক। এই ক্ষেত্রের গবেষণার গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না।

স্বয়ংক্রিয় বহুবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের মধ্যে সংযোগসূত্র সম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্ন নিয়ে আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। এই আলোচনা থেকে একথা বোধ হয় স্পষ্ট হতে পেরেছে যে, গণিতশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন ও সমন্বয়ের দিন আগত ঐ।

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিসূচ্যের দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দুর্ভাগ্য বোঝা বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, শ্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারণ উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারণ শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বার্ষিকীতে, নয়তো কারণ কোন কৃতকার্যতায়, আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী' এই উপহারের জন্ম স্মৃতি আচরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থালাস। প্রদত্ত ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে খুশী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরণের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে কে-কোন জাতব্যের জন্ম লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।

বনস্পতি রঙ করার কি দরকার?



কেউ কেউ বলেন যে বনস্পতি রঙ করা উচিত, যাতে ঘিয়ে ভেজাল হিসেবে বনস্পতি ব্যবহার করলে সহজেই তা ধরা যায়।

কিন্তু খাবার জিনিসে মেশাবার মত এমন কোন রঙ নেই যা বনস্পতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য বনস্পতিতে ৫ শতাংশ তিলের তেল থাকায় ঘিয়ের মধ্যে ৫ শতাংশ বনস্পতি ভেজাল দিলেও একটি সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষায় সহজেই তা ধরা পড়ে।

বনস্পতি ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্তে একথা সত্য যে, যি ব্যবহারকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্তে বনস্পতি রঙ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, কিন্তু যে-রঙ মেশানো হবে তা যাতে লক্ষ লক্ষ বনস্পতি ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের অনিষ্ট না করে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। যে রঙই মেশানো হোক, তা ১৯৫১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত “যি অ্যাডালটারেশন কমিটির” মৌলিক শর্তাবলী অনুযায়ী হওয়া চাই। তার প্রধান প্রধান শর্তগুলি হল :

- ১। “রঙটি বনস্পতিতে সহজেই মিশে যাওয়া দরকার।
- ২। “বনস্পতিতে মেশানোর পর বনস্পতির যে রঙ হবে তা দেখতে মনোরম হওয়া চাই।
- ৩। “রঙটি পাকা হবে এবং রাসায়নিক বা অল্প কোন প্রক্রিয়ায় যেন সহজে পৃথক করা না যায়।
- ৪। “উত্তাপে যেন রঙের পরিবর্তন না হয় এবং রান্নার তাপেও (প্রায় ২০০°সে:) নষ্ট না হয়।
- ৫। “দীর্ঘদিন ব্যবহারেও রঙের দরশন যেন বিঘাত প্রতিক্রিয়া না জন্মায় কিংবা অনিষ্ট না হয়।”

খাবার জিনিসে সাধারণতঃ যে সব রঙ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে কোন রঙই এই সমস্ত শর্ত পূর্ণ করে না। সেগুলি হয় বনস্পতিতে মেশানো অথবা সহজেই বনস্পতি থেকে পৃথক করা যায়। পাকা সিন্থেটিক রঙে বিঘাত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় কিংবা ক্যান্সার রোগ জন্মায়। সুতরাং বনস্পতিতে

মেশাবার উপযুক্ত রঙ এখনো পাওয়া যায়নি।

জগতের বৈজ্ঞানিকদের দৃঢ় অভিমত এই যে, খাদ্য কিংবা পানীয় জিনিসে রঙ মেশানো উচিত নয়। কারণ, বছ বছর নির্দোষ ঝ'লে ব্যবহৃত অনেক রঙ পরে ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করে ঝ'লে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সব উন্নত দেশেই খাদ্য ও পানীয়ে মেশাবার উপযুক্ত রঙের সংখ্যা ক্রমে কমিয়ে আনা হচ্ছে।

ঘিয়ে ভেজালের সমস্যা

যতদিন ঘিয়ে ভেজাল দেবার জন্তে কাঁচা বা পরি-শোধিত তেল, জাস্তব চর্বি ইত্যাদি জিনিস সহজেই পাওয়া যাবে ততদিন কেবল বনস্পতি রঙ করে ঘিয়ে ভেজাল বন্ধ করার আশা বুধা।

ঘিয়ে ভেজালের সমস্যা এদেশে থাকে ভেজাল দেবার বিরাট সমস্যার একটা অংশ মাত্র। ১৯৫৪ সালের “খাদ্য ভেজাল নিরোধ আইন” এবং তার অন্তর্গত নিয়মাবলী থাকে ভেজাল নিবারণের উদ্দেশ্যে রচিত। এই আইন যত কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হবে ততই থাকে ভেজাল নিবারণের চেষ্টা সার্থক হবে। তাছাড়া, বনস্পতির মত ঘি-ও কেবলমাত্র সীলমোহর করা টিনে বিক্রি করা হলে এই চেষ্টা আরো সফল হবে।

বনস্পতি ব্যবহারকারীদের প্রতি আশ্বাস

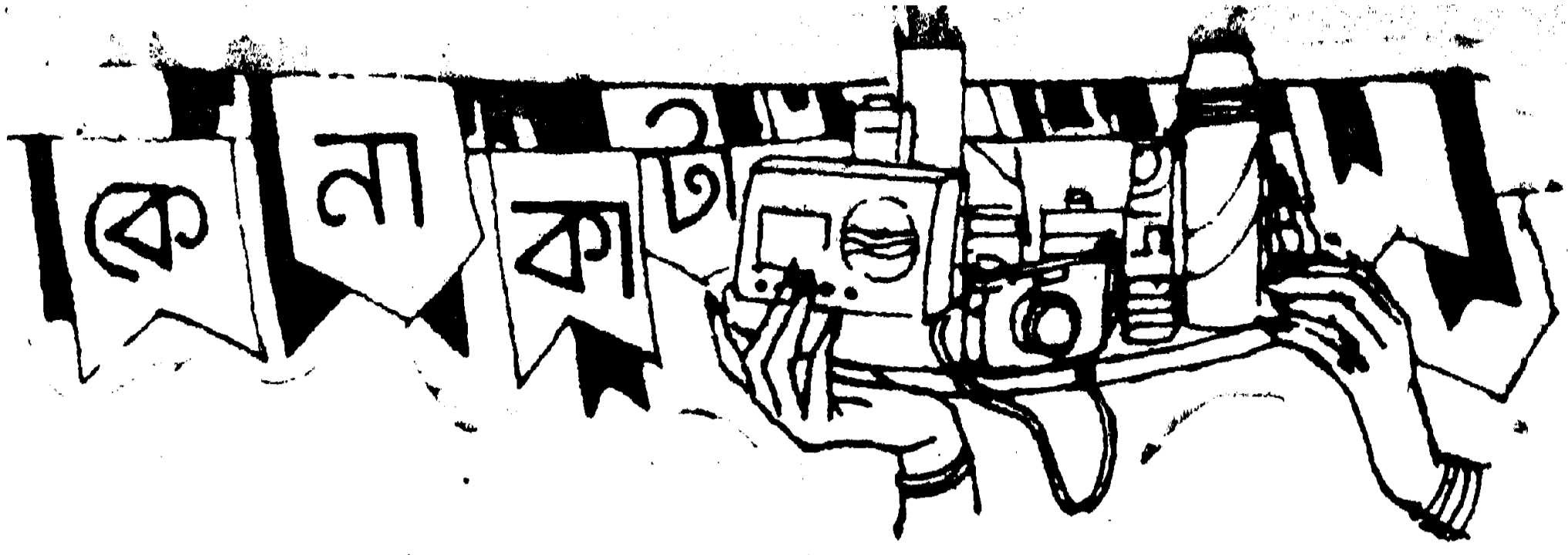
বনস্পতি প্রস্তুতকারীদের কাছে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ঘিয়ে ভেজাল দিয়ে বনস্পতির অপব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা তাঁরা জোর দিয়ে বলতে চান যে বনস্পতি সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন করা হলে বনস্পতি ব্যবহারকারীদের হিতের দিকে লক্ষ্য রেখেই যেন তা করা হয়।

বনস্পতি প্রস্তুতকারীরা বনস্পতি ব্যবহারকারীদের এই আশ্বাস দিচ্ছেন যে বিগুহতা ও পুষ্টিকারিতার সর্বোচ্চ মান অমুসারেই বরাবর বনস্পতি তৈরী করা হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্ত লিখুন :

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড সোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া
ইণ্ডিয়া হাউস, কোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই-১

স্বাস্থ্য
ক



বাঁশ

আমাদের দেশে বাঁশ একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, শুধু তাই নয়, আমাদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে বাঁশের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যদি আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি তাহলে শুধু সত্যের অপলাপ করা হবে না, উপযুক্ত বিঘাট অবিচারও করা হবে বলে মনে হয়।

বাঁশ যে আমাদের কত কাজে লাগে তা এক কথায় যেমন বলে শেষ করা যায় না, তেমনি এর প্রয়োজনীয়তার তালিকা দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মোটামুটি ছাড়া বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

কবে কখন এই বাঁশ আমাদের সমাজ-জীবনের সাথে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে পড়ে, একথা আজ ঠিক ভাবে বলা অসম্ভব। তবে একথা ঠিক যে, বাঁশ বহু প্রাচীন কালের। বাঁশের প্রাচীনত্ব সন্দেহ বতটুকু জানা যায় যে, দেবীস্বরের যুদ্ধের বহুপূর্বে অতি প্রাচীনকালে মানবের আদিম অবস্থায় আশ্রয়কর করার অথবা শত্রুকে আঘাত করার সহজলভ্য প্রধান অস্ত্রই ছিল গাছের ডাল বেত ও বাঁশের লাঠি। তখনও মানুষ খনিজ ধাতুর ব্যবহার জানত না। তখন এমন কোন প্রকার ধাতুনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার হয়নি, যার দ্বারা আশ্রয়কর ও শত্রু দমন করতে পারে। মানব ধাতুর ব্যবহার শেখবার পূর্বে পাথর যথেষ্ট প্রয়োগ করা অস্ত্রই ব্যবহার করত। এর বহু পরে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লৌহনির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়।

বাঁশ ভূগর্ভীয় উদ্ভিদ হলেও লম্বার তিরিশ-চল্লিশ হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর ভেতরটা কাঁপা, এক হাত বা দেড় হাত অন্তর অন্তর গাঁট থাকে। আবার গাঁট থেকে যে শাখা বের হয়, তাকে আমরা কঞ্চি বলে থাকি। এই কঞ্চিতে পাতা জন্মায়।

বাঁশপাতা লম্বা সরু এবং বেশ ধারালো হয়ে থাকে এর কিনারাগুলো। বাঁশ গাছ খুব শক্ত। বড় বাঁশ গাছ ছুরে পড়লেও ভেঙ্গে পড়ে না। বাঁশ গাছের মূল মাটিতে পুঁতলেই ক্রমে ক্রমে বাঁশঝাড়ের সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন প্রকারের বাঁশ দেখা যায়, যথা—তন্না বা তল্লা, বড়ো, পড়া, কেল বৈয়ালী অথবা কাল বৈয়ালী, বেউড়, জাগয়া প্রভৃতি। তন্না বাঁশে চিকণ চিকণ আঁশ অথচ খুব বেশী কাঁপা কিন্তু আবার বেশী মোটাও নয়। বড়ো বাঁশ বেশ মোটা লম্বা আর শক্ত এমন কি এর গাঁটগুলো বেশ শক্ত আর ঘন হয়ে থাকে। পড়া বা কাল বৈয়ালী বাঁশ খুব মজবুত ও কালো হয়। বেউড় বাঁশ কটকমুত ও লাকারে ছোট হয়ে থাকে।

ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, চীন, জাপান, জার্মানি ও জাপানে প্রচুর বাঁশ জন্মায়। বাঁশের চাব প্রণালীও অতি সহজ। মাটি বেশ সরস হওয়া চাই। বাঁশের মূল মাটিতে পুঁতলেই এর থেকে বাঁশ জন্মায়।

বাঁশের বঙ্গবৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে বাঁশের পাতা বখন করে বায়ু তখন পরিষ্কার করে বাঁশের গোড়ায় মাটি দিতে হয়, বাঁশ বাংলা ও আসামের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এর থেকে বাঁশের খুঁটি বেড়া ঘরের চাল ইত্যাদি ছাড়াও বাঁশ আমাদের মনো কাজে লাগে। ধরা রাজমিস্ত্রীর তাজা, মজুরের মাখালী, সোয়ালার ঝাঁক, বৃহন্নীর তাঁত, মাছ ধরবার ছিপ, পোলোর কাঠি, হাকনী জালের কাঠামো, ঝড়ি, কুলা, চালুনী, ধুচনি, ঘুনী, লাঠি, ছড়ি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী হয়ে থাকে। "বাংলা ভাষার ইতিহাস" পুস্তকখানি থেকে আমরা জানতে পারি যে "এ দেশের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষার নাম দেশ। যে সময়ে এদেশে কোনরূপ প্রাকৃত ভাষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, বোধহয় তখনই সাধারণের ব্যবহারের জন্ত এদেশে এক আদিম ভাষা ছিল, সেই ভাষার শব্দ সকল সংসর্গবশতঃ প্রাকৃতের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। ঢেঁকি, কুলা, ধুচনি, চুপড়ি, ইত্যাদি শব্দ না সংস্কৃত, না প্রাকৃত, না পারসী, না আরবী। সুতরাং মনে হইতে উহার— উপরিউক্ত আদিম দেশীয় ভাষার শব্দ।"

বাংলা ভাষার ইতিহাস থেকে বাঁশের তৈরী জিনিসের কয়েকটি নামের নমুনা থেকে প্রাচীনত্ব সন্দেহ আর এক দিকে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারছি। ছাতার বাঁট ও বাঁশী ছোট নলে এ ছাড়া আরও কত রকমের অসংখ্য শিল্প কাজ আর খেলনা তৈরী হয় তার ইয়ত্তা নেই।

বাঁশ আমাদের যথেষ্ট উপকারে আসে সত্য কিন্তু বাঁশঝাড়ে মশকও বৃদ্ধি পায় যথেষ্ট, কাজেই অন্তরিক্তে বাঁশের পক্ষেও কৃতিকর। এর থেকে ম্যালেরিয়াও ছড়িয়ে পড়ে।

বাঁশের মগু থেকে কাগজ প্রস্তুত হয়ে থাকে। পাতা গবাদি পশুর খাদ্য। এক কালে বাঙ্গালীর হাতের লাঠি ঘন, মান প্রাণ বাঁচাতে একমাত্র ছিল লম্বা।

বাঁশের অবদান যে কত, তা বলে শেষ করা যায় না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও পূজা-পার্বণে, বিবাহ, আঁচ, জম্ম, মৃত্যুতে বাঁশ থাকবেই। একটা প্রবচন আছে যে "বাঁশবনে ভোম কানা"। ঠিক আয়ারও তাই অবস্থা, বাঁশ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে তাবহি অনেক কথাই বলবার ছিল অথচ কি বেন বলতে পারিনি।

বাঁশের ব্যবহারের কথা বললাম বটে কিন্তু বাঁশ শুধু কৈমস্কিন সামাজিক জীবনেই সীমাবদ্ধ নেই, পাল-পার্বণে আঁচ-পাতিতে,

দ্রুত-সুখ্যতে, বৃগ-বৃগান্তর ধরে কারেমী বার্থ বজায় করে শুধু চলছে না। ইতিহাসে, মহাকাব্যে, গানে, বাজনার বাঁশ কোথায় নেই বলুন তো? এমন কি, জাতি ধর্ম ও কুলে কালি দিয়ে একেবারে বাঁশ বাজাঘরেও হাজির হয়ে গেছে। কচি বাঁশের তরকারি হয়ে।

বাঁশ একটি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ বটে কিন্তু এর গুণের ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ করতে কেন একটি কাব্য সৃষ্টি হয়নি, তাই ভাবছি। আমাদের মনে হয়, বাঁশের প্রতি আমরা যে অবিচারের পরিচয় দিয়েছি তা বড় মর্মান্তিক।

জগতে যখন প্রথম এলায় বাঁশে। আবার জগত থেকে যখন দীনাখেলা সাজ করে চলে যাব তাও বাঁশে। আবার অপরকে বাঁশ দিতেও আমরা মোটেই কুণ্ঠিত নই। কচি বাঁশের তরকারি খাই বাঁশের, যে বাঁশের লাঠির সাহায্যে শত্রু দমন করি সেই বাঁশই আবার রাণাকুণ্ডের প্রেমকে করেছে অমর অক্ষয় বাঁশী হয়ে। এ সবকিছু একটি গ্রাম্য গাথা আছে—

“বাল্যকালে মাথায় টুপি
কৃষ্ণ অবতারে মজায় গোপী
রাম অবতারে রাবণ মলো
সেই তরকারি আমাদের হলো।”

অর্থাৎ কচি বাঁশের তরকারিও হয় আবার রাম ধনুক দ্বারা রাবণ বধ করেছিলেন, ধনুক ছিল বাঁশের এবং ঐ বাঁশেরই বাঁশীতে শ্রীকৃষ্ণ মজিয়েছিলেন গোপিনীদের। আরও পড়িবার করে বলতে হলে বাঁশ চার বৃগের রচনিতা, মনে হয় ঐ কথা বলতে গিয়ে উক্ত প্রসঙ্গে রাম ও কৃষ্ণ অবতারের বর্ণনা করেছেন।

শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারতে বাঁশের বর্ণনা কেমন পাওয়া যায় একবার দেখা যাক।

মহাভারতে ইন্দ্রধ্বজ পূজার কাহিনীতে আছে রাজা উপরিচর বসু প্রথমে ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রচলন করেন। মাটিতে একটি বেণুষ্টি প্রাধিক করে তাতেই ইন্দ্রের পূজার ব্যবস্থা হত। এখানে বেণুষ্টি বাঁশকেই বোঝায়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কবি বলতে ‘মাত্র দু’জন, একজন মুকুন্দরাম ও দ্বিতীয় জন ভারতচন্দ্র। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে এবং চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণের মধ্যে মুকুন্দরাম রচিত একটি পুস্তকের মধ্যে বাঁশের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা নিম্ন রূপ—

“খন্দে নাহি নিব বাড়ী রহে বসে দিহ কড়ি
ডিহি দার নাহি দিব দেনো।
সেনালী বাঁশ গাড়ী নানা ভাবে বস্ত কড়ি
না লইব গুজরাট বাসে।”

অন্য—

“খুড়া, তিন গোটা শর ছিল একখান বাঁশ
হাতে হাতে ফুলরা পসরা দিত মাম
দৈব বসে যদি আমি ছিলাম কান্দাল।
দেখিরাছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরাল।”

এই তো গেল প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে বাঁশের কথা। এ ছাড়াও বাংলার অসংখ্য সাহিত্যিক কবিগণের রচনার মধ্যে বাঁশের বহু উল্লেখ

পাই। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় মহারাজ নন্দকুমারের সুখ্যতে দেশের চারি দিকে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, এ সবকিছু একটি গ্রাম্য স্মৃতি আছে, নিখিলনাথ রায় রচিত “মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে” পাওয়া যায়। তাহা নিম্নরূপ—

—“নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ ডাকার পানে চেয়ে
আর না নামিয়ে বাছা জোড়া তিজি বেয়ে।
খোপেতে কোঁতর কাঁদে কোঁ হারাতে হাঁস
জোড় বাংলার কাঁদে সৈন্যর গুলতে বাঁশ :—”

বাঁশ কে নিয়ে আরো বহু গান কবিতা আছে স্থানান্তরে সম্পূর্ণ উল্লেখ করা গেল না। স্থানের নামও বহু পাওয়া যায় কথা— বংশবাটি অথবা বাঁশবেড়িয়া বাঁশত্রোগী ইত্যাদি মাতৃয়ের নামও আছে যেমন বংশীলোনে বাঁশরী ইত্যাদি—এমন কি কবিতাকী উৎসেও বংশলোচন বলে একটি ঔষধ দেখা যায় ঐ গুলি বাঁশের মধ্যে পাথরের আকারে আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উক্ত ঔষধটি উপকারী এবং হস্তাপ্যও বটে।

একবার কংগ্রেস অধিবেশনের সমস্ত ঘর-বাড়ী যখন বাঁশের ও মাটির তৈরী হইয়াছিল তখন ইংরেজদের পত্রিকাতে উহাকে— “সমস্তই অসংকৃত কচিবিকৃত”...বাঁশের শহর বলে উপহাস করা হইয়াছিল। এর এক বৎসর পর হরিপুরা অধিবেশনের সময়—ঐ বাঁশের শহরকেই আবার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে হইয়াছিল। এরকম বহু দৃষ্টান্ত আমরা পাই। এছাড়া উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পঞ্জাব দক্ষিণভারতের ঘরবাড়ীতেও বাঁশের ব্যবহার হয়ে থাকে। বাংলার সূত্রধর ও ঘরামিরাই গ্রামের ছপতি, তাঁদের শিল্পকচিবোধও বেশ সমৃদ্ধ। গ্রামের সাধারণ লোকের ঘর-বাড়ী স্থানীয় উপাদানে প্রস্তুত হয়।

কথা :—বাঁশ, খড়, তালপাতা, নারকেলপাতা, হোগলা, কাঠ ইত্যাদি। আমাদের সামাজিক প্রয়োজনের কত অংশ যে কাঠ দিয়ে মেটাতে হয় মনে হয় বেন কাঠ ছাড়া এক পা-ও চলবার উপায় নেই। বাঁশের খুঁটি ও বাতা দিয়ে ঘরের বাটাম বা কাঠামো তৈরী হয়। ক্রীহট, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিং জেলার ভাটি অঞ্চলে এই বেধাকার গৃহনিবেশ অধিকাংশ গ্রামের বৈশিষ্ট্য। বস্তার কবল থেকে আশ্চর্যকার জন্ত বাঁশের বেড়া দিয়ে গ্রাম ঘেরা থাকে। পূর্বেই বাঁশ চিরে পাটি অথবা বাতা প্রস্তুত করে গ্রামের চারিদিকে দেওয়াল দেওয়া হয়। বাংলা দেশে গ্রামে বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত করা ঘরবাড়ীগুলি দেখলে মনে হয় বাংলার স্থাপত্যশিল্পের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যে বাঁশঝাড়কে আমরা দিনের পর দিন দেখেছি ভ্রক্ষেপ করিনি বরং উপেক্ষা করেছি। ভূতের অথবা শাঁকচূড়ির গল্পে বাঁশঝাড়ের কথা আছে, রাতের গাঢ় অন্ধকারে বাঁশঝাড় বিতীষিকা মনে হয়েছে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বাঁশঝাড়ের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। “পথের পাঁচালী”র লেখক বিজুতিভূষণ কত সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কত কবিতায় বাঁশের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া পন্নীসংগীতে দেখেছি, শিল্পীর তুলিতে দেখেছি, আবার সেই বাঁশের তৈরী অপরূপ শিল্প সৃষ্টি দেখে বিস্মিত হয়েছি শিল্পীর অপরূপ শিল্পনৈপুণ্য দেখে। বাংলার বাঁশের তৈরী জিনিসপত্র আজও লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

উপসংহারে বাঁশের লাঠির কথা বলেই আমি বর্তমান প্রবন্ধের ছন্দ টানবো।

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত—মাহুব আওয়াজকার জন্ত পাছের ডাল, বেত এবং বাঁশের লাঠি ব্যবহার করে আসছিল। কারণ, একাধারে শুলভ ও সর্বত্র অনায়াসেই পাওয়া যায়। মাহুব প্রাচীন কাল থেকেই লাঠিখেলার অভ্যাস করেছিল। কালের স্রোতে আজ তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বহু বিবর্তন ও বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে লাঠিখেলার পদ্ধতি ভারতবর্ষে যে রূপ প্রচলিত ছিল আজ তা একেবারে নেই বললেই চলে।

বাঁশের লাঠির ভূমিকা সে কতখানি তা সে যুগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই সহজে বোঝা যায়।

একটা প্রবচন আছে—

“টাকির লাঠি,
সাতকীরের মাটি
গৌরভাঙ্গার হাতি।”

এ ছাড়া দেশের লাঠি একের বোঝা তো আছেই।

লাঠির কথা ‘টাকির ইতিহাসে’ও পাওয়া যায়। রামপালের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রঘুরামপুর গ্রামে বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কেদার রায়ের অব্যবহিত পূর্বে রঘুরাম রায় নামে একজন স্থানীয় রাজা ছিলেন। তাঁর বীর সেনাপতি রাম মালিক লাঠিওয়াল হিসাবে একটি পদ্মকবিতায় স্থান পেয়েছিলেন; তাহা নিম্নরূপ—

রাম মালিকের লাঠি।
রঘুরামের মাটি।
উঠলে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পালায় বাঘ ॥
গুলি ফিরে ঝাঁকে।
রামের লাঠির পাকে।
মালিক ধরে লাঠি
যম বেন সে খাঁটি ॥

“টাকির ইতিহাস”
প্রথম খণ্ড ৪১৮ পৃষ্ঠা
যতীন্দ্রমোহন রায়।

বাংলার বাঁশের লাঠি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে জানতে হলে শ্রীপুলিনবিহারী দাস মহাশয়ের রচিত “লাঠিখেলা ও নাসাঁশিকা” পুস্তকখানি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া “বড় লাঠি বা রায় বাঁশ খেলা”

পুস্তকের লেখক শ্রীজ্যোতির্শ্বর দেব রায়চৌধুরী মহাশয় লাঠিখেলার বিস্তৃত আলোচনা করে গেছেন, তিনি তাঁর পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন—

শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে একমুখ শারীরিক ব্যায়াম বহু প্রকারের আছে, তন্মধ্যে লাঠির ভাঁজ ঘূরান ও লাঠিখেলা অন্যতম। নিয়মিতরূপে লাঠির ভাঁজ ঘূরাইলে শারীরিক বলের বৃদ্ধি হইয়া পেশী সকলের উৎকর্ষ সাধন হয়। ইহা যুগের ভাঁজের অনুরূপ ক্রিয়া করে। “লাঠিখেলা ও নাসাঁশিকা” জ্যোতির্শ্বর বাবু উল্লেখ করেছেন—

“বড় লাঠি বা রায় বাঁশ খেলা” কিছু অংশ শ্রীশুলভিত সরকার সম্পাদিত ১ম বর্ষের ‘সুবক’ মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৬ সনের মাস সংখ্যা হইতে ১৩৩৭ সনের ত্রয়ো সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১৩৩৭ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। “বড় লাঠি বা রায় বাঁশ খেলা”র পুস্তকখানির বেন নামকরণ তথ্যেছিল লেখক সে কথা মুখবন্ধে লিখেছেন। রাহ = রাজা, শ্রেষ্ঠ; বাঁশ = বাঁশ, লাঠি। রাজলাঠি বা শ্রেষ্ঠ লাঠি দীর্ঘ বাঁশবাঁশ বা বড় বড় বাঁশের লাঠি। বিক্রমপুরের স্বাধীন নৃপতি, বারভুঁইয়ার অন্ততম মহারাজ চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বাজালী বাহিনীর মধ্যে এক তৎপর পূর্ব দুর্ধর্ষ লাঠিওয়াল পাইকের দল ছিল। রায় রাজার ঠাঁয়ের এই লাঠিওয়ালগণকে বরুণ পূর্ব নতুন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ বাঁশের লাঠি দ্বারা খেলা শিক্ষা দিবে এক মহা পরাক্রমশালী লাঠিওয়াল যোদ্ধার দল গঠন করেছিলেন যে যাদের উৎকর্ষের বহুসম লাঠির দ্বারা শত্রু ভীর শেষ শস্যায় চিরবিভ্রাম লাভ করত। বিক্রমপুরের গৌরব সেই রায়-রাজাদের নাম থেকে লাঠির ইতিহাসে এই বড় লাঠি ‘রায় বাঁশ’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বিক্রমপুরের পদ্মা-পাড়ের এই লাঠি খ্যাতি বেন একটি জনশ্রুতির মতই এককাল চলে এসেছে। প্রবাদটা হলো :—

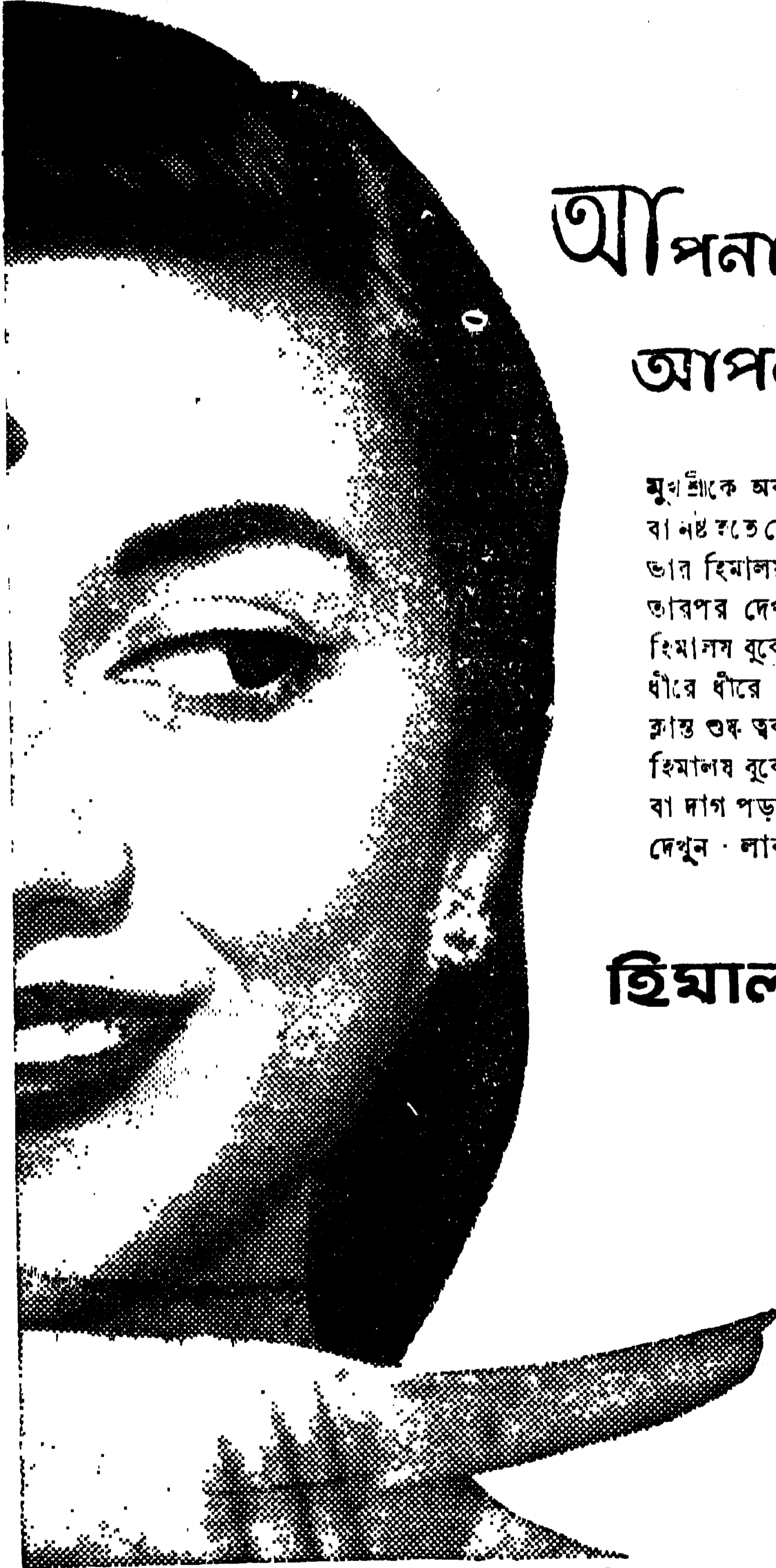
“চাঁদ কেদারী লাঠি যম সে যে খাঁটি,
ঘোরে বিঘম পাকে শত্রু পড়ে ঝাঁকে।”

পরে ঠগী ও পিণ্ডরী দস্যুগণ লাঠিখেলাকে নিজেদের পাপকার্যে ব্যবহার করে এর মর্যাদা নষ্ট করেছিল। আজ যুগের পরিবর্তনে এসেছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু অতীতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এই বাংলার বাঁশের লাঠিই এককালে বাজালী ধন, মান, সম্রম বাঁচাবার একমাত্র সঞ্চল ছিল।

—শ্রীগোপালচন্দ্র সাঁত্তরা।

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে পক্ষে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে—
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ করিয়া ছুটে বেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া—
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ’তে অসীমের মাঝে হারা।

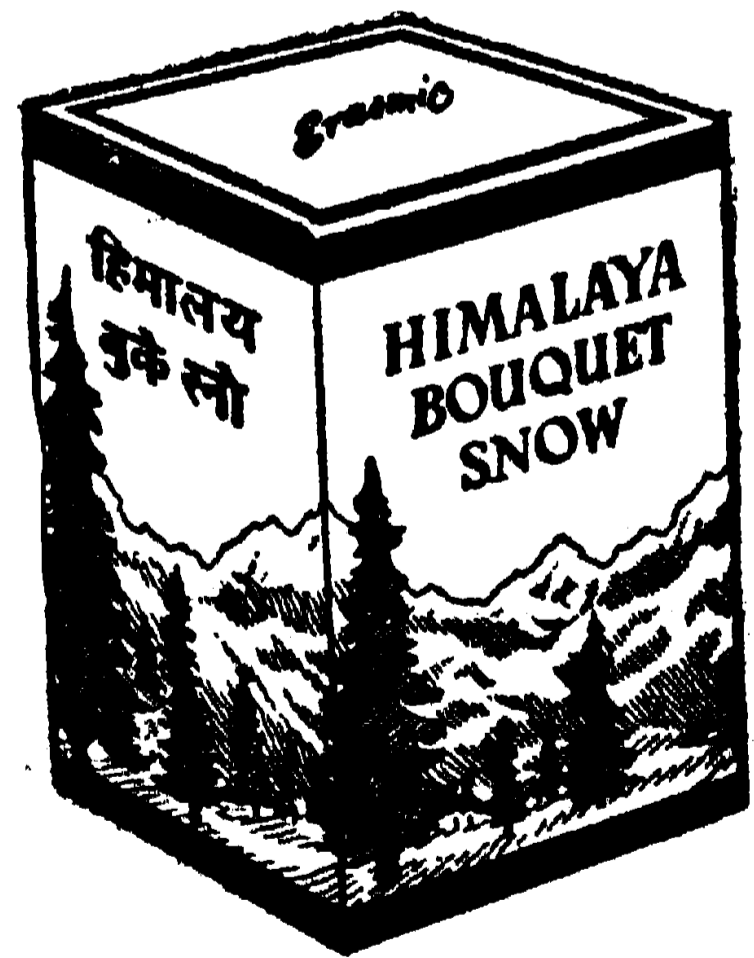
—স্বপ্নসঙ্গ



আপনার রূপ লাভন্য আপনারই হাতে!

মুখটিকে অকারণ রোদে—ধুলোর কালো
বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাভন্যতা বন্ধীর
ভার হিমালয় বৃকে স্নো ওপরই ছেড়ে দিন—
তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি
হিমালয় বৃকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কাস্তি
ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে!
ক্রান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে!
হিমালয় বৃকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ
বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারায়
দেখুন লাভন্যতা এনে ধরেছে...

হিমালয় বৃকে স্নো!





রহস্যপুরীর রত্নোদ্ধার

(এ্যাডভেঞ্চার অফ লে ভেরী)

[পূর্ক-প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

8

সুদীর্ঘ নদীর এঁাকবঁাকে উপর দিয়ে ভেসে চলতে-চলতে ক্রমশঃ নদী প্রশস্ত হতে লাগল। কিছুটা পথ এগুবার পর সামনেই দেখা গেল একটা ছোট দ্বীপের মত জায়গা। ঐ দ্বীপটার বস্তুই আমরা কাছাকাছি হতে লাগলুম, ততই জলের টান বেন বেড়ে চলেছে। একটা জায়গায় ঘূর্ণির মত জল পাক খাচ্ছে। এর আগেও ছুঁ-একটা ঘূর্ণির সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের। কিন্তু এখানে নৌকাগুলিকে বাঁচাতে গিয়ে বেশ বেশ পেতে হ'ল। লোকজনরা আশ্রয় চেষ্টা করে কোন বকমে তীরের দিকে নৌকাগুলিকে নিয়ে এল। এখানে নদীর এক ধারে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা বিশেষ কিছুই নজরে পড়ে না। কোথাও বহু ফটিকের মত তার গা বকমক করছে, আবার কোথাও ধূসর ধূলা-মলিন। এই পাহাড়ের ছুঁচালো চূড়াগুলি নানা জঙ্গীতে উঠেছে উপর দিকে।

পাহাড়ের গা-ধঁবে নদীপথ দিয়ে অতি কষ্টে আমরা আধ-জাগা আধ-ভোবা এই দ্বীপটি অতিক্রম করলুম বটে, এইবার আমরা বিপদসঙ্কুল একটা 'দানবের গর্ভে' এসে পড়লুম। পাহাড়ের গা থেকে সেখানটার জীৱ বেগে ঝরণার জল এসে পড়ছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে জলের মধ্যে চলেছে নিরন্তর আলোড়ন, আর বৃদবৃদের দৈত্য-নৃত্য। এর সঙ্গে আওয়াজ তো আছেই! এ দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যায় না। দূর থেকে দেখলেই ভয় হয়; মনে হয়, ভয় ধরে-কাছেও কাঁক বাওয়ার সাধ্য নেই! এইটুকু অতিক্রম করতে পারলেই আমাদের আজকের মত যাত্রা শেষ হবে—আমরা বিশ্বাস নেব নৌকাগুলিকে বেঁধে। কিন্তু এই হুমুর হানটুকু পার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের নিজস্ব নেই।

এই 'দানবের গর্ভে'র পরই নদীর ছুঁ-তিনটে লক্ষ লক্ষ ক্যাকড়া

বেরিবে গেছে ছুঁ-তিন দিকে। আমাদের যাত্রাপথের ম্যাপ দেখে নির্দিষ্ট নদীর মোহানাতেই আমরা রাত কাটাতে স্থির করেছিলুম।

দিনের আলো ক্রমশঃই তখন নিবে আসছে, রাতের অন্ধকারের সুখোমুখি এসে পাড়িয়েছি আমরা। ইতিমধ্যে কারিব ইণ্ডিয়ানদের একজন জোরান ছেলে নৌকাত্তেই ভীষণ ম্যালেরিয়া হয়ে আক্রান্ত হয়েছিল। তার বাপও ছিল আমাদের এই দলের মধ্যে। ছেলেটাকে কুইনিন ইন্জেক্সন দিয়ে আমি বধাসম্ভব তাড়াতাড়ি ভাল করে তোলায় চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু তার বাপের এসব কিছুই পছন্দ হচ্ছিল না। সে নিজে ছিল একজন জঙ্গী-চিকিৎসক। ইংরেজীতে বাকে 'উইচ ডক্টর' বলে, সে ছিল সেই ধরণেরই। কাজেই, ঝাড়-ফুক, তুকতাক করে সে তার ছেলেকে ভাল করতে চায়। প্রথমে আমি এসব বিশ্বাস করতুম না বলেই নিজের হাতে তার চিকিৎসা করছিলুম, তাছাড়া একবার এ বিষয়ে তাদের প্রশ্ন দিলে আর বক্কে নেই! কিন্তু এ ক্ষেত্রে এলিস ও আমি যুক্তি করে দেখলুম যে, বাপ বধন নিজেই ছেলেকে সুস্থ করার ভার নিজের হাতে নিতে চাইছে, তখন আমাদের হাতে ওকে না রাখাই শ্রেয়ঃ।

কিন্তু কয়েক দিন পরে ঝাড়-ফুক কিছু সুবিধা না হওয়ায়, আবার তার ভার আমার নিজের হাতেই নিতে হ'ল। ঝাড়-ফুক অবস্থা আরও সন্তান হয়ে আসছে দেখে, আমি তাকে আবার ইন্জেক্সন দিলুম। এ-ব্যাপারে দলের অনেকেই বেশ বিচলিত হয়ে পড়ল।

যেদিন ইন্জেক্সন পড়ল সেদিনের রাতটা একই ভাবে কাটল। পরের দিন সকালে অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে হ'ল ছেলেটাকে। মনে হ'ল, সে বোধহয় এ-যাত্রা বেঁচে উঠবে। এ অবস্থার ফসীকে কেবল পাঠানোর কথা চিন্তা করা যেমন হানুতকর, তেমনি অসম্ভব। তাছাড়া এখন তাকে বা তার বাপকে এখানে ছেড়ে দিলে নির্ধাত কোন জীবজন্তুর পেটে যে তাদের চলে যেতে হবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

কে ম'লো আর কে বাঁচল, যদিও তখন আমাদের দেখবার অবকাশ ছিল না, তবু একটা ছোট ভিত্তিতে তার জন্তে আমরা স্বল্প ব্যবস্থা করলুম। এটা শুধু তার জন্তেই নয়, ওদেশের বিদ্যুট ভয় বা অন্য কোন অশুখের সংক্রামকতা সঙ্গী লোকজনদের মধ্যে বাতে ছড়িয়ে পড়তে পা পারে, সেই জন্তেই এই ব্যবস্থা করা হ'ল।

ভোর হয়ে এসেছিল, চর ছেড়ে আমরা এগুতে লাগলুম আমাদের গন্তব্য পথে। কিন্তু দুপুরের মধ্যেই আবার আমাদের নৌকাকে নোঙর করতে হ'ল একটা বঁাকের মুখে।

অকারণ এই পথে সময় নষ্ট করার লোক আমি নই, কিন্তু আমাদের বিশ্বস্ত গাইড টাইগারের কথার তা আমাদের করতেই হ'ল। ইতিপূর্বে এইখানে, নদীর এই বঁাকের মুখে, ছুঁধারের তটদেশ ও তলদেশে হীরক ও স্বর্ণরেণুর কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে সে আমার আভাস দিয়েছিল। এ ছাড়া যাত্রার প্রথম দিকে, সেই যে এক কারিব জাতীয় বুড়ী বলেছিল, সেটা নাকি এই জায়গারই কথা। বাই হোক, হাতের ম্যাপ দেখে আমরা এই জায়গাটাকেই মার্ক করলুম।

হুঁদিন সমারোহের সঙ্গে ক্যাম্প ফেলে আমরা বধাসম্ভব অসুসন্ধান কার্য সমাধা করলুম। কথাটা নির্জলা মিথ্যে নয়; ওঁড়ো সোনা ও হীরে ছুঁ পাওয়া গেল এখানকার নদীর গর্ভ থেকে।

কিন্তু ছোটো জিনিসই এমন নগণ্য পরিমাণ যে তা মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। তবে একটা জিনিস সবক্কে আমরা প্রায় নিশ্চিত হইলাম যে, প্রধানতঃ এই নদীই নিশ্চয় কোন ভূগর্ভস্থ পথ থেকে এই স্বর্ণরেণু ও চূর্ণহীরক বহন করে আনছে শ্রোতের সাহায্যে।

আমাদের পক্ষে এই সুইবো নদী থেকে এর আগে যে সব শাখা-নদী পড়েছে, সেই সব জায়গার জল ও মাটি আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু তা থেকে ঠিক এতখানি নিশ্চিত হতে পারিনি এবং এত জল জায়গার মধ্যে অপেক্ষাকৃত এত বেশী হীরককণাও পাইনি।

এই নদীপথে পথভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা পদে পদে থাকলেও, এবার আমি খানিকটা নিশ্চিত হইলাম এই ভেবে যে, আমরা ঠিক পথেই চলেছি।

এঁয়াক-ব্যাক ছুরি-ছাঁক-এর মত সুইবো থেকে শাখানদী আর খাল-বিল কোথা দিয়ে যে কে বেরিয়েছে এবং কোথায় গিয়ে পড়েছে, তার ঠিক ঠিক হৃদিশ পাওয়া এখানে মোটেই সম্ভব নয়। তাছাড়া স্বচ্ছ-আপটার ও বানের জলে এখানকার নদ-নদীর স্বাভাবিক রূপ প্রায়ই বদলে যায়। চওড়া নদীর পাড় ধসে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, শীর্ণা নদী হয়ে যায় প্রশস্ত।

কিন্তু তবুও মনে সেই একই চিন্তা—কবে গিয়ে পৌঁছব, কবে সেই মণি-মুক্তা-রত্নরাজীর ভাগ্যেরে ঘাব উদ্ভুক্ত হবে, কবে আবিষ্কৃত হবে সেই রহস্যবৃত্ত হীরকের উৎস!

নদীর এই পথ ধরেই চলব এখন আমরা। ক্রমশঃই উঁচু থেকে এখন আরও উঁচুতে উঠতে হবে আমাদের। সন্দের বুনো মাঝি-মাল্লারা সোনার খোঁজ পেয়ে আফ্রাদে আটখামা। হীরের চেয়ে এই স্বর্ণরেণুর প্রতি ওদের টান বেশী। সাধারণ পাথরের মত ঔজ্জ্বলাহীন হীরের টুকরোর চেয়ে সোনার মূল্য দেয় এরা অনেক বেশী। শুধু এরা কেন, আমার স্ত্রী এলিসও নদীর কাঁদাবালির মধ্যে সোনার সন্ধান পেয়ে বেশ খানিকটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

সোনার সন্ধান উৎফুল্ল হলে কি হবে, সেদিন এলিস এখানে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। সর্ব্বত্রই তার স্নানের জল আলাদা জলের ব্যবস্থা থাকত বাধক্রমের মধ্যে। এখানকার নদীর জলে নানাভাবে নানাপ্রকার কিছুতকিমাকার মাহ ও জলজন্তদের ভয়ে জলে নেবে স্নান করার কোনই উপায় ছিল না।

সেদিন তাঁবুর মধ্যে তার 'বাধ টাবে' জল উত্তীর্ণ করে রেখে, বুনো পরিচারকরা যখন সকলেই প্রায় নদীর তীরে বালি ধুয়ে স্বর্ণরেণু অনুসন্ধানের ব্যস্ত, তখন এলিস তার স্নানের ঘরে ঢুকেই বিকট চীৎকার করে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এলো। আরম্ভিকয়েক মুহূর্ত কাটলেই হয়েছিল আর কি। সেদিন সেখানে নিশ্চিত যে তার জীবনান্ত ঘটত, তাতে আর সন্দেহ ছিল না।

এলিসের চীৎকারে সকলেরই দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হ'ল। আমি বজ্রবার উপরে একটি আরাহ-কেন্দ্রার বসে বই পড়ছিলাম, হঠাৎ এলিসের গলায় বিকট আওয়াজ শুনে লাফিয়ে তার কাছে এসে হাজির হইলাম। এলিসের মুখ বিবর্ণ; সে ঠকঠক করে কাঁপছে বললেই হয়।

ভীত ও ভ্রম এলিসকে জড়িয়ে ধরে কি হয়েছে, প্রশ্ন করতেই সে মুখে কোন কথা না বলে আঁত ল দিয়ে তার স্নানের ঘরের দিকে

দেখিয়ে দিলে। সেদিকে একই এগিয়েই আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলুম—সমস্ত গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। কী ভয়াবহ দৃশ্য! স্নানের ঘর থেকে ডাবডেবে দুই চোখ বার করে এক বৃহদাকার সর্পীকৃপ বেরিয়ে আসছে এঁকে-বঁকে।

এলিসের নিজস্ব দেহরক্ষী হ'লন ও নৌকার অস্ত্রাস্ত্র লোকেরাও তখন এসে পড়েছে ঘটনাস্থলে। কিন্তু সেদিকে কেউই বিশেষ এগুতে চাইছে না। বন-জঙ্গলের কোন জীবন্ত জন্তকেই এরা ভয় করে না, বতো করে এই 'বৃশ মাষ্টারকে'। এমন হিংস্র, ক্রূর, নিঃশঙ্কচরী বিবাস্ত্র জীব বনে আর নেই বললেই হয়।

'বৃশ মাষ্টার' এই জায়গার একরকম বিরাটকার বিবাস্ত্র সাপ। লম্বায় এরা প্রায় আট-দশ ফুট এবং শরীরে বেশ ভারী। সবচেয়ে বীভৎস এদের মুখের চেহারা আর গায়ের রঙ। এরা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন। বস্ত্র লোকেরাও এদের দেখে চমকে ওঠে, মনের বল হারিয়ে ফেলে। পৃথিবী-বিখ্যাত সর্প-বিদ্যায়দ ও অত্যন্ত সাহসী পুরুষ ডাঃ ভিটমারও এদের জীবন্ত ধরতে বহু দিন বহু পরিশ্রম করেছিলেন এবং এদের চরিত্র সবক্কে বহু বিচিত্র কথা লিখে গিয়েছেন।

সমস্ত সর্পকুলের তুলনায় এদের চরিত্রও যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি গতিবিধিও বিচিত্র। একবার মাসুকের গন্ধ পেলে, হুঁ-চার ক্রোশ দূর থেকেও এরা তার সন্ধান বেরিয়ে পড়বে এবং অদ্ভুত ভাবে সেইখানে উপস্থিত হয়ে, কাক-না-কাক জীবনান্ত ঘটিয়ে তবে ছাড়বে।

ওদেশের বস্ত্র অধিবাসীদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠী আছে, তারা এই সাপকে দেবতার অংশ বলে বিশ্বাস করে। তা ছাড়া তারা একথাও বিশ্বাস করে যে, এদের দেখলেই মাকি কিছুকালের মধ্যে মাসুকের মারা যায়। সত্যিই এরা যেম সাক্ষ্য বস। কিন্তু এখন এই বনের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্তে যেমন করেই হোক উপায় আমাদের বার করতেই হবে।

লোকজনদের মধ্যে এলিসের প্রধান দেহরক্ষী শাখাকে আমি কাছে ডেকে বললুম, যেমন করে হোক, যে কোন উপায়ে হোক, এখন তড়িৎঘড়ি জন্তটাকে শেষ করে ফেলা চাই। শাখা সাহসী ও বলশালী, কিন্তু হলে কি হবে, সেও প্রাচীন জাতীয় সংস্কারের বশীভূত। পাছে ওকে মারলে তার কোন বিপদ ঘটে, সেই ভয়ে বৃশ মাষ্টারকে মারতে সে মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করল না। এ অবস্থায় তার মুখ চেয়ে আর দেরি করা উচিত হবে না ভেবে, আমি সবাইকে ডেকে বললুম, তোমরা ওকে মারতে না চাও তো জায়গাটা এমন ভাবে ঘিরে ফেল, বাতে ও পালাতে না পারে। শাখা আমার এই আদেশে সায় দিল এবং সে-ই সবাইকে বুঝিয়ে দিল যে, সাহেব নিজেই ওকে মারবে, অতএব 'বৃশ মাষ্টারকে' হত্যা করার দায়িত্ব তাদের কিছুই নিতে হবে না।

অল্পকণের মধ্যেই তাঁবুর বাইরে তার দেহের খানিকটা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম। একটা, দুটো, তিনটে করে উপরূপরি কয়েকটা। প্রথম গুলিতেই তার মাথাটা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তখনও, তবুও, তার ভেজ-বিক্রম লক্ষ্য করার মত। গুলি খেয়ে, আহত অবস্থাতেই সে ভেঙে আমাদের আক্রমণ করার জন্তে এগিয়ে এলো। কিন্তু তার পায়ের গুলিতেই বাহ্যিকের উখানশক্তি একেবারে রহিত হয়ে

গেল। পেয়ে একটা লোক সেটাকে বল্লমের মুখে পেঁখে এলিসের সামনে তুলে ধরল।

এ ব্যাপারে এলিস একবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। খানিকটা হতভম্ব হবার ব্যাপারও বটে। কিন্তু এক হিসেবে ঘটনাটা ভালও লগেছে তার। এই মরতে-মরতে বেঁচে যাওয়া, যমের মুখ থেকে কিয়ে আসা—একি কম উত্তেজনার।

এলিসের হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে আমি বললুম, 'বাছা, অত দাবড়ালে চলবে কেন!—জঙ্গলে এটা এমন কিছু একটা ব্যাপার নয়, বার জন্তে মুখ-হাঁড়ি করে থাকতে হবে।'

মুখে জোর ক'রে একটু হাসি এনে সে বললে, 'মুখ আবার হাঁড়ি দেখলে কোথায়?'

'বেশ একটু ভয় পেয়েছ যেন মনে হচ্ছে?'

'বয়ে গেছে ভয় পেতে—আমি এমন সহজে ভয় পাবার মেয়ে নয়।'

এই ধরণের কথা বার-বারই এলিস বলে থাকে এবং আমিও বার-বারই ওটা শুনতে চাই ওর মুখ থেকে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, ভয়কে ভয় করে বসে থাকলে সে আরও পেয়ে বসে, তাই তাকে বার-বারই অস্বীকার করতে হয়, ভয়ের মুখেই সাহস দেখিয়ে হয় ঝাঁপিয়ে পড়তে তবেই ভয়কে জয় করা যায়, ভয়ের হয় সমাধি।

বাই হোক, সকালের দিকে এমনি একটা কাণ্ড ঘটে গেলেও, আমি ভেবেছিলুম, বাকী দিনটা নিশ্চিন্তে ভালই কাটবে। কিন্তু তাতে বিধি বান সাধলেন এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটল আর এক বিপদ। এলিস অবশ্য আমাদের সেই কথার পর নিজেকে বেশ খানিকটা সামলে নিয়ে, উৎসাহের সঙ্গে আবার লোকজনদের সঙ্গে নদীর জলে ও বালুবেলার হীরক ও স্বর্ণের সন্ধানে মন দিয়েছিলেন।

এখানকার নদী সঙ্কীর্ণ ও তাতে জল খুব বেশী না থাকার মাসাত্মক রকমের কিছু ভয় আমাদের ছিল না। কিন্তু কয়েক দিন ধরে নিকটবর্তী পাহাড়ের উপর ও জঙ্গলে যে বর্ষা নেমেছিল, তার ফল ভীষণ রূপ নিয়ে অকস্মৎ আমাদের উপর এসে পড়ল। এর জন্তে আগে থেকেই যে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা আমাদের উচিত ছিল, তা আমরা মোটেই করিনি। তা ছাড়া আমরা কল্পনাও করতে পারিনি যে, দু'বে পাহাড়-জঙ্গলে যে বৃষ্টি হচ্ছে ক'দিন ধরে তার ফল এমন সাম্প্রতিক হতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, বহু-নদীতে বস্তার মত মাসাত্মক আর কিছু নেই! জঙ্গলের মধ্যে সামান্য একটু বড়-জলেই আতঙ্ক সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু এক এক সময় এই জল এমন ভয়াবহভাবে বিধাসঘাতকতা করে যে, প্রাণ রক্ষা করাই তখন প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটে, তাই একটু বিশদ ভাবে এখন বলি যারা, রাজিবেলা কোন পার্কিত্য জঙ্গলের মধ্যে তুমি ক্যাম্প ফেলে আছ, টিম টিম ক'রে একটা আলো অন্ধকারের বিকল্পে বিদ্যোহি বোধনা ক'রে তোমার তাঁবুর মধ্যে জ্বলছে। এমন সময় মেঘের 'হুড়ুম-হুড়ুম' আরম্ভ হ'ল—বৃষ্টি নামল। তোমার কানে বৃষ্টির আওয়াজ আসছে, কিন্তু তোমার তাঁবুতে এক কোঁটাও জল পড়ছে না। জল হচ্ছে উপরের পাহাড়ে আর তুমি আছ অনেক নীচে। এই বৃষ্টিধারা যেন বনানীর মধ্যে আটকা খেতে খেতে ক্রমশ: নীচে নামে এবং তোমার তাঁবুতে এসে পড়তে বেশ খানিকটা সময়

লাগে। কিন্তু বখন তাঁবুর ওপর আচমকা এসে পড়ে, তখন হয়ত বৃষ্টির শব্দ বা বড়-বাতাসের কোন চিহ্নবাঁপই নেই। এক-এক সময় পাহাড়ের উপরের এই জলধারা নীচের দিকে এসে প্রবল প্রতাপ ধারণ করে, যা কিছু সামনে পায় কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা থাকে না। পার্কিত্য অঞ্চলে নদীতে বস্তার ক্ষেত্রেও ঘটনাটা ঘটে এই ভাবে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই নদীতে বজা আসে না; পাহাড়ের উচ্চাংশের জলধারা নানা বাধা-বিঘ্নের ভেতর দিয়ে নদীতে নামতে সময় লাগে এবং বতাই নীচের দিকে নামে, সেই জলধারার গতিবেগ ততই বার বেড়ে। জল নামার ছোট ছোট বোরাগুলি বড় হয়ে বার এবং সেগুলি একত্রিত হয়ে ভীষণ আকার ধারণ ক'রে সমতলের নদ-নদী, খাল-বিল বন-জঙ্গল প্রাবিত করে দেয় সেই জলের তোড়। সময়-সময় এইসব জায়গায় এমন আচমকা এই সব ঘটনা ঘটে যে, জীবজন্তু বা জংলী মানুষেরা নিজেদের সামলাবার কোন অবকাশই পায় না।

ক'দিনের বিজী আবহাওয়ার যদিও আমি মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিলুম, কিন্তু ব্যাপারটা যে এত তাড়াতাড়ি এমন ভাবে ঘটে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, তা ভাবতে পারিনি।

সঙ্গের জংলীরা কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকই আন্দাজ করেছিল। কিন্তু একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগেই বস্তার ভীষণ তোড় হঠাৎ আমাদের উপর এসে পড়ল। সশঙ্ক গর্জন করতে করতে, নদীর পাড় উপরে ফুলে ফুলে বিক্ষুব্ধ জলপ্রপাত গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় ও জীবজন্তু সব ভাসিয়ে নিয়ে চারিদিক প্রাবিত করে ফেলল কিছুক্ষণের মধ্যে।

নৌকাগুলিকে তীব্র বেঁধে রাখা সম্ভব নয় দেখে, আমরা তাড়াতাড়ি যেগুলি গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল, তাদের দড়ি কেটে দিলুম, আর যেগুলির নজর কেঁলা ছিল, সেগুলির নজর তুলে নিলুম। সামান্য কিছু জিনিসপত্র ও দুটো তাঁবু আর নেওয়ার সময় হ'ল না।

তাঁবুর জন্তে দুঃখে নেই, এখন কোন রকমে সবাই প্রাণে বাঁচলেই বখেঁট। একেত্রে নৌকাগুলি ওলটাবার ভয়ই সবচেয়ে বেশী। ক্রমশ: এমন অবস্থা হ'ল যে আর বৃষ্টি থকা পাওয়া সম্ভব নয়। তালগোল খেতে-খেতে আমরা চলছি, নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে বিপদে। নাগরদোলার মত আমাদের বজরা ও বড় নৌকাগুলিও হুলছে আর ঘুরছে; টেউয়ের তোড়ে ওপর-নীচেও করছে মুতমুহঃ। জংলী পাড়ি-মাঝিরা কিছুতেই তাদের বাগে আনতে পারছে না। আর পারবেই বা কি করে! এই শ্রোতের মুখে কোন কার্যদাই কলত্র হওয়া সম্ভব নয়।

লোকজনরা ভয়ানক ঝাঁটমাটু আরম্ভ করে দিয়েছে দেখে, আমি ধমক দিয়ে উঠলুম। এদিকে এলিসও কুকড়ে-কুকড়ে বেন এতটুকু হয়ে গেছে, আর নৌকার ঝাঁকুনি ও বোরপ্যাচে ওয়াক্-ওয়াক্ করছে। অনবরত বমি আগছে তার। এই বিপদের মধ্যে এক-এক কম বিপদ নয়! এই সময় একবার আবার মনে হ'ল, ওকে সঙ্গে না আনলেই ভাল হ'ত। বাইরে বা ঘটে ঘটুক ভেবে আমি বজরার হাউনির মধ্যে হুক তাকে ধরে বললুম ও একটা এ্যাক্টি-নসিরা পিল বাইরে দিলুম।

কিন্তু আমরা এখন ঠিক কোন পথে চলছি, তা আমাদের

বোঝবার কিছুই উপায় ছিল না। আর বুঝলেও এই বিক্ষুব্ধ শ্রোতে পা-ভাসিয়ে দেওয়া চড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রকৃতির এই ভয়াবহ লীলার কাছে মানুষকে পরাভব স্বীকার করতেই হয়।

এইভাবে কিছুকণ চলতে-চলতে আমরা যেন একটা জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছি বলে মনে হতে লাগল। জঙ্গল ফুলে উঠে নদীর পাড় ও জঙ্গলকে একাকার করে ফেলেছে। বড় বড় কয়েকটা গাছপালা বাঁচিয়ে সন্ধ্যার আগেই আমাদের জলযানগুলি এসে ঘোঁর মত একটা জায়গায় আটকে গেল। আলো থাকতে থাকতে আমরা একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছব বা সুবিধামত মজবুত কোন একটা গাছের সঙ্গে নৌকাগুলি বেঁধে ফেলব, মনে মনে এই বাবুস্বাই করছিলাম। এমন সময় ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতই এই জঙ্গলে ঘোঁর চড়ায় আপনা থেকেই আটকে গেলুম আমরা।

[ক্রমশঃ।

হারিয়ে যাওয়া তারা

শ্রীমূলতা কর

একমনে আমি কবিতার শেষ পাদপূরণে ব্যস্ত আছি,

এমন সময় পুরানো ভৃত্য আমার ডাকল। কর্তা, হু'জন দেবদূত এসেছেন। দরজায় দাঁড়িয়ে আপনাকে ডাকছেন।

কবিতার মিলে বাধা পড়ল। বিরক্ত হয়ে বললাম—তুই কি নেশা করেছিস? দেবদূতেরা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, এই কথা বোঝাতে চাইছিস?

আপনি নিজেই দেখুন না কর্তা, সত্য বলছি কি মিথ্যা বলছি? এই বলে পুরানো ভৃত্য আমার ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

আমি চেয়ে দেখলাম, অপূর্ণ সন্ধ্যার দুটি যুবক দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেখেই বললাম, এঁরা দেবদূত না হয়ে যান না। আমি তাঁদের সাগরে আমার ঘরে এসে বসতে বললাম।

অতিথিরা ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের পিঠের উপর বিশাল হু'খানি করে পাখা রয়েছে। সেই পাখা ভেদ করে স্নিগ্ধ উষার মৃদু রশ্মি ও রামধনুর সাতরঙ্গা রং আমার ঘরকে রঙীন করে তুলল।

আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের এখানে আসবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

প্রথম দেবদূত বললেন—নিশ্চয়ই। আমাদের কথা আমরা সংক্ষেপেই বলব। যে ঘটনার কথা বলছি তা বোল বছর আগেকার। একদিন আমরা হু'জন দেবদূত আধুনিক মাসের এক শুক রাতে মেঘমুক্ত আকাশের বিস্তৃত ভ্রামল আভরণে বসে কয়েকটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে লোকালুকি করে খেলছিলাম।

আমি—মহাশয়, আকাশের আভরণ কি ভ্রামল?

প্রথম দেবদূত—যেখানে গভীর সেখানেই আকাশের নীলিমা। কিন্তু স্থানে স্থানে বিশেষ ভাবে শান্ত গ্রামগুলির উপরে, কিংবা ভারতবর্ষের বড় বড় নগরগুলির অনেক উপরে, নয়নলোভন ভ্রামলিমাই আকাশকে রূপ দেয়।

প্রথম দেবদূত বলে চললেন হ্যাঁ, আমরা একমনে খেলছিলাম। অতি স্নন্দর কয়েকটি তারা ছিল আমাদের খেলার হু'টি।

আমরা খেলাতে মগ্ন হয়ে গিয়েছি। আমি প্রায় অবলাভ করে

আসছি, সেই সময় হঠাৎ আমার হাত থেকে কসকে হু'টি অতি স্নন্দর তারা পৃথিবীর বুকে ছিটকে পড়ল। এ ঘটনাটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠল।

আপনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে দুটি তারা যদি আকাশ থেকে ধসে যায় তবে আকাশের ক্ষতি কম হয় না। দেবরাজ সেই মুহূর্তে আমাদের দণ্ড দিলেন—যে পর্যন্ত আমরা সেই স্থানচ্যুত তারা ছিটকে পুনরুদ্ধার করে আকাশে এনে না রাখতে পারি, সে পর্যন্ত আমাদের স্বর্গস্থলে অধিকার নেই। কাজেই আমাদের হু'জন দেবদূতকে স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে এসে থাকতে হল। পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হল।

আমরা হু'জন দেবদূত মিলে দীর্ঘ বোল বছর ধরে সেই হারান তারা হু'টি খুঁজে বেড়াচ্ছি। পৃথিবীর প্রতি স্থান আমরা কি ধৈর্যের সঙ্গেই না তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেছি। আমাদের ধারণা, তারা হু'টি পৃথিবীতেই আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের খোঁজা সাধক হল না। কোথাও সন্ধান পেলাম না। অপর্যায় যখন চির-নির্কাসন-দণ্ড নিতেই আমরা উজ্জত হয়েছি—ঠিক সেই সময় শুনলাম যে—এই পৃথিবীতে একটি তরুণী আছে, যার চোখের অপরূপ সৌন্দর্যের তুলনা নেই। আমরা জেনেছি এই তরুণী আপনার প্রিয়তমা। আর আমাদের হারান তারা হু'টি ওই তরুণীর চোখের তারা হয়ে আটকে রয়েছে। এখন—দেবদূত বিনীত স্বরে বললেন—এখন ওই হু'টি হারান তারা কিরিয়ে দিয়ে তিনি কি আমাদের হু'ভাগা মোচন করবেন না?

আমি খুব চঞ্চল হলাম। আমার একান্ত প্রিয়তমার মনোরম চোখ দুটির জ্যোতি কেউ কেড়ে নেবে, এ চিন্তা দুঃসহ। কিন্তু বিবেকের অনুরোধে দেবদূতদের চির-নির্কাসন-দণ্ডের কথাও আমার ভাবতে হল।

অবশেষে কিছুই ঠিক করতে না পেরে আমি আমার স্ত্রীকে ডাকলাম ও সকল ঘটনা খুলে বললাম। সব কথা শুনে সে বিস্মিত হল না, চঞ্চল হল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল। তারপর দেবদূতদের সামনে এগিয়ে এসে কোমল হু'টি চোখের পল্লব বিস্তৃত করে ধরে মৃদু স্বরে বলল—হে স্বর্গের অতিথিরা, দেখ, আমার চোখের মধ্যে কি হারিয়ে যাওয়া তারার সন্ধান পাওয়া যায়?

দেবদূতেরা স্রুত পায় তরুণীর সামনে এগিয়ে এলেন। উৎসুক হয়ে বার বার তরুণীর স্বচ্ছ চোখের তারা দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁরা যেন বিশ্বয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা একটু দূরে সরে গেলেন। কিছুকণ অস্পষ্টভাবে হু'জনের মধ্যে কি যেন আলোচনা হল। যেন হু'জন বিচারপতি বিচারকল বলবার আগে মতামত বিনিময়ে ব্যস্ত।

পরে প্রথম দেবদূত নিরাশ হয়ে আমাকে বললেন—না মহাশয়, আমরা হতাশ হয়েছি। বোল বছর আগে যে হু'টি তারা হারিয়ে গেছে সেই হারান হু'টি তারার সন্ধান পেলাম না। যদিও আমাদের সেই তারা হু'টি আধুনিক মাসের শুক রাতে অত্যাঙ্গল হয়েছিল কিন্তু তবু আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই তরুণীর চোখের স্নিগ্ধ মধুর জ্যোতির তুলনায়, আমাদের সেই হু'টি হারিয়ে যাওয়া তারার জ্যোতি স্নান ও নিম্নত।

দেবদূতেরা রাস্তা খাঁড় করে, রাস্তা বুখে আমার ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

তাদের দুঃখে আমার মনে সমবেদনা জেগেছিল সত্য কিন্তু আমি একথা ভেবেও সুখী হলাম যে, তাঁরা আমার প্রিয়তমার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিতে পারেননি।

আর আমার প্রিয়তমা? দেবদূতেরা চলে যেতেই সেমিটি সুরে হেসে উঠল। বলল—দেবদূতদের আজ খুব ঠকিয়েছি।

বিস্মিত হয়ে বললাম—সে কি?

সে ধীরে ধীরে বলল—তোমাকে সত্য ঘটনা বলব। দেবদূতদের কাহিনী সত্য। আকাশের সেই হারান তারা দুটিই আমার চোখের তারার পরিণত হয়েছে। আমি মাংসের মুখে বহু বার শুনেছি যে আমার জন্মসূত্রে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। আমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাত্রই আকাশ থেকে দুটি উজ্জ্বল তারা খসে পড়ল।

যে ঘরে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি, সেই ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে সেই খসে-পড়া তারা দুটি ছুটে এল। এসেই নবজাত শিশু আমার দুটি চোখের তারার ভিতর ঢুকে পড়ল। ঢুকে পড়ে সেখানেই আটকে রইল।

সারা জীবন, সেই খসে-পড়া তারা দুটি আমার চোখের তারার মিশে রইল। আমার চোখকে এত মার্ধ্য্য দিল যে পৃথিবীতে আমিই হলাম একমাত্র তরুণী, যার চোখের অপরূপ সৌন্দর্যের ফুলনা নেই।

যখন তুমি দেবদূতদের উপস্থিতি ও তাঁদের বক্তব্য আমাকে বললে, তখন আমি কেমন করে দেবদূতদের প্রবন্ধনা করে খসে-পড়া তারা দুটিকে আমার চোখের ভিতরেই আটকে রাখব ভেবে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। তা যদি না পারি তবে আমার অপরূপ চোখের জ্যোতি চিরকালের মত নিবে যাবে, চিরজীবন অন্ধ হয়ে থাকব, এই কথা ভেবেও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটি সুন্দর কৌশল আমার মাথায় এল। আমার সব চিন্তা দূর হয়ে গেল।

আমি দেবদূতদের সামনে এলাম। প্রশান্ত মনে তাঁদের আমার চোখ পরীক্ষা করতে বললাম। যখন তাঁরা একমনে আমার চোখের তারা পরীক্ষা করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি আমার উদ্ভাবিত কৌশলটি কাজে লাগলাম। এবং তাইই জন্ম দেবদূতেরা প্রবন্ধিত হলেন। তাঁরা বলতে বাধ্য হলেন যে, স্বর্গের সকল তারার জ্যোতিই আমার চোখের জ্যোতির তুলনায় ম্লান।

তুমি নিশ্চয়ই ভাববে—কি সে কৌশল? সেটা আর কিছুই নয়, শুধু প্রথম প্রেমের স্মৃতি। যখন দেবদূতেরা আমার চোখের তারা দেখতে ব্যস্ত, তখন আমি স্মরণ করলাম একটি মুহূর্তের কথা। সেই মুহূর্ত, যখন প্রিয়তম তুমি আমার চোখের উপর প্রথম প্রেমের চুমু এঁকে দিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তটি মনে পড়তেই বিগত দিনের প্রথম প্রেমের পুলক স্পর্শ আমি অনুভব করলাম। আমার চোখের জ্যোতিতে সেই পুলক আবির্ভূত হল—সেই প্রথম প্রেমের প্রথম চুমু।

এখন তুমি বুঝলে, কেন সেই মুহূর্তে আমার চোখের জ্যোতি এত স্নিগ্ধ, এত মনোহর হয়েছিল? যাকে স্বর্গের সকল তারার জ্যোতিই ম্লান হয়ে গেল।

ইংরেজ আমলে নদীয়া

সুনন্দাকুমারী

লর্ড রাইড তখন বাংলার গভর্নর। বাংলার ভাগ্যাকাশে অনাবৃষ্টি আর অনাসৃষ্টির মসী-মেঘে বেজে উঠেছে আসন্ন হুর্যোগের দুন্দুভ। দিকে দিকে শোনা যায় হুর্ভিক্ষের পঙ্খনি। ভূখা-মানব মিহিরের কেউ কেউ অকালে, অস্থানে প্রাণ হারায়।

অবশেষে টনক নড়ে কর্তৃপক্ষের। 'এ ভাবে শাসন চালালে, অন্ততঃ বাংলার বোধ করি খুব ২২শী সুবিধে করা যাবে না।' তাই, অন্তঃপর দেশকে তারা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করতে শুরু করলো। ১৭৮০ সাল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একখানি অভিলিখিত ব্যবস্থাপত্র দ্বারা শিবচন্দ্রকে স্বীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। শিবচন্দ্র ১৭৮২ থেকে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নদীয়ার নির্বিবাদে রাজত্ব করেন। শিবচন্দ্র পিতৃ-আসনে উপবেশন করলে, তাঁর স্বীরাধিকারে তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'বোর্ড অফ রেভিনিউ'র সভাপতি মিঃ জন শোবের প্রস্তাব ক্রমে তদানীন্তন বাংলার ছত্রিশটি রাজত্ব আদায়ের প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে মাত্র চব্বিশটি জেলার সৃষ্টি হয়। ভাগীরথীর সন্নিকটবর্তী অধিকাংশ স্থানগুলোয় জেলা—কৃষ্ণনগরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রস্তাবানুসারে—মিঃ রেড কিয়ার্ন কৃষ্ণনগরের প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন। এই সময়েই নদীয়া রাজ্য নদীয়া বলে পরিগণিত হয়। কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ সড়ক বা গোয়াড়ীতে একটি ফৌজদারী ও একটি দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়। কালেক্টরগণ দেওয়ানী মামলার বিচার আর পূর্কোক্ত প্রধাঙ্কধারী কাজী ও মুকতিগণের উপরই ফৌজদারী মামলার বিচারকার্যাদির দায়িত্ব বলবৎ থেকে যায়। রাজা শিবচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়া রাজ্যের অধিকারী হ'ন। এই সময় লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজত্ব আদায়ের সুবিধার্থে প্রথমে দশশালা পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন। নদীয়ারাজ বিষয়-সংক্রান্ত কার্যাদিতে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। তত্পরি ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের বক্তায় শস্তাদির অপরিমিত ক্ষতি হওয়ার ঈশ্বরচন্দ্র যথাসময়ে স্বীয় রাজ্যের রাজত্ব দিতে অসমর্থ হ'ন। ফলে, ঈশ্বরচন্দ্রের রাজত্বকালে তাঁর রাজ্যের সীমা ক্রমশঃই হ্রাস পেতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্রের পরলোকগমনের পর নদীয়া রাজ্যের সীমা অত্যধিক হ্রাস পেয়ে নামেমাত্র পর্যাবসিত হয়। কথিত আছে, এই সময়েই সমগ্র নদীয়ার দস্যু-তন্ত্রের উপক্রমে নদীয়াবাসী তটস্থ হ'য়ে ওঠে। দেশমধ্যে শান্তিশূন্যতার কোনও ব্যবস্থা এই চরমকালটিতে একরকম ছিল না বললেই হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া বিভাগকে ষোল্লটা জেলায় এবং আঠারোটি বিভাগে ভাগ করা হয়। কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, বনগ্রাম, চূয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর নিয়ে নদীয়া জেলা গঠিত হয়—উনবিংশ শতকের প্রাঙ্কালে নীলকরদের সাথে বাংলার কুবককুলের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। এই সময়ে বাংলার গভর্নর ছিলেন সিসিল বীডন। এইই কার্যকালে প্রথমতঃ রাণাঘাট এবং পরে কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া ও কুমারখালিতে পৌরপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়।

ইংরেজ-আমলে বা ইংরেজ শাসনে শাসনের নামে শোষণ এক

বিচারের স্থলে ব্যক্তির যে কিছু কিছু দৃষ্ট পরিদৃষ্ট হয়েছে, তার নতির যেমন আমরা একটাকে আজুল উঁচিয়ে দেখাতে পারি, তেমনি তাদের দান, যেমন—রেলপথ নির্মাণ, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পৌরপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডের সৃষ্টি প্রভৃতি জনহিতকর মহৎ কর্মগুলিকেই বা আমরা বিস্মৃত হইব কেন? ইংরেজ-আমলের গোড়ার দিকে নদীয়ার হৃত্তিক এসেছে, দন্দ্য-তত্ত্বের অস্ত্যাগারের সুর-ব্যবস্থা করনি। একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও একান্ত সত্য যে, পরবর্তীকালে এই ইংরেজ শাসকেরাই হতশ্রী নদীয়ার সুশ্রু-সৌন্দর্যকে পুনঃ বিকশিত করবার এক বিশেষ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়। তার প্রমাণ কফনগর, চাঁদমাগী (অধুনা কমালী) ইত্যাদি স্থানে অজ্ঞাপিও বিজয়।

অনেক দূরের পথ

(হাল আগেরসেনের জীবনী অবলম্বনে উপভাস)

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কথামুখ

এমন কি, আজ পর্যন্ত ডেনমার্ক যেন এক রূপতথ্যর দেশ।

ইতস্ততঃ ছড়ানো অসংখ্য দ্বীপ, আর সমুদ্রের উপকূল-নীল কোমরবন্ধ। বহু প্রান্তর, বুনো জলাভূমি, আর হানসার গান। কত যে কেল্লা আর পাথর-সিঁড়ানো উঁচুনিচ বাস্তা। অনেক দিনের পুরোনো বাড়ি-ঘরাদির ভিত্তি। সব মিলিয়ে ডেনমার্ক। নিচু খাঁড়ওয়াল খামারবাড়ির সামনে ঊঠান, আর বাড়ির ভিতরে উৎসব-সজ্জার সাজানো বড়ো চলবর গল্লের প্রাসাদের মতো ঘন। তাদের প্রতিবিম্ব কাঁপে হ্রদ আর ঝিলের দলে খিরখিরিয়ে, যেখানে রাজহংসেরা শাদা জিলির শরীর ছুঁয়ে ভসে বেড়ায়। টর্কপাথির বাসা, সোনালি কেশজু মাথার হলেমেঘেরা, ঘোড়ার চ'ড়ে বাজা চলেছেন প্রজাদের মধ্য দিয়ে, ইতকালের বর্ণিছড়ানো তুবাকড, গ্রীষ্মের উষ্ণ দীর্ঘ রাত্রি, অথচ, ব-কোনো ভালো রূপকথার মতোই, ডেনমার্কও ব্যবহারিক জিনিস নয় মাথা খামার। খাবারদাবারের অভাব থাকতে দেয় না দেশে। আর রাজধানী কোপেনহাগেন একদিকে যেমন ফুল-কারারা-আলোর শহর, তেমনি আবার তাকে বাইসিকলের দেশ লতেও কোনো বাধা নেই।

দিনেমাররা যে কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে ভাল করেনা কখনো, আর অবহেলা করেনা ব্যবহারিকতাকে, এ কথাটাই সবচেয়ে আগে উল্লেখ করবার। একদিকে যেমন অনেককালের পুরোনো কেল্লা প্রচুর আছে দেশে, তেমনি একালে তৈরি হয়েছে কত টুকুল, কত হাসপাতাল, কলকারখানা। দিনেমারদের তৈরি গাধন, বেকন আর বিহারের কথা বলতে বাওয়া তো বাহুল্য মাত্র। হাইল্ড বেল সভ্যতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'মধুব এক বিচারশক্তি দার মূল্যায়নের ক্ষমতা,' তা যদি যেনে নিই, তাহলে এই ছোটো দেশটিকে পৃথিবীতে সবচেয়ে সভা বলবার কোনো বাধা থাকে না।

এর স্বপক্ষে অনেক অভিজ্ঞান দিতে পারে দিনেমাররা। সৌজন্য, সৃষ্টির প্রসার, আর নিঃস্বার্থের তেজস্বী রূপ এই দেশে

সমবার কুবিকেল সার্থক হয়েছে। রাজাবারার কোপেনহাগেনের তো বিখ্যাতো খ্যাতি। অথচ তাদের দৈনন্দিন জীবন এত সহজ সরল যে অত্র সব দেশকে তার তুলনার মনে হয় বোরপ্যাচওয়ালি জটিল এক পোলকর্থা। বিদেশী কেউ ডেনমার্ক গেলে বই আর ফুলের দোকানের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হবে। রাজ্যের পুলিশম্যান তো বলতে গেলে থাকেই না। রাজ্যগামী অনাহাসেই রাজ্য দিয়ে নিরুদ্বেগে চলতে পারেন। চিড়িয়াখানার জীবকে লোকে যেমন ভাবে দেখে তেমনি ভাবে তো দুয়ের কথা কেউ তাঁদের দিকে তাকাতে পর্যন্ত না। আর সবচেয়ে আগেই এ কথা আমার বলা উচিত ছিলো—দিনেমাররা খেলাধুলো করতে জানে, যে গুণটি আজ পৃথিবী থেকে একেবারে অদৃষ্ট হ'তে চলেছে। কোপেনহাগেনের প্রমোদ-উঠান টিভোলি লোকজনের কলহান্তেই মুগ্ধ থাকে,—বহুর নাগরদোলা সেখানে আনন্দ সৃষ্টির ব্যর্থপ্রয়াসে কাঁচকাঁচ করে না।

অতীত ইতিহাসের কথা যদি ওঠে তো ডেনমার্ক গর্ব করতে পারে অনাহাসে। ভাইকিং হ'লো দিনেমারদের উৎসব। অবশ্যগতের এলনিনোরের—বার পাশ দিয়ে সারাদিন চলে জলপোত্তেরা—বাড়িরে আছে কোনবার্গের কেল্লা। সেই কেল্লার ভিতরে, নিচে, মাটির নিচে রয়েছে গভীর অন্ধকার এক মণিকোঠা। কেউ কখনো পলাপণ করেনা সেখানে। সেখানে ঘুমিয়ে আছেন হোলগের ডালকে, বাঁকে ডেনমার্কের সভা বলা হয়েছে ইতিহাসে। পরনে তাঁর লোটার বর্ম, দীর্ঘ বাতমুগলের উপর বুঝতে শির বিস্তৃত করে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর দীর্ঘ শরীর এসে ছুঁয়েছে মারবেল পাথরের টেবিল, তারপর যেন সেই টেবিল কুঁড়েই বেড়েছে, বাড়ছে ক্রমাগত। যুয়োছেন হোলগের, স্বপ্ন দেখছেন কী কী ঘটছে ডেনমার্ক। যদি কোনো দিন, আচমকা কালবোশেখির মতো, সত্যিকার বিপদ ঘনিয়ে আসে, বুড়ো হোলগের-এর ঘুম ভেঙে যাবে, জেগে উঠবেন তিনি, ফেটে চোঁচির হ'য়ে যাবে মারবেল পাথরের টেবিল, ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে বখন তিনি তাঁর শরীর টেনে তুলবেন মাথা কাঁকুনি দিয়ে; আর ডেনমার্কের স্বপক্ষে গ'র্জে উঠবে তাঁর গলা, ডেনমার্কের হ'য়ে তাঁর হৃদয় এই লড়াই উপাখ্যান হবে পৃথিবীতে। এখনো সেই দুঃসাহসী সভা ঐ মণিকোঠার ঘুমিয়ে আছেন; আজকাল তো আর ঘুম অতীতের অনিশ্চয়তা নেই, আজ তো ডেনমার্কের এক স্বয়ংস্বর্ণ নিরাপত্তা পরিষদ রয়েছে, তাই বুড়ো হোলগের জেগে উঠছেন না। প্রাণ্ডার সঙ্গে দীর্ঘদিনের লড়াইও তাই নিতান্ত অবহেলার; এমন কি ১১৪০-১১৪৫-এর বিকুল দিনগুলি পর্যন্ত বাঁতে টোঁট চেপে কোনোরকমে সহ করেছে ডেনমার্ক, কেমনা, চরা হুর্দিন না এলে তো আর ডেনমার্কের সেই হৃদয় সিতার কু ভাঙানো যায় না। এত অল্প বিপদে কি আর তাঁকে আলাভ করা যায়?

এই সব ছাড়াও আরেকটি জিনিস আছে; দৈনন্দিনের কর্ক প্রহরের মধ্যেও আরেকটি আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে ডেনমার্ক সে হ'লো তার স্নিগ্ধ হাসির মধ্যে। সে হাসি আবার অনেকা ছামলেটের মতো, বিষন্ন, পীড়িত, ও অপার্থিব। শোনা যায়, তামে গ্রীষ্মবাসিনীর অভিজ্ঞতা হানের নেই, যারা ডেনমার্কের 'de lyse Noetter'-কে জানেনা, তারা কেউ দিনেমারদের কোনোরকমে বুঝতে পারবে না। এই 'de lyse Noetter'-এর সঠিক উর্ভবা হ'ত

পায়েরা বলে বিখ্যাত অসুবাদক কাণ্ডরিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর মতে দিনেমার কবিরের বেন হাজি তার বিশাল-নিরঙ্কর মাথা লক্ষ্যদোষবর্ণ নিয়ে ছায়ামূর্তির মতো হানা দেয়।

'Fairy' বাক্য বলে ইংরেজিতে, বাংলার পরী—বানের নিয়ে লেখা আখ্যানকে আমরা বলি রূপকথা—শিশুদের সহবাসেই তার কথা আমাদের মনে জাগে। তার আসল মানে আজ আমরা তুলে বেতে বসেছি। পুরোনো ফরাসি শব্দ 'faerie' বা enchantment বোঝায়, বা এসেছে লাতিন 'fata' থেকে (যার মানে হ'লো things fated', কিন্তু বা স্ত্রীলিঙ্গ একবচনরূপে গ্রাহ্য), যার ইতালীয় প্রতিশব্দ হচ্ছে 'fata', স্প্যানিশ 'hada' এবং জার্মান 'fee' (এটা ফরাসি থেকে নেওয়া)—তাই থেকে 'fairy' কথাটির সৃষ্টি। বেন এই উক্ত্যে প্রমোদ একদা লোকগাথার গুহাবাসী অতিপ্রাকৃত জীব, অন্ধকারের প্রতিহারী বামন, মায়ামিনী ডাইনিদের দ্বারা জীবিত হয়েছিলো; এককোঁটা পান্নার মতো সবুজ রক্ত প্রত্যেক দিনেমারের ধমনীর চকস রক্তে আভাষা হ'য়ে গেছে; আর বেন এরই সঙ্গে সৌম্যময়োগ করার জন্য ডেনমার্কের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক হলেন রূপকথার রাজা: হান্স ক্রিষ্টিয়ান আণ্ডেরসেন।

১৮৬৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ডেনমার্কের কপিমালায় মধ্যমণি কিনের রাজধানী ওডেন্সে-র সিটি হলের উপরতলায় এক ভোজসভা চলছিলো।

ধীর সম্মানে এই আয়োজন, তাঁর বয়স অনেক, বুড়ো বলা চলে তাঁকে, আর সহজেই তিনি তাঁর দৈর্ঘ্য আর হাত-পারের আকাষের জন্ত চোখে পড়েন; কোঁকড়ানো কেশগুচ্ছ এসে পড়েছে তাঁর চওড়া কপালে, এসে ছুঁয়েছে দুই উজ্জ্বল চোখের উপরফার ঝিকানো সূত। কোনো বিখ্যাত চিত্রকর লিখেছেন: 'লোকে তাঁকে কুঞ্জী বলতেই অভ্যস্ত ছিলো আগে, কিন্তু শেষ জীবনে উন্নত ইচ্ছার বাহন তাঁর চেহারা এত সুন্দর হয়ে উঠেছিলো যে, পুরোনো অভ্যেস তুলে গিয়ে, অনেকেই তাঁকে কুঞ্জী বলতো না।' পরনে তাঁর পরিষ্কার কামো পোশাক, তাঁর শার্টের উপর বুকের কাছে সম্মানের অভিজ্ঞান: 'দি স্মাইডিশ অর্ডার অব দি রাইট অব দি পোলার টার,' 'দি হোরাইট কাকন অব হ্বাইমার,' 'দি রেড ট্রগল অব গ্রানট্যা,' এখন কি সমুদ্র পেরিয়ে মেসিকো থেকে আনা 'দি অর্ডার অব আওয়ার স্লেডি ইরাতাল্যাপি।' দিনেমারদের সর্বোচ্চ সম্মানও তিনি পেয়েছেন সম্প্রতি, টেট কাউন্সিলার হয়েছেন, আর তাঁর সামনে, টেবিলের উপর এখন প'ড়ে আছে রাজার অভিনন্দন জানানো তার।

আসের দিন কোপেনহাগেন থেকে আসার সময় বিশপও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন, সঙ্গে ক'রে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলেন; সেইদিন সকালবেলার 'ক্রীডম অব ওডেন্সে' উপাধি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁরই সম্মানে এখন গোটা শহর উৎসবের সাজে সেজেছে। সমস্ত দুঃখ-কলেজ বন্ধ, কারণ তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য ডিসেম্বরের দু-তারিখকে ঘোষণা করা হয়েছে সাল তারিখ ব'লে। আর এখন শেষ 'টোইট' সাজ হ'লো, হাত থেকে তিনি এইমাত্র নামিয়ে রেখেছেন জাম্পেন-ভরা গেলাশ; সাজ হ'লো — সাজসাজ; তাঁকে অসুবাদ করা হ'লো খোলা জানলার

এসে দাঁড়াতে। আঙে-আঙে তিনি জানলার এসে দাঁড়ালেন; একটু ক'লেন নিচের দিকে তাকাবার জন্য।

টাউন-হোয়ারের সিটি হল তার বিরাট শরীর নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার তিন দিকেই জড়াজড়ি ক'রে এ-ওর গায়ে ক'রে প'ড়ে দাঁড়িয়ে আছে বহুকালের পুরোনো বাড়িঘর। এক দিকে সেট কল্লুডের গির্জার গগন মধ্য-নীল ছুঁয়েছে। সে-রাজ্য আলোর মালার সেজেছে শহর: প্রতিটি বাড়ির জানলার ফলছে সারি-সারি মোমবাতি আর জুয়ারে চিনে লঠন; হোয়ারের মধ্য থেকে একের পর এক হাউই, আতশবাজি আর ফায়ুস উঠে বাজে আকাশে; শোভাযাত্রা ক'রে আসছে রাজকীয় সেনাবাহিনী, হাতে তাদের দিনেমার জাতীয় পতাকা আর অনেক মশাল; তারপর এলো ওডেন্সে-র ছেলেমেয়ে সারি-সারি—তারা গান গাচ্ছে 'In Denmark I was born'—যে-জাতীয় স্তোত্র তিনিই তাঁর স্বদেশের জন্য রচনা করেছেন। 'না, এ বড়ো বাড়াবাড়ি হ'য়ে বাজে—মনে-মনে ভাবলেন আণ্ডেরসেন—'এত আনন্দ আমি সহ করবো কী করে? আনন্দের চাপে বুক যে চূরমার হ'য়ে বেতে চাচ্ছে।' আলোর শিখা আকাশ ছুঁয়েছে বেন, তাদের আলোর তারাদের স্নিগ্ধনীল দ্যুতি ঢাকা প'ড়ে গেছে, আর রাতের হাওয়ার ভয় ক'রে স্পষ্ট ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের স্বচ্ছ, সুরেলা গলা—মনে হচ্ছে বেন সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়ে এসে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে।

যোগ দেয়াটা অসম্ভব ছিলো না। যদি এই ছেলেমেয়েরা হ'তো চীনে কি জাপানি, কাফ্রি কি হিন্দু, গ্রীক কি ভারতীয়, মাকিন কি রুশ, ওলন্দাজ কি ইংরেজ—যদি সারা পৃথিবীর হ'তো তারা—তবে তারা একই ভাবে তাঁকে ভ্যামতো, বুঝতো, একই রকম আত্মীয় হ'তো তাঁর। আর, শুধু কি ছেলেমেয়েরাই? বয়স্করা বুঝি নয়? রাজাবাদী থেকে শুরু ক'রে সবচেয়ে দরিদ্রজন, প্রত্যেকে—লেখক, গায়ক, শিল্পী, জ্ঞানী-গণী—প্রত্যেকেই তো প্রতিমিথি ওডেন্সে-র এই ছেলেমেয়েরা। অনেককাল আগে আণ্ডেরসেন লিখেছিলেন: 'কোনো ছোটোদেশে কবিকে গরিব হ'তেই হয়, আর তাই বুঝি খ্যাতির সোনালি পাখিকে সে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে।' নিজে সত্যি-সত্যি বিশ্বাস না-করেও সেট সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন: 'সেই সোনালি পাখিকে ধরতে হ'লে এখন বুঝি কেবল রূপকথা লেখাই আমার বাকি—সাহিত্যের আর সব বিভাগেই তো পদার্পণ ঘটেছে আগে।'

রূপকথা। ছোটোদের জন্য রূপকথা লিখে পৃথিবীর খ্যাতির আশা? এটা তো অসম্ভবই প্রায়, অবিখ্যাত। কিন্তু সত্য তো করনার চেয়েও বিশ্বয়কর, আর জীবন নিজেই তো সবচেয়ে আশ্চর্য রূপকথা, তাই এই অসম্ভবও ঘটলো, ঘটলো হাব আণ্ডেরসেনের বেলায়।

সারা পৃথিবীতে আণ্ডেরসেন আজ নিজেই বেন এক রূপকথা তাঁর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে লোকের চোখে ধূসর ধূসর ঞ্ হাতছানি ভেসে ওঠে। 'আঃ', মনে-মনে মর্মর জাগে তখন 'সেই "জলকতাদের ছোটো বোন", "আলুসিনা", "বুনো হাঁসের দল" আদ্যেবই অংশ বেন এই রূপকথাক'ল, এদের ছাড়া আমরা

সম্পূর্ণ হ'তে পারতুম না, আর তাই আমরা মনে রাখি না এগুলো লিখেছিলেন একজন পরিচরী দিনেমার লেখক।

হাল আণ্ডেরসেনের দেশেরই লোক ক্যাজ মুক্ত একদা মন্তব্য করেছিলেন, 'রচনা আছে ছ' জাতের : সাময়িক ভাবে আনন্দ দেওয়া যাদের উদ্দেশ্য, বারী অপকালীন, আর হ'লো চিরকালেরই লেখা, বারী সপ্রাণ, সংরক্ষণ ও স্পন্দনময়, বারী আজীবন সঙ্গী হ'তে পারে মানুষের।' রূপকথা সাধারণত প্রথমোক্ত পর্যায়ের লেখা ব'লেই গণ্য হয়, কিন্তু হাল আণ্ডেরসেন হলেন সেই বিয়ল লেখকদের একজন, বারী রচনা হ'লো চিরকালের অপকালীন কথা : একই কালে তারা ক্যাটাগরি ও জীবন, সর্জনীন ও চিরকালীন, স্পর্শ তাদের লবু, নরম, অথচ গভীর।

আমরা বারী দিনেমার নই, আমাদের পক্ষে এটা বোঝা খুব কঠিন। বোধ করি আজ পর্যন্ত কোনো লেখকই অনুবাদকের হাতে এতটা বিকৃত হননি। আণ্ডেরসেনের নিজের লেখার মধ্যে চিত্রলতার সঙ্গে ছিলো শক্তির আর সুরমিতার স্পর্শ, ছিলো এক ধরনের অদম্যতা, বা কখনো-কখনো এক নিষ্ঠুর এবং নির্মম যে হয়তো মোটেই ছোটোদের উপযোগী নয়। বহু ও ধারালো কৌতুকে আর বিক্রমে তারা তাঁর লেখা : সঙ্গে আছে তীব্র আবেগের স্পর্শ, বা কবিতার মতোই স্থাতিময়, তীক্ষ্ণ ও গুঢ়মর্মী। অধিকাংশ ইংরেজি ভূজ্যাতাই—বাংলা ভূজ্যাতোও—এই সুরমিত, শক্তি, শুদ্ধ কাঠিষ্ঠ ও গুঢ়মর্মের স্পর্শ বিনষ্ট হয়েছে ; বরং ধারের বদলে এসেছে উচ্ছ্বাসের ভার ; কখনো-কখনো ষণ্ডিত হয়েছে রচনা, কখনো বা বদলানো হয়েছে সমাপ্তি, কোনো-কোনো বাংলা অনুবাদে আবার শীতের দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়ে পটভূমি হয়েছে উষ্ণ জঙ্গল। বলতে গেলে তাঁর রচিত অঙ্গকলা ভূজ্যাত বজায় থেকেছে কদাচিত্ ; কিন্তু তবু যে-করেকজন বিয়ল অনুবাদক বিশ্বস্ততাকে ধর্ম ব'লে মেনেছেন, তাঁদের সাহায্য পেয়ে, আণ্ডেরসেনের সেই আশ্চর্য জাতের রচনার ভূজ্যাত প'ড়ে পর্যন্ত তাঁকে আমরা ভুলতে পারি না। সেই মনীষীর উক্তি মনে পড়ে, যিনি বলেছিলেন, 'সেই রচনাই মহৎ, অনুবাদের মধ্যেও বা আমাদের মনের ভিতর আপেলের মতো পুষ্টি ও স্বাদ ছড়িয়ে দেয়।' একথা দিবালোকের মতো স্বপ্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে বলতেই হবে যে, আণ্ডেরসেনের রূপকথা সেই মহৎ রচনার অন্ততম। বারী বারী তা পড়ি কবিতার মতো, গুনগুন করি মনে-মনে, নতুন-নতুন সংকেত বারী করি প্রত্যেকবার, বারী বারী নতুন মর্মর আর প্রতিসাম্য, আর আপশোষ করি এই ভেবে যে, কেন দিনেমার হলাম না আমরা, দিনেমার হ'লে তো মূল আণ্ডেরসেন লালন করতে পারতুম সত্যায়। অনেক হাত-বদল হ'রে আসার পরও বা মৃত হই না, আণ্ডেরসেনের সেই কবিতার সংস্পর্শ তো আরো গভীর হ'তে পারতো তাহলে আমাদের সঙ্গে।

শাল'পেরো, প্রিমভ্রাতা কি আমাদের দেশের উপেক্ষাকিশোর, দক্ষিণারজন কি ত্রিভঙ্গ রায়ের রূপকথা—সত্যি বলতে কি—এত আলোড়িত করে না আমাদের, মনেও থাকে না আমাদের, যেমন থাকে আণ্ডেরসেন, অক্ষর ওয়াইন্ড, জৈলোক্যানাথ কি অবনীন্দ্রনাথ। শত বর্ষ আগে রচিত হ'রে আণ্ডেরসেনের রূপকথার বহু বিক্রি হয়েছে, তত বোধ হয় আর কোনো গ্রন্থ হয়নি ; সময়ের হিসেব ধরলে বাইবেলও না, লেঙ্গপীরও না, বুনগনের 'তীর্থভ্রাজকের

সম্মুখভ্রাজা'ও না। আর পঞ্চাশটি ভারী ভিন্ন সহস্রাবিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থের। এমন কথা আমি বলতে চাচ্ছি না যে, কেবল এটাই হ'লো তাঁর রচনার খেঁচনের কারণ ; কেননা এমন প্রমাণ ভূবি-ভূবি উদ্ধার করা যায়, যা দিয়ে বোঝানো যায় যে, কেবল বিক্রি দিয়েই বইয়ের ভালো-মন্দ বোঝা যায় না। বরং বলতে চাচ্ছি যে, এত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আণ্ডেরসেনের রূপকথা সত্যিই মহৎ। পৃথিবীর সব দেশ থেকে লোক আসে তাঁর জন্মভূমি ওডেন্সের, আজ বা তীর্থহানের মতো। ছোট দেশ ডেনমার্ক আণ্ডেরসেনের শিক্ষায়, ভ্রমণে, জীবনধারণে বহু অর্থ ব্যয় করেছিলো, তার বহু লক্ষণ প্রতীকান পেয়েছে আজ পর্যন্ত। আণ্ডেরসেনের গবেষণায় কতজনে আজীবন ব্যয় করেছেন ; সেই জাপানি অধ্যাপক যিনি মূল আণ্ডেরসেন পড়ার জন্য বহু বয়সে দিনেমার ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁর নাম তো অনেকেরই জানা ; আর ডেনমার্ক গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দিনেমারদের বলেছিলেন : "Why you need so many subjects? You need only one Andersen."

কোপেনহাগেনের কিংসগার্ডেনে হাল ক্রিষ্টিয়ান আণ্ডেরসেনের মর্মরমূর্তি আছে ; রোজেনবার্গের সেই পুরোনো, রোম্যান্টিক বেঙ্গাকে ঘিরে সেই কিংস গার্ডেন, হাওয়ারা সেখানে যেন সব সময়েই এলোমেলো, চিরকাল সেখানে ছোটোরা খেলাধুলো করে, বোলো শতকের তৈরি সেই কামানটার বড়ো, সাদা, মারবেল পাথরের গোলাগুলির আড়ালে, অপাশে ওপাশে, তাদের লুকোচুরি খেলা চলে। আণ্ডেরসেন বই পড়ছেন, মর্মর মূর্তিটা এমনি অবস্থায় ; এমনভাবে তৈরি, যেন মনে হয়, বই পড়তে-পড়তে কথা ব'লে উঠবেন একুণি, বলবেন 'লাল জুতো' কি সেই ছোট মেয়েটির গল্প, যে দেশলাই বিক্রি করতো। আর মর্মর-মূর্তির ভিত্তিভূমির পায়ে খোদাই-করা আরেকটা ছবি, 'বল্লী ধালের ছানা' গল্পের ছবি, ঠিক সেই মুহূর্তের ছবি, যখন রূপান্তর ঘটছে কুংসিত ধালের, তার সত্যিকার আকার নিচ্ছে সে, নিয়ে তাকান্ছে জলের আয়নার, আর তারপর চমকে আবিষ্কার করছে যে সে আসলে হ'লো অপকালীন এক রাজহাঁস, রূপোলি তার বিশাল ডানা ছড়িয়ে পড়ছে হু-ধারে, যেন সে একুণি সাঁতার কাটবে বহুক্ষণিক জলে।

আণ্ডেরসেনের জীবনে সুখী, উজ্জল, বিজয়ী দিন এসেছে, কিন্তু ওডেন্সের দীপালির সঙ্গে কোনোকিছুই তুলনা হয় না। 'গাঁরের সন্ন্যাসীর ভিক্ষে মেলে না' কথাটা মিন্ধ্য হ'লো এই প্রথম, কারণ আণ্ডেরসেনের জন্ম তো হয়েছিল ওডেন্সেই। গরীব জামাকাপড় পারে, কাঠের জুতো পারে, একদা এই ঘোঁরায়েই শীতে কাঁপতে-কাঁপতে তাঁর মনে হয়েছে রক্ত বুকি জমে গেলো, বুকি ভূমিকম্প হচ্ছে শরীরের ভেতরে, ঠোকাঠুকি হচ্ছে হাড়ে-হাড়ে, এবং তখন তিনি তাকিয়েছেন আশেপাশের বাড়িগুলোর জানলা দিয়ে ভিতরের উষ্ণ স্বাক্ষর্যের দিকে, আর বাসনা তাঁকে আলোড়িত করেছে ; আলো বলমল সেট কহুডের গির্জের ভিথিরির মতো আশ্রয় নিয়েছেন তখন, শিক্ষানবীশ হিসেবে দর্জিদের সংস্থার কতকাল যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। এখন যে-যরে তিনি পীড়িয়ে আছেন, তার কাছেই আজকের মশাল-জালানো ওডেন্সের সব চেয়ে গরীব রাস্তার, তাঁতাচোরা এক বাড়িতে কেটেছে তাঁর শীতের রাত।

আর বাট বছর আগে এক বৃদ্ধি তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো, আর তাঁর বাবামশাই তখন যে কথা শুনে হো-হো ক'রে হসে উঠেছিলেন, কিন্তু হালের মা মনে মনে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন ঐ বৃদ্ধি স্ত্রীলোকের উজ্জ্বল উজ্জ্বলকে, কারণ এই বয়েসের তুলনায় বড়ো, কুৎসিত ছেলেটার মাথায় এমন সব অপরূপ স্পর্শকাতর ভাবনা আগে মাঝে মাঝে বা তাঁর কাছে মনে হ'তো উদ্বেগের সুকপুকির মতো, কিংবা হেয়ালির বিমূর্ততার মতো। বখনি কেউ ভাবতে চেয়েছে বড়ো হ'লে কী করবে হাল, সেদিনকার সেই কুৎসিত ছেলেটি উচ্চারণ করেছে: 'আমি বিখ্যাত হবো,'—বা, এক অর্থে, কী হাত্তকর যে ছিলো তখন।

কিন্তু সেই বৃদ্ধি স্ত্রীলোকটি তাঁর সেই উজ্জ্বলকে সমর্থন করতো। 'উপযুক্ত না-হ'লেও অনেক খ্যাতি পাবে সে চারদিক থেকে,'—বাগের গলায় বলতো বৃদ্ধি; তার এতটা বাগের কারণ, বাবার মতো ছেলেও তাকে সবসময় খোঁচা দিয়ে কথা বলে কি না; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তো আর নিজের কথা ফিরিয়ে নিতে পারে না, তাই বলতো, 'হাল বড়ো হ'লে মস্ত এক বুন্ডো পাখি হবে—পৃথিবীর অনেক উপরে, আকাশের মধ্যনীল ছুঁয়ে, সোনালি ডানা ছড়িয়ে মধু গৌরবে উড়বে সে,'—তারপর সে বোগ করতো,—'আর, একদিন সমস্ত ওড়লে তারই জন্ত আলোর মালার সাজবে।' হালের মা সর্বত্র এ-কথা ব'লে বেড়াতে ব'লেই লোকেরা এ-কথা জানতে পেরেছিলো, আর এই বাট বছর যে তারা এ-কথা মনে ক'রে

রেখেছে তার প্রমাণ তো আজকের এই লাল তারিখ: ৬ ডিসেম্বর, ১৮৬৭।

জানলার কাঁড়িয়ে নিচের দিকে ভাকিয়ে বইলেন হাল। স্নানুর ভিতরে সকাল থেকেই তীব্র উত্তেজনা আলুখালু হ'য়ে উঠেছিলো, তাই, তারই দক্ষণ, সারা সন্ধ্যাবেলা তাঁর ভয়ানক দাঁত ব্যথা করছিলো; ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা, কনকনে, পাঁজরার ছুরি-চালানো হাওয়া আরো মারাত্মক হ'য়ে উঠেছে বেন এখন; আর, এই কারণেই, বার বার তিনি নিজেকে বোঝাতে পারলেন যে, বা এখন চোখের সামনে দেখছেন, তা স্বপ্ন হয়—স্বপ্ন নয় সেই ছোটো দেশলাইওয়ালির অপরূপ দর্শনের মতো, বরং সত্যি, ভয়ংকর রকম সত্যি, যেমন সত্যি ছিলো সেই ছোটো মেয়েটির স্বপ্নের অন্তঃসার, অন্তঃসারের সৌরভ, সৌরভের উদ্গাদনা।

লোকজনের উজ্জ্বল গলা ভেসে আসতে লাগলো তাঁর কানে। আলোর আলোমলো শিখা আর হাউইয়ের কম্পিত নানান রঙ ফোরার থেকে উঠে আকাশ ছুঁয়েছে। তাঁর চারদিক থেকে এখন কাঁড়িয়ে আছেন মেয়র, বিশপ এবং আরো কত গণ্যমান্ত জন। তাঁর বুকের উপর সম্মানের অভিজ্ঞান সোনালি তারাগুলি বলসে উঠে এখন রংমশালের আলোর, হাতে তাঁর মাজার পাঠানো তার। আঠারোশো পাঁচ সালের এপ্রিল মাসের দুই তারিখের সেই ছোট, ভাঁপশা, ভাড়াচোরা ঘর থেকে আজকের দিন অনেক, অনেক দূরের পথ। [ক্রমশঃ]

নিঃসঙ্গিনী তুলে শস্য

[William Wordsworth-এর 'The Solitary Reaper' অবলম্বনে]

চেয়ে দেখো, একাকিনী প্রান্তরে,
ঐ যে সঙ্গিনীনা পার্বত্য বালিকা।
কাটিছে শস্য গাহিছে গান আপন মনে;
খেমে বাও ক্ষণিক, কিম্বা চলে বাও ধীরে।
একই কাটিছে আর বাঁধিছে শস্যগুচ্ছ,
গাহিছে গান সক্রম তান;
কান পেতে শোন ভূমি,
প্রাবন এনেছে সারা উপত্যকা ভূমি।

কোনো বুলবুল গাহেনিকো গান
এমনি শান্ত করিতে শান্ত-পখিকের প্রাণ
আরব মকর প্রান্তে আদি
ছায়াময় মরুতানে বসি।
এমনি শিহরণ আগেনিকো আর
বসন্তের কোকিলের পুরধ্বংস তান
ছিন্ন করিতে নীরবতা সন্তোষের ভবু—
স্বপ্ন হেরিডিসে বসি কেহ জনেনিকো কবু।

কেহ কী বলিবে আমার, কি গান সে গায়।
সক্রম গীতি বেন প্রবাহিয়া যায়।
স্বরিনা বিবাদঘন অতীতখানি,—
হয়তো হবে কোনো সময় কাহিনী।
তবে কী গায় সে সরল চলিত পাখা,
কিম্বা আভিকার এতোটুকু ব্যথা?
অতীতের দুঃখ-কৃতি অন্তরের বেদনা
আবার বাটিতে পারে হেন সম্ভাবনা?

জানি নাকো কি গান এ বালিকা যে গায়,
মনে হয় গান শেষ হবে নাকো হার।
কাজ করে আর গান পেয়ে যায়
চুইয়ে পড়ে কান্তে চালার।
কান পেতে শুনি আমি,
ভাবে বিবুদ্ধে কখন গিয়েছি যে আমি।
পাহাড়তে উঠে গেলাম—গেলাম বহুদূর,
স্বপ্নে গীথিয়া নিলাম অজ্ঞত সে সুর।

অনুবাদক—অমূল্যচন্দ্র বোম



বিক্রুট  লডেন্স

এখানে



ছধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুস্বাদু স্বাদে এমনটী আর হয়নি

কোলে বিক্রুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড • কলিকাতা-১০

অক্ষয় ও প্রাক্ষয়



গুরু-শিষ্য প্রসঙ্গ শ্রীমতী দীপালী দে

স্বাতন্ত্র্য, মূল আত্মতত্ত্বে সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে
সৎগুরুর একান্ত প্রয়োজন। সে পথ অতি দুঃসহ—
তাই তো—কঠ বলিয়াছেন—

সুবস্ত্র ধারা মিশিতা হুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তং কবরো বদন্তি। কঠ ১।৩।১৪

গীতাতেও শ্রীভগবান এই তত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া অর্জুনকে
বলিতেছেন—

আশ্চর্য্যং পশুতি কশ্চিনেন-
মাশ্চর্য্যবদন্তি তথৈব চাত্ম্য।
আশ্চর্য্যবর্জ্জনমজ্ঞঃ শৃণোতি
অহাপোয়ং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। গীতা ২।২১

সুতরাং কঠ-উক্ত 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' (১।৩।১৪) হাড়া আদ
গত্যন্তর নাই।—

গুরু শব্দের অর্থ—গু=অঙ্ককার এবং রু=প্রকাশ। যিনি
অজ্ঞানরূপ অঙ্ককার দূর করিয়া জ্ঞানালোকে শিষ্যের চিত্ত উদ্ভাসিত
করেন এবং তাহার বরূপ উপলব্ধির সহায়ক হ'ন, তিনিই গুরুপদবাচ্য।

বিষয়টির ভিত্তেও সেই একই কথা ধ্বনিত হইয়াছে—

গুরুরশ্চাকারঃ স্যাক্রকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞান-ধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুয়েব ন সংশয়ঃ।

এই আত্মতত্ত্বের বিষয় জানিতে হইলে প্রথমেই গুরুর কাছে
করিতে হইবে আত্মাত্মিক আত্ম নিবেদন। ইংরাজিতে ইহাকেই
বলে 'Unconditional and complete Surrender'।
গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন কত বড় বড় প্রশ্নের উপাশন
করিয়াছেন; কিন্তু গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণ সে সব সমস্তার সমুচিত উত্তর
বেন ইচ্ছা করিয়াই পাশ কাটাঁইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে

অর্জুনের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে—'শিষ্যোক্তেহং শাবি মাং
দ্বাং প্রপন্নম্', অমনি দেখা যায়, প্রিয় শিষ্যকে কত মেহে ও বশে
দিকা দেবার শ্রীভগবানের কি আকুল প্রয়াস।

শিষ্যের এই আত্মাত্মিক আত্মনিবেদনের প্রতিধ্বনি পাই—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেশ্যাত্ত তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ ভবদর্শিনঃ।' গীতা ৪ ৩৪

বাঁহার কাছে শুধু ব্রহ্ম সত্য সেই শব্দরঙ বলিয়াছেন—'সকল
ভূতের সহিত অর্ধৈত কিন্তু গুরুর সহিত নহে'।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—কাহাকে গুরুরূপে বরণ করা যায় অর্থাৎ
সৎগুরুর লক্ষণ কি হওয়া উচিত। উপনিষদ্ কৃপা করিয়া এই
সমস্তারও মীমাংসা করিয়াছেন—

'তদ্বিজ্ঞানর্থে স গুরুমেবাতিগচ্ছৎ

সমিৎপাণি শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠম্।' মুণ্ডক ১।২।১২

অর্থাৎ গুরু হইবেন বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং শিষ্যেরও চাই
শ্রদ্ধা। শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রশ্নে
বলিয়াছেন—

'গুরু কে?' 'শ্রোত্রিয়ঃ, অবুজিনঃ, অকামভতঃ যঃ ব্রহ্মবিশ্বমঃ'
কঠ বলিয়াছেন—

'আশ্চর্য্যো বস্তা কুশলোহস্ত লকা-

শ্চর্য্যো জাতা কুশলানুশিষ্ট।' ১।২.১

অর্থাৎ এই আত্মতত্ত্বের বস্তা (গুরু) আশ্চর্য্য বা অসাধারণ হইবেন
এবং জাতা (শিষ্য ও) হইবেন আশ্চর্য্য বা কুশলী। এই বিষয়ে
বিবেকানন্দজীর উক্তিও মনে রাখার মত 'The person from
whose soul such impulse comes is called the
'Guru'—The teacher, and the person to whose
soul the impulse is conveyed is called the
'Sishya'. To convey such an impulse to any
soul in the first place, the soul from which it
proceeds must possess the power of transmitting
it, as it were, to another; and, in the second
place, the soul to which it is transmitted must
be fit to receive it. The seed must be a living
seed and the field must be ready, ploughed;
and when both these conditions are fulfilled,
a wonderful growth of genuine religion takes
place.'

এই অপরূপ মণিকাঞ্চন বোগ দেখিতে পাই গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ
এক শিষ্যরূপী নরেন্দ্রনাথের মধ্যে। এখানে উভয়েই আশ্চর্য্য।—

সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটিতে ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের
মিলন ঘটে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। ঠাকুর তাঁহার অস্তর-
দৃষ্টির সাহায্যে প্রথম সাক্ষাতেই বুঝিতে পারেন যে, এ আধার
আশ্চর্য্য। তাই বুঝি নরেন্দ্রনাথ যখন তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিতে
দক্ষিণেধরে উপস্থিত হন তখন ঠাকুর অতি মেহের সুরে বলিয়া-
ছিলেন—'এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোমার পথ
চেরে হাঁ করে বসে আছি, তা কি একটাবারও মনে কর্তে নেই?
বিধবী লোকদের সঙ্গে কথা করে করে আমার ঠোঁট যে পুড়ে
যাবার মত হয়েছে...তুমি সেই পুণ্ডরিক ঋষি নরনারায়ণের,

জীবের দুর্গতি নিবারণের জন্ত তোমার শরীর ধারণ হয়েছে... ইত্যাদি বাৎসল্য-প্রেমে বিগলিত হইয়া—'ওরা খাবে এখন, তুমি খাওনা', বলিয়া স্বহস্তে মাখন মিছরীটুকু তাঁহাকে খাওয়াইয়া যেন নিশ্চিত হইলেন।—তাঁহার পর নবরঙ্গনাথকে আর একদিন একলা আসিবার জন্ত কি আকুল মিনতি।—

যুগক উপনিবন্ধে আছে—

তট্টৈ স বিদ্যাত্মপসরায় সম্যক্

প্রশান্তচিত্তায় শমাদিতায়।

'বেনাকরং পুরুষং বেন সত্যং

প্রোবাচ তাং তদ্বতো ব্রহ্মবিদ্যুঃ। যু ১২'১৩

প্রশান্তচিত্ত, সংযত-ইন্দ্রিয় নবরঙ্গনাথকে তাই ঠাকুর প্রথম সাক্ষাতেই এত ভাল বাসিয়া ছিলেন। তাঁহার সবক্ষে ঠাকুরের মত অতি উচ্চ ছিল। কলিকাতার মত স্থানে এমন সবুগুণী আধারও থাকিতে পারে ভাবিয়া ঠাকুর বিগ্নিত হইয়াছিলেন। সর্বদমক্ষে তাঁহাকে আজগু ব্রহ্মজ্ঞানী, নিত্যসিদ্ধের থাক, ধাপ-খোলা তলোয়ার, অখণ্ডের ঘর ইত্যাদি বলিতে ঠাকুরের একটুও বাধিত না, কারণ তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে, নবরঙ্গের মধ্যে যে জ্ঞানার্ণি প্রকলিত ছিল তাহাতে এই সমস্ত প্রশংসাসূচক বাক্য

ব্যবহার করিলেও তাঁহার সংস্কারশূন্য মনে কোনও গর্বোন্মেষের আশঙ্কা নাই।—গীতার (৪।৩৮) "জ্ঞানার্ণি সর্ককর্মাণি ভবস্যাং কুরুতে তথা" শ্রবণ করিয়াই বোধ হয় ঠাকুর বলিয়াছিলেন—এ যদি শোর গরুও খায়, কোন দোষ হবে না। ঠাকুর কামনা' বিগ্নিত ভক্তপ্রদত্ত অন্ন নিজে খাইতেন না, কিন্তু নবরঙ্গনাথকে খাওয়াইতে তাঁহার কোন চিন্তা ছিল না। শিশু সুলভ সরলতার সহিত ঠাকুর ভক্তদিগের কাছে বলিতেন—'দেখ নবরঙ্গের কত গুণ—গাটকে, বাজাতে, বিজ্ঞায়, জিতেন্দ্রিয়; বলেছে বিয়ে করবে না; ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরে মন.....।'

এর পর দেখা যায় ঠাকুরের তাঁহার প্রতি একটানা ক্রমবর্ধমান প্রেম।—নবরঙ্গকে কয়েকদিন না দেখিলেই তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন।—একবার পরীক্ষার জন্ত ব্যস্ত থাকায় নবরঙ্গ সে সময় তাঁহার কাছে বেশী বাইতে পারিতেন না। তাই তিনি স্বয়ং তাঁহার 'টবে' উপস্থিত হন, সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন গামতার বাঁধিয়া সন্দেশ। অক্ষত্বারাকান্ত চক্রে তাঁহার অমুযোগ—'কেন এতদিন বাসনি', 'নবরঙ্গকে দেখবো বলে বসে বসে কাঁদতুম', 'প্রাণটা হাঁকুপাকু করে', 'সময় সময় এমন যত্নগা হোত যে, মনে হোত বুকের ভেতর কে যেন গামছা নিংড়োবার মত জোর করে নিংড়োচ্ছে'; 'বাউতলার

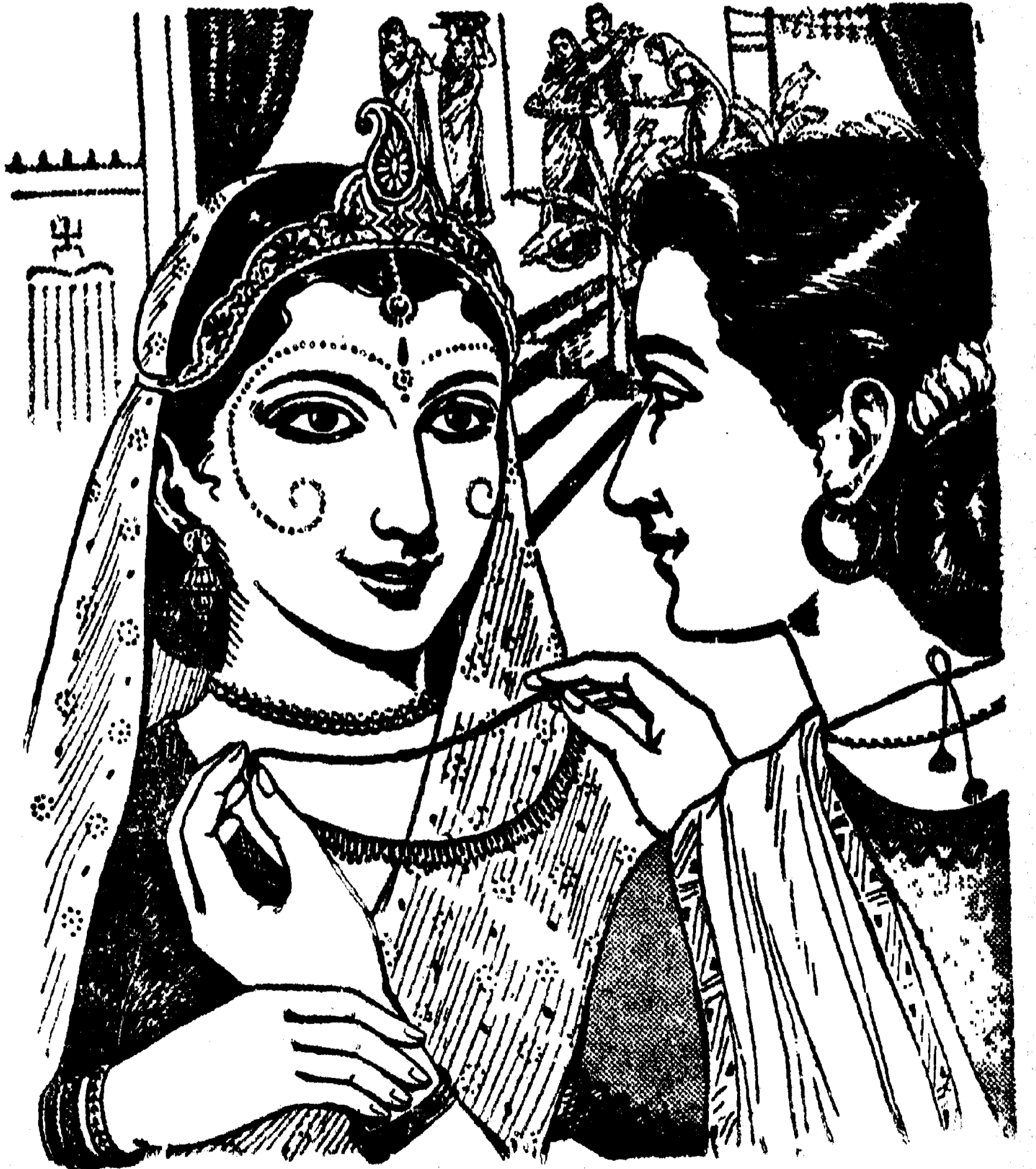
মনের কথা

"এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?"
"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স
দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, ভাই,
মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে
ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও
দারিদ্র্যবোধে আমরা সবাই খুসী চলেছি।"

মুখার্জী জুয়েলার্স

মুনি নিম্নলিখিত গহনা নির্মাতা ও রত্ন-কর্মকারী
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



দিয়ে চীৎকার করতুম ওরে তুই আর, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না—প্রভৃতি ঠাকুরের উক্তি থেকে তাঁহার প্রেমের গভীরতা সহজেই অনুমেয়। তিনি জানিতেন, নরেনের দ্বারা জগতের অনেক উপকার সাধিত হইবে। তাই তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—‘মা ওর বিয়ে টিমে বরিয়ে দে’। তিনি বলিতেন ‘কেশবের যদি একটা বড় শক্তি থাকে, নরেন্দ্রের সে বকম আঠারটা শক্তি আছে।’ নরেন্দ্রনাথ একবার শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ ছয় দিন সমাধিতে ডুবিয়া থাকার ইচ্ছা প্রকাশ্য করিলে ঠাকুর উস্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘কোথায় তুই একটা বিশাল বট গাছের মত হবি, তোর ভাটার হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে...তুই কিনা শুধু নিজের সুক্তি চাস’? নরেনের মধ্যে পূর্ণ অদ্বৈতের সংস্কার দেখিয়া তিনি মায় কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—‘মা ওর মধ্যে একটু মায় প্রবেশ করাইয়া দে’। তিনি একথাও বলিতেন যে, নরেন্দ্র যেদিন জানিবেন উনি কে অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কি, সেদিন আর তিনি দের রাধিবেন না। মায়ার লেশ না থাকিলে তাঁহার পক্ষে লোকচিত্তকর কার্য অসম্ভব বুদ্ধি ঠাকুরের এইসব উক্তি।—নরেন্দ্রনাথ একদিন নির্ভিকল্প ডুম্বিতে আরোহণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন—‘আমার শরীর কোথায় গেল’? ঠাকুর শুনিয়া বলিয়াছিলেন—‘বেশ চরিতে, থাক খানিকক্ষণ, ওর জন্ম আমার বড় আশান্তন করে তুলেছিলি।’ পরে নরেনকে বলিয়াছিলেন—‘চাষি কিছু আমার হাতে বটল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাষি খুলব’।—তাঁহার শক্তির প্রতি ঠাকুরের এরূপ উচ্চারণ ছিল যে, তিনি তাঁহার কপালের কাটা দাগ দেখাইয়া বলিতেন ‘যদি সেদিন এই বকমে ওর শক্তি না কমে যেত তাহলে যে পৃথিবীটা একেবারে ওলট পালট করে ফেলত।’

শিবা তিন প্রকার—(১) উত্তম, (২) মধ্যম এবং (৩) অধম। বহির্জ গুরুসেবা অপেক্ষা অন্তর্জ গুরুসেবাই উপর উত্তম শিবের লক্ষ্য থাকে বেশী। অবল্ল প্রয়োজন হইলে তিনি বহির্জ সেবা করিতে পশ্চাৎপদ হ’ন না। ঠাকুর বলিতেন—‘তোর পথ আলাদা।’ বহির্জ সেবা যথা হস্তপদাদি ধৌত করা, উচ্চৈর্ভৌজন প্রভৃতি তিনি কখনও নরেনকে করিতে দিতেন না। অবল্ল ঠাকুরের অনুর্থের সময় নরেন্দ্র তাঁহার পূজরক্ত মিশ্রিত গরার খাইতে উত্তত হইয়া এই কথাই প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, প্রয়োজনবোধে উত্তম শিব্য বহির্জ সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে।

ক্রিপাত হইতে শিবের আত্মাত্মিক চূঃখনিবৃত্তিই সঙ্গুল্ল একান্ত লক্ষ্য। জাগতিক উন্নতি বিষয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট থাকেন না। তাই দেখি, প্রিয়তম নরেনের নিদারুণ অর্ধকষ্টের দিনেও, তাঁহার বহু অনুরোধ সত্ত্বেও ঠাকুর হাতে ইহার প্রতিকারের জন্ত কিছুই জানান নাই। বরং নরেনকেই পাঠাইয়াছিলেন স্বয়ং প্রার্থনা করিবার জন্ত। শুদ্ধাচার নরেনও তিনবার চেষ্টা করিয়াও প্রতিবারেই শুধু জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই উচ্চারণ দেখিয়া ঠাকুর শেখবারে ‘আশীর্বাদ’ করিয়াছিলেন—‘মায় ইচ্ছায় আর তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কষ্ট থাকবে না।’ নরেন্দ্র সব্বদে তাঁহার ধারণা এক

টুক ছিল যে, তাঁহার কাছে প্রিয়শিবের চরিত্র সব্বদে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করায় তিনি জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, ‘ওর দ্বারা জীবনে কখনও বোঝিৎ সঙ্গ হইবে না।’

নরেন্দ্রকে তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন—‘তুই জানী ও ভক্ত তুই হ।’ দেহত্যাগের পূর্বে তিনি যন যন তাঁহাকে কাছে ডাকিতেন। ‘আজ তোকে সর্ব্বদ দিয়ে ককির হলুম’—এই উক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে তাঁহার অপার আনন্দের ইঙ্গিত। মহাপ্রয়াণের পূর্বে সকলের ভাব তিনি তাঁহার উপর দিয়া যান। নরেন প্রথমে স্বীকৃত না হওয়ার বলিয়াছিলেন, ‘তোর বাড় করবে।’

দেহত্যাগের পরেও বৃষ্টি এই শ্রেহবন্ধন ছিন্ন হয় নাই। নরেন্দ্র গাজিপুুরের পাণ্ডহারী বাবার নিকট নীলা লইতে মনহ করিলে তিনি কয়েকদিন যাবৎ দেখেন যে, ঠাকুর বেন চল চল চক্রে বিবাদমাধা যুখে চাহিয়া আছেন। তখন তিনি সে সংকল্প ত্যাগ করেন। আমেরিকা যাইবার পূর্বে তিনি ও স্ত্রীমা যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন, তাহা হইতে বৃষ্টি যাবৎ, গুরু-শিবের শ্রীতির সব্বদ শুধু এই ময় জীবনেই সীমাবদ্ধ নহে।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন চিব আত্ম-বিশ্বাসী। ছোট হইতেই তিনি বিবেকের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন। তিনি ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তবে তাঁহাকে জীবনসর্ব্বদ করিয়াছিলেন।—প্রথম প্রথম তাঁহাকে অনেকটা অর্দ্ধোদ্যাদ বা বিকৃত মস্তিক বলিয়া মনে করিতেন। তাই তিনি অকপটে ঠাকুরকে একথাও বলিতে কষ্টিত হন নাই—‘হাজার লোকে ঠিকর বলুক,—আমার বতকণ সত্যি বলে না বোধচর ততকণ কিছুট’বলব মা’; ‘রূপ-টুপ আপনায় খেয়াল’—ইত্যাদি। প্রথম স্পর্শে যখন নরেনের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী বৃত্তিতে থাকে তখন স্তব্ব হইয়া তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন যে ঠাকুর সন্দোহন বিতা জানেন।—ইহার মধ্যে অবল্ল কোথাও কোনও উচ্চতা ছিলনা। সুযোগ পাটলেই তিনি ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। স্মল্ল ঠাকুরের বিদ্যামায় টাকা রাখিয়া তিনি যখন দেখিলেন সত্যাই তিনি ‘জলে গেল, জলে গেল’ করিয়া ভাগিয়া উঠিলেন তখন তাঁহার বিশ্বাস ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইতে লাগিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পর্ব্বদ যখন ‘ঐশ্বর দর্শন করিয়াছেন কিমা’ এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই অথচ এক নিরকর পূজারী ভ্রাজণ—‘হ্যাঁ গো, এই যেমন তোমার দেখছি’ এই কথা সরলভাবে বলিলেন তখন নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন ‘এ বক্তা আশ্চর্য্য’। ঠাকুরের অবতার-তত্ত্বেও তাঁহার সন্দেহ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর ঠিক পূর্বেই নরেন্দ্রনাথের মনে এই সন্দেহ আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অন্তর্ধ্যামী ঠাকুর ‘এখনও তোর জ্ঞান হোল না...বে মায়, যে কুক, সেই এ শরীরে রামকুক’...ইত্যাদি উচ্চারণ করার তাঁহার সন্দেহের লেশটুকু চিরতরে খুইয়া যায়। পরবর্ত্তী জীবনে ভাঙ্করানন্দজীর সহিত তর্কে তিনি জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে, জীবনে তিনি এমন একজনকে দেখিয়াছেন, যিনি সম্পূর্ণ কামিনী-কাঞ্চনের পাশ হইতে মুক্ত। তিনি একথাও বলিতেন—‘অবতার বললে তাঁকে ছোট করা হয়।’ ঠাকুরের জীবমুক্ত অবস্থার কথা আমেরিকায় বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

'In the presence of my master, I found out that man could be perfect, even in this body.

(My Master)

অধৰ্ণবেদীর শাস্তিপাঠ—'ও জহং কর্ণেতি: শূণ্যাম দেবা, ভহং পশ্চৈমাকিৰ্ণিৰ্ভজ্জা:।—এই উক্তির অভিব্যক্তি ঠাকুরের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—

'Those lips never cursed any one, never criticised any one, those eyes were beyond the possibility of seeing evil, that mind had lost the power of thinking evil.' তাঁহার আত্মনিবেদনের পরাকাষ্ঠা ধ্বনিত হইয়াছে পরবর্তী কয়েক ছন্দে—

'If there has ever been a word of truth, a word of spirituality, that I have spoken anywhere in the world, I owe it to my Master, only the mistakes are mine.'

সরসী বাঈ

শ্রীমতী সীমা গঙ্গোপাধ্যায়

মুতুপথগামিনী সরসী বাঈ-এর মুখে ফুটে ওঠে একটি শিথিল করণ হাসি। অন্ন টাকায় ভাড়া করা ত্র্যংসেতে একটি ঘরে শুয়ে আছে সরসী বাঈ। ঘরে আসবাব-পত্র বলতে একটি ছোট খাট, অল্পরূপ একটি আলমারী ও একটি টি-পয়, টি-পয়টিতে ছোট বড় নানা আকারের ঔষধের শিশি পত্র সাজান। দেওয়ালে একপাশে ঝোলানো রয়েছে ঘুঙুরের তোড়া, নীল-কাপড়ের ঢাকা পরাণ সারেকী ও তানপুরা। ঘরের এককোণে ছোট একটি জল-চৌকীর উপর একটি হারমোনিয়ম বাজ। বাইরে শ্রাবণের অবিজ্ঞাত বর্ষণ ও বড়ের তাণ্ডব মাতামাতি। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ ও মেঘ ডাকার গুঞ্জন শব্দ। ঠিক এমনই একটি ছবোঁগের যাত্রির কথা মনে পড়ে যায় সরসী বাঈ এর; সরসী বাঈ-এর মা কুম্ভলা বাঈ সেকালে গোয়ালিয়রের শ্রেষ্ঠা রূপসী বলে বাঈ মহলে খ্যাত ছিলেন। সরসী যখন ছোট ছিল তখন ওস্তাদের কাছে নাচ গান শিখত বাড়ীতে। তারপর একটু বড় হলে মায়ের সঙ্গে মুজরোর বেত। একদিন কুম্ভার বাহাদুর খুদাবজের বাড়ীতে গিয়েছিল সরসী বাঈ তার মা কুম্ভলার সঙ্গে। কুম্ভার বাহাদুর বসে আছেন দামী ক্রাসের উপর, ছু পায়ে মোসাহেব ও আমন্ত্রিত ব্যক্তির। আতর গোলাপজল ও সুগন্ধি ফুলের তোড়ার ছড়ছড়ি। সরসী-বাঈ তার মায়ের সঙ্গে বেহাগ সুরে গান ধরল "ক্যার-সে বাঁউ বহুনাকে তাঁর"। গানের তালে তালে হুলে উঠল সরসী-বাঈ এর আকরাণী রঙের বাগরা, জরী জড়ান মুক্তার ফুল আঁকান বেশী, চোখে মদির ভাবালস চাউনী ও শুভ্র যরালের মত শেলব বাহুটি অজতঙ্গী সহকারে এক মোহের সৃষ্টি করল। বিভোর হয়ে নাচছে সরসী বাঈ, হঠাৎ এক সময় কুম্ভার বাহাদুরের চোখে চোখ পড়তে শিউরে উঠল সে। কুম্ভার বাহাদুরের

চোখ ছিট কামার্ভ হিংস্র ঝাপদের মত বলছে। সেদিন এক যুহুর্ডের অল্প ঘুঙুরের তালও বুঝি কেটে গিয়েছিল সরসী বাঈ-এর। কুম্ভলার এখন পড়তি বয়স। তবুও যৌবনের রূপ ও খ্যাতির কথা স্মরণ করে ছুই এক জায়গা থেকে ডাক আসে তার। ছু এক খানি গান গেয়েই কুম্ভলা সেদিন চলে গিয়েছিল। নাচ শেষে অনেক রাতে সরসী বাঈ এর ডাক এসেছিল কুম্ভার বাহাদুরের খাস কামরার। কুম্ভার বাহাদুরের ঘৃণিত আহ্বানে ও কুম্ভার্ত আক্রমণে ভয়ে মিশাহারা হয়ে গেলেও, প্রাণপণ শক্তিতে সরসী বাঈ দিতে চেয়েছিল। দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিল "ছু না মত।" শেষ রাতে যখন বাড়ী ফিরল তখন তার সব কিছুই হারিয়েছে সে। ছেঁড়া কাঁচুলী ও গুড়নাটা বৃকে চেপে ধরে সেদিন অঝোরে কেঁদে ছিল সরসী বাঈ। তার পর এক বছরের মধ্যে কোলে এল কুম্ভার বাহাদুরের সন্তান রোশনী। রোশনীর জন্মের কিছুকাল পরে কুম্ভলা বাঈ এর মৃত্যু হয়। রোশনীকে পরিচায়িকার কাছে রেখে সরসী বাঈ মুজরোর বেত। এই ঘটনার পর আরও ছুই একবার কুম্ভার বাহাদুরের বাড়ী মুজরোর গিয়েছিল সরসী। হাব্, ভাবে ছুই একবার মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিল পূর্ব স্মৃতি। রোশনীর মুখ চেয়ে কুম্ভার বাহাদুরকে নিজের অজান্তেই তালবেসে কেনেছিল সরসী। কুম্ভার বাহাদুর তখন লঙ্কোঁ-এর মেহেরা বাঈকে নিয়েই ব্যস্ত। অজ্ঞদিকে চোখ দেবার সময়ই বা কোথায়! তবুও আশা ছাড়েনি সরসী বাঈ। একদিন সুরোগ মত কুম্ভার বাহাদুরকে জানিয়েছিল রোশনীর কথা। নিজের প্রেমও জানিয়েছিল অকুণ্ঠ ভাবে। পরিবর্তে কুম্ভার বাহাদুরের মুখ থেকে শুনেছিল রুচ কঠিন প্রত্যাখ্যানের ভাষা। "নটীর সন্তানের আবার পিতৃপরিচর কি? জমন আমার কত সন্তান নাম গোত্র হীন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" নিজের সঞ্চিত ভালবাসা ও চরম অপমান সরসী বাঈকে আরও নীচ হীন প্রবৃত্তিতে নামিয়ে নিয়ে গেল। সুরসাধিকা সরসী বাঈ হল দেহ-পসারিনী সরসী বাঈ। রোশনী মায়ের কার্ণকলাপ কিছুই জানতে পারত না। সে চিন্তিত তার শুদ্ধাচারিণী সুর সাধিকা মা সরসী বাঈকে। রোশনীর বড় ঝোঁক ফুলে পড়ার। মেয়ের পীড়াপীড়িতে সরসী বাঈ মেয়েকে ফুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। বেশিদিন তাকে ফুলে বেতে হলনা, একদিন ফুল থেকে বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে কেঁদে পড়ল রোশনী। ফুলের মেয়েরা তাকে দেখে মুখ মচকে হাসে, তার মা সরসী বাঈ এর কথা নিয়ে হাসাহাসি করে। সব শুনে সরসী বাঈ সেদিন পাথর হয়ে গিয়েছিল। ফুলের নাম কাটিয়ে লঙ্কোঁ এর ফুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল রোশনীকে। সেখানে হয়ত তার মার নাম নিয়ে কেউ হাসাহাসি করবে না। সরসী বাঈ-এর ইচ্ছা রোশনী লেখাপড়া শিখে মাস্তব হয়। নিজের জীবনের মত রোশনীর জীবনটা বের বয়ে না যায়। এই ঘটনার পর বছরদিন অজীত হয়ে গেছে। সরসী মাঝে মাঝে টাকা পাঠান ছাড়া মেয়ের আর খোঁজখবর বিশেষ রাখেন না। রোশনী এখন ফুল ছেড়ে কলেজে পড়ছে। মায়ের ঠিকানা সে জানে না। মেয়ের প্রসঙ্গে যদি মায়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, এই আশঙ্কায় সরসী নিজের কোন পরিচর বা ঠিকানা পাঠাতেন না। এগাণীং সরসী বাঈ বুঝা ও হোসকীর্ণা হয়ে পড়েছেন, একটি পরিচায়িকা

সর্বদা দেখাশুনা করে। অতীতের মধুপারী সঙ্গী-সাথীরা মধু নিঃশেষ হওয়ার সাথে সাথে অল্প ফুলে গিয়ে বসেছে। অতীতের কথা স্মরণ করে সরসী বাঈ-এর রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখে ফুটে ওঠে একটা শিথিল করুণ হাসি। হঠাৎ চমক ভাঙে পরিচায়িকা আমিনার ডাকে। 'আম্মি, সাঁঝ কো বাত্তি লাগা দি?' হৃণুর গড়িয়ে সন্ধ্যার জমাট অন্ধকার তখন ঘরখানাকে গ্রাস করেছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও মেয়েদের কর্মসম্ভাবনা

শ্রীমতী নির্মলা সরকার

আমাদের জাতীয় সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও দেশবাসীর জীবন-যাত্রার মান উন্নত করার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করে রূপায়ণ করছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হবে আগামী বৎসর এপ্রিল মাসে। এই পরিকল্পনাগুলির দ্বারা শুধু যে দেশের পুরুষ-সমাজ উপকৃত হচ্ছেন তা নয়, মেয়েরাও এই পরিকল্পনাগুলি মারফৎ উপকৃত হচ্ছেন। উপকৃত হচ্ছেন দুই প্রকারে, প্রথমতঃ এই পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের সময় মেয়েদের কল্যাণকর কতকগুলি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে মেয়েরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে দেশের সেবা করার আত্মতৃপ্তি পাচ্ছেন, তাছাড়া মেয়েদের এ থেকে অর্থ উপার্জনের পথও কিছুটা সহজতর হয়েছে। মেয়েরা এই পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন, সেবিকারূপে, কর্মীরূপে। পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত হওয়ার পর মেয়েদের কর্ম-সংস্থান আরও বেড়ে যাবে বলেই মনে হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী রূপায়ণকালে এবং রূপায়ণের পর মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে কি সুযোগ সুবিধা পাবেন, সে সবকিছু হ'চার কথা সংক্ষেপে বলব।

প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষার কথা ধরা যাক। পরিকল্পনা-কমিশন বলেছেন, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা কম প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে। তবে, কমিশন আশা করেন যে, ছয় থেকে এগারো বৎসর বয়সের পড়ুয়াদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বর্তমানে বন্ধকন, তার শতকরা বাটগুণ বেড়ে যাবে তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে। এককমভাবে এগারো থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছাত্রীসংখ্যাও বেড়ে যাবে বলে কমিশন আশা করেন। এই মেয়েরাই 'ভবিষ্যৎ'এ বড় ভূমিকা রাখবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সেই বড় হওয়ার দিকে প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। তাই যখন শুনি তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে ছয় থেকে এগারো বৎসর বয়সের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা বাধ্যতামূলক হবে, তখন মনে হয়, আমাদের দেশে শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাবে। পরিকল্পনা-কমিশন বলেছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে আরও অতিরিক্ত চার লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন হবে। বেশ কিছুসংখ্যক মেয়ে এই বৃত্তি গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। মেয়েরা

যে প্রাথমিক শিক্ষাদান কাজে বিশেষ উপযোগী, সে কথা সর্বজন-স্বীকৃত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থা মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিলে ছোটদের শিক্ষাদানের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি সহজতর হবে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে বহু মেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে এসে তাঁদের কর্মসংস্থান করে নিতে পারবেন। এভাবে মেয়েরা উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ে থাকবেন না বলেই মনে হয়।

পীড়িত মানব-সেবার ক্ষেত্রেও মেয়েদের প্রয়োজনীয়তা ধুব বেশী। পরিকল্পনা-কমিশন আশা করেন, তৃতীয় পরিকল্পনা কালে উনিশ হাজার চিকিৎসক পাশ করে বের হবেন। এর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মেয়ে চিকিৎসক দেখতে পাব না কেন? মেয়েদেরও চিকিৎসকের মহান্ন ব্রত গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে হবে। অনেক বলবেন, মেয়েরা সে সুযোগ পাবেন কি? মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আসন-সংখ্যা এত কম যে, প্রত্যেক ইচ্ছুক ছেলে-মেয়ে গুঁড়ি হতে পারে না। বলা বাহুল্য, তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মেডিক্যাল কলেজগুলির সংখ্যা বেড়ে যাবে। ১৯৫১ সালে যেখানে ত্রিশটি মেডিক্যাল কলেজ ছিল, সেখানে ১৯৬১ সালের মধ্যে পঞ্চাশটি কলেজ স্থাপিত হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণ কালে দেশের হাসপাতালগুলির সংখ্যাও বাড়ান হবে। এই সময়ের মধ্যে চৌদ্দ হাজার ছয় শ' হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারী স্থাপন হবার কথা, আর হাসপাতালে শয্যা-সংখ্যা বাড়ান হবে আরও এক লক্ষ নব্বই হাজার। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে বহু কর্মীর প্রয়োজন, সে কথা বলা বাহুল্য। নার্সিং ইত্যাদি কাজে বেশ কিছুসংখ্যক মেয়ে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবেন। পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন, তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণ কালে চার হাজার পঁচাত্তর নাঙ্গ, সাত হাজার সহকারী নাঙ্গ ও দাত্রী ও সাত হাজার দাই ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হবে। এই কাজগুলিতে মেয়েদের প্রয়োজন হবে এবং বেশ কয়েক সহস্র মেয়ে নিজেদের এই কাজে নিযুক্ত রাখতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবার নিয়ন্ত্রণ ক্রীমের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে এই পরিকল্পনার পিছনে। ১৯৬১ সালের মধ্যে সহরাকলে ছয় শত ছিয়াত্তরটি ও গ্রামাকলে এগার শত একশতটি পরিবার নিয়ন্ত্রণ ক্রীম অস্থায়ী কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এই কেন্দ্রগুলির অধিক সংখ্যক কর্মী মেয়েদের হওয়া উচিত। তাছাড়া, এই ক্রীম অস্থায়ী কাজে সহযোগিতার জন্য সেবামূলক মহিলা প্রতিষ্ঠানকে অগ্ররোধ করবেন, এটা অগ্রমান করে নিতে পারি, যদিও কমিশন এ সবকিছু সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি।

এছাড়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাত্ত্বক বহুবিধ কাজে—যেমন সমষ্টি উন্নয়ন, গ্রন্থাগার, বয়স্কদের জন্য শিক্ষাদান কেন্দ্র, শিশু কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা নানাবিধ কাজের সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন। সরকার যে এসব কাজের জন্য মেয়েদের ও মেয়েদের দক্ষতা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতা কামনা করবেন তা অগ্রমান করা শক্ত নয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গুলিতে মেয়েদের উপযোগী নানাবিধ কাজ থাকবে এবং যিনি যে বকম

কাজের উপযোগী সে রকম কাজে নিয়োজিত করতে এগিয়ে আসেন, তাহলে তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হবেন তা নয়, সমগ্র ভাবেও দেশের সেবা করবেন। এটা জানি, এই সব পরিকল্পনাগুলি নানারকম কারণের জন্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যে বর্ষেট উৎসাহ আনতে পারেনি। এইসব পরিকল্পনার ক্রটি বিচ্যুতি আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনাগুলি যে মেয়েদের নানাবিধ কর্মক্ষেত্রে কিছুটা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, সে কথা স্বীকার্য।

পটপরিবর্তন

মহালক্ষ্মী দত্ত

“কি ব্যাপার রে যুগু? খুব যেন excited মনে হচ্ছে!

ব্যাপার কি? কোথাও গিয়েছিলি নাকি?”

—“গিয়েছিলাম একটু নিউমার্কেটে। কিছু কেনাকাটার ছিল।

তাই ভাবলাম, আজ ঠুর ছুটি আছে, একটু ঘুরে আসি।”

—“তা এতে আর excited হওয়ার কি আছে?”

—“Excited হ’ব না? আজ যা দেখেছি! দেখে শু

আমার মুখ চোখ লাল হ’য়ে কাণটান গরম হয়ে গেল—লজ্জায়।

—কি দেখলি বলবি ত? শুধুই ত ভণিতা করছিস।

—দেখলাম একটি ভদ্রমহিলা, মুখে চোখে অতি উগ্র প্রসাধন, ব্লাউজটি কাঁচুলীর মত পিছনে বাধা এবং আঁচলাটি হাতের উপরই প্রায়! সে একেবারে দিখমনা সুন্দরীর সাজ। কিন্তু সব থেকে মজা এই যে, যদিও সকলের দৃষ্টি তাঁর ওপর, তিনি কিন্তু মোটেই সে সত্বে সচেতন নন। আমি ত ঠুর সামনে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারলাম না। বললাম তুমি একটু এগিয়ে যাও—আমি তোমার পেছনে যাচ্ছি।

তুনে ত বিস্ময়ে ভুঙ্ক হয়ে গেলাম। এই কি আমাদের ভারতের নারী! আমাদের ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য, আমাদের ভারতের ঐতিহ্য, সব গেল কোথায়? ভাবলাম হায়, আমরা এ কোথায় চলেছি? পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা যে আমাদের সজ্জাকে লাশ্চর্য্য সাধারণ পণ্য নারীর পর্যায়ে রূপান্তরিত করেছি। যা দেখে স্বামীর সামনে পর্ষদ নয়ন আপনা হ’তে লজ্জায় নত হয়ে যায়! আমাদের ভারতীয় নারীর সে কল্যাণময়ী রূপ গেল কোথায়? যা’ দেখে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নারীকে মাতৃ-সম্বোধন করেছিলেন।

বললাম, জানিস, এ’রাই আবার আগেকার যুগের মেয়েদের পোষাককে বলেন obscene। কারণ তাঁরা কোনও অলঙ্কার ব্যবহার করতেন না। আর, অলঙ্কারে কি এসে যায়? একখানি মাত্র সাদাটাই তাঁরা এক সুরম্যভাবে পরতেন যে, পায়ে পাতা দেখা যেত না—পরীরের অস্তিত্ব অংশ ত দূরের কথা। আর প্রসাধন? তাঁরাও প্রসাধন করতেন। নানান হাঁদে কবরী বাঁধতেন, কপালে সিন্দুর-বিশু দিতেন, ভাড়ুলে অধর রাঙাতেন, আর পায়ে দিতেন আলতা। তখন শু আর লিপটিক ছিল না, পানিই লিপটিকের কাজ করত আর তা থেকে কোনও skin disease এরও আশঙ্কা ছিল না। তাঁদের সেরূপে সত্যিই চোখ জুড়োত। অন্যত এ আমি

বলছি না যে, সে যুগের মেয়েরা অলঙ্কার ব্যবহার করতেন না বলে এ যুগের মেয়েরাও তাই করুক। কারণ, এ যুগ ও সে যুগের তফাৎ অনেক। আজকের এই প্রগতির যুগে অলঙ্কারই এখন কেবল নারীর কর্মক্ষেত্রে নয়, বাইরের জগতেও তাদের ডাক এসেছে; কাজেই যে পোষাক অলঙ্কারহলের পক্ষে সূষ্ঠ, তা’ কখনও বাইরের পক্ষে সূষ্ঠ হ’তে পারে না—তবে বাই আয়রা পরিণা কেন, তা’তে শীলভার হানি যা’তে না হয় তাই দেখাই বোধ হয় ভাল এবং তা’তেই বোধ হয় আমাদের ভারতীয় নারীর পোষাকের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। কিন্তু অলঙ্কার ব্যবহার করেও নিজেকে সকলের কাছে প্রকাশ করার এই চেষ্টা দেখে মনে হয় আমরা সে কথা ভুলে যাচ্ছি, কিংবা হয়ত যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের শীলভার সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে, আর আমরা back-dated হয়ে রয়েছি!

বড় নগরে একটি দিন

কুমারী অপর্ণা সরকার

১৩৬৫ সালের ২রা আশ্বিন আমার জীবনের এক চিরস্মরণীয় দিন। কারণ, এই দিনই আমি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং বাস্তবী সমষ্টি-ব্যাহারে দেখেছিলাম বাংলার সুপ্রসিদ্ধ রাণী-ভবানীর অময়কীর্তি।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখি কম কম বৃষ্টি পড়ছে। মনটা কেমন বিস্ত্র হয়ে উঠল, আজ না আমাদের নৌকাজরণে যাওয়ার দিন। ভগবানের প্রতিও মনটা বিরূপ হয়ে উঠল, কারণ এই পৃথিবীর শুভাশুভ সমস্তই যে নির্ভর করে সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের উপর। তিনি কি আমাদের বাত্মাণথে বিয় বটাবার জন্তেই তাঁর রক্ষিত জলের কমগুলু উপড় করে দেননি, নইলে অসময়ে বৃষ্টি কেন?

বাইহোক, আশা-নিরাশার দোলায় উঘেলিত মন নিয়ে আমি নিকিষ্ট সময়ে বিজ্ঞালয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি, আমার অনেক বন্ধু এর আগেই এসে অপেক্ষা করছে। হৃদয়ের মাঝে এক টুকরো ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিল—হয়তো যাওয়া হতে পারে। ৬টার আগে আমরা বিজ্ঞালয়ে গিয়েছিলাম, ৬টা বেজে গেল, ৮: ৮ করে ৭টা বেজে যাওয়ার ইচ্ছিতও দিয়ে গেল বিজ্ঞালয়ের বন্ধ দেওয়ালঘড়িটা। আমরা যখন একেবারে অর্ধেক হয়ে পড়েছি, ঠিক সেই সময় দৈবপ্রেরিত দূতের মতই এলেন দিদিয়া (শিক্ষিকার), বৃষ্টি তখন ধেমে গিয়েছে, দেখা দিয়েছেন আলোর রাজা সুর্য্যদেব। আমরা আর দেয়ী না করে বাত্মা করলাম পতকল্যের ভাড়া করা নৌকাটার দিকে। নৌকা-গহ্বরে প্রবেশ করে, গজার শুভ সমাপ্ত করে, আমাদের বিজ্ঞালয়ের নামে জয়ধ্বনি তুলে শুরু করলাম গান,—

“মোদের যাত্রা হ’ল শুরু

ওগো কর্ণধার।”

হৃদয়ে যেন আনন্দের জোয়ার উধলে উঠছিল। উঠ’বই বা না কেন? ছাত্রী-জীবনের শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রকনিনে যে আশার বীজ বপন করেছিলাম, সেই আশা আজ সকল হ’তে চলছে। কর্ণধার যথেষ্ট চড়ে একদিন ধরে যে রতিন কর্ণধার আল বুনোছি, সেই কর্ণধা আজ বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে চলছে, তাই,—

“হৃদয় আমার নাচে যে আজিকে
ময়ূরের মত নাচের
হৃদয় নাচেরে।”

আমরা প্রাচ্যকালীন জলযোগ শেষ করে নৌকার ছাড়ে উঠলাম, এইবার প্রকৃতির উদার নির্মল রূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল—

বর্ষাবিধৌত সুনীল আকাশে খেলা করছে অপূর্ব মাধুরী। গলিত স্বর্ণের মত বালসূর্য্যের স্নিগ্ধ-কিরণে বলমল করছে পৃথিবী। বর্ষসিক্ত রাশি রাশি শুভ্র শেফালী ঝরে পড়েছে প্রভাতের মৃদু-সমীরণে বেন কার চরণে অর্ধরূপে। একদিকে নীল আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে মিতালি পাতাতে বেন মিশে গিয়েছে মাটির সঙ্গে। অপরদিকে বৃকরাজি বেন ভগবানের আবাসস্থল স্বর্গধাম দেখবার অভিপ্রায়ে আকাশের সঙ্গে মিশে বেতে চাইছে। ছোট ছোট গাছগুলি পৃথিবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রণাম জানাবার উদ্দেশ্যে লুটিয়ে পড়ছে তার চরণ প্রান্তে।

আমরা বখন পৃথিবীর এই মনভোলান রূপ দেখতে ব্যস্ত, সেই সময় কোড়ো হাওয়া বওয়ার জন্ত আমরা নীচে নেমে আসতে বাধ্য হলাম। নৌকাখানি আমাদের উদরস্থ করে মাঝগঙ্গা দিয়ে হেলে ছলে এগিয়ে চলছিল তার গম্বুবাহুল বড়নগরের উদ্দেশ্যে। তার ছলুনির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বপ্নও উঘেলিত হয়ে উঠেছিল এক অজানা আশঙ্কার। যদি নৌকাখানি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায় এবং আমরাও যদি সজিল-সমাধি লাভ করি চিরদিনের জন্ত এই আশঙ্কার নিজেদের অজ্ঞান্তে আমাদের অনেকেই চীৎকার করে উঠেছিল। ‘কপালকুণ্ডলার’ বৃক আরোহীর মত আমারও চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করছিল,—‘কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!’ বলে। গঙ্গাবন্ধে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ দেখে মনে পড়ছিল কবিগুরুর সেই কবিতাটি,—

“মস্থল চিহ্নক কুক কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহাজিহ্ব সর্পসম ক্রুর
খল জল ছলভরা, তুলি লক্ষ কণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালারিত মুখ।”

অবশেষে একসময় আমরা এসে পৌঁছলাম বড়নগরে। মূর্তিদাবাদের সাদেকবাগের অপর পারে আজিমগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের একফোশ ঘরে, গঙ্গার পশ্চিমকূলে রাণী-ভবানীর প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বড়নগর। বড়নগরে অবস্থিত অপূর্ব কারুকার্যবিশিষ্ট অসংখ্য মন্দির দেখে মনে হল আমরা বেন হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান বারাণসীতে এসেই পৌঁছিয়েছি। এখানে এসেই বুঝতে পারলাম সেই কবিতাটির সার্থকতা,—

“গঙ্গার পশ্চিমকূল,
বারাণসী সমতুল।”

বড়নগরে বহু দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে রাণী-ভবানীর প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী মূর্তি এবং দ্বাদশ শিবের মন্দির দেখলাম। দেখলাম তাঁরই কন্যা তারার স্থাপিত গোপাল-মন্দির। গোপালমন্দিরের পশ্চাত্তানে একটি গুহ বিঘ্রকের ভলবন্ধে পঞ্চমূর্তীর আসনও

দৃষ্টগোচর হল। এই আসনে বসেই সাধনা করতেন রাণীভবানীর নন্দকপুত্র সাধক রাজা রামকৃক।

বড়নগরের সমস্ত দেখা শেষ করে রাণীভবানীর কীর্তিস্থধা পানে পরিভ্রমণ আমরা পুনরায় প্রবেশ করলাম নৌকাগর্ভে। পৃথিবী তখন সেজেছে এক অপরূপ সাজে। সন্ধ্যা সমাগত, প্রত্যাহের মত সেদিনও সূর্য্য পেল অস্তাচলে, আদিগন্ত আকাশ সোনালী লালে ইমন কল্যাণ গলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা চলল বাসর ঘরে। তখন গরু চরিয়ে ফিরছে রাখালেরা, কাঁপাগলার ডাক বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে ছোট ছেলে ডাকছে পথ হারানো বাছুরকে। পাখীরা কিচির মিচির করে ফিরে বাছে তাদের বাসায়, বাসার ডাক পৌঁছেছে তাদের কানে—

“ওরে পাখী, সন্ধ্যা হ’ল ডাকিছে কুলায়।
সমস্ত গগন ভরে আঁধার পড়িছে ঝরে,
ওরে পাখী অন্ধকারে নীড়ে ফিরে আয়।
বন্ধ কর পক্ষ তোর, ডাকিছে কুলায়।”

দিগ্দিগন্ত ক্রমশঃই ছেয়ে আসছে গভীর অন্ধকারে। নক্ষত্র-বিশিষ্ট অনীম আকাশ বেন অসংখ্য নেত্রে চেয়ে আছে ধরিত্রীর তামসী সৌন্দর্য্যের দিকে, আর পরিপূর্ণা ভাগীরথী ঝরে বাছে বল কল নাড়ে, তরঙ্গ তরঙ্গ নেচে উঠছে তার অগণিত নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব। বেন রাশি রাশি মণি-মাণিক্য চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বাছে সেই তরঙ্গের বৃত্তলাভে,—

“আজি উত্তরোলে উত্তর বায়ে উতলা
হয়েছে তটিনী।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে
পুলকে উছলি ঢেউ ছলোছলে
লক্ষ্য মাণিক বলকি আঁচলে
নেচে চলে বেন নটিনী।”

আমার স্মৃতির মণিকোঠায় চির অমলিন সত্তার বিদায় করবে এই দিনটি। সাহারা মরুভূমি যদি জলাকীর্ণ হয়, হিমালয় পর্বত যদি সমস্তলভূমিতে পরিণত হয়, ভব ভুলবনা, বতদিন আমার নখা দেহ থাকবে জীবিত এই পৃথিবীতে ততদিন আমি ভুলবনা, ভুলবে পারবনা এই স্মরণ মধুময় দিনটির কথা।

মোগল রাজকুমারী

শিবানী ঘোষ

মুসলিম পর্বীর অন্তরাল হতে দেখা বাছে দিল্লী শহরের একটা ভগ্নাংশ। অদূরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে যমুনা। এ নদীর পানে আর তাকিয়ে থাকা যায় না বৈশীকণ। রক্তে রূপ হয়ে গেছে আজকের এই জলধারা। শুধু কি তাই, সবত্র ভয়ঙ্কর আজ হয়েছে অশান-ভূমি। নাদীর পাছের দাপটে চতুর্দিক পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্থলে।

এতদে আর বৈশীকণ দেখা যায় না মোগল সাম্রাজ্যে ধ্বংসাবশেষ। জানালা হতে মুখ কিরিয়ে নিলেন রাজকুমারী

তখন তাঁর চোখ দুটি আগনি গিয়ে পড়ে দেওয়ালে টাঙানো ছবি ছবির পানে। একটি ছবি হচ্ছে তাঁর ঠাকুমা মিহ্নুরিসা বেগমের। তিনি ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের কনিষ্ঠা কন্যা। অপর ছবিটি হচ্ছে তাঁর ঠাকুর্দা ইজাদ বন্দের। তিনি ছিলেন আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা মুবাদ বন্দের পুত্র। এগার বৎসর বয়সে এই মিহ্নুরিসা বেগমের বিবাহ হয় ইজাদ বন্দের সাথে। কি সুখের দিনকালই ছিল সেই সময়। এখনকার মত এমন অশান্তির ঢেউ এসে পৌঁছায় নি মোগল-সাম্রাজ্যে।

—ছবি দুটির পানে চেয়ে কি এত ভাবছো মা? —বয়ে চুকেই বলে উঠলেন দেওয়ার বন্ধ।

পিছন ফিরে পিতাকে দেখে সাহজাদী বলেন—জানো বাবা, তোমার মা-বাবার ছবি দুটো দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছে যদি আমি তাঁদের সময়ে জন্মাতাম তবে কি সুখই না হত।

দেওয়ার বন্ধ বলেন—সত্যি মা, যদি তাঁদের সময়েই জীবনটা অতিবাহিত করে যাওয়া যেত, তবে মোগল-সাম্রাজ্যের এমন ধ্বংসলীলা আর স্বচক্ষে দেখতে হত না। তা বা হোক, ছবির সবুজ আলোচনা পরে হবে। এখন তোমাকে যে কথাটা বলতে এসেছিলাম তা হল—

কি পিতা?

দেওয়ার বন্ধ বলেন—রাজ সুনছি নাদির শাহ, আক্রমণ করবেন এই রাজপ্রাসাদ। অবশ্য সম্রাট মহম্মদ শাহ, তাঁর সাথে সন্ধি করতেই মনস্থ করেছেন। কারণ, সেই পারস্য নৃপতির আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত শক্তি আমাদের বাদশাহের নেই। তা আমি বলছিলাম কি—রাজ তুমি মহম্মদ শাহের অন্তঃপুরে চলে যাও। কারণ, যদি সন্ধির প্রস্তাব গৃহীত হতে বিলম্ব হয়, তবে প্রাসাদের এই দিক থেকেই আসবে শত্রুপক্ষের প্রথম আক্রমণ। কাজেই এখানে থাকলে তোমার বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজকুমারী বলেন—তা থাকুক পিতা। কিন্তু এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। এই ঘরে মা-ঠাকুমা কাটিয়ে গেছেন তাঁদের জীবন। কাজেই এই কক্ষ আমার কাছে জীবনের চেয়েও প্রিয়। যদি মরতেই হয়, তবে আমি এই ঘরেই মরবো।

দেওয়ার বন্ধ বলেন—কেন মা, তবে তাই থাকো। আমি এখন চললাম। রাজপ্রাসাদের এই দিকটার বাত্রে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়, আমি তারই চেষ্টা করবো কিছু সৈন্য সামন্ত নিয়ে। আর তোমার কাছে এই ছোরাটা রেখে দাও। যদি কোথাও কোন বিপদের সম্মুখীন হও, তখন এটা তবু তোমাকে ভরসা দেবে কিছুটা। —বলেই তিনি চলে গেলেন ঘর থেকে।

রাজকুমারী ছোরাটা হাতে নিয়ে একবার পরীক্ষা করলেন তার শাণিত দিকটা। তখন একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে তাঁর ঠোঁটে। নিরোধ মাহুয এই দিকে করতে চায় মাহুযকে জয়, কিন্তু এ দিকে সে যে কত বড় পরাজয় ডেকে আনে তা টের পান অন্তর্ধামী। রাজকুমারী ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ঘরের মেঝের।

এমন সময় তাঁর ঘরে প্রবেশ করে রহিমুরিসা ওরফে কোকি জিউ। কোকি জিউ হল জান্নাহ মহম্মদ নামক এক ঘরামির কন্যা, কিন্তু ঐ ঘরামি আসলে মুসলমান হলেও হিন্দুদের মতই ছিল তার

জ্যোতির শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য। ঘেরেকেও সে শিক্ষা দেয় এই বিষয়ে। ফলে রহিমুরিসাও বিশেষ দক্ষতা লাভ করে হস্তরেখা পণনার এবং কোষ্ঠী বিচারে। এই কারণেই ঘেরেটি বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠে মহম্মদ শাহ এবং তাঁর মাতার। তাই রাজ-অন্তঃপুরে ছিল তার অবাধ গতি। সে ঘরে এসেই বললে—একি কুমারী, তুমি এখানে একলাটি রইলে কেন? সম্রাট যে অন্তঃপুরের সব নারীকে তাঁর নিরুত্তর কক্ষে আশ্রয় নিতে বলেছেন।

রাজকুমারী বলেন—কোন প্রয়োজন নেই কোকি। স্বত্বা যদি ঘনিয়েই আসে, তবে মিথ্যে ইহরের মত ছুটোছুটি করে লাভটা কি?

রহিমুরিসা বলে—আচ্ছা দেখি কুমারী একবার তোমার হাতটা।

রাজকুমারী হাতটা মেলে ধরলেন তার সামনে। তাঁর হস্ত-রেখাগুলো কিছুক্ষণ দেখে রহিমুরিসা বলে—এই যে কুমারী তোমার হাতেই রয়েছে সেই রেখা।

—কিসের রেখা কোকি?

কোকি জিউ ওরফে রহিমুরিসা বলে—কিছু পূর্বে আমি পণনা করে দেখি নাদির শাহের ষাণ্ডা এই রাজপ্রাসাদের কোন কক্ষই হতে পারবে না। তার কারণ সম্রাটের সাথে তাঁর সন্ধি অবতরণাবী এবং সেই সন্ধি মূচতর করার মূলে রয়েছে মোগল অন্তঃপুরেরই এক নারী। কে সেই নারী, তা দেখবার জন্তে আমি সব ঘেরেই হাত দেখলাম। কিন্তু কারও মধ্যেই নেই সেই জিনিষ। তা এখন দেখছি তোমার হাতে রয়েছে সেই রেখা। বাই—এ কথাটা সকলকে বলে আসি।—বলেই চলে যায় রহিমুরিসা।

সে চলে গেলে রাজকুমারী চেয়ে দেখেন নিজের হাতটা। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন যে, তাঁর হাতে কি এমন রেখা আছে যে, তিনি মূচতর করবেন নাদির শাহ এবং মহম্মদ শাহের সন্ধি? আর কি ভাববই তা সম্ভব হবে?

হঠাৎ বাইরে থেকে শোনা যায় জনতার এক প্রচণ্ড চীৎকার।

কি হল! রাজকুমারী তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ান জানালার পাশে। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো বিরাট সৈন্যদল ঘিরে কেন্দ্রে তাঁদের প্রাসাদের এই দিকটা।

নাদির শাহের পুত্র মির্জা নসরুল্লার নেতৃত্বে আজ এগিয়ে এসেছে ঐ দলটি। চতুর্দিকে সুরহ হয়ে গেছে ধ্বংসলীলা আর হত্যাকাণ্ড। তারা ক্রমশঃই এগিয়ে আসে প্রাসাদের দিকে। রাজকুমারীর মনে হয়—এ অবস্থায় ঘরের দরজা খুলে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। তিনি ছুটে বান দরজা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু ঘর বন্ধ করার পূর্বেই উগ্ৰুজ্ঞ তরবারি হস্তে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেন এক সুবাপুত্র।

রাজকুমারী কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন—কে! কে আপনি!

সুবাপুত্র বলে—আমি হলাম পারস্তাধিপতি নাদির শাহের পুত্র মির্জা নসরুল্লা। এর বেশী বোধ করি আর কিছু বলতে হবে না। এবার আপনার পরিচয় আশা করি আমি পেতে পারি।

রাজকুমারী বিস্ময়িত নেড়ে তাঁর পানে তাকিয়ে বলেন—

আপনার মত হত্যাকারী নৃশংস পুরুষ—বারা সোনার ভারতবর্ষ
আজ পরিণত করেছে পুশান-ভূমিতে, তাদের নিকট আমার পরিচয়
দিতে যুগা বোধ করি।

রাজকুমারীর কথা খানিকটা হেসে নসরুল্লা বলেন—আপনার
আকৃতি এবং কঠোর শুনে অসুমান করছি, আপনি দেওয়ার বস্ত্রের
কথা। কিন্তু শাহজাদী, মনে রাখবেন, তিনি এখন আমাদের
কাছে বন্দী।

—বন্দী? পিতা বন্দী হয়েছেন আপনারা কাদের কাছে?

—হ্যাঁ। তা শুধু শাহজাদী, আপনার পিতাকে আমি এখন
বুঝি দিতে পারি যদি আপনি আমার একটি সর্ভ রক্ষা করেন।

—সর্ভ! কি সর্ভ?

—স সর্ভ হচ্ছে আপনাকে আমার সহধর্মিণী হতে হবে।

—কি! কি বললে!! তৈয়ুব বংশের নারী হয়ে আমি
স্বামী রূপে বরণ করে নেবো এক নৃশংস হত্যাকারীকে?

নসরুল্লা বলেন—এখন আপনার এ আশঙ্কন মিথ্যে শাহজাদী।
এইটুকু মনে রাখুন, এখন আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন নাদির শাহের
পুত্র রিজা নসরুল্লার সামনে। এই পারশু যুবক দয়া, মায়ী, মমতা
বলে কিছু জানে না। এর উগ্রুত তরবারি আবালবৃদ্ধ বনিতার
উপর চালিত হয়েছে নির্বিচারে। কাজেই আপনার ঐ মিথ্যে
আশঙ্কনের জবাব কি ভাবে দিতে হয়, তা এর জানা আছে ভাল
করেই।

রাজকুমারী বলেন—মূঢ় বর্ধক, তাই বলে দেওয়ার বস্ত্রের কথা
মাথা মত করবে এক হত্যাকারীর নিকট?

—দেখা থাক করে কিনা। বলেই নসরুল্লা ডাক দিলেন—
রক্ষণ!

রাজকুমারী এককণ লক্ষ্য করেননি তাঁর ঘরের বাইরে সারি
পাশি এসে দাঁড়িয়েছে বিদেশী সৈন্য। নসরুল্লার ডাকে কুর্নিশ
পানিয়ে এগিয়ে এল একজন লোক। তিনি তাকে বললেন—
পিতা বন্দী দেওয়ার বস্ত্রকে নিয়ে এস এখানে।

চলে গেল লোকটি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে আসে বন্দী
দেওয়ার বস্ত্রকে নিয়ে। বন্দী পিতাকে দেখে কেঁদে ওঠে রাজ-
কুমারীর অন্তর।

নসরুল্লা বলেন—বলুন শাহজাদী, এখনও আপনি আমার সর্ভ
হানতে রাজী কিনা? নচেৎ আপনার চোখের সম্মুখে এর ওপর
আমি চালাবো অকথ্য অত্যাচার।

তাঁর কথা শুনে ভয়ে শিউরে ওঠেন রাজকুমারী। তাঁকে
এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হবে, তা তিনি কল্পনাও
করতে পারেননি। এখন একদিকে রয়েছে পিতার প্রাণ, অপর
দিকে নিজের আত্মসম্মান। কোনটা তিনি এখন বিসর্জন
দেবেন?

নসরুল্লা বলেন—তাড়াতাড়ি আপনার মতামত জানান
শাহজাদী। বিলম্বে আপনার পিতার প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে
অসম্ভব হবে।—বলেই তিনি উল্লসিত করেন তাঁর তরবারি।

দেখে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে রাজকুমারীর। মনে হল, তাঁর
পদতল থেকে ভূমি বেন ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। তিনি পরিষ্কার দেখতে
পান, পিতাকে হত্যা করতে তরবারি ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর
বুকের কাছে। কিন্তু না-না-না, এ তিনি কখনই দেখতে পারবেন
না। রাজকুমারী অশ্রুট স্বরে বলে ওঠেন—আমি আপনার সর্ভ
যেনে নিলাম। পিতাকে আপনি রক্ষা করুন।—বলেই তিনি
মানসিক বস্ত্রণায় আছড়ে পড়েন মাটিতে।

তাঁর কথা শুনে যুহু হাসেন নসরুল্লা। তাঁরপর তিনি
দেওয়ার বস্ত্রের বস্ত্রন মোচন করে নিয়ে বলেন—এই কস্তার জন্তে
আজ আপনি ফিরে গেলেন প্রাণ। আর শুধু দেওয়ার বস্ত্র,
আপনি যত পুরুষ। এমন কস্তারত্ব বিরাট যোগল সাম্রাজ্যে আর
হুটি চোখে পড়েনি।—বলেই তিনি ভুলুঠিতা ক্রন্দনরতা
রাজকুমারীকে উদ্বেগ করে বলেন—আর শুধু শাহজাদী, আপনি
আর ব্যথিত হবেন না। আপনার জিদ আমি ভাঙতে পারি কিনা
সেইটুকুই পরীক্ষা করছিলাম। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে
বিবাহ করে অপমান করতে আমি মোটেই চাই না। আজ আপনারা
উভয়েই মুক্ত।

দেওয়ার বস্ত্র বলেন—কিন্তু নসরুল্লা, তুমি আমাদের মুক্তি
দিলেও, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না। এই কস্তাকে আমি
তোমার হাতে সম্প্রদান করে চিরকালের মত বন্দী করে রাখতে
চাই।—বলেই তিনি মেয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাক দেন—কুমারী!

মাথা তুলে রাজকুমারী বলেন—পিতা?

দেওয়ার বস্ত্র বলেন—এঁকে বিবাহ করতে তুমি মন স্থির করে
কেনো কুমারী। কারণ, আজ এই পারশু-যুবকের বে শৌর্ধ, বীর্য
এবং মহত্ব দেখলাম, তাতে বে কোন নারীর পক্ষে তাঁর সহধর্মিণী
হওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কথা।

রাজকুমারী ধীর কণ্ঠে বলেন—আপনার ইচ্ছাই আমার
মতামত পিতা।

এমন সময় তাঁদের কক্ষে ছুটে আসে হুজর শাহির লুত।
তারা সাদা নিশান উড়িয়ে বলে—আপনারা কান্ড হোন যুদ্ধ থেকে।
কারণ, ওদিকে যোগল বাদশা মহম্মদ শাহ সন্ধি করেছেন
পারশুাধিপতি নাদির শাহের সাথে।

দেওয়ার বস্ত্র বলেন—তাঁদের গিয়ে বলা, এদিকে আমরা তাঁর
চেয়েও এক বড় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছি।

নসরুল্লা শুধু এগিয়ে এসে ধরেন রাজকুমারীর হাত-হুটো।
কুমারীর তখন মনে পড়ে কোকি ভিউ-এর কথা। এই পরিস্থিতিই কি
সে দেখেছিল তাঁর হস্তরেখার মধ্যে? হয়ত তাই।

সর্বত্র গৃহিণীরা বলাবলি করছেন
- সার্ফে কাচলে বোঝা যায়

সাদা জামাকাপড় কতখানি ফরসা হতে পারে!

সার্ফে কাচলেই বুঝতে পারবেন যে সার্ফে জামাকাপড়কে শুধু "পরিষ্কার" করে না, ধবধবে ফরসা করে। সার্ফে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। সহজেই সার্ফের দেদার ফেনা কাপড়ের ময়লা টেনে বার করে, কাপড় আছড়াবার কোন দরকার নেই। আর সার্ফে কাপড় যা পরিষ্কার হয় তা, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। এর কারণ সার্ফের অদ্ভুত কাপড় কাচার শক্তি! দেখবেন সার্ফে রঙ্গীন কাপড়ও কেমন ঝলমলে হবে! সার্ফে সবচেয়ে সহজে আর সবচেয়ে চমৎকার কাপড় কাচা যায়। ধূতি, শাড়ী, ফুক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন—এক কথায় বাড়ীর সব জামা কাপড় সার্ফে কাচুন—দেখবেন ধবধবে ফরসা করে কাচতে সার্ফের জুড়ী নেই!



সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় সবচেয়ে ফরসা হবে

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

কবি কর্ণপুর-বিরচিত আনন্দ-বন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

একাদশ স্তবক

১। তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্যসকলি ছটি ভাই—বনে বনে খেলে বেড়াতে বেড়াতে একদিন উপস্থিত হলেন এক ভাণ্ডার-বটের তলার। ক্রোড়ার বিক্রমে কেউ তাঁরা কম যান না। বটগাছটিরও বেশ বাড়ন্ত যৌবন।

সেদিন সূর্যের কী করাল তাপ। পথের ধূলা এক তেতে উঠেছে, বে নখ বুঝি পুড়ে যায়। কে নেবাতে পারে সে ধূলির দাহ? বিহার-মনিগুহা থেকে নিঃসৃত হয় যে নির্যয়ের ধারা, হয়ত পারে তার শৈত্য, আর হয়ত পারে বোড়ো বাতাসের দল, যারা দীর্ঘদিনের শিখা হয়ে লহরিকার কণার ভারে মগ্ন হয়ে ছোটে, ছোটে শিরীষকুলের মধু খেতে খেতে পেট ফুলিয়ে। তাদের সখ থাকতে পারে ঘর্ম-সলিল পান করার। আর একমাত্র ঐ ধরতাপ নেবাতে পারে বনের বিটপিগুলি, মাথার উপর টাঙিয়ে দিয়ে তাদের পল্লবঘন ছায়ার চাঁদোয়া।

ভাণ্ডারবটের ছায়ার বিরাজিত ছিল কুমুদিত এক কুমুদীয়া। কুটীরঘারের এদিকে ওদিকে ছোট ছোট পানীয়শালা। পানীয়শালার কয়েকটিতে ছিল চন্দনগন্ধী জলজরা জলবস্ত্র, কয়েকটিতে পরিসরে সংরক্ষিত ছিল নীতল গন্ধজলের কলস; কয়েকটিতে ছিল বসুধার সূধাতুল্য পক আত্রফলের পানক-বস, প্রশান্ত পরিপালনশীলা বনদেবীদের মত এই পানীয়শালাগুলিই লঘু করে কৃষ্ণহস্তদের পিপাসা ও অবসাদ।

২। কঠে তাঁদের প্রকুর মলিকা-মালিকার আভরণ; কর্ণে তাঁদের শিরীষকুলের স্তম্ভুল অবতংস; কেশে তাঁদের নিফুট কুটজ ফুলের মাল্য,—বলব-কিশোরেরা খেলতে লাগলেন রাম ও দামোদরের সঙ্গে। আর গিরিসত্বের কোলে কোলে, ছায়া-তরুর তলায় তলায়, ধেমুর দল আরামে চিবোতে লাগল জলপ্রপাতের জলে-ধোওয়া নরম নরম ঘাস। দেখতে দেখতে ঘুমে বিমিয়ে এল তাদের চোখ।

৩। বালকদের মধ্যে কেও গেরে গুঠেন পান, কেউ বাজান, কেউ নাচেন; কমল ও বলরাম নাচেন আর কৃষ্ণ বাজান মুরলী, করেন গান, কখনও কৃষ্ণ নাচেন আর বলরাম ও সহচরেরা তোলেন তান। এমনি চলেছে গোপ-বালকদের মেলা এমন সময় মধুরঙ্গি বাক্যের হোজা তুলে জীকৃষ্ণ বলে উঠলেন—

৪। হো: হো: হো: ভাইয়া ভাই হো, এবার নৃত্য গীত ও বাজ তোমাদের খামাইও। এবার এস—আমরা অন্ত খেলা খেলি।

তাঁরা শুনে বলে উঠলেন—

এই তো, আমরা কাছেই তো রয়েছি, দামোদর; বল ভাই—তারপর—কোন খেলা খেলি।

জীকৃষ্ণ বললেন—

তাহলে, দ্বিবাভিভক্ত হোন আপনারা; বলরামের সেনা হয়ে একদল অমুগামী হোন তাঁর, আর একদল আমার।

নির্দীপ্ত হল জীবলরামের সেনা এবং জীকৃষ্ণ স্বপক্ষে বাছাই করে নিলেন তাঁদের বীর্য-দৌড়দার। ঠিক হয়ে গেল জয়-পরাজয়ের পূর্ণ;—পরাজিতের স্বাক্ষরোহণ করবেন বিজয়ী; যে হারবে সে বইবে। আশঙ্ক হয়ে গেল খেলা। জীদামোদরের কপট-খেলা বিখ্যাত। অথচ কি আশ্চর্য, যিনি উদরের মধ্যে জগৎ বনু তিনিই কিনা, সেই পীতাম্বরই কিনা, ছেয়ে গেলেন। তাঁকেই কিনা ফড়ে বইতে হল জীদামকে! কৃষ্ণর চরিত তর্কের অভীত—অনধিগম্য!

৫। ঠিক সেই সময়ে সেইখানে পা-ঢাকা দিতে দিতে সকলের অগোচরে উপস্থিত হয়ে গেলেন এক মহাদৈত্য। বোধ হয় কালক্রম হয়েছিলেন বলেই তথায় তাঁর এই আগমন। দৈত্যভোক্তার প্রথম নামটিই তাঁর। রাখালবেশে তিনি এলেন। এসেই নিজেকেই নিজেকে পরাজিত করে ছুটে গেলেন সেই দিকে, যেদিকে চন্দনগৌর জীসকর্ষণ স্বকীয় রাজিত্যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করতে করতে খেলছিলেন। তারপরে এক ঝটকায় তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে, চোর যেমন করে গুপ্তধন চুরি করে পালার তেমনি ক্রোড়াকৃষ্ণের সীমানা ছাড়িয়ে তরুতল লজ্বন করে সবে পড়লেন।

৬। গণ্ডী ছাড়িয়ে বাহক যার? অতিক্রমের এই বিক্রমে বিস্মিত হয়ে উঠলেন বলরাম। বৃহমল্ল হাসতে হাসতে কিয়ে চাইলেন তাঁর অলৌক মনুজমূর্তি অমুজের দিকে।

চমৎকৃত চীৎকারে বললেন—

দামোদর, এই দেখ, কে এক বেটা আমাকে নিয়ে পালাচ্ছে। পাগলামির ব্যাধি যেমন করে মন নিয়ে পালায়, তেমনি নিজের আনন্দের বেগে বেটা পালাচ্ছে। তুমি তো আছা লোক, মনোরম ছবিটি সঙ্গে এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ? এখনও খেলতে পারছ? দয়া করে এখন একটু ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ করন, বলুন, কি করতে হবে আমাকে?

কৌতুকে রঙ চড়িয়ে ভগবান বললেন—অত অপ্রতিভ হচ্ছন কেন?...শক্র ভয়ে আক্রান্ত হয়েছেন আপনি, বিক্রম দেখিয়ে ওকে বধ করন।

বলতে বলতে জীকৃষ্ণের কণ্ঠধরে নেমে এল সজল জলধের গভীর নির্ঘোষ।

৭। তারপরে সেই মহাদৈত্যের মুণ্ডের উপর দম্বান্দ পড়তে লাগল মধুমথনাগ্রজ জীবলরামের প্রচণ্ড মুষ্টি-মুদগর। মৈনাকের পক্ষভেরী বস্ত্রের সহোদরসম সেই মুষ্টির আঘাত মুষ্টিতে দৈত্যের মুণ্ডপিণ্ডটিকে খণ্ড খণ্ড করতে কত আর সময় লাগে দৌর্ভাগ্যপ্রতাপ বলরামের? এতটুকুও দয়ার প্রকাশ করলেন না বলরাম।

প্রাণত্যাগের পূর্বে সেই মহাদৈত্য এক বিস্তীর্ণ করলেন আশ্রয়রীটিকে, যে তাঁর স্বক্যাবস্থান-কৃত্বহীনী কর্ণধবল হলধারীটিকে দেখতে হল অক্ষাণ্ডের অঙ্গলর একটি পার্শ্বি চন্দ্রমণ্ডলের মত। অবাক হয়ে গেল জনতা।

৮। তুলনা দেওয়া যায় না এক বিপুল ক্ষীতি সেই দৈত্যদেহের। গলগল করে নিরর্গল গলে পড়তে লাগল শোণিতস্রাব। লাগ হয়ে গেল তাঁর ধূম-ধূমল দেহ। সন্ধ্যার স্বক্যেব-সন্ধ্যিত যেন এক

দর্শনের ছবি। বিদ্যাগিরি বেন তার আমল-মৌলি-মিলিত
দশোক-কুলের রক্তসারোহ নিয়ে শোকে আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়ল
ধরীতে এবং সেই নৈশানিপাতের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে,
কুমুদগাঙ্গী গগনবিহারিণীদের কব-বুকুল থেকে হর্ষোৎসবে করে
পড়ল প্রহনের বৃষ্টি।

৯। ভালধর জীবলরামের হাতে নিহত হলেন প্রসিদ্ধাস্বর
প্রলয়। পরম দায়বল অবলম্বন হয়েছিল তাঁর, কলমাতও করেছিলেন
উত্তাল উত্তোর এবং মর্ম-পাপরাশির সংহনন করেছিলেন বলেই
সেই থেকে দেবেন্দ্রাদিবন্দ্য জীবলরামও প্রকান্তে নামান্তর গ্রহণ
করেছিলেন “প্রলয়”।

১০। যিনি নিত্য দান করেন আনন্দ সেই রম্যচরিত দামোদরের
নিকট থেকে এবং তাঁর আসল বালাবকুলের নিকট থেকে—
জীবলরামের অভিমুখে ছুটে এল অভিনন্দন। হান্তে বিশ্বরে ও
হর্ষমদে এক উন্নতি হরে উঠলেন তিনি, যে তিনি বখন বিশ্বামের
জন্ম ভাণ্ডীরঘটের মূলে গিয়ে বসলেন, তখন মনে হল তিনিই বেন
সাত্র শোভার একটি ভাগ।

১১। জীদাম-সুদাম সুবলাদি গোপাল বালকদের সঙ্গে আনন্দে
বিশ্রাম করতে লাগলেন জীবলরাম এবং জীদামোদর। চতুর্দিকে
চেউ খেলছে ববের ক্ষেতে। যেমন ববের দানা, তেমনি ববের
গাছ। অপরিমিত প্রাচুর্য ও সৌরভ। অমুকুল বনুনার কল।
অতএব ধেমুদের ভ্রমণ লাগসার বাধা দেয় কে? তার উপর বখন
কুক রয়েছে নিকটে তখন ভয়ের ও কোনো বালাই নেই। ধেমুর
পাল চক্রে চক্রে দৈব বশত: “ইবীকাটবীর” মধ্যে প্রবেশ করল।

১২। কাশবনে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল ধেমুর পাল। তাদের
হঠাৎ—দেখতে না পেলে আশঙ্কায় ভরে উঠল গোপাল বালকদের
মন। দেখতে দেখতে এল আশঙ্ক, চোখ ভরে উঠল ভলে।
চরাচরগুণ অক্ষয়জনন জীকৃষ্ণ ককশাসুতে-ভরা নয়নেও দেখা দিল
অক্ষবিন্দু। তিনি বললেন—

১৩। “এই, বনের মধ্যে পাখী থাকে, হরিণ চরে। সুমই
এখানকার বল। এতটুকু ও তো ভয় হবার কথা নয় নৈচিকী
গাভীরের অথচ আশর্চ্যা, ওদের একটিকেও দেখা যাচ্ছে না কেন?
দেখতো কি হল? সুখের ধ্বংস ঠিকেন না ঘটে।”

কুক ভারতীর জালবাসা ও শোভার অথগুণ্ডার চকল হয়ে হারানো
ধেমুদের অমুসন্ধানে ছুটলেন গোপাল বালকেরা।

কচিকচি কোমল বাস থেকে থেকে, মাটিতে ধূবের দাগ রেখে
বে সব পথ ধরে ধেমুরা এগিয়ে গেছে সেই পথে চলতে লাগল
ধুমুদের অমুসন্ধান; বন-বাদাক ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল তর তর করে
খুঁজলেন তাঁরা, কিন্তু বৃথা। বেড়ে যেতে লাগল তাঁদের শক্তি।

এদিকে—গোপাল বালকদের বখন এই হেন অবস্থা, নয়নের
কান্তরতা বখন কল্যাণ দেখতে পাচ্ছে না কোথাও, ওদিকে, তখন
ধেমুর ইবীকাটবীর মধ্যে নষ্ট বৃদ্ধির মত দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ
তাদের হঠাৎ যির বেলেছে এক দশদশে দাবানল। কুকনাখা
হলেও আজ তারা অনাথা, পলারনের পথ নেই। কৌশ হয়ে এসেছে
জীবনের আশা, সুখোমুখী দাঁড়িয়ে পড়েছে তারা, আর তাদের
বড় বড় বিহ্বল চোখে অক্ষবিন্দু সাথে সাথে বের করে পড়ছে
ক্রিয়কর্মের আর্ধনা।

১৪। ধেমুদের খুঁজে না পেয়ে অনন্ত চিন্তার আকুল হয়ে
গোপাল বালকেরা পুনরায় যির এলেন জীকৃষ্ণের নিকটে। কারণ,
তাঁরা জানতেন কুকই অমুসন্ধানের সঙ্গ করতেন। বখন বাসনার
কামধেমু, আশ্রিতদের মনোরথ সিদ্ধির চিন্তামণি, এবং নবের
নয়ন-পথিক হলেও তিনিই নরাকৃতিপর পরত্রক।

তাঁরা বললেন—

কোথাও দেখতে পেলুম না আমরা ধেমুদের।

নৈবতকুলের যিনি মুকুট-মহা-মারকত, তিনিও ভাবিত হয়ে
পড়লেন। মড়ক নয় তো? তখনই নিজে বেরিয়ে পড়লেন।
বেমন করেই হোক কিরিয়ে আনতে হবে গাই।

পথ ধরে চললেন জীহরি। আর মেঘমল্ল-ঘরে প্রত্যেকটি গাভীর
নাম ধরে ধরে হাঁক দেন তিনি। সে ডাক বেন আকাশে লাঙ্কিরে
উঠে পুথায় বায় মিলিয়ে। বত চলেন, ততই ঘন ঘন ওঠে ডাক।

সুবলীতে তান মধুর গান ধরেন জীহরি,—আর গানে ভাসে সব
নাম—

“বুদ্ধে নন্দিনি, চন্দিনি, ইন্দুভিলকে,
কন্তুবি, কপূরিকে,
শিল্পে, রত্নিনি, ধুমলে ধবলিকে,
কিজঙ্কিকে, রত্নিনি,
ভামে, কেতকি, চন্দ্রিকে, শবলিকে,
কাশ্মীরিকে, চন্দ্রিকে, . . .”

আর মন্দাকান্তার হী হী হী ববে হাড়িরে বায় সুবলীর মধুর তান
চৌদিকে।

১৫। বিশ্বায়ের মধু-মধুর সুবলীর কলনাদ অমৃত চলে দিল
ধেমুদের কানে। বাবা চিরকাল চিন্তা করে এসেছে জীকৃষ্ণের পথ,
কৃষ্ণের পথামুসরণই বাদের আশায়িত করে বেখেছে প্রাত্যাহিক জীবন-
ধারণে, অন্তঃকরণে এনেছে বিশ্বাস, আশু প্রাপ্য করেছে আশ্রয়,—
দাবানল যেবা সেই ধেমুসংহতি আজ কেবার পথ বন্ধ দেখে আকুল
হয়ে উঠল প্রত্যুত্তরহীন এক চঞ্চলতায়। তাদের মুখ থেকে শেষ
পর্বস্ত বেকল কেবল হুয়া, হুয়া, হুয়া।

কিন্তু সেই বাণীর গভীরতার, তরহীনাবয় সৌন্দর্যে, সে আবেগন
ছিল সেটি পৌঁছে পেল জীভগবানের জগরে। মৌনী দশমীদের ও
শমীদের যিনি মন ও বাক্যের অগোচর, তাঁরও গোচর হয়ে গেল সেই
হুয়া, হুয়া, হুয়া, তিনি শ্রীতি হলেন।

১৬। এবং ঘোবেধরনন্দনের সেই শ্রীতি সেই আনন্দ বেন ক্রীড়া
করে উঠল কুতূহলী হলগারী বলরামের সঙ্গে সঙ্গে সহচরদেরও অন্তরে।
সে এক হর্ষে, তৃপ্তির, মদব্যাপ্তির সম্পূর্ণতা। বেন বকমকে শত
শত দস্তের জুড়াহস্তে ধবস্ত হয়ে গেল কানন-গহবরের অঙ্কার।

১৭। পথ চিনিয়ে দিল ধেমুদের ধনি। জীকৃষ্ণের পাছু
পাছু ছুটলেন সকলে। তারপরে বলরাম ও জীকৃষ্ণ দেখতে পেলেন—
ইবিকাবনের অভ্যন্তরে বককহীন অবস্থায় ধেমুরা অবসর হয়ে
কাঁপছে, শীর্ণ হয়ে গেছে তাদের উৎসাহ, চতুর্দিকে অরণ্যবহির
তপ্ত গভী। হার হার করে চাঁকার যিরে উঠলেন জীকৃষ্ণ। কে
ভাবতে পেরেছিল মৃত্যুপথের পথিক হয়ে এরা হঠাৎ এমন বিপত্তির
মধ্যে এসে পড়বে, ভাবতে ভাবতে জীকৃষ্ণের ব্যাকুল নয়নের দৃষ্টি
জ্বালার অক্ষুণ্ণিতে চকিত হয়ে উঠল। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর

দিকে চেয়ে রয়েছে খেঁড়া, খাঁড়া কাঁচা, ককর প্রবাহিনী বেয়ে তাঁর কাছে ভেসে আসছে তাঁকের মানস-ভরণী। অসৌম্য করণার ভয়ে উঠল তাঁর মন, বিগত হয়ে উঠল হৃৎ। তিনি বুঝতে পারলেন -- আকাশে যদি মেঘও জমে, জলও চলে, নিববে না এই আকাশচাষিনী বনবাহির জালা। নেবানো অসম্ভব।

তাই আবার পূর্ববৎ অপূর্ব হয়ে উঠল তাঁর শ্রীকৃষ্ণছবি। তাঁর ইচ্ছা হোলো, অলঙ্কারী কোলেও তিনি তাঁর তাত্‌কালিক সহস্রাত ঐশ্বর্য-শক্তি দ্বারা পান করিয়ে ফেলবেন সেই অনল। তাই অহুচরদের সম্বোধন করে বললেন—

১৮। “তোমরা সকলে চোখ ঢেকে ফেল; আনন্দ কব; ঘোচন করাও আপন মোহ।”

আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে লঘালক গোপবালকেরা পরিপূর্ণ বিশ্বয়ে আচ্ছাদিত করে ফেললেন তাঁদের নয়ন। এবং সেই মুহূর্তে, কৃত্যবিশারদ ব্রজবাহু-তনয় কয়ল-কলিকার মত নিজের করতলটিকে তুলে ধরলেন নিজের অধরতটে; যেন তিনি এক গুণেই অমৃতের মধুধারার মত আনন্দে পান করতে চান অনল। এবং সেই মুহূর্তে পৃথক্ এক প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করে প্রকট হয়ে গেল তাঁর ঐশ্বর্য-শক্তি। এবং সেই শক্তি মুখেই শ্রীভগবান নিজেই যেন অপূর্ব নৈপুণ্যে পান করে ফেললেন দাবানল। শক্তির অক্ষততার পরিচয় রইল না কোথাও।

১৯। অস্তও রয়েছে যন রসদাতা, বীর রস-বর্ষণে অস্ত হয় অরণ্য বহির; কিন্তু ওরে মন জেনে রেখো, এই একটাই মাত্র রয়েছেন যনরসদাতা বীর করুণাঘন নয়নের একটি কটাক্ষেই নির্ধাপিত হয়ে বীর মানব-সংসারের নিত্য দাবজালা। সকল-সৌভাগ্যবতী শক্তির দাক্ষিণ্যে তিনি যে একটা তুচ্ছ দাবানলকে সংহার করতে পারবেন এবং শান্ত করতে পারবেন গোকুলের প্রাণরক্ষি-সম খেঁড়দের, এর মধ্যে কোথাও নেই বিশ্বের অবকাশ।

২০। এবং যিনি অখণ্ড তেজঃস্বরূপ, যিনি উৎসক-সিদ্ধিকারী ও বর্কাসুরের শত্রু, বহুল প্রভাব প্রভার যিনি ভবন বিশেষ, তাঁর জ্যোতির্ময়তার আধারে দাবানলছলে একটি খণ্ডতেজ যে প্রপট্ট হয়ে বাঁবে একে আর আশ্চর্য কি? আর সত্যই খণ্ডতেজের মত একটি অপ্যাঙ্কে কেমন করেই বা থাকতে পারে ঈশ-ভাব? এমন কোনো পণ্ডিত নেই যিনি অভিনয়ন করলেন না শ্রীকৃষ্ণ বিঘ্নক বুদ্ধির এই সারস্বত। অতএব অমারই শ্রীকৃষ্ণে ধাঁরা নমোবিধান করেছেন, কালের গতিবেগে তাঁদের যে কখনও বিকল হবে না জন্ম, এই কথা সিদ্ধ হল।

২১। অমৃতধারাত্মক বধন গীত হয়ে গেল দাবানল, তখন উল্লসিত হয়ে উঠল দেবতাদের আনন্দ। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের প্রণামাঞ্জলির সঙ্গে সঙ্গে নন্দকিশোরের অভিব্যুখে বধন বয়ে পড়তে লাগল জন্মর মালা-সুন্দর নন্দনকুসুমাজলি, তখন মনে হল দিব্যালোক থেকে ঐ বুদ্ধি কাজল-টানা হাজির চোখের আনন্দ-জল রয়েছে।

২২। দেবতাদের বন্দনাগানের অহুমোহন করতে করতে পতাবিক খেঁড়র সঙ্গে সঙ্গে গোপেশ্বরেরও শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে এসেন নির্মল হারানীতল ভাণ্ডীরভক্তভলে...অলঙ্কিতে ও আশ্চর্য্যে বলে। ভক্তঃপর প্রকাশ্যে বললেন—

হে বরসুগুণ, আধার দিকে এবার তোমরা নয়ন মেলে চাও।

চাকা চোখ খুলে গেল গোপবালকদের। আনন্দের নিবিড় বিশ্বরে তাঁরা বলে উঠলেন—

আশ্চর্য, আমরা কি পাগল হয়ে গেছি, না স্বপ্ন দেখছি? কোথায় পালালো দাবানল? লক্ষণ পর্য্যন্তও চক্ষে পড়ছে না। কোথায় বা গেল সেই ইবিকাবন? আর ভাণ্ডীরবটের ভলায় আমরাই বা এলুম কেমন করে? আর এই খেঁড়গুলিও?... আশ্চর্য!

২৩। প্রশান্ত হয়ে গেছে অরণ্যবহির, অতএব শান্ত হয়েছে নৈচিকী গাভীর মন, মুখে তাঁদের আচ্ছাদনের বিলাস, আনন্দমত্ত অক্ষবেগে স্তিমিত তাদের দৃষ্টি।...ভালবাসার প্রাচুর্য্যের প্রণয়ন করতে করতে তারা যখন অহুসরণ করতে লাগল শ্রীকৃষ্ণকে তখন মনে হল তাদের লোচনগুলি যেন পান করছে পরম প্রেমাস্পর্শকে, রসনাগুলি লেহন করছে কুপাময়কে, প্রমোদ-প্রকাশিকা নাসিকাগুলি যেন জ্ঞান করছে গোপেশ্বরতনয়কে। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর করুণা-কোমল অমলকণ করতল দিয়ে প্রত্যেক সৌরভেরী গাভীটিকে দান করতে লাগলেন স্পর্শ সুখশ্রীতি।

২৪। দেখতে দেখতে দিব্যবসান হয়ে এল। যে প্রতাপী নির্দাষ পূর্ব সমস্ত মধ্যাক্রম ব্যোপে জনতার আপদ হয়ে বিবাহ করছিলেন, তথাৎ তাঁর বদলে গেল মন। তাঁর বাসনা হোলো আকাশের শোভা-বিহার ছেড়ে অমুক হয়ে এবার তিনি ধীরে ধীরে নেমে এসে প্রবেশ করবেন অস্তসিঁরিব মণি কন্দরে। অতএব তিনি সংহার করলেন তাঁর তীব্র ভেজ, শূন্য-দর্শনীর হলেন বিশ্বলোচনের। শীতল হল তপ্ত ভূতল—প্রবল দাহকরের বিরতিতে মধুধামেচের মত। নির্মল হল পদ্মসারের যৌক্তরান কমলমল।

পদ্মসারের মকরন্দ স্বরিয়ে রসের হাসি হেসে উঠল শিরীরকুলের প্রকুলতা। সরোবরে স্নান করে পদ্মের মধু খেয়ে অলস হয়ে বিমিরে এল জন্মরয়ের উচ্ছীনতা। পবন-গন্ধে অধ্বিত হয়ে তারা সেবা করতে লাগল দিব্যবাসনের।

মুরলীতে ধ্বনি তুলে ব্রজের পথ ধরলেন নন্দকুমার। সায়রে অপরাহু-স্নান সেরে সহচরদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীবলরামের সঙ্গে গোষ্ঠ থেকে ফিরে চললেন শ্রীকৃষ্ণনয়ন। সিন্ধু তহুও এক পুঞ্জী হয়।

পথ চলেন শ্রীকৃষ্ণ, আর ব্রজবাসী পথিকদের নয়নে মেতে ওঠে উৎসব। ব্রজের দিকে খেঁড়ের মুখ কিরিয়ে চলেন শ্রীকৃষ্ণ জলাশয়ের তরঙ্গশীতল অতকূল বাতাস তাঁর গায়ে এসে লাগে। পো-খুরের অল অল রেণু উড়িয়ে এগিয়ে এগিয়ে ছুটে যায় বাতাস, আর শ্রীকৃষ্ণের ভাঙা ভাঙা বাবরি চুল, মাথার পাগ—সাদা হয়ে বা রেণুতে। শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে পথিক হয়ে দেশ-দেশান্তরে ছুটে যায় বাতাস।

কৃষ্ণের মধুর অধরে বাজে মুরলী। মুরলী-বহ-মাদুরীতে আধর হয় কানন ভক্তলতিকার নীত-সোহাগী পাখীর মল। পথ-চাওর বিয়হী হরিণদের দূব হয়ে যায় চুর্ভিদ হৃৎ। তাদের চিরতরুণ অমৃত মন আনন্দিত হয়ে ওঠে মুরলীর গানে।

আর যখন দক্ষিণ-সমীর-বিকম্পিত কাননের সীমানা হাড়িত বেরিয়ে এসেন শ্রীকৃষ্ণ, তখন কাননের বুকের অলঙ্কার, মীল মানিক্যের মালার মত ঐ ভ্রমরের মীল,—তাঁর পরসুখের সৌরভে যে অস্ত হয়ে অহুসরণ করে এল তাঁর—ব্রজের পথে কিরিয়ে। [কমলা:

আজ বাতায়...

লক্ষ পারিবার তৃপ্তির সাথে

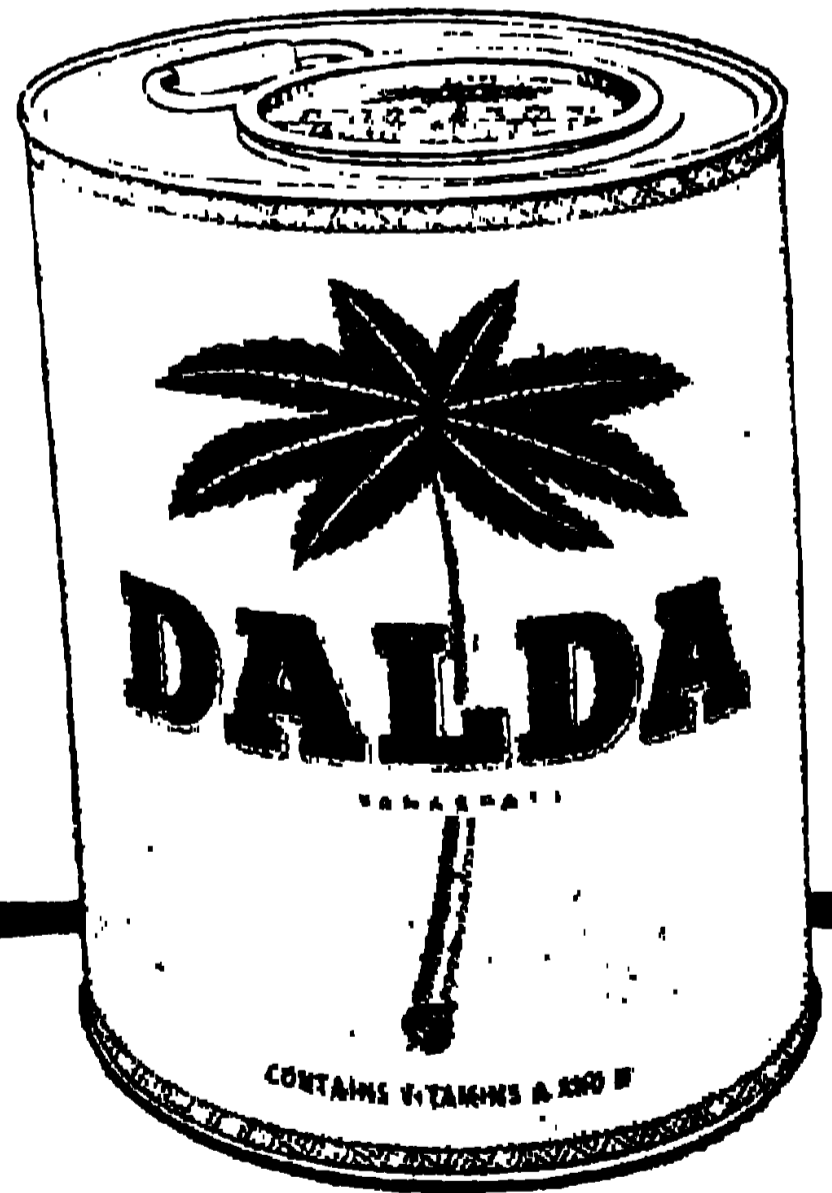
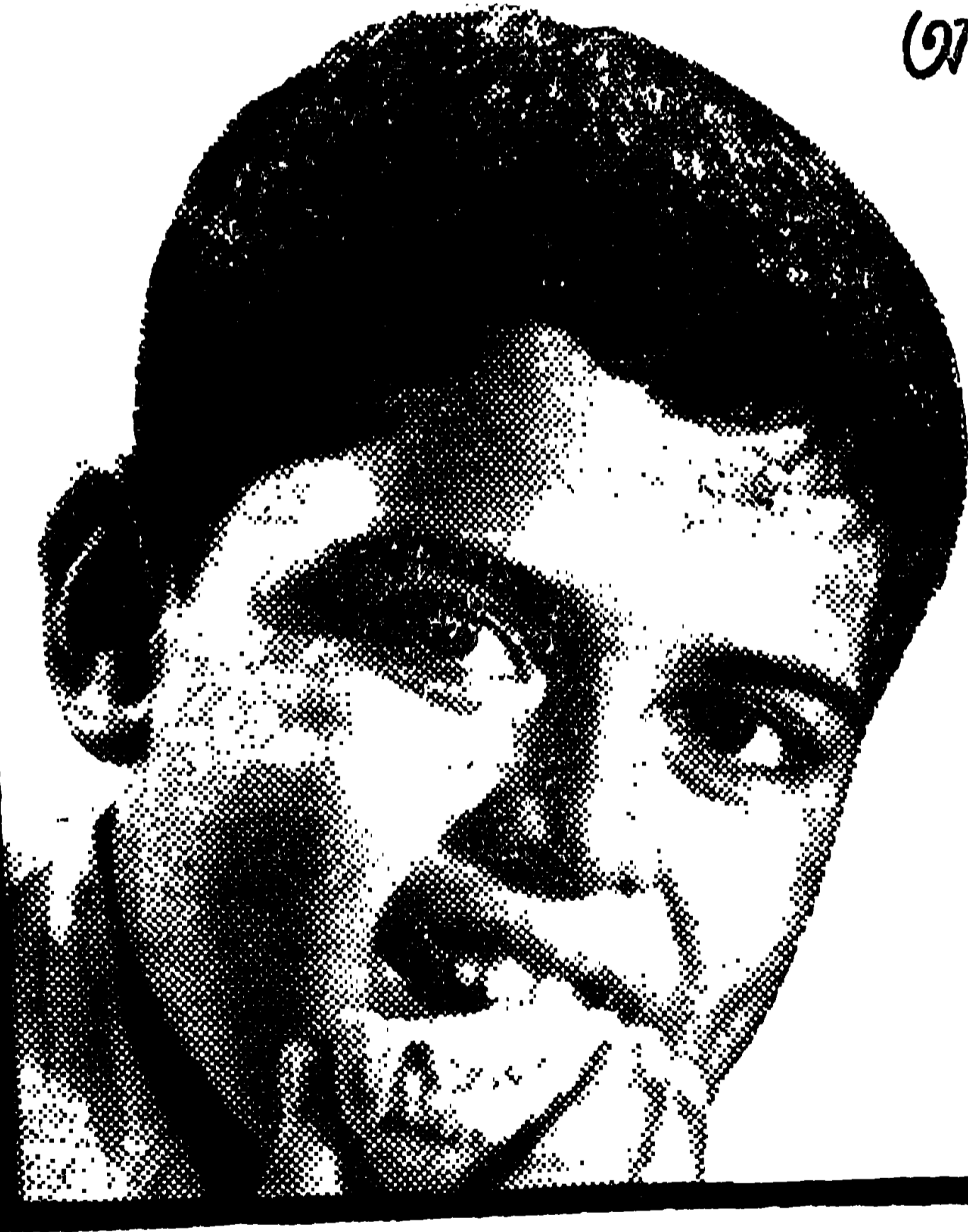
ডালডায় বাঁধা

খাবার খাবেন

আপনার পরিবারইবা

বঞ্চিত

হবে কেন?



ডালডা একটি খাঁটি জিনিষ। কারণ সবচেয়ে খাঁটি ভেষজ তেল থেকে তৈরি। এবং ডালডা পুষ্টিকরও বটে; কারণ স্বাস্থ্যের জন্য এতে ভিটামিন যোগ করা হয়েছে। তাই মাছ মাংস, শাক-সব্জী, তরিক-তরিকারী ডালডায় বাঁধলে সত্যিই সুস্বাদু হয়। আজ লক্ষ গৃহিনী তাই তাঁদের সব রান্নাতেই ডালডা ব্যবহার করছেন। আপনিইবা তবে পেছনে পড়ে থাকবেন কেন?

ডালডা
বন স্রুতি

হিন্দুহান লিডারের তৈরী

DL.53-X52 BO

অকাল বোধন

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ভগবান শ্রীমামচন্দ্র সীতা উদ্ধারকল্পে রাবণ বধ প্রয়োজনে আত্মপক্তি ভগবতীর পূজা করিলেন। মঙ্গলঘণ্টে সঙ্গ করিলেন অষ্টোত্তর শত নীলকমল অর্ঘ্য দিব সর্বমঙ্গলার উদ্দেশে। কিন্তু মাতা একটি কমল হরণ করিয়া ভগবানের ভক্তি পরীক্ষা করিলেন। ভগবান যখন সঙ্গ পূরণে চক্ষু উৎপাটন করিতে বসিলেন তখন মাতা দশভূজা মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, "হে স্বামী, তুমি স্বয়ং বিষ্ণু, এ কি করিতেছ ?" শ্রীমাম অমনি বিষ্ণুশক্তিতে উদ্ভূত হইলেন। মহাশক্তি যে শক্তিতে উদ্ভূত করেন, ভক্তিপরায়ণ সেই শক্তিতে শক্তিমান।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মায়ের পিত্রালয় গমন কেমন করিয়া বর্তাইল, বুঝিতে পারিলাম না। আগমনী-সঙ্গীতে মায়ের পিত্রালয় গমন সূচিত হয় এবং আমাদের হিন্দু সমাজ, বিশেষ করিয়া বঙ্গ নরনারীর ভাষা, ভূমিকায় এবং আচরণে প্রতিপন্ন হয় কল্পাপরিমা। দশভূজার জন্মভূমি পাগলের প্রলাপ! দশভূজার আবির্ভাব মহিমান্বয়ের উৎসাহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের তেজে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নিজ নিজ অস্ত্র প্রদান করিয়া শক্তিপূজা করিলেন। কুবের হার, কেয়ুরাদি দিয়া মাতাকে সন্মানিত করিলেন। মাতা অবলীলাক্রমে মহিমান্বুরকে বধ করিলেন। ইহাতে সূচিত হয় কি মাতার পিতা-মাতা বৃত্তান্ত? অস্ত্র উমামাহাত্ম্যা এবং দক্ষযজ্ঞে মাতার পিত্রালয় গমন। কিন্তু শিব অপরাধে মাতা আব কৈলাসে কিরিলেন না; আহা শিব অপরাধের কি মহাত্মা, মর্ত্যে বাহারি পীঠস্থান।

লেখকের সিদ্ধান্ত—মহাশক্তি দশভূজার পূজা ভগবান ব্যতীত অন্য কাহারও করিবার শক্তি নাই। দশমীতে বিসর্জন প্রথা অপূর্ণ। মহাশক্তি দশভূজার বিসর্জন কি কখনও সম্ভব হয়? বিসর্জন পড়া, কামনা-বাসনা বিসর্জন। ভগবানের কামনা সীতা উদ্ধার এবং রাবণকে পরম ভক্ত বলিয়া অসংকে জানাইবার বাসনা। যখন রাবণ বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিলেন তখন কামনা বিসর্জন দিলেন এবং রাবণ, মামচন্দ্রকে নীতি উপদেশ দিবার প্রাক্কালে স্বয়ং দশ মুখে ব্যাখ্যা করিলেন—"ভগবান শ্রীমামচন্দ্র আমার পরম ইষ্ট।" অমনি বাসনা বিসর্জন হইল। সত্য বাক্যে সত্য প্রতিজ্ঞা, কামনা বাসনা বিসর্জন মহাশক্তির মহাপ্রসাদ। ভগবান শ্রীমামচন্দ্র বন গমনে ব্রহ্মচর্য আচরিত হইয়া শক্তিপূজা করার শক্তি পাইলেন, কিন্তু বর্তমান জীব-জগৎ যে তাহা দশভূজার পূজা করে তাহা ভগবান শ্রীমামচন্দ্রের নীতিবিরুদ্ধ। ভগবান, বানর ভক্ত, রাক্ষস কত শত অক্ষৌহিনী সৈন্য লইয়া একমন, একপ্রাণ, একধর্ম, একআত্ম হইয়া পূজা করিলেন, কিন্তু আমাদের অলিতে গলিতে মায়ের পূজা হইতেছে, চাঁদা আদায় উত্তল করতঃ পূজা করিতেছি, কিন্তু ভগবান শ্রীমামচন্দ্রের মাতৃপূজার চাঁদা তুলিয়া পূজা করা চণ্ডীতে বা দেবীভাগবতে উল্লেখ আছে কি? কাণ্ডেই জীবের অপরাধে শিবের মহাত্মা, আহা, শিবের কত করুণা। কিন্তু আমরা জীবের কাছে অপরাধ করিলে রাজস্ব ও ধর্মও চুই হওতে দণ্ডিত হইয়া পূর্বাণর তুলিয়া বাই। এই তুল সংকারে বাহারি পীঠস্থান। এহলে বিশ্বাসকে এক নিঃশ্বাস বলা হইয়াছে। বিশ্বাস হইলে তবে শক্তি ভক্তি প্রকাশ। ভক্তির বন্দনা ভোগ—ইতি ভক্তি,

শক্তির আরাধনা ব্রহ্মচর্যে ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মচর্যে ব্রহ্মচর্য শক্তি নামে অভিহিত।

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী শিবাভ্য। বতপি আমরা দুর্গাপূজা অলিতে গলিতে করি, তথাপি দুর্গতির অস্ত্র নাই, কেন বল দেখি এরূপ হয়? যদি বলিতেই হয় তবে সত্য বলাই ভাল, কলিতে দুর্গাপূজা করিবার শক্তি কাহারও নাই, ভক্তি হইবে কেন? শক্তি, ভক্ত অভাবে জানের পরিবেশ কঠোর কঠোর। সকলেরই বঠ জানের কথা বলিতে, উপদেশ দিতে সুদক্ষ। সুদক্ষ বলিতেছি এই যুগধর্ম। এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যিনি জানের উপদেশ দেন নাই? স্বয়ং দেখেছি, জানীর নিকট আগমন করিয়া বলেন "দর্শন করিতে আসিলাম" কিন্তু দর্শনে 'পত্রং পুং কলম্ তোয়ম্' গীতার মহাবাক্য, কিন্তু সেদিকে জানের উৎকর্ষ অস্তিত্ব। অন্তেদাত্মা বলিয়াই অনেক কথা বলিয়া যান, "আপনার ইহা করা উচিত, ইহা অসুচিত ইত্যাদি" অতএব নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, কলিযুগে জ্ঞান ভিন্ন অস্ত্র কিছু নাই।

ইত্যবসরে একজন দর্শনাভিলাষী আসিয়া বলিলেন, "আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, বহুদূর হইতে আপনার নাম শুনিয়া আসিয়াছি, কিছু তত্ত্বকথা বলুন।" এই বলিয়া স্বয়ং তত্ত্বকথা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, তখন বলিলেন, "আমাকে অনেক দূর বাইতে হইবে, এখানে প্রসাদ পাইয়া যদি বাই আপনার অনুবিধা হইবে কি?" এক্ষেত্রে বতই অনুবিধা হউক, তিকা করিয়া আশ্রম চলে, তথাপি তাঁহার অনুবিধা করিতেই হইল। কোন কোন ক্ষেত্রে বাইবার গাড়ীভাড়া চাহিয়া বসে। বিশেষ পরিচিত বলিয়াই বাওয়ার ভাড়া প্রস্তাবে করুণা-সিকন করেন, আর বলেন, "আমাদের বাবোয়ারী পূজাতে আপনার সাহায্য, বিশেষ সাহায্য বলিয়াই আমাদের কমিটি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমরা গৃহী, ছেলেমেয়ের কাপড়-জামা ইত্যাদি কিনিতে হয়, কোথা হইতে কিনিব তাহার ঠিক নাই, আপনার তো এ সব বালাই নাই, অতএব আপনাকে মোটা টাকা দিতেই হইবে, এই সব সংকাজে আপনারা যদি না দেন তবে সংকাজে উৎসাহ কাহার দিবে বলুন তো?"

উত্তরে বলি, "আচ্ছা আশ্রম, নমস্কার, বাহা দিলাম, তিকা করিয়াই দিলাম, সন্তুষ্ট হউন, দেখিবেন কষ্ট হইবে না।" অনন্তর নিবিষ্টচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম, এ কি অসম্ভব বারতা, ইহা তো ধর্ম নহে, নীতি নহে, তৎপরমুহূর্তে মনে হইল কলির মহাত্মা।

কলিতে জড়বিজ্ঞানের প্রাধান্য। জড়বিজ্ঞান জমির সার প্রস্তুত করিতেছে, গোময়ের প্রয়োজন হয় না, জমি চষিবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, বলদের প্রয়োজন হয় না। বলদের দ্বারা জমি চষিয়া, গোময় সার দ্বারা উর্বরা করিয়া কসল সংগ্রহ করিলে, সেই কসলে (হবিত্তে) বস্ত্র করিলে মেঘ বারি বর্ষণ করে। দেবতা তুষ্ট হওয়ার যে অন্ন পাওয়া যায় সেই অন্ন ব্রহ্মচর্যের পড়া শ্রুগম। এজন্য ব্রহ্মবিদগণ বলিয়াছেন—"অন্ন ব্রহ্ম" কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, হে বন্ধুসকল, কলির প্রভাবে ধরিত্রীমাতা ওলট-পালট হইয়াছে, অস্ত্র ইহা নুতন নহে, যুগে যুগেই এই একই বৃত্তান্ত। বৃত্তান্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্য, যথা, যে যুগ অতীত হয় সেই যুগই ভাল ছিল, অতএব হে বন্ধুগণ, আমাদের ভাল বলার কসনা কি ভাল? কাসেই এখন কসনা সংবৎ করা বিশেষ প্রয়োজন, তাহার পর আর বাহা সংবৎ করা প্রয়োজন তাহা আপনিই হইবে। ইহাতে পাতকল প্রণিধান

চিত্তবৃত্তি নিবোধ যোগনিধান। বলা বাহুল্য, ভোগ করিতে হইলে যোগের প্রয়োজন, নতুবা ভোগাসক্তি বাড়িবেই। আসক্তিই তো আত্যন্তিক দুঃখের কারণ, কারণ সুখের ইচ্ছাই তো দুঃখের বসন্ত ভ্রাতা। বসন্ত বিধানে নিধান পরিচয়, বড়টির মাথা ধরিলে ছোটটির ধরিয়েই, বড়টির পেট খারাপ হইলে ছোটটির পেট খারাপ হইবেই। এইরূপ সংক্রামক ব্যাধিতে ব্যাধিগ্রস্ত হমক ভ্রাতার নাম শরীর ও মন। বসন্তের সুখ বৃত্তান্ত, "আমি সুখী হবো আর কেহ যেন সুখী না হয়। সুখী দেখিলেই গাভ্রজালার অলঙ্ক বিবরণ, দিনে ডাকাতি, চুরি, হরণ এই সব কলির প্রভাব নিরাক্রম চটয়া একপদে তপস্রা করে। কলিতে এক পাদ ধর। এই তপস্রার ফলে হাপরে চুরি হরণ দুই প্রচলিত। ভগবান জীকৃক বাল্যকালে নবনী চুরি করিতেন, পরে বস্ত্র হরণ, ক্রীড়নী হরণ, পারিজাত হরণ এবং সখা অর্জুন দ্বারা স্তম্ভ্র হরণ করাইলেন। অতঃপর ত্রেতার সীতা হরণ, বাহাব ভক্ত অকাল বোধন।

অকাল বোধন ত্রেতার অক্ষয় কীর্তি, ত্রেতাতেই অকাল বোধন, কালবন্দনা নহে। এ-হেন পূজা ভগবানেই সম্ভব হইয়াছে, এখন অকালে ত্রিকাল দোষ। বধা—পবিত্র অন্নাত্যব, পবিত্র জলাভ্যব, পবিত্র ফলাভ্যব, একত্র ব্রহ্মচর্যের অভ্যব। বাস্তবিত্যের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না, এখন নৃত্তিকাগার হাসপাতালে। সন্তানের চক্ষু উৎপাটনের চক্ষু নাই, অক্ষ, বাল্যকালেই চশমার প্রয়োজন হয়। আবার কোন কোন সন্তানকে পেট চিরিয়া বাহির করিতে হয়। উক্ত সন্তানগণ আজীবন গর্ভবস্ত্রণা ভোগ করে। কারণ, ত্রিবিধ মাতা সংকাব হইল না, বধা ধরিত্রীমাতা, ধাত্রীমাতা, গর্ভধারিণী মাতা। বর্তমানে ত্রিমাতা সংকাব না থাকায় গায়ত্রী অপবাধ। ত্রিসক্ষা গায়ত্রী বন্দনার ত্রিমাতার রূপ বর্ণনা আছে, বধা বালিকা, বৃবতী, বৃদ্ধা পরিবেশ। এই মাতার ত্রিবিধ পরিবেশে ত্রিশক্তি ত্রিবিজ্ঞা সর্করূপ রক্ষা করেন। রক্ষাকল্পে শাস্তি, শাস্তি প্রত্যক্ষ হয় ত্রিপুত্রীতে। ত্রিপুত্রীতে গঙ্গা, যমুনা, সরযুতী। গঙ্গাতটে মহেশ্বর, যমুনাতটে বিষ্ণু এবং সরযুতীতে ব্রহ্ম। ত্রিদেবই একসঙ্গে বর দান করেন। বর দানের মাহাত্ম্য আত্মদর্শন, নির্করণ, নির্করণ, মহানির্করণ।

হে পাঠকবর্গ, আমাদের জন্মবৃত্তান্ত অত্যন্ত অল্পতাপের যোগ্য গর্ভবস্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক, অধিক, অধিক। তিন অধিকে শরীর, মন, প্রাণ এবং বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচার। এক্ষণে লেখকের বিচারে কলিবৃত্তান্তে নাম-সর্কর্করণ এবং পদব্রজে বাহার্য পীঠস্থান দর্শন। বানবাহনে পীঠস্থান গমনে আমোদ-প্রমোদ বর্তায়।

হে ভগবান, রক্ষা কর, কমা কর, করুণা কর, আমরা অকাল

বোধনে আমোদ-প্রমোদই করিলাম। অত বিজয়া উৎসব, কিন্তু মাতৃদর্শন হইল না, ছুটিলাম স্বর্ণমুগের পশ্চাতে, এদিকে সুযোগ পাইয়া অহংকাররূপী বাবণ আমাদের বিজ্ঞাপিনী সীতা দেহীকে হরণ করিলেন। তৎপরিবর্তে "নাক-কান কাটা সুর্পনখা"কে পাইয়া বিজয়া উৎসব করিলাম। সুর্পনখা অবিজ্ঞা, অবিজ্ঞাতে মাতিয়া গেলাম, মজিয়া গিয়া মরিলাম প্রায়; মরিতাম, নিশ্চয়ই মরিতাম, কিন্তু অবিজ্ঞা বাক্চাতুর্যে বক্তৃতা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, অথচ শক্তি নাই অবিজ্ঞাকে দমন করি, শ্রমণ করিয়া বশীকৃত করি, বশীকৃত করিতে হইলে আত্মায় আত্মায় রমণ করিতাম, বলিতাম সীতা মহালক্ষ্মী, রাম মহাবিকু এবং বাবণ কুস্তকর্ণ পরম ভক্ত জয় বিজয় তাৎপর্য কুস্তকর্ণ সর্কজয়কারী এবং বাবণ সর্কবিজয়ী, অতএব বিজয়া উৎসব মহোৎসব নামে পরম মঙ্গলে চতুর্কর্গ চরিতার্থ হইয়া চরিতার্থ করিল শাস্ত, বৈক্যব, শৈবকে। কিন্তু আমরা সুখ-প্রাণ সম্প্রদায় বাদ বিবাদে। সারা জীবন গেল, এখন জীবনান্ত কাল উপস্থিত, নির্কিবাদ হইতে পারিলাম না।

পাঠকবর্গ, লেখকের আমোদ-প্রমোদ আর ভাল লাগে না, পদব্রজে পীঠস্থান বাহার আর শক্তি নাই, কাজেই, ছোট ছোট বালকদিগকে বত্রিশ অক্ষয় মহামন্ত্র নামাবলী গায়ে দিয়া, বৈক্যব তিলক পরাইয়া, গলে ভুলসীমালা পরাইয়া নগর কীর্তনে বাহির হইয়া দেখি কত সুলভ চক্ষু চাক্ষুবে অস্তরে কত শাস্তি। এইরূপে কলি সংকাবে, কলি ধীরে ধীরে বর্কুল বিলীন হইয়া মহাকালে নির্করণ লাভ করিবেন।

ও শান্তম্ অধিতীয়ম্ ॥

উপসংহার

ভগবান জীরামচন্দ্র অকাল বোধনের নিয়ন্তা, কিন্তু সময়বাহ্যে কাল ভুক্তি করিয়া সীতা উদ্ধার করতঃ বাবণ এবং কুস্তকর্ণকে তিন জন্মের অভিশাপ এক জন্মে সার্থক করিলেন। জড়বিজ্ঞান এবং চৈতন্যবিজ্ঞান সত্য সংকাবে উত্তর বিজ্ঞানকে স্বীকার করিয়া অথচ বটাইলেন। কিন্তু আমরা একটি বিজ্ঞানের উপর বৌক দিয়া অকৃতকাব্য হই। বধা জড়বিজ্ঞান দ্বারা ভূমি কর্বণ—এবং ভূমি উর্কণ করিবার প্রণালীতে আপাততঃ আশাতীত ফসল পাই বটে কিন্তু ভূমির শস্ত দানের পরিমিত আছে, জড়বিজ্ঞান দ্বারা সেই পরিমাণ হারাইয়া অবশেষে একগাছ তৃণ দিবার কমতা থাকে না। ঐ পরিণামের কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া সুখী সন্ন্যাসনে নিবেদন, জড়বিজ্ঞান এবং চৈতন্য-বিজ্ঞানকে সমানভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কর্মে ধর্ম এবং ধর্মে সত্য প্রত্যক্ষ করুন।

ডঃ কর্তিক বসু

টার্কোপোড	নানালা
অন্ন, অর্জুন ও ডিসপেনসিয়ার	ব্যথা ও বেদনায়
ডঃ বসু ল্যাভোরটরী লি. - কলিকতা ১	

হাল খুনি আলয়া

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আন্তোব মুখোপাধ্যায়

১১

অনুখে এত ঘটা শুলতান কুঠিতে আগে আর কেউ দেখেনি।

একটু আধটু অনুখ হলে এখানকার রোগী যার ডাক্তারের কাছে, আর রোগিনী বিনা চিকিৎসাতেই সেবে ওঠে। বাড়াবাড়ি অনুখ হলে প্রথমে আসে একটাকা ভিজিটের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, তারপর ছটাকা ভিজিটের আলোপ্যাথ। বৃড়োদের অনুখ-বিপুলে কবিরাজ ডাকা হয়, তাদের কী বলে কিছু নেই, দরাদরি করে ওষুধের দামটা ধরে দিতে হয়।

কিন্তু বজ্রিণ টাকা ভিজিটের ডাক্তারের কথা কেউ কখনো দেখেছে, শুনেছে, না ভেবেছে।

রমণী পণ্ডিতের কথা পল্লকথা মনে হয়েছিল প্রথম। তারপর বা সব কাণ্ডকাবখানা দেখা যাচ্ছে ক'দিন ধরে, আর অবিখ্যাত মনে হয়নি কারো।

ডাক্তারী ব্যাগ আর বুক-দেখা যন্ত্র হাতে মেয়ে-ডাক্তার পর্বত এসে গেল যখন, আর অবিখ্যাসের কি আছে। এমন মেয়ে-ডাক্তার রোগী দেখে কি করে আপাতত সোটাই বিশ্বাস সকলের। রোগীই তো বরং ওই ডাক্তারকে হাঁ করে দেখবে চেয়ে চেয়ে।

ঘটা বলতে শুধু ডাক্তারের ঘটা নয়, অনুখ উপলক্ষে বেশ একটা সমারোহ দেখে উঠল শুলতান কুঠির বাসিন্দারা। এমন সব চিকিৎসক, এমন পরিচর্যা, আর এমন সব শুভার্থী শুভার্থিনীর পূজার্পণ ঘটলে অনুখেও মুখ।

প্রথমে এসেছেন হিমাংগ মিত্র।

তার গাঢ় লাল গাড়িটা একটা লালচে বিজয় হুড়িয়েছে সকলের চোখে।

অনুখের দরুন বীরাপদকে পর পর তিন দিন অফিসে অনুপস্থিত দেখে বাড়ি থেকে হিমাংগবাবু প্রথমে কেয়ার-টেক বাবুকে পাঠিয়েছিলেন কেমন অনুখ দেখে আসতে। ঠিকানা-পত্র নিয়ে 'কেয়ার-টেকবাবু সাতঘরে এসেছে আর বীরাপদকে দেখে গিয়ে সবিনয় আড়ম্বরেই বড় সাহেবের কাছে অনুখের বোরালো অবস্থাটি ব্যক্ত করেছে। রোগী দেখে গিয়ে কেয়ার-টেকবাবু নিজে যেমন বুকেছে, আর বড়টা বলা উচিত বিবেচনা করেছে, তাই বলেছে। কারণ, তখন পর্বত বীরাপদকে দেখার অন্ত কোনো

ডাক্তারের পূজার্পণ ঘটেনি। এমন কি, প্রথম দিন ছই ওইটুকু অনুখ নিয়ে বীরাপদ অফিসেও বেত নিশ্চয়। সোনাবউদির জন্তে পেরে ওঠেনি। গণ্ডাকে দিয়ে সোনাবউদি টেলিফোনে অনুখতার খবর জানিয়ে দিয়েছিল। তারপর অধিকা কবিরাজের কাছ থেকে রমণী পণ্ডিত ওষুধ চেয়ে এনে দিয়েছিলেন। সোনাবউদি শুক্রবা ক'ছিল, বীরাপদ তার দরুণ বিব্রতবোধ করছিল, আর রমণী পণ্ডিত স্বয়ং কবিরাজকেই একবার ধরে নিয়ে আসবেন কিনা সেই চিন্তা করছিলেন।

তৃতীয় দিনে চিন্তাটা তিনি একান্তে ব্যক্ত করেছেন, অর্থাৎ, বীরাপদর অনুমোদন চেয়েছেন।

শিরুরের পাশে মেঝেতে সোনাবউদি বসেছিল। রমণী পণ্ডিতকে দেখে চার আঙুল ঘোঁটা টেনে দিয়েছিল। বীরাপদ জবাব দিতে পারেনি, কারণ তার মুখে তখন ধার্মোমিটার। সেটাও সোনাবউদির। ছেলপুলের অনুখ লেগে আছে বলে ধার্মোমিটারও আছে একটা। শুলতান কুঠির বাবতীয় অর-আলায় এই এক ধা ধার্মিটার ভরসা।

জবাব বীরাপদর বললে সোনাবউদি দিয়েছে।—কবিরাজ-টবিরাজে হবে না, আপনি আলই একজন ডাক্তার ডাকুন।

রমণী পণ্ডিতের মুখ বন্ধ। সোনাবউদির অর দেখার কীক বীরাপদ ইশারার নিবেধ করেছে, অর্থাৎ, আপাতত কাউকে ডেকে কাজ নেই। অর দেখার পর আবার কি হুকুম হয় ভেবে রমণী পণ্ডিত পায় পায়ে প্রস্থান করেছেন।

ধার্মোমিটার ধুরে রাখতে রাখতে সোনাবউদি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে ডাক্তার ডাকতে বারণ করলেন কেন ?

এই ক'দিন ধরেই সোনাবউদিকে গভীর দেখে বীরাপদ। সেই রাতের পর ক'টা দিন এড়িয়ে চলতে পারলে বাঁচত। একেবারে উন্টো হল। অত রাতে চান করে আধতেজা পায় মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তবে আর মাথার ব্যর্থার অনেক বেলা পর্বত মাথা তুলতে পারেনি।

বীরাপদ জবাবদিহি করল, উনি কি কাউকে চেমেন না জানেন, কাকে ধরে নিয়ে আসবেন ঠিক নেই—তাকে দিয়ে হবে না।

কাকে দিয়ে হবে জাহলে ? আমি কেবলো ?

বীরাপদ আনন্দা আমজা করে বলেছে, গুণ্য এসে না হই...

কে এসে ? এত নিবুড়িতাই কেন বিরক্তির কারণ সোনাবউদির ।
—তার জ্যোমোশন হয়েছে না ? মস্ত চাকুরে না সে এখন ?—বুড়ির
চোঁকি সব আগনারা—

গরগর করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে গেছে ।

অরটা কত জিজ্ঞাসা করা হয়নি, বতই হোক বীরাপদ চিত্তিত
নয় । ডাক্তার ডাকারও গরজ নেই ভেমন । বুকে সর্দি বসে অর,
হুদিন বাধে সেবে ধাবে । সোনাবউদির এই উদ্ভা ঘরের কারণে
বোধ হয়, খিটখিটের তো লেগেই আছে । সেই রাতে
অস্বাভাবিকতা হয়ত চোখে পড়েনি । সোনাবউদির রাগ দেখে
বীরাপদ স্বস্তি বোধ করেছিল একটু ।

কেয়ার-টেক বাবুর আবির্ভাব ।

বড় সাহেব দেখতে পাঠিয়েছেন, দায়িত্ব কম নয় । সেই
দায়িত্ব-বোধে সর্দিটাকে যদি বুকজোড়া নিউমোনিয়ার পর্যায়ে ফেলেন
তিনি, আর পায়ের তাপ যদি ঝই-ফোটা অর বলে মনে হয়—
সেটা বড় রকমের অস্তিশয়োক্তি কিছু নয় ।

হুঁপটার মধ্যেই বড় সাহেবের পাড়ি মুলতান কুঠির এলাকার
এসে চুকেছে ।

কুঠির বাসিন্দারা হাঁ করে সেই পাচ লাল পাড়ি দেখেছে আর
পাড়ির মালিককে দেখেছে । নিজের ঘরের দোর-পোড়া থেকে
সোনাবউদিও দেখেছে বিভ্রতমুখে হিমাংগ মিত্রকে কেয়ার-টেক বাবু
সরাসরি ঘরে এনে চুকিয়েছে । খবর শুনে বড় সাহেব এতটাই
উত্তলা হবেন ভাবেনি বোধহয় ।

হকচকিয়ে গিয়ে বীরাপদ বিছানার উঠে বসতে বাচ্ছিল ।

হিমাংগবাবু ধমকের ছবে বাধা দিলেন, উঠো না, তব
থাকো ।

বীরাপদ তখনই পড়ল । অসহায় বোধ করছে । ঘরের এই
অবস্থা, কোথায় বসতে দেবে, কি বলবে ।

হিমাংগবাবু বসলেন না, পাড়িরে পাড়িরেই দেখলেন একটু ।
ঘরের চারদিকে তাকালেন একবার । এই অবস্থার থাকে একে
ভাবেন নি ।

ডাক্তার কে দেখেছে ?

অবাব না দিলে নয় ? বলল, এখনিতেই সেবে উঠব
ভেবেছিলাম, আজ কাউকে খবর দেব...

বড় সাহেবের বিষয় এবারে আরো স্পষ্ট । বুকে একখানা
হাত ওর কপালে ঠেকালেন । কপাল ভালো, অরটা বেশ চেপেই
এসেছে মনে হচ্ছিল বীরাপদর ।

হিমাংগবাবুর মুখ গভীর । এখানে তোমার কে দেখাতনা
করে ?

আশেপাশের সব আছেন...

হঁ । এখানে এভাবে থাকার দরকারটা কি তোমার ?
ওখানে অস্তবড় বাড়িটা খালি পড়ে আছে, গিয়ে থাকলেই তো হয় ।
এই মুহুর্তে সেই ব্যবস্থার সময় নয় ভেবেই আর কিছু না বলে অর
থেকে বেরিয়ে পাড়িতে এসে উঠলেন ।

সেই হুপুয়েই কেয়ার-টেক বাবু হস্তদস্ত হয়ে আবার এসে
হাজির হয়েছে । একা নয়, সঙ্গে বড় ডাক্তার । বীরাপদর
শয্যাপাশে তখন রমণী পণ্ডিত বসে । লাল পাড়ির ঘোঁকা কাটতে

মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও
সুনিদ্রার সহায়তা করে



ভুঙ্গল শুধু যে
কেশের পক্ষেই বিশেষ উপকারী
তাহা নহে, ইহা মস্তিষ্ক স্মৃষ্ ও
শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার সহায়তা করে ।

ভুঙ্গল সুগন্ধি মহাত্মগোবিন্দ কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২০

না কাটতে বাইরে আবার গাড়ি থামার শব্দ শুনে হুকান আগেই খাড়া হয়ে উঠেছিল তাঁর।

মনে মনে এই আশঙ্কাই করছিল বীরাপদ। বড় সাহেব কিরে গিয়ে চূপ করে থাকবেন না। রাসভাগী এই মাহুঘটির অহুশাসনেও প্রচ্ছন্ন স্নেহটুকু ইদানীং উপলব্ধি করতে পারে। শুধু বীরাপদ নয়, অনেকেই পারে।

বড় ডাক্তার বিবরণ শুনে নিয়ে রোগী পরীক্ষা করলেন, তারপর স-নির্দেশ প্রেসক্রিপশান লিখে দিয়ে গেলেন।

বালিশের তলা থেকে তাড়াতাড়িতে গোটা মানি-ব্যাগটাই রমণী পণ্ডিতের হাতে গুঁজে দিয়েছে বীরাপদ—কেয়ার-টেক বাবুকে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তারের কী দিতে হবে। ডাক্তারের পিছনে হুমড়ি খেয়ে কেয়ার-টেক বাবুও যে-ভাবে ভয় হয়ে রোগী দেখাছিল, বীরাপদ চেঁচা করেও ইশারার কী-টা কত জেনে নেবার সুযোগ পায়নি। প্রেসক্রিপশান লেখার সময়ও না। ডাক্তার পাজোখান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যাগ-পত্র তুলে নিয়ে সেও পিছনে পিছনে রওনা হয়েছে।

রমণী পণ্ডিত পিছন থেকে জামা ধরে টানতে কেয়ার-টেক বাবু ঘুরে দাঁড়াল। ডাক্তার ঘর ছেড়ে গাড়ির দিকে এগিয়েছেন। হাতে মানি-ব্যাগ দেখে কেয়ার-টেক বাবু রমণী পণ্ডিতের ইশারাটা বুকে নিয়ে একটা দৃষ্টির যাবে তাঁকে ছেঁটে কেলে দিয়ে বীরাপদের দিকে তাকালো। বলল, ভিজিট বত্রিশ টাকা, দরকার হয়ল দিনে তিনবার করে আসবেন উনি—আপনার অন্তর হলও কি তা'বলে টাকাটা আপনাকেই দিতে হবে ?

ঠাণ্ডা অহুযোগ। নাটকীয় প্রস্থান।

পরদিন একটু বেলাবেলি এসেছে কোম্পানীর ছোট ট্রেন-ওয়ার্পন। তার থেকে নামল লাভণ্য সরকার। একা।

আর সকলের মত বারান্দায় দাঁড়িয়ে গুলুও হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথম। কোথায় দেখেছে তাও চট করে মনে করতে পারেনি। মনে পড়তে হতদহ হতে সাদর অভ্যর্থনায় বীরাপদ ঘরে নিয়ে এসেছে তাকে।

ক'টা দিনের মধ্যে গুলুও এই ঘরে এই প্রথম পরামর্শ।

বীরাপদের হাতে দুধ-বালির গেলাস। পাশে সোনারউদি বসে। নবাবতার সঙ্গে চোখোচোখি হল একদফা। ট্রেসকোপ হাতে কোলাতে দোলাতে লাভণ্য সরকার সামনে এসে দাঁড়াল। সুখখানা হাসি-হাসি।

ব্রহ্মে উঠে সোনারউদি কোণ থেকে মোড়াটা এনে সামনে রাখল। লোকজন আসছে দেখে একটা মোড়া কালই এঘরে রেখে দিয়েছিল। বসার কঁাকে লাভণ্য আবারও তাকে দেখল একবার। বীরাপদের বিব্রত-বিস্ময়টুকুও প্রচ্ছন্ন কোঁতুকের কারণ। বলল, বেশ কাহিল হয়েছেন তাহলে ? আর্কিতো কিছুই জানতাম না—আজ শুনলাম।

কবে কিরলেন ? বীরাপদ আশ্চর্য হতে চেঁচা করছে তখনো।

বক্রান্তাস কি না এক-পলক দেখে নিয়ে লাভণ্য বলল, কোথা থেকে ? কবে থেকে ?—কবেই তো। কিরে এসে আপনার অন্ত সুখ্যাতি শুনে বেগে গেছি। বড় সাহেবেরও ধারণা দেখলাম, আপনি না থাকলে এই ক'দিনে গোটা ব্যবসাটা প্রায় অচল হত।

পিছনে গুলু দাঁড়িয়ে, একিকে সোনারউদি। হাসলো তাঁর

বেশি আর কিছু বোঝার কথা নয় তাদের। শুধু বীরাপদ বুঝেছে। লোকজনের সামনে অন্তত লাভণ্য সরকার বড় সাহেব বলে না, মিটার মিত্র বলে। অন্তত বা অন্ত সময়ে হলে পালটা ঠাট্টার হলে বীরাপদও বলত কিছু। কিন্তু বাড়ি করে দেখতে আসার কলে এর বিগুণ স্নেহও মুখ বুজে হজম করবে জেনেই বলা।

হাতের দুধের গেলাসটার দিকে ইঙ্গিত করে লাভণ্য বলল, খেয়ে নিন আগে। সোনারউদির দিকে তাকালো, প্রেসক্রিপশানটা কই ?

আজও সকালে কেয়ার-টেক বাবু এসে বড় ডাক্তারকে ধবন জানাবার জন্তে রোগীর অবস্থা খুঁটিয়ে জেনে গেছে। কিন্তু সে-কথা কেউ বলল না। সোনারউদি বীরাপদের বালিশের নিচে থেকে প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে তার হাতে দিল।

সেই কঁাকে ঘরের ভিতরটা একবার চোখ বুন্ডিয়ে দেখে নিয়েছে লাভণ্য সরকার। সেই দেখাটাও বীরাপদ লক্ষ্য করেছে। মনে মনে নিজের ওপরেই বিব্রত একটু, আগে তো বিব্রত বোধ করত না, এখন করে কেন !

প্রেসক্রিপশান পড়ে লাভণ্য বলল, ডাক্তারের সঙ্গে টেলিকোনে আলাপ হয়েছে, আজকের রিপোর্টও পেয়েছেন, ওবুধ একটু বদলাতে বললেন—আগে দেখে নিই, আপনি শুয়ে-পড়ুন দেখি, ভালই তো আছেন মনে হচ্ছে—

বীরাপদ অসহায় বোধ করছিল কেমন, আজ এত দিনে লাভণ্য সরকার যেন কিছুটা হাতের মুঠোর পেয়েছে ওকে।

লাভণ্য নিজের খামোরিটার বার করে অর দেখল। মাড়ি দেখল, জিত দেখল, চোখের পাতা টেনে দেখল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বুক পিঠ পরীক্ষা করল। শেষে গভীর মুখে বলল, উঠে বসবেন টসবেন না অত, শুয়ে থাকবেন—পড়ন্ত শীতে বেশ করে ঠাণ্ডাটি লাগিয়েছেন বুঝি ?

চকিতে বীরাপদ সোনারউদির দিকে তাকালো একবার। টোটার কঁাকে হাসির আভাস কিনা দেখার জন্তে দ্বিতীয়বার চোখ কেঁরতে পারল না। ও-বারে গুলু দাঁড়িয়ে। কেন দাঁড়িয়ে বা, কি দেখেছে তার নিজেরও খেয়াল নেই।

কাগজ চেয়ে নিয়ে লাভণ্য সরকার প্রেসক্রিপশান অচল বদল করল একটু। সোনারউদির হাতে সেটা দিয়ে কখন কোন্ ওবুধ দিতে হবে বুঝতে দিল।

চিকিৎসকের অধঃ দাবি নিয়ে এখানে রোগী দেখতে আসেনি সে। শ্রীতি এবং সৌজন্যবোধে সহকর্মীকে দেখতে আসাটাই মুখ্য। তাই চিকিৎসকের মত বিদায়ও নিল না। ইঙ্গিতে সোনারউদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইনি ?

বউদি।

সোনারউদি না বলে শুধু বউদি বলল বীরাপদ।

সোনারউদির উদ্দেশে লাভণ্য বৃক্ত-করে মাথা নোয়ালো একটু, তার পর হাসিমুখে অহুযোগ করল, যে অনিয়ম করেন উনি, অন্তর হবে না—কড়া শাসনে রাখেন না কেন ?

সলজ্ঞ বিনয়ে সোনারউদি বলল, আমি পাতানো বউদি, কড়াকড়ি করলে পাছে সম্পর্কটা ছেঁড়ে সেই ভয়ে পারিনে।

সকোঁতুকে লাভণ্য সরকার এবারে আর্কিতো একটু মনোযোগ দিয়েই দেখে মিল তাকে। এই এক জবাব থেকেই যেমন প্রায় বউদি

ভেবেছিল ভেদন মনে হল না বোধ হয়। ওদিকে গণ্ডার মুখে বিবস্ত্রিত আভাষ, স্ত্রীর জবাগাটা মনঃপূত হইল।

বা বলেছেন—লাবণ্য সরকারের লগ্ন সমর্থন, কড়াকড়ি করার ফল আমি অস্বস্ত হাতেনাতে পেয়েছি। ঠুকে দেখার পর থেকেই নিরীহ গোছের লোক দেখলে ভয় করে—সেই প্রথম দিন থেকে কতবার যে জঙ্ক হয়েছি ঠিক নেই।

ধীরাপদর সঙ্গে লাবণ্যর বেবাবেবি যেমন, স্বগতাতও তেমন। একটা থেকে আর একটার পৌঁছতে সময় লাগে না। তবু, আজকের এই অস্বস্তক সুরটা নতুন। বোগ-বহুলা বিশ্বস্ত হবার মতই। ধীরাপদর হেসে ফেলেছিল। কিন্তু সোনারউদির দিকে চোখ পড়তে শঙ্কিত একটু। তার সবল বিশ্বাসের বক্র-বীতি সেই জানে শুধু।

একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সোনারউদি আলতো করে বলল, এই সুখবরটাও এতদিন গোপন ছিল।

লাবণ্য হাসল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সোনারউদির সয়ানরি চাউনিটা এড়ানোর জন্তে অঙ্গদিকে মুখ ফেরালো। বেদিকে গণ্ডার ঠাড়িবে। গণ্ডার স্ত্রীর উদ্দেশে তাড়াতাড়ি বলে বলল, একটু চা করে দিলে না ?

লাবণ্য তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। বোগী দেখতে এসে চা কি, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি আছে। ধীরাপদর দিকে তাকালো, আপনি ভালয় ভালয় শুয়েই থাকুন দিন-কতক, তা না হলে অসুখটা আপনাকে আমাদের মত অত খাতির না-ও করতে পারে। চলি—

দরজার দিকে এগিয়ে গণ্ডাকে বলল, আমাকে ছুঁবেলাই টেলিফোনে একটা করে খবর দেবেন, সকালে নার্সিং হোমে বিকেলে অফিসে—কোন নম্বর ধীরাবাবু কাছেই পাবেন।

সবিনয়ে ঘাড় নেড়ে গণ্ডার তাকে এগিয়ে দিতে গেল।

লাবণ্যকে ধীরাবাবু বলতে এই প্রথম শুনল ধীরাপদ। প্রথম মাঝে মাঝে মিষ্টার চক্রবর্তী বলেছে। কাকে বলছে ধীরাপদই এক-একসময় ভুল হয়ে যেত। এই নিয়ে অপ্রস্তুতও হয়েছে, বলেছে, এই পোশাকী ডাকটা এত কম শুনেছি যে নিজেরই সব সময় খেয়াল থাকে না। লাবণ্য এর পর একদিন ধীরাপদবাবু বলতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল, ঠাটা করেছে, নাম বলতেই দম শেষ, কি জন্তে এলাম ভুলে গেলাম...।

সামনাসামনি আর মিষ্টার চক্রবর্তীও শোনেনি, ধীরাপদবাবুও শোনেনি। আজ ধীরাবাবু শুনল। নামের এই চালু সংক্ষেপটা কারো মুখে শুনেছে হয়ত। কোথায় শুনল?...অমিতাভ ঘোষের মতে ধীরাপদ নামটা বিচ্ছিন্ন, ধীর নামটা মিষ্টি। মূলতান কুঠির এই ঘরে বসেই মজ্বা করেছিল সে। কিন্তু তার কাছ থেকে লাবণ্য সরকার শুনবে কেমন করে...। বোগহয় বড় সাহেবের মুখে শুনেছে। তিনি ধীর ডাকেন আজকাল। চাকরির মুখে হয়ত ওই নামই শুনে অভ্যস্ত তিনি।

কিন্তু এই একজনের মুখে এই চিরাত্যস্ত চালু নামটা আজ নিজের কানেই মিষ্টি লাগল ধীরাপদর।

সু-বচনীটি কে ?

সোনারউদি হাতের প্রেসকৃপশানটা নাড়াচাড়া করছে, আর বটাকে জাকেই নিরীকণ করছে। হাসির চেঁচায় ধীরাপদ টোক গিলল, লাবণ্য সরকার, কোম্পানীর মেডিক্যাল অফিসার।

৩-৩। পশ্চিমপূর্ণ পরিচয়টি জানা করে গেলেন। হাতের প্রেসকৃপশানটা আর একবার উন্টেপাটে দেখে নিল সোনারউদি।—এটা কি করব, এর আর সরকার আছে কিছু না, ওকেই কাজ হয়েছে ?

হাসি ছাড়া জবাব নেই। গণ্ডার পুনঃপ্রবেশে সে-চোঁটা থেকেও খানিকটা অব্যাহতি পেল। কিন্তু স্ত্রীর উদ্দেশে গণ্ডার কক্ষ অস্বস্তিকান্নে বেতে হু-চোখ টান ধীরাপদর। ঘরে ঢুকই বিবস্ত্রিত-বর্ষণ, তোমার কি বাস্তব আর শাড়ি-টাড়ি নেই কিছু ? দেখেই এ-ঘরে লোকজন আসছে বাচ্ছে—একটু গুজ্বলোকের মত এসে বললেও তো পারো ?

সোনারউদির মুখে আবারও খানিক আগের সেই নিরীহ অভিব্যক্তি।

গণ্ডার বিবস্ত্রিত উপসংহার, বাড়ির কি-ও এর থেকে ভালোভাবে থাকে।

ধীরাপদ ঘাড় কাত করে দেখে নিল, সোনারউদির পরনের শাড়িটা খুব ময়লা না হলেও আধময়লাই বটে। আর কাঁধের আঁচলের কাছটা খানিকটা ছোঁড়াও।

সোনারউদি কি হাসছে ? ধীরাপদ ঠাণ্ডর করে উঠতে পারল না। মনে হল, গাভীরেঁধের বাঁধে কোঁতকের বস্তা ঠেকিয়ে রেখেছে। মাথা নিচু করে বুকে-কাঁধে চোখ চালিয়ে বেশ রয়েসয়ে নিজের কি-এর অবস্থাটা দেখে নিল আগে। তারপর গণ্ডার চোখে চোখ রাখল। আগে খেরাল থাকলে তোমারও বুকেটা দেখে দিতে বলতাম। হল না এখন কি আর করবে, এ-ই এনে ফুজনে মিলে ভাগাভাগি করে খাও। প্রেসকৃপশানটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে সোনারউদি উঠে সোজা ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল।

দরজাটাকে তন্ন করা সম্ভব নয়, গণ্ডার উৎকৃষ্ট ধীরাপদর মুখের ওপর এসে খামল। ভরসা করে তাকেও কিছু বলতে পারল না। ভালো কথাতেই যে-মুঠি দেখেছে কিছুদিন আগে, ভরসা হবে কোথা থেকে। তবু তার নীরব অসুযোগ স্পষ্ট। অর্থাৎ, মেরেছেলেকে বেশি আঙ্কারা দিলে কোথায় ওঠে নিজের চোখেই দেখে নাও এবার।

প্রেসকৃপশানটা তুলে নিয়ে গণ্ডারও চলে গেল।

মূলতান কুঠিতে অর্গ্যানাইজেশন চাক সিতাও মিত্রর ধপধপে শাণা ছোট গাড়িটা লাবণ্য সরকারের ষ্টেশান-ওরাগনের থেকেও বেশি অপ্রত্যাশিত। সিতাওও বোগী দেখতে এসেছে।



ক্যালকাটা অর্পার্টিক্যাল কোং প্রাইভেট) লিঃ
ফোন-৩৫-১১১৭, প্রতিষ্ঠা: ডাঃ সার্জিক্যাল স্কুল কম-বি।
গ্রাম-কলকাতা, ৪৫ নং ব্রাহ্মণী স্ট্রীট বিনিকাস ৩।

কিন্তু আসলে এসেছিল বোধহয় পদমর্যাদার খোলস ছেড়ে বীর্যপদর সঙ্গে সম্পর্কটা আর সকলের মত সহজ করে নেবার তাগিদে। তার প্রয়োজন বোধ করেছিল কেন সেই জানে। অনুধেয় বন্ধন হুঁশিয়ার প্রকাশ করেছে, চিকিৎসার কোনরকম ক্রটি না হয় সে কথা বার বার বলেছে। এই ক্রিকে নিজের সহজ হয়ে ওঠাটাও সহজ হয়েছে। আরো অনেক কথা বলেছে তারপর। এ সময় বীর্যপদর বিছানায় পড়ে থাকলে চলবে কেন, কাজের কি শেষ আছে এখন। ক'টা মাস বাদে কোম্পানী দশ বছরে পড়বে, সবাই উৎসব-উৎসব করছে বটে, কিন্তু খামেলার কথা ভেবে তার এখন থেকেই হুঁশিয়ার। তাছাড়া, কোম্পানীর নতুন শাখা পত্তন হচ্ছে শিঙ্গাইরই, প্রসাধন-সামগ্রী তৈরীর বিভাগ—কেমিক্যাল পারফিউমারি ব্রাঞ্চ। এতবড় ঝঁকিটা বাবা এখন না নিলেই পারতেন, কিন্তু মাথায় ঢুকেছে বধন করবেন—করবেনই। কোথায় করবেন, কারখানার এলাকার আর জায়গাই বা কোথায়, সিঁতাংত ভেবে পাও না। এর জন্তে আলাদা ব্যবস্থা চাই, আলাদা বহুপাতি সাজ-সরঞ্জাম চাই, ব্যাপার কম নাকি। অথচ কাজের বেলায় তো হাতগুন্নতি ক'টি লোক। অবশ্য বীর্যপদর ওপর আস্থা আছে সকলেরই, সিঁতাংত নিজেরও আছে—বাবার লোক চিনতে ভুল হয় না, আগে তাদেরই বয়ং বা একটু খটকা ছিল...

আপসের পুর, অন্তঃস্ব স্বীকৃতি।

বিনিময়ে বীর্যপদর শুধু একটা কথাই জানতে ইচ্ছে করছিল, একটা কথাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে বাচ্ছিল, লাবণ্য সরকারকে নিয়ে বধে থেকে কিরে আসার পরই তাদের বা-একটু-খটকাটা পুরোপুরি গেল কেমন করে। হিমাংগ মিত্র কি বলেছেন, কেমন ব্যবহার করেছেন? লাবণ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি ভোলেনি, বড় সাহেবের ধারণা সে না থাকলে গোটা ব্যবসটা প্রায় অচল হত। এমন অস্বাভাবিক ধারণার কথা বড় সাহেব বলেননি নিশ্চয়। কিন্তু কিছু না বললেই বা এরা এমন সময় কেন তার ওপর?

কেন, তার কিছুটা আঁচ বীর্যপদর পেয়েছে। সুলতান কুটির আড়িনায় পর পর দুদিন আরো একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। চাকরির ক্রিম-কালারের চকচকে গাড়িটা। প্রথম দিনের আগন্তুক চাকরি নিজেই।

চাকরির খেদ আর অভিযোগ হুঁইই আন্তরিক। কিছু জানতেন না সেই খেদ আর কিছু জানানো হয়নি সেই অভিযোগ। বড় ডাক্তার চিকিৎসা করছেন এবং তিনি অতঃপরেই যেনে কিছুটা নিশ্চিত। এসে অনেকক্ষণ ছিলেন। আর্থে'কটা বিছানায় আর আর্থে'কটা মাটিতে বসেছিলেন। সোনাবউদি তাড়াতাড়ি একটা আসন এনে পেতে দিয়েছিল। হাত ধরে আপনজনের মত চাকরি ভাকেই সেই আসনে টেনে বসিয়ে দিয়েছেন—আমি বেশ বসেছি, তুমি বেসো। গাড়ি থেকে একদিন চোখের দেখা দেখেছিলেন, আজ সামনাসামনি ভালো করে দেখে নিলেন হুঁই এক মুহূর্ত—তোমার কথা একদিন যীকর মুখে শুনেছিলাম, আমি ওর দিদি হই সম্পর্কে—জানো তো?

সোনাবউদি মাথা নাড়ল, জানে।

চাকরি বীর্যপদর দিকে তাকালে একপলক, তারপর তরল

বিভবনার বলে উঠলেন, ও যে ন'বছর বয়সেই আমাকে বিয়ে করার জন্তে কেপে উঠেছিল তাও জানো নাকি?

বহুদিনের এই পরিহাস-প্রসঙ্গ আজ কেন জানি তেমন মিঠা লাগল না বীর্যপদর কানে। কতটা বলা হয়ে তাঁর মূর্খ, এগারের জবাব থেকে চাকরি তাই বুঝে নিতে চান। কিন্তু বোঝা হল না। হাসি-হাসি মুখে সোনাবউদি বৃহৎ মন্তব্য করল ওঠারই তো কথা—

চাকরি লজ্জা পেলেন, তুমিও তো আবার কম নও দেখি। একটু বাদে বললেন, এতবড় অনুধেয়টার সব ধকল তোমার ওপর দিয়েই গেল বুঝি?

বড় অনুধেয় ডাক্তার বললেন? সাদামাটা পাণ্টা প্রায় সোনাবউদির।

স্নেহভাষনের অনুধেয়-বিশুদ্ধ মেয়েরা সাধারণত বড় করেই দেখে থাকে, সেই রীতিতে বলা। সোনাবউদির সবল চাউনিতে বক্রভাস ছিল না একটুও। তবু ভিতরে ভিতরে বীর্যপদর লজ্জাবোধ করছিল একটু। চাকরি বললেন, কি জানি বাপু, আমার তো শুনে ভয়ই ধরেছিল, সময়ে ধরা না পড়লে কোথা থেকে কোথায় দাঁড়াবে জানে—এখনো, তো চোখ-মুখের অবস্থা ভালো ঠেকে না খুব

সোনাবউদিও চাকরির উৎকর্ষা নিয়ে বীর্যপদরকে দেখে নি। এক-নজর, তারপর মাথা নেড়ে সারি ছিল। অর্থাৎ, ভালো ঠেকে না ঠিকই। সোনাবউদির সাথে ব্যক্তিগত আলাপে মগ্ন হলে চাকরি। বাপের বাড়ি কোথায়, কত বছর বিয়ে হয়েছে, কী ছেলেপুলে, ইত্যাদি।

সোনাবউদি এক ক্রিকে উঠে যেতে চাকরি বীর্যপদর দিকে ঘেঁষে বসলেন। বেশ বউটি। মন্তব্যের বাইরে আর কোনো কৌতূহল দেখা গেল না। জিজ্ঞাসা করলেন, অমিত্ত এসেছিল?

বীর্যপদর বাড়ি নাড়ল, আসেনি।

কি যে হচ্ছে দিনকে দিন ছেলেটা। বলতে বলতে চাকরি কিছু একটা রসালো ব্যাপার মনে পড়ল বোধহয়। হুঁই'বনা'জনি গাভীরের ওপর খুশির কলক নামল। বললেন, সেদিন তো আমি ওখানেই মামা-ভাগ্নেতে এক-হাত হয়ে গেল। তোমার কথাও হয় চাকরির উৎকর্ষ প্রাণ্ডি, তুমিও ওস্তাদ'কম নও—হুঁ'প'ক'ই দিদি তু দেখি তোমার ওপর।

বীর্যপদর নীরব আগ্রহ গোপন থাকল না। ভিতরে ভিতরে উসুখ সে। চাকরির বাড়িতে মামা-ভাগ্নেতে এক-হাত হয়ে গেল কবে? যে-দিন চাকরি আর হিমাংগবাবু বেড়াতে বেয়িয়েছিলে আর, যে-দিন এক নগ্ন-চাহিদার মুখে পার্বতীকে কলে বীর্যপ পালিয়ে এসেছিল সেই দিন? চাকরিই বা অত খুশি কেন—মাম ভাগ্নেতে এক-হাত হয়ে গেল বলে, না বীর্যপদর কথাও হল বলে না কি ওর হুঁ'প'ক'কে ভুঁই রাখার কেরামতি দেখে?

কিন্তু ঘটনা বা শুভল সেটা এমন কিছু নয়। মামাকে হাতে কাছে পেয়ে ভাগ্নে কৈকিৎ তলব করেছে—যে-সব কর্মচারী ছুটি ছিল বা বাবা সাময়িক হারে কাজ করছে, এ মাসে তাদের অনেকে বাইনের গুণগোল হয়েছে, অনেকে বাইনে পার্মি এ সব দেখা'জনা দাড়িয়ে থাকবে, বাইনের মুখ কেনেও কাজকে কিছু না বলে খেঁচা খুশিমত জায়া দেখালে সেখানে চলবে কবে?

হিমাংশু মিত্র হালকা টিম্নী কেটেছিলেন, এ বিচ্ছেদটা ওরা তোর কাছেই শিখেছে বোঝব।...পরে তারের মেলাজের আঁচে আস্তে হয়ে ভালোমানুষের মত ভিজ্ঞাসা করেছেন, বানের দায়িত্ব তারা তাহলে কাজ-কর্ম দেখেছে না ঠিকমত ?

জবাবে বেপরোয়া আক্রমণ অমিতাভ বোবের, দেখবে না কেন খু দেখেছে, যেমন বড় সাহেব নিজে দেখেছেন আর সকলেও তেমনি দেখেছে। রাগের মাথায় তখনই বীরাপদর প্রেসজ উল্লেখ করেছে সে। নেহাত চাকর মাসির কল্যাণে একটা ভালো লোক এসে মুখ বুজে সব বামেলা সামলে চলেছে ভাই, নইলে এবই মধ্যে দেখা যেত। গেল মাস কাবারে গোটা ওবুধের লোকানের মাইনে বন্ধ করে মজা দেখানোর ইচ্ছে ছিল তার—লোকটা অমন একরোখা ভালো লোক বলেই হল না।

হিমাংশুবাবু আবারও ঠাটা করেছেন, তোর মতেও তাহলে ভালো লোক দুই একজন আছে !

অমিতাভ বোবও তেমনি ব্যঙ্গ করেছে, সেই ভালো লোকটিকে বড় ভীবেদার ভাবছ নিজেদের তা-বে নয় তাও টেরটি পাবে একদিন।

হিমাংশু মিত্র আর কিছু না বলে শুধু হেসেছিলেন গুনল। চাকরি চলে যাবার পরেও যুবে কিবে একটা কথাই মনে চলেছে বীরাপদর, মামা-তারের এই বচসার কারণে চাকরি এত খুশি কেন ! মামার প্রতি ভাগ্যেটি বিরূপ বলেই তো তাঁর দুশ্চিন্তা দেখে আসছে। কোম্পানীতে একজন ভালো লোক আমতানী করতে পারার তুষ্টি ?

কিন্তু ভালো লোক দেবার জন্তে কেউ তো তাঁর প্রত্যাশী ছিল না। নিজের গরজেই দিয়েছেন।

বীরাপদর হঠাৎই মনে হল, চাকরি খুশি—ওর ওপর স্বয়ং কর্তাটি খুশি বলে, আর, ওরই ওপর অমিত বোবের এমন আস্থা দেখেছেন বলে। চাকরির এটুকুই কাম্য ছিল হয়ত--

কিন্তু যুবে কিবে তেমনি হৈয়ালীই থেকে' গেল সব কিছু। একা ঘরে বীরাপদর এলোমেলো ভাবনাটা আর এক পথে গড়ালো। রমণী পণ্ডিতের গ্রন্থ-মাহাত্ম্যই বিশ্বাস করবে শেষ পর্যন্ত। সে-তো সেই অকেজো মানুষ, সময় না কাটলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে কার্জন-পার্কের লোহার বেঞ্চিতে বসে থাকত। আর, এই এত বড় প্রতিষ্ঠানের সংর্গে সংগ্রহ হবার পরেও সে এমন চমকপ্রদ কিছু করেনি যার বিনিময়ে এতখানি বিশ্বাস আর এতখানি মর্যাদা তার প্রাপ্য। সেই বিশ্বাস আর সেই মর্যাদা বাড়ছেই। আরো যে বাড়বে তাও স্পষ্ট।... আশ্চর্য !

আরো আশ্চর্য, বড় সাহেবের আস্থা-ভাজন, চাকরির প্রিয়পাত্র, অমিত বোবের অন্তরঙ্গ মানুষ, লাভণ্য এমন কি সিতাংশুরও স্বীকৃত ব্যক্তি জেনারাল সুপারভাইজার বীরাপদ চক্রবর্তী গেষ্টা করেও এই নতুন সাজে নিজেকে দেখতে পার না কেন ? যখনই দেখতে চায়, দেখে ওই লোকটিকে—মুলতান কুঠির ভূমি-শয্যায় হাত-পা ছড়িয়ে নিম্পন্দের মত পড়ে আছে যে—যে-লোকটা কার্জন-পার্কের লোহার বেঞ্চ-এ বসে থাকত তাকে, যে-লোকটা ছেলে পড়াক্তো, অধিকা কবিরাজ আর দে-বাবুর জন্তে বিজ্ঞাপন লিখত

শীতের দিনে-ও

ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন
আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

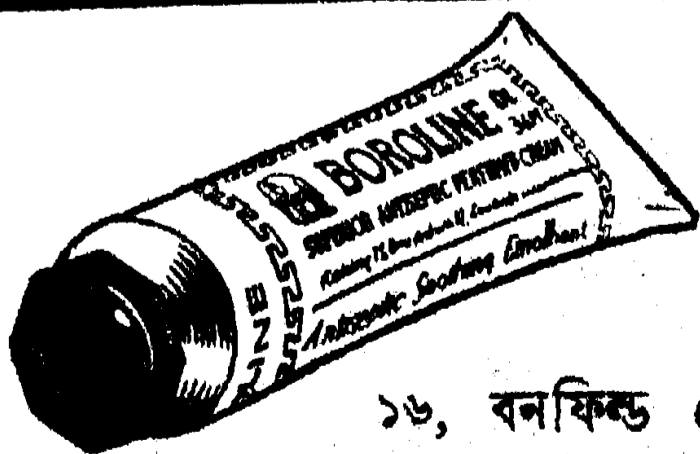
শীতের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ফেস্ ক্রীম। নিয়মিত ব্যবহারে, ওষধিগুণ-যুক্ত, সুরভিত বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, মসৃণ ও সজীব করে তুলবে আর আপনার অন্তর্লীন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোন্মুল করুন।



বোরোলীন

পঞ্চম প্রসাদন

পরিবেশক : ডি, দত্ত এণ্ড কোং



বোরোলীনে—ল্যানোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও ঠোঁটকাটার হাত থেকে রক্ষা করে আর রুক্ষতম ত্বকের-ও লাভণ্য বৃদ্ধি করে।

১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১



তাকে। সেই ধীরাপদই যেন চোখ ধাঁধানো নতুন খোলস পরেছে একটা, মনের আয়নার তার প্রতিফলন নেই।

পরদিন। হুপুরের দিকে কোম্পনীর একটা নতুন প্যামফ্লেটে চোখ বোলাতে বোলাতে ধীরাপদ ঘুমিয়ে পড়েছিল। লাভণ্য সরকার লোক মারকত অফিস থেকে এই প্যামফ্লেটগুলো পাঠিয়েছে। প্রচার-পুস্তিকার মুদ্রণ পরিচ্ছন্নতা, কাগজের মান, প্রচ্ছদ-পারিপাট্য— এক কথায় সমস্ত আঙ্গিক-বিক্রাস তার 'অমুমোদন-সাপেক্ষ'। অবশ্য এক্ষেত্রে অমুমোদনের ক্ষেত্রে পাঠানো হয়নি এগুলো—আগের কাজ, নতুন এসেছে তাই দেখতে পাঠানো হয়েছে।

ঘুম ভাঙতে আবার সেই প্যামফ্লেটই নাড়াচাড়া করছিল। ঘরে পা দিয়ে সোনাবউদি বলল, সারা হুপুর পড়ে পড়ে ঘুমোলেন তাতে আবার ছয়-আলা না আসে—শরীর খারাপ হয়নি তো? কপালে হাত রাখল, ছাঁক-ছাঁকই তো করছে।

প্যামফ্লেট নামিয়ে ধীরাপদ হালকা জবাব দিল, এত ঘটার পরে এরই মধ্যে একটু ছাঁক-ছাঁকও না করলে লজ্জার কথা না? তাঁরা সব ভাববেন কি...

তা অবশ্য...। সার দিল সোনাবউদি, আপনার দিদির গাড়ি আজও এসেছিল—আমি আদর করে ডাকতে গিয়ে দেখি আপনার দিদি নয়, আর একজন।

আর একজন! আর একজন মানে অমিতাভ নিশ্চয়। বিশ্বের থেকেও বিরস দেখালো ধীরাপদর মুখ, আমাকে ভেঙে দিলেন না কেন?

যুঝুঝে দেখে ডাকতে দিলে না, নিশ্চয় উত্তর, আপনার বোজ-খবর নিয়ে আমার সঙ্গেই একটু গল্পসল্প করে চলে গেল।

হেঁয়ালীর মত লাগল কানে, সোনাবউদির মুখে না হোক চোখে চাপা হাসি। দ্বিধার সুরে ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, সেই প্রথম দিন আমার সঙ্গে এসেছিলেন...সেই জঙ্গলোক তো?

অমিতাভ ঘোষ? উন্টে সোনাবউদিই বিস্মিত বেন, চাকরিতে প্রবেশন করিয়েছেন ও নাম তো অপের নাম—তিনি এলে তাঁকে আর চিনব না!

ধীরাপদ অবাক আবারও। চাকরির গাড়িতে কে আর আসতে পারে!

তার এই নির্বাক আগ্রহটুকু উপভোগ্য বেন, সোনাবউদি ধীরেধীরে জ্ঞাপন করল, জঙ্গলোক নয়, জঙ্গমহিলাগোত্রের... আপনার ভাগিনী, মামাবাবুই তো বলল আপনাকে...নাম বলল পার্বতী।

তখনও ধীরাপদ চেয়েই আছে ক্যালক্যাল করে। পার্বতী আসবে তাকে দেখতে তুলেও বিখাস করার মত কি?

আপনার আর কে কোথায় আছে আজকাল, বলে রাখুন তো, বড় গণ্ডগোলে পড়ে বাই। হেসে ফলে মোড়াটা টেনে বসে পড়ল, ভাগিনীটি বেশ, তবে বড় গভীর—ভয়-ভয় করে। ধীরাপদর বিড়ম্বিত মুখখানা দেখে চেয়ে, উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল আবার, বাড়িতে যে কাজ করে সেও অমন একখানা গাড়িতে চেপে দেখতে আসে আপনাকে—আপনি এখানে এ অবস্থায় পড়ে আছেন কেন ভেবে তো অবাক আমি!

পার্বতীর আবির্ভাবের বিষয় এড়িয়ে ধীরাপদ লঘু জবাব দিয়ে ফেলল, আর কোথাও সোনাবউদি নেই।

হঁ? সোনাবউদির সমস্ত মুখখানি সেই আগের দিনের মত পরিহাস-সজীব। ঠোট উন্টে মন্তব্য করল, ঘবে মেজেরূপ আর ধরে বেঁধে প্রেম—কানটাই বা টেকে। ছাঁচোখ সরাসরি ধীরাপদর মুখের ওপর ধমকালো হঠাৎ। তা বললেনই যখন, এ সোনাবউদি তো বাইরের পাঁচ জনের মত যোগী দেখতে এসে কি-হল কি-হল করে চলে যাবে না। আমি তো জিজ্ঞাসা করব, কেমন করে হল—ঠাণ্ডাটা লাগল কি করে?

হাতে কি গুটা...প্যামফ্লেট...এগুলো দেখে রাগা ধীরাপদর কর্তব্য।

বিশ্ব সোনাবউদি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়নি তখনো। দুই এক মুহূর্তের প্রতীক্ষা। সেদিন সেই ঠাণ্ডা রাতেও আপনি হঠাৎ অমন গুণ্ডগোলে চান করে উঠলেন কেন, আর সারাঘাত এই ঠাণ্ডা মেঝেতেই বা গুয়ে কাটালেন কেন?

নিকন্তরে একটু হাসতে পারলেও জবাব এড়ানো যেত বোধহয়। ধীরাপদ চেঁচাও করেছিল। তাতের প্যামফ্লেট চোখের সামনে উঠে এসেছে, অফিসের কাজ—দেখে রাখাটা জরুরী বেন।

যরনী দ্বিধা হও...

সোনাবউদি আবারও কপালে হাত রাখলে দেখত কপাল আর ছাঁক-ছাঁক করছে না। কপাল ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে।

দরজার কাছে একাধিক পারের শব্দ। চটির চট চট আর খড়মের খটখট আওয়াজ। সোনাবউদির চোখ দুটো গুর মুখের ওপর থেকে দরজার দিকে ঘুরল একক্ষণে। উঠে মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে দেয়ালের দিকে সরে গেল।

শকুনি ভটচাঁব, একাদশী শিকদার আর রমণী পণ্ডিত। আপনজনেরা যোগীর খবর নিতে এসেছেন। প্রায় বোজই আসেন একে একে।

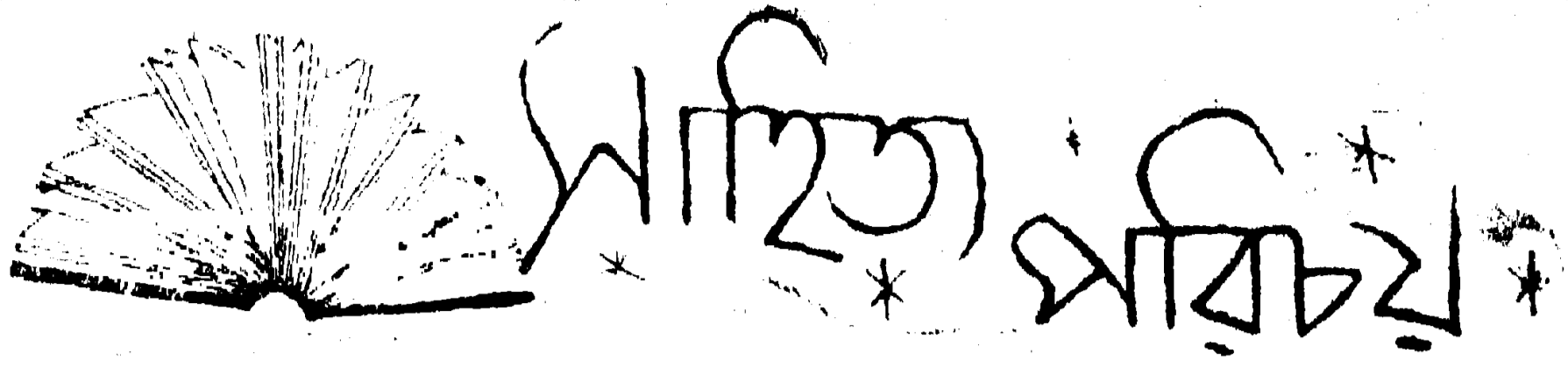
দেয়াল ঘেঁষে সোনাবউদি বাইরে চলে গেল। ধীরাপদ হাঁপ ফেলে বাঁচল।

ত্রিমূর্তি সুবাহিত।

[ক্রমশঃ]

"If the critics cannot control the stars, they can at least administer the stripes."

—GEORGE BERNARD SHAW.



উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

শেষ গ্রীষ্ম

আলোচ্য গ্রন্থখানি বর্তমান শতাব্দীর এবং বিখ্যাত বিদগ্ধ সাহিত্যিকের একখানি অল্পময় রচনার অমুদ্রিত। আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানারক ছিলেন বরিস পাষ্টেরনাক, তাঁর বহু-বিশ্রুত গ্রন্থ 'দি লাস্ট সামার'; এই বইটির অমুদ্রিত করেছেন স্বনামধন্য শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। শ্রী অচিন্ত্যকুমারের পরিচয় আজ আর নতুন করে দেওয়ার নেই কিচ্ছ, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বেগবান রচনার্শলী আলোচ্য পুস্তকটিকে এক অনঙ্গসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে; অমুদ্রিত-কর্ম রসোত্তীর্ণ করে তোলা বড় সহজ নয়, অচিন্ত্যকুমারের সমৃদ্ধ লেখনী যে এই কাজে নিবৃত্ত হয়েছে, অমুদ্রিত-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ স্বর্কে সেটি একটি সুনিশ্চিত স্মরণ।

বহুখ্যাত পুস্তক 'ডাঃ জিভাগো' ব্যতীত পাষ্টেরনাক আর একটি মাত্র উপন্যাস লিখেছিলেন, সেটি এই "শেষ গ্রীষ্ম"। যুদ্ধপূর্ব যুগের পরিচ্ছন্ন স্মরণ এক গ্রীষ্মের দিনগুলির স্মৃতিচারণ চলেছে এই তরুণ নায়কের মনে, সে স্বপ্ন দেখছে সেই স্বর্ণালী অতীতের যে অতীতে প্রেম ছিল যুগাব চেয়ে সহজ, জীবনের পরক্ষণ ছিল সরল স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের পথে, আত্ম-জিজ্ঞাসার অন্তর্দ্বন্দ্ব বধন মাহুৎ ব্যাকুল হত না প্রতি পলে!

কাহিনীটির আধানভাগ আপাত সরল হলেও জীবনের জটিল জিজ্ঞাসা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। বিদগ্ধ পাঠক ও সাহিত্যিক উভয়েই এই অমুদ্রিতকর্মটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি। আজিক সন্মুখেও পুস্তকটি সমৃদ্ধ। 'শেষ গ্রীষ্ম' বরিস পাষ্টেরনাক। অমুদ্রিত শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক—ডি. মেহরা, রূপা অ্যান্ড কোং ১৫ বন্ধিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

জুনাপুর স্টীল

বর্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ, মাহুৎবের মনুষ্যত্ব আজ বাস্তবিকতার লৌহপাশে আবদ্ধ হয়ে অবরুদ্ধ বস্তুর নিঃস্বাস কেলছে প্রতিবৃহুর্ভে, এই বস্তুরাকেই ভাষা দিয়েছেন লেখক আলোচ্য উপন্যাসখানির মাধ্যমে। জুন'পুর স্টীল বা জিহ্বার লৌহ কার্ণেসের দাহ একদল মাহুৎবের জীবনকে গালিয়ে মনুষ্যত্বকে ছেঁকে বার করে নিয়ে কেমন করে তাদের বেঁচে থাকাকে চূর্নিত করে তুলেছে তারই মর্মভঙ্গ বাস্তবধর্মী চিত্র এই অমুদ্রিত পুস্তকটি। লেখকের আত্মপরিষ্টি বর্জিত কলম বাস্তবিকতার চাকার পিঠে একদল মাহুৎবের বাঁচবার দাবীকে করেছে সমর্থন, তুলে ধরেছে তাদের পথ চলার গ্লানিকে পাঠকের সামনে, যুগমানবের আত্মার অশান্ত ক্রন্দনধ্বনিও এর প্রতিছাড়ে। আত্মপরাণী এই উপন্যাসটি পড়ে আমরা স্থবী হয়েছি, আশা

করি পাঠক-সমাজ একে বোধ্য সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। বইটির প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা, বাঁধাই উচ্চাঙ্কর। 'জুনাপুর স্টীল' গুণময় মাল্লা। প্রকাশক—এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স এন্ড কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম—১০ টাকা।

অকাল প্রেম

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি সুপাঠ্য প্রেমের উপন্যাস, অধিকাংশ আধুনিক পুস্তকের মত এতে কোন ইজম্ নিয়ে মাথা ঘামাননি লেখক। দ্বিষ্ট সুরে একটি গল্প বলেছেন তিনি, বা হালকা অবসর বিনোদনের সহায়ক। শৈশব থেকে একত্র প্রতিপালিত নায়ক-নায়িকার প্রেম বিরহ ও মিলন বর্ণিত হয়েছে সুন্দর সরস ভাষার মাধ্যমে। সহযোগী নায়ক-নায়িকার চরিত্র দুটিও অত্যন্ত উপভোগ্য, বালাবিবাহ এখন বিন্মুতপ্রায়, বর্তমানে ভ্রমসমাজে শিশুদম্পতির দেখা মেলে না আর, সেজন্তই পুস্তকে বর্ণিত বাস্তব বিবাহিত দম্পতিটির দাম্পত্যলীলা এক মধুর স্বপ্নের আভাস দেয় পাঠকমনে। আমাদের পুরাতন রীতি-নীতি পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা আজ বিন্মুতির অন্ধকারে বিলুপ্তপ্রায় আর সেজন্তই সেই পুরাতনী বাহিনী আকর্ষণ করে আমাদের অন্তর্গামী সূর্যের রাঙা আভার মতই। গ্রন্থকার অপেক্ষাকৃত নবীন হলেও তাঁর প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। তাঁর ভাবাও সুন্দর ও সরস, আমরা বইটির সাক্ষ্য কামনা করি। অঙ্গসজ্জা সাধারণ। অকাল প্রেম—অজিতকুমার রায়চৌধুরী ভাষনাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা—৬। দাম—তিন টাকা।

একটি নায়িকার উপাখ্যান

আলোচ্য গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সত্ত-প্রকাশিত একটি ছোট উপন্যাস; সিনেমা বা চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি অত্যধিক প্রবণতা আজকের দিনের ছেলে-বয়েদের সহজাত। এই বিষয়বস্ত্র অবলম্বনেই রচিত হয়েছে বর্তমান পুস্তকটি। পল্লের নায়িকা স্বর্ণা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা, পিতার সাঞ্জহ অমুদ্রিত লাভ করে হারাহুবিব রত্নীম জপতে পা বাড়িয়েছিলো সে একদিন, ক্রমে ক্রমে কেমন করে এই হারার দায়ী আছন্ন করে তুলল তাকে, পদ্বিপত লেখনীতে তারই ছবি এঁকেছেন লেখক। ছবির নায়িকার কাল্পনিক সূত্র-সূত্রে বিচলিতা হয় স্বর্ণা, বাস্তব সংসারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহজ সরল ছন্দে মিশোতে পারেনা সে নিজেকে আর অবশেষে সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে সে শেষ পর্যন্ত বেছে নেয় অভিনেত্রী-জীবনকেই। কোন বিশেষ গুরুত্ব না দিয়েও আধুনিক যুগের এই সমস্ত স্বর্কে এক নতুন আলোকপাত করেছেন লেখক আলোচ্য

কাহিনীটিতে। নবজনাথ মিত্র গল্প বলেন গল্প বলার আনন্দেই, আর সেজন্যই তাঁর রচনা রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে সহজেই। বর্তমান পুস্তকটিও তাঁর রচনার এই প্রসারগুণে বঞ্চিত নয়, সুন্দর সহজ ভাষায় বলা কাহিনীটি নিঃশব্দেই পাঠকমনকে আকর্ষণ করে। আমরা গ্রন্থটির সাক্ষ্য কামনা করি। পুস্তকটির প্রচ্ছদ ও অভ্যন্তর আঙ্গিক মোটামুটি।

শবনম

'শবনম' সৈয়দ মুক্ততাবা আলীর আধুনিকতম উপন্যাস, 'দেশ' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ইতিপূর্বেই। ডাঃ আলীর এই শবনম রচনাটি তাঁর অপরাপন প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ একটি সবসময় রম্যচনা মাত্র নয়, এটি সম্পূর্ণরূপেই একটি প্রেমোপাখ্যান; রোমাঞ্চিক প্রেমের গল্প লিখতেও যে আলীসাহেব সিদ্ধহস্ত 'শবনমে' তারই পরিচয় মেলে। গল্পের নায়ক-নারিকার জীবনে তীব্র ভাবাবেগ পূর্ণ মিলনের অব্যবহিত পথেই নেমে এলো নিদারুণ বিচ্ছেদ সর্বনাশ। মৃত্যুতে। গল্পটির এই ট্রাজিক পরিণতি বৈদ্যনাথবিশ্ব করে তোলে মনকে; সুন্দর, স্নিগ্ধ ও করুণ একটি প্রেমের কাহিনী সরস বহুলাভ ভাষায় পরিবেশন করেছেন লেখক, প্রচণ্ড আঘাতে বিপর্যস্ত নায়কের হারানো দয়িতার জন্ত আকুল প্রার্থনার যে চিত্রটি তিনি এঁকেছেন তা সত্যই মর্মস্পর্শী। বইটি পড়ে যে আমরা খুসী হয়েছি একথা অকুণ্ঠ স্বীকার করি। সুন্দর ও সুশোভন প্রচ্ছদ এবং পরিচ্ছন্ন বাঁধাই এই উপন্যাসখানির আর এক সম্পদ। প্রকাশক ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৫ টাকা মাত্র।

বেনারসী

বিমল মিত্রের সঙ্গপ্রকাশিত ছোট গল্পসংগ্রহ 'বেনারসী', মোট আঠাট গল্প স্থান পেয়েছে এই সংকলনটিতে, যার ভিতর বেনারসী গল্পটিই প্রথম ও প্রধান। এক পতিতা নারীর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন। উপলব্ধি; পতিতা বলেই বেনারসীর জীবনের সব সম্ভাবনা ম্লান করে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে গেল নিপুণ হাতে তারই ছবি কেছেন লেখক। রূপে-গুণে অল্পমাত্রা এক নারীর সাময়িক দখলনকেই দেখতে পেলো সর্কারী সমাজবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, তাই হু হু করে গেল বেনারসীর মত অনভা একটি মেয়ে, ফলে ফলে সর্কারী হয়ে উঠতে চেয়েছিলো যে আপন নারীসত্তার সহায়ার বে গেলো সে ব্যর্থতার অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে, গল্পটির সুন্দর নিবিক আবেদন মর্মস্পর্শী; লেখকের সুজীৱনার আমাদের দায়ের এই বহু-আলোচিত সমস্যাটির সম্বন্ধে পাঠকমন আগ্রহী হতে ওঠে স্বাভাবিক ভাবেই। গ্রন্থটির অপর গল্পগুলিও সুপাঠ্য, দৃষ্ট লেখকের নিপুণতার স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। আমরা এই সংগ্রহটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি এবং এর সাক্ষ্য কামনা করি। প্রচ্ছদ মনোরম ও অপরাপন আঙ্গিক সুঠা। প্রকাশক—ত্রিবেণী

প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৪'৫০ নং পঃ মাত্র।

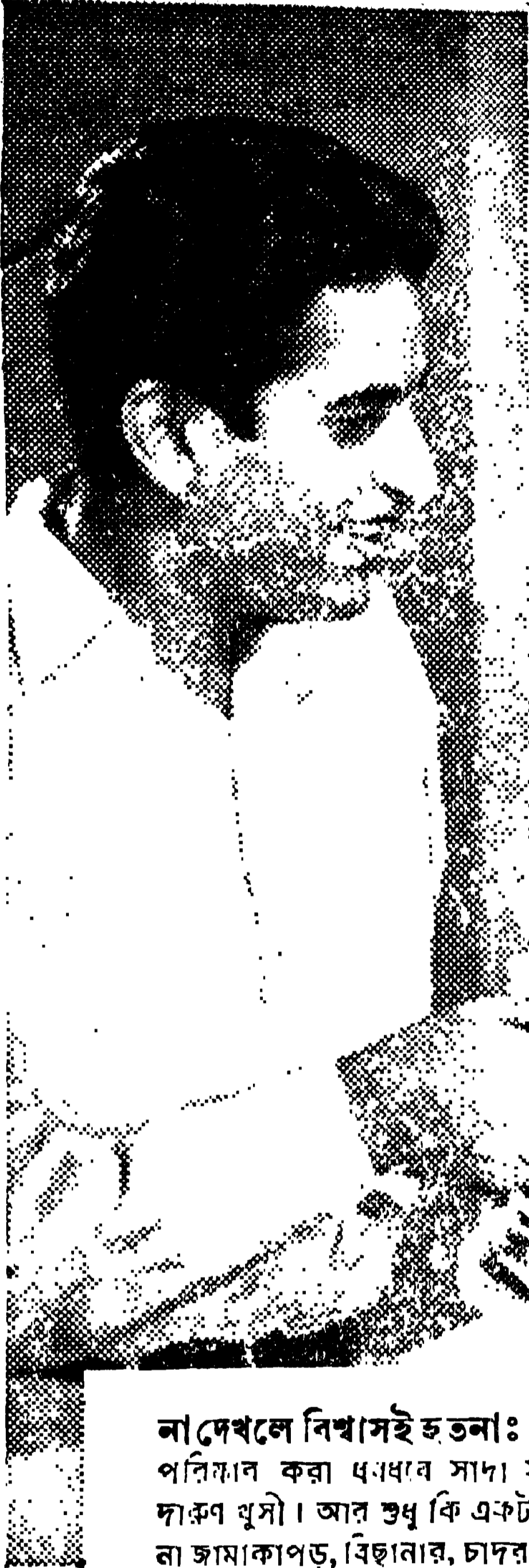
রমণীর মন

আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রখ্যাত কথাসিদ্ধী শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরীর নবতম গল্পগ্রন্থ। মোট নয়টি গল্প স্থান পেয়েছে এতে। গল্পগুলি মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ, সুস্থ বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবনকে দেখেছেন লেখক, তাই তাঁর রচনা কোন 'ইজমে' ভাবাক্রান্ত না হয়েই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। নিখুঁত আঙ্গিকে লেখা গল্পগুলি অত্যন্ত সুখপাঠ্য। কয়েকটি বিশেষ করে উল্লেখ্য—যেমন 'হাসি' 'রুকমিণী' 'বধন বৃষ্টি নামল' প্রভৃতি, উল্লিখিত গল্পগুলি লেখকের সুন্দর অল্পদৃষ্টি ও দয়দী দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষরবাহী, সমাজের সর্কারী গণ্ডীর বাইরে ছ'টি নরনারীর সাম্মিলিত জীবন কেমন করে প্রকৃত প্রেমের মধ্যে সর্কারী হয়ে উঠল 'হাসির' কাহিনীতে লেখক তারই ছবি এঁকেছেন। 'রুকমিণী' গল্পটি একাধারে ট্রাজিক ও হাস্যকর। গল্পগুলির চিত্রে ছিত্রে লেখকের গভীর জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায় যা সত্যই হৃৎস্পর্শী। আমরা বইটি পড়ে আনন্দিত হয়েছি, আশা করি পাঠক সমাজে এটি আদৃত হবে। পুস্তকটির অঙ্গসজ্জা সাধারণ। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা পকাশ নয় পয়সা মাত্র।

শ্রী'ম'-দর্শন

যুগান্তর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকৃত ভক্তগণের অল্পতম শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা শ্রী'ম' কথিত বহু বাণী নিষ্ঠাতারে একত্র প্রেরিত করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক এই পুস্তকে শ্রী'ম'র জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন, সাধক-জীবন কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় গ্রন্থটি পাঠে। অধ্যাত্মবাদের পীঠস্থান এই ভারতভূমি বহু সাধক মহাপুরুষের আবির্ভাবে হয়েছে বহু, এই সাধকগণের ভিতর পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের নাম চিরস্মরণীয়, শ্রী'ম' ছিলেন ঠাকুরের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার, ঠাকুরের অমৃতোপম উপদেশাবলী 'কথামৃত' নামে লিপিবদ্ধ করেন তিনি লোকহিতার্থে; তাঁরই শ্রীমুখ-নির্গত ঠাকুরের প্রসঙ্গ-কথা বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে; বোধোচিত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থকার বিবরণবস্তুর গুরুত্ব ও মর্মব্যঙ্গ সম্পূর্ণ বজায় রেখে গিয়েছেন আপাগোড়া, তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক বইটি পড়ে সত্যকার আনন্দ লাভ করবেন এ আশা বহুলাই করা যায়। অশান্তি শোক-দুঃখ অর্জিত মানব-হৃদয়ে বইটি উদ্বোধ ও অল্পপান এতদূতরেই কাজ করবে, এ কথা সহজেই বলা যায়। এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্ত গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়েই আমাদের ধন্যবাদার্থ, আমরা এই সুন্দর পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি। বইটির অঙ্গসজ্জা ত্রিভীণী। শ্রী'ম' দর্শন বাণী নিত্যস্বানন্দ, প্রকাশক—প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী ১৫ কলেজ কোয়ার্টার, কলিকাতা-১২। মূল্য—পাঁচ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন।



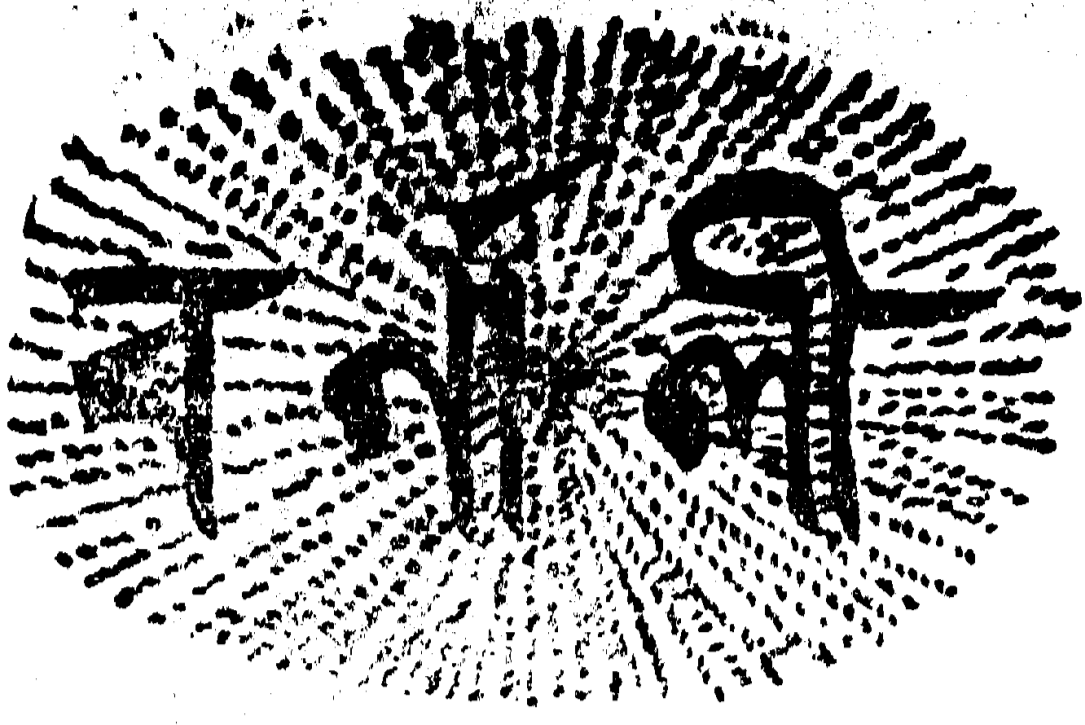
একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায় তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা



না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিচয় করা ধাধাও সাদা সাটটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সাট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোমালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্যকরী ও অফুরন্ত ফেনা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারে না! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না কেন... আজই!



সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

নীল হেসে বললো—মন্দ হয় কি।

ডাইভার জানতে চাইলে কোথায় যেতে হবে।

মঞ্জু বললো—ট্যাগ বোডে—পঞ্জাব ধারে।

হর্ন দিতে দিতে আর পিছু চলতে চলতে একটা কাঁকা জায়গায় শরীর ঘুরিয়ে নিয়ে গাড়ী শহরের পথ ধরলে। মঞ্জু এমন দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল যেন সে গভীরভাবে দিল্লী বাবার কথাটাই চিন্তা করছে।

নীল গাড়ীর গম্বীতে পিঠ রেখে আরাম করে বসে বললো, বাঁচালেন। আপাততঃ দিল্লী ছোটায় চাইতে পঞ্জাব ধার দিয়ে ছোটায় অনেক বেশী কাজের হবে।

মঞ্জু একটু হাসলো।

চললো হুগাতে মুঠো করে ধরে মাথাটায় কবে একটা বাঁকুনি দিলো নীল—ছানচাপা ঘরে বসে থেকে থেকে বুদ্ধিও যেন কেমন চ্যাপটা খেয়ে গেছে। দেখা যাক, এবার খোলা হাওয়ার ছুটে কিছু সচল হয় কিনা। কোন হৃদয় পাই কিনা। আপনিও ভাবুন।

বাইরের দিকে চোখ রেখেই জবাব দিল মঞ্জু—আমি ভেবে কি করবো। আমার ভাবায় কি এগুবে বলুন?

—কাক ভাবায়ই কিছু এগুবে না। না আপনার। না আমার। না আর কার। সমস্ত চিন্তা-জগৎ খেমে পড়ছে।

—কার কাছে। নীলের দিকে চোখ ফেরালো মঞ্জু।

—হৃদয়ের কাছে? হৃদয়ের কাছে। পাঁহাড় উড়িয়ে পথ তৈরী করলে তবেই চলার কাজ আরম্ভ করা যায়। এই হৃদয় আর হৃদয়ের পাঁহাড়ও যতক্ষণ না উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে, ততদিন বোধ-বুদ্ধি-জ্ঞানের চলার পথ নেই—এগুবার উপায় নেই।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরালো নীল। দেশলাই-এর কাঠিটা গাড়ীর গায়ে লাগানো ছাইদানে ফলে একস্থখ ঘোঁরা ছাড়লো। বাইরে জার বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ীর কাচের শার্সি বন্ধ। ঘোঁরাটা বেরবার পথ করতে না পেয়ে গাড়ীর ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। নীল সেটা লক্ষ্য করে বললো—আপনার অন্তর্বিষে হচ্ছে?

মঞ্জু বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে—কিসের জন্ত?

—বন্ধ গাড়ী। ঘোঁরাটা বেরতে পারছে না।

—ও! না।

কিন্তু আরও দু-একবার ঘোঁরা ছাড়ার পর গাড়ীর ভেতরকার

ঘোঁরাটে ভাবটা দেখে, হাতল ঘুরিয়ে কাচের শার্সি মাঝিয়ে সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিল নীল। তার পর কের কাচটা তুলে দিতে দিতে বললো, কাল আমাদের একটা মিটিং আছে—মিটিং মানে বক্তৃতা টক্কিতা কিছু নয়। সবাই মিলে একত্র হয়ে পরামর্শ করা কি করা যায় আর না যায়। আপনি আসুন না?

—কখন?

—এই বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার।

—আসবো।

দোকান-বাজার-হাট, কর্মমাস্ত পথ, কাঁচা ড্রেন' ভোবা পুকুর পেরিয়ে গাড়ী শহরের পথও পার হয়ে এসে ট্যাগ বোডে পড়লো। মুলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ডাইভারের সামনের কাচের উপরকার কম্পাসের কাঁটার মতো কাঁটাটা অনবরত এদিক আর ওদিক করে করে কাচের গাের জল মুছে চলেছে। তবু তারি বৃষ্টিতে বাঁপসা পথঘাট দেখা যাচ্ছে না। পঞ্জাবে চেনা যাচ্ছে না। তার বুকের উপর নোঙর বাঁধা স্ট্রিমার, নৌকো, বোটের আলোগুলোকে দেখাচ্ছে অন্ধকারের বুকে ইতস্তত ফুটে থাকা আলোর মতো। বৃষ্টি-বাঁপসা পথে সতর্ক হাতে গাড়ী চালানো ডাইভার। মাঝে মাঝে এমন সতর্ক হাতে চালানো গাড়ী ট্যাগ পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে হেড লাইটের আলো ফেলে ফেলে। বন্ধ জানালার কাঁক দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে গাড়ীর মধ্যে। কুকের ফটোর গলার ঝোলানো বেলকুঁড়ির মালা হুটো বাতাসে ছলছে। মঞ্জু আসন থেকে কিছুটা এগিয়ে এলো। মুখটা সামনে এনে হু' হাতে উড়ন্ত চুল চেপে ধরে বসে রইল। জল বাতাস ছুঁ করে বয়ে চললো ওর মুখের উপর দিয়ে। ঠাণ্ডায় জমে উঠল ওর মুখটা। যেমন বসেছিল তেমনি থেকেই বললো—আঃ বেশ লাগছে।

ওদের গাড়ী অন্ধ আর একটা গাড়ীকে পাশ কাটালো। পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ী টাল খেলো। মঞ্জু কাত হয়ে পড়তে পড়তে নীলের হাঁটু ধরে ফেলে টাল সামলালো।

নীল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলো। হু'বার দেশলাই-এর কাঠির টানটা বাজের বাইরে পড়ল, তিন বাবের-বার কাঠির বাজের মুখ বাজের বাজের ওপর বেখে শক্তহাতে টান মেবে দেশলাই জ্বালাল। সিগারেট ধরাল। কাঠিটা গাড়ীর গায়ে ছাইদানে ফেললো।

কুকের ফটোর গলার ঝোলানো বেলকুঁড়ির মালাটা বৃষ্টির ছাঁটে ছাঁটে এতক্ষণে ফুলে উঠেছে। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ—কি মিষ্টি গন্ধটা! একটা মালা দিন না। ছেলেম'মুখের মত হাত বাড়িয়ে একটা মালা চাইলো মঞ্জু ডাইভারের কাছে।

এ ভাবে কেউ বোধ হয় কোনো দিন ডাইভারের আরাধ্য দেবতার গলার মালা চায়নি। মঞ্জুর দিকে একবার তাকালো সে। বোধ হয় মনে মনে একটু হেসেই একটা মালা তুলে দিলো তার হাতে।

নাকের কাছে মালাটা মুঠো করে ধরে মস্ত একটা নিঃশ্বাস টানলো মঞ্জু—আঃ, দেখুন। মুঠোমুঠু নীলের নাকের কাছে নিয়ে মালাটা ধরলো সে—দেখুন কি মিষ্টি গন্ধ।

গাড়ীর বাঁকুনির সঙ্গে মঞ্জুর হাতটা নীলের হাঁটু স্পর্শ করলে, বুকেটা থক'ক'য়ে উঠলো মঞ্জু। তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে এনে মালাটা খোঁপায় জড়াতে লাগলো সে। নীল সিগারেটের ছাই বাড়তে বাড়তে আসনের উপরে সোজা হয়ে বসলো। মালাটা



সন্ধ্যাসঙ্গীত

— প্রিয়রঞ্জন বরদিক্ত





মেমোরিয়াল

—চিত্ত নন্দী

মিষ্টিহাসি
—গোপাল দাসমজুমদার

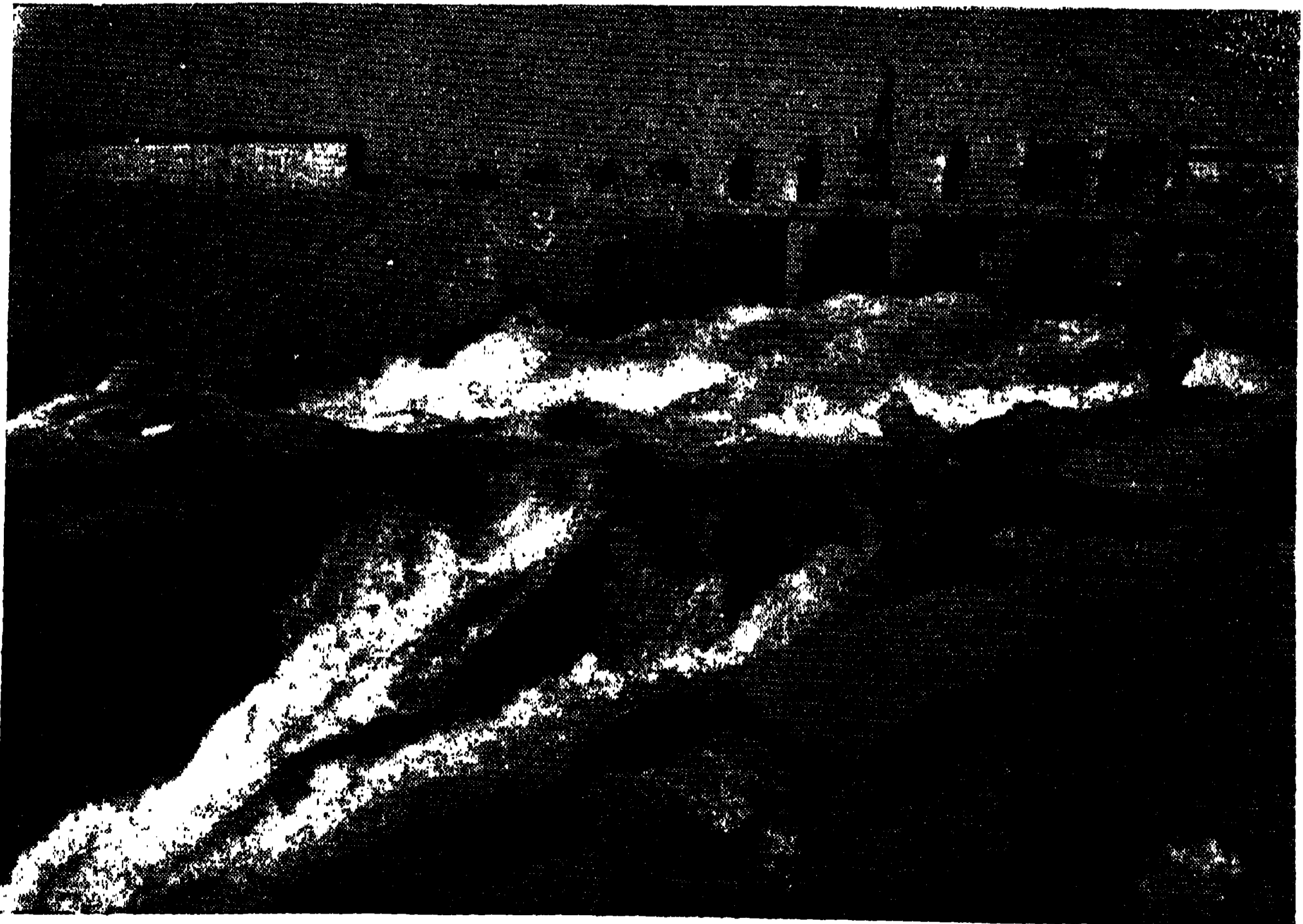




অপরাহ্নে
—অজিত দাস

মুক্তির বন্ধন

—গোবিন্দলাল দাস





शुभ्रायन्त्रिगण (कोणाकरक)

ধোঁপার জড়িয়ে হঠাৎ লম্বা সোকার সুখোমুখি হয়ে বসবার মত মজু নীলের দিকে ঘুরে আসে জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা, আপনারা কেবল বাওয়ার কথাই ভাবছেন কেন? না বাওয়ার দিকটা ভাবা যায় না?

—তাই যদি ভাবা বাবে, তবে তো আর ভাববারই কিছু থাকে না?

—ভাবা বাচ্ছে না টাকার জন্তে তো?

—নিশ্চয়।

—টাকাটা সংগ্রহ করা যায় না?

—কি ভাবে?

—এই ধরুন, আপনাদের প্রতিটি ঘর থেকে জন্মির দাম হিসেবে কিছু তোলা হ'লো তাব পরেরটা যার।

এর জবাবে নীল বেভাবে কথাগুলি বললো তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল সে নিজেই এই পথটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছে এবং এখনও ক'রছে। সে বললো—যদিও কিছুই দেবার শক্তি নেই আমাদের তবু ধরলাম, ধার করে বর্জ করে, চেয়েচিন্তে এনে দিলাম আমরা এবং তাতে মোট টাকার সিকি অংশ উঠলো। অর্থাৎ আমরা পঞ্চাশ ঘর মিলে 'শ' হুই করে দিয়ে, পঞ্চাশ হাজার টাকার দশ হাজার না হয় পনের হাজার টাকা যোগাড় করলাম। তারপর।

—না : তারপর আর কিছু নেই।

শিছুকণ চূপচাপ কাটলো। যেন বাইরে বৃষ্টির শব্দ আর বৃষ্টির

জলের উপর দিয়ে পাড়ী চলার শব্দ ছাড়া যেন অন্যতে কোনো শব্দ নেই।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে বাওয়ার মত ক'রে মজু বললো—ঐ যে ধারের কথা বলছিলাম? বর্তমানের জন্তে ধার পাওয়া যায় না কোথাও?

—আমাদের বর্তমান আর ওবিধাতে কোনো তফাৎ নেই। এমন কি, এই পুরুষের ধার সামনের পুরুষ এসে শোধ করবে তেমন সম্ভাবনাও অস্বকাবে। তা শোধ না দিয়ে না হয় স্ত্রীই গৌনা গেল যদি আর পাওয়া যায়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিও জানা নেই যার কাছে গিয়ে আমি এক টাকা ধার চাইতে পারি।

আবার মজু কিছুকণ পূর্বে নীলের ঘরে হু-হাত কোলের ওপর রেখে বেভাবে স্থির হয়ে বসেছিলো ঠিক সেই ভাবে হু-হাত কোলের ওপর রেখে স্থির হয়ে বসলো।

—একটা কাজ চাই। ওর মুখে একটা কাজ চাওয়ার কথা শুনে যেন কাজ শব্দটার অর্থ বুঝে উঠতে পারছে না, এমনি দৃষ্টিতে রক্তত তাকিয়েছিলো ওর মুখের দিকে।

—কাজ?

—হ্যাঁ কাজ। একটা কাজের তীব্র দরকার আমার। একটা টাকা রোজপায়ের উপায় না করলেই চলছে না আমার।

রক্তত সোকার বসে থেকেই পাশের দেওয়াল খুলে একটা চেকবই



জীবাণুনাশক নিমতেল থেকে তৈরী, সুগন্ধি মার্গো সোপ কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সোপের প্রচুর নরম কেনা রোমকুপের গভীরে প্রবেশ করে ত্বকের সবরকম মালিন্য দূর করে। প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপেই উৎকর্ষের অঙ্গ বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিষ্কার ও প্রফুল্ল থাকবেন।

পরিবারের
সকলের পক্ষেই
ভালো



মার্গো সোপ

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

দ্বি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

CHOCIS DEN

আর কলম টেনে বের করেছিলো। তারপর একটা টানা সই দিয়ে চেকটা বই থেকে টিপে টিপে লাইনে লাইনে ছিঁড়ে নিয়ে কাগজ চাপা দিয়ে রেখেছিলো মঞ্জুর সামনে। মঞ্জুর বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলো—এটা কি ?

—চেক। তোমার প্রয়োজন কত তা তো আমি জানিনে, অকটা তুমি বসিয়ে নিয়ে।

—মঞ্জুর পরিহাস করেছিলো।

—আমার খুসীমত বলাব ?

—নিশ্চয়।

—দশ, বিশ, ত্রিশ হাজার বলাব ?

—বলাও।

ওর পরিহাসের জবাব দিয়েছিলো রক্ত বিনা পরিহাসে।

বাড়ীর বাস্তায় ট্যান্ডি চুকল না। রাত্তা তখন জলের তলায়। ষোড়ের মাথায়ই নেমে পড়তে হ'লো মঞ্জুরকে। নেমে পড়ছিলো নীলও। বাধা দিল মঞ্জুর।

—আপনি নামছেন কেন ?

—আপনাকে পৌঁছে দিতে।

—এই জলে নেমে কুড়ি হাত পথ আর পৌঁছে দিতে হবে না আমাকে। বলতে বলতে ব্যাগ খুলে একটা দশ টাকার নোট বের করে বিনা দ্বিধায় 'মঞ্জুর নীলের বুক-পকেটে ত'রে দিলো সেটা। তারপর নিজে ডাইটারকে নির্দেশ দিলো—বাবুকে পৌঁছে দাও।

আপত্তি করলে না নীল। জল-সাঁতার বাসে উঠে ভীড়ের চাপে দাঁড়িয়ে ঝলতে ঝলতে এখন বেন ইচ্ছে করছিল না তারও। চোখ বুজে একটা একটানা গতির ভেতরই বাসে থাকতে ইচ্ছে করছিলো।

ভিজে জুতো হাতে, ভিজে শরীরে, পারের তলায় ভিজে কাপড় ছপ্, ছপ্, শব্দ তুলে যখন ঘবে এসে পঁড়ালো মঞ্জুর, তখন ওর দিকে তাকিয়ে মৌরী বলে উঠলো—খতি মেয়ে! এই বুট মাথায় ক'রে বাড়ী এসেও বেরিয়ে গেলি কেন ?

—তোমার জন্তে। দে টাকা দে। এসপ্লানেন্ড আর বালীগঞ্জ, বালীগঞ্জ আর এসপ্লানেন্ড—ট্রামে বসে কেবল চক্কর খেয়েছি। অনেক পরমা পেছে।

—ক বলেছিলো তোকে ?

—বলবে আবার কে ? সুদর্শন বাবুকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবার জন্তে আমি বহুপরিকর। আচ্ছা কাপড় ছেড়ে এসে সুদর্শন-সংবাদ শুনিছি। জানের ঘরে গিয়ে চুকল মঞ্জুর।

রাতের খাওয়ার টেবিলটার দিকে তাকিয়ে একটু সময় চুপ করে বসে রইল মঞ্জুর। সুদর্শন সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়ারটার ভেতর একটা ধূসী এনে দিয়েছে—বেন তারই প্রমাণ এই খাওয়ার টেবিলটা। বিয়ে-ভাজা জুনোখিচুড়ি মিষ্টিগরু হুড়াচ্ছে, বাবু পরম পরম ডিমভাজা মাছভাজা বেগুনী পরিবেশন করছে। কেউ না কেউ নীলের ঘরেও একখালা ভাত আর একটা কিলু ভরকারী বেখেই পেছে। সুখার্ণ্ড নীল উপুড় হয়ে নিশ্চয়ই তা গ্রাসে গ্রাসে খুঁ খুঁ তুলছে।

পরের দিন সকালবেলা মঞ্জুর নীলের সেই কথাগুলোই নিয়ে বসে চারের কাপে আর আর চুমুক দিচ্ছিল—কোথায় লোকগুলোকে নিয়ে—বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, কোথায় ?

উত্তেজিত অমিতা কাগজ হাতে ছুটতে ছুটতে এসে। ঘবে। মঞ্জুর হাতে কাগজটা ধরে দিয়ে কার্জাতার গলার বললে দেখো কি হয়েছে আসামে। বড়দি তার বড় বড় মেয়েগুলো নিয়ে ওখানে। জানিনা কি হয়েছে, আমি মার কাছে বা তোমরা একটু রাত্রা-বারাটা দেখো। পাগলের মত বেরিয়ে অমিতা।

মঞ্জুর, মৌরী উপুড় হয়ে পড়লো কাগজের ওপর—

: আসামে বাঙ্গালী-হত্যাকাণ্ড!—বাঙ্গালীর বাড়ীঘর আত্মীয়স্বজন—বাঙ্গালী নারীর ওপর অত্যাচার—আসামের প্র-শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

খানিক বাদে পত্রিকা রেখে উঠে গেল মঞ্জুর টেবিলের কাঁচ কোলের উপর মেলে ধরলো তার উদ্গৃহিত খাতা। পাতা ওঠে ওঠাতে চোখ খামলো গিয়ে তার একটা উদ্গৃহিত ওপর। উদ্গৃহিতটা যে সে কতবার পড়লো তার অভ্যুত নেই।

গীতার বলেন, শুকুতের রক্ষা ও হুকুতের বিনাশের রক্ষাবর্জিত বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে বাঁধা ও জড়িত হয়, তখনই সীদ্ধিত দেশের অতর্কিততার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট আত্মবিরোধী দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাঙ্গালদেশের অদৃষ্টকালে চূর্ণোপগ ৩৩ ঘনিত্ব নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাটবে একত্র হয়েচে বি শক্তি। আমাদের অর্ধনীতিতে বর্মনীতিতে প্রেরণীতিতে প্রেরণেতে নানা ছিত্ত, আমাদের বাটনীতিতে হালে ঠাঁড়ে তা মিল নেই। হুঁতাগ্য বাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে, ঠাঁড়ীয়ে বোগের যন্তো তাদের পেয়ে বাসে ডেমবুদ্ধি; কাছের লোক তারা দুয়ে ফেলে আপনাকে করে পর, প্রাজ্ঞকে করে অসম্ম স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগাতার ও সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টি সম্মু উর্দ্ধ তুলে ধরে মান বাঁচাতে হবে.....

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তা নাজীর তিতরকার সমস্ত প্রস্তুত বিব জেপে উঠে সাংঘাতিকতা এগিয়ে আনে। অন্তর বাহিরের চক্রান্তে অবসাদপ্রস্তু : নিবাসয় করবার পূর্ণশক্তি প্রবেশ ক'রতে পারেনা। এইরকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিময় পুরুষের হৃদি হস্ত যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূলে ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উৎস করতে পারেন।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলা দেশ যতকি সুবোধ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিভবনাকেই সে আও পৌক্কেবর আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত ক'রে তুলবে, এ চাই। আপাত পরাততকে অধীকার করার যে বল জাগ্রত হয়, যে স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে বাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকে দেখা পাই বাঙ্গলা দেশের অকল্প অদৃষ্ট তাকে প্রেরণ দিতে বিলুপ্ত এই বিলুপ্ততাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ় চিত্তে বলতে পাই আত্মরক্ষার হুঁ বিনাধার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যে।

বাধা হয়ে যদি সেই উপকরণকে কলকাতার তালি ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে। হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের ওপর চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হোতে হবে।

দুঃসাধ্য অব্যবসায় হুর্গর লক্ষ্য গিয়ে পৌঁছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুঃস্থ সমস্তা এইখানেই। কিন্তু কেন বলব "বদি" কেন প্রকাশ করব সংশয়। মিলতেই হবে, কেননা দেশকে বাঁচাতেই হবে। বাঙ্গালী অদৃষ্ট কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবেনা,--সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙ্গালী মারের ওপর মাথা তুলবে।--

বাঙ্গলা দেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুত্তম খল্লকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙ্গালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে

বিপর্যস্ত করা সম্ভব কি না, এ নিয়ে সেদিন সে বিজের মতো ভাব করেনি বিচার করেনি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা ক'রেছিলো। তার পরবর্তী কালের প্রায়শে ইচ্ছার অস্বপ্ন রূপ দেখেছি বাঙ্গালীর তরুণদের চিত্তে।--তাদের সেই ভ্রাতৃপের পর ভ্রাতৃপ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, আশু নিঃফলতার ভয়সং হরেছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মত প্রমাণ ক'রে গেছে বাঙ্গালীর হুর্গর ইচ্ছাশক্তিকে ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অস্বপ্ন তাক্ষের যে স্রষ্টাবিদারক প্রমাণ দেখা দিয়েছিল তার উত্তরে আইনের লাহুনা বস্ত মসীলেপন করুক তার তবু কি কালো করতে পেরেছে তার আন্তনিহিত ভেজক্রিয়াকে? বার বার-- বার বার পড়ে চললো মঞ্জু। যেন রবীন্দ্রকাব্যগুলো মুখস্থ করবে সে।

[ক্রমশঃ]

প্রেমোন্মাদিনী রাখা

মনসাকিনী ভাড়াড়ী



প্রেমের সাধিকা ওগো রাখারাগী প্রেমে গড়া তনু-মন কৃষ্ণস্থখে সুখী তারি লাগি ত্যাগ নিছাম নিছিকন। বিরহে বিরলে অঝোরে কেঁদেছ হা কৃষ্ণ কোথা ব'লে কত না বাতনা নীরবে সয়েছ পিরীতি করার ফলে।

বনে বনে তুমি খুঁজিয়া ফিরেছ কোথা প্রাণসখা হার সে চতুর রহে আঁখির আড়ালে প্রাণ বুঝি তব বার। বাসকণ্ঠা রচনা করিয়া জাগিয়াছ সারা নিশি ব্যর্থ হয়েছে তবু তারে চেয়ে আঁখি-নীয়ে গেছ ভাসি।

বনফুলে তুমি মালাটি গেঁথেছ তাহারে পরাবে ব'লে তুচ্ছ হইয়া বরিয়া পড়েছে সে নিঠুর গেছে চ'লে। তোমার নাগর তোমারে ছলিয়া আন ঘরে চ'লে যায় মান কর তুমি ওগো অভিমাত্রী তা দেখি সে ব্যথা পায়।

বহুবল্লভ নামটি তাহার জগতে বিরিক্ত যে যে তাহারে ডাকে ধরা দেয় তারে পারেনা থাকিতে সে। তমালেবে হেরি কৃষ্ণ ভেবে মনে জড়িয়ে ধরো গো তায় নবজলধরে শ্রাম অহুমানি নয়ন ভাসিয়া যায়।

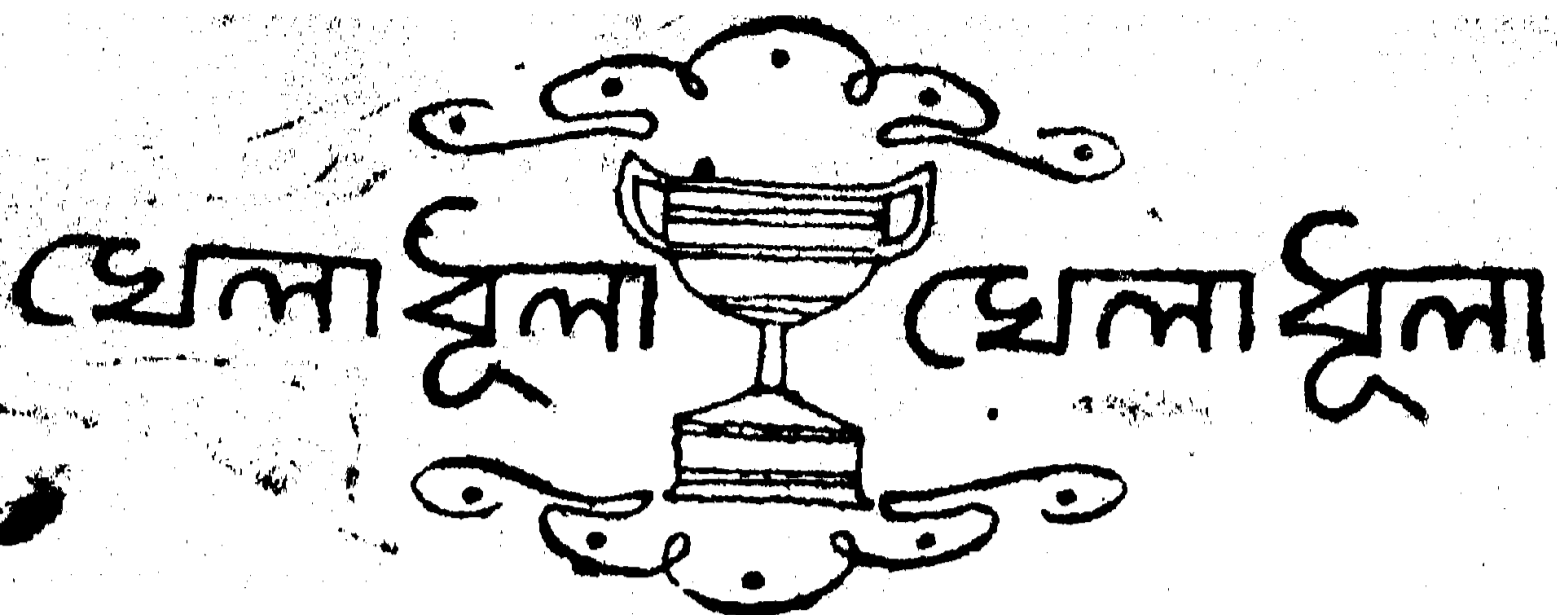
তাহারে হোরতে জল আনা হলে বাও তুমি বহুনার শালুড়ী ননদী দেয় বে গজনা তবু নাহি ছাড় হার। তাহার লাগিয়া কলককালিমা করিলে পলার হার দেও সুখ তব মনে তার তুমি "পিরীতি" করেছ সার।

তোমার প্রেমের বতক পরিমা না পারে বলিতে কেহ বঁধুয়া তোমার চিরখণী হল শোধিতে নারিল মেহ। যৌয়ার ছলনা করিয়া বে কাদ নাহি বুঝে আন জনে আঁজিনা পিছল করিয়া চলো গো। ব'লো তুমি কী কারণে।

শ্রামের বাঁধনী হবে পশে কানে না পার রহিতে বীর পাগলিনী প্রায় অভিসারে বাও চরণে রহেঁনা স্থির। সখীরা তোমারে কত বুঝিয়েছে তুলিতে কালার মুখ শোন নাই মানা ওগো তুমি রাই পেলেও শতক হুখ।

তাইত তোমার প্রাণবঁধু আজ বরিয়াছে তব পায় দাসধত লেখে বলে ক্রমা করো তবু মান নাহি যায়। বদন কিরানে থাক যে বসিয়া সে রহে জুড়িয়া কর হেঁট মুখে বলে "শোন রাই খনি না বাব পয়ের ঘর"।

তবে খুসী হয়ে দিলে অহুমানি বসিতে তোমার পাশে সখীগণ সবে দেয় জয়ধ্বনি গগনে চলিয়া হাসে। মনে অভিলাষ হব তব দাসী হেরিব পরম সুখে যুগল চরণ হুজনার তবে জড়িয়ে ধরিব বুকে। তোমার প্রেমের অপার মহিমা গাহিয়া বেড়াব আমি এ ময় জগতে স্বরগ হইতে অমৃত আসিবো আমি।



উইম্বলডন টেনিস খেলার ইতিকথা

টেনিস খেলা ধীরে ধীরে ভাঙ্গা ভাঙে বিশ্ববিখ্যাত টেনিস প্রতিযোগিতা "উইম্বলডন"-এর নাম তাঁদের কাছে অজানা নয়, যদিও এটা বেশকিছু বিখ্যাত প্রতিযোগিতা বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। এই "উইম্বলডন" প্রতিযোগিতার এসেছেন কত খেলোয়াড়, তাঁদের সুন্দর কলা-কৌশলে মুগ্ধ করেছেন ক্রীড়ামোদী দর্শকদের তার ইচ্ছা নেই। এই সব কাহিনী শ্রবণ করলেই প্রথমে মনে পড়ে স্পেন্সার গোরের কথা; ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম "উইম্বলডন" টেনিসে বিজয়ী সন্মানে ভূষিত হয়েছিলেন, গোরের দশ বছর পর এখানে বিজয়ী হন "এম. ওয়াটসন"। ইনিই উইম্বলডনের প্রথম বিজয়ী মহিলা খেলোয়াড়। ওয়াটসন "কেপ্ট" টুপি ও পা পর্যন্ত স্নানের "সুট" পরে খেলতেন। তাঁর পোষাকের বস্তুসমূহে দর্শক-মনে আলোড়ন এনে দিত। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ওয়াটসনের খেলা দর্শক মহলে আলোড়নের বস্তু হয়ে উঠেছিলো। ১৮৮৭ সালের মহিলা খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হতো। ওয়াটসনকে দেখলে মনে হতো খেলোয়াড়দের ব্যক্তিত্ব ও পোষাকের আকর্ষণময়ই টেনিস খেলার সবচেয়ে বড় জিনিষ।

এর পর মনে আসে মার্কিন খেলোয়াড় উইলিয়াম টিলডেনের কথা। ১৯২০, ১৯২১ আর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর তিন বছর চমকপ্রদ জয়লাভ সারা বিশ্বের টেনিস মহলে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। মার্কিন টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনি খুব উঁচুদরের খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর মা টেনিস মহলে চিরদিনই শ্রবণীয় হয়ে থাকবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে উইম্বলডনের সর্বাপেক্ষা সেরা খেলোয়াড় ছিলেন বরোক্রো, কোচেট ও লাকোটে। এঁরা তিনজনেই ছিলেন করাসী। তাই তাঁরা বিখ্যাত ছিলেন করাসী জরী নামে। ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে এঁরা তিনজনেই ছিলেন "উইম্বলডনের" একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁরা প্রত্যেকেই ছ'বার করে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বকর ঘটনা হলো ১৯২৭ সালে কোচেটের কাছে টিলডেনের পরাজয়।

ইংলণ্ডের টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে ফ্রেড প্যারী ছিলেন একজন সুন্দর খেলোয়াড়। ১৯৩৪-১৯৩৫ আর ১৯৩৬ সালে উপর্যুপরি তিন বছর তিনি চ্যাম্পিয়ন হন। পরে তিনি পেশাদার খেলোয়াড় হন। তিনি পেশাদার খেলোয়াড় না হলে অপেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে আরও সন্মান লাভ করতেন। প্রাক্‌যুগকালীন এই সব খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন মার্কিন খেলোয়াড় ডোনাল্ডবাজ। ইনি ছিলেন উইম্বলডনের

বিশ্বর। এক বছর ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা আর উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে সারা ছনিয়ার টেনিস মহলের বিশ্বরূপে প্রতিষ্ঠাত করেছিলেন নিজেকে।

'ব্যারণ গটফ্রেড ভন ক্র্যাম'-এর কথাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। যদিও এঁর দত্তন হুর্ভাগা খেলোয়াড় উইম্বলডন প্রতিযোগিতার আর দেখা দিয়েছিল কি না সন্দেহ। ভন ক্র্যাম জ্বাচে ছিলেন জায়াণ। পর-পর তিনবার সিম্বলস কাইন্ডালে উন্নীত হয়েও জয়লাভ করতে পারেননি একটিকেও। অথচ খেলোয়াড় হিসাবে ইনি ছিলেন অত্যন্ত উঁচুদরের। তৎকালীন বিখ্যাত খেলোয়াড় বাজের কাছে ইনি একবার পরাজিত হন, এই খেলার খ্যাতনামা খেলোয়াড় টিলকেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ভন ক্র্যামের পরাজয় নিতান্তই হৃদেব ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রবণ রাখার মত যে, ক'টি খেলা তাঁর স্মৃতির সক্ষয়ে আছে, আলোচ্য খেলাটিও তারই অঙ্গতম।

মহিলা চ্যাম্পিয়নদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে করাসী খেলোয়াড় লুজান লেংলেনের কথা। মহিলাদের সিম্বলসে পর পর ছয় বার বিজয়ী হয়ে ইনি আর একজন বিখ্যাত পুরুষ খেলোয়াড় এইচ, এল দোহাতি'র রেকর্ডও ভেঙে দিলেন। দোহাতি' জিতেছিলেন পর পর পাঁচ বার। লেংলেনের এই নৈপুণ্যের জন্মেই প্রথম মহাবুদ্ধের পর লন টেনিসের কবর বেড়ে গেল। লেংলেন যে কেবল খেলাতেই নৈপুণ্য দেখাতেন তা নয়, পোষাকের ব্যাপারেও সব মেয়ে-খেলোয়াড়দের - ইনিও ছিলেন আদর্শ। এমনি কিটকাট কেতাচরিত ছিলেন লেংলেন।

সুজেনকে খেলা শিখিয়েছিলেন তাঁর বাবা। কোর্টের "সাইড লাইনে" দাঁড়িয়ে উনি যেমন মন্তব্য করতেন তখন বাস্তবিকই মজা লাগতো। তিনি নিজেও নিশ্চয়ই ভালো খেলতেন; তা না হ'লে নিজের মেয়েকে এমন পাকা খেলোয়াড় করলেন কি করে?

এর পরেই মেয়ে-খেলোয়াড়দের মধ্যে নাম করতে হয় মিসেস সুদি আর এলিস মারবেলের। মিসেস সুদির খেলা ছিলো লেংলেনের খেলার ধরণের একেবারে উল্টো। তাঁকে বলা হ'ত "Poker-Face" বড়ো বড়ো আদর্শ খেলোয়াড়ী মেজাজ ছিলো তাঁর। চূড়ান্ত মুহূর্তে কখনও উত্তেজিত হতেন না তিনি। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৫ এর মধ্যে সাত বার ইনি উইম্বলডনে জিতেছিলেন। হেলেনের বিজয় ব্যক্তিত্ব বলে কিছু ছিলো না।

মহিলাদের মধ্যে যুদ্ধোত্তর যুগে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও উইম্বলডন টেনিসে একই মরতমে জরী হন। ১৯৫৫ সালে এক হুর্ধনায় তাঁর এই পৌরবন্দর জীবন শেষ হয়ে যায়।

এই হ'লে উইম্বলডনের ইতিকথা। এই উইম্বলডনের যে খ্যাতি একোমিনি দেশ-বিদেশে সবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছিলেন "লিটল মো"।

তার তাক নাম ছিলো মরিন কনোলি। ইনি ছিলেন আমেরিকার অধিবাসিনী, বিপ বহুরে পা দেবার আগেই ইনি তিনবার উইমলডনে জিতেছিলেন। ইনিই প্রথম মহিলা যিনি করাসী— ছড়িয়েছিলো পেশাদার টেনিসের হাওয়ার তা কিন্তু দু'বে সবে যাচ্ছে। পেশাদার টেনিস বন্ধ না হ'লে উইমলডনের মোহ আর থাকছে না। ক্র্যামার, গণ্ডলেস, ম্যাক শ্রেগরের মতো খেলোয়াড়রা আজ পেশাদার দলভুক্ত, তাই নিয়মামুখ্যরী উইমলডনে তাঁরা খেলতে পারেন না—উইমলডনের কদরও তাই কমছে। এই সমস্তার সমাধানের রাস্তা কেউ দেখালে টেনিসের উৎসাহী সমর্থক যাত্রাই খুশী হবেন।

খেলা দেখার আনন্দ

আগেই বলে রাখি, ক্রীড়াসমালোচক হলেও, খেলাধুলার সমালোচনা করার সময় নিরপেক্ষ হলেও, মনে মনে একটি দলকে 'সাপোর্ট' করি। তবে আমার এই সমর্থনের পেছনে আছে ক্লাবটির অনেক বছরের ঐতিহ্য। আমরা সমালোচকরা মনে মনে প্রায় সকলেই এক-একটি দলের সমর্থক। সাধারণ ক্রীড়ামোদীর মত আমাদের অনুভূতিও একই ধারায় প্রবাহিত হয়। সেখানে আমাদের সংগে কোন পার্থক্য নেই উগ্র সমর্থক দর্শকমণ্ডলীর। নিরপেক্ষ আসনে বসে নোট নিতে নিতে আমাদের মনও আশায়-হতাশায় ভরে ওঠে। তাই হয়তো মনের দুর্বলতা মাঝে মাঝে প্রকটিত হয়ে উঠে আমাদের লেখার। আর সেই লেখা পড়ে আপনারা আমাদের প্রশংসা করেন, আবার গালাগালিও দেন, পক্ষপাতিত্বের জন্ত আমাদের অভিযুক্ত করেন।

এই অভিযোগ একজন সাংবাদিকের পক্ষে অমার্জনীয়। এই অপরাধের গুরুত্ব হয়তো আপনারা ঠিক অনুধাবন করতে পারবেন না—একজন সমালোচকের পক্ষে এ গ্রানি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই আগে থেকে বলে রাখি—আপনারা আমার ক্ষমা করুন। চেষ্টা করেও মনের দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারিনি বলে আপনারদের কাছে মার্জনা চাইছি। আর তাই অকপটে আপনারদের কাছে সব কথা স্বীকার করলাম। আমরা মুখে বলে বেড়াই যে আমরা নিরপেক্ষ, কোন বিশেষ দলকে আমরা সমর্থন করি না, লেখার সময় আমরা খেলার ধারা অনুযায়ী লিখি। কিন্তু আমাদের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি সকল সময়ই আমাদের নাড়া দেয়। হয়তো বিশ্ব একটা দল জিতলে আমরা আনন্দ পাই, আবার পরাজিত হলে দুঃখিত হই। এখানেই আমাদের পরাজয়, আমাদের মনের গোপন ইচ্ছা, সূক্ষ্ম অনুভূতি মাথা তুলে দাঁড়ায়। আমরা কিছুই করতে পারি না, তবু মুখে বলি আমরা নিরপেক্ষ।

মাক করবেন! একটি কথা বলে রাখি, আমার এই প্রবন্ধটি পড়ে যদি সব সমালোচকদের, সব সাংবাদিকদের এক শ্রেণীর মনে করেন, তাহ'লে সেখানে আপনারদের চরম ভুল হবে। আর সে ভুলের মাপুল নিতে আমার হয়তো পাতিয়ালার পাহুনিবাসে পংকিল শব্যায় পড়াতে হবে। তাই বলি অন্ত বড় ভুলটা করবেন না বেন। আমাদের গালাগালি দিন, আমাদের নিন্দা করুন তাতে আমরা কিছু

মনে করি না, ওতে আমরা অভ্যস্ত; কিন্তু আমাদের উপর বেন অন্ত বড় একটা মিথ্যা ধারণা রাখবেন না।

খেলা দেখার নির্বল আনন্দ আজ হুলস্থল। প্রতি দিনের খেলাতে এমন একটা না একটা ঘটনা ঘটবেই বাতে খেলার সৌন্দর্য এবং খেলা দেখার আনন্দ দুই-ই নষ্ট হয়। মাঠের মধ্যে টিল ছোড়া, খেলোয়াড়দের আক্রমণ, রেফারীকে মারতে যাওয়া, এতোই হামেশাই ঘটছে। এর মধ্যে নতুনদের সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে একথা ঠিক যে, এ ধরনের আচরণ আগে খুব বেশী দেখা যেতো না। আধুনিক মনের অপ্রকৃতিস্থ অটিলতা আর তরুণ মনের চঞ্চলতাই এর প্রধান কারণ। কিন্তু সব থেকে দুঃখ হয় যখন খেলার মাঠে বয়স্কদের দেখি এ ধরনের আচরণ করতে, তরুণদের সংগে যুবকদের সংগে হাত মিলিয়ে অর্ধবৎ আচরণ করতে। তাই বলতে বাধ্য নেই...

খেলার মাঠে যারা করে ভীড়

কমই তাদের ভালোবাসে খেলা,

জয় চায় নিজেদের দলটির

খেলাকে তারা করে অবহেলা।

খেলার মান নেমে যাওয়ার এও একটা কারণ। নাম-করা দলগুলি কি করে বিজয়ী হবেন, এই শুধু চিন্তা করেন। তাই বিভিন্ন স্থান থেকে আসে নাম-করা সব খেলোয়াড়। তাঁদের জন্ত হাজার হাজার টাকা খরচ করতে ইতস্তত করেন না ক্লাব-কর্তৃপক্ষ। আর খেলোয়াড়দেরও তাই টাকার সংগে সঙ্ক গড়ে উঠে, খেলার সংগে নয়। দলগুলির সংগে যে একটা মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাও নয়।

এই মনোভাবের জন্ত অনেক বাঙালী খেলোয়াড় সুযোগ পাচ্ছেন না—পাচ্ছেন না নিজেদের প্রতিভার পরিপূর্ণ সুযোগ নিতে। তারি দেখি, যখন বাংলা থেকে এগার জন খেলোয়াড় ভারতীয় অলিম্পিক দলে স্থান পান, তখন তাঁদের মধ্যে আছেন মাত্র চার জন বাঙালী। বাংলার খেলাধুলার জগতে এক ক্রিকেট বাদে আর বিশেষ কোথাও বাঙালী খেলোয়াড়রা চাল পাচ্ছেন না—তা কি ফুটবল বলুন, বি হকি বলুন। কিন্তু এর কারণ কি—এর জন্ত দায়ী কারা? ঠিক এই প্রশ্নই তুলেছিলেন মাননীয় সুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় C. I. T ট্রেডিং এর উদ্বোধন করতে গিয়ে। তিনি বাংলা দেশের প্রধান দলগুলির কাছে আবেদন করেছিলেন যাতে তাঁরা বাঙালী খেলোয়াড়দের উপর লক্ষ্য রাখেন তাদের প্রাধান্য দেন। বাংলার বাইরের খেলোয়াড় এনে টাকা নষ্ট না করে সেই টাকা যদি বাঙালী খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতির জন্ত ব্যয় করা হয় তাহ'লে মনে হয় বাঙালী খেলোয়াড়রা কোন অংশেই কম বাবেন না। দশটা-পাঁচটা কলম পিছে খেলা যায় সত্যি—কিন্তু সে খেলার জৌলুস থাকে না থাকে না খেলোয়াড়দের দেহের ও মনের প্রকৃতি। অনুশীলনের কথা জো এঁরা চিন্তাই করতে পারেন না। একটু অপ্রাসংগিক হলেও এ কথাগুলো আপনারদের জানানোর প্রয়োজন ছিল, অবশ্য এ কথা যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করবেন আপনারা—আমি নই।

যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম...খেলা দেখার আনন্দ। আজ শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অনেক দেশে

এই অভিযোগ শোনা যাচ্ছে—সমর্থকদের উগ্র মনোভাব প্রকৃত খেলা দেখার আনন্দকে বিনষ্ট করেছে। কি খেলোয়াড়, কি সমর্থক সকলের মনে জয় লাভের ইচ্ছা এত বিক্রী ভাবে দেখা দিয়েছে যে প্রত্যেক খেলার এই জয়ই কিছু না কিছু গণ্ডগোল হচ্ছেই। যেমন করেই হোক জয়লাভে হবে। জয়লাভের ইচ্ছা ভালো, কিন্তু তার নগ্নতা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। খেলার জয়-পরাজয় থাকবেই, খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়ে তাকে মেনে নিতে হবে। জয়লাভ করলে তো কথাই নেই আর পরাজয়—পরাজয়ই সই! এই মনোভাব আমাদের মধ্যে কবে যে আসবে তা একমাত্র ভগবানই বোধহয় বলতে পারবেন। তবে একথা জোর গলায় বলব যে এই মনোভাব যখনই আসবে, খেলার মান তখন বহুগুণে উন্নত হবে।

কোলকাতার প্রধান দলগুলির যেদিন খেলা থাকে, সেদিন গড়ের মাঠ জনারণ্য হয়ে উঠে—আর গুরুত্বপূর্ণ খেলা হলে তো কথাই নেই। রায়মপার্ট, জ্যামপার্ট থেকে শুরু করে লাইট-পোর্ট গাছের ট্রেডিয়াম সব আগে থেকেই

'রিজার্ভ' হয়ে যায়। আর মাঠের মধ্যে সাধারণ আসনে বীরা থাকেন তাঁরা গায়ের জামা খুলে রোদ্দরে শুকিয়ে নেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা লাইন দিয়ে, মাঝামাঝি করে মাঠে ঢোকান পর ক্লাস্ত মন এমনিতেই খিঁচিয়ে উঠে। তার উপর যদি মাঠে একটু গণ্ডগোল হয় তাহলে তো কথাই নেই—আরও হয়ে বাবে খণ্ডযুদ্ধ। মাঠের মধ্যে ঢিল ছোড়ার দরকার হলেই বাইরে থেকে সেই ঢিল সাপ্রাই করা হয়। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো যে এখনও ওদেশের মত অটেল বোতল ছোড়া শুরু হয় নি।

ট্রেডিয়ামের কথা না বললে প্রবন্ধটি অসমাপ্ত থেকে যাবে। কিন্তু চুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ফুটবল-ট্রেডিয়াম কবে হবে তা আমরা বলতে পারি না। কোলকাতার ফুটবল-ট্রেডিয়াম প্রসঙ্গে এতো বেশী আলোচনা হয়েছে আর আপনারা এমন মনোবোপ দিয়ে সেগুলিকে পড়েছেন যে নতুন কিছু আর আমরা আপনাদের শোনাতে পারব না। তবু জোর গলায় একথা বলব যে কোলকাতার মত শহরে, যেখানে ফুটবল দলের সংখ্যা অতগুলি আর লক্ষ লক্ষ তার



অলিম্পিকের সাক্ষ্য প্রত্যাশী—(বাঁ দিকে) ডন ব্রাগ, পোল ভন্টার ও (ডান দিকে) প্যারী ও'ব্রিয়েন, শটপুট চ্যাম্পিয়ান—উভয়েই মার্কিন ক্রীড়াবিদ।

অমুরাগী, সেখানে সামান্য একটা ফুটবল-ট্রেডিয়াম না থাকা যে কি লজ্জার কথা তা ভাবায় প্রকাশ করা সহজ নয়। যখন বিদেশী দলগুলি কোলকাতায় খেলতে আসে বা কোন বিদেশী ক্রীড়াঙ্গুরাগী কোলকাতায় আসেন তখন তাঁরা কোলকাতার মত শহরে ফুটবল-ট্রেডিয়াম নেই শুনে বিষয়ে হতবাক হয়ে যান আর আমরা লজ্জার মুখ লুকাই।

কিন্তু এবার নাকি ট্রেডিয়াম হবে। ভেটোলজি এসে দেখেও গেছেন। হিসেব করা-কষি চলছে—সে এক বিরাট ব্যাপার! তবে মস্তুরা করতে কতদিন লাগবে জানিনে, আর লাল কিত্তে-বাঁধা ফাইলে যদি একবার ঢোকে, তাহলে যে কি অবস্থা হবে তা আপনারা আমার থেকে ভালোই জানেন। তাই জোর গলায় সবাই একসঙ্গে বলব, ট্রেডিয়াম আমাদের জাতীয় দাবী—ট্রেডিয়াম আমরা চাই। সেই সংগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই যে তাঁরা যেন এই বিষয়ে এগিয়ে এসে খেলাধুলার ক্ষেত্রে কোলকাতার মান রক্ষা করেন।

—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে আমাদের দেশের গ্রাম্য বালক-বালিকার আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রটি রামকিঙ্কর সিংহ গৃহীত।



রেক্সোনা সাবানে 'কাডল'
 বলে একটি বিশেষ ধরনের ডেল
 মেশানো হয়, যাতে ত্বক আরও
 কোমল, আরও হালক, আরও
 লাভণ্যময়ী হয়...! সুবাস ভরা রেক্সোনার
 গরম সাবানদিন আপনাকে সজীব আর
 সতেজ রাখে। সৌন্দর্য সাধনায় সর্বদা
 রেক্সোনা ব্যবহার করুন।

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাভণ্যময়ী করে।

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিডার লিঃ তৈরী।

RP.165-X52 BO

নাট্যশাস্ত্র

ভারতীয় নৃত্যকলা

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(পরিচালক—ভারতীয় নৃত্যকলা-মন্দির)

আদিম যুগে মানুষের কোন নির্দিষ্ট জাতি কিংবা ধর্ম ছিল না। অপরিচিত লোককে জিজ্ঞাসা করত—“কি নাচ তুমি নাচ?” নৃত্যের ভঙ্গি দিয়ে তারা বুঝত কে কোন পাহাড়ের, কে কোন মন্ডলের বা কোন বীণের।

তার পর সত্যতার প্রথম আলোকে তাদের মনে ধর্মতাব জেগে ওঠে, নৃত্যের সঙ্গে ধর্মকে তারা জড়িয়ে ফেলল এবং এর মধ্য দিয়ে তারা দেবার্চনা শুরু করে দিল।

এইরূপে আদিম যুগ থেকেই ভারতে নৃত্যকলার চর্চা শুরু করে দিল। তাই দেখি, বৈদিক যুগে প্রথম শব্দ থেকে “নৃত্য” নাম থেকে “গীত” বস্তু থেকে “অভিনয়” এবং অর্থ থেকে “রস” কলা-শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

ত্রন্যার আদেশে বিধকরা একটি নাট্যশালা স্তৈরী করলেন। তার প্রয়োগতার ভরতের উপর গিয়ে পড়ে। প্রয়োগ কালে শিব সেখানে ছিলেন, সকলের অস্থবোধে শিব ততুকে ডেকে ভরতকে অজহারগঙ্গার প্রয়োগ দেখাতে আদেশ দেন। ততু যে সব নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন, তাই হচ্ছে বিখ্যাত “ভাগব নৃত্য”। এদিকে পার্কর্তী সন্তুষ্ট হয়ে “লাত্ৰ” নামে কমনীয় নৃত্য ভরতকে দেখান। ভরত ভাগবনৃত্য মন্থ্যলোকে আনেন, আর পার্কর্তী নিজে বলিরাঙ্গ-হুহিতা উধাকে লাত্ৰ নৃত্যকলা শিখিয়ে দেন। এইরূপে বর্গের নৃত্য মর্চে প্রচারিত হল। তারপর ভারতে ধর্মনৃত্যের বেশী প্রচলন হয় পুরাণের সময় থেকে। এর পর রামায়ণে দেখতে পাই সব কৃষ্ণ রামায়ণের সম্পর্ক উপাখ্যান নৃত্য ও গীতের সাহায্যে বিবৃত করত। মহাভারতে পাণ্ডীবধারী অর্জুন নৃত্যকলার বিশেষ পারকর্ষী ছিলেন। তিনি রথভাগব (যুদ্ধনৃত্য) নৃত্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের সময় বৃষ্ণলা নামে নর্তকীর বেশ ধারণ করে অর্জুন বিরাটবিজয়ের অন্তঃপুরে নৃত্যকলা শিখা দিতেন।

ভারতের নৃত্যকলার প্রধানত: দুটি রূপ—ভাগব ও লাত্ৰ। ভাগবের দুটি রূপ—সেবলি ও বহুরূপ; লাত্ৰেরও তাই—সুরিত ও বৌবত। ভারতীয় নৃত্য অত্যন্ত অল্পাঙ্গনবহুল কিন্তু খুব সর্বত। সেবলিতে অভিনয় কম কিন্তু অঙ্গসকালন বেশী। বহুরূপ ভাবপ্রধান এবং ভাষ-যুগের নামাঙ্গণ অভিব্যক্তিতে সৌন্দর্য। সুরিত,

আলিঙ্গন আর বৌবত তাল ময় মান ধারা নিরঙ্কিত হয়। আবার ভারতীয় নৃত্যের অঙ্গসকালন অনেক রকম—ভূমু মস্তকের সকালনই ২৪ রকম, যেমন অধোমুখম্, অবমুখ, প্রকল্পিত সৌন্দর্য, কল্পিত, পরাবৃত্তা, উৎক্লিপ্ত প্রভৃতি। দৃষ্টি ৪০ রকম—বেমন, লঙ্কিত, মুদিত, কুক্ষিত, যৌত, ধীর, দৃগু, শান্ত, ম্লান, ছট্ট, উগ্র প্রভৃতি। শ্রীবার দোলন ৪ রকম, যেমন—প্রকল্পিতা, পরিবর্তিতা, তিরস্বিন ও স্পন্দনী। ইহা ছাড়া মুখের পরিবর্তন ৪ রকম, জ্বিকার ৭ রকম ও বাহুসকালন ২৮ রকম। নৃত্যে ভাবপ্রকাশক অঙ্গুলী বিভাগবে বলা হয় হস্তক। সংযুক্ত হস্তক ৩৮ রকম। হাতে হাতে, পায়ে পায়ে বা হাতে পায়ে যে মিলন তার নাম “করণ”। “করণ” ও “বেচক” সংযুক্ত হয়েই অঙ্গহারের সৃষ্টি হয়। এই অঙ্গহারগুলো নৃত্যের মধ্যে প্রধান জিনিষ। অঙ্গহার ২৪ রকম। নৃত্যের এই অঙ্গবিক্ষেপ ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি করতে হয়। যেমন বিক্ষুকে নৃত্যে দেখাতে হলে জ্বিপতাকা হস্তধরে ধারণ করতে হয়। পার্কর্তীকে বোঝাতে হলে ভান হাত উঁচু করে অর্ধচন্দ্রে এবং বা হাত নীচু করে অর্ধচন্দ্রে ধারণ করতে হয় এবং হস্তযন্ত্র “অভয়া” বা “বরদা” ভাবে স্থাপন করতে হয়।

নৃত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, নৃত্য মানুষের জীবনের সাথে একদিন জড়িত হয়েছিল। সকল দেশেই নানা উৎসব-অঙ্গুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল নৃত্য। মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে সকল প্রকার ধর্মীয় ও সামাজিক অঙ্গুষ্ঠানে নৃত্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তাছাড়া বীজবগন, কসল কর্তন, থেকে বৃষ্ণজয়, বিদেশ অভিবান, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতি উপলক্ষে নৃত্য অঙ্গুষ্ঠিত হত। নৃত্য মানব-সমাজে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নব নব রূপে দেখা দিয়েছে। বর্তমান কালেও সকল দেশে সকল জাতের মধ্যেই নৃত্যের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। সকল জাতিরই নিজস্ব নৃত্যকলা আছে। ভারতবর্ষেও প্রতি দেশে এমন কি বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব লোকনৃত্য দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের নৃত্যকলা যে কত উচ্চতরের তা অজ্ঞতা, ইলোরা ও মহেন্দ্রগড় প্রভৃতির ভাস্কর্য দেখলেই বুঝতে পারা যায়। ভারতের বিখ্যাত ভারতনাট্যম্ নৃত্য (ভাগব) কথাকলি (মাত্রাজ), মণিপুরী (মণিপুর, ইন্দ্রল) কথক (লক্ষ্মী) প্রভৃতি নৃত্যকলা সকল দেশের নৃত্যবসিকদের মুগ্ধ করেছে। নৃত্যকলা সকল সমাজের ও সকল দেশের প্রিয় শিল্পকলা। ‘সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্’ বাহা সত্য মঙ্গলময় এবং সুন্দর তাই আর্ট। ধারা ভাবে আঙ্গহারা, রসে বিস্তারন, সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ পূজারী আমরা তাদের পিতা নামে অভিহিত করে থাকি। নৃত্যশাস্ত্র-বাহু মানুষের

প্রকৃতির অপূর্ণ বিকাশ এবং শরীর বন ও চরিত্র গঠনের কাজে এই সব শিল্পের অবদান প্রচুর। নৃত্যে শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশ হয়। আর সীতবাসতে হয় অন্তরতৃষ্ণা।

যে জিনিষ মানুষের অন্তরকে উন্নত করে তার চর্চা—সাধনা বললেই অধিকতর উপযুক্ত হয়—করা সকলেরই কর্তব্য। সকলের গান আসে না, কিন্তু নৃত্যের সাধনা সকলেই করতে পারেন, নৃত্য প্রদর্শনের দ্বারা লোকের প্রশংসা অর্জনের ক্ষমতা নয়, নিজের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্ত। নৃত্যের দ্বারা এক্ষণ আনন্দময় ব্যায়াম আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।

কিছুকাল আগেও আমাদের দেশে নৃত্যের বহুল প্রচলন ছিল। পল্লীগাম্যে পূজা-পার্বণ ব্রত উপলক্ষে ঘেরেদের নৃত্য করতে হত। পুরুষের নৃত্য ছিল লাঠিখেলা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু পশ্চিমের সভ্যতা আমাদের দেশে বিস্তার সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত সম্রাট্য নৃত্যকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করলেন। লোক-নৃত্যকে তারা মনে করতেন অশিক্ষিত লোকের অমার্জিত ক্রটির বিকাশ। কিন্তু স্বপ্নের বিষয়, নৃত্যকলা পুনরায় তার স্রষ্টাগৌরব কিয়ে পেল, শিক্ষিত সমাজ পুনরায় নৃত্যকে সাদরে গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বারা মনোহী বধন নৃত্যকলাকে স্রষ্টার চোখে দেখলেন তখন শিক্ষিত জনসাধারণের স্বীকৃতি পেতে বিলম্ব হল না। তারপর বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ নৃত্যের সমাদর আরো বাড়িয়ে দিলেন শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে।

আমাদের দেশে নৃত্যকলাকে ধারা পুনরুজ্জীবিত করলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই নাম করা যেতে পারে শ্রীমানন্দর চৌধুরী (উদয়শঙ্করের পিতা), উদয়শঙ্কর, ৷হরেন ঘোষ, ৷অশোক শাস্ত্রী ৷শঙ্করম নাথুজি, ৷কন্দল্লা পিলাই ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, তিমিরবরণ, আবুরি সিং প্রভৃতি মনোবিগণের ও বিখ্যাত নৃত্য বঙ্গসংগীত বিশারদগণের। ভারতবাসী মাত্রেই এদের কাছে ধনী থাকবে। ভারতীয় নৃত্যগীত-বাত আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অমূল্য সম্পদ—তাই আমরা এই সকল শিল্প ও কলাকে এত শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি। বিখ্যাত রাশিয়ান নৃত্যবিদ বর্গগতা এ্যানা প্যাভলোভা ভারতীয় নৃত্যকলার মুগ্ধ হয়ে এর চর্চা করেছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী নৃত্যবিদ মাদাম সিমকি বহুদিন উদয়শঙ্করের সঙ্গিনীরূপে ছিলেন। এছাড়া আরও বহু বিদেশী মহিলা ভারতীয় নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য দেখে নৃত্যকলা চর্চা করে বহু বর্ষ অর্জন করেছেন।

আজ পৃথিবীর সব জায়গায় এই নৃত্যকলার প্রচার লাভ করেছে কিন্তু কোন্ডের বিষয় বে, এই নৃত্যকলা তার বৈশিষ্ট্য পুনরায় আমাদের দেশে হারাতে বসেছে। এদিকে দেশের জানী ও গুণী, চিন্তানায়ক ও শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আমার কথা (৬৯)

শ্রীমতী গায়ত্রী বসু

মিষ্টি হাসি, প্রিয় ব্যবহার এবং সর্বোপরি বাসিকাতুলত সুরলতা ভরা এক যুগ পরিবেশে বসে মনের আনন্দে গুনহিলায় বাংলার অন্ততমা সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী গায়ত্রী বসুর "আমার কথা"। বর্তমানে যে কয়েক জন সঙ্গীতশিল্পী কণ্ঠমাধুর্যে জনচিতে আসন

গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছেন, শ্রীমতী বসু তাঁদের অন্ততমা। শ্রীমতী গায়ত্রী বসু বলেন—চব্বিশ বৎসর পূর্বে ১৯৩৬ সালে জলপাইগুড়িতে আমি জন্মগ্রহণ করি। জন্মের পর হতেই মা, বাবা এবং ভাই-বোনের সঙ্গে কলিকাতার চলে আসি। কলিকাতা এসে অল্প পাঁচজন মতো লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে চাকুরিয়ার বিনোদিনী গার্লস স্কুলে ভর্তি হই। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই কখন কোন কুহর্ষে মনের কোণে গানের উদ্দেশ্য হইতাম নিজেই জানি না। বাড়ীতে বাবা বঙ্গসঙ্গীতে মা কণ্ঠসংগীতে গানের চর্চা করতেন। বোধ হয়, তাঁদের যত্নের সংমিশ্রণে গড়া আমার স্বভাবে যুগি বা গানের বীজ আপনা হতেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাই তাঁদের আশীর্ষক এবং ঈশ্বরের করুণার আমার এগারো বৎসর বয়সেই "তুমি হুঁ-হাত ভরিয়া" এবং "জানি আমারে যাবে না ফুলিয়া" গান হুঁখানি সস্তোষ সুখাশীর ট্রেনিং-এ মেগাকোন কোম্পানীতে রেকর্ড করি।

এ একই সময়েই আমি জল ইতিয়া রেডিওতে "শিতমহলে" গান গাইতে থাকি এবং বোম্বে পদার্থপর করার আগে পর্যন্ত "শিত মহলের" সংগে সঙ্গিত থাকি।

একদিকে গান অন্তরিকে পড়াগনা, দুই-ই শিখতে লাগলাম এবং ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিকও পাশ করে উচ্চ শিক্ষার আশায় আন্তোব্য কলেজে আই, এ ক্লাশে ভর্তি হলাম। পড়াগনার দিকে একটু এগিয়ে এলাম বলে গানের দিক থেকে পিছনে পড়ে

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা
খুবই স্বাভা-
বিক, কেমনা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জ্ঞতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার
জন্ত লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২ এল্‌গ্যান্ডেট ইস্ট, কলিকাতা - ১

ইলাহ না। আই, এ ক্লাশে ভর্তি হওয়ার সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট ঐ বৎসরই আন্তঃ-কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানশিপও লাভ করি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গানের দিকে ঝোঁক একটু বেশী পড়ার পড়াশুনার দিকে একটু ব্যাঘাত হতে লাগলো। বার কলে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে ১৯৫৫ সালে আমাকে আই, এ পাশ করতে হলো।

আই, এ পাশ করে মুম্বাইয়ের গার্ল'স কলেজে যি, এ ক্লাসে ভর্তি হই এবং এখানে এসেই আমার কলেজী শিক্ষার আজ পর্যন্ত ভাটা পড়ে আছে।

সাধারণ শিক্ষা বন্ধ হলেও গানের শিক্ষা সম্মান তালেই চললো। শচীনদাস মতিলালের কাছে তুংরি, খেরাল এবং মনুদীর্ঘাল, চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে আধুনিক একই সংশ্লিষ্ট শিখতে লাগলাম। বতটা মনে পড়ে ১৯৫০ সাল থেকে বাজারে সঙ্গীতবরসিকদের কাছে নিজের পরিচিতি লাভ করতে লাগলাম। উৎসাহ যেন একটু বেড়ে গেলো, কখনো রেডিও, কখনো রেকর্ড কখনো বা সিনেমার প্লে ব্যাক নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবেই সঙ্গীতজগতের মাঝখানে ডুবিয়ে রাখতে হলো। আজও তার গতি সম্মানে চলছে।

চিত্রজগতে সংশ্লিষ্ট হয়ে যে সব বইয়ে প্লে ব্যাকে গান গেয়েছি, তার মধ্যে শুভদা, পরবিণী, গঙ্গা, গুনছো, মন্ত্রশক্তি,

কেয়দীর জীবন, কব এবং গরীবের ঘরের নাম এখনো মনে পড়ছে।

এ ছাড়া "মিকি" নামে একখানা পাঞ্জাবী বইতেও পাঞ্জাবী গান পাঠতে হয়েছে। সিনেমা-জগত বাদ দিলে আধুনিক, ভজন গীত, অভুলপ্রসাদ প্রভৃতি মিলিয়ে কলকাতাতে রেকর্ডও করেছি প্রায় ৩০ খানার উপর গান, আজ পর্যন্ত অনেক গেয়েছি কিন্তু যে কয়েকটি গানে জনমনে আনন্দ দিতে পেরেছি বলে উপসর্গ করেছি তার মধ্যে "কোন দূরের পাখী" "নীল প্রজাপতির" নাম বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। সর্বশেষ এবারের মনুদীর্ঘাল "তুমি দিয়েছো বতো।"

"এ মন কেমন করে জেনেছো বলে" যে ছ'খানা রেকর্ড করেছি তা জনমনে আনন্দ দিতে পেরেছে কি না আজও জানি না। গান আজ পর্যন্তও গেয়ে বাছি, তবে আধুনিক গানের জন্তে আর কারো কাছে শিক্ষা নিছি না। যে ছ'টার জন ছাত্রী আমার কাছে গান শিখতে আসে তাদের শিখাতে গিয়েই নিজের অভ্যাস বজায় রাখছি। জীবনের ২৩ বৎসর পর্যন্ত গানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেও ভারতীয় নারীর চিরন্তন আদর্শ "বায়ীর ঘর" করার কথা মন থেকে মুছে কেলতে পারি নাই। তাই গত মার্চ মাসে শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করে নারীর চিরন্তন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি।

দ্বিত্ব-রূপ

রমেশ্বর ঘটকচৌধুরী

পার্বত্য-নির্মল-ধারা অধিবাস কল-গানে ভাসে।
 পাখির কাকলিকরা বর্ণে বর্ণে পুষ্পগুচ্ছ হাসে।
 নৃত্যের অপূর্ণ ভঙ্গে মহাবীর মন্দির বাতাস
 এলোকেশে পঞ্চকল্পা জলকলি করে অধিবাস—
 গুরুপক্ষে মুক্তধারা জোড়নার শীতল-পরশ
 লক্ষকোটি হীরামণ্ড আকাশের তারা,
 বিচিত্র মনের বস্ত্রে সপ্তস্বরে আশ্চর্য গমক
 হৃদয়ের লুকোচুরি মনের দর্পণ আনন্দিত।
 প্রেমের প্রাচীর-পথা দেশে দেশে বন্ধরে বন্ধরে
 সমুদ্রের বেলাভূমি অধিবাস আছে প্রতীকার
 চরণের চিহ্নখানি বীচিস্তম্ভ জীবন-কোরক।

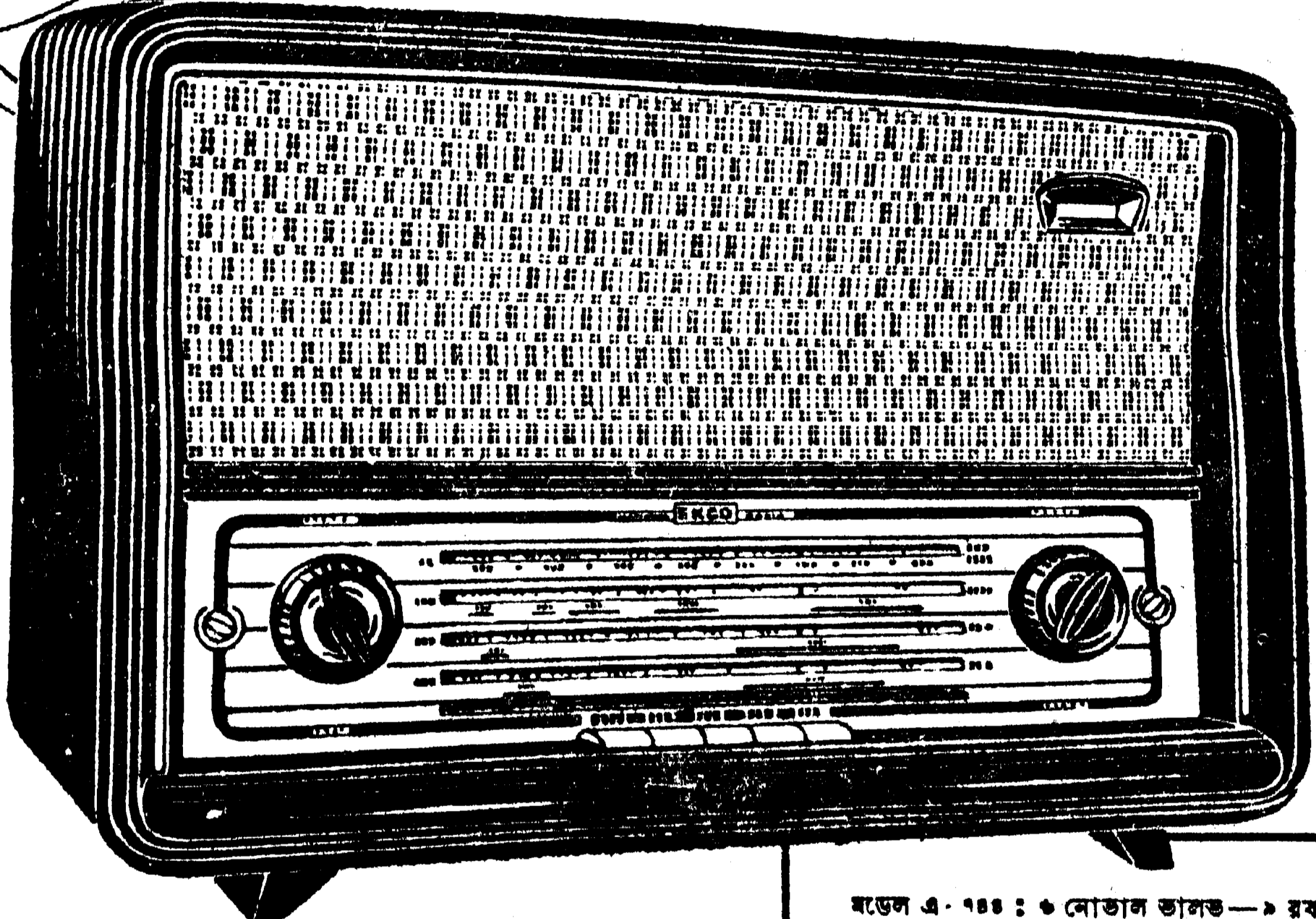
আদিম উলঙ্গ শিশু বনে বনে করে অন্বেষণ
 বন্ধের বিস্তৃত স্তম্ভ হস্তকর উচ্চত উদর।
 হৃদয়ে চাকলা নেই বৃত্তসু আশ্রয় ক্রন্দন
 অরণ্যের শুক পত্র গৃহের সক্রোধ সজীবন
 ভাবাহীন বোঝা যন্ত্রে নৈসর্গিক গুরুর খিঁচায়।
 মনের নবায়নেই, কলনের উৎকর্ষ আছান
 প্রেমের বাধুর্ষ মাত্র মনে মনে হুল আলাপন—
 পরিভ্রমণ বরণে বরণে করে আনাসোনা।



অনবদ্য শিল্প-কৌশল...
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য...

ন্যাশনাল একো-র

নতুন মডেল এ-৭৪৪



সঙ্গীত রসিকেরা ন্যাশনাল-একো-র চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসার পক্ষমুখ না হ'লে পারবেন না। এর অনিন্দ্য গড়ম, ফলাকৌশল ও চক্চকে চেহারা যেমন মনুনা ভিরায, তেমনি প্রতিমধুর ও স্থল্পট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সজ্জি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারকে বাজিয়ে শোনাতে বলুন—কোন ধরত নেই।

আমাদের অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো ডিলারের
কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : ৬ নোভাল ভোল্ট—৯ বক্স কাজ, মনোরম কেবিনেট সমন্বিত ৪-ব্যাণ্ড যুক্ত এসি রেডিও—সারা পৃথিবীর কভারন ধরা যায়। পিগ্রানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন; ম্যাজিক আই; গ্রামোফোন ও এককী স্পীকারের জুড়ি যোগাযোগ ব্যবস্থা; টেপ, রেকর্ডারের জুড়ি বিশেষ বন্দোবস্ত। এক বছরের গ্যারান্টি।

৪১৫৭ নীট

হাবীস ট্যাক বক্স

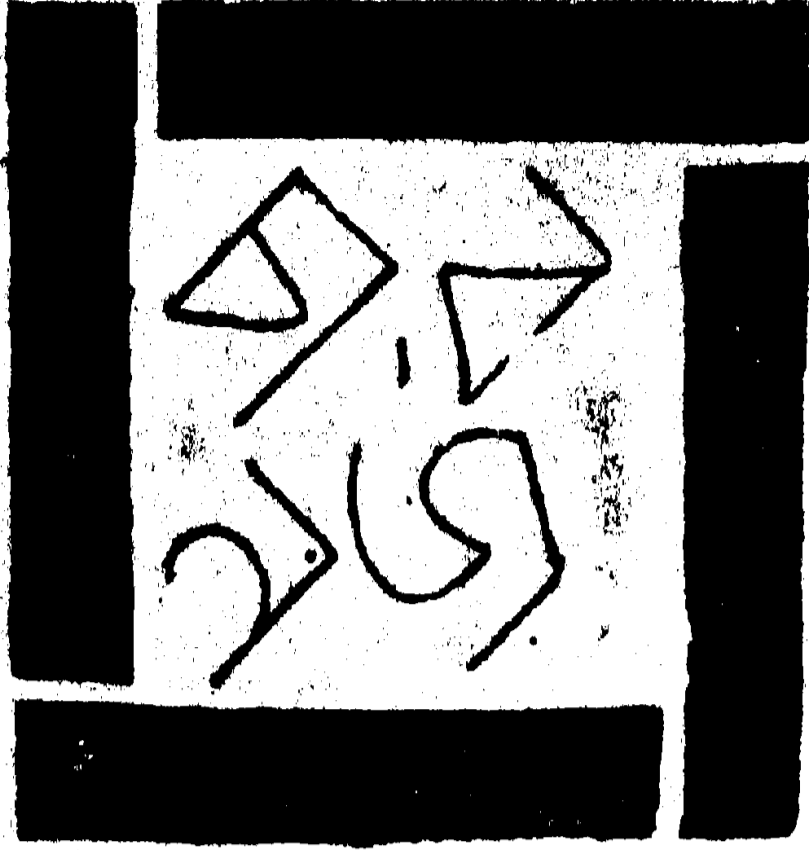


ন্যাশনাল একো রেডিওই সেরা—এগুলি



ন্যাশনাল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লি:
কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • বাহাওয়ালপুর • বালানোর • দিল্লী • লোকেশ্বরাবাদ





শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে

(অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এন্স)

ভারত তখনও কিছু বিদেশী নাগপাল্যে কঠিনভাবে আবদ্ধ, সরকারী উচ্চপদগুলোতে বেসকারদের সর্বত্র একচেটিয়া অধিকার। এমনি চূড়িানে ক্ষমতার ঐ আসনগুলো দখল করার জন্তে যোগ্যতার দাবী নিয়ে যে কয়েকজন ভারতীয়কে এগিয়ে আসতে দেখা যায়, তাঁদেরই অন্ততম শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে। সে আমলে ইনি ছিলেন সত্যি একজন দক্ষ ও নামকরা সিলভিয়ারি (আই, সি, এন্স)। কিন্তু একেবারে যেটি লক্ষ্য করবার—কর্মজীবনে শ্রী দে বরাবর যেসব সোজা রেখে চলেছেন, সিলভিয়ারি হয়েও জাতীয়তাকে বিকিয়ে দিতে ভয় পাননি ইনি কখনও।

মেদিনীপুরের এক সম্ভ্রান্ত শান্ত পরিবারে বীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১২৮৮ সনের ২১শে তারিখ। পিতা ওরাজেন্দ্রলাল দে ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা পুরুষ—আত্মসম্মান কুর করে অর্ধোপার্জন করবার তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। এর জন্তে তুম্ব তিনি নিজেই আর্থিক কষ্ট ভোগ করেন নি, বীরেন্দ্রনাথের প্রারম্ভিক পড়াশোনার ব্যাপারেও অনেক অস্ববিধার কারণ ঘটে। আরও ছুঁধের কথা,



শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে

তিনি বছর বয়স হতে না হতেই বীরেন্দ্রনাথ পুণ্ড্রী অননীকে (বোপেন্দ্রমহী) হারান কিন্তু শত প্রতিকূল অবস্থায় ভেতর থেকেও তিনি এগিয়ে যেতে চেয়েছেন প্রতি পদক্ষেপে। ঠাকুরমা, গিসিমা, ঠাকুরদা (৩করালীচরণ দে)—এঁদের মেহের অনুশাসন তাঁকে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করে খুব বেশিরকম।

শ্রী দেের লেখাপড়ার সূচনা হয় নিজের পঞ্জীর (হবিবপুর) পাঠশালাতে—যেখানে অল্পদিন মধ্যেই রাখেতে সমর্থ হন তিনি সাকল্যের প্রথম স্বাক্ষর। পাঠশালার পড়া শেষ হওয়া মাত্র ভর্তি হন তিনি মেদিনীপুর কলেজ-খুলে।

এই স্কুল থেকেই ১৮৯৮ সালে তিনি এন্ট্রাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অল্পশাস্ত্রে বরাবর তাঁর একটা অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। এন্ট্রাল পরীক্ষাতে সর্ববিষয়ে তিনি অষ্টম স্থান অধিকার করেন, কিন্তু অল্পশাস্ত্রে কেউ তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি এফ-এ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা যায়, এবারের অঙ্ক) তাঁরই প্রথম স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে। ছ'বছর পর বি, এ, (অনার্স) পরীক্ষায় অল্পশাস্ত্রে শুধু প্রথম শ্রেণীতে প্রথমই হন না, রেকর্ড নম্বর পেয়ে পুনরাম অর্জন করেন। সেবারে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রেও তিনি অধিকার করেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান।

ইত্যবসরে বীরেন্দ্রনাথ অনেক ছলারসিপ ও পদক, এমন কি প্রাথম স্বর্ণপদক পর্যন্ত লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ স্তার আভ্যন্তরে তাঁর ওপর স্বভাবতঃই নজর পড়ে। শ্রী দে প্রেসিডেন্সী কলেজেই এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে যান—বিষয় থাকে অঙ্ক। সে ১৯০৩ সালের কথা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি ছলার মনোনীত হয়েছেন যোগিতঃহয় কিন্তু অনিবার্য কারণে এখানে এম-এ পরীক্ষা না দেওয়ার বৃত্তিটি ভোগ করতে পারেন না। এম-এ পড়তে থাকাকালীনই ভারত সরকারের বহুরে ছুই সাত পাউণ্ডের একটি বৃত্তি পেয়ে তিনি চলে যান ইংলণ্ডে। বৃত্তিটি নির্দিষ্ট ছিল তিনি বহুরে জন্ত—শ্রী দে উচ্চ-শিক্ষা লাভের এই পরম সুযোগ ছাড়লেন না।

বিলম্বে গিরে কৃতী ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ ক্যাম্ব্রিজের সেট অনার্স কলেজে যোগদান করেন। অল্পশাস্ত্রে এখানেও নিজের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিতে তাঁর বিলম্ব হয় না। এর জন্তে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও আলাদা ভাবে তিনি বৃত্তি পেতে থাকেন। আই-সি-এস কাইঞ্জাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি ১৯০৬ সালে এবং সেবারে অল্পশাস্ত্রে ট্রাই পোজ পরীক্ষাতেও সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ স্থানের হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

এমনি পুনরামঃ মধ্যাহ্ন কৃত্বিত হয়ে শ্রী দে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কিরে আসেন স্বদেশে। দেশব্যাপী তখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলেছে তাঁর মাতায়। ধুতি-পাজাবী পরিহিত অবস্থায় বঙ্গগুর ট্রেনে তিনি যখন নামেন, এমনি 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সহকারে স্থানীর লোকেরা তাঁর গলার পরিষে দেন ফুলের মালা। আই, সি, এন্স বীরেন্দ্রনাথ অভিজুত হয়ে পড়েন এই মুহুর্তে, কিন্তু এর জন্তে কিছু পরিমাণে হলো রাজস্বের তাঁকে বরণ করতে হয়। সে সময়কার ইংলিসিয়ান ও ট্রেটসিয়ান কাগজে 'বঙ্গদেশী সিলভিয়ারি' বলে তাঁর সম্পর্কে বহু বিকৃত সর্মালোচনা পর্বত হয়ে যায়।

কর্মজীবনের সূচনাতেই বীরেন্দ্রনাথ নাগপুরের সরকারী কমিশনারের দায়িত্বভঙ্গ পদে নিযুক্ত হন। আপন কার্যভার নিয়ে তিনি তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের নানা জেলায় ঘুরে বেড়ান। তাঁর প্রতিপত্তি দেখে ব্রিটিশ অফিসারগণ পর্বস্ত ঈর্ষাবিভ ছিলেন, নানা ব্যাপারে এইটি বুঝা গেছে। সেদিনের নাগপুর প্রায়ে কেবলমাত্র ইউরোপীয় সমস্ত থাকার যখন প্রস্তাব হয়, তখন তিনি সাহসের সঙ্গে এর বিরোধিতা করেন। ১৯২২ সালে লী কমিশনের সামনে যেতাত্ত অফিসারসংঘের তরফ থেকে যেতাজদের জন্তে বিশেষ অধিকার দাবী করা হলে ভারতীয় অফিসারদের পক্ষে তাঁকেই প্রতিবাদ ধ্বনিত করতে দেখা যায়। সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে কমিশনের নিকট ইউরোপীয় অফিসারগণ সিভিলিয়ানদের সম্পর্কে যে কটাক্ষ তারও প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে যান শ্রীমদেই। এর জন্তে এই মাহুটিকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অনেক ঝঁকি নিতে হয়েছে, এইটুকু ধরে নেওয়া চলে।

কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বীরেন্দ্রনাথকে চেপে রাখতে চাইলেও তাঁর অসাধারণ যোগ্যতাকে অস্বীকার করতে বোধ হয় সাহসী হননি। তাই দেখা গেল, ১৯২৬ সালে তিনি নিযুক্ত হয়েছেন মধ্যপ্রদেশ সরকারের রাজস্ব ও অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী—যে দায়িত্বভঙ্গ পদে বসানো হয়নি তাঁর আগে আর কোন ভারতীয়কে। বেরাবের কমিশনারের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি ১৯২৮ সালে আর এখানেও থেকে যায় তাঁর যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আবার এই ভেজস্বী পুরুষের মতবিরোধ ঘটে—কর্মক্ষেত্রে সমধিক দায়িত্বশীল পদ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন, আর সেটি এতটুকু প্রক্ষেপ না করেই।

বীরেন্দ্রনাথের নাম ইতোমধ্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়—আই, সি, এস পদ ছেড়ে দিলেও দেশে তাঁর গৌরবশ্রী যোগ্যত্যা অস্বীকৃত হল না। ১৯৩৭ সালে তিনি সাংলি রাজ্যের দেওয়ানের আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯৪৮ সাল অবধি (সাংলির ভারতভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত) এই দেশীয় রাজ্যটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকে নিবিড়। এখানে থাকা অবস্থায় তিনি রাজ্য সাহেবের উপদেষ্টা ও একজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট পদেও অধিষ্ঠিত হন, এ নিশ্চয়ই সৌরভের।

শ্রীমদে একজন প্রকৃত সমাজসেবী, বাস্তব ক্ষেত্রেই রয়েছে তার বহুল প্রমাণ। চাকরিজীবনে থাকাকালীন নাগপুরের অঞ্চল-বিশেষে হৃদিক দেখা দিলে জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে তিনি সাধ্যমত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি নিজের জীবন বীমা ও সাংলি রাজ্য থেকে অর্জিত সমস্ত টাকা-পয়সার (যার পরিমাণ প্রায় ৬১ হাজার টাকা) মেদিনীপুরের অমৃত জেদ্দীর লোকদের শিক্ষা-ব্যাপারে দান করে দিয়েছেন, এ কম কথা নয়। মেদিনীপুরের সম্বন্ধী বিভাগমন্ডির (ঠাকুরমার স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত) প্রতিষ্ঠার তাঁর সমাজ-হিতৈষণার অপর নিদর্শন হিসাবে গণ্য। নিজ জন্মভূমিতে শিশুশিক্ষিত তিনি নিদেখরী কালীমন্ডিরটি ইষ্টকর্মিষ্ঠিত করারও ব্যবস্থা করেন। শ্রীমদে আর অস্বীকার্যীয় বৃদ্ধ, কিন্তু এখনও তাঁর

চোখ-বুখে ব্যক্তিব ও প্রতিভার ছাপ রয়েছে। তাঁকে কেবলমাত্র একটি সার্থক বাঙ্গালী-জীবনের জীবন্ত ছবি চোখে পড়ে, এ বলতে হরত অভ্যুক্তি হবে না।

শ্রীমদীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

[হিন্দুস্থান ট্যাগার্ড পত্রিকার প্রধান বার্তা-সংগ্রাহক]

বর্তমান কালের অন্ততম প্রচারবহু সংবাদপত্রের শ্রীমদীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের চিত্রসমূহ দেশ ও দেশের কথা সুবিন্যাসে সঞ্চারিত করা বাহার দৈনন্দিন কর্ম—নিজ জীবনী সবচেয়ে তাঁহার প্রচার-বিষয়তা আশ্চর্য বোধ হলেও অসম্ভব নয়। আনন্দবাজার পত্রিকার ত্তপূর্ব ও হিন্দুস্থান ট্যাগার্ড-এর বর্তমান প্রধান বার্তাসংগ্রাহক সুহৃৎভাবী ও পরিপূর্ণ "বাঙ্গালী" শ্রীমদীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সহিত পরিচয়ে আবার এই কথাগুলি মনে করিয়ে দেয়।

শ্রীমদীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিত্তালকার ও শ্রীমতী কুমুদকাঞ্চিন্দেবীর পুত্র মদীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা জিলার (বর্তমানে পাকিস্তানভুক্ত কালীকান্দ্র গ্রামে ১৩১৫ সালের আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালার কলাপাতার অক্ষরজ্ঞান ও উর্দ্ধলবী সাহায্যে সংখ্যাগ্ঞান হয়। তখার গুরুমহাশয়ের শাস্তিমান-বর্ধায় জলের উপর দিয়া পড়িতে আনা—বাঁশের সঁকোর উপর লাকালাকি করা—বানান পরীক্ষার প্রথম হওয়ার ছাত্র-পরীক্ষা হওয়া—এক পড়ুয়ার ছুটি ভুল বানান সংশোধন না করা—তখন নিজের পাওয়া নব্বয় হইতে শাস্তিভরণ পাঁচ মার্ক কাটা যাওয়া—এই সবস্ত অভিজ্ঞতা তিনি পাঠশালার লাভ করেন। পর গ্রামের এক-ই-স্থলে কিছু কাল কাটাওয়ার পর সরাইল উচ্চ ইংরেজ বিত্তালয় হইতে ১৯২৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কুমিল্লা জিটোরিয়া কলেজ হইতে ইন্টারমিডিয়েটে ও ইংরেজী সাহিয়ে



শ্রীমদীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

অনাস'সহ প্রাক্করেট হন। তখন পাঠকালে ত্রিপুরার অধিবাসী সনামধন্য মহেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সামসাদা হাজিাবাস'-এ মণীন্দ্রনাথ অবস্থান করিতেন। এই স্থানে প্রাতে প্রার্থনাসভার বেতন, গৃহাদি পরিষ্কার, ঠাকুরপূজা, বাজার করা, রান্না ও বানসপত্র মাঝা-অর্থাৎ সমস্ত কাজই হাজিরের বহুস্তে করিতে হইত। ত্রিপুরা জেলার কয়েক শত সন্তান মহেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বানসীলতার উপকৃত হইয়াছেন। কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ছিলেন আমেরিকানিবাসী পরলোকগত ডঃ পুর্বীন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ স্নাতকোত্তর বসু। সপ্তম বাগে এনট্রাল পাশ করিলেও তাঁহার অধ্যাপনার খুব সুনাম ছিল। মাহিনা সামান্য বৃদ্ধি করার কলেজের ছাত্ররা একবার তখন ধর্মঘট করে। পরে জনপ্রিয় নেতা কাশিনীকুমার কস্তুর মধ্যস্থতায় মীমাংসা হইয়া যায়। টেই পত্রিকার অক্ষতকাব্য হওয়ার মণীন্দ্রনাথকে ইংরাজী সাহিত্যে অনাস'সহ কলেজে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই—কিন্তু তাঁহার অগম্য মনোভাবের জন্ত পরে তর্ক করা হয়। প্রথম হইতেই তিনি কলেজ-পত্রিকার লিখিতে থাকেন।

১৯৩১ সালের শেষে তিনি প্রথম কলিকাতায় আসেন কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন নাই—বরং গৃহশিক্ষকতা করিতে ও ৩২সহ সর্টফাইন্স লিখিতে থাকেন। তখন বাংলাদেশে সনাসবাদীদের কার্যকলাপে সরকার ব্যতিব্যস্ত। মণীন্দ্রনাথ একদিন ড্যালহৌসী ঘোষার দিয়া বাইবার সময় অকস্মাৎ পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া গোয়েন্দা বিভাগের আফসে নীত হন। নিখিলবন্ধ ছাত্রসভার সহিত পূর্বে হইতে তাঁহার সংশ্রব ছিল—তৎকর্ত্ত তাঁর প্রেমের গৃহে খানাতল্লাসী করা হয়। আপত্তিজনক কিছু না পাওয়ার পনের দিন পরে তিনি মুক্ত হন। ইহার পর তিনি চা. মনোহারী দ্রব্য প্রভৃতির 'ক্যানভাসার' হন। মধ্যে সাঁইখিয়াতে ৪০০ টাকা বেতনে অল্পদিনের জন্ত চাকুরী করেন।

কলিকাতার কিরিয়ার পর শ্রী ভট্টাচার্যর জীবনের 'চক্র' ঘুরিয়া গেল। সত্তপ্রতিষ্ঠিত Free Press of Indiaতে বিনা মাহিনার শিক্ষানবিশী বার্তা-সংগ্রাহক হিসাবে প্রবেশ করেন—তখন ছয় মাস প্রচুর পরিচয় করেন—সংবাদপত্র সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন—কলে শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্তর পরিচয়পত্র লইয়া আনন্দবাজার পত্রিকার কন্যাধ্যক্ষ শ্রীমাখনলাল সেনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উহাতে চার পাঁচ মাস শিক্ষানবিশী করার পর মণীন্দ্রনাথ ৪০০ টাকা মাহিনায় প্রথম ঠাকুরি রিপোর্টার হিসাবে নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে উক্ত পত্রিকায় ঐ পদ ছিল না। কায়ে পরিগণিতার দরুন ১৯৩২ সালের জাহুয়ারী মাসের শেষে বরাবর তিনি তখন স্থায়িত্বাবে গৃহীত হন।

১৯৩৪ সালের জাহুয়ারী মাসে উত্তর-বিহারে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর শ্রীভট্টাচার্য আর্জুমানব ও বিধ্বস্ত বিহারের খবরাখবর সংগ্রহার্থে বিহার প্রদেশে প্রেরিত হন। ভীষণ দীর্ঘ, জনমানবশূন্য প্রান্তর—বোগাযোগবিহীন এলাকার মণীন্দ্রনাথ এক মানব্যাণী ভ্রমণ করেছেন—বীভৎস দৃশ্য সংগ্রহ করে লোকমারক্য পাঠিয়েছেন বিবরণ—আনন্দবাজার পত্রিকায় উহার প্রতিকলনে লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বেলিত হয়েছেন—প্রচুর সাহায্য পাঠিয়েছেন—সরকারী ও

১৯৩৮ সালে সুরাটের নিকট হরিপুরা-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। দেশগৌরব সুরভাচন্দ্র সে বার নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। আনন্দবাজারের রিপোর্টারের কর্তব্য হাড়া তিনি সুরভাচন্দ্রের ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে তাঁহার চিঠিপত্র ও ভাষণ লিপনের কাজ করেন। ইহার পূর্বে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের অলঙ্কার করার কথা উঠে। হরিপুরা বাওয়ার পথে ট্রেনে নাগপুর ট্রেনে সুরভাচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। কথায় কথায় জানা যায় যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা অলঙ্কারের পক্ষপাতী। সহবাজী সাংবাদিক মণীন্দ্রনাথ সুরভাচন্দ্রের আপত্তি সম্বন্ধে Scoop-News হিসাবে খবর পাঠালেন তাঁর পত্রিকায় যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরাই সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গাহবার বিরোধী ও তৎকর্ত্ত উহার অলঙ্কার কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ইহার পর তিনি ত্রিপুরা কংগ্রেস ও বামগড়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের সংবাদদাতা ছিলেন। ইহা হাড়া তিনি বহু সম্মেলনে প্রেরিত হন।

১৯৪২ সালে তিনি 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় যোগদান করেন ও ১৯৪৬ সালে উহার চীফ রিপোর্টার নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে তিনি 'আনন্দবাজার'-এর প্রধান বার্তা-সংগ্রাহক পদে ছিলেন।

১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে তিনি শ্রীজগদ্বলাল নেহরুর সাহিত্য একই বিমানে ও গাড়ীতে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ঢাকা জিলায় ও পরে সমস্ত আসাম প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। অনেক সময় শ্রীভট্টাচার্য এইরূপ 'বটিকা' ভ্রমণে নেহরুর বক্তৃতাগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুবোধে রাজে শ্রীনেহরু বিশ্রামের পূর্বে আবার সাংবাদিকদের নিকট বক্তৃতা দিচ্ছেন।

১৯৪৬ সালে দিল্লীর লালকেন্দ্রায় আই, এন, ও বিচারপদের পূর্বে সাংবাদিক মণীন্দ্রনাথ ও দেশনেতা জগদ্বলাল একই ট্রেনের বাক্স হিসাবে চলেছেন। মধ্যপথে নেহরুর সিগারেট শেষ হয়। পূর্বে পরিচিত মণীন্দ্রনাথকে দেখিয়া তিনি উহা চাহেন। কিন্তু কমদামী সিগারেট থাকায় শ্রীভট্টাচার্যের মনে অধা আসে। শ্রীনেহরু উহা বুকিতে পারিয়া তাহা গ্রহণ করেন।

এক রাত্রে 'সুরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার পত্রিকার রিপোর্টারদের বলেন যে একটি চমকপ্রদ খবর সে রাত্রে জানা করা যায়—তৎকর্ত্ত তাঁহার বেন আরও কিছুকণ নগ্নরে অপেক্ষা করেন। মধ্যরাত্রে মধ্য উহা না আসায় শ্রীভট্টাচার্য গৃহে কিরিয়া যান। পরদিন প্রাতে আনন্দবাজারে প্রকাশিত হল 'সুরভাচন্দ্রের ভারত হইতে অস্বর্ধানের সংবাদ।' সুরেশচন্দ্র উক্ত খবরটা খবর দিয়াছিলেন বলিয়া পরে জানা যায়।

১৯৪২ সালের 'ভারত হাড়া' আন্দোলনের বিবরণ সংগ্রহের সময় অল্পের জন্ত তিনি নিশ্চিত বৃত্তা হইতে রক্ষা পান। ১৯৪৬ সালের জাহুয়ার সাপ্তাহিক দাজিহালায়ার সময় মণীন্দ্রনাথ অল্প কয়েকজন সহকারীর সাহিত্য সংবাদ সংগ্রহ করিতেন—কোনরূপে একপৃষ্ঠার সংবাদ সংগ্রহ হত সহকারীর অভাবে—রাত্তার চুই পাথে বৃত্তদেহ দেখিতেন—কোন কোনটির উপর "পাক জিন্দাবাদ" পতাকা দেওয়া থাকিত।

১৯৪২ সালের বাঙ্গালার ময়মনসিংহের সময় সাংবাদিক কর্তব্যে

বাধা-নিষেধ থাকার স্বেচ্ছা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪৭ সালে কলিকাতার আইনসভার পূর্ববঙ্গের সদস্যদের শোকাভঙ্গ মনোভাব থেকে তিনি বৃষ্টিতে পারেন যে খুবই অনিচ্ছার সহিত তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইতেছেন।

সম্প্রতিকালে জীভটাচার্য্য কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট সংক্রান্ত ব্যাপারে ও আসামে বাঙ্গালী নির্ধাতনের পটভূমিকায় সংবাদ সংগ্রহে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীয় পরিচয় দেন।

ডাঃ শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তা

[বিনিষ্ঠা অধ্যাপিকা]

বিশ্বাধ্যয়িনী সর্বস্বতীর আশীর্বাদ নিয়েই বোধ হয় জন্মেছিলেন শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তা। সমগ্র ছাত্রীজীবনে অপ্রতিরূপিত সাক্ষ্যের আলোকে আলোকিত করেছেন দেশী এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস।

নির্ধারিত সময়েই উপস্থিত হলাম শ্রীমতী সেনগুপ্তার দরজার, দেখা করলাম শ্রীমতী সেনগুপ্তার সংগে। ভূমিকা না করেই জানতে চাইলাম তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনের গৌরবময় ইতিহাস। পিতার একমাত্র আত্মে কন্যা শ্রীমতী সেনগুপ্তা উত্তর দিতে লাগলেন প্রতিটি কথাই। আজ থেকে ২১ বৎসর পূর্বে ১৯৩১ সালে এই কলিকাতায়ই জন্মেছেন শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তা। আদিনিবাস কলিকাতার (পূ-পাকিস্তান) হলও তথ্যই তাঁর পদার্পণ হয়েছে খুবই কম। পিতা শ্রী ব্রজবোধ্য সেনগুপ্ত (দস্ত চিকিৎসক) মহাশয়ের একমাত্র কন্যা তিনি। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার দিকে এক অদম্য আগ্রহ লক্ষ্য করে উঠি করে দেন তিনি কলিকাতার গোখলে গার্ল'স স্কুলে।

১৯৪৩ সালে উক্ত স্কুল হতে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সংগে ম্যাট্রিক পাশ করলেন শ্রীমতী

সেনগুপ্তা। ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক কলেজ হতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে সাক্ষ্যের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে আসেন শ্রীমতী সেনগুপ্তা এবং ১৯৪৮ সালের ইন্টারমিডিয়েটের (আর্টস বিভাগে) পরীক্ষায় ছোল-মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন।

বি, এ ক্লাসে অর্থনীতিতে অনার্স সহ উর্ধ্বী হলেম প্রেসিডেন্সি কলেজ। ১৯৫০ সালে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি, এ ডিগ্রি লাভ করে অর্থনীতি নিয়ে যোগ দিলেন এম, এ ক্লাসে। ১৯৫২ সালে প্রথম শ্রেণীতে বিত্তীয় স্থান অধিকার করে এম, এ ডিগ্রি লাভ করলেন। ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসেসে যোগ দিয়ে অর্থনীতির অধ্যাপিকারূপে সরকারী কার্যে যোগ দেন।

১৯৫৬ সালে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে যোগদান করেন এবং "প্রাইম বেসপনস ইম এগ্রিকালচার" বিষয়ের থিসিস লিখে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫৯ সালে লণ্ডন হতে ফিরে এসে পুনরায় ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসেসে যোগ দান করেন এবং বর্তমানে লেডি স্মার্টন কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপিকারূপে নিযুক্ত আছেন। শ্রীমতী সেনগুপ্তার স্বামী শ্রী ব্রজবোধ্য নাগ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টার।

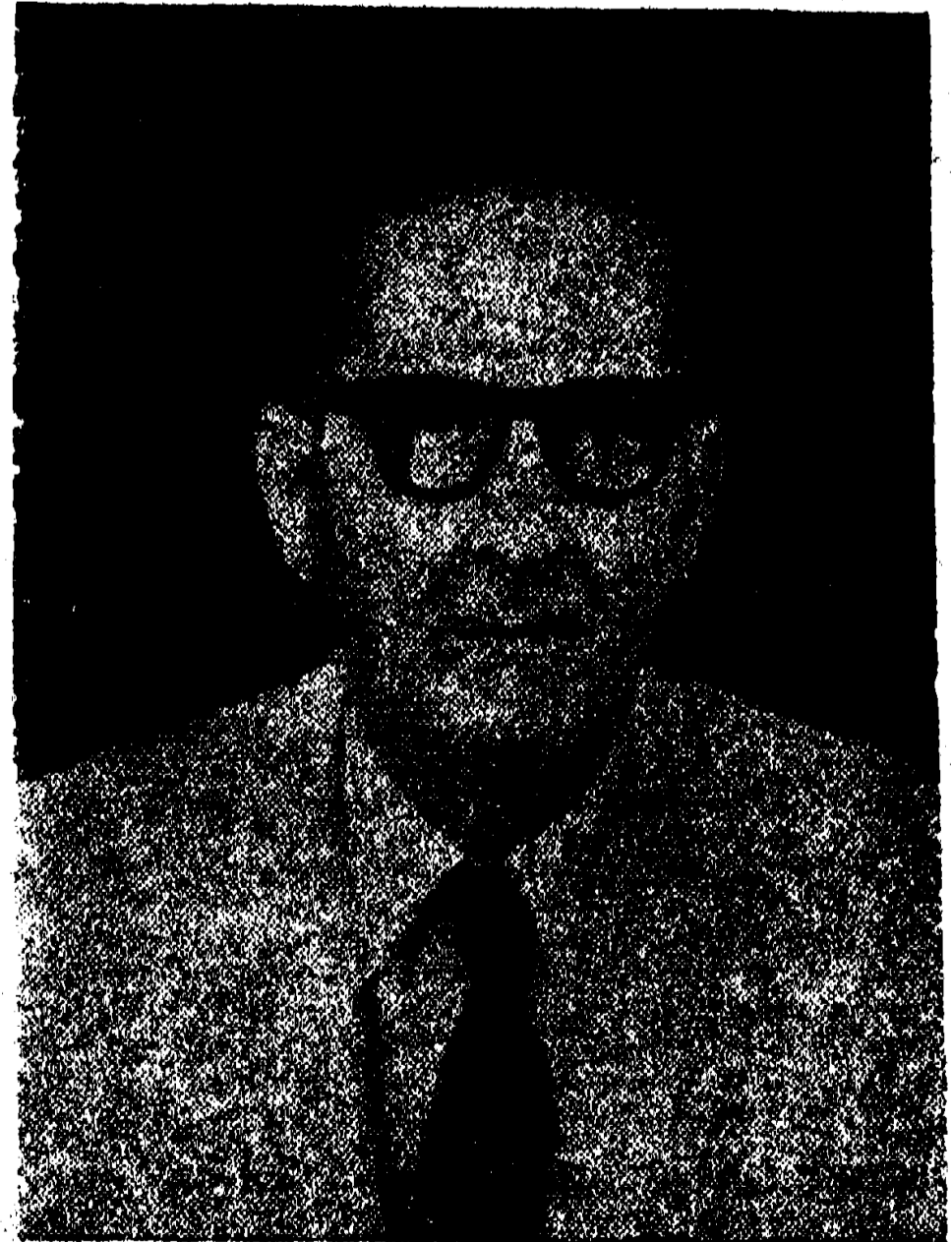
শ্রীগিরিজা গুপ্তা

[বিশিষ্ট আইনজীবী]

অকাল পিতৃবিয়োগ, আর্থিক অনটন ও আবালা অভাব-অভিব্যোগের কষ্টকাঠোর পথগুলি অতিক্রম করেও আত্মপ্রতিষ্ঠায় গৌরবান্বিত হয়েছেন কলিকাতা হাইকোর্টের অভ্যন্তরীণ আইনজীবী শ্রীগিরিজা গুপ্তা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের পক্ষে বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে



ডাঃ শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তা



শ্রীগিরিজা গুপ্তা

আমার কলমকে বাহ্যিক রূপ দিয়েছেন ঐশ্বরতারা। সামান্য
স্থূলমুখিক-বিজ্ঞানগোবিন্দ গুপ্ততারা পুত্র ঐগিরিজা গুপ্ততারা
১১০০ খাল পারমা জিলায় বোগনামা গ্রামে জন্মগ্রহণ
করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে
শিকুরিয়োগ-ব্যথা সঙ্ক করিতে হয়। জীবনে সাফল্য লাভ নিশ্চিতই
হুইয়াই হুবি মর্যাদিক শিকুরিয়োগও তাঁহার উন্নতির পথ রোধ
করিতে পারে নাই। বধাসময়ে ১১১৬ সালে মটন স্কুল হতে
ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন
ঐগুপ্ততারা। ১১২০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে বি. এ
ডিগ্রি লাভ করে ব্যারিটার হওয়ার উগ্র বাসনা জেগে উঠলো
তাঁর মনে। কামনা আছে অথচ সক্ষমতা নাই, সাময়িক নিরীভাব
হয়ে পড়লেন ঐগুপ্ততারা। কিন্তু আশা বেখানে উচ্চ, উচ্চ
বেখানে সং তার উপায়ও করে কেন ভগবান। নিজের চেটার
এক ইচ্ছার করণায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেন বন্ধুবান্ধবদের
কাছ হতে। কোনরকম চিন্তা ভাবনা না করেই ১১২০ সালে

যাত্রা করলেন লণ্ডনে। বোগ বিলের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদ
সিভেজিন-এ ব্যারিটারী পড়তে। শেষ করলেন শিকা। হলেন
ব্যারিটার। বিলেত গিয়ে শুধু পনের উপরই নির্ভর করেন নাই
ঐগুপ্ততারা। ইতিয়া হাউসে লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করলেন চাকুরী।
বোগলেন নিজের খরচ। শিকার অব্যায় শেষ করে ১১২৫
সালে দেশে ফিরলেন ব্যারিটার গুপ্ততারা। বোগ বিলেন কলিকাতা
হাইকোর্টে, শুরু করলেন আইন ব্যবসা। দেওয়ানী হেফে
কৌজদারী মামলার পথই বেছে নিয়েছেন তিনি। দীর্ঘ ৩৫ বৎসর
আইন ব্যবসায় নাম করেছেন, পরিচালনা করেছেন অনেক
সরকারী এবং বেসরকারী কৌজদারী মামলা। বর্তমানে যে ক'জন
বিশিষ্ট আইনজীবী কোলকাতা হাইকোর্টে মুপ্রতিষ্ঠিত, ঐগুপ্ততারা
তাঁদের অন্ততম। ঐগিরিজা গুপ্ততারা অপেক্ষা জি, গুপ্ততারা
নামেই জনসমাজে সমধিক পরিচিত, সদা-প্রস্তুত, অটুট স্বাহ্যের
অধিকারী ঐগিরিজা গুপ্ততারা বাংলায় আইন-জগতে আয়ো বেশ
কিছুদিন সক্রিয় ডুমিকা গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়।

সমর্পণ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

যখন তোমার হাতে সমর্পণ করেছি প্রথম
আমার কল্পিত হাত,—
আকাশে ছিল না কোনো তিথি
থরো-থরো অক্ষর ছেঁয়েছিল যেন সব স্মৃতি
তোমার আঁরত চোখে কী-পতীর কুকর্ণক রাত।

আকাশে ছিল না চাঁদ ; দূর নক্ষত্রেরা
কিন্তু কিন্নু অক্ষর যেন। হুঁ বাহুর আলিজনে ঘেরা
আমার বুকের মধ্যে তবু কোন পূর্বিয়ার আলো
মরালের মত হুঁটি
শব্দ-বল ডানা সহসা ছড়ালো।

আমি একদিন মনে পড়ে
ভনেছি মেঘের ডাক সচকিত নিঃশব্দ প্রহরে
তোমার নির্জন বুকে।
আমার স্বপ্ন
হুঁটির ধারায় ঘুরে ভবে গেছে বোয়ালিত কক্ষ-কেশবে
বেহ বেন বেহ নয় সমর্পিত প্রতিটি পাণ্ডিত্য
আজ্ঞার অংশ বেন ভরেছিল হুঁটির অংশে—

বাকল দিনের সেই প্রথম কবম স্মৃতি রেখেছ কি মনে ?

বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল সে

শক্তি মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল সে।
সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছে পথের ওপর
পৃথিবীকে চিনবে
আকাশকে জানবে
গ্রহগুলোই হুঁড়ে হুঁড়ে দেখবে
মৃত কি সজীব।
তারপর জয়ের পতাকাভঙ্গে ঠাঁড়িয়ে
সে বলবে
আমি চিনেছি
আমি জেনেছি
আমি পেয়েছি আজ সত্যের সন্ধান।
বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল সে।
ভাগ্যের লিপিখানা হুঁছে দিতে চেয়েছে যেদিন
নিষ্ঠর বিজ্ঞান কাছে এসে
প্রতিশোধ নিলে।
রক্তাক্ত দেহ তার বুকু রক্তপথে লুটাল সেদিন
বিজ্ঞানের চাকা তার জীবনে সমাপ্তি এনে দিলে।
রক্তের দেখা টেনে স্রুতগামী ট্রান্সখানা ধমকে ঠাঁড়িয়ে
জ্বালাৎ চোখ মেলে ভাকাল পিছনে।
শেষ হ'ল একটা জীবন।
একটা বিজ্ঞান।
কিভাবেই পাড়াগো হওয়ার উচ্চে ভখনো।

বন্দন



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আইডান তুর্গেনিভ

২৫

সানিন আর এক নিখাসে দৌড়ে তার হোটেলের কক্ষে এল। তার মনে হচ্ছিল কেবল মাত্র সেখানে গিয়েই, যখন সে একা থাকবে বুঝতে পারবে কি হচ্ছে তার অন্তরে। সত্যিই যখন সে ঘরে গিয়ে টেবিলে বসে কিছুই ছুটো টেবিলে রেখে হাত ছুটো তার গালে রাখলো—বিষাদ ভরা সুরে বলে উঠল 'আমি তাকে ভালোবাসি—ভীষণ ভালোবাসি।' অলঙ্কারের উপর থেকে কেউ যদি হঠাৎ উড়িয়ে দেয় তাহলে যেমন অলঙ্কার থেকে পড়বে ঠিক সেরকম তার সারা অন্তর প্রকলিত হয়ে উঠলো। একটি ছোট মুহূর্ত—সে ভেবে পাচ্ছিল না কি করে সে তার পাশে বসে কথা বলছিল কেন সে বুঝতে পারে নি যে তার আমার প্রতিটি ভাঁজ পর্বত তার কাছে ভালবাসার ধন হয়ে দেখা দিয়েছে। যুবকরা যে বলে থাকে—তার পায়ে তলার প্রাণ দিতে পারি— ঠিক তাই মনে হচ্ছিল তার। বাগানের সেই সাক্ষাতেই বোঝাপড়া হয়ে গেছে। এখন আর তার আর আলোর এলোমেলো চুলে তার সেরূপ তার মনে এল না। তার মনে এল 'সে বেঁকিতে বসে, টুপিটা হঠাৎ মাথা নেড়ে পেছনে করে দিল, বিশ্বাস ভরা চোখ মেলে চাইল তার দিকে। তার ভালোবাসার ছুঁনিবার বেগ, ভালোবাসার ঢুকা সারা ধমনীতে বেম হুড়িয়ে পড়ল। হুঁদিন থেকে যে সৌন্দর্যটি সে পকেটে করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বের করে জোরে গোঁটে চেপে ধরল। চিন্তা শক্তি বা ভবিষ্যতের ভাবনা গুলিয়ে গেল। অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার সারা জীবন। তার সজীবন আনন্দহীন জীবনভরণী নোজর কলে অন্ধকার তার ঘরে দাঁড়িয়েছিল—এবারে খুসীর জোয়ারে ভাসিয়ে দিল নৌকো—জানতে চাইল না কোথায় ভিড়বে গিয়ে—হয়ত অপলক এই নৌকো কোন পাথরে বাঁকা থাকবে। উল্লেখের গীতিকাব্যের সেই শান্ত নদীর রূপ এককাল তাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল—এখন দেখা দিল ভীষণ তরঙ্গরাশি। তরঙ্গভঙ্গে ভেসে যেতে লাগল সে। একটা কাগজ টেনে নিয়ে এক টানে লিখে গেল সে।

"প্রিয় জেমা,

তুমি জানো তোমাকে কি উপদেশ আমার দেবার কথা ছিল। তুমি জান তোমার মা কি চান ও কি করতে তিনি বলেছিলেন আমাকে। কিন্তু বা তোমার জানা নেই ও বা আমি তোমাকে জানাতে চাই তা হচ্ছে আমি তোমাকে ভালবাসি। যে স্বপ্নর আগে কখনও ভালবাসে নি সে স্বপ্নর আজ পঁতখুঁটি উচ্ছ্বাসে তোমাকে ভালবেসেছে। অপ্রত্যাশিতরূপে প্রীতি হয়ে উঠেছে আমার সারা স্বপ্ন। অবর্ণনীর মাঝে আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছে

যখন তোমার মা এসে আমার সাহায্য চেয়েছিলেন, তখনও আমার প্রেম পূর্ণরূপ নেয় নি। তা না হলে কে কোন সংস্রবের মতই খুব সম্ভবতঃ আমি এ কাজের তার মিতে অস্বীকার করতাম... আমি বা প্রকাশ করলাম এখন এ সত্যিই আমি অন্তর থেকে তরহি। আমি তোমাকে জানানো কর্তব্য মনে করি, আমাদের মধ্যে বেন ভুল বোঝা না দেখা দেয়। বুঝতে পারিছো আমি তোমাকে কোন উপদেশই দিতে পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ভালবাসি—এ হাজার আমার মনে বা স্বপ্নে আর কিছু নেই।— দমিত্রি সানিন।"

চিঠি ভাঁজ করে খামে বন্ধ করে প্রথমে ভাল সানিন গুয়েটারকে ডেকে তার হাতে চিঠিটা পাঠাবে। না—সে ভাল হবে না। এমিলকে বলব নিয়ে বেঙে ? কিন্তু দোকানে গিয়ে সব বিক্রেতাদের মাঝে বেতে তাকে খুঁজে বের করা বড়ই অশোভন দেখাবে... তাছাড়া সন্ধ্যা হয়ে গেছে—সে হয়ত একতরফে দোকান ছেড়ে চলে এসেছে। বাই হোক, একথা ভেবে সে টুপি পরে বেরিয়ে এলো। হুঁবার মোড় ঘুরল সে, তারপর অবর্ণনীর আনন্দে তার মন ভরে গেল। হঠাৎ দেখতে পেল এমিল আসছে। একহাতে চামড়ার ব্যাগ, অপরহাতে কাপড়ে মোড়া একটা ঠোকা—বাড়ীর দিকে এগিয়ে বাচ্ছিল ছোট ছোটটি।

সানিনের মনে হল লোকে যে বলে থাকে প্রত্যেক প্রেমিকেরই সৌভাগ্য-ভারকা আছে, তার নিশ্চয়ই ঝানিকটা সত্যি। এমিলকে ডাকল সে।

এমিল ঘুরে দাঁড়িয়ে গুকে দেখতে পেয়ে ভীষণ খুসী হয়ে দৌড়ে এল। সানিন তাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দিল না। বলল, চিঠিটা কাকে কি ভাবে দিতে হবে। মন দিয়ে শুনল এমিল।

তার মুখের ভাব দেখতে হল অত্যন্ত গভীর ও রহস্যপূর্ণ। বলল, 'হাতে কেউ দেখতে না পার ?' অর্থাৎ বেন বলতে চাইল আমরা দুজনেই—জানি কি আছে গুতে।

অপ্রত্যাশিত বোধ করে সানিন এমিলের গাল টিপে দিল, 'হ্যাঁ, আমার হোট বন্ধ, যদি কোন উত্তর থাকে—আমার কাছে, নিয়ে আসবে তুমি—তাই না ? আমি সারাদিনই বাঁড়ী থাকব।'

এমিল খুসী হয়ে বলল, 'কিছু চিন্তা করবেন না।' দৌড়ে চলে যেতে যেতে ঘাড় কিবিরে দেখে মাথা নাড়ল।

সানিন আবার নিজের ঘরে গিয়ে গেল। আলো না বেলে হাত ছুটো মাথার নীচে রেখে পাঠে শুয়ে পড়ল। প্রথম প্রেমের উয়েকে যত্ন অটুট করে তার সারা মন ভরে গেল। তাবার এ ভাব ব্যক্ত করা যায় না। এর অল্পময় মাসুর্ কোন প্রেমিকের কাছেই অজ্ঞাত

নেই। আর যে কখনো ভাসিবারই ভাষে বর্ণনা দিয়েও তা বোঝান পারে না।

খোলা বসুধার এখিলের মাথা দেখা গেল। কিস-কিস করে বলল, 'এই যে জবাব—আমি এনেছি।' মাথার ওপরে একটা ভাঁজ করা কাগজ সে ধরেছিল। সানিন খাট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এখিলের হাত থেকে কাগজটা নিল। তার কামনা তখন এত উচ্চতরে পৌঁছে গেছে যে কচিসমত গোপন করে বাখার চিন্তা অস্তিত্ব হয়েছিল— এমন কি তার ভাই—এই ছোট ছেলেটির কাছ থেকে সম্পূর্ণ সংবত ব্যবহার করতে পারলে সে খুশী হত,—যেখিনি ভাই-এর সাহায্যে অকঠিকর কিছু করতে সে চায়নি—কিন্তু তার ব্যবহার তার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল।

বাখার বাতির আলোর ছোট্টলোর জানলার দাঁড়িয়ে পড়ল সে। আদি মিনতি করছি, চাইছি কাল সানিন এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন না। আবার পকে আপনার অল্পপছন্দি একাঙাই প্রয়োজনীয়। পরে সব ছিব হবে। আমি আমি আপনি এর অমাথা কয়েক না কারণ—

সানিন গিটিটি হুবার পড়ল—কি মিষ্টি, কি মরম্পনী সুন্দর তার হাতের দেখা। তার পর এক মিনিট ভেবে কিবে দাঁড়িয়ে এখিলকে মাঝ করে ডাকল। এখিল নিতান্তই সুবোধ জনের মত দেওয়ালের দিকে হুধ করে দাঁড়িয়ে নখ খুঁটছিল, এবারে বৌড়ে এসো তার দিকে।

'আমি কি করতে পারি ?'

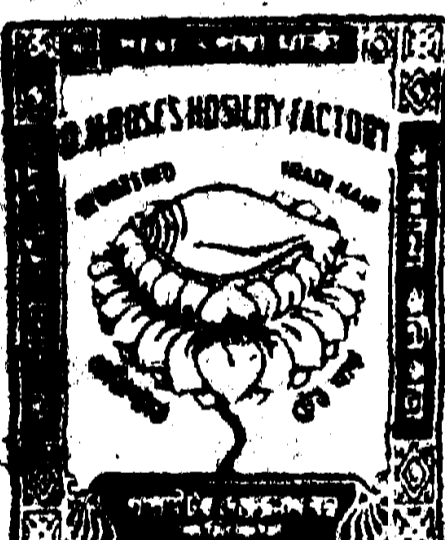
'শোন বন্ধু, তুমি কি...?'
এখিল উদ্ভিত মনে মাথা তিল 'খুঁটিয়ে বিসিদ্ধি, আমাকে তো (.তুমি কবাসীতে) বলেন না কেন ?'
সানিন হাসল, 'ভাই হবে।' (এখিল আনন্দে লাফিয়ে উঠল 'শোন বন্ধু, তুমি কবে একজনকে—জান তো কার কথা আমি আমি—যে সে বা বলেছে ভাই হবে ?' (এখিল ঠোট জে গভীর ভাবে মাথা নাড়ল)...) 'আর তুমি...কাল তুমি কি করছ ?'
'আমি ? কাল আমি কি করলে আপনি খুশী হন ?'
'যদি পার'তো কাল খুব ভোরে এসো। ফ্রাঙ্কফোর্টের আশেপাশে আমরা দুবে বেড়াব তাহলে। তোমার ভাল লাগবে ?'
এখিল আবার আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। 'ভীষণ ভালো লাগবে আপনার সঙ্গে বেড়াতে যেতে। এর চেয়ে ভাল আর কিছু হবে পারে না। আমি নিশ্চয়ই আসব।'
'আর যদি গুণা আসতে না দেন ?'
'আসতে দেবো না।'
'শোনো—বল না—তুমি তো জান কাকে...যে আমি তোমাকে সানিনের মত নিয়ন্ত্রণ করেছি।'
'কেন বলব ? আমি শুধু চলে আসব তাহলেই।'
এখিল সানিনকে চুপ ধরে পাজিয়ে গেল।

সানিন অনেকক্ষণ পাঁচটাবি কবলো ঘরে, শুভে গেল দেখী করে। তার মন আবার মিষ্টি-মধুর আবেশে ডরে গেল—মতন জীবনের আয়ত্তে তার অন্তর পরিবর্তিত হয়ে গেল আবার আনন্দে, আধো ডরে। এখিলকে সানিনের মত নেহতর কবেতে ভেবে খুশী হল সে। ঠিক তার বোনের মতট এখিল। নিজের মনেই বলল সানিন, 'সে আমাকে জেনার কখাট মনে করিয়ে দেবে।'
কিন্তু একটি প্রঙ্গ আর সকল প্রঙ্গ ছাড়িয়ে জাগছিল। কালকের মিনিটি কি করে আজ থেকে ভিন্ন ? মনে হত, সে যেন অনন্তকাল ধরে টকমাকে ভালোবেসে এসেছে। ঠিক আজ যে রকম ভালোবাসে সে।

২৬

পরদিন ভোরে টাটাঞ্জিরার পলার কিত্তে বেধে সকাল আটটার এখিল সানিনের চরভার দেখা দিল। ভাগীণ পিতামাতার সন্তান হলেও এর চেয়ে আগে আসতে পারত না সে। বাড়ীতে মিথো কথা বলে এসেছে। সে বলেছে, প্রান্তবাসের আগে সানিনের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে ও সেখান থেকে সোভা চলে যাবে কোথানে। সানিন বখন পৌরাক পরছিল, এখিল একটু স্তমিত ভাবে জেনারও হের কুহাবের সঙ্গে তার বগডার কথা পাড়ল। কিন্তু সানিন একেবারে চুপ করে থাকতে এখিলও চুপ হয়ে গেল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন বুঝতে পারছিল কেন এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা শোভন নয়। ভাই ভেবে মাঝে মাঝে তার জেহারা জীবন গভীর দেখাছিল।

ককি পারের পর দুই বন্ধু পরস্পরে চাউৎসেন বলে ফ্রাঙ্কফোর্টের অনতিদূরে অবশ্যেই একটা ছোট গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হল। এখান থেকে টাউন্স পরভমালার সবটাই দেখা যাচ্ছিল। দিন খুব ভাল করেছিল। যৌবন দাঁড়াতে ভাল লাগছিল। সবুজ



বিখ্যাত

'শঙ্খ ও গন্ধ'

মার্কা গেম্বী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—টিউল ভিনো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫/১, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২১১৫

কানে থেকে ইচ্ছাকৃত হারা কেন্দ্রিত—হারা সবে সবে বাহির
 টির ওপর থেকে। তখন ছুটি শিশুগিরি পতন চাড়িয়ে মুকব বাঁধামে।
 যা ধরে জোবে হাঁটতে লাগল। একটা ছোট বনে ঘুরে বেড়াল
 নিকরকণ, তারপর প্রাণের সহাইতে প্রান্তরায় খেয়ে নিয়ে পাহাড়ে
 চল। সেখান থেকে প্রাকৃতিক দৃশ দেখে খুসী হল তারা, পাখর
 ঠে ফেলতে লাগল নীচে। হঠাৎ নীচে থেকে এক পক্ষি পাখর
 ার গারে লাগতে গাল দিল তাদের। এবারে তারা ছোট,
 কনো ঈহৎ হলদে বালির উপর শুয়ে পড়ল। তারপর
 লে আরেকটা সহাইতে বিহার পান করবে বলে। তারপর
 ঠে বেড়াল প্রান্তরের উপর দিয়ে, কে কত দূর লক্ষ্যে পাবে
 বীক্ষা হল, প্রান্তরের ওপরে থেকে প্রতিধ্বনি শোনা যাওয়াতে
 ারা প্রতিধ্বনির সঙ্গে গান গাইল, শিশু দিল, কথা বলল।
 াদের ডাল ভেঙ্গে তাদের টুপি সাজাল, এমন কি নাচল পর্বত।
 ার্টাগিরি তাদের সঙ্গে সর্বকণ বুরছিল। সে অবস্থ টিল ছুঁতে
 গারছিল না। কিন্তু টিলের পেছন পেছন ছুটছিল, পানের সঙ্গে
 াতবাছিল। বিহার পান করল বিরক্ত হয়ে। এই অভ্যাসটি তার
 াঙ্কন প্রভু এক ছাত্রের কাছে শেখা। তার বর্তমান প্রভু
 াটালেওনের সে বড় বাধা ছিল। কিন্তু এমিল যখন তাকে
 কথা বলতে' কিবা হাঁচতে বলছিল সে শুধু ভিত্ত বের করে লেজ
 াড়ছিলো।

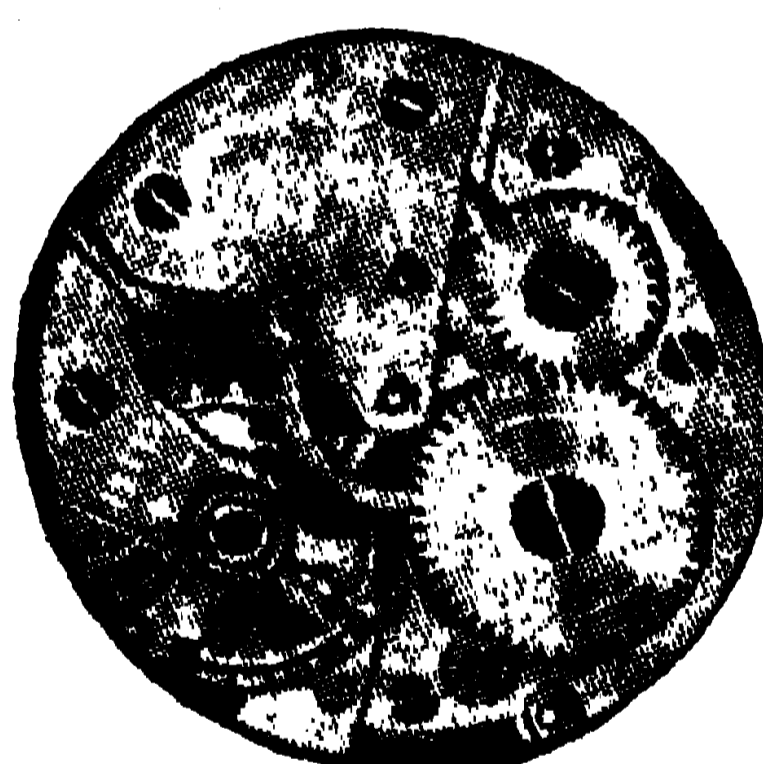
তখনই অনেক কিছুই আন্দোচনা করছিল। বুদ্ধিতে সানিন
 াবস্ত করল জীবনের উদ্দেশ্য, জীবিকা, তার অর্থ ও প্রকৃতি
 কি কিন্তু কথাবার্তা শিশুগিরিই সাধারণ শুয়ে নেয়ে এল। এমিল
 তার বন্ধু ও ভাবাবধারণকে রাশিয়া সবচে জিজ্ঞেস করল, সেখানে
 কি করে বন্দবন্দ হয়, সে দেশের মহিলারা কি সুন্দরী, রাশিয়ান
 তারা শিখতে কতদিন লাগে; যখন অফিসারটি শুনি ছুঁড়ছিল
 তখন তার মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি।
 সানিনও তাকে জিজ্ঞেস করল তার বাবার কথা, তার মার
 কথা, তাদের পারিবারিক অবস্থার কথা, অতিকষ্টে সে
 জেনার কথা পরিহার করে চলছিল—কিন্তু তার কথাই ভারি হল
 সে সবসময়। বস্তুতঃ ঠিক যে তার সবচে ভাবছিল তা নয়, সে
 ভাবছিল, আগামী কাল আগামী প্রভাত কি অপ্রত্যাশিত কি
 অনির্ভর্যমূর্তি মুখ নিয়ে দেখা দেবে। তার মনের ছবিতে যেন
 পাড়লা মুখ আরক দেওয়া পর্দা বলছিল—বাতাসে কাঁপছিল
 অস্থতব করতে পারছিল ওপারে রয়েছে একটি নবীন মুখ, ছিব,
 মেঘফুলত, ঠোঁটে মুহু হাসি, কপট হলনার সস্তর চুনরনের পদ্ম
 নীচে নামানো। এ যেন জেনার মুখ নয়—এ মুখ পুথের। অবশেষে
 তার সেই মুহুর্ভটি এসেছে, পর্দা সরে গেছে, ঠোঁট বুলে গেছে,
 পদ্ম উপরে উঠে গেছে—বর্গীর মুখ দেখতে পেয়েছে তাকে—
 স্বর্ষকির মত বিছুরিত হচ্ছে আলোক, কি অশীত আনন্দ, কি
 অপরিণীত বিহ্বলতা। যখন সে এই মুহুর্ভটি, এই অসংগত
 প্রভাতের কথা ভাবছিল তার জংপিণ্ডের স্পন্দন যেন খেয়ে বাছিল
 —অশীত আশান্তে তার মন পূর্ণ হয়েছিল।

আর এই আশা, এই কামনাকে বাধা দেওয়ার কিছু ছিল না।
 সর্বত্র ছিল তারা তার সখী। এই আশা ও কামনায় ভরপুর ঐক্য
 সঙ্গের সে বধ্যাক জোকর কারল চন্দ্রসহায় একটি বন্দাইতে এমিলের

সঙ্গে। বিহার-কলকের মত তার মনে হারো-হারো উপর হাছিল
 লোকে যখন জানবে। যথাক্রমে জোনের পর তারা ব্যক্তিগত মত
 লাগছিল। একটা একাও বড় কৃপাচারিত্ব হঠাৎ তারা
 খেলছিল এখন, সে যখন এমিলের পিঠের উপর তিরে পা মুঠো
 হাড়িয়ে পাখীর মত আর উড়ে বাছিল ও টার্টাগিরি জাংগলে
 চোঁচাছিল—হঠাৎ সানিন অভ্যন্ত লক্ষিত ও স্তম্ভিত হয়ে লেগতে
 গেল হাঠের একপাশে হুজন সেনারলের অফিসার পাড়িয়ে আছে।
 একজন কালকের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অপর জন তার সর্বস্বামী—হেব কন
 উনহোক ও হেব কন রিটার। তাদের প্রত্যেকের চোখে এক
 কাঁচওলা চশমা পরা ছিল—হুর্জনেই হাসছিল তারা। সানিন
 মাটিতে পা ঠেকিয়ে ঘুরে পাড়িয়ে ছাড়া কোটটি তাড়াতাড়ি পরল ও
 এমিলকে রওয়ানা হতে বলল। এমিলও তার কোট পরে নিলে,
 তারা দ্রুতপদে ফ্রান্সকোট রওয়ানা হল।

বড় দেয়ী হল ফ্রান্সকোট পৌছাতে।
 বিহার নেবার সময় এমিল বলল—'আজ আমার ভাগ্যে বহুনি
 আছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে-যায় না। আজ দিনটি কেটেছে
 চমৎকার।'
 হোটেলের ফিরে এসে দেখল জেনা একটা চিঠি লিখেছে তাকে।
 বহু পার্কেবেষ্টিত ফ্রান্সকোটের একটি পাকে আগামীকাল সকাল
 সাতটাের সময় সে সানিনের সঙ্গে দেখা করবে লিখেছে।
 আনন্দে বিশেষারা হয়ে গেল সে। জেনার অস্থরোধ নির্ভর
 সঙ্গে পালন করেছে জেবে কি খুসী হলো—ভগবান—অনাগত

GUARANTEED



**WATCH REPAIRING
 UNDER EXPERT
 SUPERVISION**

ROY COUSIN & CO
 JEWELLERS & WATCHMAKERS,
 4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA.

OMEGA, TISSOT & COVEYRY WATCHES

প্রভাত কি নিরে আসছে, অবিশ্বাস, অসম্ভব, অবিভীত, অবততাবী—
কি নিরে আগবে না সে ?

জেন্নার চিঠির উপর আবার চোখ বুলান সে। 'জি' অক্ষরটির
নিচের দিকটা লম্বা করে টেনে দিয়েছিল জেন্না—তাকে মনে এলো
তার মনের আঙ্গুলগুলো। তার মনে পড়ল ঠোঁট দিয়ে কখনো
এই অনিন্দ্যসুন্দর হাসটিকে আদর করে নি সে। ভাবল—লোকে
যা বলে ইটালীয়ান মেয়েরা তো তা নয়। এরা—বিশেষ করে
জেন্না অত্যন্ত লজ্জাশীলা ও নির্মল। সে বেন রাণী, বেন দেবী—
মর্মর পাখরের মত পবিত্র ও নির্মল।

কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতে—সময় যখন আসবে... সে রাজ্যে
ক্রাককোটে একটি সুখী লোক ছিল... সে বুঝেছিল, কিন্তু কবির
ভাবার বলতে পারত আমি বুঝি...-

কিন্তু সদাঙ্গপ্রত আমার অস্তব ঘুম কাঁকে বলে জানে না...-

প্রীত্বের পূর্বশ্মিতে ফুলের উপর ডানা মেলে প্রজাপতি গুয়ে
ধাকে—সে বকম তার অস্তব হাস্য মনে বিচরণ করছিল।

২৭

পাঁচটার সময় সানিন ঘুম থেকে উঠে ছটার মধ্যে
পোষাক পরে নিল। সাড়ে ছটার সময় পার্কে হেঁটে বেড়াচ্ছিল
সে, জেন্নার নির্দেশমত একটি ছোট প্রীত্বকালীন ঘরের দিকে
নজর রেখে।

শান্ত গরম ধূসর ছিল সকালটি। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে
বুড়ি আসবে। কিন্তু হাত পাতলে তাকে জল লাগছিল না, কেবল
কোঠের ছাতাটা সামান্য ভিত্তেছিল—একটু পরে তাও বন্ধ হয়ে
গেল। মনে হচ্ছিল পৃথিবী থেকে হাওয়া চিরন্তন বিদায় নিয়েছে।
শব্দহীন বেন স্থির হয়ে বায়ুতে ত্রিশকুম্ব মত ঝাড়িয়ে ছিল, দুবে
কুয়াসা হয়েছিল। স্মৃষ্টি মিনোনেট ও সাগা খয়ের-ফুলের গন্ধে
ভরপূর্ণ ছিলো বাতাস।

সব দোকান বন্ধ ছিল কিন্তু রাস্তার দূর-একজন পথচারীকে
দেখা বাচ্ছিল। থেকে থেকে গাড়ীর চাকার আওয়াজ আসছিল—পার্ক
বায়ুসেবনকারী আর কেউ ছিল না। শুধু একটি মালী আস্তে
কোনদিক দিয়ে রাস্তা ঠিক করছিল। রাস্তার কালো পোষাকে
আচ্ছাদিত এক বুড়ীকে দেখা গেল—এক মুহূর্তের জন্য সানিনের
মনে হল এই বুড়ি জেন্না, তার বন্ধ স্পন্দিত হতে লাগল, চেয়ে
বুইল কালো দাগটি বতকম না আড়াল হয়ে যায়।

সাতটা, গীর্জার বড়িতে সাতটা বাজল।

সানিন এবারে ঠাড়িয়ে পড়ল। সে কি আসবে না? এই
চিন্তায় তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল বেন। এক মুহূর্ত—তাবপরই
তার সারা দেহ যোমাকিত হয়ে উঠল, এবারে কিন্তু একেবারে
অস্তকারণে। মনেতে গেলে লম্বনকে কে এগিয়ে আসছে—তার জামার
আওয়াজ আসছে। কিরে দেখল—জেন্না।

জেন্না রাস্তা ধরে অমুদরণ করল তাকে। সে পড়েছিল একটি
ঘূসর রঙের পোষাক, মাথায় ছিল কালো একটি টুপি। ঘূষ ভুলে
চাইল সে, মাথাটা হেলিয়ে সানিনকে ছাড়িয়ে গেল।

অমুদরণে সানিন ডাকল—জেন্না—

জেন্না তাকে শুধু মাথা নাড়ল, হেঁটে চলল। এবার সানিন

তার অমুদরণ করছিল। বিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার—
ছোট্ট টেনে নিয়ে যেতে পারছিল না।

প্রীত্বকালীন ঘটি ছাড়িয়ে ডাইমে ঘূষল জেন্না। এব
ছোট অগভীর স্বরণাতে একটি নিঃসঙ্গ চতুর্দৈ শ্রম করছিল—পেরি
গেল, লাটলাক কোণের পেছনে রাখা একটি বেঞ্চ বসল।
লোকচক্ষু অস্তরালে ভারী আরাধনারূপ ছিল এই কোণটি। সানি
বসল তার পাশে।

এক মিনিট কেটে গেল। সব চূপচাপ। জেন্না তার দি
চাইল না পর্বত, সানিনও অবশ্য তার মুখের দিকে চারটি
চেরেছিল ছোট ছাতার ওপরে রাখা হাত ছুটির দিকে।
বলবে? কি বলার আছে? তার শুধু হৃদয়ে একা, এত ভো
এত কাহাকাছি বসে আছে এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে পরিষ্
করে কি বলা যেতে পারে?

অনেকক্ষণ পর সানিন কোনরকমে বলল—'আমার ওপ
আপনি কি রাগ করেছেন?'

অবশ্য বলেই ব্যস্তে পারছিল অত্যন্ত হান্তকর হয়েছে কথা
বাই হোক তাতে অস্তব: নীরবতা ভঙ্গ হল।

'রাগ করব আপনার উপর না তো—কেন?'

'আমার কথা বিশ্বাস হয়েছে?'

'অর্থাৎ চিঠিতে বা লিখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

জেন্না উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করল। ছাতা পড়ে
তার হাত থেকে। তাড়াহাড়া তুলে নিল সে ছাতাটা।

সানিন বলে উঠল 'বিশ্বাস করুন। আমি যা লিখেছি কি
করুন।' তার সব সন্ধ্যাচেনে হঠাৎ কেটে গেল। আবেগের
বলতে লাগল 'পৃথিবীতে সত্য বলে যদি কিছু থাকে—পরিষ্
প্রকৃত সত্য—তা হচ্ছে জেন্না আপনারা আমায় ভালোবাসি।'

জেন্না এবারেও শুধু আড়চোখে চেয়ে দেখল তাকে, হাত
আবার ছাতাটা পড়ে গেল।

সানিন হাত ছোট্ট বাড়িয়ে দিল, কিন্তু জেন্নাকে স্পর্শ ক
সাহস তার হল না। 'বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন—কি ক
বিশ্বাস হবে আপনার?'

জেন্না চেয়ে দেখল আবার। 'ম'পিরে দিমিত্রি, সেই যে
আপনি আমাকে বোঝাতে এসেছিলেন সেদিনও কি আ
বোঝেননি?'

প্রতিবাদের সুরে সানিন বলল 'আমার মন বুঝেছিল।
আমি জানতাম না। আপনাকে প্রথম মর্শনেই আমি ভালো
কেনেছিলাম। তাছাড়া, তুললাম আপনার বিয়ে স্থির হয়ে গেছে
আর প্রথমত: আপনার মায় অল্পবোধ আমি কি করে এত
তারপর বিতীয়ত:—সেদিনকার আমার আচরণেই ধরা
গিরেছিলাম'—

হঠাৎ পেছনে ভারী পারের শব্দ শোনা গেল। এক
জহলোক, কাঁধে বোলান বোলা, ধূষ সস্তবত: বিনেশী—বে
পিছন থেকে আবির্ভূত হলেন—জোরে কেশে, অশিষ্ট ও
ওদের দিকে চেয়ে এগিয়ে গেলেন।

পাঁচের শব্দ বিস্তার বেতে সানিন বলল, 'আপনার মা আ

বলেছিলেন, আপনি এ বিয়েতে অস্বীকৃত হলে কলঙ্ক হবে আপনার নামে।' আপনাকেই যেন জেন্নার তুচ্ছ ঠাট্টা কুঁচকে গেল। 'আরো বলেছিলেন, এই অপ্রিয় সমালোচনার জন্য আমি খানিকটা দায়ী—কাজেই আপনার প্রণয়ী হের রুয়বারকে যাতে আপনি বিমুখ না করেন তা দেখা আমার কর্তব্য।'

সানিনের পাশে বসে জেন্না নিজের চুলের ভেতর হাত ঢালাতে লাগল—'ম'শিরে মিমিড্রি, আর কখনো হের রুয়বারকে আমি প্রণয়ী বলবো না। আমি তাকে বিয়ে করব না। তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি আমি।'

'কখন? কবে?'

'কাল।'

'সোজানুজি তাকেই?'

'হ্যাঁ, তার সুখের ওপরেই, যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

'জেন্না, এর অর্থ কি আপনি আমাকে ভালবাসেন?'

সুয়ে বসল জেন্না। বেকিতে হাত রেখে চুপি চুপি বলল, 'তা না হলে কি আসতাম এখানে?'

সানিন এই অবলম্বনহীন হাতটি তুলে নিল, তার চোখে তার ঠোঁটে বুলিয়ে নিল... কাল তার সামনে যে পর্দা নড়ছিল হাওয়ার সঙ্গে গেল—এই তো সুখ—এই তো অনির্বচনীয় সুখের দীপ্তি।

মাথা তুলে এবারে জেন্নার চোখে চোখে চাইল। সে-ও তার মাথা ঠাট্টা নত করে চেয়েছিল তার দিকে। তার চোখের পলক ছিল অশ্রুসিক্ত। আর ঠোঁটে ছিল হাসি—নিঃশব্দ স্বর্গীয় হাসিতে তার সারা মুখ হব্বছিল উদ্ভাসিত।

সানিন যেন তাকে বুকে টেনে নিতে চাইল কিন্তু সে সে-রকম নিঃশব্দে হেসে মাথা নাড়ল। তার চোখ দুটো যেন বলছিল—'অপেক্ষা কর।'

সানিন চেঁচিয়ে উঠল—'ও জেন্না, আমি কি কখনো ভেবেছিলাম তুমি (তার ঠোঁট দিয়ে যখন 'তুমি' শব্দটি বেরল মনে হল নতুন মুহূর্ত যেন তার মনোবীণা বেজে উঠল) আমাকে ভালবাসবে?'

জেন্না বলল যত্নসহ, 'আমিও কখনো ভাবিনি।' সানিন বলে চলল 'আমি কি কখনো ভাবতে পেরেছিলাম ফ্রান্সফোর্টে ছু-ভিনবটার জন্য থাকতে এসে আমার চিরজীবনের সুখের উৎস খুঁজে পাব?'

'তোমার চিরজীবন? সত্যি বলছ? জেন্না জিজ্ঞেস করল। 'আমার সারাজীবন চিরতরে' সানিন আধা উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল। হঠাৎ পার্কের মাণী কোদাল দিয়ে তাদের বেকির পাশে ঘাটি কোপাতে লাগল।

জেন্না বলল 'চল, এবার বাড়ী যাওয়া বাক—একসঙ্গে বাব?' এই মুহূর্তে সে যদি বলত—'সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়। তোমার ইচ্ছে আছে?' সে কথাটা শেষ করার আগেই হরত—সানিন ঝাঁপিয়ে পড়ত সমুদ্রে।

পার্ক থেকে বেগিয়ে এল দু'জন, বাড়ীর পথে পা দিল, কিন্তু সহরের ভিতর দিয়ে না গিয়ে কাঁকা সহরভঙ্গীর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল।

২৮

সানিন ও জেন্না পাশাপাশি হাঁটছিল। মাঝে মাঝে সানিন পিছিয়ে পড়ে জেন্নাকে দেখছিল, হাসছিল সবসময়। আর জেন্না যদিও দ্রুত হাঁটছিল তবু হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাচ্ছিল। বসন্তে, ভারী উত্তরে একজন ফ্যাকাশে ও অপরা আবেগে বক্তব্য যেন ঘরে বিভোর হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে—হৃৎনে ধরা গিয়েছে হৃৎনের কাছে—নবীন আশায় উদ্ভিপ্সার তাদের সারাজীবনের গতিপথ বদলে দিয়েছে—এই যে হঠাৎ পরিবর্তন এ যেন তাদের বিশ্বয়-বিহ্বল করে দিয়েছে। তারা যেন ভীষণ ব্যর্থ সেই সেদিন সন্ধ্যার মত পরস্পর পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে সানিনের মনে হলো সে যেন জেন্নাকে এখন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে। সেই মুহূর্তেই সে লক্ষ্য করল জেন্নার হাঁটার ভঙ্গি, হাত পা নড়ার ভঙ্গি, ভগবান—তার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি কি মনুষ্য কি অভিনব সুরস্বর। জেন্নাও বুঝতে পারছিল সানিন তার দিকে নতুন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে।

উভয়েই এ প্রথম প্রেম, প্রথম প্রেমের উন্মত্ত তাদের জীবনে। প্রথম প্রেম যেন বিপ্লবের মত। গতানুগতিক বাঁধাধরা দৈনন্দিন জীবনে এক মুহূর্তে দেখা দেয় পরিবর্তন, সব বাধাধর ছাড়িয়ে উদ্ভাস বোঝন তার বিশ্বয় কেতন তুলে ধরে, নতুন জীবন—এমন বিমূর্ত্য পর্যন্ত তখন তার কাছে পরম কাম্যরূপে দেখা দেয়—সব কিছুকে স্বাগত জানায় সে।



ফোন

৬৪-৬২৩৯

পি, মি, তাত

জুয়েলার

১২৫ বি. বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা ১২

একটি লোক তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল।

‘কেও—আমাদের দুজনে?’ সানিন হঠাৎ ঠেঙিয়ে উঠল তাকে হাধিয়ে। অনির্ভরীয় ভাবে তার মন জরে ছিল, ভালোবাসা হাড়া অস্ত্র কিছু নিয়ে জেয়ার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার, বিধি খেন, তার জে বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

সুগভি উঠল হয়ে জেয়া, উত্তর দিল ‘হ্যাঁ, পাটালেওন।
‘সবুজ: সে আমার পোছন পোছন ছিল... সে বুকতে পেরেছে।’

সানিনও জানকের সঙ্গে বলল ‘হ্যাঁ, সে বতে পেরেছে।’
সানিনের ভরষন এমন অবস্থা জেয়া বা বলত তাতেই সাহ দিত সে।

এবারে সে বলল কাল কি কি ঘটছে খুলে বলতে। জেয়া তখনই ভাড়াভাড়া কখনো একটু হেসে, কখনও বিমর্ষ ভাবে সানিনের দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে চেয়ে উন্টোপাটা বর্ণনা করে বেতে লাগল। বলল কি করে তার মা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন তাঁর কাছ থেকে কথা বের করবেন বলে, কি করে সে ফ্রাউ সেনোরকে একদিনের জন্ত বৈধি ধর থাকতে বলল, কি ভীষণ কষ্ট করে যে তার মাকে ঠেঙিয়ে রাখল, অপ্রত্যাশিত ভাবে হের রূপবানের আবির্ভাব, আরো বেশী পরিপাটি ও মাজিত রূপে। সে এসে বলল রাশিয়ান বিদেশী জহলোকটির অমার্জনীয় ধুটতা ও আচরণে সে কতকুর মর্ষাহত হয়েছিল। বলল—‘তোমার বন্দবুদ তাকে অপমানিত করা হাড়া আর কিছুই নয় (ঠিক এই শব্দগুলোই সে বলেছিল)। বলল, আর কেন তোমাকে আমাদের বাড়ীতে চুকতে বেওয়া না হয়। ‘কারণ’ সে বলল—‘এটুকু বলে জেয়া হের রূপবানের গলায় স্বর ভাবভঙ্গীর অহুকরণ করে বলল ‘এতে আমার কমানের ব্যাখ্যাত হয়, মনে হয় আমি আমার প্রেমিকার জন্য ঠিকঠকে পরিশ্রমি, কেন তার প্রয়োজন ছিল বা কোন সুবিধে ছিল তাতে। সাহা ক্রমকোটি সহর কাল জানতে পারবে একজন সেনোর। লোক আমার প্রণয়িনীর জন্য একজন অফিসারের সঙ্গে সফেছে। কে করে এমন কথা শুনেছে এতে লস্কাস হানি হবে আমার।’ আর জেবে দেখে, মা তাতে মাজি হসেন। কিন্তু আমি তাকে তখনই বললার তার নিজের জন্ত বা সন্মানের জন্ত বিশুদ্ধ বিচলিত বোধ করার প্রয়োজন নেই, তার প্রণয়িনীর হরুতে লোকে কি বলবে এই ভেবে অপমানিত বোধ করতে হবে মা তাকে—কারণ, আমি আর তার প্রেমিকা নই ও তার স্ত্রী হব মা আমি কখনো। অবশ্য এখন তোমার কাছে স্বীকার করছি আমি—একবারে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে কথা বললে ভাল লাগত আমার। কিন্তু কি করব... সে আসতে নিজেসে সামলাতে পারলাম না। মা তো জরে ও হুখে কানতে জন্ত করসেন—আমি পাশের ঘর থেকে তার আংটি এসে কেবত বিলাস, তুমি লক্ষ্য করনি আমি আংটিটা খুলে কেনেছিলার হুদিন আগে আনুল থেকে। হের রূপবান মর্ষাহত হয়েছিল কিন্তু তার লন্ত ও গঞ্জিা বজার রাখতে গিয়ে কিছু বলতে পারল না। সে বাকী থেকে বেরিয়ে গেলে মার কাছ থেকে আমার কম কথা শুনতে হয়নি। অবশ্য মা এত কষ্ট পাচ্ছেন কেনে আমি নিজেও কম সন্তুষিত নই, তাহাড়া আমারও মনে হচ্ছিল বড় ভাড়াহাড়া করছি। কিন্তু দেখ, আমি জানতাম—তোমার দিষ্ট পেরেছিলাম, কিন্তু জায়ও আগে জানতাম...’

সানিন যোগ করল—‘সে আমি তোমাকে ভালবাসি।’

‘হ্যাঁ, বে তুমি আমাকে ভালোবাস।’

জেয়া অনবরত কথা বলে বেতে লাগল। অস্ত্র কোন পথচারী তাদের খুব কাছে এসে পড়লে সে চূপ করে যাচ্ছিল। কখনও আস্তে, কখনও জোরে হেসে গভীর হয়ে বকে বেতে লাগল। মা ভীষণ সুফে পড়েছেন। তার মাথায় এটা চুকছেই না বে হের রূপবানকে আমি যোটেই পছন্দ করি না। আমি তাকে বিয়ে করতে রাজী ছিলাম ভালোবেসে নয়—মার কথা শুনে। মা এখন সন্দেহ করছেন আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। এখন কেবলই বলছেন কি করে এ বাবণটা ঠুর মাথায় সেদিন আসেনি, তাহলে মা তোমাকে আমার মত পরিবর্তনের জন্ত উপদেশ দিতে অহুবোধ করতেন না। অহুত যোগাযোগ এই অহুরোধটি—না? এখন মা বলছেন জেনে-শুনে তুমি এই কাণ্ডটি বাধিয়েছ। তার মরল বিশ্বাসের এই প্রতিদান দিচ্ছ। আমাকেও বলেছেন তুমি আমাকে বকনা করবে, হুদিন খেলা কবে ময়ে পড়বে...’

বাধা দিয়ে সানিন বলল, ‘কেন জেয়া, তুমি তাঁকে বলনি?’

‘আমি কি বলব? আমার বলার কি অধিকার ছিল তোমার কাছ থেকে না জেনে?’

সানিন তার হু’বাহ বাড়িয়ে দিল—‘এখন অহুত: আশা করছি তুমি তাঁকে সব বলবে, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে, তোমার মার কাছে আমি প্রমাণ করতে চাই বে আমি প্রচারক নই।’ সেই সঙ্গে সানিনের অহুতুল থেকে অহুকল্পা জরা উচ্ছাস ও আবেগে দীর্ঘবাস বেদিয়ে এল।

বড় বড় চোখ মেলে জেয়া চেয়ে দেখল তার দিকে।

‘অর্থাৎ তুমি চাইছ এখনই আমার সঙ্গে মার কাছে যেতে? মার কাছে? মা তো বলছেন আমাদের হুজনের মধ্যে কিছুই হতে পারে না। অর্থাৎ...’ জেয়া একটি শব্দ কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারছিল না, তার ওষ্ঠ বেন জলে যাচ্ছিল। কিন্তু সানিন বুকতে পারল জেয়া কি বলতে চায়—গভীর সুখে বলল, ‘তোমাকে বিয়ে করতে জেয়া তোমার স্বামী হতে—এর চেয়ে বড় সুখ আমি কল্পনা করতে পারি না।’

সেই হুহুর্তে তার প্রেমের—তার মহম্বের—তার বাসনার বেন শেষ ছিল না।

জেয়া দাঁড়িয়েছিল—সে কখন এ কথাটা বলল—অমনি বেন হুটে চলল জেয়া—বেন এই অপ্রত্যাশিত গভীর সুখের কাছ থেকে পালিয়ে বেতে চাইল—এত সুখ বেন কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু হঠাৎ জেয়ার পা হুটৌ বেন অবশ হয়ে গেল। সামনের মোড় থেকে, মাজ করেক পা দূরে, একটা নতুন টুপি ও নতুন কোট পবে হুন্দর কৌকড়ানো চুল নিয়ে ভীষণবেগে এসে কীড়াল হের রূপবান। প্রথমে জেয়া ও পরে সানিনকে দেখে নিজের মনে অভিলাপ দিল বেন। তার সুবেশ রুন্দর জেহ বেন হঠাৎ পোছন দিকে মত হয়ে গেল, এগিয়ে গেল সে। সানিন চমকে উঠেছিল প্রথমটা, কিন্তু রূপবানের চেহারার ছিল কুপামিঞ্জিত বিহের ও কুপামিঞ্জিত বিহের দেখে সানিন জোখে কিংগ হয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো।

জেয়া তার হাতে হাত বসল পাড় তাব ইচ্ছাকৃত—তার

হৃৎপূর্ব প্রণয়ীর দিকে চাইল। হের রূপবার চোখ ছোট করে আড়লি ভাবে একপাশে সরে পাড়িয়ে পাতে কাঁচ চেপে বলল— 'গানের চিরন্তন শেষ কলিটি।' একটু লাকিয়ে লাকিয়ে চলে দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

'কি বলল পাঞ্জীটা?' জিজ্ঞেস করল সানিন—তখনই সে রূপবারের পেছনে ছুটতে রাজী ছিল। জেন্মা তাকে যেতে দিল না। হাতে হাত ধরে এগিয়ে গেল।

বসেলীর লোকান এখন দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, জেন্মা খেমে বলল—'দিমিত্রি, ম'শিয়ে দিমিত্রি, আমরা এখনও ভেতরে বাই নি, মার সঙ্গে এখনও দেখা করিনি। যদি ইচ্ছে হয় আবার ভেবে দেখতে পারো, যদি... তুমি এখনও বন্ধনশুক্ত, দিমিত্রি'...

সানিন উত্তরে শুধু তার হাত বৃকে চেপে ধরে সামনে টেনে আনল তাকে।

ফ্রাউ লেনোর যে ঘরে বসেছিলেন সে ঘরে সানিনকে নিয়ে গিয়ে জেন্মা বলল—'মা, এবার আমি প্রকৃত লোকটিকে এনেছি।'

২৯

জেন্মা যদি বলতো সে কলেরা বা সাকাং বৃত্তাকে নিয়ে এসেছে—ফ্রাউ লেনোর এর চেয়ে বেশী চুঃখিত হতেন না। তিনি তখনই দেওয়াল-এর দিকে মুখ করে এক কোণায় বসে কান্নার ভেঙ্গে পড়লেন—বালিবান কৃষ্ণ-রঙ্গী তার স্বামী বা সন্তানের বৃত্তাতে যে বকস কাঁদে ঠিক সেরকম। এক মুহূর্তের জন্য জেন্মা এত বিচলিত হয়ে পড়ল যে সে তার মার কাছে যেতে পারল না পর্বত—ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে কাঁড়িয়ে বইল। সানিনেরও কান্না আসছিল—তার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। অশ্রুভ ভাবে কেঁদে চললেন জেন্মার মা—পুত্রো এক বটা। পাটালেওন লোকানের সদয় দয়কা বন্ধ করে দেওয়াই সমীচীন বোধ করল, বাতে কেউ আসতে না পারে—সৌভাগ্যবশত তখনও বেলা বেশী বাজে নি। বুড়ো নিজেও কম অগাধ হর নি। জেন্মাও সানিনের সমস্ত ব্যাপার সবকিছু এত তাড়া ভাল লাগছিল না তার। অথচ অন্তর থেকে তাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলার পাচ্ছিল না সে। সর্বতোভাবে তাদের পক্ষ সমর্থন করতে রাজী ছিল—রূপবারকে সে এতটী দুঃখী করত। এমিল জানত সে নিজে তার বন্ধু ও বোনের মাধ্যমেই কাজ করেছে। সবকিছুই ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে ভেবে সে গর্ভবোধ করছিল। দুঃভেই পারছিল না মা কেন নিতান্তই অব্বের মত ব্যবহার করছেন। তার ধারণা হল যেহেঁা অত্যন্ত অব্বিবেচক। সবচেয়ে মর্মান্তিক অব্বা হল সানিনের। সে এখনই ফ্রাউ লেনোরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখনই তিনি চিংকার করে কেঁদে উঠছিলেন। সে অনেকবার নিরাপদ দূরবে পাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আমি আপনার কন্যার পাবিগ্রার্থী।' তাতে কোনই কাজ হলো না। ফ্রাউ লেনোর সবচেয়ে বিরক্ত হয়েছিলেন নিজের প্রতি—কেন তিনি কিছু বুঝতে পারেন নি? কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'জিরোভান বাচিটা বেঁচে থাকলে এবং কিছুই হত না।' সানিন নিজের মনেই বলছিল 'ভগবান, এ সব কি কাণ্ড।' জেন্মার দিকে চাইতে সাহস হল না তার, জেন্মাও চোখ ভুলে চাইতে পারছিল না। সে মার সেবা করছিল—যদিও তাকে বাঁড়া দিবে সম্বন্ধে বিবেছিলেন তিনি এখন

অবশেষে বীরে বীরে পাঁচ হল বন্ধ। ফ্রাউ লেনোর কান্না থামিয়ে ঘরের কোণ থেকে উঠে কাঁড়ালেন, জেন্মা তাকে জাননার পাশে চেয়ারে নিয়ে বসালো। কমলাকুলের গন্ধবাসিত জল খেতে দিল। তিনি সানিনকে কাছে আসতে না দিলেও ঘরে থাকতে দিলেন (প্রথমে তিনি চেয়েছিলেন সানিন কেন এই বৃত্তকে বাঁড়া ছেড়ে যায়)। এখন আর সানিনের কথাই বাবা হিসেবে মনে সানিন এই সুযোগে একটা ছোটখাটা বক্তৃতা দিবে দিল। জেন্মার সামনেও বোধহয় ইতিপূর্বে সে তার প্রেম ও বাসনা এত সিন্দুরভর সঙ্গে খুলে বলতে পারেনি। তার আবেগ ছিল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রেম ছিল পবিত্র—'বাঁধার অথ সেভিল' কঠোর আলমাজিত্তার মত। সে নিজের কাছে বা ফ্রাউ লেনোরের কাছে গোপন করল না অনুবিবেগলো। সত্যি অনুবিবেগলো—স্পষ্টই বোকা যাচ্ছিল। সত্যি সে বিদেশী, তারা তাকে সত্যি চিনেছেন, তার নিজের সবকিছু বা তার আর্থিক অব্বা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। কিন্তু সে যে একজন উন্নয়ন ও উন্নয়নী নর, তার বধেই প্রমাণ-সে দিতে পারে। তার নিজের মেরুর লোকদের কাছ থেকে ফ্রাউ লেনোর তা জেনে নিতে পারেন। সে আশা করে জেন্মাকে সে সুখী করতে পারবে। তার পরিবার থেকে বিচ্ছেদ হলোও বধেই আনন্দ সে পাবে সারা জীবন। 'বিচ্ছেদ' কথাটি আবার সব পণ্ড করে দিচ্ছিল। ফ্রাউ লেনোর চেয়ারে বসে কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন। সানিন তাড়াতাড়ি বোপ

Amico's
GREEN LINIMENT

আপনি নিজের বৈদিক ব্যথায় অথবা পায়েন-বোথা?
কোনও, হাঁটুতে, কিংবা কোন পড়িয়ে?
'তনে খুসী হবেন—

পারীক্ষিত, মুক বা পিঠের পীড়ন,
বাতে ইত্যাদি রাসতীর ব্যথা

এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেন্ট
(সবুজ বাসিন)
ব্যতিক্রম নির্ভরযোগ্য।

মূল্য : বড় সিপি—২.৭৫ মঃ পঃ
ছোট সিপি—১.৭৫ মঃ পঃ
'হাতল' বস্ত্র

কল্যাণের জন্য সিপি—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
১০ নং বন্দুকী রোড, ঢাকা-১



করল—বিচ্ছেদ তবু অপকালের জন্য আর হয়ত তার দরকার নাও হতে পারে।

সানিনের বন্ধুতা বুঝা গেল না। ফ্রাউ লেনোর যদিও দুঃখ ও অভয়ানভয়া দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলেন এখন সানিনকে তবু আগেকার ক্রোধ ও বিদ্বেষ ভাব আর তাতে ছিল না। পরে তিনি তাঁর কাছে এসে বসতে দিলেন তাকে, জেয়া তাঁর অস্ত পাশে বসেছিল। এবারে তিনি জ্বলন্ত করত, লাগলেন সানিনকে কিন্তু তাতে যেন স্নেহ মাখানো ছিল। অভিযোগ করলেন—এবার করতে লাগলেন একবার সানিনকে একবার জেয়াকে। সানিনকে তার হাত ধরতে দিলেন, আরো চোখের—জল কেললেন কিন্তু এবারে একেবারে অস্তকারণে। করণ হাসি হেসে বললেন—জিয়ার্তান বাট্টা আজ বেঁচে নেই—এবারে কিন্তু তির অর্থে বললেন—কথাটা। আরো খানিকক্ষণ গেল—হুই পাপী—সানিন ও জেয়া—হুই পেড়ে তাঁর পায়ের কাছে বসল ও তিনি হুহাতে তাদের মাথার হাত বুলাতে লাগলেন। আরো খানিকক্ষণ পর তারা মাকে জড়িয়ে হুই খেল, এমিল খুসীতে উচ্ছল হয়ে দৌড়ে এল ঘরে তাদের মাঝে বসল পড়ল। পাটালেনওন এবারে উঁকি দিল। মুচকি হেসে ফুস—ফুসকে সদর দরজা খুলতে গেল।

৩০

ফ্রাউ লেনোরের হতাশা থেকে বিহার ও বিবাদ থেকে শান্ত নিষ্পত্তাব বেতে বেক্ষণ লাগেনি। আর এই শান্ত নিষ্পত্তাবও সহজেই রূপান্তরিত হল গোপন ভূমিতে। কিন্তু বাইরে তিনি সম্ভাব প্রকাশ করলেন না। প্রথমদিনের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সানিনকে তার ভাল লেগে—গিরেছিল। এখন তিনি তাকে নিজের জামাতারূপে মনে মনে গ্রহণ করলেন তখন তার বিচ্ছিন্নে বলার মত কিছুই খুঁজে পেলেন না। কিন্তু তবু তাবলেন আরো কিছুক্ষণ অন্তত: চিন্তিত ও বিব্রত থাকি সমীচীন। গত কয়েকদিনের ঘটনাবলী বড়ই চমকপ্রদ—একটা ছাড়িয়ে আর একটা। যা হিসেবে তিনি সানিনকে কতগুলি সাংসারিক প্রশ্ন করা কর্তব্য মনে করলেন। আর সানিন? সে এখন সকালে জেয়ার সঙ্গে দেখা করবে বলে বেরিয়েছিল তখন কল্পনাই করেনি জেয়াকে বিয়ে করবে সে। কিন্তু এখন প্রচণ্ড উৎসাহে বিবাহের পাত্র হিসাবে সব প্রশ্নের খুঁটিনাটি উত্তর দিতে লাগল। ফ্রাউ লেনোর জেনে খুসী হলেন সানিন সম্ভাববংশের ছেলে, বিশ্বয় প্রকাশ করলেন সে রাজকুমার নয় বলে। অত্যন্ত গভীর হয়ে সাবধান করে দিলেন সানিনকে—বললেন তিনি খোলাখুলিভাবে কতগুলো প্রশ্ন করবেন—যা হিসেবে প্রশ্ন তিনি কর্তব্য মনে মনে করেন। সানিন বলল সে খুসী হয়েই সব প্রশ্নের উত্তর দেবে।

তখন ফ্রাউ লেনোর জানালেন হের রু রবারের (একটু ইতস্তত: করে ঠোঁট চেপে নিখাস কলে তিনি তার নাম করলেন) জেয়ার তৃতপূর্ব ভাবীখামীর আর ছিল আট হাজার সীতারের ওপর তার আর প্রতি বছরই বেড়ে চলেবে। সানিনের আর কত জানতে চাইলেন তিনি।

সানিন হিসেব করে বলল—আট হাজার সীতার—আমাদের দেশের টাকা পনের হাজার রুবল। আমার আর তার চেয়ে অনেক

কম। টুলা গুবারনিয়াতে আমার অল্প তুস্পত্তি আছে। ভালভাবে চালালে তা থেকে পাঁচ বা ছয় হাজার আসবে। আর আমি যদি সরকারী চাকরী নিই তাহলে দু হাজার সহজেই পাব।

‘রাশিয়ার চাকরী’ ফ্রাউ লেনোর চেঁচিয়ে উঠলেন—‘তার মানে জেয়াকে ছেড়ে থাকতে হবে আমার?’

সানিন বলল—‘আমি যদি দৌত্য বিভাগে চাকরী নিই তাহলে বিশেষে বাস করতে পারব। আমার জানাশোনাও আছে। কিবা সব চেয়ে ভাল হয় যদি আমি আমার জমিদারী বিক্রী করে দিই—আর সেই টাকা কোন লাভজনক ব্যবসারে খাটাই—তখন আপনার খাবারের দোকানের ব্যবসারে।’ সানিন বুঝতে পারছিল নিতান্তই অর্ধহীন প্রলাপ বকছিল সে—কিন্তু অত্যন্ত আক্রোশ যেন চেপে গিরেছিল। জেয়ার দিকে চেয়ে সব বাধা যেন ভেসে গেল। এই মুহূর্তে, যা করলে জেয়া খুসী হয়, শান্তি আসে তার মনে—তাই করতে প্রস্তুত ছিল সে।

ফ্রাউ লেনোর এক মুহূর্ত ইতস্তত: করে বললেন—‘হের রু রবারও আমাকে ব্যবসারটা পাড় করাবার জন্য কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন।’

জেয়া ইটালীয়ানে চেঁচিয়ে উঠল—‘মা, ভগবানের দোহাই, মা—চূপ কর।’

তার মাও ইটালীয়ানে উত্তর দিলেন ‘দেখ জেয়া এসব কথাই আগেই নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া উচিত।’

সানিনের দিকে ঘুরে পাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাশিয়ার বিবাহবিধি কিরূপ? প্রশ্নটিতে ক্যাথলিকের সঙ্গে অস্তধর্মীর বিবাহতে যেমন বাধা আছে রাশিয়াতে ও সেবকম? (ঠিক সে সময় ১৮৪০ সালে—সারা জার্মানী তখনও প্রশিরা সরকার ও কলোনের আর্চবিশপের সত্বক বিবাহ নিয়ে বিবাহের কথা জুলতে পারেনি)। তিনি সম্ভাব প্রকাশ করলেন এখন ওনলেন রাশিয়ার সম্ভাব বংশে বিবাহের কলে তার কস্তাও সম্ভাববংশেরই একজন বলে পরিগণিত হবে। ‘কিন্তু প্রথমে তো একবার রাশিয়ার বেতে হবে তাই না?’

‘কিসের জন্য?’

‘কেন, তোমাদের সম্ভাবের অনুমতি আনতে?’

সানিন বুঝিয়ে বলল—এসবের একেবারেই দরকার নেই। কিন্তু হয়ত বিবাহের পূর্বে একবার তাকে রাশিয়ার বেতেই হবে কয়েকদিনের জন্য। (এই কথাগুলি বলার সময় তার হৃদয় বেদনার যেন কেটে বাছিল আর জেয়াও তার দিকে চেয়ে তার বেদনা অনুভব করে আরক্তিম মুখে অন্তমনে চেয়ে রইল) তার দেশে গিয়ে তার তুস্পত্তি বিক্রী করার চেষ্টা করবে অন্তত: সরকারী টাকা জোগাড় করে আনবেই.....

ফ্রাউ লেনোর জিজ্ঞেস করলেন ‘আজ্ঞা আমার কোর্টের জন্য আর্ট্রাখান কার আনতে পারবে? ওনেছি সেখানে নাকি ভীষণ সম্ভাব অতি দুন্দর কার পাওয়া যায়?’

‘নিশ্চয়ই আনবে। জেয়ার জন্যও আনবে।’

এমিল ঘরের মধ্যে মাথা গুলিয়ে বলল ‘আর আমার জন্য রূপোর কাজ করা সবকো চারফার টুপি।’

‘হ্যাঁ আনবে আর পাটালেনওনের জন্য চটি।’

ফ্রাউ লেনোর বললেন, 'আচ্ছা যথেষ্ট হয়েছে। এবার কাজের কথাই আসি। কিন্তু আরেকটা কথা—তুমি তো বলছ তোমার ভূসম্পত্তি বিক্রী করে দেবে। তাহলে তোমার কৃষাণদেরও বিক্রী করতে হবে না?'

সানিন অত্যন্ত ব্যথিত হল। তার মনে পড়ল 'মেডেম রসেলী ও তার মেয়ের কাছে ভূ-দাসদের কথা বলতে গিয়ে বলেছিল এ নীতি অতি নীচ। সে জীবনে কখনও তার কৃষাণদের বিক্রী করবে না, এ যে দুর্নীতির নামান্তর।

ধেমে ধেমে বলল, 'একজন ভাল লোকের কাছেই আমার সম্পত্তি বিক্রী করতে চেষ্টা করব। কিংবা হয়ত কৃষাণরা তাদের স্বাধীনতা নিজেরাই কিনে নিতে চাইবে।'

ফ্রাউ লেনোরও বললেন—'তাহলেই ভাল হয়। মানুষ বিক্রী করা'—

পাটালেওন গর্জন করে উঠল—'বর্বরতা,' দরজার সামনে এমিলের পিছনে তার মুখ দেখা গেল—টুপি নাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল আবার।

সানিন নিজের মনেই বলল 'আমার এ সব ভাল লাগে না।' জেম্মার দিকে আড়চোখে চাইল। মনে হল সে তার শেষ কথাটি শুনেই পারনি। 'আচ্ছা দেখাই যাক।' সে ভাবল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে পর্যন্ত সাংসারিক কথাবার্তা চলল। শেষের দিকে ফ্রাউ লেনোর যেন একটু নরমও হয়ে এসেছিলেন—তাকে দিমিত্রি বলে ডাকছিলেন—সম্প্রতি আজুল নেড়ে সাবধান করে দিচ্ছিলেন—বিধাসভার সভ্য সানিনের ওপর প্রতিশোধ নেবেন তা। তার পরিবার ও বংশ সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কারণ তার গুরুত্বও কম নয়। রাশিয়ার গীর্জার কি করে বিবাহোৎসব পালিত হয় সব জানতে চাইলেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গেলেন যখন জেম্মাকে বিবাহের বেশে সাদা পোষাক ও সোনালী মুকুট পরে কল্পনা করলেন।

মাক্সিমলভ গর্ব অহুভব করে বললেন, 'সে যে রাশিয়ার মতই সুন্দরী। সত্যিই পৃথিবীর কোন রাশিই এক সুন্দরী নয়।'

সানিন বলল, 'পৃথিবীতে আর জেম্মাই নেই।'

'হ্যাঁ সেজ্ঞাই তো তার নাম জেম্মা (ইটালীয়ানে জেম্মা অর্থ বন্দা)।

জেম্মা তার মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। মনে হল

এতক্ষণে যেন তাঁর কাঁধের যোকা হাকা হল, স্বাভাবিক ভাবে খালি প্রথাস পড়তে লাগল।

আর সানিন অহুভব করল অনির্বচনীয় সুখ, শিশুসুলভ পুলক অহুভব করল, এই যথেষ্ট বসে সেদিন যে স্বপ্ন সে দেখেছিল তা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে দেখে। তার মনে হল এখনই লোকান্নে গির ঠাড়াবে সে, কিছুদিন আগে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে জিনিস বিক্রি করছিল 'আর আজ তা করার পূর্ণ অধিকার আছে আমার। আমি এখন পরিবারেরই একজন।'

সত্যিই সে কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে খন্দেরদের দেখাশোনা করতে লাগল, এক পাউণ্ড চিট্রি বিক্রি করল দুটো ছোট মেরেকে—অর্থাৎ প্রায় দু'পাউণ্ড জিনিস দিয়ে এক পাউণ্ডের অর্ধেক দাম নিল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সানিন জেম্মার ভাবী স্বামিরূপে তার পাশে বসল। ফ্রাউ লেনোর এখনও টাকাকড়ির ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না। এমিল অকারণেই ভীষণ হাসছিল সানিনকে বলছিল ওকে রাশিয়ার নিয়ে যেতে ওর সঙ্গে। সানিন দিন পনের পরই যাবে স্থির হয়েছিল। পাটালেওনকেই কেবল বিবরণ দেখাচ্ছিল, ফ্রাউ লেনোর তাকে ঠাটা করছিলেন—আর তুমি ছিলে তার সহযোগী (পাটালেওন বেগে উঠছিল তাকে)।

জেম্মা কিছুই বলছিল না—কিন্তু তার মুখ আগে কখনও এত উজ্জ্বল, এত সুন্দর দেখায়নি। খাওয়া দাওয়ার পর সে সানিনকে এক মিনিটের জন্য বাগানে আসতে বলল। ছাদন আগে বে বেকিতে বসে চেতী বাচ্ছিল সে, সেখানে বসেই বলল 'আমার ওপর রাগ করনা দিমিত্রি, কিন্তু আমি তোমাকে আরেকবার বলতে চাই এখনও তুমি সুস্থ, এখনও ইচ্ছ করলে...'

সানিন তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না।

জেম্মা তার মুখ কিরিয়ে নিল।

'আর মা বে বলেছিলেন ভিন্নধর্ম সম্বন্ধে—দেখো' সে তার গলার সুর শ্রুতায় ঝোলানো গার্গেট পাখরের ত্রুটি করে এত জোর টানল যে শ্রুতো ছিঁড়ে গেল। সানিনের হাতে ত্রুটি নিয়ে বলল 'আমি যদি তোমার হই, তাহলে তোমার সম্বন্ধে আমার ধর্ম।'

জেম্মার সঙ্গে যখন সে ঘরে ফিরে গেল তখন সানিনের চোখে জল দেখা দিয়েছে।

সন্ধ্যার পূর্বেই সব কিছু স্বাভাবিক রূপ নিল। এমন কি ট্রেনেট খেলতে পর্যন্ত বসে গেল তারা। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—আশা দাস

বাঙলা সম্পর্কে সর্দারজী

"India took her first sips of patriotism from the political leaders of Bengal and how can we forget today the suffering that Bengal has suffered in recent times? How can we forget the August 16 Direct Action Day and the agonies of Noakhali where Mahatma Gandhi took his pledge of 'Do or Die' and eventually died for that cause? Therefore, one who has sense of patriotism cannot but have sympathy with Bengal".

"I am not a literary man, I started my life as a peasant and became a soldier all my life and

till the day I breathe my last I will serve Bengal".

"Time has come when we should all unite and work for the common cause by common means and settle properly. Let us not quarrel among ourselves. Opportunity is too great. It is upto us to forget everything till Bengal is strong and takes its rightful place where it led the whole of India, because if Bengal lags behind, if Bengal is lame and lacerated, India will not rise".

—S. V. Patel.



শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্কট—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান উহার পঞ্চদশ অধিবেশনে সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, এমন কি উহার ভরাডুবি হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে একথা বিশ্বাসী সকলেই শুনিয়াছেন। কেন এই সঙ্কট, কি উহার স্বরূপ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ভরাডুবি হওয়ার আশঙ্কাই বা দেখা দিয়াছে কেন, সত্যই এইরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে কি না তাহা বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। সাধারণ পরিষদের পঞ্চদশ অধিবেশন গত ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্কিং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যদিও রাশিয়া বা রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভের নাম করেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বক্তৃতাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জেনারেলের প্রচেষ্টাকে প্রকাশ্য ভাবে কয়েকটি রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশিল্ডের সমালোচনার অর্থই হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডাইকেন বেকার গত ২৬শে সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদে উহার বক্তৃতার বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জেনারেলের পদে তিন ব্যক্তিকে মিলিত ভাবে নিয়োগ করিবার জন্য মঃ ক্রুশেভ যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কার্যে পরিণত করা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই মনে পড়িতে পারে যে, জার্মানী ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাস জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন পরিত্যাগ করে। জাতিসঙ্ঘের সঙ্কট এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়, একথা বলিলে ভুল হইবে না। ঐরূপ কোন পরিস্থিতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে দেখা দিয়াছে ইহা মনে করাও সম্ভব নয়। উত্তর অবস্থার মধ্যে কোন সাধুও নাই।

প্যারীতে যে শীর্ষ সম্মেলন হইতে পারিল না তাহাতে নিরস্ত্রীকরণ

সম্পর্কে আলোচনা হইত। কিন্তু বোধনের পূর্বেই উহার বিসর্জন হইয়াছে। কে উহার জন্ত দায়ী সে সম্পর্কে পশ্চিমী শিবির ও কমিউনিষ্ট শিবিরের মধ্যে মতভেদের অংসান কোনদিনই হইবে না। তবে একথাও অস্বীকার করা সম্ভব নয়, মার্কিং ইউ—২ গোয়েন্দা বিমানের ঘটনাটিই প্যারীর শীর্ষ সম্মেলনের ভরাডুবি জন্ত দায়ী। শীর্ষ সম্মেলন হইতে না পারিলেও জেনেতার পুনরায় দশরাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল। রাশিয়া এবং অপর চারিটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র সম্মেলন পরিত্যাগ করার উহা ভাঙ্গিয়া গেল। উহার জন্ত কোন পক্ষ দায়ী সে সম্পর্কেও উত্তর পক্ষে মতভেদ থাকিয়া যাইবেই। কিন্তু ১৯৩৩ সালে জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বন্ধনের সহিত ১৯৩০ সালে রাশিয়া এবং অপর চারিটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতে চলিয়া আগার কোন ভুলনা চলিতে পারে না। শীর্ষ সম্মেলন না হইলেও, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতে রাশিয়া চলিয়া আসিলেও নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজন মঃ ক্রুশেভ ছাড়েন নাই। তিনিই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সভার সমস্ত রাষ্ট্র প্রধানদের মিলিত হইয়া নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে পত্র দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানান। তাঁহার এই আহ্বানের উপর প্রথমে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু মঃ ক্রুশেভ যখন বোঝা করিলেন যে, তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রূপ প্রতিনির্ধারণের নেতৃত্ব করিবেন, তখন একে একে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানই সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে উদ্যোগী হন। অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানই সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন। ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধান এই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই বটে, কিন্তু সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশন যে বৃহৎ শীর্ষ সম্মেলনে পরিণত হইয়াছিল, একথাও অস্বীকার্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে বলা হইতেছে তাহা নিরস্ত্রীকরণের প্রসঙ্গ নহে। রাশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান বর্জন করিতেও চাহে না। বাহ্যিক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্কট বলা হইয়া থাকে, তাহা দেখা দিয়াছে কঙ্গোর প্রসঙ্গ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশিল্ড যেভাবে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব বক্তৃতাতে কার্যকরী করিয়াছেন, রাশিয়া তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অমার্জনীয় ভাবে জ্ঞানের ভিত্তিতে নিযুক্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী তালিয়া দিবার জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছিল গত ১৭ই সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে তাহা ৭—২ ভোটে অগ্রাহ হইয়া যায়। রাশিয়া ও পোল্যান্ড প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। সিংহল ও টিউনিশিয়া ভোটদানে বিরত থাকে। কঙ্গো সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি পুনরায় সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া সিংহল ও টিউনিশিয়া যে প্রস্তাব উপস্থাপন করে তাহাতে রাশিয়া কতগুলি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপন করে, কিন্তু অগ্রাহ হইয়া যায়। অতঃপর রাশিয়া ভোট প্রয়োগ করিয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। রাশিয়া ২০শে সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের যে অধিবেশন আরম্ভ হইবে তাহাতে কঙ্গোর রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র

অধঃতা বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা দীর্ঘকাল একটা প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সেক্রেটারী জেনারেলকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মার্কিন প্রতিনিধি ২৪ ঘটায় মধ্যে সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব করেন। সেক্রেটারী জেনারেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ ক্রমে সাধারণ পরিষদের পঞ্চদশ অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালেই জরুরী অধিবেশন আহ্বান করেন। এই অধিবেশনে সেক্রেটারী জেনারেল এবং কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কমান্ডের কঠোর সমালোচনা করিয়া উপস্থিত প্রস্তাবটি রাশিয়া প্রত্যাহার করে এবং ১৭টি আফ্রো-এশিয় দেশ যে প্রস্তাব উপস্থাপন করে তাহাই গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী কার্যক্রমে এবং উহার বাহিরে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবের যে সকল সংশোধন প্রস্তাব রাশিয়া উপস্থাপন করিয়াছিল সেগুলিও প্রত্যাহার করা হয়।

সপ্তদশ আফ্রো-এশিয় রাষ্ট্র যে প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশন উপস্থাপন করে তাহার পক্ষে ৭০ ভোট হয়; বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রই ভোট দেয় নাই। ১১টি রাষ্ট্র ভোট দানে বিরত ছিল। এই প্রস্তাবে কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে সামরিক সাহায্য দেওয়ার সময় মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অন্তর্গত কিম্বা অন্তর্বিধ সামরিক উপকরণ, অথবা সামরিক ব্যক্তি ধরা সাহায্য কিম্বা সামরিক উদ্দেশ্যে অস্ত্র সাহায্য না দেওয়ার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে কঙ্গোলীগকে কঙ্গোর ঐক্য ও অধঃতা রক্ষার জন্য সমস্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্ত বিরোধ মীমাংসার করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। জরুরী অধিবেশনে কঙ্গো সম্পর্কে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলেও সোল্ডিয়েট ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ জোরিন সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশনে কঙ্গো সম্পর্কে আলোচনার দাবী করেন। ম্যানহাতানে মঃ ক্রুশেভের উপস্থিতির জন্য সপ্তদশ আফ্রো-এশিয় রাষ্ট্রের প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়া সহজ হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কে কোন আলোচনা এখানে করা নিষ্পয়োজন। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও কঙ্গোতে পশ্চিম শক্তিবর্গের সামরিক সাহায্যদান বন্ধ হইবে ইহা মনে করা কঠিন। কিন্তু সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশনে কঙ্গো সম্পর্কে আলোচনার যে দাবী মঃ জোরিন করিয়াছেন তাহার সার্থকতা উক্ত অধিবেশনে আলোচনা ও তাহার প্রতিক্রিয়া হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সপ্তদশ আফ্রো-এশিয় রাষ্ট্রীয় প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গ মনে করিতে পারেন নাই। পশ্চিমী শিবিরের কয়েক জন রাষ্ট্রপ্রধান সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বোগদান করিলেও সাধারণ পরিষদ দীর্ঘ সম্মেলনের জন্য মঃ ক্রুশেভ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা কার্যতঃ সফল হইয়াছে। কিন্তু ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের জন্য সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। নিরপেক্ষ পক্ষান্তর প্রস্তাব যে কোঁশলে ব্যর্থ করা হইয়াছে সে সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সঙ্কটের কথা পশ্চিমী শক্তিবর্গ বলিয়াছেন তাহার বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ সাধারণ পরিষদে উহার বক্তৃতার

প্রধানতঃ তিনটি দাবী উপস্থাপন করিয়াছেন। তাহার একটি দাবী তিন দফার নিয়ন্ত্রীকরণ প্রস্তাব কার্যকরী করা। দ্বিতীয়তঃ তিনি উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবমান দাবী করিয়াছেন। তাহার তৃতীয় দাবী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যনির্বাহক ব্যবস্থার পরিবর্তন। তাহার এই তৃতীয় দাবীকে বেঙ্গল করিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্কটের কথা উঠিয়াছে। উহাই 'সর্কাপেকা' অধিক উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে পশ্চিমী শিবিরে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যনির্বাহক ব্যবস্থার পরিবর্তন সহিত সেক্রেটারী জেনারেলের পদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সেক্রেটারী জেনারেলই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার। এই পদাধিকারের বলে তিনি সাধারণ পরিষদ প্রভৃতিতে কাজ করিয়া থাকেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে যে সকল কার্যভার অর্পণ করেন তিনি সেগুলি সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই পদের গুরুত্ব বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মঃ ক্রুশেভ তাহার বক্তৃতার সেক্রেটারী জেনারেলের পদ বিলোপ করিয়া তৎস্থলে তিনজনকে নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন। ইহার অল্পকালে তিনি যে বৃদ্ধি দিয়াছেন—তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেন পনের বৎসর পূর্বে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ছিল তাহা এখন আর নাই, উহা নূতন বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। পনের বৎসর পূর্বেই জাতিপুঞ্জ যে এখন আর নাই তাহা আমরা সকলেই জানি। ১৯৪৫ সালের ২৪শে জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন উহার সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ৫১টি। তন্মধ্যে এশিয়ার ১টি দেশ এবং আফ্রিকার চারিটি দেশমাত্র উহার সদস্য ছিল। ভারত তখনও স্বাধীনতা লাভ করে নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও বৃটেনের অতিরিক্ত তাহার কোন সত্তা ছিল না। ১৯৪৬ সাল হইতে ক্রমে আরও নূতন নূতন রাষ্ট্র উহার সদস্য হইতে থাকে। এক ১৯৫৫ সালেই ১৬টি রাষ্ট্র উহার সদস্য হয়। ১৯৫৩ সাল হইতে যে সকল রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সদস্যপদ লাভ করিয়াছে। ১৯৬০ সালে আফ্রিকার যে সকল রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হইয়াছে। সাইপ্রাসও স্বাধীনতা লাভ করিয়া উহার সদস্যপদ লাভ করিয়াছে। বর্তমানে উহার সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ৯১টি। শুধু সদস্য সংখ্যাই প্রায় বিংশ হয় নাই, উহার প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই ছিল পরাধীন। যে সকল স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল সেগুলি পশ্চিমী শিবির এবং সোল্ডিয়েট শিবির এই দুইটি শিবিরে বিভক্ত ছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উহারই প্রতিক্রম হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। শক্তি সাম্যের পাত্রাটীও পশ্চিমী শক্তি শিবিরের দিকেই ঝুঁকিয়াছিল এবং এখনও যে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে তাহা ভোটের অবস্থা হইতে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা লাভ করিতে থাকার নূতন আর একটি শিবিরের উদ্ভব হইয়াছে। এই শক্তি শিবিরটি নিরপেক্ষ শক্তি শিবির। যদিও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নিরপেক্ষ শক্তি শিবির গঠন করেন নাই, তাহা হইলেও তাহারা প্রায় সকলেই একযোগে কাজ করিয়া থাকেন। সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের পঞ্চদশ অধিবেশনে আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ১৩টি রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সদস্য পদ লাভ করিয়াছে। ইহাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আফ্রিকা-এশিয় সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ২১টি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪২টি হইল। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মালি ফেডারেশনের আভ্যন্তরীণ বিরোধ কিছুকাল কয়েক সপ্তাহ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার প্রতিনিধি হল সাধারণ পরিষদে আসন গ্রহণ করেন নাই।

কয়েকটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশিল্ড যেভাবে কার্য পরিচালনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে মঃ ক্রুশভ তীব্র অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎকারের পক্ষপাতী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি পশ্চিমী শক্তি শিবির, সোভিয়েট শক্তি শিবির এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ এই তিন পক্ষের তিন বক্তৃতা লইয়া একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনের এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য পদের নিউইর্ক হইতে সরাইয়া লইবার বিষয় বিবেচনা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রুশ প্রধান মন্ত্রীর এই প্রস্তাবে পশ্চিমী শক্তিবর্গ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মঃ ক্রুশভের বক্তৃতাকে উদ্বেজনাকর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মিঃ হার্টার বলিয়াছেন, মঃ ক্রুশভ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ধ্বংস করিতে চান। বৃটিশ প্রতিনিধিবৃন্দের নেতা মনে করেন যে, মঃ ক্রুশভ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গ যেভাবে সেক্রেটারী জেনারেলকে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে কমনউইথ শিবিরের অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু অবশ্য মিঃ হামারশিল্ডের প্রতি আত্মী প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও মনে করেন, সেক্রেটারী জেনারেলের অপ্রতিহত ক্ষমতা সংবত করা প্রয়োজন। তিনি তিন পক্ষের তিনজন লইয়া একটি কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করা সমর্থন করেন না বটে, কিন্তু সেক্রেটারী জেনারেলের ক্ষমতা সংবত করিবার জন্য একটি ছোট পদার্থ পর্যায় পর্যায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রেসিডেন্ট নাসের কয়েক জনসাধারণের বৃহত্তর বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বিপদটি হইতেছে এই যে, সাক্ষাৎকার উহার দুর্বলতাই গোপন করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে উহার মুখোমুখি হিসাবে ব্যবহার করিবার চেষ্টার সহিত হইয়াছে।

পশ্চিমী শক্তিবর্গ বাহাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্কট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন উল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহার স্বরূপ বৃষ্টিতে পাওয়া যায়। এতদিন ধরিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাঁহাদেরই ছিল একাধিপত্য। কমনউইথ শক্তি শিবিরের কোন প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ছিল না। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রস্তাব স্থাপন পাওয়ার আশঙ্কা তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন না। মঃ ক্রুশভের বক্তৃতার মধ্যে তাঁহাদের এই আশঙ্কাকেই তাঁহারা বাস্ত্বরূপ গ্রহণ করিতে দেখিতে পাইতেছেন। নিরপেক্ষ শক্তিগুলি যে বাশিরাকে সমর্থন করিবে তাহা নয়। কিন্তু অনেককালে তাঁহারা বাশিরাকে সমর্থনও করিতে পারে। কাজেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পশ্চিমী শক্তিবর্গ এতদিন যে আধিপত্য জোগ

করিয়া আসিতেছিলেন তাহা আজ বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ইহাই তাঁহাদের কাছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্কট বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহাদের একাধিপত্যই যদি না থাকিল, তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ থাকার সার্থকতা বা কি?

পঞ্চশক্তির প্রস্তাব—

মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং রুশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তির প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গের কূটনৈতিক চালে ব্যর্থ হইয়া গেল। উক্তয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যানার প্রেসিডেন্ট নক্রুমা, ইকোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুরোকান, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু একযোগে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং মঃ ক্রুশভের নিকট ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৬০) পত্র দেন। এ সম্পর্কে সাধারণ পরিষদে তাহারা যে প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে চান তাহার খসড়াও ঐ পত্রের সঙ্গে প্রেরণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এই পত্রের যে উত্তর দেন তাহাতে পঞ্চশক্তির অস্বাভাবিক ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "There is nothing in the words or actions of the Government of the Soviet Union which gives me any reason to believe that the meeting you suggest hold any such promise. I would not wish to participate in a mere gesture, which in present circumstances, might convey a thoroughly misleading and unfortunate impression to the people of the world." অর্থাৎ প্রে: আইসেনহাওয়ার মনে করেন সোভিয়েট সরকারের কথায় ও কার্যে এমন কোন আভাস পাওয়া যায় না বাহাতে প্রস্তাবিত সাক্ষাৎকারে কোন ফল হইতে পারে এইজন্য বিশ্বাসীর মনে ভ্রান্তধারণা সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কোন সাক্ষাৎকারে তিনি ইচ্ছুক নহেন। প্রে: আইসেনহাওয়ার যেসব সাক্ষাৎকারের সর্ব আয়োজন করিয়াছেন মঃ ক্রুশভও তেমনি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাহিত যোগাযোগ স্থাপন ও আলোচনা করিতে সম্মত আছেন যদি মার্কিন সরকারের সকল কার্যের কলে সোভিয়েট মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটিলে তাহার নিন্দা করিয়া মার্কিন সরকার সংসাহসের পরিচয় দেন উক্তরেই সর্ব আয়োজন করিলেও নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তির প্রস্তাব ব্যক্তি করিতে পশ্চিমী শক্তিবর্গই বিশেষভাবে উত্তেজিত হইয়াছিলেন।

নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তির প্রস্তাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপনের কথা সম্পূর্ণ ভাষাতে বলা হইয়াছিল। উহাকে ব্যর্থ করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ মেগিস উহার এক সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করেন ওয়াশিংটনে প্রে: আইসেনহাওয়ার ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: মাকমিলানের সহিত তাঁহার আলোচনার পর তিনি এই সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এই আলোচনার ফলেই যে উক্ত সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় তাহা মনে করিলে ভুল হইয়া না। এই সংশোধন প্রস্তাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং সোভিয়েট

প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের পরিবর্তে বৃহৎ চতুঃশক্তিৰ শীর্ষসম্মেলনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই সংশোধন পক্ষে মাত্র পাঁচটি ভোট হইয়াছিল। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়া এই পাঁচটি রাষ্ট্র এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। এই কেসস ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ মেঞ্জিসের প্রস্তাবের কোন কোন অংশে সোভিয়েট নীতির নিন্দা করা হইয়াছে। মিঃ মেঞ্জিসের সংশোধন প্রস্তাব ভোটে পিছুলাভে হারিয়া গেল বটে, কিন্তু উত্থাপিত হইল ক্যাজেটিন'র সংশোধন প্রস্তাব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বাহাতে সংযোগ স্থাপিত না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই সংশোধন প্রস্তাবটি বচিত হয়। উহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের অসুবিধা জানানো হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। কাজেই এই সংশোধন প্রস্তাবের তৎপর্যাপ্ত উদ্দেশ্য বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপন বলিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও রুশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যেই সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে ইহা বুঝায় না। এই সংযোগ স্থাপন পয়রাষ্ট্র মন্ত্রীর স্তরে, কিম্বা কূটনৈতিক পর্যায়েও হইতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ পক্ষ শক্তি চাহিয়াছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং রুশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎকার।

আর্জেন্টিনার সংশোধন প্রস্তাবটির পক্ষে ৩৭ এবং বিপক্ষে ৩৬ ভোট হয় এবং ২২টি রাষ্ট্র ভোট দেয় নাট। লক্ষ্য কয়িবার বিষয় যে, এই সংশোধন প্রস্তাবটি দুই তৃতীয়াংশ ভোট পায় নাই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বোলাগু (আবল'গু) ঘোষণা করেন যে, প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। বহু সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সভাপতি বোলাগু এক অদ্ভুত কলিং প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, যেহেতু—আর্জেন্টিনার সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে প্রায় ভোটের সংখ্যা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মূল প্রস্তাবের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন নাই, সেই জন্য উহা অগ্রাহ হইল না। সভাপতি বোলাগুর নিছাস্ত ভোট দেওয়া হইলে উহার পক্ষে ৪৩ ভোট এবং বিপক্ষে ৩৭ ভোট হয়। পনরটি রাষ্ট্র ভোট দেয় নাই এবং তিনটি রাষ্ট্র অস্থপস্থিত ছিল। আর্জেন্টিনার সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে যে ভোট হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, এখনও পশ্চিমী শক্তিবর্গের ইচ্ছাতেই ভোটের সংখ্যাধিক্য ঘটয়া থাকে। বোলাগুর কালং হইতে ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের স্বার্থেই এই কলং দেওয়া হইয়াছে। আর্জেন্টিনার সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সভাপতি যে সিদ্ধান্ত করিলেন তাহার তৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। উক্ত সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার নিরপেক্ষ পক্ষশক্তির মূল প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে সাধারণ পরিষদের উত্থাপিত হইত। মূল প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হইলে নিরপেক্ষ পক্ষশক্তি যে উদ্দেশ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যের বিলোপ ঘটিত। তাহার্য্য যে উদ্দেশ্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা সাধিত না হইয়া যদি অল্প উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা হইলে পশ্চিমী শক্তিবর্গের কূটকৌশলই সাক্ষ্যলাভ করিবে।

নিরপেক্ষ পক্ষশক্তি বাহা চাহিয়াছিলেন তাহা বন্ধ হইল না, বরং অল্প উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পথ পরিষ্কৃত হইল তখন প্রস্তাব প্রত্যাহার করা ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর রহিল না। কাজেই মূল প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হইল।

একথা অবশ্য সত্য যে, মূল প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যত হওয়ার আর্জেন্টিনার সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়া সম্বন্ধে উহা অর্থাহীন হইয়া পড়ল। যে প্রস্তাবের সংশোধন প্রস্তাব তাহাই বন্ধন আর রহিল না, তখন সংশোধন প্রস্তাবের কোন সার্থকতাই আর থাকিতে থাকিতে পারে না। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গের কূট কৌশলের জয় হইসই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও রুশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সরাসরি সংযোগ বাস্তব নিরস্ত্রীকরণ, বিশ্বশান্তি কিছুই সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণের বিরোধী শক্তিই-শক্তিশালী। এই জন্যই নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হওয়ার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মারকং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপ দেওয়ার একটা চেষ্টা নিরপেক্ষ পক্ষশক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু যে উপায় উহা ব্যর্থ করা হইল তাহা নিন্দনীয়। উহার একমাত্র ফল হইল এই যে, প্যারিসে শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর বিধে যে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা প্রশমনের জন্য আর কোন প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্মুখে রহিল না। পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনায়কগণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উপস্থিত থাকিয়াও শান্তি স্থাপনের এই সুযোগকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

কঙ্গো কোন্ পথে—

কঙ্গোর পরিণতি কোন্ পথে বাইবে তাহা এখন বুঝিয়া উঠা ধুব কঠিন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কাজ ছিল কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া উহার স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করা। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি এমন কোশলপূর্ণ উপায় প্রতিপালন করা হইয়াছে যে, কাটাঙ্গার সোবে এবং দক্ষিণ কাঙ্গাটের কলোজির পক্ষে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া তো সম্ভব হইয়াছেই, কঙ্গোর প্রকৃত কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও সৃষ্টি করা হইয়াছে বিরোধ। এই বিরোধে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থক প্রেসিডেন্ট কাঙ্গাভু এবং তাহার নিবৃত্ত প্রধান মন্ত্রী ইলিওর প্রত্যই পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে সুযোগ পাইয়া কাঙ্গাভু কঙ্গোর প্রধান সেনাপতি লুওনাতে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থলে মোবুটুকে প্রধান সেনাপতি নিবৃত্ত করেন। মোবুটু প্রধান সেনাপতি হইয়া লুওনার মন্ত্রণালয় এবং কাঙ্গাভুর মন্ত্রণালয় উভয় মন্ত্রণালয়ই বাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন। কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী এমন কোশলপূর্ণ উপায় নিরপেক্ষতা নীতি প্রয়োগ করিলেন যে, কঙ্গোর প্রকৃত গবর্নমেন্ট কে সে-সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী পক্ষপাতিত্ব করিয়াছে ইলওর মন্ত্রণালয় প্রতি। আন্তর্জাতিক বাহিনী বরং লুওনাকেও লিওপোল্ডভিলের বেতারকেন্দ্র ব্যবহার করিতে বাধ্য দিয়াছিল, যদিও সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ তাহারই প্রতি আস্থা প্রকাশ করিয়াছে। বেতারকেন্দ্র ও বিমানবন্দর বন্ধ করিয়া দিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী নিরপেক্ষতা নীতি ত্যজ করিয়াছে। ইহাতে

সুবিধা হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থকদের। কলকাতা সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশিল্ডে ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ছিল আমেরিকার নিগ্রে। রাজনীতিক ম্যালক বাব। তাঁহার হানে এমন সময়ে ভারতীয় কূটনীতিক রাজ্যের দয়ালকে নিযুক্ত করা হইয়াছে যে তাঁহার পক্ষেও সমস্ত সমাধান করা অসম্ভব কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

কাটাঙ্গা ও কাঙ্গাইয়ে বিক্রোহ দমনে মিঃ লুয়ুয়া বখন প্রায় সাক্ষ্যের দ্বারা আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন সেই সময় কর্ণেল মোবুটুর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। তাঁহার প্রথম কাজ হইয়াছিল কলকাতা রাশিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রত্ববাস বন্ধ করিয়া দেওয়া। ঐরাজ্যের দয়াল বলিয়াছেন, যে-স্থানীয় সরকার কার্যকরী, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহাকে স্বীকার করিবেন। কাঙ্গাভূমি কলকাতা শাসন-তান্ত্রিক বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন। কর্ণেল মোবুটু শাসনতন্ত্র ও পাল্ল্যামেন্ট দুটাই বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এই অধিকার তাঁহাকে কে দিল? পাল্ল্যামেন্টে কিন্তু মিঃ লুয়ুয়াই সংখ্যা পরিষ্ঠিত। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সমস্ত সমাধানের উৎকৃষ্ট উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জনগণের নির্বাচিত পাল্ল্যামেন্টকে কাজ করিতে দেওয়া উচিত। পাল্ল্যামেন্ট যে সরকারকে সমর্থন করিবে সেই সরকারকে সাহায্য করাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তব্য। কয়েক দিন পূর্বে লিওপোল্ডভিল হইতে প্রেরিত এক সংবাদে এই অভিযোগ করা হয় যে, কলকাতা পাল্ল্যামেন্টের যে-সকল সদস্য মিঃ লুয়ুয়ার সমর্থক তাহাদিগকে স্বার্থ বিশিষ্ট দলগুলি অর্থ দ্বারা বন্দীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মিঃ লুয়ুয়াকে সমর্থন না করিলে মোবুটু পাল্ল্যামেন্টের অবিশেষণ হইতে আপত্তি করিবেন না বলিয়া সংবাদ প্রকাশ। পাল্ল্যামেন্টের সদস্যদিগকে বন্দীভূত করিবার জন্য বৈদেশিক শক্তিবর্গই যে অর্থ দিতেছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত হওয়া আবশ্যিক। মিঃ লুয়ুয়াকে প্রেরণ করিবার জন্য মোবুটু সৈন্য প্রেরণ করে। তাহারাই বাইরা দেখিতে পায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী দ্বারা পাহারা দিতেছে। মোবুটু হস্তাকী দিয়াছিলেন জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সহিত লড়াই করিয়া মিঃ লুয়ুয়াকে প্রেরণ করা হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী বাধা দিতে সক্ষম করায় মিঃ লুয়ুয়াকে প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। তিনি নিজের গৃহেই বন্দী হইয়া রাখা হইলেন। কিন্তু বন্দী থাকিয়াও তিনি কলকাতা ব্যাপক অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

সাধারণ পরিষদের কর্তব্য অবিশেষণে কোন পক্ষে সামরিক পাহারা না দিবার জন্য শক্তিবর্গকে যে অস্বীকার করা হইয়াছে তাহার মত কি হইবে বলা কঠিন। হস্ত সাধারণতঃ সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থকরাই সামরিক সাহায্য পাইবে এবং কলকাতার স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে কোন সাহায্যই পাইবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কলকাতার অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কমিশন পঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হইলে কলকাতার ক্ষত অবস্থাই শুধু জানা যাইবে না, উহার অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার পথের সন্ধানও পাওয়া যাইবে। কলকাতাকে সম্পূর্ণরূপে বিহারের শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে না পারিলে আন্তর্জাতিক স্থিতি আরও খোঁসালো হইয়া উঠিবে।

জয়-পরাজয়—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রায় চারি সপ্তাহ কর্তব্যভার মধ্যে কাটায়া রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ মন্থো কিরিনা গিয়াছেন। আরও যে সকল রাষ্ট্র প্রধান সাধারণ পরিষদে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারাও নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মঃ ক্রুশেভ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শীর্ষসম্মেলন চাহিয়াছিলেন। অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়কই সাধারণ পরিষদে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহা শীর্ষ সম্মেলন হইয়াছিল কি না তাহা লইয়া মতভেদ থাকিবে। তবু অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়ক সাধারণ পরিষদে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করার মঃ ক্রুশেভের একটা জয় হইয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটাইবার জন্য তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শীর্ষসম্মেলন চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, পশ্চিমশক্তিবর্গ এখন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান চাহেন না।

নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা রাজনৈতিক কমিটির পরিবর্তে পূর্ণ অবিশেষণে হওয়ার যে প্রস্তাব রাশিয়া করিয়াছিল সাধারণ পরিষদে তাহা বিপুল ভোটে অগ্রাহ হইয়া যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কমিউনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিদের প্রস্তাব আলোচ্য হুচীভুক্ত না করার জন্য নিয়ামক কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহাও সাধারণ পরিষদ ৪২-৩৪ ভোটে অস্বীকারিত হয়। বাইশটি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল এবং একটি দেশের প্রতিনিধি অসুপস্থিত ছিলেন। রাশিয়ার মার্কিন বুকরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবিশেষণে আলোচনার প্রস্তাবও বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ হইয়াছে। ঔপনিবেশিক জনগণকে স্বাধীনতা দান সম্পর্কে মঃ ক্রুশেভের ঘোষণা সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অবিশেষণে আলোচনার প্রস্তাবটিই শুধু বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। উহাই মঃ ক্রুশেভের একমাত্র জয় বলা যাইতে পারে। নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ারও পশ্চিমী শক্তিবর্গ তাঁহাদের জয় এবং ক্রুশেভের পরাজয় বলিয়া মনে করিতেছেন।

মঃ ক্রুশেভ এগারজন সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের পদ সম্পর্কে উক্ত প্রস্তাবের কাঠামোর পরিবর্তনের দাবী করিয়াছেন। তিনি এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন বা, ইহা করিতে বিলম্ব হইলে রাশিয়া রাজনৈতিক কমিটি এবং পঞ্চদশ সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্ভুক্ত কমিটিতে কাজ করিতে রাজী হইবে না। পশ্চিমী শক্তি গোষ্ঠী, নিরপেক্ষ শক্তিগোষ্ঠী এবং সোশ্যালিশ শক্তিগোষ্ঠী বাহাতে সমানভাবে জাতিপুঞ্জ প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে তাহার জন্য উহার কাঠামোর পরিবর্তন দাবী করিয়াছেন। পশ্চিম শক্তিবর্গ এতদিন ধরিয়া যে সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা তাঁহারা সহজে ত্যাগ করিতে রাজী হইবেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রাশিয়ার সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশিল্ডের অবস্থা অসহনীয় করিয়া তুলিতে পারে। তাঁহার পূর্ববর্তী সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ লীয়েবের অবস্থা রাশিয়া এমন করিয়া তুলিয়াছিল যে, অবশেষে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

স্বাধীন নাইজেরিয়া—

গত ১লা অক্টোবর (১৯৬০) নাইজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করার আফ্রিকার আর একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় হইল। নাইজেরিয়া বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিবে এবং স্বাধীনতা লাভের পরই এই রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ লাভ করিয়াছে। নাইজেরিয়ায় বহু উপজাতীয় লোকের বাস। এই সকল উপজাতির মধ্যে হোসা, কুসানি, য়োক্কাবা এবং ইবসু এই কয়েকটি উপজাতিই সর্বাপেক্ষা বড় এবং ইহাদের লোক সংখ্যাই নাইজেরিয়ার মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৮০ জন। ভাষার পার্থক্যও আছে যথেষ্ট। নাইজেরিয়া কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত। উত্তর অঞ্চলে হোসা এবং কুসানি উপজাতির বাস। পশ্চিম অঞ্চলে য়োক্কাবা উপজাতি বাস করে। ইবসু উপজাতি পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী। এক সময়ে বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম এই তিনটি অঞ্চলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাছাড়া বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যেও বিরোধ দেখা দিয়াছিল। তথাপি ভারত বিভাগের মত ঘটনা নাইজেরিয়ায় ঘটে নাই। যুক্তরাষ্ট্র হিসাবেই অণু স্বাধীন নাইজেরিয়ার অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহা সত্যই আনন্দের কথা।

নাইজেরিয়ার আয়তন বৃটিশ যুক্তরাজ্যের প্রায় চারিগুণ, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় অর্ধেক। এই রাজ্যের লোক সংখ্যা ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের একভাগ বাস করে নাইজেরিয়ায়। আফ্রিকার এই বৃহৎ এবং জনবহুল নূতন স্বাধীন স্বাধীন রাষ্ট্রকে বিশ্ববাসী স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়াছে। নাইজেরিয়া যুক্তরাষ্ট্র কঙ্গোর পথে যাইবে না, বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিলেও আফ্রো-এশিয় শক্তিগোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি করিবে, ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

মস্কটন কমিশনের রিপোর্ট—

মধ্য-আফ্রিকা ফেডারেশন সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রকাশনের জন্য বৃটিশ সরকার লর্ড মস্কটনের সভাপতিত্বে যে কমিশন

গঠন করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট প্রণয়নে মস্কটন কমিশন যে বিশেষ দৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্তমান আকারে মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনকে রক্ষা করা যে সম্ভব নয়, তাহা মস্কটন কমিশন ভাগ করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কমিশন ফেডারেশন ভাঙ্গিয়া দিবার সুপারিশ করেন নাই। ফেডারেশনের কোন একটি ইউনিটকে পৃথক করারও সুপারিশ করা হয় নাই। ফেডারেশনকে বজায় রাখিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। কিন্তু কমিশন ইহা বৃত্তিতে পারিয়াছেন যে, এই অঞ্চলের কৃষক অধিবাসীরা ফেডারেশনের নামটাই আর বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। সাত বৎসর ধরিয়া খেতাজদের অধিপত্যে বাস করিয়া তাহারা ধৈর্যহীন হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পার হইলে অস্বাভাবিক ফেডারেশন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দিতে হইবে। অর্থাৎ ফেডারেশনের আন্তর্ভুক্ত সম্রাটের উপর প্রতিক্রিয়া করাই কমিশনের অভিপ্রায়। সেইজন্য ফেডারেশনের আমূল পরিবর্তন করার সুপারিশ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকিবে অর্ধ, পররাষ্ট্র নীতি ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা। অল্প সময় বিয়র অস্বাভাবিক হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। খেতাজ কৃষক নির্বিশেষে সকলকে ভোটাধিকার দিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে এবং দক্ষিণ রোডেশিয়ার কৃষক-বিদ্বেষী খেতাজ শাসনেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। কমিশন কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে সদস্যের সংখ্যা ৩৫ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬০ করিবার এবং খেতাজ ও কৃষক সদস্যসংখ্যা সমান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই ফেডারেশন টিকিয়া থাকিতে পারিবে। মস্কটন কমিশনের সুপারিশগুলি মধ্য আফ্রিকার খেতাজ শাসকদের মধ্যে বিকোভ সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষকগণও এই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে কি না সন্দেহ।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৬০

সোমনাবুলিজম বা নিদ্রাযোগে ভ্রমণ

সোমনাবুলিজম বা তন্দ্রাক্রম অবস্থায় ভ্রমণের অভ্যাস বহুজনেরই আছে, বলা বাহুল্য, এই অভ্যাস অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং একটি ব্যাধিরূপ গণ্য হওয়ারই যোগ্য, যদিও এই সমূহ অনিষ্টকর অভ্যাস সবচেয়ে আজও আদর্য বোধচিত্ত অবহিত হতে পারিনি বললে অত্যাধিক করা হয় না।

এই কু-অভ্যাসটির কারণরূপ অনেক বলেন যে, জাগ্রতাবস্থায় যাহুয যে চিন্তা করে, তাহাই অবচেতন প্রকাশ ঘটে তার স্মৃতির মধ্যে এবং তাহাই বেশ সে চালিত হয় সে সময়; তবে এই মতকে সঠিক বলে মনে করা বোধ হয় সমুচিত নয়; আরও একটি তুল্য ধারণা এ সম্পর্কে প্রচলিত আছে, তা হল সোমনাবুলিষ্ট বা নিদ্রা-ভ্রমণকারী নিদ্রাযোগে চলাফেরার সময় যদি কোন আঘাত পান, তা নাকি বেদনাদায়ক হয় না; বলা বাহুল্য, একথা সম্পূর্ণ অলৌকিক; এ অবস্থায় পতনাদি ঘাঘা যাহুয যে আঘাত ব্যথা ইত্যাদি পান, তা জাগ্রতাবস্থায় মতই অনিষ্টকর ও বেদনাদায়ক হয়ে থাকে।

অনেকে বলেন, এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে আকস্মিক ভাবে জাগানো সমূহ ক্ষতিকর, তাতে নাকি তাঁদের নার্ভের উপর প্রচণ্ড ঝাঁকানো লাগার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু পরীক্ষার প্রমাণিত হয়েছে যে একথাও সত্য নয়, একটি অ্যালার্জি ঘড়ির শব্দে নিদ্রাজাগ হলে যাহুয যেটুকু সচকিত হন, তার বেশী শব্দ এতে লাগে না।

এই ব্যাধির কারণরূপ বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, সাধারণতঃ যুগ্মবোগ ও শব্দামূত্র এই দুটি রোগের কোন একটি থাকলে তবেই যাহুয সোমনাবুলিষ্টে পড়িত হয়; তাঁরা আরও বলেন যে, তন্দ্রাক্রম্য বাধকরূপে বাওয়ার অন্তর্নিহিত তাপিদেই যাহুয নিদ্রাময় অবস্থায় ভ্রমণের চেষ্টা করে থাকেন সচরাচর। কারণ যাই হোক, ব্যাধিটি উপেক্ষার নয় এবং এতে আক্রান্ত ব্যক্তির বিপদাশঙ্কাও অত্যন্ত বেশী; এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে যোগীরা চাই লৌহসম মনোবল ও পারিবারিক সহায়ত্ব ও দয়ন, কারণ উক্ত ব্যাধিটি শুধু যাহুযের দেহেরই নয়, মনেরও।

বাঙলায় কন্ট্র্যাক্ট ব্রীজ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বটনকারীর পরবর্তী খেলোয়াড়ের ডাক (Bids by Second-Hand)

খেলা দেখে ও আলোচনার মাধ্যমে। নীচে কয়েকটি দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের তাসের নমুনা দেওয়া হ'ল।

দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের ডাকের পুনঃস্থিতি হই প্রকারের :—

- ১। বটনকারী ডাক দিলে
- ২। বটনকারী পাস দিলে।

উদাহরণ নং ১

ই—টে, ৭, ৩
হ—১, ২
ক—সা, বি, ১, ৬, ২
চি—বি, ১০, ৪

বটনকারী ডাক উদ্বোধন করলে সাধারণ ভাবে বোকা যায় যে, তার হাতের উচ্চ তাসের ক্ষমতা স্বাভাবিক বিভাগ অপেক্ষা বেশী। এর ফলে চতুর্থ খেলোয়াড়ের তাসের ক্ষমতা ঐ অল্পপাতে কম হওয়ার সম্ভাবনা। যেমন দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের নিম্নে ২ই ট্রিকের কাছাকাছি তাস থাকলে তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে, উদ্বোধনকারীর প্রায় ৩ ট্রিক ও নিম্নের ২ই মোট ৫ই ট্রিক। ৮ ট্রিক থেকে বাদ দিলে বাকী থাকে কেবলমাত্র—২ই ট্রিকের মত তাস; তৃতীয় খেলোয়াড় ও চতুর্থ খেলোয়াড় অর্থাৎ তার খেড়ির মধ্যে বিভক্ত। সুতরাং চতুর্থ খেলোয়াড়ের কাছে ১+ ট্রিক স্বাভাবিক ভাবে থাকতে পারে এই বুঝে তাকে ডাকের প্রতিযোগিতার নামতে হবে। এটিই হ'ল অক্ষয়প্রয়তে সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম প্রয়োজন। সে সময় একের ডাক দিতে পারলে ত' কথাই নেই দুইয়ের ডাক দিতে হলেও দিতে হবে একের ডাকের উপযোগী তাসে। ডাকে সাহায্য দেবার সময়ে চতুর্থ খেলোয়াড়কে উক্ত বিবরণি স্মরণে রাখতে হবে, নচেৎ তিনি বেশী খেসারৎ দিয়ে দলের পক্ষনের নিমিত্তভাগী হ'তে পারেন। স্মরণে রাখতে হবে যে, দ্বিতীয় খেলোয়াড়কে কিছুটা বাধ্যতামূলক ভাবে সময়ে সময়ে দুইয়ের ডাক দিতে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তার তাসের ক্ষমতা একটির ডাক উদ্বোধন করবার সমতুল্য হতে পারে। ৩ই ও ৪ই বটনকারী পাস দিলে তিনি একটির ডাকই দিতেন, কিন্তু সে উপায় না থাকায় তিনি দুইটির ডাক দিতে বাধ্য হয়েছেন। এটুকু ঝুঁকি অনেক সময়ে নিতে হয়। কারণ প্রথম চক্র ডাক ফসুকে গেলে আর তার পক্ষে ডাক দেবার সুযোগ নাও আসতে পারে এবং বেশী ভাগ ক্ষেত্রে সে সুযোগ আসেও না। ফলে বিপক্ষ দল কম ডাকের চুক্তির খেলা করে পয়েন্ট অর্জন করেন অথচ প্রকৃত তাসের ক্ষমতাসুধারী নিজেদের তদপেক্ষা বেশী ডাকের খেলা করা সম্ভবপর হ'ত, কিন্তু প্রথম চক্রে দ্বিতীয় খেলোয়াড় ডাক না দেওয়ার আর পরে মুখ খোলবার ঝুঁকি নেওয়া সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না তার পক্ষে। এ রকমও দেখা যায় যে, দ্বিতীয় খেলোয়াড় ডাক না দেওয়ার ফলে উদ্বোধনকারীর খেড়ি নো-ট্রাম ডেকে গেম করে নিরেছেন যেটা সম্ভবপর হ'ত না দ্বিতীয় খেলোয়াড় ডাক দিলে এবং সেই রংয়ের তাস প্রথম খেলা হ'লে। বাই হোক, কোথায় ডাক দিতে হবে এবং কোথায় ডাক দিলে বিপক্ষের সম্ভাবনা বেশী এটা বুঝতে হলে দরকার বেশ ঠৈর্য ও অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞ হয় ক্রমশঃ ভালো খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলে বা পাশে বসে

মনে করুন যে, তাস বটনকারী একটি হরতনের ডাক দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় খেলোয়াড় পেয়েছেন উপরের তাস। তাসটিকে ২ই ট্রিক (১১ পয়েন্ট) থাকায় একটি ডাক দেওয়ার পক্ষে প্রায় উপযুক্ত কিন্তু প্রথম খেলোয়াড় একটি হরতন ডাক দেওয়ার তিনি ঐ ডাক হ'তে বঞ্চিত। সুতরাং বাধ্য হ'য়ে কম মূল্য তাসেই দুটি ফহিতনের ডাক দিতে হবে ঝুঁকি দিয়ে কারণ এই সময়ে ডাক না দিলে আর ডাক দেবার সুযোগ তার মিলবে না এবং চতুর্থ খেলোয়াড়ের কিছু কিছু তাস থাকায় তিনি আর মুখ খুলতে সাহস পাবেন না, কারণ দ্বিতীয় খেলোয়াড় প্রথম সুযোগে পাস দেওয়ার তার হাতে যে ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন তাস থাকতে পারে এরূপ আশঙ্ক করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। এর ফলে বিপক্ষ দল কম ডাকের চুক্তির খেলা করে পয়েন্ট অর্জন করতে সক্ষম হয়, যেটা সম্ভবপর হয় না দ্বিতীয় খেলোয়াড় সমসমত নিজ ডাক দিলে।

উদ্বোধনী ৩টি রংয়ের ডাকের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের ডাকের সাধারণ প্রথা ও কয়েকটি নমুনা তাস নীচে দেওয়া হ'ল :—

১। ভাল্‌নারেবল (Vulnerable) অবস্থায় ২ থেকে ২ ট্রিক (Honour trick) এবং পাঁচপিঠ জয় করবার উপযোগী তাস হাতে থাকলে একটি রংয়ের ডাক দেওয়া চলে। উক্ত রংয়ের পাঁচখানি তাস টে, সা, বি, গো,-এর মধ্যে দুখানি ছবি তাস থাকায় প্রয়োজন—গোলামের স্থলে ১° থাকলেও চলতে পারে। যেমন, টে, ১০ বা সা, ১০ অথবা বি, ১০ সমেত পাঁচখানি। চার তাসেও একটির ডাক দেওয়া চল, কিন্তু সেক্ষেত্রে ছবি তাস অল্পতঃ তিনখানি থাকায় প্রয়োজন।

২। নন-ভাল্‌নারেবল (Non-vulnerable) ১ই ট্রিক ও চারপিঠ জয় করবার তাসেই দেওয়া চলে।

৩। বিপক্ষ দলের একটির ডাকের উপর দুটির ডাক দিতে হলে সাধারণতঃ প্রয়োজন—

(ক) ভাল্‌নারেবল অবস্থায় ২ই ট্রিকের কাছাকাছি উচ্চমূল্যের ও চারপিঠ জয় করবার মত তাস। ডাকের রংটি শক্তিসম্পন্ন পাঁচতাসের হওয়া চাই।

(খ) নন-ভাল্‌নারেবল অবস্থায় পাঁচটি পিঠ জয় করবার উপযোগী ও ১ই থেকে ২ ট্রিকের তাস। এক্ষেত্রেও ডাকের রংয়ের তাসখানি

ধাকা দরকার। উক্ত অবস্থায় ৪ খানি তাসে হুইয়ের ডাক বিপজ্জনক।

উদ্বোধনকারীর একটি চিড়িতন ডাকের উপর দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের একটি ডাকের উপযোগী করেকটি নমুনা তাস :—

১। ই—সা, বি, গো, ১, ৩; হ—টে, ৩, ২; ক—১, ৫, ৪; চি—৭, ৬ ডাক হবে একটি ইঙ্কান।

২। ই—সা, বি, ২; হ—বি, ৪, ৩; ক—সা, বি, ১, ৫, ৩; চি—৫, ২ ডাক হবে একটি কহিতন।

৩। ই—টে, ৪, ৩; হ—বি, গো, ১০, ১, ৬, ৪; ক—বি, ২; চি—৪, ৩ ডাক হবে একটি হরতন।

৪। ই—৭, ৩; হ—টে, বি, গো, ৩; ক—বি, ৫, ৩; চি—সা, ৭, ২ ডাক হবে একটি হরতন।

৫। ই—বি, ১, ২; হ—টে, ৩, ২; ক—বি, গো, ১, ৫, ৩; চি—সা, ৪ ডাক হবে একটি কহিতন।

৬। ই—টে, বি, ১০, ২; হ—১, ৩; ক—বি, গো, ১০, ২; চি—বি, ১০, ২ ডাক হবে একটি ইঙ্কান।

৭। ই—৭, ৫, ২; হ—টে, সা, বি, ৪, ৩; ক—৫; চি—বি, ৩, ২ ডাক হবে একটি হরতন।

ভালনারেবল অবস্থায় ৪ ও ৬ নং নমুনার তাসে ডাক না দিলেই ভাল হয়, কারণ তাসে পাঁচ পিঠ জয় করার কমতার অস্তর।

নিম্নলিখিত তাসে উদ্বোধনকারীর একটি ইঙ্কান ডাকের উপর দ্বিতীয় খেলোয়াড় দুটির ডাক দিতে পারে :—

১। ই—টে, ৫, ২; হ—৭, ৩; ক—সা, বি, ১, ৩, ২; চি—বি, ১০, ৪ ডাক হবে দুটি কহিতন।

২। ই—৭; হ—গো, ১০, ১, ২; ক—টে, বি, গো, ৫, ৪, ৩; চি—সা, ৩ ডাক হবে দুটি কহিতন।

৩। ই—৬, ৫; হ—বি, গো, ১০, ৮, ৭; ক—টে, ৫; চি—সা, বি, ১০ ডাক হবে দুটি হরতন।

৪। ই—সা, ৬; হ—বি, গো, ৫; ক—টে, ১, ২; চি—বি, ১০, ১, ৬, ৩ ডাক হবে দুটি চিড়িতন।

উপরোক্ত হাতগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :—

১নং তাসে কহিতন রংয়ে হাতটিতে প্রায় ছয় পিঠ জয় করার কমতা আছে বধা, ই—১, ক—৩ই+, চি—ই মোট ৫+। অর্থাৎ ৬ পিঠ অপেক্ষা কিছু কম কিন্তু কমসঙ্গে প্রথম সুযোগে ডাক না দিলে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না, সুতরাং কিছুটা ঝঁকি নিয়ে ঐ ডাক দিতে হবে।

২নং তাসে—তাসটিতে কহিতন রংয়ে প্রায় ৬ পিঠ (ক—৫, এবং উদ্বোধনকারীর বামে অবস্থিত থাকার চিড়িতনের সাহেব বাধীন ভাবে পিঠ জয় করতে পারে এই আশায়) জয়ের সম্ভাবনা উপরন্তু খেড়ি যদি দুটি হরতন ডাকতে পারে, তাহলে মেয়ের সম্ভাবনাও আছে, এই চিন্তা করে দুটি কহিতনের ডাক খুই প্রশস্ত।

৩নং তাসে—১নং তাসের ভার ৬ পিঠের কিছু কম শক্তিসম্পন্ন। তৎসঙ্গেও আর সুযোগ নাও আসতে পারে, এই চিন্তা করে প্রথম সুযোগেই দুটি হরতন ডাকা উচিত।

৪নং তাসে—ডাইনে অবস্থিত খেলোয়াড় ইঙ্কান ডাক দেওয়ার সাহেবটি দ্বিতীয় চক্রে পিঠ জয় করবে এইরূপ বিবেচনার তাসটিতে চিড়িতন রংয়ে পিঠ জয় করার কমতা ৫+ (ই—১, হ—২, ক—১ ও চি—৩)। এক্ষেত্রে প্রথম সুযোগে দুটি চিড়িতন ডাক প্রশস্ত।

উদ্বোধনকারী পাস দিলে দ্বিতীয় খেলোয়াড় উদ্বোধনকারীর পর্যায়ে এসে পড়েন, কিন্তু সামান্য তফাৎ এই যে, তিনি তখন স্থির জানেন যে, বণ্টনকারীর হাতে ডাকের উপযোগী তাস না থাকার চতুর্থ খেলোয়াড় অর্থাৎ তার খেড়ির তাসের শক্তি স্বাভাবিক গড় অপেক্ষা কিছু বেশী এইরূপ আন্দাজ করে সামান্য কম শক্তিসম্পন্ন তাসে ডাক উদ্বোধন করতে পারেন বা করা উচিত দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের। দু'টিক থেকে ২ই+টিকে ডাক চলে, এমন কি, অবস্থামুযায়ী টে, বি, ১০ সমস্ত পাঁচ বা ছ'খানি তাস কোনও রংয়ের ও অপর রংয়ের একটি সাহেব থাকলে ঐ রংয়ের একটির ডাক দেওয়া চলে। খেড়িকে সাহায্য দেবার সময় বা বিপজ্জনকের ডাকে ডবল দেবার সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, দ্বিতীয় খেলোয়াড় উদ্বোধনকারীর পাসের পর কিছু কম শক্তিতে ডাকের সুযোগ নিতে পারে।

বণ্টনকারীর খেড়ির ডাক
(Bids by Dealers Partner)

উদ্বোধনকারীর খেড়িকে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়, এইগুলি সাধারণত নিম্নরূপ :—

- ১। বণ্টনকারী ও দ্বিতীয় খেলোয়াড় পাস (Pass) দিলে।
 - ২। বণ্টনকারীর পাসের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় ডাক দিলে।
 - ৩। বণ্টনকারীর ডাকের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় পাস দিলে।
 - ৪। বণ্টনকারীর ডাকের উপর পরবর্তী খেলোয়াড় ডাক দিলে।
 - ৫। বণ্টনকারীর ডাক পরবর্তী খেলোয়াড় ডবল (Double) দিলে।
- ১। দুটি হাত পাস দেওয়ার অর্থ সাধারণ ভাবে এই যে উক্ত খেলোয়াড়েরা ডাক দেওয়ার উপযুক্ত তাস পান নি; উচ্চমূল্যের

পেটের মল্লুগা কি মারাত্মক তা ডাক্তারভোগীরাই শুধু জানেন।
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বাকলা

বহু গাছ গাছড়া
জারা বিশুদ্ধ
মতে প্রস্তুত

কম্বল জরুরী
রোগী আরোগ্য
লাভ করেছেন

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্বলশুল, পিত্তশুল, অম্বলপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেফুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দারি, বুকজ্বালা,
আহারে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম।
দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে মারা হত্যাশ হয়েছেন, তারাও
স্বাস্থ্যকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করছেন। বিশ্বকোষে মূল্য ফেরত।
৩২ ডোজের প্রতি কৌটা ৩ টাক, একসে ৩ কৌটা -- ৮-।। আশা। ডঃ, মাঃ, ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-শালিশাঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান)
ফোন-১৪৯, মহাআ. গাঙ্গী স্কোড, কলিঃ - ৭

তাসের (Honour Trick) অথবা পিঠ জয় করবার তাসের (Playing Trick) অভাব ঘটেছে তাসের হাতে। সুতরাং তৃতীয় খেলোয়াড় নিজ তাসের শক্তি বাচাই করে ধরে নিতে পারেন যে বাড়তি উচ্চতাস চতুর্থ খেলোয়াড়ের কাছে জড়ো হয়েছে। তৃতীয় হাতে ডাক দিতে গেলে চিন্তা করতে হবে যে, চতুর্থ খেলোয়াড়ের নিকট এই ডাকের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হতে পারে। যদি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবার সম্ভাবনা না থাকে তবে তৃতীয় হাতে মুখ না খোলাই উচিত, কারণ তৃতীয় হাতে কম শক্তিতে মুখ খুললে বিপক্ষদলকে অতি অস্বাভাবিক নির্দিষ্ট ডাকে পৌঁছবার সুযোগ করে দেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রেই অথবা এমন খেসারৎ দিতে হয় যে, ডাক না দিলে হেরত বা চতুর্থ খেলোয়াড় ডাকের উপযোগী তাসের অভাবে 'পাস' দিতেন অথবা ডাক উদ্বোধন করলেও সেইরূপ সংখ্যক পয়েন্ট অর্জন করতে সক্ষম হতেন না। তৃতীয় হাতে ডাক উদ্বোধন বিষয়ে নানারূপ অভিমত পাওয়া যায়। কেহ কেহ বিপক্ষদলের বড় খেলা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কমশক্তির ডাক সমর্থনও করেন কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, চতুর্থ খেলোয়াড় কিছুটা সচেতন থাকলে ঐরূপ কমশক্তির ডাক সামান্যই কার্যকরী হতে পারে। বড় জোর শতকরা পঁচাবার বাকী পঁচানব্বইবার ঠকাত্তে গিয়ে ঠকতে হয় নিজেকেই। সুতরাং এত অধিক ব্যবধান কেবলমাত্র বিপক্ষদলকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ঐরূপ ডাক সমর্থনযোগ্য ত' নয়ই বরং এরূপ কার্যে বৈধতাগ সময়ে দলের পতন থেকে আনে ও খেঁড়ির আস্থা নষ্ট হয়।

নিয়মদায়িক ডাক দিতে হ'লে তৃতীয় খেলোয়াড়ের খালা উচিত উদ্বোধনকারীর ডাকের শক্তি অপেক্ষা একটি সাহেব অথবা একটি বিবি ও একটি গোলার বেশী। ইহাতে কতিপয় সম্ভাবনা খুবই কম থাকে ও কম ভালই হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবস্থাহুবারী এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলে। যথা :—

(ক) কোন রংয়ের টে, সা, বি সমেত পাঁচখানি অথবা এক রংয়ের সা, বি, ১০ সমেত পাঁচখানি ও অপর কোনও রংয়ের টেকা থাকলে উচ্চতাস মূল্য যথোপযুক্ত না হলেও উক্ত রংয়ের একটির ডাকে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা কম অথচ চতুর্থ হাতে হঠাৎ নো-ট্রাম্প ডাকে অস্বাভাবিক টিল হুঁড়তে হয় না, প্রথম খেলোয়াড়কে উপরন্ত বিপক্ষ দলকেও সম্ভাব্য গেম করার সম্ভাবনা থেকে কিছুটা হটান চলে। ইহার সম্ভাবনাময় উপকারিতা বিবেচনার সামান্য খেসারৎ দিতে হলেও সেটা বরদাস্ত করা যায়।

(খ) একসাথে তিনটি বা চারটি ডাকা (Pre-emptive Bid)। এই ডাকের উপকারিতা কয়েকটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী হ'তে দেখা যায়। এইরূপ ডাকের দ্বারা বিপক্ষ দলের ডাকের বিনিময়ের পথ বন্ধ হয় এবং নির্দিষ্ট ডাকে পৌঁছবার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

তৃতীয় খেলোয়াড়ের ডাকের উপযোগী কয়েকটি নতুন তাস ও ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া হল :—

- ১ নং। ই—সা, ১, ২ ; হ—৫, ৩ ; ক—টে, সা, বি, ৪, ২ ; চি—গো, ৪, ৩।
- ২ নং। ই—সা, বি, ১০, ৭, ২ ; হ—টে, ৫, ৪ ; ক—বি, ৩, ২ ; চি—৮, ৩।

৩ নং। ই—সা, বি, ১০, ৮, ৭, ৫, ২ ; হ—১০, ৩ ; ক—সা ১০, ২ ; চি—৭।

৪ নং। ই—সা, ৬, ২ ; হ—বি, ৫ ; ক—সা, বি, ১০, ৮, ৭, ৬, ৫, ২ ; চি—X।

১নং তাসে যে কোন অবস্থায় একটি রহিতন ডাক খুবই সমীচীন। তাসটিতে রহিতন রয়েছে হয় পিঠ জয় করবার সম্ভাবনা থাকায় বটনকারী পাস দেওয়া সত্ত্বেও একটি রহিতনের ডাকে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা ত' নেই, উপরন্ত চতুর্থ খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভাব্য গেম করার (নো-ট্রাম ডাকে) পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং চতুর্থ খেলোয়াড় ডাক পেলে প্রথম খেলবার কোনও অসুবিধা থাকে না। ইহা ছাড়াও আর একটি দিক আছে যে, বটনকারী উচ্চমূল্য তাস খালা সত্ত্বেও উপযুক্ত পিঠজয়ের তাসের অভাবে পাস দিয়ে থাকলে তৃতীয় খেলোয়াড়ের ডাক পাওয়ার পর নিজহাতের শক্তি অস্বাভাবিক ডাকে পুনঃপ্রবেশ করে সমবেত শক্তি হিসাবে গেমের ডাকে পৌঁছাতে বা বিপক্ষদল ডাকের সীমারেখা অতিক্রম করলে যথোপযুক্ত খেসারৎ আদায় করতে সক্ষম হয় ডবল দিয়ে। তৃতীয় খেলোয়াড়কে কিন্তু ডাক দেবার আগে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে—

১। খেঁড়ি চতুর্থ খেলোয়াড়ের ডাকের উপর প্রতিযোগিতামূলক ডাকে প্রবেশ করলে কিরূপ ডাক আসতে পারে এবং তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে আন্দাজ করা ও তার অস্তিত্ব প্রত্যাশা আছে কিনা লক্ষ্য করা। এরূপ প্রত্যাশা, একই রংয়ে বা অপর রংয়ে অথবা নো-ট্রাম্পে না থাকলে তৃতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষে ডাক বৃদ্ধিযুক্ত নয়, কারণ সেসকল অবস্থায় অথবা অধিক খেসারৎ দিতে হ'তে পারে।

২। তৃতীয় হাতে থেকে চতুর্থ খেলোয়াড়ের মুখ খোলবার সুযোগ বেন করে না দেওয়া হয়।

২নং তাসের উচ্চতাস মূল্য ও পিঠজয়ের শক্তি ১নং তাস অপেক্ষা কম হ'লেও একটি ইচ্ছাবন ডাক দেওয়া চলে পূর্বোক্তরূপ কারণেই।

৩নং তাসে উচ্চতাস মূল্য খুবই কম এবং বিপক্ষদলের রংয়ের ডাকে বাধাদানের ক্ষমতা সামান্য, কিন্তু ইচ্ছাবন রয়েছে হয় থেকে সাত পিঠ জয় করবার সম্ভাবনা আছে ঐ তাসটিতে। সুতরাং তাসটি আক্রমণাত্মক পর্যায়ের এবং অবস্থাহুবারী এককালীন তিনটি ইচ্ছাবনের ডাক অনেক সময়েই কার্যকরী হয় বিশেষতঃ চতুর্থ খেলোয়াড় তীব্র প্রকৃতির হ'লে।

৪নং তাস ৩নং তাসের গ্রাধ অস্বাভাবিক এবং আক্রমণাত্মক বিপক্ষদলের ডাকে বাধাদানের ক্ষমতা নেই বললেই চলে। এরূপ তাসে অবস্থাহুসারে চারটি রহিতনের ডাক চলে।

২। বটনকারীর পাসের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় ডাক দিলে তৃতীয় খেলোয়াড় অর্থাৎ বটনকারীর খেঁড়ির ডাকের সমস্তাটি একটু কঠিন। কঠিন এই কারণে যে, বটনকারীর হাতে উদ্বোধনী ডাকের উপযুক্ত তাসের অভাব জানা গেলেও তার তাস কতটা দুর্বল জানা যায়নি এবং জানা সম্ভবপরও নয়। সেসকল কিছুটা ঝঁকি নিতে হয় ডাক দিতে গেলেই। প্রথম হাতের পাসের এবং দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের ডাকের পর ডাক দিতে গলে দরকার—

(ক) একের ডাকে ১ই থেকে ২ টিকের বড় তাস এবং

পিঠ জর করার কমতা অন্তত পক্ষে তালনারেবল অবস্থায় পাঁচটি ও নতুনতালনারেবল অবস্থায় চারটি।

(খ) ছুটির ডাক দিতে হলে দরকার অন্ততঃপক্ষে ২ ট্রিক এবং পিঠ জরের কমতা তালনারেবল অবস্থায় ছয় পিঠ ও নতুনতালনারেবল পাঁচ পিঠ।

সচরাচর এইটি যেনে চলা কর্তব্য কিন্তু সময়ে সময়ে কিছুটা ব্যতিক্রম প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং এটা নির্ভর করে তাসের বিভাগ ও পরিস্থিতি এবং খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞতার উপর। এইরূপ অবস্থার বিষয় মরণে যেনে উদ্বোধনকারীকে অগ্রসর হতে হবে তৃতীয় খেলোয়াড়কে ডাকে সাহায্য দেবার সময়ে অথবা কোনও বদলী ডাক দিতে গেলে।

৩। বণ্টনকারীর উদ্বোধনী ডাকের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় পাস দিলে তৃতীয় খেলোয়াড়ের কাজ তিনটি :—

- (ক) পাস দেওয়া
- (খ) খেড়ির ডাক বাড়ান
- (গ) কোন বদলী ডাক দেওয়া

(ক) উপযুক্ত শক্তি হাতে না থাকলে পাস দেওয়াই উচিত। উপযুক্ত শক্তি বলতে কি বোঝায় এখন সেইটিই বিবেচ্য। উদ্বোধনী ডাকের আলোচনা কালে বলা হয়েছে যে, ডাক দেবার সময়ে প্রথমেই যেনে নেওয়া হয়েছে যে, খেড়ির কাছে গড়ে (average) ছুটি ট্রিক (Honour Trick) বর্তমান সুরতায় তদপেক্ষা বেশী না থাকলে সাধারণত পাস দেওয়াই কর্তব্য যদি না প্রকৃতিগত বিভাগে সেইটি পূরণ করা সম্ভব হয় অর্থাৎ Honour Trick এর বদলে Playing Trick দ্বিগুণ সাহায্য করা যায়। কিন্তু উদ্বোধনকারীর একটি ডাকের শক্তি ২ই থেকে ৩+ ট্রিক পর্যন্ত সুরতায় একের উপর একের ডাকের বেলায় সমানানুপাতে খেড়ির শক্তি কমান হয়েছে (একের উপর একের ডাক স্ট্রব্য) সামান্য ব্যতিক্রম প্রয়োজন হয় শুধু উদ্বোধনকারীর একটি চিহ্নিত ডাকের ক্ষেত্রে কারণ সময়ে সময়ে ঐরূপ ডাক তিন তাসেও দিতে হয় উদ্বোধনকারীকে। এরূপ ডাকের পর কেবল সংখ্যাধিক্যে একটি ইন্ডাবন বা একটি হরতন (Major Suit) ডাকা চলে এবং কল খাওয়া হয় না যদি না উদ্বোধনকারী ভুলে যান যে খেড়ির ঐ ডাক শুধু ডাককে বাঁচিয়ে রাখবার জন্তও হ'তে পারে (Only to keep the bidding alive)।

(খ) খেড়ির ডাক বাড়ান চলে ছুটিতে, তিনটিতে, চারটিতে এমন কি আরও বেশীতে, নির্ভর করে উঁচু তাসের শক্তি ও তাসের বিভাগের উপর। ছুটিতে বা চারটিতে ডাক ভুলে দেওয়ার অর্থ—প্রকারান্তরে উঁচু তাসের অভাব প্রকাশ করা। যে সকল তাসে খেড়ির রংয়ের ডাকে সাহায্য করা ছাড়া বিপক্ষ দলের ডাকে বাধাধানের কমতা কম, সেই সকল তাসে প্রথম সুযোগেই পিঠজরের কমতানুসারে রংয়ের ডাকে ভুলে দেওয়ার খেড়িকে জানান যায় "খেড়ি, আমি ভাই তোমার ডাক তুলেছি, হাতে শক্তি বিশেষ নেই, তবে তোমার ডাকে এতগুলি পিঠ দিয়ে সাহায্য করতে পারি; সুরতায় বিপক্ষ দল ডাকে চুকলে তুমি বা ভাল সুখে সে রূপ করবে"। অপর দিকে ডাক উঁচু হয়ে বাওয়ার চতুর্থ খেলোয়াড়ের ডাকের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয় কিছুটা। কারণ ডাকতে গেলে ডাকে উঁচু

ডাকের ওপরে একক ডাকতে হয়। সকল সময়ে ঐরূপ ডাকের খুঁকি নেওয়া সম্ভব হয় না, কলে সামান্য খেসারৎ দিয়ে এমনকি চুক্তির খেলা করে পয়েন্ট অর্জন করা যায় বিপক্ষ দলের বড় খেলা বন্ধ করে। এ সুযোগ হরত' পাওয়া যেতনা খেড়ির ডাক ভুলে না দিলে কারণ সে সময়ে কম খুঁকি থাকায় চতুর্থ খেলোয়াড় সুখ খোলবার চেষ্টা করতে পারতেন এবং একবার সুখ খুললে সে তার খেড়ির সাহায্যে (যিনি হরত প্রথমে পাস দিয়েছিলেন কোনও অনিবার্য কারণ বশতঃ) ডাকে অগ্রসর হ'তে পারেন কিছুটা, গেমে বা এমনকি স্ল্যামেও (Slam) পৌছান চলে এরূপ ক্ষেত্রে বিয়ল নয়। কিন্তু খেড়িকে তিনটির ডাকে ভুলে দেওয়ার অর্থ বহুতর। এরদ্বারা শক্তি জানান ও ডাকে উৎসাহিত করা বোঝায় (পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে) বড় রংয়ের (ইন্ডাবন বা হরতন) একের ডাককে তিনে ভুলতে হ'লে প্রয়োজন ২ই থেকে ৩ ট্রিকের তাস সহ অন্ততঃ চারখানি রং। কমদরের রংয়ের (Minor Suits—Diamond and clubs) একটি ডাককে তিনে তোলায় অর্থ পৃথক, এরূপ ডাককে কতকটা এককালীন ডাকের পর্ধ্যায়ে (Pre-emptive bid) ফেলা চলে। প্রয়োজন ১ই থেকে ২ই ট্রিকের মতন উচ্চ তাসের শক্তি ও রংয়ের তাস অন্ততঃপক্ষে পাঁচখানি টে, সা, বি, গো, ১° এর মধ্যে তিনখানি সহ। চারখানি রংয়ের তাসেও এরূপ ডাক দেওয়া চলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজন উচ্চ রংয়ের 'টে, সা, বি'র মধ্যে অন্ততঃ দুখানি ও সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ ২ই ট্রিকের মত তাস বদলী ডাকের উপযুক্ত তাসের অভাব; কতকটা একটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী কিন্তু কোনও একটি রংয়ের দুখানি ছোট তাস থাকায় ঐ ডাক দেওয়া সমীচীন নয়।

খেড়ির একের ডাককে চারের ডাকে তোলা কার্যকরী হয় ইন্ডাবন ও হরতনের ডাকের ক্ষেত্রে (Major Suit)। এইরূপ ডাকে উচ্চতাস মূল্য কম, ১ ট্রিক থেকে ২ ট্রিকের মধ্যে হ'লেও চলে যদি উচ্চ রংয়ে খেড়িকে অনেকগুলি পিঠ জরে সাহায্য করবার উপযোগী তাস থাকে। আর প্রয়োজন রংয়ের পাঁচখানি বা বেশী তাস ও অপর কোনও এক টি রংয়ে ছুট (void) বা একখানি তাস। তাসের বিশেষ এই যে, বিপক্ষ দলের ডাকে কোনও বন্ধের

ডাঃ বঙ্গুর

মেসার্স কার্ডিয়েল

কার্যকরী শক্তি ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

প্রথম প্রস্তুতকারক:

ডাঃ বঙ্গুর ল্যাবরেটরী লিমঃ

কলিকাতা-৯

একখানি মাত্র শিঠির করার সম্ভাবনা। সুতরাং তাসটি আক্রমণাত্মক শ্রেণীর ও উচ্চতাসমূল্য কমহেতু নিজস্বের স্লামের সম্ভাবনা খুবই কম।

৩। বদলী ডাকের পর্যায় পাঁচটি, যথা :—

(ক) উদ্বোধনী ডাকের বদলে অপর কোনও রংয়ের একটির ডাক (One over One) .

(খ) একটি নো-ট্রাম্প ডাক।

(গ) একটির ডাকের উপরে প্রয়োজনীয় দুটির ডাক (Two over One) .

(ঘ) উদ্বোধনী ডাকের বদলে প্রয়োজন অপেক্ষা একটি বেশীর ডাক (Single jump)

(ঙ) প্রয়োজন অপেক্ষা দুটি বা বেশীর ডাক (Double or multiple jump)

উদ্বোধনী একটির ডাকের উপর একটির ডাক উচ্চতাসের তাসের ক্ষেত্রে (Major Suits) চলে নিম্নলিখিত তাসে :—

১। হ'তাসে বা ৭ তাসে-০-২ ট্রিক (Honour trick) থেকে ২-২ ট্রিকে

২। পাঁচ তাসে .. ১ ট্রিক থেকে ২-২ ট্রিকে

৩। চার তাসে .. ১-২ ট্রিক থেকে ৩+ ট্রিকে

উদ্বোধনকারীর খেড়ির ডাকের ক্ষেত্রে উপযুক্তরূপ বিস্তৃত থাকার দক্ষণ একটির উপর একটির ডাক অন্ততঃ একচক্র (one round) বাঁচিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতার অভাব যোগ হ'লে অর্থাৎ খেড়ির কাছ থেকে বদলী ডাক দাসার পর দ্বিতীয় চক্রে ডাকের প্রস্ততি না থাকলে উদ্বোধনকারীর প্রথম চক্রে ডাকের উপযোগী উচ্চতাসমূল্য থাকা সত্ত্বেও "পাস" হওয়াই কর্তব্য নচেৎ বিপদে পড়বার সম্ভাবনাই বেশী। একের উপর একের ডাকের উপযোগী তাসের কয়েকটি নমুনা নীচে দেওয়া হ'ল।

উদ্বোধনকারীর একটি চিহ্নিত তাসের উপর খেড়ির তাস কি ডাক হবে দেখান হয়েছে :—

খেড়ির তাস	কি ডাক হবে ?
১। ই—৭, ২	} একটি হরতন (উচ্চতাসমূল্য ২+)
হ—বি, গো, ৭, ৬, ৫, ৩	
ক—৪, ৩, ২	
চি—গো, ২	

খেড়ির তাস	কি ডাক হবে ?
২। ই—বি, ১০, ৮, ৫, ৪, ৪, ৩	} একটি ইন্ডাবন (উচ্চতাসমূল্য ২ বিস্ত ই ৭ তাস)
হ—১, ২	
ক—৭, ৩	
চি—বি, ২	

নিম্নলিখিত তাসে উদ্বোধনী একটি ক্রহিত তাসের উপর এক ইন্ডাবন বা একটি হরতনের ডাক চলে :—

১। ই—সা, বি, ৮, ৫, ২, হ—৬, ৩; ক—৭, ৫, ২; চি—১০, ৩, ২ ট্রিকদর ১ ডাক হবে একটি ইন্ডাবন।

২। ই—৫, ২; হ—বি, গো, ১, ৫, ৩, ২; ক—১০, ৫, ৩; চি—৭, ৪ ট্রিকদর ২ ডাক হবে একটি হরতন।

৩। ই—সা, ৩, ২; হ—টে, ১০, ৬, ৪, ৩; ক—১০, ৩; চি—বি, ৭, ২ ট্রিকদর ১-২ ডাক হবে একটি হরতন।

৪। ই—টে, ৭, ২; হ—সা, বি, গো, ৭; ক—৫, ৪, ২; চি—বি, ৫, ২ ট্রিকদর ২-২ ডাক হবে একটি হরতন।

৫। ই—টে, বি, ৩; হ—টে, সা, ৭, ৩; ক—১, ৫, ৩; চি—৬, ৫, ৪ ট্রিকদর ৩-২ ডাক হবে একটি হরতন।

৬। ই—টে, গো, ২; হ—টে, বি, ১, ৫, ৩; ক—৩; চি—বি, গো, ৪, ২ ট্রিকদর ৩+ ডাক হবে একটি হরতন।

[ক্রমশঃ।

মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)		ভারতবর্ষে	
বার্ষিক রেজিস্ট্রী ডাকে	— ২৪	প্রতি সংখ্যা ১-২৫	
বাগ্মাসিক "	— ১২	বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিস্ট্রী ডাকে	— ১-৭৫
প্রতি সংখ্যা "	— ২	পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)	
ভারতবর্ষে		বার্ষিক সতাক রেজিস্ট্রী খরচ সহ	— ২১
ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সতাক	— ১৫	বাগ্মাসিক " " "	— ১০-৫০
" বাগ্মাসিক সতাক	— ৭-৫০	বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	— ১-৭৫

মাসিক বসুমতী কিম্বদন্তি ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে বিদ্রোহে আর পড়তে বসুন ●

চলচ্চিত্রসমালোচকের কি কি গুণ থাকা দরকার সিসিল বি, ডি, মিলি

বিশ্ব-চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অমরত্বের আসন ধানের অধিকারগত, ধানের কল্যাণে চলচ্চিত্র-জগত ক্রমশঃই সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে, চলচ্চিত্রে বাবা নানাভাবে সুগপৎ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আয়োণ করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বর্তমান শতাব্দীর অল্পতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার বর্গত সিসিল বি, ডি মিলি তাঁদেরই অল্পতম। চলচ্চিত্রের উন্নতিসাধনই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। জীবনের একটি সুবহুৎ অংশ এই অতিবাহিত হয়েছে চলচ্চিত্রের সেবার। চলচ্চিত্র ও সংশ্লিষ্ট নিকণ্ডলি সম্বন্ধে তাঁর প্রতিটি অভিমত, যেমনই সূচিস্বত, তেমনই মূল্যবান, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাঁর সারগর্ভ আলোচনা তাঁর অসামান্য প্রতিভারই পরিচায়ক। চলচ্চিত্রের সমালোচকের কি কি গুণ থাকা দরকার সেই সম্বন্ধে তাঁর সারগর্ভ আলোচনা সম্বন্ধে আমাদের পাঠক-সমাজে কিছু আলোকপাত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ডি' মিলির মতে চিত্রসমালোচনা জনসেবারই নামান্তরমাত্র। মানুষ মানুষকে নানাভাবে সেবা করতে পারে আর সেবার উপকরণও বলতে গেলে সর্বত্রই হুড়িয়ে আছে। চিত্রসমালোচকরা আরও একটি কাজ করে চলেছেন—জনশিক্ষা দান। সমালোচনার মধ্যেই জনগণকে শিক্ষাদানও করে চলেছেন অবিরামগতিতে, সমালোচনা এমনভাবে করতে হবে—যা পাঠ করে সাধারণ পাঠক অনেক কিছু শিখতে পারবেন। সুতরাং চলচ্চিত্র-সমালোচককে যে কতখানি দায়িত্ব, সততা এবং কর্তব্যবোধের সঙ্গে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে উল্লেখ নিশ্চয়োজন। চিত্রসমালোচকের বৃত্তি গ্রহণ করার প্রাক্তালে চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে সম্যক এবং গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। একটি ছবির মধ্যে কতগুলি বিষয় আছে সে সম্বন্ধে কারোরই অভ্যাস নেই—এই সকল বিষয়ে সমালোচকের জ্ঞান থাকা দরকার—না হলে সমালোচনার ঐ দিকগুলি সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলতে পারবেন না আর না জেনে যদি কোন কথা বলতে যান তা হলে প্রকারান্তরে সেটা নিজের পারেই কুড়ুল মারা হবে। সমালোচককে শুধু চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি জানলেই চলবে না—সাহিত্য, ইতিহাস, রস সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার। কেন না বহন, কোন বিখ্যাত সাহিত্যকৃষ্টি, কিংবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা কোন ধর্মীয় আখ্যান চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হল। সমালোচক সেখানে কি শুধু আলোকচিত্র, শব্দগ্রহণ ও অভিনয় কেমন হল সেই আলোচনা করেই কলম তুলে নেবেন? অতএব এ সকল বিষয়েও তাঁর দক্ষতা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। এই জিনিষগুলি পড়া বা জানা না থাকলে এদের সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করবেন কি করে? যখন ওয়াটারলুয় যুদ্ধ নিয়ে একটি ছবি এল—আপনি তার সমালোচনা করছেন, এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বাস্তবিক তথ্য আপনার সংগ্রহে রাখতে হবে—সমালোচনার সেই ঐতিহাসিক পটভূমিকার অবতারণা না করলে সমালোচনা সার্থক হবে না, হবে না পূর্ণাঙ্গ। আপনি ছবি বখন দেখবেন তখন আপনার অনুভূতি, আপনার অনুভূতি আপনার বিশ্লেষণশক্তি সব একসঙ্গে কাজ করে চলবে। সর্বোপরি আপনাকে এক সত্যানী মন নিয়ে ছবি দেখতে হবে। আপনার চিন্তাবোধের সাহায্যে, আপনার বোধশক্তির সাহায্যে, আপনার



যথার্থ

দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ছবিটিকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে আপনাকেই।

খুব খানিকটা প্রশংসা করলেই কি খুব খানিকটা বিদ্রোহ করলেই সেটা বিচার নয়। কারণ প্রাপ্যখোলা প্রশংসা বা প্রশংসার গালাগালি কোনটাই সমালোচনার একমাত্র মাপকাঠি নয়—তা হাতী এ গুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বললে অনেক হয়তো বেগে বেগে পারেন কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয় এবং সেই জন্তেই আজকাল দেখা যাচ্ছে যে সমালোচনাটি কলপ্রবু হয় না। কোন সমালোচক কোন ছবিকে একেবারে বর্জে তুলে দিলেন তা সম্বন্ধে ছবিটি চলল না। আবার কোন সমালোচক কোন ছবিকে একেবারে নরকস্থ করলেন, তবুও ছবিটির জয়জয়কারে সারা দেশ ভরে উঠল। অতএব এই ভাবে সমালোচনার মান এঁরা নিয়গামী করে তুলছেন ক্রমশঃই, এই মনোবৃত্তির আওত অবসান বাহুর। আপনি যাকে প্রশংসা করছেন, প্রশংসার কারণও আপনাকে খুঁটিয়ে দেখাতে হবে, আবার যাকে নিন্দা করছেন নিন্দার কারণও আপনাকেই ব্যাখ্যা করতে হবে—আর তা যদি না করতে পারেন বা না করেন তা হলে ও তিরস্কার পুরস্কারের কোন মানেই হয় না।

চলচ্চিত্রের এক একজন সমালোচকের সমালোচনার প্রচার হচ্ছে সারা দেশে, একটি সেখনী থেকে যে অভিমত জন্ম নিচ্ছে সেই অভিমত হুড়িয়ে পড়ছে ঘরে ঘরে। একের সেখনীর মনোবাসন করছে বহুতে। সেই জন্তেই আপনি বুঝন যে জনমত গঠনের দায়িত্বও আপনার। আপনার দৃষ্টিভঙ্গীতে বা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই সত্যকেই আপনি নির্ভীকতার সঙ্গে অসঙ্কোচে তুলে ধরবেন হাজার হাজার মানুষের মাঝখানে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনার যত্ন। যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়, তাহলে বুঝুন কত লোকের মনে আপনি এক জ্বাল ধারণার সৃষ্টি করছেন। অতএব আপনাকে কতখানি নির্ভেজাল সং এবং আন্তরিকতাপূর্ণ থাকতে হবে বুঝতে পারছেন? অতএব এই আলোচনার প্রতি একটু মেজপাত করলেই আপনার মনেও এই ধারণাই স্পষ্টতর রূপ নেবে যে সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক এবং সর্ববিধরক জ্ঞান, শিল্পমন, সত্যানী দৃষ্টি, তাঁর অনুভূতি, বহু অনুভূতি ও সত্যকে প্রকাশ করার সংসাহসই চলচ্চিত্র-সমালোচকের যাত্রাপথের প্রধান পাথর।

নাট্যবেদে জর্জরের স্থান
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, সর্ববর্ণের কল্যাণ সাধনের জন্ত তিনি একটি নৃত্য বেন সৃষ্টি করলেন—সেটি হচ্ছে নাট্যবেদ। এই বেদের পাঠাংশে নিজের ধর্মের থেকে, গান সাম থেকে, অভিনয়াদি যজুর্বেদ এবং যজুসমূহ অর্থাৎ বেদ থেকে। ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত করে তিনি করতে চাইলেন এর প্রয়োগ। দেবতাদের উপর এই প্রয়োগের তার অর্পণের কথা ব্রহ্মা শত্রুকে বলায়, ইন্দ্ররাজ বললেন যে, দেবতারা এই প্রকৃতির গ্রহণের উপযুক্ত নহে—বেদ ও ধ্যানকুশল হুনিরাই এর উপযুক্ত পাত্র। তখন ব্রহ্মা ভরতকে শ্রম করলেন। ভরত তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি শব্দপুত্রসম্বন্ধে। ভরত হুনির উপর এই কাজের ভার দিলেন। ভারতী, সার্বভৌম, আরওটা ব্যতীত কৈশিকী বৃত্তিরও আধার নেতারা স্থিরীকৃত হলো। নারীদের সার্বভৌম ব্যতীত কৈশিকী বৃত্তির সুরণ সম্ভবপর নর বলে ব্রহ্মা মঞ্জুকেশী প্রবুধ ২৩ জন মানস অঙ্গরার সৃষ্টি করলেন। সশিষ্য স্বাতি বাতাসে, নারদ ও অন্যান্য গন্ধর্ভেরা সঙ্গীতাদি প্রয়োগ করলেন। তাত্র মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে ব্রহ্ম-মহঃ নাট্য প্রয়োগের শ্রেষ্ঠ সময় এই—ব্রহ্মা বললেন—

‘মহানমঃ প্রয়োগস্ত সময়ঃ সনুপস্থিতঃ।

অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রশ্চ প্রবর্ততে।

অত্রৈশানীময়ং বেদো নাট্যসংকঃ প্রবৃধ্যতাম্’

নাট্যশাস্ত্র, ১ম অধ্যায়, ৫৪—৫৫

নাট্যবিষয় মহেন্দ্র-বিজয়োৎসব। দলে দলে দেবতারা সমবেত হয়েছেন; ভরত করলেন অষ্টপদসংযুতা নান্দী-গান। দেবতারা কি করে দাঁড়বদের পরাক্রমিত করাইলেন, তার অভিনয় চলতে লাগলো—তিনি তিন দেবতারা অভিনয়ে সঙ্গীত করে তিন তিন বস্ত্র পরিধান করলেন—ইন্দ্র দিলেন ধ্বজা, বরুণ ভূদায়, বিষ্ণু সিংহাসন, কুবের হুকুট এবং সার্বভৌম দিলেন ‘প্রাব্যং প্রেক্ষণীয়মক’; শিব দিলেন সিঁচি। অন্যান্য দেবতা, গন্ধর্ভ, বক্ষ:, বক্ষ:, পরস প্রভৃতি ধারা ছিলেন, তাঁরাও ভরতপুত্রকে য য অভিনয়পযোগী তারা, তাব, যস, আদিক প্রভৃতি প্রদান করলেন।

দান পরাজয় অভিনয় এখন চলতে থাকলো, তখন অনিমন্ত্রিত অঙ্গুর, ধারা সেখানে ছিলেন, তাঁরা আর সহ করতে পারলো না। বিরূপাক্ষের আশ্রয়ে তারা দেবতাদের আক্রমণ করলো। অভিনয়ের পরই বিষ্ণু সংঘটিত হলো। অঙ্গুরেরা ‘বিষ্ণু’র আশ্রয়ে ভরতপুত্রদের বাগ্নবৃত্তি, চলনশক্তি এবং মেধা যুগপৎ রুদ্ধ করে দিল (১-৬৬) ধ্যানবলে ইন্দ্র পুত্রধার এবং তাঁর সঙ্গী কুলীজবর্ণের অসহায় অবস্থা সব অবগত হলেন। রৌবকবায়িত মেধে তিনি সশিখচিত তাঁর ধ্বজাধারা নিয়ে নাট্য বাধাদানকারী অঙ্গুর এবং বিরূপাক্ষকে সম্পূর্ণ পরাক্রম করলেন। পরমামলে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, হে দেব! আপনি আপনার এই ধ্বজের দ্বারা ‘অঙ্গুর’ ‘বিষ্ণু’ সকলকে ‘জর্জর’ করেছেন, তজ্জন্ত এই ধ্বজার নাম হবে জর্জর—

‘জর্জরীকৃতদেহাংস্তানকরোজর্জরেশ সঃ।

নিহতেষু চ সর্বেষু বিষ্ণেষু সহ দানতৈঃ ॥ ১-৭২

সংপ্রহৃত্য ভক্তো বাক্যমাহুঃ সর্বে বিবৌকসঃ।

অহো গ্রহয়ৎ দিব্যমিদমাসামিতং বরা ॥ ১-৭৩

নাট্যবিষ্ণুসিঃ সর্গে যেন তে জর্জরীকৃতাঃ।

তন্মাজ জর্জর ইত্যেব নামভোহিঃ ভবিষ্যতি ॥ ১-৭৪

শেবা বে চৈব হিংসার্বিপুণস্বাত্তি হিংসকাঃ।

দৃষ্টে ব জর্জরঃ তেহপি গমিব্যাত্ত্যেবমেব তু ॥ ১-৭৫

এবমেবাধিত্তি ভক্তঃ শত্রুঃ প্রোবাচ তান্ সুরান্।

বক্ষাত্তশ্চ সর্বেষাং ভবিষ্যত্যেব জর্জরঃ ॥ ১-৭৬

এই প্রথম অভিনয়ের সময়েই পুনরায় অঙ্গুরগণের আক্রমণ আরম্ভ হলে ব্রহ্মা প্রথম রাজার (নাট্যবেদ) স্থাপনের নিমিত্ত আদেশ দিলেন। বিষ্ণুকে এই নাট্যবেদ নিৰ্মাণ করলেন। নাট্যবেদের বিভিন্ন অংশের বক্ষণাবেক্ষণের তার বিভিন্ন দেবতাও গ্রহণ করলেন। নিরতি ও বম দ্বারপাল হলেন। ইন্দ্র নিজে থাকলেন রাজপীঠের পার্শ্বে। বিষ্ণুসত্তার রইলো ‘মন্তবারণী’তে এবং রাজারের ভক্তরাজির সংরক্ষণের তার রইলো শক্তিশালী ভূত, বক্ষ, পিশাচ ও গুহকদের উপর। জর্জরের অভ্যন্তরে রইলেন দৈত্যনিধনকারী ব্রহ্ম, ইন্দ্রধ্বজা জর্জরের বিভিন্ন পর্বে রইলেন শক্তিশালী দেবতারা। সর্বোপরি রইলেন ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে শিব, তৃতীয়ে বিষ্ণু, চতুর্থে কার্তিকের এবং পঞ্চমে শেব, ষাণ্ডকি, সাতক প্রভৃতি নাগগণ (১,১২-১৫) ॥

রাজপীঠাধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদের পূজাবিধি নাট্যশাস্ত্রের তৃতীয় প্রকরণে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে জর্জরের পূজাবিধিও দৃষ্ট হয়। শিব, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, বিষ্ণু, কার্তিকের, সার্বভৌম, লক্ষ্মী, সিঁচি, মেধা, স্মৃতি প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ এবং বাতব্রহ্মসমূহের অর্চনার পরে জর্জর-পূজা বিহিত। এ পূজার উদ্দেশ্য—নাট্যে যাতে কোনও বিষয় না হয়। তার মন্ত্রটি এই—

যং মহেন্দ্রপ্রহরণং সর্বদানবন্দনম্।

নির্মিতং সর্বদেবৈশ্চ সর্ববিদ্যানিবারণম্ ॥

নৃপায় বিজয়ং দেহি বিপুনাঞ্চ পরাজয়ম্।

গোত্রাকলপিতং চৈব নাট্যশ্চ চ বিবর্ধনম্ ॥

জর্জরের পূজার পূর্বে জর্জরের মস্তকে খেত বস্ত্র, তার পরের রৌদ্রপর্বে নীল বস্ত্র, বিষ্ণুপর্বে পীতবস্ত্র, তার পরের বক্ষপর্বে রক্তবস্ত্র এবং সর্বনিম্ন পর্বে বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র খণ্ড বস্ত্র করতে হবে। পক্ষ, মালা, ধূপ প্রভৃতির দ্বারা পূজা করে জর্জরকে এই মন্ত্রে স্তুতি নিবেদন করতে হবে—

বিদ্যানাং শমনার্থং-হি দেবৈর্জর্জর পুরোগঠৈঃ।

নির্মিতং মহাবীৰ্যো ব্রহ্মসারো মহাতমুঃ।

নিরন্তে বক্ষতু ব্রহ্মা সর্বদেবগঠৈঃ সহ।

দ্বিতীয়ং চ হবঃ পর্ব তৃতীয়ং চ জনাৰ্দনঃ।

চতুর্থক কুমারশ্চ পঞ্চমঃ পরাগোত্তমঃ।

নিক্যং সর্বে হি পাত্ত্ব যং সুরাষ্চ চ শিবো ভবঃ।

বক্ষত্রেহভিজিত্তি যং চ প্রনৃত্তো বিপুল্লহনঃ।

জয়ং চাত্ত্বদয়তৈকৈব পার্শ্বিবার প্রবক্ষ নঃ।

এব পূজা দান করে মন্ত্রাধিত্তি পূর্বক অগ্নিতে হোম করতে হয়। (নাট্যশাস্ত্র, ৩৮-৮৪)।

পরবর্তী যুগে ভরতের এবং সাগর জর্জরস্তুতি সধকে বা বলেছেন, তাতে নৃত্য আর কোনও বিদ্যুতি নেই। জর্জর সধকে সর্ব প্রাচীন গ্রন্থের উক্তিই প্রামাণিক এবং এখনও পর্যন্ত শেব উক্তি।

ভারতে স্বাধীনতাগমে এখন সংস্কৃতনিকা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা এবং তদ্ব্যপ্ত নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বর্ধন করার একান্ত কার্য। নাট্যাভিনয় প্রাথমিক কৃত্যের অন্ততম কর্মপুঞ্জ। তাই তার মৌলিক উদ্দেশ্য ভারতবাসীমাত্রেরই অবগত হওয়া।

ক্র্যাঙ্ক সিনাট্রার প্রসঙ্গে

সারা জগতে অভিনেতা হিসেবে ক্র্যাঙ্ক সিনাট্রা নাম প্রচারিত হ'লেও ঐটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। অভিনেতার চেয়ে সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে সিনাট্রা সারা বিশ্ববাসীর কাছে অনেক বেশী পরিচিত। যৌবনকালে অভিনেতা হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ কিন্তু সুরের সাধনার তিনি বাল্যকাল থেকেই আত্মমুগ্ধ। পেশার দ্বারা তিনি অভিনয়বৃত্তি গ্রহণ করলেও অন্তরে তিনি সুরশিল্পীই। ক্র্যাঙ্ক সিনাট্রা সুরশিল্পী হিসেবে যে বিরাট প্রতিভা সম্পদের অধিকারী সে বিষয়ে আমরা নিজেরা কিছু না বলে বিড় ক্রসবিব তাঁর স্বকীয় উক্তিটিকেই পুনরুল্লেখ করব মাত্র। হলিউডের সঙ্গীত-জগতের সত্রাট বিড় ক্রসবিব। হলিউডের সঙ্গীত সাম্রাজ্যে তাঁর সত্রাট স্বর্ভজনস্বীকৃত, কেবলমাত্র রসিক-সমাজ কেন, দেশ-বিদেশের সুধীমণ্ডলী এবং বিখ্যাতজন্যিতর নায়েকের দলও বিড় ক্রসবিকে একবারে স্বীকার করে নিয়েছেন হলিউডের সুরলোকের দিকপাল অধীশ্বররূপে। সুরভাং এ কথা সহজেই অচুমের যে, এ ক্ষেত্রে বিড় ক্রসবির উক্তির গুরুত্ব কতখানি প্রতিভাকে স্বীকার করতে বিড় ক্রসবি কোন দিনই পরাধু্য নন, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি বলেছেন ক্র্যাঙ্ক সিনাট্রা সেই জাতের শিল্পী যারা কালের দীর্ঘ ব্যবধানে ব্যয়েকের জন্মে দেখা দেন। সিনাট্রা যে কতখানি শক্তিমান শিল্পী এই উক্তিটি কি সে সবকিছু যথেষ্ট পরিমাণে আলোকপাত করে না ?

কিন্তু এ সবও বলব, ক্র্যাঙ্ক সিনাট্রার প্রতিভা একমুখী নয়, অল্প আমাদের এ বিষয়ে বলার মধ্যে নতুন কিছু নেই। কারণ এ কথা সমকালীন ইতিহাসের মধ্যেই লিপিবদ্ধ করা হইল। পেশা হিসেবে অভিনয়বৃত্তি গ্রহণ করলেও সে ক্ষেত্রে তিনি আপন অসামান্য শক্তির পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেন নি, তিনি প্রমাণ করেছেন, দিকপাল সঙ্গীতশিল্পীরূপে, তিনি সর্বসাধারণের মিকট পরিচিত হলেও অভিনয়রঙ্গ বিঘাতা তাঁকে কিছু অল্প পরিমাণ দেন নি, তিনি প্রমাণ করলেন যে সার্বজনীন অভিনয়শিল্পীর যে সকল বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন সে সবগুলিই তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় শোভা পাচ্ছে। বেশী দিন আগের কথা নয়, মাত্র সাত বছর আগের কথা—সাত বছর আগের ঘটনা আমরা আশা করি অনেকেরই পরিচয় মনে আছে। ১৯৫০ সালে ক্রম হিয়ার টু ইটাণিটি নামে একটি ছবি মুক্তি পেয়েছিল, ছবিটি সারা বিশ্বে সাদা জাগিয়েছিল, জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাদরে এই ছবি সার্বিকতার মুখে দেখতে সমর্থ হয়েছিল। অবিস্মরণীয় ছবিগুলির ইতিহাসে এই ছবিও সম্মানে লিপিবদ্ধ হয়ে যইল। এই ছবি ধারা দেখেছেন তাঁরা কোনও দিনই তাকে ভুলতে পারবেন না, আর এই ছবি স্বতন্ত্রিন মানুষের শক্তির মধ্যে বেঁচে থাকবে—ভবিষ্যৎ এই ছবিতে সিনাট্রার অপূর্ব অভিনয়ও মানুষের মনে গেঁথে থাকবে। এক প্রতীকময়ী ইতালীয় বার্কিন

সৈনিকের চরিত্রে সিনাট্রার অভিনয়রঙ্গতা ভোলবার নয়, সমগ্র ছবিটি বললে অভ্যুত্তি হবে না সিনাট্রার কল্যাণেই এতখানি জনপ্রিয়তা অধিকারে সক্ষম হয়েছিল। এই অপূর্ব অভিনয়-রঙ্গতার স্বীকৃতিস্বরূপ সিনাট্রাকে হলিউড যাকাতেমী পুরস্কারে সম্মানিত করল। সারা জগতের কাছে প্রমাণিত হল যে অভিনয়শিল্পীরূপে তিনি কতখানি শক্তির অধীশ্বর।

তেতাগ্নিশ বছর আগে ১৯১৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর সিনাট্রার জন্ম। সিনাট্রার বাবা ছিলেন স্থানীয় দমকল বাহিনীর অধিনায়ক। এই পক্ষে ধারা বহাল থাকতেন তাঁরা প্রত্যেকেই মোটা অঙ্কের বেতন পেতেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে সিনাট্রাপরিবারকে কোন দিন অর্থের অভাব বোধ করতে হয়নি, সংসারযাত্রা পথম স্বচ্ছন্দে নির্বাহ হোত, বাল্যকালে সিনাট্রার কেটেছে যথেষ্ট বাহুল্যের মধ্যে দিয়েই। তাঁর সাজসজ্জা বিলাস-বৈভব তাঁর সমবয়সীদের নিত্য আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন তাঁর মাত্র পনেরো বছর বয়স তখনই তাঁর সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব একটি ক্রায়েলার গাড়ী ছিল আপন অধিকারে। তাঁর বেশভূষা এত মূল্যবান ছিল যে একবার পশ্চিমঘো চু'জন গোয়েন্দা তাঁর পথরোধ করে রীতিমত জেরা করে যে এই মূল্যবান পোষাক কি সূত্রে তাঁর অধিকারগত হল ? এরকম অনধিকার এবং অসম্মানকর প্রশ্ন সিনাট্রা বরদাস্ত করার লোক নয় ; তিনি এমন একটি উত্তর দিলেন যা শুনে মাথা ঠাণ্ডা রাখা গোয়েন্দাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। পরবর্তী ঘটনার জন্মে সিনাট্রা প্রস্তুতই ছিলেন, এতক্ষণ মুখের মুক্ত চলছিল। তারপর হাতের মুক্ত শুরু হল। প্রস্তুত এবং রক্তাঞ্জিত অবস্থায় মহাদুলা বেশবাস পরিহিত সিনাট্রা বাড়ী ফিরে এলেন।

ছুলের পড়া শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন সিনাট্রা, নামাধরণের জীবিকা তিনি গ্রহণ করেছেন, বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর জীবননদী প্রবাহিত হতে থাকল—সকল দিক থেকে জীবনকে দেখার সুযোগ তিনি পেলেন, বোধ করি এই বিচিত্রতার সমাবেশে জীবন এক অপূর্ব রূপ নিয়ে তাঁর সামনে প্রকট হল। বাস্তব বাস্তব সংবাদপত্র কেবী পর্যন্ত করতে কুঠাবোধ করেননি সিনাট্রা কোন দিন। এই সময়ে বিড় ক্রসবির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। আবেগন করলেন স্থানীয় বেতারকেন্দ্রগুলিকে— তাঁকে গান গাইবার সুযোগ দেওয়া হোক, পরসা তিনি চান না। তাঁর আবেগন গ্রাহ্য হল—কখনও কখনও কোন কোন কেন্দ্র থেকে তিনি বাড়ী কেয়ার বাসভাড়াটি পেয়েছেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি পুরোপুরি পেশাদার হয়ে উঠলেন। তাঁর উপার্জনের পরিমাণ তখন হস্তার পঁচাত্তর ডলার। এ পঁচাত্তর ডলার একদিন পরিপক্ব হল আড়াইশো ডলারে দেখতে দেখতে অসামান্য জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়ে উঠলেন সিনাট্রা। নারীমহল তো সিনাট্রা বলতে, অজ্ঞান। তাঁ অল্পষ্টানের দিন গুণগোল মেগেই থাকত, পুঞ্জি নিমুক্ত কা পরিপার্শ্বিক শক্তি রক্ষা করতে হোত। বছরে তাঁর আয় নির্দিষ্ট হ এক লক্ষ ডলারে।

এইবার সিনাট্রা সবচেয়ে একটি প্রায় অজানা তথ্যের প্রকাশ করি। এই কথা প্রকাশ করলে তাঁর অধিবাসীর দল হয়তো তাঁর

জীবনের একটি মজুদ দিক দেখতে পাবেন। আপনারা জানেন যে, ক্রান্তি সিনাট্রা একজন ধ্বংসকারী, নানা কুসংস্কৃতিতে, ভেঙে ব্যঙ্গ্যে, সন্তোষ সম্পর্কিত প্রকাশনার এক আর্থিক নানা ক্ষেত্রে তাঁর টাকা খাটতে, আপনি জানতেন এ কথা ?

একদিন সামান্য ভীতির দৃষ্টিতে অভিনয় করার ক্ষেত্রে প্রতিটি ইচ্ছার ধারে ধারে ঘুরতে হোয়েছে তাঁকে, আজ তিনি সিগারেটের একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে চাইছেন দেড় লক্ষ পাউণ্ড। লোকে দিচ্ছেও তাঁকে।

প্রথম জীবনে স্ত্রী স্ত্রী এক তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন সিনাট্রা, এই বিবাহে একটি কল্যাণ লাভ করেন। সেই মেয়ের আত্মবয়স প্রায় কুড়ি হতে চল্লিশ স্ত্রী আজ আর সিনাট্রার সহধর্মিণী নন, তাঁকে ঘন ঘন দেখা বাচ্ছে চিউ ও ব্রায়নের সঙ্গে যে সম্পর্কে নানাভাবে নানা অত্যাচার পোষণ করতেন। অবশ্য এ সম্পর্কে এখনও পর্বে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশিত হয় নি। সিনাট্রার দ্বিতীয় সহধর্মিণী ছিলেন অপরাধ সৌন্দর্যের অভিনেত্রী এডা গার্ডনার। তারপরে অনেকের সঙ্গেই দেখা গেছে সিনাট্রাকে নানাভাবে, সে মাঝগুলির ভালিকা বিবাহ, তবে তারপরই হঠাৎ উল্লেখযোগ্য নাম লেডী বিটি। তাতা এই প্রসঙ্গে দক্ষ অভিনেতা স্নর্গ চার্লস বোয়ার্টের বিধবা সহধর্মিণী অভিনেত্রী লোয়েন বোল্ড অভিনেত্রী জুডি মেয়েভিথ এবং অভিনেত্রী জুজিওট প্রোসের নামও উল্লেখযোগ্য। এদের সঙ্গে মেলায়েণার সময়ে সকলেই অত্যাচার করেছিলেন যে হয়তো এবার সিনাট্রা বিবাহিত জীবনে আবার প্রবেশ করতেন এঁদের মধ্যে কেবলমাত্র শেরোফাই এখনও সিনাট্রার মিত্যসঙ্গিনী।

সুভিত্তিক থাক

জীবনের চলার পথে বহুটি ছক বেঁচে নেওয়া থাক, সেই ছক ধীরা পথের নিরাপত্তার জন্তে হস্তই তাঁকে নির্দিষ্ট পন্থীতে সীমাবদ্ধ করা থাক বা ঘটায় তা ঘটবেই—তাঁকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ভবিষ্যতের স্থির বিধানের কাছে সর্বপ্রকার সাবধানতা, হিসেব, সুভিত্তিক, সুভিত্তিক, তর্ক সিফল সম্পূর্ণরূপে। অদৃষ্ট ভাগ্যলিপির পাঠ্যকার, আজ পর্বে চল না সম্ভব। এই চিরজাগর, সাধন ও অবিরতের সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ছাদাছবি "সুভিত্তিক থাক" এর কাহিনীর মধ্যে দিয়ে। সে জাধায়ে এই সত্যের জয়গান করা হয়েছে সেই আধাঘটিও বহুই বৈচিত্র্যপূর্ণ। দশ মিনিটের ব্যবধানে দ্বিগুণ শিখারাতার কয়েকটি বোন একসঙ্গে এক চোখা দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখল, নিঃসন্তান বিস্তবতী মাসী বড় বোনকে দিয়ে গেলেন আপন নাড়কের রূপ দেবেন বলে। দীর্ঘকাল পরে মায়ের মৃত্যুকালে ছোট বোন জানল এই বড় বোনের কথা। মাতৃবিয়োগের পর সে মাসীর আশ্রয়ে গেল, সেই দিনই বড় বোনের ট্রেন চুইটনা ঘটল, মসো-মাসী ছোট বোনকে বড় বোন বলেই ডেকে নিলেন বাড়ীর কর্তাই তাঁকে চিনতে পারল না। বড় বোনের সঙ্গে বিয়ের স্থির ছিল জয়ন্তর, জয়ন্তরও তাঁকে চিনল না। কিছুকাল আগে জয়ন্তর কার্য পৈত্রিক ভিটে বেঁধে গিয়েছিল পল্লীগোমে ছোট বোনদেরও এই প্রায়ই বাস জয়ন্ত চান্দুভাবে সে সময়ে কোমণ্ডিনই তাঁকে খেঁচি কিন্তু সে আত্মা থেকে বেঁধেছিল জয়ন্তকে আর দেখানাই

তার সমস্ত ভালোবাসা তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিল। জয়ন্তর সঙ্গে তারই বিয়ে হল, জয়ন্তর জানল সে তারই প্রথম পাণিগ্রহণ করল ছোট বোনও তার মনের মালুমকে নিজেই বপেল। এনিকে বড় বোন চুইটনার প্রাণে দক্ষা পেল বটে বি সুভিত্তিক হয়ে গেল, সুভিত্তিক অবস্থার দুরূহে এক সমস্তর ডাক্তার আশ্রয়ে সে কালাতিপাত করতে থাকে। তারপর ঘটনার ঘনঘন করে একদিন ছোট বোনে মিলন হল। জয়ন্তর কাছেও আসল স উল্লেখিত হ'ল বড় বোনের সুভিত্তিক করে এল কিন্তু সে জয়ন্তর কা আর ধরা দিল না—তার ছোট বোনের অবস্থা বিবেচনা করে—এইখানেই তার মহত্ব আর এইখানেই সে জিতে গেল মনিকসমাজে এই ছবি পরিচালকগোষ্ঠী "বাজিক"এর দ্বিতীয় উপহার সে দিক দিয়ে বিচার করলে এঁরা নিঃসন্দেহে সাধুবাদার্থ'। এঁদের এ প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। উত্তরকালে বাঙালির চিত্রজগতের এঁদের ঘারা বহুই পরিমাণে জীবিত হোক—এই কামনা করি। এই ছবি চিত্রনাট্যকার শ্রীশ্রেয়স মিত্র। ছবিতে বৈভূমিকার অভিনয় করেছেন সুচিত্রা সেন। চলচ্চিত্রে বৈভূমিকার রূপদান তাঁর এই প্রথম। ছ'টি বিভিন্ন চরিত্রের রূপদানে সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছেন শ্রীমতী সেন, ছ'টি চরিত্রই অত্যন্ত সুন্দর চরিত্র। শ্রীমতী সেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে চরিত্র ছ'টিকে জীবিত করে তুলেছেন। "সুভিত্তিক থাক" তাঁর অনবদ অভিনয়-প্রতিভার সুন্দরই প্রমাণ হতে পারে। তাঁর পরেই উল্লেখ করব বিকাশ রায়ের নাম। ছবির শেষাংশে তাঁর আবির্ভাব। জয়ন্তর কথার তাঁকে দেখা গেছে, কিন্তু এই জয়ন্তর প্রোগেই স্নর্গ-স্বয়ং তিনি জয় করতে পেরেছেন। বিকাশ রায়ের পর অভিনন্দনযোগ্য অভিনয়শ্রেণী প্রদর্শন করলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। অত্যন্ত ভূমিকার ছবি বিধান, তসিতবরণ (জয়ন্ত), বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সবিতারত রত্ন, ছবি বোঝান, শ্রীতি মজুমদার, গোপাল মজুমদার, বাধারমণ, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, সাধনা বারগোঁড়া, বাণী গাঙ্গুলী, সুভিত্তিক গোয়ারী, আশা দেবী, অজিতা কর প্রভৃতি শিল্পীরাও আপন আপন অভিনয়দক্ষতা কৃতিত্বের সঙ্গেই প্রদর্শন করেছেন।

শহরের ইতিকথা

প্রায়ের ঘরে বিদেশী ভাষার সঙ্গে অপরিচিতা থাকতে পারে, সাহেব মেয়ের সঙ্গে কথাপকথনে অক্ষয় হ'তে পারে, তথাকথিত "সোসাইটি"তে মেলায়েণার অপায়ণ হতে পারে—কিন্তু তাই বলে সে অপায়ণেরা নয়—সেও এক অক্ষয় প্রাণসম্পদে পরিপূর্ণ। নারীজগতের প্রতিটি বৃত্তি তার মধ্যে আশ্রিত, সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-আবেগ-অহুত্ব সবারে সম্পূর্ণ গঠিত। তথাকথিত "সোসাইটি"তে মেসার পটুতাই নারীদের মাপকাঠি নয়। মাসী কল্যাণী, মাসী আনন্দময়ী, মাসী জী। এই পটুত্বই অবলম্বন করেই শহরের ইতিকথার গলাংশ গড়ে উঠেছে। এই শহরের নারিকাত একটি প্রায় তরুণী। তার পিতৃবহুপুত্র সামন্তের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির ছিল। বিসেক থেকে কয়েক এসে সামন্ত এ সমস্ত ডেও দেওয়াল—তার মত একজন "সোসাইটি হিরো" একটি পল্লীগোমের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইল না। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এসেন মাসিকায়ের অধিকার, তিনি কলকাতার নিজের বাড়ীতে নারিকাতকে এসে রাখলেন, উপযুক্ত পত্রসংসার সাহায্যে প্রভূত বয়

ও চোঁর নারিকা 'আপ-টু-ডেট' হয়ে উঠল—প্রকৃতপক্ষে হল আলোকপ্রাপ্তা। সামন্তের সঙ্গে তার পরিচয়ও হল। সামন্তের মাসামাসোলুপ কুৎসিত রূপটিও তার কাছে অস্পষ্ট রইল না। সামন্তও বুল সে নিয়ত যে সব মেয়েদের সঙ্গে যেনে এ মেয়ে অল্প জাতের। এদিকে নারিকা নারিককে অর্থাৎ তার জাণকর্তা ও জীবনের নবমন্ত্রনাজ। জমিদারনন্দনটিকে মনে মনে নিজেকে উৎসর্গিতা করেছে। তারপর ষাণ্ড-প্রতিষাণ্ড-সংঘাত। অবশেষে অমৃতপ্ত সামন্তকে নারিকার প্রত্যাখ্যান এবং সর্বশেষে নারিক-নারিকার শুভমিলন।

সামন্ত-চরিত্রটি সুচিন্তিত সুবর্ণিত এবং সুবিন্দিত—আমাদের আশে-পাশে এরকম সামন্ত সেনের অভাব নেই, সৌন্দর্যের সুখোস পরে অনেক জব্ব পশু সগর্বে সমাজে শোভা পাচ্ছে এবং এই ভাবে কত জনের সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছে, তার হিসেব অস্বামী হাড়া কে রাখতে পারছে?

সমগ্র ছবিতে সবচেয়ে যে জিনিষের অভাব চোখে পড়বে তা হচ্ছে পরম্পরা, এর দৈর্ঘ্য ছবিটিকে রীতিমত কতিগ্রস্ত করেছে। ছবিতে জাঁকজমকের ত্রুটি নেই, বিলাস-বৈভবের হড়াহড়ি, বড় বড় হোটেল ক্লাব প্রায়শই দেখানো হচ্ছে—কিন্তু মুখ্য শিল্পী হাড়া অস্তিত্ব নির্বাক শিল্পীদের দিকে দেখুন—কি ধারণা জন্মাবে আপনার? বেশ-ভূষা আকৃতি-প্রকৃতি সব দেখে আপনার মনে হবে যে পাড়ার সাধারণ চায়ের দোকানের আড্ডাবাজদের বিয়ে এখানকার শুল্ল চেয়াংগুলি পূর্ণ করা হয়েছে। যে জন্তে আবেষ্টনী আবহাওয়া ও পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই খাপ খাচ্ছে না। জমিদারগৃহে দেখছি যে জমিদার স্বয়ং এবং কয়েকটি চাকরবাকর ছাড়া আর কেউ সে বাড়ীতে নেই, জমিদারের আপনার লোক বলতে কি কেউ নেই, সে কি মুল্লনটীন একা? সব চেয়ে যে জিনিষ চোখে লাগে এবং যার জন্তে ছবিটিকে অবাস্তবতার দোষে অনার্যাসে চুই করা চলে তা হচ্ছে নারিকার বাবা মা শ্রেফ একা নারিকের জিম্মায় অনিশ্চিত কালের জন্তে অগ্নানবদনে মেয়েকে সেখানে থাকতে মিল, কুসংস্কারের তো দূরের কথা—সত্যতার আলোকপ্রাপ্ত বীরা তাঁরাও এই ভাবধারা সমর্থন করতে পারেন না—যার বাড়ীতে আত্মরন বলতে কেউ নেই তত্পরি যে নিজে অবিবাহিত সেক্ষেত্র মনিবের ইচ্ছে বলে প্রতুতস্ত কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে সেখানে রেখে এল। তার উপর বেখানে সমাজের অত্যাশন বড় কড়া—সেই সব পল্লীগামের একটিতেই নারিকার বাবার বাস। অতএব এ চিন্তা করাও তো তাদের পক্ষে অসম্ভব। হাসির খোরাক ছবিতে অনেক আছে যেখানে হাসি স্বতঃস্ফূর্ত সেখানে সর্বনাশারণ তা উপভোগ করেছে যেখানে কৃতিয়ে চাগানো হয়েছে—সেখানে দর্শকের মনে আনন্দ লাগে নি। জেগেছে বিরাক্ত।

অভিনয়ে সকলকে ছাপিয়ে গেছেন মাল্য সিনহা। বিশেষত সত্যতা শিকার্বিনী পল্লীগামার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এককথায় অতুপনীয়। নারিকের ভূমিকায় উত্তমকুমার চরিত্রের প্রতি পূর্ণ আস্থা আরোপ করেছেন। অস্তিত্ব ভূমিকায় পাহাড়ী সাত্তাল, অস্তিত্ব বন্দোপাধ্যায়, বীরাঙ্গ দাস, হারা দেবী, কাজরী গুহ, বাপী হাজরা প্রকৃতি বিদ্যায় সু-অভিনয়ই করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিত্ত দাসগুপ্ত।

হাসি, হাসি, হাসি,

এক

রীতিমত ক্যাসায়ে পড়ে গেছেন চিত্রপরিচালক রিচার্ড বর্ণ। ছবি তুলতে এ কি বিড়ম্বনা? ছবির নাম স্নাত্তমলন এক ব্যাক্রিকা স্মৃতি হচ্ছে মাকটাউ কেনিয়াতে। বুদ্ধের দৃষ্টি, দেখাতে হবে বুদ্ধে নিহত প্রচুর শব্দেহ। বর্ণ হানীর অবিবাসীদের মধ্যে সেই ভূমিকাগুলি বটন করে দিলেন। কাজ কিছুই নয়, মবার মত খালি শুয়ে থাক। তাতেই মুঞ্চিলে পড়লেন বর্ণ। হানীর অবিবাসীদের কৌতুহলের শেব নেই। অকুসল আগ্রহ তাদের, যেই ছবিতোলা শুরু হয় অমনি তারা উঠে বসে দেখতে থাকে কেমন করে ছবিতোলা হচ্ছে। চিত্রগ্রহণের কলাকৌশল অস্বাভাবন করতে চায় তারা, মবার মত চোখ বুজে শুয়ে থেকে এ সুযোগ তারা নষ্ট করতে চায় না। কর্মীরা তাদের কিছুতে বোঝাতে পারেন মা যে তারা মৃতের ভূমিকায় অভিনয় করছে, সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার, বর্ণ জীবনে হয়তো অনেক কিছুই ভুলতে পারবেন, কিন্তু এই ঘটনা কি কোনদিন ভুলতে পারবেন?

দুই

'ব্যাণ্ডিট এক জোড'-এর স্মৃতি চলছে। শহরের এখানে সেখানে তোলা হচ্ছে ছবি। ঘটনাস্থলে আকস্মিকভাবে এক আগন্তকের আগমন। হান মাস্তিদ, স্পেনের রাজধানী। দৃষ্টি হচ্ছে এক তরুণ ব্রিটিশ সৈনিকের মৃত্যু উপলক্ষে শবদাত্তা। প্রথমে শবদাত্তার অংশগ্রহণকারী জনতার দৃষ্টিগুলি পর পর নেওয়া হয়ে গেল। আগন্তকের চোখে পড়ল ক্যাথেরার পিছনে দাঁড়িয়ে কফি খেতে খেতে একজন অভিনেতা চিত্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করছেন। আগন্তক সোজা তাঁকেই জিজ্ঞেস করল কে মায়া গেলেন? আমি—উত্তর দিলেন কফি-পানরত শিল্পী সিন কেলি। (ছবিটিতে ব্রিটিশ সৈনিক লেকটানেন্ট উইলির চরিত্রটির তিনিই রূপ দিচ্ছিলেন) আগন্তকের পরবর্তী প্রশ্ন—কে মারল আপনাকে?—এর উত্তর দিলেন অভিনেতা ডেনিস—আমি এক আগামী কাল (অর্থাৎ পরের দিন উইলির মৃত্যু দৃষ্টি গ্রহণ করা হবে আর ডেনিস উইলির হত্যাকারী হনুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই, উইলি হত্যার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি—বলতে বলতে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ভিক্টর ম্যাচিষোর। আগন্তকের প্রতি যিষ্ট হাসিটি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন—ও তো আগামী কাল উইলিকে মারবে—আর আমি যে ওকে গত বৃহস্পতিবার মেয়ে কেলেছি (অর্থাৎ হনুর হত্যাকারী এ ঘটনার স্মারকেই নেওয়া হয়ে গেছে।)

বাংলাদেশে চিত্রগৃহ নির্মাণের বাধা অপসৃত

পূর্বম আন্দলের সঙ্গে আমাদের পাঠকসমাজে একটি শুভসংবাদ পরিবেশন করার সুযোগ পেয়েছি আমরা। পাঠকসাধারণ আশা করি নিশ্চয়ই স্বগত আছেন যে পশ্চিম বাংলাদেশ নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের প্রতি একটি নিবেগাজ্ঞা এতাবৎকাল বলবৎ ছিল। নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের অস্বাভাবিত পাত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না। আশা ও আন্দলের কথা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে সেই নিবেগাজ্ঞা প্রত্যাখ্যার করে বখেই সম্ভবতার পরিচয় দিলেন। যে কোর পল্লীতে চিত্রগৃহের নির্ধারিত সংখ্যাগুলির সংশোধন করা হয়েছে

এই সরকারী বিজ্ঞপ্তির দ্বারা। এই সংশোধনের ফলে ছিন্ন হল
এ প্রতি পুঁজি হাজার লোক পিতৃ একটি করে নতুন চিত্রগৃহের
স্বত্ব দেওয়া হবে, এই সংখ্যা অতিক্রান্ত হবে না। কোন
কিন্তু পুঁজি, শিকারস্থান, ছাত্রাবাস, মেবালর প্রভৃতি থেকে অন্ততঃ
একটি করে অর্থাৎ চিত্রগৃহের মধ্যে কোন চিত্রগৃহ থাকবে
না, বসে একটি নিয়ম বলবে ছিল—সম্প্রতি আর একটি বিজ্ঞপ্তির
দ্বারা, এই নিয়মের সংস্কার করা হয়েছে এই নতুন নিয়মে
ব্যবস্থাপনাকে চারশ চল্লিশ থেকে একশো গজে পরিণত করা হয়েছে।

বাঙলা চলচ্চিত্রের সামনে একটা নতুন পথের দারোয়ানটন
টল এই সরকারী সিদ্ধান্ত, আমর আনন্দেব সঙ্গে লিপিবদ্ধ
হয়, বাঙলাদেশের ছাত্রাবাসের অগতে প্রভূত উপকার সাধিত হল
এর বিস্তৃত সীমার প্রসারণ ঘটল এবং বাঙলা ছবির প্রতি
সরকারী কর্মসূচীশীল মনের এক সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন।

চিত্রগৃহের সমস্যা তা সমাধান হল। কিন্তু চিত্রের? সেখানে
এখনো হাহাকার। বাঙলা ছবির সংখ্যা উত্তরোত্তর ক্রমশঃই কমে
চলে, এ অত্যন্ত আশঙ্ক্য কথা। আমাদের বক্তব্য, নতুন নতুন
বোঝকরা এগিয়ে আসুন, আসুন ডিষ্ট্রিবিউটরদের দল
বাঙলাদেশে বাঙলা ছবির অভাব পূর্ণ করতে, শিল্পের জন্মভূমি
বাঙলাদেশে সেই দেশে এত বড় শিল্পের এই দুর্ভোগ—এ স্বপ্নেও ভাবা
য না, তারা এগিয়ে এসে কর্তব্যের আগুন গ্রহণ করুন তার দুর্ভোগ
করুন। তার আকাশে বাতাসে আবার মুঠা মুঠা আনন্দ
হি ও প্রশান্তি ছড়িয়ে দিন তাহলে বাঙলা ছবির বিশ্বব্যাপী
প্রচারা রোধ করার কক্ষতা কোন শক্তির থাকবে না এ আমাদের
ভয়ের বিশ্বাস।

সংবাদ-বিচিত্রা

বিশ্বেশ্বরায় শততম জন্মোৎসবে বৈজয়ন্তীমালার
নৃত্যপ্রদর্শন :

পাঠকসাধারণ আশা করি সকলেই অবগত আছেন যে সম্প্রতি
শত-গৌরব ডাঃ শ্রী মোক্ষগুপ্ত বিশ্বেশ্বরায় জীবনের শততম
দিবার্পন করেছেন। এ উপলক্ষে ব্যাঙ্গালোরে যে বিশেষ
ধর্মীয় উদ্দেশ্যে হয় তাতে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারকবিখ্যাত
শ্রী বৈজয়ন্তীমালা। অহুষ্ঠানে রাজাপাল, সুখামণী, মন্ত্রিসভার
পাঠ সদস্য এবং আরও বহু সঙ্গীত অভিনয় উপস্থিত ছিলেন।
নিমন্ত্রণ নেহরুকে বৈজয়ন্তীমালা মালাভূষিত করে সম্মান জানান।
নৃত্যের প্রধানমন্ত্রণ শিল্পীকে মালাভূষিত করে শুভেচ্ছা জানান।

চলচ্চিত্রের প্রসারকল্পে ধারণাদান

ছাত্রাবাসের উন্নয়নকল্পে এবং উপযুক্ত উত্তমী ব্যক্তদের উৎসাহদান
। চিত্রনির্মাতার জন্তে কল্যাণ কাইডাল কর্পোরেশনের ধারণাদানের
হা করেছেন। ডিনেম্বাণের মাঝামাঝি থেকে এই ধারণাদান
হবে। এদের কর্মকর্তার ঠিকানা—১১ ওয়ালকেম্বর রোড
।ই-৬।

সি, টি, এ, বি কৰ্মকর্তা নিৰ্বাচন

সিনে টেকনিশিয়ান স্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের ১১৬-৬১
এ কৰ্মকর্তা নিৰ্বাচনে অহুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি নিৰ্বাচিত

হয়েছেন সুবীল মজুমদার। সহকারী-সভাপতি নিৰ্বাচিত হয়েছে
তপন সিং এবং বিনয় চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক নিৰ্বাচিত হয়েছে
ভূপেন ঘোষ।

সেলার বোর্ডের নতুন সমস্যা

মাত্রা থেকে জানা গেল যে পুনর্গঠিত সিনে সেলার বোর্ডে
অন্ততঃ সমস্যা হিসাবে ভারতীয় লোকসভার সমস্যা সীমিত
আসামীনাথনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাচীরপত্রের প্রতি ধার্য করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

সিনেমার পোষ্টারের প্রতি অত্যন্ত অকণ্ঠের অধিকার
ব্যাঙ্গালোরেও মহীশূ। সরকার যে কর ধার্য করেছে সেই সিদ্ধান্তে
কেন্দ্র করে তুলুল বিরুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছে। এ উপলক্ষে মহীশূ
কিন্ম চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন
করা হয়। বলা হয় যে কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রে
কর ধার্য করা যেতে পারে ব্যাঙ্গালোরে তার অধিকার করা
পরোক্ষভাবে এখানকার চলচ্চিত্র শিল্পের প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হবে
কলকাতা বোম্বাইতে যে ব্যবস্থা হতে পারে, অতি অল্প পরিমিত
চলচ্চিত্র শিল্পের সেই ব্যাঙ্গালোরের মত ছোট শহরে সে ব্যবস্থা
কোনক্রমেই ধার্য করা চলে না।

বাঙলা ছবিতে গুজরাটী অভিনেতা

নির্মল চৌধুরীর পরিচালনার "শ্রীনারায়ণ" নামে একটি ছবি
গৃহীত হচ্ছে। বাঙলায় বিশিষ্ট শিল্পীগণ এতে আত্মপ্রকাশ করবেন
এই ছবি প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে খবরটি প্রচারিত হয়েছে তা হচ্ছে
গুজরাটী অভিনেতা চাম্পসিতাই নাগদাও এই বাঙলা ছবিতে
অভিনয় করবেন।

বুটেনের চিত্রজগতে দুর্ভোগ

বুটেনের চলচ্চিত্রজগতে ঘোরতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে
১১৫১-৬০ সালটি চলচ্চিত্রশিল্পের অতি দুর্ভাগ্যের বলে এখা
ঘোষিত হয়েছে। চার শো প্রেক্ষাগৃহ বাধা হয়ে বন্ধ করে দেও
হয়েছে। বর্ষক-সংখ্যাও বীতিমত কমতে শুরু করেছে। বুটেন
দুর্ভোগের হাত থেকে মুক্তি পাক এই কামনাই করি।

লানা টার্নার

প্রখ্যাত অভিনেত্রী লানা টার্নার (৪১) ক্রীড়াবিদ জেড
(৪৪) কে বিবাহ করার আইনসম্মত অহুমতি পেয়েছেন, অ
এই অহুমতিকে তিনি "কার্যকরী" করবেন বলে এ সঙ্কে কোন উ
করতে তিনি একেবারে নারাজ। ইতঃপূর্বে লানা পাঁচ
বিবাহপত্রের আবিদ্ধ হয়েছেন। এই বিবাহ হবে লানার বঠ বিবাহ

ক্রার্ক প্বেল

বিধবিধ্যাত অভিনেতা ক্রার্ক প্বেলের পারিবারিক জীবনে
আনন্দসংবাদ ঘোষিত হয়েছে। বিধবপুত্রে লানা গেছে যে এই
সন্তানহীনতার দুঃখ থেকে ক্রার্ক মুক্তি পেতে চলেছেন। তার পূর্বে
চার পত্নী কেউই তাঁকে সন্তান উপহার দিতে পারেন নি, এ
ভেতাল্লিশ বছর বয়স পঞ্চম পত্নী তাঁর এই পুত্রতা দূর কর
চলেছেন। ষাট বছর বয়সে অভিনেতা এই প্রথম সন্তানের
দেখবেন। তাঁর পারিবারিক জীবন উত্তরোত্তর সুস্থ হলে উ
এই আশ্বাসের আধার।

সংক্ষেপিত—

১শ আখিন (১৭ই সেপ্টেম্বর) : স্বাধীন শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন স্বাধীনতার অনবদ্য রচনাকর্মীরা মূলত সংস্করণ (৭৫ টাকা) প্রকাশার্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্ততি।

২শ আখিন (১৮ই সেপ্টেম্বর) : "শিক্ষকতা ও পূর্বের একই মত চনা উচিত—পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের উদ্বোধনী ভাষণ।

৩শ আখিন (১৯শে সেপ্টেম্বর) : আসামের ধুবড়ী সহরের মন্থিত রেলপথ ও আত্মীয় সড়ক বন্ধাব প্রাবিত—ট্রেন ও যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত।

৪শ আখিন (২০শে সেপ্টেম্বর) : আসামের আগামী আনন্দময়ীর প্রসন্নমণ্ডার সংশোধিত ব্যবস্থা—১৯৫১ সালের 'দেশীয় অধিবাসী' সংক্রান্ত প্রস্তাব বাতিল।

৫ই আখিন (২১শে সেপ্টেম্বর) : পাঁচটি পাহাড়ী জেলা ও নেকা লইয়া পৃথক রাজ্য গঠন করার দাবী—আসামের পাহাড়ী এলাকার নেতৃসম্মেলন নিযুক্ত সংগ্রাম পরিষদ নেতা মিঃ এস ডি, সি নিকলসনের ঘোষণা।

৬ই আখিন (২২শে সেপ্টেম্বর) : "আসাম দাঙ্গার সহিত রাজ্য ভাবার কোন সম্পর্ক নাই"—আসাম সরকারে প্রত্যাগত কলিকাতার সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস নেতা শ্রীমতুল্য ঘোষের বিবৃতি।

৭ই আখিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) : "আসামে বাঙালী উৎখাতের পিছনে মূল কারণ পরিকল্পনা ছিল"—আসাম সরকারী পশ্চিমবঙ্গ পি-এস-পি ও সারা বাংলা বাঙালীরা সম্মেলন প্রতিনির্মিতের অভিমত।

৮ই আখিন (২৪শে সেপ্টেম্বর) : রাষ্ট্রপতি সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানার্থ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিউইয়র্ক যাত্রা।

আই-এক-এ কুটবল প্রতিযোগিতার মোহনবাগানের ষষ্ঠবার শীত বিজয়ের গৌরব অর্জন—কাইতালে ইণ্ডিয়ান নেভী ১—০ গোলে পরাজিত।

১৫ই আখিন (২৫শে সেপ্টেম্বর) : "সরকারী কর্মচারীদের ষষ্ঠঘণ্টা নিষিদ্ধ করা হইতেছে না—প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত আইনের সম্প্রসারণ মাত্র"—নয়াদিল্লীতে ভারতীয় শ্রম সংস্থানে কেন্দ্রীয় শ্রম সচিব শ্রীমলজারীলাল নন্দের ঘোষণা।

১০ই আখিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) : শ্রীনেহরু (প্রধানমন্ত্রী) প্রমুখ বিশিষ্ট নেতাদের হত্যার বড়বন্দ—পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ও পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সহিত চক্রান্তের কথা—আওয়ালয় অতিরিক্ত দায়িত্ব জজের আদালতে চাকল্যকর মামলা।

১১ই আখিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) : 'বধোচিত বন্ধকবচ সহ অসমীয়াকেই আসামের রাজ্য ভাষা করিতে হইবে'—জোরহাটে আগাম প্রজ্ঞাসমাজতন্ত্রী দলের বৈঠকের প্রস্তাব।

১২ই আখিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) : বিভাবী পাঞ্জাব রাজ্য হইতে সরকারী ভাষা (পাঞ্জাবী ও হিন্দী) প্রবর্তন—রাজ্যপাল কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারী।

১৩ই আখিন (২৯শে সেপ্টেম্বর) : আসামের সরকারী ভাষা একমাত্র অসমীয়া হইতে পারে না—শিলচরের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে ধারী।



১৪ই আখিন (৩০শে সেপ্টেম্বর) : প্রবল বন্ধাব কটক ও বালেশ্বর জেলার ৫২৫টি গ্রাম জলময়—৪৫০ বর্গ মাইল এলাকার প্রায় তিন লক্ষ নর-নারী বিপর হওয়ার সংবাদ।

১৫ই আখিন (১লা অক্টোবর) : ভারত সরকার কর্তৃক পরবর্তী ভয়াসের আমদানী নীতি ঘোষণা—মুদ্রা, সূতীবন্ধ, কাচ, টাইমপিস ও কাঁচা ফিল্মের আমদানী হ্রাস।

১৬ই আখিন (২রা অক্টোবর) : অপসারিত শহীদ স্মৃতি তত্ত্ব পুনর্নির্মাণের দাবীতে আন্দোলনে পুনরায় সত্যাপ্রহ্ন আন্দোলন—শহীদ স্মৃতি কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীইলুলাল বাজিক সহ ৩০ জন সত্যাপ্রহ্নী গ্রেপ্তার।

১৭ই আখিন (৩রা অক্টোবর) : দিল্লীতে ১২ দিনব্যাপী দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক প্রমুখগার-সেমিনার শুরু—ইউনোস্কো (রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থা) ও ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগ।

১৮ই আখিন (৪ঠা অক্টোবর) : আসামে রাজ্য ভাষার প্রস্নে শিলং-এ সার্বজনীয় সম্মেলন আদৃত—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা কর্তৃক সম্মেলনের উদ্বোধন।

ভাষা সমস্যার সমাধানে সাহায্যের তত্ত্ব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের শিলং (আসাম) উপস্থিতি।

১৯শে আখিন (৫ই অক্টোবর) : পঞ্জপালের ভয়াবহ আক্রমণে পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মতীশ্বর রাজ্যের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার সরকারী সংবাদ।

২০শে আখিন (৬ই অক্টোবর) : ঐক্যবন্ধের অভাবে বিদ্রা সিন্ধাস্তে আসামের সরকারী ভাষার নিছারণ সংক্রান্ত সর্বদলীয় সম্মেলন সমাপ্ত।

২১শে আখিন (৭ই অক্টোবর) : আসামে রাজ্য ভাষা সমস্যার সমাধানে পণ্ডিত পন্থের (কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব) বার্ষিক—বিত্তিক (হিন্দী ও আসামী) পুস্তক গ্রহণে পার্বর্ত্য নেতাদের অসম্মতি।

২২শে আখিন (৮ই অক্টোবর) : অসমীয়া ও হিন্দী (ইংরেজীর বিকল্প) আসামের সরকারী ভাষা—বিভিন্ন ভাষাভাষী এলাকার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা—দিল্লী, বাঙ্গার প্রান্তালে স্বরাষ্ট্রসচিব পন্থের ঘোষণা।

"অবিদ্যে কান্দীর হইতে পাক সৈন্ত অপসারণ করিতে হইবে"—কান্দীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্রী পোলাম মহম্মদের দৃষ্ট ঘোষণা।

২৩শে আখিন (৯ই অক্টোবর) : ভাতিলা জেলে (পাঞ্জাব) রাজামাকারী আকালী বন্দীদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—সাত জন বন্দী নিহত ও শতাব্দিক ব্যক্তি আহত।

২৪শে আখিন (১০ই অক্টোবর) : আসামে অসমীয়া ও সাময়িক

ভাবে হিন্দী পরিবর্তে ইংরেজী সরকারী ভাষা হইবে—আসাম রাজ্য বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী জি.চালিহা কর্তৃক ভাষা বিল পেশ।

২৫শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর) : বঙ্গা প্রসিদ্ধিত লক্ষী মহর হইতে বিপুল অধিবাসীদের অপসারণে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ—স্বাভাবিক ও মন্ত্রীদের গৃহ-প্রাক্রমে স্বভাব জল প্রবেশ।

২৬শে আশ্বিন (১২ই অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ৩৪১ কোটি টাকার পরিকল্পনা (তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) হ্রাস করা সম্ভব নহে—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

২৭শে আশ্বিন (১৩ই অক্টোবর) : নগরী হইতে ৩০ ম.ইল দূরে লক্ষার (আসাম) পুনরায় হাঙ্গামা—বাঙালীপ্রধান অঞ্চলে প্রাথমিক স্কুল গৃহ ভয় ভুক্ত।

২৮শে আশ্বিন (১৪ই অক্টোবর) : ' দ্বিভাষিক ব্যবস্থাকেই আসামের ভাব-সমস্তার সর্বোত্তম সমাধান'—শিলং-এ আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সভায় মুখ্যমন্ত্রী জীবনলাল প্রসাদ চালিহা উক্তি।

২৯শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর) : ' অসমীয়াই সর্বমুখে আসামের একমাত্র সরকারী ভাষা হইবে'—আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক ভোটাধিক্যে সরকারী ভাষা প্রস্তাব সংশোধন।

৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) : খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ—দিল্লীতে পরিকল্পনার কমিশনের কৃষি সংক্রান্ত বৈঠক।

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর) : উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসী কলহের মীমাংসা আলোচনা ব্যবহৃত—দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী জিনেহরর সহিত কংগ্রেস সভাপতি জি.জ্ঞানচন্দ্র গুপ্তের বৈঠক।

বহির্দেশীয়—

১লা আশ্বিন (১৭ই সেপ্টেম্বর) : কঙ্গো প্রদেশ আলোচনার সাধারণ পরিষদের জরুরী বৈঠক—রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার ডেপুটি প্রেসিডেন্টের কলে টিউনিসিয়া ও সিংহলের ঘোষণা প্রস্তাব বাতিল।

৩রা আশ্বিন (১৯শে সেপ্টেম্বর) : সিঙ্গুর জল বটন সম্পর্কে করাচীতে ভারত-পাকিস্তান ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত—স্বাক্ষরকারী—প্রধানমন্ত্রী জিনেহর (ভারত) ও পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান।

৪ঠা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর) : কঙ্গোর শান্তি স্থাপনে রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হামারকজোন্ডের উপর দায়িত্ব অর্পণ—রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদে এশিয়া-আফ্রিকান প্রস্তাব গৃহীত।

৫ই আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর) : কাশ্মীর সমস্তা সম্পর্কে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সহিত প্রধানমন্ত্রী জিনেহর (ভারত) আলোচনা—মুরী ও মাথুয়াপলিতে (পঃ পাকিস্তান) দীর্ঘ বৈঠক।

৬ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর) : সোভিয়েট ইউনিয়নকে আবার নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার আহ্বান—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বক্তৃতা।

৭ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) : কাশ্মীর সমস্তা সমাধানের পন্থা সম্পর্কে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সহিত স্বত্ববিবাদ—লাহোরে মাসব্যাপী বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জিনেহরর উক্তি।

অধিবাসীদের উপনিবেশিক দেশ-সমূহের স্বাধীনতা দাবী—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভের ভাষণ।

৯ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর) : মাসিক আইসে অনুষ্ঠিত

পাকিস্তান মসলেম লীগের সভাপতি আব্দুল কালাম খান পেশোয়ারে প্রেস্তার।

১২ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) : পাক-আফগান সীমান্ত সংঘর্ষে ৬ লাখ ব্যক্তি হতাহত—পাকিস্তান কর্তৃক সমগ্র সীমান্ত বাহিনীকে হ'সিয়ার থাকার নির্দেশ।

১৪ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর) : আইক (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) ও ক্রুশ্চভের (রুশ প্রধান মন্ত্রী) পুনরায় বৈঠকের প্রস্তাব—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে নিরপেক্ষ পাঁচটি দেশের (ভারত সমেত) ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা।

১৫ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর) : চীন (কম্যুনিষ্ট) ছাড়া নিরস্ত্রীকরণ সমস্তার সমাধান অসম্ভব—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চভের ঘোষণা।

১৭ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) : নিরস্ত্রীকরণে অত্যধিক বিলম্ব হইলে বিধে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটবার আশঙ্কা—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রধান মন্ত্রী জিনেহর (ভারত) দৃপ্ত ভাষণ।

২০শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) : আইক-ক্রুশ্চভ বৈঠক সম্পর্কে নিরপেক্ষ পক্ষরাষ্ট্রীয় (ভারত সমেত) প্রস্তাব প্রত্যাহত—পশ্চিমী কারসাজিতে বেদনাক্রান্ত ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী জিনেহরর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ কক্ষ ত্যাগ।

২১শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর) : ' কাশ্মীর প্রদেশের মীমাংসা না হইলে পাকিস্তান ভারতকে বিশ্বাস করিতে পারে না'—পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের জেহাদী ভিঙ্গীবিঃ পাক সৈন্য দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকিবে না।

২৩শে আশ্বিন (৯ই অক্টোবর) : কাশ্মীরে দ্বিতাবধা বানচা করিতে চাহিলে বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে—নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী জিনেহরর সতর্কবাণী—খালের জলের প্রস্র ও কাশ্মীর প্রস্র সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ বলিয়া মন্তব্য।

২৪শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর) : কঙ্গো রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি জীবাজোখর দয়াল কর্তৃক আন্তর্জাতিক সুস্থতাকে (কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী) প্রত্যাশনের জন্য বিস্মোহী নেতা কর্ণেল মবুটু চবমপার বাতিল।

২৭শে আশ্বিন (১৩ই অক্টোবর) : উপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতার দাবী সংক্রান্ত প্রস্র—সাধারণ পরিষদে আলোচনার জর ক্রম প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভের প্রস্তাব গৃহীত।

২৯শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর) : বঙ্গা ও বঙ্গার রক্ত তাত্তবে পূর্বে পাকিস্তানে প্রায় চার হাজার লোকের প্রাণহানি—নোয়াখাতি ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের সহস্র সহস্র নব-নারী গৃহহীন।

অল্প হ্রাস সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে বুটেন, আমেরিকা ইটালী কর্তৃক ছয়টি পথ-নির্দেশক নীতি প্রসূত প্রস্তাব পেশ।

৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) : কিউবার আরও তিনজন আমেরিকানের আশ্রয়—'প্রতি বিপ্লবীদের' প্রতি কিউবার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ কাষ্ট্রোর সতর্কবাণী।

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর) : বিধি উদ্ভেদনা প্রস্রনে ২০টি দেশের মিলিত প্রচেষ্টা—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ জি. জি. বি ককসেন (ভারতের মুখ্য প্রতিনিধি) কর্তৃক ঘোষণা প্রস্তাব পেশ।

চাপা থাক

“আমাদের দেশে... নিধনের সময় কংগ্রেসকর্মীদের... আসাম কংগ্রেস... হাই কমিটি... না। কংগ্রেস... খুঁই বিচার... কংগ্রেস... উপদলের... সুতরাং ব্যাপ... কংগ্রেস... চূড়ান্ত... করেন নাই।”

—দৈনিক বসুমতী।

কলিকাতার প্রকোপ

“কলিকাতা... ইনস্টিটিউট... সংক্রান্ত... উদ্দেশ্য... রোগটি মূলতঃ... কিল্ড দেখা... ঠেকাইয়া... মরতমী... প্রাণের পক্ষে... রোগ কিছু... চূঃধের সতিত... হইতে আ... সত্বে বিশেষ... অথবা উপদেশ... কলিকাতার... বহু বেদনা... করিয়াছে। ই... অবস্থার পরিচায়ক... নিরোধ করিবার... কি নাই? সরকারী... বিভাগেরও কি এ...”

—আমৃত্যু... পত্রিকা।

আমৃত্যু...

“দিল্লীর... কলোনীতে... কর্তনক... করিয়াছে, তাহার... ব্যাপারে ‘ভাবতর... উদ্ভলোকের... তোলায় বেশী... কৃত্যবান... নাহী।”

**স্বাময়িক
প্রসঙ্গ**

ইটা ছাড়া উদ্ভলোকের নামে ব্যাঙ্ক ৩০ হাজার টাকার... আছে। ইনি... টাকা পাঠাইয়া থাকেন, তাহার মণি-অর্ডার... অসুস্থতান এখনও চলিতেছে। আরও ধনসম্পত্তি... বিচিত্র নহে। মাত্র দেড় শত টাকা মাসিক বেতনের... এমন ঐশ্বর্যশালী হইলেন কি প্রকারে তাহা কাহাকেও... কুলাইতে হইবে না। সরকারী অথবা অর্ধ-সরকারী... মধ্যে চূর্নীতির স্রোত যে প্রবল তাহার প্রমাণ ইতিপূর্বেই... গিয়াছে। কিন্তু কটকের রেল কলোনীর এই উদ্ভলোক... চূর্নীতি বিজ্ঞান হাজার হাজার সরকারী কর্মচারীকেও... শীর্ষস্থানে পৌঁছিবীর উপক্রম করিয়াছিলেন। দিল্লীর পুলিশ... তাহার বড় সাধে বাদ সাধিল। এই জন্তই বাংলা... “চুরি বিত্তা বড় বিত্তা যদি না পড়ে ধরা”

—সুপাত্তর।

বীরের মত উক্তি

“শোনা... সংযুক্ত... করিতেও... এরূপ নূতন... করিয়া সংখ্যা... আমরা... উগ্রসর হইবার... সঙ্গ ত্যাগ... বীরদের... পারে। তবে... বলিয়া প্রায়... মসজিদ... কংগ্রেসের... উকাত্ত শুধু এই... তাকাত্ত... তাকাত্ত... অনিবার্হ।”

—স্বাধীনতা।

লুপ্তনের সন্দ

“আমাদের... নামে... হইতেছে। বোর্ড... চেয়ারম্যান... হইতেছেন। ইহাকে... একটি... কিসাল... ”

মন্ত্রীর দাবিতে নোট চিহ্নিতলেন—Finance has been asked to agree, therefore Finance agrees, সেই ভেপুটি সেক্রেটারী আজ সেক্রেটারী হইয়াছেন এবং ঐ পদ সৃষ্টি অনুমোদন করিয়াছেন। মুসলিম লীগ আমলে এই এ. ডি. বাঁ নৌকাবিলাসের বাঁ সাহেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ইহার হাত দিয়া লোকসান হইয়াছিল। আজ ইহারই হাতে ২০ কোটি টাকার স্বয়ং কুলিয়া দেওয়া হইতেছে। বাঁ সাহেব চেনারমান, বিপ্লবন সিং সেক্রেটারী, যুগোস্লাভ-পাঞ্জাবী কণ্ট্রীর বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়া বাঙ্গলার স্বর্গরাজ্য ২৮না করিবে— ইহারও প্রতিবাদ হয় না। —মুগবাণী (কলিকাতা)।

মন্ত্রীর ক্রন্দন

“ঘটনার দুইদিন পরে পঃ বঙ্গের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীভূপতিভূষণ মজুমদার কান্দিতে ‘ভাল সময়ক্ৰন্দন’ সপ্তাহ উদ্বোধনের জন্ত কান্দী সহরে আসিয়াছিলেন। ভালগাছ রোপণ কর। ভাল গুড় খাও। ভাল রস আকর্ষণ পান কর। ভালের গাছ কাটিয়া বাজী তৈয়ারী কর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কথা জনসাধারণের কাছে প্রচার করিতে বাইরা অবশেষে কান্দী কাছারীর ভালবুক দুইটির অতাল অপহৃত্যুতে তিনি অক্রন্দন করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রকাশ।” —জনমত (মুর্শিদাবাদ)।

ইহা কি সত্য ?

“ইহা কি সত্য স্থানীয় সেচ বিভাগের W. G. F. ১১১নং গাড়ীতে ভট্টনৈক জটাঙ্গুধারী রত্নাকোথানা পরিহিত ব্যক্তিকে লইয়া প্রত্যাহ সাইথিয়া হইতে সিউড়া বাতায়াত করিতেছে ? কে এই ব্যক্তি ? সরকারী গাড়ীতে সরকারী কর্মচারী সমভিব্যাহারে সাইথিয়া সিউড়া বাতায়াত করিতেছে এবং সরকারী গাড়ী তথা পৌরী সেনের অর্ধের এই অপব্যবহার করিতেছে ? স্থানীয় সেচ-বিভাগের কর্তৃপক্ষ কি বলেন ?” —বীরভূম বাণী।

শোকসংবাদ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত সরকারের কমার্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস্‌ য়্যাণ্ড ট্র্যাডিস্টিকস্‌ের দূতপূর্ব ডিরেক্টর জেনারেল কলকাতার প্রখ্যাত নাগরিক রায়-বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১১ই আশ্বিন মহাপূজার সপ্তমীদিবসে ৮২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। পুণ্য বাসিন্দাধামে এঁর জন্ম এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ইনি বি. এ ও এল. এল. বি ডিগ্রী অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে ইনি ভারত সরকারে কর্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। ভারতে বখন ইণ্ডিয়ান ট্যাক্সি বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হয় ইনি তার প্রথম সচিব নিযুক্ত হন। এঁর দুই পুত্র কেন্দ্রীয় রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য শ্রী বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এম. কম পাঠরত শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাত কন্যা

সর্বশ্রী শ্রীমতীতরুলা মুখোপাধ্যায়, শান্তিলতা মুখোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, বিমলা ঘটক, অনিলা মুখোপাধ্যায় নিকোপাধ্যায় ও উম্মিলা মুখোপাধ্যায় ছয় জামাতা এবং বহু নাতি নানী বর্জন আশ্রয় তাঁর আশ্রয় সদগতি কাশনা করি।

শৈলজ মুখোপাধ্যায়

ভারতবিধাত চিত্রশিল্পী শৈলজ মুখোপাধ্যায় গত ১১শে আশ্বিন ৫৩ বছর বয়সে মহাশয়গে গহনায় মর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীগণের মধ্যে তাঁর নাম এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারী। সমসাময়িক কালে বে কলকাতার শিল্পী আন্তর্জাতিক চিত্র সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁদের অগ্রতম। ইনি এক নতুন শিল্পরীতির উদ্ভাষ পশ্চাত্য শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও নিজেকে ইনি কোম্পর্ক হারিয়ে ফেলেননি। কাঙড়া কলারীতির সাবলীল বেধাৎ লোকশিল্প সহজ সরল ভঙ্গীকে ভিত্তি করে নিরব অভিযান্ত্রিক রীতির প্রবর্তন করলেন এবং সেই রীতি অনুসরণ করেই হিসেবে অটুট প্রতিষ্ঠার অধিকারী হন। এঁর চিত্র ভারতীয় চিত্রশিল্পের এক অপূরণীয় কৃতি সাধিত হল।

সত্যকিঙ্কর সাহানা

প্রবীণ সাহিত্যসেবী রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সাহানা গত ২১শে আশ্বিন বাকুড়ায় ৮৭ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি বাকুড়ায় প্রসিদ্ধ সাহানা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য সাধনার ইনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং পক্ষে কল্যাণমূলক বহু কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আইন-সভারও ইনি একজন সদস্য ছিলেন।

শিবকালী চট্টোপাধ্যায়

বনামগজ অভিনেতা শিবকালী চট্টোপাধ্যায় গত ২৬শে মে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯৪০ সালে প্রথম সাধারণ বঙ্গালয়ে যোগদান করেন, তারপর বিভিন্ন উপায়ে বিপুল যশের অধিকারী হন। তিরিশ বছর কলকাতার সঙ্গ তাঁর অবিচ্ছেদ্য যোগ বিজয়ান ছিল। ১৯৩৯ সালে ইনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের সঙ্গে একটা শক্তিময় শিল্পীর আসন শূন্য হল।

বিজলীপ্রভা দেবী

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীমদমুখোপাধ্যায়ের জননী বিজলীপ্রভা দেবী গত ৪ঠা আশ্বিন মৃত্যুবরণ করেছেন। ৭১ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। শ্রীমদমুখোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় ভারতীয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী বিজলীপ্রভা দেবী কলকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যাপিকা মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ছিলেন। বোম্বাইয়ের চিত্রপরিদর্শন শাস্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এঁর অগ্রতম পৌত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

প্রকাশনা—১৯৬৬ খ্রীঃ অব্দে বিলিমবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, “বঙ্গবন্ধু রোটারী বেনিফে” শ্রীভারতনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অধিকার ও প্রকাশিত।

কিন্তু 'নাম' মাহুভাষাতি এবং বিবেকানন্দের এই শাখত বাগীই
চাওয়া খবিরে—

East is East, and West is West,
Twin shall never meet—

এই নেতৃত্বকে যুক্তিকে ধূলিসাৎ করেছে। আমাদের কবি
হয়ে এই মহামিলনের গান :—

“হে রত্নবীণা বাজো, বাজো, বাজো,
সুগা করি দুবে আছে বাবা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামিলনের সাগর তীরে।”

এমনভাবে অস্তের ধর্মকে সুগা না করে তার মধ্যে সত্যের
স্বাক্ষর চোটা একমাত্র ভারতেই হয়েছে—এ তা ভারতীয় সংস্কৃতির
দা। তাইতো আজ পৃথিবীর শতকোটি লোক দক্ষিণেশ্বরের
শুভীতলে মিলিত হয়েছে—গেয়েছে আমাদের মহামিলনের গান।
সংস্কৃতির এই পরিচয়ই শাখত—বা ভারতবাসীকে দিয়েছে
স্বয়ং প্রেমরাজ্যের সন্ধান—করেছে তাকে অহিংসপ্রেমিক। তাই—
“India offers unity in diversity” এ কথা সত্যতা
যেই আমরা দেখতে পাই।

এইবার আমরা ভারতীয় রাজধর্মের বখার্ব স্বরূপটিকে দেখতে
। ভারতবর্ষের রাজধর্ম ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ
এই কবিতায় এই রাজধর্মেরই মহিমা কীর্তনে ব্রতী হইয়াছেন—
স্বয়ং আদর্শকে রূপায়িত করেছেন উদাহরণের মাধ্যমে। বিশেষতঃ
‘প্রতিনিধি’ কবিতায় দেখতে পাই—ভারতীয় নৃপতির
আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন—নৃপতি
শুকী ও গুরুদেব রামদাস বাবাজীকে। একটা কাহিনীর
স্বরূপে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন—ত্যাগমণ্ডিত প্রতিনিধিই
ভারতীয় রাজ ধর্মের স্বরূপ। গুরুরামদাস শিষ্য শিবাজীকে ভারতের
স্বয়ং রাজধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। শিষ্যকে তিনি সর্বত্যাগী
হইয়াছেন—আবার তাকেই প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করবার ভার
দিয়েছেন—শাসককে টেনে এনেছেন শাসিতের অতি নিকটে।
নিঃস্বার্থ প্রেমমাত্র সার্বিকাই ভারতে শাসককে পিতার আসনে
শাসিতকে পুত্রের আসনে বসাইয়াছে। প্রতিষ্ঠিত করেছে
সম্প্রদায় উন্নত মনুষ্যধর্মকে।

এ দেশের রাজারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ঐশ্বর্য—বৈভবের
সমারোহ প্রদর্শন করতেন না—ভোগ বিলাসে নিমগ্ন থেকে জীবন
অতিবাহিত করতেন না। রাজ্যশাসন—প্রজাশাসন ব্যাপারটিকে
তারা উচ্চতর মানব ধর্মেরই অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। অধ্যাত্মত
ভারত যুগ যুগ ধরে যে প্রদীপ্ত মনুষ্যধর্মের সাধনা করেছে ভারতের
নৃপতিবৃন্দও উহাকে নত মস্তকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। যুগ-প্রাচীন
ভারতে সেই সাধনার—সেই তপস্যার প্রেরণাবশে মনুষ্যধর্ম ও
ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে রাজ্যের অধীশ্বর প্রজাপুত্রের সেবার
আপনাকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিতেন। ইহাই ভারতবর্ষের চিরন্তন
রাজধর্ম। রাজর্ষি জনক, রাজা ভরত, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি এই
রাজধর্মই পালন করে গেছেন।

“তেন ত্যাগেন তুজীথাঃ মা গৃথঃ”—উপনিষদের মহাবাক্যই
ভারতের রাজধর্মের আদর্শকে প্রকটিত করে। আধ্যাত্ম ভারতবর্ষ
তার রাজধর্মকে শিখিয়েছে—তাজিতে মুকুটলগু সিংহাসনভূমি—
ধরিতে দরিদ্রবেশ। কারণ ভারতীয় দৃষ্টিতে রাজা বিশ্বপতির
প্রতিনিধি মাত্র। বিশ্বাধিপতির এই বিশাল রাজ্যে রাজা তাঁহার
প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করেন। সেও তাঁহার রাজ্যের একজন
সামান্য প্রজা বই আর কেউ নয়। কাজেই বিশ্বপিতার অতুল
ঐশ্বর্য বা তাঁহার সমস্ত প্রজাবৃন্দের মঙ্গলের জন্য প্রতিনিধি তথা
রাজার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহাকে যথেষ্ট ব্যবহার করবার
অধিকার তাঁর নেই। কিন্তু প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে লোভ সঞ্চার করে
প্রজারঞ্জন করা বড় শক্ত। তাই এদেশের সর্ব সাধারণের মঙ্গলের
জন্য রাজাকে নিতে হয়েছে ত্যাগের দীক্ষা। কারণ ত্যাগের আশুনে
লোভ, মোহ ইত্যাদি গুড়ে ছাই হয়ে যায় তার, তারই উপর
প্রতিষ্ঠিত হয় কর্তব্যপালনের অদম্য অটল ইচ্ছাশক্তি। কর্তব্য
পালনে শৈথিল্য আসে ভোগ লালসা থেকে—আর এই শৈথিল্যই
আনে সকলের জীবনে মহাঅকল্যাণ অঙ্কুরিত করে মহাবাসের
বীজকে। রাজা যদি কর্তব্য পালন না করেন, তবে অপরাধী তথা
মহাপাপী হন। আর সেই পাপের ফল ভোগ করে তাঁর সন্তানগণ—
তাঁর প্রজাবৃন্দ। তাই এই ধর্মের হাত থেকে—কর্তব্যশৈথিল্যের মহা
অপরাধ হ’তে দেশকে—প্রজাগণকে বাঁচানোর জন্য রাজাকে শিখতে
হয় রাজধর্ম—ত্যাগমণ্ডিত কর্তব্যপরায়ণতা। ভারতবর্ষ এই সত্য
জানিত—তাই তার নৃপতির আদর্শ ঐরূপ।

যে বীর, সে-ই ত্যাগ করিতে পারে ; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের
ভয়ে একহাতে চক্ষু মুছিয়া থাকে, আর একহাতে দান করে ;
। তাহার দানে কি ফল ? জগৎপ্রেম অনেক দূর ! চারাগাছটিকে
ঘিরিয়া রাখিতে হয়, বন্ধ করিতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থ
ভালবাসিতে শিখিতে পারিলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা
যায়। ইষ্টদেবতারিণেবে ভক্তি হইলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে ঐতি
হইতে পারে। অতএব একজনকে অন্য আত্মত্যাগ করিতে পারিলে
তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা বলা উচিত, উহার আগে নহে।
সকাম হইতেই নিষ্কাম হয়। কামনা না অগ্রে থাকিলে কি
কখন তাহার ত্যাগ হয় ? আর উহার মানেই বা কি ? অন্ধকার
না থাকিলে কি কখন আলোকের মানে হয় ?

কল গড়িয়ে এসে বন্ধিমবাবুর জুতোর তুড়ে এসে ঠেকেছে। তিনি তখন সেই দিকে তাকিয়ে বন্ধিমবাবুকে উদ্বেগ করে বললেন— বন্ধিম চট্টো ভেঙ্গে গেলো রে! বন্ধিম চট্টো ভেঙ্গে গেল বন্ধিমচন্দ্র বসিকতাটা বুঝে উত্তর দিলেন—দামোদর মুখো হয়ে বুকি? দেখুন, হুজুর লেখক স্থান, কাল, পাত্রের মধ্যে কাল এবং পাত্র প্রায় ঠিক বেছেছেন, কিন্তু স্থান সবচেয়ে হুজুরেই ভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ এক বিশেষতঃ যেটা আমার মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে হুজুরেই জানেন পরিহাসটা কোথায়। “দামোদর মুখো” এই কথাটা হুজুরেই জানেন, কিন্তু পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন ধারায়, ফলে পরিহাস ঠিকই থেকে গেছে, কিন্তু পটভূমি-পার্শ্ব পেছে ফলে বসিকতাটা আমরা ছোটো লেখার ছরকর ভাবে অনুভব করেছি। এতে লাভও হয়েছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কার কথা সত্যি? হুজুর লেখার পটভূমির মধ্যে একটি নিশ্চয় বানানো, হয়তো ছুটিও বানানো হতে পারে, তাতে লেখকের লাভ কি হোল? ইতি— বিজয় বড়াল। ৭৫, রাজবল্লভ সাহা লেন। হাওড়া।

আপনার মাসিক বসুমতী ৩৮বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা কালীন ১৩৬৬ সনের একটি প্রবন্ধে (বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন) শ্রীমদময়ঙ্কন ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত (৭৪০ পৃঃ) “রাজা সুবোধ মন্ত্রকের অর্থে হুয় মাসের জেল হয়”। যে বিবরণ পত্র প্রকাশিত, তাতে একটি-বিশ্লেষণ ঘটানো। বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য প্রকৃত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করা বাঞ্ছিত করিবেন। “রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমন্ত্রকের অর্থে বন্দেমাত্যরম পত্রিকা স্থাপিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু ইহার প্রধান সম্পাদক পদে বৃত্ত হন—বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়। সহকারী সম্পাদকবর্গের মধ্যে ছিলেন—অরবিন্দ। রাজনীতিক মতানৈক্যের ফলে বিপিনচন্দ্র উক্ত পত্রিকার সংগ্রহ পরিত্যাগ করেন। অরবিন্দ প্রধান সম্পাদক হন। সরকার কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের মামলার অরবিন্দ অভিযুক্ত হন ও সরকার পক্ষ বিপিনচন্দ্রকে সাক্ষী মস্ত করেন। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় আসামী পক্ষ অবলম্বন করেন। দাশ মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অহুরোধে বাধ্য হয়ে উক্ত মোকদ্দমার সাক্ষ্যপ্রদান করেন নাই। তিনি আদালতে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন যে, “আমি এ মোকদ্দমার সাক্ষ্য দেবো না”। আদালতের অবমাননার জন্য তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয় ও তাঁকে বঙ্গের জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তথ্যের থাকাকালে তিনি “জেলের খাতা” নামে একখানা পুস্তিকা লিখেছিলেন। পাল মহাশয় সাক্ষ্য প্রদান না করার জন্য প্রমাণভাবে অরবিন্দ অব্যাহতি পাইয়াছিলেন”। ইতি—নিবেদক—শ্রী উপেন্দ্রনাথ দত্ত। কালীনগর চাঁ-বাগান, পোঃ রামকৃষ্ণনগর (কাছাড়)।

কার্তিক সংখ্যা ১৩৬৬ বসুমতীর “আমার কথা (৫৮)” পড়তে গিয়ে একটা মারাত্মক ভুল চোখে পড়লো—বার প্রতিবাদ না করে পাবলুম না। “আমার কথা” প্রসঙ্গে শ্রী অমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন—৬ম বিধান অভিনেতা হবি বিশ্বাসের পিতামহ। অভিনেতা শ্রী হবি বিশ্বাস হোলেন আমাদের গ্রাম সম্পর্কিত কাকা, সেই হুজুরে আমার বা জানা আছে তাতে মনে হয়

হবিকাকার পিতামহের নাম (বঙ্গীয়) মহাশয় কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস। এবং হবিকাকার পিতার নাম ৬ম পতিমোহন বিশ্বাস। সুশান্তিবাবু ও হেমবাবুর সঙ্গে বন্ধু হাড়া আর কোনো সম্পর্কই বোধহয় ছিল না বোসেই আমার জানা আছে। “পাঠক-পাঠিকার চিঠি” বিভাগে আমার এই চিঠিখানি প্রকাশ করা হলে খুসী হবো। নমস্কারান্তে—শ্রীনীলিমা মজুমদার C/o শ্রী বি. এস. মজুমদার, নিউ ভাঙ্গবাংলো বোড, পাটনা-১ (বিহার)।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

I am sending herewith—Rs 7-50. Kindly adjust it against membership—J. K. Chandra—Maharashtra.

This is a payment of our annual subscription for M. Basumati—Lady Kenne Girls College, Shillong.

Subscription for monthly Basumati is sent herewith. Please enlist us as subscribers of the Journal.—

1. Herrn Ashim Kumar Ganguly, Memminger Strasse-39. Ochsen Hausen/Wurt, West Germany.
2. Mr. S. N. Dass. Govt. Secondary School, Port-Sudan, Sudan.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া প্রতিমাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাঞ্ছিত করিবেন। মিসু বীথিকা মিত্র, শিলচর, আসাম—
মিঃ কে. এম. সিংহ, রিটার্ড প্রোফেসর—দাদুহান বোড, বাঁচী।

ডাঃ এস. কে. মুখার্জী—পারোয়াল, উত্তরপ্রদেশ।
The Head Master and the staff of the Nishimayee Compt. Basic School, Nishiganj, Cooch Behar.

- শ্রীমতী বেধা ব্যানার্জী, হিবনপুর—দাঁড়তাল পরগণা।
- শ্রীমতী বাণী ব্যানার্জী, কলিকাতা।
- শ্রীভোলানাথ মুখার্জী, দুর্গপুর, বর্ধমান।
- মিসেস রেণুকা দেবী, বোম্বাই।
- Surg/Lt A. K. Chatterjee, Bombay-1.
- শ্রীমতী পুনীতি দে সরকার, সৌরাষ্ট্র।
- আমি পুনরায় ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ৭'৫০ পাঠাইলাম। প্রাপ্ত হইতে আবার বহু পাঠাইয়া বাঞ্ছিত করিবেন—শ্রীপ্রভাতা দে, শিবসাগর।

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা (প্রাপ্ত হইতে পৌঁষ ১৩৬৭ সাল) ৭১০ টাকা পাঠাইলাম—জাবনাপ্রভা দে, দিল্লী।

Please accept my subscription for Kartick to Chaitra 1367 B S. on account of your monthly.—Ava Rani Devi, Kanpur.

Subscription for six months for Monthly Basumati which please acknowledge and continue from Kartick onwards.—Aparna Pal, East Nizam, M.P.

প্রাচীনভারতে গণতন্ত্র ও তার পরিণতি

শ্রীমদ্রায়চৌধুরী

আজ সারা পৃথিবী জুড়ে মানবাত্মার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনা যাচ্ছে। সত্য ও জ্ঞানের অধিকার-প্রযুক্তি মানুষ হাছাকার হচ্ছে। তাই বিশ্বের সাধারণ মানুষ আজ গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকছে। আজকের এই চেতনা ন্যূনাত্মক আড়াই হাজার বছর আগে ভারতে কতখানি সার্থকতা লাভ করেছিল, বৈশালীর ইতিবৃত্ত লেখকগণের অস্তর্গত মন্তব্যের বসতি গ্রামে প্রাচীন বৈশালী বসতি ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পক্ষ হতে ধননকার্য দ্বারা Dr. Bloch এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন। Dr. Iteckar এর মতে “Establishment of the Vaisali public took place about 30 generations or 600 years before this event (Bharata War).— Approximate date of this Constitutoinal change is C. 2000 B. C. ডাঃ সরকার মনে করেন যে খৃঃ পূঃ ২৩০০ থেকে মোহন-জো-দরোর সভ্যতার শেষভাগে অথবা প্রাক-আর্য সভ্যতার প্রাককালে (খৃঃ পূঃ ৩,৭৫০—২০০০) ও উত্তর ভারতের ক বিরাট অংশ নির্বাচিত মানুষের দ্বারা শাসিত হত—রাজাদের দ্বারা নয়। অতএব মানব ইতিহাসের এই গণতন্ত্রের কথা আমাদের বিশ্বাসের বিষয়।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। রাজতন্ত্রের উপর লোকের যেন একটা স্বভাব-বিষেব দেখা দেয়। ফলে উত্তর ভারতে কতকগুলি গণতান্ত্রিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ভগবান বুদ্ধের বহুপূর্বে বৈশালীতে গণতন্ত্র বিস্তারিত ছিল। ধানকার রাজতন্ত্র কি করে এই গণতন্ত্রে পরিবর্তিত হল তার উৎসাহ আজ অপরিজ্ঞাত। তবে অনেকে অনুমান করেন, বাণিজ্য মাঝে সমৃদ্ধ বৈশালীতে বৈশালী প্রভুত্ব বিস্তারিত অধিকারী হয়ে পড়ে। রাজা নাভাগও সুপ্রভা নামে ধনী এক বৈশালীকে বিবাহ করেন। ফলে রাজতন্ত্রে বৈশালী প্রভাব বিস্তার লাভের সাথে সাথে দেশে বিপ্লব ও সংঘাত দেখা দিল, হয়ত প্রজাতান্ত্রিকতা তারই অবশ্যস্বার্থী পরিণতি। প্রাচীনকালে গণকথাটা নামে একটা স্থান ছিল। সেই স্থানে নরগণের গণতান্ত্রিক রাজ্য গড়ে ওঠে। বৈশালী, লিচ্ছবি ও অনারার মত প্রমুখ এই নরগণকে একত্রে আবদ্ধ করে গড়ে দেয় বজ্রসংঘ। মোট আটটি জাতি নিয়ে হল এই সংঘ। বজ্র, লিচ্ছবি, বিদেহ ও জাতুক তারমধ্যে ছিল প্রধান; এ ছাড়া আরও আটটি জাতি ছিল ভোগ, উগ্র, ইন্দ্রকু ও কুরু। লিচ্ছবির রাজ্য বৈশালীই ছিল এই সংঘের প্রধান নগর। এই সংঘের প্রতিটি রাজ্যই আভ্যন্তরিক শাসন-ব্যাপারে পুরা স্বাধীন ছিল। সমগ্র বৈদেহিক নীতিই ছিল সমবেত সংঘের অধীন। কোন সামরিক আক্রমণ সংঘেও সংঘই কর্তৃত্ব করতেন। সংঘের সদস্যদের অধিকার সমান ছিল। কেহ রাজা বা মহারাজা ছিলেন না। জনসাধারণের ৭৭০ জন প্রতিনিধি দ্বারা রাজকার্য পরিচালনা করা হত। বজ্রসংঘের মধ্যে লিচ্ছবির শাসন প্রাধান্য

অবশ্য আত্মীয় ছিলেন। অনেক সময় ঐ আত্মীয়-প্রধান ব্যক্তিরাই গণসভার সভ্য নির্বাচিত হতেন। এই গণসভা রাজকার্যের সুবিধার জন্য একটি ছোট প্রভাবশালী-সভা গঠন করতেন, তাকে বলা হত ‘অষ্টকুলক’। আটজন গণরাজা এই সভার সভ্য হতেন। আর গণসভা গণসভা দিয়ে এই গণরাজাদের নির্বাচিত করতেন। গণসভাকে গণসম্মিলিত আর গণভবনকে বলা হত সংঘাগার (সংঘাগার)। গণরাজাদের যখন সভাতে যেতেন তখন ব ব রত্নের পোষাক পরে যেতেন, আর তারা যে যে অস্বাস্থ্যবোধে যেতেন তাদের রত্নও পোষাকের অঙ্গুরণ থাকত। বৈশালীর রাজ্যে প্রথম অটালিকা-বেষ্টিত একটা পুঙ্খবিনী ছিল—তার নাম ছিল অভিবিন পুঙ্খবিনী (বর্তমান ধরোনা পাথর)। নবনির্বাচিত গণরাজাদের এখানে খুব সমারোহে অভিবিন হতেন। এই পুঙ্খবিনী দিয়ে অগণিত নরনারীরা অভিবিন বিধি দেখতেন। কথিত আছে যে নবনির্বাচিত গণরাজা মহালি যখন এই পুঙ্খবিনী হতে প্রান করে অভিবিন হয়েছেন সেই সময় সংবাদ আসে মহারাজ বিবিসার দ্বারা বৈশালী আক্রমণ করতে আসছেন। আরও সংবাদ আসে মহারাজ চটকের বোন ত্রিশলা এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করেছেন। এই শুভ অবসরে মহানায়ক তাঁর নাম রাখেন ‘মহাবীর’। ইনি পূর্বে ২৪ তীর্থঙ্কর রূপে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়েছিলেন।

মহাবীর বর্তমান ও ভগবান বুদ্ধের বিহার-ক্ষেত্র ছিল বৈশালী। বৈশালীর নিকট কুণ্ডগ্রামে (বাগকুণ্ডে) মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। এবং কোলহা গ্রামে যেখানে অশোকস্তম্ভ আছে এখানেই ছিল ‘মহাবন’ বিস্তৃত ‘কুটামার-শালা’। ভগবান বুদ্ধের ঐ স্থান ছিল বড় প্রিয়। এই দু’মহাপুরুষের লীলাক্ষেত্র বলে প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের মধ্যে বৈশালীর প্রাচীন কীর্তি-পাথর কিছুটা আনন্দ জানতে পারি। হিমালয় হতে সমুদ্র পর্যন্ত সুবিস্তৃত মহাবনের আবহাওয়ার বৈশালী নগরী অবস্থিত থাকার মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের কথায় বলা চলে পাটলিপুত্রের মত বৈশালীর নগর-প্রাকার ছিল শাল-কাঠের নির্মিত। এমনি কি বৈশালীর শিল্পীরা যে সুলক্ষণ সুলক্ষণ শিল্প সাধনা করতেন, তার আধার ছিল কাঠ ও মাটি। ফলে আজ আর তাদের সাক্ষাৎ-প্রমাণ সম্ভব নয়। কালের অঙ্কুরে আজ সেই সব সভ্যতার অপরূপ নিদর্শন চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে।

উত্তর-বিহারের বজ্রসংঘের মত হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের মত এক শাক্যদিগের মধ্যেও জনতান্ত্রিক প্রভাব বিস্তারিত ছিল। তাছাড়া পাঞ্জাবেও শক্তিশালী সংঘরাজ্যের বর্ধিত পরিচয় আজ পুরাতত্ত্বের প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে। পাঞ্জাবে বৌদ্ধের জাতির হাজার বছরের গৌরবের কাহিনী আবিষ্কৃত অভিলেখ, মুদ্রা ও শিল্পকর্মের দ্বারা আজ সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাছাড়া মালব, শিবির, কুরুক আদি সংঘরাজ্য বোধ করি বৈশালীর সমকালীন ছিল।

ভারতীয় সংঘরাজ্যের মধ্যে বজ্রসংঘের শাসক ও সংঘপ্রধান ছিল সর্বাঙ্গের সুব্যবস্থিত আর এই সম্রাট ভগবান বুদ্ধও অভিবিনের বৌদ্ধসংঘের ‘বিনয়-নিয়মে’ বৈশালীর অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সিদ্ধেছিলেন। 'দীর্ঘনিকায়' অবলম্বনে জানা যায়, অজাতশত্রু বৈশালীর সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বজ্জিদের ব্যবহার অভিপ্রায়ে উপদেশার্থে অমাত্য বর্ষকারকে বুকের পাঠান। অজাতশত্রুর অভিসন্ধি জেনে বুদ্ধ আনন্দকে লক্ষ্য রাখিলেন, "বতদিন বজ্জিগণ সজা করে কাজ করবে, বজ্জিদের উন্নতি হবে, অবনতি নহে।" এই প্রসঙ্গে বজ্জিদের কয়েকটি গুণের প্রশংসা করেন: বৈশালীরা অজাতশত্রুর সত্যের বহু মত নিয়ে কাজ করতো, [২] সংঘবন্দ-ন্যে কিছু করতো, [৩], বজ্জি ধর্মবিরোধী অতৈবধনিক কোন করতো না, [৪] বুদ্ধদের শ্রদ্ধা করতো ও তাঁদের উপদেশ করতো [৫] মহিলাদের সম্মান করতো [৬] দেবস্থানের শ্রদ্ধা নিবেদন করতো, [৭] অহতদের সুখ-সুবিধা বিধান করতো। উপরের সাতটি গুণের কথা শুনে বুঝা যায় বৈশালীর তাত্ত্বিক ব্যবস্থা, শ্রী ও বুদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা ও উদার ধর্মমতের মহামানব বুদ্ধও এদের উন্নতি কামনা করতেন।

বৈশালীর অজাতশত্রুর জায়-ব্যবস্থা খুবই সুন্দর ছিল। কোন অপরাধীকে বজ্জিসংঘের শাসকেরা ধৃত করে শাস্তি না দিয়ে 'বিনিশ্চর' নামাঙ্কের হাতে সমর্পণ করতেন। ইনি বিচার করে নিরপরাধ হলে ক্ষেপে দিতেন, অজাতশত্রু 'ব্যবহারিকের নিকট' যথাবিধি ব্যবহার জ্ঞান দিয়ে দিতেন। এইভাবে বিধিক্রমে সর্বশেষে অপরাধী 'গণপতির' হাতে সমর্পিত হত। তিনি 'প্রবেশি-পুস্তকে' লিখিত অপরাধ বহুসংখ্যক দণ্ডবিধান করতেন। 'বিনিশ্চর-মহামাত্ত' ও 'ব্যবহারিক' ছিলেন ভার্যাদিকারী।

"লিছবি যুবক কাঠের বালিশে শয়ন করে, তারা পরিভ্রমী, উৎসাহী। তারা আলস্যহীন কঠোরভাবে জীবন যাপন করে। বতদিন এদের মধ্যে এই গুণাবলী বিস্তারিত, ততদিন এদের পরাজিত করা যায় নহে।" ভগবান বুদ্ধের এই উক্তি পরেও বজ্জিসংঘের কি করে গঠন হল তা বৃত্ত: আলোচনীয়।

আবশ্যকচূর্ণি (উত্তরভাগ) হতে জানা যায়,—বৈশালী গণ-তন্ত্রের অধিনায়ক চেটকের সাতটি পরমানন্দরী কন্যা ছিলেন। এদের পাঁচজনের বিবাহ হয়ে গেলে বাক্যক্রমে সর্বকনিষ্ঠ সুলোচনা ও সেরগা অবিবাহিত রয়ে গেল। এই সময় মগধরাজ শ্রেণিক (বিবিসার) সুলোচনার পাণিপ্রার্থী হয়ে চেটকের নিকট আবেদন জানালেন কিন্তু 'হৈহয়'-বংশোদ্ভব চেটক 'বাহীক' বংশীয় শ্রেণিককে চূণাপূর্বক প্রত্যাখ্যান করলেন। মধ্যভারতের একচ্ছত্র সম্রাট শ্রেণিক এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং সুলোচনার সম্মতিক্রমে তাঁকে হরণ করবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। অবশেষে ঘটনাচক্রে সুলোচনার হানে চেরণাকে হরণ করে তাঁকে শ্রেণিক বিবাহ করলেন। এমনি করে বজ্জিসংঘের সাথে প্রতিবেশী মগধরাজের সংঘর্ষের সূত্রপাত হল। যে চেটক গণতান্ত্রিক বজ্জিসংঘের চরম জীবুদ্ধিসাধন করেছিলেন, তাগোয় পরিহাসে তাঁরই দৌহিত্র (চেরণার পুত্র) মগধাধিপতি কুণিকের (অজাতশত্রুর) কুটচক্রান্তে তার ধ্বংস হয়ে গেল।

বুদ্ধের যে সময় বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন সেই সময় গজার কুলে একবোজনবেষ্টিত একটা মনোরম বন্দর ছিল। এর অর্ধেক

ত্রব্যাদি নির্গত হয়ে নদীতে পড়ত। মহারাজ অজাতশত্রু এই সব ত্রব্যাদি নিজের বলে দাবী করতে থাকতেন কিন্তু উৎসাহী লিছবিগণ তার পূর্বে যেয়েই ঐ সকল ত্রব্য সংগ্রহ করে আনত। ফলে অজাতশত্রু লিছবিদের প্রতি শক্রভাবাপন্ন হয়ে পড়লেন এবং অচিরেই তাদেরকে ধ্বংস করবার অভিপ্রায়ে গজার কুলে পাটলিগ্রামে নগর-পূর্ণ নির্মাণ করলেন। লিছবিদের সম্মুখসংগ্রামে পরাজিত করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। সেইজন্য তিনি বুদ্ধদেবের নিকট অমাত্য বর্ষকারকে পাঠালেন। কিন্তু বর্ষকার তথাগতের নিকট লিছবিদের ভূয়সী প্রশংসা শুনে মগধে কিরে এলেন আর কুটচক্রান্ত দ্বারা তাদের পরাজিত করবার জগু ছিন্ন অশেষণ করতে লাগলেন। পরে বর্ষকার ছল করে অজাতশত্রু দ্বারা মস্তক মুণ্ডিত এবং লাহিত হয়ে মগধ হতে বিতাড়িত হলেন। পরে গঙ্গা পার হয়ে বৈশালীতে উপনীত হয়ে অজাতশত্রুর যথেষ্ট নিন্দাবাদ করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর কুটনীতিবলে বজ্জিসংঘের আস্থা অর্জন করে প্রশাসনিক-বিভাগে উচ্চপদে আসীন হলেন এবং সেই সুযোগে লিছবিদের মধ্যে ভেদ-বিভেদের সৃষ্টি করে কয়েক বছরের মধ্যেই আপন অতীষ্ট কার্য সিদ্ধ করলেন। তখন ধর্মগ্রন্থে আরও একটা ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। 'মহারাজ বিবিসার জীবিতকালে কুণিকের ছোট ভাই বেহলকে 'সেরগ-হাতী' আর বহুমূল্য 'অটোরসংক' হার দিয়ে গিয়েছিলেন। কুণিকের পত্নী ঐ দুটি জিনিস স্বামীর কাছে চাইলেন। কুণিক শ্রীর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্ত ছোট ভাইয়ের নিকট ঐগুলি দাবী করলেন। কিন্তু বেহল এ দুটির পরিবর্তে অর্ধেক রাজ্য দাবী করলেন। এতে কুণিক ক্রুদ্ধ হয়ে ঐগুলি জিনিস অবিলম্বে লাভের জন্ত চাপ দিতে থাকেন। বেহল বেগতিক বুঝে দাদামশায় চেটকের আশ্রয় নিলেন। তখন অজাতশত্রু চেটকের নিকট দূত পাঠিয়ে ঐ হার, হাতী আর বেহলকে ফেরৎ চাইলেন। উত্তরে মহানায়ক চেটক জানালেন: কুণিকের মত বেহলও আমার দৌহিত্র। শ্রেণিক জীবিতকালে তাকে হার ও হাতী দিয়ে গেছেন, ঐগুলি বেহলের। যদি রাজ্যের অর্ধেক ভূমি বেহলকে দিতে সম্মত হও তাহলে হার-হাতী-বেহলকে ফেরৎ পাবে। এই উত্তরে কুণিক ক্রুদ্ধ হয়ে বৈশালী আক্রমণ করেন। রাজা চেটক নবমন্দি ও নবলিছবি গণরাজ্যের সম্মতিক্রমে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হলেন কিন্তু চূর্তাগ্যক্রমে এই বুদ্ধে চেটকের পরাজয় হল এবং তিনি শোচনীয়ভাবে এক কুঁয়ার মধ্যে লাকিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। এইভাবে গণতন্ত্র-লিছবিদের পতন হল। ঐতিহাসিকদের অভিমত: কুণিকের সাম্রাজ্য-লিপ্সা রাজবংশের পারম্পরিক ঘেব ও বৈশালী-গণতন্ত্রের বিত্তব এই পতনের মূল কারণ।

প্রাচীন-ভারতের এই গণতন্ত্রের বিদ্যুত-ইতিহাসের সম্যক পর্যালোচনা সম্ভব হলে আজকের ভারত শুধু পৌরবাধিত হবে না—সেই আদর্শ অনুকরণে অগতে বঙ্গীয় হয়ে উঠতে পারে। আমরা সেই অনাগত দিনের জয়ধ্বনি করি।

এই প্রবন্ধ রচনার নিয়োক্ত পুস্তক ও আচার্যগণের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি:—

কৌল ও জৈন ধর্মগ্রন্থ, বিনয় পিটক, দীর্ঘনিকায়, আবশ্যকচূর্ণি, প্রাচীন ভারত, মৈত্রায়ণ, মৈত্রায়ণ বিজয়েশু সুরী, ডাঃ

ভারতীয় রাজধর্ম

শ্রীকল্যাণকুমার ভট্টাচার্য

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির ধারা বিভিন্ন। সব দেশের মত ভারতেরও নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। ভারতের সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়। নানা বিভক্তদের মধ্যে একতান জাগিয়ে তোলা—তথা নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ভারতের চিরন্তন সাধনার মূল ধারাটিও এই সংস্কৃতির বাহক। ভগবান যুগে যুগে পাঠিয়েছেন তাঁর যোগাত্মক সাধক মহাপুরুষকে নানা বৈচিত্র্যের তথা বিভক্তদের মধ্যে একের সাধনা করার জন্য। এই একের সাধনার নিরয়োজিতদের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে যুগপুরুষ। ভারতের বৃক্ক, রামকৃষ্ণ, রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন যুগের সব যোগসাধক মহাপুরুষের দল এই কাজই করে গিয়েছেন। এই যুগেও মহাপুরুষের পর মহাপুরুষ, এই কাজই করেছেন—ভবিষ্যতেও করবেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইটাই হ'ল মর্ম্মকথা।

এই একের সাধনা তথা যোগ আজও শেষ হয়নি। যতদিন এই যোগস্থাপন চেষ্টার প্রয়োজন থাকবে, ততদিন ভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধকদের ক্রমাগত এদেশে পাঠাবেন। ভারতে ভগবান হয়ত বৈচিত্র্যকেই চেয়েছেন। তাই ধর্ম্মে, বর্ণে, আচার-ব্যবহারে-ভাষায় তিনি সৃষ্ট করেছেন বিভক্তদের দুর্গম বেড়া। এই তো এখানে কোন প্রবল সভ্যতা বা সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল অল্প সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিনাশ করেনি। সবাই পাশাপাশি বন্ধুভাবে বাস করেছে। বিভিন্নতা থাকলেই বা বিঘ্ন কেন জাগবে? এখানে ভগবান হয় তো চান সকল সাধনার মধ্যে মৈত্রী এবং সকল সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় স্থাপনা। ভারতে মহাপুরুষ তাই যুগে যুগে এসেছেন মহামিলনের—মহাসমন্বয়ের বাণী নিয়ে। প্রেমের পথে আপন সাধনা-লক্ষ ফল দিয়ে রচনা করেছেন মিলনের মহাসেতু। জগতে আর কোথাও ঠিক এমন দেখা যায় না। সেখানে এক ধর্ম্ম বা সংস্কৃতি অল্প সব দুর্বল ধর্ম্ম বা সংস্কৃতিকে মেয়ে কলে সমস্তা গোজা করে দিয়েছে। সে সহজ পথ ভারতের নয়। ভারতের মহাপুরুষেরা সকলেই মানবের মধ্যে তথা নানা ভেদ-বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সেতু রচনা করার মহামন্ত্রই ঘোষণা করে গিয়েছেন।

ভারতের শাস্ত্রের বা সারস্বত কথা তাই দিয়েই ভারতীয় সাধনার পরিচয়। ইহ লোকের সাধনা হ'ল সংস্কৃতি। অনন্ত লোক নিয়ে সাধনা হ'ল ধর্ম্ম। ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যেই অনেক যুগের অনেক মানবমণ্ডলীর নানা দান মিশে আছে।

ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় আর্ষাদের আসবার পূর্বের অবিভক্ত সভ্যতাকে আধেরা নষ্ট করেনি। অবিভেদে তৎপূর্ব সব সভ্যতার উচ্ছন্ন সাধন করেনি। এইভাবে বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পলিমাটি দিয়ে স্তরে স্তরে ভারতের সংস্কৃতি-লোকটি গড়ে উঠেছে। বর্তমান হিন্দু সংস্কৃতি আর্ষ-অনার্ঘ-অবিভক্ত সভ্যতার সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে।

বস্তুত: "আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনের দেশ।

সুদূর অতীত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবজীবনের য় আদর্শগুলি বিস্তারিত রহিয়াছে। প্রাচীন আর্ষসভ্যতার এক ধার ইউরোপে ও একধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। ইউরোপে ধারা দুই মহাকাব্যে ও ভারতে ধারা দুই মহাকাব্যে আপন কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে। ভারতবর্ষ বহু শতাব্দীর যত-প্রতিঘাত, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত সাম্রাজ্য প্রথা ও আচারের আবির্ভাব সত্ত্বেও এখনও বাঁচিয়া আছে ভারতের জীবন অমর—প্রাণশক্তি অক্ষয়। ইহা কখনও কে কোন পর্ব্বত অপেক্ষা অচল। বস্তুত: ভারতের জীবন আদর্শ মত অনাদি, অনন্ত ও অনির্কারণ। বিভিন্ন যুগধারার সঙ্গে মিলিতে গিয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহির্ভাগে বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু ইহার অন্তরের কোন পরিবর্তন ঘটে না যুগ-যুগান্তরের সাধনার ভারতবাসীর অন্তরে সঞ্চিত হয়েছে পরলো লুপ্ত আত্মা, বৈষয়িক ভোগের একান্ত বিতৃষ্ণা, ত্যাগের অসামর্থ্য তেজ—ঈশ্বর ও অবিদ্যার আত্মার জলন্ত বিশ্বাস। ভারতে যুগে কত আতি বিজয়দর্প প্রবেশ করেছে—এসেছে কত বিসংস্কৃতির ধারা। কিন্তু ভারত তার নিজ বৈশিষ্ট্যকে হারায়নি আবার নূতন সংস্কৃতির ধারাকে অবমাননা করে বিতাড়িতও করেনি সব গ্রহণ করেছে নিজের মধ্যে। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে যোগসূত্র। মিলিত হয়েছে উভয়ে—কিন্তু একে অস্ত্রের মধ্যে লুপ্ত হয়নি। মুসলমান এসেছে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে—ইউরোপীয়েরা এসেছে তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে কিন্তু কোন সংস্কৃতিই ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতিকে নষ্ট করবে পারেনি। তবে তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে অনেক কিছু। ভারত কখনও কাউকেই ফেরায়নি—সকলকেই আপন করে নিয়েছে—এটাই হ'ল তার একের সাধনার পরমদান। ভারতের আপন রহস্য নেওয়ার এই আসক্তি ও অত্মকে লয় করে না দেওয়ার বৈরাগ্য হারা দিয়েছে নানা সংস্কৃতিকে পাশাপাশি।

ধর্ম্মের ব্যাপারে আমরা দেখি, বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মধ্যে ঐক্য সেতু ভারতই রচনা করেছে। ভারত কখনও কাউকেই উচ্ছন্ন করেনি, সকল ধর্ম্মমতকেই স্থান দিয়েছে নিজের ধর্ম্মমতের পাশে তারই ফলে দেখি হিন্দু, পার্শি, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি পাশাপাশি ভারতে জালিত-পালিত। শুধু তাই নয়—স্বর্গীয়ভাবে মহাসমন্বয়ে সৃষ্ট হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে সব মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা চেষ্টা করেছেন সব ধর্ম্ম সমন্বয়ের—খুঁজছেন মূল সূত্র—বা দিচ্ছে সমস্ত মতের ঐক্যকে বেঁধে রাখা যায়। আমায় যুগ পুরুষ রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গানদী তীরে সাধনার সিঁড়ি করে ঘোষণা করেছেন বিশ্ববাসীর নিকট, সমস্ত ধর্ম্মমতই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অন্তর্গত হানে পৌঁছবার বিভিন্ন পথ মাত্র। একমু ভারতবাসী বিবেকানন্দই বিশ্বকে ভনাইয়েছেন উপনিষদের সা মৈত্রী ও মিলনের বাণী—জানাইয়াছেন জগৎকে—বিশ্ববাসী সকল ভারতের পুত্র, সকলেই তাই—অনন্ত সৃষ্টির একস্রাবতি

মহুযজ্ঞাতি এবং বিবেকানন্দের এই শাস্ত বাণীই

দেব—
East is East, and West is West,
Their win shall never meet—

বীভূতক স্বত্বকে ধ্বংস করেছে। আমাদের কবি
ই মহামিলনের গান :—

"হে ক্ষত্রবীণা বাজো, বাজো, বাজো,
সুণা করি দূরে আছে বাবা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে পাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

তারে অস্তের ধর্মকে সুণা না করে তার মধ্যে সত্যের
কোন একমাত্র ভারতেই হয়েছে—এ তা ভারতীয় সংস্কৃতির
তাইতো আজ পৃথিবীর শতকোটি লোক দক্ষিণেবের
পাশে মিলিত হয়েছে—গেয়েছে আমাদের মহামিলনের গান।
এই সংস্কৃতির এই পরিচয়ই শাস্ত—বা ভারতবাসীকে দিয়েছে
যে প্রেমরাজ্যের সন্ধান—করেছে তাকে অহিংসপ্রেমিক। তাই—
"India offers unity in diversity" এ কথায় সত্যতা
ই আমরা দেখতে পাই।

ইবার আমরা ভারতীয় রাজধর্মের বর্ধিত স্বরূপটিকে দেখতে
ভারতবর্ষের রাজধর্ম ত্যাগের মহিমায় মগ্নিত। বরীন্দ্রনাথ
কবিতায় এই রাজধর্মেরই মহিমা কীর্তনে ব্রতী হইয়াছেন—
এই আদর্শকে রূপায়িত করেছেন উদাহরণের মাধ্যমে। বিশেষতঃ
"প্রতিনিধি" কবিতায় দেখতে পাই—ভারতীয় নৃপতির
আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন—নৃপতি
শিবী ও গুরুদেব রামদাস বাবাজীকে। একটা কাহিনীর
সারাংশ করে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন—ত্যাগমগ্নিত প্রতিনিধিই
ভারতীয় রাজ ধর্মের স্বরূপ। গুরুরামদাস শিব্য শিবাজীকে ভারতের
জন রাজধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। শিব্যকে তিনি সর্কৃত্যাগী
করিয়েছেন—আবার তাকেই প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করার ভার
দিয়েছেন—শাসককে টেনে এনেছেন শাসিতের অতি নিকটে।
এই নিঃস্বার্থ প্রেমন্নাত সান্নিধ্যই ভারতে শাসককে পিতার আসনে
আসন্ন শাসিতকে পুত্রের আসনে বসাইয়াছে। প্রতিষ্ঠিত করেছে
সর্বসম্বন্ধিত উন্নত মহুযজ্ঞকে।

"এ দেশের রাজারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ঐশ্বর্য—বৈজ্ঞবের
সমারোহ প্রদর্শন করতেন না—ভোগ বিলাসে নিমগ্ন থেকে জীবন
অতিবাহিত করতেন না। রাজ্যশাসন—প্রজাশাসন ব্যাপারটিকে
তারা উচ্চতর মানব ধর্মেরই অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। অধ্যাত্মতত
ভারত যুগ যুগ ধরে যে প্রদীপ্ত মহুযজ্ঞের সাধনা করেছে ভারতের
নৃপতিবৃন্দও উহাকে নত মস্তকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। যুগ-প্রাচীন
ভারতে সেই সাধনার—সেই তপস্যার প্রেরণাবশে মহুযজ্ঞ ও
ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে রাজ্যের অধীশ্বর প্রজাপুত্রের সেবার
আপনাকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিতেন। ইহাই ভারতবর্ষের চিরন্তন
রাজধর্ম। রাজর্ষি জনক, রাজা ভরত, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি এই
রাজধর্মই পালন করে গেছেন।"

"তেন ত্যাগেন ভূজীবাঃ যা গৃধঃ"—উপনিষদের মহাবাণীই
ভারতের রাজধর্মের আদর্শকে প্রকটিত করে। আধ্যাত্ম ভারতবর্ষ
তার রাজধর্মকে শিখিয়েছে—তাজিতে মুকুটলগ্ন সিংহাসনভূমি—
ধরিতে দরিদ্রবেশ। কারণ ভারতীয় দৃষ্টিতে রাজা বিশ্বপতির
প্রতিনিধি মাত্র। বিশ্বাধিপতির এই বিশাল রাজ্যে রাজা তাঁহার
প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করেন। সেও তাঁহার রাজ্যের একজন
সামান্য প্রজা বই আর কেউ নয়। কাজেই বিশ্বপিতার অচুল
ঐশ্বর্য বা তাঁহার সমস্ত প্রজাবৃন্দের মঙ্গলের জন্য প্রতিনিধি তথা
রাজার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহাকে বখোছ ব্যবহার করবার
অধিকার তাঁর নেই। কিন্তু প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে লোভ সংবরণ করে
প্রজারঞ্জন করা বড় শক্ত। তাই এদেশের সর্ব সাধারণের মঙ্গলের
জন্য রাজাকে নিতে হয়েছে ত্যাগের দীক্ষা। কারণ ত্যাগের আগুনে
লোভ, মোহ ইত্যাদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার, তারই উপর
প্রতিষ্ঠিত হয় কর্তব্যপালনের অদম্য অটল ইচ্ছাশক্তি। কর্তব্য
পালনে শৈথিল্য আসে ভোগ লালসা থেকে—আর এই শৈথিল্যই
আনে সকলের জীবনে মহাঅকল্যাণ অঙ্কুরিত করে মহাঅসুখের
বীজকে। রাজা যদি কর্তব্য পালন না করেন, তবে অপরাধী তথা
মহাপাপী হন। আর সেই পাপের ফল ভোগ করে তাঁর সন্তানগণ—
তাঁর প্রজাবৃন্দ। তাই এই ধর্মের হাত থেকে—কর্তব্যশৈথিল্যের মহা
অপরাধ হ'তে দেশকে—প্রজাগণকে বাঁচানোর জন্য রাজাকে শিখতে
হয় রাজধর্ম—ত্যাগমগ্নিত কর্তব্যপরায়ণতা। ভারতবর্ষ এই সত্য
জানিত—তাই তার নৃপতির আদর্শ ঐরূপ।

যে বীর, সে-ই ত্যাগ করিতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের
ভয়ে একহাতে চক্ষু মুছিয়া থাকে, আর একহাতে দান করে;
তাঁহার দানে কি ফল? অগতঃ প্রেম অনেক দূর। চারাগাছটিকে
ঘিরিয়া রাখিতে হয়, বড় করিতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থ
ভালবাসিতে শিখিতে পারিলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা
যায়। ইষ্টদেবতারিশেষে ভক্তি হইলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্ম শ্রীতি
হইতে পারে। অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করিতে পারিলে
তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা বলা উচিত, উহার আগে নহে।
সকাম হইতেই নিঃকাম হয়। কামনা না অগ্রে থাকিলে কি
কখন তাহার ত্যাগ হয়? আর উহার মানেই বা কি? অন্ধকার

